

CUK 405187 75-P3045

চিত্র-সূচী

75

রঙীন চিত্র

পাখী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
মাথা—শ্রীঐবদ্যনাথ দাস
নী—শ্রীভিলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
ধনাশ্রী—শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী
শ্রীনিশীথকুমার মজুমদার

একবর্ণ চিত্র

কুমার বহু
একটি মোটর-রাস্তা
কিশোর আন্দোলন
ক্যাম্প-স্কুলে ছেলেরা ক্ষেত্রের কাজে রত
ক্যাম্প স্কুলে মেয়েরা নিজের নিজের কাজ করছে
ছেলেদের আনন্দ-কেন্দ্র
বোমা-বিধ্বস্ত শহরের চীনা ছেলেরা ইতিহাস পড়ছে
সাগর-তীরে শহরের ক্যাম্প-স্কুল
স্কুলের ছেলেরা একমনে গল্প শুনছে
ডো
উকু নাচ
কাঠমাড়ো
গোঁসাইগিরি
বাগাঙ্কুন
বাঁহুঘর
শ্রীঅনিলকুমার মাইতি
শাস্তিত অবস্থায়—ঐ
বহারী দে
পাণ্ডা
পকলস্ব ভূবার-পর্বত বিদারণে উত্তত 'কাটার'
হুইট ভূবার-পর্বতের মধ্যবর্তী ভূবার-স্থূপ-বিদারণ-
'কাটার'
এবং যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা অভিবাদন-রত সম্মিলিত
বাহিনী
হান বহু
ও বকেট
নাথ গল্পোপাধ্যায়
রায়
হা
র পরিকল্পনা
নাথ মিত্র
নাথ শাস্ত্রী
দত্ত
কুজার
শিব
তে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের সদস্যর
বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি
বিক শক্তির ভবিষ্যৎ
সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার

বিষ্ণুর জীবিক্রম : বামনাবতার

বৌদ্ধমূর্তি

৪২১-৬

—পদ্মপাণি লোকনাথ
—মারাচি
—রত্নসম্ভব
—লোকনাথ
ব্রিটিশ নববর্ণমেটের রাজপথ গবেষণাগার
ভগীরথ ও গঙ্গা
মার্কিন উপকূল-রক্ষী হেলিকপ্টার
মাল্যাকার পথে

—আকসের হিডুম, পেনাড
—ক্রাগন রোড
—জেনারেল পোষ্ট আপিস
—টাউন হল, সিঙ্গাপুর
—প্রাচীন দুর্গ-তোরণ, মালাক্কা
—ফার্ডিনেন্ড গার্ডেন
—বর্ণা রোড
—বোষ্টন এণ্ড কোম্পানীর দোকান
—বৌদ্ধ মন্দির, আনন্দান রোড
—মসজিদ
—রেজ নাট্য-গৃহ
—রেন কোর্স
—রোমান ক্যাথলিক গির্জা, আনন্দান রোড
—'সিটি-লাইট' নৃত্য-শব্দন
—স্থলীম কোর্ট
—হাসপাতালের একাংশ

মিসিসিপি নদী

—ইডস ব্রিজের নীচে আধুনিক থেরা নৌকা
—ইম্পাতের বজরা
—ভার গমের ক্ষেত
—মডেলের একাংশ

মুক-বধিরের শিক্ষা

—গুপ্ত-পাঠ
—প্রাক্তন ছাত্রের কারখানা
—ভূগোল শিক্ষা
—মুকবধিরদের ছাপাখানার কাজ
—মোহিনীমোহন মজুমদার
—স্পর্শ দ্বারা স্বর শিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্র

—আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত রেল স্টেশন
—ইলিনয়সের পশ্চিম অঞ্চলে নূতন পরিকল্পনায় নির্মিত
একটি যন্ত্রা-নিবাস
—কৃত্রিম হ্রদ মিড
—টেক্সাস স্টেটে সিনথেটিক রবার তৈরি করিবার
যন্ত্রের অত্যুচ্চ ব্যুৎপন্ন
—দক্ষিণ-পাশ্চম অঞ্চলের তৈল-কোম্পানীতে অভূত
আকারের ট্যাঙ্ক
—হুইট বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র

—পশ্চিম উপকূলস্থ একটি শহরের 'সিটি হলে' সংশ্লিষ্ট ঢালু পথ	৪৩০	হুশোভন দত্ত	...
—পুর্নোৎসবের রেল-স্টেশন	১৪৫	সংক্রামক বর্ষ প্রতিবেদক ডিডিট	৫৫৩
—বোম্ভার বোম্বের বিরাট জেনারেলের সমুহ	১১৩	হাজারিবাগ	...
—মার্কিন সৈন্যবাহী জাহাজ 'কুইন মেরী'	১৪৪	—চালের কাজ	...
—মিশিগানের ডিট্রয়েটে অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত	...	—তেলিমন্দির	...
কাচের প্রাচীরযুক্ত 'ডব্লিউ ট্রাক প্লান্ট'	৩১৫	—বেগুন	...
—লুশিয়ানা স্টেটের তৈলের কারখানায় গ্যাসোলিন	...	—রামগড় হইতে রাজকুমার পথে প্রাচীন শিবমন্দির	...
উৎপাদক বস্ত্র	৪৮১	—শিবমন্দিরের নিকট-দৃশ্য	...
যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী-মেলা	১৭২-৪	—সোনাহত নদীপথে	...
যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প	...	হুগলী	...
—তৈল-কুপ খনন	৫২২	—ইমামবাড়ার ভিতরের দৃশ্য	...
—তৈল-ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড	৫২১	—ইমামবাড়ার সম্মুখের দৃশ্য	...
ক্রীষোত্তমমোহন সাহা	২৬	—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...
মৌন-পরিবর্তন	৬২-৫	—দাতা গৌরীসেন প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির	...
রজ্জুর সাহায্যে উপকূলরক্ষী জাহাজ হইতে চিকিৎসকের মার্চেন্ট	...	—প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি	...
জাহাজে অবতরণ	২৪১	—ব্যাণ্ডেল গির্জা	...
রাগ দীপক	৩৯২	—হাজী মহম্মদ মহসীন	...
রাগ ভৈরব	৩৯২	—সমাধি-স্তম্ভ	...
রাজকুমার রায়	২৪৬	হুগলীতে বাধকাব্য	...
রোগাক্রান্ত মার্কিন নৌ-বহুশিল্পীকে খাটুলিতে করিয়া	...	—উদনা বাধ	...
'সি-প্লেনে' গমন	২৬৮	—গোপালদহ বাধ	...
সমুদ্রে দুর্গতদের উদ্ধারকল্পে উপকূলরক্ষী 'কাটার' এবং	...	—গোপালদহে নদীর চরে 'কেশের কুড়ে'	...
বিমানের একদলে গমন	২৬৯	—বোরো অঞ্চলের নজা	...
হৃদয়ের বর্ধমান অবস্থা	৩৯৩	—ভুয়েড়া বাধ	...

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

ক্রীষ্ণভাসী বহু	...	ক্রীষ্ণভাসী পাল	...
—ক্ষুদ্র বিশ্ব ও বিশ্বতত্ত্ব	২৮	—সঙ্গীত (কবিতা)	...
ক্রীষ্ণনাথবন্ধু দত্ত	...	আকবর আলি, এম	...
—গ্রীষ্মমণ্ডলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটি দিক	৫০৮	—একাদশ শতাব্দীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া	২
ক্রীষ্ণনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ক্রীষ্ণাদিত্য ওহদেদার	...
—মমতাহীন মৃত্যু (গল্প)	৫১৫	—কুমারী (গল্প)	...
ক্রীষ্ণপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	...	আশরাফ সিদ্দিকী	...
—গাঁয়ের মাটির পরশ আর কি পাবে? (কবিতা)	৪৮০	—স্মৃতি (কবিতা)	...
—জাহানকোষার জীবন জাগ্রত হ'ল (কবিতা)	৬১	ক্রীষ্ণান্তোষ ভট্টাচার্য	...
ক্রীষ্ণবনৌমোহন চক্রবর্তী	...	—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য	...
—আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রগণের কথা	৪৩৬	ক্রীষ্ণান্তোষ সান্তাল	...
ক্রীষ্ণমরমোহন মুখোপাধ্যায়	...	—স্বপ্নশেষ (কবিতা)	...
—মার্কিন ঔপন্যাসিক ডব্লিউ প্যাসস	২৯৬	ক্রীষ্ণিন্দ্রা দেবী চৌধুরাণী	...
ক্রীষ্ণমলকুমার মাল	...	—রবীন্দ্র সঙ্গীতদার	...
—শান্ত মোরা (কবিতা)	৩০৪	ক্রীষ্ণমলরাণী মিত্র	...
ক্রীষ্ণমিতাকুমারী বহু	...	—জাগে (কবিতা)	...
—মহারাজ্ঞী নারী	৫২৫	ক্রীষ্ণকরণাম্বর বহু	...
ক্রীষ্ণমিয়াকুমার দত্ত	...	—পূর্ণিমার রাত্রি ঘেন (কবিতা)	...
—পৃথিবীর আবহাওয়া	৪৭১	—রাতের কাহিনী (কবিতা)	...
ক্রীষ্ণশোক চট্টোপাধ্যায়	...	ক্রীষ্ণকালিকারঞ্জন কানুনগো	...
—সাম্য	১৬০	—কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম	...
		—শাহজাদা দারাসুজ্জোর জীবন-কাহিনী	১২২, ২৬৬

গীতিকর সেনগুপ্ত		—আমেরিকার অগ্রগতি—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্মাণে	
সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা	... ২৬৯	অভিনব পদ্ধতি (সচিত্র)	... ৪২৮
রমাল দাশগুপ্ত		—যুক্ত রাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প (সচিত্র)	... ৫২১
—সমাধান (সচিত্র নাটিকা)	... ১৩২	—সংক্রায়ক বাধি-প্রতিষেধক ডিউটি (সচিত্র)	... ৬১৩
—বাসব (সচিত্র নাটিকা)	... ৬২১	শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র	
পালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		—বিদ্যালয়ে দলগত ধর্মশিক্ষা ও তাহার প্রভাব	... ৮৩
—পরমানবিক শক্তির ভবিষ্যৎ (সচিত্র)	... ২৮৩	—বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ	... ২৮৮
—যৌন পরিবর্তন (সচিত্র)	... ৬২	শ্রীনীলিমা দত্ত	
বিল্ব চক্রবর্তী		—পঞ্চের ডাক (কবিতা)	... ৩৮৮
—দ্বীপের মেয়ে (কবিতা)	... ৩৯২	শ্রীপ্রেমমোহন মজুমদার	
—রমোহন দাস দে		—মুক-বধিরের শিক্ষা (সচিত্র)	... ১৫৬
—মাল্যকার পথে একদিন (সচিত্র)	১৮৬, ২৪৮	শ্রীগঙ্গানন্দ চক্রবর্তী	
—শিশুচন্দ্র ঘোষ		—মনবিহঙ্গ (কবিতা)	... ৫৩৬
—উমেশ পণ্ডিত (গল্প)	... ৪১৬	শ্রীপারমল গোস্বামী	
—শিশুচন্দ্র দে		—নতুন পরিচয় (সচিত্র গল্প)	... ২৩
—হিন্দী ভাষায় লিঙ্গ প্রকরণ	... ৫৩৪	—হাজারিবাগ ভ্রমণ (সচিত্র)	... ৫৮৫
—বাংলা ভাষায় অ-বাংলা শব্দ	... ৬৫৫	শ্রীমী প্রজ্ঞানন্দ	
—প্রকুমার নাগ		—রামায়ণে সঙ্গীতের কথা	... ৬১৫
—বুড়াবুড়ির তট	... ২৯২	—সঙ্গীত মকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ	... ৪৫
—তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		শ্রীদণ্ডিভূষণ চক্রবর্তী	
—জেট ও রকেট (সচিত্র)	... ১৩৭	—দার্শনিক (গল্প)	... ১৯৫
—সোভিয়েট কৃষি-উন্নয়নে বিজ্ঞান	... ৬৩৩	বজ্রলুর রশ্মি, এ, এন, এম	
গোবিন্দরায়		—পাঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)	... ১৭৪
—ঋতু-চক্র (কবিতা)	... ৩৭২	—“বৃক্ষ ইব দিবি স্তব্ধ” (কবিতা)	... ৫৫০
—শীপ দে চৌধুরী		বাঙালী গৃহিণী	
—স্পর্শ (কবিতা)	... ৪৯৪	—আমাদের আয় ও খাদ্যব্যয়ের মূল্য	... ১৯০
—নেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	... ৬০৩	—বস্ত্র বেশনিং ও বাঙালী সংসার	... ৬৭
—ইটী বিদ্যালয়কার		শ্রীবাণী রায়	
—বেঙ্গলনাথ চট্টোপাধ্যায়		—নার্স (গল্প)	... ৩৬৯
—ইংরেজী শিক্ষা, না জাতীয় শিক্ষা	... ৩০২	শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী	
বেঙ্গলনাথ দাশ		—রবীন্দ্রনাথ	... ৩৮৯
—অপরাজিতা (কবিতা)	... ৪৭০	শ্রীবিজয়গোপাল বহু	
—প্রথম সাধনা (কবিতা)	... ৬৩৭	—দক্ষিণ-খানপুরের প্রভু-সম্পদ	... ৫৩৭
দীপেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র		শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়	
—অমৃতের হেথা আসন পাতা (কবিতা)	... ৬১০	—বাঙালীর বাংলা	... ৫৬
—শুভক্ষণ (কবিতা)	... ৪২০	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	
—গঙ্গানাথ চন্দ্র		—অসমীয়াদের রন্ধন ও ভোজন-পদ্ধতি	... ৬২৮
—ভারতে সমাজতন্ত্র	... ১৯৮	শ্রীবিমলাচরণ দেব	
উদ্দিন আহমদ		—কৃপা	... ৫০
—পরমাত্মার পরিণতি	... ৪৮৫	শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত	
—বাংলাদেশের নদী-সমগ্র ও তাহার প্রতিকার	... ১৬৪	—বিপরীত (গল্প)	... ৪৭৭
—গোপাল চক্রবর্তী		শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
—গিগল কি সত্যই বিকৃত মস্তিষ্ক	... ৪৪০	—নব-সন্ন্যাস (উপন্যাস)	৫৬, ১৪৮, ২৫২, ৪০০, ৪৯৫, ৫৭৫
—গোমদেব চৌধুরী		শ্রীব্রজসুন্দর রায়	
—ঋগ্বেদের দাস ও দহা	... ৪০৯	—বাধীন ভারতের স্বাধীনসমগ্র	... ৬০০
—বৈদিক আর্ঘ্য ও আবেস্তিক আর্ঘ্য	... ১৪২	শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
—মলিনীকুমার ভদ্র		—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সচিত্র)	... ৫৯১
—আমেরিকার বাণিজ্য-সরনী মিসিসিপি (সচিত্র)	... ৬৬	—নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী	... ৬০
—যুক্তরাষ্ট্রের পল্লীমেলা (সচিত্র)	... ১৭২	—নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায় (সচিত্র)	... ২৪৫
—যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগ (সচিত্র)	... ২৬৭		

—বাংলায় গদ্য কবিতার সূচনা	...	৩৭৩	শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	...
—বাংলায় প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র (সচিত্র)	...	৩৯০	—নবীনচন্দ্র (কবিতা)	...
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রলাল সাহা	...		—প্রমথ চৌধুরী (কাবিতা)	...
—সংস্কৃতির রূপ	...	৬৩৮	শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস	...
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	...		—পথ (কবিতা)	...
—হৃদয়-আগন (কবিতা)	...	২৬১	শ্রীমোহনলাল ভট্টাচার্য্য	...
শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী	...		—কিবা চাই (কাবিতা)	...
—হিন্দুবিবাহ-সংস্কার	...	৬৩৩	শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত	...
শ্রীমনোজমোহন রায়	...		—দক্ষিণ আটলান্টিকে ভেলা-বকে	...
—আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়	...	৫০৫	—নাৎসী-কুজারে (সচিত্র)	...
শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...		শ্রীনাথনন্দন বসু	...
—জাগর স্বপ্ন-বিলাসী	...	২৭৮	কল্কণার রাত (গল্প)	...
—পেশাদার জুয়াড়ী বা দূতকার	...	৭৮	শ্রীহরিশঙ্করবিমল মুখোপাধ্যায়	...
—সনঃসমীক্ষকের কৌতুহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা	...	৫১২	—শোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমতা এবং তাহার সমাধান	...
মুনি শ্রীকান্ত সাগর	...		—“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে...”	...
—অদৃশ্য লিপি	...	৬৩৯	শ্রীহৃদীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী	...
শ্রীসুরারিপ্রসাদ গুহ	...		—প্রহেলিকা (কবিতা)	...
—গ্রীষ্মের ফল আম	...	৮৮	শ্রীহৃদীরকুমার নন্দী	...
শ্রীধোগানন্দ ব্রহ্মচারী	...		—এ কিসের আলোড়ন (কবিতা)	...
—বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি	...	৬৩৬	—রাব প্রণাম (কবিতা)	...
শ্রীধোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...		শ্রীহৃদীরকুমার মজ	...
—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টির রূপ-	...	৭০	হুগলী (সচিত্র)	...
—বিজয়পুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তির পরিচয়	...	২৩৭	শ্রীহুনীলকুমার পাণ্ডা	...
শ্রীধোগেন্দ্রনাথ রায়, বিজ্ঞানবিধি	...		কাঠমাড়ো (সচিত্র)	...
—“বাংলায় প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র” (আলোচনা)	...	৬২৭	শ্রীহৃৎকমল রায়	...
—বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম : বামনাবতার (সচিত্র)	...	৪২১	—রাসায়নিক কারিগর “এনজাইম”	...
—বিষ্ণুর বরাহ ও কুর্ম অবতার (সচিত্র)	...	২৩৩	শ্রীহৃৎবোধ রায়	...
—বিষ্ণুর মৎস্য অবতার (সচিত্র)	...	৫৬৯	—এরা (কবিতা)	...
শ্রীরঞ্জিত সিংহ	...		—ঘন্দ (কবিতা)	...
—ইংলণ্ডের কিশোর আলোলন (সচিত্র)	...	৪৮১	—নেতাজী (কবিতা)	...
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়	...		শ্রীহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	...
—হুগলীতে বাধকার্য্য (সচিত্র)	...	৩২	—হমস্তুের পত্র	...
শ্রীরবীন চৌধুরী	...		সুলতানুল আলম চৌধুরী, এ বি মোহাম্মদ	...
—প্রেমধর্ম	...	২০২	—আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা	...
শ্রীরমা চৌধুরী	...		শ্রীহুশালকুমার দে	...
—বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা	...	২৯৯	—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা	...
শ্রীরাণী চট্টোপাধ্যায়	...		শ্রীহুহুচন্দ্র মিত্র	...
—জিজ্ঞাসা (কবিতা)	...	৫১৪	—শেয়ার-বাবসারী	...
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	...		শ্রীহৃদ্যপ্রসন্ন বাজপেয়সী চৌধুরী	...
—ভয় (গল্প)	...	৩৭	—রাষ্ট্র ও রাজা	...
—ধন্যবাদ (“)	...	২৩৯	শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস	...
—উন্নতি (“)	...	৫২৬	—বাংলাদেশে আভিষিধানের আবাদ	...
শ্রীশ:	...		শ্রীহিরণ্ময় তরফদার	...
—“হুখে আছি”	...	১৮৩	—কান পেতে শুনি (কবিতা)	...
শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায়	...		শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক	...
—সৌরজগতের উৎপত্তি	...	৩৮৫	সেতু (গল্প)	...

বিষয় সূচী

পি—মুনি শ্রীকান্ত সাগর	... ৬৩৯	বন্দ (কবিতা)—শ্রীহরবোধ রায়	... ৬১৫
তা (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ	... ৪৭০	ঘোপের মেয়ে (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী	... ৩৯২
হেথা আসন পাতা (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র	... ৬১২	ধন্যবাদ (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	... ২৩৯
দের রক্তন ও ভোজন-পদ্ধতি—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	৬২৮	নতুন পরিচয় (সচিত্র গল্প)—শ্রীপরিমল গোস্বামী	... ২৩
আরবী সাহিত্যের ধারা		নব-সন্ধ্যা (উপন্যাস)	
বি, মোহাম্মদ হুসাইন আলম চৌধুরী	... ৩৯৬	— শ্রীবিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ৬৬, ১৪৮, ২৫২, ৪১০, ৪৯৫, ৫০৫	
আর ও বাগ্‌দাদবোর মূল্য—বাঙালী গৃহিণী	... ১৯০	নবীনচন্দ্র (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৪৪
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—শ্রীমনোজমোহন রায়	... ৫০৫	নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৬০
শিক্ষা সম্বন্ধে ছ'চারটি কথা—শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী	... ৪৩৬	নাট্যকার ও নব-ছন্দ-প্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায় (সচিত্র)	
র অগ্রগতি—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্মাণে অভিনব		—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৪৪
ত (সচিত্র)—শ্রীললিতাকুমার ভদ্র	... ৪২৮	নাংসী-কুজারে (সচিত্র)—শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত	... ৫২৮
র বাণিজ্য-সরণী মিসিসিপি নদী (সচিত্র)		নার্তসু (গল্প)—শ্রীবাণী রায়	... ৩৬৯
ললিতাকুমার ভদ্র	... ৬৬	নেতাজী (কবিতা)—শ্রীহরবোধ রায়	... ১৬৩
	... ৬২৭	পঁচিশ বৈশাখ (কবিতা)—এ. এন. এম. বজলুর রশীদ	... ১৭৪
শিক্ষা, না জাতীয় শিক্ষা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	... ৩০২	পথ (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্র বিদ্যাস	... ৫৫২
কিশোর আন্দোলন (সচিত্র)—শ্রীরঞ্জিত সিংহ	... ৪৮১	পথের ডাক (কবিতা)—শ্রীলীলামা দত্ত	... ৩৮৮
গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	... ৫৯৬	পরমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ (সচিত্র)	
ত (গল্প)—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ	... ৪১৬	—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	... ২৮৩
ন ও দহা—শ্রীনীলমোহন চৌধুরী	... ৪০৯	পরমাণুর পরিণতি—নছিমউদ্দিন আহমদ	... ৪৮৫
কবিতা)—শ্রীজীবনময় রায়	... ৩৭২	শাগল কি সতাই বিকৃত-মস্তিষ্ক	
তাকীর রানায়নিক প্রক্রিয়া—এম. আকবর আলি	... ৪৩২	— শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী	... ৪৪০
আলোড়ন (কবিতা)—শ্রীহরীকুমার নন্দী	... ৬০৪	পুস্তক পরিচয়	... ৯৯, ২০৮, ৩৩৭, ৪৪৩, ৫৪০, ৬৪৯
বিতা)—শ্রীহরবোধ রায়	... ৩৮৪	পূর্ণিমার রাত্রি যেন (কবিতা)—শ্রীকরণাময় বসু	... ১৮৫
আলোচনায় নতুন দৃষ্টি—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়	... ৬০৫	পৃথিবীর আবহাওয়া—শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত	... ৪৭১
(সচিত্র)—শ্রীনাথনচন্দ্র বসু	... ২৮০	পেশাদার জুহাড়া বা দাতকার—শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৭৮
র দেশপ্রেম—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো	... ১৭	প্রমথ চৌধুরী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	... ৬২৫
(সচিত্র)—শ্রীমুনীলকুমার পাল	... ৫৩	প্রহেলিকা (কবিতা)—শ্রীহরীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী	... ১৩৬
ওনি (কবিতা)—শ্রীহিরণ্য তরফদার	... ৫৯০	প্রেমধর্ম—শ্রীরবীন চৌধুরী	... ২০২
—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	... ৮৭	প্রেম-সাধনা (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ	... ৬৩৭
গল্প)—শ্রীআদিত্য ওহদেদার	... ৮০	বঙ্গ রেশনিং ও বাঙালী সংসার—জটনকা বাঙালী গৃহিণী	... ৬৭
বমলচরণ দেব	... ৫০	বাঙালীর বাংলা—শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়	... ৭৬
বিশ্বতত্ত্ব—শ্রীঅতনী বসু	... ২৮	বাসব (সচিত্র নাটক)—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	... ৬২১
র পরশ আর কি পাবে ? (কবিতা)		বাংলাদেশে আউশ ধানের আবাদ—শ্রীহরগোপাল বিদ্যাস	... ৫২২
বপুর্নকৃত ভট্টাচার্য্য	... ৪৮০	বাংলাদেশের নদী-সমস্তা ও তাহার প্রতিকার	
বাস্তববাদী শোধনের একটি দিক		—নছিমউদ্দিন আহমদ	... ১৬৪
বাসবন্ধু দত্ত	... ৫০৮	বাংলা ভাষায় অ-বাংলা শব্দ—শ্রীজগদীশচন্দ্র দে	... ৬৫৫
ম—শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ	... ৮৮	বাংলায় গল্প কবিতার সূচনা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৩৭৩
ম—শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৭৯	বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র (সচিত্র)	
— ১)—শ্রীকমলরায়ী মিত্র	... ২৭	—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৩৯৩
জীবন জগত হ'ল (কবিতা)		"বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র" (আলোচনা)	
বৃক্ষ ভট্টাচার্য্য	... ৬১	—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	... ৬২৭
বিতা)—শ্রীরাণী চট্টোপাধ্যায়	... ৫১৪	বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধমূর্তির পরিচয় (সচিত্র)	
(সচিত্র)—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	... ১৩৭	—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	... ২৩৭
মুখোপাধ্যায় (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৫২১	বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা—শ্রীরমা চৌধুরী	... ২৯৯
টিকে ভেলা-বক্ষে—শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত	... ২৭৪	বিদ্যালয়ে দলগত ধর্মশিক্ষা ও তাহার প্রভাব	
রের প্রভু-সম্পদ—শ্রীবিজয়গোপাল বসু	... ৫৩৭	—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ	... ৮৩
— ১)—শ্রীগণভূষণ চক্রবর্তী	... ১৯৫	বিপ্লব (গল্প)—শ্রীবিজয়ভূষণ গুপ্ত	... ৪৭৭
দাশগুপ্তের জীবন-কাহিনী		বিবিধ প্রসঙ্গ	... ১, ১১৩, ২১৭, ৩৪৫, ৪৪৯, ৫৫৩
শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো	... ১২৯, ২৬২, ৩৬১	বিশ্বের ত্রিবিক্রম : বামনাবতার (সচিত্র)	
কথা (সচিত্র)	... ২৬, ২১৩, ৩৪৩, ৪৪৮, ৫৫১,	—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি	... ৪২১

বিষ্ণুর বরাহ ও কুর্শ-অবতার (সচিত্র)	...	২৩০	রাতের কাহিনী (কবিতা)—শ্রীকল্পা বসু	...
—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি	...	২৩০	রামায়ণে সঙ্গীতের কথা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	...
বিষ্ণুর মৎস্য অবতার (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	...	২৩০	রাষ্ট্র ও রাজা—শ্রীস্বর্ধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী	...
বুড়াবুড়ির তট—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ	...	২৩২	রাসায়নিক কারিগর “এনজাইম”—শ্রীস্বর্ণকমল রায়	...
বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী	...	২৩৬	শান্ত মোরা (কবিতা)—শ্রীঅমলকুমার মাল	...
বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ	...	২৩৮	শুভক্ষণ (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ	...
“বৃক্ষ ইব দিবি শুক্ল—” (কবিতা)—এ. এন্. এম. বজলুর রশীদ	...	২৪০	‘শেয়ার’-ব্যবসায়ী—শ্রীহৃৎচন্দ্র মিত্র	...
বৈদিক আর্ধ্য ও আবেস্তিক আর্ধ্য—শ্রীনরীমাদব চৌধুরী	...	২৪২	সংক্রামক ব্যাধি-প্রতিষেধক ডিউটি (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার	...
ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণা ও তাহার প্রতিক্রিয়া	...	২৪২	সংস্কৃতির স্বরূপ—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহা	...
ভয় (গল্প)—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	...	২৪২	সঙ্গীত (কবিতা)—শ্রীঅখিনা পাণ্ডা	...
ভারতে সমাজতন্ত্র—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ	...	২৪৮	সঙ্গীত মকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	...
মনবিহঙ্গ (কবিতা)—শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী	...	২৪৮	সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা—শ্রীকালীকঙ্কর সৈনগুপ্ত	...
মনঃসমীক্ষকের কোতুলোদৌগক অভিজ্ঞতা	...	২৪৮	সমাধান (সচিত্র নাটিকা)—শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	...
—শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪৮	সামা—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	...
মমতাহীন মৃত্যু (গল্প)—শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪৮	“সাহিত্য-সাধক চরিতমালা”—শ্রীহৃদয়লাল কুমার দে	...
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য	...	২৪৮	“সুখে আছি”—শ্রীশঃ	...
—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	...	২৪৮	সেতু (গল্প)—শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক	...
মহারাষ্ট্রে নারী—শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	...	২৪৮	সোভিয়েট কৃষি-উন্নয়ন বিজ্ঞান—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...
মহিলা-সংবাদ (সচিত্র)	...	২৪৮	সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমস্তা এবং তাহার সমাধান	...
“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে...”	...	২৪৮	—শ্রীহৃদয়লাল কুমার দে	...
—শ্রীহৃদয়লাল কুমার দে	...	২৪৮	সৌরজগতের উৎপত্তি—শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায়	...
মার্কিন ঔপন্যাসিক ভন্স প্যানাস—শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়	...	২৪৮	স্পর্শ (কবিতা)—শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী	...
মালাকার পথে একদিন (সচিত্র)	...	২৪৮	স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্তা—শ্রীব্রজেন্দ্র রায়	...
—শ্রীগৌরমোহন দাস দে	...	২৪৮	স্বপ্নশেষ (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল	...
মুক-বধিরের শিক্ষা (সচিত্র)—শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার	...	২৪৮	স্মৃতি (কবিতা)—আশু রাফ সিদ্দিকী	...
যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল রক্ষা বিভাগ (সচিত্র)	...	২৪৮	হটা বিভাগলঙ্কার—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...
—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	...	২৪৮	হস্তের পত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	...
যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী-মেলা (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	...	২৪৮	হাজারিবাগ ভ্রমণ (সচিত্র)—শ্রীপরিমল গোস্বামী	...
যুক্তরাষ্ট্রের পেটোলিয়াম শিল্প (সচিত্র)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	...	২৪৮	হিন্দীভাষায় লিঙ্গ প্রকরণ—শ্রীভগদীশচন্দ্র দে	...
যৌন-পরিবর্তন (সচিত্র)—শ্রীমোহনচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	২৪৮	হিন্দুবিবাহ-সংস্কার—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	...
রবি-প্রণাম (কবিতা)—শ্রীস্বর্ধ্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী	...	২৪৮	হুগলী (সচিত্র)—শ্রীস্বর্ধ্যপ্রসন্ন মিত্র	...
রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী	...	২৪৮	হুগলীতে বীধকার্য (সচিত্র)—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়	...
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টির রূপ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	২৪৮	হৃদয়-আসন (কবিতা)—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	...
রবীন্দ্র-সঙ্গীতসার—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	...	২৪৮		...

বিবিধ প্রসঙ্গ

অনাহারে মৃত্যু	...	২	কলিকাতায় লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”	...
অপচয়ের নমুনা	...	৪৫২	কলিকাতায় দাঙ্গা সন্ধিক্ষে চিন্তাশীল মুসলমানদের অভিমত	...
অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট গঠনে কংগ্রেসের আপত্তির কারণ	...	৩৪৭	কংগ্রেস ও লবণ-কর	...
আর্থিক উন্নতি সন্ধিক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব	...	৪৬৬	কংগ্রেস গবন্মেণ্টে কর্মচারীদের বেতন	...
আলিগড় হাঙ্গামা	...	১২৩	কংগ্রেস-প্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস	...
আসন্ন রেল-ধর্ম ঘট	...	২২৬	কুইনাইন	...
ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন রেশনিং	...	৭	কুড়িগ্রাম শহর স্থানান্তরের প্রস্তাব	...
উপযুক্ত শিক্ষা-বিস্তার সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়	...	১১৩	কৃষি-সমস্তা ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেস-গবন্মেণ্ট	...
ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব	...	৫৫৬	ক্যাভিনেট মিশনের মীমাংসা প্রয়াস	...
কত ব্যা কার্য সম্পাদনে পুলিশের অবহেলা	...	৩৫৭	খাতকদের দ্রবদ্রব্য	...
কতৃপক্ষের আধা	...	২২৬	খাজ অপচয়ের পরিমাণ	...
কলিকাতায় মিলিটারী লরীর উপদ্রব	...	৬	খাজসঙ্কট ও ভারতের খাজবরাদ	...
কলিকাতায় যানবাহন সমস্তা	...	৪৬২	খাজ সমস্তা সন্ধিক্ষে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি	...

খানাকুল খানায় বোরো ধানের চাষ	...	১০	বাংলার প্রধান মস্তুর দুই রূপ	...	৫৫২
গ্রামাঞ্চলে ঘূষের জাল	...	৩৬০	বাংলার বাজেট	...	৪, ৪৫১
গ্রামাঞ্চলে রেশনিঙের নমুনা	...	২২৪	বাংলার সমস্তা	...	২, ১১৪
গ্রামবাসীদের বাস্তবতা প্রতাপণ	...	১১	বিভিন্ন শিল্প সরকারী কতৃৎবাদীনে আনয়নের জন্ত আসাম	...	১২৪
গ্রামবাসীর অবস্থা	...	২২৩	সরকারের উত্তম	...	২৩২
চট্টগ্রামে পুলিশের অত্যাচার	...	১৩	বিরাজমোহন দাশগুপ্ত	...	১৪
২৪-পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন	...	১২০	বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদল	...	১৫
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবী	...	২৩০	বিহারে বাঙালী	...	৫৬৪
মিঃ জিন্নার জয়-পরাজয়ের হিসাব	...	৩৫০	বোম্বাই সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা	...	৪৫৫
ডাক ধম ঘট	...	৪৫৫	ব্যাক্তি কেরানীদের দাবি	...	৩৫১
ডাক বিভাগের ধম ঘট	...	৩৫১	ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওনাদার	...	৪৫৩
তমলুকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ	...	১১২	ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন	...	৪৬৩
দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্যে	...	৪৬৩	ভারতবর্ষে যক্ষ্মা নিবারণ চেষ্টা	...	১৩
দাবির উগ্রতা অবাস্তব	...	৫৬০	ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ	...	১২
দামোদর ক্যানেল-কর বৃদ্ধি	...	১২২	ভারতে বিলাতী মূলধন	...	২৫৬
দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে মার্কিন মিশনের অভিমত	...	৫৬২	ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও দেশীয় রাজ্য	...	১২৮
দুর্ভিক্ষের প্রথম পর্যায়	...	২২১	ভূলাভাই দেশাই	...	২১৭
নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশন	...	৩৪২	মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব	...	৫
নির্ব্বাচন গ্রহণ	...	৫	মুসলিম লীগ প্লানিং কমিটির দৃষ্টিতে মিশনের প্রস্তাবের	...	৫৫৩
নূতন জাতীয় গবর্নেন্ট	...	৫৫৩	অর্থনৈতিক ফলাফল	...	৫৬২
নৌকা বিভাগের কীতি	...	৫৬২	মোটরগাড়ীর কারখানার জন্ত জমি সংগ্রহ	...	৩৫৪
পাটচাষীর বিপদ	...	৩৫৪	যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্মচারীদের ঊনাদীপ্ত	...	১৪
প্রস্তর নিক্ষেপে চৈতন্যদায়	...	১৪	যুক্ত প্রদেশে বিদ্রোহ সরকার	...	২১২
ফরিদকোট ও কাশ্মীর	...	২১২	যুক্তপ্রদেশের এলেক্ট্রিক্যাল কারখানা	...	৩৫৬
সর ফ্রেডরিক বারোজ ও ডিমোক্রাসি	...	৩৫৬	যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে চাউলের দর	...	১
বর্ধশেষ ও নববর্ধ	...	১	রবীন্দ্রনাথ	...	১০
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিকতা	...	১০	রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি	...	২২২
বস্ত্র-সঙ্কট ও সরকারী বরাদ্দ	...	২২২	রেল-ধর্মঘট ও ধর্মঘটের নেতা	...	২
বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ	...	২	রেল-ধর্মঘটের নোটিশ	...	১০
বাঁকুড়ায় বস্ত্র-সঙ্কট	...	১০	লাহোর হুগে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার	...	৩৪৫
বাঙালীর ভবিষ্যৎ	...	৩৪৫	লীগ ও কংগ্রেস	...	১২২
বাংলা ও আসাম কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন	...	১২২	শশিকুমার সেনগুপ্ত	...	১২১
বাংলাদেশে স্থপতির ব্যবসা	...	১২১	অমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশ	...	১১৮
বাংলাদেশের ফুড কমিটি	...	১১৮	শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	...	৩৪৬
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ	...	৩৪৬	১৫ই আগস্টের পর	...	৩৫৭
বাংলা-সরকারের খাজ উপদেষ্টা কমিটি	...	৩৫৭	সন্দীপে নৌকাডুবি	...	১১৮
বাংলায় অন্নবস্ত্রের অবস্থা	...	১১৮	সরকারী অব্যবস্থার জন্ত যশোহর জেলার দুর্দশা	...	৫৬১
বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা	...	৫৬১	শ্রীমতী সরলা রায়	...	৫৬৩
বাংলায় চিনির বরাদ্দ হ্রাস	...	৭	সিভিল সার্ভিস	...	১১৩
বাংলায় পাকিস্থানের নমুনা	...	১১৩	সিমলার পর	...	২৩১
বাংলায় অন্ন-সমস্তার কতকগুলি কারণ	...	২২২	স্বাধীন বহু	...	৫৫৮
			হানাহানিতে লাভ কাহার		

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

মহাভারত (সচিত্র) ৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—	
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—এ	১০
চাটাজির পিকচার এল্বাম	
(১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে)	প্রত্যেক ৪০
চিরন্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী	৪০
উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)—এ	২০
সোনার খাঁচা—	২৫
শ্রীসীতা দেবী	
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) এ	১০
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) এ	২০
উজ্জ্বলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২৫
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীযুনাথ মল্লিক	৪০
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১৫
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১৫
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১০
চণ্ডীদাস চরিত—(৬কৃষ্ণপ্রসাদ সেন)	
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত	২৫
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য	৪৫
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)—	
শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪০
পাথুরে বাদর রামদাস (সচিত্র)—	
শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১৫
জল্পনা—শ্রীহেমলতা দেবী	১০
খেলাধুলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৫
বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য	১০
ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ	১৫

ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০/২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

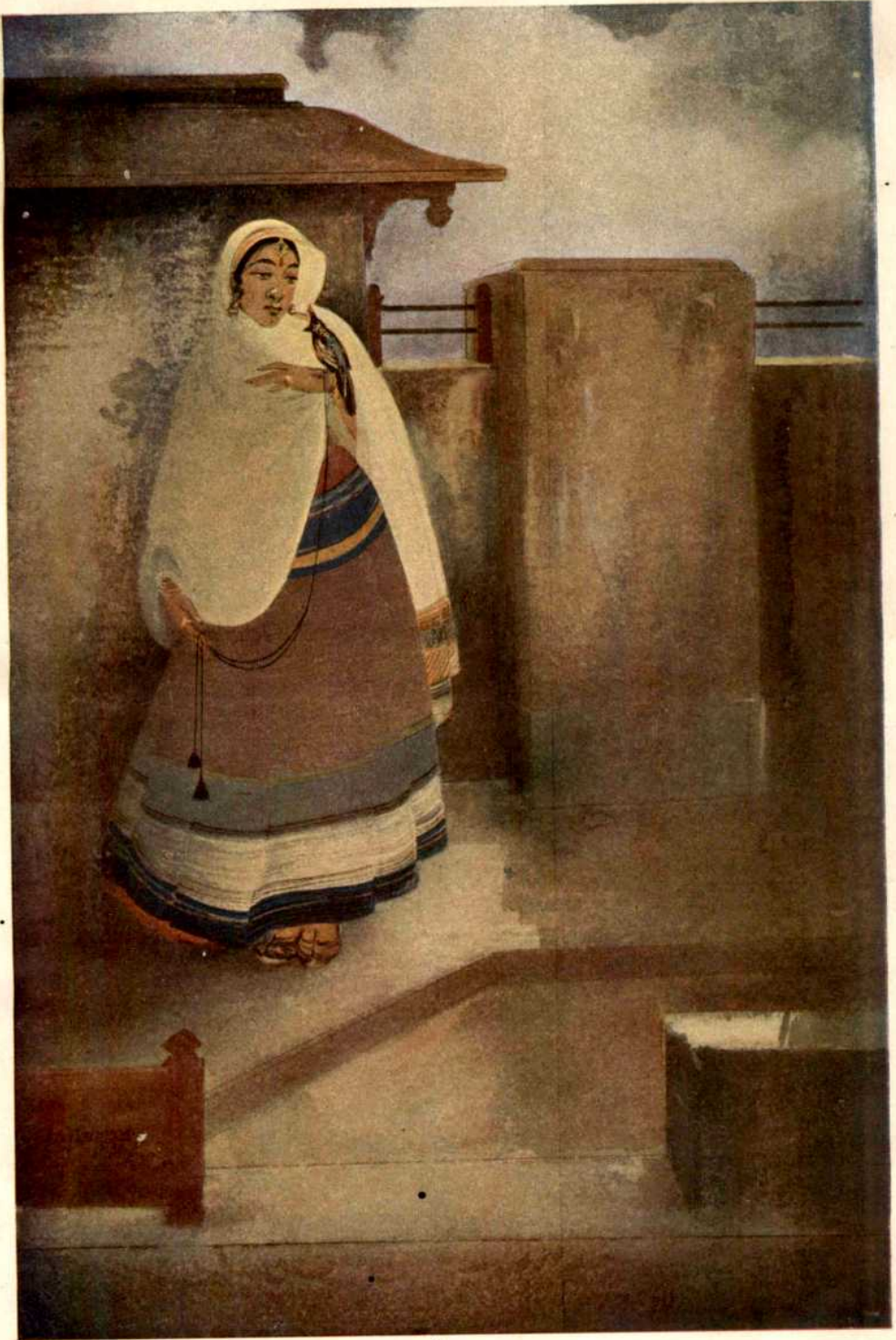
BOOKS AVAILABLE

Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17	Rs. A. 5
(No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock)	
—each No. at	4 0
History of Orissa Vols. I & II	
—R. D. Banerji	each Vol. 25 0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12 0
Dynasties of Mediæval Orissa—	
Pt. Binayak Misra	5 0
Eminent Americans: Whom Indians Should	
Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4 8
Emerson & His Friends— ditto	4 0
Evolution & Religion— ditto	3 0
Origin and Character of the Bible ditto	3 0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2 0
Prayag or Allahabad—(Illustrated)	3 0
The Knight Errant (Novel)—Sita Devi	3 8
The Garden Creeper (Illust. Novel)—	
Santa Devi & Sita Devi	3 8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3 0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3 8
India And A New Civilization— ditto	4 0
Mussolini and the Cult of Italian Youth	
(Illust.)—P. N. Roy	4 8
Story of Satara (Illust. History)	
—Major B. D. Basu	10 0
My Sojourn in England— ditto	2 0
History of the British Occupation in India	
—[An epitome of Major Basu's first	
book in the list.]—N. Kasturi	3 0
History of the Reign of Shah Alum—	
W. Franklin	3 0
The History of Medieval Vaishnavism in	
Orissa—With introduction by Sir	
Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6 0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0 8
Protection of Minorities—	
Radha Kumud Mukherji	0 4
Indian Medicinal Plants—Major B. D. Basu	
& Lt.-Col. K. R. Kirtikar—Complete	
in-8 Vols. [Authoritative Work with	
numerous Superb Plates]	320 0

Postage Extra.

The Modern Review Office

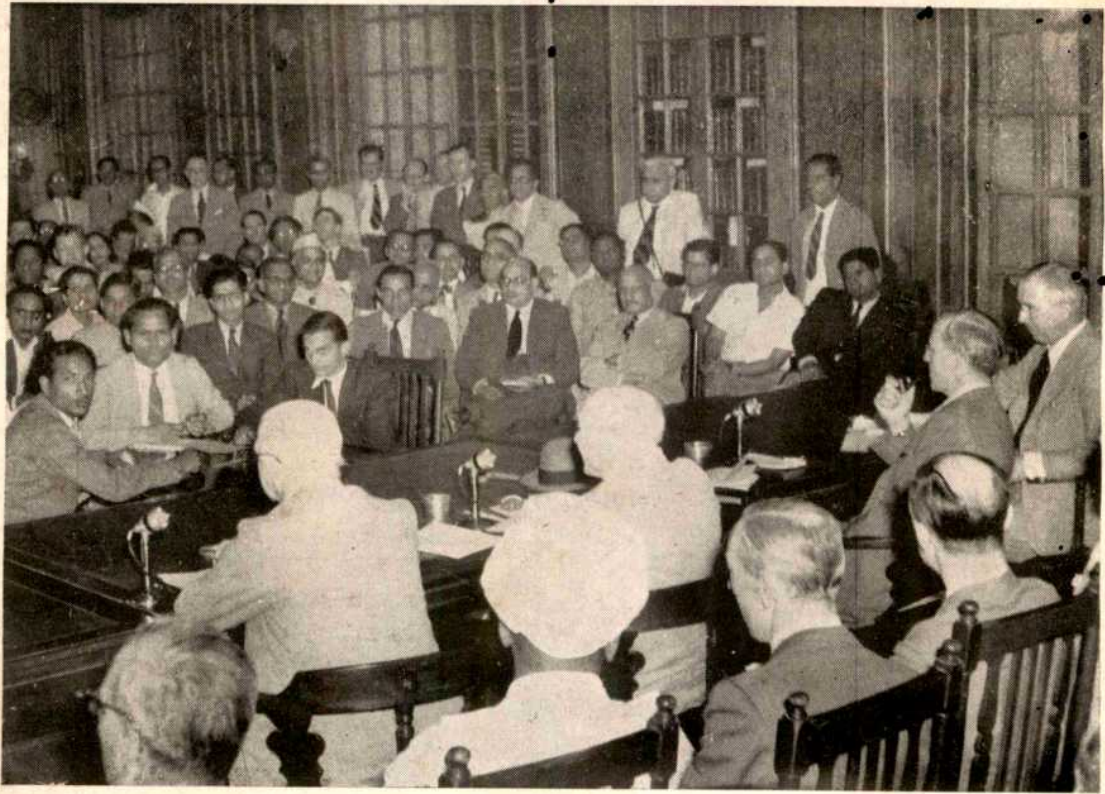
120-2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA



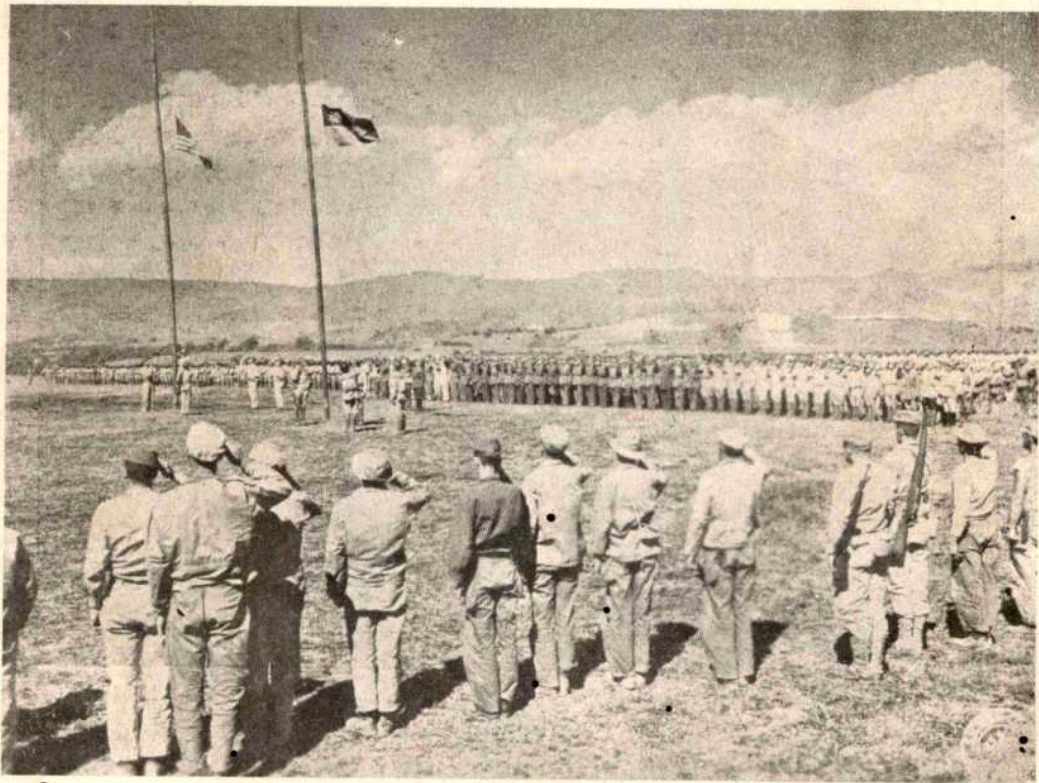
পোষা পাখী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



নিউ দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের সদস্যগণ P30145



প্ৰিন্সওয়েল রোডের পাশে মিউজ অধিনায়ক চীনদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা অভিবাদনরত
ব্রাহ্ম রণাঙ্কন এবং চীনদেশের সম্মিলিত চীনা বাহিনী

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামস্মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ

১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ষশেষ ও নববর্ষ

বাঙ্গালীর দুর্ভিক্ষ ও দুঃসহ জীবনের আর একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। জাপানী যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে, গত বৎসর যুদ্ধ ষাণ্মাসিক পরও তাহার কোন উন্নতি হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে হইবার কোন লক্ষণও নাই। আর বঙ্গ এখনও দুর্ভিক্ষ, এক দুর্ভিক্ষের জের মিটিতে না মিটিতে আর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আগমনবার্তা ঘোষিত হইয়াছে। অনশনে মৃত্যু, স্তন্য হইয়া গিয়াছে। ইংরেজের রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে গত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এবার জননায়কেরা দুর্ভিক্ষ নিবারণের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে স্ত্রপণের দাবী করিয়াছেন। ইংরেজ তাহা মানিয়াও মানিতে পারে নাই, আশ্রুও সে ভারতবাসীর অশ্রু ও বস্ত্রের উপর প্রপ্রতিহত প্রভুত্ব বজায় রাখিতে ব্যস্ত।

ঔষধের অভাব, বাসস্থানের অভাব, রেলো, ষ্ট্রামের, ট্রামে, বাসে ভ্রমণের দুর্দশা আরও অব্যাহতই আছে। রাকমার্কেট অবাধে সরকারের চোখের উপর তাহাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া চলিতেছে। বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বাড়ী শূন্য ও চুরির টাকার সন্ধানে খানাভাগ্নী হইয়াছে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কিন্তু অসহায়সাধ্য কারণে ইহারা সকলেই যথাপূর্ণ রহিয়াছে কাহারও নামে মামলা হয় নাই। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কিনা এবং পাওয়া গিয়া থাকিলে কেন মামলা করা হয় নাই তার দাবীও সংবাদপত্রে উঠিয়াছে। কিন্তু গবর্নেন্ট ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে অসং- কর্মচারীর দল আরও বেপরোয়া হইয়া আরও প্রকট চুরি করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

গত এক বৎসরে মিঃ কেসি গবর্নেন্ট অত্যাচার অবিচার ও দুর্নীতির জন্য যে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকের সহিত তাহার তুলনা মেলে। সরকারী কর্মচারীদের অবাধে চুরি করিবার ও ঘুষ লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, সে সুযোগের পূর্ণ সদ্যবহার তাহারা অনেককেই করিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশ ও মিলিটারীকে ওসী চাপাইবার শিরস্ত্রাণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শহিদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যাসম্পর্কিত

তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সত্য প্রকাশিত হওয়ায় কুরো-নারের তদন্ত বন্ধ করা হইয়াছে। ভার নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়ার জন্য কুরোনার মিঃ হককে অপসারিত হইতে হইয়াছে। ছাত্র ও তরুণের মধ্যে কলিকাতার রাজপথ রঞ্জিত হইয়াছে। প্রস্থানের পূর্বে মিঃ কেসি বিজয়-কর বস্ত্রের আদেশ দেওয়ার সারা বাংলাব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তিন সপ্তাহব্যাপী হর-তালের পর বাংলা সরকার সে আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়।

মিলিটারীর উপদ্রব সমানই রহিয়াছে। মিলিটারী লরীর চক্রতলে পিষ্ট হইয়া প্রাণহানি বা অঙ্গহানি এখনও দৈনন্দিন ঘটনা। নারীর সন্ধানে মিলিটারী কর্তৃক লোকের বাড়ী চড়াও হওয়া, বাধা দিতে গেলে নরহত্যা একাধিকবার হইয়াছে, অল্প কয়েক দিন আগেও হাওড়ায় হইয়াছে। গবর্নেন্ট ইহা বন্ধ করিবার যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর মরণশয্যা পড়িয়া আদালতে দণ্ডিত হইলে হাইকোর্টে তাহাদের দণ্ড আশ্রয় করিয়াই দেওয়া হইয়াছে। অনেকের মরণও পড়ে নাই। চট্টগ্রামের একটি গ্রামে একই কারণে চড়াও হইয়া গ্রাম পোড়ায় ও লুণ্ঠ করিয়া ইহারা যে অত্যাচার করিয়াছে অন-মতের চাপে বাধ্য হইয়া গবর্নেন্ট তাহাদিগকে খেপ্তার করিয়া বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুলিশ কর্তৃক গ্রাম চড়াও, বাড়ী চড়াও, লম্পত্তি নাম প্রকৃতির অভিযোগও হইয়াছে, প্রতিকার হয় নাই। এক কথায় বাংলার শাসনযন্ত্র প্রায় অচল হইয়া এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। সুষ্টেরা অত্যাচারের সর্ববিধ সুযোগ পাইয়াছে, শিষ্টেরা পদে পদে লাজিত হইতেছে।

আট বৎসর পর বাংলার ব্যবস্থা পরিমর্দের নিকীচন হইয়াছে। হিন্দু-আসনে কংগ্রেস ও মুসলমান-আসনে লীগ প্রার্থীরা নিকীচিত হইয়াছেন। মাজ্জারিকন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিকীচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস মনোনয়ন যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দূরদর্শিতা বা আদর্শনিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহার ফল শুভ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে। মনোনয়ন-দানের ভার ইহাদের হাতে ছিল আট বৎসর পূর্বে মজিমাওল গঠনের সময় এবং বাংলা-প্রজা মজিমাওলের বিরুদ্ধে অন্যথা

প্রস্তাবের সময় তাঁহারা দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাঁহাদের একদেশদর্শী কার্যে বাঙালীর প্রভুত্ব ভিত্তি হইয়াছে। লীগ ও সিভিলিয়ানভক্তের ক্ষমতা যেখানে অপ্রতিহত, কংগ্রেস যেখানে দুর্বল সেই অবস্থায় নববর্ষের শুভপ্রভাতকে অভিবাদন জানাইয়া বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা আশার আলোকের প্রতীকস্বরূপ আমরা করিতেছি।

বাংলার সমস্যা

বাংলার সমস্যা দুইটি বহু সমস্যা উদ্ভিত হইয়াছে, একটি পাকিস্তান, অপরটি মল্লিমণ্ডল গঠন। বাংলা দেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার ক্ষমতা মিস্রি দাবি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বাংলার বর্তমান সীমানা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। মিস্রি সহীদ স্মরণার্থী তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, তিনি আনন্ডম, সিংভূম সাঁওতাল পরগণা ও পুণিয়া জেলা প্রত্যর্পণ দাবি করিয়া উহাদিগকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বিভিন্ন স্বতন্ত্র মিল্লীর যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বাংলাকে খণ্ডিত করিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী ডিভিসন এবং ঝুলনা ও চব্বিশ পরগণা বাদে প্রেসিডেন্সি ডিভিসন লইয়া পাকিস্তান গঠনের কথা চলিতেছে। ইহা সত্য হইলে বর্তমান ডিভিসন, কলিকাতা, ঝুলনা ও চব্বিশ পরগণা লইয়া তবিশ্যৎ বাংলাদেশ গঠিত হইবে।

মিস্রি স্মরণার্থী পশ্চিম বঙ্গের লোক, পূর্বে ও উত্তর-বঙ্গ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইলে সেখানে তাঁহার প্রভুত্ব খাটিবে না। হিন্দু বাংলায় ত কোন স্থানই থাকিবে না। জীবনে এই প্রথম তিনি নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হলে-বলে-কৌশলে করায়ত্ত করিয়াছেন, সমগ্র বাংলার উপর কর্তৃত্ব বক্ষার রাধিবীর চেষ্ঠা তিনি করিবেন ইহা স্বাভাবিক। সিংহভূম, আনন্ডম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলা হাতে পাইলে খনিজ সম্পদও আসিবে, তথাকার কোল-সাঁওতাল প্রভৃতিতে জোর করিয়া মুসলমান করিয়া অথবা সেলাস রিপোর্টে মুসলমান বলিয়া লিখাইয়া মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধিরও চেষ্ঠা হইতে পারিবে।

অঞ্চল বা খণ্ডিত কোন বাংলাকেই বাঙালী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিতে পারে না। বাংলা বাঙালীর দেশ, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা এক ও অতিম, শুধু মর্মে বা আচার ব্যবহারে কিছু পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয়কে ভিন্ন ঘাতি মনে করিবার কারণ নাই। বাংলার মুসলমানের প্রায় সকলেই ধর্মাস্তরিত হিন্দু, বাংলার মুসলমান, বাঙালী। বেশী দিনের মুসলমানও ইহারা নয়, ইহাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষের নাম খুঁজিলে হিন্দু নামই বাহির হইবে।

বাংলা পাকিস্তানে পরিণত হইলে বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে হুঁচিয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস মল্লিভের পূর্বে ও পরে যে মনোভাব দেখা গিয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাঙালী হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইবে না ইহা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। বাংলার প্রতি বর্তমান কংগ্রেসের এক দলের মনোভাব বাঙালীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় ইহার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অপ্রীতিকর হইলেও ইহা আজ স্বীকার করা দরকার। একমাত্র মহারাষ্ট্র বা মুজপ্রদেশের কোন কোন স্থান ভিন্ন

বাঙালীর পক্ষে পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিবারও স্থান থাকিবে না। বাঙালীর অপরাধ বাঙালী চিরকাল বিপ্লবী, রাষ্ট্রে সমাজে শিকার ও জীবনের সর্বস্বত্রে প্রয়োজন হইলেই বাঙালী নৃতনকে গ্রহণ করিতে জানে। বাঙালী তরুণ, বিদেশী শক্তি বা অবাঙালী প্রাধান্য কখনও মাথা নত করিয়া সহ্য করে না। সাহসে, শৌর্ধ্য ও জ্ঞানে বাঙালী বহুদিন ভারতে নেতৃত্ব করিয়াছে। পরের দস্যব বা কুট রাষ্ট্রনৈতিক কৌশলের সাহায্যে অস্ত্র পথে বাঙালী শক্তি সংগ্রহের চেষ্ঠা করে নাই, ত্যাগ শৌর্ধ্য ও শোণিত মূল্যে বাঙালী সারা ভারতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইংরেজ বাঙালীকে ভয় করে, তাই বাঙালীকে শিক্ষার ও স্বাস্থ্য পন্থা করিয়া তাহাকে আত্মবিস্মৃত ও আত্মবীতশ্রদ্ধ করিয়া রাধিবীর ক্ষমতা তাহার চেষ্ঠার অন্ত নাই। অপর প্রদেশবাসীর নিকটও বাংলা শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাই বাঙালীকে দাবাইয়া রাধিবীর ক্ষমতা তাহাদের প্রয়াসও বহু ক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতেছে। বাঙালী হিন্দুকে ধ্বংস করিতে পারিলে অবাঙালী শোষণের লাভ, এই শোষণ ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয়, মারবাড়ি বা বিদেশী মুসলমানের কোন ভেদ নাই। আত্মরক্ষার ক্ষমতা বাঙালী হিন্দু আত্মও যদি মাথা তুলিয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে আত্মবিনাশের পথই সে প্রাপ্ত করিবে। আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে বাঙালী হিন্দু এই মহা বিপদ সম্মুখে আস্তে আস্তে সজাগ হয় নাই, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ বাংলার প্রত্যেক সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে হওয়া উচিত ছিল তাহার কিছুই হয় নাই।

বাংলার প্রায় প্রাদেশিক, সুতরাং উহার আলোচনা করিলে প্রাদেশিকতার প্রভাব দেওয়া হইবে এমনই একটা কুসংস্কার অনেকের মধ্যে আছে। আত্মবিলোপের দ্বারা বাংলাদেশকে অপর দেশ বা প্রদেশের শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেওয়া কোন শ্রেণীর মহাত্মবৃত্তা আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ব্যক্তি শক্তি সংগ্রহ করে পরিবারের কল্যাণের জন্য, পরিবার সুগঠিত হইলে গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি হয়, গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করিলে জাতীয় ভিত্তি দৃঢ় হয় ইহাই সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্র। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী শক্তিমান ও আত্মনির্ভরশীল হইলে সারা ভারতের যে অশেষ কল্যাণ সে করিতে পারিবে, দুর্বল বাঙালী তাহা পারিবে না। কাজেই বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার প্রয়াসকে প্রাদেশিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে মহা ভ্রম করা হইবে, সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, প্রাদেশিকতাবাদী যে কুট-কৌশলে বাঙালীকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতেছে সেই অভল গহবরের দিকেই তাহাকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

তারপর মল্লিমণ্ডল গঠনের প্রশ্ন। ১৯৩৭ খ্রিঃ কংগ্রেস লীগকে কোণঠাসা করিয়া প্রজাভ্যাসের সহিত কোরালিশন বা করিয়া যে ভুল করিয়াছিল এবার লীগের সহিত কোরালিশন করিতে চলিয়া ঠিক সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেদিন কংগ্রেসের অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয়তা বাংলার তথা সারা ভারতে লীগকে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছে, আজ কংগ্রেস লীগের সহিত মিলিয়া তাহার সকল

হৃদয়ের অশ্রীদার হইয়া তাহাকে আরও শক্তি সংগ্রহের পথ করিয়া দিতে চলিয়াছেন। লীগের দুর্নীতি সুবিদিত। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যাহারা লীগ টিকিটে নির্বাচিত হইয়াছে তাহারা মাসিক দেড়শত টাকা বেতন ও পরিষদ অধিবেশনের সময়ের দৈনিক সাড়ে বার টাকা ভাতার আশায় আসে নাই। এই টাকা সুদে আসলে তুলিবার চেষ্টা তাহারা করিবেই। সুতরাং লীগ মন্ত্রিস্থে এবার আরও প্রবলভাবে দুর্নীতি চলিবে। রোলাও কমিটির সুপারিশ অনুসারে সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের উপর মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতা হ্রাস করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অতঃপর সম্পূর্ণরূপে থাকিবে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের হাতে, মন্ত্রীদের যথেষ্ট দুর্নীতির দ্বারা পোষাইয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করিলে দেশের কোন উন্নতি করিতে ভো পারিবেনই না, নিজেরাও সেই দুর্নীতির অংশভাগি হইয়া পড়িবেন। এবার কংগ্রেস মনোনয়ন বাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু সম্মতের অতীত নহেন, কয়েকজনের অতীত কার্যকলাপে দুর্বলতার ছাপ আছে। কর্পোরেশনে এই শ্রেণীর কংগ্রেসওয়ালাদের যে কার্যকলাপ দেখা গিয়াছে মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইলে তাহা হইতে ভিন্নরূপ হইবার ধারণা করিবেন কি করিয়া, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের কর্মীদের উপর দেশবাসীর যেটুকু আস্থা আজও আছে, লীগের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিলে তাহাও নিঃশেষ হইবে ইহাই আমাদের আশঙ্কা। কংগ্রেস বিরোধী দলে থাকিয়া কংগ্রেস কমিটিগুলির সাহায্যে লীগের দুর্নীতি প্রকাশ এবং আদালত ও সংবাদপত্রের সহায়তায় প্রতিকারের চেষ্টা করিলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা ছিল কিনা তাহাই নেতৃবর্গের বিবেচ্য।

ক্যাবিনেট মিশনের মীমাংসা প্রয়াস

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দিল্লীতে ক্যাবিনেট মিশন যে নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন তাহা প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান সমতা লইয়াই চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় তাঁহাদের প্রস্তাব মোটামুটি ভাবে এইরূপ : (১) মিঃ জিন্নার পাকিস্থানের দাবি মূলতঃ মানিয়া লওয়া হইবে, (২) হিন্দু-স্থান ও পাকিস্থানের জঙ্গ দুইটি পৃথক কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট থাকিবে, (৩) উভয় কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টের উপর দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের জঙ্গ একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকিবে এবং (৪) শাসনতন্ত্র রচনার জঙ্গ গণপরিষদ একটিই হইবে বটে, তবে উহাতে দুইটা ধোঁপ থাকিবে, গণপরিষদের হিন্দু সদস্যেরা হিন্দুস্থানের এবং মুসলমানেরা পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এই অপূর্ণ তিনতলা রাষ্ট্রবিধির প্রস্তাব সত্য হইলে উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে মিঃ জিন্নার মুখরক্ষা হিলাবে (face saving device) এরূপ প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আমাদের আছে।

পাকিস্থান মানিয়া লওয়ার আমরা ধোর বিরোধী। সব মুসলমান পাকিস্থান চায় না, একটা দল-বিশেষ উহার দাবি

তুলিয়াছে। মুসলিম লীগ কনভেনশনে লীগ-নেতাদের বক্তৃতায় যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা যে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষে ধ্বংস হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আর্থসমাজের ধর্মগ্রন্থে মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য ছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থ লইয়া ভুল আন্দোলন যাহারা করিয়াছে, লীগ কনভেনশনে তাহারা হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থাকে কটুক্তি করিয়া সেই কটুক্তি প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করিতেও দ্বিধা করে নাই। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতে ধর্মান্তরিত হইয়া যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহারা নিজেদের শাসক জাতি এবং শাসন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জঙ্গ ধোর গলায় বক্তৃতা করিতে কুণ্ঠিত হর নাই। এই কনভেনশনে মিঃ জিন্না, মিঃ সুরাবর্দী, মিঃ খালিকুজ্জমান এমন কি বেগম শাহ্ নওয়াজ পর্যন্ত যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন আমরা জানি না ভদ্র ইংরেজ তাহা পরিপাক করিয়া কেমন করিয়া আবারও ইহাদের জঙ্গ face saving device-এর কথা তুলিবে।

পাকিস্থানের দাবি প্রথমে শুরু হয় রাগা হিসাবে ১৯৪০ সালে। তারপর উহা দরকষাকষির একটা অল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখন পাকিস্থান না হইলে মিঃ জিন্নার অসুচরবুদ্ধ ব্লায় প্রাণ লুটাইয়া দিবেন বলিয়া শপথ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দাদার ভয় দেখাইয়া পাকিস্থান আদায়ের এই চেষ্টার হিন্দু ভীত হইবে না, হয়ও নাই, কিন্তু এই অস্থিার সুযোগে ইংরেজ মন্ত্রিমিশনের দোষ্য বার্ঘ করে কি না তাহাই বর্তমানে দ্রষ্টব্য। দেশের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সর তেজবাহাদুর দফ্র পৃষ্ঠাই বলিয়াছেন, মিঃ জিন্নার সহযোগিতা যদি পাওয়া যায় ভাল, নতুবা তাঁহাকে বাদ দিয়াই অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং ঐ গবর্নেন্টের হাতেই ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিলাতে মিডল্টন মারের ছাত্র মন্বীষীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জঙ্গ উপযুক্ত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিতে হিন্দু সর্বদা প্রস্তুত আছে, কিন্তু কয়েকটি শর্তে তাহা করিতে হইবে : (১) ভারতবর্ষ কোনরূপে বণ্ডিত হইবে না, (২) সমগ্র ভারতবর্ষে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট থাকিবে, (৩) একটিমাত্র গণপরিষদ ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এবং (৪) মুক্ত নির্বাচন-প্রথা সকল স্তরের ও সর্বশ্রেণীর নির্বাচনে পুনঃপ্রবর্তিত হইবে।

কংগ্রেস-নায়কদের কাহারও কাহারও উজ্জিতে প্রকারান্তরে ইহার নাম না করিয়া পাকিস্থান দাবি মিটাইবার ইচ্ছা দৃষ্টি হইতেছে। ইহার মধ্যে পণ্ডিত জবাহরলালের ৯৫ পাসেন্ট পাকিস্থান মিটাইবার অভিপ্রায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ক্যাবিনেট মিশনের যে প্রস্তাবের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত পণ্ডিতজীর ৯৫ পাসেন্টের বিশেষ অমিল নাই। সর্দার প্যাটেল পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু বর্ধের ভিত্তিতে মুসলমান প্রধান অঙ্গগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করিতে তিনিও সম্মত আছেন। গান্ধীজী পাকিস্থান দাবি করা পাপ বলিয়াছেন কিন্তু রাজাগোপালাচাীর যে প্রস্তাব

সদার প্যাটেল গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন সেই ধরনের modified পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, পূর্বে রাজাগোপাল-প্রসাদ তিনিও সমর্থনই করিয়াছিলেন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের লীমা নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে উহা করিতে গেলেই পাকিস্থানের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। কংগ্রেস-নেতাদের কথায় বাঙালী হিন্দুর আশঙ্ক হইবার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। লীগকে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট এডমিন যে সাহায্য ও সহায়ত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং কংগ্রেস যে ভাবে উহাকে ভাষণ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিলে অল্প দিনের মধ্যেই লীগ নেতারা প্রকৃতিস্থ হইবার সুযোগ পাইবেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে পাকিস্থানের ধূম তুলিয়া লীগ অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়াই সব মুসলমান পাকিস্থানের অর্থ বুঝিয়াছে বা সত্যই উহা চার ইহা মনে করিবার কারণ আমরা বুঝিয়া পাইতেছি না। স্নাকমার্কেটের টাকা, জুজামি, সরকারী সাহায্য এবং বন্দীভক্ততার প্রশ্রয় দান এই চারিটি কারণেই লীগ এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিয়াছে। একদল নবাব, জমিদার প্রভৃতি প্রভু-লোভী লোকের রাজনৈতিক অভিলষি এবং কোটি কোটি বন্দীভক্ত অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকের ভোটের অর্থ ও উদ্বেগ এক ইহা মনে করা যায় না।

আজ আমাদের একথা ভুলিলেও চলিবে না যে ক্যাবিনেট মিশন এদেশে যেচ্ছায় আসে নাই, যায হইয়াই আসিয়াছে। কংগ্রেসের পিছনে আজ যে 'ভাংসন' আছে, যে গণ-সহায়ত্ব আছে, তাহার শক্তি অপরিমিত। কংগ্রেসের হাতে অস্ত্র নাই, কিন্তু যে গণ-শক্তি আছে তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সৈন্ত ও পুলিশের সাহায্যে ভারতবাসীকে পদানত রাখা আর সম্ভব নয়, ইংরেজ ইহা গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। ১৯৪২-এর আন্দোলন, ভারতের বাহিরে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ ও স্বাধীন ভারত গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে সৈন্ত ও পুলিশের মধ্যে চঞ্চলতার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবাসী আর ইংরেজের অধীনে পশুজীবন যাপন করিতে প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের নির্দেশে ও পরিচালনাধীনে এই বিপুল গণ-শক্তির অভ্যুত্থান ঘটিলে তাহা রোধ করিবার ক্রমতা ইংরেজের নাই। এই শক্তি সম্বন্ধে কংগ্রেসেরও সচেতন হওয়া দরকার। ক্যাবিনেট মিশন বলিয়া-ছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্বীকার করিতে তাহারা বাধ্য, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যদি আন্তরিক ও সহজাত হয় তবে এখনও হিন্দু-মুসলমানের সাময়িক বিরোধের সুযোগে তাহারা কূট কৌশল প্রয়োগে ব্যস্ত কেন? কংগ্রেস আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইলে ইহাদের সকল কূট কৌশল ও চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বাংলার বাজেট

করদাতার টাকা অপচয়ের পরিণাম কি হইতে পারে ১৯৪৬-৪৭ সনের বাংলার বাজেট তাহারই প্রমাণ। এই বাজেট প্রকাশ করিতে সিদ্ধান্ত গবর্নর বিগত কয় বৎসরের লোকসানের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ :

১৯৪৩-৪৪	২,৭৩,৬৭,০০০
১৯৪৪-৪৫	৪,৭৩,১৪,০০০
১৯৪৫-৪৬	৭,৪৫,৫৮,০০০
১৯৪৬-৪৭	২,৪৬,৩৫,০০০

২৪,৩৮,৭৪,০০০

বিবরণ এইখানেই শেষ নহে। ১৯৪৪-৪৫ সালের ষাটটি মিটাইতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ৭ কোটি টাকা বাংলা-সরকারকে দিয়াছিলেন তাহাও ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে এই চার বৎসরে (বর্তমান বৎসর লইয়া) বাংলা দেশে ৩১ কোটি টাকারও বেশী লোকসান হইয়াছে। খাজা মাজিদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রিমণ্ডল যে দুর্নীতি কান্নেম করিয়াছিল দুই বৎসর লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের পর ৯৩ বারার আমলেও তাহার অবসান ঘটে নাই। লীগ মন্ত্রিসভা দুই বৎসর ধরিয়া দেশ-বাসীকে যত্নের দিকে লইয়া গিয়াছে, আর সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীরা বাকী এক বৎসরে সেই যত্নকে আরো নিকটে টানিয়া আনিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালের যে বাজেট গবর্নর বারোজ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় এই বৎসরের খাজিতি হইবে সাড়ে নয় কোটি টাকা। আয়ের অল্প মোটামুটি একচল্লিশ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশী।

এখন প্রশ্ন যে এই ব্যয়ের বরাদ্দ কোন্ কোন্ কাজের জন্য হইয়াছে। বাজেটে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাগুলিকে সাড়ম্বরে প্রচার করা হইয়াছে। এই বরাদ্দের ব্যবস্থা ও পরিমাণকে একটু ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলেই বাংলা-সরকারের অপচয়ের ব্যাপার বরা পড়িবে। যে সব কাজে কর্তৃপক্ষী করিয়া অসহ-পায়ে কাঁচা পরমা পাওয়া যায় সেই সব কাজেই টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। মাত্র কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিলেই ইহা পরিষ্কার হইবে।

দেশের বিরাট সমস্তা সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া। অথচ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র তিন লক্ষ টাকা। ঠিক একই নীতিতে প্রভুতি ও শিল্পমুদ্রা নিবারণের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। অথচ পুলিশের বাড়ি তৈরির জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং জল পুলিশের মোটর-বোট কিনিবার জন্য সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

দামোদর-পরিকল্পনার জন্য ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার জন্য ৬০ লক্ষ টাকা। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন আপত্তি করিতেছি না, কিন্তু ঝাল, কুপ, পুকুর প্রভৃতি পরিকল্পনার নামে সাধারণতঃ যে অত্যন্ত অপচয় হয় এই ষাট লক্ষ টাকা সেই ভাবে নষ্ট না হইলেই আমরা খুশী হইব। আমাদের আশঙ্কা এই সব সেচ-ব্যবস্থার নামে টাকাই জলের মত খরচ হইবে, জল আর পাওয়া যাইবে না।

সর্বোপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হইয়াছে হরিণঘাটীয় গরু লইয়া গবেষণা এবং প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। বাড়ী তৈরি বাবদ পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা এবং অজ্ঞাত কাজের জন্য ঘোঁল লক্ষ ষাট হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। গবেষণার নামে এই পরিহাসের অর্থ কি হইবে? হরিণঘাটা পঞ্জীর পরিবারবর্গকে ভিটাঘাট

ছাড়িয়া অসহায় হইতে হইবে এবং সেইখানে নবনির্মিত প্রজনন কেন্দ্রে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে এক দল অপদার্থ কর্মচারীর অঙ্গ-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

এই বঙ্গবের শেষে গবর্নেন্টের দেনার পরিমাণ থাকিবে বিপুল। এই দেনার আছে জনসাধারণের নিকট ট্রেজারী বিল বাবদ সাড়ে সাত কোটি টাকা, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট প্রায় ২০ কোটি টাকা এবং ভারত-সরকারের নিকট প্রায় ১০ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেট অনুসারে কাজ হইলে আগামী বঙ্গ-রাজ্যে দেনার পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে, কারণ ট্রেজারী বিলের পরিমাণ বাড়িয়া সাড়ে পনের কোটি টাকার দাঁড়াইবে। এই টাকা খরচ হইয়াছে গবর্নেন্টের ধান চাউল জবণ চিনি ও নৌকার ব্যবসায়। বাংলা-সরকার আশা করেন যে গুদামজাত এই সব জিনিষ বিক্রয় করিয়া অধিকাংশ টাকাই উঠিয়া আসিবে। আমাদের কিন্তু আশঙ্কা হয় যে এই টাকার অনেক অংশই পাওয়া যাইবে না। গুদামের দুর্ভাগ্যব্যবহার যেন কল তথা এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে পরিমাণ খাদ্য এই পর্য্যন্ত পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে গুদামজাত দ্রব্যের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়।

বাংলা দেশে ট্যাক্স বর্ধ্য করিবার যে রীতি তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ ক্রমশঃই নিশ্চিত হইতেছে এবং তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। বাংলা দেশের প্রাদেশিক ট্যাক্স ১৯৩৯-৪০ সালের ৯ কোটি টাকা হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে, এবং এই বৃদ্ধির মূল রহিয়াছে দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সাহায্য ছাড়া বাংলার প্রয়োজন মিটিবে না। বাংলা দেশের প্রতি সুবিচার করিতে হইলে ভারত-সরকারের বর্ণী অর্থ-সাহায্য করা নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলার আর্থিক দুর্দশার একটা বড় কারণ যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের একথা জুলিলে চলিবে না।

নির্বাচন প্রহসন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের সময় হইতেই বাংলায় মুসলিম লীগ গুণ্ডামির চূড়ান্ত স্তর করিয়াছিল এবং সরকারী কর্মচারীগণ নিলিপ্ত দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লীগ গুণ্ডাদের প্রশংসা দিয়া আসিতেছিলেন। প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় এই গুণ্ডামি একেবারে চরমে উঠিয়াছিল এবং কোন কোন ইংরেজ ও মুসলমান সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছিল।

সম্প্রতি মোলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে নির্বাচনে লীগের গুণ্ডামি ও সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব কোন প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রদেশ হইতে বাংলা দেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকল স্থানেই লীগ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে লীগকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা যেন একটা

আন্তঃপ্রাদেশিক যড়যন্ত্র হইয়াছিল। বাংলার নির্বাচন সম্বন্ধে মোলানা সাহেবের বিবৃতি প্রকাশের পর মিঃ শহীদ সুরাবর্দী তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু সে প্রতিবাদে কোন যুক্তি নাই, আছে মিথ্যা কটুক্তি। মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন নির্বাচনে

পক্ষপাতিত্ব যে সব সরকারী কর্মচারী করিয়াছে তাহার মুসলমান নয়, হিন্দু—কংগ্রেসের হইয়া তাহার কাজ করিয়াছে। নির্বাচনের সময় মুসলমান কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ হইয়াছে, অনেকের বিরুদ্ধে শাট-সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরিতও গিয়াছে, কিন্তু কোন হিন্দু কর্মচারীর নামে এরূপ প্রকাশ্য অভিযোগ হয় নাই। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে লীগদলের গুণ্ডামির অসংখ্য সংবাদ একটি একটি করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, লীগ মুখপত্রগুলিতে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হয় নাই, হুই-চারিটা সামান্য ঘটনা কলাও করিয়া জাহির করা হইয়াছে এই মাত্র। মিঃ সুরাবর্দীর বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন ভিন জন—মোলবী ফজলুল হক, মোলানা আমেদ আলী এবং মোলবী আশরাফউদ্দীন আমেদ চৌধুরী। ইঁহারা সকলেই লীগের গুণ্ডামির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দীকে সমর্থন করিয়া দৈনিক আজাদ ২৫শে চৈত্র তারিখে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহারাও বাংলা দেশে লীগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নামে গুণ্ডামির একটি অভিযোগও আনিতে পারেন নাই।

লীগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রধানতঃ অভিযোগ হইতেছে (১) নেতাদের উপর আক্রমণ, (২) ভোটদানের এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সাহায্যকারীদের উপর আক্রমণ, (৩) বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গ এবং (৪) হুঁহুদাহ। সরকারী কর্মচারীদের, বিশেষতঃ পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের, বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে (১) তাঁহারা এই গুণ্ডামি বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, (২) সামান্য অছিলায় লীগ বিরোধী মুসলমানদের উপর গুলী চালাইতেও দ্বিধা করেন নাই, (৩) জাতীয়তাবাদী নেতাদের আক্রমণ হইতে দেহিয়াও নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং (৪) ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের গোপনতা রক্ষা করেন নাই। মোলবী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে পুলিশের সম্মুখে লীগ গুণ্ডারা মোলানা হোসেন আমেদ মাদানীকে আক্রমণ করিলে তাহাদের বাধা দেওয়া হয় নাই। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ডাঃ নূরুল নাথ বহু এক গুণ্ডাকে হাতে হাতে ধরিয়া তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিলেও পুলিশ কিছু করে নাই। ইতিপূর্বে মৈমনসিংহে জঙ্গল গরু-গাঁওয়ের ঘটনায় দেখা গিয়াছে পুলিশ সামান্য অছিলায় কৃষক-প্রজা দলের লোকের উপরে গুলি চালাইয়াছে এবং লীগের সভা যাহাতে নির্বিবাদে হইতে পারে সেজন্য সভামণ্ডপ পাহারা দিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চটগ্রামে মোলানা মণিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ঘরে আগুন দেওয়া হইয়াছে, পুলিশ আজ পর্য্যন্ত গুণ্ডাদের ধরিবার কোন চেষ্টা করে নাই। লীগ-বিরোধী মুসলমান নেতাদের উপর আক্রমণের বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তার একটরও প্রতিবাদ লীগ নেতারা করিতে পারেন নাই।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাহা ঘটয়াছে, মোলবী আশরাফউদ্দীন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে ভোট গ্রহণের দিন প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। ভোট গ্রহণের গোপনতা আদৌ

রক্ষিত হয় নাই। পর্দা তুলিয়া, পর্দার দ্বিধা করিয়া অথবা বেড়ার উপর চড়িয়া কে কোন্ দিকে ভোট দেয় তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া ঘরা পড়িলে গুণ্ডার হাতে প্রহার, অঙ্গহানির ভয় ভোঁ আছেই তার চেয়েও বড় ভয় অনবজ্ঞে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। মঞ্চস্থলে প্রায় সমস্ত কুড় কমিটি লীগ কর্তৃক অধিকৃত এবং অনবজ্ঞ বিতরণের ভার ইহাদের হাতে। লোকে জানে লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া ঘরা পড়িলে গ্রামে আর অনবজ্ঞ মিলিবারও উপায় থাকিবে না।

মৌলানা আক্কাব মির্জাচানে গুণ্ডামির অভিযোগগুলির সত্যাসত্য যাচাই করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। লীগের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠিয়াছে এরূপ তদন্ত তিন্ন লোকে তাহা অবিশ্বাস করিবে না। বাংলা-সরকার এই তদন্তে রাজি হইবেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বীর বিরুদ্ধে অভিযোগের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও হার্বার্টের গবর্নেন্ট প্রকাশ্য তদন্তে সম্মত হন নাই। এ ক্ষেত্রেও সরকারী কর্মচারীদের কীটিকলাপ প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বাংলা সরকার তদন্তে বাধা দিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কুইনাইন

বিদেশী বণিকের স্বার্থরক্ষার জন্ত ভারত-সরকার এ দেশের লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেও যে কৃতিত্ব হন না তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কুইনাইন। ওলন্দাজ কিনা বুরোর স্বার্থরক্ষার জন্ত এদেশে কুইনাইন উৎপাদন সর্বদা দাবাইয়া রাখা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন উৎপাদনের সর্ববিধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে ম্যালেরিয়ার এই মহোষধের জন্ত ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত। জাপান এই দীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর ভারত-সরকার ভারতবর্ষে কুইনাইন উৎপাদন বন্ধির চেষ্টা করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মন ছিল না বলিয়া ভারতীয় কুইনাইনের পরিমাণ বিশেষ বাড়ে নাই। জন্মহত প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিয়া মংপুর কুইনাইন উৎপাদন কেন্দ্র কতকটা বাড়ান হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অল্প দিক দিয়া ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের কুইনাইনের ব্যবসার সচল রাখিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। যুদ্ধের সময় কুইনাইনের অভাব যখন অভ্যস্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তখন কুইনাইন, মেপাক্রিন প্রভৃতি বিদেশী ঔষধ আমদানী হ্রাস হয় এবং বাংলা-সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার ঐসব ঔষধ কিনিয়া বিদেশী বণিকদের সাহায্য করেন। হুর্কল ও অনশনক্লিষ্ট দেহে কুইনাইন ও মেপাক্রিন প্রয়োগের ফলাফল শুভ হইবে কিনা এ সম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমত হইতে না পারা সত্ত্বেও বাংলা-সরকার পরম উৎসাহে এগুলি কিনিয়া কতক বিনামূল্যে বিতরণ করিতে ও কতক বিক্রয় করিতে শুরু করিলেন।

এই সব বিদেশী ঔষধ চালাইবার জন্ত সরকার দেশে কুইনাইন উৎপাদন কমান্ডার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি আর এক কোশল অবলম্বন করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে যে, মংপুর কুইনাইন কারখানায় ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ১১৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র ৪১ হাজার পাউণ্ড বিক্রয় হয় অবশিষ্ট ৭৫ হাজার পাউণ্ড মংপুরেই পড়িয়া থাকে।

কলিকাতায় গবর্নেন্টের কুইনাইন ডিপোতেও হাজার হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ক্রমেই জমিয়া চলিতেছে। এদিকে বৎসরে প্রায় দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ার ভোগে এবং প্রায় এক কোটি এই রোগে মরে। চিকিৎসকেরা হিঙ্গাব করিয়া দেখিয়াছেন গবর্নেন্টের হাতে এক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন জমিয়া থাকার অর্থ তিন কোটি রোগীর চিকিৎসা বৃদ্ধ হওয়া।

বিদেশী বণিকদের হাতে যত দিন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে তত দিন এই অসহনীয় অবস্থার উন্নতির কোন আশা নাই। ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড় চালাইবার জন্ত দেশী কাপড় উৎপাদন ও বিতরণ সম্বন্ধে যে কোশল অবলম্বন করা হইয়াছে, কুইনাইনের বেলায়ও কি সেই প্রকার ব্যাপারই চলিতেছে?

কলিকাতায় মিলিটারী লরীর উপদ্রব

মিলিটারী লরীর উৎপাতে কলিকাতার রাজপথে চম্ভাচলের বিপদ মুক্তাবলানে শেষ হওয়া দূরের কথা আরও বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই সব লরী যেরূপ বেপরোয়া গতিতে গাণ্ডিত হইত এখন যেন তাহা আরও বাড়িয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি লোক লরী চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। গত চার বৎসর যাবৎ গবর্নেন্ট এই ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে পারেন নাই ইহা লোকে দেখিয়াছে। ২২শে মার্চ একটি বালক লরী চাপা পড়িয়া নিহত হইলে পরে উদ্বেজিত জনতা সেই লরীটিকে আটকাইয়া উহা পোড়াইয়া দেয়। এ সম্পর্কে গবর্নেন্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন :

“গবর্নেন্ট পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, এই ধরনের হুর্দটনার জন্ত দায়িত্ব কাহার, তাহা স্থির করিবার জন্ত গবর্নেন্ট ও সামরিক কর্তারা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। তাহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যখনই তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে কোন দিল্লিওয়ান বা মিলিটারী ড্রাইভার হুর্দটনার জন্ত দায়ী বলিয়াই জানা যাইবে, তখনই অথবা কালবিলম্ব না করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্নেন্ট ইহাও স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছেন যে, এইরূপ ঘটনার উদ্বেজিত হইয়া দায়িত্বহীন জনতা যদি প্রতিষ্ঠিত আইনের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজদের হাতে দণ্ডদানের অধিকার গ্রহণ করে অথবা অল্প কোন যানবাহনের ক্ষতি করে তাহা হইলে গবর্নেন্ট কোন মতেই তাহা সহ করিবেন না।”

এই ইস্তাহার প্রকাশের পরদিনই রাজে লরী চাপা পড়িয়া একটি ভদ্রলোক নিহত হন। লরীটি বেপরোয়া গতিতে ছুটিতেছিল এবং হুর্দটনার সঙ্গে সঙ্গেই উহার পিছনের আলো নিবাইয়া দেওয়ার কেহ উহার মন্থন পড়িতে পারে নাই। আজ পর্যন্ত এই দল্লী-চালক আবিষ্কৃত বা গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার চারি দিন পর ২৮শে মার্চ কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ সেন লরী চাপা পড়িয়া নিহত হন। তাহাকে চাপা দিয়াই লরীটি তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া যায়। ঐ দিনই আর একটি লরী বার বছরের এক বালককে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়া নিহত পলায়ন করে। ৩১শে মার্চ সকালে একটি লরী

এক বৃহৎ ভদ্রলোক ও তাঁহার ভৃত্যকে চাপা দেয়, অপরাহ্নে একটি বাসকে সাইকেল হইতে ঝাঁকি মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে চাপা দিয়া হত্যা করে। এই ঘটনার পর সরকারী ইস্তাহারের উপর আস্থা রাখা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, জনতা পুনরায় লরীটিকে আক্রমণ করিয়া পোড়াইয়া দেয় ও উহার ড্রাইভারকে প্রহার করে। ইহাই শেষ নয়, ইহার পর আরও অহরূপ হুর্ঘটনা ঘটতেছে।

গবর্নেন্ট “মব-ক্লল” সহ্য করিবেন না বলিয়া শাসাইরাছেন কিন্তু গবর্নেন্ট যেখানে প্রচার প্রাণ রক্ষায় চূড়ান্ত অক্ষমতা দেখাইয়াছেন সেখানে লোকে হত্যাকাবীর শাস্তিবিধান অগ্রসর হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে বাধা দিবেন কি বলিয়া? যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এখন তীরবেগে শহরের উপর দিয়া লরী চালাইবার কোন কারণই নাই। লরী চাপা পড়িবার দোষ গবর্নেন্ট বরাবর পঞ্চচারীদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ক্ষয় তিন সপ্তাহ ব্যাপী পঞ্চ চলা শিক্ষাদানের আয়োজনের নামে বহু টাকাও তাঁহারা নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ঐ তিন সপ্তাহের পূর্বে হুর্ঘটনার সংখ্যা বাহা ছিল, উহার মধ্যেও তাহা কমে নাই, পরে ত বাড়িয়াছেই। ট্রাম কোম্পানী অনেক বার বলিয়াছেন যে, মিলিটারী লরীর দ্বারায় তাঁহাদের এত গাড়ী নষ্ট হইয়াছে যে পূর্ণসংখ্যক ট্রাম গাড়ী চালু রাখা অসম্ভব; দিবা বিপ্রহরের আলোয় প্রশস্ত রাস্তাপথের মাঝের আলোর ধাম, এমন কি ফুটপাথের উপরের দশ ফুট উচ্চ বাড়ির ধাম তো মিলিটারী লরীর দ্বারায় শত শত বার নষ্ট হইয়াছে, অথচ লোক চাপার জন্ত দায়ী পঞ্চচারী, কিবা অপরাধ বিচার। আমরা বিশ্বাস করি যে পঞ্চচারীদের অত্যধিক সতর্কতার জন্তই হুর্ঘটনার সংখ্যা তবু কিছু কম হইতেছে। মোটরযানের সংখ্যার সহিত পথের হুর্ঘটনার অহুপাত কমিয়া দেখিলে বোধ হয় দেখা যাইবে যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় কলিকাতায় পাঁচ হইতে দশ গুণ অধিক লোক আহত ও নিহত হইতেছে।

কলিকাতার রাস্তায় ঘটায় পনের মাইলের অধিক বেগে লরী চালাইবার কোন কারণই এখন আর নাই। মিলিটারী লরী পরিচালনার ভার যে সকল দায়ীত্বশূন্য সামরিক কর্তৃপক্ষীর হাতে জন্ম আছে, এই সব হুর্ঘটনার তাহাদের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের অবিলম্বে পদচ্যুত করিয়া কোর্ট মার্শাল করা উচিত। রাস্তার যে সব স্থানে ঘটায় ২৫ মাইল বেগে লরী চালাইবার নির্দেশ রহিয়াছে সেই সব স্থানেও উহার দিগ্ভ্রম বেগে লরী ছুটিতে দেখা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই সব হুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি মূলত্বী প্রস্তাব আনীত হইলে সমস্ত বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, লরী চালনার সতর্কতা সম্বন্ধে যথাযোগ্য “উপদেশ” দেওয়া হইয়াছে। এই সব উপদেশ দেওয়া হইলেও তাহা প্রতিপালিত হয় না তাহা ভাল করিয়াই দেখা যাইতেছে। অথচ এই সব মর্শাস্ত্রিক হুর্ঘটনা বন্ধ করা অত্যন্ত সহজ। যোগ্য লোকের হাতে লরী চালকদিগের ভার দিলে ও গতিবেগ ১৫ মাইলে বাধিয়া দিলে এবং উহার বেশী বেগে কাহাকেও ছুটিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিলে অতি

অল্পদিনের মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড দিবারিত হইতে পারে। মিলিটারীর এই অবাধ হত্যা নিবারণ করিবার কোন সত্য-কারের চেষ্টা গবর্নেন্ট কেন করিবেন না আশ্রয় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। গবর্নেন্টের এই অক্ষমতা গণ-বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ, “মব-ক্লল” বন্ধ করিতে হইলে গবর্নেন্টকে কঠোর হস্তে এই হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাইতে হইবে, শুধু হুমকী দিয়া ইস্তাহার বাড়িলে ফল হইতে পারে না।

বাংলায় চিনির বরাদ্দ হ্রাস

এ বৎসর চিনির উৎপাদন কিছু কম হইয়াছে, এই কারণে ভারত-সরকার বাংলাদেশের জন্ম বরাদ্দ চিনির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন। বাংলা-সরকার তদনুসারে চিনির বরাদ্দ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা কমাইয়াছেন শতকরা ২৫ ভাগ। ৮ই এপ্রিল হইতে স্বহস্তর কলিকাতা ও অন্যান্য যে সকল স্থানে পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, সেখানে চিনির রেশন বরাদ্দ প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি আট আউন্স (চার ছটাক) হইতে কমাইয়া ছয় আউন্স (তিন ছটাক) করা হইয়াছে।

জেলা, মহকুমা সদর ও দশ হাজার বা ততোধিক লোকের বসতিসম্পন্ন শহরে জনপ্রতি প্রতি সপ্তাহে ছয় আউন্স পাইবে এবং অন্যান্য শহরে প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি চার আউন্স (দুই ছটাক) করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে এতটুকু প্রতি মাসে দুই আউন্স (এক ছটাক) করিয়া পাইবে। অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চিনির বরাদ্দ শতকরা ২০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে।

বাকি চিনিটা বোধ হয় গ্ল্যাকমার্কেটে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে। গ্ল্যাকমার্কেটের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্বন্ধে বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহাতে দেশের লোকের মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক।

ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন রেশনিং

ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে প্রচণ্ডতম যুদ্ধের মধ্যেও লোকের খাদ্যাভাব কিভাবে ঘটিয়াছে ইহা নিম্নোক্ত তুলনা-মূলক তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। গম, ভূট্টা বা চাউল ইহাদের একমাত্র লব্ধ ছিল না, ঐ সঙ্গে তাহারা আলু, চিনি, মাংস, দুগ্ধ, তেল ও মাখন, মাছ এবং ডিমও বেশ ভাল পরিমাণেই পাইয়াছে। আমাদের দেশে সরকারের দোলেতে যে রেশন ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে শুধু চাউল চিনি ও তেলের বরাদ্দই করা হইয়াছে, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি তো চোখে দেখাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে ছড়র। হিসাবগুণী সবই কিলোগ্রামে দেওয়া হইল। এক কিলোগ্রামে ৩৫ আউন্স অথবা আমাদের কিকিদ্দিক ১৭ ছটাকের সমান।

জার্মানী		১৯৪৩-৪৪
মুদ্রের আগে		
গম প্রভৃতি	১৪৪	১৪০
আলু	১৭৬	১৭৫
চিনি	২৪	২৩
মাংস	৪৪	৩১
দুধ	১১২	৬৫
তেল ও মাখন	২৫	১৫
মাছ	১২	৮
ডিম	১২২ট	৭০ট

রুম্যানিয়া		১৯৪৩-৪৪
মুদ্রের আগে		
গম প্রভৃতি	১০৪	১২৮
আলু	৫০	৬৭
চিনি	৫	৭
মাংস	১৬'৮	১৫
দুধ	৭০	৬৮
তেল ও মাখন	৬'৭	৮'৪
মাছ	১'২	১'৬
ডিম	৮৫ট	৭৩ট

গ্রীস		
গম প্রভৃতি	১৬০	১১৭
আলু	১৬৭	১৬৮
চিনি	২২	১৪
মাংস	৪৭'৭	২১'২
দুধ	১০৩	৭৪
তেল ও মাখন	১৩	৫'৬
মাছ	৯'১	২
ডিম	১৫৪ট	৭০ট

পোল্যান্ড		
গম প্রভৃতি	১৩০	১৪৩
আলু	৩০০	৩০০
চিনি	১১	১২
মাংস	২১'২	১৩'৬
দুধ	১০৭	৬৭
তেল ও মাখন	৮'৮	৬'৩
মাছ	১'৫	X
ডিম	৭০ট	৪৮ট

অস্ট্রিয়া		
গম প্রভৃতি	১৬৫	১৪০
আলু	৮৫	১৭৫
চিনি	২৪	২৩
মাংস	৫০	৩১
দুধ	২০০	৬৫
তেল ও মাখন	১৬	১৫
মাছ	১	১
ডিম	১১০ট	৭০ট

ইটালি		১৯৪২-৪৩
গম প্রভৃতি	১৫৮	১৪০
আলু	৪১	৪২
চিনি	৭'৬	৮'৮
মাংস	১৬'৪	১৩'৮
দুধ	৬৫	৪৭
তেল ও মাখন	১১	৮'২
মাছ	৬'৫	৩
ডিম	১৩০ট	১০০ট

আর আমাদের দেশে? বাংলা দেশে রেশনের দৌলতে লোকের খাদ্য দাঁড়াইয়াছে নিম্নোক্তরূপ—

চাউল	১২৮
চিনি	৪'৫
তেল	৬

মাছ মাংস দুধ সজী প্রভৃতি লোকের যে পরিমাণ খাওয়া দরকার তার শতাংশের একাংশও সাধারণ লোকের জোটে না। ভারতবর্ষে কুহুরে পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি লেবরেটরী আছে। এই লেবরেটরীর হিসাবে দৈনিক এক পাউন্ড চাউল বা গম যাহারা খায় তাহাদের পুষ্টির জন্য ইহার উপর প্রতিদিন আট আউন্স দুধ, তিন আউন্স ডাল, ছয় আউন্স আলু, দুই হইতে চার আউন্স সজী দুই আউন্স ফল এবং দুই আউন্স তেল ও মাখন খাওয়া উচিত। গ্রহিব শুধুরের কথা বড়লোকের ভাগ্যেও এই খাণ্ড জোটে না, সাধারণ লোকে ভাতের বা রুটির সঙ্গে সামান্য কিছু ডাঁটা চক্ষুড়ি সংগ্রহ করিতে পারিলেই যত্ন হয়। তার পূর্বে পরিমাণের কথা। কুহুরের গবেষণা-কেন্দ্র চাউল বা রুটির যে পরিমাণকে অপর পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত না খাইলে অপরিপাক্য মনে করেন, গবেষণে তাহাকেও কমাইয়া এক পাউন্ডের স্থলে ১২ আউন্স করিয়াছেন এবং তাহারা জানেন যে ভাত বা রুটি ভিন্ন লোকের আর কোন খাদ্য নাই। তেলের পরিমাণ এই হিসাবে পাওয়া উচিত—মাসে সাড়ে তিন সের, কিন্তু সরকারী রেশনের কল্যাণে পাওয়া যায় মাত্র আশ সের। ইউরোপে হিটলার কর্তৃক অবিকৃত দেশগুলি পর্যন্ত যে খাদ্য পাইয়াছে, ভারতবর্ষে অসম্ভব ইংরেজশাসনাধীনে মাহুষের ভাগ্যে তাহা জোটে নাই। ক্যালরির দিক দিয়া দেখিলে অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হইবে। ইউরোপের যে দেশগুলির নাম উপরে দেওয়া হইল তাহাদের এবং ভারতবাসীর ভাগ্যে কত ক্যালরি খাদ্য প্রতিদিন জোটে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

ক্যালরি—(১৯৪৩-৪৪ সাল)

জার্মানী—২৫০০
রুম্যানিয়া—২৬০০
গ্রীস—২০৫০
পোল্যান্ড—২২০০
অস্ট্রিয়া—২৫০০
ইটালি—২১৫০

ভারতবর্ষ—হওয়া উচিত ২৪০০, কিন্তু সরাসরি মাদাগাস্কারের মতে ১২০০ পাইতেছে কি না সন্দেহ।

অনাহারে মৃত্যু

কলিকাতায় দুঃস্থগণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনাহারে মৃত্যুর সংবাদে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। তরা এপ্রিলের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে মার্চের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় তেইশটি অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্যে পাঁচটি অনাহারে মৃত্যু বলিয়া জানা গিয়াছে। এই খবরের দুই-তিন দিন পরে বাংলা গবর্নেন্ট একটি প্রেসনোটে এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত সংবাদটি সরকারপক্ষ হইতে প্রচারিত হয় নাই, এবং উল্লিখিত সপ্তাহে অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা দুইটি।

প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে কলিকাতায় দুঃস্থদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ার যে সমস্তর উদ্ভব হইয়াছে গবর্নেন্ট তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমতঃ দুঃস্থগণ যাহাতে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া না বেড়ায় তাহার জন্য সরকারী দুঃস্থাবাসসমূহে যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরন্তু দুঃস্থগণ যাহাতে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কলিকাতাভিমুখে আসিতে না আরম্ভ করে তাহার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। বিশেষ করিয়া চকিষ পরগণা এবং হাওড়ায় মিলিক ব্যবস্থা নানা ভাবে চালু করা হইয়াছে। গবর্নেন্ট চেষ্টা করিতেছে যাহাতে খাদ্যাভাব যেখানে প্রথম দেখা দিবে সেখানেই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়। ইহার পরেও যে সকল দুঃস্থ কলিকাতার দিকে রওনা হইবে তাহাদিগকে পথের মাঝে সন্ধান করিয়া পার্শ্ববর্তী দুঃস্থাবাসে স্থান দিতে হইবে। এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি কোম দুঃস্থ কলিকাতায় পৌঁছে তাহাদের জন্য কলিকাতায় ব্যবস্থা করা হইবে।

এই গেল বাংলা-সরকারের সাফাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে ত্রিমুখ শশাঙ্কেশ্বর সামন্ত এই সম্পর্কে মূলত্বী প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে চাহিলে খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেও প্রায় একই ধরনের অজুহাত পাওয়া গিয়াছে। অনেক ভূমিকার পরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে দুইটি অনাহারজনিত মৃত্যু মতাই ঘটয়াছে। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছেন যে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যসম্ভার মজুত আছে। তাহা সত্ত্বেও যে কেন অনাহারে লোক মারা গেল তাহার সঠিক কারণ তিনি জানেন না। তাহা ছাড়া বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনাধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ইহা জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে কলিকাতা ও তৎসম্বন্ধিত স্থানসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার মজুত আছে। খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী নিশ্চিন্ত থাকিলেও আমরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

বাংলার খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল জানাইয়াছেন বাংলায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই, এখানে খাদ্য-সামগ্রীর এত অভাব পড়ে নাই যে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার মতে এ বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগৃহীত হইতে পারে তাহার সহিত সরকারের হাতে যে চাউল মজুত আছে তাহা যোগ করিলে চাউলের যে পরিমাণ দাঁড়ায় প্রয়োজনের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত। গত দুর্ভিক্ষে নাজিম-শহীদ মঞ্জীসভার পুরানো

• বুলি আওড়াইয়া তিনিও বলিয়াছেন যে জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার যে ক্ষমতা সরকারের আছে সেই সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা বলায় রাখাই সর্বোপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য।

গত দুর্ভিক্ষের সময় আগামী দুর্ভিক্ষের বেলায়ও বাংলা-সরকারের কার্যকলাপ ধাপে ধাপে মিলিয়া যাইতেছে। খাদ্যের অভাব জানিয়াও তখন খাদ্য রপ্তানী করিতে দেওয়া হইয়াছে, এবারও হইতেছে। বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে বাহিরে চাউল পাঠানোর সংবাদও প্রায়ই আসিতেছে। এক দিকে কর্তারা বলিতেছেন চাউলের অভাব নাই। অপর দিকে মাহুষের অপরিাপ্ত চার সের বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অব্যোধ্য অপদার্য কর্মচারী চালিত গবর্নেন্টের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য তখন যে প্রচারকার্য হইয়াছিল এখনও ঠিক তাহাই চলিতেছে। সেবারও সরকার যখন অভাব নাই এই কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন তখনই অনশনে মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে; এবারও ঠিক তাহাই ঘটতেছে। সেবারও সরকারী ভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয় নাই, এবারও হইতেছে না, কারণ ইহাতে সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বাড়ে।

বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাকুড়ার অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি দৈনিক কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে :

বিষম অজ্ঞে জানা গিয়াছে যে, বাকুড়া জেলা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল দৈনিক জেলার বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছে। বিশেষতঃ আরামবাগ ও হুগলী জেলা হইয়া কলিকাতার শিল্প অঞ্চল প্রভৃতি স্থানগুলিতে প্রেরণ করা হইতেছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, গত ১৮ই মার্চ হইতে শিল্পাঞ্চলে বেশন প্রভৃতি কমিয়া যাওয়ার চোরাকারবারীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখা দিয়াছে। জেলা হইতে চাউল রপ্তানী বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন তাহা অজ্ঞাত। বাকুড়া জেলার নাকি খুদ চাউল আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। জেলা হইতে চাউল রপ্তানীর কারণ বুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ত্রিমুখ ঘোহনলাল গুপ্ত কোন এক সরকারী স্ত্রীমায়ের এক লক্ষ বাইশ হাজার মণ অখাত চাউল আট টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি উক্ত অখাত চাউল ইন্দপুর ও ওন্দা থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে আট টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতেছেন। এসব অঞ্চলে ভীষণ ভাবে কলেরা ও বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে।

বাংলা দেশের খাদ্য বিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টর-জেনারেল কার্যভার গ্রহণ করিয়া এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে বাংলা দেশে এ বৎসর চাউলের অভাব শতকরা ৮ ভাগের মত হইবে। এই হিসাব সত্ত্বেও বেশনের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। •কঠিন শারীরিক পরিশ্রম যাহারা করে তাহাদের পক্ষে সপ্তাহে ৪ সের চাউলই অপর্যাপ্ত ছিল,

বর্তমান বরাহে তাহাদের আধিপত্য ষাওয়াইরা রাধিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই এবং রেশন কর্তৃপক্ষের বহু কাজের দ্বারা নব নব স্ন্যাক মার্কেট সৃষ্টি হয় এবং প্রচলিত স্ন্যাক মার্কেট চালু থাকে। অজ্ঞান ও অনাবস্থক ভাবে চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়ার চাউলের স্ন্যাক মার্কেট আবার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাঁকুড়া জেলা এখনই তাহার চরিত্র হইতে ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত দুইটিকে সিভিল সাপ্লাইয়ের সহযোগিতায় মিল মালিকেরা আমানত হইতে চাউল কিনিয়া শ্রমিকদের ক্ষুদ্র মজুত রাখিয়াছিলেন, তখন যুদ্ধ ছিল, কাজেই গরজ ছিল বেশী। এবার দেখা যাইতেছে এই কার্যের ভার স্ন্যাক মার্কেটের চোরাকারবারীদের হাতে প্রথম হইতেই অর্পিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ কি ভাবে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে তাহার কথা আমরা বহু বার আলোচনা করিয়াছি। ত্রিমাসী বেপকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজ অভিজ্ঞতা জানাইয়া সরকারের কর্তব্যজ্ঞান উদ্রেক করিবার চেষ্টাও যথাসাধ্য করিয়াছেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃকারীদের সহিত স্ন্যাক মার্কেটের যোগাযোগ যত দিন থাকিবে তত দিন প্রতিকার হইবার সম্ভাবনাও নাই।

বাঁকুড়ায় বস্ত্র-সঙ্কট

সম্প্রতি মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি বাঁকুড়ার বস্ত্রসঙ্কট সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে সরকারী বস্ত্র-বিতরণ-ব্যবস্থার গলদ নুতন করিয়া বরা পড়িয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশ যে ইন্দ্রপুর, সদর থানা প্রভৃতি এলাকার প্রত্যেক পরিবারই বস্ত্রাভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে পরিবারের দুই-তিন জনের হস্ত একখানা করিয়া দ্বি-বস্ত্র অবশিষ্ট আছে; কিন্তু বাকী পরিজনবর্গ প্রায় অর্জন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। রিলিফ সোসাইটি বলিতেছেন যে, “বস্ত্রক বালক-বালিকা উলঙ্গ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে এবং এই সকল দুর্গতির দৃশ্যে প্রত্যেকেই নিরতিশয় ব্যথিত ও অজ্ঞিত হইতেছেন।”

এই ঘটনার উপরে মন্তব্য করিতে পর্যাপ্ত আমরা লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিতেছি। দেশের যে সকল দুর্গত নরনারী বিগত দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রসঙ্কটের দ্ব্যর্থোগ অতিক্রম করিয়া সুদিনের আশায় চাহিয়া আছে তাহাদের পক্ষে এই অবস্থা এক ভয়াবহ সমস্যা। এই সম্পর্কে সরকারপক্ষ হইতে অনেক আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে ভাল করিয়া নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা কার্যে হইলে এই রকম বস্ত্রাভাব পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে আমরা অনেক কাল প্রতীক্ষা করিয়াছি। কলিকাতার অভিজ্ঞতা সকলেই অবগত আছেন। কর্তৃপক্ষের নোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল তখন দেখা গেল প্রয়োজনীয় এবং পরিধানযোগ্য বস্ত্র নাই। আমানতের অবস্থা আরও শোচনীয়। নিজের ফুড কমিটিগুলি আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে যদি সরকার দয়া করেন। ইহার উপরে আছে চোরাকারবারের কীটিলুপ এবং সরকারী কর্তৃকারীদের দুর্নীতি। এখনো কলিকাতায় এক শ্রেণীর লোকের

পক্ষে ভাল কাপড় নিয়মিত এবং প্রয়োজনানুযায়ী ভাবে পাওয়া মোটেই কঠিন হইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের মূল নীতি, প্রাদেশিক সরকারের অযোগ্যতা, ব্যবসায়ীদের চোরাকারবার এবং স্থানীয় কর্তৃকারীদের দুর্নীতি—এই সকলে মিলিয়া দেশের বস্ত্র অদৃশ্য পথে উধাও হইতেছে। ফলে লোকের দুর্গতি চরমে পৌঁছিতেছে; বাঁকুড়ার ঘটনা মাত্র একটি প্রমাণ।

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অর্থোত্তিকতা

আহমদাবাদ মিল মালিক সম্মেলনের সভাপতি শেঠ শঙ্করলাল বালাভাই সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তুলিয়া লওয়া হইবে। তাহা হইলেই কাপড়ের কলগুলি আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া পূর্বের জায় দেশের বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারিবে। কিন্তু সম্প্রতি ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কর্তৃপক্ষের জানাইয়াছেন যে আরও প্রায় দেড় বৎসর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকিবে। ইহার প্রতিবাদে মিল মালিকদের পক্ষ হইতে শেষে বালাভাই বলেন, “আমাদের তরফ হইতে ইহাই বলিবার আছে যে, বর্তমানে যুদ্ধের অর্ডার প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণও যৎসামান্য; অল্প দিকে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় দেশের লোকে কেন যে বস্ত্রাভাবে দিন কাটাইবে তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর! আমরা মনে করি এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন রহিয়াছে, কেননা বর্তমান বস্ত্রবর্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক; তদুপরি বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল দিয়া প্রভূত পরিমাণ বস্ত্র অল্প চলিয়া যায় বলিয়াও আমরা আশঙ্কা করি। তবে বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় মজিনগুলি গঠিত হওয়ার আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।”

বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কারসাজির মূল উদ্দেশ্য দেশী কাপড় উৎপাদন ও বর্টনে যথাসম্ভব বাধা দিয়া বিলাতী কাপড় আমদানীর পথ তুলিয়া রাখা ইহা বহু পূর্বেই লোকে সন্দেহ করিয়াছে। আমরাও এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি। বিলাতের কাপড়ের কারখানাগুলি সচল করিতে আরও অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবার কথা, সুতরাং ততদিন বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিবার চেষ্টা হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

খানাকুল থানায় বোরো ধানের চাষ

এ দেশের গবর্নেন্ট জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণকর কোন কাজ নিজেদের করেন না, দেশবাসীকেও নিজ হাতে উদ্ধার করিতে দেন না। হুগলী জেলার বোরো ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের চেষ্টায় যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই সংখ্যার অন্তর্গত প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের অপেক্ষা না রাখিয়া দেশের লোক নিজেদের কাজ নিজেদের করিয়া লইতেছে জেলা কর্তৃপক্ষের ইহা সহ হইল না, তাঁহারা কংগ্রেসকর্মীদের কাজ করিতে না দিয়া ফলসেচের ভার বহুশ্রেণে গ্রহণ করিলেন। ফল যাঁহা হইবার তাহাই হইয়াছে, সাধারণের টাকা খরচ হইয়াছে অথচ সময়-মত ক্ষেতে ফল মিলে নাই। ১৯৪৪-৪৫ সালে কংগ্রেস কর্মীরা ২২৫৩৬

টাকা ব্যয়ে ১৫টি (বুঝ ছোট বঁধ লইয়া মোট ২০টি) বঁধ নির্মাণ করিয়া ৫০টি গ্রামে এগারো হাজার বিঘার অধিক ক্ষমিতে ঠিক সময়ে সেচের জল দিয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরে সরকারী চেষ্টায় মাত্র ৫টি বঁধ নির্মিত হইয়া মাত্র আড়াই হাজার বিঘা ক্ষমিতে জল দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অসময়ে এবং বহু বিলম্বে এই জল আসায় কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। প্রকাশ, এই ৫টি বঁধ বাঁধিতে গবর্নমেন্টের ২১০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। গবর্নমেন্ট বোরো চাষের ক্ষয় শুধু পশ্চিম অঞ্চলে কামানদীর দিকে জল দিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলে যুগেশ্বরী নদীতে তাহার উদমার প্রধান বঁধ বাঁধেন নাই—কলে বোরো চাষের পূর্বাঞ্চল সেচের জল পায় নাই। অথচ এই পূর্বাঞ্চলেই বোরো চাষ হয় বেশী এবং বোরো ধানের উপর লোকের নির্ভরও বেশী।

বর্তমান বর্ষে গবর্নমেন্ট উদমার বঁধ না বাঁধায় দুই-তিনটি গ্রামের লোক উৎসাহী হইয়া নিজ ব্যয়ে ঐ বঁধ বাঁধিয়াছিল। কিন্তু গোপালনগরের সর্বপ্রধান বঁধ গবর্নমেন্ট ঠিক সময়ে বাঁধিতে না পারায় নদীতে জল সঞ্চয় এত কম হইয়াছে যে উদনা অঞ্চলে জলসরবরাহ হইতেছে না। ফলে ঐ অঞ্চলের আবাদের ধান মরিতে বসিয়াছে। ইহা ছাড়া গত বৎসর কংগ্রেসকর্মীরা জল-সরবরাহ করার ঐ সব স্থানে প্রায় হাজার বিঘা ক্ষমিতে পৈরাঙ্গ, আলু, আখ প্রভৃতি রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসর গবর্নমেন্ট জল দিতে না পারায় ঐ সব ফসল শুকাইয়া মরিতেছে। থানাভূল থানার কংগ্রেসকর্মীদের হাতে যে কার্য সকল হইয়াছিল গবর্নমেন্টের হাতে সেই কার্য ব্যর্থ হইয়াছে।

যে গবর্নমেন্ট দেশবাসীর অন্ন ভোগাইতে অক্ষম, সেই গবর্নমেন্ট জনসাধারণকে নিজেদের অন্ন নিজেরা সংগ্রহ করিতে দেখিলে বাধ্য দেয় কেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে হুঁকোষ্য মনে হইলেও উহার প্রকৃত কারণ অসুখ্যমান করা হুঁসোষ্য বা কঠিন নহে। আবার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আসন্ন আনিয়াও গবর্নমেন্ট চাষ পণ্ড করিবার ক্ষমতা বিনা কারণে অগ্রসর হয় নাই। বোরো চাষ উপলক্ষে থানাভূল থানার চাষীরা চায়ানীর টাকা শোধ করিয়া যে স্বাবলম্বন ও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার ভাব দেখাইয়াছিল, গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপে তাহা ফুটতে পারিল না। কৃষকদের সম্বায় আন্দোলনকে গবর্নমেন্ট কখনও স্বাবলম্বনের পথে পরিচালিত করেন নাই। প্রথমাবধি উহাকে সরকারের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়া স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলে কঠোরভাবে করিয়াই আসিয়াছেন। এই কারণেই গবর্নমেন্ট কখনও সম্বায় আন্দোলনকে হাতছাড়া করেন নাই। কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বনের ভাব অর্থাৎ পার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবনের অসংখ্য ক্ষেত্রেও তাহা সঞ্চারিত হইবে ইহা বিশ্বাসের মত কৃতিবুদ্ধি বিদেশী গবর্নমেন্টের আছে। যে শ্রেণীর ভারতীয় কর্মচারীর সহায়তা ইংরেজ গবর্নমেন্টের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় তাহার অভাব এখনও এদেশে হয় নাই। যুদ্ধের সময় যে এদেশীয় 'সিভিলিয়ান' সরকারী পদস্থ থানায় প্রেস এডভাইসার এবং ন্যাশনাল ওয়ার-কন্ট্রোল ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে এদেশে বিদেশীর স্বার্থ সাধন করিয়া গিয়াছেন, হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপেও তিনি

সেই কাজই করিতেছেন। থানাভূল থানার প্রশংসনীয় কাজটি পণ্ড করিবার মূলেও এই ব্যক্তিরই উৎসাহ ও উত্তম প্রধান। সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের হস্তে যে অসামান্য ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারে, কেমন করিয়া কৃষকের দৈনন্দিন জীবনকে পর্যাপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে পারে, হুগলীর এই ঘটনা তাহার একটি নিদর্শন মাত্র।

গ্রামবাসীদের বাস্তবতা প্রত্যাপন

“ভায়মণ্ড হারবার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিম্নলিখিত বিষয়টি দিয়াছেন :

ভায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট থানার দেউলানাঙ্গরা প্রভৃতি যে দশটি গ্রাম হইতে গত ১৯৪২ সালে যুদ্ধের কারণে লোকপসারণ করা হইয়াছিল সেই সকল গ্রাম এখন অধিবাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন প্রধান সমস্যা এই যে, এখন কেমন করিয়া ঐ সকল হতভাগ্য গ্রামবাসীরা তাহাদের পুনঃপ্রাপ্ত বাস্তবতা তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া লইবে। সাময়িক দখলকালীন ঐ সকল গ্রামের প্রায় সকল গৃহই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন তাহাদিগকে মাত্র শুষ্ক ভূমি ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, অপনারিত গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের বাসগৃহাদির ক্ষয় ক্ষতিপূরণ (পর্যাপ্ত হটক বা নাই হটক) দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের অধিকাংশ দরিদ্র ক্ষুদ্রাচারী বা ভূমিহীন মজুর, বাসগৃহের ক্ষয় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাহারা বাহা পাইয়াছিল তাহা বহুপূর্বে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ও দুর্দুর্লভ্যতার বাজারে তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য তাহারা ঐ অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি এখন গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে গৃহাদি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না দেয় তবে এসব হতভাগ্য ব্যক্তি তাহাদের নিজগ্রামে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। গৃহাদির ক্ষয় তাহাদিগকে এক বার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে—এই অজুহাতে গবর্নমেন্ট যেন তাহাদের গুরু দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা না করেন। তাহাদিগকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তখনকার বাজারদরের হিসাবে তখনকার তুলনায় গৃহনির্মাণের সরঞ্জামের মূল্য ও মজুরির হার অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জলের ব্যাপার আরও এক সমস্যা। সাময়িক দখলের সময় ঐ সব গ্রামের সব পুকুরিগির জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুকুর-গুলির জলের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, উহা ঘোষার কাজেরও অযোগ্য হইয়াছে। সরকারের খরচে এসব গ্রামে টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। উপরন্তু প্রতি গ্রামে অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া পুকুর সংস্কার করা হইয়া দেওয়া আবশ্যক।

গ্রামগুলির জল নিকাশের ব্যবস্থাও নষ্ট হইয়াছে। গ্রামের অন্তর্ভাগে নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন কালভার্ট (পুল) রাখা হয় নাই। উপরন্তু ড্রেনের উপর স্থানে স্থানে মাটি ফেলা হইয়াছে বা অন্তরূপে ড্রেন নষ্ট করা হইয়াছে। গ্রামগুলির জল নিকাশের পথের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গবর্নমেন্টকে করিতে হইবে।”

এই আবেদন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। “রিহাবিলিটেশনে”র

নামে বাংলা সরকার বহু টাকা অপচয় করিয়াছেন অথচ কাজ কিছুই হয় নাই। এক্ষেত্রে কিছু টাকা সাহায্য করিলে এই লোকগুলি নিজ নিজ বাস্তু ভিত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতে বিলাতী মূলধন

ভারতে বিলাতী মূলধনের অবস্থা স্বাধীন ভারতে কি দাঁড়াইবে তাহা লইয়া লগনের বর্ষিক মহলে গবেষণা শুরু হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে দৈনিক 'ভারতে' (২১শে চৈত্র) যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ইংরেজ বণিকদের হিসাবে ভারতবর্ষে বিলাতী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। শিল্প-বাণিজ্যে এই টাকা খাটাইয়া ব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে স্তম্ভ ও লভ্যাংশ প্রায় দশ কোটি টাকা উপাৰ্জন করে। এই অর্থ উপাৰ্জনের জন্ত ইংরেজ বণিকেরা ভারত-শাসন আইনে অনেকগুলি রক্ষা-কবচ বিধিবদ্ধ করাইয়া এতদিন ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ছুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার ভারতীয় যুগ্ম শিল্পগুলি আজ পর্যন্ত মাথা তুলিতে পারে নাই। বিলাতী জাহাজওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত এদেশে জাহাজের কারখানা প্রতিষ্ঠার বিধিতে বাধা দেওয়া তো হইয়াছেই, অধিকন্তু অধিকাংশ দেশী জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে ইহাদের অস্বাভাবিক ও অসামান্য প্রতিযোগিতার ফলে আত্ম-রক্ষা করা দুষ্কর হইয়াছে। কোন সভ্য দেশ দেশীয় কোম্পানীর সহিত বিদেশীয় "বেট-ওয়ার" বা অস্বাভাবিক ভাবে ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতা সহ্য করে না, এদেশে তাহাও ঘটয়াছে। বিলাতী ইঞ্জিন আমদানির পথ খোলা রাখিবার জন্ত ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্মাণে বাধা দেওয়া হইয়াছে। দুই মহাযুদ্ধে বিলাতী লোহা আমদানি বন্ধ না হইলে টাটা কোম্পানী মাথা তুলিতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমাদের কয়লা ইংরেজ বণিকের করতলগত। শুধু যে ভাল ভাল কয়লার খনি-গুলিই ইহার দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহা নহে, ইহাদের অপচয়ে খনিগুলি নষ্ট হইতেছে এবং কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইহার বহু ভারতীয় কোম্পানীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে সব কারখানা বিলাতী কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করে, ইহাদের হাত হইতে কয়লা বাহির করিতে না পারায় তাহাদেরই ক্ষতি হইয়াছে সর্বোত্তরে বেশী। ভারতবর্ষের সমস্ত পেট্রল ইংরেজ বণিকের হাতে। গত কয়েক বৎসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব নুতন পেট্রলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও লাইসেন্স ইংরেজ বণিকদেরই দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অল্প, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি যে সকল মূল্যবান খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, তার লম্ভ্য খনি ইংরেজ বণিকের মুষ্টিগত। কৃষি-সম্পদের মধ্যে চা এবং পাট ইংরেজ বণিকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকিবার ফলে, চা-বাগানের কুলি এবং পাটচাষীর দুর্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে।

ভারতে ব্রিটিশ আর্থিক সম্পদ টাকা ধিন্দা মাগিলে চলিবে না, উহার গৃহ অভিসন্ধি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। দেশের কয়লা, পেট্রল, খনিজ সম্পদ এবং পাট ইহাদের হাতে আছে বলিয়া ইহার আমাদের বৈষয়িক জীবনের বহুক্ষেত্রে ধবরদারী করিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক স্বাধীন দেশ যে সব আর্থিক সম্পদ মূল সম্পদ মনে করিয়া কখনও বিদেশীর হাতে ছাড়িয়া দেয় না, এদেশে ইংরেজ বণিকেরা সেই সবগুলিই দখল করিয়া বসিয়া আছে। এই সব ক্ষেত্র হইতে ইহাদিগকে হটাইতে না পারিলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন স্বাধীন ভারতেও কঠিন হইয়া উঠিবে।

ভারতে বিলাতী মূলধন ৩০০ কোটি টাকা; ইহা বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে—পরের টাকার ব্যবসা করিয়া তাহার চৌদ্দ আনা লাভ পকেটে ফেলিবার অপূর্ণ কৌশল—ম্যানেজিং এজেন্সি নামক যে বস্তুটি সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর অজ্ঞ কোনও দেশে তাহার তুলনা নাই। এই ম্যানেজিং এজেন্সির ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া জানা থাকিলে ভারতের বৈষয়িক জীবনের উপর ইহাদের ক্ষমতা কত সুদূরপ্রসারী, তাহা বোধগম্য হইবে। ভারতবর্ষের চটকলগুলির শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী মূলধন ভারতবাসীর হাতে আসিয়াছে কিন্তু উহাদের পরিচালন ব্যাপারে সামান্যতম ক্ষমতাও ভারতীয় অংশীদারেরা পায় নাই। বার্ষিক সভায় আনা যাইবে এমনই ধরনের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের হাতে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ শেয়ার থাকিলে যেকোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব হারাইবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। এই কারণে বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্টরা যে সব কোম্পানী পরিচালনা করেন, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার নিশ্চিন্ত মনে বাজারে ছাড়িয়া দেন। স্তম্ভরূপে এদেশে বিলাতী মূলধনের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার আসল অর্থ এই যে, অন্ততঃ ৮০০ কোটি টাকার মূলধনের উপর ইহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত।

ভারতবর্ষের কোন কোন বিলাতী ব্যবসা যেখানে হস্তান্তরিত হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ শেয়ার বাজারে ছাড়িয়া রাখিয়া মিজেরের খুশীমত কারবার চালানো ইংরেজ বণিকদের পক্ষে ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময় ঠালিং সিকিউরিটি জমা রাখিয়া যে ১২০০ কোটি টাকার নোট বাজারে ছাড়া হইয়াছে তার অধিকাংশই অল্প কতকজন ভারতীয় বণিকদের হাতে আসিয়া গিয়াছে। এই টাকার জোরে ইহার বহু কোম্পানীর শেয়ার আটকাইয়া ফেলিয়া ম্যানেজিং এজেন্টদের কোণঠাসা করিবার আয়োজন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একদল ইংরেজ বণিকদের দলে জুটয়া তাহাদের সহিত ভাগে কারবারে লিপ্ত হইতেছে। বিরলতার সহিত মুক্তি এবং টাটার সহিত ইম্পিরিয়াল কেমিকেলের চুক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে দেশী নামে বিলাতী জিনিষ বিক্রয়ের পথ পরিষ্কার হওয়া আশ্চর্য নয়। আর একদল বিলাতী ম্যানেজিং এজেন্টদের বিতাড়িত

করিয়া ইহাদের কারবার দখলের চেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে বড় বড় মিলমালিকদের দ্বারা ভারতীয় বড় বড় বিলাতী সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় ও নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ লক্ষ্যীয়। গত যুদ্ধের পর বিলাতে ও আমেরিকায় কোটিপতি মিলমালিকেরা ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলি কিনিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য যেভাবে সংবাদপত্রের স্বত্ব দখলের আশ্রয় দেখাইয়াছিল, এই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটতেছে। সুতরাং ইহাদের দ্বারা ইংরেজ বণিক বিতাড়িত হইলেও ক্ষেতলাধারণ সমতান্ত্রিক বিষয় শোষণ হইতে রেহাই পাইবে কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে।

ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ

নাগপুর হাইকোর্টের উকীল ও ভবিষ্যৎ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ দেশপাণ্ডেকে অবিলম্বে “মুক্তিদান”র আদেশ নাগপুর হাইকোর্ট দিয়াছেন, সরকার পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আদালত করিয়াছেন। যুদ্ধ পরিচালনা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার নামে কিভাবে ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ হয় এই মামলার তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, ডাঃ দেশপাণ্ডেকে মধ্যপ্রদেশের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ১৯৪৪ সালের ২১শে আগষ্ট ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অহুমারে গ্রেপ্তার করেন। ভারতরক্ষা আইনের উক্ত ধারায় এইরূপ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের কার্য যদি কোনও পুলিশ কর্মচারীর মনে মুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উদ্ভূত করে এবং যদি তিনি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির কার্যকলাপ জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সাফল্য-জনক ভাবে যুদ্ধপরিচালনার পরিপন্থী তাহা হইলে তিনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতিরেকেই উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। ডাঃ দেশপাণ্ডের গৃহ তত্ত্ব করিয়া তজ্জাসী করা হয়। তাঁহার জী ও আত্মীয়স্বজনের বহু আবেদন সত্ত্বেও ডাঃ দেশপাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ কি তাহা তাঁহা-দিগকে জানান হয় নাই অথবা তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের অহুমতি দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাঁহার জীর পক্ষ হইতে নাগপুর হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত করা হইলে হাইকোর্ট তাঁহার মুক্তির আদেশ দেন। রায়ে হাইকোর্ট মন্তব্য করেন যে, ডাঃ দেশপাণ্ডেকে আটক রাখা অবৈধ ও অসুচিত হইয়াছে এবং যেহেতু মুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান না থাকার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সুতরাং উহাকে ভারতরক্ষা আইনের জালিয়াতি বলা চলে।

সরকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের আবেদন করা হইলে কতকগুলি কঠোর শর্ত সাপেক্ষে উহা মঞ্জুর করা হয়। শর্তগুলি এইরূপ :

ডাঃ দেশপাণ্ডেকে পুনর্বিচার সম্পর্কিত কোন কারণেই পুনরায় গ্রেপ্তার করা চলিবে না এবং আপীলে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁহার যে ব্যয় হইবে তাহা সরকার পক্ষকে বহন করিতে হইবে।

লাহোর দুর্গে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার

লাহোর দুর্গে রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে, মুক্ত রাজবন্দীদের নিকট হইতে দেশবাসী ইহা জানিতে পারিয়াছে। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের প্রবীণ ব্যক্তি এবং দেশের একজন সর্বজনপ্রিয় নেতা। তিনিও লাহোর দুর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তথাকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকমন্ডল ইহা লইয়া আলোচনা উপস্থাপিত হইলে স্বরাষ্ট্র-সচিব সাফ জবাব দেন যে, লাহোর দুর্গের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ হইয়াছে তাহা হয় মিথ্যা নয় অতিরঞ্জিত।

স্বরাষ্ট্র-সচিবের উক্তির প্রতিবাদে সর্দার শার্দুল সিং তাঁহার অভিযোগের পুনরুক্তি করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অবশুন কর্মচারীদের সভ্যবাদিতার স্বরাষ্ট্র-সচিবের যদি অটুট বিশ্বাসই থাকিয়া থাকে, তবে সর্দারজীকে আদালতে অভিযুক্ত করিবার সাহসও তাঁহার থাকি উচিত। সর্দারজী আরও বলিয়াছেন যে, লাহোর দুর্গ হইতে তাঁহাকে ক্যামেলপুর জেলে স্থানান্তরিত করিবার পর তিনি লাহোর দুর্গের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের নামে মামলা করিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারের অহুমতি প্রার্থনা করেন। ইহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও সে অহুমতি আসে নাই। ব্যাপারটা আদালতে টানিয়া লইবার ক্ষমতা সর্দারজী বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ আদালতে মামলা উঠিলে সভ্য প্রকাশের একটা সুযোগ অন্ততঃ খটিবে। কিন্তু ভারত-সরকার কিছুতেই আদালতের পথ মাড়াইতে চান নাই। সর্দারজী শেষ পর্যন্ত এমনও বলিয়াছেন, যে, গবর্নেন্ট তাঁহার নামে মামলা করিলে সেই মামলার ব্যয়ভার বহনে তিনি রাজী আছেন, তৎসত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রসচিব আদালতে আসিবার সাহস পান নাই।

কারাগারীদের অন্তরালে রাজবন্দীদের উপর যুদ্ধের কয়-বৎসরে যে অত্যাচার চলিয়াছে তাহা বহুলাংশে নাংসী বন্দী-শিবিরের সহিত তুলনীয়। প্রাচীরঘেরা জেলের মধ্যে বন্দীদের উপর গুলী ও লাঠি চালাইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে দেশবাসী তাহা বুঝিতে অক্ষম; অথচ বহু বন্দীশিবিরে এরূপ ব্যাপার ঘটয়াছে। অন্য অসংখ্যবিধ অত্যাচার তো চলিয়াছেই। কারাকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসিয়াছে কিন্তু গবর্নেন্ট তার প্রতিকারও করেন নাই, নিরপেক্ষ অদন্ত কমিটি বনাইয়া সভ্যসভ্য যাচাই করিবারও চেষ্টা করেন নাই। বাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদেরই কৈফিয়ৎ বেদবাক্যরূপে নিরোষাখ্য করিয়া তাঁহারা সকল অভিযোগ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্দার শার্দুল সিং ব্যাপারটা আদালতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে পুলিশের অত্যাচার

‘স্বাধীনতা’র প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে মার্চ সকালে একদল পুলিশ এবং আবগারী বিভাগের কর্মচারী হাতিমপুর গ্রামের ৫টি মুসলমান কৃষকের বাড়ী ছড়াও করে। তাহারা ৮০ বৎসরের এক যুদ্ধের দাড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে

উঠানে ফেলিয়া বেদম প্রহার করে এবং জনৈক মুসলমান গৃহস্থের জী ও তাঁহার পরিবারের অপর দুই জন মহিলাকে মার-পিট করে।

প্রকাশ, পুলিশের সহিত নাকি কাহারপাড়ার কয়েকজন নানজাতি দাপ্তকে দেখা যায়।

চার খণ্ডী প্রদানদে আক্রমণ চালানোর পর দুর্ভিক্ষেরা ফিরিয়া যাইবার সময় টাক, চেয়ার, কাপড়, সুপারির বস্তা, তামাক, নগদ টাকা এবং সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ফলে, মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫,৪২০ টাকা।

যাহাদের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাদের দখল হইতেই ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আবগারী বিভাগের লোকেরা এই পাড়ার কৃষকদের কাছে তামাকের ট্যাক্স আদায় করিতে গেলে উভয় পক্ষে বচসা হয়। বচসার ফলে, পিওনের সহিত কৃষকদের মারামারি হয়। পর দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পুলিশ মলমল ভুটাইয়া এই কৃষকপাড়া আক্রমণ করে। যে সমস্ত কৃষকের বাড়ী আক্রান্ত হয়, তাহাদের নাম ভজু মিঞা, বসুরত আলি, আমির জুমা, আব্দুর আলি ও আহম্মদ মিঞা। ইহারা সকলেই তামাক-চাষী।

রংপুর জেলার বৈভববাজার গ্রামেও অল্পরূপ অত্যাচার ঘটয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। গবর্নেন্ট উহার প্রতি-বিধান না করিয়া বামাচাপা দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে হয়ত তাহাই ঘটবে। পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচার গ্রামাঞ্চলে কি ভাবে বাড়িয়াছে এই সব ঘটনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রস্তর নিক্ষেপে চৈতন্যোদয়

এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল—কালীগঙ্গা খালের উপরস্থ অস্থায়ী পুলটি রানবিহারী এভিনিউ ও চেতলা রোডকে সংযুক্ত করিয়াছে। অল্প সকালে এই পুলটি ভাঙিয়া ফেলিবার কালে অল্পসংখ্যক বালক পুলিশ ও বাংলা-সরকারের সেচবিভাগের কতিপয় মিস্ত্রির প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করে। সরকার যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের নিমিত্ত পুলটি তৈয়ার করিয়াছিলেন। স্থানীয় বালকগণ এই কারণে আপত্তি জানায় যে, তাহাদের বিজ্ঞানসম্মত যাইবার পক্ষে পুলটি প্রবিধানক। কিন্তু তাহাদের প্রতিবাদ নির্বাক হইলে তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে শুরু করে এবং খোলা ভক্তাগুলি লইয়া চলিয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতিও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।

সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ইহার কার্য আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।—এ.পি.

যুদ্ধের সময় যে সব রাস্তা ঘাট পুল প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে তাহার নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছে দেশের লোক।

যুদ্ধের পর এগুলি সাধারণের কাছে লাগিলে এই অর্থব্যয় সার্থক হইবে। তাহা না করিয়া কোন কর্তৃকারীর আদেশে উপরোক্ত পুলটি ভাঙিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হওয়া দরকার। এই পুলের যতখানি ভাঙা হইয়াছে তাহা যেরামত করা দরকার এবং যে কর্তৃকারী উহা ভাঙিবার আদেশ দিয়াছে যেরামতের ব্যয় তাহার নিকট হইতে আদায় করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি পরীক্ষায় ফিজিক্সের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র অতিশয় কঠিন হইয়াছে বলিয়া প্রায় এক হাজার ছাত্র কলিকাতার পরীক্ষাগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। বাকুড়া কলেজের ছাত্রেরাও উত্তর দিতে না পারিয়া বীরে বীরে উঠিয়া যায়। ইহা লইয়া অনেক প্রকার মন্তব্য হইয়াছে, সংবাদপত্রে সমালোচনাও হইয়াছে। ছাত্রদের উপর দোষারোপের ভারটাই যেন একটু বেশী। ছাত্রদের পক্ষাবলম্বনের ইচ্ছা আমাদের নাই, কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। পাঠ্যভালিকা নির্ধারণ এবং কলেজে অধ্যাপনা, প্রশ্নপত্র রচনা এবং পরীক্ষার ষাণ্টা দেখা ইহাদের কোনটির সহিত কোনটির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই ইহা গত কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। ম্যাট্রিকের পাঠ্যভালিকা অনাবশ্যক দীর্ঘ, এ অভিযোগ অনেক হইয়াছে। ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজীর পাঠ্য যেভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে ছাত্রদের ইংরেজী জ্ঞান বাড়িবার সহায়তা হয় নাই, অনেক অভিজ্ঞ অধ্যাপকও এই বারণা পোষণ করিতেছেন। জনৈক ইংরেজী পরীক্ষকের নিকট শুনিয়াছি তাহার নিকট যে সব ষাণ্টা আসিয়াছে তার মধ্যে অর্ধেক ছাত্র পাস করিয়াছে; যাহারা ফেল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দশ-পনের জন বাদে অপর সকলেই পাঠ্যবস্ত্ত বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে নাই বলিয়া পাসের নম্বর পায় নাই। এখানে গলদ রহিয়াছে গোড়ায়। আগে ম্যাট্রিকের ছেলেরা কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকা সত্ত্বেও যে ইংরেজী শিখিত, আজকাল ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রেরাও তার অর্ধেক শেখে না। আগে জুলে ম্যাট্রিকের ছেলেরা অল্পবাদ, রচনা-পদ্ধতি ও ইংরেজী ব্যাকরণ ভাল করিয়া শিখান হইত, ফলে তাহারা ভাষাটা শিখিত। এখন নির্দিষ্ট দীর্ঘ ইংরেজী পাঠ্যভালিকা শেষ করিতেই বৎসর চলিয়া যায়, ব্যাকরণ ও ভাষা শেখানর ঐক্য থাকে কম। ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে ছেলেরা ইংরেজীতে কঁাচা হইয়া আসে এবং পরে প্রতি পরীক্ষায় বিপন্ন হয়। ইংরেজী বই গেলানোর চেয়ে ভাষা শেখানোর দিকে বেশী মন দিলে বাঙালী ছেলে সহজেই উহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ইংরেজের ছেলে মাতৃভাষার সঙ্গে জন্মান ও ফরাসী দুইটি ভাষার যদি ব্যুৎপন্ন হইতে পারে, তবে বাঙালী ছেলেও অনায়াসে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিখিতে পারিবে। বর্তমান জগতে ইংরেজী ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে, ইংরেজী বাদ দেওয়া চলিবে না।

তারপর বিজ্ঞানের ছাত্রদের কথা। বিজ্ঞান শিক্ষার দুইটি পথ আছে,—প্রথম, বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও প্রণালী লব্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মান; দ্বিতীয়, গণিতের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-শিক্ষা;

কলেজে বি-এসসি শ্রেণীতে প্রথমোক্ত প্রণালীতে পড়ান হইলে এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রশ্নপত্র রচিত হইলে গোলযোগ ঘটবেই। আমাদের বিশ্বাস এবারকার বি-এসসি পরীক্ষাতেও এইরূপই কিছু ঘটরাছে। ছাত্রদের মধ্যে জনকতক দুর্ভাগ্যবশত সব সময় থাকে, কিন্তু সকল ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যে কোন পরীক্ষার তো তাহারা গোলমাল করে না। ম্যাট্রিকের সব পরীক্ষা ছাত্রেরা শান্ত ভাবে দিয়াছে, গোল হইয়াছে শুধু ভূগোলের দিন। বি-এস-সি পরীক্ষার অষ্টাশ্র দিন কোন কিছু হয় নাই, বিশৃঙ্খলা ঘটরাছে শুধু ফিজিক্সের দ্বিতীয় প্রশ্নের দিন।

বি-এসসি, এম-এসসি প্রভৃতি বিজ্ঞানের ছাত্রদের এবং বি-এ অনাস এবং এম-এর ছাত্রদের বইয়ের অভাবে গত কয়েক বৎসর যে অসুবিধা ও ক্লেশ সহ করিতে হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দিকে বোর্ধ হয় লক্ষ্য রাখেন না। লাইব্রেরীর একপ্রস্থ বই নকল করিয়া ইহাদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বইগুলি পাওয়াও অতিশয় দুষ্কর। ইহা দেখিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বই আনাইবার আয়োজন বা এখানে উপস্থিত বই লিখাইয়া তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহাদের পুস্তক প্রকাশ বিভাগ আছে, ইংরেজী বাংলা প্রভৃতি 'সিলেক্সন' প্রকাশ করিয়া উহার একটি বা দুইটি রচনা বদলাইয়া দিয়া প্রতি বৎসর তাহারা নূতন পুস্তক কিনিতে ছাত্রদের বাধ্য করেন। এই ব্যবসায় বুদ্ধির একটা অংশ ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহে ব্যয়িত হইলেও কিছু কাজ হইত। যে সব বই পাওয়া যায় না, সেগুলি পাঠাই বা করা হয় কেন? শুধু প্রশ্নপত্র রচনা বা পরীক্ষা গ্রহণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য শেষ হয় না। ভাল বই সরবরাহও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততম দায়িত্ব। অস্কোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়িতে হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি এরূপ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না? কলেজে ঠিক মত পড়া হয় কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য।

প্রশ্নপত্র রচনার বৎসরটি আছে সিভিকিট কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি তাহা বলিয়াছেন। প্রশ্নপত্রের উন্নতি সাধনের অন্ততম উপায় প্রশ্নকর্তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি তাহাও ঐ সঙ্গে বল হইয়াছিল। প্রশ্ন রচনার পারিশ্রমিক ৩২ টাকার হ্রাসে ৪৮ টাকা করিলে উহা আরও ভাল হইবে, এই ইচ্ছিতও অনুচিত। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যে প্রশ্নকর্তার উপর নির্ভর করিতেছে তিনি যদি ছেলেরদের কথা না ভাবিয়া টাকার কথাই বড় করিয়া দেখেন তবে আমাদের মতে তাহাকে এই কার্য হইতে অব্যাহতি দেওয়াই সদত।

সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে ছাত্রেরা তাহাদের অভিযোগ কিভাবে জানাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা সন্তুষ্ট হইবেন? গত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় কলিকাতার আন্দোলনের জন্য ইংরেজী বাংলা পরীক্ষা হইতে পারে নাই। ছাত্রেরা চাহিয়াছিল সব পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহাদিগকে তিন দিন সময় দিয়া ইংরেজী পরীক্ষা লওয়া হউক। ছাত্র

প্রতিনিধিরা ভাইস-চ্যান্সেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা জানাইলে তাহারা আশ্বাস দেন সিভিকিটের সভায় তাহাদের অভিযোগ বিবেচিত হইবে। প্রশ্ন দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সভা তাহারা আহ্বান করিতে সময় পান নাই। অবশেষে ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর কতিপয় ছাত্র দুর্ভাবহার করিলে তার ১৪ ঘণ্টার মধ্যে সিভিকিটের অধিবেশন আহুত হয়। ছাত্রদের এইরূপ আচরণ অতিশয় নিন্দনীয় ও গণিত ইহা আমরা তখনও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। কিন্তু যত দিন তাহারা শান্তভাবে অভিযোগ জানাইয়াছে তত দিন তাহাদের উপেক্ষা করিয়া এই অপ্রীতিকর ঘটনা ডাকিয়া আনিতে কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সাহায্য করেন নাই? তাহাদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ঐ ঘটনার পর তাহা প্রত্যাখ্যান না করিয়া উপায়ও ছিল না; কিন্তু ছাত্রদের দাবি কি সত্যই যুক্তিহীন ছিল? যথাসময়ে সিভিকিটের সভা ডাকিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিতেন যে ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজী পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ও দীর্ঘ বলিয়া পরীক্ষার তিন চার দিন আগে ছাত্রেরা আর সব বই রাখিয়া শুধু ইংরেজী পড়ে। বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা বজায় থাকিতে ছাত্রদের পক্ষে এই কয়দিন সময়ের প্রয়োজন আছে। স্ততরাং মাঝে সময় না দিয়া অল্প পরীক্ষা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়। "তোমাদের পরীক্ষার মাঝে মাঝে যে ফাঁক পাও তাহা দৈবক্রমে ঘটে, ইহার উপর তোমাদের কোন দাবি নাই"—একথা বলিলে ভাষাসঙ্গত কথা বলা হয় না।

মাঝে কিছুদিন ছাত্রদের মধ্যে যে ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়াছিল তাহার জের কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে, পরীক্ষা গ্রহণ কেলে উচ্ছৃঙ্খলতা শুধামি এখনও মাঝে মাঝে ঘটতেছে, কিন্তু মোটের উপর বাংলার ছাত্রসমাজ ধীরে ধীরে যথেষ্ট শৃঙ্খলাবোধ কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বুঝিতেছে ইহা আমরা মনে করি। ষষ্ঠঘণ্টা ও হটগোল, দুর্ভাগ্যবশত ব্যবহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিল নষ্ট করা অতিশয় গণিত কাজ ইহা ছাত্রসমাজ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে, কয়েকজন ছাত্রের এই সব অসদাচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ বাহাতে আর্দ্র ঘটতে না পারে তার জন্য তাহারা ই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে এবং দুর্ভাগ্যকারী ছাত্রদের শাস্তিবিধানের ভারও তাহারা ই লইতে পারিবে। কিন্তু আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রটি ও অদূরদর্শিতা এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলির জন্য কম দায়ী নয়।

বিহারে বাঙালী

১৯৩৭ সালে বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বাঙালী বিরোধী কার্যকলাপের ফলে বিহার বাঙালী সমিতির জন্ম হয়। ১৯৪৬ সালে পুনরায় বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার বাঙালী সমিতির নূতন উদ্ভবে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। বিহারে বাঙালী সমিতির হিসাব-নিকাশ দেখাইয়া ২৪শ্চে চৈত্রের 'যুগান্তরে' ত্রিনিদাদ দাশগুপ্ত লিখিত যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত

হইয়াছে তৎপ্রতি সকল বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার।
প্রবন্ধটি দীর্ঘ, উহার কতকাংশ নিয়ে প্রমত্ত হইল :

বাঙালী সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ : (১) বিহার-প্রবাসী বাঙালীর কৃষ্টির উন্নতি, (২) অর্থনৈতিক উন্নতি, (৩) প্রাদেশিকতার মনোভাব দূর করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্য ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইয়াছে।
তৃতীয় লক্ষ্য সমিতি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ডোমি-সাইল সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে কোরাল প্রতিবাদ চলিয়াছিল এই সমিতিরই উদ্যোগে। শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ কংগ্রেসী বড়কর্তাদের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে এইরূপ সার্টিফিকেট প্রথা শাসনতন্ত্রের বিধি-বহির্ভূত। কংগ্রেসী বড়কর্তাগণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট এই আবেদন পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কাজ আর অগ্রসর হয় নাই।

সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ বিহার-প্রবাসী সমগ্র বাঙালী আত্মিকে পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল আরও উচ্চে। প্রাদেশিকতা পরিহার করিয়া আত্মজাতিকতা প্রচারই ছিল লক্ষ্য। তবে, প্রাদেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া বাঙালী সম্প্রদায় যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেইজন্য তিনি বিশেষভাবে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোভাব এই ছিল যে, প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সমিতি ও তাহার বিভিন্ন শাখার সাহায্যে সামাজিক ও কৃষ্টিগত উন্নতি সাধিত হইবে। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। কংগ্রেসী আমলে জনগণের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে অভিযান হয় তাহাতে বাংলা ভাষাকে বর্জন করা হইয়াছিল। হিন্দী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। মানভূম, সিংভূম, পুর্ণিমা প্রভৃতি বাঙালীবহুল স্থানেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে বাঙালীদের শিক্ষার প্রসার ও বাংলা ভাষার প্রচারে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দাশ এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে একটি কার্যবিধি প্রস্তত করিয়াছিলেন। সেই কার্যবিধির মর্ম্ম এই যে, বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া সপ্তাহে দু-দিন বাংলা ভাষার শিক্ষা দিতে হইবে। এক-একটি লোকের বা দলের মাসে তিনটি গ্রামের ভার লইতে হইবে। বিনামূল্যে বহু পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল। এই ব্যবস্থার সমগ্র বিহারে মাসে হাজার টাকা ব্যয় হইত। টাকার অভাব হইত না, বরং টাকার সম্বন্ধে প্রতি-জ্ঞতিও পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু কর্ম্ম ও উৎসাহের অভাবে চার-পাঁচ মাসের বেশী এই শিক্ষাদান চলিতে পারে নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব কার্য-তালিকা তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অল্পব্যবী স্থির হইবে। বাঙালী সমিতি স্বয়ং অবস্থায় কি করিতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলিতেছেন :

প্রথমতঃ শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। যে সব স্থানে বাংলা ভাষার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই সে সব স্থানে দৈনিক অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া বাংলা ক্লাস খুলিতে হইবে।

ইহাও অসম্ভব হইলে সপ্তাহে দুই দিন। এই সব স্থানে যাহারা ভাল বাংলা জানেন তাঁহারা ই পড়াইবার ভার লইবেন। ইহাতে ব্যয় অতি সামান্যই হইবে। অথবা কেহ ইচ্ছুক হইলে অবৈতনিক কাজও করিতে পারেন। মাঝে মাঝে বড় বড় লোক বা মনীষীদের আনাইয়া বক্তৃতার আয়োজন করাও আবশ্যক। পুস্তাপার্কণাদিতে রচনা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে বাংলা ভাষার প্রচার হইবে। লাইব্রেরির ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্তব্য। সকল স্থানে লাইব্রেরি স্থাপন করা আপাততঃ সম্ভব না হইলে ‘চলন্ত লাইব্রেরি’র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মেয়েদের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন; দরিদ্র মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো ও সেই সব দ্রব্য বিক্রী করিবার ভারও সইতে হইবে। ছেলেদের শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষা দিলেই চলিবে না। যাহাতে তাহাদের কেবলমাত্র চাকুরীর দিকেই না তাকাইয়া থাকিতে হয়, সে উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অর্থকরী বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাঙালী সমিতির একটি প্রচেষ্টার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। বিহারের সমস্ত শহরে, বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালীর সংখ্যা সঠিক ভাবে জানিবার আশ্রয় ইহাদের ছিল। কিন্তু ইহাও কার্যে পরিণত হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী-সমিতির আদর্শ উচ্চ ছিল, আইডিয়া ভাল ছিল, ছিল না শুধু তাহা কাজে লাগাইবার উৎসাহ ও কর্ম্ম।

বিহার-প্রবাসী বাঙালীর এই তো মোটামুটি হিসাব। তবে, এই সন্দেহ ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিহারীদের সন্দেহ যোগ রাখিয়া তাহাদের চলিতে হইবে—নতুবা প্রাদেশিকতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। এই যোগ-নানাভাবে হইতে পারে :

(১) স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক মেলা-মেশার, (২) ক্লাবে, (৩) পুস্তাপার্কণ ও বিবাহাদি উৎসবে পরস্পরের আমন্ত্রণে, (৪) বিহার-প্রবাসী বাঙালীগণ যাহারা নানাভাবে বিহারের সেবা করিয়াছেন তাহাদের কার্যধারা ও জীবনী বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষার প্রচার, (৫) হিন্দী অক্ষরে বাংলাভাষার পুস্তক রচনা, (৬) বিপদে-আপদে বিহারীদের সাহায্য করা।

বিহারে, বিশেষতঃ সিংভূম, মানভূম, পুর্ণিমা ও সাঁওতাল পরগণায় বাঙালীর সংখ্যা, তাহাদের বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা বিশ্বাস করি বিহারী বাঙালী সমিতি চেষ্টা করিলে ইহা করিতে পারেন। বাংলার সহিত এই চারটি জেলার পুনর্নি-জনের দাবি অবিলম্বে খুব জোরের সহিত তোলা দরকার। এখানে বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন পছন্দ করিবার জন্য পত কয়েক বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা হইতেছে তাহার আত্মপুর্নিক বিবরণ প্রকাশিত হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি আমাদের নিকট পাঠাইলে তাহার ব্যবহারের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১

আমি কবি, ভাবুক কিংবা কথাশিল্পী নহি। লোকে বলে, পুঁজি না থাকিলেও ঐতিহাসিক পরের ধনে পোদ্ধারী করিয়া থাকে। প্রথম কথা, সর্বসাধারণ অবগত আছেন বাংলা-সাহিত্যের শাহান্ শাহ্ বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মারফৎ ফরমান্ জারি করিয়া গিয়াছেন বাঙালী নিঃস্বল হইলেও সমালোচক হইতে পারিবে; যেহেতু মাদ্রাজী না হইলেও সমালোচক জাতীয় জীব-আরবী তমব্-ই-হিন্দ (হিন্দুস্থানের খেজুর), বিলাতী tamarind এবং এতদেশীয় তেঁতুলধর্মী। বলা বাহুল্য, সুবে বাংলায় সমালোচনা কার্য এ যাবৎ উক্ত বঙ্কিমশাহী ফরমান্ মোতাবেক চলিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় কথা, যে চট্টলপ্রকৃতির কোড়ে নবীনচন্দ্র মানুষ হইয়াছেন, কবিতার প্রেরণা পাইয়াছেন সে চট্টলপ্রকৃতি আমাদের কাছে নবীনচন্দ্রের কবিতায় অম্লরাগ জন্মাইয়াছে; আমরা তাঁহার “রঙ্গমতী”-দর্পণে মায়ের ছবি দেখিয়া থাকি। চন্দ্রনাথ পাঠাড়ে চড়িয়া—

“অগ্নির উপরে অজি অজি তুলপরি”

আমরা যত বার দেখিয়াছি নবীনচন্দ্রের মত ভাল ছেলের সেই অবকাশ কোথায়? কবি সারি গান গাহিয়াছেন; দাঁড় টানিয়া আমাদের হাতে কড়া পড়িয়াছে। জুমিয়া-জীবন দেখিতে দেখিতে আমাদের পাড়ার একজন ফাঁদে পর্যন্ত পড়িয়া গেল, তবুও আগে-পরে একটা কবিতা বাহির হইল না। পূর্ণিমার উষা অধীর আনন্দে পল্লীজননীর বুক নামিয়া বিষাদে ভোরের উষায় মুখ লুকাইয়াছে কৈশোরের প্রতি কোজাগর পূর্ণিমায়। নবীনচন্দ্র চট্টলজননীর যে অল্পপম রূপ শতবর্ষ পূর্বে দেখিয়াছিলেন উহার নৈসর্গিক জ্যোতিঃ আজিও স্নান হয় নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন আমরাও উহা দেখিয়াছি। কিন্তু কবির দৃষ্টির মধ্যে ছিল ক্যামেরার “অদ্ভুতরশ্মি,” কণ্ঠে ছিলেন বাগীশ্বরী—সুতরাং তাঁহারই মাতৃদর্শন সার্থক হইয়াছে।

যাঁহাদের মন তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাঁহারা ভবপারের খেয়াঘাটে “সোনার তরী”র অপেক্ষা করিতেছেন, নবীনচন্দ্র মুখ্যতঃ তাঁহাদের জ্ঞান কবিতা লিখেন নাই,—শেষ বয়সে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতেও দেখিতে পাই, “রাজ-নীতি-মন্ত্র”-র তপ্তশ্বাস, এবং “বীরের শোক” হরিনাম-কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যলক্ষ্মী আশ্রমপালিতা চকিতা হরিণী “শকুন্তলা”, মুগ্ধা “মালবিকা” কিংবা দুর্বার-গতি দামবনন্দিনী “প্রমীলা” অথবা জালাময়ী “এল্লিলা” নহেন; তিনি আমাদেরই পাছাড়াই মেয়ে; সরলা, সবলা, স্বচ্ছন্দবিহারিণী রহস্যময়ী বনবালা।

শুনিতেছি, পাঠশালার ছেলেরা মাইকেল-হেম-নবীনকে কবি হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দিয়াছে, এবং কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথকেও ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় কবিগুরুকে আজি হইতে শতবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করিতে হইবে না। অদূর ভবিষ্যতে মজতুরমাহাত্ম্য, চোঙ্গা সনেট, চরকাগীতি, মিল-সংহার জাতীয় কাব্য বাংলার সাহিত্যের ময়দানে কুরুক্ষেত্র ঘটিইবে। ভবিতব্যের প্রচণ্ড বিক্ষোভে গোটা উনবিংশ শতাব্দী হয়ত মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইবে; বিংশ শতাব্দী উত্তমাদ হারাইয়া জনগণতাগুব আরম্ভ করিবে এবং ইংরেজ এই কবন্ধের ভয়ে প্রাচ্যভূমি হইতে তল্লিতল্লা গুটাইবে। আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই; কল্লান্তে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লোপ পায়।

২

সম্প্রতি “দেশ” “দেশ” করিয়া দেশে হাহারব পড়িয়া গিয়াছে; ভারতমাতা বলিতে অনেকেই অজ্ঞান। যে দেশ আকারে মহাদেশতুল্য, একাধিক নরগোষ্ঠী (race) ধর্ম এবং ভাষা যে দেশে প্রাধান্য লোলুপ, অতীত ইতিহাস বিকৃত হইয়া যে দেশে বিরোধের বহিতে নিয়ত ইক্ষন যোগাইতেছে সে দেশে দেশাত্মবোধ এত সহজলভ্য বস্তু নহে। যে প্রেমের আগুনে দৈবীভাব ঈর্ষা অবিশ্বাস কপটতা পুড়িল না সে প্রেম প্রেম নহে। প্রেমের গলি অতি সংকীর্ণ; উহার মধ্যে দুই জনের ঠেলাঠেলি করিবার জায়গা হয় না; যে হৃদয়ে দেশপ্রেমের উদয় হইয়াছে সে হৃদয়ে আমার অহংভাব, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অভিমান থাকিতে পারে না। ইংরেজ শাসনে ভারতসন্তান সাবালক হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা তাহাদের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চায়। কিন্তু দ্বিতীয় শৈশবের শোচনীয় দশা প্রাপ্ত ভারতমাতার ভার কে গ্রহণ করিবে? “অনাথাশ্রম” না “এতিমথানা” এই বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহাকে বিলাতী আতুরাশ্রমে রাখিতে অনেকে অনিচ্ছুক নহেন। এদেশে দেশের উপর দাবিদার অনেক; তাঁহাদের মামলা-মীমাংসা করিতে হইলে সোলেমান কিংবা নশিরবান্-বাদশার* বিচক্ষণবুদ্ধি এবং ত্রায়নিষ্ঠতার প্রয়ো-

* কথিত আছে, দুইজন জীলোক একই সম্রাটের মাতৃদাবী করিয়া সোলেমান বাদশার কাছে হবিচার প্রার্থনা করিয়াছিল, সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা কোন পক্ষের দাবী একচুলও হাক্কা হইল না। বাদশাহ্ শিশুটিকে সমান দুই ভাগ করিয়া উভয় পক্ষের দাবী মিটাইবার হুকুম দিলেন। ফরিয়ারী জীলোক বলিয়া উঠিল, “শাহনশাহ বে-নজীর কামাল ইনসাফ করিয়াছেন।” অপর জন বিষয় মুখে বলিল, “দোহাই আলা হজরত।

জন। এদেশে এক প্রকার নার্টকীয় সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিক্ষেত্রে হইতে সাহিত্যের মজলিসে সংক্রামিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেল-হেমচন্দ্র, নবীন-বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র যে অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখক ঐ সাহিত্যকে মুসলমান-বিদ্বেষপ্রসূত হিন্দুসাহিত্য ভ্রম করিয়া মুসলমানের জন্ত পৃথক মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, বৃন্দেলখণ্ড এবং পঞ্চনদ প্রদেশে হিন্দু জাগরণের প্রতীক-স্বরূপ একশ্রেণীর দরবারী হিন্দু সাহিত্য হিন্দী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—যথা ভূষণ-রচিত “শিবরাজভূষণকাব্য”, মানকবির “মানপ্রকাশ” বা রাজ-সিংহচরিত্র, লালকবির “ছত্রপ্রকাশ”, কবি হৃদন-কৃত “সুজানচরিত” ইত্যাদি। বাংলাদেশে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর মুসলমান রাজত্বে কোন হিন্দু অভ্যুত্থান ঘটে নাই; বাংলা ভাষায় কোন হিন্দু সাহিত্যও সৃষ্টি হয় নাই। ইংরেজের আমলে হিন্দুরা কোন পানিপতের লড়াই ফতে করিয়া মুসলমান পতনের উল্লাসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই তথাকথিত “হিন্দু সাহিত্য” সৃষ্টি করিল? বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর “দ্বিসপ্ত কোটিভুজ” কোথায় পাইলেন? ইহার মধ্যে অন্ততঃ সাত কোটি হাত যে মুসলমানের, উহা সরকারী আদমশুমারীর খাতায় লেখা আছে। নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে “বাঙালির আন্তরিক রোদন” কাহার জন্ত? হিন্দুর জয়ডঙ্কা বাজাইবার মতলব থাকিলে, কিংবা কেবল হিন্দুর জন্ত কান্নাকাটি করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি অনায়াসে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, বাজীরাও কিংবা “ভাউ” সাহেবকে কোন মহাকাব্যের নায়কত্বে বরণ করিতে পারিতেন। সেকালে ভোটাভুটি ছিল না; বাঙালী নিজের নাক কাটিয়া পরের ঘাতাভঙ্গ করিত না। স্মৃতরাং বঙ্কিম-নবীন হিন্দু মুসলমান, উৎকল-দ্রাবিড় পঞ্জাব সিদ্ধু সপ্তদে আদৌ সচেতন ছিলেন না; ধর্মনির্বিশেষ সকলকে এক মায়ের পেটে পুরিয়াছেন।

আসল কথা, এই যুগে আমরা আর মুসলমান আমলের ইলিয়দ-জুসরৎ ‘বাঙালী’, ছুটি খাঁ-পরাগল খাঁ নহি। বঙ্কিম-নবীনের সময় পর্য্যন্ত বাদশাহী আমলের ধারা বজায় ছিল। মর্লে সাহেবের রূপায় অধিকাংশ বাঙালী “মুসলমান” হইয়া গিয়াছে; বাদ বাকী “অমুসলমান”-গণের মধ্যে আবার “বর্ণ হিন্দু” এবং “তপশিলী” মার্কী আছে। বিংশ শতাব্দীতে (সাহিত্যে দেড় শত বৎসরে এক শতাব্দী)

আমি আত্মনা শিশু প্রসব করি নাই। প্রাণে না মারিয়া শিশুটি উহাকে দেওয়ার হুকুম হৌক। বাদশাহ ব্যাপীর বৃষ্টিতে পারিয়া ঘষোঁচিতি বিচার করিলেন।

বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভা এবং রসবোধে ভাটা পড়িয়াছে; স্মৃতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে এই যুগে কসরৎ করিয়া বৃষ্টিতে হইবে। আপন খেয়ালে কবি আপন সৃষ্টিতে নিজের স্বরূপ দেখিয়া থাকেন। স্বয়ং খোদাতালা এই সখের খেয়ালে ছুনিয়া সৃষ্টি করিয়া উহার মাঝে নিজের রূপ নিজেই দেখিতেছেন—আপু হি আপু রূপ নেহারহি।

ইহা যদি সত্য হয় নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়িয়াছে, দৃষ্টিদোষে আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ দেখা যাক, নবীনচন্দ্রের দেশ কোথায়? চট্টগ্রাম, বাংলা না ভারত-বর্ষ?

৩

“অবকাশ-রঞ্জিনী”র কবি ফেণী নদী পার হইলেই মনে করিতেছেন দেশ ছাড়িয়া নির্বাসনে চলিয়াছেন, চট্টলার শৈলমুকুট, “কাঞ্চী”র কণ্ঠহার, “শঙ্কু”র বলয়, জননীর চরণ-চুশন-চঞ্চল বঙ্গবারিধিকে দেখিতে না পাইয়া অবকাশের অন্তরালে আকুল স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের নবীনচন্দ্র মনে-প্রাণে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন; পিতৃভূমি ভারতবর্ষের ছায়া কবির মনে সবে-মাত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে; এই কাব্যে ব্যাপক অর্থে দেশ-প্রেম দানা বাঁধা শুরু করিয়াছে। প্রাণ খুলিয়া পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে” অন্তঃরুদ্ধবীর্ঘ্য সর্পের মত ফাঁস ফাঁস করিতে-ছেন (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮২ সাল), কারণ কবি এবং সমালোচক দুজনাই ডেপুটি; এই যুগে বাঙালী হৃদয়ের অনির্বাক্য চিতানল,—পলাশীর যুদ্ধের আগুন উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার ডেপুটিগিরি হারাইয়া detenue হইতেন। বঙ্কিম-চন্দ্র এই জন্ত উপসংহারে লিখিয়াছেন, “পলাশীর যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহার [পাঠকগণ] ইহার মথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আত্মোপাস্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙালী হইয়া বাঙালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল তাহার বাঙালী জন্ম বৃথা।”

দেখা যাক পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে কবির মনের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়; স্বয়ং কবি কাহারও ভূমিকায় নামিয়া-ছেন কিনা। প্রথম সর্গে শেঠজীর বাড়ীতে গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রী উক্তি। উহাতে দেখা যায় মন্ত্রী পাপ-পুণ্যের ভয় রাখেন; সিরাজ অত্যাচারী হইলেও তাঁহার প্রতি প্রাণের দরদ আছে; নিমকহারামি করিতে তিনি নারাজ। মন্ত্রির উপদেশ মাহুঁষোঁচিতি :

“সাজহ সময় সাজে কি কাজ কৌশলে?”

বুদ্ধ বিচক্ষণমন্ত্রী নির্ভয়ে কৃত্রিম সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন;

কারণ তিনি ভালরকম জানেন কৃষ্ণচন্দ্র-রাজবল্লভ, বাণিয়া জগৎশেঠ, মীরবক্শী মীরজাফর আদৌ মল্লয় নহে। আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগে গোঁড়ের স্থলতানী-সেরেস্তার দেওয়ানগী, বাঙালী “বড়বাবু”র এই উজ্জল ঐতিহাসিক চিত্র কেমন করিয়া কবির ধ্যানস্থ হইল। বাবরের দিনচর্য্য (Tuzuk-i-Baburi) কয়েক বৎসর পূর্বে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ না হইলে আমরাও ফাঁপরে পড়িতাম। মুসলমান আমলে বাঙালীর একটা রাজভক্তির অভিমান ছিল। বাবর বাদশাহ্ লিখিয়াছেন, “...Bengalis are loyal to the throne.” এদেশে গোঁড়ের শাহী মসনদে কে বসিলেন, কোন হতভাগ্য স্থলতানের মাথা কাটিয়া বসিলেন, তিনি ভাল কি মন্দ এই সমস্ত লইয়া সরকারী দপ্তরখানার দেওয়ান হইতে হরকরা পর্য্যন্ত, কিংবা জমিদার চাষা কেহ মাথা ঘামাইত না। প্রজা সাধারণের মনোভাব কবি ঐতিহাসিক অপেক্ষা অল্প ভালই বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

“এক রাজা যাবে পুনঃ অল্প রাজা হবে
বাদশাহার সিংহাসন শূন্য নাহি হবে।”

রাজাও প্রজাদের নিকট বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিতেন না :

“যায় যাবে মম রাজ্য আমি হব হত,
প্রজার কি দুঃখ তাহে হইবে অন্তরে?”

মন্ত্রী ইত্যাদি পৌরুষহীন পুরুষবর্গের মধ্যে নবীনচন্দ্র নাই। “সাধে কি বাঙালী-মোরা চিরপরাদীন” ইত্যাদি বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা অবাঙালী জগৎশেঠের মুখে আমাদিগকে না শুনাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে শুনাইলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। ফতেচাঁদ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ বাঙালী নয়, মাড়োয়ারী ও পঞ্জাবী ক্ষেত্রী সাতপুরুষ বাংলাদেশে থাকিলেও বাঙালী হয় না। “বাঙালীর মন্ত্রণায়” সিরাজের পতন হয় নাই; কারণ প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ফতেচাঁদ, উমিচাঁদ অবাঙালী; মীরজাফর মীরণ পশ্চিমী মুসলমান। ফতেচাঁদ আলিবর্দীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নবাব সজ্জাউদ্দীনের পুত্র সর্দারজাং থাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি বাংলাদেশের ইহুদী। “সজীব বচন” বাণিয়ার মুখে অস্বাভাবিক, যেহেতু ভিজা কাঁথা আগুনে গরম হয় না। চামুণ্ডারূপিণী রাণী ভবানীর রণহুঙ্কার শুনিয়া আশঙ্কা হয় হিন্দু কবি বুঝি এইবার একটা যবন-সংহারিণী কালী আসরে নামাইলেন। নবীনচন্দ্রের মধ্যে নাটকীয় কিছু ছিল না; নাটক লিখিলে তিনি বিপাকে পড়িতেন। বেচারী মীরজাফর বাংলার মসনদের লোভে পড়িয়া রাজ্যের দুর্ঘোষে হিন্দুর দ্বারস্থ হইয়াছেন। পর্দার আড়াল হইতে, “কিছু দিন পরে মহারাত্রিপতি হবে ভারত-ভূপতি,”—এই আকস্মিক অশনিসম্পাতে বুদ্ধের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিবার বিষয়বস্তু থাকিত

না। মীরজাফরকে ইংরেজ কিছুদিন কাঠের পুতুলের মত নাচাইয়া আরাম আয়েশ করিবার অবকাশ দিয়াছিল। কিন্তু বর্গীর হাতে পড়িলে বল্লমের উপর চড়িয়া দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ সমেত খাঁ সাহেবের মাথাটা নাগপুর হইয়া সরাসরি পুণায় পৌছিত, এবং মহাপাপী ফতেচাঁদ-জগৎশেঠের ভিটায় দ্বিতীয়বার পুকুর খোঁড়া হইত। রাণী ভবানীর অহেতুক উপস্থিতি ঘটাইয়া কবি কাঁচা কাজ করিয়াছেন। “রাণীর কি মত?” জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গালে চড় খাইলেন—সমস্তই বানচাল হওয়ার উপক্রম। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাণী আর এক দফা বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আবার অশনি পতন; রুষ্টা বহিঃপ্রকৃতি বা নিয়তি রাণীকে নিরস্ত করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “রাণীর উক্তি দৈববাণীর দ্বায়”, কিন্তু দেবতা কোথায় তিনি ঈদ্রিত করেন নাই। নারী-দেবতার সন্ধানে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ নাই। কবি বলিতেছেন—

...শূন্যদৃষ্টি, হ্রস্বন শির;
এইরূপে বঙ্গমাতা যদি শূন্য মনে।

রাণী ভবানী এই দৃশ্যে মানবী নহেন। তিনিই স্বয়ং বঙ্গমাতা।

কবি দৈববাণীর দুর্বল আশ্রয় না লইয়া বঙ্গমাতার মুখে নিজের কথা শুনাইয়া ষড়যন্ত্রের উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। এই স্তবে কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম, রাণী ভবানীর উক্তি এবং পরে বাঙালীর গৌরব সেনাপতি মোহনলালের উক্তির দ্বারা বিচার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

“যদি উচ্চঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্শ্বেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়-শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্কীসাশ্রয়িত জোধ্য, দেশবাসস্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাস্তব নবীনবাবুর...”

৪

পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান এবং ইংরেজ উভয়ের প্রতি ঐতিহাসিক স্মৃতিচার করিয়াছেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর আশ্রিত, অথচ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনচেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন রচিত সায়ের-উল্-মুতাখ্বিরিন পুস্তকের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে হাজী মোস্তাফা-কৃত ইংরেজী অনুবাদ হইতে খুব সম্ভবতঃ সিরাজ, মীরজাফর এবং মীরণ চরিত্রের উপাদান কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই তিনটি চরিত্রের কাল রং নবীনবাবুর কাব্যে সিরাজের স্বপ্ন অংশটি বাদ দিলে—মুসলমান ইতিহাসের মসীবর্ণ হইতে অনেক হান্ধা মনে হইবে। সিরাজের লাম্পটি এবং নৃণংসতা মীরজাফর মীরণের কেলেকারীর তুলনায় কিছুই নয়। ইংরেজ আমলে পুণ্ডিয়ার পাপিষ্ঠ দেবীসিংহের পৈশাচিক অত্যাচারের তুলনায় সিরাজরাজত্ব রামরাজ্য বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সত্যের খাতিরে সিরাজের দুর্দশ

গোপন করেন নাই। স্বদেশপ্রেম, হিন্দু মুসলমানের প্রতি অপক্ষপাতিত্ব এবং হতভাগ্য সিরাজের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি অন্তঃসলিলা ফকুদারার ন্যায় তাঁহার ইতিহাসে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, পলাশীর যুদ্ধের প্রতি সর্গে কবির সেই সহানুভূতি, তিরস্কারের অন্তরালে প্রাণের দরদ লোকপাবনী জাহ্নবীধারার মত বঙ্গভূমি প্রাণিত করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে কদাচিৎ কোন হিন্দু কবি এবং মুসলমান ঐতিহাসিক এইভাবে স্বর মিলাইতে পারিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরিণাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহার বিপ্লবকারী স্বদূর প্রতিক্রিয়া, নবীনচন্দ্র বাহা গভীর অস্থ-ভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে যুগের কোন ইংরেজী ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ ছিল না, এমন কি গোলাম হোসেনের সুস্ম ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও উহা ধরা পড়ে নাই।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়ত অনেকের মনঃপূত হইবে না। নিছক সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া পলাশীর যুদ্ধ কিংবা রঙ্গমতী পড়িলে ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। যথা,

(১) রে মূর্খ যবন!

(২) স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্থ্য রাজ্য গরে

ভেমতি যবন রাজ্য স্বজাতিপ্রবণ

ইত্যাদি।

এক পক্ষের অভিযোগ নবীনবাবু হিন্দুস্থানী মুসলমানকে আরবী খেজুরের চারা না বলিয়া হিন্দুর অস্থখ গাছের বুড়ি বলিয়াছেন, আর্থ্যরাজ্যকে মধ্যাহ্ন এবং মুসলমান আমলকে গোখুলি বলিয়াছেন; মুসলমান রাজত্বের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নাই—

পশিয়া পিঞ্জরান্তরে বনবিহগীর

কিবা হুথ কি অস্থখ সমান অধীন।

অন্য পক্ষের উত্তর—“রে মূর্খ যবন!” গালাগালিতে চটবার মত কিছুই নাই, পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে; মুসলমান হতভম্ব; হাত-পা তাহার পেটের ভিতর গিয়াছে—‘বাপ-জান’ ‘মিঞাসাহেব’ বলিয়া তোয়াজ করিবার সময় উহা নয়, যে আগুনে মুসলমানের মতিমহল পুড়িয়াছে, সে আগুনে গরীব হিন্দুর চালাঘরও পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ “পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন” কিনা, একবার পড়িয়া দেখিলেই হয়। মুসলমান যুগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অপরাধই বটে; দুপুরের পর অপরাহ্নের গোখুলি না ডিঙাইয়া দাসত্ব-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে না। অপর পক্ষ বলিবেন,

(১) যে বীর জাতির এই দুর্গ সিংহাসন,

ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি যেমন

অচল অটল রাজনৈতিক সাগরে।

অথবা—

(২) ছিল না ঐখ্য বীর্ঘ্য এই ধর্মতলে

সমকক্ষ যবনের, বীর পরাক্রম

অন্তাচল হৈতে খাত উদয় অচলে।

ইহা রাখিয়া ঢাকিয়া প্রশংসা কে বলিবে? যদি হিন্দু-মুসলমানকে ভারতের সহিত অভিন্ন মনে না করিতেন তাহা হইলে পলাশী প্রভাতে, “পোহাইল ভারতের সুখের রজনী” এই বেদনা কবিকে ব্যথিত করিত না। দাসত্বলভ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকিলে নবীনচন্দ্র উদীয়মান ইংরেজ ভাস্করকে “ওঁ নমো কাশপুষ্প-ধবলং” মন্ত্রে বন্দনা করিতেন।

ত্রৈরূপ বাদানুবাদ কাব্য বিচার নহে, ঐতিহাসিক গণ্যেণাও নহে।

“রঙ্গমতী”র সমালোচনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, “পলাশীর যুদ্ধে নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির হুংখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন তাঁহার কবিতা গৈরিকনিম্ববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্মভেদী রোদন, “রঙ্গমতী”র অস্থি পঙ্কর …” যুদ্ধেরা যেখানে ক্রন্দন শুনিয়াছেন তরুণ সেখানেই শুনিতে পাইয়াছে দাসত্বপুষ্ট সভ্যতার সহিত আদি মানব-প্রকৃতির শাশ্বত সংগ্রামের বাণী—“বীরেন্দ্র! দাসত্ব হতে দস্ত্য উত্তম”।

এই কাব্যে কবির দেশবাৎসল্যের কেন্দ্র নির্গম করা কিছু কঠিন। নায়ক বীরেন্দ্র মোগল সম্রাটের আত্মগত্য ত্যাগ করিয়া শিবাজীর অঙ্গুলি-সংকেতে “পুরবে চট্টাচল পশ্চিমে গাঙ্গার” তাঁহার পিতৃভূমি বলিয়া চিনিয়াছেন; এবং গুরুর নিকট হইতে ভারত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গুরুর তীক্ষ্ণ অস্থভেদী দৃষ্টিতে নবদীক্ষিত বীরশিষ্যের দুর্বলতা ধরা পড়িল; বীরেন্দ্রের জ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান প্রেমে পরিণত হয় নাই। আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম ক্ষুদ্রতর বঙ্গভূমি এবং ততোধিক ক্ষুদ্র পিতৃরাজ্য “পুরব চট্টল”কে অতিক্রম করিয়া আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুস্থানকে অভিষিক্ত করিতে পারে নাই। এইজন্ত মহারাষ্ট্রপতি বাংলাদেশকে শিষ্যের কক্ষস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিকের মনে স্বভাবতই সন্দেহ উপস্থিত হয় শিবাজী-বীরেন্দ্র সাক্ষাৎকার কি নিছক কবিকল্পনা, মনো-রম “স্বপ্ন” না বাস্তব ইতিহাসের ছায়া? বাঙালীর উপর নজর রাখিয়া মুসলমান যুগের ইতিহাস পড়িয়াছি; কিন্তু দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে কোন বাঙালী বীরের সন্ধান মিলে নাই। অবশ্য বাঙালী যুদ্ধ করে নাই এমন কথা নহে; ভাস্করা স্থলতান হাজি ইলিয়সের “বঙ্গাল” সৈন্ত নেপাল জয় করিয়া কাঠমণ্ডু পোড়াইয়া দিাছে; স্থলতান সিকেন্দর শাহ-র

পনাতিক বাহিনীর সেনাপতি “সহদেব বঙ্গালী” দিল্লীখর ফিরোজ ভোগলকের তুর্কী রিসালাকে হটাইয়াছে। মোগল সম্রাটের অধীনে বাঙালী জমিদার বাংলাদেশে লড়াই করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে নহে; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপত্যাসের বাঙালী বীরগণ মনগড়া মনসব্দার; বাদশাহী মনসব্দারের তালিকায় স্বয়ং এবং চন্দ্রকোণার রাজা ছাড়া তৃতীয় বাঙালীর উল্লেখ নাই। যাহা হউক, লালকবি প্রণীত মহারাজ ছত্রসাল বৃন্দলার জীবন-চরিত হিন্দী “ছত্র-প্রকাশ” কাব্যের সহিত “রঙ্গমতী” মিলাইয়া পড়িলে সন্দেহ হয় নবীনচন্দ্র যেন শিবাজী-ছত্রসাল সাংস্কার বিষয়ক অধ্যায়ের ছায়ায় শিবাজী-বীরেন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের পূর্বে “ছত্রপ্রকাশ” অবলম্বন করিয়া ইংরেজী ভাষায় বৃন্দলখণ্ডের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ আমরা যতটুকু অল্পমান করিয়া থাকি বঙ্কিম-নবীন উহার চেয়ে ঢের বেশী ইতিহাস পড়িয়াছিলেন।

জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা সুস্থি এবং স্বপ্নের মধ্যে মাহুকের আসল রূপ নিজের কাছে ধরা পড়ে বলিয়া মনস্তত্ত্ববিদগণ মনে করেন। আমরাও দেখিতেছি “রঙ্গমতী”র ‘বিজন কানন স্বপ্নে’ নবীনচন্দ্র ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। চট্টলের নিভৃত অঙ্গে “কাকী” তীরে কল্পনার “রঙ্গমতী” বীরেন্দ্র তথা নবীনচন্দ্রের ক্ষুদ্রদেশ—রাজ্য না হইলেও রায়-বংশের স্ববিস্তৃত জমিদারী। মুসলমানের প্রতি যে বিদ্বেষ শিবাজী বীরেন্দ্রের মনে জাগাইয়াছিলেন দেশে ফিরিবার পর উহা বাংলার মাটিতে মিলাইয়া গেল। বীরেন্দ্র প্রথমতঃ দ্বিধায় পড়িয়াছিলেন, একদিকে গুরুর নিষেধ, “যবন সপক্ষে অসি করিতে ধারণ।” অন্য দিকে চিন্তা, “আর্য্য অরি নহে কিহে মঘ পর্ভুগীস?” বাঙ্গালা দেশ তখন আরাকানী মঘ এবং সমুদ্রতঙ্কর পর্ভুগীসগণের অত্যাচারে জর্জরিত, বীরেন্দ্রের পিতৃরাজ্য দস্যুকবলিত। দেশপ্রেম না থাকিলে তিনি বিদেশী আক্রমণকারীগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অন্ততঃ নিম্নবঙ্গে মুসলমান-অধিকার লোপ করিতে পারিতেন; এবং বিদেশীর হস্তে পুরস্কার-স্বরূপ পিতৃরাজ্য অনায়াসে সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারিতেন। কর্তব্য নির্ণয়ে বীরেন্দ্র ভুল করিলেন না। এই সময় মোগল স্ববেদার শায়েস্তা খাঁ ফৌজী তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিবার জন্ত তাঁহার এই অভিযান। ছদ্মবেশী বীরেন্দ্রের রণকৌশলে মঘ পর্ভুগীস পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিল। যবন-বিদ্বেষ বাঙালীর দেশপ্রেমের নিকট পরাজয় মানিল। “ছিল না জননী মম ছিল জন্মভূমি”—বীরেন্দ্রের এই আন্তরিক রোদন ভারতবর্ষ কিংবা বাংলার জন্ত নহে। পল্লীজননীর জন্ত স্বয়ং কবির এই করুণ ক্রন্দন। কবি নায়ক বীরেন্দ্রের

মৃত্যু ঘটাইয়াছেন সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে; স্বয়ং দেহরক্ষা করিলেন চট্টগ্রাম শহরে রহমতগঞ্জের বাড়ীতে, এবং তাঁহার পবিত্র চিতাভস্ম মিশিয়াছে স্বগ্রামে পিতৃপিতামহের শ্মশানে।

৬

কবি নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধের ক্রমবিবর্তন, আর্থ্য-যবনের মধ্যে মনোবাজ্যে আদর্শবাদের সংগ্রাম অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারায় চলিয়াছে, ভাবের ঘরে কোথায়ও লুকো-চুরি নাই। শিবাজীর সভাকবি ভূষণ-কৃত “শিবরাজভূষণ কাব্য” এবং নবীনচন্দ্রের “রঙ্গমতী” কাব্যে একই ভাবপ্রবাহ প্রবহমান। মধ্যকালীন দুই শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত উত্তর-ভারত এবং দক্ষিণাত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বিরাট হিন্দু-জাগরণের জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখিতে পাই পুরুষোত্তম ধামে হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত রঘুজী ভোঁসলার প্রতি মহাদেবের স্বপ্নাদেশ। বঙ্কিম-নবীনের যুগে হিন্দু-মুসলমান একই খাঁচার পাখী; ইংরেজের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইতেছে। তখন হিন্দুর সমাজ, ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছিল; মুসলমানের হাতে নহে, নাস্তিক ইহকাল সর্ব্বষ পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল শিক্ষিত হিন্দুর মনে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অহুসার সৃষ্টি। নবগোপাল মিত্রের “হিন্দু-মেলা” সংস্থাপন, রাজনারায়ণ বসু কৃত “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব” জাতীয় বাংলা সাহিত্যের মূলে ছিল হিন্দুর এই আত্মরক্ষার প্রেরণা; মুসলমান বা খ্রীষ্টান বিবেচনায় নয়। জাতির প্রকৃত সত্তার উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জঙ্ঘালের স্তূপ পড়িয়া ছিল উহাকে হয় তীব্র উদ্দীপনার আগুন পুড়াইতে হইবে; না হয় প্রবল বজ্রায় ভাসাইয়া লইতে হইবে। সাহিত্য আগুন জ্বালাইতে পারে; কিন্তু মহাপ্রাণ একমাত্র ধর্মের খাতে প্রবাহিত হয়। বাংলা সাহিত্য হিন্দুর অতীত ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে বাহন করিয়া যে জাতীয় উদ্দীপনা এবং উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিল উহাতে আর্থ্যাভিমানের ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে; কিন্তু উহা হিন্দুধর্মের উপহসিত “আর্থ্যামি” নহে।

P30145 ৭

কবি নবীনচন্দ্রের “রৈবতক” এবং “কুরুক্ষেত্র” কাব্যের বিষয়বস্তু ইতিহাসের পাল্লার বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। মহা-মনীষী হীরেন্দ্রনাথ “সাহিত্য” পত্রিকায় এই কাব্যদ্বয় সমালোচনা করিয়া ঐতিহাসিকের অন্ধ চক্ষুকে দৃষ্টি দিয়াছেন; তাঁহার কৃপায় নবীনচন্দ্রের “ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” রৈবতকাদি কাব্যত্রয় বাঙালী বর্তমানে না হইলেও ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। তিনি বলিয়াছেন; “চারি

সহস্র বৎসর পূর্বে মহাভারত পূর্ণাঙ্গ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া আৰ্য্য জাতির যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, দেশ কাল এবং পাত্রভেদে কুরুক্ষেত্র রৈবতকও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। সেই দিন আর কতদূরে? ভারতবর্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি গভীর দূরদৃষ্টিপ্রসূত এই আকুল ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত অদূরভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের “উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” আখ্যা একাধারে গুণগ্রাহী সমালোচকের প্রশংসা এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ নিন্দুকের শ্লেষ। শুনা যায়, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রকাশিত হইবার পরে ধর্মপ্রাণ সনাতনপন্থী আৰ্য্যগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ এবং চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন কবি মহাভারতের নামে তাঁহাদের জ্ঞান ব্যাসকালী সৃষ্টি করিয়াছেন; “ঋষি দুর্কাসা” পলাশীর যুদ্ধের কবি নবীনচন্দ্র নহেন—নাগরাজের পরিত্যক্ত নিম্নোক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল আৰ্য্যভিমানের শোচনীয় অথচ স্থনিশ্চিত পরিণাম। আমরা দেখিতে পাই কবির দেশাভিমানের ক্ষুদ্র পর্বতনিব রীণী রৈবতকের পাদদেশে নির্মল উদার দেশ-প্রেমের গঙ্গাপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে; কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়া প্রভাস-সৈকতে এই প্রেম মহামানব সমুদ্রে নির্বাণ খুঁজিতেছে।

কাব্য বুঝিবার আস্পদা আমাদের নাই; তবে স্থূল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উক্ত কাব্যত্রয় কাব্যও নয়, মহাভারতও নয়—উহা ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যপূরণ—ভাবী মহাভারতের পূর্বগামিনী ছায়া। সংস্কৃত মহাভারতে অল্পদার বর্জন-নীতি নাই; প্রাচীন ভারতে জাতি এবং বর্ণবৈষম্য দূর করিবার জ্ঞান বেদব্যাস ইতিহাসকে মনের মত ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন—ইহার একটি প্রমাণ যযাতির বংশ-তালিকা। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জ্ঞান নবীনচন্দ্রও উহা করিয়াছেন এবং বেদব্যাসের কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া আৰ্য্য অনাৰ্য্য “অপবিত্রঃ পবিত্রো বা” সকলকেই কালোপযোগী ফলপ্রসূ দেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের কবি অনাৰ্য্যের প্রতি আৰ্য্যের ঘৃণা এবং অবিচার, অনাৰ্য্য হৃদয়ে উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতি-শোধস্পৃহা যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইতিহাস উহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছে। হিংসা, লোভ যুদ্ধ এবং কূটনীতির মধ্য দিয়া ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত জাতির উত্থান-পতন ঘটয়াছে; হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু সর্বহারা হইয়াও ভারতের অন্তর-আত্মায় ধ্বনিত হইতেছে অহিংসার স্বর, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, কে কাহার পাকা ধানে সুদূর অতীতে মই দিয়াছে, মন্দির ভাঙিয়াছে, কি মসজিদ ভাঙিয়াছে—হিসাব

নিকাশের প্রয়োজন নাই; মন্দির মসজিদ গীর্জা যেগুলি আছে উহাও কয়দিন থাকিবে কেহ বলিতে পারে না। কবি বলিয়াছেন, “সংহার সৃষ্টির নীতি”, সময়-স্রোতে সবই ভাসিয়া যাইবে। আমরাও মনে করি, ভাঙাগড়া ধোঁদার মজ্জি, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ নিমিত্ত মাত্র। শেষ পর্যন্ত জাতির মনকে এই স্তরে উন্নীত করিতে না পারিলে দেশ-প্রেম কুলাভিমান বা Communalism-এর উল্কে উঠিবে না; ভারতের ভিতরে কিংবা বাহিরে শাস্তি স্থাপিত হইবে না।

নবীনবাবুর কুরুক্ষেত্র পড়িয়া হীরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

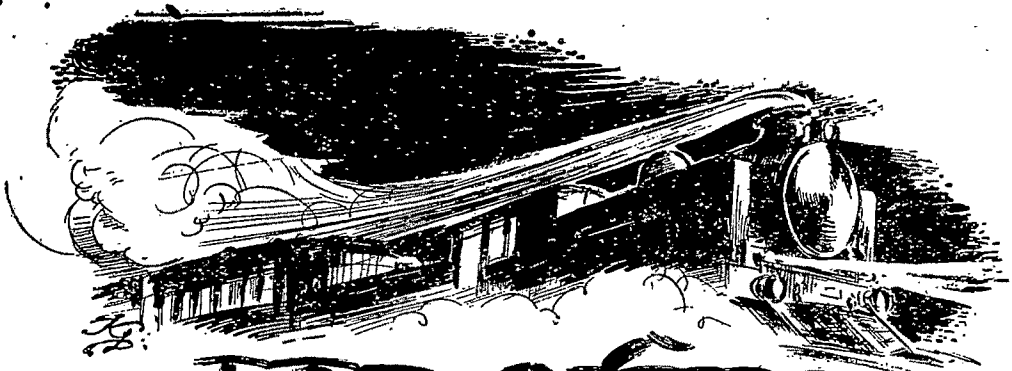
“এই বহি সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র,.....বন্ধিমবাবুর কল্যাণে কুরুক্ষেত্রের আবর্জনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন নবীনবাবুর কাব্য কুরু-ভক্তিপ্রচারে মহাভারতের স্থানীয় হউক।”

কিন্তু পাষাণ ঐতিহাসিক এই কাব্যের মধ্যে অতীত ইতিহাস কিংবা কোন ঐতিহাসিক চরিত্র খুঁজিয়া পায় না; অথচ আধুনিক ইতিহাস যিনি পড়েন নাই, ভারতবর্ষের ভাবী রাজনৈতিক সমস্যা ষাঁহার ধ্যানের বিষয়ীভূত হয় নাই তিনি রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কখনও এমন চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। মনে হয় শিবাজীর মাবলী সৈন্তই যেন কৃষ্ণের “গোপসেনা”, কংস বধ যেন আফজল খাঁ-বধ কিংবা মোগল কবলিত পুণা নগরী উদ্ধারের জ্ঞান বরষাজীর ছদ্মবেশে শায়েস্তা খাঁ-র শিবিরে শিবাজীর প্রবেশ এবং অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। যাহা হউক, অন্ততঃ বহি পড়িয়া বিনায়ুদ্ধে প্রবীণ সৈনিক হইতে না পারিলে বন্ধিম, নবীনের মত চমৎকার যুদ্ধবর্ণনা মামুলি কবি বা উপপাদ্যসলেখকের সাধার অতীত।

কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষতার অজুহাতে স্থির করিলেন নিজে অস্ত্রধারণ করিবেন না; অথচ ক্ষুদ্র কুলাভিমানী নীতিহীন শৌর্য্যদৃষ্ট ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস না হইলে তাঁহার জীবনব্রত পূর্ণ হইবে না; বিষ্ণুচক্রে খণ্ডীকৃত সতীদেহের ত্রায় সাম্রাজ্যচক্রান্তে গুণ্ডণঃ বিভক্ত ভারতমাতার দেহে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিবে না; তাঁহার বুকে “এক জাতি, এক রাজ্য” প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এইজন্তই নিকাম, নির্লিপ্ত, নিষ্পন্ন মহাকাল তাঁহার বিরাট মূর্তি সংহার করিয়া প্রাকৃত মানবের ত্রায় কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। হয়ত তিনি মহাভারত সৃষ্টির কামনায় নরদেহে আবার আসিবেন কিংবা আসিয়াছেন; আমরা যেন নবীনচন্দ্রের মত দেখিতে পাইতেছি—

“নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে,
সাধিছেন স্থিরচিণ্ডে ক্ষত্রিয় বিনাশ।”*

* কবি নবীনচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর চট্টগ্রাম অধিবেশনের জ্ঞান লিখিত।



নতুন পরিচয়

শ্রী পরিমল গোস্বামী

ট্রেনে চলছিলাম কলকাতার বাইরে।

আজ সাত বছরের শহুরে একথেকে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র সত্য কথা?

চলছিলাম গয়া, ভাবী যন্ত্রের একমাত্র কচাকে দেখতে। যুগযুগ বলতে পারেন।

কটা বছর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাববারই সময় পাই নি, অথচ চুলগুলো আমার অপেক্ষা না করেই পেকে উঠছে, দাঁতও অমেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটস দিয়েছে। বয়সটা যে চলছে সে কথাটা যুগান্তে হঠাৎ বেশি অনুভব করছি। আর দুটো বছর পার হ'লেই চল্লিশে গিয়ে উত্তীর্ণ হব, সুতরাং আর বিলম্ব করা যায় না।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। অন্তরে আমি যাই হ'লি বাহিরটা কি ইতিমধ্যেই পরিণত-কার্ণের প্রতিফল সন্ধ্যা দিচ্ছে না? শুধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে সন্ধ্যা বেড়ে গেছে। এখন কি ক'রে আমার ভাবী যন্ত্রকে বোঝাব যে আমার অন্তর-বাহির এক নয়? আমার এই অকাল-প্রকৃত্যই বা কে বিশ্বাস করবে? আমার অন্তর-বাহির এক নয়, এবং আমি অকালপক, এই দুটো কথা আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি ব'লে আমার একটা গর্ব ছিল। অথচ আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি এই প্রার্থনাই করছি—আমার ভাবী যন্ত্র-কুল যেন ঐ দুটো কথা আজ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে আমি খুব নিশ্চিতভাবে ট্রেনে উঠি নি। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানটী প্রেলোকের সঙ্গে যোগাযোগের একটি প্রধান ট্রেন, সেখানে অভিপ্রেরের সন্ধান। যাওয়ারটাই কেমন যেন একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার। সে জেডও মন ভাল নেই।

সেকেন্ড ক্লাসের উপরের একটা বার্থ রিজার্ভ করে চলেছি। গাড়ি হাওড়া ছাড়বার মুখে আমাদের কামরায় মোট যাত্রী সাতটা হল। আমি পাঁচ। আমার বিপরীত দিকে এক জন ইউরোপীয় ভ্রমলোক। আমার নীচে মোটা শাল জড়ানো এক বাঙালী যন্ত্রহীন বৃদ্ধ। মাঝখানে আর এক বাঙালী বৃদ্ধ, গায়ে কালো কোট, গলায় কফটার। ইউরোপীয় ভ্রমলোকের নীচে পশ্চিম

ফেলার পুষ্টকার এক ভ্রমলোক। দুর্দান্ত শীত। সবাই বিছানা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছেন। আমি আগেই শুয়েছি।

কেট কারো পরিচিত মন, সুতরাং কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ইউরোপীয় ভ্রমলোক শুয়ে পড়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন। তার পরেই লেপচাপা দিলেন পশ্চিম ভ্রমলোক। দুই বৃদ্ধ বাঙালী তখনও ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু বেশি অপেক্ষা করতে পারলেন না, শীতে হাড়হুড় কাঁপিয়ে তুলছে সবাই।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখি কালো-কোটেদারী বৃদ্ধ উসখুস করছেন। আমার নীচের বৃদ্ধ ভ্রমলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হ'ল তিনিও জেগে আছেন।

কালোকোট লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না, মাথা বের করে হাই তুললেন।

এতক্ষণ পরে শালধারী প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “মহাশয়ের ঘুম আলছে না বুঝি? আমারও ভাই।”

“না ভা ঠিক নয়।” ব'লে কালোকোট চিন্তাবিষ্ট হলেন।

শালধারী প্রশ্ন করলেন, “মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?”

কালোকোট বললেন, “গয়া।”

গয়া শব্দটী আমাকে বিচলিত করল। এঁদের আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলাম। কে জানে, ইনিই যদি আমার ভাবী যন্ত্রের পদ অলঙ্কৃত করেন? নানা রকম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা মুখের উপর আরও টেনে দিয়ে কোশলে চোখ দুটো বের ক'রে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম কালোকোটধারীর উপর। ভ্রমলোক যেন দাগী আসামী, আর আমি যেন ডিটেকটভের লোক।

ইমিও পান্টা প্রশ্ন করলেন, “আপনি কতদূর?”

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, “দানবাদ।”

ইতিমধ্যে কালোকোট উঠে বসেছেন। এইবার কি তবে আলাপ ভাল করে জমবে? কথায় কথায় কি কচীর বিবাহের কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে বাঁচি। ভাবী জামাতা সম্বন্ধে

তার মতামত শ্রীষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আমার ভাবী স্বপ্নর এ সময়ে কলকাতা আসবেন কেন? কিছুই বলা যায় না, হয় তো আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে এসেছিলেন গোপনে। হয় তো গত কাল ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো কারণে যাওয়া হয়নি তাই আজ চলেছেন। মনের সন্দেহ আমার দূর হ'ল না, বরঞ্চ ক্রমশঃই ধারণা হতে লাগল যে কাল এঁকেই গিয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করতে হবে। সুতরাং আমার কোতু-হলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি।

কালোকোটের মনে কি আছে কে জানে?

কিন্তু তিনি ও কি করছেন? ব্যাগ খুলছেন কেন? সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম ব্যাগ থেকে চণ্ডা-মুখ ভরল পদার্থপূর্ণ একটা বৈটে শিশি বের করলেন। তারপর শিশির কর্ক খুললেন। তারপর কস ক'রে তার বাঁধানো দাঁত দুপাটি খুলে সেই শিশিতে পূরলেন এবং পুনরায় কর্ক এঁটে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন।

শালধারী বলে উঠলেন, “আপনার তো মশাই সব বন্দো-বস্তাই বেশ পাকা। ভাল করেছেন দাঁত খুলে রেখে।”

কালোকোটের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ছিলেন প্রায় ষাট বছরের, এখন আশী বছরের মতো হলেন। তার উচ্চারণও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, বললেন, “মশাই, বাচ্য হয়ে বগোবন্ট করটে হয়েছে।”—দাঁত খুলে নেওয়ারতে দণ্ড্য উচ্চারণ-গুলো আর হ'ল না।

শালধারী বললেন, “বাধ্য হয়ে কি রকম?”

“দীতে বড় কষ্ট পাই, দাঁত ঠক্ ঠক্ করতে থাকে, এই যুদ্ধের বাজারের চতুর্গুণ দামে কেনা বাঁধানো দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়ে লাভ কি?” বলে বিষয় হাসি হাসলেন।

শালধারী বললেন, “দামের কথা যদি বললেন, তা হলে দীতে আমার যা লোকসান হয়েছে সে আর বলবার নয়।”

কোট সে কথা জানবার জন্তে উৎসাহিত হলেন।

শালধারী বললেন, “আর বলেন কেন। শস্তার বাজারে কিছু সোনা কেনা ছিল, তাই দিয়ে দুপাটি দাঁত করিয়ে নিলাম যুদ্ধের বাজারে। বরচ একই পড়ল, কারণ বাজারের দাঁতের দামও তখন সোনার মতোই। গত মাসে এই গাড়ির মধ্যেই দুমস্ত অবস্থায় আমার যুদ্ধ থেকে সে দাঁত চুরি হয়ে গেছে, তাই এখন বিনা দীতেই কাটাছি।”

“বলেন কি। এ তো সাংঘাতিক চুরি।”

“সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক।”

মিনিট তিনেক চুপচাপ কাটল। কালোকোট ব'লে উঠলেন, “হুঁষ করবেন না মশাই, শুধু বিনা দীতে তো নয়। যা দিন-কাল পড়েছে, বিনা অয়ে, বিনা বস্ত্রে, বিনা বহু জিনিষে কোনো রকমে টেকে থাকে মাত্র।”

এ কথা শুনে আমার মনটা কেন যেন ধারাপ হয়ে গেল। শুনেছি আমার ভাবী স্বপ্নর গ্রীষ্মক অরুণা মজুমদার খুব ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বাড়ি আছে, দেশের বাইরে গয়াতে বাড়ি আছে—এবং কত মাত্র একটী। তথাপি এ কি কথা? “কোনো রকমে টেকে থাকে” তো কোনো ধনী ব্যক্তিরই কথা হতে পারে না। ঠিক দিকে করণ দৃষ্টি মেলে

এই সব কথা ভাবছি—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ব্যাগের উপরকার দুটি অক্ষরের উপর। ইংরেজী এ, এম, দুটি অক্ষর। আর সন্দেহ রইল না লোকটি কে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে লেপের মধ্যে ভাল ভাবে আত্মগোপন ক'রে রইলাম। ক্রমশঃই আমার মনে নৈরাশ্রের সঞ্চার হতে লাগল আমার নিজের চেহারা সম্পর্কে। আমার পাকা চুলই আমাকে পরাভূত করবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভাবী স্বপ্নর যদি ধনী না হন তা হলে অথবা এ পরীক্ষার মধ্যে নামি কেন? তার চেয়ে এখনই আত্মপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

কিন্তু অল্প মন আশা ছাড়তে চায় না।

শালধারী বললেন, “মশাই ছত্রিশ বছর ডায়গার মধ্যেও যে সব ঘটনার স্থান হয় না, তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেল এই ছটা বছরের মধ্যে।”

“ঠিকই বলেছেন আপনি।”—কোট উৎসাহিত হয়ে বললেন। “ঠিক তুঝি বাজির মতো। এক-আঙুল ধূপারী মধ্যে এমন সব জিনিষ ঠেসে পুরে দেয় যার মুক্তি পেতে জায়গা লাগে পঞ্চাশ হাত।”

“তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার। ছত্রিশ বছরের জীবন ছ-বছরের ধূপারী মধ্যে কাটানো কি সোজা কথা?”—ব'লে শালধারী ঐ কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

হাহতাতালের হাওয়ার আলোচনা হতাশনের মতোই ছিল উঠতে লাগল।

কোট বললেন, “মশাই ভেবে দেখুন ১৯৩৯ থেকে আমাদের মার্চের উপর মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির বা পড়েছে কি না?”

শালধারী বললেন, “আপনার মতো ভাষার জোর নেই, কিন্তু আপনি ষাট কথ্য বলেছেন। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় চকিত ষটা কাটাতে হয়েছে।”

“শুধু দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তা করতে গেলেও তো মনের ধানিকটা সক্রিয়তা ধরকার হয়। এ যে একেবারে বেঁধে মারা। মন কিছু ভাববার সময়ই পায়নি—পড়ে পড়ে কেবল মার খেয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অন্তটা বোঝা যায় নি, কিন্তু এই মার খাওয়া অসহ হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে।”

“ঠিক কোন্ সময়টার কথা বলেছেন?”

“বলছি যখন থেকে আলো-ঢাকা শুরু হ'ল। অন্ধকারে গুতো বেতে বেতে পথ চলতে হ'ল।”

শালধারী একটু চিন্তা করে বললেন, “কিন্তু আপনি একটু বড় কথা বাদ দিচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম তার আগে থেকেই বাড়তে শুরু করেছে।”

“বাবু দেব না কিছুই—সবই বলছি একে একে”—ব'লে কোটধারী লেপটা গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে বললেন।

কি সর্বনাশ, এই ছ-বছরের দুঃখের ইতিহাস শুনেও হবে পড়ে পড়ে। কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। রাজি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর-দুজন যাকী বংশধর ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাবী স্বপ্নরকে এতক্ষণ ঐ শালধারী উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এমন একটা বিষয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন যা মনে হ'ল তার অত্যন্ত প্রিয়। নানা রকম উপমা দিয়ে যে রকম ফলাও ক'রে

তিনি এ সম্পর্কে দু-চারটে কথা এতক্ষণ বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যুদ্ধভূমিত দুর্দশাকে তিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতোই আপন মনে বিশ্লেষণ করে এসেছেন এতদিন। এ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ একটু বেশিই মনে হ'ল। তা না হলে তিনি ঘুরে কিরে আলোচনাটা এর মধ্যেই টেনে আনতেন না। তা ছাড়া রাজি গভীর। চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ, চারিদিকের অন্ধকারের বৃক একমাত্র শব্দ। এই শব্দের পটভূমিতে, এমন গভীর রাতে, এমন মহাহুতুভিগ্ন জোতার সম্মুখে যে-কোনো লোকেরই মর্ম-বেদনা আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম কোটাধারী যুদ্ধ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর স্নায়ুর উপর ছ-বছর ধরে মিনিটে দশটা করে হাতুড়ির বা পড়েছে, এই ছ-বছরে খিঁড়ের মতো তাঁর মনের চারদিকে যে খাসবোধ-কারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে বুঝবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হতে হ'ল তাঁর কথা শোনার ক্ষেত্রে।

শালধারীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, “তখন সব?”

শালধারী জোর গলায় বললেন, “তখন না মনে? নিশ্চয় শুনব। এ সব কথা যত শোনা যায় ততই মনটা হালকা হয়। তা ছাড়া দুঃখ-দুর্দশা তো শুধু আপনার একার নয়, আমাদের সবার, এবং ব'লে আপনি যত আরাম পাবেন, আমরা শুনতে তত আরাম পাব।”

“সে তো বটেই। কিন্তু সব শেষে এমন একটি কথা প্রকাশ করব যা শুনে হয় তো আপনি চমকে যাবেন—আর হয় তো কেন, আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় চমকে যাবেন।”

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই কথাটি শুনে। আমার সন্দেহ হ'ল উনি সর্বশেষ যে বিশ্বাসের কথা বলবেন সেটি নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে। বলবেন—“ছ-বছরের দুর্দশা কাটিয়ে যদি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি বা কলকাতার বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম, কিন্তু প্রথমই যে পাঁজটিকে পেয়ে বুঁধি হব তাবলম সে একটি অপাত্ত। একে-বারে বুড়ো, আমারই বয়সী; এইভাবে মশাই বাকার পর শাক্তা, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে চলেছি।” অথবা এই কথাই অল্প ভাষায় বলবেন।

এই কাল্পনিক অপমানে আমার অন্তরান্না বিজোহী হয়ে উঠল। সে বঁকে দাঁড়াল। আমি গম্ভীর নামব না ঠিক করে ফেললাম। গাড়িভাড়াটা গেল, থাকগে। বিয়ে যদি করতে হয়, ধরে বসে করব। আরও অনেক রকম শপথ করলাম মনে মনে।

শালধারী একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। বোধ হয় এই যুদ্ধের কয়েকটি বছরের মধ্যে চমকে যাবার মতো কিছু আছে কি না বুঝে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না। বললেন, “বলুন না আপনার কথা—বুঝি অদ্ভুত কথা না কি?”

“একবারে আরব্য উপজাসের মত অদ্ভুত। দাঁড়ান দাঁত লাগিয়ে মিই আগে—মইলে বড়ো অনুবিধা হচ্ছে।” ব'লে ব্যাগ থেকে দাঁত বের করতে লাগলেন।

কথা আরম্ভ হ'ল। শুরু হ'ল ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের প্রথম

দিন থেকে। কি-রকম দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়তে লাগল, কি ভাবে আলোক নিরঞ্জন শুরু হ'ল, জাপানী আক্রমণের



আশঙ্কা হ'ল, তার পর জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল—সব একে একে বললেন। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ধবর কি ভাবে মাহুয়ের নার্ভের উপর বা মেরেছে তা শোনাগেল। তার পর জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া—জিনিস দুপ্রাপ্য হওয়া—লোকের দুর্গতির কথা, শোনাগেল। দুর্গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাপানীরা বর্মা প্রবেশ করল, কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালাল, আবার ফিরে এল, তারপর '৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতার প্রথম বোমা পড়ল, দ্বিতীয় বার শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হ'ল। এইভাবে শহরবাসীরা মানা ভাবে মাছানাবুদ হতে লাগল। জাপানীরা আন্দামান দখল করল। যখন তখন কলকাতা আক্রমণের ভয়। এই অবস্থায় আবার একে একে শহরে ফিরে আনা এবং দ্বিতীয় বার সর্বস্বান্ত হওয়া—এই সব কথা একটি একটি করে তাতে অতি ভয়ঙ্কর রং ফিলিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য আমিও স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। এ রকম বিভীষিকা বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি নি। তাই তাঁর একটানা একটি পর্বের বহুতা শেষে যখন তিনি হঠাৎ তাঁর শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন, “তখন?”—তখন আমিই হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আগে বলে উঠলাম, “বুঝ মনোযোগের সঙ্গে শুনিছি।”

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময় শালধারীও উদ্বেজিত ভাবে বলে উঠলেন, “নিশ্চয় শুনছি—আপনি ধামবেন না।” তাই আমার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারি নি।

আমি মিনিট বিরামের পরেই কোটাধারী আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। এ কাহিনীর মধ্যে নতুন কিছু কিছুই নেই—এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিটি দিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি যেভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এগুলো

আমাদের স্বাস্থ্য উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে—তা আমার কাছে অন্ততঃ সম্পূর্ণ নতুন। যুদ্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের সর্বনাশ করে গেছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

১৯৪৩-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখের বোমার আক্রমণটা তিনি বর্ণনার ভঙ্গীতে আবার বাস্তব করে তুললেন। এত দিন পরে তা শুনে আবার বুক কাঁপতে লাগল। তার পর নিপুণ-ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহর ছেড়ে পালানোর স্বাস্থ্য উপর যে পরিমাণ খা লেগেছিল, দ্বিতীয় বারের পলায়নে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি খা লেগেছে। উপরন্তু এ অবস্থাতেও যখন ৩০ মার্চ তারিখে গোটা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হ'ল তখন থেকে শহরের কোনো মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নি—সহস্রভাবে কেউ আর নিশ্বাসও নিতে পারে নি।

যুদ্ধের বলবার ভঙ্গি সভ্যই অতি চমকপ্রদ। যখন কথা শুরু করেন তখন কণ্ঠ কিছু ক্ষীণ থাকে। তার পর সে কণ্ঠ ধাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। তিনি না থামা পর্যন্ত মাঝখানে আর কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না। তাই এতক্ষণ আমরা মনোমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনে গিয়েছি, কখনও বিরক্তি বোধ করিনি—জামা কথার পুনরাবৃত্তি এক যুদ্ধের জটিল একধারে লাগেনি।

যুদ্ধ দ্বিতীয় বার একই ধামতেই শালধারী নিজাত্ত বৈচিত্র্য পুষ্টির জন্মেই তাঁর কতকগুলো কথা নিজেরই কথা বলে আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং জামালেন ছবার শহর ছেড়ে পালানোর ব্যাপারে তিনিও প্রায় সর্বশাস্ত হয়েছেন।

কোটাধারী আবার অন্তপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন, “হতেই হবে, কারোই নিষ্কার নেই। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আতঙ্ক আর ছুটোছুটিতেই তো সব শেষ নয়, শুধু কাল্পনিক ভয় তো নয়, বিজ্ঞানিক বৃত্তি ধরে এল একেবারে চোখের সম্মুখে। ভাইনে বামে নিরস্তর হাছাকার—ভাইনে বামে যত্না দৃষ্ট। পথ চলতে হচ্ছে যতদূর ভিত্তিরে ভিত্তিরে। মানুষের এমন যত্না তো কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি নি। এর কম নিষ্ঠুর করুণ যত্না, এমন অসহায় নীরব যত্না।—শত শত নরনারী শিশু বালক যুদ্ধ যুদ্ধ কর্তৃক—শুভ দৃষ্টি মেলে বুকে বুকে মরছে চোখের সামনে—এ কি দেখা যায়? চোখ খুললে এই বেদনার দৃষ্ট, চোখ বুজলে গভীর আতঙ্ক। পায়ের নীচে যেন মাটি নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়, আকাশে চাঁদ উঠলে বোমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। এমনি অবস্থাতেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, পাগল হইনি এ খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিংবা হয়েছি কি না কে জানে।”

শালধারী বললেন, “এমন কি ধরনের কাগজ খুললেও কেবলই বীভৎস সব ছবি দেখতে হয়েছে—জাপানীদের অত্যাচারের সব ছবি।”

“ঠিক কথা। এইভাবে শহরের লোকের হাত পা বেঁধে ছ-বছর ধরে তার উপর যেন লাঠি চালানো হয়েছে। মনে আতঙ্ক, চোখে বিজ্ঞানিক, কানে করুণ ক্রন্দন—এতদিন ধরে

কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? কিন্তু আজও কি যুক্তি পেয়েছি? যুদ্ধ শেষে যে যুক্তি আশা করেছিলাম, সে আশা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সাইরেন নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে?”

এই পর্যন্ত বলে যুদ্ধ চূপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি বেদনাচ্ছন্ন, উদাস। যেন ভবিষ্যৎ কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একবার সে দৃষ্টি চালনা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আছি। এতক্ষণ তাঁর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছি এবং আমিও যে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ছটি বছর কাটিয়ে এসেছি তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন চলেছি। এমন সময় শালধারীর কণ্ঠ থেকে প্রবল কানে এল “আপনি সর্বশেষ কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন?”

এই প্রশ্নটি আবার আমাকে বিবল করে তুলল। নিশ্বাস ঘোষ করে অপেক্ষা করে রইলাম সেই কথাটি শোনবার জন্য, যেন এইবার আমার যত্নাদেশের আদেশটি শুনতে পাব।

কিন্তু যা শুনলাম সে তো যত্নাদেশের নয়। অত্যন্ত সাধারণ একটি কথা এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। বললেন, “মশাই শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমি এই শব্দ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।”

তা হ'লে কি যুদ্ধ উদার? কে জানে। হয় তো তাই। কারণ তিনি উদ্ভাদের মতোই পলকহীন দৃষ্টিতে শালধারীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে হুঁকে পড়ে বললেন, “এই দেখছেন চুল? এর একটুকু কালো নেই। এই দেখছেন মুখ? যুদ্ধের চামড়া খুলে পড়েছে। দাঁতের কথা তো আগেই জানেন। কিন্তু কেন আমার এই দুর্দশা? এই যুদ্ধের আঘাতে, স্বাস্থ্য উপর অবিরাম ধাক্কা। আমার স্বাস্থ্য শেষ করে দিয়েছে এই ছটি বছর। আমি—আমি সম্পূর্ণ অকালে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি—সম্পূর্ণ অকালে, আপনি বিশ্বাস করুন।”

শালধারী মাত্র একটি বিষমহুচক শব্দ করলেন, তাঁর মুখ থেকে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। আমার মনে সহসা মতুন আলোকপাত হ'ল। আমি এই প্রযোগে একেবারে উঠে বললাম। যুদ্ধের কথা আমার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর কথার আমারই আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলে গেল, হয় তো যুক্তিও এতেই মিলবে। এখন একমাত্র ভাবনা রইল, ভাবী যুদ্ধের কতাকে কি বলে ভোলাব? তবু পকেট থেকে ডায়েরি বের করে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতে লাগলাম।

এমন সময় আমার সমস্ত আশা নিবূল করে কোটাধারী বলে উঠলেন, “মশাই বিশ্বাস করতে পারেন আমার বয়স আটত্রিশ বছর? বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ বছর ধরে কি অমানুষিক বেদনায় একধামি কাঁচা মন ব'রে বেঁড়াছি একধামি পাকা দেহের মধ্যে?”

আমার আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না। এর যদি বয়স

আমার সমান হয়, তাহলে ইনি যে আমার ভাবী স্বস্তির নন সে কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ আমার কিছু আরাম বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরে যাকে অন্তর থেকে পূজনীয় করে তুলেছি—মনে হ'ল তিনি যেন আজ আমাকে নানাভাবে ঠকাবার জন্তেই উত্তত হয়েছেন। হঠাৎ একটা আশাভদের বেদনার চেয়েও নিজের অসুমানশক্তির এতখানি দারিদ্র্য উপলব্ধি করে বেশি বেদনা পেলাম। সমস্তই কেমন যেন একটা ঝাঝ বলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিয়া চলছে—যেন সমস্তই অবাস্তব, সমস্তই মায়।

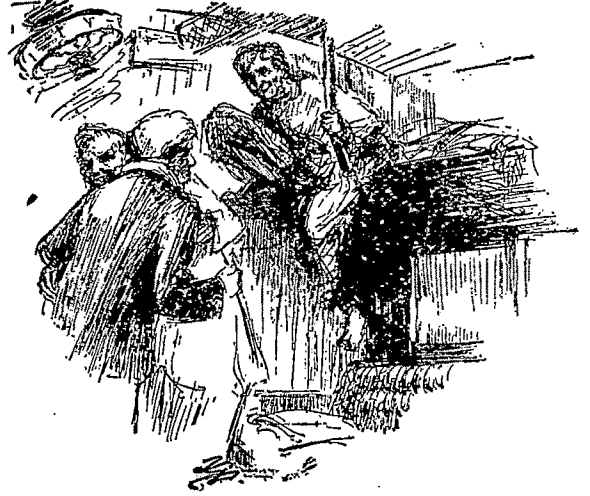
সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল যখন শালধারী বললেন, “মশাই কে কাকে অবাক করবে তাই ভাবছি। আমার বয়স কত মনে হয়? বিশ্বাস করবেন, আপনার চেয়ে আমি মাত্র ছ-বছরের বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ বরকার হয়নি। কাউকেই বলি না, চুপ করে থাকি, কোতুক বোধ করি মাঝে মাঝে নিজেকে স্বপ্ন মনে করে।”

কোটিধারী একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বললেন, “তাহলে দেখছি আমার নিজের কথা সত্যিই সবার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ যুদ্ধের স্বাক্ষর তা হলে স্মরণীয় সব বাঙালী যুবকেরই এই দশা ঘটেছে—আমি একা অসুস্থ হুজুকেই শুধু বড়ো ছইনি।”

শালধারী তড়িৎগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে অসুস্থ যুগুৎকে জাপটে ধরলেন, এবং গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, “তুই অসুস্থ? তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি লস্কোষ।”

এইবার আমার পালা। আমার হাত-পায়ে প্রকৃত যৌবন-শক্তি ফিরে এল, আমি এক লাফে নীচে পড়ে হুজুকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম—“আর আমি যে বিনয় রে। চিনতে পারছিস তোরা?”

এর পর যা ঘটল তা অকথ্য। চলল বেপরোয়া চীৎকার। তিন অকালযুদ্ধের কোলাহলে ইউরোপীয় ভ্রমলোক রক্তচক্ষু বুলে কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন “হোয়াটস আপ দেয়ার?”



“নাথিং সাহেব, উই ওল্ড ফ্রেণ্ডস্ মীট আন্ডার নিউ সার-কমন্ট্যান্সেস্”—বলে আমি সাহেবকে আশ্বস্ত করলাম। সাহেব পাশ ফিরে গেলেন।

সাহেবকে সত্য কথাই বলেছিলাম। আমরা তিন জনেই সহপাঠি অন্তরঙ্গ বন্ধু—মাত্র ছ-সাত বছর আমাদের দেখা হয়নি।

এত কোলাহলেও পঞ্চম যাত্রীটির কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল বহু বাঙালীকে মেরে ইনি সম্রাতি ফীত হয়েছেন, তাই তাঁর নাক-ডাকা একইভাবে চলতে লাগল।

জাগে

শ্রীকমলরাণী মিত্র

যুগের প্রহরী বিনিজ-চোখে জাগে,

জাগে চির-শর্বরী ;—

আকাশের ভালে জমে ওঠে হুধোগ,

ঝড়ের কাপটে মহা-প্রলয়ের বাণী।

মসীমাধা নভে চেয়ে কেগে আছি আছো,

কেগে আছে শর্বরী।

যুগের প্রহরী বিনিজ-চোখে জাগে ॥

প্রাণের আবেগে মাটিতে করুণা জাগে

শ্রাম-স্বপ্নার শ্রামল করুণাখানি,

মাহুষের প্রাণ সে শ্রাম পরশে জাগে

—অহুরাগ-রাঙা প্রেমের স্বপ্নবাণী—

আলোভরা নভে চেয়ে কেগে আছি আমি—

জাগে চির-শর্বরী

যুগের প্রহরী বিনিজ-চোখে জাগে ॥

ক্ষুদ্র বিশ্ব ও বিশ্বতত্ত্ব

শ্রীঅতসী বসু

(আমাদের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কি আকৃতি, এর প্রসারণ ও সংকোচন কি ভাবে হয় এবং তার পরিণামই বা কি এই সব পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বোঝাতে গেলে সকলে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে সমর্থ নাও হতে পারেন। সাধারণকে সহজে যাতে বোঝানো যায়, সেজন্য এক কল্পিত ছোট বিশ্বের অবতারণা করা হয়েছে। এই বিশ্বের (আমাদের বিশ্বের তুলনায় সামান্য খেলনার মতই) সবচেয়ে বেশী প্রসারণের সম্মুখ ব্যাস প্রায় ১০০ মাইল। আলোর গতির বেগ এই বিশ্বে যত, আমাদের বৃহৎ বিশ্বে তার দশ কোটি গুণ বেশী। মাধ্যাকর্ষণ এই ক্ষুদ্র বিশ্বে সহস্র কোটি গুণ বেশী এবং পাহাড় ইত্যাদির গুরুত্ব আমাদের পাহাড়েরই সমান। প্রসারণ থেকে সংকোচন সূর্য হবার সময় এই ছোট বিশ্বে দু ঘণ্টা মাত্র। বিজ্ঞানী গল্প ও কথোপকথনের ছলে বিশ্বতত্ত্ব সরল ভাবে বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন।)

সেদিন বিজ্ঞনবাবু বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বৈচিত্র্যহীন কেরানীর জীবন। সারাদিন একঘেয়ে কাজ করে মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটা কিছু নুতন আনন্দ না হলে আর যেন চলে না। খবরের কাগজটা উঠে পাণ্টে দেখে দর্শনযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না—সুধু সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অরুচি হয়ে গেছে। হঠাৎ বিজ্ঞনবাবু খবরের কাগজটার এক কোণে দেখলেন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের (Modern Physics) উপর কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে এবং আজকের বক্তব্য বিষয় ‘বিশ্বতত্ত্ব, বোম ও সময়’ (Space, Time and Cosmology)। বিজ্ঞনবাবুর মন নুতনের স্বাদ পেয়ে নেচে উঠল। এই ত ঠিক তিনি যা চাইছিলেন। অস্পষ্ট ভাবে তাঁর স্মরণে এসে কিশোর বেলার তিনি একবার কোন বইয়ে পড়েছিলেন, এক জন জ্যোতির্বিদ বেলুন চড়ে দূরে অনেক দূরে গ্রহ তারার মধ্যে বিচরণ করেছিলেন। বিজ্ঞনবাবু স্থির করলেন এই বক্তৃতা শুনতে যাবেন।

বিজ্ঞনবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ হলটিতে পৌঁছলেন বক্তৃতা শুভক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। আলোকিত প্রকাণ্ড ঘরটি লোকে গম গম করছে। দর্শকদের বেশীর ভাগই অল্পবয়সী ছাত্র। সবার দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ—র‍্যাকবোর্ডের কাছে সাদা দাড়িওয়া দীর্ঘকায় লোকটির উপর।

অধ্যাপক বক্তৃতার মাঝে বোডে এক লাইন কি একটা অঙ্ক লিখলেন, বিজ্ঞনবাবুর কাছে এত মজার ও অদ্ভুত লাগল প্রথম বা শেষ কিছুই বুঝতে পারলেন না তার। বিজ্ঞনবাবুর গণিতশাস্ত্রের দখল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চার প্রণালীর ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল, তাও তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই বেশী অভ্যস্ত, রোজকার কাজে দরকারে লাগে বলে। বিজ্ঞনবাবু আশা করছিলেন অধ্যাপক যতই এই সব অদ্ভুত অঙ্ক লিখুন বা কেন শেষে হয়ত এমন দুচারটি বিষয়ে বলবেন যা বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু অধ্যাপক সে রকম কিছুই বললেন না এবং

বারংবার উচ্চারিত “আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা বক্র ও বক্র এবং অবিরত প্রসারিত হচ্ছে” লাইনটি ছাড়া আর কিছুই বিজ্ঞনবাবুরও মাথায় প্রবেশ করল না। কিন্তু এই কথা-গুলি তাঁর মনে গভীর ভাবে দাগ কাটলে। যদিও বিশেষ কিছুই কল্পনা করতে পারলেন না বা বুঝতে পারলেন না। নাঃ, কি ভুলই করেছেন এই বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনতে গিয়ে, বিজ্ঞান তাঁর জ্ঞান নয় এটা তাঁর আগেই বোকা উচিত ছিল। এই রকম মনের ভাব নিয়ে গভীর অবসাদ ও ক্লান্তিবশতঃ অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিজ্ঞনবাবু হঠাৎ জেগে উঠে অসুস্থত্ব করলেন তিনি যেন একটা শক্ত জিনিষের উপর শুয়ে রয়েছেন। চক্ষু মেলে দেখলেন যে তিনি একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর রয়েছেন, কিন্তু পাহাড়টি শূন্যে ঝুলছে অথচ কোথাও কোন অবলম্বন নেই। সারা পাহাড়টি সবুজ শেওলায় ঢাকা এবং কোথাও কোথাও ছোট ছোট খোপও রয়েছে। পাহাড়ের চারি বার এক যুগ আলোতে আলোকিত এবং চারিদিকে বড় ঘূলা। হাওয়ার এত ঘূলা তিনি কখনও দেখেন নি এর আগে। ঘূলা থেকে পরিজ্ঞান পাবার আশায় বিজ্ঞনবাবু তাঁর ক্রমাগত বৈশ ভাল করে নাকের উপর দিয়ে বঁেবে নিলেন ও অনেকটা আরাম বোধ করলেন। কিন্তু চারি ধারে ঘূলার চেয়েও বিপজ্জনক ও ভয়াবহ জিনিস দেখতে পেলেন। প্রায় বিজ্ঞনবাবুর মাথার সমান, এমন কি আরো বড় পাখরের টুকরা ইতস্তত নিষ্কিপ্ত হচ্ছে। আর পাহাড়ের গায়ে লেগে একটা অদ্ভুত রকমের চাপা শব্দ করছে। বিজ্ঞনবাবুর ভয় হতে লাগল তাঁরই মাথায় একটা ঐ প্রকাণ্ড পাখর না আঘাত করে। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন আরও দু-একটি বড় পাহাড় শূন্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞনবাবু এতক্ষণ প্রাণপণে পাহাড়ের একটা কোণ আঁকড়ে ছিলেন—সর্বক্ষণ তাঁর ভয় হচ্ছিল কখন পড়ে যাবেন ঐ ঘুমিয়ে অভয় গর্ভে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর মনে সাহস সঞ্চার হ’ল, দেখলেন যে পড়ে যাবার বিশেষ ভয় নেই তাঁর ওজন তাঁকে পাহাড়ের দিকে ঠেলে আটকে রাখছে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে অস্পষ্ট আলোতে বিজ্ঞনবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সেই অধ্যাপককে, যিনি গতকাল বক্তৃতা শিরেছিলেন—সেই সাদা দাড়ি দীর্ঘ রেহ—তিনি যেন মাথা নীচু করে ছোট একটা মোট বইয়ে কিছু লিখছেন।

বিজ্ঞনবাবুর চোখের সামনে থেকে বীরে বীরে যেন একটা পর্দা সরে গেল তিনি যেন বুঝতে সক্ষম করেছেন। মনে পড়ল বাল্য-বয়সে জুলে পাঠকালে শিখেছিলেন যে পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড গোলাকার পাহাড়ের মত স্বর্ঘ্যের চারি ধারে বিনা বাধায় শূন্যে ঘুরে বেড়ায়। হাঁ, এই পাহাড় সব কিছুই নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। বিজ্ঞনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যাক পড়ে যাবার ভয় তা হলে নেই। পাহাড়টিতে বিজ্ঞনবাবু ও

অধ্যাপক মাত্র দুই প্রাণীই ছিলেন। বিজ্ঞনবাবু অধ্যাপক মহাশয়কে “সুপ্রভাত” বলে অভিযাদন করলেন।

অধ্যাপক এই প্রথম নোট বই থেকে মুখ একটু তুলে বললেন—কিন্তু এখানে কোন প্রভাত নেই, কোন সূর্য নেই, এমন কি এই বিধে একটু জলন্ত তারা পর্য্যন্ত নেই। ভাগ্যক্রমে এই যে যুহু আলো দেখা যাচ্ছে এ এক প্রকার রাসায়নিক জিয়ার প্রভাবে, নয়ত আমি এই বিশ্বের প্রসারণ পর্য্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হতাম না।—বলে তিনি আবার তাঁর ছোট বইটিতে মনঃসংযোগ করলেন।

বিজ্ঞনবাবু বড়ই হতাশ বোধ করলেন, এই বিধে একমাত্র প্রাণী সেও এত উদাসীন, কি করা যায় তা হলে? কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি পাখর এসে থাক। মেরে অধ্যাপকের হাত থেকে নোট বইটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বইখানি বেগে বিজ্ঞনবাবুদের ছোট এহ থেকে চলে যেতে লাগল। বইখানি ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে শূন্যে উড়ে যেতে লাগল। তাই দেখে বিজ্ঞনবাবু অধ্যাপককে বললেন, বইখানি আপনি আর দেখতে পাবেন না। অধ্যাপক বললেন—না ঠিক তার বিপরীত। আমরা এখন যেখানে আছি সেই ব্যোম সীমাহীন, সর্বত্রবিস্তৃত নয়। হ্যাঁ জানি, স্থলে তোমাদের পড়ানো হয়েছিল ব্যোম অসীম এবং দুটি সরল রেখা মেলে না। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা—আমাদের এই বিশ্বের বেলাতেও তা সত্য নয় বা সমস্ত মহাব্যের জ্ঞান যে বিশ্ব তার বেলায়ও নয়। অবশ্য সমস্ত মানব যে বিধে বাস করে সে খুবই যুহু, কিন্তু অসীম নয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তার বর্তমান আয়তন প্রায় ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল, সাধারণ ভাবে প্রায় অসীমই বলা চলে। আমার বই যদি ঐ বিধে হারিয়ে যেত তা হলে কিরে পেতে অসম্ভব রকমের দেরি হ’ত, কিন্তু এখানকার ব্যাপার অল্পরকম। যে যুহুর্ভে আমার হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই যুহুর্ভে আমি কবে দেখে-ছিলুম এই বিশ্বের ব্যাস পাঁচ মাইলের বেশি নয় যদিও এই বিশ্ব ক্ষতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। আমি আশা করছি আশ বণ্টার মতোই বইখানি ফিরে পাব।

বিজ্ঞনবাবু লাহসে গুরু করে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি রকম করে সম্ভব হতে পারে? আমি ত এমন কোন প্রক্রিয়া ভেবে উঠতে পারছি না বা কল্পনা করতে পারি না বা বইখানি আপনার পায়ের কাছে এনে দেবে।

অধ্যাপক বললেন, তুমি যদি জানতে চাও কি করে এ সম্ভব হতে পারে তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের কথা ভাব। পৃথিবী যে একটি গোলাকার বলের মত এ কথা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। মনে কর এক জন প্রাচীন গ্রীক কাটিকে সোজা উত্তর দিকে যেতে বললেন কোনও দিকে না বেঁকে। কল্পনা কর, সেই গ্রীক ভদ্রলোক কি রকম আশ্চর্য বোধ করলেন যখন সেই লোকটি দক্ষিণ দিক থেকে তাঁর কাছে ফিরে এল।

প্রাচীন গ্রীকটির পৃথিবীর চারদিকে বেড়াবার কোনও রকম ধারণা ছিল না এবং নিশ্চিত ভেবে নিলেন যে, তিনি যাকে চমতে বললেন সে নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলে মোড় ঘুরেছে এবং তবুই ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে লোকটি সর্বত্রফই নাক-বরাবর সোজা চলছিল এবং সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে অবশেষে বিপরীত দিক থেকে ফিরে এল। আমার বইয়ের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটবে যদি না অন্য কোন প্রস্তরখণ্ড আবার থাক। দিয়ে সোজা পথ থেকে সরিয়ে দেয়। এই নাও, দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখ বইখানি এখনও দেখতে পাও কিনা।

বিজ্ঞনবাবু দূরবীক্ষণটি ভাল করে চোখে পরলেন এবং খুলাসে ভিতর দিয়ে যত দূর দৃষ্টি চলে দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন অধ্যাপকের নোট বইখানি দূরে, বহুদূরে সরে যাচ্ছে এবং আশ্চর্য হয়ে আরও দেখলেন যে দূরে সকল বস্তুই এমন কি বইখানিও লাল রঙের দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞনবাবু টেচিয়ে উঠলেন, আপনার বই ফিরে আসছে, এখন আগের চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছে।

অধ্যাপক বললেন, না, এখনও দূরেই যাচ্ছে। তুমি আকারে বড় দেখছ তার কারণ গোলাকার ও বড় এবং অল্পতরকম জি-বিস্তৃত-বক্র ব্যোমের প্রভাব আলোর রশ্মির উপর পড়তেই বইটি বড় দেখাচ্ছে। দেখ, বইটির ছায়া এখন খুব কাছেরই এসে গেছে। এখন বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ, তুমি যা দেখছ এ শুধু বইটির ছায়া—যে আলো বিশ্বের অর্ন্তেক পরিভ্রমণ করেছে সেই আলোর রশ্মি ছায়ায় বেকে চূরে দিয়েছে। যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে দেখ পাথরের টুকরাগুলি বইয়ের পাতার ভিতর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিজ্ঞনবাবু বইখানি ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর হাত বইয়ের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল, কোথাও এতদূর বাধা পেল না। অধ্যাপক বললেন, আসল বইখানি এখন বিশ্বের বিপরীত মেরুর খুব কাছে পৌঁছেছে, বইটির দুই ছায়া, একটি তোমার পিছনে রয়েছে, যখন দুই ছায়া মিলে যাবে তখন বইটি ঠিক বিপরীত মেরুতে থাকবে। বিজ্ঞনবাবুর কানে বিশেষ কিছু প্রবেশ করল না, কিন্তু অধ্যাপকের কাছে জানতে চাইলেন ব্যোম-বক্র কেন হয় এবং বক্র ব্যোমের দ্বারা এ রকম অল্পতরকম ব্যাপার ঘটে কেন।

অধ্যাপক বললেন, পদার্থের উপস্থিতিই এর কারণ। মিউটন যখন প্রথম মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন তখন সাধারণ আকর্ষণ বলেই জানতেন। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রথম পরিকার ভাবে দেখান যে পদার্থের উপস্থিতির প্রভাব ব্যোমকে বক্র করেছে এবং যেহেতু ব্যোম বক্র, যে-কোন বস্তু এই ব্যোমে ভ্রমণ করলে তার চলার পথও গুরুত্ব আকর্ষণের জ্ঞান বক্র হবে। কিন্তু আমার মনে হয় গণিত-বিজ্ঞান যথেষ্ট আরও না থাকায় তোমার পক্ষে এসব বোঝা বড় কঠিন হবে।

বিজ্ঞনবাবু বললেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু যদি কোন পদার্থ না থাকত তা হলে কি আমরা যে জ্যামিতি স্থলে পড়েছিলুম আমাদেরও সেই ব্যাপার হ’ত, এবং দুই সমান্তরাল রেখাও একত্র হ’ত না?

অধ্যাপক বললেন, না, তা হ’ত না কিন্তু তাদের বাধা দিতে কোন বস্তুও থাকত না।

বিজ্ঞনবাবু আলোচনাচ্ছিলে বললেন, হয় ত ইউক্লিডের

নিষ্করই কোন অস্তিত্ব কখনও ছিল না, তাই তিনি যে জ্যামিতি রচনা করেছেন সে শুধু একেবারেই শূন্য ব্যোমের জন্তে যেখানে কোন পদার্থ নেই।

কিন্তু অধ্যাপকের এই দার্শনিক আলোচনায় যোগ দেবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বইখানির ছাত্রা প্রথমে যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকেই আবার অনেক দূরে চলে যেতে লাগল এবং একটু পরেই দ্বিতীয় বার ফিরে আসতে লাগল। বইটিকে এখন আরও বেশী বাঁকাচোরা দেখাতে লাগল, চিনতেই পারা যায় না সহজে—অধ্যাপকের মতে এখন আলোকরশ্মির বিশ্বকে সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করার ফলেই বইটিকে গুরুপ দেখাচ্ছে।

তিনি বিজ্ঞনবাবুকে বললেন, চেয়ে দেখ আমার বইটি সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে ফিরে আসছে, এবার আর ছাত্রা নয়, আসল বই। এই বলে তিনি হাত বাড়িয়ে বইটি নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, এই বিধে এত ধূলি ও পাথরের টুকরা রয়েছে যে, আমরা চারিদিক দেখতে সমর্থ হই না। চতুর্দিক এই যে কিছুতকিমাকার ছাত্রাগুলি দেখছে হয়ত এসব আমাদের ও আমাদের সঙ্গের পাথরের ছাত্রা, কিন্তু চেনা যায় না কোন্টী কিসের ছাত্রা।

আমাদের সেই বৃহৎ বিধে যেখানে আমরা আগে বাস করতাম সেখানে কি এই রকম সব ঘটনা ঘটে না?—বিজ্ঞনবাবু জানতে চাইলেন।

অবশ্যই ঘটে, কিন্তু সে বিশ্ব এত বড় যে, আলোকরশ্মি এক বার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণ করতে সহস্র কোটি বৎসর সময় নেয়। তুমি তোমার মাথার পশ্চাদভাগের চুল কি রকম কাটা হয়েছে দেখতে পেতে কিন্তু পরমাণবিকের কাছে বসবার সহস্র কোটি বৎসর পরে, আর সে ছাত্রাও অভ্যস্ত অপরিষ্কার দেখাত ধূলার জন্তে। প্রবাদ আছে, একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ রসিকতা করে বলেছিলেন, আমরা আকাশে যত নক্ষত্র দেখতে পাই তার অনেকগুলিই শুধু ছাত্রা, বহু বহু দিন আগেকার নক্ষত্রের ছাত্রা।

অধ্যাপকের এই সব ব্যাখ্যা ও বর্ণনা শুনে বোঝবার বুধা চেষ্টা করে বিজ্ঞনবাবু শুধু ক্রান্তিই বোধ করতে লাগলেন। পরে চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আকাশের ছবি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ধূলি অনেক কমে গেছে দেখে নাক থেকে ক্রমশঃ ঝুলে কেললেন।

ছোট ছোট পাথরের টুকরাগুলি অনেক কমে গেছে, অনেক পরে পরে তারা পাহাড়কে আঘাত করছে এবং তাদের শক্তিও আগের চেয়ে কমে গেছে।

বিজ্ঞনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, যাক্ এবারে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। আমার সর্কদাই ভয় করছিল কখন ঐ পাথরের টুকরা এসে আমার শরীরে আঘাত করে। কিন্তু দৃষ্টপটী এরকম বদলে যাবার কারণ কি, আপনি কি বলতে পারেন?—বিজ্ঞনবাবু অধ্যাপকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন।

অতি সহজেই। আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্ব এখন দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। আমরা প্রথম যখন এখানে আসি তখন

যদি এর আয়তন পাঁচ মাইল থাকে, এখন তাহলে এক-শ মাইল। আমি এখানে এসেই প্রসারণ লক্ষ্য করেছিলুম, দূরের জিনিসগুলিকে লাল রঙের দেখাচ্ছিল সেই থেকে।

বিজ্ঞনবাবু বললেন, আমিও দেখেছি দূরের বস্তু সব লাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে প্রসারণ কি করে বোঝায়?

অধ্যাপক স্তব্ধ করলেন, তুমি কি কখনও লক্ষ্য করেছ যখন কোন ট্রেন দূর থেকে ষ্টেশনে আসে তার বাঁশী কি রকম তীক্ষ্ণ শোনায়। কিন্তু যখন ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে, তার বাঁশী অনেক কম তীক্ষ্ণ শোনায়, অবশ্য তুমিও যদি দূর থেকে শোন। তুমি জান বোধ হয় শব্দ হাওয়াতে তরঙ্গ রূপে ভ্রমণ করে। শব্দের উৎস (এখানে যেমন ট্রেন) যখন দর্শকের কাছে আসে তখন তার আয়ত্তি (frequency) বেড়ে যায়, আর আয়ত্তি বাড়ার জন্ত শব্দ তীক্ষ্ণ শোনায়। কিন্তু শব্দের উৎস যখন দূরে চলতে থাকে, যেমন ট্রেন যখন ষ্টেশন ছেড়ে যায়, তার বাঁশী মোটা শোনায়। এরই নাম প্রসিদ্ধ ডপলার-সিফ্ট (Doppler Effect)। অতএব আমরা শব্দের পরিবর্তিত আয়ত্তি থেকে বলতে পারি তার উৎস কত বেগে দূরে যাচ্ছে বা কাছে আসছে। কিন্তু শুধু নীহারিকাদের কাছে আমাদের শব্দ তো পৌছবে না, এখানে আলোর উদ্ভিমানলাই আমাদের সাহায্য করবে, কারণ আলো শব্দের মতই তরঙ্গরূপে ভ্রমণ করে।

যখন সমগ্র ব্যোম প্রসারিত হয়, প্রত্যেক বস্তু দর্শকের কাছে থেকে তাদের দূরত্বের অনুপাত গতিতে বাহিত হয়, সুতরাং সেই সব বস্তু থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তার ক্রমেই লোহিত হয়ে যায়,—আলোর লোহিত হয়ে যাওয়া আর শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যাওয়া একই পর্ধ্যারে পড়ে, দুইয়েরই কারণ টেউয়ের আয়ত্তি কমে যাওয়া। যে বস্তু যত দূরে আছে তাদের সরে যাবার গতিও তত বেশী এবং ততই আমাদের চোখে লাল দেখায়। আমাদের সেই পুরনো প্রকাণ্ড বিধে জ্যোতির্বিদেরা নীহারিকাদের দূরত্ব কয়েক বার করেছেন শুধু এই আলোর লোহিত হয়ে যাওয়া থেকে; এবং তাদের দূরত্ব এত বেশি যে আলোকরশ্মির সেখানে যেতে আট লক্ষ বৎসর লাগে।

বর্তমানে প্রসারণের হার শতকরা ০.০০০,০০০,০১ প্রতি বৎসরে। সুতরাং প্রতি সেকেন্ডে বিশ্বের ব্যাস এক কোটি মাইল বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বের প্রসারণের হার অনেক কম, এর আয়তন শতকরা এক ভাগ বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মিনিটে।

বিজ্ঞনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রসারণ কি কখনও থামবে না?

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই থামবে এবং তার পরেই সংকোচন শুরু হবে। প্রত্যেক বিশ্ব একটি বুব ছোট ব্যাস ও বুব বড় ব্যাসের মধ্যে স্পন্দমান। আমাদের সেই বিশ্বের কাল—প্রসারণ থেকে সংকোচন শুরু হওয়ার মধ্যকার সময়—অনেক, প্রায় সহস্র কোটি বৎসর, কিন্তু আমাদের এই বিশ্বে প্রসারণ থেকে সংকোচন শুরু হতে মাত্র দু-বর্তী লাগে। এখন প্রসারণের গতি সবচেয়ে বেশি, বুব ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে নাকি?

প্রকৃতপক্ষে প্রথমে তাপরশ্মির দ্বারা যেটুকু গরম ছিল, এখন

বোম্ব অনেক বেড়ে যাওয়াতে সেই সামান্য রশ্মি গরম রাখেই অসমর্থ হয়েছিল, এবং প্রায় ক্ষণে যাবার মত ঠাণ্ডা বোম্ব হচ্ছিল।
অধ্যাপক বললেন, আমাদের ভাগ্য ভাল, প্রথমেই যথেষ্ট তাপরশ্মি ছিল, তাই এখনও আমাদের কিছু গরম রয়েছে, নয়ত এত ঠাণ্ডা হয়ে যেত যে, আমাদের চারদিকের হাওয়া ক্ষণে ধন হয়ে যেত ও আমরা তাতে ক্রমে মরে যেতুম। কিন্তু সংকোচন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং শীত্রই আবার সব গরম হবে।

আকাশের দিকে চেয়ে বিজ্ঞনবাবু দেখলেন দূরের বস্তুগুলি লাল থেকে বেগনি রঙে পরিবর্তিত হয়েছে, অধ্যাপকের মতে এর কারণ বস্তুগুলি এবারে তাঁদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। বিজ্ঞনবাবুর মনে পড়ল অধ্যাপকের দেওয়া সেই ট্রেনের বাঁশীর উপমা, যখন কাছে আসে তখন তার শব্দ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়—তবে কেঁপে উঠলেন।

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন যদি সব কিছুই সংকুচিত হতে শুরু হয়ে থাকে তা হলে বিশ্বের মত বড় বড় পাহাড় সব একীভূত হয়ে যাবে, আর আমরা তাদের মধ্যে পড়ে পিষে মারা যাব, এ আশঙ্কা কি আমাদের নেই?

শান্ত ভাবে অধ্যাপক উত্তর দিলেন, অবশ্যই আছে, কিন্তু তারও অনেক আগে ভাপ এত বেড়ে যাবে যে আমরা হু-জ্বনেই অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যাব, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও এই পরিণাম—সব কিছুই মিশে যাবে একাকার হয়ে এক ভগ্ন প্যাসের মাঝে এবং আবার নূতন প্রসারণের সঙ্গে বিধে নূতন জীবন শুরু হবে।

বিজ্ঞনবাবু হতাশার স্বরে বললেন, আহা, সেই বিশ্বের এই পরিণাম হতে অনেক অনেক দেরি, আপনার মতে ত প্রায়

সহস্র কোটি বৎসর দেরি আছে, কিন্তু এখানে যে বড়ই শীত্র আমার এই ধৃতি পাঞ্জাবীতেও গরম বোম্ব করছি।

অধ্যাপক নিলিপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওগুলো খুলে ফেললে কোনই লাভ হবে না, স্ততঃসংগত ও সব না খুলে শুয়ে পড় এবং যতক্ষণ পার পর্যবেক্ষণ কর, একটু পরেই ত সবকিছুর সমাপ্তি।

বিজ্ঞনবাবু কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। হাওয়া এত গরম বোম্ব হচ্ছে যে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। খুলা এত বেড়ে গেছে যে, তাঁর চারিপাশে ঘন হয়ে খুলা ক্রমেই এবং তিনি অসুস্থব করলেন যেন একটি গরম কম্বলে তাঁকে জড়ানো হচ্ছে। নিজে থেকে মুক্ত করবার ও বাঁচবার প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর একটি হাতে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। বিজ্ঞনবাবু প্রথমে ভাবলেন বোম্ব হয় তিনি ঐ বিধে—সেই ভয়ঙ্কর বিধে একটি ছিদ্র করেছেন এবং তাতেই এই ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করছে। ভাবলেন অধ্যাপককে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে তোরের আলোতে তিনি নিজের শয়ন-কক্ষের অতি-পরিচিত আসবাবপত্রের আদর দেখতে পেলেন। দেখলেন তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন এবং গরম কম্বলটিতে জড়িয়ে গেছেন, মাত্র একটি হাত মুক্ত করতে পেরেছেন কোন মতে।

বিজ্ঞনবাবু ভাবলেন বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা মনে করে—
“প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের ‘সূচনা’—ভগবানকে স্বচন্দ্র, আমরা এখনও প্রসারিত হচ্ছি।*

* Gr. Gamow's *Mr. Thomkins in the Wonderland*-এর দ্বারা অবলম্বনে।

রাতের কাহিনী

শ্রীকরণাময় বসু

মেঘের পরীরা রাঙা ওড়নার ছেয়েছে নীলান্বর,
উড়ে উড়ে যায় ললকন্ঠার ঘেঁষে;
পাখীর পালকে ভেসে আসে বুঝি সাগরের মর্মর,
অহামার বাগী এনেছে স্বপ্নে সে।
এমনেই তোরের বকুলবনের ভাষা,
নিবসের কূলে নিশীথের ভালোবাসা;
গহন পথের প্রান্তে রেখেছে মায়ী-দ্বীপালীর শিখা;
এনেছে চোখের লজল কাহিনী মেঘ-মমতায় লিখা।

ভুলিতে পারি নি বন্ধু, তোমার স্নিগ্ধ যুগল আঁর্বি,
মনে পড়ে আজো কাঞ্চল লক্ষ্যাকূলে;
সাধে কি এনেছ জন্মান্তর ভুলে-যাওয়া সেই রাণী,
স্মরণ-প্রদীপ রেখেছ কি বেদীমূলে?

মায়ার লিখনে রচছে যে আলিপনা,
আমার জীবনে কখনো তা মুছিব না;
ভোমারে হেরিয়া শিশির-নীতল শিথিল কুসুম চুমি
নদীর ওপারে উত্তলা পবন কিরে গেল বনভূমি।

কাণ্ডন এনেছে সোনার লক্ষ্য, পথিকের পথ চাওয়া,
বেলা শেষ হ'লে কূলে ভিড়িবার গান;
মুদিত কমল কুমারী-কোরক বন্ধে কি কিরে পাওয়া,
চৈতালি রাত হয়নিক' অবসান?

বৈকালী বেলা কুসুম-কুণ্ডলে
মালিকা গলায় কোন সে বাসিকা চলে,—
মাঠের কিনারে আলোর ওধারে চলেছে তেপকম্বরে,
সারা জনমের কাহিনী লিখিছ সেই সে পথের 'পরে।

হুগলীতে বাঁধকার্য

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সোদপুরে অবস্থানকালে গান্ধীজী হুগলীতে বাঁধকার্যের কথা ঐ জেলার কোন কংগ্রেস-কর্মীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ঐ কার্য সম্পর্কে প্রশ্নাদিও করিয়াছিলেন। বাঁধকার্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর মন্তব্যের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। হিন্দুস্থানী ভাষায়

১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে সেবাগ্রাম হইতে গান্ধীজী গঠনকর্ম সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দেন। অগ্রাঙ্ক কথার মধ্যে ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন,

"The detailed constructive programme is to be found in my pamphlet on it and Dr. Rajendra Prasad's which is a running commentary on it. It should be remembered that it is illustrative, not exhaustive. Local circumstances may suggest many more items not touched in the printed programme. These are beyond the scope of a treatise on an All-India programme. They are necessarily for local workers to find out and do the needful." (Italics are ours)

অর্থাৎ গঠনকর্মের বিস্তৃত তালিকা আমার ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকাখানি আমার পুস্তিকারই ব্যাখ্যা-রূপ। একথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, আমরা যে সব রকম কাজেরই কথা বলিয়াছি তাহা নয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এই মুদ্রিত কর্মতালিকায় উল্লিখিত হয় নাই এমন অনেক কাজের লিখা মনে হইতে পারে। স্থানীয় কর্মীদেরকে এই সকল কাজ খুজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং ইহা করিবার জগৎসমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঘটনাক্রমে ঐ ২২-১০-৪৪ তারিখেই হুগলী জেলা বঙ্গ-সাহায্য-সমিতির পক্ষ হইতে আশামবাগ মহকুমার রাজহাটী গ্রামে "খানাকুল খানা বোরো-বাঁধ কমিটি" গঠিত হয়। পরে গান্ধীজীর উপরোক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এই বোরো-বাঁধ কমিটির কৃত কার্য রচনাশ্রম কার্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আমাদের সে আশা সফল হইয়াছে।

গত মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এই বাঁধকার্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে এই কার্য সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখের মধ্যে বলা হইয়াছে, "অল্পের জগৎ ইংরেজ সরকারের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে ছুড়িফে মরাই সার হইবে এই কথা

বুঝিয়া বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিলে এখন হইতেই ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে বাঙালীকে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যেখানে পদে পদে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, কংগ্রেসকর্মীরা সেই ঘন অন্ধকারে আশার আলো প্রতিফলিত করিয়া দেশকে বাঁচিবার পথের সন্ধান দিয়াছেন এজন্য বাঙালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।"

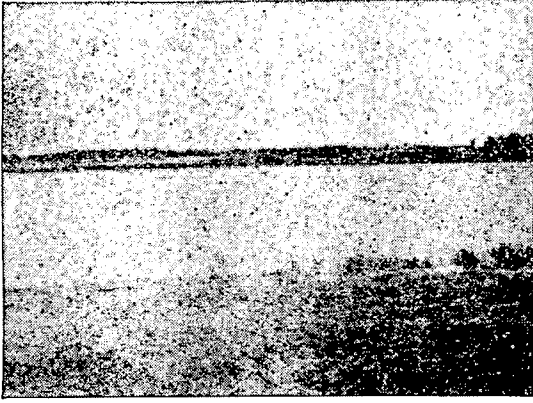
এই বাঁধকার্য সম্বন্ধে কয়েকটা স্থূল কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গান্ধীজীর মন্তব্যের প্রতিলিপি

তিনি লিখিয়াছেন, "হুগলীতে বো বাঁধকাম হয়, জিস্বে লোগোঁকো বড়া ফায়দা পুঁচা উসে মৈ রচনাশ্রম কার্যকা হিয়াহি সমবতা হ'। ঔর ঐসী শোধক শক্তি সব সেবকমে হোনী চাহিয়ে।" অর্থাৎ হুগলীতে যে বাঁধকার্য হইয়াছে, যাহাতে লোকের বড় উপকার হইয়াছে, সেই কার্যকে "গঠনমূলক কর্মের অংশ বলিয়াই আমি বুঝি। আর এইরূপ শোধক শক্তি সব সেবকের মধ্যেই হওয়া চাই।"

হুগলীতে বাঁধকার্য
বো বাঁধকাম হয়
জিস্বে লোগোঁকো
বড়া ফায়দা পুঁচা
উসে মৈ রচনাশ্রম
কার্যকা হিয়াহি
সমবতা হ'।
ঔর ঐসী শোধক
শক্তি সব সেবকমে
হোনী চাহিয়ে।
অর্থাৎ হুগলীতে
যে বাঁধকার্য
হইয়াছে, যাহাতে
লোকের বড়
উপকার হইয়াছে,
সেই কার্যকে
"গঠনমূলক কর্মের
অংশ বলিয়াই
আমি বুঝি।
আর এইরূপ
শোধক শক্তি
সব সেবকের
মধ্যেই
হওয়া চাই।

মুণ্ডেশ্বরী নদী সম্বন্ধে কৰ্মীদের কোন জ্ঞান ছিল না। বিভিন্ন ক্ষতান্তে নদীর গতি, জলের প্রবাহ ও হ্রাসবৃদ্ধি, নদীগর্ভের আকৃতি



গোপালদহ বাঁধ—দৈর্ঘ্য ৭৭৫ ফুট, সম্মুখ হইতে



গোপালদহ বাঁধ—পিছন হইতে

ও নদীতীরের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যাদি তাঁহারা কোথায় পাইবেন? তাঁহাদের এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি ও যত্নপাতিও ছিল না। বাঁধ বাঁধিবার সময় কোন রাশভারি রাজপুরুষ অথবা জ্ঞান-গভীর এঞ্জিনিয়ারের শুভ পদার্পণও সেখানে হয় নাই। কর্মীদের পুঁজি ছিল কেবল—করিয়া তুলিবার আগ্রহ ও সঙ্কল্প, আর ছিল একটা বলিষ্ঠ কল্পনা যাঁহা ভবিষ্যৎ বাংলার বাঁচিবার পথের রেখাটি দেশের একটি ক্ষুদ্রতম অংশেও একটি বার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চায়।

মুণ্ডেশ্বরীর চরে গঙ্গাপূজা করিয়া বাঁধকার্য আরম্ভ হইল। গোপালদহ ও ভূয়েড়ার নদীতীর কর্মমুখর। মাটিকাটারা মাটি কাটিয়া তুলিতেছে। যুদ্ধের কারণে গ্রামে বাঁশ পাওয়া দুষ্কর। তাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে বাঁশ সংগ্রহ করা হইতেছে। ক্রোশ দুই দূর হইতে সারি সারি গরুর পিঠে কেশে বোকাই হইয়া আসিতেছে, খড় আসিতেছে। পাশাপাশি খড়ের দড়ি পাতিয়া তাহার উপর কেশে বিছাইয়া ও মাটি ছড়াইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'হেতে' পাকানো হইতেছে। বাঁশ কাটিয়া শত শত শুলো তৈয়ারী হইতেছে। শুলো পুতিয়া হেতে পাতিয়া আর নদীর দুই তীর হইতে ত্রিশ ফুট চওড়া ও আট দশ ফুট উঁচু মাটি ফেলিয়া আসিয়া, নদীর মাঝে উপযুক্ত স্থানে বাঁধের দুই মুখ মিলাইয়া 'মুখমুদ' করিয়া বাঁধ সম্পূর্ণ করা হইবে।

জলপ্রবাহ কি সহজে বাঁধা পড়িতে চায়? তবু কর্মীদের নিয়ত আগ্রহ ও তৎপরতার মধ্যে ক্রমে গোপালদহ ও ভূয়েড়ার বাঁধ দুইটি ২৯শে পৌষ ১৩৫২, ইংরেজী ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সম্পূর্ণ হইল। পৌষ-সংক্রান্তির সময় মাঠে মাঠে বোরো চাষের প্রথম জল চলিয়া গেল।

এই অঞ্চলে দুই রকম বোরো-আবাদের চলন আছে—কাল-পিনে আবাদ ও চটা আবাদ। খুব নীচু মাঠে প্রয়োজনমত ছোট ছোট বাঁধ দিয়া বর্ষার জল ধরিয়া রাখা হয়। এই জল শীতকালে ধীরে ধীরে শুকাইয়া উঠে, কিন্তু জমি নরম রাখে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি এই নরম জমিতে বোরো ধান রোয়া হয়। ইহাকে কালপিনে আবাদ বলে। ইহা ছাড়া চটা আবাদ আছে। চটা আবাদে ধান রুইবার জন্ত পৌষ-সংক্রান্তি বরাবর এক সপ্তাহের মধ্যে জল চাই। তারপর আরও দুই বার জল দিতে হয়; এক বার মাঝে ও আর এক বার শেষের দিকে। এই মাঝের জল ও শেষের

জল চটা ও কালপিনে উভয় আবাদেই প্রয়োজন হয়। আমরা বাঁধ বাঁধিয়া চটা আবাদের প্রথম জল ঠিক সময়েই দিতে পারিলাম।

মাত্র কয়দিন পরে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ছোট নাগপুর পাহাড় অঞ্চল হইতে জল নামিয়া নদী হঠাৎ খুব ফুলিয়া উঠিল। এই সময়ে নদীজলের এত ক্ষীতি কচিং দেখা যায়। কশ্মিগণ গোপালদহে মুণ্ডেশ্বরীর চরে 'কেশের' কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। কল্যাণকৃত কশ্মিগণের ইহা কল্পবাদের মত। নিদারুণ শীত। ছোট কুঁড়ের মধ্যে রান্না, খাওয়া, শোওয়া-বসা, আপিস-করা সবই চলিত। নদীতে ভয়ানক বান দেখিয়া সকলে প্রমাদ গবিলেন। জল ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রমে বাঁধ ছাপাইয়া গেল। নিরুপায় নিসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারা নদীর এই নিষ্ঠুর জীলা দেখিতে লাগিলেন। তারপর উন্নত জলপ্রবাহে গোপালদহের প্রকাণ্ড বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ভূয়েড়ার বাঁধেরও সেই দশা হইল।

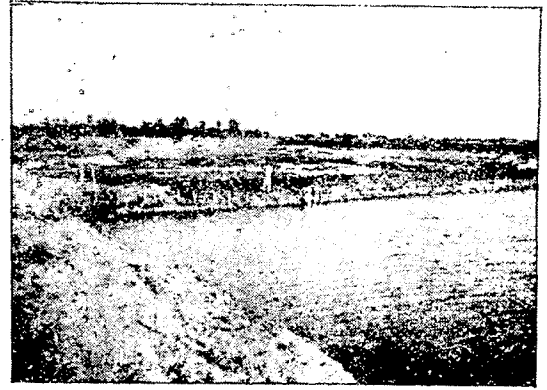
কশ্মিগণ যখন বাঁধের কাজে হাত দেন তখন বুদ্ধিমানদের জিজ্ঞাসা করেন নাই পাছে তর্কের তোড়ে বাঁধার আগেই বাঁধ ভাসিয়া যায়, পণ্ডিতদেরও পরামর্শ লন নাই পাছে ব্যঙ্গের মধ্যে বাঁধের সমাপ্তি ঘটে। এখন কিন্তু বাঁধা বাঁধ সত্যিই ভাঙিয়া গিয়া বেহিসাবী কাজের হিসাব-নিকাশের সময় আসিল। তাঁহারাও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আজ পর্যন্ত বাঁধের কাজে ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা কর্মীরা নিজ দায়িত্বে দিয়াছেন। এখন সব টাকাই জলে ভাসিয়া গেল। দুই-চারদিন অবসর থাকিবার পর তাঁহাদের ভিতরের পাগল হাসিয়া উঠিল। পুনরায় হাজার দশেক টাকা যোগাড় করিয়া তাঁহারা প্রধান সব বাঁধগুলি একে একে বাঁধিয়া ফেলিলেন। আর তার উপর কংগ্রেসের ধ্বজা তুলিয়া দিয়া পরমানন্দে আকাশ পানে চাহিলেন।

বোরো অঞ্চলের নজা দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে মুণ্ডেশ্বরী ও কানা নদী প্রায় দশ মাইল ধরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত—মধ্যে ব্যবধান গড়ে প্রায় আড়াই মাইল। বোরো চাষের পূর্বে অঞ্চল মুণ্ডেশ্বরীর দিকে, আর কানা নদীর দিকে পশ্চিম অঞ্চল। পূর্বে অঞ্চলে চিংড়া ইউনিয়ন ও তাহার সন্নিহিত স্থানে আমন ধান হয় না বলিয়া বোরোর উপর নির্ভর বেশী। তাই গোপালদহের চার



গোপালদেহ নদীৰ চৰে 'কেশেৰ কুড়ে'। ইহাই কৰ্মীসকল
বাসস্থান।



ভূয়েড়া বাঁধ—দৈৰ্ঘ্য ৩৮০ ফুট, সমুখ হইতে

মাইল নীচে উদনা নামক স্থানে মুণ্ডেশ্বৰীৰ উপৰ আড়াআড়ি আৰ
একটি বড় বাঁধ বাঁধিতে হয়। ভূয়েড়া বাঁধেৰ পঁচিশ-ত্ৰিশ হাত
নীচে একটো বড় 'উখোড়' রাখা হয়। এই উখোড় বা প্ৰণালীৰ
মধ্য দিয়া জল বহিয়া গিয়া গোপালদেহৰ প্ৰায় এক ক্ৰোশ নীচে
পুনৰায় মুণ্ডেশ্বৰীতে গিয়া পড়ে। উদনাৰ বাঁধে এই জল ধৰা
পড়ে এবং পূৰ্ব অঞ্চলে সেচৰ কাজ হয়।

ভূয়েড়াৰ প্ৰথম বাঁধ হইতে কানা নদীতে কাৰকদেহৰ শেষ
বাঁধ পৰ্যন্ত নদীপথে ব্যবধান প্ৰায় ১০ মাইল। গোপালদেহ,
ভূয়েড়া ও উদনাৰ প্ৰধান তিনিটি বাঁধ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ ও উচ্চতায়
যথাক্ৰমে ৭৭৫' x ৩০' x ১০', ৩৮০' x ৩০' x ৮' এবং ৪৫০' x ৩০'
x ১০' ফুট। ইহা ছাড়া মাঝাৰি ও ছোট বাঁধ আৰু ১৭টি
তৈয়াৰী কৰা হয়। তাহাদেৰ নাম ছত্ৰশাল, কাৰকদেহ, সোলা-
রাস্তা, আটঘৰা-পীৰতলা, কগমে প্ৰভৃতি। সমস্ত বাঁধ বাঁধিতে
৭০০১০০ ঘনফুট মাটি, ২৬৬৮১ আঁটি কেশে, ৪০৮২ খানা
বাঁশ, ১২ কাহন খড় ও বিবিধ অজ্ঞান্য জিনিস লাগে। বাঁধ
বাঁধিবৰ সময় যে সকল পৰিভাষাৰ চলন দেখা যায় তাহাদেৰ
মধ্যে কয়েকটিৰ নাম—'হেতে' (এজ্জে হেতে, চাল হেতে, নাগৰী
হেতে) 'শুলো' মুখমুদ' 'উখোড়' 'কামড়ী' 'মোকাম' 'খোস্তা'
'কিং' ইত্যাদি।

কৰ্মী যখন গোপালদেহৰ বাঁধ ভাঙিবৰ পৰ পুনৰ্নিৰ্মাণেৰ
কথা গান্ধীজীকে বলিতেছিলেন তখন গান্ধীজী হিন্দীতে প্ৰশ্ন
করেন,

"বাঁধ-বাঁধাৰ কোঁশল কোথায় পাইলে?"

"গ্ৰামেৰ লোকের যতটুকু জানা আছে। এঞ্জিনিয়ারিং জান
বা অভিজ্ঞতা আমাদেৰ এক তিলও নাই। কোন এঞ্জিনিয়ারেৰ
সাঁহায্যও আমরা পাই নাই। গোপালদেহৰ বাঁধ ভাঙিয়া গেলে
আমরা সরকারী পূৰ্ববিভাগে পৰামৰ্শ চাহিয়া চিঠি দিয়াছিলাম।
কোন জবাব আসে নাই।"

গান্ধীজী জিজ্ঞাসা কৰিলেন, "এ জানটুকুই বা কোথা হইতে
আসিল?"

"পৰম্পৰাগতভাবে, একদম দেশী।"

তুষ্টি হইয়া বাপুজী বলিলেন, "দেহাতী হৈ।"

তখন গঠনকৰ্ম সম্বন্ধে গান্ধীজীৰ নিম্নলিখিত কথাটি মনে
পড়িয়া গেল—

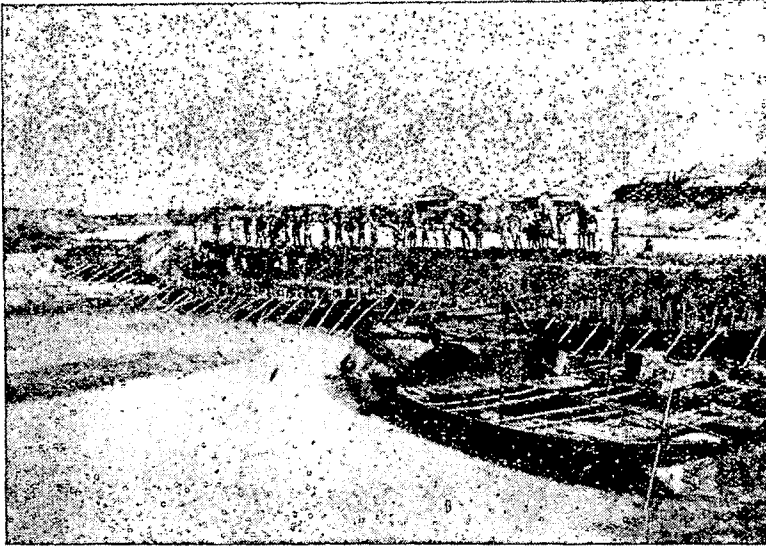
"It means a wholesale Swadeshi mentality, a
determination to find all the necessities of life
in India and that too through the labour and
intellect of the villagers. (Italics are ours.)"

অৰ্থাৎ ইহা ত পূৰাপূৰি একটা স্বদেশী মনোভাব, জীবন-
যাত্ৰাৰ প্ৰয়োজনীয় সকল বস্তু দেশেৰ মধ্যেই পাইবাৰ সক্ষম, আৰ
সে-পাওয়া গ্ৰামেৰ লোকের বুদ্ধি ও পৰিশ্ৰমেৰ জোৰে।

গান্ধীজী যখন গুলিলেন বাঁধেৰ জলে সেচৰ ফলে এ অঞ্চলেৰ
৫০ খনি গ্ৰামেৰ মাঠে মাঠে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ বিঘা জমিতে ৮০
হাজাৰ হইতে এক লক্ষ মণ ধান হইয়াছে এবং তাহাতে ৪৭০০
পৰিবার উপকৃত হইয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা কৰিলেন, "উহাদেৰ
মধ্যে মুসলমান পৰিবার আছেন কি না।"

কৰ্মী বলিলেন, "হাঁ, অনেক মুসলমান পৰিবারও উপকৃত
হইয়াছেন। আৰ বাঁধ কমিটিতে প্ৰায় চৌদ্দ-পনের জন মুসলমান
আছেন।"

ইহাৰ পৰ আৰও কয়েকটি কথা গান্ধীজীৰ গোচৰে আনা
হইল। কৰ্মী বাহা বলিলেন তাহাৰ মৰ্ম এই :—হাত পাতিয়া
ভিক্ষা লইয়া লইয়া দেশেৰ লোকের মনুষ্যত্ব খৰ্ব হইয়া বাইতেছে।
কিন্তু আমাদেৰ বাঁধকাৰ্য্য ভিক্ষাদানেৰ ব্যাপাৰ হয় নাই। প্ৰায়
লক্ষ মণ ধান যখন চাষীদেৰ ঘৰে উঠিতেছিল তখন কৰ্মীরা
তাঁহাদেৰ কাছে 'চাৰানী'ৰ কথা বলেন। বিঘা-করা কমপক্ষে
৫ মণ ফলন ধৰিলে ৮ টাকা মণ হিসাবে এক বিঘায় ৪০ টাকা
মূল্যেৰ ধান হইয়াছে। অতএব প্ৰতি বিঘায় চাষী ভাইয়া ২১০ টাকা
চাৰানী দিন এই প্ৰস্তাব কৰা হয়। এমতে প্ৰায় ২১০০০ (একুশ
হাজাৰ টাকা) চাৰানী আদায় হইয়াছে। চাষীরা তাঁহাদেৰ দেহটুকু
শোধ কৰিয়া নিজ কৰ্তব্য কৰিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ইহা
কংগ্ৰেসেৰ ষাজনা। ইহাতে এ অঞ্চলে সহযোগিতাৰ নূতন পথেৰ
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং আমরা নিজেৰ জোৰে কৰিতে পাৰি—
আত্মশক্তির এই সন্ধানও লোকে সমষ্টিগত ভাবে পাইয়া-
ছেন। স্বকৌশল কাজেৰ মধ্য দিয়া এই অভিজ্ঞতাৰ একটো বলিষ্ঠ
পৰিণতিৰ সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে।



উন্নয়ন বাধ—নির্মাণকালে

কর্মী আরও বলিলেন, “চাষীরা জানিতেন যে কংগ্রেসের লোক চারানীর টাকা আদায়ের জন্ত আদালতে যাইবে না অথবা জমিদারের মত তাঁদের ঘরে পাইক-পেয়াদা পাঠাইবে না। তথাপি কম মাসে ২১০০০ আদায় হইয়া গেল। আমাদের এই জোরটুকু মাত্র সেবা-কার্যের জন্ত, moral position এর জোর।”

বাগুজী তাঁর হাতসমুজ্জল সন্নেহ দৃষ্টি কর্মীর মুখে রাখিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

“আমরা ঋণ করিয়া বাধকাধ্য করিয়াছিলাম। এখন সে ঋণ প্রায় সবটা শোধ করিতে পারিয়াছি। বাকিটা শীঘ্রই শোধ হইবে আশা করিতেছি। আমরা বাধকাধ্যের পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছি।”

সমস্ত ব্যাপারটি গান্ধীজীকে শুনাইয়া ও তাঁহার সমর্থন পাইয়া কর্মী সেদিন খুব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর বাধের কথা গান্ধীজীকে জানান হয়। ২৩শে ডিসেম্বর সোদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মী-সম্মেলনে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এই বাধকাধ্যের উল্লেখ করেন এবং কৃষিগণকে গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা বুঝিয়া ঐরূপ কাধ্য করিতে বলেন।

বর্তমান বর্ষে (১৯৪৫-৪৬) বাধ বাধিবার জন্ত কমিটি ঠিক সময়ে প্রস্তুত হইয়া বাধ কেশে প্রভৃতি ক্রয় করিতেছিলেন এমন সময় গবর্ণমেন্ট কাধ্যহস্তারক হইলেন। নিজহাতে কাজের ভার লইয়া তাঁহার বাধ কমিটির সম্পাদককে ‘পে-মাষ্টার’ এর তীব্রদারী

করিতে ডাকিলেন, আর গ্রহণের অযোগ্য শর্ত দিয়া কমিটির নিকট সহযোগিতা চাহিলেন। যে কর্মীরা দারুণ শীতে নদীর তীরে কেশের কুঁড়েতে মাসের পর মাস বাস করিয়া নূতনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দিতে প্রাণনা করিয়াছেন,

“আত্ম-অবিধাস তার নাশ কঠিন ঘাতে, পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।”

তাঁহাদের প্রতি মোটা মাহিনার সরকারী চাকরের এই অবজ্ঞার চাহনি অসহ ও উপভোগ্য দুই-ই বটে।

দুর্ভিক্ষ আবার দেশের স্রমুখে। বাংলার কৃষক কর্মীদের হাতে থাকিলে গত সনের অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগিত। এক লক্ষ মণের স্থলে তাঁহারা দুই লক্ষ মণ ধাত্য উৎপাদনে



উন্নয়ন বাধ—দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট, সম্মুখ হইতে

সাহায্য করিতে পারিতেন, আর আক, তিল, পিঁয়াজ, আলু প্রভৃতি শীতের শেষের ফসল সেচের জলে অনেক বেশী উৎপন্ন হইতে পারিত একথা জোর করিয়াই বলা যায়। কিন্তু অন্ধ রাজপুরুষ দুদ্দিনের মাঝেও আমাদের তাহা করিতে দিলেন না এবং নিজেরাও করিতে পারিলেন না। তাই ভাবি, এঁরা কি সত্যি আমাদের লোক?

গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল যে এই বাধকাধ্য আমরা প্রতি বৎসরই করি। তিনি এই সম্পর্কে আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন। আর এই কাজ বাহাতে আমাদের হাতে থাকে তার জন্ত সরকারী মহলে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছে।

আমরা-বলিয়াছি যে বেহিসাবীর দল এই কাজে হাত দিয়াছিলেন তাঁহারা সমস্ত কাজটির আয়ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। পরাধীন দেশে বাঁচিবার পথের সন্ধান করিতেই তাঁহাদের আগ্রহ। তাঁহারা জানেন দেশ স্বাধীন হইলে

স্ববৃত্ত পরিকল্পনায় এই সকল কার্য বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতগণই হিসাব করিয়া তথ্য বুদ্ধিমান সম্পন্ন করিবেন। কন্দিগণ তখন এই সব অনধিকারচর্চা(?) ছাড়িয়া অল্প গঠনকর্মের মধ্যে গ্রাম-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে ধন্য হইবেন।

ভূয়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধে—অনাদির আনন্দের আর অবধি ছিল না। ষাট বাড়িয়া সহকর্মীদের প্রায়ই বলিত, দেখিস—এবার যদি জার্মেনী না ছেড়ে তো কি বলেছি।

সে বিষয়ে সহকর্মীদের অবস্থা মতদৈবতা ছিল না। চাকরি একটা মাঝারি-গোছের সদাগরী আপিসে। আপিসটা ইংরেজের। পার্টনার—সিনিয়র জুনিয়র দুই দলই অত্যন্ত কড়া মেজাজের। নিয়ম-শৃঙ্খলার একটু এদিক-ওদিক হইলেই ওরা কর্মচারীদের ধমক দেয়, মাহিনা কমায়। দশটা-পাঁচটার পরও দুই-এক ঘণ্টা ষাটাইয়া সে অনিয়মের শোধ তোলে। আবার মাহিনা বৃদ্ধির বেলাতেও ওদের ঔদাসীন্দ্র অপরিণীম। যুদ্ধ বাঁচিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে নাই, তবু গত মহাযুদ্ধের সময় কোন্ আপিসে কত ওয়ার-অ্যালাউন্স বা গ্রেড বাড়িয়াছিল তাহার হিসাব-নিকাশে বেশ খানিকটা তর্ক-বিতর্ক প্রত্যহই হয়। সকলেই আশা করে যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী হইলে আরের অর্ধটো বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ দিন দিন বাড়িয়া উঠে।

অনাদির সংসার মেহাং ছোট নহে। বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন, বউ এবং ছেলেমেয়ে লইয়া মোট আট জন। নব্বইটি টাকা মাহিনাও পুরা হাতে আসে না। শহরতলীর পৈত্রিক ভিটা না থাকিলে সংসার চালান কঠিনই হইত। এখনও সংসার চলে কোম রকমে। মায়ের সুগৃহিণীদের গুণে ঘরকন্ড হয় না বটে, তবে আহারে-বসনে কুছ-লাভন না করিয়া উপায় নাই। ইহার উপর যুদ্ধের উৎসাহে নগর এক আনা ধরচ করিয়া একখানা দৈনিক বাংলা কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিল। পরের কাগজ চাহিয়া আনিয়াছে ভাবিয়া প্রথম দিন-দুই মা কিছু বলিলেন না। মাস-কাবারে সংসার-ধরচের টাকা কয় পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁয়ে অনাদি, দুটো টাকা কম দিলি যে?

টোক গিলিয়া অনাদি বলিল, মানে একখানা কাগজ নিচ্ছি কিনা এ মাস থেকে।

মা বলিলেন, কাগজ নিয়ে কি হবে। ও দুটো টাকা থাকলে যে কোলের মেয়েটার দ্বয় কিছু বেশি করে নেয়া যেত।

সে কথার উত্তর না দিয়া অনাদি বলিল, ঠিক দুটো টাকা তো নয়, পুরোনো কাগজ বেচলেও হেসে-ধেলে একটা টাকা

হবে। পাছে মা আরও কিছু বলেন—এই ভয়ে সে কাজের অছিলা করিয়া ভাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুটি টাকার অভাব হ্রিগ্রন্থ সংসারে খুব বেশি বলিয়া বোধ হয় না। এদিকে জার্মেনী দেশের পর দেশ জয় করিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়াইয়া দিল। সেই সঙ্গে জিনিষের দামও কিছু কিছু চড়িতে লাগিল।

অবনী জিজ্ঞাসা করে, চা'লের দর আজকাল কত ক'রে যাচ্ছে হে?

ভূষণ বলে, পাঁচ টাকা।

অনাদি কাগজ খুলিয়া হাসি মুখে বলে, ছ—ছ বাবা—আর ক'টা দিন সবুজ কর। পাঁচ ছাড়ালেই ওয়ার-অ্যালাউন্স দিতে পথ পাবেন না বাছাবনেরা। এই দেখ কি লিখেছে।

অমাবির কথাই সত্য হইল। কিছুদিন পর চা'লের দাম সাড়ে উঠিতেই ওয়ার-অ্যালাউন্স মঞ্জুর হইল।

তারপর আদিল পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। ইতিমধ্যে যুদ্ধ-ভাতা কিছু বাড়িলেও—সে প্রাপ্তিতে আনন্দ বোধ সকলের কাট-রাছে। আর যুদ্ধের উৎসাহ কাটাইয়া দিল পঞ্চাশের মহত্তর।

সেদিন অনাদি আপিসে আসিতেই সহকর্মীরা বলিল, কই হে—কাগজ কই?

অনাদি বলিল, ছেড়ে দিলাম কাগজ নেওয়া। যুদ্ধের ধবর কি দিচ্ছে ওরা, যে পড়ে লুপ্ত পাব।

রতন বলিল, সে কি হে, জার্মেনী তো একটু একটু করে হটছে।

হাই—। সব চাপা ধবর, বলিয়া অনাদি মুখ ফিরাইল। তা জার্মেনী জিতলেই বৃষ্টি ধবরটা সত্যি হ'তো?

এই স্নেহে অনাদি জলিয়া উঠিয়া বলিল, বোঝ তো কু! একদিনও কিমলে না একখানা কাগজ, যেলা স্যাচ স্যাচ করো না বলছি।

সকলে চোখ টেপাটপি করিয়া হাসিল, আর কিছু বলিল না।

দুর্ভিক্ষ কাটিয়া গেল—লোকের হুঃখতার লাবণ্য হইল না, বরং তা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

আগে বড় বড় যুদ্ধকাহাঙ্ক ভুলিলেই কাগজ খুলিয়া অনাদি চীৎকার করিয়া উঠিত, ওহে—আজও দুখানা পটোল-তুলেছে। এই নিত্রে মোট হ'ল—

তারপর টেনের হিসাব চলিত।

আজকাল কেউ জাহাজডুবির খবর দিলে বলে, ভারি ত।—
লাভ তো এই—ওযুট্টা আর মিলবে না। পাছ হরলিক্স ?
কডলিভার ?

এমনি টাল-বেটালের মধ্যে একদিন জার্মেনী আত্মসমর্পণ
করিল। তিন মাসের মধ্যে পরমাণবিক বোমার খায়ে জাপানও
ধরাশায়ী হইল। আপিসে দুই দিন করিয়া ছুটিও হইল এই
উপলক্ষ্যে।

অবনী বলিল, যাক্, বাঁচা গেল। এবার মানুষ ধেরে-পরে
বাঁচবে।

অনাদি বলিল, ওয়ার-অ্যালাউন্স এইবার তুলে দেবে। উটে
মাইনে থেকে না কাটে।

ভুষণ বলিল, ইন্স—কাটলেই হ'লো। এই মাসির বাজারে
কাটুক না দেখি মাইনে থেকে।

কিন্তু হেভি রিডাকশান হবে।

পোস্টওয়ার প্ল্যানে ত বলেছিল—কারও চাকরি যাবে না
লীগ'সির।

আরে ওসব আমাদের ক্ষেত্রে আর কি।

অনাদি বলিল, তা যাদের চাকরি এই যুদ্ধের সময় হয়েছে—
তাদের যদি ছাড়িয়েই দেয় তো তোমার-আমার কি।

বাঃ রে—তোমার আমার বাড়ির আর কমে যাবে না—তা
হ'লে ? ছেলেরা কাজ করছে না ?

তা আর কি হবে। তোমার বাড়ি-তৈরির জন্ত যে রাজ-
মিজকে মজুরি দিয়ে খাটাও—বাড়ি শেষ হ'লে তাকে মজুরি
দিতে পার ?

কিসে আর কিসে। হরিপদ কথিয়া উঠিল। বাড়ি তৈরি
আর যুদ্ধ বাধান এক ? আমরা বাবিয়েছি যুদ্ধ ?

এই কথায় সকলে বানিককণ্ঠের জন্ত চুপ করিল।

ভুষণ বলিল, শুনছি নাকি পঁচিশ বছরের ওপর যাদের চাকরি
হয়েছে তাদের ছাঁট্টে দেবে।

তাই নাকি ? কোথায় শুনলে ?

সকলের আগ্রহকে ক্ষুর না করিয়া ভুষণ গভীরভাবে বলিল,
আমার দাদার এক বন্ধু কাজ করেন গবর্নমেন্ট আপিসে। তাঁর
এক বন্ধু কাজ করেন মিল্লীর দপ্তরে। সেখানকার কন্ফিডেন্সিয়াল
খবর—

সুতরাং গোপন কথাটি লইয়া সারা আপিসে আলোচনা শুরু
হইল। নিজের বয়স ও চাকরির বয়স হিসাব করিয়া কেহ
বিমর্ষ কেহ বা পুলকিত হইল।

অবনী বলিল, যাক্—আমার ভয় নেই। এই সত্তের
চলছে।

ভুষণ দাঁত-মুখ ঝিঁচাইয়া কহিল, তবে আর কি। তুমি
বাঁচলেই আমরা চতুর্ভুজ হব।

৩.

এই দুর গুজবের ভেলায় ভাসিয়া উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ কোন
রকমে পার হইয়া গেল। কূল এখনও বহুদূরে। ইতিমধ্যে

তুকান উঠিল। ওই লোক-ছাঁটাই লইয়া প্রথম স্বল্পপাত ; যেমন
বুদ্ধির দাবিও পরে সংযুক্ত হইল। একটি ইউনিয়ন এই
আপিসেও ছিল। কার্যকরী কতকগুলি প্রস্তাব কাগজে লিপিবদ্ধ
করিয়া তাহার কর্তব্য সে এ যাবৎ যথানিয়মে সুসম্পন্ন করি-
য়াছে। যুদ্ধের সংঘাতে মার্গ'সি ভাঙা বুদ্ধির আন্দোলনে প্রায়
চার বছর আগে প্রথম সে গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তার পর
ঐ জাতীয় অনেকগুলি আপিস ইউনিয়ন একতাবদ্ধে বদ্ধ হয়।
এখন সাধারণ ইউনিয়নের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত ইউনিয়ন সমন্বয়ে দাবি জানাইল যুদ্ধপূর্ব পুরাতন
গ্রেডের পরিবর্তন চাই। জীবনধারণের মান বহুগুণ বাড়িয়াছে।
পুরাতন বেতনে পোস্ত পরিবারবর্গ লইয়া মানুষ কোন প্রকারে
বাঁচিতে পারে না। পৃথিবীর চারি দিকে বাঁচিয়া থাকার
সমস্যা এই প্রবল হইতেছে। অবশেষে ইউনিয়নের ব্যবস্থায় প্রত্যেক
আপিসেই মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন উদ্বৃত্তন কর্মচারীদের কাশে
প্রেরিত হইল।

ভুষণ বলিল, তুমিও যেমন। মাইনে বাড়ানো বললেই বাড়ানো
আর কি।

হরিপদ বলিল, আলবৎ বাড়াবে। যুদ্ধের বাজারে লাখ লাখ
টাকা কামিয়েছে কোম্পানী।

অবনী বলিল, বর যদি মাইনে না বাড়ায় ?

হরিপদ টেবিল ঠুকিয়া কহিল, ঠাইক করব।

অনাদি বলিল, কেরাণী ঠাইক করে সাক্সেনফুল হয়েছে
কোন দিন ?

হরিপদ বলিল, হয়নি বলে কখনও হবে না ? সবাই এক
হলে ক'দিন লাগে এদের শাসনোত্তাপ করতে।

অবনী বলিল, তা যদি হয় তো কার না ইচ্ছে ঠাইক
করতে।

অনাদি বলিল, ঠাইক-পিরিয়ডে আমাদের সংসার চলবে
কি করে ?

হরিপদ বলিল, সে ব্যবস্থাও ইউনিয়ন করবে। মাসে মাসে
চাদা দিচ্ছ কিসের জন্ত ?

অনাদি লাকাইয়া উঠিল, কুছ পরোয়া নেই, চালাও ঠাইক।
মাইনে বাড়াবে না—ইয়াকি আর কি।

হরিপদ বলিল, ঠাইক বললেই ঠাইক হয় না—বড় শক্ত
জিনিস। যত উপায় আছে—সব না দেখেই ঠাইক করা চলে
না।

ভুষণ বলিল, তা কত দিন চলবে ঠাইক ?

সে কেউ বলতে পারে ? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ওরা ইচ্ছা
করলে কিছুই হবে না। কোটি কোটি টাকা যাদের
রিজার্ভ কাণ্ডে জমা—তারা আমাদের দুঃখ বোচাতে পারে না ?

অনাদি উত্তেজিত হইয়া কহিল, ওদের সঙ্গে কোন রকম
শর্ত নয়—ঠাইকই উপযুক্ত ঔষধ।

কিন্তু ঠাইক-পিরিয়ডে সকলকেই ত্যাগ করতে হবে—
কষ্ট স্বীকার করতে হবে—সেটা মনে রাখবে।

অনাদি বলিল, এমনিই কি কষ্ট স্বীকার করছি না আমরা।
এর চেয়েও কষ্ট। বর ইউনিয়ন থেকে পুরো মাইনে না-ও
পেতে পার। আশা মাইনের—

অনাদি ও একসঙ্গে অনেকগুলি লোক আতকাই উঠিল—
তা কি করে হবে।

হরিপদ অল্প হাসিয়া বলিল, একটি কিংবা দুটি মাস—এ
কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। বলিয়া গুণগুণ করিয়া সুর বলিল।

“ছব্বি বিনা অর্থ লাভ হয় কি মহীতে।”

৪

আবেদন-নিবেদনে কোন ফল না হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে
স্থিরীকৃত হইল—

কিন্তু স্থিরীকৃত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ষখট করার নিয়ম নাই।
এক মাসের নোটিশ দিয়া তবে এই সমস্ত কার্যে পরিণত করা
সম্ভব। প্রধান ইউনিয়ন আপিস ইউনিয়নগুলির মত চাহিল।
আপিসের সভ্যগুলি আবার প্রত্যেক কেরানীর সম্মতির দৃষ্ট
সাক্ষ্য লাগি করিল।

তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকের মতামত জানাইতে হইবে।

হরিপদ একখানি ফরম লইয়া অনাদির কাছে আসিতেই
সে জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি?

হরিপদ বলিল, একটা লই করে দাও। আমরা প্রাইক
করব ঠিক করলাম।

হঠাৎ অনাদির বুকের ভিতরটা শুকাইয়া উঠিল। বলে কি
হরিপদ? এত শীঘ্র?

বিস্ময় বাক্যে রূপান্তরিত হইতে-না-হইতে হরিপদ বলিল
আরে ভাবহো কি—সবাই সই করে দিয়েছে। এই দেখ।

হরিপদের হাতে এক ভাড়া কাগজ দেখিয়া অনাদি আশ্চর্য
হইল। শুষ্ক ভাবটা বুক হইতে গলায় উঠিয়া আসিল। কহিল
বড়বাবু সই করেছেন?

দূর বোকা—ও সব ঘুঘু লোক কখনও সই করে।

তবে। শুষ্ক ভাবটা আবার বুকের দিকে নামিতেছে
বোধ হইল।

হরিপদ বলিল, উনি বললেন—তোমরা সবাই সই করগে।
জান ভো, আমরা তোমাদের পেছনে আছি।

অনাদি বলিল, আচ্ছ থাক ভাই। কাল না হয়—

হরিপদ হাসিয়া উঠিল, বউয়ের পরামর্শ নেবে বুঝি। কিন্তু
আর সময় নেই—আজ বিকেলে কাগজ দাখিল করবার
শেষ দিন। তবু অনাদি হাত উঠায় না দেখিয়া সে একরূপ
বম্বক দিয়া কহিল, নাও—নাও ঢের হয়েছে। বলি তোমার
মাইনে বাড়লে আমাদের তার ভাগ দেবে? হাকা।

ভূষণ বলিল, সিমির বেলায় যে খুব এসিয়েছিলে হে—এখন
কোঁৎকার ভয়ে পিছোও কেন?

বিজ্ঞপ-বাণ বর্ষণের মধ্যে অনাদি কখন সই করিয়াছে
মনে নাই। কিন্তু সই করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল মাতা
বহুমতী বাহুকীর কণা হইতে নামিবার কোশল আনন্দ
করিতেছেন। মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া উঠায় টেবিলে মাথা রাখিয়া
সে ধানিকঙ্কণ চূপ করিয়া পড়িয়া রহিল। বহুকণ পরে বড়
গ্রাসের এক গ্রাস জল খাইয়া তবে তার গলার শুষ্কতা ঘুচিল।

দূর হইতে অবনী বলিল, দাদা ঢক ঢক করে অত জল
খাচ্ছে কেন গো?

আর এক জনের কণ্ঠস্বর কানে আসিল, সই করার মেহনৎ
তো কম নয়।

৫

আপিস হইতে শিয়ালদহ স্টেশন—প্রায় দুই মাইল। তার
পর ট্রেনে এক ঘণ্টা। ওদিকে স্টেশন হইতেও বাড়ি এক মাইল
হইবে। মাতা বহুমতী সেই যে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—
তার আর নিবৃত্তি নাই। রাগাঘাটের যে দলটি ট্রেনে চাপিয়াই
বুধা সময় নষ্ট না করিয়া হাঁটুতে ঝাড়ন বিছাইয়া তাস খেলিতে
বসেন ও নানাবিধ মন্তব্য করেন—তাহারাও অনাদির দৃষ্টি ও
ক্রান্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। বাম পাশের
কোণে হেলান দিয়া যে আশ্রয় লোকট সংবাদপত্র পড়িবার
সঙ্গে সঙ্গে পেলিল দিয়া বিশেষ তথ্যগুলিতে দাগ দেন এবং
কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলির
ব্যাখ্যা করিতে বসেন তিনিও আজ অনাদির চোখে লুপ্ত।
ভিখারীদ্বয়ের চানচুর-বিক্রেতাদের মর্মভেদী চীৎকার অর্থশূন্য
ভাবে কানে আঘাত করিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে—
সংসার স্নিয়মে মগ্ন গতিতে চলিতেছে। কাহারও সামনে
কোন সমস্যা নাই—কোন চিন্তা নাই, সেই শুধু নির্বুদ্ধিতা-
বশতঃ যে কাজ এইমাত্র করিয়াছে তাহার আলন বুঝি কিছুতেই
হইবে না। এ নির্বুদ্ধিতার পরিণতি যতই ভাবিতেছে অনাদি
ততই বাহুকীর কণা হইতে মাতা ধরিয়া নামিয়া পড়িবার
আয়োজন করিতেছেন।

মেজ ছেলে কেট খুলা মাথিয়া পথে খেলা করিতেছিল।
অনাদির ক্লাস্ত মস্তক গতি চোখে পড়িতেই ছুটিয়া আসিয়া
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে বলিল, আমার লেল
গাড়ি কই বাবা?

অনাদি সন্ধিৎ করিয়া পাইয়া দেখিল—ছেলের আলিঙ্গনে—
কাল সাবান দিয়া কাচা জামাটা পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।
ওর ঘ্যানঘেনে আদরটাও মাথায় আগুন আলিয়া দিল।
সজোরে গোটা দুই চড় তার গালে বসাইয়া দিয়া ঝাঁচাইয়া
উঠিল, রেলগাড়ি। ভারি বাপের জমিদারি তালুক দেখেছ—
না? ছ'মুঠো ভাতও যে জুটবে না।

কেট তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে অনাদির আগেই
বাড়ি গিয়া চুকিল।

অনাদির জী শোভার বয়স পঁচিশের মধ্যেই। কিন্তু চারিটি
সন্তানের জননী হইয়া ইতিমধ্যে সে বয়স নির্ণয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া
গিয়াছে। দেহে যেমন যৌবন নাই—মেজাজেও তেমনি স্নিগ্ধতা
নাই। অস্বাভাবী সংসারে ছেলেমেয়েদের দিবারাজি দেখি
দেহি রবে তিস্ত বিরক্ত হইয়া সে প্রতিদিন প্রকৃত্তে নিজের ও
সন্তানদের মৃত্যু কামনা করে। এই লইয়া শাস্ত্রী বউয়ে
মনকষাকষি প্রতিদিনই হয়, অথচ প্রতিদিন এই ‘হা অর’ রব
ও কলহ তর্ক না জমিলে মনে হয়—সংসারের ছন্দ কোথায়
বাহত হইল।

ছেলের কান্নার হেতু না বুঝিয়াই সে তাহার পিঠে আরও
গোটা কয়েক চাপড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মর মর তোরা,
আমি হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্দ হই।

অনাদির মা বাড়ি ছিলেন না। কেউ উঠানে গড়াগড়ি দিয়া বাড়ি ফাটাইতে লাগিল।

অনাদি কোন কথা না বলিয়া ছেলের পাশ কাটাইয়া রোয়াকে উঠিল। ছোট মেয়েটি হামা টানিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আঁধার ঘরে কহিল, বাবা—বাবা—

তার বড় মেয়েটির কন্ঠস্বর হইতে জ্বর। সাগু মিছরি আজ-কাল অমিল বলিয়া বাগির সঙ্গে তিনি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ছোট মেয়েদের রুচিবোধ যথেষ্ট। খাইবার সময় সে প্রত্যহই বামনা ধরে, এবং মায়ের-চপেটাঘাত ছাড়া কিছুতেই ওই তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে চাহে না। আজ আপিস খাইবার সময় শোভা বলিয়াছিল—হুঁশানা বিস্কুটও তো আনতে পার—কি একটা কমলালেবু।

অনাদি কথা দিয়াছিল আনিবে।

মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল, বাবা বিস্কুট দে।

অনাদি কথা না কহিয়া ঘরের মধ্যে গেল। মেয়েটি স্বর নাকে ভুলিয়া কান্নার মহলা দিতে লাগিল, নেবু দে, বিস্কুট দে।

অনাদির সহ হইল না, তাহাকেও একটা চড় বসাইয়া দিল। ব্যস! তারপর পাঁচ দিনের উপবাসী মেয়ের কণ্ঠ হইতে যে সুতীক্ষ্ণ চীৎকার-ধ্বনি বাহির হইল—তাঁহাতে ব্রহ্মরস না হউক, কর্ণরস কাটিয়া যাওয়া আশ্চর্যের নহে।

শোভা ছুটয়া আসিয়া কহিল, রোগী মেয়েটাকে মারলে তো?

হী, মারলাম। ঘ্যান্-ঘ্যান্ খাই-খাই ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না তো সংসার করতে গিয়েছিলে কেন? কাঁজালো কণ্ঠে শোভা জবাব দিল।

অনাদিও কাঁজালো কণ্ঠে কহিল, বক্কারি। না হ'লে মানুষ ছেনে শুনে এমন অর্থ করে।

অতঃপর শোভাও ছেলেদের সঙ্গে গুল্ম মিশাইয়া বাড়ি ফাটাইতে লাগিল। পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া মা-ও যোগ দিলেন এই গোলমাগে। অনাদির মনের উত্তাপ এই সম্মিলিত উত্তাপের চাপে ক্রমশই নীচে নামিতে নামিতে সন্ধ্যার পর কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভাল করিয়া ভাত না খাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

ধানিক পরে শোভা ঘরে আসিয়া এটাওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে আড়চোখে অনাদির ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ তার মনে হইল, অসুখ নয় তো?

কাছে আসিয়া সে যথাসম্ভব মোগারেম ঘরে কহিল, আজ ভাল করে খেলে মা কেন? আমাদের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

এই সন্ধি-মূলক স্বর অনাদির অপরিচিত নহে। তাহার মন মুহূর্তে অত্যন্ত কোমল হইয়া উঠিল। হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বলিয়া সে থপ-করিয়া শোভার একখানি হাত টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। চোখ দিয়া তার হ-হ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রাজি তখন ন'টা। মাত্র অনাদির আহার হইয়াছে—হৈসেল-পুট্ট সারিতে এখনও ঘণ্টা দুই লাগিবে। এ সময়ে বিছানায় বসিয়া অনাদির বিস্কুট মনের ইতিহাস সবটা বুটাইয়া

সুনিবার অবসর মাই, অথচ অনাদির এই কান্না শোভাকে কম বিস্ময়ান্বিত করিল না। সে কহিল, কীদ কেন?

এই কথার জবাব না দিয়া অনাদি আরও ধানিকক্ষণ কৌপাইয়া কৌপাইয়া মনের ভার লাঘব করিল। শোভাও অধীর কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আঃ কীদ কেন? কি হয়েছে বলই না ছাই।

ভিত্তরকার বাষ্প কিছু বাহির হইয়া গেলে অনাদি বলিল, আমি আজ সর্বনাশ করেছি। তোমাদের পথে বসিয়েছি।

আঃ—বল কি! শোভা আঁতকাইয়া উঠিল। ইনসিওরের টাকারটা এবার দাঁও নি বুঝি?

ওগো, সে সব কিছু নয়। আমি, বলিয়া সে পুনরায় কৌপাইতে লাগিল।

শোভা কৌতূহলের ভারে প্রায় ভালিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আর কত সহ হয়। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া সে কহিল, আর আবিখোতার কাজ নেই, কি হয়েছে তাই বল।

শোভার হ্যাঁচকা টানে অনাদি হচ্চকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধি তাহার একেবারে লোপ পায় নাই। যে ঘটনাটি আজ আপিসে ঘটয়াছে তাহার পরিণামফল ওর মানস চক্ষে জল জল করিতেছে।

অনাদি সাদা গলায় বলিল, আজ সই করে দিয়ে এলাম আপিসে—মাইনে বাড়াতে হয় বাড়াত, নইলে রইল তোমার চাকরি।

বল কি গো! চক্ষু কপালে ভুলিয়া শোভা ধানিকক্ষণ ঘ্যান্-হের মত রহিল। তারপর সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অনাদিকে বিদ্র করতঃ কহিল, সত্যি বলচ?

অনাদি সরিয়া আসিয়া শোভার গায়ে হাত দিয়া বলিল, সত্যি—সত্যি—সত্যি।

শোভা অকস্মাৎ কঁদিয়া উঠিল, ওগো, এমন দুর্ভাগ্য তোমার কেন হ'লো! আমাকে হাড়ে নাড়ে ভাজবার জেতেই কি বিয়ে করেছিলে তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কি এমন শত্রুতা করে-ছিলাম যে—

রান্নাঘর হইতে মা ছুটয়া আসিয়া কহিলেন, কি হ'লো বউমা, কীদচো কেন?

শাস্ত্রভীর সামনে মাধার ঘোমটা দিবার কথা শোভার মনেই হইল না। কীদিতে কীদিতে সে বলিল, আপনার ছেলে চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছে মা। আমার পথে বসলাম।

মা-ও এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া শুধু স্বরে বলিলেন, হাঁরে ও বুদ্ধি তোকে কোন্ শত্রু দিলে? চাকরি বিনে আমাদের গতি কি হবে বলতে পারিস?

অনাদি বলিল, ছাড়িনি এখনও—তবে সে ছাড়ারই সামিল।

মা-রোয়াকে বলিয়া পড়িয়া কহিলেন, সব বুলে বল বাছা, আমার বুক বড়ফড় করছে।

সমস্ত সুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোদের বড়বাবু—মালিপাড়ার থাকে না? যা বাবা—এখনই তার কাছে একবার ছুটে যা—

অনাদি বলিল, এত রাতিয়ে এক মাইল পথ—

মা বলিলেন, চল বাবা, তোর সঙ্গে না হয় আমিও যাবি।

এই কাকাকাণ্ডলোর সর্বশেষ করতে কিছুতেই দেব না আমি।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইয়া অনাদি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে পা দিয়াই মনে হইল—এতক্ষণ সে বৃষ্টি হুঃস্থল দেখিতেছিল। ধূলা-কোমল পথে পা ফেলিয়া এত তৃপ্তি সে বহু কাল পায় নাই। পথের ছ'পাশে ঘন বোপ অন্ধকারে মাখামাখি হইয়া ওকে সাত্বনা দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছে। আকাশের কোমল নীল আন্তরণে নক্ষত্রেরা আঁজ বেশি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। শীতল বাতাসে ক্লান্ত মস্তিষ্ক বহুক্ষণ হইল জুড়াইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য পথ—আঁরি আশ্চর্য্য আকাশ। ন'টার গরম ভাত মুখে গুঁজিয়া ন'টা আঠারের ট্রেন ধরিলার জন্ত ছুটিবার কালে এ পথ উবেগে কোথায় আশ্রয়পোশন করিয়া থাকে। ছ'টার সময় বাড়ি ফিরিবার কালে ক্লান্ত দেহে এত আলস্য জমা হয় যে সন্ধ্যামুখী আকাশের বর্ণবিলাস ওর দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ক্লান্তির ভারে পথকে মনে হয় দীর্ঘ—আকাশকে মনে হয় অনন্ত। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে, মনে এত উবেগ সত্ত্বেও, কোথায় পট পরিবর্তন সূত্র হইয়াছে কে বলিবে। যে চিন্তা এতক্ষণ মর্শ্বাস্তিক ভাবে মর্শ্বকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—সে শীতল বাতাসে তর করিয়া কোন্ উর্দ্ধলোকে উঠাও হইয়া গেল।

ওই না বড়বাবুর দ্বিতল প্রাসাদ দেখা যায়? ঘরের খোলা জানালা দিয়া আলোর রেখা পথের ধূলায় মুজ্বিতের মত পড়িয়া আছে। কোলাহলহীন নিস্তব্ধ বাড়ি। শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে অস্বস্ত সামঞ্জস্য বাড়িটার। এই পরিবেশে নিঃশব্দ দীনতা কি উদ্বোধন করা চলে? আজ থাক। কাল দিনের বেলায়—সকলের আগোচরে আপিসেই না হয়—

এই চিন্তাও অসহ্য বোধ হইতেছে। সত্যিই ত তার চাকরি যায় নাই। কলনায় আতঙ্ক সঞ্চিত করিয়া সে ডাকিয়া পড়িতেছে কেন? সকলের যে দশা তাহারও না হয় সেই গতিই হইবে? সকলকে বাদ দিয়া কিছু আপিস চলে না, আপোষ-রক্ষা একটা করিতেই হইবে।

বহুদিন পরে অনাদি গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান বরিস।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে কি বললেন বড়বাবু?

অনাদি ইতস্তত না করিয়া বলিল, বললেন ভয় নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ আপিস যাবে তো? শোভা গা ঠেলিয়া ডাকি-তেছে।

আ্যা—আপিস যাব না কেন।

না—তাই বলছি। আজ একটু বেলা হয়ে গেল—ডাল আর চড়াই না। বলিয়া শোভা বাহির হইয়া গেল।

জানালা খোলাই ছিল। শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় প্রভাত

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয়—সৌন্দর্য্যহীন। এমনই সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত প্রতিদিন তাহাকে কর্তব্যের পথে আহ্বান জানায়। কি কর্কশ স্রুত সে আহ্বান।

কোনমতে জানাহার সারিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে হয় স্টেশনে। গাড়িতেই কি বিশ্রামের ক্ষেত্র আছে। প্রায়ই গলদঘর্ম্ম অবস্থার টাড়াইয়া এর কনুয়ের গুঁতো ওর বিভিন্ন ঘোঁষা ধাইয়া এবং গাড়ির দোলাতে এধার-ওধার কাত হইয়া চাপাচাপিতে কোন রকমে কলিকাতায় পৌছিয়া যায়। তারপর অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার পাশ কাটাঁইয়া ফুটপাথে মাহুষের স্রোতে গা ঢালিয়া পায় পায় আগাইয়া যাওয়া। আপিসে প্রায়ই লেট হয় এবং বড়বাবুর গরম গরম বাক্যগুলি হজম করিয়া মোটা লেজারের অঙ্ক সমুদ্রে 'জয়কালী' বলিয়া সে ডুব দেয়। সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত এই ভাবের রসকব্ধহীন দিনের মাঝে তাহাকে ঠেলিয়া দিবার ইচ্ছিত জানায়।

কাল রাত্রির পথ ও আকাশ রাত্রির সঙ্গেই নিঃশেষ হই-রাছে। মনে অল্পে অল্পে আঁগিতেছে ভয়।

ট্রেনের কামরায় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা ওরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী মন। স্টেশনের পথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রাত্যহিক কাজগুলি এমন ঠাস-বুননে ভরা যে ন'টার আগে কোনমতেই বাড়ির চৌকাঠ ছাড়ান যায় না। ডালটা না হইলেও চলে, কিন্তু অন্ন উদরে না গেলে—

ছুট—ছুট—ছুট।

ট্রেন আসিয়া গেল হস্ হস্ শব্দে। যথানির্দিষ্ট কামরায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠিতেই কয়েকটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, এই যে জাহাজ, পান ধাওয়াও।

পান চিবাইতে চিবাইতে এক জন বলিল, কাল তো 'জয় কালী' বলে বুলে পড়লাম—দেখা যাক কি হয়।

তোমাদের আপিসেও বৃষ্টি—

অনাদির কথায় বাধা দিয়া সে বলিল, সব আপিসেই হবে জাহাজ। ষ্ট্রাইক কোথায় না হচ্ছে। অমম যে কোটিপতির দেশ আমেরিকা সেখানেও—

এইগব আলোচনায় মনে সাহস সঞ্চার হয়—ভবিষ্যতের কালো মেঘের ফাঁকে স্নপালী আভাস দেখা দেয়।

ওই প্রসঙ্গে গাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল।

শহর কিন্তু অক্ষিপহীন।

আপিল আরও নিস্তব্ধ। আসন্ন বড়ের আগে ধমধমে প্রকৃতির মত। কাগজের উপর কলমের ধস্ধস্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। দশটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে।

বড়বাবু চশমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, এ মাসে ক'দিন লেট হ'ল?

ট্রেনের আলাপ-আলোচনায় খানিকটা ধরিতা-ভাব অনাদির মনে ভরনও অবশিষ্ট ছিল। সে সাদা গলায় বলিল, ট্রেন দেরিতে এলে আমাদের কি দোষ বলুন।

আগের ট্রেনে এলেই পার। আমরা আসি না?

এমন সং দৃষ্টান্তের উল্লেখও অনাদির মন গলিল না। মনে

মনে বড়বাবুকে একটা অকথ্য সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া কহিল, আপনাদের কথা আলাদা সার।

বড়বাবু বলিলেন, বটে! আমরা মানুষ নই?

অনাদি মনে মনে বলিল, কোন কালেই নয়। প্রকৃত্তে কোন কিছু না বলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

চোমারে বসিয়াই মনে হইল, ইস—কি ভুলটাই না হইয়া গেল। টেনের উচ্চতা অভাবানি পথ বাহিয়া এই আপিসে আনিবার কি আবশ্যকতা ছিল? যে কথা বলা তার উচিত—সে কথা না বলিয়া—

অত্যন্ত চঞ্চল মনে বার-দুই সে লেজার খুলিল, বার-দুই বন্ধ করিল। দাঁতে কলম কামড়াইরা বার-কতক মাথা নাড়িল।

সামনের সীটের রতন বলিল, কি দাদা, সকালে দুর্গা নাম না লিখে কলম কামড়ে ধরলেন যে?

অনাদি অপ্রস্তুত হইয়া লেজার খুলিয়া কাজে মনোনিবেশ করিল।

৮

মন অভ্যস্ত বেয়াড়া। বড়বাবুর কাছে যতক্ষণ না নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেছে—ততক্ষণ অনাদির শান্তি নাই। নানাভাবে আলোচিত হইতেছে আসন্ন বর্ষষটের কথা—অনাদি মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না।

এক সময়ে রতন বলিল, শুনেচেন দাদা—আপিস থেকেও ফরম ছাপা হচ্ছে—কিনা বণ্ড গোছের।

কিসের বণ্ড?

রতন বলিল, প্রত্যেক কেরানীকে ওরাও নাকি সই করিয়ে নেবে—কারা কাজ করবে—কারা কাজ করবে না। রেকর্ড রাখতে চায় ওরা।

তা হলেই তো—

অনাদির গুঁড় ঘরে রতন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাখুক না রেকর্ড যত পারে। আমরা তো ভুবেছি না—ভুবেতে আছি।

রতনের হাসিতে অনাদির বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি লেজার বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবুর ঘরে আজ বেশি ভিড়। এক জন লোক বাহিরে আসে তো এক জন ভিতরে যায়। ওরাও কি চাকুরি রক্ষার জন্ত একান্তে অহ্নন করিতে আসিয়াছে? ঐহিকটা সর্বসম্মতি-ক্রমে স্থিরীকৃত হইলেও সকলের মন মুখ এক আছে তো? না এ দলে সম্মতি দিয়া ও দলে ভিড়িয়া রহিয়াছে? সাপের ও ব্যাঙের গালে প্রকৃত্তে ও গোপনে চুমা দেওয়ার লোকের অভাব তো নাই আপিসে। বৈত নীতি না থাকিলে কোন কালে তাহারা অভাব-অভিযোগের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া যাইত।

একটা ফাইল বগলে চাপিয়া অনাদি বড়বাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

চাপরাঙ্গী জানাইল—বড়বাবু সাহেবের বাস কামরায়। ফিরিতে দৃষ্টাধানেক দেয়ি হইবে।

অনাদির বুক আবার গুর গুর করিয়া উঠিল। এই সারিয়াছে। তাহাদের চাকরি লোপের ব্যবস্থা পাকা না করিয়া উনি কি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিবেন।

৯

আজও অদ্ভুত রাজির সঙ্গে অদ্ভুত পথ মন জড়িয়া বসিল। আহারের পর ‘একটু বেড়িয়ে আসি’ বলিয়া অনাদি বড়বাবুর বাড়ি অভিমুখে চলিয়াছে। সারাদিন চিন্তার পর সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে—একটা হেতুনেস্ত এ বিষয়ে আজ করিতেই হইবে। তাহার চাকরির স্থায়ী বুলিয়া আছে এত বড় সংসার। কর্তব্য বল—দায়িত্ব বল সবই একা অনাদির। এ কর্তব্যে অবহেলা করিলে কি না ঘটতে পারে। তেরশো পঞ্চাশের অঙ্কটি এত নীচ সে ভোলে নাই। ভোলা যায় না।

তবু চিন্তার সঙ্গে পথ ও আকাশ অহ্নসরণ করিতেছে। বায়ু উত্তপ্ত মস্তিষ্কে স্নিগ্ধ স্পর্শ রাখিয়া অস্ত্র এক জগতে টানিতেছে মনকে। বহুদিন আগেকার জগতে। সরাগরী আপিসের সঙ্কীর্ণ ঘরে সে জগৎ আবদ্ধ ছিল না; জীবনধারণের দুষ্কিন্দায় ছিল না তার গ্রন্থ।

পূরাতন আকাশের ওরা অনাদি কালের নক্ষত্র। ওরা ত জানে মানুষ বহু বার বদল করে দেহ; মনে লাগে পরিবর্তনের ছাপ। চিন্তার আচ্ছন্ন হয় দুয়ের, বস্তু—দুয়ের লক্ষ্য। জীর্ণ সংশয় আর অলস শান্তির বর্ষে দেহ চাকুরী সেই জগৎকে—পূরাতনকে ভুলিবার চেষ্টাই চলে অহরহ।

বড়বাবুর খোলা জানালার আলোর রেখা আজও হৃদিত হইয়া পথের ধূলায় লুটাইতেছে। আজও ও বাড়িতে অটল গাভীর্ষ্য। ও গাভীর্ষ্য ভেদ করিবার সাহস অনাদির নাই। দণ্ডধানেক নিঃশব্দে উন্মুক্ত বাতায়নের আলোক-রেখার পানে চাহিয়া সে ফিরিয়া চলিল।

১০

এইভাবে অনাদির রাজি আর দিন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যে আলোর জগৎ জীবনলাভ করিয়া নবীন আনন্দে হাসিয়া উঠে—সেই আলোই অনাদিকে চিন্তার জগতে টানিয়া লইতেছে। আশঙ্ক—সন্দেহ—ভীততার জগতে। দিন যাপনের উৎকণ্ঠা—অন্ধ প্রত্যাশার এই দুর্বিষহ বেদনা ও আর বহিতে পারিতেছে না।

হরিপদ বলিল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন হে—মনে বল আন।

অনাদি বলিল, ইউনিয়ন কি ঐহিকের দিন বার্থ্য করেছে? হাঁ—পরন্তু নোটিশ দেওয়া হবে। একমাস পরে ঐহিক। সারেরবার কিছু বলছে না? বলছে বইকি—আমাদের কাছে ভাঙছে না কিছু। জান তো প্রেক্ষিত বড় বালাই।

অন্ত সব আপিস ঠিক আছে ত? নিশ্চয়। পরন্তু শনিবার—ওই দিন নোটিশ দেওয়া হবে—আর সব আপিস মিটিয়ে একটা প্রেসেশন বার করা হবে। থাকবে, সবাই।

প্রেসেশন বার করে কি হবে?

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী কয়েক ট্রাইক কখনও সাক্ষেস-
ফুল হয়।...সবাই থাকবে মনে থাকে যেন। বলিঙ্গা হরিপদ
মাথা নাড়িল।

সকলে চলিয়া গেলে অনাদি হরিপদের জামায় যুহু টান দিয়া
চাপা গলায় কহিল, শোন।

সে ফিরিলে বলিল, আচ্ছা—সেদিন যে সেই করিয়ে নিলে
—আমরা কাজ করবো কি করবো না—তার কিছু শুনলে?
হরিপদ হাসিয়া কহিল, বিলেতে রিপোর্ট গেছে স্ট্রাক্চর
নামে। আমাদের কীসি হবে।

অনাদি শুক কণ্ঠে কহিল, এটা হাসির কথা হ'ল?

হরিপদ বলিল, ছেলেবেলায় কথামালায় সেই বেতের গোছা
ভাঙার গল্প মনে আছে ত? ব্যস। সবাই এক থাকলে ওদের
সাধ্য কি—

অতঃপর হরিপদ বহু শপথ ও কড়া মন্তব্য করিল।...

অনাদির লুপ্ত সাহস কিন্তু ফিরিয়া আসিল না।

১১

সৌভাগ্যক্রমে আজ বড়বাবু বাহিরের বৈঠকখানায় ইঞ্জি-
চেরারে শুইয়া গড়গড়ায় যুহুমদ টান দিতেছিলেন। সুরুশপ-
খোঁষা কি একটা ভিথি; যেটে ছোয়াংলায় পথ পষ্ট দেখা
যায়। সেই পথে দণ্ডায়মান একটা লোককে বহুক্ষণ এই বাড়ির
দিকলের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি সন্নিহিত হয়ে প্রশ্ন
করিলেন, কে—কে ওখানে?

বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বালা ছিল না; অনাদি এ দিকে
লক্ষ্য করে নাই। বড়বাবুর কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙিল। এ
অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে আর ফেরা চলে না, পলায়নে সফট
বুদ্বি।

ওট ওট রোয়াকের ধারে আগাইয়া আসিয়া অনাদি বলিল,
আজ্ঞে—আমি।

বড়বাবু বলিলেন, আমি কে?

অনাদি।

ওঃ! আশ্চর্য বড়বাবু দুয়ার খুলিয়া গড়গড়া হাতে রোয়াকে
আসিয়া দাঁড়াইলেন। তা তুমি এত রাতিরে আমার বাড়ির
সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

আজ্ঞে—আপনাকে ডাকব কিনা ভাবছিলাম।

কেন—কি দরকার?

মাথা চুলকাইয়া অনাদি বলিল, আজ্ঞে আপিসে কি হচ্ছে
না হচ্ছে—

বড়বাবু বলিলেন, তোমরা ত যা লিখবার লিখে দিয়েছ।

আজ্ঞে তাই ত বলছি। সাদেবরা—

—ওরা খুব চটে গেছে। আর চটেবে না-ই বা কেন।

তোমার বাড়ির চাকরেরা যদি বলে, ছড়র মাইনে বাড়িয়ে
দিন তো দিন নইলে দেখাব মজা। তুমি তাদের সন্দেশ খেতে
দেবে?

অনাদি করুণ কণ্ঠে বলিল, আপনিই বলুন না সার—এত
কম মাইনেয় ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চলে?

না চলে যদি ত চাকরি নিয়েছিলে কেন? চাকরিই যদি
নিলে ওদের চোখ রাঙাচ্ছ কোন্ সাহসে?

আপনারা তো—

বাও—বাও। বড়বাবু ধমক দিলেন। আমরা বলেছিলাম—
বাহিরের ইউনিয়নে যোগ দাও। একটু ধামিয়া বলিলেন,
প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট। আচ্ছা বিলেত থেকে কি খবর
এসেছে জান? হয় ওরা দাবি প্রত্যাহার করুক—নয়
আপিস তুলে দাও। আপিস উঠলে কয়েক ঘণ্টা। খেয়ো চারটে
হাতে।

বড়বাবু ক্রোধের বশে কঁপিতে কঁপিতে গড়গড়ায় টান
দিলেন। কলিকার আগুন বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছিল। সে টানে
কতকগুলি ছাই উড়িয়া পড়িল শুধু।

ওড়া-ছাইয়ের মত অত্যন্ত হালকা দেহে অনাদি বাড়ি
ফিরিয়া আসিল। পৃথিবী পুনরায় প্রবল বেগে ঘুরিতে আরম্ভ
করিয়াছে।

১২

শনিবার। আপিসে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। এই
মাত্র ইউনিয়ন মারফৎ লিখিত বর্ধঘট ঘোষণা করা হইয়াছে।
আসল দাবির এক চুলও এদিক-ওদিক হইলে কর্ম্মীরা কাজ
করিবে না।

ইউনিয়নের নির্দেশে আজ বেলা দুইটার পর সমস্ত আপিসের
কর্ম্মীরা মিলিয়া বিরাট একটা মিছিল বাহির করিবে। একজন
বিখ্যাত শ্রমিক নেতা মিছিল পরিচালনা করিবেন।

আজ খাতার দুর্গা বা কালী নাম লেখা হয় নাই, গেজারের
পাতায় কেহ মনোনিবেশ করে নাই। বর্ধঘট ঘোষণা করা
হইয়াছে—কার্য্যকরী হইবে এক মাস পরে। কিন্তু ঘোষণার
মুহূর্ত্ত হইতে কাঁজের সঙ্গে সকলেই বুঝি অসহযোগ করিয়া
বসিল। অনাদির বুকটা বারকয়েক কাঁপিয়া উত্তেজনার প্রথম
শাপটা অভিক্রম করিয়াছে। এখন সে উত্তেজনা মাথায় উঠিয়া
স্নায়ুতে—মজ্জাতে—রক্তে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ
নয়—বেদনাও নয়—সন্দেহ বা ভবিষ্যৎ-চিন্তা কিছুই নয়—এ
এক তুরীয় অবস্থা। ভাবিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া এখন টেউরের
টানে ভাসিয়া চলার আবেগ সঞ্চারিত হইতেছে। সে তো
আর একা নয় আর একটামাত্র আপিসেই এই ব্যাপার খেটে
নাই।

বেলা বারটার বড়বাবুর মারফৎ সাহুলার আরি হইল—
সমস্ত কর্ম্মচারীকে অহরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন
আজ বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিসে হাজির থাকেন। বিলাত
হইতে জরুরি কাজ আসিয়াছে—আজই সেট শেষ করা
চাই। অবশ্য এই উপরি থাকার অর্থাৎ উপরি মাছিনার ব্যবস্থাও
হইবে।

হরিপদ এবং আরও অনেক সাহুলার সহি করিল না।

হরিপদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এ শুধু তাঁওতা। আমরা
যাতে মিছিলে যোগ দিতে না পারি তার ক্ষত এই কোশল।

ছুটির কয়েকখানা দরখাস্ত পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর
হইয়া ফেরত আসিল।

ভূষণ বলিল, কি করা যাবে হরিপদ ?
কি আবার করব—ছুটো বাজলেই খাতাপতর শুটিয়ে লখা ।
ধবরদার কেউ আপিলে থাকবে না ।

রাজপথে বিরাট মিছিল চলিয়াছে । ভূখা মিছিল । নানা
জাতির নানা বয়সের লোক । নাশা বর্ণের পতাকা ও শ্লোগানে
ভরা পোস্টার আন্দোলন করিয়া চীৎকার করিতেছে অপরি-
মিত । যত অভাব যত হুঁশিড়া অভাবের প্রতিকার প্রার্থনা—
সম্মিত ক্রোধ ও বিদ্বেষের জ্বালা সমস্তই চীৎকারে ভরিয়া দিক্-
বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে—এই ভূখা মিছিল ।

আপিসের ছদ্মারে মিছিল আসিতেই কেহ আর বাধা মানিল
না—পথে বাহির হইয়া পড়িল ।

অনাদি ছদ্মারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে কি করিবে । পিছন
হইতে বড়বাবু ডাকিলেন, অনাদি ।

অনাদি পিছনে চাহিল ।

ফিরে এস । মিছিলে যোগ দিলে চাকরি থাকবে না ।

অনাদি দাঁড়াইল ।

হরিপদ পিছন হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, দাঁড়ালে
যে ?

বড়বাবু বলিলেন, পাগলামি কর না তোমরা, চাকরি বজায়
রাখতে চাও ত পথে পা দিও না ।

হরিপদ কোন কথা না বলিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া
অনাদিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল ।

তথাপি পথে পা দিতে অনাদির সাহস হইল না ।
ওদের পায়ের শব্দে ও চীৎকারে রোদ্দ-প্রবর মধ্যাহ্ন কাঁপিয়া
কাঁপিয়া উঠিতেছে । সেই সঙ্গে কাঁপিতেছে অনাদির বাস্তব-ভীর্ণ
মন ।

ছদ্মার হইতে সরিয়া সে ঘরের মধ্যে আসিল । প্রকাণ্ড ঘর
শুভতার ঝাঁপা করিতেছে—জনপ্রাণী কেহ নাই । বুকের মধ্যে
দুর্কহরু কম্পন বাড়িয়া উঠিল । এই বিরাট শুভতার যুগোয়ুধি-
দাঁড়াইয়া নিজেই অত্যন্ত অসহায় মনে হইল তার । যে ভয়
তাহাকে আপিসের ঘরে এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিল সেই
ভয়ই তাহাকে মিছিলের দিকে টানিতে লাগিল ।

ছুটয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

নবীনচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুভ রণভূমি, শান্ত পলাশী-প্রান্তর,
বিশ্রান্ত গন্ধার জলে ওঠে না কল্লোল,
যুগান্তে নীরব সেধা সব কর্তব্যর,
ধেমে গেছে, ধেমে গেছে নবাবের ঢোল,
স্বাধীনতা-পূর্য্য সেধা হ'ল অন্তগত ।
দেখিলে কি অন্ধকার-যবমিকা তুলে
রাজদণ্ড বণিকের হ'ল হস্তগত ?
সেই আশ্রবনে বসি' সেই গন্ধাকূলে
বহুলক্ষী কাদে আকো । আকিলে সে ছবি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে পলাশীর কবি ।

মেঘমল্ল-সুগভীর শ্রীমধুর বীণ ।
অগ্নিমল্ল-উপাসক তোমরা হু'জম
দীপকে ধরিলে ত্বর হেম ও নবীন ।
দেশের আহত আত্মা করে কি ক্রন্দন ?
কাব্য না এ হৃদয়ের গৈরিক-নিঃশ্রাব,—
যে হারালো স্বাধীনতা সে হারালো সব ।
বল কবি পূর্ণ হবে কবে সে অভাব ?
শতবর্ষ পরে করি তরু জন্মোৎসব ।
জীবন ও মরণের এ যে সঙ্গীত,
এ সঙ্গীত করি তাই তোমারে স্মরণ ।

হে ঝট্টা, দেখিলে তুমি কেটে গেল ঘোর ;
বাঁজালে নুতন তন্ত্রী কি আশ্বাস লভি'
মহা-ভারতের স্বপ্নে ব্যাকুল বিভোর
রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের কবি ।
রচিলে কি ভারতের নব ভবিষ্যৎ ?
ডামের স্বর্ধর আর পশে না শ্রবণে ।
কোন পথে ছোটো পার্শ্ব-সারথির রথ ?
পাঞ্চজন্ম বাজে ওই গভীর মিনঃসনে ।
দেশবাসীশ্রদ্ধা অর্ঘ্য আঞ্জি আনিলাম,
হে বীর গ্রহণ কর, হে কবি প্রণাম ।

নবভাবমত্ত ভূমি' ভারতের বনে
সুধার সঙ্করে পাত্ত ভরিলে ভ্রমর ।
উষাধিনি বাণী কাব্য জাতির জীবনে,
কবিতা অমৃত আর কবিতা অমর ।
যুগে যুগে থাকে লোক যার প্রতীক্ষার,
তুমি কি শুনেছ কবি, তার আগমনী ?
সে কবে আসিবে বল, দিন চলে যায়,
তার দিন গণে আর আমি দিন গণি ।
অতীত মহিমা হবে ভবিষ্যতে দীন,
তুমি রবে, হে নবীন, স্মৃতির-নবীন ।

[নবীনচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে
সেমেন্ট হলে প্রতিষ্ঠিত]

সঙ্গীতমকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ

স্বামী প্রভুনাথানন্দ

নারদ দেবর্ষি, মুনি, মন্ত্রজ্ঞা ঋষেদের ঋষি ও গুরুব্রত এতগুলি নামে পরিচিত। ঋষেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, আঠার পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতে নারদকে আমরা 'মহাতেজা', 'মুনি' 'গুরু' বা বীণাবহনকারী ঋষি ব'লেই উল্লিখিত দেখেছি। বিশেষ করে পুরাণগুলিতে নারদের চরিত্র আরও বিচিত্র। ঋষেদের ৮ম মণ্ডলের ১৯ সূক্তে দেখা যায়, ইন্দ্র দেবতা, আর কুষ্মাঞ্জয়ী ঋষি নারদ সেখানে ইন্দের স্তব ক'রে ৩৩টি মন্ত্র রচনা করেছেন। আঙ্গকাল অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, ঋষেদের ঐ নারদকেই পরে রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। আর একথা মিথ্যাও নয়। অনেকের মতে আবার নারদ নিছক এক জন 'Mythical person'। তবে মতভেদ বা অভিমত যা-ই হোক না কেন, রামায়ণে দেখা যায় : "নারদ পর্বতশৈব গৌতমশ মহাশাঃ"১, "নারদমহাতেজা"২, ইত্যাদি ব'লে নারদের প্রশংসাও করা হয়েছে। নারদ সেখানে ঋষিই। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৬ শ্লোক) নারদকে আবার "গুরুব্রজ" বলা হয়েছে। যেমন ভরতের আগে আগে গায়ক, বাদক ও অঙ্গরারী যাচ্ছেন আর তাঁদের ভেতর প্রধান ছিলেন নারদ ও তুহক : "নারদমুখপূর্ণগোপঃ * *। এতে গুরুব্রজানো ভরতভ্রাতো জগঃ।"৩ মহাভারতের আদিপর্বে (৬৫ শ্লোক) দেখা যায়, কণ্ঠের পত্নী মূনির গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেছেন ; ও তাঁর ভাগিনেয়ের নাম 'পর্বত'। মহাভারতের অশ্বশাসনপর্বে নারদ (৪ শ্লোক) আবার বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে নারদকে একেবারে গুরুব্রজ ও তুহকই অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে ; যেমন,

"ভতো হাহাহুশ্চৈব নারদমুখপূর্ণগোপ।

উপগমিতুমারজা গুরুব্রজশলা রবিন্।

যজ্ঞমধ্যমগাভারগ্রামজয়বিশারদাঃ।"

হাহা, হুহু, তুহক এ'রা গুরুব্রজের ভেতর প্রধান। নারদকেও সে প্রধানদের অত্যন্ত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের ৬ স্কন্ধে (১৫ শ্লোক) নারদ যে পূর্বজন্মে উপবর্ধন নামে এক জন গুরু ছিলেন তাও বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পরিষ্কারই স্বীকার করা হয়েছে যে, তুহক প্রভৃতির মতন নারদও গুরুব্রজ সঙ্গীতে বিচক্ষণ ও তিন গ্রামে বিশারদ ছিলেন। বৃহদ্রাশন-পুরাণে "নারদেন গীতং" কথা দু'বার বলা হয়েছে, কিন্তু "গীতং" নামে সেখানে "কবিতং"—সঙ্গীত নয়। বায়ুপুরাণে নারদকে যোগজ্ঞান যৌন্যে গুরুব্রজের ভেতর অষ্টম বলা হয়েছে। নারদ ও পর্বতকে সেখানে আবার মহর্ষি কণ্ঠের পুত্র আখ্যাও দেওয়া

হয়েছে। মহাভারতে পর্বত ছিলেন নারদের ভাগিনেয়। ভাগবতে নারদ হলেন বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ নারদপঞ্চরাজের রচয়িতা আবার 'ঋষি' নারদ। ৪ নারদপঞ্চরাজ একখানি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতন্ত্র। তাতে শুকদেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেদব্যাস 'ভগবান' ও 'ঘোষিত' নারদকে আবার নিজের আচার্য ব'লেই স্বীকার করেছেন ; ৫ এবং নারদ যে জীবমুক্তদের এক জন এ কথাও পঞ্চরাজকার সেখানে স্বীকার করতে বৃত্তাবোধ করেন নি। বেদব্যাস ত্রীকৃষ্ণ, নারদ ও শঙ্ককে প্রণাম ক'রে 'মুনি' নারদকে মহাদেবের শিষ্য ৬ এবং ব্রহ্মার পুত্র ৭ ব'লেও আবার সম্বোধন করেছেন। অহি-বৃদ্ধদংহিতায় নারদ শিব, হুবালা ও ভরদ্বাজ মুনি সকলে একত্র হয়েছেন দেখা যায়। নারদ সেখানে সকলেরই প্রশংসার পাত্র, কেননা অহর কালমমির সঙ্গে বিষ্ণুর যুগ হবার লম্বায় বিষ্ণুর স্মরণচক্রের শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কোথাও কোথাও নারদ 'গুরু' ব'লে পরিচিত হলেও বেশীর ভাগ জায়গায় কিন্তু 'মুনি' নামেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন ; যেমন, "নারদো মুনিব্রবীৎ।"৮ কিন্তু এ সকল ইতিহাস ও উপাখ্যানের কথা নিয়ে আলোচনা করবার স্থান ঠিক এ প্রবন্ধ নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল সঙ্গীতশাস্ত্রের ভেতর 'মকরন্দ' গ্রন্থ যিনি রচনা করেছেন আর বেদের শিক্ষাসমুচ্চয়ের ভেতর 'নারদীশিক্ষা' যিনি প্রণয়ন করে-ছেন তাঁরা দু-জন ঠিক একই লোক বা ভিন্ন লোক কি-না তা আলোচনা ক'রে দেখা। আর সেখানে নারদ আসলে আবার 'historical person'-ই কি-না সে সবও মীমাংসা করবার দায়িত্ব এখানে মেবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটাও ঠিক যে, 'মকরন্দ'কার ও 'শিক্ষা'-কার নারদ এই দু-জন নারদের 'historical existence' অবশ্যই ছিল।

সঙ্গীতমকরন্দের ৯ সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মনোহর রামকৃষ্ণ ভেলাঙ মহাশয় শিক্ষাকার ও মকরন্দকার নারদ এক অথবা দুই কি-না এ নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন : "It is difficult to say anything with certainty about Narada's life and time." শিক্ষাকার নারদের কথাও তিনি তুলেছেন। সঙ্গীত-মকরন্দ

৪। নারদপঞ্চরাজ, ১ম রাজ ১ম অ' ৫৮-৫৯ শ্লোক

৫। ঐ ঐ ১৩১ শ্লোক

৬। ঐ ঐ ১৪২ "

৭। ঐ ঐ ১১০ "

৮। এটি মতঙ্গ প্রণীত বৃহদেন্দ্রীর শ্লোক। বৃহদেন্দ্রীকার মতঙ্গ ছাড়াও ভরত, দণ্ডিল, পার্শদেব, শাকদেব, অহোবল ও দামোদর এ'রা সকলেই নারদকে 'মুনি' ও 'মহামুনি' ব'লেই উল্লেখ ক'রে গেছেন।

৯। গাইকোয়াড় ও রিয়েটাল সিরিজে প্রকাশিত।

১। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ২০ সর্গ ৫ শ্লোক

২। ঐ ঐ ২৭ শ্লোক

৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৬ তম অধ্যায়। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রেও নারদকে "গুরুব্রজ" ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে ; যেমন "নারদাভ্যন্ত গুরুব্রজা"—নাট্যশাস্ত্র ১।৫১

এইটি আবার বেদ ব'লে এক জন পণ্ডিতের রচনা ১০ এ ধরণের মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রদ্ধের তেলাঙ মহাশয় বেদকে মকরন্দের রচয়িতা ব'লে স্বীকার করেন নি। তা ছাড়া ছাত্র-কর্তা ব'লে প্রচলিত নারদ এক জন কি দু-জন এ সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঠিক তিনি করতে পারেন নি। তবে এইমাত্র তিনি বলেছেন যে, মকরন্দ শাক্তদেবের রচিত রত্নাকরের অনেক আগেকার বই; কেননা রত্নাকরের অনেক জায়গায়ই মকরন্দ থেকে শ্লোক প্রমাণ রূপে তুলে দেখান হয়েছে।

শ্রদ্ধের তেলাঙ মহাশয়ের যুক্তি হ'ল এই যে, সঙ্গীতরত্নাকরে বার বার “নারদো মুনিঃ”, “নারদোহব্রবীং” প্রভৃতি কথাগুলি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, গান্ধারগ্রামের উল্লেখ মকরন্দে আছে এবং শাক্তদেব যখন ঐ গান্ধারগ্রামের কথা আদ্যোচনা করেছেন তখন পরিষ্কারই তিনি স্বীকার করেছেন : “গান্ধার-গ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ।” শ্রদ্ধের তেলাঙ মহাশয় সুস্পষ্টভাবেই তাই বলেছেন, রত্নাকরকার শাক্তদেব মকরন্দ থেকে গান্ধারগ্রামের শ্রুতিসংস্থান ও নামের ভালিকা হুবহু নকল করেছেন, আর এর প্রমাণপঞ্জীও তিনি উভয় গ্রন্থ থেকে

১০। ডাঃ ডি. রাঘবন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ *Later Sangita Literature* গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন—তাঞ্জোর লাইব্রেরির ক্যাটাগলে ও বিকানীর ক্যাটাগলে ‘বেদ’ প্রণীত একখানি মকরন্দের সম্মান পাওয়া যায়। সেখানে পরিষ্কারই বাকি দেওয়া আছে : “ইতি ত্রিসঙ্গীত মকরন্দে বেদকৃতো নৃত্যাদ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।”—*Vide Tanjore Burnell Cat., p. 60 (a), Bek. Cat., p. 520. No. iii এবং S. R. Bhandarkar's Cat. of MS. in Rajputana and Central India (1904-5 to 1905-6), p. 54.*

এখানে আরও একটি উল্লেখ করবার বিষয় যে, ঐ ক্যাটাগল অফ ম্যানুস্ক্রিপ্টেই আবার আছে : “স জয়তি মকরন্দ * * ত্রিশাহু প্রবীণশ্চ যুদে বেদেন নির্মিতঃ।” কিন্তু বরোদা থেকে প্রকাশিত সংস্করণে আছে : “ভগবদ্রাধো মুনিব্রবীং” এবং “ইতি ত্রিনারদকৃতো সঙ্গীতমকরন্দে * *।” শ্রদ্ধের এম. কৃষ্ণমচারিয়ার মহাপ্রণয় তাঁর *History of Classical Sanskrit Literature* পুস্তকের ৮০১ পৃষ্ঠায় এই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মকরন্দের সময় নির্দিষ্ট করেছেন 11th Century A. D. এবং বেদ প্রণীত মকরন্দের সময় দিয়েছেন “early in 17th Century A. D.” শ্রদ্ধের তেলাঙ মহাশয়ও মকরন্দের সময় নির্ণয় করেছেন “Between 7th to 11th Century A. D.” অধ্যাপক কৃষ্ণমচারিয়ার বেদকে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পুত্র ত্রীসাহাজীর সভাকবি ব'লে উল্লেখ করেছেন। ত্রীসাহাজী মহারাষ্ট্র-সমাজে ‘মকরন্দভূপ’ নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন এই উপাধি থেকে “সঙ্গীত-মকরন্দ” নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কেননা বেদ হয়তো মহারাষ্ট্রপ্রতি ত্রীসাহাজীর নামের সম্মান রাখবার জন্তেই তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন ‘মকরন্দ’।

তুলে দেখিয়েছেন। ১১। কাষ্মেই রত্নাকরে “ভদ্রা তং নারদো মুনিঃ” কথাগুলিতে মকরন্দকার নারদকেই শাক্তদেব লক্ষ্য করেছেন এ কথাই বলতে হবে। তারপর ডাঃ রাঘবনের অভি-মত হ'ল : “Scholars opine that Narada referred to as holding the *Gandhaargram*, is the author of the *Sangitamakaranda* which has that *Grama*.” ১২।

কিন্তু দেখা যায়, শাক্তদেব তাঁর রত্নাকরে যে গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন তাঁর বর্ণনা মকরন্দের সঙ্গেই মেলে, নারদী-শিক্ষার সঙ্গে নয়। নারদীতে গান্ধারগ্রামের কোন শ্রুতির বিভাগ করা হয়নি, শ্রুতির ভাগ করা হয়েছে একমাত্র সাম-স্বরেরই। তারপর সামস্বরের পাঁচ শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রেই প্রথমে মকরন্দকার বাইশ শ্রুতির বিভাগ ও নামকরণ করে-ছেন, যেমন সিদ্ধা, প্রভাবতী, কান্তা ইত্যাদি। রত্নাকরকারও ঠিক তারপর সেই পণ্ডিতই অনুসরণ করেছেন শ্রুতিভাগের বেসায়, তবে নামকরণের কিছু পার্থক্য করেছেন এইমাত্র। এখন লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মকরন্দ যে শ্রুতিভাগ করেছেন লৌকিক স্বরের “যদা ধম্মিশ্রুতি যজ্ঞে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ” ইত্যাদি ব'লে, তার সঙ্গে রত্নাকরেরই ঠিক মিল পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, গান্ধারগ্রামের সাতটি মুছনাকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায়, শাক্তদেব মকরন্দকারকেই যেন অনুসরণ করেছেন; কেননা যজ্ঞগ্রামের মুছনাগুলির বর্ণনাবীতি সব ভিন্ন ভিন্ন। নারদীকার স্বরগুলিকে আবার আরোহণ-ক্রমে বর্ণনা করেছেন আর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত করেছেন অবরোহণ-গতিতে। বৃহদেদশী, মকরন্দ, রত্নাকর ও এমন কি ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও অবরোহণ-ক্রমে ঐ যজ্ঞগ্রামের মুছনা সাতটির নামোল্লেখ করেছেন। গান্ধারগ্রামের কথা দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ ও শাক্তদেব এরা কেউই বিশেষ কিছু বলেন নি। নাট্যশাস্ত্রে ভরত “অথ ধো গ্রামো” কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন মাত্র। দত্তিল ১৩ ও তারপর মতঙ্গ বরং গান্ধারগ্রাম যে পৃথিবীলোকে লোপ পেয়েছে, স্বর্গেই একমাত্র প্রচলিত এ কথাই বলেছেন। মোটকথা মকরন্দে ও রত্নাকরে গান্ধারগ্রামের মুছনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রত্নাকর পুরোপুরি মকরন্দকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন,

১১। মকরন্দ ১৫৪-৫৬ শ্লোকগুলির সঙ্গে রত্নাকরের “যদা শ্রুতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকগুলির সম্পূর্ণ মিল আছে।

১২। *Vide The Journal of the Music Academy (1932), Vol. iii, Nos. 1 & 2, p. 16.*

১৩। দত্তিল যে ভরতের সমসাময়িক সে কথা পরিষ্কারই বোঝা যায়; কেননা ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ১২৬ শ্লোকে কোহল ও দত্তিলের নামই করেছেন : “শাঙ্খিয়াং চাপি বাৎস্যাং চ কোহলং দত্তিলং তথা।” দত্তিলের নাম ভরত ‘দত্তিল’ ব'লেই উল্লেখ করেছেন। তবে দত্তিল বা দত্তিল ভরতের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

(১) মকরন্দে—

“সংসা বিশালা স্মৃখী চিত্রা চিত্রাবতী শুভা। ১৪
আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্ত্র্যঃ সপ্তমূর্ছনাঃ ॥”

(৩) রত্নাকরে—

“নন্দা বিশালা স্মৃখী চিত্রা চিত্রাবতী স্মৃখা।
আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্ত্র্যঃ সপ্তমূর্ছনাঃ ॥”

এ ছাড়া মকরন্দের সঙ্গে রত্নাকরের পাঠের মিল অনেক জায়গায়ই পাওয়া যায়। যেমন মকরন্দকার উল্লেখ করেছেন ‘সামবেদাদিহং গীতং তজ্জগ্ৰাহ পিতামহঃ * * হি সাধবন্’ (১১৮-২৪), রত্নাকরেও ঠিক তাই পাওয়া যায়; কেবল পার্থক্য হ’ল, মকরন্দকারের ‘তজ্জগ্ৰাহ’-এর বোলায় শার্ঙ্গদেব ব’লেছেন ‘সংজগ্ৰাহ’। শুধু তাই নয়, রত্নাকরের পদার্থসংগ্রহ-রূপ প্রথম অধ্যায়ের ২৫-৩০ পর্যন্ত শ্লোকগুলিও ঠিক মকরন্দেরই অনুরূপ। তারপর নারদাশিক্ষা, দত্তিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদেদশী, মকরন্দ ও রত্নাকর এসব গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৮ জাতি সম্বন্ধে দত্তিল ও ভরত যা বলেছেন, নারদী ও মকরন্দের সঙ্গে তার মিল থাকলেও নারদীতে অন্তত যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, শার্ঙ্গদেব যদি হুবহু সেগুলিকেই অনুসরণ করতেন তা হলে প্রথমেই তিনি রত্নাকরের অবতরণিকায় বৃহদেদশী বা মকরন্দের অনুযায়ী আহত ও অনাহত নাদ, প্রাণবায়ুরূপী অগ্নি, বাতী সম্বাদী, বর্ণ ও রস এসবের কথা উল্লেখ করতেন না। ১৫ কাছেই এসব দিক থেকেও আমাদের অনুমান করা অসম্ভব হবে না যে, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে যেখানে নারদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে প্রায়ই মকরন্দকারের কথাই বলতে চেয়েছেন।

এবার আমরা মকরন্দ থেকেই কিছু কিছু কথা তুলে দেখতে চেষ্টা করব যে, মকরন্দকার নারদ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকার নারদই কি-না? যেমন মকরন্দকার বলেছেন (ক) “সঙ্গীতকো নারদ” (১১২)। প্রথমেই দেখা যায় মকরন্দকার “ব্রহ্মা ভালাধরো হরিশ্চ পটহী” ইত্যাদি ব’লে সঙ্গীতের কোলিঙ্গ ও প্রাচীনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তারপর “শঙ্কোন্মুক্তকরন্ত” ইত্যাদি পর্যায়ে “সঙ্গীতকো নারদঃ” কথাগুলি থাকায় এটাই বুঝতে হবে যে, এই নারদ আদি শিক্ষাকার নারদই হবেন। এই নারদকেই এমন কি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যেমন : “নারদাদ্যাশ্চ গর্ভা নাট্যযোগে নিয়োজিতাঃ” (১৫১), যদিও নারদ সেখানে মুনি বা ঋষির পরিবর্তে গর্ভ ব’লেই পরিচিত। তা ছাড়া ভরতের সমসাময়িক নলিনেক্ষরও তাঁর ‘অভিনয়দর্পণে’ (১১১১) নারদের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন

১৪। ‘শুভা’-মূর্ছনার জায়গায় শার্ঙ্গদেব বলেছেন ‘স্মৃখা’ এই যা প্রভেদ।

১৫। অবশ্য সাত স্বরের বর্ণ, জাতি, তুল সম্বন্ধে নারদী-শিক্ষাকারও আলোচনা করেছেন। তারপর রাগ ও রাগিণী-দের ভাগ ও নির্দিষ্ট নামের কোন উল্লেখ না থাকলেও নারদী ‘রাগ’ শব্দ এক জায়গায় ও ভূপবর্তী ভরতও ছ’জায়গায় ‘রাগ’ এই কথা উল্লেখ করেছেন।

“জহার নারদাদীনাম্” মকরন্দকার এরকম ক’রে ১১৮ শ্লোকেও “তদগীতঃ নারদায়ৈব” ব’লে সেই আদি নারদের কথাই বলেছেন।

(খ) “নারদেন কৃতং” (১৩০)। এখানে নারদ বলতে মকরন্দকারকেই বুঝতে হবে। মকরন্দকার নিজের নাম এরকম ক’রে অনেক জায়গায়ই উল্লেখ ক’রে গেছেন। গ্রন্থে রচয়িতার নিজের নাম উল্লেখ করার রীতি বরাবরই ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও আমরা দেখি : “তং ভরতং নাট্যকোবিদন্” (১১২), “বুদীনাম্ ভরতো মুনিঃ” (১১৬)। সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেবও সেই রীতি অনুসরণ করেছেন; যেমন : “প্রচুর-তরবিবেকঃ শার্ঙ্গদেবোহন্যমেকঃ” (১১০), “নির্মথ্য ত্রীশার্ঙ্গদেব সারোত্তারমিহং ব্যধাং” (১১২), প্রভৃতি।

(গ) “নারদাদিভিঃ” (১১৮)। এই নারদ মকরন্দকার কি-না তা আলোচনা ক’রে দেখার বিষয়। মকরন্দের ১১৭-১৮ শ্লোক চারটি আবার হুবহু দত্তিলের ১৩০-৩১ শ্লোক চারটির অনুরূপ যদিও সামান্যই তাদের ভেতর পাঠভেদ দেখা যায়। সুতরাং তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মকরন্দকার দত্তিলকেই অনুসরণ করেছেন। অথবা নারদীর সঙ্গে মকরন্দের রচয়িতাকে ঝাড়া একই লোক বলতে চান তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, দত্তিলই প্রকৃতপক্ষে শ্লোক চারটি মকরন্দ থেকে ধার করেছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সার্বিকতা আমরা দেখি না; কেননা নারদীকার ও মকরন্দকার যদি ভিন্ন ভিন্ন লোক না হয়ে একই লোক হন তবে দুটি বইয়ের আলোচনা ও বিষয়বস্তুর ভেতর এত প্রভেদ থাকবে কেন? আমরা জানি যে, উয়, কণ্ঠ ও শির এই তিন জায়গা হতে মন্ত্র, মধ্য ও ভার (উচ্চ) স্বরের উৎপত্তি। উদাত্ত, অহুদাত্ত, স্বরিত বা আর্চিক, গাথিক, নামিক প্রভৃতি বৈদিক থর নিয়ে শিক্ষাকার নারদ যতটুকু ও যেভাবে আলোচনা করেছেন ততটুকু বোধ হয় আর কেউই করেন নি—একমাত্র অচ্যুত শিক্ষা-গ্রন্থ ছাড়া। তারপর নারদী যে ভাবে কেবল সাত স্বরেরই দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও গর্ভাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের নামোল্লেখ করেছেন সে রকম এমন কি নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল, বৃহদেদশী, মকরন্দ বা রত্নাকর প্রভৃতি কেউই ওই নিয়ে বেশী মাথা ঘামান নি। নারদীতে সামগানের নির্দেশ যথেষ্ট আছে। নারদীর তুলনায় অপরাপর শিক্ষা যেমন, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতমী, লোমশী ও এমন কি অথর্ববেদীয় ঋগ্বাকীও তত বেশী আলোচনা করেন নি। নাট্য-শাস্ত্রেয় কথা তজ্জগ্ৰাহ। গানের কত রকমের গুণবৃত্তি?—এ নির্ণয় করতে গিয়ে নারদী বলেছেন—“দশবিধা” ১৬ যাজ্ঞবল্ক্য বা অপরাপর শিক্ষায় এ সকলের আলোচনা নেই। নাট্যশাস্ত্রের কথাও তাই, তবে নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল এঁরা মাগধী, অধর্মাগধী, সম্ভাবিতা ও পুথুলা ব’লে গীতিকাঙ্কণের নাম করেছেন। ১৭

১৬। “গানন্ত তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তত্ভা রক্তং পূর্বমলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিজুষ্ঠং স্তম্ভং সমং স্তম্ভমারং মধুরমিতি গুণাঃ।”—নারদী ১৩৩১

১৭। নাট্যশাস্ত্র ২১।৭৬-৭৭

বৃহদেশীকার মতঙ্গ ভরতকেই অহংসরণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মকরন্দে এ সবের কিছুই উল্লেখ নেই।

তারপর আরও একটি আসল বিষয় নিয়ে বিচার করা দরকার। সেটি হচ্ছে, রাগ ও রাগিণীদের ক্রমবিকাশ, নাম ও বিভাগ। নারদী 'রাগ' এই শব্দ এক বার দু-বার মাত্র উল্লেখ করলেও রাগ ও রাগিণী—এ রকম পুরুষ ও স্ত্রী ভেদে তাদের বর্ণনা, নাম বা প্রকৃতির বিচার মোটেই করেন নি। দত্তিল এবং নাট্যশাস্ত্রেও ভরত 'রাগ' এই শব্দ দু-জায়গায় উল্লেখ করেছেন। ভরতের আগে ও ভরতের পরবর্তী মতঙ্গ পর্বন্ত "জাতিসঙ্গীতশঃ" কথাই বলেছেন, আর তা থেকে জাতিসঙ্গীতের কথাই মাত্র বুঝা যায়। রামায়ণে পর্বন্ত জাতিগানের উল্লেখ স্পষ্ট আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, দত্তিল ও ভরত তাঁরা 'জাতি' কি রকম ও কিকি রসে তাদের গাইতে হয় সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। মকরন্দে তার উল্লেখ নেই। মকরন্দকার রাগের কথা তো বলেছেনই, তা ছাড়া রাগের স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকত্ব নির্ণয়ও করেছেন। বৃহদেশীতে রাগ সম্বন্ধে যতটুকু অপ্পষ্টতা ছিল, মকরন্দে তা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে একথাই বলা যায়। কাজেই এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, মকরন্দকার জুই নারদীকারেরই নয়, ভরত, বৃহদেশীকার ও মতঙ্গেরও অনেক পরবর্তী।

(খ) "নারদস্তুত্বকশ্চব" (১৩৭)। এখানে আর একটি সমস্তা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেননা মকরন্দকার যে নারদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তিনি মকরন্দকার নারদ মোটেই নন। নারদ ও ভৃগুর নাম প্রায় একসঙ্গেই সর্বত্র পাওয়া যায়। দত্তিল থেকে আরম্ভ করে সকলেই ভৃগুর নামের সঙ্গে নারদের একসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণের সকলগুলিতেই তাই। কাজেই এই নারদ প্রবীণ নারদই হবেন। তবে এই নারদই নারদীকার নারদ কি-না সে কথা বলা দুস্কর।

এ ছাড়া মকরন্দে আরও এক জায়গায় (২।১১) আছে : "চভী ব্যালশ্চ শাহ্লো নারদস্তুত্বকশ্চ।" মকরন্দকার ভরত ও নন্দীকেশ্বরের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন ১।৭৪ শ্লোকে তিনি "ভরতেন চ চর্চিতাঃ" বলেছেন, ১৮ আর সঙ্গীতাব্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৮-২০ শ্লোকে মকরন্দকার স্পষ্টই আবার উল্লেখ করেছেন :

"হরিত্রজ্ঞা হরিশ্চৈব মতঙ্গঃ কশ্চপো মুনিঃ।

বিশ্বকর্মা হরিশ্চজ্ঞো ভরতঃ কমলান্তকঃ ॥

চভী ব্যালশ্চ শাহ্লো নারদস্তুত্বকশ্চ।

বায়ুবিধাবন্তঃ শৌরিরাজ্ঞেনমোহদশ্চ।

যদুধো বৃদ্ধিদেবেজঃ কুবেরঃ কুশিকো মুনিঃ।

মাত্রাণ্ডগৌ ১১ রাবণশ্চ সমুদ্রশ্চ সুরস্বতী ॥"

এখানে দেখা যাচ্ছে, মকরন্দকার সঙ্গীতের প্রধান প্রধান আচার্যদের নাম করতে গিয়ে মতঙ্গ, কশ্চপ, ভরত, ব্যাল, নারদ,

ভৃগু এঁদের কথাও বাদ দেননি। মতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী আচার্য। মতঙ্গ বৃহদেশী রচনা করবার সময়ে স্বীকারই করেছেন যে, রাগের বিভাগ একমাত্র তিনিই প্রথমে করলেন। মকরন্দে রাগ ও রাগিণীদের মূর্তি পরিপুষ্ট, সুতরাং মকরন্দকার রাগ-রাগিণীদের বিভাগের মীতি যে মতঙ্গের কাছ থেকেই পেয়েছেন একথা সহজেই বোঝা যায়।

ভৃগু তাই নয়, আরও একটা কথা এই যে, নারদীকার ও মকরন্দকার যদি একই লোক হবেন তবে মকরন্দে তিনি ভরত, মতঙ্গ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু বা মাতৃগুপ্ত এসব পরবর্তী গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ করলেন কেন? এতদূর অধ্যাপক এম. কৃষ্ণমাচারিয়ারও স্পষ্টই বলেছেন : "Bharat follows the views of Narada in Samasvara that **, Siksha is an ancient work entitled to priority over the extent *Natyasastra*" Fox Strangways সাহেবও নারদীশিক্ষাকে "undated" বলে তাকে প্রাচীনতার সম্মান দেখিয়েছেন। ২০। সুতরাং নারদীশিক্ষা যদি নাট্যশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীন হয় এবং মকরন্দকার ভরত ও এমন কি ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকার মতঙ্গের নাম আচার্যদের তালিকায় উল্লেখ করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তখন এ কথাই নিঃসংশয়ে বলা অসম্ভব হবে না যে, মকরন্দকার নারদ শিক্ষাকার নারদের অনেক পরবর্তী লোক, আর সেজ্ঞেই "নারদস্তুত্বকশ্চ" বলে মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

কশ্চপের কথাও তাই। মকরন্দকার নারদ "কশ্চপো মুনিঃ" বলে আচার্য হিসাবে কশ্চপের নাম করেছেন তা আগেই বলেছি। মতঙ্গের বৃহদেশীতে কিন্তু এই কশ্চপের নাম সাত বার করা হয়েছে। কশ্চপ নাট্য ও অঙ্গভার সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কোন বই এখনও ছাপা হয়েছে কি-না আমাদের জানা নেই। মোট কথা, বৃহদেশীতে মতঙ্গ কশ্চপের নাম করেছেন, আর মতঙ্গ মকরন্দকারেরও আপেকার বা সমসাময়িক আচার্য, কেননা মকরন্দকার মতঙ্গের নাম নিজেই করেছেন; সুতরাং এ থেকেও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে না যে, মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। আজ্ঞেদের কথা বিচার করলেও এ একই সিদ্ধান্ত করতে হবে।

(গ) "নারদস্তু বচঃ শ্রদ্ধা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ" (৩।৭)। এখানে দেখা যাচ্ছে "লোকপিতামহঃ ব্রহ্মা"—যিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'ক্রহিনো' ও 'ব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত হয়েছেন তিনি নাট্যসঙ্গীতের আদিকর্তা সে কথা ভরত ও তৎপরবর্তী গ্রন্থকারেরা যেমন শাস্ত্রদেব, অহোবল প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। ২১। কাজেই পিতামহ ব্রহ্মা যদি নারদের বিষয় অবগত থাকেন ও সেই নারদ যদি মকরন্দকারই হয় তা হলে মকরন্দকার নারদ অবশ্যই ব্রহ্মারই সমসাময়িক হবেন এ কথা

১৮। নন্দীকেশ্বরের নাম মকরন্দকার "নন্দীকেশ্বরকলিতম্" বলে নৃত্যাব্যায়ের তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

১৯। এর শুদ্ধপাঠ 'মাতৃগুপ্ত'-ই হবে।

২০। M. Krishnamachariar: *History of Classical Sanskrit Literature*.

২১। "সামবেদাদিং গীতং সংজ্ঞাহ পিতামহঃ।"—রত্নাকর ১।২৫

যেনে নিতে হবে। কিন্তু তা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা তরুত নিজেও অক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, আর মকরন্দকার তাঁর বইয়ে তিন বার অত্যন্ত ভরভের নাম মজির বলে তুলেছেন। কাজেই এটাই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, “নারদন্ত বচঃ শ্রুত্বা” কথাগুলির ভেতর এই নারদ অবশ্যই আদি নারদই হবেন, তা তিনি শিক্ষাকারই হন বা অল্প কোম প্রাচীন নারদই হন; মোটকথা মকরন্দকার নারদ তিনি মোটেই নন। তারপর একথাও ঠিক যে, নারদ একজনই ছিলেন না, নারদ নাম নিয়ে বহু মনীষীই আবিষ্কৃত হয়েছিলেন। কাজেই নারদ নামের যে-কোন বই দেখলেই যে সেই সমান্তর একজন নারদই সবার গ্রন্থকর্তা হবেন এ সিদ্ধান্তের কোন অর্থ নেই।

তারপর আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে দেখলে দেখা যায়, মকরন্দকার অন্তত শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। তাঁর একটি হ’ল এই যে, মকরন্দকার ‘সঙ্গীত কাকে বলে?’ বলতে গিয়ে হুঁজুরগায় বলেছেন : “গীতং বাজং চ নৃত্যং চ ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে”; অর্থাৎ গীত, বাজ ও নৃত্যের সমবেত রূপই হ’ল ‘সঙ্গীত’। কিন্তু এ ধরনের নারদী, দণ্ডিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদেবী কেউই ‘সঙ্গীত’ বলে গীতিকার পরিচয় দেন নি। এরা সকলেই ব্যবহার করেছেন ‘গীতি’ ‘গান’ ও ‘গন্ধর্ব’ বলে। তবে নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য গীত, বাজ ও নাট্য এ তিনটির একসঙ্গে উল্লেখ আছে। মনে হয় ‘সঙ্গীত’ শব্দটির বীজ ও ধারণা পরবর্তী সঙ্গীত-গ্রন্থকাররা ভরভের ঐ গীত, বাজ ও নাট্য কথাগুলির ভেতর থেকেই পেয়েছেন। তারপর সঙ্গীতের গ্রন্থ যতগুলি অন্তত আজকাল ছাপা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মকরন্দের ভেতরই সর্বপ্রথমে এই ‘সঙ্গীত’ শব্দটির ব্যবহার ও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ—এ ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। মকরন্দের পরে আর সমস্ত গ্রন্থই মকরন্দকে অনুসরণ করেছে। শাকদেব তো বটেই। সুতরাং বলা যায় ‘সঙ্গীত’ শব্দটি মাত্র আমদানী হয়েছে লগ্নম থেকে দ্বাদশ-শতাব্দীর ভেতর অর্থাৎ মকরন্দকার নারদের সময়ের। নারদীকার, ভরত, মতঙ্গ এরা মকরন্দকারের চেয়ে অনেক প্রাচীন। এরা ‘সঙ্গীত’ শব্দটি মোটেই ব্যবহার করেন নি।

তারপর দ্বিতীয় বিষয় হ’ল, রত্নাকরের গীতিকার সিংহ-ভূপাল তাঁর সুধাকরগীতায় “গ্রামমুহুর্নাক্রমতান” নামক অধ্যায়ে রত্নাকরের ৩৯ শ্লোকের ভাবকে পরিস্ফুট করবার জন্তে নারদের একটি মত তুলেছেন। সেটি হ’ল এই,
“আটিকো গাধিকং চৈব সামিকং চ ব্রহ্মস্বরঃ।

সংপূর্ণঃ সপ্তভিষ্টৈব বিজ্ঞেয়ো গীতয়োক্তভিঃ।”

এখন সহজেই জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে যে, এই নারদ কে? কেননা সিংহভূপাল যখন নারদের কথা নজির বলে তুলেছেন তখন স্বীকার করতেই হবে—এ নারদ সঙ্গীত-জগতের একজন প্রামাণিক লোক। তারপর নারদের তৈরি বলে যতগুলি বইয়ের নাম ২২ আমরা পাই তার ভেতর নারদী-শিক্ষার (১২/৩) শ্লোকগুলি এই,

২২। (১) নারদী শিক্ষা, (২) রাগনিরূপণ, (৩) সার-সংহিতা। এদের ভেতর, ‘নারদীশিক্ষা’ ও কিছুদিন আগে ‘রাগ-

“আটিকং গাধিকং চৈব সামিকং চ ব্রহ্মস্বরঃ।

কৃতান্তে ব্রহ্মশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ।

একান্তব্রহ্মেরা হ্যন্থ গাধান্থ দ্যন্তঃ স্বরঃ।

সামন্থ দ্যন্তরং বিদ্যাদেতাং ব্রহ্মতোস্তরম্।”

এখানে তুলনা করলে দেখা যায়, গীতিকার সিংহভূপাল যে শ্লোকগুলির নজির তুলেছেন তাদের ভেতর প্রথম “আটিকং গাধিকং” লাইনটির মাত্র মিল আছে, বাকি কোথাও আর মিল পাওয়া যায় না। তারপর ওড়ব, ঘাড়ব বা সম্পূর্ণের কথাও নারদীশিক্ষাকার যে ভাবে বলেছেন সিংহভূপাল তেমনটি বলেন নি।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বেদের শাখাভেদে ব্রহ্ম-নংখ্যার সব পরিবর্তন হত। ২৩ কাজেই বলা যায়, সিংহভূপাল তাঁর প্রামাণিক শ্লোকগুলি ঠিক নারদীশিক্ষা হতে উদ্ধার করেন নি, করেছেন মকরন্দ থেকেই। কিন্তু মকরন্দেও আবার পাঠভেদ আছে। কেননা মকরন্দের সঙ্গীতাব্যয়ের চতুর্থ পাদে যেখানে “গীতদোষাঃ”—র কথা বলা হয়েছে সেখানেই (৫৩-৫৫ শ্লোকে) গ্রন্থকার বলেছেন : “বাড়বোড়বসংপূর্ণরাগঃ স্যজ্জিবিধাস্তথা”; কিন্তু আটিকাদির নামগন্ধও তিনি করেন নি। কাজেই এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সিংহভূপাল নারদীকার ও মকরন্দকার থেকে ভিন্ন একজন নারদের কথা তুলে দেখিয়েছেন। অবশ্য সেই তৃতীয় নারদের কোন বই-ই আমরা এখনও পাই নি। তবে এটা অতি সম্ভব যে, নারদীর বা মকরন্দের পাঠে যথেষ্ট অদল-বদল হয়েছে এবং তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ২৪ অথবা আরও অনুমান করা যায় যে, নারদের এখনও অপ্রকাশিত বই ‘নারসংহিতা’রও ঐটি উদ্ধৃত-অংশ হতে পারে।

কিন্তু এটা ঠিক যে, উদ্ধৃতি বা প্রমাণ যে কোন বই থেকেই হোক না কেন, নারদ তাঁর নারদীতে আটিকাদি স্বরের কথা বলেছেন, কিন্তু মকরন্দ এসবের আলোচনা মোটেই করেন নি, করেছেন কেবল “বাড়বোড়বসংপূর্ণরাগঃ স্যজ্জিবিধাঃ” ঐ তিনটিরই উল্লেখ। এখন ধরেই যদি নেওয়া যায় যে, নারদীকার ও মকরন্দকার একই লোক তা হলে অনারাসেই সংশয় উঠতে পারে যে, একই লোকের সিদ্ধান্তে ও প্রতিপাত বিষয়ের এত বৈষম্য দেখা যায় কি করে? কাজেই হয় বলতে হবে যে, নারদীশিক্ষা বইখানি রচনা করবার সময়ে দেশের সমাজ ও রুচি পদ্ধতি যে রকমের ছিল, মকরন্দ বই রচনার সময়ে দেশের রুচি ও অবস্থা অনেক পার্টে গিয়েছিল। আর সেজ্ঞেই নারদ আটিকাদির কথা শিক্ষার যুগে আলো-

নিরূপণ ছাপা হয়েছে। কিন্তু ‘রাগনিরূপণ’ বইটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আমাদের বলবার আছে, কেননা তার গোড়াকার বেশী অংশই রত্নাকর থেকে ধার নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে বৈশাখ সংখ্যা (১৩৫২) প্রবর্তক পত্রিকায় আমরা আলোচনা করেছি।

২৩ নারদীশিক্ষা (কাশী সং), পৃ. ৩৯৭-৩৯৮ জঃ

২৪ এর প্রমাণও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। কারণ মূল রত্নাকরে বা কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের গীতায় মাঝে মাঝে যেখানে মকরন্দ থেকে বিষয়বস্তু তুলে দেখান হয়েছে সেখানে এটা সত্যি যে, মূল ও উদ্ধৃতির ভেতর যথেষ্টই পাঠভেদ আছে।

চনা করেছিলেন, কিন্তু মকরন্দের সময়ে তা করার কোন সার্থকতাই ছিল না। কিন্তু এসব যুক্তিও মোটেই সমীচীন নয়। কারণ নারদীতে বিষয়-বস্তু ও আলোচনার উল্লেখ-পদ্ধতির সঙ্গে মকরন্দকারের প্রকাশভঙ্গীর মোটেই মিল পাওয়া যায় না। সুতরাং এসব নানান দিক থেকে সংক্ষেপে বিচার করে দেখলেও আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হব যে, নারদীশিক্ষাকার নারদ ও সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ

সম্পূর্ণ ভিন্ন দু-জন লোক, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এসে তাঁরা তাঁদের এই রচনা করেছিলেন। ২৫

২৫। অবশ্য ডাঃ রাধবনও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোম আলোচনা না করলেও স্বীকার করেছেন : "We have at least two Naradas, one the author of the *Siksha* and the other, the author of the *Sangita-Makaranda*" —Vide *J. M. A.*, Vol. III, p. 16

কৃপা

শ্রীবিমলাচরণ দেব

নীটশে (Nietzsche, *Will to Power*, 1, § 368)-এ পড়লুম—

"Pity is a waste of feeling, a moral parasite which is injurious to the health; it cannot possibly be our duty to increase the evil in the world . . . Pity does not depend upon maxims, but upon emotions. The suffering we see infects us; pity is an infection."

মনে হ'ল, মানবিকতা তথা সামাজিকতার ভিত্তি একটা যা পেলে। কারণ উভয়েরই ভিত্তি সহানুভূতি বা সমানুভূতি—পরস্পরের আনন্দে আনন্দ বোধ; কেহ কষ্টে পড়িলে তাহাতে কষ্ট বোধ। এই কষ্ট বোধ "ধার করা কষ্ট" বা "প্রতিফলিত কষ্ট", ইহাকেই কৃপা, অল্পকৃপা বলে। ইহাই ইংরেজী pity.

এই অনুভূতি যে সমাজের, একমাত্র না ইউক, প্রধানতম বন্ধনীশক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অনুভূতি যদি বাদ দেওয়া যায়, সমাজের সমাজত্ব থাকে না, সমাজ সমজ হয়ে পড়ে।

কথাটা বোধ হয় ভুল নয়। কিন্তু নীটশে তাঁর *Dawn of Day*, § 137তে এই কৃপা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাও ভাববার জিনিস—

"Pity, taking as its principle of action, the injunction, 'suffer the misfortune of another as much as he himself,' would lead the point of view of the ego with all its exaggerations and deviations to become the point of view of the other person, the sympathiser: so that we should have to suffer at the same time from our own ego and the other's ego."

সংসারে এক জন কষ্ট বা অশান্তি ভোগ করছে। তা দেখে যে কৃপা করলে, সেও সেই কষ্ট ও অশান্তি পেলে,—

নেহাং ধার করা। সংসারে কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হ'ল। কৃপাকারীর সংখ্যা যত বাড়বে, সেই অনুপাতে সংসারের মোট কষ্ট ও অশান্তি বাড়বে। সংসারে দুঃখ কষ্ট ত যথেষ্ট আছে, এ ভাবে বাড়িয়ে কি লাভ?

এই সমস্ত বিবেচনা করেই নীটশে বলেছেন—

"Except by a few philosophers, pity has always been placed very low in the scale of moral feelings, and rightly so."—(*Human All Too Human*, I, § 103)

বড় হৃদয়হীনতার কথা ব'লে মনে হয়। কিন্তু বস্তু-তাত্ত্বিকতার দিক থেকে দেখলে, খুব ঠিক।

এই বস্তুতাত্ত্বিকতার দিক থেকে কৃপার বিচার নীটশেই যে প্রথম করেছেন, তা নয়। এ সম্বন্ধে বিবেচন মহাভারত ১২, ১৬৩, ২০তে আছে—

"কৃপাণান্ সততঃ দৃষ্টা ততঃ সঞ্জায়তে কৃপা"

"কৃপণ অর্থাৎ দুর্গত হওয়ার দরুণ যে লোক কৃপার পাত্র হয়ে পড়েছে, তাকে দেখলে "কৃপা"র উদ্রেক হয়। অর্থাৎ তার কষ্টটা দর্শক নিজেতে আরোপিত করে এবং ঐক্ৰপে সে কষ্ট সেও ভোগ করে।

এতে ফল হয় এই—কৃপাকারীর সমস্ত সত্তা ভীষণ ভাবে নাড়া পায়। সে নাড়ার কাঁপুনি বহুক্ষণ থাকে। তাতে তার সমস্ত চিন্তা, অর্থাৎ বিচারশক্তি ও তার সহিত তার ক্রিয়াশক্তি বেশ কিছু কালের জগ্ন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কৃপা করলে কৃপাকারীর লাভ এই। নীটশে যথার্থই বলেছেন—Pity weakens the soul

এই কথাই নীলকণ্ঠ তাঁর টীকাতে এইখানে বলেছেন—

"কৃপাপি চিন্তোন্মাদকরীতি দ্বেষবন্ধোয়া",

অর্থাৎ দ্বেষ যেমন চিন্তা ওলটপালট করে দিয়ে মানুষকে কিছু কালের জগ্ন কাজের বা'র করে দেয়, কৃপাও ঠিক তাই করে। কাজেই, দ্বেষ যেমন ত্যাজ্য, কৃপাও সেই রকম সর্বতোভাবে ত্যাজ্য।

এ রকম চিন্তোন্মাদ বা চিন্তাবিক্ষোভ হয়, কৃপাপাত্রের মনের সহিত "সঙ্গ" হওয়ার দরুণ। কাজেই ঐ "সঙ্গ" ত্যাগ অত্যন্ত আবশ্যক, যদি নিজের চিন্তের স্বৈর্য্য রাখিতে চাও। এই "সঙ্গ"ই নীটশে কথিত infection বা আমা-

দের দর্শনের “জপাফটিকবৎ” অবস্থা। এই “সঙ্গ” হইতে সাবধান থাকিতে বলিতেছেন মহাভারত ১২.২১৫.৪. “অথবা মনসঃ সঙ্গং পশ্চেদ্ ভূতানুকম্পা”। অর্থাৎ অনু-কম্পা করিলেই মনের “সঙ্গ” হয়, ইথা লক্ষ্য করিও, নজর রাখিও। যদি এ বিষয়ে অনবহিত হও, চিত্তবিক্ষোভ অনিবার্য, অবশ্যস্বাবী; তার ফল কতদূর খারাপ, ব’লে শেষ করা যায় না।

ব্যবহারিক জগতে প্রত্যহই দেখা যায় যে, মানুষের সমস্ত সত্তার মধ্যে চিত্তই প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম অংশ। “চিত্ত” না থাকিলে তাহার সমস্ত সত্তাই বৃথা। এ কথাই বেশ জোরের সঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭.৫.২এ বলা আছে : “তন্মাদ্ যতপি বহুব্ধিচিন্তো ভবতি নায়মন্তীজোবৈনমার্হদয়ং বেদ যদা অয়ং বিদ্যারৈখ্যমচিন্তাং শ্রুতিত্যং যত্নব্ধিচিন্তবান্ ভবতি তন্মা এবোত শুভ্রবন্তে।”

অর্থাৎ যদি কোনও লোক বহুবিৎ হইলেও তাহার চিত্ত না থাকে, তাহা হইলে লোকে বলে “ও না থাকার সমান, ওর বিদ্যাও না থাকার সমান।” আর যদি কোনও লোক অল্পবিৎ হয় কিন্তু তাহার চিত্ত থাকে, তাহা হইলে লোকে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। চিত্তের মাহাত্ম্য এত।

এখন, এই “চিত্ত” জিনিসটা ঠিক কি? ছান্দোগ্যোপনিষদের এই খণ্ডে শাস্ত্রর ভাষ্য বলেছেন—

চিন্তং চেতয়িত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবস্তুতীতানাগতবিষয় প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যং চ।

অর্থাৎ দুইটি জিনিস লইয়া এই “চিত্ত” গঠিত—(১) প্রাপ্তকালানুরূপবোধবস্তু এবং (২) অতীতানাগতবিষয়-প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্য।

প্রথমটি, প্রাপ্তকালানুরূপবোধবস্তু-প্রাপ্তকালের অর্থাৎ বর্তমান সময়ের অনুরূপ বা উপযোগী শক্তি যার দ্বারা বর্তমান অবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। কোনও কারণে কোনও রূপে যদি চিত্তবিক্ষোভ হয়, তা হলে এই শক্তি থাকে না, উন্টো ব্যাপার হয়—রজ্জুতে সর্পভ্রম, ঘোপে ভূত বা বাঘ দেখা।

তারপর এই বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ ও যথাযথ উপলব্ধি হলেও কাজ শেষ হ’ল না, কারণ তার ঠিক পরেরই কথা হচ্ছে—কি কর্তব্য?

এইখানেই “চিত্ত”র দ্বিতীয় অংশ, অতীতানাগতবিষয়-প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্য।

এই ইতিকর্তব্য স্থির করতে হলেও চিত্তস্থৈর্যের অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ বর্তমান অবস্থা থেকে অনুমান করে ঠিক করতে হবে অনাগতকালে কি দাঁড়াবে। তার প্রতিবিধানের জন্য আবার অতীতের কথা ভাবতে হয়।

অতীতে হয়ত কখনও না কখনও ঐ রকমের অবস্থা হয়েছিল এবং কি করে সে অবস্থায় কি ব্যবস্থা করে সফল হওয়া গিয়েছিল।

উদাহরণ দিই—রোগীকে দেখতে চিকিৎসক এলেন,

তার প্রথম কাজ রোগনির্ণয় অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার লক্ষণ-গুলি সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। তা না হলে রোগটা কি ঠিক নির্ধারণ হবে না। এই হ’ল চিত্তের প্রথম অংশ।

তার পরই—চিকিৎসক ভেবে দেখবেন, বর্তমানের এই অবস্থা ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে। আর—অতীতে ঠিক বা প্রায় ঠিক এই রকম কোন রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, তাতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ও ফল কি হয়েছিল এবং সে রোগী ও এ রোগীর মধ্যে পার্থক্য ও সাদৃশ্য বিবেচনা করে কি করা উচিত তার নির্ধারণ অর্থাৎ ঔষধাদি ব্যবস্থা। এই হ’ল “চিত্ত”র দ্বিতীয় অংশ।

এখন চিত্তবিক্ষোভের দরুণ যদি এই সমস্ত কাজ ঠিক ঠিক না হয়ে কোনও রকম ভুল হয় তা হলে বিপদ, বলা বাহুল্য।

চিত্তস্থৈর্য থাকলে তবে এ সমস্ত ঠিকভাবে হয়, নতুবা নহে।

এই জগতই দত্তাশ্রমেয় প্রণীত অবদুতগীতাতে আছে—

চিত্তাক্রান্তঃ ধাতুবদ্ধঃ শরীরঃ চিন্তে নষ্টে ধাতবো বাস্তি নাশম্।

তন্ম্যচ্ছিত্তঃ সর্বতো রক্ষণীয়ম্ স্বহে চিন্তে বুদ্ধঃ সন্তবন্তি।

অর্থাৎ সপ্তধাতু দ্বারা গঠিত শরীরকে “চিত্ত”ই ধরে রেখে দিয়েছে। “চিত্ত” যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বাঁধন চলে যাওয়ার দরুণ সপ্তধাতু এলিয়ে পড়ে ও শরীর নাশ হয়ে যায়। এইজন্য চিত্তকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। চিত্ত যদি স্বস্থ (নিজেতে নিজে, স্থিরভাবে) থাকে, তা হলে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়—অর্থাৎ চিন্তা, বিচারশক্তি এ সব কাজ করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে—“কুপা”কে কুপা বা অনুকম্পা করলে তার ক্লিষ্ট মনের “সঙ্গ” বা infection দ্বারা তোমার চিত্তবিক্ষোভ হবে, আর তাতে তোমার কি বিপদ হবে। এখন—সংসারে ত “কুপা” চিরকাল আছে ও থাকবে। এই “মনসঃ সংসঙ্গম্”, এই চিত্তোন্মাদ বা চিত্তবিক্ষোভ থেকে বাচি কি করে?

এ সম্বন্ধে মহাভারত বাচবার উপায় বলে দিয়েছেন—১২.২১৫.৪ “তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুবীত”। উপেক্ষা করবে। খুব ঠিক, উপেক্ষা করলে কুপণের ক্লিষ্ট মন তোমার মনকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু উপেক্ষা করবে, বলা সহজ, করা সহজ নয়। কি করে করা যায়?

কি করে উপেক্ষা করা যায় এ বিষয়ে মহাভারত দুই স্থানে বলেছেন—পূর্বধৃত ১২.১৬৩.২০র ২য় পঙ্ক্তি—

“ধর্মনিষ্ঠাং যদা বেত্তি তদা শাম্যতি সা কুপা” আর পূর্বধৃত ১২.২১৫.৪এর সম্পূর্ণ ২য় পঙ্ক্তি—

“তত্রাপ্যুপেক্ষাং কুবীত জাত্বা কর্মফলং জগৎ।”

একই কথা, কেবল একটু আলাদা ভাবে বলা।

প্রথমটি (১২.১৬৩.২০), “তোমার মনে কুপা এসেছে বটে, তোমার বিপদের কথা। কিন্তু, যদি তুমি “ধর্মনিষ্ঠা” জানতে পার তা হলে ঐ কুপা ঠাণ্ডা হয়ে, নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

এখন এই “ধর্মনিষ্ঠা”টা কি? ‘ধর্ম’ বলে যে পদার্থ তার “নিষ্ঠা” অর্থাৎ শেষ পরিণতি বা পরিণাম।

আবার তা হলে “ধর্ম” পদার্থটা কি? “ধর্ম” পদার্থটা কি, বলেছেন মহাভারত ১২.১০২.১১—

ধার্মাদ্ ধর্মমিত্যাহর্ধমেণ বিধৃত্য প্রজ্ঞা।

অর্থাৎ ধারণ করে থাকে, সমস্ত সৃষ্টিকে ধরে থাকে; অবসন্ন হতে, নাশ হতে দেয় না, সেই ধর্ম।

The law eternal, which upholds all creation.

যাকে অতিক্রম করলে থাকা অসম্ভব, কারণ Nothing is that errs from law

তার কোনও রকম ব্যতিক্রম করলে দণ্ড পেতেই হবে।

এই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে চললে বা (বিপরীতে) এর ব্যতিক্রম করলে যথাযথ ব্যবস্থা হবেই। এ কথা পাই দ্রুপাদাশ্রমনিষদের—“যাথাযথ্যতোহর্থান্ বাদধাচ্ছাশ্বভীভাঃ সমাভ্যঃ,” অর্থাৎ অনন্ত কাল ধরে যথাযথভাবে অর্থের (অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতায় পুরস্কার ও নিয়মব্যতিক্রমে তিরস্কার) ব্যবস্থা হয়ে আসছে। এর ছাড়ান-ছিড়েন নেই।

তা হলেই—যখনই দেখব কেউ “কুপণ” হয়ে পড়েছে, তখনই বুঝব এই লোক “ধর্মনিষ্ঠা”র একটি উদাহরণমাত্র, অর্থাৎ ধর্মের কোনও না কোনও প্রকার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই করেছে, তাই “ধর্ম” তার স্বাভাবিক অপ্রতিহত গতিতে অপরাধীকে এই “নিষ্ঠা”য় অর্থাৎ পরিণতিতে উপস্থিত করেছে। তখন মনে হয়—“তুমি ধর্মের ব্যতিক্রম করেছে এবং সেইজন্য নিজ কর্মের ফল, এই দণ্ড, ভোগ করছ, নিক্ষুতির উপায় নেই।” এ অবস্থায়, কর্মফল ভোগের মধ্যে কুপার অবকাশ নেই। “কুপণ”কে দেখে দর্শকের মনে যে “কুপা” উকি মেরেছিল, তা এখন ঠাণ্ডা হ’ল, নিবৃত্ত হ’ল।

দ্বিতীয়টি (১২.২১৫.৪)—সারা জগৎ যে একটা বিরাট কর্মফল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল, আনন্দের অবস্থায় আছে, সে ভাল কর্মের ফল ভোগ করছে। আর, যে কষ্টে আছে, সে খারাপ কর্মের ফল ভোগ করছে। এটা উপলব্ধি হলে “উপেক্ষা” এসে পড়ে। “কুপা” ফিরে যায়।

এই কর্ম ও তার অনিবার্য ফলের কথা আছে ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫. ১০.৭.এ—

“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়া যোনিমাপত্তেরন্ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়্যোনিং বা বৈশ্য্যোনিং বাঃশ্ব য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়া যোনিমাপত্তেরন্ স্বযোনিং বা শূকর্যোনিং বা চণ্ডাল্যোনিং বা”

কর্মের ফল যে শুধু অনিবার্য, তা নয়, পেতে দেরি লাগে না, “অভ্যাশঃ”, ক্ষিপ্ৰম্।

এই কথাই কোষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে (৩.৯)—

এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নীযতোষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি যমেভ্যো নীযতি।

ভাল কাজ করলে উন্নয়নগতি, খারাপ কাজ করলে অবনয়নগতি—Promotion, demotion।

অর্থাৎ জগৎসমষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ নিজ কর্মের দরুণ “ধর্মনিষ্ঠা”র (অর্থাৎ তার কর্মের পরিণতির বা ফলের) মূর্তরূপ। কর্মবৈচিত্র্যের জন্যই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। যে যেমন কর্ম করেছে, ভাল হোক, মন্দ হোক, সে তেমনই ফল পাচ্ছে। “যেমন কর্ম তেমনই ফল”। সমস্ত জগৎটাই এইরূপ ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ কর্মফল। এই তত্ত্ব সম্যক্ বোধ হলে “কুপা” বা “অনুকম্পা”র অবকাশ কোথায়? কুপণ দেখলে “কুপা”র বন্ধন দর্শকের ঘাড়ে প্রায় এসে পড়ে বটে, কিন্তু “ধর্মনিষ্ঠা”র জ্ঞান হলে “জ্ঞানানুজ্ঞিঃ”। “কুপা”র স্থলে “উপেক্ষা” আসে।

এইরূপ “ধর্ম” ও তাহার অবশ্যজ্ঞাবী নিষ্ঠা বা ফল জেনেই মহাভারত ১২.২৬২.১১এ তুলদ্বার বলেছেন—

“নাহং পরেষাং কৃত্যানি প্রশংসামি ন গর্হয়ে”

অর্থাৎ যে যা করছে, আমি তার প্রশংসাও করি না, নিন্দাও করি না। ভাল হোক, মন্দ হোক, যেমন কাজ করছে, তেমন তার ফল পাবে। উপেক্ষা।

এ রকম ভাগবত ১১.২৮.১এ শ্রীভগবান বলেছেন—

পরম্ভাবকর্ম্মণি ন প্রশংসেঙ্গ গর্হয়েৎ

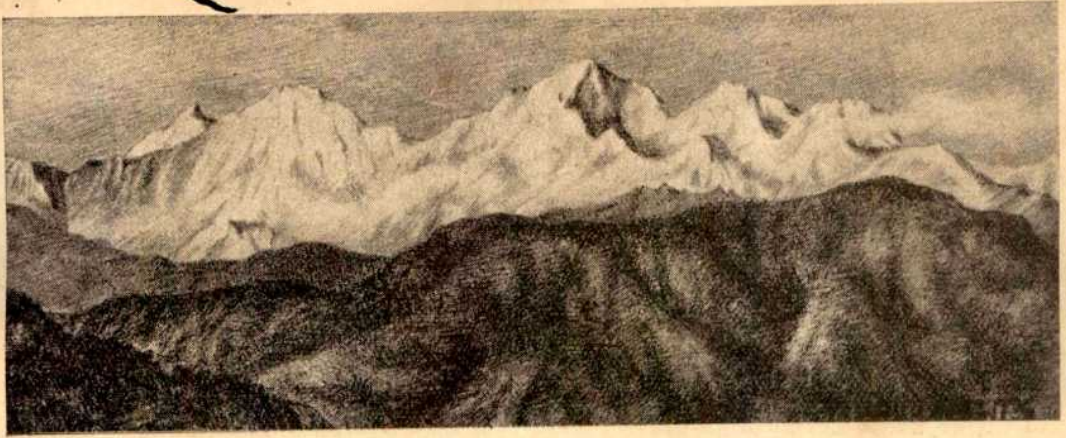
অর্থাৎ যে বার নিজ স্বভাবে কাজ করে—কাক কা-কা ডাকে, কোকিল কুহু কুহু ডাকে, তার প্রকৃতিই তাই। তার নিন্দাই কর, প্রশংসাই কর, বদলাবে না। দুই-ই নিরর্থক, কাজেই উপেক্ষা।

তা হলে—শেষটা কি এই দাঁড়াল—সমাজে থেকেও সমাজভুক্ত কোন লোককে যদি দুর্গত দেখি, কিছুই করব না? তা নয়। তার কষ্ট মোচনের চেষ্টা করব। কিন্তু ভাবালুতা মনে ঢুকতে দিব না। এই কথাই নীটশে বলেছেন (Human All Too Human, I, §. 50)

“Certainly we should exhibit pity, but take good care not to feel it.

এ কথার মর্ম্ম বুঝতে পারছি, কিন্তু বোধ হয় কথাটা তত পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নি, যেমন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলেছেন তাঁর সহজ স্পষ্ট ভাষায়—“দয়া করো, মায়া করো না”। অর্থাৎ সংসারে মুখ চেয়ে, দুর্গতকে যথাসাধ্য সাহায্য করো, কিন্তু “ধর্মনিষ্ঠা”র কথা, মনের “সঙ্গ” হওয়ার বিপদ, তুলো না। নিজের স্বস্থ মনের ভিতর “কুপণ”এর ক্লিষ্টভাব সংক্রামিত করে নিজের চিত্তস্থৈর্য্য হারিয়ে নিজের তথা সমাজের গভীর অনিষ্ট করো না।

ভাবালুতা বা ভাবপ্রবণতায় ব্যক্তি বা ব্যষ্টির কি বিপদ বললুম। সমাজ তথা জাতির বিপদ সম্বন্ধে ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়, বারাস্তরে বলব।



গৌসাইগিরি

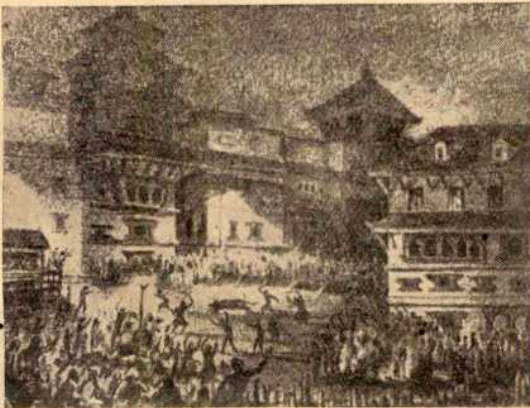
কাঠমাণ্ডে।

শ্রীসুনীলকুমার পাল

নগরীর প্রান্তে নাতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের
অর্ধ-চুড়ায় সকালবেলার স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে, দূরে
গৌসাই-গিরির অমল-ধবল ভূয়ার বলমল করছে। জ্যোতির্ময়
কম্পন যেন ভেসে বেড়াচ্ছে উপত্যকার আকাশে-বাতাসে।
ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরে ঢং-ঢং, ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, যেন
কোন স্রুত মহাকালের মন্দির থেকে উখিত হচ্ছে এই প্রভাত-
বন্দনা। শান্ত-সৌম্য নবীন উষার কাঠমাণ্ডোর সঙ্গে এই
আমার প্রথম পরিচয়। বিশ্বনাথের সৃষ্টি আর মাহুঘের কীর্তি এ
ছরের এক অপূর্ব সময় ও বিকাশ দেখলাম এই অনন্তপ্রসারিত
উপত্যকাতুমিতে। রাজ্যের অঙ্কারে কাঠমাণ্ডোর এসে
পৌছেছি, কিছুই চেনা যায় নি তখন; সারারাত প্রভাত-
আলোর কামনা করে কাটিয়েছি। প্রথম পরিচয়ে এত বিলম্ব
কেন? জানি নে, জন্ম-জঠরে আধার-মগ্ন শিশুর চেতনায়
আলোর জ্বলে এমনিধারা আকৃতি জাগে কিনা। রাত

পোহাল, আমার রাতের প্রতীক। দিনের আলোয় জীবনের
নুতন কূলে পৌঁছে সার্থক হ'ল। রূপের অমরাবতী যে আমারই
চারপাশে যামিনীর অঙ্ককার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তা টের
পাই নি। দিনের আলো ফুটেই অভিমব রূপলোকসমূহ একটি
ছুট করে জেগে উঠল নীল সরোবরে কমল-কলিকার মত।

নেপাল উপত্যকার সুবিশীর্ণ সমভূমির মাঝখানটিতে কাঠ-
মাণ্ডো জনপদ। চারিদিককার হরিৎ-হিরণ্যের মধ্যস্থলে জন্ম-
কোলাহলমুখর বসতিগুলো যেন অসীম নিস্তব্ধতার বুকে প্রাণ-
চাকল্যের প্রকাশ। এক দিকে গোদাবরী, চন্দ্রগিরি, অল্প দিকে
নাগার্জুন, শিবপুরী—এ চারটি পর্বত বৃত্তাকারে নেপাল
উপত্যকাকে বেষ্টিত করে রয়েছে। গিরিগাভ্রনিঃসৃত অগণিত নদী-
নিকরগিরীর স্নেহধারা পৃষ্ঠ সমস্ত উপত্যকা ফলে-শস্ত্রে জামশোভার
পরিপূর্ণ। শিবপুরী শিখর থেকে মহাদেবের জটানিঃসৃত জাহ্নবী-
ধারার মত নেমে এসেছে বাগমতী, বিষ্ণুমতী আর মনোহরা।
সুর্ঘ্যালোকে নদী-মেঘলা নেপালের প্রান্তর রক্তহাস্তে বলমল
করে, রাঙে চন্দ্র-তারকার ছাতিতে সে হাসি আরও সুমধুর।
এই সমস্ত ঋণ-ঋণ রূপমাধুরীর পশ্চাতে অখণ্ড, অনন্ত বিরহী
হিমালয়ের মৌন প্রশান্তি।

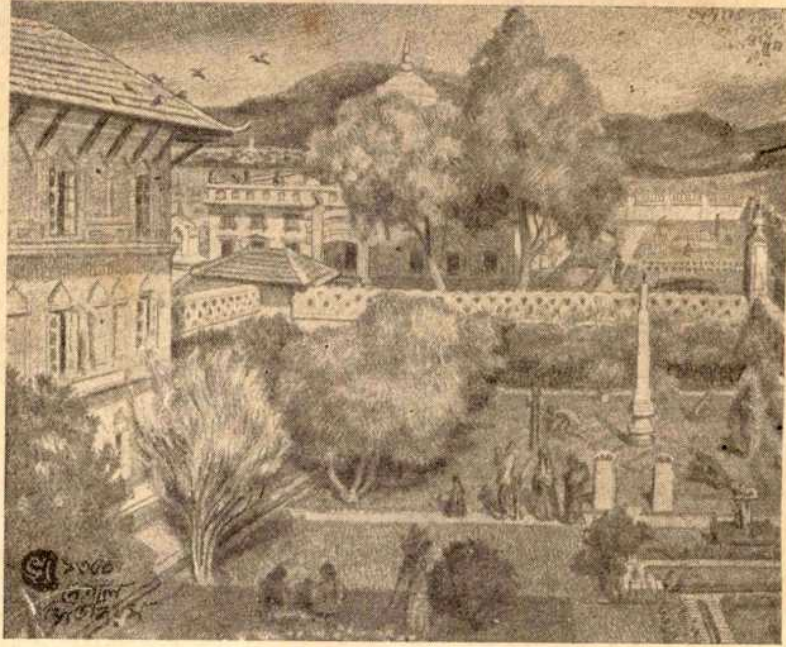


উলুনাচ

হিমালয়ের সান্নিধ্যে এসে এই কথাটাই বার বার মনে
জাগল যে, পশ্চিমের উলুনাচ দ্বার দিয়ে ভারতের সব মহিমা,
সব বৈভব একে একে সাগরপারে অন্তর্মিত; কিন্তু উত্তরে
হিমালয়ের এই দুর্গম উপত্যকার গোপন ভাণ্ডারখানি একেবারে
নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। মনে হ'ল এই নেপালে দেশমাতৃকার
মঙ্গল-প্রদীপখানি অগ্নান মহিমায় আজও প্রজ্বলিত; তারই
আলোয় যেন ভারতের গৌরবোচ্ছল অতীতকে এক বার
প্রত্যক্ষ করে ধ্বংস হতে পারি।

নেপালের পুরাকাহিনীতে রাজ্যের রাজ্যের যুগবিগ্ন হান্না-
হানি ঘৃণ-হিংসা—এই সমস্ত কথা হস্ততো ফলাও করে লেখা

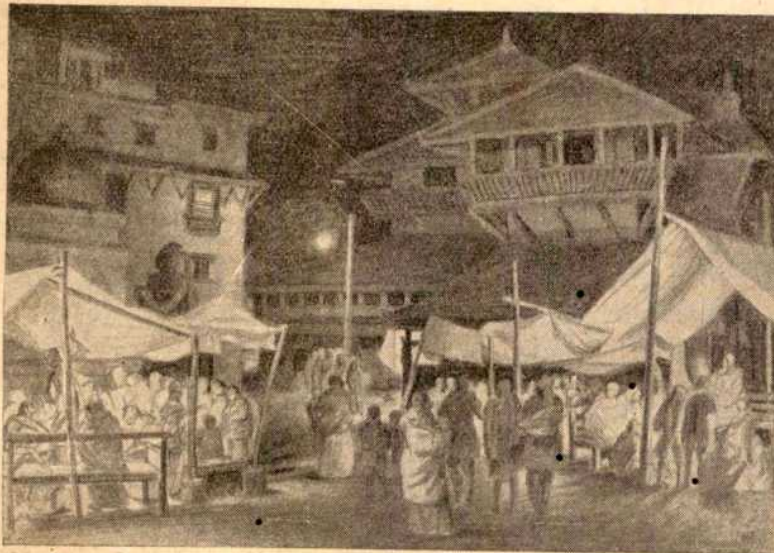
আছে, কিন্তু সে কেবল ইতিহাস, একটা জাতির সমগ্র ইতিহাস নয়। একদা এই উপত্যকার অধিবাসীরা জীবনের নব নব বৈচিত্র্যের আবাদ পেয়েছিল, সেদিন ছিল তাদের উজ্জ্বলিত প্রাণ-প্রাচুর্য। জীবনকে তারা ভোগ করেছে পরিপূর্ণভাবে, ফেলে-ছড়িয়ে,—রূপের মত সঞ্চয়-ভাণ্ডারকে আগলে বসে থাকে নি। বেঁচে থাকা আর টিকে থাকা যে এক নয় এ তারা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল। জীবনের এ মন্ত্র আহরণ করেছিল তারা শিল্প থেকে। স্বজনী প্রতিভা দ্বারা তুচ্ছকে মহৎ করে, সামান্যকে অসামান্যে পরিণত করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি অহুষ্ঠানকে ত্রীমণ্ডিত করে তারা লাভ করেছিল অপারিসীম তৃপ্তি। তাদের তৃপ্তির সে ইতিহাস



বাগ্‌ঘর

পাঠ করেছি তাদের রেখে-যাওয়া শিল্পকর্মের অশেষ ব্যঞ্জনা। এই যে সার্বক জীবন-পরিচয় এত শুধু জনকতক রূপকারের চেষ্টায় সম্ভব হবার নয়, এ যে একটা অখণ্ড সমগ্র জাতির সম্মিলিত সাধনা, এ যে সকলের পরিপূর্ণ অজ্ঞাবিমিশ্রিত আত্মনিবেদন। সেদিন সমস্ত জাতটার মধ্যেই জাগ্রত হয়েছিল সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পাহুতাগ। সৌন্দর্যের সৌরভ তারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিল। ঘরবাড়ী, দরজা-জানালা,

পথ-ঘাট, বসন-ভূষণ সর্বত্রকে ত্রীমণ্ডিত করে তবে তারা কাজে লাগিয়েছে, প্রয়োজনের ষাতিরে সৌন্দর্যবোধকে বিসর্জন দেয় নি। শিল্পের পথ বেয়ে মহত্ত্বের বিকাশ একদা নেপাল উপত্যকায় পরিপূর্ণভাবে হয়েছিল। নিজেদের চারিপাশে তারা স্বজন করেছিল মহাজীবনের স্পর্শপূর্ণ সৌন্দর্যের স্বর্গলোক। নেপালের বিগত দিনের গৌরবময় অধ্যায়টি আমি প্রভার সঙ্গে অহুশীলন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অতীতের পানে পিছু ফিরে তাকিয়ে তাকে সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করা আজ সাধ্যাতীত বলেই মনে হয়েছে।



কাঠমাড়ো

কাঠমাড়ো নগরীর ঠিক মাঝখানটিতে কাঠনির্মিত একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ আছে, শুনেছি, মাত্র একটি গাছের কাঠ দিয়ে ওরা নির্মাণ করেছিল এই মন্দির। মাঝখানে মন্দির—চারপাশে নগরীর হাফ্যুশ্রেণী। মন্দিরকে কেন্দ্র করে চতুর্পার্শ্বে মানুষের হাসি-কান্না কোলাহলমুখরিত লোকালয়। নানান ছাঁদে, পরিপাটি ভাবে ইট-বিছানো অনতিপ্রশস্ত পথ। পথের দুই ধারে ছোট ছোট টালিতে ছাওয়া লাল ইটের শ্রেণীবদ্ধ ঘরবাড়ী। গৃহের প্রবেশদ্বার বিচিত্র নক্সার মণ্ডিত।



নাগার্জুন

গৃহদ্বারের এই অপূর্ণ মনোহর শোভা বুঝ কম জায়গায়ই বোধ করি দেখতে পাওয়া যায়। প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্ব ও শীর্ষদেশ দেবদেবীর মূর্তি বা চিত্র দ্বারা সুশোভিত। দরজার পাশে বহির্বাগির দিকে আচ্ছাদিত উঁচু বেদী পথিকদের বিশ্রামের জন্য সযত্নে রক্ষিত। কারুকার্যবচিত্র দ্বিতলের অলিন্দ ও গবাক্ষের শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ণ। নেপালের শিল্পে গবাক্ষের অলঙ্করণ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই জানালার ধারে উন্নত বৃক্ষের উদাস দৃষ্টি বিদেশী পথচারীর চোখে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পথের এখানে-ওখানে অগণিত ছোট-বড় মন্দির। হাতে ফুল নিয়ে, প্রদীপধারিণী মেয়েরা ধূপের সুবাস বিতরণ করে ধীর পদক্ষেপে সম্মুখে দেবালয়ে চলেছে; নিরুদ্বেগে মাহুচ চলা-ফেরা করছে, মাঝে মাঝে অথকুরের শব্দে সচকিত জনতা সওয়ারকে পথ ছেড়ে দেয়। দিনের এ ক্রোলাহল রাজের প্রথম প্রহরেই শুরু হয়ে যায়, কেবল মাঝে মাঝে মন্দিরসংলগ্ন নাট্যমন্দির থেকে উথিত ভজন-গানের উদাত্ত সুর উর্দ্ধাকাশে যেন কার অদেয়ণ করে বেড়ায়।

কাঠমাড়ো, পাটন, ভাতগাঁও, কাঠিপুর এই পুরাতন নগরীগুলির ভিতরে ও বাইরে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যাভীত মন্দির। উপত্যকার এখানে-ওখানে সর্বত্র দেব-স্থান, নানা পার্শ্বণে যাত্রীরা ঘুরে তীর্থ করে আসে। নেপালের সমাজে জাতিভেদের কলঙ্করেখা থাকলেও মন্দির-প্রাঙ্গণে সে গভী টেনে বিভেদের সীমা নির্দেশ করা হয় নি। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণকে মাঝে রেখে তার চারদিকে কাঠমাড়োর জনপদবাসীরা সারি সারি বাসা বেঁধেছে। একই আভিনায় এসে যে যার ঘরে গুঁঠে।

এই এক প্রাঙ্গণেই শিশুদের খেলা, মেয়েদের কাপড় কাচা, বান শুকানো, রোদ পোহানো ইত্যাদি সংসারের খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ। এখনি একটা সবার-জুড়ে-খোলা আভিনার চৌমিকে বাসা বাঁধার কল্লনার বাস্তবরূপ আজও নেপালে দেখা যায়। এক আভিনায় একত্রে গুঁঠাবসা, একসঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মাহুচ হওয়া, এ যেদিন তাদের শেষ হবে, নেপালের পুরনো সমাজ থেকে সেদিন তারা একেবারে নির্বাসিত হবে। হয়ত এর আর ঘেরি নেই; বর্তমান যুগের সুখ-সুবিধার মোহ এদের চোখে নেশা লাগাতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো এই মুহূর্ত জাতির ভিতর প্রাণরস একেবারে শুকিয়ে যায় নি, বহু উৎসবে রক্তে তাদের যে দোলা লাগে তারই চাকল্যে আজও তারা সঞ্জীবিত। উৎসবের তাদের শেষ নেই, একটার পর একটা পার্শ্বণ নতুন করে তাদের মাতিয়ে দিয়ে যায়। সে উৎসবে জী পুরুষ বান্ধীর সুমধুর তানে চারদিক মুগ্ধিত করে আনন্দের উপচার নিয়ে কোন-না-কোন দেবপীঠে দল বেঁধে চলতে শুরু করে। কখনও দেখেছি নগরীর বাইরে উদ্যুক্ত শ্রামল প্রান্তরে বহু দূর হতে বান্ধীর সুর ভেসে আসছে। বিবিধ সজ্জায় ভূষিত এক দল মাহুচের ধীর মধুর গতি; মাঠের মাঝে উৎসবের কল-কোলাহল,—এ সমস্ত আমার মনকে এক অপার আনন্দলোকে টেনে নিয়ে গেছে। উৎসব নেপালের জীবনের অঙ্গ, তাদের সমাজে বিবিধ পূজাপার্কণ উপলক্ষে উৎসবের আর অন্ত নেই, এই উৎসবই আজও তাদের জীবনকে মধুময় করে রেখেছে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

নুতন হেডমাষ্টার যিনি আসিলেন তাহার বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। গৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় বড় চুল। শৌখিনের বড় নয়, আলস্যের বা অবহেলার বড়, কেমনা চিরুনির সহিত তাহাদের কখনও দেখা-সাক্ষাৎ নাই; হেড মাষ্টার মশাই স্নানের পর মাথাটা মুছিয়া দশটি আঙুলকে একটু বাকাইয়া চুলের মধ্যে দিয়া কয়েকবার টানিয়া দেন; নিশ্চিন্ত।

লোকটি কথা বলেন অল্প, অন্তত কথা বলার ক্ষমতা লোক বোঝেন না। তবে কথা অল্প বলিলেও সরস করিয়া বলেন। কথা বলার সঙ্গে হাসার অভ্যাস। থাকার শাখা কথাও সরস শোনার। মাষ্টার মশাইয়ের এটা প্রত্যেক দিক; খানিকটা আবার নেপথ্যে আছে, সেখানে যা-সব আলাপ আলোচনা সম্ভব হয় তাহার বক্তাও উনি, শ্রোতাও উনি।

জায়গাটি রাণীগঞ্জ—বরাকরের এলাকায়। চারি দিকেই কয়লার খনি, তাহারই লোকজনের সমাবেশে একটি মাঝারি সাইজের গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; নামটাও গল্পভিহি। স্থলটা মাইনার স্থল; বাড়িটা একটু বাহিরের দিকে একটা টিলার উপর। পাশেই খানিকটা সরিয়া হেড মাষ্টারের বাসা।

আসার কয়েকদিন পরে এইখানে একদিন টুলের সঙ্গে মাষ্টার মশাইয়ের পরিচয় হইল।

বাসার সঙ্গে নিচু দেয়াল দিয়া ঘেরা বেশ খানিকটা জায়গা, তাহার মধ্যেই একদিকে আর একটা উঁচু চিবির উপর একটি কাকন ফুলের গাছ, বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, বেগুনে ফুলে ভরা। এই প্রায়—নিরন্তপাঙ্গদেমে গাছটি চোখে পড়ে খুব বেশি করিয়া। স্থল বড় হইবার পর যখন একটু ঠাণ্ডা পড়ে, মাষ্টার মশাই তাহার নিচেটিতে গিয়া বসেন। সামনে প্রায় পোয়া মাইলটাক দূরে মজুরদের বসিটা। আর একটু দূরে, বাঁদিকে বাজার। আরও বেশ খানিকটা দূরে খনির মালিক, কর্মচারী প্রভৃতির বাড়ি ও কোয়ার্টার। এর পরেই বোম্ব হয় পনর-বোল মাইলের পরিধি লইয়া রাণীগঞ্জ—বরাকর অঞ্চলের একটা বিরাট খনিচক্র—এখানে-ওখানে, কাছে দূরে, আরও দূরে অসংখ্য বরিশীর অভিলাষের মতো বোয়ার কুণ্ডলী উঠিয়া আকাশ মলিন করিয়া তুলিতেছে; পায়ের নিকট হইতে দিকচক্রবল্লিত সমস্ত দৃশ্যটুকু এক নজরে দেখা যায়; খুব দূরে বাঁদিকে শুকনিয়া পাহাড়ের নীল রেখা। মাষ্টার মশাই একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। এক এক সময় বোম্ব হয় নিজে হইতেই কিছু বলিয়া ওঠেন, তাহার উত্তরও নিজেই দেন কখনও কখনও।...অত্কার একটু জমিয়া উঠিলে আবার বাসার ফিরিয়া যান।

স্থলের দেওয়ালের পাশ দিয়া একটা রাস্তা উঠিয়া আসিয়াছে, টিলার গা বাহিয়া আবার অল্প দিকে নামিয়া গেছে; লোক চলা-চল খুব কম। এক দিন টুল সেই রাস্তায় আসিয়া মাষ্টার মশাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া করকোড়ে নমস্কার করিল। অচেনা লোক, সপ্রসন্ন নেত্রে চাহিতে বলিল—“ইয়ে—ক’দিন দূর থেকে

আপনাকে দেখেছি—কেন ঠিক বলতে পারি না, কেমন একটা প্রমাণ হয়, ইচ্ছে হয় আলাপ করি, তাই—”

মাষ্টার মশাই কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিমুখে বলিলেন—“চাঁদা চাঁদা আমার দ্বারা হবে না, এখনও শুধিরে বসতেই পারি নি...”

টুল একটু বিপর্যস্ত ভাবে বলিল—“আজ্ঞে, চাঁদা নয়।”

“ইনসিগুরেন্সের প্রিমিয়ামও আমি নিয়মিত ভাবে জুসিরে উঠতে পারি নি—কিন্তু শেরারের কল—অনেক গচ্ছা গেছে।”

“আজ্ঞে, এক্ষেপ্ট নয় আমি।”

“তবে?”

“মানে, কত বার মনে হয়েছে...মানে...”

টুল ব্যাকুল ভাবে এক বার সামনের দিকে চাহিল, এক বার উপরের দিকে চাহিল, তাহার পর চুপ করিয়া গেল।

মাষ্টার মশাই হাসিমুখে বলিলেন—“বোস; অনুবিবে হবে মাটির ওপর বসতে? বাস নেই তেমন।”

“আজ্ঞে, বাস নেই তো কি হয়েছে? আপনি নিজে যখন বসে রয়েছেন...”

—বলিয়া একেবারেই হাস নাই এমন একটা জায়গা দেখিয়া টুল বসিয়া পড়িল। পাশেই একটা আধপোতা পাথরের টাই ছিল, তখনও বেশ তপ্ত, কিছু বলিলে বোধ হয় বিনয়ের আভি-শয্যে সেইটার উপরই গিয়া বসিবে এই ভাবিয়া বসা সম্বন্ধে মাষ্টার মশাই আর কিছু সম্ব্য করিলেন না। তবে হাসিটা মিলাইয়া মাইবার পূর্বে আবার এক বার স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

আগন্তুকই আগমনের উদ্দেশ্যটুকু বলিবে এই আশায় মাষ্টার মশাই একটু প্রতীক্ষা করিয়াই রহিলেন, শেষে তরুতাটা বেশ অবশ্যিকর হইয়া ওঠায় যেন একটা কথা পাড়িবার ক্ষমতা হইয়া বলিলেন—“কিছু মনে করলে না তো?...ও-রকম পৌরচক্রিকা এর আগে অনেক জুসিরেছে। তাই...”

“না, আপনি বলবেন তার ক্ষেত্রে মনে করব কি?...তা ভিন্ন, ভোগায় বৈ কি ওরা—”

প্রশ্ন হইল—“এখানে কোথায় থাক তুমি? কর কি?”

টুল বলিল—“এখানে থাকি না আমি, নতুন এসেছি। বাজারে কাকার একটা স্টেশনারি দোকান আছে—স্টেশনারি আর ড্রাগস্—সব চেয়ে বড় সেটা—ব্যানাক অ্যাণ্ড কোম্পানি, দেখে থাকবেন।”

“সেই দোকানে বসো?”

“আজ্ঞে না, ওসব দিকে টেই নেই।”

“তবে? মাইন্—এ কাক পুঁজু?”

“আজ্ঞে না, ওসব কিছুই ভাল লাগে না।”

মাষ্টার মশাই একটু মুখের দিকে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন—

“পড়েছ কত দূর?”

উত্তর পাইতে একটু বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া প্রশ্নটার আর পুনরাবৃত্তি করিলেন না।

নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্তার মোড় কেয়ার টুপ বেন একটু ধুশী হইল, বলিল—“আজ্ঞে, আমার নাম নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের বাড়ি রাজসাহী, বাবা সেখানে ওকালতী করেন—বেশ বড় উকিলই এক জন। আমার কিন্তু আই-এ পাশ দেওয়ার পর আর পড়তে ভাল লাগলো না—কি হবে পড়ে বলুন?—এই তো দেখছি। ইচ্ছে হয় কিছু কাজ করি, কিন্তু ঠিক মনের মতন কাজ পাচ্ছি না।”

প্রশ্ন হইল—“কি ধরনের কাজ চাও তুমি?”

টুপ একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—“আপনি স্বামী ভূমানন্দ মহারাজের নাম শুনেছেন বোধ হয়?”

“না, নামটা মতন মতন ঠেকছে; একটু বেশি ‘অ্যাধি-শাস’ও।

টুপ আবেগের মাধ্যম মন্তব্যটা আর খেয়াল করিল না, বলিয়া চলিল—“সেই এক মহাপুরুষ দেখেছিলাম। রাজসাহী থেকে কয়েক মাইল দূরে পদ্মার ধারে আশ্রম করে ছিলেন। ছ’ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, তেজ যেন কুটে বেরুচ্ছে। সমাধির মধ্যেই কথা কইতেন, এক জন লিখে রাখত, তার পর লম্বা ভাঙলে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন...”

মাষ্টার মশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন; শেষ হইলে ঠোঁটের কোণটা যে একটু কৃষ্ণিত হইয়া উঠিয়াছিল সেটাকে মিলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—“তুমি-সেই আশ্রমযত্ন হয়ে ছিলে বুঝি?”

“হব-হব মনে করছি—মানে, হাঁটা-হাঁটা করে একটু কপা-লাত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এমন সময়...”

টুপ হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। একটু অপেক্ষা করিয়া মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—“চুপ করলে যে?”

কুঠাটাকে কাটাছিয়া উঠিয়া টুপ বলিল—“অমনবারা লোক কখনও দাসি আসামী হতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয়? ...ছ’ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি...”

মাষ্টার মশাই আরও একটা হাসিকে অনেক কষ্টে মিলাইয়া লইলেন, বলিলেন—“আমি লাভ কুট আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত দাসি আসামী দেখেছি।...এক দিন বুঝি হঠাৎ আর তাঁকে দেখা গেল না?”

একটু বেদনাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া টুপ বলিল—“আজ্ঞে, ওরা এমনই থাকতে চান না লোকালয়ে, তার ওপর এই সব লুকা-চুরি ব্যাপার—জামেনই তো পুলিশকে।...আমরা কয়েকজন শির মিলে তাঁর আদর্শটা প্রচার করব ভেবেছিলাম—সেখানেও পুলিশ...”

“আদর্শটা ছিল কি তাঁর?”

টুপ একটু চিন্তা করিয়া বোধ হয় সেটা গুছাইয়া বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেখা গেল স্থলের সেক্রেটারি গোট খুলিয়া স্থলে প্রবেশ করিতেছেন। মাষ্টার মশাই উঠিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, আর এক দিন শোনা যাবে।...হ্যাঁ, তোমার নামটা কি বললে?”

টুপ বিনীত ভাবে মাথাটা এক দিকে একটু ঝুঁকাইয়া বলিল—“আজ্ঞে, নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই টুপ বলে ডাকে, আপনিও তাই বলেই ডাকবেন।”

দুই জনে কাকমতলা থেকে বীরে বীরে একসঙ্গে নামিলেন। কটকের বাহির হইয়া টুপ গল্পের টপটা দিকে মুখ ফিরাইল। মাষ্টার মশাই একটু বিমিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—“ও দিকে যে?”

টুপ মুখটা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। বিতীয় বার প্রশ্নে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—“বালিয়াড়িতে এক জন নাকি সিদ্ধ পুরুষ এসেছেন স্তর...”

মাষ্টার মশাই এবার বিষয়ে একেবারে সিধা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—“ভাতে কি?...আর বালিয়াড়ি—সে তো প্রায় ছ’কোশ এখান থেকে—দখো হয়ে এল, নির্জন পথ।...”

টুপ মুখটা তুলিয়া লজ্জিতভাবে হাসিল। হাসিটা সলজ্জ হইলেও মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিলেন তাহাতে একটা অটল প্রতিজ্ঞা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রথম বার চেষ্টা করিয়াও তিনি নিজের মুখের অত সহজ হাসিটা টানিয়া আনিতে পারিলেন না। টুপ ঢালু পথদিয়া বীরে বীরে নামিয়া চলিল, একবারও ফিরিয়া চাহিল না, যেন টের পাইয়াছে মাষ্টার মশাই ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া আছেন, ফিরিলেই আবার লজ্জায় পড়িতে হইবে।

নীচের বস্তি থেকে কি একটা কলরব উঠিল—ওঠো মাঝে মাঝে ওরকম—হয়তো মাতলাসি, হয়তো এ ওর ঘরে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, হয়তো চুরির চেয়েও বীভৎস কিছু।—মাষ্টার মশাইয়ের দৃষ্টিটা বীরে বীরে বিরাট খনি-চক্রের দিক-রেখার উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিল—এই একটা মাত্র বস্তি নয় তো—এমন কত শত। ধরিজীর সমস্ত অঙ্গ বিস্তারিত ক্ষেত্রে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর টুপের উপর মনঃকটী ফিরিয়া গেল—দূর পদক্ষেপে সাধুলক্ষ্মে চলিয়াছে—দেশের এক জন সক্ষম যুবা।

নেপথ্যের মাষ্টার মশাই বড় একটা হাসেন না, কথাটাকে যেন চিবাঁইয়াই বাহির করিলেন—“ভক্তি।—মাহুদ না পাওয়া যায়, অমাহুদের পায়েই লুটেরে পড়বে, ভক্তি ঢালা চাই-ই—হাজার বছর ধরে শুধু তো এই জমা করলে, রাখে কোথায়?—যতই অভ্যাচার বেড়েছে ততই জমেছে যে ভক্তি...”

স্থলের চাকরটা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া বলিল—“সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।”

কথাটা কানে গেল না; মাষ্টার মশাই টুপের দিকেই চাহিয়া বলিলেন—“আমার চাই; ওই তপস্বী, ওই দূর গতি আমি উণ্টো দিকে ফেরাবই—”

চাকরটা আবার বলিল—“সেক্রেটারি বাবু এলেন আজ্ঞে।” ফিরিয়া চাহিয়াও কথাটা বুঝিতে মাষ্টার মশাইয়ের একটু বিলম্ব হইল; চাকরটা আবার সেই একভাবে চারিট কথার পুনরাবৃত্তি করিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—“চোরার বের করে দিয়েছিস?—চল্।”

কয়েক পা গিয়া আবার একটু বাধা পড়িল; টুপের গলা—স্তর একটু দাঁড়ান।

ফিরিয়া দেখেন হন-হন করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে আসিতে বলিল—পায়ের ধূসো নেতুয়া হয় নি...

বুঁকিতে যাইবে, মাষ্টার মশাই তাহার কাঁধ দুইটার হাত দিয়া সোকাই দাঁড় করাইয়া রাখিলেন, মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—এসে যেমন করেছিলে তেমনি সোকা হইবেই নমস্কার কর টুপু।...অন্ততঃ একটা মাল ঘেঁষে নাও অত ভক্তির যোগ্য কিনা এই নতুন লোকটি।...যাও এবার, নমস্কার।

ওর অভিযাদনের আগেই প্রত্যভিযাদন করিয়া আবার ফুলের অভিযুক্ত হইলেন।

২

এর পর টুপুই মাষ্টার মশাইয়ের সমস্ত মনটা অধিকার করিয়া রহিল—একেবারে নিদ্রা না হওয়া পর্যন্ত, বরং বেশ খানিকটা বাধাও দিল নিদ্রায়। ছেলেটি আসিয়াছে তাহার আকর্ষণে—তাহার ফুলে নিশ্চয় তাহার ঐ কানন-তলাটির মৌন-বিলাস; আসিয়াই কিছু সেও মাষ্টার মশাইকে আকৃষ্ট করিয়া লইল।

টুপু যে আই-এ পাস করিয়াছে বলিল, সে নিশ্চয় অনেক পূর্বের কথা, এখন তাহার বয়স প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। বেশির ভাগ বাঙালী যুবকের মত ব্রহ্মাণ্ড ও আদর্শবাদী। মনে হয় বাড়িতে একটু আদর পাইয়া আসিয়াছে বেশি; এই আদর ও আদর্শের সমন্বয়ে তাহাকে বয়সের অসুপাতে অনেক বেশি ছেলেমানুষ দেখায়। এইখানে টুপু মায়ী জন্মাইয়াছে একটা।...এদিকে টুপু একটা আশা লইয়া আসিয়াছে—ওকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিতে হইবে—নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক; কোন গভীর আধ্যাত্মিক রহস্ত উন্মোচন করিয়া বলিতে হইবে ওর চোখের সামনে; ওকে কোন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ভূমানন্দের সম্বন্ধে বিজ্ঞপে টুপু গীড়া অসুতব করিয়াছিল, সিদ্ধ পুরুষের উল্লেখে হইয়াছিল লজ্জিত। তবুও এই যে হৃদয়জ্ঞান বিষয়ে মাষ্টার মশাইয়ের ওদাসীভ এতে টুপুকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ও বরং এটাকে মহাপুরুষের লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে,—ওঁরা ত এইভাবেই আত্মপোষন করেন, গা ঝাড়া দেন।

এইখানে আকর্ষণের মধ্যে আছে আশঙ্কা।—যদি উহাকে পুষ্ট করিয়া বলা যায় অলৌকিক কোন-কিছুর বিন্দুবিসর্গও ওর মধ্যে লুকান নাই ত টুপুর বিশ্বাস আরও পাকা হইয়া উঠিবে, এবং ও হয়ত তখন বোলাবুলিই ভগ্না আরম্ভ করিয়া দিবে। এরা আবার মহাত্মা বলিয়া চারি দিকে ঘোষিত করিয়া অনেক সময় অতিষ্ঠ করিয়াও তোলে। চিন্তার বিষয় বইকি।

এসব চিন্তার পাশেই সেই ছবিটি ফুটিয়া উঠে—অন্ধকার সমুদ্রে রাখিয়া স্রুতর নির্জন পথে দৃঢ় পদক্ষেপে টুপু সাধুসঙ্গমে চলিয়াছে।

আকর্ষণে-বিকর্ষণে টুপু মাষ্টার মশাইয়ের একটা অশান্তি হইয়া উঠিল। কিন্তু সব-কিছুর মধ্যেই ঐ কথাটা ধরিয়া রাখিলেন—টুপুকে চাই-ই।

বর্মের বিলাস টের হইয়াছে, এখন ঐ প্রতিজ্ঞার দরকার অল্প দিকে। হাজার বৎসরের ধর্মাবেগকে কাজে ফিরাইতে হইবে।

কিন্তু এমন ভাবে কথাটা পাড়িতে হইবে যাহাতে ওর

“কপালাভ”—এর আশাটা একেবারে ধুলিসাং না হইয়া যায়, তাহা হইলে ভড়কাইয়া যাইবে। প্রথম নম্বর—ভাষাটা হওয়া চাই আধ্যাত্মিক-বৈধা।

পরদিন টুপু আসিলে বলিলেন—টুপু, মনের খুব গভীরে আমার এক সময় একটা ইয়ে হচ্ছে—এক ধরনের সন্তোষ পাচ্ছিই বলতে পার, যে ভূমি আধ্যাত্মিক কিছু একটা পাবার ক্ষেত্রে হাতড়ে বেড়াচ্ছে...

ভাষাটি নিজেই কানেই বেশ চমৎকার লাগিল, “হাতড়ে বেড়াচ্ছে”টা আবার একেবারে আধুনিক।

টুপু উল্লসিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা কচলাইতে কচলাইতে বলিল—আপনি যে সেটা একদিন-না-একদিন টের পাবেনই ভর, আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আপনি মুখে যাই বলুন, কিন্তু আমি ত অনেক জায়গায় ঘুরলাম, অনেক সাধুসঙ্গ করলাম...

খুব স্বল্প একটা আধ্যাত্মিক হাসি ঠোঁটে অল্প একটু ফুটাইয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন—কিন্তু একটা কথা টুপু, ছাদে উঠতে চাইছে একটা লোক, অর্থাৎ এমন জায়গায় পৌঁছতে চাইছে যেটা তার বাড়ির শেষ—এক হিসেবে তার ঐহিক যা কিছু তার পরিসমাপ্তি;—অতটা যদি না-ই স্বীকার কর—তার ধরকরা যেখানে গিয়ে মুক্ত আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে—যে আকাশ অনন্তেরই একটা প্রতীক; স্বীকার কর ত?

টুপু নড়িয়া-চড়িয়া গুহাইয়া বলিল।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—কিন্তু একটা কথা উত্তর দাও, সে এক লাফে যদি ওঠবার চেষ্টা করে...

টুপুর মুখটা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা কাড়িয়া লইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গেই বলিল—তা হলে বুঝতে হবে ভর, তার একেবারে আদি পুরুষের বুদ্ধি আবার মাথায় ঢুকে পড়েছে।

ডারটাইনের মতবাদ টুপু যে এমন চমৎকার রসিকতায় ঝাঁটাইবে মাষ্টার মশাই সেটা আশা করেন নাই, বেশ ধুলিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। তার পর আবার গভীর হইয়া বলিলেন—স্বীকার করছ ত? তার মানে তাকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। এখন এই সিঁড়ি জিনিষটাকে বোঝবার চেষ্টা কর : এ এমন একটা জিনিষ যা আমরা পা দিয়ে মাড়াই অর্থাৎ যা নিম্ন স্তরের অধঃচা বা মাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খানিকটা করে তুলে দেয়।

টুপু মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পাশে একটা ফুল বরিয়া পড়িতে অজমনক ভাবেই সেটা তুলিয়া লইয়া দুই হাতের মধ্যে করিয়া কতকটা ভাগবত শোনার মত হইয়া বলিল।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—তা থেকে ঠাড়াচ্ছে কি?—এই নয় কি যে আমরা কোন জিনিষকেই ছোট বলতে পারি না?—শুধু তাই নয়—কোন বড় কাজ করতে হলে, কোন বড় সাধনায় সিঁড়ি পেতে হলে আমাদের ছোট থেকেই আরম্ভ করতে হবে...?

তুলনার মধ্যে শাপ ব্যাঙ যাই থাক। ফল হইল। টুপু

একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, বলিল—আগে এ-বি, তারপর
ত বি-এ, এম-এ স্তর।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—আমি জানতাম তোমার বোঝাতে
বেগ পেতে হবে না আমার।...ঠিক এইভাবে আমাদের দেশের
মুনিবিররা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আগে রেখেছেন সেবা-ধর্ম,
কেননা চিন্তাশক্তি করতে সেবা-ধর্মের মতন কিছুই নেই, আর
চিন্তাশক্তি না হলে...

টুলুর চোখের দীপ্তি হঠাৎ একটু নিম্নপ্রভ হইয়া গেল যেন,
বলিল—কিন্তু গুরুদেব—অর্থাৎ স্বামী ভূমানন্দ বলতেন ওসব
আজকালকার মিশন-সন্ন্যাসীদের হজুগ, ও দিয়ে আত্মার কিছুই
লাভ হয় না স্তর।

মালাই-মালপোয় গড়া ছ' ফুট তিন ইঞ্চির দাস—সে
সন্ন্যাসী আর অজবিধ কি বলিবে; মাষ্টার মশাই সে কথা অবজ্ঞা
টুলুকে বলিলেন না এবং যদিও একটু ঝাড়া খাইলেন, নিকরংসাহ
হইলেন না; কহিলেন—তোমার গুরুদেব ঠিকই বলেছেন
টুলু—হয়ত তোমার একটু বোঝবার ভুল হয়েছে, লোকে
সেবার মেশাতেই পড়ে থেকে সব নষ্ট করে যে। কথা হচ্ছে—
নির্দিষ্টা যেমন উদ্ভেদ ময়, উদ্ভেদ হার, সেবাটাও তেমনি সাধন
মাত্র, উদ্ভেদ আত্মিক উন্নতি। এখন তুমি যদি নির্দিষ্ট আকড়ে
পড়ে থাক—পারবে কি উঠতে ছাড়ে?

আবার চোখের দীপ্তিটা কিরিয়া আসিল, বরং মনে হইল
বেশ একটু বেশি করিয়াই, টুলু বলিল—কি করতে আপনার
আদেশ হয় বলুন।

মাষ্টারমশাই হঠাৎ মৌন হইয়া পড়িলেন। শুক, পাণ্ডুর
মুখটা স্থানে স্থানে রক্তিম হইয়া উঠিল। নেপথ্যে কে যেন
তাপালা দিতেছে—সে তাহার নিজের ভাষায় কি বলিতে চায়;
প্রবন্ধনার ভাষা নয়—স্পষ্ট অসুভূতির সঙ্গে সে ভাষার মাড়ির
যোগ। তবু সংযত ভাবেই আরম্ভ করিলেন—

যার সেবা করছ, তার অবস্থাটা যত হীন, সে যত দুঃখ,
যত পতিত, সেবার ক্ষেপটা ততই বেশি, আর তাই থেকে
চিন্তাশক্তির সুযোগটাও তত বেশি এটা নিশ্চয় স্বীকার করছ।
তা হলে ঐ বস্তির দিকে চেয়ে দেখো—রোগ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি
—মামুষকে টেনে পত্তর স্তরে নামিয়ে কেলেতে যা-কিছু দরকার
সে সবার এক জায়গায় অমন সমাবেশ আর দেবতে পাবে না
টুলু। সর্বনাশের কথা এই যে ওরা যে কত নেমে গেছে, উঠতে
পারলে মানুষ হিসেবে ওদের যে কত গুণবার সম্ভাবনা ছিল—
সেটা পর্য্যন্ত ওরা আর টের পায় না। আরও সর্বনাশের কথা
ওরা সুখে আছে। হয়ত বলবে সুখই যখন সবার চরম লক্ষ্য
তখন কাজ কি ওদের অশান্তি বাড়িয়ে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে
অবস্থার কুরুর, ছাগল, এমন কি নর্দমার পোকা সুখে থাকে সে
অবস্থার যদি মানুষও সুখে থাকে তো সে যে একটা মস্ত বড়
অপচর ভগবানের রাজ্যের টুলু, অভাবানি মনুষ্যত্বই যে বিলীন
হয়ে গেল সৃষ্টি থেকে। মানুষের দারিদ্র্য হবে ইচ্ছাকৃত ভ্যাগ
থেকে উৎপন্ন—সে দারিদ্র্য মানুষের তপস্যা, সে মানুষের মতই
বিরাট। ঠিক এই এখন আমার চোখের সামনে সে দারিদ্র্যের
ছবি ভেসে উঠছে স্বাভাবিক রঘুনন্দনের জীবনে—ওঁতুলপাতার
শাক আর অন্ন—প্রতিদিন প্রতি ওঁতুলপাতাটা তার মধ্যে

মনুষ্যত্বের তেজ পূর্ণ করে তুলছে—রাজা দান দিতে চাইলে, এই
অকিঞ্চন পৃথিবীতে তিনি নেবার যুগিয়া কিছুই খুঁজে পেলেন
না।...ওই দারিদ্র্যকে বুঝি; তার মধ্যে হীনতা কিছু নেই,
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের আত্মারই একটা বিকাশ সে
দারিদ্র্য। কিন্তু চারদিকের অর্ধগত বিলাসের মধ্যে, চার-
দিকের ভূরি ভোজের টেকুরের মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে
জী-পুত্র-কল্যা নিয়ে ঐ যে তিলে তিলে মরা, তারপর এই তার-
তম্যের—অর্থাৎ এই অভাবের বোঝটুকু আস্তে আস্তে অসাড়
হয়ে যাওয়া—একে একে যতরকম পাপ সবকে পাথের করে
নিয়ে—অমৃতের পুত্র বলে বাদে বাদে সবকিছু বড়াই করি তাদের এই
নরকের দিকে তীর্থযাত্রা—এ দারিদ্র্য আমি বুঝি না টুলু। যদি
কিছু করতে চাও ত এদের বাঁচাও, তার চেয়ে বড় কাজ কিছুই
নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি হয়ত ভাব বিকেলে এই
নির্জন কাকনতলাটিতে বলে আমি আত্মার ক্ষমতা উপলব্ধি
করবার চেষ্টা করি কিংবা পরমেশ্বরের ধ্যান করি। জায়গাটি
বড় মনোরম—একেবারে চরম সত্যেরই আরাধনা করবার
মতন, হয়ও ইচ্ছে এক এক সময়, কিন্তু পারি না। বড়
বাধা দেয় আমার ঐ বস্তি, আর, তারই অন্ন খেয়ে তারই দিকে
উদ্ভত অবজার দৃষ্টিতে চাওয়া ঐ রং-করা বাড়িগুলো।...
আমার উপায় নেই—কেন তা হয়ত এক দিন তোমার বলব;
এখন কেনে রাখ—পরের দাস, সময় অন্ন, তার ওপর অন্ন-
চিন্তা চমৎকার।—তুমি নেমে এস এইখানে,—তোমার বয়স
আছে, উৎসাহ আছে, টাকা আছে। আর সব চেয়ে বড় কথা
আছে অবসর, তুমি...

হঠাৎ মনে পড়িল একটু বৌকে পড়িয়া গেছেন, আবেগের
মাধায় যা-কিছু বলিয়া গেলেন, সেগুলো টুলুকে না বিচলিত
করিবারই কথা। ওর মাথা খাইয়াছে ধর্ম—ধর্মের বিকারই বলা
সমীচীন, যাহাতে ছ' ফুট তিন ইঞ্চির একটা ভোগপুষ্টি
হৃৎকণ্ঠকেও জ্ঞাপকতা গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে না।...
চূপ করিয়া গেলেন।

টুলু বুকের উপর চোখ তুলিয়া শুনিতেছিল, চূপ করিতে দৃষ্টি
নত করিল। মাষ্টার মশাই চূপ করিয়াই রহিলেন; যখন প্রকাশ
হইয়াই গেছে মনের আবেগটা, হাসি বা প্রবন্ধনার ভাষা দিয়া
আর ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন না; উত্তরটা কি হয় শুনিবার জর
নীর্বে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এক ভাবেই থাকিয়া টুলু অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর
মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার বিশ্বাস হয় আমার ধারী
হবে?

নরম ভাবালু দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটু দীপ্তি আসিয়াছে।
ঐ ধরনের ছেলেদের মধ্যে এটা অনেক বারই দেবিবার সুযোগ
হইয়াছে—চেনা জিনিস, বড় একটা টেকে না; তবু নিকরংসাহ
করিলেন না মাষ্টার মশাই, অর্থাৎ নিকরংসাহ হইলেন না,
বলিলেন—এক দিনেই ত কোন জিনিষ হয় না টুলু।

টুলু একটু সন্দিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কিন্তু এই পথে গেলে
পাব ত সে জিনিষ, স্তর যা খুঁজি?

মাষ্টার মশাই বলিলেন—পথটা তো আমার নয় টুলু, মুনি-
বিশিষ্টের সৃষ্টি, আগেই ত বলেছি সে কথা তোমার।

টুপু আবার দুটি মত করিয়া একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—তাই করব না হয়, চিন্তাশক্তি হয়ে যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছেন...

সেই দীপ্তি এইটুকুতেই মলিন হইয়া আসিয়াছে,—মনের উপর সংশয়ের চাপটা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না টুপু।

আজ এই পর্যন্তই রছিল; মাষ্টারমশাই এসকালের আনিয়া কেলিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, তুলেই গিয়েছিলাম,—তুমি যার দর্শনে গিয়েছিলে কাল—কি হ'ল—এসেছেন?

—না, বোধ হয় ঘেরি হবে স্তর, টপ করে তো পাওয়া যায় না তাঁদের।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—ভালই হ'ল টুপু, তুমি বরং তত দিন খানিকটা এগিয়ে থাক...হট করে অত বড় একটা মহাপুরুষের সামনে হওয়া...

হাসিয়া বলিলেন—মানে, হাইস্কুলের আগে তুমি আমার মাইনারের কোর্সটা শেষ করে নাও।

ক্রমশঃ

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদান করিতেছি। তালিকায় বঙ্গনী-মধ্যে পুস্তকের সন তারিখ-যুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত।

১। অবকাশরঞ্জিনী—১ম ভাগ (খণ্ড কাব্য)। ১লা বৈশাখ ১২৭৮। পৃ. ১৭১।

ইহাই কবির প্রথম গ্রন্থ। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তাঁহার আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত।

২। পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)। ১লা বৈশাখ ১২৮২ [১৫ এপ্রিল ১৮৭৫]। পৃ. ১৭৩+পরিশিষ্ট ৮০।

ইহার একটি 'বিদ্যালয়-পাঠ্য' সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। ভারত-উচ্ছ্বাস (কবিতা)। [২০ ডিসেম্বর ১৮৭৫]। পৃ. ১৩।

ইহা ২য় ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'র ১২২৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে আগমন করেন। সেই উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' রচিত হয়।

৪। ক্লিওপেট্রা (কাব্য)। ১ ভাদ্র ১২৮৪। পৃ. ৫১।

ইহা ১২২৫ সালে মুদ্রিত 'অবকাশরঞ্জিনী'র ২য় ভাগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। অবকাশরঞ্জিনী—২য় খণ্ড। (কাব্য) মাঘ ১২৮৪ [২২ জানুয়ারি ১৮৭৮]। পৃ. ২২২।

১২২৫ সালে প্রকাশিত (পৃ. ২৮৭) ইহার একটি সংস্করণে কয়েকটি কবিতা বৈশী আছে; সেগুলি—ক্লিওপেট্রা, ভারত-উচ্ছ্বাস, বন্ধুতা ও বিদায়, প্রত্যাখ্যান, কীত্তিনাশা, মেঘনা, একবর্ষ, প্রতিকৃতি, কবির উপহার, নবজীবন, প্রকৃতির গীত।

৬। রঙ্গমতী—(কাব্য)। [১৫ জুলাই, ১৮৮০]।

পৃ. ২৪৬+১০ শুদ্ধিপত্র।

৭। রৈবতক (কাব্য)। ১লা ভাদ্র ১২৯৩ [২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭]। পৃ. ৩৮০।

৮। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (পদ্যানুবাদ)। [১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২]। পৃ. ২০৪।

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ)। [ইং ১৮৮২]। পৃ. ২২৪।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৭০-৭১) পাঠে জানা যায়, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ইহা সমালোচিত হইয়াছিল।

১০। খুষ্ট (কাব্য)। ১২২৭ সাল। [৪ মার্চ ১৮৯১]। পৃ. ৬৭।

"মেথু প্রণীত খুষ্ট-মাহাত্ম্য হইতে সংক্ষেপে খুষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত; কবিতায় অল্পবাদিত, করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

১১। প্রবাসের পত্র—ভারতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। আশ্বিন ১২২৯। পৃ. ১১৮।

১২। কুরুক্ষেত্র (কাব্য)। ৩০ বৈশাখ ১৩০০। পৃ. ৩৪৪।

'কুরুক্ষেত্র' স্বতন্ত্র কাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান-ভাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'রৈবতকে'র সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ 'রৈবতকে'। অতএব 'রৈবতক' না পড়িলে 'কুরুক্ষেত্র'র সঁমাক কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না।

১৩। অমিতাভ (কাব্য)। ২৯ আষাঢ় ১৩০২। পৃ. ১৮+২০১।

ইহার বিষয়—বুদ্ধলীলা।

১৪। প্রভাস (কাব্য)। [১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৬] ?
পৃ. ২৪৫ + ৬ পরিশিষ্ট।

“রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মথালীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।”

১৫। শুভনির্মাণ্য (নাটিকা)। [২৭ জানুয়ারি ১৯০০]। পৃ. ২০।

চট্টগ্রামে পুত্র নির্মলের বিবাহ উপলক্ষে নবীনচন্দ্র কুমিল্লা হইতে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬। ভানুমতী (উপন্যাস)। ২৫ মার্চ ১৯০০। পৃ. ১৭২।

১৭। আমার জীবন (আত্মজীবনী) প্রথম ভাগ। ১৩১৪ সাল। [১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]। পৃ. ২৬২ + ২ নিবেদন।

দ্বিতীয় ভাগ। শ্রাবণ ১৩১৬। পৃ. ৪২২।

তৃতীয় ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩১৭। পৃ. ৫১৪।

চতুর্থ ভাগ। চৈত্র ১৩১৮। পৃ. ৪৭২।

পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। পৃ. ৫২৩।

১৮। অমৃতভা—অগ্রহায়ণ ১৩১৬। পৃ. ২২৪।

ইহাই কবির শেষ কাব্য। ‘অমৃতভা’ কাব্যের বিষয় চৈতন্য-লীলা। কবি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় (১২শ সর্গ পর্যন্ত) লিখিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সহ ইহা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাবলী—১৩১১ সালে হিতবাদী কার্যালয় হইতে ‘নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ‘অমৃতভা’ ‘শুভনির্মাণ্য’, ও ‘আমার জীবন’ ছাড়া নবীনচন্দ্রের সকল পুস্তকই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরে বহুমতী-কার্যালয় হইতেও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

জাহানকোষার জীবন জাগ্রত হ’ল

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ক্লাস্তমুখ্য কেন্দ্রে ওঠে দিগন্তের অন্তর্গিরি হতে
পল্লবের দীর্ঘশ্বাসে জনশ্রুত ছায়াচ্ছন্ন পথে
আত্মের মঞ্জরী বঁধে যুক্তিকার চৈত্র-সমীরণে
অরণ্যের অন্তরালে অশ্রুপ্লুত খোসবানে তুমি
এ বঁদের রাজ্যলক্ষ্মী স্তম্ভ কেন সমাধি-ভবনে।
লুংফুয়েসা! চেয়ে দেখ সর্বহারার মোর জন্মভূমি।

সমাধি-বন্দনা-দীপ দিনে দিনে প্রজ্জ্বলিত করি,
কুসুম ছড়িয়ে হোথা সিরাজের ছিন্ন বকোপরি
রক্ত অবশেষের প্রান্তে বসি তীক্ষ্ণ আর্দ্রনাড়ে
বকে তব করাবাত করিতে যে তমসার মাঝে।
বিহ্বলের সাজনার কোম শ্রুতি যুগ সন্ধ্যারান্তে
পারে নি ভূলাতে কহু বেরনার স্মৃতি চিত্ররাশি।
পরানীনা দীপ্তিহীন কলসনা বহে বক্রগতি,
পূর্বদোরবের গাথা নির্মাণ্য করেছে ভাঙ্গিরাখী।

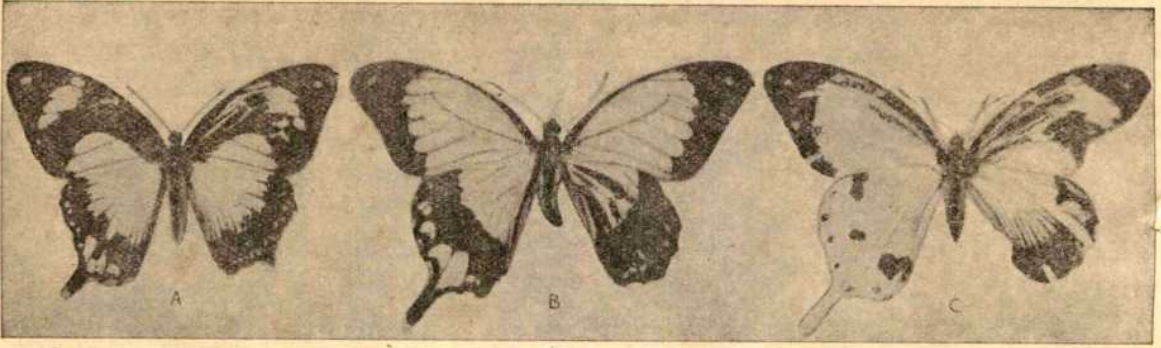
ছিন্নমূল্য ভ্রততীর মত আকো হারান্নে লরম
লুংফুয়েসা! রাকপথে কঁাদে মাতা আমিনা বেগম।
পলানী প্রান্তরে চলো আর এক বার,—বিহ্বলতা
যাবে ঘুরে, নবযুগ প্রভাতের শোনো আগমনী।
বিষাতার মহাকাব্যে রচিবে যে অদৃষ্ট-দেবতা
তোমার মুহূর্তোৎসব ভাবী দিনে আনি জয়ধ্বনি।

আজ তুমি জেগে ওঠ লুংফুয়েসা,—জাহানকোষার
জীবন জাগ্রত হ’ল। ঐ শোনো ফকির হানাদার
কৃতঘ্নতা ছুঁগে বন্দী, শৃঙ্খলিত মোহানন্দীবেগ,
মীরজাকরের মৃত্যু ঘনায় এসেছে অজকারে।
জয় হিন্দ, জিন্দাবাদ পরজিহে বিপ্লবের মেঘ,
তাকণ্যের ক্ষণপ্রভা অন্বেষণ করিছে তোমারে।

মহিলা-সংবাদ

ডক্টর ত্রিমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অল্পবয়স) রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সর্বপ্রথম মহিলা কেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্তী ছাত্রী; তিনি আই-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং দর্শনশাস্ত্রে বি-এ অনার্স ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপিকা। ডক্টর চৌধুরী-রচিত ‘মিলাক

দর্শনমূলক তিন বই দর্শনগ্রন্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ‘স্বকী ও বেদান্তদর্শনমূলক গ্রন্থ’ সুবীলম্বাঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ডক্টর রমা চৌধুরী জীবনানন্দমোহন বহু মহাশয়ের পৌত্রী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রশিমল চৌধুরীর পুত্রী।



বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি । একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষের আংশিক বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত

যৌন-পরিবর্তন

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইউ, পি'র খবরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটি অদ্ভুত রোগীর কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। রোগীটির বয়স চৌদ্দ বৎসর, সে নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলের এক চাষী পরিবারের ছেলে। ছেলেটির শরীরে নারীদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন হয়তো গীর্জাই সে বালিকার রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তারপর আবার ২২শে মার্চ '৪৬ তারিখে ইউ, পি'র খবরে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিপুর কুমারিয়া গ্রামের অহরূপ আর একটি ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে সাহেবুল্লা নামক ১৮ বৎসরের একটি মুসলমান যুবক গুরুতর টাইফয়েড রোগ হইতে আরোগ্য লাভের পর তাহার শরীরে নাকি নারীদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। উক্ত যুবকটি বর্তমানে নান্দিনা চেরিটেবল ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।

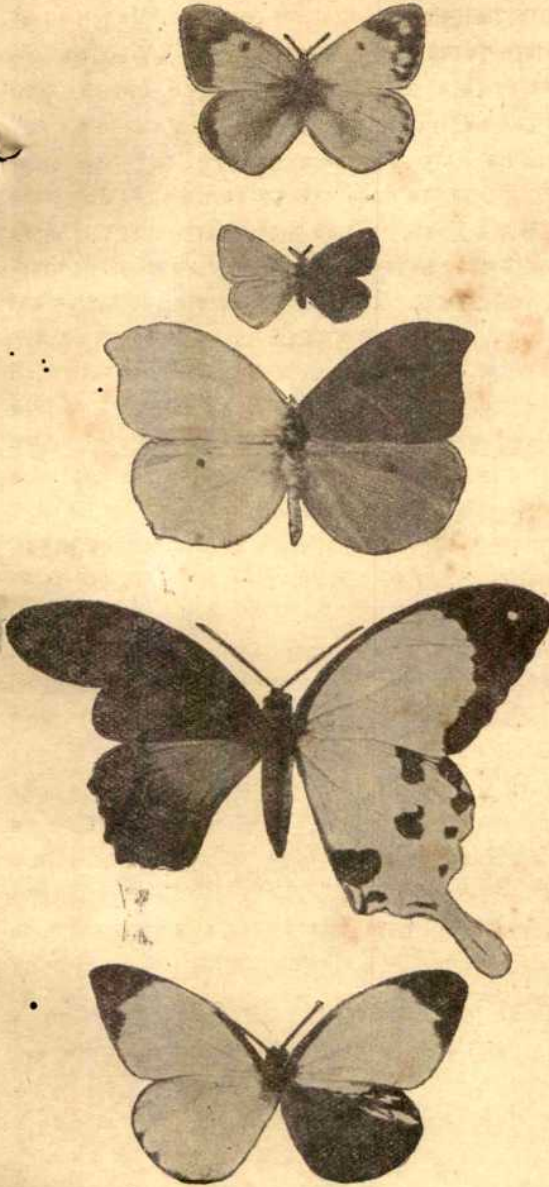
ঘটনাগুলি বিস্ময়কর হইলেও অভিনব নহে; কারণ অহরূপ না ঘটিলেও এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। অভিনব না হইলেও অহরূপ ঘটে না বলিয়াই এরূপ যৌন-পরিবর্তনের ঘটনায় লোকের কৌতূহল ও বিস্ময়ের অন্ত নাই। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষেত্র বিশেষে যৌন-নিয়ন্ত্রণ, যৌন-পরিবর্তনের ব্যাপার-গুলি নিয়মিতভাবেই সংঘটিত হইতেছে। পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীর প্রাণী লইয়া মোমাছি, পিঙ্গলিকা প্রভৃতির সমাজ গঠিত। শ্রমিকদের সংখ্যাই ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক। পিঙ্গলিকারা বাচ্চাগুলিকে অতি শৈশবাবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণে বিশেষ একরকম পদার্থ খাওয়াইয়া পুরুষ অথবা রাণীতে পরিণত করে। এই বিশেষ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় অথবা না খাওয়াইবার ফলেই অবশিষ্ট অধিকাংশ বাচ্চাই শ্রমিকে পরিণত হয়। শ্রমিকেরা না পুরুষ, না স্ত্রী। তবে মোটের উপর ইহা-দিগকে অপরিণত স্ত্রী বলা যাইতে পারে। পুরুষ ও রাণীরা কেবলমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই জীবনধারণ করে।

পুরুষ ও রাণীর সেবা, তাহাদের সম্ভাবন প্রতিপালন এবং সমাজ-রক্ষার জন্য অজান্তেই যাবতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। কাজেই সমাজ-রক্ষার প্রয়োজনে পিঙ্গলিকারা সংস্কার বশেই যৌন-নিয়ন্ত্রণ করিয়া বহুসংখ্যক শ্রমিক উৎপাদন করে। রাণীরা আবার যৌন-মিলন না ঘটিলেও ডিম পাড়িতে পারে। এরূপ ডিম হইতে যে বাচ্চা উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই হয় পুরুষ। মোমাছীদের সমাজেও স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়। চাকের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর প্রাণীদের জন্য বিভিন্ন আয়তনের কুঠরি থাকে। মোমাছারা রাণীর কুঠরিতে প্রচুর পরিমাণে “রয়েল জেলী” নামে এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত করিয়া রাখে। দেখা গিয়াছে রাণীর কুঠরির বাচ্চা শ্রমিকের কুঠরিতে রাখিয়া দিলে সে রাণী না হইয়া শ্রমিকে পরিণত হয় এবং শ্রমিকের কুঠরির বাচ্চা রাণীর কুঠরিতে রাখিলে সে রাণী-রূপেই পরিণতি লাভ করে। ইহা হইতেই দেখা যায়—ডিম হইতে বাচ্চাগুলি স্ত্রী অথবা পুরুষের পার্থক্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না। হয়ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই বাচ্চার মধ্যে অন্ত-নিহিত থাকে। বিশেষ কোন বাচ্চা প্রভাবেই হউক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণেই হউক ইহাদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রবল হইলেই তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য জৈব-স্বভাব বা ক্রোমোসোম-সংশ্লিষ্ট। নিষিক্ত ডিম্ব প্রথম বিভাজনের সময় এই জৈবস্বভাব বিপর্যাস হইলে দেহের অর্দ্ধাংশ স্ত্রী এবং অপরাংশ পুরুষরূপে অথবা অন্য কোন রকমের আংশিক বৈষম্যও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পিঙ্গলিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে এরূপ অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী এবং অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ অথবা আংশিক বিপরীত লক্ষণযুক্ত প্রাণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তলিতে রূপান্তরিত হইবার সময় কোন কোন প্রজাপতির বাচ্চাকে আন্দোলিত করিলে বা কোন রকমে আঘাত দিলে পরিণত অবস্থায় তাহার মধ্যে ন্যূনাত্মক স্ত্রী, পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করে।

মাহুষের ষাট একজাতীয় কিছুকের মধ্যে যৌন-সম্পর্কিত এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনের প্রারম্ভে

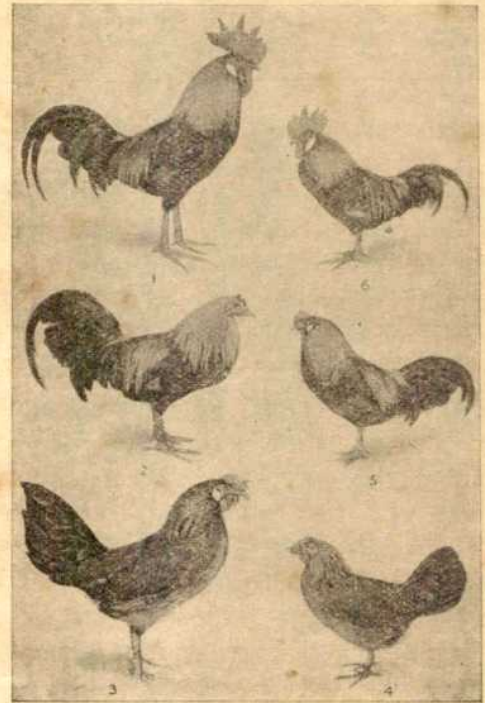
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতি শৈশবাবস্থায় ব্যাঙাটিকে অল্পাঙ্গক জল অথবা উচ্চ তাপে রাখিলে তাহা পুরুষ ব্যাঙেই পরিণত হয়। উপযুক্ত সময়ের তিন-চার দিন পর ডিম ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলে দেখা যায়—অতিরিক্ত সময় গর্তাশয়ে অবস্থানের ফলে নিম্নতম ডিম হইতে কেবল পুরুষ-ব্যাঙই জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য নিম্ন স্তরের কীটপতঙ্গের এই সকল ব্যাপারের সহিত মাহুষের যৌন-পরিবর্তনের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ মাহুষের যৌন-ক্রোমোসোমের মত এই জাতীয় প্রাণীদের যৌন-ক্রোমোসোমের মধ্যে পরিষ্কৃত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদের ক্ষেত্রে দেহ-সংগঠন প্রক্রিয়ার সময় স্থানীয় প্রভাবসমূহই বেশী ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখীদের মধ্যেই বোঝা হয় যৌন-পরিবর্তনের ঘটনার প্রাচল্য দেখা যায়। ৪৭২ বৎসর



বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি। একই দেহে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত

ইহারা থাকে—পুরুষ, তারপর আবার স্ত্রীতে পরিবর্তিত হয়; এবং সারা বৎসর ধরিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে অতি ধীরে ধীরে বাৎসরিক ধারায় এরূপ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিভিন্ন উপায়ে ব্যাঙাটির ক্রোমোসোম-সংস্থানের বিপর্যয় ঘটাইয়া ইচ্ছামত স্ত্রী অথবা পুরুষ ব্যাঙ উৎপাদন করা যাইতে পারে। একটা ব্যাঙ যতগুলি ডিম পাড়ে তাহা হইতে সাধারণতঃ শতকরা ৫০টি স্ত্রী ও ৫০টি পুরুষ ব্যাঙ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ডিমগুলিকে বেশী জলে না রাখিয়া কেবল ভিজা অবস্থায় রাখিলে তাহার অধিকাংশ হইতে স্ত্রী-ব্যাঙ



বামে—মোরগ, ডানদিকে—নব মুরগী। বামে—প্রথমটি সাধারণ মোরগ, দ্বিতীয়টির অণ্ডকোষ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তৃতীয়টির অণ্ডকোষের পরিবর্তে ডিম্বকোষ বসানো হইয়াছে। ডানদিকে—উপরটির ওভারির বদলে অণ্ডকোষ বসানো হইয়াছে।

পূর্বে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৪৭৪ সালে বালে নামক শ্বইচ টাউনের বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মামলার বিচার হইয়াছিল। এই মামলার আসামী ছিল একটা মোরগ। মোরগটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, পুরুষ হইয়াও সে এক দিন একটা ডিম পাড়িয়া বসে। তখনকার ডাইনী-ডাকিনী প্রভাবাধীন আমলে কোন অস্বাভাবিক বিষয়কর ঘটনা ঘটাইলে তাহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। কাজেই মোরগটার এই অস্বাভাবিক কাজের জন্ত তাহাকে ডাইনী বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। এক তরফা হইলেও, আনুষ্ঠানিক বিচারে

মোরগটা ঘোষী সাবাস্ত হওয়ার প্রকৃত স্থানে তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারা হয়। মুরগীর একপ যৌন-পরিবর্তনের ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এক একটা মুরগী বরাবর নিয়মিত ভাবে ডিম পাড়িয়া আসিতেছে—হঠাৎ দেখা গেল সে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, মোরগের মতই তাহার মাথার



প্রথমাবস্থায় এটা ছিল মোরগ। তার পরে মুরগীতে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং ডিম পাড়িতে থাকে

খুঁটি গজাইতেছে এবং মোরগের মতই ডাকিতে শুরু করিয়াছে। এমন কি কিছুকাল পরেই সে মুরগীর পিছনে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অধ্যাপক জুঁ তাহার পরীক্ষাবীন তিন বৎসর বয়স্ক একটি মুরগীর কথা বলিয়াছেন। মুরগীটি নিয়মিত ভাবে বরাবর ডিম পাড়িয়া আসিতেছিল। ডিম হইতে তাহার অনেক-গুলি বাচ্চাও হইয়াছিল। হঠাৎ সে ডিম পাড়া বন্ধ করিয়া দেয়। বীরে বীরে তাহার খুঁটি ও অজ্ঞাত পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মোরগের মতই ডাকিতে আরম্ভ করে। পরের বৎসরে সে পালক পরিবর্তন করিয়া পুরাপুরি মোরগে রূপান্তরিত হয়। তখন নূতন একটা মুরগীর সঙ্গে তাহাকে এক কুঠরিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে এই পরিবর্তিত মুরগীটার সহিত যৌন-মিলনের ফলে নূতন মুরগীটা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বাচ্চাও জন্মগ্রহণ করে। পরিবর্তিত মুরগীটার মৃত্যুর পর তাহার শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায় কোন অজুত রোগ-প্রভাবে তাহার ওভারি অর্থাৎ ডিম্ব-কোষ প্রায় স্বাভাবিক আকৃতির টেস্টিস্ অর্থাৎ অণ্ডকোষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থি-নিঃসৃত হর-মোনের প্রভাবেই নির্দিষ্ট স্থানের পেশীতন্তুগুলিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। পরিবর্তনের কারণ যাহাই হউক না কেন মোটের উপর গরম রক্ত সমৃদ্ধ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শৈশব কিংবা যৌবনে একপ যৌন-পরিবর্তন ঘটাই মোটেই অসম্ভব নহে।

কেমন করিয়া পুরুষ, জীতে অথবা জী, পুরুষে পরিবর্তিত হইতে পারে সে কথা বুঝিতে হইলে সাধারণ জী ও পুরুষ সন্তানের উৎপত্তি রহস্য সম্বন্ধে কিকিং আলোচনার প্রয়োজন। প্রত্যেক জী ও পুরুষের দেহ-কোষের অভ্যন্তরে অতি ক্ষুদ্র ৪৮টি ক্ষুদ্র মত পদার্থ জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। এই পদার্থ-গুলিকে বলা হয় ক্রোমোসোম। এই ২৪ জোড়া ক্রোমো-

সোমের সাহায্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানে পরিচালিত হইয়া থাকে। এক এক জোড়ায় যে দুইটি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে সেগুলি সর্বাংশে প্রায় একই রকমের। পুরুষের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে এক জোড়া কেবল বিসদৃশ। এই কারণে পুরুষের ক্রোমোসোমকে বলা হয় XY; কিন্তু জী-দের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের কোনটাতাই বৈসাদৃশ্য নাই। কাজেই এইগুলিকে বলা হয় XX. “রিডাক্সন্ ডিভিসনের” প্রক্রিয়ার যৌন ক্রোমোসোম পৃথকীকৃত হয়। এই যৌন-ক্রোমোসোম বিভাজনের সময় পুরুষের শুক্রকীটের ৫০ ভাগের মধ্যে যায় X আর বাকী ৫০ ভাগের মধ্যে যায় Y. জীদের ওভারি হইতে যে ডিম নিঃসৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই X যৌন-ক্রোমোসোম থাকে। কারণ তাহাদের সাধারণ এবং যৌন ক্রোমোসোম সবগুলিই XX. কাজেই দেখা যায়—যৌন-মিলনের পর যদি X শুক্রকীট জী ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সন্তান হইবে জী। আর যদি Y শুক্রকীট জী ডিম্বে প্রবেশ করিতে পারে তবে সন্তান হইবে পুরুষ। কিন্তু ক্রোমোসোম কর্তৃক জী বা পুরুষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হইয়া গেলে মাহুষ যখন জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাকে জী ও বলা যায় না বা পুরুষও বলা যায় না। তাহাতে উভয় অঙ্গেরই

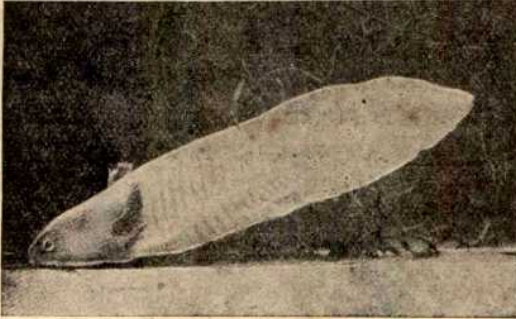


মাড়ে-তিন বছরের বালিকা। কিন্তু ইহার পুরুষের মত দাড়িগোফ বাহির হইয়াছে

প্রাথমিক চিহ্ন বর্তমান থাকে। এই হিলাবে প্রকৃত প্রভাবে তাহাকে Hermaphrodite অর্থাৎ বি-লিঙ্গী বা উভ-লিঙ্গী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ জগ জীও বটে পুরুষও বটে। যৌন-যন্ত্র প্রথমে এক জোড়া গোনাদ (Gonad) রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই গোনাদই পরিশেষে ডিম্ব-কোষ বা অণ্ডকোষে পরিণত হয়। গোনাদ যদি অণ্ডকোষে পরিণত হয় তবে পুং জননেন্দ্রিয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জী জননেন্দ্রিয় অপরিণত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। গোনাদ ডিম্ব-কোষে পরিণত হইলে জী-জননেন্দ্রিয় পরপুষ্ট লাভ করে আর পুং-জননেন্দ্রিয় অগুণ্ট অবস্থায় রহিয়া যায়। কাজেই অস্পষ্ট বা অপরিণত হইলেও পুরুষ-দেহে জী-লক্ষণ এবং জী-দেহে পুরুষ-লক্ষণ বিজ্ঞমান থাকে। টেস্টিস্ এবং ওভারি হইতে হরমোন নামে এক প্রকার যৌন-রস নিঃসৃত হয়। এই রসই যৌন-যন্ত্রের বৃদ্ধি এবং যৌন-ক্রিয়ার পরিপোষক। টেস্টিস্-নিঃসৃত রসের আধিক্য হইলে পুং-জননেন্দ্রিয় এবং ওভারি-নিঃসৃত রসের আধিক্যে জী-জননেন্দ্রিয় প্রাধান্য লাভ করে। ষ্ট্রিনাক এবং

অপরাপর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন জীব-জন্তুর উপর বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া এ বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে ষ্টিন্যাকই ছিলেন প্রথম পথ-প্রদর্শক। বহু রকমের বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও ষ্টিন্যাকের পরীক্ষার ফলসমূহ আজ পর্যন্ত নিছুল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। অস্ত্রোপচারে তিনি বাচ্চা গিনিপিগের টেস্টিস অপ-সরণ করিয়া দেখিলেন, সে সম্পূর্ণরূপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হয়। গিনিপিগটা অস্ত্রোপচারের পর পুরুষের মতই বর্ধিত হয় বটে, কিন্তু তাহার পুরুষত্বব্যাঞ্জক যাবতীয় প্রকৃতি লোপ পায়। কিন্তু ঐরূপ অস্ত্রোপচারের সময় যদি জী-গিনিপিগের ওভারি কাটিয়া লইয়া সে স্থলে জুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে জী-গিনিপিগরূপেই বর্ধিত হইতে থাকে। মূলতঃ পুরুষ হইলেও এ অবস্থায় তাহার আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায় এবং জী-লক্ষণসমূহ আত্মপ্রকাশ করে। যথাসময়ে স্তনপরিপুষ্ট হয় এবং রীতিমত দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়া থাকে। অল্প কাহারও বাচ্চা কাছে দিলে মায়ের মতই তাহাকে দুগ্ধ পান করায়। পুরুষ হইতে জীতে পরিবর্তিত ঐরূপ প্রাণীরা অবশ্য সন্তান প্রসব করিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব হইতেই যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয়।

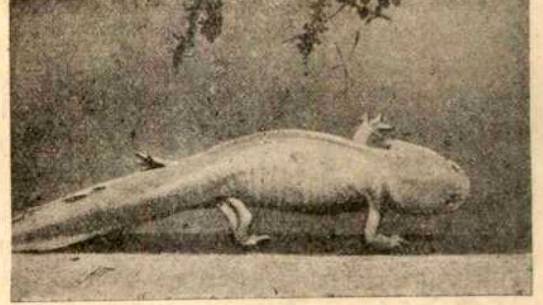


ম্যাক্সলোটল—ঐরূপ আকৃতি লইয়াই ইহার বরাবর জলের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে

অনুরূপ পরীক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুরগীকে মোরগে এবং মোরগকে মুরগীতে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে। এমন কি মুরগীর দেহে যে কোন স্থানে মোরগের টেস্টিস সংলগ্ন করিয়া দেখা গিয়াছে—তাহার ফলে তাহার আকৃতি-প্রকৃতি মোরগের মতই হইয়া যায়। গিনিপিগের দেহে ওভারি এবং টেস্টিস উভয়ই সংযোগ করিয়া ষ্ট্রিমাক আশ্চর্য ফললাভ করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থি একই শরীরে সংযোজনের ফলে প্রাণীটা কিছুকাল জী এবং কিছুকাল পুরুষের ভাষে ব্যবহার করিতে থাকে। অল্প বিদ্যায় কিছু নৈপুণ্য থাকিলে যে কেহ এই রকমের—পরীক্ষায় পুরুষকে জী এবং জীকে পুরুষে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক বৃত্তিবলে মানুষ যেমন জীকে পুরুষ এবং পুরুষকে জীতে রূপান্তরিত করিতে পারে, প্রকৃতিও যেন সেরূপ মাঝে মাঝে খেয়ালবুশীমত ছই-একটা পরীক্ষা করিয়া আমাদেরকে তাক লাগাইয়া দেন। বালক, বালিকায় অথবা বালিকা, বালকে

পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত ঐরূপ প্রায় ছই হাজারেরও বেশী ঘটনার বিবরণ প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশেও বর্তমান ঘটনা ছাড়া এই ধরনের অসঙ্গত বিবরণ সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত

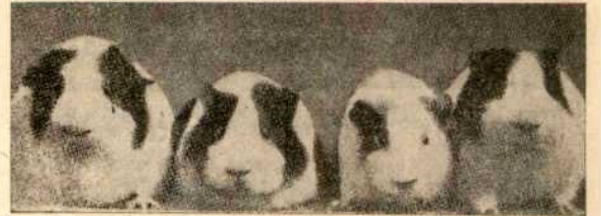


পাইরগিন প্রয়োগে জলচর ম্যাক্সলোটল স্থলচর গিরগিটিতে রূপান্তরিত হইয়াছে

হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, বাহ্যিক যাবতীয় লক্ষণ হিসাবে সুস্পষ্ট ভাবেই তাহার ছিল বালক অথবা বালিকা। কিন্তু ঐরূপ বালিকাদের শরীরের অভ্যন্তরে টেস্টিস এবং বালকদের তলপেটে ওভারি লুকাইয়া ছিল। পরে কোন কারণে দেহাভ্যন্তরের টেস্টিস বা ওভারি হইতে নিঃসৃত হরমোনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই ঐরূপ যৌন-পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

এ ছাড়া অনেক সময় জীদের গৌক, পুরুষের উন্নত বন্ধ, মেয়েদের পুরুষোচিত স্বভাব বা পুরুষের মেয়েলি স্বভাব প্রকৃতি বহু রকমের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তের মধ্যে আংশিক ভাবে বিপরীত প্রকৃতির হরমোন নিঃস্রাবের ফলেই হয়তো ঐরূপ ব্যাপার ঘটয়া থাকে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও মানসিমা চেরিটেবল ডিসপেন্সারীর রোগী ছইটির ক্ষেত্রেও হয়তো অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটয়াছে। বিভিন্ন কারণে স্তন গ্রন্থি সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে অথবা নিঃসৃত হরমোনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। তাহার ফলে ঐরূপ পরিবর্তন ঘটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মেন্ডিকোর ম্যাক্সলোটল নামক প্রাণীদের কথা বোঝ হয় অনেকেরই



প্রথমটি—পুং গিনিপিগ, ২য়—স্ত্রী, ৩য়—স্ত্রী-জন্মের পরেই ইহার ওভারি কাটিয়া দেওয়া হয়। এর কোন যৌন আকাজ্জা নাই। ৪র্থ স্ত্রী, কিন্তু ইহার ওভারি কাটিয়া অণুকে বদানো হইয়াছে। ফলে এটি সম্পূর্ণরূপে পুরুষে পরিবর্তিত হইয়াছে।

ভূমিহাঙ্গন। ইহার জলচর জীব। বংশাঙ্কুরে জলেই বিচরণ করিয়া আসিতেছে। একমাত্রা ধাইরজ্ঞান ষাওয়াইয়া দিলেই—ইহার জলচর গিরগিটি জাতীয় প্রাণিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলোচ্য রোগী দুইটির দেহাভ্যন্তরে হয়তো ডিম্ব-কোষ লুপ্তারিত রহিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তাহাদের টেপিস-মিস্ত হরমোনের প্রভাবে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণই প্রকাশ

পাইয়াছিল। কোন বিশেষ রোগ বা ষাড, তাপ, আলোক প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন-জনিত প্রভাবে অথবা কোম আকস্মিক আঘাতের কলে এখন তাহাদের ওভারি বিশেষ-ভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা হইতে নিঃসৃত হরমোনের আধিক্যে জী-লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আমেরিকার বাণিজ্য-সরণী মিসিসিপি নদী

শ্রী নলিনীকুমার ভদ্র

পূর্বে আপলাচিয়ান পর্বত এবং পশ্চিমে রকি পর্বতের মধ্যবর্তী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ ভূভাগের ভিতর দিয়া যে সমস্ত নদী প্রবাহমান তন্মধ্যে মিসিসিপিই প্রধান। উপনদীসমূহ লইয়া ইহাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দেশাভ্যন্তরস্থ, (inland) বৃহত্তম জল-পথ। এই বিশাল জলস্রোত ২৪৫৬ মাইল অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার বৃকের উপর দিয়া তেল,

উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ষ্টেটের একটি তুষার-রুদ্ধ মিসিসিপি নদীর উৎপত্তি-স্থান। ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে ডি সটো নামক জর্নৈক স্পেনীয় কর্তৃক মার্কিন জনপদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত উক্ত নদীর জলধারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মিসৌরী, ওহিও প্রভৃতি চল্লিশটি উপনদী সম্মিলিত মিসিসিপি নদীর জল-পথের বিস্তৃতি ১৫,০০০ মাইল—এই সুদীর্ঘ জলপথের সমস্তটাই বাণিজ্য ব্যপদেশে নৌ-বহর চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। যুদ্ধের সময় মিসিসিপি নদীপথে মিজপক্ষের বিশেষ কর্মতৎপর-তার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার উপর দিয়া বাণিজ্য নৌ-বহরের চলাচলের তো বিরাম ছিলই না, তত্পরি রণতরী এবং ল্যান্ডিং ক্রাফট সমূহ অনবরত নদীর বৃকে ভাসিয়া বেড়াইত।

মিসিসিপি বৃকে ভাসমান অগণিত বাষ্পীয় তরীর (steam-boat) সমাবেশে যে বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইত সম্প্রতি তাহা আর দৃশ্যমান হয় না বটে; কিন্তু উত্তরে কানাডার সীমা-রেখা হইতে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত, উর্বর মিসিসিপি উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহমান এই নদীটির উভয় তীরে আজও দৃশ্য-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। উত্তর অঞ্চলের মিনে-সোটা ষ্টেটে মিসিসিপি বিরাট শিল্প-মগরী মিনিপলিসকে পিছনে ফেলিয়া সুদূরপ্রসারিত গোহুমক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তৎপরে আরো একটু দক্ষিণবাহিনী হইয়া ইহা ‘টম সয়ের’ এবং ‘হাকলবেরি ফিন’ নামক গ্রন্থদ্বয়ের বিখ্যাত লেখক, হাস্যরসস্রষ্টা মার্ক টোয়েনের (সামুয়েল ক্লেমেনস) আদি নিবাস হানিবল, মিসৌরীর সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া চূড়ন করিয়াছে। “লাইফ অন দি মিসিসিপি” (মিসিসিপি নদী-বৃকে নামক আর একখানি পুস্তক মার্ক টোয়েনের প্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহের অন্ততম। তাহাতে নদীপথে তাহার অভিযান-কাহিনীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে।

মিসিসিপি নদীজলধারাগুণ্টে উইসকনসিন ষ্টেটের সুন্দর গোচারগুহুমিসমূহ নয়নানন্দকর। ইহার নিয়ন্ত্রণস্থ অঞ্চল-শক্তজামল, তাহার পরেই সুর হইয়াছে সুবিস্তৃত তামাকের ক্ষেত। ভাঙ্গকূট উৎপাদনে এই অঞ্চলই সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। তামাকের ক্ষেতের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ভূভাগে বিপুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। নদীটি ক্রমশঃ প্রশস্ততর হইয়া নিম্ন-উপত্যকার পরিপুষ্ট ঘনসবুজ বেতসবন এবং হরিদ্বর্ণ ষাড-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া শান্ত ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। মেক্সিকো উপসাগরের পথে ইহা জলাভূমিপরিপূর্ণ পলিমাটি-



ভিক্সবুর্গের নিকটে কোনো জলপথ-পরীক্ষণ ষ্টেশনে মিসিসিপি নদীর একটি মডেলের একাংশ

ময়দা, শস্য, সয়াবীন, চিনি, কফি, চাল ইত্যাদি ষাড-সম্ভার এবং ইম্পাত, গন্ধক, লেপ্টা প্রভৃতি দেশের সম্পদ ও লব্ধি বৃদ্ধির উপকরণাদিতে বোকাই কাছাকাছসমূহ অনবরত ষাডায়িত করিয়া থাকে।

পড়া সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহমান। এই অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

মেক্সিকো উপসাগরের ১০৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত মিউ ওয়লিয়েল বন্দরের নীচে মিসিসিপি দুই তটভূমিকে প্রাবিত করিয়া প্রবাহিত। প্রচুর ভলানি পড়িয়া প্রতি বৎসর এই অঞ্চলে নদীর উভয় পার্শ্বে পলিমাটিপূর্ণ উর্বরাভূমি সৃষ্টি হইতেছে। এই বিরাট নদীতে জলযান-চলাচল-ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জরুরকার প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ ডলার খরচ করিয়া থাকেন।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয়-তরীর (Steamboat) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মিসিসিপি উপত্যকার ক্রম্ভাব উন্মোচিত হইয়া বহির্জগতের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল। উক্ত জলযানসমূহ তখন প্রবল স্রোতের অশুকুল এবং প্রতিকূল উভয় দিকেই চলাচল করিতে পারিত। ফলে উপর্য উপর্যসমূহ সত্তর বজ্রব্যয়ে বিভিন্ন স্থানের গল্পগুলিতে চালান দেওয়া সম্ভব হইত। চালানী কারবারের মালিকেরা প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত যাত্রী জাহাজে চড়িয়া নদীবন্ধে বিহারপূর্বক আনন্দ উপভোগ করিত। প্রদর্শন-

তরঙ্গীসমূহে (Show-boat) অসুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় গ্রামবাসীদের চিত্তে পুলকসঞ্চার করিত। মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী কাণ্ডেমগন প্যাকেট জাহাজ চালনার প্রতিযোগিতায় প্রযুক্ত হইতেন।

মিসিসিপির এই পৌরবয়স যুগের অবসান হইল রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে এই নদীর গুরুত্ব যে কতদূর তাহা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইল প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮)—কেননা তখন রেল স্টেশনসমূহে স্তূপীকৃত বহু টন সমরোপকরণ মিসিসিপি নদীপথে যথাস্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় মাল-সরবরাহ সম্পর্কিত গুরুত্ব সমস্তর সমাধান সম্ভবপর হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই নদীর গুরুত্ব আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করা গিয়াছে। যুদ্ধকালে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক টনেরও অধিক পরিমাণ মালপত্র গীমার-চালিত ইম্পাভের বজ্রায় করিয়া, পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্যবহৃত হইয়াছিল মিত্রশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রণাঙ্গনে।

মিসিসিপি নদী মাতৃস্নেহে আমেরিকাবাসীদিগকে প্রতি-পালন করিতেছে, তাহাদের জীবনও 'নদীর পালিত জীবন'।

বস্ত্র রেশনিং ও বাঙালী সংসার

জৈনকা বাঙালী গৃহিণী

অসমস্যা কিছুদিন যাবৎ আমাদের এমন বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে যে বস্ত্রসমস্যার কথা প্রায় ভুলিতে বলিয়াছিলাম। বিশেষতঃ কুপনগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, এখন সুবিধামত এক এক করিয়া আত্মীয়-পরিজনের বস্ত্র ক্রয় করা চলিবে ইহাই ছিল রায়ণা। কিন্তু কয়েকদিন আপেকার সরকারী বিজ্ঞপ্তি আমাদের সচকিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলাদেশে জনপিছু কুড়ি গজ কাপড় বরাদ্দ হইয়াছে। আশ্বার শিশুদের (বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক) জন্য ইহার অর্ধেক মাত্র বরাদ্দ। এই সামান্য বরাদ্দ হইতেও আবার প্রথম কোয়ার্টারের কুপনগুলি বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না জুন মাসের মধ্যে কাপড় ক্রয় করা হয়। এই ব্যবহার কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কি আছে? যে কাপড় ছয় মাস না কিনিয়াও পরিবারের প্রয়োজন মিটল, তাহা সপ্তম মাসে আর কেন প্রয়োজন হইবে? সুতরাং এক কোয়ার্টারের পাঁচ গজ কাপড় বাতিল হইলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি যে কি, এবং দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহার কলাকল যে কিরূপ শোচনীয় তাহা বাহারা বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা-প্রণালী তলাইয়া না দেখিয়া-ছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন না। আর, এই যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে, এই মুদ্রা-ক্ষীতির ফলে এবং সর্বোপরি স্বাভাবিক ও বস্ত্র-রেশনিং ব্যবস্থা হইয়া অবশিষ্ট এই শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে যে প্রকার দুর্গতির ভিতর দিয়া কাল কাটাতে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ইহার উপর আবার

তাহাদের খাড়ে নুতন করিয়া বোকা চাপানো কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজী বৎসরের গোড়ার দিক হইতেই হিসাব করিয়া দেখা যাক যে, দরিদ্র বাঙালী প্রত্যেক মাসের আয়ের দ্বারা কি ভাবে তাহার প্রাসাদাদনের ব্যয় নির্বাহ করে। এ সম্বন্ধে আলোচনার ফলে বৎসরের কোন্ সময়ে বাঙালী গৃহস্থের পক্ষে পরিবারস্থ লোকদের জরুর নগদ মূল্যে বস্ত্র ক্রয় সম্ভবপর হয় তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

বাহারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে অল্প মূল্যে সরকারী স্বাক্ষর-পান, তাহাদের পরিবারস্থ লোকসংখ্যা যতই হোক না কেন, চারি জনের অধিক আত্মীয়-পরিজন এক পরিবারভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না। কিন্তু বাঙালীর সংসারে আত্মীয়বন্ধন-বৃদ্ধি এই চুলচেরা হিসাব মানিয়া চলা একান্তই অসম্ভব। তরসা করি সরকারী নির্দেশ অগ্রসরণ করিতে গিয়া বাঙালী কোনও দিন পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতি দায়িত্বজানহীনতার পরিচয় দিবে না। যাই হোক, কম করিয়াই ধরিয়া লইলাম এক এক জন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি অন্ততঃ ছয়-সাত জন পোষ্য প্রতিপালন করেন।

জাহ্নবীর মাসে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার প্রমোশন পাইয়া উপরের শ্রেণীতে উঠে, কাহাকেও বা স্কুল তত্ত্বি করিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী যদি কোন ছেলে থাকে তবে ত কণাই নাই। তাহার বই কেনা, ফিস দেওয়া, নুতন খাতাপত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির দরুনই পিতা বা অভিভাবকের হাত

খালি হইয়া যায়। তখন তাঁহাদিগকে পরবর্তী মাসের প্রতীকার থাকিতে হয়, কখন আবার হাতে নগদ টাকা আসিবে। শুধু চাকুরীজীবীরই নহে, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, দোকানদার সকলেরই জাম্বুয়াসী মাসে এক অবস্থা। এ মাসে কাহারও নুতন কাপড় কেবার কথা উঠিতেই পারে না।

ফেব্রুয়ারী মাসেও নুতন খাতা এবং বইয়ের ক্ষেত্র কিছু চলে। পরীক্ষার্থীর কোচিং ক্লাস বা গৃহ-শিক্ষকের মাহিনা (সারাবৎসর রাখা চলে না, তবে পাস করা হইবার জন্ত তিন মাস রাখিতে হয়) দিতে হয়, সরবত্তী পুজার চাঁদা দান করিয়া হোক বা অল্প রকমে হোক, কিছু খরচ হয়। এ মাসে ফুলের পড়ুয়া ছেলেমেয়ের এক একটা জামা না হইলেই নয়, তাহাদের বরাদ্দ দশ গজের মধ্যে হয়ত পাঁচ গজ বহু কষ্টে কেনা হইল। অনেক হিসাব করিয়া কাটরা-হাটরা তদ্বারা একটা ব্রক, একটা সার্ট ও একটা পাজামাও হয়ত হইল।

মার্চ মাসে কোমণ্ড বাড়তি খরচই সম্ভব নহে। চৈত্র মাসে সালতামামি হইবে। লোকে ধার দেয় বলিয়াই ত আমরা বেশীর ভাগই ভয়ভা বজায় রাখিয়া টিকিয়া আছি, উত্তমরূপে নুতন খাতার আগে কিছু দিতেই হইবে। মুদী, পোয়ালী কেহই ছাড়িবে না, সুতরাং এ মাসেও কাহারও জন্ত বজ্র ক্রয় করা সম্ভব নহে।

এপ্রিল মাসে কলেজগামী ভ্রাতা বা পুত্রের কলেজের পুরা দুই মাসের মাহিনা দিয়া হাতে উত্তৃত কিছু থাকে না। যে মাসেও একই অবস্থা, পুজকতার দুই মাসের ফুলের মাহিনা একসঙ্গে দিতে হয়, তাহার উপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি কোমণ্ড শিকট-আত্মীয়ের পুজকতার বিবাহ থাকে, তাহা হইলে ত ঋণগ্রস্ত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের এমন অবস্থা যে, আমরা প্রাণ অপেক্ষা মান বাঁচাইতে বেশী ব্যস্ত। যাহাতে আমাদের অবস্থার স্বরূপ কেহ বুঝিতে না পারে, তাহার জন্ত আমাদের প্রয়াসের অন্ত নাই। এইরূপে মে মাস পর্যন্ত কাটে।

জুন মাসে প্রথম, নির্দিষ্ট আয়ের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের পক্ষে দুই-এক ছোড়া কাপড় কিনিবার সামর্থ্য হয়। হয়ত এ মাসে দশ-পনের টাকার অধিক ব্যয় করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু এই মাসের মধ্যে যদি প্রথম কোয়ার্টারের সব কুপনগুলি না ব্যবহার করা হয় তবে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। পরিবারে যদি ছয় জন লোকও থাকে, তিন জন বরফ, তিন জন শিশু, তাহা হইলেও তিনখানা কাপড় ও সাড়ে সাত গজ ছিট, এক মাসেই একসঙ্গে কেনা কাহারও সামর্থ্যে ফুলাইবে না। আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে দেখিয়াছি যে, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী-সম্প্রদায় অল্পে অল্পে জুন জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বরেই যাহা কিছু পরিবেশ বস্তাদি ক্রয় করেন। পুজার সময়ে জেতার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং পুজার পর হইতে পরবর্তী জুন পর্যন্ত আবার বজ্রের দোকানের সঙ্গে বাঙালী পরিবারের বিশেষ সম্পর্ক থাকে না।

ষাট রেশনে এক সপ্তাহ রেশন না গইলে পরবর্তী সপ্তাহে তাহা লওয়া চলে না, তাহা বুঝি, ডবল খাওয়া ত সম্ভব নয়। কিন্তু হয় মাস বৈধেয় সহিত ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া পরিয়া

যেই নববস্ত্র কিনিবার ক্ষমতা হইল, অমনি তাহা পাওয়া যাইবে না, এ কেমন কথা? যখন মোট প্রাপ্য বৃত্তি গড়ই, (মকসলে ইহা অপেক্ষা কম) তখন বৎসরের যখন ইচ্ছা জেতা কিনিবে, তাহাতে বজ্র-রেশন বিভাগের আপত্তির কারণ কি? নগদ মূল্য দিয়া কিনিস কেনা হইবে, বরাবরের অতিরিক্তও নহে, ইহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না।

কলিকাতা জিন্ন অজান্ত মকসল শহরে যে যে স্থানে রেশনিং চালু হইয়াছে, সেখানে এখনও ব্রহ্ম-কোন্ডার বিতরণ করা হয় নাই, লোকে কুপনও পায় নাই। জনসাধারণও জানে না যে তাহার বাস্তবিক কত গজ কাপড় বৎসরে পাইবে, কর্তৃপক্ষও সে বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কাগজে দেখা যায় বিশ গজ, কর্তৃপক্ষ বলেন, বোধ হয় বার গজ এবং বাহারী অত্যাংসাহী,—নিজেরা বিশেষ ভাবে উৎসেগী হইয়া দরখাস্ত করিয়া কুপন পাইয়াছেন, তাহার বলেন, একটা করিয়া কুপন (৫ গজ বা এক ছোড়া কাপড়) ত পাইয়াছি, আর পাইব কি না জানি না।” দুই-তিনটি মকসল শহরের কথা জানি, যেখানে গত বৎসর মার্চ মাস (১৯৪৫) হইতে এই মার্চ পর্যন্ত এই একই অবস্থা রহিয়াছে। কেহই জানে না, কত গজ পাইবে, কোথায় পাইবে, কাহার কাছে দরবার করিলে সহজে একছোড়া কাপড়ের কুপন মিলিবে। কত পরী-বাসিনীর কথা জানি বাহারী শহরে আসিয়া বই বৃত্তি ভাজিয়া বা দান আনিয়া জীবিকাক্রম করিতেন আজ বস্ত্রাভাবে তাহাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাপড়ের টিকিট করিয়া দিবার জন্ত তাহাদের কাকুতি-মিনতি শুনিয়া বিচলিত হইয়াছি। বেশন-কার্ড আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পাইয়াছি, যে গ্রামে তাহার বাস করে সেখানে ত রেশন-ব্যবস্থা চালু হয় নাই, কাজেই কার্ডও নাই, এবং কার্ড না থাকায় তাহার দরখাস্ত করিয়াও কুপন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রেশন তালিকা-ভুক্ত বহু জিনিসপত্র ও বস্তাদি গ্রামে বিক্রয় করিবার ক্রীমও আছে শুনিয়াছি, ফুড কমিটিও আছে এ সকল ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্ত, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা কতটুকু? আমার ধারণা এই যে, ফুড কমিটি পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু তাহা গ্রহণ করা-না-করা রেশন বিভাগের ইচ্ছাধীন। তাহাদের পরিকল্পনা-গুলিকে কেহ সমালোচনা করিলেই তাহার আশ্রয় হইয়া উঠেন। কাগজপত্রে হিসাব ঠিক থাকে, আপিসে কাকাকর্ষণও প্রাথমিক চলিতে থাকে, কিন্তু সরবরাহ বিভাগের পোড়ারই গলদ, আসল প্রয়োজনই তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহার সাধারণকে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারেন না।

মকসলে কুপন নামক চরম বস্ত্রটি সংগ্রহ করিয়াছেন এমন সৌভাগ্যবান বাহারী, তাহারও কিছু ঈর্ষার পাজ নহেন। আমি একটি পরিবারের কথা জানি, চঠাং মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাহাদের পরিবারভুক্ত দশ জনের জন্ত দশখানি কুপন পাওয়া গেল, রেশন কার্ডগুলিতেও যথারীতি সহি এবং কুপন নম্বর প্রভৃতি লেখা হইল। গৃহিণী খুব খুশি, কিছু কিছু শাড়ী বৃত্তি, জামার কাপড় ছিট ইত্যাদি কেনা

যাইবে। প্রথমে চাকর দোকানে দোকানে ঘুরিয়া আসিল, কোনও দোকানেই মাল নাই, পরবর্তী সপ্তাহে আসিবে। চার-পাঁচ দিন পরে পুনরায় লোক প্রেরিত হইল, দোকানদার বলিল—খুব ভালো সার্ট পাঞ্জাবী ইত্যাদির কাপড় আসিয়াছে কাল গাঁট খোলা হইবে, ভয়েলও আসিয়াছে। পরদিন গৃহকর্ত্তা নিজেই গেলেন, পছন্দ করিয়া কাপড়-চোপড় কিনিবার বাসনা।... গাঁট খোলা হইয়াছে, কিন্তু সার্টের গাঁটে আছে ছাতার কাপড় এবং ভয়েলের গাঁটে আছে শালু। বৃত্তি বাহা আছে, তাহা ১ হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি, এবং শাড়ী ১২ হাত কিন্তু বহর ৪২ ইঞ্চি। তাও আবার অভ্যস্ত খেলো। কিন্তু তাই বলিয়া দাম কম নহে, শাড়ী প্রায় পাঁচ টাকা একখানা, (আগে এই দামে ধেমুখালি শাড়ীপুরী কাপড় পাওয়া যাইত) বৃত্তিও দুই টাকা বার আনা। অগত্যা কিছুই কেনা হইল না; কুপনগুলির মেয়াদ ছিল ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সুতরাং তাহা বাতিল হইল। ইহা একটীমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, এরূপ ঘটনা ঘটতে আমি বচস্কে বহু বার দেখিয়াছি। বঙ্গ রেশন বিভাগ জানেন না, দোকানদারকে কি সরবরাহ করা হইতেছে, দোকানদার জানে না গাঁটে কি আছে, আর জেতা-সাধারণ আসল ব্যাপারটি বুঝিবার আগেই তাহার কুপন বাতিল হইয়া যায়।

কেলা রেশন কর্তৃপক্ষ আবার কলিকাতার আপিসকে দোষ দেন। তাহার নাকি তাহাদের চাহিদামত জিনিষ সরবরাহ করেন না। মহকুমা কর্তৃপক্ষ বলেন, আগে যে সকল জিনিস চলে না তাহাই গাঁটের পর গাঁট মহকুমার আসিয়া উপস্থিত হয়। গ্রামবানী পাতলা ভয়েল, মিহি বৃত্তি এবং ভাল কোটের কাপড় দেওয়া ও তাহার দাম তিনরা খুব ফিরাইয়া চলিয়া যান, মহকুমার জিনিষ জমা হইয়া থাকে কিছুদিন, তাহার পর আবার শুদামজাত হইয়া থাকে কিনা, তাহা সরবরাহ বিভাগই জানেন। কোন্ প্রকার কাপড় কি কাজে লাগে, তাহার নাম কি এবং চাহিদা কি রকম বঙ্গরেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষীদের এ সম্বন্ধে খুবই অস্পষ্ট ধারণা। “সার্টিং” “কোটিং” “লংক্লেথ” এবং বৃত্তি শাড়ী মোটামুটি ইহাই তাহার ব্রহ্মণ্ড। কিন্তু সার্টিং অর্থে ছাতার কাপড় হইতে দোহুতী, এমন কি সোফা কুশন পর্দা কোটিং ও ড্রিল জিন প্রভৃতি সকল রকমের মোটা কাপড়ই যে বুঝাইতে পারে তাহা তাহার অবগত নহেন। লংক্লেথের বেলা ভুল হয়ত হয় না, কিন্তু ‘মার্কিন’ কি চিঙ্ক তাহা অনেকই জানেন না। কোরা জিনিসমাজেই “গ্রে”। সাদা ড্রিল আছে কিনা বোঝ করিলে রেশন বিভাগ বলিবেন—নাই। কিন্তু দোকানে দেখা যাইবে যে “গ্রে ড্রিল” বলিয়া সাদা কোরা ড্রিল বিক্রয় হইতেছে।

কেলার রেশন বিভাগের কর্ত্তা হইয়া যে সকল খেতাব-পুঙ্খব বঙ্গসমাজ সমাধানে নিযুক্ত আছেন তাহাদের আবার বাঙালীর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আরও চমৎকার। গত বৎসরে এক বার একটি মহিলা-পরিচালিত আশ্রমের হুঃই মেয়েদের জন্ত ষ্ট্যান্ডার্ড কাপড় ক্রয়ের জন্ত ‘পারমিট’ চাওয়া হইয়াছিল। মহিলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট দরখাস্ত করিয়াছিলেন বার-খানি কাপড় চাহিয়া, তাহার মধ্যে আটখানি শাড়ী এবং চার-খানি বৃত্তি। বৃত্তিগুলি বিববাদের জন্ত। সেই কেলার যে

সাহেবটি রেশন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি পারমিট নামঞ্জুর করিলেন, লিখিলেন, মেয়েদের আশ্রমে শাড়ী চাওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝি কিন্তু বৃত্তি দেওয়া হইবে কেন তাহা বোধগম্য হইতেছে না। বলা বাহুল্য খেতাব কর্ত্তাচারীটি পারমিট দিলেন না। আশ্রমের ভারপ্রাপ্তা মহিলা বিস্তারিত পত্রে বাংলাদেশের হিন্দু বিববাদের বৃত্তি অথবা ধান পরিবার প্রথা সম্পর্কে তাঁহাকে ওরাকিকহাল করিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া পুনরায় পারমিটের জন্য আবেদন করিলেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সাহেবও যেন ক্ষেপ করিয়া বলিলেন কিছুতেই তিনি বুঝিবেন না। শেষ পর্যন্ত বৃত্তি তো পাওয়া গেলই না, শাড়ীর জন্য পারমিটও মিলিল না। বিববা মহিলাগণ অগত্যা শাড়ী পরিতেও রাকী হইয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গ রেশন বিভাগের খেতাব বড়কর্ত্তার বিধানে তাহাদের ভাগ্যে তাহাও জুটিল না। এক মাদোয়ারী কাপড়ের পারমিট পাইয়া ষ্ট্যান্ডার্ড কাপড় বিতরণ করিতেছিলেন, আশ্রম কর্তৃপক্ষকে তাহার নিকট হইতে থিকা করিয়া আনিয়া মেয়েদের বঙ্গ-সমাজ মিটাইতে হইল।

সাদা ধান কাপড় এখনও খুব কমই পাওয়া যায়, সরু পাড় দশ হাত বৃত্তিও বড় একটা মেলে না, আবার সাড়ে নয় হাত নয় হাত বৃত্তিতে মেয়েদের ক্লারও না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বঙ্গ-রেশন-ব্যবস্থা বাঙালী মেয়েদেরই বেশী অসুবিধার কেলিয়াছে। বছরে কুড়ি গজ অর্থাৎ চারখানা শাড়ীতে কষ্টে-সুটে চলে বটে, কিন্তু শেমিজ-জামার কি ব্যবস্থা? আড়াই গজ হিসাবে বয়িয়া চারটি শেমিজের জন্ত অন্ততঃ আরও দশ গজ কাপড় শহরবাসিনীদের প্রয়োজন হয়। বার বছরের নীচে ছেলেমেদের দশ গজ বরাহ। ইহাদের দশ গজে বড় জোর খুব হিসাব করিয়া কাটরা ছাঁটরা বাড়ীতে তৈয়ার করিলে তিনটি হাফপ্যান্ট, তিনটি সার্ট হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ছেলেরই তিনটি প্যান্টে বহর কাটে না, বাড়ন্ত মেয়েদের শাড়ী পরিবার বরসে ত দশ গজে কোনমতেই হয় না, ছোট ছোট মেয়েদের তিনটি ব্রক ও তিনটি পাঞ্জামা ও একটি শেমিজ দশ গজে (বড় বহর না থাকিলে) হয় কিনা সন্দেহ। গৃহকর্ত্তাদের ত কুড়ি গজ বরাহে চলা অসম্ভব; বৃত্তি ছাড়া সার্ট পাঞ্জাবীরও প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি শতপ্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস রহিয়াছে যাহার কথা রেশন করিবার সময়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তাও করেন নাই।

ইহার মধ্যে একটি বিষয় আমরা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে অনেক সময়ই আলোচনা করিয়া থাকি। সকলেই জানেন শিশু জন্মিলে তাহার জন্ম বস্ত্র বস্ত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই। অথচ এ কথা প্রত্যেকেরই জানা আছে যে বর্ত্তমানে বস্ত্রভাবের জন্ম নবজাতশিশুর শয্যা ও জামা-কাপড় ইত্যাদি একটা সমাজ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন কাপড় দিয়া আগে কাঁধা প্রভৃতি করা হইত, এখন জননীরাই যথেষ্ট কাপড় ছোটে না, ত শিশুর জন্ম পুরাতন কাপড় আসিবে কোথা হইতে? একটি শিশুর জন্ম কাপড়ের প্রয়োজন বড় কম নহে, কাঁধার অভাবে আট-দশখানি চাদর, কিছু জামা বালিশ বিছানা কোন্ জিনিষটা না হইলে চলে? নবজাত শিশু ও তাহার জননীর জন্য কি বিশ গজ কাপড় বরাহ

করা বুঝবে? বিলাতে ভারী জননীর জন্য বিশেষ কুপনের ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতি শিশুর জন্মের আগেই অবসর সময়ে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তাদি তৈয়ারী করিয়া লয়। আমাদের দেশে যদি শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মার্কিন বা লংক্লথ কিনিতে পাওয়া যায় তবে জননীরা অনেক হাকামা পোহানোর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

আর মায়েদের বস্তাটি কি কম? গৃহকর্ম আছে, চারি বেলা বস্ত্র বেশনে ও বস্ত্র আয়ে কি বাইতে দেওয়া বাইতে পারে সে চিন্তা আছে, সব কাজ যদিই বা সারিয়া উঠিতে পারেন, হাতের হুট-হুটার আর বিরাম নাই।

বেশন বিভাগের বন্দোবস্তে অসুবিধা আজকাল হুস্তাপ্য হইয়াছে, পাওয়া কঠিন বলিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতে সময়ও অধিকায়ণ বাঙালীরই নষ্ট হয় প্রচুর। আবার প্রয়োজন অপেক্ষা কম পাওয়া যায় বলিয়া কাকি দিয়া কিংবা বেনী দাম দিয়া গ্ল্যাক মার্কেটে কিনিতেও অনিচ্ছুক নহেন। দিন দিন আমাদের

ন্যায় অন্যায় বোধ যে কমিয়া যাইতেছে তাহা কি আমরা অনুভব করিতেছি না? চোরা কারবারীদের আমরা যুগে যুগে করিতেছি কিন্তু কোনও কারবারী যদি ষাতির করিয়া আমাদের সামান্য লাভ রাখিয়া দশ সের চিনি বা দশ গজ কাপড় দিতে চায় আমি প্রস্তুত হইব না কি?

অথচ চোরা কারবারীদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার প্ররুতি জনসাধারণের হৃদয় হইতে নির্মূল করা কঠিন নহে। জনসাধারণকে প্রয়োজনানুযায়ী বাজ ও বস্ত্র না দিলে তাহারা বাকিটুকু জোপাড় করিবার জন্য চোরা কারবারীর দ্বারস্থ হইবেই, কিন্তু তাহাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বাজ ও বস্ত্রের বরাদ্দ ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে তাহাতেই তাহাদের অভাব মিটবে, চোরাকারবারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিবে।

কিন্তু অসুবিধার এরূপ অভাব কতদিন আমরা সহ করিব তাহাই ভাবি। আস্ত এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে বাঙালী ষাতির আর বাঁচোয়া নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টির রূপ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৃষ্টিরহস্ত বা বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে অনেক কবিতা আছে। তাঁহার কাব্যে তিনি জননী বসুন্ধরার জন্মের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং তাহার সহিত আমাদের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেমন করিয়া এই বিশ্বজনন গড়িয়া উঠিল, আকাশের এই তারা-মন্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র, উল্কা, ধূমকেতু আরও কত কি, অনন্ত আকাশ—এই যে বিশ্বনির্মিত তাহার কি ভাবে সৃষ্টি হইল, কোন্‌ সে নিয়ামক তাহা গড়িয়া তুলিলেন—সেই গভীর সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে তাঁহার কবি-চিন্তা যে উন্মূখ হইয়া উঠিল তাহা তাঁহার কাব্যে নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাতৃময় পৃথিবীকে বরাবরই মাতৃরূপে বন্দনা করিয়া আসিতেছে। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন : “Unsophisticated Early man, wiser in his simplicity than some of his posterity, spoke of the Earth as the Great Mother.” কেন পৃথিবীকে মাতা বলি? কেমনা আমাদের এই মেহ, জীবজন্তুর মেহ, তরু-লতা-শুষ্ক যাহা কিছু ব্যবহার্য্য সব কিছুই মাতা বহুমতীর অঙ্গ হইতেই আমরা পাই, তাহারই দেহরসে আমরা সঞ্জীবিত। কিন্তু কেমন করিয়া এই পৃথিবী গড়িয়া উঠিল? সৌরজগতের সৃষ্টি হইল? বিশ্বজগৎ রূপ পাইল, তাহা কে জানে? পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় লইয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ইসলাম সকল ধর্মই আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের বিরচিত ধর্ম গ্রন্থ ও পুরাণের মধ্য দিয়া। সে কাহিনী সে উপাখ্যান বিজ্ঞান মানে না। না মানিলেও তাহার মধ্যেও এক বিরাট কল্পনা ও এক বিরাট অমুহূর্তি রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণকারেরা যে সব

কথা বলিয়াছেন তাহা যে কেহ আলোচনা করিলেই ঐ সকলের মধ্য হইতে কল্পনার বৈচিত্র্য অনুভব করিতে পারিবেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন :—

বেশ শূন্য, কাল শূন্য, জ্যোতিঃ শূন্য মহানুভূত 'পরি

চতুর্ধুখ করিছেন ধ্যান,

সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উৎখলিয়া,

আদিবৈষ্মন্যে বুলিলা নয়ান।

চারিমুখে বাহিরিল বাণী,

চারিদিকে করিল প্রয়োগ।

সীমাহারা মহা অন্ধকারে,

সীমামুখ ব্যোম-পারাবারে,

প্রাণপূর্ণ বটিকার মতো,

আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,

সঞ্চাতিতে লাগিল সে ভাষা ॥

• আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে বাস,

অষ্ট নেত্রে বিক্ষুব্ধ জ্যোতিঃ।

জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্য প্রভা বহি'

দ্বিরদিকে পড়িল ছড়ারে ॥

জগতের গদোদ্রী-শিখর হ'তে

শত শত স্রোতে

উজ্জ্বল অগ্নিময় বিশ্বের নিকর,

জলতার পাষণ-হৃদয়

শত ভাগে গেল বিদীর্ণিয়া ॥

তার পর কি হইল ?

মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া

জগতের মহা চিত্তানল ।

বহু বহু রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা

বিশু বিশু আধারের মতো বরষিছে চারিদিক হ'তে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে মুহূর্তেই যেতেছে মিশারে ।

স্বজনের আরম্ভ সময়ে আছিল অনাদি অন্ধকার

স্বজনের ধ্বংস-মুগাঙ্করে রহিল অদীম হত্যাশয় ।

অনন্ত আকাশপ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে

মহাদেব মুদি' জিন্ময়ান

করিতে লাগিলা মহাধ্যান ॥

এইখানে কবি পুরাণের কল্পনার সহিত বিজ্ঞানের আদর্শকে একাকীভূত করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে মানুষ যুগের পর যুগ সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে কল্পনা ও গবেষণা করিয়া আমাদের জ্ঞান তাঁহাদের চিন্তার দ্বারা সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সব কাহিনীর মূলে সর্বত্র একটা সত্য রহিয়াছে, তাহা এই যে এই বিরাট জগৎ একজন living creator অর্থাৎ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই স্রষ্টার কল্পনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ঘেষিতে পাওয়া যায়। কোথাও এক বিরাট পক্ষী; কোথাও কোন বিরাট জন্তু, কোথাও এক বৃহৎ বাজি, কোথাও জন্মা, তাঁহাদের দ্বারাই নানা রূপে এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যেমন মানুষের জ্ঞানের প্রসার হইল, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইল, তখন তাঁহারা কল্পনার রাজ্য হইতে আসিলেন নূতন চিন্তাধারার মধ্যে—প্রকাশ পাইল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটি 'প্রভাত সঙ্গীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে অনেক আগের কথা। কাজেই এ কবিতাতে সর্বত্র বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় নাই কিন্তু তবু কবিত্বের মাধ্যমে এই বৈজ্ঞানিক কবিতাটিকে আমরা The Birth of the world revealed by Astronomyর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি।

সমুদ্রের প্রতি কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

“হে আদি জননী, সিঁদু, বহুধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কথা তব কোলে। তাই উজ্জা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক জুড়ি' সধা লকা, সদা আশা,
সধা আন্দোলন।”

রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে আছে ;—

“আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্রোত থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন স্বর্ধাকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠে-ছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি জ্বলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত সন্তানকে মাঝে মাঝে উদ্ভট আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে কেল'চে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বদা দিয়ে প্রথম স্বর্ধ্যালোক পান করেছিলাম, নব শিশুর মত একটা অ জীবনের পুলকে নীলান্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠে-ছিলাম। এই আমার মাটির মাতাকে এই আমার মস্তক শিকড়-

গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর অন্তরস পান করেছিলাম।” কবির এই কল্পনার রূপটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুপ্রাণিত।

আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,

ভ্রমেতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন

কিছু কিছু মর্ম তা'র,—বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন

আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অস্তরের মাঝখানে

নাড়িতে যে-রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,

আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে—

যখন শিশুীন ভাবে ছিহু ওই বিরাট জঠরে

অজাত ভুবন-জগৎমাঝে—লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে

ওই তব অবিশ্রাম কলতান অস্তরে অস্তরে

মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম—পূর্বের স্মরণ—

গর্ভস্থ পৃথিবী-পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন

তব মাতৃহৃদয়ের, অতি কণি আভাসের মতো।

জাপে যেন সমস্ত শিরার, শুনি যবে নেত্র করি' নত

বসি' জনশ্রুত ভীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

দিক্ হ'তে দিগন্তের যুগ্ হ'তে যুগান্তের গণি।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়িলেই মনে হয় কবি পৃথিবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তিনি পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের কথাও যেমন জানেন, সেই প্রলয় পর্যায়ে জলের মধ্য হইতে কেমন করিয়া জননী ধরিত্রীর সৃষ্টি হইল, কেমন করিয়া প্রথম জীবনের সৃষ্টি বা অনুভূতি আসিল—সবই তিনি সুপরিজ্ঞাত। তাই বলিতেছেন :—

আমার পৃথিবী তুমি

বহু বরষের। তোমার স্বত্বিকাসনে

আমারে মিশিয়ে লয়ে অনন্ত গগনে

অশ্রাও চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ

সবিত্তমণ্ডল, অগংখ্য রজনীদিন

যুগ-যুগান্তর বরি'; আমার মাঝারে

উঠিয়াছে ত্বণ তব, পুষ্প ভারে ভারে

ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি

পত্রফুলদল গন্ধেরেণু।

কবি আদিজননী সিঁদুর গর্ভ হইতেই যে পৃথিবীর উৎপত্তি এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে প্রকাশিত করিয়াছেন অতি সুন্দর ভাবে। যথা—

গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন

তব মাতৃহৃদয়ের।

তখন আছিলে তুমি একাকিনী অধঃ অকূল

আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহারহত বিপুল

না বুঝিয়া।

প্রতি প্রাতে উষা এসে

অসুমান করি' যেতো মহাসম্মানের জয়দিন,

নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন

শিশুহীন শয়ন-শিথরে। সেই আদিজননীর

জনশ্রুত জীবশ্রুত মেহচকলতা সুপতীর,

আমার প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি; হৃদয়ে আমার
স্বপ্নান্তর-সুতি সম উদ্ভিত হ'তেছে বারম্বার।

‘ছিন্নপত্র’ কবি বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আত্মককার এই চকল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে উদ্ভিত হ'তে থাকত সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান জল-ধ্বনি শুনে তা যেন বোকা যায়।” কবি সমুদ্রকে আদিজননী বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদেই অমূল্য করিয়া।

বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক কবি পৃথিবীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কাব্যের ভিতর প্রকাশ করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত পৃথিবী নামক সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কবিতায় মধুসূদনের সাধারণ সহজাত ভাবের মাত্র প্রকাশ রহিয়াছে। মধুসূদন বলিতেছেন :—

“নির্মিষ্ট গোলকারে তোমা আরোপিয়া সবে
বিষমাবে স্রষ্টা, বরা, অতি হুই মনে।
চারিদিকে তারা চয় সুমধুর রবে
(বাজারে সুবর্ণ বীণা) গাইলা গগনে—
কুলবালা হল সবে বিবাহ-উৎসবে
হলাহলি দেয় মিলি বধু দরশনে।
আইলেন আজি প্রভা হেম বনা-নদে,
ভাসি ধীরে শূভরূপ সুনীল অর্ণবে,—
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা ভ্রাম-বাসে বর-কলেবরে;
আচলে বসায় নব কুলরূপ মনি,
নবকুলরূপ মনি, কবরী উপরে
দেবীর আদেশে তুলিলা নব রমণি
কটীতে মেঘলা-রূপে পরিলা সাগরে।”

ইহাতে কোনও বৈচিত্র্য বা নুতনত্ব নাই। মধুসূদনের এই কবিতাটিতে মূলতঃ সৃষ্টির কল্পনার দিক দিয়া কোনও অভিনবত্বই নাই। সেই পুরাতন কথা। আমাদের দেশের বেদ, পুরাণ, ঐষ্টানদের বাইবেল, আদিরিত্তা, ব্যাবিলোনিয়ার সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের ভিতর আমরা একই কথার আভাস পাই। বাইবেলে আছে—আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিষির উপরে ঈশ্বরের আভা বিলীন ছিলেন। Deluge বা দ্রাবনকাহিনী সকলের পরিজাত। আমরা আদিজননী কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কর্তৃক লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ বাংলা মারেরই মত সিঁদুর রেংবাকুলতা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের একটি গূঢ় সম্বন্ধ, যেহেতু অত্যাচার, নিপীড়ন, আকুলিষ্যাকুলিভাবে—প্রথম শ্লোকে সুপ্রকাশিত। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :

কমনী যেমন জানে জঠরের গোপন শিতরে,
প্রাণে যবে স্নেহ কাপে, শুনে সবে হৃদ উঠে পুরে।

দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক দিয়া কিংবা পুরাণতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিলেও অবশেষে সেখানে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই অমূল্য করিতে হইবে, কিন্তু কবির নুতনত্ব বরা পড়িল তাহার কল্পনার মাদুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রের প্রতি কবিতায় শব্দসম্পদ, বিখ-প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির অর্থও পরিচয়, এই কবিতায় দেদীপ্যমান। কবি বলিতেছেন,—

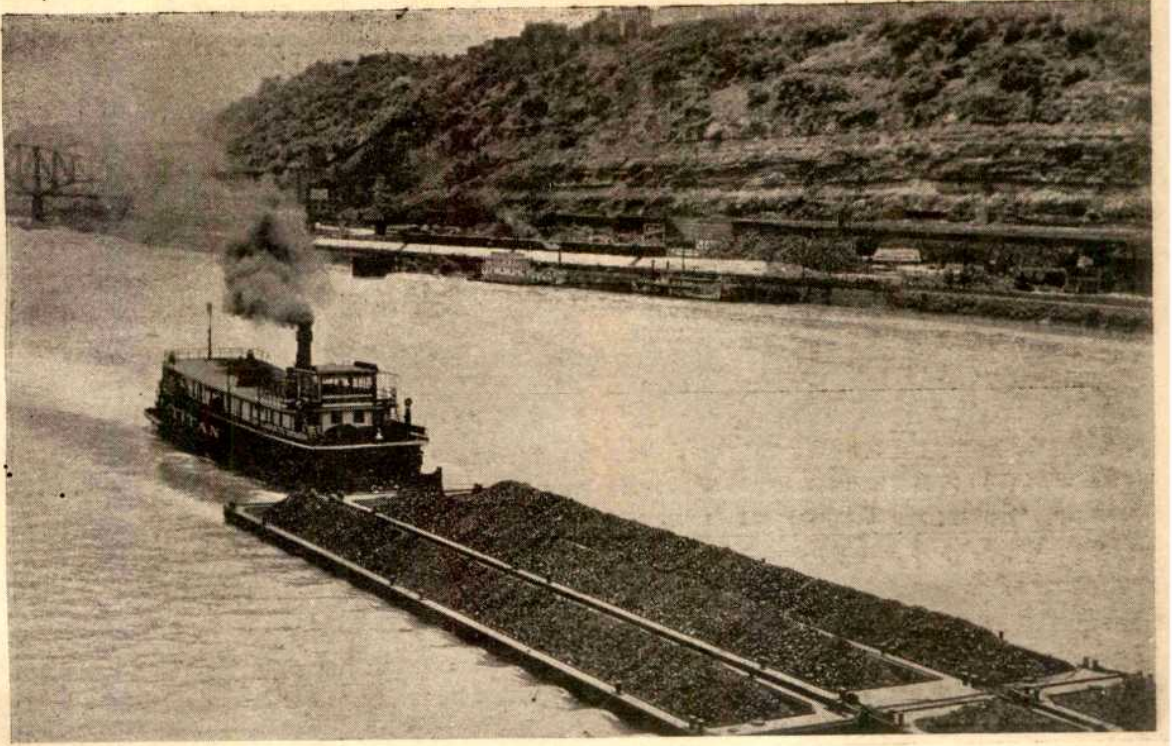
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজাত ব্যাধি তরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশার, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিক্ততলে
যেন নব মহাদেশ স্রবন হ'তেছে গলে গলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অমূল্য তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিরেছে সকারি
আকার-প্রকার হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাপের, অগোচর, প্রত্যক্ষের, বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তা'রে পরিহাসে, মর্ম্ম তা'রে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না জানে।

এই ভাবে আমরা কবির কল্পনার নুতনত্ব, দার্শনিকত্ব এবং তারতম্যের আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব ও আন্তরিক সহানুভূতি দেখিতে পাই সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে যেমন—

হে জলধি, বুঝবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা। জান কি তোমার বরাহুনি
পৃষ্ঠায় পীড়িত আজি কিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উচ্ছ্বাস,
নাহি জানি কী যে চায়, নাহি জানি কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাবে আপনি সে হারিয়েছে দিশা
বিকারের মহাচিকা-জালে। অতল গভীর তব
অন্তর হইতে কহ সাঙ্গনার বাক্য অভিনব
আবাচের জলর মস্তুর মতো। স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তা'র ভালে ভালে বারম্বার হানি',
সর্বদা সহস্রবার দিয়া তা'রে স্নেহময় চুমা,
বলো তা'রে “শান্তি শান্তি” বলো তা'রে

“ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা”।

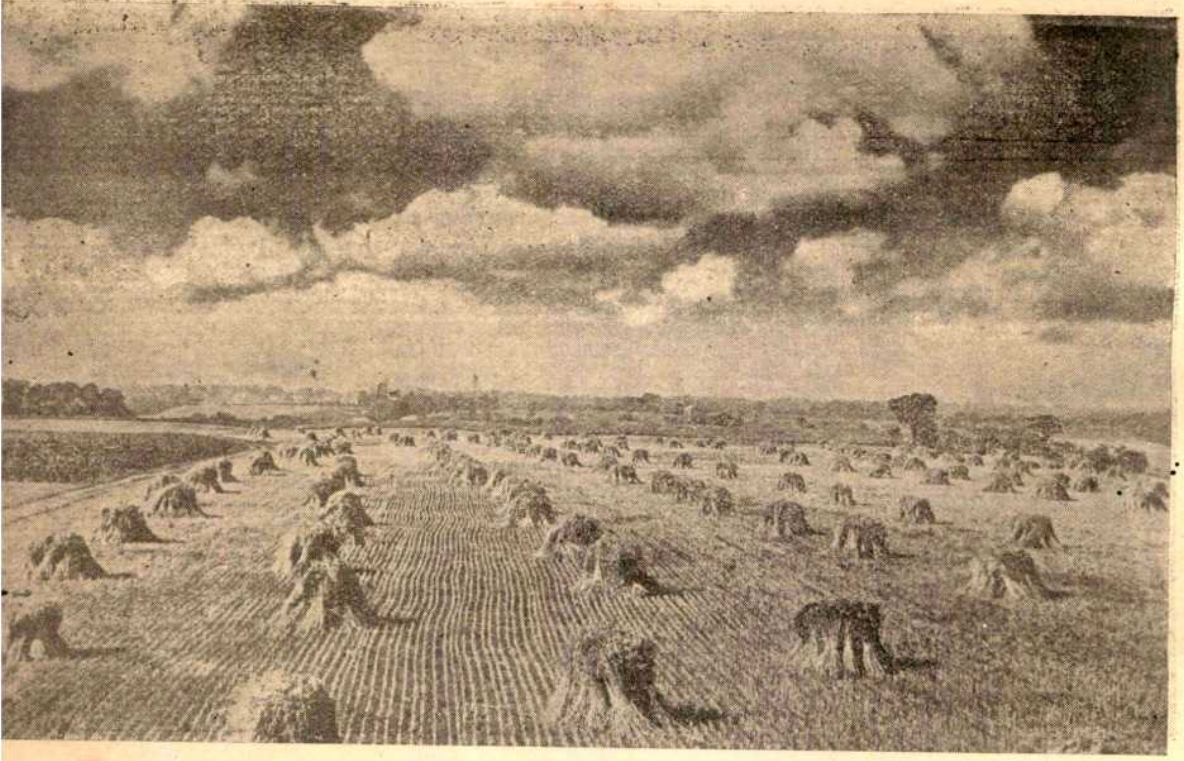
ওমর খৈয়াম, হাকিন্জ, ভোগের, নিজামি, আতার জেলাল উকীন কবি প্রকৃতির কবিতারও সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে কবিতা আছে। পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে বারদন টেনিসন এবং আরও অনেকে সমুদ্রের উপর কবিতা লিখিয়াছেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে লর্ড টেনিসন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লইয়া লিখিত হইয়াছে। এই কবিতায় এক দিকে জড়বাদ অল্প দিকে কল্পনার অপূর্ণ বিকাশ ভাবরাজ্যে এক নুতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কোন কোন কবি সমুদ্রের প্রতি কবিতা লিখিয়াছেন। মেঘনাদ-বর কাব্যে সমুদ্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে গাভীরা পূর্ণ বর্ণনা আছে। তাহার আদর্শ স্বতন্ত্র, সাধারণভাবে বর্ণনা মাত্র।



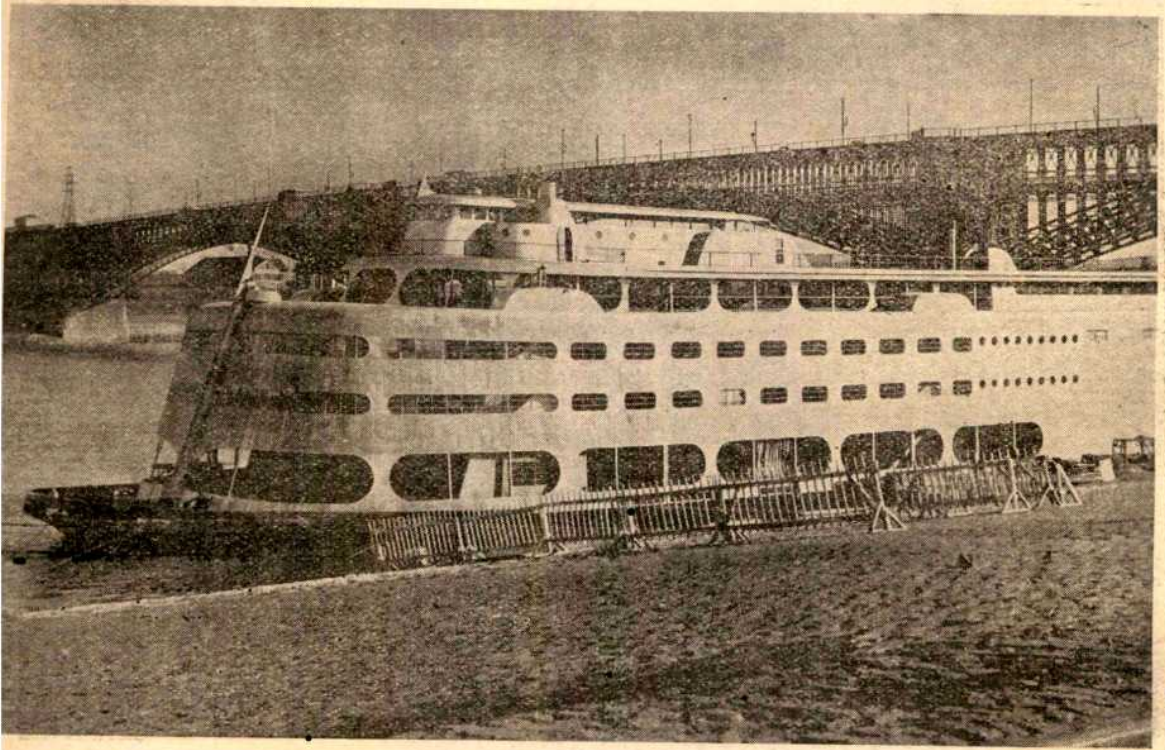
ইন্ডাভের বজরা মিসিসিপির উপর দিয়ে বন্দরাভিমুখে চলিয়াছে



পিটসবুর্গ, পেনসিলভানিয়া। ওহিও নদীর পোল



মিসিসিপি নদীর তীরে গমের ক্ষেত



সেণ্ট লুইয়ে মিসিসিপি নদীর উপরকার ইড্‌স ব্রিজের নীচে একটি আধুনিক থেয়া নৌকা

পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের 'আদি মন্ত্রটি' রবীন্দ্রনাথ নানা বয়সে, নানা সময়ে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই লব পণ্ড ও গজ রচনার মধ্যে কবির বৈজ্ঞানিক মন সৃষ্টির রহস্য-জাল ছিন্ন করিয়া তাহার মূল-রহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। এখানে দৃষ্টান্ত দিতেছি। পত্রপুটের 'পনের' শীর্ষক অসম হৃদয়ের কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেরেছি আপন পুলক কম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।

পেরেছি নারকেল শাখার কালর-ঝোলা

আমায় বাগানটিতে।

তেড়ে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।

প্রথম প্রাণের বহি-উৎস থেকে

নেমেছে তেতোমরী লহরী,

দিয়েছে আমার নাড়ীতে

অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

আমার চৈতন্তে গোপনে দিয়েছে নাড়া।

অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা,

প্রাচীন স্বর্ষের বিরাট বাস্পদেহে বিলীন

আমার অব্যক্ত সত্তার ক্ষুরণ।

হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেরে

আলোর নিঃশব্দ চরণ ধ্বনি'

তুনেছি আমার রক্ত-চাকল্যে।

সেই ধ্বনি আমার অহুসরণ করেছে

জন্ম পূর্বের কোন পুরাতন কাল যাত্রা থেকে।

বিশ্বের আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে

যখন ডেবেছি

সৃষ্টির আলোক-তীর্থে

সেই জ্যোতিতে আঁক আঁখি জ্বাঞ্জ

সেই জ্যোতিতে অমৃত নিরুত বৎসর পূর্বে

সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

তারপর আবার এক স্থানে বলিয়াছেন :—

সৃষ্টির কারণে বেয়ে যে-রস নামছে আকাশে আকাশে

তাকে জেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।

সেই রঙীন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে

যেমন লেগেছে ধানের ক্ষেতে,

যেমন লেগেছে বনের পাতায়,

যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।

এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আঁকে দিনের বিশ্বহরি।"

সৃষ্টির সহিত মানুষের জীবনের যে অখণ্ড সংযোগ রহিয়াছে তাহা আমরা অনুভব করি অথচ প্রকাশ করিতে পারি না তাহাই কবি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। কবি বলিতেছেন—সৃষ্টির আলোকতীর্থে গ্রহভারকা মণ্ডল মধ্যে সৌর জগতে যে আলোক-তীর্থ বিরাজিত, তাহারই জ্যোতিঃ প্রভার করির অন্তর জাগিয়া উঠিয়াছে। যে আলোকে পৃথিবী হাসে, যে আলোকে ধরণীর জীবজন্তু প্রফুল্ল হয়, যে আলোকে সর্বলোককে আনন্দময়

করিয়া তুলে সেই সৃষ্টির আলোকতীর্থে সেই জ্যোতিতে কবির হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই প্রতিধ্বনি স্তমিতে পাই কবির বিভিন্ন কবিতায়, বিভিন্নরূপে কিন্তু মূল সুর সেই একই ভাবে গুঞ্জনিত হইতেছে।

"এই তো তোমার আলোক-বেশ স্বর্ষ্য তারা বলে বলে,

কোথাও ব'সে বাতাসে বেগু চরাও মহা-পগনতলে।

ভূগের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্রায়ণ পাতা,

আলোর-চরা বেগু এরা ভিত্ত করেচে কুলে-কর্লে।"

আবার স্তমিতে ছি,

"আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আবার ঘাটে।

'মিনাস্তের' গানে স্তমিতে পাই আবার সেই সুর—সেই মূলতত্ত্ব (key-note)

এই জীবনের আলোকেতে, পারি তোমার দেখে যেতে,

পরিয়ে যেতে পারি তোমার আমার গলার মালা।"

কবি পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, আলোকতীর্থের সহিত যে যোগ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নানারূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

'বনুদ্ভরা' কবিতা ২৬শে কাটিক ১৩০০ সালে লিখিত এবং 'দোনার তরী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির 'জীবনমুখতি'তে তাঁহার 'ছিন্নপত্র'ে কবি কবিতার মূল স্বরূপ নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রালকম্বে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি পড়িয়া যে সত্যটি অন্তর মধ্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল সে কথা তিনি সর্বদা ভাবেন, বিশ্বের পরিচয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অবশেষে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারি।

এ কথা অতি সত্য, কিন্তু ভবুও তত্ত্বাধেয়ী মন নান্যভাবে সৃষ্টিরহস্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। এ প্রশ্ন চিরন্তন। এ ভাব এ চিন্তা ও তাহার সমাধান করিবার জন্য অনাদিকাল হইতেই মানুষের চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। কিন্তু উত্তর মিলে নাই। কবি জন্মে জন্মে যে একটি সংযোগহীন আপনাকে সৃষ্টির অব্যক্ত এবং অপরিজ্ঞাত সত্তার সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন, একটি অহুত্বতি বোঝ করিতেছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদকেই কবি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সৌরজগতের সৃষ্টি, সেই আলো, সেই স্বর্ষ্য, সেই গ্রহভারায় অনন্ত আকাশ আর এই গ্রামলা ধরণী, সকলের মধ্যেই যে জীবন বিজড়িত ছিল, সেই জীবন নানা ভাবে নানা রূপে নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া জগৎকে প্রাণিপূর্ণ করিয়াছেন। মানব তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিযাজ্ঞ। 'বনুদ্ভরা' কবিতায় সেই যে অভিযাজ্ঞিবাদ তাহাই অতি সূক্ষ্মর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে কবি শুধু কবি নহেন, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টিতত্ত্বও তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :

ওগো মা স্বপ্নায়ি,

তোমার স্বপ্তিকা মাঝে ব্যাঙ হ'য়ে রই,

দিশিধিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া

বসন্তের আনন্দের মতো। বিদ্যারিয়া

এ বক্ষ-পঙ্কর, টুটুয়া পাখাণ-বন্ধ

সকল প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ

অন্ধ কারাগার। হিল্লোলিয়া, মন্দিরিয়া,
কম্পিয়া, খলিয়া, বিকিরিয়া, বিছুরিয়া,
শিহুরিয়া, সচকিয়া আলোকে পূজকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত ভাগে।...

এইখানে 'হিল্লোলিয়া', 'মন্দিরিয়া', 'কম্পিয়া', 'খলিয়া',
'বিকিরিয়া', 'বিছুরিয়া', 'শিহুরিয়া', 'সচকিয়া', 'প্রবাহিয়া' প্রভৃতি
ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে একটা অশ্রান্ত ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়।
কবি যেন আপনার প্রাণকে প্রকৃতির সবকিছু বৈচিত্র্য, সবকিছু
গতি-ভঙ্গীর মধ্যে বিলাহিয়া দিতে চাহিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বজনীশক্তির মূলে একটি যোগমুগ্ধ লক্ষ্য করিয়া-
ছেন। কবি বলিয়াছেন, "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর
সঙ্গে এক হয়েছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত,
শরতের আলো পড়ত, স্বর্ধ্যকিরণে আমার স্তূরবিভূত জামল
অন্দের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের স্নগদ উত্তাপ উথিত
হতে থাকত আমি কত দুঃস্বপ্নের, দেশদেশান্তরের জলহল ব্যাণ্ড
করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিশ্চলভাবে শুয়ে পড়ে থাকতাম,
তখন শরৎ স্বর্ধ্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটা আনন্দ-
রস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত
প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত—তাই যেন ধানিকটা
মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত,
অঙ্গুরিত, মুক্লিত, পূজিত, স্বর্ধ্য-সনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব।
যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং
গাছের শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত
শব্দক্ষেত্র রোমাক্ত হতে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক
পাতা জীবনের আবেগে ধর ধর করে কাঁপছে।"

"এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক
জন্মকার ভালবাসার লোকের মতন চিরকাল নতুন। * *
জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া
ভগবানই আমাদের টানিতেছেন অপর কাহারও টানিবার
ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের
পরিচর পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি।
জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের
আবাদন।"

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে সৃষ্টির রূপ ও তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ়ত্ব
কবির স্রমধুর স্তরগুণনে প্রকাশ পাইয়াছে :

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অনংঘ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মুক্তিকার পাত্রখানি ভরি বারবার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিস্মৃত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ্য বৃত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আহলা তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে ॥ ইজিরের দ্বার
স্বস্ত করি' যোগাসন, সে নহে আমার।

যে কিছু আনন্দ আছে দুহে গড়ে গানে
তোমার আনন্দ রবে তা'র মাঝখানে ॥

তাই কবি বলিতেছেন :

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই বজ্রাত আলোকে
কেন অন্ধকারে যদি পথ খুঁজে খুঁজে।

কবি জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে সর্বত্র একটা আনন্দের
ধারা প্রবাহিত হইতেছে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি তৃণ, মাটি,
জল সর্বত্রই অনুভব করিয়াছেন প্রাণের পূজক-শিহরণ।
সেজতাই বলিতে পারিয়াছেন :

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীবসাথে যদি কিরি ধরাভাগ
কিছুভেই নাহি ভাবনা।

যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবহীন আপনা।

* * *
তৃণ রোমাঞ্চ ধরতির পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেরে দেশি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পূজকে।
মনে হয় যেন স্থানি
এই অকথিত বাণী,

মুক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত সুগন্ধ মোরা ঘেঁষেছি
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দৌড়ে কঁপেছি।

কবি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া সৃষ্টির গভীর রহস্যের
সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অনুভব করিতেছেন অনাদি অতীত ও
অনন্ত ভবিষ্যতের সৃষ্টিধারা;—সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের রূপটিও
কবির নিকট প্রত্যক্ষ।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ কিরণ কণিকা
গাঁধ নাকি মোর জীবনে?
কি মূর্তি মাঝে কুটালে আমারে,
সেদিন লুকায়ে প্রাণে?
হে চির পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নুতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চির দিন-ধরিতা ॥

Evolution বা ক্রমবিকাশের মধ্যেই রহিয়াছে সৃষ্টির রহস্যের

প্রকৃত তত্ত্ব। কবি এ কথাটি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।
সেইজন্মই নিখিল ভুবনের সর্বত্র একটা যে যোগসূত্র অমূল্য
করিতেছেন তাহা এই :

তুণে পুলকিত যে মাটির বরা লুটায় তোমার সামনে,
সে আশায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেনে।

মনে হয় যেন সে ধুলির তলে

যুগে যুগে আমি ছিহু তুণে জলে

সে ছয়ার ধূলি' কবে কোন্ হলে বাহির হোয়েছি ভ্রমণে ;

সেই মুক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেন করিয়া তাকায় আমার প্রাণে সে,

লক্ষ যোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে।

যে ভাষায় তারা করে কানাকানি

সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,

চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে দে।

অমাবসি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে ॥

বহু রে আমি অনন্তকাল, বহু আমার বরণী,
বহু এ মাটি, বহু সূর্য তারকা হিরণ বরণী।

যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,

নাহি জানি জ্ঞান কেন বল করে।

আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুল ভুবন-তরণী

যা হয়েছি আমি বহু হয়েছি বহু এ মোর বরণী।

কিন্তু এই যে আত্মীয়তা, এই যে একপ্রাণতা, তাহার মূল-
তত্ত্বের আবিষ্কারে কবির বৈজ্ঞানিক মন ব্যাকুল এইজন্মই
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব, নীহারিকার আবির্ভাব, সৌর-
জগতের প্রকাশ, আমাদের জননী বহুব্রহ্মার সৃষ্টির ক্রমবিকাশের
ইতিহাস অহুলস্থান করিতেছেন। কোন্ অঙ্কার যুগ হইতে,
কি ভাবে প্রকাশ পাইল অনন্ত আকাশের ব্যবধানের অপকল্প
সৃষ্টিলাভের ক্রমবিকাশমান হ্রাসমান সূর্য্য এবং কি ভাবে তরু-
লতা ও প্রাণিজগতের বিবিধ প্রাণীর আবির্ভাব হইল, যে সৃষ্টি
যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ অবিস্রাজ্ঞ ভাবে জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা
করিয়া চলিয়াছে সমভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস দ্বারা। সে রহস্যের
আবরণ-উন্মোচনপ্রয়াসী কবি বলিয়াছেন :

পদে পদে ভূমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আঁখি নাহি পাই ঠিক
ক্রান্ত হৃদয়, ভ্রান্ত পথিক

এসেছি নতন দেশে,
কখনো উদার গিরির শিখরে
কছু বেদনার তমো গহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

তাই দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গৃহ গান গাহে।

কবি জীবনে যে বিশ্বপ্রেম, সর্বস্বাতির মধ্যে অনন্ত
ঐক্যের মূলমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহাই হইতেছে কবির মহা
মিলনের বাণী :

“সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া।”

আবার বলিতেছেন,

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে। নদীস্রোতোমীরে
আপনারে গলাইয়া ছই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক’রে যাই দান
পিপাসার জল, পেয়ে যাই কলগাম
দিবস নিশীথে।

* * * ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উদ্ভুদ্ধ করি পান
মরুতে মারুৎ হই মানব-সন্তান
হৃদয় স্বাধীন। তিব্বতের গিরিভটে
নির্গিষ্ট প্রান্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপাত্রী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাহার নির্ভীক
অধারচ, শিষ্টাচারী সতেজ আপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিধিনামান
কর্দ্ব অমরত, সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক’রে লই যেন ইচ্ছা করে।

রবীন্দ্রনাথ জগতের রূপ রস গন্ধ ও বর্ণে মুগ্ধ ছিলেন,
পৃথিবীকে শত রূপে শত ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন।
তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভীর্ণ দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়া বলিত-
ছেন,

এই ভীর্ণ দেবতার বরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পুজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইলু সযত্ন-চরনে
সারাক্ষর শেষ আয়োজন, সে পূর্ণ প্রণামধানি
মোর সারাজীবনের অন্তরে অনির্বাক্য বাণী
জালায়ে রাখিয়া গেহু আরতি সজ্যা-দীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি ষত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ বরষণে।
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কপিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে, দার ধুলে দুঃখ বটিকা
বারবার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ’লে
দেবতার পথ-চিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা মিল তোমাদের সকলের নাম।
বহিল পুজার মোর তোমাদের সবার প্রণাম।

কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির উদ্ভবের মধ্যেই
অনন্তের নিত্য লীলা প্রত্যক্ষীভূত করিয়া সকলের মাঝখানেই
‘চিন্তের স্থাপন’ করিয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে চিরন্তন
রহস্য অজ্ঞাতরূপে মানব-মনকে বিচলিত করছে সেই সৃষ্টির লীলা-
সন্ধানী কবি নানাভাবে তৎসম্বন্ধে কখনও কল্পনায়, কখনও
বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কখনও বা পুরাণ ও শাস্ত্রমতামুসারে
আলোচনা করিয়া যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা

অতুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের উদারতা এই সব কবিতার মধ্য দিয়া কি হৃদয় ভাবেই না প্রকাশ পাইয়াছে।

মহাপ্রাণ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি :—

জগতের মহা বেদবাস,
গঠিলা নিখিল উপভাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্ব নীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা
চক্রপথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে-লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
মহাজ্ঞান মহা অহুপ্রাণ
শূণ্ডে শূণ্ডে বিভারিল পাশ।

কবি প্রাণের অশ্রান্ত গতিবেগের মধ্য দিয়াই স্বপ্নের রূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ‘নৈবেদ্যে’ প্রকাশিত তাঁহার ‘প্রাণ’ কবিতাটিতে তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা এখানে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাজিহীন যায়।

সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-মিথিদ্ধয়ে,
সেই প্রাণ অপকল্প ঘন্থে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চূপে চূপে
বহুবার স্বত্বিকার প্রতি মোহকূপে
লক্ষ লক্ষ ভূণে ভূণে সকারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পূর্ণে বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জঘন্যত্বা সমুদ্র-দোলায়
হুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটার
করিতেছি অহুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীমান্ন।

সেই যুগযুগান্তর বিরাট হৃদয়
আমার নাড়িতে আজ করিছে নর্দন।

পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবি রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ লইয়া ব্যাপকভাবে মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেন নাই—একথা এই প্রসঙ্গে সগৌরবে উল্লেখ করিতে পারি।*

* রবিবাসরের উত্তোকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে অহুজ্জিত প্রথম সভাবিবেশনে রবীন্দ্রনাথের বিচিন্তা শুবনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

বাঙালীর বাংলা

শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়

বাংলার কবি আশীর্ষচন্দ্র উচ্চারণ করেছিলেন :

বাংলার মা’টি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হটক পুণ্য হটক
পুণ্য হটক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ধরে যত ভাইবোন
এক হটক এক হটক
এক হটক হে ভগবান।

কিন্তু বাঙালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি, সে বারবার ভুলে যায় তার ইতিহাস, তার অতীত, তার কীর্তি; সে অন্যমনা হয়ে যায় তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি। বাংলার বৈশিষ্ট্যের, তার ভাষার, তার ভাবসম্প্রদায়ের, তার স্বকৃতি বৈচিত্র্যের, তার ভাব-প্রেরণার, তার কল্পনা-সম্প্রদায়ের স্বরূপাত কোন ক্ষুণ্ণমানে হয়েছিল ইতিহাস তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নির্দেশ করে না।

মেগাস্থিনিসের পর্যটন-কাহিনীর ভিতর তাত্ত্বিকতার (অধুনিক তত্ত্ব) প্রধান স্থান ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের একত্র বিবরণ অন্ততঃ ইহা প্রমাণ করে যে ইতিহাস-রিস্কৃত যুগ হতে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার বহু সম্বন্ধ ও বহু আদ্যমুদানের বিনিময় কেবলমাত্র সম্ভব ছিল না,

হুমিষ্ঠিত ছিল। পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণ পাটলিপুত্র ও গৌড়ের সঙ্গে বহু স্নেহবন্ধনে বেশবাসীদের আবদ্ধ করেছিলেন তার বিখ্যাসযোগ্য প্রমাণ অপ্রতুল নয়। মগধ মিথিলা মবধীপের পূর্ব ইতিহাস, নালন্দার রাজগৃহের পূর্ব বিবরণ এ বিখ্যাস সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। বিভাপতির পদ্মাবলী বাংলা ও মিথিলার ভাষা সাবুদ্র উভয় দেশের সংস্কৃতির সাম্য প্রমাণ করে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদরাও আজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাবসাম্যই প্রকৃত সাম্য আনে। (Cf. Gerald Heard’s Sub-conscious Cohesives.)

মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তারকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্যবিপর্যয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংঘটিত হয় কিন্তু এক কথা ইতিহাস নির্দেশ করে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় প্রায়ন্তেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই শাসনতন্ত্রের সমষ্টিরূপে একই গভীর অন্তর্গত বলে পরিগণিত হয়েছিল। “সুবা” বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সেই সময় হতে একই গভীররূপে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের অধিকারে আসে। ষষ্ঠ ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-ভার গ্রহণকাল হতে হবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একই শাসন-ভারের অন্তর্ভুক্ত সমষ্টিরূপে পরিচালিত হয়। বাংলা প্রদেশ শাসনের প্রথম সাংবৎসরিক সমালোচনা (First Administration Report of the Province of Bengal

of 1855-56) প্রকাশিত হয় দর ফেডারিক হালিডের আমলে। লর্ড ডালহৌসি বাংলাকে হাটকাট করে তার যে রূপ দিয়েছিলেন এই রিপোর্টে তাই দেখা যায়। বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখান হয় :

বিহার	৪২০০০ বর্গমাইল
বাংলা	৮৫০০০ " "
উড়িষ্যা	৭০০০ " "
উড়িষ্যার করম্ব মহাল	১৪৫০০ " "
হোটনাগপুর	৬২০০০ " "
আসাম	২৭৫০০ " "
আরাকান	১৪০০০ " "

মোট—২৫৩০০০ " "

আরাকান অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসাম ১৮৭৪ সালে পৃথক চীফ কমিশনারের প্রদেশে পরিণত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা নিম্নবিন্যাসে ১৯০৪-৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ১৯০৩-৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লর্ড কার্জন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব করেন। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে [পরে ইহা পার্লামেন্ট কমাণ্ড ২৬৫৮ (১৯০৫)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়] বলেন যে, “বাংলার শাসনতন্ত্র লোকবৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য জটিল হয়ে উঠছে” এবং “এই কারণে এই শাসনভার লব্ধ করতে হলে বাংলাকে বিভক্ত করা ভিন্ন উপায় নাই।” বাংলার এই অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। কুপল্যাণ্ড সাহেবের দাব প্রকাশিত ভারতীয় রাষ্ট্রিক প্রশ্নের সমালোচনার কিন্তু ইহার উল্লেখ পর্যন্ত নাই। এই আন্দোলনে বাঙালী প্রথম বুঝে যে শাসকদের ব্যক্তি অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, এর পিছনে আছে বাংলার শক্তিকে ব্যাহত ও ধ্বংস করার প্রয়াস ও অতি-সঙ্কট। হিন্দু বাঙালীর বুদ্ধি বিত্ত ও প্রগতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কখনও সহ্যহুত্বের চোখে দেখেন নাই। বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তদানীন্তন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, “বেশ বুঝা যায় সরকারের ব্যক্তি উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর স্বাধীনতা ধ্বংস করা, কলিকাতার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা এবং বাংলার শিক্ষিত হিন্দুদের দমন করার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সাহায্যে ইংরেজের সুবিধাজনক শক্তি সংগঠন।”

এই সময় হতেই ইংরেজের মুসলমানপ্রীতি উগ্র হয়ে ওঠে। মুসলমানেরা সরকারের সুযোগার্থী বলে পরিচিত হন। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বাংলার মুসলমান প্রধানতঃ বাংলার নিম্নস্তরের হিন্দুরই সম্মান, মুসলমান ধর্ম দীক্ষিত হয়ে মুসলমান বলে পরিচিত হয়েছে। আধুনিক ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সব ভ্রমের মুসলমানকে আরবনিবাসী বিবেচনা ও হাল সাফিন বাংলা বলে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন সরকারী বা বেসরকারী রিপোর্টে হিন্দু-মুসলমান-দ্বন্দের উল্লেখমাত্র না থাকে। সত্ত্বেও হিন্দুর অত্যাচারে মুসলমানের প্রগতি বন্ধ হয়েছে এই কথা প্রচার করতেও এঁরা লজ্জাবোধ

করেন না। এঁদের প্রচারকার্যের ফলে বাংলার মুসলমান বিশ্বাস করতে শিখল যে তারা আরবের লোক, তারা বিবেচ্য। হিন্দুদের দ্বারা ইহা বারংবার পুনরাবৃত্ত ও উদ্ভূত হতে পারে নাই। ঢাকার মবাব সলিমুল্লা অকর্মণ্যতার ফলে বিনষ্টপ্রায় কমিয়ারী রক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হতে অর্থ সাহায্য পেয়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিদান দিলেন। তাঁর চেয়ে অনেক শোচনীয় অবস্থাতেও অন্য কোন কমিয়ারের ভাগ্যে সরকারী তহবিলের সহায়তা লাভের দোভাগ্য হয় নাই। মুসলিম লীগ সৃষ্টি, লর্ড হিটোর সঙ্গে দলবদ্ধ সাক্ষাৎ, পৃথক নির্বাচন ও অবশেষে অগ্রদূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও সেই বাঁটোয়ারা-নির্মিত মজিমুলীর দ্বারা সমস্ত জাতীয় জীবনকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যশক্তিকে আচ্ছন্ন করার ইতিহাস সুবিদিত। মিথ্যার প্রশ্রয় দানের ফল ইংরেজের কাছেই হয়েছে সবচেয়ে মর্মান্তিক। আজ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব আছে কিন্তু সম্রাট নাই, রাষ্ট্রতন্ত্র আছে কিন্তু আত্মগত্য নাই, রাজ্য আছে কিন্তু প্রজা বিদ্রোহী ও প্রজাহীন।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ১৯১২ সালে আবার বাংলার সীমা পরিবর্তন করা হ'ল। এই পরাজয়ে বাঙালীর উপর ইংরেজের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। বঙ্গ বিচ্ছেদ রহিত হ'ল বটে কিন্তু বাংলার পশ্চিম প্রান্তের সমৃদ্ধ জেলাগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হ'ল। মানস্ফু, বলস্ফু, জামতাড়া, রাজমহল, পাবুড় প্রভৃতি বহু অঞ্চল বাহা বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ও যাদের ভাষা, সমাজ পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও ভাবমস্তাবের সঙ্গে বাংলার কোন স্মিল নাই তাদের কোর করে বিচ্ছিন্ন করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিয়ে বাঙালীকে আত্মত্যাগ করার চেষ্টা চলল। সর্বপ্রকার ভাষাবিগৃহীত, যুক্তিবিগৃহীত ও নীতিবিগৃহীত পদ্ধতির দ্বারা বাঙালী হিন্দুকে ছর্ব্বল করার চেষ্টা চলতে লাগল। ছুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে মেতাদের কাহাকেও কাহাকেও যোগ দিতে দেখা গেল।

ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণ কংগ্রেসও সমর্থন করেছেন এবং এই ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনই সব চেয়ে ভাল। ভাষার ভিত্তিতে বাংলার সীমা পুনর্নির্ধারণের আন্দোলন আমাদের অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার। বিভক্ত বাংলার যে অংশগুলি যথা মানস্ফু, বলস্ফু, রাঁচি, হাজারিবাগের একাংশ জামতাড়া, পাবুড়, নাহেবগঞ্জ, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি বিহারের সঙ্গে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। বিভীষিতঃ, আদিবাসীদের যে সব অঞ্চল বহু দিন বাংলার সঙ্গে ছিল এবং যেগুলি বাংলার মদী সংস্কার ও লেচ পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বাঙালী ও আদিবাসী উভয়েরই কল্যাণের জন্য সেগুলিকে বাংলার ফিরিয়ে আনা দরকার। তৃতীয়তঃ, বাঙালীর স্বার্থ ও কল্যাণ বিবোধী যে সব লক্ষ্যনামা বিভিন্ন প্রদেশে প্রণীত হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা করে অম্যায় আদেশগুলির উচ্ছেদ সাধনেরও সময় এসেছে। চতুর্থতঃ, ভিন্ন প্রদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত রাখবার জন্য সমবেত চেষ্টাও আবশ্যিক।

পেশাদার জুয়াড়ী বা দ্যূতকার

শ্রীমদ্ভগবতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র ও প্রকৃতিতে, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে, অল্প-বিস্তর প্রভেদ আছে। এক এক জন এক একটি বিষয় আশ্রয় ও অনুধাবন করে ও তা থেকে সুখ পেতে চেষ্টা করে। ভিন্ন-রুচিই লোকাঃ। বান্নোকেপ বা ধিয়েটার দেখা, ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ দেখা, পুরাতন টিকিট সংগ্রহ করা, নভেল পড়া, ছুড়ি উদ্ভান, মাছ ধরা, শিকার করা, সাঁতার কাটা, ভাস, দাবা বা পাশা খেলা, নাচ গান বাজনা, ছবি আঁকা, জিম্নার্স্টিক বা কুস্তি করা, গল্প করা, আড্ডা দেওয়া, বৃথা ঘুরে বেড়ানো, যাত্রা বা ধিয়েটারে অভিনয় করা, স্টাউট হওয়া, দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা, দেশোদ্ধারের জন্ত দল বেঁধে কোনও মতবাদ প্রচার করা প্রভৃতি কাজে আগ্রহ, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ব্যাপারের আগ্রহকে ‘সখ’ বলা হয়, সখের মাত্রা বেশী হলে তাকে ধৌক এবং মাত্রা আরও অতিরিক্ত হলে নেশা বলা হয়। বহু লোকের মধ্যে কোনও বিষয় বা ব্যাপার সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রবণতা, উৎসাহ বা তদ্ব্যস্ততা দেখা যায়। সাধারণতঃ সখের সঙ্গে জীবিকার চেষ্টা বা সম্পর্ক দেখা যায় না।

এই সব সখ, প্রবণতা ধৌক বা নেশা, যে কেন জন্মায়, তা মনোবিদের বিচার্য। সখের উৎপত্তির কতকগুলি কারণ সকলের বোধগম্য। আনন্দ লাভ করা এক প্রধান উদ্দেশ্য—আনন্দ প্রাণীমানুষেরই কাম্য। লোকে যে ভাবে মানুষ হয়, যাদের কার্যকলাপ অহরহ দেখে, যাদের উপর ভালবাসা বা উচ্চ ধারণা তাদের থাকে এবং যাদের সঙ্গে যেনে, তাদের অনু-করণ করতে শেখে। অভ্যাসের ফলে, ক্রমে ক্রমে অনেক সময়ে সখ ও ধৌকের মাত্রা বেড়ে যায়। নেশা বেড়েই চলে, তাকে হাড়া যায় না। ক্রমে নেশা কর্তৃমানা হয়। কর্তৃমানা নেশাকে শাস্ত্রকারেরা ‘বাসন’ বলেন। বাসনাকে লোকে নিন্দা করে।

সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্। কতক প্রকারের ধৌক, নেশা বা বাসন আছে যা সমাজের পক্ষে তত অনিষ্টকর নয়।

আবার এমন অনেক নেশা বা বাসন আছে, যেগুলি সমাজে বিশেষ ভাবে নিন্দিত হয়, মাত্রা ছাড়ালে এগুলি ‘অপরোধে’র মধ্যে গণ্য হয়। যেসব মনোবিদ নিজস্ব মনের আলোচনা করেন, যারা সাইকোলজ্যানালিষ্ট বা মনঃসমীক্ষক বলে পরিচিত, তাঁরা অতিরিক্ত ধৌক বা নেশাকে—যার সম্বন্ধে এখন বলব—মানসিক রোগের পর্যায়ে গণ্য করেন। ‘সাদা কথা’র তাঁরা ঐগুলিকে ‘মানস-বিকার’ বলে বিবেচনা করেন। এই শ্রেণীর ধৌক বা নেশার উদাহরণ দিতে গেলে, সিদ্ধি, গাঁজা, কোকেন, আফিং ও মদের নেশা এবং পণ্য-জী ও দ্যূত-জীভার আসক্তির কথা প্রথমে মনে আসে।

‘নিজস্ব মনে’র সম্বন্ধে হুঁচার কথা না বললে, বিষয়টি পরে সহজে বোঝানো যাবে না। মনের যতটুকু আমরা জানি বা জানতে পারি, তা অতি সামান্য; আমাদের মনের বেশীর ভাগ ভরই আমরা সাধারণতঃ জানি না; এই অংশকে নিজস্ব মন বলা হয়, মানুষের মনের জাত অংশকে তার

দেহের বাইরের দৃশ্যমান অংশের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। শরীর যেমন তার ভিতরের অদৃশ্য যন্ত্রের ক্ষিপ্রাভে রক্ষিত ও চালিত হয়, মানুষের জ্ঞানগোচর মনও সেইরূপ নিজস্ব মনের দ্বারা বহুল পরিমাণে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজস্ব মন জ্ঞাত মন অপেক্ষা আয়তনে অনেক গুণ বেশী। নিজস্ব মন সখ এবং আনন্দ লাভের বহুবিধ কামনা ও যৌন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরস্পরবিরোধী, বহুবিধ সুখলাভের এই সকল ইচ্ছা নিজস্ব মনে একত্র বাস করে। আমরা এই সকল ইচ্ছার বিশেষ কোন ধর জানি না। পরিবারের মধ্যে মাতাপিতা, শাস্ত্রী, আত্মীয়-পরিজন, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির সহিত মেলামেলামির ফলে শৈশবে মানুষের আদর্শ, মৌলিক স্বার্থপর প্রবৃত্তিগুলি, নিজস্ব মনে নির্ধারিত হয়; ক্রমে অপরের দিকটী ভেবে লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান ও বিবেকের উদ্ভব হয়। উহা বাহ্য জগতের সম্পর্কের ফলে তার প্রতীক রূপে উড়ে এসে জুড়ে বসে। যে বাবা-নিষেধ, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান, প্রথমে শৈশবে বাইরের ব্যাপার বলে বিবেচিত হ’ত, তা অন্তঃ-প্রবৃত্তি হয়ে বিবেক-জ্ঞানে পরিণত হয়।

এবার জুয়াড়ী বা দ্যূতকারের প্রসঙ্গে আসা যাক। শেয়ার-ব্যবসায়ীর ও জুয়াড়ীর মনোবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। শেয়ার-ব্যবসায়ীরা যেমন ভবিষ্যতে দর চড়বে কি নামবে, এই অনিশ্চিত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত হন বা মনে মনে আলোচনা করে থাকেন, জুয়াড়ীরাও সেইরূপ অনিশ্চিত ব্যাপারের উপর, পণ বা বাজি রেখে, অর্থ-লাভের চেষ্টা করে। অধিকতর, জুয়াড়ীর যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে প্রধামত কোন না কোন প্রকার খেলার সম্বন্ধ থাকে। শেয়ার ব্যবসায়ী ও জুয়াড়ীর কাজে আর একটি মিল আছে। উভয়েরই মনোবৃত্তিতে, প্রভূত লাভের আশা, বহু ক্ষতি বা সর্বনাশের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে অগ্রাহ করতে সাহস দেয়। উভয়েরই সংশয়-দোলাতে দোলবার অভ্যাস হয়ে যায়।

অক্ষজীভা বা জুয়াখেলা পুর প্রাচীন; এর উল্লেখ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদিতে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, এমন কি বেদে পর্যন্ত পাওয়া যায়। কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে এবং মলোপাধ্যানে অক্ষজীভা বা পাশাখেলায়, রাজ্য এবং জী পর্যন্ত পণ রাখার কথা সকলেই জানেন। অক্ষ বা পাশাতে প্রথমে বহেড়া গাছের ফল এবং তারই কাঠের তৈরি পাশা নিয়ে খেলা হ’ত। বাজি রেখে দাবা ভাসখেলা প্রভৃতি ছাড়া, ফুটবল ম্যাচ, কোন দল জিতবে, বৃষ্টি আজ হবে কি না, যদি হয়, তবে কখন হবে—সোনার দর, পাটের দর, তুলার দর, শেয়ারের দর বাড়বে কি কমবে, এই সকলের উপরও গুপ্ত আড্ডার বাজি খেলা হয়। প্রকারে হ’লে শাস্তির বিধান আছে। বৈদিক যুগ থেকে বোড়দোড়ের খেলা প্রচলিত আছে এবং বোড়-দোড়ের বাজি নিয়ে জুয়া প্রায় সর্বদেশে ও সর্ব সমাজে, সর্টারীর দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। কুরু-বোড়ও বাজি হয়।

তেমনি আবার মোরগ ও বুলবুলির লড়াইয়ে বাজি খেলা হয়। এ ছাড়া এমন কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনা নাই যা নিয়ে লোকে বাজি রাখে না; আর এইরূপ বাজি ধরে ধরে কথায় কথায় হয়, একে ঠিক জুয়া নাম দেওয়া চলে না। এই বাজিতে খেলোমেয়ে, পুরুষ-স্ত্রীলোক, সকলেই কখন না কখনও লিপ্ত হয়ে থাকে। বালক-বালিকার খেলার দ্বার বাজি রাখার ঝোঁকও কতক পরিমাণে মানুষের স্বাভাবিক বলা যেতে পারে। কিন্তু বাজিখেলা যখন ব্যাসনে পরিণত হয় তখন তার বিষময়র ফল লক্ষ্য করেই জুয়া বা বাজি সমাজে গৃহীত বলে বহু করার চেষ্টা হয়ে থাকে। আবার নিরুদ্দ প্রবৃত্তিকে পরিভূক্ত করার জন্য কখনও কখনও আনন্দ-উৎসবের দিনে বাজির উপর কড়াকড়িটা শিথিল করে দিয়ে বাজিখেলার প্ররোচনা দেওয়া হয়। যেমন উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কোথাও কোথাও কোলাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে অন্ধ-স্ত্রীড়ার বিধান আছে। নেপালে আবার কালীপূজার দিন কোন না কোন প্রকার জুয়াখেলার রীতি আছে। এই রকমের আর একটা উদাহরণ—হোলিখেলা। ইহাতে কাঁদা-মাটি ঝাঁটা হয় এবং অশ্লীলতার সাময়িক প্রেত্ন দেওয়া হয়। কালীপূজাতে যে আতসবাজির খেলা হয়—তাতেও মানুষের রুদ্ধ ইচ্ছা আশুত্ব নিয়ে খেলাতে তৃপ্তিলাভ করে।

জুয়াড়ী বা দ্যুতকারের মনোরঞ্জিত অহুসহান করতে গেলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। একটি হল না হলে জুয়া খেলা হয় না। প্রকৃত জুয়াড়ী সামাজিক “অপরাধী” (criminal) না হলেও অপরাধীদের মধ্যে যারা উগ্র বা গুণ্ডা প্রকৃতির তাদের অনেকেই দস্তুরমত জুয়াড়ী। সাধারণতঃ যৌবনোত্তরের বয়স থেকে আরম্ভ করে ৫০।৬০ বছর বয়স পর্যন্ত লোকে জুয়াতে লিপ্ত থাকে। এটা লক্ষ্য করতে পারা যায় যে, পুরুষের পক্ষে এই বয়সের মধ্যেই কামের ইচ্ছা সাধারণতঃ সজাগ থাকবার কথা। জুয়াড়ীরা অনেক স্থলে, মদ ভাঙ প্রভৃতি মেশা করে, বেছাদিস্ত হয় এবং রোজগারের টাকা বাবুয়ানা করে দেবার ওড়ায়। দ্যুতকারদের মধ্যে, অধিকাংশ স্থলেই, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, পিতামাতা, ভাই-ভগিনী প্রভৃতির প্রতি অর্থাৎ পারিবারিক আকর্ষণ অভ্যস্ত হয়ে যায়। অনেক জুয়াড়ীর বিশেষ অন্য কোন উপার্জন জীবিকার হুতি থাকে না। তারা বালমূল্য অলস-সময়েক্ষেপ করে, এবং বিনা পরিশ্রমে অনায়াসে প্রভূত উপার্জনের বাঞ্ছা করে। তারা প্রায়ই বুঝ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়; স্বার্থসিদ্ধির জন্য দৈবজ্ঞের কাছে আনাগোনা করে এবং ঠাকুরের কাছে মানত করে। Obsessional বা Compulsion neurotic-দের মত কতকগুলি চিন্তা ও কাজ এবং সন্দেহ সন্দেহ তাদের বিপরীতগুলিও না করে তারা থাকতে পারে না। আবার দেখা যায়, পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের যে সব দোষ থাকলে সন্তান মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় বা অপরাধী হয় বা আত্মহানিক বর্ধবাভিকগ্রস্ত হয়, জুয়াড়ীর পিতামাতা বা পূর্বপুরুষগণের মধ্যে সেই সমস্ত দোষ প্রায়ই দেখা যায়। জুয়াড়ীদের মানসিক বিকার কতকটা আছে, বুঝতে হবে।

মনঃসমীক্ষকদের মতে নির্জান-নিরুদ্ধ অজানা ইচ্ছাগুলিই

আমাদের প্রায় সব কাজই করিয়ে থাকে; সুতরাং জুয়াড়ীর কার্যকলাপ ও মনোবৃত্তিতে অজ্ঞাত ইচ্ছার কার্যকলাপের অহুসহান করা আবশ্যিক। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যসনকে কাম-চেষ্টার প্রতিনিধি বা প্রতীক বলেছেন। ব্যসন তাঁদের মতে কামজ ও কোপজ; আমরা দেখেছি, জুয়াড়ীর ব্যবহারে কামের সহিত সম্পর্ক আছে। ঐ কাম সরল সহজ বা সাধারণ পন্থায় প্রকাশিত হতে না পেরে অন্য উপায় অবলম্বন করে। কামের যে চেষ্টা বহুদূরে পরিণত হয় তাকে মূলতঃ সমলৈঙ্গিক কামিতা বা লমকামিতা বা Homosexuality বলে। উহা জুয়াড়ীর মধ্যে বিশেষরূপে প্রকট।

আমাদের মনের জ্ঞাতদ্বারে যে সব ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়, নির্জানে ঠিক তার বিপরীত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা রুদ্ধ হয়ে থাকে; জুয়াড়ীর অর্থলালসা বিষয়ে এই বিপরীত ইচ্ছা দুটি সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিকতর বলবতী। সুতরাং জুয়াড়ীর নির্জান মনের অর্থলক্ষ্য ও সর্বনাশের ইচ্ছাই তাকে সর্বত্র পণ করতে বাধ্য করে। কেউ কোন দোষ করলে তাকে অর্থদণ্ড শাস্তিরূপে নিতে হয়, যখন রাজা দণ্ড না দেন, তখন বর্ষশাস্ত্র-বেত্তারা প্রায়শ্চিত্তরূপে অর্থলক্ষ্য করান। প্রায়শ্চিত্ত করা আবার মানুষের স্বভাব। দ্যুতকার সর্বত্র নষ্ট করে অপরাধের শাস্তি নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু নিজে তা জানে না।

জুয়াখেলার টাকাই বাজি ধরা হয়। টাকাই লক্ষ্যবিষয়। টাকা যেখানে অন্যের কাছ থেকে অনায়াসে পাওয়া যায়, সেখানে নির্জান মনের ছেলে পাবার ইচ্ছা অর্থাৎ মাতৃয়ের ইচ্ছা, অন্য কথায় বলতে গেলে, স্ত্রীজনোচিত ইচ্ছার পরিভূতি হয়। আবার টাকা জোর করে আদায় করা ঠিক যেন তার উন্টো, অর্থাৎ পুরুষ যেমন তার স্ত্রীর কাছ থেকে ছেলে পায়, ঠিক সেই রকম ব্যাপার। মানুষের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিতর পুরুষোচিত ও স্ত্রীজনোচিত দুই ইচ্ছাই বর্তমান থাকে। এই উভয় ইচ্ছা পর্যায়ক্রমে দ্যুতজীড়ার পরিভূত হয়।

জুয়াড়ীরা মদ ভাঙ আকিঞ্চিৎ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকে; মাদক জিনিস লোককে অভিভূত করে ফেলে। ঐগুলি পিতৃবীর্যের প্রতীক। সুতরাং ঐ সকলের সেবার দ্বারা স্ত্রীজনোচিত ইচ্ছার পরিভূতি হয়।

এই প্রসঙ্গে ঋষিদের ১০ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১৪টি শ্লোকের কথা বলে উপসংহার করছি। ঐ সূক্তের ঋষি কবয় অক্ষ ও দ্যুতকার তাদের দেবতা বা প্রসক্তের বিষয়। এই সূক্তটি অক্ষসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, বৈদিক সূক্ত সম্বলনের মধ্যে মুদ্রিত আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক ত্রিমুক্ত ক্রীতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তক আত্মল সংস্কার করেছেন। তিনিই প্রথম আমার দৃষ্টি এই সূক্তের প্রতি আকর্ষণ করেন। আমি উহা পড়িয়া বিমিত হইয়াছি, ইহাতে জুয়াড়ীর বেদ মর্শ্বলক্ষ্য ভাষায় স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। “অক্ষ” বোধ হয় স্ত্রীর প্রতীক। অক্ষসূক্তের বিশ্লেষণ করলে জুয়াড়ীদের মনোরঞ্জিত হৃদয় আভাস পাওয়া যায়। জুয়াড়ীদের মনঃসমীক্ষণের ফল, এই অক্ষসূক্তে উল্লিখিত মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে অনেকাংশে মিলবে, এটা আমার বিশ্বাস।

* অলু ইতিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রথম বক্তৃতা।

কুমারী

শ্রীআদিত্য ওহদেদার

জানি, সুমিতা তার মনের আনন্দকে ধরে রাখতে পারছে না। তার ছোট হৃদয়ে এত আনন্দ কি করে সে ধরে রাখবে। সে আনন্দ যেন গিরি-কন্দরে লুকিয়ে থাকে। স্বর্গীয় মত সুন্দর-কোঁপে চোখের সঙ্গীতে ছুটে আসতে চায়। কিন্তু কাকেই বা সে জানাবে?—এ কি বলা যায়। সুমিতা শান্ত হতে চেষ্টা করে। তবু কি পারে সে। এত আনন্দ সারা আকাশও যে ধরে রাখতে পারে না।

তিন বছরের ছোট ভাইটি এল তার সামনে। সুমিতা অমনই তার গলা জড়িয়ে ধরলে দু হাতে; সঙ্গেহ চুপ খেয়ে বললে, মণি, ভাইটি আমার। তারপরই হঠাৎ তার গালে সুমিতা বলিয়ে দিলে এক চড়। রাগ দেখিয়ে বললে, পাখী, দুটু কোঁধাকার। যাঃ তোকে চাই না।

বিশ্বের ঘোরটা কাটতেই মণি অভিমানে ঘুব ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। চীৎকার করে কাঁদলে না। কেননা, অত ভাল দিদির ওপর সে ত রাগ করতে পারে না, অভিমানই করতে পারে; আর অভিমান, সে ত নিজের প্লাণের গোপন ব্যাধা, অতকৈ ত তা জানান যায় না। মণি ভাই নীরবে অশ্রু ফেলে দিদির হাত জড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইলে।

—ওরে আমার সোনামণি। এত রাগ দিদির ওপর? সুমিতা মণিকে বুকে চেপে ধরলে। আমার এমন ভাইটিকে কি মারতে পারি। সুমিতা হাসতে গিয়ে কেঁদেই ফেললে।

নিজের কাছেই সুমিতা অবাক মানে। সে কি পাগল হ'ল নাকি?

খানিক পরে সুযোগ বুকে সুমিতা এল তার বাবার শোবার ঘরে। বিছানার নীচে থেকে সেই খামখানা বের করে আনলে সম্ভবপে লুকিয়ে। নির্জনে চিঠিখানা খুলে সেই লাইন কটা পড়লে—কথাটা আমার নন্দ তুলেছে। সুমিতাকে তার ভারী পছন্দ। অবিশ্রি জানি না কতদূর কি হয়। তবে এদেরও আগ্রহ আছে। আমার জা ত সুমিতাকে দেখেছে, সুমিতার মত মেয়ে কেন না মনে ধরবে। একটা কটো যত শীঘ্র পার পাঠিয়ে দাও। অত ভালুর বুড়বুড়দের দেখাতে হবে। আমার ত মনে হয় এই বোশেখেই কাজ হয়ে যেতে পারে। এখন ভগবানের হাত।

চিঠি লিখেছেন সুমিতার পিসিমা। সুমিতার পিসিমা পড়েছেন বড় ঘরে। যেমন টাকা-পয়সা তেমনই স্কলশীল। সেই সেবার, তখন সুমিতার বয়স এগার-বার, সুমিতা গিয়েছিল তার পিসিমার খন্তরবাড়ি। যেমন বিরাট বাড়ি, তেমনই লোকজনে ভরা; আর সকলকেই দেখতেও বা কি সুন্দর। যেমন তার পিসিমার ভাস্কর-দেওররা সুন্দর, তেমনই জায়েরাও সব এক-একটি যেন রূপের ডালা সাজান। সেই বাড়ির সুমিতা হবে 'বো'—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও লজা পেল সুমিতা।

পিসিমার মনকে সুমিতার এত ভাল লাগে। এখনও দেখতে কি সুন্দর। অথচ বয়স হয়েছে, বিধবা মাতৃস্ব; কোন মতই ত মনে না শরীরের। সুমিতাকে তিনি কি বুকে এত পছন্দ

করলেন। সুমিতার ভারি অবাক লাগে। কিন্তু আনন্দও কি কম।

আর সুমিতার মনে পড়ছে তার কথা। তার কথা ত কত আগে থেকেই আসতে চাইছে সুমিতার সারা মন জুড়ে—পাখার রামধনু জাকা শানা পাখীর ঝাঁকের মত। কিন্তু সুমিতা ইচ্ছে করে সে চিন্তাকে ছোর করে ঠেলে রাখতে চেয়েছে এতক্ষণ। মাতৃস্বের মনের নীচে বোধ হয় আর একটা মন আছে;—সুমিতার ত তাই মনে হয়। সেই নীচের মনটা যেন মণিকোঠা। যত ভাল-লাগা স্মৃতি তার মধ্যে বহু থাকে। সে মণিকোঠা কি আর যখন-তখন খোলা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মণিকোঠার ভেতর থেকে কি সব যেন ঝাঝা দিগৈ বেরিয়ে আসতে চায়। সুমিতার বুক বুকি তাই টিপ টিপ করছে। কিন্তু না, সুমিতা কিছুতেই এখন খুলবে না সে মণিকোঠার দুয়ার। এখুনি তাকে মার কাছে যেতে হবে যে রান্নাঘরে।

সুমিতা কানের তাকার লবু হয়ে উঠল। চিঠিখানা তার বাবার বিছানার তলায় যেমন ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে রেখে দিয়ে সে এল মার কাছে। খোলা চুল দু-হাতে জড়িয়ে একটা এলো বোঁপা বাঁধলে।

নীলিমা বললেন, এখনও চুল বাঁধিস নি সুমি। সন্ধ্যা যে গড়িয়ে এল। কি করছিলি এতক্ষণ? যা, চুল বেঁধে আয়। উনি যে বলছিলেন আজই কটো তুলতে যাবেন।

সুমিতা দেখলে তার মার সাড়া চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্ত আনন্দের দীপ্তি। মার মুখের দিকে দ্বিতীয় বার চাইতে সুমিতার কেমন লজ্জা লাগল। নতমুখে 'এই যাই না' বলে সুমিতা এল আয়নার সামনে।

আয়নার সামনে সুমিতা নিজেকে চেয়ে দেখলে। পিসিমার মনর সুমিতাকে পছন্দ করেছেন। সে কি সত্যি অরুণদার যোগ্য।

অরুণদা? এরই কথা ত সুমিতা এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। আশ্চর্য, কে ভেবেছিল অরুণদার সঙ্গেই সুমিতার বিয়ের সম্ভব আসবে। অরুণদা? না, এখন আর অরুণদা নয়, এখন অরুণদা সে। সুমিতার সারা দেহে আনন্দের হোয়াক লাগে।

এই ত বছর-দুই আগের কথা। অরুণদা এসেছিল তাদের বাড়ি বেড়াতে। অরুণ এয়-এ পাস করেছে সবে। সুমিতার মনে পড়ে খুঁটিনাটি সেই দশ দিনের কথা;—অরুণদা মাত্র দশ দিন ছিল। মনে পড়ে অরুণ প্রথমেই তাকে বলেছিলঃ তোমার ত সেবার দেখেছিলাম, তখন ক্রক ছেড়েছ সবে। এখন ত নাম ধরে ডাকতে অসুস্থি চাইতে হয়। সুমিতা বলে ডাকতে পারি ত?

মুখে তার হুঁমি-ভরা হাসি। ঐ হাসিটা সুমিতার এত ভাল লাগে। আজও সুমিতার চোখের সামনে সেই হাসি যেন ধোঁদাই করা রয়েছে। আর তার মুখখানি?—জগতে অমন সুন্দর আর কেউ আছে নাকি?

সুমিতা আশে চোখ বোজে।

অরুণের সে কথার উত্তরে সুমিতা কি জবাব দিয়েছিল, সুমিতার বেশ মনে আছে। বলেছিল, অরুণের মেনার আগেই ত ডেকে নিলেম।

হেসে উঠেছিল অরুণ : এই ত হারাবার চেষ্টা দেখি। কেনই বা তা না হবে? ম্যাটিকে ফাট'রাস। কিন্তু আমি তোমায় ত ডাকি নি, তোমার নামটা যে মনে আছে তাই জানিয়ে দিলাম।

সুমিতা ছাড়ে নি। বলেছিল, অরুণশক্তি যে আপনার উত্তম, তা জানি। সব পরীক্ষার ফলাফলই এমনিই পান নি।

—অরুণশক্তির কথা যখন তুললে, তখন স্বীকার করছি আমার সেটা আছে; আর সেই অরুণশক্তির নক্ষির টেনেই বলছি যে এত সম্মান ত সেদিন পাই নি। ভবন ত তুমিটাই বেশ চলত।

—এখন যে আপনি মিষ্টার অরুণকুমার বোস, রিসার্চ-কলার।

—ও, তাই নাকি? বেশ। অতি গম্ভীর হয়ে ছই হাত জোড় করে সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে অরুণ বলেছিল, সুমিতা দেবী, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন।

সে ভঙ্গীতে হাসি কি চাপা যায়। সুমিতা হেসে ফেলে বলেছিল, ভাল হবে না বলছি, অরুণনা; আর এমন বলবে?

—I win, your Majesty! কেমন, পক্ষে এসেছে এবার?—তারপর সারা ঘর কাঁপিয়ে সে কি বিমর্ষ হাসি।

উঃ, কি হাসাতেই না পারে। প্রতি কথায় হারাতে চায়। তার কাছে হারতেও কি ভালই না লাগে। কত কি যে পড়েছে আর কত কি যে জানে তার ঠিক নেই। কিন্তু অহংকার নেই একেবারে—সুমিতার তাই এত ভাল লাগে। পাড়ায় সুরেন ছেলেটিও ত ইউনিভারসিটির ভাল ছাত্র; কিন্তু বাকী। কি দেখাকে লোক। সব কথায় জানাবে, সেই যা জানে তাই জানার চরম। জগতের যত বই সেই যেন সব গিলে খেয়েছে। আর কখনও কি হাসতে জানে। এত যুগ গোমড়া করে থাকলে সুমিতার ভারি হাসি পায়।

সেই দশটি দিনের সব কথা, সব টুকটাকি ঘটনা সুমিতা কিছুই ত ভোলে নি। সবই মনের তলে চাপা ছিল। সুমিতা ভেবেছিল বুঝি বা সে ভুলেই গেছে। মনে পড়ে অরুণনা চলে যাবার পর দু-তিন দিন মনটা একটু খারাপ ছিল—অরুণের কথা, অরুণের মার কথা, অরুণের পিসিমার কথা মনে পড়ত।

কিন্তু সেদিনের অরুণ আর আজকের অরুণ সুমিতার কাছে কত যে আলাদা। খোঁপায় কাঁটা শুদ্ধতে শুদ্ধতে সুমিতা চুপ করে তার খুবখানা ভাল করে দেখতে লাগল। সুমিতাই যেন আজ নতুন হয়ে উঠেছে।

এই কথা অরুণও নিশ্চয় জানতে পেরেছে। আচ্ছা, কি ভাবছে সে। সুমিতার এত আনন্দের খানিকটাও কি তার হচ্ছে না? সুমিতাকে অরুণের ভাল কি লাগে নি? সুমিতার মন বলে নিশ্চয়। মনে পড়ে সেদিনের কথা। সুমিতা পরেছিল ফলস রঙের শাড়িটা। অরুণের সামনে পড়তেই অরুণ বলেছিল, বাঃ, তোমার কি স্নায়ব লাগছে সুমিতা। আর্টিষ্ট হলে আমি একে নিতাম।

কথাটা যখন অরুণ বলেছিল, তখন কাছে কেউ ছিল না। যেমন ভালও গেলেছিল, তেমনিই লজ্জাও পেরেছিল সুমিতা।

কিন্তু লজ্জাটা ঢাকতে হয়েছিল পরিহাস দিয়ে। বলেছিল, খুব বাড়িয়ে বলা স্বভাবটা তোমার এত বিজ্ঞ।

এ কথার উত্তরে অরুণ অল্প সময় হলে বেশ পরিহাস করে কিছু বলত—দারাল বুদ্ধি দিয়ে কথা। সুমিতা ত তারই প্রতীকা করেছিল। কিন্তু সুমিতাকে আশ্চর্য করে দিয়ে অরুণ বলেছিল, সত্যি বলছি, কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলি নি সুমিতা। তুমি সত্যি ভারি স্নায়ব। নিজের কথায় অরুণ যেন লজ্জা পেয়েই বাইরে চলে গেল।

পুরষের কণ্ঠে সে ভাষা মেয়েদের মন দোলায়।

দশ দিনের সকল কথাবার্তায় অরুণের কণ্ঠে সুমিতা সেই সেদিন সেই ক'টি পরিহাসযুক্ত কথা শুনেছিল।

আজ সেই কথায় এত বর্ণ, এত ভাল-দাগার জাল বোনা।

আজ সুমিতা কণ্ঠে তুলতে যাচ্ছে সেই ফলস রঙের শাড়িটা পরে।

খোনা গেল মার গলা : সুমি, একেবারে কাপড়-চোপড় পরেই আর। উনি ত এতুনি আসবেন।

সুমিতা বাজ বুনে শাড়ির তলে সেই ফলস রঙের শাড়িটা খুঁজতে লাগল।

রাত্রে সুমিতা শুনে মা বলছে বাবাকে : আমাদের এমন ভাগ্য কি হবে? এ যে বিশ্বাস করা যায় না। এত বড়লোক, তাতে অরুণের মত অমন ছেলে। তবে এক সময় ওরা ঠাকুর-ঝিকে যেমন শুধু রূপ দেখেই নিয়েছিল, সেইরকম সুমিকেও যদি নেয়। কি বল?

বাবা বললেন, হাঁ তবে বড়লোকের মেজাজ, কিছু বলা যায় না। যদি হয় সুমিতার ভাগ্য।

সুমিতার ভাগ্যই বটে। এত সৌভাগ্য বুঝি কোন মেয়েরই হয় না। কিন্তু সে কি অরুণনা বড়লোক বলে? সুমিতা নিজে ত জানে, অরুণনা যদি গরীব হ'ত, অতি গরীব, তা হলেই বা কি এসে যেত। অরুণকেই ভো সে জানে, তার লম্পদকে ত জানে না সুমিতা।

আবার শুনে পেলো মা বলছে—কিন্তু এদিকে সুরেন বাবুরাও তো এক রকম রাজী—মেয়ে ত পছন্দই হয়েছে। তাদেরকে কি বলা যায় এখন।

বাবা বললেন, হাঁ তাই ভাবছি।

এই সুরেনবাবুর ছেলে সুরেশের সঙ্গে সুমিতার সখ্যের কথা চলছে। সুমিতাকে নাকি তাদের পছন্দ হয়েছে। বিশেষ কিছুই বাই তাদের নেই। কিন্তু অরুণের পাশে সুরেশ? সুরেশ যে কতো কানো সুমিতা এখন বুঝতে পারে। তা ছাড়া কেমন বোকা-বোকা চেহারা লোকটার। মিতান্ত্রই যেন গোবেচারি। তাই বলে সুরেশকে কি আর ঘৃণা সুমিতা করছে। বরং সে প্রার্থনা করছে সুরেশের সঙ্গে যেন সুমিতার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ের সখ্য হয়।

সুমিতার বিছানার পাশে ছোট জানলাটি দিয়ে দেখা যায় দূর নীল আকাশের তারা—অলঙ্ঘন, হাসি-তরা।

বড় ভাল লাগে তার। যেন কোন আনন্দলোকের হাতছানি।

বড় ভাল লাগে অরুণ নামটি। বিশ্বের মাথায় যেন ঐ নামে।

নাঃ, সুমিতার এ অচায়। এখনও তো পাকাপাকি কিছুই হয় নি। শুধু একটি সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু সুমিতার মন যে বলছে—এইখানেই, আর কোথাও নয়।

হায় রে কুমারী মন! সাত দিন পরে বাবার টেবিলে রাখা তার পিসিমার নতুন চিঠি পড়ে তানা গেল অরুণের বিশ্বের সম্বন্ধ টিক হয়েছে অস্ত জায়গায়। কণাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে। মেয়ে বি-এ পাশ। বড়ঘরের মেয়ে, দেখতে খুবই সুন্দরী। অরুণও খুব রাজী তাকে বিয়ে করতে।

চিঠিটা সত্যই সুমিতার সামনে। সুমিতাকে ঘিরে স্পষ্ট দিনের আলো—হৃৎস্পন্দ বলে সাবুনা পাবার কিছু নেই।

বেশ ত, কি আর হয়েছে। অরুণদার বিশ্বের সম্বন্ধ হয়েছে খুব ভাল করে। ভালই ত।

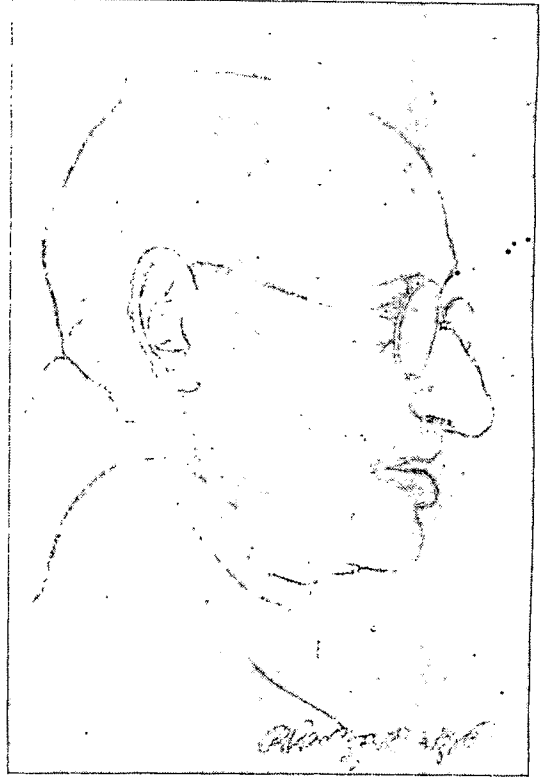
রাজে শুনে মা বলছে—তবুনি জ্ঞানভান, এমন কপাল কি আর আমাদের। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো কেন?

বাবা বললেন, সুরেনবাবুকেই কথা দিয়ে দিই। এই বৈশাখেই কাজ সারি।

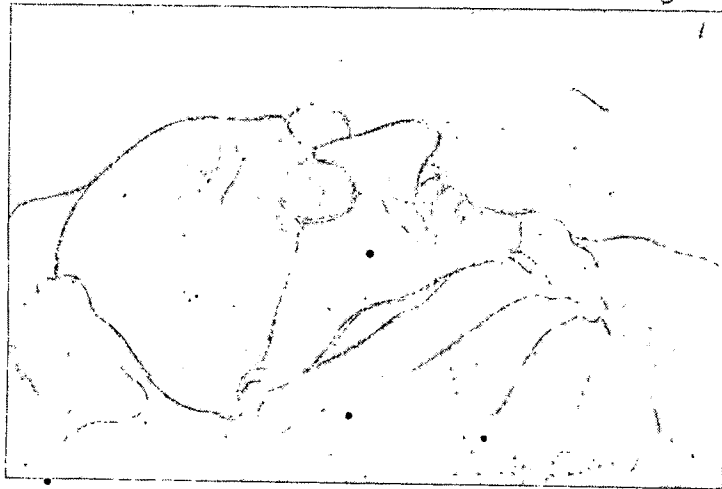
সুরেশ। সুমিতার মনে হ'ল সুরেশের মুখখানি বেশ নর, একটা কোমল সরলতায় ভরা। পলকে সুরেশকে সে যা দেখেছিল, তাইতে এই পরিচয়ই তো সুমিতা পেয়েছে। আগামী বৈশাখে সে-ই হবে তার স্বামী।

ছি, ছি। অরুণদাকে নিয়ে কি যা তা সে ভেবেছে ক'দিন। কুমারী সে, এ ত তার পাপ।

সুমিতার চোখে জল এল। হে ভগবান, এই জলে তার মনের ময়লা যেন ধুয়ে যায়। আকাশে জলজলে তারা—প্রসন্ন করণ দৃষ্টি। সুমিতা সেই দিকে চাইতে চাইতে ঘুমোবার অন্তে চোখ বুজলে।



মহাত্মা গান্ধী—শিল্পী ত্রিঅনিলকুমার মাইতি



মহাত্মা গান্ধী, শান্তিত অবস্থায়—শিল্পী ত্রিঅনিলকুমার মাইতি

বিদ্যালয়ে দলগত ধর্মশিক্ষা ও তার প্রভাব

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

বাণিক্যের পসরা নিয়ে এশিয়ার নতুন হাটে বেচাকেনা করতে এসে বিলাতের বণিকপুত্রেরা রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজকন্যা নয়, ক্রমে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসল। রাজ্য লাভ হলো তারা মনোবৃত্তিতে বণিকই থেকে গেল। ভারতরূপ কামবেহু দোহন করতে ভারতীয় শিক্ষিত 'মজুরদের' সহায়তার প্রয়োজন হওয়ায় বিদেশী বণিকভাবাপন্ন রাজতন্ত্রের প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত। প্রকৃত রাজ্যের মত শাসন করতে হলে প্রকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁদের সুব্যবস্থা করতে হ'ত। কিন্তু বৈখ্যানে শাসনের আসল উদ্দেশ্য নিজ দেশজাত পণ্যব্রহ্মের ক্ষয় বাক্যের দখল করা সেখানে প্রকার প্রতি রাজ্যের কর্তব্য যদি কিঞ্চিৎ আদর্শভ্রষ্ট হয় তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তদুপরি শাসক সম্প্রদায় এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। মাননীয় মেকলে সাহেব প্রাচ্য এলেম আর পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রেম এবং বিজ্ঞপ বর্ণন করেই কান্ড হন নি, তাঁদের সকল জ্ঞান এবং আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থের সকল সার ইংরেজী ভাষার মারফৎ এক গণ্ডিতে পান করে তিনি রায় দিলেন : প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার অযোগ্য, প্রাচ্যের সাহিত্য দর্শন কুসংস্কার আর বাজে মালে ভরা, স্তব্ধতা বর্জনীয়। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা এমন এক ভারতীয় সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে যারা শুধু রক্তে ও চামড়ার রঙে হবে দেশী কিন্তু রুচিতে, আচার-ব্যবহারে, নীতিতে বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ ("Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and intellect.")

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক বিপর্য্য উপস্থিত হ'ল। যুক্তিমূলক মধ্যবিত্ত ও অর্থশাসী লোক ইংরেজী শিক্ষার আওতায় এসে দেশের জনসাধারণ থেকে ক্রমে দূরে সরে পড়তে লাগল। পাঁচালি, মদলগান, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার যে ধারা আবহমান কাল চলে আসছিল, ক্রমে তা রুদ্ধ হয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, সাহসজ্ঞদের আধ্যাত্মিক জীবনকথা, সাংসারিক জীবনের পক্ষে মানা উপদেশপূর্ণ আধ্যাত্মিক। স্থলজিত কণ্ঠে গীত হয়ে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে কত নিরক্ষর নরনারীকে জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছে। ক্রমে এ সব বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান রইল ইন্সুল কলেজ। ধর্ম বা নীতি শিক্ষাকে ইন্সুল-কারিকুলামে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হ'ল না। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন সংস্কারমুক্ত হবার আগ্রহাতিশয্যে নীতিধর্মকে কোণঠাসা ক'রে বিজ্ঞানকেই বড় করে তুলল।

আগবিক শক্তির যুগ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে আগবিক বোমা আবিষ্কৃত

হওয়ায় মানুষের যে স্বষ্টিধর্মসকারী পাশ্চপত অজ্ঞানতা হয়েছে তা সাময়িকভাবে জগতের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্ত নাহি। মানুষ যদি আগবিক বোমা যুদ্ধাঙ্গুরে ব্যবহার করে তবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মানব জাতির বিলোপ নিশ্চিত। মানুষের কল্যাণবৃদ্ধি জ্ঞাত করে পরম্পরের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি করা ব্যতীত জগতের মঙ্গল আশা করা যায় না। এক জন মানবহিতৈষী গিখেছেন—

A deeper faith in God and therefore in man as a child of God and a more sacrificial effort to make brotherhood a guiding principle of society alone offer real hope that atomic rockets can be kept under control, and the new energy be put to the service of human needs.

ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি প্রীতির ভাব— বর্তমানের বিজ্ঞান জগতে এরই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ঈশ্বর ভাব বা মানবপ্রীতি এক দিনে আসে না। আজ যারা ছাত্র ছ-দিন পরে তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নায়ক। ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তির জন্ত তাদেরই মনোভাবের পরিবর্তন আবশ্যক। অমূল্য পরিবেশের মধ্যে শিশুর মনে ধর্ম ও মানবতার ভাব সঞ্চার করে সমস্ত বিকশিত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন যুক্তরাষ্ট্র দেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষাদানের জন্ত আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষেও তার সূচনা হয়েছে। বর্তমান ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইন্সুলে ধর্ম-শিক্ষার বিরূপ ফল আশা করা যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

দলগত ধর্মশিক্ষা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী

ভারতবর্ষ এক মহাদেশবিশেষ। এখানে বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মসম্প্রদায়ের বাস। এখানকার ইন্সুলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্র একত্র অধ্যয়ন করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক ভাবে ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হলে ভারতবাসীর এক-জাতীয়তার আদর্শ কি ক্ষুর করা হবে না? বিশেষত বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় যখন কাম্বীর থেকে কুমারিকা, পশ্চিম সাগর হতে পূর্ব সাগর পর্যন্ত বিপুল জাগরণের সাড়া জেগেছে ভারতবাসীর মনে? শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে উদার, সহিষ্ণু, স্বায়নিষ্ঠ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহায়ভূতিসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। বহু জাতির মিলনতীর্থ এই ভারতে একতা ও পরম্পরের প্রতি প্রীতির ভাব বিশেষ ভাবে কাম্য, কেননা ভারতের সংস্কৃতি মিলনের ভিত্তিতেই রচিত এবং এর সার্থকতা তখনই হবে যখন দেশবাসী কবির কথায় "বিভেদ ভুলিবে জাগাবে তুলিবে একটি বিরাট হিয়া"। নইলে কাজী নজরুল

ইসলামের তীক্ষ্ণ শ্রেণ কশাঘাত ভারতের অদৃষ্টে চিরন্তন হয়ে থাকবে :

“এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে” হে ঋষি,
তেজিগ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।

গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজায়ুতের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে যায় একটারে ধরি’ আসি’
আরটা তখনো দিবি মোটারে হ’তেছে ধোঁয়ার ধাসি।
তনে হাসি পায় ইহাদেরও নাকি আছে গো বর্ষ জাতি,
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আয়েক ছাগল পাতি।

মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কসারের কল্যাণে,
তখনো ইহারা লাঙল উচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ভারতের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ, সাম্প্রদায়িক মিলন, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন। বিভিন্ন ধর্মের বহির্ভূত আচার বা রীতিনীতিগত পার্থক্যকে বড় করে তুলে পরস্পরের মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করা নয়, সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে ভারতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত সমবেত হয়ে এক মহাজাতি গড়ে তোলা। শিক্ষায়তনে সাধারণ শিক্ষক দ্বারা সম্প্রদায়গত (sectarian) ধর্মশিক্ষার ব্যবহার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের অপরিণত মনে পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা ভাবী ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে তা কখনই কল্যাণপ্রদ হবে না।

ইংলণ্ডে সম্প্রদায়গত ধর্ম শিক্ষাদানের দাবি গবর্ণমেন্ট মেনে নেয় নি। অতীত যে নতুন শিক্ষা-আইন রচিত হয়েছে তাতে শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট মিঃ বাটলার সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে দলগত ধর্মশিক্ষার কোম ব্যবস্থা করতে রাজী হন নি। শিক্ষা বিলে বলা হয়েছে :

... the State, concerned though it is to ensure a sound religious basis for all children, cannot take on itself the full responsibility for fostering the teaching of formularies distinctive of particular denominations designed to attach children to particular worshipping communities. (*Educational Reconstruction*, 1943, p. 15)

বিলাতে একই মূলধর্মের বিভিন্ন শাখা, যথা, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, পিউরিট্যান, মেথডিস্ট প্রভৃতির জন্ত ভিন্ন ভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা জনসাধারণ মেনে নেয় নি। আমাদের দেশের অবস্থা এর চেয়ে বহু গুণে জটিল। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির (National Planning Committee) সভামত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট : বিভাগ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান দেওয়া হবে না। সমিতি বলেছেন :

Religious Instruction : State education should take no responsibility for religious instruction. Religious instruction is the concern of the individual, the home, the family and the religious group concerned.

Note : Shri Ambalal Sarabhai, Prof. M. N. Saha, Shri A. K. Saha and Shri K. T. Saha were of opinion that religious instruction should be the concern of the individual alone. (*Handbook of National Planning Committee*, 1946, p. 137)

রাশিয়ার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতির বাস। তা সত্ত্বেও সেখানে এক মহাজাতি গড়ে তোলা অসম্ভব হয় নি। দলগত ধর্মের সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধিকে সমূলে উচ্ছেদ করে সকল সম্প্রদায়কে এক নতুন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একত্রিত করা সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। যে ধর্ম ও মনোবৃত্তি মানুষে মানুষে মিলনের অন্তরায়, সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী ভার সম্বন্ধে ষ্টালিনের মন্তব্য নির্দ্বন্দ্ব কঠোর। তিনি বলেছেন :

Petrified religious rites and fading psychological relics cannot replace the living social, economic and cultural environments which surround a people. (Quoted in K. M. Munshi's *Zonal Divisions of India*, p. 14).

কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জনসাধারণের জাগতিক উন্নতি অবনতি এক অবিচ্ছেদ্য স্রোত্রে গাঁথা। এই পরিবেশকে উপেক্ষা করে এর পরিবর্তে পচা ধর্মের বিধান আর ক্ষীয়মান মনস্তত্ত্বের অবশেষ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।

ভারতবর্ষ রাশিয়া নয়। ধর্ম ভারতের মজাগত। আমরা ধর্ম ও নীতিবদ্ধিত শিক্ষার পক্ষপাতী মোটেই নই। ধর্মের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্বন্ধ। ধর্মকে শুধু পোশাকি জামার মত ব্যবহার করা নয়, প্রতিদ্বন্দ্বের প্রতি কর্ণে, মননে ও আচরণে ধর্মকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এ শিক্ষা দেওয়া আর নেওয়া উভয়ই কঠিন।

ধর্মশিক্ষা দিবেন কে ?

What India Thinks গ্রন্থের এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

There are truths, which are of the nature of information, that can be added to our stock of knowledge from outside. But there are other truths, of the nature of inspiration which cannot be used to swell the number of our accomplishments. These latter are not like food, but are rather the appetite itself, that can only be strengthened, by inducing harmony in our bodily functions. Religion is such a truth. . . . It cannot be doled out in regulated measure, nor administered through the academic machinery of education. It must come immediate from the burning flame of spiritual life in surroundings suitable for such life.

এক প্রকার সত্য আছে যা বাইরে থেকে আহৃত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে। আর এক প্রকারের

সত্য আছে যা সংসারের জগীভূক্ত নয়, যা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় না। এ বাইরের জিনিষ নয়, এ ভিতরের জিনিষ; এ খবর নয়, অহুপ্রেরণা, মনের স্বাভাবিক নয়, মনের ক্ষুধা, ধর্ম এই প্রকারের সত্য। ইহুজের রুটিন-বীণা পরিমাপে শিক্ষা-যজ্ঞের মারফৎ ধর্মশিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অগত্যা বলেছেন :

“স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্মও তেমনিই মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত।

“স্বাস্থ্যকে টাকাপয়সার মত হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আহুজুলোর দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জগাইয়া তোলা যায়। তেমনিই মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্ত বোধকে তাহার এই ধর্মপ্রযুক্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মত ইহুজ কয়টির শাসনাধীনে সন্ন্যাস করা যায় না। ইনস্পেক্টরের তদন্তকালে তাহার উন্নতির পরিমাপ করা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্ক দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব। কেবল সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীন পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বীণা নিয়মে বিভাগে দেওয়া নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।” (সঞ্চয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড পৃ. ৩৮১)

বেধ উপনিষদ বা গীতার কতকগুলি শ্লোক কঠোর করলেই বার্ষিক হওয়া যায় না। বার্ষিক হওয়ার পথ এত সহজ হলে বার্ষিক লোকে বেশ ছেঁদে যেত। ধর্মগুরু হওয়াও বড় সৌজা কথা নয়। যিনি উপদেশ দিবেন তাঁকে সেই উপদেশের উদাহরণস্থল হতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে ও উপদেশে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাঁর কথা কার্যকরী হতে পারে না, তখন তাঁরোছাত্র ইমাস'নের কথায় বলবে :

“I cannot hear what you say, because what you are is shouting at me.”

• ‘আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আপনার আচরণ চিংকার করে আত্মপ্রকাশ করছে।’

ধর্মশিক্ষা দান বড়ই দুর্লভ ব্যাপার; ধর্মগুরুও দুর্লভ। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি ধর্মকে উপলব্ধি করেছেন, তিনিই সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। এক অন্ধ অপর দৃষ্টিহীনকে পথের সন্ধান দিতে পারে না। সত্যদর্শী, চক্ষুস্থান, সহানুভূতিশীল গুরুর সঙ্গলাভই ধর্মজীবন উন্মেষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যক। এ বিষয়ে কবিরূপ রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করি :

“আমরা অত্যন্ত ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনই সহজ হইবে না। যেমন, অত্যন্ত দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই স্বভাবতই অতের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মত, তাহা পাতলা এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষা

ইহুজ নাই, তাহার আশ্রয় আছে,—যেখানে মানুষের ধর্ম-সাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অহুরূপে অহুষ্টিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সর্বপ্রকারেই ধর্মজীবনের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে।”

বর্তমানের যন্ত্রপ্রধান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই যত কিছু হানাহানি, শোষণ, উৎপীড়ন ও বিশ্বব্যাপী অশান্তির বহিঃপ্রকাশ। ব্যবসায়বুদ্ধি আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। বিভাজনবণ্ড হয়েছো ছোট্টশাট এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কোথায় সেই শান্ত পরিবেশপূর্ণ বিভাজনবণ্ড যেখানে গুরু নিজের ধর্মজীবনকে শতদল পত্রের মত বিকশিত করে তুলেছেন যার সংস্পর্শে এলে শিষ্যের অন্তরও রাঙিয়ে উঠবে? উপযুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি লক্ষ্য না রেখে ইহুজ ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হলে তা প্রহসনে পর্যাবসিত হতে বাধ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি মানুষের সম্ভাব বৃদ্ধি করা, জাতিধর্ম বা সম্প্রদায়নির্দেশে সকলের প্রতি সকলকে প্রীতি-ভাবাপন্ন করা, হৃদয়ের উদারতার দ্বারা সকলকে আপন করে নেওয়া। দলগত ধর্মের সংকীর্ণ গভীর মধ্যে চিরদিন আবদ্ধ থাকলে মনের উদারতা লাভ আশা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু দলগত ধর্মশিক্ষা বিভাগশিক্ষার আদর্শের পরিপন্থী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ছাত্রদের সম্মুখে এক উদার সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ তুলে ধরলে তাদের মনের প্রসারতা সম্পাদন সহজ হয়ে আসে। স্বামী অভেদানন্দ *Ideal of Education* পুস্তকে বলেছেন :

Any education that separate mortals from mortals, that disunites brothers from brothers is not uplifting and should not be the ideal.

যে শিক্ষা মানুষ হতে মানুষকে ভাই থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে তা কখনই মহান নয়, তা কখনই আদর্শ হতে পারে না। উদার-চরিত্র মানুষের কাছে বহুধর্মের কুটুম্বকম—সমগ্র বিশ্ববাসীই আত্মীয়তুল্য।

সহনশীল এবং উদার মন নিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে সন্ধান করলে সকল ধর্মমতের মধ্যেই সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সকল ধর্মপ্রবাহের গতিপথ ধরে উৎস সন্ধানে বের হলে একই মানস-তীর্থে গিয়ে উপনীত হতে হয় যেখানে সব ধর্মমতের সমন্বয় হয়েছে একই সত্যের উপভ্যাকার। বিভাগে সার্বজনীন ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। দলগত ধর্মের পরিবর্তে তিনি উদার বিশ্বজনীন ধর্মের সমর্থন করে বলেছেন :

• Among all special religions there is undercurrent of true religion which is nameless and formless, and that nameless and formless religion should be brought forward. . . . education should be based upon universal principles and not upon sectarian religious ideals. (Pp. 31-32).

জগতের সকল দলগত ধর্মের ভিতরেই অসুঃসমিলা ক্ষুদ্র শ্রোতাবারীর যত একটি নামহীন, আকারহীন সত্যধর্মের প্রবাহ বর্তমান আছে। ইহা সর্বধর্মের মূলভিত্তি, সর্ব কালের সর্ব মানবের পক্ষেই চিরন্তন সত্য। এখানে কোন বিরোধ নাই। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সত্য লাভ বিশ্বমানবের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হলে মানুষের এক বিরাট অনন্ত অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নেবার হাতকর প্রয়াস হ্রত বহু হবে; সংকীর্ণতা মানুষ অন্তর্হীন আকাশে খুঁটি পুঁতে সীমানা-চৌহদ্দি যেনে নেবার অন্ধ চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারবে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বজনীন ধর্মের সম্ভাব্যতা লক্ষ্যে বলেছিলেন :

“খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না কিবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না—কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অমৃত্যু ধর্মের সারভাগগতিকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা পুষ্টি-লাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হইবে। ...পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়া দাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয়; প্রত্যেক ধর্মই অতি মহাহুতব উদারচরিত্র নরনারী প্রসব করিয়াছে।” (শিকাগো বক্তৃতা পৃ ৪৬)

উদারতা ভারতবাসীর যজ্ঞাগত। বিজ্ঞানজগতে পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরাবীন ভারতকে বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেও অব্যাহতমাত্রায় ভারত সকলের শীর্ষস্থানে—অতীতে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদেশের আউল বাউল দরবেশ সম্প্রদায় সর্বধর্মগ্রাহ একমেবাবিভীতীয়ম্কে উপলব্ধি করার আনন্দে ভিন্ন ধর্মমতের মনগড়া গতি ভেঙে ফেলে সরল ও সহজ পথ বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার নিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গেলে ধর্মের প্রাণ ছেড়ে ধোঁস নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বাউল কবির সঞ্চে-গাওয়া গানটির মধ্যে এই সুখই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ :

The cult of the One dies in the conflict of the many.
The door to it is closed by many a lock of Koran,
Puran and Rosary.

একের তত্ত্ব বহুর ঘন্দের চাপে মারা পড়ে। কোরান, পুরান, আর জপমালায় বহুসংখ্যক তালায় এর দরজা হয়ে আছে রুদ্ধ। এই রুদ্ধ দরজায় আরো নুতন তালা না লাগিয়ে বরং সেগুলো খুলে ফেলে সকলের জন্ত নির্মল দত্তের প্রকাশকে অব্যাহত সহজ সুন্দর করে দেওয়ার চেষ্টাতেই ধর্মশিক্ষার সার্বিকতা; এই সার্বজনীন ধর্মবোধের উদ্বোধনই বিজ্ঞানে নীতিশিক্ষার কাম্য আদর্শ।

সাংস্কৃতিক ঐক্য সমস্যা

ভারতে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য—unity in diversity—বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য। বিভিন্ন সম্প্রদায় অরণ্যভীত কাল থেকে এখানে নিজ নিজ সংস্কৃতি গড়ে তোলাবার কাজে ব্যাপ্ত

আছে; ভাষা, ধর্মমত, আচারনিষ্ঠা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য থাকলেও উচ্চ আদর্শ ও সংস্কৃতির স্বত্রে সকলেই একত্র এখিত। আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, জৈন-শিখ প্রভৃতির ধর্মমতের বহিরূপে প্রভেদ দেখা যাবে। বৈচিত্র্যই জগতের নিয়ম। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেমন ঐক্য বিজ্ঞান ভেদনি এই সকল ধর্মমতের গভীর তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলেও এক মহাসত্যের উৎসে গিয়ে পৌছতে হয়। বিভিন্ন ধর্মের দেশ এই ভারতের সাধকমণ্ডলী—কবীর নামক থেকে রামমোহন, পরমহংস রামকৃষ্ণ, কেশব লেন পর্যন্ত—সকলেই এই ধর্মের উৎসমুখে পৌঁছে ঘোষণা করে গেছেন : মূল এক। অল্পরাগ থাকলে সবরকম সাধনপদ্ধতি দিয়েই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যত মত তত পথ।

তবে প্রশ্ন হবে সকল ধর্মই যদি মূলত এক তা হলে ধর্মকে কেন্দ্র করেই এত বিরোধ কেন? সাম্প্রদায়িক বা ধর্মানৈক্য-জনিত বিরোধ প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির বৃষ্ট নয়। স্বার্থসন্ধ চতুর জনের ব্যক্তিগত বা দলগত—পারমাণ্বিক নয় জাগতিক লিঙ্কি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মের মুখোশে সাজিয়ে রাজনৈতিক রসদকে নামানো হয়েছে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির মনে এর জন্ত কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণ যারা গভীর তত্ত্ব না বুকেও চিরকাল একত্র ভ্রাতৃত্বাবে পরস্পরের সহযোগিতায় বাস করে এসেছে এবং একত্রই যাদের বাস করতে হবে—তাদের মন বিষিয়ে গেলে ভারতের মুক্তি ও জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হবার আশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী রোশম মাসানির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। *The Cultural Problem* পুস্তকে তিনি বলেছেন :

The gospel which can unite all human souls under one standard of universal religion is the gospel of Humanity. It will not be a religion in the ordinary sense of the term. It will not be a revealed religion. It will have to be evolved by the combined effort and co-operation of men of goodwill on earth, . . . Not by political pacts, nor by constitutional devices, but by the acceptance of this larger and nobler conception of religion may man hope to overcome the differences that divide people. (Pp. 38-39)

মানবতার ধর্মই যাবতীয় লোককে এক বিশ্বজনীন ধর্মের পতাকাভালে সমবেত করতে পারে। ইহাকে ঠিক ধর্ম আখ্যা দেওয়া চলে না। ইহা অপৌরুষেয় ধর্ম নয়, পৃথিবীর মহাহুতব ব্যক্তিদের সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগিতা দ্বারা এর উদ্বোধন করতে হবে। রাজনৈতিক চুক্তি বা শাসনবিধির মারপ্যাচে নয়, সকল ধর্মের উদার মূল একত্রাবধকে স্বীকার করার মধ্যে দিয়েই মানুষ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অনৈক্য মুছে ফেলতে পারে। ঈশ্বরে ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করার সময় এই কণ্ঠগুলো আমাদের বিশেষ ভাবে শ্রবণ রাখতে হবে নতুবা আমাদের গণতন্ত্র ও জাতীয়তার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবার সম্ভাবনা।

আর একটি কথাও শিক্ষাত্রুতীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতার অল্প প্রস্তুত করে তোলাই পরাধীন দেশে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, কেননা স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়। পরাধীনতা মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান অন্তরায় ; এর গুরুভারে জাতির যেরূপও ভেঙে যায় ; সমাজ-জীবনে নংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির কলে মানুষ

ক্রমে মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানজনকবর্জিত ক্রীতদাসে পরিণত হয়। স্বাধীনতার অমুকুল আবহাওয়ায় মানুষ তার অন্তর্নিহিত প্রতিভার সম্ভাবনাকে সর্বপ্রকারে বিকশিত করে তুলতে পারে, কাজেই স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করাও বর্ধেরই অঙ্গস্বরূপ।

কি-বা চাই ?

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমি কি-বা চাই ?

যাহা চাই পৃথিবীতে আজি তাহা হুঁজে নাহি পাই ?

পেয়েছিছ এক দিন অকুরন্ত স্বাস্থ্য ও যৌবন,

পরিপূর্ণ ভোগ আর নিষ্পাপ জীবন,

পদতলে স্নানদ্রী বরণী,

মোরা হুঁটি অমৃতের তরুণ-তরুণী,

দাঁড়য়ে পবিত্র হয়ে

গেয়েছিছ আনন্দের ছন্দে বেদগান,

সারা বিধে সেই দিন দেখেছিছ পরিপূর্ণ প্রাণ।

এতটুকু মিথ্যা কত পশে নি জীবনে,

বরণী-মা আশীর্বাদ করি,

উল্লাসেতে শত দিত আমাদের প্রতি গৃহ ভরি'।

বিস্মেতে বিহ্বানো ছিল আমাদের সুখ-আন্তর্য,

ভগবানে ছিল এই চিত্ত নিবেদন,

চন্দ্র-সুখ-গ্রহগণ উর্দ্ধে থেকে দিত আশীর্বাদ,

করিয়া পড়িত শিরে দেবের প্রসাদ ;

পৃথিবীর পশুপক্ষী গাছপালা তাই

সকলে মোদের ছিল ভাই।

গোটা বিধে বাঁধা ছিল এক পরিবার,

সবে মিলে একটি সংসার ?

আজ হায়, দেখিতেছি কারো সাথে কারো মিল নাই,

দ্বিরদ্বির করেছে সবাই।

বরণী হইতে আজ মুছে গেছে প্রেম,

মানুষে মানুষে ঐক্য নাই,

বন্ধ থেকে ভগবান নিয়েছে বিদায়।

সারা পৃথিবীটি আজি হয়ে গেছে মাংসের দোকান,

মাছি শুধু করে ভুং ভুং,

পুতিগন্ধে ভ'রে গেছে বিষাক্ত পবন,

আকাশেতে ভূতের তাণ্ডব,

নীচেতে প্রেতের উপদ্রব,

এই প্রেত-উৎসবের মাঝে

কেহ কেহ বলে হায়—মোরা বেশ আজি।

যারা বলে, তারা পশু-নর,

এ সমাজ এ সভ্যতা নহে মানবের,

সভ্যবেশী ইহা বর্করের।

বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্তির লাগিয়া আজি তাই;

প্রাণ চাহে বাইতে সেবার,

বিষাক্ত হয় নি পাপে ঘেখানেতে মানুষের ভীড়,

আমি চাই সেই পৃথিবীর

একখানি পরিপূর্ণ আনন্দের কোল,

এক ঋণ ক্ষুদ্র শত ক্ষেত,

তারি পাশে নীলাকাশে আনন্দের দোল,

সেই আকাশের নীচে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বতী-তীর,

তারি কোলে বাঁধিয়া কুটীর,

স্নানদ্রী তরুণী এক তার হুঁটি প্রেমভরা আঁধি,

তার হাতে হুঁটি হাত রাখি,'

প্রাণ করি' পরিপূর্ণ ছন্দে আর গানে,

মোর সাথে বাঁধি ভগবানে,

বলিব—পেয়েছি শান্তি, জড়িয়াছি অমৃত-অমৃত,

এই চাই এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।



অধ্যাপক শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

প্রচুর ব্যবহার, সুমিষ্ট স্বাদ ও অম্লত্ব গুণের জন্য আমকে 'শ্রীমঙ্গলের আপেল' এবং ফলের রাসা বলা হয়। এশিয়ার শ্রীমঙ্গলের গাছ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর শ্রীমঙ্গলের সর্বত্রই একে পাওয়া যায় নানান জাতীয় ফলের বাগানে লাগানো গাছ হিসাবে। একদম পুরোপুরি আমবাগানও কম যায়গাতে দেখা যায় না। আমগাছের প্রয়োজনবোধ বিশেষ করে শ্রীমঙ্গলেরই উপযুক্ত এবং সামান্য তুষারপাতও এরা সহ করতে পারে না। এই কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কেবলমাত্র দক্ষিণ-ফ্লোরিডায় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অল্পবিস্তর এর চাষ সম্ভবপর। যদিও শতাধিক বৎসর পূর্বে ফ্লোরিডাতে এর প্রথম আমদানি হয়েছিল তবুও গত পঁচিশ বৎসরেই সে দেশে এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং আম সেখানে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে জন্মানো হচ্ছে।

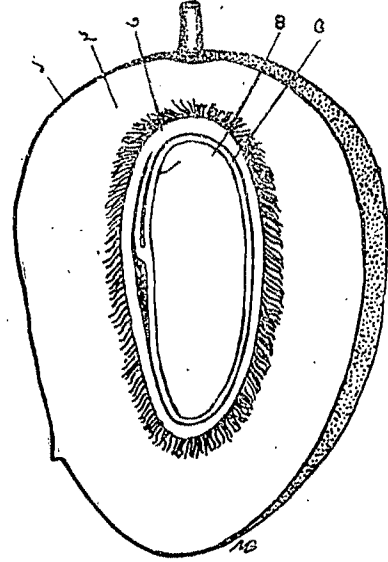
প্রায় ত্রিশটি জাতের গাছকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে *Mangifera* শ্রেণীর। ভারতবর্ষে আমের শত শত উপজাতি আছে এবং এই সংখ্যাধিক্যের জন্যই তাদের সঠিক সংখ্যা এবং স্থানীয় নাম বলা সম্ভবপর নয়। তবে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা বিভাগ এই বিষয়ে বর্তমানে সচেষ্ট এবং আমের একটি Mono-gram তাদেরই পরিচালনার দ্বারা তৈরি হচ্ছে।

দক্ষিণ-টেনাসেসিমে ফলের জন্য চাষ-করা ব্রহ্মদেশীয় 'লাম্বুত' (*M. foetida*), আমের চেয়ে অনেক নিকট। আম বা আঁব সাধু ভাষায় অত্র বা আত্র নামে পরিচিত। এ ছাড়া পুরনো সংস্কৃত পুঁথিতে এর বহু নামের ব্যবহার দেখা যায়।

যদিও এশিয়ার উষ্ণমণ্ডলের অথবা ইন্দো-মালয়েশ ফলবান গাছ, তবুও গত শত বৎসরে পুরাতন এবং নবীন পৃথিবীর উষ্ণ-মণ্ডলে এবং তারই নিকটবর্তী অঞ্চলে আমের খুব বেশী রকম চাষ শুরু হয়েছে। বর্তমানে পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, তুরস্ক, আরব, চীনদেশ, ব্রেন্সিল এমন কি ইতালি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলেও এর প্রচুর চাষ হয়ে থাকে।

হিমালয়ের উষ্ণমণ্ডল; সমুদ্রপৃষ্ঠের ১-৩০০০ ফুট উঁচুতে পর্যন্ত কুমাইন-থেকে ভুটান পাহাড়, বিহারের উপত্যকা, খাসিয়া পাহাড়, ব্রহ্মদেশ, অযোধ্যা, পশ্চিম উপদ্বীপের বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ যুক্ত এবং পূর্বে বাংলা থেকে সিংহল পর্যন্ত এরা আপনা হতেই জন্মাত এবং এখনও জন্মে। দক্ষিণাত্যের দক্ষিণ অংশে কাডাঙ্গার পাহাড়েও প্রায় বহু অবস্থায় আমগাছ দেখতে পাওয়া গেছে। ভারতের যে সব স্থানে আবহাওয়া উপযুক্ত এবং জমির অবস্থা বেশ ভাল, সেই সব স্থানে এর প্রচুর চাষ হয়। তা ছাড়া

ভারতের সমস্ত জমির প্রায় সমস্ত বনেই আমগাছ পাওয়া যায় এবং এখানে সেখানে যে সব গাছ পাওয়া যায় তারা জন্মের পরিত্যক্ত আঁটি থেকে।



আমের দেশ—(১) বহিঃত্বক (২) মধ্যত্বক (৩) অন্তঃত্বক
(৪) বীজ ও (৫) বাগাবরক দেখা যাইতেছে

আমের গাছগুলো সাধারণতঃ ২৫-৩০ হাত উঁচু হয়, তবে প্রায় ৬০ হাত পর্যন্তও উঁচু হতে পারে। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলির দুই ধার দিয়ে আমগাছ খুব বেশী করে লাগান উচিত। যে সমস্ত আঁটি থেকে বীধি বা বাগিচার গাছ তোলা হয় সে সমস্তই বাছাই করা আমের টাইকা আঁটি পুঁতে ভেঁরি হয়। এদের অল্প বয়স হয় বেশ তাড়াতাড়ি এমন কি অনেক সময় ১০-১৫ দিনের মধ্যেই। গাছগুলি চারার বাগানে জন্মান যেতে পারে যদিও টব অথবা খুড়ি ব্যবহার করাই সঙ্গত, কারণ গাছটির প্রধান শিকড় খুব লম্বা এবং প্রতিরোপণের সময় এই শিকড় জ্বলম্বল হতে পারে। শুকনো মাটিতে গাছগুলিকে জল সেচন করতে হয় অনেক দিন পর্যন্ত। সাধারণতঃ প্রায় ৬-১০ হাত পর্যন্ত যখন উঁচু হয় তখনও, কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে আমগাছ না লাগানই ভাল। অজায়গার পুঁতলে স্বর্ষ্যের আলোতেও ছোট চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।

ভাল জাতের গাছগুলি তোলা হয় দ্বোড়কলম এবং গুল-কলম থেকে। প্রায় সর্বত্রই আজকাল দ্বোড়কলম-পদ্ধতি প্রচলিত এবং এই পদ্ধতিতেই পুরোপুরি সাক্ষ্য দেখতে পাওয়া যায়। গুলকলম এবং চারা তোলাবার অন্যান্য পদ্ধতিতে শত-করা ২৫-৮০ ভাগ সাক্ষ্য লাভ করা যায়। আঁটির গাছ বেশ বড় ও সতেজ হয় কিন্তু কলমের গাছ ভেঁমন হয় না।

১ হিন্দিতে এর নাম আম; বরিয়াম—আসামী, জেগাহু, বোছো—গাড়া; মার্কী—গোন্দী; উলি—কোল; উল—সাঁওতালী; অর—উড়িয়া; আখা—মহারাষ্ট্রী; মা, মাদস—তামিল; মামাধি, মামি—তেলেগু; মাতু—মালয়ালম; তেরেতি—বর্মী।

আঁটির গাছের চেয়ে আগে ইহার ফলন হয় এবং ফলের সংখ্যাও অনেক বেশী হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় ছোড়কলমের সাহায্যে প্রয়োজন মত উন্নত ধরনের গাছ আমরা জন্মাতে পারি—যাতে ফলের এবং ফলনের অনেক উন্নতি দেখা যায়।

আমাদের দেশে বর্ষার শেষ দিকটাই চারা লাগাবার প্রশস্ত সময়।

বিভিন্ন জাতির গাছের মধ্যে ফল ধরবার সময়ের তারতম্য খুব বেশী। আগেই বলেছি কলমের গাছে আঁটির গাছের চেয়ে আগে ফল ধরে। কলমের গাছে ফল ধরতে ৪-৯ বৎসর সময় লাগে। তবে সাধারণতঃ পঞ্চম বৎসর থেকেই ফল ধরতে আরম্ভ করে যদিও জমির সার এবং সেচের উপর ফলন অনেকটা নির্ভর করে। আমগাছে প্রতি বৎসর এক বার ফল ফুল ফোটে এবং তা থেকেই ফলের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে আমগাছে ফলনেরও সাময়িক বিশেষত্ব (periodicity) আছে, প্রচুর ফলনের পরবর্তী বৎসরে ফলন কম হয় এবং পর্যায়ক্রমে ফলন এই ভাবেই হতে থাকে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে এই দেশের দক্ষিণাংশে পৌষ মাসের শেষে আমের মুকুল বের হতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাসে মুকুল মঞ্জরিত হওয়া প্রায় কোন গাছেই বাকী থাকে না। আমের মুকুল যখন মঞ্জরিত হয় তখন ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এই বৃষ্টিই আমের ফলনের প্রচুর পরিমাণে অনিষ্ট করে। ফুল ফোটার পর বৃষ্টি হলে সেই ফুল ফুলের পরাগ এবং গর্ভ-কেশরের মধ্যে জমে ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং সেইজন্য গর্ভস্থ নিষিক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয় জলের সংস্পর্শে এসে পরাগ-কেশর পচে যায়। প্রায় দশ দিন পর্যন্ত তাজা থাকবার পর অনিষিক্ত অবস্থার শুকিয়ে যায় অর্থাৎ ফলন আর হয় না।

মেঘা গেছে এই ভাবে অসময়ে বৃষ্টি হবার ক্ষয় শতকরা প্রায় ৭০-৯০ ভাগ আমের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুল যদি বৃষ্টির পরে ফোটে অথবা বৃষ্টির পর বেশ রোদ এবং বাতাস হয় তা হলেও বৃষ্টির জল শুকিয়ে যাবার দরুন ভেয়ান কোন ক্ষতি হতে পারে না। তবে এই ক্ষতির হাত থেকে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আম রক্ষা করা যায় যদি বৃষ্টি হবার পরই গাছের ডাল-গুলিকে খুব জোরে বাঁহুনি দিয়ে ফুলের ভেতরকার জল বের করে দেওয়া যায়। এতে ফুলগুলি শুকনো অবস্থায় থাকে এবং কেশর পচে যায় না বলে ফলনের বিশেষ কোন ক্ষতিই হতে পারে না।

ফুল ফোটার এক পক্ষকাল মধ্যে ফল ধরে এবং এইগুলিই যখন ছোট ছোট গুটির আকার ধারণ করে তখন তাকে আমরা 'কড়া' বা 'কড়িয়া' বলি। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আম ধরে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় সমস্ত আমই পেকে যায়। কিন্তু ভাগলপুর, মালাধা থেকে পশ্চিমের সব জায়গাতেই মাঘ ফাল্গুন মাসে ফুল ফোটে এবং আষাঢ় মাসে আম পাকতে আরম্ভ করে। ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে আষাঢ় মাসেই আম পাকে। সেখানে বাংলা-দেশের চেয়ে অনেক পরে আম পেকে থাকে। কোন কোন

ক্ষেত্রে আশ্বিন মাসেও আম পাকে। শুধু তাই নয় মালদা অঞ্চলের কোন কোন গাছে সমস্ত বৎসরই ফল ধরে। আমাদের দেশেও এই জাতীয় গাছের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই পাকা আম সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দশ বৎসরের একটি গাছে প্রায় ৫০০ আম ধরতে পারে এবং ৩০-৪০ বৎসরের গাছে ১৫০০ আম ধরতে পারে। তবে ৩০০০-এর চেয়েও বেশী আম একটা বড় গাছে অনেক সময় ধরতে দেখা যায়।

সামান্য জবখাচ্ছ দরদ জমিতে আম গাছ খুব জোরালো হয়, তবে নীরস বেলে ও কাঁকরযুক্ত মাটিতেও এরা জন্মে থাকে। ভিজা আবহাওয়ায় ও কাল মাটিতে আম সব চেয়ে ভাল জন্মায় এবং মাকড়া পাথুরে মাটিতেও মন্দা জন্মায় না। ৩০'-১০০' বৃষ্টিপাত আমগাছের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী।

ভাঙা প্রাচীরের মাটি এবং শুকনো পাক মাটি আম গাছের গোড়ায় দিলে গাছ খুব জোরালো হয়ে ওঠে।

১৬ সের গোবর সার, ২২ সের হাড়ের গুঁড়ো এবং ১৫ সের ছাই মিশিয়ে আম গাছের উপযোগী সার তৈরি করা যায়। হুনও ব্যবহার করা যেতে পারে। সার ব্যবহার করা ভাল কিন্তু নাহিত্রোজেনের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় ফুলফলের পরিবর্তে ডাল-পালাই খুব বেশী হতে থাকে। সেইজন্যই মাঝে মাঝে একেকজো অথবা বহু ডাল-পালা বাদ দিয়ে দেবার ক্ষমতা গাছ হাঁটাই করা হয়। খুব বেশী হাঁটাই কিন্তু ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আকারে গাছগুলি খুব বড় হওয়ার দরুন যতটা সম্ভব দূরে দূরে চারা লাগান দরকার, ২০ হাতের কম ত নয়ই। সিঁহু প্রদেশে ১২-১৭ হাত অন্তর গাছ লাগান হয়ে থাকে। এইভাবে আমের বাগান করতে যুদ্ধের আগে প্রতি একর জমিতে প্রায় আড়াই শ টাকার খরচ পড়ত।

দশ বৎসরের বেশী দিনের বাগান, যেগুলির গাছের শিকড় সমস্ত জমির ভেতরই ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে সার দিতে হলে সম্পূর্ণ জমিতেই প্রতি একরে ১০ গাড়ী কৃষিকেন্দ্রের আদিনার আবর্জনা, গোবর ইত্যাদি পচানো সার দিতে হয় অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে যখন বাগানগুলোতে অল্প ফসলের চাষও করা হয়ে থাকে।

নতুন বাগানগুলোতে প্রত্যেকটি গাছে জ্বালাদা সার দিতে হয়। ১-৪ বৎসরের গাছগুলিতে ১০-১৫ সের, এবং ৫-১০ বৎসরের গাছগুলিতে ২০-৪০ সের পচান সার প্রতি গাছে দিতে হয়। গাছগুলির ডালপালার গম্বুজের ঠিক বাইরের দিক দিয়ে খানা কেটে এই সার দিতে হয়। খানাটি চওড়া হবে ২-৩ ফুট এবং গভীর হবে ৪-৬ ইঞ্চি।

চারা লাগানোর পর থেকে ফলধরা পর্যন্ত যে অবকাশটুকু পাওয়া যায় সেই সময় আমাদের দেশে, সিঁহুর নবাবশা প্রদেশ এবং অণ্ডাজ জায়গাতেও নানান জাতের কতকগুলি ফসলের, যেমন লক্ষা, বেগুন, পেঁয়াজ, বাজি প্রভৃতির চাষ করা হয়। এমন কি গরু-ছাগলকে খাওয়ানোর ক্ষমতা গ্রীষ্মকালে যোয়াজরও চাষ করা হয়।

কোন বৎসর গ্রীষ্মকালে কোন গাছে যদি যথেষ্ট বৃন্তন ডাল-পালা না জন্মায় তবে বর্ষার ৩৪ সপ্তাহ আগে জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে 'এমোনিয়া সালফেট' দিতে হয়। ৬-৮ বৎসর বয়সের গাছে /২১০ এবং এঁইভাবে হিসাবমত ২০ কিংবা তার চেয়েও বেশী বয়সের গাছে /৫ সের পর্য্যন্ত সার (প্রতি গাছে) দিতে হয়। সার দেবার পর দু-এক বার ভালভাবে সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাগানের মাটিতে যখন অধিক পরিমাণ 'পটাশ' এবং 'ফস-ফরাসের' অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ডাল ফলনের ক্ষত গাছ-গুলির সেই অভাব পূরণ দরকার হয়ে পড়ে তখন হাড়ের গুঁড়ো অথবা 'সুপারফস্ফেট' এবং কার্টের ছাই দিতে হয়। হাড়ের গুঁড়ো অথবা 'সুপারফস্ফেট'র পরিমাণ হচ্ছে : ১ বৎসরের গাছে /২১০ সের এবং প্রতি বৎসরে /১০ সের করে বাড়িয়ে /৭১০ সের পর্য্যন্ত প্রতি গাছে দিতে হয়। সেই ভাবেই কার্টের ছাই ১ বৎসরের গাছে /৫ সের প্রতি বৎসরে /১ সের করে বাড়িয়ে প্রতি গাছে /১৫ সের পর্য্যন্ত। এ সার সুবিধামত আশ্বিন-পৌষের মাঝামাঝি যে-কোন সময় দেওয়া যায়।

আমের ফলের স্বাদেরই যে শুধু তারভদ্রা দেখা যায় তা নয় আকার এবং আয়তনেরও প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়—ছোট ফলের আকার থেকে আরম্ভ করে বিরাট 'ফজলি' ইত্যাদি সকল প্রকার আমই পাওয়া যায়।

আম ইত্যাদি শাঁসালো ফলের ত্বক (Pericarp)কে বি-অংশে বিভক্ত করা যায়—প্রথমে, বহিঃত্বক (epicarp) তা-মধ্যত্বক (mesocarp) এবং অন্তঃত্বক (endocarp)। জাতীয়-ফলের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'ড্রুপ' (Drupe)। আ-বহিঃত্বক হচ্ছে খোলা, মধ্যত্বক হচ্ছে ফলের শাঁস—যা অ-খাই, এবং অন্তঃত্বক হচ্ছে আঁটি যার ভেতর বীজ থাকে।

শাঁসের স্বাদ-গন্ধের উপরই ফলের দাম কম বেশী থাকে। শাঁসের রং সাধারণতঃ বেশ চমৎকার সোনালী ও লালচে বা লালে-হলুদে মেশানো হতে পারে।

মোলায়েম এবং পাভলা খোসা, গোলঠোঁট, এবং হ-থেকে লাল রঙের ফলগুলিই সব চেয়ে দেখতে সুন্দর আকর্ষণীয়। বাছাই-করা জোড়কলমের গাছের ফলের সাধারণ কড়া গন্ধওঝালা ফলের মিল করলে ভুল করা হ-প্রথমগুলো মূল্যবান, মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত, শাঁস-চমৎ-মোলায়েম এবং আশশূন্য। শেষোক্তগুলো যদিও খাবার উপ-তবুও গন্ধ তাপিনের মত উগ্র এবং এমন আশশূন্য যা যে-বিরক্তি লাগে। ফলের চেহারায় এবং আকারেও অনেক ভ-ভদ্রা আছে। সাধারণতঃ আঁটির গাছের ফল আকারে-হয় কিন্তু ডাল কলমের ফলের ওজন /১১০ সের পর্য্যন্ত-পারে, এমন কি এর চেয়েও বেশী। পাকা ফলে ইঁদুর শব-পরিমাণ শতকরা ১১-১২ ভাগ থাকে, শতকরা অর্ধ-১।

শ্রী ক্যাম্বল নিমিটেড

হেড অফিস-৩/১ ব্যাংকশাল স্ট্রীট • কলিকাতা

ফোন-কলকাতা-১১২২ ও ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট,
বড়বাজার, ল্যানসডাউন, খিদিরপুর, বেহালা,
বরানগর, বার্টানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার,
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা,
বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস

মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুশীল সেন, বি, এ

রূপ চর্চায়-
অপরিহার্য.



সি, আর, দাশের

রাংজাভা স্নো ও
পাউডার

বিশুদ্ধ ও স্থনির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ।
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মসৃণ ও কোমল হয় এবং ত্রণ
প্রভৃতি চর্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ সুদুর্গন্ধ, মধুর ও
দীর্ঘস্থায়ী। সর্বত্র পাওয়া যায়।

অনুম্পা কেমিক্যাল কলিকাতা

‘প্রোটিন’, যেভসার খুব কম অথবা থাকেই না এবং খাদ্যপ্রাণ ‘ক’ এবং ‘খ’ বেশ থাকে। তা ছাড়া কাঁচা আমে ‘গ্যালিক এসিড’ প্রচুর পরিমাণে থাকে। পাকা আমের গুণ অনেক। জলখাবার হিসেবে পাকা আম খুবই মূল্যবান, উপাদেয় এবং পুষ্টিকর।

নামকরা হাজারো উপজাতির ভেতর আমাদের দেশে বোম্বাই-এর ‘আলফোলো’, গোয়ার ‘ফার্মাণ্ডিন’, মাল্ভাজের ‘মালাগোবা’, মালদহের ‘ফজলি’, ‘গোপালভোগ’, ‘ফীরসাপাত’ এবং বিহারের ‘ল্যাংড়া’ আম খুব বিখ্যাত। এখন নানান জায়গায় এই সব আমেরই চাষ করা হয়ে থাকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। পূর্ববঙ্গের ‘অম্বুভূটীর’ উপজাতীয় আম খুব ভাল। বাংলাদেশে একমাত্র উত্তর বঙ্গে আম প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই অঞ্চলের আমই সর্বোৎকৃষ্ট।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফ্লোরিডা’তে যে সব আম জন্মানো হয় তার ভেতর বিশেষ করে ‘হাডেন’, ‘পাহেড়ী’, ‘ক্যান্ডো-ডিয়ানা’, ‘মিসিল’, ‘পিকো’, ‘সমের্শ’, ‘ল্যাংড়াবেনার্সি’ এবং ‘আমিনি’ ইত্যাদি খুব বিখ্যাত। তবে এর মধ্যে ‘হাডেন’ জাতীয় গাছই খুব বেশী লাগানো হয় তার কারণ হচ্ছে এর ফলের জাত খুব ভাল, আকার বড় এবং রং খুব চমৎকার।

আম পাকলে গাছ থেকে পেড়ে ধরে রাখলে কয়েক দিনেই পচে যায় কারণ এর স্মিষ্ট রসে নানান জাতীয় জীবাণু সহজেই জন্মাতে পারে, যারা আমটিকে পচিয়ে দেয়। পূর্ব বঙ্গের এবং আসামের নানা জায়গায় আম পাকবার

সময় তার ভেতর এক রকম কীট জন্মায়, এই সব পোকা জন্মানোর জন্য সম্পূর্ণ আমটাই নষ্ট হয় না। কিন্তু আর এক প্রকার ফ্রিমির মত খুব ছোট ছোট কীট জন্মে—পাকা আমে তারা কিলবিল করে শব্দভে থাকে। এই সব কীট জন্মালে সে আম আর খাওয়া যায় না। আম যখন কচি অবস্থায় থাকে তখন একপ্রকার পরাঙ্গপুষ্ট পতঙ্গ ফলটির ভেতর গর্ত করে ঢুকে তার মধ্যে ডিম পেড়ে বেড়িয়ে যায়। তারপর আমটিও বড় হয়ে পাকে, সেই সঙ্গে ডিম থেকে সেই পতঙ্গের শূককীটের সৃষ্টি হয় এবং এই শূককীট-গুলোকেই আমরা পাকা আমে কিলবিল করে শব্দভে দেখি। এ ছাড়াও নানা রকম ব্যাধি আমের হয়ে থাকে কডক বা ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার জন্ম, কতকগুলি আবার নানা প্রকার কীটপতঙ্গের দমন। যেমন ডালের ডগা শুকিয়ে যাওয়া; ফুল ধরে যাওয়া, শেকড় পচে যাওয়া, ডাল পচে যাওয়া ইত্যাদি। *Bacillus mangifera* কচি ডাল আক্রমণ করে। আমকে অনেক প্রকার কীটপতঙ্গের অন্যাচার সহ করতে হয়, তবে এর ভেতর কতকগুলি আবার মানুষের কাজেও লেগে থাকে যেমন আসামের ‘উমলুরি’ অথবা ‘এ্যাম্পটনি’ গুটিপোকা (*Cericlea trifenestrata*, Helfer)। এরা আমের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু এদের নিকট থেকেও অতি অল্পপরিমাণ রেশমই পাওয়া যায়। সাদা মোমের পোকা (*Ceroplastes ceriferous*, Sign) কেও অনেক সময় এর উপর দেখা

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্তরের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বেচ্ছা ও তত্পরি ঐ টাকা শেষায়ে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বেচ্ছা ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষার ও সিকিউরিটি ক্রেয়-বিক্রেয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরথাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও বোণাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিজ্ঞান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সামুদ্রিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুক্তরাজ্যকালীন মহামাত্য ভারতসম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাত্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ x x-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইহার নিভুল গণনা, অলৌকিক শ্রিবাঙ্গুষ্ঠির আর একটি জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের প্রত্যাাদি হেড অফিসে দেখিলেই বৃষ্টিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষবিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ বোম্বার প্রথম দিবসেই ৪ বর্ষা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য বাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাত্র, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিঙ্গ হাইনেস মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার—মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস মাননীয়া ষষ্ঠমাত্রা মহারাজা ত্রিপুরা স্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যি তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সচিবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” -কেউনবাড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর নেতার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি. মাধবম্ নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যি তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রবন্ধে উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লয়েল বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অভ্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।
ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজত্বলাভ প্রাপ্ত, মান, ধন, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (ভক্তোক্ত) মূল্য ৭৫।
অভূত শক্তিসম্পন্ন ও সফর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯৫।, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য।
বর্ণলাভকর কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিহ্র মানবকে সঙ্কট রাখিয়া কমে দ্রুতগতিতে ব্রহ্মাণ্ড। মূল্য ২৫।, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৫। (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)।
বশীকরণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাণী) মূল্য ১১৫।, শক্তিশালী ও সফর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৫। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরীয় জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
সাফাভের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা।
ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা
 ফোন : কলিঃ ৭৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০।
লণ্ডন অফিস—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

যায়। আমের লাকানো পোকা (*Idiocerus* sp.) মুহুল এবং কচি ডালপালা আক্রমণ করে। 'রোজিন সোপ কম্পাউন্ড' দিয়ে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শস্তচূর্ণবৎ পোকা (*Monophlebus stebengii*) কচি ডাল, মুহুল এবং ফল আক্রমণ করে। বৃক্ষ-ভেদক কীট (*Engnapptus marginatus*) পাতা, এবং ছোট ডালপালা কেটে দেয়, বীজ নষ্ট করে দেয় এবং পাকা ফল আক্রমণ করে। ডালপালা শাখাপ্রশাখায় ছিদ্র করে; গাছের ছালের নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ ইত্যাদি করে এরা গাছের অনেক ক্ষতি করে। দুই পাখাওয়ালা পতঙ্গের (*Dacus ferrageneus*, *D. persicol*) আক্রমণে ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও আমের আরও নানাপ্রকার শত্রু আছে, বিশেষ করে নানা জাতের রাত-প্রজাপতি।

ক্লোরিডাতে লাল মাকড়সা এবং কয়েক প্রকার আশ-ওয়ালা পোকাই গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। যন্ত্র-পাতির তেল এবং জল ১ ভাগে ৭০ ভাগ এবং তার সঙ্গে 'নিকোটিন সাল্ফেট' মিশিয়ে শীতের সময় দু-এক বার গাছে লাগালে এই সব পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলের কীট গ্রীষ্মমণ্ডলে খুব দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এদের উৎপাত একদম নেই।

প্রায় পেকে গেছে এমন আম গাছ থেকে পেড়ে খড় অথবা আম কিংবা ঐ জাতীয় কোন গাছের পাতার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়—চালানও দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া শেওলা,

কাঠকয়লার গুড়ো, খবরের কাগজ অথবা 'অয়েল পেপার' দিয়ে মুড়েও চালান দেওয়া যেতে পারে—এতে ঠাণ্ডা এবং শুকনো আবহাওয়াতে তাপ এবং আর্দ্রতা ঠিক বজায় থাকে। সময়ে এবং সাবধানে পাঠালে ছোট চারাগাছও দূর দেশে চালান দেওয়া সম্ভবপর।

কাঁচা আম এক মাস কি তার সামান্য বেশী সময় টিন বন্দী করে রাখা যায়।

আজকাল ভাঙারজাত করবার নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইওয়াতে উপযুক্ত বাজারের এবং জাহাজের অভাব হলেও বিশেষ কিছুই আসে যায় না। দেওয়ালের জন্ত ঘানের তুষ, তাপমাত্রা নামানোর জন্ত 'এমোনিয়া', রবারের ঢাকা দেওয়া কাঠের দেওয়াল, এবং 'গ্র্যাসবেন্টস্' ঢাকা দেওয়া ইত্যাদি সুবিধা আধুনিক জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরে থাকে।

পরীক্ষাধারা দেখা গেছে যে ৩৬° ফার্নহিট তাপপরিমাণের ঠাণ্ডা ঘরে যদি সম্পূর্ণ পরিপক্ব অথচ সবুজ আম রাখা যায় তবে তা অন্ততঃপক্ষে ১৮ দিন পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে।

যে সব আম স্বাভাবিক ভাবে পাকে না, ৩৫ দিন পরে তাদের গায়ে ইম্পাত-ধূসর রঙের ছোপ প্রকাশ পায়—আম অনেক দিন জলের মধ্যে থাকলেও এই রংটি প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

ফোন : বি. বি. ১২৭১

টেলি : ডালিয়াটেলর



নানাপ্রকার লোভনীয়
উপহার সামগ্রী
এবং
তৈরী পোশাক
সব সময়ই পাইবেন।

দোকান আইনে বন্ধ—
রবিবার : ইটার পর,
সোমবার : সম্পূর্ণ।

শুভ বিবাহে—
বিচিত্র রঙের
বেনারসী ও
সিল্ক সাড়ী

চেয়ারম্যান—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়

ডালিয়া
৯৫ নং ১১ নং রাস্তা
কলিকতা

১ মণ নির্বাক্তিত জলে প্রায় ১৫ সের হুন দিয়ে তৈরী
আরকে পাকা আম বোতলজাত করা যায়।

হানোভার, ক্যানাডা, এবং আমাদের ভারতবর্ষের বিহার,
মুজাফফর গড়, রত্নসিরি, দিল্লী, কলিকাতা, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি
যায়গায় আম টিনজাত করবার ব্যবসায় আছে।

আমাদের দেশে কাঁচা আমকে সরু সরু করে কেটে
অনেকেই শুকিয়ে রাখে—তাকে আমরা ‘আমচুর’ বা ‘আমসী’
বলি। পাকা আমের রস পাভলা করে শুকিয়ে ‘আমসত্ত্ব’
তৈরি হয়। ভাল করে রোদে দিয়ে রাখলে আমচুর এবং
আমসত্ত্ব বারমাস থাকে এবং তাতে পোকা লাগতে পারে
না। কিন্তু আমচুরে হজুর এবং হুন না মেশালে বর্ষা কালে
পোকায় মষ্ট করে ফেলতে পারে।

আংশহীন কাঁচা আম লম্বা করে কেটে দিয়ে অল্প ভেঁকে
চিনির রসে জাল দিলে মোরব্বা তৈরি হয়। এই আতীর
আমই জলে সেদ্ধ করে তার পর চালুনিতে ছেঁকে নিয়ে চিনির
রসে জাল দিয়ে তৈরি হয় জেলী। এ সব তৈরির পক্ষে
‘কজলি’ আমই সব চেয়ে উপযোগী।

যেখানে আম জন্মায় সে সমস্ত দেশেই আম দিয়ে আচার
চটনী ইত্যাদি তৈরি করবার রীতি আছে।

শুধু যে কলের শাঁসই আমাদের কাছে লাগে তা নয়,
গাছের ছাল এবং শুকনো আঠা (Resin) নানা প্রকার গুহ

তৈরির জন্য দরকার হয়। আটর ভেতরকার সাদা শাঁস
শুকিয়ে রেখে প্রয়োজন মত তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়
এবং অনেক সময় শুঁড়ো করে রাখা হয় ভবিষ্যতের ব্যবহারের
জন্য। আম-কাঠ যদিও খুব শক্ত এবং মজবুত নয় ও
সহজেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে তবুও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র
তৈরি করাতে এর প্রয়োজন আছে প্রচুর।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)



**মাঃ! নিম টুথ পেস্টের গুণে খোবনের
দাঁত শুনি বেশ নির্দোষ হয়ে উঠেছে দেখছি!**

ক্যালকেমিকোর ‘নিম
টুথপেস্ট’ আর নিমের শুঁড়া
মাজন ‘মার্গোফ্রিম’ সকল
বয়সেই দাঁতগুলিকে বেশ
মজবুদ ও উজ্জ্বল করে রাখে।



**ক্যালকাটা
কেমিক্যাল**

দেশ-বিদেশের কথা

কৃতী বাঙালী

বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা, এম-এসসি, সম্প্রতি বেলজিয়ামের অন্তর্গত ব্রুসেলসের 'ইন্টার এলাইড্‌ রিপেয়া-রেশনস্‌ এজেন্সী'র রসায়ন-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত



শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা

হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটির এই একটি মাত্র পদই এক জন ভারত-বাসীকে দেওয়া হইয়াছে।

যোগেন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তীক্ষ্ণবী

ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রজীবনে সকল পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিবিধ বৃত্তি এবং পদক ইত্যাদি লাভ করেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণা করিতেন। অবশেষে যোগেন্দ্রমোহন চিনি-শিল্প বিষয়ক গবেষণায় যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যে শিক্ষালাভ করিয়া উক্ত বিষয়ে এক জন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। অন্তঃপর ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক তিনি নিউ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আবকারী এবং লবণ-বিভাগের রাসায়নিক পরীক্ষক নিৰ্বাচিত হন। এই পদে থাকা কালে তিনি যোধপুর রাজ্যের দিহুয়ানা নামক স্থানে বিপুল সোডিয়াম সালফেটের এক বিরাট উৎস আবিষ্কার করেন। এই অঞ্চলে তাঁহার আবিষ্কৃত সোডিয়াম সালফেটের পরিমাণ আনুজ ৮০ লক্ষ হইতে এক কোটি মণ। ইহা দ্বারা আগামী ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের চাহিদা মিটানো যাইবে। এই আবিষ্কারের জন্ত যোধপুর-সরকার তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ ৮৫,০০০ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কাগজ, কাচ, বস্ত্ররঞ্জন-শিল্প এবং ঔষধাদিতে সোডিয়াম সালফেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ইত্যাদি লোমশুদ্ধ করিবার জন্তও ইহা ব্যবহার করা হয়। শ্রীযুক্ত সাহাৰ আবিষ্কারের পর সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করা আর আবশ্যক হইবে না।

যে সমস্ত বাঙালীর প্রতিভা দেশ-বিদেশে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে যোগেন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্ততম।

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল

সিটি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল মণ্ডল বিপুল রসায়নের গবেষণার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এসসি ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ তাঁহাকে সাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়াছে।

ডাক্তারেরা বলেন

ব্লাড-ভিটা

দুর্বলতা ও ক্ষমতাশীলতা (যে কোন রোগের আশঙ্কা টানিত ও বৃত্ত জীবিত)

সর্বত্র মধুর বাবুর
মোডার্ন রিসার্চ লেবোরেটরি
সি-২০, ডাক্তার এডমিড, কলিকাতা

শ্রীআনন্দ আশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক সেবা-সদন

কয়েক বৎসর হইল স্বামী জ্যোতিজীবন প্রমুখ কয়েকজন সম্মানী দরিদ্রনারায়ণের সেবার আদর্শে উদ্ভূত হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী সাহেবগঞ্জের নিকটবর্তী মির্জাচৌকি নামক স্থানে উপরি-উক্ত আশ্রম এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দা সাঁওতাল এবং দরিদ্র চাষীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহারা এত গরীব যে, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই। এই দুর্গতদের দুঃখ মোচন-কল্পে আনন্দ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বিনামূল্যে ইহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া সমাজের প্রভুত হিতসাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪২০০ জনের অধিক নূতন রোগী এবং ১৪,৮০০ জন পুরাতন রোগী আশ্রমের চিকিৎসা-বিভাগ কর্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩০০ জন সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী। ৮০ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে এবং কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত ২০০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ২৫ জন রোগীকে আশ্রমে স্থান দিয়া নিজেবাই, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি বাহাতে উপযুক্ত অর্থসমৃদ্ধ লাভ করিয়া আরও ব্যাপকভাবে আর্ন্ত মানবতার সেবার আত্মনিয়োগ

করিতে পারে সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া আবশ্যিক। গৃহাদি নির্মাণ, ঔষধপত্র এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সকলেরই সাধ্যমত সাহায্য করিয়া এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত। টাকাকড়ি নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

স্বামী জ্যোতিজীবন

সম্পাদক—শ্রীআনন্দ আশ্রম

পোঃ—মির্জাচৌকি

(সাঁওতাল পরগণা) ই, আই, লুপ।

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা সমিতির

সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :

“আগামী ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী। এই দিবস যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই আমাদের একথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে যে, জাতীয় কবির নিকট আমাদের স্বপ্ন অপরিশোধিত রহিয়া গিয়াছে। কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত অর্থভাণ্ডারে গত ১৫ই মার্চ পর্যন্ত মাত্র ১২১৯১১৬৪/১০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে এই অর্থ আদৌ যথেষ্ট নহে।

এযাবৎ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে উহা আশঙ্করূপ নহে। অধিকাংশ সাহায্যই দরিদ্র জনসাধারণের সামান্ত সাহায্য দানে

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

সংগৃহীত হইয়াছে। এমন কি, দুই আনা, এক আনা চাঁদাও তন্মধ্যে আছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে এখন পর্যন্ত তেমন উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। যদি অর্থাভাববশতঃ আমরা যথোপযুক্তভাবে কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে উহা গভীর পবিত্রতাপের বিষয় হইবে। কবিগুরুর আগামী জন্ম-দিবসের পূর্বে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাই আমাদের সঙ্কল্প। সকলের সহযোগিতা পাইলে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া এখনও আমরা আশা করি। এই মহান উদ্দেশ্য বাহাতে সকল হইতে পারে, তৎকালে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট পুনরায় আবেদন জানাইতেছি।

সমস্ত দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :

সাধারণ সম্পাদক, নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ৬৩ নং দারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা অথবা ১নং বর্ষণ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

শ্রীশোভন দত্ত

শ্রীশোভন দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পদার্থ বিদ্যায় এম-এসসি পাশ করিয়া প্রেসিডেন্ট রায়েচাঁদ বৃত্তি পান এবং সিটি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভারত-সরকারের Assistant Industrial Adviser এর পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য করিতেছিলেন। গত ১লা মার্চ তারিখে হঠাৎ দিল্লীতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী ও সায়াস এণ্ড কালচার পত্রিকার চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। বিশ্বভারতীয়

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ-গ্রন্থাগার অন্তর্গত “বিশ্বের ইতিকথা” স্কন্ডর রচনা। ইহাও তাঁহার লেখা। যে সমস্ত দ্রঃস্থ পবিব্রার বোগের



শ্রীশোভন দত্ত

চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না তাহাদের সাহায্যার্থে মৃত্যুকালে তিনি দশ হাজার টাকা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন।

পানে পরম ভক্তি

শ্রীমদভিউ

দার্ডিঞ্জলিং চা

শ্রীমদভিউবিউচাম্

কমলালয় ষ্টোর্স লি:

শুভ
বিবাহের
জন্ম
সর্বপ্রকার
প্রয়োজনীয়
সামগ্রী
আমাদের
ষ্টোর্সে
পাইবেন।

কমলালয় ষ্টোর্স
লিমিটেড,
ধর্মতলা, কলিকাতা।

সুপ্তক - পার্শ্ব

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জীবনী ও পত্রাবলী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫২। শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩। আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

রবীন্দ্রনাথের যুগে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। শরৎচন্দ্র নিজেকে নিজের প্রতিষ্ঠার আসন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান করিয়া লইতে তাঁহাকে কাহারও প্রশংসাপত্র আদায় করিতে হয় নাই। আত্মকথা বলিতে গিয়া শরৎচন্দ্র নিজেকে বলিয়াছেন, “বাংলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার ছুঁতোগ ভোগ করতে হয় নি।” ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিক। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এক-এ পড়িবার সময় সাংসারিক ছুঁতোগে তাঁহাকে পড়া ছাড়িতে হয়। তারপর তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হন। তিন বৎসর পরে ১৯০৩ সালে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। সংসার কিন্তু তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া এবার শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি একাউটেট-জেনারেলের আপিসে কাজ করিয়া বার-তের বৎসর কাটাইয়া দেন। তারপর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার ডাক পড়িল। বঙ্গদেবের নির্বন্ধাতি-শয্যে তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। “যমুনা”র ‘রামের স্মৃতি’, ‘পথ-নির্দেশ’ ও ‘বিন্দুর ছেলে’ বাহির হইবামাত্র দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। তখনও তিনি ব্রহ্মদেশে। তার পর বঙ্গদেবের আহ্বানে এবং শারীরিক অসুস্থতার দরুন তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং “ভারতবর্ষ” প্রভৃতিতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার লেখা চলিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র

বাংলার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রূপে পরিগণিত হইলেন। বাষট্টি বৎসর মাত্র বয়সে লেখার পূর্ণ জোয়ারের সময় তিনি পরলোকগমন করেন শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যসেবী ছিলেন না, স্বদেশের সেবাও তাঁহার জীবনে ব্রত ছিল। কংগ্রেসের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। না বঙ্গবাক্যকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলির মধ্যে তাঁহার জীবন-চরিতের বিশি উপকরণ পাওয়া যায়। এই অমূল্য পত্রাবলী একত্রে সংগ্রহ করিয়া ব্রজেননাথ শরৎ-জীবনীর উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন সাময়িক পত্রে লিখিত কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থকার শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত পাঠকবর্গের নিকট হৃগোচর করিয়াছেন। চরকা, মহাত্মা, দেশবন্ধু সত্যচন্দ্র এবং অজ্ঞানের সম্মুখে তাঁহার মন্তব্য সম্বলিত রচনাগুলি সম সাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা দিক উদ্ভাসিত করিবে। শরৎচন্দ্র সম্মুখে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্যপূর্ণ এই জীবন-চরিত পাঠকের বহুত কোতুহল চরিতার্থ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নাগপাশ—শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী। এম, সি, সরকারি ও সঙ্গ লিমিটেড। ২সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা। পৃষ্ঠা ১৩১।

বাংলা কথা-সাহিত্যে লেখক নবাগত। তাঁহার উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

নূ ত ন সং স্ক র ণ

ধোগেশচন্দ্র চৌধুরীর
সামাজিক নাটক

ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সামাজিক নাটক

পতিব্রতা ১১০

বাক্সালী ১১০

বাংলার মেয়ে ১১০

পৌরাণিক নাটক

পরিণীতা ১১০

ক্ষত্রবীর ১১০

মাকড়সার জাল ১১০

শিবপ্রসাদ করের
পৌরাণিক নাটক

পথের সাথী
নাটক

কর্ণালিকা ১৫০

শ্রী ও উজ্জ্বলা সিনেমাতে চলিতেছে
দাম দেড় টাকা

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের
পৌরাণিক নাটক

অভিষেক ১১০

আশুতোষ সান্যালের
সামাজিক নাটক

আগামী কাল ১১০

বন্দিনী ১১০

নূ ত ন ব ই

চরণদাস ঘোষের
অভিনব উপন্যাস

অতুল গুপ্তের

চমৎকার রেসিটেশনের বই

তেপান্তর

আরতি-ধারা

দুই টাকা

দেড় টাকা

ভয়ঙ্কর দুন্দরবন

সত্য ঘটনামূলক এডভেঞ্চারের বই
দাম এক টাকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

সমস্ত প্রকাশিত নূতন সংস্করণ

শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ

বেণু ও বীণা

তিন টাকা

রাসবিহারী মণ্ডলের
সর্বজন প্রশংসিত উপন্যাস

প্রদীপ ও শিখা ২১০

মরণমেলায় যাত্রী ১১০

মহন্তের পটভূমিকায় ছেলেদের
হৃদয় উপন্যাস।

আর, এইচ, ক্রীমানী এণ্ড সন্স—২০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অষ্টম বর্ষীয় কন্ঠার বৈধব্যকে অস্বীকার করিবার সাহস সরকারী চাকরে অচ্যুতবাবুর ছিল না। অথচ এত অল্প বয়সে মেয়েকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিতেও তাঁর বাধ্য। এই নিষ্ঠুর শাস্তির কবল হইতে কন্ঠাকে মুক্তি দিবার প্রয়াসে তিনি বাংলা ছাড়িয়া এলাহাবাদে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন এবং তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। নূতন পরিবেশে, নূতন জীবনে যেসব ঘটনা ও সমস্তার সমাবেশ লেখক করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনী, পাওয়া যায়। রোমান্স, সমাজতত্ত্ববাদ প্রভৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে গল্পের ক্ষুদ্রটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই বলিয়া রসটি বেশ জমিয়াছে।

এবার অবগুণ্ঠন খোল—শ্রীঅরুণা গোস্বামী। দি সিটি বুক কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য—২১ টাকা। পৃ. ১৪৩।

এই উপন্যাসটিতে পাত্রপাত্রীর মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও উপদেশ আছে। অনেকগুলি গান আছে কিন্তু গল্পাংশ বলিতে বিশেষ কিছু নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মৃত ও অমৃত—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। পূর্ববী পাবলিশার্স, ৩৭৭ বেনেটগা লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৬৪; মূল্য আড়াই টাকা।

মৃত ও অমৃত গল্পের বই। ডোমের চিতা, বিয়োগান্ত, অন্তর-বাহির, তারা তিন জন প্রভৃতি বারোটি ছোট গল্প আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে। ডোমের চিতাকে ঠিক গল্প আখ্যা দেওয়া যায় না,—এটি একটি নক্সা, বাকী এগারটি নিপুণ শিল্পীর হাতের সার্থক গল্প। দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়।

প্রমীলার সংসার—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। রূপশ্রী পাবলিশার্স, ২১, ডবলু. সি. ব্যানার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃ. ১৪৮। মূল্য দুই টাকা।

প্রমীলার সংসার একখানি ছোট উপন্যাস। প্রবোধবাবুর ভাষার খ্যাতি আছে। তাঁর সেই মনোজ্ঞ ভাষায় প্রমীলার সংসার এক বেপরোয়া হুষ্টি,—শুধু বেপরোয়া নয়,—অদ্ভুতও। প্রমীলার স্বামী বাহু-দেবের কথাবার্তা শুনে মনে হয় না—সে বোকা, গোবেচারী ভালমানুষ। গ্রন্থের প্রারম্ভে এক জারগায় বলা হয়েছে এই ‘স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ভারি মধুর’ (৭ পৃ.), অন্তর্ভুক্ত (১০ পৃ.) বলা হয়েছে ‘স্বামীর উপর ভক্তি এবং দয়া প্রমীলার অসীম’,—তবু স্বামীর বন্ধু জহরের জন্ত তার চিন্তা তৃষিত। প্রমীলা ‘দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসকে চেপে রাখতে পারে না।’ স্বপ্ন দেখে জহরের সঙ্গে সে পালিয়ে যাচ্ছে, ‘এল এক মরুভূমির প্রান্তে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মরণপথের দুটো মাত্রী শুধু বলছে—জল, জল!’ জহরের প্রেম কিন্তু একনিষ্ঠ নয়। সে মোপাসাঁর ‘বে-লামি’,—এখানে ওখানে মেয়েদের পরখ করবার ছলে তাদের চিন্তা হরণ করে বেড়ায়। রূপশিল্প, কলা-নৈপুণ্য প্রভৃতি যেসব সম্পদের জোরে পুরুষ নারীচিন্তা জরে সক্ষম হয় জহরকে সে সকল গুণের অধিকারী করে কোন নারীর কাছেই উপস্থাপিত করা হয় নি, তবুও তারা তার কাছে আত্মনিবেদনে উন্মুখ। জহর অবশ্য ধনী জমিদার কিন্তু সে কথা এক প্রমীলা ছাড়া আর সকলের কাছেই অপ্রকাশিত,—শুধুও আত্মনের মুখে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে গড়ছে তারা সবাই।

মাধবীর প্রেম করুণ ও মধুর, কিন্তু তার দিদি রাগিনী দেবীর কামনা ভয়াবহ—বাস্তব জীবনে এরূপ চরিত্র বড় বেশি মেলে না,—তাই রক্ষা।

শ্রীতারাপদ রাহা

বুরি ভাজা—শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, কলিকাতা। দাম আট আনা।

কোন প্রেমীর কাব্য, নামেই তাহার পরিচয় আছে।

জল-ডম্বরু পাঁহাড—শ্রীঅশোকবিজয় রাহা। মর্ডার বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। দাম আট আনা।

কবিতাগুলিতে কবিমনের জাদুস্পর্শ আছে।

কবিতা : ১৩৫০—শামসুদ্দীন। চন্দ্রনিকা পাবলিশিং হাউস। ৪২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

ইগল, শকুন, নৈব্যক্তিক, আত্মকেন্দ্রিক প্রভৃতি আধুনিক কবিতার মূর্ত্যাদোষ সত্ত্বেও রচনার মাদুর্য আছে।

সায়ানিকা—প্রভাসময়ী মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

‘পরিচায়িকা’র শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রচনার ‘লালিতা, সৌন্দর্য, ছন্দের বৈচিত্র্য এবং পারিপাট্যের’ প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা সঙ্গত।

সুর-সন্ধান—শ্রীমহিরকুমার সেন। ভারতী-ভবন, ১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

অপরিণত রচনা দু-একটি আছে সম্ভব নাই, কিন্তু কবি সুরানুরাগী।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চার পুণ্যস্থান—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। মহাবোধি সোসাইটি, ৪৭ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ডবলক্রাউন ১০ + ৩৪। মূল্য—৮০, বাঁধানো ১৮ টাকা।

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাব, বুদ্ধদেহাত ও ধর্মপ্রচারের পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত লুধিনী, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ও সারনাথ এই চারটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। স্থানগুলি সমগ্র পৃথিবীর বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ সমাদৃত ও সুপরিচিত হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভারতবাসীর জ্ঞান নগণ্য। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বহু ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এই সকল তীর্থ ভ্রমণ-জনসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা এই সকল প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহাদের কিছু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ এই সব স্থান সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

টিকানাটা লিখিয়া রাখুন

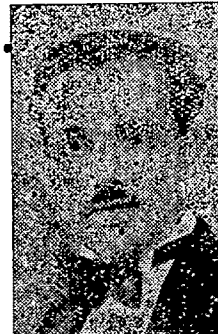
Mr. P. C. SORCAR

Post Box 7878

Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচ্যে যাহুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে engage করিতে হইলে এখানেই পত্র দিবেন।

ট্রেডমার্ক ‘SORCAR’ বানান লিখিতে ভুল করিবেন না।



—তার জন্ম পরে

বহুদিন ভুগেছিল সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিলনা আশা—

ভারতের লক্ষ লক্ষ মাতার
জীবন-মৃত্যুর এমনই সংকট দোলায়

* ভাইনো-মণ্ট *

সকল অবসাদ, দুর্বলতা
ও ক্লান্তি দূর করিয়া স্খুঠাম
স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া
দিতে পারে।

টাইফয়েড

নিউমোনিয়া

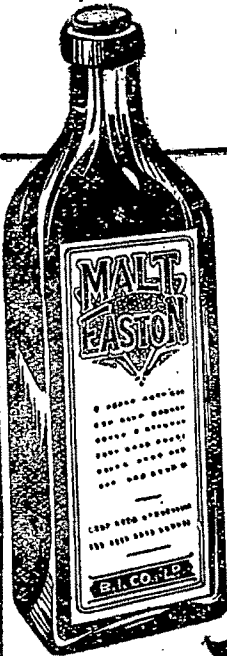
ইনফ্লুয়েঞ্জা

প্রভূতি কঠিন ও দীর্ঘ রোগভোগের
পর হ্রতস্বাস্থ্য উদ্ধারে সহায়তা করে।

সমস্ত সম্ভাব্য ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ক্ষুধিত কঙ্কাল

জীবনের আশা না মিটেই যারা অকালে
তিলে তিলে শুকিয়ে ক্ষয়ে যান চোখের
দীপ্তি, দেহের লাবণ্য হতে যারা বঞ্চিত,
কালের করাল গ্রাস হতে তাদের
অব্যাহতি কোথায়?



শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণা
তার উত্তর দিয়েছে—
মানুষের কল্যাণের জগুই
তার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের সাধনা!
শীর্ণ, বিকৃত-অস্থি, নিত্য
ক্ষীণ মান দুর্গত মাছুষ
এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক
পরিণতির দিকে, তাদের পথ
রোধ করতে পারে বেঙ্গল
ইমিউনিটীর

মাল্ট-ইস্টন

সমস্ত সম্রান্ত
ঔষধালয়েই পাবেন

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোংলি:
কলিকাতা

মুক্তি সংগ্রামে জনসেনা—খ্রীদিগিজনাথ বল্ল্যাপাধ্যায়।

মিত্রালয় ১০, জামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, পোলাও, গ্রাস, ইতালি, এস্টোনিয়া, লিথুয়ানিয়া চীন, ব্রহ্মদেশ, আরাবান, মালয়, ফিলিপিন এবং ইন্দোনেশিয়া এই সকল দেশের জনসেনা বা গরিলা বাহিনীগুলির অপূর্ণ দেশভক্তি ও ত্যাগের কাহিনী যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া লেখক এই গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিভিন্ন দেশের অন্তরীণ, অর্থহীন, গৃহহীন এবং এই সমস্ত জনসেনা কিরূপে অপরিণীম অত্যাচারী ক্যাসিরাত্ত্বশক্তিকে পরাজয়ের পথে টেলিয়া দিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

ক্যাসি অত্যাচার-কাহিনীর বহু সংবাদ মিত্রশক্তির প্রচারপত্র হইতে গ্রহণ করিতে লেখক বাধা হইয়াছেন, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় যুগ্মমান জাতিসমূহ যারপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিবে ইহা কিছু সম্ভব নহে, বিশেষতঃ পরাজিত শত্রুর প্রতি যে কোন দোষ আরোপ করা আরও সহজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে এক কথায় ক্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ বলা যাইতে পারে এবং ইহাদের কেহই বিশ্বপ্রেমিক নহে। পুস্তক রচনাকালে লেখক এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। বাহা ইউক, পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জার্মানীর সেরা গল্প—খ্রীশৈলবিহারী ঘোষ অনূদিত।

বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৬ পৃ., মূল্য তিন টাকা।

বইটিকে প্রাক্‌যুদ্ধের জার্মানীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। হাউগটম্যান, হুডারম্যান, ওয়াসারম্যান, স্ট্রিকেন জাইগ, জুক্কে, স্কলিজ্‌লার এবং ফোরনার এই কয়েকজনের বাহাই-করা এক একটি গল্প অনুবাদ করিয়া অনুবাদক ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ জাতির রসসাহিত্য বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল, রচনার কোথাও আড়ম্বর্তা ধরা পড়ে না এবং মৌলিক গল্পের রসান্বাদন কোথাও ব্যাহত হয় না। কিন্তু কয়েকটি কারণে পাঠকের চিত্তে অভুত্থি থাকিবার কারণ। প্রথমতঃ প্রস্তাবনার জার্মান সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, দ্বিতীয়তঃ অনূদিত সাহিত্য-রখিগণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়পঞ্জী পাঠকের কোঁতুলল উদীপ্ত ও আংশিকভাবে নিবৃত্ত করিতে পারিত, তৃতীয়তঃ গল্পের সংখ্যা আরও দু-একটি বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত। ভূমিকায় উক্ত অমিয় চক্রবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত বর্তমান বাঙালী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া অনুবাদকের রসরসটির প্রশংসা করিয়াছেন।

বীরপূজা—খ্রীলা দেবী। পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রথমে কয়েকজন দেবতা ও অবতারগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মগুরু, রাষ্ট্রগুরু এবং অন্ত্যস্ত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ও সাহিত্য-দ্বিপালগণের কীর্তিকথা স্মরণ করিয়া কবি তাঁহাদের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। কবিতাগুলি অসম ছন্দ ও রিলের সমন্বয়ে রচিত। কবিতাগুলির সহজ সরল অমার্জিত বাহ্যিক কাব্যমোদীগণের পূর্ণ ভূমি সাধন করিতে পারিবে না বটে, কিন্তু গভীর ভাবাবেগ ও অন্তর্গত অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশ্রীতির অভিব্যক্তিরূপে সাধারণ পাঠকের আনন্দবিধান করিবে।

টাক্ ডুমাডু ডুম্—খ্রীজ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বিবহারতী

প্রথমাল, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহার আদরের বড় নাতির মনোরঞ্জনের জন্ত এই পুরানো গল্পটিকে

নাট্যাকারে রূপ দিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ানের স্ত্রী হইলেও তিনি আধুনিকভাবে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না, কারণ তাঁহার অষ্টমবর্ষে গৌরীদান বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি পত্নীগামবাসী গৃহস্থের কন্যা ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর উন্নত পারিবারিক পরিবেশে পরে তিনি নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে স্বামীর সহিত বোম্বাই প্রবাসে দীর্ঘকাল বাগন করিয়াছিলেন, পরে তিনি একলাই ছেলেমেয়েদের লইয়া বিলাত পর্যন্ত যুরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার 'সাত-ভাই চম্পা'র পরিচয় পাঠক পূর্বে পাইয়াছেন, এই ছুখানি বই তাহাকে বাংলা শিশুসাহিত্যে হুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বহু পুস্তকের ছবিগুলি আঁকিয়াছেন। একখানি রঙীন ও অনেকগুলি পূর্ণগুঠা হাফটোন ছবি, প্রচ্ছদপটের উভয় পৃষ্ঠায় ছুইরঙা ছবি দুটি, উৎকৃষ্ট কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বইটিকে চমৎকার উপহারোপযোগী করিয়াছে। নাট্যকাটি অভিনয় করিয়া ছেলেরা প্রচুর আমোদ লাভ করিবে।

যত রাজ্যের রূপকথা—খ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০।

রূপকথা সকল দেশের ছেলেমেয়েদেরই ভালবাসে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, রুশ, চীন, জাপান, আফ্রিকা, এশিয়া, রেড ইন্ডিয়ান, মায় হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি যত রাজ্যের এক একটি রূপকথা এক একটি রেখা-চিত্রে সজ্জিত করিয়া লেখক এই রূপকথার বিভিন্ন ডালি ছেলেদের হাতে উপহার দিয়াছেন। রূপকথার উপযোগী স্বরূপে ভাষা ও সরস বর্ণনাভঙ্গী বইটিকে উপাদেয় করিয়াছে। ভারতবর্ষের কোন রূপকথা এই বইটিতে স্থান পায় নাই। ছেলেরা এই বইটি শেষ করিয়া সেগুলির গীত প্রকাশের আশায় উদ্গ্রীব হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অন্তগামী চাঁদ—জন্ম টেইনবেক্। অনুবাদক—খ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। মডার্ন পাবলিশার্স, ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়বস্তুর অবলম্বনে লেখা জন্ম টেইনবেকের "The Moon is Down" নামক উপন্যাসের তর্জমা। অনুবাদক খ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য বাংলা সাহিত্যে হুপ্রতিষ্ঠিত। মূল গ্রন্থখানি বর্তমান যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জহরী-গণকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার চিত্তরূপায়ণ পৃথিবীর নানা দেশের দর্শক-মণ্ডলকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বোধ করি আর কোনো উপন্যাসে এমন পরিপূর্ণভাবে উল্লেখিত হয় নাই। উপন্যাসের কাহিনীটি মোটেই যোরাহীন নহে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে আক্রমণকারীরা ছোট একটি শহর দখল করিয়া সেখানে জাঁকিয়া বসিল। নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্ত হুস্র করিল তাহারা অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন, কিন্তু বাধীনতাপ্রিয় বিজিত জাতির মুক্তি-কামনাতে দীর্ঘকাল দাবাইয়া রাখা বিজিতাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না, জাতির প্রাণশক্তির অগ্নিস্ফুল্ল হইতে সেই সামান্য শহরে প্রজলিত হইয়া উঠিল প্রচণ্ড দাবানল। আক্রমণকারী জাতির জয়ের পেছনে যে কত বড় নৈতিক পরাজয় ও বার্ষতার বেদনা লুকানো থাকে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তাহাই অপরূপ নৈপুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অত্যাচারীর হত্যাকাণ্ডে আক্রান্ত দেশের লোক মরে, কিন্তু জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয় না—এই একটি মাত্র মূল সুর উপন্যাসের কাহিনীটির মধ্যে আগাগোড়া অনুসৃত্য রহিয়াছে। এই আশাসবালী পরাবীন দেশের লোকের মনে-আশার সঞ্চার করে।

'অন্তগামী চাঁদ' বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

শব ও স্বপ্ন—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী ইতিপূর্বে 'হে বীর পূর্ণ করো' নামক নাটকখানা লিখিয়া এক জন শক্তিমান নাট্যকাররূপে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। "শব ও স্বপ্ন" তাঁহার দ্বিতীয় নাটক। ইহার বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকারের সমাজ-সচেতনতা, উন্নত আদর্শবাদ, জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং সর্বোপরি দরদী শিল্পীমনের পরিচয় পাই। ১৯৪২ সনের আগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লব-বহিতে বাংলার নরনারীর আত্মহত্যার মধ্যে তিনি যে অভাবিতপূর্ণ গণজাগরণের অগ্র-সূচনা দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহার রস-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া এই নাটক রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছে। সেই জাগ্রত গণস্বেভতার বন্দনগানই অসহযোগী ইন্দ্রজিৎ, বিপ্লবপন্থী স্বর্ধাশঙ্কর, হিমাদ্রি, উজ্জ্বলা প্রমুখ নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভিতর দিয়া উদগত হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জাতির অন্তর্গত মর্মান্বিত মন্মথকুমার সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নাটকের উপকরণ আহরণ করিয়াছেন তিনি বর্তমান দুর্গত বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন হইতে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত হৃদয় ভাব-কালে। সেই সত্যদৃষ্টি গভীর ব্যাপক ও হৃদয়প্রসারী। লেখকের বেদনাবোধ

এত তীব্র যে, একটা সমগ্র জাতির মর্মান্বিত দুঃখদুর্দশা যথাযথভাবে তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের দুঃখবেদনা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ট্রাজেডিকে ছাপাইয়া একটা জাতির সমষ্টিগত বেদনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া চরিত্রগুলি ব্যর্থ স্থিতি হয় নাই বা কতকগুলি মতবাদের বাহনমাত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। নাট্যকারের সংলাপ বাস্তবিকই স্থানে স্থানে চমক লাগাইয়া দেয়, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত, সংযত, বাহ্যলবর্জিত জুথচ পাঠক ও দর্শকচক্ষে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয় সাফল্যে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শব ও স্বপ্ন মঞ্চ-সফলতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া গণ-আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও পরিপুষ্টির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। অত্যাচারজর্জরিত জাতির দুঃখমৈনাময় বর্তমান গলিত শব্দস্রোতের ন্যাট্য ক্রমশঃ বিলীমমান, আর সেখানে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে স্বপ্ন দিয়া তৈরি গৌরবোজ্জ্বল দীপ্ত ভবিষ্যৎ। জাতীয় রঙ্গমঞ্চে নাট্যকারের এই মহান কল্পনার সার্থক রূপায়ন দেখিবার জন্য আমরা সমগ্র প্রতীক্ষা করিব।

শ্রীনিলিনীকুমার ভদ্র

গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি

প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথা সময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে, সেই মাসের ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নিদ্রিষ্ট গ্রাহকনম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। ডাকঘর হইতে প্রতি মাসেই বিস্তর প্যাকেট অপহৃত হয়, এ বিষয় অবহিত হইয়া সকলকেই যথোচিত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, তাঁহাদের চাঁদা যেসংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ না করিলে কার্যসাধনে গোলমাল অবশ্যজ্ঞাবী।

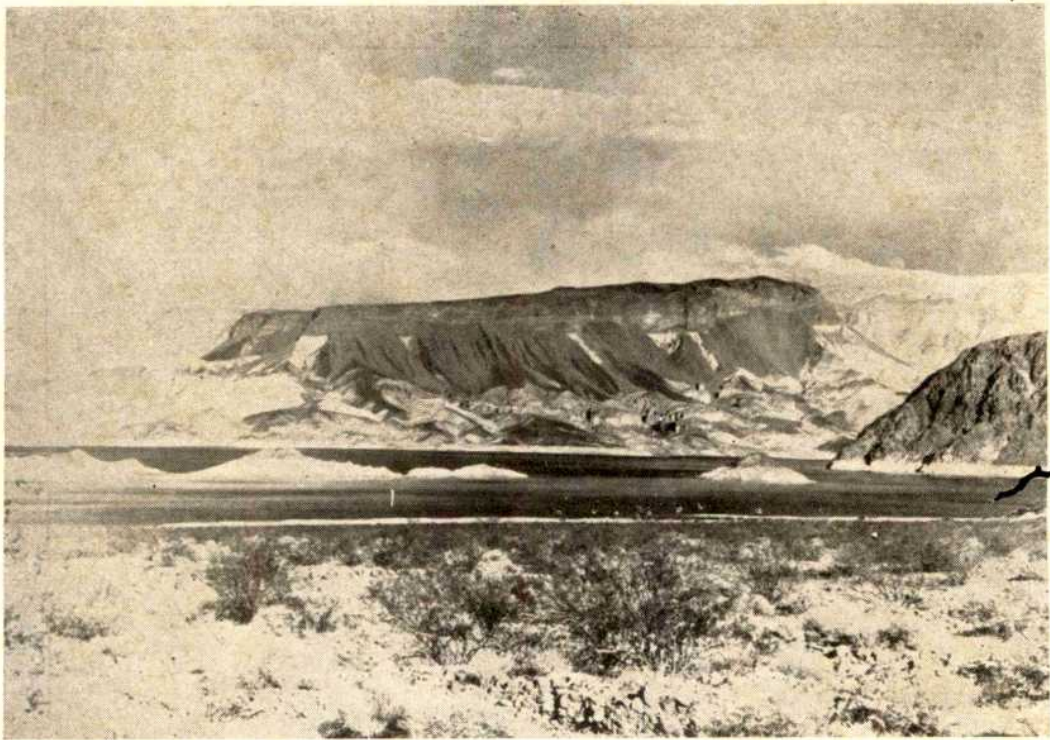
কন্সাধ্যক্ষ—প্রবাসী



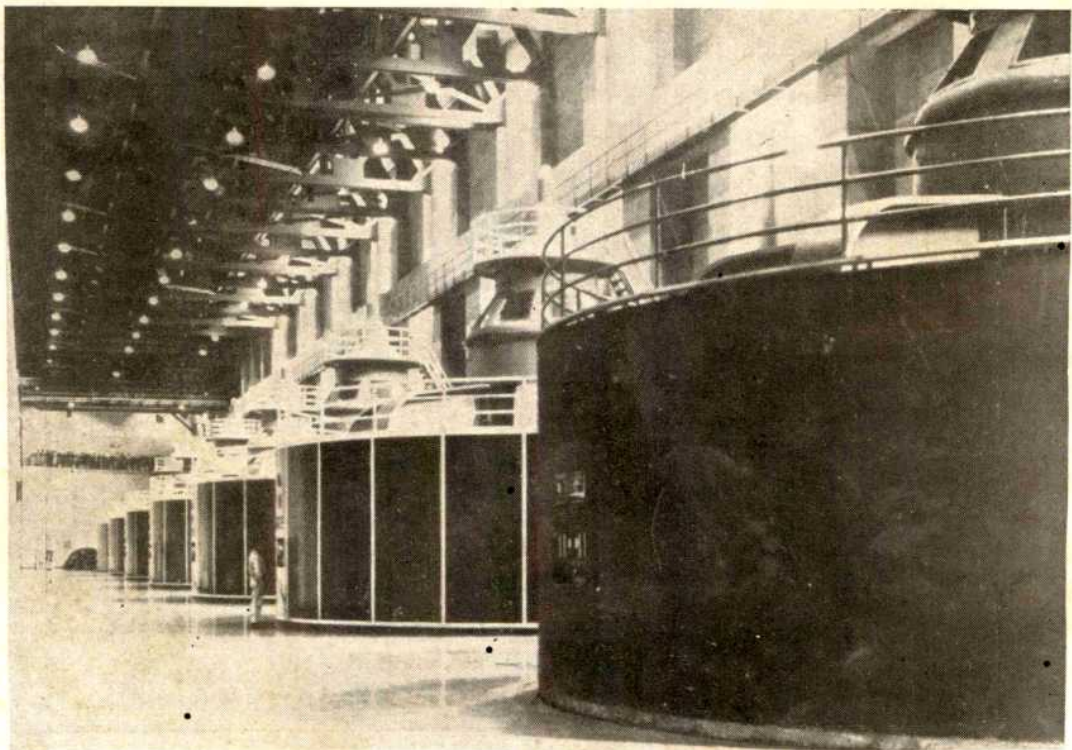
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাগিণী ধনাশ্রী
শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গী

১



যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর উপরকার পৃথিবীর উচ্চতা, (৭২৬ ফুট) “বোল্ডার” বাঁধের ত্রিশ মাইল উত্তরে
১২০ মাইল দীর্ঘ কৃত্রিম হ্রদ মিড



বোল্ডার বাঁধের বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদক বিরাট জেনারেটরদম্বুহ

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সিমলার পর

সিমলার বৈঠকে কোন নিষ্পত্তির আশা আমাদের কোন দিনই ছিল না, সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ আমরা পাই না। বরঞ্চ আমাদের নেতৃবর্গ যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সন্ধি-সমঝোত করার জন্ত আলোরার পশ্চা-
ত্বাবন করিয়া আর কালক্ষেপ করিতে চাহেন নাই ইহাতেই আমরা আশার আলোক দেখিতেছি। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র এখন “কুইট ইণ্ডিয়া” অর্থাৎ “ভারত হইতে বিদায় হও”—অথচ ইংরেজ বিদায় *একটা* মিঃ জিন্নার যুগ-তুফিকা সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার সহিত সমঝোতের অর্থ কংগ্রেসের ঐ মূলমন্ত্রকে এবং তাহার সঙ্গে বহু অল্প আদর্শকে জ্বালালি দেওয়া। এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন প্রকারেই বর্তমান সমস্তার পূরণ হওয়া সম্ভব নহে।

হইতে পারে যে এই দেশ ও এদেশবাসীর সম্মুখে আরও অনেক বিপদ আপদ আছে এবং ইহা নিশ্চিত যে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার যোগ্যতা অর্জনের জন্ত এদেশবাসীর আরও অনেক ত্যাগ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, অনেক বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহার জন্ত প্রথমেই ইতোদ্রষ্ট স্তোত্র হইলে লাভ কি হইতে পারে? যে ব্যবস্থার মূলে অসত্য তাহার অন্তে সর্বনাশ নিশ্চিত হইল। ১৭৫৭ সাল হইতে অজাবধি প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাস আমাদের পদে পদে শিক্ষা দিয়াছে এবং লক্ষ্য প্যাক্ট হইতে “রামজি ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড” তাহারই অল্প এক রূপ দেখাইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে স্বাধীন-অস্বাধীন কোনই লাভের সম্ভাবনা নাই। সিমলায় সরুপ কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় দেশবাসীর আনন্দিত হওয়াই উচিত।

বিদেশে প্রবাদ আছে যে, “সৌভাগ্যের আশা রাখো, কিন্তু দুর্ভাগ্যের জন্ত প্রস্তুত হও।” ইহা আমাদের দেশের প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রযোজ্য। দেশের নূতন রাষ্ট্রপতিকে এ বিষয়ে স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার এদেশের ও

বিদেশের অভিজ্ঞতায় তিনি সত্যের সঙ্গে ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আপোষ রক্ষার কি বিষয় ফল ফলিতে পারে তাহা বিলক্ষণ জানেন। এইজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের সঙ্গে আমরা এইটুকুই বলিব যে, দেশ তাঁহার সঙ্গে দুর্গমতম পথে চলিতে প্রস্তুত আছে।

বাস্তবিকই চরম মীমাংসা এক দিনে হইতে পারে না, যদিও দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আমরা এ কথা বলি না যে আপোষ অসম্ভব বা দেশ সরলতর পথে গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে পারে না। কিন্তু আপোষ সম্ভব হয় তখন, যখন দুই পক্ষই সমান সততার সহিত তাহার জন্ত ইচ্ছুক থাকে এবং সালিশি যাহারা, তাঁহারা যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। সে অবস্থা যেদিন আসিবে সেদিন মীমাংসা হওয়াও সহজ হইবে। তত দিন পর্যন্ত দৃঢ়চিত্তে নিজের লক্ষ্যের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়

সীমান্ত গারী বা আবদুল গফুর বা নয়া দিল্লীতে জাতীয়তা-বাদী মুসলমানদের এক বৈঠকে শিক্ষিত মুসলমানেরা স্ব-সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ না করায় তাহাদিগকে ভৎসনা করেন এবং দেশের বর্তমান দুর্ব্যবস্থার জন্ত প্রধানতঃ তাহাদিগকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের মুসল-মানেরা সামাজিক দিক দিয়া জগতের অজ্ঞাত মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, কাজেই তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এ দেশে ইংরেজের শিক্ষা প্রবর্তনের পর মুসলমানেরা বহু দিন উহা বর্জন করিয়া চলিয়া ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা নিজেদের শিক্ষা শুধু মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিতে অগ্রণী হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে অল্প দিনের মধ্যেই অনেক অগ্রসরও হইতে পারিয়াছেন। মুসলমান সমাজে

ব্যাপক ভাবে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ঘটিতে থাকিলে আত্ম-স্বার্থসর্বস্ব সাম্প্রদায়িকতাবাদী নবাব জমিদারদের প্রভুত্ব বজায় রাখা কঠিন হইবে ইহা তাহারা বুঝিয়াছে, কাজেই মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষা লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টিতে ইহাদের উৎসাহের অভাব নাই। বাংলাদেশেই আমরা দেখিতেছি লীগ মন্ত্রীদের আমলেও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা হয় নাই এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিবার জন্ত বিল আনিয়া উহা পাস করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতেছে। স্কুলের সংখ্যা কমান এবং বর্তমান ব্যয়বহুল শিক্ষাকে আরও ব্যয়সাধ্য করিয়া তোলা এই বিলের প্রধান লক্ষ্য।

নবাব জমিদার ও খেতাবধারীরা মুসলমান সমাজের যে ক্ষতি করিতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া খাঁ আবদুল গফুর খাঁ বলেন, “যাহারা নিজেদের অস্তিত্ব ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ইন্ডিয়ায় লীগের মুখাপেক্ষী, তাহারা কখনও ইসলামের রক্ষক হইতে পারে না। আমাদের এই হতভাগা দেশে বিদেশীদের কতকগুলি এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সামাজিক অবস্থা বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমান জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণকামীদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া প্রচার করিয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দালালরা নিজদিগকে মুসলমান সমাজের বন্ধু বলিয়া জাহির করিতেছে। দরিদ্র ও মূর্খ মুসলমানগণ প্রতিপদে বিপক্ষে পরিচালিত হইয়াছে। এই দেশের প্রত্যেক নরনারীর কতব্য অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ঠিক পথে চলিতে সাহায্য করা। পৃথিবী অবিরাম পরিবর্তনশীল, সে মুসলমানের জন্য অপেক্ষা করিবে না।”

বাংলার সমস্যা

বাঙালীর সম্মুখে ভবিষ্যতের সমস্যা ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর হইতে বাঙালী হিন্দু ধর্ম সাধনের কাজ পূর্ণ উত্তমে চলিতেছে। বিপ্লবী বাঙালী হিন্দুর উপর ইংরেজের বিদ্বেষও বড় কম নয়, তাই লীগের এই কার্যে ইংরেজ সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতেছে। সর্বজন হার্বার্ট লীগের সাহায্যে হিন্দুর সর্বনাশ সাধনের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, ইংরেজ সিভিলিয়ান ও পুলিশ সাহেবেরা সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। বাংলার যে সব স্থানে হিন্দু সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে হিন্দুর ধনপ্রাণ সম্পত্তির সকল নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইয়াছে; ক্রীপকর্মনির্বিশেষে হিন্দুর উপর মুসলমান গুণ্ডা কর্তৃক দলবদ্ধ অত্যাচার নির্বিবাদে চলিতেছে। শাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ ও মুসলমান কর্মচারীরা উদাসীন, হিন্দু কর্মচারীরা অসহায়। বাংলার স্থানে স্থানে কি ভয়াবহ গুণ্ডারাজ চলিতেছে অজ্ঞ তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের অজ্ঞ কোন প্রদেশে বাঙালী হিন্দুর উপর এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠে নাই। মিঃ জিন্না কথায় কথায়

শাসাইয়া থাকেন যে, হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানের উপর অবিচার হইলে তিনি মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিয়া তাহার শোধ লইবেন। মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াও তিনি যে তাহা পারেন বাঙালী হিন্দুর উপর যে বর্বরতা চলিতেছে তাহা দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু হিন্দু উহা পারিবে না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচারের পাণ্টা জবাব পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু দিতে পারে নাই। পারিবেও না। হিন্দুর শালীনতা বোধ অনেক উন্নত, একের অপরাধে অপরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হিন্দু পারিবে না। মুসলমান হিন্দুর এই দৌর্বল্য বুঝিয়া লইয়াছে, তাহার সাহসও তাই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

পাকিস্তানের যে দাবি মিঃ জিন্না ধরিয়া বসিয়া আছেন তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া কংগ্রেসের সহিত লীগের মিলন হইল না। বাংলা ও আসাম লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠনের দাবি লীগ তুলিয়াছে। হিন্দু ও আরবী সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত ভারতীয় মুসলমানের আধা হিন্দু আধা মুসলমান সংস্কৃতি রক্ষার জিদ মিটাইবার জন্ত বাংলা ও আসামের সমস্ত হিন্দুকে মুসলমানের পদানত হইয়া থাকিতে হইবে, পাকিস্তানের ইহাই মর্মার্থ। অথচ বাংলা ও আসাম যোগ করিলে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক কম হয়। তবুও এই দাবি উঠিয়াছে। মিঃ শহীদ সুরাবর্দী প্রমুখ আর এক দল লীগওয়ালারা শুধু বাংলাকে পাকিস্তানে পরিণত করিতে চান এবং মানভূম, সিংভূম, পুর্ণিয়া, দাঁওতাল, পরগণা প্রভৃতি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। মিঃ সুরাবর্দীর আশা তাহার হিন্দু বন্ধুরা ইহা অহুমোদন করিবেন। ভাষার ভিত্তিতে বাংলার সীমা পুনর্গঠিত হইলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে বটে, তবে এই সংখ্যাধিক্য শতকরা দুই-তিন ভাগের বেশী হইবে না। কাহারও কাহারও ধারণা এত কম মেজরিট লইয়া মুসলমানেরা বাংলাদেশে কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে পারিবে না; হিন্দু যেমন করিয়া হউক প্রাধান্য পুনরায় অর্জন করিবেই, সুতরাং বাংলা অভিজ্ঞ থাকাই ভাল। এই যুক্তিতে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে বাংলাকে পাকিস্তান বলিয়া স্বীকার করার অর্থই হইবে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের হাতে দেশকে তুলিয়া দেওয়া। মিঃ জিন্না স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র মুসলমানেরা রচনা করিবে, উহাতে হিন্দুদের কোন হাত থাকিবে না। সুতরাং বাংলা পাকিস্তান হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি রচনা করিবে মুসলমান লীগওয়ালারা, হিন্দুর কোন কথা বলিবারও অধিকার থাকিবে না। ফাসিষ্ট শাসনতন্ত্রের ছায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সমগ্র আসনের দুই-তৃতীয়াংশ শতকরা ৫২ জন মুসলমানের জন্ত সংরক্ষিত রাখিয়া বাকি ৪৮ ভাগ হিন্দুর জন্ত দয়া করিয়া এক-তৃতীয়াংশ আসন ছাড়িয়া দিলে

হিন্দুকে তাহা লইয়াই সম্ভষ্ট থাকিতে হইবে। পাকিস্থানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইবে, হিন্দুর ছেলে এখনই প্রাথমিক স্কুলে “ভোর হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে” এর পরিবর্তে “ভোর হইয়াছে মুয়োজিন আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর বলিয়া আজ্ঞান দিতেছে” পড়ে; পাকিস্থানী স্কুলে হিন্দুর ছেলেকে পড়িতে হইবে, “বেরাদর বরখিজ, আফতাব বরআমদ।” বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলেই বাঙালীকে তাহার নিজস্ব ভাষা তুলাইবার ক্ষমতা বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে বলপূর্বক হিন্দী চালাইবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা হইতেই বাংলায় পাকিস্থানী রাজত্বে বাঙালী হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতির কি অবস্থা ঘটবে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রদেশের সমস্ত উচ্চপদে তখন মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত হইবে, উহার ফল কি হইবে বাঙালী হিন্দু এইকি তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে এখনই যাহা ঘটতেছে, পাকিস্থানে তাহার সহস্রগুণ অধিক পক্ষপাতিত্ব ঘটবে। মানভূমের কয়লা ও সিংভূমের লোহা একবার পাকিস্থানের হাতে আসিলে বাংলার লীগনেতারা দুর্জয় শক্তির অধিকারী হইবে। ৪৮ পার্সেন্ট হিন্দুর পক্ষে ৫২ পার্সেন্ট মুসলমানের অত্যাচারে বাণ্য দেওয়াও তখন সহজ হইবে না, কারণ সরকারের হাতে অস্ত্র থাকিবে এবং সাড়ে তিন কোটি মুসলমান পুলিশের কাজ করিবে।

ইহাদের ভরসা হিন্দুস্থানের অস্বাভাবিক প্রদেশ বাঙালী হিন্দুকে সাহায্য করিবে। আমরা এ ভরসা রাখিতে পারিতেছি না। বিহারে বাঙালী হিন্দু সহায়ত্বভূতি পাইবে না ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতিরও অবস্থা অনুরূপ। একমাত্র মহারাষ্ট্র ও মুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে কিছু আশ্বকল্য হইলেও হইতে পারে। বাঙালীর বিপদে সাহায্যের ক্ষমতা যে কেহ অগ্রসর হইবে না, গত দুইভিক্ষে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশ বাঙালীর নিকট নানা ভাবে স্বর্গী, কোন কোন বাঙালী কোথাও কোথাও ইংরেজের পক্ষ হইয়া অত্যাচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বাঙালীর দান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয়। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র প্রদেশ বাংলা যেখানে প্রাদেশিকতা আজও প্রবেশ করে নাই।

অপরের আশায় বসিয়া না থাকিয়া বাঙালী হিন্দুকে আজ স্বাধীনতা হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে এক দল লোক মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া নানা কারণে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই বাঙালী হিন্দুর সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, ইহা নিবোধ, উদ্ভাদ ও স্বাধীন লোক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ পাকিস্থান ওয়ালাদের হাতে সমর্পণ করিবার অধিকার কাহারও নাই, কংগ্রেস বা হিন্দুস্থান উহা করিতে

গেলেও বাঙালী স্বীকার করিবে না; যথাশক্তি বাধা দিবে।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় বঙ্গভঙ্গের কথা উঠিয়াছে। লীগদলের এক মুখপত্র “আজাদ” দাবি তুলিয়াছে যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসন এবং কলিকাতা লইয়া পাকিস্থান গঠিত হউক। তাঁহাদের মতে শুধু বর্ধমান বিভাগ লইয়াই বাঙালী হিন্দুর সম্ভষ্ট থাকা উচিত। বঙ্গভঙ্গের কথা আমাদের কাছে আজ পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে এবং এবার ভাবাবেগ বর্জিত হইয়া উঠা করিতে হইবে। মুসলমান যদি হিন্দুর সঙ্গে কোনমতেই না থাকিতে চায় তবে বঙ্গভঙ্গ প্রয়োজন হইতে পারে। একায়ে থাকিয়া নিত্য বিরোধের চেয়ে পৃথগর হইয়া শান্তিতে বাস করা ভাল। কিন্তু এই নূতন সীমা নির্ধারণ কিরূপে হইবে? আজাদের দাবি অত্যাচার ও অযৌক্তিক ইহা বলাই বাহুল্য। সর্বপ্রথমে আমাদের বক্তব্য এই যে বঙ্গ বিভাগ করিতে গেলে সকলের আগে গণ-ভোট গ্রহণ করিয়া বাংলার হিন্দু মুসলমান সমস্ত অধিবাসীকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক জেলার, প্রত্যেক মহকুমার ও থানার লোকদেরও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহারা পশ্চিম বাংলায় কিবা পূর্ব বাংলায় থাকিতে চায়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি অনেক জেলায় সমগ্র ভাবে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও উহাদেরই কোন কোন মহকুমায় হিন্দু যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, শতকরা কতজন মুসলমান এক স্থানে থাকিলে তাহাকে মুসলমান-প্রধান বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা চলে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই আনুপাতিক হার ৭০-এর নীচে হওয়া উচিত নহে। যে সব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭০-এর বেশী, সেগুলিকেই শুধু পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা কোনক্রমেই মুসলমান বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

মুসলমান-প্রধান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সহিত পশ্চিম বাংলাকে জুড়িয়া রাখিলে ঐ দুই স্থানের হিন্দুর যদি কোন লাভ হইত তাহা হইলে বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা মুক্তিসম্পন্ন হইত। কিন্তু ইহাতে কোন লাভ তো নাই-ই অধিকন্তু সমগ্র বাঙালী হিন্দুর স্বাধীনতা, ধর্ম ও ঋণী ইহা দ্বারা নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ যদি আলাদা হয় এবং মানভূম, ধলভূম ও সাঁওতাল পরগণা যদি বাংলার ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে হিন্দু বাংলার শক্তি বড় কম হইবে না। পূর্ব বঙ্গের হিন্দু এখানে আসিয়া নিবিবাদের রাসবাস করিতে পারিবে। মুসলমানের অত্যাচারে ইহাদের অনেককে এখনই বাঙালীর বেচিয়া ফেলিয়া কলিকাতায় বা শহরতলীতে বাড়াই করিতে হইতেছে। পশ্চিম বাংলা আলাদা হইলে ইহাদের সুযোগ আরও প্রশস্ত হইবে, অত্যাচার সন্তান বাঙালীর সম্মুখে বিনাশেরই পথ পরিষ্কার করা হইবে।

বাংলায় পাকিস্থানের নমুনা

বাংলায় পাকিস্থানকামী মস্তিষ্কগুলি ১৯৪৩ সালে সর জন হার্বার্টের দৌলতে দেশের অনিষ্টসাধনের যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে পাইয়াছিলেন তাহার পূর্ণ সদ্যবহার তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ইংরেজের স্বার্থ ঘোল আনা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন বলিয়া ইংরেজ গবর্নর, ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টরা ইঁহাদের অত্যাচার কার্যে কোন বাধা দেয় নাই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে লীগকে বড় করিয়া রাখিবার যে নীতি অদূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদীরা অমসরণ করিয়া চলিয়াছেন ইহা তাহাদেরই বিষময় ফল। যে সব অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে তাহাদের ধন-প্রাণ-সম্পত্তি ও নারীর সম্মান কি ভাবে পদে পদে বিপন্ন হইতেছে তাহার সংবাদে মনে হয় যেন বাংলার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে পাকিস্থানের নামে গুণ্ডার দলের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকার আজও করেন নাই। এই ব্যাপক লুণ্ঠতরাজ ও জী-পুরুষনির্বিশেষে হিন্দুর উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার কোন আন্তরিক চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। এই সম্পর্কে যে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে দুইটি যথেষ্ট উদ্বিগ্নজনক। কোন সভ্য গবর্নমেন্ট উহার প্রতিকার না করিয়া পারিত না।

দৈনিক 'ভারতে' প্রকাশিত (৫ই মে) কিশোরগঞ্জের সংবাদটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাংলা-সরকারের প্রতিবাদ-তৎপর প্রচার বিভাগ সম্ভাব্য কালের মধ্যেও ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

ভৈরববাজার, ৩রা মে—কিছুকাল ধরিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে দলবদ্ধ গুণ্ডামির ফলে লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এক তীরে কুলিয়ারচর ও সরারচর হইয়া কিশোরগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল, অপর তীরে গফরগাঁও হইতে কাওরাইদ পর্যন্ত, টাকা সদর মহকুমার কিয়দংশ এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ অবাধ লুণ্ঠতরাজের ফলে এক অরাজক ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

গত নির্বাচনের সময় যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছিল তাহাতে এই অঞ্চলের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ হিন্দুর ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে উন্নত গুণ্ডাদের ধামখেয়ালের বশুতে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ত্রিকোণাকৃতি অঞ্চলটাতে পূর্বে কয়েকবার হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। মুসলীম লীগের কার্যকলাপে ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা-আসাম রেলওয়ের ট্রেনগুলি গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত ও আটক হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক

ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালগাড়ি হইতে হিন্দুদের এবং ব্যবসায়ীদের মালপত্র লুণ্ঠ হওয়ার ফলে রেল-কোম্পানীকে আজ পর্যন্ত সাত লক্ষ টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লুণ্ঠ-তরাজের উদ্দেশ্যে ট্রেন আক্রমণ বহুদিন যাবৎ অবাধে চলিতেছে। এই অঞ্চল হইতে প্রায়ই নারীহরণের সংবাদও পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে রেল-স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষ হইতে পর্যন্ত নারীহরণ হইয়াছে।

শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণ এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ অরাজক জানিয়া যত দূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলে। ব্যবসায়ী ও অত্যাচারি যাত্রীদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলায় তাহারা সকলেই পৈত্রিক ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া এই অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে।

ভৈরববাজারে কতকগুলি লোক নিজেদের মুসলিম লীগের কর্মী বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু দোকানদারদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা-পয়সা আদায় করিতেছে। অবস্থার পাকে পড়িয়া হিন্দুগণ পুলিশের উপরও সকল আস্থা হারাইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমত হইল যে, এক দল লোক পিছন হইতে গুণ্ডাদের উদ্ধার দিয়া হিন্দুদের সর্বনাশ করিতেছে। প্রকাশ যে, পুলিশ বিভাগের কয়েকজন লোক ইঞ্জিন চালকদের সহিত ঘাঁট করিয়া এমন সমস্ত স্থানে ট্রেন ধামায় যাহাতে নাকি গুণ্ডারা বিনা বাধায় লুণ্ঠতরাজ চালাইবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পায়। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অত্যাচারি বিভাগের কর্মচারিগণই নাকি এই সমস্ত লুণ্ঠতরাজ ও জুলুমের বৃদ্ধি ও পরামর্শ দিয়া থাকেন।

১৯৪৪ সালের শেষ তিন মাসে ট্রেন ডাকাতি, ডাকাতি প্রভৃতি লইয়া ৯৪টি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের শেষে অল্পরূপ ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া ১০৯টিতে দাঁড়ায়। বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ট্রেন-ডাকাতির সংখ্যা প্রচণ্ড ভাবে বাড়িয়া ১৩২ হইয়াছে।

একটি বিস্তৃত অঞ্চলের গ্রামে সাধারণ মানুষের বস-বাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাজাভাবে লোক অধের বিষ্ঠা হইতে পর্যন্ত ছোলা সংগ্রহ করিয়া খাইতেছে দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থাতেও নেতাদের চৈতন্য হইতেছে না। তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিসরের জাঁকজমক লইয়াই মশগুল হইয়া দিন কাটাইতেছেন। ইঁহারা যদি দেশের দণ্ডযুগের কর্তা হন আর বর্তমান অবস্থা যদি ইঁহাদের শাসন-ব্যবস্থার নমুনা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাংলাদেশের নরকে ডুবিতে আর বিশেষ দেরি নাই।

—সংবাদদাতা

যশোহরে নিম্নলিখিত ঘটনাটির আত্মপুর্নিক বিবরণ ৭ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :

২৫শে এপ্রিল রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ত্রিশ জনের অধিক সংখ্যক এক ডাকাত দল আগেরায় এবং অত্যাচার মারাত্মক অস্ত্র লইয়া রাজাপুর থানার অন্তর্গত সুশীলকুমার দাসের বাড়ীতে হানা দেয় এবং সুশীল দাস, তাহার মাতা ও পরিবারস্থ অত্যাচার জীলোকদের আহত করিয়া সোনাকুপার অলঙ্কার প্রায় ৩০০০ টাকা, নগদ ৮০০ টাকা ও তৎসহ বাসনপত্র জামা কাপড় সমস্ত লুণ্ঠন করে। ডাকাতরা উহাদের বিছানাপত্রে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং পরিবারস্থ একন্টি জীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ দলই পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি বাড়ীতে হানা দেয়। উহার একটির অধিবাসী কালীপ্রসন্ন দাস নামক এক ব্যক্তি ভীষণ ভাবে আহত হইয়াও দোড়াইয়া থানায় গিয়া সংবাদ দেয়। থানা ঘটনাস্থল হইতে মাত্র ৫০০ হাত দূরে। রাত্রি ৪টার সময় পুলিশ আসে, ইতিমধ্যে কালীপ্রসন্নের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়।

ডাকাতেরা অতঃপর যোগেশ দাসের বাড়ীতে হানা দিয়া তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠ করে। উহার যোগেশের এক আত্মীয়ের উপর পাশবিক অত্যাচারও করে।

পুলিস আসিবার আগে প্রায় ৫০০ গ্রামবাসী একত্র হইয়া সশস্ত্র ডাকাত দলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া পলায়নের সময় ডাকাতেরা পথে নবাব আলি হাজির বাড়ীতে হানা দিয়া তাহারও নগদ ১৭০০ টাকা লুণ্ঠ করে।

পরদিন রাত্রে ঐ থানারই তারাবুলিয়া গ্রামের রহম চাপরাশীর বাড়ীতে ডাকাতেরা হানা দেয়। গ্রামবাসীরা আবার বাধা দেয়। এই সংঘর্ষে দুই জন গ্রামবাসী আহত হইয়া পরে মারা যায় এবং পুটিয়াখালীর লেহাজুদ্দীন নামক এক ডাকাত মারাত্মক ভাবে আহত হয়। সে ব্যক্তিও পরে মারা যায় কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এক স্বীকারোক্তি করে।

পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

প্রকাশ, গত চার মাসে এই একটি মাত্র থানার অধীনে ৭২টি ডাকাতি হইয়াছে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা জয়নাল আবেদিন প্রায় সবগুলি ঘটনা সম্বন্ধেই যথারীতি রিপোর্ট দিয়াছেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা পড়ে নাই, দণ্ডিতও হয় নাই।

ময়মনসিংহের পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, একটি গ্রাম হইতে ছয়টি জীলোককে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই রেলগাড়ী বা রেল-স্টেশন হইতে অপহৃত।

মুসলমান দুরৃত্তের দল এইরূপ দলবদ্ধ ভাবে নানা স্থানে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, কতৃপক্ষ তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকার তাহাদের কার্যে বাধা দিবে না এ

বিষয়ে কতদূর নিশ্চিত হইলে ইহারা থানার ৫০০ হাতের মধ্যে সদলবলে হানা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ডাকাতি করিতে ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার সাহস পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। থানার বড় দারোগা মুসলমান, চার মাসের মধ্যে ৭২টি ডাকাতি তাহার এলাকায় ঘটয়া যাওয়ার পর সে শুধু রিপোর্টই দিয়াছে, একটি লোককেও গ্রেপ্তার করে নাই, দুরৃত্তদের পক্ষে ইহার চেয়ে শুভ সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না। এই সব রিপোর্ট পাইয়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টও কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে দুরৃত্তদের অপকার্যে প্রশ্রয়ই দিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জের ট্রেন লুণ্ঠ বা বরিশালের ডাকাতির সঙ্গে রাজনীতির গন্ধমাত্র থাকিলেও ইহারা অত্যন্ত কর্মতৎপর হইয়া উঠিত, সারা বাংলা তোলপাড় করিয়া সন্দেহক্রমে হাজার হাজার যুবককে গ্রেপ্তার করিত, যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাইত তাহাদিগকে মামলায় দায়ের করিয়া অবশিষ্ট সকলকে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা করিত। অথচ আজ হিন্দুর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহারা নীরব, মাতৃজাতির উপর পাশবিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়াও ইহাদের কতব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হয় না।

মুসলমান মন্ত্রী, মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট, মুসলমান পুলিশ সাহেব, মুসলমান দারোগা ও মুসলমান গুণ্ডার মনোভাব প্রায় একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের পক্ষে ইহা গভীর বেদনার বিষয়। হিন্দুর সর্বস্ব লুণ্ঠন ও হিন্দু নারীর সর্বনাশে ইহাদের মধ্যে একজনও বিবেকের দংশন অনুভব করে না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছে। ময়মনসিংহের যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লীগের প্রতি প্রকাণ্ডে অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, অকারণে যে ব্যক্তি কৃষক-প্রজা দলের লোকদের উপর গুলি চালাইয়াছেন, নির্বাচনের সময় যে ব্যক্তি লীগ প্রার্থীদের জয়ী করিবার জন্ত ছল চাতুরীর আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়াও যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা মুসলমান কর্মচারীরা কি এই ইঙ্গিতই পাইবে না যে লীগ দলের গুণ্ডাদের সর্ববিধ প্রশ্রয় দিয়া পাকিস্তান কায়ম করিতে সাহায্য করাই তাঁহাদের প্রোমোশনের শ্রেষ্ঠ উপায়?

নারীর সম্মান নষ্ট করিয়া রেহাই পাওয়া এ দেশে ইংরেজ রাজত্বের বিশেষত্ব। ইংরেজ সৈনিকেরা ভদ্রলোকের গৃহে হানা দিয়া অস্ত্র দেখাইয়া লোকজন সরাইয়া রক্ষা নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। দায়রা জজ ইহাদিগকে কতকটা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিলেও হাই কোর্টের ইংরেজ জজেরা তাহাদের দণ্ড অনেক লাঘু করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের সময় একরূপ বহু সৈনিক ভারতীয় নারীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাহাকেও বা ভৎসনা করিয়া বা সামান্য শাস্তি দিয়াই কতব্য শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নারী-নির্ধাতনকারীকে রীতিমত প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। আজি-কার লাক্ষনা তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। আজ মুসলমান ছুর্ত্তোর ও ইংরেজ গুণ্ডাদের দেখাদেখি নারীর সম্মান নষ্ট করিতে বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান মন্ত্রী ও ইংরেজ সিভিলিয়ান ইহাতে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন অনুভব করেন না। আমেরিকায় নারীর উপর অত্যাচারের শাস্তি স্বত্ব। এ দেশে এই ব্যবস্থা কেন প্রবর্তিত হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বর্তমান আইনেও নারী নির্ধাতনকারীর যে দণ্ডের বিধি আছে তাহাই বা কেন পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইবে না? মাতৃজাতির লাক্ষনা নিবারণে দেশের সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি যেখানে হুঁয়ার গতিতে নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল আমাদের শাসকেরা সেখানে পরম উপেক্ষাভরে এত বড় মহাপাপ ও মহা অপরাধের প্রতি উদাসীন।

বাংলাদেশের ফুড কমিটি

বাংলা দেশের প্রায় প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই স্থানীয় লীগ-মাতব্যবহরদের করতলগত। গত নির্বাচনের পর এই সব ফুড কমিটি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষে রীতিমত ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে তাহাদিগকে নানা অছিলায় ফুড কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্য দ্রব্যাদিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। শুধু যে রাজনৈতিক কারণেই দ্রব্যাদি বন্টনে বৈষম্য চলিতেছে তাহা নহে, কর্তৃপক্ষের নিজেদের ও দলের লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও এরূপ ঘটতেছে। এই সব অনীচারের বিরুদ্ধে উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানাইয়া কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। ইহার কারণও হুঁরিয়া নহে। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সিভিল সাল্লাই ও ফুড কমিটি একই ছাঁচে ঢালা। ইহারা কি ভাবে জনসাধারণের নিকট নিষ্পেষণ-যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে তাহার সামান্য পরিচয় ২৬শে বৈশাখের “কৃষক” পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত পত্রখানি হইতে বুঝা যাইবে :

কুঠিয়া মহকুমার মিরপুর থানার অধীন চিথলিয়া ইউনিয়ন ফুড কমিটি যেভাবে জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও অবিচার করিতেছে, তাহা সাধারণের সহের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন উপায়ে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণকে হাত করিয়া ইচ্ছামত নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তিদিগকে লইয়া গ্রাম্য ফুড কমিটিগুলি গঠনপূর্বক ইউনিয়ন ফুড কমিটিতে নিজের অবাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। উক্ত কমিটির সেক্রেটারী তাহার ক্ষেত্রে করোগী। কমিটির সভ্যদিগের কাহাকেও রেশন দোকান, কাহাকেও বিভিন্ন দ্রব্যাদি অত্যধিক দান করিয়া হাত করিয়া বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধি এবং

ব্যক্তি বা দলগত ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ চরিতার্থ করিতেছেন। বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া কিংবা না দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া নানারূপ অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। অধিকাংশ দ্রব্যই উক্ত সভ্যগণ এবং তাঁহাদিগের আত্মীয় অহুগত এবং প্রিয়পাত্রগণই আত্মসাৎ করিতেছেন। উক্ত সভ্যগণের বা তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে বিভিন্ন রেশন কার্ড বা স্পেশাল স্লিপে অতিরিক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া হইতেছে। পক্ষান্তরে বিশেষ প্রয়োজনে জনসাধারণ নিম্নতম প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদিও ‘ষ্টকে নাই’ এই অজুহাতে পায় না। এসম্বন্ধে স্থানীয় মহকুমা কোর্টলায়ের নিকট বহু আবেদন করিয়া প্রতিকার-প্রার্থনা করা হইয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারিগণ উক্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধাতন ব্যতীত কোন ফলই পায় নাই। মহকুমা কোর্টে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও কোর্ট হইতে অপছত্ত হইয়াছে। পরে পুনরায় দরখাস্ত করা হইয়াছে।

বাংলায় অন্ন বস্ত্রের অবস্থা

বাংলার গ্রামাঞ্চলে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ করা কিভাবে ক্রমাগত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ প্রায়ই অপ্রকাশিত থাকে। আমরা দেখিয়া সুস্থি হইলাম দৈনিক ‘নবযুগ’ এরূপ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা মফস্বলের লোকদের হৃদশার অন্ততঃ ধানিকটা অনুমান করা সম্ভব হইবে। অতীত দৈনিক পত্রগুলিও এবিষয়ে মনোনিবেশ করিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হইবে। এই সমস্ত বিবরণ এখন হইতেই প্রকাশিত হওয়া দরকার। ১৫ই বৈশাখের ‘নবযুগ’ের রিপোর্টগুলি উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি বলিয়া নিয়ে উহা প্রদত্ত হইল :

চৌমোহিনীর (নোয়াখালী) বেগমগঞ্জ থানার অধীন কুতুবপুর গ্রামনিবাসী ভারতচন্দ্র নাথ নামে এক ব্যক্তি অনশনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বুদ্ধনে আত্ম-হত্যা করিয়াছে। আরও প্রকাশ, গত দুই-তিন মাস হইতে তিনি বস্ত্রব্যয়ের স্বতি মোটেই পাইতেছিলেন না এবং জী ও ছেলে-মেয়েসহ প্রায়ই অনশনে দিন কাটাইতে ছিলেন।...

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী বাঁকুড়ার কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বাঁকুড়ার খাঞ্চ-সঙ্কট সম্পর্কে জানাইয়াছেন :—“বাঁকুড়ার কৈজিরাবুড়া গ্রামের গরীব-লোকেরা ৮ টাকা মণ দরে যে চাউল ক্রয় করিতেছে তাহা মাহুঘের খাণ্ডের অযোগ্য।...সদ্যদ্বিহা গ্রামে প্রায় তিন শত পরিবারের বাস। ইহাদের সকলেরই একদিন চাষের জমি ছিল। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের সময় সমস্ত জমি বিক্রি করিয়া দেওয়ার ফলে তাহারা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।...গ্রামের একজনের জীকে কোন

প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিতে দেখিলাম। কলকাতার লোকগুলি এমন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেছে যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।...

ভারত-সেবাশ্রম সমাজের মুখ্য-সম্পাদক সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা পরিদর্শন করিয়া তথাকার দুর্ভিক্ষের অবস্থা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পার্বতীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও হতাহাটা থানার অধীনস্থ অল্প পঁচিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অল্পসংখ্যক করিয়া জানা গেল যে, তাহাদের শতকরা পঁচিশ জনকে কোন কিছু না থাইয়াই শিক্ষালয়ে আসিতে হয়। অনেক পরিবারে প্রায়ই দিনের পর দিন এক মুষ্টি খাত্তও মিলে না। অম্মাভাবে জনসাধারণ হতাশ হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছে।...

নালিতাবাড়ী সরকারী এজেন্টের গুদামে বর্তমানে তিন হাজার চার শত মণ আউল ও বোড়ো চাউল পচিয়া মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।...

কিশোরগঞ্জের কটদীঘী ও পাকুন্দিয়া থানায় চাউলের দর হইয়াছে ১৮ টাকা। গ্রামে গ্রামে উপবাস শুরু হইয়াছে।...

হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া ও সদর মহকুমায় আট হাজার মণ খারাপ চাউল সত্তা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।...

বাঁকুড়া জেলার খবরে প্রকাশ যে, ইন্দপুর, সদর, ছাতনা, গঙ্গাজলবাগি, বড়জোরা এবং ওন্দা—এই ছয়টি মাত্র থানায় সাড়ে চার লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে। প্রায় পঁচিশ হাজার লোক ইতিমধ্যেই এই অঞ্চল হইতে জেলার বাহিরে পলাইয়াছে।...

চাঁদপুর মহকুমার পল্লী অঞ্চল হইতে দ্রুত চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান গ্রামাঞ্চলে চাউলের মূল্য প্রতিমণ ১৯ টাকা হইতে ২০।০ টাকা। দুঃস্থ গ্রামবাসীরা খাত্ত ডিম্বাক্য বাহির হইয়াছে।...

কুষ্টিয়া মহকুমার পল্লী অঞ্চলে বস্ত্রের অভাব অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহে পল্লী অঞ্চলের সহস্রাধিক লোক কুষ্টিয়া শহরে দল বাঁধিয়া উপস্থিত হয় এবং বস্ত্র দাবি করিতে থাকে। পরে এক বিরাট জনসভায় বস্ত্রহীন পল্লী-বাসীদের নিদারুণ দুর্দশার কথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।...

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত ব্রজরাজপুর গ্রামে দীনবন্ধু মাল গত ১৯শে এপ্রিল অনাহারে মারা গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহাশয় দীনবন্ধুকে রিলিফ অফিসারের নিকটে কাজের জন্ত পাঠাইয়া দেন কিন্তু রিলিফ অফিসার তাহাকে কার্খ নিযুক্ত না করার সে-ব্যর্থ হইয়া

গৃহে ফিরিয়া আসে ও অনাহারে দিনযাপন করিতে থাকে। পরে উক্ত তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। উক্ত গ্রামে বহু ব্যক্তি কাজের অভাবে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে।

তমলুকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের অবস্থা সম্বন্ধে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্র সামন্তের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে (ভারত, ২৫শে বৈশাখ) তাহা হইতে ঐ স্থানের জনসাধারণের আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বেশ বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে দেশের নেতাদের নিক্রিয়তা বস্তুতঃই বেদনাদায়ক। মেদিনীপুরের এই অধিবাসীরাই দেশের সেবা করিতে নামিয়া সর্বত্র বলিদানেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নীরব উপেক্ষা ভরে ইহাদিগকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়িতে দেওয়া চূড়ান্ত কৃত্যতার কাজ হইবে। গত আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের দান চিরস্মরণীয়; সেই আন্দোলনের বাহবা যাহারা কুড়াইতেছেন ইহাদের সাহায্যে তাহাদেরই সর্বপ্রাে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বিবৃতিটি এই:

তমলুক মহকুমায় ছয়টি থানা—নন্দীগ্রাম, হতাহাটা, মহিষাদল, ময়না, তমলুক, পাঁশকুড়া—সর্বত্রই দারুণ অম্মা-ভাব ঘটিয়াছে। গত ঝটিকার সময় এই মহকুমার জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। সেই সময়ই জমিজমা, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিভিন্ন রিলিফ কমিটির সাহায্য ও সরকারী সাহায্যের দ্বারা কোনক্রমে জীবনধারণ করে। এই সময়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এখনও মিটে নাই। বিভিন্ন স্থানে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া জনসাধারণের জীবনীশক্তি ধ্বংস করিতেছে। এই বৎসরও সারা মহকুমায় ফসল মোটেই হয় নাই। নন্দীগ্রাম, হতাহাটা থানার সমুদয় অঞ্চল, মহিষাদল থানার কিয়দংশে লোনা জল প্রবেশ করায় পানীয় জলের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। জমিগুলি লবণাক্ত ও ফসল জন্মানোর অল্পপযুক্ত।

পাঁশকুড়া থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ২।৩টি বাদে অল্পগুলিতে গড়ে একর পিছু ৪/ মণের বেশী ধান হয় নাই। তমলুক থানার অবস্থা ঐক্যপ। মহিষাদল থানার ২।৩টি ইউনিয়ন বাদে অজ্ঞাত ইউনিয়নে গড়ে ৪/ মণের বেশী ধান হয় নাই। নন্দীগ্রাম থানার ১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩।৪টি ইউনিয়ন বাদে বাকিগুলিতে একর প্রতি ২/ মণের বেশী ধান হয় নাই। ময়না থানার ৩।৪টি ইউনিয়ন বাদে বাকিগুলিতেও ৩/ মণের বেশী ধান হয় নাই। হতাহাটা থানার কোন কোন অঞ্চল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। এই থানার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ১টি ইউনিয়ন বাদে অল্পগুলিতে একর পিছু ৫০-ত্রিশ সের হইতে ৪/ মণ পর্যন্ত ফসল হইয়াছে। ২নং ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয়। এই ইউনিয়নে গড়ে ১০ ত্রিশ সেরের বেশী ফসল হয় নাই। এই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের বিশিন দাস (৫২) অস্বাভাব্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহার পরিবারে ৮জন লোক রহিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে একজন মাত্র সক্ষম ব্যক্তি। এই স্থানগুলিতে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই মহকুমার জনসাধারণ জ্যেষ্ঠের প্রথম হইতে একেবারে অস্বাভাব্যে পতিত হইবে। সরকারী ও বে-সরকারী ধর্মের জ্ঞান শতকরা ৯৫ জন লোকের জমি বাঁধা পড়িয়াছে। অস্বাভাব্য সম্পত্তি, থানা, বাট ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। গরু, বাছুর ইত্যাদিও গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। এরকম অবস্থায় ব্যাপক সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে অচিরে এই মহকুমার বহু অংশ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইবে।

মোটরগাড়ীর কারখানায় জন্ম জমি সংগ্রহ
দৈনিক 'ভারতে' ২৫শে বৈশাখ তারিখে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে :

কোমগরের সমিহিত ভ্রমকালী, কোতরং, ছোট বহুড়া, মাধলা প্রভৃতি গ্রামের চাষীদিগের যে ভিটা বাড়ী ও আবাদী জমি একটি সুরক্ষণ মোটর নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারী ল্যাও অ্যাঙ্কুইজিশন আইনের বলে গ্রহণ করা হইতেছে, উহা গ্রহণ করিবার কোনও সন্দেহ নাই; তথাপি জমি দখলের যে পদ্ধতি সচরাচর অবলম্বিত হয় তাহা গ্রহণ না করিয়া “নিতান্ত আবশ্যক” বলিয়া জরুরী বিধি প্রয়োগ করিয়া অতি অল্প সময়ের নোটিশেই এই সমস্ত অতি দরিদ্র ব্যক্তিদের গৃহহারা করা হইতেছে। এই জমিতে একটি মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপিত হইবে। দেশময় যে সময়ে খাড়াভাব প্রত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে আবাদী জমির আবাদ বন্ধ করিয়া কারখানা স্থাপনের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যুদ্ধের প্রয়োজন বলিয়া সরকার বহু লক্ষ বিঘা আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি অ্যাঙ্কুইজিশন আইনের বলে দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনেক জমিই যুদ্ধের কোনও প্রয়োজনেই আসে নাই। মেমারি অফলে এক লগু সাড়ে তিন হাজার ও অপর এক লগু আড়াই হাজার বিঘা এরূপ আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি সরকার কাড়িয়া লইয়া কোনও প্রয়োজনে না লাগাইয়া আজও ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এ জমিতে আবাদ হইলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত। তাহা করা যদি নাও সম্ভব হয়, তবে এখানেও কারখানা স্থাপন চলিতে পারিত। পানাগড়ে মার্কিন সামরিক প্রয়োজনে প্রায় ১০ লক্ষ বিঘা জমি এক্ষেপে দখল করা হয়। তন্মধ্যে

আড়াই লক্ষ বিঘা জমি আবাদী ছিল। যুদ্ধের পরে উহা ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু এখন তাহা ফেরত না দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; এখানেও কয়েকটি বৃহৎ কারখানা হইতে পারে। কাকিনাড়া অঞ্চলে এই ভাবে সংগৃহীত বহু জমি আছে। সেগুলি না লইয়া নতুন করিয়া আবাদী জমি গ্রহণে সরকারের এত উৎসাহ কেন?

বিড়লা-ভুক্তি কোম্পানীর কারখানার স্থান সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য হুগলীর যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরূপ অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছেন, তিনি তাঁহার কার্যকাল পূর্ণ হইবার বহু পূর্বে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন কি না 'ভারত' তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। আই-সি-এসের পদ পরিত্যাগ করিয়া ইতিপূর্বে কেহ কেহ মোটা বেতনে বণিক বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লইয়াছেন। সরকারী ক্ষমতার সুযোগ লইয়া কোম্পানী বিশেষকে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়া তাহার প্রতিদান-স্বরূপ মোটা বেতনের চাকুরী লওয়ার পথ বড়লাট লর্ড লিনলিথগো দেখাইয়া গিয়াছেন। হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন কিনা সে রহস্য উন্মোচিত হওয়া দরকার।

২৪-পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

২৪-পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি-রূপে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্দশা ও উহার কারণ সম্বন্ধে যে আবেগ-পূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার পরদিন নিখিল-বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহার সভাপতি ছিলেন নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; উদ্বোধন করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং শিক্ষকদের প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের মনো-ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন শিক্ষা সচিব শ্রী বাহাদুর মোহাম্মদ মুদ্দীন হোসেন। সভাপতি দেখাইয়াছেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতি বিধানের জন্য যে টাকা দরকার তাহা ব্যয় করিতে গেলে বাংলার রাজস্ব কুলাইবে না, প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন বেশী গোল করিলে তিনি সমস্ত প্রাথমিক স্কুল ভুলিয়া দিবেন এবং শিক্ষা সচিব তাঁহাদিগকে সেলুস ট্যাক্স বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে বলেন। তিন জনের বক্তৃতার কোন অংশে আমরা শিক্ষকদের ছরবছর প্রতি লেশমাত্র দরদের পরিচয় পাইলাম না এবং বিশেষ ভাবে এই কারণেই শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসুর অভিভাষণ আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। বে-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ তিনি, শিক্ষকদের উন্নতি সাধনের ক্ষমতা তাঁহার নাই—কিন্তু সম্মেলনে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শনে এবং ইহাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ নির্দেশে তিনি কার্ণগ্য বা দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার অভিভাষণের একাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

একথা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তিহীন। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যেমন ছিল ত্রিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেও ঠিক তেমনই আছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাবে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হয় পৃথিবীর কোনো সভ্যদেশেই তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনও একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা স্পষ্ট আদর্শ এর পশ্চাতে নেই। আমাদের পাঠশালাগুলো নিঃশালার চেয়েও অধম। অর্ধভগ্ন জীর্ণ কুটির; না আছে শিক্ষার কোন উপাদান, না আছে কোন সুচিন্তিত পদ্ধতি। গুরু মহাশয়ের দশা ভিক্ষুকের চেয়েও হীন। ভিক্ষুকের তবু একটা বেপরোয়া স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে বিরূপ দায়িত্বের ভার চাপানো আছে, অথচ পদে পদে তাঁরা সমাজের ও উপর-ওয়ালাদের কাছে লালিত ও উৎপীড়িত। পরিদর্শকের ভয়ে তাঁরা ভীত। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁদের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু সে কাজ করবার জন্যে তাঁরা কি খেয়ে বেঁচে থাকবেন সে কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন মনে করে নি। যে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র জাতিগঠনের সবচেয়ে গুরু কতব্যে এমনিভাবেই ফাঁকি দিয়ে চলেছে সে দেশের শিক্ষার কোন রকম উন্নতিই কেউ কখনো আশা করতে পারেন না।

অথচ দুই শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দশা এমন শোচনীয় ছিল না। যে দিন অভিশপ্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদেশে উপস্থিত হয়ে দেখতে দেখতে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে উঠল সেদিন থেকেই আরম্ভ হ'ল আমাদের সর্বনাশ। আমাদের দেশের পল্লীসভ্যতার ভিত্তি পড়ল ভেঙে, নিরক্ষরতা হয়ে উঠল সর্বব্যাপী; চতুষ্পাঠী ও মক্তবগুলো দ্রুত নিষ্ফল হয়ে যেতে লাগল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আবির্ভাবের সময় এক বাংলাদেশেই আশি হাজার পাঠশালা ও মক্তব ছিল। শোষণ ও শাসন যন্ত্র চালাবার জন্য কোম্পানীর প্রয়োজন হয়েছিল বেয়ারা, আরদালী, কেরানী, মুংসুফি আর আপিস-বাবুদের। ফলে চাকুরীর অসুপাতেই নিৰ্ধারিত হ'তে লাগল, শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি। এদেশের বিদেশী সরকার তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে সামরিক ও পুলিশবাহিনী এবং মাথা ভারি আমলাতান্ত্রিক ঠাঁট বজায় রাখবার জন্যেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে বসে থাকে, শিক্ষার ভিক্ষার বুলিতে দান করবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

বাংলাদেশে সুপারির ব্যবসা

যুদ্ধের পূর্বে সুপারির দর ছিল ছয় আনা সের। এ বৎসর

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব উহার উপর এগার আনা সের হিসাবে আমদানী-সুদ বসাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে উৎপন্ন সুপারির উপরও উৎপাদন-সুদ চাপিয়াছে। নিত্যব্যবহার্য কোন দ্রব্যের উপর মূল্যের দ্বিগুণ হারে আমদানী সুদ ও উৎপাদন-সুদ কোন সভ্য দেশে আছে কিনা আমরা জানি না। দরিদ্রের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপর এত চড়া হারে কর ধার্য করা সভ্য রীতিবিগাহিত বলিয়া আমরা মনে করি। গরীবের প্রতিনিধিত্বের দাবি লইয়া যে সব বড়লোক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে গিয়াছেন তাহারা ইহাতে সন্তোষিত দিয়াছেন ইহা আরও দুঃখের বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কার্যের মূলে বাংলায় সুপারির ব্যবসায় কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, 'আর্থিক জগৎ' পত্রিকা তাহার বিবরণ দিয়াছেন। উহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সুপারির উৎপাদন এবং সুপারির ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বাংলাদেশের স্থান সর্বপ্রধান। বাংলায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় ভারতের অল্প কোন প্রদেশে কিংবা দেশীয় রাজ্যে তাহার সমপরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় না। সুপারি আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যাপারেও বাংলার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা—এই কয়টি প্রদেশেই সুপারির চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী। আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সুপারি আমদানী হয় তাহা প্রধানতঃ বাংলা হইতেই রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি, বোম্বাই প্রদেশেও বাংলা হইতে সুপারি রপ্তানি হয়। বিদেশ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে প্রায় কুড়ি লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয় তন্মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মারফতে চৌদ্দ-পনের লক্ষ মণ সুপারি আসিয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, উৎপাদন-সুদ আমদানী-সুদ দ্বারা সুপারির ব্যবসায় হইতে ভারত-সরকারের মোট যে পরিমাণ অর্থ আয় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে বাংলাদেশ হইতে।

বাংলার সকল জেলাতেই অল্প-বিস্তর সুপারির চাষ আছে। কিন্তু বাধরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলা, খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা এবং ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে যে সুপারির চাষ হয় তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জেলায় যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় তাহাতে স্থানীয় চাহিদা মিটে না। বাধরগঞ্জ, নোয়াখালী, খুলনা এবং ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ মণেরও বেশী পরিমাণ সুপারি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার অধেক রপ্তানী হইয়া থাকে কলিকাতায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিহার, উড়িষ্যা,

সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে এই সমস্ত সুপারির কতকাংশ চালান হইয়া থাকে।

বাংলা হইতে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত স্থানে সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশে প্রায় দুই লক্ষ মণ সুপারি রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অল্প পরিমাণ সুপারি সিংহল, এডেন, আফ্রিকা, ব্রিটিশ গায়না এবং আমেরিকাতেও রপ্তানী হয়।

বহির্ভারত হইতে বাংলায় প্রায় চৌদ্দ-পনের লক্ষ মণ সুপারি আমদানী হয়। ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেন্ট এই সুপারি আমদানীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র; ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেন্ট হইতে বাংলায় সুপারি আমদানীর পরিমাণ সাধারণতঃ দশ লক্ষ মণেরও উপর। আমদানীর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র নন-ফেডারেটেড মালয় ষ্ট্রেটস্। এখান হইতে বাংলায় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ঊনআশি হাজার মণ। জাভা, সুমাত্রা, ফেডারেটেড মালয় ষ্ট্রেটস্, শ্রামদেশ, চীন, জাপান, ভার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশ হইতেও সামান্য পরিমাণ সুপারি আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একমাত্র কোচীন এবং মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডিয়া অঞ্চল হইতে অল্প পরিমাণ সুপারি কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় আমদানী হইয়া থাকে।

যুদ্ধের দরুন সুপারি আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুনর্বীর উহা আরম্ভ হইয়াছে। আগামী কয়েক বৎসর যদি দশ লক্ষ মণ সুপারিও বাংলাদেশে বহির্ভারত হইতে আমদানী হয় তাহা হইলে প্রতি সের এগার আনা আমদানী-শুল্কের দরুন দেশে সুপারির মূল্য হ্রাস পাইবে না। সুপারির চাহিদাও আরও হ্রাস পাইবে। উৎপাদন-শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের জটিল নিয়মকানুনের জন্য বাধারগঞ্জ, খুলনা, নোয়াখালী প্রভৃতি হইতে সুপারি চালান দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাদের ধামখেয়ালীর বশে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

দামোদর ক্যানেল-কর বৃদ্ধি

বর্ধমান অঞ্চলে দামোদর ক্যানেলের কল্যাণে সেখানকার কৃষকদের অবস্থা সামান্য একটু ভাল হইয়াছে এই সুযোগে বাংলা-সরকার ক্যানেল-কর দ্বিগুণেরও বেশী বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে কিন্তু সরকার উহাতে কর্পাত মাত্র করেন নাই। ক্যানেল-কর বৃদ্ধিতে সরকারের হয়ত কয়েক হাজার টাকা আয় বাড়িবে কিন্তু তদনুপাতে কৃষকদের ক্ষতি হইবে অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে দৈনিক কৃষকে (১৮ই বৈশাখ) একটি পত্রে সমস্ত অবস্থা বিবৃত

হইয়াছে। তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার স্বতঃপ্রসূত হইয়া ইহার প্রতিকার করিবেন এতদ্বি ভরসা করা কঠিন, কিন্তু কর-বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। পত্রটি এই :

১৯৪৫-৪৬ সাল হইতে দামোদর ক্যানেল-করের হার একর প্রতি ২৥/০ আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫৥০ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। এই কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্যানেল অঞ্চলের কৃষক সাধারণ ইতিমধ্যে গবর্ণর সকাশে বহু আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া এ বিষয়টির সমস্ত দিক আলোচনা করা হইয়াছে। অনা-বৃষ্টি এবং তজ্জনিত অজমার বিরুদ্ধে ক্যানেলের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কৃষক সাধারণের কোন-রূপ ভুল ধারণা নাই। ক্যানেল কৃষি-জলের সমস্তার সমাধান করিয়াছে। উপযুক্ত হারে ক্যানেল-কর দিতে কৃষকদেরও বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। অধিকন্তু ক্যানেল-বহির্ভূত এলাকার কৃষকরাও আজ আরও ক্যানেল খননের দাবি করিতেছে। একমাত্র ক্যানেল-করের হার অত্যন্ত ভাবে বৃদ্ধি করার ফলেই সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। বর্তমানে ধাতের দর অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি চাষীর আয়ের অল্প বাড়ি নাই এবং তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নততর হয় নাই। ধাতের দর পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে খইল, বলদ প্রভৃতি চাষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মূল্য ছয় গুণ বাড়িয়াছে। সকল জিনিস মর্হাষ হইয়াছে এবং চাষীর জীবনযাত্রা-প্রণালী দিন দিন নিম্নস্তরে যাইতেছে।

বাংলা ও আসাম কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-চ্যান্সেলর ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাংলা ও আসামের কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই কয়টি আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না—(১) ছাত্র বেতন বাড়াইয়া নিম্নতম বেতন ৮ টাকা করা; (২) যে সব ছাত্র আপিসে চাকুরী করিয়া কলেজগুলির সাক্ষ্য বিভাগে কমান্স পড়ে তাহাদিগকে দুই বৎসরের পরিবর্তে তিন বৎসর পড়িতে বাধ্য করা এবং (৩)

প্রতি কলেজে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা। ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্ত কোন কলেজের আর্থিক অবস্থার ক্ষতি হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয় ঘাটতি টাকা ঐ কলেজকে নিজে দিবে না, বাংলা-সরকারের নিকট হইতে পাওয়াইয়া দিবার জন্ত দরবার করিবেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তার যাহাতে ব্যাপকভাবে না হইতে পারে তৎপ্রতি ইংরেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা তিনটির ক্ষেত্রেই ইংরেজ সরকার বিধিমতে সঙ্কচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্কুলগুলিকে ভাল করিবার নামে স্কুল

কমানো ও প্রতি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার দিকে ইংরেজ সরকার সর্বদা নজর রাখিয়াছে। ইংরেজের স্বার্থবাহী লীগদলও শিক্ষাক্ষেত্রে এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত জনমত তীব্র হইয়া উঠিলে সর্বাপেক্ষে সেস ও ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা হয়, স্কুল প্রতিষ্ঠা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বইয়ের দাম ক্রমাগত বাড়াইয়া, বছর বছর বই বদলাইয়া এবং অল্প সহস্রবিধ উপায়ে শিক্ষাকে যত দূর সম্ভব ব্যয়সাধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করাইবার জন্ত লীগওয়ালাদের এত আগ্রহ, শিক্ষা-সঙ্কোচে উহা এক ব্রহ্মাঙ্গ-স্বরূপ হইবে।

এই অবস্থায় সর আন্তোভোয়ের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর আন্তোভোয়ের জামাতাকে শিক্ষা-সঙ্কোচের সমর্থক হইতে দেখিয়া আমরা বিমিত ও দুঃখিত হইয়াছি। সরকারী বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষার প্রসারে সর আন্তোভোয়ের দান চিরস্মরণীয়। উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এক মহৎ উপকার করিয়াছেন।

আলিগড় হাঙ্গামা

আলিগড়ের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা সম্পর্কে আশ্রা বিভাগের কমিশনার ও পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেলের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল তথ্যসমূহের কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ জনষ্টন ও মিঃ সুইফটকে দুইটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি দিতে বলা হইয়াছিল; প্রথমতঃ, কল্যাণগঞ্জ থানায় কাহারো আগুন লাগাইয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীরা নিষ্ক্রিয় ছিল কিনা।

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, “কল্যাণগঞ্জ বাজারে এক দল মুসলমান আগুন লাগাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; শহরের মুসলমান ও ছাত্রগণও এই ঘটনার সহিত নিশ্চিত জড়িত ছিল। কল্যাণগঞ্জের দোকানদারগণ প্রহৃত ও झুঠিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।”

হাঙ্গামার মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, বাজারের জনৈক বস্ত্রবিক্রেতার সঙ্গে কলহ হইতেই গোলমালের সূত্রপাত হয়। বস্ত্রবিক্রেতা কৃষ্ণবিস্বাসী লাল রেশন কার্ড ছাড়া কাপড় বিক্রয় কবিত্তে অস্বীকৃত হইলে ছাত্রগণ গোলমাল আরম্ভ করে, এবং পরে মহেন্দ্র পাল নামক আর এক জন ব্যবসায়ীর দোকানেও অনুরূপ গোলমাল হয় এবং ইহার পরেই অসংযত এবং উত্তেজিত জনতা ও ছাত্রগণ বাজার আক্রমণ করে। বিবৃতিতে এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই হাঙ্গামা পূর্ব হইতে পরিকল্পিত ছিল না।

প্রাপ্ত সংবাদসমূহ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, এই হাঙ্গামার অন্তরালে পূর্ব হইতে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল এবং তদনুসারে আয়োজন করা

হইয়াছিল। স্থানীয় সংবাদ হইতে জানা যায় যে ঘটনার পূর্ব দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলিতে ছাত্রদিগকে হিংসাত্মক কার্যে উত্তেজিত করিয়া প্রাচীর-পত্র টাঙানো হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রাচীর-পত্রে ছাত্রগণকে পাকিস্তান-বিরোধী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্ভবদ্ব ভাবে আক্রমণ চালাইবার জন্ত উৎসাহিত করা হইয়াছিল। কংগ্রেস-আন্দোলন এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্ত এবং তদুদ্দেশে যানবাহন, বেতার এবং অস্ত্রাশ্রয় সংযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিবার জন্ত একটি গুপ্ত সংগঠনের আভাসও এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল।

সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এই ধরনের পরি কল্পনার কথা ভিত্তিহীন। যদি ইহা সত্যই অমূলক হয় তবে ঘটনার এক সপ্তাহ পূর্বে আলিগড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশ সম্পর্কে একটি নিষেধাজ্ঞা কেন জারি করা হইয়াছিল? আর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও কেন ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয় নাই? রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে কোন আশঙ্কা বা অশান্তির সময়ে ছাত্রদের শহরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা বুঝিয়াও কেন কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে বাজার আক্রমণ করিবার সময়ে বাধা দিতে পারেন নাই? এই সকল প্রশ্নের কোন সমুত্তর পাওয়া যায় নাই। রেশন কার্ড ছাড়া বস্ত্র বিক্রয় অসম্ভব একথা আলিগড়ের ছাত্ররা জানে না ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে সুতরাং তাহারা দাঙ্গা করিতেই আসিয়াছিল এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি?

রিপোর্টে বিভিন্ন অগ্রিকণ্ঠের কথা ও অশান্তি দমনে সরকারী কর্মচারীদের তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী বিবৃতিতে সরকারী কর্মচারীদের অক্ষমতাকে যে অস্বীকার করা হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অথচ এই কর্মচারীগণ যে এই হাঙ্গামা দমন করিবার জন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কোন বিবরণই মিঃ জনষ্টন ও মিঃ সুইফটের বিবৃতিতে নাই। বিপদের পূর্বাভাস পাইয়াও পুলিশ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। রিপোর্টে বলা হইয়াছে—“হাঙ্গামার সময় ছাত্রদের শহরে প্রবেশ বন্ধ করা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি। আলিগড়ের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র সম্ভবদ্ব মনোভাব বর্তমান; বলপ্রয়োগ দ্বারা ইহাদের থামাইতে হইলে যথেষ্ট শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিতও আমরা একমত। ছাত্রদের উত্তেজনা দেখিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে ইহাদের শান্ত করিবার জন্ত গুলি চালাইতে হইলে বেপরোয়া ব্যাপক গুলিবর্ষণের প্রয়োজন এবং ফলে এক শত অথবা দুই শত লোকের মৃত্যু হইত। ম্যাজিস্ট্রেটের এই ধারণা সম্পর্কে আমরাও দ্বিমত নহি।”

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত এই যুক্তি শুধু হস্তাকর নহে, ইহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করিতে গিয়া বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ অনেকস্থলেই পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের এই কর্মচারীরাই কলিকাতার শান্ত ছাত্র-শোভাযাত্রার উপরে নির্বিচারে বেপরোয়া গুলি চালাইয়াছিল এবং এই ধরনের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ইতিহাস অল্প প্রদেশেও বিরল নহে। অবশ্য আমরা এই কথা বলিতে চাহি না যে আলিগড়ের ছাত্রদের উপরে গুলিবর্ষণ করাই একমাত্র সম্ভব কান্ড হইত। আমরা শুধু জানিতে চাই সরকারী কর্মচারীদের বিবেচনায় এই তারতম্য কেন? ইহা কি হঠাৎ অহিংসা নীতির পরিগ্রহণ না প্রচ্ছন্নভাবে লীগের বিদ্রোহ-নীতির সমর্থন? লাঠি অথবা কাঁছনে গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ হঠাৎ এত বিবেচনাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন কেন? ইহার গুঢ় মর্ম কি তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

যদি আমরা মনে করিতে পারিতাম যে এই হাঙ্গামা একটা সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার মাত্র তবে আমাদের এত উদ্বিগ্ন হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে লীগ প্রতি-নিধিরা যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশঙ্কা হয় এই ধরনের দাঙ্গাবাজি মুসলীম লীগের অনু-মোদিত কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। চৌধুরী খালিকুজ্জমান কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে শাসাইয়াছেন যে আলিগড়ের ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার জিয়াউদ্দিন নাকি গবর্ণরের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া-ছেন। উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, বিকৃতরুচি ছাত্রদের সংযত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের জন্ত লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই দরদ একান্ত দুঃখের বিষয়। আর ছাত্রদের এইরূপ বর্বরো-চিত আচরণও নূতন নহে। ট্রেনের যাত্রীগণ, রেলওয়ে কর্মচারী, দোকানদার এবং এমনকি রাস্তা-ঘাটে নারীদের উপর ইহাদের অশিষ্ট এবং অসংযত আচরণ সম্পর্কে বহুবার অভিযোগ শুনা গিয়াছে। আলিগড়ের সমস্ত বিশেষ গুরুতর এবং রিপোর্টে ঠিকই বলা হইয়াছে যে ইহা সরকারের নীতি সংক্রান্ত। আশা করি যুক্তপ্রদেশের গবর্নেন্ট এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বিভিন্ন শিল্প সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের

জন্ম আসাম সরকারের উদ্ভব

আসামের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আসাম-সরকার কতকগুলি শিল্প জাতীয়করণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। যে সকল শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা হইতেছে : ১। জলশ্রোত নিয়ন্ত্রণপূর্বক উৎ-পাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক গঠন, ২। বস্ত্রশিল্প, ৩। শর্করা ৪। সূরা, ৪। পাট, ৫। কাগজ, তুলা, পেট্রবোর্ড প্রভৃতি ৬। স্ফুশিল ও সেলুলয়েড, ৭। কাঁচ শিল্প, ৮। হালকা

ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ৯। কৃত্তিক সোডা ও আলকাতরা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের জন্য ভারত-সরকার ইতিমধ্যেই আসামের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পের জন্য বরাদ্দ যথাসময়ে করা হইবে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে সরকারী প্রস্তাবের মর্মার্থ হইতেছে এই যে, এই সমস্ত শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের বিষয়াধীনই হইবে—কোনরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত সম্পদ হইতে পারিবে না। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, আসাম-সরকার উপরোক্ত শিল্পগুলি ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি চালু শিল্প যথা—সিমেন্ট, দেশলাই, পেট্রল, প্লাইউড ও করাতকল এবং চর্মশিল্প প্রভৃতিকেও জাতীয়-করণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এই উভয়বিধ শিল্প ব্যতীত অন্য যে কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন বা চালু কোন শিল্পের প্রচারের জন্য বাহাতে দশ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন খাটানো হইবে তাহাই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। আসাম-সরকার এই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই তাহাদের অবলম্বনীয় নীতি শীঘ্রই ঘোষণা করিবেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইহাও স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর প্রতিষ্ঠিত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই গবর্নেন্ট প্রয়োজন মনে করিলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীন করিতে পারিবেন।

আসামের যে জিনিষটী সর্বাগ্রে সরকারের হাতে আনা উচিত ছিল, উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সেইটাই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা অনিচ্ছাকৃত ক্রটি নহে, জানিয়া শুনিয়াই চা-বাগানগুলিকে তালিকায় ধরা হয় নাই। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করায় তাহাদের মুখপত্র সম্ভাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসী বিম্মিত হইয়া ভাবিবে এই প্রহসনের কি প্রয়োজন ছিল? তালিকায় যে সব কারখানার নাম করা হইয়াছে আসামে তাহাদের সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই নগণ্য। সেখান-কার অর্থনৈতিক জীবনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র চা-বাগান এবং এখানেই শ্রমিকদের উপর অন্যায় ও অবিচার হয় সবচেয়ে বেশী। চা-বাগানের আয়ের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যায় এবং এই বাগানগুলির মালিকানা স্বত্বের বলে ইংরেজ মালিকেরা আসামের রাজনৈতিক জীবনে হস্ত-ক্ষেপ করিবার সাহস পায়। চা-বাগানগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে জনসাধারণ ইহা বিশ্বাস করিত। এ বিষয়ে বরদলৈ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন।

খাদ্যসঙ্কট ও ভারতের খাদ্যবরাদ্দ

কিছুকাল যাবৎ পৃথিবীর ঋতুসমস্তা এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের জন্ত খাদ্যবরাদ্দ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলে তীব্র বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের অভিনয়ে আমে-রিকান কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় ঋতু প্রতিনিধি দলই বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছেন। অবশ্য ইংরেজ প্রভুরাও মাঝে মাঝে মত-

প্রকাশ করিতে বিমত হন নাই। এক দিকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর করাল ছায়া ভারতবর্ষকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে তখন এই সকল মুখর ভাষণের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পারস্পরিক মনোভাবের ধারাতী বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমেই আরম্ভ করা যাউক কিছুকাল আগের ভারতীয় ফুড ডেলিগেশনের আমেরিকা যাত্রা হইতে। তাঁহারা গিয়া সম্মিলিত খাদ্য সমিতির (Combined Food Board) নিকট ভারতের প্রয়োজনের কথা জানাইলেন। ডেলিগেশনের অধ্যতম সদস্য সর রামস্বামী মুদালিয়র ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা খাদ্য সমিতির নিকট হইতে ভারতের জন্য ১,৪০০,০০০ টন গম বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

চতুর্দিকেই যখন খাদ্যভাব সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখা যাইতে লাগিল তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে তিন মাসের মধ্যে খাদ্যসঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। খাদ্যবস্থা সম্পর্কে এই আশ্বাস দেওয়ার মূলে ছিল খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ধারণা। কারণ ইহার কিছু দিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এণ্ডারসন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিলেন যে এই বৎসরের ভারতীয় খাদ্যসঙ্কট গতবারের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের মত ভয়াবহ হইবে না।

এই ধরনের আবাস্তব আশাবাদের প্রতিবাদ নানা দিক হইতেই করা হইল। পূর্ব-এশিয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আন্তর্জাতিক সঙ্কটগ্রাণ সমিতির ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ হেনড্রিকসন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন যে বর্তমান বৎসরের ভারতীয় খাদ্য-পরিস্থিতি পূর্বকার দুর্ভিক্ষ হইতেও গুরুতর এবং পশ্চিম দেশসমূহ হইতে খাদ্য না পাইলে ভারতবর্ষ গত বার অপেক্ষা এই বার আরও বেশী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে অল্পকালের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ হইতে দেড় কোটি লোক প্রাণ হারাইবে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ এণ্ডারসনের উক্তি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারী মহল হইতেও তীব্র সমালোচনা শোনা গেল; ইণ্ডিয়া অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী মন্তব্য করেন যে ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত বিবৃতিসমূহ রীতিমত হাঙ্গ-কর। ব্রিটিশ মহল হইতে আরও জানা গেল যে মে এবং জুন মাসে যদি ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে গম পায় তবে তাহা খুবই সামান্য এবং সম্ভবতঃ এই দুই সঙ্কটপূর্ণ মাসে আমেরিকা হইতে গম একেবারেই ভারতবর্ষে যাইবে না।

আমেরিকার সাহায্য সম্পর্কে যখন এই সকল নিরাশার কথা শুনা যাইতেছে তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহাদের সাহায্যব্যবস্থার পরিমাণ এবং নীতি জানাইয়া বলিলেন যে তাঁহারা এইবার কথাবার্তার অধ্যায় ছাড়াইয়া আসল কাজ

আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি জানাইলেন যে বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্র গবর্নেন্ট ইউরোপ এবং এশিয়ার দুর্ভিক্ষ-প্রদীপ্ত নরনারীর জন্য মাসে ১,০০০,০০০ টন গম রপ্তানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘোষণার উত্তরে সঙ্কটগ্রাণ সমিতির ভূতপূর্ব ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ লেহম্যান স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্যব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নহে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার পঞ্চাশ কোটি লোকের পক্ষে মাসে দশ লক্ষ টন খাদ্য কিছুতেই পর্যাপ্ত নহে।

খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে আমেরিকার মতামত এবং সাহায্য-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়া সোভিয়েট কাগজ 'নিউ টাইমস্' এ মিঃ এ. ডায়াকভ খোলাখুলি ভাবেই লিখিলেন যে ভারতবর্ষে যে বার বার দুর্ভিক্ষ ঘটে ইহার কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই শুধু নহে। ভারতবর্ষকে সাহায্য করা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে যে প্রচার হইতেছে সেই সম্পর্কে লেখক বলেন যে প্রস্তাবিত রিলিফ ব্যবস্থা জনসাধারণের হুঃখ-হৃদশার সমুদ্রে একটি বিন্দুর বেশী আর কিছু নহে।

নানা দিক হইতে এই সকল সমালোচনা শুনিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কিছু সচকিত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, বিশ্বের খাদ্যসঙ্কট অত্যন্ত গুরুতর এবং এই সঙ্কট ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অনাহার ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এতকাল পরে যদিও বা যুক্তরাষ্ট্রের কতৃদেবের কিছুটা বাস্তবজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কিন্তু এই সময় হইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোলাটে জল আসিয়া এই বাস্তবজ্ঞানকে বিকৃত করিয়া দিল। ফল হইল এই যে, ইহার পরে ট্রুম্যান এবং অগাধ আমেরিকান প্রতিনিধিগণ যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন, সর্বত্রই ভারতবর্ষের সঙ্কটকে ধামাচাপা দিয়া ইউরোপের পরিস্থিতির উপরে বেশী জোর দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। মিঃ হার্বার্ট হভার যখন কায়রো হইতে ভারতভিষ্মুখে রওনা হইবার আয়োজন করিতেছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সহসা তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই আগ্রহের অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মুখে তিনি বলিলেন যে ইউরোপের পরিস্থিতির গুরুত্বের বিবেচনায় মিঃ হভারের দেশে ফেরা প্রয়োজন। আসল উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের খাদ্যবস্থা মিঃ হভার না দেখিলেই ভাল। মিঃ হভার অবশ্য ভারতবর্ষে আসিলেন। কিন্তু আসিয়াই মামুলী সুরে বলিলেন, যে, ভারতের খাদ্যসঙ্কট ইউরোপের খাদ্যসঙ্কটের মত গুরুতর নয়। উপরন্তু আরও বলিলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে কোন দুর্ভিক্ষ নাই, তবে খাদ্য চালান না পাইলে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হইবে। হভার সাহেবকে ভারতবর্ষের বর্তমান এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রমাণ দেওয়ার মত অনেক তথ্যই রহিয়াছে; কিন্তু যাহা হউক হভার সাহেব নিজেও কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে এক তার কন্ঠিয়া জানাইলেন যে, ভারতবর্ষ এক চরম বিপদের সম্মুখীন

হইয়াছে এবং অবিলম্বে ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন।

ইহা সত্ত্বেও আমেরিকার নীতির কোন লক্ষ্যীয় পরিবর্তন ঘটে নাই এবং ভারতবর্ষের অবস্থা সত্ত্বেও আমেরিকার উদাসীনতা পূর্ববৎই আছে। ইউরোপের জন্ত আমেরিকার দরদের সীমা নাই, অথচ ভারতবর্ষের দুর্দশা সম্পর্কে এই উদাসীনতার কারণ কি? প্রথম কারণ চিরাচরিত এবং তাহা এই যে, ইংরেজ বা আমেরিকানরা মুখে যাহাই বলুক ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়া ভারতের ক্ষতি সাধন করিতে কেহই কম যায় না। ইহা ছাড়া ইউরোপের জন্য অপরিসীম দরদের অন্য কূটনৈতিক কারণও অবশ্য আছে। ইউরোপে আজ ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণায়মান এবং সোভিয়েটের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি পুঁজিবাদী ইঙ্গ-মার্কিন মহলের বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। পোলাণ্ড আর ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক প্যাচকষাকষি শুরু হইয়াছে তাহা এই ঋণসাহায্যকে আশ্রয় করিয়াই ঘনাইয়া উঠিতেছে। সাম্যবাদের বিভীষিকাকে দূর করিবার জন্ত আমেরিকা ও ব্রিটেন যে ভারতবর্ষকে ভুলিয়া ইউরোপের হুংগে গলিয়া যাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আর এই আমেরিকাই আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতির কর্ণধার।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ভারতের ঋণবরাদ্দ লইয়া সাম্প্রতিক বাদবিতণ্ডার কথা। আমরা রামস্বামী মুদালিয়রের কথামত ১,৪০০,০০০ টন গমের আশায় দিন গুণিতেছিলাম। হঠাৎ গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিখ্যাত লেখিকা এবং “ইণ্ডিয়া ফেমিন এমারজেন্সী কমিটির” সভানেত্রী পাল বাক এক চাকল্যকর বিবৃতি প্রকাশ করিলেন। তিনি জানাইলেন যদিও সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছে যে কন্সাইণ্ড ফুড বোর্ড হইতে ভারতবর্ষ ১,৪০০,০০০ টন গম আগামী ছয় মাসে পাইবে, উল্লিখিত কমিটি জানিতে পারিয়াছেন যে এই ধরণের কোন বরাদ্দই এই পর্যন্ত ফুড বোর্ড কর্তৃক হয় নাই।

ইহার পরে আমেরিকান ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি মিঃ জে. জে. সিং ভারতীয় ঋণ-প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এক অতীব গুরুতর অভিযোগ করেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ১,৪০০,০০০ টন গম পাইবার আশা ভারতবর্ষ কোন রকমে করিতে পারে না। খুব বেশী হইলে বড় জোর ৮০০,০০০, টন খাদ্য ঐ তারিখের মধ্যে ভারতে পৌঁছিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় ঋণ-প্রতিনিধি দল যদিও প্রকাশ্য বিবৃতিসমূহে ২,০০০,০০০ টন গমের দাবি জানান, কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষের আসল প্রয়োজনীয়তা ইহা অপেক্ষা অনেক কম।

●ভারতের ঋণ-প্রতিনিধি দলের এই চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ যে বিশেষ লজ্জাকর সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ অথবা

অসাবধান কথাবার্তার ফলে যদি এই ব্যাপার ঘটয়া থাকে তবে তাহাও কোনোক্রমেই মার্জনীয় নহে। অবশ্য এই দলের মুখ-পাত্রগণ আত্মপক্ষসমর্থনের জন্ত অনেক কথাই বলিয়াছেন।

প্রথমেই প্রতিবাদ আসে সর্ জে. পি. শ্রীবাস্তবের নিকট হইতে। তিনি বলেন যে, ঋণ-প্রতিনিধি দলের বিবৃতিতে কোন ভুল নাই এবং ব্রিটিশ ঋণ-মন্ত্রী সর্ বেন স্মিথই এই ১৪,০০,০০০ টন বরাদ্দের কথা জানান। সর্ এস. জি. রাম-মুর্তি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সর্দার জে. জে. সিঙের মন্তব্য একেবারেই ভ্রান্ত সংবাদদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্দার সিঙের উচিত ছিল এই সকল ভ্রান্ত সংবাদ প্রচার না করিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা। সর্ রামস্বামী মুদালিয়রও এক বিবৃতিতে উল্লিখিত অভিযোগের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, মিঃ সিঙের সংবাদ যেখান হইতেই আসুক, উহা একটু চুষ্ট মিথ্যা প্রচার মাত্র। এই মন্তব্যের উত্তরে সর্দার জে. জে. সিং বলেন যে, সর্ রামস্বামীর উচিত ছিল তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া এই অভিযোগ সম্পর্কে যথোচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল যে কন্সাইণ্ড ফুড বোর্ড হইতে ১,৪০০,০০০ টন বরাদ্দ সম্পর্কে যে বিবৃতি ঋণ-প্রতিনিধি দল প্রদান করিয়াছেন তাহার মূলে কোন সরকারী স্বীকৃতি নাই এবং প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার উপরে ভিত্তি করিয়াই ঋণ-প্রতিনিধি দল এই মন্তব্য করিয়াছেন।

এখন ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে ভারতের ঋণবরাদ্দ কমাইয়া আনিবার জন্ত। কন্সাইণ্ড ফুড বোর্ডের কর্তারা এবং যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ভারত-বন্ধুগণ ক্রমশই চেষ্টা করিতেছেন কি করিয়া ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া সমস্ত ঋণ অগ্রহালাপ দিয়া রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখা যায়। সর্ মনলাল নানাবতী সত্যই বলিয়াছেন যে আমেরিকার আচরণ লজ্জাকর। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে আমেরিকাবাসিগণ মনে করে যে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ যখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তখন এই বৎসর আর একবার দুর্ভিক্ষ ঘটিলেও কিছু আসে যায় না।

আন্তর্জাতিক সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং কন্সাইণ্ড ফুড বোর্ডে এখনও আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও যে দাবি জানাইয়াছেন তাহা আমরা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তিনি বলিয়াছেন যে যে মাসের জন্ত ৫ লক্ষ টন ঋণ-বরাদ্দকে যদি কোনক্রমে কমানো হয় তবে জুনের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভারতের রেশন-ব্যবস্থা প্রায় অচল হইবে এবং এক আঘাতে ভারতের অন্ততঃ ১০০,০০০,০০০ লোককে অনাহারে দিন যাপন করিতে হইবে।

যথেষ্ট ঋণবরাদ্দের জন্ত আমাদের এই দাবি ভিক্ষা নয়। বরাদ্দের সমুদয় ঋণই আমরা টাকা দিয়া কিনিব। যে সঙ্কট-ত্রাণ সমিতিতে ভারতবর্ষ প্রথম বারেই ৮ কোটি টাকা দান

করিয়াছে সেই সমিতির এই উদাসীনতা লক্ষ্য করিবার বিষয় বাটে। যে আমেরিকার হাজার হাজার সৈন্যকে ভারতবর্ষে পাঠসম্ভার দিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে আশ্রয় দিয়াছে সেই আমেরিকা আজ তাহার সর্বনাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। ইংরেজ আমেরিকার পরমমিত্র, কাজেই ইংরেজের শত্রু ভারতবর্ষকে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতে আমেরিকা দ্বিধা বোধ করিতেছে না।

রেল ধর্মঘটের নোটিশ

ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত কর্মচারী ২৭শে জুন হইতে ধর্মঘট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্তৃপক্ষকে নোটিশও দিয়াছেন। বেতন ও ভাতারূপে ইহাদের সর্বপ্রধান দাবি। রেলওয়ে বোর্ড প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছেন যে কর্মচারীদের দাবি পূরণ করিতে গেলে যত টাকার প্রয়োজন তত টাকা পাওয়া সম্ভব নহে। এখানে কর্মচারীদের সহিত বিরোধ রেলওয়ে বোর্ডের, উভয়েই এই বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষ। রেলওয়ে বোর্ডের বিচারের উপরও দেশের লোকের আস্থা নাই। সুতরাং কর্মচারীদের দাবির উত্তরে তাহাদের বক্তব্যকেই লোকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবে না। এখানে নিরপেক্ষ সালিশী নিয়োগের একান্ত প্রয়োজন আছে, এরূপ সালিশী ভিন্ন বর্তমান বিরোধের সম্মীমাংসা হইতে পারে না।

রেলওয়ে কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যুদ্ধের কয় বৎসরে ইহারা শুধু যে সর্বপ্রকারে ইংরেজের সহায়তা করিয়াছেন তাহা নহে, যাত্রীদের উপর যে অত্যাচার ইহারা করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাওয়া খুব সহজ নহে। দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য কিছু চাউল কোন প্রকারে যাহারা সংগ্রহ করিয়া রেল চড়িবার দুঃসাহস করিয়াছে বহু রেল কর্মচারী তাহাদিগকে পুলিশে দিবার ভয় দেখাইয়া এই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের নিকট হইতে ঘুম আদায় করিতে দ্বিধা করে নাই। স্টেশনে টিকিট ফুরাইয়া যাওয়া রেল পরিচালনার এক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখনও উহা চলিতেছে। টিকিট কিনিতে গিয়া না পাইয়া যাহারা বিনা টিকিটে রেল চড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে ঘুম বাবদ যথার্থ মাংশুলের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করা হইয়াছে। মালের ভাড়া চার্জ করিবার নামে ঘুম আদায় ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া সিভিল সাপ্লাইয়ের লোকেরা যাত্রীদের বোঁচকা খুলিয়া চিনি, চাউল প্রভৃতির তল্লাস করিয়া যখন তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে ও ঘুম লইয়াছে, রেল কর্মচারীদের তখন অগ্রসর হইয়া যাত্রীদের সাহায্য করিতে তো দেখাই যায় নাই, বরং ভাগ আদায়ের আশ্রয় দেখা গিয়াছে। স্টেশনে কুলির উৎপীড়নের কোন প্রতিকার ইহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। ধর্মঘট করিতে গেলে যাত্রীদের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয় ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ট্রাম ধর্মঘট প্রভৃতি ব্যাপারে আমাদের এই

অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে ধর্মঘটী কর্মচারীরা ধর্মঘটের সময়কূটই শুধু যাত্রীদের নিকট নরম থাকে, ধর্মঘট মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহাদের পুলিশী মেজাজ ফিরিয়া আসে। রেল কর্মচারীদের বেলায় ইহা চলিবে না। কারণ এত বড় ও ব্যাপক সর্বভারতীয় ধর্মঘট যাত্রী সাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ভিন্ন কিছুতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং ধর্মঘট করিবার আগে এখন হইতেই যাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার করিয়া পূর্বকৃত অত্যাচারের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও সুরূপ হওয়া উচিত।

রেল ধর্মঘট যে সময়ে আরম্ভ হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে আমাদের মতে তাহাও সমীচীন হয় নাই, ইহাতে কয়েক লক্ষ কর্মচারীর সুবিধা হইতে পারে কিন্তু দেশের কোটি কোটি লোকের সমুখ বিপদের এমন কি প্রাণহানির আশঙ্কাও রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় ধর্মঘট করিলে ইহারা সকল দাবি আদায় করিতে পারিতেন ইহা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য। বোম্বাইয়ের শ্রমসচিব ত্রীযুক্ত গুলজারীলাল নন্দ বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময় ধর্মঘট না করা রেল কর্মচারীদের পক্ষে খুব ভুল হইয়াছে। ইংরেজের যুদ্ধে ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত না করিবার জন্ত যাহারা সেদিন ধর্মঘট করেন নাই, তাহারা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘট করিয়া কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করিতে কেন অগ্রসর হইয়াছেন ইহা লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইংরেজের যুদ্ধে রেল বন্ধ হইলে দেশবাসীর লাভ ছাড়া কোন লোকসান ছিল না; কিন্তু ২৭শে জুন ধর্মঘট সুরু হইলে দেশের লোকেরই মহা বিপদ হইবে, ইহাতে ইউরোপের কিছুমাত্র লোকসান নাই, দুর্নামেরও ভয় নাই। রেল ধর্মঘটের জন্ত খাদ্য চলাচল বন্ধ হইয়া দুর্ভিক্ষে লোক মরিলে তার দায়িত্ব ইংরেজের ঘাড়ে ততটা চাপিবে না, যতটা চাপিবে কর্মচারীদের নিজেদের উপর। এই ধর্মঘটের তারিখ নিশ্চিত ভাবে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের সুবিধা হইবে, স্থানীয় শত্রু আটকাইয়া ইহারা দশ গুণ দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে। যুদ্ধের মুখে রেলকর্মচারীদের যে সব নেতা ধর্মঘটের পরামর্শ দেন নাই, দুর্ভিক্ষের সময় রেল বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়া তাহারা যে সর্বনাশ করিতে চলিয়াছেন এখনও তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আছে।

কেহে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখনও দূর হয় নাই, উহার যথেষ্ট সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। যুদ্ধের পাঁচ বৎসর যাহারা অপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহারা আর কয় মাস অপেক্ষা করিতে পারেন না ইহা মনে করা কঠিন। ভারতীয় রেল-পরিচালন ব্যবস্থায় গুরুতর গলদ আছে। আমাদের দেশের রেল পরিচালনার সকল পরিকল্পনা ইংরেজের প্রয়োজন বুঝিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কর্মচারীদের বেতনও সেই হিসাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ দেশে ইন্ডিয়ান, মালগাঙ্গী প্রভৃতি নির্মিত হইলে এবং অত্যন্ত সরঞ্জাম, বাজার

যাচাই করিয়া যেখানে, সম্ভায় মিলিবে সেখান হইতে কেনা হইলে প্রতি বৎসর রেলের বহু কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে ইহা নিশ্চিত। এইভাবে রেলের খরচের সমস্ত দিক ভাল করিয়া অঙ্গসন্ধান করিলে জাতীয় সরকারের পক্ষে নিম্ন-বেতনের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্ত টাকা বাহির করা খুব কঠিন নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। এই কারণেই আমাদের বিশ্বাস মোলানা আজাদের আবেদন শিরোধার্য করিয়া রেল কর্মচারীদের পক্ষে আরও কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করা উচিত। দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘট চূড়ান্ত অপরিশ্রামদর্শিতার কাজ হইবে।

ত্রিনিবাস শাস্ত্রী

ত্রিনিবাস শাস্ত্রী পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। যদিও শাস্ত্রীজি দীর্ঘ ও সার্থক জীবন যাপন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন তথাপি দেশের এই চরম সঙ্কটক্ষেত্রে তাঁহার ছায় শক্তিমান পুরুষের অভাব বিশেষ ক্ষতির বিষয়।

শাস্ত্রীজি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোস্বালের উপযুক্ত শিষ্য এবং এই শিষ্যত্বের মধ্যদা তিনি কোনো কালেই ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যে শিক্ষকতার ব্রত তিনি প্রথম জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রতের অনির্বাক্য দীপশিখা তাঁহার স্মদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ কোনো কালেই ছিন্ন হয় নাই; যুগান্ত পূর্ব পর্যন্তও তিনি আরামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস-চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯০৭ সনে শাস্ত্রীজি “সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি”তে যোগ দেন। ১৯১৫তে এই সমিতির সভাপতিত্বপে তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯২৭ পর্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় তাঁহার ডাক পড়িত সর্বত্র। কারণ তাঁহার তীক্ষ্ণ বিবেচনাজি, প্রগাঢ় দূরদৃষ্টি এবং গভীর মানসিক সংযম এই সকল আলোচনার পক্ষে অমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শাস্ত্রীজি তাঁহার দীর্ঘ জীবনে বহুকাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং সর্বত্রই তাঁহার মনীষা ও চরিত্রবলের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হিসাবে, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে, বিভিন্ন ডোমিনিয়নে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে তাঁহার কর্মনিপুণতার ইতিহাস। তাঁহার অক্লান্ত কর্মজীবনের পরিচায়ক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজি ছিলেন “লিবার্যালিজমের” কর্ণধার। উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তাঁহার নাম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিপ্লবী ভাবাদর্শের যে প্লাবন সমগ্র দেশকে নাড়া দিয়াছিল, শাস্ত্রীজির লিবার্যাল বিশ্বাসে তাহা ভাঙন ধরাইতে পারে নাই। দেশের সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের পরিবর্তন ঘটয়াছে। শাস্ত্রীজির রাজনৈতিক বিশ্বাস বর্তমান

সময়ে হয়ত যথেষ্ট প্রগতিশীল বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি নিজের আগষ্ট-আন্দোলনের পর হইতে তাঁহার রাজনৈতিক মতামতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রীজির জীবন ছিল অশ্রান্ত সাধনা, একনিষ্ঠ আদর্শবাদ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং অগ্নান চরিত্রবলের প্রতীক। তাঁহার জীবনের আদর্শ যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে গ্রথিত ছিল সেই সত্যনিষ্ঠার প্রেরণা ভারতবাসীকে দুঃখের দিনে আশার সন্ধান দিবে।

ভুলাভাই দেশাই

শাস্ত্রীজির মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই ভারতের আর এক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের লোকান্তর ঘটয়াছে। ভুলাভাই দেশাইর পরলোকগমনে ভারতের রাজনৈতিক জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আইন শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় ভুলাভাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এম. এ. পাস করিবার পর তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরেই অধ্যাপনা ছাড়িয়া তিনি আইন-ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রতিভাসম্পন্ন আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল বারদৌলি কিষণ সত্যগ্রহের সময়। ১৯২৮ এবং ১৯৩১ সনে তিনি কিষণদের পক্ষ সমর্থনকালে তাঁহার গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। ইহার পর ইহাতেই তাঁহার জীবন কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত হইয়া যায়। কংগ্রেস-মহলের নেতৃত্বদ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, এবং দেশাই-লিয়াকৎ আলী চুক্তির ফলে অনেকের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ ঘটিলেও কংগ্রেসের নেতৃত্বদের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক কোনো কালেই ছিন্ন হয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে যখন সমগ্র দেশ আলোড়িত হইল তখন কংগ্রেস পক্ষ হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ভুলাভাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের কালে তিনি যে সুগভীর আইন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে-কোন আইনজ্ঞের পক্ষে গৌরবের বস্তু।

ভুলাভাই নানা প্রকারে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসের জটিল গবেষণাসমূহে তাঁহার দান, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা হিসাবে তাঁহার বাগ্মিতা, এবং সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনকালে তাঁহার যুক্তিশীলতা দেশের ইতিহাসে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

আমরা ভারতের এই বিখ্যাত জননায়কের আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি ও সাহুনা জানাই।

শাহজাদা দারাশুকের জীবন-কাহিনী

ত্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

প্রথম অধ্যায়

বাল্য ও কৈশোরের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল। আকাশে-বাতাসে মোগল সাম্রাজ্যে আনন্দের অধীর স্পন্দন, জাঁহাঙ্গীর-রাজত্বের দশম বার্ষিক “নওরোজের” ঈদ আগতপ্রায়—সুখ্যদেবের মেঘ-রাশিতে প্রথম সংক্রমণের মুহূর্তে উৎসবের বাণ্য বাজিয়া উঠিবে। আজমীর শহরের যে রাস্তা দিল্লী দরওয়াজা বামে রাখিয়া পুষ্কর তীরে চলিয়াছে উহার নিম্নভূমির উত্তর দিকে “অন্নাসাগর”-সরোবরের বিপুল জলরাশি। সরোবরের পূর্বতীরে নগরীর পশ্চিম উপকণ্ঠে বাদশাহী ডেরা—একটি সুপরিকল্পিত মনোরম তাঁবুর শহর। দারু-উল-সুলতানত্ আগ্রা নগরী আজকাল দারু-উল-বরকত্ আজমীরের দৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। রাজধানী ছাড়িয়া প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শাহান্ শাহ জাঁহাঙ্গীর মিবার অভিযান পরিচালনার জন্ত আজমীরে শিবির স্থাপন করিয়া আছেন। আজমীর শরিফের খাজা সাহেবের বরকতে আকবর বাদশাহ বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও ক্ষুদ্র মিবার রাজ্য জয় সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শাহজাদা খুরম-কে মহারাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া জাঁহাঙ্গীর পীরের দরবারে পুত্রের বিজয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। খেয়ালী বাদশাহ ভক্তির আবেগে গত বৎসর (১৬১৪ খ্রীঃ) কর্ণভেদ করিয়া চিশতী-র কান-ফোঁড়া গোলাম হইয়াছিলেন। এই জন্ত দরবারী মুসলমান আমীরগণের মধ্যে কান ছিঁড় করিবার হিড়িক পড়িয়া গেল। মক্বরার উঠানে যে অতিকায় ডেগ-মুগল এখনও আকবর-জাঁহাঙ্গীরের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া ধ্বংসস্থানে বিরাজ করিতেছে উহার মধ্যে বড় সওয়াশ’ মণী ডেগটা আগ্রায় তৈয়ার করাইয়া বিগত বৎসরে সম্রাট জাঁহাঙ্গীর মহাসমারোহে আজমীরে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঐ দিন সকালবেলা স্বয়ং হুজুজাহান বেগম নিজের হাতে উহুন ধরাইয়া বড় ডেগে খিচুড়ী পাক করিয়াছিলেন। রাজরাজেশ্বরীর এই অল্পপূর্ণা রূপ জাঁহাঙ্গীর ব্যতীত আর কেহ দেখিতে না পাইলেও তিন বৎসর পরে সর টমাস রোগল শুনিয়াছিলেন। পাক শেষ হইবার পর মইয়ের সাহায্যে আলা হজরত সর্বপ্রথম এক থালা খিচুড়ী নামাইয়া গরিবদিগের পাতে পরিবেশন করিলেন—সেইদিন পাঁচ হাজার কাঙাল খিচুড়ী প্রসাদ পাইয়াছিল।

বিজয়ী খুরম কুমার করণকে সঙ্গে লইয়া ১০২৪ হিজরী মহরম মাসের ২০ তারিখ (ফেব্রুয়ারি, ১৬১৫ খ্রীঃ) দরবারে

উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ শাহজাদা খুরমের বীরত্ব, কূটনীতি এবং সর্বোপরি সহদয়তার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দুই মাস পূর্বে কুমার করণকে সন্ধির প্রস্তাবসহ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিবারের বিজিত ভূমি চিতোর দুর্গ সহ মহারাণা ফিরিয়া পাইলেন; কিন্তু শিশোদিয়া রাজলক্ষ্মী চিরদিনের মত বন্দিরী রহিলেন মোগল কারাগারে। এই বিজয় উৎসবের আনন্দ ও উদ্ভাদনার স্রোতে ভাটা না পড়িতেই ভরা বসন্তে (মার্চ, ১৬১৫) আসিল “নওরোজের” নূতন জোয়ার। “নওরোজ”-দরবারের নয় দিন পরে অমাবস্তার রবিবারে পূর্ণগ্রাস সুখ্যগ্রহণের ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হইল হিন্দুকুল-সুখ্য শিশোদিয়া বংশের ভাগ্যবিপর্যায়। পরের দিন সোমবার রাত্রি ১২ দণ্ড ৪২ পল গতে (২০শে সফর ১০২৪ হিঃ ২০শে মার্চ, ১৬১৫ খ্রীঃ) মমতাজমহল বেগম কন্যা জাহানারার জন্ম সম্বসর, অতীত না হইতেই রাহমুন্না সুখ্যের গায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন,—শাহী গোলাপবাগে প্রথম কোরক প্রসুটিত হইয়া সম্রাটের বসন্তোৎসব দ্বিগুণ সার্থক করিল।

খুরমের প্রথম পুত্রের জন্ম-সংবাদ পাইয়া আলা হজরতের খুশীর পেয়লা বে-সামাল হইয়া পড়িল। বাদশাহ হুকুম দিলেন এইবার তিনি বাবা খুরমের দৌলতখানায় “নবাগত অতিথি”র শুভ-কামনা করিয়া ডবল ঈদ মানাইবেন। অন্নাসাগরের তটভূমিতে শাহজাদার তাঁবু পড়িয়াছিল। সেইস্থানে পরের দিন সম্রাটের অভ্যর্থনার আয়োজন হইল। উৎসব মণ্ডপের তোরণদ্বারে দিল্লীশ্বরের উপর প্রাচীন ভারতের “লাজবর্ষণ” প্রথার অনুকরণে “নিসার”* বা মাদ্রলিক রোপ্যামুদ্রা বর্ষিত হইল। শাহান্ শাহ সভা অলঙ্কৃত করিবার পরেই শাহজাদা খুরম হাজার আশরফী কদম মোবারকে নজর রাখিয়া শিশুর নামকরণের প্রার্থনা জানাইলেন। আলা হজরত নজর মাপণ করিয়া পৌত্রের নাম রাখিলেন সুলতান দারাশুকে।

* প্রকৃতপক্ষে “নিসার” কোন চলিত মুদ্রা নহে; “ঐ” অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারী পাতলা রূপার ছোট ছোট পাত, উপরে টাকশালের ছাপ। মোট বত তোলা রূপা নিসারে ব্যয় হইত উহার দান ধরিয়া হিসাব হইত এত হাজার টাকার নিসার।

† নজর মাপ করার অর্থ বাদশাহ উহা হইতে একটি আশরফী স্পর্শ করিয়া উঠাইয়া রাখিলেন,—গ্রহণ না করিয়া দাতাকে উহা বকশিশ করিলেন ইহাই অভিপ্রায়।

২

দারার জন্মের ত্রয়োদশ মাসে শাহজাদা খুর্রমের প্রথম সন্তান, জাহানারার জ্যেষ্ঠা ভগিনী হুর্ উম্মিসা আজমীর শহরে তিন বৎসর এক মাস বয়সে অকালে অসুস্থ হইয়া মরিলেন। ইহার এক মাস পরে দ্বিতীয় পুত্র শুজাকে কোলে পাইয়াও (১৩শে জুন, ১৬১৬ খ্রিঃ) মমতাজ জীবনের প্রথম শোক ভুলিতে পারেন নাই। সম্রাটের অন্তঃপুরে লালিত-পালিত শিশুপুত্র শুজা জাহাঙ্গীর বাদশাহ-র পিয়াদের নাতি হইয়া উঠিলেন; পিতার স্নেহের অংশ জাহানারা এবং দারা ভাগাভাগি করিয়া লইলেন। তাঁহারা উভয়ের প্রতি পিতৃস্নেহের পক্ষপাতিতায় ঈর্ষান্বিত হইয়াই যেন শুজার চৌদ্দ মাস পরে হাজির হইলেন কুমারী রৌশনারা (জন্ম ব্রহ্মনপুর, ২৪শে আগষ্ট ১৬১৭ খ্রিঃ)। গুণ ও স্বভাবে রৌশনারার জুড়ি এবং প্রিয়তম ভ্রাতা আওরঙ্গজেব ভূমিষ্ঠ হইলেন রৌশনারার পিঠে ঠিক চৌদ্দ মাস পরে (২৪শে অক্টোবর, ১৬১৮ খ্রিঃ)। দারার জীবন-নাট্যের কনিষ্ঠতম প্রতিনায়ক মুরাদ-বক্শ পিতৃদ্রোহী খুর্রমের চঞ্চল বিদ্রোহী রক্ত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আওরঙ্গজেবের ছয় বৎসর পরে বিহারের রোহতাশ দুর্গে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৬২৪ খ্রিঃ);—তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বল্পায়ু আরও দুই ভাই এবং এক ভগ্নী।

শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র সুলতান আওরঙ্গজেব “বাহাদুর” যখন মাতৃগর্ভে পূর্ণতা লাভ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র ভাগ্যবান খুর্রম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগ্য খসরুকে হত্যা করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্ফলক করিবার জন্ত মমতাজের পিতা আসফ খা এবং পিসী-শাওস্তী নূরজাহান বেগমের সহিত নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রে গভীর ভাবে লিপ্ত। অধিকন্তু ঐ সময়ে সম্রাজ্ঞীর অসীম অহুগ্রহের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা এবং পিতার অনাবিল স্নেহ ও একান্ত নির্ভরতার প্রতিদান-স্বরূপ বিদ্রোহের পরিকল্পনাও তাঁহার মনের গোপন কোণে দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। খসরুর প্রতি খুর্রমের আকোশ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর সচেতন ছিলেন এবং কিঞ্চিৎ দৃঢ়তার সহিত এই পর্যন্ত খসরুকে নূরজাহান, আসফ খা এবং খুর্রমের নাগালের বাহিরে রাখিয়াছিলেন; অনীরায সিংহদলন নামক* সুবিশ্বাসী রাজপুত বীরের হেফাজত হইতে নজর-

*রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে অনুপরায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করিয়া “অনীরায সিংহদলন” উপাধি পাইয়াছিলেন।

সংক্ষেপে ঘটনাটি এই :—

টিগার ডাইয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ একটি বাঘকে গুলী করিয়াছিলেন। বাঘ বাদশাহ্ উপর হামলা করিল; আলা হজরত চিং হইয়া পড়িয়া গেলেন, অল্পচরবর্গের মধ্যে দুই তিন জন তাঁহার বৃক্কের

বন্দী খসরুকে সরাইবার জন্ত “নূরজাহান চক্র” অনেক কাণ্ড করিয়াছিলেন। একদিন দুপুর রাতে বাদশাহী মোহরযুক্ত এক জরুরী হুকুমনামা সহ একজন গুর্জবরদার কয়েকজন সিপাহী লইয়া অনীরাযের কাছে হাজির হইল;—বাদশাহের হুকুম তাহাদের সঙ্গে খসরুকে অবিলম্বে শাহী মহলে পাঠাইতে হইবে; গোয়ার রাজপুত সাফ জবাব দিয়া বসিল, স্বর্যাস্তের পর শাহানুশাহের হুকুমনামায় কোন কাজ হয় না। পরের দিন সকালে অনীরায বন্দী খসরুকে দরবারে হাজির করিয়া পূর্ব রাত্রির ঘটনা হুজুরে নিবেদন করিলেন। নূরজাহান বেগমের কড়া শাসনে দিনের বেলা সাধারণতঃ আলা হজরত প্রকৃতিস্থ থাকিতেন; স্তত্রাং আসল ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অনীরাযের কার্যের প্রশংসা করিয়া খসরুকে তাঁহার জিম্মায় থাকিবার হুকুম দিলেন।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে জাহাঙ্গীর তাঁহার বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ-পুত্রের চক্ষুদ্বয়ে একপ্রকার গাছের বিষাক্ত সাদা রস [আকন্দ পাতার ক্ষীর] প্রয়োগ করিয়া অন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। হুকুম তামিল হওয়ার পর অল্পতপ্ত হইয়া পুত্রের দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের জন্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন। কিছুকাল পরে যখন জানিতে পারিলেন খসরু কিছু কিছু দেখিতে পায় তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কুমার খসরু রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়, খান-ই-আজম মীর্জা আজিজের জামাতা এবং ঐ স্তত্রে খান-খানান্ আবদুর রহিমের নাতি-জামাই। রাজা মানসিংহ পরলোকগত হইলেও পরাক্রান্ত কচ্ছবাহ-কুল ভাগিনেয় জ্ঞানে মনে মনে কুমার খসরুর পক্ষাবলম্বী ছিল। অপর পক্ষে কুমার খুর্রম যোধপুরের দৌহিত্র; রাঠোরের লাখ তলওয়ার সর্বদাই কচ্ছবাহ-কুলের প্রতিস্পর্ধী। অধিকন্তু তিনি পরাজিত মহারাণাকে সম্মান-জনক শর্তে দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি ব্যাপারে সহায়তা করিয়া

উপর দিয়াই দৌড়াইল। অনুপরায় দুইহাতে বাঘের মাথায় এক ডাঙা মারিলেন। বাঘ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাঙা সহ হাত দুইখানা কামড়াইয়া ধরিল। ইহার পর বাঘে রাজপুতে কুন্তী—মাটিতে লুটোপুটি। ইতিমধ্যে অস্ত্রাশ্রয় করেকজন বাঘকে তলোয়ারের কয়েক ঘা দিতেই বাঘ অনুপরায়কে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল; রাজপুত গা ঝাড়া দিয়া আবার বাঘের মুখে মারিল দুই তিন ঘুঘি; আবার বাঘে মানুষে কুন্তী। কিছুক্ষণ পরে অনুপরায় তলোয়ার বাহির করিবার ফুরসত পাইয়া প্রস্থানোত্তর বাঘকে এক কোপ মারিলেন। ঐ কোপে ভূর উপরের চামড়া কাটিয়া বাঘের চোখ দুইটির উপর ঝুলিয়া পড়িল। ইত্যবসরে অস্ত্রাশ্রয় বাহাদুররংগ হাজির হইয়া অন্ধপ্রায় ব্যাঘ্রকে নিপাতিত করিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ নিজের খাসা তরবারি উক্ত উপাধির সঙ্গে অনুপরায়কে উপহার দিয়াছিলেন—মোগল ও রাজপুত ধন্ত হইল।

(Memoirs of Jahangir i. p. 185-7.)

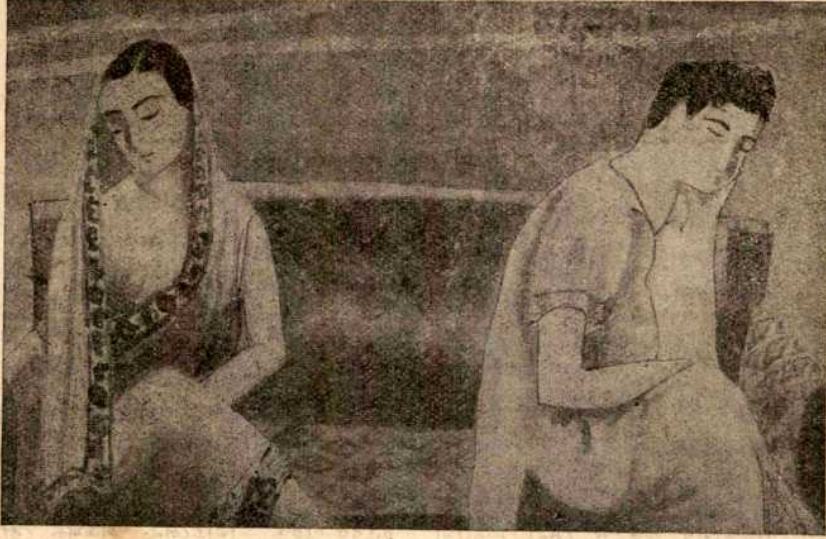
শিশোদিয়াগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; মহারাণা করণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীম শিশোদিয়া শিকারী চিতা-বাঘের মত তাঁহার প্রতি অম্লরক্ত। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পরবেজকে খুরম হিসাবের মধ্যেই গণ্য করিতেন না; তিনি চিররোগী, অকর্মণ্যতার জন্য পিতার অপ্রিয়ভাজন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। পরবেজের দাবি জাহাঙ্গীর পরোক্ষে একরকম বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন—প্রমাণ খুরমের ত্রিশ হাজারী মনসব, “শাহ বুলন্দ ইকবাল” উপাধি, সরকার হিসাবের জায়গীর ইত্যাদি। সুতরাং দিল্লীর মসনদের উপর বদ্ধদৃষ্টি শাহজাদা খুরম, তাঁহার শস্তর আসফ খাঁ এবং হুরজাহান বেগম বন্দী খসরুকে যথাসীদ্ধ পরলোকে প্রেরণ করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মালিক অঘর বিজাপুর ও গোলকণ্ডার অর্থ ও সৈন্য সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে মোগল অধিকার লোপ করিবার উপক্রম করিল। অঘরকে দমন করিবার মত বাহাহুর সিপাহ-সালার খুরম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে শাহজাদা খুরম মালিক অঘরের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আদেশ পাইয়া সম্রাটকে জানাইলেন, আসফ খাঁর হাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুকে সমর্পণ না করিলে তিনি এই অভিযানের ভার গ্রহণ করিবেন না। অন্য কাহারও এইরূপ আপত্তি বিদ্রোহ বলিয়াই গণ্য হইত; কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইহা বাবা: খুরমের * আব্দার। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে (১৬১৬ খ্রি:) অনীরায়েব হেফাজত হইতে “কতিপয় কারণে” খসরুকে আসফ খাঁর হাতে তুলিয়া দিতে তিনি বাধ্য হইলেন। স্বীয় আশ্চর্য্যেতে সত্য কথা লিখিবার সংসাহস পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীরের হয় নাই; প্রথম কথা, বাদশাহর উপরে বাদশাহ, হুরজাহান বেগমের রোষকষায়িত কটাক্ষের ভয়; দ্বিতীয় কথা, তুজুক পড়িলেই মনে হয় ঐ পুস্তক (শেষ অংশ বাদ) হুরজাহান এবং বাবা: খুরমের

প্রতি বাদশাহর ভালবাসা ও অনুগ্রহের ফিরিস্তি। সত্য ঘটনার গুপ্ত দিনচর্যা হইলে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীর ঐতিহাসিক মূল্য তুজুক-ই-বাবরী অপেক্ষা এত কম হইত না। যাহা হউক, দুর্বলচিত্ত, অসহায় সম্রাট জানিয়া শুনিয়া অন্ধ-মৃত অক্ষপুত্রকে মৃত্যুরূপী আসফ খাঁর কবলে প্রেরণ করিবার পূর্বে পিতৃশ্রমেহের নিদর্শন-স্বরূপ একখানা থামা শাল খসরুকে উপহার দিয়াছিলেন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যের অন্ধকারে বুরহানপুর শহরে খসরুর অস্থঃপুরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের লোভে উন্মত্ত খুরম স্বহস্তে গলা টিপিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিলেন। কেহ যেন কোন প্রকার সন্দেহ করিতে না পারে সেই জন্য পরের দিন যথারীতি শহরের মধ্য দিয়া চলিল শবাহুগমনের বিরাট মিছিল। খুরম পিতার কাছে দুঃখের সহিত ডানাইলেন, পিতৃশূল রোগে (ফা: কুলঞ্জ) ভুগিয়া ভাই সাহেব স্বর্গবাসী হইয়াছেন। জাহাঙ্গীর প্রকৃতই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা খোদাতালা জানেন; তবে “তুজুকে” তিনি উক্তরূপ সংবাদ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢোল কিছু দেরিতে হইলেও বাতাসে একদিন বাজিয়া উঠে। আলমগীরশাহী আমলে বুদ্ধ ঐতিহাসিক মহম্মদ সালেহ কাশেখা তাঁহার আমল-ই-সালেহ গ্রন্থে শাহজাহানের দুর্ভাগ্যসমূহ সন্নিহিত লিখিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদগণ নাকি স্বীকার করেন, পিতামাতার কাণ্ড, চিন্তাধারা এবং মনোভাব গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধি ও স্বভাবকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় ১৬১৬ খ্রি: হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহজাদা খুরমের যে সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহারা মাতৃগর্ভেই কুটনীতি, শাঠ্য, নৃশংসতা ও পিতৃদ্রোহের পাঠ আয়ত্ত করিয়াছিল;—পরবর্তী ইতিহাস ইহার সাক্ষী। দারার দুর্ভাগ্যকে নিয়তির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া ঐতিহাসিক সন্দেহ করিতে পারেন “মরে পুত্র জনকের পাপে”—শুজা-আওরঙ্গজেব মুরাদ গুধু নিমিত্ত মাত্র। শাহজাহান মম-তাজের গর্ভে বিদ্রোহীর বীজক্ষেপণ করিয়া পিতৃভক্ত, রাজভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল পুত্র কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারেন?—“যবা: প্রকীর্ত্তা: ন ভবন্তি শালয়:”: ক্ষেতে যব ছিটাইয়া আমন ধানের ফসল কেহ পায় নাই।

* আকবর বাদশাহ শাহজাদা সেলিমকে আদর করিয়া ডাকিতেন, ‘শেখু-বাবা’। বিদ্রোহের পূর্ব পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর তৃতীয় পুত্রকে বরাবর ‘বাবা’ খুরম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ত কোন পুত্রকে তিনি ‘বাবা’ বলেন নাই। আজকাল দিল্লী অঞ্চলে বাপ ও ছেলেকে ‘ভাইয়া’ এবং পিতামহকেই বাবা বলিতে শুনা যায়।





সমাধান

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী—মোহিত ও শোভা, যুবক-যুবতী—সদ্বন্ধ
স্বামিজী।

স্থান—মোহিতের লাইব্রেরি।

কাল—রাত দশটার পরে।

পাঠরত মোহিতকে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরে বই ফেলে
দিয়ে উঠে সে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, একটু বাদে আবার
এসে চেয়ারে বসে, বই খুলে পড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু বেশীক্ষণ
পড়া হয় না, বই বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে বসে—এমন সময়
প্রবেশ করে শোভা, ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে একটা চক্র
দিয়ে—

শোভা—রাত এগারটা বাজতে চলল।

মোহিত—ও—তাই ত, রাত অনেক হ'ল।

শোভা—চমৎকার হাওয়া বইছে।

মোহিত—হুঁ, জানালার পর্দাটা সরিয়ে দাও।

শোভা—(জানালার ধারে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিয়ে)
চামেলির গন্ধও আসছে খুব, তুমি যে লাগিয়েছিলে সেই গাছটার
ফুল ফুটেছে।

মোহিত—বেশ বড় হয়েছে তা হলে, আমি ত ভুলেই
গিয়েছিলাম।

শোভা—(বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) জোৎস্নাও
উঠেছে বেশ।

মোহিত—(চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে) তাই নাকি—
আজকে কি পূর্ণিমা?

শোভা—(একটু হেসে) আজকে নয়—কালকেও নয়,
পূর্ণিমার দেরি আছে।

মোহিত—তাই হবে, ঠিক খেয়াল নেই।

শোভা—তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।

মোহিত—না, শরীর ত ভালই আছে, তবে ঘুমটা যেন
ঠিক হচ্ছে না।

শোভা—ওটাও একটা রোগ।

মোহিত—তেমন গুরুতর কিছু নয়।

শোভা—আমার মনে হয় তোমার একটা চেষ্টা দরকার।

মোহিত—চেষ্টা! ক'খাটা শুনতে বেশ।

শোভা—কাজেও বেশ। আমি বলছি নে যে তুমি সিমলা
বা রামেশ্বর যাও। এ ঘর থেকে ও ঘরে গেলেও চেষ্টা হতে
পারে।

মোহিত—কিন্তু তার উপকারিতা কতখানি।

শোভা—খুব। এই ধর যদি তুমি পুরোনো শোবার ঘরে
না শুয়ে তেতলার ঘরে বা এক তলার একটা ঘরে শোবার
ব্যবস্থা কর তা হলে আবার সুনিদ্রা হবে।

মোহিত—ঘুম হবে বলছ।

শোভা—আমি ভেবে দেখেছি হবে।

মোহিত—আমার নিদ্রার কথা ভেবে তোমার নিদ্রার
ব্যাঘাত কর না কিন্তু।

শোভা—ভাবুক বলে খ্যাতি আমার কোন কালেই নেই,
আমার ঘুম ঠিকই হচ্ছে।

মোহিত—তা হলে যাও, শুয়ে পড়গে।

শোভা—নিশ্চয় যাব। তুমি কি মনে করেছ জ্যোৎস্না
নেবে রাত-দুপুরে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে এসেছি?

মোহিত—ছিঃ, এমন কথা আমি ভাবতে পারি? তোমার
সব্বন্ধে ধারণা আমার অত ছোট নয়।

শোভা—আমার সব্বন্ধে তোমার ধারণা তা হলে যথেষ্ট
বদলেছে?

মোহিত—হ্যাঁ বদলেছে, কারণ তুমি যথেষ্ট বদলেছ।

শোভা—বদলেছি বইকি, বিয়ের পরে বয়েস বেড়েছে তিন
বছর।

মোহিত—শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও।

শোভা—সেটা স্বাভাবিক, বয়েসের ছাপ মনের উপর
পড়বেই।

মোহিত—সেই ধারণাই এতকাল আমার ছিল, কিন্তু
তোমার দেখছি উটোটা—শরীরের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু
মনের বয়েস কমে আসছে।

শোভা—এ তোমার কল্পনা।

মোহিত—কল্পনা। সকাল নেই, বিকেল নেই, সময় নেই,
অসময় নেই এই যে ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী শুনতে পাই,
এটাও কি কল্পনা? এতে গায়িকার মনের খুসীই প্রমাণ হয়
না কি?

শোভা—গান আমি গাই, তবে সময় অসময় বুঝে গাই।
তা ছাড়া গান গাইলে কেউ খুসী হয় না।

মোহিত—আমার ধারণা তাই।

শোভা—তোমার ওরকম ধারণা হবার মানে তুমি গান
বোঝ না।

মোহিত—না, সত্যি বুঝি না, বলতে আমার কিছুমাত্র
লজ্জা হচ্ছে না যে আমি একজন সঙ্গীত-বিশারদ নই।

শোভা—গান আমার ভাল লাগে, গান আমি বরাবর
গাই; তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগেও গাইতাম, বিয়ে হবার
পরেও গেয়েছি, এখনও গাই।

মোহিত—সেটা আমাকে জ্ঞপ্ত করবার জন্তে।

শোভা—তোমাকে জ্ঞপ্ত! এমন কথা তুমি কেমন করে
বললে?

মোহিত—কেমন করে বললাম? আমি বাড়ী ফিরলেই
যেমন করে তুমি গান গাইতে বসো!

শোভা—আগে তুমি আমার কাছে যতটা আসতে আক-
কাল ততটা আস না—সেই কাক আমার পূরণ করি গান গেয়ে।

মোহিত—কিন্তু সেগুলো ঠিক বিরহ-সঙ্গীত নয়।

শোভা—আমি ভেবে পাই না গানে এত অরুচি তোমার
কবে থেকে হ'ল। এমন এক নয় গেছে যখন গান শোন-
বার উৎসাহ তোমার খুবই ছিল। তখন সময়-অসময়ের বিচারও
যে খুব করত তা মনে হয় না।

মোহিত—গান যদি এক সময়ে ভাল লাগত এবং যদি
এখন আর ভাল না লাগে তা হলে সেটা উন্নতির লক্ষণ।

শোভা—তোমার উন্নতি যে হয়েছে তা অস্বীকার করছি নে,
যথেষ্ট উন্নত হতে না পারলে অতি-আধুনিক সাহিত্যের রসিক
হওয়া যায় না।

মোহিত—অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য তুমি বোঝ না,
পড়ও নি।

শোভা—সত্যিই, আমি পড়িও না অতএব বুঝিও না, তুমি
পড়ও যে বোঝ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

মোহিত—ধাক, সাহিত্য-আলোচনার সময় এটা নয়, আমি
স্বীকার করে নিচ্ছি ও বিষয়ে আমাদের মতের অতিশয় গর-
মিল। শুধু সাহিত্য বিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই আমাদের
মত এক নয়।

শোভা—মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না, একেমন কথা।

মোহিত—আর সেই প্রভেদকে সব সময় মনে করিয়ে
দেবার জন্তে লালঝাঙা উড়িয়ে বেড়াও।

শোভা—(হেসে গোলাপী রঙের শাড়ীর আঁচল নাড়তে
নাড়তে) এটা লাল নয় গোলাপী, এতেও আপত্তি। গোলাপী রং
আমার পছন্দ, তা ছাড়া রংটা তো অসুন্দর নয়, আমার মতে
খুবই সুরুচিসঙ্গত।

মোহিত—আমি জানতাম তুমি বলবে আমার সুরুচিও নাই,
সৌন্দর্য্যবোধও নাই। ও সব তোমার একচেটে।

শোভা—সৌন্দর্য্যবোধ তোমার নেই তা বলতে চাই নে
কিন্তু আমার চেয়ে যে কম এ কথা সত্যি।

মোহিত—তাই বুঝি অধুনা খুব সৌন্দর্য্য-চর্চা চলছে? ওর
যে একটা ধরনের দিক আছে বোধ হয় সেটা ভুলে গেছ।

শোভা—কাপড়-জামার অনাবগুক ধরচা আমি করি নে।
তবে একটা ঠিক যে সৌন্দর্য্য-চর্চা বিষয়ে আমি উদাসীন নই,
এক সময়ে তুমিও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছ।

মোহিত—কিন্তু কোন সময়েই আমি লাল রংকে সুন্দর
বলি নি।

শোভা—এ লোহিতাতঙ্ক তোমার কবে থেকে? এ শাড়ী-
খানা যে তুমিই এক সময়ে কিনে দিয়েছিলে।

মোহিত—তা হলে প্রমাণ হচ্ছে যে এক সময়ে আমার কিছু
পছন্দ ছিল, কিন্তু বলতে পার এখন আমার পছন্দ এত অপছন্দ
হয় কেন?

শোভা—অনেককাল তোমার পছন্দের কোন পরিচয়ই
পাই নি, আমার সঙ্গে দোকানে তো যেতেই চাও না, নিজেও
কিছু কিনে আন না।

মোহিত—যথেষ্ট অবসর যখন ছিল তখন তা কাটাবারও
অনেক কন্দি করেছি। এখন এমন অবসর নেই যে একটা
কাল্পনিক গোলাপী রঙের শাড়িই গল্প কাপড় কিনতে সারা
কলকাতা ঘুরে বেড়াই।

শোভা—হ্যাঁ, সত্যিই তোমার অবসর নেই। যার এত বড় একটা কারখানা সামলাতে হয় তার অবসর কোথায়? হল-ঘরে কাঠের গদা ক্রমশঃ উঁচু হচ্ছে, বারান্দায় করাত কাত হয়ে আছে, এখানে হাতুড়ি ওখানে বাটালি—আমাদের মত একেকজো লোকের চলাফেরাই দায়। আর সৃষ্টি যা হচ্ছে তা—(হেসে) থাক সে কথা।

মোহিত—সৃষ্টি যা হচ্ছে তা আর যাই হোক সঙ্গীতের মত শুল্লময় নয়, তা দেখাও যায় ছোঁয়াও যায়।

শোভা—হ্যাঁ, তা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে এবং ভারীও খুব। শব্দ লোকের অনেক রকম থাকে কিন্তু এমন কঠিন শব্দ—

মোহিত—সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, এই তো! অসাধারণ বলেই এতে আমার আনন্দ।

শোভা—সাধারণ জিনিষে আর তোমার আনন্দ নেই, এই যেমন আমি ইত্যাদি।

মোহিত—আর অসাধারণ জিনিষে তোমারও আনন্দ নেই যেমন আমি ইত্যাদি। দেখ, আর লুকোচুরি চলে না, এর একটা সমাধান দরকার হয়ে পড়েছে।

শোভা—এবং সেটা যত শিগগির হয় ততই বোধ হয় ভাল। (ঘরের আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জানালার ধারে ফিরে এসে) আমারও সেই কথা, যা টিকবে না তাকে জোড়াতালি দেবার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

মোহিত—আমরা এত তফাতে সরে গেছি যে আর ফিরে আসা সম্ভবই নয়।

শোভা—(বেশ কঠিনভাবে) ফিরে আসবার ইচ্ছেও নেই। যদি চাও আরো দূরে সরে যাব, আমি তার জন্তে প্রস্তুত হয়ে আছি।

মোহিত—সরে যাবার কথা হচ্ছে না, সরে না গিয়েও ব্যবস্থা হতে পারে।

শোভা—না, সরে যাওয়া ছাড়া অল্প ব্যবস্থা হতে পারে না। আমি যখন কোন ভাবেই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি নে তখন কেন আর মিথ্যা অভিনয়? মনে করো না এ কথা আমি অভিমান করে বলছি, খুব ভেবেচিন্তেই বলছি।

মোহিত—অভিমান করার বিষয়ও এটা নয়। এতদিনে প্রমাণ হয়েছে যে তোমার আমার পথ ভিন্নমুখী।

শোভা—তা হলে ভিন্নমুখেই চলা যাক। আত্মসম্মান বজায় রেখে এ বাড়ীতে বাস করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মোহিত—সম্মান-অসম্মানের কথা কেন তুলছ? কথা হচ্ছে মিল-অমিলের।

শোভা—অত চুলচেরা বিচার আমি করতে জানি নে, সহজভাবে আমি এই বুলি যে যেখানে মিল নেই, সেখানে মিলনও নেই; অতএব তুমি তোমার অসাধারণত্ব নিয়ে এখানে থাক, আমি আমার সাধারণত্ব নিয়ে বিদেয় হই।

মোহিত—তোমার মীমাংসা এক দিক দিয়ে যেমন সহজ অল্প দিক দিয়ে তেমন সহজ নয়, এখান থেকে চলে যাওয়াটা লোকের চোখে ভাল দেখাবে না।

শোভা—মিয়ামিতে এর চেয়েও সামান্য বিষয়ে ডাইভোস' হতে পারে।

মোহিত—প্রথম কথা আমরা মিয়ামিতে নাই, দ্বিতীয় কথা আমরা হিন্দু।

শোভা—গরমিলটা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান, পার্শ্ব-খ্রীষ্টান নিরীক্শে।



মোহিত—তবুও একটা স্ট্রটকেশ হাতে করে তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে সেটা ঠিক শোভন হবে না।

শোভা—ওঃ, বেরিয়ে যাওয়াটা শোভন করতে হবে?

তথ্য। এই ধর যদি আমি চেঞ্জের অজুহাতে শিলঙে আমার মাসীর বাড়ী চলে যাই, সেখানে কিছুদিন থেকে শেষে যাই সাধারণপুরে আমার কাছে তা হলে আশা করি শোভন হবে।

মোহিত—প্রভাবটা সত্যিই ভাল, অবশ্য মাসে মাসে আমি—

শোভা—(ধামিয়ে দিয়ে) তারও দরকার হবে না, বাবা। মা লেবাপড়া শিখিয়েছিলেন তাতে একটা মাষ্টারী জুটে যাবে।

মোহিত—কিন্তু, দেখ—

শোভা—আবার কিন্তু কেন? তোমার জীবনে যাতে আর 'কিন্তু' না আসে তারই ব্যবস্থা তো করছি। যা করব তা পাকা করেই করব।

মোহিত—অবিশ্বাস তোমার মতামতের উপর আমার বলবার কোন অধিকার নেই।

শোভা—নিশ্চয় নেই, আমি এখন স্বাধীন, আমি যখন খুশি গান গাইতে পারি, যেমন খুশি বই পড়তে পারি, যতখুশি গোলাপী রঙের শাড়ী কিনতে পারি।

মোহিত—তা পার।

শোভা—আর তুমিও যা খুশি করতে পার, অর্গ্যানটা বেচে দিয়ে ডজন করে রঁাদা কিনতে পার, আর শোবার ঘরে কারখানা হুলতে পার আর সন্ধ্যাবেলা আমি যখন পূর্বী গাইতাম তখন তুমি আনন্দে করাত চালাতে পার।

মোহিত—অর্গ্যানটা অবশ্য অনাবশ্যক।

শোভা—তা হলে অত্যাশঙ্কক হাতুড়ি দিয়ে অনাবশ্যক অর্গ্যানটা ভেঙে কেল।

মোহিত—আমি বলি ওটা তুমি নিয়ে যাও।

শোভা—বস্তুবাদ, আমি এ বাড়ীর কিছুই নিতে পারি না—নেব না।

মোহিত—আমি জোর করতে পারি না কারণ—

শোভা—কারণ আবিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমাদের সভ্যতা হোক, আমার অনেক কাজ আছে, কিছু জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।

মোহিত—এত রাতিরে? কাল গোছালেও চলবে।

শোভা—সময় যথেষ্ট নেই, কেননা ভোর সাড়ে সাতটার গাড়ীতে রওনা হব ঠিক করেছি। তুমি হয়ত অত ভোরের উঠতে পারবে না, আমার যা বলবার আছে এখনই বলে যাই। টাকাকড়ি আমার কাছে যা ছিল তা প্রায় সবই দেড়াজে আছে, তোমার দেওয়া গহনা-পত্রের সব রেখে যাব। আর কিছু বলবার নেই, (বীরে বীরে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে) একটা কথা, ছোট স্টুকেসটা নিয়ে যাব সেটাও বলে রাখি, (আবার দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এসে) তুলে যাচ্ছিলাম, আর একটা কথা, তেমন কাজেরও নয়—বলে যাই, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক সে আমার কাছে থাকবে।

মোহিত—(চমকে উঠে) কি বললে?

শোভা—বললাম ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক সে আমার কাছে থাকবে।

মোহিত—কার ছেলেমেয়ে?

শোভা—আমার।

মোহিত—(হেসে) তামাশা করবার সময়টা ঠিক হ'ল না।

শোভা—তামাশা করছি নে।

মোহিত—(উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি সত্যি বলছ?

শোভা—মিছে কথা বলা আমার অভ্যাস নেই।

মোহিত—একথা এত দিন তুমি কেন বলনি?

শোভা—শোনবার অবসর ছিল তোমার? যাক্ দেখা, আমার যা কিছু বলবার ছিল সব বলা হয়ে গেছে, এবার আমি চলি।

(দরজার দিকে এগিয়ে যেতে মোহিত শোভাকে বাধা দিয়ে)

মোহিত—তুমি কি যাবেই?

শোভা—এ কেমন প্রশ্ন? এতক্ষণ ধরে এত বিচার-বিশ্লেষণ করে কি ঠিক হ'ল?

মোহিত—কিছুই ঠিক হ'ল না—সব গোলমাল হয়ে গেল।

শোভা—বেশ, তুমি নির্জনে বসে চিন্তা কর, আমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই।

মোহিত—(শোভার সামনে এসে) তোমার যাওয়া চলবে না।

শোভা—(কঠিন ভাবে) তুমি কি এখনও মনে কর আমার যাওয়া-না-যাওয়া তোমার খুশির উপর নির্ভর করে? আমাকে যেতেই হবে।

মোহিত—আমি যেতে দেব না।

শোভা—একটু আগে তুমিই না বলছিলে তোমার আমার পথ ভিন্নযুগ্মী।

মোহিত—একটু আগে কি বলেছিলাম তা আর আমার মনে নেই।

শোভা—আমার মনে আছে। আমাকে আর বাধা দিও না, যেতে দাও।

[চলে যাবার চেষ্টা]

মোহিত—তোমাকে যেতে দেব না।

শোভা—আমি যাবই।

মোহিত—আমি এমন টেচাব যে আশপাশের বাড়ী থেকে লোক ছুটে আসবে।

শোভা—সেটা বৃষ্টি অশোভন হবে না? থাক, তুমি আর টেচিও না, আমি জানি প্রতিবেশী পুরুষেরা তোমাকেই সমর্থন করবে। (ফিরে জানালার ধারে এসে) কিন্তু কেন তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, আত্মসম্মান বজায় রেখে আমি আর তোমার বাড়ীতে থাকতে পারি নে।

মোহিত—(এক পা এগিয়ে এসে) আমি তোমার সম্মান তো ক্ষুণ্ণ করি নি।

শোভা—যে বাড়ীতে আমার স্বাধীনতা নেই সে বাড়ীতে আমার সম্মানও নেই। যেখানে আমি যখন খুশি গান গাইতে পারব না সেখানে আমি থাকতেও পারব না।

মোহিত—আমি কিন্তু কোনদিনই গান গাইতে তোমাকে বাধা দিই নি।

শোভা—খুল ভাবে লাঠি নিয়ে তাড়া করেনি সত্য, কিন্তু মর্মান্তিক বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে কজুর কর নি।

মোহিত—(আর এক পা এগিয়ে এসে) ওটা তোমার কল্পনা। দৃষ্টভঙ্গীটা একটু বদলে নিলে দেখতে পেতে বাণে বিষণ্ড ছিল না ধারণা ছিল না।

শোভা—তা ছাড়া প্রাণ গেলেও আমি এই লাল কাণ্ড (আঁচল নেড়ে) ছাড়তে পারব না।

মোহিত—ওটা লাল নয়, গোলাপী।

শোভা—দৃষ্টভঙ্গী অনেকখানি বদলে গেছে দেখছি।

মোহিত—(আর এক পা এগিয়ে এসে) চমৎকার চাপার গন্ধ আসছে।

শোভা—চাপা নয়, চামেলি।

মোহিত—জ্যোৎস্নাও উঠেছে বেশ।

শোভা—জ্যোৎস্না কোথায়? চাঁদ যে অনেকক্ষণ ডুবে গেছে, দৃষ্টভঙ্গীর কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

মোহিত—(শোভার খুব কাছে এসে) শোভা!

শোভা—নামটা তা হলে মনে আছে।

মোহিত—(শোভার হাত ধরে) শোভা, তুমি আশ্চর্য্য!

শোভা—ওকি, প্রেমালাপ নয় তো?

মোহিত—(শোভাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে) আমি বঙ্গছি কি যে, তোমার অর্গ্যানটা অত্যন্ত পুরোনো হয়ে গেছে, একটা নতুন আর বড় অর্গ্যান কিনলে হয় না?

শোভা—আর নতুন অর্গ্যান কিনে দরকার নেই, পুরোনো জিনিষেই আমার বেশী প্রীতি।

(পটক্ষেপ)

প্রহেলিকা

শ্রীশুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

এই কি বুঝিতে হবে যা দিয়েছ দে কিছুই নয়?
তোমার দোহাগ যত মত্ত এক মুহূর্তের খেলা?
রত্নসম স্মৃতি যাহা সযতনে করেছে সঞ্চয়
নীরব গুঁদাঙ্গ দিয়ে ঘোষিছ তা মৃত্তিকার ঢেলা!

ক্ষুরিত অধরে তব, বিক্ষারিত হরিণ-নয়নে
সখন স্পন্দিত বক্ষে, কণ্ঠলগ্ন বাহুল্যিকায়,
এলায়িত কেশদামে, গদগদ মধুর বচনে
দেখেছি সুধার শ্রোত ছলকি ছলকি বহি যায়।

মোহিত—রাত্রে গোলাপী রঙের শাড়ী পড়লে তোমাকে চমৎকার দেখায়, ভাল একবার ছুঁলে দোকানে গিয়ে কয়েকখানা গোলাপী শাড়ী কিনে আনব—কি বলো?

শোভা—ও আমার ডজন খানেক আছে, তার জন্মে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

মোহিত—আমি ভাবছিলাম কি অতি-আধুনিক সাহিত্যের বোঝাটা পুড়িয়ে ফেলি—আপদ যাক।

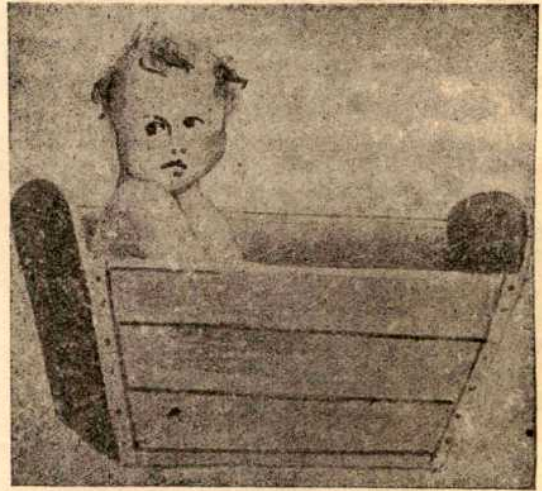
শোভা—(হেসে) নাইবা পোড়ালে। কয়েকখানা বই বেশ ভালই আছে, আমি চুপি চুপি পড়েছি।

মোহিত—আর, আর একটা কথা। ঐ অনাবশ্যক হাতুড়ি বাটালিগুলো পুরোনো লোহার দরে কালকেই বেচে দেব।

শোভা—(মোহিতের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ এসে) বেচবে কেন? হাতুড়ি বাটালির আবশ্যকতা আমি আবিষ্কার করেছি, আমাকে একটা জিনিষ তৈরি করে দিতে হবে।

মোহিত—হুকুম কর।

শোভা—একটা দোলনা।



তুমি কি বলিতে চাও সে আমার অলীক স্বপন?
ছিল না আশ্রয় দীপ্তি, মোহ অন্ধ তব দিলাসে?
কোন মন্ত্রে দ্বিধাভিন্ন করেছিলে দেহ আর মন?
এই বন্ধনাই সত্য হয়ত ভাগ্যের পরিহাসে!

মুগ্ধ দেহের পায়ে যে সুরা ঢেলেছ স্তম্ভময়
চিন্ময় আধারে তাই সুধা হয়ে আজো আছে জমা।

জেট ও রকেট

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বিবিধ রূপ আছে। কোন কোন আবিষ্কার হয়ত সম্পূর্ণ আকস্মিক; অচিন্তিত এক প্রাকৃতিক সত্য কোনও সূত্র ধরিয়া সহস্রা বিজ্ঞানীর কাছে ধরা দেয় এবং তারই ফলে অভাবনীয় সম্ভাবনা বিশ্বমানবের সম্মুখে বিরীতি বিখ্যরূপে



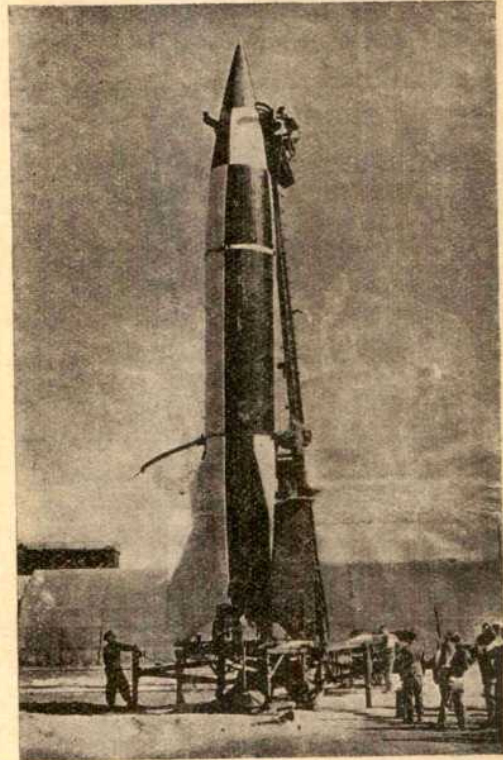
V-2 রকেট বোমা ও তাহার আবিষ্কার

আগ্রপ্রকাশ করে। রবার্ট হেনরী, পেনিসিলিন প্রভৃতির আবিষ্কার এই পর্ধ্যায়ে পড়ে। আবার এক জাতীয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আছে যেগুলির মূল তথ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হয়ত মানুষের সম্মুখে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের ব্যবহারিক সার্থকতা বা তদ্ব্যপেক্ষ লুক্কায়িত বিরাট সম্ভাবনা বহুদিন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। এমনই খুব সাধারণ ও সর্বজনবিদিত অথবা বহুকালাবধি বিজ্ঞানীদের নিকট পরিচিত নৈদর্শিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনেক বড় আবিষ্কার হইয়াছে। বেতারবার্তা, প্লীম এঞ্জিন প্রভৃতির আবিষ্কার এমনই ধরনের। এই জাতীয় আবিষ্কারের অন্ততম দৃষ্টান্ত জেট-চালিত এরোপ্লেন।

বহুকাল ধরিয়া মানুষ হাউই বাজির স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছে। অগ্নিসংযোগে যে হাউই উর্দ্ধে ছুটিয়া চলে সে ত বালকের হাতের ক্রীড়নক বই অল্প কিছু নহে। বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারের সূত্রপাত এমনি খেলাঘরেই। সামান্য খেলনা জাইরোকোপ অথবা যন্ত্রদানবের মস্তিষ্কের কার্য্য করিতেছে। যে কারণে হাউই উর্দ্ধে ছোটে বহুকাল পূর্বেই বিজ্ঞানের কাছে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই সত্যকে কাজে লাগাইবার সকল প্রচেষ্টাই এতাব্যবসায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে। হাউইয়ের অন্তর্নিহিত শক্তিভাণ্ডারকে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিবাব বা মহলগ্রহে অভিযান করিবার পরিকল্পনা নূতন নহে, কিন্তু এখনও তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে হাউই বাজি আকাশে অস্থির হইয়া ছুটিয়া চলে কেন? হাউইয়ের খোলার ভিতরে

বিস্ফোরক বারুদ ভরা থাকে, নীচের দিকে আছে একটা ছিদ্র। আগুনের স্পর্শে বারুদের বিস্ফোরণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে সামান্য পরিমাণ বারুদ হইতে প্রভূত গ্যাস উৎপন্ন হয় যাহার জ্বল বিরাট বিস্তৃতি স্বরকার, হাউইয়ের ছোট খোলার ভিতর তাহার স্থান সংকুলান হয় না। এই গ্যাসরাশি প্রভূত চাপযুক্ত হইয়া খোলার গায়ে ভিতরের দিক হইতে চাপ দেয় ও বাহিরে আসিবার পথ বোঁজে। বলিতে পারি আভ্যন্তরীণ গ্যাসের কণিকাগুলি চাপ ও তাপের প্রভাবে প্রচণ্ডবেগ প্রাপ্ত হইয়া খোলার দেওয়ালে আঘাত করিতে থাকে, অথবা কলন করিতে পারি যে ভিতরে অবস্থান করিয়া কোন অশরীরী হস্ত যেন চতুর্দিকের দেওয়ালে প্রচণ্ডবেগে অগণিত ঢিল ছুড়িতেছে। ঢিলের আঘাতে কোন বস্তু বেগপ্রাপ্ত হইবার কথা কিন্তু এই প্রকার আভ্যন্তরীণ গ্যাসের ঢিলে চতুর্দিকে বদ্ধ খোলটি সাধারণতঃ বেগপ্রাপ্ত হয় না কারণ খোলার সবদিকের দেওয়ালেই সমান সংখ্যক ঢিল পড়ে। কিন্তু যদি



V-2 রকেট বোমা (বিস্ফোরণের জ্বল প্রস্তুতি)

খোলার এক দিকে একটা ছিদ্র থাকে তবে সেই পথ কতকগুলি গ্যাসের কণিকা বাহিরে আসিতে সমর্থ হয় এবং এ

দিককার দেওয়ালের আঘাতটা বার্থ হয়। সেইজন্ম ছিদের বিপরীত দিকে খোলের অপরাংশে যে সকল কণিকা আঘাত করে তাহাদের ধাক্কাই হাউই সম্মুখে ছুটিয়া চলে। যে পর্যন্ত ভিতরের গ্যাস ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতে থাকে ততক্ষণ



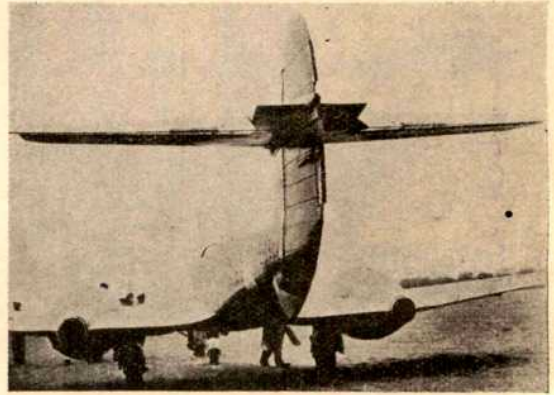
রকেটে ডাক চলাচল

উহা চলিতেই থাকে। বন্দুকের ভিতর হইতে গুলী বাহির হইয়া গেলে বন্দুক যে পিছনে ধাক্কা খায় তাহাও অল্পরূপ কারণেই। বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত গ্যাসের আয়তন খুব বেশী হয় বলিয়াই এই প্রকার গতির উৎপত্তি সম্ভব।

পেট্রোল বা ষ্টীম চালিত সাধারণ এঞ্জিনের সঙ্গে হাউইয়ের শক্তি জোগাইবার প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য খুব বেশী নাই। ষ্টীম এঞ্জিনে বয়লারে জলকে বাষ্প করিয়া আনিয়া সিলিঙারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। জল বাষ্প হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় যাহার ফলে বাষ্পের চাপে সিলিঙারের পিস্টন বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার পেট্রোল এঞ্জিনে সিলিঙারের ভিতরেই পেট্রোল পুড়িয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাসের চাপ পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয়। সঙ্কচিত অবস্থায় থাকিলে গ্যাস স্বতই আয়তনে বদ্ধিত হইতে চায়। হাউই কিম্বা ষ্টীম বা পেট্রোল এঞ্জিনে গ্যাসের এই সম্প্রসারণশীলতাকেই কাজে লাগানো হয়। কিন্তু হাউইয়ের অগ্রসর হইবার প্রশালী ও ষ্টীম-পেট্রোল চালিত যানবাহনের অগ্রগতির পন্থা ও রীতি এক নহে।

একটি নৌকাকে জলের উপর চালাইতে হইলে আমরা জুই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারি। পাড়ে দাঁড়াইয়া নৌকাকে পিছনের দিক হইতে ঠেলিয়া দিলে নৌকা অগ্রসর

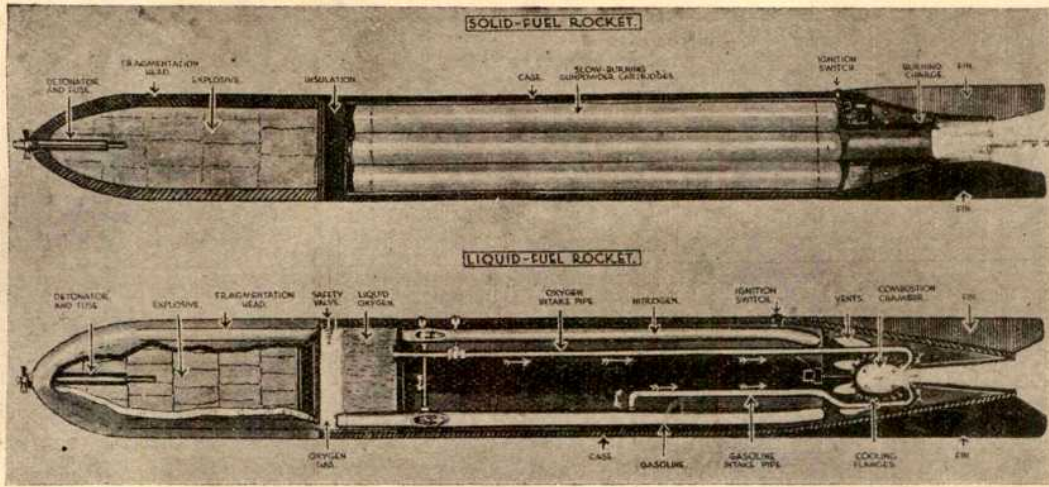
হইয়া থাকে আবার নৌকায় বসিয়া দাঁড় টানিলেও নৌকা চলে—এখানে দাঁড়ের আঘাতে জল কাটিয়া নৌকা আগাইয়া যায়। ঠেলিয়া নৌকা চালাইতে হইলে এককালে বেশী শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইবার সময় অপেক্ষাকৃত কম শক্তি হইলেও চলে অবশ্য শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় বারংবার। বরফের উপর দিয়া ‘স্কেটিং’ করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় আবার ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ করিয়াও আগাইয়া যাওয়া যায়। এই জুই প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য আছে। দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালানো বা পা বাড়াইয়া পথ চলা উভয় ক্ষেত্রেই গতির জন্ম মাধ্যমের সাহায্য দরকার—প্রথম ক্ষেত্রে জল, দ্বিতীয় বারে মাটি প্রত্যক্ষভাবে গতি-উৎপত্তির জন্ম দায়ী। কিন্তু ‘স্কেটিং’ করিয়া যাওয়া বা ঠেলা দিয়া নৌকা চালনা ইহাদের ব্যাপারে গতিপ্রাপ্ত পদার্থই মাধ্যমের ভিতর দিয়া চলে, মাধ্যম সেই গতিতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা ভিন্ন সাহায্য করে না। আমাদের পরিচিত পেট্রোল এঞ্জিনে যখন এরোপ্লেন চলে তখন ‘প্রপেলার’ করে দাঁড়ের কাজ, এ যেন পা পা করিয়া পথ চলা; কিন্তু বিস্ফোরকের জোরে যখন হাউই ছোট্ট সে চলে পিছনের ঠেলায়। প্রপেলার সম্বলিত এরোপ্লেনের জন্ম বায়ু-সমুদ্র দরকার। যেখানে বায়ু নাই এরোপ্লেন সেখানে পড়—কিন্তু হাউইয়ের গতি বায়ুশূন্য প্রদেশে আরও বেশী। পেট্রোল এঞ্জিনে গ্যাস অবস্থায় পেট্রোলের যে আয়তন বৃদ্ধি হয় হাউইয়ে সে অল্পপাতে আয়তন বৃদ্ধি



জেট-চালিত এরোপ্লেন। (লেজের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।)

জেট-যন্ত্র উভয় পার্শ্বে

অনেকেটা বেশী, তাই বেগ উৎপত্তির জন্ম এবং বাতাসকে ঠেলিবার জন্ম পিস্টন ও প্রপেলারের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় না। হাউই বা রকেটের ক্রিয়াকে মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করিবার জন্ম যন্ত্রবিদেরা একদা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রকেটের জোরে গাড়ী চালাইবার কাজে অনেক প্রকার কার্য-করী বাধা আসিয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়া এতদ্বিষয়ক চেষ্টা তদানীন্তন কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।



রকেট সেলের নির্মাণকৌশল

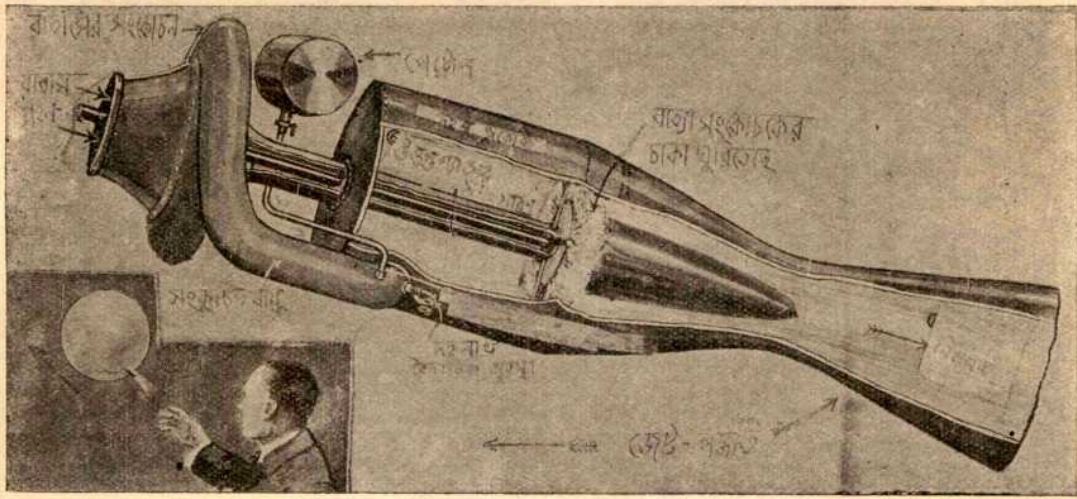
ওপেল প্রমুখ কন্সটিগন রকেট গাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। মোটরের এঞ্জিনের পরিবর্তে এই সকল গাড়ীতে গোটাকয়েক বিস্ফোরকপূর্ণ রকেট দেওয়া থাকিত। একটার পর একটা রকেট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বিস্ফোরিত হইলে গাড়ী অবিরাম গতিতে চলে। কিন্তু এই প্রকার গাড়ীকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার পথে দুইটি প্রধান অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ, গাড়ীর অমিত বেগ, দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত জ্বালানি বা বিস্ফোরক যাহা গাড়ীকে অবিরাম গতি দিতে পারে তাহার অভাব।

ওপেলের একটি গাড়ীতে দুই সেকেন্ডের ভিতর ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই বেগ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া এত বেশী হয় যে তাহার ফলে মোটর গাড়ী উল্টাইয়া যায়, রেল গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। এই বেগকে আয়ত্তে আনা মাধ্যাতীত বলিয়াই এতদ্বিষয়ক প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এই প্রকার প্রচণ্ডবেগ উৎপন্ন করিবার চাবিকাঠি হাতে পাইয়াই একদা মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিল। পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিলে মাধ্যাকর্ষণের টানে সে আবার নীচে নামিয়া আসে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে উর্দ্ধে ছুড়িবার সময় মাধ্যাকর্ষণের টানের চেয়ে বেশী শক্তি নিয়োজিত করা হয় তবে সে পদার্থ আর মাটিতে নামিয়া আসিবে না। সেকেন্ডে সাত মাইল বেগে যদি কোন বস্তু উপরে উঠিতে থাকে তবে উহা আর মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না। রকেটের সাহায্যে এই প্রকার বেগ উৎপন্ন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া এই বেগে কোন পদার্থ চলিতে আরম্ভ করিলে বায়ুর সহিত সংঘর্ষে উহা অতি-মাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার ফ্রেডরিক শ্টিভেল রকেটকে মানুষের কাজে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রাজের নিকটবর্তী পার্কভ্য অঞ্চলে সোকেল ও রেডগাড নামক দুইটি ছোট শহর

আছে। শহর দুইটি যদিও মাত্র দুই মাইল দূরবর্তী কিন্তু উহাদের মধ্যে উচ্চ পর্বতের ব্যবধান। এক শহর হইতে অল্প শহরে ডাক চলাচলের জন্য ফ্রেডরিক রকেট ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই ডাক-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক অস্বীকৃত ছিল এবং অত্য়াপি এই ডাকের টিকেট উচ্চ মূল্যে প্রিন্সিপ সংগ্রাহকগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকে। দুই বৎসর পরে জুকের নামক এক ব্যক্তি হার্জ পর্বতের উপর দিয়া অল্পরূপ ডাক-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই রকেটে বারুদ জাতীয় চূর্ণ পদার্থই ব্যবহৃত হইত। তদানীন্তন কালে অল্পপ্রকার বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হয় নাই। বারুদ জাতীয় বিস্ফোরকের কয়েকটি অন্তর্বিধ আছে। ইহা অতিমাত্রায় দাহ্য বলিয়া খুবই বিপজ্জনক পদার্থ। তত্পরি ইহা খুবই দ্রুত পুড়িয়া যায় এবং বিস্ফোরক দ্রব্য পুড়িয়া নিঃশেষ হইলেই রকেটের চালনা বন্ধ হয়। টিলিং নামক এক ব্যক্তি এই প্রকার বিস্ফোরক দ্বারা রকেটকে এক মাইল পর্যন্ত উর্দ্ধে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষা-কার্যে নিয়োজিত অবস্থায় তিনি ও তাহার তিন জন সহকর্মী বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অতঃপর চেষ্টা হইয়াছিল অল্পপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ সন্ধান করিবার যাহা শক্তিমত্তায় ন্যূন না হইয়াও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, বারুদের মত দ্রুত পুড়িয়া শেষ হয় না এবং যাহার ফিরা মানুষের আয়ত্তে রাখা যায়। তরল বাতাস, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি তরলীকৃত গ্যাসও এই কার্যের উপযোগী বলিয়া জানা গেল। এই সব তরল পদার্থ যখন তাপের প্রভাবে সহস্র তরল অবস্থা হইতে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় তখন উহারা বহুলাংশে আয়তনে বৃদ্ধি হয় এবং এইজন্য ইহারা বিস্ফোরক হিসাবে কার্য্য করিতে সক্ষম। মনে রাখিতে হইবে বিস্ফোরণের মূলকথা—কোন পদার্থের মুহূর্ত্ত মধ্যে আয়তনের বিপুল বৃদ্ধি। তরল বাতাসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণক্ষমতা



জেট-যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

কয়েক বৎসর আগে টাটার লৌহের কারখানায় পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছিল। এই প্রকার তরল জ্বালানি বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করিবার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাদিগকে নির্দিষ্ট পাত্রের ভরিয়া লইয়া পরে ইচ্ছামত বিস্ফোরণ কার্যে ব্যবহার করা সম্ভব। সাধারণত ইহারা মোটেই বিপজ্জনক নয়। প্রয়োজনানুযায়ী ইহাদিগকে নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে কম-বেশী চালান করিয়া বিস্ফোরণ ঘটান যাইতে পারে। বারুদ জাতীয় বিস্ফোরককে এমনই ভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। জার্মানীর বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়া রকেটকে ধ্বংসকার্যে ব্যবহার করিয়াছেন। জার্মানীর প্রসিদ্ধ V-2 রকেট বোমা এই প্রচেষ্টার ফল। অধ্যাপক ভার্নার ফন ব্রাউন ইহার আবিষ্কর্তা।

V-2 বোমায় দীর্ঘাকৃতি রকেটের মাথার দিকে থাকে মারাত্মক বিস্ফোরক বোমার সরঞ্জামাদি ও পশ্চাতে থাকে রকেট বিস্ফোরণ-ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট দিকে চলিবার ও চালাইবার জন্ত পিছনের দিকে লেজের মত অঙ্গ ও সম্মুখে রেডিও-যন্ত্র। জার্মানীতে রকেট বিস্ফোরণের জন্ত পূর্বোক্তরূপ তরল জ্বালানি ও যুদ্ধ দহনশীল বারুদ জাতীয় পদার্থ উভয়ই ব্যবহৃত হইত। লক্ষ্যস্থলের দূরত্বের হিসাব করিয়া রকেটের বিস্ফোরক পদার্থের পরিমাণ ও রক্তপথের পরিধি স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে কোণ করিয়া উহার উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহার উপরেও উহাদের পাল্লা নির্ভর করে। রকেট শেল বায়ুমণ্ডলের শুষ্ক স্তর দিয়া চলিত এবং ইহার গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশী ছিল (ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল)। এইরূপ প্রচণ্ড বেগে চলে বলিয়া ইহাদিগকে অনেক দূরে পাঠানো যাইত। রকেটের শক্তি দ্বারা কোন বস্তুকে বেশীক্ষণ ধরিয়া চলমান করা সম্ভব নহে, কারণ বস্ফোরক পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া গেলেই রকেট থামিয়া

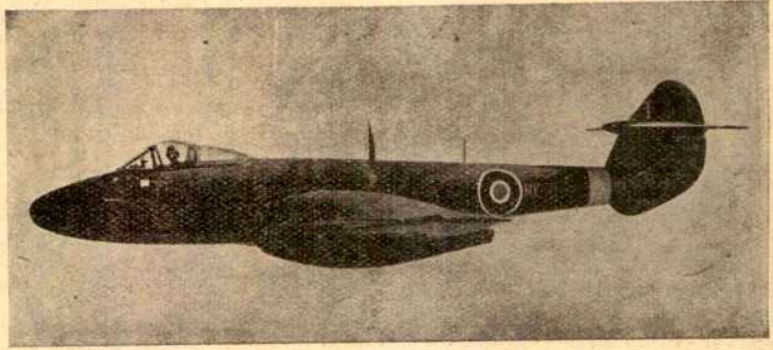
যাইবে। রকেটের সাহায্যে এরোপ্লেন চালাইতে হইলে উহাতে যে পরিমাণ জ্বালানি পদার্থ লওয়া দরকার তাহাতে এরোপ্লেনের বর্তমান আকৃতিতে মোটেই স্থান সংকুলান হইবে না। জার্মানীর উড়ন্ত বোমা রকেট চালিত এরোপ্লেনই ছিল বটে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দূরের পাল্লার যাত্রীবাহী এরোপ্লেন চালানো সহজ নহে। জার্মানী Me-163 নামে পরিচিত জঙ্গী বিমানে রকেট ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। ইহাতে তরল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও গ্যাসোলীন ব্যবহার করা হইত। এই বিমানে এক জন মাত্র আরোহী যাইতে পারিত এবং ইহা মাত্র পনের মিনিট আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ ছিল কারণ তদতিরিক্ত চলিবার মত জ্বালানি লওয়া যাইত না।

রকেটের মূল পদ্ধতির সম্প্রদারণ দ্বারাই জেট চালনা ব্যবহার উদ্ভব হইয়াছে। রকেটে গতি উৎপন্ন করিবার মূল কথা—কোন পাত্রের আবদ্ধ বেশী চাপের গ্যাসকে ক্ষুদ্র রক্তপথে নির্গত হইতে দেওয়া। বেশী চাপের গ্যাস উৎপন্ন করিবার জন্তই বিস্ফোরক প্রয়োজন কিন্তু অল্প উপায়েও এই কার্য করা সম্ভব।

একটি খেলনা রবারের বেলুনে বাতাস ভরিয়া দিলে উহা ফুলিয়া উঠে এবং ভিতরে থানিকটা উচ্চ চাপের বাতাস আবদ্ধ হয়। এক্ষণে এই বেলুন ছাড়িয়া দিলে উহার নল দিয়া বাতাস বাহির হইয়া আসিবে এবং তাহারই ফলে বেলুনটি বিপরীত দিকে চলিতে থাকিবে। এখানে বিস্ফোরণের কোন ব্যাপার নাই, কেবলমাত্র উচ্চ চাপের বাতাসকে ক্ষুদ্র রক্তপথে নির্গত হইতে দিয়াই বেলুনকে গতিশীল করা হইতেছে। জেট-চালিত এরোপ্লেনের মূল তথ্য এই বেলুন চালাইবার কৌশলের অনুরূপ।

বিক্ষোরক পদার্থ না লইয়াও অথ কোন উপায়ে উচ্চ চাপের গ্যাস সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে তাহার নির্গমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জেট-চালিত এরোপ্লেনের সম্মুখ ভাগে বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিয়া একটি নলের ভিতর লইবার ব্যবস্থা থাকে। এই বাতাসকে তারপর যন্ত্রের সাহায্যে খুবই সঙ্কুচিত করা হয়। সঙ্কুচিত বাতাসকে পশ্চাৎ দেশ দিয়া বাহিরে যাইবার পথ করিয়া দিলে উহা বেগে বাহির হইয়া যাইবে এবং তাহারই ক্রিয়ায় এরোপ্লেন সম্মুখে গতি পাইবে। কিন্তু বাহিরে যাইবার পূর্বে এই সঙ্কুচিত বাতাসকে আরও বেশী চাপযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সঙ্কুচিত বাতাসকে বাহির হইবার পূর্বে আর এক স্থানে চালান করা হয়। উহার নাম দহনপ্রকোষ্ঠ (Combustion Chamber)। এই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার মুখে বাতাসের সঙ্গে পেট্রোল মিশ্রিত করা হয় এবং অতঃপর বৈদ্যুতিক স্ক্রলিদের সাহায্যে পেট্রোল পোড়ানো হইয়া থাকে। পেট্রোল নিজে গ্যাসে পরিণত হয় ও বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। এই দুই কারণে দহন-প্রকোষ্ঠের বাতাস ও পেট্রোল গ্যাসের ধোঁয়া খুব বেশী চাপযুক্ত হয়। এই প্রচণ্ড চাপের গ্যাস অতঃপর পশ্চাৎ দিক দিয়া নির্গত হয় এবং এরোপ্লেন চলিতে থাকে। বায়ুমণ্ডল হইতে বাতাস টানিবার জ্ঞ ও বাতাসকে সঙ্কুচিত করিবার জ্ঞ যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় উহাকে চালু রাখিবার জ্ঞও এই গ্যাসই ব্যবহৃত হয়। দহনপ্রকোষ্ঠ হইতে নির্গমনকালে গ্যাসরাশি একটি চাকাকে ঘুরাইয়া থাকে এবং এই চাকার ঘূর্ণনেই পূর্বোক্ত যন্ত্র কাজ করে। ইহাই জেট-চালন ব্যবস্থার মূলকথা।

রকেটের সঙ্গে জেটের মৌলিক সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য অনেক আছে। রকেটের মত জেটকে চালু করিবার জ্ঞ বিক্ষোরক পদার্থ বহন করিবার প্রয়োজন নাই। কোনপ্রকার বিক্ষোরণের ব্যাপার না থাকায় ইহা নিরাপদ ও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণযোগ্য। যে বাতাসকে টানিয়া লওয়া হইবে বা যে পরিমাণ পেট্রোল পোড়ানো হইবে উহার ত্রাস বৃদ্ধি করিয়া এরোপ্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জেট-চালিত এরোপ্লেনে 'প্রপেলার' বা 'এয়ার স্ক্রু'র প্রয়োজন নাই। এইজন্য এরোপ্লেন চালাইবার কার্য অনেক সহজ হইয়াছে। প্রপেলারের ঘূর্ণনে বাতাসে যে আবর্তের সৃষ্টি হয় উহা পাখা ও লেজে আটকাইয়া এরোপ্লেনের স্বচ্ছন্দ গতিকে মন্দীভূত করে। জেট-চালিত এরোপ্লেনে এই রকম অসুবিধা নাই। তবে জেট-নির্গত বাতাস-প্রবাহ যাহাতে পেছনের হাল ও লেজে না লাগে সেইজন্য জেট-চালিত এরোপ্লেনের লেজ ঝাড়া ভাবে নির্মিত হয়। এই



জেট-চালিত এরোপ্লেন। গতি মিনিটে দশ মাইল

জাতীয় এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০০ মাইল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। প্রপেলার সহলিত এরোপ্লেনে চলিবার সময় কম্পন অল্পভূত হয়, জেট-চালিত এরোপ্লেনে কাঁপুনি নাই। এই প্রকার এরোপ্লেন সম্বন্ধে আরও একটি সুবিধার কথা বলা হয়। পৃথিবী হইতে দশ-বার মাইল উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের শুক্কন্তর (Stratosphere)—বায়ু সেখানে হাল্কা বলিয়া প্রপেলার সেখানে ভাল কাজ করে না। একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রপেলার বায়ুকে কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হয়—তাই বায়ু সেখানে স্বল্প প্রপেলারের কার্যক্ষমতা সেখানে কমিয়া যায়। তাই শুক্কন্তরে সাধারণ এরোপ্লেন চলিতে পারে না কিন্তু জেট-চালিত এরোপ্লেনের গতির জ্ঞ বায়ুর সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া এই এরোপ্লেনগুলি শুক্কন্তর দিয়া অনায়াসে যাইতে পারে। শুধু তাই নয় বায়ুর প্রতিরোধ সেখানে কম সেজন্য গতিবেগও বেশী হইয়া থাকে।

শুক্কন্তরের ভিতর দিয়া আকাশ-স্রমণ নানাকারগে সুবিধা-জনক হইবে বলিয়া মনে করা হয়। সেখানকার বায়ুতে বিক্ষোভ নাই—নিশ্চল বায়ুসমুদ্র। কিন্তু কতকগুলি বাধা আছে বলিয়া এখন পর্যন্ত অত উঁচু দিয়া চলাচল সম্ভব হয় নাই। শুক্কন্তরের বাতাস খুবই ঠাণ্ডা, কোন কোন স্থানে তাপমাত্রা ৬৫° ডিগ্রী। তত্পরি যে বায়ুর স্বল্পতা এরোপ্লেনের গতি-বৃদ্ধির কারণ তাহাই আবার মানুষের জীবনের পক্ষে হুঁসহ ও বিপজ্জনক। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনের পাউণ্ড, সাড়ে তিন মাইল উর্দ্ধে এই চাপের পরিমাণ ইহার অর্ধেক এবং দশ মাইল উর্দ্ধে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় দেড় পাউণ্ড। এই স্বল্প চাপের বায়ুতে মানুষের শ্বাসযন্ত্র কার্য করিতে পারে না। আমরা প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে প্রায় এক পাউন্ট বাতাস গ্রহণ করি, ফুসফুসের ৪০ কোটি কোষ এই বায়ুর জ্ঞ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দশ মাইল উর্দ্ধে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাত্র এক-দশমাংশ বায়ু গ্রহণ করিয়া ফুসফুসের কাজ চলা সম্ভব নহে। অধিকন্তু কম চাপের বায়ু ফুসফুসের ভিতরকার সকল স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না।

তাই এই রকম আবহাওয়ায় গেলে মানুষ অস্বস্তিবোধ করে, চাপ সম্বলিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে গুরুত্বের চলাচল খাস ও নাজীর গতি ক্রম হয়। বিশেষ ভাবে নির্মিত উচ্চ করা সম্ভব। এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে।

বৈদিক আৰ্য্য ও আবেস্তিক আৰ্য্য

ত্ৰীনীমাধব চৌধুরী

ইউরো-এশিয়ার সীমা নির্দেশক উরল পর্বতমালার দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম থিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ার আদিবাস-ভূমি হইতে আৰ্য্যজাতির কতকগুলি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম মুখে চলিতে চলিতে যুক্তাইনের কাল মাটির অঞ্চল অতিক্রম করিয়া পোলাও অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ইউরোপের নানা-ভাগে ছড়াইয়া পড়ে। কয়েকটি দল বিভিন্ন সময়ে সম্ভবতঃ দারবেণ্ড গিরিপথে ককেশাস অতিক্রম করিয়া আজের-বাইজানের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্য এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে ইহাদের কয়েকটি গোষ্ঠী ইরাণে উপনীত হয়। ইরাণ হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অথবা শিষ্টানের মরুভূমি পার হইয়া বেলুচিস্থানের পথে ইহাদের কতকগুলি দল সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করে। ইহারাই বৈদিক আৰ্য্যজাতি। আৰ্য্যজাতি কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও বিজয়ের প্রচলিত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।

কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী এই বৈদিক আৰ্য্যজাতি ব্যতীত আর একটি অবৈদিক আৰ্য্যগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে প্রবেশের কথা বলেন। এই অবৈদিক আৰ্য্যজাতি আসিয়াছেন মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চল হইতে। কিন্তু অসম্ভব করা হয় পূর্ব-ইরাণ হইতে পামীর হইয়া অতি প্রাচীনকালে ইহার পূর্বদিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রাচীন স্তূপ বা বোথারার পার্শ্বত অঞ্চল পামীরের পর্বতমালার সঙ্গে মিশিয়াছে। এইখানে কারা-টেগিন উপত্যকার মধ্য দিয়া গিরিপথ আলাই উপত্যকায় পড়িয়া কাশগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে কুয়েন-লুন পর্বতের খনি হইতে প্রাপ্ত জেড-এর বাণিজ্য ও চীনের রেশম-বাণিজ্য এই পথেই পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিত। চীনের রেশম-বাণিজ্য চলিবার আর একটি পথ দক্ষিণে আনিচর পামীরের মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রসারিত ছিল এইরূপ বলা হয়।

পামীরের পর্বত-গ্রন্থি হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ উঠিয়া দক্ষিণে হিন্দুকুশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পূর্বদিকে দুইটি পর্বতশ্রেণী, তিয়েনসান (চীন পর্বত) ও কুয়েনলুন উত্তর ও দক্ষিণে পূর্বদিকে প্রসারিত। তিয়েনসান ও কুয়েনলুনের মধ্যে তারিম অববাহিকা তাকলা মাকান ও লপ মরুভূমি। মধ্য এশিয়ার এই

অঞ্চল হইতে অবৈদিক আৰ্য্যজাতির কতকগুলি গোষ্ঠী অস্কাস উপত্যকা হইয়া, অথবা পামীর হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া অথবা কারাকোরাম গিরিপথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। এই অবৈদিক আৰ্য্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করা হইবে না। ভারতবর্ষে বৈদিক আৰ্য্যজাতি বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা ছাড়া অল্প গোষ্ঠীভুক্ত আৰ্য্যজাতিও আসিয়াছে, এই মতবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত এখানে ইহাদের উল্লেখ করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম থিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ রুশিয়া হইতে আসিয়া যে বৈদিক আৰ্য্যজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত তাহাদের নাম দিয়াছেন প্রোটো-নর্ডিক (Proto-Nordic)। এই কথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হেডন। ইহার অর্থ এই যে ইহারাই ইউরোপের নর্ডিক আৰ্য্যজাতির পূর্বপুরুষদিগের সমগোষ্ঠীয়। সে যাহা হউক, এই প্রোটো-নর্ডিক অথবা বৈদিক আৰ্য্যজাতি কর্তৃক (খ্রিঃ পূঃ ২০০০-১৫০০) ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয়,—এই সুপ্রসিদ্ধ মতবাদের একটি অংশ এই রূপ যে ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র বা বহুস্তোত্র ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছিল। কেহ বলেন এই সকল স্তোত্র রচিত হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়, কেহ বলেন ইরাণে। পূর্বের এক প্রবন্ধে (“বৈদিক আৰ্য্যগণ কি সেমিটিক?”—প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) আৰ্য্য ভাষাভাষী ও আৰ্য্যদেবতার উপাসক মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার কয়েকটি প্রাচীন জাতির সহিত বৈদিক আৰ্য্যদিগের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, বৈদিক ঋগ্ ও ঋগ্বেদের স্তোত্র সম্বন্ধে এই মতবাদের ভিত্তি—এ সকল জাতির কোন কোন প্রাচীন লেখনে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্য, সূর্য্য ও মরুৎ এই কয়েকটি দেবতার নামের উল্লেখ। যুক্তি কতকটা এইরূপঃ এই সকল বৈদিক দেবতার নাম যখন পাওয়া যাইতেছে তখন যে ঋগ্বেদে ইহাদের নাম পাওয়া যায় তাহাও অবশ্য মেসোপটেমিয়ায় রচিত হইয়াছিল। ইন্দ্র, নাসত্য, মিত্রের নাম জেন্দাবেস্তায় পাওয়া যায়। সুতরাং জেন্দাবেস্তাও মেসোপটেমিয়ায় রচিত হইয়াছিল, এ প্রকার যুক্তির বলে একথাও বলা চলে, কিন্তু তাহা বলা হয় না। অর্থাৎ প্রাচীন পার্সীদিগের ঋগ্শাস্ত্র জেন্দাবেস্তা ইরাণে

রচিত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দিগের ধৰ্মশাস্ত্র ঋগ্বেদ মেসো-পটেমিয়ায় রচিত।

পশ্চিম এশিয়ায় যে সকল প্রাচীন লেখনে বৈদিক দেবতা-দিগের নাম পাওয়া যায় তাহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের রচনা।

মেসোপটেমিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ ইরাণ হইয়া এবং সমুদ্রপথে পারস্ত উপসাগর হইয়া। অধিকাংশ মেসোপটেমিয়া-পন্থী ও মধ্য এশিয়া-পন্থী পণ্ডিত সমুদ্রযাত্রার বিপক্ষে, তাঁহাদের উদ্ভূত দলের মত আৰ্য্যজাতি ইরাণে ভেরা বাসিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত উভয় দলের মিল থাকিলেও আৰ্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় সম্বন্ধে স্বভাবতঃই মতানৈক্য দেখা যায়। মেসোপটেমিয়া-পন্থীগণ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের পরে আরও তিন চার শতক হাতে রাখিয়া আৰ্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট করেন খ্রীঃ পূঃ দশম হইতে নবম শতকের মধ্যে। তিন-চার শতক হাতে রাখিতে হয় মেসোপটেমিয়া হইতে ইরাণে পৌঁছিয়া সেখানে আৰ্য্যজাতিকে বসবাস করিবার সময় দিবার জ্ঞ। মধ্য এশিয়া-পন্থীগণ আৰ্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় আরও পিছাইয়া দেন। তাঁহাদের (ম্যাকডোনেল, কীথ, মরগ্যান প্রভৃতির) মতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে আৰ্য্যজাতি ভারতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত কোনো ও হিবনটারনিটজের মতে আৰ্য্যজাতির ভারত প্রবেশের কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বৎসর।

বলা বাহুল্য আৰ্য্যজাতির ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার কাল মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসরের মধ্যে ধরিলেও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের লেখনে উল্লিখিত দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ নির্ণয় করা সমস্তার বিষয় রহিয়া যায়। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের সহিত আবেস্তার সম্বন্ধের ব্যাখ্যা লইয়াও সমস্তার উৎপত্তি হয়। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে।

*মধ্য এশিয়া-পন্থীগণ ঋগ্বেদের রচনা-কাল ও রচনা-স্থান সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন দেখা যাউক। রুম-ফিল্ডের মতে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হয় খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে, হিবনটারনিটজের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ২০০০ অব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হয় ও খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দের মধ্যে উচ্চা শেষ হয়। ম্যাক্সমুলারের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০, কীথের মতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনা সমাপ্ত হয়। দেখা যাইতেছে যে, আৰ্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রবেশ ও ঋগ্বেদের রচনা সমসাময়িক, এইরূপ মত প্রবল। ম্যাকডোনেল বলেন যে, প্রাচীন ইরাণীয় আৰ্য্যগোষ্ঠীসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরে অল্পকালের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ তাঁহার মতে খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০ অব্দের আগে ইরাণ হইতে বৈদিক আৰ্য্যগণ ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। এই সময় নির্দেশ স্মরণ রাখিতে হইবে।

ঋগ্বেদের রচনা-স্থান সম্বন্ধে মধ্য এশিয়া-পন্থীদের মধ্যে

Hille Brandt-এর মতে ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডল আরাকোশিয়ায় অর্থাৎ কান্দাহার অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ম্যাকডোনেলের মতে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ পূর্ব আফগানিস্থানে রচিত হইয়াছিল। অতএব তিনি বলিতেছেন,

“The people by whose poets the Rigveda was composed were settled in the north-west of India from Kabul to the Jumna”.

অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় আমলে আৰ্য্যজাতি কাবুল হইতে যমুনা অর্থাৎ গান্ধেশ উপত্যকার পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করিতেন। ইরাণীয় আৰ্য্যগোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৈদিক আৰ্য্যদিগের কাবুল উপত্যকা হইতে দিক্ উপত্যকা ও পূর্বে যমুনা পর্য্যন্ত আসিতে অবশ্য দীর্ঘ দিন লাগিয়াছিল। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ-পূঃ ১৫০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। Hille Brandt-এর মতে ষষ্ঠ মণ্ডল আরাকোশিয়ায় রচিত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। এই মণ্ডল ভররাজ-কুলের রচনা। এই মন্তের প্রধান ভিত্তি কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা : হরিয়ুপিয়া = ইরিয়াব বা আলিয়াব ; সরস্বতী = হরণাবৈতি ; দাস = দাহি (Dahae) ; পগি = পারনিয়ান ইত্যাদি। এই সকল নাম প্রাচীন ইরাণীয় ইতিহাসে পরিচিত।

দেখা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের রচনার স্থান পণ্ডিতগণের মতে যেভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ঋগ্বেদ ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছে বলা যায় না। আরাকোশিয়া, পারোপানি-সাদি ও আরিয়া, অর্থাৎ কান্দাহার, কাবুল ও হিরাট প্রদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, গ্রেডোশিয়া বা বেলুচিস্থানও ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য আমলে শুধু এই সকল অঞ্চল নহে পরন্তু বালথ (ব্যাকট্রিয়া), স্বেগদা (সগডিয়ানা) প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া সমগ্র পূর্ব ইরাণ বৌদ্ধধর্মের প্রবল বজায় প্রাবিত হইয়াছিল। বালথ জরাথুষ্ট্রের জন্মস্থান। আবেস্তা প্রাচীন বালথি ব্যাকট্রিয়ান ভাষায় রচিত। আবেস্তার সঙ্গে ঋগ্বেদের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার প্রদত্ত ত্যাগ করিয়া এইবার ইরাণের বা আবেস্তিক আৰ্য্যগণের সঙ্গে বৈদিক আৰ্য্যগণের সম্পর্কের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে।

আবেস্তিক আৰ্য্যগণের সঙ্গে বৈদিক আৰ্য্যগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভাষা, দেবদেবী, সোমরসের ব্যবহার, অগ্নি উপাসনার প্রাধান্য, হোমাদি যজ্ঞ-ক্রিয়া ইত্যাদি বহু বিষয়ে আবেস্তা ও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচনার ফলে যে-সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সারমর্ম এইরূপ যে, আবেস্তিক আৰ্য্য ও বৈদিক আৰ্য্য—জাতিতে, ভাষায় ও ধর্মে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে প্রাচীন ইরাণীয় বা জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মসাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা দরকার।

প্রাচীন ইরানের সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে। তখন শিশুনাগ বংশীয় রাজা, সম্ভবতঃ অজাত-শত্রু, (খ্রীঃ-পূঃ ৫০২) মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কোশল, কাশী ও লিচ্ছবীদিগের রাজ্য জয় করিয়া অজাতশত্রু পূর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হাকামনিবংশের প্রথম দারিয়ুস বা দারিয়াবাহ (খ্রীঃ-পূঃ ৫২১—৪৮৫) তখন পারস্যের প্রবল প্রতাপাধিত সম্রাট। মিডিয়া, ইরাক, মিশর, দিরিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীসের থ্রেস, মাসিডন, পূর্বদিকে সুগদা বালখ ও হিরটি হইতে কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার সাম্রাজ্য। সমগ্র দিগ্ধ উপত্যকা হাকামনি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল দারিয়ুসের গ্রীক সেনাপতি নিকলাকুদের দিগ্ধ অভিযানের সাফল্যে। ভারতবর্ষের সহিত ইরানের এই সংযোগের ফলে কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদান কিরূপ হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ মিলে না, কিন্তু হাকামনি সম্রাটগণের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় প্রদেশ (Indian Satrapy) কিরূপ অর্থ ও লোকবল যোগাইয়াছিল তাহার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তারপর সংঘটিত হইল গোগামেলার যুদ্ধে তৃতীয় দারিয়ুসের পরাজয়, আলেকজান্ডার কর্তৃক সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার এবং পঞ্জাব আক্রমণ। ইহা খ্রীঃ-পূঃ ৩৩১ হইতে ৩২৬ এর মধ্যকার ঘটনা।

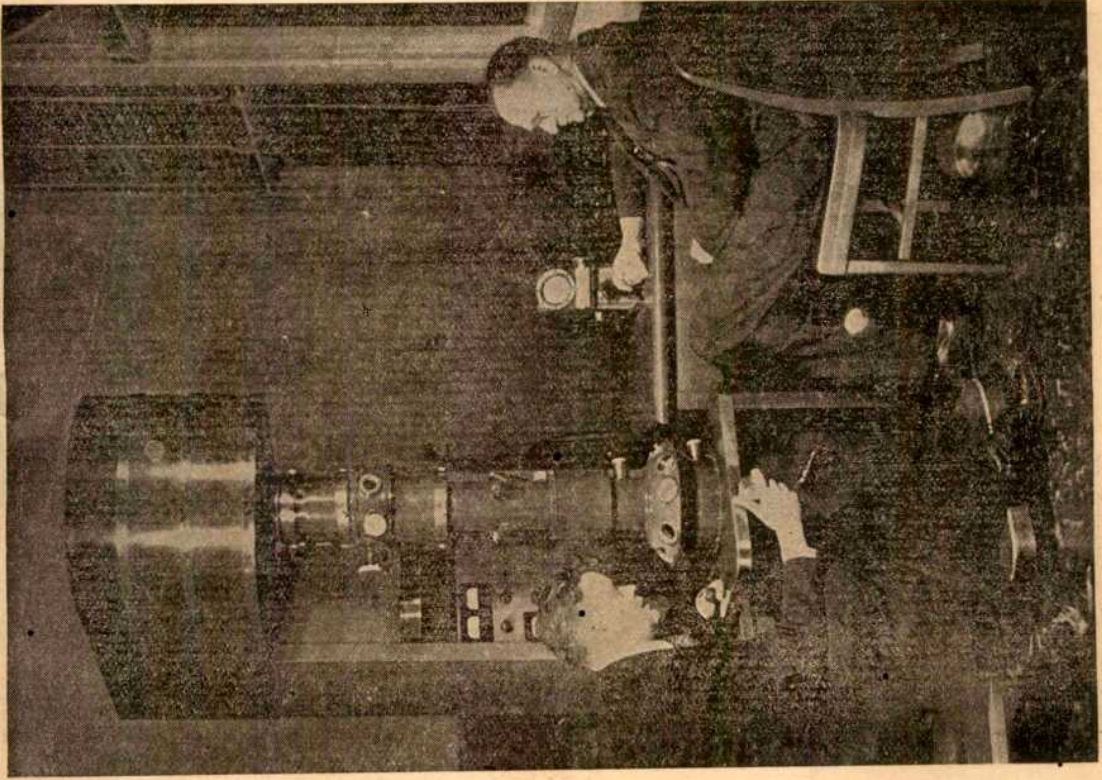
জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের প্রবর্তক জরাথুষ্ট্র প্রথম দারিয়ুসের পিতা হিষ্টাসপেদের (Hystaspes) সমসাময়িক বলিয়া একটা মত প্রচলিত আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর এক জন গ্রীক লেখক বলেন—এখনকার পারশীকগণ মনে করেন যে, ধর্মপ্রচারক জোরোস্ত্রার হিষ্টাসপেদের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু এই হিষ্টাসপেদ দারিয়ুসের পিতা কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিতর্কের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এ সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি মত দেখা যায়। একটি মতানুসারে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল আলেকজান্ডারের ২৮০ বা ২৮৮ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ-পূঃ ৬১০ বা ঐরূপ সময়ে। ঐ সময়ে সিঅাকসজারেস (Cyaxares) মিডিয়ার সম্রাট, হাকামনি রাজবংশের তখনও অভ্যুদয় হয় নাই। এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ আরবী লেখক ও পর্যটক মাসুদী এবং ইহার ভিত্তি পারশীক-দিগের প্রাচীন গ্রন্থ বন্ডাবিশ (Bundabish) এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস। দ্বিতীয় মতানুসারে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ-পূঃ ১০০০ হইতে ১২০০ বৎসরের মধ্যে। পণ্ডিত মার্টিন হগ ও আরও অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হগের মত এই যে, জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ-পূঃ ১০০০ বৎসরের পরে হইতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে খ্রীঃ-পূঃ ১২০০—১০০০ জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব-কাল ও আবেস্তা সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের রচনাকাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সময় নির্দেশ মনে রাখা প্রয়োজন।

আবেস্তা সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন ইরানীয় ধর্মশাস্ত্র জেন্দাবেস্তা জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু জেন্দ ও আবেস্তা একই বা দুইখানি পুথক গ্রন্থের নাম নহে। জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে : “জেরাথুষ্ট্রের (জরাথুষ্ট্র) রচিত আদি গ্রন্থের নাম আবেস্তা। পারশীকগণ উহা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় জেরাথুষ্ট্র একটি ভাষা রচনা করিলেন। উহার নাম দেওয়া হইল জেন্দ। এই ভাষার আর একটি ভাষা তিনি রচনা করিলেন। উহার নাম দেওয়া হইল পাজেন্দ (Pazend)। জেরাথুষ্ট্রের মৃত্যুর পরে পারশীকগণ এই নূতন ভাষার একটি ভাষা রচনা করিলেন এবং উল্লিখিত সকল গ্রন্থের ভাষা প্রস্তুত করিলেন। উহার নাম হইল ইয়াজদহ (Yazdah)। এই ভাষা হইতে জানা যাইতেছে যে, জেন্দ আবেস্তার ভাষা। পঞ্চাবীতে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মগ্রন্থের নাম *Avistak va Zand*। আবেস্তা বলিতে গোড়ায় জরাথুষ্ট্র ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের রচিত ধর্মশাস্ত্র বুঝাইত, জেন্দ বলিতে শিষ্যগণের একই ভাষায় রচিত উহার ভাষা বুঝাইত। এই ভাষা ক্রমে সাধারণের অবোধ হওয়ায় সাদানীয় যুগে পঞ্চাবী ভাষায় মোয়াবেদগণ (সাদানীয় আমলে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের পুরোহিতগণ) ইহার অনুবাদ করেন। ইহাই সাধারণতঃ জেন্দ নামে পরিচিত।

দে যাহা ইউক, সমগ্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া দাবি করা হইলেও আবেস্তার প্রাচীনতম অংশমাত্র তাঁহার রচনা এইরূপ বলা হয়। আবেস্তার এই প্রাচীনতম অংশ ইয়ফা (Yasna, Sk. Yajna)। ইয়ফার প্রথম অংশ জরাথুষ্ট্রের রচিত কয়েকটি গাথা। অগ্রাংশ অংশ তাঁহার শিষ্য-গণের রচনা বলিয়া মনে করা হয়। গাথাগুলির ভাষা আবেস্তার অগ্রাংশ অংশের ভাষা হইতে ভিন্ন ও প্রাচীন। এইগুলি বিভিন্ন ছন্দে রচিত, পাঁচটি ভাগে বিভক্ত প্রার্থনা ও স্তোত্র প্রভৃতির সংগ্রহ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গাথাগুলি সমগ্র জেন্দাবেস্তার প্রাচীনতম অংশ এবং ইয়ফার পরবর্তী অংশগুলি, বিসপরদ ও ভেন্দাদ (Visparad, Vendidad), রচিত হইবার সময়ে এই গাথাগুলি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ও সম্মানিত হইত।

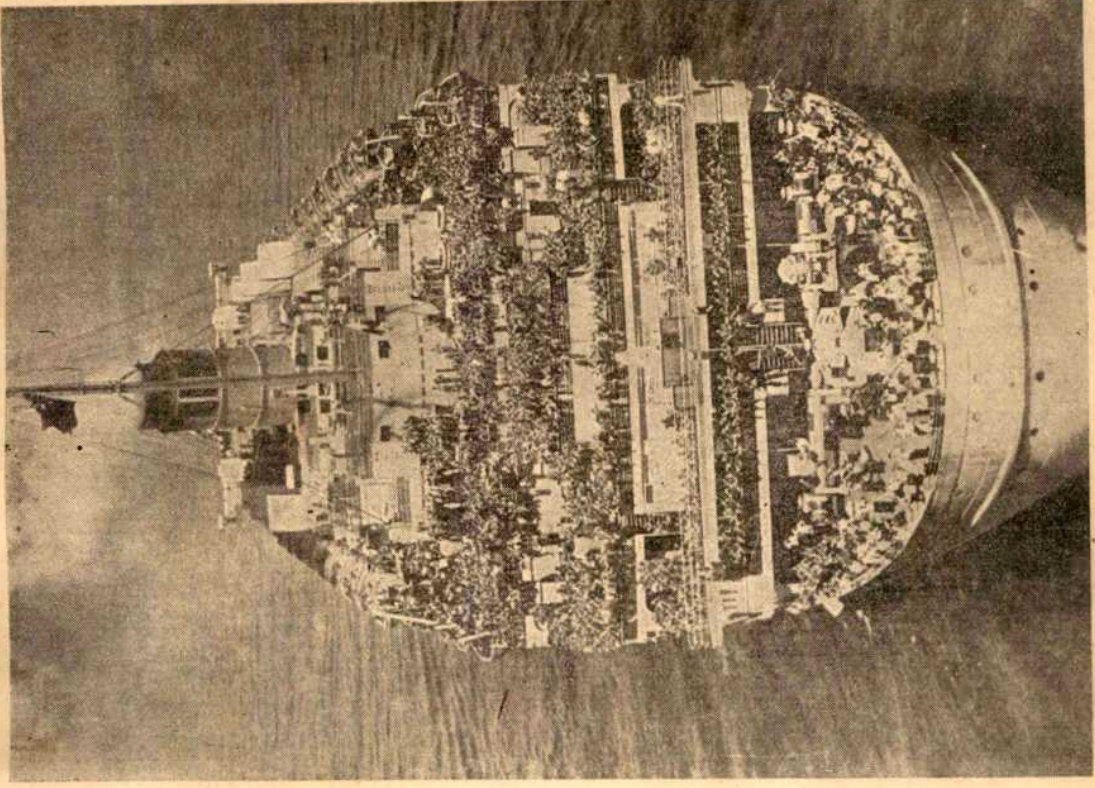
এই গাথাগুলির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমে ভাষার কথা বলা যাইতে পারে। গাথার ভাষা পূর্ব ইরানীয় বা ব্যাকট্রিয়ার ভাষা। ব্যাকট্রিয়ার ভাষার দুইটি স্তর লক্ষিত হয়। প্রথম স্তর গাথাগুলির—ইহাকে Gatha dialect বলা হয়। দ্বিতীয় স্তর লক্ষিত হয় আবেস্তার অপরাংশে। এই স্তরের নাম দেওয়া হইয়াছে ব্যাকট্রিয়ান বা Classical Avestan language। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, আবেস্তা যে ভাষায় রচিত সে ভাষার কোন নাম নাই—উহা Avestan language বলিয়া পরিচিত। বৈদিক সংস্কৃতের সহিত ক্লাসিকাল সংস্কৃতের বহু পার্থক্য

বৃহত্তম অণুবীক্ষণ

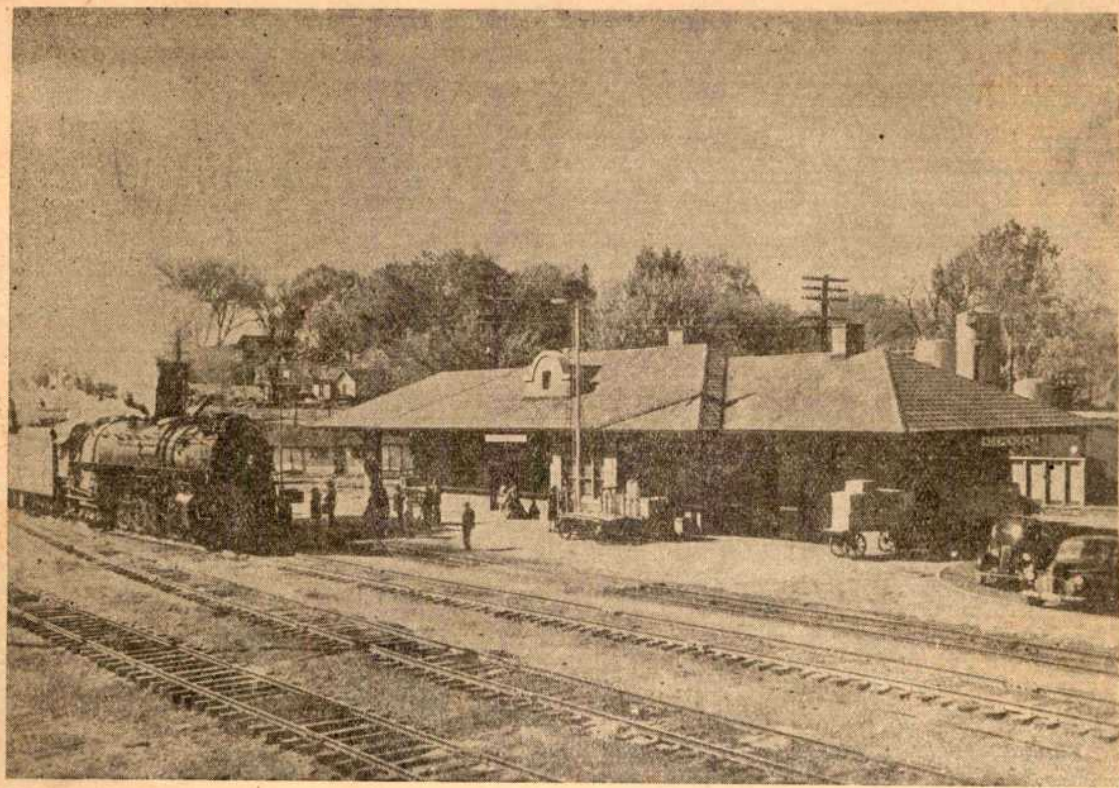


আমেরিকায় উদ্ভাবিত হুইট ব্রহ্ম ও স্কুদ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র। এই উভয় যন্ত্রের ভিতর দিয়েই পদার্থের আকৃতি লক্ষ্যগণ ব্যক্তি দেখায়

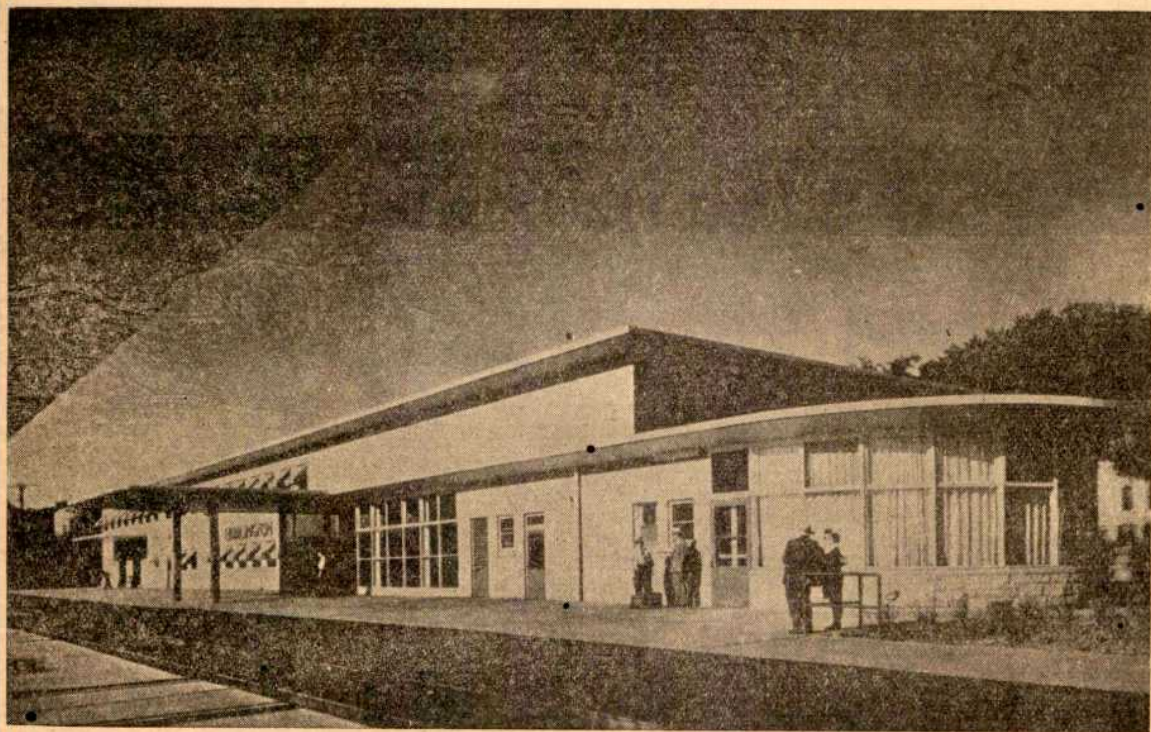
বৃহত্তম জাহাজ



নিউ ইয়র্কের পথে ১৪৫২৬ জন মার্কিন সৈন্তবাহী জাহাজ 'বুইন মেরী'



প্রেসিডেন্ট টুম্যানের জন্ম-শহর ইন্ডিপেন্ডেন্স, মিসৌরীর পুরনো বাঁচের রেল-স্টেশন



আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি রেল-স্টেশন

ধাকিলেও উহা সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু আবেস্তার ভাষা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে লুপ্ত হইয়া যায়। হাকামণি বংশের বেহিসতুন (হামাদানের নিকটবর্তী) লেখনের ভাষার সহিত ব্যাকট্রিয়ান ভাষার সাদৃশ্য, ধাকিলেও উহার ভাষা আবেস্তার ভাষা নহে এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তার (গাথার) ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“The two languages are only dialects of two separate tribes of the same race;” অর্থাৎ “এক জাতির দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর ভাষা বৈদিক ভাষা ও আবেস্তার ভাষা।” ব্যাকরণে এই দুই ভাষার পার্থক্য খুব কম, বেশী পার্থক্য উচ্চারণের নিয়মে ও শব্দসম্বন্ধে। পণ্ডিত হগের মতে জার্মান ও ডাচ ভাষার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য বৈদিক ভাষা ও আবেস্তার মধ্যে পার্থক্য তাহার বেশী নহে। গাথাগুলির ছন্দ বৈদিক ঋক্‌গুলির ছন্দের অনুরূপ। প্রথম গাথা অহনাবৈতির ছন্দ গায়ত্রী ছন্দের ছায়। দ্বিতীয় গাথার ছন্দ বৈদিক ত্রিষ্টুপ ছন্দের ছায়। তৃতীয় গাথার ছন্দ ঋক্‌টি ত্রিষ্টুপ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সামবেদের সঙ্গে গাথাগুলির বিষয়বস্তুর এবং ইয়কার অপর অংশগুলির সহিত যজুর্বেদের তুলনা করা যাইতে পারে।

স্পষ্টতম জরাথুস্ত্রের জন্মস্থান ব্যাকট্রিয়া বা বালখ বলিয়া অনুমান করা হয়, কিন্তু বালখের কোন্ নগরে তিনি জন্মিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। গাথা উষ্ট্রাবৈতিতে বালখের (berekdha) গৃহ ও সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে—যে পাঁচটি গাথা তাঁহার রচনা তাহা তাঁহার নিজের নগরে প্রচলিত ভাষায় লিখিত। এই ভাষা আবেস্তার অজ্ঞাত অংশ রচনার সময়ে প্রায় প্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাথা ভাষা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাতে মূল ভাষা হইতে ধানিকটী অবনতির লক্ষণ দেখা যায়। (“We find her no longer in the prime of life; she appears rather in her declining age.”) মূল ভাষা হইতে গাথার ভাষার এই পরিবর্তন ঘটতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান সহজে করা চলে। জরাথুস্ত্রের আবির্ভাব-কাল যদি খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে হয় তাহা হইলে গাথার ও পরবর্তী আবেস্তার ভাষার এই পরিবর্তন ঘটতে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। বৈদিক ভাষাকে মূল ভাষার অবিকতর নিকটবর্তী বলিয়া মনে করা হইলে উহার এই অবিকৃত অবস্থা গাথার রচনা-কাল হইতে আরও দুই শত বৎসরের পূর্বেরকার ব্যাপার এরূপ অনুমান করা চলে।

ভাষা, ছন্দ প্রভৃতিতে বৈদিক সাহিত্য এবং আবেস্তার মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইল। ঋগ্বেদে আৰ্য্য, আৰ্য্যবৰ্ণ, আৰ্য্য-ব্রত প্রভৃতি পদের বহু ব্যবহার দেখা যায়। আবেস্তায় এইরূপ কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদ *airyao danhavo*—ইহার অর্থ করা হইয়াছে Aryan countries এবং পারশ্ব

মিডিয়া ও বালখ, এইগুলি আৰ্য্যদিগের দেশ এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পার্শ্ব, কাস বা পারশ্বের ও মিডিয়ার ভাষা পশ্চিম ইরানী শাখাভুক্ত এবং পূর্ব ইরানী শাখা হইতে ভিন্ন। এই পশ্চিম ইরানী শাখা হইতে আধুনিক পার্সী ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। জরাথুস্ত্র নিজের বালখের লোক। পূর্ব ইরানী শাখার ভাষা যে সকল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—যথা, স্তগদা, হারোয়া (হিরাট) প্রভৃতি অঞ্চল কি ভাবে *airyao danhavo* হইতে বাদ যায় তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভেন্দাদাদে অহর-মাজদা যে সকল শ্রেষ্ঠ অঞ্চল আৰ্য্যদিগের বা জোরোস্ত্রিয়ান মতে বিশ্বাসীদিগের বাসের জন্ম স্থষ্টি করিয়াছেন বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে কাস বা পারশ্ব ও মিডিয়ার উল্লেখ নাই। তারপর যে পদ পাওয়া যায় তাহা হইতেছে *Airyana-Vaejo*—ইহার অর্থ করা হইয়াছে আৰ্য্যদিগের স্বর্গ বা পৃথিবীর স্বর্গ। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উত্তরের শীতপ্রধান যে অঞ্চলকে স্বর্গ বলা হইয়াছে তাহাই আৰ্য্যজাতির আদিম বাসস্থান। এই দুইটি পদ ব্যতীত আরও দুইটি পদ পাওয়া যায় *Airyama* ও *Airyaman*—*Airyama* পদের অর্থ করা হইয়াছে স্বর্গক। *Airyaman* বেদের অর্যমন যিনি আবেস্তায় ও বেদে বিবাহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

এখন বৈদিক ধর্ম ও আবেস্তার ধর্মের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। জরাথুস্ত্রের আবির্ভাব-কাল ও মূল ভাষা হইতে বৈদিক ভাষার তুলনায় গাথার ভাষায় ও আবেস্তার ভাষায় পরিবর্তনের লক্ষণ সম্বন্ধে উপরে যাচা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরও রাখা প্রয়োজন।

বৈদিক ধর্ম ও আবেস্তার ধর্মের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, আবার অনেকখানি বৈষম্যও দেখা যায়। প্রথমে সাদৃশ্যের কথা বলা হইতেছে।

ইন্দ্র, মিত্র, অর্যমন, নাসত্য, শব (যজুর্বেদে রুজের নাম), যম, অরমতি, ত্রিত, ত্রেতন, সোম, বায়ু, ভগ প্রভৃতির নাম বৈদিক সাহিত্যে ও আবেস্তায় দেখা যায়। ইন্দ্র ঋগ্বেদে যজুহা, আবেস্তায় বেরেথুয় (বেহবাম), মিত্র আবেস্তায় মিথ্র, নাসত্য—নাওনহৈথ্য, শব—শৌব, যম আবেস্তায় যিম, অরমতি—অরমতি, ত্রিত—থিত, ত্রেতন—থৈতন, সোম—হোম বা হোওমা, বায়ু—বায়ু, ভগ—বধা, বৈবস্বত—বৈবান হো ইত্যাদি। দেব, দানব, অহর প্রভৃতি পদ ঋগ্বেদে ও আবেস্তায় দেখা যায়। অগ্নির নরাংশ নাম নৈরিরোশাংস রূপে আবেস্তায় দেখা যায়। নৈরিরোশাংস অহর মাজদার দূত, অগ্নিকে ঋগ্বেদে দেবগণের দোত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। দুই খণ্ড কাষ্ঠ (ঋগ্বেদের অরবি) ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন, যজ্ঞে পশুবলি, সোম যাগ প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম ও আবেস্তার ধর্মের অঙ্গ। জরাথুস্ত্র হোমকে (সোম) জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাকে কে প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও কি পুরস্কার তিনি পাইয়া-

ছিলেন? উত্তরে হোম বলিতেছেন, বিবাহহো প্রথমে হোম-রন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার যিম ক্ষেত্রে নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর অথহব্যা হোমরস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার অহিহাহক বিনাশকারী ধৈতন নামক পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর ধিত হোমরস প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার উর্বক্ষহয় ও কেরেসাম্পা নামক দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর পৌরুষম্পা হোমরস প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র তুমি জরাধুষ্ট্র জয়গ্রহণ করিয়াছ। তুমি আইরিয়ানা বেজোতে (Airyana-Vaejo) বিখ্যাত হইয়াছ। জরাধুষ্ট্র হোমের স্তুতি করিতেছেন,—

“Then spake Zarathustra. Reverence to Homa ! Good is Homa, well created is Homa, rightly created, of a good nature, healing, well shaped, well-performing, succesful, goldencoloured, with hanging tendrils, as the best for eating and the most lasting provision for the soul.” (Haom yasht.)

হোম গীতবর্ণ পর্বতচূড়ায় জন্মেন, হোম স্বাস্থ্য, বল, ভোগ, সামর্থ্য, বিজ্ঞা দান করেন, পুত্রহীনদিগকে বীরপুত্র ও কুমারীদিগকে স্বামী দান করেন। হোম বিজ্ঞতা ও শত্রুধ্বংসকারী। হোম রোগ দূর করেন। ঋগ্বেদের একমাত্র নবম মণ্ডল হইতে সোমের সম্বন্ধে অল্পরূপ বর্ণনার সবগুলিই উপস্থিত করা যাইতে পারে।

আবেস্তায় কবি করপান (Karpan), উশিক্ষ (Usiks), অধুবন পুরোহিত শ্রেণীর নাম। করপানের কার্য্য বৈদিক শ্রোত্রীয়ের অনুরূপ বলা হইয়াছে। উশিক্ষ বৈদিক উশীজ। ঋগ্বেদে উশীজপদ অগ্নিরাগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। কবি-পদ ঋগ্বেদে ঋষি, স্তোতা, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অধুবন আবেস্তার অগ্নির পুরোহিত, ঋগ্বেদে অধর্বন-কুল অগ্নি-উপাসনার প্রবর্তক।

বৈদিক ধর্ম্ম ও আবেস্তার ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্যের এই পরিচয় এখানে যথেষ্ট মনে করা যাইতে পারে। এখন বৈষম্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের দেবদেবী আবেস্তায় ঘৃণিত অপদেবতা, ছুষ্ট শত্রু, পিশাচ প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত। তাহারা সকল প্রকার কুৎসিত, ঘৃণ্য বস্তুর ও অপবিত্রতার হেতু। তাহারা মৃত্যুর হেতু। ধার্মিক ব্যক্তিদের গৃহ ও ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করিয়া তাহারা আনন্দ লাভ করে। আবর্জনা ও পুরীষপূর্ণ স্থানে তাহারা বাস করে। ইন্দ্র, শর্ব, নাসত্য, ইহারা সকলেই ঘৃণিত দয়েব (daeva) বা দেব। ঋগ্বেদের অত্যন্ত দেবদেবীর মধ্যে মিত্র, অর্যমন যম, ভগ ও অরমতি আবেস্তায় সমান লাভ করিয়াছেন। বায়ু আবেস্তায় সর্বত্র সঞ্চরণশীল spirit, ত্রিত ও ত্রৈতনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয় নাই। ঋগ্বেদে পৃথিবীকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে আবেস্তায় অরমতিকে অরমৈতি রূপে সেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে জাতিচ্যুত করিয়া অপদেবতার শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজনকে ঋগ্বেদে দেবতার উচ্চ স্থান না দিলেও সম্মানের আসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সম্মানের স্থান তাহারা পাইয়াছেন গাধার পরবর্তী আবেস্তা সাহিত্যে। গাধাগুলিতে অহর মাজদা ব্যতীত অত্ কোন উপাস্য দেবতা নাই। ইয়ফার শেষের অংশে ও তাহার পরবর্তী আবেস্তা সাহিত্যে মিত্রাদি দেবতাকে দেবদূত (Yazatas) রূপে দেখা যায়। কিন্তু আবেস্তার সর্বত্র দেবধর্ম্ম অহরা-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। অহর বা অহুর আবেস্তায় প্রধান দেবতা; ঋগ্বেদের প্রথম দিকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সবিতা প্রভৃতিতে অহুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পরে অহুর আখ্যা দাস ও দম্বাদিগকে, দেবগণের শত্রুশ্রেণীকে দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়।

যে প্রেরণা হইতে ইন্দ্রাদি দেবতাকে শত্রু ও পিশাচরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে সেই প্রেরণা হইতে আবার সোমমাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকে আক্রমণ করা হইয়াছে। দেব-ধর্ম্মের পুরোহিত ও সোম অভিষেককারীকে আক্রমণ করা হইয়াছে। এই সঙ্গে প্রতিমা-পূজকদিগকেও আক্রমণ করা হইয়াছে। ১। হে দেবগণ হে অপদেবতা, তোমাদের নীচ মন, নীচ বাক্য, নীচ কার্য্যের দ্বারা অসং ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করিয়া মনুষ্য-জাতির ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছ। (Yas, xxxii. 5) ২। হে দেবগণ, (সোমপানে) প্রমত্ত অপদেব হইতে তোমরা জন্মিয়াছ; মনুষ্যগণকে প্রবঞ্চিত ও বিনষ্ট করিবার বিবিধ ছলাকলা তোমরা তাহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছ; এই সকলের জন্ত তোমরা সর্বত্র পরিচিত। (Yas, xxx. 3.) ৩। হে মাজদা, কখন বীর্য্য ও সাহসযুক্ত ব্যক্তিগণ আবিষ্কৃত হইয়া মত্ততাজনক রস (সোম) কলুষিত করিবে? এই ঘৃণিত ক্রিয়া (সোমমাগ) প্রতিমাপূজকদিগকে দাস্তিকতায় পূর্ণ করে এবং অপদেবতা এই দণ্ডে ইন্দ্রন যোগ করে। (Yas. xlviii. 10.)

জরাধুষ্ট্র রচিত গাধা হইতে উপরের স্তম্ভগুলি উদ্ধৃত করা হইল। ইয়ফার পরবর্তী অংশে, হোমা ইয়াটে, একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখা যায়। সোমরস দেবদেবীরাগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করুক এই প্রার্থনা করা হইতেছে। একবিন্দু সোমরস সহস্র দেবগণের বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট এইরূপ বলা হইতেছে। (Yas. x. 1, 6.)

উপরে আবেস্তিক ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাচা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, এই ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্যে কয়েকটি পর্য্যায় আছে। প্রথম পর্য্যয়ে আবেস্তিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম মিলিত এক মূল ধর্ম্ম ছিল এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সবগুলি না হউক অন্ততঃ প্রধান কয়েকজন ঋগ্বেদীয় দেবদেবীর উপাসনা, সোমমাগ ইত্যাদি এই মূল ধর্ম্মের

অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয় পৰ্য্যায় জৱাধুস্ত্ৰেৰ ধৰ্ম্ম-সংস্কাৰেৰ আন্দোলন আৰম্ভ হইল। ইন্দ্রাদি কয়েকজন দেবতাকে জাতিচ্যুত কৰিয়া দানব বা অপদেবতাৰ শ্ৰেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইল, সোম-যাগাদি বৰ্জন কৰা হইল। মঙ্গলময় ঈশ্বৰ ৰূপে অহৰ মাজদাৰ উপাসনা প্রচলিত হইল, সকল অমঙ্গলেৰ হেতু আহৰিমান তাঁহাৰ প্ৰতিদম্বীৰূপে কল্পিত হইল। অহৰ মাজদাৰ প্ৰতীকৰূপে অগ্নিৰ উপাসনা প্রচলিত হইল। গাথা অংশে উপাস্ত বা স্তুতিভাজন আৰু কেহ নাই। তাৰপৰ তৃতীয় পৰ্য্যায় প্ৰধান দেবদূতগণেৰ (Fravshis), অমর মানব-হিতৈষী-গণেৰ (Amesha Spentas), পৃথিবীৰ ও অগাছ জী-দেবতাৰ (gena) সদগুণসমূহেৰ (Asha Vahumano) স্তুতি আৰম্ভ হইল, প্ৰাচীন সোমযাগ সংস্কৃত হইয়া পুনৰায় দেখা দিল। ডাঃ হগেৰ মতে “There is an attempt to conciliate *Paoiryō-traesho*, men of the old creed, who were unwilling to forsake the ancient polytheistic religion and its time-honoured rites and ceremonies” অৰ্থাৎ পুৰাতন বহু-ঈশ্বৰবাদী ধৰ্ম্মেৰ অঙ্গৰূপ ক্ৰিয়া ও অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিতে অনিচ্ছুক প্ৰাচীন ধৰ্ম্ম-পন্থী-দিগকে তুষ্ট কৰিবাৰ একটা প্ৰয়াস দেখা যায়।

এই প্ৰাচীন বহু-ঈশ্বৰবাদী ধৰ্ম্মকে মূল ধৰ্ম্ম বলিয়া অনুমান কৰা যাইতে পাৰে। জৱাধুস্ত্ৰেৰ ধৰ্ম্মসংস্কাৰ এই প্ৰাচীন ধৰ্ম্মেৰ বিৰুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। এই ধৰ্ম্ম সংস্কাৰেৰ আন্দোলনেৰ ফলে বৈদিক আৰ্য্যগণ ইয়াৰ বা বালথ ত্যাগ কৰেন এইৰূপ মতপ্ৰকাশ কৰা হইয়াছে। ডাঃ হগেৰ মতে বৈদিক আৰ্য্যগণেৰ বালথ ত্যাগ কৰিবাৰ সময় ইন্দ্র তাঁহাদেৰ প্ৰধান উপাস্ত দেবতা ছিলেন এবং এই সময়ে অধিকাংশ ঋগ্বেদীয় স্তোত্ৰ ৰচিত হইয়াছিল।

এই মতানুসারে দাঁড়ায় যে, বৈদিক আৰ্য্যগণ জৱাধুস্ত্ৰেৰ সময় ইয়াৰ বা বালথ ত্যাগ কৰিয়া ভাৰতবৰ্ষ অভিমুখে প্ৰস্থান কৰেন। ইহা খ্ৰীঃ পূঃ ১২০০-১০০০ বৎসৰেৰ ঘটনা।

এই মত মানিয়া লইলে কতকগুলি প্ৰশ্ন উঠে। জৱাধুস্ত্ৰেৰ সময় পৰ্য্যন্ত ইয়াগীয়া আৰ্য্য ও বৈদিক আৰ্য্য একত্ৰ বাস কৰিতেন যদি এই কথা স্বীকাৰ কৰিতে হয়, তাহা হইলে মূল ভাষা হইতে জৱাধুস্ত্ৰেৰ ৰচিত গাথাৰ ভাষায় যে পৰিবৰ্তন এবং বৈদিক ভাষা ও গাথাৰ ভাষায় যে পাৰ্থক্য দেখা যায় তাহাৰ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বৈদিক আৰ্য্য বলিতে যাহাদেৰ বুকাৰ তাহাৰা জৱাধুস্ত্ৰেৰ আবিৰ্ভাবেৰ বহুপূৰ্বেই বালথৰ প্ৰাচীন ইয়াগীয়া গোষ্ঠীসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এইৰূপ অনুমান কৰা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক ভাষা ও গাথা ভাষাৰ পাৰ্থক্য যদি জাৰ্ম্মাণ ও ডাচ ভাষাৰ পাৰ্থক্যেৰ

অনুরূপ হয় এবং বৈদিক আৰ্য্য ও আবেস্তিক বা ইয়াগীয়া আৰ্য্য যদি একই জাতিৰ (race) দুইটি পৃথক গোষ্ঠী হয় তাহা হইলে জৱাধুস্ত্ৰেৰ কাল পৰ্য্যন্ত তাহাৰা এক বাসভূমিতে একসঙ্গে বাস কৰিত এইৰূপ অনুমান কৰা সম্ভব নহে। ভৌগোলিক ব্যবধান না থাকিলে গোষ্ঠীৰ পাৰ্থক্য ও ভাষাৰ পাৰ্থক্য গড়িয়া উঠিতে পাৰে না। আবেস্তায় দেব-ধৰ্ম্মাদিগেৰ ও দেব-ধৰ্ম্মেৰ পুৰোহিতদিগেৰ প্ৰতি আক্ৰমণ হইতে বৈদিক আৰ্য্যগণ জৱাধুস্ত্ৰেৰ সময়ে ভাৰতবৰ্ষে প্ৰস্থান কৰেন এইৰূপ অনুমান কৰা অপরিহার্য নহে। জৱাধুস্ত্ৰেৰ ধৰ্ম্মসংস্কাৰেৰ আন্দোলনেৰ পূৰ্বে যে প্ৰাচীন বহু-ঈশ্বৰবাদী ধৰ্ম্মেৰ অস্তিত্বেৰ কথা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহাৰ তিৰোধানেৰ পৰে যাহা পুনৰায় প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰিতে আৰম্ভ কৰে, তাহা অবশ্য প্ৰাচীন ইয়াগীয়া সমাজেৰ কোন কোন অংশেৰ মধ্যে ৰহিয়া যায়। ইহাৰাই প্ৰাচীন মতাবলম্বী; কিন্তু কেহ যদি এইৰূপ মত প্ৰকাশ কৰেন, যে দেবধৰ্ম্মকে গাথাৰ ও আবেস্তায় আক্ৰমণ কৰা হইতেছে তাহা বৈদিক আৰ্য্য ও ইয়াগীয়া আৰ্য্যেৰ বিচ্ছিন্ন হইবাৰ পূৰ্বেৰ বা সেই সময়কাল ব্যাপাৰ নহে, এই ধৰ্ম্ম ভাৰতবৰ্ষ হইতে পূৰ্বে ইয়াৰ অভিমুখে অগ্ৰসৰ হইয়াছিল ও জৱাধুস্ত্ৰেৰ আন্দোলন এই ভাৰতীয় ধৰ্ম্মেৰ বিৰুদ্ধে, এবং ঘন ঘন প্ৰতিমাপূজকদিগেৰ উল্লেখ হইতে মনে কৰা যায় যে, এই ভাৰতীয় ধৰ্ম্ম ঋগ্বেদেৰ অনেকটা পৰবৰ্ত্তীকালেৰ ব্যাপাৰ, তাহা এক কথায় উড়াইয়া দিবাৰ মত নহে। প্ৰতিমাপূজক ও প্ৰতিমাপূজকদিগেৰ অতিশয় দাস্তিক পুৰোহিতদিগেৰ উল্লেখ ব্যতীত এই সম্পৰ্কে আৰু একটা বিষয়েৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা যাইতে পাৰে। Travardin yasht-এৰ একস্থানে বলা হইতেছে, that ingenuous man (Zarathustra) who spake such good words, who was the source of wisdom, who was born before Gotam... গৌতম বুদ্ধ নিৰ্ৰূপ লাভ কৰিয়াছিলেন অনুমান খ্ৰীঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে। আলেকজান্ডাৰেৰ পঞ্চাব আক্ৰমণেৰ সময়ে বৌদ্ধধৰ্ম্ম পূৰ্বে আফগানিস্থানে প্ৰচাৰিত হইয়াছিল প্ৰাচীন গ্ৰীক ও ৰোমান লেখকদিগেৰ বিবৰণ হইতে ইহা জানা যায়। অৰ্দ্ধ শতাব্দীৰ অপেক্ষা অল্পকালেৰ মধ্যে উহা হিন্দুকুশ অতিক্ৰম কৰিয়া বালথ, স্তগদা ও পূৰ্ব দিকে বহুদূৰ প্ৰসাৰিত হয়। জেদ্দাবেস্তাৰ yasht অংশকে খ্ৰীঃ পূঃ ৪০০ অব্দেৰ রচনা বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, গ্ৰীক আক্ৰমণেৰ বহুপূৰ্বে বুদ্ধদেবেৰ নিৰ্ৰূপ লাভেৰ এক শতাব্দীৰ মধ্যে জৱাধুস্ত্ৰেৰ প্ৰসঙ্গে গৌতমবুদ্ধেৰ নাম উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন হইয়াছিল। স্মরণ কৰা যাইতে পাৰে যে অনেকেৰ মতে খ্ৰীঃ পূঃ ৬১০ অব্দ জৱাধুস্ত্ৰেৰ আবিৰ্ভাবকাল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় ধৰ্ম্মেৰ মধ্য এশিয়ায় গতিৰ বিস্তাৰ প্ৰমাণ আছে।

নব-সন্ধ্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩

মানুষ যে কাজটা করিতে চায় না, অথচ যেটা না করিয়া উপায় নাই, সব ছাড়িয়া আগে সেই কাজটা ধরে। আনন্দ আছে এমন কাজ মানুষ জিয়াইয়া রাখে, ধীরে-সুস্থে একটু একটু করিয়া স্বাদ লইয়া সম্পন্ন করে, যে কাজে বিতৃষ্ণা-বিরক্তি সেটা তাহার কাঁধের বোঝা, কোন রকমে তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া না ফেলা পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই।...বস্তির সেবায় টুলুর তাহাই হইল।

সেবাটা যে ঠিক কাহার হইবে, কি আকারের হইবে সে সম্বন্ধে মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে একটা পরামর্শ করিবার ঐর্ষ্য রহিল না টুলুর। সে যেন কোন রকমে তাঁহাকে একটা রিপোর্ট আনিয়া দিলে বাঁচে—এই আমি গিয়াছিলাম, এই আমার কাজ, এই আমি ফিরিয়াছি। কাজ শেষ করিবার তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজটা যে কি সেটা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসত হইল না।

বস্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাও নাই। চিরকাল আশ্রম ষাট্টিয়াই বেড়াইয়াছে, নদীর তীর, কিম্বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, তাহার পর বৃক্ষলতাগুচ্ছের স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রম—ছাদই হোক, খড়ের চালই হোক, তক্তকে বক্বকে কাঁচি ঘর, গেরুয়ায় ছোবানো বস্ত্র-উত্তরীয়-পরা শান্ত দৃষ্টি, ম্লহাস আশ্রমবাসীর দল—বাড়ীর বাহিরের জীবন সম্বন্ধে টুলুর এই ধারণা। এই নিশ্চিত, সন্তু-গুণাপ্রিত জীবনের সঙ্গে যাহা খাপ খায় না টুলু তাহা কখনও খোঁজে তো না—ই, বরং সব রকমে এড়াইয়াই আসিয়াছে। গঞ্জডিহি আসিয়াও সে আকৃষ্ট হইয়াছে এর বাহিরের সৌন্দর্য্যে, এর দূরের রূপে কি যে এর বেদনা, কি যে ধ্যান, কাছে গিয়া দৃষ্টি নত করিয়া দেখিবার না হইয়াছে প্রবৃত্তি, না অবসর। পাকেচক্রে এখন সেইটাই হইয়া পড়িয়াছে প্রয়োজন।

স্কুলের টিলা হইতে খানিকটা নামিয়া রাস্তাটা ভাগ হইয়া গেছে—একটা গেছে গঞ্জের দিকে সোজা, একটা একটু ডান দিক দিয়া ঘুরিয়া বস্তির দিকে। এটা সরু একটা ফালি গোছের, বস্তির যে কয়টি ছেলে স্কুলে পড়িতে আসে তাহাদের পায়ে পায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মশাইয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া টুলু এই পথই ধরিল। রাত্রি হইয়াছে; দূরে নিচের দিকে বস্তিটা—স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে একটা চাপা চঞ্চলতা অহতব করা যায়, মোমাছির চাকের মত। মাঝে মাঝে একটা শব্দও উচ্চকিত হইয়া উঠিতেছে। দূরের জন্ত আর চারি দিকের ধোঁয়ার জন্ত আলোকবিন্দুগুলা অস্পষ্ট। অপরিচিত, রহস্যময় কদর্য্য—তবু একটা অমোঘ আকর্ষণে টানিতেছে বস্তিটা। টুলু অগ্রসর হইতে লাগিল; ঢালু, পাথরে রাস্তার উপর এক একবার পা হড়কাইয়া যাইতেছে। যতই অগ্রসর

হইতে লাগিল ততই একটা প্রশ্ন মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল—কি করিতে হইবে তাহাকে? বস্তি ত এই কাছে আসিয়া পড়িল, তাহার কাজ কি? আরও কাছে আসিয়া মনে হইল সময়টাও ঠিক বাছা হয় নাই; এত রীতিমত রাত্রি, একটা অজানা জায়গায় এ সময় সেবার কাজ কি করা যাইতে পারে?

তবুও আগাইয়া চলিল। কর্মক্ষেত্রটা যতই স্পষ্ট হইয়া আসে, ততই কর্মের একটা স্পষ্ট রূপ দেখিতে চায়।...এক সময় টুলুর হঠাৎ মনে পড়িল—কেন, মাতব্বর দেখিয়া ইহাদেরই এক জনকে জিজ্ঞাসা করা যাক না—ইহারা কি চায়; কি ইহাদের অভাব-অভিযোগ; তাহা হইলেই তো কর্মপন্থা আপনি বাহির হইয়া আসে।...“অভাব-অভিযোগ!”—বাঃ, চমৎকার মনে পড়িয়া গেছে।...কথাটা টুলু মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখে; কোতুল না থাকায় নিতান্ত ঐর্ষিক, নিম্নস্তরের জিনিষ মনে হওয়ায় এতদিন ও-লইয়া মাথা ঘামায় নাই; এখন কাজের স্মৃচনা হিসাবে টুলু কথাটাকে ধরিয়া রহিল। গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে—“তোমারের অভাব-অভিযোগটা কি বল দিকিন।”

একটা অবলম্বন পাইয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। এখন, একেবারে বস্তিতে না প্রবেশ করিয়া বাহিরেই যদি কাহারও দেখা পাওয়া যাইত ত বেশ হইত; মাতব্বরগোছের হইলে ভালই, না হোক, মাতব্বরের নামধামটা দিতে পারে এমন কেহ।

তাহাও পাওয়া গেল।

রাস্তাটা বস্তিকে চক্রাকারে ঘিরিয়া, পিছনে রাখিয়া গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মাঝামাঝি ডান দিক থেকে একটা রাস্তা আসিয়া এই রাস্তাটার উপর দিয়া সোজা বস্তির দিকে চলিয়া গেছে। এটা খনি আর বস্তির যোজক। খনির দিক হইতে দুই জন লোক আসিতেছিল, আগাগোড়া এত কালো যে মনে হয় একটা অন্ধকার যেন ঘেঁষাঘেঁষি দুই জায়গায় জমাট হইয়া সচল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁধের উপর এক একটা কি ফেলা, খুব সম্ভবত খনির কোন হাতিয়ার, এক জনের মুখে পুরান্দমে-তানা একটা বিড়ির মত—কি দুই বার জলিয়া উঠিয়া মুখের বিকৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।...দেখিলে ভয় হয়, সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘৃণাও। তবুও একটা হাতে পাওয়া সুযোগ, টুলু দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

চৌমাথায় আসিয়া উহাদেরই একজন প্রশ্ন করিল—“তু কাকে চাস?”

মনে হইল টুলুকে লইয়া উহাদের মধ্যেও এতক্ষণ কিছু আন্দাজের চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রশ্নের উপরই দ্বিতীয়

ব্যক্তি দুই পাটি সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—
“আমি জানচি রে তু কাকে চাস।”

—সাদা সাদা চোখ দুইটা ঘুরাইয়া এমন ভাবে মাথাটা নাড়িতে লাগিল যেন মস্ত বড় একটা কৌতুক আছে সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে।

কেমন একটা অবস্থির মধ্যেই টুলু বলিল—“এ বস্তির মাতব্বর কে?”

মুখ চাওয়াচাওয়া করিয়া এবার ছুঁজনেই হাসিয়া উঠিল, ছুঁজনেই জড়াজড়ি করিয়া মাথা ছলাইয়া ছলাইয়া বলিল—
“জানচি রে জানচি, তু চরণদাসকে চাস; বাবুটি আচিস তু বটে।”

একজন আলাদা করিয়া বলিল—“জোয়ানটি আচিস বটে।”

হাসিটা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কথা আর বিকৃত হাসির ভঙ্গিতে গা-টা ঘিন্ঘনি করিতেছে,—ব্যাপারখানা কি? ...টুলু কিন্তু রহস্য সমাধানের দিকে গেল না। একটা কথা ঠিক—চরণদাস একজন সর্দার-গোছের কেহ, নামটাও বাঙালী-বাঙালী; টুলু প্রশ্ন করিল—“চরণদাসের বাসাটা কোথায়?”

—“ঐ হুণা, একাশি নদর ঘর। তু যাবি আমাদের সাধে?
—আয়।”

—হাসি তেমনি চলিতেছে, প্রতি কথাতেই। টুলু এক বার সামনের বস্তিটার পানে চাহিল। গা-টা ছমছম করিতেছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল, “না, আজ রাত হয়ে গেছে। একাশি নদর বাসা ত? কাল আসব দিনের বেলা।”

“কাল আসবে। বাবুটি কাল আসচে। চল খবরটি দিই।”

—বাংলায় এই পর্যন্ত বুঝা গেল, তাহার পর নিজেদের ভাষায় কি বলিতে বলিতে, আরও উৎকট ভাবে হাসিতে হাসিতে লোক দুইটা বস্তির পানে চলিয়া গেল। টুলু শুদ্ধ ভাবে আরও একটু দাঁড়াইয়া রহিল। কোন জিনিষই স্পষ্ট নয়—বস্তিও নয়, এদের কথাবার্তাও নয়, তবু সেই অস্পষ্টতার অন্তরালে যে জগৎটার আভাস পাওয়া যায় সেটা টুলুর পক্ষে সম্পূর্ণ এক নূতন জগৎ। তাহার সামনে দাঁড়াইতে সাহস বা অভিরুচি হইতেছে না বলিয়াই এত কাছে আসিয়াও, এমন একটা সুযোগ পাইয়াও টুলু আপাতত এক দিন বিলম্ব করিল। বস্তিটা পরিষ্কার করিবার সময় অনেক বারই ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিল—এদিকটা পিছন দিক, আবর্জনার উপর অন্ধকারের চাপ, সামনের দিক হইতে একটানা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে, এক জায়গায় যদি একটু নরম হইল ত আর এক জায়গায় একেবারে দিগুণ চতুগুণ জোর। কিসের ভারে টুলুর মনটা যেন হুইয়া পড়িতেছে, গতিটা হইয়া পড়িতেছে আরও শ্লথ। বাজী পৌছিতে রাজি হইয়া গেল; আহা করিল না, একটা ছুতা করিয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

সমস্ত রাত নিদ্রাও হইল না, পাশেই কোন্ বাজীতে একটি

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; নবজন্মের বেদনায় সে সমস্ত রাত আতনাদ করিয়া কাটাছিল; টুলুও তাহার সঙ্গে জাগিয়া রহিল।

নিদ্রা নাই হোক, সকালে যখন উঠিল, মনটা অনেকটা দৃঢ় হইয়াছে। দিনের বেলা কেন সে চরণদাসের ওখানে যাইবে? যাইতে হয় ত রাগেই, রহস্যটার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেখার মধ্যে যদি খানিকটা বাকিই রহিয়া গেল ত সে দেখার সার্থকতা কি?—কাল ভুল হইয়াছিল।

টুলু আর দিনের বেলা মাঠার মশাইয়ের কাছে গেল না। কেন, তাহা নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল না; শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল যে এর আগে, যাওয়ার চিন্তাতেই যে একটা আনন্দ পাওয়া যাইত সেটা নাই। অথচ শ্রদ্ধাও যে কিছু কমিয়াছে এমনও তো নয়।

বাসা থেকে বস্তিটা মাইলখানেকের কাছাকাছি। টুলু সন্ধ্যার একটু আগে বাহির হইল; যখন বস্তির সামনে পৌছিল হালকা একটু অন্ধকার নামিয়াছে।

লম্বা টানা খোলার চালের নিচে দুই সার বাসা, দেওয়াল-গুলা এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়া তৈয়ারী। অনেক জায়গায় চালের প্রান্ত ভাগের খোলা পড়িয়া গিয়া বাঁশ ও বাতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক বাসার সামনে একটা ছোট্ট দাওয়া, তাহার এক কোণে একটা করিয়া উলুন; দাওয়ার পিছনেই পর পর দুইটি করিয়া ঘর, খুপরি-বলিলেই ভাল হয়। বাসার লাইন দুইটা সমান্তরালে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝখানে হাত কুড়ি চওড়া একটা খালি জমি, ইট দিয়া বাঁধানো, দুই দিক হইতে ঢালু হইয়া আসিয়াছে, মাঝখানে একটা নর্দমা একেবারে এমুড়ো-ওমুড়ো চলিয়া গেছে। সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা তুমুল অরাজকতা—উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে-মেয়েদের দল; ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, তাহাদের ছানা, সব একসঙ্গে মিশিয়া গেছে। মেয়ে-পুরুষেরাও প্রায় সবাই জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, তাহার উপর গায়ে-কাপড়ে কয়লার ছোপ। এ জিনিষটা কোথাও বাদ নাই, হাঁসটাকেও পর্যন্ত হাঁস বলিয়া চেনা যায় না।

বাসার সামনে এক একটা করিয়া খাটুলি, তাহাদের দড়ি ঝুলিয়া প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়া গেছে। একটাতে একটা কুলি ধুতুকাকার হইয়া নির্জীবভাবে পড়িয়া আছে, একটাতে কয়েক জন ছেলেমেয়ে পড়িয়া ছটোপুটি করিতেছে, একটাতে একটা কচি শিশু শোয়ানো—পরিব্রাি চিংকার জুড়িয়া দিয়াছে। জানোয়ার, পাখী, মানুষ—ধাড়ি, কচি সবার কণ্ঠ হইতে একটা মিশ্র কলরব উঠিয়া বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিয়াছে। একটা জলের কল, কলসী, বালুতি, ডেকচি, গামলা—আরও নানারকম পাত্রে বোঝাই; মেয়ে-পুরুষের ঝগড়া, ইতর গালাগালিতে কানপাতা যায় না। ওদিকেও গোটা তিনেক কল, এই রকম জটলা।

প্রতিপদেই নূতন অভিজ্ঞতা, টুল তবুও অগ্রসর হইয়া চলিল, কেমন একটা জিদ ধরিয়া গেছে। শুধু শব্দ আর দৃশ্যই নয়, কতকগুলো দাওয়ায় রান্না আরম্ভ হইয়াছে, মাংস পোড়ার একটা উৎকট গন্ধ নর্দমার গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে নূতন ধরণের একটা তীব্র গন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটা বাসার মাঝের দেওয়ালের গায়ে আলকাতরা দিয়া ইংরেজীতে বাসার নম্বর লেখা, সেই গুলোও দেখিয়া দেখিয়া টুলু আগাইয়া চলিল। দু-এক জন কৌতূহলী হইয়া প্রশ্নও করিল, টুলু বলিল—চরণদাসের বাসায় যাব। দু-এক জন দেখাইয়া দিল, দু-এক জন অবহেলাভরে চুপ করিয়া রহিল, কেহ কেহ একটু বক্র হাসির সহিত মুখটা ঘুরাইয়া লইল; যাহারা দেখাইয়া দিল তাহারাও একটু হাসিয়া মুখ ঘুরাইল।

একশি নম্বর বাসাটা এ লাইনের একেবারে শেষ বাসা। এইখানে আসিয়া একেবারে চরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বাসার নিচেই পাঁচ-ছয় জন লোক নেশা করিয়া জটলা করিতেছে। একজন মাঝরয়সী লোক, মুখে ধোঁচা ধোঁচা গৌফ-দাড়ি, মাথায় বাবরি, একেবারে বেসামাল হইয়া নর্দমার ধারে পড়িয়া আছে। এক জন বোধ হয় তাহাকে তুলিতে গিয়া তাহার পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাতাল আর পাগলের মত ছেলেমেয়েদের কৌতুক উদ্বেক করিতে আর কেহই পারে না। এদের ঘিরিয়া বেশ একটু দল জটিয়াছে, নাচিয়া কুঁদিয়া, ছড়া আওড়াইয়া, নানা রকম প্রশ্ন করিয়া খেপাইয়া তুলিতেছে; তাড়া ধাইয়া, কুৎসিত গালাগালি ধাইয়া প্রবল উল্লাসে হাততালি দিতে দিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার জড়ো হইতেছে। টুলু একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল বিষবায়ুর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে তাহার মনটা নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল, এখানে আসিয়া যেন একেবারেই অসাড় হইয়া গেল। তাহার ছাব্বিশ বৎসরের জীবনে এ ধরণের অভিজ্ঞতা হয় নাই, এর কাছাকাছিও কিছু নয়, খানিকটা তাহার বাকস্মৃতিও হইল না। তাহার পর একটু সন্ধি হইলে বাসাটার পানে ঘুরিয়া চরণদাসকে ডাকিতে যাইবে, মনে হইল কে যেন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল; তাহার শরীরের উর্ধ্বভাগটা ঘরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেছে, নিচের ময়লা কাপড়ের যতটুকু নজরে পড়িল তাহাতে মনে হইল জীলোক। টুলু ডাকিল—চরণদাস আছ? ঘর হইতে কোন উত্তর আসিল না, উত্তরটা আসিল পিছন থেকে। এক জন নেশার গাঢ় ঘরে বলিল “চরণদাস ওখানে কোথায়?”

টুলু ফিরিয়া দেখিল দলের মধ্যে এক জন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। টুলু প্রশ্ন করিল—কোথায় চরণ দাস?”

আরও যাহাদের একটু সাড় ছিল পিট-পিট করিয়া টুলুর পানে বোধহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকটা কোন উত্তর না দিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া নর্দমার ধারে সেই প্রোচটার

কাছে উপস্থিত হইল। সে লোকটা পিঠে মাথা ঠেকাইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—তুলতে পারলিক নি বুড়োকে?

প্রোচের পিঠেই গোটাছুই ঠেলা দিয়া বলিল—অ্যাঁই, লতুন নিসপিকটার সায়েব; উঠ।

কথাটার দলের আর সবার মধ্যে একটু সাড় আসিল, যে যেমন ভাবে পারিল হাতটা কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল। এক জন উঠিয়া ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত তাড়া করিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চোখে-মুখে মাতালের গান্ধীর্ষ ফুটাইয়া সকলে চরণদাসকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। টুলুর যে মনটা অসাড় হইয়া গিয়াছিল তাহাতেই যেন একটা নেশার অদ্ভুত চৈতন্য জাগিয়া উঠিতেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর চরণদাসের একটু জঁস হইল, ঝাঁ হাতে ভর দিয়া, সামান্য একটু সোজা হইয়া বসিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। হাতটা কিন্তু পোতা ছিল নর্দমাটার একেবারে ধারে, হঠাৎ পিছলাইয়া গিয়া চরণদাস এবার নর্দমার মধ্যেই হুমড়ি ধাইয়া পড়িল।

মাথায় কোথাও চোট লাগিয়া থাকিবে, এবার আগের চেয়ে অল্প ডাকেই চৈতন্য হইল—যদিও অতি সামান্যই। সেটাও বিকৃত হইয়াই দেখা দিল; মাতালের অনিশ্চিত মনে সন্ধ্যের বদলে আসিয়া পড়িল ক্রোধ; গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—নেকালো! নিসপিকটারি চরণ দাসের কাছে?—নিসপিকটারি নিসপিক...

—এইবার চলিয়া বেশ ভালো করিয়াই নর্দমায় গড়াইয়া পড়িল।

এ সময় আরও একটা ব্যাপার হইল, বস্তির ঘরে ঘরে এক যোগে বৈদ্যুতিক আলো জলিয়া উঠিল। এও এক অদ্ভুত পরিহাস, জাতি-সংঘের আদেশ পালন—শ্রমিকদের অঙ্গলো চাই একেবারে সেরা। তা নহিলে নরক গুলজার হয় কিসে?

সেই গুলজার নরকের গায়ে, তাদের সঙ্গেই মানাইয়া, আরও একটি দৃশ্য যাহা টুলু কোন জন্মেই কল্পনায় আনিতে পারিত না। একশি নম্বর বাসার ঘরের ভিতরে চৌকাঠ ঘিরিয়া একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, বেশ পরিপাটি করিয়া একখানি পরিষ্কার শাড়ী পরা, সমস্ত পরিষ্কার করা মুখে বিদ্যুতের আলো গিয়া পড়িয়াছে। টুলুর দৃষ্টি পড়িতেই চৌকাঠ ডিঙাইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল—“এখন বাবার নাকি সাড় থাকে?—কারই বা আছে? আপনাকে তো নোতুন ইনিসপিকটারি-ই করে দিলে।”

—শেষে হাসিল একটু তরল শব্দ তুলিয়াই।

সামনের দিকে চলিয়া গেছে; টুলু আর বস্তির মধ্যে না গিয়া এই দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিল, তারপর হুন্ হুন্ করিয়া অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, ছোট্ট নাই তবু হাঁপাইতেছে। গল্পজিহ্বির এটা এদিককার শেষপ্রান্ত, একেবারে ফাঁকা, সবচেয়ে নিচুও; এখান থেকে সমস্ত জায়গাটা এক নজরে দেখা যায়—একেবারে দূরে ঐ কতাদেব কৰ্মচারীদের বাড়ী-কোঠা, অনেকগুলো দোতলা, আলোয় ঝলমল করিতেছে—পাড়াটার নামও পড়িয়াছে কতাপাড়া। তাহার নিচে খানিকটা আসিয়া বাজার; একেবারে এদিকে, বাঁ-দিকে গল্পজিহ্বির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় ঐ স্কুলটা, তাহার পরেই মাষ্টার মশাইয়ের বাসা, অন্ধকারে লিপ্ত ঐ কাঞ্চনগাছটা দেখা যাইতেছে। টুলুর মনে অদ্ভুত একটা আনন্দের জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সেটা যে শুধু ঐ নরককুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার জুই তাহা নয়, তাহার মধ্যে আরও একটা বৃহত্তর মুক্তির উল্লাস রহিয়াছে। বস্তি যে কি নরক পণ্ডিতমশাই সেটা নিশ্চয় সম্পূর্ণ জানেন না; এবার টুলুর এ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি।

নিচের এই উল্লুখ প্রাঙ্গণ আর উপরের অসীম আকাশের সঙ্গে আর মিলাইয়া টুলু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন নিজের জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে।...তবু সজ্ঞ অভিজ্ঞতার কথাটা আগাগোড়া আর একবার মনে পড়িয়া গেল,—সব শেষে সেই মেয়েটি। টুলু বেশ বুঝিতে পারিল ও-ই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কাল থেকে আজ পর্যন্ত চরণদাসের বাড়ি খোঁজা লইয়া যত বিজ্ঞপ, বক্র হাসি, বাঁকা চাহনি, এতক্ষণে সমস্তরই অর্থ বুঝা গেল। সমস্ত শরীরটা বার বার সিঁড়ি সিঁড়ি করিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সব ছাপাইয়া একটা আনন্দ, একটা বোঝাপড়া হইয়া গেছে, আর কি? টুলু বেশ ভাল করিয়া সমস্ত জায়গাটার একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। রাস্তা নাই এখান থেকে, তবে সোজাঝুজি গেলে একটা না একটা পাইয়া যাইবে নিশ্চয়।

স্কুলের দিকটায় বিদ্যুতের আলো নাই, উঁচু-নীচু ডাঙিয়া যখন পৌঁছিল তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গেছে। মাষ্টার মশাই কি এতক্ষণ কাঞ্চনতলায় থাকিবেন?...চিপটিটার দিকে যাওয়ার আগে টুলু বাসার সামনে দাঁড়াইয়াই একটা হাঁক দিল, “স্তার বাসাতেই আছেন?”

“কে? দাঁড়াও আসি।”

খড়ম পরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতেই প্রশ্ন করিলেন, “টুলু নাকি?”

ছয়ার খুলিয়া বলিলেন, “তাইতো দেখছি। অনেকক্ষণ কাঞ্চনতলায় অপেক্ষা করে ডাবলাম—যাঃ, দিলাম বুঝি ভড়কে টুলুকে; মনটা এত ধারাপ হয়ে গেছে।”

উঠানের ওদিকে রান্নাঘর, উনানে আগুন জ্বলিতেছে, উপরে কি একটা চড়ানো।

টুলু অতিমাত্রা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “রাঁধছিলেন স্তার?—আপনি রান্না করছিলেন।”

“মনটা ধারাপ হয়েছিল বটে টুলু, তা বলে কি এত ধারাপ হয়েছিল যে রান্না-খাওয়া ছেড়ে দোব?”

—বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন মাষ্টার মশাই।

টুলু একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, “না, বলছিলাম নিজের হাতেই রাঁধেন আপনি?”

মাষ্টারমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “এবার তুমি সত্যি হাসালে টুলু,—তোমায় আমি পরের সেবা করবার উপদেশ দিচ্ছি, আর এদিকে আমার নিজের হাতই আমার নিজের পেটের সেবা করবে না?”

ছয়ারটা একটু ঠেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, “ভেতরে এস; কি খবর? এত দেরি হ’ল যে?”

ছয়ারটা বন্ধ করিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে, বলিলেন, “বরং অজ্ঞভাবেই জিগ্যেস করি,—এতটা দেরি হয়ে গেল, তবুও এলে যে?...এস বারান্দায় ঐখানটায় বসি, তুমি ঘর থেকে ঐ চেয়ারটা বের করে নিয়ে এস। না, কাঞ্চনতলাতেই যাবে?”

টুলু একটু সঙ্কচিত ভাবে বলিল, “রান্না চড়ানো রয়েছে স্তার, আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেটা।”

মাষ্টার মশাই আবার একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তুমি এলে, আর রান্না ভোলবার মতনও আনন্দটুকু হবে না আমার—টুলু?”

টুলু আরও লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, “আমার এত সৌভাগ্য স্তার?”

“যার আনন্দ, সৌভাগ্য ত তারই টুলু। বেশ, এইখানেই বস। যাক।...দাঁড়াও বরং, ভাতের হাঁড়িতে ছোট্ট আলু ফেলে দিয়ে আসি। তুমি যাওয়ার পর আমার আনন্দও থাকবে না, তার ওপর যদি আবার আলুভাতেটুকুও না থাকে...”

হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে পা তুলিয়া গুছাইয়া বসিলেন; প্রশ্ন করিলেন, “তার পর, কি খবর বল।”

টুলু বলিল, “হ’ল না স্তার।

—চেপ্টা সত্ত্বও বিফলতার উল্লাসটা চোখে-মুখে ঠেলিয়া আসিয়াছে।

মাষ্টার মশাই মুহূর্ত কয়েক বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কি হ’ল না টুলু?”

টুলু একটু ভূমিকার সহিতই আরম্ভ করিল এবং তাহার আন্তরিকতা যে কত বেশী সেটা বুঝাইবার জন্য ভূমিকায় প্রচুর কল্পনার সাহায্য লইল—কপালাভ করিতে হইলে মন জোগাইয়া চলিতে হইবে তো আবার? বলিল—যখন

থেকে আপনার কাছে জানতে পারলাম যে সেবা-ব্রতই সব চেয়ে বড় ব্রত, সেবাই আত্মসম্মতির একমাত্র উপায়, তখন থেকে কাজে নেমে পড়বার জন্তে মনটা বড়ই অস্থির হয়ে রইল স্ত্রীর। এখান থেকে ফিরতি সোজাই বস্তিতে নেমে গেলাম, ভাবলাম শুভম্র শীত্রম্, তাহলে আর দেরি করা কেন? ওদের অভাব-অভিযোগটা কি জানবার জন্তে খোঁজ নিয়ে বুঝলাম ওদের সর্দার হচ্ছে চরণদাস। চরণদাসের সঙ্গে কিন্তু দেখা হ'ল না কাল। মনটা যে কি খারাপ হয়ে রইল সমস্ত রাত! কাজটা আরম্ভ করে আপনার কাছে মুখ দেখাতেও পারছি না এদিকে—

মাষ্টারমশাই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু কি আরম্ভ করতে চুঁলু?—তোমায় কোন রকম একটা ধারণা দিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।

চুঁলু মাষ্টার মশাইয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বেশ একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর বলিল—সেইটেই ঠিক করবার জন্তে আজ সন্ধ্যার সময় চরণদাসের বাসায় গিয়েছিলাম—একাদশ নম্বরের বাসা—সেইখান থেকে সোজা আসছি।

প্রমাণ হিসাবে বাসার নম্বরটা পর্বস্ত বলিয়া দিয়া চুঁলু চুপ করিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করিয়া বলিল—জিগ্যেস করতে গিয়েছিলাম—তাদের অভাব-অভিযোগটা কি—মানে, অভাব-অভিযোগগুলো না জানতে পারলে তো আর...

“কমিশন বসানো চলবে না।”

—মাষ্টার মশাই কথটা বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতেই আবার বলিলেন—তোমার কথাগুলো রাতারাতি আমাদের বিলিতি কর্তাদের মতন কি করে হয়ে উঠল ভেবে সারা হুঁজি চুঁলু—অভাব-অভিযোগ, তারপর কমিশন, তারপর রিপোর্ট, তারপর অর্থাভাব সবশেষে সেই ফক্কির—আবার যথাপূর্ব্ব তথা পরম্—দেড়শ বছরের এই ইতিহাস। অভাব-অভিযোগের কথা জিগ্যেস করতে গিয়েছিলে—সমুদ্রকে যদি জিগ্যেস করা হয় কোনখানটা তার নোনা তো কি তার উত্তর হবে চুঁলু?

এক একটা হাসি একেবারে অন্তস্তলে গিয়া হানা দেয়; চুঁলু বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, শেষের কথাটির মুখ তুলিয়া চাহিল। ভূমিকা করিতে যাওয়াটাই ভুল হইয়াছে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে, তাহার আসল বক্তব্যটায় আসিয়া পড়ায় যেন বাঁচিল, একবার আরম্ভ করিয়া মাঝপথে কোথাও আর থামিলও না; বলিল—

“সেই কথাই বলছিলাম স্ত্রীর, কত যে ছুঃখ ওদের, কত রকম গ্লানিতে ভরা যে ওদের জীবন তার আর হিসেব হয় না। চালে খড় নেই, কোমরে কাপড় নেই বললেই চলে। অন্নের বদলে ওদের যা খেতে হয় তাতে অন্ত্রপ্রাশনের ভাত উঠে আসে; নেশাভাঙ তো মেয়েছেলেদের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে চুকেছে; ছাখানা

চাঁনা চালার খুপির মধ্যে এমন জাত নেই যা পাওয়া যায় না। ভাষা বুঝা না গেলেও ওদের কথার মাত্রাই যে অতি কুৎসিত গালাগাল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বস্তিতে চুকেই আর এক পা এগুতে প্রবৃত্তি হয় না স্ত্রীর, তবু আমি মনের সমস্ত জোর দিয়ে এগিয়ে চলেছি—এই পথেই যখন কত ব্যা তখন চোখ-কান বুজে এগিয়ে যেতেই হবে—ছু-পা এগুতেই আরও কদর্য একটা কিছু যেন পথ আগলে দাঁড়ায়—ছেলেমেয়েরা খেলা করছে কি মেয়ে-পুরুষে কলতলার জল নিতে এসেছে—একই রকম ব্যাপার—যেমন কুৎসিত তেমনি নোংরা, তেমনি মুখের ভাষা—নরক যেন পাতাল ঠেলে উঠে এসেছে। গ্রামের মধ্যেও মানুষের ছুঃখ-কষ্ট দেখেছি, কিন্তু এরা যেন মানুষের স্তর থেকেই নেমে গেছে। যাক তবুও এগিয়েই চললাম আমি—আপনি বলেছেন অবস্থা যতই হীন সেবার স্বেপচা ততই বেশী—সেই নরকছু ঠেলে কোন রকমে চরণদাসের বাসার সামনে এসে পড়লাম; একটা দস্তুরমতো অভিযান, কোথা থেকে যে মনের জোর পেলাম নিজেই বুঝতে পারি না। সেখানে এসে দেখি একেবারে চরম, কোনও উপায় নেই, একেবারে শিবের অসাধ্য রোগ।

চরণদাস নেশায় চুর হয়ে বস্তির নর্দমার কাছে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে আরও পাঁচ-ছ জন, সবার অবস্থাই প্রায় ঐ রকম, তবে চরণদাস একেবারেই বেহঁস। আমি অমন দৃঢ় কখনও দেখিনি স্ত্রীর, না দেখলে কল্পনার মধ্যেও আনতে পারতাম না যে, মানুষ নিজেকে একেবারে অমন করে ভুলতে পারে। অসহ হয়ে উঠেছিল, তবু রইলাম একটু দাঁড়িয়ে, যখন এসেছি শেষ দেখেই যাই। ওরা আমার নতুন ইনস্পেক্টার বাবু বলে ঠাউরেছে, যাদের একটু হাঁস ছিল তারা বোধ হয় ভয় পেয়ে চরণদাসকে তোলবার চেষ্টা করলে। একবার উঠতে গিয়ে চরণদাস নর্দমার মধ্যে মাথা গুঁজড়ে পড়ল, তারপর দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে সোজা হয়ে বসে কটমটিয়ে আমার পানে চৈয়ে রইল—চুলে নর্দমার পাক লেগে জট পাকিয়ে গেছে, জামাতে কাপড়ে নর্দমার পাক, তার ওপর আপাদমস্তক কয়লার কালিতে ঢাকা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, আর মুখের হাড়গুলো এতখানি করে বেরুনো; আর সে কী চোখ!—নেশায় টকটকে লাল, এতখানি করে গর্তের মধ্যে ছোটো আঙুলের ভাঁটীর মতন জলছে, নেশার জন্তেই স্থির নয়, এক একবার নরম হয়ে এক একবার দিগুণ চতুঃপাণ্ডে জলে উঠছে। ইনস্পেক্টার এসেছে শুনে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল, তারপর হঠাৎ তেড়েই চিংকার করে উঠল—‘নেকাণো! নিস্পিক্টিরি চরণদাসের কাছে!’...সে রকম অদ্ভুত বিকৃত গলার আওয়াজ আমি কখনও শুনি নি স্ত্রীর—গলাটা যেন ওর চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। তারপরই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে একেবারে তালগোল পাকিয়ে আবার নর্দমার মধ্যে পড়ে গেল। আমি জ্যান্ত নরক দেখে এই ফিরছি স্ত্রীর।”

টুলু একটু থামিল। মুখটা কৃষ্ণিত হইয়া গেছে, বলার গানিতেই তাহার সমস্ত শরীরটা যেন ক্লেদাক্ত। মাষ্টার মশাই কি বলিতে যাইতেছিলেন, টুলু আবার স্মৃতির আলোড়নে যেন মূতন করিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ, এইখানেই শেষ নয়, এর চেয়েও একটা কুৎসিত ব্যাপার স্মার, কিন্তু সে আপনাদের সামনে আমি মুখ দিয়ে বের করতে পারছি না...”

মাষ্টার মশাই এক দৃষ্টে টুলুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার মুখের রেখায় কি যেন একটা পাঠোদ্ধার করিতেছেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—“চরণদাসের মেয়ে চম্পা?”

এবার টুলুর চাহিয়া থাকিবার পালা, তাহার দৃষ্টিতে বিষ্ময়ের যেন অন্ত নাই।

প্রশ্ন করিল—“আপনি জানেন?”

“বস্তির সব চেয়ে বড় ট্রাজেডির কথা জানব না?”

“এর পরে আমায় কি করতে বলেন তাহলে?”

“আগে যা বলেছিলাম তাই—অর্থাৎ সেবা করতে।”

টুলু একটা মন্ত বড় ঝাঙ্কা খাইল। সে নিজের মুক্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছিল, এত ব্যাপারের পরও যে আবার তর্ক করার দরকার হইবে এটা ভাবিতেই পারে নাই। একটু ভক্তিত হইয়া থাকিয়া বলিল, “কিন্তু সেবা নেবে কে বলুন? চরণদাস—ওদের সর্দার—যার ভরসায় আমার যাওয়া তার নিজের অবস্থাই ত আপনাকে বললাম।”

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, বলিলেন—“তুমি কি সেবা করতে গিয়েছিলে টুলু? কথটা এই জগ্রে জিগ্যেস করছি—তুমি যে সব সাহচর্য খুঁজে বেঁচে গেলে এ পর্যন্ত তার অনেক ক্ষেত্রে সেবা কথটার মানে হচ্ছে পা টেপা আর গাঁজা সেজে দেওয়া। আমায় শপথ করিয়ে নাও, এ ধরনের কোনটাতে চরণদাস তোমায় অমন করে চোখ রাঙিয়ে উঠত না।...দাঁড়াও, আসছি ভাতের হাঁড়ি বড়বড়ানি লাগিয়েছে।”

কিরিয়া আসিয়া টুলুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইলেন, তাহার কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ দিয়া বলিলেন—“কথাগুলো আমার একটু কড়া হয়ে পড়ল, না? কিছু মনে করো না বলে সাধুনা দোব না টুলু। তোমার যত দূর যা মনে করবার করো, তার পরেও যদি মাষ্টার মশাইকে অন্তরের সঙ্গে নিতে পার, সেই

নেওয়াই আসল নেওয়া।...এইবার কাজের কথায় আসা যাক—তুমি কাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করছ যাতে বস্তির কাজে তোমায় নামতে না হয়।...কথটা বড় আশ্চর্য বোধ হচ্ছে না? কাল থেকে তুমি এ হাদ্ধামটা কোন রকমে চুকিয়ে আমার কাছে একটা জবাবদিহি তৌয়ের করবার জগ্রে এত ব্যস্ত আছ যে মনের প্রবঞ্চনাটা ধরবার অবসর পাও নি। মুকোচুরিতে মনের মূতন অত বড় খেলোয়াড় আর নেই টুলু; আজ হাদ্ধাম চুকেছে, বাঁড়ী গিয়ে স্থির হয়ে নিরপেক্ষ ভাবে ভেবে দেখ, দেখবে আমি মিথ্যে বলছি না। কাজ কিভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমিই তোমার রাস্তা বাৎলে দিতাম, আর সেটা নিশ্চয়

চরণদাসের বাঁসার রাস্তা হ’ত না। তবুও, অভিজ্ঞতা একটা যখন হ’লই, সেটাকে জীবন থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। চরণদাস বস্তি-জীবনের একটা টাইপ ত বটে; তুমি ওকে কি রকম দেখবে আশা করেছিলে?”

“অন্তত এত খারাপ দেখব এ ধারণা ছিল না; মাহুষের বাইরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত বস্তিটাই তাই মনে হ’ল। সেবা মাহুষের করতে পারা যায়, কিন্তু...”

মাষ্টার মশাই মুহূ হাসিয়া টুলুর কাঁধে একটা হালুকা চাপ দিয়া তাহার উচ্ছ্বাসটা বন্ধ করিলেন, বলিলেন—“চরণদাস ঠিক এই রকমই হবে, এক চুল এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয়; বস্তির আর সবাইয়ের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তুমি তাড়া-তাড়ি সেবায় নামতে গিয়ে যে পরিণামটা দেখে শিউরে উঠেছ, তার কারণটা দেখনি বলেই। ওদের যা জীবন, যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, যে ভীষণ অবিচার-অত্যাচারের মধ্যে যা অমাহুষিক ওদের খাঁটুনি, তাতে নেশা না করলে ওরা এক দিনও বাঁচবে না।...তুমি বাঁচা আর নেশা না করার মধ্যে কোনটাকে বড় বল টুলু?”

“নেশা না করা স্মার, এতে আর মতামত কি থাকতে পারে?”

“আমি কিন্তু বলি বেঁচে থাকা।”

“ঐ রকম নেশাখোর হয়ে বেঁচে থাকার দরকার কি স্মার?”

“দরকার এই যে বেঁচে থাকলে এক সময় ভাল করে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, স্বষ্টি-পরিকল্পনায় সে সম্ভাবনা যে একটা বিরাট জিনিষ। মরে গেলে যে সবই গেল শেষ হয়ে।...যাক, এ কথটা একটু অবাস্তব এসে পড়ল। আমাদের কথা হচ্ছিল চরণদাস তার অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। তা যদি হয় ত দোষটা ত ওর নয়। আর এটা যদি স্বীকার করো ত সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কি স্বীকার করো না?”

“অবস্থা জিনিষটা তো আর্যমুদ্রাক্ট কিছু নয় স্মার, তার পরিবর্তন ঘটানো মানে ত ঐ ধরনের মাহুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করা।”

“আজ সেটা যত কদর্য বলে মনে হচ্ছে, একটু অভ্যাস হয়ে গেলে ততটা নাও হতে পারে।”

“মন যদি কোন সময় এমন কদর্যতাকে গায়ে না মাখে তো সেটা মনের অবনতি নয় কি স্মার?”

“কথটা তোমার একেবারে কঁলে দেওয়া যায় না টুলু। কিন্তু কাউকে তোলবার জগ্রে যদি একটু ঝুঁকতে হয় তো উচিত নয় কি ঝোঁকা?...কিন্তু তর্ক এখন থাক। যদি চরণদাসকেই এখানকার বস্তি-জীবনের উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া হয় তো যে-কোন মহাপুরুষই এই অবস্থার মধ্যে পড়লে চরণদাস হয়ে যেতে বাধ্য কিনা সেটা একবার খতিয়ে নিলে হয় না?...আজ রাত হয়ে গেছে, তুমি...”

মাষ্টার মশাই মনে মনে একটু হিসাব করিয়া লইয়া বলি-

লেন—“পূর্ণ রবিবার আছে, তুমি বেলা তিনটের সময় এক-বার এসো আমার কাছে।”

৫

দিন সাতেক টুলুর আর একেবারে দেখা নাই। মাষ্টার মশাই কানুনতলাটিতে আসিয়া নিয়মিত ভাবে, বসেন। এক এক দিন নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ বড় বেশি জমিয়া উঠে। একটা শিকার হাতের মধ্যে আসিয়া আবার ছাড়িয়া গেলে হিংস্র জন্তুর যেমন অবস্থা হইয়া উঠে, মাষ্টার মশাইয়ের অবস্থাও হইয়া পড়ে অনেকটা সেই রকম। চাপা আক্রোশে গর্জাইতে থাকেন—“ও ভেবেছে আমার কাছ থেকে ওর নিষ্কৃতি আছে—পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে—ওর ধর্ম ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে!—ধর্ম...সে এবার সরে দাঁড়াক আসর ছেড়ে, মুখোস ফেলে দিয়ে, নইলে এই টুলুকেই মাঝে রেখে আমাদের বোঝাপড়া আরম্ভ হবে, আর এটাও ঠিক যে সে বোঝাপড়ায় আমি হারব না!—এক এক সময় একেবারেই নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকেন সামনে যে-কোন একটা জায়গায় দৃষ্টি ফেলিয়া, কিন্তু যেন সমস্ত দৃষ্টপটটাকে চোখের মধ্যে ভরিয়া লইয়া; একটা নিঃশব্দ মমতায় চোখ দুইটি নরম হইতে হইতে সজ্ঞ পর্যন্ত হইয়া উঠে, মাষ্টার মশাই যেন সবার কারা নিজের বৃক্কে জমা করিয়া লইয়াছেন। এ ভাবটা কিন্তু স্থায়ী হয় না; আবার আসে জালা, আবার টুলু, আবার তাহার ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করার প্রতিজ্ঞা।

অন্ধকার হয়ে গেলেও ওঠেন না। স্থলের বুড়া চাকর বন-মালীকে ডাকিয়া বলিয়া দেন তাহার হাঁড়িতেই চালটা ছাড়িয়া দিতে। তাহার পর সে রান্নার পাট সারিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে বস্তির গল্প হয়। লোকটা চরণদাসের বাবা; আগে কি রকম ছিল বলা যায় না, তবে এখন যেন একটু মাথা খারাপ হইয়া গেছে। নিজে হইতে কথা কয় কম, তবে দম দিয়া যাইতে পারিলে নিঃশব্দে বক বক করিয়া বকিয়া যাইতে পারে—ঠিক একটা গ্রামোফোনের মতোই—স্বতির রেকর্ড একখানি করিয়া তুলিয়া দিলেই হইল, বনমালী আওড়াইয়া যাইবে; চম্পার কথাও বলে—যেন তাহার নাতনি নয়, যেন কোন সম্পর্কই নাই তাহার সঙ্গে।

চরণদাসের আগে বনমালীই ছিল একাশি নগর বাসায়, কাজ ছাড়িয়া ছেলের সঙ্গেও অনেক দিন ছিল; বস্তি-জীবনের একটি বিশ্বকোষ।

মাষ্টার মশাইয়ের একটা বিশেষত্ব—টীলা ছাড়িয়া কখনও নিচে নামেন না। নিম্নতম সীমা স্থল, উচ্চতম সীমা কানুনতলা, এর মধ্যে তাঁহার দিনরাত। এবারে কিন্তু সাত দিনের দিন তিনি নামিলেন। ঐ শিকারের উদাহরণই দিতে হয়—সে যখন এ তল্লাট ছাড়িয়াছে তখন নিজের ঝাঁটটুকু আগলাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না তো।

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইলে মাষ্টার মশাই নামিলেন। বাজারে ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানির ঔষধবিভাগ, ষ্টেশনারি বিভাগ লইয়া বেশ বড় দোকান। টুলু নাই। মাষ্টার মশাই অবশ্য রাত্তা হইতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিলেন, কেন না টুলু আবার দেখিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। টুলু থাকিলে তিনি আশেপাশে অপেক্ষা করিতেন, তাহার পর বাহির হইলে ধরিতেন এই ছিল শিকারের ধ্যান। দোকানে না পাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন, কতটা পাড়ার এক প্রান্তে টুলুর কাকার বাড়ি। ঐ প্রচ্ছন্ন ভাবেই সন্ধান লওয়া; টের পাওয়া গেল সেখানেও টুলু নাই। আক্রোশে নিজের প্রতিদ্বন্দী—অর্থাৎ টুলুর ধর্মের সঙ্গে বাগ যুদ্ধ করিতে করিতে মাষ্টার মশাই টীলার দিকে ফিরিলেন। সে-ই জিতিয়াছে, তবে এটা যেন সে অবধারিত সত্য জানেন, তাহার জয়, তাহার এ উল্লাস ক্ষণিক।

টীলার নিচেটিতে আসিয়াছেন, দেখেন তাঁহার বাসা হইতে একটা ছায়ামুগ্ধি বাহির হইয়া নামিয়া আসিতেছে, পরক্ষণেই বৃষ্টিতে পারিলেন—টুলু। একটু কাছাকাছি হইতে বলিলেন—“তুমি এখানে?—এদিকে তোমার জন্তে আমি সারা গল্প ডিহি এক করে বেড়াচ্ছি। একেবারে হুগুকে হুগু দেখা নেই যে?”

টুলু মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্তত করিয়া, মাষ্টার মশাই নিবারণ করিবার আগেই ঝুঁকিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইল, বলিল—“এবার আর মানা মানলাম না স্থার, বড় একটা শুভ খবর নিয়ে এসেছি।”

অন্ধকার হইলেও বুঝা যায় তাহার মুখটা রাস্তা হইয়া উঠিয়াছে, গলার স্বরও একটু আবেগকম্পিত।

প্রশ্ন করিলেন—“খবরটা কি টুলু?”

একটু হাসিয়া বলিলেন—“শুভ বলছ অথচ ফল—অবাস্যতা।”

“আমার খোঁজার পালা শেষ হয়েছে স্থার, এতদিনে আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি। আমি বিদায় নিতেও এসেছিলাম, কেননা আমার আর এখানে থাকা একেবারে অনিশ্চিত; তা ভিন্ন বড় ইচ্ছে ছিল আপনিও যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন...”

দারুণ নিরাশায় অন্ধকারের মধ্যে মাষ্টার মশাইয়ের চোখ দুইটা একবার জলিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন—“দেখা! দেখা কার সঙ্গে টুলু—কোন...”

আর একটা উগ্রতর কি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, নিজেকে সংবৃত করিয়া লইলেন এবং টুলু অন্ধকারে ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই মুখটা একটু ফিরাইয়া লইয়া চোখের দৃষ্টিটা শাস্ত করিয়া লইলেন, বলিলেন—“ভেতরে চল টুলু; বড় ঘুরিয়েছ, ভাল খবর একটু ভাল ভাবে নেওয়ার মতন অবস্থাটা ক’রে নি।”

বনমালীকে ডাক দিলেন, বাহির হইলে বলিলেন—
“চাল ভাল বের করে নিয়ে আসবি চল, তোর হাঁড়িতেই
ফুটিয়ে দিস।”

টুলু বিম্বিত ভাবে মুখের পানে চাছিল; মাষ্টার মশাই
প্রশ্ন করিলেন—“কি?”

“কিছু না তো।” তাহার পর যেন অহুচিত জানিয়াও
প্রশ্নটা কোনমতে চাপিতে পারিল না, এইভাবে বলিল—“মানে,
ওর রান্না খাবেন আপনি?”—নাসিকটা একটু কুঞ্চিত হইয়া
উঠিয়াছে।

মাষ্টার মশাই হাসিলেন, বলিলেন—“নিজের হাতে রাঁধব
তাতে আপত্তি, বনমালী রেঁধে দেবে তাতে আপত্তি—তা
হ’লে?”

টুলুও লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল—“না স্তার, সে কথা
বলছিলাম না। আর সত্যিই ত, আপনাদের মতন যারা
উঁচুতে উঠে গেছেন, তাঁরাও যদি এটুকু সংস্কারমুক্ত না হতে
পারেন তো...”

দু-জনে আসিয়া বারান্দায় চেয়ার লইয়া বসিলেন।
টুলুকেই আরম্ভ করিবার একটু সময় দিয়া মাষ্টার মশাই
বলিলেন—“তারপর? তোমার কথার ধাঁচে মনে হচ্ছে
এবার তুমি সত্যিই এক জন বড় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছ।
সমস্ত হুগুটি তাঁর কাছেই ছিলে নাকি?”

“না, তিনি কল্যাণ পরশু এসেছেন।”

“এখানে?”

“এসব জায়গায় তো তাঁদের পায়ের ধূলো পড়বার নয়
স্তার—দেখতেই পাচ্ছেন ত জায়গার স্ত্রী। তিনি এসেছেন
বালিয়াড়িতে।

“সিদ্ধ বাবা তা’হলে?”

টুলুর মুখটা সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—
“আজ্ঞে হ্যাঁ; পরশু এসেছেন। এই পাঁচ-ছয় দিন নাগাড়ে
ঘুরেছি স্তার। প্রথমটা শুনলাম বরাকরে আবির্ভাব হয়েছেন,
নদীর ধারে আস্তানা গেড়েছেন। ছুটলাম সেখানে; গিয়ে
শুনলাম ঘণ্টা-কয়েকের দেরি হয়ে গেছে, এক মারোয়াড়ী
শিষ্যের ওখানে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ আগেই মুলুটিতে এক
শিষ্যকে রূপা করতে গেছেন। ছোট্ট সেখানে;—সে আবার
বিটকেল জায়গা, পথের ঠিক সন্ধান না পাওয়ায় একটু
ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যেতে হ’ল। পৌঁছে জানতে পারলাম
একটা দিন ছিলেন, সেখান থেকে এসেছেন পিরুলিতে, বাবার
এক জমিদার শিষ্যের ওখানে,—তারই মোটর গিয়ে নিয়ে
এসেছে। পিরুলি এসে শুনলাম তিনি সেইদিনই বালিয়াড়িতে
চলে এসেছেন, গঞ্জডিহির সাহাদের বাগানবাড়ীতে। পিরুলি
থেকে বালিয়াড়ি ঝাড়া সতের মাইল। একটা মোটর সার্ভিস
ছিল, তাও সাত দিন থেকে তেলের অভাবে বন্ধ। যা পরি-
শ্রমটা হ’ল স্তার, কিছুদিন মনে থাকবে।”

মাষ্টার মশাই যেন দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন
করিলেন—“হাঁটলে সতের মাইল?—ঐ ঘোরাঘুরির পর।”

তৃত্ত্ব হাসিতে টুলুর মুখটা একটু এলাইয়া পড়িল, বলিল—
“একটু না ঘুরিয়ে তো ওঁরা দেখা দেবার পাত্র নন স্তার—
খানিকটা পাপক্ষয় হওয়া চাই ত?”

মাষ্টার মশাই মুখটা ফিরাইয়া লইলেন, বেদনায় কুঞ্চিত
হইয়া উঠিয়াছে, নিরুপায় ভাবে একটা বিরাট অপচয় দেখিলে
যেমন হয়। “উস্!” করিয়া চাপা একটা শব্দও বাহির
হইয়া পড়িল মুখ দিয়া। টুলু প্রশ্ন করিল—“কি হ’ল স্তার?”

“কিছু না, মাঝে মাঝে একটা বেদনা ওঠে না?...তক্ষুনি
ভ্যানিশ করে যায়।”

হাসিয়া বলিলেন—“তোমার কত পাপ ছিল টুলু? যে
রকম ঘুরতে হয়েছে এই পাথুরে জায়গায় তাতে ত পাপ-পুণ্য
সুদু সমস্ত দেহটাই ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা।...বেশ, তার পর
—কি রকম দেখলে?”

“ও রকম দেখি নি স্তার, অপূর্ব—একেবারে অপূর্ব!...
আপনার তত্ত্বশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে?”

“অবিশ্বাসের কথা কখনও শুনেছ?”

“সিদ্ধবাবা তত্ত্বসিদ্ধ মহাপুরুষ, বৈশীর ভাগ সময়ই সমাধিতে
থাকেন, আমার বরাত জোর, পরশু এসে সহজ অবস্থাতেই
পেলায়। সব শুনে একটু মুচকে হাসলেন, বললেন—‘তোমার
তপস্রা আছে, পরশু বিকেলে আসিস।’...আজ গিয়েছিলাম,
বিকেলের একটু আগেই। নির্বিকল্প সমাধি-রূপ কথাতোই শুনে-
ছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম। কোথায় আছেন, কি হচ্ছে চারি
দিকে, কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। নদীর ধারে চমৎকার বাগান-
বাড়ী সাহাদের, দোতলাতেই থাকেন বাবা। নীচে কি করতে
নেমেছিলেন, বারান্দার পাশে যেখানে ছাদের নলটা নর্দমার
উপর নেমে এসেছে সেইখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আমি
যখন পৌঁছিলাম, দু-জন শিষ্য ঘিরে বসে আছে, কখন সমাধি
ভাঙবে সেই প্রতীক্ষায়—বিরক্ত করবার হুকুম নেই কিনা।
সে রকম নোংরা নালা না হোক, তবু ত অত বড় বাড়ীটার
নানা জায়গার জলনিকাশের পথ, খানিকটা খানিকটা নোংরা
আছেই—তা জ্রক্ষেপ মাত্র নেই—দেওয়ালে চেস দিয়ে,
নালার উপর দিয়ে পা ছুটো বাড়িয়ে বসে আছেন, রক্তবস্ত্র-
ঞ্জরা, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালায় সমস্ত বুকটা ভরে আছে।
কাপড়ের খানিকটা নর্দমার মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে—জ্রক্ষেপ নেই,
খানিকক্ষণ পরে ছেলে নিজেও গড়িয়ে পড়লেন—একেবারে
নির্বিকার—তিনি যে কে, আর রয়েছেন যে কোথায় একেবারে
চৈতন্য নেই। বসে আছি ত বসেই আছি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক
পরে চোখ খুললেন—কি অপূর্ব মূর্তি! দীর্ঘ জটা, এই বিশাল
শরীর, রক্তচেলির মধ্য দিয়ে জ্যোতি যেন ফুটে বেরচ্ছে—
মুখখানা রাজা টকটকে, তার ওপর কারণ-বারিতে গোলাপী
ছটি চোখ। আকর্ষণবিশ্বস্ত কথাকাটা বইয়েই পড়েছিলাম, আজ

চাক্ষু্য করলাম, যেন করণায় ঢুলঢুল করছে। আর কি যে তার চাউনি!—অপার্থিব কথাটাও কানেই শোনা ছিল, সে চাউনিও যেন এ পৃথিবীর নয়, চোখ ফিরিয়ে নেয় কার সাধ্য। আমার দিকে চেয়ে থেকে থেকে অনেকক্ষণ দেখলেন, তারপর একবার হঠাৎ বলে উঠলেন—“বেরিয়ে যা এখান থেকে।—নেকালো।” ...শিখেরা আগেই আমার সাবধান করে দিয়েছিল—দাবড়ানি, ধমকানিতে দাবড়ালে চলবে না, ওঁর ঐ রীত, ঐ পরীক্ষা—আমি হাত জোড় করে প্রণামীর টাকা কয়টি সামনে রেখে বললাম—”

মাষ্টারমশাই টুলুর কাঁধে হাতটা চাপিয়া বলিলেন—“আর পারছি না টুলু, ধাম এবার।”

ছুই জনে উঠানের দিকে মুখ করিয়া পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন। আলোটা ঘরের মধ্যে, বিলম্বিত জ্যোৎস্নার একটা ক্ষীণ আভা বারান্দার এক পাশ দিয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের একদিকে আসিয়া পড়িয়াছিল, কথাটা বলিবার জন্ম ফিরিতে ছায়ায়-আলোয় সেই আভা মুখের সামনেটা স্পষ্ট করিয়া

দিল। মাষ্টার মশাইয়ের মুখটা শীর্ণ, রেখাবহুল, কিন্তু বরাবরই তাহার উপর একটি প্রসন্নতার আচ্ছাদন দেখিয়া আসিয়াছে, এমন বিকৃত কখনও দেখে নাই টুলু, শক্তি ভাবে প্রশ্ন করিল—“বেদনাটা বাড়ল নাকি স্ত্রার?”

সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া বুঝিতে পারিল এটা কোন দৈহিক বেদনার অভিব্যক্তি নয়; একটু চিন্তিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—“আপনি তত্ত্বশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না স্ত্রার?—সিন্ধুবাবা আবার শুনেছি এদিকে পরম বৈষ্ণবও।”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“বিশ্বাসের কথা নয়, প্রয়োজনের কথা টুলু। হাজার বছর ধরে তু নর্দমায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছি, আরও দরকার আছে?”

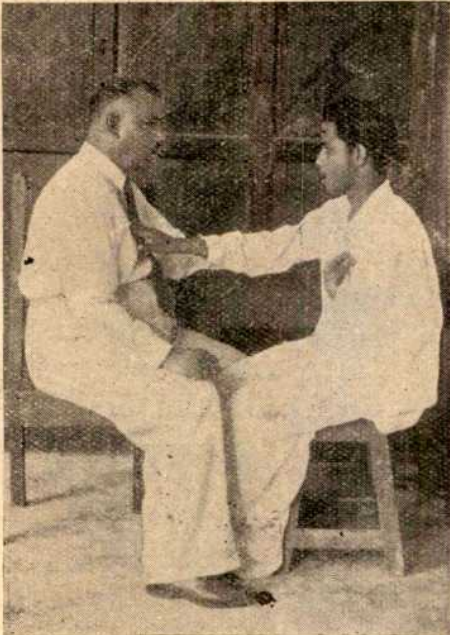
একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—“কেন এই ভাবে পড়ে থাক। সেটা ভেবে দেখবার কি এখনও সময় হয় নি টুলু? ধর্মের ব্যভিচারকে আমরা আর কত দিন এই করে ধর্মের মর্যাদা দিতে-থাকব?”

(ক্রমশঃ)

মুক-বধিরের শিক্ষা

শ্রীপেন্দ্রমোহন মজুমদার

পৃথিবীর সভ্য সমাজে একটি বৃহৎ অংশ কোন সুদূর অতীত হইতে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ নিগৃহীত হইয়া নিত্যন্ত উপেক্ষিত



স্পর্শ দ্বারা স্বর শিক্ষা

ও ঘৃণিত ভাবে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস তাহার সুনির্দিষ্ট সংবাদ দিতে অক্ষম। অথচ জগতের যাবতীয়

ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস এই প্রকার এক শ্রেণীর অক্ষম মানবের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতিকারকল্পে কখনও কোনও উদ্যোগ হইয়াছিল কিনা তাহার তেমন কোনও প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকগণ মানবজাতির শিক্ষাকল্পে যত প্রকার প্রণালী ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে মুক-বধিরদিগের ভাষা-শিক্ষা-পদ্ধতিও একটি অতি আশ্চর্যজনক ও আবশ্যক আবিষ্কার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুষ্টিমেয় কণ্ঠবীরদের আবিষ্কারের ফলে আজ সমাজের বিকল একাংশ ঘৃণিত জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান যুগে মুক-শিক্ষার নানাবিধ পদ্ধতি ও প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও মৌখিক প্রণালী (oral method) সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মুক-বধিরের ভাষা বলিতে এখনও অনেকে তাহাদের ইসারা বা ইঙ্গিতের কথাই ভাবিয়া থাকেন; তাহারা যে যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা তাহাদের প্রতিশক্তিসম্পন্ন ভ্রাতৃ-দিগের ছায় কথা বলিতে ও অজ্ঞের কথিত ভাষা বুঝিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত। অনেকেই মনে করেন মুক-বধিরগণ বাক্শক্তিহীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও বাক্শক্তির অভাববশতঃ কালক্রমে তাহাদের শ্রবণশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা নিত্যন্ত ভিত্তিহীন ধারণা। অনেকের এমনও ধারণা আছে যে, “কোনও বাগ্‌যন্ত্রের অভাবে বা দোষে

মুক হইয়া থাকে।" ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। মুক-বধিরদের বাগ্‌যন্ত্রের কোনই অভাব বা দোষ পরিলক্ষিত হয় না। সামান্য মাত্র অশীলন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, জন্ম বা বাল্য-বধিরতাই তাহাদের মুকত্বের একমাত্র কারণ। কোনও



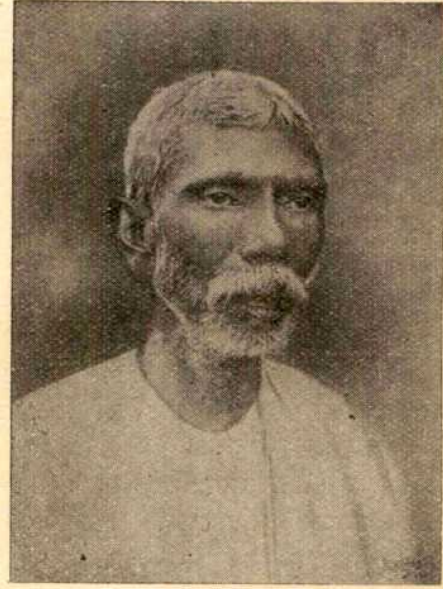
ওষ্ঠ-পাঠ

মুক-বধিরকেই কণ্ঠস্বরবিহীন দেখা যায় না এবং তাহাদিগকে নানাবিধ অব্যক্ত ধ্বনি করিতে দেখা যায়। শ্রবণশক্তির অভাবের জন্মই ইহারা কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। কথা আমাদের জন্মগত নহে; ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। আমরা আশৈশব পিতামাতা ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে যে ভাষায় বাক্যলাপ করিতে শ্রবণ করি তাহাই আমরা অমুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া লই। এইজন্মই বাঙালীর সন্তান বাংলা, ইংলণ্ড-বাদীর সন্তান ইংরেজী ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজের সন্তান ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা যুগপৎ শিক্ষা করিয়া থাকে। বধির শিশু শৈশবাবধি কোনও ভাষাই শ্রবণ করে না, সুতরাং কোনও ভাষাতেই কথা কহিতে পারে না। কাজেই জন্ম-বধিরগণ অথবা জন্মের পর ভাষা শিক্ষার পূর্বে যাহারা কোন অশ্রবের জন্ম বধিরত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারা মুক হইয়া থাকে।

মুক-বধিরদের উচ্চারণ-শিক্ষার পূর্বে নানাবিধ প্রক্রিয়া-দ্বারা উহাদের দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির উৎকর্ষ সাধন করানো হয়। কোন শব্দ উচ্চারণকালীন শ্বাসযন্ত্রস্থ বায়ু নির্গত হইবার সময় উহা স্বর-তন্ত্রীদ্বয়ে (vocal cords) আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত তন্ত্রীদ্বয় সেতারের তারের দ্বায় কম্পিত হইয়া উঠে। শব্দ বায়ুর ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা উচ্চারণকালীন যে কম্পন সৃষ্টি হয় তাহা বক্ষে বা চিবুকে হস্তাঙ্গণ করিলে অনুভব করা যায়। মুক-বধির স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ বক্ষে বা চিবুকে অমুকরণ কম্পন সৃষ্টি করিতে যত্নবান হয় এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা ইহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। শব্দ উৎপত্তির পর বর্ণ উচ্চারণকালীন মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বার যে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয় উহার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হয়, উপরন্তু ছাত্র একটি আয়নার সাহায্যে তাহার মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বার সঠিক

স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে পারে। যেমন, “পা” এই বর্ণ উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হয়, বহির্গামী বায়ু ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে “পা” এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। “কা” বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাভাগ বক্ষ হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং তালুর পশ্চাভাগের সহিত সংযুক্ত হয়। বহির্গামী বায়ু জিহ্বা ও তালুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেই “কা” এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। দৃষ্টি ও স্পর্শের সাহায্যে এক একটি বর্ণ এবং ক্রমে পদ ও বাক্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সাধারণ শিশু যেমন ভাষা ব্যবহারের পূর্বে প্রথমে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় কথা ও ক্রমে ভাষা বুঝিতে পারে মুক-বধির শিশুকেও বর্ণ উচ্চারণের ও ভাষা শিক্ষার পূর্বে দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে অশ্রবের কথা বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কথা বলার সময় বক্তার ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের এবং মুখাবয়বের যে বিভিন্ন গতি হয় উহা লক্ষ্য করিয়া মুক-বধিরগণ



মোহিনীমোহন মজুমদার

অপরের কথা বুঝিতে পারে। যেমন ‘পাতা’ এই পদটির উচ্চারণকালীন জিহ্বা ও মুখের যেরূপ হয় ‘টাকা’ বলিতে তদনুরূপ হয় না। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই মুক-বধির গণ বক্তার কথা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহাকে “ওষ্ঠ-পাঠ” বলা হয়। শিক্ষার কৌশলে ক্রমে দৃষ্টিকুশলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুক-বধিরগণ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে সহজেই সাধারণের কথা বুঝিতে সমর্থ হয়। কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ-কালীন ওষ্ঠের ও মুখের আকার একই রূপ দেখায় অথবা পার্থক্য এত সামান্য যে সহজে বোধগম্য হয় না। ইহাদিগকে সমদৃশ্যমান শব্দ বলা হয়। যেমন—আতা-আদা; পালা-মালা; তালা-খালা; পেয়ারা-পেয়াল। ইত্যাদি। মুক-বধিরের যখন ভাষা-

জ্ঞান জন্মায় তখন এই সমদৃষ্টিমান শব্দ বুঝিতে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। কারণ আমরা সাধারণতঃ কি প্রকারে অস্ত্রের কথা বুঝি? আমরা কখনও কি বস্তুর প্রত্যেকটি বর্ণ মনোযোগদ্বারা শ্রবণ করি? উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকায়



ভূগোল শিক্ষা

অস্ত্রের কথা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। বধিরদের মধ্যেও যাহাদের ভাষা-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারা “আতা মিষ্টি” বলিলে কখনই “আদা মিষ্টি” বুঝিবে না। মূক-বধিরদের শিক্ষা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ভাষাজ্ঞান জন্মাইতে প্রায় দশ বৎসর কাল আবশ্যক হইয়া থাকে। কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষা দ্বারাই ইহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম হইবার নিমিত্ত ইহাদিগকে উপযুক্ত শিল্পশিক্ষা দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ছায় মূক-বধিরদের শিক্ষার সম্প্রসারণ না হইলেও মুষ্টিমেয় কন্মিগণের চেষ্টায় ইহা কথঞ্চিৎ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের প্রধান ধর্মযাজক ডাঃ লিউ মিউরণ মহোদয়ের প্রযত্নে বোম্বাই শহরে একটি মূক-বধির বিজ্ঞালয় সংস্থাপিত হয়। ইহাই ভারতের প্রথম মূক-বধির বিজ্ঞালয়। ইহার কিছুকাল পরেই ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বাঙালীর যত্নে ও সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতা মূক-বধির বিজ্ঞালয় সংস্থাপিত হয়। বাংলার মূক-বধিরদের হুৎথে দয়াক্ষিপিত হইয়া উহাদিগের হুৎথ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্ত স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ তদানীন্তন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতায় সিটি কলেজ ভবনে মাত্র ছুটি ছাত্র লইয়া একটি ক্লাস খোলেন। কিছুকালের মধ্যেই মোহিনীমোহন মজুমদার ও যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনাথ বাবুর এই সাধু প্রচেষ্টায় যোগদান করেন। এই তিন জন যুবকের অক্লান্ত চেষ্টা-যত্নে এবং উমেশ বাবুর সহযোগিতায় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত ক্ষুদ্র ক্লাসটি কলিকাতা মূকবধির বিজ্ঞালয় নামে অভিহিত হয়। উমেশচন্দ্র এই বিজ্ঞালয়ের প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। যামিনী-

নাথ প্রথমতঃ বোম্বাই বিজ্ঞালয় হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষা-প্রণালী শিখিয়া আসিয়া তদীয় অত্যন্ত সহযোগী-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ সিংহ ও মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে এখানকার শিক্ষা-কার্যে ত্রুটি হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, ইউরোপ বা আমেরিকায় গিয়া বিশেষরূপে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে না পারিলে স্কুলের যথোপযুক্ত উন্নতিসাধনের আশা সূদূরপর্যন্ত। যামিনীনাথ বিজ্ঞালয়ের তদানীন্তন কার্যনির্বাহক সভা ও সম্পাদক-উমেশবাবুর নিকট বিলাত ও আমেরিকা যাত্রার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সূত্রের বিষয় কার্যনির্বাহক সভা যামিনীনাথের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এফ. জে. রো এবং তদীয় পত্নীর অর্থ সংগ্রহ-কালীন একান্ত চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



মূকবধিরদের ছাপাখানার কাজ

যামিনীনাথ কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইলে সমাজে তাঁহার কি প্রকার লাঞ্ছনা ও ছুরবস্থা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাংলা—বাংলা কেন সমগ্র ভারতের প্রায় দুই লক্ষ অসহায় মূক-বধিরের নীরব মর্ম-বেদনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যামিনীনাথ ইংলণ্ড, আয়ারল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করিয়া এবং মূক-বধির শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং এই শিশু-প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে শিক্ষায়তনের কার্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুনিয়ন্ত্রিত রূপে পরিচালিত হইতে থাকে।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞালয়ের কার্যে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, গবর্নমেন্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন অর্থসাহায্য দ্বারা বিজ্ঞালয়ের কার্যে সহযোগিতা করেন। ক্রমশঃই বিজ্ঞালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকরী সভার সভাপতি মাননীয় সি. ডবলিউ. বোর্স্টন সাহেবের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টায় শিশু-প্রতিষ্ঠানটির

জন্ম বর্তমান ২৯৩ নং আপার সারকুলার রোডস্থ ৫ বিধা জমি ক্রয় করিয়া সুরমা অটালিকা নিশ্চিত হয়। নবনিশ্চিত গৃহে প্রবেশ করার অল্প কালের মধ্যেই ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার প্রথম মুক-বধির-শিক্ষক এবং বিজ্ঞালয়ের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত ও অকাল মৃত্যুতে বিজ্ঞালয়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল।

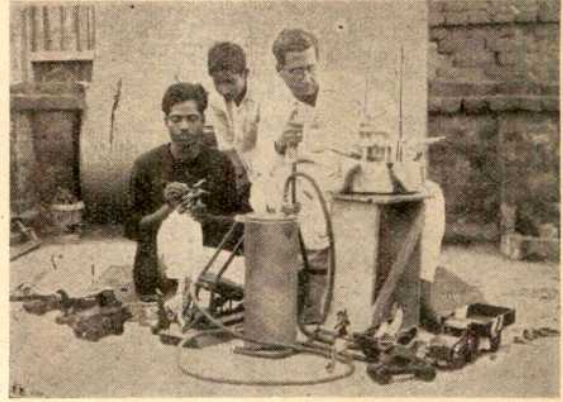
শুধু কথা কহিতে শিখিলেই মুক-বধিরদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না—ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম হইবার উপযোগী শিল্প শিক্ষায়ও তাহাদের পারদর্শী হইতে হইবে। বিজ্ঞালয়ের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও তাহারই প্রচেষ্টায় এই বিজ্ঞালয়ে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার জন্ম একটি আদর্শ কারখানা স্থাপিত হইয়া ছাত্রছাত্রীদের শিল্প-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু মুক-বধির এই বিভাগ হইতে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সাধারণ কারখানায় অথবা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। মোহিনীবাবু কেবলমাত্র বিজ্ঞালয়ে শিল্প-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই উপরন্তু তিনি মুক-বধিরদের সম্বন্ধে নানা বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক “মুক-শিক্ষা” নামক একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বিজ্ঞালয়ের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ যামিনীনাথের স্বার্থত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আজ বিজ্ঞালয়টি ভারতের শ্রেষ্ঠতম মুক-বধির শিক্ষায়তনে পরিণত হইয়াছে। সম্মানিত করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যামিনীনাথ দীর্ঘকাল এই বিজ্ঞালয়ের কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অধুনা বিজ্ঞালয়ের অধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। ইনিও ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য দেশ হইতে মুক-বধির শিক্ষা প্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সুপরিচালনায় বিজ্ঞালয়ের কার্য্য ক্রমশঃই নানা ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে।

এই বিজ্ঞালয়ে মুক-বধিরদের লেখাপড়া ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে। বিভাগটি—শিক্ষক ট্রেনিং বিভাগ (Teacher's Training Department)। এই বিভাগে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে শিক্ষিত যুবক ও মহিলাগণ আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া মুক-বধিরদিগের শিক্ষকতা-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া থাকেন। মুক শিক্ষার প্রণালীতে বিশেষরূপে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে মুক-বধিরদের শিক্ষাকার্য্যে ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের—মহীশূর,

বরোদা, আমেদাবাদ, দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচী প্রভৃতি স্থানের ও বাংলার প্রায় সমস্ত বিজ্ঞালয়ের শিক্ষকগণই এই বিভাগ হইতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।



প্রাক্তন ছাত্রের কারখানা। কাঠের খেলনা রং করা হইতেছে

ইউরোপ ও আমেরিকায় মুক-বধিরদিগের জীবন-ধারণ যে রূপান্তর আসিয়াছে, তাহা আজও এদেশে সম্ভব হয় নাই। শিক্ষার গুণে স্বাবলম্বী হইয়া তাহারা জীবনের জায়া দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে জনসাধারণ, এমন কি উচ্চশিক্ষিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা কল্পনাও করিতে পারেন না যে যত্ন ও চেষ্টায় মুক মুখর হইতে পারে। আজ আমাদের দেশে যখন শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসার হইতেছে তখন শিক্ষিত সমাজকে মুক-বধিরদের শিক্ষার দাবি বিশেষ রূপে চিন্তা করিতে হইবে। দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্ম ইহাদের দাবি উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

বাংলাদেশে মুক-বধিরদিগের সংখ্যা ৩৫,০০০। ইহাদের শিক্ষার নিমিত্ত ৫০ বৎসরের প্রচেষ্টায় মাত্র ১১টি শিক্ষায়তন সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে মাত্র ৩৫০ জন মুক-বধির। কলিকাতা মুক-বধির বিজ্ঞালয় ব্যতীত অগ্রাঙ্ক জেলার শিক্ষায়তনগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষায়তনগুলির অস্তিত্ব বজায় আছে শুধু মুষ্টিমেয় নিঃস্বার্থ কর্মীদের প্রাণপণ চেষ্টায়। এই সমস্ত জনহিতকর মানবতার কার্য্যে শুধু কর্মীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিতে পারে না; প্রয়োজন জনসাধারণের উৎসাহ, অর্থসাহায্য ও সহযোগিতা। গবর্নমেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিরও এই সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে লোকশিক্ষা ও প্রচার-কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন বিধায় নিখিল-ভারত মুক-বধির শিক্ষক-সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলন মুক-বধিরদিগের উন্নতির জন্ম নানা ভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। সম্মেলন আশা করেন জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সহায়ত্ব লাভ করিয়া শীঘ্রই ইহা উন্নততর কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে।

সাম্য

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

১

মানুষের মনে সাম্য লইয়া যে সকল চিন্তার ধারা প্রবাহিত হয় অধিকাংশ স্থলেই তাহার মূলে রহিয়াছে সংসারের অপরাপর লোকের তুলনায় নিজের পাওনা কম হওয়ার দুঃখ ও নৈরাশ্য। নিজের প্রতি শ্রীতি না থাকিলে মানুষ বাঁচেনা ও তাহার মনুষ্যজীবন বার্থ হইয়া যায়। ইহা শুধু যে মানুষের সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে; সকল জীবের বাঁচিবার ও বাঁচিয়া থাকিয়া নিজ জাতীয় অপরাপর জীবের প্রজননে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলার মূলেও রহিয়াছে ঐ আত্মশ্রীতি। এই কারণে নিজ গুণ, নিজ অধিকার ও নিজ কর্মের নিন্দা বা অনিষ্টকর কোন কিছু মানুষ সহজে মানিয়া লইতে রাজী হয় না। নতুবা এই সাম্যের বিচারে ক্রমাগতই শুধু পাওনা-গণ্ডার কথা উঠে কেন? “উহার কেন বড় বাড়ী, আমার কেন ছোট? উহার বেতন তিনশ টাকা, আমার কেন একশ টাকা। উহার মুখে সিগারেট আমার মুখে বিড়ি, উহার গায়ে রেশম আমার মার্কিন, উহার হাতে ওমেগা আমার হাতে রেলওয়ে রেগু-লেটর এবং ও যায় নিজের মোটরে আমি চলি ট্রামে-বাসে। এই সকল সাম্যবর্জিত ব্যাপার কখনও ছাড় হইতে পারে না। কেননা, আমি কাহারও অপেক্ষা হীন অক্ষম অথবা নিকোঁধ নহি। সুতরাং ইহা একটা বিরাট যড়যন্ত্রের বাহ্য লক্ষণ ও আমার কর্তব্য এই যড়যন্ত্র ভাঙিয়া নিজের পাওনা-গণ্ডা ঠিকমত বুঝিয়া লওয়া।” অর্থনৈতিক সাম্যবাদের মনস্তত্ত্ব বিচারের এই এক দিক।

অপর দিকে রহিয়াছে যাহাদের উত্তরাধিকারস্বত্রে অধিক জুটিয়াছে ও যাহারা বর্তমান অর্থনৈতিক বিলম্বাবস্থার সুযোগে নিজ বুদ্ধি, কর্ম বা কপালগুণে প্রাচুর্যের মালিক হইয়া বসিয়াছে। তাহারা বলে, “মানুষ উপায় করে সন্তানসন্ততির আরাম ও সুবিধার জন্ত। সুতরাং আমার পিতা বা অপর কোন পূর্ব-পুরুষ আমায় যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমারই অধিকার। ইহা আমার পিতা বা অপর কাহারও স্বাধীন অধিকারপ্রসূত ও ইহাই মানব-স্বাধীনতার একটা চিররক্ষণীয় আদর্শ। ব্যক্তিগত সম্পদ যদি অর্জন, উপভোগ বা দান করিবার ক্ষমতা মানুষের না থাকে ত স্বাধীন মানব ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? আমি যাহা উপার্জন করি তাহাতে আমার পূর্ণ অধিকার ও তাহা কেমন করিয়া ভোগ করিব অথবা দান-ব্যয় করিব তাহা আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।” যাহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাহারাও ঐ নিজ সুবিধার মার্গেই রহিয়াছেন। কারণ যাহার যতটা আছে সে ততটাই বজায় রাখিয়া অধিকের অন্বেষণে

ছুটিয়াছে এবং আরও অধিক পাইবে এই আশায় জীবন কাটাইয়া দিতেছে।

সাম্য কথাটার সোজা অর্থ যাহা তাহাই যদি একটা উচ্চ আদর্শ হইত তাহা হইলে মানুষ সর্বদা সবার সমান আকার দান করিবার চেষ্টা করিত। সুকণ্ঠ গায়কদিগকে জেলে বদ্ধ করিয়া, সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে আন্দামানে পাঠাইয়া, সুলেখকদিগের হাত ভাঙিয়া দিয়া সংসারে কণ্ঠস্বর, সৌন্দর্য ও সাহিত্যক্ষমতার ক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিত। সকল ঘরবাড়ী এক মাপের ও এক আকৃতির হইত, সকল জামা-কাপড় এক ধরনের ও এক বর্ণের হইত এবং অল্প-চিকিৎসার সাহায্যে সকল ব্যক্তিকে ক্রমশঃ এক চেহারার করিয়া ফেলা হইত—অন্ধে বিভিন্ন সংখ্যা, রসায়নে বিভিন্ন দ্রব্য, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বিভিন্ন গ্রহতারকা ও শক্তি এবং পৃথিবীতে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের বৈচিত্র্য অস্বীকার করিয়া একটা নিদারুণ ও উৎকট ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠিত। সেই ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ অবশ্য সকল বৈচিত্র্য উচ্চ-কণ্ঠে মহা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজেদের রচিত কল্পনার অনন্তসাম্যের ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ প্রয়োজনমত পাপ করিয়া বিচরণ করিতেন। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। আসল কথা এই যে, মানুষ সাম্যের আদর্শটাকে সম্পূর্ণই অর্থের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। চেহারায়, শক্তিতে, বুদ্ধিতে, কল্পনায়, ভোগে, ত্যাগে, নীচতায়, মাহাত্ম্যে, কর্ম্মে, অপকর্ম্মে, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে; সকল কিছুতে কম-বেশীর স্থান থাকিতে পারে; শুধু পারে না “আমার পাওনায়”। তাও বিশেষতঃ কর্মের ক্ষেত্রে; বেশী হইলে আপত্তি নাই। কিন্তু বেশী যাহাদের আছে তাহারাও ছেনরি ফোর্ড ও হায়ড্রাবাদের নিজামের নিদারুণ সমালোচক।

এই যে স্বার্থান্বেষণ ইহার দ্বারা কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কয়েক শতাব্দী হইতেই কম যাহারা পায় তাহারা বেশী পাইবার জন্ত আবহাওয়া বজ্রাঙ্গিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যাহারা বেশী পাইয়া ফেলিল তাহারা আবার নিজ নিজ কড়াগণ্ডা সামলাইবার তাড়নায় পূর্ব আদর্শ তুলিয়া স্বার্থের পথ অবলম্বন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সংসার চলিয়া চলিয়া অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়া মুন্সুকে একটা মহা ওলটপালট ঘটয়া গেল। জার্মান সেনার হস্তে রুশিয়ার সম্রাটের ফৌজ যখন ট্যালেনবার্গে মার খাইয়া বিধ্বস্ত হইল, রুশিয়ার কমভোগীরা তখন সুবিধা পাইয়া বেশী ভোগ-দিগকে পাড়িয়া ফেলিল। অতঃপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাতে নিয়ম করা হইল (সাম্যবাদের নির্দেশ অনুযায়ী) যে-সকল মানবকে “স্বার্থান্বেষণ” কাজ করিয়া রাষ্ট্রের সম্পদভার

বৃদ্ধি করিতে হইবে ও সকল মানবকে রাষ্ট্র “যথাপ্রয়োজন” সেই সম্পদের অংশ দান করিয়া রাষ্ট্রীয় সংসার নির্বাহ হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা টিকিল না। কেন?

কারণ এই যে, “যথাক্ষমতা” ও “যথাপ্রয়োজন” কথা দুইটি গুণিতে সহজ হইলেও কর্মক্ষেত্রে পাটীগণিতে “যথাক্ষমতা” হইতে “যথাপ্রয়োজন” ওজনে বেশী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেল। অর্থাৎ “যথাক্ষমতা” কাজ করিয়া এক ব্যক্তি এক সের প্রমাণ সম্পদ উৎপাদন করিয়া “যথাপ্রয়োজন” অনুসারে ১১০ সের প্রমাণ সম্পদ ভোগ করিতে চাহিল। ফলে দেখা গেল যে, সমগ্র জাতীয় উৎপাদনশক্তি প্রযুক্ত হইয়া যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু উৎপন্ন হইল যথাপ্রয়োজন ভোগের জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যবসস্তারের দরকার। আর একটি মুশকিল এই হইল যে, যখন “যথাপ্রয়োজন” পাওয়া যাইবে জানা গেল তখন সকলেরই “যথাক্ষমতা”র শক্তিটা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। বেশী দিন এই ব্যবস্থা চলিল না, কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ব্যক্তিবিশেষের চলিলেও একটা সমগ্র জাতির পক্ষে চলে না। বিশেষ করিয়া যে জাতি জগতের অপরাপর জাতির নিকট ঋণ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত রাখে নাই। রুশিয়াকে অগত্যা অর্থনৈতিক সাম্যবাদের মূলমন্ত্রটা বাস্তব অর্থনীতির প্রাচীন রীতি অনুযায়ী শোধন করিয়া লইতে হইল।

অতঃপর স্টালিনি মতে আইন হইল যে, সকল ব্যক্তিকে যথাক্ষমতা কার্য করিতে হইবে এবং পাওনার বেলায় “যথাক্ষমতা” অর্থাৎ কর্মপ্রসূত উৎপন্ন বস্তুর হিসাব করিয়া পাওনা মিলিবে। ফলে অনেকের কর্মক্ষমতা অকস্মাৎ বাড়িতে আরম্ভ করিল এবং বহু লোকেই ভোগের রাশ টানিয়া, প্রয়োজনের কথা তুলিয়া নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ভোগের পথ অবলম্বন করিলেন। রুশিয়াও দেউলিয়া হইবার পথ ছাড়িয়া অর্থনৈতিক অসাম্য অবলম্বনে জাতীয় শক্তি ও সম্পদ বাড়াইতে আরম্ভ করিল।

বর্তমানে রুশিয়ার অবস্থা আলোচনা করিয়া মার্চ মাসের “রোটেরিয়ান” পত্রিকায় গ্রীষ্মক ওয়াশ্‌টন ডুর্যাটি একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

১। যদিও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়া একাধারে গৃহ ও পরিবার, ধর্ম ও গির্জা এবং অর্থ ও সম্পত্তিকে রুশীয় রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে পুরাতন বিষাক্ত ভাব আজকাল সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, তথাপি একথা মানিতেই হইবে যে, বর্তমান রুশিয়ায় গৃহপরিবার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও অর্থসম্পত্তি পূর্ণ মাত্রায়ই বজায় আছে ও অতঃপর চিরকালই থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

২। রুশিয়ায় বিবাহ ও বিবাহ নাকচ করিবার পদ্ধতি আমেরিকা হইতে অনেক অংশে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে এবং বর্তমানে রুশিয়ায় কোন দম্পতির মধ্যে কাহাকেও দিনান্তে বিকালে বাড়ী ফিরিয়া একটি নতুন পতি বা পত্নীর সহিত পরিচিত হইবার আশঙ্কা থাকিতে হয় না। বিবাহ, ধর্মমত

বা ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদকে একটা মহাজনী ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া আধুনিক রুশিয়ান আর প্রচার করে না এবং সে নিজে স্বীকার করে যে এগুলি মানুষের বহু সহস্র বৎসরের সামাজিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার ফল। মানুষের হৃদয় ও আত্মার স্বভাবজাত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ভিতর হইতে বিবাহ ও ধর্মের উৎপত্তি। মানুষ যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, দেশভক্তি, মতবাদ প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপর সকল মানবের সহিত সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই কারণে রীতি অনুযায়ী লিখন চিত্রণ, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি করিয়া থাকে; পত্নীপ্রেম ও পরিবার গঠনে কিম্বা আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিচারেও সে তেমনি সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ও এই অনুভূতি হইতেই বিবাহ এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়।

৩। রুশিয়া চেকিয়া শিখিয়াছে যে সকলকে এক বেতনে কার্য করাইলে সকলেরই কার্যে উৎসাহ চলিয়া যায়। আজ তাই রুশিয়ায় যে মজুরি ও বেতন-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে কম্যুনিজম কোন মতেই বলা চলে না। সে ব্যবস্থা মহাজনী মতেই করা হইয়াছে; শুধু মহাজনের পরিবর্তে আছে রাষ্ট্র। ব্যক্তি যথাক্ষমতা ও যথাইচ্ছা আয়-ব্যয় করিতে পারে। শুধু টাকা দিয়া টাকা টানিবার পথ নাই। ব্যক্তিগত করবার করা নিষিদ্ধ। বড় বড় কর্মচারীরা বেশী বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। পদোন্নতির সহিত বেতন বৃদ্ধি হয়। অধিক কর্ম-শক্তি দেখাইলে অধিক মিলে। বৎসরান্তে ভাল কাজ হইলে পর বোনাস প্রাপ্তি ঘটে ও অধিক সময় কাজ করিলে অতিরিক্ত পাওনা হয়। উপার্জিত অর্থ যেমন খুশী ব্যয় করা চলে। বাড়ী কেনা যায়, শুধু জমির ৪৯ বৎসরের প্রজ্ঞাপত্র। বাড়ীর সন্তানকে দিয়া যাওয়া যায়। মোটরগাড়ী ক্রয় করা যায়, চাকর রাখা যায় এবং যাহা বাজারে পাওয়া যায় তাহা ক্রমে কোন বাধা নাই।

৪। রুশিয়ায় ডিমোক্র্যাসি বা সাধারণের স্বাধীন মতবাদের উপর রাষ্ট্র গঠন করিবার চেষ্টা হয় নাই। লেনিনের মতে রুশিয়ার মত দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিমোক্র্যাসির উপযুক্ত স্বাধীন মতবাদ গঠিত হইতে তিন পুরুষ লাগিবে। ১০০ বৎসর পূর্বেও রুশিয়ার জমির সহিত চাষী ও বিক্রীত হইত। তাহার এ দাসত্ব মনিবের জন্য চাষ করিবার দাসত্ব ছিল। রুশিয়ার শতকরা ৮০ জন লোক এইরূপ দাস বা সার্ক ছিল। আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাস হইতে এইটুকুই তাহাদের পার্থক্য ছিল যে রুশীয় সার্ককে জমি-ছাড়া করা যাইত না ও তাহার পরিবারও অধঃ থাকিত।

৫। রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অর্থে শিক্ষিত রাষ্ট্রীয় কর্মচারী জাতীয় লোক বুঝায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকই কম্যুনিষ্ট ও তাহার সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। তাহাদের কাজ জনসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া রুশিয়াকে ক্রমশঃ আরও শক্তিশালী করিয়া

তোলা। পূর্বে রুশিয়ায় শতকরা ১০ জন লেখাপড়া জানিত, এখন জানে ৯৫ জন। পূর্বে রুশীয়েরা খুবই কদর্যাভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। চাষীদের একমাত্র আশ্রয় ছিল শনিবার করিয়া রাতে মাতাল হইয়া পল্লীকে প্রহার করা। এখন তাহারা নানা প্রকার খেলাধুলা করে ও রেডিও চালাইয়া নিজের শুনে ও পরিবারস্বদের শুনায়ে। বর্তমান কালে রুশীয়েরা জগতের অপরাপর জাতিদের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প কাহারও হইতে নিষ্কণ্ট নহে।

এই বিরাট পরিবর্তনের মূলে ছিল সুচিন্তিত কার্যপদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি। প্রায় দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া রুশীয়েরা প্রমাণ ও সুবিচার ব্যতীত কোন কিছুতে হাত দেয় নাই। গলাবাজি ও বুক চাপড়াইয়া চিংকার করিয়া মিথ্যাকে সত্য বা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা সেদেশে চলে নাই। শত শত বৎসরের পুরনো বস্তাপচা আদর্শ বা বিশ্বাসকে সত্য বা অজান্তে বলিয়া গায়ের জোরে প্রমাণ করা তাহাদের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। চিন্তা, কর্ম ও বিচারশক্তির উপরেই রুশীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

২

অর্থনৈতিক সাম্য তাহা হইলে রুশিয়ার নবরাষ্ট্রে চেষ্টা সত্ত্বেও শিকড় বসাইতে পারিল না। ইহার কারণ শুধু এই যে, অর্থনৈতিক ভাগবাঁটোয়ারা যে সকল নিয়মের বশবর্তী সে সকল নিয়মকে কোন উচ্চ আদর্শের খাতিরে উল্টাইয়া দিয়া সংসারে কাজকারবার চলে না। যথা, একটা নিয়ম এই যে, কোন জাতি অথবা জনসংঘের পক্ষে নিজ উৎপাদিত সম্পদের অধিক ভোগ করিবার অধিকার পাইতে হইলে কয়েকটি উপায়ে তাহা পাওয়া সম্ভব। যথা, ঋণ করিয়া, অপরের নিকট দান গ্রহণ করিয়া, লুণ্ঠ বা চুরি করিয়া, ঠকাইয়া ইত্যাদি। সরল ও সত্যতার পথে থাকিয়া কাহারও পক্ষে নিজ পরিশ্রমার্জিত সম্পদের অধিক ভোগ করা সম্ভব নহে। সুতরাং যাহার কর্মশক্তি অধিক সে অধিক অর্জন করিবে এবং সে কর্মশক্তি দৈহিক, মানসিক অথবা মৌভাগ্যজাত হইতে পারে। অর্জনের আশা বা ভোগের আকাঙ্ক্ষাই কর্মের প্রধান প্রেরণা এবং পাইবার আশা না থাকিলে কেহ পরিশ্রমে রাজী হয় না। এই কারণে উপার্জনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রচার করিলে অধিকাংশ লোকই কম পরিশ্রম করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে সামাজিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে। ভাল করিয়া কাজ করিলে ও নিত্য নূতন উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করিলে, সমাজের নিকট পুরস্কার পাইবার আশা থাকিলে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা সত্য প্রাণবান ও জাগ্রত থাকে; সে পুরস্কারের অভাবে মানুষ ক্রমশঃ নিষ্কর্ম হইয়া অবশেষে বেকার হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সকলের উপার্জন-শক্তি সমান মুখে সেইরূপ সকলের পাওনাও সমান হইতে পারে না। ভোগের ক্ষমতাও তেমনি সকলের সমান হয় না। কেহ

পুস্তক পাঠে আনন্দ পায়, কেহ পায় গঞ্জিকা সেবনে। কেহ চিত্র-কলা ও সঙ্গীতের রসগ্রাহী, কেহ বা ২২ জনে একটা বায়ু-ক্ষীত চর্মগোলকে পদাঘাত করিতেছে ইহা দেখিয়াই তৃপ্ত হয়। কেহ চার প্রকার তরিতরকারী হইতে পঞ্চ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহার করে, কেহবা শুধু ছাতু খাইয়াই আনন্দে দিন কাটায়। কাহারও ভ্রমণস্পৃহা আছে, কাহারও বা বসিয়া বসিয়া তাস খেলিবার আগ্রহই প্রবল। কেহ বাসস্থান, আসবাব ও পরিধেয় বসনের ত্রী ও পরিচ্ছন্নতার জন্ত বহু কষ্ট স্বীকার করে, কেহ আবার স্বর্ণ রৌপ্য আহরণ করিয়া তৈলচিহ্নিত গদির উপর ছারপোকাবহুল জীবনযাপন করিয়াই আনন্দলাভ করে। কাহারও মনের গতি ধর্ম, দর্শন, জনহিত ও বিজ্ঞানের দিকে, কাহারও বা নীচপ্রযুক্তির অনুসরণেই চিত্ত চির আকৃষ্ট। সুতরাং ভোগশক্তির দিক দিয়া মানুষের অর্থনৈতিক সমতার সমাধান সম্ভব নহে। জমা-খরচের মিলন স্থাপনার্থে উপার্জনের দিকটাই ভাল করিয়া দেখা দরকার এবং উপার্জনশক্তিহীনকে জীবনধারণের অতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলে কোন জাতির অর্থনীতিই সে ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য সকল জাতিরই কর্তব্য অসহায়কে বাঁচাইয়া রাখা ও শক্তিহীনকে খাওয়াইয়া শিখাইয়া শক্তিমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা। সে কার্য কোন ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত করা সম্ভব তাহা বিচারসাপেক্ষ এবং সমাজের পুঞ্জি দেখিয়া করা কর্তব্য। এই আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যে সকল লোকের উপার্জনশক্তি যাঁচাই করিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে তাহাদের জাতি পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া অজানা লোকের খোরাক বাড়ানো অর্থনীতিবিরুদ্ধ।

যাহা হউক অর্থনৈতিক সাম্যের পথে বহু বিঘ্ন আছে ইহা ইতিহাস হইতেই প্রমাণ হয়। তাহা হইলে সাম্য কাহাকে বলে? এই সুবিশাল সৃষ্টির মধ্যে যে বস্তুনিচয় লক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে আকারপ্রকারগত কোন সাম্যই ত আমরা দেখিতে পাই না; তাহা হইলে সাম্যবাদ কি উম্মাদের কল্পনা অথবা অসংযত দৃষ্টির পটে প্রতিফলিত মরীচিকা মাত্র? আসল কথা, সাম্যবাদ একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘকালস্থায়ী অজ্ঞানের প্রতিবাদ মাত্র। যেমন জগতে শতকরা একশত প্রমাণ সাম্যেরও কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই, তেমনি এই পৃথিবীতে মানুষ বহু সঙ্গ, প্রতিষ্ঠান বিলি ব্যবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহারের মধ্যে একটা অজ্ঞান অসমান ভাবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহার মধ্যে সত্য কোথাও নাই ও যাহা বহুল অংশে মিথ্যা ও বুদ্ধিক্রুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যাহা উপার্জন করিতেছে তাহাকে হয়ত তদনুপাতে দেওয়া হইতেছে না। কেহ হয়ত কিছুই উপার্জন করিতেছে না অথচ পাইতেছে প্রচুর। কেহ বঞ্চনা করিয়া লইয়া বলিতেছে, “ইহা আমার জাতি পাওনা।” কেহ দৈহিক শক্তিটা সম্পদ উৎপাদনে না লাগাইয়া অপরের উৎপন্ন সম্পদ জোর করিয়া লুণ্ঠিয়া লইতে

নিয়োগ করিতেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই জাতীয় মিথ্যা প্রবল প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। কেহ বড়, কেহ ছোট। কাহারও রক্ত নীল, কাহারও বা সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত রক্তসম্পর্ক। সকলেই কাহারও না কাহারও তুলনায় দেবতুল্য অথবা ঘৃণ্য। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে মিথ্যার অংশটা এত অধিক যে সত্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার উপর রহিয়াছে বিভিন্ন পর্যায়ের সত্য মিথ্যা মিশানো অহঙ্কারের এক দীর্ঘ তালিকা ও তজ্জাত ঔদ্ধত্য ও দম্ভের ফিরিঙ্গি। কেহ ব্রাহ্মণ নয় বলিয়া হুঁকা পাইল না, কেহবা আরবি খানদানের অভাবে চাকরি পাইল না। কেহ জমিদারের সম্মুখে জুতা পায়ে দাঁড়াইবার অপরাধে জুতাইত হইল, কেহ পূর্ব-পুরুষের দৌলতে কুপের জল নিজ হস্তে উত্তোলন করিয়া খাইতে পারিল না। এই নিদারুণ মিথ্যার অভিনয়ে নিজ নিজ প্রকৃতি-দত্ত পালায় কেহ নামিতে পারে না, সকলেরই একটা একটা মিথ্যার মুখোস আছে। পৃথিবীব্যাপী এই মিথ্যার অভিনয়ের প্রতিবাদের অপর নাম সাম্যবাদ।

পণ্ডিত ও পুঙ্জনীয় যে, শ্রদ্ধার দাবি যাহার সত্যকার, সে যদি সকলের নিকট প্রণাম পায় তাহাতে কাহার আপত্তি? পয়দা করিয়া যে ফয়দা লুটিতেছে তাহাকেও কে বাধা দিতে চায়, যদি না সে অপরের লোকসান করিয়া সেই কাজ করে? সত্যকার বংশমর্যাদা যাহার তাহাকে সে গৌরব হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না। চটী মারিয়া ঘটা করিয়া পাওনার অতিরিক্ত দাবি করাতেই আমাদের আপত্তি। যে বিশেষত্বের মূল্য মাহা, শুধু সেইটুকুই তাহাতে আরোপ করা চলে। গাছে চড়িতে পারে বলিয়া কেহ পুকুরের মংস্ত দাবি করিতে পারে না। বিশেষ কোন আঁতুড় ঘরে জন্মাইয়াছে বলিয়া কেহ প্রণম্য হইতে পারে না। খুতনি অথবা ব্রহ্মতালুতে কেশোদগম করাইলে তজ্জন্ত কাহাকেও বিশেষ ভাবে সম্মম দেখাইতে হইবে ইহা গ্রাম্য কথা নহে। বিশেষ বিশেষ তকমা লগাইয়া গুরিয়া বেড়াইলে কাহাকেও মহাকর্মা বলিয়া মানিয়া

লইতে হইবে ইহাও স্বীকার্য্য নহে। এক কথায় সকল প্রকার দাবি ও দম্ভের সত্যতা বিচার করিবার অধিকার বর্তমান জগতের মানুষ আর পুরাতন রীতিনীতি, ইতিহাস ও গতানুগতিকের উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। স্বাধীনতা অর্থে দড়ি-হেঁড়া গরুর মত ছুটিয়া বেড়ানো নহে, সাম্য অর্থেও সকল কিছুকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সমান করিয়া দেওয়া নহে। উভয়ের অর্থই সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া সকলের গ্রাম্য অধিকার, গ্রাম্য দাবি ও স্বার্থ পাওনা মানিয়া লইয়া মিটাইবার সুব্যবস্থা করা।

সাম্যবাদের সাম্য তাহা হইলে নিজের বা ব্যক্তির সত্য-রূপের সহিত তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের সত্য, গ্রাম্য ও সুপরিমিত সম্বন্ধস্থাপন মাত্র। যে ঘটনা পণ্ডিত, ধার্মিক, উপার্জনক্ষম, গ্রাম্যবান বা কোন কিছুতে পারদর্শী, তাহাকে সত্যের মাপকাঠিতে ভোল করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া দিলেই সাম্যের আদর্শ সুরক্ষিত হইবে। চার ফুট মানুষকে আট ফুট বলাও চলিবে না, আবার তিন ফুট বলাও বারণ। চার টাকার মালিককে আট টাকার অথবা আট আনার মালিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ঘৃণ্যকে প্রণাম করিতে কেহ বাধ্য থাকিবে না এবং অনুপযুক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেও হইবে না। সকলের সত্যকার দাবি যে-সমাজে বা রাষ্ট্রে পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেইখানেই সাম্যের আদর্শ জীবগুরুপে স্থাপিত হয়। যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিতে, প্রত্যেক পরিবারে, সকল গ্রামে, নগরে, জেলায় ও দেশে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে এই সাম্যনীতি কার্য্যত সুপ্রতিষ্ঠিত নহে সে জাতির পক্ষে সাম্যবাদের আক্ষালন না করাই শ্রেয়ঃ। বড় বড় কথার সহিত ছোট ছোট কাজের সংমিশ্রণ জগতের নিকট হস্তান্তর হইবার একটা সহজ উপায়।

নেতাজী

শ্রীশ্রবোধ রায়

ওষধি-গুহ্ম-অরণ্যমাঝে সুবিশাল মহীকূহ
গগনচুম্বী শির তুলি' করে স্বর্য্য-নমস্কার,
সংখ্যাবিহীন আকাশচারীর রচে আশ্রয় ব্যুহ,
হাসিমুখে বহে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দায়-ভার।

- কর্ণা ছুটেছে আপনার বেগে পাষাণের বুক চিরে,
একটি সজল স্রিষ্ট প্রবাহে পাষাণের পরাজয়;
তৃষ্ণা নিবারে, প্রাণ করে দান, দেশে দেশে তীরে তীরে,
পাষাণের চেয়ে সত্য যে সে-ই, দেয় তা'র পরিচয়।

মরু-বিজয়ের সঙ্গীত যথা শ্রামল মরুজানে,
বিশাল উষর অভ্যাচারের বিদ্রোহী গ্রাম শিখা।
লক্ষ ভীকর মাঝারে যে বীর অরিরে আঘাত হানে,
বন্দী দেশের ললাটে সে আঁকে মুক্তির ললাটিকা।

তোমারে স্মরিলে নয়নেতে জাগে এ ছবি-উজলতম,
বিরোট, বিশাল, বরুনহারা বিদ্রোহী বীর নমো।

বাংলাদেশের নদী-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

নছিমউদ্দিন আহমদ, এম. এস-সি.

বাংলাদেশের নদীগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা :—(১) সম্বৎসরব্যাপী নদীসমূহ (Perennial Rivers)। এই নদীগুলিতে সারা বৎসরই জলপ্রবাহ চলে, তবে বর্ষাকালে জলপ্রবাহের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা ও তাহার শাখা, প্রবাহিকাসমূহ (Spill channels), তিস্তা সহ ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা—এই নদীগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) খরশ্রোতা নদীসমূহ (Torrential Rivers)। এই নদীগুলি প্রধানতঃ ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার নীচু পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ধমান বিভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী অথবা হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অজয়, মোর, দামোদর, কাঁসাই প্রভৃতি নদী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ষাকালে এই নদীগুলিতে বহু দেখা দেয়; বজ্রার স্থায়িত্ব খুবই অল্প, প্রায় দুই-তিন দিনের বেশী সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। তারপর নদীগুলি আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলিতে জল প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। দ্বিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার নীচু পর্বত হইতে যে সমস্ত নদী উৎপন্ন হইয়াছে যথা—গোমতী, কর্ণফুলী, হালদা ইত্যাদি, সেগুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; তবে এই নদীগুলি বর্ষাকালে খরশ্রোতা হইলেও অল্প সময়ে একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ে না; কিছু কিছু জলবারী শুষ্ক ঋতুতেও বহন করে।

(৩) জোয়ার-ভাটা-বিশিষ্ট নদীসমূহ (Tidal Rivers)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নদীগুলির শেষাংশসমূহ প্রধানতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অথবা সমুদ্রের সহিত যোগ থাকায় এই অংশগুলিতে সারাবৎসর জোয়ার-ভাটা চলে। এই জোয়ার-ভাটার ফলে দেশের বিস্তার উপকার সাধিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে নদীগুলির অবস্থান বা অবস্থা যেরূপ দেখা যায় অতীতে সেরূপ ছিল না। এই অবস্থা-পরিবর্তনের কারণ ও গতি অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমতঃ জানা দরকার নদী কি ভাবে প্রকৃতিতে আপনাকে জীবিত ও পরিপুষ্ট রাখে। নদীর জীবন তাহার অববাহিকায় (Catchment basin) সম্বৎসর যে বৃষ্টিপাত হয় তাহারই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু বৃষ্টিপাত সারা বৎসর একরূপ হয় না, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত মৌসুমী ঋতুর দুই-তিন মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে, আর বাকী বৎসর বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। এই মৌসুমী ঋতুতেও যে বৃষ্টিপাত প্রতিদিন সমানভাবে হয় তাহাও নহে। কয়েকদিন হয়ত প্রবল বৃষ্টিপাত হইল তারপর হয়ত কয়েকদিন ধরিয়া মোটেই বৃষ্টি নাই। বৃষ্টির জল যদি সমস্তই

গড়াইয়া নদীপথে প্রবাহিত হইয়া যাইত তাহা হইলে আমরা নদীতে শুধু বর্ষাকালেই জল দেখিতে পাইতাম, আর অল্প সময়ে কোন জল থাকিত না; নদী শুষ্ক হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। অল্প ঋতুতে জলপ্রবাহের প্রখরতা কম হইলেও নদী একেবারে জলশূন্য হইয়া যায় না। ইহার কারণ নদীর অববাহিকা বৃষ্টির জলের কিয়দংশ আপন স্তরে শুষিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। সেই জলই শুষ্ক ঋতুতে স্তর চূষাইয়া নদীতে আসে এবং শুষ্ক ঋতুতে তাহাই নদীর পূঁজি। বাংলাদেশের মত সমতল ও নরম জমিতে বৃষ্টির জলের বহুলাংশ মৃত্তিকাস্তরে সঞ্চিত হয়। কিন্তু পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত খুবই বেশী এবং যাহার উপরই নদীর জলপ্রবাহ বা জীবন প্রধান ভাবে নির্ভর করে সেখানে মৃত্তিকা কঠিন হওয়ায় তাহার জলশোষণের ক্ষমতা খুবই কম; কাজেই ভূস্তরে অতি অল্প পরিমাণ জল সঞ্চিত থাকার ও অধিকাংশ জল নদীপথে গড়াইয়া আসার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পার্শ্বত্যাগ অঞ্চল বনজঙ্গলে ও তৃণভূমিতে পূর্ণ। এই সমস্ত গাছপালা ও তৃণের শিকড়ের দরুন ভূমি সচ্ছিন্ন থাকায় জল অনেক পরিমাণে আটকা পড়িয়া ভূস্তরে শোষিত হয় ও প্লাবনের প্রখরতা প্রশমিত করে এবং শুষ্ক ঋতুতে স্তর চূষাইয়া নদীতে আসিয়া নদীর জীবন রক্ষা করে। এই শুষ্ক ঋতুর প্রবাহ নদীর জীবনধারণের পক্ষে এবং মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বর্ষাকালে নদীতে অনেক সময় প্রবল বহু ঘটয়া থাকে, তখন নদী উপকার না করিয়া বরং অলুবিধাই ঘটাইয়া থাকে। কাজেই নদী যাহাতে সারা বৎসর মানুষের উপকার করিতে পারে সেইজন্ম এই শুষ্ক ঋতুর প্রবাহ বজায় রাখিতে হইবে; তজ্জন্য নদীর অববাহিকার বিশেষ করিয়া পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলের মৃত্তিকার জল শোষণের ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস না পায় সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নদী বাংলাদেশের কি উপকার সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশ মোটামুটি ব-দ্বীপাকার। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উৎপত্তি, বৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহার নদীশ্রেণীপ্রবাহিত পলিমৃত্তিকা দ্বারা। যদিও এবিষয়ে পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলে উৎপন্ন সমস্ত নদীরই কিছু-না-কিছু দান রহিয়াছে কিন্তু গঙ্গা নদী ও তাহার শাখা প্রবাহিকার দানই এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলে এবং অববাহিকার অন্যান্য অংশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বর্ষাকালে নদী সমস্ত অববাহিকা হইতে বৃষ্টির জলের সহিত মাটি, প্রস্তরচূর্ণ, নানাবিধ ধাতব পদার্থ ধৌত করিয়া নদীপথে প্রবলবেগে বহন করিয়া আনে। সাগরসঙ্গমে

গাত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নদীবাহিত দ্রব্যাদি শুষ্ক পীড়িত হইয়া জমিয়া উঠিতে থাকে। গঙ্গা নদী প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হইলে উত্তর কালে ক্রমশঃ বিভিন্ন পথে সাগরের সহিত মিলিত হইতে, থাকে। বর্ষাকালে প্লাবনের ফলে এই সব প্রণালীর ছুকুল ছাপাইয়া জল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে; ফলে নদীবাহিত পলিমুত্তিকা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইতে থাকে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়। এইরূপ সংঘটনের ফলে ব-দ্বীপের জন্ম ও বৃদ্ধি হইয়াছে। ব-দ্বীপ উন্নত ও বাসোপযোগী করিতে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ব্যাপকভাবে সাহায্য করিয়াছে। বঙ্গোপসাগরের আকার 'ফানেলের' মত হওয়ায় এই জোয়ার-ভাটার শক্তি প্রবল। জোয়ার-ভাটার ফলে প্রতিদিন দুই বার নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত হয়। তাহার ফলে সাগরসঙ্গমে নদীবাহিত পলিমুত্তিকাদি ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া প্রতিদিন নদীপথে কিয়দূর পর্যন্ত যাতায়াত করে এবং পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডকে ক্রমশঃ উন্নত ও বাসোপযোগী করিয়া তোলে। এই পলিমুত্তিকার উর্বরতাশক্তি খুবই বেশী, ফলে দেশ ক্রমশঃ উর্বর হইতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের আকার ফানেলের (Funnel) মত হওয়ায় ব-দ্বীপের প্রসার ক্রমশঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অতি ক্ষীণ গতিতে প্রসারিত হইতেছে; ফলে নদীবাহিত দ্রব্যাদি বর্ষাকালে প্লাবন ও সমস্ত বৎসর জোয়ার-ভাটা দ্বারা ব-দ্বীপের সর্বত্র অধিকতর ভাবে বিস্তৃত হইয়া দেশকে ক্রমশঃ উন্নত করিতেছে।

বঙ্গদেশের এই সমস্ত নদীর উপর দেশের আর্থিক উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, জমির উর্বরতা—এক কথায় দেশের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। নদীগুলির অবস্থা বর্তমানে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গ, পশ্চিম-বঙ্গ এবং মধ্য-বঙ্গে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাংলাদেশ তার প্রাচীন গৌরব, সমৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

নদীগুলির এই শোচনীয় অবস্থা তথা দেশের জনস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি তিরোধানের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ দুইটি কারণ—(১) প্রাকৃতিক পরিবর্তন, (২) মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও আপাতস্বার্থের মোহ।

প্রকৃতির রীতি অনুসারে যে পথে বাধা অল্প সেই পথেই নদী বাহিত হয়। বৎসরের পর বৎসর একই পথে প্রবাহিত হওয়ার ফলে সে অঞ্চল ক্রমশঃ পলিমুত্তিকা দ্বারা উন্নত হইতে থাকে; নদীর ছুকুল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উচ্চ হইয়া যায়। কিন্তু যদি নদীর স্বাধীন প্রবাহে অথবা অববাহিকায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা না হয় তাহা হইলে নদীর তলদেশও সমভাবে উন্নত হইতে থাকে, ফলে নদীর গভীরতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এইজন্য বৎসরের পর বৎসর প্রায় একই পথে চলিয়া নদী ছুকুলের সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু বহু শতাব্দী পর তলদেশ কুলের সহিত তাল রাখিতে পারে না। কূল অত্যধিক উচ্চ হইয়া পড়ে, ফলে নদীপ্রবাহ কূলে বাধাপ্রাপ্ত

হয় এবং কালক্রমে কূল ভাঙিয়া ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। এইভাবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী অধুনা যে অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে অতীতে সেই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত না। শত শত বৎসর পর তাহারা গতিপরিবর্তন করিয়া ভিন্নপথে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই নদীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন।

মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির দ্বারা নদীরও স্বাধীনতা ও স্বাধীন রাজ্য আছে। অববাহিকাই তাহার স্বাধীন রাজ্য; তাহারই উপর তাহার জলপ্রবাহ নির্ভর করে। এই স্বাধীনতায় বা স্বাধীনরাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। শক্তি-হ্রাস হয়ত বর্তমান মুহুর্তে অনুভূত না হইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে তাহা অনুভূত না হইয়া পারে না। দেশের জনরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বাড়িয়া চলিয়াছে, কাজেই বাধা হইয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক লাভের বশবর্তী হইয়া সে নদীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও অববাহিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে বনজঙ্গল ও তৃণভূমি মানুষ প্রয়োজনবোধে অথবা লোভের মোহে কাটিয়া ফেলিয়াছে। অনেক অনধ্যুষিত স্থান কৃষিকার্যের জন্ত ব্যবহার করিতেছে। তাহার ফলে অববাহিকার জল শোষণের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে; ইহাতে নদীগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক ঋতুতে জলশূন্য হইয়া পড়িতেছে এবং বর্ষাকালে প্লাবনের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানে স্থানে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু সাময়িক সুবিধার জন্ত নদীর ছুকুলে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া প্লাবন রক্ষা করা হইতেছে। নদীর জলধারা বলপূর্বক নির্দিষ্ট পথে চালিত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে জলসেচনের জন্ত নদীর জল সেচপ্রণালী দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া নদীর জল বাহনের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই ভাবে বহু বৎসর ধরিয়। নদীর স্বাধীনতা ও স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করায় নদীগুলি ছুকুল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দেশের পক্ষে অনর্থের কারণ ও সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাকৃতিক কারণে নদীর বৃহত্তর গতি পরিবর্তনের জন্ত বঙ্গদেশে যে সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তর-বঙ্গ, মধ্য-বঙ্গ এবং ময়মনসিং ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল উল্লেখযোগ্য।

১৭৬৪ হইতে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সার্ভে করিয়া রেনেল (Rennel) বাংলাদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য মানচিত্র। এই মানচিত্রে দেখা যায় তিস্তা, উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া করতোয়া, আত্রৈয়ী, পূর্ণিবা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় প্রবাহিত হইয়া নিম্নদেশে মহানন্দা নদীতে পতিত হইয়াছে। অতঃপর একত্রে হরাসাগর নাম ধারণ করিয়া বর্তমান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে জাকিরগঞ্জ নামক স্থানে গঙ্গার মুহিত

মিলিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে উত্তর-বঙ্গের এই নদী-শ্রেণী সম্ভবতঃ বর্তমান ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গাপথে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত। ছায়াসাগর অজ্ঞাবধি রহিয়াছে তবে বর্তমানে উছা বরাল (গঙ্গানদীর একটি প্রবাহিকা), যমুনেশ্বরী, আত্রেয়ী এবং করতোয়া নদীর নির্গমন প্রণালী এবং গঙ্গা নদীতে মিলিত না হইয়া বর্তমান গোয়ালন্দ হইতে কয়েক মাইল উপরে যমুনা নদীতে মিলিত হইতেছে। পূর্ণভবা বর্তমানেও মহানন্দায় পড়িতেছে এবং মহানন্দা গোদাগাড়ি নামক স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে। মহানন্দা বর্তমানে উত্তর-বঙ্গের সর্বাপেক্ষা পশ্চিমে অবস্থিত নদী। প্রাচীনকালে তিস্তা নদী ও তাহার বিভিন্ন শাখা প্রবাহিকা সহযোগে উত্তর-বঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোশী নদী যাহা বর্তমানে ভাগলপুরের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছে তাহাও প্রাচীনকালে উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ববর্ণিত তিস্তামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। অতএব কোশী নদীও উত্তর-বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়া অতি প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদীও সম্ভবতঃ উত্তর-বঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে গঙ্গানদী পদ্মা নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তদবধি পদ্মানদী উত্তর-বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল উন্নত করিতেছে।

বাংলা ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) তিস্তা নদীতে এক প্রবল বন্যা হইয়া বহু স্থানের বিশেষতঃ রংপুর জেলার ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। সেই সময়ে তিস্তানদী ইঠাং পূর্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া তাহার এক প্রাচীন পরিত্যক্ত পথে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বাহাছরাবাদের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। তিস্তার এই দিকপরিবর্তনের ফলে তাহার শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য প্রবাহিকাগুলি (spill-channels) ক্রমশঃ ছুঁকল হইয়া পড়ে। হিমালয় হইতে তিস্তা নদীপ্রবাহিত পলিমুত্তিকা হইতে ইহার বক্ষিত হইতে থাকে। এই সব অতি প্রয়োজনীয় পলিমুত্তিকা তিস্তানদীপথে যমুনায় আসিয়া বুধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং যমুনায় ছুঁকল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যুষ্টিকার ক্রমশঃ ক্ষয় সাধন (erosion) করিতেছে। তিস্তানদীর জলধারা যমুনানদীর উভয়পার্শ্বে প্লাবনের প্রখরতা বৃদ্ধি করিতেছে। পার্শ্বত্যাগ অঞ্চলের প্রবাহের চাপের অভাবে তিস্তার শাখা প্রবাহিকাগুলি গঙ্গা বা যমুনায় সহিত সঙ্গমস্থলে এই নদীদ্বয়ের জলপ্রবাহের চাপের ফলে পলিমুত্তিকা দ্বারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাইতেছে এবং জল নিকাশনের পক্ষে অল্পযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত কারণে কালক্রমে উর্বর সমৃদ্ধিশালী উত্তর-বঙ্গ অল্পবর্ধন স্বাস্থ্যসমৃদ্ধিশীন হইয়া পড়িয়াছে। চলন বিল এবং ইহার চতুর্পার্শ্বস্থ স্থান অতি নীচ; তিস্তা সরিয়া গেলে উপরের

পলিমুত্তিকা হইতে বক্ষিত হইয়া সম্ভবতঃ এই নীচ অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ধাকালে এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায় এবং বহু দিন ধরিয়া জল আবদ্ধ থাকিয়া কৃষি ও স্বাস্থ্যের সমুদ্ব অনর্থ ঘটায়। আবদ্ধ ও পচা জল মশার উৎপত্তিস্থল; কাজেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এই অঞ্চলে খুব বেশী। শীতকালে এবং অল্প শুষ্ককালে এই অঞ্চলের জল শুকাইয়া যায় এবং ভূগর্ভে বহুদূর পর্যন্ত খনন করিয়াও জলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ভূগর্ভের এত নীচে জল চলিয়া যায় কেন তাহা ভাবিবার বিষয় এবং এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

যাহা হউক, এই অঞ্চলের তথা উত্তর-বঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত ও উর্বরতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। তিস্তার জলধারা পূর্বের পথে প্রেরণ করিতে পারিলে সমস্তর অনেকেংশে সমাধান হইবে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ির নিকটে তিস্তানদীতে জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ (barrage) বাঁধিয়া এবং হিমালয়ের সন্নিকটে তোয়াধার (reservoir dam) নির্মাণ করিয়া জলপ্রবাহ প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই সমস্ত সমাধানের পরিকল্পনা চলিতেছে। ইহাতে উদ-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে সফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

ব্রহ্মপুত্র প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল; পরে ডিহাং নদী দ্বারা তিব্বতের শানপো নদীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া আকারে ও আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতীতে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা ময়মনসিংহের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্তমান যমুনা তখন একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিস্তানদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইলে ব্রহ্মপুত্রের পক্ষে সমস্ত জল ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই উছা ধীরে ধীরে বর্তমান যমুনায় ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়। বর্তমানে ইহা খুবই বড় এবং শক্তিশালী নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৪০ মাইল এবং ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৩৬১০০০ বর্গমাইল। বর্তমানে গোয়ালন্দে গঙ্গা ও যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদী বর্তমানে গঙ্গার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং গঙ্গার জল-প্রবাহকে প্রবলভাবে বাধাপ্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর এই দিকপরিবর্তনের ফলে প্রাচীন অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ধাকালে পূর্বে ইহা যে পরিমাণ জল বহন করিতে পারিত বর্তমানে তাহার তুলনায় অনেক কম পরিমাণ জল বহন করিতে পারে এবং অল্প সময়ে ইহা উর্বৃত্তন শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়ে। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পূর্বাংশ এই নদীর অবদান; ইহার দ্বারাই এই সমস্ত অঞ্চল বক্ষিত ও উর্বর হইয়াছিল। বর্তমানে নদীর এই শোচনীয় অবস্থার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলের জল ভাল

ভাবে নিষ্কাশিত হয় না এবং উর্বর পলিমুক্তিকার অভাবে এই সমস্ত অঞ্চল ক্রমশঃ অসুর্বর ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। নদীটিকে পূর্বের অবস্থার ফিরাইয়া আনা একরকম অসম্ভব ব্যাপার বলিলেই চলে। তথাপি এই নদীর সংস্কারসাধন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবাহক প্রণালীগুলির (drainage) উন্নতি-সাধন সম্ভবপর, তাহাতেও এই অঞ্চলের অধঃপতিত কৃষি ও ম্যালেরিয়াপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার বিয়োগ স্থানের নিম্নদেশে অদূরে জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ বাঁধিয়া জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া ময়মন-সিংহে ব্রহ্মপুত্র ও তাহার প্রবাহিকাগুলির উৎকর্ষ সাধনের পরিকল্পনা চলিতেছে। জনস্বার্থের প্রয়োজনে পরিকল্পনা আন্ত কার্য্যকরী হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যবঙ্গ—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদী গঙ্গার প্রধান শাখা ছিল; অতঃপর যখন গঙ্গা পদ্মাকে প্রধান শাখা হিসাবে গ্রহণ করে তখন হইতে ভাগীরথী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। নিম্নদেশে হুগলী হইতে কয়েক মাইল উপরে ত্রিবেণী নামক স্থানে ভাগীরথী তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। পশ্চিমদিকের শাখার নাম সরস্বতী, পূর্বদিকের শাখার নাম যমুনা এবং দক্ষিণে ভাগীরথী—উহা নিম্নদেশে হুগলী নাম ধারণ করিয়াছে। পদ্মার পথে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের পূর্বে এই সব নদী সজীব ছিল; কিন্তু গঙ্গা যখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল তখন হইতে তাহার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সরস্বতী এবং যমুনা অধুনা মৃত। ভাগীরথীও বর্ষাকাল ছাড়া অন্যসময়ে প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। নিম্নদেশে ভাগীরথী কতকটা সজীব রহিয়াছে। তাহার কারণ পশ্চিম বঙ্গের কতকগুলি নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা নিম্নদেশে প্রতিদিন প্রবাহিত হয়। ভৈরব নদীও তৎকালে গঙ্গার একটি প্রধান শাখা ছিল কিন্তু গঙ্গার দিক পরিবর্তনের ফলে উহাও বর্তমানে মৃতপ্রায়। বর্তমানে উহা মধ্যপথে যথাক্রমে জালাঙ্গী এবং মাধাভাঙা নদীদ্বারা কর্তৃত হইয়াছে। উল্লিখিত নদীগুলি ও তাহাদের বহু প্রবাহিকা যথা কোবা-ডাক, চিত্রা, নবগঙ্গা, বেতনা, কোদলা ইত্যাদি যাহা দ্বারা সমস্ত মধ্য-বাংলায় অতীতে জল ও পলিমুক্তিকা সরবরাহ হইত সেগুলিও বর্তমানে পূর্বোক্ত কারণে নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায়।

গঙ্গা এবং তাহার এই সমস্ত শাখা-প্রবাহিকাপথে প্রবাহিত পলিমুক্তিকা দ্বারাই অতীতে মধ্য-বাংলা গড়িয়া উঠিয়াছে। উহারাই তৎকালে এই অঞ্চল উর্বর কৃষি-উপযোগী, বাসোপযোগী এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গা দিক পরিবর্তনের ফলে ইহার যখন ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে তখন এ অঞ্চলে ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেয়। জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় জল আবদ্ধ হইয়া পচিয়া মশার উৎপত্তিস্থল হইয়া উঠে এবং কালক্রমে এই অঞ্চল ম্যালেরিয়ার

আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, জমি উর্বরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, ফলে কৃষির অবস্থাও শোচনীয়।

এই নদীগুলি নিম্নদেশে সাগরসঙ্গমে জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট। প্রতিদিন এই নদীসমূহের নিম্ন অংশগুলিতে জোয়ার-ভাটা চলে। সমুদ্রে চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণের ফলে জোয়ারের উৎপত্তি। জোয়ারের সময় প্রবলবেগে জল নদীনালা পথে উর্দ্ধমুখে ধাবিত হয় এবং ছুকুল ধাবিত করিয়া জলবাহিত পলিমুক্তিকা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর পলিবিচ্যুত পরিষ্কৃত জল ভাটার সময় নদীগর্ভে পতিত পলিমুক্তিকা কুড়াইয়া লইয়া সাগরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ভাটার সময় জলের বেগ অনেক প্রশমিত হওয়ায় নদীতলদেশ সম্পূর্ণ পলিশূন্য হইতে পারে না, কাজেই আস্তে আস্তে উহা ভরাট হইয়া উঠে এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যায়; জোয়ার-ভাটাও সে পথে চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। যেহেতু দেশ গঠন, উন্নত, উর্বর ও বাসোপ-যোগ্য করার জন্ত জোয়ার-ভাটা একান্ত প্রয়োজনীয়, কাজেই উহা বন্ধ হওয়া দেশের পক্ষে সমুহ ক্ষতির কারণ। নিম্নবঙ্গে অনেক স্থানে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অথবা লোভ ও স্বার্থের বশে নদীর দুই ধারে বাঁধ বাঁধিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমিগুলিকে কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতেছে কিন্তু এই বাঁধ বাঁধার ফলে নদীগুলি দ্রুতগতিতে ভরাট হইয়া যাইতেছে, কারণ জোয়ার-বাহিত পলিমুক্তিকা বাহিরে যাইতে না পারিয়া নদীর তলদেশেই সঞ্চিত হইতেছে। এই ভাবে বহুদিন চলিলে দেশের অশেষ অকল্যাণ ঘটবে। সুতরাং জোয়ার-ভাটাকে কিছুতেই বন্ধ হইতে দেওয়া চলিবে না—ইহাকে চালু রাখিতে হইবে।

ভাটার সময় জলের বেগ বর্ধিত করিয়া দিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হয়; কারণ তাহা হইলে উহা নদীর তলদেশ সম্পূর্ণ পলিশূন্য করিয়া ফিরিতে পারিবে এবং নদী ভরাট হইয়া উঠিবে না। নদীর উর্দ্ধতন প্রদেশ হইতে বাহিত জলধারা ভাটার বেগ বর্ধিত করে। নদীতে সমস্ত বৎসর পর্য্যাপ্ত জল-প্রবাহ থাকিলে সারা বৎসরই ভাটা বেগবান ও সক্রিয় থাকে। গঙ্গা পদ্মার পথে প্রবাহিত হওয়ায় মধ্য-বাংলার এই সমস্ত নদী ও প্রবাহিকাগুলি শুষ্ক ঋতুতে গঙ্গার জলপ্রবাহ হইতে বর্ধিত হইতেছে। ফলে জোয়ারের লবণাক্ত জল উর্দ্ধদেশে বহু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছে এবং নদীগুলি নিম্ন দেশে ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উঠিতেছে। প্রয়োজনানুরূপ ধৌত হওয়ায় অভাবে যুক্তিকা ক্রমশঃ লবণাক্ত হইতেছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। এই জোয়ার-ভাটাবিশিষ্ট নদীগুলি দেশের নৌচলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়, কাজেই এইগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়া নৌচলাচলের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর।

গঙ্গা নদীর দিকপরিবর্তনের ফলে যে সুদূরপ্রসারী

সমস্তর উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। সম্প্রতি একটু আশার আলো দেখা যাইতেছে। মাথাভাঙা, জালাঙ্গী ও ভাগীরথী অধুনা মধ্য-বাংলায় গঙ্গার প্রধান শাখা নদী। গঙ্গার জলপ্রবাহ বর্তমানে গোয়ালন্দে যমুনার জলপ্রবাহ কর্তৃক প্রবল বেগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই সব শাখা-প্রবাহিকা পথে পুনরায় নির্গমনের চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে গড়াই নদী শুষ্ক, নীর্ণ প্রবাহ হইতে বৃহদাকার নদীতে পরিণত হইয়াছে এবং নৌচলাচলের উপযোগী হইয়াছে। মাথা-ভাঙা নদীর উৎপত্তিস্থলে যে বিরাট চর ছিল তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং নদীটি ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠিতেছে। ভাগীরথী ও জালাঙ্গীর উৎপত্তি স্থলও ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

প্রকৃতির এই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আশু ফললাভের সম্ভাবনা নাই। তাহার এই সাহায্য কাজে লাগাইয়া অর্থ ও বিজ্ঞান প্রয়োগে এই সমস্ত শাখা-প্রবাহিকা-পথে গঙ্গার জলধারা প্রয়োজনানুরূপ প্রেরণ করিয়া উহাদের উৎকর্ষ সাধন করা প্রয়োজন; নতুবা অচিরেই এই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি বনজঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইয়া মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অসুপযোগী হইয়া উঠিবে।

ইদানীং গোদাগাড়ীর নিকটে জলপ্রবাহ রোধার্থ বাঁধ (barrage) বাঁধিয়া একটি নির্দিষ্ট নালাপথে গঙ্গার জলধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া মধ্য-বাংলার নদী ও প্রবাহিকাগুলির উৎকর্ষ-সাধনের পরিকল্পনা চলিতেছে। পূর্বেও এই ধরনের পরিকল্পনা হইয়াছিল। স্তর উইলিয়ম উইলকক্স প্রমুখ ইঞ্জিনিয়ার বহুদিন পূর্বে এই ধরনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ধরনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বহু অর্থ ও ধৈর্যের প্রয়োজন। ইহাতে যে মঙ্গললাভ ঘটবে তাহা অর্থব্যয়ের তুলনায় সাময়িকভাবে অতি অল্প হইলেও ভবিষ্যতে মধ্য-বাংলায় ইহার সুদূরপ্রসারী সুফললাভ ঘটবে। নদীগুলি উৎকর্ষ ও সজীবতা লাভ করিলে জোয়ারের লবণাক্ত জল ক্রমশঃ নীচে সরিতে থাকিবে এবং অধিকতর ক্ষেত্র কৃষি-উপযোগী হইবে। বিল প্রভৃতি নীচ জমিতে পূর্ববঙ্গের স্থায়ী ধানগাছ অথবা অনুরূপ শস্য বপন করিলে এবং বাড়ীঘর উঁচু টিপিতে নির্মাণ করিলে বর্ষাকালে সাধারণ প্লাবনে শস্য ও ধরবাড়ীর ক্ষতি হইবে না। এই ভাবে সকলে সমভাবে নিঃস্বার্থভাবে মনোনিবেশ ও সহযোগিতা করিলে মধ্য-বাংলার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে।

পশ্চিম বঙ্গ—পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলির কোনটিরই অব-বাহিকার আয়তন খুব বেশী নহে। এই নদীগুলির মধ্যে দামোদর নদীই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৭২০০ বর্গমাইল। এই নদীগুলির অববাহিকায় সর্বত্র একসঙ্গে সমান রুষ্টিপাত হয়। ফলে মৌসুমী ঋতুতে

কয়েকদিন ক্রমাগত সমান রুষ্টিপাত হইলেই নদীগুলিতে প্লাবন দেখা দেয়। আবার যখন রুষ্টি থামিয়া যায় তখন সর্বত্র একই সঙ্গে থামে, কাজেই প্লাবনও তিন-চার দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। প্লাবন কমিয়া গেলে নদীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং এমন কি বর্ষাকালেও অনেক সময় ক্ষুদ্র ধারায় পরিণত হয়। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলি প্রায় শুকাইয়া যায়। এই নদীগুলির অববাহিকা ভারতের প্রাচীন ভূখণ্ডের অন্ততম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া রুষ্টির জলে ধৌত হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে মৃত্তিকা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; ফলে উহার জল শোষণ করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে বনজঙ্গল ও তৃণভূমি অনেক পরিমাণে কণ্ঠিত হওয়ায় ভূমি অনারত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কারণে পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি মৌসুমী কালে ধরস্রোতা এবং শুষ্ক ঋতুতে প্রায় জলশূন্য ক্ষুদ্রধারায় পরিণত হয়।

পশ্চিম বঙ্গের পূর্বাংশ ব-দ্বীপাকার এবং এই সমস্ত নদী (বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদী এবং বর্তমান জেলায় দামোদর এবং অজয় নদী) বাহিত পলি-মৃত্তিকাদ্বারা এই ভূখণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ নদীগুলিকে তাহাদের কার্য্যসমাধানের পূর্ণ সময় দেয় নাই; ভূমিগুলি যথোপযুক্ত উন্নত ও উর্বর হওয়ার পূর্বেই তাহার নদীকূলে বাঁধ (embankment) বাঁধিয়া জমিগুলি চাষ-আবাদ এবং বসবাসের কার্য্যে লাগাইতে আরম্ভ করে। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বেই এই অবিস্মৃত কার্য্যের স্বচনা। তৎকালে জমিদারগণ এই সমস্ত বাঁধ যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার কোনই চেষ্টা করিতেন না। ফলে মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙিয়া প্লাবন ঘটত, ইহাতেও সফল লাভ হইত। কারণ মধ্যে মধ্যে নদী-বাহিত পলিমৃত্তিকা পাইয়া জমি উর্বর এবং উন্নত হইয়া উঠিত।

কালক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বাঁধরক্ষার কার্য্য গ্রহণ করেন এবং খুবই যোগ্যতার সহিত বাঁধরক্ষা করিতে থাকেন। তখন ভাঙন আর ঘটত না বলিলেই চলে; যদিও কদাচিৎ ঘটত, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত; ফলে জমি-গুলি মাঝে মাঝে যে উর্বর পলিমৃত্তিকা পাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ উর্বরতা হারাইতে লাগিল। এদিকে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা নদীগর্ভে সঞ্চিত হওয়াতে নদীগর্ভও ক্রমশঃ উঁচু হইতে লাগিল; ফলে প্লাবন রক্ষা করিবার জন্ত পার্বত্য বাঁধসমূহও উত্তরোত্তর উঁচু করিতে হইল। এইভাবে কালক্রমে কোন কোন স্থানে বাঁধের উচ্চতা ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু কতদিন এইভাবে বাঁধ উঁচু করিয়া বজা রোধ করা সম্ভবপর? অতি উঁচু বাঁধ তৈয়ারী করা এবং রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য ও কঠিন ব্যাপার; কোনক্রমে তথায় ভাঙন ঘটিলে ভয়াবহ বেগে নদীর জল গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেশের ভীষণ অনর্থ ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে বাঁধ



সুখের বিষয় এই যে আধুনিক বিজ্ঞান এই জটিল সমস্যাও সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকায় এই ধরণের নদীসমস্তা রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগে চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে। আমেরিকার টেনেসী নদী পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলির অনুরূপ, কয়েকদিন প্লাবনের পর নদী মাত্র ২০ ফুট গভীর জলে পরিণত হইত। শুষ্ক ঋতুতে প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়িত এবং নৌচালাচলের সম্পূর্ণ অল্পপযোগী হইয়া যাইত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এই নদীর সমস্তা সমাধানের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। যে সব রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নদীটি চলিয়া গিয়াছে তাহাদের পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য এবং নদী-অববাহিকায় উদ্ভূত অন্যান্য বহুবিধ বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে প্রচেষ্টা বহুদিন ফলবতী হয় নাই। অবশেষে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রভাবে সমস্ত বাধা-বিরোধ

দূর হয় এবং ফেডারেল ষ্টেটের সমস্ত ক্ষমতা এই বিষয়ে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়।*

দামোদর নদী আকারে টেনেসী নদী অপেক্ষা ছোট হইলেও উহার প্রকৃতি ও সমস্ত টেনেসী নদীর প্রকৃতি ও সমস্তার অনুরূপ। এই নদীতে সাধারণ প্রাচীন ছাড়াও মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বন্যা দেখা দেয়। ১৯১৩, ১৯৩৫ এবং সম্প্রতি ১৯৪৩ সালের সর্ববিশ্বংসী বন্যা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সালের বন্যার পর বাংলা-সরকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি ‘দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি’ (Damodar Flood Enquiry Committee) গঠন করেন। এই কমিটি অনেক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে টেনেসী নদীর অধিকরণে দামোদর ও তাহার শাখা বরাকর নদীর স্থানে স্থানে কতকগুলি তোয়াধার (reservoir dams) ও নদীর নিম্নদেশে কতকগুলি জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ (barrage) নির্মাণ করিলে দামোদর নদীকে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর। তাহার তোয়াধার নির্মাণের স্থানও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (তোয়াধারগুলির অবস্থান সংশ্লিষ্ট ম্যাপে দেখান হইল। চিত্রিত)। নিম্নলিখিত স্থানগুলি তাহার তোয়াধার নির্মাণের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন :—(১) পারজোরী, (২) আয়ার, (৩) রামগড়—ইহার দামোদর নদীতীরে অবস্থিত; (৪) হর্দ, (৫) দেওলবাড়ী, (৬) পাকিয়া অথবা সন্নিকটস্থ বলপাহাড়ী, (৭) তিলিয়া—এই কয়টি বরাকর নদীর তীরে অবস্থিত; (৮) উট্রী—ইহা উট্রী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া দামোদরের অন্যান্য উপনদীতে এবং দামোদর ও বরাকরের সম্মুখস্থান ও পারজোরীর মধ্যে আরও কতিপয় স্থানে তোয়াধার নির্মাণ সম্ভবপর। এই সমস্ত তোয়াধার নির্মাণ করিতে বেশ বেগ পাইতে হইবে, কারণ অনেক স্থানে নদীর তলদেশ ৫০।৬০ ফুট পর্যন্ত বালুপূর্ণ; শক্ত, প্রস্তরময় স্থান ও ফাটলপূর্ণ। কিন্তু টেনেসী নদীতে ইহা অপেক্ষা অসুবিধাজনক স্থানেও তোয়াধার নির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে, কাজেই দামোদর নদীতেও সম্ভবপর হইবে।

তোয়াধারগুলি অতি ধীরে ধীরে বালু ও পলিমুক্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকে। তথাপি তোয়াধারগুলি ২০০ বৎসর পর্যন্ত অনায়াসে জীবিত থাকিবে। তাহা ছাড়া বালু ও পলি উদ্ধারের অনেক বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যাহা টেনেসী নদীর তোয়াধারগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে। তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তোয়াধারগুলির আয়ুষ্কাল আরও বৃদ্ধি হইবে।

* প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় ক্রিয়ত কমলেশ রায় “টেনেসী নদীর কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

কমিটি হিসাব করিয়াছেন যে তাহাদের দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে ২৫।৩০ কোটি টাকার দরকার। পরিকল্পনা ফলবতী হইলে উৎপন্ন উদ-বিদ্যুৎ (hydro-electricity) হইতেই প্রতি বৎসর গড়ে দুই কোটি টাকা আয় হইবে; তাহা ছাড়া দেশের আরও কত যে উপকার হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতে সরকারের বিধািবোধ করা উচিত নহে।

সম্প্রতি সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড তাহাদের দামোদর পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন (Preliminary Memorandum on the unified Development of the Damodar River by the Central Technical Power Board, Printed at the Govt. of India Press, Calcutta, 1946)। এই পাওয়ার বোর্ডে টি.ভি.এ.র (টেনেসী ভ্যালি অথরিটি) বিশেষজ্ঞ ভুরডুইন (W. L. Voorduin) হাইড্রো-ইলেকট্রিক মেম্বার। তিনি এককালে টি.ভি.এ.র (T. V. A.) দ্বিতীয় প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন। এই বোর্ডের পরিকল্পনা ও অনুমোদন পূর্বোক্ত ‘দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি’র পরিকল্পনারই অনুরূপ। তাহার আটটি তোয়াধার এবং নদীর নিম্নদেশে একটি জলপ্রবাহরোধার্থ বাঁধ নির্মাণ অনুমোদন করিয়াছেন। (তাহাদের অনুমোদিত তোয়াধারগুলিও ম্যাপে দেখান হইল ০ চিত্রিত)। তাহার নিম্নলিখিত স্থানে তোয়াধার নির্মাণ অনুমোদন করিয়াছেন—(১) আয়ার, (২) কোনার (কোনার নদীতে), (৩) বোকারো (বোকারো নদীতে), (৪) বাম্বো, (৫) সোনালপুর, (৬), (৭), (৮) দামোদর নদীতে অবস্থিত; (৬) তিলিয়া, (৭) দেওলবাড়ী, (৮) মালধন—এই কয়টি বরাকর নদীতে অবস্থিত। পূর্বোক্ত পরিকল্পনার ভায় ইহাও বহুমুখী পরিকল্পনা। বন্যা নিরোধ, উদ-বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি ও নৌচলাচলের উৎকর্ষ বিধান এই পরিকল্পনায়ের উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনা অথবা পূর্বোক্ত পরিকল্পনা—যে কোন একটি আশু কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন; তাহাতে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, দামোদর বিধ্বস্ত অঞ্চলের পূর্ব সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিবে, উদ্ভূত উদ-বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া এই অঞ্চলে বহু বিরাট বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। তাহা ছাড়া কয়লার ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় আমাদের এই অতি অল্প পরিমাণ জাতীয় সম্পদ ভবিষ্যতের জন্ত এবং অতি প্রয়োজনীয় কার্যের জন্ত মজুত থাকিবে, ম্যালেরিয়া চিরতরে বিদায় লইতে বাধ্য হইবে, বন্যা চিরতরে দূরীভূত হইবে, কৃষির বিপুল উন্নতি সাধিত হইবে, জমিসমূহের উর্বরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, নদী বহু দূর পর্যন্ত স্নান্য হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

‘টেনেসী ভ্যালি অথরিটি’র অধিকরণে ‘দামোদর ভ্যালি অথরিটি’ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাহারই উপরে সমস্ত ভার

ন্যস্ত করিলে অল্প সময়ে এবং সহজেই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে।

পূর্ব বঙ্গ—পূর্ব বঙ্গের নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনাই প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মেঘনা নদীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই নদীটির জলধারণের ক্ষমতা খুবই বেশী এবং বর্ষাকালে প্রবল বন্যাতেও ইহার জলের উচ্চতা খুব বেশী হয় না। শুষ্ক ঋতুতেও ইহা জলভরা থাকে, কাজেই সারা বৎসরই ইহা নৌ-চলাচলের উপযোগী। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের নদীগুলির মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট নদী। ইহার অববাহিকায় চেরাপুঞ্জী অবস্থিত, তাহার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। স্ততরাং মেঘনা-বাহিত জলের পরিমাণ খুব বেশী। ইহা যে পলিমুক্তিকা বহন করে তাহার বেশীর ভাগই 'সিলেট ক্লিল' পুরণে যায় হইয়া যায়। এই 'সিলেট ক্লিল' নামক নীচ-বিশাল অঞ্চলটি সিলেট হইতে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলার ভিতর পর্য্যন্ত (ভৈরব বাজার পর্য্যন্ত) প্রসারিত। অতঃপর যে জলধারা নীচে বহিয়া আসে তাহা প্রায় পলিমুক্তিকা-শূন্য।

সম্প্রতি পাহাড়ী অধিবাসীরা মেঘনার অববাহিকার বন-জঙ্গল পরিকার করিয়া স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করিতেছে। ইহাতে মেঘনা নদীর ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই-বিষয়ে এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

পূর্ব বঙ্গে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের নিম্ন পার্বত্যভূমি হইতে উপর নদীগুলির মধ্যে গোমতী, কর্ণফুলী ও হালদা প্রধান। এই নদীগুলি খরশ্রোতা নদীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও শুষ্ক ঋতুতে ইহারা একেবারে জলশূন্য হয় না। তাহার কারণ এই অঞ্চলে শুষ্ক ঋতুতেও কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং পার্বত্য অঞ্চলে বন জঙ্গল এখনও ব্যাপকভাবে কাটিয়া পরিকার করা হয় নাই।

এই খরশ্রোতা নদীগুলিতেও তোয়াধার নির্মাণ করিয়া জল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা চলিতেছে। কর্ণফুলী নদীতে তোয়াধার নির্মাণ করিয়া নিয়ন্ত্রণকে বন্যার হাত হইতে রক্ষা করা হইতে পারে এবং উদ্ভূত উদ-বিদ্যুৎ কাঠশিল্প (forest industry) স্থাপন এবং প্রসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোমতী নদীতেও জলপ্রবাহ রোধার্থ বাধ বাধিয়া জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জল প্লাবন হইতে রক্ষা করার পরিকল্পনা চলিতেছে।

এই সমস্ত অঞ্চলে প্লাবন তথা নদীসমস্যা তত জটিল নহে

বরং ইহাদের অববাহিকা ও স্বাধীন প্রবাহে কোন হস্তক্ষেপ না করিলেই নদীগুলির অবস্থা ভাল থাকিবে এবং বহুদিন দেশের সেবা করিতে পারিবে। বস্তুতঃ নদীকে বাধাপ্রদান না করিয়া নদীর সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিলে যে দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি অটুট থাকে পূর্ব বঙ্গই তাহার উদাহরণ। পূর্ব বঙ্গে বর্ষাকালে নদী কূল ছাপাইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে। এই বর্ধিত জলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে উচ্চ টিপিতে ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া বসবাস করে এবং এক প্রকার দীর্ঘ ধান গাছ বপন করে যাহা জলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। কাজেই বর্ষাকালে ঘরবাড়ী ও শস্যের কোন ক্ষতি হয় না। জল স্বাধীনভাবে বাড়িয়া চলিয়া আবার স্বাধীনভাবেই অল্পদিনের মধ্যে উন্মুক্ত অব্যাহত নদীনালা পথে সরিয়া যায়; কাজেই জল আবদ্ধ থাকিয়া ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের আবাসভূমি সৃষ্টি করে না। এইজন্য পূর্ববঙ্গের (ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ব্যতীত) স্বাস্থ্য বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক ভাল। জমি পলিমুক্তিকা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া অধিকতর উর্বর হইয়া উঠে এবং প্রতিবৎসর প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করে। এইজন্য পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থান স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে।

বঙ্গদেশের নদীসমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা মোটামুটি আলোচনা করা হইল। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে নদীগুলির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট। কাজেই কোন স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে সর্বত্র সম্ভবদ ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং শুধু প্রাদেশিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নহে; সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকেও যুগপৎ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা করিতে হইবে।

REFERENCES :-

1. *Rivers of the Bengal Delta*—S. C. Majumdar, C.I.E., I.S.E., M.I.E. (Ind.), (University of Calcutta publication, 1942).
2. *Science & Culture*, Vol. IX, No. 10, p. 418.
3. *Science & Culture*, Vol. X, No. 11, p. 20.
4. *Science & Culture*, Vol. XI, No. 10, p. 513.
5. Lectures by Dr. N. K. Bose, Director, River Research Institute, Bengal, on 'River System of Bengal and Her Rehabilitation' in the hall of the Indian Association for the Cultivation of Science, 210, Bowbazar Street, Calcutta, on 12th March, 18th March, 1st April and 8th April, 1946.

যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী-মেলা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আমেরিকার গ্রাম্য মেলা একাধারে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ও হইতেই সুস্থ ও সবল গো-মহিষ, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি জন্তু-আমোদ-প্রমোদের স্থান, এবং কৃষিজীবীদের অত্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্র। সমূহকে মেলাক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া সেখানে পুনরায় তাহাদের

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপ্রধান পল্লী-অঞ্চলে এই মেলার অনুষ্ঠানই সমগ্র বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

মেলা-প্রাঙ্গণে নির্মিত তাঁবু-গুলিতে আমেরিকার গ্রাম্য-জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ দর্শকদের হয় এবং কৃষি, শিল্প ইত্যাদি নানা দিক দিয়া পল্লী-বাসীরা কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং জয়লাভ করিবার পূর্বা আমেরিকাবাসীদের প্রকৃতিগত। মেলা-ক্ষেত্রেও ইহার প্রমাণ



যুক্তরাষ্ট্রের ভারত টেটের মেলা-প্রাঙ্গণে 'ফেরিজ হইল' নামক চক্রযান।



দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের একটি মেলায় মহিলাদের সূচিকর্ম ও হস্ত-শিল্প প্রদর্শনী

পাওয়া যায়। চাষবাস এবং জমিজেরাৎ সংক্রান্ত অতি সাধারণ ব্যাপারাদিও এমন সুস্থভাবে প্রদর্শিত হয় যে, দর্শকদের নিকট তাহা পরম চিত্তাকর্ষক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মেলার অত্যন্ত প্রধান আকর্ষণ পল্লীবাসীদের পুরস্কারপ্রাপ্ত (prize) পণ্য প্রদর্শনী। ছোট-বড় সকল জাতদারের নিকট

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং সুবিধামত নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষিকর্মকারীদের সমক্ষে সেগুলি প্রদর্শিতও হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের প্রত্যেক মেলাতেই, সমস্তে রক্ষিত এবং সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট ফলমূল তরি-তরকারী এবং শস্যাদির প্রদর্শনী এক দেখিবার জিনিষ। অত্যাশ্চর্য্য জিনিষের মধ্যে জীলোকদিগের সূচিকর্ম এবং নানাপ্রকার হাতের কাজ, ছুরিকা দ্বারা কাঠের উপর, কুলেজ, ছেলেদের বিবিধ সুস্থ কার্য-কার্য এবং ছাত্রীদের চিত্রকলা ইত্যাদি আমেরিকাবাসীদের বিচিত্র এবং বিভিন্নমুখী স্বজনী ক্ষমতার পরিচায়ক।

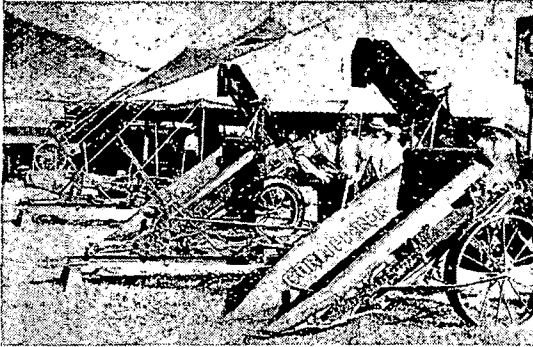
মেলায় প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে জনপদবধূরা সারা বৎসর অবসরসময়টুকু সূচিকর্ম এবং ফলমূলাদি টিনজাত করা ইত্যাদি কাজে ব্যয়িত করে। তাহাদের স্বামীরা, যে-সমস্ত গরু-বাহুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুকে প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে হইবে সেগুলির পরিচর্যায় এবং ফলমূল,

শস্ত্রাদি ও তরিতরকারীর উত্তম ফলনের জন্য বিশেষভাবে যত্ন-বান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পল্লীবাসীমাঝেই নিজ নিজ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক মেলায় একান্ত আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়া থাকে। আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের ছেলে-বুড়া সকলেরই একথা জানা আছে যে, মেলায় যেমন প্রচুর আয়োগ উপভোগ করা যায় তেমনই ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামবাসীদের পরস্পরের মেলা-মেশার দরুন নানা বিষয় শিখি-বারও সুযোগ পাওয়া যায়।

গোড়ার দিকে মেলা অনুষ্ঠিত হইত বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে, বিভিন্ন জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেতা এবং বিক্রেতাদের পার-স্পরিক সাহচর্যের সুযোগ-সুবিধা



টেল্লান ষ্টেটের সান এঞ্জেলো খেলায় জনসমাগম। পিছনে বাঁদিকে 'নারী-সদনে' মহিলাদের স্থচিকর্ম এবং টিনড্রাত খাণ্ডদ্রব্যাদির প্রদর্শনী



আইওবা ষ্টেটের মেলায় একটি নূতন ধরণের শস্ত-সংগ্রাহক যন্ত্র করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেট এবং 'কাউন্টি' বা জেলার মেলাসমূহ এলাহী কাণ্ড। এগুলি আসলে কৃষি, উদ্যান-রচনা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা, কলাবিজ্ঞা, যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্নবিষয়ক বিরাট প্রদর্শনী বিশেষ। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ষ্টেটেই প্রতি বৎসর ব্যবস্থা-পরিষদের উত্তোগে মেলায় অনুষ্ঠান হয়। পরিষদ আংশিকভাবে বার্ষিক মেলায় ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন এবং মেলা-প্রাঙ্গণে স্থায়ী ভাবে গৃহাদি নিষ্কাণের ব্যবস্থাও হয়। কাউন্টি বা জেলার মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় জোতদার এবং কারবারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সাকল্যে বায়ান্নটি প্রতিষ্ঠান বিরাট মার্কিন মেলা এবং প্রদর্শনী মহাসম্মেলের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের আগেকার বৎসরে আন্দাজ পাঁচ কোটি পল্লীবাসী আনুমানিক দুই হাজার মেলায় যোগদান করিয়াছিল।

আমেরিকার পল্লী-মেলা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী—আসলে ইহা একটি পুরাপুরি গ্রামীণ বিচিত্র অনুষ্ঠান। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। উত্তর আটলান্টিকের উপকূল-ভাগস্থ অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীসমূহের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত মেলায় পুরনো ধাঁচের নাচ হইয়া থাকে। মধ্য-পশ্চিম ষ্টেটের মেলায় সাজ-পরা অশ্বসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম তল্লাটের মেলায় মেক্সিকো অঞ্চলের সঙ্গীত-সম্বলিত রেড ইন্ডিয়ান নৃত্য পরম উপভোগ্য হইয়া থাকে।

সর্বত্রই মেলায় দর্শকদের সামনে নাটকীয় এবং বিচিত্র দৃশ্যসমূহের অবতারণা করা হয়। আমেরিকার প্রত্যেক পল্লী-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত মেলার আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস হইতেছে 'ফেরিজ ছইল'। এই চক্রযানে মেলা-প্রাঙ্গণে পরি-



উত্তর আটলান্টিকের উপকূল অঞ্চলস্থ মেলায় দুইটি ঘাঁড়ের মধ্যে ভারবহন প্রতিযোগিতা



টেক্সাস স্টেটের গঞ্জালেস 'কাউন্টি'-মেলায় স্বস্ত-প্রস্তুত, পাঁজরাত
খাজবস্তুর প্রদর্শনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান জনৈক বৃদ্ধা মহিলা

ভ্রমণ বিশেষ আমোদজনক। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পল্লীবালকেরা যখন দেখে যে, ফেরিজ ছইলগুলি সহরতলীর পথে চলিয়াছে তখনই তাহারা আদম মেলার পূর্বাভাস পায়।

মেলায় কৃষকদের মধ্যে উত্তম ফসল উৎপাদন-প্রণালী এবং কৃষক-বনিতাদের মধ্যে টনজাত খাজবস্তুর বিক্রয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। যুদ্ধের সময় মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ,—অনেক উৎপাদক সর্বোচ্চ মূল্যে যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়ার বণ্ড' ফ্রেতার নিকট বিক্রী করিয়াছিল, এমনভাবে তাহারা মিত্রপক্ষের সমরোপকরণ সরবরাহ-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রবি-প্রণাম

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

পঁচিশে বোশেখ এল, তোমার জন্মের দিন,
হে কবি-সম্রাট,
নব জন্ম লও কবি আমাদের ধরে ধরে ;
এ নবজাতক
বাঁধুক আবার বীণা, ভরে দিক্ সুরে সুরে
আমার আকাশ,
ভরে দিক্ বনবীথি, ভরে দিক্ ছায়াতল
পথ, ঘাট, মাঠ।
তোমার সুরের মায়া ছুঁয়ে যাক্ বারবার
আমার ভুবন,
মাটিতে প্রণাম করি, জানি না ত যায় কি না
সে স্বর্ঘ্য-প্রণাম—
না যায় নাই বা গেল, থাক্ হেথা পড়ে থাক্
অভিযোগ নাই,
ধরার ছলল ছেলে, মাটির ধরায় এস,
ধাক্ কিছুক্ষণ।
না দাও, নাই বা দিলে, কিছু আর চাহি নাকো
দিয়েছ অনেক—
আজ শুধু একবার, একবার নেমে এস,
দূরেতে কি কাজ
কত ঝড় বয়ে গেল, কত মেঘ উড়ে এল,
তবু ভুলি নাই,
পঁচিশে বোশেখ এল, তুমি ত' এলে না কবি,
এলে না ক্ষণেক।

পঁচিশে বৈশাখ

এ এন এম বজলুর রশীদ

বৈশাখের তপ্তবায়ু চকলিয়া শালের মঞ্জরী
মালতীর লতাকুঞ্জে মর্মরিয়া উঠিল গুঞ্জরি ;
শ্রামলীর শূন্য ঘরে উদীচীতে দিয়ে গেল ডাক,
মহাকাল তরঙ্গের প্রান্ত হতে পঁচিশে বৈশাখ।
সে ত নাই যে পথিক স্বখে-দুখে ধ্যান-জাগরণে,
বর্ষণমুখর রাতে ফাল্গুনের সমীরণে,
প্রদোষের লগ্নে ভাঙি অন্তরের অপরূপ কাঁরা;
সুন্দরের সুরে তার বাজাইয়া গেছে একতারা।
সুদূরপিয়াসী কবি—অন্তহীন দিগন্তরেখায়,
শালতাল শিরীষের বনশীর্ষে পত্রের লেখায়,
পেয়েছে দূরের ডাক—সে বাউল বীণাতারে তার
বিচিত্র ছন্দের গানে অন্তরের শত উপচার
নিবেদন করে গেছে। দেখেছে সে স্বর্ষের উদয়
তমসার পার হতে। পুষ্পগুচ্ছে পূর্ণ জ্যোতির্ময়
'আদিত্যবর্ণম্' যিনি—শিবশান্ত নয়নাভিরাম,
তাঁর লাগি রেখে গেছে পরিপূর্ণ একটি প্রণাম।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতসার

শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

গত ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে আমি, কবিবর রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের মধ্যে তাঁর স্বকৃত শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে শ্রেষ্ঠ শত গান নির্বাচন করে আমাদের যেন শ্রাবণ মাসের মধ্যে পাঠানো হয়, পাঠকদের কাছে এই রূপ একটি আবেদন করেছিলুম। ভাষাটী ঠিক পরিষ্কার হয়েছিল কি না মনে নেই, কিন্তু মনোভাব এই ছিল যে, গানগুলি এমন জনপ্রিয় এবং অবশ্য শিক্ষণীয় হয় যাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার হয়।

ছুঃখের বিষয় আশাশূন্য ফললাভ করি নি। প্রথম ধাক্কা খানচারেক মাত্র জবাব পেয়েছিলুম, তারও একটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয় নি। হতে পারে আমার আশঙ্কের তেমন জোর নেই, আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তেমন বহুল প্রচার নেই। মাঝে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সম্পাদক আমাকে লিখেছিলেন ওরকম ভাবে সাধারণ্যে আবেদন না করে, বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীতজ্ঞের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের স্বমত আহ্বান করাই ভাল; নইলে গ্রামোফোন, সিনেমা ও রেডিও প্রচারিত সঙ্গীতই নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা। তাঁর প্রস্তাবটি সমীচীন, কিন্তু সময়মত আমি তা কার্যে পরিণত করি নি, সেটি আমারই দোষ। আসল কথা আজকাল সকলেই নিজের নিজের চরখায় তেল দিতে এত ব্যস্ত যে, সব দিক সামলে উঠতে পারে না। আমি অতি সম্প্রতি কতকটা তাঁর প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করেছি। অর্থাৎ গীতালি, গীতবিতান এবং সঙ্গীত-ভবনের কর্তৃপক্ষের অভিমত জানবার চেষ্টা করেছি। তবে শেষ মুহূর্তে আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ করতে পেরেছি।

এই কয়েকটি তালিকা তুলনাপূর্বক তাঁর মধ্যে যে কয়টি গান ছয়ের বেশি ভোট পেয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র তালিকা করেছি। তাঁর পর আমার নিজস্ব তালিকার সঙ্গে সেটি মিলিয়ে শেষ তালিকা প্রস্তুত করেছি। আমার মুশ্কিল হয়েছে এই যে, নতুন গান আমি খুব কম জানি; অথচ কেবল পুরনো গান দিয়েও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তা ছাড়া একমাত্র নিজের মতও জারি করতে চাই নে, “আপনারা পাঁচ জনে কি বলেন”, তাই জানতে চাই।

যখন এ কার্যে হতক্ষেপ করেছিলুম, তখন ভাবিনি যে কাজটি সুসম্পন্ন করা এত দুর্লব হবে। এ বিষয় একজন পত্রপ্রেরক যা লিখেছেন, তা এস্থলে তুলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

“কোনও গানের শ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা:—

(১) কবিতা হিসাবে গানের কথা ও ছন্দের সার্থকতা ও আন্তরিকতা

(২) স্বর হিসাবে তাহার চমৎকারিত্ব ও অভিনবত্ব।

(৩) এ দুইটির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য, অর্থাৎ বিষয়ের উপযুক্ত স্বর হইয়াছে কি না।

এই তিনটি স্বর দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ ৫০০ গান এ পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইবে। তখন কাকে ফেলে কাকে রাখা— এই এক বিষয় সমস্তা হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য।”

আর এক জন বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত-ভক্তের কথাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন “হরের দিক থেকে (শুধু কাব্য হিসাবে নয়) যেগুলো সবচেয়ে ভাল লাগে তা লিখতে গেলে দেখছি, গানের শ্রেণী বিভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীতে সমান সংখ্যক গান বসানো চলে না। কারণ “পূজা” বা “স্বদেশ”, “প্রকৃতি”র মধ্যে এক “বর্ষা”র সঙ্গেই পালা দিতে পারে না—“বিবিধ” নামক শ্রেষ্ঠ গানের বিপুল ভাণ্ডারের সঙ্গে ত দূরের কথা।”

এইখানে বলে রাখি যে, প্রত্যেক বিভাগে সমান সংখ্যক গান নির্বাচন করতে হবে। এমন অভিপ্রায় আমার আদৌ ছিল না; উপরন্তু অভিপ্রায় ছিল যে, সকাল একাল দুই কালেরই গান দিতে হবে। তবে জানি নে তাড়া-তাড়িতে সে কথা বিজ্ঞপ্তিতে ভালরূপ প্রকাশ করতে পেরেছি কি না।

উল্লিখিত কৈফিয়ৎ থেকে অন্ততঃ এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হয়েছে আশা করি যে, গানগুলির ভোট কতক ব্যক্তিবিশেষ এবং কতক সঙ্গীত-সভা থেকে সংগৃহীত (তাও শেষটা ব্যক্তিতেই গিয়ে দাঁড়ায়), এবং অবশেষে আমার নিজের মতে নির্বাচিত। এতে কতটা গণমত পাওয়া গেছে বলতে পারি নে; তবে ভোট-সংখ্যার তার-তম্যে অন্ততঃ জনপ্রিয়তার তারতম্য সামান্যভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং অবশ্য শিক্ষণীয় শত গানেরও একটা মোটা-মুটি আন্দাজ পাওয়া গেছে, যেটা আমার অগ্রতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে মনে করেছিলুম এই আলোচনার নাম দেব “শ্রেষ্ঠ শত রবীন্দ্র-সঙ্গীত”। তাঁর পরে ভাবলুম দুটি বিশেষণেই আপত্তি উঠতে পারে। কেউ হয় ত বলবেন যে, —“শ্রেষ্ঠ” কার মতে? যথেষ্ট ব্যাপক ও স্থানীয়ভাবে

ত জনমত সংগ্রহ করা হয় নি। এ আপত্তির যৌক্তিকতা মেনে নিচ্ছি। তার পর 'শত' সংখ্যার মধ্যে যে কিছুতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আবদ্ধ করা যায় না তাও শতবার স্বীকার্য। স্বতরাং বর্তমান নামটি অপেক্ষাকৃত নিকিবাদী বলে মনে করলুম।

এই কাজ করতে করতে আমার হঠাৎ মনে হ'ল যে এক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেই পঞ্চ প্রধান শিল্পকলার উদাহরণ বা উপমা পাওয়া যেতে পারে। তাঁর কোন সঙ্গীত যেন স্থাপত্যধর্মী, যথা:—“মোরা সত্যের পরে মন”, “সবার মাঝারে তোমাতে স্বীকার”, “ভুবনেশ্বর হে”, “জনগণ মন” প্রভৃতি বড় বড় একই স্বরবৃত্ত গানগুলি যেন পাথরের উপর পাথর গেঁথে এক একটা ইমারত গড়ে তুলেছে; আবার কোন সঙ্গীত যেন চিত্রধর্মী, যথা:—“শেফালি বনের মনের কামনা”, “এম নীপ বনে” ইত্যাদি—একেবারে রঙ রেখায় যেন ছবি এঁকে দিয়েছে; আবার কোনটি কাব্য-ধর্মী, যথা:—“হৃদয় বেদনা বহিয়া”, “এমন দিনে তারে বলা যায়” “তুমি একটু কেবল বসতে দিও” “তোমার গোপন কথাটি” প্রভৃতি গভীর মধুর অন্তঃকণ্ঠ ভাবের গানগুলি। যেখানে সবই সঙ্গীত, সেখানে গীতধর্মী আর কাকে বাদ দিবে কাকে বলব; তবে হিন্দী-ভাঙা গানগুলিকে যদি তা বলা যায়, সুরের প্রাধান্য হিসেবে—বিশেষত: হিন্দী টপ্পা ভাঙা কয়টি। আর সবই যখন রূপক, তখন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকে স্বতন্ত্র আসন দেওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন। চার কলির গান-গুলিকে ‘ক্ষীণ মধ্যা’ মূর্তি বলে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু উপমার উপর বেশি জোরজবরদস্তি করা কিছু নয়। হয় ত আমার এ-সব পরিকল্পনার ভিত্তি কথার উপরেই স্থাপিত; কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা আর সুর আলাদা করবে কে?—Those whom God hath joined, let no man put asunder।

ভোটের বিষয় বক্তব্য এই—যে গানগুলি খুব কম মার্কী পেয়েছে, সেগুলি আমারই প্রায় একলার সমর্থিত ধরতে হবে। হয় ত তার এক কারণ এই যে, আমাদের কালের পুরণো গান খুব কম লোকেই জানে। দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন রুচির্হী লোকাঃ। আমি নিজেই হয় ত চেপে ধরলে বলতে পারি নে এই কোণঠাসা গানগুলি দেবার মূলে আছে ছেলেবেলার সংস্কার না পরিণত বয়সের বিচার।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই নির্বাচনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমার চেয়ে কেউ বেশি সচেতন নয়। যদি বুল—তবে লোক সমক্ষে প্রকাশ করলে কেন?—তার সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, এক বৎসর হয়ে গেল, এখনো যদি প্রকাশ না করি ত কবে করব?—বিশেষত: যখন আমাদের খুব বেশি দূর ভবিষ্যতের জ্ঞান অপেক্ষা করবার সময় নেই।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলুম, তা অত্যন্ত কিছুদূর অগ্রসরও করে দিয়েছি। এখন “নূতন যুগের ভোরে” অত্যন্ত উপযুক্ত লোক এই কার্য্যভার গ্রহণ করুন, চালিয়ে যান, এই প্রার্থনা।

পূজা

ভোট সংখ্যা

১। অন্ন লইয়া থাকি	৩+১
২। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	৩+১
৩। ওহে জীবন বলভ	৬
৪। প্রভু আমার প্রিয় আমার	১+১
৫। তোমার আমার এই বিরহের	৬+১
৬। আমার সকল দুখের প্রদীপ	৪+১
৭। সমুখে শান্তি পারাবার	১+১
৮। আনন্দ লোকে	৩+১
৯। সন্ধ্যা হল গো	২+১
১০। দুঃখের তিমিরে	৩+১
১১। সুখ সাগর তীরে	১+১
১২। শুধু তোমার বাণী নয় গো	২+১
১৩। ভুবনেশ্বর হে	৩+১
১৪। মোর হৃদয়ের গোপন বিজন	৪+১
১৫। যদি প্রেম দিলে না	১+১
১৬। মোরা সত্যের পরে মন	২
১৭। রাঙিয়ে দিয়ে যাও	৩+১
১৮। এবার নীরব করে	৬+১
১৯। ভোরের বেলায় কখন	২+১
২০। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	৬+১
২১। তোমার অসীমে	৬+১
২২। তাঁহারে আরতি করে	৫+১
২৩। ওহে স্নান মরি মরি	৫+১
২৪। অন্ধ জনে দেহ আলো	৭+১
২৫। ঐ আসন তলে	১+১
২৬। অনেক দিনের শূন্যতা মোর	২+১
২৭। আলোকের এই বরণা ধারায়	৬+১

প্রেম

ভোট সংখ্যা

১। তবু মনে রেখো	৪+১
২। আজি যে রজনী যায়	৩+১
৩। তুমি যেয়োনা এখনি	৪+১
৪। ওহে স্নান মম গৃহে আজি	২+১
৫। মরিলো মরি	১+১

৬। মম যৌবন নিকুঞ্জে	৮+১	২৪। চিত্ত পিপাসিত	২+১
৭। ওগো কাঙাল আমারে	৬+১	২৫। ওগো কিশোর আজি	৪+১
৮। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৩+১	২৬। আজি দখিন ছুয়ার খোলা	২+১
৯। আমার পরাণ যাঁহা চায়	২+১	২৭। বাজো রে বাঁশরী বাজো বাজো	২+১
১০। মরণেরে তুঁহ মম শ্রাম সমান	৫+১	২৮। মধু গন্ধে ভরা	৩+১
১১। আমার পরাণ লয়ে	১+১	২৯। এস শ্রামল সুন্দর	২+১
১২। বড় বিষয় লাগে	১+১	৩০। ওগো দখিন হাওয়া	২+১
১৩। তুমি রবে নীরবে	৩+১		
১৪। দীপ নিভে গেছে মম	৬+১		
১৫। তোমার গোপন কথাটি	২+১		
১৬। আমারে কর তোমার বীণা	২+১		
১৭। মায়াবন বিহারিণী হরিণী	২+১		
১৮। ওগো বধু সুন্দরী	৩+১		

প্রকৃতি

১। এস হে বৈশাখ	৫+১
২। এমন দিনে তারে	৩+১
৩। তিমির অবগুষ্ঠনে	২+১
৪। বহু যুগের ওপার হতে	৭+১
৫। শ্রাবণের ধারার মত	২+১
৬। বাদল মেঘে মাদল বাজে	১+১
৭। বর্ষ বর্ষ বরিষে	২+১
৮। ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের	৩+১
৯। হৃদয় আমার	৩+১
১০। যেতে যেতে একলা পথে	১+১
১১। যেতে দাও গেল যারা	১+১
১২। আজি শরত তপনে	১+১
১৩। শরৎ তোমার অরুণ আলোর	১+১
১৪। ওগো শেফালি বনের	৪+১
১৫। আজ ধানের ক্ষেতে	১+১
১৬। কার বাঁশী নিশি ভোরে	২+১
১৭। আমার নয়ন ভুলানো এলে	২+১
১৮। হিমের রাতে ওই গগনের	৪+১
১৯। শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন	৭+১
২০। এস এস বসন্ত ধরাতলে	১+১
২১। আজি বসন্ত জাগ্রত ঘরে	৭+১
২২। একি আকুলতা ভুবনে	৬+১
২৩। মোর বীণা ওঠে	৭+১

স্বদেশ

ভোট সংখ্যা

১। জনগণ-মন অধিনায়ক	১০+১
২। দেশ দেশ নন্দিত করি	১০+১
৩। অয়ি ভুবন মনোমোহিনী	২+১
৪। সার্থক জনম আমার	৮+১
৫। জননীর দ্বারে আজি ওই	৬+১
৬। হে মোর চিত্ত	৭+১
৭। আগে চল আগে চল	২+১
৮। আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে	১+১
৯। বাংলার মাটি, বাংলার জল	৫+১
১০। আমার সোনার বাংলা	৮+১
১১। তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	৭+১
১২। যদি তোর ডাক শুনে	৭+১
১৩। সঙ্কোচের বিহীনতা	৭+১
১৪। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি	২+১
১৫। এবার তোর মরা গাঙে	৪+১

বিবিধ

ভোট সংখ্যা

১। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ	৭+১
২। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী	২+১
৩। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	৮+১
৪। আমি চকল হে	৮+১
৫। তোমার হল স্বরূপ	৬+১
৬। আমাদের শান্তিনিকেতন	৪+১
৭। আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো	৪+১
৮। হে নূতন	৬+১
৯। ভরা থাক ভরা থাক	৭+১
১০। এ শুধু অলস মায়া	২+১

‘শেয়ার’-ব্যবসায়ী

শ্রীমুহুৎচন্দ্র মিত্র

বৈচিত্র্য যে এই বিশ্বজগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এ কথা মেনে নিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করবার কারও দরকার হয় না। জীবনের এক দিনের অভিজ্ঞতার দিকে একটু মনোযোগ দিলেই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি হয়। আকাশে কত রঙের খেলাই না আমরা দেখি, বাতাসে কত স্রেরের ঝঙ্কারই না শুনি। কত বিচিত্র রূপ ও রসের বিভিন্ন গন্ধ ও স্পর্শের, বিবিধ শব্দলহরীর মাধুর্য ও মহিমার কথা যুগের পর যুগ কবিরা গেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। সে বর্ণনার, সে ব্যাখ্যার শেষ আজও হয় নি। জীবজগতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত কত বিভিন্ন গঠনের বিভিন্ন প্রকৃতির জীব জগতে বিচরণ করে কে তার সংখ্যা সঠিক নির্ণয় করতে পারে? আবার জড় ও প্রাণিজগতের মত মনোজগতেও বৈষম্যের বিরলতা নেই। ঠিক একই ধরণের মানসিক গঠনসম্পন্ন দুইটি ব্যক্তি কোথাও মেলে না। বুদ্ধি, Emotion বা প্রাক্ষোভ, কৰ্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি এবং দয়া-দাক্ষিণ্য নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি গুণাগুণ প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু আছে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত মিলে মিশে অবশেষে যে ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয় তা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন। তাই আমরা দেখি কেহ স্বভাবতই শান্ত ধীর, কেহ সর্বদাই চঞ্চল-অস্থির, কেহ বা অভ্যাসের দাস আবার অনভ্যাসই কারও অভ্যাস, কেহ প্রত্যেক পয়সাটি পর্যন্ত হিসাব করে খরচ করেন, কেহ অতিমাত্রায় বেহিসাবী অপব্যয়ী। কেহ স্বল্পভাষী, প্রত্যেক কথাই যেন ওজন করে বলেন, আবার কেহ নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে যেন খুব ভালবাসেন তাই অনবরত কথাশ্রোত চালিয়ে যান। একটু চিন্তা করলেই আরও অনেক প্রকৃতির মানুষের কথা আপনাদের মনে আসবে। এই বিভিন্নতা শুধু পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, যুক্ত পরিবারে যারা বাস করেন—বাড়ির গৃহিণীদের, বধূদের কাজকর্মের ধারা, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করলেই বহু প্রকার বৈলক্ষণ্যের সন্ধান তাঁরা পাবেন।

এই বিভিন্ন ধরণের মনোভাবসম্পন্ন লোকদের ভেতর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাদের অস্বাভাবিক বলা নিশ্চয়ই যায় না। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাঁদের কার্যকলাপ স্বাভাবিক লোকের মতও ঠিক নয়। যেন ‘নিশ্চিত’র চেয়ে ‘অনিশ্চিত’র আকর্ষণটাই বেশী মাত্রায় অনুভব করেন এবং উপভোগও

করেন। তাই অবশ্যম্ভাবী লাভের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত হয় লাভ, না-হয় ক্ষতির পথে চলতে তাঁরা সব সময়েই বেশী পছন্দ করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজে বুঝা যাবে। ধরুন, কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি দৈনবাহুগৃহে এক হাজার টাকা অপ্রত্যাশিত ভাবে পান (অবশ্য হাজার টাকার একখানা বা পাঁচশত টাকার দুইখানা নোট নয়, ছোট ছোট নোট এবং নগদ টাকা) তা হ’লে স্বতঃই তাঁর চেষ্টা হবে টাকাটা এমনভাবে কোথাও গচ্ছিত রাখতে যাতে সেটা নিরাপদে থাকে আর তিনি প্রতি বৎসর বা প্রতি ছ’মাস অন্তর ডিভিডেণ্ড বা সুদ হিসাবে নিয়মিত কিছু পেতে পারেন। কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের কথা আমরা বলছি তাঁদের কেউ যদি ঐ টাকা পান তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা ফাটকা-বাজারে অথবা শেয়ার মার্কেট ষ্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে কেনা-বেচা আরম্ভ করে দেবেন। নিশ্চিত লাভের কথা, গৃহে অর্থের অসচ্ছলতার কথা বা অন্য কোন কথাই তাঁর মনে উদয় হবে না। বন্ধু-বান্ধবের সুপরামর্শ, আত্মীয়-স্বজনদের নিষেধ কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। হয়ত ঐ কেনা-বেচায় তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। আবার সমস্ত টাকাটা সম্পূর্ণ লোকসান করে হয়ত বা আরও কিছু দেনা করেও তিনি ফিরতে পারেন। লোকসান হ’ল বা ধার করতে হ’ল বলে তিনি যে ঐ কাজ থেকে ভবিষ্যতে বিরত হবেন তা মনে করবেন না। আবার হাজার টাকা পেলে ঐ পথেই তিনি যাবেন, কারণ ঐ পথই তাঁর একমাত্র পথ, অন্য পথের কোন আকর্ষণ তাঁর নেই। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন কোন প্রকৃতির লোকের কথা আমরা বলছি। এ ধরণের লোক নিশ্চয় আপনাদের অপরিচিত নন। আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় একাধিক ব্যক্তি এই প্রকৃতির আছেন। কারণ এদের সংখ্যা খুব কম নয়। এরা ব্যবসায়িক অত্যাশ্রুত কি নেন ও হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করেন। এই ‘অনিশ্চিতের পিয়াসীদে’র ইংরেজী ভাষায় বলে, ‘The speculators.’

অভিধানে ‘speculate’ শব্দটির যে দু’টি অর্থ দেওয়া আছে সে দু’টিতেই এই অনিশ্চিতের ইঙ্গিত পাই। কোন একটি কার্যের কারণ কি, বা কোন কারণের কার্য কি হতে পারে, নিশ্চিতভাবে জানা না থাকায় সম্ভব কারণ ও কার্যসমূহ সম্বন্ধে কল্পনা করার নাম ‘speculate’ করা। আর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অধিক লাভে বিক্রয় করবার

আশায় ভ্রাবাদি ক্রয় করা বা ধরে রাখাকেও speculate করা বলে। যিনি এরূপ কল্পনা বা এরূপ কাজ করেন তিনি speculator—এখন কথাটির অর্থ এবং ব্যঙ্গনা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা এবং সেই কল্পনা-নির্দিষ্ট পথে কাজে অগ্রসর হওয়া এই অর্থে যদি speculate কথাটি নেওয়া যায় তা হলে বলতেই হয় যে মানুষ মাত্রই speculator. কারণ এই পৃথিবীতে সর্বজ্ঞ কে আছেন? সমস্ত কারণের কার্য এবং কার্যের কারণ জ্ঞাত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু পরিমাণ অজ্ঞাত, অনিশ্চিত ঘটনার ওপর নির্ভর করে সকলকেই চলতে হয়। ভবিষ্যতে ফললাভের আশায় যে-কোন কাজই আমরা করি সে সবই speculation-প্রসূত। কারণ ভবিষ্যৎ যে অতীতের মতই হবে এ-ত অনাগত অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে একটি কল্পনা মাত্র। আমাদের দৈনন্দিন ছোটবড় অভ্যস্ত অনভ্যস্ত সমস্ত কাজের মূলে এই speculation বিদ্যমান আছে। আজ পর্যন্ত যা ঘটে এসেছে কালও তা ঘটবে এ বিশ্বাস যদি না রাখি তা হলে আমরা একপদও এগোতে পারি না। কালও সূর্য উঠবে, আহারে ক্ষুধিবৃত্তি, পানীয়ে তৃষ্ণার অবসান হবে, এ সব আমরা ধরেই নি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে না। সুতরাং আমরা অনবরতই speculation করছি।

আপনারা হয়ত বলবেন কথাটি ঠিক নয়। কল্পনা আর বৈজ্ঞানিক সত্য এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আমাদের কথাটা মেনে নিলে সে প্রভেদ অস্বীকার করা হবে। কাল সূর্যোদয় হবে, পানীয়ে তৃষ্ণা নিবারণ হবে এগুলো কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং ঐগুলির ওপর ভিত্তি করে কাজে এগনো speculate করা নয়। আমরা উপস্থিত প্রশ্ন করব না, বৈজ্ঞানিক সত্য কাকে বলে। শুধু এখন যে principle of indeterminism সম্বন্ধে খুব আলোচনা বৈজ্ঞানিক মহলে চলবে তার কথা আপনাদের একবার স্মরণ করতে বলব। এ বিষয়ে অবাস্তর আলোচনা করবার এখানে আমাদের দরকারও নেই, কারণ আমরাও স্বীকার করি যে, মানুষ মাত্রই স্পেকুলেটর (speculator) নয়। তা হলে স্পেকুলেটর বলতে একটি বিশেষ কোন শ্রেণীর লোক বোঝাত না।

অনিশ্চিত সম্বন্ধে কল্পনা মাত্রকেই speculation বলব না। কল্পনাটির বাস্তব হবার সম্ভাবনা কত পরিমাণ আছে তার বিচার করে তবে নির্ণয় করব কল্পনাটি speculation মাত্র, না যুক্তিযুক্ত চিন্তা বলতে মনোবিদ্রা যা বোঝেন তাই। সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ণয় করবার পদ্ধতি অঙ্কশাস্ত্রের ব্যাপার। কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবার বা

না ঘটবার সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাব্য-গণিতের বিবিধ সূত্র অনুসারে অঙ্ক কষে বার করা যায়। যা হোক, আমরা সকলেই অঙ্কশাস্ত্রবিদ নই কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা সকলেই করে থাকি এবং সেই কল্পনা অনুযায়ী কাজও করে যাই। সম্ভব-অসম্ভবের একটা মানদণ্ড নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ঠিক করে নিই। শতকরা পঞ্চাশ বার যে ঘটনা পূর্বে কোন একটি অবস্থায় ঘটেছে ভবিষ্যতে সেই অবস্থায় সেই ঘটনা ঘটবে কিনা সঠিক বলা যায় না, ঘটবার বা না ঘটবার সম্ভাবনা সমান সমান। কিন্তু যে ঘটনা শতকরা ৬০ বার ঘটেছে ভবিষ্যতে না ঘটবার অপেক্ষা তা ঘটবার সম্ভাবনাই কিছু বেশী। সেই রকম শতকরা যত বেশী বার পূর্বে কোন ঘটনা ঘটে ভবিষ্যতে তা ঘটবার সম্ভাবনা ততই বেশী হয়। সূর্য্য এ যাবৎ প্রত্যহই উঠেছে, সুতরাং কালও তার উঠবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই খুব বেশী সম্ভাবনাকেই আমরা নিশ্চিত বলে ধরে নিই। বৈজ্ঞানিক সত্য এই বেশী সম্ভাবনাই প্রকাশ করে। কারণ পুরোপুরি নিশ্চিত জ্ঞানলাভ, নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ সত্যের উপলব্ধি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত হিসাব অনুসারে যে ঘটনা না ঘটবার সম্ভাবনাই বেশী সেই ঘটনা ঘটবে, অথবা যা ঘটবার সম্ভাবনা বেশী তা ঘটবে না—এরূপ আশা করে যিনি কাজে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন তিনিই স্পেকুলেটর। স্পেকুলেটরদের সাফাং তাই শেয়ার মার্কেট এবং তদনুরূপ স্থানেই বেশী পাওয়া যায়। স্পেকুলেটরদের নিজেদের যে কোন অঙ্কের হিসাব থাকে না তা নয়—তবে তাঁদের হিসাব সাধারণ লোকের সহজ হিসাব থেকে তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণে যা বিশ্বাস করে না তাঁরা তা করেন। বিশ্বাসের এই বিকৃতি কেন ঘটে?

প্রথমেই বলা যায় তাঁদের প্রবল ইচ্ছাই অঘটন ঘটবে এই বিশ্বাসের মূল। Their wish is father to their thought. কিসের এই প্রবল ইচ্ছা? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই ইচ্ছা অধিক অর্থ লাভের ইচ্ছা। কিন্তু অধিক অর্থ লাভ ত অল্প উপায়েও হতে পারে? অর্থলোভই যদি স্পেকুলেটরদের ব্যবসায়ের একমাত্র কারণ হয় তা হলে লোকসান হলে তাঁরা বিরত হন না কেন? বিরত হতে হয়ত কখনো কখনো বাধ্য হন কিন্তু তা বাইরের কোন কারণে, হয়ত উপস্থিত হাতে টাকা নেই বলে, কিন্তু মন থেকে তাঁদের সে ভাব যায় না। উপরন্তু প্রভূত অর্থ অল্প ভাবে পেলেও ত তাঁরা নিবৃত্ত হন না। তাঁদের ব্যবহারে আরও দেখা যায় যে, প্রথমে তাঁরা নিজেরা কিছু অর্থ ব্যয় করতে চান এবং বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পেতে চান। মনোবিদ্যার দিক থেকে দেখলে কিন্তু অর্থ লাভটাই মুখ্য

উদ্দেশ্য বলা যায় না, কারণ অর্থনাশও যে হতে পারে এবং হয়ও তা তাঁরা বিলক্ষণ বোঝেন। তা হলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পাওয়া-না-পাওয়ার অনিশ্চয়তা হেতু আশা-উদ্বেগ-মিশ্রিত মনের যে একটি চাঞ্চল্যকর উত্তেজনার ময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থাটাই তাঁদের কাম্য। তাঁরা নিজেরা এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না এবং আপনারাও হয়ত স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করছেন। মনে করছেন ইচ্ছা করে কে আবার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে চায়? এখানে মনোজগতের একটি তথ্যের কথা আপনাদের স্মরণ করতে অনুরোধ করি। আমাদের সব কাজই আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছানুসারে হয় না, অনেক কাজের উৎসই নিজ্ঞানস্থিত ইচ্ছা (unconscious wish)। নিজ্ঞানস্থিত ইচ্ছাই স্পেকুলেটরদের ঐ অবস্থায় আসতে বাধ্য করে। মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) বলে স্পেকুলেটরদের নিকট অর্থ সূখ অর্থ নয় অজ্ঞানিষের প্রতীক, যেমন রূপণদেরও। মৃত্যুকাল পর্যন্ত রূপণতা করে এক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করেই গেল, কোন দিন অর্থের ব্যবহার দ্বারা সূখ ভোগ সে করলে না। তার এই সঞ্চয়ের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না যদি না অর্থকে তার নিজ্ঞানস্থিত কোন জিনিষের প্রতীক হিসাবে দেখি। স্পেকুলেটরদেরও তদ্রূপ। অর্থ ব্যয় করার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া প্রভৃতি স্পেকুলেশন সংক্রান্ত সব কাজই নিজ্ঞানস্থিত ইচ্ছার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হলে তাই নিজ্ঞান-স্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন হয়।

নিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে স্পেকুলেটরদের অর্থ পাবার ইচ্ছা যেমন আছে, অর্থ নষ্ট করবার ইচ্ছাও তেমন আছে। এজ্ঞাই তিনি এমন কাজ বেছে নেন যাতে অর্থনাশের সম্ভাবনাই অধিক অথচ যাতে মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায় যে, এই কাজে অধিক অর্থ লাভ হবে। ঝুঁকিযুক্ত কার্যবारे এই অর্থ লাভ এবং অর্থ নষ্ট করা উভয় ইচ্ছাই তৃপ্ত হয়। স্পেকুলেটর যেন বাধ্য হয়েই তাঁর ক্ষতিকর কাজে নামেন।

গভীর মনোবিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থলাভ ও অর্থনাশের ইচ্ছাধয়ের প্রকৃত স্বরূপ যথাক্রমে অর্থ পাওয়া বা আদায় করা এবং অর্থ দেওয়া বা ঠকা। মনোবিদ দেখেছেন যে, অর্থ পাওয়ার পশ্চাতে স্ত্রীহলভ সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা বর্তমান। অর্থ আদায়ের পশ্চাতে সন্তানের জন্ম দিয়া তাহার পিতা হবার পুরুষহলভ ইচ্ছা বর্তমান। এক্ষেত্রে অর্থ সন্তানের প্রতীক। অর্থ দান পুরুষহলভ ইচ্ছা এবং ঠকবার ইচ্ছার পশ্চাতে স্ত্রীভাব বা passive homosexuality বা ভোগবৃত্ত সমকামিতা বর্তমান।

অর্থ যেমন সন্তানের প্রতীক সেইরূপ অর্থ বীর্যেরও প্রতীক। শিশুমনে আবার অর্থ মলের প্রতীক। মরনারীনির্বিষে প্রত্যেকের ভেতরই অল্পবিস্তর স্ত্রীহলভ ও পুরুষহলভ উভয় প্রকৃতিই বর্তমান। আবার পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তিরও নিজ্ঞানমনে শিশুহলভ মলপ্রীতি দেখা যায়। এ সব কথায় হঠাৎ হয়ত কারুর বিশ্বাস হবে না, কিন্তু মনঃসমীক্ষণদ্বারা বহুক্ষেত্রেই এর যথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কারণে এবং শৈশবের বিশেষ বিশেষ পরিণামে পুরুষ-প্রকৃতি, স্ত্রীপ্রকৃতি, সমকামিতা প্রভৃতি যৌন লক্ষণের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে আর তখনই নানা প্রকার মানসিক বিকারের বীজ রোপিত হয়। পরবর্তীকালে এই বীজ নানা ভাবে পরিণতি লাভ করে। কখনও এই কারণে মানসিক রোগ উৎপন্ন হয় কখনও বা ব্যক্তিরে স্বাভাবিক বিকৃতি ঘটে। কেহ বা রূপণ হয়, কাহারও বা স্পেকুলেটর হবার আগ্রহ জন্মায়। স্পেকুলেটরের মনোবৃত্তির উৎপত্তি-ব্যাপার অতিশয় জটিল। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে কতকটা বুঝাবার চেষ্টা করছি। 'ক' বাবু পিতামাতার জোটে সন্তান। শৈশবে তিনি মাতার বহু তাড়না ভোগ করেছেন এবং পিতার অতিরিক্ত আদর পেয়েছেন। ছেলেবেলায় পাঁচ-ছয় বছর বয়সে তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তিনি খুঁ গিলতে ভয় পেতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল খুঁ গিললে যেন বিষ খাওয়া হবে। তাঁর আরও একটা ভয় দেখা গেল বুঝি বা পেছন থেকে কে তাঁকে আক্রমণ করলে।

বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষের স্ত্রীলোকের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে মোটেই দেখা গেল না। তিনি অপার বালকের সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধের জন্ম আগ্রহম্বিত হলেন। লেখাপড়ায় তিনি বরাবরই ভাল। বি-এ পরীক্ষা পাস করার পর পিতামাতা তাঁর বিবাহের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হয়ে সংসার ত্যাগ করে এক আশ্রমে ধর্মজীবন যাপন করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর এক অভূত প্রবৃত্তি দেখা দিল। পুরুষ বা স্ত্রীলোক কেহ শোচে বসলেই তাদের দেখবার তাঁর দুর্দমনীয় আগ্রহ হতে লাগল। নানা যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েও তিনি মনকে ফেরাতে পারলেন না, অবশেষে আশ্রম ত্যাগ করে সংসারে এলেন। প্রথমটা দিনকতক শিক্ষকতা করলেন পরে তিনি ফাটকায় প্রবৃত্ত হলেন। ফাটকার উত্তেজনায় নেমে তাঁর যৌন-বিকারের লক্ষণগুলি সেরে গেল ও তখন তিনি বিবাহ করলেন। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেন না এবং স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলেই পিছু দিক থেকে কেউ তাঁকে

আক্রমণ করবে বাল্যকালের সেই ভয় পুনরায় তাঁর মনে দেখা দেয়। পশ্চাৎ হতে আক্রান্ত হবার ভয় ভোগবৃত্তি সমকামিতার ইচ্ছার রূপান্তর। ফাটকায় নেমে লোকসান হলে সমকামিতার ইচ্ছা গোণভাবে চরিতার্থ হয়। আবার এই ইচ্ছাকে দমিত রাখবার জ্ঞাত কর্মবৃত্ত পুরুষভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় জাগতে হয় তাতে অপরের নিকট হ'তে টাকা আদায়ের ইচ্ছা ও পরকে ঠকাবার ইচ্ছা মনে জাগে,

ফাটকায় জিতলে এই ইচ্ছা তৃপ্ত হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল ফাটকা-কাঞ্ছের নিজ্ঞানের মনোবৃত্তি এক প্রকারের নয়—এখানেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই আলোচনায় ফাটকা-কাঞ্ছের নিজ্ঞান মনের এক অংশ মাত্র দেখাবার চেষ্টা করা গেল।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেতু

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

সপ্তাহব্যাপী গৃহ-সম্মিলন সমাপ্ত হইল। শেষদিনের প্রার্থনা-সভা অনেক রাত্রে ভাঙিল। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়ে সভা ভঙ্গ করিয়া আমরা চ্যাপেলের প্রশস্ত বারান্দায় আসিলাম। আকাশে চৈত্রের শুক্লা চতুর্দশী অতি মনোয়ুজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের আয়োজন করিয়াছিল। তিন-চার ঘণ্টা একটানা ধর্ম-বিষয়ক আলোচনার পরে এ দৃশ্যে সকলেরই মনে একটা অপূর্ণ আবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

নৈশ আহ্বারের দুর্ভাবনা ছিল না। রাত্রি নয়টায় অর্ধ ঘণ্টার বিরতির সময়েই আমাদের সকলের আহ্বারাদি হইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রালোকিত বারান্দায় আসিয়া অধিকাংশ সভাই চেয়ারে, বেঞ্চে ও দীর্ঘ সিঁড়ির ধাপের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। ফয়জাবাদ হইতে আগত তিনটি তরুণী মিশনরী স্বপ্ন-সদৃশ এই চৈত্র-পূর্ণিমাকে আর এড়াইতে পারিলেন না। পরিষ্কার স্নানকৃত কণ্ঠে, “মুনলাইট সোনটা” আরম্ভ করিয়া দিলেন। বারান্দার চেয়ার হইতে আর একজন মাউথ-হারমোনিয়ামে তাঁহাদের গানের সঙ্গে যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে গান রীতিমত জমিয়া উঠিল।

আমরা চার-পাঁচ জন সম্মুখের উত্তানে পায়চারি করিতে-ছিলাম। স্মরণীয় ও স্মকবি সত্যেন থাকিতে না পারিয়া কুহিল, মেম-সাহেবদের গান শেষ হলে রবিবাবুর একটা গান ধরে দেব, তুমি ভাই যোগ দিও।

বুঝিলাম, এমন কবিত্বময় চাঁদিনী নিশীথে হাজার মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত হইলেও ইংরেজী গানে তাহার গায়ক-চিহ্ন তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। বারান্দার অপর প্রান্ত-হইতে একটি হিন্দুস্থানী সভ্য বলিয়া উঠিলেন, কাল সকালের গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে ফিরতে চান কেউ? ভোর রাতে ট্রেন ছাড়বে। কানপুরে থামব আমরা শহর দেখবার জ্ঞাত।

ইতিমধ্যে মেম-সাহেবদের গান শেষ হইয়াছিল। আমরা একত্রিত হইয়া দেশে ফিরিবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দেখা গেল, সম্মিলনে যোগদানকারী পয়তাল্লিশ জনের মধ্যে আমাদের সঙ্গী হইবার মত ছিলেন প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি।

ফিরিবার পথে কয়েক স্থানে ধামিয়া বিভিন্ন শহর দেখিয়া লইবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। অবশেষে হাসাহাসি, বিদায়-এহণ ও করমর্দনের পালা শেষ করিয়া আমরা যখন নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

মর্যাল রি-আর্মামেন্ট অভিযানের কল্যাণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলা ও শহর হইতে আগত বিভিন্ন জাতীয় পয়তাল্লিশ জন নরনারীর প্রার্থনা-সম্মিলন আমাদের অতিশয় আন্তরিকতা, শ্রীতি ও সহৃদয়তার মধ্যেই সমাপ্ত হইল। সাত দিন যাবৎ লক্ষ্মী শহরের এই সুদৃশ্য বাগানবাড়ীতে আমাদের এই গৃহ-সম্মিলনী—বহু গুরুতর ও জটিল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। রাত্রে স্মরণ করিয়া ইহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে কানপুর সেন্ট্রাল ষ্টেশনে যখন আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম তখন বেলা সাড়ে-সাতটা।

প্রাতঃকৃত্য গাড়ীতেই সমাধা হইয়াছিল। নানাপ্রকার হর্ষধ্বনি ও কোলাহল করিয়া আমরা আটশ জন ফেলনারের ছুইখানি প্রকাণ্ড বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম।

সে এক অপূর্ণ দৃশ্য।

দশ-এগার জন ইউরোপীয় তরুণ-তরুণী, দুই জন মাদ্রাজী, চার-পাঁচ জন হিন্দুস্থানী এবং বাকি দশ জন আমরা বাঙালী। আমাদের দশ জনের মধ্যেও তিন জন মহিলা ছিলেন। কোর্ট-প্যাণ্ট, পাগড়ী-আচকান, শাল-আলোয়ান, ফ্রক-শাড়ী এবং পায়জামা ও বুতির এই অদ্ভুতপূর্ণ সংমিশ্রণ এবং তাহাও

মাত্র দুইখানি বেকের মধ্যেই কানপুর ষ্টেশনে ইতিপূর্বে কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। ঘটিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের খিরিয়া কৌতূহলীদের এত বড় ভীড় জমিত না।

একটি ভদ্রলোক আমাদের দলের পুরোবর্তী এক জনকে অতি বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—আমরা কে? কংগ্রেসী নিশ্চয়ই নহি, কেননা, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সাহেব-মেম থাকা সম্ভব নয়। কোনপ্রকার পতাকা বা পরিচয়-জাপক কোন চিহ্নও নাই। আমরা তাহা হইলে কে? কানপুরে আমাদের কি প্রয়োজন?

কাছাকাছি এক জন সহাস্তে জবাব দিলেন, আমরা খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টের শিষ্য বলেই এত ভাষাভাষী ও ভিন্ন দেশীয় হয়েও আমাদের এই সম্মিলন সম্ভব হয়েছে। কেবল কানপুর নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সহযোগিতা ও জাতত্বের মতবাদকে প্রচার করাই আমাদের ত্রুত।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমারও বার বার এই কথাটি মনে জাগিতে লাগিল। বাস্তবিক। জাতি-বর্ণ-সামাজিক রীতি-পদ্ধতি ও বাসস্থান নির্বিশেষে জগতের সমস্ত নরনারীকে এক স্ত্রে ও এক বন্ধনে বাঁধবার এত বড় সহজ উপায় ত আর কেহ কোন দিন দেখাইতে পারিলেন না? পৃথিবীর ইতিহাসে ত সেরূপ একটি চরিত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না?

আমার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কত বড় মীমাংসা, কত বড় ঐর্ষ্য আমাদের হাতে আছে—অথচ, এই মহাসম্মিলনী মন্ত্ৰ, ক্ষত-বিক্ষত মানব জাতির এই অমোঘ শান্তি-প্রলেপের অধিকারী হইয়াও আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্গতি ও দুঃখের জন্ত দায়ী এই খ্রীষ্টীয় জগৎ। সর্বাপেক্ষা মহান্ দায়িত্ব বাহাদের উপরে, তাহারাই আজ হীনতম ও নিরুপ্ততম অপকার্যে ব্যাপৃত।

চা খাওয়া শেষ হইল।

কেলনারের কর্মচারী সিগারেটের একটি অদ্ভুত টিন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল। দামী ও উৎকৃষ্ট সিগারেট হইলেও টিনটি পড়িয়াই রহিল। দলের কেহই আমরা ধূমপান করি না। অন্ততঃ সাত-আট মাস পূর্বে অভিযানে নাম স্বাক্ষর করিবার দিন হইতেই ও বস্তুটি আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার বলেই ইহা সম্ভব হইলেও এ কথা আমরা কেহই অস্বীকার করি না যে, ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস ও আস্থার বলেই এই কঠিন পরীক্ষায় বহু দুর্বল মুহূর্তকোণে আমরা অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিয়াছি।

আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

আটশ-ত্রিশ জনের এক জনও একটি সিগারেট ধরাইলাম না দেখিয়া একবার মনে হইল যেন কেলনারের সব কয়টি কর্মচারী, মায় স্টেশনের বহু লোকও আমাদের দিকে অবিখ্যাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিউটিনি মেমোরিয়াল।

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্মৃতিস্তম্ভটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহসা আমার মনে যেন কি অব্যক্ত আশঙ্কায় একবার ছলিয়া উঠিল।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস জানে না এমন কেহই ছিল না আমাদের মধ্যে। বিদ্রোহের সময়ে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ দেশীয় সৈন্যদের হাতে যে সকল ব্রিটিশ কর্মচারী প্রাণ দিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই স্তম্ভটি রচিত।

স্তম্ভটি এক দিকে যেমন গভীর পরিতাপ ও ক্রোধের সঞ্চার করে, অল্প দিকে ভারতীয় অন্তরেও তেমনই আর এক প্রকারের পরিতাপ ও ক্রোধের উদ্বেক করে। এক জন ভারতীয় ও এক জন ইংরেজের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব থাকিলেও এই স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবিচলিত থাকা ও সেই মধুর সম্পর্কের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছিলাম, হে ঈশ্বর, হে সর্বদর্শী মঙ্গলময় জগদীশ্বর, এই দুঃস্বপ্ন পরীক্ষায় তুমি শান্তি ও সম্প্রীতির সহিত আমাদের উত্তীর্ণ করিয়া দাও।

কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান্ নিজেই বোধ হয় ফলাফল দেখিবার জন্ত এই কঠিন পরীক্ষাটির আরোজন করিয়াছিলেন। পর মুহূর্তেই ইহার শোচনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল।

গত রাজ্যের গায়িকা, ফয়জাবাদ মিশনের তরুণী তিন জন নিতান্ত অকস্মাৎই উচ্ছ্বসিত ও গর্জিত কণ্ঠে আমাদের পরীক্ষাকে রীতিমত অগ্নিপরিক্ষায় পরিণত করিয়া গান ধরিলেন,—

“Rule Britannia,
Britannia rules the waves.....”

মিউটিনি মেমোরিয়াল স্থাপিত করিবার সময়ে নির্মাণ-কর্তাদের মনে কি ছিল জানি না, তবে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে রেযারেসি ও শত্রুতার সম্পর্কে জিয়াইয়া রাখিবার জন্ত নিশ্চয়ই নহে। তাহা হইলে শান্তি ও সদ্ভাবের সহিত এদেশ শাসন করিবার এই যে সদিচ্ছার কথা তাঁহার প্রচার করেন—তাহা মিথ্যা হইয়া যায়।

গানের প্রথম লাইন শেষ হইবার আগেই দেখা গেল, আমাদের সম্মিলিত দলের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। মাথা নত করিয়া আমরা যেন কি এক অদ্ভুত শক্তির আকর্ষণে দলের এক দিকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। রুল ব্রিটানিয়ার উচ্চ প্রাচীরের অপর দিক হইতে যেন ঐ আট-দশ জন ইংরেজ তরুণ-তরুণীর গর্জিত গানের ঢেউ ভাসিয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল।

গভীর বেদনায় আমার সমস্ত অন্তরখানি যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম প্রতীক এই স্মৃতি-

সুস্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন ভারতীয়ের পক্ষেই ‘কল ত্রিটা-নিরা’কে ব্রদান্ত করা সম্ভব নয়।

ওদিকে ভ্রান্ত উত্তেজনার মাতিয়া উহার সকলেই ক্রমে যেন অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত উহাদের জাতীয় ঔদ্ধত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বহুপরিকর হইল। সমধর্ম ও ভাতৃশ্রের মধুর সম্পর্কের কথা উহার যেন ক্ষণকালের জন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল।

সকলেই সংযতমনা হইলেও অপমান ও বেদনায় আমার অস্থির হইয়া উঠিলাম। যুহুর্ভের জন্ত আমার মনে হইল, সুদূর দ্বীপবাসী এই উদ্ধত ও গর্ভিত ধ্বংস জাতি কিসের অধিকারে আজ আমার মাতৃভূমির বক্ষে দাঁড়াইয়া আমাকে সাক্ষী রাখিয়া এই সঙ্গীত গায়? আমার ধর্মভাব ও শ্রীতির সুযোগ লইয়া এত বড় হীনতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় উহার কেন দেয়?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টায় অল্প দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। দেখি, কবিভাবাপন্ন সত্যেন রুমাল দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিয়াও যেন স্থির হইতে পারিতেছে না।

৪

গান ধামিল।

প্রকাশ্য ভাবে অপমানজনক প্রহার স্বগিত হইলেও নিদারুণ অসম্মান ও বেদনার পীড়ন যেন কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না।

সত্যেনের গায়ক কণ্ঠ অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিল। এতক্ষণের পরিতাপ ও লাঞ্ছনা ভোগের পরে আর থাকিতে না পারিয়া সে এই অভিনব উপায়ে তাহার ও আমাদের সকলের অপমানিত আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। দেখিতে দেখিতে সকলেই গানে যোগ দিলাম,

“জনগণমন অধিনায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা।...”

পনর-ষোলটি তরুণ কণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীতে আর একবার প্রভাতী আবহাওয়া মস্তিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

জীবনে বহুবার ঐ গানে যোগ দিয়াছি, কিন্তু সেদিন প্রাতে, সেই বেদনাক্লান্ত হৃদয় ও পদদলিত আত্মমর্যাদাকে বক্ষে লইয়া যে গান করিলাম, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার স্থান যেখানেই হোক, সাধুনা ও তৃপ্তির দিক হইতে সে স্মৃতি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই। মনে হয়, সেদিনের সেই গানে আমাদের ষোল জন তরুণ-তরুণীর কণ্ঠের মধ্যে যেন অপমানিত ও উৎপীড়িত সমগ্র ভারতবর্ষ ও তাহার অসংখ্য সন্তানের প্রতিবাদধ্বনি ঝঙ্কত হইতেছিল।

কিন্তু গানের মধ্যেই সর্বদর্শী বিধাতা যেন এইবার তাহার কৃপা ও আলীকর্ষদের মঙ্গলবারি বর্ষণ করিলেন।

সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ইংরেজ যুবকটি মাথার টুপি খুলিয়া ও মাথা নীচু করিয়া আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনভ্যন্ত কণ্ঠে আমাদের গানে যোগ দিলেন।

দেখা গেল এই এক জনের দৃষ্টান্তেই বাকি কয়েকজনেরও যেন সন্ধি শুভবুদ্ধির পুনরুদ্ধার হইল। একে একে সকলেই তাহার টুপি খুলিয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গানের সমস্তটা কাহারও জানা ছিল না। দুইটি অন্তরা গাহিয়া গান সমাপ্ত হইল। বয়ঃপ্রবীণ ইংরেজ বন্ধুটির দৃষ্টান্তেই সেদিনকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শুভ সমাপ্তি ঘটিল। ফয়জাবাদের সেই তরুণী মেম তিনটি সর্বাপেক্ষে আসিয়া আমাদের সহিত কর্মমর্দন করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের ক্ষমা করুন বন্ধুগণ—আমরাই অপরাধী।

“সুখে আছি”

শ্রীশ:

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা—কাহিনী নহে। দূর-দূরান্তেও না—বাংলার চট্টগ্রামে, যাকে পাকিস্তানীরা এছলামাবাদ বলেন। মফঃস্বলের এক মহকুমা হইতে বন্ধুবর জানিতে চাহিলেন—কেমন আছি। পত্রোত্তরে লিখিলাম—সুখে আছি, পরম সুখে। বন্ধুটি কোতুলকী হইয়া লিখিলেন, সরবরাহ কি ঐ রকমের কোনো একটা দপ্তরে নিশ্চয়ই আপনি কোনো key post এ আছেন, এই দুর্দিনে আমার যদি কোন একটা...। বন্ধুটি খুব সরলপ্রাণ, অমায়িক মানুষ—প্রাণটা বিলাইয়া দিবার নিমিত্ত হাত দুইখানি সর্বদাই প্রসারিত করিয়া আছেন। প্রত্যন্তরে লিখিলাম, বন্ধু হে! সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীরাই আজ বাদে কাল ক্ষুধার্ভের তকমা পরিয়া বাহির হইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন। এ সময়ে আসবেন না, মাথা-গুণ্টি

রেশন—আবার বরাদ্দও কমিয়া গিয়াছে, আতিথেয়তার পুণ্য সঞ্চয় করাও চলিবে না।

কবি লিখিয়াছিলেন, “রাতে মশা দিনে মাছি, তাই নিয়ে কলকাতায় আছি।” থাকি আমি দূরে মফঃস্বলে—মশামাছির ঝোঁজ-খবর করিবার ফুরসত আমার নাই। তবে বর্তমানে নিষ্কর্মা হইয়াও খুবই কর্মব্যস্ত আর শশব্যস্ত আছি। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত বেশ অবিরাম ষাটরা-খুটরা—চলিয়াছি—মাথা কর্ম-জীবনেও অনাবাদিত ছিল।

ধারাবাহিক ভাবে আমার সুখের পর্য্যালোচনা করিব এবং আমার এই অনাবাদিতপূর্ব সুখের পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহাও নিবেদন করিব। সুখ আমার হালে সঙ্কটে দাঁড়াইয়াছে—সেই সুখ-সঙ্কট সর্বত্র, সর্বদারায়।

বর্তমানে সুখ-সঙ্কটের কুজু সাধনায় যে চতুর্ভুজ ফললাভ করিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

১। গৃহ-সুখ-সঙ্কট

ভদ্রাসন বাড়ীখানি বহুকাল যাবৎই হাতছাড়া—ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কবলগত। যুগ-যুগান্ত প্রবাস-বাসের পর তখন সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি একমাত্র আশ্রয়স্থল ভদ্রাসন বাড়ীতে; সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছেদসাধন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত তল্লিতল্লা গরু বাছুর লইয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটিয়া পড়িলাম একেবারে তেপান্তরের মাঠে—সপরিবারে। তার পর কয়েকটা বৎসর চাকুর্য্যে ভাইয়ের পান্থশালায় খেসাৎখেসি ঠাসাঠাসির ভিতর সহিষ্ণু জন্তর মত চালাইয়া দিলাম। বিজয়-দুন্দুভি যখন বাজিয়া উঠিল, তখন কত না ভরসা, কত না আনন্দ! বৃকে করিয়া ফিরিয়া আসিলাম আমার জন্মভূমিতে—নিরাশ্রয় জনের আশ্রয় মিলিবে নিজেদের ভদ্রাসনবাড়ীতে এই বিপুল উৎসাহে। কিন্তু, কাণা মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র নহে দৃষ্টি—আশ্রয় কোথাও জুটিল না; অগত্যা শরণ লইলাম Admin. Comdt. প্যাটন সাহেবের। তিনি আমার দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া দয়াজর্জিত হইলেন, কিন্তু আমার ভদ্রাসন বাড়ীখানি অচিরকাল মধ্যে কবলযুক্ত করিতে পারিবেন না, তাহাও বলিলেন। সামরিক বিভাগের ইংরেজ হইলে কি হয়—বড় ভাল মানুষ লেঃ কর্নেল প্যাটন সাহেব; আর তাঁহাদের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন, ইংরেজ মাঝেই মন্দ নহেন—অতি সজ্জন, মহানুভব ও উদারচিত্ত মানুষও তাঁহাদের মধ্যে অনেক আছেন। তিনি এবং তাঁহার S. S. O. আমাকে আশ্রয় দান করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এমনকি, এক দিন আমাকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১৩০।১৩১ এবং ১৫৮ নং হোল্ডিঙের বাড়ী তিনখানা দেখিয়া আসিয়া ঐগুলি কবলযুক্ত করিবার ব্যবস্থাও করিলেন, অধিকন্তু ১৬ই জানুয়ারী ২০০।৯।৪।২৬ নং চিঠিতে স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিলেন,

“... Every assistance be given to him. His case has been investigated by this H. Q. and it is strongly recommended. . . . The holdings under reference have been put up for de-requisitioning by this H. Q. and if you can arrange for one of these properties to be rented by him until his own can be released, it would be greatly appreciated.”

ভাবিলাম, ভগবান বুঝি সদয় হইয়া এতদিনে অগতির গতি করিলেন, কিন্তু ভগবানের উপরও যে আমলাতন্ত্রের ভাগ্যান্য়স্তারা বিরাজ করিতেছেন, তাহা প্যাটন সাহেবের হয়ত জানা ছিল না। বাড়ীগুলি মিলিটারী-কবলযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিতে ভাগ্যবানেরা স্প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী Land Acquisition আপিসে

গিয়া জানিলাম, প্যাটন সাহেবের চিঠিখানা ঐ আপিসে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি নিখোঁজ। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় রাজত্ববর্গের ভক্তাগ্রগণ্যই ছিলাম—অদ্যপি তাঁহাদের অনেকেরই কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আমার কপালেই যখন অষ্টরস্তা, অজ্ঞে পরে কা কথা?

২। খাদ্য-সুখ-সঙ্কট

শহরের খাদ্য রেশনিং সম্পর্কীয় ২নং বিজ্ঞপ্তিতে সর্বপ্রথম ১লা ফেব্রুয়ারী অবগত হইলাম যে, গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত রিটেল দোকানে ২৯শে জানুয়ারী হইতে নূতন রেশনকার্ড রেজেষ্টারী হইতেছে, তখনই নূতন রেশনকার্ডের জন্ম আর্জি পেশ করিলাম। রেশনিং বিভাগের জনৈক কর্মচারী আমার প্রতিবেশী ছিলেন, কাজেই ছ-টাকা গাড়ী ভাড়া দিয়া ১২ই তারিখে তাঁহার আপিসের দপ্তরখানা হইতে কার্ড করখানা সত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া আনিতে হইল। অতঃপর ঐ দিনই যথাকালে আমার বর্তমান নির্জলা ও নিম্প্রদীপ বাসস্থানের সন্নিকটে সাব-এরিয়র রেশন দোকানে দোকানীর ত্রীহস্তে কার্ডগুলি রেজেষ্টারী করাইবার বাসনার অর্পণ করিলাম। তিনি সন্ধ্যা ৬।৫ টিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টা কাল আমাকে তীর্থের কাকের মত তাঁহার খাস কামরায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া পরদিন সকাল ৮টার পর হাজির হইতে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য কার্ডগুলি তিনি নিজের জিন্মায় রাখিলেন। “যে, আজ্ঞা” বলিয়া সেই দিনের মত বিদায় লইয়া আসিলাম এবং তৎপর দিবস যথাকালে তাঁহার এজলাসে হাজির হইলাম; কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, কার্ডগুলি তিনি রেজেষ্টারী না করিয়াই আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নিরুপায় হইয়া শেষে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত আর এক গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত দোকানে কার্ডগুলি রেজেষ্টারী করিয়া লইতে হইল। টাউন রেশনিং অফিসারের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অপর অপর ক্ষেত্রে যাহা হইয়া আসিতেছে, এক্ষেত্রেও তাহার অন্তথা হইল না।

তার পর ষাণ্মাস্য তো বরাদ্দ মাফিক ধরে আনিলাম, কিন্তু কয়লা আর জ্বোটে না, নির্দিষ্ট আড়তে কয়লা ছিল, কিন্তু দপ্তরখাতায় মুদ্রিত ছাড়পত্রের অভাব হইয়া পড়িল।

৩। বস্ত্র-সুখ-সঙ্কট

বস্ত্রের কুপন আদায় করিতে গলদুর্ঘট হইতে হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাস হইতে আমাদের বস্ত্র আর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা ইউক, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় সাব-এরিয়র আপিসের দপ্তরখানা হইতে ক্যামক্রেসে ৬৬৯৪৬-৬৬৯৪৭ নম্বরের কুপন সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু লাগে তীর না লাগে তুচ্ছ। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া

হয়রান হইলাম—না জুটিল ধূতি না জুটিল শাড়ী! শুনিয়া-
ছিলাম যে গত জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ একটি ফতোয়া জারি
করিয়া নির্ধারিত বস্ত্রব্যবসায়ীদের উপর এই নির্দেশ দিয়া-
ছিলেন যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের দোকানে কত মাল মজুত
আছে, সে সম্বন্ধে কোন খবর ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে না দেন;
কিন্তু এই খবর তো পাই নাই যে কর্তৃপক্ষ নিজেরাও সেই
খবর লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতে-
ছেন! স্থানীয় রেলওয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে মিহি
ও ভাল শাড়ী এবং ধূতি ও ছিটের বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল,
তদ্ব্যতীত ন্যূনতম ১৫০ জোড়া Superfine texture-এর ধূতি
ও ঐ পরিমাণের শাড়ী পুলিশ বিভাগের কর্মচারীর জন্য বরাদ্দ
করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি; তারপর সর্ব-
সাধারণে যে কুপন দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি সেখানে একে-
বারে অচল। Special permit ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে দেওয়ার
ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ঐ ধরনের special permit কেহ কেহ
দুই-তিন টাকা দিয়া প্রাপকের নিকট হইতে ক্রয় পূর্বক চাহিদা
মিটাইতেছে দেখিয়াছি। ঐ পারমিটে শাড়ী সংগ্রহ করিয়া এক
একখানা শাড়ী চোরাবাজারে দশ টাকা মূল্য বিক্রয় হইয়াছে।

৪। তৈল-সুখ-সম্পদ

বাঁটি সর্বপ তৈলের কথা বলিতেছি না—ঐ দুর্লভ জিনিষটি
এখন ভাগ্যবানদের করায়ত্ত এবং উহার উপযুক্ত প্রয়োগে ইষ্ট-
সিদ্ধি হইতেছে, স্তত্রাং এক্ষণে চাহিদাও বেশী। আমি
কেরোসিন তৈলের কথাই বলিতেছি। প্রায় দুই মাস হাঁটা-
হাট করিয়াও যথোপযুক্ত ছাড়পত্র একখানি সংগ্রহ করা
দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কর্তার মুখভঙ্গী করিয়া বলেন—
ছাপানো ফর্ম নাই। তথ্য! পরিবর্তনশীল সাময়িক কুপনে
কাজ চালাইয়া আসিতেছিলাম তাহাও মাসে পনের দিন
আকাশে বিধাতার আলো বা রাজবসন্তের বৈজ্ঞানিক আলোর
উপর প্রকাস্তভাবে নির্ভর করিয়াই রাত্রিযাপন করিতে হইয়া-
ছিল। কেন? ১৮।২।৪৬ ইং তারিখে ৭২৫ নং পারমিট তো

বৎকষ্টে একখানি সংগ্রহ করিলাম—দু-তিন দিন ছয় মাইল পথ
পদকষ্টে যাতায়াত করিয়া। C. R. Stores-এ কেরোসিন
ক্রয় করিবার ডিক্রী লাভ করিলাম বটে, কিন্তু দশ দিন
যাবৎ দুই মাইল হাঁটাচাট ও দুর্ভোগের পরও নির্দিষ্ট ষ্টোরে
তৈল ক্রয় করা সম্ভব হইল না। দোকানী থাকে তো তৈল
থাকে না আর তৈল থাকে তো দোকানী থাকে না। অগত্যা
২৭শে ফেব্রুয়ারী আবার সাপ্লাই আপিসে ধমা দিলাম—কর্তৃপক্ষ
দয়াপরবশ মকবুল আলীর দোকান হইতে তৈল ক্রয় করিবার
সংশোধিত ছাড়পত্র মঞ্জুর করিলেন। আমার বর্তমান আবাস-
স্থল হইতে উপরোক্ত দোকান তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।
২২০ সের কেরোসিন তৈল ৮০০ আনায় ক্রয় করিলাম বটে,
কিন্তু কুলীকে মজুরি দিতে হইল ১০ আনা। অনেকে হয়ত
বলিতে পারেন কেন? তৈলের টিনটি নিজ হাতে করিয়া
কিন্ধা চাকরের মারফতে আনিলেই হইত? হ্যাঁ, এই দুইটার
যে কোনটাই সম্ভব হইলে ভালই হইত সন্দেহ নাই; মোক্ষ
কথা হইতেছে যে, আমি তো দেশপূজা বিভাগাগর নহি আর
বয়সও হইয়াছে ঘাটের উপর। তারপর চাকর? “ভৃত্য” বা
“চাকর” শব্দটি আর সরল বাংলা অভিধানে এখন নাই—যুদ্ধের
পরিস্থিতিতে তাহাদের অজাতশত্রুরা মিলিটারী ফ্যাসানের
কোর্ডা পেটলুন আর জুতা মোজা পরিয়া চোখে চলমা আঁটিয়া
সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে যত্র-তত্র স্থানে-অস্থানে বিচরণ
করিতেছে, আয়াসলব্ধ কৃত্তিক কেশের বাহার পাছে নষ্ট হয়
তাই টুপি সঙ্গ্রে অসহযোগ স্থাপন করিয়া সর্বত্র don't
careism-এর সাধনা করিতেছে আর যাহারা বিধাতার
নিদারুণ কার্পণ্যে সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা
আপিসে আপিসে পাখাটানার আভিজাত্য লাভ করিয়া মোটা
মাহিনায় মুকাম্মীদের বশবদ হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা
অপাতজ্ঞেয় তাহারা হয়ত যন্ত্রারোগী নয়ত বাতব্যাধিগ্রস্ত, মাস-
মাহিনা ত্রিশ টাকার নীচের কোঠায় আর পা দিতেছে না।

সুখে আছি বই কি—পরম সুখে।

পুর্ণিমার রাত্রি যেন

ত্রিকরুণাময় বসু

পুর্ণিমার রাত্রি যেন উর্বশীর শাড়ীর সংকেত,
মন্দির সৌন্দর্য স্বপ্নে রেখাঙ্কিত সোনালী আলপনা,
জ্যোৎস্নার জরির কাজ বহুদূরে স্বর্ণশঙ্করে
কুয়াশা-গুপ্তন টানি রাত্রি আগে বিধুর উন্নয়ন।

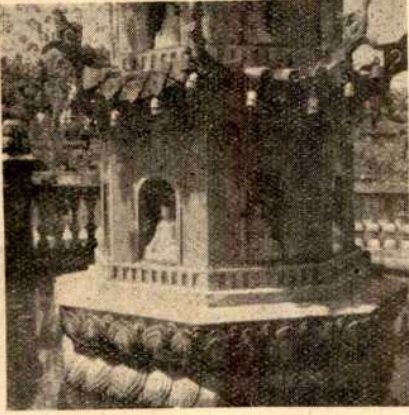
নিশ্চয় সোনার রাত্রি, শুধু যুগ পতঙ্গের ডাক
অপূর্ব রহস্যভরা রচিতেছে শান্ত পরিবেশ;
করণ কুঁড়িতে আঁকা হেমন্তের শিশিরের দাগ,
হঠাৎ দেখিছ তোমা সেইক্ষণে একটি নিমেষ।

মনে হ'ল সে ত নয়, তুমি যেন আর এক জন,
দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্র ছাড়ি' উজ্জ্বলোকে তুমি;
আমার চৈতন্য মাঝে কি আনন্দ, এ কি শিহরণ,
যুগিত প্রাণের বস্তু অকস্মাৎ উঠেছে কুসুমি।
মাঠের আলোর ধারে আঁকাবাকা রাজমাটি-পথ,
বিশীর্ণ নদীর ধারা গ্রামান্তরে ক্লান্ত হুঁরে চলে;
দু-জনে রয়েছি বসে, যেন এক অদৃশ্য জগৎ
সোনালী স্বপ্নের হুঁরে জীবনের কত কথা বলে।
তোমার আমার মাঝে স্বপ্ন ছিল, ছিল কিছু কান্না,
মায়াময় এ মুহূর্ত রেখে গেল অনন্তের দাগ।

মালাকার পথে একদিন

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

দু-চারদিন আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম যে, আশ-পাশের প্রায় সব জায়গাতেই ত ঘোরা গেল, মালাকারও একদিন ঘোরা যাক। অনেকের কাছে শুনেই পাই যে এই শহরটি মালয় দেশের সবচেয়ে পুরনো শহর। পোর্ট ডিকসন (আমরা যেখানে আছি) থেকে বেশী দূর নয়। মোটের ওপর



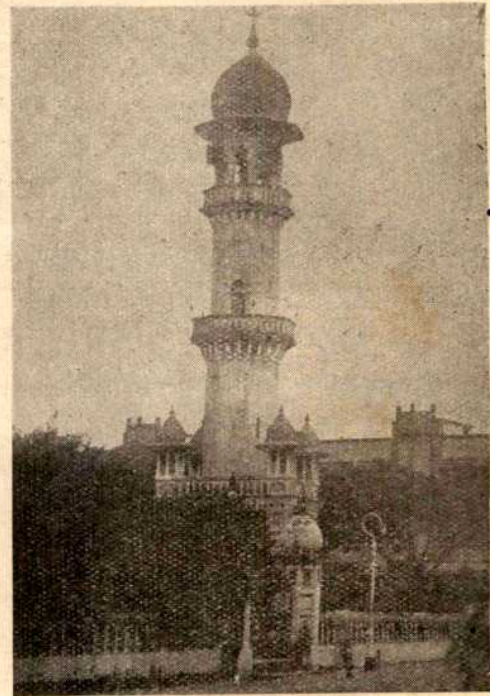
বৌদ্ধ মন্দির, আনসন রোড

সাতান্ন মাইল হবে—যদি আমরা মালাকা প্রণালীর ধার দিয়ে যাই। অনেকে বললেন, এ রাস্তাটা মোটে ভাল নয়—কোন রকমে যাওয়া যেতে পারে, তবে যদি সেরানবানের রাস্তা দিয়ে যেতে পারি তা হলে ভাল ও বেশ চওড়া পিচালা রাস্তা পাব। এই পথ দিয়ে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। এই পথে কেনডং কাম্পুঙের (গ্রাম) মাইল তিন-চার ছাড়িয়ে ছোটো রাস্তা হ্রদিকে গেছে—একটা বাঁয়ে ও একটা ডাইনে। বাঁয়ের রাস্তা সিঙ্গাপুরের দিকে গেছে, আর ডাইনের রাস্তা ‘আলোর গাজা’ শহরের ভেতর দিয়ে মালাকার পথে মিশেছে। এখান থেকে মালাকার দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল হবে। সেরানবান হতে পোর্ট ডিকসনের দূরত্ব আন্দাজ কুড়ি মাইল। আমাদের কিন্তু অত দূরপথে যেতে মন চাইল না—আমরা মালাকা প্রণালীর পাশ দিয়ে যাব স্থির করলাম। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেজন্ত রবিবার দিন ইউনিটের লোকদের ছুটি দেওয়া হয়। সেদিন তারা একটু আমোদপ্রমোদ করে, আমাদের আপিসের কাজ আর লেবরেটরীর কাজ ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

আমরা ৭ই অক্টোবর রবিবার যাত্রার দিন স্থির করলাম। আগের দিন (শনিবার) রাত্রে বেঙ্গল এন্টেটের ম্যানেজার গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, পরদিন সকাল আটটায় তাঁকে নিয়ে আমরা মালাকার পথে পাড়ি দেব। একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল যে, অক্টোবর

নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাস এখানে বর্ষাঋতুর প্রাবল্য—তবে কোন কোন সময় জাহ্নয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্তও বেশ বৃষ্টি হয় অথবা সারা বছর অল্পবিস্তর বৃষ্টি লেগেই আছে। শীতের প্রকোপ এখানে নেই বললেই চলে। সেদিন ভোরের দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো যাওয়া হবে না। তাই বিছানায় পড়ে রইলাম সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল—আকাশও বেশ মেঘলা। চাকর দুটো সকাল থেকেই ঘুর-ঘুর করছে। আগের দিন রাত্রে তাদের বলা হয়েছিল যে, সকাল সাতটার আগে যেন তারা আমাদের ডেকে দেয়।

তড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমরা জলযোগ করলাম। চাটুজ্যোমশায় একটু আপিসের কাজ করতে গেলেন। তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে গুপ্তমশায়কে আনতে গেলাম। বেলা তখন নয়টা বেজে গেছে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমাদের জন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন, একটা টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। টিফিন-কেরিয়ারে কি আছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ভদ্রলোক তাঁর মেয়েদের দিয়ে কিছু খাবার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু ভোজন-



আরব মসজিদ

বিলাসী তাই এ আয়োজনে খুশী হয়ে উঠলাম। এতদিন এখানে এসে ক্যাম্প থেকে ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের শুধু ‘কম্পো’* খেয়ে কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, বাংলার মা-বোনদের হাতের রান্না যদি এই বিদেশ-বিজুইয়ে এসে মেলে তবে সেটা ভাগ্যের কথা। বেলা প্রায় দশটায় আমরা আমাদের গন্তব্য পথে রওনা হলাম। আমরা থাকতাম পোর্ট ডিকসন হতে সাড়ে-চার মাইল দূরে মালাক্কা



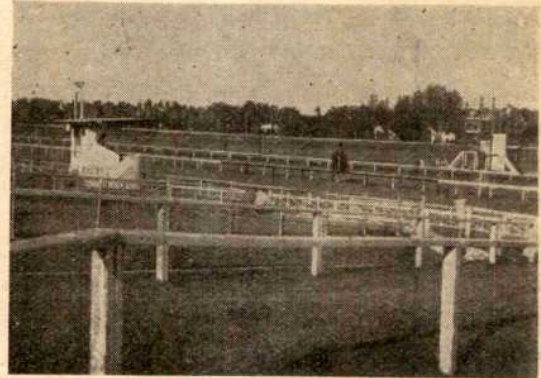
সমুদ্র-তীরে জেনারেল পোস্ট আপিস

যাবার পথে আর গুপ্তমশাই থাকতেন পোর্ট ডিকসন শহরের মধ্যে।

মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে আমাদের জীপ গাড়ী ছুটল। জীপ-চালক পয়ং চাট্টকো-মশাই—চালান ভালই, কিন্তু তিনি গাড়ীর গতি কখনও মন্থর হতে দেন না যদি না পথের মধ্যে বাঁক থাকে। ডান দিকে সুবিশিষ্ট মাঠ বুঝু করছে।

দূরে মালাক্কা প্রণালী—অগণিত জাহাজ ভাসছে। বালুময় তীরের ওপর প্রণালীর ঢেউয়ের বিফল আঘাতের ছলাং ছলাং শব্দ ও তার সঙ্গে বাতাসের কৌসকৌসানি আমাদের বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঢেউয়ের জল উঠে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে গেল। প্রণালীর ধারে ধারে খোলা জায়গায় কোথাও সাগরী আপিস, কোথাও কারখানা রয়েছে। তার মধ্যে বেশ ছোট ছোট কয়েকটি সুন্দর বাংলো দেখলাম, সবই ইন্ট-কার্টের তৈরি। বাঁ-দিকে সারি সারি রবার গাছ দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা বেঁধে। এখানে কতকগুলো সুউচ্চ

দেখলাম। এগুলো জাপানীরা তৈরি করে গেছে—সৈন্যেরা এখানে লুকিয়ে যুদ্ধ চালাবে বলে। এই সুউচ্চগুলোর মধ্যে চুকতেই ভয় করে, পাহাড়ের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। এই পাহাড়ের ওপরে আগে মালয় সৈন্যদের ‘হেড কোয়ার্টার’ ছিল। বেশ সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাংলো রয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ব্রিটিশ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হচ্ছে। আমরা এ সব ছেড়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটি মন্দ নয়, বেশ চওড়া ও পিচালা; তবে মাঝে মাঝে পিচের সঙ্গে পাথর উঠে গর্ত হয়েছে দেখতে পেলাম। শুধুলায় কিছুদিন আগে রাস্তাটি খুব ভাল ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের চলমান বড় বড় ট্যাঙ্ক আর বুলডোজার* এর দফা একেবারে সেরে ফেলেছে। কিছু দূরে ডান দিকে একটা খোলা মাঠ রয়েছে, সেখানে আগে নারকেল গাছ জন্মানো হ’ত। কোন কারণে সেগুলোকে কেটে ফেলেছে—গুঁড়িগুলো এখনও রয়েছে দেখলাম। খানিকটা এগিয়ে দেখি প্রণালীর ধারে বড় বড় জাহাজ থেকে ট্যাঙ্ক, জীপ, বুলডোজার, ট্রাক ইত্যাদি একে একে বেরিয়ে আসছে। বেশ মজা লাগল দেখতে। মালয় অধিকারের জন্য এত সৈন্যসামন্ত ও এত যুদ্ধের সরঞ্জাম এরা এখানে আনবে, এদের মধ্যে থেকেও আমরা তা বুঝতে পারি নি। বাঁ-দিকে পাহাড় ও রবারের বন চলেছে একটানা—মাঝে মাঝে আতপ পাতা দিয়ে ছাওয়া মালয়ীদের ছোট ছোট বাড়ী। প্রণালীর ধারে বড় বড় বাংলো রয়েছে। এগুলো সবই ছিল ব্রিটিশদের অবস্থানের জায়গা।



রেস কোর্স

যুদ্ধের আগে ভারতীয় কিংবা মালয়ীদের এখানে আসবার অধিকার ছিল না। এখন সেখানে সবাই বাস করছে—ভারতীয় অফিসার থেকে সিপাহী পর্যন্ত।

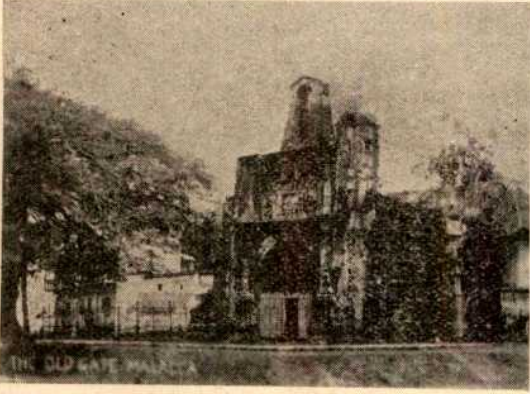
মাইল দশেক আসবার পর দু-ধারে বেশ ঘন ও বড়

* বুলডোজার—পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করবার জন্যে। এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, দেখতে অনেকটা ট্যাঙ্কের মত।

*কম্পো—প্যাসিফিক কম্পো।

আমরা এসেছিলাম এখানে আক্রমণকারী সৈনিকদের সঙ্গে—যুদ্ধ লাগলে আমাদের আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। সেজন্য ‘কম্পো’র মধ্যে টিনের ভিতর হরেক রকম তৈয়ারি খাবার ছিল। সে সব খেতে হ’ত। প্রথম কিছুদিন আমরা এই খেয়েই ছিলাম। এ সমস্তই আমেরিকার জিনিষ। লবণ থেকে সিগারেট পর্যন্ত এর মধ্যে থাকে।

রবার গাছের বন দেখা গেল। গাছগুলোর মধ্যে বেশ কঁক রয়েছে, আমাদের জীপ অনায়াসে ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। গাছগুলো সরু হয়ে উঠে গেছে কতকটা নারকেল গাছের মত। ডান দিকে একটা সাইন-বোর্ড রয়েছে “Rille Range”। এদিকে জাপানী সৈন্যদের



মালাকার প্রাচীন দুর্গ তোরণ

রাইফেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। এদিকে বেশ ঘন রবার-বন রয়েছে। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে সোজা রাইফেল রেঞ্জের দিকে আর একটা পথ বাঁ-দিকে গেছে রবার-বনের মধ্যে—এই নতুন রাস্তাটা জাপানীরা তৈরি করেছে Cape Rachad তে যাবার জন্তে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে আকাবাকা সরু পথ, জীপের মত ছোট গাড়ী অনায়াসে যেতে পারে। একটা পাহাড় পার হয়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হয়। এখানকার রাস্তা ভয়ানক খারাপ, পাহাড়ের জল এসে রাস্তার মধ্যে নালা করে দিয়েছে। এই পাহাড়ের মাথার ওপর একটা Light-house (দীপ-গৃহ) রয়েছে। এর প্রায় সবটাই ভেঙেচুরে গেছে। এখানে একটা দূরবীণও ছিল—সেই দূরবীণ দিয়ে সূর্য্যোদয়ের তীর দেখতে পাওয়া যেত। কিছু নীচে একটা মন্দির আছে—সকল দেশের মানুষ সেখানে গিয়ে পূজা দেয়। বড় পাহাড়ের মাথায় যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল না হলে বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি অতি কষ্টে এই পথ দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম।

মালাকার পথে আরও দুই মাইল এগিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে কতকগুলো রবার-বন সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে দেখা গেল। এই সব জায়গায় মালয়ীরা কিছু কিছু শত্রে আবাস করেছে দেখতে পেলাম। এখানে জাপানীরা খুব চেষ্টা করেছিল ফসল উৎপাদন করার জন্তে কিন্তু বিশেষ ফলাভ করতে পারে নি। ফসলের মধ্যে টেপিয়োক-ই বেশী ফলত। গাছগুলো টেঁড়স গাছের মত দেখতে। পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ফুট উঁচু হয়। এগুলো শেকড় থেকে গজায়

মিষ্টিআলুর মত। এগুলো খেলে শুধু পেটই ভরে—শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। জাপানী আমলে প্রথম দিকে এই এক কাঠির (আড়াই পোয়ার) দাম ছিল পাঁচ থেকে দশ ডলার; শেষের দিকে ১০০ থেকে ২০০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল।* তখন এখানকার লোকেরা বলতে গেলে ভাত তো চোখেই দেখতে পেত না। অবশ্য ধনীদেব কিংবা ধারা ধান-চাল গুদামজাত করে রেখে দিতেন তাদের কথা আমি বলছি না। জাপানীরা সরকারী রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেটা মনে হয় লোক দেখাবার জন্তে, তাতে লোকের একবেলাও পেট ভরত না। এই রকম করে এখানকার লোকের দিন চলত। এখানে চীনারা বেশী ধনী, তারাই সব ব্যবসা একচেটে করে রেখেছিল। তারা জাপান-সরকারকে মোটা টাদা দিয়ে রেহাই পেত। ব্রিটিশদের আমলে এ ধরনের কষ্ট এদেশের লোকেরা পায় নি। ব্রিটিশরা এদেশে পা দিয়েই গ্রামে গ্রামে বিনি পরসায় চাল বিলিয়েছে। আগেকার দিন ফিরিয়ে আনবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা এরা করেছে। শুধু করে নি বাংলায় যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরল।

চাটুজ্যে মশায় গাড়ী চালিয়েই চলেছেন, ধামবার নাম নেই। কিছুদূর গিয়ে গুপ্তমশায় একটা বাগানের কাছে গাড়ী থামাতে বললেন। বাগানটা এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের। এর মধ্যে ছোট একটা বাংলা আছে—আগে ইনি এখানে থাকতেন। এখন আর এদিকে থাকেন না। বাংলাদেশের ভাল আম, চালতা, শিউলি ফুলের গাছ সবই রয়েছে। ভদ্রলোক তামিল ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন। প্রায় তিন মাইল যাবার পর আমরা একটা গ্রামে এসে ঢুকলাম। এর নাম পাসার পাঞ্জাং, রাস্তার দু-ধারে দোকান-পাট রয়েছে। সব মালয়ী ও চীনা এখানকার অধিবাসী। তবে এখানকার চীনারা সকলেই প্রায় ধনী। এখানে চীনারাই দোকান করে বসে আছে—মালয়ীরা বাজারে মাছ ও তরকারী বিক্রী করেছে দেখা গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা প্রকাণ্ড ‘Victory Gate’ (বিজয়-তোরণ) রয়েছে।

* জাপানীদের আমলে একটা সিগারেটের দাম ১০০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। ১০০০ ডলারের কম কেউ একটা ছোটখাটো সংসার প্রতিপালন করতে পারত না। চোরা-বাজারের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হ’ত। চাকরীর ২০০/৩০০ ডলারে কুলোত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মাইনে ২০০০ ডলার ছিল। জাপানীরা তখন এসমস্ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। এ সব ঘটেছিল আত্মসমর্পণের কিছু আগে। এখন প্রত্যেকের কাছে প্রায় ১০ হাজার থেকে ১০০ হাজার পর্যন্ত জাপানী ডলার আছে। এখন এর কোন মূল্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট দিচ্ছে না।

সব জাতের পতাকা দিয়ে এটাকে সাজিয়েছে—কিন্তু পরাধীন ভারতের পতাকা উড়তে দেখলাম না। এদেশের চীনারা সকলেই সাম্যবাদী; তাদের কি ধরে, কি বাইরে, কি মোটরে—সব জায়গায়ই একটা করে সাম্যবাদী পতাকা উড়ছে। ছোট



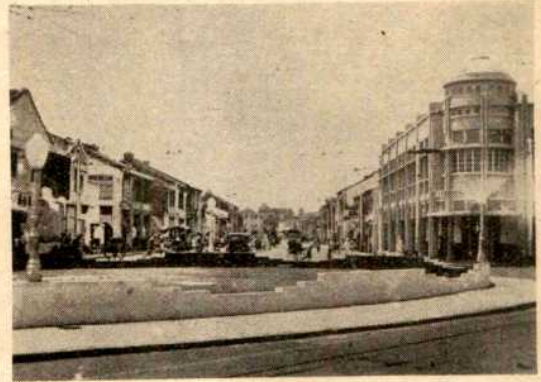
রেক্স নাট্য-গৃহ

ছোট চীনা ও মালয়ী ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে। আমরাও তাদের প্রত্যভিবাদন করলাম। এদিকে মিলিটারী গাড়ী মোটেই দেখতে পাওয়া গেল না। এক বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন একটু দূরে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমরা এগিয়ে চললাম।

দু-পাশে সারি সারি রবারের বন চলেছে। মাঝে মাঝে মাঠ, জলা জায়গা, রবারের কাটা গাছ তাতে ভাসছে। মালয়ী ছেলেরা ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরছে। তার মধ্যে জাপানী কৃষি-বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিষ্কৃত আতপ-গাছের পাতায় ছাওয়া কতকগুলো ভেঙে-পড়া কার্টের বাড়ী, তাও জলে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখলাম। আমরা কিছুদূর যাবার পর পেঙ্গাল কেমাপাস নামক গ্রামে ঢুকলাম। পোর্ট ডিক্সন থেকে পেঙ্গাল কেমাপাসের দূরত্ব ২১ মাইল, এখানেও চীনা ও মালয়ী বসতি, ভারতীয় এখানে খুব কম। চীনা মেয়েরা খুব প্রগতিশীল। প্রত্যেকেরই প্রায় একটা করে সাইকেল আছে। সকলেই রাস্তায় সেজেগুজে বেড়াতে চলেছে। মালয়ী মেয়েরা, কি গরীব কি ধনী সকলেই একটা করে লুঙ্গির মতন বাহারে ছাপ দেওয়া কাপড় পরে। সেই রকমই ছাপ দেওয়া একটা করে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত বড় কোট গায়ে দেয়। বেশীর ভাগ মালয়ী মেয়েরা মাথায় ধোমটী দেয় না। খোঁপার বাহার দেখবার জিনিষ। কেউ তাতে ফুল গুঁজে, কেউ বিলিতি রঙ-বেরঙের ফিতা দিয়ে ধোঁপাটিকে মনের মত করে সাজায়। এরা সকলেই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, দেখতে অনেকটা বাঙালী মেয়েদেরই মত—কিন্তু নাক চেপ্টা। শরীর এদের খুব মজবুত। এখানকার বাজারের পাশ দিয়ে ছোট একটা নদী বয়ে যাচ্ছে—

রাস্তার দু-ধারে মালয়ী ও চীনাাদের বাড়ী। গ্রামে নারকেল গাছ, কলা গাছ, পেঁপে গাছ ও কাঁটাল গাছ প্রচুর দেখলাম—অনেকটা লিচুর মত দেখতে এক রকম ফল আছে যার নাম 'রম্বুতান', এখানে খুব ফলে। 'ডোরিয়ান' ফল কাঁটালের মত দেখতে; বিস্ত্রী গন্ধ, কাছে যেতে পারা যায় না। ফল পাকলে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে, কিন্তু মুখে গন্ধ লেগে থাকে—ধুলেও যায় না। আনারস প্রচুর হয়।

মাইল ছয়েক গিয়ে আমরা একটা মোড়ের মাথায় এলাম। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে সেরানবানের দিকে, আর ডান দিকের রাস্তাটি গেছে মালাঙ্কার দিকে। এখানে একটা ছোট গ্রাম দেখলাম। এখানকার বাসিন্দা সবাই মালয়ী। একটা পচা খাল পাশ দিয়ে চলেছে। এটা পার হয়ে আমরা ডানদিকে চললাম। একটু এগিয়ে দু-দিকে বেশ ধানের ক্ষেত রয়েছে দেখলাম, এর মাঝে মাঝে আতপ গাছগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু-দশ ঘর মালয়ী ও চীনা এদিকেও রয়েছে—সবাই চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মাইল-চারেক যাবার পর আমরা নেগ্রি সেমিলান ও মালাঙ্কার সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। এখানে ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটের একটা শুল্ক আদায়ের আপিস রয়েছে। কয়েকটি

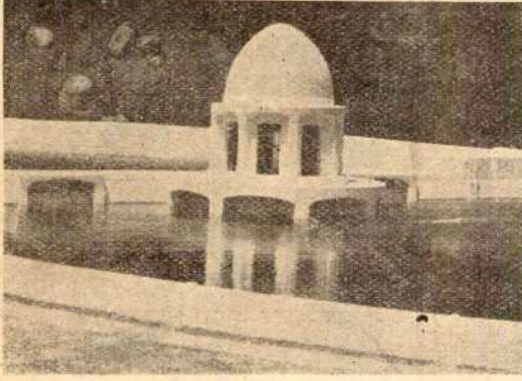


ক্রান্তান রোড

বাংলোও আছে, সব জলে ডোবা। এর পরেই একটা ছোট খাল—পোলের ওপর দিয়ে পার হতে হয়। বর্ষাকাল ব'লে রুষ্টির জল মাঠ ছাপিয়ে রাস্তাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আন্তে আন্তে পার হয়ে আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। এর নাম লাবুচিনা পাসার,—পাসার মানে বাজার। বাজারটি ছোট, বড় নোংরা। শুটকী মাছের মধুর গন্ধে বাজারটি আমোদিত হয়ে রয়েছে।

একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম দু-দিকে ধানের ক্ষেত সমান ভাবে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এদিকটায় ধান মন্দ হয় না। ঠিক যেন বাংলাদেশেই আছি বলে ভ্রম হয়। রাস্তা সব জলে ডুবে গিয়ে মাঠের সঙ্গে মিশে

গেছে। এদিকটায় খুব নীচ জমি। মাইলতিনেক অতিক্রম করে দেখি আবার সেই ঘন পাহাড়ী জঙ্গল ও রবারের ক্ষেত চলেছে সার দিয়ে। এদিকে আসতে লোকে এখনও ভয় পায়, কারণ চীনা ও জাপানী গরিলা সৈন্য পথে-বাটে



কাউন্টেন গার্ডেন

লুকিয়ে আছে স্তন্যপায়ী পাওয়া যায়। বনের পাশে মালয়ীদের আতপ পাতায় ছাওয়া কুটির মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। ধনীই হোক আর গরীবই হোক এরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করে। বাড়ীর আশপাশ তকতকে বকরকে, একটুও নোংরা দেখলাম না। বাড়ীর সামনে এরা ছোট ছোট বাহারে ফুল গাছ পুতেছে। কারও কারও বাড়ীর ভেতর ছোট-বড় ঢোলক তুলছে, এরা সঙ্গীতপ্রিয়। কিছু দূর যাবার পর আবার সেই শ্রামল ধানের ক্ষেত ও নারকেল বাগান, আতপের সারি। এখানে পাহাড়ের ওপর ছবির মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ী রয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে। আশ মাইল এগিয়ে আমরা একটি ছোট শহরের মধ্যে এসে পড়লাম। এ শহরটির নাম মসজিদ টানা। এখানে 'ইট-কাঠে' তৈরি বাড়ী চোখে পড়ল। এই শহরের দুটো রাস্তা দু-দিকে গেছে। বাঁ-দিকের রাস্তা ধরলে আমরা আলোর গোজা শহর দিয়ে

মালাক্কায় পৌঁছাতে পারি। লোকের মুখে শোনা যায় যে আলোর গোজার পর থেকে রাস্তা খুব ভাল। আমরা সোজা রাস্তা ধরে চললাম। এদিকে গ্রাম ছাড়বামাত্রই রাস্তার দু-ধারে সুরা হল কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন, কোথাও বা রবারের ক্ষেত। প্রায় পাঁচ মাইল যাবার পর আমরা সুদৃষ্টি উজাং গ্রামে এসে পড়লাম। গ্রামে চুকতেই একটি ধান নজরে পড়ল, একটি মালয়ী বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারী দিচ্ছে। এ গ্রামে আছে ধানের ক্ষেত আর নারকেল বাগান। এখানে পাকা বাড়ী দেখলাম না। একটু এগিয়ে একটি মালয়ী স্কুল দেখতে পেলাম। সবই পাতলা কাঠের বাড়ী, কিন্তু বেশ বড়। এর পরেই বাজার,—বাজারটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কেউ কেউ দোকানে বসে গুড়গুড়ি টানছে। এখানে সবই মালয়ী তবে দু-এক জন চীনাও দেখলাম। এখানকার ছোট ছোট বাছারা আবার জাপানী কায়দায় সেলাম দেয়। এদিককার গ্রামে বেশ লোকজন আছে। এখান থেকে মালাক্ক শহর প্রায় তের মাইল হবে।

তিন-চার মাইল এগিয়ে যাবার পর আর একটি গ্রামে এসে পড়লাম। এর নাম হচ্ছে টাঙ্গু বাটু, এখানে একটি বড় স্কুল দেখলাম। এদিকটা বেশ পরিষ্কার। মসজিদ প্রায় দুই গ্রামেই একটি করে আছে। এগুলো কোঠাবাড়ী তবে ছাদগুলো বড় টালি দিয়ে ছাওয়া। ভেতরে গিয়ে দেখলে বাংলার মসজিদের মত মনে হয়। বড় বড় ঢোলক একটি করে সব মসজিদেই আছে। এদিকটায় বেশ ধানক্ষেত দেখলাম। এখানকার ছেলেমেয়েরা পর্যায় বৈশিষ্ট্য চালাক ও পরিগ্রামী। চীনারা বাংলাদেশের জমিদারদের মত এদেশীয়দের শোষণ করছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

* UDANG—চিংড়ি মাছ, Sungi—নদী। বোধ হয় এখানকার নদীতে খুব চিংড়ী মাছ পাওয়া যায় তাই এই গ্রামের নাম Sungi udang.

আমাদের আয় ও খাত্তাব্যবসায় মূল্য

জনৈক বাঙালী গৃহিণী

বাংলার বাহিরে বাঙালীর ভোজনবিলাসী বলিয়া দুর্নাম আছে। আমরা নাকি শুধু ডাল রুটি অথবা ছাতু গুড় ও কাঁচা ফলমূল খাইয়া জীবনধারণের কথা ভাবিতে পারি না। আমাদের যে পাঁচপদ মাছ তরকারি ও ভাত না হইলে চলে না তাহা আমরা গর্বের সঙ্গে প্রতিবেশীর নিকট প্রচার করি আর সর্বদাই দেখাইতে চাই যে আমরা ভোজন ও রন্ধন ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল ও পারতপক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ধরণধারণ পরি-

বর্তন করিতে ইচ্ছুক নহি। কথাটা হয়ত কতক পরিমাণে সত্য। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী মেয়েদের বেশীর ভাগ সময়টাই রন্ধনশালায় ও ভাণ্ডারগৃহে কাটে এবং নানা রকম জিনিষ রান্না করিবার শখও তাঁহাদের বড় কম নহে। কিন্তু আজকালকার দিনে বাঙালীর সম্বন্ধে ভোজন-বিলাসী কথাটা প্রযোজ্য হইতে পারে কি না ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সাধারণ বাঙালী সংসারের আজকাল যাহা আয়

তাহাতে মেয়েদের পক্ষে কি রক্ষন করা সম্ভব এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকাল বাস্তবিক কি খায় তাহা একবার খতাইয়া দেখা মন্দ নহে।

চাষী গৃহস্থ, বড় চাকুরীয়া ও ধনী ব্যবসায়ীর কথা আমাদের আলোচ্য নহে; যদিও শহরাঞ্চলে খাজ-রেশন সকলের পক্ষেই সমান। ধনীর পক্ষে অল্প সকল প্রকার খাদ্যবস্তুই দুর্লভ এবং চাষী গৃহস্থেরও তরিতরকারি এবং চিঁড়া মুড়ি চাউল ইত্যাদির অল্প বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কাজেই জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িয়াছে সর্বশ্রেণীর চাকুরীজীবীর, সে চাকুরী সরকারী বেসরকারী, যে প্রকারেরই হউক না কেন। ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে আয় সেই অল্পপাতে বাড়ে নাই, এবং খাজবস্তুর মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান নামিতে নামিতে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অনেক বলেন যে রেশন-ব্যবস্থা হইয়া তবু কতকটা রক্ষা হইয়াছে, ইহা কতদূর সত্য জানি না। আমার মনে হয় যে, যে দরে খাজ-রেশন পাওয়া যায়, তাহাও বহু পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। খাজশস্ত্র রেশন দোকানে পাওয়া গেলেই ত খাজ-সমস্তার সমাধান হয় না, ক্রেতার সে রেশন ক্রয় করিবার মত সন্মর্থ্য থাকেও দরকার। চাকুরীজীবীর যাহা আয় তাহাতে এই নিম্নতম স্তরে বাঁধা দুর্খল্য রেশন কিনিতেও কত টাকা মাসে খরচ হয় এবং কতই বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যে কিরূপ দুষ্কর হইয়াছে বুঝা যাইবে।

প্রতিজনের সাপ্তাহিক রেশন	প্রতিজনের চারি সপ্তাহের রেশন	সরকারী বাঁধা দরে চারি সপ্তাহের রেশনের মূল্য
চাউল—/২৯/০	সাড়ে দশ সের	৩৫/০
চিনি—/১/০	বার ছটাক	১০/১০
লবণ—/১	ঘোল ছটাক	১/০
তৈল—/১/০	আধ সের	১১/০
		৫১/১০

প্রতি পরিবারে পাঁচ জন করিয়া লোক ধরিলে পাঁচ জনের চারি সপ্তাহের রেশন ক্রয় করিতে ব্যয় হয় ৫১/১০ × ৫ = ২৫৬/১০। ইহার মধ্যে ডাল মশলাপাতি বা তরিতরকারি নাই। ঐ সকল জিনিসেরই বা বর্তমান বাজার দর কি তাহা দেখা যাক। কলিকাতা ও মফস্বলে দরের সামান্য তারতম্য আছে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে এবং বাংলার সর্বত্র শহরাঞ্চলে দর প্রায় একই রকমের বলিলেই হয়। শুধু মাত্র মাছের মূল্যেই কিছু তফাৎ দেখা যায়, তাহারও কারণ প্রাকৃতিক।

খাজবস্তু	তরকারি, যে কোন প্রকার
প্রতি সের	প্রতি সের
কাঁচা মুগ—/১/০	শাক—১০/০ হইতে ১০

মসুর—/১০	কুমড়া—/১০
হোলা—/১০	আলু—/১০ হইতে ১০/০
অড়হর—/১০	মিষ্টি আলু—/১০—/১০
গুড়—৫০	কচু—/১০—/১০/০
চিঁড়া—৫০	পটল—৫০
মুড়ি—১১	ঝিঁড়া—/১০—/১০/০
লম্বা—১৫০	পেঁয়াজ—/১০
সরিষা—৫০	টেঁড়স—/১০
ধনিয়া—১১০	কাঁচা কলা—/৫ একট
হলুদ—১১	বেগুন—/১০ হইতে ১০/০
জিরা—২১	পাকা কলা—/১০ একট
বেসুম—৫০/০	টোমাটো—/১/০
ছাত্ত—/১০ হইতে	জালানী—২১০ মণ

উপরি-উক্ত দরে ন্যূনতম পরিমাণ ডাল ও একটা তরকারি খাইতে হইলে চারি সপ্তাহের জন্য পাঁচ জনের সংসারে কমপক্ষে আড়াই টাকার ডাল /৫ ও এক টাকার মশলা ও দৈনিক তিন-চার আনার তরকারি না কিনিলে জীবনধারণ করা কঠিন। তাহা হইলে মোট খরচ দাঁড়ায়,

রেশন—	২৬/১০
ডাল—	২১/০
মশলা—	১১
তরকারি—	৭১/০
জালানী—	৩১
	৮০/১০

ইহা শুধু দৈনিক দু-বেলা খাওয়ার খরচ। ইহা ভিন্ন শিশুর দুধ, বালক-বালিকার জলখাবার, পরিধেয় বস্ত্র, বাড়ী ভাড়া, স্কুলের মাছিনা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। আর যে সকল জিনিস দুর্খল্য যথা—মাছ, মাংস, ডিম, ফল ও দুধ—ইহা চাকুরীয়া শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে বলিয়া তাহার হিসাব করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত যে সকল জিনিস ও ঔষধপত্রাদি নিয়মিত ভাবে ব্র্যাকমার্কেটে ক্রয় করিতে হয় তাহারও দর ধরা হয় নাই।

কিন্তু বৈশাখের প্রবাসীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিতেছি যে, আমরা যাহা দুর্লভ ও দুর্খল্য বলিয়া খাজতালিকা হইতে বাদ দিয়াছি, সেই সকল খাজদ্রব্য যথা—মাংস, দুধ, মাখন, মাছ, ডিম ও আলু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, জাপান, ইটালী প্রভৃতি দেশ দারুণ যুদ্ধের মধ্যেও সর্বসাধারণ রেশন ব্যবস্থায় উচিত মূল্যে পাইয়াছে এবং রুটির ত রেশনই হয় নাই। সম্প্রতি ভারতবর্ষ, ইউরোপের অধিকৃত দেশসমূহ ও চীন, জাপানে অনাভাব ও গমের অভাব হওয়ার ফলে এত দিন পরে পাউরুটি রেশন হইবে কি-না অথবা রুটি কম করিয়া খাওয়া উচিত কিনা তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকা বাসিগণ চিন্তা ও বিবেচনা করিতেছেন। শেষ পর্য্যন্ত রুটির রেশন করিতে

তাহাদের সাহসেও কুলায় নাই, অথচ আমাদের দেশে এক কলমের খোঁচায় প্রধান ও একমাত্র ঋণ চাউল ও আটা শতকরা ২৫ ভাগ কমান হইল ও তাহার মূল্য আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরেই রহিল। পুষ্টিকর দ্রব্য ত রেশনে সস্তায় পাইবার উপায়ই নাই।

আমাদের দেশে পাঁচজন পোষ্যবিশিষ্ট পরিবারের উপযোগী ন্যূনতম ঋণ ও তাহার মূল্য উপরে দেখান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য সরকারী বেসরকারী যে প্রকারের চাকুরীয়াই হউন না কেন, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে উপরি-উক্ত পরিমাণ খোরাকী খরচ তাহার পক্ষে অপরিহার্য। সামাজিক স্তর ভেদ বা জীবনযাত্রার মাপকাঠি ভিন্ন বলিয়া তাহাদের জ্ঞত রেশনের বা সজীর বিশেষ সুবিধাজনক কোনো দর বাঁধা নাই। ছু-বেলা ভাত তরকারি বা ভাল ভাত খাইতে হইলে এই খরচ অনিবার্য। কাজেই একজন ঋড়ুদার, চাপরাশী হইতে কেরাণী, শিক্ষক বা দোকান-কর্মচারী পর্যন্ত সকলের পক্ষে ন্যূনতম ঋণ-সংস্থানের সমস্ত আঙ্কাল, সমান জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জৈনিক পত্রপ্রেসকের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর বেতনের হার পরিবর্তন সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যায়। মন্ত্রীদের বেতনের হার যখন পাঁচ শত হইতে বাড়াইয়া পনের শত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে, তখন একজন চাপরাশী বা কেরাণীর বেতনও তিন গুণ করা উচিত—ইহাই ছিল পত্রপ্রেসকের বক্তব্য। মহাত্মা গান্ধী তাহার যতাবসিদ্ধ আন্তরিকতা ও

ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দিয়াছেন : “হাতীর প্রচুর খাবার চাই, কিন্তু পিপড়ার এককণা হইলেই কুলাইয়া যায়। ইহা কেন হয়? ঈশ্বর যাহাকে যেমন প্রয়োজন তাহাকে তেমনই দেন। হাতী এবং পিপড়ার প্রয়োজনের পার্থক্য যেমন সহজে বুঝা যায় মানুষ এবং মানুষের প্রয়োজনের পার্থক্যও যদি তেমনই সহজে বুঝা যাইত, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। সমাজে প্রয়োজনের পার্থক্য আছে তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি।” তাহার পর একথাও বলিয়াছেন, “চাপরাশীর পক্ষে ঘুম না লইয়া ১৫ টাকায় পরিবার প্রতিপালন করা কি সম্ভব? তাহাকে এমন বেতন কি দেওয়া উচিত নয় যাহাতে তাহার ঘুম লওয়ার লোভ না হয়?”—এই উক্তি দ্বারাই মহাত্মাজী আসল সমস্তা সমাধানেব ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু ন্যূনকল্পে কত বেতন দিলে এই তথাকথিত নিম্নস্তরের কর্মচারীদের জীবনযাত্রা নিরীহ সহজ হইবে তাহা বলেন নাই।

বর্তমান গবর্ণমেন্ট ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কত বেতন ও মাগ্গী ভাতা দেন এবং তাহা তাহাদের জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না দেখা যাক। আর এই বেতন তিন গুণ করিলেও কাহারও কাহারও পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব কি না তাহাও বিচার্য। এক শত টাকার বেশী যাহারা পান, এই হিসাবের মধ্যে তাহাদিগকে ধরলাম না এবং উপরে দেওয়া হিসাব অল্পযায়ী পাঁচ জনের শুধু খাওয়ার খরচ চল্লিশ টাকা ধরা গেল।

পাঁচজনের নিম্নতম

সরকারী চাকুরিয়া	বেতন	মাগ্গী ভাতা	মোট বেতন	ক্লে খাওয়ার খরচ	উদ্ভ
ঋড়ুদার	১২	২০	৩২	৪০	৮ ঋণ হয়
চাপরাশী বা পিওন	১৩	২৪	৩৭	৪০	৩ "
মালী	১৩	২৪	৩৭	৪০	৩ "
কেরাণী (Civil ও Criminal Court)	৩৫	২৭	৬২	৪০	২২ বাঁচে
পোষ্ট্যাল কেরাণী	৩৮	২৯	৬৭	৪০	২৭ "
পোষ্ট্যাল পিওন (শহরে)	২০	২৪	৪৪	৪০	৪ "
পোষ্ট্যাল পিওন (গ্রামে)	১৮	২৪	৪২	৪০	২ "

পিওনরা “গুড কণ্ট্রি”র জ্ঞত অভিরিক্ত ১০ পায়।

শিক্ষক (ইংরেজী)	৭৫	২৭	১০২	৪০	৬২ ঋণ হয়
শিক্ষক (বাংলা)	৫০	২৭	৭৭	৪০	৩৭ "
শিক্ষক (মৌলবী বা পণ্ডিত)	৬০	২৭	৮৭	৪০	৪৭ "
প্রাইমারী স্কুল :—					
প্রধান শিক্ষক	১৬	৩	১৯	৪০	২১ ঋণ হয়
প্রথম শিক্ষক	১৪	৩	১৭	৪০	২৩ "
দ্বিতীয় শিক্ষক	১২	৩	১৫	৪০	২৫ "
তৃতীয় শিক্ষক	১০	৩	১৩	৪০	২৭ "
মেয়েদের স্কুল :—					
সহকারী শিক্ষয়িত্রী	৭৫	২৭	১০২	৪০	৬২ বাঁচে
বাংলা শিক্ষয়িত্রী	৫০	২৭	৭৭	৪০	৩৭ "
ক্লাসিকাল শিক্ষয়িত্রী	৬০	২৭	৮৭	৪০	৪৭ "
সরকারী মোটর ড্রাইভার	৫০	২৭	৭৭	৪০	৩৭ "
একজন সিপাহী	১৭	—	—	—	নিজ খাওয়ার খরচ নাই ১৭ "

ইহা ভিন্ন রেল ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মচারী আছেন যাহাদের মাহিনায় সামান্য তারতম্য আছে, কিন্তু জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে কোনও বিভাগের কর্মচারীদের বেতনই পর্যাপ্ত নহে। সরকারী বেতনের যে স্কেল তাহাতে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অশিক্ষিত ঋড়ুদার ও অল্প লেখাপড়া জানা চাপরাশী পিওন অপেক্ষা ম্যাট্রিক পাস বা ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন অনেক কম এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্ত পূর্বোক্তদের যেখানে তিন টাকা খণ করিতে হয় সেখানে এক জন শিক্ষক তাহার নয় গুণ স্বগ্ৰস্ত হন।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনের স্কেল ও মাগ্গী ভাতার পরিমাণ নীচে দেখান গেল :—

বেসরকারী চাকুরিয়া	বেতন	মাগ্গী ভাতা	মোট বেতন	স্কেলে ঋড়ুদার খরচ	উদ্বৃত্ত
দোকান কর্মচারী	২০৷	৩৷	২৩৷	৪০৷	১৭৷ স্বগ্ৰস্ত হয়
দারোয়ান বা পিওন	১৫৷	৫৷	২০৷	৪০৷	২০৷ "
সর্বপ্রকার কেরানী	৩০৷	১০৷	৪০৷	৪০৷	—
কম্পাউণ্ডার	২০৷	—	২০৷	৪০৷	২০৷ "
মোটর ড্রাইভার	৫০৷	—	৫০৷	৪০৷	১০৷ বাঁচে
এডেড স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী :—					
প্রধান শিক্ষক	১০০৷	৫৷	১০৫৷	৪০৷	৭০৷ "
ইংরেজী শিক্ষক	৬০৷	৫৷	৬৫৷	৪০৷	২৫৷ "
বাংলা শিক্ষক	৩০৷	৫৷	৩৫৷	৪০৷	৫৷ স্বগ্ৰস্ত হয়
ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষক	৪০৷	৫৷	৪৫৷	৪০৷	৫৷ বাঁচে
বেসরকারী আন্ এডেড স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী					
প্রধান শিক্ষক	৬৫৷	৩৷	৬৮৷	৪০৷	২৮৷ "
ইংরেজী শিক্ষক	৫০৷	৩৷	৫৩৷	৪০৷	১৩৷ "
অগ্রাধ্যক্ষ শিক্ষক	৩০৷	৩৷	৩৩৷	৪০৷	৭৷ স্বগ্ৰস্ত হয়

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনের নির্দিষ্ট কোন স্কেল নাই। তত্পরি তাঁহারা যাহা সহ্য করেন সেই পরিমাণ টাকাই লকল ক্ষেত্রে পান তাহাও নহে। তবু গড়পড়তা ধরা যায় যে, কেরানীকে, ত্রিশ টাকা, পিওনকে পনের টাকা ও শিক্ষকগণকে ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন ছাপাখানার কম্পোজিটার হইতে মোটর মেকানিক, হোটেল ও দোকানের কর্মচারী, বাসার চাকর, ধানসামা, ঘোষার, রাঁধুনি, মালী প্রভৃতি কাহারও বেতন কুড়ি হইতে চল্লিশের বেশী নহে বরং কাহারও কাহারও তদপেক্ষাও কম। কিন্তু ইহাদের সকলকেই একই দামে রেশন কিনিতে হয় ও কম-সে-কম চার-পাঁচ জনকে প্রতিপালন করিতে হয়। পাঁচ জনের শুধু রেশনই ক্রয় করিতে যখন লাগে ২৬/১০, তখন নিম্নতম বেতনের স্কেল যে তাহার অনেক উপরে বাঁধা উচিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এদিকে তো যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় কমাইবার জন্ত লোক ছাঁটাই করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ওদিকে কিন্তু মোটী মাহিনার

কর্মচারীদের মোটী মাগ্গী ভাতা দেওয়ার পর্যাপ্ত বিদ্যমান নাই। রেশন ও খাদ্যবস্তু সুলভ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই অথচ অল্প বেতনের কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা বন্ধ করা যায় কি না সে বিষয়ে গুরুতর গবেষণা চলিতেছে।

মাগ্গী ভাতার ব্যবস্থা থাকায় শুধু ভাতে ভাত বা সামান্য তরকারি ভাত থাইয়া অনেক পরিবারের লোকেরা কোনও মতে দিন গুজরান করিতেছে কিন্তু আসলে তাহাদের মাহিনা বার, পনের বা ত্রিশ-চল্লিশের বেশী নহে; অতরাং মাগ্গী ভাতা বন্ধ হইলে যখন উপবাস করিবার ঘোল আনা সম্ভাবনা, তখন পূর্বোক্তেই দাবি উপস্থিত করা দরকার। আর সে দাবি স্বীকৃত না হইলে রেশনের দর যাহাতে অন্ততঃ তিন ভাগের এক ভাগ হয় সেজন্ত আন্দোলন চালান প্রয়োজন। ইহা

পাঁচ জনের নিম্নতম

ভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যও অল্প দামে জনসাধারণ যাহাতে পাইতে পারে, সে-ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। বিলাতে রেশন-ব্যবস্থা হইয়াছে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের জন্তই। শিশুদের জন্ত সে দেশে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের রেশন-ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধোত্তর কালে এবং খাদ্য-সঙ্কটের সময় আমরা যাহা রন্ধন করি তাহার সঙ্গে বিলাতের গৃহিণীদের রন্ধিত দ্রব্যের আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ জন বয়স্ক লোকের জন্ত তাঁহারা যে রেশন পান তাহা দেখাইতেছি : দুধ—সাড়ে বার পাইন্ট (এক পাইন্টে আড়াই পোয়া), চিনি—আড়াই পাউণ্ড বা পাঁচ পোয়া, মাখন দশ আউন্স বা পাঁচ ছটাক, মার্কার্বিন—কুড়ি আউন্স বা দশ ছটাক, চর্বি বা তেল—পাঁচ আউন্স, বা আড়াই ছটাক, বেকন—পনের আউন্স, জেলী প্রভৃতি—সওয়া এক পাউণ্ড, ফল-ত্রিশটি, ডিম—পাঁচটি। রুটি যত ইচ্ছা।

ওদেশে আয়ের অল্প আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। দরিদ্রতম বিলাতী পরিবারও এই রেশন কিনিতে পারে এবং পেট ভরিয়া থাইলেও সপ্তাহে পৌনে দুই পাউণ্ডের বেশী মাথাপিছু খরচ হয় না।

আমরা উপরোক্ত পুষ্টিকর খাদ্যগুলি কি দামে পাই আর পাইলেও ক্রয়ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও দেখা মন্দ নহে। কলিকাতার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মঞ্চবলে মোটামুটি এক প্রকার বাঁধা দর আছে, তাহা সর্বত্রই প্রায় নিম্নোক্তরূপ। মাংস—ছুই টাকা সের, মাছ—বাঁধা দর নাই, গড়ে ছুই টাকা সের। ডিম—ছপয়সা ছ-আনা একটি। দুধ—টাকায় ছ-সের। ফল—বাঁধা দর নাই। ঘৃত—৬ টাকা সের। মাখন—২৫৬০ পাউণ্ড। চিনি—(ইহা রেশনে পাওয়া যায়) ১১০ সের। ইহা ভিন্ন সরিষার তৈল ২ টাকা সের দরে ব্ল্যাক-মার্কেটে পাওয়া যায় শুনিয়াছি, চাউলও রেশনের ঘাটতি পুরাইবার জন্ত ছুই টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় শুনিয়াছি।

বিলাতী রেশনের ক্ষেত্রে যদি এদেশের পাঁচ জন পোষ্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের লোকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে কম পক্ষে ছুই শত টাকা মাসে খরচ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এতক্ষণ শুধু একটি পরিবারের ছুই বেলা ডাল-ভাত খাওয়ার খরচই দেখাইয়াছি। কিন্তু খাদ্য-সমস্যার অত্যন্ত দিক সম্বন্ধেও চিন্তা করা দরকার। অনেক পরিবারের উপার্কনক্ষম ব্যক্তিকে কার্য্যহলে একা মেসে থাকিতে হয়। তাঁহাদের কি রকম খরচ পড়ে ও নিজের খাওয়ার ও থাকার খরচ কুলাইয়া তাঁহাদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব কি না তাহাও বতাইয়া দেখা প্রয়োজন।

নিম্নে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চাকুরিয়াদের একটি মেসের খাদ্য-তালিকা ও খরচের হিসাব এবং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের একটি মেসের খাদ্যতালিকা ও খরচের হিসাব দিলাম।

পুরুষদের এই মেসের লোকসংখ্যা দশ জন, ইহাদের প্রত্যেকের বেতন ৫০/-+২৭/-। এই মেসে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন একবেলা মাছের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকেই শারীরিক পরিশ্রমকারী তালিকায় পড়ে একত্ব সপ্তাহে ৩০/- সের চাউল রেশন পায়।

খরচ :—চাউল—৫ মণ— ৬৭১০
সরিষার তৈল—৭১ সের— ৫১৬০
লবণ—১০ সের— ১৫৬০
কাঠ ও কয়লা—১৫ মণ—২৫/-
বাজার খরচ—২ দিন—৬০/-

১৫৫/-

প্রত্যেক মেসদ্বারকে ১৫৫/- দিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন চা ও জলখাবারও কিনিয়া খাইতে গড়ে ৯১৬০ প্রত্যেকের খরচ গিয়াছে। মোট খরচ ২৫/-। ইহার সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে সরিষার তৈল সম্বাদরে ৫০ করিয়া পাইয়াছে। চাউল নূতন ক্ষেলের পূর্বের কিছু উষ্ম ছিল, তা নহিলে নূতন

ক্ষেলে চারি সপ্তাহে সাড়ে তিন মণে ইহাদের পুরা খাওয়া হইত না। চাকুরির মাছিনা গবর্ণমেন্ট দেয়।

মেসেদের উপরি-উক্ত বোডিঙে খাদ্যব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ : সকালে চা ও একখানি করিয়া বিস্কুট, বেলা দশটায় ভাত ডাল মাছ ও তরকারি। বেলা একটায় ১০ মূল্যের খাবার অথবা চা। বৈকালে সাড়ে চারিটায় রুটি তরকারি ও চা অথবা মুড়ি মিষ্টি ও চা। রাত্রে ভাত ডাল ও তরকারি। মেসদ্বার ছয় জন সাবুল্যে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা খরচ পড়ে। প্রতিভেট ফণ্ডে জমা দিতে হয় বলিয়া প্রত্যেকে পুরা বেতনটা হাতে পান না।

পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া শারীরিক পরিশ্রমকারী এবং মস্তিষ্ক চালনাকারী যে খাদ্য গ্রহণ করেন তাহা শারীরিক পুষ্টিসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তাহা নিম্নস্থ আদর্শ খাদ্য তালিকা (ভারতীয়দের জন্ত) দেখিলে বুঝা যাইবে।

খাদ্যদ্রব্য	নিরামিষাণী	আমিষাণী	খাদ্যের দর
চাউল বা আটা	দশ ছটাক	দশ ছটাক—	১৫
ডাল	দেড় ছটাক	দেড় ছটাক—	১৫
সজী (কাঁচা ও মূলজাতীয়)	চারি ছটাক	চারি ছটাক—	৬০
তৈলজাতীয়	১ ছটাক	আট ছটাক—	১০—১৫
দুধ	১ পোয়া	১ পোয়া—	৬০
চিনি	এক ছটাক	এক ছটাক—	১০
মাংস মাছ ও ডিম	—	ছুই ছটাক—	০—১০
ফল	এক ছটাক	এক ছটাক—	১০

প্রত্যেকের দৈনিক খরচ—৫১০—৫১৫

উপরি-উক্ত আদর্শ খাদ্যতালিকা “Your Food” হইতে উদ্ধৃত।

নিরামিষাণীর শুধু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে দৈনিক ব্যয় ৫১০ হিসাবে মাসে খরচ হয় ২৩০/-। ইহাতে জ্বালানী বা মশলার হিসাব ধরা হয় নাই। যিনি আমিষভোজী তাঁহাকে দৈনিক ৫১৫ ব্যয় করিতে হয়, মাসে খরচ হয় ২৫৫১০। ইহাও জ্বালানী প্রভৃতি অন্যান্য খরচ বাদে। মেসে থাকিয়াই হউক অথবা নিজ গৃহে বাস করিয়াই হউক, বার, পনর, পঁচিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরিয়ার পক্ষে তিন-চারটি পোষ্যের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব কিনা, তাহা বুঝিতে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যাপ্তির আবশ্যক করে না।

এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে হয়ত বা মারোয়াড়ী ভাতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ছাড়ু-গুড় খাইয়াই আমাদিগকে কোনমতে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

দার্শনিক

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

সুলতা বসে থাকে জানালার ধারে। অদূরে রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে তার অফুরন্ত রূপরাশি ছড়িয়ে। ভেঙ্গে আসছে কলো-ছাস—বেলার বৃকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের শব্দ ছাৎছল্ ছাৎছল্। ওপারের বনভূমির মুখে ফুটে উঠেছে বেলাশেষের ক্ষীণ হাসি। কর্মমুখর পৃথিবী কিগিয়ে আসছে অবসাদে।

অনেক কথাই আজ তাবছে সুলতা বিকেল থেকে, বিশেষ করে তার স্বামী মোহনের কথা। কি অদ্ভুত মানুষ। সংসারের কোন খবরেরই ধার ধারে না সে। উদাসীন, নির্বিকার। সুলতার অনেক কথাই পৌঁছে না তার কানে। নিজের খাওয়া-পরা এমন কি চুল আঁচড়ানটি পর্যন্ত তাকে তাগিদ দিয়ে করাতে হয়। সুলতা এই নিয়ে কতদিন অভিযোগ করেছে তার কাছে, বারে বারে পেয়েছে একই উত্তর—‘ধরা বাঁধা জীবনের মতো অভিযাপ বোধ হয় আর কিছু নেই সুলতা।’

স্বামী-স্ত্রীর সংসার। আর কেউ নেই বালকভৃত্য গুণী ছাড়া। বছরখানেক হ’ল বিয়ে হয়েছে ওদের। বিয়ের পূর্বে সুলতার স্বপ্ন ছিল তার স্বস্তরবাড়ী হবে পাড়াগাঁয়ে। স্বামী হবে বিদ্বান কিন্তু চাকুরে নয়। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি কিছু থাকবে তার, তাতে করেই কোনরকমে দিনগুলো কাটিবে ওদের হাসিখেলার মধুর দাম্পত্য-প্রেমে। অতীত স্বপ্নের সঙ্গে বর্তমান বাস্তবকে মিলিয়ে দেখে সুলতা—যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে সে। উপরন্তু একটা বেশী আশীর্বাদ পেয়েছে বিধাতার কাছ থেকে—তার পিছনে সদাসর্বদা টিকটিক করে বেড়াবার মতো জটীলা-কুটীলার বালাই নেই। কিন্তু তবু সে যেন কিছুই পায় নি। মোহন হয়ত তাকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে ওই রূপনারায়ণকে, তার এশ্রয়কে আর ঘরের কোণে আলমশরী-ভরা এই বইগুলোকে। আর কাউকে কিনা কে জানে? যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বৃকে মাঝে মাঝে ক্ষণিক আলো জ্বলে যাওয়া বিহ্বলের মত সে আসে সুলতার কাছে। প্রশংসা করে তার গান শুনে—আদর করে করে রঙ্গ-পরিহাস। কিন্তু কতটুকু সে? সে চায় মোহনকে। সর্বদা কাছে পেতে; চায় এমন একটি ছবি, যা আঁখির স্রুক্ষে ভেসে বেড়ায় সারাক্ষণ; এমন একটি গান যা ধামে না কোন দিন—দিনরাত বেজে চলে একটানা সুরে। কিন্তু কোথায়? মোহন তার ব্যথা বোঝে না। সে যে একা, বড় একা। দীর্ঘখাস পড়ে সুলতার। মোহন নদীতীরে বটতলায় বসে এশ্রয় বাজাচ্ছে। হাওয়ায় ঢুলছে তার দীর্ঘ কেশ। বড় ভাল লাগল সুলতার। তার স্বামী সুন্দর, খুব সুন্দর। সে স্থির করল আর থাকবে না সে একা একা। পারবে না মোহন আর তাকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে। সেও যাবে, হ্যাঁ সেও যাবে।

তুমি এলে যে সুলতা। মোহনের চোখে বিষয় দৃষ্টি।

হ্যাঁ, কিন্তু কার উদ্দেশ্যে এমন করণ সুরে এশ্রয় বাজানো হচ্ছে শুনি?

তার আগে তুমিই বল তো, কেটেঠাকুর কদমতলায় কার জন্তে বাঁশী বাজাতেন।

শ্রীমতীর জন্তে।

এক্ষেত্রে শুধু শ্রীমতী নয়, একটা নামও জড়িত আছে তার সঙ্গে।

শুনতে পাই কি সে নামটা?

তার আগে বল তো সে বাঁশী শুনে দৌড়ে যেত কে।

শ্রীমতী আর গোপিনীরা।

এক্ষেত্রে যে এল, তারই উদ্দেশ্যে বাজানো হচ্ছিল অন্যায়সে ধরে নিতে পার।

মিথ্যে কথা।

খাটি সত্যি কথা।

সুলতা বসল মোহনের খুব কাছ ধেসে। মোহন ওর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিতে দিতে বলল—তুমি আর একা থাকতে পারলে না, নয় সুলতা? সুলতা নীরব। তন্ত্রীগুলোয় জেগে ওঠে অভিমানের কম্পন, উত্তর দেয় তার সুন্দর নিটোল গণ্ড বেরে গড়িয়ে-পড়া দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু—ঠিক যেন ক্ষতস্থানে সমাধি আঘাত লেগে রুধিরপাতের মত।

কি হ’ল তোমার সুলতা? মোহনের কণ্ঠস্বরে আবেগ। কিছুই হয় নি—ভারী গলা, উদাস দৃষ্টি সুলতার।

তবে, তোমার চোখে জল যে। লুকিয়ে না, সত্যি করে বল লক্ষ্মীটি।

তুমি আমায় এমন করে দূরে সরিয়ে রাখ কেন?

মোহন নীরব, গম্ভীর। চঞ্চল বাতাস বাড়িয়ে তুলেছে ঢেউয়ের মত্ততা। রূপনারায়ণের আনন্দ ধরে না, সুর চড়িয়ে গাইছে কল্কল্ ছল্ছল্।

মোহন বলল—‘তুমি জান না সুলতা, দূরত্বের মাধুর্য কত। ওই যে দেখছ ওপারের তরুলতা, ওই যে শ্রামল চর, কেন এত ভাল লাগে জান? ওরা দূরে আছে বলে। এপারের তরুলতার অভাব নেই, অভাব নেই চরের শ্রামলিমার; কিন্তু কই, অত ভাল লাগে না তো। আবার যদি ওপারে যাই, তখন এপারের এরাই চোখে ধরা দেবে কত সুন্দর হয়ে, আর ওঁরা হয়ে যাবে ম্লান, নিপ্প্রভ। পুরাতনকে নতুন করে পাওয়া যায় দূরে, আর নতুন কাছে এসে পুরাতন হয়ে যায় সুলতা।’ একটু ভেবে নিয়ে সুলতা বলে—

‘কিন্তু মন তো মানে না সে-কথা।’

‘মনের ওই না-মানাই তো মধুর স্মৃতি। তুফা না থাকলে জলের আবাদ পাওয়া যাবে কেন। অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য হ’ত কতটুকু? এপারের বন থেকে কপোতী চাইছে ওপারের বনের কপোতকে, আর ওপারের বন থেকে কপোত চাইছে এপারের বনের কপোতীকে; ভাবতেও ভাল লাগে। এর বেশী কি চাই? পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই যে বড় সে কথা তোমায় কি ক’রে বোঝাই ভেবে পাই নে স্মৃতি।’ শান্তির প্রলেপ নিয়ে নেমে আসে শান্তিময়ী সন্ধ্যা। ঘরে ঘরে শব্দ উঠরবে গায় তার আগমনী। স্মৃতি শব্দান্তে উঠে পড়ে—‘যাই, সন্ধ্যা দিতে হবে। তুমি আমার একটা কথা রাখবে?’

‘কি বল?’

‘সারাবেলা তো নদীর ধারে কাটাঁলে, এবার ঘরে চল। আমি সন্ধ্যা দেখিয়ে র’ধতে বসব, তুমি গল্প করবে, কেমন?’ বেশ,—মোহন আপন মনে আনন্ড করতে করতে চলল—

“লও তার মধুর সৌরভ
দেখ তার সৌন্দর্য বিকাশ
মধু তার ক’র তুমি পান
ভালবাসো, প্রেমে হও বলী
চেয়োনা তাহারে।

আকাজ্জার ধন নহে আত্ম মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, শুভ্র কোলাহল
নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে
চলো, ধীরে ঘরে ফিরে যাই।”

স্মৃতি পেরে ওঠে না মোহনের স্বরূপ নির্ণয় করতে। তার সম্বন্ধে কোন একটা পাকা ধারণা করা চলে না। মোহন সাধারণতঃ উদাস, গভীর প্রকৃতির। কিন্তু এক এক সময় সে এমন হাঙ্গা হয়ে পড়ে যে তাকে তখন নেহাত ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কি ছুঁইমিই না জানে আর কি হাসাতেই না পারে, বাপস্।

হুপরে মোহন বই পড়ছে শুয়ে শুয়ে। স্মৃতি ওর চুলে আঙুল দিতে দিতে বলল—‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব?’ বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ মুখ মোহন বলে—‘করো।’

‘আগে বই বন্ধ কর।’

‘আচ্ছা নাও’ মোহন পাতার মধ্যে আঙুল রেখে বই বন্ধ করে।

‘আমি বলছি, তুমি কি এত ভাবো দিনরাত। তোমায় দেখলে মনে হয় যেন কিসের একটা অভাব বোধ কর তুমি সারাক্ষণ। আমার কাছে লুকিয়ে না, বল তোমার সে অভাবটা কি।’

• ‘আমি নিজেই তা জানি না স্মৃতি। কিছুই অভাব নেই,

পেয়েছি জীবনের প্রশান্ত অবকাশ, বাধাহীন আলো, আকাশ-বাতাস, দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত ময়দান আর চতুর্দিকে সবুজের মেলা। পেয়েছি পাখীর গান, বাড়ীর সম্মুখেই রূপনারায়ণের কলতান আর পেয়েছি তোমার মত সহধর্মিণী। পেয়েছি সবই কিন্তু তবু, কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে। যেন কি পাই নি, তুমি ওইটে শোনাও না স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথের ওই ‘কী পাইনি’ গানটা।

স্মৃতি গায়। নীরব নিষ্পন্দ মোহন অনেকক্ষণ দেয়ালের পানে অপলকনে তাকিয়ে থেকে বলে—‘এই চাওয়ার এই বোজার শেষ নেই স্মৃতি। তুমি কোথায়? আমরা তো অল্প কিছু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারি না। আচ্ছা স্মৃতি, বলতে পার তুমি কাকে চাও?’ একটু নীরব থেকে মুহূর্তে স্মৃতি বলে—‘তুমি কি জানো না?’

‘না।’

‘বেশ, তা হলে জেনেও লাভ নেই।’

‘রাগ ক’রো না স্মৃতি, বলই না তুমি কাকে চাও।’

‘তোমাকে, শুধু তোমাকে।’

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে মোহন। স্মৃতি আঁৎকে ওঠে—‘তার মানে?’

‘আমি বলব তুল। তুমি চাও তোমাকে।’

‘আমি চাই আমাকে। আর তুমি?’

‘একই উত্তর, আমিও চাই আমাকে। শুধু তুমি আমি কেন স্মৃতি, পৃথিবীর সবাই চায় যে যার নিজেকে।’

‘না না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না তোমার কথা। আমি তো জানি, আমি সত্যিই তোমাকে চাই কিনা।’

‘তুমি ঠিকই জান স্মৃতি। শুধু একটু পার্থক্য আছে। আচ্ছা শোন—আয়নাতে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখে তুমি খুশি হলে, তোমার খুব ভাল লাগল। এখন বলত, ভাল লাগল কাকে—আয়নাকে না তোমার নিজেকে?’

‘আমার নিজেকে। কিন্তু মানুষ তো আর আয়না নয়, তবে মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন?’

‘তার মধ্যে নিজেরই আদর্শ দেখতে পায় ব’লে। তুমি ইচ্ছে করলেই পরীক্ষা ক’রে দেখতে পার যার কথার সঙ্গে তোমার কথার খাপ খায়, যার মনের সঙ্গে তোমার মন মেলে, তাকে তোমায় নিশ্চয় ভাল লাগবে।’ স্মৃতি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মোহনের মুখের পানে। মোহন ব’লে যায়—

‘আবার রহস্য এই যে, তুমি যাকে চাও, আমিও তাকে চাই আর পৃথিবীর সবাই ঠিক তাকেই চায়।’

‘বিশ্বের এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে, বছর মধ্যে আমি সেই একেরই সত্তা অনুভব করি স্মৃতি।’ মোহন ধামে।

‘তা হলে কি এসব মিথ্যা? শুধু স্বপ্ন?’—স্বলতার কণ্ঠে প্রকাশ পায় উত্তেজনা।

‘স্বপ্ন ছাড়া আর কি স্বলতা। জগতের সব মহাপুরুষই তা প্রত্যক্ষ ক’রে বলে গেছেন।’

‘কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটছে, যা দেখছি, অনুভব করছি প্রাণে, তাকে মিথ্যে বলে ভাবা যায় কেমন ক’রে?’

‘আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখনকার মতো সে ঘটনাগুলোকে কি সত্যি বলে মনে হয় না? এও ঠিক সেই রকম স্বলতা। তফাৎ শুধু সময়ের। সে-স্বপ্ন কয়েক ঘণ্টার আর এ-স্বপ্ন কয়েক বছরের। সে একটা রাজির, আর এ একটা জীবনের। কিন্তু থাক, আজ আর নয়। এখন এশ্রাজ্জটা দাও দিকিন বটতলায় যাই।’

‘আমিও যাব তোমার সঙ্গে’—স্বলতা বায়না ধরে।

‘বেশ এস।’

স্বলতা যায় ওর পিছু পিছু। বর্ষার রূপনারায়ণ ফেটে পড়ছে অব্যক্ত রূপে। ভরা বৌবনের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছে টলমল করতে করতে। দূরে বান ডাকার গর্জন। উন্মত্ত জলরাশি ছুৎকারে ভেঙে আসে সর্ব-গ্রাসী লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত ক’রে। স্বলতা, আঙুল বাড়িয়ে দেখায়—‘দেখ দেখ, কেমন বান ডেকে জোয়ার আসছে।’

‘দেখছি স্বলতা।’

‘কি ভাবছ।’

‘ভাবছি, কতক্ষণের জ্বাছে ওর ওই বিপুল সমারোহ। কত শীগগিরই না ওকে স্নান হয়ে যেতে হবে কালের ভাঁটায়। আশ্চর্য, স্বলতা আশ্চর্য।’

‘এর মধ্যে তুমি আশ্চর্যের কি পেলে শুনি? জোয়ারের পর ভাঁটা, দিনের পর রাত, অথের পর দুঃখ আছেই এ তো জানা কথা।’

‘ওই জানার মধ্যেই যে এক বিরাট অজানা লুকিয়ে থাকে স্বলতা। দেখ, আপেল মাটিতে পড়ে চিরকাল সকলে জেনে

এসেছে। কিন্তু ওই জানার মধ্যেই ত লুকিয়ে ছিল অদ্ভুত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা এক দিন ধরা দিল সত্যসন্ধানী নিউটনের প্রাণে। মানুষ চিরদিন মরে, চিরদিনই পৃথিবীতে আছে শোক, দুঃখ, হাহাকার। এই জানার মধ্যেই ত লুকিয়ে ছিল অমৃতময়ী সর্ববন্ধনবিমুক্তি, মহানির্বাণ, যা ধরা দিল কুমার সিদ্ধার্থের কঠোর সাধনায়। শুধু জানা নিয়েই যারা সন্তুষ্ট থাকে, অজানার আভাস তারা কোনদিনই পায় না স্বলতা।’

স্বলতা কি উত্তর দেবে? আপাততঃ ও-প্রসঙ্গের নির্বাণ লাভ করাই সমীচীন বোধ ক’রে বলল—‘তুমি সে দিনের সেই সুরটা বাজাও একবারটি, বড় ভাল লাগে আমার।’

যুহু হেসে মোহন বলল—‘সে সুর ত এখন বাজবে না স্বলতা। বিরহের সুর মিলনে বাজতে যাবে কোন্ দুঃখে?’

‘তবে তোমার যেটা ভাল লাগে বাজাও।’

* * *

রাত্রি অনেক। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছাওয়া। ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে যায় আসন্ন ঝড়ের বার্তা। মোহন নিঃশব্দে বসে থাকে বাইরের দাওয়ায়। নিদ্রাদেবীর অহুগ্রহ ওর ওপর বড় একটা নেই। স্বলতা বিছানায় বসে চুলতে থাকে মোহনের প্রতীক্ষায়। প্রদীপটার বুক পুড়ে যায়।

‘শুনছ? অনেক রাত হ’ল যে, ঘুমবে না?’—স্বলতা এসে দাঁড়ায় ওর পিছনে।

‘সবাই ঘুমোবে স্বলতা, তুমি আমি সবাই। তবু, যতক্ষণ জেগে থাকি যায়, তার পূর্ণ ব্যবহার ক’রে নেওয়াটাই কৃতিত্ব।’

‘সব তাতেই তোমার ওই হৈয়ালী।’

‘অতি সহজ সত্যই আমাদের কাছে হৈয়ালী ঠেকে স্বলতা।’

‘বেশ গো, তাই। পায়ে পড়ি তোমার, চল, আর রাত জেগো না অস্থখ করবে যে।’

‘আচ্ছা, চল।’ মোহন ওঠে।...



ভারতে সমাজতন্ত্র

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ

কমিউনিজম মতবাদ সোশালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদেই এক উগ্র সংস্করণ মাত্র। সোশালিষ্টরা চায় ধনের উৎপাদন, পরিবেশন ও বিনিময়ের যন্ত্র সরকারের হাতে আনিতে; আর কমিউনিষ্টরা চায় তত্বপরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করিতে। জার্মানীর কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩) উদ্ভাবিত এই কমিউনিষ্ট নীতির দার্শনিক ভিত্তি হইল জার্মান দার্শনিক হেগেলের ডায়ালেক্টিসিজম (দুই বিরুদ্ধ ভাবের উচ্চতর স্তরে সমন্বয়), এবং ইংরেজ অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর ধনতত্ত্ববাদ। ইহার স্থূল অর্থ এই যে, মালিকানা প্রথাই (thesis) আত্মস্বার্থে বহু কলকারখানা করিয়া বহু-শ্রমিক প্রথা সৃষ্টি করে (anti-thesis) এবং এই দুইয়ের স্বার্থসংঘাতে শেষে বিজয়ী-শক্তি হিসাবে শ্রমিক-ধনতন্ত্র (synthesis) প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস বলিয়াছেন “ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের” নীতি মানিয়া লওয়াই হইল সামাজিক আদর্শ। ইহার মর্ম এই যে, মজুররাই অর্থ সৃষ্টি করে; অর্থশালীরা উহা দিগকে অল্প বেতনে খাটাইয়া লভ্যাংশ (theory of surplus profit) নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কলকারখানা স্থাপন করিতেছে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মালিকেরা যেমন কাঁপিয়া উঠিতেছে মজুররা তেমন নিঃশব্দ হইতেছে। এমতাবস্থায় বিদ্রোহের জোরে মজুরদিগকে সরকারী কর্তৃত্ব হাত করিয়া কলকারখানাসমূহ আত্মকর্তৃত্বে সর্বসমীকরণের আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক ভাবে গণভোটাদিক্রমে আইন-সভা দখল করিয়া তৎসাহায্যে এই শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইলে তাহা তত আপত্তিকর হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে এই জোরজবরদস্তির নীতির জুইই কমিউনিষ্ট সজ্ঞ বে-আইনী বলিয়া বিবোধিত হইতেছে। জবরদস্তি জবরদস্তিই সৃষ্টি করে।

এই কমিউনিষ্ট মতবাদ মেক্সিকোতে আংশিকভাবে ও রুশদেশে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনে ও ফ্রান্সে সাময়িকভাবে বামপন্থী বা অগ্রগামী বিরুদ্ধবাদীদের মিলিত সরকার (popular front) গঠিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইয়াছে। মুসোলিনী-প্রচলিত ফ্যাসিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে দিত, কিন্তু উহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিত। ইহাতে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; ফ্যাসিষ্ট কর্তৃত্বাধীনে শ্রমিক-সজ্ঞ ও মালিক-সজ্ঞ যুক্তসঙ্গে গ্রথিত হইত। নাৎসী জার্মানীর ত্রাশনাল সোশালিজম অনর্জিত আয় রদ, যুদ্ধকালীন লাভ বাজেরাণ্ডি, সজ্ঞ ব্যবসায়সমূহ সরকারীকরণ ও পাইকারী লাভ দূর করার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত

ফ্যাসিষ্ট মতবাদই জার্মানীতে গৃহীত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও (কংগ্রেস নির্বাচনপ্রার্থীদের অল্পসংখ্যক ১১-১২-৪৫ তারিখের পত্রে) বলিয়াছে যে প্রধান শিল্পাদি, খনিজ সম্পদ, রেল জাহাজাদি যানবাহন, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, ইনসিওর্যান্স ইত্যাদি জনস্বার্থে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু সরকার ও প্রজাতন্ত্রাধিকারীর মধ্যবর্তী জমিদারী স্বত্ব ত্রায়া ক্ষতিপূরণ দিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিকদের বেকারত্ব দূর, সর্বনিম্ন বেতন ধার্য, অল্প জীবনযাত্রা প্রচলন ও মালিক-শ্রমিক বিরোধ মীমাংসার যন্ত্র স্থাপন ইত্যাদি সরকারী কর্তব্যরূপে গণ্য হইবে।

রুশেও ইহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্রথমে ১৯২২-২৭ সন পর্যন্ত তথায় “নেপ” নীতিতে দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত কারবারাদি চালাইতে দেওয়া হয়; তৎপরে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী কর্তৃত্বে কলকারখানা পরিচালিত হইতে থাকে। বর্তমানে কলকারখানা ও রেল প্রভৃতির ইত্যাদি প্লানিং কমিশনের নির্দেশমত সরকারী কর্তৃত্বে চালানো হয় কিন্তু কৃষি হয় যৌথ কৃষিপ্রণায় পরিচালিত। কৃষকেরা উপরোক্ত যৌথ কৃষিতে তাহাদের প্রাপ্যংশ ব্যতীত নিজেরাও দুই-এক একর জমি, দুই-একটি গরু এবং বাড়ী রাখিতে পারে। কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ এত চেষ্টায়ও সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যে ধনসাম্যের জন্ত এত হৈ-চৈ সেই ব্যবস্থাও দুঃস্বপ্নেই পরিণত হইতে যাঁতেছে। উপরোক্ত সব যৌথ কৃষিকার্যের ম্যানেজারদের বেতন সাধারণ শ্রমিকের প্রায় ৮০ গুণ অধিক। উচ্চতম ও নিম্নতম বেতনে ভারত-সরকার ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কোন সরকারেই এত পার্থক্য নাই। এই ম্যানেজারগণ এখন তাহাদের উদ্ভূত অর্থ ব্যক্তিগত আয়ের জন্ত দেশ-বিদেশে খাটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহার ফলে তথায় কমিউনিজমের মূলোচ্ছেদও হইতে পারে। রুশে এই কমিউনিজমের শেষ পরীক্ষা এখনও হয় নাই। রুশের শ্রেণীহীন সমাজ মার্ক্সীয় আদর্শমত সরকারহীন সমাজে রূপান্তরিত হইতেছে না, বরং দ্রুতর অতিলাভী কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি করিতেছে। ট্রুটস্কির আশঙ্কা মতই রুশে কমিউনিজম-বিরোধী আমলাতন্ত্র দেখা দিয়াছে। রুশ ইতি-মধ্যেই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতই সাম্রাজ্য বিস্তারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদ লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড ও পোল্যান্ডের একাংশ গ্রাসের পর এখন আবার মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, পার্শ্ব, তুরস্ক ও বলকান প্রদেশ গ্রাসে উত্তত। পরশোষণ দ্বারা আত্ম-ভোগ বৃদ্ধিই ইহার মূল প্রেরণা। তাই এই ভূ-সাম্রাজ্যবাদও

আর্থিক সাম্রাজ্যবাদই রুশীয় কমিউনিজমের কবরখানায় পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভাষা ও সংস্কৃতিগত জাতিত্ব উঠাইয়া দিয়া এক বিশ্বশ্রমিক জাতি গঠনের (যদিও তদ্বারা বহু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তাহাদের স্বার্থসংঘাত নিবারণিত হইতেছে না) মার্কসীয় আদর্শ ও বাস্তবতার রূপ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১২ সনে শ্রমিকদের দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল বলিয়াছিল যে, মালিকরা জাতিগত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে উহা সর্বদেশে শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটাইবে। কিন্তু ১৯১৪ সনে যুদ্ধারম্ভে সকল দেশের শ্রমিকই শেষে নিজ নিজ দেশের যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। মস্কোর ১৯২০ সনের তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বশ্রমিক-বিপ্লবের ট্রেসকি পরিপোষিত মূল কমিউনিষ্ট নীতি মিত্র-শক্তির চাপে রুশ প্রকাজেই পরিত্যাগ করিয়াছে। যদিও তলে তলে কমিউনিজম ছড়াইবার রুশীয় চেষ্টায় মনে হয় যে এই ঘোষণাও তাহার জাপ বিশ্বাসঘাতকতারই দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র, তবু কার্যতঃ ইহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই বিশ্বশ্রমিকবাদই বিশ্বমালিকবাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই কমিউনিষ্ট মতবাদ অগ্রত্ব ছড়াইবার বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সনে জার্মানী, ইটালি ও জাপান যে একট-কমিউনিষ্ট প্যাটি করে তাহার আদর্শেই বর্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করিতেছে। ইহার ফলে পারস্য, বলকান ও চীনে ব্যক্তিস্বাধীনতাই থাকিবে কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল ও রুশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই চাপে শেষ পর্যন্ত স্পেনের মত রুশেও রাষ্ট্র-রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে। ভায়লেক্টিসিজম বা ভাঙা-গড়ার নীতি বিশ্বের অনন্ত অবিশ্রান্ত নীতি (যেমন নীহারিকার গ্রহ-উপগ্রহে এবং গ্রহউপগ্রহের নীহারিকার পরিণতি) বলিয়াই মনে হয়। রাজনীতিতে শ্রমতন্ত্রেই উহার শেষ নয়, উহার পরবর্তী পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদে ও ব্যক্তিতন্ত্রে। রুশের উপরোক্ত অগ্রগতি কি তাহাই স্থচনা করিতেছে?

কমিউনিজমের মূল তথ্যটি (dialectic materialism) কেবল আর্থিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেগেল বলিয়াছিলেন যে মানসিক ধারণা (idea) বাস্তবতার (real) রূপ লাভ করে। কিন্তু মার্কস বলিয়াছেন যে বাস্তবতাই বিভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করে এবং আর্থিক পরিস্থিতিই ইতিহাস (ঘটনাক্রম) আইন ও ধর্মাদির বিভিন্ন স্বরূপ সৃষ্টি করে। এই ভোগলালসাবাদ নিম্ন মনোবৃত্তিকে কিয়দূর পরিচালিত করিলেও শেষে মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারপর মানুষ যন্ত্র নহে, নৈতিক জীব। বিবেক ও স্বাধীন কর্ম-প্রেরণা (conscience and free-will) তাহার বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী হওয়ায় কমিউনিজম কতকটা এই মূল মনুষ্যধর্ম-বিরোধী। এই

মূল মনুষ্যচরিত্র বদলানো অসম্ভব বলিয়া স্থায়ী কমিউনিজম অসম্ভব। ইহার শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি সমাজের সর্বস্বার্থেরও উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো বলিয়াছে “তথা-কথিত রাজশক্তি এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীকে অত্যাচারের সুগঠিত শক্তি।” কিন্তু শ্রমিক-মালিকের শ্রেণীস্বার্থের বাহিরে মনুষ্য-ত্বের আদর্শে রাষ্ট্রগঠনের নীতি কখনও আদর্শরূপে গৃহীত হয় নাই কি? পাণ্ডবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী ও নেতাজীর অমর বাহিনী কোন্ শ্রেণীস্বার্থে আত্মবলি দিতে গিয়াছিল? ইহাদের আদর্শ ছিল কি শ্রেণীস্বার্থ না সর্বস্বার্থ সমন্বয়? বিত্তহীনের বিত্ত, ক্ষুধিতের অন্ন থাকাই দরকার। ইহার প্রতিকার বিত্তহীনের বিত্ত আহরণে, বিত্তশালীর বিত্ত হরণে নহে। শিক্ষিতকে অশিক্ষিত করিয়া অশিক্ষিতের শিক্ষাসাম্য সাধিত হইবে কি? ইহা সামাজিক আদর্শ হইতে পারে না। সর্ব-সমীকরণ প্রচেষ্টায় ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-প্রচেষ্টা যেমন বন্ধ করা যায় না তেমনি তাহার অর্থ আহরণ প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় না। অপর সকলেরও লেজকাটার এই বুদ্ধি সর্বদা পরিহার্য। বাস্তবিক সর্বসমীকরণ নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব। আজ সকলকে এক অবস্থাপন্ন করিলেও বিভিন্ন মানব তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতার জন্ত কালই বিভিন্নরূপ উন্নতি সাধন করিবে।

মানব-সভ্যতা শারীরিক ও মানসিক শ্রমেরই ফল সত্য এবং কারখানাজাত সম্পদ সৃষ্টিতে বহুসংখ্যক লোকের শ্রমও অপরিহার্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ভূমি, মূলধন ও পরিচালন-প্রচেষ্টাও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই মূলধন ও পরিচালন-প্রচেষ্টার অভাবে ধনি চালু হয় না, কারখানা গড়িয়া উঠে না, এমন কি গঠিত কারখানাও অচল হয়। এই শ্রমশক্তি প্রায় তড়িতাদি নির্জীব শক্তিরই পর্যায়ভুক্ত। ইহাকে কাজে লাগানোর ভিতরেই সম্পদসৃষ্টির রহস্য। কাজেই মূলধন ও পরিচালন-শক্তিকে তার প্রাপ্যংশ দিতেই হইবে; শ্রমিকের সর্বগ্রাস অসম্ভব। এমনও দেখা গিয়াছে যে নিজ মালিক হইতে খীয় প্রাপ্যংশ বৃদ্ধিতে অতি উৎসাহী শ্রমিকই নিজ ভৃত্যের প্রাপ্যংশ হ্রাসে যত্নবান, এমন কি সে নিজেই শ্রমিকশোষক মালিকের স্থান অধিকারে উদ্যোগী। ইহা কি সমীকরণ না স্বার্থ? পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ভোগেচ্ছা (নিজে ও পুত্রাদির ভিতর দিয়া) মানুষের স্বভাবগত। তাই ধন আহরণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অজ্ঞিত ধনের উত্তরাধিকারিত্ব একেবারে রোধ করা অসম্ভব ও অসম্ভব।

মার্কস পুঁজিবাদে যত অনর্থ দর্শাইয়াছেন বর্তমানে তাহা নাই। বর্তমান প্রজাতন্ত্র সামাজিক চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকাংশের স্বার্থেই ইহা পরিচালিত। গণভোটের বাধায় মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থেই ইহা পরিচালিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রায় সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই

শ্রমিকের হিতার্থে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করিয়াছে। ভারতে ১৯০১ সনের ইন্ডিয়ান মাইনস্‌ এক্ট, ১৯১১ সনের ফ্যাক্টরী এক্ট, ১৯২৩ সনের ওয়ার্কমেনস্‌ কম্পেনসেশন এক্ট, ১৯২৯ সনের ট্রেড ডিসপুটস্‌ এক্ট ও ১৯৩৬ সনের পেমেন্ট অব ওয়েজ্‌স্‌ এক্ট (এই সকল এক্টেরই অল্প পর্যন্ত বহু সংস্কার হইয়াছে) দ্বারা ভারতের শ্রমস্বার্থ সংরক্ষিত ও সংবদ্ধিত হইয়াছে। রুশিয়ায় জারের স্বৈরাচারে লোকের যে কষ্ট হইয়াছে ইংলণ্ড-আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে (তথায় বেকারদিগকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই) তত হয় নাই এবং এই জুই কমিউনিজম শ্রমিক-প্রধান ইংলণ্ডে না হইয়া হইয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রধান রুশিয়ায়। রুশিয়ার বর্তমান কমিউনিষ্ট জারের স্বৈরাচারও অবশ্য ভূতপূর্ব রাজতন্ত্রী জারের স্বৈরাচারেরই জাতি। ট্রটস্কির উচ্ছেদ, “জি পি-ই উ” সন্ত্রাস ছাড়িয়া দিলেও ১৯৩৬-৩৭ সনের মস্কো পার্কে (বিরুদ্ধবাদী উচ্ছেদ) মত কাজ গণতন্ত্রে অসম্ভব। তারপর রুশিয়ায় কমিউনিষ্ট ব্যতীত কাহারও নির্বাচনে দাঁড়ানোই নিষিদ্ধ। অপর দলের (সংখ্যালঘু বা সংখ্যাধিক্য) কথা যেখানে প্রকাশিতও হইতে পারে না কত ভয়াবহ সে স্থান। সংগঠনের ফলে সংখ্যালঘুও অনেক সময় অসংবদ্ধ সংখ্যাধিক্যকে দাবাইয়া রাখিতে পারে। ইহা গণতন্ত্রও নহে, মনুষ্যত্ব বিকাশের অহু-কুলও নহে। ইহার সংস্কার না হইলে মনুষ্য-ধর্ম বিকাশের এই স্বৈরাচারী নিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে তত্ত্বাত্মক মনুষ্য-ধর্ম এক সময়ে বিদ্রোহ করিবেই। জবরদস্তিই যদি রাজ্যশাসনের নীতি হয় তবে রুশিয়ায়ও শ্রমিকরা না হইয়া সৈন্তেরাও রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিতে পারে।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (ধন আহরণে) অপরিহার্য হইলেও শ্রমস্বার্থে ও জনস্বার্থে উহার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ধন আহরণ তার বায়ুসেবনের মত অত্মনিরপেক্ষ হইলে ইহার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সমাজে ধন আহরণের সাধারণ বাজার সীমাবদ্ধ এবং শ্রম ও শিল্পাদির পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়সম্বৃত। এমতাবস্থায় বিশেষ যোগ্যতার ফলে অল্প কয়েকজন সমস্ত কৃষি-শিল্প অধিকার করিলে (দেশ-বিদেশের বাজার সীমাবদ্ধ বলিয়া) অপরের আত্মবর্ধনের সম্ভাবনা কোথায়? এতৎ সমাধানার্থে আমাদের প্রস্তাব এই যে, অর্থ আহরণের কোন ক্ষেত্রেই যেন ব্যক্তিবিশেষের একাধিকারে আসিতে দেওয়া না হয়।

বুহং শিল্পাদি মাত্র কোম্পানী প্রধায় পরিচালিত হইলে এবং ব্যক্তিবিশেষের এক বা একাধিক কোম্পানীর অধিক শেয়ার ক্রয় নিরুদ্ধ হইলে (যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে কতকটা হইয়াছে) এবং এই শিল্পাদির আয়ের ত্রায়াংশ (ষ্টকিও শিল্পাদি হইতে শ্রমিকাংশ কম হইবে) শ্রমিকের মধ্যে বণ্টনের আইন হইলে সর্বস্তরের ধন বণ্টন অনেকটা সংসাধিত হইতে পারে। কুটীর-শিল্প এই বুহং শিল্পের অন্তর্গতভাবে (কিন্তু

মহাত্মা গান্ধী-কথিত উপায়ে উহাকে বাদ দিয়া নহে)* পরিচালিত হইতে পারে। অধিক ভূসম্পত্তিও একহস্তে গুপ্ত না হওয়ার আইন হওয়া প্রয়োজন। তারপর জনস্বার্থে প্রয়োজন বোধে অধিক অর্থশালীদের সম্পত্তির উপর পাবলিক সার্ভিস ট্যাক্স (কার্যতঃ ইহা ওয়েল্থ টেক্স) ও বর্তমান অধিক আয়ের উপর একট্রা প্রকিট ট্যাক্স বসাইয়া জনহিত ও আংশিক ধনসাম্য সাধিত হইতে পারে। এই সব কৃষি শিল্পের উপর সাধারণ সরকারী মুরবিস্তান থাকিবেই এবং তৎসাহায্যেই জনস্বার্থে ইহার প্ল্যানিংও (কার্যতঃ ব্যক্তিগত প্ল্যানিং অথবা হইয়াছে যদিও উহা নিজস্বার্থে, জনস্বার্থে নহে) হইতে পারে। ইহাই হইবে আসল কৃষি-মজুর-প্রজা রাজ। ভারতীয় কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাব মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত ও জবাহরলালজীর সমাজতন্ত্রবাদের মিশ্রণ বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই মিশ্রণ আদর্শগত নহে, মনোগত। ব্যক্তিগত নীতি যদি থাকিলেই তবে উহার একাংশ সরকারী হাতে নেওয়ার অর্থ কি? উহা সমাজতান্ত্রিক, সর্বনাশে সমুৎপাদে অর্ধ ত্যজিত পণ্ডিতঃ—এই নীতি নয় কি? শাসন-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে যদি পোষ্ট আপিস ও রেল-ষ্ট্রিমারাদির মত কোন বিষয় সরকারী হাতে রাখা হয় তবে সে ভিন্ন কথা। কিন্তু কংগ্রেস-পরিকল্পনাটি তদাদর্শে পরিকল্পিত নহে। অনুরূপ দেশে সরকারকেই শিল্পাদিতে হাত দিতে হওয়ার নীতিও স্বাধীন ভারতে খাটিবে না।

কমিউনিজম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ধর্মেরও উচ্ছেদসাধন করিয়াছে। হেগেল বলিয়াছেন যে শেষ আদর্শ উন্নতিমূলক হইলে পাপাচারে দোষ নাই। মার্কস তত্পরি বলিয়াছেন যে, নৈতিকতা শ্রেষ্ঠ স্বার্থানুসারে পরিকল্পিত। কেবল ধর্ম পরস্পরসাথে অজ্ঞাতম বিঘ্ন বলিয়া নহে, পরস্পর রুশিয়ায় ধর্ম-যাজকেরা জারের সহায়ক ছিল বলিয়া তথায় কমিউনিষ্টদের মধ্যে ধর্মবিরুদ্ধতা দেখা দেয়। ভারতে ঐরূপ জনস্বার্থবিরোধী যাজক না থাকিলেও পরস্পরসাথে স্ববিধার জুই কি ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্তৃক ধর্মবিরুদ্ধতা অনুসৃত হইতেছে? এই ধর্মোচ্ছেদ বিশেষ করিয়া ভারতীয় শান্তি-সভ্যতার বিরোধী।

এই কমিউনিজমের মূল উৎস মজুর সমৃদ্ধি। কিন্তু ইংলণ্ডাদির মত অভিজাতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের মত বহু স্বল্পবিত্তশালী দেশে কমিউনিজম সম্ভব নহে। ভারতের ৩৯ কোটি লোকের মধ্যে ১৯৩৯ সনে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ১৭৫১১৩৭ শ্রমিক ছিল। ইহার বাহিরের শ্রমিকও সংখ্যা খুব বেশী নহে। এখানে সিঙিক্যালিষ্ট মতানুযায়ী শ্রমিক-সম্মত সংশ্লিষ্ট কারখানায়

* মহাত্মাজীর বুহং শিল্পের পরিবর্তে কুটীর-শিল্প ও পরিবেশিত গ্রাম-সম্মত নীতি রুশিয়ার ক্রোপটকিন (১৮৪২-১৯২১) হইতে গৃহীত, যেমন তাহার অহিংসা-নীতি রুশিয়ার টলষ্টয় (১৮২৮-১৯১০) হইতে পরিগৃহীত।

কর্তৃত্ব হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিত্ত-
শালীর ভারতীয় রাষ্ট্র উহা বরদাশ্ত করিবে কি? ভারতে ভূবিত্ত-
সাম্য যথেষ্ট বিদ্যমান, সম্পূর্ণ বিত্তহারার সংখ্যা সামান্য যদিও
ভারতীয়দের গড়ে বাৎসরিক আয় কিওলে সিরাজের মতোও ১০৭
টাকার (উহার কারণ অমবিয়ুখতা ও বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিল্পে

অভাব) বেশী নয়। ভারতে খাঁটি কমিউনিষ্ট ধাঁহারা আছেন
তাঁহারা এতদ্ব্যতীত ভারতে কমিউনিজমের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন
হইবেন কি? অবশ্য বোপলজ্ঞ কারণে কমিউনিষ্ট নামধারী
জনস্বল্প ও পাকিস্থান সম্বন্ধে ইহাতে নিরস্ত হইবে আশা করা
যায় না।

স্মৃতি

আশ্রাফ সিদ্দিকী

ধান ধই ধই মাঠের কিনার, ফুল টুপটুপ সরোবর—

মনে আছে সেই ময়নামতীর চর?

তার পাশে এক ছোট পাতার ঘর?

হিমসিম বায় সবুজ ধানের ঘি মউ মউ সুরভি—

রাখালী বাঁশীর মন-কেমনের পুরবী!

ছুটি মুখ কাঁপে স্বচ্ছ জলের পর—

মনে আছে সেই ফুল টুপটুপ সরোবর?

ঢেউ ছলছল পদ্মার পারে রোদ ধমধম ছুপুরে—

মনে পড়ে সেই ছুঁছুঁ কোকিল কুহরে?

আলোর নাচন কাপসা দূরের চরে?

ঝুপ ঝাপ ঝাপ পানসী মিলায় : স্বচ্ছ আকাশ-সরসী—

তুমিও তখন ঢেউ-ছলছল ঘোড়নী!

মালা গঁথেছিলে বনকুলুমের ধরে—

মনে পড়ে সেই ছুঁছুঁ কোকিল কুহরে?

রাত ধমধম নিরুন্ম ঘরগী, জল বম্বম বরিষণ,

মনে আছে সেই পাগলা হাওয়ার শিহরণ?

লক্ষ্মী নদীর নুপুর বনের বন?

রোদ ঝলঝল দিনের পেছনে বড় শমশম অজগর—

লুটালো কখন স্বপ্ন-জলের ঘর...

তবু তারা মোর রাজ্যে মনের বন।

মনে আছে সেই জল বম্বম বরিষণ?

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী তৃণা রায় এই বৎসর সঙ্গীতে সুরশ্রী উপাধি পরীক্ষায়
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি মূর্শিদাবাদ কাকুনতলা-
নিবাসী অমোহিনীমোহন রায়ের কন্যা এবং সঙ্গীতজ্ঞ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ছাত্রী। ওস্তাদ দবীর খাঁ
সাহেব, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর
রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) প্রমুখ বিশিষ্ট
সঙ্গীতজ্ঞগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা
শ্রীমতী তৃণার সেতার বাজনার, বিশেষতঃ, আলাপ অংশের
বিশেষ প্রশংসা করেন।



শ্রীতৃণা রায়

প্রেমধর্ম

শ্রীরবীন চৌধুরী, এম্-এ

মহাপ্রভু কর্তৃক যে ধর্ম প্রচারিত, তাহাই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে খ্যাত। এই ধর্মের মূলে প্রেম। সেইজন্য এই ধর্মকে প্রেমধর্ম আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও ভক্তিবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল—গীতার এবং পুরাণ-গুলিতে ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবন এবং অসামান্য প্রতিভার ফলেই এদেশে ভক্তধর্মের এত ব্যাপক প্রচার। ভক্তি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পরিপক্বতা লাভ করিয়া তবৈ প্রেমে পরিণত হয়। ভক্তিকে প্রেমে পরিণত হইতে হইলে যে সোপানাবলী অতিক্রম করিতে হয়, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে মহাপ্রভু স্বয়ং জ্ঞান ও কর্মকে ভক্তির অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই। “জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ” ১।

“Rupa Gosvamin himself establishes later on that karman itself is not an anga or means of Bhakti, nor is Jnana or Vairagya.” ২

অবশ্য এখানে কর্ম বলিতে শাস্ত্রবিহিত দান, ব্রত, যজ্ঞাদি কর্ম বুঝিতে হইবে। সেই সমস্ত কর্মকেই বুঝিতে হইবে যাহা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নহে এবং জ্ঞান বলিতে অদ্বৈতমার্গের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“পুরুষ স পুরঃ পার্থ, ভক্ত্যা লভ্য স্তনুজয়া”—সেই পরমপুরুষকে অন্তঃপ্রাপ্তির দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু ভক্তি কি? ভক্তি কাহাকে বলে?

শ্রীরাপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ গ্রন্থের পূর্ববিভাগে ভক্তি-ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে অল্প সকল প্রকার বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া ও একান্ত কৃষ্ণকনিষ্ঠ হইয়া সকল ইঞ্জির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাকে ভক্তি বলে। ৩ অবশ্য এখন উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

“কৃষ্ণভক্তি-স্বয়ং-মূল হয় সাধু সঙ্গ” ৪। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ অটল বিশ্বাস হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং শ্রদ্ধার পরিপাকে জন্মে ভক্তি। ভক্তির উদয় সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে ‘আদৌ শ্রদ্ধা’।

ভক্তি ভক্তভেদে ত্রিবিধ—উত্তমা বা শ্রদ্ধা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা।

“শাস্ত্র-যুক্তো অনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।

উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।

শাস্ত্র-যুক্ত নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।

মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম” ৫

১। চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

২। Susil Kumar De—Vaisnava Faith and Movement, page 127.

৩। “সর্বোপাধি বিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিক্র্যাতে।”

(ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ—পূর্ববিভাগ, প্রথম লহরী)

৪। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ।

৫। এ

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত সিকান্তগুলিতে সুপণ্ডিত এবং শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস যাহার দৃঢ় তিনিই উত্তম অধিকারী। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

“অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।

আনুকূল্যে সর্বোজ্ঞিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।”

এখানে আনুকূল্যে অর্থে বুদ্ধিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন এই-রূপ ভাবে। উত্তমা ভক্তির অধিকারী ত্রিগুণ উদ্ধারে সমর্থ। মধ্যমা ভক্তির অধিকারীর শাস্ত্রে তেমন নিপুণ না হইলেও চলিবে, কিন্তু ইহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া চাই। আর যাহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা তেমন দৃঢ় নহে, তিনিই কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্তও ক্রমে ক্রমে উত্তম ভক্তে পরিণত হইতে পারেন। কৃষ্ণভক্তে কৃপালুতা, অকৃতজ্ঞোহতা৬, সমতা৭, নির্দোষতা, বদাম্বতা ইত্যাদি গুণগুলি বর্তমান। কৃষ্ণভক্তকে বৈষ্ণব-আচার পালন করিতে হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত (কৃষ্ণের অভক্ত) প্রভৃতি অসংসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম, গৃহ, স্ত্রী পুত্রগণ, বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেক্ষরণ হইতে হয়। গীতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, “সর্ব-ধর্মান পবিত্র্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম”।

উত্তমা ভক্তি তিন প্রকারের—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি, এবং প্রেম-ভক্তি।

সাধন-ভক্তি দুই প্রকারের—বৈধী সাধন-ভক্তি এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তি। শাস্ত্রবাক্যের অনুরোধে যে শ্রীকৃষ্ণভজন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগ অর্থাৎ প্রগাঢ় ভালবাসাজনিত প্রবল আকর্ষণ নাই, তাহাই বৈধী-ভক্তি। এক্ষেত্রে ভজন অনেকখানি নরকাদির ভীতিতে—প্রাণের সে একান্তিক টান এখানে নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে।

“রাগহীন জনে ভজ্ঞে শাস্ত্রের আজ্ঞার।

বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব শাস্ত্রে গায়” ৮

শ্রীরাপ গোস্বামী গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা ইত্যাদি চৌষটি প্রকারের ভজনকে বৈধী-সাধন-ভক্তি লাভের অঙ্গ বা উপায় বলিয়াছেন। এই চৌষটি ভজনাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঁচটিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি যথাক্রমে সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রীমূর্তির সঙ্গ দেখা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভাগবতেও নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠানকে স্বীকার করা হইয়াছে। ৯ এই চৌষটি প্রকারের ভজনাদের মধ্যে একাদ ভজনের দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ করা যায়। পরীক্ষিত-শ্রবণ, শুকদেব কীর্তন, অর্জুন সখা—এমনি ভাবে একাদ ভজনের দ্বারা ইহারা প্রত্যেকে ফললাভ করিয়াছিলেন। অনেকাঙ্গ সাধনা

৬। অকৃতজ্ঞোহতার অর্থ কাহারও অনিষ্ট না করা।

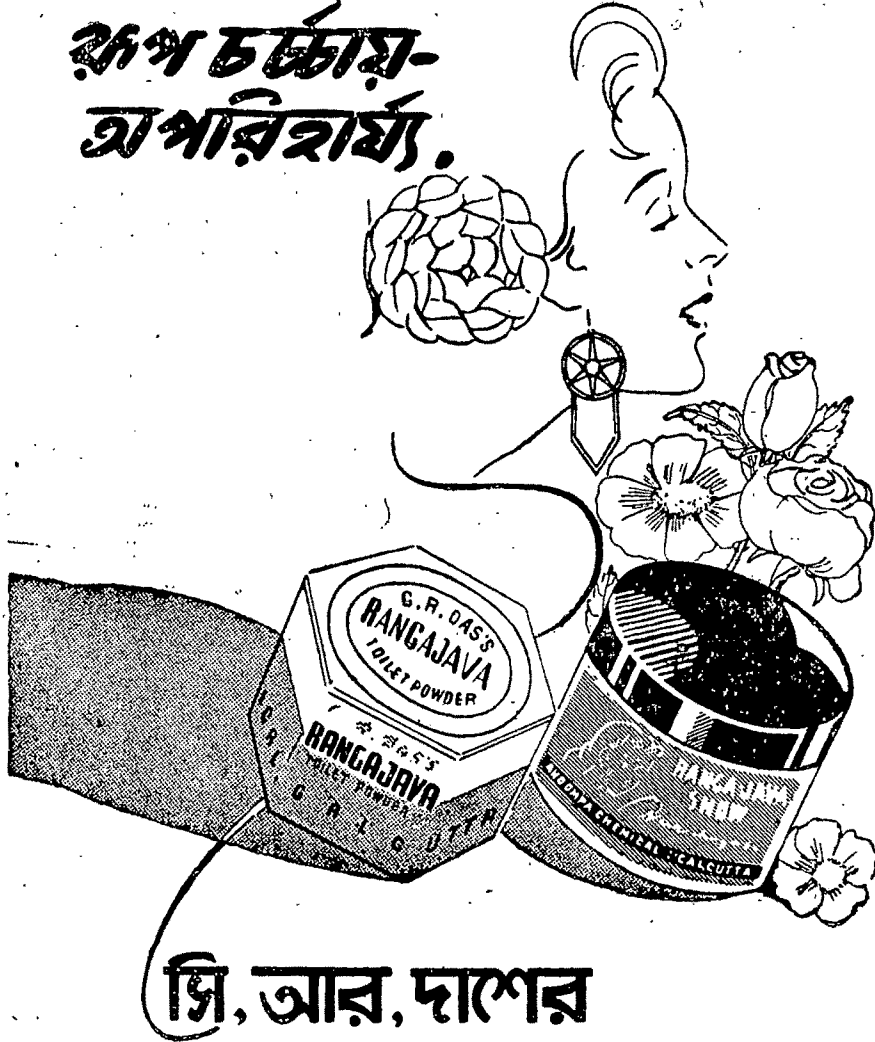
৭। সমতা অর্থে সর্বত্র সমদৃষ্টি এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার।

৮। মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ।

৯। “শ্রবণ কীর্তনং বিখ্যোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্রং সখ্যমাঙ্গনিবেদনম্।”

রূপ চর্চায়-
অপরিহার্য.



সি, আর, দাশের
রাঙ্গাজবা স্নো ও
পাউডার

বিশুদ্ধ ও স্ননির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ।
নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক মসৃণ ও কোমল হয় এবং ত্রণ
প্রভৃতি চর্মরোগ নিরাময় করে। গন্ধ স্নহ, মধুর ও
দীর্ঘস্থায়ী। সর্বত্র পাওয়া যায়।

অনুম্পা কেমিক্যাল কলিকাতা

দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ হয়। অম্বরীষ প্রমুখ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কি একান্ত সাধন, কি অনেকাঙ্গ সাধন—উভয় প্রকারের ভক্ত্যনুষ্ঠানেই নির্ভী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

“রাগাঙ্গিকা ভক্তি মুখ্য। ব্রজবাসিন্ধবে” ১০—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি প্রধানতঃ ব্রজবাসিন্ধবের মধ্যে বিদ্যমান। রাগের স্বরূপ হইতেছে ‘ট্টে গাঢ়ত্ব’ এবং ট্টার ফলে ‘ট্টে আবিষ্টতা’।

“Raga is defined as the natural, deep and inseparable absorption in the desired object, namely, Krishna.” ১১

ব্রজবাসিন্ধবের এই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাঙ্গিকা ভক্তি। এই রাগাঙ্গিকা ভক্তির প্রতি যদি কোন ভাগ্যবানের লোভ জন্মে, তবে তিনি ইহা পাইবার জন্ম নিজ অভিলাষানুযায়ী ভাবযুক্ত কোনও ব্রজবাসীর অমুগত হইয়া তাঁহার ভাবটি গ্রহণ করেন। তিনি দাস্যভাবের নিমিত্ত উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণ-দাসগণের, সখ্যভাবের নিমিত্ত শ্রীদামাদি সখাগণের, বাৎসল্যভাবের নিমিত্ত নন্দাদি গুরু-জনগণের এবং মধুরভাবের নিমিত্ত ললিতাদি সখীগণের অমুগত হন। এই ভাগ্যবান সাধক নিজ ভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ অভীষ্টমত কৃষ্ণপরিচয়কে অরণ্যপূর্বক তাঁহাদের লীলাকথায় অমুগত হইয়া সর্বদাই ব্রজে বাস করেন (কুণ্ডাৎ

বাসং ব্রজে সন।)। শরীরে ব্রজবাসে অসমর্থ হইলে অগত্যা মনের দ্বারাও ব্রজবাসী হন। ১২

এ সম্বন্ধে উক্ত স্বশীলকুমার দে বলেন,

“One desirous of this way of realisation will adopt the particular Bhava (e.g., Radha-bhava, Sakti-bhava, etc.) of the particular favourite of Krishna according to his or her Lila, Vesa and Svabhava, and live in the ecstasy of that vicarious enjoyment.” ১৩

এই ভাগ্যবান ব্যক্তির ভক্তিই রাগাঙ্গিকা ভক্তি।

অরণ্যই রাগাঙ্গিকমার্গের সাধনের মুখ্য অঙ্গ। তবে সাধনের প্রথমাবস্থায় অরণ্যে তেমন অধিকার জন্মে না বলিয়া শ্রবণ, কীর্তনাদি ভজনাদিগুণিকে আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু ভক্তনের পরিপক্ব অবস্থায় অরণ্যই কর্তব্য।

“The devotee by his ardent meditation not only seeks to visualise and make the whole Vrindayana-Lila of Krishna live before him, but he enters into it imaginatively, and by playing the part of a beloved of Krishna, he experiences vicariously the passionate feelings which are so vividly pictured in the literature.” ১৪

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠাবাসী রূপমঞ্জরীর ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রূপমঞ্জরীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, মহাপ্রভু ও তাঁহার অমুগত গোষ্ঠামিগণের ভজন-প্রণালী রাগমার্গীয়।

১৩। Vaisnava Faith and Movement, page 131.

১৪।

ঐ

১০। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

১১। S. K. De—Vaisnava Faith and Movement, page 130.

১২। শ্রীজীব গোষ্ঠাবাসী বলিয়াছেন—“সামর্থ্যে সতি ব্রজে... শরীরেণ বাসং কুণ্ডাৎ। তদভাবে মনসাপীতি।”

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্বদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫০০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বদ ও তহুপরি ঐ টাকা শেষারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহণপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

রাগামুগা ভক্তি দুই প্রকারের—কাম্যামুগা এবং সখ্যামুগা।

ভক্তিরসামৃত সিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠাস্বামী সাধন-ভক্তিকে 'কৃতি-সাধ্যা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাধ্যা বলিয়াছেন। উত্তমা ভক্তিই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে শ্রবণ, কীর্তনাদির দ্বারা সাধন-ভক্তিতে পরিণত হয়। পুনরায় সাধন-ভক্তির উভয় শ্রেণীই বাহ্য উপায় দ্বারা লভ্য—যেহেতু ভজন, কীর্তন দ্বারা বৈধীভক্তি লাভ হয় এবং শ্রবণের সাহায্যে রাগামুগা ভক্তি অর্জন করা যায়। রাগামুগা ভক্তি সাক্ষাৎভাবে শাস্ত্রবোধ হইতে অর্জিত না হইলেও, রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি লোভ হইতে ইহার জন্ম এবং শ্রবণ ও অভীষ্ট ব্রজপরিকরের অনুসরণ দ্বারা ইহার পুষ্টি—সুতরাং ইহা ভক্ত-হৃদয়ের স্বতোৎসারণ নহে। সুতরাং ভক্ত-হৃদয়ের স্বতোৎসারিত যে ভক্তি, যাহাকে ভাব-ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার সহিত রাগামুগার পার্থক্য স্পষ্ট।

বৈধী-ভক্তিতে শাস্ত্রানুযায়ী ভজন-পূজনই যথেষ্ট, ১৫ কিন্তু রাগামুগায় প্রয়োজন হইলে শাস্ত্রও লঙ্ঘিত হইতে পারে। রাগামুগা ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বতোৎসারণ না হইলেও, ইহাতে সাধক-হৃদয়ের ঐকান্তিক টানের পরিচয় আছে এবং এই মার্গের ভক্তিতে কল্পনা ও হৃদয়াবেগের স্থানও বর্তমান। কারণ রাগামুগা-মার্গের সাধক কল্পনার দ্বারাই অভীষ্ট পরিকরের সহিত পরিণয়ে অভিন্ন হইয়া যান এবং এইভাবে বৃন্দাঙ্গন-লীলা উপভোগ করেন।

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধির পূর্ববিভাগেও তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। ভাবভক্তির অষ্ট নাম রত্ন। এই ভাব

১৫। এখানে শাস্ত্রানুযায়ী বলিতে অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও অষ্টাঙ্গ বৈষ্ণব শাস্ত্র বুঝিতে হইবে।

বা রত্ন সাধন-ভক্তির পরিপক অবস্থা। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তগণের কৃপাদ্বারাও ১৬ এই ভাব-ভক্তি লাভ করা যায়—যদিও তাহা দুর্লভ। সুতরাং ইহাকে তিন শ্রেণীর বলা চলে—

(১) সাধনাভিনিবেশ—ইহা আবার বৈধী ও রাগামুগা ভেদে দ্বিবিধ। (২) কৃষ্ণপ্রসাদজ। (৩) কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ।

ভাবভক্তি সাধক-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্বতোৎসারণ। হৃদয়াবেগ বা emotion হইতে ইহার জন্ম। কিন্তু ইহা প্রেম নহে, প্রেমের অন্তর মাত্র।

"It may be born of Sadhana-bhakti, but it is not the direct result of extraneous ways and means, and arises spontaneously as a personal feeling, although this feeling has not yet ripened into Prema-bhakti." ১৭

এই ভাবভক্তির উদয়ে ভক্তের মনে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরতি। মানশূন্যতা, আশাবদ্ধ, সমুৎকর্ষা, নামগানে সদাকৃতি, শ্রীকৃষ্ণগুণ-কথনে আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থলে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান-সমূহে প্রীতি প্রভৃতি নয়টি অনুভাবের জন্ম হয়।

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধির পূর্ববিভাগের চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তি আলোচিত হইয়াছে। ইহা বৈধী ভাবভক্তি এবং রাগামুগা ভাব-ভক্তির পরিণত অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেও প্রেমভক্তি লাভ করা যায়। পুনরায়

"The grace may be either pure, that is, not dependent on any other circumstance (Kevala), or the result

১৬। 'কৃষ্ণ কৃপয়া তদভক্ত কৃপয়া বা'—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, পূর্ববিভাগ, ভাবভক্তি-লহরী।

১৭। S. K. De—Vaisnava Faith and Movement, page 133.

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার "শ্রী" মার্কী স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে 'শ্রী' স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীমুভাষ চন্দ্র বসু

of the knowledge of his greatness (Mahatmya-Jnana), the former being Raganuga and the latter following the Vaidhi Marga." ১৮

কীৰ্ত্তন গৌণীমী প্রেমভক্তির সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন—

“সম্যক্স্থপিত-বাস্তা মমত্বাতিশয়াক্তিতঃ ।

ভাবঃ স এব সজ্জাতা বৃধেঃ প্রেমা নিগচ্ছতে ॥”

চিত্ত মন্থনকারী, অতিশয় মমতাসম্পন্ন যে ভাব বা রতি বা প্রেমাত্মক, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া বৃধগণের দ্বারা প্রেম নামে অভিহিত হয় ।

প্রেমভক্তির জন্মকথা এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়— প্রথমে জন্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ ক্রীকৃষ্ণে অটল বিশ্বাস । অটল বিশ্বাস হইতে সাধু-সঙ্গে ইচ্ছা । সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া । শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির ভজনানুসমূহের যাজ্ঞন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় । যাহা ভক্তির ব্যাঘাত করে, তাহাই অনর্থ—কৃষ্ণ বিনা অস্ত্র আসক্তি মাত্রই অনর্থ বলিয়া । অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভজনে নিষ্ঠা বা আগ্রহ জন্মে এবং এই আগ্রহ হইতে শ্রবণাদিতে রুচি হয় । রুচি হইতে ভজনাদিতে প্রচুর আসক্তি লাভ হয়, অর্থাৎ ভজনাদি না করিয়া থাকা যায় না । আসক্তি হইতে ভাব বা রতির জন্ম এবং রতি গাঢ় হইলে প্রেম আখ্যা লাভ করে ।

১৮ । ঐ ” ১৩৪ পৃষ্ঠা ।

“প্রেম বুদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অহুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥” ১৯

প্রেম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে মহাভাবে পরিণত হয় । মহাভাব একমাত্র ব্রজগোপীগণের মধ্যেই বিদ্যমান । শাস্ত্র-রীতিতে শুধু প্রেম পর্য্যন্ত হয়, দাস্ত্রো রাগ পর্য্যন্ত হইতে পারে । সখ্য-রীতিতে অহুরাগ পর্য্যন্ত লাভ হয় এবং বাৎসল্যে অহুরাগের শেষ-সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু মধুর রীতিতেই একমাত্র মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে । মধুর রীতিই এইজন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অবশ্য এখানে মধুর রতি বলিতে ব্রজগোপীগণের মধুর রতি বৃত্তিতে হইবে) ।

মধুর রসের ভক্তগণের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণের তুলনা নাই । দ্বারকার ও মধুরার মহিবীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের রতি ‘ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা’—ব্রজগোপীগণের রতি ‘কেবলা’ অর্থাৎ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী ১২০ । এইজন্ত ব্রজগোপীদের মধুর রতি তুলনাহীন এবং একমাত্র ইহাতেই মহাভাবের উদয় সম্ভব । দ্বারকাদি ধামের মহিবীগণের মধুর রসে মহাভাবের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ হয়, তাহার অধিক নহে ; একথা বিস্তৃত হইলে চলিবে না ।

১৯ । চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ ।

২০ । “গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ।

পূরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥”

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯ পরিচ্ছেদ ।

পানে পরম ভক্তি

ম্লোভিউ

দার্ড্জিলিং চা

• ম্লোভিউবিউচাম •

কমলালয় ষ্টোর্স লি:

শুভ
বিবাহের
জন্ম
সর্বপ্রকার
প্রয়োজনীয়
সামগ্রী
আমাদের
ষ্টোর্সে
পাইবেন ।

কমলালয় ষ্টোর্স
লিমিটেড,
ধর্মতলা, কলিকাতা ।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিশুষ্ণ পণ্ডিত শ্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষাবর্ষ সামুজিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিবিধাচার্য্য অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুগান্তকালীন মহামায়া ভারতসম্রাট এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিবর্তিত গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে,

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামায়া ভারতসম্রাট মহোদয়কে এবং ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাহার বধিক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠি দ্বারা উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইহার নিতুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আর একটি জাম্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার তাত্ত্বিক, ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বৈরাগ্যভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তুরিতুরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষবিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ বোম্বার প্রথম দিবসেই ৪ বটা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং যিনি আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত-মহাসম্মেলনের সভায় একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্ররোণে ডাক্তার

কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য বাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদুস্তের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ. হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—যুদ্ধ ও বিস্মিত।” হার্স হাইনেস্ মাননীয়া যম্মাতা মহারাজী জিপুরা স্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যি তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্ত্রীর মম্বনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্ত্রীর মম্বনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষে বর্ষে মিলাইয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কৃত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এন্, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য মণীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচর্চা মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বর মাননীয় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্সি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্ত্রীর সি. মাধবম্ নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যি তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীয় মিঃ কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষে বর্ষে মিলাইয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অভ্যাসচর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদান কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, বংশ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭১০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সখর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯১০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কবচ। বর্ণনামুখ্য কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিহ মানবকে সন্তুষ্ট রাখিবার কমে দ্রুতলাভে ব্রহ্মার। মূল্য ২০০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০। (এই কবচে ভাওয়াল সম্রাটী জয়লাভ করিয়াছেন)। বঙ্গীকরণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও সর্কার সাধনযোগ্য হয়। (শিববাচ্য) মূল্য ১১০, শক্তিশালী ও সখর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিকেল এণ্ড এন্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
সাক্ষাৎদের সময়—প্রাতে ৮।৩০টা হইতে ১১।৩০টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বিকাল ৫।৩০টা হইতে ৭।৩০। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

পুস্তক - পারিচয়

ধর্ম ও সমাজ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ। প্রাপ্তি-স্থান, ৩, শত্ৰুনাশপণ্ডিত স্ট্রিট, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্ত্যাত্ম বাংলা পুস্তকালয়। মূল্য ২৫০ আনা।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় এবং অন্ত্যাত্ম বিষয় আলোচিত হইয়াছে: বেদ কি? হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব কি? জাতিভেদ ও তাহার ফল, বলশেভিকবাদ ও হিন্দুধর্ম, বেদে বাল্যবিবাহ, বিবাহ সমস্তা, খ্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি।

ড.

আনন্দ মঠ, কপালকুণ্ডলা—সংক্ষেপিত বঙ্কিমগ্রন্থমালা। সম্পাদক—শ্রীবিজয়বিহারী ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৭নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখনি ১ টাকা। হ্রদর প্রচ্ছদপট।

সংক্ষেপিত বঙ্কিমগ্রন্থমালা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় এক জায়গায় বলিয়াছেন, দেশে শিক্ষার প্রসার যে পরিমাণে বাড়িতেছে বঙ্কিমের পাঠক সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়িতেছে না বরং কমিতেছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি জানাইয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্য-পাঠের অনুরূপ আবেষ্টনের অভাব হওয়াতেই বর্তমান দূরবহুর উদ্ভব। পিতামাতা অভিভাবক শিক্ষক ইহাদের কাহারও সময় নাই। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। তাহা ছাড়া গ্রন্থের আয়তনও গ্রন্থারস্তের একটা প্রবল

অস্তরায়। ইংরেজি অনেক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে, বাঙ্গালায় সেরূপ বেশী হয় নাই। বাহা হইয়াছে তাহারও অধিকাংশ মূল্যের সহিত সম্পর্ক রহিত।

এই অভাব দূরকরণার্থে সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন। সম্পাদকের ভাষায়, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মূল অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট। মূল্যের রস বজায় রাখিয়া যতটা কমানো যায়, কমানো হইয়াছে, গ্রন্থকারের ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত সম্পাদকীয় সংযোজন অংশ ছোট অক্ষরে যতদূরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

সংক্ষেপিত আনন্দমঠ ও কপালকুণ্ডলা পড়িয়া সম্পাদনার নিষ্ঠা ও কৃতিত্বকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বৃহত্তর মূলগ্রন্থের রস হৃষ্ট ভাবেই পরিবেশিত হইয়াছে এবং এই ধরণের গ্রন্থ পাঠে গ্রন্থকারের প্রতিভা ও সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাঠকমনে মূলগ্রন্থ আশ্বাদনের আগ্রহ সঞ্চার করিবে। স্বল্পকালের মধ্যে সংক্ষেপিত আনন্দমঠ ও কপালকুণ্ডলার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিতে পারি।

মাটি আর পাথর—প্রবোধকুমার সাহা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৫০ আনা।

এই সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলি গল্প আছে। লেখকের সাহিত্য-সাধনার প্রথম অধ্যায় হইতে পূর্ণতার বিকাশের ধারা এই গল্পগুলিতে

নূ ত ন

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সামাজিক নাটক

পতিব্রতা ১৥০

বাংলার মেয়ে ১৥০

পরিণীতা ১৥০

মাকড়সার জাল ১৥০

পথের সাথী

নাটক

শ্রী ও বিভিন্ন দিনেমাতে চলিতেছে
দাম দেড় টাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের
সামাজিক নাটক

আগামী কাল ১৥০

সং স্ক র ণ

ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সামাজিক নাটক

বাহালা ১৥০

পৌরাণিক নাটক

ক্ষত্রবীর ১৥০

শিবপ্রসাদ করের -
পৌরাণিক নাটক

অর্ণলক্ষা ১৫০

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের
পৌরাণিক নাটক

অভিষেক ১৥০

আশুতোষ সাহাচার্য্যের
সামাজিক নাটক

বন্ধিনী ১৥০

চরণদাস ঘোষের
অভিনব উপন্যাস

তেপান্তর

দুই টাকা

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
বহু প্রকাশিত গ্রন্থ

তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

সাড়ে তিন টাকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

সত্ত প্রকাশিত নূতন সংস্করণ

শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ

বেণু ও বীণা

তিন টাকা

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
অভিনব সংস্করণ

কুহ ও কেকা

সাড়ে তিন টাকা

অল্পআবীর ৩৥০

বেলাশেষের গান ২৥০

বিদায় আরতি ২৥০

তীর্থসলিল ১৥০

তুলির লিখন ১৥০

মোহিতলাল মজুমদারের

শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ

হেমন্ত-গোধূলি

আড়াই টাকা

আর, এইচ. ক্রীমানী এণ্ড সন্স—২০৪নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

পাওয়া যায়। গল্প হিসাবে প্রত্যেকটি স্থলিখিত এবং কয়েকটি গল্পে বিচিত্র ধরণের টাইপ স্ট্রিটে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থলিখিত গল্পগুলির মধ্যে একটি সিনেমার গল্প (বহু) নিতান্তই অনবিকার প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণত সিনেমা-গল্পের মধ্যে গতিটা প্রধান বলিয়া অবাস্তব অসম্ভব কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে রসস্থিতি অবহেলিত হয়। এই ধরণের সাহিত্য-মূল্যহীন গল্প এই সংগ্রহে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

রাণা প্রতাপ সিংহ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র, এম-এ।

আন্তোয় লাইব্রেরী, ৭নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা।

রাজপুতকুলগৌরব রাণা প্রতাপ সিংহের অসীম শৌর্যমহিমা-মণ্ডিত চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাস পাঠক মনেই পরিচিত। স্বাধীনতার বেনী মূলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াও তিনি ছিলেন দৃঢ় অনমনীয়। এই সংঘাতময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনী যত বার পাঠ করা যায় তত বাবই নূতন অনুভূতিতে ও প্রেরণায় চিত্ত চঞ্চল হয়, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। লেখক অত্যন্ত দরদর সঙ্গে কিশোরদের জন্ত এই মহান জীবনীকথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁর ভাষায় আবেগ এবং শক্তি আছে। বর্ণনভঙ্গীও মনোরম। কিশোর চিত্তে এই নিঃস্বার্থ বীরের জীবনী যে গভীরভাবেই রেখাপাত করিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এই দেশেরই মেয়ে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রকাশক—

এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা।

বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে সব ভারতীয় মহিলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও শৌর্য-বীর্যের মহিমা সম্ভা জগতের বিস্ময় হইয়া আছে

তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইচ্ছাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিশোরদের জন্ত লিখিত হইলেও ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলার জীবন-কথার মধ্য দিয়া আমরা জানিতে পারি পাঁচ হাজার বছর আগেকার ভারতীয় মহিলারা শিক্ষা সংস্কৃতিতে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ভূমিকা—শ্রীমাখনলাল

মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস। পাইওনিয়ার বুক কোং। ১৮, থামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১০।

ঘটনা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক প্রধান চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'আলোচ্য উপস্থাসের আঙ্গিক রূপের' আলোচনার তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সব্যসাচী—শ্রীরণজিৎকুমার সেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪,

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১২ টাকা।

কিশোর পাঠ্য উপস্থাস। গল্পটি চিত্তাকর্ষক। আজকালকার এই জাতীয় অনেক উপস্থাসে লেখকগণ কেবল রোমাঞ্চকর ঘটনাস্থটির দিকে লক্ষ্য রাখেন, কিশোর মনের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেন না। এখানি সেরূপ নহে।

লঘুছন্দী—শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম

চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১২ টাকা।

'মুখরা চাঁদ' 'লাজুক চাঁদ' 'অসতী চাঁদ' 'ভীষ্ম চাঁদ' 'তবী চাঁদ'

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস-৩/১ ব্যাঙ্কম্যান স্ট্রিট • কলিকাতা

ফোন-কলোন-১১২২ • ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রিট, বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস

মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুনীল সেন, বি, এ

‘গোলানো চাঁদ’ ‘উজ্জ্বল চাঁদ’ ‘গাঙা চাঁদ’ বয়স্কীতা কুমারী চাঁদ ‘চাঁদের মেঘ’ ‘চাঁদের চুল’,—চাঁদকে লইয়া কবি মুশকিলে পড়িয়াছেন, তাহার মোহন বাণে বুঝিবা তিনি ‘আহত’। আবার ‘ঝুলে পড়া দিন’ ‘সাদাটে রাত’ ‘অনুজু দুরাশা’ ‘উদারী রাত’ ইহাদের লইয়াও কি কম বিভ্রাট? “উট পাখী আর খেজুরের লাল আকর্ষণে শূন্যকে যারা শোনাতে চেয়েছে নমস্কার”—‘আকর্ষণে নমস্কার শোনানো’—আমরাও নূতন শুনিলাম।

কাশবনের কথা—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস ৮, থামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা।

পল্লীজীবনের একখানি হৃদয় কাহিনী-কাব্য। চমকপ্রদ কিছুই নাই, গ্রাম্য প্রকৃতির মতই সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু তেমনি মনোরম ও তৃপ্তিকর। ছাপা ও বাঁধাই স্বদৃশ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ—সংক্ষেপিত বঙ্গিমগ্রন্থমালায় তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ। সম্পাদক—শ্রীবিজয়বিহারী ভট্টাচার্য। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানির ১ টাকা, পৃষ্ঠা বর্ধাক্রমে ১০০ এবং ১৪২।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থানের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপস্থানসমূহের মধ্যে গণ্য। বাঁহারা বাংলাদেশের ক্লাসিক রচনার সহিত পরিচিত হইতে চান, অথচ সময়াভাবে-পারেন না এই সংক্ষেপিত গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আবার অনেক উচ্চশ্রেণীর উপস্থানও বিশেষ বিশেষ বর্ণনার জন্ত অসঙ্কেতে তরঙ্গ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না,—এরূপ যে যে অংশ তরঙ্গ-মনের অনুপযোগী সেই সেই অংশ সম্পাদক

কর্তৃক পরিবর্জিত অথবা পুনর্লিখিত ও পরিমার্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থদ্বয়ের মূল রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীতারাপদ রাহা

তবুও মানুষ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দে। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

উপস্থানক্ষেত্রে এই নবাগত লেখককে স্বাগত জানানো যাইতে পারে। যে অবস্থা-বিপাকের মধ্যে তিনি অশোক এবং মালাকে লইয়া গিয়া তাহাদের চরিত্রের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। তা ছাড়া মানবতা এবং সাহিত্যের প্রতি সজাগ মনোবৃত্তি এই লেখকের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বিবাহ ও প্রেমকলা—শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে। আর এন এও কোম্পানী, মালাকারটোলা, ঢাকা। মূল্য তিন টাকা।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য যৌনতত্ত্ববিদ হাভলক এলিস বলিয়াছেন—“জীবনের মূলে রহিয়াছে যৌন-প্রবৃত্তি এবং যৌনতত্ত্বকে সম্যকরূপে না বুঝা পর্যন্ত জীবনের প্রতিও আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতে পারে না।” প্রাচীন ভারতে জীবনের এই মূল রহস্য সম্বন্ধে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বাংস্তায়নের ‘কামসূত্র’। এই অমূল্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সর্ রিচার্ড বার্টন বলিয়াছেন, ‘ইহা বাংস্তায়নকে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে’। রমেন্দ্রবাবু বিশেষ ভাবে বাংস্তায়নকে অনুসরণ করিয়াই “বিবাহ ও প্রেমকলা” নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ মেরি ষ্টোপেসের Married Love এবং মিসেস এটিএ. হর্শকেকের পুস্তক হইতেও তিনি কিছু কিছু

একমাত্র স্বাস্থ্যরত্নী ডাঃ মেরাই-

—স্বস্ত সমস্ত শিশুর জন্মই হতে পারেন!

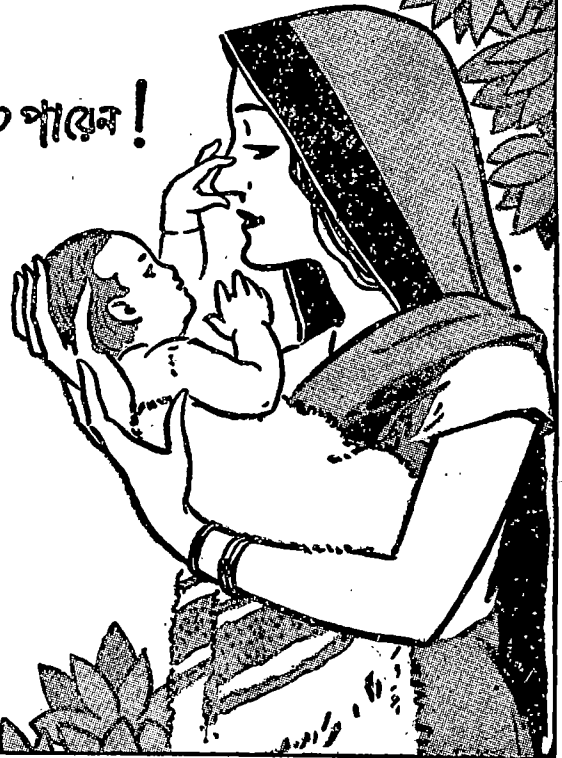
অশোকিনা

জরায়ু সংক্রান্ত সমস্ত জীবাধির ঔষধ।
ঋতু ব্যতিক্রম, নাড়ীর দোষ বাধক
প্রভৃতি দুরারোগ্য জীবাধি আরোগ্য হয়।



অশোকিনা মাসে
একাধিকবার অনিয়মিত ঋতু
ও শবাল্লতায় সেবনীয়।

ক্যালকাটা
কোমিক্যাল



উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য যৌনতত্ত্ববিদগণ দম্পতির যৌন জীবনের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে গিয়া অশ্রদ্ধা দিকের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষ্ময় হইলে শুধু যৌন-পরিভূতি দ্বারাই বিবাহিত জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করা যায় না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সম্ভ্রান্তি প্রকাশিত The Discovery of India নামক পুস্তকে problem of human relationships নামক নিবন্ধে বলিয়াছেন :

“Marriage was an odd affair, and it has not ceased to be so even after thousand years of experience. We saw around us the wrecks of many a marriage . . .”

দাম্পত্য জীবনে ও অশ্রদ্ধা মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন আদর্শই যে ব্যস্তির পক্ষে কল্যাণকর ছিল পণ্ডিতগণী উক্ত নিবন্ধে সেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই আদর্শ বিস্মরণই হয়তো বর্তমানের অনেক পরিণয়ের শোচনীয় পরিণতির জন্ম দায়ী। রমেন্দ্রবাবু হিন্দু বিবাহের মহান উচ্চ আদর্শের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—“হিন্দু বিবাহ জ্ঞান-পুঙ্খ সংযোগের কেবলমাত্র একটি সামাজিক রীতি নহে;...ইহা একটি কঠোর যজ্ঞ, হিন্দুজীবনের একটি মহাব্রত ও চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ়তম বন্ধন”। বস্তুতঃ হিন্দু-বিবাহ যে দম্পতির মধ্যে দৈহিক মানসিক ও আত্মিক মিলনের ভিত্তিভূমির সোপানস্বরূপ তাহা “বরামি সত্যগ্রহিণী মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে” এই মন্ত্রেই হৃদয়স্পর্শক। শাস্ত্রোক্ত, বিবাহবিষয়ক বিবিধ তত্ত্বের বর্ণনা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আলোচ্য পুস্তকটিকে রাজ্যের প্রচলিত বিবাহবিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পুস্তকের ভাষা সংস্কৃতবহুল। প্রবর্তনী সংস্করণে শব্দাঙ্কুর বর্জন করিয়া ভাষা একটু প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। প্রচ্ছদপটের ছবিটি অত্যন্ত খেলো এবং গুঁড়া। পুস্তকটি হইতে ‘শিষ্টজ্ঞানমোদিত নয়’ এমন কতকগুলি বিষয়ের বর্ণনা বাদ দিলেই ভাল হইত। এ বিষয়ে আবুল হাসানাব সাহেবের ‘বৌন-বিজ্ঞান’ই উক্ত বিষয়ক পুস্তক লেখকদের আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীনিলিনীকুমার ভদ্র

রণ ও রাষ্ট্র—শ্রীদিগন্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বক্সিম চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৭০, মূল্য ৪/- টাকা।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রন্থকার আদিম সমসামাজ্য ব্যবস্থা, দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঞ্জিবাদ, ফাসিবাদ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সময়-বিজ্ঞান ও যুদ্ধপদ্ধতির বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। আদিম কালের যুদ্ধের সহিত এ কালের বিরাট

যুদ্ধের কোন তুলনাই হইতে পারে না। লেখক স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া এই সকলের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। বিমানবাহিনী আধুনিক হইলেও অল্প দিনের মধ্যে ইহার বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। বায়সা-বাণিজ্য ও যাতায়াতে সর্বত্র বিমানের ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। যুদ্ধকৌশলও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। প্রত্যেক বড় যুদ্ধেই ইহার পরিবর্তন ও বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের বহু শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় লেখক হৃদয় ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আজিকার দিনে সৈনিক এবং রাষ্ট্রনায়কদের চেয়ে সাধারণ লোকই যুদ্ধদ্বারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক লোক অপেক্ষা বেসামরিক লোকেরাই বেশী মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ যে আরও ভয়ঙ্কর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অল্প কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি যুদ্ধ বাধাইলেও বহুদেশের বহুলােক মিলিয়া—অর্থাৎ জনগণের সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ চলিতে পারে না। জন-স্বার্থ যুদ্ধের সহিত জড়িত বলিয়াই সর্বসাধারণের আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষায় রণ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এজাতীয় বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ নাই বলিলে হয়। ইহা পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক যুদ্ধ-সংক্রান্ত মোটামুটি প্রায় সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। যুদ্ধে তৈল, বেতার, পক্ষমবাহিনী, রেড-ক্রস, আলোক-চিত্র প্রভৃতির ব্যবহার পাঠকের চোখ নানাদিকে খুলিয়া দিবে। পুস্তকের শেষে যুদ্ধের নির্বর্তন ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত



নকল হইতে সারধান!

অমৃততাঞ্জণ

১০ বৎসরের প্রসিদ্ধ পাকিট ডাক্তার
লক্ষাধিক নিরীতি সর্বদা পাওয়া যায়
অমৃততাঞ্জণ লিঃ পোঃ বক্স নং ৬৮-২৫, কলিকাতা



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR

Post Box 7878

Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাহুকর
শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে
engage করিতে হইলে
এখানেই পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক ‘SORCAR’ স্বাক্ষর
লিখিতে ভুল করবেন না।

হুভাষ-বাহিনী—শ্রীহরীকুমার সেন। প্রকাশক—এস, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। ১৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২১০ টাকা।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রানবিহারী বহুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের উৎপত্তি ও সংগঠন আরম্ভ হইলেও উহা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী-ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নেতাজী হুভাষচন্দ্রের সিদ্ধাপুরে আবির্ভাবের সঙ্গেই তাঁহার নেতৃত্বে উহা দস্তরমত সামরিক কার্যসময় পুনর্গঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে এক অমরত্বপূর্ণ গৌরবময় পৃষ্ঠার সূচনা করিল। এইচতাই গ্রন্থকার জাতীয় বাহিনীর হুভাষ-বাহিনী নামকরণ করিয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ও লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে কালিঙ্গ রাণী-বাহিনী প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং 'জয় হিন্দ'র অভিযান প্রণা ও 'দিল্লী চলে' অভিযান-বাণীর স্রষ্টা হিসাবে নেতাজী সর্বোপায়ে সর্বোদ্যমের সহকারী উপযুক্ত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া তিনি যে আজাদ হিন্দ ফৌজের রূপ দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের সমরবাহিনীর উহা আদর্শ হইয়া থাকিবে। বিধির বিধানে উহার বার্ষ পরিশ্রমি ঘটিলেও ব্রহ্ম, মালয় ও সিঙ্গাপুরে বেসামরিক অসহায় ভারতবাসীর ধনপ্রাণের নিরাপত্তা সাধনে উহার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কয়েকটি স্থলিখিত অধ্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করিয়াছেন।

নেতাজী ও অত্যাচার সমরনায়কদের কয়েকখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে, আরও কয়েকখানি ছবি দিলে ভাল হইত। দিল্লীর লালকেল্লায় সেনানায়কগণের বিচার-কাহিনী শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীবাহিনীকান্ত সোম। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, ছায়াচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য সাত টাকা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভক্তগণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও ছেলেদের জন্য একখানি স্থলিখিত জীবনকাহিনীর অভাব ছিল। 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথের' যশস্বী লেখক সেই কার্য হৃষ্টভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এমন মধুর ভাষায় ও স্বরগ্রাহীভাবে রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দীক্ষা সাধনা ও 'কথামৃত' এবং তাঁহার স্বনামধন্য ভক্তগণের কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িতে বসিলে বইখানি শেষ না করিয়া থাকি যায় না এবং পড়িবার পর স্বয়ং এক অপূর্ব দিব্যভাবে আশ্রিত হয়। বইখানিতে বিশ্বাসের নৈপুণ্যের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল প্রধান ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে। ছেলেরা ইহা পড়িয়া এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

নবযুগের দৃষ্টি ও সৃষ্টির পরিচয়

এঙ্গেলসের

সমাজতত্ত্ববাদ—

কম্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক ৬০/০

অনুবাদক—রেবতী বর্মণ

মাত্রবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মাত্রবাদী বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাত্র অপরিহার্য।

লেনিনের

গ্রামের গরীবদের প্রতি ১/

বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনূদিত

কৃষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তিশালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য। লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্তে একমাত্র সহায়।

বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হয়েছে ৮০ লক্ষ খানি—

তিন অব ক্যান্টারবেরির সেই বই অবলম্বনে—

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা

সোভিয়েট তুনিয়া ২১/০

রাশিয়া সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

আশনালা বুক এজেন্সী লিমিটেড—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অর্থনীতির গোড়ার কথা ১।০

বাংলার বিখ্যাত মার্কসীয় লেখক রেবতী বর্মণের এই বইখানি মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক—যার অভাব এতদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

বিখ্যাত মার্কসীয় লেখক

অমিত সেনের

ইতিহাসের ধারা ১।০

আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংলা ভাষায় একমাত্র মার্কসীয় বিশ্লেষণ।

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

সুধাংশু দাশগুপ্তের

বিপ্লবী চীন ১/

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। লেখক আধুনিক চীন-ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র।

দেশ-খিন্দেদের কথা

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম

২০ নং হরিনাথ দে রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা খরচে রাখিয়া কলেজে পড়ান হয়। সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নিজ ব্যয় বহন করিয়াও কতক ছাত্র এখানে থাকিতে পারে। এ বৎসর ঘাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, শুধু তাহাদেরই আবেদন বিবেচিত হইবে। অবিলম্বে সেক্রেটারীর নিকট টেব্লেট নম্বর ও তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ আবেদন করিতে হইবে।

বাঁকুড়া মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৭শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত বাঁকুড়া শ্রীরাম-

কৃষ্ণ মঠে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও মায়াবতী অর্দ্ধেত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পবিত্রানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সংস্পর্শে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করেন। এতদ্ব্যতীত পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, আশ্রমস্থ ছাত্রগণ কর্তৃক “গুরুদক্ষিণা” নাট্যাভিনয় এবং শ্রীহর্গা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শন সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দ দান করে।

নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক-সম্মেলন

চতুর্বিংশ অধিবেশন (১৯৪৬)—দিনাজপুর

- (১) ডাক্তার য়েবনাদ সাহা—সভাপতি;
- (২) শ্রীনিখীনাথ কুণ্ডু—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি;
- (৩) অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ—সম্মেলনের উদ্বোধক;
- (৪) ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়—সাহিত্য শাখার সভাপতি;
- (৫) শ্রীরাম-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধারণ সম্পাদক;
- (৬) শ্রীলোকানন্দ মজুমদার—যুগ্ম-সম্পাদক অভ্যর্থনা-সমিতি।



বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউশন

—নিম্নিত্তে—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এস্টেয়ার
আই, সি, এস (রিটার্ড)

মূর্তি ও মডেল

কৃষ্ণনগর মৃৎকলা বিশ্বসমাদৃত; কক্ষসজ্জায় ও উপহারে সুকচিৎপ্রাপক। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির “বাষ্টমূর্তি” (৬”-৮”) মূল্য ২৫০; লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবী মূর্তি (৮”-১০”) মূল্য ২০, প্রতি মূর্তির জন্ত ১০ অগ্রিম অবশ্য পাঠাইবেন। সমস্ত প্যাক করিয়া ডাকে পাঠান হয়। ম্যানেজার, “আর্ট চেম্বার”, আমিনবাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া।

কৃষিতত্ত্ববিদ দ্বিজদাস দত্ত

বিগত এই এপ্রিল মাসে কৃষিতত্ত্ববিদ, কৃষি-বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ও ইকনমিক বোটানিস্ট দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-মাতার একজন অসম্মান, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, দেশপ্রেমিক, সর্বোপরি অগ্রণী কৃষিতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাজ্ঞাতীর তিরোধন হইল।



দ্বিজদাস দত্ত

ময়মনসিংহ জেলার ঢাকী গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে দ্বিজদাস জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পাঠ্য জীবনে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এসসি

চলার পথে! চলার পথে ৩

বাংলা সাহিত্যে এত বড় বৃহৎ পটভূমিকার আর কোনও উপস্থাপনা লেখা হয়নি। ভিক্টোরিয়া জাহাজে নানা দেশের নানা জাতির নরনারীর সমাবেশে এক বিচিত্র রসমধুর লেখা। অপূর্ণ, অনবঙ্গ, দীপ্ত ও দৃপ্ত।

THE SOUL OF INDIA

Rs. 2-8

লেখক যুরোপের নানা দেশে যে হৃদয় বজ্রতাপ্তি দিয়াছিলেন তাহার সকলন। ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ ইহাতে ফুটিয়াছে। লক্ষপ্রতিষ্ঠ হুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের এই গ্রন্থ দুই-খানি আপনাদের পাঠাগারে না থাকিলে তাহা সত্যই অসম্পূর্ণ রহিবে।

গাঁহার অস্ত্রাঙ্গ গ্রন্থ :—নব্য ও সবিভা—২৯, পতিব্রতা—১৯, হাসির মূল্য—১৯, বিরহ শব্দ—১০, চিরস্থনী—১০, ঋতু ১ম—১০, ঋতু ২য়—১০, শিশুমনের চলচিত্র—১০। একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—প্রান্তিকার, ১০১, সেগুনবাগান, রমনা পোঃ, ঢাকা।

পাস করিয়া তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন “কৃষি-বিভাগে” শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে কৃষিবিজ্ঞানে অধিক-তর ব্যাপ্তি লাভার্থ ১৯০৬ সালে সরকারী বৃত্তি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তথায় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষিতত্ত্বের সহিত এম. এস এ ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণাক্ষেত্রে তাঁহার অধ্য-বসায় ও কৃষিতত্ত্ব অধ্যাপকমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছিল। দেশে ফিরিবার পূর্বে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটে ও গ্রেট ব্রিটেনে প্রসিদ্ধ কৃষিগবেষণাগারসমূহের কাৰ্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবার মানসে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কোর্সে যোগদান করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে নিজের অধীত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের ও দেশের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি সংগ্রহপূর্বক, “আদর্শ গো-পালন ও কৃষি গবেষণাগার” প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশের কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির ইতিহাসে একরূপ ব্যক্তিগত প্রয়াস বোধ হয় এই প্রথম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির চর্চা দ্বারা তাঁহার দেশসেবার প্রয়াসকে তখন লোকে অহেতুক সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। অবশেষে দ্বিজদাস বুঝিলেন, সরকারের সহায়ত্ব ও সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রয়াসে পক্ষে বৈজ্ঞানিক কৃষির চর্চা দুরূহ ব্যাপার। ১৯১২ সনে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে কিছুকাল চট্টগ্রাম কলেজে ও অধ্যাপনা করেন। ১৯১৩ সনে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ পুনর্গঠিত হইলে তিনি ইহাতে যোগদান করেন এবং মাধ্যমিক কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনে গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করেন। এইরূপে ঢাকার বর্তমান “এগ্রিক্যালচার ইনস্টিটিউট”র গোড়াপত্তন হয়। তৎপরে তিনি গবর্ণমেণ্টের “ইকনমিক বোটানিস্ট” নিযুক্ত হন। বাংলার শস্ত, ডাল, জলীয় দান, গোখাদ্য ও তুলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা তিনি করিয়া গিয়াছেন। নেপায়ার ঘোসের ফলন ও প্রচলন এদেশে তিনিই প্রথম করেন। লম্বা উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস যে এদেশের আবহাওয়ায় ও হইতে পারে, ইহা তাঁহার গবেষণা দ্বারা প্রথম প্রমাণিত হয়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগে তাঁহার গবেষণালব্ধ বহুবিধ কাৰ্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দত্ত কলিকাতা, ঢাকা ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা গোপনে আচরিত হইত। তেজগাঁওস্থিত তাঁহার পল্লীভবন “ঈন্দ্রিরা-নিলয়” অল্পসময়ে পরিণত হইয়াছিল এক কথা বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না। নিরস্ত্র কখনও সেখান হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। বহু গরীব ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় তিনি নীরবে বহন করিয়াছেন।

দেশের শিক্ষা-সংস্কারে তাঁহার অনন্তসাধারণ আগ্রহ ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে তেজগাঁওস্থিত “পলিটেকনিক হাইস্কুল” প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গে এই ধরনের ইহাই প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ইহাতে শিক্ষা-বিজ্ঞা শিক্ষাদানের সঙ্গে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াই-বার ব্যবস্থা আছে। জীজাতির উচ্চশিক্ষার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। নিজের কল্যাণকে তিনি উচ্চ

BOOKS AVAILABLE

Rs. As.

Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock) each No. at	4 0
History of Orissa Vols. I & II —R. D. Banerji	each Vol. 25 0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12 0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5 0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4 8
Emerson & His Friends— ditto	4 0
Evolution & Religion— ditto	3 0
Origin and Character of the Bible ditto	3 0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2 0
Prayag or Allahabad—(Illustrated)	3 0
The Knight Errant (Novel)—Sita Devi	3 8
The Garden Creeper (Illust. Novel)— Santa Devi & Sita Devi	3 8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3 0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3 8
India And A New Civilization— ditto	4 0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (Illust.)—P. N. Roy	4 8
Story of Satara (Illust. History) —Major B. D. Basu	10 0
My Sojourn in England— ditto	2 0
History of the British Occupation in India —[An epitome of Major Basu's first book in the list.]—N. Kasturi	3 0
History of the Reign of Shah Alum— W. Franklin	3 0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6 0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0 8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0 4
Indian Medicinal Plants—Major B. D. Basu & Lt.-Col. K. R. Kirtikar—Complete in 8 Vols. [Authoritative Work with numerous Superb Plates]	320 0
Postage Extra.	

The Modern Review Office

120-2, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

মহাভারত (সচিত্র) ৩রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২৮
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ	১০
চট্টাজির পিকচার এল্বাম (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে)	প্রত্যেক ৪৮
চিরস্থনী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী	৪১০
উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)—ঐ	২৮
সোনার খাঁচা—শ্রীসীতা দেবী	২১০
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ	১৮
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ	২৮
উজ্জ্বলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২১০
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক	৪৮
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১১০
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১১০
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১০
চণ্ডীদাস চরিত—(৮কৃষ্ণপ্রসাদ সেন) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি সংস্কৃত	২১০
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীধামিনীভূষণ সাহিত্যচাৰ্য্য	৪১০
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)— শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৮
পাথুরে বাদর রামদাস (সচিত্র)— শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১১০
জল্পনা—শ্রীহেমলতা দেবী	১১০
খেলাধুলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১১০
বিলাপিকা—শ্রীধামিনীভূষণ সাহিত্যচাৰ্য্য	১০০
ল্যাপল্যাও (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ	১১০

ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০১২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং জ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রে তিনি অপরিসীম ছিলেন। তাঁহার এই সহজাত জ্ঞানসূহা জীবনের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। বাঁহারা এই তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। পারিবারিক জীবনে দ্বিজদাস বহু শোক ভোগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দিরার মৃত্যুর পর তিনি “গৃহী-সন্ন্যাসী”র মত জীবন বাপন করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

মেসার্স এম, এল বহু এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের (লন্ডনবিলাস) ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৭ই

বৈশাখ মঙ্গলবার তাঁর কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর ছিলেন। হৃদযন্ত্র পীড়িত বৎসরকাল তিনি উক্ত কোম্পানী কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁর মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ধর্মীয় সম্ভান বলিয়া তাঁর কোন অহঙ্কার ছিল না, উচ্চ নীচ সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মেলামেশা করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ায়, বিধবার কন্যাদ্বারা সাহায্য-দান, অনাথ-আতুরের সেবায় আশ্রম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহু সংকার্যে তাঁর দান ছিল অপরিমিত। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি গ্রীষ্মের স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক হিসাবে উৎকৃষ্টতর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।



দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চিত্র পরিচয়

রাগিণী ধনাশ্রী:

হুর্বাদলশ্রামতহুর্মমোজা

কান্তং লিখন্তী বিরহেণ চুনা।

ধেতে কপোলে দধতী দুগধু

—নিয়মনির্ধৌতকুচা ধনাশ্রী:।

হুর্বাদলশ্রাম, মনোজদেহা বিরহখিনী ধনাশ্রী: কান্তের আলেখ্য চিত্রিত করিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে স্বেত কপোল এবং কুচযুগ প্লাবিত হইতেছে।

সংগীতদর্পণম্—

শ্রীদামোদরমিশ্রেন

প্রণীতম্।

ডাক্তারেরা বলেন

ব্রাড-ভিটা

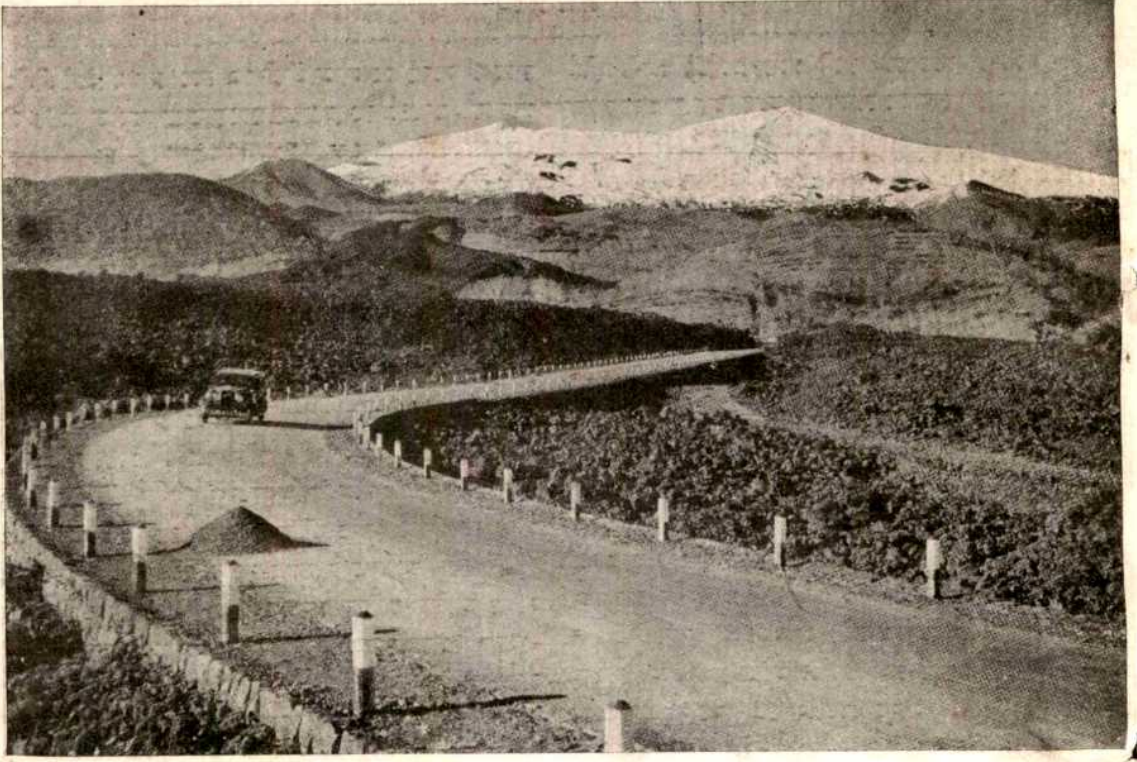
দুর্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগের আদর্শ টনিক ও রক্ত শোধক

স্বচ্ছ মস্তক বাবুর
মেডিকেল রিয়ার্স লেবরেটরি
দি-২০, সেকুল এডিনিউ, কলিকাতা

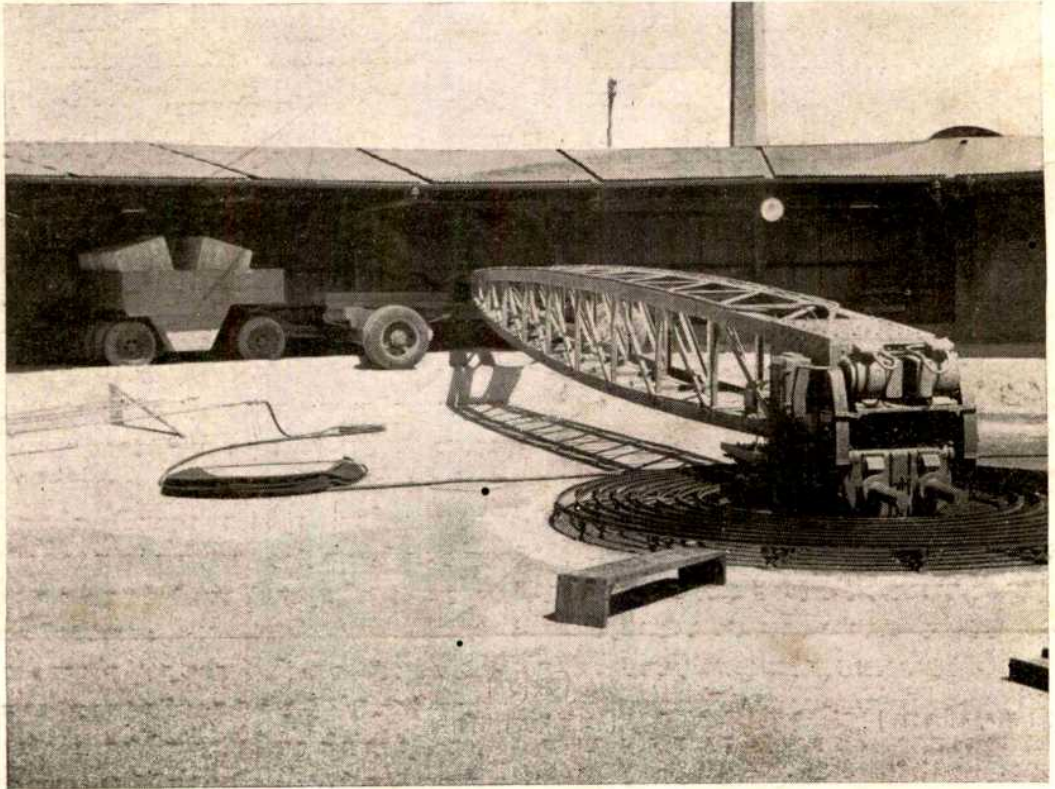


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বিরহিণী
ঐতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়



আধুনিক ইটালীর একটি মোটর-রাস্তা
(প্রাচীন রোমকগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দ্দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিল)



ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের একটি বিশিষ্ট রাজপথ গবেষণাগার । সমুদ্রস্থ বৃত্তাকার পথের উপর দিয়া

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নায়মাত্মা বগবানেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৫৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত মন্ত্রী-মিশন যে প্রস্তাব
করিয়াছেন তাহা সমগ্রভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।
প্রস্তাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যাখ্যা এবং কংগ্রেস ও
লীগের অভিমতও ঐ সঙ্গে দেওয়া হইল। লিখিবার সময়
পর্যন্ত (৩১শে জ্যৈষ্ঠ) কংগ্রেসের শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়
নাই। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও
কংগ্রেস এই প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-
তন্ত্র গঠন করিতে সম্মত আছেন। গান্ধীজীর অভিমত এই যে
প্রস্তাবের ভিতর স্বাধীনতার বীজ আছে, উহাকে অঙ্কুরিত
করিয়া তোলার দায়িত্ব আমাদের। বর্তমানে কংগ্রেসের সহিত
মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের আলোচনা চলিতেছে দুইটি বিষয়
সম্পর্কে। মিঃ জিন্না অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারে লীগ ও কংগ্রেস
সদস্যদের সংখ্যা সমান হউক বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং
বাংলা ও আসামের ব্যবস্থা-পরিষদের ইংরেজ সদস্যেরা গণ-
পরিষদ গঠনে ভোটদানে বিরত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ
করিয়াছেন। কংগ্রেস এই উভয় দাবির বিরোধী। মিঃ জিন্নার
দুই-জাতি থিওরী মন্ত্রী-মিশন তাহাদের প্রস্তাবে সরাসরি অগ্রাহ
করিয়াছেন, ইহার পর কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে হিন্দু-মুসলমান
সংখ্যাসাম্যের দাবি কোন মতে টিকিতে পারে না। গত
নির্বাচনের ফল অনুসারে মিঃ জিন্না সব মুসলমানের প্রতিনিধি
বলিয়া তর্কের বাতিরে ধরিয়া লইলেও ভারতীয় সংখ্যার মাত্র
এক-চতুর্থাংশ তাহার অনুগামী, আর কংগ্রেসের অনুগত বাকী
তিন-চতুর্থাংশ। সুতরাং এককে তিনের সমান বলিয়া গণ্য
করিবার দাবি সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অর্থোজিক বলিয়া কংগ্রেস
উহা অগ্রাহ করিয়াছেন।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহার

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বর্জন করিয়াছেন, গণ-পরিষদ নির্বাচন
ব্যবস্থায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব না করিয়া জন-
সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করিয়াছেন এবং
সাম্প্রদায়িক কোন বড় সমস্যা লইয়া মতভেদ হইলে উভয়
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহার
সমাধান হইবে বলিয়া বলিয়াছেন। এই গণতন্ত্রসম্মত নীতি
অনুসরণ করিলেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে অসুবিধা হইত না।
অন্তর্বর্তী শাসন-পরিষদ গঠনের বেলায় কেন এই নীতি প্রয়োগ
করা হইতেছে না তাহা এখনও ছুর্বোধ্য রহিয়াছে।

অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়ার পর গণ-পরিষদ
আস্থানের আয়োজন আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের
ব্যবস্থা-পরিষদ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।
কোন প্রদেশ কত জন প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাহা প্রস্তাবে
স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে; মোটামুটি প্রতি দশ লক্ষ
লোকের জন্ত একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। ভোট
দেওয়ার অধিকার থাকিবে শুধু ব্যবস্থা-পরিষদের, যে সব
প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা আছে তাহার সদস্যরা ভোট দিতে
পারিবেন না। গণ-পরিষদের জন্ত ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য বা
তাহার বাহিরের লোকেরাও প্রার্থী হইতে পারিবেন।
পরিষদের মুসলমান সদস্যেরা মুসলমান, শিখেরা শিখ
এবং অপরা সকলে জেনারেল সদস্য নির্বাচন করিবেন।
সিন্ধেল-ট্রান্স্‌ফারের ভোটের দ্বারা এই নির্বাচন হইবে বলিয়া
বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্যেরা তেত্রিশ জনের
মধ্যে একজন সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। ইংরেজ
সদস্যদের সংখ্যা পঁচিশ এবং মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব অনুসারে
ইহাদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। গণ-পরিষদের
প্রার্থী হইবার অধিকার ইহাদের আছে কি না সে সম্বন্ধে
মতভেদ হইয়াছে। প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্ত একজন

প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন এই নীতি অনুসারে কোন ইংরেজ প্রার্থী হইতে পারেন না। গান্ধীজীর মত এই এবং কলিকাতার ইংরেজ মুখপত্র ষ্টেটসম্যানও এই কথাটি লিখিয়াছেন। সাধারণ লোকের ধারণা হইতাদের ভোট দেওয়ার অধিকার যখন আছে তখন হইবার দাঁড়াইতেও পারিবেন। বিষয়টি এখনও মন্ত্রী-মিশনের বিবেচনাবীন।

গণ-পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ দিল্লীতে সমবেত হইবেন। প্রথম বৈঠকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন, একটি এডভাইসরি কমিটি গঠিত হইবে এবং গণ-পরিষদের কার্যক্রম নির্ধারিত হইবে। অধিকাংশের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কংগ্রেস-মনোনীত ব্যক্তিই এই পদ লাভ করিবেন। চেয়ারম্যানের ক্ষমতাও প্রচুর। কোন আলোচ্য বিষয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন উঠিলে চেয়ারম্যানের অভিমত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। চেয়ারম্যানের মতের সহিত কোন সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতের পার্থক্য হইলে তাঁহারা চেয়ারম্যানকে ফেডারেল কোর্টের মত লইবার জন্ত অহরোধ করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান ফেডারেল কোর্টের অভিমত অগ্রাহ করিতে পারিবেন না এমন কোন কথা নাই।

সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া এডভাইসরি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটিতে ভারতীয় খ্রীষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ইংরেজ প্রভৃতির প্রতিনিধি যেমন থাকিবেন তেমনই মুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান প্রদেশের মুসলমান এবং বাংলার হিন্দু ও পঞ্জাবের হিন্দু শিখ প্রভৃতিও থাকিবেন। এডভাইসরি কমিটি গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে তাঁহাদের সুপারিশ উপস্থিত করিবেন। কোন প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন অভিযোগ থাকিলে প্রস্তাবের আকারে এই কমিটি তাহা গণ-পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং অভিযোগ সাম্প্রদায়িক হইলে গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় প্রতিনিধিদের উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশের সন্মতি না পাইলে কোন সিদ্ধান্ত হইবে না। এই ব্যবস্থায় সুবিধা এই যে বি বা সি গ্রুপের লীগসদস্যরা হিন্দু বা শিখের স্বার্থবিরোধী শাসনতন্ত্র খাড়া করিতে চাহিলে মুসলমানপ্রধান প্রদেশসমূহের হিন্দু ও শিখ সদস্যরা এডভাইসরি কাউন্সিল মারফৎ গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে উচ্চর প্রতিকার দাবি করিতে পারিবেন। নিয়মতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে এই কমিটির গুরুত্ব খুব বেশী, সাংবাদিক সম্মেলনে আইনজ্ঞ সর ষ্ট্রাকোর্ড ক্রিপস্ উহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

চেয়ারম্যান নির্বাচন, এডভাইসরি কমিটি গঠন ও কার্যক্রম নির্ধারণের পর গণ-পরিষদ 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। 'এ' বিভাগে থাকিবে মুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহার। এই ছয়টি প্রদেশের

প্রতিনিধিরা মিলিয়া নিজ নিজ প্রদেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। 'বি' বিভাগে থাকিবে পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। এই চারটি প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়া নিজ নিজ প্রদেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। 'সি' বিভাগে থাকিবে বাংলা ও আসাম। এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র মিলিয়া বাংলার ও আসামের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত হইবার পর এই তিন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেরা মিলিয়া গ্রুপ গঠন করিবেন কি না তাহা বিবেচনা করিবেন। এখানে প্রদেশ হিসাবে মত লওয়া হইবে। আসামের প্রতিনিধিদের অমত হইলে বাংলা ও আসাম গ্রুপ গঠন হইতে পারিবে না। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্ত তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু গ্রুপ গঠন বাধ্যতামূলক নয়। পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, বাংলা ও আসাম লইয়া পাকিস্তান গঠনের যে প্রস্তাব মিঃ জিন্না করিয়াছিলেন, এই গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবের দ্বারা তাহাই মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। আমাদের মতে এই আশঙ্কা ভুল। প্রথমেই বাংলা ও আসামকে আলাদা করিয়া দিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে পশ্চিমাঞ্চলের চারটি মুসলমান প্রদেশের সঙ্গে এই ছুটিকে জুড়িয়া দেওয়া চলিবে না। বাংলা ও আসামকে 'সি' বিভাগে ফেলিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত একত্র করিয়া দেওয়া বাংলারই লাভ হইবে বেশী। গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে সাধারণ ২৭, মুসলমান ৩০। আসামে সাধারণ ৭, মুসলমান ৩। উভয়ে একত্র মিলিলে সাধারণ সদস্য ৩৪ ও মুসলমান হইবে ৩৬। সাধারণ আসন-গুলি কংগ্রেস দখল করিতে পারিবে আমাদের আশা আছে, ৩৬টি মুসলমান আসনের একটি জাতীয়তাবাদীরা পাইবেন। গ্রুপ গঠন করা-না-করা প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন কিন্তু অকবার গ্রুপে চুকিলে দশ বৎসরের মধ্যে বাহিরে আসা চলিবে না।

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনার পর পুনরায় গণ-পরিষদের পূর্ণ বৈঠক বসিবে। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র রচিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও যানবাহনের ভার থাকিবে। আপাত দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইবে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা হইবে না। এ সম্বন্ধে মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির সম্পাদকের বিবৃতি পরে প্রকাশিত হইল। উহা হইতেই দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট ক্ষমতাসালী হইবে। কংগ্রেসের হাতে ছয়টি বৃহৎ প্রদেশ এবং সমগ্র ভারতের সৈন্যদল, বৈদেশিক নীতি এবং রেল, ষ্ট্রিমার, জাহাজ, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি থাকিলে পাকিস্তানী ভেদনীতি বেশী দূর অগ্রসর হইবার পথ থাকিবে না। কোন প্রদেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হইতে বাহিরে যাওয়ার চেষ্টাও বাতুলতায়

পর্ববসিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষেও অখণ্ড ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবানুসারে কাজ হইলে অখণ্ড ও শক্তি-শালী ভারত প্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া যাইবে ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে ইহা আমাদের বিশ্বাস। তবে সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে কংগ্রেস-নেতাদের দৃঢ়তা, সততা, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর।

ফরিদকোট ও কাশ্মীর

ফরিদকোট ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের দেশীয় রাজ্যসমস্তার উপরে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। যে রাজকীয় নিপীড়ন ও বিক্ষুব্ধ গণজাগরণ এই দুই দেশীয় রাজ্যকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে ভারতের বর্তমান ইতিহাসে তাহার অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষেপেও দেশীয় রাজ্যের শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি চিরন্তন প্রতিক্রিয়াশীল পথ ধরিয়াই চলিতেছে।

ফরিদকোটে গোলাযোগ আরম্ভ হয় এক মাসেরও বেশী সময় পূর্বে। জনসাধারণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে চাহিলে স্টেট পুলিশ তাহাতে বাধা দেয়। রাজ্যে ব্যাপক হরতাল এবং পরে সত্যাগ্রহ দমন করিবার জন্ত পুলিশ সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। প্রজামণ্ডলের কর্মিবৃন্দ অত্যাচারে লাঞ্চিত হন, এমন কি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটিকে পর্যন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত জরায়রলাল নেহরু ১৪৪ ধারার অহুশাসন উপেক্ষা করিয়া নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই অচল অবস্থার অবসান হইয়া গেল, ফরিদকোটের রাজার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর আলোচনার ফলে সমস্তার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান বাহির করা হইল। ১৪৪ ধারার অহুশাসনের অবসান ঘটিল, বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং অদলীয় তদন্ত কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল।

কাশ্মীরের ঘটনাবলী ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। শ্রাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি শেখ আব্দুল্লাহর “কাশ্মীর ছাড়” আন্দোলনের পূর্বতন ইতিহাস যাহাই হউক না কেন এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে এই আন্দোলনের বর্তমান রূপ সম্পূর্ণ জাতীয় এবং প্রগতিশীল। কাশ্মীরের বর্তমান রাজবংশ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই রাজত্ব লাভ করেন এবং তার পর হইতে আজ পর্যন্ত এই মুসলমান-প্রধান রাজ্যে এই হিন্দু রাজবংশ শাসন করিতেছেন। বর্তমান মহারাজের অধীনে কাশ্মীরের যে কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা শ্রাশনাল কনফারেন্স কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক-

লিপিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ যখন সমগ্র দেশে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে ‘ভারত ছাড়’ বলা হইতেছে তখন কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজবংশকে কাশ্মীর ছাড়িতে বলা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; বিশেষ করিয়া যখন এই রাজত্বের ভিত্তি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক খেয়ালের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে বর্তমান রাজবংশের বিরুদ্ধে শ্রাশনাল কনফারেন্সের এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রসূত। কিন্তু ঘটনাবলী বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শেখ আব্দুল্লাহ পরিচালিত ‘কাশ্মীর ছাড়’ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক অভীষ্ট সিদ্ধি নহে।

যাহাই হোক, কাশ্মীরের ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যের শাসনগোষ্ঠী অত্যাচার ও নিপীড়নের সকল অঙ্গই অবলম্বন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে এই অশান্তির সময় সরকারী নিরীহ পথিকদিগকে উক্ষীষ খুলিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহাদিগকে রাস্তায় স্বাভাবিক ভাবে চলিতে বাধা দিয়াছে, সঙ্গীন উত্তত করিয়া “মহারাজ কি জয়” বলিতে বাধ্য করিয়াছে, অশান্তির মূল কারণ যাহাই হউক এই ধরনের মধ্যস্থগী দমননীতি লইয়া বিংশ শতাব্দীতে রাজ্যশাসন করা চলিবে না। এই সব ব্যাপারের তদন্ত ও প্রতিবিধান না করিয়া শেখ আব্দুল্লাহর বিচার করা শুধু অজ্ঞান নয় বিপজ্জনকও।

ফরিদকোট ও কাশ্মীরের শাসকবৃন্দ ভুল করিয়াছেন। যুগের অগ্রগতির ধারা কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত বাস্তবদৃষ্টি তাহাদের নাই। কিন্তু এই মোহমত্ত মন লইয়া স্বৈরাচারের খেলায় মাতিয়া থাকিলে বিক্ষোভের তীব্রতাসহ গণশক্তি জাগিয়া উঠিবে; এবং সেই বিদ্রোহের আগুনকে নির্বাপিত করিবার ক্ষমতা স্টেট পুলিশের থাকিবে না। ফরিদকোটের মহারাজ তাহার ভ্রান্তি বুঝিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজকে আমরা সতর্ক করিতে চাই যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আলোকে ঘটনাবলীকে বিচার করিতে না পারিলে এই রাজবংশের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

মুসলিম লীগ প্ল্যানিং কমিটির দৃষ্টিতে মিশনের প্রস্তাবের অর্থনৈতিক ফলাফল

মুসলিম-লীগ প্ল্যানিং কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতির সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়ন বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং যানবাহনের ভার গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া এই ইউনিয়ন এই সব কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ করিবার অধিকারী

হইবে। এই বিষয়গুলিকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অধীনে রাখার অর্থনৈতিক ফলাফল নিম্নরূপ হইবে :

বৈদেশিক সম্পর্ক :—যে কোন দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের সঙ্গে সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ ভাবে জড়িত। দেশের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক স্বার্থের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তাহার বৈদেশিক নীতি দ্বারা প্রদেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি এবং ধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে।

দেশরক্ষা :—সাধারণ রাজস্ব ব্যয় করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সমষ্টির আর্থিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এবং প্রভাবিত করিবেও। দেশরক্ষার জন্ত ব্যয়-ব্যবস্থা সাধারণত রাষ্ট্রিক ব্যয়ের একটা বড় অংশ অধিকার করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অল্পমাত্রী দেশরক্ষার জন্ত ব্যয়ের ভার থাকিবে কেন্দ্রের উপরে। কাজেই এই ভাবেও প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক জীবন কেন্দ্রদ্বারা বহুাংশে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রত্যেক দেশের দেশরক্ষা বিভাগ সেই দেশের সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা। এই বিভাগকে প্রত্যক্ষভাবেই সৈন্যদল প্রভৃতিতেও বহু লোককে নিয়োগ করিতে হয়। পরোক্ষভাবে এই বিভাগকে যে লোক নিয়োগ করিতে হয় তাহার সংখ্যাও কম নহে। কারণ দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ত বহু কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং তাহার জন্তও অনেক লোক দরকার। এই সব নিয়োগই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দেশরক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পড়ে :—লৌহ ও ইস্পাত, সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট, চামড়া, কাপড়, চিনি, কাগজ, দিয়াশলাই, সাবান ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি মৌলিক শিল্প, কারণ ইহাদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি অত্যন্ত শিল্পের জন্ত একান্ত আবশ্যক। এই সকল শিল্পের অবস্থান প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবে কেন্দ্রীয় সরকার, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসেই বিভিন্ন বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনাদি সূক্ষ্মভাবে মিটাইবার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দরকার হইবে। বিশেষ করিয়া উল্লিখিত শিল্পগুলির বিস্তারের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারকে করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রদেশমণ্ডল এবং বিভিন্ন প্রদেশ উভয়েরই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে যাহাতে তাহাদের আংশিক পরিকল্পনাগুলি খাপ খায় ইহা দেখা ছাড়া আর কোনও অধিকার প্রদেশগুলির থাকিবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে দেশরক্ষার জন্য পরিকল্পনার

দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।

যানবাহন :—দেশের আর্থিক জীবনে যানবাহনের গুরুত্ব কম নহে। শিল্প ও বাজারের সংস্থান, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি—এই সবই নির্ভর করিবে মালপত্র চলাচলের সুবিধা এবং ভাড়ার উপরে। একই দূরত্ব এবং মালের জন্য সর্বত্র রেলের এক ভাড়া হইতে পারে না। বৈষম্যমূলক ভাড়ার প্রয়োজন অর্থনৈতিক কারণেও হয়। এই বৈষম্যমূলক ভাড়া নির্ধারণের অধিকার রেল কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিলে কোনও বিশেষ অঞ্চলের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে।

অর্থ :—কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির জন্য অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে। এই অর্থ কি ভাবে আদায় হইবে তাহা জানান হয় নাই। ইহা করিবার দুইটি উপায় আছে :—(১) কোনও চুক্তি অনুসারে অংশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ দিতে পারে; অথবা (২) কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব শক্তিতে অর্থ আদায়ের জন্য কর বসাইতে পারে।

প্রস্তাবিত গণ-পরিষদই যখন এই বিষয় নির্ধারণ করিবে তখন এই কথা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পরিষদের অধিক সংখ্যক সদস্য দ্বিতীয় প্রকার পক্ষপাতী হইবে। কেন্দ্রের জন্ত অর্থ এইভাবে আদায় করার অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রের রাজস্ব আদায়ের যে সব পথ আছে তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান :—শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ, আয়-কর, মুদ্রানীতি। রাজস্ব আদায়ের জন্ত আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য করার সঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে জড়িত। তাহা হইতেছে বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্ত সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা। একটি যাহাতে অপরটির উদ্দেশ্য ব্যাহত না করিতে পারে তাহা দেখা প্রয়োজন। উভয়ের যথাযথ সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের ভার একই জায়গায় থাকা দরকার। স্বভাবতই এই ভার থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই অধিকারের মারফত শিল্প সংরক্ষণ নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের ফল রাজস্বের জন্তই হউক অথবা সংরক্ষণের জন্তই হউক, সব লোকের জন্ত এক হইতে পারে না। বিভিন্ন জায়গায় ইহার অর্থ বিভিন্ন রূপ হইবে, যেমন পাটের উপর শুল্কের চাপ প্রায় সমস্তটাই পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের উপরই পড়িবে। আবার চিনির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করার ফল হইয়াছে এই যে মুসলমানগণ এবং অত্যন্ত লোকেরা চিনি ব্যবহার করিবার জন্ত বেশী টাকা দিতেছে এবং যুক্তপ্রদেশ বিহারের হিন্দু আখচাষীগণ এবং অমুসলমান চিনির কলের মালিকগণ লাভবান হইতেছে। এই ধরনের আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি

এই কথা প্রমাণিত হইতেছে যে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য করায় কর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে অর্থের পুনর্বন্টন এবং লাভ ও ক্ষতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ :—সর্বত্র সমান হারে আবগারী শুল্ক ধার্য করা চলে না। মাত্র কয়েকটি জিনিষের উপরেই শুল্ক ধার্য করা হয় এবং এই শুল্কগুলির হারেও তারতম্য ঘটে। উপরন্তু এই আবগারী শুল্কের ফলে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ফলাফল হয়। কাজেই এই ব্যাপারের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার লোকের ব্যয়ের বোঝা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। এই কর ধার্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশের লোকের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। প্রত্যক্ষ ভাবে যে কর্তৃপক্ষ কর ধার্য করে তাহার সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক বেশী। এই কারণেই প্রত্যেকে দেশের ক্ষেত্রের মতো আংশিক মণ্ডলগুলি প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়া পরোক্ষ করের ভার কেন্দ্রের হাতে দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের ফলে প্রদেশগুলির প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ফলত তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

মুদ্রানীতি :—মুদ্রানীতি দ্বারাই প্রয়োজনানুসারে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি সংকট সময়ে মুদ্রাপ্রচলন ব্যবস্থাই হইতেছে কেন্দ্রীয় অর্থ সংগ্রহের প্রধান উপায়। যদি একবার মানিয়া লওয়া হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির অর্থ সাহায্য ব্যতীত কর ধার্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে তবে মুদ্রানীতির উপরে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যাইবে।

মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং উভয়ের সমন্বয়িত অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে ব্যাঙ্কিংও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসিবে। কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স তুলিয়া ধরচা চালাইবার অধিকার লাভ করিলে মুদ্রানীতি তাহাদের হাতে যাইবেই এবং মুদ্রানীতি গেলে ব্যাঙ্কও যাইবে।

রক্ষাকবচ :—মিশনের প্রভাবে বলা হইয়াছে যে প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্ত উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মত দরকার হইবে। ইহার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মমূলক স্বার্থে অযথা হস্তক্ষেপের প্রতিবিধান হইতে পারে। কিন্তু এই ধরনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কারণ কোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বা ধর্মকে ধীরে ধীরে এবং অলক্ষ্যে বিনষ্ট করিবার একটি উপায় অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নাই। কারণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে “প্রধান সাম্প্রদায়িক সমস্যা” বলিয়া আখ্যা দিতে গেলে কেহ শুনবে না।

সিদ্ধান্ত :—কোন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত কয়েকটি প্রধান বিষয় হইতেছে :—

- ১। বৈদেশিক বাণিজ্য
- ২। সংরক্ষণমূলক ব্যাঙ্ক
- ৩। সাধারণ ব্যয় (ইহার মধ্যে দেশরক্ষার জন্ত ব্যয় একটি প্রধান অংশ অধিকার করে)
- ৪। আয়কর
- ৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- ৬। মৌলিক শিল্প
- ৭। মুদ্রানীতি
- ৮। ব্যাঙ্কিং।

প্রায় সব বিষয়ই কোন-না-কোন কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হইবে এবং এই সরকার বাস্তবত একটি অর্থও হিন্দু-স্থান কেন্দ্রীয় সরকারই হইবে। প্রদেশগুলি দেখিতে পাইবে যে তাহাদের প্রধান প্রধান প্রায় সব বিষয়ের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা, এবং তাহাদের কাজ হইবে এই নীতি অনুসারে কাজ করিয়া যাওয়া। এই কথা বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না যে, এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রদেশ ও প্রদেশ মণ্ডলগুলি কতকগুলি সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটির বৃহত্তর সংস্করণমাত্র হইবে।

দুর্ভিক্ষের প্রথম পর্যায়

গত এক মাসের বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে দুর্ভিক্ষ আর আমাদের কাছে এখন দূর সম্ভাবনা নহে। খাদ্যভাবের করাল ছায়া সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্বে যখন কলিকাতায় অনাহারে মৃত্যুর খবর শোনা গেল তখন বুঝিতে পারা গেল যে আমাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিছুকাল পূর্বের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সরকার লোকের মনের মিথ্যা সন্দেহকে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সমগ্র বাংলায় আজ যে খাদ্যভাবের বিপদ বনাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তো অমূলক ভীতিপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। গত এক মাসে কি রকম ভাবে চাউলের মূল্য বাড়তির দিকে চলিয়া কোন কোন স্থানে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনা করিলেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। দেখা যাইবে ১৯৪৩-এর পুনরারত্তির সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পুনরারত্তির ফলাফলও নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহের একটি সংবাদ হইতে আরম্ভ করা যাক। কিশোরগঞ্জে চাউলের দর ১৭ টাকা হইতে ২০ টাকা, রংপুরে সর্বোচ্চ দর ২০ টাকা, ঢাকার গ্রামাঞ্চলে ২০ টাকা। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে ‘ভারত’ জানাইতেছেন মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ২৯ টাকা। নারায়ণগঞ্জে

৩৫ টাকা এবং বিক্রমপুরের গ্রামে ২৩।২৪ টাকা। তিন চার দিন পরে এ.পি, জানাইতেছেন জামালপুরে চাউলের দর সহস্রা বাড়িয়া ১৩ টাকা হইতে ২০ টাকা হইয়াছে। এই সময় অর্থাৎ ৯ই ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে চাউলের দাম বিভিন্ন জায়গায় ছিল নিম্নরূপ :

বগুড়া—২৫
টাঙ্গাইল—৩০
মুন্সীগঞ্জ—৩০
সিরাজগঞ্জ—২০
নোয়াখালী—২০, হইতে ২৫
মাদারীপুর—২২
নেত্রকোণা—২০
ফেনী—১৯
চাঁদপুর—২৬
বরিশাল—১৯
চরঘুগুরিয়া—২৪

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ উপরোক্ত সংবাদের প্রায় এক সপ্তাহ পরে চাউলের দাম কি ভাবে বাড়িয়া গেল তাহা নিম্নলিখিত দরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে :

বরিশাল—২০, হইতে ২৪
মাদারীপুর—৩৫
ফরিদপুর—৩০
মুন্সীগঞ্জ—৩২
পাবনা—১৭, হইতে ২০

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে, ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'ভারতে' সেই সময়কার চাউলের দরের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহের দরবৃদ্ধি দিয়াই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

সিরাজগঞ্জ—৪০
ঐ (গ্রামাঞ্চল)—৩২
ময়মনসিংহ—৩৭
পিনাং (ময়মনসিংহ)—২৬
বজ্রযোগিনী (ঢাকা)—৩৫
ফরিদপুর—২২
মাদারীপুর—৩০
চাঁদপুর—৪০
নোয়াখালী—৩৪
ফেনী—২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া—২৩
আমতা (হাওড়া)—২০
বাঁকড়া—২০
বর্ধমান—২০

২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'নবযুগে' যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায় মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ৩৫ টাকা, বরিশালে ২৫ টাকা, গাইবান্ধায় ২৪ টাকা, বেরায় ২৫ টাকা এবং সন্দ্বীপে ২০ টাকা।

চাউলের দরের এই যে ক্রমিক বৃদ্ধি আজও ইহা বন্ধ হয় নাই। এই দরের তালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে লোকের মনে যদি আতঙ্ক বা ভয় হয় তবে কি তাহা অসঙ্গত? ১৯৪৬ সালের জুন মাসে যদি ১৯৪৩ সনের জুন মাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে পরিণাম কি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সেই পরিণামের সূচনাও আরম্ভ হইয়াছে। অনশনে মৃত্যুর সংবাদ ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলার অন্ন সমস্যার কতকগুলি কারণ

'নবযুগ' বাংলার কৃষক-প্রজা দলের মুখপত্র। দেশের মাটির সহিত ষাঁহাদের যোগ নিবিড়তম তাঁহারা এই কাগজ-খানির পরিচালক। বাংলার আসন্ন দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'নবযুগে' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি :

১। এই মাসে বৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববঙ্গে আউস ধানের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও পুনরায় ধান বপনে বিলম্ব হইতেছে। আউস ধান শরৎকালীন শস্য ও বাংলার অন্ততম প্রধান ফসল। ২। সরকারী গুদামে মজুত শস্যের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ৩। বাহির হইতে এত অধিকসংখ্যক ছুঃস্থ বাংলায় প্রবেশ করিতেছে যে, সরকারী কর্মচারিগণ অস্ত্রাস্ত্র প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহাদের স্ব-প্রদেশবাসী ছুঃস্থদের লইয়া যাইতে অনুরোধ জানাইছেন। ৪। কোন কোন জেলায় চাউল ও আটার দর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দরিদ্রদের পক্ষে চাউল বা আটা ক্রয় ক্রমশ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এক রকমের মোটা চাউল পাওয়া যাইতেছে বটে, তবে তাহা খাওয়ার অযোগ্য।

বাংলায় ছয় কোটিরও অধিক লোকের বাস। সমস্ত ভারতের উৎপন্ন চাউলের এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় জন্মায়। এপ্রিল ও মে মাসে বাংলায় যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। এপ্রিলের বৃষ্টিতে আউস ও আমন ধান বপনের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু মে মাসের বৃষ্টি ও তৎসহ প্রবল বাতাসে আউসের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় মে মাসের মাঝামাঝি পর্বন্ত আউস ধানের মোটা শতকরা দশ ভাগ রোপণ করা হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষেত্রে জল জমিয়া যায়, ক্ষতির পরিমাণ কত তাহা নির্ণয় করার জন্য সরকারী কর্মচারিগণ রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছেন। সরকার চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা

গিয়াছে। রবি শতকের পরিমাণও ১৯৪৫ সালের অনুরূপ হয় নাই। বর্তমান খাজসস্কটের ইহাও একটি কারণ।

গ্রামবাসীর অবস্থা

চাউলের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের লোকের অবস্থা কি হইয়াছে নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত রজনী-কান্ত প্রামাণিক তমলুক মহকুমার শোচনীয় অন্নসঙ্কট ও দুরবস্থা সম্পর্কে এই বিবৃতিটি দিয়াছেন। শুধু মেদিনীপুরের তমলুক নয়, বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে এবং সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, নোয়াখালী জেলা প্রভৃতিরও অনেক এলাকায় গ্রামবাসীর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকারে গবন্মেণ্টের কোন আশ্রয় নাই। সাহায্যদানের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নাই। তত্বপূর্ণ গত দুর্ভিক্ষে ও দুর্গোপাত্যায় বিধবস্ত অকলসমূহে যে সব ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখন অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের চেষ্টা হইতেছে এবং ঋণ মহলের ঋজনা আদায়ও যথারীতি নিষ্ঠুর ভাবেই চলিতেছে। গ্রামের অবস্থা সহজে গবন্মেণ্টকে সচেতন করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ জাগ্রত করিবার জন্য যে আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই এবং হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। গ্রামের যে অবস্থা তাহাতে শুধু চাউলের দর ও খাজাবাবের বিবরণ প্রকাশই যথেষ্ট নয়, গ্রামের লোকের সর্ববিধ দুর্দশার চিত্র প্রকাশিত হওয়া দরকার। আলোচ্য বিবৃতিটিতে তমলুক অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থার মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল :

তমলুক মহকুমার ছয়টি থানা—নন্দীগ্রাম, স্তাহাটা, মহিষাদল, ময়না, তমলুক, পাঁশকুড়া—সর্বত্রই দারুণ অনাভাব ঘটিয়াছে। গত ঋতুকার সময় এই মহকুমার জনসাধারণ সর্ববাস্তব হইয়াছিল। ঐ সময়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী সংক্রামক রোগের প্রাচুর্য এখনও মিটে নাই, বিভিন্ন স্থানে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, জনসাধারণের জীবনীশক্তি ধ্বংস করিতেছে। এই বৎসরও সারা মহকুমায় ফসল মোটেই হয় নাই। নন্দীগ্রাম, স্তাহাটা থানার সমুদয় অঞ্চল, মহিষাদল থানার কয়দংশে লোনাঙ্গল প্রবেশ করায় পানীয় জলের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। জমিগুলি লবণাক্ত হওয়ায় ফসল জন্মানোর অল্পপুঙ্ক্ত হইয়াছে। পাঁশকুড়া থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে দুই-তিনটি বাদে বাকীগুলিতে গড়ে একর পিছু ৪/০ মণের বেশী ধান হয় নাই। তমলুক ও অন্যান্য থানার অবস্থা ঐরূপ। স্তাহাটা থানার ২ নং ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামের বিপিন দাস (৫২) অনাভাবে সংসারযাত্রা

নির্বাহ করিতে না পারিয়া কিছুদিন পূর্বে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই স্থানগুলিতে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই মহকুমার জনসাধারণ জৈষ্ঠের প্রথম হইতে একেবারে অনাভাবে পতিত হইবে। সরকারী ও বেসরকারী ঋণের জন্য শতকরা ৯০ জন লোকের জমি বাঁধা পড়িয়াছে। অস্থাবর সম্পত্তি, ধালা, বাটি ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলে হয়। গরু, বাছুর ইত্যাদিও গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অল্প। এরকম অবস্থায় ব্যাপক সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে অচিরেই এই মহকুমার বহু অংশ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হইবে—

পার্বতীপুর গ্রামের বিপিন দাসের অনাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ শুনিয়া আমি তমলুক মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত ও রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীঅনঙ্গমোহন দাসের সহিত উক্ত গ্রামে উপস্থিত হই। আমরা সেখানেও যখন উপস্থিত হই তখন স্থানীয় মাখন-লাল রায় প্রামাণিক, শ্রামচরণ দাস, পঞ্চানন মান্না প্রভৃতি প্রায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। মৃত বিপিনের নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। বিপিন দাস পূর্বে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ক্রমাগত অজ্ঞান হওয়ায় সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মাত্র বার বিধা জমি থাকে; বন্যার পর সাত বিধা জমি অনাভাবে বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। গত দুই বৎসর পর পর অজ্ঞান হওয়ায় বাকী পাঁচ বিধা জমি তমলুক লোন কোম্পানীর নিকট বন্ধক দিয়া দুই শত টাকা ঋণ লইয়া সংসার চালায়।

সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্ত অল্প কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিন দিন অনাহারে থাকিবার পর সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। বর্তমানে তার পরিবারে আট জন লোক রহিয়াছে, তাহার মধ্যে দুই জন স্ত্রী-লোক ও পাঁচ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, এক জন মাত্র সক্ষম ব্যক্তি। এই অঞ্চলে অস্থাবর সম্পত্তি কাহারও নাই বলিলেই চলে। অনেকে কাজ না পাইয়া বিদেশে কাজের জন্ত চলিয়া গিয়াছে, গরু প্রভৃতি পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, যাহা আছে তাহাও বিচালী ও কুঁড়ার অভাবে মৃতপ্রায়।

প্রতিকারের উপায়—(১) অবিলম্বে রিলিফের ব্যবস্থা, (২) সর্বপ্রকার লোন আদায় স্থগিত, (৩) ঋণ মহলের ঋজনা আদায় মকুব, (৪) ধান ভানার ব্যবস্থা, (৫) স্তাহাটা, (৬) হাওমেসিনের সাহায্যে সরিষা হইতে তৈল প্রস্তুত, (৭) নারিকেল দড়ি, পাট ও সনের দড়ি প্রস্তুত করান, (৮) ধাতার দ্বারা আটা প্রস্তুত করান, (৯) আউস ও আমন উভয় প্রকারের বীজ দান প্রদান করা, (১০) অরহর, ভুট্টা, বিউলী ও তুলাবীজ দেওয়ার

ব্যবস্থা করা এবং (১১) স্বল্প মূল্যে চাউল বিক্রীর জন্ত
দোকান খোলা।

গ্রামাঞ্চলে রেশনিঙের নমুনা

বাংলা-সরকার গ্রামাঞ্চলে “মডিফায়েড রেশনিং” প্রবর্তন
করিয়েছেন এবং তদনুসারে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক
রেশন কার্ড পাইয়াছে বলিয়া কৃতিত্ব আহির করিবার চেষ্টা
করিয়া থাকেন। রেশন কার্ড ইহার পাইয়াছে সত্য কিন্তু
রেশন যে কি ভাবে পায় তাহার কিছু নমুনা সম্প্রতি প্রকাশিত
হইয়াছে। নিম্নে উহার দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। উহা
হইতেই গ্রামের লোকের দুর্দশা অনুমান করা সহজ হইবে।
১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের “ভারত” লিখিতেছেন :—

সরকারী রেশন-ব্যবস্থার উপর দেশের লোকের আস্থা
বজায় রাখা কঠিন হইয়াছে। কলিকাতা এবং অজ্ঞাত আটটি
শহরের প্রায় ৬০ লক্ষ লোককে রেশন জোগাইতে গিয়াই
বাংলা-সরকার গলদ্বর্ষ হইয়াছেন, তাও এখানে বিলাতের
জায় বালক যুবা, ছাত্র শ্রমিক, প্রস্তুতি ও শিশু প্রভৃতি বিভিন্ন
শ্রেণীর জন্ত বিভিন্ন বরাদ্দ নাই এবং সেখানকার মত ডিম, দুধ,
মাছ, মাংস, মাখন, চিনি প্রভৃতিও রেশন করিতে হয় নাই।
চাউল, চিনি, আটা ও লবণ এই চারিটি দ্রব্য, শিশু বৃদ্ধ, রোগী
ও নরনারী নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর লোককে একই হারে
জোগান দিতে গিয়া ইহার নাজেহাল হইতেছেন। গ্রামের
লোকের জন্ত আছে “মডিফায়েড রেশনিং।” এই অপূর্ব রেশ-
নিঙের একটি নমুনা এখানে দেওয়া গেল। বিক্রমপুরের একটি
ইউনিয়নে ১৭০৪১ জন লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে শিশু
ও বয়স্ক লইয়া মোট ৩০৯৬৬ ইউনিট (পূর্ণ বয়স্ক ২ ইউনিট
ও শিশু ১ ইউনিট হিসাবে) রেশন কার্ড চাঙ্গ আছে। ১৯৪৫
সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই
লোকগুলিকে রেশন কার্ড মারফৎ দেওয়ার জন্ত ফুড কমিটি
নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাইয়াছে :—

ধান—	৬৭৫৫/৫০
চিনি—	৪২৯/৭৫০
কেরোসিন—	১৪২৬ টন
কমলা—	৫০৫/০
সরিষার তৈল—	১৭৬৫০৫/০
নারিকেল তৈল—	৩/৩
লবণ—	১১৯২৫৭
ময়দা—	৩২/৫
শাড়ী—	৩৩৫৯ খানা
ধূতি—	৭৮২৯
মার্কিং, শার্ট ইত্যাদি—	২৬০২১১৫০ গজ
বিহানার চাদর—	১৬ খানা
কম্বল—	১৮

ছাতা— ১৮টি
লুঙ্গি— ১০০টি

একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে, এই ১৭০৪১ জন
লোক বৎসরে এক সের হিসাবে চিনি, সের দেড়েক কমলা
ও আধ সেরেরও কম সরিষার তৈল পাইয়াছে। যে
গবমেণ্ট বছরে এক সের চিনি বা আধ সের তেলের
বেশী রেশন কার্ড মারফৎ সরবরাহ করিতে পরে না, কোন
জীবিত মানুষ তাহার উপর কেমন করিয়া বিশ্বাস রাখে?

২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের “আনন্দবাজার পত্রিকা”র ঢাকার
সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে ইউনিয়ন ফুড কমিটির সেক্রেটারী-
বৃন্দের নিকট যে পত্রখানি গিয়াছে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত
হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে :

ইউনিয়ন খাজ সমিতির সেক্রেটারী মহাশয় সমীপে।

নিম্নলিখিত আদেশগুলি অবিলম্বে পালনের জন্ত
আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে :—

[ক] পরিবর্তিত বরাদ্দ পরিকল্পনা অনুসারে চাউল ও
ধাতের বরাদ্দ নিম্নলিখিত ভাবে হ্রাস করিতে হইবে :—

[১] চাউল প্রত্যেক বয়স্কের জন্ত [৮ বৎসরের অধিক]
সপ্তাহে /২ সের।

চাউল প্রত্যেক শিশুর জন্ত [৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক]
সপ্তাহে /১ সের।

[২] ধাত—প্রত্যেক বয়স্কের জন্য সপ্তাহে /৩ সের।

এই নির্দেশ শুধু ঢাকার জন্য নহে, অন্যান্য জেলাতেও
হয়ত অনুরূপ পত্র গিয়াছে ইহা অনুমান করা অসম্ভব নহে।
দুই বেলায় এক পোয়া চাউলের ভাত খাইয়া কৃষকেরা কি
ভাবে আমন ফসল জমাইবার চেষ্টা করিবে তাহা বুঝিবার মত
ক্ষমতা বর্তমান সরকারী কর্তৃপক্ষের আছে বলিয়া মনে
হয় না।

খাজ অপচয়ের পরিমাণ

সরকারী অব্যবস্থার ফলে খাজ অপচয়ের বিবরণ সংবাদপত্র-
সমূহে এত প্রকাশিত হইয়াছে যে নূতন কোন তথ্যই বিশ্বাস্যকর
মনে হইবে না। কিন্তু এই অপচয়ের মোট পরিমাণ সম্পর্কে
একটা ধারণা থাকিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বর্তমান
হুর্ডিক কেবলমাত্র বিধাতার অভিশাপ নহে। প্রাকৃতিক
বিপর্যয় অপেক্ষা সরকারী অক্ষমতা এবং দুর্নীতিই এই-
জন্য অধিকতর দায়ী। এই অপচয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকা-
শিত হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র হইতে অপচয়ের
খবরগুলি সংগ্রহ করিলে একটা আংশিক বিবরণ পাওয়া যাইতে
পারে। কিন্তু সংবাদপত্রে সব খবর প্রকাশিত হয় না, এবং
যাহা হয় সেইগুলিকে একত্র করাও খুব দুঃসাধ্য কাজ।
সম্প্রতি “যুগান্তর” বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে কতগুলি প্রধান
অপচয়ের সংবাদ একত্র করিয়া একটি তালিকা দিয়াছেন।

এই তালিকা মোট অপচয়ের তুলনায় অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে অপচয়ের বিরাট পরিমাণের অন্তত একটা আংশিক ধারণা হইবে। আমরা “মুগান্তরে”র সম্পূর্ণ বিবরণটি নিম্নে তুলিয়া দিলাম :

জানুয়ারী—১৯৪৬	
চাউল	আটা
চেতলা —	১৪০০ মণ
ফেব্রুয়ারী—১৯৪৬	
চাউল	আটা
দিনাজপুর ৩০,০০০	—
বিরেকানন্দ রোড ৪১,০০০	—

নাটোর হইতে প্রেরিত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে দেখা যায় যে, স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ী মেসার্স চিরঞ্জীলাল আগরওয়ালার গুদাম হইতে বিপুল পরিমাণে আটা অধাদ্য বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় নিষাদ্বাজারের একটি খাদে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আটা ১৯৪৩ সালের খাদ্যদ্রব্যের সময় গুদামজাত করা হইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী—১৯৪৬

ঢাকা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারীর অপর একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জে সীতলক্ষ্যা নদীতে বিপুল পরিমাণে অধাদ্য আটা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার্চ—১৯৪৬

১লা মার্চ বাগেরহাট কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এক তারে জানাইয়াছেন যে, ৮০,০০০ মণ ধান বুষ্টির জুজ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত স্থানসমূহেও খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে :—

চাউল	আটা
বাঁকুড়া ১,৬০,০০০ মণ	—
নাটোর —	১০০ বস্তা ২০০ মণ
মেহেরপুর ৫০০০ মণ	—
হাওড়া —	১০০০০০ মণ
লিলুয়া —	২০০০০০ মণ
কলিকাতা —	১০০০০০ মণ

এপ্রিল—১৯৪৬

চাউল	আটা
নেত্রকোণা —	১৪৩ মণ
মে—১৯৪৬	
চাউল	আটা
ঢাকা ৭৫০০০ মণ	—

উপরোক্ত ধান চাউল এবং আটা কেবলমাত্র ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই নষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ১৯৪৫ সালের কোন মাসে কত খাদ্য নষ্ট হইয়াছে বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :—

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ সাল হইতে—মে, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খাদ্যশস্য নষ্ট হইবার সংবাদসমূহ :

নোয়াখালি—আটা	৮৫০ মণ
কলিকাতা—আটা	৩০০০ মণ
জলপাইগুড়ি—আটা, অভ্রহর ডাল ইত্যাদি	২০০০ মণ
কলিকাতা—আটা এবং ময়দা	১৫০০০ মণ
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন	৫০০০ মণ
খুলনা রেলওয়ে কলোনী—ময়দা	১৪৬০০০ মণ
মাণিকগঞ্জ—চাউল	১০০০০০ মণ

১৯৪৫ সালে অগ্রাণ্ড সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহের মোট হিসাব :

জুলাই—১৯৪৫ : আটা—১০২৬১৮ মণ। আগষ্ট—১৯৪৫ : চাউল ৬৮৪২৮ মণ, আটা ২২০০০ মণ। সেপ্টেম্বর—১৯৪৫ : ৪৫০০০০ মণ, আটা ২১৪০০ মণ ; অক্টোবর—১৯৪৫ : চাউল ৩৩৮৮২ মণ, আটা ৩৫০০০ মণ। নবেম্বর—১৯৪৫ : চাউল ২৮৫০০ মণ, আটা ৩৫২৭ মণ।

সমস্ত হিসাবপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় :—

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত চাউল ৩১১০০০ মণ, আটা ৩১১৭৪৩ মণ নষ্ট হইয়াছে।

১৯৪৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৫ সালে চাউল ৬৮০৮১০ মণ ও আটা ৩২১৩৯৫ মণ নষ্ট হইয়াছে।

অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৯৯১৮১০ মণ চাউল এবং ৬৩৩১৩৮ মণ আটা অথবা ময়দা বিনষ্ট অথবা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই হিসাবে বাগেরহাটের ৮০০৩০ মণ ধান নষ্ট হওয়া এবং নাটোর ও ঢাকা হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে আটা নষ্ট হওয়ার যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে অধিক পরিমাণ না থাকায় ধরা হয় নাই।

• সর্বশেষ গত ২৫শে মে এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে ফকীতে স্থানীয় সরবরাহ বিভাগের গুদাম হইতে প্রচুর পরিমাণে আটা ও ময়দা নষ্ট বলিয়া স্থানীয় হেলথ অফিসার ঘোষণা করিয়াছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি একত্র করিয়া বাংলায় খাদ্যশস্য অপচয়ের এই লঙ্কাকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট হইতেছে তাহা কে বলিবে ?

কর্তৃপক্ষের আশ্বাস

যদিও সমগ্র বাংলা জুড়িয়া খাদ্যাভাব ও অনশনের তাণ্ডবলীলা শুরু হইয়া গিয়াছে তবুও কর্তৃপক্ষ বিচলিত হন নাই। বাংলা-সরকারের বড়কর্তারা ক্রমাগত আশ্বাস দিয়া যাইতেছেন যে ভয়ের কোন কারণ নাই, খাদ্যবস্থা মোটেই আশঙ্কাজনক নহে এবং খাদ্যাভাবের সংবাদ নিছক আতঙ্ক-প্রসূত। কর্তৃপক্ষের এই সর্বনাশা মনোভাব কি অজ্ঞতা, অযোগ্যতা বা ঊদাসীন্যের ফল তাহা ভবিষ্যতের বিষয়। গত মাসের সরকারী সাফাইয়ের নমুনাটি একবার দেখিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইবে।

এক মাসেরও অল্প পূর্বে বাংলা-সরকারের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর ভি. এন. রাজন এক বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে যদিও বাংলায় ৭৫০,০০০ টন খাদ্যশস্ত্র ঘাটতি আছে তথাপি নৈরাশ্রের কোন কারণ নাই। কারণ এই ঘাটতির পরিমাণ অস্বাভাবিক নহে, যুদ্ধের পূর্বে ইহা অপেক্ষা বেশী ঘাটতির নজির আছে।

কিছুদিন পরে এক বেতার-বক্তৃতায় খাদ্যবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এন. কে. চ্যাটার্জি খাদ্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আশ্বাসের মাত্রাকে আরও বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে সরকার এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে এই বৎসর আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন স্থানীয় আতঙ্কই এই ঘটনার কারণ। তিনি আশ্বাস দেন যে গবর্নমেন্টের হাতে যে পরিমাণ চাউল মজুত আছে, তাহা দ্বারা অনেক দিন পর্যন্ত রেশন অঞ্চলগুলির চাহিদা মিটান যাইবে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি এবার কেন হইবে না তাহার নিম্নলিখিত কারণ-গুলি তিনি দিয়াছেন।

(১) ১৯৪৩ সালে বাংলা গবর্নমেন্টের হাতে খাদ্য প্রায় একেবারেই মজুত ছিল না। এবার তিন লক্ষ সওয়া পঁচিশ হাজার টন চাউল মজুত আছে।

(২) ১৯৪৩ সালে গবর্নমেন্টের চাউল সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এবার তাহা আছে এবং ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বা জেলাগুলিতে অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ছিল না। এবার সংগ্রহ, মজুত ও বণ্টন ব্যবস্থার জ্ঞত যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী আছেন।

(৪) ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্ত্র মজুত করিবার জ্ঞত কোন গুদাম ছিল না, এবার তাহা আছে।

(৫) ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের জ্ঞত যানবাহনের সমস্তা অতি তীব্র ছিল। এবার তাহা নাই।

যুক্তিগুলি স্বাভাবিক ও সম্ভব সন্দেহ নাই এবং সেই-জন্মই আমাদের হৃৎকণ্ঠে বোঁী। আমাদের প্রশ্ন এই যে এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চাউলের দাম বাড়িতেছে কেন এবং

অনশন ও যত্ন আরম্ভ হইয়াছে কেন? ইহার কারণ কি জনসাধারণের আতঙ্ক না সরকারের অযোগ্যতা? যদি আতঙ্ক থাকে তবে তাহা কি অমূলক? সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার নমুনা দেখিয়া লোকের মনে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়িতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আতঙ্ককে দূর করিতে হইলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন এই অযোগ্য সরকার তাহা করিতে অক্ষম। যে কর্মচারীদের কথা মিঃ চ্যাটার্জি বলিয়াছেন তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং অকর্মণ্য। যে গুদামের আশ্বাস তিনি দিয়াছেন সেগুলিতে সরকারের কর্ম-নৈপুণ্যে চাউল কেবলমাত্র পচে, যে চাউল সংগ্রহ-ব্যবস্থার কথা তিনি বলিয়াছেন, সে ব্যবস্থাতে সংগ্রহ-কারী এজেন্টরা চোরাকারবার করে। ইহার পরেও লোকের মনে সরকারের প্রতি আস্থা থাকিবে কি করিয়া?

ইহার পরে দেখা যাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি সাহেব কি বলেন? চাঁদপুর কলেজে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে চাঁদপুরকে চাউল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে আতঙ্ক যুক্তিহীন, কেননা ঐ আতঙ্কের কোন ভিত্তি নাই। বর্তমান পরিস্থিতির কোন 'যুক্তি' নাই। দেশের খাদ্যবস্থা প্রধান মন্ত্রীর যুক্তি অনুসারে চলে না ইহা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু যুক্তি থাকুক অথবা নাই থাকুক মিঃ সুরাবর্দির আশ্বাস সত্ত্বেও চাঁদপুরে চাউলের দাম আজ পর্যন্ত-চল্লিশ টাকা। মিঃ সুরাবর্দি অজ্ঞত বলিয়াছেন যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার উপায় সরকারী গুদাম হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয় করা। ইহা সত্য কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ব্যবস্থা কেন অবলম্বিত হইতেছে না। মিঃ চ্যাটার্জির মতানুসারে যদি সরকারের হাতে যথেষ্ট চাউল মজুত থাকে তবে সেই চাউল বাজারে ছাড়িয়া এই মূল্য-বৃদ্ধি রোধ করা হউক। কিন্তু আজ পর্যন্তও তাহা হইতেছে না।

সর্বশেষ আশ্বাস দিয়াছেন দিল্লী হইতে ভারত-সরকারের খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী সন্ন্যাসী হাচিংস। তিনি ৭ই জুনের বক্তৃতায় বলেন যে, সরকারী সংবাদ অনুসারে মুন্সীগঞ্জে চাউলের দর ২৬ টাকা, নারায়ণগঞ্জে ২১।০, এবং ঢাকা সদরে ২১ টাকা। পূর্ববঙ্গের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে যানবাহনের অপ্রবিধা, জনসাধারণের আতঙ্ক এবং বণ্টন দ্রুত আউসের ক্ষতির জন্ম এই অবস্থা ঘটয়াছে। তথাপি তিনি আশ্বাস দেন যে বাংলাদেশের পক্ষে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট খাদ্য শিক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না। বাংলা তাহার নিজের মজুত খাদ্য দিয়াই নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

আমল রেল-ধর্মঘট

রেল-কর্মচারিবৃন্দ আগামী ২৭শে জুন হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়াছেন। গত ১লা

জুন এই নোটিশ দেওয়া হয় এবং তদুপলক্ষে কলিকাতায় টেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি বসুর সভাপতিত্বে রেল-কর্মচারীদের এক সভা হয়। কর্মচারীদের দাবি লইয়া কর্তৃপক্ষের সহিত কর্মচারীদের ফেডারেশনের যে দরকষাকষি চলিতেছিল আপাতত তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

কর্মচারীদের দাবী মোটামুটি এইরূপ :

১। নিম্নপদস্থ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া অন্ত্য ২৫ টাকা করিতে হইবে।

২। ২৫০ টাকার নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বেতন অবিলম্বে ১০ টাকা হিসাবে বাড়াইতে হইবে।

৩। প্রত্যেক কর্মচারীকে ১০০ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিতে হইবে।

৪। বিভিন্ন অঞ্চলে মাগ্‌গি ভাতার যে তারতম্য আছে তাহা বাতিল করিয়া সকলকে এক হারে ভাতা দিতে হইবে।

৫। কর্মচারীদের কাজের সময় কমানিয়া ৮ ঘণ্টা করিতে হইবে।

৬। যাহারা ছুটিতে যাইবে তাহাদের বদলি হিসাবে যত লোক এখন রাখা হয় তাহার সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগ বাড়াইতে হইবে।

৭। ছুটি সম্বন্ধে কেরাণীরা যে সুবিধা পায় তাহা শ্রমিকদেরও দিতে হইবে।

৮। শ্রমিকদের দিন মজুরি দেওয়া বন্ধ করিয়া মাস-মাহিনা দিতে হইবে।

৯। যে সব কর্মচারী একাদিক্রমে এক বৎসর কাজ করিয়াছে তাহাদের চাকুরি পাকা করিতে হইবে।

১০। চুক্তি করিয়া শ্রমিক খাটানো বন্ধ করিতে হইবে।

১১। মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত লোক ছাঁটাই বন্ধ করিতে হইবে।

ইহার জবাবে রেলওয়ে বোর্ড নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন :

১। বর্তমানে যাহাদের বেতন ১৪ টাকা আছে তাহা বাড়াইয়া ১৬ টাকা করা হইবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাব করিবার সময় মাগ্‌গি ভাতার অর্ধেক বেতনের সহিত ধরা হইবে।

২। নিম্ন বেতনের কেরাণীদের সকলের বেতন ৩০ টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৮৫ টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে। এই সামান্য বেতন বৃদ্ধিতেই রেলের ব্যয় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়িবে।

নিম্নপদস্থ শ্রমিক ও কেরাণী কর্মচারীদের বেতন আরও বাড়াইবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করিতে হইবে ইহাতে স্খিমত থাকিতে পারে না। ১৬ টাকা বা ৩০ টাকা বর্তমান সময়ে কেন, কোন সময়েই সমর্থনযোগ্য নহে। উচ্চপদে ৩০০০ টাকা ও নিম্নপদে ১৬ টাকা বেতনের এই অত্যাচার তারতম্য যত শীঘ্র

দূর হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা একটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। বর্তমান রেলওয়ে বোর্ড যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত তাহাতে ইহাদের হাতে কর্মচারীদের সুবিচার প্রাপ্তির আশা কম। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এক প্রস্তাব আনিয়া দাবি করিয়াছিলেন যে ইংরেজের স্বার্থে ইংরেজ পরিচালনায় আমাদের রেলের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হউক। এরূপ একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও হইয়াছিল। তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতিক্রেত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটয়াছে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করিলে সমগ্র রেল বিভাগের উপর দেশবাসীর নিজস্ব অধিকার বিস্তৃত হইবে। তখন শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রস্তাবিত কমিটি আরও স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া রেলের সকল গলদ ধরিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের ধারণা এই ধরণের একটা ভাল তদন্ত হইলে রেলের ব্যয় বহু কোটি টাকা কমানো সম্ভব হইবে এবং নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের বেতন শতকরা দশ টাকা কেন, তার চেয়েও বেশী বাড়ানো চলিবে। ইহার জন্য আন্দোলনই যথেষ্ট হইবে, ধর্মঘটের প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে ত্রায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করিতে হইলে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে।

রেল-ধর্মঘটের বর্তমান সময়ে নোটিশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। আগামী ফসল উঠিবার আগে ধর্মঘট দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর হইবে। ছুড়িফের মুখে ধর্মঘটের দ্বারা রেল-কর্মচারীদের সুবিধা হইতে পারে কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে বহু লক্ষ লোককে অনশনে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। রেল-কর্মচারীদের ব্যবহারে জনসাধারণ সন্তুষ্ট নয় ইহা আমরা আগেও দেখাইয়াছি। যুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ কলিকাতায় বোমা পড়িবার পর, লোকজনের শহর ত্যাগের সময় রেল-কর্মচারীরা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা ভুলিতে সময় লাগিবে। শিশু, রোগী ও স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া ভ্রমণের সময় রেল-কর্মচারীদের হাতে এই সময়ে লোক যে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে এবং টিকিট জব্দ হইতে স্তব্ধ করিয়া স্টেশন পরিত্যাগ পর্যন্ত সহস্র অছিলায় যে ভাবে ইহারা ঘুষ আদায় করিয়াছে তাহা পুলিশী অত্যাচার ও ঘুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এ-কথাটা কর্মচারীরা এবং ধর্মঘটে যে নেতারা উত্তেজিত করিতেছেন তাহারা ভুলিয়া না গেলেই ভাল করিবেন।

১লা জুনের সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি বসু বলেন যে, শ্রমিকদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং উহা সকলের সমর্থন লাভ করিবে। রেল-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি দেশবাসী সমর্থন করিবে, ধর্মঘটের অসুবিধাও প্রয়োজন হইলে স্বীকার করিবে ইহা আমরাও জানি, কিন্তু আমাদের আপত্তি ধর্মঘটের

সময় সম্বন্ধে। যুদ্ধের সময় ধর্মঘট না করিয়া যাহারা ঠকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে, দুর্ভিক্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মঘটের দ্বারা দাবি আদায়ের চেষ্টা তাহারা করিতে গেলে দেশের লোকে সন্তুষ্ট হইবে না—বহু মহাশয় এই দিকটা ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিতেন। যুগলবাবু বলিয়াছেন, রেল কর্মচারীদের এই সংগ্রাম বিত্তশালী ও সর্বহারার সংগ্রাম। (Essentially this struggle of the railwaymen was a struggle between the haves and have-nots) বহু মহাশয়ের এই বক্তৃতার তাৎপর্য স্বয়ংসম করিতে আমরা অসমর্থ। ভারতীয় রেল জাতীয় সম্পত্তি। এই জাতীয় সম্পত্তি দেশবাসী ভোগ করিতে পারে নাই এইজন্য যে এই সম্পত্তি পরিচালনার ভার এত দিন আমাদের হাতে ছিল না। এই দায়িত্ব অতি শীঘ্রই দেশবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে আসিতেছে। মূল প্রশ্ন এখানে বেতনের হার, জাতির প্রতিনিধিত্ব এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সুযোগ শীঘ্রই লাভ করিবেন। রেল-কর্মচারীদের দাবি সুবিচারের দাবি, উপনিবেশ বা পরের সম্পত্তি লইয়া ‘হাভ্‌স্’ ও ‘হাভ্‌-নটসের’ বিরোধ বলিয়া আমরা মনে করি না।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ধর্মঘটের নেতাদের উক্তি বিচারসহ নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন রেল-ধর্মঘট হইলেও দুর্ভিক্ষ আসিবে, না হইলেও আসিবে। যুগলবাবু উক্ত সভায় বলিয়াছেন দুর্ভিক্ষের জন্ত রেল-কর্মচারীরা ভয় পাইবে না, সে দাবি পরিত্যাগ করিবে না। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বহু, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার প্রভৃতি শ্রমিক নেতারাও দুর্ভিক্ষের মুখে ধর্মঘটের নিন্দা না করিয়া প্রকারান্তরে উহা সমর্থনই করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি বহু যুদ্ধের কয় বৎসর নির্বিবাদে কাজ করিয়াছেন। অত্যন্ত শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই জেলে ছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতি বহু কমিউনিষ্ট, সুতরাং তিনি দল-গত নীতি অনুসারে ইংরেজকে যুদ্ধে জয় লাভ করাইবার জন্ত শ্রমিকদের যুদ্ধের মধ্যে ধর্মঘট হইতে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা বিবাস করা যায়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি যে যুগলকান্তি বহু আজ শ্রমিকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেল-ধর্মঘটের নেতৃপদ লাভের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রমিকদের জন্ত যুদ্ধের মধ্যে চেষ্টা করেন নাই কেন? ১৮৪৪ সালে রেল প্রতিষ্ঠার পর হইতে কর্মচারীরা ১০২ বৎসর যে হারে বেতন পাইতেছে তাহা বাড়াইবার জন্ত ধর্মঘটের ব্যবস্থা কি আর পাঁচ মাস পর ফল উঠিলে হইতে পারিত না? যুগল বাবু শুধু ট্রেড ইউনিয়নের নেতা নহেন, তিনি সাংবাদিকও। দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তাঁহার আছে। ফল উঠিবার আগে রেল-কর্মচারীদের যাহারা ধর্মঘটে উত্তেজিত করিতেছেন তাহারা দেশের দীন-দরিদ্র আত্ম-দিগের জন্ত—যাহাদের জন্ত রেল কোম্পানীর রেশন, ভাণ্ডার

বা হাসপাতাল কোন দিন খোলা ছিল না—কি কোনও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন না? ধর্মঘটের মধ্যে খাণ্ড-শস্ত্র ও ঔষধ যাহাতে অবাধে চলিতে পারে সে ব্যবস্থা না করিয়া যদি ধর্মঘট হয় তবে বুঝিতে হইবে রেল-শ্রমিকের নেতৃবর্গ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দেশের কোটি কোটি দরিদ্রের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ তো করিতেছেনই, এমন কি রেল-কর্মচারীদেরই এক তীব্র গণ-বিরোধিতার সম্মুখীন করিয়া তুলিতেছেন।

রেল-ধর্মঘট ও ধর্মঘটের নেতা

রেল-ধর্মঘটের নেতাদের সম্বন্ধে জনৈক প্রাক্তন রেল-কর্মচারীর নিম্নলিখিত পত্রখানি স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে :

১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে রেল-ধর্মঘট হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। প্রায় দুই মাস এই ধর্মঘট চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত উহা ব্যর্থ হয় এবং বহু কর্মচারী বেকার হয়।

ধর্মঘটের নেতারা কত রকমের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্মচারীদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে। টাকার অভাবে যখন কর্মচারীদের পক্ষে নিজের এবং পরিবারের ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভিন্ন আর সব নেতা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন তাহাও আমি ভুলি নাই। যতীন্দ্রমোহন তাঁহার শেষ কপর্দক পর্যন্ত ধর্মঘটীদের জন্ত ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য বলিয়া ধর্মঘটীদের হৃদশা মোচন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই ধর্মঘটের শেষের দিকে দেশবন্ধু দাশ ও দীনবন্ধু এগরুজ হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, এতগুলি লোককে এই ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিবার জন্ত ধর্মঘটের নেতাদের তাঁহারা ভৎসনাও করিয়াছিলেন। পদচ্যুত কর্মচারীরা আবার যাহাতে কাজে ফিরিয়া যাইতে পারে সেজন্ত তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। বহু কর্মচারীকে ভিক্ষুকে পরিণত হইতে হইয়াছিল।

রেল-কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় এবং অত্যন্ত স্থানে লোক সংগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যেই রেল চালু করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেলে যাহারা কখনও কাজ করেন নাই এবং যাহারা বর্তমানে কাজ করেন না এমন বহু লোক ধর্মঘটের নেতৃত্ব করিতেছিলেন, কর্তৃপক্ষ লোক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে ইঁহারাই সকলের আগে চাকুরি গ্রহণ করেন।

বর্তমান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিলে রেল-কর্মচারীরা উপরূত হইবেন :

যাহারা ধর্মঘটের প্ররোচনা দিতেছেন ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে তাঁহাদের কোন লোকসান নাই; রেলের সকল কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করিবে না; এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজ কর্মচারীরা ডলারিয়ার শ্রেণীভুক্ত, স্ততরাং তাহারা যোগ দিতেই পারে না। ধর্মঘট শুরু হইলে কর্তৃপক্ষ চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারা নূতন লোক নিয়োগের চেষ্টা করিবে; অসংখ্য মোটর গাড়ী ও লরী এবং এরোপ্লেন সরকারের হাতে আছে, উহার দ্বারা ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টা হইবে।

রেল-কর্মচারীদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, ধর্মঘট করিবার পূর্বে তাঁহারা যেন পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ এবং ডাঃ গান্ধীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই তিন জন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে কাজ করেন।

এই পক্ষে যে কঠিন সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে ত্রীযুক্ত যুগলকান্তি বসু, ত্রীযুক্ত জ্যোতি বসু, ত্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রীযুক্ত নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার প্রভৃতি ধর্মঘটের নেতাদের বক্তব্য দেশবাসী জানিতে চাহিবে। ধর্মঘট ভাঙিলে অসংখ্য রেল-কর্মচারীর সর্বনাশের সম্ভাবনা আছে। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। রেলের মুসলমান কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। ধর্মঘট শুরু হইলে মুসলমান নিয়োগ করিয়া রেলওয়ে বোর্ড রেল চালাইতে পারিবে কিনা, এবং এই ভাবে রেল মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলে হিন্দু কর্মচারীর স্থান আর কখনও উহাতে হইবে কিনা একথা ধর্মঘটের প্ররোচনা-দাতারা বিবেচনা করিয়াছেন কি? কলিকাতার উপকণ্ঠে টিটাগড়ে অন্ধ্র শ্রমিকদের ধর্মঘটের কি ফল হইয়াছিল সে কথা সকলেই জানে।

যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্মচারীদের উদাসীনতা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সর্দার ত্রীযুক্ত শশীকিশোর সাম্রায় নিজের রেল-দ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বহরমপুর হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

শিয়ালদহের ১৯ নং আপ গাড়ীটিতে কোন প্রকার আলোর ও পাখার ব্যবস্থা ছিল না। পরন্তু প্রত্যেকটি কামরা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ আসিতেছিল। কামরার আসন-গুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর আসনগুলির গদিও সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন ছিল। রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট এ সম্পর্কে পুনঃপুনঃ আবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় নাই, এবং তাঁহারা এই বিষয়ে নিলিপ্ত ছিলেন। আমি নিজে একবার গাড়ী থামাইবার জন্ত চেন টানিয়াছিলাম, কিন্তু গার্ড গাড়ী থামান নাই। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনটি চলিতে

ছিল। ইহাতে সমস্ত যাত্রীরই অত্যন্ত অসুবিধা ও ভীতির উদ্বেগ হইয়াছিল।

রেলের আলো, পাখা প্রভৃতি ঠিক আছে কি না দেখা ও কামরা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কি রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদের, না ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের। বিপদস্বচক চেন টানিলেও যে গার্ড গাড়ী থামায় না সেই ব্যক্তিও বেতনস্বত্বের জন্ত ধর্মঘটে যোগদানের সম্বল প্রকাশ করিয়াছে তো? আমরা বার বার এই কথাই বুঝাইতে চাহিতেছি যে যাত্রীদের সহিত রেল-কর্মচারীদের ব্যবহার এখনও সন্তোষজনক হয় নাই; যুদ্ধের সময় দেশবাসীর সকল অসুবিধা নিতরূপে ভাবে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া টাকার লোভে ইহারা যে ভাবে ইংরেজের গোলামি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে সেই মনোভাব আজও দূর হয় নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে দূর না হইলে ধর্মঘটে জনসাধারণের সক্রিয় সহায়ভূতি অর্জন কঠিন হইবে এবং দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের অকুণ্ঠ সহায়ভূতি না পাইলে এত বড় ভারতব্যাপী ধর্মঘট সফল হওয়া কঠিন হইবে।

বস্ত্রসংকট ও সরকারী বরাদ্দ

বাংলা-সরকারের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা বহুবার সমালোচনা করিয়াছি। এই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে তাঁহাদের কাজ মোটেই সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না সে বিষয়ে নূতন করিয়া মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কলিকাতার বস্ত্ররেশনিং ব্যবস্থাই তবু প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল। গ্রামাঞ্চলে এই রেশনিং-ব্যবহার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকিলে কলিকাতাবাসীরা ধারণা করিতে পারিবেন যে কলিকাতা ছাড়া বাংলার সর্বত্র কি ভয়ানক বস্ত্রসমত্তা দেখা দিয়াছে।

গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে সরকার কাপড় সরবরাহের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। কথা ছিল সকলকে দশ গজ করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে। গত এপ্রিল মাস হইতে এ বৎসরের এপ্রিল মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সরকার বিভিন্ন জেলায় যে কাপড় পাঠাইয়াছেন তাহার হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই তের মাসে সরকার মোট ২,৬৯,৮৬৫ বেল কাপড় পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই বছর এপ্রিল মাসেই কাপড় গিয়াছে প্রায় ৪১ হাজার বেল। স্ততরাং গত এক বৎসর সরকার জেলাগুলিতে এক লক্ষ আটশ হাজার বেলের মত কাপড় পাঠাইয়াছেন। জেলাগুলির লোকসংখ্যা প্রায় ছয় কোটি ধরিয়া এবং প্রতি বেলে ২০০ খানা দশ গজী কাপড় ধরিলেও দেখা যায় যে গত এক বৎসরে গড়ে মাথাপিছু সাড়ে চার গজ করিয়া কাপড় পড়ে। উপরন্তু আমরা যদিও ধরিয়া লইলাম যে দশ গজী কাপড় দেওয়া হয় আসলে আট গজী বা নয় গজী

ধৃতিই সাধারণত পাঠান হয়। সুতরাং প্রাপ্ত কাপড়ের পরিমাণ আসলে আরও কম। ইহারই নাম “মডিফায়েড রেশনিং”।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের সময় এই দাবি কৃষক-প্রজা দল তুলিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর মৌলবী ফজলুল হক এই দ্বন্দ্ব কার্য কিরূপে সাধন করা যায় সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য পরামর্শ দিবার জন্ত ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিশনের সভাপতিপদে উপযুক্ত ভারতবাসীর পরিবর্তে সর্ব ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করায় প্রতিবাদস্বরূপ সৈয়দ নৌশের আলি মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দিয়া সমস্ত জমিদারী সরকারকর্তৃক ক্রয় করিয়া লওয়া উচিত। লীগ মন্ত্রিদের আমলে কমিশনের সুপারিশ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে, শুধু নির্বাচনের সময় এক-এক বার হৈচৈ হয় মাত্র।

এবার আবার জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কথা উঠিতেছে এবং এবারকার দাবির বিশেষত্ব এই যে, এবার বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হউক বলিয়া প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছে। এক দল ইহারও উপরে আর চড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন “জমিদারীতে ষাঁহারা লাভবান হইয়াছেন সেই পক্ষভুক্ত জমিদার ও ইংরেজগণ ক্ষতিপূরণ দিবেন এবং বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন।”

ফ্লাউড কমিশন ক্ষতিপূরণ দানের পরামর্শ দিলেও ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনেই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী দখলের দাবি উঠিবে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মূল বক্তব্য এই যে, ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তখন জমিদারেরা জমির কোন দাম দেন নাই, সুতরাং আজ গবর্নেন্ট তাঁহাদের নিকট হইতে জমি লইতে গেলে তাহার জন্ত দাম দিতে হইবে কেন? তাঁহাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা সরকারের হইয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবেন এবং নির্দিষ্ট হারে সরকারী খাজনা উম্মল দিবেন। কোম্পানী জমিদারের দেয় খাজনার পরিমাণ চিরদিনের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু প্রজার দেয় খাজনা বাঁধিয়া দেন নাই। জমিদারেরা প্রজার খাজনা বাড়াইয়া এবং নূতন জমিতে প্রজা বসাইয়া এত দিন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং সেই অর্থ নিজেরা ভোগ করিয়াছেন। কোম্পানীর আমল হইতে এই ভাবে তাঁহারা সরকারের হইয়া যে তহশীলদারী

করিয়া আসিয়াছেন বর্তমান গবর্নেন্ট তাঁহাদিগকে সেই কার্য হইতে রেহাই দিতে চাহিলে ঐ সঙ্গে জমির মূল্যস্বরূপ তাঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কেন? এই আপত্তি আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও উহা বিচারসহ নহে। কারণ ১৫৩ বৎসর পূর্বে যে জমিদারদের সহিত কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন ভিন্ন আর সকলেরই জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। নীলামে শুধু বাকি খাজনা উম্মল দিয়া এই সব জমিদারী কেহ কেনেন নাই, ষাঁহারা কিনিয়াছেন তাঁহাদিগকে জমির উপস্থিত অনুসারে অপর অস্থাবর সম্পত্তির ভায়া খাজনার বহু গুণ টাকা মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছে। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাদিগকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া অসঙ্গত হইবে।

জমিদারী প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই রূপে দূর হইলে সাম্প্রদায়িক সমতা সমাধানের পথও প্রশস্ত হইবে। বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু, তাঁহাদের নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতিও হিন্দু। প্রজার অধিকাংশ মুসলমান। জমিদারের সহিত প্রজার সম্পর্ক অনেকটা ষাণ্ড-খাদক সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ কৃষক গবর্নেন্টের সাফাং পায় না, জমিদারের নায়েব প্রভৃতিকেই তাহার সরকারী ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া মনে করে। জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে খাজনা আদায়ের ভার সরকারের হাতে যাইবে এবং খাজনা আদায়কারী নায়েব, গোমস্তার সংখ্যা চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে অর্ধেকের বেশী হইবে। মুসলমান নায়েব ও মুসলমান পেয়াদা সরকারী সার্টফিকেটের জোরে মুসলমান চাষীর ঘটি বাটি বাকি খাজনার দায়ে যখন টানাটানি আরম্ভ করিবে, সরকারের স্বরূপ সম্বন্ধে মুসলমান প্রজার চোখ ফুটিবে সেই দিন। হিন্দু জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন প্রভৃতিকে বাদ দিয়া সরকারের মুসলমান কর্তৃপক্ষের কার্য-কলাপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার সুযোগ মুসলমান প্রজা সেই দিন হইতে প্রাপ্ত হইবে।

সন্দ্বীপে নৌকাডুবি

নোয়াখালী জেলায় সন্দ্বীপ নামে একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। যুদ্ধের আগে সন্দ্বীপে যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল চটগ্রাম-বরিশাল ষ্ট্রামার সার্ভিস। একট ছোট লঞ্চ-জাতীয় ষ্ট্রামার মাঝে মাঝে নোয়াখালীর সহিত উহার যোগ রক্ষা করিত, তবে অধিকাংশ সময়েই এই ষ্ট্রামারটি চরে চেকিয়া পড়িয়া থাকিত। গত কয়েক বৎসর যাবৎ উভয় ষ্ট্রামার সার্ভিসই বন্ধ হইয়াছে। নৌকা এখন সন্দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র উপায়। সমুদ্র অতিক্রম করিবার এই সব নৌকা অনেক সময় বিপন্ন হয়, নৌকাডুবির ফলে প্রাণহানির সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিমাণও কম হয় না। দ্বীপের লোকদের পক্ষে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা শুধু

যাতায়াতের দিক দিয়াই হুঃসাধ্য নয়, দিনের পর দিন ডাকের অভাবে বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এখানকার লোকদের দিন কাটাতে হয়। অথচ সন্দীপ স্মৃতি ও নারিকেল ব্যবসায়ের একটি বড় কেন্দ্র।

নৌকাডুবির ফলে কি ভীষণ ক্ষতি হইতেছে তাহার কিছু পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী আমাদের নিকট গত এক বৎসরের নৌকাডুবির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। তালিকাটি এইরূপ :

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫ : পাঁচ জন আরোহীসহ নোয়াখালী হইতে সন্দীপ আসার পথে মেঘনার মোহানায় চর শিবভূঞার নিকট নৌকাডুবি। আরোহীদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫ : নোয়াখালী হইতে সন্দীপ আসিবার পথে মেঘনার মোহানায় “বাগুয়ার দোনায়” কালবৈশাখীর ঝড়ে পড়িয়া মাঝিমাঝা ও আট-দশ জন আরোহীসহ নৌকাডুবি। লোকজনের কোন সন্ধান মিলে নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা।

৫ই মে, ১৯৪৫ : পনর-ঘোল জন যাত্রী ও মালপত্রসহ কুমিরা হইতে সন্দীপ আসার পথে নৌকাডুবি। চরের অতি নিকটে নৌকাডুবি হওয়ায় প্রাণহানি ঘটে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

১৩ই জুলাই, ১৯৪৫ : প্রত্যেকখানিতে প্রায় ত্রিশ জন যাত্রীসহ দুইখানি নৌকা একত্রে কুমিরা হইতে সন্দীপ আসিবার পথে কুল হইতে তিন মাইল দূরে একটি নৌকা ডুবিয়া যায়। চার জনের খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার হাজার টাকা।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ : নোয়াখালী হইতে সন্দীপ আসিবার পথে চৌদ্দ-পনর জন লোকসহ নৌকাডুবি। চরের নিকটে নৌকাডুবি হওয়ায় অনেকে সাতরাইয়া ডাঙায় উঠিতে সমর্থ হয় কিন্তু পাঁচ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

২০শে অক্টোবর ১৯৪৫ : ১৫।১৬ জন আরোহীসহ কুমিরা হইতে সন্দীপ আসিবার পথে নৌকাডুবি। একজন লোকের সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই হাজার টাকা।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ : পাঁচখানি ধানের নৌকা হাতিয়া হইতে সন্দীপ আসার পথে ডুবিয়া যায়। তিন-চার জনের সন্ধান মিলে নাই, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার টাকা।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ : হাতিয়া হইতে ধানের নৌকা সন্দীপ আসার পথে ডুবিয়া যায়। দুই-তিন জন লোক নিখোঁজ, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় হাজার টাকা।

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬ : দশ-বার জন আরোহীসহ নোয়াখালী

হইতে সন্দীপ আসিবার পথে নৌকাডুবি। চরের নিকটে জলমগ্ন হওয়ায় লোকজন সাতরাইয়া ডাঙায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার টাকা।

ইহা মাত্র এক বৎসরের বিবরণ। বহু বৎসর যাবৎ এই ব্যাপার চলিতেছে। এক-একটি বড় রকমের নৌকাডুবিতে একসঙ্গে বহু লোকের প্রাণহানিও মাঝে মাঝে ঘটয়াছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্ত বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। যেমন বাংলা-সরকার, তেমনই জেলা বোর্ড, উভয়েই এ বিষয়ে সমান উদাসীন। অথচ ইহার প্রতিকার আদৌ ছরছ-নয়। বরিশাল-চট্টগ্রাম সার্ভিস থুলিয়া দিলে এবং নোয়াখালী হইতে সন্দীপ যাতায়াতের জন্ত দুই একটি গুপ্তার দিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাংলাদেশের এই বর্ধিত স্থানটিতে টেলিগ্রাফ যায় নাই। টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, ডাকের স্বেচ্ছাবশত করিতেও সরকার সমর্থ হন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নোয়াখালী জেলা হইতে যে সব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা সন্দীপের লোকদের এই দুর্দশা দূর করিবার জন্ত কোন আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া উচিত।

ডাঃ স্মৃধীন্দ্র বসু

ডাঃ স্মৃধীন্দ্র বসুর মৃত্যুতে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীই যে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কয়জন ভারতীয় দেশের ভাবধারা বিদেশে প্রচার করিবার কাজে সমগ্র জীবন আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ডাঃ বসু তাঁহাদের অগ্রতম। বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন-ভারতীয় সম্প্রীতি এবং ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

ডাঃ বসুর পৈতৃক বাসভূমি ছিল ঢাকা জেলায় এবং তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় কুমিল্লায়। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র বসু ছিলেন ডাঃ বসুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বাল্যকাল হইতেই ডাঃ বসু হুঃসাংসিক অভিজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং স্কুলের পাঠ শেষ নব হইতেই তিনি স্বীয় চেষ্টায় সূদূর আমেরিকায় পাড়ি দেন।

আমেরিকার আইওয়া নামক স্থানে ডাঃ বসু স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ স্থানে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রে ‘ডক্টরেট’ লাভ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ডাঃ বসু যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলসমূহে বিশেষ করিয়া অমগ্ন করেন এবং ভারতবর্ষের সমস্তা ও ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলির ফলে ডাঃ বসুর খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে এবং নানা স্থানে অমগ্ন করিবার ফলে আমেরিকার

নাগরিক ও পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত নিবিড় যোগ-যোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার পড়াশুনাও যথায় চলিতে থাকে।

১৯১৪ সালে ডাঃ বসু আইওয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচিত হন। তিনি প্রধানত স্কুর্ প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত সমস্ত উপরেই অধ্যাপনা করিতেন। ইহা ছাড়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা করিতেন। অধ্যাপক হিসাবে ডাঃ বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের সুখ-সুবিধার জন্ত ডাঃ বসু প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আমেরিকায় হিন্দুস্থান ছাত্র-সংসদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ডাঃ বসু ছিলেন প্রধান। এই সংসদ হইতে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইত এবং এই সাময়িক পত্রের মারফত ডাঃ বসু ভারতবর্ষের ভাবধারা ও সমস্তাদি সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের সচেতন করিবার জন্ত প্রচুর চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মূল্য যে কত গভীর তাহা সাধারণের পক্ষে অহমান করা কঠিন হইতে পারে।

ডাঃ বসু ভারতীয় পত্রিকাদিতে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। বিশেষ করিয়া ‘মডার্ন রিভিউ’ কাগজে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রায়ই প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া আমেরিকার রাজনীতিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে এই সব লেখা *Fifteen Years in America* নামে একখানা ইংরেজী গ্রন্থে সংকলিত হয়।

ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ডাঃ বসুর এই দেশে আগমনের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টার পরে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের প্রচেষ্টায় তিনি এই দেশে একবার ভ্রমণ করিবার অমুমতি পান। পুনর্বার ভারতে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার আর এদেশে আসা হয় নাই।

১৯২৮ সালে যখন তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত ডাঃ বসুর আজীবন সাধনা তাঁহাকে আমাদের ইতিহাসে অমরীয় করিয়া রাখিবে।

পরলোকে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত

কলিকাতার প্রবীণ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত, এল এম এস, তাঁহার ৩৩২ বিডন স্ট্রিটস্থ বাটীতে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে

তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। তিনি এক পুত্র ও ৭ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে এল এম এস পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া একরা হাসপাতালে চিকিৎসকের কাজ গ্রহণ করেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত বহু জনহিতকর, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি একজন অক্লান্ত কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। উত্তর-কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি বহু দিন কংগ্রেসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহিতও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ডাঃ সেনগুপ্ত দরিদ্র ও কংগ্রেসসেবীদের বিনা পরসায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

পরলোকে ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত

কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত বাড়গ্রামে (মেদিনীপুর) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি গত দুই-তিন মাস কাল হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন।

মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাস করিয়া তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জেন হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রোটো-জ্যুয়েলজির অধ্যাপক কর্ণেল নোলসের সহকারীর প্রোটো-জ্যুয়েল পদে নিযুক্ত হন। কর্ণেল নোলস প্রোটোজ্যুয়েলজি সম্পর্কে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা রায় বাহাদুর বিরাজমোহন দাশগুপ্তকে উৎসর্গ করেন। উক্ত বিষয়ে ডাঃ দাশগুপ্ত প্রচুর গবেষণা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণা প্রোটোজ্যুয়েলজি বিভাগকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কর্ণেল নোলসের মৃত্যুর পর রায় বাহাদুর ডাঃ বিরাজমোহন দাশগুপ্ত কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রোটোজ্যুয়েলজির অধ্যাপক হন এবং অবশেষে ট্রপিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর হন। তাঁহাকে লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ‘চেয়ার’ অলঙ্কৃত করার জন্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্ত তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বাড়গ্রামে তাঁহার অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

বিষ্ণুর বরাহ- ও কুম্-অবতার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বরাহ-অবতার

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ৩টা ৪টার সময় যখন চারিদিক নিস্তরু ও চিত্ত প্রশান্ত থাকে, তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নীল নভোমণ্ডলে অগণ্য তারা দীপ্তি পাইতেছে। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, উপরে যেন লক্ষ লক্ষ হীরা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এমন মাহুস নাই, যে আকাশের সে উজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ না হয়। কোথাও যেন বিকটাকার মাহুস দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও



চিত্র ১। কাল-পুরুষ নক্ষত্র

ভীষণ কুকুর মূখব্যাধান করিয়া আছে, কোথাও পক্ষী উড়িতেছে। কোথাও সর্প, কোথাও মৎস্য, কোথাও নৌকা, কোথাও শকট, কোথাও বৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা আকাশ ছাইয়া আছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তারা-দ্বারা নানাবিধ রূপ-কল্পনা করিতেন। পৌরাণিক কল্পিত আকার অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচনা করিতেন। কয়েকটি তারার যোগে কল্পিত আকারকে নক্ষত্র (Constellation) বলি।

নক্ষত্র-খচিত আকাশকে ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন। কেমনে স্বর্গ শূন্তে রহিয়াছে? ঋষিগণ বলিতেন, বলশালী ইন্দ্র স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। তাইারা বিষ্ণুর মহিমার পার দেখিতে পান নাই (ঋ ৭।১২২)। “তিনি বৃহৎ স্বর্গকে উপরে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্বত্রস্থিত ময়ূষ (খোঁটা) দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।”

মূল ‘পৃথিবী’ শব্দ আছে। এই স্থিরা পৃথিবীকে ধারণ করিবার কথা উঠিতে পারে না। এই পৃথিবী শূন্তেও নাই। ঋষিগণ নীল নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ-সমুদ্রও তেমন নীল। এই আকাশ-সমুদ্র অর্ণব, মহাৰ্ণব। এই অর্ণব তরণ করে বলিয়া তারার নাম তারা হইয়াছে। যেমন সমুদ্র দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি স্বর্গলোকে, যেমন সরস্বতী (নদী) দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি স্বর্গলোকে (স্বৰ্গঙ্গা), তেমন পৃথিবীও দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে অপরটি

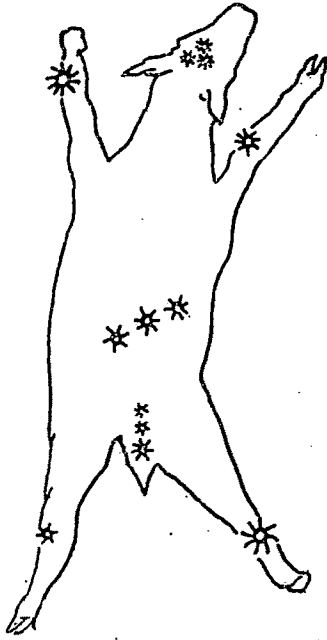
স্বর্গলোকে। ঋগ্বেদের পৃথিবী সূক্তে (ঋ. ৫।৮৪) এক ঋষি বলিতেছেন,—“হে বিচিত্রগমনশালিনি! স্তোভুর্বার্গ গমনশীল স্তোভু দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শঙ্কায়মান অশ্বের জ্ঞায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর।” বলা বাহুল্য, এই পৃথিবী গমনশীল নহে, স্থিরা। অর্জুনি অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা নয়, এখানে মেঘ-গর্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় গো শব্দের এক অর্থ পৃথিবী, কিন্তু এই পৃথিবী গমন করে না, গো নাম পাইতে পারে না। এই গো নক্ষত্র-শোভিত নভোমণ্ডল বা স্বর্গ। বিষ্ণু ইহাকেই ধারণ করিয়া আছেন, নচেৎ ইহা পড়িয়া যাইত। স্বর্গ গো; তাহার নীচের আধারও গো, পৃথিবী।

সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলময় ছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে, প্রজাপতি বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই বরাহ দিব্য বরাহ, স্বর্গীয় বরাহ, শ্বেত বরাহ, যজ্ঞ বরাহ। ঋগ্বেদে রুদ্রদেব স্বর্গীয় বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহতুলা ভীম (ভয়ঙ্কর)। এই উপমা হইতে আর্ঘগণ রুদ্র-মূর্তিতে বরাহ-মূর্তি দেখিতেন। যিনি প্রজা সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন তিনি প্রজাপতি, কাল-রূপ। বিষ্ণু, চরিত্র সূর্য; যে সূর্য বর্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, পর্যায়ক্রমে ঋতু আনয়ন করিতেছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা প্রজা পালন করিতেছেন। অতএব বিষ্ণু প্রজাপতি, আর বিষ্ণু বর্ষপতি। তিনি বৎসরের ও ঋতুর আরম্ভ দেখাই-ছেন। সে সময়ে যজ্ঞ হইত বলিয়া তিনি যজ্ঞপতি, যজ্ঞেশ্বর। (বামনাবতаре বর্ণিত হইবে।) প্রতি বৎসর সূর্য বরাহের সহিত এক সূত্রে আসিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও তারা একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিম্বা সূর্যাস্তের পরে দেখা হইত। যেদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্য বরাহকে উদিত হইতে দেখা যাইত, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইত, এই হেতু দিব্য বরাহের নাম যজ্ঞবরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্গলোকে, বরাহ স্বর্গলোকে, অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহাও স্বর্গলোকে।

কত বৎসর পূর্বের কথা?

এই প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত বরাহ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কালপুরুষ নক্ষত্রই বরাহ। (চিত্র ১, ২। প্রত্যেক চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক।) কালপুরুষ নাম বাংলা, ইহার সংস্কৃত নাম যুগনক্ষত্র। যুগের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে (যুগশিরা)। চারি

পদে চারিটি তারা উজ্জ্বল; সম্মুখ পদের পূর্বদিকের তারা তাম্র-বর্ণ (আর্দ্রা)। কটিতে তিনটি এক তির্যক রেখায়



চিত্র ২। যুগ-নক্ষত্র

(ইষকা), পুচ্ছে তিনটি, মধ্যেরটি শুভ্র মেঘখণ্ডবৎ নীহারিকা। এই তেরটি তারায় যুগের ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে (চিত্র ৩)।

এই নক্ষত্রের বর্তমান উদয় ও অস্তকাল লিখিতেছি।

প্রাণ	প্রথম	সপ্তাহে	রাত্রি	৪টায় উদয়
আশ্বিন	"	"	"	১২টায় "
অগ্রহায়ণ	"	"	"	৮টায় "
মাঘ	"	"	"	৪টায় অস্ত
চৈত্র	"	"	"	১২টায় "
জ্যৈষ্ঠ	"	"	"	৮টায় "

সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে তাহার নিকটবর্তী পশ্চিমের নক্ষত্র পূর্বদিকে দৃশ্য হইয়া উদীয়মান সূর্যরশ্মি দ্বারা অচিরে অদৃশ্য হয়। যখন দিকচক্রে উঠিতে থাকে, তখন মনে হয় নক্ষত্রটি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। বরাহ দ্বারা পৃথিবীর উত্তোলনও সেইরূপ উদয়কালে ঘটে।

কোন ঋতুতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা বৈদিক গ্রন্থে কিম্বা পুরাণে লিখিত নাই। রুদ্রদেবের ঋগ্বেদোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, বসন্ত ঋতুতে লক্ষিত হইয়াছিল। (কারণ সে ঋতুর আরম্ভে সূর্যোদয়ের পূর্বে উদয় হইত, অথ ঋতুতে হইতে পারিত না।) এখন বসন্ত ঋতুতে ৭ই চৈত্র দিবস-রাত্রি সমান হয়, এবং সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্রের উদয় ৫টায় হয়। ইহা ধরিয়া একটি মোটামুটি হিসাব করিতেছি।

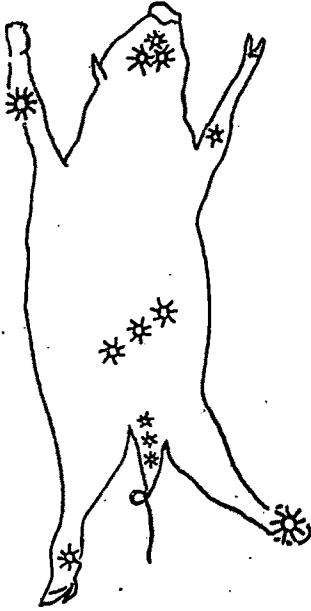
বর্তমানে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে ভোর ৬টার সময় যুগ নক্ষত্রের উদয় হয় (যদিও দেখিতে পাওয়া যায় না)। আমরা জানি, মাস স্থির আছে ঋতু পিছাইয়া আসিতেছে। ২০০০ বৎসরে ১ মাস পিছায়। এখন আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে যুগনক্ষত্রের উদয় যেমন দেখিতেছি, তখন চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অন্তে তেমন দেখা যাইত। অতএব চৈত্রের ৩, বৈশাখের ৪, জ্যৈষ্ঠের ৪, ও আষাঢ়ের ২ সপ্তাহ, একুনে ৩ মাস ১ সপ্তাহ ঋতু পিছাইয়াছে। অতএব ৬৫০০ বৎসর পূর্বের ঘটনা। মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের কথা।

ঋগ্বেদে আছে, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বভুবন সলিলময় ছিল। পরে দেবতারা উৎপন্ন হইলেন। এই সূত্র ধরিয়া পৌরাণিক লিখিয়াছেন সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলময় ছিল। বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া দংষ্ট্রার দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন। পৃথিবী বিস্তীর্ণা, এই হেতু জলের উপর ভাসিতে লাগিল, ডুবিলা না। তারপর সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঋগ্বেদের ঋষির উক্তির অভিপ্রায় এই,—এক সময়ে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ছিল না, তখন মাত্র মহার্ঘব ছিল, অর্থাৎ ত্রিভুবন নীল শূণ্য আকাশ মাত্র ছিল। তখন জ্যোতিঃ পদার্থ ছিল না। পরে বরাহ অর্থাৎ যুগনক্ষত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋগ্বেদে এই নক্ষত্র দক্ষ। দক্ষ হইতে আদিত্যগণ জন্মিয়াছিলেন। এই সৃষ্টিক্রম মৎস্যাবতারে দেখা যাইবে। আকাশ-সমুদ্রের সলিল বা অপ্পাথিব জল নয়।

পাঁজিতে লিখিত আছে, বর্তমানে শ্বেতবরাহ-কল্প চলিতেছে। কল্প এক কাল-সংখ্যা। সে সংখ্যার নাম ব্রহ্মার দিবস। শ্বেতবরাহ-কল্প, যে ঋগ্গায় বরাহ হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টির কাল-সংখ্যা করিতে হইলে অর্থাৎ কত বৎসর পূর্বে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে নিশ্চয় বহু বৎসর গণিতে হইবে। বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকেরাও গণিয়াছেন। পাঞ্জির অল্পমানে ও বৈজ্ঞানিকের অল্পমানের ঐক্য হইবে, এমন কথা নাই। উভয়ের অভিপ্রায় একই, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। যদি একটা বৃহৎ পরিমাণ বলিতে হয়, কত শূণ্য বসাইবে? এই অল্পবিধা দূর করিতে ছোট জিনিস মাপিবার মাপকাঠি বা মিত্র (unit) ত্যাগ করিয়া বড় মিত্র গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। পূর্বকালে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা কাল-সংখ্যার বিবিধ মিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মিত্র ব্যবহার করেন। এদেশে দিবস, বৎসর, যুগ পরিমাণের দুইটা মান বহু প্রচলিত ছিল। একটার নাম মাহুষ মান, অপরটির নাম দৈব মান। মাহুষ

মান দ্বারা মানুষের ব্যবহারোপযোগী কাল গণিত হইত। বৃহৎ কাল-সংখ্যার নিমিত্ত দৈব মানের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের এক বৎসর দৈব এক দিন। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈব এক বৎসর, ইত্যাদি। পাজিতে যে সব যুগ-পরিমাণ লিখিত হয়, সে সব দৈব। এই কথা মনে না রাখাতেই অনর্থ হইয়াছে।



চিত্র ৩। বরাহ।

আমি উপরে মানুষ মান দ্বারা খেত-বরাহের কাল-গণনা করিয়াছি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ দ্বারা সে কাল ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এক প্রকার যুগ গণনায় প্রত্যেক যুগের পরিমাণ ১০০০ মানুষ বৎসর ছিল। চারিযুগে ৪০০০ মানুষ বৎসর। এই মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে কলিযুগের, ২৫০০ অব্দে দ্বাপরের, ৩৫০০ অব্দে ত্রেতার, ৪৫০০ অব্দে সত্য যুগের আরম্ভ হইয়াছিল। এই কলি যুগের আরম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্বাপরের আরম্ভে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে এক বেদ বিভক্ত হইয়া চারি স্বতন্ত্র বেদ হইয়াছিল। অগ্নি গণনার সহিত এই কলি ও দ্বাপরের আরম্ভকাল মিলিয়াছে। পুরাণ-মতে ত্রেতা যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দে ঋক্‌মন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমার মতেও এই সহস্র বৎসর ঋগ্‌বেদের অস্তিমকাল। এই তিনের ঐক্য দেখিয়া সত্য যুগের আরম্ভকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ ঠিক বলিয়া মনে হয়। ইহার অগ্নি প্রমাণও আছে। ১০ সেকথা এখানে তুলিয়া বরাহ-অবতারকে আবৃত করিব না।

কূর্ম-অবতার

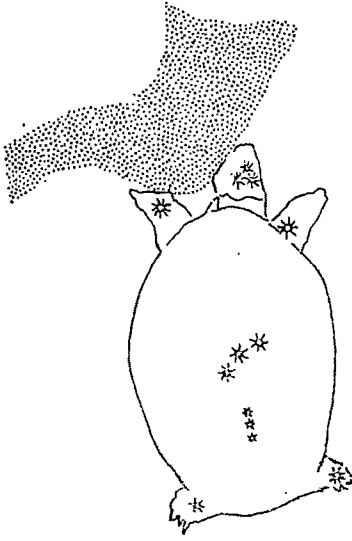
বরাহ-ও কূর্ম-অবতারের মূল একই। যখন পৃথিবী সলিলমগ্ন ছিল, তখন বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জলের উপরে স্থির রাখিয়াছিলেন। এই কল্পনার মূল শুক্ল যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে। সেখানে কূর্মের নাম কচ্ছপ। কচ্ছপ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। অথর্ববেদে কচ্ছপ স্বয়ম্ভু। তিনি প্রজাপতি। তাই হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

যে তেরটি তারা দ্বারা যুগনক্ষত্রের দেহ গঠিত হইয়াছে, তদ্বারা কচ্ছপের আকারও হইয়াছে (চিত্র ৪)। পুরাণে কচ্ছপ এক ঋষি। মহাভারতের আদিপর্বে দক্ষের পঞ্চাশ কন্যা ছিলেন। তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্রনামী সাতাইশটি, কচ্ছপকে তেরটি ও ধর্মকে দশটি দান করিয়াছিলেন।

যদি চন্দ্রের পত্নী তারাকপিনী হয়, তাহা হইলে কচ্ছপ ও ধর্মের পত্নীও তারাকপিনী বলিতে হইবে। যুগনক্ষত্রে তেরটি তারা গণিয়াছি। কূর্মও সেই তেরটি দেখিতেছি, পরে মংশ-অবতার আলোচনার সময় দেখিব শিশুমাররূপী ধর্মও দশটি তারা সহজে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব কালপুর্ব নক্ষত্রই কচ্ছপ ঋষি। তাং গণিয়া পত্নীর সংখ্যা হইয়াছে। তারাই পত্নী। কচ্ছপের অদ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে আদিত্য দেবগণের এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দৈত্যগণের, দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দানবদিগের জন্ম হইয়াছে। ইহারা অবশ্য স্বর্গলোকে বাস করেন। কচ্ছপের গন্ধর্ব্ব অপ্সরা পশু পক্ষী সর্প বৃক্ষ প্রভৃতি অপরাপর সন্তানও স্বর্গলোকে, একটিও ভুলোকে নয়। এই তত্ত্ব না জানাতেই বেদের অনেক অংশ ও পুরাণের বহু উপাখ্যান ভুলেই হইয়া রহিয়াছে। ভুলোকে যেমন পশুপক্ষী সরীসৃপ গিরি নদী বৃক্ষ ইত্যাদি আছে, স্বর্গলোকেও তেমন আছে। অনুসন্ধান করিলে কয়েকটিকে নক্ষত্রের আকারে চিনিতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য, কচ্ছপের সন্তানের মধ্যে মানুষ নাই। মানুষ মানব, মনুষ্য সন্তান কেবল এই ভুলোকেই আছে। স্বর্গলোকে পিতৃগণ থাকেন।

পুরাণে বিষ্ণুর কূর্ম-রূপ ধারণের প্রয়োজন অন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগে দেবাসুর মিলিত হইয়া দুষ্ক-সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। মন্দর পর্বত মহান (মন্থন যষ্টি), সর্পরাজ অনন্ত বাহুকি নেত্র (মন্থন বজ্র) হইয়াছিল। বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া মন্থনের অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। এই রূপকে স্বরূ-গন্ধা ক্ষীর-সমুদ্র, বাহুকি রবিপথ-বৃত্ত, মন্দর পর্বত ইহার অক্ষ। সমুদ্র মন্থনে উৎকট কল্পনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। (মেরু পর্বত পর্বতের কর্ণিকাসদৃশ। তাহাকে স্থির রাখিতে চারি পার্শ্বে চারিটি বিষ্ণু (কীলক) পর্বত আছে। পূর্ব পার্শ্বে মন্দর, উত্তর তুলিয়া আনিতে হইয়াছিল।)

সমুদ্রমন্ডনে লক্ষ্মী ও শশী উথিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী ক্ষীরাক্ষি-ভনয়া, আমাদের মাতা; শশী মাতুল। ভিষক-শ্রেষ্ঠ ধনন্তরি অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুহস্তে উথিত হইয়াছিলেন। এই কমণ্ডলু চন্দ্র। চন্দ্র সুধাময়। (কিন্তু মহাভারতে ও বিষ্ণু-



চিত্র ৪। কূর্ম।

পুরাণে চন্দ্রের আবির্ভাব পৃথক্ লিখিত হইয়াছে। পরে পশ্চাৎ ১) ঋগ্বেদে রুদ্রদেব ভিষকশ্রেষ্ঠ। তিনি হিতকর ভেষজ জ্ঞানেন। আয়ুর্বেদের ধনন্তরি নাম উপাধি। চন্দ্র মহেশ্বরের শিরোভূষণ। যে নক্ষত্র রুদ্রদেব, সে নক্ষত্রই লক্ষ্মীর ও ধনন্তরির দেহ হইয়াছে। (এখানে বিষয়টি অল্প কথায় বুঝাইবার উপায় নাই।)

সমুদ্রমন্ডনদ্বারা আরও অনেক স্বর্গীয় বস্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। কৌস্তভ মণি, ঐরাবত স্বেতহস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা স্বেত অশ্ব আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌস্তভ মণি নিশ্চয় কোন উজ্জল তারা। ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা দুই নক্ষত্র দেখিয়া কল্পিত হইয়াছিল। ইংরেজী তারা-পটে ইহাদের অণু নাম আছে। আমার মনে হয় ঐরাবত (Cassiopeia) স্বর্গদ্বায় অবস্থিত। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সময় ঐরাবত গঙ্গায় হাবুড়ু খাইয়াছিল। মহাভারতের উপাখ্যানে গরুড়-জননী বিনতা ও সর্প-জননী কঙ্ক নদীর সেপারে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিতে গিয়াছিলেন। সুরগঙ্গার পশ্চিম পারে কণ্ঠপ, সেখানেই তাহার ত্রয়োদশ পত্নীর বাস। অতএব বিনতা ও কঙ্ক সুরগঙ্গার পূর্বদিকে উচ্চৈঃশ্রবা দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, জ্যোতিষের মধ্য নক্ষত্র উচ্চৈঃশ্রবা। বালক কৃষ্ণ এক তালবনে এক গর্দভাকার অশ্বের বিনাশ করিয়াছিলেন। সে গর্দভও মধ্য। ইহা অঘাসুরও বটে।

এই সকল উদাহরণ হইতে তিনটি তথ্য জানা যাইবে।

(১) পৌরাণিকেরা আকাশে কেবল চন্দ্র সূর্য ও চন্দ্রের নক্ষত্র দেখিতেন না, আরও অনেক নক্ষত্র দেখিতেন। প্রাচীন তারা-পট নাই, আমরা চিনিতে পারি না। (২) একই নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। নক্ষত্রের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। এক যুগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছিল। (৩) যাহা স্বরলোকের ব্যাপার, পৌরাণিক তাহা ভুলোকে আনিয়াছেন।

সমুদ্রমন্ডনের পর অমৃত-প্রাপ্তির নিমিত্ত দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ ঋতুতে যুদ্ধ হইয়াছিল? যখন সমুদ্র মথিত হইতেছিল, তখন ইন্দ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব যুদ্ধ বর্ষারম্ভে হইয়াছিল। সেদিন দক্ষিণায়ন-আরম্ভ, দেবাসুরের যুদ্ধের কালই এই। অণু কাল অকাল। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র-মন্ডনে লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই লক্ষ্মী, কোজাগরী লক্ষ্মী, যাহাকে চারি দিক্-হস্তী স্নান করাইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ষাকাল আরম্ভ। আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজা হয়। এককালে আশ্বিন মাসে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইত। এখন বর্ষা ঋতু পিছাইয়া আসিয়াছে। কত প্রাচীনকালের স্মৃতি আমাদের পূজা-পার্বণে জড়িত হইয়া আছে তাহা এই একটি উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মী বেদের ইড়া। তিনিও বর্ষারম্ভের দেবী। অপ্সরা উথিত হইয়াছিল। ইহারা বর্ষার সূচনা-করে। বারুণী উঠিয়াছিল। ইহা মত নয়; বরুণের অধিকার (বর্ষাকাল) আরম্ভ হইয়াছিল।

যুদ্ধের ঋতু পাইলাম। যুদ্ধ অবশ্য দিবসে হইতে পারে নাই, রাত্ৰিকালে হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে না ভোর রাত্রে? যে চন্দ্র মহেশ্বরের শিরোভূষণ, সে চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র, না কলা-চন্দ্র? আমার বোধ হয় কলা-চন্দ্র। নচেৎ কৃষ্ণচতুর্দশী শিবের তিথি হইত না। তবে ভোর রাত্রে, কৃষ্ণ চতুর্দশীতে যখন কলা-চন্দ্র দেখিতে পাই, তখন। অতএব অমৃতভাণ্ডই চন্দ্র। পরদিন অমাবস্তা, চন্দ্র সূর্য রাহু একত্র হইয়াছে বিষ্ণু স্বদর্শন চক্র-দ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদ করিয়াছেন; নিশ্চয় প্রাতঃকালে সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। এই বর্ষারম্ভের দিন প্রাতঃকালে এক পূর্ণ সূর্যগ্রহণ বেদের কাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আছে। পৌরাণিক তাহার রূপ দিয়াছেন।

মৎস্য-পুরাণে প্রতিমার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে বিষ্ণুর কূর্ম, বরাহ, বামন, মৎস্য, নরসিংহ, এই পাঁচ অবতারের প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, এককালে এই সব অবতারের পূজা হইত। প্রতিমা থাকিলে মন্দিরও ছিল বলিতে হইবে। এই পাঁচ অবতার বিষ্ণুর দিব্য অবতার। স্বর্গের ব্যাপারের নিমিত্ত বিষ্ণু এই সকল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচের মধ্যে নরসিংহ-

অবতার-কল্পনায় কবিত্ব বা মহত্ত্ব কিছুই নাই। যে বরাহ সেই হিরণ্যকশিপু। আবাত সেই সিংহমুখ নরাকার নর-সিংহ। গণেশের গজানন, আর নরসিংহের ভীষণ মূর্তি একই প্রদেশের কল্পনা মনে হয়।

বহুস্থানে, যেমন কুরুক্ষেত্রের সরোবরে, যমুনায়, পুরীর এক সরোবরে কচ্ছপকে বিষ্ণুর অবতার ভাবিয়া ভক্তেরা ভোজ্য দান করে। দক্ষিণ রাঢ়ে ধর্মরাজ নামে গ্রাম্যদেবতা বহু প্রসিদ্ধ। নাগবেষ্টিত কুম্ভ-মূর্তি ধর্মের প্রতিমা। নাগ, অনন্ত বাহুকি, ইহার ফণায় নারায়ণ অনন্ত শয়নে আছেন।

এই নাগ সমুদ্র-মন্ডনে মন্ডন-রজ্জু হইয়াছিল। কুম্ভ মাথানীর (মন্ডন যষ্টির) আধার। সমুদ্র মন্ডনের এই দুই প্রাণীতে নারায়ণ স্মরণ হইতেছে। “শূন্য পুরাণে”ও ধর্মের নাম নারায়ণ। যখন চারিদিক একাগ্র, তখন নারায়ণ কুম্ভের পৃষ্ঠে ধ্যানস্থ ছিলেন। দক্ষ, যে ধর্মকে দশ কন্যা দান করিয়াছিলেন, সে ধর্মকে মংস্ত্র অবতारे পাইব। তিনি নারায়ণের এক রূপ। তিনি ধবল বরণ, কারণ দেহ শ্বেতবর্ণ তারাময়।*

* এই প্রবন্ধের চিত্র চারিখানি এক ইঞ্চুলের ছাত্র শ্রীহরীকান্ত বহু লিখিয়া দিয়াছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তির পরিচয়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বহু শ্রীমূর্তির পরিচয় ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’ ও অজ্ঞাত মাসিক পত্র দিয়াছি, এখানেও কয়েকটি মূর্তির কথা বলিতেছি। ‘বিক্রমপুরের ইতিহাস’ প্রথম খণ্ডে বিষ্ণু, শিব ও বৌদ্ধ মূর্তির চিত্র ও পরিচয় দিয়াছি—তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

রত্নসম্ভব—ধ্যানী বুদ্ধ

অনেক দিন পূর্বে—বেঙ্গলী গ্রামের নিকটবর্তী একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে ‘রত্নসম্ভব’ বুদ্ধ মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্তিটির মুখের দিকটা ক্ষতবিক্ষত। হয় কোদালের আঘাতে ঐরূপ হইয়াছে কিংবা অগ্নি কারণেও তাহা হওয়া অসম্ভব নহে। এক সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে, মাঠে, পুকুর পাড়ে, বনেজঙ্গলে যে সমুদয় প্রস্তর মূর্তি অথবা পড়িয়া থাকিত তাহা ‘নাককাটা বাসুদেব’ এই সাধারণ নামে আখ্যাত হইত।

ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পঞ্চ নামে পরিচিত। রত্নসম্ভব মূর্তিটি কক্ষবর্ণ কঙ্ক প্রস্তরে নির্মিত। বুদ্ধগয়ার মন্দিরানুসৃত্তি বোধিত মন্দির মধ্যে রত্নসম্ভব ধ্যানী বুদ্ধ বিকশিত শতদলোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জাহ্নুর উপর বরদা মুদ্রাকারে স্থিত। বাম হস্তখানি দক্ষিণ পদতলের উপর মুক্ত ভাবে স্থাপিত। আসন শতদলের নিম্ন ভাগে তিন জন উপাসক ও উপাসিকা। তন্মধ্যে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দুইটি নারী মূর্তি—উভয়েই মালাধারিণী। তাহার উপরে দক্ষিণ দিকে হস্তী এবং বাম দিকে অশ্ব মূর্তি খোদিত। বৌদ্ধ পুরাণানুসারে অশ্ব, তরবারিধারী, কুবের, কুমারী, রত্ন, চক্র ও হস্তী হইতেছে সপ্তরত্ন। এই মূর্তির বেদী নিম্নে সপ্তরত্নের অন্যতম অশ্ব ও হস্তী খোদিত আছে। মূল মূর্তির উভয় পার্শ্বে কাল্পনিক জীব—অর্ধ সিংহ ও অর্ধ অশ্বের আকারে শোভমান।

রত্নসম্ভবের দৃষ্টি আনত। কেশ কুঞ্চিত। কেশশীর্ষ চূড়া-কৃতি, তদুর্দ্ধে বজ্রচিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে বোধিত। গায়ে উপবীত নাই, বস্ত্র কটিদেশ হইতে আঙুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম স্কন্ধোপরি উত্তরীয় চিহ্ন। এই মূর্তির সন্নিবেশ মন্দির চিহ্ন, স্তূপোল বাহ, প্রশস্ত বক্ষদেশ, সৌম্যশাস্ত্র নত দৃষ্টিভঙ্গিমা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রত্নসম্ভব ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি প্রভৃতির আবির্ভাব বৌদ্ধ পুরাণে অধিক দিনের নহে। রত্নসম্ভব শব্দের অর্থ রত্ন হইতে আবির্ভূত—“born of jewels.” এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তির শক্তি হইতেছেন যথাক্রমে—বৈরোচনের—বজ্র-ধাতিধারী, অকোভোর—লোচনা, রত্নসম্ভবের—মামকি, অমিতাভের—পাণ্ডরা, অমোঘ সিদ্ধির—তারা। মূর্তিটির আকার—সাড়ে তিন ফুট উচ্চ ও ২ ফুট প্রস্থ হইবে।

লোকনাথ

লেখকের বাসগ্রাম বিক্রমপুর মূলচরের একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে তিনটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল—(১) স্বর্য়ামূর্তি, (২) লোকনাথ মূর্তি, (৩) একটি প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ও একটি নৌকার ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি ভগ্ন সোপানশ্রেণীর চিহ্ন। বাল্যকালে পুষ্করিণীর পাড়ে দুইটি বেলগাছের নীচে মূর্তি দুইটি অবস্থিত ছিল। শিকলটি অথবা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। স্বর্য়ামূর্তি এখনও মূলচর গ্রামেই শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনের বাড়ীতে এক শ্রমশানোপরি রহিয়াছে। এই লোকনাথ মূর্তি—পূর্বতন অধিবাসীদের গ্রাম পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত অবস্থায় অজ্ঞাত ছিল—পরে উহা রাজসাহী বারেন্স মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, লোকেশ্বর নাম মহাযান বৌদ্ধ-গণের একান্ত প্রিয়। আমাদের এই মূর্তিটির মুখাবয়ব নাসিকা ও মুখের দিকটা ভগ্ন ও ক্ষয়িত। লোকনাথদেব অর্ধপর্য্যাকাসনে

উপবিষ্ট। দক্ষিণ হস্তখানি দক্ষিণ জাহ্নব উপর হস্ত এবং জপ-মালা ধৃত। বাম হস্ত দ্বারা একটি সনাল বিকশিত শতদল ধৃত। কর্ণে কারুকার্য খচিত কুণ্ডল। কণ্ঠে রত্নখচিত তিন লহর মালা। বাহ্যে বাজু। বর্তমান আর্মলেটের অঙ্করূপ। মুকুটের গঠননৈপুণ্যও মনোরম। শীর্ষদেশে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি। বক্ষের উপরে সুন্দর উত্তরীয়। ত্রিনেত্র, খেতাদ্ব, অতি সুন্দর মূর্তি। লোকনাথ মূর্তি সিংহনাদ, খশরপণ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই মূর্তির ধ্যান ও বর্ণনা নানা গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং আমিও এ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। আমাদের এই মূর্তিটি খশরপণ লোকনাথ নামে আখ্যাত করা যায়। লোকনাথের বাম দিকে ক্রকট। ক্রকট মূর্তি চতুর্ভুজ। ত্রিনেত্র। দক্ষিণ দিকের হস্তে বন্দন ভঙ্গিমা, তন্নিম্নের হস্ত দ্বারা জপমালা, বাম দিকের নিম্ন হস্ত দ্বারা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন এবং বামোদ্ব হস্ত উদ্ধ দিকে উখিত। দক্ষিণে হয়গ্রীবের মূর্তি। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, বাম হস্ত নিম্নাভিমুখে লম্বিত। এতদ্ব্যতীত উভয় পার্শ্বে উপাসকমণ্ডলী, অতি সুন্দর ভাবে খোদিত রহিয়াছে। লোকনাথ দেবের পরিধানে ব্যাজ্রচর্চ। এই মূর্তির গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে বিবিধ লোকনাথ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত খশরপণ অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি অনেকের মতে বাংলা দেশের ভাস্কর্য শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। তন্মধ্যে মহাকালী গ্রামে প্রাপ্ত লোকনাথ এবং সোনায় গ্রামে প্রাপ্ত দ্বাদশভুজ লোকনাথ মূর্তিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশভুজ লোকনাথ মূর্তিটি লেখক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায় উপস্থিত হইয়াছে।

পদ্মপাণি লোকনাথ

বিক্রমপুর সোনায় গ্রামে প্রাপ্ত পদ্মপাণি লোকনাথ মূর্তিটি তক্ষণ শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিটি কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি প্রস্তরে নির্মিত। বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রাকারে একটি শতদলোপরি হস্ত। বাম হস্ত দ্বারা মুণালসহ বিকশিত পদ্ম ধৃত। উর্ধ্বে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ। নিয়ে উপাসকমণ্ডলী যুগ্ম হস্তে ও মালা হস্তে উপাসনারত। পদ্মপাণির কিরীট ও কর্ণভূষার বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য সহজ্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের উভয় পার্শ্বে দুইটি নারী মূর্তি। উভয়েই দণ্ডায়মানা রূপে খোদিত। দক্ষিণ দিকের মূর্তির দক্ষিণ হস্তে রত্ন মুদ্রা। বাম হস্ত দ্বারা মুণালসহ ধৃত পদ্মকোরক, বাম দিকের নারী মূর্তির দক্ষিণ হস্তে বন্দন-ভঙ্গিমায় উন্নত। বাম হস্ত বক্ষনিম্নে রক্ষিত। পদ্মপাণি লোকেশ্বর ত্রিনেত্র। কণ্ঠে দোহাঢ্যমান উপবীত। হস্ত প্রকোষ্ঠে বলয়, বাঁ-হাতে বাজু, কণ্ঠে অতি সুন্দর কর্ণহার।

পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তির কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে

পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের নাম করিতেছি :—তঁাহারা যথাক্রমে সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি।

নেপালে এই সকল বোধিসত্ত্ব মূর্তির প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী। উত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক লোকনাথ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিক্রমপুরেও কয়েকটি লোকনাথ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ মূর্তির সংখ্যা ১০৮টির কম নহে।

মারীচি

এখানে প্রকাশিত মারীচি মূর্তিটির বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তির অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন। তিব্বতের লামারা—মারীচি দেবীকে উদার প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। হিন্দু সূর্য্যমূর্তির সহিত বৌদ্ধদের এই মারীচি মূর্তির তুলনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যমূর্তিতে যেমন সপ্তাঙ্গ খোদিত দেখা যায়, তাঁহার যেমন রথ ও পদবিহীন অরুণ সারথি আছেন, তেমনি মারীচি দেবীর বাহন হইতেছে সপ্ত শূকর, তাঁহার এক সারথিও আছেন। তিনিও পদবিহীন। রাহু নামে আখ্যাত।

অনেকে বলেন বজ্রবারাহী ও মারীচি মূর্তির সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। এ অসুমান সত্য নহে—মারীচি দেবী বৈষ্ণব চনের শক্তি মূর্তি। মারীচি দেবীর মন্দির মধ্যে অবস্থিত। তন্নিম্নে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ মূর্তি আছেন। মারীচির তিনটি মুখ। তিনি ত্রিনেত্র ও অষ্টভুজ। দেবীর দক্ষিণ দিকের মুখখানি রক্তাভ, বাম দিকের মুখখানি শূকরাভূতি ও নীলবর্ণের। দক্ষিণ দিকের চতুর্হস্তে যথাক্রমে—বজ্র, অঙ্কুশ, তীর ও স্তচীমুখ অস্ত্র। বাম দিকে অশোকপল্লব পত্র, ধনু, পাশ এবং এক হস্তে তর্জ্জনী মুদ্রা। মারীচি দেবী প্রত্যাঙ্গীর্ণা গদা এবং বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান। দেবীর চারিদিকে চারিটি দেবীমূর্তি—পূর্ব দিকে বার্তালি, লোহিতবর্ণা এবং শূকরমুখী। চতুর্ভুজা, চতুর্হস্তে যথাক্রমে—অঙ্কুশ, অশোকপল্লব, পাশ এবং স্তচীমুখো অস্ত্র। দক্ষিণে বদালি। পীতাভ, চতুর্ভুজা বর্তালির অঙ্কুরূপ অস্ত্রধৃত। পশ্চিম দিকে—বরালি, খেতাদ্বিনী তাঁহার উত্তরে রহিয়াছেন—বরাহমুখী। বরাহমুখী রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজ যথাক্রমে বজ্র, তীর, অশোকপল্লব এবং ধনু। মারীচি মূর্তি অশোককাস্তা, আর্ঘ্য মারীচি, উক্কীষবিজয়া মারীচি প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মারীচি আছেন।

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে মারীচি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুয়ালী, পণ্ডিতসার, আটপাড়া প্রভৃতি গ্রামের মূর্তি কয়টি উল্লেখযোগ্য। এখানে যে মারীচি মূর্তির চিত্র প্রকাশিত হইল, এই মূর্তিটি ত্রীনগর থানার অন্তর্গত আটপাড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্যন্ত কুকুটিয়া গ্রাম-নিবাসী মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল—বর্তমানে এই মূর্তিটি রাজসাহী বারেন্দ্র মিউজিয়মে আছে।

এখানে যে মূর্তি কয়টির চিত্র প্রকাশিত হইল, সে মূর্তি কয়টি রাজসাহী বারেন্দ্র চিত্রশালায় রহিয়াছে।

ধন্যবাদ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ছ'টা আটচলিশে ট্রেন কলকাতায় পৌঁছল। কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে জী আর আর্ট বছরের ছোট ছেলেটার হাত ধরে রতন এসে ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াল। যেতে হবে তাকে শিবপুর। শিয়ালদহ থেকে শিবপুরের গাড়ি ভাড়া আর্ট টাকার কম নয়। যুদ্ধের মরমুম নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহ-স্থের মান-সম্মত-শালীনতার বোধটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। ট্রাম আর বাস'এ চড়ে অস্তঃপুরিকার শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত খুশীমত বেড়ালেও কেউ নাকমুখ সিঁটকে এই অনাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন না। সে এক প্রকার ভালই হয়েছে। অর্থ যাদের বেড়েছে—তাদের বেড়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাতে কি। তাঁরে দাঁড়িয়ে চেউ গোনা বা চেউ দেখে উত্তেজিত হওয়া ছাড়া এ শ্রেণীর লোকেরা আর তো কিছু করেনি।

কুলি ভাড়াও লাগত না। নেহাৎ দেশে বেড়াতে গিয়ে দেশের বেগুনটা কলাটার ওপর মমতা বশতঃ বড় ও মাঝারি গোছের গোটা তিনেক মোট হয়েছে। কুলি ভাড়া বাবদ হিসেব করে দেখলে লোকসান বই লাভ এতে নেই। এখন ট্রামের কণ্ঠাক্টার হৃদয়হীন হলেই বাসের মাশুল গুনতে হবে—তা য'খানা টিকিটের দামই সে ধরে নিক না কেন। আর্টটা টাকা দিয়ে পুরো একখানা বোড়ার গাড়ি ভাড়া করা সম্ভব নয়।

ট্রাম মনে হ'ল অনিয়মিত। বহু যাত্রী লাইনের হু'পাশে ভিড় জমিয়েছে। দূর থেকে দেখা যায় ট্রাম আসছে সারি সারি—কিন্তু সেগুলি বোবাক্সারের বাঁক পেরিয়ে এদিকে আর এগুচ্ছে না; স্তব্ধ করে চুকে পড়ছে আশানায়। যাও বা ছটকে হু' একখানা এদিকে এল—তাদের নিশানা গালিফ দ্বীট। যাত্রী অবশ্য কিছু কমলো, তবে হাওড়ার জন্ত হা-পিতোশ করে যারা দাঁড়িয়ে রইল—তাদের সংখ্যাই বেশি।

একজন বললে, এদিকের ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে।

রতন পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধ হ'ল কেন? একজন হিন্দুস্থানী উত্তর দিলে, হাওড়ার পুল টুটে গেল বাবুজি।

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। এত বছর ধরে কত কাণ্ড আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে পৃথিবীর অশ্রুতম উল্লেখযোগ্য জিনিসটির এই আকস্মিক পরিণতি—অবিশ্বাস হবারই কথা। যাই হোক, ট্রাম আসছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সবাই অর্ধমুগ্ধ হয়ে উঠেছে—মুটেটো ছটফট করছে। রতন বাসের চেষ্টায় মুটে ও জীপুত্র সমেত রাস্তার অশ্রু ধারে এসে দাঁড়াল।

সাধ্য কি বাসে ওঠে। পাঁচ-ছ'খানা বাস মাহুষে গাধা-গাদি ঠাসাঠাসি হয়ে গেল—পলক ফেলতে-না-ফেলতে। সচল ও অচল বোঝা নিয়ে এ ভিড়ে বাসে ওঠা দুঃসাধ্য। ট্রামের আশায় আবার সে এগিয়ে এল পথের এ ধারে।

একবার মনে হ'ল সত্যিই যদি ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আশ্রয় নেবে সে জীপুত্র নিয়ে! আত্মীয়-বন্ধু তো দূরের কথা—হু' দণ্ডের আলাপিত কোনও লোককে তো মনে পড়ছে না—যারা শিয়ালদহের আশেপাশে কোথাও আছে। আর বঙ্কটি হ'ল এই মোট। এগুলোও যদি না থাকত।

কইমট করে একবার বউয়ের পানে চেয়ে স্বগতোক্তি করলে, এখন কি যে করি এই মোটিঘাট নিয়ে।

জী স্নলতা কতখানি দুঃস্থিতাগ্রস্ত হয়েছে—তা অহুমান করা দুঃসাধ্য। চারদিকে ভিড়—ব্যস্ততা—ঠেলাঠেলি—ছড়া-ছড়ি—আলো—রিকশা—মোটর—বোড়ার গাড়ির মিশ্র শব্দ সে আশ্রমটোর ভিতর দিয়ে মৌনবিশ্ময়ে হয় তো উপভোগ করছিল। স্বামী যখন সঙ্গে রয়েছেন—তখন বাড়ি পৌঁছবার দায়িত্ব তাঁরই। আর এত বড় কলকাতা শহরে একটা না-একটা উপায় হবেই। এত লোক সবাই তো দাঁড়িয়ে হায় হায় করবে না—কিন্তু বিহ্বল ভাবে এধারে ওধারে ছুটোছুটি করে বুকের খুকখুকনি বাড়াবে না। উপায় একটা হবেই।

রতনের স্বগত খেদোক্তিতে তার মনে হ'ল ওটা—তারই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হ'ল। স্নলতা দায়দোষ ঝাড়ে নিয়ে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। সংসারের অভাব-অভিযোগ সয়ে সয়ে ওর এক কালের কোমল চিত্ত আজ রীতিমত কঠিনই হয়েছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরে ওর পটুতা সব সময়েই প্রকাশিত হয়।

বললে, আমায় বলছো?

রতন বললে, তোমাকে বলে আর কি হবে। এই মোট-গুলো যদি না থাকতো—

• স্নলতা বললে, আমি নিতে বলেছিলাম মোট?

যেই বলুক—মোট হয়েছে তো? রতন উত্তর দিলে।

তা তোমাদের কলকাতায় যে নিত্য নতুন হাঙ্গামা কে জানে! মাহুষ কি স্তব্ধ থাকে এখানে!

উত্তর দিলে বাদাহুবাদ উত্তরোত্তর চড়বে। পথের মাঝে এমন বিপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেটা চালিয়ে যাওয়া পৌরস্বজনক নয় ভেবে রতন চুপ করলে। মোট-স্বস্তির দোষটা অবশ্য তার একার নয়—হু'জনের; কিন্তু দায়টা এসে পড়েছে তারই ঝাড়ে। দায়িত্ব অধীকার করবার সাধ্য তার নেই।

আরও পাঁচ মিনিট পরে দশখানা বাস ছেড়ে যাওয়ার পর—মোড় ঘুরে ক'খানা ট্রাম এই দিকে আসছে দেখা গেল। ট্রামের মাথায় অগ্নি অক্ষরে হাওড়া ষ্টেশনের নাম পড়ে রতন পুলকিত হয়ে উঠল।

ট্রাম কিন্তু আকণ্ঠ বোকাই। রতনকে উপহাস করে এগিয়ে গেল। তার পর এল আর একখানা। সেখানাও লোকে ঠাসাঠাসি, চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তার পরের খানা ততটা ছাপাছাপি না হলেও—পথের ভাঙনে ট্রামের সান্নিধ্যে এরা পৌঁছতেই পারলে না।

কিন্তু আশা ভেগেছে। অগ্নি অক্ষরে হাওড়ার নিশানা নিয়ে ট্রামের পর ট্রাম আসছেই। একখানা-না-একখানাতে সে আশ্রয় পাবেই।

কুলিটার সাহায্যে পেলোও আশ্রয়। স্ললতার পা ছড়ে গেল, ছেলোটো ধাক্কা খেয়ে কঁদে উঠল চীৎকার করে, রতনও মোট সামলাতে গিয়ে কিছু আঘাত পেলো। কিন্তু এসব ক্ষুদ্র ক্ষতিতে জঙ্কেপ করলে চলবে না এখন। হাওড়ায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এই আঘাত-বেদনার কথা বলাবলি করে পরস্পরকে অভিভূত করে দেবার প্ররতিও ঠিক আসছে না।

এত ভিড়ের মধ্যেও স্ললতা খোকাকে নিয়ে বসতে পেলো লেডিজ সীটে, রতন মোট আগলে দাঁড়িয়ে রইল। কণ্ঠাক্টার এলো—টিকেট দিলে। আশা হ'ল—হাওড়ায় পৌঁছবে তারা কোন-না-কোন সময়ে। তা হোক।

প্রকৃত ব্যাপারটা শোনা গেল—ট্রামের মধ্যে। সব তথ্য খুঁটিয়ে অবগু নয়। তবে মোটামুটি যা শোনা গেল তা এই :

আজ এগারোই ফেব্রুয়ারি। আই-এন-এ'র ক্যাপ্টেন রসিদের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হওয়াতেই হিন্দু-মুসলমান মিলে অত্যাচার বিচারের প্রতিবাদ করে এক মিছিল বার করেছিল। পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠি কি গুলী চালিয়েছে। ফলে এই বিক্ষোভ। প্রথম নাকি ডালহৌসি স্কয়ার থেকে এই হাঙ্গামা শুরু হয়—পরে সারা কলকাতায় পড়েছে ছড়িয়ে। হাঙ্গামার বেগটা ডালহৌসি স্কয়ার থেকে লালবাজার পুলিশ আপিসের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে বোবাজার পর্যন্ত। আর একটা বেগ শাখাপথে চিংপুর রোড ধরে সিঁহুরেপটির মোড় পর্যন্ত এসে হারিসন রোডের দিকে পাক খেয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ পেরিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত এসেছে। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ বা অষ্টাদশ অংশেও বেগ কোথাও প্রবল, কোথাও বা মধ্যম আকারে প্রকাশিত হয়েছে। হাওড়া যাবার রাস্তায় যে বেগটুকু চোখে পড়ছে অর্থাৎ যে বাধা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—ট্রামের মধ্যে তাই নিয়েই চলছে আলোচনা।

রতন মনে মনে ডাকলে, হে ভগবান, হাওড়া পর্যন্ত ডালয় ডালয় পৌঁছে দাও। হে ভগবান—

বিপদে বিহ্বল হয়ে সে অবগু পূজা মানত করে বসে নি।

কারণ ট্রাম যখন চালু হয়েছে তখন হাওড়া পর্যন্ত সে যাবেই। তার আশু গতি সম্বন্ধে দেবতাদের অনুন্নয় করা চলে—কিন্তু আট টাকা গাড়ি ভাড়ার ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে পূজা মানত করে বে-হিসাবের পরিচয় সে দেবে কেন।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে অবগু বুঝলে বিপদের গুরুত্ব। সংসারের হিসাব এই জনসমুদ্রে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সারি সারি ট্রাম আছে দাঁড়িয়ে, একটাও মোড় পেরায় নি। বাসগুলি এই ভিড় দেখে যেন ভয় পেয়ে যাত্রীদের বমি করে শূন্য গর্ভে ফিরে চলেছে শিয়ালদ'র দিকে। যাত্রীরা ভয়ে বিষ্ময়ে হতাশাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। জনতা থেকে মুহূ-মুহ উঠছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। সবাই বলতে লাগল—ট্রাম আর যাবে না। ক্ষিপ্ত জনতা যেতে দিচ্ছে না কোন গাড়ি।

রতন ভাবলে—যত বিক্ষোভ ট্রাম বাস বন্ধ করে কি প্রকাশ করা বিধি। যারা যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে—সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রয়েছে মোটবাট—তাদের অসহায় অবস্থার কেউ ভেবে দেখবে না? বৈর শাসনের বিরুদ্ধে যত খুশী বিদ্রোহ হও না কেন এদিকটাও ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক। হে ভগবান—সম্মতি দাও ওদের। হে ভগবান—

ভাবনার মধ্যেই ট্রাম গা নাড়া দিলে। তবে বুঝি সম্মতি দিলেন ঈশ্বর। প্রবল বিশ্বাসে হুঁহাত জোড় করে রতন তাঁকে সন্তোষ নতি জানালে।

অন্তদের অনুসরণ করে এ ট্রামও মোড় পেরুলো। অকস্মাৎ জলকল্লোলে যেন বৈশাখী ঝড় এসে লাগল। এবং সেই প্রমত্ত ডেউ গ্রাস করে ফেললে ট্রামখানাকে।

নামুন—নামুন মশাই—নামুন। হাতে লাঠি মুখে ছফার। উদ্বেজিত জনতা বৈরাচারের সমস্ত দায়িত্ব বুঝি নিরীহ যাত্রীদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সাত্বনা লাভ করবে।

মহিলা যাত্রী কেউ ছিলেন না। হুড়হুড় করে পুরুষমাত্রীরা নেমে গেলেন।

রতন আতঙ্কে হাত জোর করে অনুন্নয় করলে, দেখছেন সঙ্গে মেয়েছেলে—

একজন বললে, ওসব শুনবো না মশাই—হিন্দু মুসলমান মেয়ে পুরুষ সব এক হয়ে গিয়েছে। লাঠি না খেতে চান তো নেমে পড়ুন।

রতন তথাপি হাত জোর করে কঁাদ কঁাদ মুখে অনুন্নয় করতে লাগল।

এবার একজন ধর্মধারী এগিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা আপনি থাকুন। এখানে আমরা ছাড়ছি, কিন্তু চিংপুরের মোড় পেরুতে পারবেন কি।

রতন কি বলতে যাচ্ছিল—ড্রাইভার পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে। কণ্ঠাক্টার অভয় দিয়ে বললে স্থির হয়ে বসুন—কোন ভয় নেই।



বুদ্ধ—ধানী বুদ্ধ



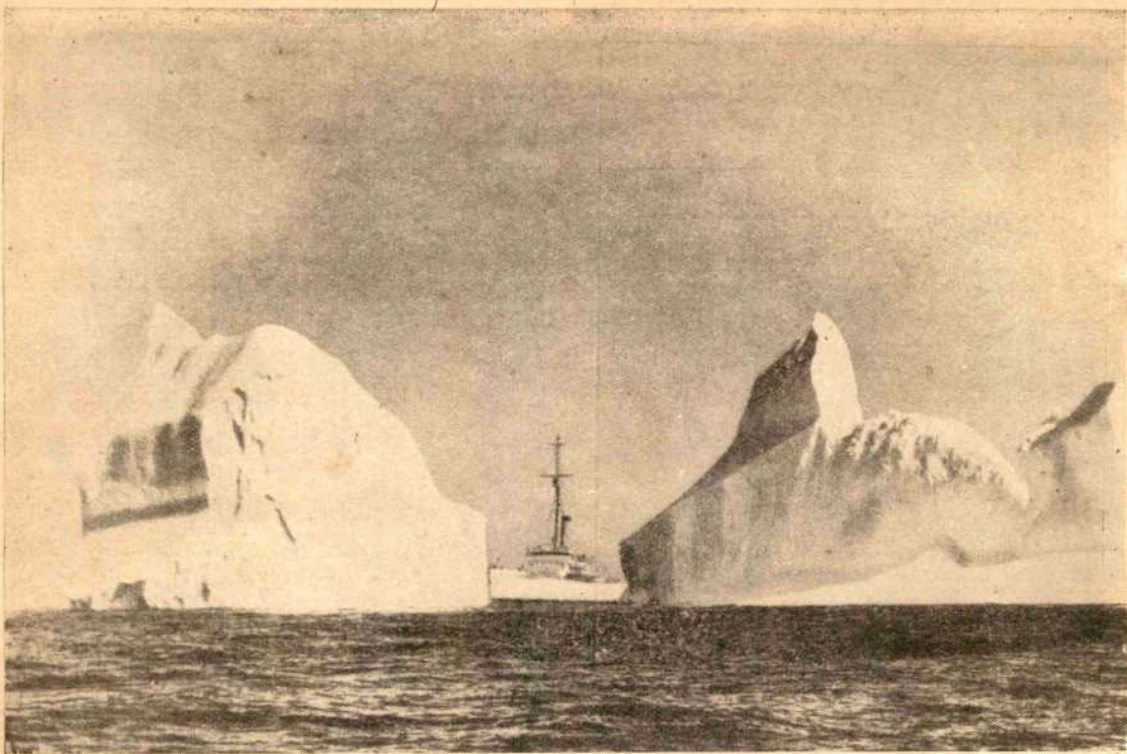
লোকনাথ



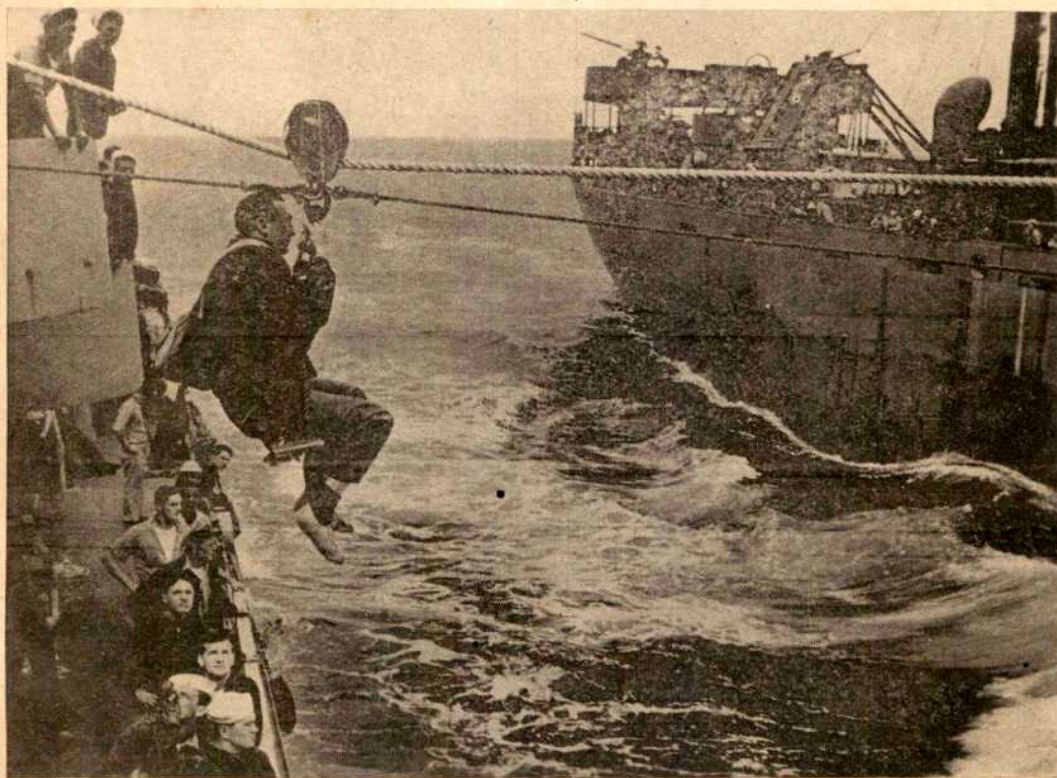
পদ্মপাণি লোকনাথ



মারীচি



উত্তর-আটলান্টিকের দুইটি তুষার-পর্বতের মধ্যবর্তী তুষার-স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া তাহা নামক
উপকূলরক্ষী 'কাটার' অগ্নসর হইতেছে



দড়ির বোলা অবলম্বন করিয়া একটি উপকূলরক্ষী জাহাজ হইতে জনৈক চিকিৎসক অন্য একটি মাৰ্চেন্ট জাহাজে

ঈশ্বর আশ্রয় হলেও রতন বসতে পারলে না। কণ্ঠাক্টার এ দিকের কাঠের খড়খড়িগুলো উঠিয়ে দিলে। কিন্তু জনতা ঢিল ছুঁড়লে আহত হওয়া আশ্চর্যের নয়।

ট্রাম চলছে দেখে পায়ে-হাঁটা যাত্রীরা ট্রাম ষ্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করলে। ড্রাইভার সে ইঙ্গিত গ্রাহ্য করলে না। এ তো স্বাভাবিক অবস্থা নয় যে—স্বাভাবিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

পূর্ণবেগে চলছে গাড়ি—থর থর করে কাঁপছে খড়খড়িগুলো—সেই তালে লাকাচ্ছে রতনের হৃৎপিণ্ড। কখন পৌঁছবে হাওড়া—কখন পার হবে বিপদের গভী।

বড় জংশন সেন্ট্রাল এভিনিউ। এখানে আইন অমান্ত করে গাড়িকে পূর্ণবেগে চালানোর বিপদ আছে। শাস্তি-রক্ষকরা সতর্ক উচ্চিয়ে পাহারা দিচ্ছে পথ। স্তব্ধ গাড়ি থামালো। থামবামাত্রই প্রতীক্ষমান যাত্রীদলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো গাড়ী।

সাহস ফিরে এল—ভয়ও হ'ল রতনের জনতা যদি গাড়ির ভিড় দেখে পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

যদি আক্রমণ করে গাড়ি যেমন কলেজ প্লটের মোড়ে করেছিল! এই সিদ্ধ প্রমাণ পুরুষ মানুষের ভিড়ে বিন্দুপ্রমাণ মহিলাকে আবিষ্কার করে কোন উত্তেজিত মানুষের মনেই বা সহ্যাত স্মবিবেচনার উদয় হবে। হায় হায় ওরা কেন গাড়িতে উঠে বিপদ বৃদ্ধি করলে।

ক্ষেত্রারির প্রথম। সন্ধ্যার মুখে শীতের প্রকোপ যথেষ্টই ছিল। তবু রতনের কপাল দিয়ে টস টস করে ধাম করতে লাগল। মনে মনে আরও জ্বরে ডাকতে লাগল ভগবানকে। গলাটা অসম্ভব রকম শুকিয়ে গেছে—বাইরের স্বর তো ফুটছেই না—মনের মধ্যেও প্রার্থনা ঠিকমত জমছে না।

আবার গাড়ি সচল হ'ল। দুই রাত্তার সংযোগস্থল বীরে বীরে অতিক্রম করে গতি হ'ল তার দ্রুত। ভয়কে তলায় রেখে উত্তেজনা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। হঠাৎ দ্রুতগত সমুদ্রগর্জন ভেসে এল কানে। ফটাফট শব্দ। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা নিশ্চল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলো-গুলো গেল নিবে। হড় হড় করে যাত্রীর শ্রোত গাড়ী থেকে বেরিয়ে পথের ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের প্রবল গর্জনটা গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ল। রতন স্তলতা ও ঝোকার হাত ধরে মোটগুলো পাশে রেখে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। শুয়ে না পড়ে উপায় নেই। বন্ধ খড়খড়ির ওপিঠে লাঠিরুষ্টির প্রচণ্ড শব্দ। কাঁচ ভেঙ্গে পড়ছে—খড়খড়ি ভাঙছে। অন্ধকার গাড়ি। ভেতরে কে আছে দেখবার ঘো নেই। তবু ওরা অন্ধ আক্রোশে লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা কাঁচে কাঁচে থা খেয়ে যে আতঁনাদ তুলেছে তাতে কর্ণপাত করবার অবসর কারো নেই।

আর যে আতঁনাদ রতনের—স্তলতার ও ছোট ছেলেটির

অন্তর ঠেলে উঠছে তা কি অন্তর্যামীর কানে পৌঁছবে এই মুহুর্তে? এই ভাবে একসঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টটা ও কল্পনাই করতে পারছে না। কোথায় ঈশ্বর? প্রাণপণ শক্তিতে স্তলতা আর রতন শুদ্ধ গলার মধ্যে ধ্বনি আনতে চেষ্টা করলে। অন্তরের প্রার্থনায় আন্তরিকতা ফিরে এল।

লাঠি চালিয়ে জনতা শ্রান্ত হয়ে পড়ল কি নতুন ট্রামগাড়ী ঠেঙানোর উৎসাহে এগিয়ে গেল—ঠিক বোঝা গেল না। কণ্ঠাক্টার কাছেই ছিল। তাড়াতাড়ি দোর গোড়ায় এসে বললে, শীগ্গির নামুন, আর এক দল আসছে।

ছেলের হাত ধরলে স্তলতা—আর মোটগুলি ছ'হাতে তুলে নিলে রতন। প্রাণের দায়েও সংসারের হিসাব ওর ভুল হয় নি।

সামনেই ছিল একটা দর্জির দোকান। মালিক বাঙালী। সাদরে আহ্বান জানালেন, আসুন মা, ঘরে এসে বসুন।

স্তলতাকে অনুসরণ করে রতনও সেই ঘরে আশ্রয় নিলে। রতনদেরই মত কয়েকজন নিরুপায় যাত্রী, ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ঠাক্টার সেইখানে আশ্রয় নিয়েছে। এক ছয়ারি ছোট দোকান ঘর। কাটা কাপড়ের স্তুপ এ পাশে ও পাশে। ছুটো আলমারি—জামার ছিট ও তৈরি জামায় ভর্তি। তিন চারটে সিঁদুর মেসিন রয়েছে। কারিগররা আসিন ছেড়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে এই অভিনব দৃশ্য। সবাই কথা বলছে একসঙ্গে, কারও কথা কেউ শুনছে না। চোখের সামনে এমন ব্যাপার ঘটলে কথা না বলে চুপ করে সে দৃশ্য দেখা ও অপরের মন্তব্য শুনে যাওয়াও কম অবশ্যিক নয়।

আশ্রয় পেলে বটে—আশ্রয় হ'ল না রতন। এই সঙ্কীর্ণ ঘর—এতগুলি বাকুবান লোক—ঠাসাঠাসি জামা ও ছিটের কাপড়—দপ্ দপ্ করে জ্বলছে ছুটো উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ আলো—পথের ওপর অমানুষিক কোলাহল—দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল ট্রামগাড়ি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দল এসে ট্রামখানা ঠেঙিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। হৈ হৈ করে আসছে তৃতীয় দল। এরাও ট্রাম ঠাঙাবে ও প্লোগান আওড়াবে। লোহ ও দারু সংমিশ্রিত না হলে দেশলাইয়ের বাজের মত ট্রাম যেত গুঁড়িয়ে। কিন্তু এভাবে দলের পর দল যদি ট্রামকে পিটিয়েই হুঁরা বাড়ায় শাস্তি রক্ষকরা কি করছে তবে? ট্রাম চালু করে এতগুলি বিপন্ন লোককে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া ওদের কর্তব্য নয় বুঝি?

চার-পাঁচ দল ট্রাম ঠেঙিয়ে চলে যাবার পর বেগ ঈশ্বর মন্দীভূত হ'ল যেন। প্রোট দোকানদার (পরে নাম জানা গেল •জগৎবাবু) রতনের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোথেকে আসছেন মশাই?

রাধাধাট।

যাবেন কোথায়?

শিবপুর।

শিবপুর। একটু বিস্মিত হয়ে জগৎবাবু বললেন, তাই তো যাওয়াই মুশকিল।

কেন—গাড়ি কি চলবে না? শুকনোর রতন জিজ্ঞাসা করলে।

গাড়ি। এতক্ষণ যে চলেছে এই আশ্চর্য্য। হাস্যামা বেধেছে দুপুর বেলায়। গুলি চলেছে—লোকও মরেছে।

বলেন কি। তবে কি আজ শিবপুর পৌঁছতে পারব না? জগৎবাবু বললেন, ট্রাম বাসের আশা ছেড়ে দিন। একখানা রিকশ কি বোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিন। না হয় মোটরগলো দোকানে রেখে পায়ে হেঁটে যান।

এই গোলমালের মধ্যে গাড়ি ভাড়াটা মনে মনে হিসেব করে রতন অত্যন্ত কাতর হয়ে বললে, গাড়ী করে এই ভিড় ঠেলে যেতে সাহস হয় না মশায়।

জগৎবাবু বললেন, না—না পাবলিককে ওরা কিছু বলবে না। এই তো একটু আগে হু'জনের রিকশ করে দিলাম।

রতন বললে—তা হলে ওরা ট্রাম বাস পিছুচ্ছে কেন? তাতেও তো পাবলিক যাচ্ছিল।

জগৎবাবু নে কথার উত্তর দিতে—না—দিতে আর এক দল চীৎকার করতে করতে সেন্ট্রাল এভিনিউর দিক থেকে এসে ট্রাম ঠ্যাঙাতে শুরু করলে।

তারা চলে গেলে জগৎবাবু বললেন, তবে হেঁটে যান।

না মশাই—অতদূর হাঁটতে পারব না।

কাছাকাছি কোন আয়ীযবজ্ঞ বা জানা শোনা লোকের বাড়ী আছে কি?

রতন মাথা নাড়লে। বিপদের সমুদ্র চারদিকে উত্তাল হয়ে উঠেছে। অল্প জানা কাউকেও মনে পড়ছে না।

জগৎবাবু বললেন, তবে আমার বাসায় থাকুন আজ রাতের মত। কাল সকালে শিবপুরে যাবেন।

মনের ভাল মনে করে সেই ব্যবস্থায় সায় দিয়ে রতন জিজ্ঞাসা করলে, আপনার বাসা কোথায়?

এই কাছেই—নবীন কুণ্ডুর লেনে। গোলমাল একটু কমুক, দোকান বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে যাব।

তখন আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। এমন কিছু রাত হয় নি যে উদ্বেগ বাড়বে। রাতের মত নিরপদ আশ্রয়ের আশ্বাস পাওয়া মাত্র রতন খানিকটা সুস্থ বোধ করলে। বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে এসেছে সুলতা। এ বিষয়ে ওর বুদ্ধি-বিবেচনার অপ্রভুততা রতন কোন দিন অনুভব করেনি। সুলতা না থাকলে ওর অল্প উপার্জনের সংসারের কি অবস্থা যে হ'ত।

ছেলেটা ইতিমধ্যে গোটা দুই স্বতোর কাটিম ও ছাকড়ার টুকরো জোগাড় করে আপন মনে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌতুকে ও হয়তো আবিষ্ট হয়ে

রয়েছে। হায়—ওদের মত নিরুদ্বিগ্ন চিন্ত যদি বয়স্ক মানুষের হ'ত।

নিধাস ফেলে রতন সুলতার কাছ বৈসে ফিস্ ফিস্ করে বললে, শুনলে তো—আজ শিবপুরে যাবার দফা গয়া! ওরই বাসায় কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সুলতা বললে, তা কখন বাসায় যাবে?

দোকান বন্ধ হলে—এই ন'টা আন্দাজ।

ছেলেটা খেলা সেরে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে বললে, খিদে পেয়েছে।

বায়নাদার ছেলে। একবার হু'বার বলেই কান্দবার উপক্রম করল।

পুঁটুলি খুলে—লুচি বেগুন ডাঙ্গা বার করে খোকাকে দেওয়া হ'ল। সুলতা বললে, একটু জল।

দোকানে জল নেই। আর কোথায় জল পাওয়া যাবে রতন জানে না। জগৎবাবু উঠে কোথায় গেছেন। দোকানের কর্মচারীরা বিশেষ কান দিলে না কথায়।

খোকা খাচ্ছে—এমন সময় মোড়ের মাথায় হুম্ হুম্ করে শব্দ হ'ল গোটা কতক। ছড়মুড় করে লোক ছুটে এল মোড়ের দিক থেকে। জগৎবাবুও ওই দিকে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন, হাস্যামা বাড়ল দেখছি। হু' গাড়ি বোম্বাই মিলিটারি এসেছে—কাহ'নে গ্যাস ছাড়ছে।

এত দূরেও সুস্ব বাপ বাতাসে ভর করে এসে দোকান ঘরে উঁকি দিলে। সকলের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল।

রতন বললে, ওরা গ্যাস ছাড়ছে কেন?

ক'খানা লরি পুড়িয়ে দিলে কিনা।

ওদিকে ফটাকট আওয়াজ বাড়ছে—এদিকের কোলাহলও। প্রলয় কালে বুঝি সপ্ত সমুদ্র উবেল হয়ে উঠল।

দোকানের সামনে তখনও ট্রামটা দাঁড়িয়ে। দোকানের মধ্যে কণ্ঠকূটার আর ড্রাইভার কি করা উচিত তাই বলারুলি করছে। গাড়িটা ড্রাইভারের চার্জে থাকলেও এই অকল্পিত পরিস্থিতির উদ্বেবে ওর দায়িত্বটা শিথিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্যান্সার বোকা কাঁধে বুলিয়ে কণ্ঠকূটারের দায়িত্বটা সেই অনুপাতে বেড়েছে। হান্নাকারীদের মধ্যে অনেক গুণ্ডা বদ-মায়েসও সুযোগ অনুসন্ধান মনোনিবেশ করেছে। তারা সর্বপ্রথমে চেষ্টা করছে বিশৃঙ্খলা বাড়াতে। কোথায় নিরীহ পথচারী, কোথায় টাকার থলি নিয়ে ট্রাম বাসের কণ্ঠকূটার, কোন্ দোকান অরক্ষিত—এই সবের দিকে ওদের দৃষ্টি প্রথর। ওরাও দলে ভিড়ে টেঁচাচ্ছে খুব জোরে, সোডার বোতল বা ইঁট ছুঁড়ছে পুলিশের দিকে—আবার পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুড় ছুড় করে পালিয়েও যাচ্ছে সকলের আগে।

সমুদ্রের ঢেউ এগিয়ে এল ট্রামের কাছে। হাতে ওদের তেলের টিন—পেট্রোল কিংবা কেরোসিন—কে জানে। সেটা উপুড় করলে ট্রামের অভ্যন্তরে।

রতন শিউরে উঠে চোখ বুজলে। ওদের উদ্দেশ্য সে বুঝতে পেরেছে। মুহূর্ত পরে দাউ দাউ করে জলে উঠবে ট্রাম—সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটে আসবে শান্তিরক্ষকের দল। আর পথ থেকে কতটুকু দূরেই বা এই একত্বোয়ারি ঘর। এক ঘর কাপড়ের সঙ্গে—সপরিবারে ওরাও ভস্মীভূত হয়ে যাবে—কাল সকালে নাম উঠবে সংবাদপত্রে। ওদের নয়—এই দোকানখানির। ওরা তো পুড়ে পরিচয়চিহ্নহীন হয়ে লোকের বিষয় ও করুণা উদ্বেগ করবে। আর আগুনে যদি বা পুড়ে না-ও মরে—দোকান থেকে পালাবার সময় শান্তিরক্ষকের গুলিতে প্রাণ দিতেই হবে। কোন সংকাজে নয়—নিতান্ত অকারণেই। পরম উত্তেজনার মধ্যে গৌরবময় মৃত্যুর সন্ধান রতনের মত লোকেরা তো কোন কালে কল্পনা করতে পারে না। অথচ বৈরশাসনের প্রতিবাদে দৈববশে এমনই একটি গৌরবময় মৃত্যুর অনিচ্ছাকৃত অংশীদার হয়েও তার ভাগ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। রতন কাপতে লাগল ঘর ঘর করে।

জগৎবাবু সহসা দোকান থেকে লাফিয়ে ফুটপাথের ওপর এসে চীৎকার করে বললেন, ছি-ছি। করছেন কি আপনারা! ট্রামে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবেন এই এক ঘর লোককে? কচি ছেলে—স্ত্রীলোক—যারা কোন দোষ করে নি—তাদেরকে! আর ট্রাম পুড়িয়ে ক্ষতিটা হবে কার! একে ট্রামের অভাবে কষ্টের সীমা নেই—

জনতা শুনলে সে কথা। দেশলাই জ্বাললে না। কয়েকটি কণ্ঠে শোনা গেল, চল—চল—মিলিটারি ট্রাকে আগুন দেওয়া যাক।

তার পর শ্লোগান আওড়াতে আওড়াতে মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল জনতা।

লোখ খুলে রতন স্থলতাকে বললে, ভগবানকে ডাক। আজ যদি রক্ষা পাওয়া যায়—পুনর্জন্ম মনে করো।

ন'টা বেজে গেল। ঠায় একভাবে দোকানে বসে বিপদের ঢেউ কতক্ষণ গোনা যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বেলা চারটায়। ট্রেনের জিড় ও শহরের হাঙ্গামা উদ্বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে দেখে জমিয়ে তুলেছে প্রচুর শ্রান্তি। একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠছে।

জগৎবাবুকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে—মারোয়াজি-বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। থাকবেন?

আপনার বাড়ি—

দেখছেন তো—সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড় পেরুনো যাবে না। কট করে একটা গুলি লাগলে—ছোট ছেলে—উনি—

রতন আকুল স্বরে বললে, তাই ব্যবস্থা করে দিন মশায়। আপনি আজ আমাদের বাঁচিয়েছেন—আপনাকে কি বলে যে—

না—না—কিছুই নয় এ। মনে করুন—এমন বিপদে আমিও তো পড়তে পারতাম। আসুন। দোকানে পুঁচিল থাক।

থাক মোটবাটি। এ সব তো মাহুষের প্রাণের চেয়ে বেশি নয়! বলে স্থলতার পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রতন উঠে দাঁড়াল। নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন মানসিক বৃত্তিগুলি ওকে ঘিরে ফেলেছে। কিংবা এই সম্বন্ধে নিজেরা পরিজ্ঞান পেলে অথচ অত সাধের সংগৃহীত জিনিসগুলিকে হয় তো রক্ষা করতে পারলে না এই নৈরাশ্রে ক্ষোভ ওর বাস্তবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে।

আশ্রয় পাওয়া গেল। কোলাপ সিবিল গেটের মধ্য দিয়ে ওরা পৌঁছল নাতিপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে। চারদিকে উঁচু পাঁচ ছ' তলা বাড়িগুলি ছুর্ভেদ্য পক্ষপুটে ঘিরে রেখেছে সেই প্রাঙ্গণটিকে। প্রাঙ্গণের এদিকে ওদিকে খানচারেক মোটর—মাকখানে জলের ফোয়ারা। ফোয়ারার বেদি ঘিরে ক'খানা বেঞ্চি পাতা আছে। তারই একখানিতে স্থলতা ও ষোকায়ে নিয়ে রতন বসলে। আঃ—এত আরাম জীবনে ও কোন দিন অনুভব করে নি। চার পাশের বাড়িগুলির অসংখ্য গবাক্ষপথে বিদ্যুৎ আলোর তীর এসে প্রাঙ্গণটিকে ক্ষতবিক্ষত করছে—তবু কি অপক্লপ শান্ত মনে হ'ল প্রাঙ্গণটিকে। উপরে বুলে আছে নক্ষত্রভরা নীল আকাশ—সেও আশ্চর্য্য সুন্দর। নির্বিঘ্ন পরিবেশে ক্রটি অসমাপ্ত্য নিয়ে খুঁত খুঁত করা মাহুষের স্বভাব হ'লেও—রতনরা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

ঘরবার পাশের বেঞ্চে বসে হাত মুখ ধুয়ে আহার সারলে হ'জনে। বাড়ির কোন ছেলে এসে মিঠাই পুরি কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করলে। শোবার জন্ত বন্দোবস্ত হ'ল একখানি মার্বেল পাথরমণ্ডিত ঘর। কয়েকখানা কবলও এরা দিলে। খানিক পরে একজন বর্ষীয়সী ষি (ভাগ্যে সে বললে এই বাড়িতে কাজ করে। নইলে তার এক গা গহনা ও পরিষ্কার-পরিছন্ন বেশভূষা দেখে—দাসী জাতীয় বলে অনুমান করা হুংসাধ্য হ'ত।) বড় একটা গ্লাসে করে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এল খোকার জন্ত। এরা দস্তুরমত ভদ্র এবং অতিথিবৎসল।

শোবার আগে মনে হচ্ছিল কত না ক্লান্ত, শুয়ে কিন্তু ঘুম এল না। রাত বাড়ার সঙ্গে বাইরের হাঙ্গামা বেড়েই চলেছে। আওয়াজ হচ্ছে ফটাকট। কাঁছনে গ্যাস কিংবা গুলি ছোঁড়ার শব্দ। শ্লোগান...আওয়াজ একটানা।

হিন্দু-মুসলমান এক হও। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শোবার পর জানালা দিয়ে আকাশের স্রো অংশটুকু রতনের চোখে পড়ল—তা মনোরম বটে, তবে তারাগুলো অত উঁচুতেও কেঁপে কেঁপে উঠছে—মনে হ'ল। রাজপথের ধুলোয় আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠার কারা রক্তদান করে অমর হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা আশ্রয় করলে—রতনের তা অজানা রইল।

ও স্নাতককে বলল, কাল সকালে ট্রাম চললেই ট্রামে—
নইলে গাড়ি করে শিবপুরে যেতে হবে।

স্নাতক বললে, জিনিসগুলো যে দোকানে রইল।

রতন অন্ধকারে কটমট করে স্নাতকের পানে চেয়ে দাঁতে
দাঁত রেখে বললে, ছুতোরি জিনিস—আপনি বাঁচলাম তাই
যথেষ্ট নয়। আর একদিন এসে জিনিস নিয়ে যাব।

ভোর বেলায় তজ্জার মাঝে ট্রামের ধ্বংস আওয়াজ শোনা
গেল। মধুর আওয়াজ। দেবতাদের স্মরণ করে রতন উঠে
বসলো বিছানায়। স্নাতকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, ট্রাম
চলছে—শীগগির ওঠ।

স্নাতক উঠলে—খোকাকে ওঠালে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য
সেরে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

পাশেই দরজির দোকান। রতন সেদিকে চেয়ে বললে,
দাঁড়াও তো—যদি মোটগুলো পাওয়া যায়।

মোট পাওয়া গেল—ট্রামও এসে পড়ল। তার পর
হাওড়ার ট্রাম বদল করে ওরা নির্ধরে শিবপুরে পৌঁছল।

বাড়ির অঙ্ক ভাড়াটেরা বললে, ব্যাপার কি? কাল কোথায়
ছিলে?

আর ভাই—! রতন পুরুষমহলে আর স্নাতক স্ত্রীমহলে
বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করলে। আশ্চর্য্য, কাল যে পরিমাণে ভয়,
উদ্বেগ, নিরাশা ওদের মনে ভারি পাথরের মত চেপে বসেছিল
—আজ ঘটনাগুলিকে ফেনিয়ে, রসিয়ে করুণ ক'রে বলে
সেই অতুপাতে ওরা আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করলে।

আহারাদির পর সুস্থ হয়ে রতন বললে, কাল কিংবা
পরশু গিয়ে জগৎবাবু ও মারোয়াদিকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব।
ওঁরা যা উপকার করেছেন।

স্নাতক বললে, আহা—ওঁরা ভগবানের প্রেরিত।

সপ্তাহ কেটে গেল উত্তেজনা। ট্রাম বাস ক'দিন চলল
না। তার পর ট্রাম বাস চালু হতেই—রতন বললে, আজ
মনে করছি—বড়বাজারের দিকে যাব। বাস্তবিক ওঁরা যা
করেছেন—ওঁদের ধন্যবাদ না দেওয়া পর্যন্ত মন সুস্থ হচ্ছে না।

স্নাতক বললে, দেখ—একটা কথা বলছিলাম।

রতন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্নাতকের পানে চাইলে।

স্নাতক বললে, জিনিসপত্রের সবই পৌঁছেছে—কেবল
তাড়াতাড়িতে আমার চটি জোড়ারটা দোকানে ফেলে এসেছি।
যদি একবার জিজ্ঞাসা করে—

রতন উগ্র দৃষ্টিতে স্নাতকের পানে চেয়ে বললে, জানি—
তোমাদের হৃদয়পর্ক কিছু নেই। যাব তাঁকে ধন্যবাদ দিতে—
আর অভ্যর্থনার মত বলব—মশাই আমার স্ত্রী এক জোড়া চটি
জুতো ভুল করে ফেলে গেছেন—আপনাদের দোকানে—দয়া
করে যদি সেটা তুলে রেখে থাকেন—! ছিঃ ছিঃ, তাই কখনো
বলা যায়! ওঁরা মনে করবেন কি? ক্রোধে গর গর করতে
করতে রতন বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য্য—সেই দোকানে পৌঁছে—জগৎবাবুর সামনে
দাঁড়িয়ে—নমস্কার করে ধন্যবাদ জানানোর বদলে রতন হুবহু
আবুত্তি করলে,—মশাই আমার স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতো ভুলে
ফেলে গেছেন আপনাদের দোকানে—দয়া করে যদি সেটা
তুলে রেখে থাকেন—

জগৎবাবু বিস্মিত হয়ে তাকালেন কর্মচারীদের পানে।
কর্মচারীরা আড়চোখে রতনের পানে চেয়ে মুচকি হেসে মাথা
নাড়লে। অর্থাৎ তারা জানে না।

এই আড়চোখের চাহনি ও হাসির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হ'ল
না রতনের। কর্মচারীরা নিশ্চয়ই ওকে বুদ্ধিহীন ঠাউরেছে।
ক্রোধে ওর মাথার ভিতর চিন্ চিন্ করে উঠল। কিন্তু
নির্বোধের মত ক্রোধ প্রকাশ করে ও আর একবার ওদের
কৌতুক বুদ্ধি করলে না।

একটু শ্রান হেসে আমতা আমতা করে সে বললে, আচ্ছা
—আচ্ছা—তার জন্তে আর কি! না পাওয়া যায়—নাই
গেল। ভারি তো এক জোড়া জুতো!

বলতে বলতে সে নেমে এল দোকান থেকে। ধন্যবাদ
দেওয়া আর হ'ল না।



নাট্যকার ও নব-হৃদ-প্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৭২—১৮৯৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিস্রব ও অজ্ঞতার দরুন আজিকার বাঙালী পাঠক রাজকৃষ্ণ রায়কে ভুলিতে বসিয়াছে, ‘অবসর-সরোজিনী’ পড়ে না বলিয়াই সে কবি রাজকৃষ্ণ রায়কে জানে না, পড়িলে “ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি” প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না।

রাজকৃষ্ণ কেবল সুকবিই ছিলেন না, তিনি এক জন সুদক্ষ অভিনেতা ও খ্যাতনামা নাট্যকারও বটে। তাঁহার রচনার মধ্যে নাট্যাংশের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—বেঙ্গল, জাশনাল, বীণা ও ষ্টার থিয়েটারের জন্তই তিনি প্রধানতঃ নাট্যাংশগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁহার রচিত “এক প্রহ্লাদ-চরিত্র” নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত তাঁহার ‘নরমেঘজ্ঞে’র কথা এখনও অনেকে জানেন। রাজকৃষ্ণের নাট্যাংশগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহার প্রথম নাট্যাংশ—‘পতি-ব্রতা’ একখানি পৌরাণিক নাট্যাঙ্গীতি, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়; তখনও গিরিশচন্দ্রের কোন নাট্যাংশ প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রাজকৃষ্ণকে রঙ্গালয়ে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য-যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

নাট্যাংশের তালিকা

রাজকৃষ্ণ যে-সকল নাট্যাংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

১। পতিব্রতা (নাট্যাঙ্গীতি)	... ১৮৭৫, ৩ ডিসেম্বর
২। নাট্যসম্ভব (উপরপক)	... ১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর
৩। অনলে বিজলী বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা	... ১৮৭৮, ৭ এপ্রিল
৪। দাদশ গোপাল (প্রহসন)	... ১৮৭৮, ১১ জুলাই
৫। ভারত-দাণ্ডনা (কবিতামূলক দৃশ্যরূপক)	... ১৮৭৯ (১৮৮৬ সাল)
৬। লৌহকারাগার	... ১৮৮০, ২৮ জানুয়ারি
৭। তারক-সংহার	... ১৮৮০, ২০ জুলাই
৮। হরধর্মভঙ্গ	... ১৮৮১, ২৮ জুলাই
৯। রামের বনবাস	... ১৮৮২, ১৫ আগষ্ট
১০। যজুবংশধর	... ১৮৮৪, ১ মার্চ
১১। তরঙ্গীসেন বধ	... ১৮৮৪, ১৫ জুলাই

১২। রাজা বিক্রমাদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক)	... ১৮৮৪, ২৫ আগষ্ট
১৩। প্রহ্লাদ-চরিত্র	... ১৮৮৪, অক্টোবর
১৪। চমৎকার	... ?
১৫। চন্দ্রহাস	... ১৮৮৮, ১৬ জুন
১৬। হরিদাস ঠাকুর	... ১৮৮৮, ২৫ জুলাই
১৭। কলির প্রহ্লাদ (ব্যঙ্গনাটক)	... ১৮৮৮, ২ সেপ্টেম্বর
১৮। কাণা কড়ি (বিজ্ঞপহাসক)	... ১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর
১৯। মীরাবাই	... ১৮৮৯ (১৮৯৬ সাল)
২০। খোকাবাবু (প্রহসন)	... ১৮৯০, ২ মার্চ
২১। বেহুনে বাঙালী বিবি (প্রহসন)	... ১৮৯০, ২ মার্চ
২২। ডাক্তার বাবু (প্রহসন)	... ১৮৯০, ২৫ মার্চ
২৩। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা	... ১৮৯০, ৯ জুলাই
২৪। চতুরালী (কৌতুক-নাট্যাঙ্গীতি)*	... ১৮৯০, ১১ জুলাই
২৫। চন্দ্রাবলী (নাট্যাঙ্গীতি)	... ১৮৯০, ২৬ জুলাই
২৬। টাটকা-টোটকা (প্রহসন)	... ১৮৯০, ৯ সেপ্টেম্বর
২৭। জগা পাংগলা বা জ্যাক্তে মরা (প্রাঙ্গনিক নাট্যরঙ্গ)	... ১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর
২৮। লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক)	... ১৮৯০, ৪ অক্টোবর
২৯। জুজু! (প্রহসন)	... ১৮৯০, ৬ অক্টোবর
৩০। রাজা বংশধরজ	... ১৮৯১, ১৫ জানুয়ারি
৩১। হীরে মালিনী (নাট্যাঙ্গীতি)	... ১৮৯১, ১৮ জানুয়ারি
৩২। লক্ষহীরা	... ১৮৯১, ২৫ জানুয়ারি
৩৩। প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র ২য় খণ্ড	... ১৮৯১, ২৮ জানুয়ারি
৩৪। নরমেঘজ্ঞ	... ১৮৯১, ১ আগষ্ট
৩৫। লয়লা-মজ্নু (গীতি-নাটক)	... ১৮৯১, ১২ ডিসেম্বর
৩৬। বনবীর (ঐতিহাসিক নাটক)	... ১৮৯২, ৩ ডিসেম্বর

* রাজকৃষ্ণ ইহার “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন :—“বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক-নাট্যাঙ্গীতি (Comic opera) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা ‘চতুরালী’ রচনা করিলাম।”

৩৭। ঋগ্বেদ (গীতিনাট্য) ... ১৮৯২, ৩১ ডিসেম্বর

৩৮। বেনজীর—বদ্রেমুনীর

(গীতিনাট্যিক) ... ১৮৯৩, ২১ ডিসেম্বর

রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী, ১ম-৭ম ভাগ।—রাজকৃষ্ণ রায়ের কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হইয়া প্রথমে রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছিল। *এগুলি—

১ম ভাগ (এপ্রিল ১৮৮৪) :—উৎকট বিরহ—বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া (ঔপহাসিক হাস্যনাট্য)।

২য় ভাগ (ইং ১৮৮৫) :—গঙ্গা-মহিমা নাটক, বামনভিক্ষা, দশরথের যুগয়া বা বালক সিদ্ধুবধ।

৩য় ভাগ (ইং ১৮৮৮) :—ভীষ্মের শরণায়া, হর্কাসার পারণ।

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৮৯) :—হরিহরলীলা, জন্মাষ্টমী, প্রমদরা, হৈয়ালি অভিনয়।

৫ম ভাগ (ফেব্রুয়ারি ১৮৯২) :—লক্ষপতি, শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা, গিরিগোবর্দ্ধন, ছুটি মনোচোরা।

কাব্যে ও নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন

রাজকৃষ্ণের 'হরধর্ভঙ্গ' একখানি সুলিখিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য, প্রকাশকাল—২৮ জুলাই ১৮৮১। ইহার একটি অভিনব আছে। অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে বাংলা নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণই সর্বপ্রথম এই ছন্দে 'হরধর্ভঙ্গ' নাটকখানি রচনা করেন। এই আভিনয়িক ছন্দের উপযোগিতা বুঝাইবার জন্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“দুই তিন জন সুদক্ষ অভিনেতার অহরোধে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 'হরধর্ভঙ্গ নাটক' খানি লিখিতে হইল। তাঁহাদের অহরোধ, নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে বড় ভাল হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়া দেওয়াও চাই। সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ছন্দে লিখিয়া শেষ করা যে কি পর্য্যন্ত দুর্ভট, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ত আমি ইহার অধিকাংশ স্থলে “ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে” দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক প্রকার অহরোধ রক্ষা করিলাম।

“এ দেশে কবির ৩মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ বাহির করেন। চতুর্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ সেই চতুর্দশটি অক্ষরেই গঠিত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্য খানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর-

ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও



রাজকৃষ্ণ রায়

প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দশাক্ষরায়ক অমিত্রাক্ষরছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অঙ্গুত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের জাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চুড়ামণি ৩বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐ রূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, “এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারাই এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।” ইংলণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষেণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক “ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ” বাঙ্গালায় হইত কি না

সন্দেহ। এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে “জলবৎ তরল” এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। লোকের অহরোধে বা নিজের ইচ্ছায় দুই চারি দিনের মধ্যে এক এক খানা বড় বড় নাটক পড়ে লিখিতে হইলে এই “জলবৎ তরল” ছন্দই—এই অমিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই—বিশেষরূপে উপযোগী। সুতরাং এই হরধর্মুর্ভঙ্গ নাটকের অধিকাংশ স্থলেই ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে।...

“ইংলণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃনপ্রদায় সেক্ষণীর, বেন্ জনসন, অট্টোয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ আভিনয়িক ভাঙা ছন্দে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া, তাঁহারা এই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাওয়া উড়াইয়াছেন। সেই হাওয়া যে, আমাদেরও গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না ইংরাজি আমাদের বর্তমান রাজভাষা।...

“মহাকবি সেক্ষণীর তরীয়া জগদ্বিখ্যাত নাট্যকাবলীর মধ্যে গত ও পত্ত উভয় ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার পত্তভাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) মিত্রাক্ষর ও (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অনেক বেশী। তিনি যে যে স্থলে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থলে সে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মহাকবি মিল্টন প্রভৃতির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ছায় নিয়মবদ্ধ নহে, অভিনয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া নানাবিধ ছোট বড় পংক্তিতে ক্রমাগত প্রথিত। সুতরাং উক্ত ছন্দকে আমরা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দ বলি। উহা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহাকে পড়াবার গতও বলা যাইতে পারে। আমরা কলিকাতার থিয়েটার স্ট্রল ও করিন্থিয়ান থিয়েটারে ইংরাজ অভিনেতৃগণ কর্তৃক অভিনীত উক্ত মহাকবির ‘হামলেট’, ‘ম্যাকবেথ’, ‘কিঙ লিয়ার’, ‘ম্যাক এডো এবাউট নাথিং’, ‘ওথেলো’ প্রভৃতি নাটকগুলির আভিনয়িক বাক্যপরিম্পরা শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যেন স্বাভাবিক গল্প কথা কহা হইতেছে। দেশীয় রঙ্গভূমিতেও সেইরূপ হওয়া উচিত।

“আমি ১২৮৫ সালে ‘নিত্তনিবাস’ নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ষণ্ড কাব্য প্রভৃতিতে ইহা যেন “এক ঘেয়ে” হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, অধিক লিখি নাই; যাহা হউক, এ স্থলে সেই স্থান তুলিয়া দিতেছি। (স্বতন্ত্ররূপে পার্শ্বে বসিয়া উল্লেখ্যভাবে) বিজয় বলিতেছেন;—

প্রিয়তমে!—মনোরমে।

উঠ উঠ, বেলা হ’ল;

উঠ না হে,
উঠ না হে,
ধাক শুয়ে—ধাক শুয়ে।
আমি কি নির্দয়,
হায়,
জাগাই তোমায় তাই,
ধাক শুয়ে,
উঠিও না,
খুল না খুল না আঁধি;...”

রচনার নিদর্শন-রূপ ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ‘হরধর্মুর্ভঙ্গ’ নাটকের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ;
অগ্নিচক্র মধ্যাহ্ন তপন;
সূর্য্যকরে বিদম্ভ ধরণী।
ডাকে না বিহঙ্গ শাখে,
রুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া নীরবে।
প্রকৃতির প্রভাতের হাসি নাহি আর;
মুচ্ছিত হইয়া যেন আকুল-হৃদয়া।
বহি’ছে গঙ্গার বারি, ধীরি ধীরি গতি,
নির্জন প্রদেশে।
তরী নাহি একখানি;
কেমনে হ’বেন পার রাম রঘুমণি
লক্ষণের সনে?
অগ্নি গঙ্গে পতিতপাবনি।
কর পার ভব-সিন্ধু-পার-কাঙারীরে,
দয়াময়ি। (পৃ. ৪৪)

বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক-রূপে যে-সম্মান রাজকৃষ্ণ রায়ের জায্য প্রাপ্য তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ প্রচার করিয়াছেন, “রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্রই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—প্রথম প্রবর্তিত করেন।” কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘হরধর্মুর্ভঙ্গ’ নাটকের সহিত পরিচয় থাকিলে বা ইহার প্রকাশকাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, তাঁহারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। ‘হরধর্মুর্ভঙ্গ’ ও ‘রাবণবধ’ একই বৎসরে প্রকাশিত হয়; উভয় নাটকেরই আখ্যাপাত্র প্রকাশকাল—“১২৮৮ সাল” মুদ্রিত আছে। কিন্তু তারিখ ও মাসের উল্লেখ না থাকায় কেবলমাত্র সাল দ্বারা কোনখানি আগে, কোনখানি পরে প্রকাশিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কঠিন হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যত পুস্তক মুদ্রিত হয়, মুদ্রাকরের প্রেরিত বিবরণী হইতে সেগুলির নামধাম-প্রকাশকাল-আদি সংকলন করিয়া গবর্নমেন্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি চারি কিস্তিতে ‘ক্যালকাটা গেজেট’ে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গেজেট হইতে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধর্মভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ'র সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করিয়াছি।

'রাবণবধ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—৫ নবেম্বর ১৮৮১ তারিখে। নাটক প্রচারিত হইবার পূর্বেই রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রমাণ। 'রাবণবধ'ও পুস্তকাকারে প্রকাশের তিন মাস পূর্বে—৩০ জুলাই ১৮৮১ তারিখে জ্ঞানদাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী। তাহার 'হরধর্মভঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—২৮ জুলাই ১৮৮১ তারিখে এবং বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় তাহারও পূর্বে।

নাটকে পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্য

আভিনয়িক পদ্যছন্দ ছাড়া রাজকৃষ্ণ বাংলা নাটকে আরও একটি নূতন ধরণের ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন; উহা পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্য, যাহাকে কেহ কেহ আধুনিক কালে "গল্প-কবিতা" বলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকের "বিজ্ঞাপনে" রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"আমি এ দিকে ক্রমান্বয়ে হরধর্মভঙ্গ, রামের বনবাস, যজুবংশধ্বংস এবং তরঙ্গীসেনবধ এই চারিখানি নাটক যে ছন্দে লিখিয়াছি, উহা আভিনয়িক অমিত্রাক্ষর পঞ্চছন্দ। গত ১২৮৫ সালে মংগলীত নিতৃতনিবাস কাব্যের এক স্থলে আমি এই ছন্দের কিয়দংশ লিখিয়াছিলাম। তখন এই ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক প্রকাশিত হয় নাই।...

"সম্প্রতি এই 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকখানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্তে নূতন ধরণের গল্পে রচিত হইল। ইহা আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্য। হুই এক স্থলে

আভিনয়িক পঞ্চছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্যন্ত এরূপ পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্ত এই নূতন ধরণের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্য গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগধৃতি বা বাকপুষ্টি (Prompting) পক্ষে এইরূপ গদ্য-পৌঙ্ক্তিক যেমন অভিনয়-ব্যাখ্যা-নিবারণের সুগম উপায়, টানা গদ্য-পৌঙ্ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।"

রচনার নিদর্শনরূপ আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্ক্তিক গদ্যে লিখিত 'রাজা বিক্রমাদিত্য' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রম—ভর্তৃহরির ধন সংসার-বিরাগ।

এই বিরাগের ফল "অমরশতক" গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে রমণী-প্রেমের কুটিল চিত্র

এবং বিবেকের মূর্তি স্নান চিত্রিত হয়েছে।

যার লেখনী এমন গ্রন্থ রচনা করেছে,

তাকে পুনর্বীর সংসারী করা দুঃসাধ্য।

অনেক বরেন্দ্র—অনেক বুঝলেম,

কিন্তু শ্রোত কোন মতেই ফিরলো না।

ধাব, আর বিরক্ত করবো না।

মধ্যে মধ্যে নিজেই এসে ভর্তৃহরিকে দেখে যাবো

এখন আর এখানে বিলম্ব করবো না,

মহিবীকে বলে এসেছি শীঘ্রই ফিরবো,

কিন্তু রাজি প্রভাত হয়ে এলো,

মহিবী না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন। (পৃ. ১২৭)

মালাকার পথে একদিন

(পূর্বাহ্নয়তি)

শ্রীগৌরমোহন দাস দে

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। মাঝে মাঝে পিচ উঠে গিয়ে রাজামাটির পথ হয়ে গেছে। দুধারেই লোকের বাড়ী। গ্রামটি ছাড়িয়ে সোজা চললাম। ক্রমে ক্রমে আমরা মালাকা প্রণালীর তীরে এসে পড়লাম। মালাকা শহর এখান থেকে সাড়ে ছয় মাইল হবে। তীরছূমির ধার দিয়ে বিরাট বিরাট অট্টালিকা উঠেছে, সবই পাশ্চাত্য ধরনের। সামনে এক-একটা ক'রে ছোট-বড় বাগান রয়েছে। একটু আগে দু'ধার থেকে বড় বড় সুন্দর বাড়ী

উঠেছে। এ বাড়ীগুলো সবই চীনাদের। বাড়ীগুলো দেখে বালিগঞ্জের কথা মনে পড়ে গেল। এই সময় এখানে বর্ষাকাল কিন্তু রাতারাতি যেন বক্ বক্ করছে। এ দিককার রাস্তা সুন্দর, চওড়া ও পিচঢালা।

এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগল। এখান থেকে মালাকা প্রণালীর মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গলভরা দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়—জেলেরা মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে জোয়ার চলে গেলে শুকনো বালুময় তীরে এরা 'পাগার' তৈরি



হাসপাতালের একাংশ

করে। কতকগুলো বাঁশের বেড়া তৈরি করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেয়। জলের দিকে একটু কঁক রাখে মাছ ঢোকবার জেতে। যখন জোয়ার আসে ছোট-বড় মাছ সব ভেতরে ঢোকে। জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে না। ভাটার সময় জেলেরা মাছগুলো ধরতে পারে। এইরকম বড় 'পাগার' এখানে দেখলাম। দূরে জেলেক্সি দিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। একটু আগে বাদিকে মালয়ীদের কবর। এখানকার রাত্তা মাঝে মাঝে একেবারে প্রণালীর ধার দিয়ে এঁকে বেকে চলেছে, জল মাঝে মাঝে রাত্তার ওপর আছড়ে পড়ছে। মালাক্কায় ঢোকবার মুখে বড় বড় অট্টালিকাগুলো দেখে মনে হয়েছিল শহরের ভিতরেও এই রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পাব। কিন্তু চুকেই চোখে পড়ল অত্যন্ত অপরিষ্কার ছোট-বড় বাড়ীগুলো মালাক্কা প্রণালীর ধার দিয়ে উঠেছে। এই বাড়ীগুলো সবই চীনাদের। বাইরের দরজা-গুলোতে সোনালী রঙের প্রলেপ। মালয়ী এখানে খুব কম, বেশীর ভাগ অধিবাসীই চীনা। ভারতবাসী এবং সিংহলীও



সুপ্রীম কোর্ট

এখানে খুব কম। এখানকার চীনারা খুব ধনী ও ব্যবসায়ী। মনে হয় দেশটা যেন চীনাদেরই।

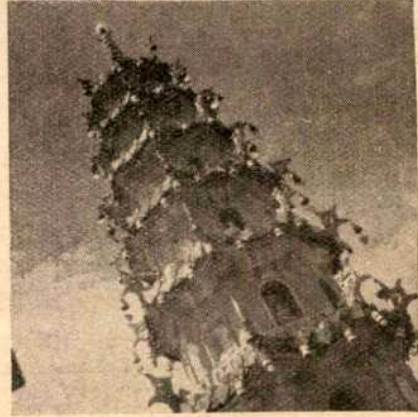
চীনাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা করে দোকান আছে— স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই বেচাকেনা করছে। এরা এখন মাতৃভাষা এক রকম বর্জন করেছে। প্রায় সবাই মালয়ী ভাষায় কথা বলে। সাড়ে বারোটায় আমরা মালাক্কায় পৌঁছি, সেখানে নানা জিনিষপত্র সওয়া করতে করতে একটা বেজে গেল। তার পর জিপ চালিয়ে বাদিকে মোড় ঘুরতে হ'ল, সামনেই একটা বড় পোল। এটা মালাক্কা নদীর উপর। পোলটা পার হয়ে সামনেই টাওয়ার রক—তবে এখন খড়িটা অচল হয়ে রয়েছে। এর সামনেই লাল রঙের



রোমান ক্যাথলিক গির্জা, আনসন রোগ্

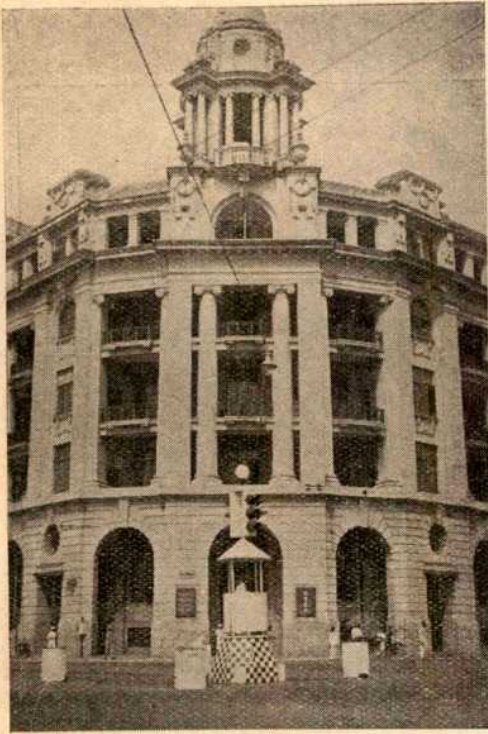
অনেকগুলো পুরনো বাড়ী। পেছনে পাহাড়ের ওপর পুরাতন পত্তীগীজ কেল্লা মাথা উঁচু করে রয়েছে। এখানে কিছু দেখবার নেই। শুধু কতকগুলো অস্থিকঙ্কালসার দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এটি বোধ হয় তৈরি হয় খ্রীঃ পূঃ ১৫১১-১৬০৫ অব্দের মধ্যে। আসবার পথে লাবুচিনা ক্যাম্পাঙের মাইলতিনেক আগে এদের একটা রবার এণ্টেট দেখে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীর মোড় ফেরানো হ'ল একেবারে সিঙ্গাপুরের পথে। এখানে বাদিকে মেয়েদের কনভেন্ট, ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, রেঠ হাউস, খেলার মাঠ রয়েছে। ডানদিকে মালাক্কা প্রণালীর ধারে কতকগুলো জাপানী

বন্দীকে প্যারেড করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। জাপানীদের বেশ সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেখে। কিছুদূর যাবার পর ডানদিকে উঁচু প্রাচীরেবরা জেলখানা নজরে পড়ল। একটা দোতলা কাঠের বাড়ী মাঝখানে রয়েছে, সেটার কয়েদীরা থাকে। ডানদিকে ছোট একটা রাস্তা জেলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। আমরা ভিন্ন একটা বড় রাস্তা ধরে সোজা বাঁদিকে চললাম। ডানদিকে একটু দূরে একটা পাহাড়ের ওপর পর্বতগুজদের আর একটা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে দেখলাম। আন্দাজ আধ মাইল এগিয়ে আমরা একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম। ডানদিকে গেলে



আজ্ঞের হিউম, পেনাঙ

cityতে গিয়ে সেন মশায়ের বাড়ী খুঁজে বের করলাম। দেখানে আর একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হ'ল। মালাকায় বাঙালী পরিবার খুব কম। ইতিমধ্যে সেন মশায়ের জী আমাদের খাবারের জোগাড় করতে চাইলেন। ছুপুরে রোদ খাঁ খাঁ করছে, এমন সময় বাইরে যেতে কারও ইচ্ছে হয় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেন মশায়কে নিয়ে জীপ করে বেরিয়ে পড়লাম—মালাকা শহর দেখবার জে। জেলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। এবার আমরা মালাকা শহর ও মালাকা হাসপাতাল দেখবার জে যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরলাম। খোলা মাঠে রোদের মধ্যে জাপানীদের সেই অবিরাম প্যারেড চলেছে। শহর পার হয়ে আমরা গ্রামের ভেতরে ঢুকলাম, ধানের ক্ষেত এখানেও রয়েছে। একটা ঘেরা চহরের মধ্যে বড় বড় পাঁচতলা বেশ সুন্দর সুন্দর অটালিকা দেখলাম। সামনে ডানদিকে বড় একটা গেট—লাল মাটির পথ চলে গেছে ভেতরের দিকে। আমাদের জীপ আন্তে আন্তে ঢুকে



টাউন হল, সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের দিকে যাওয়া যায়—বাঁদিকে এগোলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মালাকা শহরে পৌঁছানো যায়। আমরা সোজা চলে গেলাম একটা ছোট গ্রামের ভেতরে সেন মশায়ের বাড়ীর খোঁজ করবার জে। সামনে একটা উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। পাহাড়টি বেশ বড়—ইটের গাঁথুনি এটাকে বেশ বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। এই পাহাড়টির নাম 'বুকিত চিনা', আর ঐ ইটের গাঁথুনিগুলো চীনাঁদের কবর। এই রকম ছোটো পাহাড় এখানে কবরে কবরে ভরতি হয়ে গেছে, কোথায় একটুও ফাঁক নেই। তাই চীনা সম্প্রদায় ঠিক করেছে যে সমাহিত করার চেয়ে পোড়ানোই ভাল। খানিকক্ষণ পরে পাহাড়ের ওধারে Garden



বন্দা রোড

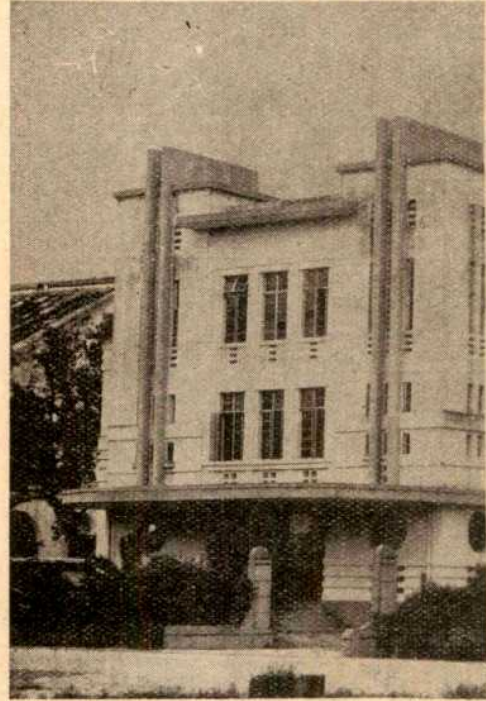
পড়ল। খানিক দূরে আমরা মিত্র মশায়ের বাড়ী এসে উঠলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন, আমাদের পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আমরা তাঁর সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে চললাম। খানিকটা যাবার



বোষ্টন এণ্ড কোম্পানির দোকান

পর দেখি সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে। মিত্র মশায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ওটা খালিই পড়ে ছিল অনেকদিন থেকে। জাপানীরা যখন এদেশ দখল করে ও সূদূর প্রাচ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন ছাত্রদের সুবিধার জন্তে সিঙ্গাপুর মেডিকেল স্কুল উঠিয়ে দিয়ে মালাক্কা স্থানান্তরিত করে। সিঙ্গাপুরে তখন তারা মিত্রপঙ্কের বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল। এক অংশে দেখলাম ছেলেদের হোস্টেল, আর একটা অংশে ক্লাস। নীচে ছেলেদের মেন রয়েছে। প্রত্যেক খাবার টেবিলে নাম লেখা রয়েছে—এখনও কেউ পরিষ্কার করে নি। চীনা, সিংহলী, মালয়ী ও ভারতবর্ষীয় সব জাতির ছেলেরা এখানে পড়তে এসেছিল এই নামাবলী দেখেই বুঝতে পারলাম। এদের পড়াবার জন্তে ভাল ভাল অধ্যাপক জাপান থেকে এসেছিলেন। নূতন ছ-একটি ঔষধ ও যুদ্ধের সমন্বয় এরা তৈরি করেছিল। এর পরে আমরা গেলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। মেঝে ও পাশের দেয়াল (সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত) রবার দিয়ে মোড়া। কেউ জোরে চললে যেন পদশব্দে রোগীদের বিশ্রাম ও শান্তির ব্যাধাত না হয়। নার্সদের অহুমতি নিয়ে আমরা ওয়ার্ডে গেলাম। এখানে রোগীর সংখ্যা খুব কম—প্রায় সবাই গরীব মালয়ী। জাপানী আমলে এরা এখানে আসতে ভয় পেত—এখন জাপানীরা চলে যাওয়াতে একে একে এসে জুটেছে। তিন শ্রেণীর কেবিন দেখলাম। নার্সগুলি সব চীনা—মালয় দেশে এদের জন্ম; স্বাস্থ্যবতী ও বেশ কর্মঠ। জাপানী আমলে এরাই ছিল এখানকার নার্স। এদের উপর জাপানীরা কোন অত্যাচার করে নি। এখানে অনেক অস্ট্রেলিয়ান নার্স ছিল যুদ্ধবন্দী হয়ে—তাদের প্রতি নাকি খুব খারাপ ব্যবহার

করা হয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে আমরা পাঁচ তলার ছাদে উঠলাম। সেখান থেকে মিত্র মশায় পুরনো হাসপাতাল দেখালেন, একটা বনের মধ্যে ছোট ছোট বাংলো অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এখান থেকে 'জোহর বার'র পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়, দূরে কালো পাহাড় মেঘে ঢাকা রয়েছে। হাসপাতালের নির্মাণ আরম্ভ হয় ইং ১৯২৮ সালে এবং শেষ হয় ইং ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ওখান থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড এবং প্যাথোলোজি রুম দেখতে গেলাম। পাশেই মর্গ (পোস্টমর্টেম রুম) রয়েছে। এই সব দেখবার পর মিত্র মশায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন।



'সিটি লাইট'—নৃত্য-ভবন

ফিরলাম বাজারের দিকে, বাজারটি শহরের এক পাশে—শাকসব্জী অনেক রকম নজরে পড়ল। সেখান থেকে একটু দূরে মালাক্কা রেলওয়ে স্টেশন। গিয়ে দেখি স্টেশনটি ঠিকই আছে—কিন্তু রেল লাইন নেই। জাপানীরা শ্রামের কাছে রেল লাইন পাতবার জন্ত এগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। আমি শ্রামের ওদিকে গিয়েছিলাম, কিছু কিছু নূতন রেল লাইন পাতা হয়েছে দেখছি। শহরের মধ্যে অনেক দোকানপাট রয়েছে—ছোট ছোট রাস্তা আর সব চীনাদের দোকান। এখানে সব জিনিষ সস্তা।

আর দেরি করা যায় না—ক্যাম্পে আজই ফিরতে হবে, তাই সেনা মশায়ের ওখানে খাবার জন্তে গাড়ীর মোড় ফেরান হ'ল। সেনা-গৃহিণী চমৎকার হালুয়া আর কফি তৈরি করে রেখেছিলেন। খেতে বেশ লাগল। নমস্কার জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম।

নব-সন্ন্যাস

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

টুলু নিরতিশয় বিশ্বয়ে মাষ্টার মশাইয়ের মুগ্ধের পানে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর শুধু বলিল—“ব্যভিচার!”

এর আগে ধর্ম লইয়া, অন্তত তাহার ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া এক-আধবার বিক্রপ করিয়াছেন—তাও মনে হইয়াছে লঘু ভাবে কখন-কখন কথা কওয়া স্বভাব বলিয়াই—একেবারে সোজা মুক্তি যে এতবড় আঘাতটা দিবেন, টুলু নিজের মনকে যেন বিশ্বাস করাইতে পারিতেছে না। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“আপনি কোন্টাকে ব্যভিচার বললেন স্ত্র, তান্ত্রিক সিস-টেমটাকেই, না, সিদ্ধাবার এই যে সমাধিপ্ৰাপ্তি, এই যে শুচি-অশুচি সম্বন্ধে নির্বিকার ভাব, এই যে সবকিছুর মধ্যেই তাঁর তেজের বিকাশ...”

কণ্ঠে শুধু ক্ষোভই নয়, খানিকটা আবেগও আসিয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় একটু দৃষ্টান্তও—সামান্য হইলেও একটু বিদ্রোহ। মাষ্টার মশাই বলিলেন—“তন্ত্র সিসটেমটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলবার অধিকারী নই টুলু। আমার জীবনে আমি ধর্মচর্চা করবার অবদান পাই নি, অন্তত এই সিসটেম অনুযায়ী ধর্ম, যাকে ক্রীড (creed) বলে, যা এক মানুষ থেকে অল্প মানুষকে আলাদা করে রাখে। তাই আমি ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই পছন্দ করি। তবে এ প্রশ্নটা ত মনে উদয় হতে বাধ্য যে, এই প্রায় হাজার বছরের মধ্যে যে সব সাম্প্রদায়িক ধর্মের উৎপত্তি—বোধ হয় মাত্র একটির কথা বাদ দিলে—তারা আমাদের দিয়েছে কি? আমাদের যা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ পরাধীনতা—তা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পেরেছে?—যা হারিয়ে, আমাদের ঘর বাঁচিয়ে, আমাদের সম্রম বাঁচিয়ে, এমন কি যে ধর্মকে সবচেয়ে বড় বলে মেনে নিয়েছি তাকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে আমরা মানুষের মর্যাদায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি নি। বরঞ্চ দিন দিনই নতুন নতুন ক্রীডের নব নব মোহে আমরা জীবন সম্বন্ধে উত্তরোত্তর উদাসীন হয়ে গেছি, যে জীবন এত বড় একটা বাস্তব, যার মধ্যে এত বড় সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ঠেলে রেখে...”

“কিন্তু আমরা কি মিছিমিছিই ঠেলে রেখেছি? এই বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা কি একটা বড় আনন্দ অর্জন করছি না স্ত্র?”

আশ্রমের বাঁধা বুলি; মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—“কোথায়?”

“এর পরের জগৎ—পরলোকে—সেখানে আনন্দ আরও সত্য।”

মাষ্টার মশাই একটু চুপ করিলেন। তাঁহার মুখে আবার

একটু হাসি ফুটল, ব্যঙ্গের হাসি, বলিলেন—“করছিই যে, এমন বলতে পারি না, তবে করলেও দে আনন্দ আমাদের সামনে থেকে উবে যাবে টুলু—আমাদের মনের গঠনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা যেটা হাতের কাছে পাচ্ছি সেটা ছেড়ে ক্রমাগতই একটা আরও বড় জগৎ ব্যাকুল হয়ে উঠি।—অনেক তপস্যায় স্বর্গ পেলে আমরা সেটাকেও পায়ে ঠেলে আরও একটা বড় স্বর্গের জগৎ ব্যাকুল হয়ে উঠব—আমরা অর্জনই করে যাব, পাওয়া—ভোগ করা এ চিরবৈরাগীদের ভাগ্যে কখনই জুটবে না।—যাক, তোমার প্রশ্নের ওপর একটু অবাস্তব কথা এসে পড়ল। আমি যা বলছিলাম—নতুন নতুন ক্রীডের মোহে, এত বড় সম্ভাবনার যে জীবন সেটা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই উদাসীন হয়ে গেছি। আমাদেরই সমাজ-শরীরের অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে, নির্বিকারভাবে চেয়ে দেখছি। বড় বড় ধারা ধর্মপ্রবর্তক তাঁদের অশ্রদ্ধা করি আমার এমন ধৃষ্টতা নেই, তবে একটা কথা ঠিক যে হয় তাঁরা তাঁদের বাণীকে একেবারে যুগোপযোগী করে দিতে পারেন নি, নয় ত লোকে নিতে পারেন নি; হয়ত দু’টোই একসঙ্গে সত্য। চৈতন্যের ধর্মই দেখ না—অন্তত আচণ্ডাল সবাইকে কোল দিতে বলেছিলেন তো? ও-যুগে যা সবচেয়ে অচিন্তনীয় ব্যাপার—মুসলমানকে পর্যন্ত তিনি নিজের ধর্মে গ্রহণও করে-ছিলেন। লোকে পারলে রাখতে? সেই জাত-পাত সবই রয়েছে—বাড়তির মধ্যে এল অভিদারের জয়জয়কার আর পুরুষদের কণ্ঠে মেয়েদের বিরহের নাকী কান্না। একে পুরুষ দেশে ছিলই কম—”

টুলু বাধা দিল, বলিল—“স্ত্র—”

মাষ্টার মশাইয়ের কথাগুলো ক্রমাগতই ক্রমশই উঠিতেছিল, যা সাধারণত হয় না; চুপ করিয়া একটু অজমনক হইয়া রহিলেন। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—“কিছু বলবে?”

মাত্র বাধা দিবারই উদ্দেশ্য ছিল টুলুর, তবু প্রশ্ন করিল—“কিন্তু এতে চৈতন্য আর কি করতে পারতেন?—আপনি—‘হয়ত দু’টোই একসঙ্গে সত্য’—বললেন, তাই জিগ্যেস করছি।”

“এত বড় মুক্তির মন্ত্র যে দিলেন, তার সঙ্গে শৌর্যের মন্ত্র দেওয়া উচিত ছিল, কেননা শৌর্যই মুক্তিকে রক্ষা করতে পারে। যে সাহস, মনের যে বলিষ্ঠতা পেলে সমাজের এই জাত-পাতের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা যেত, সেই সাহস আরও এগিয়ে আরও বড় জিনিস এনে দিতে পারত আমাদের—আরও বড় মুক্তি। এও হতে পারে উনি ভেবেছিলেন এই মুক্তি থেকেই ওই সাহস জন্মাবে; কিন্তু মাটির দোষেই হোক, বা ঘে জগ্গেই হোক, তা জন্মাল না।”

ছ'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বেশ ধানিক-ক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই বলিলেন—“কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমি অনধিকারী টুলু, ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করবার অবসর আমি পাই নি জীবনে। শুনেছি সব ধর্মের সামনেটা তার খোলস মাত্র, ভেতরে অতি স্বল্প জিনিস আছে। আমার মোট বক্তব্য, তা মেনে নিলেও এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হচ্ছে।—ধরো ঐ বস্তুটা—তুমিই বললে ওরা মানুষের স্তর থেকে নেমে গেছে। আমি বলি আগে ওদের মানুষের স্তরে তুলে নিয়ে আসতে হবে—শুধু পেটের অন্ন, পরনের কাপড় আর মানুষের সাধারণ নীতিবোধ দিয়ে, তার পর ওদের ধর্ম দেওয়া আর স্বল্প তত্ত্বকথা বলা—যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের ধর্ম আমার একটা অমার্জনীয় বিলাস বলেই মনে হয় টুলু। ইতিহাসের গোড়ায় দেখতে পাই যতদিন নাকি অর্থ-দের অতিমাত্রায় যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে থাকতে হ'ত, ততদিন যুদ্ধটাই ছিল সমাজ-জীবনের বড় কথা, যুদ্ধ তখন সবার সাধারণ ব্রত ছিল। যুদ্ধ-কাণ্ড শেষ করে যখন সমাজ গোছাবার অবসর হ'ল তখন তাঁরা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জায়গা দিয়ে, যারা তাতে ব্রতী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের স্বল্প সমাজের শীর্ষে তুলে রাখলেন। আমাদের এখন চারদিকে যুদ্ধের অবস্থা চলছে টুলু, এমন অবস্থা যে রক্ষাও করতে পারছি না ধর্মকে, এখন—”

টুলু বলিল—“কিন্তু জীবন থেকে ধর্মকেই যদি বাদ দিলাম, ঈশ্বরকেই যদি—”

মাষ্টার মশাই টুলুর পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন—“ঈশ্বরে আর ধর্মেতে এক জায়গায় বিস্তর তফাৎ আছে টুলু—যেখানে তফাৎ আমি সেইখানটার কথাই বলছিলাম বিশেষ করে।”

কথাটা টুলুর মনে খিতাইয়া বসিবার জুই মাষ্টার মশাই একটু বেশি সময় লইলেন এবার। এত বড় একটা বিরুদ্ধোক্তি তেও টুলু যখন কোন প্রশ্ন করিল না, মাষ্টার মশাই নিজেই আবার আরম্ভ করিলেন—“তুমি আমায় জিগ্যেস করলে আমি তত্ত্বকে ধর্মের ব্যাভিচার বললাম—কি তোমার সিদ্ধাবার মতন তাত্ত্বিককে—তাই থেকেই কথাগুলো এসে পড়ল। তোমার কথার আসল উত্তরটা আমার এখনও দেওয়া হয় নি। ব্যাভিচার আমি বিশেষ করে এদেরই কীর্তিকলাপকে বলেছি।”

এদের—কথাটার একটু বেশি ঝোক দিলেন মাষ্টার মশাই। টুলু দৃষ্টি নত করিয়া শুনিতেছিল, বোধ হয় যে অবজ্ঞাটা প্রকাশ পাইল তাহার জুই একবার মুখ তুলিয়া চাছিল, কিন্তু মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিলেন এবার টুলু শিহরিয়া উঠিল না। বলিয়া চলিলেন—“এদের প্রতি আমার আক্রোশ আর ঘেমার অন্ত নাই টুলু; কিন্তু তা এই জুড়ে নয় যে এরা গীজা-মদটাকে ‘কারণ’ বলে তাইতে ডুবে থাকে,—আমি ত বলি এদের যা জীবন তাতে এরা যত বেশি ডুবে থাকে, সংসারের ওপর এরা এদের কলুষ-দৃষ্টি যত কম দিতে পারে ততই ভাল। তার পর—এরা যে অমুক অমুক লক্ষণতির গায়ে বসে, জ্ঞানের মত রক্ত-

মোক্ষণ করছে তাতেও আমার দুঃখ নেই, কেননা সে রক্ত যত কমে সমাজের ততই কল্যাণ—আমার দুঃখ আর আক্রোশ এই জুড়ে যে, তোমাদের মতন ভাবপ্রবণ যুবকদের চিন্তাশক্তিকে মোহগ্রস্ত করে একেবারে অসাড় করে দিয়ে এরা নিজের পসার জমিয়ে চলেছে। তোমার মতন একটা বাঙালীর ছেলে দেখলে আমার লোভ হয় টুলু—তোমাকে যে সেদিন শক্ত পায়ে বালি-য়াড়ির দিকে চলে যেতে দেখলাম, সে কথা আমি কখনও ভুলব না। যে সাধনা আলোয়ার পিছনে নষ্ট হ'ল, আলোর পিছনে যদি তা লাগাতে পারা যেত! আমি সেদিন সমস্ত রাত্রি এই দুঃখই করেছি। আমি অনেক সাধনাই চোখের সামনে এই ভাবে অপব্যয় হতে দেখেছি, তার আপশোষ আমার যাবার নয়। আমার আক্রোশ এদের প্রবঞ্চনার জুড়ে; এরা ঐ আলোয়া—পচা বিলের বিষাক্ত গ্যাস, এরা আলোর মুখোশ পরে এই মোহ ঘটাতে কেন?—এই আমার নালিশ এদের বিরুদ্ধে। ছ' ফুট তিন ইকির রাত্তা টুকটুকে লাস নিয়ে—”

মাষ্টার মশাই ধামিয়া গেলেন, লক্ষ্য করিলেন এবার এত বড় মোক্ষম আঘাতেও টুলু মুখ তুলিল না। কি একটু ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন—“কিন্তু তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে টুলু, একে রাত করেই এসেছ; আর একদিন না হয়—”

টুলু মুখ তুলিয়া বলিল—“রাত একটু হোক গে না, কি আর হয়েছে?”

এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই বলা কথাটা, সিদ্ধিকে সামনে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই মাষ্টার মশাইয়ের অন্তরটা নাচিয়া উঠিল, আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, টুলু হঠাৎ একটু বিদ্রোহী ভাবেই মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—“কিন্তু এঁরা প্রবঞ্চক, এঁরা যে আলোয়া এটা শেষ পর্যন্ত না দেখে জানছি কি করে স্তর? শেষ পর্যন্ত না দেখে, এঁদের ভাল ভাবে বোঝবার অভিজ্ঞতা অর্জন না করে যদি একটা অভিমত খাড়া করি যে এঁরা আমাদের বিচারশক্তিকে মোহগ্রস্ত করেছেন, তবে আমাদের খুব গর্হিত একটা মিথ্যাচরণের ভাগী হবারই সম্ভাবনা নয় কি?”

এবার মাষ্টার মশাইয়ের বিস্মিত হইবার পালা; যখন ভাবিলেন কথাগুলো টুলুর মনে বসিয়াছে—বিজয় একেবারে মুঠার মধ্যে, তখন হঠাৎ টুলু যেন একেবারে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখের সবচেয়ে রুচ কথামূলি বেশ ছ'ট দাঁপিত প্রেমের মধ্যে সাজাইয়া ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশাইয়ের মুখে কিন্তু হাসি ফুটল; যেন এও একটা স্মলক্ষণ, চরম পরাজয় স্বীকারের পূর্বে এটা যেন হবেই। ধীরে ধীরে বলিলেন—“টুলু, চরণদাস যা খেয়েছিল আর আজ তোমার সিদ্ধাবা যা খেয়েছেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাৎ আছে?—একটুও—এতটুকু?”

টুলু যেন একটা বাঁ খাইয়া সিঁধা হইয়া বসিল, কয়েক

সেকেও তাহার মুখে কোন কথাই সরিল না, তাহার পর বলিল—“ওঁর ওটা মদ নয়, মত্তপুত ‘কারণ’।”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“মত্তপুত ‘কারণ’ হলে ত উঁচুতেই তুলে নিয়ে যাবার কথা—দোতলা থেকে তেতলায়, নিচে নর্দমায় টেনে ফেলাবে কেন ?”

ব্যঙ্গটার তীব্রতায় আর ভিতরে নূতন সন্দেহের অধস্তিতে টুলু যেন নিস্পন্দ হইয়া গেল। একটা উত্তর ভাবিয়া লইবার জন্তই স্থির দৃষ্টিতে মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কয়েকবার মাথা নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিলও, তাহার পর আবার নিরুপায় ভাবেই দৃষ্টিটা আগের জায়গায় ফিরাইয়া আনিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—“তুমি আবেগের মাথায় চরণদাস আর তোমার সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছ—মনে রেখ, দুজনের কথাই তুমি আবেগের মাথায়ই বলেছ—সেগুলো যদি আমি পাশাপাশি লিখে রাখতে পার-তাম ত দেখতে তার মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়ে একটুও তফাৎ নেই।—সেই নর্দমা, সেই পাকৈ ল্যাপটানো মাথার চুল, পরিধেয়, সেই তীব্র নেশায় অচেতন অবস্থা, সেই রক্ত চক্ষু,—একটুও কি তফাৎ আছে ? ভেবে দেখ,—এমন কি চরণদাসও তোমার সে ‘নেকালো’—বলে ভেড়েফুঁড়ে উঠল, তোমার সিদ্ধবাবাও ঠিক সেই ‘নেকালো’ বলেই তোমায় অভি-নন্দিত করলেন।—কিন্তু বিষয়ের দিক দিয়ে, ঘটনার দিক দিয়ে এক হ’লেও, ভাবের দিক দিয়ে, আর সেই জন্যেই ভায়ার দিক দিয়ে কত প্রভেদ হয়ে গেছে দেখ। তোমার বর্ণনাটা চরণদাসের বেলায় হ’ল—নেশায় বেহুঁস, সিদ্ধ-বাবার বেলায় হ’ল—সমাধি, অর্থাৎ যোগের চরম সিদ্ধি—সায়ুজ্য। চরণদাসের চোখ হ’ল—নেশায় টকটকে লাল, গর্তের মধ্যে এক জোড়া ভাঁটার মত জ্বলছে, সিদ্ধ-বাবার বেলায় হ’ল—আকর্ণবিস্তৃত চোখে করুণায় ঢল ঢল দিব্য চাহনি। চরণদাসের বেলায় হ’ল—বিকৃত স্বরে তিরস্কার, আবার ঠিক সেই তিরস্কারটাই তোমার সিদ্ধবাবার বেলায় হ’ল—পরীক্ষা, দয়ার রহস্য। বিচারশক্তি যদি পক্ষাধাতগ্রস্ত নাই হয়ে থাকে ত এমন ওলট-পালট আর কি করে হয় টুলু ? এ আলোয়ার সম্মোহন নয় ত কি ? প্রবঞ্চনা ভিন্ন একে কি বলব ?”

আর একটু চূপ করিলেন, তাহার পর বলিলেন—“এর চেয়ে চরণদাসের ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট, তার ব্যবহারটাও সাধু, অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলা যায় More honest ; তিরস্কারটা তিরস্কার বলেই নিয়ে তুমি তার পথ ছেড়ে দাঁড়াবে এই তার অভিপ্রেত ছিল, তাকে প্রণামী দিতে গেলেও সে নর্দমাতেই ফেলে দিত দেখতে। হয়ত বলবে তোমার সিদ্ধ-বাবাই যে হাতে করে নিয়েছিলেন একথা তুমি আমার কখন বললে ?—মেনে নিচ্ছি, নেন নি, না নেওয়াই সম্ভব ও অবস্থায় ; কিন্তু যাতে নর্দমায় না পড়ে, আর ‘নেকালো’ কথাটারও

তুমি যাতে আসল অর্থ নিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ না দাও তার জন্তে তিনি কাছে শিষ্যদের পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন।”

জলটা খুব তাড়াতাড়ি বহিয়া গেলে মাটিতে বসিতে পায় না ; মাষ্টার মশাই আবার চূপ করিলেন। নির্জন জায়গাটার নিশ্চিন্তাটুকু এটুকু শব্দের বিরতিতে যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল, শুধু খুব দূরে কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্ত একটা উৎকট শব্দ—সেই শুদ্ধতা একটু ব্যাহত হইল ; বোধ হয় বস্তুরই কিছু ব্যাপার, টুলু একবার মুখটা ঘুরাইল সেদিকে ; আবার দৃষ্টি নত করিল। জ্যোৎস্না আরও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, টুলুর মুখের আলোছায়ার রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; মাষ্টার মশাই কয়েকবারই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন—বাইরের আলো-ছায়ার সঙ্গে ভিতরেরও আলোছায়া, রেখায় রেখায় একটা অব্যক্ত বেদনা, সংসারের জ্বালা, অহুতাপ ; তাহার পাশে সংশয়মুক্তি, আশার আলোক। মাষ্টার মশাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এই আলোই ধীরে ধীরে যেন হইয়া উঠিতেছে জয়ী।... আরও ডাবুক ও, দরকার আরও চিন্তা।

এক সময় টুলু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিল—“আজ উঠি তা হলে সুর, রাত হয়ে গেছে।”

“হ্যাঁ, আমি যখন উঠতে বলেছিলাম তার চেয়ে মিনিট পাঁচেক ত বেড়েছেই রাতটা।”

—কথাটা বলিয়া মাষ্টার মশাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“না, ওঠো, সত্যিই হয়েছে রাত।”
দুয়ার পর্যন্ত গিয়া প্রশ্ন করিলেন—“তোমায় একটু এগিয়ে দৌব ?”

টুলু বলিল—“না সুর, একলাই বেশ যাব।”

টুলু দূরে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গেলে ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—“ভালই, যতক্ষণ একলা ভাবতে পাইরে।”

নেপথ্যের মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা চলিল। নিশ্চিন্ততার গায়ে এবার মাত্র একজনের নিশ্বাসের শব্দ।

প্রায় আধ ঘণ্টাটুকু পরে দরজায় করাঘাত পড়িল। বনমালী ভাত আনিবে, মাষ্টার মশাই উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দেখেন টুলু দাঁড়াইয়া। মুখে জ্যোৎস্নাটা পুরাপুরি আসিয়া পড়িয়াছে, কোনখানে এতটুকু ছায়া নাই, আর তাহার উপর সেই নিঃসংশয়তার আলোক, তাহাতেও কোথাও যেন আর এতটুকু মলিনতা নাই।

মুখের হাসিটা সেই রকম অপ্রতিভভাবেই ফুটল কিন্তু, টুলু বলিল—“ফিরেই এলাম সুর, রাতটা বেশিই হয়েছে মনে হচ্ছে যেন, গেলাম না আর।”

মাষ্টার মশাই ভিতরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—“কিন্তু তোমার খাওয়া ?”

দুয়ারটা এবার খোলাই ছিল, বনমালী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—“ভাত আনলাম আজ্ঞে।”

টুলু ও মাষ্টার মশাই একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর কি যেন আশা করিয়া মাষ্টার মশাই আবার প্রশ্ন করিলেন—“কিন্তু তোমার খাওয়ার কি হবে টুলু?”

টুলু আবার অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া একেবারে মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—“বনমালীই তার জবাব দিয়েছে স্তর;

ওর খাটুনি একটু বাড়ল শুধু।”

চরণ স্পর্শ করিবার জন্ত নত হইল। মাষ্টার মশাই বলিলেন, “কিন্তু বনমালীর হাতের খাওয়া মানে চরণদাসের হাতের খাওয়া.....চম্পাও বাদ পড়ছে না টুলু।”

টুলু পদধূলি মাখায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই অপ্রতিভ হাসি, বলিল—“তা হোক, কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না স্তর।”

৭

অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কথা হইল। টুলু যখন শয্যা-শ্রয় করিল তখন রাত তিনটা।

মাষ্টার মশাই জাগিয়াই রহিলেন। স্কুল থেকে খানচােরক বেকি আনিয়া টুলুর খাট করা হইয়াছে, মাষ্টার মশাইয়ের খুব সংক্ষিপ্ত বিছানার খানিকটা সেই খাটে গেল; তাহাতেই টুলু এত আপত্তি করিল যে মশারির কথাটা মাষ্টার মশাই একেবারে তুলিলেনই না। টুলু ঘুমাইয়া পড়িলে সেটা আস্তে আস্তে খাটাইয়া দিয়া খুব সন্তপণে তাহার বিছানার চারিদিকে গুঁজিয়া দিলেন। তাহার তৃপ্ত নিদ্রিত মুখের পানে মাতার মত অপরি-সীম স্নেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। একবার ভাবিলেন কানুনতলাটিতে গিয়া বসেন—জায়গাটা ছুৎখেও টানে, আনন্দেও টানে। কিন্তু টুলু হঠাৎ উঠিয়া পড়িতে পারে, তাহার কাছে থাকাই ভাল। উঠানের ছয়ার খুলিয়া মাষ্টার মশাই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; খরটা পাশেই, টুলুর গাচ নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে।

বাড়ীর সামনেই রাস্তাটা লইয়া খানিকটা চৌরস জায়গা, মাষ্টার মশাই সেইটুকুর উপর পায়চারি করিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া দিলেন। আকাশে পাখুর একফালি চাঁদ, নিচে সমস্ত খনিচক্র ব্যাপিয়া এখানে-ওখানে আগুনের হলুকা—কোথাও কাঁচা কয়লা পোড়াইতেছে, কোথাও চিমনিগুলোই

হুইয়া পড়িয়াছে আগুনের পিচকারি। সাহাদের তিন নম্বর খনিটা ধরিয়া গিয়া এখনও জায়গায় জায়গায় জ্বলিতেছে—বড় বীভৎস দেখাইতেছে।

আজ নিজের সঙ্গে মাষ্টার মশাইয়ের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বচসার আর অন্ত নাই। পায়চারি করিতে করিতে প্রেমের বা উত্তরের গুরুত্ব এক একবার ধামিয়া যাইতেছেন, সেগুলো কখন-কখন মনে মনেই, কখন বা স্পষ্ট। একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া বা হাতে ডান হাতের মুঠাটা চাপিয়া বলিলেন—“কিন্তু এত শীগগির ও আসবে না—কখনই না—এরা আসে না এত শীগগির এদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস ছেড়ে।”...

বারকয়েক চিন্তিত ভাবে পায়চারি করিয়া এর উত্তরটাও পাওয়া গেল—“কিন্তু যত দেরি করে আসবে, যত ভুগিয়ে আসবে, তত ভাল করে আসবে; তার জন্তে থাকতে হবে ধৈর্য ধরে,—নরেন দত্তকে বিবেকানন্দে দাঁড় করাতে তো কম বেগটা পেতে হয় নি,—এদের ধাতই এই যে...”

বিরাত্রি দৃশ্যপটের গায়ে সমস্ত রাত একটা স্বগতোক্তি-অভিনয় চলিল। এক সময় দৃশ্যপটটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পূর্বের দিকটা আলো হইয়া উঠিয়া শুভনিয়া পাহাড়ের নীল রেখাটাকে প্রথমে জাগাইয়া দিল। খনিচক্রের অগ্নিস্তম্ভ পুঙ্খলা স্তিমিত হইয়া আসিল।...মাষ্টার মশাইয়ের মুখে একটা প্রশান্ত দীপ্তি; রাত্রির গ্লানি শরীর মন হইতে ঝাড়িয়া সম্পূর্ণ অন্ধ একটা অভিনয়ের জন্ত যেন প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় টুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—“সমস্ত রাত ঘুমোন নি স্তর?”

কখন যে ওর ঘুমের সেই গাচ নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেছে খেয়ালও হয় নাই, মাষ্টার মশাই বেশ একটু ধতমত খাইয়া গেলেন, বলিলেন—“ঘুম—মানে—হ্যাঁ—তা, বড় গরম বোধ হচ্ছিল টুলু...”

অপরোধী মত মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিলেন। টুলু ক্ষুদ্রকণ্ঠে বলিল—“আপনার মশারিখানিও আমার বিছানায় টাঙিয়ে দিয়েছিলেন দেখলাম...”

মাষ্টার মশাই এবার ভালভাবেই হাসিয়া বাঁচিলেন যেন, বলিলেন—“এই দেখো।—ঘুম হচ্ছে না, তবু আমার মশারি বলে আমি গায়ে জড়িয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম? অধিকার জ্ঞানের এ-যে চূড়ান্ত হ'ল টুলু; ছোট ছেলেরাও এমন খুনসুটি-পনা করে না বোধ হয়।”

তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—“তুমি বাড়ি যাও এবার, দিবা ঠাণ্ডা আছে। আর হ্যাঁ, আজ রোববার, তিনটের সময় তুমি একবার নিশ্চয় আসবে, সেবারকার মতন যেন স্কুল-পালানে ছেলে হয়ো না। উদ্বেগুটাও তোমায় বলে দিই এবার,—তুমি পরিণামটা দেখেছ, কারণ একবার দেখাতে চাই তোমায়, কারণের কতকটা। মানে, একবার খনি দেখতে যাব।

তিনটার আগেই টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় পাঁচটার সময় মাষ্টার মশাই তাহাকে লইয়া সাহাদের এক নম্বর খনির মুখে উপস্থিত হইলেন; স্কুলের সেক্রেটারী ম্যানেজার, তাহার সম্মতি পূর্বকই লওয়া ছিল। দেখাইবার জন্ত এক জন যুবক ঠিক করা ছিল—খনির কোন অংশের কর্মচারী—মাষ্টার মশাই ঈশ্বর হাসির সহিত তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন, বলিলেন—“মানুষকে নামবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে হয় না; তুমি যাও তোমার কাজে।”

হুই জনে গিয়া লিফ্টের খাঁচায় উঠিলেন। আরও দুই জন

উঠিল—কুলি, তাহার পর খাঁচাটি পায়ের তলায় বসিয়া যাইতে লাগিল। একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুলু যেন দম বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতকটা অভ্যাস হইলে প্রশ্ন করিল—“ছেলেটিকে সঙ্গে নিলেন না স্ত্র, আপনি নামেন নাকি এর মধ্যে মাঝে মাঝে?”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“হ্যাঁ, এক এক সময় ওপরের দিকে চেয়ে তোমাদের ভগবানকে বড় ডাকতে ইচ্ছে করে টুলু, তখন তাঁর নিচের রূপটাও এসে দেখি।”

—হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু মুখটা সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হইয়া উঠিল। টুলু আর কোন প্রশ্ন করিল না, শুধু মাঝে আর এক বার সেই কঠিন মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া লইল।... খাঁচাটা নামিয়া চলিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছে এই বুঝি পা হইতে আলাদা হইয়া গেল। এ অবস্থার মধ্যেও বুকেটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল—জলের তোড়ের শব্দ, যেন একটা বান ডাকিয়াছে।...তখনই কিন্তু কারণটা বুঝিতে পারিল। একটু পরেই খাঁচাটা নিচের মেঝের আসিয়া ঠেকিল, চালক দরজাটা টানিয়া দিতে ছই জনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হাতকয়েক পরিধি লইয়া গোলমত এক ফাঁকা জায়গা; কালো এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল, মাঝে কয়েকটা কালো ধামের মত, একটা বিদ্যুতের বাল্ব থেকে আলো বাহির হইয়া এ-গুলার গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চোখ দুইটা একটু অভ্যস্ত হইতেই টুলু চের পাইল—সব পাখুরে কয়লা।...লিফ্টের রাস্তার গা বাহিয়া এবং অল্প চারিদিকেরও দেয়াল বাহিয়া বরবর করিয়া জল নামিয়া নালা দিয়া একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে। শুষ্কটের সঙ্গে সঁাতসেতে, অদ্ভুত ধরণের এক গন্ধ, পৃথিবীর উপরে কোথাও এ গন্ধ নাই—টুলুর মনে হইল এ যেন টুঁট-টেপা পাতালের কষ্টখাঁস, সংক্রামকতায় যেন তাহারও দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল মাষ্টার কয়েক ফুট উপরেই অন্ধকার ছাত, কয়লার চাপ একটা যে-কোন মুহূর্তেই ত উপরের ভারে নামিয়া পড়িয়া এই অবকাশটুকু বন্ধ করিয়া দিতে পারে—নিঃশব্দ মৃত্যু—আত-নাদের এতটুকুও শব্দ পৃথিবীর কাছে পৌঁছবে না।

এই চত্বরের গায়ে গোটাচারেক গর্ত প্রায় এই রকমই উঁচু—চালু হইয়া নামিয়া গেছে। সবগুলোতেই এক জোড়া করিয়া ছোট রেল পাতা, একটার মধ্যে হইতে জনতিনেক লোক একটা ট্রাক ঠেলিয়া তুলিল, কয়লার বোঝাই, লিফ্টের কাঁছে দাঁড় করাইল। একটা ব্যাচ একটা ট্রাক খালাস করিয়া অল্প একটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল—সতর্ক করিতে করিতে—যদি কেহ থাকে সেই পথে; তাহাদের কণ্ঠস্বর আন্তে আন্তে মিলাইয়া গেল।...চারদিকেই লোক—পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বড়ো—লিফ্ট বাহিয়া ওঠানামা করিতেছে, গর্ত-গুলার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, বাহির হইয়া আসিতেছে,

সঙ্গে বেতের বুড়ি, গাঁইতা, শোভেল—বিটকেল চেহারা—শুধু চোখ দুইটা আর ওষ্ঠাধর ছাড়া অঙ্গে সর্বত্র কয়লার আধিপত্য। কেমন একটা ক্লান্ত, নিম্প্রহ ভাব সবার মুখে, হৃদয়ের সঙ্গে ধর করিয়া অভ্যাসের একটা অবহেলা আছে—তবুও চোখে-মুখে একটা চাপা ভয়ের ছাপ, এ জিনিষটা টুলু সেদিনও বস্তুতে সবার মুখে লক্ষ্য করিয়াছিল—খনির কুলিকে যেন একটা আলাদা জাতই করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এর মধ্যে হাসিও আছে, ঠাট্টাও আছে, সম্পূর্ণ এক অল্প জগৎই।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“এইটুকু হ’ল এখানকার গড়ের মাঠ, এইবার চল একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকি। দাঁড়াও, একটা লোক নিই, সব জায়গায় আবার আলো পাওয়া যায় না।”

এক জন কেরানীগোছের লোক একটা টেবিলের সামনে বসিয়া কি একটা হিসাব লিখিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বলিতে সেক্টি-ল্যাম্প-হাতে একটি যুদ্ধগোছের কুলি সঙ্গে দিল। টুলু একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল—“সে ছোকরাকে সঙ্গে নিলেন না যে তা হলে?”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“খনির গুণগান করতে ত আমরা নামি নি। এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে আমার যা এদের প্রতিমধুর নাও হতে পারে।”

এবড়ো-খেবড়ো চালু পথ দিয়া নামিয়া চলিলেন। মাষ্টার উপর খিলানটা আরও নিচু, এক এক জায়গায় এত নিচু যে, একটু কুঁজা হইয়া না গেলে বিপদ আছে; লোকটা আগাইয়া যাইতেছিল, সাবধান করিয়া দিতে লাগিল। এক এক জায়গায় ছই ধারের দেয়ালও আগাইয়া আসিয়া গলিটাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে, মাঝখান দিয়া সেই রেলপথ, এদিকে খানিকটা খাঁজের মধ্য দিয়া জলের স্রোত নামিয়া যাইতেছে। এই রকম একটা ছ’ধার-চাপা জায়গায় আসিতে হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ উঠিল, যেন রেল বাহিয়া আসিতেছে শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট সতর্কবাণীর মত—মাটির অত নিচে শব্দেরও যেন জাত বদলাইয়া গেছে।

কুলিটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“ট্রাক নামছে গো বাবু।” জায়গাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেও কি একটা জোরে বলিয়া চালকদের সাবধান করিয়া দিল। মাষ্টার মশাই তাড়াতাড়ি টুলুকে লইয়া অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন; কয়েক সেকেন্ড পরে খালি ট্রাকটা নামিয়া গেল। চালুর মুখে ছই জন লোক উঁচু দিকে ঝোঁক দিয়া তাহার গতিটা সংযত করিয়া চলিতেছে।

টুলু শুক মুখে মাষ্টার মশাইয়ের দিকে চাহিল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—“অবশ্য পাশাপাশি দেয়াল ধেসে দাঁড়ালে বিপদ ছিল না, তবে একেবারেই কি নিরাপদ?”

টুলু প্রশ্ন করিল—“বাড়িয়ে দেয় না কেন ফাঁকটা এখানে?” “খুব সম্ভবত জায়গাটায় শক্ত পাথরের চাঁই পড়ে গেছে।” “কয়লার মধ্যে হঠাৎ শক্ত পাথরের চাঁই যে? আর,

থাকেই তো পথ করবার সময় কেটে ফেলে নি কেন? এ যে কুলিদের প্রাণ নিয়ে—”

মাষ্টার মশাই ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, হাসিয়া বলিলেন—“খনির মালিকদের জন্তে বিশেষ করে খনি নিজে করে তোয়ের করে নি, সুতরাং মাঝে মাঝে এক-আধখানা শক্ত পাথর নিজের গায়ে ওড়াবে বসিয়ে নেবার তার অধিকার আছে; তার পর, খনির মালিকরাও বিশেষ করে কুলিদের বাঁচাবার জন্তেই টাকা খরচ করে মাটির ভেতর এই কাণ্ডটা করে নি, সুতরাং ওরকম এক-আধটা বুনে পাথর যদি ছেড়েই যায় তো তাদেরও অগ্রাহ্য করবার অধিকার আছে।”

সঙ্গী কুলিটা বলিল—“উট পাখাণ পাখোর আজ্ঞে, লড়েক নাই, ভাঙেক নাই।”

টুলু প্রশ্ন করিল, “লোক মারা পড়ে না?”

“হুঁ মরছে; খেঁতো হইছে—মরছে, খেঁতো হইছে—মরছে; মরবার কি বারোন আছে গো?”

বেশ নিশ্চিন্ত আর নির্বিকার ভাবে মাথা ছুলাইয়া ছুলাইয়া কথাপালা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

এই সুড়ঙ্গটার গা ভেদ করিয়া অল্প সব সুড়ঙ্গও মাঝে মাঝে ডাইনে বামে চলিয়া গেছে, কোনটা অনেক দূর—অন্ততঃ অস্পষ্ট আলোয় তাই মনে হয়, কোন কোনটা কয়েক হাত মাত্র; ধোঁড়া হইতেছে, দেয়ালের গায়ে গাঁহিতার চোঁট পড়িয়া রড় বড় কমলার চাপ খসিয়া পড়িতেছে, সংগ্রহ করিতেছে বেশির ভাগ মেয়ে-কুলিরাই, বেতের বুড়িতে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া ট্রাকে বোঝাই করিতেছে।

একটু অল্পবয়সী স্ত্রীলোক বুড়িটা ধালি করিয়া তাহারই সামনে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে আসিয়া নূতন একটা সুড়ঙ্গের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া বসিল। গাল বসা, চোখ ছুইটা কোঁটের মধ্যে জল জল করিতেছে; খামে চুলগুলো পর্যন্ত ভেজা; মুখে ক্লান্তির সঙ্গে একটা অসহায় আতঙ্কের ছাপ। বক্ষ আর উদর ফুলিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, স্ত্রীলোকটি টানিয়া টানিয়া সমস্তটার উপর হাত বুলাইতে লাগিল, মুখটা মাঝে মাঝে যেন অসহ্য বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

একটু আগাইয়া গিয়াছিল,—টুলু ফিরিয়া, আর একবার তলাইয়া দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে বলিল—“পেটে সন্তান মেয়েটির স্থার! এদেরও খাটতে হয় নাকি?”

কয়েকজন স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, প্রশ্নাদি করিতেছে। মাষ্টার মশাই ঘুরিয়া বলিলেন—“তুমি অঙ্কে তো বড় কাঁচা ছেলে দেখছি টুলু—খালি পেটে, অর্থাৎ শুধু নিজের জন্তে যখন খাটতে হচ্ছে মেয়েদের, তখন সন্তান পেটে আরও বেশি খাটবার কথা নয় কি? হুঁ হুঁটো জীবনের দায়িত্ব ত তার ওপর?”

সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া খুব মুহূর্ত একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বহিতেছে, তবু যেন নিখাসের হাওয়া পাইতেছে না টুলু।

সেইরূপ শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই বলিল—“কিন্তু যেন শুনে-ছিলাম আইনে গর্ভবতী মেয়েদের খাটতে দেওয়া মানা—”

“কিন্তু দয়া বলেও ত একটা জিনিস আছে?—মা আইনের ওপর—”

“বুঝলাম না স্তর।”

“খনির মালিক বা ধরো ম্যানেজার—এরা মাহুষই ত? দয়া-ধর্ম বলে একটা জিনিস থাকতে নেই এদের? এরা আইনকে লুকিয়ে দেয় খাটতে বেচারাদের; যোজ্জার চাই তো?”

মেয়েটিকে ঘিরিয়া আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক জড়ো হইয়াছে, জনকতক দাঁড়াইল বলিয়া তাহাকে আর দেখা যাইতেছে না। মাষ্টার মশাই নেই দিকে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন, তাহার পর আবার সামনের দিকে ঘুরিয়া পা বাড়াইয়া বলিলেন—“এসো।”

টুলু যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছে, না ঘুরিয়াই বলিল, “কিন্তু শুনেছিলাম যেন বসে খেতে দিতে হয় ক’টা মাস—”

মাষ্টার মশাই আগাইয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিলেন, হাসিয়া বলিলেন—“হুঁরকম ভাবেই দয়া করতে হবে? তোমার আবদার কম নয় ত!—চলো, খনিতে দেখবার জিনিসের এমন অভাব নেই যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই দেখতে হবে, তা ভিন্ন কিছু মেয়েলি ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক নয়ও দাঁড়ানো।”

হুঁজুনেই একসঙ্গে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন, কিন্তু টুলুকে আবার ঠিক তেমন ভাবেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল; হাতদশেক পরেই এ সুড়ঙ্গটা আড়াআড়ি অল্প একটার সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই তেমাখার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চম্পা। একা নয়, পাশেই হাফ-প্যান্ট আর নূতন ষ্টাইলের আধ হাত গেঞ্জি পরা একটু যুবক, চম্পা বেশ ছলিয়া হাসিয়া তাহার সঙ্গে কি একটা প্রসঙ্গ চালাইয়া যাইতেছে।

মাষ্টার মশাই আগাইয়া চলিয়াছেন, টুলু মুহূর্তখানেক থমকিয়া দাঁড়াইয়া আবার অগ্রসর হইল। চম্পার শাড়ি ময়লাই তবে বেশ আন্ত আর সযত্নে পরা, একটা বেতের বুড়ি উপুড় করিয়া তাহার উপর ডান পাটা তুলিয়া দিয়াছে, এদিকে নজর পড়িতেই বুড়িটা তুলিয়া লইয়া পাশ কাটাইয়া উঠিয়া আসিল; মাষ্টার মশাইকে পিছনে ফেলিয়া টুলুর পাশাপাশি হইয়া একবার মুঁখ তুলিয়া চাছিল, বেশ একটু হাসি-হাসি ভাব; তাহার পর হন হন করিয়া উঠিয়া গেল।

নামিয়া আসিতে যুবকটি হাত তুলিয়া মাষ্টার মশাইকে নমস্কার করিল, প্রশ্ন করিল—“মাইন দেখতে এসেছেন?”

“মাষ্টার মশাই প্রতিদিন নমস্কার করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, এই ইনি নতুন লোক, সখ হয়েছে।”

যুবকটি হাসিয়া নমস্কার করিয়া সামনে আগাইয়া গেল, মাষ্টার মশাই তাহার উণ্টো দিকে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন—“এটি এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।”

বিশেষ কিছু না মনে করিয়াই টুলু এক বার ঘুরিয়া দেখিল, দেখে যুবকটিও খাড়া ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখের দৃষ্টি বেশ শ্রীতিপূর্ণ নয়।

৮

ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও অনেকক্ষণ দেখিয়া বেড়াইল। মনটা ক্রমেই নিব্বুম হইয়া পড়িতেছে, তবুও একটা উৎকট কোঁড়ুল। মনে করিতে গেলে যেন বিশ্বাস হয় না যে পৃথিবীর আলো, বাতাস, গতি যেখানে একটা বিরাট চাপের নিচে এই রকম ভিত্তি সেই জায়গাটাই আবার পৃথিবীতে আলো, বাতাস, গতি জোগাইবার ভার লইয়াছে।... আরও প্রায় ষষ্ঠাংকনেক ঘুরিয়া মাষ্টার মশাই সঙ্গীকে প্রশ্ন করিলেন—“চরণদাস কোন-খানটায় কাজ করে জানিস?”

বলিল জানে, একটা দিকে লইয়া চলিল এবং অপর একটা স্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই হাওয়াটা ধামিয়া গিয়া একটা বিকী রকম গুমোট। কাজও হইতেছে না। একটু আগাইয়া গিয়া এর গা হুঁড়িয়া আর একটা স্তম্ভ। সঙ্গী তাহার সামনে আলোটা তুলিয়া ধরিল। মাষ্টার মশাই প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শঙ্কিতভাবেই বলিল—“পারবেক নি বাবু।”

না পারিবারই কথা, একেবারে অসহ গুমোট, তবু মাষ্টার মশাই ভিতরে পা বাড়াইয়া বলিলেন—“না, পারব; এসো টুলু।”

টুলু ছুই পা আগাইয়া বলিল—“শুধু, এ রকম কেন?—এ যে।...”

সত্যই, পৃথিবীর উপরের কোন উচ্চতার সঙ্গেই এর মিল নাই; সেখানকার উচ্চতা তীব্র হইলে দক্ষ করে, এ যেন টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে, এ যেন আগুনের প্রেতমূর্তি—স্বর্ধর্মভট্ট। আর একটু আগাইয়া টুলু আতঁভাবে বলিয়া উঠিল—“মাষ্টার মশাই।”

হাত দশ-বারো ভিতরের দিকে একটা লোক গাঁইতা চালাইতেছে, বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিল—ক্ষীণ বিছাতের আলোর দেখা গেল শুধু শরীরের একটা বহিঃরেখা আর এক জোড়া জলন্ত চোখ।

মাষ্টার মশাইয়েরও গলার স্বর বদলাইয়া গেছে—একটা অদ্ভুত জিদ, যেন আক্রোশই; বলিলেন—“এগিয়ে এস?”

“বেরিয়ে আসুন—আসুন বেরিয়ে!!”

নিছক প্রাণধর্মের তাগিদেই টুলু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, শরীরটা কাঁপিতেছে, অবসন্ন ভাবে দেয়ালে কপালটা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তাড়াহাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল।

মাষ্টার মশাইও আসিয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে চরণদাস। গাঁইতাটা রাখিয়া দিয়া টুলুকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—“উই-খানে চলুন আজ্ঞে, বাঙাসে।”

সেদিনকার সে চরণদাস নয়, তবু কথা কহিতে মুখ দিয়া ভক্ত করিয়া সুরার গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল, টুলু মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ছুই জনে আস্তে আস্তে বড় স্তম্ভটায় লইয়া আসিল। ঠাণ্ডা, চালানি বাতাস অল্প অল্প বহিতেছে, একটু বসিয়া থাকিয়াই টুলুর শরীরটা অনেকটা ধাতব হইল; বলিল—“একটু জল পাওয়া যাবে?”

বৃদ্ধ হাসিয়া চরণদাসের পানে চাহিল, বলিল—“চরণদাসের ডারায় সাধা জল?—বাবু কি কয় গো চরণ ভাই।—আমি আনছি জল আজ্ঞে।”

চরণদাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—“কি করি বাবু মশাই?—পেট বড় দুশমন—মাই আজ্ঞে।”

—যেন থাকিবার লজ্জা এড়াইবার জন্তই এক বার ভীত দৃষ্টিতে স্তম্ভটার পানে চাহিয়া একটা সেলাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

টুলু মাষ্টার মশাইয়ের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“আপনি আরও ভেতরে গিয়েছিলেন?”

মাষ্টার মশাই একটু অশ্রমক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—“তোমায় বড্ড বেশি একেকট করেছিল, নোঁ আমারই ভুল হয়েছিল, অতটা আন্দাজ করতে পারি নি।”

একটু হাসিয়া বলিলেন—“আমার কথা আলাদা, আমি সিজন্ড (seasoned), আগুনে জলে আর কিছু করতে পারে না; পেঙ্গাদের ছাপ মেরে দিয়েছে।”

টুলু আতঙ্কের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“মনে করতেও আমার এখনও ভয় করছে শুধু। গরম এ রকম হয়।”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“স্তম্ভটা একোঁড়-ওকোঁড় না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা, ভেতরে আরও ভীষণ, ওপর থেকে পাম্প-করা হাওয়াটা খেলতে পাচ্ছে না কিনা। ওঠ, যাওয়া যাক।”

ঘটনাক্রমের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া টুলু মাথা নিচু করিয়া চলিয়াছে। এক সময় মুখ তুলিয়া আবার বলিল—“কি গরম শুধু। শুধু সেই কথাই ভাবছি আমি; আর ছ’পা গেলেই আমার...”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“আমি যে প্রশ্নটা তোমার কাছে আশা করে নিয়ে গেছলাম, সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত পেলাম না টুলু।”

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি প্রশ্ন শুধু?”

“চরণদাস ঐ স্তম্ভটার মধ্যে আরও প্রায় আট-দশ হাত ভেতরে কাজ করে, তাও অল্প কাজ নয়, গাঁইতা চালানো। ভেবেছিলাম...ওর কথাটাই আগে তুলবে তুমি।”

টুলু আরও বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের সদ্য অভিজ্ঞতার উপরে চরণদাসকে লইয়া এই ব্যাপারটা যেন জুড়িবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনমতেই মিলাইতে

পারিতেছে না। একটা নিতান্ত অসম্ভব কাণ্ড, যা কখনই হইতে পারে না, অথচ চোখের সামনে হইয়া যাইতেছে। টুলু বলিল—“তাইতো, ভেবে দেখিনি তো।—আরও আট দশ হাত ভেতরে। হ্যাঁ, গাঁহিতাই তো চালাচ্ছিল।”

মুচের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল—হিসাব ধরিতে পারিতেছে না।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“এরই প্রতিক্রিয়া—সেই নর্দমার ধারে যা দৃশ্য দেখেছিলে। খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে?”

টুলু কোন উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবার মত প্রশ্ন নয় বলিয়া মাষ্টার মশাই সেটার পুনরুক্তিও করিলেন না।...চিন্তা করুক ও। ছুই জনে নিঃশব্দে চলিয়াছেন; সামনে বৃদ্ধ আলো লইয়া; বুড়া মানুষ বলিয়াই বোধ হয় বকা অভ্যাস, বিড়বিড় করিয়া নিজের ভাষাতেই কি মন্তব্য করিতেছে। তাহার পিছনে টুলু, মাথাটা গৌজা, পিছনে মাষ্টার মশাই, টুলুর পানেই চাহিয়া আছেন, যেন হিসাব রাখিয়া যাইতেছেন তাহার মনের উপর কতটা চাপ দেওয়া যায়।

চড়াই বাহিয়া উঠিতেছেন। হঠাৎ গুমগুম করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন শব্দটা পিষিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা কাঁপনি। “ভূমিকম্প।” বলিয়া উৎকট একটা চিংকার করিয়া টুলু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মশাই সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলিয়া বলিলেন—“না, কিছু ভয় নেই।”

টুলু চকিতে কক্ষ দৈত্যটার মতখানি পারিল যেন এক বার শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া সমস্ত শরীরটা কঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাষ্টার মশাই উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিলেন, মুখে অল্প একটু আশ্বাসের হাসি।...কিছু হইল না, শুধু পাশের দেয়াল থেকে বুর বুর করিয়া খানিকটা গুঁড়া কয়লা ঝড়িয়া পড়িল।

সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছে, টুলু প্রশ্ন করিল—“কি হ’ল স্তর?”

“সম্ভবত ডিনামাইট করেছে কোনখানে।”

“এই ধনিতে?”

“খুব সম্ভব?”

টুলুর চোখে ভয়টা আবার ফুটিয়া উঠিল, মাষ্টার মশাই বলিলেন—“কিন্তু পাশের কোন ধনিতেও হতে পারে, কিম্বা...”

টুলু উৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—“কিম্বা তিন নম্বর ধনিটায় যে আগুন লেগেছিল, বোধ হয় একটা বড় ধস নামল।”

—মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; হিসাব লওয়া চলিতেছে—কতটা বরদাস্ত করিতে পারে টুলুর আহত স্নায়ু-মণ্ডলী।

টুলু বলিল—“এবার উঠবেন স্তর?”

“হ্যাঁ, উঠছিই; অনেকক্ষণ হ’ল, না?”

“ঘুরে ফিরে অল্প দিক দিয়ে উঠবেন, না?”

উত্তরটা আপনিই পাওয়া গেল,—মোড় ঘুরিতে সামনেই সেই জায়গাটি যেখানে সেই আসন্নপ্রসবী জীলোকটি বসিয়া পড়িয়াছিল। এবারে কিন্তু জায়গাটা ঘিরিয়া লোক আরও বেশি—মাঝখানটায় জীলোক, বাইরে বাইরে কয়েকজন পুরুষ, বেশ একটু জটলা হইয়াছে যেন। মাষ্টার মশাই টুলু আর বৃদ্ধ সঙ্গীর পাশ কাটাঁইয়া হস্তদত্ত হইয়া সামনে আগাইয়া গেলেন, পাশের একটা লোককে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“কিরে, ব্যাপার কি?”

“খোঁকাটি হ’ল আজ্ঞে।”

“আর মা?”

—ডিড ঠেলিয়া ভিতরে গেলেন। থাকি হাফ-পার্ট পরা একটা ছোকরা ডাক্তার, একটা ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বোধ হয় ভদ্রলোক দেখিয়া বলিল—“ও আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।...Hell;”

বিশেষ কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া বলিল—“ম্যানেজার-বাবুকে খবর দে, ছেলেটার কি ব্যবস্থা করবেন।”

আরও বারকয়েক—“Hell! hell! নরক।” বলিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। বোধ হয় নূতন চাকরি লইয়া আসিয়াছে।

মাষ্টার মশাই সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন, টুলুও আসিয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—“কি স্তর?”

“সেই মেয়েটা প্রসব করে মারা গেছে।”

তাহার পর নিজেই এক জনকে প্রশ্ন করিলেন—“ওর স্বামী?—তাকে খবর দেওয়া হয়েছে?”

একটি প্রগল্ভা মাঝবয়সী মাঁওতালী জীলোক কতকটা যেন রসিকতা করিয়াই বলিল—“কুখা তাকে খবর দেওয়া হবেক গো?—উ ত হুথায়।”

—উর্ধ্ব অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—“ওপরে?”

“হু, খুব উপরে।”—রসিকতায় একটু হাসিয়াই উঠিল।

টের পাওয়া গেল মেয়েটির স্বামী মাসছয়েক আগে একটা ছুঁটনায় মারা গেছে খনির মধ্যেই। সংসারে উহার আর কেহই ছিল না।

জীলোকটি পাশ ফিরিয়া পড়িয়া আছে। বস্ত্রে সস্ত্র মাতৃহের গ্লানি, তাহাই স্ত্রী গোছগাছ করিয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেন সংসারের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সে বিদায় লইল। পাশেই নগ্ন শিশুটি; মিনিট দুয়েক কান্নাটা বন্ধ ছিল, একটু বৃদ্ধাগোছের জীলোক মুখে আঙুল দিয়া মুখটা পরিষ্কার করিয়া দিতে আবার হাত-পা ছুঁড়িয়া বেশ স্নহ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। অষ্টপৃষ্ঠ ফুটফুটে রং, মাথায় এক মাথা কুচকুচে চুল; বিদ্যুতের আলোয় এই

স্বকৃষ্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে যেন ঝলমল করিতেছে। ও-ই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওরই পাশে যে অত বড় ট্রাজেডি, সেদিকে যেন কাহারও খেয়াল নাই। যাহা অস্বাভাবিক তাহাই মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বামী নাই—তাই পূর্ণ গর্ভ লইয়া ধনিতে কাজ করে—সুতরাং মরিবেই, এ ত নিত্য স্বাভাবিক কথা, এর মধ্যে আর আলোচনার কি আছে? বুদ্ধা জীলোকটি গিমিষের চণ্ডে বলিল—“আরে, চূপ কর ছাওয়াল, বাপ খেলে, মা খেলে, আবার...”

কোলে লইয়া বারহুয়েক লুকিয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল—“কে ছুধ দিবি গো? কার মায়ে ছুধ আঁই গো?”

শিশুকোলে একটি জীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সব মেয়েরা তাহার পানে চাহিতে সে বোধ হয় লজ্জার জ্বলি ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া গেল, অম্পষ্ট ভাবে বলিল—“ই—স্ গো। আমার আপন ছাওয়ালই পায় না।...”

ছুধ কিন্তু জোগাড় হইল। “ছুধ—সরো, ছুধ—সরো” বলিতে বলিতে একটি মেয়ে পিছন হইতে পুরুষ আর জীলোক-দের ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাটিতে করিয়া খানিকটা ছুধ আর একটা ঞাকড়ার পলতে আনিয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। উপস্থিতবুদ্ধি এবং তৎপরতার জ্বলি তাহার একটু খাতির হইয়া পড়িল, সবাই জায়গা ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি কোন দিকে খেয়াল না করিয়া সামনে বসিয়া পড়িল, এবং বুদ্ধার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া তাহার মুখে ছুধে-ভিজান পলিতাটা সাদা করাইয়া দিল। টুলু স্থির বিমুঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—চম্পা।

মুখ্য ছাড়িয়া জীবনের কথাই চলিল।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“ছেলেটিকে তোরা কেউ নে, মানুষ করতে হবে ত? যা হবার তাহো হয়ে গেল।

মেয়েদের মধ্যে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল; কোন উত্তর দিল না। মাষ্টার মশাই পুরুষদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“কি হে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত?”

“চম্পা লিবে, কোল আলো করা খোকা বটেক।”

—মেয়েদের মধ্যে এক জন একটু ঠাট্টার সুরে কথাটা বলিয়া, হাসিয়া মুখটা নিজের ঘাড়ে গুঁজিয়া লইল। বেশ একটু হাসি টিপ্তনী চলিল, চম্পার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে বুদ্ধার কোলে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল—“চম্পা! —ইস্—মাইরি নাকি গো।”

মাষ্টার মশাই একবার সবার পানে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—“তা হলে?...কেউ গেল খবর দিতে ম্যানেজারবাবুকে? মেয়েটির সংস্কারেরও ত ব্যবস্থা করতে হবে?”

পাশের একটি লোক বলিল—“গেঁইছে।”

পিছন হইতে এক জন বলিল—“তাক পাবে কুখা? তিনি বর্ধমান গেঁইছেন। আসিষ্টেণ্ট বাবুকে খুঁজতে পাঠাইছি।”

কিছু করিবার নাই দেখিয়া সবাই নিম্পন্দ হইয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে টুলু মাষ্টার মশাইয়ের পানে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিচু গলাতেই বলিল—“স্বর, এরা কিন্তু ছেলেটাকে নষ্ট করে ফেলবে, ম্যানেজার যদি জোর করে একটা ব্যবস্থা করেও, তার চেয়ে আমরা যদি...”

মাষ্টার মশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“কিন্তু আমরা যে ওদের চেয়ে আগে নষ্ট করে ফেলব টুলু—নির্জলা পুরুষের বাড়ি...”

“না, সেকথা বলছি না, ধরুন, এদের কাউকে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায়? ছেলেটি আমারই...মানে... মানে...”

“অর্থাৎ তুমিই নিলে এই ত?”

টুলু আরও লজ্জিত ভাবে বলিল—“চমৎকার ছেলেটি স্বর শেষে নর্দমায় গড়াবে ত?”

মাষ্টার মশাই ঈষৎ জ্ব কুণ্ঠিত করিয়া মুহূর্তখানেক কি ভাবিলেন, তাহার পর মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“এই বাবু ছেলেটিকে নিলে; কিন্তু ছুধ না ছাড়া পর্যন্ত সে ত রাখতে পারবে না, তদ্দিন তোরা কেউ মানুষ করে দে, বাবু টুকা দেবে।”

টুলু পকেট থেকে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া মাষ্টার মশাইয়ের হাতে দিল। মাষ্টার মশাই সেটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—“আপাতত এই পাঁচ টাকা, বাবুর হাতে এখন আর নেই...”

পুরুষদের মধ্যে চাপা প্রশংসার একটা গুঞ্জন উঠিল, মেয়েরা কিন্তু একেবারেই চূপ করিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল তাহাদের সবারই মর্ষাদা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, অর্থের বদলে মাতৃত্বকে পণ্য করিতে বাধিতেছে; যাহার হয়ত লোভ আছে সেও এ আসরে সেটাকে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিতই হইল। এক জন বর্ষীয়সী সবার মুখপাত্র হইয়া বেন একটু শ্লেষ ভরে বলিল—“ট্যাকাই চাইছে নাকি গো?”

মাষ্টার মশাই বলিলেন—“তা না, একটা খরচ আছে ত? ছেলে যখন ইনি নিলেন, তখন অপরে সে খরচটা বয় কেন?”

—এই আর কি। আর যার কচি ছেলে আছে সেই ভার নেবে ত? নিজে একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে ছোটো ছেলেকে জোগান দিতে পারবে কেন?...কি বল তোমরা?”

পুরুষদের সালিস মানিলেন, তাহারা সাগ্রহে অহুমোদন করিল।

ছেলেকোলে সেই জীলোকটি সঙ্কুচিত ভাবে ভিড়ের মধ্যে পিছাইয়া যাইতেছিল, সকলে তাহাকেই ধরিল, এবং রাজীও করিল শেষ পর্যন্ত। মাষ্টার মশাই তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া টাকাটা লওয়াইলেন। এ পর্যটী শেষ হইল।

মাষ্টার মশাই হাসিয়া টুলুর পানে চাহিলেন, শুধু হাসিই নয়, আরও অপূর্ব কি আছে দৃষ্টিতে। টুলু অতিমাত্র লজ্জিত

হইয়া নিজের দৃষ্টি নত করিল। মাষ্টার মশাই বলিলেন—“বেশ হ'ল টুলু, একট নতুন জন্মের সঙ্গে তোমার-বস্ত্রের সেবা আরম্ভ হ'ল।...আর জন্মটিও অদ্ভুত, পুরনোকে যেন একেবারে মুছে দিয়ে জন্মাল।”

টুলুর চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে,—নিশ্চয় মনের পূর্ণতার জন্মই, কিন্তু লজ্জা ঢাকিবার জন্মই সামনের এই অবলম্বনটুকু ধরিল, বলিল—“কিন্তু এ কি মুছে ফেলা যায় মাষ্টার মশাই?”

মাষ্টার মশাই মেহতরে টুলুর কাঁধে হাত দিলেন, বলিলেন—“না, ভুল বুঝো না টুলু, ও যে বাপ-মাকে হারিয়ে জন্মাল—সে ট্রাজেডিয়া কি অস্বীকার করা যায়?...আমি ঘটনাটা প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে বলছি।...আর তাও বলি,—ভীরা ছ'জন ত সেইখানেই গেছেন যেখান থেকে সম্ভানের ওপর তাঁদের আশীর্বাণীটা আরও ফলবতী হতে পারে।”

টুলু বেশ বিস্মিত হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের পানে চাহিল, তিনি যেন ছুতা করিয়াই সেটা ওদিকে ফিরাইয়া লইয়া উপস্থিত সবাইকে বলিলেন—“তা হলে এই ব্যবস্থাই রইল। তোমরা পাঁচ জন ভালোমানুষ রয়েছ জী-পুরুষে, ম্যানেজারবাবু এলে বলো আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, আমিও বলে দোব। এইবার মেয়েটির সংকার—”

সবাই যেন একটা ধমধমে ভাব হইতে জাগিয়া উঠিল; কয়েকজন একসঙ্গে বলিল—“কিন্তু পুলিশ না এলে উঠবেক না বাবু।”

“বেশ, তা হলে আমরা এখন যাই, চল টুলু।”

দুই পা গিয়াই মাষ্টার মশাই আবার ফিরিলেন, বলিলেন—“এস টুলু, আর একটা কাজ সেয়ে যাই ওর মায়ের সামনেই।” কাছে আসিয়া সবার পানে এক বার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—“কমলার ধনিতে হীরে জন্মায়, তাই ওর নাম...”

• এক জন বৃদ্ধগোছের লোক উৎসাহিত ভাবে বলিল—“হ্যা, হীরেলাল থাকুক বটে, দিবা টুকটুকে ছাওয়াল...”

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন—“ওই রইল, তবে একটু বদলে। তোমাদের আমাদের যুগ যে যাচ্ছে কড়া, আমাদের নাতিদের ও নাম পছন্দ হবে কেন? আজকাল চাই দীপক, অলক,—তোমাদের নতুন ডাক্তারবাবুর নাম দেখছ না—পুলক; ওর নাম রইল হীরক।...এস টুলু।”

উঠিয়া আসিয়া লিক্টের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় সেই জীলোকটি চিংকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—“দেখো, ছাওয়াল কেড্যা নিলেক, আমার কাপ্তোড় ছিঁড়্যা দিলেক, আমার জামা ছিঁড়্যা দিলেক, চুল ছিঁড়্যা দিলেক, দেখো—ভুমাকো বলছে—বড়া মানুষ, টাকার চকমকি দেখায়।—আমার ছাওয়াল দে...এই দেখো, চলো তুমরা—”

—আলুখালু কেশ, পিঠের কাছে কাপড়টা ছেঁড়া, মুখের এক জয়গায় খামচানোর দাগ।—আরও কয়েকজন জীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন—“কে?”

“উই চম্পা—চরণদাসের বিটি—দেখো তুমরা—ই মাইয়ারা সাক্ষী রইছে—”

মাষ্টার মশাই আর টুলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন; মাষ্টার মশাইয়ের মুখে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি। টুলু বোধ হয় নিতান্ত যাজিক ভাবেই ফিরিয়া পা বাড়াইয়াছিল, মাষ্টার মশাই তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—“পাগল হয়েছে?”

পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া জীলোকটিকে বলিলেন—“আর নেই আমার কাছে। তুই সেই পাঁচ টাকার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়-জামা করিয়ে নিস।”

লিক্টি নামিয়া আসিল, দুই জনে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ

হৃদয়-আসন

(ধনু হইতে)

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আমার হৃদয় আসন এমনি ছোটো

তাহাতে একের অধিক হয় না স্থান,—
তুমি-ই যে তাহা দখল করিয়া আছো,

করিতে কী পারি পরেরে সে আমি দান?

তুমি-ই যে মোরে চোরের মতন চূপে,

করিতেছ ভোগ নানান ছন্দে, রূপে,

তুমি সেই ধন ফিরিয়ে না দিলে পরে—

চেয়ে আমি কেন পেতে যাই অপমান?

তোমারি প্রভাবে তুচ্ছ ও গৃহ-হার

রক্ত-অশ্রু কাঁদিয়া ফিরিছে প্রাণ।

যতেক অতিথি আসিছে আমার তরে

গান গেয়ে যায় ভিজাতে আমায় শুধু;

যতেক কুসুম ফুটিছে আমার গাছে

দিতে চাহিতেছে ঢেলে হৃদয়ের মধু।

নাচিছে কতই, আরতি করিছে মোরে,

কাছে নিতে চায় হাত দিয়ে হাত ধরে,

আমি শুধু বলি নির্ভর হয়ে সদা—

“ফিরে যাও দূরে, স্থেথায় হবে না স্থান।”

তুমি-ই যে তাহা দখল করিয়া আছো,

করিতে কী পারি পরেরে সে আমি দান?

শাহজাদা দারাজ্জাহান জীবন-কাহিনী

শ্রীকালিকারজন কানুনগো

৪

যৌবনে পিতৃজ্যোতী, প্রোঢ়ে নবীন প্রেমিক, বার্ককো বাল-
স্বভাব, জাহাঙ্গীর বাদশাহ পিতা আকবর এবং পুত্র
শাহজাহান অপেক্ষা ইতিহাসে নিরুপস্থিত চরিত্র। সুদীর্ঘ চারি
বৎসর কাল প্রেমের আশ্রমে পুড়িয়া মেহেকলিসাংকে পত্নী-
রূপে লাভ করিবার পর তিনি যেন হাতে হাতে স্বর্ণ
পাইলেন (মে মাস, ১৬১১ খ্রি:)। নবীন প্রেমের উত্তাল
তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিল্লীস্থর “এক টুকরা রুটি
ও এক পেয়ালা শরাবেব দামে” হিন্দুস্থানের বাদশাহী
সুন্দরী নুরজাহানের পায়ে বিকাইয়া দিলেন, গোপনে নয়
নিতান্ত প্রকাশ্যে। দরবারী “ঘাট হাজারী” মনসবদার
সম্রাজ্ঞী “নুরমহল” (কিছুদিন পর নুরজাহান) ১৬১১
হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে সম্রাট
এবং তাঁহার সাম্রাজ্য উভয়ই শাসন করিয়াছিলেন।
জাহাঙ্গীর বাদশাহর বয়স বাড়িয়াছিল, দেহ অতিভোগ-
জনিত অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু চিরকাল
তিনি নাবালকই রহিলেন। অন্তঃপুরে নুরজাহান বেগমের
পদার্পণের পর আলা হজরতের নাবালকত্ব যেন আরও
বাড়িয়া গেল; বে-সরকারীভাবে নবপরিণীতা পত্নী
হইলেন শাহনশাহর “আতালিক” বা অভিভাবিকা।
ঐতিহাসিকেরা জাহাঙ্গীর-রাজত্বের এই একাদশ বৎসরকে
“নুরজাহান-চক্রের” শাসনকাল আখ্যা দিয়াছেন। এই
“চক্রের” (junta) মধ্যে ছিলেন নুরজাহানের পিতা
উজীর ইতিমাদ-উদ্দৌলা, ভ্রাতা আসফ খাঁ এবং শাহজাদা
খুর্রাম। নুরজাহান মনে করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর
পর খুর্রামকে শিখণ্ডীর মত দিল্লী-সিংহাসনে বসাইয়া বাকী
জীবন তিনিই হিন্দুস্থানে সর্বস্বত্বাধী থাকিবেন। এই
আশায় নুরজাহান অগ্রণী হইয়া আসফ খাঁর কণ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী
আরজুমন্দ বাহু বা মমতাজমহলের সহিত শাহজাদা খুর্রামের
বিবাহ দিলেন (৩-শে এপ্রিল ১৬১২ খ্রি:)। ইরান-সম্রাট
শাহ ইসমাইলের বংশধর মুজফ্ফর হোসেনের কন্যার সহিত
দুই বৎসর পূর্বে (সেপ্টেম্বর ১৬১০ খ্রি:) খুর্রামের প্রথম
বিবাহ হইয়াছিল।* বাস্তবিক স্বার্থের প্রেরণায়

নিয়মপ্রাধিনী প্রথমা পত্নীকে গ্রাস্য অধিকার হইতে
বঞ্চিত করিয়া খুর্রাম পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসন
লাভ করিলেও সুখী হইতে পারেন নাই। অবজ্ঞাতা অভি-
মানিনীর অশ্রুর বদলে শাহজাহানের যে শোকাশ্রু বিধাতার
বিচারে অবসরে ঝরিয়াছিল তাজমহলের শ্বেতমণ্ডর
আজিও উহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহা হউক, এই বিবাহের
পর শাহজাদা খুর্রাম আলালের ঘরের দুলাল হইয়া উঠিলেন।
গর্ভধারিণী যোধপুর-রাজকুমারী যোধাবাদীর পুত্র খুর্রাম;
যোধাবাদী সম্রাট জাহাঙ্গীরের নজরে হইয়া পড়িলেন খুর্রামের
“অশ্রুজল”। মাতৃস্থানীয়া এবং বিমাতাগণের মধ্যে একজন
মাত্র; অপরপক্ষে নুরজাহান বেগম হইলেন “আসল মা”।
ভাবাবেশে আলা হজরত লিখিয়া গিয়াছেন বাবা খুর্রাম
দাক্ষিণাত্য জয়ের উপটৌকনস্বরূপ “আসল-মা [ওয়ালেদা-ই
খোদ] নুরজাহান বেগমকে দিলেন দুই লাখ টাকা এবং
অশ্রুজল মা, বেগম ইত্যাদি সকলে মিলিয়া পাইলেন ষাট
হাজার টাকা।” মুসলমান আমলে বিবাহাদির পর শাহী
মহলে শাহজাদাগণের প্রবেশ অল্পমতিসাপেক্ষ ছিল।
পূর্বাগের প্রচলিত এই রীতি ভঙ্গ করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ
বাবা খুর্রামকে অন্তরমহলে যাতায়াত করিবার অবাধ অধি-
কার প্রদান করিয়াছিলেন। নুরজাহান বেগমের সম্মতি
এবং বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত খুর্রাম এই অধিকার হস্ত
পাইতেন না। কিন্তু লোকচক্ষে ইহা বিসদৃশ এবং কটাক্ষের
বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বনিতা ও কবিতার “সাদুভূ” সম্বন্ধে
ভবভূতির যুগ অপেক্ষা বাদশাহী আমলে মানুষ অধিক
“ভুজ্জন” ছিল। স্ত্রীর টমাস যো রচিত পুস্তকে খুর্রাম-
নুরজাহান সম্পর্কে অশোভন ইঙ্গিত আছে। সত্য মিথ্যা
ভগবান জানেন; তবে সর্বমু অত্যন্তগর্হিতং।

পুত্রের সহিত বাগদত্তা কন্যার বিবাহ-কার্য্যটা নিষ্পন্ন করিবার অবকাশ
জাহাঙ্গীরের হয় নাই—এইরূপ অনুমান করিবারও কোন অজুহাত নাই।
সর্বাপেক্ষা বিবেচ্য বিষয় জাহাঙ্গীর এমন কোন কথা তাঁহার তুজুকে
উল্লেখ করেন নাই। হতরাস সন্দেহ হয় মমতাজমহলকে প্রেমিক শাহজাহান
দরবারী ইতিহাসে প্রথম এবং শেষ প্রণয়পাত্রী হিসাবে জাহির করিবার
জন্যই এই বাক্যদান ব্যাপার উদ্ভাবন করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক-
গণ বাদশাহ-নামকে অজ্ঞাত জ্ঞান করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন,
যথা:—

Memoirs of Jahangir, Rodgers & Beveridge, Vol. I, p. 224, footnote.

“the long-engaged pair . . .” (*History of Shahjahan, Banarasiprasad Saxena, p. 14*).

বিনা বিচারে বিশস্ত চিন্তে দরবারী ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ
করা নিরাপদ নহে।

* শাহজাহান-রাজত্বের অসম্পূর্ণ দরবারী ইতিহাস বাদশাহ-নামায়
লিখিত আছে, মমতাজমহলের সহিত খুর্রামের বাগদান হইয়াছিল, প্রথমা
স্ত্রীর সহিত বিবাহের শ্রায় তিন বৎসর পূর্বে। ঐ স্ত্রীর গর্ভে খুর্রামের প্রথম
সন্তান জন্মিল মমতাজের সহিত বিবাহের একমাস পূর্বে। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে
খুর্রামের সহিত মমতাজের বাগদান হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা
যায় না। নুরজাহানকে বিবাহ করিবার পূর্বে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে

বন্দী খসরুকে আসিফ খাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া হুজুহান বেগম চালে ভুল করিয়া বসিলেন, “হুজুহান চক্রে” ভাঙন সুরু হইল। স্বার্থের সংঘাতে ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে ঐক্য ও স্নেহের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। শাহজাদা খুরম হুজুহানের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন; তবে ঘন ঘন বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাটকে খুশ মেজাজে রাখিতেন। হুজুহান-চক্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খান-ই খানান আকসুর রহিমের পৌত্রী (শাহনওয়াজের কন্যা) সহিত খুরম হঠাৎ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। হুজুহানের বিরুদ্ধে ইহাই খুরমের প্রথম পান্টা চাল; বাদশাহ-নামায আছে “কতিপয় রাজনৈতিক কারণেই” এই বিবাহ হইয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অবজ্ঞাত শাহজাদা পরবেজ দরবারে আমন্ত্রিত হইলেন, এবং তাঁহার মনসব বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতে সম্রাজ্ঞীর কূটনীতি খেলার নূতন খুঁটি হইলেন পরবেজ।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, হুজুহান বেগমের পিতা বিচক্ষণ বৃদ্ধ উজীর-ই আজম ইতিমাদ-উদ্দৌলার মৃত্যুর তিন মাস পরে, শাহজাদা খুরম প্রকাণ্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। দাক্ষিণাত্য, মালব এবং গুজরাটের বাদশাহী ফৌজ খুরমের বক্তৃতা স্বীকার করিয়া শাহজাদার অধিনায়কত্বে রাজধানীর দিকে অভিযান করিল। সম্রাজ্ঞী হুজুহান একক এবং অসহায়; পিতা মহানিজার ক্রোড়ে, ভ্রাতা আসিফ খাঁ পার্শ্ব কণ্টকস্বরূপ, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম মোসাহেব মুতামিদ খাঁ শত্রুর গুলচর। চতুর্দিকে অবিশ্বাস এবং ষড়যন্ত্রের ছায়া। শাহজাদা খুরমের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিতা করিয়া হুজুহান বেগম সম্রাটের পুণ্ডিতন বিশ্বস্ত যোদ্ধগণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। শাহজাদা মনে করিলেন, তিনি রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেই স্বা লাহোর, দিল্লী, আগ্রার বাদশাহী মনসবদারগণ হুজুহান বেগমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। এইবার হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও কূটনীতিবিৎ পুরুষসিংহের সহিত এক তেজোদগ্ধ নারীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। শাহজাদা পরবেজ এবং খসরুর পুত্র দাওয়ার বকশকে সম্মুখে বাড়াইয়া হুজুহান খুরমকে বেকায়দায় ফেলিলেন; দাওয়ার বকশের অভিভাবক সমরনিপুণ মীর্জা আজিজ এবং পরবেজের পৃষ্ঠপোষক অসুর-বিক্রম মহাবত খাঁ সম্রাজ্ঞীর সহিত শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন; আশ্চর্যপতি মীর্জা জয়সিংহ এবং দুর্ধ্ব পাঠান সেনাপতি খানজাহান লোদী বিপন্ন সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্ত সৈন্তে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল।

মহাবত খাঁ ছিলেন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জাহাঙ্গীরের পুণ্ডিতন বিশ্বস্ত অলুচর; হুকুম পাইলে ইবলিস-কেও একহাত না দেখিয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি দিলখোলা জাহাঁবাজ সিপাহী; তাঁহার দোষ বা গুণ—মুখের উপর অপ্রিয় কথা শুনাইবার বেপরোয়া হিন্দুত। তিনি একবার স্বয়ং দিল্লীশ্বরকে বলিয়া বসিয়াছিলেন, “আলা হজরত! জনানার আঁচলে দিনরাত ঝুলিয়া থাকিলে বাদশাহী ছারখার হওয়া কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়।” হুজুহান বেগম মালুস না চিনিলে পূর্ণ ষোল বৎসর জাহাঙ্গীর বাদশাহর বাদশাহী রক্ষা করিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন মহাবত খাঁ গোঁয়ার এবং দুশ্মুখ হইলেও কাজের লোক—না চটাইলে নিমকহারামি করিবে না। জাহাঙ্গীর বাদশাহর বেঘাড়া বাঘ মহাবত খাঁ খুরমের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হুজুহানের কূটনীতির যাত্রাগুণে সিংহবাহিনীর পশুরাজ হইয়া পড়িলেন।

দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে বিলোচপুর নামক স্থানে বিদ্রোহী খুরমের ভাগ্য পরীক্ষা হইল (এপ্রিল ১৬২৩ খ্রিঃ)। প্রারম্ভে যখন উভয় পক্ষের লড়াই চলিতেছিল তখন মহাবত খাঁর সহকারী সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লা খাঁ, পূর্বষড়যন্ত্র অনুসারে বাদশাহী ফৌজ হইতে পৃথক হইয়া সৈন্ত শাহজাদার সহিত মিলিত হইল। এই ষড়যন্ত্রের কথা খুরমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং বিদ্রোহমন্ত্রদাতা রাজা বিক্রমজিৎ ছাড়া অস্ত্র কেহ জানিতেন না। খুরমের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক দারাব খাঁকে এই শুভ সংবাদ প্রদানের জন্ত রাজা বিক্রমজিৎ যখন ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন, সেই সময় বাদশাহী তোপখানার একটি গোলার আঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত হইল। বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগে আবদুল্লা খাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির রহস্য খুরমের সৈন্তগণ বুঝিতে না পারিয়া পরাজয়ের আশঙ্কায় হতোদ্যম ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শাহজাদা খুরমের সৌভাগ্যসূচ্য পিতার অভিশাপে রাহগ্রস্ত হইল; তিনি ‘বে-দৌলত’ বা দুর্ভাগ্যের ত্রায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। মহাবত খাঁ বিদ্রোহী শাহজাদাকে দম ফেলিবার অবকাশ দিলেন না; বিজাপুর, গোলকুণ্ডা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিল না।

মমতাজ এবং তাঁহার শিশুসন্তানগণকে লইয়া কয়েক হাজার বিশ্বস্ত অলুচাত্রী সহ শাহজাদা খুরম মহাবত খাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া তৈলঙ্গ ভূমির গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আশ্রয়পাণন করিয়াছিলেন। অসীম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি অবশেষে উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। প্রাচীর দিগ্বাল রেখায় আবার সৌভাগ্যের মুহূর্ত্ত রাগ

তাহার প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। অকস্মিক স্ববাদের আহ্বান বেগ বিনা যুদ্ধে উড়িয়া হইতে পলায়ন করিয়া রাজমহলের পথ ধরিলেন। শাহজাদা খুরম ক্রতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উদ্ধাবেগে রাজমহলের উপর আপতিত হইলেন। যুদ্ধে বাংলার বুদ্ধ স্ববাদের ইব্রাহিম খাঁ কতেজদকে পরাজিত ও নিহত করিয়া খুরম রাজমহলে বাদশাহীর দিবা-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্ববে বাংলার রাজধানী ঢাকা-জাহাঙ্গীরনগর বিজয়ী শাহজাদাকে রামপালের নামকরা কলা (হয়ত অমৃতসাগর) কয়েক কান্দি ভেট পাঠাইয়াছিল। যাহা হউক কয়েকমাস পরে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া স্ববে বিহার দখল করিবার জন্ত শাহজাদা খুরম রাজা ভীম শিশোদিয়াকে পাটনার দিকে প্রেরণ করিলেন। পাটনা অধিকার করিয়া তাহার অগ্রগামী সেনাদল বিহারের পশ্চিম প্রান্তে টৌস (প্রাচীন তমসা) নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিল। শাহজাদা আসন্ন-প্রসবী মমতাজমহলকে রোহতাস দুর্গে রাখিয়া স্ববা এলাহাবাদ ও অযোধ্যা আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন, এই সময়ে তাহার এক পুত্র লাভ হইল—নাম রাখিলেন মুরাদ-বকশ।

৭

দাক্ষিণাত্যে পলায়িত খুরমের কোন সন্ধান না পাইয়া বিজয়ী সেনাপতি মহাবত খাঁ এবং শাহজাদা পরবেজ শত্রুর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে যখন জল্পনা-কল্পনা করিতে ছিলেন, সেই সময় জরুরী ফরমান মারফত তাহার অবগত হইলেন “বে-দৌলত” মশরিকী তিন স্ববার উপর কজা করিয়া স্ববা এলাহাবাদের জৌনপুর শহরে* ডেরা করিয়া আছে। খুরমকে পরাজিত এবং বুদ্ধ খান-ই-খানান আবদুর রহিমকে গ্রেপ্তার করিয়া মহাবত খাঁ খান-ই-খানান খেতাব এবং শাহজাদা পরবেজ চল্লিশ হাজারী মনসবু পাইয়াছিলেন। তাহার নূতন উদ্যমে চল্লিশ হাজার সেনা সহ দিনরাত কুচ করিয়া বিজোহপর্ব সমাপ্ত করিতে চলিলেন। এই সংবাদ পাইয়া খুরম জৌনপুর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া বিহার প্রান্তে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। টৌস বা তমসাতীরে বাহবদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গতিক ভাল নয় দেখিয়া অনতিদূরে গঙ্গাবক্ষ হইতে শাহজাদার বাঙালী “নৌবারা” (জঙ্গী নৌকার বহর) অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া খুরমের পলায়নের উপায় নাই। খুরমের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও সেনানায়কগণ

সকলেই তাহার জীবন-মরণের সঙ্গী, রণনিপুণ এবং অসম-সাহসিক যোদ্ধা। আক্রমণ আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়া তিনি মহাবত খাঁর উপর হামলা করিলেন। রাজা ভীম শিশোদিয়া এবং শের খাঁর নেতৃত্বে তাহার অগ্রগামী সেনা বাদশাহী তোপখানা দখল করিয়া প্রচণ্ড ঝগ্গাবেগে শত্রুবাহের কেন্দ্রস্থলে শাহজাদা পরবেজকে আক্রমণ করিল, বাদশাহী ফৌজে হাহাকার পড়িয়া গেল। শাহী ফৌজের বামভাগে নদীর পারে কিছু দূরে ছিলেন যোধপুর-পতি গজসিংহ। বিদ্রোহী খুরম যোধপুরের দৌহিত্র; কিন্তু এক বৎসর পূর্বে শাহজাদা পরবেজ গজসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন; এই দো-টানা স্রোতে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রশ্রাবের বেগ হইল। গজসিংহ পায়জামার ডোরী সবেমাত্র খুলিয়াছেন। এমন সময়ে কুস্পাবৎ গোবর্দ্ধনদাস রাঠোর ঘর্মান্ত দেহে তথায় পৌছিয়া কড়াহুরে বলিল, “মহারাজ! সব ভাসিয়া গেল, এখন আপনার লঘুসংখ্যা করিবার সময়?”* যোধপুর-রাজ কার্যটি না সারিয়াই নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে পায়জামা কসিয়া বলিলেন, “আমি দেখিতেছিলাম খবর দেওয়ার জন্য কোন রাজপুত অবশিষ্ট আছে নাকি?” মহাবত খাঁ বিচক্ষণ সেনাপতি; তিনি রাজা ভীম ও শের খাঁর গতিবোধ করিবার জন্ত জটাজুট নামক পাগলা জঙ্গী হাতী ছাড়িয়া দিলেন; এবং এই অবসরে তাহার সেনাবাহিনী পুনরায় বাহবদ্ধ হইল। এইবার আবহুল্লা খাঁ খুরমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পলায়ন করিল। মহাবত খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ভীম শত্রুপুত হইয়া বীরগতি লাভ করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্রোহী খুরমের শ্রায় অনিশ্চিত জয়, পরাজয় ও পলায়নে পর্যাবসিত হইল।

তমসার জলে খুরমের ক্ষীণ আশা ভাসিয়া গেল। যে পথে আসিয়াছিলেন আবার সেই পথে জীপুত্র ও হতাবশিষ্ট অহুচরবর্গের সহিত শাহজাদা “বে-দৌলত” দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন, মহাবত খাঁ এবং পরবেজ অন্যপথে আবার দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যের পুনঃ পুনঃ আঘাতে খুরমের অকাল স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। জীপুত্রসহ হতপ্রভ জ্যোতিষ্কের ন্যায় তিনি মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। গর্জিত খুরম পিতার ক্ষমা এবং হুরজাহানের করুণা ভিক্ষা করিয়া দরবারে-দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার উপর হুকুম হইল, জামীন-স্বরূপ কুমার দারা এবং আওরুঙ্গজেবকে

* শাহজাদা খুরম ১০৩১ হিঃ অর্থাৎ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জৌনপুরে ছিলেন (Vide Amal-i-Salih Text p. 187 i)

* গোবর্দ্ধনদাস ওয়া কৃত হিন্দী রাজপুতানকা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড ৫২৬ পৃ.

† Khafi Khan, Muntukhab-ul-labab

অগ্রে দরবারে প্রেরণ করিয়া পরে তাঁহাকে স্বয়ং হুজুরে হাজির হইতে হইবে; এবং আসীরগড়, রোহতাশ প্রভৃতি যে সমস্ত দুর্গে তাঁহার সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিতেছে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিতে হইবে।

দারা ও আওরঙ্গজেব নাসিক হইতে (সোমবার ওরা জুমাদি-উল-সানী, ১০৩৫ হিঃ) দরবারে যাত্রা করিলেন; দুই লক্ষ টাকার হীরা-জহরত ও অন্যান্য সামগ্রী বাদশাহর হুজুরে পেশকর দেওয়ার জন্য কুমারদ্বয়ের সহিত প্রেরিত হইল। খুরম পরাজিত হইয়াও বিদ্রোহের চেষ্টা করিতে পারেন নাই। তিনি ইরান-সম্রাট শাহ আব্বাসের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার সাহায্য পাইলে তিনি সফরী-বংশকে হিন্দুস্থানের বাদশাহী নজর করিতে পারেন। সন্ধির দ্বিতীয় সর্ত্ত, অর্থাৎ দরবারে উপস্থিতির আদেশ পালনে তিনি নানা অছিলায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের ন্যায় হিন্দুস্থানের রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট সহসা তাঁহার অল্পকালে পরিবর্তিত হইল।

সম্রাজ্ঞী হুরজাহান খুরমের আচরণে ঠেকিয়া শিথিয়াছিলেন, কাহাকেও অতি বাড় বাড়িতে দিলেই বিপদ। খুরমকে দমন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল মহাবত খাঁর মত ভীমকর্ত্তা স্বদক্ষ সেনাপতির; সুতরাং কাজ হাসিল হওয়ার পর হাতিয়ার কেমন করিয়া ভাঙিবেন নুরজাহান সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খান-ই-খানান মহাবত খাঁ তখন মোগল সাম্রাজ্যের স্বস্তররূপ (রুকন-উল-মুলতানত) এবং জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র, দিল্লীর মসনদের স্বেচ্ছা উত্তরাধিকারী পরবেজের আত্মনিক। সাম্রাজ্যের শান্তি, স্বার্থ এবং উত্তরাধিকারিত্বে ন্যায় বিচার যদি হুরজাহান বেগমের কাম্য হইত, যদি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর স্বীয় প্রাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত নিতান্ত সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁহার রাজনীতিকে বিপথগামী না করিত তাহা হইলে তিনি পুনরায় পরবেজ এবং মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেন না। সম্রাটের দাসীগর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র অকর্মণ্য শারিয়াবের সহিত হুরজাহান বেগম শের আকগানের ওরসজাতা কন্যা লাভলী বেগমের বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী মনে করিতেন শাহজাদাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দিল্লীর মসনদ তাহাকেই তিনি দিতে পারেন। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া তিনি খসরুর পুত্র দাওয়ার-বকশ এবং পরবেজকে দাবা খেলার ঘুটির ন্যায় আগে বাড়াইয়া খুরমের বাজিমাৎ করিয়াছিলেন। মহাবত খাঁর বাজবলে পরবেজ হুরজাহানের শিখণ্ডী শারিয়াব এবং আসফ খাঁর জামাতা খুরমকে ডিঙ্গাইয়া পাছে সিংহাসন

অধিকার করে, এই আশঙ্কায় ভ্রাতা ভগ্নী পূর্ব বিরোধ চাপা দিয়া একযোগে কার্য আরম্ভ করিলেন। আলা হজরত সাম্রাজ্যে সাংখ্যের পুরুষ, তাঁহাদের হাতে কলের পুতুল। মহাবত এবং পরবেজকে পরস্পর দূরে সরাইয়া একে একে দুই জনকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে পরবেজকে দাক্ষিণাত্যে বাহাল রাখিয়া মহাবত খাঁকে সরাসরি বাংলায় বদলী করা হইল, এবং মহাবত খাঁর স্থানে খানজাহান লোদী শাহজাদা পরবেজের আত্মনিক বা অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন—ইনি আসলে আসফ খাঁর চর এবং নজরবন্দী শাহজাদার ‘কারারক্ষক’। মহাবত খাঁ কুটনীতির মারপ্যাচ কিছু কম বুঝিতেন; সুতরাং তিনি অসম্মিষ্ট চিত্তে বাংলায় চলিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে পৌছিতে-না-পৌছিতেই দরবারে তাঁহার ডাক পড়িল, অধিকন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল বহু লক্ষ টাকা তিনি সরকারী তহবিল হইতে তহরুর করিয়াছেন; শাহানশাহর হুকুম, তাঁহাকে হিসাব বুঝাইয়া দেওয়ার জন্ত লাহোরে হাজির হইতে হইবে। বাদশাহী আমলে কোন আমীরকে বেকায়দায় ফেলিয়া অপমানিত ও অপদস্থ করিবার প্রয়োজন হইলেই কড়াকড়ি হিসাব দাখিল করিবার হুকুম হইত; কারণ যাহারা সেকালে দস্তরমত আমীর তাহারা কোনদিনই হিসাব রাখিতেন না, দিতেও পারিতেন না;—এই সমস্ত বাজে কাজ করিত কায়স্থ দেওয়ানজী। মহাবত খাঁ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কাগজপত্র কিছু সঙ্গে লইলেন না; তাঁহার সঙ্গে চলিল বাছা বাছা পাঁচ হাজার রাজপুত সিপাহী,—সেকালের গুর্খা; হুকুম পাইলে “পিতরমপি ন জানামি”। মহাবত কোমর কষিয়া লাহোরে হাজির হইলেন; দরবারে হিসাবের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

হুরজাহান বেগম বুঝিতে পারিলেন সিন্ধু নদের এই পারে খান-ই-খানান মহাবত খাঁর সহিত হিসাব-নিকাশ নিরাপদ নয়। কিন্তু বিলম্ব নদী পার না হইতেই সম্রাট জাহাঙ্গীর মহাবত খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। হুরজাহান এবং আসফ খাঁ সম্রাটকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত বন্দীদশা স্বীকার করিলেন। মহাবত খাঁর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না; সম্রাটের ইচ্ছা অনুসারে তিনি নিতান্ত বিখন্ত চিত্তে আটক অতিক্রম করিয়া কাবুল চলিলেন। ইতিমধ্যে হুরজাহান নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার প্রেরিত চরগণ মোটা বেতনে উপজাতীয় পাঠান সিপাহী ভর্ত্তি করিয়া গোপনে রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। এক দিন পেশাওয়ারের নিকট মহাবত খাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। মহাবত খাঁ হতাবশিষ্ট তিন হাজার ফৌজ সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন; পশ্চাতে হুরজাহান বেগম লাহোর পর্যন্ত তাঁহাকে দম ফেলিবার অবকাশ

দিলেন না। এইবার মহাবত খাঁকে দমন করিবার জন্ত সপ্ততিপর মুম্বু বুদ্ধ আব্দুর রহিমের ডাক পড়িল। খুরমের সহিত বিদ্রোহে শরীক হওয়ার অপরাধে মনসব এবং খান-ই-খানান উপাধি হারাইয়া এই সময়ে আব্দুর রহিম ছমায়-মকবরার মুখোমুখী নিজের সমাধি নির্মাণ করিতে ছিলেন। নির্বাপনোন্মুখ আশা-প্রদোপের শেষ শিখায় বিভ্রান্ত হইয়া স্রুবি আব্দুর রহিম একটি ফাদি কবিতা রচনা করিয়া দিল্লীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

“মারা লুত্‌ফে জাহাঙ্গীরি জে তাইদাতে রব্বানী।

দো বারঃ জিন্দগী দাদঃ দো বারঃ খানখানানী ॥”

(অর্থাৎ খোদার রেজামন্দী ও জাহাঙ্গীর বাদশাহর মেহেরবাণী আমাকে দ্বিতীয় বার জিন্দগী [জীবন] এবং দুই-দুই বার খানখানানী বকশিশ করিয়াছে।

যাহা ইউক, আখেরী লড়াই ফতে করিবার জন্ত কোমর-বন্দ কসিতেই খান-ই-খানান আব্দুর রহিমের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মহাবত খাঁ মিবাড়ের পথে পলায়ন করিয়া নাসিক শহরে বিদ্রোহী শাহজাদা খুরমের সহিত মিলিত হইলেন (সেপ্টেম্বর, ১৬২৭ খ্রি:)।* এইবার জাহাঙ্গীর রাজত্বের শেষ দৃশ্য এবং শাহজাহানের রাজত্ব তথা দারাসুকের জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক।

২

আসফ খাঁ ছায়ার ত্রায় জাহাঙ্গীর বাদশাহর পার্শ্বে থাকিয়া স্ত্রুদিনের আশায় সম্রাটের নাভিস্থান গণিতে ছিলেন। জামাতার বিদ্রোহের পর দরবারে তিনি বিভ্রান্তপন্থী সাজিয়াছিলেন,—অপদার্থ বে-দোলত খুরমের কথা মুখেও আনিতে ন। দাসীগর্ভজাত অকর্মণ্য শাহজাদা শারিয়ারকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন হুরজাহান বেগম প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসফ খাঁ প্রকাশ্যে শাহজাদা খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্শকে ত্রায়ের খাতিরে সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেন। স্বতরাং হতভাগ্য খসরু এবং সম্রাতি পরলোকগত শাহজাদা পরবেজের প্রতি অহরন্ত দরবারী মনসবদারগণ সহজেই আসফ খাঁর অহুগত হইয়া পড়িল। আসফ খাঁ গভীর জলের মাছ, বাহুতঃ তিনি সম্রাটের সেধা ব্যতীত সর্ববিষয়ে উদাসীন—কেবল ত্রায় এবং ধর্মের খাতিরে স্বযোগ মত খুরমের দুষ্কার্যের তীব্র নিন্দা এবং দাওয়ার বক্শের দাবি সমর্থন করিয়া নিজের নিঃস্বার্থ অপক্ষপাতিতা জাহির করিতেন।

১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর রবিবার সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে নরলীলা সংবরণ করিলেন। বৈধব্য দশাপ্রাপ্ত শোকাত্তা সম্রাজ্ঞী হুরজাহান

ভ্রাতা আসফ খাঁকে একবার অন্দর মহলে-তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাতর অহরোধ জানাইলেন। কিন্তু আসফ খাঁ জানিতেন ভগ্নীর অসাধ্য কাজ কিছুই নাই; স্বতরাং তিনি সেই ফাঁদে পা বাড়াইলেন না। অধিকন্তু, কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের দরবারে পিতার প্রতিভূরূপ নজরবন্দী, দারা, শুজা এবং আওরঙ্গজেবকে ভগ্নীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সম্রাজ্ঞীকে বন্দিনী করিলেন। লাহোর দুর্গে হুরজাহানকে সতর্কভাবে কারারুদ্ধ করিয়া আসফ খাঁ বেচারী দাওয়ার বক্শকে একপ্রকার জোর করিয়াই প্রকাশ্য দরবারে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাহার নামে খুব পাঠ এবং সিক্কা জারি হইল। ঠিক ঐ দিন ধৃত আসফ খাঁ নিজের সাক্ষেতিক অঙ্গুরীয় বেনারসী নামক গোলামের হাতে দিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত স্থানে স্বগোপনে প্রেরণ করিলেন।

১০

তিন মাস পরে (২১শে জানুয়ারি, ১৬২৮ খ্রি:) লাহোর দুর্গে আসফ খাঁ স্বীয় জামাতার কল্যাণার্থ এক অকাল বকর-ঈদ পর মানাইয়া দিলেন। এই ঈদের প্রথম বলি, ইজি-হাসে আসফ খাঁর “বকর ঈদের মেঘ শিশু” বলিয়া পরিচিত সেই হতভাগ্য দাওয়ার বক্শ, তাহার পর শাহজাদা শারিয়ার এবং এইরূপে পর পর পাঁচ জন রাজপুত্র ঐ ঈদে বলি পড়িল—তৈমুর বংশে দিল্লীর মসনদের কোন সম্ভাব্য দাবীদার আর অবশিষ্ট রহিল না। আসফ খাঁ অবশ্য বিনা হুকুম এই কাজ করেন নাই। রাজ্যারোহণের এক মাস পূর্বে শাহজাহান এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আদেশ দিয়া ছিলেন।

শাহজাহানের সিংহাসন নিষ্কটক করিয়া আসফ খাঁ দৌহিত্রত্বকে সঙ্গে লইয়া ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৬২৮ খ্রি:) আগ্রার অনতিদূরে আকবরের সমাধিক্ষেত্র সেকেন্দ্রায় উপস্থিত হইলেন। পঞ্জিকায় [হিন্দু এবং ইউনানী জ্যোতিষ মতে গণিত] ঐ দিন রাজধানী প্রবেশের পক্ষে অস্তিত্ব ছিল বলিয়া শাহজাদাগণ সেকেন্দ্রায় অপেক্ষা করিবার হুকুম পাইলেন, কিন্তু মায়ে মন পঞ্জিকা মানে না। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল আগ্রা ও সেকেন্দ্রার মধ্যবর্তী স্থানে একটি তাঁবুর মধ্যে পুত্রগণকে দেখিবার জন্ত চলিলেন। স্বদীর্ঘ তিন বৎসর নির্বাসনের পর দারা ও আওরঙ্গজেবের মাতৃদর্শন হইল, পিতামহের কাছে প্রতিপালিত বালক শুজা আবার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

পরের দিন আসফ খাঁকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত মহা সমারোহে আগ্রা দুর্গে দরবার-ই-আস বসিল। দৌহিত্রগণ সহ আসফ খাঁ কুণিশ করিবার পর সম্রাট মসনদের

“ঝরোকা” [অলিন্দ] হইতে নামিয়া আসিয়া পুত্রদ্বয়কে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। আসক খাঁ দীন ও ছুনিয়ার মালিক শাহানশাহর “কদম্-বোসী” করিয়া ধৃত হইলেন। শাহজাদা দারাশুকো যথারীতি বাদশাহর দরবারে নজর এবং নিসার পেশ করিবার পর সম্রাট তাঁহাকে নগদ দুই

লক্ষ টাকা বকশিশ করিয়া তাঁহার জন্ত দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করিলেন।

শাহজাদা দারাশুকো এই কথিতপ্রদিক্ত পিতৃ-সিংহাসনের বিধিনির্দিষ্ট ভাবী উত্তরাধিকারী। এই পটভূমিকা পরবর্তী ইতিহাসের পূর্বগামিনী ছায়া।

যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের জলযান চলাচলোপযোগী অঞ্চলে যাবতীয় আইন প্রবর্তন এবং বৈধ বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা প্রমোদ-ভ্রমণাদি উপলক্ষে যে সমস্ত জাহাজ জলপথে যাতায়াত করিয়া থাকে সেগুলির নিরাপত্তা বিধানই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগের মুখ্য কর্তব্য। তা ছাড়া নৌ-সৈন্য পরিপূর্ণ উপকূল-রক্ষী জাহাজ এবং ষ্টেশনগুলিকে যুদ্ধকালীন কৃত্য সম্পাদনের জন্ত প্রস্তুত রাখা এবং ছোট বজরা ও ফ্রাকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে জাতির সঙ্কট-সময়ে কি ভাবে কর্তব্য পালন করিতে হয় তাহা শিক্ষাদান করাও উক্ত বিভাগের কর্ম-সূচির অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রযাত্রীদের অথবা মহাসমুদ্রে এবং ইহার তীরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণকারীদের ধনপ্রাণ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান ছাড়া উপরি-উক্ত বিভাগকে আরও বহুদিশ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয়—যেমন, বিদেশ হইতে নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যের বে-আইনী আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা; বিশেষ বিশেষ সামুদ্রিক প্রাণী এবং মৎস্যাদির রক্ষণার্থে আইন প্রবর্তন এবং তাহার

প্রয়োগ, তুষার-পর্বতের বিদারণকার্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্ট ইত্যাদি দাখিল করিবার জন্ত একটি আন্তর্জাতিক রক্ষী বিভাগ পরিপোষণ এবং দুর্গত অঞ্চলে সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট হইতে উপকূল-রক্ষা বিভাগের সূচনা। তখন কংগ্রেসের বিধি-অনুযায়ী প্রথমে ‘রেভিনিউ-মেরিন’ এবং পরে ‘রেভিনিউ কাটার সার্ভিস’ নামক দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৯১৫ ইংরেজীর ২৮শে জানুয়ারীর একটি আইন অনুসারে ‘রেভিনিউ কাটার সার্ভিস’ এবং ‘লাইফ সেভিং সার্ভিস’ যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রক্ষা বিভাগ নামক প্রতিষ্ঠানের

অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আইনতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত।

শান্তির সময়ে ট্রেজারি বিভাগের অধীনে ইহার কার্য-পরিচালনা হয়, আর যুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর অত্যন্ত অঙ্গ হিসাবে



একটি উপকূলরক্ষী ‘কাটার’র নাবিকেরা গ্রীনল্যান্ডের উপকূল অঞ্চলস্থ

একটি তুষার-পর্বত বিদীর্ণ করিবার উত্তোগ করিতেছে

উহার সেক্রেটারীর আদেশানুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভাগের কশকর্ম নির্বাহিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখেপ্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দুই নম্বর পুনর্গঠন পরি-কল্পনার অঙ্গীভূত করিয়া উপকূল-রক্ষা-বিভাগের কার্য ধারাকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা হয়। পূর্বতন দীপ-গৃহ (Light-house) বিভাগও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়।

যুদ্ধকালে উপকূল-রক্ষা বিভাগের কর্মচারীগণ কনভয়-রক্ষক রূপে নৌ-বাহিনীতে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে আমেরিকার উপকূল-ভাগ রক্ষা এবং সৈন্য চলাচলাদির ব্যবস্থা করিতে হয় এবং মার্কিন বাহিনী যখন শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে

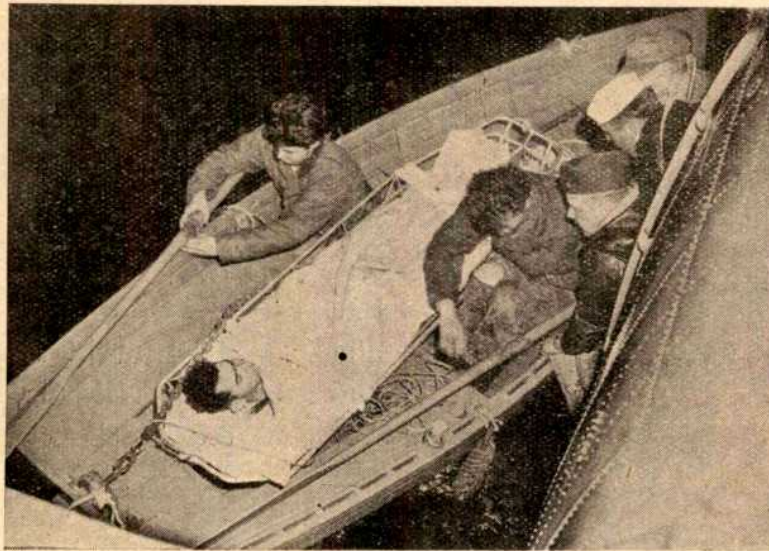
আক্রমণ চালায় তখন বিমান হইতে অবতরণাদি ব্যাপারে তাহাদিগকে সহায়তা করিয়া থাকে।

সমুদ্রপথে যে সমস্ত ভয় জাহাজ এবং পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত দ্রব্য বিপত্তির সৃষ্টি করে, উপকূল-রক্ষা বিভাগ সেগুলিকে অপসারিত এবং বিনষ্ট করিয়া জলযান চলাচলের পথকে সুগম করিয়া দেয় এবং দীপ-গৃহ (Light-house) দীপ-পোত (Light-ships) বয়্য রেডিয়ে ও বিবিধ প্রকার আলোক-স্তম্ভ এবং আবহ ও বেতার-কেন্দ্র স্টেশন ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। তা ছাড়া উক্ত বিভাগ উত্তাল সমুদ্রে বাষ্পীয় পোতারোহী বিপন্ন নাবিকদের উদ্ধারসাধন এবং বহুপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য্য পরিচালনাও করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে পোতারোহণপূর্বক মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত নাবিকদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও উক্ত বিভাগের কর্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নূতন বাষ্পীয় পোতাদি নির্মাণ এবং পুরাতন জাহাজ মেরামত করা ইহার অহুমোদন সাপেক্ষ। সারের নাবিক এবং অগ্নাশ্র কৰ্মচারীরা এই বিভাগের অহুমতি-পত্র এবং প্রশংসা-পত্রের জোরেই কর্মে বহাল হইয়া থাকে।

যুদ্ধ-বিষয়ক কেতাবী-বিজ্ঞা শিক্ষাদানের নিমিত্ত মার্কিন উপকূল-রক্ষা বিভাগ নিউ লন্ডনের কানেকটিকাটে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করিতে চারি বৎসর লাগে। এঞ্জিনিয়ারিং, সমর-বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং বিবিধ বৃত্তিশিক্ষামূলক বিষয়সমূহ ইহার পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নৈরুবিভাগে নূতন আমদানি লোকদের

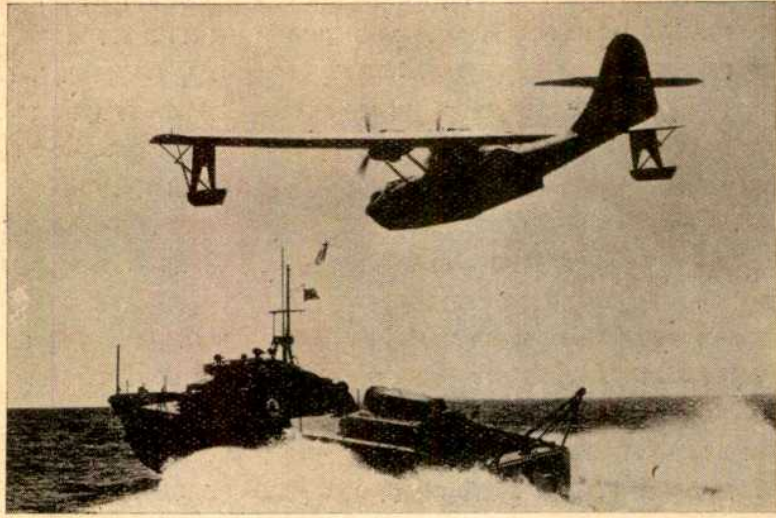


যুক্তরাষ্ট্রের বোর্টন বন্দরের দীপ-গৃহের উপর
একটি মার্কিন উপকূল-রক্ষা হেলিকপ্টার



রোগাক্রান্ত জনৈক মার্কিন নৌ-যন্ত্রশিল্পীকে একটি বাটুলিতে করিয়া
সান ডিয়েগো নামক স্থানে একটি 'সি-প্লেনে' লইয়া যাওয়া হইতেছে

শিক্ষাদান, ঐ বিভাগের তালিকাভুক্ত কর্মনিরত ব্যক্তিদের জন্ত উন্নত ধরণের শিক্ষা বিধান। এবং অফিসারদের জন্ত বিশিষ্ট পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকল্পে বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ক্রীড়া-কৌতুক-সংক্রান্ত একটি সুপরি-কল্পিত কর্মপদ্ধতিও অহুস্ত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর একদল শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র জলপথে অভিযানে বাহির হয়—সচরাচর তাহারা বৈদেশিক বন্দরগুলিতে নোঙ্গর করিয়া থাকে।



সমুদ্রে দুর্গতদের উদ্ধার কল্পে একটি উপকূল-রক্ষী 'কার্টার' এবং বিমান একই সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের স্থান

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয় পরাজয়ের সহিত তাঁর নিবিড় যোগ এবং গভীর পরিচয়। ভগবান মানুষকে তাঁর নিজের ছাঁচে সৃষ্টি করেছেন।—‘মমৈবাংশো জীবলোকে জীব ভূতঃ’—মানুষ তাঁর অংশাবতার। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’—এই রূপ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মশাস্ত্রে এবং কাব্যে মানুষই যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ সৃষ্টি—তা স্বীকৃত, গীত এবং প্রচারিত হয়েছে। এই স্বীকৃতি মোহাবিষ্ট মনের ক্ষণিক ভাবোচ্ছাস নয়—ইহা তত্ত্বদর্শী মনের সত্যাকার উপলব্ধি। তুলসীদাসের ‘সব ঘট বিরাজে রাম’, উপনিষদের—‘সদাজ্ঞানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ’, বিবেকানন্দের—‘বহুরূপে সন্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পুজিছে ঈশ্বর।’ সত্যেন্দ্রনাথ এই চরম সত্য এবং পরম সত্যকে তাঁর অনিন্দ্য ভাষায় এবং ছন্দে রূপ দিয়েছেন—‘জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি। এক পৃথিবীর স্তম্ভে লালিত এক রবি শশী মোদের সাথী।

‘কালো স্মার ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবাবি সমান রাঙা।’

তাঁর ‘কুহানাদপি’ কবিতায় বারাদনা-বন্দনা, সাম্য-সাম, শূদ্র, মেধর, জাতির পাতি, প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে এই অতলস্পর্শ, অপরিমেয় মানব-তত্ত্বের যথোদ্যোগেই বিনিয়ুক্ত হয়েছে।

এই মানবতত্ত্বই কাব্য-সাহিত্যের ভিত্তি বিধায়—Matthew Arnold কাব্যকে Criticism of Life বলেছেন। Lyallও এই দিক দিয়াই কাব্যকে minute mental dissection আখ্যা দিয়েছেন।

এই মানবতত্ত্বকে বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে, প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতং’ ক’রে সকল নরনারীর অন্তঃকরণের সুখ-দুঃখের ধুক-ধুক করা স্পন্দন তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ভিতর অহুস্ত করেছেন যার পরিচয় পাই—‘হুই বিধা জমি’, ‘পুরাতন ভূত’, ‘পতিতা’ ‘বাসবদত্তা’ ‘মুক্তি’, ‘কাঁকি’, ‘নিষ্কৃতি’ প্রভৃতি তাঁর বহু কবিতায়। আবার অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিখিল জগতের সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন—তাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের অহুস্তির অংশভাগী হবার আগ্রহে। কবির চিত্তবীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দ-গীতি ঝঙ্কত হয়ে উঠেছে—

‘সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া...
‘ঘরে ঘরে আছে পরমায়ী তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া’
‘ইচ্ছা করে মনে মনে...স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে’
‘দেশ দেশান্তরে...জন্মলাভ করে লই ছেন ইচ্ছা করে’

সত্যেন্দ্রনাথ একরূপ বৃহৎ বিরাট ব্যাপক ভাবে নিজেকে বিশ্বময় বিলিয়ে দিতে পারেন নি সত্য। তাঁর অহুস্তির পরিধিও খুব বিস্তৃত নয়—তা সাধারণ মানবের সুখ দুঃখের গভীর মধ্যোই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি আপনার সহানুভূতি ও সম-

বেদনায় দেশের নর-নারীর নিত্যকার নির্ধাতন মর্মে মর্মে অহুত্ব করেছেন। বালবিধবার দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন :—

‘গঙ্গার ধারা যতদূর যায়, ওগো দয়াময় তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখবঞ্চিত চিরলাঞ্ছিত ভ্রম ভারে’
পতিতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—

‘স্বর্ঘ্য যদি না বর্জন করে তোরে,

আমিও তোমারে করিব না বর্জন’

সকল স্বর্গকামী পুণ্যাত্মাকে ডেকে বলেছেন—

‘মন্দির কন্দের ছাড়ি এস বন্ধু এস বাহিরিয়া

স্বর্গের কামনা ভেঙে প্রবাণিত মানবের হিয়া।’

সকলকে মানুষের কাছে মানুষের মাঝে ডেকে বলেছেন—

‘এস এস মানুষের মাঝে,

নরলোকে আছে কাজ স্বর্গে তুমি কি লাগিবে কাজে?’

স্বর্গের সম্পদ, স্বর্গের অমৃত কবিকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

রবীন্দ্র-কাব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে কবির ব্যক্তিগত অহুত্বিত সার্বজনীন এবং সার্বভৌম অহুত্বিতর মধ্যে বিলীন এবং পরিব্যাপ্ত। ‘ভাব হ’তে রূপে, এবং রূপ হ’তে ভাবে’ অবিরাম আকাশবিহারী কবির আসা-মাওয়া তাঁর অহুত্ব, আবাদন, প্রকাশভঙ্গী এবং আবেদন নৈর্ব্যক্তিক এবং তাতে অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত অনেক বড়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অহুত্বিতকে সরল ভাবে এবং সরল ভাষায়—স্পষ্ট অর্থে সকলের পক্ষে সুবোধ্য এবং সুগোচর করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ সুপ্রচুর, ‘বুঝলাম না’ বলবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের গভীরতা অগাধ, অতলম্পর্শ ছরবগাহ, তিনি অরূপ রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দেন। তাঁর উচ্চতাও ছরারোহ, প্রাণ্ডলভ্য। বিশেষ অধিকারীর কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সাধারণ পাঠক উদ্ধাহ হয়েও সকল সময় তাঁর নাগাল পায় না, প্রাণ্ডলভ্য এবং সহজবোধ্যতার দরুণ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যমুখ্যত রসাবাদন সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য। তাঁর রচনা পাঠকসাধারণের চিত্তকে সুখ-দুঃখের দোলায় বিচিহ্নভাবে আন্দোলিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনা

বর্ণনার দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক এবং বহির্মুখী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভাবধন এবং অন্তর্মুখী। তাঁর ভাবাবেগ প্রাণধর্ম এবং সৃষ্টিশক্তি এতই প্রচুর এবং সক্রিয় যে অতি সাধারণ বস্তুতন্ত্র রচনাতেও তাঁর প্রতিভার অলৌকিক রশ্মি বিকিরিত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ-মেহুর-মাধুর্য্যে মণ্ডিত করেছে। আলংকারিক ভাষায় তাঁর রীতিকে বলা যেতে পারে বৈদর্ভ্য রীতি, তাঁর ইঙ্গিত পদে পদে তাঁর অর্থকে অতিক্রম করে যায়, অভিধার চেয়ে ব্যঞ্জনায় হয় জটিল এবং প্রহেলিকাময় এক সমস্তার কাণ্ডে অল্প অনেক সমস্তা শাখা বিস্তার করে—

পত্রপুষ্পফলে সফল ও সুন্দর অথচ ছায়া এবং সুরভিতে নিবিড় ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। সত্যেন্দ্রনাথের রীতি প্রধানতঃ গোষ্ঠী রীতি, বর্ণনা বস্তুতন্ত্র, সঙ্গীর্ণ কিন্তু স্বধর্মনিষ্ঠ, অর্থ অভিধা-প্রধান। ‘কোদাল’কে তিনি স্পষ্টরূপে কোদাল বলেই প্রকাশ এবং প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। ‘রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান—সত্যেন্দ্রনাথ নিজের নামকে সার্থক করে সত্য-প্রধান। সত্যের তুলনায় ভাব অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিচিত্র। সত্যের শুভ্র আলোককে সে স্বীয় প্রতিভার ত্রিকোণ ক্ষটিকে (prism) প্রতিফলিত ও বিকিরিত করে ইন্দ্রধনু রচনা করে। ভাবতন্ত্র কবির দান অরূপণ এবং উদার। সত্য-পরতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র কবির দান অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তরূপ সত্যেন্দ্রনাথের একট বর্ণনা উদ্ধৃত করি :

‘হাড় বেরনো খেজুরগুলো, ডাইনী যেন ঝামর চুলো

নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কি ধমকে গেলো ?

জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।

কোথাও অস্পষ্টতা নাই, এই বর্ণনা মুষ্টিমন্ত জীবন্ত এবং বাস্তবধর্মী। সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা জ্বালিয়ে উষ্ণমুখর সাগরের পারে কোনও অপরিচিতার আশ্রয় নির্দেশ করবার স্পর্শ তার নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ চারণ কবি

সত্যেন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে বাংলার চারণ কবির আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর বঙ্গজননী, সিংহল, তাজ, কবর-ই-হুর-জাহান, গঙ্গাধদি বঙ্গভূমি, কয়ালু, যুক্তবেণী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, আখেরী, প্রভৃতি কবিতা দেশের ঐতিহ্য কথায় উজ্জ্বাসে এবং ভাবে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি স্বল্পতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের বিচিত্রতায় এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও। তিনি একাধারে জীবনের সর্ববিধ তত্ত্বের বিশ্বতচ্ছন্দু ঋষি এবং তাঁর প্রতিভার প্রকাশ সর্বতোমুখী। তিনি বৈষ্ণব কবি, সূফি কবি, মরমী কবি, দরদী কবি, প্রকৃতির কবি, অপ্রাকৃতের কবি, মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি।

অপর দিকে সত্যেন্দ্রনাথ Boswell-এর অহরাগ নিয়ে এবং তদপেক্ষাও প্রশস্ততর কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে কবিগুরুর প্রতি তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে ‘আত্মদায়িক’ কবিতায় তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস পাই :—

রবির অর্থ্য পাঠিয়েছে আজ ধুবতারার প্রতিবাসী

প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্তসাগর মিলল আসি।

পুণ্যে তব পুষ্টি আজি বাস্মীকি ও ব্যাসের ধারা

বিশ্ব কবি সভায় ওগো বাজাও বীণা হাজার-তারা।

প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথ সহস্রতন্ত্রী বীণা বাজিয়েছেন। বিশ্বের কাব্যকুণ্ডকে বিচিত্র রাগরাগিণীর স্বভারে অহুরণিত করে

গেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সম্ভ্রান্ত্রী বিপক্ষিকায় সাতটি যে তার-সেই তার কটি বাজিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন এবং তৃপ্তি দান করেছেন।

তাঁর মনীষী বন্দনা বা বীরপূজা (hero-worship) বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাঁর অসংকীর্ণ ও অক্লপণ মনের অনুরাগ, উদারতা এবং বিশ্বমৈত্রীর স্বতঃসমুৎসারিত জাহ্নবী-সারাই হুসু হুসু ধ্বনি শুনতে পাই। দৃষ্টান্তরূপে তাঁর মনীষী মঙ্গল, বুদ্ধ গুণিমা, নমস্কার, গান্ধীজী, শ্রদ্ধাঘোষ, বড়দিনে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দীন দরিরদের বন্দনা করেছেন এবং তাঁর চরণ গীতি সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর 'গঙ্গাহ্রদি বঙ্গভূমি'র জুতি গানে, কণ্ঠ তাঁর মুখরিত হয়ে উঠেছে দেশের মনখীদের কীর্তিকথা বর্ণনে।

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মুগ্ধমন্ত মায়ের স্নেহ গঙ্গাহ্রদি বঙ্গভূমি
তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযুষ দানে
মমতা তোর মেহুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।

ব্রাউনিং-এর তীব্র ভাবাবেগ শেলির নিগূঢ় কল্পনাকুশলতা রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়লোকের নিবিড় ধ্যানৈক্যতানত। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে স্পর্শপরিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি তাঁর অবদানে অগ্রাহ্য নাই। তাঁর ভাষা; বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষা হতে চয়ন করা শব্দ-সম্পদ তাঁর বিচিত্র ছন্দ বিরচনা তাঁর উন্নত এবং অনবদ্য ভাবরাজি যে কোন দেশের যে কোন কবিকে গৌরব দান করতে পারে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'He uttered nothing base।' এ কথা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। তিনি শুধু যে তাঁর রচিত কাব্যে কুরূচি এবং অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই তাই নয়, তিনি যা কিছু পরিবেশন করেছেন তার দ্বারা তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে, তাঁর জাতিকে জাতীয়তায়, আত্মমর্যাদায়, স্বাধীনতার প্লাবায় এবং উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। অতীতের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, পুরাণ, আরণ্যক-ইত্যাদির বিবরণ থেকে যা কিছু গ্রহণীয় ও সফলনীয় তা তিনি নিজের প্রতিভার রসায়নে রঞ্জিত করে উপস্থাপিত করেছেন। এই মৃতকল্প জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই-কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে প্রত্যক্ষের উর্দে সূদূর আদর্শলোকে।

কবি ও স্বাধীন ভারতের সভাকবি

সত্যেন্দ্রনাথ রূপক ব্যাখ্যান করেন নি, এবং নরনারীর প্রেমের অথবা যৌন আকর্ষণের বিলাস বিবর্ত সম্বলিত স্তম্ভ বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায় নাই এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন তা দার্শনিক তত্ত্বের জল্পনা-কল্পনায় পূর্ণ বা পরিপূর্ণ না হ'লেও তাকে নিছক কাব্য হিসাবে উপভোগ করার কোন বাধা হয় না। মূলতঃ মানব

জীবন, কৃত্তী মানুষের জীবনী, নৈসর্গিক দৃষ্টি, সাময়িক ঘটনা, লাক্ষিত নরনারীর জন্ত বেদনাবোধ, ইত্যাদিই তাঁর অধিকাংশ কবিতার উৎস। হয়ত নূতন ছন্দের রচনা-কৌতূহলে রূপ ও রীতি কখনও বর্ণনীয় ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তবলার বোল হয়ত গানের সুরকে চাপা দিয়েছে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই, তাঁর উদার অন্তরের মত তাঁর সমস্ত কবিতাই ঔদার্য্যে শ্লীলতায় শালীনতায় এবং শুচিতায় পরিপূর্ণ। তিনি oriental mystic বা প্রাচ্যের ঐশ প্রেমের মরমিয়া কবি নন, কিন্তু তাঁর অনিন্দ্য হৃদে ও কথায় স্বাধীন ভারতের যে কল্পনালোক তিনি রচনা করে গেছেন তারই সভা-কবি আখ্যা তাঁকে দিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি প্রহ্লাদ-জননীর মুখে বলেছেন—

কার তরে এই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে তোর দে রে আগুন দে।
বিদ্রোহ নয় বিপ্লব নয় জাঘা অধিকার
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার
খেদ কিছু নাই আর না ভরাই চিত্তে মাড়িঃ রব
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এই মম গৌরব।
কম্বাধু তোর-জনম সাধু মোছরে চোখের জল—
রাজরোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

পঞ্জাবের লাহোরের পর 'রবীন্দ্র-নমস্কারে' সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যে দ্বিধার দিয়েছিলেন, আজ সে কথা আরো কত সত্য।

দাঁড়িয়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষণে অগ্রিয় সত্য কথা
জবজ্জ জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্রে দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাধিকার স্বত্রে পেয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং ভাবধারা, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা কবির তৃতীয় নেত্র এবং দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ব্যাধিতের বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন, আর্ন্ত মানবতার বেদনা তাঁর অন্তরকে মথিত করে তুলেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আরও সন্নিকটে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দারিদ্র্যপীড়িত অস্পৃশ্য পতিত নরনারীকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং বহু কবিতায় তিনি মনুষ্যসৃষ্ট ভেদবৈষম্যকে সর্বজন সমক্ষে কশাঘাত করতে কৃষ্ণা বোধ করেন নি :

“এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপরীত ধরি গলে
পশুর অধম অম্মুর দণ্ডে মানুষেরে তবু দলে।
দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখ না খোলা মন্দির দ্বার
দেবতা কাহারো নহে তৈজস দেবভূমি সবাংকার।

ছন্দোবৈচিত্র্য

বাক্য এবং অর্থের সূত্রে সংযোজনায় রসসৃষ্টি হলেই তার ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের তারতম্যই কাব্যের তর তর নির্ধারিত

হয়। বাক্যের প্রধান অলঙ্কার ধ্বনি এবং অল্পপ্রাস অর্থের প্রধান সম্পদ তার ভার এবং ব্যঞ্জন, তার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বাগ্‌বিজ্ঞাসের প্রধান রীতি যতি ও প্রবরের (accent) বিজ্ঞাসের উপর নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ছন্দের বহুবিধ প্রাচুর্য্যে এবং মাধুর্য্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু এই ছন্দের পরীক্ষণের ফলে সমুদ্ভূত প্রত্যেকটি কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা নয়, বরং তার কতকগুলি ছন্দ তার একঘেয়ে সমাবর্তনের পৌনঃপুনিকতায় যে পরিমাণে মনকে অভিভূত এবং কানকে পরাভূত করে সে পরিমাণে ঠিক প্রাণকে কাব্যরসে রসায়িত করে না। সৌন্দর্য্য আধুনিক সমালোচকদের কেহ কেহ তাঁহাকে কবি না বলে শুধু ছান্দসিক বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁর পিয়ানোর গান, পাকীর গান, দূরের পাল্লা প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এগুলিতে গানের সুরকে অতিক্রম করে বাদিদের accompaniment বা সহকারী যন্ত্রের ঔদত্য প্রকাশ হলে যে দোষ হয় সেই দোষই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বহু মৌলিক ছন্দ রচনা করে এবং বহুবিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দের আমদানী করে কাব্য-সাহিত্যকে তিনি যে রূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করেছেন আধুনিক কালের সমালোচক যদি সে অপরিমোদ্য ধণ না স্বীকার করেন তবে সে অকৃতজ্ঞতা ও অক্ষমণীয়তার পর্যায়ে পড়বে। কতকগুলি ছন্দে, বিশেষতঃ হালকা পল্কা দ্রুতছন্দে আরম্ভি দীর্ঘ হলে কানের যেন মুখ মেরে যায়—একটা Cloying effect হয়। এক-এক জন গায়ককেও ঠিক একই অপরাধে অপরাধী বলে মনে হয় যখন তিনি গানের আস্থায়ী অন্তরা সঙ্গারী বা আভোগের যে কোন একটি পর্ব ধরে ক্রমাগত ‘হুনিয়ে’ এবং ‘ফেনিয়ে’ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিপর্য্যস্ত এবং শ্রোতাকে বিপর করে তোলেন। গানের melody বা মাধুর্য্য এবং কবিতার রস একই পর্যায্যভুক্ত। উভয়ই মুকাবেদনবৎ। শ্রোতা এবং ভোক্তার অনুমোদন ইহার কষ্টপাথর। তাই সংশয়ে ভয়ে কবি বলেন—

“অপরিতোষাদ বিহুবাং ন সাধু মত্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।”

সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দসিক ছিলেন স্বীকার করি কিন্তু স্বীনার্থে নয় বিশিষ্টার্থে। তিনি যে কেবল অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত মিট্রাক্ষর বা অমিট্রাক্ষর দিয়ে chronometer বা metronome অর্থাৎ কালমান বা তালমান যন্ত্রের মত ছান্দসিক ছিলেন তা নয়।

ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্ত-সাধারণ। যারা বাংলাদেশে বাউলের নাচ দেখেছেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, কখনও গোপীযন্ত্র বাজিয়ে, কখনও এক হাতে একতারা অথ হাতে ডুগি বাজিয়ে অপূর্ণ ছন্দের লহরী তুলতে, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন বাংলা ভাষার ছন্দপ্রবণতা অথ ভাষার চেয়ে কত বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে বহু অপূর্ণ এবং বিচিত্র স্বদেশী ও বিদেশী ছন্দ অপরূপ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে।

সেই কবির নিপুণ হস্তের প্রসাধনে এবং সুরের ঝঞ্ঝারে ছন্দ-রাজি মুগ্ধিমন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ কাব্য

তাঁর অনুবাদ Fitz Gerald প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ধর্ম সাধনায় ‘আর্জবৎ’ বা ঋজুতাকে প্রথম সোপান বলা হয়েছে। সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতই সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি ঋজুতা ও সত্যবাদিতার বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ। তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলি একই কালে অনুবাদ ও নূতন কাব্য এবং এত সহজ ও সরস যে অনুবাদ বলে মনেই হয় না, পরন্তু অধিকাংশ রচনাতেই মৌলিক রচনার আবাদন লাভ করা যায়।

‘তীর্থ রেণু’ ও ‘তীর্থ সলিলে’র রহস্য-কুক্কীয় দেখতে পাওয়া যায় জগতের সকল দেশের সকল প্রচলিত ভাষার পরিচিত কবিদের কাব্য তিনি অনুবাদ করে বঙ্গভারতীকে উপহার দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ এই যে, তাঁর এই লেখাগুলি ‘মূলকে বস্তু স্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।’

সেই স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যের সাধনার ধন প্রস্ফুটিত কুসুম-গুলিকে অপরের নামে সংযোজিত করে সত্যেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন তা অতুলনীয়।

গীতি-কাব্য

সত্যেন্দ্র-প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক তাঁর ‘গীতি-কাব্য’। তাঁর ‘সবুজ পরী’ যেন রূপকথার সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমন্ত রাজকন্যা। অপর দিকে তাঁর ‘নীল পরী’ যেন রূপকথারই সেই ঘুম পাড়ানো রূপার কাঠি। সবুজ পরী—যৌবনের পরী, জীবনের পরী, তারুণ্যের সোমরস পানে মত্ত সে জীবন-বীণায় যৌবনের জয়গাথা গান করে। লালপরী—ইন্দ্রপুরে অবোধ গমনা—তার মানা নেই,—কিন্তু সবুজ পরীর প্রবেশে নিষেধ হয়েছে, কারণ—

“সবুজ পরী এক ঝোঁকে মাহুঘ রাজার পুত্রকে

বাসলো ভালো কায়মনে”

এই অপরাধ এই তো পাপ অমনি হ’ল দৈব শাপ
ধাকতে হবে মর্ত্যে গো মৃত্যু কীটের গর্তে গো।
সবুজ পরী টললো না, শাপের ভয়ে তুললো না
ভালো বেসেই ধম সে চায় না কিছু অম সে
চায় না যেতে স্বর্গে আর মাহুঘ যে প্রেম পাছ তার।
লাল পরীর ইন্দ্র সভায় প্রবেশ নিষেধ হয় নাই, সে নিষিদ্ধ
ফল আবাদ করে নাই। সে কিশোর লোকের অপরাধ।

“কিশোর কিশলয় পরে তোমার পরশ সধরে”

সবুজ পরী ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে সবুজ

পাখা ছুলিয়ে পাগল আঁখির পরে তার মুগল আঁখি ঢুলিয়ে যায়।
‘যাহুকরের পান্না জলে তোমার হীরার আংটিতে’—সে যাহুকরী।

ঘাসের গীষে সবুজ করে শিশু দিয়েছ স্নানরী
তাই উথলে হরিৎ সোনা কৃষ্ণবনের বুক ভরি।
যৌবনের যৌবরাজ্য; দেওয়া তোমার নিত্য কার্য
পাঞ্জা তোমার শ্রামল পত্র নিশান তৃণ মঞ্জরী।

তোমার হাতে হেম ঝরি—

সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ স্রবের সঞ্চারী।
সবুজে তোমার দোবজাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লৌচর্য বিভোল বিভ্রমে।

নিখিল জীবন তোমার বশ

আলোর তুমি বুক চেরা ধন অন্ধকারের রতন রস।
রামধনুকের রং নিঙাড়ি, রাঙাও ধরার মলিন সাজী
মরুভূমির সবজী বাতী নিত্য গাহে তোমার বশ।

মৃতন স্রবের উল্লাসাত।

গাহ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনের জয়গাথা।
ভরা দিনের তীব্র দাহে, অরণ্যানী যে গান গাহে
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্রামল মেঘের জাল পাতা।

জর্দাপরীকে বলা যায়—‘the elan vital’—the dash
of life—সে বিদ্যুৎপর্ণা :

মোরা উঠি পল্লবি বিদ্যুৎ লতিকায়,

নীহারিকা ছায়া ছবি মোরা নাচি খিরি ভায়
দিয়ে যাই মত্তের নৃতনের হর্ষ, সঁপে যাই অন্তরে বিদ্যুৎ স্পর্শ,
দিয়ে যাই চুখন, চলে যাই উন্নয়ন।

তাকে প্রশ্ন করুন :

“জর্দাপরী জর্দাপরী হিরণ জরীর ওড়না গায়—

রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে ছুই পাখানা মেলে যাও কোথায়?”

সাজা পুবেন—যাই কোথায়? হায়রে হায়—

স্বর্যমুখী ফুলের বনে স্বর্যকাস্ত মণির ভায়।

প্রশ্ন করুন—রূপবতীর রৌষের মত স্বর্ণ সীঁখে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার?
গরবিনী উত্তর দেবে—“আবার কার? এই আমার।

কুহুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙাই উৎস জ্যোৎসনার”

প্রশ্ন করুন—

ধনের স্বভা বক্ষে তোমার জোনাক পোকার হার চুলে
আলোয়া তোর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ চুলে

উত্তরে সোহাগ ভরে সে পরিহাস করে বলবে—

“চোখ চুলে? মন ভুলে?”

অহঙ্কার করে সে বলবে—

কুবের পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে।
আমরা বলি—ভ্রূগমে যে রাঙা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস
ছঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ।

বিদ্রূপ করে চোখ বাঁকিয়ে সে বলবে—

বাসরে বাস। সোনার চাষ।

অমনি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস?
মুগ্ধ হয়ে লুক হয়ে আমরা বলি—

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়
সাধের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্নে ধরা ফিরাস্ পায়

শেষ করে সেই অতিথি পরিভাবিনী অগ্নান বদনে বলবে—

ফিরাই পায়? হায় গো হায়।

পরশমণি চায় যে আগে সকল হরষ তার বিদায়।

বুকের পাজির ঝাঁকর করে মাড়িয়ে চলে যায় সে,—আমরা
অহুযোগ করে বলি—

“জর্দাপরী জর্দাপরী জরির জুতা সোনার পায়

মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ডাইনে বায়

সে তার পরম পারিতোষিক অপাঙ্গে বর্ষণ করে বলে—

সোনার পায় মাড়াই যায়

আমার স্বয়ম্বরের মালা, আলোকলতা তার গলায়।

এবার রূপকথার রূপার কাঠি স্পর্শ করে ঘুম পাড়াবার
জন্ত আসেন নীল পরী—

তার কানে সুনীল অপ্ রাক্ষিতা পাপড়ি চুলে জ্বাক্ রাণের
পায়ে জড়ায় নুপুর হয়ে শেষ বাসরের রেশ গানের।

তাকে ডেকে কবি বলছেন—‘নীল পরী গো নীল পরী,

নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী।

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা টিপটি নীলা কাঁচ পোকার,

তল্লা তোমার সূর্য্য চোখের তল্লা তোমার আলতা পা’র,

স্বপ্ন তোমার সাজীর আঁচল মুছা নিচোল নীল বরণ

ঘুম যে তোমার আলগা চুমা মরণ নিবিড় আলিঙ্গন।

ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী করা কুমুদ-কঙ্কণারের প্রসাধনের
মতই নিরর্থক। কবিতাপাঠ শেষ হলেও নীল পরীর পায়ের
নুপুরের রেশটুকু যেন কানে বাজতে থাকে।*

* সত্যেন্দ্র সাহিত্যসভা, কবির ৬৫তম জন্মবার্ষিক স্মৃতি-
বাসরে সভাপতির অভিভাষণ।

দক্ষিণ-আটলান্টিকে ভেলা-বক্ষে

শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

[১৯৪২-এর মার্চ মাসে নরওয়ের 'আউস্ট' নামে একখানা জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে অঙ্গসন্তার নিয়ে যাচ্ছিল আফ্রিকার রণাঙ্গনের দিকে। পথে দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যবর্তী দক্ষিণ-আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় একটি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে জাহাজখানি বিধ্বস্ত হয়। জার্মান রেইডার জাহাজ হতে প্রবল গোলাবর্ষণে এ জাহাজটিতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়, ফলে ভারতীয় রেডিও-অফিসার, লেখক, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন।]

সত্তরগ-বিভাগ নিপুণতা কোনদিনই আমার নেই, কিন্তু কি ভাবে ও কত দ্রুত যে দূর-সমুদ্রে সরে যাচ্ছিলাম, পরে তা নিজের ক্রাচ্ছেই খুব বিষয়কর বোধ হয়েছিল। বিপদে মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে শুনেছি; গত প্রায় সাত-আট মাস নিয়ত যত্নাচ্ছায়ার নীচে থেকেও বিপরীত ভাব লক্ষ্য করেছি। সমস্ত ইন্ডিয়গুলো প্রত্যেক সঙ্কটকালে হয়ে ওঠে সতেজ ও সতর্ক, বুদ্ধিগতি বিনা আয়াসে কলের মত যেন এদের পরিচালিত করে। চিন্তার অবসর নেই, অথচ আপাতদৃষ্টিতে চিন্তাবীন কর্ম-গুলির ধারা ও প্রকৃতি বুদ্ধিগতির সূচক বিভাগ ব্যতীত কেমন করে সম্ভব বুঝে ওঠা যায় না। 'সহজাত প্রবৃত্তি' বলে বর্তমান কালের মনস্তাত্ত্বিকদের প্রমুখতার সমাপ্তি-রেকা টেনে দেওয়াও নিরর্থক।

অনেকটা দূরে একখানা র‍্যাফট ভাসছে। পৃথিবীতে সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। নিজীব সজীবকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন চৌম্বক শক্তি ভাসমান ঐ বস্তুটিতে প্রকট হয়ে কেজীভূত হয়েছে।

র‍্যাফট-এর ওপর সাময়িক হলেও নিরাপদে বসে, এতক্ষণে আশপাশের সমুদ্রে যতদূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখছি, আসলে ব্যাপারটা কি ঘটল, সঙ্গীরা কে কোথায় আছে বা নাই। এতক্ষণে বুঝলাম সমুদ্রের যে জায়গাটিতে আর এক মূর্তিমতী নৃশংসতা সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে হুস্ হুস্ শব্দ করছে, সেখান থেকে খুব দূরে আমি নাই। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন নিপুণ সত্তরগকারী এসে র‍্যাফটে উঠল। তৃতীয় এঞ্জিনীয়ার সেই চারুশিল্পী স্নাইডিস ভদ্রলোকটি আমার পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করলেন 'তুমি বেঁচে আছ?' যেন আমার বেঁচে থাকারটা পৃথিবীর চরম বিষয়। খানিক চুপ করে আবার বলে চলল, 'ত্রিজের ওপর অত আপনেনল গোলার মধ্যে থেকেও কেমন করে'—হিস্-স্ শব্দে আর একটি গোলা এসে আমাদের প্রায় পঁচিশ হাত দূরে বিস্ফোরিত হয়ে ওর কথা-গুলোকে চাপা দিলে। আমার সম্মুখে জলের ওপর পা ঝুলিয়ে

নবান্নত যে নাবিকটি বসেছিল, রক্তচ্যুত ফলের মত সে জলের ওপর চলে পড়ে গেল। কারও মুখে একটি কথা নেই, আরও বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছি। আর একটি লোকের সার্টের সবটাই রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। চুপ করে বসে আছে, ভাবলাম কাকে বলবে, কি-ই বা বলবে আর বলে কি ফল হবে, তাই। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনেনলের চুকরোটা লেগেছে কোথায়?

লোকটি ইংরেজী বোঝে না, ঘাড় নাড়ল। বুঝলাম, সে যে কত বড় গুরুতর আঘাত পেয়েছে এখনও তা সম্যক জানতে পারি নি। 'স্নাইডিসের' দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। স্নাইডিস ও নরউইজীয়ানরা একই ভাষায় কথাবার্তা বলে।

'স্নাইডিস' ওকে বোঝে হয় সেই কথাই জিজ্ঞেস করলে। এসে লোকটি তার সার্ট পরীক্ষা করেই বিড় বিড় করে কি বলতে লাগল, অকস্মাৎ মুখখানি তার পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। পেটের ডান পাশে একটা জায়গায় সার্ট কেটে আপনেনল চুক্রে গেছে। আর একটি কাঁধের কাছে। রক্ত বেরুচ্ছে কাঁধের ক্ষত দিয়ে, কিন্তু আশ্চর্য পেটের ক্ষতটি দিয়ে রক্ত নিঃসরণ অতি সামান্যই হচ্ছে।

আমার, 'স্নাইডিসের' এবং আহত ব্যক্তির নিজের রুমালগুলো একত্র করে কাঁধের ক্ষতটি বাঁধবার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছু সাহায্য যে হ'ল না সবাই বুঝি—তবু আহতকে সাহায্য দেবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস।

হতভাগ্য সে। সমুদ্র তার লাইফ জ্যাকেটটি ভাসিয়ে রেখেছে—যত্ন তার মুখ থেকে জীবনের সকল চিহ্ন ইতিমধ্যে মুছে দিয়েছে। বীভৎস মুখের একটা পাশ একেবারেই নাই, জাহাজের বিস্ফোরণ-গোলার হাত থেকে বেঁচে এসেও এখন আর সে নাই।

মেসরুম-বয়টির মুখের অনেকটা পোড়া, সীতার কেটে এখানে আসবার সময় লোনা জলে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, এক পাশে বসে প্রাণপণে দহন-যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে, হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আপনিও আহত হন?

আহত? দেখি বুকের কাছে অনেকটা স্থান জুড়ে টাইকা রক্ত। সার্ট পরীক্ষা করতে করতে বুঝবার চেষ্টা করছি, কোথাও যন্ত্রণা অনুভব করছি কিনা। বুকের একটা জায়গায় যেন কেমন একটা ছুঁচ ফোটার মত যন্ত্রণাও অনুভব হচ্ছে। কিন্তু অছিলা সার্ট। অনেক সময় এ সব অবস্থায় সার্টের কাটা জায়গাটাও নজরে পড়তে চায় না। জামা খুলে ফেললাম। আমি বুকের সম্মুখ ভাগ পরীক্ষা করছি, 'স্নাইডিস' পিঠ দেখছে। কোথায় কি? সমুদ্রে পতিত লোকটির রক্ত

হবে, সে আমার সমুখেই বসে ছিল। সম্পূর্ণ অক্ষত আমি।

আর কোন ভীতিজনক হি-স্-স শব্দ শুনে পাচ্ছি না। জাহাজটির জীবনতরীগুলি কোথাও ছিটকে পড়েছে কিনা, আর কোন মানুষ সমুদ্রে ভাসছে কিনা ঘুরে ফিরে দেখছি।

জাহাজ থেকে এখানে এই সমুদ্র-বক্ষে ক্ষীণ কম্পন-রেখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। সত্যিই তাই। কিন্তু র্যাফটে সমুদ্রের ঠিক কোলের ওপর বসে এখন দেখছি জলরাশি যেন ওঠানামা করছে। দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ অনেকখানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কয়েক গজের বেশী চোখে পড়ে না। উঁচু কোন স্থান থেকে একেবারে নীচে নেমে এলে সর্বক্ষেত্রেই বুঝি তাই ঘটে।

‘সুইডিস’ জলের ওপর থেকে ছোটো বড় লগি দেখে ভুলে নিলে, দাঁড় তৈরী করবে। কোমরে ছুরি ছিল আহত লোকটির, খুলে নিয়ে সে ওটাকে দাঁড়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় লেগে গেল। বোধ হয় যে, এই জলরাশির উপর এদিক-ওদিক খুশি-মত দাঁড় টেনে জীবিত কেউ ভাসছে কিনা দেখতে ওর সাধ হয়েছে।

আহত লোকটি রক্তমোক্ষণে ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। চোখের উপর কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব ধীরে ধীরে যেন ফুটে উঠছে। এখানেই কোন মতে শুইয়ে দিলাম।

‘সুইডিস’ লগিটার ওপর ছুরির কাজ চালাতে চালাতেই জিজ্ঞেস করলে, ক্যাপ্টেন তোমার সঙ্গেই ছিল না, ‘ইডিয়া’?

হ্যাঁ, রেডিওতে খবর ছড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত কেন, তার পরেও জিজ্ঞেস ওপর আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। আগুন, ধোঁয়া আর সেই ভয়ানক বিস্ফোরণের পর তোমাদের প্রথম দেখলাম।

চারজনই চূপচাপ। কি ভাবে কি হয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে। এক ঘণ্টা আগেও পরিপাটি বিছানায় গ্রীষ্মের দিবানিদ্রার আরাম উপভোগ করছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে একি হুঃস্বপ্ন দেখছি? নিউইয়র্কে সবাই বলছিল বার বার উত্তর-আটলান্টিক সমুদ্রের নাংসী সাবমেরিন আক্রমণের উল্লেখ করে আমরা নাকি খুবই ভাগ্যবান। তার পর নিউইয়র্ক থেকে সুর করে প্রায় ব্রেজিল পর্যন্ত সেই একটানা বহু বিধ্বস্ত পোত দেখতে দেখতে এসে এ ধারণা বেশ যেন বন্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, আমাদের কিছু বিপত্তি হবে না। ব্রেজিল ছাড়বার দুদিন পর থেকে ত জাহাজের অবস্থান-স্থলের সংবাদ পর্যন্ত রেডিও বিভাগকে জানাতেও ওরা ভুলে যাচ্ছিল, কাপ্তেনও হেসে বলছিলেন আর এ সম্বন্ধে অতটা সাবধানী হবার কি দরকার থাকতে পারে? দক্ষিণ-আটলান্টিক নিরাপদ স্থান।

আর এখন? নিমেষের মধ্যে সমস্ত সৌভাগ্য কর্পূরের মত উবে গেছে। দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিশাল জলরাশির প্রায় মাঝামাঝি স্থানে ‘আউস্টের’ বহুকালব্যাপী বহু বারের শান্তিহীন পৃথিবী-দ্রমণ পর্ব অকস্মাৎ

শেষ হয়ে গেল। যে অকল্পনীয় ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে আমি কিছুদূরে সমুদ্র-বক্ষে নিষ্কণ্ট হয়েছিলাম সে যেন আততায়ীর আকস্মিক নিষ্ঠুর আঘাতে আউস্টের মৃত্যু-আওলাদ। অগ্নি-কাণ্ড তখনও যেখানে চলছে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মনের গভীরতম প্রদেশটি জড় নিজেঁর কাঠ-ইপ্পাত-নিশ্চিত বস্তুটির জন্ম বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠল। জীবনমৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে প্রাণচেতনাত্মক সেই জাহাজটির জন্ম বেদনা অমূল্য মুক্তি-শাস্ত্রের নিয়ম মেনেছিল কি না জানি না। আউস্টের অন্তিম দুর্গতিতে বারে বারেই মনে হতে লাগল এতদিন কত দুর্ব্যোগের মধ্যেও, কি পরম যত্নে আমাদের তার ক্রোড়দেশে আশ্রয় দিয়েছিল। উত্তর-আটলান্টিকের বিপুল ভদ্রুর সহস্র সহস্র তরঙ্গ উন্নত ভাবে আমাদের গ্রাস করতে ছুটে এসেছে, ক্রোড়ের শিশুদের রক্ষার জন্ম স্নেহময়ী মাতার মতই ডেউয়ের প্রচণ্ড আঘাত সে আপনার সর্বাঙ্গে গ্রহণ করেছে।

র্যাফটে পানীয় জল নেই। আহত লোকটি জল খেতে চাইছে। এতক্ষণ ঐ কথাটি একবারও মনে হয় নি, এখন ওর জল পানেচ্ছায় সকলেরই একসঙ্গে পিপাসার সঞ্চার হ’ল। দক্ষানন মেসরুম-বয় বয়সে বালক, আঠার বৎসরের বেশী বয়স কিছুতেই হবে না, জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ এ অবস্থায় অর্থশূন্য জেনেই চূপ করে বসেছিল। এখন আপনেনে আহত লোকটির জলের আকাঙ্ক্ষা তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিল, করণ কণ্ঠে সেও বলে উঠল, ওঃ যিওজী, একটু যদি জল দিতে।

কিন্তু জল কোথায়? পানীয় জল। কি নিষ্ঠুরা প্রকৃতি! কত গভীর জলরাশির ওপর বসে আছি, র্যাফটের গাত্রসংলগ্ন প্রথম জলকণাগুলি থেকে সুর ক’রে হাজার হাজার মাইল উত্তরে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত জলরাশি, দক্ষিণ দিকে মাটির লেশমাত্র নাই, পৃথিবীর সকল মহাসমুদ্রের বারিধারা এসে আর এক মেরুতে একাকার হয়ে গেছে, ডানদিকে পশ্চিম-আফ্রিকার তটদেশ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল কেবল জল আর জল, বামে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-আমেরিকা ও আবাদের মধ্যবর্তী স্থানের দুই হাজার, বার’শ মাইল, মানব-কল্পনার অতীত এই জলরাশির উপর বসে এক গভুর তৃষ্ণার জলের অভাব! মনে পড়ল, নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দেড়মাস আগে টর্পিডোর আঘাতে বিধ্বস্ত-পোত আমাদের সেই পূর্ব সহচরদের কথা। এমনি করে চৌদ্দ দিন তারা ক্ষুদ্র এক জীবনতরীতে অনাহারে, জলাভাবে কাটিয়েছে। বন্দর থেকে মাত্র ১০০ মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কোন জাহাজই তাদের উদ্ধার করতে আসে নি, একে একে দুজন ছাড়া সকলেই মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছিল। আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মত আমরাও নিউইয়র্কের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে খবরটি পড়েছিলাম, পূর্ব-সহকর্মীদের জন্ম সহানুভূতি হয়ত আর সকলের চেয়ে কিছু বেশীই হয়েছিল, কিন্তু যে নিদারুণ জলপিপাসায় পশ্চিম-

আটলাণ্টিকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সে যে কত কষ্টকর, মর্মান্তিক তা এতটুকুও বুঝি নাই।

উপকূলের অত কাছেও উপকূলরক্ষী জাহাজগুলি ওদের সে অবস্থার কথা জানতে পারে নি। তবে? বহু লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে অবস্থিত আমাদের কে দেখবে? ঠিক এই স্থান দিয়ে আগামী কয়েকদিন বা মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষের কোন জাহাজ যাবে কি না, কে জানে? কোন কালেই যাবে কি না তারই বা স্থিরতা কি? অথবা, যখন কারো চলার পথে এই বিন্দুটি চোখে পড়বে তখন আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনার সকল চিহ্নই সমুদ্রে আকাশে বাতাসে বিলীন হয়ে গেছে।

আহত হু'জন বারে বারে দেখছে সমুদ্র-জলের দিকে। এ ভাবে যদি কিছুক্ষণ আরো চলে, সমুদ্রে পিছনে ডাইনে বামে গভীর নীল জলের আকর্ষণ দুর্বল হয়ে উঠবে, কোন দুর্বল মুহুর্তে বিবাদ লবণত্বের কথা ভুলে যাবে। 'সুইডেন' ও আমি ওদের চোখে চোখে রাখছি; সাবধান করে চলেছি, এ জল মুখে দিয়ে অকস্মাৎ তৃষ্ণাকে যেন জটিলতর না করে তোলে।

'আমরা এখন কোথায় জান?' 'সুইডিস' প্রশ্ন করলে। লগি ছটোকে অনেকটা দাঁড়ের মত করে ফেলেছে ও। একটা আমার হাতে ঠেলে দিয়ে অগাধ দিয়ে জলের ওপর বৃত্ত সৃষ্টি করলে।

আমাদের ওপর বিমানের ও অজাত রণতরীর আক্রমণ-কালে জাহাজ অবস্থান করছিল ১৯° ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা-রেখা ও ১৭° দক্ষিণ অক্ষাংশের সংযোগস্থলে। শান্ত সমুদ্রবক্ষে এত অল্প সময়ে মধ্যে সেখান থেকে বেশীদূর যাই নি নিশ্চয়, কাছাকাছিই আছি, সে কথাই বললাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি মানুষ জন্মেছিল, দেশ দেশান্তরের মানুষ কেউ কাউকে জানত না, জানবার সম্ভাবনাও ছিল না, রীতি, নীতি, ভাষা, সব পৃথক। সবাই ছিল ছোট ছোট এক একটি বৃত্ত-মধ্যে; নিত্যকার জীবন স্রুনির্দিষ্ট ধারায় অতিবাহিত করছিল। সবার অলক্ষ্যে মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় আর একটি নতুন অধ্যায় মানুষ ও জাতিসমষ্টির পরস্পরবিরোধী বাসনাগুলির সংঘাতের ফলে সংযোজিত হয়ে পড়ল—পরিণামে এল প্রচণ্ড যুদ্ধ। অনন্ত মহাসমুদ্রে ভেলা-বক্ষে জীবনমুতুর সন্ধিক্ষণে বসে এমনি ধরণের নানা দার্শনিক চিন্তা মনে উদ্ভিত হচ্ছিল।

কি মনে হয় তোমার গুপ্ত? আর কেউই নেই?—'সুইডেন' আবার প্রশ্ন করল। সঠিক উত্তর কেমন করে দেব? বারে বারে মনে হচ্ছে, প্রলয়ের মত ভীষণ শেষ বিস্ফোরণ পর্যন্ত কাপ্তেন ও একজন মেট আর আমি ত্রিভুজের ওপর একসঙ্গেই ছিলাম, অথচ সমুদ্রে নিষ্কণ্ট হবার পর কাউকেই দেখছি না। যুক্তি বলছে ওরাও আমারই মত কোথাও উৎকণ্ঠ হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন দিকে? ঐ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যস্থলেই নয় তো?

হেসে বললাম, দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই বন্ধু, জলভাগের যেখানটায় আছি কিছুকাল পরে কেউ কারুর জ্ঞত চিন্তা করবার থাকবে না।

'সুইডিস'র আশা অপরিসীম। বললে, মানচিত্রটা তোমার মনে নেই? কোন ছোট দ্বীপ যদি কাছাকাছি থাকে। চার্টরুমে তোমার তো সব সময়ই গতিবিধি ছিল।

তা ছিল, দক্ষিণ-আটলাণ্টিকের সমস্ত চিত্রটা পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ভূভাগসমেত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে ছবি মনে আশার সঞ্চার করল না। বললাম, তাই বুঝি তুমি দাঁড় তৈরী করলে? এ অবস্থায় অথবা হাত পা ছুঁড়ে লাভ কি?

সুইডিস বললে, ক্ষতিটাই বা কি? কাছাকাছি ধর দশ-পনের মাইলের মধ্যে যদি কোন ছোট দ্বীপ থাকে আমরা হু'জনে চেষ্টা করলে পৌঁছেও যেতে পারি ত? আমি জবাব দিলাম, না। সে আবার বললে, সেখানে পৌঁছব যে নিশ্চয়, তা বলছি না, কিন্তু ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, পারিও ত পৌঁছতে। এ ভাবে চূপ করে বসে থাকার চেয়ে—

বললাম, তা হয় না। দশ-পনের মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপ ত নেই—ই হু'শ মাইলের মধ্যেও আছে বলে মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ছে সেন্ট হেলেনা এখান থেকে নিকটতম স্থলভাগ—হু'শ মাইলেরও ওপর। অদৃষ্ট মানো তুমি সুইডেন?

বললে 'মানি'

হেসে তাকে বললাম, ব্যস্ তবে তুমি চূপ করে বসে থাক—এ অবস্থায় অকূলের উদ্দেশ্যে দাঁড় চালানো মানে তৃষ্ণার ধার বাড়িয়ে দেওয়া। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে, দেখবে ঠিক বেঁচে যাব। আর যদি সময় হয়েই থাকে পরিশ্রম করে মরতে আমি রাজী নই।

'সুইডিস' ও মেসরুম বয় হু'জনেই হেসে উঠল।

সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ভবিতব্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? 'সুইডেন' ওর বেন্টটা ধুলে ফেললে। নীচে বিচিত্র উপায়ে রক্ষিত একটি ওয়াটার-প্রফ সিগারেট কেস বার করে নিজে একটি মুখে দিল, সকলকে একটি একটি করে দিলে। কেসটার ভেতর কয়েকটি দেশলাইয়ের কাঠি ও বারুদমাখা একটু কাগজও আছে।

'খুব হুঁসিয়ার তো তুমি' বললাম।

'হু' সে বললে 'প্রায় বছরখানেক ধরে এ ভাবে চলছি সমুদ্রে। বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে বেরুলেই সিগারেট আর কাঠি-গুলো ভরে নিই এতে।'

সিগারেটের ধোঁয়াটা বেশ ভালই লাগছে।...কি করছে ওরা এখন বাড়ীতে? মনে মনে হিসেব করছি কলকাতায় এখন সময় কত হতে পারে। এখান থেকে প্রায় সাত ঘণ্টার বেশী ব্যবধান। রাত বোধ হয় নটা-দশটা হবে। এখন গ্রীষ্মকাল, হিসেবমত চৈত্রমাস, গ্রীষ্মকালে না পড়লেও কার্যত, তাই। সন্ধ্যাই হয় প্রায় আটটার সময়। ওরা কি আহার করছে

সবাই, না তারই যোগাড়ে আছে। অথবা ঠিক আর কি হতে পারে কল্পনাতে আনতে পারছি না। বেতারে যখন আমাদের ওপর আক্রমণের সংবাদ দেবার চেষ্টা করছিলেন, আক্রমণকারীরা বেতার-তরঙ্গে বাধার সৃষ্টি করছিল। মিজ-পক্ষীয় কোন জাহাজ বা উপকূলবর্তী বেতার স্টেশনগুলি এ সংবাদ সম্ভবতঃ একেবারেই পায় নি। কেপটাউনে পৌছবার দিন ‘আউস্ট’ সেখানে পৌছবে না। যুদ্ধের সময় এক মহাদেশ হতে অল্প মহাদেশে টাইমটেবল্ অনুযায়ী জাহাজ চলাচল হওয়া সম্ভব নয়, হয়ও না। পরের দিনও আমাদের জাহাজ দেখে সকলে সন্দেহ করবে, হয় ত দক্ষিণ-আটলান্টিকে আর একটি জাহাজের সলিল-সমাধি হ’ল। প্রতি দিন আশঙ্কা বেড়ে যাবে, সপ্তাহখানেক পরে তা বদ্ধমূল হবে—কোন খবর নেই অল্প কোন বন্দর থেকে বা জাহাজ থেকে। কেবল-এ বা বেতারে কেপটাউন, পারনামবুকো, নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের মধ্যে অনেকগুলি সংবাদ আদান-প্রদান হবে। আরও এক মাস অপেক্ষা করবে কর্তৃপক্ষ যদি কোথাও থেকে কোন নাবিকের সংবাদ পায়। তারপর যাবে সহানুভূতিজ্ঞাপক বার্তা সকল নাবিকের গৃহে—বহুদিন হয়ে গেছে জাহাজ আসছে না বন্দরে, সুতরাং ধরে নিতে হবে এটি শত্রু-আক্রমণে সমুদ্রপথে ধ্বংস হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর প্রিয়জনদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ যদি কেউ থাকে, সে তাই নিয়ে মনে মনে জল্পনা শুরু করবে। শেষ সংবাদ সে নিউইয়র্ক থেকে পেয়েছিল, তাই নিউইয়র্ক ও কেপটাউনের মধ্যবর্তী অঞ্চল জলরাশির ঠিক কোনখানে, কবে ও কখন প্রিয়জনের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল শুধু সে খবরটির জন্ত তার মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকবে। কত বার চোখ বুলিয়ে যাবে মানচিত্রের গায়ে এই রুহং অংশটির উপর, হয়ত একটা ক্ষীণ আশাও মনে জাগবে বুঝি কোন দীপে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ তো বুঝতেও পারছে না যে, বিপদ আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, মৃত্যু যেন শিকার একান্ত করায়ত্ত আছে কেনেই পরম নিশ্চিত হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে। আরও কিছুকাল পরে কল্পনার ধার আমাদের ধীরে ধীরে ভেঁতা হয়ে আসবে। সৃষ্টি-স্থিতি ও ধ্বংসের মূল কথা, আত্মপরিচিতির নব নব অয়োজন, স্বার্থের সংঘাত পরিজন-বিরোগ-ব্যথা হবে দূরের অস্পষ্ট স্মৃতি—তারপর বিস্মৃতি ও সত্যিকার মৃত্যু।

ঐ যে, ঐ যে বোধগোচর জাহাজ—কানাডিয়ান সেই ‘বয়’টি আঙুল দিয়ে একটা দিকে আমাদের হৃৎকেন্দ্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অনেক দূরে ক্ষুদ্র ধ্বংসবর্ণ একটি জাহাজের মত দেখা যাচ্ছে। চেয়ে আছি সেই দিকে। এতগুলি মানুষের সকল আশা, ভবিষ্যতের সমাপ্তি-রেখা টেনেছে ও-ই নাকি? কাদের জাহাজ, জার্মানীর না জাপানের সেকথা নিয়ে কিছুক্ষণ চলল আলোচনা।

‘সুইডিস’ বলছে জাপানী হওয়াই সম্ভব। ওদের রণতরী-বহর জার্মানীর চেয়ে বড় ও শক্তিশালী। আমার দৃঢ় ধারণা জার্মানীর। দক্ষিণ-আটলান্টিকে পূর্বেই নাংসী ‘রেডার’ের উপদ্রব শুরু হয়েছে। ‘সুইডিস’ও সে কথা জানে, তথাপি সে জাহাজটিকে জাপানী নৌ-বহরেরই মনে করছে। পাশ্চাত্যের ভীতি সশস্ত্র প্রাচ্যের ওপরই সমধিক। বোধ হয় চেন্সিঙ্ক খান ও সালাদিনের স্মৃতি।

জাহাজটি ক্রমেই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন এই দিকেই আসছে। উন্মুখ হয়ে বসে আছি, কি চায় ওরা, কি করবে? আরও কাছে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড স্বস্তিক পতাকা উভয়দিক, দুই-কেননিভ বস্ত্রের শুভ্রতার উপর ঘন কৃষ্ণবর্ণ বাঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন। অন্তরে কেমন একটা অনুভূতি জাগল। এই জার্মানীর স্বস্তিকা! যে চিহ্নের কথা ভারতে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে শত শত বার শুনেছি, নানা প্রবন্ধে পড়েছি, ভারতের অতীত গৌরবের সেই স্বস্তিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে জার্মানীর জাতীয় পতাকা হয়েছে। নিজ চোখে দেখছি সেই নাংসী পতাকা নাংসী জুজারে।

যদি ওরা আমাদের বন্দী করে? তড়িতের মত কথাটা খেলে গেল বোধ করি সকলেরই মনে। কি স্বস্তি! অবস্থা বিপাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত মানুষও সাধ করে শৃঙ্খল পরতে চায়! কানাডিয়ানটি বললে, কিন্তু বাঁচিয়েছেন, এটা জাপানী বোম্বার্ডে নয়।

যেন আমাদের বিজ্ঞপ করেছে অকস্মাৎ জাহাজটি মোড় ঘুরে একটু বাদেই আবার আমাদের চোখের অন্তরালে গেল। তবে বোধ হয় তুলবে না আমাদের। বুঝলাম মনের অন্তরতম গভীরতায় বর্তমান অনিশ্চয়তার চেয়ে কিছুকালের মত শৃঙ্খলা-বদ্ধ নিশ্চয়তাও কত বরগীয হয়ে উঠেছে।

জীবনের প্রতি ভালোবাসা যে কত সুগভীর, মৃত্যু-গহ্বরের দারদেশে এসেও আলো জ্বল ও আকাশ থেকে প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে নিজস্ব সত্তা বজায় রাখবার কি যে বিপুল প্রয়াস, এ অবস্থায় ভিন্ন তা বোঝার চেষ্টা নিরর্থক।

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ‘সুইডেন’ বললে, বোধ হয় ভালোই হ’ল, বুঝলে শুভ! নাংসীরা অসহায় নাবিকদের জীবন-তরীতে ভাসতে দেখে বহু জায়গায় মেশিনগান চালিয়ে মেরেছে। ওরা নিশ্চয় আমাদের দেখে নাই।

কোথায় শুনে এ কথা?—জিজ্ঞেস করলাম।

‘কেন? ইংলণ্ডের কাগজে পড় নি, আমরা সেখানে থাকতেই এ সব খবর কত বেরিয়েছে?’ এ ধরনের কথা অনেক শুনেছি ইংলণ্ডে থাকতে, পড়েছিও অনেক অভিজাত পত্রিকায়। আবার বহু নাবিক যে জার্মানীতে বন্দী হয়ে আছে এ সংবাদও আমার অজানা ছিল না। চূপ করে রইলাম। এক এক বার মনে হচ্ছে জলের ঠিক ওপরে, এত নীচু থেকে আমরা রেডারকে দেখতে পেলাম, জাহাজের ওপর

ওদের ব্রিজ থেকে কি ওরা দেখছে না আমাদের? এত শান্ত সমুদ্রে তো জানি সু-উচ্চ স্থান থেকে কত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

দূরে কর্কশ বাষ্পীয় ছইসল শুনছি। কি এ? কি হচ্ছে, কোথায় আবার বাজল শিটি। যাই হোক, সমুদ্রের এ অংশে আমরা সত্যিই একা নই। আততায়ী জাহাজটি কি করছে জানতে সবাই কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠছে। ‘সুইডেন’কে বললাম, আর একটি সিগারেট ধরাও। নাৎসীর! এখনও এখানেই আছে দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুকে অন্ততঃ তখনকার মত যে আবার ফাঁকি দিতে পারব, এ বিশ্বাস আমার প্রায় দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললাম, ‘সুইডেন’! আজকার ডিনারটি মনে আছে তো? যেন লাষ্ট সাপার! ধর, যদি এসে মেশিন-গান চালায়ই, এ হচ্ছে লাষ্ট শোক।

‘সুইডিস’ একটু মুচকি হাসলে। জুজারটি আমাদের দিকে আসছে দেখা যাচ্ছে। যেন একটা দড়ির সিঁড়িও বুলছে। ওটার গায়।

জাগর-স্বপ্নবিলাসী

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এসসি

কোন বস্তু বা বিষয়ের অভাববোধের মূলে, কোন-না-কোন ইচ্ছা বর্তমান। আর এই ইচ্ছা থেকে সেই বস্তু বা বিষয়টি পাবার চিন্তা উৎপন্ন হয়। শিশুর বেলাতেও এই নিয়ম খাটে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অভাববোধও বাড়ে। শিশুর সকল অভাব মেটাবার সামর্থ্য পিতামাতার থাকে না। তার বায়না ও কান্না সামলান পিতামাতা বা অভিভাবকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যখন কোন নতুন জিনিস শিশুর নজরে পড়ে। “কাল পাবে, আর এক দিন কিনে দেব, বড় হলে পাবে, বড় হয়ে নিজের রোজগার ক’রে কিনবে” এই ধরনের মিথ্যা কথা শুনতে শুনতে শিশুর ক্রমাগত মনোভঙ্গ হতে থাকে এবং অভিভাবকদের প্রকৃতি, শক্তি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে তার নিজের নানা রকম ধারণা জন্মাতে থাকে।

অভাব ও চাওয়া খুব ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। খাবার, পরবার, খেলবার বা অথ কোন জিনিস পাবার ইচ্ছা ছাড়া বস্তুবিধির সঙ্গে শিশুর অল্প অনেক প্রকার ইচ্ছা প্রতিহত হয়। তার মনে নানা ইচ্ছা জাগে, যেমন পরকে গালি দেওয়া, অস্ত্রের জিনিস কেড়ে নেওয়া, মারা, যখন খুশী বেড়ান, দৌড়ান, লাফান, নেড়া ছাতে বা মইয়ে উঠা, ঘোড়ার গাড়ীতে নৌকায় রেল জাহাজে এরোপ্লেনে চড়া, ইচ্ছামত খেলা বা আড্ডা দেওয়া, পরের তোয়াক্কা না রাখা, যা বলা যায় ঠিক তার উল্টাটি করা, প্রভৃতি। ইচ্ছামত সব কাজ করা যায় না, অল্প অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়,—এই দুই প্রকার অভিজ্ঞতা থেকে শিশু ব্যবহারিক জগতের স্বরূপ বুঝতে পারে। তার নিজের শক্তির পরিমাণ অস্ত্রের তুলনায় কত কম, ক্রমে শিশুর এই জ্ঞান জন্মে।

এই হীনতাবোধ বালক-বালিকার পক্ষে দুঃখের কারণ। এ থেকে স্থলভেদে দুই প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়। এক নিজেকে বড় ক’রে তোলবার ইচ্ছা বা উৎসাহ; অপরটি দুঃখে ভ্রিয়মাণ হয়ে পিছিয়ে পড়া, “কারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা

করতে যাব না, আমি কোন কাজের নই, বড় হতে পারব না”—এইরূপ হেয়, হেরো বা পরাজয়ের মনোবৃত্তি।

বালক-বালিকার একটি বিশেষ স্বভাব এই যে, মনের বাসনাকে কল্পনায় রঞ্জিত ক’রে নানা মনোরম অবস্থা-পরম্পরা রচনা করা ও তা থেকে আনন্দ লাভ করা। এই সব স্বপ্ন অলীক হলেও তৃপ্তি এবং সুখপ্রদ। এই প্রকারের আনন্দ-ভোগ বস্তুনিরপেক্ষ। এরূপ আনন্দ লাভের চেষ্টা দেখা যায় ছই অবস্থায়—প্রথমতঃ ঘুমের ভিতর স্বপ্নে, এবং দ্বিতীয়তঃ জেগে জেগে ভাবের ঘোরে তন্ময় হয়ে। এই শেষোক্ত অবস্থাকে জাগর-স্বপ্ন বলে। সংস্কৃত ভাষায় জাগর-স্বপ্নের অরূপ অনেক-গুলি ভাব-প্রকাশক শব্দ আছে, যেমন—“আশা-মোদক-চর্বাণ” অর্থাৎ আশার লাভ, খাওয়া, “অভিভি-চিত্রকর্ম” অর্থাৎ ভিত-শুভ দেওয়ালে ছবি আঁকা, বা “ব্যোমি—চিত্রকল্পনা” অর্থাৎ আকাশে চিত্রকল্পনা ইত্যাদি।

ঘুমের ভিতর শিশুর অতৃপ্ত ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হয়। বয়স্ক লোকের স্বপ্নের মধ্যেও এইরূপ পরিতৃপ্তির উদাহরণ কখনও স্পষ্টভাবে থাকে, কখনও বা গৌণভাবে দেখা যায়। দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারীদের ভ্রমণস্বভাঙে দেখা যায়, যখন তারা অনশনক্লিষ্ট হয়ে প্রাণসংশয় অবস্থায় পড়েছিল, তখন তাদের সকলেই উত্তম চর্য্যচোয়ের স্বপ্ন দেখত। বয়স্ক লোকের স্বপ্নে, কামনার পরিতৃপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা ঘুরিয়ে হয় ব’লে স্বপ্ন দুর্বোধ্য ও কিছুতুচ্ছিকমাকার হয়ে পড়ে। মনঃ-সমীক্ষণের দ্বারা তার মানে পরিষ্কার হয়।

জাগর-স্বপ্নের উদাহরণ পূর্ণবয়স্কদের দিয়েই আরম্ভ করছি। ভারতীয় নীতিকথায় একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। গল্পটি গ্রীক ও আরবদের দ্বারা অনূদিত হয়ে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়। আরব্য উপখ্যাসেও এই গল্প আছে। গল্পের নায়ক হচ্ছেন ম্যাল্হাস্কার। নাম পরিবর্তিত হলেও বিষয়টি মূলতঃ ঠিকই আছে। সংস্কৃত আখ্যানটি বলছি।

একদা দেবীকোট নগরে বেদশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁকে কেউ বিয়ুব-সংক্রান্তির দিন এক সরা ছাত্তু দান করেছিলেন। তিনি ঐ সরা নিয়ে এক কুমোরের হাঁড়িঝুঁড়ি ভরা খোড়ো ঘরের এক পাশে এক জায়গায় শুয়ে আধঘুমন্ত অবস্থায় ভাবতে লাগলেন—“যদি এই সরাটি বিক্রি ক’রে দশটি কড়ি পাই, তা হলে সেই কড়ি দিয়ে মাদুর ও সরা কিনে বেচব। এই রকম অনেক বার কেনা-বেচা করতে করতে লাভ হয়ে যাবে, তখন একটা,—একটা কেন চারটে বিয়ে করব। তার মধ্যে যেটি দেখতে খুব সুন্দরী ও যুবতী হবে, তাকেই বেশী ভালবাসব। আমার এই রকম এক-চোখমি দেখতে দেখতে সতীনেরা যখন হিংসায় জ্বলে বগড়াঝাট করবে, তখন আমি খুব রেগে লাঠির বাড়ি তাদের এই রকম ক’রে মারব।” এই ভাবনাতে বিভোর হয়ে ব্রাহ্মণ কাছে যে লাঠিগাছটি ছিল সেটি ছুঁড়লেন। সেই লাঠির খায় নিজের ছাত্তুর সরা, আর তার সঙ্গে কুমোরের অনেক হাঁড়ি-কলসী ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙার শব্দে কুমোর এসে ব্যাপার দেখলে ও তিরস্কার ক’রে ব্রাহ্মণকে তার ঘর থেকে বের ক’রে দিলে।

নীতিজ্ঞ পণ্ডিত, এই আখ্যানের পূর বলছেন যে, যিনি অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গা ঢেলে দিয়ে আনন্দ লাভ করেন, তাঁকে কষ্টে পড়তে ও নিন্দাভাজন হতে হয়। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এটি খুব টাটকা, গল্প নয়, —নিছক সত্য। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমার একটি রোগী হঠাৎ এক দিন আমার কাছে এসে বললেন, “সম্প্রতি ৫০০ টাকা ও তাঁর ওপরের নোট আর চলবে না, এই আদেশ বেরিয়েছে; এই রকম নোট কেনা-বেচার ব্যবসা চলছে। আমি ব্যাঙ্কের কর্মচারী, আমার হাতে ফ্রেতা ও বিক্রেতা দুয়েরই সন্ধান আছে। কিন্তু নিজের টাকা নেই। কিছু মবলক টাকা রোজগারের মতলব ভাঁজলুম। আমার পরিচিতা কোন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ধনবতী অভিনেত্রীর নিকট গিয়ে লাখখানেক টাকা এনে তা দিয়ে নোট কেনার ব্যবসা করব; লাভ থেকে অভিনেত্রীকে তাঁর টাকা ফিরিয়ে দেব।” রোগী বলতে লাগলেন, “আমি যাবামাত্র যেন টাকা পাবার সুযোগ হ’ল; কিন্তু টাকা কর্মস্থলে আনতে হবে, কিসে ক’রে আনব? ট্রামে বা বাসে অত টাকা নিয়ে চড়া নিরাপদ নয়, সুতরাং ট্যাক্সি ক’রে আসাই ঠিক করলুম; ট্যাক্সি চড়ে মনে হ’ল, যদি ড্রাইভার টের পায় তবে আমি তার সঙ্গে জোরে পারব না, সে পঙ্কাবী, আমাকে মেরে ফেলবে গলা টিপে।” তদন্য ভাবের চিন্তা এখানে এসে ছেদ হয়ে গেল; দম আটকে গিয়ে যত্নের বিভীষিকায় গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে পড়ল, হাঁপ ধরতে লাগল। এই রোগীর বেলায় জাগর-স্বপ্ন সুখে আরম্ভ হয়ে ভয় ও কষ্টে পরিণত হ’ল।

জাগর-স্বপ্ন কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনা মনের একটি সহজ যুক্তি। কল্পনা ছাড়া মানুষ নাই—কল্পনা অনেক উপকারে আসে। যে চিন্তা, উদ্ভাবন ও আবিস্কারে লাগে, তার মূলে থাকে কল্পনা; তবে কল্পনার মাত্রা কমবেশী হয় ব্যক্তি-বিশেষে। ছোটবেলায় শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য তত বুঝতে পারে না। নিজ হীনতা বা অভাবের কষ্ট থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চায়। এইজন্ম সকলেই ছোটবেলায় সুখ বা আনন্দের কাল্পনিক ঘটনা রচনা করে, বাস্তব অবস্থাকে এড়াবার চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টা থেকেই জাগর-স্বপ্নের সূচনা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে ছেলের বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং জাগর-স্বপ্ন কমে যায়। আবার যারা বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে না, তাদের মন অন্তর্মুখী বা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, লোকের সঙ্গে তারা মিশতে চায় না, নিজের ভাবনা নিয়েই মশগুল থাকে। এদের জাগর-স্বপ্ন বেড়েই যায়। ঘুমের আগে অথবা একলা থাকলে অথবা যে কাজে প্রতি পদে মন দিতে হয় না, সেসকল কাজ করবার সময় জাগর-স্বপ্ন দেখা দেয়। পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের এবং পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালক-বালিকাদের মধ্যেই জাগর-স্বপ্ন বেশী দেখা যায়।

বয়োরুদ্ধির সঙ্গে জাগর-স্বপ্নের জটিলতা বৃদ্ধি পায় শৈশবের জাগর-স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে শিশুর প্রতি-হত কামনা, হিংসারূপিত, শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা এবং কৌতূহল চরিতার্থ হয়। এ ছাড়া শিশুর মনে, যে-সব ভয় উৎকর্ষা স্বপ্না রাগবেবাদির ব্যাপার গভীর রেখাপাত করেছে, সেগুলো জাগর-স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। শৈশবের পর ও যৌবনোদ্ভেদের মধ্যবর্তী কালে যখন ‘নির্জ্ঞান’ের রুদ্ধ ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তখন জাগর-স্বপ্নের প্রকৃতি কিছু পরিবর্তিত হয়। এই সময় উচ্চাভিলাষের সঙ্গে নানা প্রকার বিরূত কামেচ্ছা—যেমন, অগম্যগমন সমকামিতা প্রভৃতি এবং সমাজ-নিষিদ্ধ বিবিধ যৌন-ইচ্ছা জাগর-স্বপ্নে অল্পবিস্তর ছদ্ম বেশে দেখা দেয়। যৌবনোদ্ভেদের পরে, পূর্বোক্ত কল্পনার সঙ্গে ধর্ষণ ও মর্ষণ কামজড়িত হয়। কেহ কল্পনা করে—‘আমি অতি ভয়াবহ ও রোমহর্ষণ ব্যাপারের মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ ক’রে অভিলষিত এক সুন্দরীকে উদ্ধার ক’রে বিবাহ কর-লাম।’ আবার কেহ বা এমন মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগের কল্পনা করে যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নিজেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে সে সুখ ও আনন্দ অনুভব করে।

ছোটদের পক্ষে রূপকথার বই খুব চিত্তাকর্ষক; কারণ এই সব বইয়ের গল্পের সঙ্গে নিজেদের কামনা মিলিয়ে গল্পের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে বালক-বালিকারা একাত্মবোধ করে ও আনন্দ পায়। রোমাঞ্চকর ভাষাতের গল্প ও ভূতের গল্প অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের মনের অশুভ বাসনাকে উদ্ভূত করে। আবার অনেক যুবক-যুবতী নানা রকমের ডিটেক-

টিভ উপগ্রাস আগ্রহের সঙ্গে পড়ে যে আনন্দ পায়, তার মূলেও সেই একই তদাত্ম্যবোধ ও কাল্পনিক পরিতৃপ্তি বর্ধমান। অনেক উপগ্রাস-লেখকের রচনা তাঁদের নিজ নিজ জাগর-স্বপ্ন-প্রসূত; এজ্ঞ তাঁদের বিভিন্ন গল্প একই ছাঁচে ঢালা দেখা যায়।

জাগর-স্বপ্নের যে একটা মন্দ ফল আছে তা আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছি। কাজের মধ্যে বা পড়াশুনার সময় যে বালক-বালিকারা অগ্রমনস্ক হয়, সেটা অনেক স্থলে জাগর-স্বপ্নের জন্য। জাগর-স্বপ্নের মাত্রা বেড়ে গেলে বালক-বালিকারা

অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আবার অন্তর্ভুক্ততার মাত্রাবৃদ্ধির ফলে বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থার উদাহরণ আমরা বহু মানসিক বিকারে দেখতে পাই। 'একপক্ষে কল্পনা ও বাস্তব একাকার হয়ে যায়। অতএব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, জাগর-স্বপ্নের আশামোদক অধিকমাত্রায় সেবনীয় নহে।*

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা-কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

কঙ্কণার রাত

শ্রীসাদনচন্দ্র বসু

কঙ্কণার ঘাটে সন্ধ্যা নেমেছে। নীল আকাশে রক্ত আলোর দাগ মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে কালো অন্ধকার। সবুজ মাঠের শ্রামলত্ৰী স্বপ্ন আলোতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করছে। বাবুরা সেখানে থাকে না। বিরান্টি বাড়ীখানা এক সময়কার ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের অজস্র পরিচয় নিয়ে আছে। একা বুড়ী পিসি সারা বাড়ীখানা আগলে থাকে। জনহীনতার দুঃসহ ব্যথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাড়ীখানা। সন্ধ্যার কালো অন্ধকারে পিসি তুলসী-তলার মাটির প্রদীপ একটা জ্বালিয়ে দেয় রোজ। লোকে বলে কঙ্কণার বাবুদের কল্যাণদীপ। কোন দিনই তার ব্যাঘাত হয় না। এক সময়ে ঐ প্রদীপ ছিল সোণার। তার আলোতে তুলসীতলার চারি পাশ উজ্জ্বল পড়ত। আজ আর তার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নায়ের আর গোমস্তাদের হাতে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ শুধু সেখানে মাটির প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলে। বাড়ীর কাঠামো ছাড়া আর সব চিহ্ন লোপ পেয়ে গেছে। বাড়ীর গায়ে জন্মেছে অশ্রু, আর আশ-পাশ ঝোপঝাপে ভর্তি হয়ে গেছে। বনতুলসীতে সারা ভিতরটা ছেয়ে ফেলেছে। বড় করবী গাছটা আর অশোকের ঘন পাতার গুচ্ছে আজও ফুল ধরে। চাপার যুগু গন্ধ কাঁকা বাতাসে ঘুরে মরে। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা নেই। তাই সে সব ফুল আজ আর কেউ তোলে না। মনে তাদের ঝোঁপায় সুরভিত স্বর্ণ চাপার মাধুরী। পূজার দালানখানাও এক বিরান্টি অংশ জুড়ে রয়েছে। সেখানে নিত্য পূজারতির দিন চলে গেছে। সন্ধ্যারতিটা গিয়ে ঠেকেছে সপ্তাহে এক দিন। পূজারী কালের পরিবর্তনে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামর্থ্যও এসেছে কমে। কোন রকমে একটা দিন কতব্য সেরে যায়। দু-একটা ঘরে হয়ত চামচিকেরা বাসা বেঁধেছে। এক দল পায়রা সারাদিন বসে বসে ডাকে। এক সময়ে এগুলো ছিল কঙ্কণার বাবুদের পোষা। দালানের সামনে বাছড়েরা সারাদিন বুলতে থাকে। কালো রাতে তাদের চোখ জ্বটে

জ্বলে ওঠে। বাড়ীর মধ্যেই বকুল গাছটা ছায়ার আসর জমিয়েছে। লুপ্ত জনবাসের দুঃসাহসে দিন-রুপুরেও শোয়ালেরা বাড়ীর মধ্যে ঘুরে ঘায়। বাড়ীর আসবাব, বাসন, নানা দামী জিনিসপত্র একে একে নিজেদের জায়গা শূন্য রেখে নিঃশব্দে আয়লাভীদের স্বার্থপরতা পূর্ণ করেছে। তবু কঙ্কণার ঘাটে সন্ধ্যা নায়ে। নীরব নিথর বৈকালি বাতাস ধর ধর করে কঁপে ওঠে। ঝাপসা অন্ধকারে গাছের ঘন পাতাগুলো সেই কাঁপনে নড়তে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে শত্রু-ঘণ্টাধ্বনি মুখর হয়ে উঠবে। বাড়ীর ভিতর থেকে আলো এসে উজ্জ্বল উজ্জ্বল এসে পড়বে বাইরে। সাঁঝের আসর গমগমে হয়ে উঠবে। আশপাশের বন লতা-পাতা চমকে চমকে উঠবে। কিন্তু কই? নিশ্চিন্তি রাত নামছে, একে একে তারাগুলো ঝিকঝিকিয়ে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। নিরেট আকাশে কালো মাটির রঙের সঙ্গে মিশে আছে। থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে শুধু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ী—নিঃশব্দ, নিম্পন্দ। দেখলে মনে হয় সে যেন মরে গেছে কতকাল। অন্ধকারের কালো দাগ তার গায়ে ফুটে উঠছে। সদর দরজা দিয়ে শুধু দেখা যায় জোনাকির মত একটা প্রদীপ জ্বলছে। বনতুলসীর গায়ে গায়ে জোনাকিরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সজীব প্রাণীর চিহ্ন শুধু ঐ আলোগুলো। ঝিকঝিক জ্বলছে। কঙ্কণার ঘাটে একখানায় নৌকো এসে থামল। একটা লঠন সেটার ওপর জ্বলছে। শোনা গেল—'এবার নামুন, বড় অন্ধকার হয়ে গেল। জন-তিনেক লোক নামল তাদের অস্পষ্ট ছায়া থেকে বোকা গেল। ঘাটের ওপর থেকে পথের দাগ আঁধারে মিশমিশ করছে। লোকের দেহ স্পষ্ট দেখা না গেলেও সচল লঠনের আলোয় তাদের চলাচল বেশ বোকা গেল। পথ ধরে তারা এগিয়ে এল। এ নিরেট অন্ধকারে অসিতের মনটা ধমধমে হয়ে উঠল। মাহুষের রাজ্য ছেড়ে সে কি হাজির হয়েছে অন্ধকারের রাজ্যে। সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দারোগাবাবু,

এখানে কি লোকজনের বাস নেই। 'আছে', উত্তর এল, 'এই ক'জন চাষাছুষো লোকই আছে। ভদ্রলোক বলতে মাত্র বাঁধা ক'ষর।' কোন বাড়ীর চিহ্ন দেখা যায় না। জোনাকিদের আলো ছাড়া অন্ধ আলো আর লক্ষ্যে পড়ে না। 'আর হাঁটতে হবে কত দূর?' অসিত প্রশ্ন করে। 'আর বেশী না', উত্তর আসে, 'বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়ে একটু এগুলেই হরি ডাক্তারের বাড়ি। হরি ডাক্তারই আপনাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে। সেও এক সময়ে নাকি কংগ্রেসে ছিল।' অসিত ভাবতে থাকে, 'সে বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রী। সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে নীরব বিশ্বাসে। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে তারা চলে যায়। আর সুশ্রী দেহ শুভ্র তরুণ কান্তির পিছনে তারা যেন বিশ্বাসের কিছু খুঁজে পেতে চায়। যখন তারা পায় না তখন নীরবে ফিরে চলে যায়। অথচ তাদেরই মত সাধারণ মানুষই সে। গ্রামেও হয়ত তার আসার আগে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল হরিবাবুই তাকে আশ্রয় দেবার সাহস পেল কোথায়? রাজবন্দী সে। চলতে চলতে কখন যে কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে এল তা টেরও পেল না। সে তখন চিন্তায় মগ্ন। ঋতু-ছাওয়া ঘরখানার সামনে এসে পড়তেই দারোগাবাবু বললেন, 'এই যে এসে গেছি।' অসিত ধমকে দাঁড়াল। পথের পাশেই একটা মস্ত নারকোল গাছ অন্ধকারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগাবাবু হাঁক দিলেন, 'ডাক্তারবাবু আছেন নাকি বাড়ী?' বাড়ীতে তিনি সন্ধ্যার সময় থাকেন না। এসময়ে বাজারে তাঁর ডাক্তারখানায় দাবার আসার জমে। কোন উত্তর ফিরে এল না। দারোগাবাবু আবার হাঁক দিলেন। পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে গেল। মুহূরবে শোনা গেল, 'ডাক্তারবাবু এখনও আসেন নি। অপুনারা ভিতরে এসে বসুন।' দারোগা ইতস্ততঃ করছিলেন। অসিত হির ভাবে দাঁড়িয়েই ছিল। মুহূ কণ্ঠে আবার ডাক এল, 'ভিতরে আসুন। তিনি এখনি আসবেন।' অসিত দারোগাবাবুর পিছন পিছন এগুলো। ঘরের চালাখানা খুলে এসে পড়েছে। সেখানা মাথায় এসে ঠেকে। অসিত মাথাটা নিচু করে নিল। লঠনের আলোর ঘরখানাকে বেশ দেখা যাচ্ছে। খালি খাটে মাদুর পাতা। পিছনের লোকটি সেই খাটের উপর অসিতের বিছানাপত্র নামিয়ে রাখল। দারোগাবাবু বেশ ভাবিত কণ্ঠে বললেন, 'তাই ত...।' মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর দিল, 'ডাক্তারবাবু সব বলে গেছেন। এখানে জল আছে জিরিয়ে হাত-পা ধুয়ে নিতে বসুন। আমি চা আনছি। আপনিও চা খেয়ে যাবেন।' দারোগাবাবু সব ব্যবস্থা ঠিক মত হয়েছে উপরন্তু চায়ের ব্যবস্থা দেখে একটু বেশী মাত্রায় খুশী হয়ে উঠলেন। চায়ের তৃষ্ণা পথ চলার রহস্য ঢাকা পড়েছিল। দারোগাবাবু বললেন, 'নিম্ন, হাত-পা ধুয়ে নিম্ন। এখানেই আপনি থাকবেন। ডাক্তারবাবু না এলে আমি

নিশ্চিতে যেতে পারছি না।' অসিত কোন উত্তরই দিল না। সে হাত-পা ধুয়ে নিল। নূতন জল তার হাতে অপরিচিত স্পর্শ দিল। চায়ের আয়োজন দেখে স্তব্ধ হ'ল। এত সে খায় না। তবু সে খেতে লাগল। শেষে সে জানিয়ে দিল, 'রাত্রে তার আর কিছু লাগবে না। যত্ন আপত্তি এল, কিন্তু সে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করল। আর কোন উত্তর ফিরে এল না। সে বেশ নিশ্চিতে বিছানায় হেলান দিয়ে বসল। দারোগাবাবু বললেন, 'গায়ে থাকা দায়। লোক নেই ছুটো কথা কইবার। আপনি তবু এলেন ছুটো কথা কওয়া যাবে। গায়ের লোক যত সব মূর্খের দল। আমাকে দেখলে ত ঘরে গিয়ে খিল দেয়। হরি ডাক্তার তবু এক জন আছে। মাঝে মাঝে ছুটো কথা কওয়া যায়। এত বড় একটা জমিদার বাড়ী খাঁ খাঁ করছে একজনও লোক নেই।' অসিত কোন উত্তর দিল না। সে শুধু শুনে যেতে লাগল। ঠিক সে কোন কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। দারোগার কথার টুকরোও কানে আসছে আর কিছুদূর ডাকও শোনা যাচ্ছে, আর সব নিস্তব্ধ। যে মেয়েটি তাদের পরিচর্যা করছিল সে চলে গেল। সাদা-সিঁধে শাড়ী-পরা মেয়েটির দিকে অসিত ভাল করে তাকায় নি। তার মুখখানার আবছা ছায়া অসিতের চোখের সামনে ঘোরানুরি করতে লাগল। পথে যে রাত্রে লোক-চলাচল করে তা মনে হ'ল না। নিকটেই কোন বাদাড়ে ডেকে উঠল শিয়াল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। অনেক দূর থেকে তাঁর সাড়া ফিরে এল। অসিতের বুক অপরিচিত শব্দে কেঁপে উঠল। সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী পরিকল্পনায় সে মত্ত ছিল। জন-বসতির মধ্যে বসে নূতন সমাজ-সভ্যতার আলো তার মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কিন্তু আজ এখানে জনমহুঘোর চিহ্ন নেই। সমাজের গঠন এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত পরিকল্পনা এত চেষ্টা এখানে কারোরই জন্ম নয়। সমাজ বলতে লোকেরা বোঝে এখানে ক'ষর তথাকথিত ভদ্রলোকের রীতিনীতি। দেশ, পরাধীনতা, রাজনীতি এসব শব্দ তাদের কাছে অপরিচিত। স্বাধীনতার মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান মিলবে একথা যেন কেমন কেমন অদ্ভুত শোনাতে তাদের কানে। অসিত স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকে। রাত ক্রমাগত একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। দারোগার চোখে চুপুনি আসছে। মুখ বুজে বসে আছে। চোখ বুজে নীরবে বিড়ি টানছে। বিড়ির গন্ধে ঘরখানা ভরে উঠছে। অসিত মাঝে মাঝে নাক পিটকাচ্ছে। বিপ্লবের নূতন কোন মন্ত্র হয়ত তার মাথায় ঘোরানুরি করছে। দারোগাবাবু হাই তুলে বললেন, 'তাই ত ডাক্তারবাবুর এখনও ফেরার লক্ষণ নেই।' অসিত কোনই উত্তর দেয় না। দারোগাবাবু কতব্য হেলা করে ফেলে যেতে পারে না। অথচ অসিতের মত ভদ্র যুবককে অবিশ্বাস করতেও তার মন চায় না। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে এত

শান্তিশিষ্ট নম্র ছেলে সরকারের কি ক্ষতি করতে পারে। তবু তার যা কাজ সে করে। এরকম কয়েকবার সে দেখেছে। এদের মুখে আশ্চর্য্য নূতন কথা শোনা যায়, যা সে জীবনে শোনে নি। হঠাৎ হরি ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দারোগাবাবু এসেছেন নাকি?' তিনি সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েন। দারোগাবাবু সোজা হয়ে বসেন। হরি ডাক্তার অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনিই নাকি?' দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, ইনিই।' হরি ডাক্তার দারোগাবাবুর কথায় কান না দিয়েই বলেন, 'আপনার নামটা।' অসিত বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে বলে, 'আজ্ঞে আমার নাম অসিত বোষ।' 'ও আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেল', হরি ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে।' অসিত বলে, 'হ্যাঁ...হয়েছে।' 'ও আচ্ছা, আপনার বিছানাটা করে দিক। আপনি আজ শুয়ে পড়ুন, কাল সব কথা বলব আপনার সঙ্গে', হরি ডাক্তার বলে উঠল, 'দারোগাবাবুও কি আজ থাকবেন না-কি?' দারোগাবাবু আপত্তি করে উঠেন, 'না না না, আমি শুধু আপনার জুতেই বসে আছি।' 'তাই নাকি? তবে এক কাপ চা খেয়ে যান', হরি ডাক্তার ভিতরে যাবার উত্তোষ করেন। 'না, হয়ে গেছে চা খাওয়া, আমি চলি।' দারোগাবাবু চলে গেলেন, হরি ডাক্তার একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'উঃ এদের জালায় জলে মোলাম। আপনি আসবেন শুনে দারোগাবাবুও ভেবে অস্থির। শেষে আমি সব থাকার ব্যবস্থার ভার নিতে তবে রক্ষে। আমাকে অবশ্য এরা স্নানজরে দেখে না। তবে বিনে পয়সার চিকিৎসার সুযোগ নিতেও ছাড়ে না। তা আপনার এখানে থাকতে অস্ববিধে হবে অনেক। দেখে শুনে নেবেন। মালু...।' অসিতের দিকে ফিরে বললেন, 'মালতী এসে আপনার বিছানা করে দিক।'

মালতী এসে অনুযোগ করল, 'বাবা, উনি ভাত খাবেন না বলেছেন।' হরি ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'সে কি? তা হবে না।' অসিত বেশ স্পষ্টভাবে বলল, 'না, আমি অনেক খেয়েছি আর খেতে পারব না।' হরি ডাক্তার বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা ছেলেছোকরা মাহুষ এ বয়সে যদি না খান, যাক শুয়ে পড়ুন।' অসিত আপত্তি করল, 'বিছানা আমি করে নিচ্ছি।' হরি ডাক্তার তা অগ্রাহ করে দিল, 'না তা হবে না, এটা আপনার নিজের বাড়ীর মত মনে করবেন।' একে একে মালতী, হরি ডাক্তার নানা উপদেশ দিয়ে চলে গেল। কাঁকা ঘরখানায় লণ্ঠনটা জ্বলতে লাগল। মাথার ওপর ছাদটা অদ্ভুত দেখাতে লাগল। দরজার সামনে এসে অসিত দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁগুলো ডাকতে ডাকতে থেমে গেছে। হরিবাবুর গলা অন্দরমহলে শোনা যাচ্ছে। আলোচনা চলছে তাকেই কেন্দ্র করে। কলকাতার পথে এখনও লোক আর গাড়ী চলাচল বন্ধ হয় নি। সেখানে রাত

কতই বা হয়েছে। আর এখানে সাঁঝ পেরোতেই সন্ধ্যা। আবছা গাছপালাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিল। লণ্ঠনের আলোয় মশারির পিছনে বিছানাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মশারি সরিয়ে দিতেই কতকগুলো মশা ডেকে উঠলো। অসিত সচেতন হয়ে উঠল। এদের হতে থেকে সাবধান থাকা দরকার। আলোটা মাথার কাছে এনে নিভিয়ে দিল। শুষ্ক অন্ধকারে ঘরখানা ডুবে গেল। নিশ্চুপতার অসিদ্ধ জেগে রইল। ঘুম আসা দায়, অপরিচিত ঘর, একটুও শব্দ নেই কোথাও। নিশাচর পাখীদের ডানার শব্দও পাওয়া যায় না। মাথার তলায় বালিশটাও কেমন চূপ করে রয়েছে। অসিত চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

একটু একটু করে আলো ফুটে উঠেছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ অসিতের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ভিতরে যারা জেগেছে তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অসিত উঠে পড়ে। কাজ তার কিছুই নেই। গ্রামের প্রতি মোহও তার নেই। হরি ডাক্তারকে প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। সামান্যসামান্য দেখে তার সে ধারণা বদলে গেছে। কর্তৃহীন অবসর তাকে পীড়া দিতে থাকে। পথের চলন্ত মুখরতার তার কালকের দিন কেটে গেছে। কলকাতায় হলে এতক্ষণ তার চুপচাপ থাকার সময় থাকত না। নিজের বলা কথা-গুলোই মনে পড়তে থাকে : 'যে সংগঠন নিয়ে আজ আমরা এত মাতামাতি করছি তার প্রতি কথাটিকে কাজে পরিণত করতে হবে। অনেকেই আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ক'দিন পরে অনেকেই আর এখানে এসে দাঁড়াতে পারব না। তবু যে কয়জন থাকবে সে কয়জনও অন্তত চেষ্টা করব আজকের প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করতে। পরিবর্তন আসে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। আমরা চাই বিপ্লব। বিপ্লব বলতে শুধু ধ্বংসই বোঝায় না। কতকগুলো বিকৃত রীতিকে বদলে নূতন আর দৃঢ় সংগঠন আছে তার পিছনে। নিজেদের উপর চাই বিশ্বাস।' আরও কত কথা। সঙ্গীতের দীপ্ত মুখখানা ভেসে উঠে তার চোখের সামনে। সে চলে গেছে রাজসাহীতে। সে হয়ত আর যোগ দিতে পারবে না কাজে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে গ্রামে যাবে সেখানে গিয়ে প্রচার করবে সমাজতন্ত্রের নূতন কথা। রাশিয়ার কথা গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে বলবে গ্রামবাসীদের কাছে। কিন্তু এখানে এসে তার মুখবন্ধ হয়ে গেছে আপনা থেকেই। হরি ডাক্তার এসে ডাক দিল, 'উঠেছেন নাকি?' অসিত সাড়া দিল, 'হ্যাঁ।'।

চায়ের পাট সেরে সে হরি ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে পথে। একটু পথ পেরিয়েই কল্লণার বারুদের বাড়ী। বিরাট বাড়ীখানা দিনের আলোতে নিজের অস্তিত্বকে জোর করে ঘোষণা করবার চেষ্টা করছে। হরি ডাক্তার বলতে থাকে, 'এই আমাদের জমিদারদের বাড়ী। ছেলেবেলায় দেখেছি কত জাঁকজমক ছিল এর। সারা বাড়ী প্রজায় আর

নায়েব গৌমত্য গমগম করত। তারপর ক'বছরের মধ্যে কি যে হ'ল সব ভেসে গেল। জমিদারীও গেল। শুধু পড়ে রইল ভিটেবাড়ীখানা। জমিদাররা গা ছাড়া হয়ে চলে গেছে। আজ বিশ বছরের উপর। যা-কিছু বাকি ছিল নায়েব-গৌমত্য লুটপাট করে নিয়েছে। এত বড় একখানা বাড়ী, যে আসে সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কি ছিরি ছিল আজ কি হয়েছে। শুধু এখনকার জমিদারের বুড়ি এক পিসি একা থাকে। সে আছে বলে তাই আজ ভিটের আলো জ্বলে। সে বুড়িই বা আর ক'দিন। সে গেলে আর কেউ থাকবে না। বাড়ীটা পিছনে ফেলে তারা বাজারে এসে হাজির হয়। হরি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। টিনের ছাওয়া একখানা ঘর। একটা খাট আর ধানকয়েক বেষ্টিপাতা। একটা ভাঙা আল-মারিতে নানা রকমের ওষুধ রয়েছে। হরি ডাক্তার বলে, 'বুনুন।' রাজারের কাছেই থানা। হরি ডাক্তার দারোগা-বাবুকে খবর দিতে যায়। দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসে। দারোগাবাবু এসে-রহস্তের চোখে অসিতের দিকে তাকিয়ে বলে, এ দিকে যখন এসেছেন তখন একবার থানা হয়ে যাবেন। অসিত সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, বলে, 'চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। দারোগা একটু হেসে নেয়। নিজের ক্ষমতার দস্তকে বাজারের লোকের সামনে প্রকাশ করতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই অসিতের সম্বন্ধে নানা বিশ্বয়কর কথা ছড়িয়ে পড়ে। সকলে মনে মনে একটু ভীতও হয়, আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে, অসিতের চোখে নির্লিপ্তির ভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। সে নিশ্চিন্তে চলতে থাকে দারোগার পিছনে। দারোগাবাবু বলতে থাকে, 'যে ক'দিন এখানে থাকবেন যদি একবার এদিকে ঘুরে যান ত বড় ভাল হয়। তবে সন্ধ্যার পর আর কোথায় বেরবেন না, উত্তরের অপেক্ষা তিনি করেন না', বলেই চলেন, 'কোথাই বা বেরবেন। সন্ধ্যা না হতে হতে নিশ্চিন্তি।' থানা থেকে ফিরে এসে আবার ডাক্তারখানায় বসে। অপরিচিত সকলেই। হরিবাবুর সঙ্গে তার সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল। সে আসতেই আলো-চনার মোড় ঘুরে গেল। সে গ্রাহ্য করল না, দু-এক জন রোগীও

শিশি হাতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখলেই বোকা যায় বোকা তাদের সর্বদেহ গ্রাস করেছে। লিকলিকে হাত-পাগুলোর উপর ভর করে তারা কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অনাবৃত দেহে জীর্ণতার স্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। পেটটাই আকারে সবচেয়ে বেশী দীর্ঘতা লাভ করেছে। অসিত তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, ওকি, দারোগাবাবু আবার আসছে কেন। এবার রীতিমত হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। এসেই বলতে আরম্ভ করল, 'যাক আপনি বেঁচে গেলেন। এই চিঠি নিয়ে লোক এসেছে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বিকেলের ট্রেনে যান ত স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব।' হরি ডাক্তার বলল, 'তা হলে ত আপনিও বেঁচে গেলেন দারোগা-বাবু।' কোন উত্তর না দিয়েই হাঁটতে শুরু করল। হরিবাবু অসিতের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'চলুন আজ আপনাকে ভাল করে খাইয়ে দিই, গ্রামের কারুর সঙ্গে আলাপ হ'ল না।' যারা বসেছিল, ওর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা তাদের বিশেষ আছে বলে মনে হ'ল না। তাদের ভয় কাটে নি। ওর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দারোগাবাবুর সুনজরে পড়াটা কারুরই ইচ্ছা নয়।

শান্ত সন্ধ্যা নামছে কল্লগার ঘাটে। অসিত ঘাট পেরিয়ে এল। সঙ্গে দারোগাবাবু আছে। হরি ডাক্তার ঘাট পর্যন্ত এসে চলে গেছে। মালতীর অপরিচিত চোখ অসিতের মনে ভেসে উঠতে থাকে। ওপারের খেজুর গাছটার মাথা দেখা যাচ্ছে। মাত্র কাল সন্ধ্যায় অসিত কল্লগার ঘাট পার হয়েছিল। আজ কল্লগার ঘাট পিছনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। জলো বাতাস অসিতের গায়ে অপরিচিত প্রকৃতির ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে। আবার সেই কলকাতা। জনমুখর পথ ও দেখতে পায় চোখের সামনে। ঘুরের ট্রেন লাইনটা বেঁকে গেছে। একটু পরেই ও লাইনের সীমানা পেরিয়ে চলে যাবে। দূর আকাশের পশ্চিম গায়ে ঢলঢল সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঝাপসা হয়ে আসছে সবুজ মাঠের পারে। ওপারে কল্লগার ঘাট আর দেখা যাচ্ছে না।

পরমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ

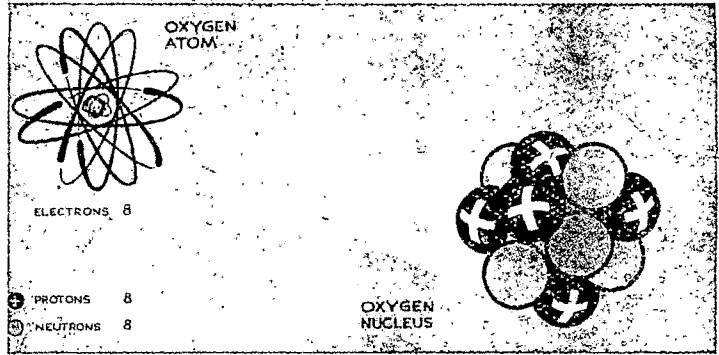
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জাপানে এটম-বোমা বিস্ফোরণের পর পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার জ্ঞান বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা জোর গবেষণা শুরু করিয়া দিয়াছেন। জাপানের বিরুদ্ধে যেকোন পরমাণবিক শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই সে রূপ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। পেট্রোল, বাষ্প, বিদ্যুতের

পরিবর্তে আধুনিক যান-বাহন, কল-কারখানা ইত্যাদি পরমাণুর শক্তিতে পরিচালিত হইতে পারিবে কিনা, এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে না পারা গেলেও অতি উচ্চগতিসম্পন্ন দূরপাল্লার বিমান, রকেট প্রভৃতি যে নীড়ই পরমাণুর শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা উচ্চ আশা পোষণ করেন। দূরপাল্লার আকাশ-যান পরিচালনে যে গ্যাসোলিনের প্রয়োজন হয় তাহার পরিমাণ বড় কম নহে, কাজেই গ্যাসো-

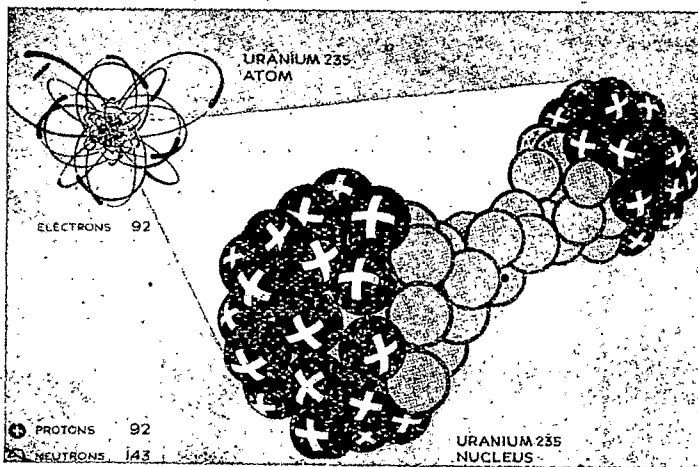
লিনের পরিবর্তে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইতেছে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থ ভাঙিবার ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতে ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইলে এই শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ইচ্ছামত কেমন করিয়া এই শক্তির উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব—তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে জানা দরকার—‘যে কোন পদার্থের পরমাণু না লইয়া এটম-বোমায় কেবল ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার করা হয় কেন এবং এই পরমাণু হইতে শক্তি নির্গত হয়—ই বা কেমন করিয়া?’

পরমাণু সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে—বহুবিধ উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া ঘটান যাইতে পারে। তাহার মধ্যে অন্ততঃ ডজনখানেক উপায়ে পরমাণু হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি নির্গত হইয়া থাকে। পরমাণুর অভ্যন্তরে কোথায় কোন জিনিস রহিয়াছে আজ বৈজ্ঞানিকেরা তাহার খুঁটিনাটি হিসাব দিতে পারেন। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির কথাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যাহারা এটম-বোমাকে কার্যকরী করিয়াছেন তাঁহারা কি কৌশলে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে পরমাণুর নিউ-



বোম—অক্সিজেন পরমাণুর অভ্যন্তর ভাগের দৃষ্ট। দক্ষিণে—নিউক্লিয়াসকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। যোগচিহ্নিত কালো গোলকগুলি ধন-তড়িতাবিশিষ্ট প্রোটন, বাকীগুলি নিউট্রন

ক্লিয়াস হইতে এই প্রচণ্ড শক্তিকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাই হইতেছে প্রধান রহস্য। দ্রুতগামী টিল নিক্ষেপ করিয়া পরমাণুকে ভাঙিতে পারিলে তাহা হইতে শক্তি নির্গত হয়—একথাও বৈজ্ঞানিকদের অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। কিন্তু টিল ছুড়িয়া অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকিলে তাঁহারা অনেক পূর্বেই পরমাণুর শক্তি-সাহায্যে এঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। একটী পরমাণু ভাঙিবার জন্ম তাঁহাদিগকে লক্ষ লক্ষ টিল ছুড়িতে হয়। তাহার মধ্যে দৈবাৎ এক-আধটা লাগিয়া যায় মাত্র। কারণ কোন পদার্থ আমাদের কাছে যতই নিরেট বলিয়া মনে হউক না কেন, উহার অনেকটাই শূন্যতা বা ফাঁকা জায়গা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতি জোরালো



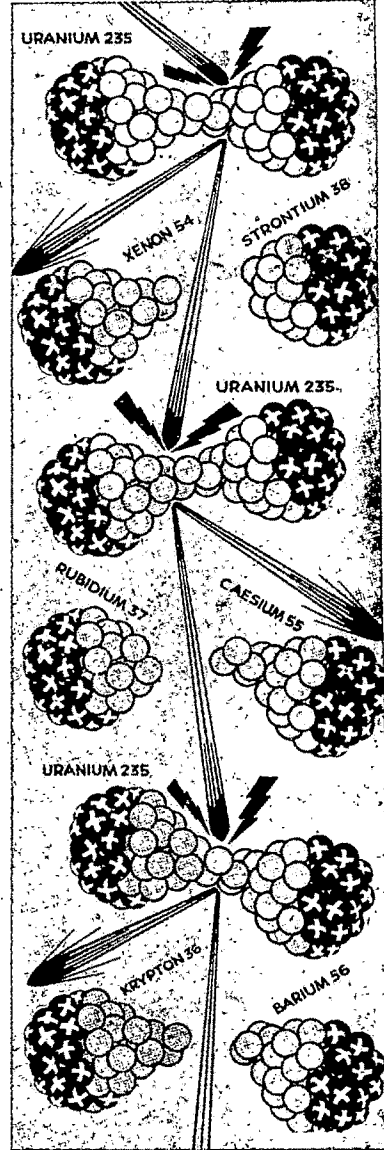
বোম—ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর পরমাণুর অভ্যন্তর ভাগের দৃষ্ট। দক্ষিণে—নিউক্লিয়াসটাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। যোগচিহ্নিত কালো গোলকগুলি ধন-তড়িতাবিশিষ্ট প্রোটন-কণিকা। নিউট্রনগুলি মধ্যস্থলে থাকিয়া নিউক্লিয়াসটাকে একটা অসমান ভাঙত্বের আকৃতি প্রদান করিয়াছে।

তাত্ত্বিক শক্তির টানে পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলিয়া পদার্থকে নিরেট অথবা নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে বিরাট শূন্যস্থান থাকা সত্ত্বেও এটম-বোমা-নির্গাতারা এমনই একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেকটি টিল বা বুলেট প্রত্যেকটি পরমাণুকে ঠিক জায়গায় আঘাত করিয়া শক্তি উৎপাদন ভৌ করেই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে দুইটি করিয়া নূতন বুলেট (নিউট্রন কণিকা) নির্গত করাইয়া আরও দুইটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদীর্ণ করিতে পারে। কেবল ইহাই নহে, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন প্রত্যেকটি পরমাণু হইতে যতটা শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই অভিনব প্রক্রিয়ায় তাহার শতগুণ অধিক শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

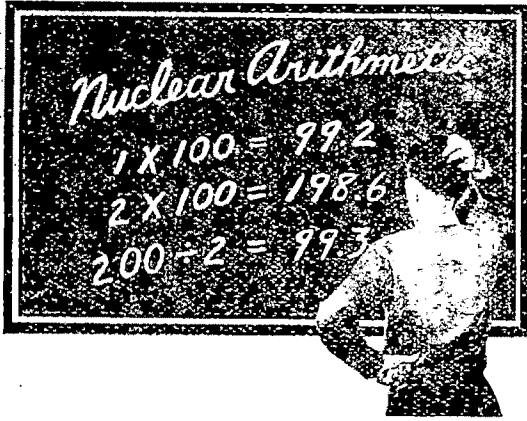
এটম-বোমার অপরিমেয় শক্তির ইহাই মূল রহস্য। এই শক্তির উৎস কোথায় জানিতে হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে কি কি পদার্থ আছে তাহা জানা দরকার। পরমাণুর কেন্দ্রেই আছে—নিউট্রন নামক কতকগুলি নিউক্লিও বস্তু-কণিকা আর কতকগুলি ধন-তড়িতাবিশিষ্ট বস্তু-কণিকা, যাহারা প্রোটন নামে পরিচিত। আর কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্ভাগে আছে ইলেকট্রন নামক কতকগুলি ঋণ-তড়িৎ কণিকা। ইহাদের বস্তু-পরিমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। সৌর-জগতে গ্রহগুলি যেমন বিভিন্ন কক্ষের স্বর্ষ্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইলেকট্রন-গুলিও সেইরূপ পরমাণুর কেন্দ্রীয়-বস্তু বা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে। কাজেই পরমাণুর গুরুত্ব বা বস্তু-পরিমাণ নিউক্লিয়াসের উপরই নির্ভর করে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকিবে তড়িতিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত তাহাদের চতুর্দিকে ততগুলি ইলেকট্রন সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় এই ইলেকট্রনগুলির কক্ষ পরিবর্তনের ফলেই শক্তির আবির্ভাব ঘটয়া থাকে। কয়লা বা গ্যাসোলিন পোড়াইলে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা পরমাণুর শক্তি হইলেও পরমাণুর নিউক্লিয়াস হইতে উদ্ভূত শক্তি নহে। ইহা ইলেকট্রনের কক্ষ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত শক্তি। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষ-পথের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

কোন পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর বস্তু-পরিমাণ বা গুরুত্ব যে একই হইবে এমন কোন কথা নাই। কাহারও গুরুত্ব কম, কাহারও বা একটু বেশী থাকিতে পারে। কারণ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউট্রন থাকে একই পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুতে তাহাদের সংখ্যা সমান নহে। এটম-বোমার প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম ঠিক এই রকমেরই একটা মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম পরমাণুর প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াসে ৯২টা প্রোটন থাকে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। ইউরেনিয়ামের কতকগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১৪২টা নিউট্রন থাকে। এইগুলিকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম—২৩৪ অর্থাৎ ৯২টা প্রোটন + ১৪২টা নিউট্রন = ২৩৪। কতকগুলি ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১৪৩টা করিয়া নিউট্রন পাওয়া যায়। এইগুলিকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম—২৩৫ অর্থাৎ ৯২ + ১৪৩ = ২৩৫। আবার কতকগুলি পরমাণুতে নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬ হইতেও দেখা যায়। ইহাদিগকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম—২৩৮ অর্থাৎ ৯২ + ১৪৬ = ২৩৮। তবে সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে ২৩৮ ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যাই বেশী। ইউরেনিয়াম—২৩৪ পরমাণু সামান্য দুই চারিটি পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু ইউরেনিয়াম—২৩৫-ই হইতেছে সবচেয়ে বেশী প্রয়ো-

জনীয়। ২৩৮ হইতে “থার্মেল-ডিফিউসন” প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজে ইউরেনিয়াম—২৩৫ পৃথক করা যাইতে পারে। মন্দগতি নিউট্রন-কণিকা অতি সহজেই ইহার নিউক্লিয়াসকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু ইউরেনিয়াম—২৩৮এর বেলায় নিউট্রন প্রয়োগে এরূপ ব্যাপার ঘটে না। তবে ইউরেনিয়াম



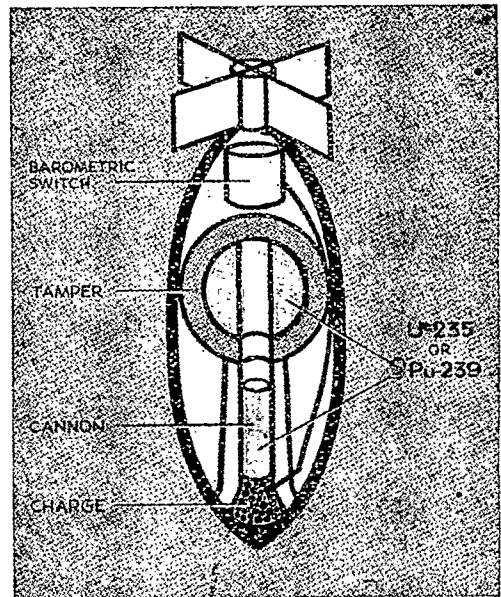
কালো রঙে চিত্রিত তীরের ফলার মত নিউট্রন-বুলেট, ইউরেনিয়াম—২৩৫ নিউক্লিয়াসের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়াছে। ফলে ইহা দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় ধানিকটা শক্তিমুক্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি নিউট্রন-বুলেট ছাড়িয়া দিয়াছে। এই নিউট্রন দুইটি আবার অল্প নিউক্লিয়াসকে দ্বিধাভিত্ত করিবে। ইউরেনিয়াম—২৩৫ এ ভাবে ভাঙিবার ফলে ৩৪ নম্বরের সেলিনিয়াম হইতে ৫৭ নম্বরের ল্যাংহেনাম পর্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া গিয়াছে।



পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পদার্থের ভাঙা টুকরা-গুলিকে একত্রে যোগ অথবা ভাগ করিলে তাহাদের মোট ওজন সাধারণ গণিতের নিয়ম মানিয়া চলে না। এই ওজন-হ্রাসই mass-defect নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াস দ্বিধা-বিভক্ত হইবার সময় বস্তুমাত্রার এই যে সামান্য হ্রাস ঘটে ইহাই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

—২৩৮এর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রবিষ্ট করাইয়া একটা নূতন মৌলিক পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পদার্থের নাম প্লুটোনিয়াম। ইহার তড়িৎমাত্রা ৯৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। প্লুটোনিয়ামেরও সহজেই ফিসন ঘটয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় ইহা উৎপাদন করা যায় বলিয়া হয়তো ইউ-রেনিয়াম ২৩৫ অপেক্ষা প্লুটোনিয়ামের সুবিধাই বেশী। কিন্তু কথা হইতেছে, অগ্নাত পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস অপেক্ষা ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউক্লিয়াস 'এত সহজে ভাঙিয়া যায় কেন?' অক্সিজেন পরমাণুর কথাই ধরা যাউক। অক্সিজেন পরমাণু ও ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন-গুলি কি ভাবে সজ্জিত আছে তাহা ছবি দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে—৮টি প্রোটন এবং ৮টি নিউট্রন। এই প্রোটন ও নিউট্রনগুলি একটা গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া রহিয়াছে। এই গোলা-কার পিণ্ডটার বহির্ভাগে ৮টি ইলেকট্রন বিভিন্ন তলের বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতেছে। ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউক্লিয়াসে আছে—৯২টা প্রোটন আর ১৪৩টা নিউট্রন। এগুলি একসঙ্গে ডেলা বাঁধিয়া থাকিলেও একটা বলের মত গোলাকার নহে। যেন একটা অসমান ডায়েলের মত। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ কণিকাগুলির উপর দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের একটি হইতেছে, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি। এই বিকর্ষণ শক্তি প্রোটনগুলিকে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দেয়। একমাত্র এই শক্তি বিত্তমান থাকিলে নিউক্লিয়াস আপনা-

আপনিই ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইত। কিন্তু তড়িতাবেশ থাকুক আর না-ই থাকুক, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণিকাগুলি যখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন তাহাদের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এই আকর্ষণ শক্তিই তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তিকে কার্যকরী হইতে দেয় না। অপেক্ষাকৃত হালকা অক্সিজেন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকাগুলির মধ্যে এই আকর্ষণ শক্তি, তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অনেক প্রবল। কাজেই অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু অনেকটা নিরেট গোলকের আকার ধারণ করে। কিন্তু ইউ-রেনিয়ামের মত ভারী পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুতে বিকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবলতর। যখন এই শক্তি যথেষ্ট প্রবল থাকে তখন সামান্য একটু অবস্থা বিপর্যয়ের ফলেই নিউট্রনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া প্রোটনগুলি প্রায় সমান অংশে দুই দলে পৃথক হইয়া পড়ে এবং উভয় দলে যেন একটা টানাটানি চলিতে থাকে। এক কোঁটা জল যেমন ছোট বড় দুইটি কোঁটার বিচ্ছিন্ন হইতে পারে সেইরূপ এই অবস্থায় একটা নিউট্রন, নিউক্লিয়াসে আঘাত করিলে তাহা দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এক টুকরা শুষ্ক-বরফ এক বালতি জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শুষ্ক বরফের কিয়দংশ বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় এবং জলের মধ্যে এমন ভাবে বৃদ্ধ উঠিতে থাকে, মনে হয় জলটা যেন ফুটতেছে। ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউট্রন আঘাত করিলে প্রায় এইরূপই একটা ব্যাপার ঘটয়া থাকে। নিউট্রনের সামান্য অতটুকু বস্তু-

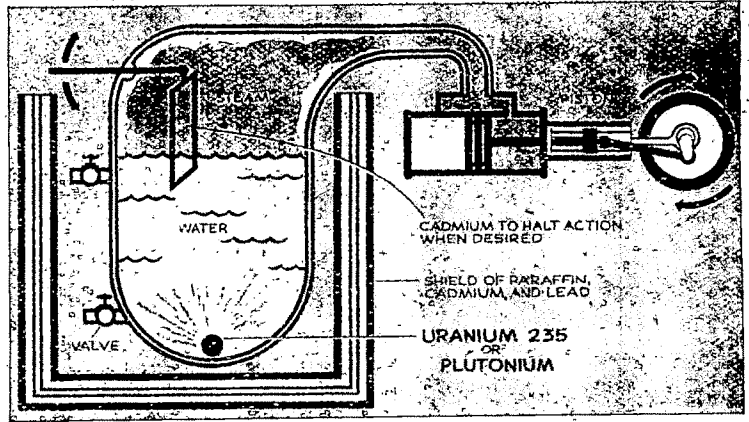


এটম-বোমা বিস্ফোরণের সম্ভাব্য কৌশলের পরিকল্পনা

মাত্রার প্রভাবে নিউক্লিয়াস কম্পান বেগ-শক্তি অর্জন করে।

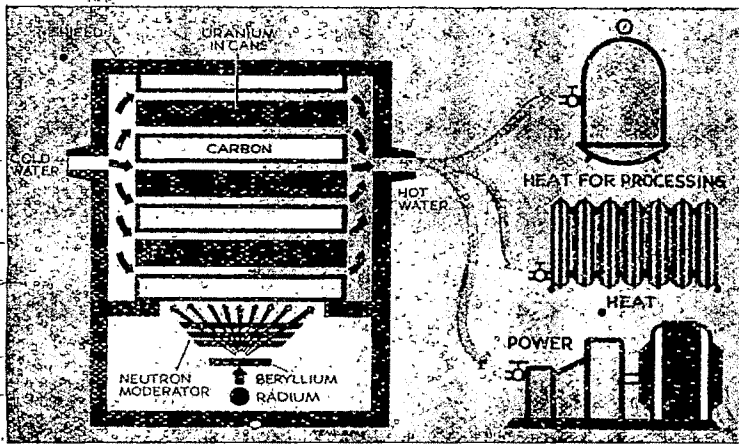
পরমাণু-বিজ্ঞানে 'mass-defect' বলিয়া একটা কথা আছে। নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত হইবার সময় এই 'mass-defect' হইতেই প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়। 'mass-defect' ব্যাপারটা কি একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। ধরুন আপনার ১০০টা মার্কেল আছে। প্রত্যেকটা মার্কেলের ওজন যদি এক পাউণ্ড হয়—তবে একত্রে ১০০টা মার্কেলের ওজন ১০০ পাউণ্ড হইবে। কিন্তু এই মার্কেলগুলিকে যদি নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়—তবে একত্রে ১০০টা মার্কেলের ওজন হইবে মাত্র ৯৯.২ পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রন ধর্মী মার্কেলগুলির প্রত্যেকটির

এক পাউণ্ড করিয়া ওজন হইলেও একসঙ্গে ১০০টা মার্কেলের ওজন কিছু কম হইবে—গাণিতিক হিসাব মত এরূপ ২০০ মার্কেলের ওজন হওয়া উচিত—৯৯.২ এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯৮.৪ পাউণ্ড। কিন্তু প্রকৃত প্রভাবে তাহা হয় না। তখন দেখা যায় ২০০ মার্কেলের ওজন হইতেছে—১৯৮.৬ পাউণ্ড। যদি এইরূপ ২০০ মার্কেলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তবে তখন আবার প্রত্যেক ভাগের—১০০টা মার্কেলের ওজন হইবে ৯৯.৩ পাউণ্ড। পরীক্ষার ফলে নিউট্রন, প্রোটনের এরূপ ওজন বৈশিষ্ট্য বাস্তব ক্ষেত্রেই প্রমাণিত



অর্জজলপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের তলার দিকে ইউরেনিয়াম—২৩৫-এর ডাঙন ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে যে কোন রকমের এঞ্জিনকে চালাইতে পারে। ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে এই শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

হইয়াছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউট্রন, প্রোটনগুলি একত্রিত অবস্থায় থাকিবার সময় এই যে ওজনের হ্রাস ঘটে ইহাকেই বলা হয় mass-defect। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর নিউক্লিয়াস দ্বিধাবিভক্ত হইবার সময়ও ওজনের এরূপই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সাধারণ পরমাণুর সমসংখ্যক কণিকার ওজন অপেক্ষা এই বিচ্ছিন্ন অংশের কণিকাগুলি একত্রে ওজনে কিছু ভারী হইয়া থাকে। নিউট্রন সংঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের এই অপেক্ষাকৃত ভারী অংশগুলির অতিরিক্ত বস্তু, বেগ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই শক্তিই এটম-বোমাকে কার্যকরী করিয়া থাকে।



জলপূর্ণ-আবদ্ধ পাত্রে ইউরেনিয়াম ও গ্রাফাইট পর পর সাজাইয়া তলার দিক হইতে পরমাণুর বিক্ষোৰণ ঘটিইলে জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। এই বাষ্পের সাহায্যে কলকারখানা পরিচালিত হইতে পারে। অথবা দেশের সর্বত্র গরম জলও সরবরাহ করা যাইতে পারে।

সরাসরি পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপাততঃ রকেট জাতীয় আকাশ-যান পরিচালনার ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কারণ প্রোপেলার চালিত বিমান আর 'জेट-প্রোপেলড' রকেটের গতি উৎপাদক কোশল সম্পূর্ণ পৃথক। অত্যধিক চাপের গ্যাসের দ্বারায় রকেট পরিচালিত হয়। কাজেই পরমাণু-শক্তি সাহায্যে সাধারণ এঞ্জিন অপেক্ষা রকেটকেই সহজে কার্যকরী করা সম্ভব হইবে। তবে সরাসরি না হইলেও কতকটা পরোক্ষ ভাবেই পরমাণু-শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কোন আবদ্ধ পাত্রে জলের নীচে ইউরেনিয়াম—২৩৫ অথবা থুটো-নিয়ামের 'ফিসন' ঘটিইলে জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে।

এই বাষ্পের সাহায্যে যে কোন রকমের এঞ্জিন পরিচালিত হইতে পারে। চিত্র প্রদর্শিত উপায়ে জলপরিপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাফাইট পর পর সাজাইয়া তাহাতে নিউট্রন প্রয়োগ করিলে জলকে বাষ্প বা উত্তপ্ত করিয়া

প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের হানকোর্ড শহরে গরম জল এবং এঞ্জিন চালাইবার বাষ্প সরবরাহ করিবার জন্ত পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের এরূপ একটি বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

মানুষের জীবনকে কর্মক্ষেত্রের জন্ত প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের দেহ মন মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করিয়া জীবন-যুদ্ধে তাহাকে জরী হইতে প্রস্তুত করে শিক্ষা। এইজন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ, বিজ্ঞায়তন 'মানুষ' তৈয়ার করার আশ্রম। মানুষের রুচি ও সামর্থ্য নানা জনের নানা প্রকার, সমাজ-জীবনের কর্ম-বৈচিত্র্যেরও অন্তর্ভুক্ত নাই। তাই মানুষের জীবনের সহিত যোগ রক্ষা করিতে, মানুষকে বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে শিক্ষার বিষয়বস্তুও হইয়াছে বহু বিচিত্র। স্বাধীন দেশসমূহের শিক্ষা-বিভাগ যে-দিকে যাহার অভিরুচি, যাহার মন যে বিষয়ের অহুশীলনে বেশি আনন্দ পায়, তাহাকে সেই সেই বিষয়েই বুদ্ধিশক্তি নিয়োজিত করিয়া আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার অচলায়তনের মধ্যে প্রাণের সজীবতা নাই। শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তো নাই-ই, যে শিক্ষা ইচ্ছুল কলেজের মারফৎ দেশের ভাবী নাগরিকদিগের মধ্যে বিস্তার করা হইতেছে তাহাও কৃত্রিম, সমাজ জীবনের সহিত সম্পর্ক-হীন। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন সমস্তা শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে না; সর্বোপরি এই পুথি-সর্বস্ব শিক্ষা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে না। তাহার ফলে বিদ্যা অর্জন করিয়া এদেশের যুবক বেকার হইয়া অন্নের কাঙাল, শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি 'ভিক্ষুক তৈরির কারখানা' বলিয়া সমাজে অবহেলিত। যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না তাহার উপর যদি সাধারণের শ্রদ্ধা না থাকে তবে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

ভারতের শিক্ষা-প্রণালীর শোচনীয় ব্যর্থতা এদেশের চিন্তা-শীল লোকমাত্রকেই চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। চল্লিশ কোটি অধিবাসীর দেশে সন্তানসন্ততির জন্ত প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যে শত শত কোটি টাকার প্রয়োজন তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? মহামান্য গবর্ণমেন্টের পুলিশ, সৈন্য, শাসন ও অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজন মিটাইতেই গৌরী সেনের তহবিল ফুরাইয়া আসে; জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য থলি ঝাড়িয়া অতি সামান্যই জোটে। অর্থের অভাবই ভারতের শিক্ষা-

প্রচেষ্টার প্রধানতম অন্তরায়। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ, ব্যাপক শিক্ষার পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার মত শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিলে অজ্ঞতার গুরুভারে পিষ্ট ভারতবাসীর উন্নতির কোন আশা নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনায় দেশের এই গুরুতর সমস্তা সমাধানে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতি মহাত্মাজীবীর জীবন দর্শনের অঙ্গ স্বরূপ এবং ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ। নিপুণ বৈদ্যের মত বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মূল রোগ নির্ণয় করিয়া গান্ধীজী তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন; যথা—

- ১। সাত বৎসরের জন্য অবৈতনিক, আবশ্যিক, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন
- ২। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা
- ৩। পুথিগত বিদ্যার উপর জোর না দিয়া কোন শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দান
- ৪। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষকের বেতন প্রদান।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ওয়ার্ড-পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে কোন বৃত্তি শিক্ষায় নিপুণ করিয়া তোলা যাহাতে সে কর্মজীবনে নিজের পরিবার প্রতিপালন ও সমাজ-সেবা উভয় কার্যেই সমর্থ হইয়া উঠে। বর্তমানের পুথি-কেন্দ্রিক শিক্ষায় ছাত্রগণ দৈহিক শ্রমের কোন কাজে অভ্যস্ত হইয়া ক্রিয়াসিদ্ধ (practical) হইয়া উঠে না; শুধু বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষতায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাহার দৈহিক পরি-শ্রমকে অবজ্ঞা করিতে শেখে। ফলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান গভীরতর হয়, উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার সম্ভাবনা সুদূরপর্যন্ত হইয়া আসে। এইরূপ অবস্থা কোন সমাজের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। গান্ধীজী ব্যাধির মূলে রুঠারায়ত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় দৈহিক শ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই শিক্ষা গড়িয়া উঠিবে। ইহাতে যে শুধু

শ্রমের মর্যাদা সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত হইবে তাহা নয়; ছাত্র-দের দৈহিক পেশী ও মানসিক সামর্থ্যের বিকাশ-সামঞ্জস্য হওয়ায় শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্যের শিশু-মনোবিজ্ঞানবিদদের অভিমত এই যে, দৈহিক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানই শিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রণালী।

ছেলেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া চাকুরি করিয়া 'দুধে ভাতে' থাকিবে ভাবিয়া যে সব অভিজ্ঞাবক ভবিষ্যতের মধুর চিত্র মনে মনে রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্পষ্ট না হওয়ায় নানাদিক হইতে, বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষিত মহল হইতে প্রতিবাদ উঠিল যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশকে ছুতার, মজুর, তাঁতীর দেশে পরিণত করিবে; হাতের কাজের দিকে বেশি ঝোঁক দিলে শিল্পী হিসাবে ছাত্রগণ কুশলী হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত সমগ্রভাবে পিছাইয়া পড়িবে। ইহার উত্তরে জাকির হোসেন কমিটি বলিয়াছেন :

The object of this new educational scheme is not primarily the production of craftsmen able to practise some craft *mechanically*, but rather the exploitation for educative purposes of the resources implicit in craft work. (Basic National Education, p. 11)

যন্ত্রপুত্তলীর মত কাজ করিতে সক্ষম শিল্পবিশারদ তৈয়ার করা নয়, শিক্ষাদান কার্যের সৌকর্যার্থে শিল্প কার্যের সহায়তা গ্রহণ করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ছাত্রগণ শিল্প শিক্ষা করিবে অত্যন্ত পুষ্টিগত বিষয়ের সঙ্গে গৌণ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নয়; তাহাদের শিক্ষা চলিবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা তাহারা শিল্পক্রিয়ার যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় জানিয়া লইবে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, the child should learn the why and wherefore of every process. এইভাবে কাজের প্রতি ছাত্রের প্রকৃত অনুরাগ জন্মিলে তবেই পরিশ্রমের মর্যাদা সে উপলব্ধি করিতে পারিবে, কায়িক শ্রমের প্রতি তাহার অবজ্ঞা দূর হইবে এবং সুস্থ সবল বুদ্ধি ও মানসপ্রকৃতি লইয়া নতুন সমাজ গঠনের কাজে ত্রুটি হইতে পারিবে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার ক্রটি হিসাবে সমালোচকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কোন ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নাই। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছেন কুটির শিল্পের প্রতি বেশী পক্ষপাত করায় বৃহৎ যন্ত্রশিল্প উপেক্ষিত হইতে পারে। প্রথমটির উত্তরে বলা যায়, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। যে সাধারণ জ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোলার মোটামুটি বিজ্ঞা যে-কোন নাগরিকের পক্ষে সর্বনিম্ন প্রয়োজন (minimum requirement) বলিয়া গণ্য, জন-সাধারণের মধ্যে তাহা ছড়াইয়া দেওয়াই ইহার কাম্য। এই সঙ্গে এমন একটি বৃত্তি ছাত্রকে শিক্ষাইয়া দিতে হইবে যে, সে ইচ্ছা করিলে, তাহা দ্বারাই জীবিকা অর্জন করিতে পারে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনার বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ গ্রহীত হইয়াছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সার্জেন্ট পরিকল্পনায় আরো এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়স হইতে শিক্ষারম্ভ করিতে হইবে বলা হইয়াছে। আর ব্যবস্থা হইয়াছে যে ৫ বৎসর বুনিয়াদি ইঙ্কলে পড়ার পর ১১ বছর বয়সে ছাত্রদের একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। তাহার ফলাফল দেখিয়া কতক তীক্ষ্ণবী ছাত্রকে মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চ শিক্ষার জন্ত পাঠান হইবে, অবশিষ্ট ছাত্রগণ বুনিয়াদি ইঙ্কলের উচ্চমানে আরও তিন বৎসর পড়িয়া কোন একটি বৃত্তি জীবিকান্ধে গ্রহণ করিবে।

দেশের অর্থনৈতিক সমাজ জীবন ও ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষাদান করাই বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্য। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ জন ভারতের প্রায় ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামে বাস করে। কাজেই ভারতের পক্ষে কল্যাণ-কর কোন শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করিতে পল্লী এবং পল্লীর সমস্তকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে, নতুবা ইহা প্রহসনে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন :

This education is meant to transform village children into model villagers. It is primarily designed for them. The inspiration for it has come from the villages . . . Basic education links the children, whether of the cities or the villages, to all that is best and lasting in India. It develops both the body and the mind, and keeps the child rooted to the soil with a glorious vision of the future in the realization of which he or she begins to take his or her share from the very commencement of his or her career in school. (Constructive Programme, pp. 15-16)

ইংরেজ-শাসনকালে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া ভারতের বাণিজ্য ও কুটিরশিল্প লুপ্তপ্রায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামগুলি হতশ্রী হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই একমাত্র নির্ভর হইল কৃষি। চাষ-আবাদের পর বছরের মধ্যে অধেকের বেশীর ভাগ কালই চাষীর হাতে কাজ না থাকায় নিরক্ষর হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া তাহার অল্প কোন প্রকার রোজগারের উপায় থাকে না। কুটিরশিল্প বিনষ্ট হওয়ায় গ্রাম ছাড়িয়া লোক জীবিকা অর্জনের আশায় শহরে ভিড় করিতে লাগিল। কতক শহরের ত্রীভুজ হইল বটে, কিন্তু পল্লী ভূমি দেশের বাহা শক্তিকেজ—দারিদ্র্যে জীর্ণ ও অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পল্লীর পুনঃসংস্কার এবং পল্লীবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও তাহার দেহে শক্তি, মনে উত্তম ও উন্নতির আশা কিরায় আনিতে না পারিলে এই মহাদেশ সদৃশ বিরাট দেশকে স্বরাজ-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা দুরূহ মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিবার সময় ভারতের এই বিশাল মুক জনসংখ্যের কথা মহাত্মাজী বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন।

দেশের পক্ষে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পেরও প্রয়োজন আছে। বুনিয়াদি ইকুলে হাতে কলমে কাজ শেখার পর ছাত্রগণ বড় কারখানায় কাজ শিখিবার পক্ষে বরং অধিকতর উপযুক্ত হইবে। তাহা হইলেও ভারতের হায় জনপূর্ণ দেশে প্রকৃত প্রয়োজন যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপাদন নয়, বহুসংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা জিনিষ তৈয়ার করান—mass production নয়, production by the masses.

দ্বিতীয় মহাসমরে দেখা গিয়াছে উড়োজাহাজ হইতে বোমা-বর্ষণে শিল্পপ্রধান দেশসমূহের বৃহৎ কারখানাগুলি ধ্বংস করা সহজ। যে আর্থিক বোমার প্রয়োগে যুদ্ধের গতি অকস্মাৎ অচল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভাবী সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া যন্ত্রশিল্পের দেশে কেলবিচ্যুত শিল্পগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান নারায়ণ আগরওয়াল বলিয়াছেন :

“পৃথিবীর অর্থনৈতিক গতি হইতেছে কেলবিচ্যুতি ও কুটীর-শিল্পগত সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে বহু অতীত কাল হইতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, অবশ্য আধুনিক কালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশ এখন ‘দানবের দাঁত’ বপন করিয়া তাহার ফসল কুড়াইতেছে, আমাদের তাহা অম্লসরণ করিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন একটি পরিকল্পনা ভারতবর্ষে করিতে হইবে যাহা দেশের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবে। এই দেশজ ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ডাঃ এনি বেসাণ্ট তাঁহার কমনওয়েল্‌থ অব ইণ্ডিয়া বিলে। গান্ধীজীও গ্রাম্য সম্প্রদায় এবং কুটীরশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন।” (গান্ধী পরিকল্পনা—পৃঃ ৭১)

কার্যতঃ মহাত্মাজী বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়া দেশবাসীর বৃহত্তম অংশের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস।

বুনিয়াদি শিক্ষার আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা (economic self-sufficiency) অর্থাৎ ছাত্রদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তদ্বারা ইকুলের খরচ নির্বাহ করার বিষয় লইয়া বহু সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ছাত্রদের উপার্জনের উপরই যদি শিক্ষকদিগকে নির্ভর করিতে হয় তবে ইহা অসম্মান করা অসঙ্গত হইবে না যে ছাত্রগণকে শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল মাতৃভাষা প্রভৃতি শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ না দিয়া হয়ত শিক্ষকগণ তাহাদিগকে অর্থকরী কার্যেই অধিককাল নিয়োজিত রাখিবেন। জাকির হোদেন কমিটি শিক্ষকদিগকে অর্থকরী শিল্পকাজের প্রতি পক্ষপাত-প্রবণতা সহজে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং অর্থপ্রসূ শিক্ষার বিধান দ্বিগুণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণ

কর্তৃক উপার্জিত অনির্দিষ্ট পরিমাণ আয়দ্বারা শিক্ষকের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে না। শিক্ষকগণ সরকারী তহবিল হইতে বেতন পাইবেন; ইকুলের উৎপাদিত জিনিসের মূল্য টেক্ষারিতে জমা দেওয়া হইবে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনাও বুনিয়াদি শিক্ষার ছাত্রের পরিগ্রহলব্ধ অর্থে শিক্ষার খরচ বহন করার প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা সমিতি বলিয়াছেন : খুব বেশি হইলেও এই আশা করা যায় যে, ইকুলে প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিল্পকার্যের জন্য অতিরিক্ত মালপত্র ও সরঞ্জামের যোগাড় হইতে পারে। কিন্তু আচার্য জে. বি. রূপালনী বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের আর্থিক আত্মনির্ভরতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। *The Latest Fad* নামক গ্রন্থে গান্ধীজীর ওয়ার্ডা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, শিল্পগত শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বাবলম্বন পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে আবদ্ধ। একটিকে বাদ দিলে কিম্বা একটিকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটিকে প্রাধান্য দিলে সমগ্র পরিকল্পনাই নিবর্থক, অচল হইয়া পড়িবে। তিনি লিখিয়াছেন :

Recently every educational conference, Central or Provincial, has recognised and recommended the principle of imparting education through craft work. But if there is any divorce between this and the principle of economic self-sufficiency, the scheme is bound to fail. If proper attention is not paid to the economic value of goods produced by the children, in course of time the value question will altogether disappear. (*The Latest Fad*, p. 69)

সম্প্রতি অল্পকাল প্রত্যেক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে শিল্পকার্যের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই নীতি হইতে আর্থিক স্বাবলম্বনের নীতি বিচ্ছিন্ন করিলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যের আর্থিক মূল্যের প্রতি নজর না দিলে কালক্রমে ইহার মূল্যের প্রশ্নই লোপ পাইবে। ক্রমে এই কাজের মধ্যে উদাসীনতা ও অবহেলা দেখা দিবে; বাজারের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করা হইতে হইলে যেরূপ যত্ন, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জিনিস উৎপাদন করিতে হইত, তাহা হইবে না। ফলে শিল্প শিক্ষা প্রাণহীন অবাস্তব কাজে পরিণত হইবে এবং শিল্প কাজকে কাঠামো করিয়া যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তোলার কথা, তাহাও স্থায়ী বা সুন্দর হইবে না। কিছু কাল পরে নৃতনত্বের ঝোঁক কাটিয়া গেলে, আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক বিদ্যালয়তনে যেরূপ ঘটিয়াছে, শিল্পকাজ অপ্রয়োজনীয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া বাদ পড়িয়া যাইবে।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পক্ষে যে আর্থিক আত্মনির্ভরতা অর্জন করা—অন্ততপক্ষে ইকুলে প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত

টীকায় শিক্ষকের বেতন চালান—আদর্শবাদের স্বপ্নসাধ নয়, পরীক্ষা কার্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ কর্তৃক পরিচালিত সেবাগ্রাম বুনিয়াদি ইকুলের ১৯৪৪ সালের বার্ষিক হিসাব হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা হইয়াছিল : প্রথম হইতে পঞ্চম মাস পর্যন্ত পাঁচ শ্রেণীর বিদ্যালয় ; প্রত্যেক শ্রেণীতে ৩০ জন ছাত্র। ১৯৪৩ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দশ মাসে ইকুলের কাজ ২২০ দিন। শিল্প কাজ দৈনিক গড়ে আড়াই ঘণ্টা। উৎপাদিত জিনিসের মোট মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ১২১৮৮০ অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ১২১৮৮/০। শিক্ষকের বেতন জন-প্রতি মাসে ২৫ টীকা ধরিলে ইকুল প্রায় আর্থিক স্বাভাব্য অর্জন করিয়াছিল বলিতে হইবে।

পরিকল্পনা পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হইলে অর্থাৎ সপ্তম মান পর্যন্ত চালু করা হইলে বিজালয় যে অগ্রনিরপেক্ষ হইবে তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সেবাগ্রামে স্বতাকাটা ও বয়ন প্রধান শিল্প হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালী অনুযায়ী নিম্নলিখিতগুলির যে-কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান চলিতে পারে :

- (ক) স্বতাকাটা ও বয়ন।
- (খ) কাঠের কাজ।
- (গ) কৃষি।
- (ঘ) ফল ও সজীর চাষ।
- (ঙ) চামড়ার কাজ।

এই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে (১) মাতৃভাষা, (২) অঙ্ক, (৩) ভূগোল ও পৌরজ্ঞান, (৪) সাধারণ বিজ্ঞান, (৫) চিত্রাঙ্কন, (৬) সঙ্গীত ও (৭) হিন্দুস্থানী ভাষা। মেয়েরা সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে পারিবারিক বিজ্ঞান বিশেষভাবে শিক্ষা করিবে।

পাশ্চাত্য দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মিল নাই। ভারতের স্থায় দরিদ্র, জনবহুল, কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বিজালয় পরিচালনার সম্ভাব্য নাই, প্রয়োজনও নাই। কৃষি এবং কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা, পুষ্টির স্বাস্থ্য, শোভন পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, রোগ প্রতিষেধ ও সূচিকিংসার বন্দোবস্ত করা—এক কথায় স্বাস্থ্যবান অন্তত সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন কর্মচঞ্চল অধিবাসী-অধ্যুষিত পল্লী গড়িয়া তোলাই দেশের অগ্রতম প্রধান সমস্যা। প্রতিভাবান শিশুদের উচ্চ শিক্ষা এবং বৃহৎ যন্ত্রশিল্প শিক্ষাকে উপেক্ষা করা

হইবে না কিন্তু উচ্চ শিক্ষার দিকে পক্ষপাত করিতে গিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করিলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ হইতে পারে না। স্বরাজ সাধনার জন্ত মহাত্মাজী যে গঠন-মূলক কার্যক্রমের নির্দেশ দিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার জিহ্বাবরণ। আচার্য রূপালনী বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার ব্রত লইয়া রাজনৈতিক জীবন শুরু করিয়া ক্রমে চরকা ও ধানি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, স্বাধীনতা এবং গ্রাম্য শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সর্বশেষে রচনা করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা। এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উপরই তাহার সমগ্র জীবন-সাধনা নির্ভর করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতের ভাবী নাগরিকগণ বিদেশী বণিকের শোষণযুক্ত, অগ্রদূতপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমাজ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। ইহাই স্ব-রাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান।

ভারতের শিক্ষা-প্রচেষ্টার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা সন্দেহে সার্জেন্ট পরিকল্পনা যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা প্রত্যেক ভারত-বাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হইয়াছে :

... in a country where apathy and inertia have reigned so long in the educational domain and where poverty has been the accepted excuse for leaving undone what ought to be done, a prodigious effort will be needed on the part of those responsible, both to set things going and to face the financial implications which such action will involve. Other countries, however, are already on the march towards the goal of social security and if India continues to evade her responsibilities in this respect, she must be content to relegate herself to a position of permanent inferiority in the society of civilised nations. (Italics ours.)

যে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা বহুদিন হইতে বিরাজ করিতেছে, যেখানে দারিদ্র্যের অজুহাতে কর্তব্য কাজ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে কার্যে ব্রতী হইতে এবং উদ্বেগ সাধনের জন্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে অমাত্রয়িক শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। অল্প সকল দেশ নিজ নিজ সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যে আগাইয়া চলিয়াছে ; ভারতবর্ষ যদি এখনও এই সঙ্কে তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে থাকে তবে বিশ্বের সভ্যজাতির সমাজে ভারতের ভাগ্যে হীনতর আসন চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

ভারতের নবজাগরণ শুরু হইয়াছে। বহুদিনের তন্দ্রাচ্ছন্ন যুক্তকল্প জাতির বুকে নবজীবনের জোয়ার আসিয়াছে ; দিকে দিকে তাহারই স্পষ্ট আভাস। এই মহাজাতির নব উত্থানকে পরম সার্থকতার দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে যে বিরাট জনগণ, তাহাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান বর্তমান ভারতের এক অনিবার্য কর্তব্য।

বুড়াবুড়ির তট

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বাংলার পুনরুজ্জীবিত লবণ-শিল্পের প্রসার পর্যবেক্ষণ করিতে সমুদ্রকূলস্থিত জেলাগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কক্স-বাজারের সন্নিকটস্থ মহিষখাল দ্বীপে, পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত আদিনাথ দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের পশ্চিম-সীমান্তে দিঘার নীলসাগর-জলে অবগাহন পর্যন্ত বাদ যাইতেছে না। এই ভ্রমণচক্রে সহসা কার্য্য উপলক্ষে ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের উপকূলে বঙ্গোপসাগরের একটি বারিবাছর মোহানায় বুড়াবুড়ির তটের সহিত পরিচয় ঘটে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন কি দূর স্থানে গিয়াছিলাম যে তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তার উত্তরে বলিব যে, বুড়াবুড়ি হয়তো দূরত্বে শত মাইলের বেশী নয় এবং এমন কিছু ছুঁমুঁও নয়, কিন্তু তার তীরে অতি অল্প লোকই পদার্পণ করে। অথচ সেখানে পৌঁছিলে দেখিতে পাইবেন দেড় শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন লবণপ্রস্তুতির চিহ্ন কিরূপ বিস্তৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

সুন্দরবন ডেপুট্য চ্ সার্ভিসের ঈমার বর্তমানে নিয়মিত ভাবে কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হইতে ছাড়ে। প্রায় প্রতিদিনই আশ্মেনিয়ান, জগন্নাথ ঘাট ও নিমতলা ঘাট হইতে ভোর রাত্রে জাহাজ ছাড়ে। লেখক সম্ভ্রান্তি এক দিন রাত্রে গিয়া আশ্মেনিয়ান ঘাটের 'গাইরালা' ঈমারে একটি কেবিন দখল করিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে 'গাইরালা' একটি ক্ল্যাট লইয়া অতি ধীরে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। সারাদিন গঙ্গার হাওয়া এবং সঙ্গের শুক খাবার খাইতে খাইতে যাওয়া গেল। অপরাহ্নে কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের উত্তরাংশে শিকারপুরের মুখে বারতলা বা মুড়িগঙ্গাতে (Channel creek) পড়া গেল। সায়াহের কিছু পূর্বে বারতলা ছাড়িয়া 'গাইরালা' জাহাজ নামখানার মুখে হেতালিয়া ক্রীকে প্রবেশ করিল। নামখানা একটি ঈমার ষ্টেশন। ইহার অবস্থানটি বড় ভাল লাগিল—নামখানা খাল ও হেতালিয়ার সম্মুখস্থ এই গওগ্রামটি সুন্দরবনের আবাদ বিস্তৃতির ফলে বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিসের দুই দ্বিতল ইমারৎ মুড়িগঙ্গা হইতে ভারি সুন্দর দেখাইতে থাকে। সুন্দরবন ফরেষ্ট ডিভিসনের নামখানা রেঞ্জের আপিস এবং সাপ্লাইয়ের আপিস থাকাতে নামখানার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। নামখানা ফরেষ্ট রেঞ্জ পাথর, প্রতিমা, শিকারপুর, নলখোঁরা এবং কুলতলা 'ফরেষ্ট' আপিস ও সুন্দরবনের কতকগুলি জঙ্গলের উদ্বৃত্ত কুপ (coupe) কন্ট্রোল করে।

নামখানা হইতে ঈমার বরাবর পূর্বাভিমুখে যাইতে লাগিল। হেতালিয়া খাল সরু হইলেও গভীর, সেজন্ত ইহাই সুন্দরবনের জলপথে, খুলনা চাঁদপুর ও আসাম বা কাছাড়

যাইবার এখন একমাত্র পথ। হেতালিয়া নদীর পূর্বমুখ সপ্তমুখীতে। সপ্তমুখী বেশ চওড়া নদী, সমুদ্রের সহিত যুক্ত এবং উত্তরভাগে কোন বিশেষ মিঠা জলের নদীর সহিত সংযুক্ত নয় বলিয়া ইহার জল কম ষোলা কিন্তু লোনা বেশী—গঙ্গার মত নহে। রাক্ষসখালি ও তমলুকের দ্বীপের (Lothian Island) গভীর অরণ্য দুই পাশে রাখিয়া চলিয়াছি—পছনে শূর্য্য কখন অস্ত গিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনায়মান। সারেঙের পাশে বসিয়া উপর হইতে তমলুকের দ্বীপের স্থাপদ-সঙ্কুল বনভূমি লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। মনে পড়িল বঙ্গের লবণশিল্প প্রসার-প্রয়াসের অন্ততম বিরুদ্ধবাদী পিট সাহেব এই দ্বীপটিতে লবণ-কারখানা বসাইবার কথা বলিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার বন জঙ্গল কাটিয়া কত দিনে তা সম্ভব হইবে বলা দুঃস্বপ্ন। দ্বীপটি বেশ বড়, ইহা বরাবর সপ্তমুখীর পশ্চিম তীর ধৈমিয়া সমুদ্র পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আগাগোড়াই নিবিড় বন—মাঝে একটি খাল আছে—সেই খালের ধারে ধারে দুই-এক 'চেন' দূরত্বের ভিতর বাওয়ালিরা লুকাইয়া কিছু গাছ-গাছড়া নষ্ট করিয়াছে। এই অরণ্যখণ্ডকে লটে বিভক্ত করিয়া জমিদারদের আবাদ না করিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। তাহা না হইলে এই ২৪ পরগণার অন্ততম অরণ্যসম্পদ কবে সাগর, জেজারগঞ্জ, ঢাংনাল প্রভৃতির মত ধাতক্ষেত্র ও লোকবসতিতে পূর্ণ হইয়া যাইত।

সপ্তমুখী হইতে রাক্ষসখালির দক্ষিণে হাবিলা ক্রীকে 'গাইরালা' প্রবেশ করিল এবং প্রায় ঘণ্টা দুই পর বারছড়ার কিছু আগে দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণপুর খালের মুখে নামাইয়া দিল। স্থানীয় লটদারের কাছারি বাড়ীতে গিয়া উঠা গেল। পরদিন প্রভাতে একটি ছোট ডিঙ্গি করিয়া পাথরপ্রতিমা আসিলাম। হাবিলা নদী দিয়া দেখিলাম গর্জন, গরাণ, বায়েন, গঙ্গয়া প্রভৃতি কাঠ (টিয়ার বা জালানির জন্ত) বোঝাই করিয়া নৌকা আসিতেছে দেখি। বাতাসে পাল তুলিয়া। ইহারা আসিতেছে বেশীর ভাগ, বসিরহাট, খুলনার জঙ্গল হইতে। পাথরপ্রতিমা, বনজামনগর, মাধবনগর প্রভৃতি পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া মনে হইল না যে, সুন্দরবনের মধ্যে রহিয়াছি। বন কাটিয়া ধানচাষের এমন আবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে এদিকে সাধারণ পল্লীগাম অপেক্ষাও স্থানে স্থানে বৃক্ষের একান্ত অভাব চোখে পড়ে। লোনা জলকে অবরোধ করিতে এবং শতভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে কয়েক স্থানে খাল পর্যন্ত বন্ধ করা হইয়াছে—ইহাতে লবণ প্রস্তুতি-বুদ্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে খালের নিত্যন্ত অনটন হওয়াতে এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিতে

সাহস হয় না। কিন্তু পূর্বে যখন আবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন আমার মনে হয় অরণ্যসম্পদ এবং লবণাক্ত ভূমিকে একেবারে নিঃশেষ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

পানীয় জলের জন্ত নামখানার পর কয়দিন কোন টিউবওয়েল পাই নাই। জল ফুটাইয়া খাওয়া ছাড়া উপায় নাই। জমিদারবাবুরা প্রজা বসাইয়া নিশ্চিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের সূত্র-সুবিধার জন্ত নলকূপ খনন করা, দাতব্য চিকিৎসালয় করা বা পথঘাট নির্মাণ করা এসব বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট পড়ে নাই। এই অঞ্চলে অর্থাৎ কাকদ্বীপ, সাগর এবং মধুরাপুর ধানার অন্তর্গত অংশের জমিদার, লটদার এবং প্রজারা প্রায় সকলেই মেদিনীপুরবাসী।

পাথরপ্রতিমার ফরেষ্টবাবুর কাজ বাওয়ালীদের নিকট 'রয়েলটি' আদায় করিয়া ছাড়পত্র দেওয়া। ইহার উন্মুক্ত রূপে (coupe) মার্কামারা গাছ কাটিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া দূরাঞ্চলে লইয়া যায়। নৌকার মালবহন-ক্ষমতা অল্পযায়ী রয়েলটি দিতে হয়। বর্ষা হইতে কাঠের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ইহাদের বাজার খুব গরম গিয়াছে। জালানি কাঠ পর্যন্ত সন্নিকটস্থ বাজারে, কি খুলনায় কি ফলতায় দেখিয়াছি এক শত মণের এক শত টাকা দর গিয়াছে। বুঢ়া বাজারে দুই টাকা পর্যন্ত এক মণ জালানি কাঠের দাম উঠিয়াছে।

পাথরপ্রতিমার প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে বুড়াবুড়ির তট একেবারে সমুদ্রের উপর—যেখানে পশ্চিম পাশে সপ্তমুখীর মোহানা এবং পূর্বে দিকে জগদল ও ঠাকুরাণ নদী সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। হাঁটাপথে গেলে কার্জন ক্রীক পার হইতে হয় বলিয়া আমরা নৌকায় গিয়াছিলাম। সেই দিন রাতেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বোটের ছাউনির তলায় শয্যাগ্রহণ করা গেল। ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎস্নার আলোয় বেশ নির্বিঘ্নে সপ্তমুখীতে আসিয়া পড়া গেল। এইবার গন্তব্যপথ ছাড়িয়া প্রায় দক্ষিণ-দিকে নদীর মোহানার উদ্দেশে চলিতে সুরু করিল। সপ্তমুখী এইবার বিশেষ চওড়া হইয়া গিয়াছে—কিছুক্ষণ বেশ নিরাপদে গৌচ মারিয়া মারিয়া নৌকাকে মন্থরভাবে সর্পগতিতে লইয়া যাইতেছিল। সহসা বাতাস বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ভাঁটার স্রোতের সহিত ইহার সংঘর্ষের ফলে তরঙ্গের আধিক্য এবং উচ্চতা বিশেষ উপলব্ধি হইল। চটপ্রায়ে একবার শঙ্খ-নদীতে ক্ষুদ্র একটি শাম্পানে এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মাঝি বেগতিক দেখিয়া সেবারে নৌকা কূলে ডিঙাইয়া আমাদের নামাইয়া দেয়। এক্ষণে হাজার মণী বজরাও দেখি রীতিমত লাফাইতে সুরু করিয়াছে। আরও মুশকিল হইল চত্রেয় ক্ষীণ আলোয় মাঝিরা গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। সহযাত্রীরা বলিলেন, একেবারে 'বাহির'-সমুদ্রে আসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

যাহা হউক ভাগ্যক্রমে তৎক্ষণাৎ দিকনির্ণয় এবং চ্যাংনানের খাল কাঁকড়ামারীর মুখে একটি একাকী দণ্ডায়মান বিটপীর চিহ্ন নজরে পড়ায় নৌকাযাত্রীরা সকলে যেন নিশ্চিত হইলেন অনেকটা। কিন্তু দুরন্ত বাতাস ও ভাঁটার গতি উভয়কে সামাল দিয়া খাড়ির মধ্যে ঢুকিতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত্রি তিনটায় আমরা কাঁকড়ামারি খালে কিয়দূর গিয়া নৌকা নোঙ্গর করিয়া পুনরায় নিজার আয়োজন করিলাম। নৌকার হোগা লার ছাউনির কাঁক দিয়া দেখিলাম পশ্চিমে হেলিয়া-পড়া চত্রেয় কিরণ সপ্তমুখীর নীল জলে চিকিমিকি খেলিতেছে। কিন্তু স্থিতির আলোকে উঠিতে আর ইচ্ছা হইল না—যদিও মন চাহিল বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির এই মধুর দৃশ্য উপভোগ করিতে। ফাল্গুনের বাতাসও রাত্রিশেষে বিশেষ ঠাণ্ডা মনে হইতেছিল—কমল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম সংক্ষিপ্ত শয্যাটিতে।

দিনের আলো ফুটিতেই নৌকা হইতে নামিয়া বালুময় নদী-তীর দিয়া গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে প্রবেশ করা গেল। গ্রাম বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে—নিতান্ত কয়েক ঘর বহিরাগত কৃষকের বাসভূমি এবং দিগন্তব্যাপী শস্তক্ষেত্র। মাঝে মাঝে খাল ও পুকুরিণী—পথ বলিতে বাঁধের উপর দিয়া বা ধানজমির আলোর উপর দিয়া যে মেঠো পথ সুরু হইয়াছে তাহাই। এই পথ ধরিয়াই বুড়াবুড়ির সমুদ্রতটে পৌছিলাম। তটদেশ এখনও বনভূমি—আবাদ এত দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই স্থান রেভিনিউ ম্যাপে জি প্লট পঞ্চম খণ্ড (গোবর্দ্ধনপুর) এবং জি প্লট ষষ্ঠ খণ্ড নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাদের আদি নাম যথাক্রমে বুড়া, বুড়ি। তটদেশ দিয়া ভ্রমণ চলিল না, কারণ বুড়ি একেবারে জঙ্গলপূর্ণ—গাছের শিকড়গুলির উপর অবিরাম সাগরের জল আছাড় থাইতেছে, সেজন্ত তটপ্রান্তস্থিত বৃক্ষ-গুলির তলা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। এই ষষ্ঠ খণ্ডে লবণপ্রস্তুত করিবার কারখানা বসানো চলে কি না তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম।

স্থানীয় অধিবাসীরা যে লোন মাটি হইতে এখানেও ১৯৩০ সাল থেকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিবে। কিন্তু বুড়াবুড়ি যে এক সময়ে শতবর্ষেরও পূর্বে লবণ-শিল্পের অত্যন্ত কেন্দ্র ছিল তাহা বোধ করি বর্তমানে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, কারণ উত্তর-দিকে আবাদ এবং দক্ষিণ দিকে নিবিড় অরণ্য—রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রভৃতির আবাসস্থল। মধ্যাহ্নের প্রথর রৌদ্রে দল পাকাইয়া বনের মধ্যে ঢুকিলাম। কোন পশুর সাক্ষাৎ মিলে নাই বটে, কিন্তু বহু স্থানে শতাধিক বৎসরের পুরাতন লবণ প্রস্তুতির চিহ্ন চোখে পড়িল। মলঙ্গীরা যে চুল্লীতে লোনাড়ল জাল দিত সেই সব চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ এবং অসংখ্য ভাঙা ভাঁড় খুরি শুপাকারে মাটির গাদার সহিত পড়িয়া আছে। কবে কতকাল পূর্বে মলঙ্গীরা এইগুলিকে ফেলিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গিয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়

নিষেধ আইন পাস হইবার সময় ১৭৯৩ সালে। দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে এগুলি নিমক এজেন্সী রিপোর্ট-বর্ণিত পিরামিড আকৃতির চুল্লী ছিল—যাহার উপর তিন-চারি থাক্ গোল সারিতে ভাঁড়গুলি সাজাইয়া দেওয়া হইত। এই ফার্নেস সম্বন্ধে পূর্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছি সেজন্য বিশদ বিবরণ দিলাম না। তাহার ছবিও ঐ সঙ্গে ছাপা হইয়াছিল। রেলিক্ হিসাবে একটী গোটা যুগপাত সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্বে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম উড়িষ্যার দেবমন্দিরের ভোগ রন্ধনে যেরূপ মাটির ভাঁড় ব্যবহার হয় ঠিক সেইরূপ (u) ইউ আকারের মত। ছোট ধরণের এক একটিতে খেপে খেপে এক সের পর্যন্ত লোনা জল ধরিতে পারিত। যতক্ষণ না প্রায় কানায় কানায় লবণ পড়িত, জাল দিবার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাতে লোনা জল ঢালা হইত।

বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রাচীন লবণ শিল্প তৎকালীন অরণ্য-পূর্ণ সুন্দরবনের একেবারে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া-ছিল। কোথায় নালুয়া মথুরাপুর আর কোথায় বুড়াবুড়ির তট। ২৪-পরগণা এজেন্সীর অধীনে পশ্চিম সুন্দরবনের সমগ্র তটভূমি ও তৎসম্বন্ধিত স্থানসমূহে লবণশিল্পের প্রসার ঘটে সম্ভবতঃ তমলুকের দ্বীপ, ধক্ষি, বিজারিয়া প্রভৃতি বাদে। সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, বুড়াবুড়ি, বুলছরি, গুর্দা এবং গোমাবার পূর্ব তীর-স্থিত স্থানগুলিতে রীতিমত লবণের চাষ হইত। কারণ এই সমস্ত স্থানে শুধু তার চিহ্ন পাওয়া যায় নাই বর্তমানে তাহার পূর্ণ বিকাশও ঘটিয়াছে। বগ্‌খালি দ্বীপেও ইহার প্রসার ঘটিয়া-ছিল বলিয়া মনে হয়। আবাদের সৃষ্টি হওয়ায় সে সব চিহ্নের অস্তিত্ব নাই কিন্তু মাটি খনন করিলে তাহা পাওয়া যায়। বুড়া-বুড়ির বর্তমান অধিবাসীরা বনের ভিতরকার একটী খালকে বিস্কুটের খাল বলে, কারণ এই খালের ধারে এক স্থানে কোম্পানীর এজেন্সির নাকি খাণ্ড-রসদের একটী কুঠি ছিল। খালের নামে বিস্কুট কথা যুক্ত থাকাতে এই কিংবদন্তী অবিশ্বাস করিলাম না।

বুড়াবুড়ি সম্ভবতঃ এক সময় জলপাই জমির মতন জঙ্গল এবং ফাঁকে ফাঁকে চরভূমিযুক্ত ছিল। চরে 'চাতর' বানাইয়া লবণের চাষ চলিত এবং বন হইতে লোনা জল জাল দিবার জালানি মিলিত। লোনা জল পরিশুদ্ধির দবারীগুলির কোন

চিহ্ন নাই। চাতরগুলিও কালের স্রোতে প্রায় পুরি বর্ষার জলে আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে। মলঙ্গীদের পরিত্যক্ত এই চরে কবে আবার লবণের চাষ পুরাতাত্ত্ব্য হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এডেন ও পোর্ট সৈয়দের করকচ লবণ যত দিন বঙ্গের বাজার মুঠার মধ্যে রাখিবে তত দিন নহে।

২৪-পরগণা এজেন্সী কোম্পানীর আমলে গড়ে প্রতি বৎসর ৮ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করিত। ১৮৪৮ সালে এজেন্সী সিস্টেম বন্ধ হইবার পরও কিছু দিন ইহার কাজ চলিয়াছিল এবং প্রায় সিপাহীবিরোধের সময় পর্যন্ত সুন্দরবনে লবণশিল্পের অস্তিত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিদেশী লবণের আমদানিতে লোপ পাইতে বসে। এই এজেন্সীতে (প্লাউডনের রিপোর্ট অনুযায়ী) ৮টি হুদা ছিল যাহার আয়তন ছিল ২৭ হাজার বিঘার বেশী। হুদা বলিতে আড়ঙের বিভাগ বুঝায়। হিজলী এজেন্সী ছিল কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বড় লবণ-ডিপ্লিট। ইহার ছিল ছয়টি আড়ং : ১। বীরকুল (দীঘা), ২। বাহিরমুঠা, ৩। নারায়ণ-মুঠা, ৪। এড়িং, ৫। মজনা মুঠা এবং ৬। বাঘরাই। এই ছয়টি আড়ঙে সর্বসমেত ৮৩টি হুদা ছিল। ইহার মোট বাৎসরিক প্রস্তুতি ছিল ১১ লক্ষ মণ। এক একটী হুদা একজন হুদাদারের পর্যাবেক্ষণে থাকিত। তাহার অধীনে চরে চরে চাতর বানাইয়া মলঙ্গীরা লবণের চাষ করিত এবং নিকটস্থ চুল্লীতে চুল্লীতে মাহিঙ্গরা লোনা জল জাল দিত।

বাংলায় ছয়টি এজেন্সী ছিল : ১। হিজলী, ২। তমলুক, ৩। ২৪ পরগণা, ৪। রায়মহল (যশোহর-খুলনা) ৫। ভুলুয়া, ৬। চটগ্রাম। যশোহর এজেন্সী ১৮২৬ সালে উঠিয়া যায়। ভুলুয়া ১৭৮০ সাল হইতে মাত্র ৫০ বৎসর চালু ছিল। ভোলা, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মনপুরা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮১৯ সালে ওয়ালটার বলিয়া জনৈক এজেন্ট ভুলুয়ার একটী লবণ প্রস্তুতির হিসাব দিয়াছিল তাহাতে দেখা যায় হাতিয়া ১ লক্ষ মণ, সন্দ্বীপ ২০ হাজার মণ, বামুনী ২০ হাজার এবং মেঘনার অত্যন্ত দীপগুলিতে প্রায় ৬০ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০ হাজার জন মলঙ্গী এখানে কাজ করিত। মলঙ্গী কথটি নোয়াখালিতে গালি হিসাবে বর্তমানে ব্যবহার হইলেও ইহারাই এক সময় ৩ লক্ষ মণ প্রস্তুত করিয়াছিল।



রাসায়নিক কারিগর “এনজাইম”

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

অতি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জীব ও গাছপালার শরীরে এনজাইম (Enzyme) নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। দেহের পরিপুষ্টির ব্যাপারে ও অত্যন্ত বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এনজাইমের বহু-বিধ দান আছে। উহাদের গঠন ও প্রকৃতি অল্পসন্ধানের জন্ত আজকাল জৈব রাসায়নীগণ (organic chemists) অত্যন্ত তৎপর হইয়াছেন। পরিষ্কার রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে উদ্ভূত করাই ইহাদের ধর্ম। কিন্তু ইহাও সত্য, উহারা নিজেদের শরীরটিকে ভাঙিয়া উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বিলাইয়া দেয় না, কেবল মাত্র উপস্থিত থাকিয়া কার্যের সহায়তা করে। রসায়নে এরূপ প্রক্রিয়াকে অণুঘর্ষণ বা কেটালিসিস বলে এবং এক্ষেত্রে এনজাইমটিকে বলা হয়—অণুঘর্ষক বা কেটালাইটিক্ এজেন্ট। স্বচ্ছলতা, জীব বা কীটপুং নির্ঘাস হইতে এনজাইম সংগৃহীত করা যায়। এনজাইমকে পূর্বে কেহ কেহ প্রাণবন্ত মনে করিত। বর্তমানে রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ফারমেন্ট বলিয়া অভিহিত করেন, এজন্য অতি ক্ষুদ্র জীবাণুদের বলা হয় জীবন্ত ফারমেন্ট। আধুনিক রাসায়নিক অল্পসন্ধানের ফলে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এনজাইমগুলি প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার প্রোটিন। যদিও প্রোটিনের গঠনভঙ্গী ও অত্যন্ত বহুবিধ রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি আজ পর্যন্ত এনজাইম সম্বন্ধে ততটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদ্ব্যাসন্ধান হয় নাই।

এনজাইমগুলির প্রত্যেকের মধ্যে একটি সুন্দর গুণ প্রকটিত আছে। • উহারা সকলে সমান ভাবে সকল বস্তুর উপর রাসায়নিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উক্ত কাজ সাধন করিবার জন্ত প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ শরীর পছন্দ করে। যেমন সমস্ত চাউনি সকল তালার প্রযোজ্য নয়, তজ্জপ সমস্ত এনজাইম সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যে ক্ষেত্রে একটি এনজাইম কর্মতৎপর সেই ক্ষেত্রে অগ্ণান্য এনজাইম দর্শকমাত্র। এই কর্মতৎপরতাও আবার কেটালাইটিক এনজাইমের কর্মবৈশিষ্ট্য অধিক তাপে নির্ধারিত হয়। এমন কি যে বস্তুটির উপর ইহাদের রাসায়নিক প্রভাব পরিচালিত হয় তাহাদের মাত্রাধিক্য সময় সময় ইহাদের বল ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এনজাইমগুলিকে এক প্রকার রাসায়নিক কারিগর বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাহারও কাহারও সঙ্গীকরণে কো-এনজাইম নামে আর একটি কারিগর থাকে। ইহারা সর্বক্ষেত্রে একযোগে কাজ করে এবং প্রত্যেকটি রাসায়নিক ফলাফলের জন্য উহারা দায়ী।

রাসায়নিক জগতে মানুষের গবেষণাগারে কত সব অদ্ভুত কর্মধারা ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাতে অহঙ্কারী মানুষ নিজেকে পরম জ্ঞানী রসায়নী মনে করিলেও তাহার চেয়ে সেরা কোন রসায়নী আছেন। এই অজ্ঞাত রসায়নীর হাতের নিপুণ রচনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহার চরণতলে মাথা আপনিই লুটাইয়া পড়ে। বিজ্ঞানী বলিতে পারেন এ সমস্ত প্রাকৃতিক রচনা সবই স্বভাবের ফল, কোন গোপন হস্তের ইঙ্গিত করা মুর্থতার পরিচায়ক। যদি তাই হয়, ঐ স্বভাবকেই আমরা প্রণাম করিব। উহার প্রেরণায় ক্ষুদ্র এনজাইমগণ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পুষ্টিসাধন করিতেছে তাহা অতীব অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহে হজমক্রিয়া সাধিত হয় তাহার পিছনে এই এনজাইমগণ। ডায়াষ্টেজ বা এমাইলেজ নামক এনজাইমটি মণ্ট, ইষ্ট্ এবং আমাদের মুখলালা ও ক্রোমসের মধ্যে বর্তমান। ইহারা অতি নৈপুণ্যের সহিত খেতসারকে শর্করার রূপান্তরিত করে। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য আহার করি তাহা দেহমধ্যে ক্রমশঃ এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আমাদের জন্ত বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কতকগুলি এনজাইম ঐ সমস্ত কোষ্ঠায় বসিয়া উক্ত কার্য সাধন করে। প্রথমতঃ, মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র এমাইলেজ ও টায়ালিন নামক দুইটি এনজাইম খেতসার পদার্থকে খণ্ডিত করিয়া অনেকটা শর্করায় পরিণত করিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার পথ সহজ করিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য এই প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বা পাকস্থলীতে উপনীত হয়। সেখানে পৌছানো মাত্র পাকস্থলী হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গে মিলিত হয়। পেপসিন ও রেনিন নামক এনজাইমদ্বয় এই রসের প্রধান কর্মী। ইহাদের প্রধান কাজ প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে ভগ্ন তথা হজম করিতে সহায়তা করা। পেপসিন পেপের রসে বর্তমান। এজন্য প্রোটিন মাংস রান্না করার সময় পেপের রস মিশ্রিত করিলে মাংস অতি সহজ পক্ক হয়। আমাদের খাতের দুইটি প্রধান উপাদান খেতসার ও প্রোটিন। এভাবে পাকস্থলী ও মুখের নিপুণ কারিগরের কেরামতিতে বহুলাংশে হজমের উপযোগী হয়।

উক্ত অর্ধ পক্ক ভুক্তদ্রব্য তৎপর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ বা ক্ষুদ্রান্ত্রে উপনীত হয়। এই স্থানে যক্ষ্ম হইতে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় হইতে অগ্ন্যাশয় পাচক রস ও ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত হয় এবং উহাকে সম্যক পরি-

পাক করিতে সহায়তা করে। অগ্ন্যাশয় পাচকের মধ্যে তিনটি এনজাইম টি পসিন, এমাইলেজ ও লাইপেজ বাস করে। এই তিনটি এনজাইম এই প্রকোষ্ঠের প্রধান কর্মী। খেতসার ও স্নেহ পদার্থ সম্পূর্ণ হজমের উপযুক্ত করিতে ইহারা বিশেষ পারদর্শী।

ইন্ডারটেজ নামক অপর একটি এনজাইমও মনুষ্য-শরীরে বর্তমান। ইষ্ট ও বৃক্ষপত্রও ইহা পাওয়া যায়। ইন্ডারটেজ ইক্ষু-শর্করাকে গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে। আমরা ইক্ষু-শর্করা গ্রহণ করি সত্য কিন্তু ইহারা গ্লুকোজের রূপ না পাইলে হজম হয় না। উক্ত ইন্ডারটেজ চিনিকে হজমের উপযুক্ত করিয়া দেয়। মণ্টেজ নামক আর একটি এনজাইম মণ্ট, ইষ্ট ও মনুষ্যদেহে অবস্থান করে। ইহা মণ্টোজ নামক এক প্রকার শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। রক্ত যাবতীয় গ্লুকোজকে গ্রহণ করিয়া অক্সিজেনের নিকট যাইতে দেয় এবং উদ্ধৃত তাপ শরীরের তাপ ও শক্তি রক্ষা করে।

গ্লুকোজকে ভাঙিবার জন্ত জাইমেজ নামক এক প্রকার এনজাইম পাওয়া যায়। ইহাদের কাজ গ্লুকোজকে সুরাসারে পরিণত করা। জাইমেজ ইষ্টের মধ্যে প্রচুর আছে। কাজেই ইষ্টের সাহায্যেই যে মদ তৈয়ার করা সর্ব্বৈব সুবিধা তাহার আর সন্দেহ নাই। ইষ্ট ইন্ডারটেজ ও জাইমেজ উভয়ই বহন করে। সুতরাং ইষ্ট চিনির সংস্পর্শে রাখিলে ইন্ডারটেজ কারিগরগণ প্রথম দফা তাহাদের কাজ সাধন করে অর্থাৎ চিনিকে গ্লুকোজে পরিণত করিয়া থাকে—তাপের দ্বিতীয় কারিগর জাইমেজগণ তাহাদের কাজ আরম্ভ করে এবং গ্লুকোজকে সুরাসারে পরিণত করিয়া অভীষ্ট কল দান করিয়া থাকে।

বর্তমানে খেতসার হইতেও মদ প্রস্তুতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে প্রথমতঃ খেতসারকে মণ্টের সংস্পর্শে আনা হয়।

মণ্টের দুইটি এনজাইম—ডায়াস্টেজ ও মণ্টেজ তখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটি খেতসারকে মণ্টোজ রূপ দান করে। দ্বিতীয়টি তখন মণ্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। মণ্টের কারিগরগণ এইখানকার কাজ শেষ করে। এখন ইষ্ট কারিগর জাইমেজের সহায়তা প্রয়োজন। জাইমেজ আসিয়া গ্লুকোজকে মদে পরিণত করার ভার গ্রহণ করে। সোজা কথায় বলা যায় যে, চাউল আটা ময়দা আলু প্রভৃতি খেতসারযুক্ত পদার্থগুলি মণ্ট ও ইষ্টের যুক্ত প্রেরণায় যে সুরাসার রূপ গ্রহণ করে তাহার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আসল কার্য সম্পন্ন করে এক দল এনজাইম।

সমস্ত এনজাইমের কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শেষ করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে উহাদের শ্রেণী বিভাগ করিলে দাঁড়ায় এই :

১। এনজাইম যাহারা প্রোটিনকে খণ্ডিত করার ব্যবস্থা করে—পেপসিন, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

২। যাহারা চর্বিতে বিভক্ত করে—লাইপেজ।

৩। যাহারা কার্বোহাইড্রেটকে আক্রমণ করে—অক্রেজ মণ্টেজ ইন্ডারটেজ সায়োজ ইত্যাদি।

৪। যাহারা চাকা বাঁধাইবার সহায়তা করে—থুম্ব্রেজ, বেগিন।

৫। যাহারা অক্সিজেনকে অপর পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট করায়—অক্সিজেন।

৬। যাহারা হাইড্রোজেনকে প্রবিষ্ট করায়—রিডাক্টেজ।

৭। যাহারা কার্বনিক এসিড গ্যাস উৎসৃত করে—জাইমেজ।

৮। যাহারা বড় বড় আকারের রাসায়নিক পদার্থকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করে—ল্যাক্টেজ।

৯। যাহারা আভ্যন্তরিক গঠনের পরিবর্তন করে—মিউটেজ।

মার্কিন ঔপন্যাসিক ডন্স প্যাসন্স

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিকদের সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়েন তাঁরা—যাঁরা কল্পলোকের গজদন্ত-মিনারবাসী এবং যাদের নায়ক-নায়িকা এত বেশী স্বপ্নবিলাসী যে প্রাত্যহিক জগতের আলোড়ন ও আক্ষেপ তাঁদের জীবনে কোন স্পন্দন আনে না। দ্বিতীয় দলভুক্ত সেই সব ঔপন্যাসিক—যাঁরা ঝড়-ঝঞ্ঝাময় দৈনন্দিন জীবনের সহিত এরূপ নিবিড় ভাবে সংযুক্ত যে, আধুনিক দৃষ্টময় জীবনের দৈন্য অভাব হতাশা এবং অত্যাচার সম্যক্রূপে তাঁদের উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করে। তাঁরা শুধু ব্যক্তি-সমাজকে দেখেনই না, সমাজের যে

সমস্ত সমস্ত, যে সমস্ত অভাব-অভিযোগ সেগুলিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করেন এবং হয়ত বা কিছু মাত্রায় নীতিবাণীশ হয়ে, সে ক্রটিগুলির প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণ করেন। সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা করেন তীব্র প্রতিবাদ—যেমন শরৎচন্দ্র করেছিলেন। এর দ্বারা আমি একথা বলছি না যে তাঁরা সর্ব্বদা সমাজ-সচেতন হয়েই লেখেন—তাঁদের উপন্যাস সেরূপ দলগত হয়ে ওঠে না। সমাজের থেকে কোন চিন্তাশীল মনের উপর যে প্রভাব অবস্থগতাবী, এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা সেই প্রভাব-সচেতন হয়ে ওঠেন।

এই দুই শ্রেণীর ভিতর হয়ত আরও শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন যাদের লেখায় লেখকের সহায়ত্ব প্রকাশ পায়; অত্যাচারী শুধু কিছু মাত্র তীব্র অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দ্বারা সেই সমস্তকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর লেখকের নিরীক্ষণ-শক্তির পরিচয় মেলে—চরিত্রের উপর তিনি নিজের কল্পনার পৌঁচ লাগান না; ঘটনার স্রোতে চরিত্রগুলি আপনি গড়ে ওঠে, আপনি ভেঙে যায়। তাদের পিছনে কোন নীতি বা দুর্নীতি নাই, কারণ কোনটা নীতি বা কোনটা দুর্নীতি লেখক তার বিচারক নন। ঘটনা-পরম্পরায় চরিত্রের প্রকাশই তাঁর উদ্দেশ্য—তাদের কর্তব্যের মূল্য নির্ণয় করা তাঁর লক্ষ্য নয়। জীবনের ঘোষণা অপেক্ষা জীবনের প্রকাশ তাঁদের কাছে অধিকতর মূল্যবান।

এই শেষোক্ত দলের ঔপন্যাসিকদের ভেতর আধুনিক আমেরিকার একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়। তিনি ডস্‌ প্যাসস্‌। অবশ্য কোন উচ্চ শ্রেণীর লেখককে বিশিষ্ট দলভুক্ত করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। সে কথা জেনেও যে প্যাসস্‌কে এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত করা হ'ল তা শুধু তাঁর কৃতিত্বকে সহজবোধ্য করবার জন্তে।

ডস্‌ প্যাসস্‌ একজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন লেখক। তিনি শুধু সমাজে বাসই করেন না—সমাজের ভেতর যে গতি আছে সেই গতির সহিত তাঁর নাড়ীর যোগ। সমাজের অত্যাচার-অনাচারের কাতর-ধ্বনি তাঁর চিন্তাশক্তিকে বেষ্টী আন্দোলিত করেছে তাঁর মনের চেয়ে। তিনি তার অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ করে জানবার চেষ্টা করেছেন এমনটি কেন হয়? মাহুষে মাহুষে কেন এত ভেদাভেদ, কেন এত স্বার্থ-পরতা—হিংসা? এর ভেতর হৃদয়বেগের স্থান ততটা নাই যতটা আছে সমগ্র মননশক্তিকে বিক্ষুব্ধ করবার শক্তি এবং প্যাসস্‌র সমগ্র মননশক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এই সমস্যার দ্বারা অভিভূত হন নি—সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির যেরূপ হওয়া উচিত—তিনি হয়েছিলেন সেইরূপ এবং সেইজন্ত তাঁর সমস্ত রচনায় সমাজের প্রতি বিদ্রোহের বাণী বেজে উঠেছে। বহুদেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন, মাহুষকে তিনি দেখেছেন নানা দেশে, নানা বেশে ও অবস্থায়। তবুও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে দেশকালভেদে বাহ্যিক যতই বৈষম্য থাকুক না কেন, মাহুষের যে চিরন্তন অভাব-অভিযোগ, যে হাহাকার, যে ক্রন্দন তা সর্বদেশের এবং সর্বকালের এবং সেইজন্তে তাঁর বর্ণিত ঘটনার ভেতর, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রের উপর “সবার উপর মাহুষ সত্য তাহার উপর নাই”—এই বাণীর চিরন্তন সত্যতার ছাপ স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত। কি সমসাময়িক জীবনের প্রতিবিম্ব রূপে, কি শিল্পীর মননশক্তির পরিচয় রূপে, কি শিল্পীর নিছক শিল্প-প্রতিভা রূপে

যে ভাবেই তাঁর রচনাকে বিচার করা হোক না কেন, তাতে এক অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করা যায়।

তথাপি তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। একজন বলেছেন যে তিনি নিছক কল্পনাবিলাসী এবং কল্পনার রঙীন চশমা দিয়ে তিনি সমগ্র সভ্যজগৎকে দেখেছেন। আর একজন বলেন যে; তিনি আসলে রূঢ় বাস্তববাদী। তৃতীয় জনের বক্তব্য এই যে, তাঁর ভিতর আমরা উপরোক্ত দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখতে পাই। এক হিসাবে হয়ত তিন জনই সত্য কথাই বলেছেন। কারণ, প্রথমতঃ কোন যথার্থ ঔপন্যাসিককে বিশেষ কোঠায় ফেলা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, যে-কোন শক্তিমান লেখকের ভেতরেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখে তাঁর প্রতিভার বিরাটত্বের পরিচয় লাভ করি। রবীন্দ্রনাথও কি আমরা এরূপ বহু-বিচিত্রের সংমিশ্রণ পাই না?

আমেরিকায় প্রসিদ্ধ নগরী চিকাগোতে ১৮৯৬ সালে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে ডস্‌ প্যাসস্‌র জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ ফিলাডেলফিয়া শহরে জুতা তৈরি করতেন। তাঁর পিতা বাল্যকালে রণবাহুরের দলে বাদক ছিলেন—পরে অসুস্থতার জন্ত সেই পদ ত্যাগ করে আপন অধ্যবসায়ের সাহায্যে করপোরেশনের ব্যবহার্যজীবীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বাল্যকালে প্যাসস্‌কে মেক্সিকো এবং পরে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইংলণ্ডের এক স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময়েই তাঁর যে ভ্রমণ-লিপ্সা জন্মে, তারই সাক্ষ্য পাই আমরা পরবর্তী জীবনে তাঁর বহু দেশ পর্যটনের ভিতর। প্রথমে প্যাসস্‌র পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আত্মোপালিসের নৌবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তা সম্ভবপর না হওয়ায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ উপাধি লাভের পর স্থপতিবিজ্ঞা শিক্ষার জন্ত স্পেনে গমন করেন। পরে যখন আমেরিকা যুদ্ধে নামে তখন তিনি আমেরিকান মেডিক্যাল কোরে যোগদান করেন।

যুদ্ধ সমাপ্ত হ'লে তিনি নানা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে গমন করেন। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সর্বদাই ঘটনার মর্মস্বত্ত্ব প্রবেশ লাভ করতেন এবং কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁর দৃষ্টির অগোচর থাকত না—সেই সমস্ত সাধারণ ঘটনা যা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি না। ক্ষুদ্র, সাধারণ ঘটনা থেকেই তিনি অনেক সময় এরূপ মূল্যবান উপকরণ আহরণ করেছেন যা সত্যিই আমাদের চমৎকৃত করে। যুদ্ধান্তে সমগ্র পৃথিবীর নূতন আন্দোলন, মাহুষের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের হোঁচল লেগেছিল তাঁর এই সময়কার জীবনে।

তাঁর যুদ্ধবিষয়ক দুইখানি উপন্যাস *One Man's Initiation* ও *Three Soldiers*, যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২১ সালে

প্রকাশিত হ'ল। স্ননিপুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই এদের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এই বর্ণনার ভেতর এমন একটা স্নমিত ছন্দ আছে যে তা স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শব্দ-চয়নে, ঘটনা-বিস্তার এবং বর্ণনা-নৈপুণ্যে এই গ্রন্থের স্বকীয়তা লাভ করল। অসংখ্য মানুষের যে আদান-প্রদান, তাদের সঙ্গে লেখকের যে কোন ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে সে কথা জানবার অবসর লেখক আমাদের না দিলেও, এ কথা আমরা বুঝলাম যে এবার আমরা এক যথার্থ শক্তিশালী লেখকের সন্ধান পেয়েছি। কোন-বিশেষ ঘটনা বা কোন বিশেষ চরিত্রকে তিনি অতিশয় প্রাধান্য দেন নি। বিরাট জনসমুদ্রে কত মানুষই ত আসে যায়—কতটাই বা থাকে যেটা তাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। তবুও তারা বেঁচে আছে; অর্থোপার্জনের জন্ত সর্বদাই তারা যে সচেতন—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনে এই বিশেষত্বহীনতাই ত বৈশিষ্ট্য। এই বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থ করেও দূরে থাকার শক্তি ডু প্যাসসকে এক উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিকের পদে এনে দিয়েছে। সেই সময়ে প্রকাশিত তাঁর তিনখানি ভ্রমণ-গ্রন্থ *Rosinante to the Road Again*, *Orient Express* এবং *In All Countries* তাঁর ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার নিদর্শন। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে উঠেছে; স্পেন ও ইউরোপের অত্যাশ্চর্য দেশের ভিতর যে নূতন চাক্ষু্য, নূতন চেতনা উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেগুলো যে প্যাসসের জীবনেও রেখাপাত করেছে তারই প্রমাণ পাই আমরা এই তিনখানি ভ্রমণগ্রন্থে। মানুষকে তিনি দেখলেন নানারূপে—ইউরোপের যুদ্ধের শান্তির পর যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব নৈরাশ্র সমগ্র ইউরোপীয় সমাজকে অভিভূত করে ফেলেছে।

তাঁর লেখক-জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা হ'ল ১৯২৫ সালে *Manhattan Transfer* নামক উপন্যাসের প্রকাশ। এবার তিনি আমেরিকার বৃহত্তম নগরীর নিউইয়র্কের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিতর প্রবেশ লাভ করলেন। এই নিউইয়র্কই তখন তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কেন্দ্র—এখানকার নানা সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত। সেখানকার অধিবাসী বিরাট জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের ভিতরেও যে এক অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য আছে, তিনি এই উপন্যাসে তার পরিচয় দিলেন। নিউইয়র্ক নগরী পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়েও যে কোন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই প্রকাশ এই উপন্যাসে। নিউইয়র্কের ভাষারও এক নিজস্ব ধারা আছে, সেই সর্বসাধারণের ভাষাকে তিনি সমসাময়িক শেরউড এণ্ডার্সন প্রভৃতির মত, নূতন রূপ দিয়ে ব্যবহার করলেন। তারই ফলে প্যাসসের এই উপন্যাস নিউইয়র্কবাসীর নিজস্ব জীবনের যথার্থ আলেখ্য হয়ে উঠল।

তার পর প্রকাশিত হ'ল তাঁর পাঁচখানি সামাজিক উপন্যাস : *The 42nd Parallel* (১৯৩০); *Nineteen-ninety* (১৯৩১); *Big money* (১৯৩৫); *Adventures of a young man* (১৯৩৬) এবং *Number 1*. ১৯৪৩।

প্রথমোক্ত তিনখানি গ্রন্থ সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপের পটভূমিকায় লিখিত বিরাট উপন্যাস। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে দেশের দূরত্ব আর মানুষের জীবনে বাধারূপে উপস্থিত হয় না; কর্মোদ্যোগী মানুষের সমস্ত পৃথিবীতে আজ অবাধ গতিবিধি। বিশ্বচিন্তার আদান-প্রদানও সেই দূরত্বের সীমাকে লুপ্ত করে সমগ্র পৃথিবীকে এক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। এই যুগে মানুষ মাত্রেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা, কারণ সকলেই জানে যে অর্থকে করতলগত করলে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তার পদমর্যাদা বাড়ে এবং সেই ক্ষমতার লোভে মানুষ নিজের অন্যান্য শক্তির কিরূপ বিনাশ ঘটায়, এই উপন্যাসত্রয়ের তাই প্রতিপাদ্য বিষয়। আমেরিকার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে কমবেশি কুড়ি জন ব্যক্তির চরিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হ'লেও তাদের মধ্যে কেউই নায়ক রূপে উপস্থিত হয় না। এই বৃহৎ উপন্যাসে, দেশকাল সমাজের রুচির বা যুগচিন্তার পরিচয় ও নানাবিধ দৃষ্টাবলীর বর্ণনাই শুধু পাই না, আমরা পাই কেমন এক জীবনদর্শন যাতে বৈচিত্র্যের ভেতর সমন্বয়ের সুর বেজে ওঠে।

তাঁর এই উপন্যাসের সঙ্গে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের রচনা-শৈলীর তুলনা করলে, প্যাসসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কোথায় আরও ভাল করে তা বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ডি, এইচ, লরেন্সের নাম। সমাজকে এক প্রকার নির্মূর তীব্রতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেও এবং সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও মনস্তত্ত্বমূলক তাঁর কতকগুলি ধারণা তাঁর স্বজনীশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। নরনারীর যৌন জীবনের সার্থকতাকে স্বীকার করলেও, তিনি যেন মাঝে মাঝে এই সম্পর্কে সহজ গভীর বাইরে নিয়ে গেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। সেই অসুভূতিরই অঙ্গরূপ প্রকাশ দেখতে পাই ভার্জিনিয়া উল্ফের রচনায়। এই ব্যক্তিগত অসুভূতির চরম পরিচয় লাভ করি জ্যর্জের ইউলিসিসের শেষ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যেখানে রুম তার বিগত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছে। এ'রা সকলেই ব্যক্তি-সত্যকে স্বীকার করেছেন তীব্রভাবে এবং তাঁদের বিশ্লেষণের ভিতর নূতনত্বের মোহ থাকলেও, মনে হয় যেন ব্যক্তির প্রাধান্য একটু বেশী দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি যে নিছক ব্যক্তি নয়—সে যে সামাজিক জীব-লোকালয়ে জন্মায়, বড় হয় এবং মরে, এ কথাটা হয়ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে “ইউলিসিসের”

কাহিনী-বর্ণন আমাদের বাইরের দিকে না নিয়ে গিয়ে ভেতরের দিকেই নিয়ে যায়। তাঁদের উপন্যাসে বস্তু-নিষ্ঠার চেয়ে ব্যক্তি-নিষ্ঠার উপর এত বেশী প্রাধান্য যে, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়, এদের উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের ঠিক যোগ কোথায়। ব্যক্তি-নিষ্ঠতার প্রলেপের অভাবে কোন রচনাই আর্ট পর্যায়ভুক্ত হয় না সত্য, কিন্তু সেই ব্যক্তি-নিষ্ঠতা যখন বস্তু-নিষ্ঠতাকে অতিরিক্ত মাত্রায় অতিক্রম করে, তখন রচনায় কিসের এক অভাব দৃষ্ট হয়। ডস প্যাসসের উপন্যাসে সে অভাব নেই; যে পরিবেশ ও যে সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় তিনি জীবনকে দেখেন সেই জীবনের অন্তরালে তিনি এক নতুন রূপ আবিষ্কার করেন। সে যে কত বাস্তব, তা উপলব্ধি হয় তাঁর ভাষায়, অতিশয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরলতায়, ভাবালুতায় এবং সত্যক সংযমে। তাঁর রচনায় সেই ভাবাহুত্বটি অপেক্ষা এক স্বপ্ন এবং স্বপ্নমার, অথচ দৃঢ় এবং অসংশয় অভিব্যক্তি আছে।

সেই শক্তির এক নতুন বিকাশ দেখি আমরা তাঁর ১৯২২ সালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ—*Pushcart at the Curb*।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ভ্রমণ-পুস্তক—*Journy Between Wars*-এর ফাঁকে ফাঁকেও তাঁর এই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ দৃষ্ট হয়। তাঁর ডায়েরিমাণ জীবনে মাঝে মাঝে আটলান্টিক উপকূলস্থ বাসগৃহে তিনি যে সংক্ষিপ্ত অবসর লাভ করেন, সেই সময়ে তিনি ভ্রমণ-স্মৃতি রচনা করেন যার পিছনে ভ্রমণকাল পর্যটকের আয়েসের আমেজ নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে প্যাসসের ভ্রমণ-স্মৃতি পুনরায় বলবতী হয়ে উঠল এবং তিনি যুদ্ধোত্তমবাস্তব সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র পর্যটন করে যাবতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি দেখলেন বিমান ও নৌ-বিভাগের কর্মকর্তা শ্রমিক-দের, অধিকতর ফসল উৎপাদন-রত চাষীদের এবং সেই সমস্ত প্রচারকারী ও বক্তাদের যারা আমেরিকার যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করেছে। তাদের ভেতর তিনি এক নতুন উৎসাহ ও জীবনীশক্তির সন্ধান পেলেন যার প্রভাবে তারা নিজেদের সমস্ত কলহ ও মতভেদ বিস্মৃত হয়ে এক প্রাণে কর্মে রত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত *State of the Nation* যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রাণতার আশ্চর্য্য চিত্র।

বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা

শ্রীমতা চৌধুরী

অতি সুখের বিষয় যে, অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতি লাভ করে জগৎসভায় স্থান পাবার উপ-যুক্ত হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগের মধ্যে কথ্য ও কাব্য বিভাগই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ বিভাগ অপেক্ষাকৃত মুহুম্মদ তালে অগ্রসর হলেও, এর সম্বন্ধেও নিরাশার কোনো কারণ নেই। এরূপ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জটিল ও গুরুগম্ভীর বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখবার পথে প্রধান বাধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। আমরা এতকাল ধরে সমানে ইংরেজী পরিভাষায় এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, বাংলায় এই সব কথা ভাবতে আমাদের রীতিমত ঝুঁকিই বোধ হয়। অধিকাংশ পরিভাষা আজ পর্যন্ত রচিতই হয় নি, যাও বা হয়েছে তাও জনসমাজে ব্যবহৃত কমই হচ্ছে। সেজন্য একটি প্রচলিত ও অভ্যস্ত ইংরেজী শব্দের বদলে তাঁর বাংলা প্রতিশব্দ আজও আমাদের কানে লাগে ও মনে ধরে না। যেমন, বাস্পান, ব্যোমযান, ত্রিভুজ, কোণ (angle), ছায়াচিত্র, হ্রৎপিণ্ড, নাট্যাভিনয়, রক্তাল্পতা প্রভৃতি বলে আমরা আজও আরাম বোধ করি না, সে জন্য এই সবের ইংরেজী প্রতিশব্দই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা

ক্রমশঃ কথ্যবর্তী এবং প্রবন্ধাদিতে যথাসম্ভব শুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী ছিছি। সেজন্য, কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা পরিভাষা সম্বলনে ত্রতী হয়েছেন। বিশেষ ভাবে, প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলাই শিক্ষার বাহন রূপে গৃহীত হওয়ায়, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির পরিভাষা প্রবর্তন করা অত্যাশঙ্কক হয়ে পড়েছে।

এস্থলে প্রশ্ন এই যে, এই পরিভাষা আমরা পাব কোথা থেকে? কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ প্রভৃতি আমাদের অতি নিজস্ব দেবভাষা সংস্কৃতের সুবিশাল রত্নধনি থেকেই এই সব শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই হ'ল পরিভাষা গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, যদিও বর্তমানে অনেকে এই সত্যটিকে স্বীকার করা লজ্জার বিষয়ই মনে করেন। অন্ততঃ শব্দের দিক থেকে সংস্কৃতই বাংলার প্রাণশক্তি। বাংলার অধিকাংশ শুদ্ধ, লেখ্য শব্দই সংস্কৃত শব্দ, বা সংস্কৃত থেকে সম্বলিত। সে ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও উচ্চ তত্ত্বাদি প্রকাশের জন্য যদি সংস্কৃতের আশ্রয়েই নব পরিভাষা রচনা করার চেষ্টা করা হয়

ত তা অতি সুবিবেচনার কাজই হবে। কারণ, খাঁটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক শব্দ বাংলা ভাষারই নিজস্ব শব্দ, বিদেশী শব্দ নয়। যেমন—

“নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত ঞ্জামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-ভুষার-কিরীটনী।”

এস্থলে প্রত্যেকটি শব্দই খাঁটি সংস্কৃত; অথচ খাঁটি বাংলাও বটে। কেহই এ স্থলে বলবেন না যে আমাদের বাঙালীদের নিজস্ব বাংলা ভাষাতে জোর করে কতকগুলি অতি পুরাতন, বিদেশী শব্দ ঢোকান হয়েছে। এই একই ভাবে যদি আমরা খাঁটি সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক শব্দ পরিভাষা রূপে ব্যবহার করি, তা হলে সেও হবে ফলতঃ বাংলা ভাষারই অধুনালুপ্ত, বহুকাল অনাদৃত শব্দ-সম্ভারেরই পুনরুজ্জীবন, পুনরাদর মাত্র, বিদেশী ভাষার কাছে হাত পাতা নয়। যেমন সরলীকরণ (Simplification), সমবাহ (equilateral), সন্ধিবন্ধনী (ligament), বর্হিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (radius), বাষ্পীভবন (evaporation), দিকেশ্বর (diandrous)। প্রকৃতি খাঁটি সংস্কৃত, অথচ শুদ্ধ বাংলাও। এই পারিভাষিক শব্দ-সমূহের সবগুলিই ঠিক বাংলা ভাষায় পূর্বে স্থান না পেলেও, এরা বাংলা শব্দই, বিদেশী শব্দ নয়। সেজ্জন্ত সংস্কৃতের বিশাল ভাণ্ডার থেকে শব্দচয়ন করলে, তা বাংলা শব্দই হবে। সুতরাং বাংলাকে অচিরে অল্প নিরপেক্ষ, স্বাধীন ভাষায় পরিণত করতে হলে একমাত্র সংস্কৃতের সহায়তাই তা সম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অন্ত্যন্ত সুধীবর্গ কর্তৃক অল্পস্বত পরিভাষা গঠনের এই সুচিন্তা-প্রস্তুত পন্থায় কেহ কেহ আপত্তি তুলছেন। তাঁরা বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত” বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও পুনরালোচনা ও পুনর্বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। যদিও প্রদ্যেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরিকল্পনায় এবং তাঁহার ও কতিপয় বিশেষজ্ঞের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে এই পরিভাষার সৃষ্টি, তথাপি ইহার সঙ্কলন ব্যাপারে আর একটু উদার মতাবলম্বন বাঞ্ছনীয় ছিল। যে সময় ব্ল্যাক আউট, রেশন কার্ড, ট্রেক, কন্ট্রোল, সাইরেন; ইঞ্জিনিয়ার, সিনেমা, রেডিও হইতে আরম্ভ করিয়া ‘এটম বোমা’ পর্যন্ত অবধি আমাদের ভাষায় স্থান লইতেছে এবং অনেক বর্ধপ্রাণ মুসলমান সাহিত্যিকের ভাবাবেগে বাংলা দেশ আরব পারস্যের পানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তখন বহু যুগ-বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবের কঙ্কালের মত শব্দসমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার গহন ধনির পবিত্র তলদেশ অনুসন্ধান না করিলেই বোধ করি ভাল হইত। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে ভারতবর্ষের দান অতি উচ্চস্তরের এবং যাহাদের উচ্চাঙ্গের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা অতি

প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে বিद्यমান ছিল, সেই সব শাস্ত্রের সংস্কৃতমূলক পরিভাষা সম্বন্ধে মতবৈধ থাকিতে পারে না; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যে সকল বিভাগে আমাদের দানের বিন্দুবিসর্গও প্রায় নাই, তাহাদের পরিভাষার জন্ত দেব-ভাষার দ্বারস্থ না হইয়া আন্তর্জাতিক শব্দ ছবছ গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। ইহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের সুবিধার সঙ্গে দেশে মৌলিক গবেষণার পথও সুগম হয়। একই কথা বার বার কণ্ঠস্থ করায় জাতীয় শক্তির বিরাট অপচয় হয় মাত্র। পরন্তু যে সব ছাত্র বেশী দূর অগ্রসর হইবে না, আন্তর্জাতিক শব্দ শিখিলে তারা বরং লাভবানই হইবে। ...ভাষার শালীনতা রক্ষার জন্ত আমাদের ম্যাটি কুলেটদিগকে চলতি আন্তর্জাতিক শব্দসমূহ থেকে বঞ্চিত করে, কতকগুলি অপ্ৰচলিত কথা শিখান লাভজনক মনে হয় না। সাহিত্যের শালীনতা ও আভিজাত্য রক্ষা সর্বথা প্রশস্ত হইলেও বিজ্ঞান-শিক্ষার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের পরিচায়ক রূপেই গণ্য হবে। আমাদের ল্যাবরেটরিতে নিরক্ষর বাঙালী ছেলেরাও ইথর, অ্যালকোহল, স্লিচিং, পাউডার—প্রভৃতি স্পষ্ট ভাবেই বলে ও অল্প দিনেই চিনিয়া লয়।”২

ইহা সত্য যে, দেড় শতাব্দিক বংসর ইংরেজী ভাষার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়ে, বাঙালী বহু ইংরেজী শব্দই তার মাতৃ-ভাষায় স্বভাবতঃই গ্রহণ করেছে; উর্দু, ফার্সী শব্দ সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। বিশেষভাবে বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আধুনিক যুগে বাঙালীর মৌলিক দান অল্পই বলে, এবং বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা জগৎসভায় তাঁদের জ্ঞান্য সম্মান পাবার জন্তে নিজের গবেষণাদি ইউরোপীয় ভাষাতেই মুখ্যতঃ লিপিবদ্ধ করেন বলে, বাংলা ভাষার বিজ্ঞান বিভাগ বিশেষ পরিপুষ্ট নয়। অপর পক্ষে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিপিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের সমাদর এবং প্রচারও আমাদের দেশে প্রায় নেই বললেই হয়। এই সব কারণে আমরা যে সব বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দাদি ব্যবহার করে থাকি, তা সবই ইংরেজী বা বিদেশী ভাষার শব্দ। কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, ইংরেজী, ফার্সী প্রভৃতি, সমভাবে উর্দু-ফার্সী প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার পক্ষে বিদেশী শব্দ মাত্র। সেজ্জন্ত এই সব শব্দ যত দিন বাংলা ভাষায় থাকবে, তত দিন বাংলাকে নিজেই শক্তিতে স্বাধীন ভাষা বলা যাবে কি করে? অল্প ভাষার শব্দাদি অবশ্য সব ভাষাতেই কমবেশী আছে, এবং বিদেশী শব্দকে আত্মসাৎ করে নিজের কাজে লাগানও ভাষার প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে—সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলেই যা ছিল, সজীবতার

১ ‘চলন্তিকা’ থেকে গৃহীত

২ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা—ত্ৰীহরগোপাল বিশ্বাস, ‘ভারতবর্ষ’, বৈশাখ, ১৩৫৩।

লক্ষণ, তা হয়ে দাঁড়ায় দুর্বলতা মাত্র, যা ছিল স্বকীয় প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য, তা পর্য্যবসিত হয় কেবল অন্ধ অহু করণেই। আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করবার প্রচেষ্টাকালে, এই কথাটিই আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বিদেশী শব্দের প্রাচুর্য কোন ভাষারই পক্ষে গৌরবের বস্তু নয়, বরং এ তার দুর্বলতা ও দৈবেরই পরিচায়ক। বহু ইংরেজী ও উর্দু-ফার্সী শব্দ অবশ্য বাংলা ভাষায় আমাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবেশ লাভ করেছে। কথ্য ভাষায় এরূপ সংমিশ্রণ কেবল ক্ষমার নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু লেখ্য ভাষায়, বিশেষভাবে উচ্চ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদিতে, এরূপ ‘দো আশ’লা’ খিচুড়ী ভাষা যথাসম্ভব বর্জন করলেই ভাল। সেজন্য আজ নূতন শব্দচয়ন কালে আমরা আমাদের অতি নিজস্ব সংস্কৃতির শব্দভাণ্ডার সামনে বর্তমান থাকলেও কেন অকারণে বিদেশী শব্দকেই আমাদের মাতৃভাষাতে শাশ্বত স্থান দেব? আজ অবশ্য আমাদের সকলকেই ‘রেডিও’, ‘রেশন-কার্ড’, ‘কন্ট্রোল’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই, কারণ এদের বাংলা প্রতিশব্দ আজও তৈরি হয় নি। কিন্তু চিরকালই এদের আমাদের ভাষায় সাদরে স্থান দেওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতগুলি শব্দ যদি আমাদের ভাষায় না থাকে ত তাতে যে ফাঁকের সৃষ্টি হবে, তাকে ত ভাষার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য বলে কিছুতেই ঢাকা যাবে না। সেজন্য একেবারে এক সঙ্গে হঠাৎ না হোক, ক্রমশঃ এদেরও বাংলা প্রতিশব্দের সঞ্চলন ও প্রচলন করতে হবে; এবং সে সঞ্চলনে সর্বপ্রধান দান হওয়া উচিত একমাত্র সংস্কৃতিরই, কারণ এক বিদেশী ভাষা ছাড়তে গিয়ে অপর এক বিদেশী ভাষা গ্রহণ করলে লাভ আর কি? সেজন্য বহু যুগ বিলম্ব হলেও সংস্কৃত শব্দসমূহই এখানে একমাত্র আশা-ভরসা।

সাধারণ শব্দের পক্ষে যেমন, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শব্দের পক্ষেও তেমনি এই একই কথা অনেকাংশে খাটে। গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞান ছ-একটি বিভাগ ছাড়া, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় যদি হাজার হাজার বিদেশী পরিভাষাকেই শাশ্বত ভাবেই আমাদের ভাষায় যেনে নেওয়া হয়, তা হলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনা কি যথা গ্রহসনেই পর্য্যবসিত হবে না? বিজ্ঞান ত লম্বা লম্বা প্রবন্ধ রচনা নয়—এতে প্রতি পংক্তিতেই থাকে প্রধানতঃ বহু পারিভাষিক শব্দ; এবং এই সব শব্দই যদি বিদেশী শব্দ হয়, তা হলে সেই পংক্তিটিকে বাংলা ভাষা নাম দেওয়াই কি মিথ্যা বাগাড়ম্বর মাত্র নয়? কেবল ছ-একটি ক্রিয়াপদ প্রভৃতি বাংলায় জুড়ে দিয়ে সেই ভাষাকে বাংলা বলার চেয়ে, সবটাই বিদেশী ভাষাতেই লেখা চের ভাল নয় কি? যেমন, দুইটি গ্যাস ‘অক্সিজেন’ ও ‘হাইড্রোজেন’র মধ্যে ‘ইলেকট্রিক কারেন্ট’ ‘পাস’ করাইলে জলের সৃষ্টি হয়; যখন কয়েকটি ‘মিনারেল’ ‘ক্রিষ্টালাইস’ করে, তাহারা জলের কয়েকটি ‘মোলিকিউল’র

সঙ্গে যুক্ত হয়...এই জলকে ‘ক্রিষ্টালাইজেশন’র জল বলা হয় ইত্যাদি। এরূপ রচনাকে বাংলায় বিজ্ঞান রচনা বলা ত কিছুতেই চলে না।

আপত্তি হতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বিদেশী শব্দ না জানলে মুশকিলে পড়ব আমরাই, কিন্তু অপর পক্ষে কেহই কষ্ট করে আমাদের সম্বন্ধে রচিত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পরিভাষা শিখতে আসবে না। আমাদের বর্তমান দীনহীন অবস্থায় অবশ্য এ-কথা সত্য। আন্তর্জাতিক পরিভাষা আমাদের আজ ত শিখতেই হবে, ভবিষ্যতেও হবে, কারণ বর্তমান যুগ আন্তর্জাতীয়তারই যুগ, এ-যুগে কুপমণ্ডুক হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিভাষা গ্রহণের অর্থ নয় জাতীয় পরিভাষা বর্জন। অন্যান্য সত্য, স্বাধীন দেশে জাতীয় পরিভাষা বর্জন না করেই আন্তর্জাতিক পরিভাষা সুবিধার জন্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেই পন্থাই গ্রহণ করা কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে, আজ থেকেই ক্রমশঃ বাংলা পারিভাষিক শব্দাদি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করা উচিত। কে বলতে পারে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বাংলা পরিভাষা জগৎসভায় স্থান পাবে, এবং সকলে তা আগ্রহ করে শিখবে। সে আশার কথা ছেড়ে দিলেও, সত্যই যদি আমরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-রচনা করতে চাই ত তা হলে যথাসম্ভব বাংলা শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

বাংলা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জগতে প্রচলিত বিজ্ঞানের পরিভাষা, সংস্কৃত, অল্প প্রভৃতি বিদেশী ভাষাতেও যে আমাদের শিখতে হবে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাতে পরিশ্রম একটু বেশী হতে পারে বটে, কিন্তু “জাতীয় শক্তির বিরূহী অপচয়” ত তাকে বলা যায় না। তার চেয়েও বিরূহী ক্ষতি হবে যদি বাংলার বিজ্ঞানবিভাগ, শুধু আজ নয়, চিরকালই এভাবে শব্দ-সম্পদের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরাও অজ্ঞান্যাসে অত্যাবশ্যক প্রধান প্রধান বিদেশী শব্দ কণ্ঠস্থ করতে পারে। অন্ততঃ মাতৃভাষাকে বিদেশী ভাষার নিকট চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করার চেয়ে, এইটুকু শ্রমবীকারে তারা নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ হবে না।

সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার থেকে আহৃত এই সব পরিভাষা যে আজ আমাদের কাছে অদ্বিত ও হাশাস্পদ লাগবে, সে ত স্বাভাবিকই। কিন্তু ব্যবহার করতে করতে ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত আমাদের হতেই হবে। কিছুদিন আগেও ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে বাংলায় চিঠিপত্রাদি লেখার মোটেই প্রচলন ছিল না। সেজন্য, ‘Dear Sir’র জায়গায় ‘সবিনয় নিবেদন’ প্রভৃতির যখন প্রথম প্রচলন হয়, অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন। আজ কিন্তু এসব কারো কানেই লাগে না। এই ভাবে, ‘কৃষ্টি’, ‘সংস্কৃতি’, ‘অবদান’ ‘পরিবেশ’ ‘বান্ধবী’ ‘পৌরোহিত্য’ ‘কর্ম-সচিব’ প্রভৃতিতে আমরা ক্রমশঃ বেশ অভ্যস্ত হয়ে আসছি—যদিও কারো কারো কানে এখনও এসব শ্রাকামি বলে মনে

হয়। যাহোক, এসব স্থলে আমরা আজকাল প্রায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি না। এইভাবে যে সব ছাত্র সপ্তম শ্রেণী থেকেই 'ত্রিভুজ' 'কোণ' 'দ্রাঘিমা' 'লঘিমা' প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছে, তাদের কাছে এসব ত মোটেই হাতোদীপক নয়। শব্দের মূল্য তার প্রচলনে, চলন করলেই ত শব্দ চলে। কাজেই আজ অপ্রচলিত বলে এদের চিরকালই তাই রাখতে হবে, সে কোন কাজের কথা নয়। যে সব শাস্ত্রে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের দানের কথা আমরা জানি, সে সব (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি) বিভাগের শব্দও ত আজ সমান অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, এবং এই সব বিভাগেও আন্তর্জাতিক বিদেশী শব্দ আমাদের সমান শিরতে হয়। সেজন্য যে সব বিভাগে প্রাচীন ভারতীয়গণের দান আছে, সেই সব বিভাগেই কেবল সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করা হোক এবং যে সব বিভাগে তাঁদের দান নেই, সে সব বিভাগে ছবছ বিদেশী শব্দই গ্রহণ করা হোক—এরূপ প্রভেদ করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ বিভাগে তাঁদের দান আছে, আর কোন্ কোন্ বিভাগেই বা নেই, সেই ত স্থির নিশ্চিত নেই। কেই বা মাথা ঘামিয়ে এই সব আদিকালের দান খুঁজে বের করছে? আমরা বর্তমানে তাঁদের বিজ্ঞানে দানের সম্বন্ধে যা জানি, গবেষণা করলে তার চেয়েও আরও অনেক বেশী দানের কথা প্রমাণিত করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে সে অনুরোধ অরণ্যে রোদন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের কয়েকটি বিভাগে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, এবং অত্যন্ত অধিকাংশ বিভাগে

খাঁটি বিদেশী শব্দ প্রচলিত করলে, নানারকম গভগোলের সম্ভাবনা বাড়বে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তৃতীয়তঃ, যে বিভাগে সংস্কৃত পরিভাষা গৃহীত হবে, সে বিভাগেও ত বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী শব্দ না জেনে উপায় নেই। সেইজন্য বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ না করে, সব বিভাগে সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত বাংলা পরিভাষার প্রচলন করে সন্দেহে সব বিভাগেই প্রয়োজন মত আন্তর্জাতিক বিদেশী পরিভাষাদির শিক্ষা-ব্যবস্থা করাই ভাল।

জায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে আমরা সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের পূর্ণ পক্ষ-পাতী। এই সব বিভাগে অবশ্য অনেক শব্দ মূল সংস্কৃতেই পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাওয়া যায় না তা গড়ে নিতেও বেশী শ্রমস্বীকার করতে হয় না। মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিতেও বিশেষজ্ঞগণ বাংলা প্রবন্ধাদিতে বাংলা প্রতিশব্দই যথাসম্ভব ব্যবহার করছেন। কেবল বিজ্ঞান চিরকালই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে 'একঘরে' হয়ে থাকুক এ নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামিগণ কেহই ইচ্ছা করবেন না। সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সংস্কৃত থেকে বিজ্ঞানেরও পরিভাষা সংগ্রহের এই যে সাধু প্রচেষ্টা, তা আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বিশিষ্ট বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণও নিশ্চয়ই আমাদের এই মত সমর্থন করবেন।

ইংরেজী শিক্ষা, না জাতীয় শিক্ষা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় daring in its curriculum—পাঠ্য-ব্যবস্থায় দুঃসাহসী। ইংরেজ যখন ভারত ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে চলিয়াছে তখন ইংরেজী ভাষাকে তাহার উচ্চাঙ্গ হইতে নামাইবার সময় আসিয়াছে কি না তাহা পৃথিবীর অত্যন্ত গুরু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবিয়া দেখিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি।

সর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্বে বাংলা দেশের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। সর আশুতোষ শিক্ষায় স্বরাজ আনিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বযোগ্য পুত্র ডাঃ ঞ্চামাপ্রসাদ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

কিন্তু প্রবেশিকা পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিবার অর্থ কি ইহাই নয় যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে?

গত কয়েক বার হইতে দেখিতেছি প্রতি পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র ইংরেজীতে ফেল হওয়ার জন্ত পরীক্ষা পাস করিতে পারে নাই। বাংলা দেশে ইংরেজী ভাষায় অকৃতকার্য হইলে উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ হয় ইহা অপেক্ষা মধ্যান্তিক ব্যাপার কি হইতে পারে? অথচ দেশের শিক্ষাবিদগণ ইহার জন্ত কি করিয়াছেন তাহা জানা নাই। অন্ততঃ শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আসে নাই। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় শতকরা কুড়ি হইতে ত্রিশ জন মাত্র কৃতকার্য হইতে পারে সে ব্যবস্থা কোন মতেই চলিতে পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজীতে কেন আড়াই শত নম্বর থাকিবে? আবার পাস

করিতে হইলে কেন শুধু ইংরেজীতে শতকরা ছত্রিশ নম্বর পাইতে হইবে? পরীক্ষার মান উচ্চ হইয়াছে কি না? অত্যন্ত বিষয়ে যখন ছাত্রেরা অনান্যাসে শতকরা ৯০।৯৫ নম্বর পাইয়া থাকে তখন তাহারা কেন ইংরেজীতে ৭০।৭৫ নম্বর পায়? ইহাতে ইংরেজী পরীক্ষকদের বিশেষ অহুদারতা সূচিত হয় কি না? ইহা সত্য কি না যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্বের ৮।১০ জন করিয়া ছাত্র ইংরেজীতে শতকরা ৮০ নম্বর পাইত, কিন্তু এখন একজনও পায় না। কেন পায় না? অত্যন্ত বিষয়ে ছাত্রেরা যদি পূর্বের মতই নম্বর পায় ইংরেজীর বেলায় কি তাহাদের বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়? আবার দেখি ইংরেজীতে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তাহা বহু ছাত্র বুঝে না। ইহার জন্ত দায়ী কে?

আমি বিশ্বাস করি না ছাত্রদের বুদ্ধি কমিয়াছে। অবশ্য পূর্বের ছাত্রেরা কম সংখ্যায় পরীক্ষা দিত, এত অপরিপক্বতা দেখা যায় নাই। এখন ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় ও বহু অশিক্ষিত পরিবারের সন্তান শিক্ষা পাওয়ার কিছু বিচিত্র রকমের অপরিপক্বতা দেখা গিয়াছে। ইহার জন্ত দায়ী ছাত্রেরা যত তাহা অপেক্ষা বেশী দরিদ্র স্কুল ও অংশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়। অপরিপক্ববুদ্ধি ছাত্রদের পরীক্ষার জন্ত দরিদ্র স্কুল প্রতিবারই ছাত্র পাঠাইয়া থাকে। যাহারা টেস্টে ফেল করে তাহারা পরীক্ষা দেয় কি করিয়া? বিশ্ববিদ্যালয় যে অসম্ভব রকমের পাঠ্য পুস্তকের বোঝা বালকদের দুর্বল ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছে তাহার জন্তই এই প্রকারের মর্মান্তিক ব্যাপার অস্বীকৃত হইতেছে। স্কুলে হয় শুধুমাত্র পড়া, পরীক্ষায় হয় কেবল লেখা। ছেলেরা লিখিবে কেমন করিয়া? ছাত্রদের প্রথমে বোঝা করিয়া শেষে তাহারা চলিতে অসমর্থ বলিয়া যেন তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। তাহা অবশ্যই ভাল, কিন্তু ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে যাহারা অভ্যস্ত তাহারা কোন দিন এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে সত্যকার মঙ্গল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা আয়ত্ত করিতে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশী সময় যায় অথচ সাধারণ ছেলে যাহাতেই ফেল হয় তাহা সর্বথা ত্যাগ।

ইংরেজী ভাল না জানিলে জ্ঞানের পরিপক্বতা আসে না এ কথা অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক আজও বিশ্বাস করেন। মনে হয় এ এক প্রকারের দুর্বলতা। আমি ইংরেজীকে ছোট বলিতে চাহি না; কিন্তু বাংলাদেশে কেন ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার বাহন হইবে? ইংলণ্ডে এক সময় ফরাসী, লাতিন ও ইংরেজী পাশাপাশি চলিত। চসারের সমসাময়িক গাওয়ার ঐ তিনটি ভাষায় তিনখানি বই লিখিয়া গিয়াছিলেন; যে ভাষা বাঁচিবে তাহাতেই তাহার নাম থাকিবে ইহাই ছিল তাহার ইচ্ছা। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন বেকন পর্যন্ত তাহার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ লাতিন ভাষায় লিখিয়া গিয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ডে ফরাসী

বা লাতিন ভাষার গুরুত্ব কোথায়? এদেশের পণ্ডিতগণও এক সময় সংস্কৃতের চর্চা প্রবল বেগে চালাইয়াছিলেন, বাংলা ভাষা তাহাদের কাছে ছিল অনাদৃত। অথচ পাড়ীর আসিয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্তন করেন; দেশীয় লোকেরা তাহাতে খুব উৎসাহ দেখায় নাই। আজ দেশে স্বরাজ আসিবার দিন উপস্থিত, কিন্তু দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত কেন হইতেছে না? যাহা আসিবেই তাহার জন্ত বন্দোবস্ত কই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয়েই অগ্রণী, তাহাকেই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক হউক ইহাই আমাদের কামনা।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ইংরেজীর উপর ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। কলেজে দেখিতেছি ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা বুঝিতে প্রথম প্রথম ছাত্রেরা মোটেই পারে না। বি-এ, বি-এসসি; এম-এ, এম-এসসিতেও বাংলায় বক্তৃতা দিলে ছাত্রদের বুঝিবার সুবিধা। ইংরেজীতে যদি মাত্র এক শত নম্বর করিয়া দেওয়া হয় ও ভাল করিয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হয় তাহাতেও ভাল ফল ফলিবে মনে হয়। কিন্তু ইংরেজীর জন্ত হাজার হাজার ছাত্রকে ফেল করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা চালানো কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বাংলা ভাষায় শিখাইলে ছাত্রেরা ভাল করিয়া বিষয়বস্তুগুলি বুঝিবে ও ভাষার অন্তর্বিধায় তাহাদের জ্ঞান ভাসাভাসা রকমের হইবে না ও বুঝা বুদ্ধিরতির অপব্যয় হইবে না। ভাষার দুর্বোধ্যতা একটা মন্ত অন্তর্বিধা। বাংলা ভাষায় শিখাইলে সময় বুদ্ধি প্রভৃতির অপচয় হইবে না। বুদ্ধিরতির বিকাশই হইবে।

ইংরেজী সাহিত্যের উচ্চিষ্ট লইয়া যাহাদের জীবন যায় ও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাহাদের ধূলা উড়াইয়া দিন কাটে, তাহাদের হাত দিয়াই একদিন সত্যকারের সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমরা আশা করি। নানা দিক দিয়া তাহাদের মনের পূর্ণ বিকাশ হইবে। দেশীয় ভাষায় পড়িয়া লিখিয়া চিন্তা করিয়া মন সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীর ব্যর্থ সাধনা ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় ভাষায় দেশীয় মনের বিকাশ সাধনের শুভ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। দাসমনোভাব লইয়া স্বরাজ আনিবার স্বপ্ন অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ভুলিবার দিন আসিয়াছে। ইংরেজী ভাষা যাহারা শিক্ষা দেন শিক্ষা-বিভাগে তাহাদেরই সম্মান বেশী। ইহাও দাস-মনোভাবের একটি প্রচণ্ড লক্ষণ। বাংলা ভাষায় বা সংস্কৃতে যাহারা শিক্ষিত তাহাদের প্রতি একটি করুণার ভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। অথচ ইংরেজীতে সত্যকার দক্ষতা শতকরা কয় জন শিক্ষক ও অধ্যাপকের আছে? ইংরেজী সাহিত্যে বাঙালীর মৌলিক অবদান থাকিলেও তাহার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে দেশীয় শিক্ষা-

ব্যবস্থায় ইংরেজীকে এতটা উচ্চস্থান দেওয়া চলে না। যে ইংরেজীতে স্কুল-কলেজে অধ্যাপনা চালানো হয় তাহা অধিকাংশ স্থলেই যে উচ্চ ধরনের ইংরেজী নহে তাহা বোধ করি স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। এ কথা বলিলে কাহারও অসম্মান হইবে না আশা করি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। অক্সফোর্ড ফেরত ও জার্মানি-ফ্রান্স-রুশিয়া প্রবাসী জনৈক বিখ্যাত বাঙালী অধ্যাপক একই জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুদিন পরে দেশে ফিরিতেছিলেন। তিনি সাত আট বৎসর দেশত্যাগী; তাই কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—“এত দিনের অনভ্যাসে বাংলাটা ভুলিয়া গিয়াছি।” রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—বড়ই দুঃখের কথা বাংলাটা ভুলিয়াছ অথচ ইংরেজীটাও ভাল শিখ নাই।” এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই

সাজে। শিক্ষকদের অধিকাংশই এই দোষে দোষী। এ সোজা কথাটা বুঝিবার দিন নিশ্চয়ই আসিয়াছে যে বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় বা দেশীয় শিক্ষা দেওয়া চলে না। ইহাতে না ছাত্র না শিক্ষক, কাহারও ভাল হইবার আশা আছে। ইংরেজীর শিক্ষকেরা দেশীয় কৃষ্টিতে কতটুকু দান করিয়াছেন, অথচ কতটাই না পারিতেন?

দেশীয় ভাষা এই-ইংরেজীর স্থান লইলে শিক্ষকেরা নূতন এই লিখিবেন, নূতন কথা বলিবেন, বিদেশীর কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহাদের শিক্ষক-জীবনকে ব্যর্থ করিবেন না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের প্রাণের বস্তু হয় নাই, কখনও হইতে পারিবে না। সুতরাং দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেশীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাতে সব দিকেই মঙ্গল।

শাস্ত্রত মোরা

শ্রীঅমলকুমার মাল

আমরা বাঁচিয়া আছি—

বোমা, মহামারী, ব্ল্যাক-মার্কেট সবারে ব্যঙ্গ করি

আমরা বাঁচিয়া আছি।

সত্য-দ্রষ্টা, সার্থক-শ্রোতা মোরা

যা-কিছু দেখেছি নিছক সত্য—যা-কিছু শুনেছি তাও

শিখি নি কেবল সত্য যা শিখিবার।

মৃত্যু আসিয়া ঘাচিয়া গিয়াছে শতরূপে শতবার,

সে যাচনা জানি ব্যর্থ হয়েছে শুধু।

মাঝে মাঝে তাই সন্দেহ জাগে—

শাস্ত্রত নাকি মোরা?

বর্তমানের আমরা যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছি।

* * *

পোড়া মাটি আর ব্ল্যাক-আউটের দেখেছি বিখরুপ

অস্তর আর বাহিরের ব্ল্যাক-আউট।

মাঠে, ঘাটে, হাটে লাখে লাখে লোক আঁধারে মিশিয়া গেছে

চির-শান্তির চির-কাণ্ডে আধিয়ারে।

মুক্তি পেয়েছে তারা—

তারই আনন্দে আমরা কেবল বজ্র তা করিয়াছি

নাটক, নভেল, স্লোগান লিখেছি মোরা,

আধুনিক বাঁচে কবিতা কেঁদেছি কত

বিরহিত, ছবি, অভিযোগ ছাপায়েছি,

কাগজে কাগজে তুলিয়াছি আলোড়ন

আশানের বুক মুক্তি-মহোৎসব।

* * *

বন্ধু!

তবু এরিমাঝে শুনি তীব্র নিনাদে সাইরেন উঠে বাজি,

অস্তর কাঁপে—মাথার উপর শত্রুবিমান বুঝি।

কম্পিত বুক শেল্টারে ঢুকে হরিণাম জপিয়াছি।

সার্থক হরিণাম—

সে নামের জোরে বাঁচিয়া গিয়াছি মোরা।

বাঁচিয়া গিয়াছি—

কেবল বন্ধু! শত্রু-নজর ব্যর্থ করিয়া নহে,

ব্যর্থ করিয়া মহাকাল মহামারী,

ব্যর্থ করিয়া লঙ্ঘনখানা, ফেমিন রিলিফ, সরকারী শত নীতি

মৃত্যুঞ্জয়ী আমরা চিরঞ্জীব।

এক ঠাই থির—

প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া ‘কিউ’ শিখিয়াছি মোরা,

আর শিখিয়াছি অগ্নের দায়ে নিয়মানুবর্তিতা।

কাঠিন্য় নিয়ম, নির্ধর্ম নীতি—

সে নীতির কাছে মৃত্যু মেনেছে হার।

তাই আজিও বাঁচিয়া আছি—

ব্ল্যাক-মার্কেট, কন্ট্রোল আর সেল-ট্যাজের জোরে

আমরা বাঁচিয়া আছি।

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণা ও তাহার প্রতিক্রিয়া

মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের ঘোষণা

১। মন্ত্রী-মিশনের ভারত আগমনের অব্যবহিত পূর্বে গত ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে সত্ত্বর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়াই আমার সহকর্মীগণ ভারতে যাইতেছেন। কি ধরনের শাসনতন্ত্র বর্তমান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হইবে তাহা ভারতীয়গণই স্থির করিবেন। সত্ত্বর সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

আমি আশা করি, ভারত ও ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক। আমি বিশ্বাস করি, ইহাতে তাঁহাদের প্রচুর সুবিধাই হইবে।

ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত সংযোগ রাখা বা না রাখা ভারতীয় জনগণের স্বাধীন মতামতসাপেক্ষ। ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সংযোগ তাহা আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা স্বাধীন জনগণের স্বাধীন মিলন। আমি মনে করি, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করার অধিকারও ভারতের আছে। যথাসম্ভব সত্ত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

সিমলা সম্মেলন

২। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দায়িত্বভার বহন করিয়া আমরা মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও বড়লাট—দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে সর্ব ভারতীয় ঐক্য বা বিভাগের মূলতন্ত্রে একমত হইতে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নয়া দিল্লীতে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ মত বিনিময়ের পরে উভয় পক্ষই যথেষ্ট তাগ স্বীকার করিয়াও মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি উভয়ের মধ্যবর্তী অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করা এবং কোন মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং উভয় পক্ষের অনুমোদিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় আমরা সত্ত্বর নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছি, তাহা উপস্থিত করা আমাদের কর্তব্য।

৩। ভারতীয় জনগণ যাহাতে তাঁহাদের ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারেন, তাহার আশু ব্যবস্থা করা সাব্যস্ত হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্রই হউক, আর-বৃহৎই হউক, আমরা সকল শ্রেণীর প্রতিই সুবিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যৎ ভারত শাসনের কার্য্যকরী পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত আছে এবং ইহা দ্বারা ভারতের আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা,

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথও প্রশস্ত করা হইয়াছে।

সর্বভারতীয় ঐক্য

৪। মিশনের সমক্ষে যে রাশীকৃত সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা এই বিবৃতির উদ্দেশ্য নহে। এইস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগ সমর্থকগণ ব্যতীত অন্ত সকলেই সর্বভারতীয় ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন।

৫। ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন ও নিবিষ্ট মনে ভারত বিভাগের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করিয়াছি। পাঁছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ চিরকাল তাঁহাদের উপর শাসন চালায়, মুসলমানগণের এই ভয় ও ভাবনা আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ধারণা মুসলিম জনগণের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কাগজে কলমে কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দূর করা সম্ভব নহে। ধর্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও অশান্ত মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভার মুসলিম জনগণের হাতে তুলু করার ব্যবস্থা দ্বারাই ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা যাইতে পারে।

পাকিস্থানের দাবি অযৌক্তিক

৬। আমরা সর্বপ্রথমই মুসলিম লীগ উপস্থাপিত সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। এই পাকিস্থানের জন্ম দুইটি অংশঃ—একটি উত্তর-পশ্চিমে বেগুচিহান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব লইয়া এবং অপরটি উত্তর-পূর্বে বাংলা এবং আসাম লইয়া দাবি করা হইয়াছিল। মুসলিম লীগ প্রথমে পাকিস্থানের নীতি স্বীকৃত হইলে পরে সীমা নির্ধারণ ও আবশ্যিক মত পরিবর্তনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণের নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের অধিকার ও দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত কোন কোন স্থান শাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পাকিস্থানের অংশীভূত করার প্রয়োজনীয়তার নীতির উপরেই পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবি করা হইয়াছিল।

১৯৪১ সালের লোকগণনার সংখ্যানুপাতে উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমানগণের সংখ্যা সামান্য নহে।

পঞ্জাবঃ—

মুসলমান	১৬,২১৭,২৪২
অমুসলমান	১২,২০১,৫৭৭

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

মুসলমান	২,৭৮৮,৭৯৭
অমুসলমান	২৪২,২৭০

সিন্ধুঃ—

মুসলমান	৩,২০৮,৩২৫
অমুসলমান	১,৩২৬,৬৮৩

ব্রিটিশ বেলুচিস্তান :—

মুসলমান	৪৩৮,৯৩০.
অমুসলমান	৬২,৭০১

মোট :—

মুসলমান	২২,৬৫৩,২৯৪,
(শতকরা—	৬২'০৭
অমুসলমান	১৩,৮৪০,২৩১,
(শতকরা—	৩৭'৯৩)।

উত্তর পূর্বাঞ্চল

বাঙ্গলা :—

মুসলমান	৩০,০০৫,৪৩৪,
অমুসলমান—	২৭,৩০১,০৯১

আসাম :—

মুসলমান	৩,৪৪২,৪৭৯,
অমুসলমান—	৬,৭৬২,২৫৪

মোট—মুসলমান—৩৬,৪৪৭,৯১৩, (শতকরা—৫১'৬৯) ;
অমুসলমান ৩৪,৬৬৩,৩৪৫, (শতকরা—৪৮'৩১)

ব্রিটিশ ভারতের অগ্রজ প্রায় ২ কোটি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান ১৮ কোটি ৮ লক্ষ অমুসলমানের মধ্যে বাস করেন।

এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলিম লীগের দাবি অমুসারে পৃথক ও সার্কভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনদ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরাও পঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের অমুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জেলাগুলি সার্কভৌম পাকিস্তানের অন্তর্গত করার কোন যৌক্তিকতা দেখি না। পাকিস্তানের পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়, মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ জেলাগুলিকে পাকিস্তানের বাহিরে রাখার সপক্ষেও সেই সমস্ত যুক্তি করা চলে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রেমের সহিত শিখদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

৭। কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানগুলি লইয়া ক্ষুদ্রতর সার্কভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা সম্ভব কিনা তাহাও আমরা চিন্তা করিয়াছি। মুসলিম লীগের মতে এই ধরনের পাকিস্তান সম্পূর্ণ কার্যকরী হইবে; কারণ (ক) পঞ্জাবের সমগ্র আদ্বালা ও জলন্ধর বিভাগ, (খ) ক্রীহট জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম এবং (গ) কলিকাতা নগরী (যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৩'৬ মাত্র) সমেত সমগ্র পশ্চিম বাংলা পাকিস্তানের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পঞ্জাব ও বাংলায় এই প্রকার বিভাগ করিয়া কোন মীমাংসা করা তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী। বাংলা ও পঞ্জাবের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, স্মরণীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্তমান। বিশেষতঃ পঞ্জাবকে বিভক্ত করা হইলে যথেষ্ট সংখ্যক শিখ সীমারেখার উভয় দিকে পড়িয়া

যাইবে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সার্কভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান নহে।

অঞ্চল ভারত

৮। উপরোক্ত জোরাল যুক্তি ছাড়া আরও অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুতর যুক্তিও বিবেচ্য। ভারতের যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ অঞ্চল ভারতের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সমস্ত বিভাগ বিচ্ছিন্ন করিলে ভারতের উভয় অংশই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতের রক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি আরও প্রবল। ভারতের সামরিক বাহিনীকে সমগ্র ভারতকে রক্ষা করার জংই একীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দিবা বিভক্ত ভারতীয় বাহিনী শুধু তাহার স্মরণীয় সুনাম ও হুউচ্চ কর্ণ-শক্তিই হারাইবে না বরং ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। ভারতীয় নৌ ও বিমান বহরের কর্ণক্ষমতা কমিয়া যাইবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের উভয় অংশ ভারতের দুই স্তোত্র সীমারেখায় অবস্থিত। রক্ষাব্যবস্থার গভীরতার বিবেচনায় পাকিস্তান ভূখণ্ড অত্যন্ত অপ্রচুর।

৯। বিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজত্ববর্গের সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুতর অন্তর্বিহার কথাও আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি।

১০। সর্বশেষে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের ভৌগোলিক সংস্থাপন ও উভয় পাকিস্তানের মধ্যবর্তী ন্যূনাধিক ৭০০ মাইল দূরত্বের কথাও বিবেচ্য। উভয়ের মধ্যে সমরকালীন বা শান্তি-কালীন যানবাহন-ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১১। অতএব বর্তমানে ব্রিটিশের হস্তে স্তম্ভ ক্ষমতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সার্কভৌম রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করার পরামর্শ আমরা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে দিতে অক্ষম।

কংগ্রেসের প্রস্তাব

১২। এই সিদ্ধান্তদ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আমরা অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ভারতে মুসলমান জনগণের সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত হইবার আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এই আশঙ্কার প্রতিকারার্থ কংগ্রেস এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অমুসারে কেন্দ্রে বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব কমসংখ্যক বিষয় সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাছাড়া প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনামুসারে যদি কোন কোন প্রদেশ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত পরিকল্পনার অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তাহার উল্লিখিত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাড়া তাহাদের ইচ্ছামত অগ্রান্ত বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

আমাদের মতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যে কয়জন মন্ত্রী বাধ্যতামূলক বিষয়গুলি পরিচালনা করিবেন তাঁহারা সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী থাকিবেন; অতঃপক্ষে যে কয়জন মন্ত্রী ইচ্ছামূলক বিষয়-সমূহের ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা শুধু যে সকল প্রদেশ এই সমস্ত বিষয়ে একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাদের নিকটই দায়ী থাকিবেন। এরূপ একটি শাসন-পরিষদ এবং আইনসভা কার্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন। এই অসুবিধা আরও বেশী করিয়া দেখা দিবে যখন কেন্দ্রীয় পরিষদে কোন কোন সদস্যকে তাঁহাদের প্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এরূপ বিষয়ের আলোচনায় এবং এই সম্পর্কে ভোট গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহাদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই প্রকার কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করার অসুবিধা ছাড়াও আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রীয় গবর্ণ-মেন্টের উপর কোন ইচ্ছাধীন বিষয়ের ভার হস্ত করে নাই তাহাদের এই উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে একত্রীভূত হইবার অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব হইবে না।

দেশীয় রাজ্যের কথা

১৪। আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বেই আমরা ভারতীয় রাজত্ববর্গ ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্ক আলোচনা করিব।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় রাজত্ববর্গের সহিত ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক এতাবৎকাল বর্তমান আছে, তাহা থাকা সম্ভবপর হইবে না। ইংলণ্ডের তখন আর তাঁহার সার্বভৌমত্ব রাখিতেও পারেন না, অথবা নূতন ভারত-সরকারের হাতে তাহা হস্তও করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের যে সকল প্রতিনিধির সহিত আমাদের আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন। তাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ভারতের নবজাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত থাকিতে ইচ্ছুক। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কালেই কি ভাবে তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা কার্যকরী করা হইবে তাহা সঠিক স্থিরীকৃত হইবে। সমস্ত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একই ব্যবস্থা করা হইবে তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। এই জগুই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তেমন করি নাই।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব

১৫। আমাদের মতে যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দলের মূল দাবির পক্ষে জায্য এবং যে ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের স্থায়ী ও কার্যকরী

শাসন প্রণালী প্রণয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, আমরা এখন তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক :—

১। ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হউক। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সর্ববিধ কর্তৃত্ব এই যুক্ত-রাষ্ট্রের হস্তে হস্ত থাকিবে ও এই সকল বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করার আবশ্যক কর্তৃক ইহার থাকিবে।

২। এই যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজত্ব-বর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা-পরিষদে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথকভাবে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে হস্ত বিষয়সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

৪। দেশীয় রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে হস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী রহিবেন।

৫। প্রদেশসমূহ শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদ সম্বন্ধে দলবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয় স্থির করিতে পারিবেন।

৬। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক যৌথ সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় এই বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথমে দশ বৎসর পরে এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর শাসন-ব্যবস্থার পুনর্নিবেচনা দাবি করিতে পারিবে।

১৬। উপরোক্ত ধারায় কোন বিস্তারিত শাসনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে চাই, যাহাতে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের জগু শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন।

আলাপ-আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, শাসন-তন্ত্র রচনায় দলনীতি সম্বলিত এই প্রকার কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা না হইলে ভারতের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কোন আশা নাই।

১৭। অচিরেই নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান কার্যকরী করিবার জগু আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১৮। নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধানতম সমস্যা ইহাকে সঠিকভাবে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্বান্বিত করা। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনদ্বারা প্রতিনিধি-পরিষদ গঠনই সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু

ইহাতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটিবে। অল্পদিন পূর্বে নির্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদগুলিকে নির্বাচক হিসাবে ব্যবহার করাই একমাত্র কার্যকরী পন্থা। ব্যবস্থা পরিষদের গঠনপ্রণালীর দুইটি ব্যাপারে ইহাও একটু শক্ত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সভ্যসংখ্যা সর্বত্র প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে ধার্য করা হয় নাই। আসামে এক কোটি অধিবাসীর ব্যবস্থা-পরিষদে ১০৮ জন সভ্য আর বাংলায় লোকসংখ্যা ইহার ছয় গুণ অথচ বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৫০। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ায় কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসংখ্যা প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ধরা হয় নাই, বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪৮ কিন্তু লোকসংখ্যায় তাহারা শতকরা ৫৫ জন। কিভাবে এই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের মতে ভাষা ও কার্যকরী উপায় হইতেছে :—

(ক) প্রত্যেক প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বর্জন করা। প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের কাছাকাছি দাঁড়াইবে। (খ) প্রাদেশিক আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে। (গ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যরা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্যে সাধারণ, মুসলিম ও শিখ এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের বিষয় বিবেচনা করিলেই চলে। মুসলিম ও শিখ ছাড়া অত্যাশ্চর্য্য সকলকেই সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা হইবে। অত্যাশ্চর্য্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য প্রতিনিধিত্ব পাইতে পারে। পরন্তু ইহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে তাহাদের যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে বিংশ অধ্যায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিশেষ বিষয়ে আমরা তাহাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৯। (১) আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সাধারণ, মুসলিম ও শিখ সদস্যেরা এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিম্নোক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

প্রতিনিধির তালিকা

(ক অনুচ্ছেদ)

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১

যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্য-প্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	০	৯

মোট ১৬৭ ২০ ১৮৭
(খ অনুচ্ছেদ)

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
পঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪

মোট ৯ ২২ ৪ ৩৫
(গ অনুচ্ছেদ)

বাংলা	২৭	৩৩	০	৬০
আসাম	৭	৩	০	১০

মোট ৩৪ ৩৬ ০ ৭০

সর্বমোট ব্রিটিশ ভারত—

দেশীয় রাজ্যের সর্বোচ্চ সংখ্যক

প্রতিনিধি—

২৯২

৯৩

৩৮৫

চীফ কমিশনারের প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের দিল্লী ও আজমীর-মাদোয়ারের প্রতিনিধিত্ব এবং কুর্গ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য (ক) অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন। ব্রিটিশ বেঞ্চিস্থানের একজন প্রতিনিধি (খ) অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন।

গণ-পরিষদের প্রাথমিক কার্যক্রম

(২) গণ-পরিষদে জনসংখ্যানুপাতে অনধিক ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। ইহাদের নির্বাচন প্রণালী আলোচনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। প্রারম্ভে একটি সালিশী কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীতে সমবেত হইবেন।

(৪) প্রারম্ভিক সভায় কার্যসূচী স্থির হইবে, সভাপতি ও অত্যাশ্চর্য্য কর্মচারী নির্বাচিত হইবেন এবং বিংশসংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের সংখ্যানুসারে, উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থ এক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ইহার পরে প্রতিনিধিগণ পূর্বে (ক), (খ), (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবেন।

(৫) প্রত্যেক দল তাহাদের অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সেই সকল প্রদেশ লইয়া কোন

মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এবং হইলে সেই মণ্ডলী কোন কোন বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন। নিম্নে ৮নং উপধারায় বর্ণিত ব্যবস্থাহুসারে কোন প্রদেশ মণ্ডলীর বাহিরে থাকিতেও পারে।

(৬) প্রতি অহুচ্ছেদের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুনরায় সমবেত হইবেন।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদে যদি ১৫নং অহুচ্ছেদের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন অথবা কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়, উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের ও দুই প্রধান সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। গণপরিষদের সভাপতি কোন প্রস্তাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত কিনা তাহা স্থির করিবেন এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের যে কোন এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবি করেন তাহা হইলে ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ লইয়া তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

৮। নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পর যে কোনও প্রদেশ পূর্বে যে দল বা গোষ্ঠীর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পরেই মাত্র ব্যবস্থা-পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

২০। নাগরিকগণ সংখ্যান্ন সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সংরক্ষণার্থ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। মৌলিক অধিকার, সংখ্যান্ন সম্প্রদায়ের রক্ষা-ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশ্নাব উপদেষ্টা কমিটি গণ-পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং এই সকল অধিকার কোন প্রাদেশিক গোষ্ঠী অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে তাহাও বলিবেন।

অন্তর্ভুক্তকালীন গবর্ণমেন্ট

২১। বড়লাট অবিলম্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে এবং ভারতীয় রাজত্ব-বর্গকে সালিশী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা আশা করি, বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব ক্ষিপ্ততার সহিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য অগ্রসর হইবে এবং মধ্যবর্তী সময় অতি সংক্ষিপ্ত হইবে।

২২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদ ও ব্রিটেনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সন্ধিপত্র রচিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

২৩। শাসনতন্ত্র রচনাকার্য্য চলিতে থাকাকালীন ভারতের শাসনকার্য্য সুস্থ ভাবে চলা অত্যাবশ্যক। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থিত এক অন্তর্ভুক্তকালীন সরকার সহর প্রতিষ্ঠা করা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বর্তমান

সন্ধিক্ষণে ভারত-সরকারের এই কর্তব্য পালনে সর্বাধিক সহযোগিতার প্রয়োজন। দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালনা ছাড়াও আমাদিগকে দারুণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের পুনর্গঠন পরি-কল্পনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকলের জন্ত জনগণের সমর্থনপুষ্ট সরকার অত্যাবশ্যক।

বড়লাট এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই জনগণের আত্মভাজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে সমর-সচিব ও অস্থায়ী সমস্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় সদস্য লইয়া এক অন্তর্ভুক্তকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। ব্রিটিশ সরকার ভারত-সরকারের এই পরিবর্তনের গুরুত্ব অবগতই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং শাসন-কার্য্যের দায়িত্ব পালনে এবং শীঘ্র ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার কার্য্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

মন্ত্রী-মিশনের আবেদন

২৪। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবং জনসাধারণের এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের নিকট আমাদের শেষ বক্তব্য এই :—“আমাদের, আমাদের গবর্ণমেন্ট এবং আমাদের দেশবাসীদের আশা ছিল যে, ভারত-বাসীরা যেরূপ নূতন রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিতে চান তাহার গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের এবং আমাদের পরিশ্রম ও অশেষ ধৈর্য্য ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করি যে, সর্ববিধ মত গ্রহণ করিয়া এবং অশেষ বিবেচনাপূর্বক আমরা আপনাদের নিকট এখন যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেছি তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্তর্বিপ্লব ও অন্তরকলহ ব্যতীতই আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম করিবে। আমাদের প্রস্তাব হয়ত আপনাদের সকল দলকে খুশী করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের সহিত আপনারাও ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, ভারতের ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে রাজনীতির দিক হইতে পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, এই প্রস্তাব যদি আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তবে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহাও বিবেচনা করিতে আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। ভারতীয় দলসমূহের সহিত একযোগে একের জন্ত চেষ্টা করিয়া আমরা এই মত পোষণ করিতেছি যে, কেবল উক্ত দলসমূহের মধ্যে আপোষের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার আশা অতি অল্প; সুতরাং হানাহানি, অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য। এইরূপ শান্তিভঙ্গের ফলাফল এবং স্থিতি-কাল অনুমান করা কঠিন; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু অত্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই অবস্থাকে

ভারতীয় জনসাধারণ, আমাদের দেশবাসী এবং বিশ্বের জন-সাধারণ সমভাবে ঘৃণা করিবে।

সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ভাব লইয়া আমরা আমাদের প্রভাব আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, আপনারাও সেই ভাব লইয়াই তাহা গ্রহণ করিবেন এবং কার্যকরী করিয়া তুলিবেন। তাহার ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিজেরদের সম্প্রদায় এবং স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আমরা আশা করি, নূতন স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্রের সভ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। আমরা আশা করি যে কোন অবস্থাতেই আপনারা আমাদের সহিত নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ আবদ্ধ থাকিবেন। অবশ্য ইহা আপনাদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এই বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, বিশ্বের মহান জাতিপুঞ্জের মধ্যে আপনাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হউক এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হউক ইহাই আমাদের কাম্য।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রম ষ্ট্র্যাফোর্ডের বিবৃতি

নয়াদিল্লী ১৬ই মে—স্বস্থপতিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে শ্রম ষ্ট্র্যাফোর্ড বলেন, “আপনারা উভয় বোতার বক্তৃতাই শুনিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঘোষণাপত্রখানি আপনাদের নিকট আছে। উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত মন্ত্রী-মিশন এই সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। আগামী কল্যাণ এইরূপ সাংবাদিক বৈঠক হইবে। তখন আপনারা আমাদের প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।”

তিনি বলেন, “ঘোষণাটি মাত্র মন্ত্রী-মিশনের অর্থাৎ ঘোষণা-পত্র স্বাক্ষরকারীদেরই ঘোষণা নহে। উহা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ঘোষণাও বটে, ঘোষণায় ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নাই। উল্লিখিত বিষয়গুলি কি ভাবে কার্যকরী করা হইবে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই। কি ধরণের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়ার কর্তা আমরা নহি। আমরা মাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো সংক্রান্ত দুই-একটি মূল বিষয়ের কথা বলিতে পারি এবং জনসাধারণের নিকট উহার জন্ত সুপারিশ জানাইতে পারি। আপনারা লক্ষ্য করিবেন, আমরা ‘সুপারিশ’ কথাটি ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনারা সুপারিশই বা করিবেন কেন—ভারতবাসীর হাতে উহার ভার ছাড়িয়া দিতেছেন না কেন? আমাদের উত্তর হইতেছে যে, আমরা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠের লোককে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র রচনা-কারী প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনিতে উদ্ভাবী। বস্তুতঃ এই

খানেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা রহিয়াছে। আমরা এই বাধা অপসারণ করিয়া স্বাধীনভাবে ও দ্রুত শাসনতন্ত্র নিয়ামক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সাহায্য করিতেছি মাত্র।

“এখানে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ তাহার কাম্য পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে অথবা বাহিরে থাকিবে তাহা তাহার ইচ্ছাধীন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ যাহাতে যত সম্ভব দ্রুত সম্পন্ন হয়, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ উদ্ভাবী। ভারতবাসীরা; নিজেরা যখন তাহাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিবে তখনই উহা সুসম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উহার জন্ত তত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে অবশ্যই কিছুদিন অতিবাহিত হইবে। বড়লাট অবিলম্বে একটি প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় গবর্নমেন্ট গঠনের কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, তিনি দ্রুত নূতন প্রতিনিধিমূলক গবর্নমেন্ট গঠন করিতে সক্ষম হইবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব

“অন্তর্বর্তীকালীন যে সরকার গঠিত হইবে, তাহার দায়িত্ব-ভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাতিদারটাই সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার কথা মনে রাখিয়া যাহাতে ভারতীয়গণ কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের কাজটি নির্ধারিত সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় শাসন-ব্যবস্থা ও যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়িলে ভারতের লোকেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাই সকল দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে।

ব্রিটেন কবে ভারত ছাড়িবে

“ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে শাসনতন্ত্রগত যে সম্পর্ক এখন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কবে ছিন্ন হইবে, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত তাহা মনে মনে ভাবিতেছেন। বস্তুতঃ শাসন-তন্ত্র গঠন করিতে কত সময় লাগিবে তাহা ভারতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটা কথা খুবই সত্য, আপনারা যত শীঘ্র আরম্ভ করিয়া যত শীঘ্র উহা শেষ করিবেন, ইউনিয়ন, প্রদেশ বা আপনাদের ইচ্ছা হইলে বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া গঠিত গুপ্তগুলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তত শীঘ্র আমরা সরিয়া যাইব। ইহা কিন্তু সুপারিশ নহে—ইহা আমাদের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবেন। অবিলম্বেই শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি ধরণের শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে সে সম্পর্কে আমরা কোন সিদ্ধান্ত করি নাই। দেশবাসীর প্রতিনিধিদের দ্বারা উহা নির্ণীত হইবে। শাসনতন্ত্র গঠনের কাজে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে এবং চিরতরে দূর করিয়া ফেলাই ইহার উদ্দেশ্য।

সুপারিশের অর্থ

“আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয় দলই শাসনতন্ত্র-গঠন-পরিষদে যোগ দিবেন। সহজে উক্ত সুপারিশ বানচাল করা যায় এইরূপ বিধান দেওয়া থাকিলে জায়সঙ্গত কাজ করা হইত না। তাই আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের সম্মতি ছাড়া উহা বাদ দেওয়া যাইবে না। অর্থাৎ আমাদের সুপারিশ যে বাদ দেওয়া যাইবে না তাহা নয়, কিন্তু উহা করিতে হইলে বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন হইবে।

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার মর্গ

“প্রদেশগুলিকে যে কৈন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল সম্ভবতঃ আপনাদের মনে সে সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। বস্তুতঃ কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রদেশগুলিকে কোন না কোন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিতেই হইত। দুই ভাবে ইহা করা সম্ভব ছিল। বর্তমানে যেভাবে প্রদেশগুলি রহিয়াছে হয় সেইভাবেই তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা আর না হয়ত শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর নূতন গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত শ্রেণীবদ্ধ হইতে দেওয়া যাইতে পারিত। আমরা দুই কারণে দ্বিতীয় পন্থা সমর্থন করিয়াছি। প্রথমতঃ, কংগ্রেস এই ধরনের ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহারা চাহিয়াছিলেন যে, প্রথমে সকল প্রদেশকেই আনিতে হইবে, তবে কোন প্রদেশ যদি উক্ত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে তাহাকে পরে বাহির হইয়া যাইতে দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে আইন সভায় যে অতিরিক্ত আসন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার ফলে বর্তমান আইন সভাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না।

বয়স্ক ভোটাধিকারের প্রশ্ন

“বয়স্ক ভোটাধিকার প্রবর্তনের জন্ত আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর সময় লাগিবে। অথচ তত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। উহা আপাততঃ পরিহার করা হইয়াছে। পরবর্তী নির্বাচনের সময় প্রশ্নটি তোলা যাইতে পারিবে।

দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা

“দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর তাহাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা যে সম্ভব নহে অথচ উহা যে হস্তান্তরিত করাও সম্ভব নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। দেশীয় রাজ্যগুলি ইউনিয়নের মধ্যে থাকিয়া আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক বলিয়া জানাইয়াছেন। তাই আমরা উহার ভার দেশীয় রাজ্যগুলি ও ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করার জন্ত ছাড়িয়া দিয়াছি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ

“আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উপজাতীয় শ্রেণী এবং শাসনসংস্কারবহিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া আমরা বিশেষ অনুবিধান মধ্যে পড়িয়াছিলাম। লোক-সংখ্যানুপাতে তাহাদের জন্ত অধিক সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা যেমন সুষ্ঠুভাবে শাসনতন্ত্র কার্যকরী করার দিক হইতে অনুবিধানজনক তেমনই তাহাদের জন্ত সামান্য সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করাও নিরর্থক। তাই দুইভাবে আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্ত সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বড় বড় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি [যথা মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দু, হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুসলমান, পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় এবং তপশীল জাতিসমূহ] শাসনতন্ত্র নিয়ামক পরিষদে তাহাদের জনসংখ্যা অনুপাতে আসন পাইবে। পক্ষান্তরে এই সকল সম্প্রদায় এবং ভারতীয় খ্রীষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, উপজাতীয় জাতি প্রভৃতির মূল স্বার্থগুলির তালিকা রচনার জন্ত শাসনতন্ত্র নিয়ামক পরিষদ কর্তৃক একটি পরামর্শদাতা কমিশন গঠন করা হইবে বলিয়া আমরা সুপারিশ জানাইয়াছি। —এ. পি.

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব

প্রশ্ন—প্রদেশগুলির যদি বিভিন্ন দল (গুপ) হইতে ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসার অধিকার থাকে তবে তাহারা কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতেও ইচ্ছানুযায়ী বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে?

ভারতসচিব উত্তরে বলেন—২ বৎসরের মধ্যে উহার ইচ্ছানুযায়ী বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না। তবে ১০ বৎসরের পরে তাহাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধন দাবি করার অধিকার থাকিবে।

প্রশ্ন—আসামে আছে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা। এখন ধরুন, যদি আসাম বাংলার সহিত যুক্ত-প্রদেশ গঠন করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে সে কি অল্প কোন দলে (গপে) যোগ দিতে পারিবে না?

উত্তর—এই কারণেই বাহির হইয়া আসার অধিকারের কথা পরে আসে—বাহির হইয়া আসার ইচ্ছা কাজে পরিণত করার পূর্বেই সমস্ত জিনিষটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন—কোন প্রদেশ যদি তাহার নির্দিষ্ট দল (গুপ) হইতে অল্প দলে (গপে) যাইতে চায় তবে সে কি তাহা করিতে পারিবে?

উত্তর—এ প্রশ্নের উত্তর বিবৃতির মধ্যে দেওয়া হয় নাই। তবে গণপরিষদ যথাযোগ্য সময়ে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিবেন। এখন কোন প্রদেশের এক দল হইতে অল্প দলে যাইবার অধিকার যদি স্বীকার করা হয় এবং অপর দল যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজী না হয়, তবে একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

প্রশ্ন—কোন প্রদেশকে যে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যদি সেই দলে সে না থাকিতে চায়, তবে সে কি উক্ত দলের বাহিরে থাকিতে পারিবে ?

উত্তর—বিবৃতিতে ক, খ এবং গ এই যে তিনটি দলের কথা বলা হইয়াছে, প্রদেশগুলি আপনা হইতেই সেই দলের একটি না একটির মধ্যে পড়ে। বিবৃতিতে প্রদেশগুলিকে যে যে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেই দলগুলি তখন স্থির করিবে যে, কোন যুক্তপ্রদেশ গঠন করা হইবে কি না এবং হইলে তাহার শাসনতন্ত্রই বা কিরূপ হইবে। এই সব দল মিলিয়া যে যে যুক্তপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা হইতে কোন প্রদেশ ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসিতে পারিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিবে রচিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী আইন সভায় প্রথম নির্বাচনের পর। ইহার পূর্বে এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন—দশ বৎসর পরে কোন প্রদেশ তাহার শাসন-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করার কথা বলিতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র ‘পুনর্বিবেচনা করা’—এই কথার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হইয়াছে কি ?

উত্তর—শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করিতে চাহিলে উহা করা যাইতে পারিবে। যে কোন প্রদেশ শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করার কথা বলিতে পারে। পুনর্বিবেচনা যখন করা হইবে, তখন শাসনতন্ত্রের সব বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিতে পারিবে।

প্রশ্ন—বিবৃতির ‘খ’ দলের প্রদেশগুলি মুসলমান প্রধান। তাহারা যদি সিদ্ধান্ত করে যে, যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা যোগ দিবে না তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে ?

উত্তর—তাহা হইলে যে সর্বের উপর এই সমস্ত লোক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা হইবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদি বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যাইবে। যে সর্বের উপর তাহারা এক হইয়াছিল, এ কথা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। এখন তাহারা প্রথমে যে সর্ব মানিয়া লইয়াছে পরে তাহা মানিতে অস্বীকার করিবে—এরূপ সম্ভাবনা আমরা চিন্তা করি নাই।

প্রশ্ন—বিবৃতির ‘খ’ দলের প্রদেশগুলি কি দশ বৎসর পরে একটি স্বতন্ত্র আত্ম-কর্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত করিতে পারে ?

উত্তর—শাসনতন্ত্রই যদি পুনর্বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহার সংশোধনের সকল প্রস্তাবই আলোচিত হইতে পারে। এখন কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন।

প্রশ্ন—ধরুন, কোন দল যদি যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগ দিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?

উত্তর—এটা একটা সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিষ। কেহ যদি অসহযোগিতা করে, তখন কি করা হইবে সে সম্পর্কে পূর্ব হইতেই ঠিক কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে বিবৃতিতে যে রূপ ভাবে শাসনতন্ত্র রচনা করার কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবেই অগ্রসর হওয়ার পূর্ণমাত্রায় অভিপ্রায় আছে। কোন ব্যক্তি বা দল যদি ইহাতে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তখন কি হইবে সে এখন বলার জ্ঞান আমি তৈয়ারী নাই। তবে বক্তৃতা মানে বিবৃতি অনুসারেই কাজ করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন—বাণিজ্যশুল্ক, আয়কর এবং অন্যান্য সমস্ত কর ধার্য করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়ার অধিকার গণপরিষদের থাকিবে কি ?

উত্তর—মন্ত্রী-মিশনের বিবৃতিতে আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে গণপরিষদ তাহার যে কোনরূপ ব্যাধা করিতে পারে। তবে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রণে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন এবং দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভোটের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া গণপরিষদ ভোটাধিক্যে যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে।

—এ পি

কমন্স সভায় ভারত-প্রসঙ্গ আলোচনা

লণ্ডন ১৬ই মে—ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে এক নূতন শাসন-তন্ত্র গঠনের ব্যবস্থাকল্পে হোয়াইট পেপারের যে পরিকল্পনার খসড়া করিয়াছেন অদ্য অপরাহ্নে কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী তাহা কৌতূহলী সদস্যদের নিকট পাঠ করেন। উক্ত পরিকল্পনানুসারে ভারতের প্রধান দলগুলির নিকট ছয়টি প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইতেছে। ভারতে অবিলম্বে অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অন্তর্বর্তী সরকারের দপ্তরসমূহ এমনকি সমরদপ্তরও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে চলিয়া যাইবে।

ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পনাটি পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবাবলীতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল দলের লোকের প্রতিই সুরিচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের স্বার্থের অহুকূল এক শাসনতন্ত্র নির্ধারণের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার লক্ষ্য। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রী-মিশন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার দুইটি মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রথম নীতি ছিল এই যে, ভারত ব্রিটিশ যৌথরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে অথবা বাহিরে থাকিবে তাহা ভারতই নির্ধারণ করিবে। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে তদুদ্দেশ্যে ভারতীয়গণ স্বয়ং এমন এক বা একাধিক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন যাহা ভারতের প্রধান দল-গুলির সম্মতি ও অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

মন্ত্রী-মিশনের আলাপ-আলোচনাকালে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ঔপনিবেশিক মর্যাদাই ভারতের লক্ষ্যবস্তু নহে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিরোধী দলের নেতা মিঃ চার্চিল বলেন, আমি মনে করি এই উপযুক্ত ও বিষাদময় দলিল পাঠ করিয়া প্রধানমন্ত্রী ভালই করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রচারের পরিবর্তে ইহা পাঠ করিয়া তিনি উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে যে দীর্ঘ জটিল বিষয়টি উপস্থাপিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অল্প সন্ধ্যাতেই কোনরূপ মন্তব্যের চেষ্টা করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়। ব্রিটিশ প্রস্তাবের প্রস্তাবে মিঃ গান্ধী সেই সময় জবাব দিয়াছিলেন ভারত ছাড় ধ্বনি তুলিয়া। তিনি এবং কংগ্রেস তখন একটা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাব যখন উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সাংঘাতিক রকমে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। জাপানী আক্রমণ ও তাহার প্রত্যক্ষ ফল হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমি তাহাদের সহিত বুঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হইল। সেই বিদ্রোহের ফলে সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিকল করা হয়। কিন্তু উহার উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভাবিত জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। এই বিদ্রোহ সহজেই এবং অল্প জীবননাশের মধ্যেই দমিত হয়। ভারত-সম্পর্কেও বহিরাগ্রহণ হইতে সাক্ষ্যের সহিত রক্ষা করা হয়। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের ১৯৪২ সালের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পরও আমরা সমানে চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকি। তার পর বুটেনে কোয়ালিশন সরকারের অবসান হইলে পর যখন পুরাদস্তুর রক্ষণশীল সরকার গদীতে আসীন ছিলেন তখনও গত বৎসর ১৪ই জুন তারিখে তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ আমেরি এসম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে মন্ত্রীমিশন প্রেরণের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে পর মিঃ এণ্টনী ইডেন মিঃ আমেরি সেই উক্তি আবার নূতন করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই উক্তি এই :

বিরতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে মার্চ মাসে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার সবটুকুই এখনও বলবৎ আছে। এ প্রস্তাবটি দুইটি মূলনীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতের পূর্ণ অধিকার কোনক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকা আর না থাকা সম্পূর্ণরূপে ভারতের মঞ্জির উপর নির্ভর করিবে। দ্বিতীয় নীতি হইতেছে এই যে, এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে, তাহা রচনার কাজ ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তাই এই শাসনতন্ত্র গঠনে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান দলগুলির সম্মতি থাকা আবশ্যিক। আলোচনা-আলোচনার মধ্যে একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেছে এই যে এবারের এই সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য বস্তু ছিল অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত

শাসন এবং পরে কমনওয়েলথ হইতে পৃথক হইবার অধিকার নয়। এই আলোচনার ফলাফলের গুরুত্ব এই সভার সদস্যগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না—তবে বিষয়টি আমার নিকটও অনেকটা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। নূতন প্রস্তাবটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যেন ইহার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির স্বন্ধ হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজের স্বন্ধে গ্রহণ করিলেন এবং সেই কারণেই ব্রিটিশ সরকার নিজেই যেন এক বিস্তারিত পরিকল্পনা হাজির করিয়াছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণ স্পষ্টতঃই অন্যায় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত মন্ত্রী-মিশনকে যখন প্রেরণ করা হয়, তখন এই প্রকার কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা হয় নাই। ভারতের প্রধান দলগুলির মতের বিরুদ্ধে ব্রিটেন কর্তৃক প্রস্তুত একটি শাসনতন্ত্র ব্রিটিশের অজ্ঞের সাহায্যে তাহাদের উপর যে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া চলে না সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। (হর্ষধ্বনি) ভারতের স্থানীয় ঈর্ষ ও দেশীয় রাজ্য-গুলির প্রতিও আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। পরীক্ষা করিতে হইবে, এই প্রস্তাবের দ্বারা আমাদের সকল দায়িত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। প্রথমেই মনে পড়ে মুসলমানদের কথা। ভারতের ন্যায় এক ছোটখাট মহাদেশের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতি শক্তিশালী। ইহাদের সংস্কৃতি রক্ষা করা ভারতের শান্তি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত প্রায় ৬ কোটি অস্পৃশ্য রহিয়াছে। তাহাদের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সর্বশেষে দেশীয় রাজ্যেরও সহিত ব্রিটিশ সরকার ও নূতন ভারত সরকারের সম্পর্ক কি হইবে তাহাও বিবেচ্য। দেশীয় রাজ্যে ভারতের এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস; উহা ভারতের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্তমানে এ সম্পর্ক পবিত্র চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ এবং সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। আপাত-দৃষ্টিতে এ সম্পর্কে বাতিল করিতে হইবে। যে কোনও অর্থ করা যাইতে পারে এমন একটি ছুয়া কথা দ্বারা এই সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং দেশীয় রাজ্য-গুলি এক বেওয়ারিশ অঞ্চলে পরিণত হইবে এবং যদি উহাই হয়, তাহা হইলে এ চুক্তির সমস্ত দায়িত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। এই সমস্ত সমস্তা ও স্বেতপত্র পাঠে সদস্যদের মনে আরও যে সমস্ত প্রশ্ন উদ্ভূত হইবে তাহা বিবেচনা করিতে আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গভীর ও ঐকান্তিক বিবেচনার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং আমার মতে এই অবস্থায় সমগ্র বিতর্কমূলক বিষয়টি অবতারণা করা অথবা ষও ষও ভাবে আলোচনা করা উচিত হইবে না। অন্তর্কর্ত্তী কালীন সরকার প্রতিষ্ঠা অথবা একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইলে কিরূপ আইন প্রণয়নের

প্রয়োজন হইবে আমরা এখন পর্যন্ত তাহা জানি না। নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও রাজার ভারত সম্রাট উপাধি বাতিল করিতে হইলেই বা কি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে তাহাও আমরা জানি না। সুতরাং আমি বিরোধীদের পক্ষ হইতে বলিতে চাই যে, এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। দৃষ্ট-মান ঘটনার আলোকে আমরা এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিতে বাধ্য এবং ভবিষ্যতে আমরা কি পূর্বাগ্রহণ করিব সেই সম্পর্কে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা রহিল।

উদারনৈতিক নেতার বক্তৃতা

উদারনৈতিক দলের নেতা মিঃ ডেভিস বলেন যে প্রধান মন্ত্রী এক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতীয়রা ইহা কি ভাবে নেয়, তাহা না দেখা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। মিঃ ডেভিস ইহার পর অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। মিঃ বিড (শ্রমিক সদস্য) বৃটিশ সরকারকে সতর্কনা জানাইয়া বলেন যে, মিঃ চার্লিল এই পরিস্থিতিকে বেদনাদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ চার্লিলের মুখ হইতে উহা আশ্চর্য্যকর কিছু নহে। ১৮৩৩ সালে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, যে দিন ভারতীয়দের হস্তে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারিব সে দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসে পরম শুভদিন। আমরা আজ যাহা ভারতের জন্য করিতেছি, বহু বৎসর পূর্বে তাহাই আমরা কানাডার জন্য করিয়াছি।

কম্যুনিষ্ট সদস্যের উক্তি

কম্যুনিষ্ট সদস্য মিঃ গালাচার বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস মোটেই গৌরবোজ্জ্বল নয়। ভারতের বহু ধনিজ সম্পদ, বহু জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একটি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিবার মত ক্ষমতা ছিল না। ভারতে আজ ছুঁড়ি ক্ষুঁড়ি আসন্ন, ইহাতে ব্রিটেনের কৃতিত্ব কোথায়? আমরা এখন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রাচীন শাসনতন্ত্রের দিন অবসান হইয়াছে; ভারতে আজ বিপ্লব আসন্ন। আমার মনে আছে, যখন মন্ত্রী-মিশন ভারতে যাইতেছিলেন তখন মিঃ এটলি পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন; কিন্তু যখন সাম্রাজ্যবাদী সদস্যরা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন, তখন বিম্বিত হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, সেখানে একটা 'খেল' দেখাইতে ইহার চলিয়াছে। ভারতে ছুইটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। মন্ত্রী-মিশন তাহাদের মধ্যে মিলন না আনিয়া চরম বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জনগণের বিরুদ্ধে তাঁহারা ধনিক ও আধা-ধনিক মধ্যবিভদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। আজ ভারতে ছুঁড়ি ক্ষুঁড়ি আসন্ন। তাহার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সর্বজনগ্রাহ্য নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিবিধ কথা বলিয়া মিঃ গালাচার বলেন যে প্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া সৈন্য-পসারণ করা উচিত; তাহার পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হস্তে

ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। রক্ষণশীল সদস্য আর্ল উইন্টারটন প্রশ্ন করেন, মুসলমানদের কি হইবে। মিঃ গালাচার তত্ত্বগত বলেন যে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠদল; সে ক্ষমতা হাতে লইয়া মুসলমানদের দলে টানিবার চেষ্টা করিবে। এই উত্তরে আর্ল উইন্টারটন উচ্চ হাস্য করেন। তখন মিঃ গালাচার বলেন কংগ্রেসের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত। ইহার পর অধিবেশন মূলতুর্বা থাকে। লর্ড সত্যি উপনিবেশসচিব লর্ড এ্যাডিসন হোয়াইট পেপার পাঠ করেন। লর্ড সাইমনের এক প্রশ্নের উত্তরে লর্ড এ্যাডিসন বলেন যে, অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের সময় শাসন-পরিষদের সদস্যগণ কেবল পরিবর্তিত হইবে; বড়লাটের ক্ষমতা ও কর্তব্য একই প্রকার থাকিবে।—রয়টার

সিমলা বৈঠক সম্পর্কে কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের পত্রাবলী

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মিঃ জিন্নার নিকট লর্ড পেথিক লরেণের গত ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্র :

মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাট যে সকল প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতামত পর্যালোচনার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্ত তাঁহাদের আরও চেষ্টা করা উচিত। তাঁহারা এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে আপোষ আলোচনার ভিত্তিরূপ কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া এই ছুইটি দলকে বৈঠকে আহ্বান করা নিরর্থক; সুতরাং কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আপোষ-আলোচনার ভিত্তিরূপ আমি নিম্নোক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতেছি। এই সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাটের সহিত আলোচনার জন্ত আমি মুসলিম লীগকে ৪জন প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রের খসড়া নিম্নোক্ত রূপ হইবে :—

ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের হাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার থাকিবে,—পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপার, দেশরক্ষা এবং যান-বাহন। হিন্দুপ্রধান এবং মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিকে লইয়া ছুইটি পৃথক মণ্ডল (গ্রুপ) গঠিত হইবে। এইরূপ মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি একযোগে যে-সকল বিষয়ের ভার লইতে প্রস্তুত সেই সকল বিষয়সংক্রান্ত ক্ষমতা তাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ইউনিয়ন এবং প্রাদেশিক মণ্ডলের হস্তে ছাপ্ত ক্ষমতা ব্যতীত অশান্ত সমস্ত বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের থাকিবে।

আমাদের মনে হয় যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ আপোষ আলো-

চনার মধ্য দিয়া এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিবে।

আলোচনার ভিত্তি সংক্রান্ত এই মূলনীতি ও অজ্ঞাত বিষয় বর্তমানে বিস্তারিতভাবে বলা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আলোচনার মধ্য দিয়াই সমগ্র বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। যদি মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষ হইতে ষাঁহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান হইবে তাঁহাদের নাম আমাকে জানাইতে অহরোধ করিতেছি। এই নাম পাইবামাত্রই আমি বৈঠকের স্থান সম্পর্কে আপনাদিগকে অবহিত করিব। খুব সম্ভব সমিলাতেই আলোচনা বৈঠক হইবে।

লর্ড পেথিক লরেন্স সকাশে রাষ্ট্রপতি আজাদের পত্র :

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৬—আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রের জ্ঞত আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনি যে প্রস্তাবটি করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আমার সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে মুসলিম লীগ বা অজ্ঞ যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত ষোলাখুলি আলোচনা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। তবে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আপনি যে “মূলনীতিসমূহের” কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে ভবিষ্যতে কোন বিভ্রম না ঘটতে পারে তাহার জ্ঞত সেগুলির বিস্তারিত এবং সরল ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আপনি অবগত আছেন যে, আমাদের কল্পনা হইতেছে স্বায়ত্তশাসিকার সম্পূর্ণ অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এরূপ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অবশ্যই কতগুলি মৌলিক ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহার মধ্যে দেশরক্ষা এবং তাহার আনুযায়িক ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত গুরুতর। যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ সংহত হওয়া চাই। উহার মধ্যে একটি কার্যনির্বাহক পরিষদ এবং একটি ব্যবস্থা পরিষদ থাকা চাই। কথিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করিবার জ্ঞত যে অর্থের প্রয়োজন তাহাও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা চাই। স্ততরাং এ সমস্ত উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা স্বাধিকার বলে যুক্তরাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। সে সমস্ত কর্ত্বের অধিকার এবং ক্ষমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল এবং অসংহত থাকিয়া যাইবে, ফলে দেশরক্ষা এবং দেশের সাধারণ উন্নতিসাধনে ব্যাধাত জন্মিবে; কাজেই সাধারণভাবে বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষার ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা চাই—অধিকন্তু মূদ্রানীতি, বাণিজ্যসঙ্ক-নীতি প্রভৃতি এবং ঘনিষ্ঠতরভাবে পরীক্ষা করার পর যে সমস্ত কার্য ঐ সমস্ত বিষয়ের আনুযায়িক বলিয়া মনে হইবে, সে সমস্ত কার্যের ভারও থাকা চাই।

আপনি দুই পর্যায়ে প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এক পর্যায়ে হিন্দুপ্রধান এবং অপর পর্যায়ে মুসলিম-প্রধান। বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। একমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান প্রকৃত মুসলমান-প্রধান প্রদেশ-বঙ্গদেশ এবং পঞ্জাবে নামেয়া মুসলমানদিগের সংখ্যা-ধিক্য। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সংযুক্ত অঙ্গরাষ্ট্র গঠন—বিশেষ করিয়া ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এরূপ সংযুক্ত অঙ্গ-রাষ্ট্র গঠন আমরা অসম্মত বলিয়া মনে করি। আরও দেখা যাইতেছে যে, কোনও সংযুক্ত অঙ্গ-রাষ্ট্রে কোনও প্রদেশ যোগ দিবে কি দিবে না সেই স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট প্রদেশকে আপনি দিতেছেন না। কোনও প্রদেশ কোনও সংযুক্ত অঙ্গ রাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহিবে কি চাহিবে না তাহার কোন স্থিরতা নাই। কোনও প্রদেশকেই তাহার ইচ্ছার বিরোধী কার্য করিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অসম্মত। যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংজ্ঞিত সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির উপর থাকুক, ইহাতে আমরা সম্মত আছি তবে আমরা একথাও বলিয়া রাখিতেছি যে, কোনও প্রদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিতভাবে অজ্ঞ কোনও বিষয় পরিচালনা করিতে চাহে সে অধিকার তাহার থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যদি আবার সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায় তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং অজ্ঞ অনেক কারণে উহা অসম্মত হইয়া পড়িবে স্ততরাং আমরা এরূপ কোন ব্যবস্থা সমর্থন করি না।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে উল্লিখিত সর্বসামান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাহাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইতে হইবে। ইহা একান্ত প্রয়োজন। কি ভাবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে তাহা পরে বিস্তারিত বিবেচনা করা যাইবে।

আপনি কতকগুলি মূলনীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আসল কথারই কোন উল্লেখ নাই অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ও তদানুযায়িক ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সৈন্তের অপসারণের কোন কথারই উল্লেখ নাই। একমাত্র এই ভিত্তির উপরই আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ বা অন্তর্বর্তীকালীন কোন ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে পারি।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে-কোন পক্ষের সহিত আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি বটে কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বাহিরের কোন শাসক-শক্তি বিরাজমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আলোচনার মধ্যে কোন বাস্তবতা থাকিবে না।

আপনার প্রস্তাবমত যদি কোন আলোচনার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমার সঙ্গে যাইয়া সেই আলোচনায় যোগ দিবার জ্ঞত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং খান আবদুল গফুর খান—ওয়ার্কিং কমিটির আমার এই তিনজন সহকর্মীকে আমি অহরোধ জানাইয়াছি।

২৯শে এপ্রিল তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট লিখিত মুসলিম লীগ সভাপতির পত্র :

আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রের জ্ঞাত ধন্যবাদ জানাইতেছি। উক্ত পত্র গতকাল প্রাতঃকালে আমি আমার ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করিয়াছি। আলোচনার মধ্য দিয়া লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি আপোষ করিবার জ্ঞাত উভয় দলের প্রতিনিধি লইয়া-মজী-মিশন এবং বড়লাট পুনরায় যে চেষ্টা করিতেছেন, আমি এবং আমার সহকর্মীগণ তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছি। ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার পর হইতে নির্ধিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রত্যেক অধিবেশনে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া আসিতেছি এবং গত ৯ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভার মুসলিম লীগ সদস্যগণের সম্মেলনে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে, আমার সহকর্মীগণের ইচ্ছানুসারে তৎপ্রতি আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রস্তাবের অহুলিপি এতৎসহ প্রেরিত হইল। ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহে যে, আপনার সংক্ষিপ্ত পত্রে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, নীতি এবং বিস্তারিত কর্তৃপক্ষের দিক হইতে বহু বিষয়ে উহার বিস্তৃত বিবরণ এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বৈঠকে বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। স্মরণ্য কোনরূপ বিরূপ মনোভাব না লইয়া এবং পূর্ব হইতে কোনরূপ অঙ্গীকার না করিয়া আপোষ-আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সমস্যার সমাধান করিবার আগ্রহবশতঃ তাঁহারা লীগের পক্ষ হইতে আলোচনায় যোগদানের নিমিত্ত অল্প ৩ জন প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার আমার উপর দিয়াছেন। লীগ প্রতিনিধিগণের চারিটি নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—(১) মিঃ এম এ জিন্না, (২) নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান, (৩) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, (৪) সর্দার আবদার রব নিস্তার।

কংগ্রেস সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

২৯শে এপ্রিল ১৯৪৬—আপনার ২৮শে এপ্রিলের পত্রের জ্ঞাত আপনাকে ধন্যবাদ। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ ও আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হইবে সেই আলোচনায় কংগ্রেস যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া মজীমুল্লের প্রতিনিধিবর্গ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় যে, এই সমস্ত কথা সম্মেলনে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা কখনও এইরূপ মনে করি নাই যে, আমার চিঠিতে যে সমস্ত সর্বের উল্লেখ ছিল তাহা আগে অনুমোদন করিয়া তবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে। একটা মীমাংসার ভিত্তি স্বরূপেই আমরা এই সমস্ত

সর্ব উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা শুধু এই যে, আমাদের সহিত এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধির সহিত এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার জ্ঞাত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সম্মত হউক।

অল্প অপরাহ্নে মুসলিম লীগের উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিবেন বলিয়া লইয়া আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে, সিমলাতে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। আমরা আগামী বুধবার তথায় যাইতে ইচ্ছা করি। ২রা মে বুধস্পতিবার সকলেই যাহাতে আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে তাহার জ্ঞাত কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে যথাসময়ে সিমলায় উপস্থিত থাকেন তাহার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মুসলিম লীগের সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৬—আপনার ২৯শে এপ্রিলের পত্রের জ্ঞাত আপনাকে ধন্যবাদ। কংগ্রেস প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আমাদের মধ্যে যে যৌথ আলোচনা হইবে তাহাতে মুসলিম লীগ যোগ দিতে সম্মত হইয়াছে জানিয়া মজীমুল্লের প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, আমি কংগ্রেসের সভাপতির নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। সেই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসও প্রস্তাবিত আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন। এজন্য কংগ্রেস মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং খান আবদুল গফুর খাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। আপনি মুসলিম লীগের যে প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়াছি। আমরা কখনও এরূপ কথা মনে করি নাই যে, আমার চিঠিতে যে সমস্ত সর্ব রহিয়াছে, আগে সেই সমস্ত সর্ব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তবে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে। এই সর্বগুলিকে আমরা একটা আপোষের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া লইয়াছি। আমরা মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিকে শুধু এই কথাই বলিয়াছি যে, তাঁহারা উহা আমাদের এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জ্ঞাত প্রতিনিধি প্রেরণ করুন।

আমরা ইচ্ছা করি যে, সিমলাতে এই আলোচনা হউক। আমরা আগামী বুধবার তথায় যাইতেছি। আমরা আশা করি যে, ২রা মে বুধস্পতিবার যাহাতে আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে তজ্জন্ম মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ যাহাতে যথাসময়ে সিমলায় উপস্থিত থাকেন তাহার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারিবেন।

সিমলায় আলোচ্য বিষয়ের তালিকা

১। সংযুক্ত প্রদেশসমূহ :

(ক) গঠনপদ্ধতি।

(খ) সংযুক্ত রাষ্ট্রে অধীনস্থ বিষয় সমূহের নির্ধারণ।

(গ) সংযুক্ত রাষ্ট্রের স্বরূপ।

২। যুক্তরাষ্ট্র :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন বিষয়সমূহ।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি।

(গ) আর্থিক ব্যবস্থা।

৩। রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নকারী পরিষদ—

(ক) উহার গঠনপদ্ধতি।

(খ) করণীয় কার্যসমূহ।

(গ) যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে।

(ঘ) সংযুক্ত রাষ্ট্র সম্পর্কে।

(ঙ) প্রদেশসমূহ সম্পর্কে।

লর্ড পেথিক লরেন্সের সকাশে কংগ্রেসের সভাপতির পত্র :

৬ই মে, ১৯৪৬—গত কল্যাণ সম্মেলনে যে সমস্ত আলো-

চনা হইয়াছে তাহা আমি এবং আমার সহকর্মিবৃন্দ অবধানতার

সহিত অনুসরণ করিয়াছি এবং ঐ আলোচনার গতি অনুধাবন

করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি স্বীকার করিতেছি যে,

আলোচনাটা আমার নিকট রহস্যজনক মনে হইয়াছে। উহার

অস্পষ্টতা এবং উহার কতকগুলি নিহিত তাৎপর্য আমাকে

চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আপোষের একটা ভিত্তি

স্থির করিবার জন্ত উপায় বাহির করিতে সর্বপ্রকারে সহ-

যোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু এ যাবৎ যে ধারায়

আলোচনা চলিয়াছে—তাহাতে সাক্ষ্যের কোন আশা রহি-

য়াছে একথা বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজদিগকে মন্ত্রী-মিশনকে

বা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে চাহি

না। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি

আমাদের মতামত কি তাহা আমি আমার ২৮শে এপ্রিল

তারিখের চিঠিতে সংক্ষেপে জানাইয়াছি। দেখিতেছি যে, সেই

মতামতের অধিকাংশই উপেক্ষা করা হইতেছে এবং সম্পূর্ণ

একটা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। অবশ্য আমরা

একথা উপলব্ধি করি যে, আলোচনার প্রারম্ভে কতকগুলি কথা

ধরিয়া লইতে হয়। নতুবা অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নহে। কিন্তু

যদি আমাদের কথা উপেক্ষা করিয়া এমন সমস্ত কথা ধরিয়া

লওয়া হয় যাহা আমাদের মূল কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা

হইলে পরবর্তীকালে পরস্পর ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২৮শে এপ্রিল তারিখে আমার পত্রে আমি বলিয়াছিলাম

যে, আমাদের সম্মুখে আসল প্রশ্ন হইতেছে ভারতের স্বাধীনতার

প্রশ্ন এবং তদানুযায়ী ভারত হইতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর

অপসারণ। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতভূমিতে বিদেশী

সৈন্য অবস্থান করিবে ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা সম্ভব হইতে

পারে না। আমরা চাই সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, উহা আমরা এক্ষণেই চাই, স্বল্প বা অল্প ভবিষ্যতে নহে। অত্যাচরণ—এই স্বাধীনতার আনুযায়িক গণপরিষদ গঠিত হইবার পর সে সমস্ত কথা আলোচনা করা যাইবে।

গত কল্যাণ সভায় আমি পুনর্ব্বার এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, আপনি আপনার সহযোগিবৃন্দ এবং সম্মিলনীর অত্যাচরণ সদৃশ বৃন্দ ভারতের স্বাধীনতাকে আমাদের আলোচনার ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আপনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে অতঃপর কিরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা গণপরিষদই চূড়ান্তভাবে স্থির করিবে। আপনার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু বর্তমানে তাহাতে কিছু আসে যায় না। বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কতকগুলি পরিণাম অবশ্যস্বাভাবী। গতকল্য আমরা দেখিয়াছি যে, এই সমস্ত পরিণাম উপলব্ধি করা হইতেছে না। গণপরিষদ ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন না। সেই প্রশ্নের মীমাংসা এইক্ষণেই করিতে হইবে এবং করা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইতেছি। গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের ইচ্ছাকেই বাস্তব রূপ দিবে। আগের কোন ব্যবস্থার দ্বারাই এই পরিষদ আবদ্ধ থাকিবে না। এই পরিষদ গঠনের আগে সাময়িক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই গবর্ণমেন্ট যতদূর সম্ভব স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেন্ট হইবে। সেই গবর্ণমেন্টই অন্তর্ব্বর্তী কালের দরুণ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। গতকল্য আমাদের আলোচনায় এক সপ্তে কাজ করিবে একগুণ সংযুক্ত প্রদেশসমূহের কথা বারম্বার আলোচনা করা হইয়াছে। এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, এই জাতীয় সংযুক্ত প্রদেশসমূহের একটি করিয়া শাসন পরিষদ এবং ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে। এইভাবে প্রদেশ সংযুক্তির কথা এই যাবৎ আপনাদের মধ্যে আলোচিত হয় নাই। তথাপি উহা নিষ্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আমি পরিষ্কার বলিয়া রাখিতে চাহি যে, একাধিক প্রদেশকে সংযুক্ত করিয়া তাহার জন্ত শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের বা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ঐ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা করিয়া তাহার জন্ত একটি করিয়া শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদের বৃন্দোবস্ত করার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমরা আগেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমরা উহা মানিয়া লইতে সম্মত নহি। উহা করিতে গেলে তিন প্রকারের শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা একটা জ্বরজনক ব্যবস্থা। উহাতে কোন প্রকার প্রগতি সম্ভব হইবে না এবং সংহতি থাকিবে না। পরিণামে অবিরাম সংঘর্ষ চলিবে। পৃথিবীর কোন দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, ভারতবর্ষকে ঐক্য করি-

বার কোন প্রস্তাব আলোচনা করিবার অধিকার এই সম্মেলনের নাই। যদি ভারতবর্ষকে দ্বিধাভিত্তি করিতেই হয় তবে সেই প্রস্তাব বর্তমান শাসন শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত গণপরিষদই করিবেন।

আর একটা কথা আমরা পরিষ্কার বলিয়া রাখিতে চাই, কিবা ব্যবস্থা পরিষদে আর কিবা শাসন পরিষদে বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যার সাম্য থাকিলে এইরূপ কোন প্রস্তাব আমরা মানিতে রাজী নহি। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রত্যেক দলের এবং সম্প্রদায়ের মন হইতে সমস্ত ভয় এবং সংশয় দূর করিবার জন্ত যথাযথ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিব বলিয়া আমরা আশা করি। সুতরাং কাহারও মন হইতে ভয় ও সংশয় দূর করিবার জন্ত আমরা গণতন্ত্রবিরোধী কোন অবাস্তব পদ্ধতি স্বীকার করিতে পারিব না।

মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট লর্ড পেথিক লরেন্সের পত্র :

৮ই মে ১৯৪৬—এযাবৎ আলোচনার ফলে যাহা একটা আপোষের ভিত্তি হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি কি করিলে তাহা প্রকৃষ্টভাবে সম্মেলনে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহা আমি এবং আমার সহযোগিবৃন্দ ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিষয়-গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা বিভিন্ন পক্ষের নিকট সম্মেলন পুনরারম্ভের পূর্বে পাঠাইয়া দিলে সকলেরই সুবিধা হইবে। এই সমস্ত কথা গোপন থাকিবে। আমরা আশা করি যে, আজ সকালের মধ্যেই উহা আপনাদের নিকট পাঠাইতে পারিব। অল্প অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় সম্মেলনের পুনরধিবেশনের কথা আছে। এই সঙ্গীর্ণ সময়ের মধ্যেই আপনারা বিষয়গুলি ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রস্তাব করি যে, অল্পকার সম্মেলন স্থগিত রাখিয়া আগামী কল্যা অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় সম্মেলন আরম্ভ হইবে। এই প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হইবেন বলিয়া মনে করি। সকল দলের স্বার্থের খাতিরেই সময় তালিকার এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। আশা করি আপনারাও এই ব্যাপারে একমত হইবেন।

পেথিক লরেন্সের সেক্রেটারীর পত্র

গত ৮ই মে তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টের নিকট নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন :

আজ সকালে আপনাদের নিকট ভারত সচিব যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত নথি আপনাদের নিকট প্রেরণ করিবার জন্ত মন্ত্রী-মিশন আমাকে বলিয়াছেন। মিশনের ইচ্ছা হইতেছে, ইহা যদি কংগ্রেস এবং লীগ প্রতিনিধিগণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন তবে তাহা আগামী

বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার সময় ত্রিদলীয় অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে মীমাংসার জন্ত উক্ত নথিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে :

১। একটি সর্বভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট গঠিত হইবে এবং ইহার একটি আইন-পরিষদ থাকিবে। বৈদেশিক ব্যাপার, দেশরক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত দপ্তর ইহার হাতে থাকিবে। এই সকল ব্যাপারের জন্ত যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, তাহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা এই গবর্নমেন্টের থাকিবে।

২। অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে থাকিবে।

৩। একাধিক প্রদেশ লইয়া একটি প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন করা যাইতে পারে। এই প্রদেশ-গোষ্ঠী নিজের ইচ্ছামত কতগুলি প্রাদেশিক ব্যাপার সম্মিলিত ভাবে নিদ্বারণ করিতে পারে। গোষ্ঠী নিজেদের জন্ত শাসন-পরিষদ এবং শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৪। মুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের আইন-পরিষদে মুসলিম সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের এবং হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। এই সকল প্রদেশের আইন-পরিষদ সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে কিনা তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের আইন-পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

৫। মুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টও অনুরূপ ভাবে গঠিত হইবে।

৬। মুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের শাসনতন্ত্রে এবং প্রদেশ-গোষ্ঠীর শাসনতন্ত্রে (যদি অবশ্য প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠিত হয়) এইরূপ বিধান থাকিবে যে, শাসনতন্ত্র রচনার দশ বৎসর বাদে কোন প্রদেশ তাহার আইন-পরিষদের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করার দাবি করিতে পারিবে। ইহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর তাহার অনুরূপ দাবি করিতে পারিবে। শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা করার জন্ত মূল গণ-পরিষদের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। ইহাতে ভোটের ব্যবস্থাও অনুরূপ থাকিবে, এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্তিম ইহার শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

৭। উপরোক্ত ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হইবে :

(ক) প্রত্যেকটি প্রদেশের আইন-পরিষদের মোট সদস্যের এক-দশমাংশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদের জন্ত নির্বাচিত হইবে। আইন-পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাতে ইহার নির্বাচিত হইবে।

(খ) দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে, তথাকার প্রতিনিধি প্রেরণের জন্ত আমন্ত্রণ জানান হইবে। ব্রিটিশ

ভারতের প্রতিনিধিদের সংখ্যানুপাতে তাহাদের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে।

(গ) এই ভাবে গঠিত গণপরিষদ যথাসম্ভব স্বতন্ত্র নয়াদিল্লীতে মিলিত হইবে।

(ঘ) গণপরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ বিষয় আলোচিত হইবার পর ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইবে—প্রথম ভাগ হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া, দ্বিতীয় ভাগ মুসলমান সংখ্যাধিক প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া এবং তৃতীয় ভাগ দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া।

(ঙ) প্রথম দুইটি উপ-পরিষদের পৃথক্ অধিবেশন হইবে। তাহার নিজেদের প্রদেশ-গোষ্ঠীর জ্ঞাত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীর জ্ঞাত মুক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(চ) এই ভাবে শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর কোন প্রদেশ তাহার গোষ্ঠী হইতে সরিয়া যাইয়া অপর গোষ্ঠীতে যোগ দিবার অথবা একেবারে পৃথক্ থাকিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

(ছ) ইহার পর ১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত অল্পেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অস্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জ্ঞাত সমগ্র গণপরিষদে মিলিত অধিবেশন হইবে।

(জ) সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে থাকে তবে তাহার অল্পকালে দুইটি বৃহৎ সভার মধ্যে ভোট ব্যতীত তাহা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইবে।

৮। বড়লার্ট অবিলম্বে উক্ত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ আহ্বান করিবেন। ৭ অল্পেদে বর্ণিত ব্যবস্থা অস্থায়ী এই পরিষদের কার্য চলিবে।

মিঃ জিন্নার পত্র

গত ৩ই মে তারিখে মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—
আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রেরিত পত্র এবং আপনার পূর্বপত্রে লিখিত নথি আজ পাইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন যে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি যদি লীগ প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ত্রিদলীয় সম্মেলনের পুনরধিবেশনে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে আপনার পত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি লিখিত ছিল—“একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্ট গঠিত হইবে। বৈদেশিক ব্যাপারে দেশরক্ষা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ভার ঐ গবর্নমেন্টের হাতে থাকিবে।” ভারতের প্রদেশ-গুলিকে দুই ভাগ করা হইবে। এক ভাগ হইবে হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশগুলিকে লইয়া, অপর ভাগ হইবে মুসলমান সংখ্যাধিক প্রদেশগুলি লইয়া। উপরিউক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অল্প সমস্ত বিষয়ে প্রদেশ-গোষ্ঠী দুইটি পৃথক পৃথক ভাবে

নিজেদের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবে। প্রাদেশিক গবর্নমেন্টগুলির উপরিউক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অল্প সমস্ত ক্ষমতা এবং অসংজ্ঞিত ক্ষমতা থাকিবে।”

এই মে রবিবার সিমলায় ত্রিদলীয় সম্মেলনে এই বিষয়টি আলোচনার জ্ঞাত আমরা যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার সর্ভাঙ্গ-যায়ী আমরা যোগদানে সম্মত হই।

ত্রিদলীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আপনি আপনার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। এই এবং ৬ই মে তারিখে বহু আলোচনা-আলোচনার পর কংগ্রেস মাত্র তিনটি বিষয়ে এবং তজ্জন্ত অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্টের প্রস্তাব চূড়ান্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

আপনার পরিকল্পনায় মুসলমান এবং হিন্দু সংখ্যাধিক প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন এবং তাহার জ্ঞাত দুইটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতৈক্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ করা যাইতে পারে যে, দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। এই ভিত্তিতেই আপনার পরিকল্পনায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইয়াছে।

আপনার খসড়া পরিপূর্ণ করিবার জ্ঞাত আমাদের সম্মতি চাওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেস খোলাখুলি ভাবে এই প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করে। তখন মন্ত্রী-মিশনকে পরবর্তী পহা উদ্ভাবনের জ্ঞাত ত্রিদলীয় অধিবেশন মূলতুর্নী রাখিতে হয়।

এক্ষণে আমাদের কাছে নূতন একটি পরিকল্পনা প্রেরণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ত্রিদলীয় সম্মেলনের পুনরধিবেশনে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করা হইবে। ইহার শিরোনামায় বলা হইয়াছে, “কংগ্রেস এবং লীগ প্রতিনিধিদের মধ্যেই মীমাংসার জ্ঞাত প্রস্তাবিত স্তর।” প্রস্তাব কাহারো করিবেন তাহা মোটেই স্পষ্ট নয়।

আমরা মনে করি, যে নূতন স্তরগুলির সহিত আপনার ২৭শে এপ্রিল তারিখের পত্রে লিখিত স্তরের আগাগোড়া গরমিল রহিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আপনার নূতন পরিকল্পনায় ১ হইতে ৭ অল্পেদেদের ভিত্তিতে একটি সর্বস্বত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রস্তাবে আপনাদিগকে সম্মত হইতে বলা হইয়াছে। নূতন পরিকল্পনায় যুক্তরাজ্য গবর্নমেন্টের অধীন তিনটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। সেই বিষয়টি হইতেছে মৌলিক অধিকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্ট এবং তাহার আইন-পরিষদ কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহের অধিকারী কিনা তাহা আপনার প্রস্তাবে স্পষ্ট হয়। আপনার নূতন প্রস্তাবে যে প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠনের কথা বলা তাহা ঠিক কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের মনোভাবের অল্পরূপ এবং তাহা আপনার মূল প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। আপনি বলিয়াছেন, একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। আমরা ইহাতে

কোনক্রমেই রাজী হইতে পারি না। আপনি যেভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতেও আমরা সম্মত হইতে পারি না। আপনার প্রস্তাবে আরও কতকগুলি আপত্তিকর বিষয় রহিয়াছে। আমরা প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করিতেছি বলিয়া সেগুলির দিকে নজর দিই নাই। এমতাবস্থায় আপনার নূতন প্রস্তাব আলোচনা করিয়া কোন লাভ হইবে না। কারণ ইহা আপনার মূল প্রস্তাবের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার পরেও যদি আগামী কল্যের অধিবেশনে আলোচনার জন্ত আমাদিগকে উপস্থিত হইতে বলেন তবে অবশু স্বতন্ত্র কথা।

ভারত-সচিবের পত্র

৯ই মে তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্স লীগ প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নার নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—আপনার পত্র আমি আমার সহকর্মীদিগকে দেখাইয়াছি। আপনার পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার একটি একটি করিয়া উত্তর দিতেছি।

১। আপনি লিখিয়াছেন তিনটি বিষয় লইয়া কাজ করিবার জন্ত এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের অধিকারসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহা আমার যত দূর মনে আছে আপনার একথা ঠিক নহে। একথা সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের ক্ষমতা অতিরিক্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক জায়গায় আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহাদের যুক্তিতে কিছু সার রহিয়াছে। কারণ আপনি বলিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কিছু ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টকে অবশুই দিতে হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

ইহার পর আপনি বলিয়াছেন যে, প্রদেশ-গোষ্ঠী গঠন সম্পর্কে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি তাহা আমাদের মূল প্রস্তাবের বিরোধী। আপনার এ কথা আমরা মানিতে পারি না। ইহা মূল প্রস্তাবের কিছু বিশ্লেষণ মাত্র। প্রদেশগুলি কিভাবে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীতে যোগদান করিবে তাহাই নূতন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। প্রদেশ বিভাগের পক্ষে লীগ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং বিপক্ষ কংগ্রেস যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে নূতন প্রস্তাবে তাহার একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার প্রয়াস রহিয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত আমাদের প্রস্তাবিত পরিষদ সম্পর্কে আপনি আপত্তি করিয়াছেন। আমি আপনাকে বলিতে চাই গত মঙ্গলবারের অধিবেশনে দুইটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন পরিষদ মীমাংসিত উপায়ে কিভাবে কাজ করিতে পারে তৎসম্পর্কে আপনি বলিয়াছিলেন যে, সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত দুইটি পরিষদকে মিলিত হইতে হইবে। সর্বভারতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

প্রণয়ন কিভাবে করা যাইবে তাহা নির্ধারণের জন্ত দুইটি পরিষদের এক মিলিত প্রাথমিক অধিবেশন হইবে। আমরা ঠিক এই কথাই অল্প ভাবে বলিয়াছি, কাজেই আপনি যখন বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তখন তাহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা আমার মোটেই বোধগম্য হইতেছে না।

পরবর্তী অহুচ্ছেদে আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার প্রেরিত লিপিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার প্রস্তাবিত সূত্র কে প্রস্তাব করিয়াছে। ইহার জবাবে আমি বলিতে চাই, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতভেদ দূর করিবার প্রচেষ্টায় মজ্লী-মিশন ও বড়লাট এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

আপনার পরবর্তী আপত্তি হইতেছে মূল প্রস্তাব হইতে আমরা সরিয়া গিয়াছি। আমি আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিব যে, আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ মূল প্রস্তাব গ্রহণ করিবে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় নাই।

২৯শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম—“আমরা এ কথা কখনও মনে করি না যে কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণের অর্থ আমার পত্রে লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা মীমাংসার প্রয়াস মাত্র।

“আমরা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে শুধু অহুরোধ করিয়াছিলাম যে এ সম্পর্কে আমাদের ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার জন্ত লীগ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে।” ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মনোভাব কারণ আমাদের আলাপ-আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্ত সর্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ।

আমাদের প্রস্তাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের অধীনস্থ বিষয়গুলির মধ্যে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কারণ আমাদের ধারণা ইহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের অর্থসংগ্রহ প্রবন্ধের সমগ্র তাৎপর্য ত্রিদলীয় সম্মেলনে আলোচিত হইতে পারিবে। আপনার পত্রের শেষ অহুচ্ছেদে আপনি বলিয়াছেন যে, অল্প অপরাঙ্কে আহুত সম্মেলনে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকিয়া কোনও লাভ হইবে না তবে আমরা চাহিলে আপনার আসিতে রাজী আছেন। আমি এবং আমার সহকর্মীগণ আমাদের নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে উদয় দলের অভিমত জানিতে চাই। কাজেই বৈঠকে যদি আপনারা আসেন তবে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পত্র

৯ই মে তারিখে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

গতকল্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসার কতিপয়

প্রস্তাবসহ আপনি যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমি এবং আমার সহকর্মীগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছি। গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমি আপনাকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে আপনার ২৭শে এপ্রিলের পত্রে লিখিত মূল আদর্শ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব জানাইয়াছি। প্রথম ত্রিদলীয় আলোচনার পর ৬ই মে তারিখে সম্মেলনের আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্ভাবিত কোন ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্ত আমি আপনাকে আবার লিখি।

এক্ষণে আপনার লিপিতে দেখিতেছি যে, আপনার কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের এবং কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এইভাবে আমরা একটি জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি। একটি মীমাংসার জন্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্ত আমরা সর্বপ্রকার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি এবং ইহার জন্ত আমরা যত দূর সম্ভব অগ্রসর হইতে রাজী আছি। কিন্তু এমন একটি সীমা আছে যাহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। ভারতীয় জনগণের পক্ষে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থায় আমরা রাজী হইতে পারিব না। আমার পূর্ববর্তী সমস্ত পত্রে আমি শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। আমি আরও বলিয়াছি যে উপযুক্ত রাষ্ট্র এবং আপনার প্রস্তাবিত পন্থায় প্রদেশ বিভাগ আমরা অমুদোদন করিতে পারি না। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ এবং আইন পরিষদের অসমান সংখ্যক সম্প্রদায় হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন প্রদেশ বা অঞ্চল যদি ইচ্ছা করিয়া নিজেকেদের মধ্যে সহ-যোগিতা করে তবে আমরা তাহার বিরোধী হইতে চাহি না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সরকারীভাবে হইবে। আপনার প্রস্তাবে গণপরিষদের অবাধ বিচারের পথে বাধা রহিয়াছে। আমরা বুঝি না ইহা কি প্রকারে সম্ভব। আমরা এক্ষণে একটি বৃহৎ সমস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করিতেছি। সে দিকটি সম্পর্কে এখন কোন সিদ্ধান্ত করা হইলে আমরা বা গণপরিষদ অথবা দিক সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিবে তাহা ব্যাহত হইতে পারে। আমাদের মতে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা হইতেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত অবাধ কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি গণপরিষদ গঠন করা। অবশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্তও কিছু পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে। কাজেই কোন বৃহৎ সাম্প্রদায়িক সমস্তা স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের সম্মতিক্রমে অথবা সম্মতি না পাওয়া গেলে সালিশীর দ্বারা সমাধান করার প্রস্তাবে আমরা রাজী আছি। আপনার লিপির ৮ অঙ্কচ্ছেদে ২টি বা ৩টি পৃথক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার ফলে সর্বভারতের জন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন তিনটি অসংযুক্ত গোষ্ঠীর অল্পকম্পার উপর নির্ভর করিবে।

প্রথম অবস্থাতেই কোন প্রদেশের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত সীমান্ত প্রদেশকে কেন কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে? আমরা স্বীকার করি যে, ব্যাপ্তি বা সমষ্টির কল্যাণের জন্ত যুক্তিতর্কের বাহিরেও অনেক কিছু বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু যুক্তিতর্কের কথা একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আজ আমরা কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য তৎপর হইয়াছি। এখন অযুক্তি এবং অন্যায়েকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল বিশেষ বিপজ্জনক হইবে।

আপনার লিপিতে লিখিত কয়েকটি বিষয়ের এক্ষণে বিবেচনা করিব এবং তৎসম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করিব। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের অধীনে যে সকল বিষয় থাকিবে তাহা পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনি সেই গবর্নমেন্টকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা মনে করি এ কথা স্পষ্টভাবে বলা উচিত যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের নিজের অধিকার অনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা থাকিবে। মুদ্রা, বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের অধীনে থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্নমেন্টের হাতে আর একটি বিষয় থাকা অতিশয় প্রয়োজন। তাহা হইতেছে জাতীয় পরিকল্পনা। কেন্দ্রেই শুধু পরিকল্পনা যথা-যোগ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকার অবস্থানুযায়ী সেই পরিকল্পনার কার্য্যে রূপ দেওয়া হইল। রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে অথবা অন্য কোন জনস্বার্থ সম্পর্কিত জরুরী ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই থাকিবে।

শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে অসমান সংখ্যক সম্প্রদায়সমূহ হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা অসঙ্গত এবং ইহা বহু গোলমাল সৃষ্টি করিবে। ইহার মধ্যে বিসম্বাদ এবং অবাধ প্রগতিবিরোধী প্রয়াসের বীজ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে অথবা অল্পরূপ অন্য কোন ব্যাপারে যদি মীমাংসা নাই হয় তাহা হইলে আমরা সালিশীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। ১০ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন আমরা তাহা মানিতে সম্মত। কারণ, যে কোন সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংশোধনের বিধান ইহাতে থাকিবেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার জন্য গণপরিষদের অল্পরূপ ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এই ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা আশা করি ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। ১০ বৎসর পরে ভারতবাসী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেরে তাহাদের মনোভাব সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করিতে রাজী হইবে না।

৭নং অঙ্কচ্ছেদের (ক) দ্বারা সম্পর্কে আমরা মনে করি যে,

সকল দলের পক্ষে সুবিচারের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র হস্তান্তরীয় ভোটের সাহায্যে (সিঙ্গল ট্রান্সফারবল ভোট) সংখ্যাগুপ্তে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করাই নির্বাচনের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন বর্তমানে যে ভিত্তিতে হইয়া থাকে তাহাতে সংখ্যা-লব্ধিদের জন্ত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

গণপরিষদ এক-দশমাংশ লইয়া গঠিতে হইলে সদস্যসংখ্যা একেবারেই অপরিপূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ ঐ সংখ্যা দুই শতের অধিক হইবে না, অথচ গণ পরিষদে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইবে। উহাতে আরও অধিকসংখ্যক সদস্য থাকা সম্ভব। আমাদের মতে প্রাদেশিক পরিষদগুলির মোট সদস্যের অন্তর এক-পঞ্চমাংশ লইয়া গণ-পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত।

(খ) ধারাটি আদৌ স্পষ্ট নহে। উহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে আমরা ঐ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় যাইতে চাহি না।

(ঘ) (ঙ) (চ) (ছ) ধারাবলি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন এবং গঠনপ্রণালী উভয়ই আমাদের মতে অবাস্তব। অবশ্য যদি প্রদেশগুলি মণ্ডল গঠনে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে আমরা উহা অগ্রাহ্য করিতে চাহি না। কিন্তু এই বিষয় গণ-পরিষদের নির্ধারণের জন্ত অবশ্যই রাখিয়া দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গেই শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া কার্যকরী করিতে হইবে। এই শাসনতন্ত্রে প্রদেশ ও অঙ্গরাজ্যের জন্ত এই-বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে। আবশ্যকবোধে প্রদেশগুলি ইহার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(জ) ধারা সম্পর্কে এই কথা বলা চলে যে, বর্তমান অবস্থায় আমরা অল্পসংখ্যক ধারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। অবশ্য মতানৈক্য ঘটিলে বিষয়টি বিবেচনার জন্ত সালিশী বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। আপনার লিপিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ক্রটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের প্রস্তাব অস্থায়ী উহা সংশোধিত হইলে কংগ্রেস যাহাতে উহা গ্রহণ করে তজ্জন্ম আমরা স্তুতিপাশ করিতে পারিব। কিন্তু লিপিতে যে বসড়া করা-হইয়াছে উহা আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি।

মোট কথায় লীগের সহিত আপোষের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার প্রস্তাবগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে আমরা মানিয়া লইতে পারিব না। এমন কোন বৃহত্তর অশান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না যেখান হইতে আমাদের তিন দলকেই পরিভ্রাণের জন্ত পথের সন্ধান করিতে হইবে। স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতের বিকাশের জন্ত যদি দুইটি দলের মধ্যে কোনক্রমেই সম্মানজনক সত্ত্বে আপোষ সম্ভব না হয় তাহা হইলে অবিলম্বে একটি অন্তর্কর্ত্তাকালীন অস্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি, যে গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু

গণ-পরিষদ সম্পর্কে লীগও কংগ্রেসের মতবিরোধ নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে প্রেরণ করিতে হইবে।

দুই দলের মত-বিরোধের মীমাংসার জন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু একজন নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের প্রস্তাব করিলে বিচারকের মধ্যস্থতার আপোষের সম্ভাবনা আছে অস্বাভাবিক করিয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়। দুই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র বিনিময় হয় :

জবাহরলাল নেহরুর পত্র

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু গত ১০ই মে লীগ সভাপতির নিকট লেখেন—

গতকল্যকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অস্থায়ী আমার সহকর্মী-গণ একজন উপযুক্ত বিচারক মনোনীত করা সম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। আমাদের ধারণা যে, এই পদের জন্ত কোন ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান এবং শিখকে মনোনীত করা সম্ভব হইবে না। তাই মনোনয়নের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। যাহা উহক, আমরা একটি নামের তালিকা করিয়াছি যাহা হইতে কাহাকেও মনোনীত করা যাইতে পারে। আপনি ও আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতায় একটি অল্পসংখ্যক তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমি অস্বাভাবিক করি। আপনি-ও আমি একত্রে দুইটি তালিকা বিবেচনা করিতে চাই। ইহাতে আপনার সম্মতি আছে কি? আপনার সম্মতি থাকিলে আমরা দুইজনে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্ত মিলিত হইতে পারি; এবং আমাদের আলোচনার পর আমরা যে সুপারিশ করিব তাহা আমাদের আট জন অর্থাৎ কংগ্রেসের ৪ জন প্রতিনিধি এবং মুসলিম লীগের ৪ জন প্রতিনিধি মিলিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিয়া চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দিতে পারিবেন। আগামীকল্য সম্মেলন আরম্ভ হইলে সেখানে ঐ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে।

লীগ সভাপতির ১০ই মে-র পত্র

আপনার ১০ই মে তারিখের পত্রখানি অপরাহ্ন ৬টার সময় পাইয়াছি। গতকল্য বড়লাট-ডবনে আপনার ও আমার মধ্যে বিচারক নিয়োগের বিষয় ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অল্পক্ষণ আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গতকল্য সম্মেলনে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন উহা আপনার এবং আমার সহকর্মীগণের সহিত আলোচনার পর আমরা উহার সমস্ত দিক আরও পর্যালোচনা করিয়া দেখিব।

আপনার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিবার জন্ত আগামীকল্য সকাল ১০ ঘটিকার পর আপনার সুবিধামত যে কোন সময়ে আপনার দেখা পাইলে আমি সুখী হইব।

পণ্ডিত জবাহরলালের উত্তর

গত ১১ই মে পণ্ডিত জবাহরলাল লীগ সভাপতিকে লেখেন :

গতকল্য রাত্রি ১০ ঘটিকায় আপনার ১০ই মে তারিখের পত্র আমি পাইয়াছি। বড়লাট-ভবনে আমাদের মধ্যে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন আপনি বিচারক মনোনয়ন ব্যতীত অত্যাধিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে আমার মতামত তখনই দিয়াছিলাম। আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে আমরা একমত হইয়াছি এবং বিচারকের নাম প্রস্তাব করাই আমাদের পরবর্তী কাজ। সম্মেলনে আমাদের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার ফলেই আমার সহ-কর্মীগণ উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। অল্প অপরাহ্নে যখন সম্মেলন হইবে তখন আমরা আমাদের মনোনীত বিচারকের নাম প্রকাশ করিব, অন্ততঃপক্ষে বিচারক সম্পর্কে আমাদের মতামত জানাইব, ইহা সকলেই আশা করেন।

নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের মুখ্য তাৎপর্য এই যে, তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা উহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত জানিবে। আপনার প্রস্তাব অমুযায়ী আমি অল্প সকাল ১০-৩০ ঘটিকায় আপনার বাসভবনে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব।

লীগ সভাপতির পত্র

লীগ সভাপতি গত ১২ই মে পণ্ডিত জবাহরলালকে লেখেন : আপনার ১১ই মে তারিখের পত্র পাইলাম। বড়লাট-ভবনে আপনার সহিত আমার ১৫ অথবা ২০ মিনিট কথোপকথনকালে আমি আপনার প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক এবং তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করি। আমাদের অল্পক্ষণের জুই আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে আপনারই প্রস্তাব অমুযায়ী আপনার ও আমার পরস্পরের সহকর্মীদের সহিত বিচারক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সর্ব ভিন্ন অল্প কোন বিষয়ে সর্ব হয় নাই। পরদিন এই বিষয়ে আরও আলোচনার জন্ত আমরা তখন আলোচনা বন্ধ রাখি।

আরও আলোচনার জন্ত ১০-৩০ ঘটিকায় আপনার সাক্ষাৎ পাইলে খুশী হইব।

লীগ সভাপতির লিপি

গত ১২ই মে তারিখে মুসলিম লীগের সভাপতি লীগের সর্বনিম্ন দাবী প্রস্তাবাকারে মন্ত্রী-মিশন ও কংগ্রেসের নিকট প্রেরণ করেন :—

আমাদের প্রস্তাবের মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

১। ছয়টি মুসলমান প্রদেশকে (পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বঙ্গদেশ এবং আসাম) একটি মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এই মণ্ডল (গ্রুপ) দেশরক্ষার জন্ত আবহুৎ পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিবেন। মুসলিম প্রদেশের মণ্ডল (পরিবর্তীকালে পাকিস্তান মণ্ডল বলা হইয়াছে) এবং হিন্দু প্রদেশগুলির মণ্ডলের রাষ্ট্রতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ

একযোগে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালনা করিবেন।

২। ছয়টি মুসলমান প্রদেশের জন্ত একটি স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ থাকিবে। ঐ পরিষদ মণ্ডলের এবং মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবে এবং প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের (পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র) জন্ত ক্ষমতা নির্ধারণ করিয়া দিবে। প্রাদেশিক মণ্ডল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত অবশিষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিবে।

৩। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন প্রণালী এইরূপ হইবে যাহাতে পাকিস্তান মণ্ডলের প্রত্যেক প্রদেশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

৪। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ কর্তৃক পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রদেশসমূহের মণ্ডলের শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে রচিত হইলে পরে যে কোন প্রদেশ তাহার মণ্ডলের বাহিরে আসিবে কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে। অবশ্য মণ্ডলের বাহিরে থাকা না থাকা সম্পর্কে সেই প্রদেশের জনসাধারণের মতামত গণ-ভোট সাহায্যে নির্ধারিত করিতে হইবে।

৫। ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টে কোন আইন সভা থাকিবে কিনা তাহা শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ দুইটির যুক্ত অধিবেশনে আলোচনার বিষয় হইবে। কোন প্রণালীতে ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের জন্ত অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ দুইটির যুক্ত অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই কর ধার্য্য করিয়া ঐ অর্থ সংগ্রহ করা চলিবে না।

৬। ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টে দুইটি প্রাদেশিক মণ্ডল হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। যদি আইনসভা থাকে তাহা হইলে উহাতেও সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে।

৭। হিন্দু প্রাদেশিক মণ্ডলের এবং পাকিস্তান মণ্ডলের শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ দুইটির অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিয়া পৃথক পৃথক ভাবে ভোট না দিলে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় যুক্ত শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের বৈঠকে গৃহীত হইতে পারিবে না।

৮। তিন-চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত না থাকিলে ইউনিয়ন গবর্ণমেন্ট বিতর্কমূলক প্রকৃতির আইন এবং শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না।

৯। প্রাদেশিক মণ্ডলের এবং প্রদেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত স্বার্থ, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের মৌলিক অধিকার এবং রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১০। ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান রাখিতে হইবে যে, দশ বৎসর বাদে যে-কোন সময়েই কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট উহার আইন সভার অধিকাংশ সদস্য

ভোটে শাসনতন্ত্রের নিয়মাবলীর পুনর্বিবেচনা দাবি করিতে পারিবে।

উপরিলিখিত নীতির ভিত্তিতেই আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ-নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিতেছি। এই প্রস্তাবের মধ্যে সমস্ত বিষয়ই নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের আপোষ-প্রস্তাব

গত ১২ই মে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আপোষের ভিত্তি-স্বরূপ নিম্নোক্তরূপ প্রস্তাব করা হয় :

১। নিম্নলিখিত ভাবে গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে—

ক। প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভা হইতে একটামাত্র হস্তান্তরীয় ভোটার সাহায্যে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে। এইভাবে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সম্ভব।

খ। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হইবে। কি প্রণালীতে এই নির্বাচন হইবে তাহা পরে বিবেচনা করা হইবে।

২। গণপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। এই শাসনতন্ত্রে নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট ও আইনসভার ব্যবস্থা থাকিবে। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যান-বাহন, মৌলিক অধিকার, মুদ্রা, শুল্ক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষান্তে যে সমস্ত বিষয় ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রকাশ পাইবে, সে সমস্তই পরিচালনার দায়িত্ব ইহাদের থাকিবে। আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে বা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা থাকিবে।

৩। এতদ্ব্যতীত অল্প সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট ও অঙ্গরাষ্ট্রের হাতে থাকিবে।

৪। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন করা যাইবে এবং যে সকল বিষয়ের ভার এইরূপ মণ্ডলী একযোগে লইতে ইচ্ছুক, সেই সকল প্রাদেশিক বিষয় মণ্ডলীই নিষ্কারণ করিবে।

৫। নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্টের জন্ম গণপরিষদ উপরিলিখিতভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার পর প্রদেশের প্রতিনিধিগণ মণ্ডল গঠন করিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র নিষ্কারণ এমন কি ইচ্ছা করিলে মণ্ডলীর জন্যও শাসনতন্ত্র নিষ্কারণ করিতে পারিবেন।

৬। নিখিল-ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা উপস্থিত হইলে গণপরিষদে সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট স্বতন্ত্র ভাবে লইতে হইবে এবং কোন মীমাংসা সম্ভব না হইলে উহা সালিশী বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নকে যুক্তম-বলিয়া বিবেচনা করিবার সময় যদি সন্দেহ

উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্পীকার সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন অথবা উহার সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৭। শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি উত্থিত হইলে সেই বিশেষ বিষয়টি সালিশীর জন্য পাঠাইতে হইবে।

৮। শাসনতন্ত্রে যে-কোন সময় উহা সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে কিন্তু ক্রমাগতই বাহাতে উহা না ঘটতে পারে তজ্জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে, প্রয়োজন অনুভূত হইলে দশ বৎসর পরে গোটা শাসনতন্ত্র সম্পর্কেই পুনর্বিবেচনা করা যাইবে।

মুসলিম লীগের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস

আপোষ সম্পর্কে মুসলিম লীগ যে নীতির ভিত্তিতে প্রস্তাব করিয়াছে, উহা কংগ্রেসের প্রস্তাব হইতে এতই পৃথক যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করা দুঃস্বপ্ন। এই বিজ্ঞপ্তি এবং লীগের প্রস্তাব বিবেচনা করিলেই অসুবিধাগুলি এবং আপোষের সম্ভাবনা কতদূর তাহা সুস্পষ্ট হইবে। মুসলিম লীগের প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত মতামত নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) সারা ভারতের জন্য একটি মাত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ অথবা গণপরিষদ গঠন আমরা প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে করি। প্রদেশগুলি আগ্রহান্বিত হইলে পরে প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন করা যাইতে পারে। যদি প্রদেশগুলি মণ্ডলী গঠন করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহা করিবার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে এবং তাহারা তাহাদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই রচনা করিতে পারিবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লীগ প্রস্তাবিত মণ্ডলীতে স্থান হইতে পারে না, কারণ নির্বাচনের ফলাফল ঐ প্রস্তাবের পরিপন্থী।

(২) প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের হস্তে প্রাচীন প্রধান বিষয়ের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে সম্মত হওয়া ব্যতীতও আমরা অবশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া সম্পর্কেও একমত হইয়াছি। তাহারা উহা ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারে, এবং মণ্ডলী গঠন করিয়া কাজে চালাইতে পারে। এরূপ মণ্ডলীর চূড়ান্ত রূপ কি দাঁড়াইবে তাহা বর্তমান অবস্থায় নির্ণয় করা কঠিন; কাজেই উহা প্রদেশের প্রতিনিধিদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব।

(৩) একটি মাত্র হস্তান্তরীয় ভোটার সাহায্যে নির্বাচন করাই আমাদের মতে প্রকৃষ্ট পন্থা। আইন সভাগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যত প্রতিনিধি আছেন, সেই সংখ্যানুপাতে এই পন্থায় উপযুক্ত প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। জনসংখ্যার অনুপাতে করিতে চাহিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাতে যে সমস্ত প্রদেশে কোন কোন সম্প্রদায়কে বিশেষ-অসুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

(৪) কোন প্রদেশের পক্ষে মণ্ডলী হইতে স্বৈচ্ছায় বাহির হইয়া আসিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। তেমন কোন মণ্ডলীতে কোন প্রদেশকে যুক্ত করিবার পূর্বে সেই প্রদেশের সম্মতি গ্রহণও প্রয়োজন।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের একটা আইন-পরিষদ থাকা অনিবার্য প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের রাষ্ট্র আদায়ের ক্ষমতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

(৬-৭) যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদে দুইটি পৃথক প্রাদেশিক মণ্ডলীর সমসংখ্যক প্রতিনিধি রাখার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। গণপরিষদে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সভ্য উপস্থিত থাকিয়া সত্ত্বভাবে ভোট না দিলে কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারিবে না। এই বিধানই সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ বলিয়া আমরা মনে করি।

(৮) লীগ-৮ নম্বরে যে প্রস্তাব করিয়াছে উহা মানিতে গেলে কোন গবর্ণমেন্ট বা আইন সভা আদৌ চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আমরা যখন প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক

প্রশ্ন সম্পর্কে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়াছি, তখন ঐ ধরনের প্রস্তাবের অর্থ সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা মাত্র। আমরা উহা আদৌ অহুমোদন করি না।

(৯) শাসনতন্ত্রে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে রক্ষা-কবচের এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমাদের মতে এই সমস্ত বিষয় নিম্নলিখিত-ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব, তাহা হইলে সারা ভারতে ইহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(১০) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা অবশ্য রাখিতে হইবে। এমন কি ১০ বৎসর পরে উহার সম্পূর্ণ সংশোধনের ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। কারণ তখনই কেবল সমগ্রভাবে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ ঘটিবে। পৃথক হইবার অধিকারের কথা অন্তর্নিহিত থাকিলেও আমরা ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া সে সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করিব না। —এ পি

মিঃ জিন্না কর্তৃক ঘোষণার সমালোচনা

সিমলা, ২২শে মে—মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সমালোচনা করিয়া মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না দুই হাজার শব্দসম্বিত একটি বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন—“বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মন্ত্রী-মিশন মুসলিমদের সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা এখনও মনে করি যে, পাকিস্তানই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একমাত্র সমাধান এবং পাকিস্তান স্থাপিত হইলেই কেবল স্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন এবং ভারতের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় সমেত সকল অধিবাসীর কল্যাণসাধন সম্ভবপর হইতে পারে।”

মিঃ জিন্না বলিতেছেন—“আরও দুঃখের বিষয় এই যে, মন্ত্রী-মিশন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অতি সাধারণ ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাঁহার তাঁহাদের যুক্তিজাল এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে মুসলিম ভারত আহত বোধ না করিয়া পারিবে না। কংগ্রেসকে তোমাজ ও তোষণ করিবার জুই তাঁহার ইহা করিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। অশ্রুধার বাস্তব অবস্থার আলোচনা-কালে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ঘোষণার নিম্নলিখিত উক্তি করিতে হইত না—ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভারত-ব্যবচ্ছেদের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করিয়াছি। পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ চিরকাল তাহাদের উপর শাসন চালায়—মুসলমানদের এই আশঙ্কার কথা আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই আশঙ্কা মুসলিম জনগণের মনে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কাগজে কলমে কোন রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দূর করা সম্ভব নহে। ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করিতে হইলে ধর্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অগাধ বিষয়ের ভার মুসলিম জনগণের হাতে হস্ত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

মিঃ জিন্না আরও বলেন—“আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তনের প্রথম ১০ বৎসর পর পাকিস্তানী প্রদেশগুলির ইউনিয়ন হইতে পৃথক হইয়া যাইবার অধিকার থাকা উচিত। এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের তেমন কোন বড় রকমের আপত্তি ছিল না। কিন্তু মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে উহা স্থান পায় নাই। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসর পর ঐ শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা দাবি করিবার অধিকারই মাত্র আমাদের দিগকে দেওয়া হইয়াছে।”

শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলিতেছেন—“ব্রিটিশ বেথুচি-স্থানের প্রতিনিধিকে ‘খ’ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিন্তু তিনি কি প্রকারে নির্বাক হইবেন, তাহার কোন নির্দেশ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে। ব্রিটিশ ভারত হইতে ঐ প্রতিষ্ঠানে মোট ২৯২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, তন্মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা হইবে মাত্র ৭৯ জন। দেশীয় রাজ্য-সমূহের জুড় ৯০ জন প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার সঙ্গে ঐ সংখ্যা যুক্ত করিলে, মুসলিমদের অল্পপাত আরো কম হইবে, কেননা দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অধিকাংশই হইবেন হিন্দু। এইভাবে গঠিত গণপরিষদ অধিকাংশের ভোটে সভাপতি ও অগাধ কর্মকর্তা এবং মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণার ২০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপদেষ্টা কর্মটির সদস্য নির্বাচন করিবেন। গণপরিষদের অত্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কেও অনুরূপ নিয়মই প্রযোজ্য হইবে।

বিবৃতির উপসংহারে মিঃ জিন্না বলিতেছেন—“শীঘ্রই দিল্লীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের বৈঠক হইবে, তাঁহারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা অল্পমান করিবার কোন বাসনা আমার নাই। মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের ঘোষণা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনান্তে যে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন।”

মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া মিঃ জিন্না বলেন— ১। মন্ত্রী-মিশন পাকিস্তানকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ‘খ’ বিভাগ—উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং ‘গ’ বিভাগ—উত্তর পূর্ব অঞ্চল, ২। দুইটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদের স্থলে ‘ক’ ‘খ’ ও ‘গ’—এই তিনটি উপ-পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি মাত্র শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। ৩। তাঁহারা (মন্ত্রী-মিশন) ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য-সমূহের সমবায়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়, দেশরক্ষা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাহার থাকিবে।

দেশরক্ষার জ্ঞান যানবাহনের উপর যতটুকু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন সম্পর্কিত ক্ষমতা ঠিক ততটুকুই থাকিবে এমন কোন ইঙ্গিত মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণায় নাই। ঐ তিনটি বিষয় পরিচালনার জ্ঞান প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ কি প্রকারে করা হইবে, সে সম্পর্কেও আভাস দেওয়া হয় নাই। অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে আমরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, করদার্য্য করিয়া নহে, সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া (অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে) ঐ অর্থ সংগ্রহ করা বিধেয় হইবে। ৪। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—এই যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি শাসন-পরিষদ ও একটি ব্যবস্থা-পরিষদ থাকিবে ব্যবস্থা-পরিষদে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোটার (পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত) দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইন সভা থাকিবে না। তবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জ্ঞান গণপরিষদের হাতেই ভার দেওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যবস্থা-পরিষদ ও শাসন-পরিষদ হয় তবে পাকিস্তানী যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রের এবং হিন্দুস্থানী যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সমসংখ্যানুসারের ভিত্তিতেই করা উচিত।

আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, যুক্তরাষ্ট্র আইন বা শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিতর্ক ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। তবে যদি প্রতিনিধিদের ৪ ভাগের ৩ ভাগ লোকই এইরূপ কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেয় তাহা হইলে

যুক্তরাষ্ট্র তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু বিবৃতির মধ্যে আমাদেব সমস্ত কথাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলে তাহা উপস্থিত প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোটার দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে—ঘোষণার এই কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারণ প্রথমেই প্রশ্ন হইল এই যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি বড় কিছা ছোট কে স্থির করিবে? আবার কোনটি যে অসাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তাহাই বা কি ভাবে স্থির করা হইবে?

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রশ্নসমকারী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না বলেন যে এখানে আবার ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের প্রতি-নিধিকে ‘খ’ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে কি ভাবে নির্বাচন করা হইবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই।

প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রশ্নসমকারী প্রতিষ্ঠানে হিন্দুরা হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ভারতের প্রতি-নিধিদের সংখ্যা হইল ২৯২। ইহার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হইবে মাত্র ৭৯। দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও যদি ধরা যায় তবে দেখা যাইবে তাহাদেরও বেশীর ভাগ প্রতিনিধি হইবে হিন্দু। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের শক্তি প্রকৃতপক্ষে আরও কমিয়া যাইবে।

পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, চেয়ারম্যান একাই সিদ্ধান্ত করিবেন, ফেডারেল কোর্টের কোন মতামতই তিনি গুণিতে বাধ্য নহেন এবং সেই মতামতই বা যে কি তাহাও অজ্ঞ কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই। কারণ চেয়ারম্যানকে ফেডারেল কোর্টের সহিত কেবলমাত্র পরামর্শ করিতে বলা হইয়াছে। যৌথ অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ হইতে প্রদেশগুলির ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসার অধিকার সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এবিষয়ে জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করাই উচিত।

নাগরিকগণের, সংখ্যান্ন সম্প্রদায়ের, উপজাতীয়দের এবং সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার সম্পর্কে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে মিঃ জিন্না বলেন যে, ইহার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ যদি অধিকাংশই ভোটার দ্বারা এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারে এবং উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে গৃহীত হয় তাহা হইলে ফল হইবে এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে আরও অনেক বিষয় আসিয়া পড়িবে। উহাতে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে ধ্বংস করা হইবে। কারণ ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে তখন আর কেবল মাত্র ৩টি বিষয়ই থাকিবে না।

উপসংহারে মিঃ জিন্না বলেন যে, মন্ত্রী-মিশনের এই দলিলটি

পড়িবার পর এই বিষয়গুলিই আমি জনসাধারণের নিকট ঠিকভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল যে কি সিদ্ধান্ত করিবেন সে সম্পর্কে আমি পূর্ব হইতে কিছু বলিতে চাই না। তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। —এ পি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পূর্ণতাংপর্য্য এখানে দেওয়া হইল—ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্ব এবং বড়লাট ১৬ই মে তারিখে যে ঘোষণা করিয়াছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাহা যতপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে তাহাও যতপূর্ব্বক বিবেচনা করা হইয়াছে। সহযোগিতার মধ্য দিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের ইচ্ছা লইয়াই তাহারা বড়লাট এবং মন্ত্রিসভার ঘোষণা পর্যালোচনা করিয়াছেন। বিশ্বসভায় শক্তি ও মর্যাদাসহ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইলে স্বাধীন ভারতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট থাকা অবশ্য প্রয়োজন। আলোচ্য ঘোষণা পর্যালোচনাকালে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত কালীন গবর্ণমেন্ট গঠন সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে এবং মন্ত্রী-মিশনের প্রতিনিধিগণ তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে ঐ গবর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ স্বরূপ সম্পর্কে কতটা আভাস পাওয়া গিয়াছে আলোচ্য ঘোষণা পর্যালোচনা কালে ওয়ার্কিং কমিটি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ঐ স্বরূপ এখনও অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইবার পরই উহা ওয়ার্কিং কমিটির লক্ষ্যের কতটা অহুযায়ী তাহা বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটির লক্ষ্য হইতেছে (১) ভারতের স্বাধীনতা, (২) সীমাবদ্ধ হইলেও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট, (৩) প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বীয় শাসনাধিকার দান, (৪) গণ-তান্ত্রিক ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ (প্রদেশগুলি) গঠন, (৫) প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকারে সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উহা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিদান। (৬) প্রত্যেককে আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ দান এবং (৭) প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব অভিন্নচিত্ত জীবনযাত্রার অধিকার দান। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত লক্ষ্যের পার্থক্য রহিয়াছে দেখিয়া কমিটি চুঃখিত, বিশেষ করিয়া অন্তর্ভুক্ত-কালের জন্য যে সাময়িক গবর্ণমেন্ট কার্য পরিচালনা করিবে আলোচ্য ঘোষণার ২৩ অঙ্কেই সেই গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে একটা আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে গবর্ণমেন্ট ও তাহার মধ্যে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের কথা নাই।

যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে সাময়িক গবর্ণমেন্ট আইনতঃ না হইলেও অন্ততঃ কার্যতঃ সেই স্বাধীনতার প্রায় সমক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এই সম্পর্কে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। দেশে দখলকারী বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি উক্ত স্বাধীনতার পরিপন্থী।

বড়লাট ও মন্ত্রিসভার ঘোষণায় কয়েকটি প্রস্তাব রহিয়াছে। উহাতে একটি শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ কি ভাবে গঠিত হইবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করা হইয়াছে। শাসন-তন্ত্র রচনা ব্যাপারে এই পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বটে, কিন্তু মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি একমত নহেন।

যে কোন সময়েই কোন বিষয়ের রদবদল করার অধিকার গণপরিষদের থাকিবে। তবে কয়েকটি প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ২টি প্রধান সম্প্রদায়ের অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের জন্য ১ জন করিয়া প্রতিনিধি—এই অল্পপাতে গণপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্য, বিশেষ করিয়া বাংলা ও আসামের ইউরোপীয় সদস্যদের বেলায় এই নীতি মান্য করা হয় নাই। সুতরাং কমিটি আশা করেন যে, এই ক্রটি সংশোধন করা হইবে।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গণপরিষদের সমস্ত সদস্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। বেঙ্গলি-স্থানে কোন নির্বাচিত পরিষদ নাই সুতরাং কোন মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত প্রদেশের হইয়া কথা বলা অসম্ভব হইবে, কেননা তাহাকে ঐ প্রদেশের প্রতিনিধি বলিয়া কোনমতেই গণ্য করা যাইতে পারে না।

কুর্গের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন মনোনীত সদস্য এবং কয়েকজন ইউরোপীয় সদস্য আছেন। ইহার একটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। ঐ নির্বাচক মণ্ডলীতে ১ শতেরও কম নির্বাচক আছেন। কমিটি মনে করেন যে, সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনে যোগ দিতে পারেন।

মন্ত্রিসভার ঘোষণায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার এবং প্রদেশসমূহের উপর অব্যাহিত ক্ষমতা হস্ত থাকার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রদেশসমূহ ইচ্ছা করিলে সংযুক্ত প্রাদেশিকমণ্ডল (যৌথ অঙ্গরাজ্য) গঠন করিতে পারিবে। ইহার পরই কিন্তু এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি ভাগের প্রদেশগুলির জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং সংযুক্ত প্রাদেশিক মণ্ডলের (যৌথ অঙ্গরাজ্য) জন্য কোন স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র রচনা করা হইবে কি না তাহাও তাহারা

স্থির করিবেন। উপরোক্ত দুই প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রদেশ-গুলিকে প্রাদেশিক মণ্ডল গঠনে প্রায় বাধ্য করা হইয়াছে।

ইহা স্পষ্টতঃই প্রাদেশিক আয়কর্তৃত্ব-নীতির পরিপন্থী। আলোচ্য ঘোষণাটিকে সুপারিশ মাত্র মনে করিয়া এবং ঐ ঘোষণার বিভিন্ন প্রস্তাব ঘাহাতে পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ করা হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি মনে করেন যে, ঘোষণার পনের অহুচ্ছেদের অর্থ হইতেছে প্রদেশগুলিকে যে ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—তাহারা সেই ভাগে কি না তাহা তাহারাই স্থির করিবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে গণপরিষদকে শাসনতন্ত্র রচনা ও উহাকে কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অস্পষ্ট। এই প্রশ্নের অধিকাংশই ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে, প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে যে অনুপাত ধার্য করা হইয়াছে—দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনে সেই অনুপাত যথাসম্ভব মান্য করা উচিত। কমিটি এ কথা জানিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছে যে, দেশীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জন-গণকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় রাজ্যে সম্প্রতি যে সমস্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত অবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে যে কতিপয় দেশীয় সরকার এবং তাহাদের উপর ধাহারা প্রভুত্ব করিতেছেন তাহাদের নীতিতে কোন সত্যকারের পরিবর্তন হয় নাই।

নূতন ভিত্তির উপরই সাময়িক লোকায়ত্ত গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। গণপরিষদ যে পূর্ণ স্বাধীনতাসম্বলিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন ইহা তাহারই অগ্রদূত হইবে। বর্তমান অবস্থায় অজ্ঞান আইনের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেই ঐ গবর্ণমেন্ট কাজ করিতে পারেন। অন্তর্কর্তৃত্বকালের জন্য বড়লাট গবর্ণমেন্টের প্রধান থাকিতে পারেন। কিন্তু ঐ গবর্ণমেন্টকে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি ঘাহাতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন সেইজন্য ঐ গবর্ণমেন্টের মর্যাদা, ক্ষমতা এবং গঠন-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্দেশিত থাকা প্রয়োজন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের মন হইতে ঘাহাতে সর্বপ্রকার সম্ভাবিত ভয় এবং সংশয় দূর হইতে পারে সেরূপভাবে প্রধান প্রধান সাম্প্র-দায়িক সমস্তাগুলির মীমাংসা করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, সাময়িক গবর্ণমেন্ট এবং গণপরিষদ গঠনের সমস্তাগুলিকে এক সঙ্গে দেখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটা সংযোগ থাকিতে পারিবে। তাহার স্বাধীন ভারত গঠনের কাজে নিযুক্ত আছেন

কেবলমাত্র এই বিশ্বাসে ওয়ার্কিং কমিটি এই কাজ গ্রহণ করিতে পারেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর সহযোগিতা চাহিতে পারেন। জিনিষটির পরিপূর্ণ রূপ না জানা অবস্থায় কমিটি কোন চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। —এ পি

মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাটের বিবৃতি

মন্ত্রী-মিশন এবং বড়লাটের মিলিত বিবৃতির পূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে দেওয়া হইল :

মন্ত্রী-মিশন মুসলিম লীগের সভাপতির ২২শে মে তারিখের বিবৃতি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

ভারতীয় নেতারা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায় মন্ত্রী-মিশন উভয় দলের মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া তাহাদের প্রস্তাব করিয়াছেন। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব বা পরিকল্পনাকে সমগ্র ভাবে দেখিতে হইবে। ঐ প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হয় এবং সহযোগিতার মনোভাব লইয়া তাহাকে যদি কাজে পরিণত করা যায় তবে উহা সফল হইবে। মিঃ জিন্নার বিবৃতি এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে যে সব প্রশ্ন তোলা হইয়াছে মন্ত্রিদল তাহার কতগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গণপরিষদের কাজ ক্ষমতা এবং গঠন সম্পর্কে সকল কথাই ঘোষণার মধ্যে পরিষ্কার করিয়া বলা আছে। সেই অহুসারে যদি গণপরিষদ গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ হয় তবে উহার অভিমতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতবাসীদিগকে হস্তান্তরিত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পার্লামেন্টের নিকট সুপারিশ করিবেন। তবে এ সম্পর্কে ঘোষণায় উল্লিখিত দুটি সর্ব মানিয়া লইতে হইবে। তাহা হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা (বিবৃতির ২০ অহুচ্ছেদ) এবং ক্ষমতা হস্তান্তর-জনিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্কীর্ণ চুক্তি সম্পাদন (বিবৃতির ২২ অহুচ্ছেদ)।

নির্বাচনের পদ্ধতি অহুসারে কয়েকজন ইউরোপীয়ান গণপরিষদে নির্বাচিত হইতে পারেন। তবে গণপরিষদে তাহারাই যাইতে চান কি না চান সেটা তাহারাই স্থির করিবেন।

বেশুচিত্তানের প্রতিনিধি কোয়েটা মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী সদস্যদের ও শাহী জিরগায় মিলিত বৈঠকে নির্বাচিত হইবেন।

কুর্গে ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত সদস্যই ভোট দিতে পারিবেন। সরকারী সদস্যরা নির্বাচনে ঘাহাতে যোগ না দেন সেইভাবে তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইবে।

প্রদেশগুলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা এবং তাহাদের লইয়া যৌথ অঙ্গরাষ্ট্র গঠন করার কথা কেন বলা হইয়াছে তাহার কারণ সুবিদিত। পরিকল্পনাটির ইহাই হইল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কেবলমাত্র বিভিন্ন দলের ঐকমত্য অনুসারেই ইহার রদ-বদল করা যাইতে পারে।

শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পর প্রদেশগুলির গোষ্ঠী (গুপ) হইতে বাহির হইয়া আসার ইচ্ছা নির্ভর করিতেছে উক্ত প্রদেশের জনসাধারণের উপর। নূতন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র অনুসারে যখন প্রথম নির্বাচন হইবে, তখন স্পষ্টতঃ এই গোষ্ঠী হইতে বাহিরে আসার প্রস্তুতিই সবচেয়ে বড় হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাঁহারা এই প্রস্তুতির মীমাংসা করিবেন। ইহাই সত্যকারের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে মন্ত্রী-মিশন কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না।

—এ. পি

গান্ধীজী কর্তৃক ঘোষণার বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রী-মিশন যে সরকারী ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন চার দিন ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার আলোচনা-বিচার করিবার পর আবার এই বিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছে যে বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষের জন্ত সবচেয়ে ভাল এই দলিলই প্রস্তুত করিতে পারিতেন। দলিলখানি ঠিকভাবে বুঝবার মত মন যদি আমাদের হয়, তবে দেখিব যে ইহাতে আমাদের দুর্বলতাই প্রতিকলিত হইয়াছে। কংগ্রেস ও মুসলিম-লিগ একমত হয় নাই, হইতে পারে নাই। এই সময়ে নিবুদ্ধিতার বশে আমরা যদি এই মনে করিয়া খুশি হই যে আমাদের মধ্যে এই সব বিভেদ ব্রিটিশের স্বপ্তি, তবে সাংঘাতিক ভুল করা হইবে। আমাদের অনৈক্যের সুযোগ লইয়া নিজ কার্য সিদ্ধ করিবার জন্ত মন্ত্রী-মিশন এত পথ অতিবাহিত করিয়া আসেন নাই, ইংরেজ-শাসন শেষ করিবার সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত পন্থা বাহির করিবার জন্যই তাঁহারা আসিয়াছেন। যতদিন না তদ্বিপরীত কিছু প্রমাণ হয়, ততদিন তাঁহাদের ঘোষণা সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস রাখিবার যত সাহস আমাদের থাকা চাই। শঠের শঠতায় বিশ্বাসীর সাহস বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে।

অবশ্য আমার সাধুবাদের অর্থ এই নয় যে ব্রিটিশের দিক হইতে যাহা সবচেয়ে ভাল মনে হয়, ভারতের দিক হইতেও তাহা সবচেয়ে ভাল, এমন কি কিছু ভাল, বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাদের বিবেচনায় যাহা সর্বোত্তম, আমাদের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আমি পরে যাহা বলিতেছি, আশা করি, তাহা হইতে আমার কথার অর্থ পরিষ্কার হইবে।

দলিলখানি যাহাদের স্বপ্তি, তাঁহারা যাহা বলিতে চান তাহা পুরাপুরি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন দলের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া, সবচেয়ে কম যত্নসহিত পরস্পর

রাজি হইয়া দলগুলি ভারতের স্বাধীনতার সনদ প্রস্তুত করিবার জন্য একত্র হইতে পারেন, মন্ত্রী-মিশন তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব হয়, ইংরেজ-শাসন শেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষকে যদি তাঁহারা গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি যায় এরূপ অন্তর্বিবাদে বিচ্ছিন্ন নহে, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন তবে সে চেষ্টা তাঁহারা করিবেন। যাহাই ঘটুক, ইংরেজ-শাসন তাঁহারা শেষ করিয়া দিবেন। মন্ত্রী-মিশন সিমলায় দুইটি দলকে পরামর্শ সভায় একত্র করিতে পারিয়াছিলেন, (এজন্য তাঁহাদের দিকে কতটা ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তাঁহারা বলিতে পারিবেন,) কিন্তু দল দুইটি একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাতে এতটুকুও ব্যর্থ না হইয়া তাঁহারা সিমলা হইতে ভারতের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিলেন এবং গণপরিষদ গঠন করিয়া দিবার জন্য একটি উত্তম দলিল প্রস্তুত করিলেন। এই গণপরিষদ সর্বপ্রকার ব্রিটিশ প্রভাব হইতে মুক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সনদ প্রস্তুত করিবেন। দলিলপত্রে বাধ্যতামূলক কিছু নাই, ইহাতে ভারতবাসীগণের প্রতি আবেদন ও পরামর্শ আছে। যেমন, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া দিতে পারেন, আবার না-ও দিতে পারেন। আবার, নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগ দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন। ঘোষণাপত্রে যে কর্ম-পদ্ধতির উল্লেখ আছে গণপরিষদ বসিবার পর তাহা পরিবর্তন করিয়া নিজেদের জন্য অপর কোন পদ্ধতি স্থির করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি বা দলের পক্ষে কোন্ বিষয়টি বাধ্যতামূলক হইবে তাহা নির্ভর করিবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনের উপর। অন্য কোন কারণে নহে, মাত্র গণপরিষদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, পৃথকভাবে ভোটদান দুইটি প্রধান দলের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। এই প্রবন্ধটি লিখিবার সময় আমি পুনরায় ঘোষণাপত্রটির একের পর এক করিয়া সকল অংশই পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে ইহাতে আইনত বাধ্যতামূলক কিছুই নাই। কেবল নিজেদের কথার মূল্য এবং প্রয়োজনের তাগিদ এই দুইটিই বাধ্যতামূলক।

ঘোষণাপত্রের সেই অংশটি বাধ্যতামূলক যাহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় এইজন্যই মন্ত্রী-মিশনের চারজন সদস্য আগে হইতে বুঝিয়া পার্লামেন্টের উভয় বিভাগের এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পূর্ণ সমর্থন লইয়াছেন। ঘোষণাপত্রটি বেচ্ছায় অধিকারত্যাগের পথে প্রথম পদক্ষেপ; এজন্য মন্ত্রী-মিশন আমাদের সহায়ক অভিনন্দনের অধিকারী। কিন্তু পরিপূর্ণ অধিকারত্যাগের জন্য আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন; তাই ঘোষণাপত্রকে আমি প্রতিশ্রুতিপত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

এনিম
এলফের
একশন

মাথোজো কেল তেল

অনুগ্রহ কোমিক্যালঃ কলিকাতা



এই ঘোষণাপত্রের উত্তরে ভারতবর্ষ যদিও আপন ইচ্ছামত সাড়া দিতে পারিবে, তথাপি মিশন জানেন যে ভারতীয় দলগুলি স্মৃগঠিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, এবং বাধ্যতামূলক কার্য তাঁহারা যতটা ভাল করিয়া করিতে পারেন, ইচ্ছাধীন কার্যও তাহা অপেক্ষা পূর্ণতরূপে না হোক, অন্ততঃ তুল্যভাবে করিবার শক্তিও তাঁহারা রাখেন। স্মরণ্য জনৈক সাংবাদিককে লর্ড পেথিক লরেন্স যখন বলেন, “এ ভিত্তির উপর যদি তাঁহারা একত্র মিলিত হন, তবে বুঝিতে হইবে উহাদ্বারা মিলনের এই ভিত্তি তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক দলের অধিকসংখ্যক লোক ইচ্ছা করিলে তখনও উহার পরিবর্তন করিতে পারেন,” তখন তাঁহার কথা এই অর্থেই ঠিক বলিয়া মনে হয় যে ঘোষণাপত্রে লিখিত বিষয়গুলি পড়িয়া ও বুঝিয়া তাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, মিশন আশা করেন যে প্রধান দলগুলি এই ভিত্তি পরিবর্তিত করিয়া না লইলে প্রতিনিধিগণ উহা স্বীকার করিয়া চলিবেন। দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার পর একত্র মিলিত হয়। স্বয়ং নির্বাচিত মধ্যস্থ (দলগুলি মধ্যস্থ নির্বাচন করিয়া দিতে না পারিলে ঘোষণাপত্রের রচয়িতাগণ স্বয়ং মধ্যস্থ হইয়া পড়েন) মনে মনে এই ভাবেন যে ন্যূনতম কিছু লইয়া একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে তবে বিভিন্ন দল একত্র হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন; বিভিন্ন দলের সেই প্রস্তাবের বস্তুকে নিজেদের সম্মতিক্রমে বাড়াইবার, কমাইবার অথবা একবারে পরিবর্তন করিবার অধিকার থাকে।

ঘোষণাপত্রটি এই পর্যন্ত নিরুত্তর। কিন্তু বিভিন্ন ‘অংশ’ সম্বন্ধে কি হইবে? ভারতবর্ষে পঞ্জাবই হইল শিখদিগের একমাত্র ভূমি; তাহারা কি আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের সিদ্ধ, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া একত্রীকৃত ‘অংশ’-এর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইবে? অথবা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ‘বি’-চিহ্নিত পঞ্জাবের সহিত এবং বহুসংখ্যায়িক্যে অমুসলমান প্রদেশ হইলেও আসাম ‘সি’ চিহ্নিত অংশের সহিত যুক্ত হইবে? আমার মতে ঘোষণাপত্রের আবেদন বা পরামর্শ গ্রহণ করা বিভিন্ন দলের ইচ্ছাধীন বলিয়া যে উল্লেখ আছে তদনুসারে প্রত্যেক ‘অংশ’-এরই ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাভাব্য অঙ্গ থাকি উচিত। প্রস্তাবিত ‘অংশ’-গুলির যে কোনও অঙ্গ (প্রদেশ) আপন ইচ্ছামত ‘অংশ’-এ যোগ দিতে বা যোগ না দিতে পারে। ‘অংশ’ হইতে পরে বাহির হইয়া আসিবার যে স্বাধীনতা আছে তাহা স্বাভাব্য-রক্ষার অতিরিক্ত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু ১৫ (৫) প্যারায় (প্রদেশের) স্বাধীনতা বজায় রাখিবার যে ব্যবস্থা আছে, উহা কখনই তাহার পরিবর্তন বা অক্ষয় হইতে পারে না। ১৫ (৫) প্যারায় লিখিত আছে:—“শাসন-পরিষদ-ও ব্যবস্থা-পরিষদ-

সম্মিলিত ‘অংশ’-এর সহিত যোগ দিবার স্বাধীনতা প্রদেশগুলির থাকিবে। এবং কোন কোন প্রাদেশিক বিষয়গুলি একত্র হাতে লওয়া হইবে প্রত্যেক ‘অংশ’ তাহা স্থির করিয়া লইতে পারিবে।” ইহা তো পরিষ্কার যে ১৯ ধারায় কর্তব্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব রহিয়াছে (হুজুম নহে) তাহা দ্বারা ঘোষণাপত্রের রচয়িতাগণ এই স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতেছেন না। এই ধারা অনুযায়ী ইহাই ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ ‘অংশ’-গঠনের নীতি গ্রহণ করিবেন কি না; তাঁহারা এই নীতি যদি গ্রহণ করেন, তবে প্রদেশগুলির জন্য যে বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন কিনা, গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি তাঁহাদিগকে এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন। প্রত্যেক প্রদেশের অন্তর্নিবদ্ধ এই স্বাধীনতা এবং ১৫ (৫) প্যারায় যে স্বাধীনতার উল্লেখ আছে তাহা অক্ষয় থাকিবে। দুইটি প্যারার মধ্যে যে আপাত বিরোধ রহিয়াছে এবং বাধ্যতা বা হুজুম-মূলক যে দোষটির জন্য ঘোষণাপত্রের উদার ভাবটি একদম পাটাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা এড়াইবার আর কোন পথ তো দেখিতেছি না। স্মরণ্য ‘অংশ’-সম্পর্কীয় প্রস্তাবে এবং প্রাদেশিক-বিষয়-বর্টন সম্বন্ধে স্বৈরাচারের আশঙ্কায় তাঁহারা বিচলিত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে এই কথাই বলিব যে আমার ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে তাঁহাদের বিচলিত হইবার সামান্যমাত্র কারণও নাই।

কি করিয়া সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারা যাইবে ঘোষণাপত্রে আমাদের প্রতি তাহারই আবেদন ও পরামর্শ আছে। এই কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা ভাড়াভাড়ি উহা পাঠ করিবেন উহার অনেক কথায় তাঁহাদের ধাঁধা লাগিয়া যাইবে। তার কারণও স্পষ্ট। বর্তমান বিশৃঙ্খলা হইতে যে নূতন জগৎ বাহির হইয়া আসিবে, সেই পরিবর্তনের মাঝে পরাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজমুকুটে আর ‘উজ্জ্বলতম রত্ন’ হইয়া থাকিবে না। পরাধীন ভারত তখন হইবে এই মুকুটের গভীরতম কলঙ্ক-চিহ্ন, সে কলঙ্ক-চিহ্ন এত গভীর যে ধুলায় ফেলিয়া দিবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পাঠক আজ আমার সঙ্গে এই আশা ও প্রার্থনা করুন যে, ব্রিটেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-রাজ-শক্তির ব্যবহার ইহা অপেক্ষা যেন অনেক ভাল হয়। ‘উজ্জ্বলতম রত্ন’ বলিয়া যে দাবি সে তো অসঙ্গত। মিশনের প্রতিশ্রুতি-পত্রের মর্বাদা যখন পূর্ণভাবে রক্ষিত হইবে, তখন ব্রিটিশ রাজমুকুটে একটি অল্পম রত্ন শোভা পাইবে। এই রত্ন হইল সেই অধিকার, যথাবিধি কর্তব্য সম্পাদন করিলে যাহা স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভ করে।

প্রতিশ্রুতি-পত্রকে কার্যকর করিবার জন্য অন্য অনেক বিষয়ের প্রয়োজন হইবে যাহা ঘোষণাপত্রে নাই। কিন্তু সে আলোচনা ‘হরিজন’-এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য স্থগিত রহিল।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ এচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আনুষ্ঠানিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিজ্ঞান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সাম্বজিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন) ; বিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মহামায়া-ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামায়া ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারী যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X X -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই নোভেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩২-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের শাস্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাম্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিক্তহস্ত। ইঁহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিবৃন্দ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বৈরাগ্যভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি বহুশ্লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ যোগাণার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল বৌদ্ধিকমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়া, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুঃসূচের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সবপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল :

হিঙ্গ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাত্রা মহারাজী জিপুরা টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সম্ভ্রমের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীর গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সব শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যমণী মহামহোপাধ্যায় ভারতচাঁচর মহাকবি শ্রীহরিশাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বরসে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বর মাননীয় শ্রীযুক্ত সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন-জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্সি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি, মাথবন্স নায়ার কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি শ্রমের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কয়েকটি অভ্যাসার্থ্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক। ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজত্বলাভ এবং, মান, ধন, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তত্ত্বোক্ত) মূল্য ৭।০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্ত্বর ফলপ্রসূ কল্পবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯।০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কতব্য। বর্ণনামূল্য কবচ—শক্রদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা বৌদ্ধিকমায় হফলাভ, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিবহ মনিবকে সমুদ্র রাধিয়া কর্মোদ্রিষ্টলাভে ব্রহ্মস্র। মূল্য ২।০। শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪।০ (এই কবচে ভাওয়াল সম্রাটী জয়লাভ করিয়াছেন)। বশীকরণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১।০, শক্তিশালী ও সত্ত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪।০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রীট “বসন্ত শিবাস” (শ্রীশ্রীবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
লাক্ষাত্তের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১।১০টা। ব্রাহ্ম অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্টোয়ার), কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৭৭২। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লন্ডন অফিস :—মিঃ এস, এ, কার্টস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লন্ডন

সাংঘাতিক ক্রটি

মূলত ও আইনত ব্যাখ্যা করিলে এই কথাই মনে হয় যে সরকারী ঘোষণাপত্রে চমৎকার খোলা কথা বলা হইয়াছে। তথাপি মনে হইতেছে, সাধারণে ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছে, সরকারী ব্যাখ্যা যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আর তাই যদি সত্য হয় এবং সরকারী ব্যাখ্যাই যদি বলবৎ হয়, তবে লক্ষণ অশুভ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে সরকারী ব্যাখ্যাই সকল বিষয়ে বলবৎ হইয়াছে এবং কার্যত সেই ব্যাখ্যাই চালানো হইয়াছে। এদেশে যিনি আইনপ্রণেতা, তিনিই বিচারক, তিনিই আবার দণ্ডের প্রয়োগ-কর্তা, একথা ইহার পূর্বে পর্যন্ত আমি বিনা দ্বিধায় বলিয়াছি। কিন্তু সরকারী ঘোষণাপত্রে সাম্রাজ্যবাদী এই রীতি ছাড়িয়া নূতন কথা বলা হয় নাই কি? জবাবে আমি বলিয়াছি, 'হাঁ'।

সে যাহা হউক, ঘোষণা-পত্রের ক্রটির দিকে একবার লক্ষ্য করা যাক।

মন্ত্রী-মিশন সিমলার সংক্ষিপ্ত কাজের পালা চুকাইয়া ১৪ই তারিখে দিল্লীতে ফিরিলেন, ১৬ই তাঁহাদের ঘোষণাপত্র বাহির করিলেন; অথচ আজও কেন্দ্রে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত

হইল না, উহা দূরেই রহিয়া গেল। মনে হইয়াছিল, ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার আগেই তাহারা কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আগে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, আর তারপর অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট গঠনের উপায় খুঁজিতে সুরু করিলেন। কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট তৈয়ারী হইতে অনেক সময় লাগিতেছে; এদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নবস্ত্রের অভাবে পিষ্ট হইতেছে। ঘোষণাপত্রের এই হইল এক নম্বর ক্রটি।

সার্কভোমত্বের প্রশ্নের কোন সমাধান হয় নাই। ব্রিটিশ-শাসন শেষ হইলেই উহারও শেষ হইবে, এই বলিলেই যথেষ্ট হয় না। কারণ, অন্তর্বর্তীকালে সার্কভোমত্ব যদি অব্যাহত চলে, তবে তার ফলে পরবর্তী স্বাধীন গবর্নেন্টের জন্ম একটি জটিল ব্যাপার হইয়া থাকিবে। অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্রিটিশের সার্কভোমত্বের অবসান করিতে না পারা যায়, তবে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত সার্কভোম ক্ষমতা অন্তর্বর্তী গবর্নেন্টের সহ-যোগিতায় ব্যবহার করা উচিত হইবে। জনসাধারণই স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তাহারাই চালাইতেছে। সামন্ত-রাজগণ স্বাধীনতা চান না। তাঁহারা যে বৈদেশিক

নবযুগের দৃষ্টি ও সৃষ্টির পরিচয়

এঙ্গেলসের

সমাজতত্ত্ববাদ—

কম্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক দর্শন

অনুবাদক—রেবতী বর্মণ

মাক্সবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মাক্সবাদী বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাত্র অপরিহার্য।

লেনিনের

গ্রামের গরীবদের প্রতি ১

বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনুদিত

কৃষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তিশালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য।

লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্মে একমাত্র সহায়।

বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হয়েছে ৮০ লক্ষ খানি—

জীন অব ক্যাপ্টারবেরির সেই বই অবলম্বনে—

নারারন বন্ডেগাপাধ্যায়ের লেখা

সোভিয়েট ছুনিয়া ২৥০

রাশিয়া সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা

অর্থনীতির গোড়ার কথা ১৥০

বাংলার বিখ্যাত মার্কসীয় লেখক রেবতী বর্মণের এই বইখানি মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক—যার অভাব এতদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

বিখ্যাত মার্কসীয় লেখক

অমিত সেনের

ইতিহাসের ধারা ১৥০

আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংলা ভাষায় একমাত্র মার্কসীয় বিশ্লেষণ।

(পরিবদ্ধিত ২য় সংস্করণ)

সুধাংশু দাশগুপ্তের

বিপ্লবী চীন ১

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। লেখক আধুনিক চীন-ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র।

বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী

২



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন
স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সন্তান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত বছর লইয়া অল্পত মাহস
ও বিক্রমের সহিত হুদুর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া বীর নামাঙ্কসারে
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাঙ্গালীর সেই শৌর্য বীর্য আজ কাহিনীতে
পর্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জঘ জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

একদশ টলিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ কলিকাতা

A. A. S.

রাজশক্তির হাতে-গড়া, একথা তাঁহারা স্বীকার না করিতে পারেন। তথাপি ইহা ঠিক যে জনগণের স্বাধীনতা দমন করিবার উদ্দেশ্যেই বিদেশী রাজশক্তি তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব জনগণের হইবে। জনগণ সহজে দেশীয় রাজ্যের মুখে যে কথা বলেন, তাঁহাদের মনের কথাও যদি তাই হয়, তবে জন-প্রতিনিধিরা যখন সার্বভৌম ক্ষমতা পাইবেন, রাজত্ববৃন্দ তখন তাহা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবেন। ঘোষণাপত্রের এই হইল দুই নম্বর ক্রটি।

বলা হইয়াছে যে দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষার জন্ত এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্ত অন্তর্ভুক্ত কালে ভারতে ইংরেজ সৈন্য রাখা হইবে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত যদি ঐ উদ্দেশ্যে সৈন্য রাখা হয়, তবে সৈন্যদলের উপস্থিতির কারণে গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার কার্যে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িবে, আর তথাকথিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সৈন্যদল না রাখার চেয়ে রাখার সম্ভাবনাই বেশি হইবে। ভিতরে ও বাহিরে নিরাপদ থাকিবার জন্ত যে জাতি বিদেশী সৈন্য রাখিতে চায় অথবা রাখিতে বাধ্য হয়, তাহাকে কোন দিক দিয়াই স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। সে জাতি জীর্ণ, নিভেজ, স্বায়ত্ত শাসনের অযোগ্য।

কোথাও নত না হইয়া, একক সোজা দাঁড়াইতে পারিলেই জাতির শক্তিমত্তার কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। অন্তর্ভুক্ত কালে অপরের সাহায্য না লইয়া আমাদের কোনমতে চলিতে শিখিতে হইবে। তবেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা নিজের পায়ের ছোরে হাঁটিতে পারিব। পরের মুখ-চাওয়া এখন হইতেই আমাদের ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু এই ব্যাপারগুলি যে আজ আমাদের মনের মত হইয়া ঘটতেছে না ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহা আমাদেরই দুর্বলতা, ব্রিটিশ-শাসন অথবা ইংরেজ জাতির বজ্জাতি নয়। সাগরপারের দয়ার দান আমাদের জন্য নহে, আমরা যাহা পাইব যোগ্যতা-বিচারে তাহাই আমাদের প্রাপ্য। মন্ত্রীমণ্ডল যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, সেই অল্পযায়ী কাজ করিতে আসিয়াছেন। নিজেদের ঘোষণাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যখন তাঁহারা ইংরেজ শাসন কায়ম করিয়া রাখিবার উপায় বাহির করিবেন, তখন তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিবার সম্মত আসিবে। ভয়ের কারণ যদিও রহিয়াছে, তথাপি তাঁহারা মুখে এক কথা বলিয়াছেন এবং মনে অন্য কথা রাখিয়াছেন এরূপ লক্ষণ রাজনৈতিক গগনে নাই।

নয়া দিল্লী, ২৬-৫-৪৬

পানে পরম তৃপ্তি

স্মো ডিউ

দার্ডজলিং

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

শুভ
বিবাহের
জন্ম
সম্বন্ধপ্রকার
প্রয়োজনীয়
সামগ্রী
আমাদের
স্টোর্সে
পাইবেন।

||
কমলালয় ষ্টোর্স
লিমিটেড,
ধর্মতলা, কলিকাতা।

NETAJI

A COMMEMORATION VOLUME

CONTAINING

biographical and valedictory articles
on the life, ideals and activities of
Shree SUBHAS CHANDRA BOSE.

CONTRIBUTORS:

Mahatma Gandhi
Khan Abdul Gaffar Khan
Mrs. Sarojini Naidu
Dr. Rajendra Prasad
Dr. Pattabhi Sitaramiya
Pundit Govind Ballav Pant
Shri Purushottamdas Tandan
Dr. Kailash Nath Katju
Shri Jai Prakash Narain
St. Nihal Singh
Prof. Humayun Kabir
Dr. Suniti Kumar Chatterjee
Shri Joachim Alva
Shri H. V. Kamath

Acharya J. B. Kripalani
Mr. P. R. Das
Shri Mukundalal Sarkar
Sadhu T. L. Vaswani
Dr. Khan Sahib
Mr. Fazlul Huq
Acharya Kshiti Mohan Sen
Mr. R. Sorensen
Shri Kali Charan Ghosh
Shri Tushar Kanti Ghosh
Shri Uttam Chand
Shri Kedarnath Chatterji
Shri Ravi Shankar Rawal

Editor : **PUNDIT SHRI RAM SHARMA**

Asst. Editor : **SOMENDRAMOHAN MOOKERJEE**

Fully illustrated and sumptuous Binding.

Pre-publication Subscription price: Rs. 17/-

Publishers : Shivalal Agarwal & Co., Ltd.,

Hospital Road, Agra (U. P.)

পুস্তক - পাঠ্য

[অন্তঃপর সমালোচনার্থ 'প্রবাসী'তে প্রতি পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইতে হইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক]

সন্দীপন পাঠশালা—শ্রীভারতীয় বন্দোপাধ্যায়।
রজন পাবলিশিং হাউস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য
সাড়ে তিন টাকা।

সাময়িক পত্রে 'উদয়াস্ত' নামে উপজ্ঞাস্থানি প্রকাশিত হয়।
ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—“সন্দীপন পাঠশালাই বইখানির
সঙ্গত নাম। বাংলাদেশের শিক্ষক-জীবন অবহেলিত, অনাদৃত।
পাঠশালার শিক্ষক বা পণ্ডিতমশায়দের তো কথাই নাই।” বর্ত-
মানে এই অবহেলিত অনাদৃত শ্রেণীর প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি
পড়িয়াছে; এবং সেই দরিদ্র করুণ জীবনের জীর্ণ পাতাগুলি ধীরে
ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ভারতীয়দের
রচনা চিত্তকে আকর্ষণ করিবে জানিয়াই বইখানি পড়িতে বলিয়া-
ছিলাম। আরম্ভে মনে করিয়াছিলাম পাঠশালা সম্পর্কে জানা কথাই
হয় ত নূতন ভাবে গুনিতে পাইব। পড়িতে পড়িতে মনে চমক
লাগিল, এ শুধু চিত্তাকর্ষক কাহিনী নয়, উপন্যাস হিসাবে হয় ত
কোথাও ক্রটি থাকিতে পারে, শেষের দিকে আকস্মিকতার বেদনা
না থাকিলেও হয় ত বঞ্চিত অখ্যাত শিক্ষক-জীবনের কারুণ্য

এমনিতেই ফুটিয়া উঠিত, এ সব কি-ই বা আসে যায়—পড়িতে
পড়িতে বার বার এই কথাই মনে আসিল চিত্রগুলি কাল্পনিক নয়,
জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কেবল গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবেই
পণ্ডিত মহাশয় এবং আনুযায়িক চরিত্রগুলি কৌতূহলের উজ্জেক
করে না, জীবনের স্পর্শে ইহারা জাগ্রত বলিয়াই সহানুভূতি
আকর্ষণ করে। সন্দীপন পাঠশালা, পাঠশালার ছেলেগুলি এবং
সর্বোপরি পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম পণ্ডিত অলিখিত
জীবনের সন্ধান আনিয়া দেয়। সদগোপের ছেলে সীতারামের
আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা আমাদের মনের তন্ত্রীতে আঘাত
করে। রাণী-মা—সীতারামের যেমন তেমনই আমাদেরও অন্তরের
প্রজ্ঞা আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণ-বউ ছোটখাট টুকটাকি জিনিষ
পাইলে আঁচলে পুরিয়া থাকে, লজ্জাবোধ করা দূরে থাকে একে-
বারে ঝড়ার তুলিয়া বলে, “আ, ই-বাড়ির লোব না টোব না তো
রামা-শ্যামা-বন্দো-মধোর বাড়ীতে লোব নাকি? ইয়েতে চোখ-
টোক দিয়ে-টিও না বাপু, হ্যাঁ। বলে, তিন পুরুষ খাটছি।” এই
কথা যখন বলে, কৃষ্ণ-বউ তখন আমাদের একান্ত পরিচিত হইয়া
পড়ে। সীতারাম ছাত্রদের ভিতর দিয়া নিজের জীবন-সঞ্চিত
আশাকে সার্থক করিতে চায়, লেখক দরদ দিয়া এই ছবি আঁকিয়া-
ছেন। “সন্দীপন পাঠশালা” পাঠকের মনের দরদও জাগাইয়া
তুলিবে।



**বাঃ! নিম্ন টুথপেস্টের গুণে খোবনের
দাঁত শুলি বেশ নির্দোষ হইয়া উঠেছে দেখাচ্ছি!**

ক্যালকেমিকোর 'নিম্ন
টুথপেস্ট' আর নিম্নের গুঁড়া
মাজন 'মার্গোক্রিস' সকল
বয়সেই দাঁতগুলিকে বেশ
মজবুদ ও উজ্জ্বল করে রাখে।



**ক্যালকাটা
কেমিক্যাল**

পোস্টকার্ড—আমিহর রহমান। কমলা পাবলিশিং
হাউস, ৮১১-এ হরিপাল লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

ষোলটি ছোট গল্পের সমষ্টি। শুধু ছোট গল্প নয়, গল্পগুলি
ছোট-ছোটও বটে। এই লঘুপক্ষ গল্পগুলি মনের উপর দিয়া সাব-
লীল গতিতে ভাসিয়া চলে। “পোস্টকার্ড” গুরুতর প্রশ্ন উপস্থাপন
করে না, লঘু হাশ্বে মনকে উদ্ভাসিত করে। ভূমিকায় শ্রীসজনী-
কান্ত দাস লিখিতেছেন, “যে সব ব্যাপার নিয়ে এ দেশে সচরাচর
কেন্দ্রে ভাসাবার কথা, সেই সব জিনিষই ইনি হালকা হাসির তুড়ি
দিয়ে উড়িয়ে দিতে প্রয়াস করেছেন দেখে খুবই ভাল লেগেছে
আমার।” গল্পগুলি পাঠকদেরও ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তরুণের স্বপ্ন (১ম পর্ব)—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। ষ্টাণ্ডার্ড
বুক কোম্পানী। ২১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩ টাকা।

তরুণ নামধের দেশহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক তরুণকে লইয়া এই
কাহিনী। চারিপাশে বহু চরিত্র নাটকীয় স্বাতিতে বিকাশ লাভ
করিয়াছে। ঘটনা-স্থতির দিকেও লেখকের দৃষ্টি আছে। পাত্রপাত্রীর
মুখে সুদীর্ঘ বক্তৃতা, কতকগুলি চরিত্র এবং কোন কোন ঘটনাও গল্পকে
স্বাভাবিক বিকাশের ধারা হইতে ভিন্নমুখী করিয়াছে। তথাপি এক শ্রেণীর
পাঠকের মনে এই কাহিনী কোঁতুল জাগাইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস- ৩/১ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট কলিকাতা

ফোন-কলকাতা-১১২২ ও ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট,
বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা,
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার,
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা,
বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্

মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুশীল সেন, বি, এ

ডাক্তারেরা বলেন

ব্রাড-ভিটা

সর্বজনীন স্বাস্থ্যের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্যের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

মেডিকেল রিসার্চ ল্যাবরেটরি
সি-২০, জেনারেল এডমিরালিটি, কলিকাতা

রাজকন্ঠার বাঁপি—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীশ্রী
লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

সমালোচক বলে লেখকের খ্যাতি আছে। তাঁর হাত থেকে এমন
সরস ব্যঙ্গনাময় প্রতীক নাট্য পেয়ে আমরা অবিকতর আশাবিত্ত হয়েছি।
'রাজকন্ঠার বাঁপি' সার্বক শিল্পশৃঙ্গী। কে এই রাজকন্ঠা? অনেকে তাঁকে
দেখেছে "মেঘের মধ্যখানে রাঙা দেউলের চুড়ায় জানালা খুলে দাঁড়িয়ে
থাকতে।" সে চুড়ো "চিন্তামণিতে গড়া, তার চারদিকে কল্পলতার
দেয়াল।" কিন্তু, চিরদিন কি সে থাকবে স্বপ্নালোকে,—মেঘে আসবে
না জীবনে? আদর্শ সত্য হয়ে উঠবে না প্রতিদিনের সংসারে? বৃথা
আজ নবযুগের আভাস পেয়েছি, সে আসছে আমাদের সাথী হয়ে।

রায় রামানন্দের ভণিতায়ুক্ত পদাবলী—
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। সেন রায় এণ্ড কোং। ১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে এখনও অনুসন্ধানের বিষয় বিস্তর। আলোচ্য
পদাবলী ঐতিহাসিকগণের নিকট মূল্যবান উপকরণরূপে পরিগণিত
হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধে যাহারা কিছুমাত্র খবর রাখেন,
তাঁহারা সকলেই রায় রামানন্দের কথা জানেন। চৈতন্যদেব ইঁহার
পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং ধর্মাত্মবোধের প্রশংসা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর
শেষজীবনে ইনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। উভয়ের সরস মধুর আলোচনা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থত পদগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সম্পাদক তাঁহার যুক্তি-
গুলি ভূমিকায় স্থলরভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন। স্বীয় মত অকাটা বলিয়া
তিনি দাবি করেন নাই, শুধু পণ্ডিত-সমাজে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিয়া
সত্যের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। শ্রীমুক্ত সত্যনারায়ণ দাস উড়িয়া হইতে

উড়িয়া অক্ষরে লেখা একখানি পুথি সংগ্রহ করেন। তদবলম্বনে এই
গ্রন্থ সম্পাদিত। রামানন্দ স্বয়ং উড়িয়াবাণী ছিলেন। এ কারণে,
পদগুলি বিশেষভাবে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী—শ্রীহরকুমার সেন। বিশ্ব-
ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।
মুদলমান আমাদের বাঙালী সমাজের বিভিন্ন বিভাগের কিছু কিছু
পরিচয় মুখ্যতঃ এই যুগের বাংলা গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ইহা কৌতূহল
জাগরিত করে মাত্র, নিবৃত্ত করে না। গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত কয়েকটি
মন্তব্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বথা—
শ্রীচৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে তাত্ত্বিকতার বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ
উপাস্ত উপাসকের মধ্যে ভয়-ভক্তির স্থলে বাৎসল্য-শ্রীতির হৃদয়-সম্পর্ক
স্থাপিত হইল (পৃঃ ৩৮)। জায় ও মৃত্তি-শাস্ত্রের চর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের
একচেটিয়া (পৃঃ ৪৩)। দক্ষিণ রাঢ়ে স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাঙ্গী-
পণ্ডিতের টোল আছে (পৃঃ ৪৩)। হুংখের বিষয়, এই সকল ব্যাপক
মন্তব্যের পরিপোষক বিশেষ কোনও প্রমাণ ও যুক্তির অবতারণা গ্রন্থমধ্যে
করা হয় নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের প্রথম উক্তি তাত্ত্বিক ধর্মের বিকৃতি
সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ প্রযোজ্য হইলেও বাঁটি তত্ত্বমত সম্বন্ধে অর্দো প্রযোজ্য নয়।
দ্বিতীয় উক্তির বিবোধী দৃষ্টান্তও যে কিছু কিছু না পাওয়া যায় এমন নয়—
কায়স্থ কৃষ্ণমোহন ও কৃষ্ণদেবগণের স্মৃতি ও তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এখনও
বর্তমান আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কমনস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

স্থাপিতঃ ১৯১৩

গ্রামঃ 'EKESAR'

পি ৫, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

**প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যাঙ্ক-
সমূহের মধ্যে অন্যতম।**

আমাদের 'সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেট'
টাকা আমানত করিয়া দ্বিগুণ অর্থলাভ
করুন। এই টাকা কখনও লোকমান যায় না।

মিঃ অশোককুমার সেন রায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাবমেয়রিন সমাকীর্ণ অ্যাটর্নালটিকে
বহু সংঘর্ষের পর ১৯৪২এ

জার্মান ক্রুজারে ও

টোকিও বন্দীশিবিরে বন্দী

যুদ্ধকালে নরওয়ে নৌবহরে যুরোপীয়

নাবিকগণ মধ্যে ভারতীয় অফিসার

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত

সপ্ত সমুদ্রের রণাঙ্গনে

পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রবক্ষে কনভয় প্রাণী,
নাৎসী সাবমেয়রিন, ক্রুজার প্রভৃতির সঙ্গে
সংঘর্ষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও বিশ্ব-
রাজনীতির বহু তথ্যপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী।
প্রকাশিত হইল। মূল্য ২।।০

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪৩ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা

অথবা

কে, দাশগুপ্ত, ৩২ সি রাধাকান্ত জীউ স্ট্রিট, কলিকাতা।

রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। সম্পাদক—শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য্য। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স। ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশক পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ অর্জন করিতেছেন। এইরূপ শোভন সংক্ষেপিত সংস্করণের অভাব বাংলা সাহিত্যে বহু দিন যাবৎই অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্বও অসাধারণ। তিনি বঙ্কিমের ভাবকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, গল্পকে অনর্থক ছাঁটিয়া বাদ দিয়া সাম-জ্ঞানহীন করেন নাই। অথচ উপন্যাসটিকে সংক্ষেপিত করিয়া-ছেন। পড়িয়া মনে হইল মূল 'রজনী'র সহিত আসলে ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থমালা দ্রুত সম্পাদিত হইলে শাশ্বত সাহিত্যের অমূল্য ঝাড়ানী পাঠকের একটা বড় অভাব পূর্ণ হইবে। ইচ্ছা সত্ত্বেও বাঁহারা বৃহদায়তন উপন্যাস সমগ্রভাবে পড়িতে পারেন না—এইরূপ সংক্ষেপিত সংস্করণ তাহাদের কাছে নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে।

যুগের যাত্রী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ১১, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের আসরে লেখক বিখ্যাত নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনাটি পড়িয়া মনে হইল ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি হওয়া উচিত। চরিত্রগুলি নিপুণ তুলিকার চিত্রিত এবং ঘটনার গতি স্বাভাবিক। সুধীর, শঙ্কর, কবী, প্রণতি প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের স্বকীয় লিখন-ভঙ্গীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তবে একটা কথা বলিবার আছে—লেখকের রচনা একটু কাব্যগদ্য। লিপি-সংযম-অভ্যাস করিলে লেখকের হাত দিয়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস বাহির হইবে—আশা করা যায়।

শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

ধূসর পথের ধূলা—শ্রীগোরাঙ্গমোহন সেনগুপ্ত। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ, ১৪৪, মূল্য দুই টাকা।

আদর্শবাদী একটি তরুণের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত। নায়ক অশোককে বাল্যকাল হইতেই আদর্শ মানুষ করিয়া পড়িয়া তুলিতে যাঁহা কিছু প্রয়োজন গ্রন্থকার সমগ্র তাহার সব কিছুই অবতারণা করিয়াছেন। কাহিনী করণ ও মধুর। নায়কের

জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে গঠন করিতে লেখকের চেষ্টার ত্রুটি নাই। গ্রন্থের উপসংহারের কাছাকাছি আসিয়া অশোকের পদস্থলন হইল। গ্রন্থখানি ঠিক রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে নাই। পড়িতে পড়িতে মনে হয় লেখক আদর্শবাদী শিক্ষকের আসনে বসিয়া পাঠকবর্গকে ছাত্র মনে করিয়া গল্পাকারে তাহাদের নিকট আদর্শ জীবনের একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিতেছেন।

তমসাবৃত্তা—শ্রীপ্রশান্তি দেবী। বাসন্তী পাবলিশার্স ২৪।এ, আমবাঁঠ রো, কলিকাতা। পৃ, ১৫৫, মূল্য দুই টাকা।

তমসাবৃত্তা ছয়টি ছোট গল্পের সম্বল। প্রথম গল্প 'তমসাবৃত্তা'র শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষের 'উচলে চড়িছ' নামক গল্পের ছায়া আছে। শেষ গল্প 'সাহসিকার' পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অতি-পরিচিত দুইটি চরিত্রের প্রভাব। অবশিষ্ট চারটি গল্প সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অলিখিত। প্রকাশক ভূমিকার জানাইয়াছেন—এইটিই লেখিকার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম পুস্তক হইলেও ইহার দুই-একটি গল্পের মধ্যে লেখিকা বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, উদাহরণ-স্বরূপ 'হাইফেন' ও 'এমন কেন হয়' এ দুটির উল্লেখ করা যায়। এগুলিতে লেখিকা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ঘটনা সন্নিবেশে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শ্রীতারাপদ রাহা

চরকার বিপ্লবী রূপ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪, মূল্য চারি আনা।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর হই-তেই দেশে যে বিপ্লব চলিতেছে তাহার অগ্রতম প্রধান কারণ চরকা। চরকা



বঙ্কিমজ্ঞানী ইন্সটিটিউট .

—লিনিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেন্নায়াম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

হুতা কাটির বস্ত্র মাত্র নহে। মহাস্বাক্ষীর মতে চরকা স্বাবলম্বন, পুরুষ-কার, গ্রাম সংগঠন, আত্মশুদ্ধি ও অহিংসার প্রতীক। চরকাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবে। প্রকৃত সাম্যবাদ (রুশীর সাম্যবাদ নহে) অহিংস ভাবে চরকা ঘরাই সম্ভব হইবে। আর প্রকৃত স্বরাজ্যও চরকার ঘরাই সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর গর্বিত সভ্য মানব আজ ক্রমান্বয়ে দুইটা মহাযুদ্ধের মধ্যে নিজেদের ধ্বংসের পূর্বসূচী দেখিয়া অবিধাস-মিশ্রিত বিষয়ে মহাস্বাক্ষীর অভিনব পন্থা ও অভয়বাণীর নিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, কিন্তু হৃদয় আত্মিক দৃষ্টির অভাবে উহার তাৎপর্য আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। বাহাদের অহিংসার বিশ্বাস নাই তাহাদের নিকট চরকা স্বরাজ্যের প্রতীক ত নহেই বরং সভ্যতার শৈশব কালের একটা ক্ষুদ্র বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নহে। এই পুস্তিকায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে।

এরূপ পুস্তিকা সাধারণে বতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল হইবে।

কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত—হুশীলকুমার বহ।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীহৃদীরকৃষ্ণ মিত্র, পাঁচিয়া, যশোহর। পৃষ্ঠা ৮৬, মূল্য ১/০

এই পুস্তকে লেখক অনতিবিলম্বে জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার সপক্ষে ওকালতি করিয়াছেন কিন্তু এরূপ কার্যে ধর্ষণমণ্ডিত জমিদার-গণকে বা অস্বাভাবিক জমির মালিকগণকে কোন ক্ষতিপূরণ দিবেন কিনা সে বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। অবশ্য জমিদারী-প্রথা উঠিয়া গেলে কৃষকগণ জমির মালিক হইবে। লেখকের মতে জমিদারী-প্রথা উঠিয়া গেলে যথেষ্ট পুঞ্জি এই সকল জমির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া শিল্পে নিয়োজিত হইবে। লেখকের মতে রাষ্ট্রপরিচালিত বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই বর্তমান যুগের উপযোগী। মধ্যবিত্তশ্রেণী চিরকালই পুঞ্জিদার ও জমিদারগণের সাহায্য করিয়াছে এবং কৃষক ও শ্রমিকগণকে শোষণের সহায়ক হইয়াছে। মধ্যবিত্তের উচিত এখন হইতে কৃষক

ও শ্রমিকের সহিত কাঁধ মিলাইয়া বর্তমান সমাজপদ্ধতিতে বিদ্রব আনা। লেখক একটু ভলাইয়া দেখিলে বুঝিতেন যে, মধ্যবিত্তেরাও সমাজে শোষিতের অংশবিশেষ। হুতরাং বর্তমান পুঞ্জিপতির সমাজে কিরূপে মধ্যবিত্ত সরাসরি নিজের অধিকার ভোগ করিবে তাহা বুঝা শক্ত। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত কৃষকের প্রতি লেখক যে দরদ দেখাইয়াছেন তাহার প্রতি সভ্য সভ্যই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত কারণ কৃষক ও শ্রমিকই সভ্যতার দেশ এবং ইহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। কিন্তু দেশের উন্নতি বতদূর সম্ভব সকল শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় স্বাধীন ভারতেই সম্ভব। শ্রেণী-সংগ্রাম বর্তমানে আমাদের সমস্তা বাড়াইবে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের অগ্রগতি বাহ্যত করিবে।



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR

Post Box 7878

Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে engage করিতে হইলে এখানেই পত্র দিবেন। ট্রেডমার্ক 'SORCAR' বানান লিখিতে ভুল করিবেন না।

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত হ্রদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

- সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে হ্রদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা হ্রদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। - অল্পগ্রহণপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিকিউরিটি

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকফ"

ফোন ক্যাম ৩৩৮১

দিগন্ত—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ। বাণীচক্র ভবন, ব্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থানঃ বেঙ্গল পাব্লিশিং, ১৪ বক্সিং চার্ট্রো স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা, বোর্ড বঁধাই আড়াই টাকা।

মৃণালকান্তি দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও কাব্য-রসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কবিত্বশক্তির উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'আকাশ' যে শক্তির সুরণ আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল 'দিগন্তে' তাঁহার ক্রমবিকাশ কবির উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে আশাবিত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মৃণালকান্তি আধুনিক কবি হইয়াও আধুনিকতার উৎকট মোহ হইতে নিজেকে কি প্রকারে মুক্ত রাখিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অজ্ঞাত আধুনিক কবিদেরই মত বর্তমান যুগের দুঃখবেদনা এবং জীবনের ভটলতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহার কবিতায়ও পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্য-রচনার নামে শব্দ লইয়া পালোয়ানী পাঁচ কবিবার উৎকট রচির নিদর্শনও তাঁহার কাব্যে মেলে না। সপ্তশরীর বিচিত্র স্বাক্ষর মৃণালকান্তির কাব্যে আমরা শুনিতে পাই না। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন উদার আকাশের নীচে একটানা একতারার উদাস রাগিণী বাজিয়া

চলিয়াছে। সেই সিদ্ধকরণ স্বর-লহরী মনকে বিবাগী করিয়া স্বদূর নিগন্তের পানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আকাশবিহারী হইলেও কবি মাটির পৃথিবীর সহিত নাড়ীর গভীর যোগের কথা ভুলিয়া যান নাই। আজিকার অভিশপ্ত পৃথিবীর আর্তনাদ তাঁহারও কবিচিত্তকে বেদনার পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আশাবাদী কবির মনে দৃঢ় 'প্রতীতি' এই যে, এই অমানিশার অবসান একদিন হইবেই। কি গভীর আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ তাঁহার আশাস-বাণী! :-

“আবার বসন্ত নব দেখা দেবে বাণী বর্ণময়

উজ্জল সূর্যের হবে পূর্বাকাশে প্রসন্ন উদয়।

এই রক্তে হোক আজি পরিশোধ পৃথিবীর ঋণ

এরপর দেখা দেবে সমুজ্জল স্বর্ণগর্ভ দিন।”

ধান-ক্ষেত—শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য। মর্ডার বুক ডিপো, জিন্দা-বাজার, ব্রীহট্ট।

এই কাব্যগ্রন্থে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এই দুই বিষয়ে লেখা কতকগুলি কবিতা আছে। অধিকাংশই গদ্যকবিতা। স্থানে স্থানে লেখকের অনায়াস কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজিঃ অফিস—আখাউড়া

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা

(ত্রিপুরা স্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৬নং ক্লাইভ স্ট্রিট, ৫৭নং, ক্লাইভ স্ট্রিট (রাজকাটরা)

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—	...	...	৫০,০০০,০০
বিক্রীত মূলধন—	...	...	২২,৫০০,০০
আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—	...	...	১৪,৫০০,০০ টাকার উপর
সংরক্ষিত তহবিল—	...	...	৩,১৭,০০০,০০ টাকার উপর
কার্যকরী তহবিল—	...	...	৩,৭০,০০০,০০ টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—আজমিরীগঞ্জ, বদরপুর, বাজিতপুর, ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলচর, ব্রীহট্ট, ইক্ষল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, মৌলবীবাজার, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, তেজপুর, বেনারস, চাঁদপুর, টাংলা, গোয়ালঘাট, গোহাটা, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাইগুড়ী, নর্থলক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেঁচুগঞ্জ, ডিঙ্গগড়, শিলং।

ভালসুকিয়া ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দেশ-বিদেশের কথা

দুর্গত বাঁকুড়া

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়ন সোসাইটির সমাজ-সেবা সম্ভার (Social Service League) এক দল খেচ্ছাসেবক বাঁকুড়ার দুর্গত পল্লী অঞ্চলে গিয়া তিন শতটি গ্রামে তথ্যসংগ্রহ করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে সেখানকার অধিবাসীদের শোচনীয় দুঃস্বস্তার পরিচয় পাইয়া আতঙ্কিত হইতে হয়। দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ায় লাগিয়াই আছে, যে সমস্ত কারণে বাঁকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলায় পরিণত হইতে চলিয়াছে দুর্ভিক্ষ তাহার অন্ততম। সম্প্রতি অন্নবস্ত্রের অভাব সেখানে একেবারে চরমে উঠিয়াছে। তালদাংতারা খানার অন্তর্গত নবগ্রামের বাসি-পরিভ্রাতা একটা স্ত্রীলোক অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, মুন খাওয়াইয়া তাহার সন্তানকে শিশুকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ছাতনা খানার চন্দ্রা গ্রামের এক ব্যক্তি স্ত্রী এবং তিনটি শিশু সন্তানসহ অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের ৭৯টি ইউনিয়ন-বোর্ডের অধীনস্থ গ্রামগুলির শতকরা ৬০ জন অধিবাসী এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। ইতিমধ্যে দুর্গতরা দলে দলে আসিয়া বাঁকুড়া শহরে জড়ো হইতেছে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যিক, কিন্তু সরকার মাথাপিছু মাত্র দুই আনা করিয়া দিতেছেন। গ্রামের প্রত্যেকটি গৃহ ভগ্ন, জীর্ণ এবং গ্রামবাসী অনেকেই গৃহহারা ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু মেরামত করিবার জন্য অন্ততঃ ১৮০ টাকার খরচেরই প্রয়োজন, কিন্তু সরকার এ সম্বন্ধে বিশেষ

কোন চেষ্টাই করিতেছেন না। বস্ত্র-সমস্যাও সেখানে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। শতকরা চল্লিশ জন পল্লীবাসী ছোঁড়া জ্বাকরা পরিয়া কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। বস্ত্রভাবে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না, অনেকে চট পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কৃষকগুলির অবস্থাও শোচনীয়। তাহাদের হাতে বপন করিবার উপযুক্ত বীজ নাই, উপরন্তু কৃষিকার্যের জন্য মজুর নিযুক্ত করিবার সম্ভ্রতিও তাহাদের নাই। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু তাহারা সরকারী কৃষি-ঋণ গ্রহণ করিতে নারাজ, কেননা গত বৎসর সরকার যে ভাবে উৎপীড়ন করিয়া পাওনা আদায় করিয়া-ছিলেন তাহা তাহাদিগের মনে জ্বালা সঞ্চার করিয়াছে। তদুপরি আবার সরকারী বিধানমতে প্রত্যেক চাষী বিঘা প্রতি মাত্র এক টাকা দশ আনা কৃষিঋণ পাইবার অধিকারী, কিন্তু বিঘাপ্রতি তাহার অন্ততঃ ৫ টাকা পাওয়া প্রয়োজন।

বাঁকুড়ার গৌণ-পুণিক দুর্ভিক্ষের অন্ততম হেতু সেখানে বর্ষেষ্টসংখ্যক দীর্ঘি খাল প্রভৃতির অভাব। সেখানকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গবর্ণমেন্টের একটি হিনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিলম্বে কর্তৃক প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। বিস্তৃত পানীয় জলও বাঁকুড়ায় দুঃপ্রাপ্য, অনেক গ্রামে একটি মাত্র কুয়া পর্য্যন্ত নাই।

বাঁকুড়ার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেন্ট এবং দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই অবিলম্বে অগ্রহিত হওয়া অত্যাবশ্যক, নতুবা আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল হইতে এই জেলাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না।

নেতাজীর অনুসরণে :-

বাংলার বিখ্যাত দ্বুত ব্যবসায়ী শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা দ্বুতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ দ্বুতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বুতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বুত ক্ষেত্র্যতি অর্জন করিয়াছে, তাহা দ্বুত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

অজিতকুমার বসু, এফ-আর-সি-এস

কলিকাতা স্নলকজ কোর্টের অবসর-প্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅজিতকুমার বসু অত্র-চিকিৎসায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত সর্ চারুচন্দ্র ঘোষ ইঁহার মাতামহ। অজিতকুমার ১৯৩৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল



শ্রীঅজিতকুমার বসু

কলেজ হইতে সম্মানে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শল্যনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার, রেসিডেন্ট সার্জন প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত হইয়া অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় প্রভূত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি মাস্টার অব সার্জারি নামক ডিগ্রি লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা অতি উচ্চাঙ্গের বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ বৎসর সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জনের অস্ত্রোপচার বিষয়ক সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত

প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হন। সম্ভ্রতি বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আরও ব্যাপ্তি অর্জন করিতেছেন।

অজিতকুমার পরলোকগত চিকিৎসক ও সাহিত্যিক রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের পৌত্র।

পণ্ডিত দ্বারিকানাথ শ্যায়শাস্ত্রী

বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বারিকানাথ শ্যায়শাস্ত্রী মহাশয় গত ২৯শে বৈশাখ ১৫ বৎসর বয়সে বরিশালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ৪৬ বৎসর পূর্বে কলিকাতা কুমারটুলীতে সার্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া



পণ্ডিত দ্বারিকানাথ শ্যায়শাস্ত্রী

ছাত্রদের জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ছাত্রদের খাওয়া-পাকা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ তিনিই নির্বাহ করিতেন। ত্রিবেদীয় কাণ্ডে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ব্যাপ্তি বাংলাদেশ আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কাহারই চতুষ্পাঠীতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-পত্রিক স্থাপিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শোভা-বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতি ছিলেন এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আদর্শ চরিত্রের জন্ম সর্বত্র সম্মানিত হইতেন।

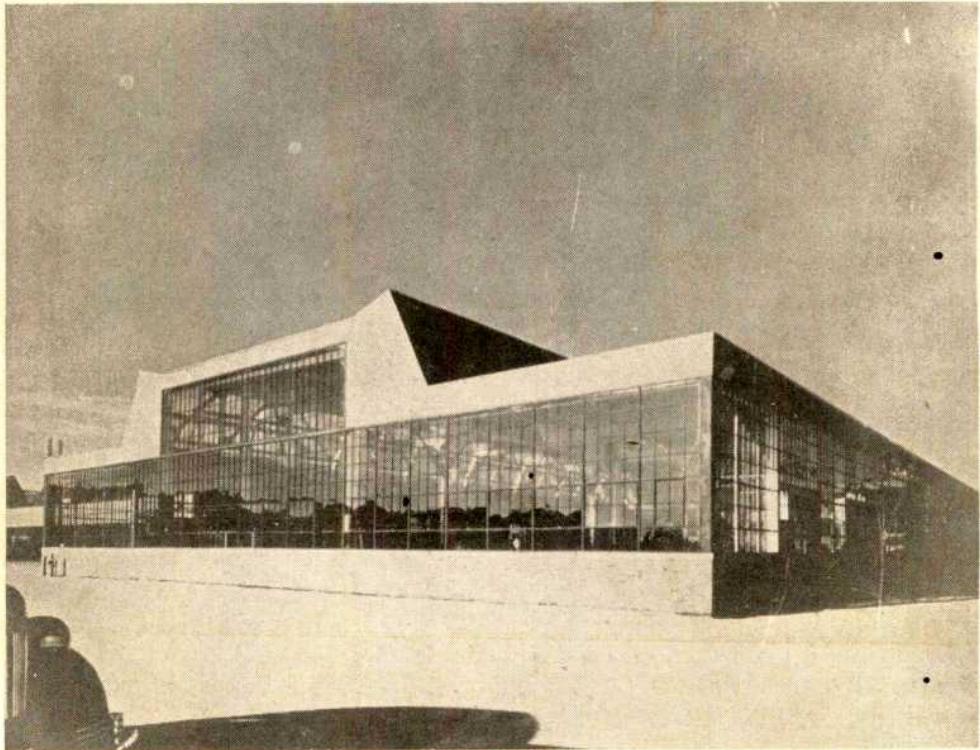


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যৌবনশ্রী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



ইলিনয়সের পশ্চিম অঞ্চলে নূতন পরিকল্পনায় নির্মিত একটি যজ্ঞা-নিবাস



মিশিগানের ডিট্রয়েটে অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত কাঁচের প্রাচীরযুক্ত 'ডজ ট্রাক প্লান্ট'

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বঙ্গবিজেতা এক মুসলমান বাংলাদেশকে “রুটীপূর্ণ নরক” আখ্যা দিয়াছিলেন। সে তো গেল মধ্যযুগের আরম্ভের কথা। আজ এই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ঐ আখ্যা আরও সার্থক হইতে চলিয়াছে। পরিবর্তনের মধ্যে এখন “রুটির” নিদারুণ অভাব। অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা বাংলা, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বাঙালীর বাসভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে পারে কিন্তু বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ অসম্ভব নহে, এবং সে ঘটনা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এ কথা ভাবিয়া মনকে আশ্বাস দেওয়া চলে না।

মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে বিজয়, বুদ্ধিতে ও রাষ্ট্রনীতিতে বাঙালীর স্থান ছিল সমস্ত ভারতের শীর্ষে। এই বাংলাদেশেই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর মুখে। বাঙালী একলা সে যুদ্ধ চালাইয়াছিল সর্ব স্ব পণ করিয়া, যে যুদ্ধের ফলে দেশের স্বাধীনতার পথ খুলিয়া যায়। তাহার পর বাঙালীর ঐখ্য্য গেল বিলাসে ব্যসনে ও আলসে, বিভ্রাট হইল মিথ্যা আড়ম্বরে, ভ্রম-বনিয়াদি চালের অহঙ্কারে ও দেশী-বিদেশী আভিজাত্যের মর্কট-তুল্য অনুকরণে। তাহার পর চাকুরী দাঁড়াইল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভালাড বা জ্ঞান অর্জন হইল গৌণ ব্যাপার। শিক্ষাদান গৌরবময় কার্য ছিল, উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল অর্থাগমের পথ। শিক্ষক ও অধ্যাপক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন, শিক্ষার্থীও শিখিল “কাঁকি দিয়া স্বর্গ লাভে”র পন্থা। বিদ্যাশিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞানের স্রোতে পড়িল ভাটা। কেবলমাত্র কয়েকজন মহাপুরুষের গগনম্পর্শী ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলার সুনাম রহিল বজায়। তখনও ছিল অতীতকে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, বাঙালীর অদম্য উৎসাহ, জীবনপণ আত্মোৎসর্গ ও অলস্তু স্বদেশপ্রেম।

আজ যে সবই প্রায় গিয়াছে, বাঙালীর উপর এখন স্বল্পতার অভিলাপ পড়িয়াছে। উপরন্তু, নিরাপদ ও অল্পপ্রাসে অর্ধোপার্জনের লোভে সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীর ও

ব্যবহারাজীবের যে পথ ধরিয়াছিল সে পথও এখন বন্ধ হইতে চলিয়াছে। বাঙালীর বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং জ্ঞানের মূল্য ক্রমেই কাণাকড়িতে দাঁড়াইতেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম যুগে দেশের শাসনকর্তারা বাঙালীকে শাস্তিদানে শাস্তি করার জন্ত নিয়ম করিলেন, “Bengalee's need not apply” বাঙালীর আবেদন মঞ্জুর হইবে না। শাসনকর্তাদিগের ইচ্ছিতে ক্লাইভ স্ট্রিটের শোষণকর্তারা বাঙালী আড়তদার ও বেপারীর ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়া মারবাড়ী ও ভাটিয়ার প্রতি হইলেন সদয়। ভিন্ন প্রদেশীয়েরা দেখিলেন বাঙালী অসহায় স্তূত-রাং তাঁহারা বাঙালীকে সাহায্য না করিয়া লুণ্ঠনে ও শোষণে বিদেশীর অহুগত শিবাদলের কাজ করিলেন। গণ-আন্দোলন ক্রমে হইল নিশ্বেজ। আজ ভারতের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর নাম কোথায়? বাঙালীর গৌরবের শেষ আশ্রয় যাহা ছিল তাহাও চলিয়াছে ধ্বংসের পথে পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিকদের কৃপায়।

পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিক কথাটা স্মৃতি। এবং বর্তমানে বাংলার সংবাদপত্রের যে ধারা তাহাতে অপ্রিয় সত্য চাপা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দেশ যে অধঃপাতে চলিয়াছে সে কথা বলিবার সময় কি তখন হইবে যখন বাঙালীর নাম, বাঙালীর যশ মান সবই চিতায় উঠিবে? আজ এই দেশে কোন নেতা আছেন যাহার দলে এই পেশাদার রাজনৈতিক ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে না? এই যে সেদিন মাত্র নতুন ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে “কংগ্রেসের জয়” “জয় হিন্দ” ইত্যাদি স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়ধ্বনিতে দেশ মুখরিত হইয়াছিল, সে শব্দ বাতাসে মিলাইতে-না-মিলাইতে নির্বাচিত ৮৭ জন কংগ্রেসপন্থীর মধ্যে বারোটটি বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত চক্রান্তে বিপক্ষের হাতে “আপার হাউসের” একটি আসন চলিয়া গেল, ইহাতে দেশের রাষ্ট্রনীতির আবহাওয়া কিভাবে বদল হইতেছে তাহাও কি বলিবার সময় হয় নাই?

রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন সভার কার্যক্রমের উপর বাংলায় জাতীয়তা-বাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে একথা সর্বজনবিদিত। বাঙালী

সম্প্রতি স্বাধীন হিন্দুস্থান হইতে দশ বৎসরের জ্ঞান নির্বাসিত হইতেছে। তাহার দাসত্ব-রজুর হাতবদল মাত্র হইবে বা ভবিষ্যতে তাহার আশা ভরসা কিছু থাকিবে তাহার নিষ্পত্তি হইবে ঐ রাষ্ট্রগঠন সভায় এবং সেখানে স্বাধীন হিন্দুস্থানের কোন কথা চলিবে না। লীগপন্থীগণ একথা বুঝেন স্ততরাং তাঁহাদের তালিকায় তাঁহাদের অগ্রতম নায়ক সুযোগ্য সহকারী লইয়া নামিতেছেন। ঐ দলের বিরুদ্ধে বাংলার কংগ্রেস নায়কগণ কি শক্তি লইয়া যাইতেছেন তাহার বিচারের কি কোনও প্রয়োজন ছিল না?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ

বাঙালী আজ ঘরে ও বাহিরে সর্বত্র বিপর্যস্ত। অনশন, অধর্শন, বস্ত্রাভাব, ঔষধের অভাব, স্থানা-ভাব যেমন ঘরে বাঙালীর নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে তেমনই বাংলার বাহিরে বাঙালীর ভাগ্যেও প্রতি পদে লাঞ্ছনা ও অপমান ললাটের লিখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বাঙালী হিন্দু একদা ঘরে ও বাহিরে সকলের নমস্কার ছিল, সেই বাঙালী আজ কোথাও বা করুণা মাত্র সম্বল করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা চূড়ান্ত লাঞ্ছনায় ও অপমানে পহুঁদন্ত হইতেছে।

ইহার কারণ অসুসন্ধান করিতে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। বাঙালীর এই সর্বনাশের একমাত্র কারণ দলাদলি। বাংলার সহিত ফ্রান্সের অবস্থা অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। যে ফ্রান্স একদা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জন্মভূমি বলিয়া বিশ্ববাসীর পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই ফ্রান্সের কি শোচনীয় অধঃপতনই না গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গিয়াছে। ইহারও একমাত্র কারণ দলাদলি। ফ্রান্সের ছায় দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান দেশ দলাদলির যে হলাহল পান করিয়া রাসাতলের অতল-গহ্বরে ডুবিতে বসিয়াছে, সেই হলাহল বাঙালীকেও ধ্বংস করিবে ইহাতে বিশ্বাসের কারণ নাই। যে বিষ স্বাধীন ও চর্য্য শক্তির অধিকারী ফ্রান্স গিলিতে পারে নাই, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে মাত্র উপনীত বাঙালী তাহা সহ্য করিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চিত। ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে সতর্ক হইবার সময় বাঙালীদের এখনও আছে। সম্প্রতি মার্কিন দেশের “ওয়ার্ল্ডওভার প্রেসের” বুলেটিনে ফ্রান্স সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

“গণতন্ত্র রাষ্ট্রবিধির চেয়েও অনেক বড়। ফ্রান্সে দল হিসাবে ভোট দেওয়ার যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা গণ-তন্ত্রবিরোধী মারাত্মক পদ্ধতিগুলির মধ্যে অগ্রতম। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে দেখা গিয়াছে ফরাসী ব্যবস্থা-পরিষদে এই প্রধায় ভোটদানই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দলগুলি আলাদা-ভাবে নিজেদের সভা করিত, নিজেদের অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, তারপর ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে ভোটদানের সময় এক-একটি দল হইতে এক জন করিয়া দলপতি গিয়া নিজের দলের হইয়া ভোট দিয়া আসিতেন। ফ্রান্সের বর্তমান গণ-পরিষদে ভোটভুটির সময়েও এই প্রথারই অনুসরণ করা হইতেছে।

“এই পরতির বিপদ এই যে কোন বিষয়ে কাহারও কোন বিরুদ্ধ মত থাকিলে তাহার কণ্ঠ দলীয় কমিটির বৈঠকের বাহিরে আসিবার সুযোগ পায় না (Steam-roller tactics in Committee rooms), একদেশদর্শী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে এবং এই সিদ্ধান্ত পাণ্টাইবার উপায় থাকে না, দলের মধ্যে যাহারা মেজরিটি তাহারা বিরুদ্ধ বাদীর অভিমত যুক্তিসঙ্গত ও শাস্যসঙ্গত হইলেও তাহা চাপিয়া দেয় এবং যে সব নেতার পিছনে মেজরিটি আছে তাহাদের হাতে এত অপরিমিত ক্ষমতা আসিয়া যায় যে পূর্দার আড়ালে ইহার যাহা খুশী করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে বাজারের গোল-আলুর ছায় ভোট কেনাবেচা করিতেও ইহাদের বাধে না। প্রকৃত গণতন্ত্রে ভোট কখনও ক্ষয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইতে পারে না।”

কৃষ্ণে দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এ দেশে পাশ্চাত্য আদর্শের রাজনৈতিক দল গঠনে সম্মতি দিয়াছিলেন। ইহার বিষময় ফল তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকারের সময় পান নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এবং শেষজীবনের মনস্তাপের প্রধান কারণ দলাদলি ইহা সর্বজনবিদিত। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এই দলাদলি বাঙালীর জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে বিস্তৃত হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে কলুষিত করিয়াছে। সংস্কার ও দূরচেতা লোকের প্রবেশ উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সততা, সচ্চরিত্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আদর্শমুগ্ধতা প্রভৃতি যে সব গুণ একদা বাঙালীর ভূষণ ছিল, সে সব বিসর্জন দিয়া শুধু দলের প্রতি অহুরক্তি যে দিন হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের একমাত্র মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হইয়াছে, বাংলার ধ্বংসের পথ সেই দিনই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পাপ এত বেশী চুকিয়াছে যে কংগ্রেস ছাপ দেওয়া দলের কর্তৃত্বের ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের নাম দাঁড়াইয়াছে “কলিকাতা চোরপোরেশন”, ওরফে Calcutta Corruption! দলাদলি অগ্রতম আছে, কিন্তু কংগ্রেসের দলাদলি অধিকতর নিন্দনীয় এইজন্য যে এই প্রতিষ্ঠান, বিশেষ ভাবে বাংলা কংগ্রেস, প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সর্বভাগী কর্মীদের যুকের বিন্দু বিন্দু রক্তের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্যাগের দোহাই দিয়া বাহারা কংগ্রেস দখল করিয়া উহাকে ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্ররূপে তৈরি করিয়া লইতে চেষ্টিত তাঁহারা ত্যাগের মর্যাদা হানি করিতেছেন, ত্যাগকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া উহার চূড়ান্ত অবমাননা করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদে, ব্যবস্থাপক সভায় এবং গণ-পরিষদের প্রার্থী মনোনয়নে দেখা গিয়াছে দলগত স্বার্থরক্ষাই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য। জাতির কিসে ভাল হইবে, কোন্ কাজে কাহাকে নিয়োগ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে সেদিকে তাঁহাদের স্থির লক্ষ্য কোথায়?

রুদ্ধ কক্ষে গোপনে পরামর্শ করিয়া দলপতিরা যাহা স্থির করিয়া দিবেন, দলাহুরজদের তাহাই নতমস্তকে পালন করি-

বার কথা, কিন্তু তাহাও সব সময়ে হয় নাই। লোভে পড়িয়া কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করিবার মত বার জন বিশ্বাসঘাতক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ৮৭ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ইতি-মধ্যেই জুটিয়াছে। দলের স্বার্থ যেখানে দেশের স্বার্থের উল্লেখ স্থান লাভ করে, ব্যক্তিগত আনুগত্য যেখানে দলাহুরতির একমাত্র নির্দেশরূপে গ্রাহ্য হয়, সেখানে ইহা ঘটবেই। কেননা স্বার্থ ও লাভের চেষ্টা দলগত হইতে ব্যক্তিগতে পরিণত হইতে দেবী লাগে না। নেতার আদর্শ সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও তাঁহার আত্মনিয়োগ যথার্থ ভাবে অনাসক্ত না হইলে তাঁহার দলে শঠ ও ধলের প্রবেশ অনিবার্য।

অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট গঠনে কংগ্রেসের আপত্তির কারণ

মন্ত্রিমিশন ও বড়লাট ১৬ই জুন তারিখে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা কেন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহার কারণ বিবৃত করিয়া মোলানা আজাদ বড়লাটকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানিতে এ সম্পর্কে কংগ্রেসের সমস্ত যুক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া উহার গুরুত্ব অনাম্য। সম্পূর্ণ পত্রটি নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রিয় লর্ড ওয়াডেল,

আপনার ১৬ই তারিখের বিবৃতি পাইবার পর আমার কমিটি এই বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই এবং আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে ও অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠনের জ্ঞান আপনি বিভিন্ন সদস্যদের নিকট যে আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন তৎসম্পর্কে কমিটি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আপনার মতামত আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি। আলোচনা কালে আমরা আমাদের অন্তর্বিধাগুলি আপনার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। দুঃখের বিষয় হইতেছে এই যে, সাম্প্রতিক পত্রালাপের ফলে এই অন্তর্বিধাগুলি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্মের লোক ইহার ভিতরে আছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই কংগ্রেস অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যে আঁকাঙ্ক্ষাই ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়কে একত্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদেরকে প্রত্যেক প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠিত হইলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রবর্তন করিয়া অধীনগত পরিবর্তন সাধনের জন্য আমরা বিশেষ চাপ দিই নাই। আপনার অন্তর্বিধাগুলি উপলব্ধি করিয়াই আমরা উহা করিয়াছি। স্বাধীনতা যাহাতে আসে তজ্জন্য শাসন-ব্যবস্থার আমরা কিছু পরিবর্তন আশা করিয়াছিলাম। এই দিক হইতে অস্থায়ী গবর্নেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়টি খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ধারণা ছিল যে উহা বড়লাটের শাসন-পরিষদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের হইবে। আপনার ৩০শে মে তারিখের পত্রে আপনি এ সম্পর্কে আমাদেরকে কতকগুলি আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে আপনি অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। তবে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের কথা বিবেচনা করিয়া আপনার প্রদত্ত আশ্বাসগুলি আমরা মানিয়া লই এবং উপরোক্ত বিশেষ বিষয়-টির জ্ঞান আমরা আর অধিক চাপ না দেওয়াই স্থির করি।

অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই সম্পর্কে আমরা বিশেষ জোরের সহিতই ইহা বলিতে চাই যে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেও আমরা ‘সংখ্যাসাম্য’র প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, দেশের শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিগণও যাহাতে ইহার ভিতরে থাকেন তজ্জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠন করিতে হইবে। সদস্যদের নাম সম্পর্কে আমরা আমাদের মতামত ঘরোয়াভাবে আপনাকে জানাই। আপনার ১৬ই তারিখের তালিকায় আমরা এক ব্যক্তির নাম দেখিতেছি যিনি সরকারী কার্যে নিযুক্ত। জনকল্যাণকর কার্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই আমরা জানি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নামে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করার পূর্বে আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। অপর এক ব্যক্তির নাম বাদ দিয়া বিবৃতিতে আপনি যে সমস্ত নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা আশ্চর্যাব্বিত হই। কংগ্রেস যে নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারও কিছু পরিবর্তন করা হয়। আপনি যে ভাবে নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় যে আপনি ভ্রান্ত পথেই সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের একজন সহকারীর নামই সেখানে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আপনি বলিয়াছেন যে উহার সংশোধন করা হইবে। কাজেই এ সম্পর্কে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না।

আপনার তালিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহাতে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম বাদ দেওয়া অত্যন্ত অসম্মত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আপনার তালিকা হইতে কংগ্রেসী দলভুক্ত এক জনের নাম বাদ দিয়া তাহার পরিবর্তে আমরা এক জন মুসলমানের নাম দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, নিজেদের দলের এক জনের নাম পরিবর্তন করিয়া সেস্থলে অপর এক জনকে নিয়োগ করাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি যে সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং শুধু

রাজনৈতিক কারণেই তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আপনি নিজেই আমাকে লিখিয়াছিলেন, “যেমন অল্প দলের আপত্তি মানিতে পারি না তেমন মুসলিম লীগকর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা সম্পর্কে কংগ্রেসের আপত্তি করিবার অধিকারও আমি মানিয়া লইতে পারি না। এক্ষেত্রে শুধু যোগ্যতাই বিচার করা হইবে।” কিন্তু আমরা কোন প্রস্তাব দিবার পূর্বেই আপনার ২২শে জুন তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিলাম। আপনি সংবাদপত্রের কয়েকটি বিবরণের ভিত্তিতে ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের মধ্যে অস্থায়ী সরকারে কংগ্রেস-মনোনীত কোন মুসলমানের নাম গ্রহণের অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনার ও মন্ত্রী-মিশনের অসম্মতির কথা আপনি আমাদের জানাইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, ইহা আপনাদের উপরি-উক্ত উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। একথা হইতে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ইচ্ছামত নিজ প্রতিনিধি মনোনয়নের স্বাধীনতাও কংগ্রেসের নাই। ইহাকে নজীর হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না বলাতেও বিশেষ কিছু তফাৎ হইল না। যে কোন স্থলে, যে কোন সময় এবং যে অবস্থায় একপক্ষ মৌলিক আদর্শ হইতে সাময়িক বিচ্যুতিও আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

মিঃ জিন্না তাঁহার ১৯শে জুন তারিখের পত্রে যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন ও আপনারা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা আপনাদের ৩১শে জুন তারিখের পত্রে আমাদের জানাইয়াছেন। আমরা মিঃ জিন্নার চিঠি দেখি নাই। তিন নং প্রশ্নে তপশীলী জাতি, শিখ, দেশীয় খ্রীষ্টান ও পার্শী—এই চারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, এই সকল জাতির সদস্যগণ খালি হইলে কাহারো তাহা পূরণ করিবে এবং সে সময় মুসলিম লীগের নেতার পরামর্শ ও অনুমোদন গ্রহণ করা হইবে কি না।

তাঁহার উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, “আপাতত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের যে সকল আসন দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটি খালি হইলে শূন্য পদ পূরণের পূর্বে আমি স্বভাবতই প্রধান দুইটি দলের পরামর্শ গ্রহণ করিব।” সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিঃ জিন্না তপশীলী জাতিসমূহকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং আপনিও এ বিষয় তাঁহার সহিত একমত বলিয়াই মনে হয়। আমাদের তরফ হইতে এই মতের বিরোধিতা করিয়া জানাইয়া দিতেছি যে, তপশীলী সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই আমরা গণ্য করিয়া থাকি। আপনার ১৫ই জুন তারিখের পত্রে আপনিও তপশীলী সম্প্রদায়কে হিন্দু হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন।

আপনার প্রস্তাবে আপনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান

বা কংগ্রেস-লীগের মধ্যে কোনরূপ সংখ্যা-সাম্যের ব্যবস্থা নাই। কারণ কংগ্রেসকে হিন্দুদের জ্ঞান ছয়টি ও লীগকে মুসলমানদের জ্ঞান পাঁচটি আসন দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের ছয়টি আসনের মধ্যে একটি তপশীলীদের জ্ঞান। আমরা এমন কোন সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক দলের সহিত কোনমতেই একমত হইতে পারি না, যে দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত তপশীলী হিন্দু বা অল্প কোন সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।

চতুর্থ প্রশ্নে তপশীলী সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবে উল্লিখিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাত গবর্নমেন্টে বজায় থাকিবে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। আপনি উত্তরে বলেন যে, প্রধান দল দুইটির সম্মতি ব্যতীত সংখ্যালঘুপাণ্ডের পরিবর্তন হইবে না। এখানেও একটি সম্প্রদায়কে কোনপ্রকার সম্পর্ক না থাকিলেও অল্প সম্প্রদায়ের পরিবর্তনাদির ব্যাপারে ভেটো দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যদি সুযোগ ও সুবিধা আসে তাহা হইলে আমরা অল্প একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও গ্রহণ করিতে পারি। উদাহরণ-স্বরূপ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কথা বলা যাইতে পারে। মুসলিম লীগের সম্মতির উপর ঐ সকল ব্যাপার নির্ভর করে। আমরা ইহাতে সম্মত হইতে পারি না। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, আপনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার দ্বারা বর্গহিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং উহার ফলে হিন্দুর প্রতিনিধি-সংখ্যা লীগের সমান হইয়া পড়িতেছে।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, “প্রধান দুইটি দলের মধ্যে কোন একটি দলের অধিকাংশ সদস্য যদি বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে সাময়িক গবর্নমেন্ট কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আপনি আরও বলিয়াছেন যে, আপনি কংগ্রেস সভাপতির নিকট ঐ বিষয় উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে, কংগ্রেস উহা সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, ভারতীয় আইন সভায় স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম। বড় বড় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া গঠিত সাময়িক গবর্নমেন্ট যদি আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহা হইলে উহা সহজেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অল্প কোন ভিত্তিতে যদি সাময়িক গবর্নমেন্ট গঠিত হয় তাহা হইলে ঐ নীতি প্রয়োগ করা যাইবে না। ১৩ই জুন তারিখে আমি যে পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, উহার ফলে শাসনকার্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়িবে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যস্বাভাব্য। মিঃ জিন্না তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন—“সদস্যসংখ্যা ১২ জনের পরিবর্তে ১৪ জন করা হইয়াছে।” অতএব অধিকাংশ মুসলমান সদস্য বিরোধিতা করিলে বড় রকমের কোন সাম্প্র-

দায়িক ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলিবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সদস্যসংখ্যা ১২ জনের পরিবর্তে ১৪ জন করার পর এই সমস্তার উদ্ভব হয় অর্থাৎ ১৬ই জুন আপনি যে বিরতি দেন তাহার পরই উহার সৃষ্টি হয়। এই বিরতিতে ঐ নিয়মের কোন উল্লেখ ছিল না। আমাদের সম্মতি নাই। লইয়াই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, ইহার ফলে মুসলিম লীগ সাময়িক গবর্নেন্টে ভেটো দিবার অধিকার কোন একটা কার্যে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে।

১৬ই জুন তারিখে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এবং মিঃ জিন্নার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাঁহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমাদের যে আপত্তি আছে, তাহা উপরে উল্লেখ করা হইল। এই সকল ক্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার জন্ত সাময়িক গবর্নেন্টের কার্য পরিচালন কঠিন হইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যস্বাভাবিক। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন আপনার প্রস্তাব তাহা মিটাইতে পারে না এবং যে আদর্শ আমাদের নিকট অতি প্রিয় আপনার প্রস্তাবে সেই আদর্শও পূর্ণ হইবে না। সেইজন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে আপনার বিরতিতে প্রস্তাবিত সাময়িক গবর্নেন্ট গঠনে আপনাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে প্রকাশিত বিরতিতে শাসনতন্ত্র-রচনাকারী পরিষদ গঠন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হয় তৎসম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৪শে মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ বিষয়ে আপনার সহিত এবং মন্ত্রী-মিশনের সহিত আলোচনা ও পত্রালাপ করিয়াছি। আমার কয়েকজন সহকর্মীও ঐ ব্যাপারে আপনাদের সহিত আলোচনা ও পত্রালাপ করেন। ঐ সকল আলোচনা ও পত্রে, প্রস্তাবে যে সকল ক্রটি আছে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। বিরতির কয়েকটি বিষয়ে আমরা আমাদের অভিমতও জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। আমাদের মতে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিয়াও আমরা আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আমরা তদনুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা ইহা বলিতে চাই যে, ভালভাবে সাময়িক গবর্নেন্ট গঠনের উপরই সাফল্যজনকভাবে গণপরিষদের কার্য পরিচালন নির্ভর করিতেছে।

বশংবদ

(স্বঃ) এ কে আজাদ

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই

অধিবেশন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনেক বিচার বিবেচনার পর মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব গ্রহণ ও বড়লাটের

১৬ই জুন তারিখের প্রস্তাব বর্জন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। মোলানা আজাদ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উহা সমর্থন করেন। মোলানা আজাদ বলেন যে কংগ্রেস এতকাল এই দাবি করিয়া আসিতেছিল যে ভারতবাসীর হাতে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্নেন্ট বহু বৎসর ধরিয়া এই দাবি অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহারা চাপে পড়িয়াই ভারতবাসীর এই দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, যেহেতু নয়। দেশ এতদিন যাঁহা চাহিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে সুতরাং গণপরিষদে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে এই দাবির কোন অর্থই থাকে না। মন্ত্রীদের ঘোষণায় ভারত বিভাগের প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই ঘোষণায় পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবে না, এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে অবিভক্ত থাকিবে। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, “আমরা স্বাধীনতার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব।” গান্ধীজী অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এক বক্তৃতায় বলেন, “দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। আজ গণপরিষদের দোষক্রটি দেখিয়া ভীত হইব কেন? আমরা যদি দেখিতে পাই যে গণপরিষদের দোষক্রটি দূর করা সম্ভব হইবে না তখন আমরা ইহার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিব।” দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার শেষে বিতর্কের উত্তর দান সমাপ্ত করিয়া আবেগভরে মোলানা আজাদ বলেন, “বিজয়লক্ষ্মী আমাদের গৃহদ্বারে সমুপস্থিত, তাঁহাকে বরণ করিয়া গৃহে স্থাপন করুন, অবহেলায় তাঁহাকে যেন ফিরাইয়া না দেন।”

ব্রিটিশ গবর্নেন্ট দয়ার দান হিসাবে ভারতবাসীকে গণপরিষদ গঠনের অনুমতি দিয়াছেন এ কথা মনে করা ভুল। কংগ্রেসের গত ষাট বৎসরের সংগঠন ও আন্তর্জাতিকের ফলে আমরা গণপরিষদ পাইয়াছি। ব্রিটিশ জনসাধারণ ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এতদিনে বুঝিয়াছেন যে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের জন্ত বহুপরিকর এবং এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে ভারতবাসীকে বিচ্যুত করিবার শক্তি কাহারও নাই। ব্রিটিশ গবর্নেন্টের সম্মুখে আজ মাত্র দুইটি পথ আছে—হয় তাঁহাদিগকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া সসন্মানে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা আবার এক ভয়াবহ বিপ্লব ডাকিয়া আনিয়া অনাবশ্যক রক্তক্ষয়ের পর অসন্মানে পদাধাতে বিতাড়িত হইতে হইবে। পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্যেরা ভারতে আসিয়া ইহা বুঝিয়া গিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া স্বদেশবাসীদের ঠিক এই কথাই শুনাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নেন্টও ইহা উপলব্ধি করিয়াই

মন্ত্রীমণ্ডলকে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার ভার দিয়াই ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম পূহা বাছিয়া লইয়া ব্রিটেন যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে ভারতবাসী তাহার অমর্যাদা করিতে পারে না।

গণপরিষদ আস্থানের সময় তাহার ক্ষমতা নির্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও গণ-পরিষদের সার্বভৌম অধিকার লাভের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ফ্রান্সের ষ্টেটস্ জেনারেল আস্থানের সময় ঘোড়শ দুই উহার ক্ষমতা নানাদিক দিয়াই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ধরাবাঁধা ক্ষমতা অতিক্রম করিতে গণ-প্রতিনিধিদের উদ্যোগী হইতে দেখিয়া রাজা তাঁহাদের সতর্ক করিবার জন্য লোকও পাঠাইয়াছিলেন। গণনায়ক মিরাবো সেই রাজদূতকে বলিয়াছিলেন, “যাও তোমার প্রভুকে গিয়া বল আমরা গণ-প্রতিনিধিরূপে এখানে সমবেত হইয়াছি, বল-প্রয়োগ ভিন্ন আমাদের সরান যাইবে না।” এই গণ-পরিষদ কি ভাবে স্বাধীন ফ্রান্সের সার্বভৌম রাষ্ট্রবিধি রচনা করিয়াছিল তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আমাদের গণ-পরিষদ সঙ্ঘে মোলানা আজাদ এবং পণ্ডিত নেহেরু উভয়েই বলিয়াছেন যে উহাকে সার্বভৌম পরিষদে পরিণত করিবার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে আছে। ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা-বিরোধী কোন বাধা উপস্থিত হইলে কংগ্রেস গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে মুহূর্তের জন্তও দ্বিধা করিবে না মোলানা আজাদ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে গণ-পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা মন্ত্রী-মিশনও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তবে তাঁহাদের দুইটি সত আছে—প্রথম মাইনরিটি সমস্তার সমাধান করিতে হইবে, দ্বিতীয় ব্রিটেনের সহিত ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। পণ্ডিতজী ঐ সঙ্কেই বলিয়া দিয়াছেন যে এই দুই সত পূরণের নামে আমাদের উপর কোনরূপ জোর খাটানো চলিবে না। মাইনরিটি সমস্তার সমাধান যাহাতে সন্তোষজনক হয় তাহার ব্যবস্থা আমরাই করিতে পারিব এবং করিব।

গণ-পরিষদে ভারতবর্ষের যে সব প্রতিনিধি যোগদান করিতে যাইতেছেন তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট অহুগত্যের শপথ লইতে হইবে না, স্বাধীন ভারতের জন্ত যে শাসনতন্ত্র তাঁহারা রচনা করিবেন ব্রিটেন তাহাই মানিয়া লইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি অথবা উহার বাহিরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গণ-পরিষদই গ্রহণ করিবে। ভারতীয় গণ-পরিষদকে আমেরিকা বা ফ্রান্সের গণ-পরিষদের চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

মিঃ জিন্নার জয়-পরাজয়ের হিসাব

মন্ত্রী-মিশনের ভারতে আগমনের পর মিঃ জিন্না মুসলিম লীগকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কেহ কেহ রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছেন। সকলে তাহা পান

নাই। মিঃ জিন্নার রাজনীতির মূল কথা এই যে, যে সময়ে কংগ্রেসকর্মীরা চরম স্বার্থত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে তাহার দল সে সময়ে বিদেশীর আজ্ঞাবহ হইয়া পুরস্কার লাভ করুক। স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজের সহিত কংগ্রেসের বোঝাপড়ার কথা যখনই উঠিবে তিনি তখনই আগাইয়া আসিয়া মুসলমান স্বার্থরক্ষার দোহাই পাড়িয়া কংগ্রেসের অর্জিত অধিকারের বখরা দাবি করিবেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের হাতে যত দিন ক্ষমতা ছিল তত দিন তাঁহারা মাইনরিটি স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মিঃ জিন্নার এই অগ্নায় দাবি সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রগতিতে বাধা দিয়া আসিয়াছেন। বিলাতের শ্রমিকদল এই চার্চিলী নীতির প্রতিবাদ সর্বদাই করিয়াছে। নিজেদের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর মিঃ এটলী বোষণ করেন যে মাইনরিটিকে আর কখনও দেশের প্রগতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ডল ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমেই পাকিস্থানের দাবিকে অমৌজিক, অবাঞ্ছনীয় ও অসম্ভব বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তার পর মিঃ জিন্না মুখরক্ষার জন্ত প্যারিটির দাবি তুলিলে তাহাও তাঁহারা অগ্রাহ করেন। লর্ড ওয়াভেল সিভিল সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকদের পরামর্শে অস্থায়ী কেন্দ্রীয় গবর্নেন্ট গঠনে লীগ-তোষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্রাবলীতে যে সব তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কোন মৌখিক প্রতিশ্রুতি সম্ভবত মিঃ জিন্নাকে দিয়াছিলেন ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। ১৬ই জুনের ঘোষণার অষ্টম ধারায় বলা হইয়াছিল যে বড়লাট অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন কোন দল তাহা অগ্রাহ করিলে তাহারা উহা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের লইয়া অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠিত হইবে। অস্থায়ী গবর্নেন্টে যোগদানের আমন্ত্রণ কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু লীগ গ্রহণ করে। এই সঙ্কেটে পড়িয়া মন্ত্রী-মিশন ১৬ই জুনের প্রস্তাবের উক্ত ধারার এক ব্যাখ্যা করিয়া অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন। ইহার পর মিঃ জিন্না ও লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে যে বাগযুদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ হয় চার্চিল-দলের লোক, লর্ড ওয়াভেল, সিভিল সার্ভিস ও ইংরেজ বণিকেরা একযোগে লীগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রমিক দলভুক্ত মন্ত্রীরা এই ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করায় এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির গত কয়েক মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লীগকে সর্বতোভাবে সমর্থনের চেষ্টা এবং লীগের সর্ববিধ সংবাদ প্রকাশের ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে এই বিশ্বাসই সমর্থিত হয়।

মিঃ জিন্নার রাজনীতি সঙ্কে মুসলমান সমাজের ধারণা বিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহারও কিছু কিছু পরিচয় মিলিতে

আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে হায়দারাবাদ রাজ্যকেই ভারত-বর্ষের একমাত্র পাকিস্তান বলা যাইতে পারে। প্রজ্ঞাদের দশ ভাগের নয় ভাগ হিন্দু হইলেও সেখানে মুসলমানদের অপ্রতিহত প্রতাপ, নবাব মুসলমান, প্রধান মন্ত্রীও মুসলমান—উভয়েই লীগের বড় সমর্থক। ব্যবস্থা-পরিষদের অধেক সদস্য মুসলমান এবং রাষ্ট্র ভাষা উর্দু। হায়দারাবাদের নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনের জন্ত মিঃ জিন্না আমন্ত্রিত হইয়াছেন। এ ছেন রাজ্যের বিখ্যাত একটি উর্দু সংবাদপত্র “পারাম” মিঃ জিন্না সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে তাহার তর্জমা “নবযুগে” প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এই :

আমরা যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, লীগ কাউন্সিল কর্তৃক অস্থায়ী গবর্নেন্টে গ্রহণে মিঃ জিন্নার সম্মতি ছিল না। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ সদস্য উহা গ্রহণের জন্ত একান্তভাবে আগ্রহান্বিত এবং সেজন্ত তাঁহারা এই অজুহাত উপস্থিত করিলেন যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্ত আমাদের সম্মুখে যখন আর কোন পরিকল্পনা নাই, তখন উহা গ্রহণ করা কর্তব্য, অত্যাশ্চর্য মুসলমান জনসাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার কিছুই থাকিবে না। বিশেষতঃ আমরা সেদিন মাত্র পাকিস্তান অর্জনের জন্ত রক্তবরা যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের যে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছি, লোকে যখন উহার কৈফিয়ৎ চাহিবে, তখন আমরা কি জবাব দিব? কিন্তু যে বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, উহা গ্রহণ করিলে উহাতে পাকিস্তান আছে বলিয়া আমরা মুসলমান সাধারণকে প্রবোধ দিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার একটা সুযোগ করিয়া লইতে পারিব। মিঃ জিন্নাও যখন দেখিলেন যে, তিনিও যেমন বর্তমান অবস্থা অতিক্রমের কোন প্রোগ্রাম দিতে পারিতেছেন না এবং অহুগামীদের অধিকাংশ যখন ত্যাগের পথ অবলম্বনে ইচ্ছুক নহে, তখন তিনি মন্ত্রিমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত স্বীকার কোন কোণে পাকিস্তানের সামান্য মাত্র (উর্দুতে আছে—খফিফ সা আকুসা) ছাড়ার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, তাহা অন্বেষণে প্রস্তুত হইলেন এবং তাহা তিনি পাইলেনও। সুতরাং লীগের জন্ত অস্থায়ী গবর্নেন্টের পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের অস্বীকৃতির পর যখন বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া অস্থায়ী গবর্নেন্টের প্রস্তাবকে স্থগিত করিলেন, তখন লীগকে ‘না ধরকা না ঘাটকা’র দশার মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইল। সুতরাং ইহাতে মিঃ জিন্না ক্রোধাক্রান্ত হইলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণই থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই ঘটনা হইতে কোন শিক্ষালাভ হইয়াছে কি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা ভবিষ্যতের জন্ত কাজে লাগাইয়া

উপকৃত হওয়া যাইতে পারে। আমরা খোদার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ক্রোধ যেন গণপরিষদের কাজে ব্যাঘাত না জন্মায়। গণপরিষদে গিয়া সবাই যদি অবাস্তর প্রশ্ন-বর্জনপূর্বক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উহার একটা সর্বাধীন হৃদয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ব্রিটিশ গবর্নেন্টের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারেন যে, আমরা আমাদের সত্ব পূরণ করিয়াছি, এখন আপনারা আপনারদের দায়িত্ব পালন করুন, তাহা হইলে প্রকৃষ্টরূপে এই কলঙ্ক-ভঞ্জন হইতে পারে। হে খোদা, তুমি আমাদের আশা সফল করিও।

এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় মিঃ জিন্না বলিয়াছিলেন, “আজ আমরা যেখানে উপস্থিত, সেখান হইতে অগ্রসর হইতে গেলে বিপ্লবের পথে পা বাড়াইয়া রক্তদানের জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু যে বস্তু আমরা পাইতেছি তাহার জন্ত এক ফোটা ঘামও আমাদের খরচ করিতে হয় নাই।” ‘নবযুগ’ সংবাদ দিতেছেন যে এই সভায় ঈশ্বরের নামে শপথপূর্বক যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে সমবেত লীগ সদস্যবৃন্দকে সহি করানো হইয়াছিল। মিঃ জিন্না দণ্ডায়মান হইয়া উহার এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লীগ কাউন্সিলের সদস্যেরা তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞাপাঠ শেষ হইলে রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরও লওয়া হইয়াছিল। ইহার পর হইতে লীগ দলীয় সংবাদপত্রসমূহে ক্রমাগত জেহাদের কথা ঘোষণা করিয়া মুসলমান সমাজকে সাম্প্রদায়িক মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং চার্টলপত্নী আমলাতন্ত্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব এই ইন্ধন দান নির্বিচার চিত্তে অবলোকন করিতেছেন।

পাকিস্তান অর্জনের জন্ত জেহাদ ঘোষণার প্রতিজ্ঞাপত্রে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দানের দুই মাস পরেই মন্ত্রী-মিশনের পাকিস্তানবর্জিত ঘোষণা বিচার করিবার জন্ত সেই সদস্যরাই লীগ কাউন্সিলে পুনরায় সমবেত হইলে মোলানা হসরত মোহানী তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মোলানা হসরত মোহানী জেহাদের কথা তুলিলে এই সব পাকিস্তানওয়ালার দল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কোণঠাসা করেন এবং পাকিস্তানবর্জিত মিশনের প্রস্তাবকেই পাকিস্তান লাভের সোপান বলিয়া গ্রহণ করেন। জনৈক উৎসাহী লীগ সদস্য সভাশেষে মিঃ জিন্নাকে সম্বোধন করিয়া “হিন্দুস্থান আমরা ভাগ করিয়া পাকিস্তান অর্জন করিবই” এই কথা বলিলে জিন্না সাহেব তাহার জবাব দিয়াছিলেন, “হিন্দুস্থান টুট গয়া, মিল গয়া পাকিস্তান।” (হিন্দুস্থান ভাঙিয়াছে, পাকিস্তান মিলিয়াছে।)

ডাক বিভাগে ধর্মঘট

গত ১১ই জুলাই হইতে ডাকবিভাগের অধস্তন কর্মচারি-

গণ ধর্মঘট করিয়াছে। ধর্মঘট ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। ইহার ফলে দেশের সাধারণ লোকের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমেই ইহা বাড়িয়া চলিতেছে। এই ধর্মঘটের পূর্বলক্ষণ বহুদিন আগেই পাওয়া গিয়াছিল সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে পারেন না তাঁহারা ইহার প্রতিকারের সময় পান নাই।

ডাক-কর্মচারিদিগের অভাব-অভিযোগ মূলতঃ ঠিক। কিন্তু যেভাবে এই সকল নানা বিভাগের অভাবগ্রস্ত কর্মীদিগের অসন্তোষের সুযোগ লইয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দলভারী করার চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইবে না। কর্মীদিগের অভাব দূর না হইলে তাহাদের পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব ইহা সত্য কিন্তু অল্প দিকে সে সকল অভাব একদিনে দূর হওয়াও সম্ভব নহে; কেননা সমস্ত দেশ এখন দূরবস্থায় রহিয়াছে। কর্মীদিগের দাবি সেইজন্ম যুক্তিযুক্ত হওয়া উচিত; অতথায় সে দাবি মিটান কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই বিষয়েই আমরা কর্মীদিগের নেতৃবর্গের বিবেচনার বিশেষ অভাব দেখিতেছি। দুই পক্ষের বা বিভিন্ন দলের নেতা পরস্পরের সহিত টঙ্কর দিয়া দাবি উচ্চ হইতে উচ্চতর করিলে শেষ পর্যন্ত এক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

আসলে দোষ দেশের উচ্চতম অধিকারিবর্গের। অন্য সকল মিত্রদেশে যুদ্ধোত্তরকালে জিনিষপত্রের মূল্য, বিশেষত খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য, ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং স্ন্যাক মার্কেটের ক্রমে উচ্ছেদ ঘটতেছে। এ দেশে এখনও স্ন্যাক মার্কেটের পূর্ণ অধিকার বজায় রহিয়াছে, যাহার ফলে দেশের লোকের সহনশক্তি সীমা পার হইয়া গিয়াছে। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নামেই আছে এবং তাহাও অসম্ভব উচ্চহারে ফেলা। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইতে যতই দেরী হইবে কর্মী-আন্দোলন ততই প্রখর হইবে ইহা সাধারণ কথা।

কর্মীদিগেরও বুঝা উচিত যে দেশের জনসাধারণের শতকরা ৯০ জন ঘোর অভাবগ্রস্ত হইয়া আছে। তাহাদের আরও ভার বৃদ্ধি করিলেই যে সবকিছু পরিষ্কার হইয়া যাইবে ইহা ঠিক নহে। তাহাদের ভার অল্প দিকে কমিলে তবে তাহারা নুতন ভার গ্রহণে সমর্থ হইবে। সুতরাং এখন সমস্ত জাতির নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, সবদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেদের দাবি সাধাবণের নিকট উপস্থিত করা উচিত।

শ্রীমতী সরলা রায়

ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী সরলা রায় ছিন্নশী বংসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-দেশের নারীশিক্ষা প্রসারের অগ্রগণ্য ক্ষতি হইল। দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনায়ক দুর্গামোহন দাশের ইনি জ্যেষ্ঠা কন্যা। দুর্গামোহন বন্ধু আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্কুলই ভারতের সর্বপ্রথম মহিলাদিগের উচ্চ শিক্ষাদানের বিদ্যালয়। দুর্গামোহন তাঁহার কন্যা সরলা, অবলা ও শৈলবালাকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সরলা ও বরিশালের ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী স্কুলের পাঠে এমন কৃতিত্ব দর্শাইতে থাকেন যে, কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিলে ইঁহারা সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। তখন ইংলণ্ডেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারী জাতির জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। কিন্তু দ্বারকানাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি এমনই আন্দোলন আরম্ভ করিলেন যে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্যতা এই দুই জন নারীর আছে কিনা তাহা একটি বিশেষ পরীক্ষায় ধার্য হইলে ইঁহাদিগকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে। সরলা ও কাদম্বিনী এই পূর্ব পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়াতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হয়। সরলা সেই হিসাবে নারীর উচ্চ শিক্ষার পথপ্রদর্শিকা এবং সেজন্ম ভারতের নারীসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পূর্বে সরলার বিবাহ ডাক্তার পি. কে. রায়ের সহিত সম্পন্ন হওয়াতে সরলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। সরলা কিন্তু নিশ্চিন্ত রহিলেন না। ঢাকায় তিনি একটি নারীশিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় নারী-চালিত প্রথম নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিলেন, সে আজ সত্তর বৎসর পূর্বের কথা। তিনি উত্তরকালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম নারী-সম্পাদিকা হইয়া স্কুলটি পুরুষ-শিক্ষকবর্জিত ও নারীপরিচালিত বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া আর একটি কীর্তি স্থাপন করিলেন। তাহার পর গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজ স্থাপন তাঁহার অত্যন্ত কীর্তি। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রথম মহিলা ‘ফেলো’ নির্বাচিত করিয়া তাঁহার আজীবন শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টাকে স্বীকার করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। যে কয়জন মহিলা আপনাদের সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, নারীগণও সুযোগ ও সুবিধা পাইলে স্নব্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িতে ও সুন্দর ভাবে পরিচালন করিতে পারেন, সরলা তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান কর্মী। তিনি এমন যুগে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন কাজের সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, অবরোধের বাহিরে আসাও মহিলাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল, তবুও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওনাদার

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্ত আমেরিকার নিকট গম প্রার্থনা করা হইয়াছিল। আমেরিকার নিকট চাহিবার অর্থ এই যে ঐ দেশেই সবচেয়ে বেশী খাণ্ড উদ্ভূত আছে, একটু চেষ্টা করিলেই আমেরিকান গবর্নমেন্ট নিজ দেশের চাহী-দের নিকট হইতে গম সংগ্রহ করিয়া উহা আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে ভারতের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নর-নারী-শিশুর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। ইউরোপ এবং এশিয়ার অসংখ্য দেশও আমেরিকার নিকটেই খাণ্ড প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে আমেরিকান গবর্নমেন্ট কাহাকেও খাণ্ড সরবরাহ করিয়াছে, কাহাকেও বা বঞ্চিত করিয়াছে। আমা-দের জন্ত আর গম বেশী জোটে নাই, ভুট্টা প্রভৃতি বাজে জিনিষ দিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ভারতবাসী যে খাণ্ড আমেরিকার নিকট চাহিয়াছিল তাহা ভিক্ষা চায় নাই, নগদ মুণ্যেই উহা আমরা ক্রয় করিতাম। ব্রিটেনের নিকট আমাদের যেমন প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা পাওনা আছে, আমেরিকার নিকটও তেমনি বড় কম টাকা আমাদের পাওনা নাই। গত ১৫ই জুন ওয়াশিংটনে মার্কিন-ভারত দেনা-পাওনা সম্বন্ধে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—১৯৪৫ সালে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৪৫ কোটি টাকার মাল কিনিয়াছে এবং বিনিময়ে আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে ২১ কোটি টাকার পণ্য। তার আগের বৎসর আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৩৪ কোটি টাকার মাল কিনিয়াছে এবং ১৫ কোটি টাকার বেচিয়াছে। এই হিসাব দিয়া আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ লিখিয়াছেন, “১৯৪৬ সালের প্রথম তিন মাসের বাণিজ্যেও এই একই ধরণ চলিয়াছে। তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছে ১৫ কোটি টাকার পণ্য, ভারতবর্ষে গিয়াছে ৮ কোটি। গত কয়েক বৎসরের হিসাবেই দেখা যায় যে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশে ভারতবর্ষ পাওনাদার এবং আমেরিকা দেনাদার। এই হিসাবে উভয় দেশের ভ্রমণকারী-দের ব্যয়, পাওনা টাকার সুদ ও লভ্যাংশ প্রভৃতি ধরা হয় নাই, হিসাব করিলে উহাতেও ভারতের পাওনাই হয়ত বেশী হইবে।”

আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে কি কি জিনিষ আসে তাহার কতক নমুনা দেখিলে আমেরিকার সহিত আমাদের বাণিজ্যের প্রকৃতি বুঝা যাইবে। ১৯৪৫ সালে নগদ টাকায় আমেরিকা হইতে নিম্নলিখিত তালিকায় উল্লিখিত জিনিষ ভারতে আমদানী হইয়াছে :

সিগারেট	২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা
কারখানার যন্ত্রপাতি	২ ” ২২ ” ”
ঔষধ	১ ” ৬৮ ” ”
ইম্পাত	৯৩ ” ”
মদ	৮৪ ” ”

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

৭৫ ” ”

কাপড়

৬০ ” ”

তালিকা দীর্ঘ করা নিরর্থক। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে সমস্ত জিনিষ আমেরিকা হইতে আসে তাহার অধিকাংশ অনায়াসে আমাদের দেশেই তৈরি হইতে পারে। যন্ত্রপাতির মধ্যে অবশ্য কিছু নকমারি আছে। যুদ্ধের আগে আমেরিকা আমাদের দেশে হিসাবের যন্ত্র অর্থাৎ “ক্যালকুলেটিং মেশিন” চালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ গবর্নমেন্টকে রিপোর্ট দিয়াছিল যে ভারতবর্ষের কেরানীরা মুখে মুখে হিসাবে এত দক্ষ যে সে দেশে এই যন্ত্র বিক্রয়ের আশা করা বুঝা।

ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা যে সব জিনিষ ক্রয় করে তাহার নমুনা দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহার অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে না লইয়া তাহাদের গতান্তর নাই। ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যে সব জিনিষ গিয়াছে তাহার কতকগুলির নাম এই :

চট ও থলে	১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা
চা	৪ ” ৭৭ ” ”
কেশিউ বাদাম	৪ ” ৭১ ” ”
পশম	২ ” ০৭ ” ”
কাঁচা চামড়া	১ ” ১৫ ” ”
ট্যান-করা চামড়া	১ ” ৮০ ” ”
তুলা	১ ” ৯৫ ” ”
গালা	২ ” ১৬ ” ”

ইহা ছাড়া অজ ও ম্যান্মানিজ টাকার হিসাবে কম হইলেও ভারতবর্ষ হইতে না লইয়া আমেরিকার উপায় নাই।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে এইরূপ বাণিজ্য চলিলেও উহাতে ভারতবর্ষের যতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ভারতবর্ষের সমস্ত ডলার হস্তগত করিয়াও নিশ্চিন্ত হয় নাই, ব্রিটেনের অসহমোদন ভিন্ন ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে মালের দাম-আদান-প্রদানের কোন উপায় ছিল না। ইংরেজের এই দালালীতে আমাদের দুই দফা লোকসান হইয়াছে। প্রথমত ইংরেজের মারফৎ আমেরিকান মাল আমাদের দ্বিগুণ তিনগুণ দামে কিনিতে হইয়াছে, ইংরেজ বণিকেরা মোটা দালালী কাঁকতালে রোজগার করিয়াছে। আমেরিকা ইহাতে বেশী আপত্তি করে নাই এই জন্ত যে সে সাধারণ বাজার দরই আদায় করিয়াছে, ইংরেজের পকেট ভরিতে গিয়া আমরাই ব্ল্যাকমার্কেটের দর দিয়া মরিয়াছি। আমাদের নিকট হইতে মাল কিনিবার সময় আমেরিকা কিন্তু যথেষ্ট সেয়ানা ছিল, এখানে সে এক বিন্দুও বোকামি করে নাই। চট, চামড়া, গালা, অজ, ম্যান্মানিজ প্রভৃতির দাম দাবাইয়া রাখিতে ভারত-সরকারকে বাধ্য করা হইয়াছে। আমেরিকান গবর্নমেন্টের স্বার্থ রক্ষার জন্ত ভারত-সরকার এই সব জিনিষের দাম এমনভাবে বাধিয়াছেন যার ঘোল আনা লাভ তাহারাই পাইয়াছে, ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

যুদ্ধের মধ্যে ঋণ ও ইজারা চুক্তির নামে ভারতবর্ষের ঘাড়ে বহু অনাবশ্যক খরচ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্মানী ও জাপানের সহিত যুদ্ধ ইংরেজ আমেরিকার যুদ্ধ, ভারতবর্ষ উহা বাধাইতেও যায় নাই, স্বেচ্ছায় উহাতে যোগদানও করে নাই। জোর করিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইয়া তাহাকে এশিয়ার যুদ্ধের ঝাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং ভারত-রক্ষার নামে অনাবশ্যক ব্যয়ের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এবং যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলে এই লাঞ্ছনা আমাদের সহিতে হইত না। আধা পরাধীন মিশরও যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা পাইয়াছে আমরা তাহাও পাই নাই। জাপানের সহিত আমেরিকার নিজস্ব যুদ্ধে লড়াই করিবার জন্ত আমেরিকা এ দেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়াছে, তাহাদের জন্ত অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাক প্রভৃতি সবই পাঠাইয়াছে, পাঠায় নাই শুধু খাবার। ইহাদের এবং ইংরেজ সৈন্যদের হাতীর খোরাক জোগাইতে গিয়া বাংলার ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্ত উদ্ভূত ফসল ইহাদের প্রয়োজনে নিঃশেষিত হওয়ায় আবার ভারতবাসীকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। মাছ মাংস ডিম তরিতরকারি প্রভৃতি ইহাদিগকে জোগাইতে গিয়া ভারতবাসী পুষ্টিহীন ঋণে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা অগ্নিশুলে ক্রয় করিয়াছে, রেল ইহাদের জন্ত স্থান করিতে গিয়া ভারতীয় যাত্রীরা গাড়ীর পাদানিতে চড়িয়া পুরা টিকিটে ভ্রমণ করিয়াছে, ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র চলাচলের জন্ত মালগাড়ী সরবরাহ করিয়া ভারতবাসী কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যে বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাদের বস্ত্রাভাব মিটাইতে গিয়া ভারতীয় নারীদের পর্যন্ত বিবস্ত্র থাকিতে হইয়াছে। ঋণ ও ইজারা চুক্তির লেন-দেনের হিসাবের উপর ভারত-বাসীর কোন হাত ছিল না, কাজেই সেদিক দিয়া আমাদের নিকট আমেরিকার মোটা টাকা পাওনা হইলেও সাধারণ বাণিজ্যের হিসাবে তাহা ধর্তব্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পাওনা-দারই আছে, থাকিবেও। দেনদার আমেরিকা ভারতবর্ষকে জাপানী যুদ্ধের ঝাঁটি করিয়া অর্থে ও অজ্ঞান্য বিষয়ে আমাদের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ নিবারণে প্রয়োজনীয় গম আমাদের নিকট অন্তত নগদ মূল্যেও বিক্রয় করিতে রাজী হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। আমেরিকা সে বিশ্বাস রক্ষা করে নাই।

পাটচাষীর বিপদ

পাটের সর্বোচ্চ মূল্য যে আইনের বলে বাধিয়া রাখা হইয়াছিল আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। এই দর যে ভাবে বাধা হইয়াছিল তাহাতে যোল আনা লাভ হইয়াছে ইংরেজ মিল-মালিক এবং মারোয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি

দালালদের। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে চাষীরা। পাটের সর্বোচ্চ দর বাধা থাকায় মফঃস্বলের চাষীরা মগ-করা ৭ টাকার বেশী দামে পাট বেচিতে পারে নাই। ইহাতে তাহাদের খরচ পোষানই দায় হইয়াছে, লাভ হওয়া তো দূরের কথা। তথাপি প্রতি বৎসরই চাষীরা আগামী বৎসর দাম পাইবে এই আশায় পাট বুনিয়াদে এবং প্রতি বৎসরই নিরাশ হইয়াছে। এবার পাট চাষের জন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির এক-চতুর্থাংশে পাট চাষ হয় নাই দেখিয়া মনে হইতেছে এত দিনে হয়ত নিরক্ষর চাষীদের মনেও স্ফূর্তির উদয় হইতেছে।

চাষীর লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু মিল-মালিক বা দালাল-দের প্রচুর লাভ হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় এই যুদ্ধেও চটকল-গুলি রীতিমত টাকশালে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে চটকলসমূহের লাভের পরিমাণ বুঝা যাইবে :

প্রদত্ত শতকরা লভ্যাংশ					
চটকলের নাম	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
হাওড়া	৭৫	৭০	৭০	৭০	৭০
ফ্রেগ	১০	২০	৩০	৫০	৫০
এলায়েন্স	৪০	৪০	৪০	৬০	৫৫
বঙ্গবজ	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৩০
গৌরীপুর	৯৫	১১০	৭০	৬০	৫০
খড়দহ	৪৫	৬০	৬০	৬০	৬০

১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ এই পাঁচ বৎসরে ইহার মোট মূল্যবনের প্রতি একশত টাকায় নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে :

হাওড়া	৩৫৫ টাকা
ফ্রেগ	১৬০ "
এলায়েন্স	২৩৫ "
বঙ্গবজ	২২০ "
গৌরীপুর	৩৮৫ "
খড়দহ	২৮৫ "

এই সব মিলের শেয়ারের আদল দামের সহিত ১৯৪১ সালের ও এবারকার দর তুলনা করিলেই চটকলের শেয়ার লইয়া কি ভাবে ফাটকাবাজি চলিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে :

চটকল	শেয়ারের	১৯৪১-এর	১৯৪৫-এর
	আসল	শেয়ারের	১৪ই জুনের
	দাম	দাম	দাম
হাওড়া	১০৭	৪৬৮০	১৩৬৮০
ফ্রেগ	৮০	১৪০	১৬৮০
এলায়েন্স	১০০৭	২৩০৭	১১৯৫৭
গৌরীপুর	১০০৭	৬৩৮৭	১৩০৩৭
বঙ্গবজ	১০০৭	২৩২৭	৭৬০৭
খড়দহ	১০০৭	৩৩৩৭	১০২০৭

এই তালিকাটি কিন্তু সম্পূর্ণ লাভের পরিচয় নহে। লভ্যাংশ

বিতরণের আগে রিজার্ভ ফাণ্ড এবং ডেপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে বহু টাকা সরাইয়া রাখা হয়। ইহাদের সকলের উপরে আছে কামধেনু ম্যানেজিং এজেন্টদের কমিশন। এই ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভায় কারখানার লাভ শোষণের ফন্দী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই বস্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের অপূর্ব সৃষ্টি, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে ম্যানেজিং এজেন্সি বরদাস্ত করা হয় না। সহস্র রকমে ইহার কারখানা হইতে লাভ আদায় করে। আপিস খরচা বাবদ একটা মোটা টাকা প্রত্যেক কারখানার নিকট হইতে আদায় হয়, তারপর প্রকাণ্ডে ম্যানেজিং এজেন্সি কমিশন তো আছেই। মাল কিনিতে কমিশন, মাল বেচিতে কমিশন, যন্ত্রপাতি কিনিতে কমিশন প্রভৃতি কত রকমের উপরি যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। এক ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে নানা প্রকার কারখানা থাকে, ইহাদের একের মাল অপরকে দিয়া ক্রয় করাইয়া সেদিক দিয়াও যথেষ্ট কমিশন ও লাভ আদায় হয়। ভাল চালু কোম্পানীর টাকা নতুন কোম্পানীতে লগ্নী করা ম্যানেজিং এজেন্টদের মধ্যে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইন সংশোধনে তাহা ~~হ্রাস~~ হইয়াছে। চটকলগুলির ম্যানেজিং এজেন্টরা আইন-সম্মত কমিশন ছাড়া কত টাকা প্রতি মিল হইতে উপরি রোজগার করেন তাহার হিসাব কোন দিন পাওয়া যায় নাই। বাংলা-সরকার গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দুই বার দুইটি পাট তদন্ত কমিটি বসাইয়াছিলেন, দুই কমিটিই চটকলের উৎপাদন ব্যয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, দুই বারই চটকল-মালিকেরা এই হিসাব দাখিল করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হিসাব পাইলে দেখা যাইত পাটের দর দ্বিগুণ বাড়াইলেও অনায়াসে চটকল-ওয়ালারা ভাষ্য লাভ করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারে। ম্যানেজিং এজেন্সির উপরও আর এক বস্তু আছে সিক্রেট-রিজার্ভ। চটকলের যখন খুব লাভ হয় তখন অনেক টাকা এই রিজার্ভে ফেলা হয়, এটা ব্যালান্সীটে দেখান হয় না। হিসাবটা শুধু পরিচালকদেরই জানা থাকে। এই টাকাটা পরে স্বেযোগ মত কিসে খরচ হইল অংশীদারদের বা বাহিরের লোকের তাহা জাদিবার উপায় থাকে না। এই বস্তুটিও এদেশে ইংরেজ বণিকদের আমদানী জিনিষ।

পাটের উৎপাদন দর ১৮ টাকার কাছাকাছি বাঁধিয়া রাখার পক্ষে মিল-মালিকেরদের যুক্তি এই যে তাহা না করিলে পাট লইয়া ফার্টিকাবাজি চলিবে, পাটের দাম বেশী বাড়িলে পৃথিবীর অনেক দেশ চট ও থলের বদলে অন্য জিনিষ ব্যবহার করিবে ইহাতে পাটের চাহিদা কমিয়া চাষীর ক্ষতি হইবে। ইহাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে চাষীর হাতে বেশী টাকা গেলে ইনফ্লেশন হইয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটবে। মিল-মালিকদের তিনটি যুক্তিই বিচারসহ নহে। ফার্টিকাবাজি গবর্নেন্ট আলাদা আইন করিয়া বন্ধ করিতে

পারেন। মিলমালিক ও দালালদের দলের সংখ্যা মোটের উপর তিন শতের মত হইবে। ইহারাত নিজেরা চেষ্টা করিলে সম্ভব হইয়া ফার্টিকাবাজি বন্ধ করিতে পারেন। নিজেরা এই চেষ্টা না করিয়া ইহার গবর্নেন্টকে দিয়া এমন ভাবে কাজটা করাইয়া লইতে চাহিতেছেন যাহার দ্বারা নিজেদেরই সম্পূর্ণ লাভ হয়। চাষীর ক্ষতি ধর্তব্যের মধ্যে নহে। দ্বিতীয় যুক্তি অল্পকালের ভয় প্রদর্শন। ইহাও নিরর্থক। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রেজিলে পাট গজাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। যে পাট সেখানে উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে তাহার দ্বারা বড়জোর একটি মিল চলিতে পারে। ব্রেজিলের সকল সম্ভব অসম্ভব স্থানে পাট বুনবার চেষ্টা হইয়া শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় ঠেকিয়াছে। আমেরিকা কাপড়ের থলে দিয়া চটের থলের কাজ চালাইতে গিয়া দেখিয়াছে উহাতে খরচ অসম্ভব বেশী পড়ে।

জার্মানী এবং আরও কোন কোন দেশ কাগজের থলি চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছে। জার্মানী কানাডা প্রভৃতি কোন কোন দেশ ফসল আমদানী রপ্তানীতে সরাসরি লরী এবং সাকসন পাম্প ব্যবহার করিয়া চটের থলে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। কৃষকের বাড়ী হইতে লরীতে মালবোঝাই করিয়া রেল-স্টেশনে আনিয়া সাকসন পাম্পের সাহায্যে মালগাড়ীতে বোঝাই করা যায়, মালগাড়ী হইতে জাহাজে বা লরীতেও এই ভাবে তোলা যায়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সকল জিনিষের বেলায় এই ফন্দী খাটিল না। গম চালান দেওয়ার এই পন্থা কার্যকরী হইল বটে, কিন্তু ব্যর্থ হইল চিনির বেলায়। শেষ পর্যন্ত প্রভুদের বাংলার পাটচাষীরই শরণাপন্ন হইতে হইল।

যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা চট ও থলে ভারতবর্ষ হইতে সস্তায় কিনিয়া ব্যবসা করিয়াছে, ন্যায্য পাওনায় বঞ্চিত হইয়াছে বাংলার পাটচাষী। পাটকে যুদ্ধের উপকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমেরিকা উহার দ্রুত বাঁধিয়াছে, ব্রিটিশ গবর্নেন্টের সহায়তায় ভারত-সরকারকে দিয়া পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধাইয়া লইয়াছে, নিয়ন্ত্রিত দামে যুদ্ধের নামে থলে কিনিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার চিনি ব্যবসায়ীদের বেচিয়া লাভ করিয়াছে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ভারত-সরকার মিলিয়া পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া কেমন করিয়া চাষীর ক্ষতি করিয়াছেন এবং বাংলার মন্ত্রীরা ইংরেজদের ভোট হারাইবার ভয়ে কেমন উহাতে সায় দিয়া গিয়াছেন তাহার বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। এই ব্যাপারে একটা কথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, পাটের অল্পকাল বাহির করিয়া পাটচাষীকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা রথ্যা চলনা ভিন্ন আর কিছু নয়।

সর্বশেষে ইনফ্লেশনের ভয়। যুদ্ধের মধ্যে দেশের নোট প্রচলনের পরিমাণ ছয় গুণ বাড়িয়াছে এবং এই টাকার অধিকাংশই অল্প লোকের হাতে জমা হইয়াছে। ফলে

দেশের এক শ্রেণীর লোক অপরিমিত অর্থের অধিকারী হইয়া বিলাস-ব্যসনে টাকা খরচের সুযোগ পাইয়াছে অথচ দেশের অধিকাংশ লোকই অর্থের অভাবে অনশনে মরিয়াছে অথবা অর্ধাশনে কাল কাটাইয়াছে। কর্মের অভাবই এই অর্ধাভাবের সর্বপ্রধান কারণ। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের হাতে টাকা গেলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির যতটা সম্ভাবনা থাকে, অল্প লোকের হাতে টাকা আটকাইয়া গেলে তাহা হয় না। পাট বিক্রয়ের টাকা চাষীর হাতে গেলে উহা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সকলের হাতে গিয়া পৌঁছিত, ফলে দেশে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুরাহা হইত। এ দিক দিয়াও চট কলওয়ালাদের মুক্তি বিচারসহ নহে।

বাংলা-সরকার পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে গত ২৯শে জুন তারিখে এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উহাতে চটকল সমিতি এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপর অনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পাটচাষীর স্বার্থ লইয়া ঠাহারা লড়াই করিয়াছেন ঠাহারা আহুত হন নাই। বাংলা-সরকার কি করিবেন ইহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। পাট-চাষীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে ইংরেজদের ২৫টি ভোট হারাইবার ভয় ঠাহাদের আছে। ইংরেজদের ভোট বিরুদ্ধে গেলে মন্ত্রিত্ব টিকিবে না।

সর ফ্রেডারিক বারোজ ও ডিমোক্রাসি

হুভিস্ক রোধ করিবার জন্ত সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন সর্বতোভাবে সহায়ক হইবে উডহেড কমিশনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া নূতন গবর্নর সর ফ্রেডারিক বারোজ কেন সে চেষ্টা না করিয়া একটিমাত্র দল বিশেষের হাতে শাসনভার হস্ত করিয়া নিশ্চিত রহিয়াছেন এই প্রশ্ন স্বাভাবিক উঠিতে পারে। গবর্নরের পক্ষে এই মুক্তি হইতে পারে যে তিনি গণতন্ত্রসম্বৃত উপায়ে বৃহত্তম দলকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার দিয়াছেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলের উপদেশ মানিয়া চলাই কত ব্যবোধ করিতেছেন। বর্তমান লীগ মন্ত্রিদলের পরামর্শ মানিয়া চলিলে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার মর্যাদা রক্ষা করা হয় কি না এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস দল এবং ইংরেজ দলের নেতা নির্বাচন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই গবর্নর বারোজ সর্ববৃহৎ দলের নেতা লীগ-নায়ক মিঃ সুরাবর্দীকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য আহ্বান করেন। দৃষ্ট হইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসম্মত হইলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কার্য গণতন্ত্রের মূলনীতিবিরুদ্ধ। কারণ ইহা দ্বারা দেশের সমগ্র স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অযোগ্যতার জন্ত সুপরিচিত একটি সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসম্মল দলবিশেষের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর অনির্দিষ্ট কাল ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান স্থগিত রাখিয়া গবর্নর এই দুর্নীতি দমনে অসমর্থ বা

অনিচ্ছুক দলটিকে চাকুরি ও কনট্রাক্ট বিলি করিয়া চোরা-কারবারীদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিয়াছেন। গবর্নরের পক্ষে মুক্তি এই হইতে পারে যে মন্ত্রীদের পরামর্শ ভিন্ন তিনি পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন না, পরিষদের কার্যপ্রণালী মঞ্জুরা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই ঠাহারা পরিষদের বৈঠক বসাইবার তারিখ নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই কুযুক্তির কাকি বাংলা দেশেই ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে। গত নির্বাচনের পর দুই মাসের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহ প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন, শুধু বাংলায় ইহার ব্যতিক্রম কেন? যেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন প্রণালী সর্বদেই দেশবাসীর মনে সন্দেহ রহিয়াছে সেখানে কি অবিলম্বে মন্ত্রীদের পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাই গণতান্ত্রিক নীতি সম্মত হইত?

গবর্নর বারোজ কি মনে করেন যে মন্ত্রীদের সুপারিশে টেঁড়া সহি দেওয়াই নিয়মতান্ত্রিক গবর্নরের কাজ? বর্তমানে দেশে যে শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহা দৃষ্ট হইলে গণতান্ত্রিক হইলেও মূলত তাহা নহে। পরিষদের গঠনপ্রণালী গণতান্ত্রিক রীতি ও নীতি উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী। খাঁটি গণতন্ত্র কখনও শ্রেণী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রস্রয় দেয় না। জনসাধারণের ভোটে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধি নির্বাচনই প্রকৃত গণতন্ত্র। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আসন বন্টনে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীস্বার্থ সম্পন্ন সদস্য নির্বাচনের যে অপূর্ব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। সাম্প্রদায়িক দলবিশেষের হাতে এই শাসনতন্ত্র অল্পসারে শাসনক্ষমতা হস্ত হইলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণের কি ভয়াবহ লাঞ্ছনা ঘটতে পারে, গত হুভিস্কে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বর্তমান ভারতশাসন আইনের রক্তসমূহের সুযোগ লইয়া কোন স্বার্থপর গণতন্ত্র-বিরোধী দল যাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারে গবর্নর ইহাই করিবেন দেশবাসী এই আশাই জায়সম্মতভাবে করিয়া থাকে।

সবচেয়ে বড় কথা পরিষদের ইংরেজ ভোট। বিদেশীদের ২৫টি ভোটের উপর লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে গতবারও নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইয়াছে, এবারও তাহাই ঘটতেছে। ইহার জন্ত লীগমন্ত্রিগণকে ইংরেজ বণিকদের নিকট দেশের স্বার্থ কি ভাবে বিক্রয় করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ শাসন করিবেন ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি, বিদেশী বণিকের প্রিয়পাত্র একটি বিশেষ দল বিদেশীর ভোটে আত্মরক্ষা করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিলে তাহা আর যাহাই হউক, গণতন্ত্র হয় না। গবর্নর বারোজ প্রকৃত গণতন্ত্রানুসারী হইলে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অব্যবহিত পরে

মন্ত্রীদেব ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিয়া ইংরেজ ভোট ছাড়া ইহার মেজরিটি পায় কি না তাহা দেখিতে চাহিতেন। আমেরিকা ব্রিটেনের সর্বত্র বাধা রাখিয়া টাকা ধার দিয়াছে, এই ঋণদানের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক দশমাংশ আসন দাবি করিয়া সেখানে ৬০ জন আমেরিকান বসাইয়া তাঁহাদের জোরে চার্চিল দলকে মন্ত্রীত্ব বহাল রাখিলে গবর্নর বারোজ কি তাহাকেও ডিমোক্রাসী বলিয়া অভিহিত করিতেন?

কর্তব্য কার্য সম্পাদনে পুলিশের অবহেলা

গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে পুলিশের যে অবনতি হইয়াছে অল্প কোথাও তাহার তুলনা মিলিবে কি না সন্দেহ। কর্তব্য কার্যে অবহেলা, নিরীহদের উপর অত্যাচার, অযোগ্য প্রাপ্তি মাত্র ঘুম আদায়, দরিদ্রের স্বার্থের প্রতি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য় বাংলার পুলিশের মজ্জাগত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার কোন প্রতিকার নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ সাধারণ গুণ্ডার হাঙ্গ দলবদ্ধভাবে গ্রামে হানা দিয়া গ্রামবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহারও কোন প্রতিকার বা যথাযোগ্য তদন্ত হয় নাই। সারাটা

দেশ যেন অরাজক হইয়া উঠিয়াছে। ফরিদপুর জেলার চিকন্দী মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী ত্রিযুক্ত নিখিলরঞ্জন গুহ রায় পুলিশ কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলার যে দৃষ্টান্ত ১৮ই আষাঢ় তারিখের দৈনিক “ভারতে” প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না আমরা জানি না। পুলিশের অধঃপতন যে কতখানি হইয়াছে আলোচ্য পত্রটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পত্রখানি এইরূপ :

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গৌসাইরহাট থানার অধীন ইদিলপুর পরগণাতে চুরি, ডাকাতি, মেয়েচুরি, খুন ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন সরকারী প্রতিকার না হওয়ায় দেশবাসীর মান, ইজ্জত, ধনপ্রাণ সমস্তই আজ বিপন্ন। উদাহরণ-স্বরূপ একটা জোড়া খুন সম্বন্ধে জানান হইল। সাত মাস পূর্বে দাসের-জঙ্গল গ্রামে (ইদিলপুর) বিগত ২৫শে নবেম্বর রাত্রি অসু-মান সাড়ে ৮ ঘটিকার মধ্যে বসন্ত কাহালী নামক জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে এক বৃদ্ধা মহিলা ও এক তরুণীকে কে বা কাহারো অতি বীভৎস রকমে হত্যা করে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই খুনের কোন হদিশ মিলে নাই। যাহাদিগকে সন্দেহ-ক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ এই যে, গৌসাইরহাট থানার পুলিশ, পালং সার্কেলের সার্কেল ইনস্পেক্টর কিম্বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মচারীগণ কোন অজ্ঞাত কারণে এই খুনের যথোপযুক্ত তদন্ত করেন নাই। এই হত্যা সম্পর্কে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাগণ নিম্ন হইতে উচ্চ-

তম কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তভাবে আবেদন করিয়াছেন, জনগণ সাধারণ সভা ডাকিয়া এই ভয়াবহ ঘটনার তদন্ত ও প্রতিকার প্রার্থনায় নিম্ন হইতে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত বাংলা গবর্নেন্ট ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট বহু টেলিগ্রাম ও আবেদন করা হইয়াছে। দেশবাসীর অভিযোগ এই যে, দাসের-জঙ্গল গ্রাম হইতে (ঘটনাস্থল) গৌসাইরহাট থানা দুই মাইলের বেশী হইবে না, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এই হত্যার সংবাদ থানায় দেওয়া সত্ত্বেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পরদিন বেলা অল্পমান ১০ ঘটিকার পরে ঘটনাস্থলে আসিয়া প্রাথমিক রিপোর্টে খুনের সময় রাত্রি ৮-১০টার পরিবর্তে রাত্রি সাড়ে ১১ ঘটিকা লিখিলেন এবং তিনি রাত্রি ৪ ঘটিকাতে ঘটনাস্থলে আসিয়াছেন এই মিথ্যা বর্ণনাতে দস্ত-খত করিতে এজাহারকারী ও অগাছ লোককে তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও বাধ্য করিলেন। উপযুক্ত তদন্তের দ্বারা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা পুলিশ কর্মচারি-গণ করেন নাই। অর্থাৎ মাটিতে হত্যাকারীদের পদ-চিহ্নের ছাপ নেওয়া অথবা হত্যার পরেই যে সকল গ্রাম-বাসী ও প্রতিবেশীগণ ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ কিছুই তাঁহারা করেন নাই। পুলিশ কর্তৃক ধৃত যুবকদ্বয় প্রতিবেশী যে বিধবার গৃহে ছিল ও তথায় যে রক্তমাখা কাপড় পাওয়া গিয়াছিল পুলিশ তাহা লইয়া যায় নাই এবং সন্দেহভাজন স্ত্রীলোক ও পুরুষদের গৃহে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাসী হয় নাই। যাহারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত বা যে লোক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে পারে পুলিশ তাহাদের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসীন্য় দেখাইয়াছে। ইদিলপুর জনহিতৈষী সমিতির পক্ষ হইতে ১০খানা টেলিগ্রাম বাংলা গবর্নেন্টের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা ও তদন্ত প্রহসন অতি রহস্যচ্ছন্ন। দেশবাসীর বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য বহু পূর্বেই বহুলাংশে প্রকাশ পাই-য়াছে কিন্তু তথাপি স্তব্ধকাল ইহা চাপা পড়িয়া আছে।

বাংলা-সরকারের খাতি উপদেষ্টা কমিটি

• বাংলাদেশের জন্ম একটি স্বব্যবস্থিত খাদ্যনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা-সরকার অবিলম্বে বিভিন্ন বণিক সমাজ, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারী ও বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিককে লইয়া একটি খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সংকল্প করিয়াছেন। এই কমিটি খাদ্য সংগ্রহ মজুত এবং বণ্টন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন। হুজিফ নিবারণের উদ্দেশ্যে সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তৎপ্রতি জনসাধারণের সহায়ত্বহুতি ও সহযোগিতা আকর্ষণ এবং চোরাকারবার দমনে সরকারের

সহায়তা করা এই কমিটির কাজ হইবে। কমিটিতে কলিকাতার মেয়র, মিঃ ইম্পাহানী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, পাঁচটি জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, বেঙ্গল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান চেম্বার ও মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্সের একজন করিয়া প্রতিনিধি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের চারি জন করিয়া প্রতিনিধি, তপশীলী সম্প্রদায়, কমিউনিষ্ট দল, হিন্দু মহাসভা, শ্রমিক দল ও ইউরোপীয় দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমিটির চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

এই কমিটি গঠনে বাংলাদেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে তাহা বলা চলে না। বাংলা-সরকারকে পরামর্শ দান ভিন্ন কমিটির আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; প্রদত্ত পরামর্শ মানিয়া চলিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন কি না সে সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহারা বলেন নাই। কমিটির মত মনঃপূত না হইলেই মন্ত্রীরা টুহা বর্জন করিবেন ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না।

হুর্ভিক্ষ নিবারণে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে গত হুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে তাহা উপলব্ধি করিয়াই দেশের লোক উহা গিবি করিয়াছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও এই দাবি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কপট প্রতিশ্রুতি দিয়াই গবর্ণর হার্বার্ট মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগপত্র আদায় করিয়া ইংরেজ দলের ভোটের জোরে লীগকে মন্ত্রীর গদীতে বসাইয়াছিলেন। যে লীগ নায়কেরা সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবিতে মৌলবী ফজলুল হককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, মন্ত্রীর মসনদে আরোহণ করিয়া তাঁহারা উহা পরিহার করেন। ফলে হুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাসের যেটুকু উপায় হইতে পারিত তাহাও সম্ভব হইল না। উডহেড কমিশনও স্বীকার করিয়াছিলেন যে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে হুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা আরও ব্যাপক ও গভীর হইতে পারিত, লীগ নায়কদের বাধা দানের ক্ষমতা তাহা সফল হয় নাই। এবারও আসন্ন হুর্ভিক্ষের মুখে সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দাবি উঠা সত্ত্বেও মিঃ সুরাবর্দী উহা সর্বতোভাবে এড়াইয়া চলিয়াছেন। পরামর্শ দাতা কমিটির যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উহার পক্ষে সরকারের অক্ষমতা ও দুর্নীতি পোষণ দুইটির কোনটিই রোধ করা তো দূরের কথা, হ্রাস করাও সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে চাউলের দর

যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরে বাংলার কোন কোন জেলার চাউলের দর কি ভাবে বাড়িয়াছে “যুগান্তর” তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। যুগান্তর লিখিতেছেন :

১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাদমে চলিতেছে। যুদ্ধের সময় স্বতাবতই জিনিষপত্র হ্রাস হইয়া

থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও আজিকার বাংলায় দ্রব্য-মূল্য যে কোন দিক দিয়াই হ্রাস পায় নাই তাহা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের দর কোথায় কিরূপ ছিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে চাউলের মূল্য কি দাঁড়াইয়াছে নিম্নে তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থা অপেক্ষা বাঙালী আজ অধিকতর শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে।

১৯৪৪—আগষ্ট

	টাকা প্রতি	সের	হটাক
২৪ পরগণা	২	৭	
ফেনী	২	১০	
সিরাজগঞ্জ	২	৭	
মুলীগঞ্জ	২	১৪	
নারায়ণগঞ্জ	২	১২	
ফরিদপুর	২	৮	
জলপাইগুড়ি	৩	১	
হাওড়া	২	৭	
যশোহর	৩	৩	
টাঙ্গাইল	২	১০	
নোয়াখালী	২	১২	

১৯৪৬—জুন

	টাকা প্রতি	সের	হটাক
২৪ পরগণা	১	১১	
ফেনী	১	৮	
সিরাজগঞ্জ	১	১০	
মুলীগঞ্জ	১	৫	
নারায়ণগঞ্জ	১	৮	
ফরিদপুর	১	৫	
জলপাইগুড়ি	২	০	
হাওড়া	১	১৩	
যশোহর	১	১৩	
টাঙ্গাইল	২	৩	
নোয়াখালী	১	২	

শুধু চাউল নয়, জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি দ্রব্য এখনও হ্রাস এবং দুস্প্রাপ্য। যুদ্ধের চাহিদা মিটরাছে, বিদেশী সৈন্যদের অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, মালগাড়ী চলাচল প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, তৎসত্ত্বেও করলা হইতে সুর করিয়া গোলআলু পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিষ এখনও অগ্রিমূল্য হইয়া রহিয়াছে। সরবরাহের ভার বাঁহাদের উপর দেশের

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের দুর্দশার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি যুদ্ধের সময়ও ছিল না, এখনও নাই।

সরকারী অব্যবস্থার জন্য যশোহর জেলার দুর্দশা

সরকারী সরবরাহ ও বণ্টনের অব্যবস্থায় যশোহর জেলার অধিবাসীদের কি দুর্দশা হইয়াছে ‘যুগান্তরে’র নিজস্ব সংবাদদাতা তাহার বিবরণ দিয়াছেন। বাংলা-সরকার কয়েকটি ঘাটতি অঞ্চলকে বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। যশোহর জেলাকে বাড়তি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে আমলাদের দেওয়া ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ঘোষণা করা হইয়াছে। আসলে গবর্নমেন্টের নিকট বর্তমান বৎসরের উৎপন্ন ফসলের কোন হিসাব নাই। কত জমিতে চাষ হইয়াছিল তাহার হিসাব আছে। গত ফসল স্বাভাবিক বৎসরের তায় হইলে ২১,৯৫,২৭৮ মণ ধান উৎপন্ন হইতে পারিত কিন্তু অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগের জন্ত গত ফসলের উৎপাদন ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ধান উৎপন্ন হওয়া তো দূরের কথা ৪৬,২১,৫১৬ মণ কম পড়িয়াছে। সংবাদদাতার হিসাব এইরূপ :

মহকুমা	কষিত জমির পরিমাণ	স্বাভাবিক বৎসর হইলে উৎপন্ন হইত	শতকরা কত ভাগ ফসল নষ্ট হইয়াছে	ফলে মোট ফসলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
সদর	৩১২৭৭৯ একর	৪৮০৯২৪৪ মণ	৪০ ভাগ	২৮৮৫৫৭১.৯ মণ
বনগ্রাম	২৪৯১৫৮ একর	৩১৩৪৭৪১ মণ	৪০ ভাগ	১৮৮০৮৪৪.৬ মণ
গিনাইদহ	২৫২২৬৮ একর	৩৬৮২৪৭৬ মণ	২৫ ভাগ	২৭৬১৮৫.৭ মণ
নড়াইল	১৬৭২৪৩ একর	২৪২৬৪৪ মণ	৬০ ভাগ	৭০৫৭৫.৪ মণ
মাগুড়া	১৭৭৫৮০ একর	২৫২৩৯৭৫ মণ	৫০ ভাগ	১২৬১৯৪৭.৫ মণ
মোট	১১৫৮৯৭৮ একর	১৬৫৭৭৬৩০ মণ		৯৭৬০৪৩৬.৪ মণ

যশোহর জেলার লোকসংখ্যা হইতেছে ১৭,৯৭,৭৯৪ জন এবং গড়ে মাথা প্রতি বৎসরে খাওয়া এবং বীজ ধানের জন্ত ৮ মণ করিয়া ধরিলে বৎসরে যশোহর জেলাবাসীর প্রয়োজন মোট ১,৪৩,৮২,৩৫২ মণ। কিন্তু সঠিক হিসাবে উৎপন্ন হইয়াছে ৯,৭৬,০৪,৩৬৮ মণ ধান। সুতরাং ঘাটতি পড়িয়াছে মোট ৪৬,২১,৫১৬ মণ ধান। গবর্নমেন্ট গত ফসলের ক্ষতির কোনও হিসাব না করিয়া জেলাকে বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করায় যশোহরবাসী এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। গবর্নমেন্টের খাজ সংগ্রহ বিভাগ এ পর্যন্ত ৫১,৬৪২ মণ ধান যশোহর হইতে ক্রয় করিয়াছেন তন্মধ্যে ৩৫,৬৪২ মণ ধান তাঁহারা অল্প জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। আরও কত প্রেরণ করিবেন তাহা জানা যায় নাই।

আমরা বিশ্বস্তভাবে অবগত হইলাম যে, কিছু পরিমাণ

চাউল যশোহরের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট বাহির হইতে যশোহরে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বাদে খুলনা জেলা হইতে চোরাকারবারীদের দ্বারা আনীত প্রায় ১২ হাজার মণ চাউল ধরা হইয়াছে, এবং খাজ সংগ্রহ বিভাগ হইতে ১৬,০০০ মণ ধান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পাইয়াছেন, ফলে তাঁহাদের ঠেকে নাকি ৬৫,০০০ মণ চাউল আছে। যশোহর জেলায় মোট প্রায় চারি মাসের ঘাটতি আছে, ইহার প্রমাণ গত মার্চ মাস হইতেই চাউলের দর জেলায় বাড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতে গবর্নমেন্ট কিছু চাউল কন্ট্রোল দরে ছাড়েন, ফলে সাময়িক ভাবে কিছু দর কমিতে থাকে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে গবর্নমেন্টের চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিটি ঘাটে চাউলের দর ভীষণভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রথমে ১০ টাকা হইতে বাড়িতে বাড়িতে আজ ২০ টাকার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, বর্তমানে গড়ে শতকরা পাঁচ জনের বেশী লোকের ঘরে অতিরিক্ত চাউল নাই; বাকী প্রায় সবাইকে চাউল কিনিতে হইতেছে। নূতন ফসল উঠিতে এখনও আড়াই মাস বাকী, অন্ততঃ গবর্নমেন্টকে বর্তমানে দুই মাসের খাজ লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে। দুই মাসের খাজ হইতেছে ২৩,৯৭,০৫৪ মণ ধান। তাই দেখা যাইতেছে গবর্নমেন্ট ৬৫,০০০ মণ চাউল লইয়া কিছুই করিতে পারিবে না। গবর্নমেন্টের পরিকল্পনা ছিল যে, দাম বাড়িলেই

কিছু চাউল কন্ট্রোল দরে ছাড়া হইবে, ফলে দাম পড়িয়া যাইবে কিন্তু বর্তমানে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্নমেন্টের ভাল ঠেক না থাকার জন্ত চোরা-বাজারকে বাধা দিতে পারিতেছেন না। যশোহরে এবং বনগ্রামে তাহারা চোরাবাজারে চাউল ১৭ টাকা হইতে ১৯ টাকায় বিক্রয় হইলে বাধা দিবেন না ঠিক করিয়াছেন। আজ বহু গ্রামে গরীব ক্ষেতমজুর, তন্তবায়, মৎস্যজীবী, কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অনশন শুরু হইয়া গিয়াছে।

খাতকদের দুরবস্থা

কৃষকেরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়াও কিভাবে মহাজনের বাড়ী ঋদ দিয়াও বিপদগ্রস্ত হইতেছে তাহার একটি নিদর্শন “নবযুগে” ২৬শে আশাঢ় তারিখে

সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত লেবুতলা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত মৌলবী কেরামত আলি নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিয়াছেন :

“ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার বহু দরিদ্র কৃষক প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে নারায়ণগঞ্জ সেন্দ্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা এককালীন ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া প্রতি বৎসরই কিছু কিছু টাকা ওয়াশীল দিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় তাহারা ঋণ-শালিসী বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উক্ত ঋণ আদায় ও মীমাংসার জন্ত ‘মনোহরদী সেন্দ্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্পেশাল সালিশী বোর্ড’ নামে এক বোর্ড বসিলে অনেকে সালিশী বোর্ডের নিকট না গিয়া জমি বন্ধক দিয়া বা জমি বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে একসঙ্গে হাল সনের সুদ সহ আসল ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। ১৩৫০ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কালে দরিদ্র জনসাধারণ বকেয়া সুদ পরিশোধ করিতে পারে নাই। এবারও লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ বিশেষ অল্পগ্রহ করিয়া বকেয়া সুদ সম্পূর্ণ রেহাই না দিলে হতভাগ্য খাতকগণের মুক্তির কোনই উপায় নাই। অতএব যে সকল খাতক এ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে সুদসহ আসল ঋণের দ্বিগুণ পরিশোধ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদিগকে উক্ত ঋণের সকল দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ত এবং সেন্দ্রাল ব্যাঙ্ক কোন অবস্থাতেই গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ও খাতকগণের নিকট হইতে যাহাতে সুদসহ আসল ঋণের দ্বিগুণের অধিক দাবি করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট অহরোধ জানাইতেছি।”

মহাজনী আইন অনুসারে মহাজনেরা সুদে আসলে ঋণ দেওয়া টাকার দ্বিগুণের বেশী আদায় করিতে পারে না। ব্যাঙ্কগুলি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে এই স্বযোগে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পর্যন্ত আসলের চেয়ে বেশী সুদ আদায় করিতেছে ইহা সমবায় ঋণদান নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

গ্রামাঞ্চলে ঘুষের জাল

লীগ মন্ত্রিত্ব ও সিভিলিয়ানী রাজত্বের দৌলতে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুষের জাল বিস্তৃত হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদের পক্ষে উহা অতি ভীষণ অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিভেটিভ অফিসার, পেট্রোল অফিসার, ছাগল অফিসার, মুরগী অফিসার প্রভৃতি সহস্রবিধ ‘অফিসার’ লীগের দৌলতে সৃষ্টি হইয়া দলের পুষ্টিসাধন চলিতেছে এবং পুলিশের সহিত যোগাযোগে ইহাদের অত্যাচারে গ্রামের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নিরীহ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। খানাতল্লাসীর নামে হয়রানির ভয় দেখাইয়া ঘুষ আদায়ই ইহাদের প্রধান কাম্য। শুধু পুলিশ নয়, রেল স্টেশন ও ঈমার ঘাটের কুলি, রেলের টিকিট কালেক্টার প্রভৃতির সহিতও ইহাদের দস্তুর মত যোগাযোগ আছে। ট্রেন হইতে মাল নামাইয়া

দুই টাকা মজুরি ইাকিয়া কুলি মোট মাধ্যম তোলে, টিকিট কালেক্টারের নিকটবর্তী হইলেই কর্তব্যপারায়ণ টিকিট কালেক্টার তৎক্ষণাৎ মোট নামাইতে হুকুম দেন, কর্তব্যপারায়ণ প্রিভেটিভ অফিসার, পেট্রোল অফিসার প্রভৃতি বর্ষার বারিবর্ষণের ছায় প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত হন, ও দিকে ট্রেন বা ঈমার ছাড়ে ছাড়ে। যাত্রীর পক্ষে ইহাদের প্রত্যেককে তুষ্ট করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

রাজশাহী জেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ আলি মোল্লা নামক একজন গ্রাম্য মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাম্য সরলতাপূর্ণ তাঁহার পত্রখানি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

রাজশাহী জেলার আতাই স্টেশনের নিকট আতাই নদীতে একজন পেট্রোল অফিসার আছেন। তিনি তিনজন ওয়াচম্যান ও তিনজন মাঝি লইয়া একটি বোটে অবস্থান করেন। অফিসার মহাশয় স্বয়ং প্রায়ই বোটে থাকেন না; সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ওয়াচম্যান-গুলিই পেট্রোল অফিসাররূপে অর্ডার জারি করেন। কোন্ নৌকায় কি আছে, কোন্ নৌকায় রেজিষ্ট্রেশনের মাল থাকা সম্ভবপর, কোন্ নৌকা উজানী বা ভাটালী ইত্যাদি কিছুই বিচার না করিয়া সমস্ত নৌকা ঘাটে ভিড়ানর অর্ডার জারি করেন, এবং যে নৌকার দিকে একবার দৃষ্টি মেলিয়া চাহিলেই সমস্তই চোখে পড়ে এমন নৌকাও আটকাইয়া রাখা হয় এবং পাটাতনের উপর পাকা কাঁঠাল বোঝাই নৌকাগুলি আটকাইয়া রাখা হয় এবং কাঁঠাল ডাঙায় নামানোর অর্ডার দেন। অথচ মুক্ত দিবালোকে সমস্ত দেখা যায় যে, অপরাধমূলক কোন মাল নৌকায় প্রায় নাই, অবশ্য কাঁঠালের ভিতরের সম্বন্ধে জানা নাই। নোয়াখালি, বরিশাল হইতে উজানী প্রকাণ্ড নারিকেলের নৌকার সমস্ত নারিকেল নামাইতে অর্ডার করেন। ডেবে দেখুন, এক একটি নারিকেলের নৌকায় ৮০।৯০ হাজার নারিকেল থাকে তাহা ডাঙায় নামান কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? মটকী বোঝাই গুড় নৌকা দিয়া যাইতেছে অথচ মটকীর দানা গুড় মাটিতে ঢালিয়া মটকী সার্চ করিবেন। এইরূপ শত অত্যাচারিত বেপারীগণ নিরুপায় হইয়া, আমি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হেতু আমার নিকটে আসিয়া নালিশ জানায়। আমি নিঃসন্দেহমূলক নৌকাগুলি সার্চ না করিতে বহুবার অহরোধ করিয়াছি; কিন্তু কর্পাপাত করেন নাই।

প্রদীপিত লোকগণের ও বেপারীদের দ্বারা জ্বালাতন হইয়া আমি বাংলা-সরকারের নিকট ইহার বিহিত ব্যবস্থার কামনা করি। দ্রষ্টব্য থাকে, যে ব্যাপারী বাম হস্তের ব্যবহারের সুদক্ষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাহার নৌকা আটকাইয়া রাখা বা মাল নামান হয় না।

শাহজাদা দারাশুকোর জীবন-কাহিনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতৃবিয়োগ এবং বিবাহ

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ হইতে সম্রাট শাহজাহান বিদ্রোহী খান-জাহান লোদীকে দমন এবং দাক্ষিণাত্যবিজয় অভিযান পরিচালনা করিবার জন্ত হুবা খান্দেমেশের রাজধানী বুরহানপুর শহরে বৎসরাধিক কাল বিজয়-স্কন্দাবার স্থাপন করিয়া আছেন; সাম্রাজ্যলক্ষ্মীস্বরূপা মমতাজ দারা জাহানারা ইত্যাদি পুত্রকন্যাগণ সহ আগ্রা হইতে তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। শাহজাহানের সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য তখন মধ্যদিনে রেখায় পৌছিয়াছে, মন তাঁহার আনন্দে ভরপুর, কোথাও দুশ্চিন্তার কালমেঘ নাই। বিজয়শ্রী দিল্লীধরের রাজন্যপ্রভাকে দ্বিগুণ উদ্ভাসিত করিয়াছে। বিদ্রোহী খান-জাহান নিহত না হইলেও জালবন্ধ, নিজাম-শাহী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত, বিজাপুর-গোলকণ্ডা মোগল বাহিনীর প্রতাপে কম্পমান। বুরহান-পুরের শাহী মহলে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য-জয়ের আশু সম্ভাবনায় উৎফুল্ল, মমতাজমহল প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দারা ও শুজার স্বথনীড় রচনার স্বপ্নে বিভোর। পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্ত মমতাজের বাগ্রতা দেখিয়া শাহানুশাহ তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান পরবেজের কন্যার সহিত শাহজাদা দারা এবং ইরানের শাহীবাংশীয় রস্তম মীরজার কন্যার সহিত শুজার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বাগদান সম্পূর্ণ হইল, মমতাজ বিবাহের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবাহের অলঙ্কার তৈজসপত্র প্রস্তুত করিবার তাগিদে আগ্রা এবং লাহোরের বাদশাহী কারখানা সরগরম হইয়া উঠিল। হিন্দুস্থানের যেখানে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত সর্বত্র উপযুক্ত লোক প্রেরিত হইল। শুজারটি, বেনারস, স্ববে বাংলার মালদহ, সাতগাঁ, সোনারগাঁ, বন্দরের শেরা বন্দর সুরাট ইত্যাদি স্থান হইতে কাপড়চোপড় এবং হীরাজহরত খরিদ করিবার হুকুম হইল।*

২

এই আনন্দ ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে মঙ্গলবার ১৬ই জিলকাদ, ১৬৪০ হিঃ (৬ই জুন ১৬৩১ খ্রীঃ) মমতাজ মহল শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন। ঐ দিন সকালবেলা হইতে

* আমল-ই-সালেহ, মূল পৃ. ৫১১-৫১২ (Bib. Indic)

পরের দিন অন্ধরাত্রি পর্য্যন্ত চতুর্দশ গর্ভের প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি এক কন্যা প্রসব করিলেন। শাহজাহান মনে করিয়াছিলেন ইহা রাণীর গতাহুগতিক ব্যাপার। কিন্তু প্রসবের পর অবস্থা আরও খারাপ হইল, আর আশা নাই বৃষ্টিতে পারিয়া কন্যা জাহানারার দ্বারা তিনি স্বামীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শোকবিহ্বল সম্রাট, পুত্র কন্যা এবং পিতামাতার উপর মমতাজের হতাশা সক্রম নিবন্ধদৃষ্টি চক্ষুদ্বয় নিশাবসানের তিন ঘড়ী পূর্বে চিরতরে মুদিত হইল।

দরবারী ঐতিহাসিকগণ শাহজাহানকে লইয়াই ব্যস্ত, স্বতরাং মাতৃবিয়োগে দারার অবস্থা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন নাই। সম্রাটের শোক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দরবারী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। সাত দিন তিনি রাজকাধ্য তাগ করিয়াছিলেন। স্থবিলাসী সম্রাট কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রঙীন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, বিলাসবাসন, সঙ্গীত, উৎসব-মজলিশ, এমন কি ঈদের দরবারও বর্জন করিয়া-ছিলেন। মমতাজের শবদেহ প্রথমে তপতী (তাপ্তী) নদীর অপর পারে জৈনাবাদ উদ্যানে সমাহিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতে কয়েক মাস পরে শবদার আগ্রায় প্রেরিত হইবার পূর্বে পর্য্যন্ত প্রতিদিন শাহজাহানের অশ্রুধারা অজস্র বর্ণণে মমতাজের কবর স্নিগ্ধ করিত। ইহার পরেও প্রত্যেক বৎসর জিলকাদ মাসে তিনি শাহী পোষাক তাগ করিয়া সাত্ত্বিক কর্তৃপক্ষবল পরিচ্ছদ [লেবাস-ই-কাফুরী] ধারণ করিতেন। শাহজাহানের শোকের পরিমাপ করিতে গিয়া বুদ্ধ আব্দুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন—আলা হজরতের গোঁড়ের মাত্র গোটা কুড়ি গাছা চুল পাকিয়াছিল, মমতাজের মৃত্যুর পর অল্পকালেই প্রায় সব সাদা হইয়া গেল।* তাজমহলের মিনার হইতে শাহানুশাহ শাহজাহান এমনও চিরবিরহীর প্রেমের আজান দিতেছেন—“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।”

৩

বিশ বৎসর বয়সে মমতাজমহল শাহজাহানকে স্বামী-রূপে পাইয়া উনিশ বৎসর এক মাস ছয় দিন চক্ষুবাণ মিথুনের অখণ্ড প্রাণ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্বগাফিলো তাঁহার চৌকটি সন্তানসম্ভবিত্বের মধ্যে মৃত্যুকালে সর্বকর্ম্মিষ্ট

* বাদশাহনামা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮

গোহর-আরা সহ সাত জন জীবিত ছিল। নগদ আশরফী, অলঙ্কার জহরত ইত্যাদিতে তিনি এক কোটি টাকার অধিক স্ত্রীদন রাখিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর সম্রাট ইহার অর্দ্ধেক দিলেন জ্যোষ্ঠা এবং প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা বেগমকে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট চারি পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে ভাগ হইল। শাহজাদীগণের শিক্ষয়িত্রী পরমবিদুযী রাজকার্য-নিপুণা ইরাণী মহিলা সিত্তি-উম্মিসা খানম অন্দর মহলের দেওয়ানখানার পেশকার (পেশদস্ত) এবং কুমারীগণের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২ই জুন বৃহস্পতিবার দুই প্রহর গতে, স্বদীর্ঘ প্রবাসের পর সম্রাট শাহজাহান যথারীতি বিরাট শোভাযাত্রার সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে শাহী তখতের পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট শাহজাদা দারা, অগ্রভাগে অর্দ্ধচন্দ্রলাঙ্ঘিত (মাহচাহ-ই-রায়া-ই-জাফর) মোগলের বিজয় কেতন, উভয় পার্শ্ব হইতে নিশারের জন্ত বস্তাবন্দী দিনার দিরইম মূদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্য-বৃষ্টি। আড়াই বৎসর পূর্বে (৩রা ডিসেম্বর, ১৬২৯ খ্রী:) এইরূপ সমারোহে সমতাজ মহলের সহিত সম্রাট জ্যোত্স্নায় বহির্গত হইয়াছিলেন। শূন্য শাহীমহলে পদার্পণ করিয়া শাহজাহান বুদ্ধিতে পারিলেন দিল্লীর বাদশাহী আজমীড় শরীফের বাৎসরিক মেলার “আড়াই দিনকা যোপরা”* বই কিছুই নয়। আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট পুনরায় রাজকার্যে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিলেন। কয়েক মাস পরে শাহজাদা দারা ও স্বজার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল।

৪

রূপে গুণে মাতা সমতাজের প্রতিচ্ছবি জ্যোষ্ঠা শাহজাদী জাহানারা অগ্ন্যন্ত ভ্রাতাভ্রাতৃগণের মাতৃস্থানীয়, — জননীর প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শাহজাহানেরও ঐ অবস্থা, শাহান-শাহ বাকী জীবন এই কন্যাটির নিকট নাবালক সন্তানের যত্ন এবং মাতৃস্নেহ দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন। জাহানারা চরিত্রগুণে দারাকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন, ভ্রাতা ভগ্নী এক জন আর এক জনকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে মুসলমান সমাজে পুরুষ ও নারীর এমন কি ভ্রাতা ও ভগ্নীর অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। কথিত আছে, এই বাধা দূর করিবার জন্ত সম্রাট আনুষ্ঠানিক ভাবে সে কালের রীতি অনুসারে জাহানারার স্তন্যদোহে পান্থস্থিত জল দারাকে পান করাইয়া-

* আড়াই দিনের প্রত্যুত্তরী কক্ষের মূখ্যদ্বারের তুঁড়িঘর, জনপ্রবাদ-কল্পিত আড়াই দিনে প্রাপ্ত মূলতান ইলডুত্বিশের বিরাট প্রসঙ্গি নয়। ভঁরা-কৃত “রাজপুত্রমোকা ইচ্ছাহা”; Sarda's Ajmer P. 69]

ছিলেন। জাহানারা এবং সিত্তি-উম্মিসা খানমের তত্ত্বাবধানে বিবাহের বিরাট আয়োজন কয়েক মাস ব্যাপিয়া চলিল। এই বিবাহে মোট ব্যয় বত্রিশ লক্ষ টাকার মধ্যে ষোল লক্ষ টাকা জাহানারা বেগম নিজের খাস তহবিল হইতে দিয়াছিলেন। বিবাহের লগ্ন নির্ণয় করিবার জন্ত শাহানশাহ দরবারী হিন্দু ও মুসলমান জ্যোতিষীগণকে হুকুম দিলেন। হিন্দু জ্যোতিষ এবং যবন (ইউনানী) জ্যোতিষ মতে বর-কন্যার কোষ্ঠী বিচার করিয়া উভয় মতে সিদ্ধ শুভদিন ধার্য করা হইল।

এই দেশে হিন্দুদের মধ্যে যেমন বিবাহের পূর্বদিন বরের-বাড়ী হইতে “বস্ত্রালঙ্কার” কন্যার গৃহে প্রেরিত হয়, সেইকাল হইতে বর্তমান পর্যন্ত মুসলমান সমাজে সাচখ বা হেনাবন্দী প্রেরণ করিবার প্রথা আছে। ১০৪২ হিজরীর ৮ই জমাদিউল-আওয়াল রবিবার [নবেম্বর ১৬৩২ খ্রী:] ১১ দণ্ড (ঘড়ী) গতে আগ্রার শাহী মহল হইতে সাচখের মিছিল বাহির হইল। নগদ একলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র অলঙ্কার ও অগ্ন্যন্ত সামগ্রী লইয়া দেওয়ান-ই-কুল আল্লামা আফজল খাঁ, মীরবকসী সাদিখ খাঁ, খান-ই-সামান মীর-জুমলা, মুসাবি খাঁ, প্রধান-সদর (মারাঠা “পণ্ডিত-রাও”), এবং পুরস্কৃতগণের মধ্যে সমতাজ মহলের পিতৃসঙ্গাগণ, মাতা ও তাঁহার জ্যোষ্ঠা ভগ্নী এবং সিত্তি-উম্মিসা খানম শাহজাদা পরবেজের হাবেলীতে উপস্থিত হইলেন। পরবেজের বিধবা পত্নী জাহানবাহু বেগম অতি সমাদর এবং কামাল আদব কায়দা মাফিক তাঁহাদের সকলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। বেগম সাহেবা প্রত্যেক আশীরের জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহুমূল্য লোভনীয় এবং নয়নপ্রীতিকর পেলাত নির্দিষ্ট করিয়া বাহির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার স্বয়ং রুচি লৌকিকতা এবং বদান্ততায় এই ব্যাপার অতি সুইভাবে শাহী শান ও শৌকতের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মেয়ে উঠাইয়া আনিয়া বরের বাড়ীতেই সাধারণতঃ মোগল পরিবারে বিবাহ-শাদী হইত। এই জনাই সম্রাটের শাস্ত্রী এবং আত্মীয়গণ “বস্ত্রালঙ্কারে”র সহিত মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন; পরবেজের স্ত্রী তাঁহাদের সঙ্গে কম্যাকে বিদায় দিলেন। আসল বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল ইহার তিন মাস পরে, কন্যাপক্ষে যৌতুক ইত্যাদিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল দশ লক্ষ টাকা।

৫

বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহানারা বেগম এবং তাঁহার “কার-ফরুগা”-(কর্ণাধ্যক্ষ)গণের ব্যস্ততায় শাহীমহল সরগরম হইয়া উঠিল। খণ্ডিত বাবল শাহী খাজনা-খানা হইতে ষোল লক্ষ টাকা মজুর হইয়াছিল।

শাহজাদী জাহানারার দরাজ নজর,—এত অল্প টাকায় মুখরক্ষা হয় না, এইজন্য নিজু তহবিল হইতে তিনি আরও বোল লক্ষ টাকা খরচ করিলেন। ইতিহাসে এই টাকার একটা মোটামুটি হিসাব আছে; তবে মনে হয় খরচের পরেই বিবাহের ফর্দ প্রস্তুত হইয়াছিল। মোট বত্রিশ লক্ষ টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয় হইয়াছিল বাদশাহী দরবারের নজর-পেশকশ, আমোর-ওমরা, আত্মীয়-কুটুম্ব, গায়ক-বাদক, শাহী মহলের বাদী-গোলাম ইত্যাদির প্রাপ্য খেলাত উপহার ইনাম বখশীশের দফায়। বাদশাহী নজর নগদ এক লক্ষ টাকা, নিসার দশ হাজার এবং পেশকশের আসবাব ইত্যাদিতে খরচ হইয়াছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। পেশকশের হাতীর সোনার হাওদার উপর যে রাজছত্র বসান হইয়াছিল উহার মুক্তার ঝালর-বাবদ খরচ সাতাত্তর হাজার টাকা। সম্রাট বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রকাণ্ড দরবারে কুমারের প্রণাম গ্রহণ করিয়া সরকারী তরফ হইতে শাহজাদাকে যে খেলাত দিবেন উহাও বিবাহের সরকারী খরচের মধ্যে ধার্য ছিল। এই খেলাতের জন্য একটা মন্দা হাতী, একটা মাদী হাতী—উহাদের পায়ে জরীদার মখমলের ঝলমল আস্তরণ, এবং পৃষ্ঠে রূপার হাওদা, সোনার এবং রূপার জীনলাগাম ইত্যাদি সাজ সহ কয়েকটি আরবী, ইরাকী, তুর্কী এবং কচ্ছী* ঘোড়া। এতদ্ব্যতীত নানা রকমের “বহিল”† “রথ” ইত্যাদি যান-

* ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যান্তির কালে (১৬৭৬-৭৭ খ্রি:) অমাত্য রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের আদেশে চুটিরাঙ্গ লক্ষণ বাস নামক একজন পণ্ডিত প্রচলিত ‘যবন’ (ফার্সী আরবী) শব্দের সংস্কৃত পরিভাষা-মূলক “রাজকোষ” বা “রাজকোষনিষ্পত্তি” নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া ছিলেন। ঐ গ্রন্থের “চতুঃসর্গঃ” শৃংখলায় লিখিত আছে:—

রহবাল সৈন্যবঃ শ্রাদ্ ইরাখী যাবন শ্রুতঃ।

• অরবী স্যাং পারসীকঃ কচ্ছী জবন উচ্যতে ॥

অর্থাৎ সিন্ধুদেশীয় অথ রহবাল, ইরাখী (Iraqi) অথ যবন দেশজাত, অরবী (Arabian) বাজী পারসীক দেশজাত এবং কচ্ছী “জবন” [বিলায়েতী?] ঘোটক। কচ্ছদেশ প্রাচীন কালে ঘোড়ার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল কিনা জানা যায় না। ইবন বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে কোন কোন স্থানে ঘোটকী বৃত্তমতী হইলে উহাকে সমুদ্রের তীরে বান্ধিয়া রাখিত; রাজিকালে সমুদ্রোচ্ছিন্ন সিন্ধু ঘোটকের সহবাসে যে অথ শাবক উৎপন্ন হইত এগুলি খুব তেজস্বী হইত। কচ্ছদেশীয় ঘোড়া দেশী ও বিদেশী ঘোড়ার সংমিশ্রণে জাত অর্থাৎ “ক্রস্স” (Cross) বলিয়া মনে হয়। কচ্ছী ঘোড়াকে “জবন” কেন বলা হইত বুঝা যায় না।

† “বহিল, বহল” শব্দের অর্থ বিচক্ৰযুক্ত পশুবাহিত যানবিশেষ, বোধ হয় গঙ্গার গাড়ী। বিচক্ৰযুক্ত অথবাহিত যান ছিল সে কালের রথ, এই যুগের এক। দিল্লীর গাড়োয়ানেরা একাকে “রথ” আজকালও বলিয়া থাকে; হোমর ও বেদব্যাসের বিচক্ৰযুক্ত অথবাহিত রথ কি রকম আয়ামপ্রদ ছিল জানা যায় না, কিন্তু এ যুগের “এক্সার থাকার” সহজে ভুলিবার নয়। “বহিল” সম্বন্ধে “রাজকোষ”-কার বলিয়াছেন—

“রথশালা তু...বহিলী মহাল ইতি কীর্তিতঃ।

বহিলী স্যাং প্রবহণং বহিল বানন্ত সারথি ॥”

বাহন বোধ হয় অন্তঃপুরচারিণীগণের শোভাযাত্রার সহিত গমনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শাহজাদা দারার তরফ হইতে শাহজাদীগণ, সম্পর্কীয় বেগম এবং “খাতুন”-দিগকে ভৌকা, সেলামী উপহার ইত্যাদির জন্য এক শত মূল্যবান জড়াউ তোরা,* উজীর-ই-আজম ইমিন-উদ্দৌলা আসফ খাঁর জন্য নয় প্রস্ত (তাক) খেলাত এবং নিকট আত্মীয় অভিজাতবর্গের পদমর্যাদা অনুসারে সাত প্রস্ত পর্যন্ত খেলাত এই আয়োজনের অঙ্গীভূত ছিল।

বাসর ঘরের আসবাব ও সাজসজ্জা বাবদ [asbab wa peraya-i-hajla] ব্যয় হইয়াছিল ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সোনার উপর মীনা করা এবং জহরত বসান ব্যবহার্য বাননপত্র, “ছপ্পর-কত”, সোনার পালঙ্ক,† জরদৌজী এবং রত্নখচিত পেশগীর,‡ নানা রকমের রঙ বেরঙের ফরাশ, বর্ণসম্ভার-সমৃদ্ধ বহুমূল্য গালিচা, স্ববর্ণতত্ত্বখচিত পুষ্পিতপট মনোরম মখমল শামিয়ানা ইত্যাদি।

৬

আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে “সাতখ” উৎসবের পরে আরও তিন মাস লাগিয়াছিল। ২৪শে রজব শুক্রবার (জানুয়ারি ১৬৩৩ খ্রি:) আগ্রাহুর্গের দরবার-ই-আম প্রাসাদের বারান্দা এবং সম্মুখস্থ স্তম্ভস্তম্ভ অঙ্গনে উপহার ইত্যাদি বিবাহের সামগ্রী জাহানারা বেগম এবং সিতী-উল্লিখ খানমের উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে সজ্জিত হইল। সকাল হইতে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত অন্দরমহলের দাসদাসীগণ এই বাপারে বাস্ত, স্বয়ং সম্রাট ঐখানেই জনানী মহলের দরবারে পদার্পণ করিবেন। নিখুঁত ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবার পর জাহানারা বেগম পিতার নিকট উপস্থিত

* “তোরা” শব্দের অর্থ টিক বুঝা যায় না। এই উপহার সামগ্রী এক রকমের অলঙ্কার হওয়া সম্ভব। “রাজকোষে” পাওয়া যায়—“তুরাহবতঃ” অর্থাৎ “তুরা” অবতঃস বা অলঙ্কার বিশেষ।

† পালঙ্ক [কা: পালঙ্ক] দড়ির বুনাণী খাটির রাজসংস্করণ। রাজকোষকার লিখিয়াছেন, “পলংগা মঞ্চকঃ”; বড় খাটির মঞ্চ বা মাচ অর্থে এখনও ব্যবহৃত হয়, আগ্রা-দিল্লীর গ্রাম্য লোকেরা খাটিকে মঞ্জ (মঞ্জ এক প্রকার ঘানের দড়ির ছাউনীযুক্ত) বলে। তক্তার ছাউনী পালঙ্ক অর্থাৎ দারুমর শয্যাখার (যাহা বাংলা দেশের খাট) বাজালার বাহিরে ব্যবহৃত হয় না। স্বয়ং বাদশাহ খাটির বা পালঙ্ক ব্যবহার করিতেন—অবশ্য শাহী খাটির সোনার ডাঙাও রেশমের দড়ির ছাউনী থাকিত। ছপ্পর-কত হিন্দী ছপ্পর-খাট; অর্থাৎ, মশারি বা অস্ত্র কোন প্রাবরণ যুক্ত খাট “ছপ্রপলংগা মঞ্চমণ্ডপঃ”।

‡ পেশগীর শব্দের অর্থ গামছা (towel, napkin; Steingass) হইতে পারে না। বর্ণনা দৃষ্টে অনুমান করা যায় ইহা এক প্রকার পর্দা [Hanging, tapestry?]। মখমল প্রাবরণ বিশেষ “ইন্দ্রগোপস্ত-মখমলঃ”।

হইয়া নিবেদন করিলেন, শাহজাদা দারার বিবাহের তৈজস সজ্জার উপর শাহানশাহ একবার নজর মোবারক ইনায়েৎ করিলে দাসী কৃতার্থ হইবে। দিল্লীস্থর দরবার-ই-আম প্রাসাদে পদার্পণ করিতেই বেগম সাহেবা মসনদের সম্মুখে জমি'বোস [ভূমি চুষন] ও তসলীম জানাইলেন, এবং দেড় লক্ষ টাকার মূল্যের হীরা জহরতের নানা রকম জিনিষ পেশকশ নিবেদন করিলেন। শাহানশাহ সাধারণতঃ যাহা "মাপ" করিয়া থাকেন, প্রিয়তমা কন্ঠার ভক্তি ও স্নেহের অর্ঘ্যজ্ঞানে উহা তিনি "কবুল" অর্থাৎ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর মজলিসে উপস্থিত নিমন্ত্রিতা শাহজাদী বেগম খাতুন এবং আমীরগণের স্ত্রী কন্ঠা সকলকেই এক একটি পূর্ব-নির্দিষ্ট উপহার সম্রাট নিজের হাতে তুলিয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নয় হইতে সাত খণ্ড (পারচা) বস্ত্রের খেলাত পাইয়াছিলেন। নয় পারচার সর্বোচ্চ খেলাত পাইয়াছিলেন বোধ হয় নয়-হাজারী খান খানান আসফ খাঁর গৃহিণী শাহানশাহের শাশুড়ী। বাদ বাকী কেহ "তুরা", কেহ অগুবিধ উপহার পাইলেন। দরবারের আঙ্গিনায় এলাহি কারখানা দেখিয়া আলা হজরতের তাক লাগিয়া গেল। তিনি বেগম সাহেবার যত্ন ও স্রুচির প্রশংসা করিয়া জানান মহলের দরবার মধ্যাহ্নে বরখাস্ত করিলেন।

এখানে বিকাল বেলা রাজপুরুষ আমীর উজীরগণের প্রকাণ্ড দরবার আহূত হইল। প্রথমেই শাহানশাহের শ্বশুরের পালা। তিনি নয় হাজারী মনসবদার, স্তত্রবাং তাঁহার খেলাত ও নয় প্রস্ত (তাক)। উহার মধ্যে ছিল তুরানের শাহী পরিচ্ছদ সোনার বুটদার ফুল-তোলা চারকব জামা,* বহুমূল্য রত্নখচিত তরবারি ও কাটারি (dagger) উপস্থিত অগাণ্ড আমীরগণ প্রত্যেকেই অন্ততঃ এক প্রস্ত খেলাত ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাইলেন। গুণী গায়ক, ওস্তাদগণও কাপড়চোপড় ইনাম খুশীর বখশিশ পাইল। সর্বসমেত আড়াই লক্ষ টাকার খেলাত এই দরবারে বিতরণ করা হইয়াছিল।

পরের দিন শনিবার ২৫শে রজব কন্ঠাগৃহ হইতে জামাতার যৌতুক ও দানসামগ্রী শাহী মহলে প্রেরিত হইল। শাহজাদা দারার শাশুড়ী জাহান বাহু বেগম সম্রাট আকবরের পৌত্রী—শাহজাদা মোরাদের কন্ঠা। তাঁহার স্বামী পরবেজ শ্বশুরের জীবদ্দশায় পরলোকগত না হইলে হয়ত তিনিই আজ দিল্লীর মসনদ অলঙ্কৃত করিতেন। যাহা হউক, যে সৌভাগ্য হইতে বিধিবিড়ম্বনায় জাহান বাহু

* আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরশাহী আমলের সমস্ত রকম পোষাক, অলঙ্কার ও অস্ত্র শস্ত্রের ছবি আছে। চারকব নাতিদীর্ঘ চোপার মত পোষাক মনে হয়।

বঞ্চিত হইয়াছেন, কন্ঠা করিম উম্মিসা সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া ভাবী সম্রাজ্ঞী হইতে চলিয়াছে এই আশায় স্বামীর বহদিন সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার উজাড় করিয়া তিনি জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে কন্ঠাপক্ষের দানসামগ্রী ইত্যাদি পূর্ব-দিনের মত দরবার-ই-আমের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিবার পর জাহানাবা বেগম সম্রাটকে ঐ সমস্ত জিনিষ দৃষ্টিপূত করিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন।

এই ব্যাপারের দুই দিন পরে ২৭শে রজব শাহান-শাহের হুকুমে আগ্রা শহরের গরীব দুঃখী ফকিরদিগকে দশ হাজার টাকা দান খয়রাত দেওয়া হইল। পঁচিশ লাখের মধ্যে গরীবের ভাগে পঁচিশ হাজারও পড়িল না!—শাহী আমল হইতে ইংরেজ আমল পর্যন্ত চিরকাল বড়লোকের জন্তই মিঠাই মণ্ডা, গরীবের ভাগো এঁটো পাত।

৭

উক্ত কাঙালী বিদায়ের দুই তিন দিন পরে শাহান মাসের পয়লা তারিখ (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩) বৃহস্পতিবার রাত্রে "হেনাবন্দী"* উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল আগ্রাদুর্গের দরবার-ই-খাস প্রাসাদে। মমতাজের মৃত্যুর পরও রমজানের চাঁদ উঠিয়াছে, নওরোজের নব্বত বাজিয়াছে, কিন্তু শাহী মহলে ঈদ খুশরোজের উৎসব হয় নাই। পুত্রের কল্যাণার্থ এবং প্রজাসাধারণের ভারাক্রান্ত মন হইতে নির্জীব আড়ষ্টতা অপনয়নের জন্ত শাহানশাহ হুকুম দিয়াছেন দেওয়ান-ই-খাস হেনাবন্দীর উৎসব সজ্জার সজ্জিত করা হউক, এখানে অভ্যাগতগণের মজলিসে তিনি খুশী মানাইবেন। শাহী হুকুম আলাদীনের বিচিত্র প্রদীপ। আয়োজনের কোলাহলমুখর দিবসের অবসানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া না আসিতেই বিচিত্র মণিময় অসংখ্য দীপাধারেরঃ রত্নচ্ছুরিত আরক্তিম আলোকচ্ছটায় শাহী

* "হেনাবন্দী" হিন্দুর বিবাহে বরের "গায়ে হলুদ" আচারের মত উৎসব। মুসলমানেরা কাঁচা হলুদের পরিবর্তে হেনা বা মেহেন্দী পাতার রং ব্যবহার করিয়া থাকে। "হেনাবন্দী"র দরবারী মজলিসে দারা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের অনুপস্থিতি দৃষ্টে অনুমান করা যায় বরের "হেনাবন্দী" স্ত্রী আচারের শামিল, অন্দর-মহলে বরের এবং বাহির মহলে নিমন্ত্রিত পুরুষগণের হাতে মেহেন্দীর রং মাখান হইয়াছিল।

+ ইতিহাসে দরবার-ই-খাস জনপ্রচলিত গোসল-খানা নামেই পরিচিত। গোসল-খানা বাদশাহী স্নানাগারের নিকটবর্তী বলিয়াই এই নিভৃত মন্ত্রণাকক্ষকেও গোসল-খানা বলা হইত। রাজব্যবহারকোষ দ্রষ্টব্য :—

"মন্ত্রস্থানঃ গুহলখানা চতুর্কং চৌক নামকং"

‡ শাহী আমলের বিভিন্ন নামের দীপাধার সম্বন্ধে রাজকোষে বলা হইয়াছে—

"দীপশাখাভু সমরো ফিলসোজঃ স্তম্ভদীপকঃ"

* * *

মহল, জমিন-আসমান, প্রভাত গগনের অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। মীর বকশী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ আমীরগণ নিমন্ত্রিত অভিজাতবর্গকে সম্রাটের পক্ষ হইতে সম্বর্দনা জ্ঞাপন করিবার জন্ত দণ্ডায়মান। বড় বড় খালা ভরিয়া কণ্ঠাপক্ষীয় দাসদাসীগণ হেনাবন্দীর সামগ্রী মজলিসের গালিচার উপর সাজাইয়া রাখিয়া অন্তরালে আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

“উদ-সোজ” ইত্যাদি ধূপদানী হইতে অগুরু ধূপের গন্ধে উৎসববাসর ভরপুর। নিমন্ত্রিতবর্গ অভ্যর্থিত হইয়া একে একে তাঁহাদের যথানির্দিষ্ট আসনের উপবিষ্ট হইলেন। যে বিরাট শোকের পর্দার অন্তরালে সদ্যেতের মূর্ত্তনা, নর্ত্তকীর নৃপুরনিকণ, যন্ত্রীর অনাদৃত্য বীণা ছুই বৎসর যাবৎ “পদানশীন” ছিল, এই উৎসব নিশীথে সেই বিষাদের যবনিকা অপসৃত করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়া সমস্তই দ্বিগুণ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অভিমানিনী মোগল রাজলক্ষ্মীর মানভঙ্গের জন্ত স্বয়ং দিল্লীশ্বর বহাদুর পরে রক্তোদ্ভাসিত সুরম্য রাজপরিচ্ছদে নাগর বেশে সজ্জিত হইয়াছেন—আজ তিনি যেন সুরসিক “সঙ্গীত-চাতুর্ধ্য-কলানুরক্ত” * শাহজাদা খুরাম, বৃদ্ধ পত্নী-শোকাতুর শাহজাহান নহেন।

সেকালে সামাজিক ব্যাপারে মজলিসের বৈঠকে রাজা ও প্রজার মধ্যে দরবারের দূরত্বক্রমা ব্যবধান; আড়ষ্টতা ও সংকোচ ছিল না। দীনছনিয়ার মালিক, জমিনের উপর খোদাতালার ছায়া [জিল্ল-ই-সোভানী], আলা হজরত বহু দিন পরে খুশ মেজাজে মজলিসে শরীক হওয়ায় নিমন্ত্রিত আমীর ওমরাগণের মনের ছুয়ার খুলিয়া গেল। দেবসভায় নৃত্যপরা অপরীর মত জোহরাভুল্য অনিন্দ্য সুন্দরী শত নর্ত্তকীর চঞ্চল নৃত্যে জমিন আসমান যেন নাচে মাতিয়া উঠিল, স্বয়ং জোহরা [Venus] ঈর্ষান্বিতা হইলেন [nahid-ra-be-rashk]। ৭ জ্যোতিষ্কসদৃশ দীপ্তিমান সুদর্শন হিন্দুস্থানী এবং তুর্কী খাদেমগণ মজলিসীগণের মেজাজ ঠাণ্ডা করিবার জন্ত মাঝে মাঝে আতর ছিটাইতেছিল। কিছুক্ষণ

পরে আদবকায়দা দুরন্ত বাদজী [কদ-বান্ন] পরিচারিকাগণ রূপের ডালা সাজাইয়া মেহেদীর রক্তরাগে মেহেমানদিগকে রাঙা করিবার জন্ত আসরে পা বাড়াইতেই মজলিস রঙীন হইয়া উঠিল। এই দেশের প্রথা অনুসারে মজলিসীগণের অঙ্গুলি রঞ্জিকার হেনায় রঞ্জিত এবং হস্তদ্বয় জরীর কুমালে বন্ধনদণ্ড প্রাপ্ত হইল। ইহার পর সৌভাগ্য ও বিফলের মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ স্বর্ণতন্তুখচিত পাখুকণ্ডুক [ফোতা=কোমরবন্ধ] নিমন্ত্রিতবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ইহার পর মিষ্টিমুখ, পান আতর, “শিরীণী” (মিষ্টদ্রব্য), মেওয়ার বড় বড় রেকাবীর ছড়াছড়ি [khwan dar khwan] শাহী মহলের বাহিরে যমুনার ধারে আতস বাজীর খেলা। এই ভাবে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত শাহী মহলের ভিতরে বাহিরে আমোদ-প্রমোদ চলিল।

বৃদ্ধ ঐতিহাসিক কাছো পরের মুখে নিমন্ত্রণের আশাদ এবং হেনাবন্দী মজলিসের রূপ রস গন্ধের সম্বান পাইয়া এই প্রমোদ-রজনীকে শব-ই-কদর বা ইসলামের নৌভাগ্য রাত্রির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

c

“হেনাবন্দী”র পরের দিন ২রা শাবান শুক্রবার বিবাহ-উৎসব।

ঐদিন শাহানশাহর হুকুমে শাহজাদা শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ বকশ, খান ই-খানান আসফ খাঁ ও অন্যান্য আমীরগণ দারাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন এবং শোভাযাত্রাসহ বরকে শাহী মহলে আগাইয়া আনিবার জন্য দারার প্রাসাদে গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব-স্ব পদমর্যাদা অনুসারে শাহজাদাকে বিবাহের নানাবিধ উপহার পেশকশ প্রদান করিয়া শাদীর মোবারকবাদ জানাইলেন। শাহজাদা অভ্যাগতগণের যথোচিত সংকার এবং আনুযায়িক আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। বিকালবেলা বরের শোভাযাত্রা শাহীমহল অভিমুখে সাড়ম্বরে অগ্রসর হইল। মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ সমুদ্র বাজী-পৃষ্ঠে “শাহ দামাদ”; অগ্র পশ্চাতে অনুযাত্রী বরাত, কেহ কেহ ঘোড়ার উপর কেহ বা পদব্রজে চলিয়াছে।

শাহজাদা দারা দেওয়ান-ই-আম মহলে শাহী মসনদের সম্মুখে কুর্ণিশ ও ভূমি চূষন (জমি-বোস) করিবার পর তাঁহাকে রক্তখচিত তরবারি, চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তা ও চুনীর জপমালা (তসবী), শাহী আস্তাবলের ছুটি খাসা ঘোড়া, শাহী ফিলখানার একটি মদ্য ও একটি মাদী হাতী সাজসমেত, মোট প্রায় চারি লাখ টাকার খেলাত প্রদান করা হইল। ইহার পর হিন্দুস্থানের রেওয়াজ মাকিক শাহনশাহ পুত্রের মন্তকে বিবাহের মুকুট [সেহরা] পরাইয়া দিলেন। বদখশানের উজ্জল লাল রবী এবং বহুমূল্য সবুজ

সাদাস্তরালদীপস্ত খন্দীল ইতি নামত।

উৎসোজঃ সাদা “দীপতর” উদ্দানী ধূপ পাত্রকং

অর্থাৎ সময় (ফাঃ শামোয়া) = দীপশাখা (বাড়)

ফিলসোজ [গীলসোজ] = স্তম্ভদীপ (দেওয়ালগীর)

খন্দীল = কাচভাণ্ডস্থিত দীপ

উৎসোজ = [আঃ উদ + সোজ] দীপতর

উদ-দানী = ধূপদানী।

* শাহজাহানের রাজাভিষেকের লগ্ন-গণক মারাসী পণ্ডিত সার্কভোম শাহজাহান গুণকীর্তন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“কুপারিবাণ সাধুজনে কুপালুঃ সঙ্গীত চাতুর্ধ্যকলানুরক্তঃ।”

—শিব চরিত্র প্রদীপ [পুণা ভারত ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডল পুরস্কৃত গ্রন্থমালা নং ৪] পৃঃ ১৩৬।

+ বাদশাহ নামা ১ম খণ্ড পৃ. ৪৫৭।

পান্না খচিত এই “সেহরা”-র সহিত শাহজাহানের অতীত মৌভাগ্য এবং স্বথস্থিতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত,—জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ “বাবা খরমের” মাথায় এই মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন মমতাজ মহলের সহিত তাঁহার বিবাহের শুভমুহুর্তে। শাহজাদা পিতাকে প্রণাম [তসলীম]* করিয়া যথারীতি তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। আসফ খাঁ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য দরবারীগণকে এই দিন পুনরায় খেলাত দেওয়া হইল।

দরবারের পর সন্ধ্যা সমাগমে বিবাহ-বাসরের আমোদ-প্রমোদ, মেহফিল-মজলিসের বৈঠক এবং আলোক-সজ্জা। স্থপোখিতা আগ্রানগরী দীপালী ও নওরোজের প্রদীপডালা একত্র সাজাইয়া মঙ্গল আরতির আনন্দকোলাহলে মাতিয়া উঠিয়াছে। রং-বেরঙের গালিচা ও ফরাসের উপর প্রতিফলিত রত্নখচিত দীপাধার-নির্গত রশ্মি বিবাহ-আসবকে বিচিত্র বর্ণসম্ভারসমৃদ্ধ করিয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত আধারস্থিত “শমোয়া”, চেরাগ, ফাহুস, মশাল প্রভৃতি মনোরম দীপাধারে সজ্জিত আলোকশ্রেণী শাহীমহলের ভিতরে বাহিরে উপরে নীচে [dar wa bam] শাহানশাহ হুকুমের অঙ্ককারের সহিত লড়াই ফতে করিয়া রাত্রিকে দিন, জমিনকে আসমান করিয়া তুলিয়াছে। অন্তঃপুরের উত্তান-বাটিকা, “দর্শন”-গবাক্ষের পাদদেশে বালুকাভূমি, অদূরে তরীসমাক্ষর যমুনাবক্ষ কোথাও আশ্রয় না পাইয়া রাত্রির অঙ্ককার দিল্লীশ্বরের দৃষ্টির বাহিরে যমুনার পরপারে আশ্রয় খুঁজিতেছে। শাহী দৌলতখানায় খুশীর বাজার সরগরম। বাহিরে নদীর কিনারায় আতশবাজীর তামাশা। আকাশের তারার সহিত ‘মাহতাবী’ বায়ুমণ্ডলে শশাঙ্কলঙ্ঘিত মোগল-কেতন প্রোথিত করিয়া দিল্লীশ্বরের বিজয় ঘোষণা এবং মোগলাই “গুল আফশান” শাহীমহলের উপর অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে; উহার সহিত সমান তালে “হাওয়াই” বাজীর তারকাবৃষ্টি।

আগ্রাদুর্গের গুপ্তমন্ত্রণা-কক্ষ [খিলবতখানা] শাহ-বুরুজে বিবাহের আসরে রাত্রি দুই প্রহর ছয় ঘড়ীর পর যৌশন-চৌকীর “পাঁচ নববত” বাজিয়া উঠিল। হিন্দু এবং যবন জ্যোতিষীগণের গণনায় সর্বস্বীকৃত শুভলগ্নে শাহানশাহ্ র সম্মুখে কাজী আসলামগণ বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিলেন—আঁদের

বর, পর্দার আড়ালে পাত্রী। বরপক্ষ হইতে কাবিননামার “মোহরানা” বা বিবাহভঞ্জে কন্যাকে ক্ষতিপূরণ বাবত পাঁচ লাখ টাকা ধাৰ্য্য করা হইল। এই পাঁচ লাখ টাকার পশ্চাতেও মমতাজ মহলের সহিত শাহজাহানের বিবাহস্বয়ত্তি; এমন এক দিনে বহুবর্ষ পূর্বে তিনি দারা জননীকে পাঁচ লাখ টাকার কাবিন কবুল করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর দুই সপ্তাহ ধরিয়া আরাম-আয়েস আনন্দ উৎসব অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ছয় দিন পর ৮ই শাবান শাহজাদা দারা সপারিসদ সন্মতি ও অভিজ্ঞাতবর্গকে নিজে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্মতির সম্মানার্থ শাহী দৌলতখানা হইতে শাহজাদার হাবেলী পর্য্যন্ত সত্তা জরির* রাস্তা মথমলের ফরাসে ঢাকা; মথমলের উপর জরির গালিচার “পা-আন্দাজ” বা পাদ আন্তরণ; রাজা-বাদশাহর ঘোড়া হাতী, পাঞ্জীবাহকের পা আমীরগমরা-র গৃহে যাইবার সময় মাটিতে পড়িলে বাদশাহী শান্ বজায় থাকে না—এই জন্তই পা-আন্দাজের ব্যবস্থা। ঐদিন শাহানশাহ-র “কদম-রঞ্জা” বা পায়ে বোঝা নিবারণের জন্য তাঁহার “অবতরণ-স্থান” গোলাবী, রূপালী, এবং দারাশাহী-লাল (purple) রেশমী জমির উপর সোনার তারের বিচিত্র সূক্ষ্ম সূচীশ্লিস্মমৃদ্ধ মনোরম আন্তরণের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে দরবারী রাস্তার উপর দেড় হাত প্রস্থ শালু কাপড়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

সন্মতি ভোজসভায় স্থখোপবিষ্ট হইলে শাহজাদা মোট এক লক্ষ টাকা মূল্যের নজর হজুরে পেশ করিলেন। পেশকণের অগ্নাগ্র মহার্ঘ সামগ্রী দৃষ্টিপ্রসাদ লাভ করিবার পর সন্মতির উপযুক্ত বাহন একটি অশ্বরত্ন হজুরে নিবেদন করা হইল—আসল ইরাকী ঘোড়া, গায়ে বহুবায় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত গোনার জড়াউ সাজ, নাম “সবু-আফ-রাজ”। ইহার পর পিতার অনুমতিক্রমে শাহজাদা নিমন্ত্রিত আমীরগণকে খেলাত উপহার প্রদান করিয়া সযত্নে জানাইলেন। নয়-হাজারী আসফ খাঁ শুভমুহুর্তক নবম সংখ্যক বস্ত্রের ডবল খেলাত ও রত্নখচিত তরবার উপহার পাইলেন। আল্লামা আফজল খাঁ এবং অন্য তিন জন উচ্চপদস্থ আমীরকে শিরোপা (আকবরশাহী “সর্ব-গাত্রী”), তুরানী “চারকব”, এবং অগ্নাত্মকে এক এক প্রস্থ খেলাত দেওয়া হইল।

দরবারী ইতিহাস পড়িলে মনে হয় এই ব্যাপারে

* “শিরমা বন্দনঃ শিজদা প্রণাম-স্ত্রীমা ভবেৎ

নমস্কারঃ সলামঃ সাদাশীর্বাদো দুবা-শ্রুত ॥ রাজকোব।

* মাসির-উল-উমারা গ্রন্থে [তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৮৯-৯১] এই কাজী নাহেবের জীবনী পাওয়া যায়, যম্মী সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে তাঁহার শিয়া-বিষয়ে এতই প্রবল ছিল যে অল্পকালের সময় এক শিয়া হেকিমের ব্যবস্থাপত্র তিনি আগুনে পোড়াইয়াছিলেন।

* এক জরির পরিমাণ ভূমি এই দেশের পোনে বিঘার সমান।

† bum-i-tala wa bum-i-nugra wa bum-i-darai.

পথসজ্জা এবং খেলাত বিতরণ ছাড়া যেন অণু কিছুই হয় নাই। দারার বাড়ীতে বৌভাতের নিমন্ত্রণ হইতে শাহান-শাহ নিশ্চয়ই খালি পেটে ফিরেন নাই। এত বড় নিমন্ত্রণের ভোজ্যতালিকাটা ইতিহাসের পাতায় রাখিয়া গেলেন এই যুগে ভোজনবিলাসীর ঢেকুর উঠিত।* ঐতিহাসিক চিরকালই শাস ফেলিয়া নারিকেলের ছোবড়া চিবাইয়া আসিতেছে। পরবেজের কচা দারার প্রথমা এবং প্রধান পত্নী করিম-উল্লিহা বাহু বেগম পরবর্তী ইতিহাসে তাঁহার ডাকনাম নাদিরা বেগম নামে পরিচিত। বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত সে কালে রাজা বাদশাহ্ আম'র শাহজাদা সকলের অন্তঃপুরে একাধিক দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী থাকিত; কাহারও তৃতীয় শ্রেণীর সন্তানজননীর উল্লেখ পাওয়া যায়, স্বয়ং আকবর বাদশাহের হারেমে এই প্রকার তিন শ্রেণীর অন্ততঃ তিন শত বেগম ছিল। জাহাঙ্গীর শাহজাহানও আওরঙ্গজেবের বিভিন্ন শ্রেণীর পত্নী, পত্নী-স্থানীয় নারীর

সংখ্যা সঠিক লেখা না থাকিলেও ইতিহাসের পাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সেকেন্দর বাদশাহের ভারত আক্রমণ কাগ হইতে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুস্থান-ইরান আরব-তুরান ইত্যাদি সর্বত্র হাটে বাজারে প্রকাশে গরু-ছাগল উট-ঘোড়া তরী-তরকারির জায় নাহুয বিক্রয় হইত। মুসলমান যুগে প্রত্যেক শহরের প্রধান বাজার বা “মণ্ডী-র এক অংশ “নাখাস”* জীবজন্তু দাসদাসী বিক্রয়ের জন্ত নিদিষ্ট ছিল। এক সময়ে সাধারণ সম্ভ্রতিপন্ন লোকেরাও ইঁদ-মুরগী বেগুন-মুগার সহিত পয়সা বাঁচিলে বাঁদী খরিদ করিয়া আনিত। সুতরাং ঐ যুগে সচরিত্র, ধার্মিক বিদ্বান শাহজাদা দারার অন্তঃপুরেও রূপসী ক্রীতদাসীর অভাব থাকিবার কথা নয়। শাহী খরিদারের জন্ত অগ্রত সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান ছিল।

“কুখ্যাম্ হরস্তাপি পিণাকাপণে:—কামদেবের এই দস্ত চিরকালই বিজয়ী হইয়া আসিতেছে। যৌবনকালে দারার গায়ে দুই একটা “পুষ্পশর” সটকাইয়া পড়ে নাই, এমন কথা নহে। ম্যাক্সমী সাহেব লিখিয়াছেন, শাহ জাদা দারা নাকি “রণাদিল” নামী এক নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। শাহজাহান পুত্রের মতিভ্রম বুঝিতে পারিয়া কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। ইহাতে শাহজাদার স্বাস্থ্যহানি এবং ভাববিকার প্রকাশ পাইল— শুকাইয়া কাঠ না হইলেও “সন্তঃ সন্তঃ কনকবলয়ঃ” অবস্থা। অবশেষে শাহানশাহ নর্তকীকে বিবাহ করিবার অল্পমতি দিয়া পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। সেই যুগের দিনকাল, নৈতিক আবহাওয়া শরীরধারী জীবের শাশ্বত দুর্বলতার কথা বিবেচনা করিলে ম্যাক্সমী লিখিত এই কাহিনী অসম্ভব কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। দারার মত স্থপণ্ডিত ভাবপ্রবণ “স্ববোধ বালক” ফাঁদে সহজেই পড়িয়া থাকে। দারা অপেক্ষা শতগুণ দৃঢ়চেতা, নিত্য নমাজী, বিলাস ব্যসনে উদাসীন নাচ গান ললিতকলাব পরম শত্রু, “শুদ্ধকাষ্ঠ” তুল্য আওরঙ্গজেব পর্যন্ত যুগধর্ম্যে প্রেমের তুফানে হাবুডুবু খাইয়া ছিলেন—“অন্তে পরে কা থা?” জৈনাবাদী মহলের

* মুসলমান আমলে চারিটি বিবাহের চমৎকার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়; যথা আমীর খসরু বাণত খিজির খাঁর বিবাহ, ইবন-বতুতা লিখিত ইরাকের ভোগলকের ভগীর বিবাহ, মোগল ইতিহাসে শাহজাদা দারা এবং ইরাকের দাস-কৃত চাহার-গুলজার-ই-শুজাই গ্রন্থে নবাব সফদর জঙ্গের পুত্র শুজা উদ্দৌলার বিবাহ। মোগল সম্রাটগণের মধ্যে ফকরসিয়ার নিত্যন্ত অপদার্থ হইলেও খুব ঘটা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। শাহজাদাগণের মধ্যে শাদী উপলক্ষে দারার বিবাহে খরচ হইয়াছিল বত্রিশ লক্ষ টাকা; কিন্তু একশত বৎসর পরে নবাব-উজীর সফদর জঙ্গ পুত্রের বিবাহে ইহার প্রায় দেড়গুণ (৪৬ লক্ষ টাকা) খরচ করিয়া বাদশাহী শান মলিন করিয়া ছিলেন। পাগলা বাদশাহ্ মহম্মদ ভোগলকের ভগীর বিবাহে হামির ব্যাপার আছে। আকবানী দৈয়দ বলিয়া পরিচিত এক গৌরার আরবী “বদ্”-র (বেহুইন) সহিত তিনি হুলতান-পুত্রীর বিবাহ দিয়া জাতে উত্তিবার জন্ত উদ্গ্রোহ হইয়াছিলেন, “বদ্” বর হিন্দুস্থানী মতে দানে কচা গ্রহণ করিবে না; বিবাহ-বাসরে সে হঠাৎ আরবী কায়দায় বাঘের মত লাফ দিয়া কচা হরণ করিবার ব্যাপার অভিনয় করিয়া বসিল; শাহজাদার অবস্থা যেন বানরের গলায় মুক্তার হার। সে যুগের সামাজিক চিত্র অঙ্কনে এই সমস্ত বিবাহ বর্ণনা ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নহে। মোগলাই আমলের রসম-রেওয়াজের নমুনা, বাদশাহী শান-শোভার বলক দারার বিবাহে পাওয়া যায়। মহম্মদ সালেহ্ কাখো বার পৃষ্ঠার এক অধ্যায়ে দারার বিবাহের আয়োজন ও উৎসব বর্ণনা করিয়াছেন (আমল-ই সালেহ মূল পৃঃ ৫২২-৩৪)। বাদশাহ নামার বিবরণ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত (মূল পৃঃ ৪৫২-৪৬০)।

† শাহজাহানের অভিজাতবংশীয়া পূর্বকথিত তিন “বেগম” ব্যতীত দুইজন “মহল” বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী ছিলেন, নাম আকরবাবাদী-মহল ও ফতেপুর-মহল। দিল্লীর হুশ্রাসিক ফতেপুরী মসজিদ ও অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত আফবাবাদী মসজিদ এই দুই মহিলার কীর্তি নিদর্শন। ম্যাক্সমী সাহেব লিখিয়াছেন শাহজাহান নাকি মমতাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অষ্ট স্ত্রীর গর্ভে তিনি সন্তান উৎপাদন করিবেন না। তিনি বাদশাহের ঐশ্বর্য নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

* জাহাঙ্গীর, দিল্লী ও লক্কোর “নাখাস” বিশেষ প্রসিদ্ধ। লক্কোর “নাখাসে” আজকাল পাখীর বাজার বসিয়া থাকে। এখানে শকুন হইতে “বটের” [বাং-বাটুই?] সকল প্রকার চিড়িয়া পাওয়া যায়।

† Sarkar's History of Aurangzeb, vol. I. pp. 56-59
সারণ্য :- শাহজাদা আওরঙ্গজেব বুরহানপুরে তাঁহার বড় মাদার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেইখানে বাগানে বেড়াইবার সময় হীরাবাই নামী মাদার দাসীকে দেখিয়া তিনি “চম্পাহত” হইলেন—কেহ কেহ বলেন একেবারে “মুচ্ছা ও লভন”। হীরাবাই বোধ হয় ইতিপূর্বে মেসো খাগিল উল্লাকেও ধাক্কা করিয়াছিল, প্রথমে তিনি ছেলের বেয়াবদী গুনিয়া অগ্নিশর্মা হইলেন। যাহা হউক, মাদার ভাড়ায়া বৃদ্ধ বলিল উজার নিকট

প্রেমে পড়িয়া তিনি শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে চলিয়া-
ছিলেন; শরিয়ত উপেক্ষা করিয়া দারার অল্পগৃহীতা দাসী
সুন্দরী উদীপুরীকে তিনি অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন এবং
শরাব খাইয়া বমি করিলেও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাহার মোহ
কাটাইতে পারেন নাই।

১০

এই প্রসঙ্গে সমগ্রাঙ্কন ব্যাহত হইলেও দারা ও
নাদিরার সন্তানগণের জন্ম-বিবরণী নিয়ে লিখিত হইল।
(নাদিরা ব্যতীত অল্প স্ত্রীর গর্ভে দারার কোন সন্তান
জন্মে নাই)

(১) প্রথম কন্যা, জন্মস্থান আগ্রা; তারিখ রবিবার
১৯শে জানুয়ারি ১৬৩৪ খ্রি:।

জন্ম উপলক্ষে সপারিষদ সম্রাট দারার গৃহে নিমন্ত্রিত
হইয়াছিলেন। তিন মাস পরে রমজানের ঈদের দিন
(২১শে মার্চ, ১৬৩৪) এই কন্যার মৃত্যু হয়। সন্তানের
শোকে দারা লাহোর যাত্রার পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া
পড়িলেন। হেকিম উজ্জীর থাকে লাহোর হইতে শাহ-
জাদার চিকিৎসার জন্য ডাকা হইল। শাহী তাঁবুর নিকট
দারার তাঁবু খাটাইবার হুকুম হইয়াছিল। জাহানারা বেগম
দারার শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন; স্বয়ং বাদশাহ কয়েকবার
পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার রোগমুক্তির জন্য
ভিক্ষুক, ফকীর ইত্যাদিকে দান খরচাত করিয়াছিলেন।*

২। সুলেমান শূকো, প্রথম পুত্র, জন্ম শুক্রবার ২৭শে
রমজান, ১০৪৪ হিঃ (৬ই মার্চ, ১৬৩৫ খ্রি:), দিল্লী হইতে
আগ্রার পথে সুলতানপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ। আগ্রা শহরে
সুলেমানের জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্রাট এবং এক হাজারী
হইতে উর্দ্ধে সমস্ত মনসবদার ও আমীরগণ দারার প্রাসাদে
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।†

হইতে অনিচ্ছাকৃত উপহারস্বরূপ হীরাবাইকে পাইয়াও না পাওয়ার
উপক্রম। হীরাবাই তানা ধরিল শরাব না খাইলে শাহজাদার আজি
সজুর হইবে না। মোহ ঘনীভূত হইলে হারাম-হালাল, চেতন-অচেতন
জ্ঞান লোপ পায়। আওরঙ্গজেব অগত্যা শরাবের পেয়ালা মুখের কাছে
উঠাইতেই হীরাবাই খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। এই হীরা-
বাই ইতিহাসে জৈনাবাদী মহল নামে পরিচিত।

* বাদশাহনামা ১ম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৩, ৯, ১০

† এ " " " " ৭৩-৭৪, ৪৮৪-৮৫

৩। মেহের শূকো দ্বিতীয় পুত্র জন্ম বুধবার ২রা
রবিউল আউয়াল; ১০৪৮ হিঃ (জুলাই ৪, ১৬৩৮ খ্রি:)।
পরের মাসের ৯ তারিখ মৃত্যু।

৪। পাক-নিহাদ বাহু, জন্ম ২৯শে জমাদিউল আউয়াল,
১০৫১ হিঃ (২৬শে আগষ্ট, ১৬৪১ খ্রি:; বাদশাহনামা,
দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ২৪৫।

৫। মমতাজ শূকো জন্ম ৬ই আগষ্ট, ১৬৪৩ খ্রি:;
পাঁচ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

৬। সিপহর শূকো; জন্ম বুধসপ্তমিতবার ১১ই শাবান,
১০৪৫ হিঃ (৩রা অক্টোবর, ১৬৪৪ খ্রি:)।*

দারার প্রত্যেক সন্তানের জন্মোৎসবে সম্রাট তাঁহার
গৃহে পদার্পণ করিতেন, এবং উৎসবের খরচ বাবত দুই লক্ষ
টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইত।

৭। জাহান জেব বাহু }
৮। আমল উরিসা }

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ১৬৪৫ খ্রি: হইতে ১৬৫৮ খ্রি:
পর্য্যন্ত দারার জীবনের শেষ তের বৎসরে শাহজাদার কোন
সন্তান লাভের উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে
প্রকৃতই তাঁহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই হয়ত
এমন নহে। শাহজাহানের পুত্র চতুর্দশের গৃহে পুত্র কন্যা
“প্রবল বন্যা”র ন্যায় আসিতেছে দেখিয়া দরবারী
ঐতিহাসিক যেন পেরেশান হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।
দারার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই কন্যা জীবিত ছিলেন; এক
জনের নাম আমল উরিসা। আওরঙ্গজেব এই মেয়েটিকে
বিশেষ স্নেহ করিতেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ
আজমের সহিত দারার অনাথা কন্যা জানী বেগমের বিবাহ
হইয়াছিল। এই জানী বেগমই সম্ভবত: জাহানজেব বাহু।
দরবারী ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও দারার মৃত্যুসময়ে
এই দুই কন্যার বয়স হইতে প্রমাণিত হয় ইহারা সিপহর
শূকোর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ১০১, ১০৪

* বাদশাহনামা ২য় খণ্ড পৃ: ৩৮৮

নাভস

শ্রীবাণী রায়

মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করে উঠল। পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত শিহরিত হয়ে স্মৃতি জাগল। আহা, কি মধুর জাগরণ।

ছোট ভাইবোন আর ভাইপো-ভাইঝি খেলা করছে ছাদে বল নিয়ে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে ছোটদের নিয়মিত বৈকালে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোক নেই, অথচ একা রাত্তায় না ছাড়বার মত ভদ্রতাটুকু আছে। স্ততরাং অভাব বিস্ত্র বায়ু-সেবন ও ব্যায়ামের। তা পূরণের চেষ্টা হচ্ছে ছোটদের সকালে খোলা ছাদে পাঠিয়ে।

অসহ্য! এক মিনিট এ বাড়ীতে থাকা চলে না। সাত-সকালে তারই মাথার উপরে এই আক্ষালন। সারা রাত্রি ঘুম হয় না স্মৃতির, ভোরের দিকে যা একটু। তা-ও এইভাবে সমাধিগ্রস্ত হ'ল। ন'টায় হাজিরের খাতায় সইট কে করবে?

“উঃ, আঃ!” স্মৃতি হাত-পা ছড়িয়ে উঠে বসল। ইচ্ছা হচ্ছে ভাই-ভাইপো নিরীশেষে গলা টিপে ধরে গোলমালের মূলোচ্ছেদ করে দেয়। অথচ এদেরি সে ভালবাসে। সে ভাল-বাসার চিহ্ন এখন কোথাও নেই।

খাট থেকে পা নামাতে হঠাৎ আঁচলে খাটের বাজুর টান লাগল। এই সব প্রকাণ্ড ধেড়ে আসবাব এইটুকু পায়রার ধোঁপে যে মানায় না সে কথা পেনশনভোগী পিতা ছাড়া সবাই জানে। বড় বাড়ীর ভাড়া গুণবার ক্ষমতা না থাকলে এই মান্দাতা আমলের আসবাবগুলি বেচে ফেলা উচিত। ‘উচিত, উচিত, একশো বার উচিত!’ কথা কয়টি চাঁৎকার করে বলে ফেলে স্মৃতি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হ'ল। আড়চোখে পার্শ্বায়িতা পিসীর প্রতি চেয়ে মন তার আবার জলে উঠল।

এইটুকু ধোঁপে আবার ভাগীদার! সকাল সাতটা বেজে গেছে, বুড়ী টান হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখ। তার নিজের এখনই ট্রাম-বাস ধরবার জন্ত ছুটতে হবে হস্তদন্ত হয়ে, অথচ পিসীর মজা কি? অথবা মাটিতে পা বধে, কেসে, চুড়ি বাজিয়ে স্মৃতি নিরপরাধা পিসীকে স্মৃতিদ্রা থেকে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। কুস্তকর্ণের ঘুম ভেঙে পিসীর উঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ‘দিই একটা চিম্টি!’—হাতখানা বাড়িয়ে টেনে নিয়ে স্মৃতি ভাবল, সত্যি কি আমি পাগল হলাম নাকি? বিদ্রোহের সঙ্গে একবার পিসীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে অবশেষে স্মৃতি বেরিয়ে পড়ল।

‘Hail glorious sun!’—প্রতিদিন সকালে এই কথাটি স্মৃতির বলা চাই-ই। কেন যে, সে তা জানে না। কিন্তু, যেন না বলতে পারলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। আবার দরজা খুলেই সোজা স্মৃতি স্মৃতির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ

করবার আগে অস্ত্র কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেদিন তত ভাল কাটবে না বিশ্বাস আছে তার। দুঃখের বিষয় দরজা খুলেই আজ মাতার পেয়ারের ঝি স্মৃতির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিরক্ত মনটা বিষিয়ে উঠল স্মৃতির।

আজ কপালে কি আছে কে জানে? স্মৃতি বন্দনা করবার পূর্বেই দেখা হয়ে গেল শূদ্রাঙ্গীর সঙ্গে। হাত-মুখ ধুয়ে স্মৃতি চায়ের টেবিলে পৌঁছল। যথারীতি চা পাত্রের ঢেলে রাখা হয়েছে—কার্তিকের হিমেল বাতাসে সে চা শৈত্যময়। কত দিন বলেছে সে বৌদিদেরকে তার চা-টা ট-পটে উলুনের ধারে রেখে দেবার জন্তে। কথাটা কানে যায় না শ্রীমতীদের।

চা-গরম করা চলে না। স্ততরাং ঠাণ্ডাজল চা খেয়ে স্মৃতি মুখ ধুলল, “এর চেয়ে জল খাওয়াও ভাল। কাল থেকে তাই খাব। এত কষ্ট করে আমার জন্তে চা করতে হবে না কারোর। হাজির বার বলেছি— নাঃ, চা খাওয়া ছাড়ব কেন? নিজে রোজগার না করলে যখন এক দিনও চলবে না, তখন রোজগারের রসদ চাই। চা, চিনি, জমানো দুধ নিজেই এনে রাখব—”

মা একটু অপ্রতিভ হলেন,—“ও বোমা, আর এক কাপ চা করে দাও না স্মৃতিকে। সত্যিই ত এখনই সারাদিনের মত চলে যাবে।”

মেজবৌদি ততোধিক অপ্রতিভ হয়ে চা করতে গেলেন। উলু বন্ধ ছিল, একটু দেরি হ'ল।

ততক্ষণে স্মৃতি নিজের ‘ধোঁপে’ ফিরে গেছে। চুল খুলে তেল দিতে গিয়ে দেখে তেল নেই। শিশিটা আঁছড়ে ফেলে দিল স্মৃতি—আর সহ্য হয় না। কেন জানি না, আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। কাল আপিসে যাবার মুখে বেশ মনে করে গিয়েছিল তার বিশেষ তেলটি কেনবার কথা। ঐ তেল ভিন্ন চুল থাকে না তার মাথায়। কিন্তু পাঁচটার পরের অসম্ভব ভিড়ে-ভর্তি ট্রাম-বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল না যে বাড়ীতে কোনমতে পৌঁছনো ছাড়া অস্ত্র কিছু তার করবার আঁই। আজ দু' বছর বি-এ পাস করে সে কাজ করছে, সাথে নয় বাধ্য হয়ে। সংসার সকলের রোজগার দিয়ে কোন মতে চলে।

কবে এ জোয়াল থেকে মুক্তি আসবে? কবে ভিড়ে ঠেলা-ঠেলি করে ট্রামে-বাসে ছুটাছুটির বদলে সে ঘরে বসে চায়ের কাপ হাতে আরামে নভেল পড়তে পারবে বান্ধবী মণির মত। হয় মণিমালিকা, মেয়েদের বিবাহের প্রয়োজন তুমি বুঝতে পার না। জমিদার-হুঁহিতা তুমি, ইচ্ছামত জীবন যাপন করবার বিলাসিতা পেয়েছ; বোঝ না কেন যেন-তেন-প্রকারেণ বিবাহ

সাধারণ মেয়েদের ঈঙ্গিত। মণিমালিকা, তোমার কণ্ঠসঙ্গীতে বাংলাদেশ আজ বিমুক্ত। নতুন যশের সন্ধানে শীতাই সাগর-পারে যাচ্ছে তুমি। বৈচিত্র্যহীন, অভাবগ্রস্ত জীবন তুমি জানবে কি করে?

কিছুই পারি না কেরানীগিরি ছাড়া। মাতার নারিকেল তেল মাথায় মাখতে মাখতে স্মৃতি দেওয়ালে-টাঙানো আয়নার দিকে তাকাই। এই কি সে? রক্ষ, কর্কশ মুখভাব, বিবর্ণ চামড়া। সারামুখে অতৃপ্তি, হতাশা মাখানো। এই কি সে স্মৃতি দত্ত, যাকে দেখে সুরীর কবিতা লিখত। যাক, ও নাম আর কেন? ক্ষণিক বিবাদভাবটা কেটে গেল দড়াম করে স্নানাগারের দরজা বন্ধের সঙ্গে। মেজদা ঠিক চুকেছে, এখন আধঘণ্টার আগে বাথরুম পাবার উপায় নেই। মেজদার হাজিরে দশটায়, কিন্তু রোজ স্মৃতির আগে বাথরুমে যাওয়া চাই। রাগে পাগলের মত স্মৃতি দরজায় বা দিতে লাগল, “বেরোও শিগগির, বেরিয়ে এস বলছি। আমার দেরি হয়ে যাবে।”

“আঃ, কি বিরক্ত করিস? মেয়ে যেন ধোড়ায় চড়ে এসেছে।—” মেজদার আত্মপ্রীত কণ্ঠ শোনা গেল। কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার ভিতর-বাহিরে বিতণ্ডার পরে স্মৃতি বাথরুমের অধিকার পেল।

ঘরে ফিরে এসে চুল বাঁধতে গিয়ে নিজেরই আছড়ে ফেলা শিশির কাঁচ ফুটে গেল পায়ে। “উঃ”—সহসা চিন্তামগ্নচিত্ত দৈহিক বেদনায় চমকিত হয়ে উঠল। গায়ের জোরে নিজের পায়ে চপেটাঘাত করে স্মৃতি টেনে খুলতে বসল কাঁচের টুকরো। নিজের ওপর করুণায় চোখে জল এসে গেছে তার। আর পারে না সে, আর পারে না প্রতিমুহুর্তে ভাগ্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে চলতে।

ঠক, ঠক। চমকে আবার শিউরে উঠল স্মৃতি। তার ভাইঝি রুণু একটা ছড়ি দিয়ে ক্রমাগত চেয়ারের হাতলে আঘাত করে যাচ্ছে খেলাচ্ছলে। নিজেকে সংবরণ করতে পারল না স্মৃতি। প্রতিটি শব্দ তার মস্তিষ্কের কোষে আঘাত করে স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। রুণু কচি গালে পিসীর পাঁচ আঙুলের ছাপ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করতে গেল মায়ের কাছে। পরক্ষণেই কলহপ্রিয় বড়বোদির বায়স কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, “বাচ্চা মেয়েটাকে মেরে রাগ দেখানো কেন? আঙুলের দাগ কেটে বসেছে দেখ। এমনই করেই মারতে হয়।—”

কি ছোটলোক বউটা! নিজেকে ছেলে-মেয়েদের ঠেঙাতে ঠেঙাতে আধমরা করে ফেলে, কিন্তু অল্প কেউ কিছু বললেই কোমর বেঁধে তারস্বরে টেঁচায়। হায় ভগবান, এত গৃহ নয়, নরক। অসহায় ক্ষোভে স্মৃতি ঘুমি পাকিয়ে হাত মুঠো করল। আয়নার পাশে বড়বোদির হাত-রত প্রতিমূর্তির উদ্দেশে সে হাত ধানিকটা উঠেই শিখিল হয়ে

গেল। আবার আয়নার মাধবী নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছে। ক্রোধে ঘৃণায় বিরক্ত, কদর্য মুখ। এ কি সেই স্মৃতি দত্ত, সুরীর যার ছবি এঁকেছিল।

দিনের শেষ। চলন্ত ট্রামের দোহুলামান লোকগুলির দিকে চেয়ে স্মৃতি নিশ্বাস ফেলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে যদি একটু স্থান পাওয়া যায়। দাঁড়াতে সে কাতর নয়, উঠতে পারলেই হ'ল। ট্রাম এসে ধামবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান জনপ্রবাহ যেন পাগল হয়ে ওঠে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে যারা শান্তশিষ্ট ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাদের অশোভন ব্যস্ততা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। তৃতীয় ট্রামের পেছনে কিছুক্ষণ ছুটে স্মৃতি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়াল। তার আপিসের এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেনো ক্রমেন জল-কেটে-চলা মাছের মত লোকের স্রোত কেটে উঠে পড়ল। উঠতে পারল না সে-ই। আজ সারাটা দিন লাঞ্চ না খেয়ে কাটল। ভারি লাঞ্চ খায় সে। ‘লাঞ্চ’ মানে চমৎকার কিছু নয়—টিনের কোটোয় বাড়ী থেকে বয়ে-আনা দালদায় ভাজা ঠাণ্ডা লুচি-পরোটা, কিছু তরকারি। কোন দিন বাস্কে খুলে দেখা যায় শাক-পাতার চচ্চড়িও আছে। দুর্লভ দিনে মাঝে মাঝে ভাল কিছুও থাকে, যেমন পরশু দিন ‘মনোহর’ সন্দেশ ছিল। বড়দি স্বস্তুরবাড়ী জনাই থেকেই পাঠিয়েছিল। নইলে স্মৃতির পক্ষে লাঞ্চ কেবলমাত্র নামেই সুন্দর। আজ বড়বোদির উপরে রাগ করে ধাবারের কোটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে চলে এসেছে। বাড়ী ফিরলে হয়তো সেই খাবারই খেতে হবে। পেটের মধ্যের নাড়ি বিতৃষ্ণায় মোচড় দিয়ে উঠল। গা বমি-বমি করছে কেন? আশ্চর্য, সারাদিন প্রায় উপবাসে কাটিয়েও এমন অরুচির ভাব হয়। অস্থির ভাবে স্মৃতি পায়চারি করে বিতৃষ্ণ ভাবটা দমন করতে চেষ্টা করল। পার্কের গাছের দিকে চেয়ে, এসপ্লানডের সাজানো দোকান-গুলোর দিকে চেয়ে স্মৃতি অতমনস্ক হবার চেষ্টা করল।

পায়চারি করবার উপায় নেই, লোকের গায়ে গা লেগে যায়। নিরুপায়ভাবে স্মৃতি আবার নেমে দাঁড়াল। সহসা একটা উপায়হীন তীব্র ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তারই মত সব কেরানীর পাল। ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে, যেন সভাপতিত্ব করতে হবে, যেন পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে। এক মিনিট দেরি সয় না, অসম্ভব ভিড় হলেও ঠেলে ঠেলে উঠবেই। যেন ট্রেন ফেল হবে। নরাকার জন্তু সব। এখনই যদি পুলিশের গুলি চলে, এরা যে যেখানে আছে সে সেখানে ধপ করে পড়ে মরে, বেশ হয়। বেশ হয়। বেশ হয়। স্মৃতি দাঁতে দাঁত পেষণ করল। কেন এরা বেঁচে আছে? কিসের লোভে, কিসের আশায় এরা পৃথিবীতে অপদার্থের দল বাড়িয়ে চলেছে? সহস্র সত্তা হয়ে স্মৃতি এদের গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়।

স্মিতার অসংখ্য শত্রুর মধ্যে এরা একজন। এদের জন্ত সে ট্রামে উঠতে পারে না, আরাম করে ঠপেজের কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না। এদের উৎপাতে সে পায়চারি করে বিব-মিষাকে দমন করতে পারছে না। গাওয়া খিতে ভাজা গরম লুচি আর মাংস আজ সে খাবে। যেমন করে হোক খেতেই হবে, খেতে পারলে নিশ্চয় তার ভাগ্যে একটা ভাল কিছু হবে। আঃ, যেন মুখের মধ্যে মাংসের ঝালের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, যেন লুচির সুগন্ধ নাকে ভেসে আসছে। আজ সে বাড়ী ফিরে গরম লুচি-মাংস খাবেই। নিশ্চয় মা আপত্তি করবেন—‘মাংসের যা দাম বাবা। গাওয়া খি-ই বা কোথায়?’ আবার মনে মনে স্মি জলে উঠে মাকে গালাগালি দিতে লাগল, ‘আমার বেলাতেই না। ছেলেরা বললে তো তখনই হয়। কেন আমি কি সংসারে টাকা দিই না? কত লাগবে দিচ্ছি। আমি আজ লুচি-মাংস খাবই।’ চমকিত হয়ে স্মিতা দেখল সে হাতব্যাগ খুলে টাকার চামড়ার থলেটা বের করে ফেলেছে। অপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ বন্ধ করে একবার চারপাশে তাকাল সে। কেউ দেখে নি তো? হায়, তার একটু নিভৃত চিন্তার অবকাশও নেই।

এবারের ট্রামে উঠে একটু বসবার স্থান পেলে স্মিতা। বিপর্যস্ত বেশভূষা সামলাতে সামলাতে পাশের ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। কি মোটা! বেকের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে হাত-পা এলিয়ে বসেছে দেখ। নূতন লোক এলে একটু গুছিয়ে বসে সে জায়গা করে দেবে সে জান নেই। মহারাগী অফ ক্যালক্যাটা। গায়ের সঙ্গে ভদ্রমহিলার স্থূল বাহু ঠেকছে। কি অসম্মত! এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব নাকি? প্রাণপণে স্মিতা আত্মসংবরণ করে বাইরে তাকাল।

বমেনেছা কেটে গেছে, কিন্তু মাথাটা ধরে উঠেছে সাং-ঘাতিক ভাবে। হঠাৎ বাঁ-হাতটা ধর ধর করে কেঁপে উঠল। হাতের দুটো আঙুল অথ আঙুলের থেকে বিভিন্ন হয়ে টিক-টিকির কাটা ল্যাজের মত লাফালাফি করতে লাগল। কি যে হয়েছে স্মিতার।

পেছন থেকে কে যেন তার গায়ে হাত দিল। কি আশ্চর্য, খুন করে ফেলব। বাড় ফিরিয়ে কিন্তু দেখা গেল, বছর দুইয়ের একটি বাচ্চা এক ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কোল থেকে তার কাপড় ধরে টানটানি করছে। মেহ হ’ল না, হ’ল বিরক্তি। তার মত একটি ভদ্রমহিলার কাপড় ধরে টানবার অপরাধে ঝি-টার কোন শাসন নেই। আবার এক টান। অতি বিরক্তিতে ত্রুটি কৃত করে স্মিতা বলে উঠল, “আঃ!” ফলে থোকার খেলার প্রবৃত্তি প্রশমিত হ’ল।

আবার মোটা মহিলার কনুয়ের খোঁচা লেগে গেল। গা শিরশির করে উঠল স্মিতার। আর সামলানো যায় না। ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে স্মিতা একটি শব্দ ঠেলা দিল। ভদ্র-মহিলা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

সহসা স্মিতার মন বেদনায় মুহমান হয়ে পড়ল। সারা-দিন আপিসে কেটেছে কত দুঃখে। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। নিষিদ্ধ মুখ দেখে সকালে শোবার ঘরের দরজা সে পেরিয়েছে, স্বর্যাকে অভ্যর্থনা করতে পারে নি। এত জানা কথা যে আজকের লাঞ্ছনা তার ললার্ট-লিখন। পাঞ্জাবী বসু ঘরে ডেকে নিয়ে চাপাসুরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করেছে। যে চিঠিখানাই সে লিখবে সেখানাতেই গোটা চারেক ভুল বের করে স্রীমান নিজের মুকুবিয়ানা দেখাবেন। ‘হাপি’ শব্দ কেটে ‘প্লাড’ বসিয়ে, ‘অ্যাও’-এর বদলে ‘অল্‌সো’ দিয়ে দেখানো চাই যে তিনি খুব জবরদস্ত ওপরওয়াল। বিছায় তো বৃহস্পতি, চাল দেখে মনে হয় চার্টার্ড-হিটলার-ট্রুম্যানের মিশ্রণ। মিশ্র যোগ। সাধারণ ইলেক্ট্রিক পাখা সংক্রান্ত চিঠি নিয়ে-সে কি টাই ধরে টেনে, চুলে হাত বুলিয়ে, পেন্সিল টেবিলে ঠুকে, ছাদের দিকে চোখ তুলে আলোচনা! যেন শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির ব্যাখ্যা হচ্ছে। কেন ওর কিছু হয় না, ঐ ধ্যাবড়ানো মুখ, চ্যাপ্টা বাংলা পাঁচের? আজ অবশ্য এ তিরস্কার স্মিতার পাওনা ছিল। কষা অক্ষের উত্তর মিলে যাওয়ার নিশ্চিততায় স্মিতা চোখ তুলে সামনে তাকাল। সে জানত আজ এ তার পাওনা ছিল।

চোখের পাতা কেঁপে উঠল হঠাৎ। মেয়েদের বাঁ-চোখ নাচা ভাল, তার কপালে নাচল ডান চোখ। কল শুভ নয়, প্রমাণ—“প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।” তার ফলে মেঘনাদের মত স্বামীরা মাথা খেল প্রমীলা।

কানের কাছে বন্ বন্ করে মিলিটারি লরি চলে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে শব্দে। এদিকে গা ঠেসে মুটকী বসেছে দেখ। যেন আমার শরীরট কুশন-চেয়ার। হাত জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে স্মিতা সংযম অভ্যাস করতে লাগল। যাক, ‘মহারাগী অফ ক্যালক্যাটা’ এতক্ষণে নেমে গেলেন।

থেকে থেকে চোখ নাচতে লাগল। উঃ, কি খিঁদে পেয়েছে। সেই ফেলে আসা ঠাণ্ডা পরোটা ও চচ্চরি উপ-করণের জন্ত মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যাহা পাই তাহা খাই। কিছু পেলেই হবে। ফেলে-আসা খাবারই তার।

বাড়ীর মোড়ে নামল স্মিতা। একটুক্ষণ হাঁটতে হবে। বাড়ী ফিরে দেখা যাবে নিদারুণ দিনের নিশ্চয় কোন নিদারুণ সমাপ্তি প্রতীক্ষা করে আছে নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যৎ দুঃখের চিন্তায় স্মিতার গলার কাছে যেন শব্দ একটা পাখির উঠে এল।

আচ্ছা, কি হ’ল তার? কখনও রাগ, কখনও দুঃখ! যে কোন একটা শব্দ কানে গেলে মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে। কি হ’ল আমার? কি অদ্ভুত লাগছে।

‘নার্ভস্!’ ঠিক, পিসতুতো ভক্তারদাদা বলেছেন স্মিতার নার্ভের অবস্থা সঙ্গীন। স্নায়বিক গোলযোগ তা হলে এই

হাসিকান্নার - কারণ। তাই তো নভেলের নায়িকার মত
ছুরোধ্য ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। সত্যি, আধুনিক লেখকেরা
ত এইভাবেই নারীচরিত্র আঁকেন আজকাল, ধরা-ছোঁয়া যায়
না। তা হলে সবাই কি নার্ডের ব্যারামে ভুগছে, একটিও
স্বস্থ-স্বাভাবিক নায়িকা নেই? কিন্তু লেখকেরা জানেন কি
যে তাঁরা রোগগ্রস্ত নায়িকার চিত্র অঙ্কিত করছেন। যদি
তা জানবেন তবে 'নেতি-নেতি' ভাব কেন? দৃঢ় তুলির আশ্র-
নিশ্চিত টান কোথায়?

আধুনিক লেখকদের মুণ্ডপাত করতে করতে স্মৃতি বাড়ী
এল। রকের ওপরে যথাক্রমে ছেলেমেয়েরা ফেরিওয়ালাকে
ডেকে বেসাতি নাগিয়েছে। দারুণ বিরক্তিতে স্মৃতি সদর
দরজা পার হ'ল। সামনেই মার-খাওয়া রুণ। লাকাচ্ছে

দেখ? লজ্জা নেই।—“পিত্তি তোমাল তিথি। মন্ত তিথি।
তিকিত আমি তাই।”

এ কি? চিঠি। চিঠি। স্মৃতির চিঠি। স্মৃতির তাকে
ভোলে নি। রুণের হাত এড়িয়ে মাধবী ধরে এসে চিঠি পড়ল।
‘কায়রো থেকে স্মৃতির রওনা হয়েছে—ভারতবর্ষে প্রথম মুখ
সে দেখতে চায় স্মৃতির। আঃ।

খাটের ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল স্মৃতি। কি স্মরণ
এই খাটখানা। বড়বৌদি কি ভাল। বিছানা পেতে
রেখেছে।

ঠক, ঠক, ঠক। ছেলেমেয়েরা ছাদে উঠে গেছে। নিয়মিত
খেলা করছে তারা। স্মৃতি স্নেহের হাসি হাসল—কি
সজীব ছেলেমেয়েরা।

ঋতু-চক্র

শ্রীজীবনময় রায়

গ্রীষ্ম

কণ্ঠে জড়িয়ে বেলফুলহার, চুতমঞ্জরী কর্ণে,
মরুপ্রান্তরে বহিতুফান তুলি পিঙ্গল বর্ণে,
কালবৈশাখী মহাজট শিরে ঘুরিয়ে বজ্র অসি,
আমি বৈশাখ রুদ্রনৃত্যে ঋতুর চক্রে পশি।

বর্ষা

ঘন ঝরনীর | জলদবরণ | জড়িয়ে,
কদম্ব রেণু | বন পথে পথে | ছড়িয়ে,
কেতকী কুসুম আমি বিহ্বৎপর্ণা ;
ভুবন-প্রাবন ঝরাই ঝরকা-ঋণা।
উমরুছন্দে মাতি আনন্দে ঢাকিয়া স্বর্ঘ্য শশী,
বরষা আমি সে ভৈরব নাটে ঋতুর চক্রে পশি।

শরৎ

প্রভাত রবির কিরণেতে অবগাহিয়া,
লঘুভার মেঘ-শুভ্র ভেলাটি বাহিয়া,
সুনীল মানসসরসী পদ্মবনে,
চলেছি ভাসিয়া দিগন্তে আনমনে।
কুসুমিত কাশপুষ্পবসনা বাল্য,
কবরীতে মোর ফুল শেফালী মালা,
স্বর্ণ-বীণা কোলেতে লইয়া বসি,
আমি শারদীয়া বীণা ঝঙ্কারে ঋতুর চক্রে পশি।

হেমন্ত

কুহেলী-ধূসর অবগুষ্ঠনে ঢেকেছি আননখানি,
অক্রসজল আঁখি ছলছল কণ্ঠে নীরব বাণী ;

দিগন্ত ভরি শশ্বে শিহরি বায়ু ওঠে নিঃশ্বসি—
আমি হেমন্ত গোপনপঙ্খ ঋতুর চক্রে পশি।

শীত

আবরিয়া তম্বু—অবনত ধনু—তুষার আচ্ছাদনে,
ঝরানো পাতার পথে চলিয়াছি কঙ্কালময় বনে।
ঘোবন আজি মিলাল স্মৃতির কুহেলী অন্ধকারে
গোলাপের রাঙা স্বপনের মাঝে রেখে গেছ আজ তারে।
রহিয়া রহিয়া তবু ক্ষণে ক্ষণে কেন হায় বারে বারে,
নবজীবনের সৃষ্টির ধ্যান বুক উঠে উচ্ছ্বসি।
আমি হিমঋতু জরতীর বেশে ঋতুর চক্রে পশি।

বসন্ত

কন্দমাধবীশিরীষ কুসুম হারে
সাজিয়া এসেছি পুষ্প-অলঙ্কারে
কোকিলকণ্ঠে বকুলগন্ধে আবুল কানন বীথি,
হৃদয় ক্ষরিত্য কণ্ঠ ভরিয়া এনেছি মিলন-গীতি।
দক্ষিণা বায়ে বাসন্তী বাস আকাশে উড়িছে খসি,
আমি মাধবিকা ললিতনৃত্যে ঋতুর চক্রে পশি।

[আবৃত্তি ও বাজের তালে সকলের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য]

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিমালী, শীত বসন্তাবর্তে,
দিবস-রাত্রি, যুগল চরণে ঘুরে ঘুরে আসি মর্ত্যে।
মোরা অমা-পূর্ণিমা যুগল অঞ্চে বর্ষ-চক্রে ফিরি,
পথে ছায়া-আলোকের চামর দোলায় উদয়-অস্তগিরি।
মোরা চির পুরাতন নবীনের বেশে বার বার ফিরে আসি,
মোরা ধরণীর যাকে বিচিত্র সাজে ফুটাই কান্না হাসি।

বাংলায় গদ্য-কবিতার সূচনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় গদ্য-কবিতার সত্তাবনা সম্বন্ধে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথম সচেতন হন। তিনি ১৯১১ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৪) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ‘আর্য্য-দর্শন’ পত্রে “বর্ধার মেঘ” নামে একটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেন। কবিতাটির শেষে একটি পাদটীকা আছে, তাহা এইরূপ :—

“যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্কজিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটী নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।”

রাজকৃষ্ণের লিখিত “বর্ধার মেঘ” কবিতাটি আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

বর্ধার মেঘ

(পদ্যপৌঙ্কজিক পদ্য-গদ্য)

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।
দক্ষিণদিক্শোভিনী দিগন্তনার অঞ্জলি হ’তে
ধীরে ধীরে বায়ু-শ্রোতে
একখানি স্বপ্ন মেঘ ডাসিয়া আসিল।
স্বপ্ন মেঘ বলিলাম কেন ?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ভায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তন্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অল্প কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
‘নাই’ বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে ?—
মহান্ কে ?
তা কি জ্ঞান না ?—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

২.

এ কি হ’ল ?

এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে

ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ’ল।

বামনমূর্তি বিরাটমূর্তিতে পরিণত হ’ল।

অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়।

বুঝিয়াছি—

জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয়।

ক্ষুদ্র কেন হইবে ?

যিনি জগতের অষ্টা,

তিনি ক্ষুদ্র হইলে

জগৎ, জগদ্বাসী প্রাণী অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,

সুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয়।

যাহাকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পরমাণু বলে

তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে

দেখা যায় না—বোঝা যায় না,

আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে।

তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে

পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।

কিন্তু আমার বিবেচনায়

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত ;

নহিলে এমন কথাও কি বলে ?

কি আশ্চর্য্য !

সকলের চেয়ে পরমাণু ক্ষুদ্র।

পরমাণু সর্বক্ষুদ্র হ’লে

সর্ববৃহৎ কে ?

৩

ভাই বৈজ্ঞানিক।

একবার বেস্ ক’রে ডেবে দেখ দেখি,—

তোমার বিজ্ঞানের পুঞ্জীপাটী কি লইয়া ?

পরমাণু লইয়া নয় ?

তোমার স্বর্ঘ্য কি ?

চন্দ্র কি ?

বৃহৎ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি ?

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনাস্ কি ?

বিশ্বসংসার কি ?

ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তার পর ব্রহ্মাণ্ড—

এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন্ মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে
এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি প্রেমের অঙ্ক কসিতে খুব মজবুৎ ।

ভাই, তুমি কি জান না,
যাদের সংযোগে বা একতায়
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,
তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর ।
ও একই কথা—যে ঈশ্বর সেই পরমাণু ।

এই কবিতা প্রকাশের অল্প দিন পরেই রাজকৃষ্ণ রায়
নাটকেও পদ্যপৌণ্ড্রিক গদ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন,—
সে-কথা গত বারে বলিয়াছি ।

হুগলী

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না ; হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্বাহ করিত । সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পৰ্তুগীজ বণিকদের যত্নেই এই শহরের পত্তন হয় ; পৰ্তুগীজগণ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোলাঘাটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হইয়াছে । ভাগীরথী তীরবর্তী যে সমস্ত স্থানে ইউরোপীয় বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই স্থানট সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । পৰ্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত হইবার পূর্বে ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল ।*

হুগলী নামটি পৰ্তুগীজদের দেওয়া নাম ; তৎকালে ভাগীরথী-তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে ।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্রাদিতে হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে ; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে যে হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় নু ।

সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের তিন কোশ দূরে দামুড়া গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পার্শ্বে ত্রিবেণী এবং ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিকা প্রভৃতির উল্লেখ আছে ; কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই । ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার সময়ে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না ।

* এই প্রবন্ধের আলোক চিত্রগুলি শিল্পী শ্রীবিষ্ণুপদ কর কর্তৃক গৃহীত ।

বঙ্গদেশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পৰ্তুগীজগণ সর্বপ্রথম বাণিজ্য বিস্তার করে ; সেই সময় ভাগীরথীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ আনিবার সুবিধা হইত না বলিয়া তাহারা মুচিখোলার নিকটে জাহাজ নোদ্বর করিত এবং তথা হইতে ছোট ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিত । ইহার কিছুদিন পর হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী নদীর খরশ্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও যুতকল্প হওয়ায়, সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করা পৰ্তুগীজদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে । সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বিস্তার করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রায়ো নামক জনৈক পৰ্তুগীজ হুগলীতে একটুও জমি ক্রয় করেন । সেই সময় সম্রাট হুমায়ুন শের-সাহের সহিত যুদ্ধে ক্যাপ্ত থাকায় ক্যাপ্টেন টাভাস এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন । পৰ্তুগীজদের এই নূতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবতীয় বাণিজ্য সেইজন্ত এই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল ।

বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র “দিগ্दर्শন” নামক মাসিক পত্রে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রধান নগরগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; নিম্নে উক্ত পত্রিকা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ।

“হুগলি শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে

সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।” (দিগদর্শন, ৫ম ভাগ আগষ্ট ১৮১৮)

মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ছিল এবং অনার্য রমণীগণের নৃত্যসহকারে গানের সময় তৎকালে হুগলী নামের উল্লেখ করা হইত। নাগর, বাহুক, টাই, কোচ, পলে প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ মধুর কণ্ঠে আজ্ঞা এই “লাচারি” গাহিয়া থাকে। উক্ত গানের দুইটি পঙ্ক্তি শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত মালদহের পল্লীভাষা হইতে উদ্ধৃত হইল—

“হুগলি সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।

আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি ॥”

—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ১৭৬

পর্তুগীজদিগের ‘গোলিন’ (Golin) নামক উপনিবেশের মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাঙেল, পিপুলবাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই ‘ব্যাঙেল’ নামটির উৎপত্তি হয়। পর্তুগীজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই স্থানে তাহারা সর্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহারা সপ্তগ্রামের কোজদারকেই অমাত্য করিত।

স্বর্গাট আকবর পর্তুগীজদিগকে সুনজরে দেখিতেন বলিয়া তাহাদের ওষ্মত ও দুর্ব্বৃত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যাচার করা হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ‘আইন-ই-আকবরি’ পাঠে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক কোশাঙ্গ ব্যবহৃত দুইটি বন্দরই কিরিদিদের হস্তে ছিল।

ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণের সহিত ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অথবা অন্টার উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নবাবের বিনা অনুমতিতে গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থান করায়, প্রত্যেক নৌকার যাতায়াতের সময় শুক আদায় করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যবসা করিত এবং হুগলী ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের গৃহে অগ্নিদান করিত। নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম্ম করিতেই তাহারা পরাশ্রুত ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে প্রজাবন্দ ‘ক্রাইট্রাই’ ডাক ছাড়িত এবং ‘মগের মুলুক’ নামক সুণিত কথা তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাগীরথীতে দস্যবৃত্তি করিত বলিয়া তৎকালে ভাগীরথীর নাম ‘দস্যু-নদী’ (Rogue’s River) ছিল, কর্ণেল ইউল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। Hedges Diary, Vol. III, Page ২০৪.

পর্তুগীজগণ হুগলী ও বঙ্গের অন্টার স্থানে প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এইরূপ অর্থ ও আধিপত্য ও দস্যবৃত্তি করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, জী-পুরুষ, বালক-বালিকা যাহাদের পাইত তাহাদের নৌকায় তুলিত; নৌকায় তাহাদের হাতের ‘চেটো’ ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রমধ্যে বেত ঢুকাইয়া নর-নারীকে শুপাকারে

নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগীকে ধান দিবার মত তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। পর্তুগীজদের আগমন-সংবাদ পাইলে পাছে তাহারা কুলে নামিয়া উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কুলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীগণকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1907, P-402)

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উত্তরকালে সম্রাট শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা মাইকেল রড্রিকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রড্রিক তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করেন এবং এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে শাহজাহান তাহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহযোগী মমতাজ বেগম পৌত্তলিক পর্তুগীজদিগের উপর বিশেষ ভাবে বিরোধপরায়ণ ছিলেন। যাহা ইউক, শাহজাহান বঙ্গের শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় পর্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি সন্তোষিত হইয়া যান। পরে পিতা-পুত্রে মিল হইয়া যায়।

পরবর্তী কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি পর্তুগীজদের অত্যাচার দমন করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং বঙ্গের শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পর্তুগীজদের দূরীভূত করিবার আদেশ দেন। কাশিম খাঁ বিশেষ সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করিতে তাঁহার সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিলে মোগলেরা পর্তুগীজদের প্রধান আড্ডা হুগলী দুর্গ দখল করে। বিজিত পর্তুগীজগণ কেহ মোগলের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে গঙ্গায় অবস্থিত তাহাদের জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গঙ্গায় পর্তুগীজদের একখানি বড় জাহাজে দুই হাজার নরনারী বহু ধনরত্নাদিসহ উক্ত জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহারা আগুন দিয়া নিজেদেরই জাহাজখানি পুড়াইয়া দেয়। চৌফটখানি বড় জাহাজ, সাতারখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুই শত ছোট জাহাজের মধ্যে মাত্র একখানি মাঝারি ও দুইখানি ছোট জাহাজ মোগলদের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিল। সাড়ে চার হাজার পর্তুগীজ নরনারী ও বালকবালিকা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহ ও ওমরাহদিগের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী অধিকার করিয়া মোগলেরা এই স্থানে একজন 'ফৌজদার' * নিযুক্ত করেন এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জলদস্যু মগদিগের আক্রমণ হইতে হুগলী বন্দর রক্ষা করিবার জন্ত হিজলীতেও একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. III, Page 200)। পর্তুগীজদের নির্মিত দুর্গ হুগলী আক্রমণের সময় মোগলরা ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেন্দ্রা নির্মাণ করেন।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও জলে দস্যুশক্তি পর্তুগীজদিগের কলঙ্ক বলিলে অত্যাচার করা হয় না। তাহারা বণিক বেশে এই দেশে আসিয়াছিল; উদ্দেশ্য এই দেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। বহু বৎসর যাবৎ তাহারা বাণিজ্য কার্যে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত দুইটি কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এমন কি তাহাদের রক্ত পর্যন্ত অত্য়পি বঙ্গদেশে বিচলমান, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পর্তুগীজশক্তি এই স্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার পর বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের ভাষা অত্যন্ত ইউরোপীয় জাতিদের 'কথ্য-ভাষা' (Lingua-Franca) বলিয়া পরিগণিত ছিল।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী রাজ্য মোগল কর্তৃক অধিকৃত হয়; উক্ত রাজ্যের ভায়সপ্ত অধিকারী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজদার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজ্যকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। হুগলীর ফৌজদার সেইজন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক "Zeevoogd" নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং হিজলীর শাসন-ভারও তাঁহার অধীনে জনৈক 'ক্ষুদ্র-রাজ্য' (Lesser Chief) উপর হস্ত হইয়াছিল। (Valentin's Memoirs to Von Den-Brooke's Map. Page 158)

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্যন্ত না নিজেদের নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ হুগলী বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্প্রশালী হইয়াছিল। মোগল শাসনকর্ত্তা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন। সুলতান সুজার রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে 'ফারমান' লইয়া ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং বঙ্গে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন। বঙ্গের

সুবাদারগণের অমুগ্রহে-পূজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ হুগলী পর্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্ত জাহাজ আনিবার অমুমতি পাইলেন। ইহার পূর্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন সম্রাট শাহজাহানের কন্ঠার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিলে, সম্রাট ডাক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশে হিতৈষী ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন পুরস্কারের পরিবর্তে বিনা মাশুলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অমুমতি চান এবং সম্রাট সেই অমুমতি দান করেন। তারপর কি ভাবে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া 'রাজদণ্ড' গ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ইংরেজ বণিকের সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হুগলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ এই স্থানেই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠী নির্মিত হইয়াছিল।

কলিকাতা স্থাপনিতা জব চারণক প্রথমে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে জব চারণকের সহিত দেশীয় ব্যক্তিগণের নানা কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণের বিশেষ অমুবিধা হইতেছিল এবং মোগলের সহিতও ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল না। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই সমীচীন মনে করেন। যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্বে মাদ্রাজের 'ফোর্ট-জর্জের' শাসন-কর্ত্তাকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'ফরমান' গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অমুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্মাণ এবং তাঁহার কর্ত্তা-চারিগণ কর্ত্তক যাহাতে ইংরেজগণ অত্যাচারিত না হয় তদ্বিষয়ে নির্দেশ দিবার জন্তও মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক ছিল।

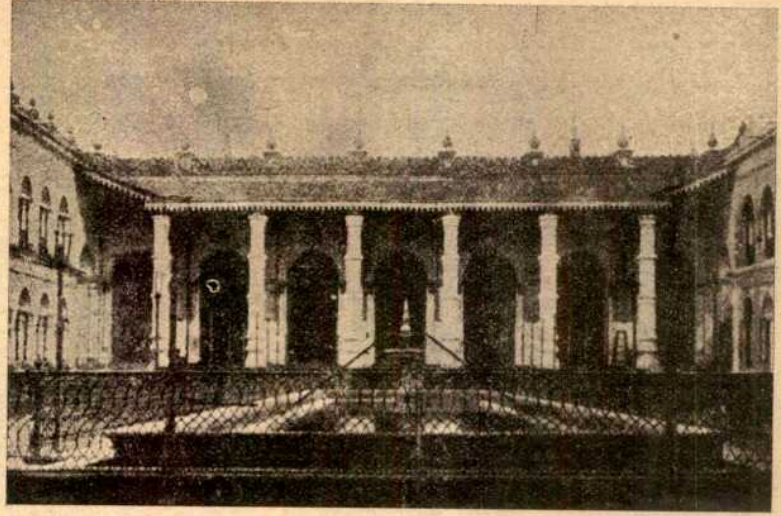
নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে শুনিয়া জব চারণক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; পরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবেন সংবাদ পাইয়া তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ সৈন্তের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বরোহী সৈন্তকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে পরাস্ত করেন। ইহাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ; ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বণিকগণ নবাবগত সৈন্তের সাহায্যে তোপ দাগিয়া হুগলী শহরের বহলাংশ

* "The Fouzdar was the chief police officer and judge of all crimes not capital."—Fields Regulations, page 135.

উড়াইয়া দেন। তোপের আঙুনেই গলীর পাঁচ শত বাড়ী এবং পণ্যরাশি-পরিপূর্ণ ইংরেজদিগের গুদামঘর পুড়িয়া যায় ফলে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদিগের অতিক্রমণে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের যুদ্ধজাহাজগুলি সমগ্র গঙ্গা নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পূর্বেরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১৬৮৭

খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবের হুগলীর কুঠী পুড়াইয়া দিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার পর জব চারণক ইংরেজ সৈন্যকে বালেশ্বরে প্রেরণ করেন এবং বালেশ্বর অধিকৃত হয়। বিলাতের ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারত-



হুগলী ইমামবাড়ার ভিতরের দৃশ্য

সম্রাট আওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হুগলী, হিজলী, বালেশ্বরের ভাষ্য অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?” (মেদিনী-পুরের ইতিহাস, পৃঃ ১৯৯)

ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ এযাবৎ বঙ্গদেশে মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর অবীনভাবে বাণিজ্য করিতেছিলেন; ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা মাদ্রাজ কোম্পানীর অবীনতা-পাশ ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর অত্যন্ত ডিরেক্টর মিঃ হেজেন্স প্রথম গবর্নর নিযুক্ত হন ও হুগলীতে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। মিঃ হেজেন্সের পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্নর হইয়া হুগলীতে আগমন করেন এবং হুগলী ইংরেজের ব্যবসার কেন্দ্র-স্থল ছিল। সেই সময় কোম্পানী আটশ হাজার মণ সোরা বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ব্রৌটনের চেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুদ্ধে ব্যবসা করিবার অল্পমতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে মহাকবি গিরিশচন্দ্র বোষ তাঁহার ‘মিরকাশিম’* নাটকে নবাবের নিজস্ব ডাক্তার ফুলারটনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলে উক্ত ইংরেজ ডাক্তার মিরকাশিমকে যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :

“আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট সাজিহানের কথাকে আরোগ্য করিয়া-ছিলেন। বদায় বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে

* মিরকাশিম নাটকখানি রাজসোবে পণ্ডিত হুগায় ইহার প্রচার বন্ধ আছে।



হুগলী ইমামবাড়ার সম্মুখের দৃশ্য

বলেন। বাদশাই পুরস্কারে বাউটন ফ্রোডপতি হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই trueborn Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাংলায় ইংরাজের বিনাশকে বাগিজের সনদ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার, আমিও নবাবের বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর বদেশীর হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল।” — ‘গিরিশ-প্রতিভা’, পৃষ্ঠা—২৭১।



ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবেদারী প্রাপ্ত হন; তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসন-কালে ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ সুবিধা হয় (Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*)। ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শোভা সিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন এবং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করেন। নুরউল্লা খাঁ সেই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন এবং তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য লইয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু শোভা সিংহ আসিতেছেন শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায় হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজ্যে ফকিরের বেশে চূর্ণ হইতে পলায়ন করেন।

হুগলী বিদ্রোহীদের হতগত হয়; অতঃপর ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন।

হুগলীর ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করিতেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহার জৈনউদ্দীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য নবাব কর্তৃক প্রেরিত দীলপত সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় নিহত হয় (*Historical Sketches of Bengal*)। তৎপরে হাসান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সূজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সূজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সূজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময় মারহাট্টারা আসিয়া বঙ্গদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ইহাই ‘বর্গীর অত্যাচার’ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্গীর অমাহুষিক অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ কষ্ট সহ করিয়াছে ইতিহাসে তাহার ভুলনা নাই। বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ইংরেজ বণিকগণ কলিকাতায় ‘মহারাষ্ট্র-খাত’ (Marhatta Ditch) খনন করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক কলিকাতাকে অরক্ষিত করেন। দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগিরথী ও সরস্বতীর তীরবর্তী গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সস্ত্রম রক্ষার জন্ত বিধর্মা ইংরেজের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরেজ বণিকগণের নব-নির্মিত বর্গীদের অনধিগম্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া কথঞ্চিৎ সাহায্য করিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস যে অজ আকার ধারণ করিত তাহা সুনিশ্চিত। বর্গীদিগের হাত হইতে কেহই নিষ্কতি লাভ করিতে পারে নাই। “বর্গীরা গ্রাম ও নগর পুড়াইয়া শতভাঙারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষের নাক-কান ও পুরজীর স্তন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলার প্রজাকুলকে সংহার করিয়াছিল।” (*Holwell's Interesting Historical Events*, Page-153).

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্তানটর জন্ম ৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুরের জন্ম ৭০ টাকা ও কলিকাতার জন্ম ৩৩ টাকা করিয়া খাজনা দিত।

নবাব আলীবর্দী বর্গীদের সহিত পরে সন্ধি করেন যে তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাহাদের কর দিবেন; তাহা হইলে তাহারা আর বাংলায় অত্যাচার করিবে না।

বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্ত বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম নামক দুই জন বণিকের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছু দিনের জন্ত নিজ অধিকারে রাখেন।

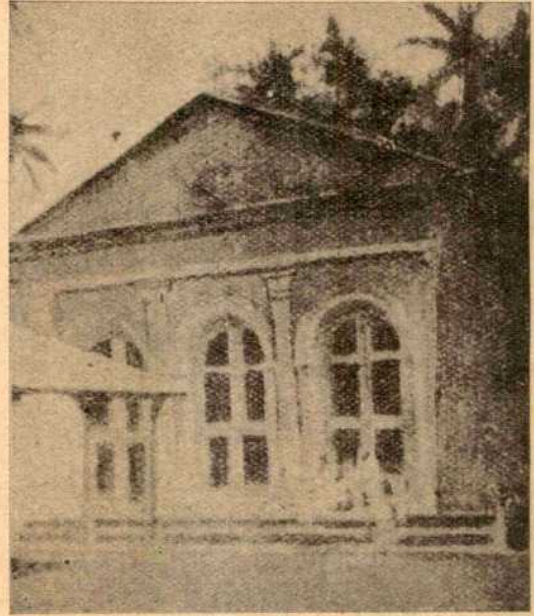
১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হেদায়েৎ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, সেই সময় নবাব আলীবর্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দেন। এই সময় চতুর্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্ত নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌঁছিত না। হেদায়েতের সহিত নন্দকুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক সাতাশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন (Long's Selections)। পরে মহম্মদ ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে তিনি 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে অভিহিত হন। এই সময় আলীবর্দী সিরাজদৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করেন এবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবর্দী গতানুগত্য হন এবং মৃত্যুকালে তিনি সিরাজদৌলাকে ইংরেজ বণিকদের হইতে সাবধান থাকিতে বলেন। (Parker's Evidence)

সিরাজদৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃবসা ঘসেটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সেই জন্ত বহু ধনরত্ন দিয়া ইংরেজের নিকট কলিকাতায় পাঠান। সিরাজদৌলা এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার চারিদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে বলেন। ডেক সাহেব কৌশলে কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া যান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন। নবাব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া শিবপুর ও ফলতা নামক স্থানে পলায়ন করে।

নবাব সিরাজদৌলা যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগম ইংরেজের সহিত হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত বগড়া করিলে চলিবে না জানিয়াই তাঁহারি সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিম ও সোরা জলাঙ্গী দিয়া উমিচাদের মারফত হুগলীতে ইহাদের ব্যবসা চলিত। (বাংলার-বেগম)

মহম্মদ আলি এই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; খোজা ওয়াজিদ নামে একজন ধনী মুসলমান বণিক সেই সময় হুগলীতে বাস করিতেন, দৈনিক এক হাজার টাকা

তাঁহার ব্যয় ছিল। তিনি ফরাসী জেনারেল ল' সাহেবকে সিরাজদৌলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহম্মদ আলি বিশেষ কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া তাঁহার পরিবর্তে নবাব সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি; নবাব ভাবিয়াছিলেন যে ইংরেজগণ আর কিছু করিবে না, সেইজন্ত তিনি তাঁহাদিগকে ফলতা হইতে



দাতা গৌরীসেন প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির

বিতাড়ন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন; তিনি ইংরেজদের আগমন রোধ করিবার জন্ত বজবজ দুর্গের সংস্কার ও কলিকাতার দক্ষিণে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ এবং শিবপুরের দুর্গটিও সংস্কার করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর নবাব কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাসম্মতক দেওয়ান ইংরেজের সহিত মিলিত হন এবং ইংরেজের ঘাঘাতে খাড়াভাব না হয় সেইজন্ত ফলতায় হাট বসান। ক্লাইভ এই সময় সৈন্ত লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন; দেওয়ান মাণিকচাঁদ বজবজে গিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধের অভিনয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈন্ত দখল করিল। তাহার পর মাণিকচাঁদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংবাদ দিয়া মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল; কলিকাতা

অরক্ষিত অবস্থায় রহিল এবং ক্লাইভ সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য লইয়া অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

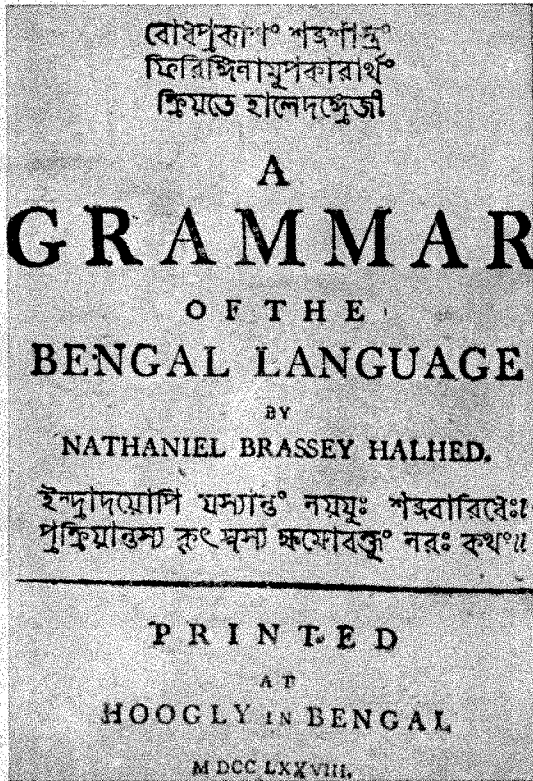
নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরধিকারের সংবাদ পাইয়া হুগলী রক্ষার জন্ত নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং নুতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া তিনি হুগলীকে অরক্ষিত করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মেজর কিলপ্যাট্রিক ইংরেজ সৈন্য লইয়া হুগলী

না করায়, সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ গেল যে নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবাব সেই জন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর্থি সাহেব লিখিয়াছেন—“নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ কখনও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিত না।”

পলাশীর রঙ্গমঞ্চে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন যে যুদ্ধের অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান এবং ক্লাইভের অনুমোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাকা ক্লাইভকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব ক্লাইভকে হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দেন এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ‘তহশীলদার’ হন; হেষ্টিংস সেই সময় বর্ধমানের রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্ধমানের রাজা তাঁহার রাজস্ব হেষ্টিংসকে দিতেন এবং হেষ্টিংসের ঐ স্থানে অনেক উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমার বর্ধমানের রাজাকে রাজস্ব তাঁহার নিকট হুগলীতে পাঠাইতে বলেন এবং সেইজন্য হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট নন্দকুমারকে দুই বার বন্দী করেন। দেশের ও দেশের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু হেষ্টিংসের চেষ্টায় মিথ্যা জাল মোকদ্দমায় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার কাসি হয়। বর্ধমানে কলিকাতায় যে স্থানে বিভূষণ উজান হইয়াছে, পূর্বে উক্ত স্থানে মহারাজার সুরক্ষণ অটালিকা ছিল।

মিরজাফর ইংরেজের প্রতি বিরক্ত হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ-দিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকে গদিচ্যুত করেন এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন। পরে তাহার সহিতও ইংরেজের মতাদৈন্য হয় এবং ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মিরজাফর নবাবের গদিতে বসেন। নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে বর্গী-দলপতি শ্রীভট্ট পুনরায় হুগলী লুণ্ঠন করেন। (Long's Records, Page ১৬১)।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মিরজাফর দেহত্যাগ করিলে নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসান। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক মতিরাম নামক এক ব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার এবং বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উভয়ে পরর্তীকালে কোম্পানীর দ্বারা হঠাৎ কারারুদ্ধ হন।



বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

আক্রমণ করিল। গোলা বর্ষণে হুগলীর কেল্লার এক স্থান ভাঙিয়া যায় এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন ও গ্রামে অগ্নিদান করে। নন্দকুমার যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন এবং ইংরেজগণ কলিকাতায় পলাইয়া আসে। ইহার পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সন্ধাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে যদি ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পায় তাহা হইলে বাংলার ইংরেজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করেন। নবাবের সহিত ফরাসীদের বিশেষ ঐতি ছিল কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য

১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল বলিয়া আবুল ফজল কৃত ‘আকবরনামায়’ লিখিত আছে। (Akbarnama translated by H. Beveridge Vol. II, page 56) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তর ইংরেজ বণিকগণ ও রেজা খাঁ সমগ্র বঙ্গের ধাতু একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশে অশ্রুশোনে পরিণত হয় এবং শৈয়াল কুকুর রাস্তায় বসিয়া শব ভক্ষণ করিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহে গঙ্গা ভরিয়া গিয়াছিল এবং শবদাহ করিবার কোন লোক ছিল না। দুর্ভিক্ষে হুগলীর অবস্থা সন্দেহে মেকলে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

“Tender and delicate women whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, throw themselves before the passerby and with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down everyday thousands of corpses closed to the porticos and gardens of the English conquerors.”—*Essay on Lord Clive*, page 135.

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরাজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরারম বিশ্বাসহতা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মিরজাকরের উপর।* মীরজাকর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাকর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে ও উৎসন্ন যায়।”—আনন্দমঠ।

এদেশীয় লেখকগণ এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। জন শোর (পরবর্তীকালে লর্ড টেনমাউথ) সেই সময় বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিষয় কবিতাকারে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :

* ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মিরজাকরের মৃত্যু হয়; তাহার পর নাজিমদৌলা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬-১৭৭০) নবাব মিরজাকরের পুত্রবধূ সেকান্দৌলা ও মবারকউদৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ‘মিরজাকর’ শব্দট বঙ্গের ইংরেজ ত্যাগদারী নবাব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

“Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue ;
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie ;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.”

—*Memoir of the life and correspondence of John Lord Teignmouth.*



হাজি মহম্মদ মহসীন

১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীকে “বঙ্গদেশের চাবি কাঠি” (Key of Bengal) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন ; ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্ট্রাবোরিনাস (Stravornius) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দৃষ্টব্য স্থান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলীকে অশ্রুশোনে পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছে। পর্ভু গুজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাগণের আত্মবাহতী নীতির ফলে হুগলীর সেই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল।

নবাব খাজা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার, তিনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অটালিকার মধ্যে বসবাস করিতেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেন এবং সেইজন্ম তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তাঁহার ছায় বিলাসী ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি বাবুনা করিলে তাহাকে “নবাব খাঞ্জা খাঁ” বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতাহ হইলে, তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে এক শত টাকা করিয়া রুত্তি পাইতেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া লুণ্ঠ করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দুই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।



হাজি মহম্মদ মহসীনের সমাধি-স্তম্ভ

হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পূর্ব গুজদিগের নিৰ্ম্মিত ব্যাণ্ডেল গির্জা বাংলাদেশের সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টীয় উপাসনাগার। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গির্জা নিৰ্ম্মিত হয় এবং মোগল কর্তৃক হুগলী আক্রমণের সময় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ধ্বংস করা হয়। পরে ফাদার ডি-ক্ৰুজ (Father De-Cruz) নামক এক ধর্মযাজক দিল্লীর বাদশাহের অমুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া গির্জা পুনর্নিৰ্ম্মাণ করিবার অমুমতি ও ১৭৭৭ বিধা নিকর জমি প্রাপ্ত হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে গোমেস ডি সোতো (Gomes De Soto) এই ব্যাণ্ডেল গির্জা পুনরায় নিৰ্ম্মাণ করেন। (“The

protuguese in North India.” Calcutta Review, 1846)

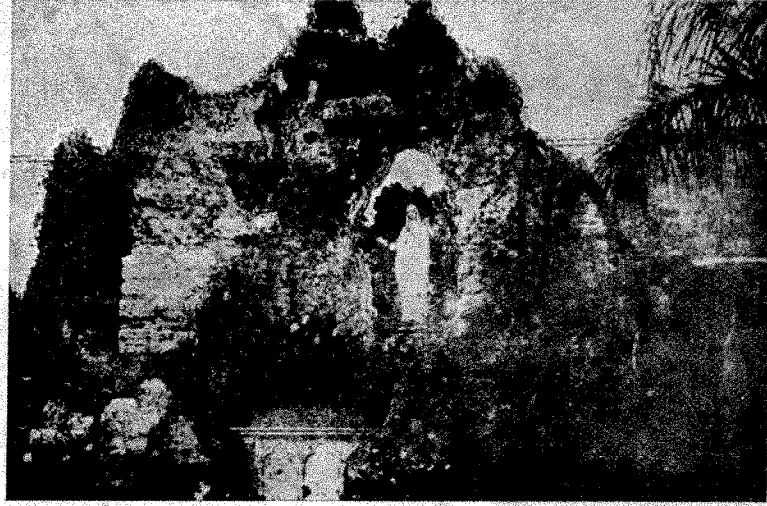
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্তিত প্রথম মুদ্রায়ন্ত্র হুগলীতে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক “A Grammar of the Bengal Language” ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথনেল ব্রাসী হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) কর্তৃক প্রণীত হইয়া হুগলীর উইলকিন্স সাহেবের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা হইত না বলিয়া তিনি বঙ্গভাষায় শৃঙ্খল ও দৌন্দর্য্য সাধনের এবং ইংরেজ বণিকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন; কারণ সেই সময় বিচারাদি ও জমিদারী কার্যের যাবতীয় কাগজ-পত্র পূর্বের ছায় বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। সেইজন্ম ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় অজ্ঞতার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অমুবিধায় পড়িতে হইত। কোম্পানীর কর্মচারিগণের অমুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

হুগলী-নিবাসী এস. কে. ধর সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করেন (Hooghly District Gazetteer, Page-186)। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে বরফ আসিবার পূর্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত; যে স্থানে বরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অজ্ঞাপি “বরফ তোলার মাঠ” বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের কার্য আরম্ভ হয় এবং হুগলীতে আড়াই তোলা ওজনের একখানি পত্র পাঠাইতে এক আনা এবং কানীতে ঐ ওজনের পত্র পাঠাইতে সাত আনা ব্যয় হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জাহ্নসারী ভ্রমণের জন্ম ‘ডাক-চৌকি’ খোলা হয়; উক্ত চৌকিতে জলপথে বজরা করিয়া এবং স্থলপথে পাল্কি করিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা শুরু হয়। কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী যাইতে ৪৬১০ খরচা পড়িত। (Calcutta Gazette, 1785).

বঙ্গবিশ্রুত দাতা গৌরী সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলীর অন্তর্গত বালি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণ-বণিক বংশসম্ভূত এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল হরেকৃষ্ণ মুরারিধর সেন। তাঁহার দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্বত্র সুপরিচিত। পরের অর্থ ব্যয় বা দাতার অসাধারণ ব্যয় প্রসঙ্গে অজ্ঞাপি “লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন” বলিয়া প্রবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। একমাত্র গৌরী সেনের প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির ব্যতীত বর্তমানে এই স্থানে আর কিছুই নাই, তবে গৌরী সেনের বংশধরগণ এখনও বর্তমান আছেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয়া পত্নী তৎকালীন বিদেশীয়

মুন্সেরীগণের মধ্যে সর্দারপ্রধান মাদাম্ গ্রাণ্ড (Madam Grand) এই স্থানে বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক র্যালফ্ ফিচ, পার্কাশ, হামিণ্টন প্রভৃতি পর্যটকগণ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং এই বংশের ব্রহ্মমোহন মল্লিক, চৌধুরী বংশের ডাক্তার বদনচন্দ্র চৌধুরী ও মিত্র বংশের ঈশান চন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে হুগলীর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি



ব্যাঙেল গির্জার ভিতরের 'গ্রোটো'র (Grotto) দৃশ্য : ইহা বঙ্গের প্রাচীনতম ভজনাগার

হইয়াছিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাশিম মল্লিক-আলি, মির্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ, আশাহুদা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। (পুরাতনী—১৪৬)

হুগলীর ইমামবাড়া ভারতের অত্যন্ত দর্শনীয় বস্তু ; ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গৌরব হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ হইতে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। ইমামবাড়ার সমুখের বৃহৎ ঘড়িট বিলাত হইতে আনা হইতে ১১৭২১ টাকা এবং গঙ্গার ধার ইট দিয়া বাধাইতে ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা বঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল। গঙ্গার ধারে ইমামবাড়ার গায়ে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহম্মদ মহসীনের দানপত্রখানি উৎকীর্ণ আছে। মরমের সময় এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে দানবীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়জন মহাত্ম্য আসিবে বঙ্গজননী গৌরবারিত মহম্মদ মহসীন তন্মধ্যে অত্যন্ত। বাল্যকালে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম মনু বেগম; মনুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রাখিয়া গতানু হইলে মনুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন এবং মহসীন তাঁহার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। মির্জা সালেউদ্দিনের সহিত মনুর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে মনু তাঁহার জ্ঞাতা কামিনী-কাকন ত্যাগী ককির মহসীনকে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে মহসীন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি

সংকার্যে ব্যয় করিবার জন্ত দানপত্র করিয়া যান। পরে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকার দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত 'মহসীন-ফণ্ড' হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মসজিদ ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পূর্বে সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্তু ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর আশ্রাফউদ্দীন আহম্মদের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের অর্থে তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মহসীনের জন্ম হুগলী ধন্ডা ও পবিত্র হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।*

মহসীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক হইলেও একটি দর্শনীয় বস্তু ; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্যমান আছে। প্রথমে প্রস্তরের আড়ম্বর-বিহীন সমাধিগুলির শীর্ষদেশে মার্বেল প্রস্তরে এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিচয়-লিপি উর্দু ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তরুজায়াসমাচ্ছন্ন উজানের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসীন, তাঁহার ভগ্নীপতি সালেউদ্দীন খাঁ, ভগ্নী মনু বেগম, মাতা জ্ঞানাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামালউদ্দীন যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর ভাগীরথীও যেন প্রতি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে মহসীনের পবিত্র নাম বঙ্গবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

“মুক্ত বেগীর গঙ্গা যেধায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাহিত ভূমি বঙ্গে।”

• বিস্তারিত বিবরণ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রচিত মহসীনের জীবনীতে লিখিত আছে।

ইহার নিকটেই গঙ্গার উপর “জুবিলী-ব্রীজ” অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। এই সেতু লম্বায় বার শত ফুট এবং ইহা নিৰ্মাণ করিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরেজী বিজ্ঞান বর্জমানের মহারাজা, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিজ্ঞান্যের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। ঈশানবাবু বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ‘higher graded service’ পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে ৭৫০ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধক রাম-প্রসাদ সেন তাঁহার কালীকীর্তনের এক স্থলে লিখিয়াছেন—

“শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥”

ভূকৈলাসের মহারাজা উক্ত সময়ে ভারতের তীর্থগুলি পর্য্যটন করেন এবং ভারতের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তুসমূহের বিবরণ তাঁহার আদেশে বিজয়রাম সেন ‘তীর্থভ্রমণ’ নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে

রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লিখিত হইল।

“চলাচল আইলা নৌকা হুগলী সহরে।
সে রাজি বঞ্চিলা কর্তা নৌকার ভিতরে ॥
হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায় ॥
বৈভের প্রধান তিনি বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান ॥
ক্ষণেক কর্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভুবনে ॥”

হুগলীতে আর এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম বসু। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে তিনি হুগলীর দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও বীরভূম জেলায় তিনি বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে দেবকীর্তি স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্ত বহু জমি বন্দোবস্ত করিয়া যান। মাহেশে ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার খরচের জন্ত তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা অজাপি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। দানশীলতার জন্ত তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। রাধানগরের যজ্ঞনাথ সর্কাধিকারী মহাশয়ের রচিত ‘তীর্থ ভ্রমণ’ নামক গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণরাম বসুর উল্লেখ আছে।

এরা

শ্রীমুখোদ রায়

আকাশ-ধরার মিতালি ইহার সহিতে নারে,
আলোকের লাগি ফুলের পিপাসা হুর্কিয়হ !
সুরের দীপ্তি মরুদাহ সম দহিয়া নারে,
চাঁদের লাগিয়া সাগরে জোয়ার ?—কি হুঃসহ !

এরা ভালবাসে ফুল হাতে শুধু ধরিতে মুঠি,
মাটি আর হুঁট লোহা-পাথরের পরশ মাগে,
কে হিসাব রাখে কোন ফুল ঝরে অকালে ফুটি ?
বিধুর হিয়াটি কোথায় অধীর রাজি আগে ?

মায়ের অমল অতল মেহও মাপিতে চায়,
দেশের লাগিয়া জীবনাঞ্জলি—ওজন করে।

গগন মাপিতে হুঁখানি আপন হাত বাড়ায়,
হার মেনে শেষে অভিশাপ দেয় বিকৃত স্বরে !

সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পিপাসী এরা,
পাছে স্কন্ধে হুঁচোখ ভরিয়া দেখিতে পায়,
মোহ-আবরণে তাইতো এদের দৃষ্টি ধরা,
বিশ্ববীণার সঙ্গীত ছাপি বেহুয়া গায় !

মাটির উপরে মাটির পিও গড়িয়া তোলে,
জানে না তাহারি চাপেতে একদা চূর্ণ হবে।
যে অধরা আলো আকাশ-ভুবন ব্যাপিয়া দোলে,
সেদিনও সে হাসি ফুলের সত্য অটুট রবে।

সৌরজগতের উৎপত্তি

শ্রীশান্তিরাম মুখোপাধ্যায়

বহু যুগ হইতে মানুষ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র; চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে পৃথিবীকে আলো দিবার জন্য, চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিয়া সাতটি গ্রহ তাহাদের রহস্যময় গতি দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই সমস্ত ভাব বা মতবাদ একটা নিয়মের স্বত্রে গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন জ্যোতির্বিদ টলেমি। তিনি জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ সালে আলেকজান্দ্রিয়াতে।

তিনি এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তনশীল। তখন লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, সূর্য্য প্রত্যহ প্রভাতে পূর্ব দিকে উদিত হইয়া মধ্যাহ্নে ঠিক মাথার উপর উঠে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমে অস্ত যায়। এই মতটি টলেমি তাঁর পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বেও সামোলের অধিবাসী এরিস্টারকাস উপরোক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, পৃথিবীকে লাটমের মত তাহার অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ করিয়া লইলেই সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয় ও অস্ত আরও ভাল ভাবে বুঝানো যাইতে পারে। কিন্তু টলেমি এই মত গ্রহণ করেন নাই। ইহার ছয় শত বৎসর পরে ভারতবর্ষে আর্যভট্ট স্বতন্ত্র ভাবে একই কারণ দেখান, কিন্তু তাহার শিষ্যবর্গ, ব্রহ্মগুপ্ত ও অন্ত সকলে উক্ত মতের পোষকতা করেন নাই।

অন্ত দিকে কোপার্নিকাস দেখাইলেন—গ্রহদের এই যে গতি তাহার স্বরূপ, সূর্য্যকে স্থির এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহকে উহার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে আবর্তনশীল মনে করিলেই সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পৃথিবীর পথের মধ্যেই ঘুরিতেছে ও বাকীগুলি উহার বহির্দিকে ঘূর্ণ্যমান। গ্রহগুলির রহস্যময় পশ্চাদগতি জ্যোতিষে বহু কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি আবর্তনশীল পৃথিবীর হিসাবে অন্ত গ্রহগুলির আপেক্ষিক স্থান ও গতি ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দিকে বৎসরে একবার ও নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে প্রত্যহ একবার ঘুরিতেছে। পৃথিবীর আন্থিক আবর্তনের দ্বারা সূর্য্যের উদয় ও অস্ত ভাল ভাবে বুঝা যায়। এই মত কোপার্নিকাসই প্রথম নির্দেশ করেন।

কোপার্নিকাস এই সব গবেষণা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে গ্যালিলিও, কেপ্লার ও নিউটন তাহার আরও কার্য সম্পন্ন করেন। কেপ্লার দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র-সাহায্যে দেখাইলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে উপকেন্দ্র (focus) করিয়া সূর্য্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকারে (elliptical)

ঘুরিতেছে। নিউটন তাহার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে গণিত-বিজ্ঞানের দ্বারা উপরোক্ত তত্ত্বকে আরও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

ইহাতে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইল। সৌরজগৎ কিরূপে সৃষ্টি হইল? পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও কি জীব থাকি সম্ভব?

প্রথমে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট ও ফরাসী বিপ্লব-যুগের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাদের মতে সৌরজগৎ প্রথমে একটি বিরাট নীহারিকাময় বস্তু (nebular mass) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। উহা স্বকীয় অংশগুলির পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের জন্য আবর্তিত হইতে লাগিল এবং বলয়াকারে উহার কতকগুলি অংশ বিক্ষিপ্ত হইল। অংশগুলি ঘনীভূত হইয়া গ্রহ ও উপগ্রহের আকার ধারণ করিল এবং কেন্দ্রীয় বা মূলবস্তু ঘনীভূত হইয়া সূর্য্যে রূপান্তরিত হইল।

লাপ্লাসের মতবাদ হইতে সৌরজগতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইল, যথা—

১। গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষ-পথে একই দিকে ও প্রায় একই সমতলক্ষেত্রে চলিতেছে।

২। উপগ্রহগুলি গ্রহগুলির চতুর্দিকে, গ্রহগুলি যে ভাবে সূর্য্যকে পরিক্রমণ করিতেছে সেই ভাবে যাইতেছে।

৩। গ্রহ ও উপগ্রহগুলির আপন আপন অক্ষদণ্ডের চারিদিকের আবর্তন ও তাহাদের কক্ষপথে পরিক্রমণ একই দিকে।

৪। কক্ষপথগুলি প্রায় বৃত্তাকার।

লাপ্লাসের মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তন্মধ্যে একটি এই যে, আবর্তনশীল নীহারিক। হইতে যে অংশগুলি বলয়াকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা একক গ্রহে ঘনীভূত হইতে পারে না, তাহারা শনিগ্রহের বলয়াকার উপগ্রহগুলির মত থাকিতে পারিত। ঐ বলয়াকার উপগ্রহ-গুলি যে স্থিতিশীল হইতে পারে তাহা ম্যাঙ্কওয়েল সাহেব ১৮৫৯ সালে প্রমাণ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক মহলে এই মতবাদ গ্রহণে সর্বপ্রধান বাধা উপস্থিত হইল সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের পরিবেশন (distribution of angular momentum) লইয়া। কোন বস্তুর ভরবেগকে (momentum) চলতি কথার বলিতে গেলে বলিতে হয় জিনিষটা কতটা ঘুরিল। আবর্তন বেগ (spin), বস্তু (mass) ও আকারের (size) উপর কৌণিক

ভরবেগ নির্ভর করে। এখন সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলির মোট ভরবেগ এক রাখিতে হইবে। ভিতরের কোন শক্তিদ্বারা উহাকে কম বা বেশী করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দেখা গিয়াছে সৌরজগতের শতকরা ৯৮ ভাগ ভরবেগ চারটি প্রধান গ্রহে পাওয়া যায়। চারটি ছোট গ্রহে পাওয়া যায় শতকরা ০.১ ভাগ। আর বাকীটুকু সূর্যের আবর্তন হইতে পাওয়া যায়। লাপ্লাসের মতবাদ হইতে বুঝা যায় না কি করিয়া শতকরা ৯৮ ভাগ ভরবেগ শতকরা ১.৫ বস্তুতে (mass of the four major planets) পাওয়া সম্ভব? অল্প কয়টি প্রমাণ করা যায় যে যদি মূলবস্তুর বাহিরের অংশগুলি এত ভরবেগ পায় তাহা হইলে তাহারা ধনীভূত হইতে পারে না। সুতরাং এই কথাটাই চিন্তা করা সম্ভব যে গ্রহগুলির এই ভরবেগ বাহির হইতে আসিয়াছে। এ বিষয়ে স্পেন্সার জেন্স বলেন, “The origin of the solar system must be sought in the swift catastrophic action of forces from outside” অর্থাৎ সৌরজগতের উৎপত্তিস্থল বাহিরের শক্তির অতিদ্রুত সংঘর্ষের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

চেম্বারলেন ১৯০১ ও মোল্টনের (১৯০৫) Planetesimal মতবাদে এবং জীন্স (১৯১৯) ও জেফ্রিজের (১৯২৯) Tidal মতবাদে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উক্ত দুইটিনা হইয়াছিল, সূর্যের খুব নিকটে অল্প একটি নক্ষত্র আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। তাঁহাদের মতে এক সময়ে সূর্য একটি গ্রহবিহীন বিচ্ছিন্ন তারকা ছিল। সূর্যের অতীতে আর একটি একক তারা মহাব্যোমে চলিতে চলিতে সূর্যের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। দুটি তারাই পরস্পরের পাশে ঘুলিতে লাগিল, পরে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা উভয়ের এত নিকটে আসিয়াছিল যে সূর্য হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্তু বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

Planetesimal মতবাদে বিক্ষিপ্ত বস্তুর অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান এবং বর্তমান গ্রহগুলি এই ক্ষুদ্র অংশগুলির ক্রমবিকাশ মাত্র। চেম্বারলেন বিশ্বাস করিতেন যে, বৃহত্তম গ্রহটি ছাড়া অল্প গ্রহগুলি প্রায় প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে জড় অবস্থায় ছিল। জেফ্রিজের মতে বিক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রথম অবস্থায় বায়বীয় (gaseous) এবং অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। বস্তুবিক্ষেপে অবিচ্ছিন্ন হইলে বিক্ষিপ্ত অংশ-সূত্রের (filament) আকারে দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে থাকিবে। ইহার আকার অট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বামেরাং নামে যে দৃঢ় কাষ্ঠাঙ্গ ব্যবহার করে তাহার অনুরূপ। তাপ বিকীরণের জন্য এই সূত্রটি শীতল হইতে লাগিল। যখন এই বিক্ষিপ্ত অংশটি একটি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যে পৌঁছিতে তখন উহা ধনীভূত হইতে আরম্ভ করিবে। বিক্ষিপ্ত অংশটি তখন মূল

বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহের আকার ধারণ করিবে। এই ভাবে বিক্ষেপ যতক্ষণ না বস্তু হইবে ততক্ষণ গ্রহের পর গ্রহ সৃষ্টি হইতে থাকিবে। বিক্ষোভ-উৎপাদনকারী তারাগুলি দূরে অপস্থত হইলে প্রথম গ্রহগুলি নিজেদের স্বাভাবিক রক্ষা করিবে এবং শেষের গুলি সূর্যে ফিরিয়া যাইবে।

রাসেল দেখাইয়াছেন যে, বিক্ষোভ-উৎপাদনকারী তারা, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিতে ভরবেগের পরিবেশন লক্ষ্য করিলে Tidal মতবাদ গ্রহণে প্রতিকূল যুক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। সূর্যে বিক্ষোভ ও উৎক্ষেপণ (eruptions) সৃষ্টির জন্ম তারকাটির সূর্যকে প্রায় স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে। ইহা যদি আকারে বস্তুগুণ্ডের সমতায় সূর্যের অনুরূপ হয় তাহা হইলে দশ লক্ষ মাইলের বেশী নিকটস্থ হইতে পারিবে না। ইহা হইতে অল্প কয়টি দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর এক মাত্রা বস্তুর ভরবেগকে এক ধরিলে তারকাটির হইবে ০.২৫, গ্রহ-জগতের এক মাত্রা বস্তুর গড়পড়তা ভরবেগ হইবে ২.৬৩। ইহা তারকাটির ভরবেগের দশ গুণেরও বেশী। ইহা অসম্ভব।

রাসেলের সিদ্ধান্ত বিষয়ে লিটলটন ১৯৩৮ সালে বলেন যে, সূর্য প্রথমে যুগ্মতারা ছিল এবং ইহার সঙ্গীটি একটি তৃতীয় তারার সহিত সংঘর্ষে সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৃতীয় তারটি আরতনে সূর্য অপেক্ষা এত বড় ছিল ও তাহার গতিবেগ এত বেশী ছিল যে তাহা হইতে গ্রহ-সৃষ্টির শক্তি প্রচুর পরিমাণ ছিল। সূর্যটি ঠিক এত দূরেই ছিল যে তাহা তৃতীয় তারার সহিত সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু ইহা তাহার, সঙ্গী ও অল্প তারার দ্বারা যে গ্রহাঙ্গক সূত্র (planetary ribbon) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ধরিতে পারিয়াছিল।

লুইটেন (১৯৩৯) দেখাইয়াছেন, সূর্য গ্রহাঙ্গক সূত্র ধরিতে আসিলে তাহাকেও তৃতীয় তারটি ধরিয়া লইয়া যাইবে।

ভার্টনগর (১৯৪০) প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রেও, গ্রহাঙ্গক সূত্র তৈয়ারী করিতে হইলে তিনটিতেই বিপর্যয় সংঘর্ষ হইবে।

স্পিট্জার (১৯৩৯) বলিয়াছিলেন যে, গ্রহাঙ্গক সূত্র প্রস্তুত হইলেও সূর্যের উত্তাপে উহা সৃষ্টির এক ঘণ্টার মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবে। লিটলটন ১৯৪১ সালে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, স্পিট্জার তারাগুলির মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র (gravitational field) বাদ দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার মতবাদ গৃহীত হইতে পারে না ইত্যাদি।

Nolké (১৯৩০) বলেন যে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ প্রায় একই সময়ে একটি সূত্রময় নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই নীহারিকার একটি স্থানে জড় বস্তুর পরিমাণ অনেক বেশী ছিল ও বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বস্তু ঘন হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহ যে কতকগুলি অনুজ্জল নীহারিকার সূত্র আছে কিন্তু তাহারা কি উপাদানে তৈরি ইহা অজ্ঞাত। ইহাও বলা যায় না

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্তী

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায়ই আমাদের পরিবারে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতাম, তখন তাঁকে দেখবার জন্মও সর্বদাই খুব আগ্রহান্বিত থাকতাম। কিশোর বয়সেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল।

আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দেওঘরের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার গিয়েছিলেন। তিনি দাদা-মহাশয়কে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দাদামহাশয়ের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল—সর্বদা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংবাদ নিতেন ও চিঠিপত্র লিখতেন। আমার মা সেই চিঠিগুলি অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, সেই সব চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরও অনেক চিঠি দেখেছি। তিনি আমার দাদামহাশয়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ নানা রকমের ছবি এঁকে, মজার মজার কবিতায় চিঠি লিখতেন। মহর্ষিদেবের পরিবারস্থ অনেকেই দাদামহাশয়কে আত্মীয়ের মত দেখতেন।

আমি যখন স্কুলের ছাত্রী ছিলাম তখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় যে বিরাট সভা হ'ত তাতে যোগ দিতাম। সেই উপলক্ষে রবিবাবুর স্মরণিত কণ্ঠের অপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

এক বার রবিবাবু উক্ত সভায় বক্তৃতা শেষ করে হল থেকে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় উপস্থিত সকলে চিৎকার করে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন—“একটি গান, একটি গান।” তখনই তিনি কিরে গাড়িয়ে, হল ঘরটি কম্পিত করে মধুর কণ্ঠে রচিত এই গানটি গাইলেন—

“কে যায় অমৃতধাম যাত্রী
আজি এ গহন তিমির রাত্রি
কাঁপে নভ জয়গানে।

আনন্দরব প্রবণে লাগে, স্তম্ভ হৃদয় চমকি জাগে
চাহি দেখে পথ পানে।

ওগো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাসবাণী
যাব অহরহ সাথে সাথে, সুখে হুখে শোকে দিবস রাতে
অপরাজিত প্রাণে।”

তাঁর গলার সুরটি আজও কানে বাজছে—ভুলতে পারি
নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, তাঁর রচিত গান অস্ত্রের
মুখে গাইতে শুনে, আর নিজেরাও তাঁর গান গেয়ে, তাঁর সঙ্গে
পরিচয় যেন দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগল।

একবার পুজার ছুটির সময় শরৎকালে আমরা—আমার

দিদি কুমুদিনী বসু ও আমি—শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সংকল্প
করলাম। ছপুরে আমরা হাওড়ায় রেলগাড়ীতে চড়ে রাজি
চাঁটায় বোলপুরে পৌঁছলাম, স্টেশনে শান্তিনিকেতনের বন্দ-
টানা বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাইতে উঠে
আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। অন্ধকার রাত্রে জোনাকীর
দল আমাদের পথের চারিদিকে ঝিকমিক করছিল, যেন
আকাশের তারাগুলি গাছের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারি
সুন্দর লাগছিল।

রাত্রে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই শুভলাল আমরা নীচু-
বাংলায় থাকব। সেখানে পূজনীয়া হেমলতা দেবী (ঋষিকল্প
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ) আমাদের কত আদর করে
বিশ্রাম ও আহ্বারের ব্যবস্থা করলেন। আনন্দে ও শান্তিতে
মন ভরে উঠল। তখন মনে হ'ল—

“পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন

সে কথা যে ভুলে যাই।”

হেমলতা দেবী স্নেহ ও মমতাপূর্ণ আত্মীয়ের মত এত আদর-
যত্ন করেছিলেন তা কখনও ভুলিতে পারিব না। সেই দিন
হতে তিনি যে স্নেহের চক্ষে আমাদের জুই বোনকে দেখেছিলেন
তা এখনও অঁটুট আছে—এ কি কম সৌভাগ্য।

রাত্রে আহ্বারের সময় আকর্ষণ হয়ে দেখলাম কবি
আমাদের সঙ্গে বসেছেন। তাঁর মুখের নানা গল্প ও হাসির
কথায় আহ্বারের সময়টুকু পরম আনন্দেই কেটে গেল।

পরদিন ভোরে শরৎকালের নির্ঝল আকাশ যখন গোলাপী
আভাষ রঞ্জিত ও মধুময় হয়ে উঠল তখন শান্তিনিকেতনের
ছেলেদের মধুর কণ্ঠে দেবাদিদেবের বন্দনাগীতি শুনে পেলাম
—সে বন্দনা বড়ই মিষ্টি লাগল।

জলযোগের পর আমরা “বড়বাড়ী”তে গেলাম। সেখানে
তখন রবিবাবু বাস করতেন। আমরা সকলে মিলিত হয়ে
তাঁর কাছে বসলাম। তিনি তখন “ভাকঘর” বইটি লিখেছেন
কিন্তু তখনও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি “ভাকঘর”
নিজে পড়ে শুনােলেন—সে যে কি সুন্দর করে পড়লেন, তা
এত বছর পরেও যেন কানে বাজছে। পড়া শেষ হলে আমার
দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“কেমন লাগল।”

তখনই আমি বললাম—“ও। কি সুন্দর।”

তখন বললেন—“সত্যি বলছ ত?”

আমি ত অবাক। আমার মত এমন নগণ্য লোকেরও মতা-
যত তিনি জানতে চান।

তারপরে তিনি আমাদের দুই বোনকে গান করতে বললেন—আমরা ভাবলাম, “ওঁর রচিত গান ওঁর সামনে কি করে করি।” শেষে ভেবেচিন্তে কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের রচিত “কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে”—এই গানটি গাইলাম।

রাত্রে সেখানে শারদোৎসব নাটকখানির অভিনয় দেখলাম। শান্তিনিকেতনের বালকগণ ও শিক্ষকগণ অভিনয় করেছিলেন, কি সুন্দর সে অভিনয় হয়েছিল তা বলা বাহুল্য—রবিবাবু উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন আমরা চলে আসব। ছুপুরে আহারের পর ঘরের বারান্দায় রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শুকাচ্ছি—হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি রবিবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হেসে বললেন—“তোমরা চলে যাচ্ছ, তোমাদের দেখতে এলাম।”

তার সৌজ্ঞ ও শান্তিনিকেতনের আতিথেয় আমরা কত যে তৃপ্তিলাভ করেছিলাম তা বলা নিম্প্রয়োজন। ছেলেদের স্মৃষ্টি গানের রেশ কত দিন ধরে যে কানে বাজছিল—অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্য থেকে বেড়িয়ে এলাম।

কলিকাতায় পৌঁছবার পর দেখি এক দিন তিনি আমাদের বাড়ীতে (৬নং কলেজ স্কোয়ারে) এসেছেন, বললেন—“দেখতে এলাম, তোমরা কেমন আছ? শরীর ভাল ত?—আমরা যে কি আনন্দিত হলাম তা আর কি বলব।

এক বার রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় আদি সমাজে উপাসনা করবেন, আর আমরা দুই বোনে গান করব এইরূপ স্থির হয়েছিল। সেদিন এত ব্যুষ্টি হয়েছিল যে কলিকাতার অনেক রাস্তাই জলে ডুবে গেল—বিশেষভাবে ঠান্ডার রাস্তা। তবুও গাড়ী করে জলে ডোবা রাস্তার উপর দিয়ে আমরা দুই বোন পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সমাজে গিয়ে গান করেছিলাম। এ সামান্য কাজটুকু যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার জিনিষ তা কখনও ভাবি নাই। পরদিন রবিবাবু একটি সুন্দর চিঠি লিখে পাঠালেন—“এমন হৃদয়োগ সঙ্গেও যে তোমরা কর্তব্য কাজ করতে এসেছিলে সেজ্ঞা খুবই আনন্দিত হয়েছি” ইত্যাদি। আমরা তা অবাক। এমন সামান্য ঘটনাও তিনি স্মরণে রাখেন।

আমার বড় মাসিমার সেজ ছেলে (ডাঃ কৃষ্ণধন শোষের ছেলে, যার নামে রংপুরের K. D. Canal-এর নামটি হয়েছে) অরবিন্দ খোষ আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন। রবিবাবু অরোদাদাকে যে শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর কবিতা—“অরবিন্দ-রবীন্দ্রের লহ নমস্কার” পড়ে জানা যায়। এক দিন রবিবাবু অরোদাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে। আমাদের ক্ষেত্র নামে ছোট উড়ে চাকর ছিল। সে দৌড়ে তাঁর মোটরের কাছে গেল—ওঁর এমন সুন্দর রাজার মত চেহারা ও মস্ত মোটর দেখে,

সে ভাবল ইনি কোনো রাজা হবেন—সে আমাদের কাছে ছুটে এসে বলল—এক রাজাবাবু দেখা করতে এসেছেন।

এ কথা বলেই সে আবার নীচ চলে গেল। পরে সেই উড়ে চাকরের মুখে শুনলাম যে সে সাহস করে রাজাবাবুকে বলেছিল যে তার খুব ইচ্ছা একটু মোটরে বেড়ায়। আর “রাজাবাবু”ও এই নগণ্য মূর্খ দরিদ্র ভৃত্যের আবদারটি উপেক্ষা না করে, তখনই তাকে মোটরে বসিয়ে গোলদীঘির চারধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তাকে খুশী করে দিলেন।

একটু পরে দেখি রবিবাবু হাসতে হাসতে উপরে এসেছেন। এ সামান্য ঘটনা থেকে বুঝা যায় তাঁর মনটি কত কোমল ও সহৃদয়তা পূর্ণ ছিল। সে প্রাণ একটি অতি নগণ্য ক্ষুদ্রতম লোকের ইচ্ছাকেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারল না। আর এই রবীন্দ্রনাথই বিশ্বের দরবারে কত পূজা ও সম্মানিত হয়েছেন।

১৯০৮ সালে আমার পিতৃদেব কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন মার শরীর অসুস্থ, তিনি মনঃকষ্টে জর্জরিত। পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধু মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মার সংবাদ নিতে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। একদিন রবিবাবুও মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি ঈশ্বরের কৃপার কথা বলতে মাকে বললেন—

“এই চৌদ্দ মাস (নির্বাসনের) যে বিশ্বাস, যে নির্ভর পেয়েছেন, তার বল আপনাকে সে বিপদ সহ্য করবার বল দেবে। আপনার পিতার (রাজনারায়ণ বসুর) যে সাধনা ছিল সে ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় নাই; আপনার ভিতরে বংশ পরম্পরায় সে সাধনার বল থাকবেই। সেই বলই এ সময়ে আপনার কাছে লেগেছে। আমি তো আজ তাই দেখতে এলাম যে আপনারা এই দুঃখকষ্টের ভিতরে কি লাভ করেছেন। এই যে ঈশ্বরের উপলব্ধি লাভ—এই বিপদের মধ্যে করেছেন, এ কি আপনাদের কম সৌভাগ্য। যারা সংসার গুচ্ছিয়ে ভাবছে যে বেশ আরামে আছি—নিজেদের ভিতরকার দৈন্ত্য বুঝতে পারছে না, তারাই হ’ল দুঃখী। আপনাদের তো খুব সৌভাগ্য যে বিপদের দিনে ঈশ্বরকে বুঝতে পেরেছেন। আমি দেখে তৃপ্ত হলাম, যা আশা করে এসেছিলাম তা পেলাম।”

কথাবার্তার পর রবিবাবুর যাবার আগে আমি কুঠার সহিত আমার অটোগ্রাফ খাতাখানি তাঁর সামনে ধরলাম, যদি তিনি কিছু লিখে দেন তা খুব সুখী হব। তিনি তখনই খাতাটি নিয়ে লিখলেন—

“আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে •

দিবস গেলে করব নিবেদন,

আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।”

১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে

ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করেন। যেদিন বাংলা দেশে এই ধবর এল, সেদিন বাংলা দেশে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জেগেছিল তা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করলেন যে স্পেশাল ট্রেন-যোগে কলিকাতা থেকে বাঙালীরা বোলপুর গিয়ে কবিকে অভিনন্দন দেবে—সকলেই আনন্দে এ প্রস্তাব অমুমোদন করেন। আমার জয়ীপতি শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু যাতায়াতের বন্দোবস্ত করবার ভার নিলেন। ঠিক হ'ল যে যাত্রীদের জন্ত টিকিট ছাপিয়ে বিক্রী করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকা অবশ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীকে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে যখন শচীনবাবু ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের এক্সেক্ট সাহেবের আপিসে গেলেন তখন এক্সেক্ট সাহেব বললেন যাত্রীদের ভাড়া ছাড়াও এক্সিনের ভাড়া দাইল প্রতি দশ টাকা দিতে হবে। শচীনবাবু এক্সিনের ভাড়া দিতে আপত্তি করেন। তখন এক্সেক্ট বললেন, ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ইতিহাসে কখনও এমন অভূত প্রস্তাব কেহ করে নাই। তখনই শচীনবাবু উত্তর দিলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসেও আজ পর্যন্ত কেহ নোবেল প্রাইজ পান নাই।” মুখের মত জবাব পেয়ে এক্সেক্ট সাহেব খুশি হয়ে এক্সিনের ভাড়া বাদ দেবার অমুমতি দিলেন।

আমরা অনেকে মিলে স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে যাই। সেখানে বিকালে আমরা প্রকাণ্ড আম গাছ তলায় একত্র হই। সেদিনের অমুঠামে বিজ্ঞানার্চাধ্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করেন। আমরা দুই বোনে গান করি। সেখানে আমরা সাদর অভ্যর্থনা ও যত্ন পেয়েছিলাম।

কলিকাতায় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে যখন আমি কাজ করি তখন শিক্ষয়িত্রীরা মাসে এক দিন কোন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করতেন—তিনি এসে তাঁদের কিছু বলতেন। তাঁকে চীফ গেষ্ট করা হ'ত। একবার ঠিক হ'ল রবিবাবুকে “প্রধান নিমন্ত্রিত ব্যক্তি” চীফ গেষ্ট করে ডাকা হবে। তাঁকে সে কথা জানাবার ও ডাকবার ভার আমার উপর পড়ল। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের অমুরোধ জানালাম। তিনি সানন্দে স্কুলে আসতে রাজী হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি স্কুলে এলেন। স্কুলের প্রকাণ্ড হল—মেরী কার্ণেটর হলে মেয়েরা সব ও আমরা শিক্ষয়িত্রীরা দম্মিলিত হলাম। লেডী অবলা বসু সেদিন আমাদের সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবু সেদিন “নারীদের কোমল স্বভাব” বর্ণনা করে একটি সুন্দর উপদেশ দিলেন। তার পরে মেয়েরা আমার কানে কানে বলতে লাগল—“ওঁকে একটা গান করতে বলুন।” মেয়েরা বলতে সাহস পাচ্ছে না কাজেই আমি বললুম—মেয়েরা আপনার গান শুনতে চাচ্ছে—অনুগ্রহ করে যদি একটি গান করেন—কষ্ট হবে না ত ?

তিনি হেসে বললেন—না না, কষ্ট হবে কেন ? এই বলেই পরিষ্কার গলায় উচ্চ ও মধুর কণ্ঠে গানটি গাইলেন—

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি

আমার হৃদয়মাঝে বিছাও আনি

রাতের তারা, দিনের রবি, আধার আলোর সকল ছবি,

তোমার আকাশভরা সকল বাণী,

আমার হৃদয়মাঝে বিছাও আনি।”

আমরা সকলে মুগ্ধ হলাম তাঁর সৌজ্ঞ দ্বন্দ্ব। বোর্ডিঙের মেয়েদের বহুতৈরি মিষ্টান্ন দিয়ে জলযোগের পর আমাদের সভা ভঙ্গ হ'ল। রবিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম। ভাবলাম স্কুলের কি সৌভাগ্য—বিশ্বকবির পদধূলি এখানে পড়ল।

১৩৩৭ সালে বালকবালিকাদের প্রাচীনতম মাসিক পত্রিকা ‘মুকুল’ পরিচালনার ভার আমার উপর পড়ে। মুকুল পত্রিকা সম্পাদনার ভার পেয়ে আমি রবিবাবুকে এ পত্রিকায় লেখা দেবার জন্ত বিশেষ ভাবে অমুরোধ করেছিলাম। সে অমুরোধ তিনি এড়াতে পারেন নি। মাসে মাসে মুকুলে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন।

এক দিন মুকুলের জন্ত একটা গল্প লিখতে অমুরোধ করবার জন্ত বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ীতে যাই। তিনি তখন সেখানে ছিলেন। গিয়ে দেখি তিনি ইউনিভার্সিটিতে যে বক্তৃতা দেবেন তা লিখছেন—খুবই ব্যস্ত। তবুও দেখা করলেন ও আমার অমুরোধের উত্তরে হেসে বললেন—“বাসন্তি, তোমার হাতে মুকুল আবার তুমিও মুকুল—কি মন্থই যে জান, আদায় না করে ছাড় না—আচ্ছা, মুকুলের জন্ত একটা গল্প লিখে দেব। দেখ ছোটদের জন্ত লেখা বড় কঠিন, ছোটদের জন্ত লিখতে হ'লে ছোটদের মতই হ'তে হয়। তুমি যদি আরও অনেক আগে এই কাগজটা চালাতে তখন অনেক লেখা দিতে পারতাম। এই গল্প দেওয়াই কিন্তু শেষ লেখা হবে, বুঝলে ? আর দিতে পারব না।”

আমি হেসে বললাম—“শেষ লেখা হবে কেন ? আরও দিতে হবে।”

অনেক দিন পরে তিনি মুকুলের জন্ত একটা গল্প লিখে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে চিঠি পেলে তার উত্তর দিতেন হাজার কাজের মধ্যেও। এই চমৎকার অভ্যাসটি তাঁকে আমাদের অতি প্রিয় করেছিল। যখনই তাঁর কাছে চিঠি দিয়েছি অবিলম্বে উত্তর পেয়েছি। সামান্য একটা খবর জানবার জন্ত একবার তাঁর কাছে চিঠি লিখি।

ফরাসী দেশের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ‘সিলভ’ লেডী পত্নীসহ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁরা আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু। আমরা তখন পাতিয়ালা রাজ্যে ছিলাম। সিলভ লেডীরা শান্তিনিকেতনে অনেক দিন ছিলেন। তাঁরা কোথায় আছেন জানবার জন্ত রবিবাবুর কাছে চিঠি লিখি। তিনি তখনই সে চিঠির উত্তর দেন।

তিনি আমার বিবাহের সময় একটি গান রচনা করে উপহার পাঠিয়েছিলেন—সেটি সেই উৎসবে গীত হয়েছিল—
তার লেখা সেই গানটি আমার কাছে আছে। সে গানটি
১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হয়েছিল—
গানটি এই—

তাহার অসীম মঙ্গল লোক হতে

তোমাদের এই হৃদয় বনচ্ছায়ে

অনন্তের পরশ-রসের স্রোতে

দিয়েছে আঁক বসন্ত জাগ্রায়।” ইত্যাদি

তার পরে রবীন্দ্রনাথকে কত সভাতে দেখেছি ও তাঁর বৃদ্ধ
বয়সেও বক্তৃতা শুনেছি—সে বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট
হল কল্পিত করে দিয়েছিল—সে হলের শেষ প্রান্তের লোকও
স্পষ্ট তাঁর কথা শুনে পেরে—তখন মাইক্রোফোনের দরকার
হ’ত না। সে দিন—

“হে মোর চিত্ত-পুণ্যতীর্থে

জাগরে ধীরে

এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।”

এই কবিতাটি কি পরিষ্কার ও মধুর স্বরে অপূর্ণ ভাবের
সহিত আবৃত্তি করেছিলেন, তা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল।
এমন আবৃত্তি কেহ কখন শোনে নাই।

আজ রবীন্দ্রনাথের দেহ ভস্মীভূত হয়েছে কিন্তু তাঁর অমর
আত্মার ত বিনাশ নাই। যতকাল বাঙালী জাতি জীবিত
থাকবে তাকে তুলতে পারবে না। তাঁর গান, তাঁর সাহিত্য,

তাঁর উপদেশ আমাদের জীবনে প্রেরণা দেবে। পৃথিবী হতে
আমাদের এই ধূলিধূসরিত মনকে এক দিব্যালোকে নিয়ে গিয়ে
পবিত্র আনন্দে প্রাণ উদ্ভাসিত করে দেবে—ঈশ্বরে বিশ্বাসী
করবে।

জীবিত কালেও যেমন তিনি কত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম
প্রীতি লাভ করেছিলেন—মরণান্তেও সে সকলের অধিকারী
হয়ে আছেন—তিনি এই দরিদ্র অসহায় পরপদানত জাতির
গৌরবের রক্ত হয়েছিলেন—চিরকালই থাকবেন।

“লভিয়া জনম বিধে, তুমি হলে স্বরগের কবি,

অমর হইয়া এঁকে গেলে অমরার ছবি,

তুমি কি ভেবেছ কবি, ছুটি নিয়ে তুমি চলে যাবে ?

সবাকার মন থেকে ছুটি তুমি কত কি গো পাবে ?

যত দিন ভারতের পুণ্য নাম লুপ্ত নাহি হবে

যত দিন সবাকার বক্ষে বক্ষে প্রাণবায়ু রবে,

তত দিন হে কবীন্দ্র সর্বজন নয়নের জলে

তোমারে স্মরণ করি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবে পদ তলে।”

আজ এই স্মরণীয় পবিত্র দিনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আলো-
চনা করবার সুযোগ পেয়ে রংপুর সারস্বত সাহিত্য-সম্মিলনীর
নিকট কৃতজ্ঞ হচ্ছি। আর স্মরণীয় মত ভাষার বিশ্ব-কবির
চরণে প্রণাম করে আমার মত ক্ষুদ্র নারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ
করছি।*

* রংপুর সারস্বত সাহিত্য-সম্মিলনীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-
বাধিকী উপলক্ষে পঠিত।

দ্বীপের মেয়ে

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

খুলে দিয়ে বাতায়ন :

দেখো বেলা-পেষে কোথা দিগন্তে বাদলে ডিজিছে বন—

অথবা মেঘের ভীড়ে

কোথায় ডুবিল উঠি-উঠি তারা হঠাৎ গাঙ্গিনী নীরে ;

হঠাৎই যদি তখন

নীল বিজলীর শিখর লাগিয়া হু-হু করে ওঠে মন ;

দ্রুত হু’হাতে রবিয়া কপাট দে নীলে শাসন ক’রো।

তা’পর শিমরে আলিয়া প্রদীপ এ লেখাটি মেলে ধ’রো।

এ শুধু তোমারি তরে :

বিজন প্রাণের পুরবীর বাঁশী নিখিল আকাশ ভ’রে।

মধুর পুলকে সহসা উখলি হয়ত’ অবাক হবে

চিরনিহুঁর ফিরে এলে বুঝি কাজিত পরাভবে ?

করো না অমন ভুল।

এ হৃদয় কেনো বিফল উজানে কভু নয় অহতুল।

যে-কথা বলিতে চাই :

আপনারে শুধু ভালবাস তুমি আর কা’রে বাসো নাই।

যে আমার লাগি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহু নিশি করো ক্ষয় :

যে-আমারে স্মরি শত-বন্দিতা মনে মানো পরাজয়—

কল্পিত ধরো ধরো

যে-বেদনখানি গড়ে ;

ভেবো না সে তব প্রেম।

সে শুধু বিলাসে ঘষিয়া-মাজিয়া তামারে করিছ হেম।

তুমি গো দ্বীপের মেয়ে।

চিরকাল ওই নিশাস ছড়াবে সাগরের পানে চেয়ে।

এতটুকু চেউয়ে যেমনি নড়িবে কোনোদিকে কোনো তীর :

নব তরুণ পলকে ধুলায় লুটে হবে অস্থির।

তা’পর উঠিয়া আঁচল ঝাড়িয়া চেনা সে’ বেড়াটি ধ’রে—

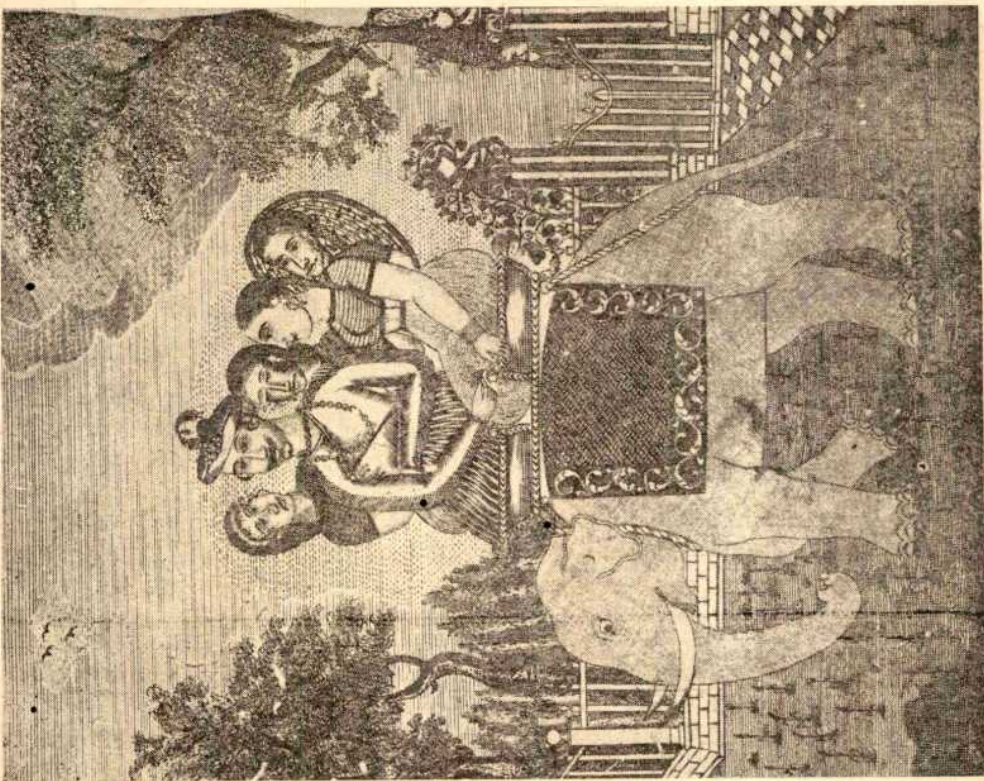
পুরাণে মায়ায় মেলিবে আবার নিজেই নতুন ক’রে।

তোমার নিয়তি এই :

এক দ্বীপ হ’তে আর দ্বীপে যাবে তার বেশী কিছু নেই।

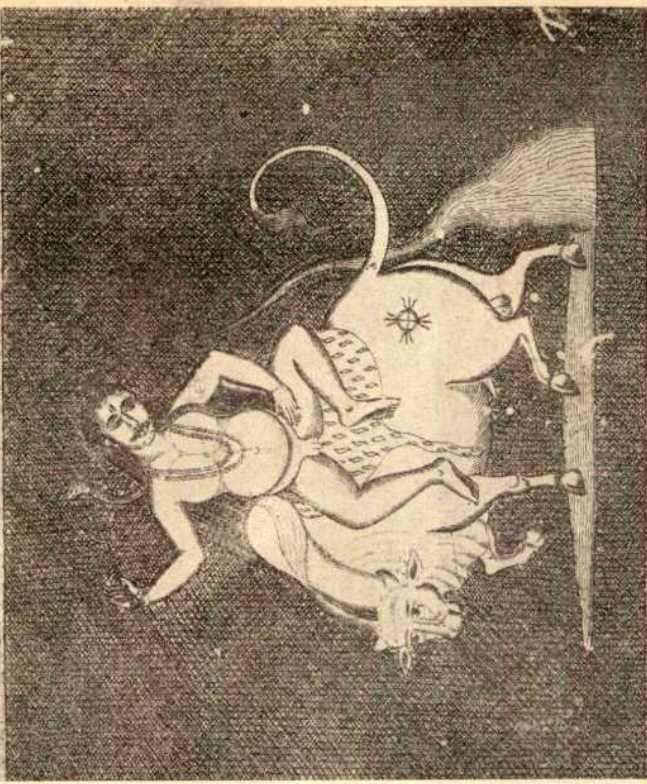
নয়ন শাসন ক’রো।

পড়া শেষ হলে যতনে এ লেখা প্রদীপে জুলিয়া ধ’রো।



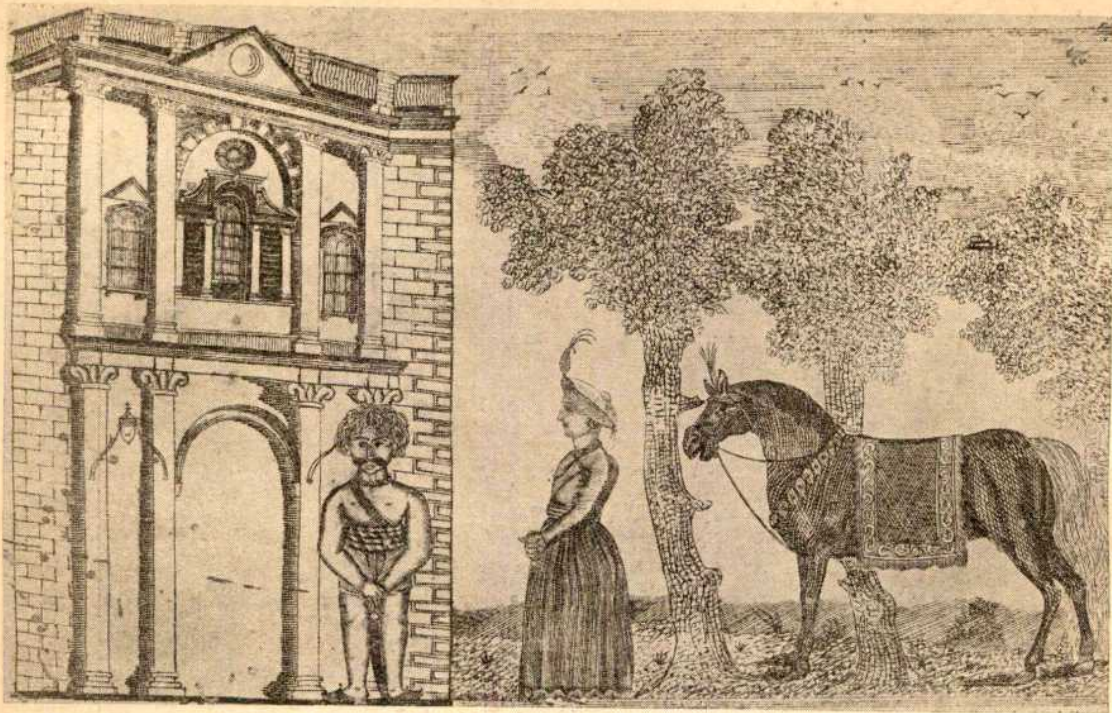
রাগ দীপক

শিল্পী :—রামচাঁদ দ্বায়, ইং ১৮১৮



রাগ ভৈরব

শিল্পী :—রামচাঁদ দ্বায়, ইং ১৮১৮



সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

শিল্পী : রামচাঁদ রায়, ইং ১৮১৮



ভগীরথ ও গঙ্গা

শিল্পী : বিশ্বস্তর আচার্য্য, ইং ১৮২৪

বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন 'মুদ্রিত মিত্রীর নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা কাঠ-খোদাই শিল্পেও পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন আরম্ভ হইল, তখন দৃষ্টবতঃই দক্ষ ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ বৈদেশিকের

কোন কোন পুস্তক চিত্র-শোভিত করিয়া বাহির করিবার বাসনা উঠোগী হই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা তখন বাংলাদেশে ছিল না। ধূল বা কপার-প্লেট এন্‌গ্রেভিং ইউরোপে সে-কালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশে শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি ঊন-বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে শুধু বাংলা-সাহিত্য লইয়া কাজ করিতে করিতে সে-কালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরনের খোদাই-চিত্রই আছে। কাঠ-খোদাই চিত্রের নিদর্শন আমি ইতিপূর্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) একটি প্রবন্ধে দিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে সে-যুগের কয়েকটি ধাতু-খোদাই-চিত্রের নমুনা উপস্থিত করিতেছি। এই চিত্র এবং চিত্রিত পুস্তকগুলি অত্যন্ত সুপ্রাপ্য, এগুলি দেখিবার



দশভুজা

শিল্পী: বিশ্বস্তর আচার্য্য, ইং ১৮২৪

সুযোগ সকলের ঘটিবে না। এই প্রতিলিপিগুলি হইতে পাঠক সে-যুগের বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ষের কিছু পরিচয় পাইবেন। শিল্পকর্ষের নিদর্শন হিসাবে এগুলির মূল্য খুব অধিক বিবেচিত না হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া এগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

সে-যুগের ধাতু-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে রামচাঁদ রায়, বিশ্বস্তর আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামনাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত ও কাশীনাথ

নিকট হইতে এই শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন।*

* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) বিবরণের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ:—

Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy.... The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper. That art they owe to the efforts of a member of this Society, some of whose friends expressed to him how groundless



নারদ ও শিব

দেশীয় শিল্পীর হস্তাক্ষিত চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের সম্বন্ধ আমরা পাইয়াছি, তাহা প্রথম বাঙালী সাংবাদিক গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ের সংস্করণ। এই পুস্তক ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। ইহাতে কাঠ ও ধাতু-বোদিত ছয়খানি চিত্র আছে। এখন পর্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এইটাই সর্বপ্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক।

এই প্রবন্ধে গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে :—

১। 'গৌরীবিলাস'—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত ও ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে দুইখানি কাঠ-বোদাই ও চারখানি ধাতু-বোদাই চিত্র আছে। বিশ্বস্তর আচার্য্য-কৃত দশভূজার ধাতু-বোদাই চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

২। 'সঙ্গীততরঙ্গ'—রাধামোহন দেন দাস-রচিত ও ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে মুদ্রিত রামচাঁদ রায়-কৃত ছয়খানি ধাতু-বোদাই চিত্রের মধ্যে আমরা "রাগ ভৈরব" ও

ইং ১৮২৪

"দীপক রাগ"-এর প্রতিলিপি দিয়াছি। চিত্র দুইখানির বর্ণনা পুস্তকে এইরূপ দেওয়া আছে :—

ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা

ভয়-রোঁ আদিরাগ শিবের বেশ।

শিব অবয়ব গুণে বিশেষ ॥

ভূজঙ্গনির্মিত শিরেতে জটা।

জটায় বেড়িয়া ভূজঙ্গঘটা ॥

হিলোল কল্লোল তরঙ্গ বায়।

ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায় ॥

ভালশোভা হরিতাল তিলকে।

সুধাংগুফলা কপালকলকে ॥

আসন বসন বাঘের ছালা।

দলমল দোলে মুণ্ডের মালা ॥

কোট শশধর জিনিয়া কায়।

তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক প্রায় ॥

বৃষভ বাহন করে ত্রিশূল।

অক্ষির ভাব চুলু চুলু চুল ॥ (পৃ. ১৭০-৭১)

দীপক রাগের ধ্যান

পরম যুবক পরিধান রক্তবাস।

গজমুকুতার মালা হৃদয়ে প্রকাশ ॥

was the idea of proficiency in engraving being ever attainable by a native. The result is one of the numerous facts that should enlarge the hopes of those who labor for the improvement of the inhabitants of this country, and for the introduction here of the ingenious arts of the European world.



শ্রীমত রাজসভায় সেনের রাজসভা

বিক্রম সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার

শিল্পী : মাধবচন্দ্র দাস, ইং ১৮২৫

তরুণ তরুণীগণ সঙ্গে রসরঙ্গে ।

আরোহণ করি এক প্রমত্ত মাতঙ্গে ॥

যামিনীতে ভ্রমণ পর্বতসন্নিধানে ।

সদাই আপনি মগ্ন আপনার গানে ॥

গানের প্রভাবে মৃতিমান হত্যাশন ।

হত্যাশনে পুড়ে পর্বতের তরুণগণ ॥

হুঃ শব্দে জলে অগ্নি দাবানল প্রায় ।

ভ্রমণে সুগম পথ আলো করে তায় ॥ (পৃ. ২১৩-১৪)

৩। ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’—উলা-নিবাসী ভূগঙ্গাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় রচিত ও ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৪) প্রকাশিত। বিশ্বস্তর আচার্য্য-কৃত ‘ভগীরথ গঙ্গা’ চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

৪। ‘ভগবতী গীতা’—রামরত্ন জায়পঙ্কজন কর্তৃক ভাষ্য-পুস্তক রচিত ও ১২৩১ সালে (ইং ১৮২৪) প্রকাশিত। ‘নারদ ও শিব’ চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

৫। ‘সুগুপ্তা-নিবাসী চিরঞ্জীব শর্মা’-রচিত ‘বিদ্যমোদ-তরঙ্গিনী’র রাধামোহন সেন দাস-কৃত পটভাস্ত্রবাদ, ১২৩২ সালে (ইং ১৮২৫) প্রকাশিত। ইহাতে ‘বৈষ্ণব শৈব শাস্ত্র হরিহরাদৈতবাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিক প্রভৃতির সভায় আগমন এবং ত্রক নিরূপণার্থে তাঁহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে।’ মাধবচন্দ্র দাস-বোদিত ‘বিক্রম সেনের রাজসভায় শাস্ত্র-বিচার’ চিত্রখানি এই পুস্তক হইতে গৃহীত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সে-যুগের আরও অনেক পুস্তকে দেশীয় শিল্পীদের কৃত ধাতু-খোদাই চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। কোতুহলী পাঠকের জ্ঞান আমি একপ কয়েকখানি পুস্তকের নির্দেশ দিতেছি; এগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগার ও রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে আছে :—

১। ‘বত্রিশ সিংহাসন’—ভাষ্য-পদ্যে রচিত ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত। ইহাতে “শ্রীমুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা” ও “বত্রিশ সিংহাসন” নামে বিশ্বস্তর আচার্য্য-কৃত দুইখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

২। ‘আনন্দলহরী’—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র বিজয়লঙ্কার-কৃত সাধু ভাষা সংগ্রহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে “শ্রীরাজরাজেশ্বরী” নামে রূপচাঁদ আচার্য্যের একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

৩। ‘অন্নদামঙ্গল’—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শেয়ালদহ গীতাধর সেনের মন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ইহাতে ১০ খানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। এগুলি বীরচন্দ্র দত্ত, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার ও রামসাগর চক্রবর্তী কর্তৃক খোদিত।

৪। ‘হরিহরমঙ্গল সংগীত’—বঙ্কমানাধিপতি তেজচন্দ্রের আদেশে দেওয়ান পরাণচন্দ্র বা প্রাণচন্দ্র বাবু কর্তৃক রচিত। ইহা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রামধন স্বর্ণকারের বোদিত ৭১ খানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা

অধ্যাপক এ. বি. মোহাম্মদ শুলতানুল আলম চৌধুরী

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আক্রমণের পর ইইতে মিশরের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আধুনিকতা ও নতনত্বের শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার অপূর্ব সম্মিলনে জাতির চিন্তাধারা এবং মন ও মস্তিষ্ক কত দূর আন্দোলিত ও প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা উত্তরকালীন আরবী সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্য দিয়া অধিকতর সুস্পষ্ট ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিবর্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে মহামতি মোহাম্মদ আলী পাশা, নছিফ ইয়াশেজী, বুতরুছ আল বুনানী, তাহাত্তী, আবদুল্লা পাশা ফিকরী ও আলি মোবারক পাশা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কদের অক্লান্ত শিক্ষা-সাধনা ও প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষানিকেতন, আধুনিক রুচিসম্মত পুস্তক প্রণয়ন ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা যেমন মিশরে আধুনিকতার সূচনা করিয়াছে তদ্রূপ তথাকার সাংবাদিকতা এই আধুনিকতার জয়যাত্রাকে অধিকতর দ্রুত ও বেগবতী করিয়া তুলিয়াছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ আলি পাশা 'আল ওয়াকায়েউল মিছরিয়া' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী যুগে মিশরের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আবর্তন ও আল বকুলী পাশা, ইব্রাহিম আদ দাহোকী, শেখ আলি ইউসুফ, সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী ও শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা প্রমুখ মনীষিবৃন্দের সাধনা ও যত্ন আরবী সাংবাদিকতার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে মিশরে মাত্র চার কি পাঁচ হাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইত আজ দেখানে তার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঞ্চাশ হাজারেরও উর্দ্ধে*। পত্রিকার প্রচার ও প্রবহণ সমভাবেই বিস্তৃত ও প্রসারিত হইয়াছে।

সাংবাদিকতার এই অস্বাভাবিক উন্নতি ও বিস্তৃতি আপামরসাধারণকে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্রবে আনিয়া দেশের জীবন ও চিন্তাধারায় নতনত্বের বিপ্লবশ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। যে ছান্দিক গড় এত দিন আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বাহন রূপে পরিগণিত হইত তাহা এখন অনেক স্থলে ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের প্রভাবমুক্ত হইয়া সহজ, সরল ও সর্ববোধগম্য গদ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং বিদেশী শব্দ, কষ্টকল্পিত উপমা ও কথ্য ভাষা আজ আরবী সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন মত

আরবী ভাষার চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম, ভাষার দ্রুত পরিবর্তন ও বিরোধী মতবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে

আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতনপন্থী মনীষিবৃন্দ বিচলিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন নতন পন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং পুরাতন আরবী ভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া জনসাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া তুলিতে চাহিলেন। নতন পন্থীরাও পূর্ণোদ্যমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষই চাহিলেন দেশের জনমত ও শুভেচ্ছা লাভ করিতে; তাঁহাদের বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার ফলে দেশের সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠিল এবং সাহিত্য-সাধনার মহা-কলরবে দিগ-দিগন্ত আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরাতনপন্থীদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাষার মধ্যে পরিবর্তন আসিয়া পড়িল, তদানীন্তন পত্রিকাসমূহ যথা, আল উরওয়াতুল উছকা, আল-মোকাতাতক, আল হেলাল এবং আল মনার প্রভৃতি পাঠে তাহা সহজেই অনুভূত হয়। এই সব পত্রিকার লেখকবৃন্দ আরবীর ব্যাকরণ ও চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করিলেও, ছান্দিক গদ্যের শৃঙ্খল ইইতে আরবী ভাষাকে অনেকটা মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরবী ভাষার এই পরিবর্তনের পশ্চাতে শেখ আবদুল্লাহর প্রভাব ও দান রহিয়াছে অপরিমেয়। তাঁহার বপ্ন ছিল মিশরবাসীদের মন ও মস্তিষ্কে অতীতের সংস্কার মুক্ত করতঃ ইসলামিক রুষ্টি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা। এই প্রচেষ্টার বাহনরূপে তিনি যে ভাষা গ্রহণ করিলেন, তাহাও হইল অনেকাংশে অতীতের সংস্কারমুক্ত, সরল ও সর্বজনবোধগম্য। তিনি ইহাও সম্ভবপর করিয়া দেখাইলেন যে, আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিজ্ঞান অতীত সংস্কার ও সংস্কৃতির সহিত সঙ্গত ছিল না করিয়াও আধুনিকতার সহিত সমান ভাবে পা ফেলিয়া চলিতে পারে।*

শেখ আবদুল্লাহর আহ্বানে দেশের তদানীন্তন সুধীবৃন্দ তাঁহার পতাকাতে জমায়েত হইলেন এবং তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সাহিত্য-সম্মেলন গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহারা পুরাতন পন্থী শেখ এবং নতন পন্থী আকেন্দীদের চরম পথ ও নীতিগুলি পরিত্যাগ করতঃ মধ্য পন্থাই অবলম্বন করিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ লুতফীর সম্পাদনায় এই দলের মুখপত্র আল জরিদা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, চরিত্র-গঠন ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের দ্বারা মিশরের জীবন গঠন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গত ছিল না করিয়া দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজ-নীতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ বপন করতঃ জাতির জয়-

* আল-ওয়াছেত, পৃ. ৩২৮-৩৩৩।

* Islamic Culture, July 1941, p. 319-320.

যাত্রাকে সীমিত ও জয়যুক্ত করিয়া তোলা।* ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণবশতঃ আল জরিদা পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া গেলেও, তাহার প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই,—তাহারই কল্যাণে আরবী ভাষা এক সর্ববাদিসম্মত নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল, যাঁহা উত্তর কালে আরবী সাংবাদিক জীবনের সর্বত্রই সঞ্চারিত হইয়াছে।

অধুনা প্রতিষ্ঠিত মিশরের ফোয়াদ আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ও আরবী ভাষার সংস্কার ও আধুনিকতার প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্যতা করিয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কলের সম্পাদনায় 'আছ ছিয়াছত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়; তাহার কল্যাণে মিশরে আধুনিকতা ও জাতীয়তার শক্তি সর্বতোভাবে শক্তিশালী ও রক্ষিত হইয়াছে। দেশের তদানীন্তন মনীষী ও সুধীবৃন্দ—যাহারা আছ ছিয়াছত পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা সাহিত্যিক সমালোচনা ও আরবী ভাষার ইতিহাসের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। এই নূতন পন্থী পণ্ডিতরাও দুইটি স্বতন্ত্র ও বিভিন্নমুখী পথ ধরিয়া চলিয়াছেন—একাধারে ডক্টর মনসুর ফাহ্মী, অধ্যাপক আহমদ আমিন ও মোস্তফা আবছুর রাজ্জেক প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে অতীতের বৈশিষ্ট্যময় ইসলামিক সংস্কৃতির অনিষ্ট সাধন না করিয়াও আরবী সাহিত্য পাশ্চাত্যের বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এবং খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক আবছল কাদের আল মাজেনীও এই মতেরই অমুগামী। অপর পক্ষে ডক্টর তাহা হোসেন আধুনিকতার চরম নীতিরই অমুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনি চান আরবী সাহিত্যের সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক ও ইউরোপীয় নীতির প্রবর্তন করিতে। তিনি বলেন আরবী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিত ও সমালোচকদের অভিমতকে বিজ্ঞানের রক্তালোকে পরীক্ষা না করিয়া অন্ধ ভাবে মানিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। জীবনতত্ত্ববিদ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সমালোচনার যে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে আরবী সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবর্তন করিতে হইবে।* তার জন্ত চাই ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সংস্কারযুক্ত, পক্ষপাতশূন্য শুদ্ধ মন। তদীয় প্রসিদ্ধ আল আদাবুল জাহেলী বা 'প্রাক-ইসলামিক যুগীয় সাহিত্য' এষ্টে প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাক-ইসলামিক সাহিত্যের নামে যে সাহিত্য আজ সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তার অধিকাংশই অলৌকিক ও ইসলামিক যুগে রচিত। চতুর্দিকে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য ও তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল,

কিন্তু শত বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়াও তিনি আরবী সাহিত্য সমালোচনার মার্মকাঠিতে অতীতের সংস্কারযুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। আছ ছিয়াছত পত্রিকার 'হাদিসুল আরবাআ' বা বুধবারের আলোচনা শীর্ষক স্তম্ভে তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি অনেক দিন ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনি উম্মিয়া এবং আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের যথা আবু নওয়াছ, বশ্শার বিন বুরদ, মৃতী বিন আয়াছ প্রভৃতির কবিতার বিভিন্ন দিক লইয়া 'বৈজ্ঞানিক ও স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

যাহাই হউক ১৮৮২ হইতে এ যাবৎ মিশরে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আরবী সাহিত্যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক আরবী কবিতা

আধুনিক আরবী কবিতার আধুনিকতা ও অভিনবত্ব তার ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, ছন্দ এবং গঠনের দিক দিয়া তাহা এখনও আব্বাসীয় যুগের প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। কবি আহমদ শওকীর সৃষ্টিমুখী প্রতিভার কল্যাণে কয়েকটি নূতন ছন্দের আবির্ভাব হইলেও তাহা পুরাতন ছন্দের সংস্কার বই কিছুই নয়। মিশরে শ্বিয়েটার, ফিল্ম কোম্পানী ও বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে ঝঞ্জল বা লোক-কবিতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এখনও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। পরলোকগত কবি আহমদ শওকী এবং হাফেজ ইব্রাহিম আধুনিক আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাদের সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পের অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণনার ফলে দ্বিগুণিত আজ জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এতৎসঙ্গেও শওকী এবং হাফেজের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে;—আনন্দ এবং গৌরবের দিকটা যেমন শওকীর মধ্যে অধিক প্রকট হইয়াছে তদ্রূপ ব্যথা এবং বেদনার দিকটা হাফেজের কবিতার মধ্যে অধিকতর লীলায়িত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শওকী এবং হাফেজের কবিতা হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শওকী বসন্তের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন:—

আজার আকবালা কুম্ বেনা এয়া ছাহি,
হায়রির রবিআ হাদিকাভাল আরওয়াহি।
একমা নাদামাজ জরফে তাহতা লেহায়াহি
ওয়ানসুর বে ছাহাতাহি বেছাতাহ রাহি।

"মার্চ মাস আসিয়াছে, হে বন্ধু এস এবং জীবনের আনন্দোদ্যান বসন্তের অভ্যর্থনা কর। আনন্দের সুরাসেবী

সকলকে তাহার পতাকাতে লে জমায়েৎ কর এবং তাহার স্তম্ভ
প্রাঙ্গণে আনন্দ শয্যা বিস্তৃত কর।”

হাফেজ তাঁহার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবিতা শেখ আবদুলহুসৈন শোক-
গাথায় বলিতেছেন :

বাকাশ শারহু ফার তাজজাত লাহল আরহু-

রাজজাতান

ওয়া ফাদাত উয়ুনুল কাওনে বিল আবারাতি।

ফাফিল হিন্দে মাহজুহুন, ওয়াফিচ্ ছীনে জাজ্জেউন

ওয়াফিমিছরা বাকিন্দ দায়েহল হাছারাতি।

ওয়াফিশ শামে মাহ জুউন, ওয়াফিল ফুরছে নাদেবুন,

ওয়াফি তুনাছা মা শেষতা মিন বাফারাতি।

“প্রাচ্য আজ গভীর শোকে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার
শোকে সমস্ত জগৎ প্রকম্পিত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের চক্ষু অশ্রু-
ভারাক্রান্ত। ভারতেও শোকের ছায়াপাত হইয়াছে, চীনেও
দুঃখের শ্রোত, প্রবাহিত হইয়াছে, এবং মিশরের ঘরে ঘরে
চিরন্তন দুঃখ গুমরিয়া কাঁদিতেছে। সিরিয়া আজ বেদনাবিধুর,
পারস্য আজ শোকগাথায় মত্ত এবং তিউনিসের দিকে দিকে
আজ করুন হা-ছতাশ।”

যাহাই হউক, শওকী এবং হাফেজ মিশরের জাতীয়
জীবনের গৌরবগাথা গাহিয়া সমস্ত দেশ এবং জাতিকে অতীতের
মহিমায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও তাঁহারা সম্পূর্ণ
ভাবে আধুনিক নহেন। ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন হায়কলের
মতে শওকীর কবিতায় ইছলামিক এবং পাশ্চাত্য দর্শনের
অপূর্ণ সম্মিলন ঘটিয়াছে।^১ কিন্তু ডক্টর তাহা হোসেন এই
মতের বোর বিরোধী। তিনি হাফেজ এবং শওকী উভয়কেই
মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যেই গণনা করেন এবং বলেন যে বর্তমান-
কালের কবিরা না অতীতের আইন কাহন বিশ্বস্তত্বে যানিয়া
চলিয়াছেন, না বর্তমানের। তাঁহাদের পূর্ণ ভাষাজ্ঞান ও মান-
সিক সক্রিয়তার অভাব বর্তমান আরবী কবিতার নিষ্ক্রিয়তার
জন্ম সর্বতোভাবে দায়ী।^২ তাঁহারা মিশরের জাতীয় জীবনের
আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাখ্যা করিলেও, পাশ্চাত্য আধুনিক
মহাকবিদের মত জগৎকে কোন স্রবণীয় বাণী দিয়া যাইতে
পারেন নাই। জনসাধারণের জীবনধারাকে তাঁহারা পরি-
চালিত করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ জনসাধারণ কর্তৃক তাঁহারা
পরিচালিত হইয়াছেন।^৩ তবুও তাঁহাদের সাধনা ও ত্যাগ
ভবিষ্যৎ কবিদের যাত্রাপথকে অধিকতর প্রশস্ত ও স্পষ্ট করিয়া
দিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আরবী কবিতায়
নূতনত্ব ও আধুনিকতার ধারা দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে,
মধ্যযুগের গতানুগতিক প্রথা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলেও

কবিতার স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও সীমারেখার দিক দিয়া আধুনিক
কবিতা সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক।

উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য

আরবী সাহিত্যের আধুনিকতা কবিতার চেয়ে উপন্যাস ও
কথা-সাহিত্যের মধ্যেই অধিকতর সুস্পষ্ট। আরবী কথা-
সাহিত্য অনেক দিন ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ইউরোপীয় ভাষার
জনপ্রিয়-উপন্যাস অনুবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে
সাংবাদিকতার প্রসার ও জনপ্রিয়তা কথা-সাহিত্যের অহু-
শীলনকে সার্বজনীন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয়
ভাষার প্রসিদ্ধ কতিপয় উপন্যাস আরবী কথা-সাহিত্যের আদর্শ
ও মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত হইল এবং সেই আদর্শকে ভিত্তি
করিয়া আরবী কথা-সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন চলিতে লাগিল।
মনফলুতী, আজ-জায়য়াত এবং আল-মাজেনী প্রমুখ মনীষিয়ন্দ-
যথাক্রমে তাঁহাদের ‘আল-আব্বাত’, ‘রফা-ইল’ এবং ‘ইবনতুল-
তবীয়া’ প্রভৃতি অনুদিত গ্রন্থাবলীতে বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের
একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বিপুল উৎসাহ ও উত্তমের
সহিত অনুবাদ কার্য চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে ডক্টর
মোহাম্মদ হোসেন হায়কল, তওফিক হাকিম এবং আলমাজেনীর
নেতৃবাহিনী কতিপয় প্রতিভাশালী লেখক ও অনুবাদক
মিশরীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও চিত্র-সম্বলিত মৌলিক উপন্যাস
রচনায় ব্রতী হইলেন। ডক্টর তাহা হোসেন প্রণীত ‘আল-
আয়রাম’ আলমাজেনী প্রণীত ‘ইবরাহিমুল কাতের’, তায়মুর
প্রণীত ‘আল আতলাল’ এবং আব্বাদিদ প্রণীত ‘ইবনতুল
মামলুক’ প্রভৃতি উপন্যাসকে বিনা দ্বিধায় মৌলিক মিশরীয়
উপন্যাস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

আরবী উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যের এখনও যাত্রারম্ভ;
দুর্বলতা ও অসামঞ্জস্য এখনও পদে পদে। এতৎসত্ত্বেও
অধ্যাপক আহমদ আমীনের যুক্তি ও গভীর দৃষ্টি ক্ষমতা, আল
মাজেনীর হাস্যরস, ডক্টর হায়কল ও তওফিক হাকিমের
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁহাদের বিভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যময় বর্ণনা-
পদ্ধতি হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে আরবী উপন্যাস সাহিত্যের
ক্রমবিবর্তনের ধারা এখন দ্রুত গতিতে পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর
হইতেছে। সেদিন দূরে নহে যখন আরবী আবার পৃথিবীর
ভাষাসমূহের মধ্যে নিজের উপযুক্ত আসন পরিগ্রহ করিবে।

গবেষণা ও তুলনামূলক সাহিত্য

ডক্টর তাহা হোসেন আরবী সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক
সমালোচনা ও গবেষণার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এখন
ফলপ্রসূ হইতে চলিয়াছে। মিশরের আধুনিক মনীষিয়ন্দ-
অতীতের সংস্কারযুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মন লইয়া পাশ্চাত্য মনীষিয়ন্দের
অনুকরণে, সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। তাহার ফলে কত
অনাবিষ্কৃত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কত সন্দেহের রহস্যজাল

১। আশ শওকীয়াত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

২। হাফেজ ওয়াশওকী, ২৫, ১৪০, ১৪১ পৃঃ।

৩। *lamie Culture*, July, 1941. P. 323.

ছিন্ন হইয়াছে এবং কত গৃহীত মতবাদ ধূলিসাৎ হইয়াছে। উক্তর তা'হা হোসেন-তদীয় 'আল-আদবুল-জাহেলী' পুস্তকে অকাট্য যুক্তি ও নির্ভীকতার সহিত প্রাক-ইছলামিক যুগের সাহিত্যের বিচার ও সমালোচনা করিয়াছেন; তাহার ফলে প্রাক-ইছলামিক যুগীয় সাহিত্যের সত্যতা সংশয় পূর্ণ এবং সেই যুগের সর্বজনমাণ ও শ্রেষ্ঠতম কবি ইমরউল কায়সের অস্তিত্ব পর্যাপ্ত সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক আহমদ আমিন তৎপ্রণীত হজরতের জীবনীতে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ব্যক্তিবিশেষের জীবনী আলোচনা মধ্যযুগীয় আরবী সাহিত্যে অতীব বিরল, আধুনিকতার সংস্পর্শে তাহার যাত্রাপথ স্পষ্ট হইয়াছে। উক্তর মোহাম্মদ হোসেন হায়কল কৃত হায়াতু মোহাম্মদ গ্রন্থে হজরত (সঃ)এর জীবনী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হইয়াছে। আব্দুর রহমান বে আল-আজ্জাম তৎকৃত 'বতুল আবতাল' গ্রন্থে হজরতের জীবনীকে তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনা ও তুলনামূলক গবেষণার এই নূতন মনোবৃত্তি আজ আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে তাহার আলোকসম্পাত করিয়াছে। ইহার ফলে আরবী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা ও সত্যাত্মক গবেষণার নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আব্বাস মাহমুদ আল আব্বাস প্রণীত 'রাজ আতুআবিল আলা' ও ইব্রাহিম রুমী ওয়া হায়াতু মিন শেরিহি এবং মাহমুদ শাকির প্রণীত মোতানব্বী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক আরবী সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টি। মাহমুদ শাকির কৃত মোতানব্বী সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শুধু মৌলিক নহে বরং প্রতিক্রিয়াশীল। প্রোক্ত গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে মোতানব্বী জলবাহকের পুত্র ছিলেন না; তিনি প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশের আলবী শাখা-সম্ভূত ছিলেন এবং মহামাণ্ডুলতান সায়ফুদ্দৌলার ভগ্নীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। এই মতবাদ মোতানব্বী সম্বন্ধীয় চিরাচরিত সমস্ত মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে।

এতাদৃশ লেখা ও গবেষণা আরবী সাহিত্য জগতে নব-জাগরণের বজ্রধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষানিকেতন, সরকারী ও বেসরকারী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান আজ একযোগে আরবী ভাষার সংস্কার ও বিস্তার সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরবী ভাষার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে মিশরে 'রয়েল ফিললজিকাল একাডেমী' স্থাপিত হয়।

আরবী ভাষার সংস্কার

আরবী ভাষার সংস্কারকল্পে প্রোক্ত ফিললজিকাল একাডেমী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী গ্রহণ করিয়াছে :

১। আল মোকতাতফ ১লা জানুয়ারী ১৯৩৬।

১। আরবী ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত করিয়া যুগের চাহিদা অমুযারী আরবী ভাষাকে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ বর্ণনা করিতে সক্ষম করিয়া তোলা।

২। বিদেশী ও কথ্যপরিভাষাকে আরবী রূপ প্রদান করা যদি অমুসন্ধানের পরেও আরবী ভাষায় প্রোক্তরূপ প্রতিশব্দ পাওয়া না যায়।

৩। সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বলিত আধুনিক অভিধান সংকলন করা এবং গ্রাম্য কথ্য ভাষাসমূহকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করতঃ গ্রহণযোগ্য শব্দসমূহ গ্রহণ করা।

উক্ত একাডেমীর তত্ত্বাবধানে ১১টি সাবকমিটি স্থাপিত হইয়াছে। আরবী ভাষার বিভিন্ন দিক ও পরিভাষা লইয়া আলোচনা ও গবেষণা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'একাডেমী'র গবেষণা সম্বলিত মুখপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে প্রতিবাদ উঠিল—জনসাধারণের মতে একাডেমী লুপ্ত ও পরিত্যক্ত পরিভাষিক শব্দকে সংজ্ঞাবিহীন করিতে চেষ্টা করিতে হইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত কথ্য পরিভাষার পরিবর্তে একাডেমী কর্তৃক গৃহীত নূতন পরিভাষা ব্যবহার করিতে তাহারা অস্বীকার করিল।

সেঁ যাহাই হউক, এইরূপ বাদানুবাদ সাহিত্যজগতে নূতন নয়। যে মূল উদ্দেশ্য ও ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ফিললজিকাল একাডেমী কর্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা হইতেছে আরব জগতের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সামঞ্জস্য ও একতা সংরক্ষিত করিয়া ভাষার অবনতির পথ রুদ্ধ করা। আরব রাষ্ট্রশক্তি ও সভ্যতার পতনের পর আরব জাহানের দিকে দিকে যে অরসাদ ও পানির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল তাহার ফলে আরবী ভাষা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে স্বাধীনভাবে পরিপুষ্ট লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু কেন্দ্রচ্যুতি ও আদর্শচ্যুতি হইল ভাষাজীবনের সঙ্কটময় অবস্থা। যে ভাষা অতীত আদর্শ মূলগত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়া কথ্য ভাষা রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে সেই ভাষার ধ্বংস ও বিলুপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী; কয়েক শতাব্দী পরে সেই ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্য ও সমরূপতা আবিষ্কার করা গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। জগতের ভাষার ইতিহাস ও ভাষা বিজ্ঞান এই সত্যই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ফিললজিকাল একাডেমী ভাষার সমরূপতা রক্ষার্থে যে মহান সাধনার দ্রষ্টা হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ভাষার অস্তিত্বের জ্ঞান যেমন জীবনী-শক্তির দরকার তদ্রূপ ভাষার স্বাস্থ্য ও সবলতার জ্ঞান বাহ্য আবহাওয়ার দরকার। ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন না দিয়া আবশ্যিক মত বিদেশী শব্দও গ্রহণ করিতে

১। মাজালাতু মাজমায়িললুগাতিল আরাবিয়াতিল মুলকী, ১ম খণ্ড, ২২ পৃঃ

হইবে নচেৎ ভাষা অনেক স্থলে ছুঁকল ও পঙ্খ হইয়া পড়িবে। আরবী ভাষাও তাল মিলাইয়া চলিয়াছে—সে দিন দূরে নহে এই উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একাডেমী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। যখন আরবী ভাষা আবার তাহার গৌরবময় আসন গ্রহণ আরবীয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের মহাকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে করিবে।

নব-সন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২

বাহিরে আসিয়া ছ'জনে গঞ্জের দিকে চলিলেন। রাত্রি বেশি না হইলেও সন্ধ্যা বেশ ভাল ভাবেই উৎরাইয়া গেছে। গভীর মৌন—অনেক দূর পর্যন্ত কোন কথাই হইল না ছ'জনের। সেখান হইতে টিলার পথটা আলাদা হইয়া গেছে, তাহার কাছাকাছি আসিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—“এর কোন উপায় নেই স্মার ?”

কোনটা যে টুলুর মনে বেশি চাপ দিবে মাঠার মশাই এখনও আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, প্রশ্ন করিলেন—“চরণদাসের মেয়েটার ব্যবহারের কথা বলছ ?”

“না; ভেবে দেখলাম ওটা ভালই হয়েছে, আমিই ভুল করছিলাম। আমি বলছিলাম খনির এই সমস্ত ব্যাপারটা, আরও কত ভীষণ বোধ হয় খুঁটিয়ে দেখাও হ'ল না। বলছিলাম বুজিয়ে দেওয়া যায় না ?”

কথাটা সহজভাবেই বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বেশ বুঝা গেল এই কয়েক ঘণ্টার সমস্ত অভিজ্ঞতার আতঙ্কটা তাহার পিছনে রহিয়াছে।

মাঠার মশাই বলিলেন—“সেটা সম্ভব নয়।... যদি সম্ভব হ'ত তো উচিতও হ'ত না টুলু।”

টুলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—“উচিত হ'ত না।”

“সত্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া অস্বাভাবিক টুলু আর সেইজন্তে বোধ হয় পাপও, যদিও এটাও সত্যি যে সত্যতার গতি কুটিল।”

টুলু নির্বাকই দাঁড়াইয়া রহিল। মাঠার মশাই বলিলেন—“একটা বেয়াড়া প্যারাডক্সের মতো শোনাচ্ছে, না ? বেশ, তার গতিপথের বেশ বড় বড় ছোটো ল্যাণ্ডমার্ক নাও—একটা মানুষের উচ্চাশার (ছুরাশারও বলা চলে) আর একটা তোমার ধর্মের। প্রথমটার নজির হিসেবে রইল ইজিপ্টের পিরামিড আর দ্বিতীয়টার—জগন্নাথদেবের মন্দির—ভাবতে পার প্রত্যেকটাতে কত লোকসংখ্য হয়ে থাকবে—কত বেদনা, কত দুঃখ, কত অত্যাচার, কত হা-হুতাশ ?”

আবার নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টিলার গোড়ায়

দুইটি পথের সন্ধানে আসিয়া বলিলেন—“জগন্নাথের মন্দিরের উদাহরণটাই দিই টুলু—ঠিক এই রকম, আমাদের এই সভ্যতার দেউলটাও গড়তে অনেক কিছু লাগল—দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার-অনাচার—বোধ হয় অনিবার্য ছিল এসব। এবার দুঃখ দিয়ে তৈরি মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে—মানুষের আনন্দ দেবতা। আমাদের যুগের এই ব্রত, আর এই ব্রত উদ্‌যাপন করতেও খানিকটা দুঃখ আছে। সভ্যতার দেবতা আরও বেশি চান, দেউল তুলতে যা হ'ল, হ'ল, এখন তাঁর বেদী তুলতেও তো তোমাদের মতন অনেককে আত্মবিসর্জন দিতে হবে?... আজ যাও, রাত হয়েছে, বেশ ক্লান্তও আছ।”

নিজে স্থলের টিলার পথে পা দিলেন।

প্রশ্ন যাই করুক, মাটির উপর পা দেওয়া পর্যন্ত টুলুর মনে একেবারেই একটা উন্টা শ্রোত বহিতেছিল। কি আনন্দ। এই মাটি, এই বাতাস, এই আকাশ প্রতি মুহূর্তে আমাদের ঘিরিয়া আছে বলিয়াই যেন ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই এত দিন—কত মধুর।—কত মধুর। খনির সঙ্গে খনির সমগোত্র যাহা কিছু—দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, অত্যাচার-অনাচার সব কিছুর সঙ্গেই সম্বন্ধ ঘুটাইয়া দিল টুলু। যাহারা ইচ্ছা করিয়া জোয়াল ঝাড়ে করিবে—লোভের, মায়ার, মোহের—তাহারা তো ভুগিবেই এমন করিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, সবাই তো এক সুরে এই কথাই বলিয়া গেছেন। টুলু কি করিবে ? না, ফিরিয়া চলো আশ্রমে, যেখানে বিরাটতর মুক্তির আলো কোন এক হৃদয় অলক্ষ্য জগৎ হইতে আসিয়া পড়িতেছে। টুলু মনে মনে শিহরিয়া উঠিল—বুদ্ধ নিজের সন্তানের মায়াজোর ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, আরও গিয়াছিল পরের সন্তানকে বুক জড়াইতে। চমৎকার। প্রকৃতি-মেয়েটির প্রশংসা করিতে হয়—নিজে মুক্ত হইয়া তাহাকে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল মন্দ নয়। চম্পা বাঁচাইয়াছে তাহাকে; শত ধন্বাদ চম্পাকে। কিন্তু কি ভীষণ জীবন। টুলু সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে, খনির সঙ্গেও, বস্তির সঙ্গেও, তবু তাহাদের স্মৃতি হইতে যেন কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। মাঠার মশাই বলিয়াছিলেন—বস্তিতে তুমি পরিণামটা দেখেছ, খনির মধ্যে তার কারণটা দেখাব। সত্যি অসহ জীবন—শুধু এক

বার একটু দেখার অভিজ্ঞতাতেই টুলুর যখন এই অবস্থা, যাহারা ভুক্তভোগী তাহারা সাদা চোখে এর উগ্রতাটা কি করিয়া বহন করিবে? চরণদাসের আবার এর ওপর আছে চম্পা,—নিজের কথা, খনি-জীবনের—আর তারই পরিণাম বস্তি-জীবনের গ্লানি মাথিয়া চোখের সামনে ডুবিয়া যাইতেছে। কি করিয়া দেখা যায় এ দৃশ্য? চম্পার কথা মনে হইতেই টুলুর দৃষ্টি যেন তাহার ছবিটির উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল—প্রত্যুপন্ন স্মৃতি—শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছবির জন্ত ছুটিয়াছে। তাহার পর সেই ছেলেকে কাড়িয়া লওয়া। এতগুলো জীলোকের মধ্যে—এতগুলো মানুষের মধ্যেই বলা চলে, এই মেয়েটিরই একটা ব্যক্তিগত আছে। তবুও কষ্ট হয়, বরং সেইজন্তই বেশি করিয়া কষ্ট।...আরও একটা কথা চম্পাদের পরিবার ওরই মধ্যে ভ্রম, অবস্থাগতিকে নামিয়া গেছে। চরণদাসের সেই কথাগুলো সেই অবস্থাতেও টুলুর কানে বড় বাজিয়াছিল—“কি করি, পেট বড় দুশমন, নইলে বোষ্টমের ছেলে...” টুলু বাড়ির দিকে গেল না, ওদিকে বাইতে পা উঠিতেছে না। বস্তি আর স্থলটা বাদ দিয়া এই দিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জীবনে-তাহার আজিকার মতো অভিজ্ঞতাও হয় নাই কখনও, মন এত ভারাক্রান্তও হয় নাই। অথচ ভাবটা যেন শূন্য তার। টুলু এতদিন যা আশ্রয় করিয়াছিল—ধর্ম, তাহা হইতে সে স্বলিত—সত্যই, পৃথিবীর এই দিকটা দেখিয়া ধর্মকে মনের একটা বিলাসই বলিয়া বোধ হয়, অথচ এই ধর্ম থেকে যে মাষ্টার মশাই তাহাকে স্বলিত করিলেন, তিনিও আজ টুলুর জীবন থেকে অন্তর্মিত। বস্তি-জীবন আর খনি-জীবনের সঙ্গে সংগ্রহ বোচানো মানেই তো তাহার জীবনে মাষ্টার মশাইকেও অস্বীকার করা। ভালমন্দ সব হারাইয়া এ যেন একটা বিরীচী শূন্যতা।

রাত হইয়া চলিয়াছে; নিতান্ত নিশিতে পাওয়ার মতই টুলু নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তৃষ্ণা পাইয়াছে, এই অহুত্বাতিটা যেন খনির মধ্যে প্রবেশ করা থেকেই ছিল, এখন ওটাকে স্বীকার করায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আরও একটা অহু-ভূতিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিল—ক্ষুধা, অসহ ক্ষুধা পাইয়াছে।

টুলু একটা কাজ, একটা অবলম্বন পাইয়া যেন বাঁচিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল খুচরা তিন আনা পয়সা গুড়িয়া আছে। হন হন করিয়া গল্পের দিকে চলিল। দোকান প্রায় সব বন্ধ হইয়া গেছে, অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা মুড়ি আর ফুলুরি-বেগুনির দোকান পাওয়া গেল; দোকানি মুড়ি ঝাঁপ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে।...আহার্যের অপূর্ণতা জলে মিটাইয়া টুলু আবার স্বীকার আসিয়া দাঁড়াইল।...মুখে এক বার একটু হাসি ফুটিল—চমৎকার।—খনি-বস্তি-জীবনের যেন হোঁচাক লাগিয়াছে, খাবার যা জুটিল তাহাও নেশার চাই। বাঃ, জীবনে অপূর্ণ একটু রাজি দেখা দিয়াছে, চিরদিন মনে থাকিবে।

তবু চিন্তাটা একটু স্বচ্ছ হইল, টুলু এটা বেশ বুঝিতে

পারিল যে ছুঁদিক ছাড়িয়া বাঁচা চলিবে না। আর এটাও ঠিক যে আশ্রম অচল; মাষ্টার মশাইয়ের একটু কথাও ভুল নয়—ও জীবন নিজের শঠতায় আরও ভয়ঙ্কর। তবে?—আবার মাষ্টার মশাইয়েরই শরণাপন্ন হইবে?

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ বিকাশে টুলুর মনটা দীপ্ত হইয়া উঠিল—পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে।—মাষ্টার মশাইয়ের পা জড়াইয়া বলিবে—আমায় অল্প পথ দেখান—চম্পার মত সর্পিণী যে পথ আগলে বেড়াচ্ছে সে পথে আমায় দেবেন না ছেড়ে।...বোধ হয় এত করিয়া বলিতেও হইবে না, আজকের ব্যাপারের পর তিনি বোধ হয় তাহার জন্ত অল্প পথ বাছিয়াও রাখিয়াছেন। জানিয়া বুঝিয়া কে সাপের মুখে ফেলিয়া দিতে পারে একজনকে—অতি বড় শত্রু না হইলে?

টুলু স্থলের পথ ধরিল।

টিলায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মত গেল বদলাইয়া। এত সত্ত্বেও মাষ্টার মশাই যদি সেই বস্তির কথাই ধরিয়া থাকেন? আর সেইটেই বেশী সম্ভব নয় কি?—মাষ্টার মশাইকে তো এতদিন দেখিল...

মনটা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—আজ একটা কিছু স্থিরনিশ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। মনের আলোড়নেই একবার সিদ্ধ-বাবার কথাটা হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়িল। টুলু একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল—একটা ছবি একেবারে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া চোখের সামনে ওই ছলিতেছে—নদীর ধার—লতার ফুলে সাজানো একখানি বাড়ি—তার দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় কয়লের ওপর একটি কুফাজিনে সিদ্ধবাবা বসিয়া—গৌর কান্তির ওপর সকালের আলো আসিয়া পড়িয়াছে—দীর্ঘায়ত চোখে অপরিদীপ্য শান্তি আর প্রসন্নতা—বিনা আমায়েই যেন তাহা হইতে প্রসন্নতা ঝড়িয়া পড়িতেছে।...টুলুর চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল—সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়া তাহার মন যেন বলিয়া উঠিল—না, আমায় মার্জনা কর, আমায় বাঁচাও; আমার যা পথ তা তোমার ঐ প্রসন্ন দৃষ্টির নিচে; আমি বুঝছি; অনেক দেখে, অনেক ভুগে, অনেক সংশয়ের পর আমি শেষ বারের মত চিনেছি তোমায়, হে দেব, আমায় ডেকে নাও, আমার উদ্ধার কর...

একটা অদ্ভুত শক্তি আসিয়া গেছে। সমস্ত দিনের ক্লান্ত পা হুঁচটায় যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ নামিয়াছে, মনটা এক মুহূর্তেই হইয়া উঠিয়াছে বকের পাখনার মতই হালকা—যেন কাহার আশীর্বাদেই। টুলু চড়াই ঠেলিয়া উঠিতেছে যেন ঢালু বাহিয়া নামিয়া যাইতেছে—মনটা চলিয়াছে আগে আগে, তাহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে।...স্থলের সামনে আসিয়া পায়ের জুতা দুইটা খুলিয়া লইল—বর্ষণের শব্দে যদি মাষ্টার মশাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়—যদি জাগিয়াই থাকেন মাষ্টার মশাই।

স্থল অতিক্রম করিয়া আবার জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়া

টুলু হুন্ হুন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কত রাত হইবে ?—ঘড়ি নাই, তবে কতকগুলো নক্ষত্রপুঞ্জের সংস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারিল প্রায় মধ্যরাত্রি—আজকাল অনেকগুলোকে চেনে। একটা কথা মনে পড়িয়া টুলুর একটু হাসি ফুটিল—মাষ্টার মশাই এক দিন বলিয়াছিলেন—“টুলু, রাত্রির গভীরতার সন্ধান না পেলে মাঝে মাঝে গভীরতার সন্ধান পায় না।” ...বড় খাঁটি কথা, এই কটা দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া কত বিনীত রাত্রিই না তাহার কাটিল।—কি গভীরভাবেই না সে দেখিল জীবনকে! নিজেই অনুভব করে বয়সের গভী ছাড়াইয়া সে যেন কত দূর আগাইয়া গেছে—কত দূর!—কত দূর!... জুলন্ত ডান দিকে রাখিয়া রাঙাটা নামিয়া গেছে, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে একটা টিলার ওপর উঠিয়াছে; প্রায় জ্বলের টিলার মতোই উঁচু, মাঝের ব্যবধানটুকু প্রায় আধ মাইল হইবে। এইখানে আসিয়া কি ভাবিয়া টুলু একবার ফিরিয়া চাহিল। খনিচক্রের অস্থূল আলোকবিন্দুগুলা টিলার অন্তরালে অবলুপ্ত হইয়া গেছে—একটা ছঃস্বরের মতোই। মাষ্টার মশাইয়ের বাসার মাথাটা কিন্তু দেখা যায়; আর ঐ ছায়াপিণ্ড কাঞ্চন গাছ। ঐটুকুকেই আশ্রয় করিয়া এক মুহূর্তে সব যেন আবার জাগিয়া উঠিল—খনিচক্র, দূষিত ক্ষতের মতো সর্বাঙ্গে তাহার রাঙা দাগ—বস্ত্রি—খনি—চম্পা—চরণদাস; অন্ধকার গহ্বরে, যমের মুঠার চাপের মধ্যেই সেই মরা প্রস্থতি—হীরক—মাষ্টার মশাই। সমস্ত মনটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল—সে ছাড়িয়া আসিল?—সে ঐ পুতচরিত্র অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়?—কালই তাহার পদস্পর্শ করিয়া চরণদাসের হাতের রান্না খাইতে রাজি হইয়া সে যুগ-যুগের একটা সংস্কার ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার পিছনে কি একটা নূতন ব্রত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ছিল না?

টুলু অনেকক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিল।...এক সময় সে আবার জ্বলের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু কয়েক পদক্ষেপ মাত্র, তাহার পর আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে যেন একটা ঝড় বহিতেছে। কি সর্বনাশ!—এই রকম অনিশ্চিত মন লইয়া সমস্ত রাত এই ছুইট টিলার মধ্যে ঘড়ির দোলকের মতো তাহাকে এদিক ওদিক করিয়া কাটাইতে হইবে নাকি?

সমস্ত শক্তি দিয়া টুলু আবার ফিরিল—অশ্রুট অধচ স্পষ্ট স্বরেই ব্যাকুল ভাবে যেন সামনে কাহার মুখ চাহিয়া বলিল—“আমায় বাঁচাও, এ জীবন আমার নয়। হে গুরুদেব, টেনে নাও আমায় তোমার পানে—তোমার সমস্ত তপোবল প্রয়োগ করে টেনে নাও—হে অন্তর্যামী সিদ্ধপুরুষ!

এই দ্বিতীয় টিলা পার হইয়া টুলু আবার একটা উৎরাই ধরিয়া বালিয়াড়ির পথে নামিতে লাগিল; একবার ঘুরিয়া দেখিল প্রথম টিলাটি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। “আঃ!” বলিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার পর যে সময়টা নষ্ট হইয়াছিল

সেটাকে পর্যন্ত উত্তুল করিয়া লইবার জন্ত গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে বাতাসে একটা মধুর বিপর্যয় ঘটয়া গেল: একেবারে দিক্‌রেখার উপর একটা কালো মেঘের ফালি ছিল, সেইটার অন্তরাল হইতে কৃষ্ণ সপ্তমীর চাঁদ একেবারে আকাশের খানিকটা ওপরে উঠিয়া চারি দিক একটা অর্ধশ্রুট জ্যোৎস্নায় ডুবাইয়া দিল; এই জ্যোৎস্নার মতোই নিতান্ত যেন কোথা থেকে একটা যুহুমান্দ সমীরণ উঠিয়া চারি দিকে একটা পুলক-শিহরণ জাগাইয়া তুলিল, আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য—এক অপার্থিব গন্ধ! জ্বলের কথা তো দূরে, একটা তৃণ পর্যন্ত দেখা যায় না কোথাও সেই কৃষ্ণ উষ্মর পাহাড়ের গায়ে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যেন কে কোথায় অলক্ষ্যে সমস্ত নন্দনকাননটা তুলিয়া আগিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

টুলুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল।—হে প্রভু, চিনেছি তোমায়, এই মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নার মতোই আমার সংসারাকুল দৃষ্টিকে তুমি স্বচ্ছ করে দিয়েছ—এই আমার ফেরার পূর্বস্বার, এই তোমার আহ্বান। এত তোমার করুণা?—এমন করেই কি নিতান্তই তোমার এই অকিঞ্চন ভক্তটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে আছ?—তা হলে তুলে নাও আমার আমার অন্তরের সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত করে নিয়ে—আমার এই একটা দিনের সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে। হে প্রভু, আমি আসছি—তোমার এই আশীর্বাদ সর্বাঙ্গে মেখে, নন্দনগন্ধম্বার হয়ে আমি এখনি এসে উপস্থিত হচ্ছি তোমার রাতুল চরণ তলে...

একটি পরম নির্ভরতা, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আর প্রগাঢ় ভক্তিরসে টুলুর চক্ষু ছুটি সজল হইয়া উঠিল। এত হালকা শরীর—টুলু মাটির স্পর্শ যেন অনুভবই করিতেছে না। যতই অগ্রসর হইতেছে গরুটা ততই স্পষ্ট, বাতাসটা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ডান দিকে টিলাটা একেবারে খাড়া, সামনে কয়েক হাত পরে একটা বাঁক—কেমন যেন মনে হইতেছে বাকের ওদিকেই তাহার জন্ত আরও অর্পণ একটা কি অপেক্ষা করিতেছে—গুরুদেবের আরও বড় একটা করুণা, আরও সুমিষ্ট একটা আহ্বান।

টুলু আরও পা চালাইয়া দিল—কি জানি, এ সব দৈব জিনিষ যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎই মিলাইয়া যায় সে—

মোড় ঘুরিয়াই দেখিল অল্প দূরে ছুইট জীলোক।...এত রাতে, এই জারগায়! আগেকার পুলক আবেগের ঝোঁকেই টুলু যেন হুন্ হুন্ করিয়া আগাইয়া গেল, তাহার পর তাহার সারা শরীরের রক্ত যেন একযোগে সমস্ত ধমনী বাহিয়া নামিয়া গেল।...চম্পা!—আর তাহার সামনে আর একটা জীলোক—মারবয়সী, গেরুয়া পরা; টুলু তাহাকে এক দিন সিদ্ধবাবার আশ্রমে হাতে কি একটা পাত্র লইয়া একটা ঘরে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।...বালিয়াড়িতে

যাইতেছে, এদিকে পিছন। চম্পার কবরী বেড়িয়া একটি টাটকা বেলফুলের মালা—তার গন্ধের সঙ্গে কি একটা মিষ্ট এসেন্সের গন্ধ মিলিয়া তাহার চারি দিকের হাওয়াটাকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। পরনে একটি পরিষ্কার শাড়ি, এইটাই বোধ হয় প্রথম দিন দেখিয়াছিল।

টুলুর নন্দনকানন এক মুহূর্তেই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত মনটা যেন তোলাপাড় করিয়া উঠিতেছে। প্রথমটা ভাবিল অপরিজ্ঞাত থাকিয়াই চুপি চুপি ফিরিয়া যায়। তাহার পর হঠাৎ কি মনে হইল দ্রুত পদে আগাইয়া গিয়া বেশ স্পষ্ট, কতকটা রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”

ছুই জনে ফিরিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর চম্পা মুখটা একটু নিচু করিয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপর জীলোকট ফির দৃষ্টিতে টুলুর মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, একটু পরেই তাহার মুখে একটা ছায়াহীন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিল—“কেন?—সিদ্ধ-বাবার আশ্রমে।”

আজ বিশ্বয়ের ওপর বিশ্বয় উপলব্ধি করার দিন টুলুর : চম্পা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল, প্রথম লজ্জার ঝোরটা কাটিয়া গেছে। বেশ সোজাভাবে মুখ তুলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সঙ্গে বলিল—“কেন, আশ্রম পুরুষদেরই একচেটে নাকি?”

একটা ঝোঁকে একটু চৈতন্য হইয়াছিল, টুলুর শরীর-মন আবার যেন অসাড় হইয়া গেল।...আলো নাই—যে গন্ধ দূর থেকে এত স্পষ্ট ছিল, নাকের নিচে আসিয়া তাহা একেবারে বিলীন—বিলীন না বীভৎস?—চারি দিকে যেন নর্দমা—আশ্রমের নর্দমার সঙ্গে বস্তির নর্দমা মিশিয়া গেছে—কি করিয়া?—কি করিয়া?...

টুলুর আঁখির যখন সন্ধি হইল—দেখে ছুই জনে ধানিকটা দূরে আগের চেয়ে লবু গতিতে আবার আগাইয়া যাইতেছে।

একটু কি ভাবিল, তাহার পর আবার দ্রুত, কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল। এবার জীলোকট আর চম্পার মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া চম্পার পানে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল—“তুমি যেতে পারবে না ওখানে।”

চম্পারও মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—“কেন?”

“নরক...”

“স্বর্গ কোথায় পাব আমি?”

টুলু একটু ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে দ্রুত কণ্ঠে বলিল—“হ্যাঁ—ইয়ে—বনমালী—স্কুলের চাকর, সে তোমার ঠাকুরদাদা নয়?—তার ভয়ানক অস্বপ্ন—স্কুল থেকেই আসছি আমি...”

—এমন একটা উত্তর যে তাহার মুতায় সেটা নিজেই যেন শেষের দিকে এলাইয়া গেল।

চম্পার মুখটা কিন্তু নরম হইয়া আসিল, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, একটু স্পষ্ট করিয়া হাসিয়াই বলিল—“স্বর্গের দরজাতেই মিথ্যা?...বেশ, চলুন, যাচ্ছি।”

ফিরিয়া জীলোকটকে বলিল—“তাকে আমার প্রণাম দিয়ে দেবেন তা হলে।”

১০

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে মাঠার মশাইয়ের রাস্তার দিকের জানালায় থা পড়িল, প্রশ্ন হইল—“জ্ঞার ঘুমোচ্ছেন?”

সাদা পাওয়া গেল না। টুলু আরও কয়েক বার ডাকিল, প্রতিবারেই গলা একটু বেশি উঁচু করিয়া। খোলা জানালার গরাদে মুখটা চাপিয়া লক্ষ্য করিতেছে, একটা ছোট গলা-খাঁকারির শব্দে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতে দেখে, বনমালী দাঁড়াইয়া। একটা চাবি বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“লেন আজ্ঞে।”

টুলু ঘাড়টা একটু পিছনে টানিয়া লইয়া দেখিল সদর দরজায় তালাবন্ধ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—“মাঠার মশাই নেই?”

বনমালী মাথা নাড়িল।

“নেই মানে?—আমার সঙ্গে টিলার নিচে পর্যন্ত এলেন। গেছেন কোথায়?”

বনমালী খুব বুদ্ধিমানের মতো ঠোট বঁকাইয়া একটু হাসিল; একটা চোখ একটু বুজিয়া নিজের মাথার ডান দিকে তর্জনী দিয়া গোটা কতক টোকা মারিল, তাহার পর হাসি-সুন্দ এই সমস্ত ইঙ্গিতটুকুর ঢীকা-রূপে বলিল—“একটু ফ্যাপা আছে বটে; এই আচে ঘুরে দেখো...”

“নেই”—কথাটার জায়গায় একটা টুসকি বাজাইয়া দিল। আবার চাবিটা বাজাইয়া বলিল—“লেন আজ্ঞে।”

টুলু অগমনক ভাবে বলিল—“খোল দরজাটা।”

ঘুরিয়া সামনের দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তার যেন কোন স্রুই ধরিতে পারিতেছে না। এই কয়টা দিন ধরিয়া সমস্ত ব্যাপারগুলো যেন একটা ভোজবাজি।... মাঠারমশাই নাই—এর অর্থ কি?—সব-কিছুর গোড়ায় যে তিনি, তাহারই ডরসায় টুলু আজ সবচেয়ে হুঃনাঃসের কাজ করিয়া বসিয়াছে—বিষধরা সর্পিণীকে সঙ্গিনী করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে। এ আবার কি নূতন সমস্যায় পড়িল এখন?

বনমালী তালা খুলিয়া দরজার পাল্লা ছুইটা ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ছুই পা আগাইয়া আসিল, বলিল—“চলেন আজ্ঞে। টেলিগেরাম এল, উই স্কুল সেক্রেটারি বাবুর কাছে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গেলুম...”

“ক’ দিনের ছুটি?”

বনমালী সে কথা জিজ্ঞেস করে নাই। মাথাটা বার ছুই

চুলকাইয়া, তাহাতে একটা ছোট ঝাঁকানি দিয়া বলিল—“তা কি বললেক ? কিয়া দেখি দুয়ার বন্ধ, তালার মধ্যে চাবিটি। আর একবার এই রকমপারা চলে গেল বটে...পাঁচ দিন...”

মাথাটা একটু নিচু করিয়া করেকবার ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া দিল—অর্থাৎ গতিক বেশ ভাল নয়, লোকটির মাথায় আছেই কিছু গোলমাল।

টুলু প্রশ্ন করিল—“তা তুমি সেক্টেরি বাবুকেই জিজ্ঞেস করলে না কেন ?”

বনমালী একটু বিরক্ত হইল, বলিল—“তুমি কথাটি বুঝোক নাই বাবুমশয়, সেক্টেরি বাবু ছিলোক নাই। উর চাকরকে দিয়ে আলুম।...কথাটি তুমি বুঝোক নাই।”

একবার বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া তখনই কিরিয়া নিজের কোমরের কাপড় হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিল—“আর ই-লেন, আপুনারও একখানা চিঠি ছিলোক।”

দিয়া বাহির হইয়া গেল।

টুলু ঝামের মধ্যে থেকে চিঠিটা বাহির করিয়া দেখিল—ছটির দরখাস্ত। বনমালীকে ডাকিল, কিন্তু তখন সে চলিয়া গেছে।

ভিতরে গিয়া টুলু মাষ্টার মশাইয়ের বিছানাটা পাতিয়া লইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। একেবারে চিন্তার অতলে ডুবিয়া গেছে। বনমালী নিজের বাসা থেকে দেশলাই আনিয়া আলোটা জালিল, ধরের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল—“পাক হবে আজ্ঞে ?”

প্রশ্নটা আরও একবার করিল, কোন উত্তর না পাইয়া মাথায় দুই বার টোকা মারিয়া মাথাটি ছলাইতে ছলাইতে চলিয়া যাইতেছিল—অর্থাৎ টুলুরও মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ আছে—কপাটের বাহিরে পা দিতে টুলু প্রশ্ন করিল—“আমায় কিছু বললে বনমালী ?”

বনমালী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—“পাক হবে আজ্ঞে ?”

“না, আমি খেয়ে এসেছি। আর রাতও তো ফুরিয়ে এল, এখন রান্না চড়ালে...ঠিক কথা, বনমালী, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তুমি চিঠির গোলমাল করেছ।”

বনমালী রগ চুলকাইতে চুলকাইতে বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল। টুলু বলিল—“এটা দরখাস্ত, আমার চিঠিটা তুমি চাকরের হাতে দিয়ে এসেছ।”

“এই কথাটি আছে ? তা সকালে উকে দরখাস্তটি দিয়ে এলেই উ তোমার চিঠিটি দিয়ে দিবেক, এত ভাবনা কেন গো ? চিঠি লিয়ে করবেক কি সে ?”

ওর সমস্ত-সমাধানের ভঙ্গিতে টুলুর একটু হাসি পাইল, কিন্তু সেটা চাপিয়া বলিল—“ও যাক্, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম...”

“বলুন আজ্ঞে।”

“চরণদাসের মেয়ে...মানে, চরণদাস তো তোমার ছেলে হয়, না ?”

“ছেলে হয় আজ্ঞে, উর মেয়ে চম্পা আমার লাভনি বটে।”

“আমি চরণদাসের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।”

“ছেলে বটে বাবুমশয়, ছেলে বটে।”

বনমালী চৌকির পাশে হাতের বেড়ে দুই হাঁটু জড়াইয়া উবু হইয়া বসিল, রেকর্ড বাজিয়া চলিল—“চরণদাস ছেলে বটে আজ্ঞে, আর ভাল ছেলে বটে। উ এমনটি ছিলোক নাই। ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া হাতের কজি—আমি চরণদাসের মাকে বলতাম—তুর ছাওয়াল সিংহীর বাচ্চা বটে গো। উর মা বলত—তুর নজর গলে যাক্, আমার ছাওয়ালকে খুঁড়হিস মিনসে।...উ রস করে বলত আজ্ঞে—উর মা মাইয়াটি ছিলোক খুব ভালো, আমায় ছাবতাতিরপারা পতিভক্তি করত। রস করে বলত—তুর নজরট গলে যাক মিনসে...হি-হি...মাইয়াটি ছিলোক খুব ভালো আজ্ঞে। সিটি যতোদিন বেঁচে ছিলোক চরণকে খনির মজি ঢুকতে দিলেক নাই। আমায় বলত—তু এ ছশমনের চাকরি থেকে ঝালাস হ আমি আমার চরণকে ফিরিয়ে লিয়ে গিয়ে আবার রাইগীয়ে সংসারটি পাতবোক। আমার ক্ষেত, আমার গোরু-বাছুর পাঁচতুতে ভোগ করছেক, চরণ আমার আবার কেড়ে লিবেক।...কথাটা বুঝলেক নাই বাবুমশয় ?—সিটি বহুৎ-বহুৎ দিনের কথা আজ্ঞে—লোতুন খনি হৈছে—আড়কাঠিরা টিপসই করিয়ে আমাদের ঘর থেকে লিয়ে এল আজ্ঞে—হুণ্ডায় হুণ্ডায় অ্যাভো ট্যাকা পাবিক—এরকম আরামে থাকবিক—লগদ ছুকুড়ি করে ট্যাকা হাতে দিলেক আজ্ঞে—রাইগী থেকে আমাদের পাঁচ জনকে ফুসলে লিয়ে এলোক—আমি, বিরিকিদাস, চন্দন বৈরিগির ছাওয়াল নিতাই, মাখন হাজরা আর অভিরাম। অভিরাম আর বিরিকি ছ’মাসের মজি মারা গেলোক আজ্ঞে।...টিপসই করা কাজ কিনা বাবুমশয় ?—চরণের মা বললেক—তু ঝালাস হ, আমি আমার চরণকে রাইগীয়ে লিয়ে গিয়ে আবার সংসারটি পাতবোক। আমি ঝালাস হবার আগে উ নিজের ঝালাসটি হোল আজ্ঞে। আমি চরণদাসকে কইলাম—“তুর মা রাইগীয়ে ফিরলেক নারে চরণ, রাইমশির পায়ে ফিরে গেলোক। সবাই বললেক—বনমালী, ধৈর্য ধরো, আবার বিয়া করো। আমি বুঝলাম—এ যে কি পুত্রশোক তোমরা বুঝবেক নারে ভাই।...উর মা থাকতে কোঁন বিটা সাহস করত নাই বাবুমশয়। একবার ম্যানেজারবাবু নিরেছিলা চরণের টিপসই, মাগি সিংহীরপারা আপিস চড়াও হয়ে পাট্টা ছিঁড়িয়ে ছাওলের হাত ধরে বাড়ি লিয়ে এল—উই একাশি লম্বর। উর মা যেতে আমারও মাজা ভেঙে গেল, উকে দিয়ে টিপসই করালেক। উর চেহারার ওপর বরাবর লজোর ছিলোক আজ্ঞে, উকে লোতুন স্ত্রুঙে দিতে লাগলোক। চন্দনের বিটি নক্ষীর সঙ্গে উর বিয়া দিলাম। নামে লক্ষ্মীট কাজেও লক্ষ্মীট বটে। লোতুন স্ত্রুঙের কাজ কঠিন মেহনতের কাজ, নেশা করিয়ে ছাড়েক আজ্ঞে। তা নক্ষী যতোদিন বেঁচে ছিলোক

নেশাটি ঘরে ঢুকতে দিলেক নাই, নামে নক্ষী কাছেও নক্ষী বটে। বলত তু নেশা করে ঘরে ঢুকলে ঝাটার চোটে তুর সাত পুরুষের নেশা ছুটিয়ে দিব বটে—হঁ। আমি সে বাপের বিটিট নয়। নিজের কানে শোনা আজে।-ছ’ কম বিশ বছর বেঁচে ছিল নক্ষীটি, দুটি ছাওয়াল দিলেক, আর উই চম্পা। গল্পভিত্তে মিশনরা তিনটি বছর মাইয়া স্কুল বসালে, চম্পা ছ’টি বছর পড়লেক আজে। তারপর ছাওয়াল দু’টি মারা গেলেক, তারপর নক্ষীটি—তারপর চ—র—ণ—দা—স এ—ক—দি—ন...”

কথাগুলি ধীরে ধীরে টুলুর কানে মিলাইয়া গেল।

একটি মুহূর্ত উপায়ের স্পর্শে আবার এক সময় জাগিয়া উঠিল।

খোলা জানালা দিয়া প্রভাত সূর্যের কিরণ মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বনমালী ঠিক একই ভাবে তাহার রেকর্ড ঘুরাইয়া চলিয়াছে—“আমি বললাম তা বিটিকে তু ইঙ্কলে দিতে গিছিল ক্যানে? আমাদের চাষাভূষাদের মাইয়া ইঙ্কলে গেলে বেয়াদবি শিখবেক না তো শিখবেক কি গো?”

আবার চোখ দুইটা বুজিয়া আসিল টুলুর। অসম্পূর্ণ নিদ্রার জড়তায় কথাগুলো একবার স্পষ্ট হইয়া আবার অস্পষ্ট হইয়া গিয়া একটা অলস সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। এখন চম্পার কথাই চলিতেছে। রাত্রে কথাগুলো আবছা আবছা মনে পড়িতেছে—লক্ষ্মীর শাসন—চম্পার মিশন স্কুল—লক্ষ্মীর মৃত্যু—তাহার পর চরণদাস হঠাৎ যেন এদিকে কি একটা করিয়া বসিল।

টুলু জড়তাটা জোর করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—“বনমালী একটু জল তুলে দিতে পার আমায়? মুখ হাত ধুয়ে আমি একটু চান করে নিই; ঘুম হয় নি, শরীরটা বিকশী হয়ে রয়েছে।”

“তা দিবোক, দিবোক নাই ক্যানে গো?” বলিয়া বনমালী উঠিয়া গেল। টুলু বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই আবার ভাবিতে লাগিল। কাল সমস্ত দিনের ঘটনাগুলো একে একে মনে পড়িতে লাগিল; কতকগুলো একেবারে নূতন ধরণের অভিজ্ঞতার ঠাসা—এমন একটা দিন জীবনে আসে নাই, বিশেষ করিয়া বালিয়াড়ির পথের অভিজ্ঞতা—গভীর রাতে। উঃ! মাষ্টার মশাই একদিন বলিয়াছিলেন—টুলু আমাদের ধর্ম থেকে অভিসার কথাটা যদি তুলে দেওয়া যায় তো সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাঁকা মেরুদণ্ড অস্তিত আধাআধি সোজা হয়ে ওঠে। যাক্ এটুকু দরকার ছিল প্রত্যক্ষ করা। টুলু ফিরিয়াছে একেবারেই; কিন্তু ফিরিয়াই পথ যে একেবারে অন্ধকার। কি করিবে সে? কোথায় আরম্ভ করিবে? মাষ্টার মশাই এ কি করিলেন?

চিন্তাটা একসময় অবসর হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল; অনিদ্রাভাব মস্তিষ্ক জটিল চিন্তাটাকে যেন বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বনমালী ছই রাত্তি জল আনিয়া

উঠানে রাখিল; ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্নানের বন্দোবস্ত করিতেছে। টুলু অগ্রমনস্ক ভাবে তাহার শরীরটার দিকে চাহিয়া রহিল—মাজাটা খুব সরু, নিচের দিকটাও ছিমেই বলিতে হয়; কিন্তু মাজার উপরেই পাঞ্জরা বুক আর কাঁধ লইয়া শরীরের সমস্ত অংশটা ধীরে ধীরে খুব চওড়া হইয়া গেছে, বয়সের ভারে একটু বাঁকা। রংটা অল্প একটু লালচে; সর্বসাকুল্যে বনমালী যেন একটি গোখরো সাপের চক্র।

মুগ্ধ নেত্রে টুলু অলসভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। অজান্তসারেই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল,—বয়সের অল্পপাতে চক্রটা ঢের বেশি শিথিল। খনির জীবন—তাহার উপর চরণদাস—তাহার উপর আবার চম্পা।

চিন্তার মোড় ঘুরিল। মাষ্টার মশাই একটা চিঠি দিয়া গেছেন, সেক্রেটারি কাছে আছে। টুলু একটু যেন আলোর আভাস দেখিতে পাইল। বনমালী গিয়া চিঠিটা আগে বদলাইয়া লইয়া আসুক।

স্নানের ব্যবস্থাটা ঠিক হইয়া গেলে বলিল—আমি ততক্ষণ নেয়েটেয়ে নিচ্ছি বনমালী, তুমি এক কাজ করো, দরখাওটা দিয়ে আমার চিঠিটা নিয়ে এস সেক্রেটারি বাবুর কাছ থেকে। কতক্ষণ লাগবে বলদিকিন?

বনমালী রগ চুলকাইতে লাগিল। পথের দীর্ঘতার হিসাব করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নিজের চলার আন্দাজ এবং তছপরি সময়ের আন্দাজ মেলানো একটু সময়সাপেক্ষ তাহার পক্ষে, বেশ একটু আয়াস-সাধ্যও। টুলু সেই সময়ের মধ্যে একটু চিন্তা করিয়া লইল। নিজে গেলে কেমন হয়? কিছু দরকার হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে। কি দরকার, অথবা কিছু দরকার আছে কিনা সেটা টের পাওয়া যাইবে ওখানেই—মাষ্টার মশাইয়ের চিঠিটা পড়িয়া—কি ধরণের চিঠি—মাষ্টার মশাই কি সব কথা লিখিয়াছেন তাহা বুঝিয়া।

আসল কথা টুলু একবার দেখিতে চায় লোকটিকে। টুলু ঠিক করিয়াছে মাষ্টার মশাই চিঠিতে কিছু নির্দেশ দেন বা না দেন, তিনি না আসা পর্যন্ত কোন একটা হালকা কাজ লইয়া থাকিবে—যেমন চরণদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া আস্তে আস্তে নেশা থেকে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। এতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আজ না থাক, খন্নি-বন্নি লইয়া কাজ করিতে গেলে এক দিন সংঘর্ষ হয় তো অবশ্যস্বাবী। তাই লোকটাকে দেখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

আর, চরণদাসকে একটু কথা বুঝিবার মতো অবস্থায় পাইতে হইলে খনিতে দেখা করা ভিন্ন তো উপায় নাই। তাহার জন্ম ম্যানেজারের হুকুম দরকার। পরিচয় নাই, শুধু শুধু হুকুমের জন্ত যাওয়াটাও অস্বস্তিকর। চিঠির গোলমালট বেশ একটা স্রোযোগ দিয়াছে।

টুলু বলিল—“থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি বনমালী। তুমি

এক কাজ করো ; মাষ্টার মশাইয়ের ভাঁড়ার খোলা আছে ?”

বাসার চাবির সঙ্গে আর একটা চাবি বাঁধা ছিল, বনমালী কোমরের ঘুনসি হইতে খুলিয়া বলিল—“ই চাবিটা ভাঁড়ারের আছে বটে।”

“দেখো তো কি আছে ; রুট, পরোটা, হালুয়া, যা হয় কিছু করে দাও একটু ; না হয় কাঠ-খোলায় ছুঁতো চাল ভেজেই দাও, একটু তাড়াতাড়ি।”

১১

বনমালী আরোজনটা তাড়াতাড়িই করিয়া দিল, টুল্লুর জল-যোগ শেষ হইলে কিন্তু বেশ একটু দেরি করিয়াই যাইতে পরামর্শ দিল, বলিল—“ম্যানেজার বাবু ওঠেন অনেক বেলায়।” টুল্লু যখন পৌঁছিল তখন প্রায় ন’টা।

হলদে রং-করা আমেরিকান ফ্যাসানের দোতলা বাড়ি, দেয়াল, আলসে, থাম প্রভৃতির প্রান্তগুলোয় কালো বর্ডার টানা। গাড়ি বারান্দায় একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ি থেকে একটুখানি সরিয়া ছুটি বড় বড় ঘর, বাড়ির সঙ্গে কড়ি-ডোর দিয়া সংযুক্ত। এরই একটা বাড়ি আপিস-ঘর, সকালের দিকে ম্যানেজারবাবু এইখানেই কাজ করেন ; দেখা-সাক্ষাৎ, নালিশ-ফরিয়াদ—সে সবও এইখানেই সম্পন্ন হয়। টুল্লু খবর লইয়া জানিতে পারিল একটু আগে নামিয়াছেন।

ঘর ছুঁটার চারি দিকেই খানিকটা করিয়া বারান্দা। সামনের বারান্দায় কড়া রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের সামনেই খস-খস দিয়া খানিকটা থেরা, দরজায় একটা সবুজ পর্দা টাঙানো। বারান্দা থেকে একটু সরিয়া একটা মাঝারি গোছের আমগাছ, তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—একটা লোক খুঁজিতেছে যাহাকে দিয়া খবরটা দেওয়া যায়। ঘরের ভিতরে ভারি গলায় কে কথা কহিতেছে ; নিশ্চয় ম্যানেজার।

মনে হইল এদিকটায় রোদ, আদালি-জাতীয় কেহ ওদিক-টায় থাকিতে পারে।

তাহারই উদ্দেশে ঘুরিয়া ওদিকে যাইতেই একেবারে ম্যানেজারের সামনে পড়িয়া গেল। ম্যানেজার কে সেটা অবশ্য আন্দাজেই বুলিল।

বারান্দার ওদিকটায় একটা ইঞ্জিচেয়ারে ছুই পা তুলিয়া গা এলাইয়া পড়িয়া আছেন। পরনে বেশ ভাল করিয়া কৌচানো ধুতি, গায়ে একটা জালিয়ার গেঞ্জি, তাহার নিচে সোনার এক-গাছা সরু চেন চিক্ চিক্ করিতেছে, দক্ষিণ বাহুতে একটা সোনার তাগা, টিলা সোনার চেনে আটকানো। চেয়ারের হাতলে একটা সিগারেটের টিন, ডান হাতের আঙুলে একটা জলন্ত সিগারেট।...ম্যানেজারবাবু আবার কতাদের বাড়ির জামাই এক দিক দিয়া।

মুখটা এই দিকে ফিরানো ; কাহার সহিত গল্প করিতে-

ছেন, থামের-আড়ালে পড়িয়া বাওয়ায় টুল্লু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

দূর থেকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন—“কি চাই ?”

টুল্লু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, বলিল—“ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে, খবর দেওয়ার কোন-লোক ওদিকে না পাওয়ায় ভাবলাম...”

“উঠে আসুন ; আমিই।”

প্রথম কুঠা এড়াইয়া উঠিয়া যাইতে টুল্লুর যতটুকু বিলম্ব হইল, তাহার মধ্যেই আবার ওদিকে গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন—“হু, তা হলে তুই আমার কথার উত্তর দে...”

টুল্লু কাছে গিয়া একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; পিছনে ছুঁইট হাত দিয়া থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চম্পা। একবার মুখ ফিরাইয়া টুল্লুর পানে চাহিল, তাহার পর যেন কোন পরিচয়ই নাই এই ভাবে মুখটা ম্যানেজারের পানে ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত শরীরটাতে একটু দোল দিয়া আবদারের স্বরে বলিল—“না, আমি ওঁসব শুনতে চাই না, বাঃ !”...

একটা চেয়ার ছিল, ম্যানেজার টুল্লুকে দেখাইয়া বলিলেন—“বসুন। আগে চম্পাবতীর কথাটা সেরে নিই। Ladies First—খনির বাইরে চম্পা নিজেকে লেডিই বলে কিনা... কি রে, না ?”

সিগারেটটা নিভিয়া গিয়াছিল, আবার দেশলাই জালিয়া হাতের আড়াল দিয়া ধরাইতে লাগিলেন, মুখে হাসি লাগিয়া আছে।

বসিবার জন্ত অবশ্য অল্পমতির দরকার ছিল না টুল্লুর, সে দিক দিয়া তাহার মর্ষাদাজ্ঞান যথেষ্ট আছে, ইদানীং কি করিয়া যেন বাড়িয়াছেও, বসে নাই এইজন্ত যে হঠাৎ এমন একটা অভিনব অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে নিজেকে লইয়া কি করিবে যেন বুঝিতেই পারিতেছে না। চম্পাকে সে আজ অনেকটা জানে, সে দিক দিয়া বিস্ময় শনাই, তবে ব্যাপারটা অল্প দিক দিয়া অত্যন্ত বিসদৃশ যেন—এত বড় খনির ম্যানেজার—আর একটা লোক আসিয়া পড়িয়াছে, তবু তো এতটুকু “কিন্তু” ভাব নাই। বরং ডাকিয়া আনিল আরও।

“হ্যা, এই যে।”—বলিয়া টুল্লু চেয়ারটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। দৃষ্টিটা কোথায় রাখিবে স্থির করিতে পারিতেছে না।

চম্পা আবার শরীরে একটা মুহূর্ত দেশলা দিয়া বলিল—“আমি অত ইংরেজী জানি না, লেডি-ফেডি কাকে বলে বুঝি না। আপনার যা দোষ—কথার ভাঁওতায় ফেলে আসল কাজ চাপা দেবেন—দেখে আসছি তো ?...বাঃ, আমি গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই, আমি একটা ছেলের খরচ জোগাব কোথা থেকে ?”

চেষ্টা সত্ত্বেও টুল্লুর দৃষ্টিটা কে যেন টানিয়া চম্পার মুখের ওপর ফেলিল, তাহার দৃষ্টি কিন্তু ম্যানেজারের মুখের ওপর, একচুল এদিক-ওদিক নাই।

ম্যানেজার একটু হাসিয়া বলিলেন—“একটা শিশু, তার আবার ধরচ! বেশ, যা লাগে ছুঁবে ছুঁ এক টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। কোম্পানী দিতে যাবে কেন? তুই দেমাক দেখিয়ে নিতে গেলি...”

এবার চম্পা অল্প পরিবর্তন করিল, মানভরে মুখটা ঘুরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বোধ হয় হাতে পাকানো সিগারেট আবার নিভিয়া গেছে; ধরাইতে ধরাইতে ম্যানেজারের মুখে একটু হাসি ফুটিল, একটু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর দেশলাইটা ফেলিয়া দিয়া টুলুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, আপনার?... ”

টুলু ক্রমেই যেন জমিয়া যাইতেছিল। এরকম অসহ্য অবস্থায় জীবনে কখনও পড়ে নাই, যদিও ম্যানেজারের গাঢ় স্বর আর ঈষৎ রক্ত চাহনি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে রাজির অসংযম-অনিয়মের একটা জের আছে, পূর্ণ প্রকৃতিস্থ একটা মানুষ নয়। নিজের কথাটুকু বলিয়া বিদায় লইবার কাক একটুও না পাইয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, ম্যানেজারের প্রশ্নে তাড়াতাড়ি ঘাড়টা একটু বাড়াইয়া উত্তর দিতে যাইবে, চম্পার উত্তর আসিয়া পড়িল।

ঘাড়টা ঘুরাইয়া রাগ রাগ স্বরে বলিল—“দেমাক দেখলেন। ভাল করতে গেলুম—মরছিল ছেলেটা... যশের ছনিয়া তো নয়...”

ম্যানেজার মুহূ মুহূ হাসিতে লাগিলেন। টুলু আবার এক বার চেষ্টা করিল—“আমার দরকার—” বলিয়া আরম্ভও করিয়াছে, চম্পা প্রবল আন্ধারে মাথা নাড়িয়া বলিল—“না, আপনাকে করে দিতেই হবে ব্যবস্থা—কোম্পানীকে দিয়ে একটা পাকারকম। আজ নয় শিশু, বাড়বে না? এক কিছুক ছুঁ খেয়েই থাকবে? তা ভিন্ন জামা আছে, বিছানা মাদুর আছে... না, আমি অত ধরচ পোয়াতে পারব না...”

“গেছলি কেন ভার নিতে?”

বেশ বুঝা যায় কথা বাড়াইয়া বাড়াইয়া শুধু সংসর্গ-লাভের মেয়াদটা বাড়ানো।... টুলুর মনে হইতেছে নরক-যন্ত্রণা কি এই ধরনেরই একটা কিছু?

চম্পা উত্তর দিল—“চোর-দায়ে ধরা পড়ে গেছি।”

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন—“গেছিস বইকি।—নিজে দিয়েছিস ধরা।”

তাহার পর হঠাৎ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন,—“হ্যাঁ, এই যে, বেশ মনে পড়ে গেছে—তুই যেমন মা, শুনলাম ছেলেটার তেমনি মুকতে একটা বাপও জুটে গিয়েছিল—মাষ্টারমশাইয়ের কে এক জন আশ্রীয়—বেশ টাকাওয়ালা...”

চম্পার মুখটা মুহূর্তেই রাঙা টুকটেকে হইয়া উঠিল, এবং এইবার তাহার দৃষ্টিটাকে কে যেন টানিয়া লইয়া গিয়া টুলুর মুখের ওপর ফেলিল—অবশ্য নিতান্ত এক খণ্ড মুহূর্তের জন্তই,

তখনই চম্পা যেন আরও জোর করিয়া সেটাকে ফিরাইয়া লইল।

টুলুও আর স্বর্ণমাত্র বিলম্ব করিল না, মনের অস্থিরতা-টুকুকে সংযত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেন আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিল, পকেট হইতে দরখাস্তের খামটা বাহির করিয়া বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“ওর এই দরখাস্তটা, বনমালী ভুল করে এর বদলে চিঠিটা রেখে গেছে।”

ম্যানেজারের চেহারাটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এতক্ষণ মুখে চোখে যে একটা হালকা কৌতুকের ভাব ছিল, একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। জ্ঞ একটু কুণ্ঠিত, চাহনি তীক্ষ্ণ, তাহার পিছনে ইতিপূর্বেই যেন একটা কুটিল চক্রান্ত আরম্ভ হইয়া গেছে। কয়েক মুহূর্ত টুলুর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—“আপনিই মাষ্টারমশাইয়ের আশ্রীয়?”

হঠাৎ এই ভাবপরিবর্তনে টুলু একটু বিস্মিত নিশ্চয়ই হইল, তবে উত্তর বেশ সহজ কর্তেই দিল; হয়তো হিসাব করিল না, না হয় জানিয়া শুনিয়াই বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ; চিঠিটা আমার জুড়েই রেখে গেছেন।”

কথাটা বলিয়া মনে পড়িল, সে তো এখানকারই ব্যানার্জি কোম্পানীর বাড়ির ছেলে। কিন্তু সে তথ্যটা ম্যানেজারের জানা নাই দেখিয়া আর কি ভাবিয়া শোধরাইতে গেল না। একটু উঠিয়া দরখাস্তটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—“চিঠিটা কাছেই আছে আপনার?”

ম্যানেজার দরখাস্তটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহা সময় লাগিতেছে তাহাতে অমন উজ্জনখানেক দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। হঠাৎ হাওয়াটা যেন শুমোট হইয়া গেছে। টুলু বেশ অস্থির সঙ্গে খানিকটা অপেক্ষা করিল, তাহার পর তাহার দৃষ্টিটা আপনা হইতেই একবার চম্পার মুখের উপর গিয়া পড়িল; চম্পা ভীত উৎকর্ষার দৃষ্টিতে ম্যানেজারের নিচু-করা মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

টুলু বলিল—“চিঠিটা...”

“জ্যা?—এই যে।”—বলিয়া ম্যানেজার মুখ তুলি লেন। একটা মালী চৌহদ্দির দেয়ালের গোড়ায় ফুলগাছ নিড়াইতেছিল তাহাকে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে চিঠিটা চাহিয়া আনিতে বলিলেন। সে চলিয়া গেলে টুলুকে প্রশ্ন করিলেন—

“এখানে কি করেন?”

“করি না কিছু।”

“কত দিন হ’ল এসেছেন?”

“মাসখানেকের কমই।”

“হু...”

অল্প দিকে মুখ করিয়া কি ভাবিলেন একটু, তাহার পর আবার—

“এর আগে কি করতেন?”

টুঙ্গ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তবু সংযতভাবেই বলিল—
“তখন কিছু নয়, পড়তাম।”

মালী চিঠিটা লইয়া আসিলে টুঙ্গ একটু হাত বাড়াইতে
ম্যানেজার মালীটাকেই বলিলেন—“না, এদিকে।”

পড়া চিঠি, তবু নিজের হাতে লইয়া একবার মনে মনে
পড়িয়া গেলেন। তাহার পর সেটা দরখাস্তের সঙ্গে চেয়ারের
হাতলের ওপর রাখিয়া সিগারেটের টিনটা চাপা দিয়া আবার
ভাবিতে লাগিলেন। টুঙ্গুর কানের গোড়া পর্যন্ত আবার রাঙা
হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—“আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—অনেকটা
দূর...”

সংযত হইয়া বলিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অধৈর্য্যটা একটু প্রকাশ
হইয়াই পড়িল। ম্যানেজার বলিলেন—“চিঠি আপনাকে
দিতে পারি না।”

“সে কি!—কেন?”

ছই জনের দৃষ্টি বেশ সোজাসুজি ছই জনের মুখের ওপর,
একদিকে জড়ঙ্গি, একদিকে বিদ্রোহ। ম্যানেজার বলিলেন—
“ও চিঠি আমাদের দরকার।”

“আপনাদের কি দরকার জানি না, তবে চিঠিটা আমার,
সবচেয়ে বেশি দরকার তো আমারই।”

এতটা উদ্ধত উত্তরে ম্যানেজার যেন অভিযত নয় এইভাবে
চাহিয়া ঘাড়টা ফিরাইয়া লইলেন।

চম্পা যেন কঠিন হইয়া ষামটার সঙ্গে এক হইয়া গেছে।

ম্যানেজার আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—“আপনার
দরকার, একবার পড়ে নিলেই হবে, আমাদের দরকার তার
পরে পর্যন্ত। দিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে পড়ে
এজুনি ফিরিয়ে দেবেন।”

টুঙ্গ চেয়ারের হাতলটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—“আমি
অমন প্রতিজ্ঞা করি না—নিজের জিনিস সম্বন্ধে।”

ম্যানেজার তাহার উদ্ধত দৃষ্টির পানে একটু হ্রিভাবে
চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ সিগারেটের টিনটা সরাইয়া,
চিঠিটা তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—“শুধুন।”

টুঙ্গকে আর একটুও সময় না দিয়া পড়িয়া যাইতে
লাগিলেন—

“কল্যাণাপ্ৰদেয়, আমরা নিতান্ত হঠাৎ চলে যেতে হ’ল,
কেন তা এসে বলব। আপাতত এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত
করেছি, কিছু বাড়াতেও পারি। তোমাকে খনিতে নিয়ে
যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; কদর্যতা আর
অত্যাচারের মূর্তি নিজের চোখে না দেখলে তোমার মনের
দুন্দ মিটত না, তুমি নিশ্চিত ভাবে ফিরতে না। এবার তুমি
সত্যিই ফিরলে। কাজের কথায় আসা যাক—জীবনে কোন
অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে যে নির্দেশ আসে, বিধান পাওয়া
যায়, বলা যায় না,—কাজ তুমি পেয়েছ, সেই অদৃশ্য বিধানই।

তোমার কাজ তিনটি বিষয় নিয়ে হবে—বস্তিতে নেশার
বিরুদ্ধে অভিযান, শিশুমঙ্গল, আর দুর্নীতির সঙ্গে লড়াই।
সেই অদৃশ্য শক্তি এই তিনটাই তোমার সামনে ধরে দিয়েছেন
চরণদাস, হীরক; তৃতীয়টির নাম না করলেও বুঝতে
তোমার দেরি হবে না। একটা মেয়ে স্তম্ভের গেলে
একটা জাতি স্তম্ভের যেতে পারে এই আমার বিশ্বাস টুঙ্গ।
আমি তোমার কর্মপন্থা বেঁধে দিলে বোধ হয় অল্পকম ব্যবস্থা
করতাম; কিন্তু এই বিধানের মধ্যে একটা স্তম্ভে এই যে
এতে খনির কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই—
অন্তত আপাতত নেই—তুমি ধীরে স্তম্ভে কাজ করে যেতে
পারবে। তারপর আবার হয়ত নতুন বিধানই পাবে সেই
অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে। তখন আমিও পাশে থাকব।
আর সময় নেই, দশটি মাইল হেঁটে আমায় সকালে ট্রেন
ধরতে হবে। তুমি এখানেই থেকো, কাজের স্তম্ভে হবে।
বনমালীর কাছে ভাঁড়ারের চাবি দিয়ে গেলাম, ওই চাবিরই
একটা তালা বাক্স লাগানো, তাইতে খরচপত্রের টাকা
আছে। ইতি মাষ্টারমশাই।”

শেষ করিয়া ম্যানেজার টুঙ্গুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন,
বলিলেন—“এই চিঠি।”

টুঙ্গ হ্রি দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“বেশ ত আপনিও সাহায্য
করুন, এর মধ্যে অজায়বাই বা কোথায়, আর চিঠিটা না
দেওয়ারই বা কি আছে?”

ম্যানেজারের যে রক্তাভ চোখে একটু আগে হালকা
রহস্যের মাদকতা লাগিয়াছিল, সে ছইটা ক্রোধে একেবারে
উগ্র হইয়া উঠিল, চেয়ারে একেবারে সোজা হইয়া বসিয়া,
গলা চড়াইয়া বলিলেন—“তোমার মধ্যে যে হুঃসাহস আছে
তা মুখ খুলতেই টের পেয়েছি, তবে সেটা যে এত বেশি
তা বুঝতে পারি নি। তুমি আমার খনির কুলিদের বিগড়াবার
জোগাড় করছ—তোমাতে আর মাষ্টারমশাইতে মিলে—আর
আমি তোমায় তাইতে সাহায্য করব?—I am surprised
at your cheek!—তুমি—তুমি—”

“এর মধ্যে বিগড়ে দেওয়ার কি দেখলেন?”

টুঙ্গুর কণ্ঠস্বর সংযতই, কিন্তু চোখের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল।

ম্যানেজারের গলা আর এক পর্দা চড়িল—“সমস্তটাই—
বিগড়াবার ব্যাপার, I can see through the game—
আমি আজ ম্যানেজারি করছি না, আর এ সব ব্যাপার কি
করে দাবাতে হয় ভাল রকম জানি।—সংঘর্ষ!...কদর্যতা
আর অত্যাচারের মূর্তি!—দেশপ্রেমিকের দল জুটেছেন।—
অত্যাচারের আসল মূর্তি দেখতে এখনও টের বাঁকি আছে।”

“যদি বাড়িয়েছেনই কথা—নয় কি কদর্যতা আর অত্যাচার?
—মেয়েটা যে করে বেঘোরে মারা গেল...”

ম্যানেজার একবার হুকার দিয়ে উঠলেন, চেয়ারের ছইটা
হাতল ধরিয়া অল্প একটু উঠিয়া বলিলেন—“But that’s

none of your business !...তোমাদের তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ?—আমার খনির মজুর—আমি মালিক...”

টুলু নিজের কণ্ঠধরটা একটুও বিচলিত হইতে দিল না, তবে বলিবার ভঙ্গিতে তাহার মনের দৃঢ়তা অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ; মেরুদণ্ডটাকে আরও সিঁধা করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে বাধা দিয়াই বলিল—“আপনি মজুরদের যা দেন তার বদলে খানিকটা শরীরের শক্তি পাবার অধিকারী আপনি ; নিচ্ছেন কিন্তু তার বাধ্য, তার প্রাণ, তার নীতি-জ্ঞান, তার ধর্ম—মানে, মনুষ্য বলতে যা বোঝায় তার সব-টুকুই। কোন্ অধিকারে আমরা তা বুঝতে পারি না, আর বুঝতে পারি না বলে আমরা মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবই। আশা ছিল আমার হাতে ভগবান নিজে যে কাজটুকু তুলে দিয়েছেন তাতে আপনাদের কিছু বলবার থাকবে না, কেননা, ওদের মনুষ্যত্বের যে দিকটা তার সঙ্গে সব মাহুষেরই একটা সংজ্ঞা সঙ্ঘত আছে,—আপনার যেমন ওদের খানিকটা দেহের শক্তি নেবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার আছে—বোধ হয় বেশি। এতে বিপদ যদি এসেই পড়ে আমি তোয়ের আছি।”

কথাগুলো এক ভোড়ে এমন বলিয়া গেল, ম্যানেজারকে বাধা দেওয়ার অবসরই দিল না। বোধ হয় বিশ্বয়ে ক্রোধে তাহার কতকটা বাকরোধের মতোও হইয়া গিয়া থাকিবে। টুলু থামিলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে হাত দেখাইয়া

আরও উগ্র ভাবে গর্জন করিয়া উঠিলেন—“Get out ! out with you !”—“বেরিয়ে যাও !—শুধু এখান থেকে নয়, ও বাসায় পর্যন্ত তুমি আর চুকতে পাবে না। ও-সব আত্মীয়-টান্ধীয় আমি বুঝি না...গল্পডিহিতেও যদি তোমায় চকিশ ঘণ্টার পরে দেখি...”

মালীটা নিড়ানি হাতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, শোফারটা গাড়ি-বারান্দা থেকে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাড়িটার দোতলায় দুই-তিনটা জানালা খট-খট করিয়া খুলিয়া গেল।...ম্যানেজারের ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টুলুও দৃষ্ট ঋজুতায় উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘাড়টা শুধু একটু হেলিয়া গেছে ; চোখের উপর চোখ রাখিয়া সেই রকম দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—“আপনার কথায় মনে হচ্ছে কুলিদের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ভয় দেখানোর একটা বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে আপনার। তবে শুধু, মাষ্টারমশাই আমার আত্মীয় নয়—আত্মীয়ের চেয়ে বড় বলে আমি আলাগা ভাবে তখন স্বীকার করেছিলাম ; কিন্তু তবু আমি ঐ বাড়িতেই চললাম, আপনার সাধ্য থাকে আপনি আমায় জ্যান্ত সেখান থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করবেন।”

যেমন অবিচলিত কণ্ঠধর তেমনি অবিচলিত পদক্ষেপে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল।

সেবার আগেই সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মত এই যে, তাহারা ভারতবর্ষের বেদ্যাইক বা প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েড গোষ্ঠীয় আদিবাসী। অবৈজ্ঞানিক প্রচলিত মত এই যে, তাহারা বর্বর, অনার্য, কুকর্ষ আদিবাসী। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মত প্রচারিত হইয়াছে। একট মত এই যে, ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু “দ্রাবিড়” জাতীয়। এখানে প্রচলিত নৃতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক মতকে আলোচনার স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েড বা সংক্ষেপে মুণ্ডা গোষ্ঠীয় আদিবাসী, সুতরাং অনার্য। এই মতানুসারে racial origin বা জাতিতে, ভাষায়, কৃষ্টিতে ও ধর্মো দাস ও দস্যুগণ আর্য জাতি হইতে ভিন্ন ছিল ইহা মনে করিতে হইবে। এই প্রাক-বৈদিক আদিবাসী-দিগকে পরাজিত ও বিভাজিত করিয়া আর্যগণ সিদ্ধ উপত্যকায় আপনাদিগের অধিকার ও সত্যতা প্রসারিত করেন। এক

শতাব্দীর অধিককাল এই মত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, যদি একথা বলা হয় যে এই মতের সত্যতায় সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এরূপ বহু প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তবে তাহা অপব্যর্থ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা। যদি এই প্রমাণের বলে মত প্রকাশ করা হয় যে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু বা তথাকথিত অনার্য, বর্বর আদিবাসী ভাষায়, কৃষ্টিতে, ধর্মে, হস্ত জাতিতেও, আর্য হইতে পারে, সে মত সংক্ষেপে গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশে বিরত থাকিয়া ঋগ্বেদ হইতে কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করা হইতেছে। এই সকল প্রমাণ বিচার করিয়া কি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব পরে দেখা যাইবে।

বর্তমান আলোচনার গোড়ায় একটি কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিয়া রাখা দরকার। ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু যে বেদ্যাইক বা প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েড গোষ্ঠীয় আদিবাসী নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের

এই মত অনুমান মাত্র। Racial classification সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন বর্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় নাই, প্রমাণ পাওয়া সম্ভবও নহে। বৈদিক দাস ও দস্যুর racial origin কিরূপ এবং কেহ কেহ কাম্পিয়ান সমুদ্রের পূর্ব অঞ্চলের যে প্রাচীন Daba হইতে বৈদিক দাস ও দস্যু অভিন্ন মনে করেন সেই “অনার্য” Daba-জাতির racial origin কিরূপ তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঋগ্বেদীয় দাস ও দস্যু সম্বন্ধে এই প্রচলিত মতের গোঁড়ায় রহিয়াছে মাত্র অনুমান ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই অনুমান নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্ত্রমমতে অনুসন্ধান প্রস্তুত বৈজ্ঞানিক অনুমান নহে, ইহা সাহিত্যিক মালমশলা দিয়া নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের দৌধ রচনার বিলাস।

ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, ইহার কি দুইটি ভিন্ন জাতি না একটি জাতি? দেখা যায় যে এই প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ইন্দ্রকে কখন দাস কখন দস্যুকে ধ্বংস করিবার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে। একটু ঠেকে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র দস্যুদিগকে সৎগুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি দাসদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছেন। এখানে দাস ও দস্যু একই শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদের কতকগুলি প্রয়োগ হইতে দেখা যায় যে একই শত্রুকে একবার দাস, পুনরায় দস্যু, কদাচিৎ অসুর বলা হইয়াছে। নমুণিক দাস ও দস্যু দুই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পিপ্র, শুগ ও মহান অবুদ (মহান্তঃ চিদবুদম) দস্যু। ত্রিংশ গোষ্ঠীর দিবোদাসের সহিত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও বিপুল ঐর্ষ্যশালী শবরের চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। শবরকে দাস ও দস্যু উভয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রত্নকে দাস ও দেব বলা হইয়াছে। বহুদ, করঞ্জ ও পর্ণকে দস্যু ও অসুর বলা হইয়াছে। দস্যু ও দাসের ঐর্ষ্যের উল্লেখ ও ইন্দ্রাদি দেবতাকে দস্যু ও দাসকে ধ্বংস করিতে আহ্বান করিবার সময়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য মনে রাখা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ইন্দ্রের বহু প্রসিদ্ধনামা প্রবল শত্রুকে দাস, দস্যু, অসুর কোন নামই দেওয়া হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুই জন প্রবল প্রতাপশালী শত্রুর কথা বলা যাইতে পারে। দশ রাজার যুদ্ধে যযুনা অঞ্চলের জাতিগুলি ভেদের নেতৃত্বে অদাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ভেদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ইন্দ্রের শব করে এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। “আয়ুধ দ্বারা অপ্রাপ্ত” ভেদকে বধ করিবার জন্ত ইন্দ্র বরুণকে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ভেদকে দাস বা দস্যু কোন নামেই অভিহিত হইতে দেখা যায় না। আর এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা কৃষ্ণ। দশ সহস্র যোদ্ধা লইয়া অংস্তমতী নদীর তীরে কৃষ্ণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সূর্যের তায় দীপ্য-

মান “অদেব” কৃষ্ণকে দাস, দস্যু বা অসুর, কোন নামেই অভিহিত করা হয় নাই, তাহাকে অদেব বা অবিদ্বাসী এই মাত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আর্য বর্ণ ও দাস বর্ণের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে দাস নামে অভিহিত একটি শত্রু গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দস্যুদিগের বহু উল্লেখ থাকিলেও দস্যু বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে দাস ও দস্যু একই শত্রুগোষ্ঠী।

দাস ও দস্যু প্রধানদিগের বিস্তীর্ণ রাজ্য, বিপুল ঐর্ষ্য ও প্রবল পরাক্রমের উল্লেখ পুনঃপুন পাওয়া যায়। পিপ্রের পুর-সমুহ, দাসের নবনবতি পুর, শবরের নবনবতি পুর, বহুদ নামক অসুরের এক শত পুর, দস্যুদিগের লৌহনির্মিত পুর, শবরের এক শত প্রাচীন পুর ও প্রস্তরনির্মিত পুর, শুগের চল্লিশ পুর (পুরং চল্লিশুম), “অদেব” বা অবিদ্বাসীদিগের পুর প্রভৃতির বহু বার উল্লেখ করা হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত দাসদিগের রাজ্য, দাসদিগের অধিকৃত গো, অশ্ব, রথ, পুর মণ্ডে সঞ্চিত বিপুল ধনের বহু উল্লেখ আছে। আপনাদিগের গোধন লইয়া আর্যগণ গৌরব বোধ করিতেন, দাস ও দস্যুদিগেরও বিস্তীর্ণ গোষ্ঠী ছিল। সামরিক পরাক্রমে দাস ও দস্যুগণ আর্যগণ অপেক্ষা হীন ছিল না। শবরের সহিত দিবোদাসের চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সংগ্রাম হইয়াছিল। যে দাস আপনাকে অসুর মনে করিত ইন্দ্র তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সন্দিকগণ আপনাদিগের পরাক্রমে গর্বিত ছিলেন। নববাস্ত ও বৃহদ্রথের পরাক্রম এতদূর বৃদ্ধি পায় যে ইন্দ্রকে বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইয়াছিল। চুমুরি ও ধুনির ত্রিশ সহস্র সৈন্য ধ্বংস করিতে হইয়াছিল, বর্জির সহস্র সহস্র অশ্বচরকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল। অঙ্গ ঋষি বলিতেছেন, সূর্যদেব দেখিলেন যে দাসের সমকক্ষ আর্য। দাসের সমকক্ষ আর্য বলিবার অর্থ দাসের পরাক্রমের প্রশংসা কীর্তন করা।

উপরে বলা হইয়াছে যে দাস ও দস্যুদিগকে বেদাইক বা প্রোটো-অস্ট্র্যালয়েড বর্ষের আদিবাসী বলিয়া কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের বৈষয়িক অবস্থা ও সামরিক পরাক্রম সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হইতে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার্য।

দাস ও দস্যু ঋগ্বেদের আর্যগণ হইতে ভিন্ন ভাষাভাষী ছিল এই মত প্রচলিত। তাহারা বেদাইক গোষ্ঠীর লোক হইলে ভাষার পার্থক্য অনেকখানি হইবার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে তাহাদের বল, বিক্রম, ঐর্ষ্য সম্বন্ধে এত কথা ঋগ্বেদে থাকিলেও ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হইতেছে না। ভাষা লইয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে এইরূপ দুইটি কথা পাওয়া যায়, যথা, বদ্রিবাচ ও যুধবাচ। যুধবাচ পদটি দস্যুর সম্পর্কে ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার দস্যু

বলিয়া অভিহিত নহে এমন শত্রুদিগের সম্পর্কেও ব্যবহার করা হইয়াছে। যুদ্ধবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে শত্রুভাবাপন্ন বা অসম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত ভাষাভাষী, of hostile or incomplete speech, এবং বদ্বিবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে বৃথা ভাষাভাষী, of vain speech, শত্রুতাজ্ঞাপক বা বিরুদ্ধ বাক্য ও বৃথা বা গর্বিত বাক্য যে সকল অমিত্র ব্যবহার করে তাহার। যে ভিন্ন ভাষাভাষী তাহা বলিবার কি হেতু আছে? ধর্ম আর্ষ এবং দাস, দস্যু প্রভৃতি শত্রুর মধ্যে বিভিন্নতা বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—শত্রুরা অযজ্ঞান, অজ্ঞব্রত, অব্রত, অদেব ইত্যাদি। আর্ষ এবং দাস ও দস্যুর মধ্যে গুরুতর ভাষার পার্থক্য থাকিলে তাহা শুধু মুছ কটাক্ষ করিয়া উপেক্ষা করিবার কি হেতু ছিল? তারপর এই দুইটি পদই দাস ও দস্যুর অতিরিক্ত অন্যান্য শত্রুর সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আর্ষ এবং দাস ও দস্যুর মধ্যে ধর্মের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে সকল কথার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই ধর্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে স্বজ্ঞকার ঋষিগণ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে positive information-এর অভাব। ইহার কারণ কি হইতে পারে বিচার্য। অদিরা কুলের সব্য ঋষি একবার কিছু বলিবার উত্তম প্রকাশ করিয়াছেন। “হে ইন্দ্র, কাহার আর্ষ এবং কাহার দস্যু তাহা অবগত হও, কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর।” জানা যাইতেছে যে আর্ষের সহিত দস্যুদিগের ধর্মের একটি পার্থক্য তাহাদের যজ্ঞবিমুখতা ও যজ্ঞবিরোধিতা। অযজ্ঞান, অযজ্ঞান, অযজ্ঞ্য বলিয়া তাহাদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি ঋকে পণি দস্যুদিগকে অকর্ম্মা, অশ্রদ্ধান ও অমস্ত (“not honouring sacred things”) বলা হইয়াছে। দাস ও দস্যুদিগকে বিভিন্ন স্থানে অব্রত, অজ্ঞব্রত, অপব্রত ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে অদেব ও অদেবয়ু (অর্থাৎ যাহারা দেবতাদিগকে ত্যাগিল্য বা ঘৃণা করে) বলা হইয়াছে। যাহারা হব্য দান করেন না ও শত্রুভাবাপন্ন সেই সকল দস্যুকে ধ্বংস করিবার জন্ত অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ঋষিদিগের শত্রু তালিকায় আর্ষ, দাস, দস্যু রাক্ষস ও যাতুধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পিশাচের উল্লেখও এক স্থানে আছে। ইহার ব্যতীত কেবল শত্রু বা অমিত্র বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও কটুক্তি বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার কোন জাতীয় শত্রু জানিবার উপায় নাই। যজ্ঞহীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধাহীন, ব্রতহীন বা অজ্ঞব্রত বা অপব্রতে অমুরজ দাস ও

দস্যুদিগের প্রতি প্রযুক্ত যে সকল বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল বিশেষণ ঋষিদিগের সকল শ্রেণীর শত্রুর প্রতি অপক্ষপাতে প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখা যায়। ফলে এই সকল শত্রুর ধর্মের প্রকৃত রূপ কি ছিল এবং দস্যু ও দাসদিগের ধর্মের সহিত অজ্ঞাত শ্রেণীর শত্রুর ধর্মের পার্থক্য কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দাস ও দস্যুদিগের ধর্মের সম্বন্ধে উপরের নেতিবাচক বর্ণনা হইতে এই পর্যন্ত বুঝা যায় যে তাহাদের নিজস্ব একটি ধর্মমত ও অঙ্গষ্ঠান পদ্ধতি ছিল এবং এই ধর্মে সম্ভবতঃ যজ্ঞের কোন স্থান ছিল না। সম্ভবতঃ কথটি ব্যবহার করিবার তাৎপর্য পরে দেখা যাইবে।

দেবতা সম্পর্কে দস্যু ও দাসদিগকে দেবহীন ও দেববিরোধী বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে শত্রুদিগের দেবতা সম্পর্কে কয়েকটি পদ পাওয়া যায় যথা, মুরদেবা, অনুতদেবা, মোঘদেবা ও শিশ্রদেবা। অনুতদেব ও মোঘদেব পদ দুইটির যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায় তাহাতে কৌতুহল উদ্ভিক্ত হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন—আমি মিথ্যা দেবতাগণের বা বৃথা দেবতাগণের উপাসনা করিলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? (যদি বাহমতদেব আস মোঘ বা দেবান অগ্ন্যুহে অগ্নে। কি মন্যন্ত্যং জাতবেদো হুগীষে দ্রোঘবাচন্তে নিঋৎ সচন্তাম)। বসিষ্ঠের মুখে এই প্রকার স্বীকৃতি আশ্চর্যের বিষয়। কাজেই এই প্রকারের স্বীকৃতির যে সরল অর্থ হয় তাহা কাটাইবার জন্ত নানারূপ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। সায়নের ব্যাখ্যা এই যে রাক্ষস বসিষ্ঠের পুত্র শতকে হত্যা করিয়া আমি বসিষ্ঠ এই উক্তি করিয়া বসিষ্ঠকে বিনাশ করিবার জন্ত আক্রমণ করিলে বসিষ্ঠ কয়েকটি ঋক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই ঋকটি তাহার মধ্যে একটি। পরবর্তী ঋক হইতে দেখা যায় যে বসিষ্ঠের বিরুদ্ধে যাতুধানের অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহা শত্রুদিগের মিথ্যা প্রচারণা বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। এই যাতুধানদিগকে মিথ্যা ও বৃথা দেবতাদিগের উপাসক বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যাতুধান শ্রেণীর শত্রুদিগের উপাস্ত দেবতার বর্ণনাও নেতিবাচক। একটি ঋকে জী ও পুরুষ যাতুধান যাহারা বকনা দ্বারা হিংসা করে তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে। তারপরে বলা হইতেছে মুরদেবতার উপাসকগণ ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। এখানে যাতুধানদিগকে মুরদেবা বলা হইয়াছে। ইহার পরের ঋকে দেখা যায় যে যাতুধান রাক্ষসের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্তত্রাং যাতুধান ও রাক্ষস উভয়েই মুরদেবতার উপাসক। মুরদেবা সায়নের মতে রাক্ষসদিগের বিশেষণ মাত্র; উইলসনের মতে worshippers of vain gods, মুইরের মতে worshippers of mad gods, কেহ কেহ বলেন worshippers of

senseless gods। যে অর্থই গ্রাহ হউক দেখা যাইতেছে যে ইহাও নেতিবাচক বর্ণনা।

শিন্দেবো পদটি লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়াছে। দুইটি জায়গায় এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়।

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—হে ইন্দ্র যাতুগণ (যাতবঃ) যেন আমাদের হিংসা না করে, প্রজাগণ হইতে আমাদের গৃধক না করে।...শিন্দেবগণ যেন আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন না করে। যাতব পদের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে যাতুগণ এবং সম্ভবতঃ রাক্ষসগণ শিন্দেব উপাসক ছিল। অথচ একটি ঋকে বলা হইতেছে যে ইন্দ্র অবিচলিতভাবে শতদ্বার-বিশিষ্ট শত্রুপুত্রী ধন অপহরণ করেন এবং শিন্দেবগণকে নিজ তেজে পরাভব করেন। শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুত্রী দাস ও দস্যুদিগের শতপুত্রী, নবনবতিপুত্রী, পাষাণনির্মিতপুর, চলমানপুর প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়, ধন অপহরণের কথাও তাহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে শত্রু বলিতে দাস ও দস্যু বুঝাইতেছে এইরূপ অনুমান করা সম্ভব মনে হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দাস, দস্যু, যাতুগণ ও রাক্ষস—এই সকল শ্রেণীর শত্রু শিন্দেব উপাসক ছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে অনৃতদেব, মুরদেব ও মোষদেব পদগুলি মাত্র যাতুগণ ও রাক্ষসদিগের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শিন্দেবো পদটির অর্থ সাধারণের মতে শিন্দোদরপরায়ণ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ শত্রু। ইউরোপীয় বেদ-ব্যাখ্যাভিত্তিকের মতে ইহার অর্থ লিঙ্গ উপাসক। শিন্দেব পদটির এই অর্থ ও এই পদ দাস ও দস্যুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই অনুমান গ্রাহ্য করিলে বলা যাইতে পারে যে দাস ও দস্যুদিগের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র positive information, কিন্তু কিছু সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। শিন্দেবো পদটির প্রয়োগ হইতে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহাতে এই কাঁক রহিয়া যায় যে শত্রু বলিতে দাস ও দস্যু ব্যতীত আর্য শত্রু ও অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুও বুঝাইতে পারে। অনির্দিষ্ট শত্রু, অর্থাৎ যাহারা কোন শ্রেণীর শত্রু বলা হয় নাই, ঋগ্বেদে তাহাদের সংখ্যা বিস্তর। এই প্রকার অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুদিগকে অত্রঙ্গা অর্থাৎ জুতিহীন, অনিন্দ্রা অর্থাৎ ইন্দ্রহীন, অনগ্নিত্রা অর্থাৎ অগ্নিহীন, অদেবা ইত্যাদি কটুক্তি করা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, দাস ও দস্যুদিগের ধর্মমত সম্বন্ধে জানিতে পারা গেল যে তাহারা সম্ভবতঃ যজ্ঞ করিত না এবং লিঙ্গোপাসক ছিল। যাতুগণ ও রাক্ষস বলিয়া অভিহিত শত্রুদিগের সহিত তাহাদের কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহা পরিষ্কার জানিতে পারা যায় না। এখানে এই আলোচনা আবাস্তরও বটে।

আর্যদিগের সঙ্গে দাস ও দস্যুদিগের কিরূপ সম্পর্ক ছিল দেখা যাউক। এই সম্পর্কে ধর্ম সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক, এই দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে।

ধর্ম সম্বন্ধীয় সম্পর্কের উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের মধ্যে বিরোধিতা ছিল। এক কথায় আর্যদিগের নিকট তাহারা ছিল বিধর্মী। বিধর্মীর ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সকলেই করে, ঋষিগণও করিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা দাস ও দস্যুদিগের সম্পর্কিত সমস্তার সমাধান হয় না। কারণ, দেখা যায় যে সকল শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে একই প্রকারের অভিযোগ করা হইয়াছে। দাস ও দস্যুরা বিধর্মী হইলে আর্যদিগের, এমন কি ঋষিগুলির মধ্যেও, বিধর্মী ছিল একথা না বলিয়া উপায় নাই। অদেব ও অত্রঙ্গা অর্থাৎ জুতিহীন বা ঋষিকহীন আর্য, ত্র্যম্বক অর্থাৎ জুতিবিধেয়ী ঋষি, ইন্দ্রহীন ও যজ্ঞবাচ গোষ্ঠীর উল্লেখ বহু আছে। আশ্চর্যের কথা যে দেবদেবী পর্যায় এই ধরণের কটুক্তি হইতে অব্যাহতি পান নাই। উষা দেবীকে দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী ও ইন্দ্রবিহীন বলা হইয়াছে। এই সকল প্রয়োগ হইতে দেখা যায় যে ধর্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারে ঋষিদিগের অজ্ঞাত শত্রু হইতে দাস ও দস্যুদিগের কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। কাজেই ধর্ম-সম্পর্কিত কটুক্তিগুলি যে অনেক ক্ষেত্রে অর্থশূন্য কটুক্তিমাত্র এই সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে আর্য অথবা ঋষিদিগের সহিত দাস ও দস্যুদিগের শত্রুতার প্রকৃত কারণ কি ধর্মের পার্থক্য না রাজনৈতিক?

দাস ও দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যে দিবো-দাসের সঙ্গে সম্বন্ধের যুদ্ধ ব্যতীত দাস ও দস্যু প্রধানগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সকল উল্লেখ দেখা যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্দ্র কোন ঋষির পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। কোন ক্ষেত্রে কোন ঋষির যজ্ঞ-মানের পক্ষ হইয়াও ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছেন। যেভাবে বিভিন্ন মণ্ডলে এক শ্রেণীর কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখ হইয়াছে তাহাতে মনে করা যায় যে এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ঋগ্বেদের পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে। এই সকল পুনঃপুনঃ উল্লিখিত কাহিনী ব্যতীত দাস ও দস্যুদিগের অধিকৃত জল ও উর্বরা ভূমি, প্রচুর ধনপূর্ণ পুরীসমূহ, অসংখ্য গোধন প্রভৃতি অধিকার ও লুণ্ঠন করিবার জন্ত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু দাস ও দস্যুর অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রুদিগের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে। লুণ্ঠিত ধন ও গোধনের অংশ পাইবার জন্ত ঋষিদিগের উদগ্র শোভ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ঋগ্বেদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ধন-লুণ্ঠন ও রাজ্যজয় এই সকল যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যুদ্ধের এই প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু নতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। এই সকল যুদ্ধের দুই পক্ষ আর্য এবং দাস ও দস্যু বা যজ্ঞকারী এবং যজ্ঞবিমুখ, ইন্দ্র উপাসক এবং ইন্দ্র

বিরোধী নহে, এই সকল যুদ্ধের দুই পক্ষ ধনহীন এবং ধনশালী, রাজ্যহীন এবং রাজ্যলোভী। আরও দেখা যায় এই শ্রেণীর অধিকাংশ যুদ্ধ ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘটয়াছিল। সুতরাং দাস ও দস্যুদিগকে আর্য জাতির প্রতিপক্ষ রূপে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত,—ঋগ্বেদে হইতে এইরূপ একটা চিত্র পাইবার আশা করা হইলে সে আশা পূর্ণ হয় না। সুদাসের সহিত দশ রাজার যুদ্ধ এবং সূর্যবের বিরুদ্ধে বিশ জন রাজার সম্মিলিত আক্রমণ ইহার প্রমাণ। ইহার অর্থ এই যে দাস ও দস্যুদিগের সহিত বিরোধিতার কারণ রাজনৈতিক হইতে পারে কিন্তু এইরূপ বিরোধিতা ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, এমন কি ঋষিকুলগুলির মধ্যেও ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা কতব্য যে দাস ও দস্যু এবং আর্যের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা বর্তমান ছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দাস ও আর্য শত্রুর সঙ্গে যুগপৎ যুদ্ধ করিতে অভিলাষী ঋষি সাহায্য পাইবার জন্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। অনিষ্টকারী, নিধনোদ্ভূত দাসজাতীয় ও আর্যজাতীয় শত্রুদিগকে অপ্রকাশ রূপে বধ করিবার জন্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে। কতকগুলি স্থলে দাস ও আর্য শত্রুর একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ পাইবার পরে যদি বলা যায় যে আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের মধ্যে বিরোধিতার কারণ রাজনৈতিক তাহা হইলে দাস ও দস্যুদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রকট হয় না, কারণ, শত্রুদলের মধ্যে আর্য, দাস ও দস্যু সকলেই আছে।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ব্যাপারে, উভয় ক্ষেত্রেই, দেখা যাইতেছে যে বিরোধিতা দাস ও দস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, আর্যদিগের সঙ্গেও এই বিরোধিতা রহিয়াছে। তাহা হইলে শুধু দাস ও দস্যু এই নাম ছাড়া দাস ও দস্যু-দিগকে আর্যদিগের বিরোধী একটা স্বতন্ত্র জাতি বা গোষ্ঠী হিসাবে দাঁড় করা ইবার ভিত্তি কি হইতে পারে? কোন্ যুক্তিতে তাহাদিগকে বৈদ্যাইক গোষ্ঠীর ভারতবর্ষের আদিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে?

যাঁহারা দাস ও দস্যুদিগকে ভারতবর্ষের অনার্য আদিবাসী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা racial origin-এর প্রশ্ন তুলেন। অর্থাৎ তাঁহারা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশ্রয় লন। এই প্রসঙ্গে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে পণ্ডিতগণ প্রমাণের উপর মতবাদকে দাঁড় করান অপেক্ষা মতবাদের সপক্ষে প্রমাণের অনুসন্ধানের সময় ব্যয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বের এক প্রবন্ধে (ঋতকায় বৈদেশিক আর্যগণের ভারত আক্রমণ, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) কিছু বলা হইয়াছে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের স্তূত্রমতে যে সকল প্রমাণের উপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা চলে ঋগ্বেদের আর্য, দাস ও দস্যু কাহারও সম্বন্ধে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযোনি, কৃষ্ণগর্ভা, কৃষ্ণা প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা লইয়া মতবৈধ আছে একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এই সকল পদের ব্যবহার হইতে

কৃষ্ণবর্ণ জাতির অস্তিত্ব অনুমান ও সেই জাতিকে দাস ও দস্যু নামে ভারতবর্ষের বৈদ্যাইক গোষ্ঠীর আদিবাসীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিলে কথকুলের মত প্রাচীন ঋষিকুল ও পুরুগোষ্ঠীর মত বিখ্যাত ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীকেও কেন যে দাস ও দস্যুদিগের পর্যায়ে গণনা করা হইবে না তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে কথকুল ও পুরুগোষ্ঠীকে শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ-যোনি, কৃষ্ণগর্ভা প্রভৃতি পদের প্রয়োগ স্থলে দাস ও দস্যুদিগকে এই সকল পদের সহিত যুক্ত করা হয় নাই এবং ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদিগকে যুক্ত করিবার চেষ্টাকে মানিয়া লইবার কোন হেতু নাই। ঋগ্বেদীয় সমাজের আর্য ও অনার্য গোষ্ঠীসমূহের—যদিও অনার্য বলিয়া কোন গোষ্ঠীর উল্লেখ নাই—racial-origin সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয় তাহা অবৈজ্ঞানিক অনুমানমূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আর্য এবং দাস ও দস্যুদিগের সামাজিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে যেটুকু প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তাহা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যায়। পরে এ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভাষা, ধর্ম ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচার করিলে দাস ও দস্যু-দিগকে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের অথবা তাঁহাদের যজ্ঞমানদিগের আর্য বলিয়া উল্লিখিত এবং অত্যাঁচ অনির্দিষ্ট পরিচয় শত্রু এবং ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীভুক্ত শত্রু হইতে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কোন জাতিভুক্ত শত্রু বলিয়া নির্দেশ করিবার কোন সন্তোষজনক স্তূত্র পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং পুরাতন সন্দেহ আবার উঠিতেছে, দাস ও দস্যু কি শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত কটুক্তিমূলক নাম মাত্র? অথবা আর্যের একটা স্বতন্ত্র জাতি?

সংক্ষেপে ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি প্রয়োগের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক এই সন্দেহ দূর বা সমাধিত হয় কিনা।

যজ্ঞ সম্পর্কে দাস ও দস্যুদিগকে যজ্ঞবিষুণ্ড ও যজ্ঞহীন বলা হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলা হয় নাই। বরশিখ নামে একটা প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। একটা ঋকে বলা হইয়াছে ইন্দ্রের প্রতি হিংসা দ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া বরশিখ বংশীয়গণ যজ্ঞপাত্র ভঙ্গ করিয়াছিল। যজ্ঞপাত্র ভঙ্গ করিবার মত গুরুতর অপরাধ দাস ও দস্যুদিগের প্রতি আরোপিত হয় নাই। বর্মধারী বরশিখগণের সহিত ভরত-বংশীয় বা স্বয়ং গোষ্ঠীর অভ্যবর্তীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা যে দাস বা দস্যু তাহা বলা হয় নাই। ইন্দ্র যজ্ঞোদ্ভূত দাস নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হইয়াছে। যজ্ঞের চর রন্ধনকারী ও সোমরস প্রস্তুতকারী দাসের উল্লেখ আছে। দাস ও দস্যু-প্রধানগণ আপনাদের ক্রিয়াকর্মের—সম্ভবতঃ, যজ্ঞ সম্পাদনের জন্ত ঋষিক নিযুক্ত করিতেন তাহার উল্লেখ আছে। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, যে ইন্দ্রকে আমরা গুতি করি তিনি দস্যুদিগের

প্রবর্তিত ব্যক্তির (দস্যু জুতার) স্তুতি গ্রহণ করেন না। একটি ঋকে ইন্দ্রের ধনরক্ষাকারী আৰ্য ও দাসের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে দাস ও দস্যুগণ কোন কোন ঋষির মতে সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াকাণ্ডবর্জিত, বর্বর, অসভ্য শত্রু ছিল না। তবে ইহা সম্ভব যে ধর্মের যে পার্থক্য গোড়ায় ছিল, অর্থাৎ দাস ও দস্যুদিগের যজ্ঞবিমুখতা, কালক্রমে সে পার্থক্য হ্রাস পাইয়াছিল।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই যে বহু দাস ও দস্যু প্রধানের নাম ও তাহাদের বল, বিক্রম, ঐশ্বর্য প্রভৃতির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইলেও কোন দাস জাতির নাম ও এক পণিগণ ব্যতীত কোন দস্যু জাতির বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই হইতে পারে যে দাস ও দস্যু বলিয়া কোন জাতি বা গোষ্ঠী ছিল না, কোন কোন ঋষি আপনাদিগের শত্রুদিগকে দাস ও দস্যু নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই যুক্তির বিপক্ষে অল্প যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার স্বপক্ষে বলিবার আরও কি আছে তাহাই এখানে দেখা যাউক।

ঘোরপুত্র কথ ঋষি বলিতেছেন, দস্যু দমনকারী অগ্নির সহিত তুর্বশ, যজ্ঞ ও উগ্রাদেবকে দূরদেশ হইতে আহ্বান করি। অগ্নি নববাস্ত, বৃহদ্রথ ও তুর্বাণিকেকে এই স্থানে আনয়ন করন। সায়নের ব্যাখ্যা মতে এই ছয় জন রাজর্ষি। কিন্তু যজ্ঞ ও তুর্বশ ঋগ্বেদের দুইটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী, উগ্রা দেব ইন্দ্র ও তুর্বাণি ঋষি। তিনি একবার জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নববাস্ত ও বৃহদ্রথ কে? ইন্দ্রের সঙ্গে যজ্ঞস্থানে ঋষিদিগকে আনিবার জন্ত অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে তাঁহার। অবশ্য সম্মানীয় ব্যক্তি। দশম মণ্ডলের এক স্থানে ইন্দ্রের জবানীতে বলা হইয়াছে দাস জাতীয় নববাস্ত ও বৃহদ্রথ নামক দুই জন শত্রু অতিশয় বুদ্ধি পাওয়াতে আমি তাহাদিগকে ভয় করিয়াছি (অহং স. যো নববাস্তং বৃহদ্রথং সং বুদ্ধেব দাসং বুদ্ধহাক্ষজং যদধর্যতম ইত্যাদি)। ষষ্ঠ মণ্ডলের একটি ঋকে বলা হইয়াছে উশনার উপকারের জন্ত ইন্দ্র নববাস্তকে বধ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রের সঙ্গে সম্মানে ঋষিদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাদিগকেই দাস নাম দিয়া ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হইতেছে। এই দুই জন ছাড়া যজ্ঞ ও তুর্বশকেও ইন্দ্রের সঙ্গে আহ্বান করা হইয়াছিল। এই দুইটি প্রসিদ্ধ গোষ্ঠী অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতাদিগের অনুগ্রহভাজন। বিভিন্ন কুলের ঋষিদিগের অজস্র প্রশংসা তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ত্রিংশ, ভরত, স্বপ্নয় প্রভৃতি গোষ্ঠী অপেক্ষা যজ্ঞ ও তুর্বশদিগের উল্লেখ অনেক বেশী আছে। শুধু ইহাই নহে, অগ্নির কুলের মত প্রাচীন, সম্মানার্থ ঋষিকুলের সহিত যজ্ঞ গোষ্ঠীর কোন কোন প্রধান বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন দেখা যায়। দশম মণ্ডলের একটি ঋকে দেখা যায় যে যজ্ঞ ও

তুর্বশকে দাস রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নির কুলের গর্বিত নাভানেদ্বিষ্টের মুখে এই কথা শুনা যাইতেছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পণিগণ একমাত্র দস্যুজাতি বাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। পণিদিগের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এখানে সকল কথার উল্লেখ অনাবশ্যক। একটি ঋকে বলা হইয়াছে,—অগ্নি যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক, শত্রুরহিত, বুদ্ধিশূন্য পণি দস্যুদিগকে বিদূরিত করেন, তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করেন। [ন্যজতু-নগ্রধিনো যুগ্রবাচঃ পণীং অরুধাং অযজ্ঞান্। প্রপ্র তান্দস্যুরগি-বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাং অযজ্ঞান্॥] ডাঃ ম্যুরের এই ঋকের অনুবাদ করিয়াছেন :

“Senseless, false, imperfectly-speaking, unbelieving, unworshipping, unpraising Panis; these Dasyus Agni removed far off. It was he who first made the irreligious degraded.”

ঋকের শেষ অংশ লক্ষ্য করিতে হইবে, পূর্বশ্চকারাপরাং অযজ্ঞান্; তিনি (অগ্নি) প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যজ্ঞহীনদিগকে হেয় করিবার একটা বিধান ঋগ্বেদের আমল হইতে প্রচলিত ছিল। পণিগণ এই অপরাধে বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার। যে কার্যিক অর্থে বিদূরিত হয় নাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু ঋকে তাহাদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। বিদূরিত করিবার প্রক্রিয়াটির নৈতিক অর্থ করিলে দাঁড়ায় যে পণিদস্যুগণ জাতিচ্যুত হইয়াছিল এবং তাহার। জাতিচ্যুত হইয়াছিল যজ্ঞবিমুখতার অপরাধে। কিন্তু বসিষ্ঠ পণিগণের সম্বন্ধে এই ঋকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার শেষ কথা নহে। কয়েকটি ঋক পরে তিনি ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তোমার যজ্ঞে আমরাই উক্ত উচ্চারণকারী; অজ্ঞ উক্ত উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার স্বয়ং দ্বারা পণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি। শত্রুহীন, যজ্ঞহীন বলিয়া অভিযুক্ত পণিগণের সম্বন্ধে বসিষ্ঠের মুখে এই কথা আশ্চর্য মনে হইতে পারে। ভরদ্বাজ কুলের একজন ঋষি গঙ্গার উন্নতকুলের অধিবাসী পণিদিগের প্রধান বরুর বদান্ততার উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন।

সে যাহা হউক, অগ্নির পণি ও অজ্ঞ যজ্ঞহীন দস্যুগণকে হেয় করিবার কারণ জানা গেল, আৰ্য ও দস্যুদিগের মধ্যে পার্থক্যের যে কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—অর্থাৎ দস্যুদিগের কুশযুক্ত যজ্ঞে অনাসক্তি,—তাহাতেও এই মত সমর্থিত হয়। দস্যুগণের যজ্ঞবিমুখতা তাহাদিগের ও আৰ্যদিগের মধ্যে বিরোধের হেতু। যে সন্দেহের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দাস ও দস্যু বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, আপনাদিগের প্রবর্তিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া অস্বীকার করায় ঋষিগণ কতকগুলি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে দস্যু ও দাস নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই সন্দেহ প্রবল হয়। ইহার পর হঠাৎ ইন্দ্রের জবানীতে

একটি স্বীকৃতি পাওয়া যাইতেছে,—আমি সেই ইজ যে দস্যু-দিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যঃ ররে আর্য নাম দত্তবে। একটি ঋকে দস্যুদিগকে সদগুণ হইতে বঞ্চিত করিবার ও দানদিগকে নিন্দনীয় করিবার কথা আছে। এখানে দস্যুদিগকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, ইহার অর্থ কি এই যে দস্যুরা বাস্তবিক আর্য, শান্তি হিসাবে তাহাদিগকে সম্মানীয় আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে? আর্য নাম বহন করিবার অধিকার তাহাদের থাকিলেও এই অধিকার অগ্রাহ করা হইয়াছে? তাহাদিগকে হেয় করিবার কথা বলা হইয়াছে; আর্য নাম হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে হেয় করা হইয়াছিল-ইহাই কি বুঝিতে হইবে? দাস ও দস্যু-দিগের সম্বন্ধে আলোচনায় যে সন্দেহের কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে সেই সন্দেহ যথার্থ বলিয়া দেখা যাইতেছে, ঋগ্বেদীয় প্রমাণসমূহের বর্তমান আলোচনা হইতে এ কথা বলা যায়।

আর্যজাতীয় ব্যক্তিকে যজাদি ক্রিয়াবিমুখতা ও এই প্রকার অপরাধের জন্ত দস্যু নাম দিয়া জাতিচ্যুত করিবার যে বিধান ঋগ্বেদের আমল হইতে প্রচলিত ছিল দেখা যায় পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্য, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সেইরূপ বিধানের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।১৮) মতে অধিকাংশ দস্যুজাতি বিশ্বামিত্রের বংশধর। বিশ্বামিত্রের অভিশাপ হেতু তাহার পুত্রগণ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হন। পুলিন্দ শবর গুপ্ত অক্লু প্রভৃতি জাতি বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ হইতে উৎপন্ন। উক্ত ভরত-বংশজাত বিশ্বামিত্রপুত্রগণের এই অবস্থা প্রাপ্তির কাহিনী তাৎপর্যহীন ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঋগ্বেদের প্রথম স্তব্ধকার ঋষি মধুচ্ছন্দার আয়ীয়গণের বেলায় এই প্রকার জাতিচ্যুতি সম্ভব হইয়া থাকিলে অজ্ঞাত আর্যবংশীয়গণের বেলায় ইহা অসম্ভব হইবার কোন কারণ নাই। তারপর দেখা যায় যে মনুর মতে (১০।৪৫) ব্রাহ্মণদি বর্ষ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় তাহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যাইতেছে, দৃষ্টান্তে মায়ুষে লোকে সর্ববর্ণেষু দত্তবঃ। লিঙ্গান্তরে বর্তমান আশ্রমেষু চতুষ্পি। দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। কর্ণপর্বে দেখা যায় যে পঞ্চ-নদের বাহীকগণের সম্পর্কে প্রাচ্য ও দাস পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাহাদিগকে অযজ্ঞান, অন্তত কর্মকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকানামযজ্ঞানাম ইত্যাদি) প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধীকে যে বর্ণনির্বিচারে দস্যু বলা হইত এখানে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদের প্রমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন চতুর্বর্ণ বিভাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই তখনও এই প্রকার অজ্ঞসরণ করা হইত।

উপরের আলোচনায় যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা হইল

তাহা সম্পূর্ণরূপে ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত, সুতরাং অতি প্রাচীন প্রমাণ। কিন্তু বৈদেশিক আর্যজাতি কর্তৃক ভারত বিজয়ের মতবাদ বৈদেশিক বেদ ব্যাখ্যাভাদিগের প্রচেষ্টায় প্রচারিত হইয়া পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। আর্যদিগের শত্রুগণ যে অনার্য বর্ষর, আদিম অধিবাসী দাস ও দস্যু, ইহা ঐ মত-বাদেরই একটি অংশ। স্বীকার করিতে হয় যে দাস ও দস্যু ভারতবর্ষের অনার্য বর্ষর আদিম অধিবাসীরূপে চিত্রিত না হইলে আর্যদিগের, পরবর্তীকালের কোরাণ ও তরবারি, বাইবেল ও তরবারি, তুলাদণ্ড ও তরবারি পদ্ধতির সঙ্গে সম্মতি রক্ষা করিয়া, বেদ ও তরবারি হস্তে ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রকাণ্ড কীর্তি অর্থাশ্রুত হইয়া যায়। উপরের আলোচনা হইতে দাস ও দস্যুদিগের এই চিত্র ঋগ্বেদ হইতে কতখানি সমর্থিত হয় তাহা দেখা গিয়াছে।

এখানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ ম্যাইরের (*Sanskrit Texts* 2-381) অভিমতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন :

“Though it is true that some of the Arian tribes who had not adopted Brahmanical institutions were so designated (অর্থাৎ দস্যু বলিয়া অভিহিত হইত) in after times, the term Dasyu could not have been so applied in the earlier Vedic era. At that time the Brahmanical institutions had not arrived at maturity, and the tribes stigmatized by the Vedic poets as persons of a different religion must, therefore, probably have been such as had never been brought into contact with the Arians, and were, in fact, of an origin, totally distinct.”

অর্থাৎ যদিও দেখা যায় যে কতকগুলি আর্যগোষ্ঠী যাহারা ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করে নাই পরবর্তীকালে তাহাদিগকে দস্যু নামে অভিহিত করা হইয়াছিল, তথাপি প্রাচীন বৈদিক যুগে দস্যু পদের ঐরূপ প্রয়োগ সম্ভবপর ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মাদি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। বৈদিক কবিগণ যে সকল গোষ্ঠীকে অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ পূর্বে কখনও আর্যদিগের সংস্পর্শে আসে নাই এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতির লোক। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে দস্যু বলা সম্ভব হইয়া থাকিলে বৈদিক যুগে ঋষিদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী আর্যগোষ্ঠীকে দস্যু অপবাদ দেওয়া অসম্ভব হইবার কোন কারণ ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ নাই। তারপর অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী বলিয়া দাস ও দস্যুদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতির লোক বলিবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই; যে অর্থে দাস ও দস্যু অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী অনৈকখানি সেই অর্থে বহু ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠী ও ঋষিকুলের কেহ কেহ অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দাস ও দস্যু-

দিগের যে চিত্র প্রচলিত আর্থবাদের অঙ্গ হিসাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহার কোন স্বত্র ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায় না; আর এসম্বন্ধে অল্প যুক্তি প্রমাণ অপেক্ষা ঋগ্বেদের প্রমাণের মূল্য অনেক বেশী।

দাস ও দহ্যাদিগের সম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ঋগ্বেদের পবিত্রায়ক দহ্যজাতি সিদ্ধু-সভ্যতার প্রতিনিধি।

উমেশ পণ্ডিত

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১
চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শরের ভিতরে বসিয়া বৃদ্ধ উমেশ পণ্ডিত সম্মুখের মাঠের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া একমনে কি যেন ভাবিয়া চলিয়াছেন। আজ শনিবার, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা এবং দ্বিতীয় শিক্ষক রাইচরণ পাল বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। চৈত্র মাস। সম্মুখের মাঠটি যেন একেবারে জলিয়া পুড়িয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পাশের শুষ্ক ডোবাটির কাদার ভিতর হইতে যেন একটা দম্ব আটকান বাষ্প ঠেলিয়া বাহির হইতেছে—পথের ধারের প্রকাণ্ড পাখড় গাছটি হইতে একেবারে শেষ পত্রটি পর্য্যন্ত বরিয়া পড়িয়া গিয়াছে—তাহারই ডালে বসিয়া একটা চিল অনবরত ডাকিয়া চলিয়াছে। এই কাঁঠাটা রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া উমেশ পণ্ডিত কেমন করিয়া যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বে চণ্ডীতলার এই ইষ্কলের সহিত তাঁহার নিজের জীবন একেবারে জড়াইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাই ভাবিয়া চলিয়াছেন। আর কয়টা দিন পরে চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে। উমেশ পণ্ডিত ইহা যে কল্পনাও করিতে পারেন না। ভূমিকম্পে অর্ধেক পৃথিবী জলের নীচে ডুবিয়া যাওয়া বা মড়ক লাগিয়া একটা জনপদ ধ্বংস হইয়া যাওয়াও তাঁহার নিকটে ইহার চেয়ে মর্যাস্তিক নহে। চণ্ডীতলার ইষ্কল—উমেশ পণ্ডিতের চল্লিশ বৎসরের সাধনার ইষ্কল আজ উঠিয়া যাইবে।—ইহাই আজ বিশ্বাস করিতে হইবে উমেশ পণ্ডিতকে? আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিল কে? গ্রামে গ্রামে এই যে চাক্রে, উকিল, ডাক্তার—এই যে সব বাবুর দল ইহাদের চোখ ফুটাইল কে? যে সব স্বদেশী ছোঁড়ার দল বহুতা দিয়া জেল খাটিয়া বাহবা পাইতেছে তাহাদের মুখে বুলি ফুটাইল কে? সকলকেই না এক দিন চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া—উমেশ পণ্ডিতের পায়ের তলায় বসিয়া বিজ্ঞা অর্জন করিতে হইয়াছে। আর আজ সেই ইষ্কল উঠাইয়া দিবার জন্ম সেই অকৃতজ্ঞের দল মিলিয়া ঘড়ঘড় করিয়াছে। না, কখনই না—উমেশ পণ্ডিত বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইতে

দিবে না। ভাবিতে ভাবিতে উমেশ পণ্ডিত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বুধাই এ উত্তেজনা—ইষ্কল ত তাঁহার সত্য করিয়াই উঠিয়া যাইবে—কোন সাধ্য নাই তাঁহার রোধ করিবার। মাত্র কয়েক মত হাত দূরে ঐ যে বড় রাস্তাটি উহারই ঐ পাশের মাঠের ভিতরে নূতন মাইনর ইষ্কলের প্রতিষ্ঠা হইবে—গতকল্যাকার সভায় একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। শুধু মাইনর ইষ্কলই নয়, এই মাইনর ইষ্কলকে নাকি কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েও পরিণত করা হইবে। গতকল্য মাণিক দত্তের বাড়ীতে—চণ্ডীতলা, মহেশপুর, বাবুইখালী এই তিন গ্রামের লোক মিলিয়া সভা করিয়াছে। মাণিক দত্তের বড় ছেলে অক্ষয় একাই সাত হাজার টাকা দিবে—বাকি হাজারকয়েক টাকা কয়েকটি গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া আদায় করা হইবে। অক্ষয় তাঁহারই ত ছাত্র—এই ইষ্কল হইতে পাস করিয়া—রাজবাড়ীর ইষ্কল হইতে ম্যাট্রিক দিয়াছে—আজ বছর পাঁচ-সাত। এবার যুদ্ধের ছিড়িকে কলিকাতায় কয়েক হাজার টাকা খাটাইয়া একেবারে নাকি লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়ের পিতার নামে হইবে নূতন ইষ্কল। অনাহুত উমেশ পণ্ডিত সভার এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সমস্ত বহুতা শুনিয়াছেন—আর ভাবিয়া চলিয়াছেন নিজের ইষ্কলটির কথা। যে ইষ্কলটি এতদিন ধরিয়া এমনি করিয়া দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিল, সেজন্ম ত একটি লোকও কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার ভাষা প্রকাশ করিল না। বরং এখানে যে কিছু হয় না—এমনি বক্রোজ্ঞি করিতেও কেহ ছাড়ে নাই।

পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া পাকা পোতা গাঁথিয়া দেওয়াল দিয়া টিনের চালার নূতন ইষ্কল-ঘর তৈয়ারি হইবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ গত বৎসর—এই খড়ের ঘর-খানিতে কয়েকটি শালকাঠের খুঁটি দিবার জন্ম ইষ্কলের অনেক হিতৈষীর নিকট বলিয়া-কহিয়াও গোটা চল্লিশেক টাকা উমেশ পণ্ডিত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রতি দুই বৎসর অন্তর গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে বাঁশ চাহিয়া আনিয়া ঘরখানি কোন প্রকারে ঝাড়া রাখিতে হইতেছে। আজ বছর বার

আগে সেবার আশ্বিন মাসের বড়ে ঘরখানি ফেলিয়া দিয়া যায়। তারপর অন্ততঃ মাসখানেক ধরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অতিকষ্টে কিছু টাকা আদায় করিয়া পুনরায় ঘরখানি তুলিতে পারিয়াছিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে বেলা একেবারে শেষ হইয়া আসিল। অপরাহ্ন-সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দরজার কঁক দিয়া রৌদ্র ধরের ভিতরে ঢুকিয়া উমেশ পণ্ডিতের চোখে মুখে লাগিতেছে। উমেশ পণ্ডিত ভাঙা ফ্রেমের চশমাখানি কৌচার খুঁটে মুছিয়া লইয়া ছাত্রগণের হাজিরা বহিখানি বগলে পুরিয়া ইঙ্কল-ঘর হইতে বাহির হইলেন।

২

সেকালে মহেন্দ্র মৈত্র ছিলেন এ গ্রামে সকলের চেয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া শহরের ইংরেজী স্কুলে কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মহেন্দ্র মৈত্রের সহায়তায় উমেশ পণ্ডিত প্রথম এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেন। যেদিন ইঙ্কলটির প্রতিষ্ঠা হয় সেদিন কয়েকটি গ্রামের ভিতরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, উমেশ পণ্ডিতের নামও ভরন লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আশেপাশের বিশটা গ্রামের ভিতরে একটা পাঠশালাও তখন ছিল না। লোকে কি সম্মানটাই না তাঁহাকে দেখাইত। কি দিনই গিয়াছে। প্রথম দশটি ছাত্র লইয়া ইঙ্কলটি আরম্ভ হয়—আজ সেই ছাত্র বাড়িতে বাড়িতে ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে উমেশ পণ্ডিত একাই পড়াইতেন, ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন শিক্ষক রাখিতে হইয়াছে। যখন ইঙ্কলের প্রতিষ্ঠা হয় তখন উমেশ পণ্ডিত ত্রিশ বৎসরের যুবক। তারপর চল্লিশটি বৎসরে তাঁহার মাথার উপর দিয়া কত ঝড়ঝাপটা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু ইঙ্কলটি তিনি ছাড়েন নাই। নিতান্ত দুর্বিপাকে না পড়িলে কোন দিন স্কুলে অল্পস্থিত পর্য্যন্ত হন নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের একান্ত আপনার বলিতে যাহারা তাহাদের সকলকেই হারাইয়া একমাত্র বিধবা কণ্ঠা আর চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্বল করিয়া নির্বিকার চিত্তে জীবনের দিনগুলি তিনি কাটাইয়া যাইতেছেন। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বারে বারে নূতন নূতন ছাত্রের ধারাপাতের সেই ইচ্ছাকিয়া, বুদ্ধিকিয়া, নামতা, বাল্যশিক্ষা আর বোধোদয় পড়াইয়া একদিনের জন্তও এতটুকু বিরক্তি তাঁহার আসে নাই। ছুটু ছেলের পিঠে বেত ভাঙিয়া নাড়ু গোপাল করিয়া বসাইয়া হাতের উপরে একখানা আস্ত ইট চাপাইয়া এক পায়ে দাঁড় করাইয়া—কত গাধা পিটাইয়া যে তিনি মাছুর করিয়াছেন তাহার কি ইয়ত্তা আছে। বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া কৈবর্তদের ছেলে কার্তিক যাইতেছিল—তাহার দিকে নজর পড়িতেই উমেশ পণ্ডিত ডাকিলেন—শুনে যা তো কার্তিক। কার্তিক উমেশ পণ্ডিতের ছাত্রদের ভিতরে সবচেয়ে বয়সে বড় কিন্তু

এখনও সে সকলের উপরের ক্লাসে উঠিতে পারে নাই। তবে তাহার বাবার নিতান্ত ধনুর্ভঙ্গ পণ যে কার্তিককে সে উমেশ পণ্ডিতের স্কুলে পাস করাইবেই। উমেশ পণ্ডিত তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন আর বছর চারেকের ভিতরে কার্তিকের পিতার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিয়াছেন কার্তিক যেন একেবারে সারাক্ষণ পুণ্ডিপত্র লইয়া বসিয়া না থাকিয়া মাঝে মাঝে তাহার পিতার ক্ষেত-খামারের কাজে খানিকটা সাহায্য করিতে থাকে।

ভয়ে ভয়ে কার্তিক তাঁহার নিকটে আগাইয়া আসিল। উমেশ পণ্ডিত সম্মুখে কার্তিককে নিজের পাশে বসাইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—বেশ ভাল আছিস্ তো কার্তিক? কার্তিক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে উমেশ পণ্ডিতের বেতের দাগ তাহার শরীরের যেখানে সেখানে খুঁজিলেই দুই চারিটি করিয়া পাওয়া যাইবে—যাঁহার উৎপাতে তাহার দুই পাশের কানের ঠিক উপরের চুলগুলি আর ভাল করিয়া গজাইতেই পারিল না—শ্যুর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি মিষ্ট বুলিগুলির সহিত যে কার্তিকের নিত্যকার পরিচয় আজ সেই কার্তিককেই কিনা স্বয়ং উমেশ পণ্ডিত এমনি করিয়া আদর করিতেছেন? ব্যাপার কি?

উমেশ পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা তুই বল্ দেখি কার্তিক—আমাদেরই ইঙ্কলে যেমন অল্প আর সাহিত্য শেখান হয় এমন আর এ মহকুমার ভিতরে কোথাও হয় কিনা? সেবারই ইঙ্কল-সাব্বইনস্পেক্টর সাহেব স্বয়ং একথা বলে যান নি?

কার্তিক মাথা হেলাইয়া জবাব দিল—হাঁ তাই তো।

উমেশ পণ্ডিত বলিলেন—তবেই বোঝ। তুই তো এত দিন ইঙ্কলে পড়ছিস্—কি না জানিস্ বল্। আর সেই ইঙ্কল না কি এত দিন পরে উঠে যাবে। কার্তিক মহা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—কবে পণ্ডিতমশাই?

উমেশ আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—নূতন ইঙ্কল হবে রে—কত টাকা তুলেছে—ওপাড়ার অক্ষয় দেবে একাই সাত হাজার টাকা।

• কার্তিক এবার আবার নিরুৎসাহ হইয়া বলিল—উঠেই যদি যাবে তবে কি কাজ আর একটা ইঙ্কল হয়ে?

—তোদেরও তো এখন থেকে সেই ইঙ্কলেই পড়তে হবে রে কার্তিক?

কার্তিক সবেগে মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল—কার্তিক কখনও সে ইঙ্কলে পড়তে যাবে না পণ্ডিতমশাই—আপনি দেখে নেবেন।

৩

ইঙ্কলে গিয়া ছেলেদের পড়াইতে আর মন বসে না।

একটা অঙ্ক দিয়া হয় তো চূপ করিয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উমেশ পণ্ডিত ঝিমাইতে থাকেন। বাংলা বই পড়াইতে পড়াইতে কখনও বা মাঝখানেই পড়া বন্ধ করিয়া বলেন—আজ থাক—কাল হবে। উমেশ পণ্ডিতের স্বদীর্ঘ এই চলিশ বৎসর মাষ্টারী জীবনে এমন তো কোন দিন হয় নাই। সারাটা দিন ধরিয়া হাঁকে ডাকে ইঙ্কুলকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ ছাত্র কতটুকু ফাঁকি দিল, না দিল তাহার কিছু মাত্র তাহার চক্ষু এড়াইয়া যাইত না। আর আজ সেই উমেশ পণ্ডিতের এমনি ভাবান্তরে ছাত্রেরা পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা হৈ হলা করিতে থাকে—উমেশ পণ্ডিত কথটি কহেন না।

সে দিন দ্বিতীয় শিক্ষক রাইচরণ পালকে বলিলেন—বুকেছ রাইচরণ, ইঙ্কুল আমাদের সত্যি করেই উঠে যাবে।

রাইচরণ অমান বদনে জবাব দিল—তা যাক্ না—আরো তো বড় ইঙ্কুল হচ্ছে।

—কিন্তু চাকরীটাও তো যাবে, সে কথা ভেবেছো তো?

—ভারি তো চাকরি—মাসিক সাত টাকা বেতন। গরু চরালেও ওর চেয়ে বেশী পাওয়া যায়।

উমেশ চূপ করিয়া গেলেন—আর কথটি বলিবার প্রযুক্তি হইল না।

কলিকাতা হইতে অক্ষয় বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া এক দিন সন্ধ্যাবেলা উমেশ পণ্ডিত তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। অক্ষয় প্রণাম করিয়া সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। অনেক করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া উমেশ বলিলেন—একটা কথা বলতে এলাম অক্ষয়। আমার ইঙ্কুলটা কি এত দিন পরে সত্যি করেই উঠে যাবে।

অক্ষয় জবাব দিল—আপনার ইঙ্কুলের তো আর দরকার নাই পণ্ডিতমশাই—মাইনর ইঙ্কুল হচ্ছে যে—তার পর কয়েক বছরের ভিতরে মাইনর ইঙ্কুলকে হাই ইঙ্কুলে পরিণত করতেও আমাদের ইচ্ছে আছে।

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—কিন্তু জান তো বাপু—এই শেষ বয়স—এ ইঙ্কুলটা ধরেই তো কোন রকমে বেঁচে আছি—যে কয়টা টাকা পাই তাই দিয়েই কোন রকমে—

অক্ষয় বাধা দিয়া বলিল—আপনি ভাববেন না পণ্ডিতমশাই—চাকরি আপনার যাবে না—আপনাকে সেকেন্ড পণ্ডিতের পদে রাখা হবে ঠিক হয়েছে। বাইরের মাষ্টার বড় একটা আমরা রাখবো না, তাতে খরচ বেশী লাগে। মহেশ-পুরের যতীন মিস্তিরের ছেলে প্রকাশ আই—এ পাশ করে বসে আছে—সেই হবে হেড মাষ্টার।

—যতীন মিস্তিরের ছেলে—খাঁহু?

—হ্যাঁ সেই।

উমেশ পণ্ডিত আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি-

লেন বটে, কিন্তু মনে তিনি এতটুকু শান্তি পাইলেন না। চাকুরী থাকিলে কি হয়? সত্যিই কি, তাহার ইঙ্কুলের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা কি এই কয়টা টাকারই সম্বন্ধ? উমেশ অনেক ভাবিয়া দেখিলেন—টাকা তিনি সত্যি করিয়াই চান না, তিনি চান তাহার নিজেই ইঙ্কুল। আর খাঁহু যে এই কয়টা বৎসর আগেও তাহারই ছাত্র ছিল সেই হইবে হেড মাষ্টার। তাহারই অধীনে তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইবে? ঠিক এই চাকুরীরই তিনি বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন—তবু এ চাকুরী করিবেন না।

মিস্ত্রি আর কুলি-মজুর লাগিয়া নতুন ইঙ্কুল গৃহ তৈরী হইতেছে। ধীরে ধীরে মাস তিনেকের ভিতরে উমেশ পণ্ডিতের চোখের উপরে নতুন গৃহটি গড়িয়া উঠিল। চলিশ হাত করিয়া ছুইখানা টিনের ঘর পাকা পোঁতা, পাকা দেওয়াল, কার্ঠের ছাদ, সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। আর পনেরটা দিন পরে একটা ভাল দিন দেখিয়া প্রথম ইঙ্কুল বসিবে স্থির হইয়াছে।

সেদিন ইঙ্কুলের শেষে সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, উমেশ পণ্ডিতও ষাতাপত্র বগলে পুরিয়া যাইবার উত্তোগ করিতেছেন। এমন সময় কার্তিক ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, পণ্ডিতমশাই? উমেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কি রে কার্তিক, তুই এখনও বাড়ী যাঙ্গনি যে।

কার্তিক তাহার কথার জবাব না দিয়া বলিল—নতুন ইঙ্কুল তো সত্যি করেই তা হলে হ'ল পণ্ডিতমশাই।

উমেশ পণ্ডিত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—হ'লই তো রে কার্তিক, কি আর করবো বল, আমার কি সাধ্য যে বাধা দিই? আমার কি হুঃখু জানিস, আমার এত দিনের সাধের ইঙ্কুলটা উঠে যাবে।

কার্তিক বলিল—“এটাই যদি উঠে যাবে তা হলে আর, আর একটা হবে কেন? এটার কি দোষ হ'ল?”

—তবেই বোঝ কার্তিক।

কার্তিক মুখে মহাহুশ্চিন্তার ভাব টানিয়া অন্ধনিয়া বলিল—বাবা বলেছে পণ্ডিতমশাই, আমাকেও নাকি নতুন ইঙ্কুলে পড়তে হবে? আমি “না” বলেছিলাম। কিন্তু বাবা যে একরোখা মানুষ, বললে ইঙ্কুলে না গেলে পিঠের চামড়া তুলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কি হবে পণ্ডিতমশাই? উমেশ কার্তিকের কথার কোন জবাব না দিয়া চূপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ কার্তিক পুনরায় বলিয়া উঠিল—একটা কষ্ট বলবো পণ্ডিতমশাই?

উমেশ বলিলেন—কি কথা রে।

—কাউকে যেন বলবেন না। আচ্ছা, রাজ্জে লুকিয়ে ওদের ঐ ইঙ্কুল ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে হয় না?

শুনিবামাত্র উমেশ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—ইস, তুই বলিস্ কি কার্তিক, ও কথা কি মুখে আনতে আছে রে। আর কখনও বলিস্ নে যেন। কার্তিক ক্ষুব্ধ মনে বলিল—তা ছাড়া যে আর পথ নাই পণ্ডিতমশাই।

উমেশ বলিলেন—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে কার্তিক আর ভেবে কি হবে বল। চল বাড়ী যাই।

৪

চণ্ডীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ জন মেধার লইয়া একটি কমিটি ছিল, বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন ইহার সেক্রেটারী। কিন্তু সকলেই ঐ নামে মাত্রই, কেহ কোন দিন ইকুলের দিকে কিরিয়াও চাহিতেন না। উমেশ পণ্ডিতই দোরে দোরে ঘুরিয়া চাঁদা তুলিয়া ঘর তুলিয়াছেন, বেক, চেয়ার তৈরি করিয়াছেন। অথচ আজ ইকুলের মেধারেরা সভা করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, যে দিন নুতন ইকুল প্রথম বসিবে সেই দিন এখানকার চেয়ার বেকি সমেত সমস্ত ছেলে তাঁহার নুতন ইকুলে লইয়া যাইবেন। আজ ইকুলে গিয়া উমেশ পণ্ডিত মোটেই আর পড়াইতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। সারাটা দিন ধরিয়া কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহারই তৈরি এই সব চেয়ার বেকি লইয়া নুতন ইকুল বসিবে—আর এই কয়টা দিন পরে তাঁহার ইকুলটি যাইবে ডাঙিয়া। ইকুলের ছুটির পর সারাটা বিকাল বেলা তিনি নিজের ঘরে বসিয়া চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ক্রোধে ও উত্তেজনা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ গ্রামে আর তিনি থাকিবেন না। কিন্তু যাইবার পূর্বে এমনি করিয়া নিজের ইকুলটি তিনি কখনও পরের হাতে তুলিয়া দিয়া যাইতে পারিবেন না। ভাবিতে ভাবিতে প্রতিহিংসায় তাঁহার ছুই চোখ জলিয়া উঠিল। মাহুষ যেমনই চিন্তা করিয়া আত্মহত্যা করিতে যায় এমনই একটি চিন্তা তাঁহার মাথায় আসিল। সন্ধ্যার পরে গিয়া তিনি কার্তিকের বাড়ী হইতে কার্তিককে ডাকিয়া আনিয়া নিজের ঘরে বসাইয়া বলিলেন—তোমার কথাই ঠিক কার্তিক, ইকুল ঘরটি আজ রাত্রে পুড়াইয়া দিতে হইবে।

কার্তিক উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—আমি তো আগেই বলেছিলাম পণ্ডিতমশাই যে দিই ওদের ইকুল ঘর পুড়িয়ে ছাই করে—সব আপদ চুকে যাক—তা আপনিই তো রাজী হলেন না।

উমেশ বলিলেন—কিন্তু ওদের ইকুল নয় কার্তিক—আমাদের স্কুল ঘরে আগুন দিতে হবে।

কার্তিক ছুই চোখ বিফারিত করিয়া বলিল—আমাদের ইকুলে কি রকম? এ আপনি কি বলছেন পণ্ডিতমশাই?

—হাঁরে আমাদের ইকুলই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাই। জানিস্ কার্তিক, আমার এত সাধের ইকুল—ওরা এর সব চেয়ার বেকিগুলো নিয়ে নতুন ইকুল করবে। আমার জিনিষ আমি দেব না ওদের—দেব সব পুড়িয়ে।

কার্তিক ভাবিয়া বলিল—কিন্তু আগুনই যখন দিতে হবে তখন ওদের ইকুলেই দিই না কেন পণ্ডিতমশাই?

—না রে ওরা কত কষ্ট করে—কত আশা করে করেছে তা হলে যে ছুখ পাবে।

কার্তিক বলিল—আমাদের ইকুল পুড়লে আমরাও তো ছুখ পাব পণ্ডিতমশাই?

কিন্তু তোর ছুখ কিসের রে কার্তিক?

কার্তিক বলিল—আমিও বুঝ ছুখ পাব পণ্ডিতমশাই। না হয় আমি ভাল ছেলে নাই হলাম, কিন্তু আজ এই দশটা বছর ধরে যে ইকুলে পড়ছি তার উপরে একটা মায়া পড়ে যায় না?

উমেশ পণ্ডিত কার্তিকের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—তুই তা হলে আমার ছুখ সত্যি করেই বুঝিস্ কার্তিক। কিন্তু ওরা যদি আমাদের ইকুল ভেঙে নতুন ইকুলে নিয়ে যায়—সে তো আরও ছুখের কথা হবে রে। তার চেয়ে চল আমাদের জিনিষ আমরা পুড়িয়েই দিই। আমি বুড়ো মাহুষ—রাত্রে ভাল করে চোখে দেখি না—তুই চালে উঠে আগুনটা দিয়ে দিবি।

কার্তিক রাজী হইয়া বলিল—কিন্তু আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রাস্তার তেমাধায় ঐ আমগাছটার ঝোপের ওখানে দাঁড়াতে হবে—ঐ গাছটায় সেবার রসিক মাঝি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—আমার বড় ভয় করে।

খানিকটা রাত্রি হইলে উমেশ পণ্ডিত আর কার্তিক এক বোতল কেরোসিন আর দেয়াশলাই লইয়া সেই আমগাছের ঝোপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। খড়ের চালায় কেরোসিন ঢালিয়া দেয়াশলাই জালিয়া কার্তিক এক দৌড়ে উমেশ পণ্ডিতের নিকটে আসিয়া বলিল—দিয়ে এলাম পণ্ডিতমশাই। সঙ্গে সঙ্গে ছু ছু করিয়া আগুন একেবারে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া গজিয়া উঠিল। সারা পথ ঘাট উঠিল আলোকিত হইয়া—ঘরের বাঁশের গিটগুলো কাটয়া বনুকের মত শব্দ হইতে লাগিল। সেই আগুনের দিকে চাহিয়া কার্তিক এক মুহুর্তে একেবারে ভড়কিয়া গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—ঘর যে একেবারে পুড়ে গেল পণ্ডিতমশাই। পণ্ডিতমশাইয়েরও তখন ছুই চোখের জলে বুক ডাসিয়া যাইতেছে। সেদিক হইতে কোন সাড়াই কার্তিক পাইল না। আর এক বার ছুই হাত দিয়া পণ্ডিতমশাইকে নাড়া দিয়া কার্তিক বলিল—শুনছেন পণ্ডিতমশাই। কিন্তু উমেশ তেমনি অসাড়ের মত সেই আগুনের দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগত্যা কার্তিক ছুটয়া গেল ইকুল ঘরের দিকে। ইতিমধ্যে গ্রাম হইতে হৈ চৈ করিয়া লোকজন এই দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কার্তিক লাথি মারিয়া ঘরের তালা ভাঙিয়া চেয়ার বেকি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। ঘরখানা আর রক্ষা করা গেল না। সময়মত লোকজন আসিয়া পড়ায় চেয়ার বেকিগুলো সমস্তই বাহির করা হইল।

ঘরের চালগুলো তখনও খসিয়া পড়িয়া পুড়িয়া চলিয়াছে

কিন্তু আর কিছু করিবার নাই—লোকজন চারি পাশে শুধু জটলা করিতেছে। হঠাৎ অক্ষয়ের নজর পড়িল কার্তিকের দিকে।

—এ কি রে কার্তিক, তোর সারা গায়ে কেরোসিন কেন রে? ই দিকে আয় দেখি। শুনিবামাত্র সমস্ত জনতা কার্তিককে ঘিরিয়া ধরিল—কার্তিক ভয়ে থবু থবু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই-একটা কিলচড় পড়িতেই কার্তিক একেবারে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। জনতা তখন ছুটিয়া গেল সেই ঝোপের কাছে—উমেশ পণ্ডিত তখনও তেমনি ভাবেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার দেহ যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে—এমনি মনে হইতেছিল।

সেখান হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনা হইল। জনতার ভিতর হইতে গালাগালি টটকারী যে বাহা পারিল দিল—শুধু বুদ্ধ বলিয়া আর এ গ্রামের সকলেই তাঁহার নিকটে এক সময়ে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া কেহ গায়ে হাত তুলিল না।

শেষ রাত্রির দিকে উমেশ পণ্ডিত বিধবা মেয়েটির হাত ধরিয়া চণ্ডীতলা ছাড়িয়া চলিলেন। জনহুই মুন্ডের মাথায় দিয়া কয়েকট মাত্র নিতান্ত দরকারী জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়াছেন। মাইল দুই দূরে রেলস্টেশন—সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া কালী চলিয়া যাইবেন—এ জীবনে আর কখনও এ গ্রামে ফিরিবেন না।

শুভক্ষণ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

বন্ধুত করি হৃদয়-তন্ত্রী
সঙ্গীত বাজে মরমে,
চিনি নাই আমি, চিনি নাই তারে
সচকিত ভয়ে সরমে।
চুপে চুপে চুপে পবনে
এসেছিল মম স্বপনে,
অলিখিত পদে অলিখিত গীতি
অবসিত মম ভরমে;
চিনি নাই আমি, চিনি নাই তারে
সচকিত ভয়ে সরমে।

এসেছিল অতি মস্তুর পদে
লাজ-নতা-বধু-রাগিণী,
অলস বিলাসে নিমীলিত আঁখি
উলসিত হয়ে জাগেনি
শুভ যৌবন-লগনে
বিধারি সে সুর গগনে
শিহরি শিহরি সুদূরে মিলায়
লীলায়িত যেন নাগিনী।
আবেশে বিবশ নিমীলিত আঁখি
উলসি উলসি জাগে নি।

ফাগুন বাতাসে সুবাসে সুবাসে
ভরিয়াছে বন-বীথিকা,
আকাশে রঙের নব নব লীলা,
অরণ্যের এ কি স্বীতি গা!
বনে উপবনে কত কি
ফুটিয়াছে ফুল কেতকী,
চামেলী চম্পা, রজনী গন্ধা,
—কোথা মম কোথা গীতিকা?
সুরে সুরে সুরে সুরভিত মন,
সুরভিত বন-বীথিকা।

আধ ঘুমঘোরে, আধ জেগে আছি,
শ্রান্ত শরীর শয়নে,
ফাগুনের স্মৃতি বহে বন-বীথি
চুলু চুলু মম নয়নে।
হৃদি মম চাহে জাগিতে
রক্তিম রঙে রাঙিতে
বেলা বয়ে যায় জানিতে জানিতে
বুধা আজি ফুল-চয়নে
এসেছিল গীতি আজি তার স্মৃতি
লেগে আছে শুধু নয়নে।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম : বামনাবতার

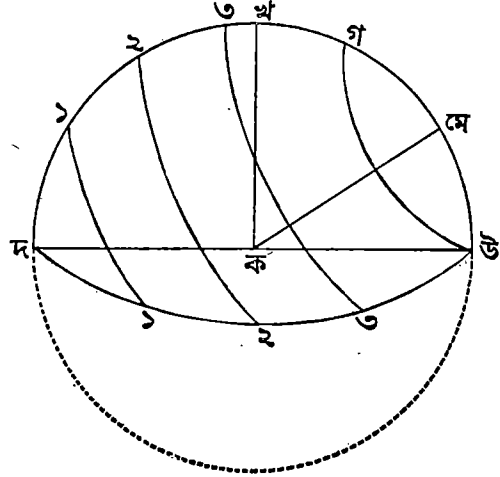
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, তিন পদক্ষেপ, তাইার প্রধান কীর্তি, ঋগ্বেদে বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা ত্রিবিক্রম শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। (১) সূর্যের উদয়-স্থানে, মধ্যগগন স্থানে, অন্ত-গগনস্থানে; (২) পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, স্বর্গে, এই তিন স্থানে তিন পদক্ষেপ। কিন্তু এই দুই অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান নক্ষত্রকেও ত্রিবিক্রম বলিতে হয়, কারণ ইহাদেরও তিন স্থান আছে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ বিক্রম শব্দের অর্থ পদ-ক্ষেপ, পদ নহে। তিন স্থান পাইলে দুই পদ-ক্ষেপ হইতে পারে, তিন হইতে পারে না। ঋগ্বেদের বহু বহু কাল পরে ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, তখন ঋগ্বেদের মন্ত্রের তাৎপর্য দ্রবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বহুপূর্বে যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দ) ত্রিবিক্রম উপাখ্যানের বিষয় হইয়াছিল। এখানে সহজ অর্থ করা যাইতেছে।

সূর্য বিষ্ণুর স্বরূপ। ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলিতেন, “সূর্যের ত্রিবিধ রশ্মিদ্বারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, উৎপন্ন হয়।” (৫।৪।৭।৪)। “তিনি স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ ‘অশ্বা’ (প্রস্তর খণ্ড) স্বর্গলোক পরিক্রমণ করেন।” (৬।৪।৭।৩)। কিন্তু সূর্যের দৈনিক পরিক্রমণদ্বারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-ভেদ হয় না। সূর্য ঋতুবিধান করেন, কিন্তু একদিনে করেন না, এক সপ্তাহসরে করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অন্তগত হয়, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের বিশেষ গতি আছে। এক রাত্রির মধ্যেই চন্দ্রকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে, তারার পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে দেখি। সেইরূপ, সূর্যেরও পূর্বদিকে গতি আছে। এই গতি ব্যতীত তাইার উত্তর দক্ষিণে গতি আছে। ঋষিগণ এই দুই গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সূর্যের যে শক্তি দ্বারা এই দুই গতি হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিয়ু সূর্য সে শক্তির আধার। যেমন, এক রামচন্দ্র কতু দগরথ-নন্দন, কতু সীতাপতি, কতু রাবণারি, কতু অযোধ্যাপতি, সূর্যও তেমন গুণ ও কর্ম ভেদে নানা নাম পাইয়াছিলেন। সূর্য কতু সবিতা, কতু মিত্র, কতু বরুণ, কতু ইন্দ্র ইত্যাদি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। সবিতা শীত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্মের, বরুণ বর্ষার, ইন্দ্র বৃষ্টির কর্তা।

সূর্যের স্বগতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। দেখা যায়, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য (পঞ্জাবে) কখনও মাথার নিকটে আসেন, কখনও বহুদূরে থাকেন। ১০।১৫ দিন অন্তর, দূরস্থ

দিক্চক্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতে থাকিলে তাইাকে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন



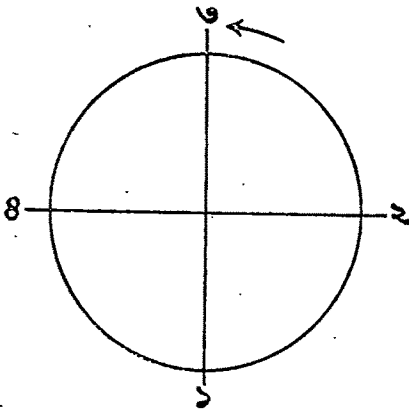
চিত্র ১। ক-লাহোর, খ-স্বস্তিক, মে-মেরু উ-উত্তর, দ-দক্ষিণ, উমেখদ-বামোত্তর বৃত্ত উ ৩২১ দ-পূর্বদিক চক্র। এই চক্রে ১-৩ দক্ষিণ-উত্তর কাঠা, ২-পূর্ববিন্দু।

করিতে দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে গমনের সীমা আছে, যেন সেখানে দুই কীলক প্রোথিত আছে, সূর্য অতিক্রম করিতে পারেন না। দোলায় শিশু যেমন দোল খায়, সূর্যেরও সেইরূপ দোলন দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কাঠায় (সীমায়) সূর্যকে দিন কয়েক নিশ্চল বোধ হয়। সূর্য গতির দিক পরিবর্তন করেন। সূর্য উত্তর কাঠায় আসিলে, ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, তখন বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র সূর্যের রথ-চক্র হরণ করিয়াছিলেন (১।১৭৫।৪ ; ৪.৩০।৪) এবং বরুণ সূর্যকে হিরণ্যয় দোলা করিয়াছিলেন (৭।৮৭.৫)। বৃষ্টি ব্যতীত কৃষিকর্ম হয় না। বর্তমান কালে যেমন ঋগ্বেদের কালেও তেমন, পঞ্জাব-নিবাসী আর্যেরা বৃষ্টির অভাব ভোগ করিতেন। তাইারা ইন্দ্রদেবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। বিষ্ণু দক্ষিণা-য়নাদিতে আসিলে বৃষ্টি হইত, না আসিলে হইত না। এই কারণে বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, বিষ্ণু উত্তর কাঠায় আসিলে বর্ষা আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দক্ষিণ কাঠায় আসিলে হিম (শীত) ঋতুর আরম্ভ হয়। সবিতার অধিকার আরম্ভ হয়। সবিতা জলশোষক (১।২২।৫)। সূর্যের দক্ষিণ কাঠা হইতে উত্তর কাঠায় যাইতে ১৮০

দিন লাগে, উত্তর কাষ্ঠা হইতে দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতেও ১৮০ দিন লাগে, বৎসরে ৩৬০ দিন। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠার মধ্যস্থলে পূর্ববিন্দু। এক ঋষি বলিতেছেন (৭।১২।২), “হে বিষ্ণু! তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করিয়া আছ।” ‘পূর্বদিক’ বিশেষ করিয়া পূর্ববিন্দু বুঝাইতেছে। পূর্ববিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতে আসিতে $২০ + ২০ + ২০ + ২০ = ৮০$ দিন লাগে। (চিত্র ১)।

অতএব বিষ্ণুর তিনটি পদ (স্থান) দিক্চক্রে প্রত্যক্ষ হয়। ঋ, ১।১৫।৬ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নাম্যভিঃ চক্রে ন বৃত্তং ব্যাতী-
বীবিপং।



চিত্র ২। বর্ষচক্র। ১২৩৪-চারি পদ।

[ব্যতীন বিবিধান স্বভাবান্ অবীবিপং কম্পয়তি ভ্রময়তি—সায়ণ] বিষ্ণু গতি-বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাব-বিশিষ্ট চারি নামের নবতিকে (নবই দিবসকে) চক্রের আয় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন, অর্থাৎ চারি নবই দিবসে বিভক্ত বর্ষচক্রকে ভ্রমণ করাইয়াছেন (চিত্র ২)। ঋষিগণ বৎসরকে চক্রের সহিত তুলনা করিতেন, সে চক্রে ৩৬০ অর. [অকারান্ত] আছে। চারি নামে অর্থাৎ চারি ঋতু নামে সীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত নামে বৎসর বিভক্ত করিতে পারা যায়। (সায়ণ $৪ + ২০ = ২৪$ কাল-অবয়ব গণিয়াছেন। সে গণনার প্রমাণ দেন নাই।)

আকাশে বিষ্ণুর সে চারি পদ (স্থান) কোথায়? দিবা-ভাগে নভোমণ্ডলে সূর্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিকালে অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন দেখায়। সূর্য ও নক্ষত্র একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, কিন্তু উভার পূর্বে কিংবা সন্ধ্যার পরে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত স্থানে অথবা সন্ধ্যাকটে যে যে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়, তদ্বারা সূর্যের পথ চিহ্নিত করিতে পারা যায়। নিরীক্ষণ করিবার অভ্যাশ হইলে বলিতে পারা যায়, কোন দিন সূর্য কোন নক্ষত্রের নিকট ছিল। এইরূপে ঋষিগণ

সূর্যের পথ চিনিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রদ্বারা চারি বিষ্ণু-পদ যুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরবাসী ও বেবিলন-বাসী এই ক্রমেই বৎসরের দিন সংখ্যা ও ঋতু নিরূপণ করিত। ঋষিগণও এইরূপে বৎসরে ৩৬০ দিন ও চারি বিষ্ণুপদ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যেদিন সূর্য উত্তর কাষ্ঠায়, সেদিন সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে তৎসন্ধ্যাকটে কোন নক্ষত্রের উদয় হইল, যেদিন মধ্য বিন্দুতে এবং যেদিন দক্ষিণ কাষ্ঠায়, সে সে দিন কোন কোন নক্ষত্রের উদয় হইল, তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারা যায়। যে রাত্রে মধ্য কাষ্ঠার নক্ষত্র মধ্য আকাশে সে রাত্রে উত্তর কাষ্ঠার নক্ষত্র পূর্ব দিক্-চক্রের নিকটে এবং দক্ষিণ কাষ্ঠার নক্ষত্র পশ্চিম দিক্চক্রের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনটি পদে দুই বার পদক্ষেপ হয়, তিন বার হয় না, চারি পদ না পাইলে তিন পদক্ষেপ হইতে পারে না। ঋগ্বেদ বলিতেছেন (১।১৫।৫), “মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ কীর্তন করে, তাহার তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করিতে পারে না।” (টিক কথা—কারণ চারিটি পদ একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, চতুর্থ পদ বিপণীত আকাশে থাকে।) সেখানে বিষ্ণু শিপিবিষ্ট। ঋগ্বেদে (৭।১০০) সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন, (রমেশ দত্তের অনুবাদ),

৫। “হে শিপিবিষ্ট! অজ্ঞ আমবা স্ততির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করিব। তুমি প্রবুদ্ধ, আমি অবুদ্ধ হইলেও তোমার স্ততি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।”

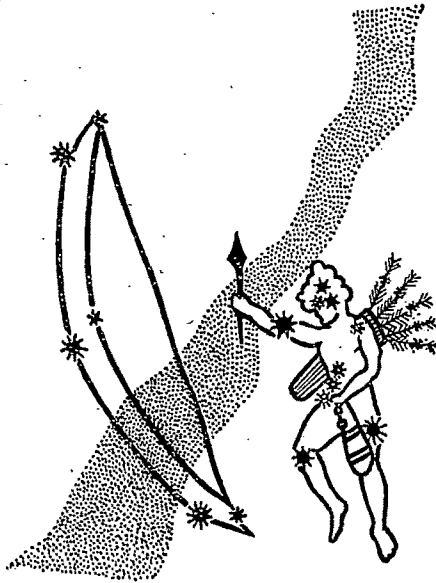
৬। “হে বিষ্ণু! আমি শিপিবিষ্ট এই যে নাম বলিতেছি ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে অগ্ন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুকায়িত করিও না।”

শিপিবিষ্ট নামটি কুৎসিতার্থ। প্রাণঃসনীয়, স্ততিযোগ্য বিষ্ণুর প্রতি সে অর্থ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া স্বাক্ষ ও পরবর্তী ভাষ্যকারেরা শিপিবিষ্ট নামের অর্থান্তর করিয়াছেন। এখানে সে সব তর্ক না তুলিয়া বলা যাইতে পারে, বিষ্ণু অদৃশ্য বা লুকায়িত থাকেন, তিনি রজোলোকের পারে অর্থাৎ এই অন্তরীক্ষের সে পারে থাকেন।*

* মহামতি টিলক তাঁহার *Arctic Home in the Vedas* পুস্তকে শিপিবিষ্ট নামের আলোচনা করিয়াছেন। মেরু নিকটস্থ দেশে সূর্যের উদয় করেক মাস হয় না। তিনি মনে করিয়াছিলেন শিপিবিষ্ট সে সময়ের সূর্য। আমি উপরে যে অর্থ করিয়াছি, সে অর্থ তাঁহার মনে হয় নাই। তাঁহার পুস্তক প্রকাশের পরে আমি তাঁহার যুক্তি-জালে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কল্পনা সত্য মনে করিয়া-ছিলাম। পরে দেখিয়াছি তিনি যে সব প্রমাণে নির্ভর করিয়া-ছিলেন, সে সবের অজ্ঞ সহজ ব্যাখ্যা হইতে পারে। তথাপি তাঁহার পুস্তক অগাধ পাণ্ডিত্যের জগৎ চির আদরণীয় হইয়া থাকিবে।

অতএব বিষ্ণুর চারিটি পদ পাইতেছি। তিনি পদ-বিক্ষেপ দ্বারা বিশ্বভুবন পালন করিতেছেন। যেখান হইতে আরম্ভ করি, তিন প্রকার পদক্ষেপ দ্বারা রবিপথ আক্রান্ত হয়। (চিত্র ৭ পৃষ্ঠ)। ঋগ্বেদ (১।২২।১৭) বলিতেছেন, “বিষ্ণু ‘ত্রিধা’ তিন প্রকারে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।”

বিষ্ণুচক্রের চারি পদ বলিতেছি, সে সে পদ কোথায়? ঋগ্বেদ বলিতেছেন (৫।৩।৩), “হে রুদ্র! তোমার জগৎ অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর অগম্য পদ স্থাপিত হইয়াছে।” এখানে তোমার ‘জগৎ’ না বলিয়া তোমার স্থানে কিম্বা তোমাতে বলিলে অর্থ আরও স্পষ্ট হয়।



চিত্র ৩। রুদ্র।

কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা (চিত্র ৩ রুদ্রের পূর্বদিকে তাইর পিনাক)। [যাবতীয় চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্বদিক। অর্থাৎ দক্ষিণ মুখ হইয়া দেখিতে হইবে।] কালপুরুষ যুগ নক্ষত্র, ঋগ্বেদে এই নক্ষত্রকে ভীম যুগ বলা হইয়াছে। যুগ আরণ্য পশু। ভীম যুগ ভয়ানক আরণ্য পশু, যেমন সিংহ, বশবরাহ, বশুমহিষ। বিষ্ণুর এক পদ যুগ নক্ষত্রে তাহা ঋগ্বেদের (১।১৫৪।২) মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। যথা—

প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্ষণে যুগো ন ভীমঃ কুচরে গিরিষ্ঠাঃ।
যন্তোক্ষমু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিৎংতি ভুবনানি বিশ্বা ॥

সেই বিষ্ণু স্তবত হইয়েন, যিনি বীর্ষণদ্বারা ভীম যুগ, যিনি কুচর ও যিনি গিরিষ্ঠ, ঋগ্বেদের বিস্তীর্ণ তিন পাদক্ষেপে ত্রিভুবন অবস্থিতি করে।

সায়ণ ভাষ্যে ভীম যুগ, কুচর, গিরিষ্ঠ, এই তিন বিশেষণের নানাবিধ অর্থ লিখিত হইয়াছে। রমেশ দত্ত

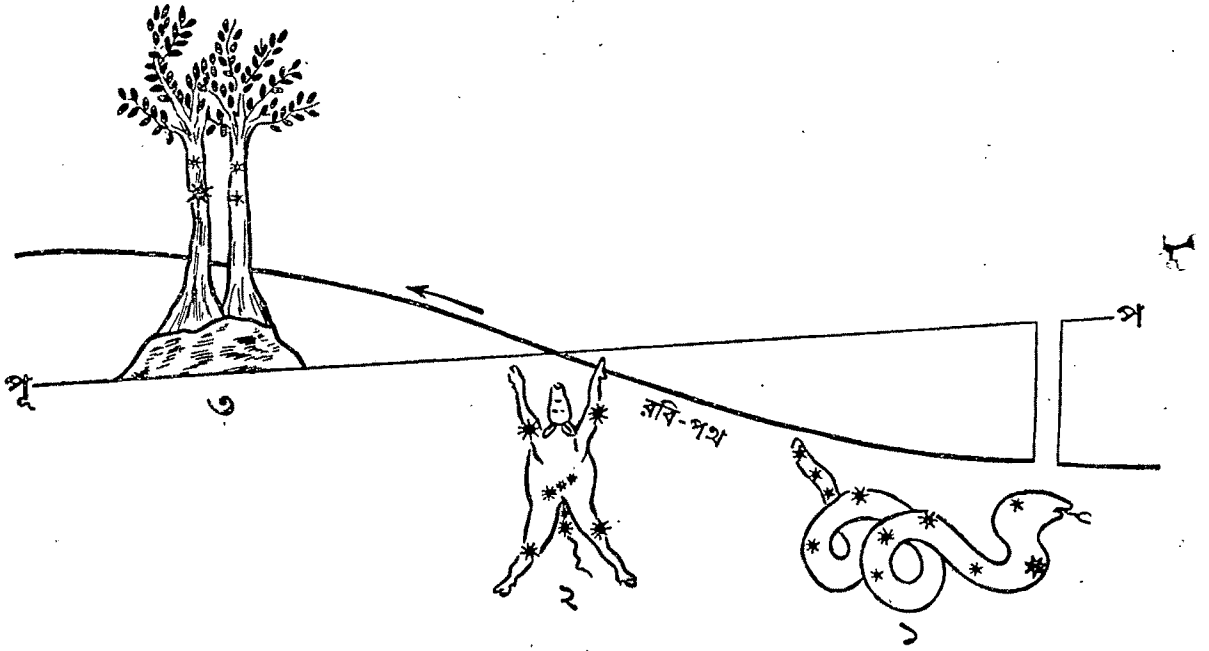
মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, “যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদ-ক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর দ্বায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।”

সায়ণ ভাষ্যদ্বারা কিংবা এই অনুবাদ দ্বারা বিষয়-জ্ঞান হইতেছে না। তিনি কতু ভীমযুগ, কতু কুচর, কতু গিরিষ্ঠ তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিষ্ণুর তিনটি পদ বুঝাইতেছে। এক পদ ভীম যুগে অর্থাৎ যুগ নক্ষত্রে, এক পদ কুচরে অর্থাৎ নিম্নস্থানে (দক্ষিণ কাষ্ঠায়), আর এক পদ গিরিতুল্য উন্নত স্থানে (উত্তর কাষ্ঠায়)। তিন বিশেষণ পৃথক না বুঝিলে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বুঝিতে পারা যায় না।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সূর্যের বায়িক গতি। বর্ষচক্রে চারিটি বিশেষস্থান আছে। সে চারিটি বিষ্ণুপদ। দুই অয়নাদি, দুই বিষুবপাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিকচক্রের সমুখস্থ উত্তরায়নাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিণোত্তর রেখায় বাসন্তবিষুব স্থান, তৃতীয় পদ পূর্ব দিকচক্রের সমুখস্থ দক্ষিণায়নাদি স্থান, এবং চতুর্থপদ পৃথিবীর নিম্নের আকাশে শারদ বিষুব স্থান। অবশ্য চারিপদ একদা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। পঞ্জাবে রবিপথ মাথার দক্ষিণে থাকে। সেখানে বিষ্ণুকে বামাবর্তে পাদক্ষেপ করিতে দেখা যায়।

ঋগ্বেদে কোন কালের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজে বলিতে পারা যায়। কারণ সেকালে যুগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অথচ দুই পদ থাকিতে পারিত না ইহা গণিতদ্বারা জানিতেছি। আনুযায়িক প্রমাণও পাইতেছি। তদবধি যুগ নক্ষত্রের মস্তকস্থিত কিম্বা কটিস্থিত তারা হইতে বাসন্ত বিষুবপাত প্রায় ৮৩° অংশ (ডিগ্রি) পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে। এক অংশ সরিতে ৭২।৭৩ বৎসর লাগে। পূর্বকালে ৭৩ বৎসর লাগিত। অতএব ৮৩ × ৭৩ = ৬০৫৯ বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ ৬০৫৯ - ১৯৪৫ = ৪১১৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। স্থূলতঃ বলিতে পারা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল।

তৎকালে কোন নক্ষত্রে সূর্যের দক্ষিণায়ন, কোন নক্ষত্রেই বা উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহাও অক্লেশে বলিতে পারা যায়। কারণ বাসন্তবিষুবপাত হইতে ৯০° পূর্ব দিকে আসিলে দক্ষিণায়নাদি ও ৯০° পশ্চিম দিকে আসিলে উত্তরায়ণাদি অবস্থিত। এইরূপে জানা যায়, ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন এবং ভদ্রপদা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। এই দুই নক্ষত্রের মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠা মূল নক্ষত্রে শারদ বিষুব ঘটত। পাঁজি দেখিলেও যুগশিরা হইতে সপ্তম নক্ষত্রে পূর্বদিকে ফল্গুনী, পশ্চিম দিকে ভদ্রপদা এবং চতুর্দশ নক্ষত্রে মূল জানা যায়। আশ্বিন মাসের



চিত্র ৪। ১-অহিবুধ (কুচর), ২-বহুবরাহ (ভীম যুগ),
৩-অজুর্নবক্ষ (গিরিষ্ঠ)।

মারামারি ভোর ৫টার সময় এবং ফাল্গুন মাসের মারামারি সন্ধ্যা ৭টার সময় আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য রেখায় যুগনক্ষত্র দেখা যায়। পূর্বদিকচক্রের নিকটে যমল অজুর্ন বৃক্ষের আকারে ফল্গুনী দেখা যায়। এইরূপ চৈত্রে মাসের মারামারি ভোর ৫টার সময় এবং ভাদ্র মাসের মারামারি সন্ধ্যা ৭টায় মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেখা যায়। (বৃশ্চিক কঁকড়া বিছা, বৃশ্চিকের পুচ্ছ মূলা নক্ষত্র)।

ঋগ্বেদের কালে চন্দ্রের সাতাইশ বা আঠাইশ নক্ষত্র নিরূপিত হয় নাই। তাহাদের নামও ছিল না। যে যে নক্ষত্রের প্রয়োজন হইত, যদ্বারা চারি বিষ্ণুপদ জানিতে পারা যাইত, কেবল তাহাদের নাম পাওয়া যায়। কদাচিৎ তাহাদের নিকটস্থ নক্ষত্রেরও নাম পাওয়া যায়। আমরা যে যে নাম জানি, যে যে নক্ষত্র চিনি, ঋগ্বেদের কালে সে সে নাম ছিল না, নক্ষত্রের আকার-কল্পনাতেও প্রভেদ ছিল। এইসব নক্ষত্র দীপ্তিমান। এই হেতু ইহাদিগকে দেবতা বলা হইত। (দিব্-ধাতু দীপ্তি)। আমরা যাহাকে যুগ নক্ষত্র বলিতেছি তাহাঁর নাম দক্ষ ছিল। ফল্গুনীর নাম অজুর্ন ছিল, কিন্তু ইহার আকার জানি না। গিরিষ্ঠ শব্দে যাহা গিরিতে জন্মে, এমন খেত বৃক্ষ মনে হয়। অজুর্ন বৃক্ষের বকল শাদা, ইহার শাখা তেমন হয় না। ফল্গুনীকে যমল অজুর্ন বৃক্ষ মনে করা চলে। মূলা নাম নিরুজ্জ্বল

ছিল। ইহা এক অম্বর। ঋগ্বেদে এই অম্বর নমুচি নামে, ও বল নামে নিহত হইয়াছিল। ইন্দ্র বধ করিয়া ছিলেন। তাহাদের পুরী ছায়াপথে সমুদ্রে। পুরাণে নিরুজ্জ্বল রাক্ষস, রাক্ষসেরা নদী কিংবা সমুদ্রের নিকটে বাস করিত। রাবণ বিখ্যাত রাক্ষস। ইহার পুরী সমুদ্রে বেষ্টিত। বসন্তঃ নিরুজ্জ্বল দশ-মুণ্ড রাবণ। বলিদৈত্যও সেই। (পরে বলিতেছি) নিরুজ্জ্বল শব্দ হইতে নৈরুজ্জ্বল কোণ নাম হইয়াছে।

ভদ্রপদা নক্ষত্র এই নামও ছিল না। বর্তমান জ্যোতিষে 'যে যে তারায় ভদ্রপদা কল্পিত হইয়াছে, সে সে তারাতেও ঋগ্বেদের কালের ভদ্রপদা গণিত হয় নাই। ইহার নাম অহিবুধ ছিল। বুধগ্রহ গভীর গর্তের অহি সর্প (চিত্র ৪)। দেখা যাইতেছে কুচর বিশেষণ সার্থক। নিম্নস্থান গর্তে চরে যে। অহিবুধের অহি, আর বুধ অহির কোন সম্বন্ধ নাই।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের এই অর্থ স্থিতি ও পুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বিষ্ণুর দোল-যাত্রা জানি। ইহা ফল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুমূর্তিকে দক্ষিণ মুখে রাখিয়া দোলায় স্থাপন করিয়া ক্রমেকবার দোলাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেদিন রবি দোলায় আরোহণ, দক্ষিণায়ন গতে উত্তরায়ণ আরম্ভ করিতেন। (এখন সেদিন করেন না, ৭ই পৌষ করেন। ইহাকে

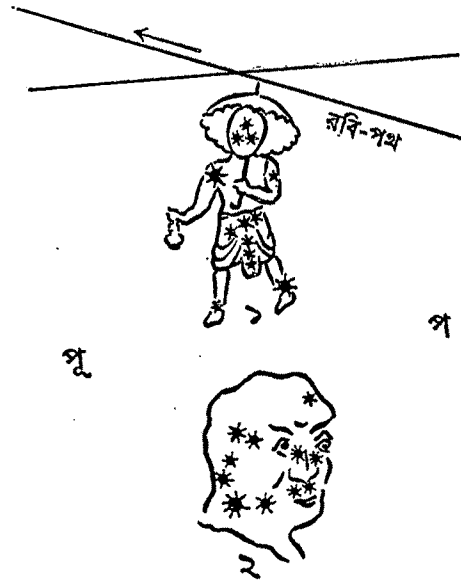


চিত্র ৫। ১-অহিবৃদ্ধ, ২-অজ একপাদ, ৩-অপাম্নপাং।

পৌষ শুক্ল সপ্তমী মনে করা যাইতে পারে।) সন্ধ্যাবেলা লোকে বহুংসব (চাঁচর) করে। কোথাও মনুষ্যমূর্তি, কোথাও মেন্টা (মেড়া) মূর্তি ভয়ীভূত হয়। লোকে বলে মেন্টাঙ্কর। প্রকৃত কথা মেন্টা নয় ছাগ। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রের বিপরীত দিকে সূর্য থাকে। চন্দ্র ফল্গুনীতে, অতএব সূর্য ভদ্রপদায় থাকে। ইহারই ছাগ মূর্তি দৃষ্ট হয়, রবি ভদ্রপদা অতিক্রম করিয়া উত্তরমুখী হয়।*

* ভদ্রপদায় ছাগ কোথা হইতে আসিল? আমরা ইহার নিকটস্থ এক ছাগ জানি, সেটি গ্রীক জ্যোতিষীর শৃঙ্গবান্ ছাগ, ইংরেজী নাম Capricorn. ইহার আকার অদ্ভুত। শৃঙ্গবান্ ছাগ কিন্তু বিপদ। পশ্চাতের দুইপদ মৎস্য-পুচ্ছ। ইহাই আমাদেব জ্যোতিষে মকর নাম পাইয়াছে। বরাহ লিখিয়াছেন, মকর যুগান্ত। বামন পুরাণ (অঃ ৫) লিখিয়াছেন, মকর যুগান্ত বৃহস্পতি গজ-নেত্র। কিন্তু মকরের চিত্রে ছাগের অবয়ব কিছুই নাই। যদি মকরকে ছাগই মনে করি, সে ছাগ অহিবৃদ্ধ হইতে পশ্চিমে দূরে অবস্থিত। ৬০০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উত্তরায়ণ হইতে পারিত না, অনেক পরবর্তী কালে (খ্রি-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) হইত। ঋগ্বেদে 'অজ-একপাদ' নামে এক দেবতা আছেন (চিত্র ৫)। অহিবৃদ্ধের সহিত একত্র জুত হইয়াছেন। পুরাণে একাদশ রুদ্রের দুই রুদ্র। অজ-একপাদ, এক-পদ-বিশিষ্ট ছাগ। এক এক নক্ষত্রের এক এক অধিপতি আছেন। পূর্ব ভদ্রপদার অধিপতি অজ-একপাদ, উত্তর ভদ্রপদার অধিপতি অহিবৃদ্ধ। ইহা হইতে মনে হয়, অহিবৃদ্ধের নিকটে পশ্চিমে অজ-একপাদ আছে। ইংরেজী তারা পটে অহিবৃদ্ধ Cetus, অর্থ তিমি। ইহার পশ্চিমে শতভিষা নক্ষত্র। ইহারই কয়েকটি তারা ইহা অজ-একপাদ কল্পিত হইয়া থাকিবে। শীতারাঙ্কে ভোর রাত্রে প্রথমে অজ-একপাদ পরে অহিবৃদ্ধ এবং ৫৬ মাস পরে বর্ষাকালে সন্ধ্যা রাত্রে উদিত হইত। বর্ষাকালে ইহাদের সহিত অপাম্নপাং (জলের পুত্র) দেখা যাইত। ইংরেজী তারা পটে ইহা Fomalhaut ভদ্রপদা নামের অর্থ, ভদ্র স্তম্ভের পদ যাহার, কিন্তু একটি ভদ্রপদ। পদহীন সর্প, অপরটি একপদ। এই অর্থ স্পষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ভদ্রপদা নাম না লিখিয়া ভদ্রপদা লিখিয়াছি। মেন্টাঙ্করের অন্তরে এত পুরাতন ইতিহাস ছিল, পূর্বে মনে হয় নাই।

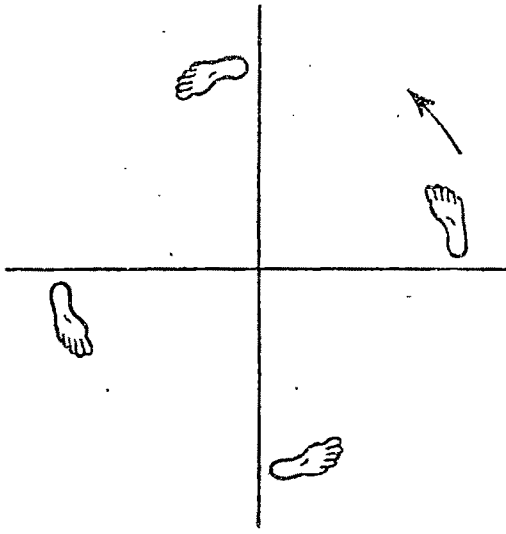
ঋগ্বেদের কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপ, ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইত। ভাদ্র পূর্ণিমায় পরিবর্তে পাজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০-২৫০০ অব্দের স্মৃতি এবং শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা পরবর্তী কালের স্মৃতি। ঋতু দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছাইয়া গেল। পরবর্তী কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল-যাত্রা ও বসন্তোৎসব মিশিষ্টা গিয়াছে।



চিত্র ৬। ১-বামন, ২-বলি।

পাজিতে চারিটি বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি লিখিত থাকে। জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস-প্রবেশের সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠা, ভদ্রপদা, যুগশিরা ও ফল্গুনী, এই চারিটি নক্ষত্রে বিষ্ণুপদ থাকিত। জ্যৈষ্ঠার পর মূলা নক্ষত্র, জ্যৈষ্ঠা ও মূলা মিলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস। এতদ্বারাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। এই বিষ্ণুপদচক্র বা বর্ষচক্রে বিষ্ণু-মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত হয়। তদ্বারা আমরা বিষ্ণু স্মরণ করি। ইহা বিষ্ণুর বিখ্যাত স্তূপদর্শন চক্র নহে। স্তূপদর্শন চক্র সূর্যবিশ্ব, যদ্বারা বিষ্ণু বর্ষচক্রে চালিত করিতেছেন।

বিষ্ণুর বামনাবতার সকলেই জানেন। একমা বলি নামক দৈত্য বিক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছিল। বলি এক যজ্ঞ করিতেছিল। বিষ্ণু বামনমূর্তি ধরিয়া বলির নিকটে ত্রিপাদভূমি ষাঞা করিয়াছিলেন। বলি



চিত্র ৭। বিষ্ণুপদচক্র।

দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, দ্বিতীয়পদে মর্ত্য ও তৃতীয়পদে পাতাল ব্যাপিগা বলিকে পদতলে বন্ধ করিলেন। ইহার অর্থ পাইয়াছি। বিষ্ণু রুদ্র স্থানে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে বামন মূর্তি ধরিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে শিশু বলা হইয়াছে। এই উপাখ্যানে বিষ্ণু রুদ্র স্থানীয় হইয়াছেন। তাঁহার পদের নিম্নে মূলা নক্ষত্র (চিত্র ৬)। এই নক্ষত্রই বলি। রবিপথের সর্বদক্ষিণ অংশে মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। রবিপথের বাহিরের দক্ষিণ ভাগের নাম পাতাল ছিল। পঞ্জাব হইতে দেখিলে মূল্যকে বহু দক্ষিণে দেখা যায়।

বামন পুরাণ (৯২।৪০) লিখিয়াছেন, বলি যেদিন ভূমি দান করে, সেদিন চন্দ্র জ্যেষ্ঠা-মূলা নক্ষত্রে ছিলেন, অর্থাৎ সেদিন জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা। অতএব সেদিন সূর্য মৃগ কিস্বা রোহিণীতে ছিলেন। ভাবে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষ্ণু দিন হইত।

বামন পুরাণ (৯২।৫৬) আরও লিখিয়াছেন, ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে এক মহোৎসব প্রবর্তিত আছে। এই উৎসব দীপ-দান নামে বিখ্যাত। বর্তমানে আমাদের পাঁজিতে ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে দীপদানপূর্বক কোন উৎসব লিখিত নাই। ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হইয়া থাকে। (এখনও বাঁকুড়া জেলায় হয়। ইহার নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তোলন) সেদিন

বামন দ্বাদশীও বটে। এক কালে এইদিনে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। ইহার তিন মাস তিন দিন পরে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শারদ বিষ্ণু দিন আসিত। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ ধ্বজ (ইন্দ্রধ্বজ) উত্তোলিত হইত। ভদ্রপদা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইত, ইহা পূর্বেও পাইয়াছি। এতদ্বারাও বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদের কালে ইন্দ্র অশুরের সহিত যুদ্ধ করিতেন, জয়ী হইতেন। বিষ্ণু চন্দ্র বৃহস্পতি প্রভৃতি অস্ত্র দেব সহায় হইতেন। কিন্তু যজুর্বেদের কাল হইতে দেব ও অশুর দুই পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেন, ইন্দ্রের প্রাধান্য হ্রাস হইয়াছিল। ঋগ্বেদের অন্তিম কালে কেহ কেহ ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেন। যেহেতু তাঁহারা পূর্বোল্লিখিত নক্ষত্রে বর্ষারম্ভ দেখিতে পাইতেন না। উপরে পাইয়াছি ফল্গুনীতে বর্ষারম্ভ হইত, যজুর্বেদের কালে মঘাতে হইত। এই হেতু উপাখ্যান রচনা দ্বারা ঋগ্বেদোক্তি বৃদ্ধিবার প্রয়াস হইত। রাজ্যের সীমা লইয়া যুদ্ধ, দেবগণ প্রায়ই পরাজিত হইতেন। এক পরাজয়ের পর বিষ্ণু বামনমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ছলনা পূর্বক অশুরগণের নিকট হইতে স্বতী রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র বল নামক এক অশুর জয় করিয়াছিলেন। বলার এক বিলে গর্তে থাকিত। এই বল পুরাণে বলি, বলের বিল পুরাণে পাতাল। ইন্দ্র বলকে বিনাশ করেন নাই, পরাজয় করিয়া ছিলেন। বলি ও বল একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

স্বস্তিক. [অকারান্ত] চিহ্নের উৎপত্তি কি? জৈনেরা এই চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। তাহাঁদের আরও অপর চিহ্ন ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে বহুবিধ রেখাচিত্রের প্রয়োগ আছে। সে সকল চিত্রের নাম যন্ত্র। যন্ত্রের গূঢ় অর্থ আছে। স্বস্তিক. চিহ্ন তান্ত্রিক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত কিনা, তাহা আগম-বাগীশেরা বলিতে পারেন। আমার বোধ হয় বিষ্ণুপদ-চক্রই স্বস্তিক (চিত্র ৭)। পঞ্জাবে রবিপথ দর্শকের মস্তকের দক্ষিণে থাকে, এ কারণে স্বস্তিক বামাবর্ত। দক্ষিণাপথ হইতে দেখিলে এই কালচক্র দক্ষিণাবর্ত হইত।*

* বাঁকুড়া কেন্দ্রীপ-নিবাসী বালক শ্রীধরগুরুমার উদ্ভাচাৰ্য এই প্রবন্ধের চিত্র লিখিয়া দিয়াছে।



সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

ডক্টর শ্রীশুশীলকুমার দে

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল শ্রমণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশের ভাগ্য-বিধাতা ছিলেন, তাঁহাদের সঠিক জীবন-বৃত্তান্ত ও গ্রন্থ-পরিচয় স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংযত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, যৎসামান্য মূল্যে প্রচার করিবার যে-সংকল্প অক্লান্তকৰ্ম্মী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন, তাহা সকল সাহিত্যাহুরাগী পাঠকের নিঃশেষ প্রশংসা ও সমর্থনের যোগ্য। ১৩৪৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত সাত বৎসর ধরিয়া সেই সংকল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া এখন ৫৩টি পুস্তিকায় প্রায় ৭০টি সাহিত্য-সাধকের কীর্তি-কাহিনী, শুধু ঐতিহাসিকের বা সাহিত্যিকের নয়, সাধারণ পাঠকেরও সুগম্য ও সুপাঠ্য করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিসার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না; বাংলা সাময়িক পত্রিকা ও বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁহার বহুতথ্যবহুল গ্রন্থগুলি এই সকল বিষয়ে প্রামাণিক রচনা বলিয়া যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই যুগের সাহিত্য-ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও সাবধানী গবেষক সত্যই বিরল। বর্তমান সংক্ষিপ্ত রচনাগুলিও তথ্যাবেষণের গৌরবে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠা খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং এই সংকল্পের ভার সৎপায়ে শূন্য করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সহস্রদয় বাঙালী পাঠকমাত্রেয়ই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বিভূত জীবন-কথা বা সাহিত্য-সমালোচনা এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য নয়। অধিকাংশ পুস্তিকা ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কয়েকটি ১০০ পৃষ্ঠা অতিক্রম করিয়াছে; ছোটগুলির মূল্য ছয় আনা মাত্র; বড়গুলির বার আনা। এই স্বল্প মূল্য ও সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে, উইলিয়ম কেরী হইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক খ্যাতনামা সাহিত্য-সাধকের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-সকল প্রয়োজনীয় সাময়িক উপাদান বিক্ষিপ্ত ও ছরধিগম্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহার উদ্ধার করিয়া নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিবরণ রচনা করাই এই গ্রন্থ-মালার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য রহং না হইলেও, ক্ষেত্র রহং; এবং প্রত্যেক পুস্তিকায় যে-পরিমাণ ছুপ্রাপ্য ও প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনাগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, গত শতাব্দীর

প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকজন লেখক সম্বন্ধে যে-কয়েকটি প্রচলিত জীবনীতে ও প্রবন্ধাদিতে কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ স্থলে তথ্য ও অত্যন্ত অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে ওতপ্রোত। বর্তমান গ্রন্থমালা আদম্বরবর্জিত, মিতভাষী ও কঠোর তথ্যনিষ্ঠার সহিত লিখিত।

একা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথই প্রায় সমস্ত পুস্তিকাগুলি লিখিয়াছেন। কেবল উইলিয়ম কেরী শ্রীযুক্ত সজ্জনীকান্ত দাসের, এবং রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের রচনা; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে সজ্জনীকান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই জন সহকারী ব্রজেন্দ্রনাথেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত। স্মরণ্য এ কথা বলিলে অত্যাতি হইবে না যে, এই গ্রন্থমালা ব্রজেন্দ্রনাথেরই অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাঁহার অগাধ সুপরিচিত গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান গ্রন্থমালার সংকল্প ও সিদ্ধি বহুকালের জ্ঞাত তাঁহার প্রধান কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তিনি একাই একটি জীবনে যাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার একনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সাধনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই গ্রন্থমালায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ও পরিচিত লেখকদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় নূতন করিয়া পাওয়া যাইবে। এই শতাব্দী বাংলা-সাহিত্যের একটি শ্রমণীয় যুগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষের ফলে বাঙালীর ভাব ও চিন্তার ধারায় যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার জের আজ পর্যন্তও শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ এই যুগের ধারাবাহিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এই যুগের প্রায় সকল সাহিত্য-সাধক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া এই ইতিহাস-রচনার খসড়া বা ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবং বহু অমূল্য ও অপরিহার্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজ সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন।

ভিতরের বস্তুর সহিত বাহিরের মূর্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া ছাপা ও বাঁধাই সুদৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু মনোহারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এরূপ গ্রন্থমালার কাঁচিতি খুব বেশি নয়; লাভবান হইবার জ্ঞাত ইহার প্রকাশ হয়ত দুরাশা মাত্র। তবুও যাহাতে লোকসান হইয়া ইহার প্রচার বন্ধ না হইয়া যায় তাহা শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নিকট আশা করা বোধ হয় নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

* সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজ্জনীকান্ত দাস ও যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত। ১ হইতে ৫৩ সংখ্যক পুস্তক চারি খণ্ডে বাঁধানো, মূল্য ২৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪৬-৫২।

আমেরিকার অগ্রগতি—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি নির্মাণে অভিনব পদ্ধতি

ক্রীলনীনীকুমার ভদ্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নযুখী অগ্রগতির বিবরণ বৎসারাধিক কাল যাবৎ নিয়মিত ভাবে আমরা প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিয়া মানুষ যে তাহার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাকে কতদূর সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ও আরামপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে এই সকল প্রবন্ধ হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। আর্থিক সমৃদ্ধিতে আমেরিকা আধুনিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—বিপুল তাহার ঐশ্বর্য, অফুরন্ত তাহার ধন-ভাণ্ডার। অবশ্য বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে নরমেধযজ্ঞে বহুল পরিমাণে এই অর্থের অপব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত দেড়শত বৎসর যাবৎ সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক জাতি-গঠনমূলক কার্যে অর্থের যথাযথ সদ্য-বহার করিয়া আমেরিকা আশ্চর্য বিধের জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বীয় আসন অভ্যেদী মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলোপ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এই দেড়শতাব্দিক বৎসরে ভারতবর্ষে তিলে তিলে দৈত্যদশায় উপনীত হইয়া ক্রমে অবনতির নিয়তম সোপানে আসিয়া দাঁড়াইল। আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করিলে এদেশের অবস্থা কেন এমনটি হইল একথা স্বতঃই মনে উদ্ভিত হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত *The Discovery of India* নামক পুস্তকে “The Economic Background of India” শীর্ষক অধ্যায়ে বিগত দেড়শত বৎসরের ভারতবর্ষ ও আমেরিকার অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিতজী বলিতেছেন—

“The independence of the United States of America is more or less contemporaneous with the loss of freedom by India. Surveying the past century and a half, an Indian looks somewhat wistfully and longingly at the vast progress made by the United States during this period and compares it with what has been done and what has not been done in his own country. It is true, no doubt that the Americans have many virtues and we have many failings, that America offered a virgin field and almost a clean slate to write upon while we were cluttered up with ancient memories and traditions. And yet perhaps it is not inconceivable that if Britain had not undertaken this great burden in India and, as she tells us, endeavoured for so long to teach us the difficult art of self-government, of which we had been so ignorant, India might not only have been freer and more prosperous but also far more advanced in science and art and all that makes life worth living.”—(P. 338).

উপরের কথাগুলির মোটামুটি তাৎপর্য এই যে, ইংরেজ

জাতি দয়া করিয়া আমাদের দুর্বল দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলে আমরা শুধু যে মুক্ত স্বাধীন উন্নত জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতাম তাহা নহে, শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম।

স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর হইতে আমেরিকা শুধু যে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা নয়, তাহার সাংস্কৃতিক প্রগতিও হইয়াছে যথেষ্ট। বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশবাসীর মানসিক উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যে কি ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার আংশিক পরিচয় প্রবাসীতে আমরা ‘আমেরিকায় বালকবালিকাদের সজ্জ-জীবন’, ‘আমেরিকার একটি মহিলা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান’ প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ছুনিয়ার সংস্কৃতির ভাণ্ডারে আমেরিকার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। আমেরিকা শুধু যে, রক্‌ফেলার, কার্ণেগী, বা হেনরি ফোর্ডের মত কোটিপতি এবং শিল্প-পতিদেরই জন্মদান করিয়াছে তাহা নয়, এডিসনের মত বৈজ্ঞানিক, মার্ক টোয়েনের (স্ট্রায়ল ক্লেমেল) মত হাস্যরসপ্রপী, ঋষানিয়েল হর্থন, এডগার এলেন পো, ও-হেনরি, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস, পার্স বাকের মত কথা সাহিত্যিক, জেমস রাসেল লাওয়েলের মত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক এবং এমার্সন, থরো ও সাঙারল্যান্ডের মত মনীষী এবং লংফেলো ও হুইট-ম্যানের মত কবিও সেদেশে জন্মিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহিত স্মরণীয় কালে যে আমেরিকার সংস্কৃতি-গত সূচক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল চমৎকৃত তাহার *Hindu America* নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে আমেরিকার দুইজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মনে ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একজন হেনরি ডি থরো, দ্বিতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুগ্ধ বিশ্বাসে যিনি বলিয়াছিলেন—

“It is unquestionably one of the noblest and most sacred scriptures which have come down to us. . . . I would say to the readers of scriptures, if they wish for a good book, read the Bhagvat-Geeta, . . . it deserves to be read with reverence even by yankees, as a part of the sacred writings of a devout people, . . . in comparison with the philosophers of the East we may say that modern Europe has yet given birth to none. Beside the vast and cosmogonical philosophy of the Bhagvat-Geeta, even our Shakespeare seems sometimes youthfully green and practical merely.”

এ কথার তাৎপর্য এই :—ভগবদ্গীতা যে জগতের অসুতম শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। থরো

মনে করেন, ইয়াক্সিদেরও শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তক-খানি অধ্যয়ন কর্য উচিত। প্রাচ্যের দার্শনিকদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে বর্তমান যুরোপে এমন একজনও জ্ঞান নাই। ভগবদগীতার উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের তুলনায়, এমনকি, শৈল্পীগীয়ারকে পর্যন্ত সময় সময় অত্যন্ত কাঁচা বলিয়া মনে হয়।

আর এক-জন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং জগতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর রাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রসমূহ* যিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্র (classical) সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার গভীর অহরাগ ছিল। এ বিষয়ে সাগরল্যাণ্ড তাঁহার *Eminent American's whom India should know* পুস্তকে (p. 47-48) বলিয়াছেন—

“Emerson was much interested in Indian literature ; I think if he were living today he would be deeply interested in India's struggle to free herself from bondage.”

ইহার তাৎপর্য এই :—

“সাগরল্যাণ্ড সাহেব মনে করেন যে, আজ যদি এমার্সন বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হইতেন।”

আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম আমেরিকার

* শুধু ভারতীয় নহে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যেও এমার্সনের অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত। ভগবদগীতা হইতে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের ধোঁরাক সঞ্চয় করিতেন। এ সম্বন্ধে নটংহাম সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার *Representative man* নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট “Life of Emerson” নামক প্রবন্ধে Richard Garnett বলিয়াছেন :

“His literary taste on the whole was in one sense very exclusive . . . in another very Catholic, ranging from the Bhagvat Gita to Martial.”

Works of Emerson, vol. iv, pp. lx, lxi.

‘In praise of Books’ নামক নিবন্ধে এমার্সন গীতা, মহাসংহিতা, উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, এবং পারশ্বের সাদীর গুলিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। সাদী সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুদীর্ঘ কবিতা আছে। তাহার দুইটি ছত্র এই—

“Saadi so far thy words shall reach,
Suns rise and set in Saadi's speech”
Works of Emerson, vol. iii, p. 196.

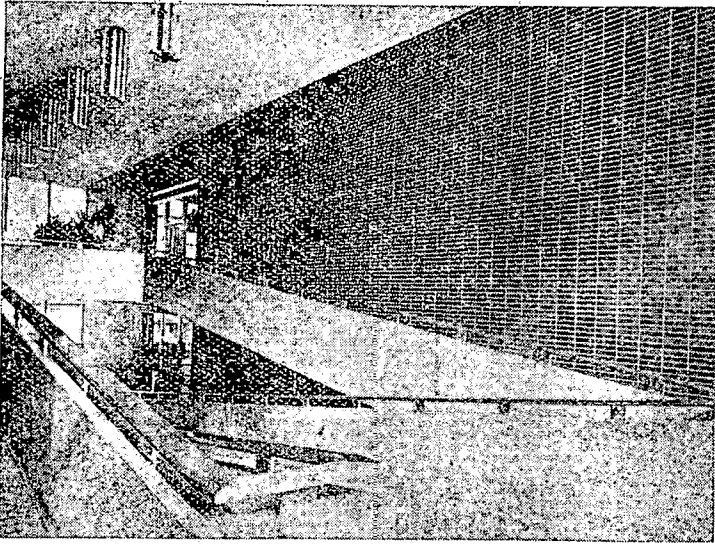
তাঁহার নিকট দেশ-কালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। প্রাচ্যের উপরিউক্ত ধর্মপুস্তক এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

“We call them Asiatic, we call them primeval, but perhaps that is only optical.”—*Works of Emerson*, vol. vi, pp. 316-18.

তাঁহার ‘Beauty’, ‘The transcendentalist’ প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে বেদান্তের চিন্তাধারার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের মত্ববাণী, বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া এই দুইটি জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন। তাহার পর হইতে এই দুই জাতির পরস্পরকে জানিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর প্রবর্তমান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু নানা প্রতি-বন্ধকতার দরুন আমরা পরস্পরকে কত কম জানি, অথবা ভুল ভাবে জানি ভারতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ-গুলিতে পার্শ্ব বাক তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ-সমূহ হইতে মার্কিন জীবন, চরিত্র ও সমাজ-চিত্রের নূতন নূতন দিক আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইতেছে। তেমনি আমাদের সমাজের বিভিন্ন দিক এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিতও যাহাতে আমেরিকাবাসীর সম্যক পরিচয় হয়, সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের আলোচনার ফল যাহাই হোক না কেন একথা নিশ্চিত যে, ইংরেজ জাতিকে অদূরভবিষ্যতে ভারত ‘ছাড়িতে’ (quit) হইবে। স্বাধীন ভারতের প্রধান কাজ হইবে তখন গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করা। যান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সম্পর্কহীন অতীতের স্বর্ণ-যুগে ফিরিয়া যাওয়ার আশা আকাশ-বুহুরের ছায় অলীক কল্পনা মাত্র। বর্তমান যুগের সঙ্গেই আমাদের সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে— কাজেই ভাবী মহাজাতি গঠন-কার্যে আধুনিক বিজ্ঞানই হইবে আমাদের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রসঙ্গ দৃষ্টিপাতে সেদিন আমাদের দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে। পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র বসু গত বৎসর যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন উৎসবে বলিয়াছিলেন—স্বাধীন ভারতে এঞ্জিনিয়ার কারুশিল্পী স্থপতি বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিরই প্রয়োজন হইবে বেশী। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনকার্যে আমরা কি পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিব? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান যুগে যান্ত্রিক সভ্যতাকে বাদ দিয়া চলিবার যখন উপায় নাই তখন ভারতীয় সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার নীরটুকু বাদ দিয়া স্বীরটুকু আমাদেরকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি আমেরিকা যতটা করিয়াছে আর কোন দেশ ততটা পারে নাই, স্তত্রাং এ বিষয়ে আমেরিকাই হইবে আমাদের আদর্শ। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং নবাবিস্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষি এবং শিল্প-বিজ্ঞানে কিরূপ আশাতীত উন্নতি করিয়াছে তাহা পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে আমরা দেখাইয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহাদি নির্মাণে কি অভিনব পরিকল্পনা অনুসৃত হইতেছে তাহা বর্ণিত হইবে। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে যখন সমগ্র দেশ জুড়িয়া বহুসংখ্যক বিরাট ক্যান্টারী, কারখানা মিল ইত্যাদি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তখন এই সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিতে পারে।



অভিনব পরিকল্পনায় নির্মিত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলস্থ একটি শহরের 'সিটি হলে' সংশ্লিষ্ট ঢালু পথ। সিঁড়ির বদলে ঐ বন্ধ ব্যবহৃত হয়

[২]

যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্লান্ট' ইত্যাদি নির্মাণের ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইয়া উঠায় অনাবশ্যক অংশ বর্জন করিয়া অভিনব পদ্ধতিতে গৃহাদি নির্মাণের আয়োজন ব্যাপকভাবেই চলিতেছে। নূতন গৃহগুলি যাহাতে উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক আলোক এবং বায়ুচলাচলের ব্যবস্থায়ুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত মজবুত ভিত্তি-সমন্বিত এবং অভ্যন্তর-ভাগ যাহাতে অধিকতর নয়নরঞ্জক বর্ণালিগুণ হয়, তাহার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। নিউ ইয়র্কের 'জার্গল অব কমার্স' দেখিতে পাই, দুইটি প্রধান বিষয়ে এখনো মতানৈক্য বিজ্ঞমান। প্রথমটি হইতেছে এক তলা বনাম বহু তলাবিশিষ্ট 'প্লান্ট' নির্মাণ লইয়া, আর দ্বিতীয়টি, সেগুলিতে জানালা থাকিবে, কি থাকিবে না তৎসম্বন্ধে।

কারখানার গৃহাদি নির্মাণে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন।

১। অপেক্ষাকৃত হালকা ইম্পাতের ফ্রেম ব্যবহার—জোড়া দেওয়া, বিশেষ এক ধরনের ওজনে হালকা এবং আয়তনে ছোট ইম্পাতের ওপর খুব জোর দেওয়া হইতেছে।

২। অধিকতর প্রসারিতভাবে বিলানসমূহ নির্মাণ করা।

৩। সাধারণ ছাদের সীমারেখার উর্দ্ধে পাঁচিলের যে অংশটুকু উদ্গত হইয়া থাকে তাহা বর্জন করা।

৪। বৃহত্তর কপাটের খোঁব বা 'প্যানেল' ব্যবহার। প্রাচীরাদি নির্মাণে ইটের বদলে কনক্রীট সিরামিক প্লাইউড প্রভৃতি ব্যবহার এবং শ্রমিকেরা কারখানা-গৃহের একপার্শ্ব হইতে অথবা নীচেকার একটি সুড়ঙ্গ দিয়া যাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। নির্গমন-পথ থাকিবে ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে। বিরাট প্ল্যাণ্টে একটি ছোট মাত্র দরজা থাকিলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অনবরত এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে আসা-যাওয়া করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া নূতন পরিকল্পনা-কারীরা স্থির করিয়াছেন যে, প্ল্যাণ্টে অনেকগুলি প্রবেশ-পথ থাকিবে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহাদি নির্মাণের ধরচ বর্তমানে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ অপেক্ষা শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিভাগের 'কনট্রাকশন ষ্ট্যাটিস্টিক্স ইউনিটে'র প্রধানকর্তা উইলিয়াম ডবলিউ শ মনে করেন যে, ১৯৪৬ সালের শেষাংশে ইহা শতকরা আরো আট ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ১৯৪৭-এর শেষ ভাগে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা ইহার সর্বোচ্চ

বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৫ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ব্যয়ের হার যতই বৃদ্ধি পাক, প্রধান প্রধান কর্তৃকটাক্ষাগণ কিন্তু মনে করেন নূতন 'প্ল্যাণ্টে' যে-সমস্ত সংস্কারমূলক, উন্নত ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে তাহাতে আয় এত বাড়িয়া যাইবে যে, প্লান্ট নির্মিত হওয়ার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। একজন কন্ট্রাক্টার মনে করেন কারখানার মালিকেরা যদি শ্রমিকদের মজুরি শতকরা সাড়ে আট ভাগ কমাইয়া দেন তাহা হইলেই নূতন পদ্ধতির গৃহনির্মাণের জয় আর অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে না। আরো কোন কোন দিক দিয়াও ব্যয়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। মোটের উপর কর্তৃপক্ষ পূর্বনো প্ল্যান্টের জয় যে-টাকা ধরচ করিতেছেন যদি তাহার দশ ভাগের এক ভাগ বাঁচাইতে পারেন তাহা হইলে নূতন প্লান্ট নির্মাণ করা তাহাদের-পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৃহাদিসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রতটবর্তী, অভিনব পরিকল্পনায় প্রস্তুত প্লান্টসমূহের মধ্যে শতকরা ৬১টি একতলা।

বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, একতলা গৃহ নির্মাণ করিতে মোটামুটিভাবে বহুতলাবিশিষ্ট প্লান্ট অপেক্ষা শতকরা নয় ভাগের একভাগ কম ধরচ পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য দেখা যায়, বহুতলা বিশিষ্ট প্ল্যান্টের ছাদ ইত্যাদি নির্মাণে কম অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু মেঝে দেওয়াল এলিভেটর সোপান মঞ্চ ইত্যাদি সব কিছুতে মিলিয়া উহাতে ধরচ অনেক বেশী পড়ে।

জানালাহীন প্লান্ট নির্মাণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত শতকরা

২২টি ভবন জানালাহীন। কোন কোন স্থপতি এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু কাহারও কাহারও মনে আবার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, জানালাহীন গৃহই হইবে কারখানার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, বিশেষতঃ বস্ত্র-শিল্পের প্লান্টসমূহে এগুলির উপযোগিতা অপরিসীম। স্থপতিগণ শতকরা ৬৫টি প্লান্টে ইম্পাতের ফ্রেম ব্যবহারের পক্ষপাতী।

কনক্রীট ব্যবহারের কথাও তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন, কেননা ইম্পাত ইত্যাদি দুপ্রাপ্য জিনিষের উপর সরকারী বিধি-নিষেধ জারী হওয়ায় বর্তমানে কনক্রীট দ্বারা বহুসংখ্যক প্লান্ট নির্মাণ করিতে হইবে।

শতকরা ৬১টি প্লান্টের দেয়াল ইষ্টক-নির্মিত, এবং শতকরা দশটি কনক্রীটের তৈরি। শতকরা বত্রিশটির ছাদ কাঠনির্মিত, শতকরা ২৬টির ছাদ ইম্পাতে তৈরি এবং ২৩টির কনক্রীট এবং সিমেন্টে প্রস্তুত। সম্প্রতি জিপসাম* ইত্যাদির অভাব হওয়ায় ছাদ নির্মাণে কনক্রীট এবং সিমেন্ট ব্যবহারের দিকে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে।

প্রখ্যাত গৃহ-পরিকল্পনাকারীগণ বলেন যে, নূতন প্লান্টগুলির অভ্যন্তর-ভাগেই সবচেয়ে বেশী নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে।

নূতন পদ্ধতিতে নির্মিত গৃহগুলিতে আলোক-ব্যবস্থাও হইবে অভিনব। অনেকগুলি প্লান্টেই কেথোড-রশ্মি-জাতীয় এক ধরনের উত্তাপহীন আলোকের বন্দোবস্ত করা হইবে, বিশেষজ্ঞদের মতে যাহার দূরগামিতা প্রতিপ্রভ (fluorescent) আলো হইতে তিন-চার গুণ অধিক। প্রাথমিক ব্যয় অধিক হইলেও এ ধরনের আলোকে চালু রাখিবার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমানে শতকরা ৩৯টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রতিপ্রভ আলো ব্যবহার হয়।

বায়ু-চলুচলের ব্যবস্থার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তাপের স্বতঃনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যেরূপ উন্নতিসাধন করা হইতেছে তাহাতে কেবল যে কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, জ্বালানি কাঠের খরচও ইহার দরুন প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কারখানায় প্রত্যহ যে উত্তাপের অপচয় হয় তাহার ক্ষতিপূরণের জন্ত যন্ত্রপাতি-সাহায্যে উত্তাপ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পরিকল্পনাকারীগণ বলেন, প্লান্টগুলির অভ্যন্তর-ভাগে বহুবিধ বিচিত্র রং ব্যবহৃত হইবে। এই রঙের প্রভাব কর্মী ও শ্রমিকদের মনের উপর তো বিশেষ কার্যকরী হইবেই, উপরন্তু ইহা তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষেও সহায়কস্বরূপ হইবে। এমন ভাবে রঙের প্রয়োগ করা হইবে যাহাতে তৎসাহায্যে প্লান্টের নির্মাণ-পদ্ধতি সহজে বোধগম্য হয় এবং রঙের দ্বারা

কারখানার ভিতরকার বিপজ্জনক স্থানগুলিও নির্দেশিত করা হইবে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে মনিব-শ্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে। নব-নির্মিত ও পরিকল্পিত প্লান্টগুলির অধিকাংশেরই শুধু যে নিজস্ব, পান-ভোজনের স্থান থাকিবে তাহা নয়, সকল সময় ‘কাকে’তে না গিয়াও শ্রমিকেরা যাহাতে খাদ্য-পানীয় পাইতে পারে সে-ব্যবস্থাও করা হইবে। উপরন্তু প্লান্টগুলিতে ব্যাপক ও উন্নত ধরনের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত বিশ্রাম, ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত তো থাকিবেই। এই শেযোক্ত বিষয়গুলি এখন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক, ‘এগুলি হইলেও চলে, না হইলেও ক্ষতি নাই’ এ কথা মনে করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শ্রমিকদের গৃহ-সমস্তার কথা চিন্তা করিলে স্বাধীন এবং পরাধীন দেশের পার্থক্য যে কত বেশী তাহা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বৈদেশিক বণিকদের শোষণ-নীতিই যে দেশীয় শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে ইংরেজ শিল্প-পতিদের উপ-চীর্ণমান সম্পদরাশি পূর্বত প্রমাণ হইয়া উঠিতেছে সেই শ্রমিকদের আহার এবং বাস-স্থান সংক্রান্ত সমস্তার প্রতি ইহার সম্পূর্ণ উদাসীন। এ সম্বন্ধে বর্তমান বৎসরের জুলাই সংখ্যা *Modern Review*তে Notes বিভাগে labour Housing problem শীর্ষক যে সম্পাদকীয় আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তৎপ্রতি দেশের শ্রমিক-হিতৈষীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে তাহাতে বলা হইয়াছে—

“Most of the big mills of the Industrial areas are owned and controlled by British traders who have done nothing to improve the living condition of the barracks attached to their mills. Things are no better in other parts of this sub-continent.”

“অর্থাৎ—(কলিকাতার) শিল্প-প্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ বড় কারখানারই মালিক ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়। কারখানা সংলগ্ন ষ্ট্রাকারগুলিকে উন্নত ধরনের বাসোপযোগী করিবার জন্ত তাহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন নাই। এই বিরাট দেশের অশ্রান্ত অঞ্চলের শ্রমজীবীদের বাসস্থানের অবস্থাও ইহার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নহে।”—উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধের আরো কিয়দংশের তাৎপর্য নীচে দিলাম।

“কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশসমূহে কিন্তু শ্রমিকদের বাস-স্থানের উন্নতিকল্পে মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক চেষ্টা চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী হাথরাস, শিকোহাবাদ, ফিরোজাবাদ, সাহারানপুর, মির্জাপুর, গোরখপুর, লক্ষৌ এবং কানপুর এই কয়টি প্রধান শিল্প-কেন্দ্রের

* ইহা দক্ষ করিয়া চূর্ণ করিলে প্লাস্টার অব প্যারিস হয়।

শ্রমিকদের বাস-গৃহাদি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অবিচার ও ওঁদাসীতে আতঙ্কিত হইতে হয়। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে বাস করার শ্রমিকদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। বিগত যুদ্ধের ফলে কড়ি বড়গা ইত্যাদি লৌহো-

পকরণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠায় শ্রমিকদের জন্ম নূতন বাসগৃহ নির্মাণের সমস্তা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।”

বাধীন দেশ আমেরিকায় সমস্তা সমাধানের কত নব নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইতেছে, আর আমরা কোণায় পড়িয়া আছি।

একাদশ শতাব্দীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া

এম আকবর আলি, এম-এসসি

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দ্রব্যের আণবিক অল্পপাত তথা ওজনের অল্পপাত সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। আণবিক অল্পপাতের তারতম্য অল্পসারে প্রক্রিয়া ও উদ্ভূত পদার্থের পরিবর্তন দেখা দেয়, সেইজন্মে এই আণবিক তথা ওজনের অল্পপাতের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা রাসায়নিকদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

অনেকেরই ধারণা রসায়ন শাস্ত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটি সর্বপ্রথম ল্যাভয়শায়ার এবং ব্ল্যাক আবিষ্কার করেন এবং তাঁদের আবিষ্কারের পর থেকেই রসায়নশাস্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপের রেনেসাঁর পরে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায়ই যখন নূতন উদ্দীপনা জেগে উঠে তখন বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে রসায়ন শাস্ত্রেও যে তেমনি উদ্দীপনা আসবে এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। ল্যাভয়শায়ার ও ব্ল্যাকের প্রক্রিয়া এই উদ্দীপনায় ইন্ধন যোগায়। তৎকালীন অসংখ্য রাসায়নিকগণ তাঁদের এই পন্থাগুলিকে অনুসরণ করে রসায়নে নব যুগ আনয়ন করেন। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওজনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম ল্যাভয়শায়ারই উপলব্ধি করেন এ ধারণা করবার কোন কারণই নেই। ল্যাভয়শায়ারের বহু পূর্বেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ ভাবেই অবহিত হন—

Special attention may be drawn to two points in connection with the Aino-s-Sanat. The first is the evidence supplied by Chapters III & IV of the great importance that was attached to weights in chemical operations 700 years before the time of Black & Lavoisier.—*Alchemical Equipments in the Eleventh Century* by Stapleton F. Azo.

এক বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও ফলাফল গোপন রাখার অজুহাতে একে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িয়ে দেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে এই আধ্যাত্মিকতাকে আরও বেশী ভাবে কাঁপিয়ে তোলা হয়। ফলে রসায়ন শাস্ত্র বিজ্ঞান রূপ পরিভ্যাগ করে যাদুবিচার রূপ পরিগ্রহ করে এবং যাদুবিচারই অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এমনি ভাবে চলতে থাকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। বিজ্ঞান হিসাবে এর আর কোন

অস্তিত্বই থাকে না। দিনে দিনে সাধু সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিকতার বাণী নিয়ে এ আরও যাদুমন্ত্রের মোহজাল বিস্তার করতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে এই মোহজালের উপর সর্বপ্রথম আঘাত আসে জাবির ইবনে হাইয়ানের হাতে। হাতেকলমে কাজ করবার এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করবার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি তাঁর পুত্রকে (বা শিষ্যকে) উদ্বেষ্ট করে এঁদের একস্থানে বলেছেন, “রাসায়নিকের সর্বপ্রধান কর্তব্য হ’ল হাতেকলমে কাজ করা এবং পরীক্ষা চালান। যে হাতেকলমে কাজ না করে বা পরীক্ষামূলক কাজ না চালায় তার পক্ষে এতে সামান্য মাত্রাও পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। তুমি নিশ্চয়ই পরীক্ষামূলক কাজ চালাবে যাতে পূর্ণজ্ঞান আহরণ করতে পার।” তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পরীক্ষামূলক কাজ চালানর জন্ম এমনি উপদেশ ও অহুপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। অন্য এক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “যত বড় ব্যক্তির মতবাদই হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ব্যবহারিক কার্যদ্বারা তার সত্যতা সঠিকভাবে নিরূপিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একে সামান্য কথাই ধরে হিসেবেই ধরতে হবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতবাদ বলেই যে তা সত্যি হবে এমন কোন কথা নেই বরং সে সত্য মিথ্যা দুইই হতে পারে। যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখনই বলব তোমার এ মতবাদ সঠিক এবং সত্য।”

বলা বাহুল্য জাবিরের হাতেই রসায়ন শাস্ত্র আধ্যাত্মিকতার মোহ থেকে মুক্তি পায়। তিনিই সর্বপ্রথম একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করান এবং তাঁর সময় থেকেই এর উপর থেকে তন্ত্রমন্ত্রবাদের প্রভাব আন্তে আন্তে তিরোহিত হতে থাকে। তবে আণবিক বা ওজনিক অল্পপাতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কতটুকু আকৃষ্ট হয়েছিল তা বলা সম্ভবপর নয়। সীস খেত (white lead) এবং পারদাম (Cinnabar) প্রস্তুত করবার বেলায় তাঁর গ্রন্থে উপাদানগুলির ওজনের কথা না থাকলেও সীসায় থেকে সীসা তৈরি করতে এবং নাইট্রিক এসিড তৈরি করবার বেলায় ওজনের কথা উল্লেখ দেখা যায়।

মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ওজনিক অল্পপাতের উপর জোর না দিলেও, তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁর পরে যে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ এদিকে বিশেষ ভাবেই প্রবৃত্ত হন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাদশ শতাব্দীর অল্পতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক আব্দুল হাকিম মোহাম্মদ বিন আব্দুল মালিক আসমালাহি আলখারিজমি আলকাছির প্রণীত “আইনুস সানা ওয়া আওনুস সানা” (Essence of the Art and aid to the workers) গ্রন্থে। গ্রন্থখানি ৪২৬ হিজরী (১০৩৪ খ্রিঃ অব্দে) বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষক আর-রহিস আবুল হাসান আলি ইবনে অকুলাার অল্পপ্রেরণায় বাগদাদে লিখিত হয়।

রসায়ন শাস্ত্র প্রথম থেকেই স্বল্পমূল্যের ধাতুগুলিকে রৌপ্য ও স্বর্ণে পরিণত করার অল্প হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসতে থাকে। জাবির একে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করালেও বৈজ্ঞানিকদের মন যে একেবারেই সোনার মোহ থেকে মুক্ত হয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণই নেই। একাদশ শতাব্দীতেও এ মোহ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নাই। আব্দুল হাকিমের গ্রন্থখানি বাথেলোর Archeologie et Historie des sciences-এ বর্ণিত মিশরীয় গ্রন্থের কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে মিশরীয় গ্রন্থ যেখানে শুধু কারিগর-দিগের শিক্ষা এবং সোনা প্রস্তুত করে ধনী হবার পন্থা নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়েছে, এ গ্রন্থে সেখানে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অল্পসন্ধান করার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানকে উন্নত করার দৃঢ় ধারণা নিয়েই যেন গ্রন্থকার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। গ্রন্থখানিতে প্রক্রিয়াগুলির যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় গ্রন্থকার নিজে এই প্রক্রিয়াগুলিকে পরীক্ষা করে সেই অল্পসারে কাজ করেছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক ধারণায় উদ্ভূত মনের পক্ষে এ সমস্ত প্রক্রিয়াতে নানা বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ি দেখে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে রসায়ন শাস্ত্রের তখন সবে মাত্র উন্মেষ হয়েছে। আজকালকার মত ধাতু ও যৌগিক পদার্থের (compound) বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তখন পর্যাপ্ত গড়ে ওঠে নাই। বৈজ্ঞানিকগণ তখন পর্যাপ্ত এর অল্পসন্ধান হাতে দেওয়াচ্ছেন। এই সময়ের কতকগুলি অযথা জিনিষের আমদানী অস্বাভাবিকও নয়, অনাবশ্যকও নয়। একটি সত্যের আবির্ভাব পথে হয়তো শত সহস্র অসত্যের আমদানী হয় কিন্তু পরিণামে তারা কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ে। এই সময় রাসায়নিক সত্য নির্ধারণের পথে সবে মাত্র যাত্রা শুরু হয়েছে, তাই এমনি সব অনাবশ্যক বিষয় দেখা দেবেই। তবে এই সময়ের মধ্যস্থতায় বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন, সেইটাই হচ্ছে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

আব্দুল হাকিমের দুই-একটি প্রক্রিয়া থেকেই এ বিষয় ভাল ভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটির নাম হ'ল “শুভ্র রৌপ্য প্রস্তুত প্রণালী”। গ্রন্থকারের বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল—

“এর পরীক্ষা হ'ল যদি তুমি এর খানিকটা আমার পাতের উপর ঢেলে আস্তে আস্তে গরম করতে থাক, তা হলে এ গলে গিয়ে মোমের মত বইতে থাকবে এবং আমার পাতটির উপরি-ভাগও রৌপ্যের মত সাদা হয়ে পড়বে। তবে এতে শুধু উপরি-ভাগই সাদা হবে, তীক্ষ্ণ প্রক্রিয়ার মত ভিতরে কোন পরিবর্তনই হবে না। কিন্তু যদি তুমি জল দিয়ে পাতটিকে ভাল করে ভিজিয়ে নাও তা হলে এ ভিতরেও প্রবেশ করবে এবং পাতের অপর পিঠও রৌপ্যের আকার ধারণ করবে। এতে ভিতর ও বাহির সবটাই সাদা হয়ে যাবে।”

প্রথম স্তরের প্রক্রিয়া—

রৌপ্যের গুঁড়া—৪ দেহরহাম

ময়ূলের তামার গুঁড়া—১ দেহরহাম

পারদ—১ দেহরহাম

প্রথমে গুঁড়াগুলো একটা খলে (সালাইয়াহ) রাখ। তার পরে এর উপর কিছু জল ছিটিয়ে ধুয়ে নাও। এইবার পারদ মিশ্রিত কর। এখন দুই দেহরহাম সালাইয়াহ মিশিয়ে খুব ভাল করে পিষতে থাক যতক্ষণ না সমস্ত পারদের চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে। এইবার চিত্রের অল্পরূপ একটি কাঁচের পাত্র নাও। সেটিকে কাদা, গোবর (গোবর কাদার এক-তৃতীয়াংশ হবে), ঘোড়ার চুল, ঘাম এবং কিছু লবণ মিশিয়ে প্রস্তুত লেই দিয়ে ভাল করে লেপে নাও। চুলগুলো ভাল করে কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে এবং এগুলোকে মিশিয়ে একটা পাত্রে দশ দিন রেখে লেইয়ের মত করতে হবে। এই লেই দিয়ে কাঁচের পাত্রটিকে বারে বারে স্তরে স্তরে লেপে দাও। এইবার পাত্রের ভিতর রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ঢেলে দিয়ে তার মুখটাকে লবণ, আঠা এবং কিছু ময়দা দিয়ে ভাল করে এঁটে দাও। পাত্রটির উপরেও কিছু কাদা দিতে হবে। এগুলো সব শুকিয়ে গেলে পাত্রটি একটি চুল্লীর উপর রেখে ভাল দিতে হবে। চুল্লীটি এক হাত উঁচু ও হাত দেড়েক চওড়া হওয়া দরকার। দেখতে হবে যেন আগুন পাত্রের সংস্পর্শে না আসে। বাতাস যাওয়া এবং ধোঁয়া বেরিয়ে আসার জন্ত চুল্লীর দুই দিকে ছুটি ছিদ্র থাকবে। এমনি ব্যবস্থা করার পর পাত্রটি চুল্লীর উপর বসিয়ে খুব মুছ ভাল দাও। রাসায়নিক দ্রব্যটি যদি উৎক্ষিপ্ত হয়ে (sublime) পাত্রের উপরি ভাগে জড় হয় তা হলে দেগুলোকে অবশিষ্টাংশের সঙ্গে আবার মিশিয়ে দিতে হবে। সবগুলোকে আবার ভাল ভাবে পিষে এমনি ভাবে দশবার উৎক্ষিপ্ত করাতে হবে যেন পাত্রের তলায় আর কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে

বরং সবটাই উৎকৃষ্ট হয়ে উপরে গিয়ে জমা হয়। এটি “সাদ-উদ্দিনের” পাথরের মত জমাট হয়ে যাবে।

এই প্রক্রিয়ায় সত্যি রাসায়নিক জিনিষটি কি দাঁড়িয়াছে তা বলা মুশকিল। প্রক্রিয়ার ক্রমিক ব্যবস্থা অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথমে তাম্র এবং রৌপ্যের একটি এমালগাম তৈরি হয়েছে। তারপর এমালগামটিকে দশবার ধীরে ধীরে তাপ দেওয়ায় পারদটা সব উবে গিয়ে বোধ হয় একটি তাম্র রৌপ্যের সঙ্কর ধাতুতে (alloy) পরিণত হয়েছে। সাল-এমোনিয়া যোগ করার ফলে কিছুটা সিলভার-ক্লোরাইড এবং কিছুটা কপার-ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে এবং এমালগাম তৈরী হওয়ার পক্ষেও সুবিধা হয়েছে। পাত্রটি সরাসরি আগুনের উত্তাপে না দেওয়াতে বোঝা যাচ্ছে, তাপ খুব বেশী উঠতে দেওয়া হয় নি। এমোনিয়াম-ক্লোরাইড-এর অনুপাত বেশী না হওয়াতে, রৌপ্য এবং তাম্রের সবটাই ক্লোরাইডে পরিণত হতে পারে নাই তা ছাড়া এমনিতেও এমোনিয়াম ক্লোরাইড অনেকটা উবে গিয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় রৌপ্য ও তাম্রের সঙ্কর যদি শতকরা ৭৩ ভাগ রৌপ্য থাকে তা হলে সেটিকে গলাতে ৭৭৮° তাপ দরকার। মনে হয় এই প্রক্রিয়ায় যে সঙ্কর প্রস্তুত হয়েছিল তার সবটুকু গলতে পারে নাই। সাধারণতঃ সিলভার-ক্লোরাইড ৪৬০০° এবং কপার-ক্লোরাইড ৪৩৪° উত্তাপে গলে যায়। খুব সম্ভব এই প্রক্রিয়ায় ধাতুগুলির ক্লোরাইডের একটি সমসত্ত্ব গলিত জিনিষ প্রস্তুত হয়ে পারদ এবং সাল-এমোনিয়ার বাষ্পের সঙ্গে বা এমনিতে ক্ষুদ্রতম পাত্রের তলা থেকে উপরে নীত হয়েছে।

এ প্রক্রিয়াটি বর্তমান রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে একটু জবরজঙ্ঘ গোছের মনে হলেও অনেকগুলি প্রক্রিয়াই বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতির মতই। এই প্রসঙ্গে ক্লোরাইড অবটিনের প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আরবী গ্রন্থে এর নাম দেওয়া হয়েছে “টিনের সাদা জল”। গ্রন্থকারের মতে “এর চিহ্ন হল যদি এ দিয়ে কোন পাতের উপর লেখা যায় এবং সেটিকে গরম করা যায় তা হলে লেখাটি রৌপ্যের উপর লেখার মতই মনে হবে এবং যদি কেউ একটি কাঁসার পাত গরম করে এর মধ্যে ডুবিয়ে দেয় তাহলে খোদার মন্দিরে পাতটির ভিতর-বাহির সাদা হয়ে যাবে।” প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :-

টিন—

১০ দেরহাম

বিশুদ্ধ পারদ—

২০ দেরহাম

খোঁরাসানের বিশুদ্ধ শুদ্ধ সাল-এমোনিয়া—

২০ দেরহাম

“টিনকে গলিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। ঠাণ্ডা টিনের উপর পারদ ছড়িয়ে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ছুটি বেশ মিশে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এমনি রেখে দাও। এইবার এই বিচিত্র পদার্থটিকে আবার গরম কর এবং গরম অবস্থায় নাড়তে থাক। তারপর এটিকে একটি পাত্রে ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দাও। এইবার এটিকে একটি খলে রেখে সাদা জল মিশিয়ে

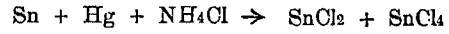
ভাল করে পেয়। পিষ্ট দ্রব্যটিকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সাল-এমোনিয়া মিশিয়ে দাও। সংমিশ্রণটিকে আবার ভাল করে পিষে নিয়ে একটি মাটির মুষার (crucible) মধ্যে রাখ। মুষাটিকে ভাল করে কাদা দিয়ে লেপে দাও। তার পর এর মুখ খুব ভাল করে এঁটে এক রাত্রি ধরে ছুঁটের আগুনে জ্বাল দাও। ছুঁটে এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন মুষাটির উপরে এবং নীচে দুই হাত পরিমাণ ছুঁটে থাকে। এইবার মুষা থেকে সংমিশ্রণটি বের করে আবার খলে ভাল করে পেয়ণ কর। তারপর আবার মুষাতে রেখে পূর্বের মতই তিন রাত্রি আগুনে জ্বাল দিতে থাক যেন আত্মা দেহের সঙ্গে মিশে যায়। এখন যদি এটাকে একটি গরম তামার পাতের উপর রাখ তা হলে দেহ ও আত্মার সঙ্গে মিশে ভিতরে প্রবেশ করবে। তখন এটিকে শোষণাধারে রেখে উর্দ্ধপাতন (sublime) করতে হবে। শোষণাধারটি যেন এক হাত দীর্ঘ ও আধ হাত চওড়া হয়। চিত্রের অঙ্কন এর ঠোঁটটি বাঁকা হওয়া উচিত। পাত্রটির অর্ধেকটা এক আঙুল পরিমিত কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। শোষণাধারটি ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে চুল্লীর উপর বসিয়ে দাও। চুল্লীটি মিষ্টায় প্রস্তুতকারীদের চুল্লীর মত গোলাকার হওয়া উচিত। এর দুই দিকে যেন দুইটি ছিদ্র থাকে। চুল্লী এবং পাত্রটির মধ্যে যেন একটু ফাঁক থাকে। এইবার পাত্রটিতে রাসায়নিক পদার্থটি রাখ এবং অমৃশণ একটি ঢাকনা দিয়ে পাত্রটিকে ঢেকে দাও। ঢাকনার মধ্যে (পাশ থেকে তিন আঙুল দূরে) ছোট একটি ছিদ্র করে রাখ। এইবার ঢাকনা এবং শোষণাধারটি তিন আঙুল পরিমাণ কাপড় দিয়ে ভাল ভাবে এঁটে দাও। কাপড়খানা কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। এইবার পাত্রটিকে খুব জ্বাল দিতে থাক। প্রথমে ছিদ্রটি খুলে রাখবে যেন বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ পরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দাও। এক দিন ধরে খুব জ্বাল দাও। এক দিন পরেও যদি দেখা যায় যে ছিদ্র দিয়ে বাষ্প আসছে তা হলে বুঝতে হবে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় নাই আর যদি কোন বাষ্প না বেরয় তা হলে বুঝতে হবে যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢাকনাটা খুলে ফেল। যেগুলো উপরে উৎকৃষ্ট হয়ে গেছে সেগুলিকে নীচেকার তলানির সঙ্গে নিয়ে পিষে গুঁড়ো কর এবং আবার সমান অনুপাতে পারদ নিয়ে একসঙ্গে ভাল করে পেয়া এইবার এগুলোকে আবার শোষণাধারে রেখে পূর্বের মতই উর্দ্ধপাতন কর। প্রথম বারের উৎক্ষেপ (sublimate) কাল, দ্বিতীয় বার ক্যাকাশে লাল, তৃতীয় বার ছাই রং, চতুর্থ বারে পাতলা ধূসর এবং পঞ্চম বারে একেবারে সাদা হবে। এখন এটিকে বের করে সম্বত্রে রাখ।”

এর পরে দ্রবণ (solution) করবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। “উৎক্ষেপগুলিকে রাখার মত একটি বড় বোতল

লও। বোতলটিতে সমস্ত উৎক্ষেপগুলিকে রেখে দাও। এইবার বোতলের মুখের উপর একটি ফানেল রেখে, ফানেলের উপর একটা ছাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ। বোতলটিকে ফেণ্টের একটা বড় ঢাকনা দিয়ে ভাল করে ঢাক। এখন ঢাকনার উপর ঘুঁটে সাজিয়ে দিয়ে আগুন দাও, এবং এমনি ভাবেই জাল দিতে থাক। প্রত্যেক সপ্তাহে ঘুঁটে বদলে দিতে হবে। চল্লিশ দিন এমনি জাল দেওয়ার পর সংমিশ্রণটি গলে সাদা জল বেরিয়ে আসবে। একটি পাত্রে প্রস্তুত রৌপ্যের সঙ্গে মিশান 'তীক্ষ্ণ জল' লও এবং পাত্রের অর্ধেকটা এই সাদা জল দিয়ে ভরে দাও। এখন পাত্রটিকে গরম ছাইয়ের উপর বসিয়ে দাও। এমনি ঘুঁ জালে এটিকে সিদ্ধ হতে দাও যতক্ষণ না মিশ্রিত তরল পদার্থগুলি একেবারে মিশে যায়। এইবার উদ্ভূত পদার্থটিকে একটি তামার পাতের উপর রেখে জাল দিতে হবে। এটি পাতের উপর দিয়ে বয়ে

যাবে এবং অল্প পাশ দিয়ে ঘুঁটে বেরিয়ে সমগ্র জিনিষটিকে রৌপ্যের মত সাদা করে ফেলবে।”

বর্তমানে ষ্ট্যানাস ক্লোরাইড (Stannous Chloride) এবং ষ্ট্যানিক ক্লোরাইড প্রস্তুত করতে অল্পরূপ প্রক্রিয়াই অনুসৃত হয়। প্রক্রিয়াটিকে বর্তমান রাসায়নিক ফরমুলা অনুসারে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে—



এমনি নানা প্রক্রিয়ার বর্ণনায় গ্রন্থখানি ভরপুর। এ ছাড়া সেই সময় রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতির কথাও গ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

পানে পরম ভূমি

স্টো ডিউ

দার্ডিঙ্গলিং চা

কমলালয় ষ্টোর্স লি:

শুভ
বিবাহের
জন্ম
সর্বপ্রকার
প্রয়োজনীয়
সামগ্রী
আমাদের
স্টোর্সে
পাইবেন।

||

ন স্টোর্স
লিমিটেড,
ধর্মতলা, কলিকাতা।

আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

চীনে ও স্পেনে অভিযানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে লক্ষ্য করে করে বোমাবর্ষণ করেছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, বিজিত জাতির প্রাণশক্তিকে ও চিন্তাশক্তিকে ধ্বংস করতে হলে এইটাই সর্বপ্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। বিজেতা জাতির প্রথম কাজই হয় নিজেদের স্বার্থ সাধনের উপযোগী করে অধীন-দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। আমাদের বিদেশী প্রভুরাও নিজেদের স্ববিধা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এদেশের জ্ঞান ব্যবস্থা করলেন একটা ওজন-করা শিক্ষা-পদ্ধতি। দেশের বৃহত্তর অংশ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। সে বঞ্চনা জানকৃত—পশ্চাতে রাজনীতি। শিক্ষা মানে পরীক্ষা পাস আর ফল তার চাকুরি, এর বেশী শিক্ষা সম্বন্ধে জাতি আর কিছু ভাবতে পারলে না। শিক্ষাগ্রহণের এটাই হয়ে উঠল প্রথা। ধনী-নিধন নির্বিশেষে সবাই ছুটল চাকুরির পশ্চাতে, কেউ অর্থের গরজে, কেউ সম্মানের লিপায়। গোটা দেশের লোক জীবন-প্রসাধনের দৃষ্টি হারিয়ে ফেললে। প্রাণের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের চাকল্য তাদের আর রইল না। জ্ঞান চাই না, বিদ্যা চাই না; সে প্রয়োজন ছাত্রের

অভিভাবকও উপলব্ধি করেন না। ছাত্রেরা চায় না জীবনকে, জগৎকে জানতে, চিনতে, বুঝতে। জাগল না সে নেশা তাদের মধ্যে যার ফলে সাধনার পথ দিয়ে দেখা দেয় বড় বড় রাজ-নৈতিক, দেশভক্ত, বৈজ্ঞানিক।

মুখ্য কথাই এই যে আমাদের শিক্ষার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নেই। তাতে জীবন-গঠনের উদ্দীপনার অভাব। এ শিক্ষা যেন জীবনের শিক্ষাই নয়। নোটের বাছাই-করা উত্তর মুখস্থ করে পাস দেওয়ার অতিরিক্ত যা-কিছু সে সমস্তই ছাত্রের কাছে আবাস্তর বলে মনে হয়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাই এ মনোভাব সৃষ্টি করে তুলেছে।

যাদের হাত দিয়ে শিক্ষা বিতরিত হয় তাঁরাও ছাত্রের গরজ-মত বাঁধা রাস্তায় চোথ বুজে চলে যান। ছাত্র, সমাজ, শিক্ষা-পদ্ধতি বা সরকার—কোনও তরফ থেকেই তাঁরা উৎসাহও পান না, কাজেই তাঁদের কাজ হয়ে পড়েছে রুটিনমাসিক, হয়ে পড়েছে কতকটা দিন-মজুরী গোছের। কিন্তু আসলে শিক্ষা-দান এ ভাবে চলে না। প্রকৃত শিক্ষাদান অন্তরের দান।

শিক্ষা-দানের মধ্যে আছে একাধারে সৃষ্টি ও গঠনের প্রেরণা। শিল্পীর আনন্দ থেকে শিল্পের জন্ম। শিক্ষাটাকে যদি মানুষ-সৃষ্টির শিল্প বলে গ্রহণ করা হয় তবে এর মূলেও চাই আনন্দ, —স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দ। যেখানে এই আনন্দের অভাব সেখানে মানুষ তৈরির আশাও ব্যর্থ। কিন্তু এদেশে যাদের উপর শিক্ষাদানের ভার হস্ত নানা কারণে তাঁদের চিত্ত থাকে আনন্দহীন, বিক্ষিপ্ত। তাঁরা সঙ্কুচিত, ভীত, অভাবগ্রস্ত, মানসিক শান্তিবঞ্চিত। জীবন-সংগ্রামে পরাভূত, রোগশোক-দুঃখব্যথা-জর্জরিত অসহায় শিক্ষক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আনন্দ থাকবে কি করে? দুর্বলতার উৎস থেকে সবল মানুষত্বের প্রেরণা আসতে পারে না, বিস্তৃত মন রস-পরিবেশনে অক্ষম।

দেশবাসীকে দেশের কল্যাণের জ্ঞান শিক্ষক-সমাজের দিকে, দৃষ্টি ফিরাতে হবে। সমাজে সব-কিছু গড়ে ওঠে সমাজের আবহাওয়া থেকে। উপযুক্ত শিক্ষকের সৃষ্টি করতে পারে উন্নত সমাজ। সেখানে চাই অন্তরের টান। সেই আন্তরিক টানই শিক্ষককে আপন কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। শিক্ষকের ত্যাগপূত আদর্শ-জীবনের বুলি অনেকেই আওড়ান। কিন্তু নিছক ত্যাগের কথা আবাস্তবতাবাদীর উক্তি। দেশ শ্রদ্ধা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সম্মান দিয়ে শিক্ষকের মর্যাদা বাড়ালে তবে ত তিনি গড়ে তুলতে পারবেন অন্তরের আনন্দ দিয়ে, মনুষ্যত্বের আলোকে আমাদের পরিবার সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা—মাতৃভূমির মুখোজ্জলকারী সন্তানদের। দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ও সেই শিক্ষা-পরিবেশনের মধ্যে পাবে সত্যিকার

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের

অপরিহার্য দুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অন্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক

শ্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম, এস মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জ্ঞান সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে।)

প্রাপ্তিস্থান :- হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং

১৬৫নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকারের নিকট, দিনাজপুর।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও বোণাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিশুষ্ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সামুদ্রিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুক্তরাজ্যকালীন মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান হ্রাস হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X X-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইঁহার নিতুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবার মাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিত্ব এবং দেশীয় নেতৃত্ব লাভাও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তুরিতির স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ষোণ্যার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ বর্ষ মধ্য ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্ররোপে ডাক্তার,

কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুর্ব্বারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, ছুরদুষ্টির প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে ইঁহার ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারানী জিপুরা স্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র ধনাত্মক পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্থনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীধর দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এফ, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচাঁদ মহাকবি শ্রীহরদাস সিকান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বরসে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্ৰী ও এসেমবলীর নেতার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্স কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি. মাথবম নায়াব কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রয়ের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যন্তব্যবহৃত, উপকারী নাইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজত্বলাভ এবং, মান, বংশ, প্রতিষ্ঠা, হুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তত্ত্বোক্ত) মূল্য ৭৫। অদ্বৈত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষত্বলা বৃহৎ ২৫৫।, প্রত্যেক গৃহী ও বাবসায়ীর অবস্থা ধারণ কতব্য। বঙ্গলালমুখী কবচ—শক্তিরূপে বণীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় হ্রাসলাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিকে সমস্ত রাধিকা কসেমিত্রিলাভে ব্রহ্মাঞ্জ। মূল্য ২০।, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪। (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। বশীকরণ কবচ ধারণে সবাই বণীভূত ও স্বর্কার সাধনযোগ্য হয়। (শিববাঁকা) মূল্য ১৫।, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রীট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
সাক্ষাৎের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা। গ্রাফ অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

সম্পদ ও মাধ্যম্য যাতে করে তাদের কুষ্ঠায়ুক্ত মন সাগ্রহে শ্রদ্ধা-ভরে গ্রহণ করবে শিক্ষকের সাধনার দান; আর চিত্ত তাদের ভরে উঠবে বৃহত্তর জীবনের রসে—যার অঙ্গস্ব ধারায় দেশের মাটিতে নেমে আসবে সজীবতা, সৌন্দর্য ও ঋদ্ধি।

এবার শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উত্থাপন করছি।

(ক) বর্তমান আবৃত্তি-মূলক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করে চিন্তামূলক স্বাধীন বুদ্ধির উন্মেষক শিক্ষা প্রবর্তিত করতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক বিভাগগুলিকে প্রতিদিন কুড়ি কি ত্রিশ মিনিট করে ছুটি ছুটির ঘণ্টা রেখে একটিকে কোনও শিক্ষক সমবেত শিক্ষার্থীদের সভায় সেদিনকার পত্রিকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। এজুত্ব দ্বিতীয় ছুটির ঘণ্টাটি নির্দিষ্ট থাকাই ভাল। পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রেরও সংবাদপত্র থেকে সাময়িক বিষয়ের প্রশ্ন থাকবে।

(গ) ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষাদান সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হতে হবে। আজকের দিনে রাজনীতিকে ভিত্তি করেই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অত্যাৱশ্যক। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র নেই, তাই ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলির ছাত্র রাষ্ট্রিক আদর্শকে রূপ দেওয়ার মত শিক্ষা-ব্যবস্থা আপাততঃ আমাদের দেশে সম্ভব হবে না। নেতৃত্বের শিক্ষা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র গণ-তন্ত্রের শিক্ষা এবং জার্মেনী, ইটালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মত নাগরিকতার শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সে সব দেশে এক একটা রাষ্ট্রিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তোলা হয় মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

(ঘ) বিভাগে সম্প্রতি যে ধরনের ধর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তা খুব কল্যাণকর হবে বলে মনে হয় না। এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দেশে, বিদ্যালয়ে এবিধ প্রথাগত ধর্ম-শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। বিদ্যালয় হবে জাতীয়তা গঠনের প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে রাখতে হবে সাম্প্রদায়িক নীতি। এক স্বার্থে, একই জাতীয়তার আদর্শে সকলের জীবন ও চরিত্র গঠিত হবে। জার্মানিতে হিটলারও বিদ্যালয়ে

ধর্মশিক্ষা-প্রবর্তনের চেষ্টাকে ফলবতী হতে দেন নি। ইংলণ্ডেও সে প্রয়াস ব্যর্থ করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান যদি আদৌ দেশে রাখতেই হয় তবে তা স্বতন্ত্র থাকাই ভাল।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার উপর ঝোঁক দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। সৈনিকের মত তারা যেন তা মেনে চলে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে আমরা অনভ্যস্ত। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে কর্মের নিয়মাহুত্বাতির ভিতর দিয়ে সমগ্র জাতিকে লক্ষ্যভিত্তিক অগ্রসর হতে হবে। আর আমাদের ছাত্রসমাজ নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ যাতে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ায় ঘিরে রাখতে হবে তরুণ মনকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবে সে জগৎ ও জীবনকে। বিজ্ঞানের আলোয় জাতির যুগযুগ সঞ্চিত জড়তা ও কুসংস্কারের অন্ধকার হবে অপগত।

(ছ) দেশের মঙ্গল-বোধকে জাগাতে হবে তরুণদের মনে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে। “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”—এই হবে তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। তাদের মনে তরুণ বয়স থেকেই জাগিয়ে তুলতে হবে নাগরিক জীবনের সত্য-বোধ বা civic sense. মোট কথা শিক্ষাকে প্রথাগত ও মামুলি প্রথাগত মাত্র করে না রেখে বহুস্থলী ধারায় বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তবেই হবে দেশের সর্বাদীর্ণ কল্যাণ, শিক্ষাদানের চরম সার্থকতা।

স্বরাজ হলে ত এসব দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে মনো-যোগী হতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত হতাশ হয়ে বসে না থেকে জন-জাগরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার রূপান্তর সাধনে আমাদের আশু অগ্রসর হওয়া দরকার—বিলম্বে দেশের অকল্যাণকেই বাড়াতে দেওয়া হবে মাত্র।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউট

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

চেন্নায়রম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR

Post Box 7878

Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাতুর

শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে

engage করিতে হইলে

এখানেই পত্র দিবেন।

ট্রেডমার্ক ‘SORCAR’ বানান

লিখিতে ভুল করিবেন না।

বাঙ্গালীর বীরত্ব কাহিনী

(২)



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন
স্বাস্থ্যহীনতার শানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সন্তান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত বছর লইয়া অদ্বুত সাহস
ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া স্বীয় নামাঙ্কনাবে
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাঙ্গালীর সেই শৌর্য বীৰ্য আজ কাহিনীতে
পর্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জগৎ জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

অদর্শ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টসেপটিকস্ কলিকাতা

A. A. S.

পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক

শ্রীনীগোপাল চক্রবর্তী

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, আমাদের পাগল হওয়ার বড় কারণ এই যে, আমরা অতি অল্প বয়সে অনেক কিছু শিখতে আরম্ভ করি এবং শিখিও খুব তাড়াতাড়ি। পশু তার আদিম মনোভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কিছু শেখও না, কিছু ভোলেও না, কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শিখে নিজেকে অভিশপ্ত করে। মনে রাখতে হবে, কোনও কিছু শেখার চেয়ে শেখা বিষয় ভুলে যাওয়া ঢের বেশী কঠিন।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, একই শিশু বলশেভিক, ফাসিষ্ট বা যা হয় একটা কিছু 'হওয়া'র শিক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিষ্ট, লীগ-পন্থী বা কংগ্রেসওয়ালা হওয়া—অর্থাৎ কোনও কিছু পছন্দ করা না করা; সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞানে রুচি, সিনেমার ছবি ভাল লাগা বা না লাগা—এ সব আমাদের জন্মগত নয়, শিক্ষাগত।

মনের উপর কোন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। এটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল—জন্মগত নয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন আর বংশগতির (hereditv) প্রভাব মানেন না।

কমনস্ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১৩ 'গ্রাম : 'EKESAR'

পি ৫, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যাঙ্ক-

সমূহের মধ্যে অন্যতম।

আমাদের 'সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেট'
টাকা আমানত করিয়া দ্বিগুণ অর্থলাভ
করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় না।

মিঃ অশোককুমার সেন রায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বার্তাবিক পক্ষে খটে এইঃ—মানুষের মস্তিষ্ক কতকটা ক্যামেরার মত, কিন্তু ক্যামেরার চেয়ে এর সুবিধা এই, এর একটা স্বতঃক্রিয় (automatic) স্পর্শক (sensitive) আছে। এই গ্রাহক বা স্পর্শক হচ্ছে মনের আবেগ (emotion)। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফির প্লেট বাইরের ছাপ (impression) খুব বেশী করে গ্রহণ করতে পারে। আবেগ যত বেশী হবে, মস্তিষ্ক-ক্যামেরা তত বেশী স্পর্শক (sensitive) হবে।

একটি খুব ছোট ছেলেকে যদি দশ বার করেও শেখান যায় যে, আট নম্ব বায়ান্ডর, সে পরক্ষণেই তা ভুলে যায়। কিন্তু পাশের বাড়ীর কুকুরটা একবারও যদি তাকে দেখে যেউ-যেউ করে ডাকে, তবে ঐ ছোট ছেলে তা ভুলবে না। মনস্তত্ত্ব-বিদেরা এ সম্বন্ধে বলেছেন, "A child without fear would be a potential corpse!"

যে 'আবেগ'র কথা বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা দু-বারী তরবারির মত। এর বশবর্তী হয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় শিখে ফেলি—যা হয়ত শিখবার কোন হেতু ছিল না। যেমন ধরুন, একটি শিশু তার হাত কেটে ফেললে। ডাক্তার এসে ইনজেকসন দিলেন, কাটা জায়গাটা হয়ত-বা সেলাই করলেন—কিন্তু দেখা গেল এর পর থেকে ডাক্তারের ব্যাগ দেখলেই রোগী ভয় পায়। এই ভাবটা চিকিৎসার সময়ে তার মনে জেগেছিল এবং সেই সঙ্গে জড়িত হয়েছিল ভয়। এর পর জীবনে অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে এই ব্যাগের ভয়। এটাও ছোটখাটো রকমের 'পাগলামির' পর্যায়ে পড়ে। এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। যেমন, একটা অসং লোক একটি ছেলেকে লুকিয়ে যৌন-প্ররতি চরিতার্থ করতে শেখালে। এখানে যৌন-উত্তেজনা ঐ ছেলেটির মনে 'আবেগ' জাগাল, আর গ্রহণশীল (sensitized) মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে লুকানোর ভাব অঙ্কিত হয়ে রইল। ফলে দাঁড়াল—'kleptomaniac' ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্তেরা পুলিশের চোখের উপর ছাইভস্ম চুরি করে। এইরূপে pyromaniacদের সৃষ্টি হয়—যারা আগুন লাগাতে ভালবাসে।

একটা ছোট ছেলেকে কোনও স্তম্ভের মধ্যে কুকুরের সঙ্গে রেখে দেওয়া হ'ল। এর ফল হবে আশ্চর্য্য। সে কুকুর দেখে ভয় পাবে না—ভয় পাবে স্তম্ভের বা কোনও আবদ্ধ জায়গার। এই রোগকে ডাক্তারী শাস্ত্রে claustrophobia বলা হয়েছে।

কিন্তু পাগলামির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে—স্থির-মস্তিষ্ক লোকের মত পাগলেরও জীবনের

আসল উদ্দেশ্য—আনন্দলাভ। এই আনন্দ অধেষণের উপায় বা পথ সকলের এক নয়, কিন্তু সকলেই এই ‘pleasure principle’ দ্বারা পরিচালিত হয়।

উপরি-উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যে পাগলামির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলিকে মানসিক উৎপীড়নজনিত ‘Leuroses’ বলা যেতে পারে। এগুলি কিন্তু pleasure principle-এর অন্তর্গত নয়; সেইজন্য এই সব রোগীকে পাগলা-গারদে দেখা যায় না। এরা সমাজের ক্ষতি করে না এবং নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারে। যে সব লোককে আমরা পাগল বলি তারা নিজেদের তত্ত্বাবধান নিজেরা করতে পারে না এবং সমাজেরও ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এদের কার্যকলাপ অনেক সময়ই অত্যন্ত চারুসঙ্গত (logical) বলে আমরা মনে করতে পারব—যদি তার পিছনের মূল কারণটা অনুসন্ধান করি।

এইবার আমাদের সুখবাদ (pleasure principle) মতে ফিরে আসতে হবে। তা হলে এদের পাগলামির কারণও বুঝা সহজ হবে আমাদের পক্ষে।

সংসারে আমরা দুঃখকে এড়িয়ে সুখটাকেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। অবশ্য দুঃখ যে আমরা একেবারে বরণ না করি তা নয়—তবে তার পিছনে থাকে একটা ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধা বা গৌরব-লাভের আকাঙ্ক্ষা। তা না হলে দন্ত-চিকিৎসকের চেয়ারে গিয়েও কেউ বসত না—পুলিসের গুলির সামনে ছাত্তেরাও বুক পেতে দাঁড়াতে পারত না।

বাইরের দিকে যে কথা মনের দিকেও তাই। যে চিন্তায় সুখ হয় আমরা সেই চিন্তাই করি। এখানে অবশ্য কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলতে পারেন—আমাদের কতক চিন্তা ত খুব দুঃখজনকও আছে। যেমন ধরুন, কেউ আমাকে অপমান করেছে, আমি সেই কথা ভাবছি, এটাও সুখের চিন্তা নয়।

মনস্তত্ত্ববিৎ বলবেন, হ্যাঁ, এর মধ্যেও সুখ আছে। এই দুঃখের চিন্তার পিছনে আছে প্রতিশোধের চিন্তা—সেটা সুখকর। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সংসার চালাতে আমাদের দুঃখচিন্তার অন্ত ছিল না—কিন্তু এর মধ্যেই ছিল আত্মরক্ষার একটা গৌরব। অবশ্য আমাদের সব চিন্তাই যে সুখের চিন্তা সে বিতর্ক এখানে করা হচ্ছে না, এখানে এইমাত্র বলা হচ্ছে যে, মানুষের দুঃখের চিন্তা ছেড়ে সুখের চিন্তার দিকে একটা ঝোঁক আছে।

তথাকথিত সুখবাদ হচ্ছে পাগলামির রহস্য উদ্ঘাটনের চাবিকাঠি বিশেষ। বন্ধ পাগলদেরও আমরা দেখতে পাই, তারা সুখের চিন্তার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। এই হিসেবে তারা অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ।

একটা পাগলের কথাই ধরা যাক। কোনও ব্যক্তি dementia praecox-এ ভুগছে। এই শ্রেণীর পাগল সারানো খুব শক্ত, এমন কি, এরা সারে না বলেই হয়। এই পাগল ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে থাকবে এবং আপন মনে বিড় বিড় করে কথা বলবে। মাঝে মাঝে এরা হাসবে এবং সংসারের উপর এদের বিশেষ একটা তৃপ্তির ভাব দেখা যাবে।

শ্রী ক্যান্স লিমিটেড

হেড অফিস- ৩/১ ব্যাংকশাল স্ট্রীট • কলিকাতা

ফোন-৩৫০৮-১১২২ • ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট,
বড়বাজার, ল্যানসডাউন, খিদিরপুর, বেহালা,
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার,
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা,
বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্

মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুশীল সেন, বি, এ

কথা বললে সে হয়ত তার কোন উত্তর দেবে না। যদি দেখায় কোন কথা বলে, তা হলে বুঝতে পারবেন, হয়ত তার ধারণা সে কোনও সোনার খনির মালিক, অথবা এমনও হতে পারে স্বয়ং নিজেকে হিটলার বলেই তার বিশ্বাস। শত্রু রাই তাকে আটকে রেখেছে, তুমি যদি তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হও, সে সমগ্র জার্মান রাজ্য তোমাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। আমি একজন পাগলকে দেখেছিলাম, সে নিজেকে ফুড কমিটির সেক্রেটারী মনে করে দিনরাত ভাল ভাল শাড়ী, চিনি, আটা, ঘানির ঝাঁট তেল এই সকলের পারমিট ছাড়ছে।

মনে রাখবেন, এরা কিন্তু প্রকৃতই সুখী। এরা একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস করে। তাদের এই স্বপ্ন কিন্তু আমাদের স্বপ্নের মত নয়—এ স্বপ্ন তাদের নিরতিশয় বাস্তব। এইজন্যই তাদের ব্যাধি ছুরারোগ্য। পাগল হয়ে তারা বেশ আরামেই আছে। এই রকম স্বপ্ন আমরাও যে জেগে জেগে কখনও কখনও না দেখি তা নয়, কিন্তু পার্থক্য এই এবং পরিতাপের বিষয় এই যে—আমাদের স্বপ্ন তাদের স্বপ্নের মত মুহূর্তে ভেঙে যায় কিন্তু এই পাগলদের স্বপ্ন কখনও ভাঙে না।

যে বালক ভাস্কর্যের ব্যাগ কি হুড়ঙ্গ দেখে ভয় পায়, সে কখনও ও-পথ দিয়ে আর যাবে না, কিন্তু এই সব বন্ধ পাগল লক্ষ লক্ষ টাকা, বড় বড় রাজ্য বিলিয়ে দেবে—ছকুম দেবে, বক্তৃতা করবে! এতে তাদের আনন্দ আছে এবং আছে বলেই তারা সেরে ওঠে না, উঠলেও কিছুদিন পরেই আবার পাগল হয়ে যায়।

আমাদের সকলের জীবনেরই একটা না একটা লক্ষ্য আছে। বড় বড় দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সকলেই সুখাশেষী—কেউ চাই ধন, কেউ যশ, কেউ শক্তি এই সব।

পাগলেরা কিন্তু জীবনের এই সমস্তার সমাধান অতি সুন্দর ভাবেই করে বসে আছে। যীশু বলেছিলেন—“The Kingdom of God is within”—অর্থাৎ “ঈশ্বরের রাজ্য তোমার নিজের ভিতরেই আছে”। পাগলেরা তাদের জীবনে এই উক্তি যথার্থ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করে থাকে। অর্থ চাও? জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী তারা। শক্তি চাও? তারা কেউ নেপোলিয়ান, কেউ হিটলার। হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে এরা সোজা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে চায়—পারেন আপনি এতটা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে? আমরা হয়ত তাদের কাণ্ড দেখে হেসে বলব—পাগল!

কিন্তু আমরা কি চাই?—সুখ। পাই কি? বড়জোর কিছু কখনও পাই, তাতে কিন্তু দুঃখ বেড়ে যায়। পাগলকে দেখুন, সে এত আত্মতৃপ্ত যে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে সে তার সময় নষ্ট করতে পর্যন্ত চাইবে না। তাদের মতে, আমরাই এক একটি মহামুর্খ, বন্ধ পাগল।

আমরা সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে খেটে মরি, শেষ জীবনে হয়ত অন্ন-বস্ত্র-তেল-চিনির চেষ্টায় এবং অভাব-অনটন, রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে প্রাণত্যাগ করি। পাগল কিন্তু কখনও কাজকর্ম করে না। এদের শোক-দুঃখ নেই। অধিকাংশ পাগলই আরোগ্য লাভ করে না—কারণ, সে আরোগ্য লাভ করতে চায় না। মনে প্রশ্ন জাগে পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক?

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাশ্চর্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিস্তৃত স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

পুস্তক-পাঠ্য

চুয়াচন্দন—শ্রীশরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৫, বাহুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ছয়টি গল্পের সংগ্রহ। শেষ গল্পটির নামে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে 'চুয়াচন্দন'। ছয়টির মধ্যে ভৌতিক গল্প দুইটি—'রক্ত খোজাত' ও 'মরণ ভোমরা'। 'কর্তার কীর্তি'র মধ্যে কৌতুক আছে। ঐতিহাসিক গল্প লিখিবার প্রথা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, গ্রন্থকার সে প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। যে কল্পনা ইতিহাসকে প্রাণবান করিয়া তোলে শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে কল্পনাশক্তি আছে। 'বাঘের বাচ্ছা'র কিশোর শিবাজীর চিত্র এবং 'রক্ত সন্ধ্যা'র ভাস্কো-ডি-গামার চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শেষোক্ত গল্পে এক জাতিস্বরের মুখ দিয়া কাহিনীটি বর্ণিত। সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প শেষ গল্প। চৈতন্যযুগের ঘটনা। শুধু যুগের নয়, এমন কি, গল্পের মধ্যে ছুঁটির ভীতি স্বরূপ, মানবীয় করুণার উচ্ছলহৃদয়, অল্প বয়সে অপূর্ণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিশোর নিমাই পণ্ডিতের দেখা পাই। প্রচুর আনন্দস্রোতের উপকরণ যোগাইয়া গল্পগুলি পাঠকের পরিতোষ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ইয়োরোপা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ। মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিখ্যাত রতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ রোয়ার, কলিকাতা।

ইয়োরোপার অনেকগুলি প্রবন্ধ যখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার

একাদিক্রমে প্রকাশিত হয় তখন তরুণ লেখকের প্রথম ফসলের রচনা-সম্ভারের মধ্যে শক্তিশালী পাকা হাতের পরিচয় পেয়ে সানন্দ বিশ্বয় অনুভব করেছিল। আজ পুনরায় সমগ্রভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ইয়োরোপা পাঠ করে অনুভব করলাম, বইখানি নিঃসন্দেহ বাংলা সাহিত্যকে বেশ খানিকটা সমৃদ্ধতর করেছে।

ভ্রমণ এবং কাহিনী—উভয়ই যখন ইয়োরোপার আলোচ্য বস্তু, তখন হিসাব-মত বইখানিকে ভ্রমণকাহিনী বললে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, যে অনির্ণেয় তৃতীয় বস্তু ইয়োরোপাকে সাধারণ অর্থের ভ্রমণ-কাহিনীর গোত্র থেকে পৃথক করে নিয়ে গেছে, সেই তৃতীয় বস্তুতেই 'ইউরোপা'র মূল্যের বার আনা অংশ নিহিত। এমন এক নিপুণ অনন্তহলভ কোশল লেখকের অধিকারে আছে, যার দ্বারা তিনি অবলীলার সহিত নিজের চোখ দিয়ে পাঠককে দেখাতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃদয় দিয়ে পাঠককে অনুভব করাতেও জানেন। তার ফলে 'ইয়োরোপা'র ইয়োরোপ তার সকল বস্তুসম্পদ এবং স্বপ্নমারা নিয়ে পরিপূর্ণ সহানুভূতির সহিত পাঠকচক্ষে ধরা দেয়; এবং তারই ফলে লেখকের সহিত চলতে চলতে কখনো আমরা পথ হারাই হাইলাণ্ডসের গভীর অরণ্যানীর মধ্যে, কখনো গুনতে পাই ভোরের স্বাইলার্কের উবা-বন্দনাগীতি, কখনো চোখের সামনে ধেগে ওঠে হানিসাক্ল-হলিহক্-লাইলাক্-ল্যাবার্গামের অপরাধ বর্ণনামা, কানে ভেসে আসে সহস্ররূপকথা-সম্পৃক্ত রাইন নদীর হৃদয় কলতান, কখনো বা বনি প্রিন্স চালি এবং হুম্বল্ডট্ট ব্রুইন মেরি তাদের অপরাধের চমক লাগিয়ে নিমেষের জন্ত চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়; এবং এই সমস্তের মধ্যে

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্বদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :-

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫০০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বদ ও তত্বপরি এই টাকা শেষোক্ত খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষোক্ত ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অগ্রহণপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিকিউরিটি লিমিটেড্

৫১১নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকম্ব"

ফোন ক্যাব ৩৩৮১

অনুভব করি ইয়োরোপের চিত্তের এবং আত্মার সানন্দ স্পন্দন। হতে পারে, 'The light that never was on sea or land,' লেখক তাঁর রচনার মধ্যে সেই আলোকের খানিকটা কিরণপাত করেছেন। কিন্তু ক্ষতি কি তাতে? রসান যদি স্বর্ণকে হালদারতর করে থাকে তাতে আপত্তির কি আছে? যে শ্রদ্ধা এবং আনন্দের দৃষ্টি দিয়ে লেখক ইয়োরোপকে দেখেছেন সেই শ্রদ্ধা এবং আনন্দই এই রসান জুগিয়েছে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অহিংসা ও গান্ধী—শ্রীঅতুল্য ঘোষ। দি ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড; ৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৪৬। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১০৮।

গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আলোচনা কম। লেখক বর্তমান পুস্তিকাখানিতে, ছয় অধ্যায়ে অহিংসা সম্বন্ধে একটি সমগ্র আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যায়গুলির নাম : গান্ধীবাদ, মূলনীতি, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, বিপ্লব ও স্বরাজ ; শেষে একটি নির্ধিক আছে। 'বিপ্লব'-নামক অধ্যায়ে গান্ধীজীর মতবাদের মৌলিকত্ব অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূলনীতি, মূল্যবোধ এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিও ভাল, কেবল সংক্ষিপ্ত করার ফলে হয়ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিষয়টিই কঠিন, ভাষা বা পরিবেশনের দিক দিয়া ক্রটি হয় নাই। সাধারণ পাঠক বইখানির মধ্যে, মতে মিলুক অথবা না

মিলুক, চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাইবেন। পুস্তকে ছাপার তুল আছে, এ সম্বন্ধে আগামী সংস্করণে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

যৌন প্রবৃত্তি ও যৌন তৃপ্তি—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। আর, এন, এণ্ড কোম্পানী; মালাকার-টোলা, ঢাকা। পৃঃ ২৫৬। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে যে দুই একখানা বই নজরে পড়িয়াছে তাহাতে যৌন-বহু সম্পর্কে সামান্য কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা থাকিলেও যোটের উপর সেগুলিকে কতকটা 'পোর্নোগ্রাফি'র সামিল বলিয়াই মনে হয়। এই সকল পুস্তকে যৌন-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্য এবং যৌন-পরিতৃপ্তির বিভিন্ন উপায় বা বিভিন্ন বিকৃত ঘটনার যে সকল বিবরণ থাকে, সেগুলিকে জানিবার আগ্রহেই অনেকে, বিশেষ ভাবে তরুণ-তরুণীরা, আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বেশী। কিন্তু যৌন-তত্ত্ব বা যৌন-বিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য ইহা নহে। সমাজ-জীবনের সুস্থতা বিধান এবং ব্যক্তিগত ভাবে দৈহিক ও মানসিক উৎসর্গসাধনে সহায়তা করিতে হইলে কতকগুলি বিকৃত যৌন-ঘটনা বা যৌন-তৃপ্তির বিচিত্র উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন—“সমাজে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় যৌন-ক্ষুধা বিপথে ধাবিত হইয়া উহার তৃপ্তি খুঁজিয়া

নবযুগের দৃষ্টি ও সৃষ্টির পরিচয়

এঙ্গেলসের

সমাজতত্ত্ববাদ—

কম্পনা মূলক ও বিজ্ঞান মূলক ৬০/০

অনুবাদক—রেবতী বর্মা

মার্ক্সবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মার্ক্সবাদী বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাত্র অপরিহার্য।

লেনিনের

গ্রামের গরীবদের প্রতি ১

বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনূদিত

কৃষকের সংগঠন ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তিশালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য। লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তার জন্তে একমাত্র সহায়।

বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হয়েছে ৮০ লক্ষ খানি—

তিন অব ক্যাটারবেরির সেই বই অবলম্বনে—

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা

সোভিয়েট ছুনিয়া ২০/০

রাশিয়া সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

অর্থনীতির গোড়ার কথা ১০

বাংলার বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক রেবতী বর্মণের এই বইখানি মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক—যার, অভাব এতদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক

অমিত সেনের

ইতিহাসের ধারা ১০

আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংলা ভাষায় একমাত্র মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ।

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

সুধাংশু দাশগুপ্তের

বিপ্লবী চীন ১

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকোশলের সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। লেখক আধুনিক চীন-ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র।

আনিব
আলফের
আকর্ষণ

স্বাস্থ্যোজ্জ্বা কেস তৈল

অনুগ্রহ কোমিক্যালঃ কলিকাতা



MAKANDA

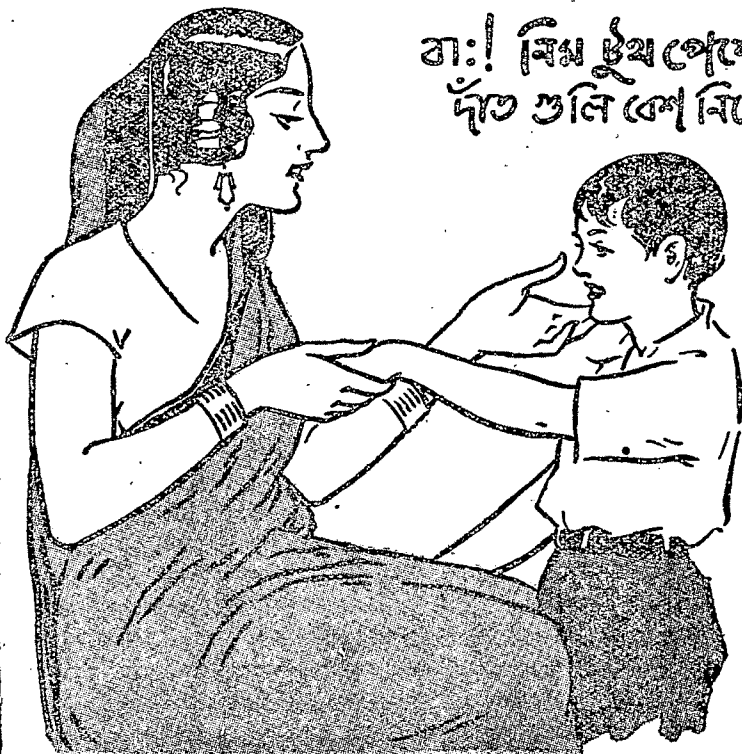
বেড়ায়। বালক ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাহার মনে যৌন-ইচ্ছার উদ্ভব হয় তখন সে ইচ্ছার স্বাভাবিক তৃপ্তির কোন উপায় না দেখিয়া...ইত্যাদি।" কিন্তু বর্তমান আর্থিক, সামাজিক এবং অজ্ঞান সমস্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের কোন উপায় বা ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, জন্ম-নিরোধক উপায়সমূহ অবগত হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান অবস্থা বিবেচনার একমুখী আশঙ্কা করিবার সম্ভব কারণ আছে। এইজন্যই বৈজ্ঞানিক আলোচনার নামে বর্তমানে যে ধরণে যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে তাহার সহায়তার অধিকারী, অনধিকারী নির্বিশেষে ব্যাপক ক্ষেত্রে যৌন-শিক্ষার প্রচলন সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ জীবন-বিজ্ঞান এবং যৌন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার পরিপূরক হিসাবে অথবা এই সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে, প্রমাণ-স্বরূপ যৌন ব্যাপারের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি পরিবেশন করিলে অন্ততঃ বর্তমান অবস্থায় যৌন-বিজ্ঞান আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এই হিসাবে আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধে ভাল-মন্দ উভয় দিকের কথাই বলিবার আছে। তবে বইখানির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ে যৌন-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তু অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। সাধারণের অজ্ঞাত অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্বাহুসন্ধিষ্ম

পাঠক বইখানি পড়িয়া যৌন-সম্পর্কিত অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

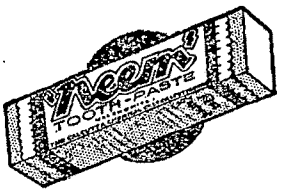
নতুন দিনের কাহিনী—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ণাঙ্গা গি:
পি ১৩, গণেশচন্দ্র এডিটরা। দাম দুই টাকা।

নতুন দিনের মানুষেরা সম্ভবতঃ হুকেমল বৃত্তির ভাবে অবনমিত নয়। স্বপ্ন, কল্পনা বা উচ্ছ্বাসের প্রাধিক্যে এযুগের কাহিনীও অনুরঞ্জিত নয়। এ যুগে বাহিরের বিশ্ব গৃহের সীমানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; হুতরাং কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সেহ প্রেম লইয়া বিলাস করিবার অবসর আজিকার দিনের নরনারীদের অত্যন্ত। প্রথম খণ্ডের কয়েকটি গল্পে এমনই বাস্তবানুগতোর পরিচয় পাওয়া যায়। সরল আবেগবর্জিত প্রকাশভঙ্গী মৌজা মনের পর্দার আসিয়া আঘাত করে। যদিও পুরাতন-অনুরাগী মনকে এই কাহিনীগুলি কতখানি অভিভূত করিবে তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীগুলির মধ্যে লেখকের কবি-মন নিলিপ্ত থাকিতে পারে নাই। প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া মানব-মনের আশ্রয় বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি কাহিনীকে রসসিক্ত ও মধুর করিয়াছে। লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতি কাব্যিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াছে। প্রথম হইতে পারে—বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করিয়া লেখক যদি কাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান তবে গল্পের রস ক্ষুর হয় কিনা। প্রথম যাহাই হোক একথা সত্য যে, গল্পের মূল্য শুধু ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নহে—প্রকাশভঙ্গীও সে মূল্যের অঙ্গীকার। এই কাহিনীগুলি স্বপ্ন-বিলাসবর্জিত না হইলেও ভাবার সৌকুমার্য্যে সাহিত্য-রসপিপাসুদের চিত্তরঞ্জন করিবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।



মাঃ! নিম টুথপেস্টের গুণে খোবনের
দাঁত গুলি বেশ নির্দোষ হ'য়ে উঠেছে দেখাচ্ছি!

ক্যালকেমিকোর 'নিম
টুথপেস্ট' আর নিমের গুঁড়া
মাজন 'মার্গেফ্রিন' সকল
বয়সেই দাঁতগুলিকে বেশ
মজবুদ ও উজ্জল করে রাখে।



ক্যালকাটা
কোমিক্যাল

নব জাতক—শ্রীহুমায় রায়। শ্রীশঙ্কর মাইত্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ আনা।

এই সংগ্রহের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস ও চারটি গল্প আছে। গল্পগুলি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। প্রত্যেকটির মধ্যে টাইপ স্ট্রিকের চেষ্টা প্রশংসনীয়, গ্রাম্য পরিবেশেও কৃত্রিমতা নাই। বিশেষ করিয়া 'হেড-মাস্টার' গল্পের ক্ষুদ্র জ্ঞানে পল্লী-পলিটিং-অভিজ্ঞ যে চুনোপুটিগুলি ধরা পড়িয়াছে সেগুলির আকৃতি-শ্রুতি আমরা ভাল করিয়াই জানি। ক্ষুদ্র উপন্যাসখানির (বড় গল্প বলাই সম্ভব) বিষয়বস্তু নির্বাচন ভালই হইয়াছে, কিন্তু ভাষার আড়ষ্টতা ও প্রকাশভঙ্গীর দৈন্ত কাহিনীটিকে রসোত্তীর্ণ হইতে দেয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ—১ম ভাগ (প্রাচ্যবাহী প্রবন্ধাবলী চতুর্থ খণ্ড)। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৩৫৩। পৃ. ১৩২। মূল্য ১।

আলোচ্য পুস্তকখানি সমরোপযোগী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে নবীনচন্দ্রের অনেকগুলি অপ্রকাশিত রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, এক্ষণে সম্পাদক আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারেন।

এই পুস্তকে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ সম্মিলিত হইয়াছে তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হুমুয়ার সেনের "নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ" প্রবন্ধটি ইহার গুণাপকর্ষণ করিয়াছে। ইহা আলোচ্য পুস্তকে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। হুমুয়ারবাবু তাহার প্রবন্ধের হৃদয় লিখিতেছেন—

"নবীনচন্দ্র সেনের পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আসলে ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। কাব্যটি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গপত্রের শেষে তারিখ পাই ১৮৮২ সালের মাঘ মাসের। সুতরাং ইহা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।" (পৃ. ১১৮)

লেখক বাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য নহে। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'র প্রথম সংস্করণের পুস্তকের উৎসর্গপত্রের তারিখ—"১লা বৈশাখ ১২৮২" (অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৭৫), অথচ ডক্টর সেন বলিতেছেন—মাঘ, ১২৮২ (ইং ১৮৭৬)। প্রথম সংস্করণের পুস্তক না দেখার ফলেই 'পলাশির যুদ্ধ'র প্রকাশকাল সম্বন্ধে লেখক এইরূপ মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছেন! 'পলাশির যুদ্ধ' যদি ১২৮২ সালের মাঘ মাসে (ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা ১২৮২ সালের

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'আর্যদর্শনে', আষাঢ় মাসের 'জ্ঞানাসুন্দরে' ও কার্তিক মাসের 'বঙ্গদর্শনে'—অর্থাৎ পুস্তক প্রকাশের অনেক পূর্বেই—কেমন করিয়া প্রকাশিত হয়? গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরিও 'পলাশির যুদ্ধ'র প্রকাশকাল—১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হুমুয়ার বাবুর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত তারিখের প্রতি উদাসীন্ত লক্ষ্য করিয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন : "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' কবিতায় (১৮৬৯) দেশ-প্রেমের উদ্দীপনা জন্মিয়া উঠিল।" আমরা জানি, হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" ৭ শ্রাবণ ১২৭৭ (অর্থাৎ ১৮৭০) তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম প্রকাশিত হয় ও ঐ বৎসরেই প্রকাশিত ১ম ভাগ 'কবিতাবলী'তে সম্মিলিত হয়।

পুস্তকে নবীনচন্দ্রের চিত্র দুইখানি আশাস্বরূপ মুদ্রিত হয় নাই। মুদ্রাকর-প্রমাদেরও প্রাচুর্য্য আছে।

নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই হলিখিত।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালচক্র—শ্রীশান্তোষ মুখোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২, বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। ২১০ পৃ., মূল্য—তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিকে 'উদয়ের পথে'র স-গোত্র বলা যাইতে পারে। চরিত্র-অঙ্কন, সংলাপ, স্পষ্টবাদিতা, কাব্য-কৌলীশ্বকে আদর্শবাদের নিকট হের প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি যে সকল গুণে 'উদয়ের পথে' সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছে—সেই সকল গুণের অমূল্যবলি আলোচ্য উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া গ্রন্থখানি চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। নিজের মূল্যায়না দেখাইতে গিয়া লেখক মাঝে মাঝে যে নান্দিত্যবৃত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত এবং রস ও প্রসাদ-গুণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বানান সম্বন্ধে, লেখক সর্বদা সতর্ক নন—যেমন—'দারিদ্র', 'স্বাতন্ত্র্য', 'ভাণ'—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে উদ্ভট বাক্যাংশও চোখে পড়ে—যেমন 'পার্থর লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য'—৬৮ পৃ।

শ্রীতারাপদ রাহা

ধন-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র সমাদার, এম. এ। গোল্ড কুইন এণ্ড কোং লিঃ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৪৭, মূল্য—৮০

বিনামূল্যে কোণী প্রাপ্ত হই

ফল বিচারের জন্ত মাত্র ২ লওয়া হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র যে কত বড় সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত এত স্বল্প পারিশ্রমিকে জনসাধারণকে সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে এক লক্ষ কোণীর অর্ডার হইয়াছে। আপনার জন্মসময় ঠিক থাকিলে ফল শতকরা একশোটাই মিলিবার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। না মিলিলে টাকা অবশ্য ফেরৎ পাইবেন। আজই জন্ম-সময়-তারিখ-স্থান পাঠান। সম্পূর্ণ অভিনব বিজ্ঞানসম্মত অব্যর্থ প্রথা। সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিপ্রাপ্ত জ্যোতিষী ও তাত্ত্বিক অধ্যাপক এন. চক্রবর্তী, এম.এ., পি.এচ.ডি. (পিএল.ডি), সিদ্ধান্তজ্যোতির্বিদ, রাজবৈজ্ঞ, ৬৬ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। [অন্তান্ত ফি:—হাত দেখা বা কোণীবিচার—সাধারণ ৪০, বিস্তৃত ১৬০, বিশেষ ৬৪০, কোণী বা কালি দিয়া হাতের স্পষ্ট ছাপ (বয়স সহ) পাঠান। বিচার ভিঃ পিঃতে যাইবে। ঘোটক বিচার বা প্রহ্ম গণনা (প্রতি প্রশ্ন) ৪০, বর্ষফল—১২৮০ টাকা।]

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার দশটি অধ্যায়ে লেখক সরল ভাষায় অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি আলোচনা করিয়াছেন। ধন উৎপাদনের সংজ্ঞা ও সূত্রগুলি, বাজার ও মূলনীতি, জাতীয় সম্পদ এবং অজ্ঞাত সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ধন-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় তরুণ বিদ্যার্থীদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বড়ই ছাষের বিষয় এই যে, বঙ্গ ভাষা নানাদিকে সমৃদ্ধিশালী হইলেও সাহিত্যের এই শাখা আজও যথেষ্ট পুষ্টি হয় নাই। বলিতে কি, ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কলেজে পড়াইবার মত একখানি বইও আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখা হয় নাই, যদিও হিন্দী ভাষায় এরূপ কয়েকখানি পুস্তক বিশিষ্ট দেখকরণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উর্দ্ধে শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ভারতে যত্নাচ্ছ বিদ্যাবিদ্যালয় এ বিষয়ে আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া বাইতেছে।

ধনবিজ্ঞান ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে না পড়িয়া মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান্যাসে জ্ঞান লাভ হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য পুস্তক এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক হইবে। ছাত্রসমাজে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

এই বিংশ শতাব্দী—শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী। আও-
তোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১০।

এই ষ্টামার, এম্বোয়েন্স ও রেডিও টেলিগ্রাফের যুগে পৃথিবীর

কোন দেশই আজ একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে পারে না। জগতের এক প্রান্তে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইলে সারা পৃথিবীতে তাহার প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন অনুভূত হইবে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এই সকল বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আজিকার দুনিয়ার চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে। এইজন্ত রাজনীতি-বিষয়ক একটা মোটামুটি জ্ঞান কিশোরদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলা বাইতে পারে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জগৎ কে'ন' পথে' (১ম সং) ইতিপূর্বে প্রমাণ করিয়াছে যে, জগতের প্রধান দেশগুলির প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলি গহজবোধ্য ভাবে ছেলেদের জন্য লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার আদর হইবে। এই পুস্তকেও গ্রন্থকার সেই পথ অনুসরণ করিয়া কয়েকটি সুচিন্তিত অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীর জগতের বর্তমান প্রতিকৃতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি ভুল খসড়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সহজ সরল ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে বইটি গল্পের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। গান্ধী, ষ্টালিন, ক্রজভেট, চিয়াং কাইশেক, হিরোহিতো, মুসোলিনী ও হিটলারের কয়েকখানি সুন্দর প্রতিলিপি ও সুন্দর ছাপা কাগজ বাঁধাই পুস্তকের দোঁঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া, তিলুড়িতে সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শ্রীযুক্ত স্বধাণ্ডকুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে হৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। "মধুসূদন" মণ্ডপ ও বিভিন্ন তোরণসমূহ সম্মেলনের দোঁঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সম্ভ্রুতি সেনভূমে সেনভূম সাহিত্য-পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া নিখিল-বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলন

বিগত ১১ই ও ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস চিত্র-মন্দির হলে নিখিল বঙ্গীয় প্রেস রিপোর্টার্স সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারাগতি সামন্ত অম্বার্না সমিতির সভাপতির পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনাট্যবৎ বেশ স্ফুটিত ও সমরোপযোগী হইয়াছিল।

ডাকারেরা বলেন

ব্রাদ-ভিটা

সর্বজনীনতা ও সমাজনীতিতে কোন বিপ্লব আদর্শটিকেই বড় করে

সর্বজনীন মনুষ্য বাস্তব

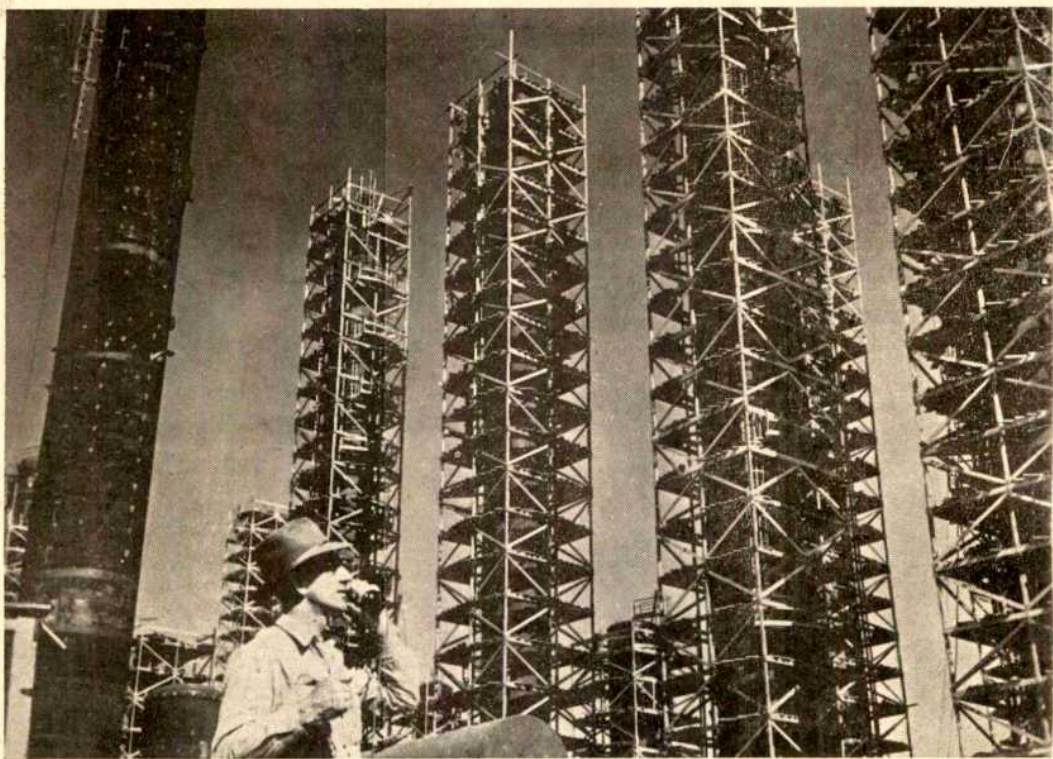
মেডিকেল রিসার্চ লেবোরেটরি

নিউজ, প্রেস, এডমিনিষ্ট্রেশন, কলিকাতা

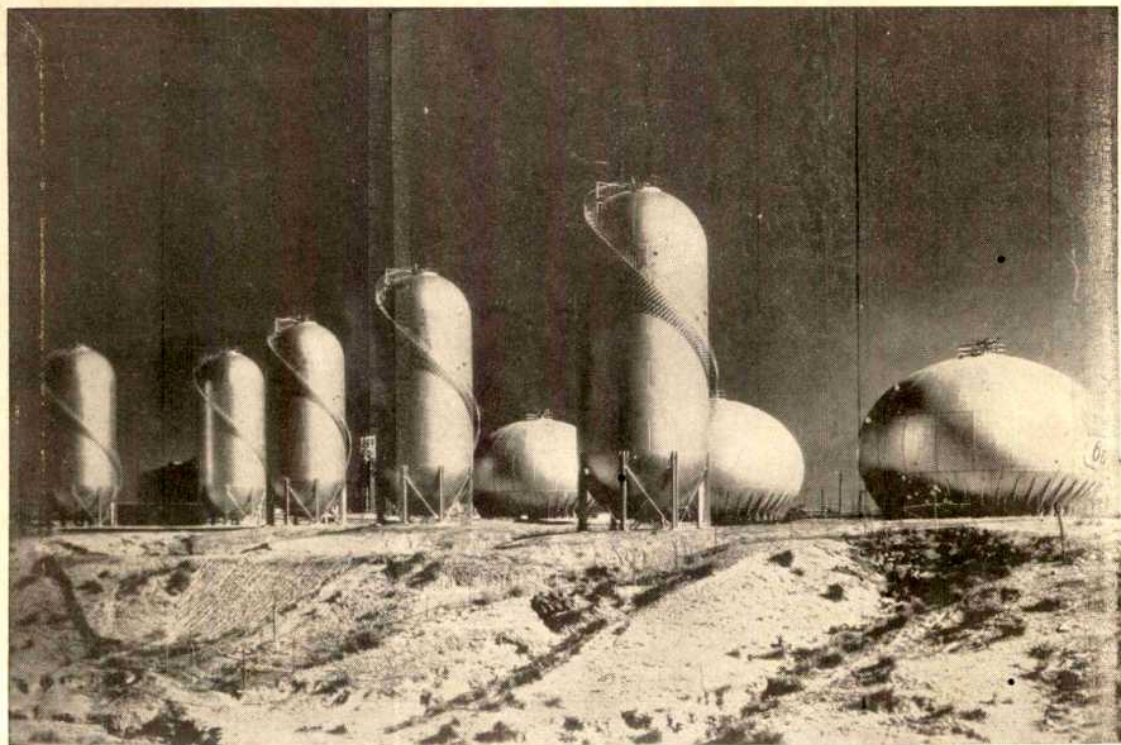


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীরাধা
শ্রীনিশীথকুমার মজুমদার



টেম্পাস গ্রেটে অপরিষ্কৃত তৈল হইতে সিনথেটিক রবার তৈরি করিবার যন্ত্রের কতকগুলি অত্যুচ্চ বুরুজ



আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি তৈল-কোম্পানীতে কতকগুলি অদ্ভুত আকারের ট্যাঙ্ক ।
এগুলিতে পরিষ্কৃত তৈল সঞ্চিত রাখা হয়

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাংলা ও বাঙালী ভারতের শীর্ষে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল সেখানে কেবলমাত্র তাঁহার শূভ আসন পড়িয়া আছে, সে আসনে বসিবার যোগ্য ব্যক্তি কত শতাব্দী পরে আসিবে জানি না। যে উন্নতশির জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি মহাপুরুষ বাঙালীর গৌরব, মান, সম্মান, বিজ্ঞানবুদ্ধির রক্তোজ্জ্বল আধার ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনের পর আজ এ দেশের জনসাধারণ সত্য সত্যই “গত গৌরব, হত আসন, নত মন্তক লাজে”, জগতে তাহার আত্মগরিমা বা প্লাধার কারণ আর কিছুই নাই। আজ বাঙালী স্বল্পতার অভিশাপে অভিশপ্ত, সকল দিকেই তাঁহার পুঞ্জি কমিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ এখন মেকির ও ফাঁকির লীলাভূমি।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্ত আবেদন-নিবেদন চলিতেছে। স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন আর যাহার হউক রবীন্দ্রনাথের নহে। সাহিত্যে, দর্শনে, নাট্যে, গীতে, ললিতকলায় এবং মানব সমাজের সংস্কৃতির জীবনায় প্রবাহে তাঁহার অরূপম শত-মুখী প্রতিভা যে নূতন জীবনের বিশাল উৎস যোগ করিয়া দিয়াছে তাহার ধরস্রোত বাঙালী ও বাংলা ভাষা যত দিন আছে তত দিন থাকিবেই। আমাদের চেষ্টিত থাকা উচিত সেই প্রবাহপথ সরল রাখিতে, উৎসের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, আবর্জনা দূর করিয়া নিজেদের প্রগতির পথ মুক্ত রাখিতে।

প্রগতির পথে রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষা। তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল যে ঐ মন্ত্রেই জাতির মধ্যে নবজীবন-নব-জাগরণের বোধন হইবে। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়া গিয়া-

ছিলেন যে ঐ শিক্ষার বজ্রে বলীয়ান হইয়াই পাশ্চাত্য জগৎ তাহার আদিম অন্ধকার ও অসভ্যতা দূর করিয়া সংস্কৃতির পথে উদ্ভাবণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রুশ দেশবাসী তাহাদের তমসাজ্জম ভবিষ্যৎকে জ্যোতির্ময় করিতে চেষ্টিত ঐ এক ইষ্ট মন্ত্রের বলে। তাঁহার নিজের পিতৃভূমির জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন কতটা সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবেই “রাশিয়ার চিঠি”তে লিখিয়াছিলেন :

“আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু ছুঃখ আজ অভ্যেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।”

ইউরোপীয়দিগের উন্নতির সম্পর্কে এখানেই তিনি বলিয়াছেন :

“ওরা একদিন জাইনী ব’লে নিরপরাধকে গুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ ব’লে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে গীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব ক’রে রেখেছে এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা শুপাকার ক’রে তোলা যায়—এ সমস্ত দূর হ’ল কী করে? বাইরের কার কোন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি, একটি মাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।”

“জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ক’রে

দিয়েছে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছে; বর্তমান তুরষ্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মাত্মতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা যেরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি, যে আলোতে আজকের পৃথিবী জ্বলে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধদ্বারের বাইরে।"

শিক্ষার অভাবে চীন দেশের কি হইয়াছিল সে বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আজকের ভারতের আসন্ন সমস্তার ছবি :

"সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অগ্রবুদ্ধ। তাই দেখি ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রাপ্তির ছরাশায় সেখানে কয়েক জন লোক লোকের হানাহানি কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী ছুরাকাজীদের হাতে তাদের নির্যাতন চৈকাবে কিসে। সে অবস্থায় তারা ক্ষমতালোভের স্বার্থসাধনের উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণদশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করেছিলে সেই পরের উপকরণদশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মুচ, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্তৃত্বে আত্মবান নয়।"

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা লেখনীবদ্ধ হইয়া থাকে নাই ইহা সর্বজন-বিদিত। অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা মনে লইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞা-আয়তনের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিশ্ব-মানবের নিকট প্রকৃত শিক্ষার ব্যবহার একটি বাস্তব পরিচয় দিবার জন্ত ঐ শিক্ষা-আয়তন বর্ধিত করিয়া, বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়া, তাহার পুষ্টি এবং সংস্থানের জন্য তাঁহার শেষজীবনের শক্তিসামর্থ্য কি ভাবে তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত, রোগক্রিষ্ট, ঋণভারপ্রাপ্তিত্বরূপের দৈনন্দিন দুঃখময় জীবনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাহাদেরই উন্নতি কামনায় তিনি ত্রীনিকেতনের স্থাপনা করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানের জন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিলেন এবং এই দুই শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের শেষসীমা পর্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন ইহাও সকলেই জানে।

অতএব যদি তাঁহার স্মৃতিরক্ষা অর্থে তাঁহার আদর্শ উজ্জ্বল এবং তাঁহার কীর্তি অম্লান রাখাই বুঝায়, তবে ভারতের জনসাধারণের উচিত প্রথমে ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের জীর্ণ-সংস্কার, ত্রীমুদ্রি এবং সংরক্ষণ। জীর্ণ-সংস্কার অর্থে এখানে ইট-পাথর চূর্ণ-সিমেন্টের কথা বলা হইতেছে না। উহার অর্থ ঐ দুই প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার দোষে বা অভাবে যে সকল আবর্জনা জমিয়া উহাদের ক্রমে অচল করিয়া আনিতেছে এবং ধরদৃষ্টি অধ্যক্ষের অভাবে ঐ শিক্ষায়তনগুলির কার্যক্রমের মধ্যে যে

সকল আগাছার সৃষ্টি হইয়া বুনিয়াদে ফাটল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার সংস্কার। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, নূতন সম্মার্জনীতে পরিকৃতি সম্পূর্ণ হয়। বিশ্বভারতীতে অর্থের অভাব নিদারুণ সন্দেহ নাই এবং অর্থের অভাবে রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত শিক্ষক ও সহকর্মী রাখিতে পারেন নাই ইহাও সত্য। বিশ্বভারতী ও ত্রীনিকেতনের অভাব পূরণের পক্ষে তেরো বা চৌদ্দ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে ইহাও বলা বাহুল্য। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা না হইলে উহার দশ গুণ টাকাও যথেষ্ট হইবে না এবং অল্প দিকে সভাগ রক্ষক-সভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নূতন উত্তমে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মূর্ত ও জাগ্রত করিতে প্রযুক্ত হইলে যে টাকা উঠিয়াছে তাহা কার্যারম্ভের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের মনে হয় এখন একথা বলিবার সময় আসিয়াছে যে স্মৃতিরক্ষা তহবিলের টাকা কি কাজে লাগান হইবে, তাহার রক্ষক-সভায় (ট্রিষ্টেবোর্ড) থাকিবেন কে কে এবং তাঁহার অধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন কি ভাবে। আমাদের বিশ্বাস আছে যে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলে ভারতের জনসাধারণ যথাসাধ্য অর্থদানে কার্পণ্য করিবে না।

লীগ ও কংগ্রেস

লীগ মন্ত্রী-মিশনের মূল প্রস্তাব এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কীয় প্রস্তাব এই দুইকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যানের সভায় এবং তাহার পরে নানা প্রকার গরম-গরম বক্তৃতা-উচ্ছ্বাস ও বাহ্যিকফোট হইয়াছে। সকলের ভিতরেই এক অসারতা ও অবাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অনুযোগ অভিযোগ এবং অভিনয়ের ভিতরে যে মূল উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা অতি সুস্পষ্ট। লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ এক শ্রেণীর লোক বিনা পরিশ্রমে, বিনা ত্যাগে বা চেষ্টায়, কেবলমাত্র ভারতের স্বাভাব্য ও জাতীয়তাবাদের প্রতিকূল আচরণ করিয়া, পরের অর্জিত ধন ও অধিকারের গরিষ্ঠ অংশ অন্ময় ভাবে পাইয়া আসিয়াছে। লীগের লালন-পালন ও পোষণ ঐ সাম্রাজ্যবাদীর হস্তেই হইয়াছে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতি অনুসারে লীগকে এ দেশের শাসক ও শোষকবর্গ পোষণপুত্র রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কংগ্রেস একাধিকবার এই পোষণপুত্রের অন্ময় আকারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য দিয়াছে। ফলে লীগ ক্রমেই পুষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্ময় অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার লালসাও সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ আজ পাট গুটাইতেছে, স্মরণ্য লীগ এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অন্ময় অধিকারগুলি কায়ম রাখিবার চেষ্টায়। তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতের শোষকবর্গ এবং তাহাদের সহায়ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজকর্মচারী

দল। মাঝে সে দল নিরাশ হইয়া পড়ে মন্ত্রী-মিশনের স্পষ্ট প্রস্তাবে। তাহার পর শেষ চেষ্টা চলে—মন্ত্রী-মিশনের অন-
 ডিজতার অবকাশে—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্পর্কিত
 চক্রান্তে। কংগ্রেস সে ফাঁদে পড়িতে অস্বীকার করায় লীগ-
 দল ও তাহাদের পোষকগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কেননা,
 চক্রান্তে ঠিক হইয়াছিল যে যদি কংগ্রেস ফাঁদে পড়ে উভয় কণা,
 কেননা, তাহা হইলে সে নিজের গলায় নিজেই ফাঁস পরিয়া
 আসিবে। যদি সে আসিতে অস্বীকার করে তবে তাহাকে
 পুনর্বার বনবাসে পাঠাইয়া পূর্ববৎ শোষণ-তোষকের রামরাজ্য
 কামেম থাকিবে। মন্ত্রী-মিশনের দল ফাঁকি ধরিয়া ফেলায় সে
 স্রাশাও ব্যর্থ হইল। বাকী রহিল বাহ্যাকাংক্ষা এবং দেশে
 মাৎস্যজ্ঞানের বড়া বহাইবার ভয় প্রদর্শন।

কংগ্রেসের সম্মুখে অত্যন্ত দুর্লভ দীর্ঘ পথ রহিয়াছে। যে
 ভাবে এদেশ আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ শাসিত হইয়াছে তাহাতে
 রাষ্ট্র চাঙ্গনার অন্তরায় প্রতিপদেই জুটবে। ঘৃণ, অত্যাচার
 অনাচার ও দমননীতি যে দেশে এত দিন নির্বিবাদে চলিয়াছে,
 সে দেশের শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনা সাধারণ ভাবেই অতি
 কঠিন। উপরন্তু এক দল লোক যদি সম্ভবত ভাবে অরাজকতা
 —করিবার চেষ্টা করে তবে অবস্থা কঠিনতর হইতে পারে। কিন্তু
 কংগ্রেসকে এই অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেই হইবে নহিলে
 জাতীয়তাবাদের ও স্বাভাবিক সকল সিদ্ধান্ত ও সমস্ত আশা-
 ভরসা চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবে। জগতের অধি-
 কাংশ দেশ বিগত দুই দশকের মধ্যে যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া
 গিয়াছে তাহার তুলনায় ভারতে কিছুই হয় নাই। সুতরাং
 এই পরীক্ষা আমাদের স্বাধীনতার যোগ্যতার পরীক্ষা বলিয়াই
 গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া দিবাসরাত্রে দিন
 কাটাইলে সর্বনাশ অনিবার্য।

কংগ্রেস দেশের নেতৃগণ গ্রহণে সক্ষম এ বিষয়ে সন্দেহের
 অবকাশ নাই। কেননা, ১৯৪২ সালের ভারতের নেতৃগণ
 জনতা কংগ্রেসের উপর তাহাদের যে আস্থা ও বিশ্বাসের
 পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে বহু দূর দেশের চিন্তাশীল সমাজেও
 এদেশ সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়। আজ নেতৃবর্গের
 উপস্থিতিতে তাহারা সে আস্থা আরও অটল ভাবে রাখিতে
 পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত দেশের শতকরা ৮০ জন
 যদি কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস অটল রাখিয়া দুর্গম পথে
 চলিতে প্রস্তুত থাকে তবে ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ
 কোথায়? কংগ্রেসের নীতি অহিংসার ভিত্তির উপর
 স্থাপিত, সুতরাং অত্যাচার বা অরাজকতা স্বপ্নের মূলে অস্ত
 পক্ষেরই মৌল আনা হাত থাকিতে বাধ্য। এখন সমাজ
 এই যে ঐক্য অবস্থার সম্মুখীন হইলে কংগ্রেসের কতব্য কি?
 দেশ-শাসন ও বিদেশী-বিদায় এখন দুইই এক হইয়া দাঁড়াই-
 তেছে, কেননা দেশ-শাসনে কৃতকার্য না হইলে বিদেশী বিদায়

লাইবে না। লীগ যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে ব্রিটিশের হস্তে
 রাজদণ্ড থাকিয়াই যাইবে।

বাংলার বাজেট

বাংলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডল কার্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথম
 বাজেট পেশ করিয়াছেন। উহা লইয়া ব্যবস্থা-পরিষদে
 আলোচনা চলিতেছে। বাজেট দ্বারা রচনা করিয়াছেন
 তাহাদের মধ্যে নূতন লোক হয়ত অনেকে আছেন, কিন্তু দল
 হিসাবে উহা একই। ইংরেজ-ভোটের সহায়তায় যে লীগ দল
 বাংলার রাজস্ব লইয়া এত দিন চূড়ান্ত বেহিসাবের পরিচয় দিয়া-
 ছেন, বর্তমান বাজেটেও তাহারই সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে।
 অনাবশ্যক ব্যয় বৃদ্ধি, অযথা নূতন ব্যয়ের ব্যবস্থা, ব্যয় সঙ্কোচে
 অনিচ্ছা এবারকার বাজেটেরও প্রধান লক্ষণ। অধিকন্তু এবার
 প্রদেশের উন্নতিসাধনের নামে সাড়ে দশ কোটি টাকা বরাদ্দ
 করা হইয়াছে এবং যে ভাবে উহা ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে
 তাহাতে মনে হয় উহার অধিকাংশ অর্থেরই পূর্ববৎ অসদ্ব্যয়
 এবং অপচয় ঘটিবে।

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার বাজেটে ঘাটতির বহর
 দেখিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে বাংলা বৃষ্টি দেউলিয়া দেশ।
 এবারও যথারীতি দশ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। যে
 প্রদেশে প্রতি বৎসর উদ্ভূত রাজস্ব থাকার কথা, যেখানে কর-
 ভার অনেক কমান সম্ভব, যেখানে সেলস-ট্যাক্সের দ্বায়
 বিরক্তিকর এবং উৎপীড়নমূলক ট্যাক্স অনায়াসে তুলিয়া দেওয়া
 যায়, সেখানে লীগ সিভিলিয়ান স্বতসাক্ষাইয়ের ফলে বাংলা
 দেশ চিরদারিদ্র্যে ভুগিয়াছে, প্রতি বৎসর বিরাট ঘাটতির
 বোকা ঘাড়ে লইয়া অনাবশ্যক করের টাকা গনিয়া দেওয়াই
 তাহার নিয়তি।

এবারকার রাজস্ব আদায় হইবে ৩২ কোটি এবং দেশ-
 শাসনে ব্যয় হইবে ৪২ কোটি টাকা। ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে
 সিভিল সাপ্লাই প্রভৃতি সাময়িক বিভাগ ও চাউলের কারবারে
 লোকসান প্রভৃতি বাবদ ১০ কোটি টাকা ধরা আছে। সুতরাং
 স্বাভাবিক অবস্থায় এই সব উপ-বিভাগ ও সরকারী অব্যবসায়
 উঠিয়া গেলে পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও
 বাংলার আয়ব্যয় সমান সমান হইবে। এই ব্যয়বরাদ্দের
 মধ্যে মাগ-গি-ভাতার অল্প কম বিরাট নয়; স্বাভাবিক অবস্থায়
 এই সব সাময়িক ভাতা এবং অধিক ফসল বৃদ্ধির নামে কৃষি
 বিভাগের অপচয় প্রভৃতি বন্ধ হইলে প্রতি বৎসর বাংলার প্রচুর
 অর্থ উদ্ভূত থাকিবে। সেলস-ট্যাক্স তুলিয়া দিলেও বেশী টাকা
 থাকিবে।

অনাবশ্যক ব্যয় কি ভাবে করা হইতেছে তাহার কিছু কিছু
 নিদর্শন দেওয়া গেল। প্রথমেই ধরিতে হয় গবর্ণরের খরচ।
 একটি মাত্র লোকের জন্ত এই বিপুল ব্যয় দরিদ্র দেশ বহন

করিতে পারে না, করা উচিতও নয়। প্রতি বৎসর গবর্ণরের জন্ত যে সব ব্যয়বরাদ্দ করা হয় তার অনেকগুলি অনাবশ্যক বলিয়া বুঝা গেলেও উহার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, পরিষদের সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার পর্যন্ত সদস্যদের নাই। গবর্ণরের ব্যয়ের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল :

বেতন	১,২০,০০০
ভাতা	২৫,০০০
মিলিটারী সেক্রেটারীর দপ্তর—(১জন মিলিটারী সেক্রেটারী, ৫ জন এডিকং, ৮ জন কেরাণী, ৩৪ জন চাপরাসী এবং আপিস খরচ ইত্যাদি)	১,৩৫,২০০
ডাক্তারের দপ্তর—(১ জন সার্জন, ১ জন মিলিটারী এসিস্ট্যান্ট সার্জন, ১ জন সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জন, ১ জন কম্পাউণ্ডার, ৪ জন চাপরাসী এবং ঔষধপত্র ইত্যাদি)	১৭,৮০০
ব্যাণ্ড	৫০,০০০
দেহরক্ষী	১,৪৮,৪০০
আসবাবপত্র এবং কার্পেট	১২,৪০০
পর্দা ও টেবিল ঢাকনি	৭,৫০০
পুরাতন আসবাবপত্র ও কার্পেট বাতিল করিয়া নূতন ক্রয়	২০,০০০
অত্যন্ত সরঞ্জাম	১৪,১০০
সেক্রেটারীর দপ্তর—(১ জন সেক্রেটারী, ১ জন ডেপুটি-সেক্রেটারী, ২জন প্রাইভেট সেক্রেটারী, ১ জন এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, ১৯ জন কেরাণী, ১৩জন চাপরাসী ও আপিস খরচ)	২,২২,৭০০
মোটরগাড়ী এবং চাপরাসী বেয়াদাদের উর্দ্ধা প্রভৃতি—	১,৪৮,০০০
ভ্রমণ ব্যয়—(ইহার মধ্যে ভ্রমণকালে গরুর গাড়ী এবং হুলিভাড়া ৯০,০০০)—	১,৫৫,৩০০
মোট	১০,৭৬,৪০০

এইভাবে প্রতি বৎসর গবর্ণরের বেতন বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং তাঁহার ভাতা ও বিবিধ ব্যয় বাবদ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। গত বৎসর মোট ব্যয় হইয়াছে ৯,৫৩,৭৯৭ টাকা। ইহা ছাড়াও গবর্ণরের জন্ত আরও খরচ আছে। শহরে যখন তিনি কোথাও যান তখন তাঁর যাত্রাপথের দুই পাশে প্রতি রাস্তা ও গলির মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড় করানো হয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের এক দল কর্মচারী তাঁহার গন্তব্যস্থলে গিয়া পাহারা দেয়। ইহাদের বেতন ও ভাতা সাধারণ রাজস্ব হইতেই দেওয়া হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ এই খরচ গবর্ণরের বরাদ্দ হইতে দেওয়া হইবে এমন কোন পরিচয় আমরা বাজেটে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তারপর বিরাট ব্যয় মন্ত্রী দলের। দশ জন মন্ত্রীর বেতন

২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ১৮ জন— তাঁহাদের বেতন ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৩ হাজার টাকা। ইহাদের জন্ত ৩ জন কেরাণী, ৩১ জন চাপরাসী এবং ৬৭ জন অস্থায়ী কর্মচারী বাবদ আরও খরচ হইবে ৩৭ হাজার টাকা। মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের ভ্রমণ-ব্যয় ৯০ হাজার এবং ভাতা প্রভৃতি ২৬,৮০০ টাকা। আপিস খরচ ৫৫ হাজার টাকা। দশ জন মন্ত্রীর জন্ত এই ভাবে মোট খরচ করা হইয়াছে ৫,৯৯,৮০০ টাকা। প্রত্যেকটি বিভাগে ব্যয় বাড়িয়াছে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উত্তমরূপে অনুসন্ধান হইলে দেখা যাইবে উহাদের অধিকাংশই অনাবশ্যক ব্যয়। পুলিশ, শাসন বিভাগ প্রভৃতির ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়াছে। যেখানে এক জন সেক্রেটারী হইলেই কাজ চলিবার কথা সেখানে চার জন নিযুক্ত হইতেছেন, পেশাল অফিসারের ছড়াছড়ি চলিতেছে, অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতির তো ইয়ত্তা নাই। শাসন-সৌকর্যের নামে এই সব নিয়োগ ক্রমাগত হইতেছে অথচ ইহাতে শাসনকার্যের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, আরও অবনতি ঘটতেছে। সুতরাং আরও বেশী কর্মচারীর প্রয়োজন হইতেছে। এই ভাবে একটি দুঃসহ দৃষ্ট চক্রের আবর্তে পড়িয়া প্রতি বৎসর ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, অপচয় বাড়িতেছে এবং কল হইতেছে দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি ও লাঞ্ছনা।

অপচয়ের নমুনা

বাংলার বর্তমান কর্তৃপক্ষের হাতে কি ভাবে সাধারণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় ঘটতেছে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নৌকার কারবার। জাপানী আক্রমণের ভয়ে বাংলাদেশের প্রায় দশ হাজার নৌকা ধ্বংস করা হয়। অল্প দিন পরেই ঘোষণা করা হয় যে খাদ্য সরবরাহের জন্ত বাংলা-সরকার স্বয়ং নৌকা নির্মাণ আরম্ভ করিবেন। নৌকা নির্মাণের ভার ছিল মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দীন ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ সতীশ মিত্রের উপর। এই কারবারে ১৯৪৪ সালে আড়াই কোটি এবং ১৯৪৫ সালে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে নৌকা নির্মাণে লব্ধিকৃত এই ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা সরকারের সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়। বাজেট আলোচনার সময় বহু সদস্য অভিযোগ করেন যে এই টাকা আদায় তো বহু দূরের কথা, ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে ইহার সবটাই লোকসান হইবে। এই নৌকা নির্মাণ কার্যে মেজর-জেনারেল ওয়েকলির উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। এই ব্যক্তির উপরে তখন জেলায় জেলায় খাদ্য সরবরাহের ভার ছিল। এক ঝাঁক নৌকা তৈরি করিয়া ইহার হাতে দেওয়া হইলে দেখা গেল সেগুলি একেবারেই কাজের অল্পপযুক্ত, প্যাকিং বাস্ক

বলিলেও অতৃপ্তি হয় না। এই নৌকাগুলি কিছুতেই চালু করা গেল না, একমাত্র কলিকাতাতেই ২৫০ খানা নৌকা জলে পচিতে লাগিল। মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী অভিযোগ করেন যে নৌকা তৈরির কন্ট্রাক্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে এবং আম-জাম, শিমুল প্রভৃতি কাঠের দ্বারা তৈরি হওয়ার নৌকাগুলি ছয় মাসের বেশী টিকিতে পারে না। নৌকা তৈরিতে লগ্নী করা টাকা যে প্রধানতঃ দলের লোক তোষণের জন্ত ব্যয় হইতেছে একাধিক বক্তা তাহা প্রমাণ-প্রয়োগ সহ অভিযোগ করেন। মৌলানা আবদুল রেজ্জাক বলেন, “মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জাপান ও ব্রিটিশের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে এই টাকা ঐ যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয় করিবেন, না তাঁহাদের দলগত ভাবে যে বহু কোম্পানী খুলিয়াছে যথা—Ganges Timber Works—Sreerampur, Shibdurga Company, Pioneer Corporation, Faridpur, U. Ali Choudhury ও মোহন মিশ্র Bengal construction—Mr. Sahabuddin, North Bengal Trading & Co. আবদুল্লাহ মাহুদ, Eagle Construction, মফিজুদ্দীন এণ্ড কোং ইত্যাদি আরও অনেক কোম্পানী যথা চলিমা মোসলেম ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং সেই টাকা দলগত মেধুরদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া বাদবাকী তিনি নিজের কোম্পানীতে জমা দিতেছেন?”

এই সব অভিযোগের উত্তর দান প্রসঙ্গে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করেন, “যে পরিমাণ অর্থ এই সব নৌকা তৈরির জন্ত প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমার মনেও একটু খটকা জাগিতেছে। (I myself feel a certain amount of hesitation regarding the building of these boats at the expense which it is considered necessary for them.)” তার পর তিনি বলেন যে এই নৌকার ব্যাপারটাতে তাঁহার মনে সংশয় আছে এবং নৌকা নির্মাণ সম্বন্ধে আত্মপূরিক তদন্ত করিবার জন্ত তাঁহার ভারত-সরকারকে এক জন অভিজ্ঞ কর্মচারী বাংলা-দেশে পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। নৌকা নির্মাণ অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্ত যে দাবি পরিষদে উঠিয়াছিল, মিঃ সুরাবর্দী এই ভাবে তাহা এড়াইয়া যান এবং বাহাদুর নামে উক্ত প্রকার গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে তাহাদেরই হাতে আরও সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা তুলিয়া দেন। ইহার পর ভারত-সরকারের তরফ হইতে ব্রিগেডার আমস আসিয়া সত্য সত্যই তদন্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন বাংলা-সরকার তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। যত দূর জানা যায় এই রিপোর্টে বাংলা-সরকারের, বিশেষতঃ খাজা সাহাবুদ্দীন, সতীশ মিত্র এবং জেনারেল ওয়েকলির বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছিল। যে কাঠের দ্বারা

নৌকা নির্মাণ হইতেছিল তাহা দেখিয়া গোড়া হইতেই বুঝা গিয়াছে যে এ সব নৌকা জলে ভাসাইবার জন্ত তৈরি হয় নাই, নৌকা তৈরি উপলক্ষ্য করিয়া টাকাটা ভাগ-বাটোয়ারা করাই ছিল কর্মকর্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিল্প বিভাগের বিতর্কের দিন শাহ্ সৈয়দ গোলাম সারওয়ার হোসেনি খাজা সাহাবুদ্দীনের নামে আরও স্পষ্টভাবে অভিযোগে আনেন। খাজা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হোসেনি সাহেব বলেন, “খাজা সাহাবুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বাংলা-সরকার ও তাহার অর্থ কি কাহারও parents' property যে তারা বাংলার কোটি কোটি টাকা এই শিল্প বিভাগের নামে জনসাধারণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে তিনি নিজে ও নিজের আত্মীয়স্বজন, যত আছে সমস্ত কন্ট্রাক্টরী sub-contract ইত্যাদি দিচ্ছেন। যেমন খাজা সাহাবুদ্দীনের নিকট আত্মীয়, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নওয়াবজাদা নছরুন্নার পত্নী ও মিঃ সৈয়দ আবদুল ছলিমের (এম. এল. এ) ভগ্নী জাহানারা' বেগম। মিঃ ছলিমের পত্নী হুফিয়া খাতুন, মিঃ সাহাবুদ্দীনের জী ফারহাত বাবু বাংলার বোর্ট-কন্ট্রাক্টরের মধ্যে অন্যতম। মিঃ সাহাবুদ্দীনের সম্পর্কিত ভ্রাতা নওয়াবজাদা আহছান-উল্লাহ বোর্ট কন্ট্রাক্টর। মিঃ এম. এ. ছলিম ও মিঃ ছলিমের নিকট আত্মীয় মিঃ এ রেজা, মিঃ ছলিমের ভ্রাতা মিঃ সাহেব আলম ছলিমের নিকট আত্মীয় নওয়াবজাদা হাফিজউল্লাহ, মিঃ সাহাবুদ্দীনের নিকট আত্মীয় খাজা আশরাফ বোর্ট কন্ট্রাক্টর। মিঃ সাহাবুদ্দীনের ভাগিনের খাজা পেয়ার লেডলী। অনারেবল সাহাবুদ্দীন আর একটি কোম্পানী নিজের নামে খুলেছেন। Bengal Industry Fund এর টাকা নিয়ে তিনি আত্মসাৎ করবার জন্ত তাঁর আত্মীয়স্বজন নিয়ে তাঁর জী প্রভৃতির নামে অত্যাশ্চর্য সমস্ত কোম্পানী গঠন করে সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করতেছেন। Bengal Industries-এর নামে যে টাকার বাজেট আজ এখানে উপস্থিত হয়েছে তা যদি পাস হয় তা হলে এই বাজেটের বরাদ্দ টাকা কখনও জনসাধারণের জন্ত ব্যয় হবে না। তা তাঁদের স্বার্থের জন্ত খরচ হবে।” খাজা সাহাবুদ্দীন ইহার উত্তরে “পরিষদের বাহিরে বলিলে দেখিয়া লইব” এই শ্রেণীর কথা বলা ছাড়া কোন জবাব দিতে পারেন নাই। তখনকার সংবাদপত্রে একাধিকবার এই ভাবে নৌকার ব্যাপারে বহু অভিযোগ হইয়াছে। শুধু কন্ট্রাক্টরী নয়, নৌকা তৈরির জন্ত সাহাবুদ্দীনের জম্বলের কাঠ আসিতেছে এ কথাও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব অভিযোগের উত্তরে খাজা সাহেব বলেন যে সংবাদপত্রে এই সব কথা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সে সম্বন্ধে আইনসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত তাঁহার সলিসিটরকে জানাইয়াছেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে মার্চ এই উক্তি করা হয়, ইহার মধ্যে সাহাবুদ্দীনের নামে আরও অনেকবার অভিযোগ হইয়াছে

কিন্তু কাহারও নামে মামলা বা অন্তরূপে প্রতিবাদ তিনি করেন নাই।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সব গুরুতর অভিযোগের পরও নৌকা নির্মাণকার্য যথারীতি চলিতে থাকে। ২৯শে মার্চ মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া যায় এবং ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গবর্নর কেসি স্বহস্তে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। নৌকা নির্মাণ-পরিকল্পনা তাঁহারও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল, ত্রিরাশপুর্বে তিনি নৌকার কারখানা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একটি রৌপ্য নির্মিত নৌকা উপহারও পাইয়াছিলেন। এক বৎসর ৯৩ ধারা অনুসারে যে শাসনকার্য চলে তাহাকে অনান্যদে সিভিলিয়ানের বেনামিতে লীগ শাসনই বলা চলে। এই সময়ের মধ্যেও নৌকা নির্মাণ বাবদ মোট ১,৫৬,৯৫,৫৬৩ টাকা খরচ হয়; কন্ট্রাক্টরদের ১,৩৪,১৫২ টাকা আগামও দেওয়া হয়। এই শুভ কার্য পরিদর্শন উপলক্ষে কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, আপিস খরচ প্রভৃতিতেও ৩১,৮৪,৯০৭ টাকা ব্যয় হয়। সারা বৎসরে দেড় কোটি টাকার তৈরি নৌকার মধ্যে মাত্র ৩৬,৫৪৫ টাকার নৌকা বিক্রয় করা গিয়াছে। আম জায় শিমুল প্রভৃতি কাঠের দ্বারা নৌকা তৈরি করিয়া উহা বিক্রয়ের আশা বাতুলতা ইহা বার বার বলা সত্ত্বেও এই কাজ বন্ধ হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালের শৌচনীয় অভিজ্ঞাতেও বর্তমান মন্ত্রীদের চৈতন্যোদয় হয় নাই। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত নৌকা তৈরি বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইলেও এ বৎসর এই বাবদ আরও কিছু টাকা ছড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই তিন সপ্তাহের মধ্যেও নৌকা তৈরি বাবদ ৩৫,১৩,৪৮০ টাকা খরচ হইয়াছে এবং আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আরও ৬০,০২,৯২০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। যে কার্গের আগাগোড়া সন্দেহ-জনক, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী নিজেও যাহা সংশয়ের অতীত বলিয়া মনে করেন না, সেই কার্য অবিলম্বে বন্ধ না করিয়া উহাতে ৯৫ লক্ষ টাকা ঢালিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? চলতি বৎসরে এই টাকায় নৌকা তৈরির জুখ ১৪,২৩,৬০০ টাকা কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হইবে। নৌকা-নির্মাণ খাতে শুধু কন্ট্রাক্টর তোষণ নহে, এক দল কর্মচারী বহাল রাখিবার আরোজনও বেশ দরাজ ভাবেই করা হইয়াছে।

সাধারণের টাকা লইয়া এই বিপুল অপচয়ের তদন্ত কি কখনও হইবে না?

রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি

বাংলা দেশের যে সব রাজনৈতিক কর্মী দীর্ঘকালের জুখ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা আজও মুক্তি পান নাই গবর্নমেন্টের নিকট ইহা স্খাঘার বিষয় নহে। কংগ্রেস-শাসিত

প্রদেশসমূহে কংগ্রেস কার্যভার গ্রহণ করিবামাত্র সমস্ত বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের সেই আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে মন্ত্রীরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলে গবর্নরেরা উহা আটক করেন। প্রতিবাদে ঐ দুই প্রদেশের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত বড়লাট লর্ড লিনলিথগো একটি মাঝামাঝি রফা বাহির করিয়া এই ব্যবস্থা করেন যে— বন্দীদের সকলকে এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হইবে না, এক এক জনের কাইল দেখিয়া ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গবর্নরেরা বাধা দিবেন না। এই সত্বে মন্ত্রীরা পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক বন্দীরাও অল্পদিনের মধ্যে মুক্তি লাভ করেন। বাংলায় রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বাংলাতেই মন্ত্রীমণ্ডলের সাহস ও স্বদেশপ্রেম সবচেয়ে কম। এই কারণে এখানকার মন্ত্রীরা গোয়েন্দা পুলিশের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া বন্দীদের মুক্তি দানে সক্ষম হইতে পারেন নাই।

এবারও কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিগ্ৰহণ করিবার দুই মাসের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন। গত বার যুক্ত-প্রদেশের কাকোরী বন্দীরাও মুক্তি পাইয়াছিলেন, এবার আগষ্ট-আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের গবর্নর এবারও বন্দী মুক্তির আদেশে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে কারা-সচিব মিঃ রফি আমেদ কিদওয়াই পদত্যাগ করেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পণ্ডিত মন্ত্রীসভার আদেশ কার্যে পরিণত না হইলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে বলিয়া গবর্নরকে সতর্ক করিয়া দেন। পণ্ডিত পন্থের দৃঢ়তার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই গবর্নরের মত পরিবর্তিত হয়। তিনি মন্ত্রীদের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন এবং বন্দীরাও মুক্ত হন।

বাংলায় বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর ইঁহারাও বন্দীমুক্তি ব্যাপারে পূর্ববৎ গড়িমসি করিতেছেন। তবে এবার জনমত অনেক বেশী জাগ্রত, আন্দোলনও বেশ চলিতেছে বলিয়া ইঁহারা এই গণ-দাবি একেবারে অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। গত ২৪শে জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন-দিবসে এক বিরাট শোভাযাত্রা বন্দীমুক্তির দাবি লইয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীকে এই জনসমুদ্রের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতে হয়। এই গণ-বিক্ষোভকে অগ্রাহ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, সমবেত জনসমষ্টি বন্দীদের কবে মুক্তি দেওয়া হইবে তাহার একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানিতে চাহিলে প্রধান মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বলেন যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হইবে। এই তারিখ আগতপ্রায়, কিন্তু বন্দীরা এখনও কারারুদ্ধ। বাংলার মন্ত্রীরা বন্দীদের মুক্তির আদেশ দানে কেন সাহস পাইতেছেন না তাহা একেবারেই দুর্ভাষ্য।

এই ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের নিকটে বাধা পাইলে সমগ্র দেশ তাঁহাদের পিছনে থাকিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

ডাক ধর্মঘট

ডাক তার ও টেলিফোন ধর্মঘট শেষ হইয়াছে। ডাক ধর্মঘটের নেতৃত্বে যে বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে তাহা ধর্মঘটের অন্যতমদের পক্ষে যেমন গৌরবের বিষয় নহে, কর্মীদের পক্ষে তেমনি ভয়ের বস্তু। ক্রীযুক্ত ঞ্ণালকান্তি বহু ধর্মঘটের পর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, “শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিচালিত না করিয়া উহাতে দলগত রাজনীতি আমদানী করিলে আন্দোলনের উপকার না হইয়া উহার মণ্ডে ভেদ সৃষ্টি হইবে এবং উহাতে শ্রমিক আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।” ডাক ধর্মঘটের প্রথম নোটিশ দেওয়ার পর ভারত-সরকার সালিশীর হাতে বিরোধ মীমাংসার ভার অর্পণে সম্মত হওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহত হয়। দেওয়ান চমনলাল ডাক কর্মচারীদের সমস্ত ইউনিয়ন লইয়া গঠিত ফেডারেশনের সভাপতিরূপে এই সালিশী স্বীকার করেন। সালিশি নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে অগ্রসর করিবার জ্ঞপ্তিও একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। সালিশের রায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই কয়েকটি ইউনিয়ন অধৈর্য হইয়া অল্প কয়েক দিনের নোটিশে ধর্মঘট আরম্ভ করেন। ধর্মঘটের নেতৃত্ব এবার আদে মিঃ ডালভীর হাতে, দেওয়ান চমনলালকে এই দল অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে। মিঃ ডালভীর সঙ্গে ক্রীযুক্ত ঞ্ণালকান্তি বহুর প্রথমে সংযোগ ও পরে নেতৃত্ব লইয়া বিরোধও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে। ক্রীযুক্ত বহু তাঁহার বিবৃতিতে শ্রমিক আন্দোলনে দলগত রাজনীতি টানিবার বিরুদ্ধে যে আত্ন দাও করিয়াছেন, দেওয়ান চমনলালকে অগ্রদূত করার সময় সে কথা কোথায় ছিল।

ডাক কর্মচারীদের এই ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের, বিশেষতঃ গরীবদের, অসহ্য কষ্ট এবং ক্ষতি হইয়াছে। এখানে ধর্মঘটের প্রয়োজন কতটা ছিল এবং এই ধর্মঘটে কর্মচারীরা বস্তুতঃ কতটা লাভবান হইয়াছে সে সম্বন্ধে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ধর্মঘটী ডাক কর্মচারীরা যে কাজ করিয়া যে বেতন পায় সেই ধরণের কাজ অল্প যাহারা করে তাহারা তার চেয়ে অনেক কম পায় ইহা অস্বীকার করা যায় না। আপিস ও ব্যাঙ্কের বেয়ারা, দারোয়ান প্রভৃতির বেতনের সহিত পিয়ন ও প্যাকারদের বেতন তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সালিশি নিয়োগের পর গবর্নমেন্ট তাঁহার রায় মানিতে বাধ্য ছিলেন, অন্ততঃ তাঁহারা উহা মানিতে অস্বীকার করিবার পূর্বে। ধর্মঘটের প্রথম ওঠার সম্ভব কারণ ছিল না। ধর্মঘটের ফলে সালিশের রায়ে উল্লিখিত সুবিধার অতিরিক্ত অতি সামান্যই পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বেতনের পিয়ন প্রভৃতি বেতন ও ভাতা বাবদ আগে

পাইত মাসিক ৪৩৬, সালিশের রায়ে অতিরিক্ত পাইয়াছে মাসিক ৫১০ আনা এবং এককালীন ৬৩ টাকা; সালিশের রায়ে অতিরিক্ত গবর্নমেন্ট দিয়াছেন মাসিক রেশনের মূল্য হ্রাস বাবদ ১১০ আনা এবং পুরানো ভাতা বাবদ ৫৭ টাকা। ইহা হইতে দেখা যায় সালিশের রায়েই কর্মচারীরা যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছে। তদতিরিক্ত যাহা লাভ করিয়াছে তাহা ধর্মঘটের ফলে মিলিয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যায় উহার পরিমাণ নগণ্য। এই সামান্য লাভ আন্দোলনের দ্বারাই হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দশ আনা এবং পাঁচ টাকার জন্ত ধর্মঘটের প্রয়োজন ছিল না ইহা সকলেই মনে করিবে। ইহা হইতে দেখা যায় সালিশি নিয়োগের পর তাঁহার রায় প্রকাশের বিশেষতঃ দে সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পূর্বে ধর্মঘটের কোন বিশেষ সম্ভব কারণ ছিল না। কর্মচারীরা শেষ পর্যন্ত যেকোন ধাপছাড়া ভাবে কাজে যোগ দিয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে এবং অবসর পাইলেই গবর্নমেন্ট উহার সুযোগ লইবে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হউক ইহা আর সকলের জ্ঞান আমাদেরও কায়া। নেতৃত্ব দখলের লোভে তাহাদের বিপক্ষে পরিচালিত করাতেই আমাদের আপত্তি, এবং সম্প্রতি বাংলায় তাহার নমুনা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

ব্যাঙ্কের কেরাণীদের দাবি

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বক্তব্য এই যে, দেশের বর্তমান মহার্ঘ-ভার দিনে তাঁহারা যে পারিশ্রমিক ও ভাতা পান তাহাতে তাঁহাদের পরিবার পোষণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং দারুণ দুশ্চিন্তা তাঁহাদের দেহ ও মনের অবসাদ ঘটাইয়া তাঁহাদের কর্মশক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। ব্যাঙ্কগুলি গত কয়েক বৎসরে আশাতীত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের পরিশ্রমে এই অর্থ অর্জিত হইয়াছে তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকদের কোনই দরদ নাই। এক্ষণে অবস্থা সহনাতীত হইয়া উঠার ব্যাঙ্ক-কর্মচারীরা প্রতীকারের জন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, আশনাল ব্যাঙ্ক, লয়েডস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকার-ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও প্রতীকার না হইলে তাঁহারা দাবি আদায়ের জন্ত যাহা সম্ভব মনে করেন তাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের মোটামুটি দাবি এই—

- (১) কর্মচারীদিগকে সজ গঠনের অবাধ অধিকার দিতে হইবে।
- (২) বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৩) সুনির্দিষ্ট নিয়ম অল্পযায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কার্যকাল অবসানান্তে বা দীর্ঘকাল কার্য করার পর অবসর গ্রহণ করিলে পেনশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) চূর্যল্যতার দরুন কেরাগীদিগকে মাসিক বেতনের উপর শতকরা ৩৫ টাকা এবং নিম্ন কর্মচারীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা ভাতা দিতে হইবে।

(৭) প্রতি বৎসর দুই মাসের বেতন বোনাস দিতে হইবে।

(৮) এগার মাস কাজ করার পর এক মাস ছুটি এবং সাময়িক প্রয়োজনবশতঃ বৎসরে ১৪ দিন ছুটি দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি ছোটখাট দাবি আছে।

কর্মচারীদের বর্তমান বেতনের হার বড় বড় ব্যাঙ্কেও এইরূপ :

কেরাগী—সি গ্রেড	৩৫	হইতে	৪০	টাকা
বি "	৭৫	"	১৫৫	"
এ "	১৫৬	"	২০০	"
দারোয়ান	২০	"	৪০	"
চাপরাসী বেয়ারা	১৮	"	৩৫	"

মাগ গিভাতা কেরাগীরা পান বেতনের শতকরা সাড়ে বারো টাকা, তবে ২০ টাকার কম নয় এবং চাপরাসী প্রভৃতি পায় ১৩ টাকা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, অত্যন্ত ব্যাঙ্কেও আন্দোলন চলিতেছে। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি যুদ্ধের সময় যে লাভ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহাতে কর্মচারীদের বেতন ছায়াসদৃশ হারে বাড়াইতে তাহাদের কোন কষ্ট হইবে না। কেরাগীদের বেতন ৭৫ টাকা এবং চাপরাসী, দারোয়ান প্রভৃতির বেতন ৪০ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। বড় ব্যাঙ্কে অসম্ভব মোটা বেতনে উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। উচ্চপদের বেতন কিছু কমাইয়াও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জ্ঞাত টাকা বাহির করা যাইতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশীয় রাজ্য

ত্রিবাঙ্গুর-পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ রাজ্যের দেওয়ান সার সি পি রামস্বামী আয়ার বলিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার জ্ঞাত ভারতীয় প্রদেশগুলির সহযোগে কাজ করিবার আন্তরিক আগ্রহ দেশীয় রাজ্যগুলিরও আছে। দিল্লীতে সম্প্রতি যে সব রাজনৈতিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে তিনি বলেন যে দেশের অত্যন্ত

নেতাদের মত তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট এবার সত্যই ক্ষমতা হস্তান্তরের জ্ঞাত আগ্রহীল। গণপরিষদ গঠন ও রাজ্যসমূহের সমস্ত আলোচনা সম্বন্ধে সার সি পি রামস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে এই বিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অগ্রতম। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম নিয়ে দেওয়া হইল :

সাধারণ শাসনতান্ত্রিক অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রি-মিশনের মধ্যে আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারত সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা বা না-করা সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যকে অন্যান্য দলের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের দলগুলির প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে আলোচনার ফলে ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্তাবলী নির্ধারিত হইবে। ইহাও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের সার্বভৌমত্ব থাকিবে না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ দেশীয় রাজ্যকে কোনরূপ স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছা জানাইয়া স্পষ্ট বিরতি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তুলিয়া যান যে, ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অল্পযায়ী প্রদেশসমূহকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভিন্নও অতিরিক্ত সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং যে ক্ষমতা প্রদেশের নাই তন্মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা সর্বসাধারণের হিতার্থে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত নেতৃবৃন্দও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে চাহেন। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ অন্যান্যের মতই এরূপ সামগ্রিকপূর্ণ ব্যস্থায় আসিতে ইচ্ছুক যাহার ফলে কেন্দ্রে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির একযোগে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে। দেশীয় রাজ্যমণ্ডলের কথা উল্লেখ করিয়া সার রামস্বামী আয়ার বলেন যে, দেশীয় রাজ্য প্রতি ১০ লক্ষ এক জন করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণের ভিত্তিতে অগ্রসর হইলে কোচিন এবং ভূপাল রাজ্য ১টি আসনের বেশী পাইবে না। কিন্তু যাহার সহিত দেশীয় রাজ্য শাসন-ব্যবহার কোন সম্পর্ক নাই এমন কোন লোক সেই আসন কদাচ পাইতে পারে না। গণ-পরিষদে বেসরকারী লোকদের আসন দিবার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে এমন ভাবে মণ্ডল গঠন করিতে হইবে যাহার ফলে প্রত্যেক মণ্ডলের পক্ষে ৩ হইতে ৪টি আসন পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা হইলে শতকরা ৫০ ভাগ অথবা তদুর্ধ্ব আসন সংখ্যাও বেসরকারী লোকদের দেওয়া যাইতে পারিবে।

কংগ্রেস-প্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষা বিভাগের জুন্ ৩, ১৭, ৪৭, ১০০ টাকার দাবি উত্থাপন করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বাবু সম্পূর্ণানন্দ ঐ প্রদেশের শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার্জেট-পরিকল্পনা কবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সময় ও সুযোগ আসিবে সেই ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া কংগ্রেস-প্রদেশসমূহ ক্ষতগতিতে শিক্ষাবিস্তার মনোনিবেশ করিয়াছে। বাবু সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে যদি তাঁহাদের পরিকল্পনা যথোচিতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দশ বৎসর পরে যুক্ত প্রদেশে একটি লোকও আর নিরক্ষর থাকিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে এই কথা উল্লেখ করিয়া বাবু সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে প্রায় ৫৪,৫০,০০০ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেইজু ১২,৬১২ সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৬৩,০৬০ জন শিক্ষক শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার গ্রহণের জু দরকার। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় তিন কোটি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন আছে। দশ বৎসরে এই উপায়ে বিদ্যালয়গৃহের জন্য বাৎসরিক ৩০ লক্ষ পরিমাণ টাকা এবং ৬০০০ শিক্ষকের জন্য বাৎসরিক ২০,০০০ টাকারও বেশী লাগিবে। এই বিরাট অঙ্কের টাকা এক সমস্যার কথা, বাবু সম্পূর্ণানন্দ সেইজন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্য চাহিয়া আবেদন জানান। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিগত সাহায্য কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া তিনি উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দানের আবেদন করেন। তিনি বলেন যে আজকালকার দিনের জাতিগঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবশু প্রয়োজনীয় এবং সেইজন্য জন-হিতৈষীদের দৃষ্টি যাহাতে এদিকে পড়ে তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রীমহাশয় বলেন যে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য যতটা সম্ভব বে-দরকারী সমিতির সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। সেই সমিতিগুলি অনেকটা আলীগড় শিক্ষা সমিতির ছায় হইবে। তাহার নিজেদের এলাকার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ও চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং এমন কি স্থানীয় গ্রাম হইতে তাঁহার কিছু অর্থ যোগাইবেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকের আশায় বসিয়া না থাকিয়া শিক্ষাবিস্তার ত্বরান্বিত করিবার জু পকাশ হাজার ছাত্রসত্তি পাস শিক্ষক এখনই নিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ততার চেয়ে পরিমাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হইবে। এই শিক্ষকদের নিজ গ্রামে অল্প বেতনে শিক্ষার দায়িত্ব লওয়া সহজ ও সম্ভবপর হইবে। তাহাদের মুখের বাণী হইবে ‘শেখ এবং শেখাও’। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। মন্ত্রীমহাশয় জোরের সহিত বলেন যে এই বিষয়ে তাঁহাদের নীতি কোন কোন

বিষয়ে ওয়াধাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির করেন যে মাতৃভাষা শিক্ষা বিভাগে ও ইংরেজী শিক্ষার বিভাগে একই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

বাবু সম্পূর্ণানন্দ ঘোষণা করেন যে সরকার কর্তৃক এক সংসদ স্থাপিত হইয়াছে যাহাতে আরবী শিক্ষার আধুনিকী সংস্করণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। মোলানা আবুল কালাম আজাদ এই সংসদের সভাপতি এবং অধ্যাপক হিমায়তুল হাসান (বেনারস হুইল কলেজের শিক্ষক) এই সংসদের সম্পাদক হইতে রাজী হইয়াছেন।

ঠিক একই প্রকারের আরও একটি সংসদ সংস্কৃত শিক্ষার আধুনিকী সংস্করণের জু স্থাপিত হইয়াছে। এই সংসদের সভাপতিরূপে গত কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলী ডাঃ ভগবান দাসকে সভাপতি নির্বাচন করেন। বর্তমানে সরকার বাহাদুর এই সংসদের অনুমোদিত উপায়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন। মোলানা আজাদ যাহার সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন, সেই আরবী শিক্ষা সংসদও গত মন্ত্রী-মণ্ডলী কর্তৃক স্থাপিত হয়। কিন্তু সংসদ কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রী-মণ্ডলী পদত্যাগ করেন। বাবু সম্পূর্ণানন্দ মোলানা আজাদকে পুনরায় কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বক্তৃতাকালে মন্ত্রীমহাশয় ঘোষণা করেন যে বাজেটে সংস্কৃত শিক্ষার জু ১,১৬,০০০ টাকা এবং আরবী-শিক্ষার জু ৬৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, এই সমস্ত বিদ্যালয়ে গবেষণার পরিসর অল্প হওয়ায় ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপনের পরে করিবার আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না। সেইজুই তিনি এই বিদ্যালয়গুলির আধুনিকী সংস্করণের জু সংসদ স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়াছেন।

আর বাংলায়? এখানে মন্ত্রীমহাশয়ের প্রধান কর্তব্য দাঁড়াইয়াছে যেন তেন প্রকারে শিক্ষা সঙ্কোচ, শিক্ষার পবিত্রতা নাশ, শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কি পাঠ্য পুস্তকগুলিতে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিছক ভোটের জোরে পাস করাইয়া লইবার জু সর্ব প্রকার চেষ্টা এখন হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে।

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ষাণ্ড পরিকল্পনা সাব-কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও অত্যন্ত ফসলের প্রত্যেকটির জু যে পরিমাণে জমি নির্ধারিত আছে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, এই সামঞ্জস্য বিধান একান্ত আবশ্যক।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, “ফসল বৃদ্ধির নামে সম্প্রতি যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা আতঙ্কজনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। কারণ দেশের কোন কোন স্থানে কেবলমাত্র

অনশনেই বহু লোক মারা গিয়াছে। ‘ফসল বাড়ান’ আন্দোলনের ফলে তুলা, পাট, ইক্ষু ও তৈল বীজ প্রভৃতি শিল্প সংক্রান্ত কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্ত নির্ধারিত জমির পরিমাণ কতকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে দেশের সমগ্র আর্থিক অবস্থার উপর ইহার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হইতে বাধ্য। সুতরাং শিল্পসংক্রান্ত কাঁচা মাল ও খাদ্য ফসল উৎপাদনের জন্ত যে পরিমাণ জমি নির্ধারিত আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বদা সম্ভবভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের উভয়-বিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত ভারতে যথেষ্ট জমি আছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্ত যে পরিমাণ জমি নির্ধারিত আছে কমিটি তাহা কোনওক্রমে হ্রাস করার সুপারিশ করেন না। বরং দেশের বহু স্থানে পার্বত্য অঞ্চলে যে দীর্ঘ সমতল জমি আছে তাহাতে চাষের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং ঐ সকল জমিতে ঐ সকল অবস্থারই উপযোগী শস্যের আবাদ করা যাইতে পারে।”

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, “এদেশে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর আবশ্যক হইবে না।” রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যদি কমিটির প্রস্তাবিত সমস্ত ব্যবস্থা যথারীতি কার্যকরী করা হয় তবে, “এদেশে দুর্ভিক্ষের কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।” কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, “কোন কোন অবস্থার রপ্তানি নিষিদ্ধ করা গেলেও” বাহির হইতে আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার প্রয়োজন নাই।

পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া কৃষিতে কখনও কৃষকের উপকার হয় না। ইহার দ্বারা কখনও খাদ্য অথবা অপর ফসলের অভাব ঘটয়া উঠা দুর্মূল্য হয়। ইহাতে এক দিকে দুর্ভিক্ষ হয় অপর দিকে চড়া দরে কাঁচা মাল কিনিতে বাধ্য হওয়ার শিল্প-জাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটয়া কৃষক ভিন্ন অপর সকলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইলে দুর্দশা ঘটে কৃষকের। পরিকল্পনাবিহীন কৃষিকার্যের ফলে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের মূল শিথিল থাকিয়া যায়। ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের কোনও উন্নতিশীল দেশে পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া ভাবে কৃষিকার্য চলিতে দেওয়া হয় না। কৃষিকার্য পরিকল্পনা যে কত সুন্দর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা যায়, রাশিয়া তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে কোন সময়েই মনোনিবেশ করেন নাই। কৃষির প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপে জানা না থাকায় তাহাদের ফসল বৃদ্ধি আন্দোলন হস্তাকর গ্রহণে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাতে দরিদ্র করদাতাদের বহু কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষিকার্যের স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমে নিম্নলিখিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। এদেশে মাঝে মাঝে কতকগুলি অর্ধ-শিক্ষিত লোক ধরিয়া তাহাদের দ্বারা চাষ-আবাদের যে ‘ষ্ট্যাটিষ্টিক্স’

সংগৃহীত হয় তাহাতে সংখ্যা থাকে প্রচুর, কিন্তু সত্য থাকে না। যাহাদের উপর এই কার্যের ভার দেওয়া হয় তাহারা প্রথমত নবাগত, দ্বিতীয়ত অর্ধ-শিক্ষিত; তৃতীয়ত ইহাদের চাকুরির কোন স্থায়িত্ব নাই কাজেই দায়িত্ববোধও নাই। অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই এদেশে বড় বড় রিপোর্ট রচিত হয় এবং তদনুসারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়।

এই সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের কাজ উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের দ্বারা চিরপ্রচলিত ভুল প্রণালীতে উপরি-উক্ত শ্রেণীর লোক দিয়াই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া ইহার সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। হাইস্কুলের শিক্ষকদের সহায়তায় ইহার আশ্রিত চব্বিশ পরগণা জেলার জমির অবস্থা, কৃষকের এবং কৃষির অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সরকারী বা আধা-সরকারী রিপোর্ট অপেক্ষা বহু গুণে বেশী নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষকদের সাহায্যে নামমাত্র ব্যয়ে ইহার এই দুর্লভ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণার পর ইহার হাওড়া জেলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ত্রুটি হইয়াছেন। হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্যে এই তথ্য সংগ্রহ চলিতে উঠা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হইবে এবং ইহার জন্ত শিক্ষকদের কিছু অর্থ সাহায্য করিলে তাহারাও সন্তুষ্ট এবং উপকৃত হইবেন। এই ভাবে একটি নির্ভরযোগ্য স্থায়ী তথ্যসংগ্রহ কেন্দ্রও অতি অল্প ব্যয়ে গড়িয়া তোলা যায়।

আমাদের দেশে সরকারের বিভাগে বিভাগে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল উপ-বিভাগ বোলা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ ব্রিটেনে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগগুলি ক্রমশ কমাইয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদের দ্বারা মূল তথ্য সংগ্রহ করাইতেছেন। আমাদের দেশেও এই ভাবে হাইস্কুলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে ব্যয় সঙ্কোচও হইবে, ষ্ট্যাটিষ্টিক্সও অনেক উন্নত হইতে পারিবে।

কৃষি-সমস্যা ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেস গবর্নমেন্ট

জুলাই মাসের ২১শে তারিখে বোম্বাইয়ের কৃষিমন্ত্রী ত্রীমুক্ট এম.এ. পাতিল প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে বোম্বাই খাদ্য সম্বন্ধে দুই বৎসরের মধ্যেই আত্মনির্ভরশীল হইবে। ফসল বৃদ্ধির জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহাকে আরও বিস্তৃত ভাবে করার আয়োজন হইতেছে। খাদ্য-ক্রবোর চাষ আরও বাড়ান হইয়াছে। কৃষকদের চিনাবাদামের খোল, এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অগ্নিসার অল্পমূল্যে দেওয়া হইতেছে। তাহাদের যাহাতে উন্নত ধরণের বীজ দান করা যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা হইতেছে।

সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থায় স্থির হইয়াছে যে দুই বৎসরের

মধ্যে জলসেচনের জন্ত হাজারের অধিক কুপ খনন, উন্নত ধরনের গরুবাছুরের প্রজনন ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহাতে শস্ত নষ্ট না হইয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। এই সব উপায়ে সরকার কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য।

কুপের দ্বারা যে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে তাহার মোট ক্ষয়ের এক-তৃতীয়াংশ সরকার বহন করিবেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ টাকা কৃষকগণকে ঋণস্বরূপ দেওয়া হইবে। এই ঋণের টাকা কিস্তীবন্দী ভাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ইহার জন্ত নামমাত্র সুদ দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সরকার পঞ্চাশ হাজার হইতে ষাট হাজার কুপ খনন ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

সার সরবরাহের একটি পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে জঞ্জাল প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা হইবে। চল্লিশটি মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং এই প্রকারে তাহাদের যথেষ্ট আয়ের উপায় হইয়াছে। গ্রামগুলিকেও এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে।

চাষবাস শিক্ষার প্রসারের জন্তও উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। বর্তমানে পুনাত্তে কেবলমাত্র একটি কৃষিকলেজ আছে। সমস্ত বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে ইহাই একমাত্র কৃষিশিক্ষার কেন্দ্র। গুজরাট এবং কানাড়াতে সরকার দুইটি কৃষি কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। প্রদেশটির মধ্যে এখন মাত্র চারটি কৃষিবিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক ব্লকটি জেলার জন্ত একটি করিয়া উচ্চ কৃষিবিদ্যা শিক্ষালয় স্থাপনের কথা স্থির হইয়াছে। এই সমস্ত ছাড়াও, স্থানীয় কতকগুলি কেন্দ্রে এক বৎসরের জন্ত ট্রেনিং দেওয়া হইবে। যুক্তপ্রদেশে বহু গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে; গো-সম্পদবর্ধন ও স্তপ্রজনন ব্যবস্থার জন্ত কৃষি-মন্ত্রী চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের জন্তও ব্যবস্থা করা হইবে। ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিতে সরকারের নিজ ব্যয়ে বলদ সরবরাহ করা হইবে।

দুগ্ধ-উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি যাহাতে দৃষ্টি রাখা হয় সেজন্ত একজন কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ডেয়ারীকারমিং ব্যাপারে উন্নত উপায় স্থির ও ব্যবস্থা করাই তাঁহার কর্তব্য হইবে।

গ্রাম সংস্কারের জন্য সংস্কার-সংসদ স্থাপন করা হইবে। ইহার সহিত বেসরকারী কর্মীরাও সহযোগিতা করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় পরিদর্শন করিবেন এবং সুবিধামত গ্রহণযোগ্য উন্নত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

এই সঙ্গে বাংলার অবস্থা তুলনীয়। এখানে গত কয়েক বৎসরে কল স্বস্তি আন্দোলনের নামে কোটি কোটি টাকা ধরচ

হইয়াছে, ফসল উৎপাদন কিছু মাত্র বাড়ি নাই। সরকারী গোলা হইতে প্রাপ্ত বীজে গাছ গজায় না, বাংলায় ইহা একটি প্রধান অভিযোগ। কৃষকদের জন্ত যে সার বরাদ্দ করা হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতিশয় সামান্য। ইহারও অতি অল্প অংশই প্রকৃতপক্ষে চাষীদের হাতে গিয়া পৌছে। কৃষির যন্ত্রপাতি এবং গো-মহিষাদি চাষীকে সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই বলা চলে। অন্তত যাহা আছে তাহাতে চাষীর কোন উপকার হয় না। কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা, প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতির নামে যে সব টাকা বরাদ্দ হইয়া থাকে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অপচয় হয় বলিয়াই দেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাদের কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের প্রধান কাজ চাকুরি বজায় রাখা এবং সম্ভব হইলে উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করা; চাষীর প্রয়োজন জানিবার এবং উহা মিটাইবার আন্তরিক চেষ্টা করা হয় না। কৃষি-বিভাগ মারফত বাংলা দেশে গত কয়েক বৎসরে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার সঙ্গতি হইলে অনেক উপকার হইত।

ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন

ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনের যে সুযোগ রহিয়াছে পৃথিবীর বহু দেশে তাহা বিরল। এ দিক দিয়া চেষ্টা প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। কয়লার খনিগুলি বিদেশীর হাতে থাকায় উহাদের পরমাণু দ্রুত ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। কয়লার অপচয় বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে ভারতীয় খনিগুলি আর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই নিঃশেষ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক চেষ্টা এখন হইতেই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশ এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, সবচেয়ে বেশী পশ্চাতে ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। বাংলায় অনেক বার ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সমগ্র প্রদেশে সরবরাহের কথা হইয়াছে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলের অনেক বার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। বহু আন্দোলনের পর শেষ পর্যন্ত দামোদর-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে নতুন মন্ত্রীরা কার্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা হইয়াছে। এখানে উড়িষ্যার পরিকল্পনাটি দেওয়া হইল; এই ক্ষুদ্র প্রদেশটিও এ-দিকে কতটা অগ্রসর হইতেছে উহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে, মহানদী উপত্যকাকে কেন্দ্রীয় পূর্ব বিভাগ জল-সেচন এবং জলযান চলাচলের উন্নতি সাধনের জন্ত একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই, তবে মোটামুটি ভাবে ছয় কোটি টাকা ব্যয় হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য এই যে উড়িষ্যার মহানদীকে বাঁধ ইত্যাদির দ্বারা শুল্কলাবদ্ধ করিয়া যাঁহাতে বহা নিবারণ, জল-সেচ, মাছের চাষ এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ জাতীয় অগাধ কার্য সুবিধামত করা হইবে।

প্রাথমিক কার্য ইত্যাদির জন্ত কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড নানা প্রকারে অনুসন্ধান ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছেন। আমেরিকা এবং ব্রিটেনে নতুন যন্ত্রপাতি আনা-বার অর্ডার গিয়াছে। উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গভর্নর জর্জ হর্থর্নহুইস ১৫ই মার্চ, ১৯৪৬ তারিখে হরিকুণ্ড বাঁধের স্থাপনা কার্য করিয়া গিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে মহানদীতে তিনটি বাঁধ এবং তিনটি খাত হইবে। তাহা দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজনন প্রচেষ্টা এবং জল-সেচ ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথম বাঁধ হইবে সদলপুরের নয় মাইল উপরে হরিকুণ্ডে। দ্বিতীয় বাঁধটি নদীর ভাটির দিকে ১৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া টিকারপাড়ার নিকটে এবং তৃতীয়টি কটকের ১০ মাইল উপরের দিকে নারাজের নিকট স্থাপিত হইবে।

এই তিনটি বাঁধে প্রায় দুই কোটি ঘন ফুট পরিমাণ জল আহরিত থাকিবে। এই জলভাণ্ডারটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। এই জলভাণ্ডারের তলদেশের ভাগটিকে স্থায়ী ভাণ্ডার (Deadstorage) বলা হইবে, ইহাতে ৫০ লক্ষ ঘনফুট পরিমাণ জল থাকিবে এবং পলি-ভাণ্ডার হইবে। বাকী দেড় কোটি ঘন ফুটের মধ্যে এক কোটি ঘন ফুট পরিমাণ অংশের দ্বারা স্থায়ী জল-সেচন ব্যবস্থা এবং অবশিষ্ট অংশের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজনন ব্যবস্থা হইবে—ইহা উপরি ভাগের বহা ব্যবস্থার জন্ত সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করা হইবে।

নারাজ বাঁধের দ্বারা যে হ্রদের সৃষ্টি হইবে তাহাকে টিকের পাড়া পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে এবং টিকের পাড়া বাঁধ-ঘটিত হ্রদকে হরিকুণ্ডের ৬০ মাইল নীচে সোনপুর পর্যন্ত বাড়ান হইবে। ইহাতে হরিকুণ্ডের নিকট হ্রদের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রে পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শত মাইল নোঁ-চলাচলের সুবিধা হইবে।

মহানদী বৎসরে প্রায় ৬ হইতে ৯ কোটি ঘন ফুট পরিমাণ জলপ্রবাহ দান করিয়া থাকে। স্থির করা হইয়াছে যে এক কোটি ঘন ফুট পরিমাণ পরিসরকে বাঁধা হইবে। ইহার ফলে বরীপ অঞ্চলের বহা নিবারণে সুবিধা হইবে। উড়িষ্যার এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রায় ২৫ লক্ষ একর পরিমাণ জমির স্থায়ী জলসেচ ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ব্যতীত জলশক্তি জনিত শুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রজননেরও সুব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

এই শুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি উড়িষ্যা এবং নিকটবর্তী অগাধ রাজ্যের খনিজ সত্তারের সদ্যবহার করার, জলা জমি হইতে পাম্প করিয়া জল বাহির করার ও জল-সেচ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত পরিসর লাভের সুযোগ প্রদান করিবে।

এই ব্যবস্থা হইতেই ব্রাহ্মণী এবং বৈতরণীর সুবন্দোবস্তের ফলে ম্যালেরিয়া রোগের নিবারণ প্রচেষ্টা করা সম্ভবপর হইবে। বুরাবলম্ এবং সুবর্ণরেখা সংস্কৃত হইয়া উড়িষ্যা ও অগাধ নিকট-বর্তী স্থানের সম্পদ হইয়া উঠিবে। হরিকুণ্ড বাঁধ যাহা প্রথমে স্থাপন করা হির হইয়াছে তাহার কথাই এখানে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যেহেতু ইহাকে লইয়া কোন রাজনৈতিক জটিলতা নাই। আশা করা যায় যে শীঘ্রই ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে। চূর্ণ নিকটেই পাওয়া যায়, সিমেন্টের কল বসাইলে যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ পাওয়া যাইবে—তাহার ফলে এই কার্যগুলি শীঘ্র সম্ভব হইবে।

যুদ্ধোত্তর সময়ে হরিকুণ্ড বাঁধের দ্বারা পথ ঘাট ও রেল-পথের উন্নতি হইবে। এই বাঁধ পার্বত্য সমতল (রকবেড) হইতে ১০০ ফুট উচ্চ এবং জলভাণ্ডারটি সমুদ্রে সমতল হইতে ৬১০ ফুট উচ্চ হইবে। যে স্থানটিকে জলভাণ্ডারটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে তাহা প্রায় ১৩০ বর্গ মাইল হইবে। জল-জনিত বৈদ্যুতিক শক্তি ৫০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা পরিমাণ সাহায্য দিতে পারিবে।

খাত ব্যবস্থাটি সদলপুর জেলা, সোনপুর ও অগাধ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের প্রায় ৮০০,০০০ একর পরিমাণ জমি স্থায়ী ভাবে সেচন করিতে পারিবে। ব্যবস্থাটিকে এক প্রকার আত্মনির্ভর-শীল বলা চলে। বাঁধটি কিয়ৎ পরিমাণ নির্মিত হইলেই জল-সেচনের কার্য চলিবে। বাঁধ ও খাতের কার্য একই সঙ্গে চলিবে।

ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ৫ বৎসরকাল সময় লাগিতে পারে।

যুক্তপ্রদেশের এলকোহল কারখানা

শিল্পপ্রসারে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যুক্ত প্রদেশের এলকোহলের কারখানা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

গবর্ণরী শাসনকালে যুক্ত প্রদেশের এলকোহলের কারখানার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেস গবর্নেন্ট কার্যভার গ্রহণ করিয়া উহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক উন্নত দেশেই এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্যবস্থাকে গবর্নেন্ট সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে এলকোহল উৎপাদনের উপযুক্ত কয়লা, গুড় এবং উহা সরবরাহের জন্ত প্রভূত পরিমাণে ট্যাক্স-ওয়াগন প্রয়োজন। এই শ্রেণীর কারখানাগুলিকে বাঁচাইবার জন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চেষ্ট।

ভারত-সরকার ১৯৩৭ সালে গুড় হইতে এলকোহল প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের অজুহাত ছিল ব্যয় বেশী হইবে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রি গ্রহণের পর এ বিষয় অনুসন্ধানের জন্ত একটি কমিটি স্থাপন করেন ও পাওয়ার এলকোহল বিল সম্বন্ধে এক রিপোর্ট দেন। কিন্তু ভারত-

সরকারের ঐদাসীতে এই বিলটি বহু দিন চাপা পড়িয়া থাকে। পরে বিলটি পাস হয় এবং তখনকার মত ক্রাফ হইতে সুদক্ষ লোক আনা হয়। কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরেই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন। তাহার ফলে পরবর্তী ১৮ মাস কাল পর্যন্ত কোন প্রকার কাজ অগ্রসর হয় নাই।

রোমেল যখন আলেকজান্দ্রার কাছে আসায় উত্তর-আফ্রিকার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে তখন সরকার বুঝিতে পারেন যে এলকোহল কারখানা হইতে প্রয়োজন মত প্রচুর পেট্রোলের অনুকল্প ইত্বন সরবরাহ করান যাইতে পারে। এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ একটি আলোচনা-সভা আহ্বান করা হয়। পরে সভা এই শ্রেণীর উৎপাদন-ব্যবসায়ীদের কাঁচা মাল ও নানা রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সুবিধা করিয়া দিবার আশ্বাস দেন। যুক্ত প্রদেশ এ বিষয়ে সকলকে ছাড়াইয়া যায়। যুক্ত প্রদেশের সরবরাহ-ক্ষমতা প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালনের কাছাকাছি হইয়া উঠে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের ৫০ লক্ষ গ্যালন ব্যয়ের কথা ধরিলে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ১ কোটি গ্যালনেরও বেশী বলিতে হয়।

উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যত্নপাতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দ্রব্যাদিই ভারতে প্রস্তুত। যদিও সরকারী ব্যবস্থায় সমস্ত মালপত্র পাওয়া যাইতেছিল তথাপি কিছু কিছু জিনিষপত্র চোরা-বাজার হইতে যোগাড় করিতে হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাক্স-ওয়াগনের। ট্যাক্স-ওয়াগন কর্তোঁলার এই ওয়াগনগুলির সরবরাহ-ব্যবস্থা ও তাহার পরিমাণ স্থির করেন। 'লসন-কমিটি' নামেখ্যাত কমিটির যে সভাপতি ওয়াগন সরবরাহের সংখ্যা নির্ধারণ করেন তিনি বার্মাশেলের সহিত পার্শ্বজড়িত ব্যক্তি। তাঁহার প্রভাবও যথেষ্ট। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও যে পরিমাণ ওয়াগন পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা অধিক কাজ পর্যন্ত করা সম্ভব নহে। ফলে ট্যাক্স-ওয়াগনের অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে এলকোহল সঞ্চিত অবস্থায় পড়িয়া পচিতেছে। আর একটি সমস্যা এই যে, উপযুক্ত রকমের কয়লার অভাব। শুঁড়া কয়লা ব্যবহারে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। এই সন্দেহে গুডের গুণানুসারে শ্রেণী বিভক্ত হওয়াও অবশ্য প্রয়োজন। যুক্তপ্রদেশ-সরকার এই বিষয়ে আইনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

চতুর্থত, বর্তমানে এই ব্যবস্থার ফলে যে পেট্রোল উৎপাদিত হয় তাহার গ্যালন প্রতি খরচ পড়ে দুই টাকা এক আনা; এলকোহল কারখানার খরচ পড়ে চৌদ্দ আনা, সরবরাহের খরচ ছয় পয়সা, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে দেয় বারো আনা, তৈলব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের ব্যয় পাঁচ আনা—সর্বশুদ্ধ দুই টাকা

এক আনা। কিন্তু পেট্রোলের দাম এক টাকা চৌদ্দ আনা। সুতরাং পাওয়ার-এলকোহলের ব্যয় পেট্রোলের চেয়ে তিন আনা বেশী। তা ছাড়া পেট্রোল অপেক্ষা এলকোহল কতকটা নিষ্কষ্ট। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উপযুক্ত সাহায্য পাইলে মূল্য কমিয়া যাইবে। সর আর্চিবল্ড রোল্যান্ডস যুক্ত প্রদেশে আগমন করিলে এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। যুদ্ধের পর সুবিধার আশার ব্যবসায়ীরা এই সব কারখানায় প্রায় এক ক্রোর পরিমাণ টাকা ঢালিয়াছিল। যদি ইহাকে ধ্বংস হইতে দেওয়া হয় তবে উদ্ভূত শুড়-ভাণ্ডার যে শুধু নষ্ট হইবে তাহা নহে ইহার সহিত যে ধনসম্পদ ব্যবসায়ব্যপদেশে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহারও অপচয় জাতীয় উন্নতির মূলে আঘাত দিবে। ভারতে প্রকৃতিদত্ত কাঁচামাল কাজে লাগাইতে না পারিলে বহুল পরিমাণে দ্রব্যাদি অব্যবহারে এবং অপব্যবহারে নষ্ট হইবে। এই শ্রেণীর কারখানায় উদ্ভূত শুড় কাজে লাগাইয়া সহজেই ২ লক্ষ গ্যালনের বেশী এলকোহল উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাতে পেট্রোলের অভাব অনেকটা ঘুচিয়া যায়।

এই শ্রেণীর কারখানাগুলিকে সাহায্য না করা হইলে প্রোডিউসারস গ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। গ্যাস মোটর ও অগ্নি যানবাহনের এঞ্জিন যন্ত্রপাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক এবং আশঙ্কা হয় বহু মোটর গাড়ী অকর্মণ্য হইয়া যান চলাচলকে ব্যাহত করিবে।

এলকোহল কারখানা যাঁহাতে সাহায্য না পায় সেদিকে পেট্রোলওয়ালা এবং তাহাদের বড় মুন্সফী ভারত-সরকারের দৃষ্টি আছে এইজন্য যে পেট্রোলের রেশন উঠিয়া গেলে এলকোহল কারখানাগুলি প্রতিযোগিতা করিবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তখন বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে 'রেকটফায়েড স্পিরিট' সরবরাহ করিতে পারে তাহাও ইহাদের এক বড় আশঙ্কা। যুক্ত প্রদেশের গবর্নেন্ট এই নূতন শিল্পটিকে বিলাতী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ত কতটা সাহায্য করিতে পারেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কুড়িগ্রাম শহর স্থানান্তরের প্রস্তাব

মেঘনার ভাঙন হইতে নোয়াখালী জেলার সদর নোয়াখালী শহরটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকার কয়েক বৎসর যাবৎ উহার সদর অগ্নি স্থানান্তরের চেষ্টা করিতেছেন। নদীতীরবর্তী বড় বড় শহর মাঝে মাঝে ভাঙনের মুখে পড়িয়া গেলে উহা বাঁচানো কঠিন হয় সত্য, কিন্তু সেদিকে যতটা চেষ্টা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সম্ভব তাহাও করা হয় কিনা সন্দেহ। ধরলা নদীর ভাঙনের জন্ত বাংলা-সরকার কুড়িগ্রাম হইতে মহকুমা সদর লালমণিরহাটে স্থানান্তরিত করিতে চাহিতেছেন। কুড়িগ্রাম প্রাচীন শহর এবং একটি স্বহৃৎ বন্দর। লালমণিরহাট একটি রেলওয়ে কলোনি মাত্র। কুড়িগ্রাম

শহরটিকে বাঁচাইবার উপায় থাকিলে তাহাই সর্বাপেক্ষে করা উচিত।

উপায় যে আছে, বিশিষ্ট সেচ-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কে. বি. রায় তাহা দেখাইয়াছেন। ধরলা এমন শ্রেণীর নদী, পাড় বাঁধাইয়া যাহার ভাঙন অল্পাংশেই বন্ধ করা যায়। কুড়িগ্রাম হইতে ২০ মাইল উজানে ধরলার উপর একটি রেলওয়ে পুল আছে। পুল তৈরির জন্ত নদীর দুই পাড় বাঁধানো হইয়াছে এবং তাহার পর নদীর ভাটিতে ছয়-সাত মাইল পর্যন্ত কোথাও পাড় ভাঙে নাই। কুড়িগ্রামের নিকটে পাড় বাঁধাইলে শহরের ভাঙনও নিশ্চয়ই বন্ধ করা যায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই পাড়ের মধ্যে সওয়া মাইল ব্যবধান রাখিয়া পাড় বাঁধাইলে সাড়ে ছয় মাইল পর্যন্ত নদীর ভাঙন বন্ধ হইবে। কুড়িগ্রামের নিকট উজান ও ভাটিতে সাড়ে ছয় মাইল ব্যবধানে দুই স্থানে পাড় বাঁধাইলে, শহরের নিকট নদীর ভাঙন আর থাকিবে না।

এই কার্যে কত ব্যয় হইবে তাহার হিসাব করাও কঠিন নয়। রেলওয়ে পুলটির পাড় বাঁধাইতে ব্যয় হইয়াছিল ৪,৬৮,৭৫০ টাকা। কুড়িগ্রামকে বাঁচাইবার জন্য দুই স্থানে পাড় বাঁধাইবার ব্যয় পড়িবে নিম্নোক্ত রূপ :

(১) নদীগর্ভের জমির দাম ২৫০ টাকা একর হিসাবে ১৬,৬৪,০০০ টাকা, (২) দুই স্থানে পাড় বাঁধাইবার ব্যয় ১০,০০,০০০ টাকা, (৩) শতকরা ৩ টাকা হারে এই টাকার উপর ১৫ বৎসরের জন্ম সুদ ১১,৯০,৮০০ টাকা। মোট ৩৮,৬২,৮০০ টাকা।

গবন্মেণ্ট যদি ধার করিয়াও এই টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলেও তাঁহার ১৫ বৎসরের মধ্যে সুদে আসলে উহা ফেরৎ পাইবেন এবং তত্পরি আরও কিছু লাভ করিতে পারিবেন। কুড়িগ্রামের নিকট ধরলার দুই পাড়ের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাড়ে ছয় মাইল ব্যবধানে দুই স্থানে পাড় বাঁধাইলে এবং উভয় পাড়ের দূরত্ব আধ মাইল থাকিলে, নদীগর্ভের অপর অংশ পলি পড়িয়া ১৫ বৎসরের মধ্যে অতি উর্বরা জমিতে পরিণত হইবে। এখন এই জমির দাম ২০০ টাকা একরের বেশী হইবে না, কিন্তু ১৫ বৎসর পর উহার দাম কমপক্ষে হাজার টাকা একর হইবে। এই দামে জমি বেচিয়া ১৫ বৎসর বাদে গবন্মেণ্ট ৬২,৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মোট ৬২৪০ একর জমি এইভাবে উদ্ধার হইবে। গবন্মেণ্টের লাভ হইবে ২৩,৭৭,২০০ টাকা, জমি বিক্রয় না করিয়া পত্তনি দিলেও গবন্মেণ্ট একর প্রতি দশ টাকা হারে প্রতি বৎসর ৬২,৪০০ টাকা আয় করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় কুড়িগ্রাম শহরটিও বাঁচিবে, তা ছাড়া আরও লাভ আছে। কুড়িগ্রামে পুরাতন যে ছোট গজের রেল-লাইন ছিল তাহার স্থলে কিছুদিন হইল মিটার গজ লাইন বসানো হইয়াছে। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সদর হানান্তরিত হইলে কুড়িগ্রামের জলুস কমিয়া যাইবে। এই লাইন নতুন করিতে গিয়া যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে, তাহা তুলিয়া আনাও কঠিন হইবে। অথচ পাড় বাঁধাইয়া নদীর ভাঙন বন্ধ করিলে এই শহর তো বাঁচিবেই, বাঁধানো পাড়ের নিকট জেট পক্টুন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া মাল ও যাত্রী-চলাচলেরও অনেক সুবিধা হইবে।

কলিকাতায় যানবাহন সমস্যা

কলিকাতা শহরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের সমস্যা ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ট্রামের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, একমাত্র বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই এই অবস্থার অনেকটা প্রতিকার অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব। কিন্তু বাসের সংখ্যাও যেন কিছুতেই বাড়িতে চাহিতেছে না। ১৮ই শ্রাবণের দৈনিক ভারতে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায়ও এরূপ একটি রিপোর্ট বাহির হয়। ভারতের মন্তব্য এইরূপ :

বাসওয়ালারা বেশী সংখ্যক বাস পাইলেও সেগুলি যে রাস্তায় চলাইবে ইহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? পুলিশ সহায় থাকিলে বাস কিনিয়া উহা ঘরে বসাইয়া রাখিয়াও যে দৈনিক চলিশ টাকা রোজগার করিয়া এক বছরে বাসের দামশুদ্ধ তুলিয়া ফেলা যায় সকলে তো ইহা বোঝে না।

আমাদের আশঙ্কা কলিকাতায় এই ব্যাপারই ঘটিতেছে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার রাজপথে চালু বাসের সংখ্যা ছিল ৩১২; গত এক বৎসরের মধ্যে আরও ২৩৭টি বাস পথ চলিবার পারমিট সহ গবন্মেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভিড় যে-কে সেই রহিয়াছে; কমা তো দূরের কথা, কমিবার কোন লক্ষণও নাই। বাসের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এই ভীড়ের কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, সবগুলি বাস চলিতেছে না, কতকগুলিকে নিশ্চয়ই ঘরে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। রুট অল্পসারে প্রত্যেকটি বাস আজকাল দৈনিক আট হইতে দশ গ্যালন পেট্রোল পায়। পেট্রোলের ক্রয়মূল্য দুই টাকা এবং চোরাবাজারে বিক্রয়মূল্য কম পক্ষে ছয় টাকা। সুতরাং পেট্রোলের কুপন বিক্রয় করিয়া ঘরে বসিয়া বিনা কামেলায় যদি দৈনিক চলিশ টাকা রোজগার করা যায়, তবে কোন মূর্খ বাসওয়ালার সবগুলি বাস পথে বাহির করিয়া ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর প্রভৃতির বেতন এবং মেরামতি খরচা প্রভৃতির ব্যক্তি পোহাইতে যাইবে? একটি মাত্র বাসের কুপন বেচিলে দৈনিক চলিশ টাকা, মাসে বারো শত টাকা এবং দশ মাসে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ বাসের দাম উত্তল। আমাদের ধারণা ভালভাবে অহুসন্ধান করিলে এই রহস্যই প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু অনুসন্ধান করিবে কে? পুলিশের সঙ্গে বাস-ওয়ালা প্রভৃতির বন্ধুত্বের কাহিনী সুবিদিত। মোটর গাড়ীর লাইসেন্স, পেট্রোলের পারমিট এবং বাস, লরী, মোটর গাড়ী প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া উহা ঠিক আছে বলিয়া ছাড়পত্র দানের ক্ষমতা যে বিভাগটির হাতে দেওয়া হইয়াছে সেটি তো সার্কেট ও পুলিশের সোনার খনি। এই বিভাগটির প্রতি সব পুলিশের এত লোলুপ দৃষ্টি আছে যে, সকলকেই কিছুদিন করিয়া সেখানে না রাখিলে নাকি পুলিশ বিভাগে শৃঙ্খলা রক্ষাই কঠিন হইয়া ওঠে।

বাসওয়ালাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও পুলিশ উহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিয়া উপরি আয়ের এমন চমৎকার পথটি বন্ধ করিবে এতটা আশা করা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু বাংলা-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগে যে যানবাহন উপ-বিভাগটি যুদ্ধের সময় গজাইয়া বর্তমানে স্থায়ী রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহারাও কি স্থায়ী কতব্য পালন করিয়াছেন? বাসের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও কেন ভিড় কমিতেছে না, ইহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন কি? পেট্রোলের এই চোরাকারবার বন্ধ করা আদৌ কঠিন নহে।

বাসওয়ালার সংখ্যা খুব বেশী নয়, ইহাদের উপর কড়া নজর অনায়াসেই রাখা যায়। ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সিভিলিয়ান কর্তৃপক্ষ একটু তৎপর হইলেই এই পাপ বন্ধ করিতে পারেন, অবশ্য যদি পুলিশ চটাইবার সাহস তাঁহাদের থাকে।

উপরোক্ত পত্রিকাধায়ে এই গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইলে তৎসম্বন্ধে বাজেট আলোচনাকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইহার পর বাস সিভিকিটের সেক্রেটারী একটি পত্র অন্ততবাজারে প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি বাসওয়ালাদের হইয়া লিখেন যে, বাসের সংখ্যা সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য সত্য নহে। যুদ্ধের সময় শহরের ১৬৯টি বাস গবর্নমেন্ট কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতকগুলির বদলে পুরানো গাড়ী দেওয়া হয় এবং একশতটির অধিক নূতন গাড়ী ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে দিয়া বলা হয় যে এগুলিকে গ্যাসের সাহায্যে চালাইতে হইবে। গত বৎসর এক শত উনসত্তরটি নূতন বাস দেওয়া হইয়াছে, দুই শত সাঁইক্রিশট নয়। তারপর সেক্রেটারী মহাশয় বলিতেছেন যে পারমিট পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গবর্নমেন্টের আছে। কোন গাড়ী ইঠাৎ এক দিন বা দু'দিনের জন্য অচল হইলে তাহার জ্বলন্ত খবর দিতে হয় না বটে, কিন্তু বেশী দিনের জ্বল অচল হইলেই সরকারকে জানাইতে হয় এবং অব্যবহৃত পেট্রোলের কুপন কিরাইয়া দিতে হয়। তা ছাড়া গ্যারেজের রেজিষ্টার থাকে এবং সেই রেজিষ্টারে গাড়ীর গতিবিধির

সমস্ত হিসাব লিখিয়া রাখিতে হয়, গাড়ী কয় ক্ষেপ দিয়াছে তাহাও লিখিতে হয়। সেক্রেটারী মহাশয়ের মোট বক্তব্য এই যে প্রায় এক শত বাস গ্যাসে চালাইতে হয় বলিয়া এগুলি ভালভাবে চালান যায় না, গ্যাসের পরিবর্তে পেট্রোল পাইলে আরও বেশী বার এগুলি চালানো যায়।

সিভিকিটের সেক্রেটারীর বক্তব্যের কাকি ধরা কঠিন নয়। যে এক শত উনসত্তরটি বাস গবর্নমেন্টের প্রয়োজনে লওয়া হইয়াছিল সেগুলি সমস্ত ইতিমধ্যে তাহারা ফেরত পাইয়াছেন কি না তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। এগুলি এতদিনে ফেরত না পাওয়ার কোন কারণ আছে কিনা আমরা জানি না। তারপর গাড়ী অচল হওয়ার কথা। গাড়ী অচল থাকিতেছে ইহাই মূল অভিযোগ। সেক্রেটারী মহাশয় ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শুধু বলিয়াছেন দুই তিন দিনের জ্বল গাড়ী বন্ধ থাকিলে সংবাদ দিতে হয় না। কিন্তু এই দুই তিন দিন কয় দিনের মধ্যে তাহা তিনি বলেন নাই। সপ্তাহে তিন দিন বন্ধ থাকিলে যদি সংবাদ দিতে না হয় তাহা হইলে তো কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। গ্যারেজ রেজিষ্টার পরীক্ষা, পেট্রোলের কুপন ফেরত লওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা পুলিশের বিশেষতঃ মোটরযান বিভাগের কর্মচারীদের এবং ট্রাফিক পুলিশের প্রশংসা ইহাদের দৌসর ভিন্ন অন্য কোন লোকে বিশ্বাস করিতে রাজি হইবে না। এই দুই শ্রেণীর পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা এবং উৎকোচ গ্রহণ প্রবণতা এত ব্যাপক ও গভীর যে এই জান প্রায় প্রতিটি লোককে তাহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতারূপে অর্জন করিতে হয়। পুলিশ সত্য সত্যই সং ও কর্তব্যপরায়ণ হইলে এই পাপ অনায়াসে বহু পূর্বেই বন্ধ হইতে পারিত।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভূমি অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া যে বিল আনা হইয়াছিল তাহা পাস হইয়াছে এবং তদনুসারে শহর হইতে ভারতীয় বিতাড়ন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জেনারেল স্মার্টসের গবর্নমেন্টের এই অত্যাচার কার্যের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ হইয়াছে কিন্তু কোন কিছুতেই করণ্যত করা হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়েরা এই আইন মানিতে অসম্মত হইয়া উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ স্বরূপ করিয়াছেন। নিরস্ত্র নিরপরাধ সত্যাগ্রহীদের উপর এমন কি শিশুদের উপরও নানা ভাবে অত্যাচার করিয়া তথাকার খেতাজ সম্প্রদায় চরম বর্বরতার পরিচয় দান করিতেছে। ভারত-সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্নমেন্টের এই কার্যের প্রতিবাদ স্বরূপ এই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। সেখান হইতে কয়লা এবং ওয়াটল গাছের ছাল এ দেশে আমদানী বন্ধ হওয়ার উহাদের আয়ের একটি প্রধান পথ সঙ্কুচিত হইয়াছে। চীনাবাদামের তেল রপ্তানী বন্ধ হওয়ার

সেখানকার সাবানের কারখানাগুলি অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত সর্বপ্রকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া উহাকে ভাঙে মারিবার ব্যবস্থা না করিলে স্মার্টস গবর্নমেন্টের চৈতন্য সম্পাদনের আশা নাই ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। শুধু ভারত-সরকার নয়, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেরই ইহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। স্মার্টস গবর্নমেন্টের এই কার্য সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা প্রাভদায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অপর দেশেও এ বিষয়ে কি ভাবে আলোচনা হইতেছে তাহা বোঝা যায়। এই সব আলোচনা সম্মিলিত রাষ্ট্র সম্মেলন কর্তৃক কার্যে পরিণত হইলে ইহার ন্যায় অন্যান্য অত্যাচারী দেশগুলিও সাবধান হইবার সুযোগ পাইবে। প্রাভদায় মন্তব্য এইরূপ :

“৬০ বৎসর যাবৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়গণকে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের প্রবেশের অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের পার্লামেন্টে যে আইন পাস হইয়াছে তাহাতে ভারতীয়গণের জীবনযাত্রা দুর্বিষদ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়গণ সম্পর্কে এই বৈষম্যমূলক আইন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণও তৎপরতার সহিত উক্ত আইনের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশ নির্যাতন ভোগ করিতেছে।

একমাত্র ৪ঠা জুলাই তারিখেই ৩ শত ভারতীয়কে জরিমানা করা হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই জরিমানা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে তাহাদের সকল অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুমকি দেওয়া হইয়াছে।

এত করিয়াও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারে এইরূপ জনসভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই আইন এত অস্পষ্ট যে, কর্তৃপক্ষ যে অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণকে উচ্ছেদ করিতে চান সেই অঞ্চলে অবস্থান করিয়া বৈষম্যমূলক আইনের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ করিলেই ভারতীয়গণকে উক্ত আইন অনুসারে যথেষ্টভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া চলিবে। এই আইন সম্প্রতি কার্যকরী করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-আফ্রিকার বহু ভারতীয়কে, বিশেষ করিয়া সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতাগণকে, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। দণ্ডিত নেতাদের মধ্যে ডাঃ ডি. এম. নাইকার, ডাঃ ইউগুফ দাঃ, মিঃ এম. ডি. নাইডু, মিঃ সোরাবজী রুস্তমজী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাঃ দাঃ হাজতবাসকালে একখানি পত্র লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত পত্রে তিনি ভারতীয়গণকে দক্ষিণ-আফ্রিকার হিটলার-গন্ধী বৈষম্যমূলক অত্যাচার আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ নাৎসী নীতির বাস্তব প্রয়োগ করিতেছেন এবং বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা

হীনতম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে ইউরোপীয়গণ ভারতীয়গণের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা সত্যগ্রহী শিবিরে সাদা পোষাকে পাহারারত একজন ভারতীয় কনষ্টেবলকে হত্যা করিয়াছে। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে জনসাধারণের মনে নিদারুণ ক্রোধের সঞ্চার হয়। নিহত কনষ্টেবলের শব্দ লইয়া দুই সহস্রাধিক লোকের যে বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ফাসিস্ট সম্রাসবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্রদায় অবিরাম প্ররোচনা ও গুণ্ডামির মধ্যেও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। ভারতীয় নেতাগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, দমননীতির ফলে আন্দোলন দুর্বল না হইয়া তীব্রতর হইয়া উঠিবে। এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রতি-ক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে এবং ফাসিস্টপন্থী বর্ণবৈষম্যের ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রতিবাদ করিতেছে।”

কারারুদ্ধ সত্যগ্রহীদের সঙ্গেও বর্বর ব্যবহার করিতে স্মার্টস গবর্নমেন্টের বাধে নাই। নাটাল কংগ্রেসের সেক্রেটারী ডারবান হইতে টেলিগ্রাম করিয়া বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে “গত ১৫ই জুলাই দশ জন সত্যগ্রহী এক মাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গত রাত্রিতে আরও দশ ব্যক্তি শিবিরে প্রবেশ করায় তাহারা অল্প এক মাস হইতে তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সত্যগ্রহীদের নূতন নূতন দল রাত্রিকালে শিবির অধিকার করিতেছে। কর্তৃপক্ষ বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার দ্বারা সত্যগ্রহীদের মনোবল নষ্ট করার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ডাঃ দাঃ নাইকার, ডাঃ গুণ্ডাম এবং মিঃ এম. ডি. নাইডুকেও লেডিসমিথ নিউকাসল ও মারিজবার্গ জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্থানীয় জেলে অপরাপর সত্যগ্রহীগণের প্রতি সাধারণ অপরাধী অপেক্ষাও কঠোর আচরণ করা হইতেছে। কারারুদ্ধ ৮ জন সত্যগ্রহী ভারী রেলওয়ে লীপার বহন করিতে না পারায় তাহাদিগকে এক্ষণে ২১ দিনের জন্ত সামান্য আহার দিয়া রাখা হইয়াছে।”

পৃথিবীতে এই যে ছয় বৎসরব্যাপী প্রলয়কাণ্ড চলিয়া গেল—যাহার মূলে এক দল লোকের জাতি-গরিষ্ঠতার দৃষ্ট এবং দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচারের অধিকারে বিশ্বাস—তাহার শিক্ষা যে অসভ্য বর্বরদিগের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে নাই তাহাদের জগতে স্থান কোথায় সে কথা বিচার করিয়া বলিতে হয় না। যেদিন ভারতবর্ষ নিজবলে বন্দী-য়ান হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে সেদিনই তাহার সম্মানগণ এইরূপ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে। তাহার পূর্বে অল্প কিছু প্রত্যাশা করাই যুগ। বিদেশে স্মার্টস ও দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাবদিগের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে ইহা উত্তম, এখন দেখা যাউক ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসম্মেলন এ বিষয়ে চেষ্টনা আসিতে কত দেরি লাগে।

হসন্তের পত্র

শ্রীশুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অশান্ত,

আধুনিক যুগের গণতন্ত্রের বয়স নিতান্ত কম নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরলেও এর বয়স দেড়শ বছরের কিছু উপরে। গণতন্ত্র আসলে হচ্ছে গুণতন্ত্র। গণতন্ত্রের মধ্যে যে সং-বস্তুটি ও মঙ্গল-ব্যবস্থাটি নিহিত আছে তা এরই মধ্যে এবং সেইজন্তে এ কথা বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে গুণতান্ত্রিক। গুণের অবিসংবাদী আদর যেখানে নেই সেখানে গণতন্ত্র অর্থহীন।

এই গণতন্ত্রের আগে ছিল রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র। এই রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র ছিল জন্ম বা শ্রেণীর দ্বারা নিয়মিত। স্বতরাং তা গুণতন্ত্রের একেবারেই ধার ধারত না। রাজার ছেলে হয়ে জন্মাতে পারলেই রাজা, অভিজাত শ্রেণীতে জন্মালেই সমাজের নেতা। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পর সমাজ-শাসনের ঐ ব্যবস্থার ভিতরের দোষ এমন উৎকট ভাবে প্রকট হয়ে উঠল যে ওর কবলে পড়ে সমাজ বা জাতির অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। ঐতিহাসিক কিনা জানি নে তবে গল্প আছে যে রাজা ঘোড়শ লুইর স্ত্রী মারি অ্যান্তোয়নেত্ (Marie Antoinette) যখন শুনলেন যে দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না খেতে, তখন তিনি বলেছিলেন যে, দেশের লোক রুটি পাচ্ছে না, তারা কেঁক খেলেই তো পারে। আর ঐতিহাসিক সত্য এই যে ফুল (Foulon) নামক এক উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, যার বাস্তবের জ্ঞান রাজমহিষীর খাবার টেবিলের কেঁক-প্রাচুর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বললেন, রুটি না খেলে দেশের লোক ঘাস খাক। এই পরিস্থিতিরই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ জাতিকে বাঁচাবার জন্তে সমাজ-বুক থেকে অনিবার্য ভাবে আবির্ভাব ঘটল গণতন্ত্রের। জন্মগত বা কোন বিশেষ শ্রেণীগত ব্যবস্থার দোষ যাতে কোনো কালে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্তে এই গণতন্ত্র হ'ল গুণতান্ত্রিক এবং এই যে গুণতান্ত্রিকতা এইটেই হচ্ছে, এর কেন্দ্রগত মহাবাণী—সর্বকালের মহাবাণী বললেও অত্যাুক্তি হবে না। কেননা এই মহাবাণীটি যে উচ্চতর নীতির দ্বারা নশ্তাং হয়ে যেতে পারে তা কেউ কোনো দিন আবিষ্কার করতে পারবে না।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্ক্স নামে এক জার্মান ইহুদী ভদ্রলোক সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য থাকলেই যে সত্য দর্শন হবেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এই সাধু উদ্দেশ্যদ্বারা

চালিত হয়ে তিনি এক অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করলেন—শ্রেফ টাকা আনা পাইয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি মানব-জন্ম ও মানব-জীবনের এক সংহিতা রচনা করলেন। ঠিক যেমন কেউ কেউ আজ ধ্যাও দিয়ে মানুষের জীবনের প্রকাশকে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য মানব-আত্মা সম্পর্কে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটা চৌদ্দ আনাই মিথ্যা, যে ছ' আনা সত্য হবার সম্ভাবনা তার মধ্যেও বহু গোল-মাল আছে। বিধমানব একদা নিঃস্ব মানব ছিল। সেইখান থেকেই যাত্রা করে সে আজিকার সুসভ্য সুন্দর সম্পৎশালী সৃষ্টিকর্ম মানুষ হয়েছে। স্বতরাং তার উন্নতির পিছনে যে শক্তিই থাক না কেন সেটা স্বর্ণ রৌপ্যের শক্তি নয়। স্থূল ছেড়ে ধীরে সূক্ষ্ম প্রবেশ করতে পেরেছেন তাঁরাই জানেন যে অর্থনৈতিক সম্বলতাই মানুষকে সর্বপ্রকারের দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করে না। মানুষের জ্ঞান ও শক্তির উন্মেষের পিছনেও যে রহস্য আছে সেটা অর্থনৈতিক রহস্য নয়। অর্থের সম্বলতা একটা নিশ্চিততা দিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা পশুজগতের নিশ্চিততা। ঐ নিশ্চিততার মাঝে মানুষের জগৎও যদি সত্যি সত্যিই নিশ্চিত হতে পারত তবে সিংহ ব্যাঘ্রের পরে পৃথিবীর বুকে মানুষের উদয় হবার কোনো তাৎপর্য থাকত না। মানুষের অন্তরলোকে যে আনন্দ-সন্তার আছে সেই আনন্দ-সন্তার আহরণের মধ্যেই আছে মানুষের দুঃখের আতাত্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু এই আনন্দ-সন্তার কোনো অর্থনীতির মধ্যে নেই। কেননা অর্থনীতি হচ্ছে মর্ত্যনীতি। অপর পক্ষে ঐ আনন্দ-সন্তার হচ্ছে অমৃতলোকের অবদান। মানব-জন্মের এই চরম রহস্য যারা না জানে তারা কখনও মানব-জীবনকে পরম কল্যাণের পথ দেখাতে পারবে না—তাতে প্রতিষ্ঠিত করা তো দূরের কথা।

অবশ্য কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা কারণ আন্দাজ করা যায়। মার্ক্স-সংহিতার একটা কথা হচ্ছে সাম্যবাদ। এখন টাকা আনা পাইয়ের উপর মানব-জীবনকে দাঁড় করাতে না পারলে সাম্যবাদ প্রচার সহজ হয় না। কেননা মানুষে মানুষে পার্থক্য কেবল টাকা আনা পাইয়ের জন্তে এটা যদি মানি তবেই বলতে পারি যে সবার টাকা আনা পাই সমান হলে সব মানুষও সমান হয়ে উঠবে। এমন সব তত্ত্ব কেবলমাত্র তাঁরাই প্রচার করতে পারেন মানব-জীবনের কোনো নিগূঢ় রহস্যই যাদের কাছে প্রকাশিত হয় নি, আর একমাত্র তাঁরাই মানতে পারেন যাদের কাছে অধ্যাত্মলোকের রহস্য-দ্বার কড়ে আঙুল

গলাবার মতোও ফাঁক হয় নি! মানুষের জ্ঞান শক্তি আনন্দ যে তার ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্সের উপর নির্ভর করে না, এটা এত স্পষ্ট ব্যাপার, যে, এ নিয়ে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। জটিল স্বভাব মানব-সমাজ, তার চাইতেও জটিল মানব-মন, এ সবার সকল সমস্যার শেষ সমাধান নিহিত আছে কেবলমাত্র একটু টাকা আনা পাইয়ের সহজ হিসাবের মধ্যে—এ কথা যেমন আরামের তেমনি প্রচণ্ডতম বিশ্বয়ের। আহা সত্যিই যদি তাই হ'ত! মানব-সমাজের ব্যাপারটা তবে কি সহজই না হয়ে উঠত!

সে যা হোক পূর্বেই বলেছি যে গণতন্ত্র হচ্ছে আসলে গুণতান্ত্রিক এবং এর মধ্যেই এর সকল কল্যাণ নিহিত। কিন্তু আজ সাম্যবাদ এই গণতন্ত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে এর ভিতরকার মহাবাগীকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে। কেননা সাম্যবাদের ঔদ্ধত্য যেখানে অধিকারীর কোলাহল তুলেছে সেখানে গুণগুণের হিসাবটা অস্পষ্ট হয়ে উঠবার স্ববৃহৎ সম্ভাবনা। অবশ্য এ কথা নিশ্চিত জানি যে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ সাম্যবাদ কোনোদিনও চলবে না। হাতে-কলমে কাজ করতে গেলেই ও তন্ত্রের ভিতরকার গলদ পূর্ণভাবে প্রকট হয়ে পড়বে। তবে এ কথাও ঠিক যে ও তত্ত্ব আজ আমাদের অনেকেরই মন অধিকার করেছে এবং ওর গলদটা কেউ বুঝেই শিখবে, কেউ দেখে শিখবে আর কাউকে ঠেকে শিখতে হবে।

একালে একটা মহা বাজারে গুজব রটেছে এই যে, লেনিন রাশিয়াতে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথাটা তাহা মিথ্যা। লেনিন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মজুরতন্ত্র—অন্ততঃ করতে চেয়েছিলেন। আর মজুরতন্ত্র অভিজাততন্ত্রেরই অপর পিঠ। অভিজাততন্ত্রের মতোই মজুরতন্ত্রও একটা বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ। অভিজাত তন্ত্রের ভিতরের কথাটা মোটামুটি এই যে সমাজ শাসন করবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিলিত সম্মুখ আর মজুরতন্ত্রের ভিতরে মোটামুটি কথাটা এই যে ও কর্তব্য করবে বৈশ্য ও শূদ্রের মিলে। এ দুই ব্যবস্থাই খণ্ডিত। কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যাপার যেমন এক দিকে গুণতান্ত্রিক তেমনি অল্প দিকে সমগ্রকে নিয়ে। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে, বংশ কুল শ্রেণী বুঝি নে—যেখানে গুণ-যোগ্যতা-প্রতিভা দেখব সেখানেই আমার আদর। গুণীর আদর করা মানেই হচ্ছে তাকে সাধারণের থেকে পৃথক ক'রে দেখা, বিশেষ ক'রে দেখা। সুতরাং সাম্যবাদ এখানে যেমন মিথ্যা তেমনি অচল। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ দুটো স্বভাববিরোধী তত্ত্ব; বলা বাহুল্য যে সমাজ-গুণের আদর করতে জানে না—কথায় এবং কাজে, তবে এবং বাস্তবে—সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং যে গণতন্ত্র খণ্ডিত এবং গুণতান্ত্রিক নয়,

সে গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রের মতোই অকল্যাণের বীজকে বুকে ক'রে আছে—স্বযোগ পেলেই তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। মনে রেখো, সবাই সমান আর সবাই সমান হলে ভাল হয় কি? সবাই সমান হবে আশা করি—এগুলো এক কথা নয়। সবাই সমান হয়ে উঠুক এই শুভ ইচ্ছা তুমি প্রাণ ভরে করতে পার। তবে মনে রেখো, উপরের দিকে উঠে সবাই সমান হলে সেটা আনন্দেরই কথা। কিন্তু নিচের দিকে নেমে সবাই সমান হবে—এটা মানবতার বাণীও নয় এবং বিবর্তনবাদের গূঢ় তত্ত্বও নয়। এর মধ্যে আছে মানব-আত্মার স্পষ্ট প্রাজ্ঞ। Quality vs. Quantity—গুণ বনাম সংখ্যা এই তর্কের মধ্যে আত্মার রাজ্য চিরকাল রু'কে আছে গুণের দিকে।

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আজ এই সাম্যলোভী গণতন্ত্র সাংসারিক ব্যাপার থেকে সাহিত্যিক ব্যাপারে নিজেকে উন্নীত করবার চেষ্টা করছে—অর্থাৎ রাজনৈতিক রাজ্য থেকে মানুষের চিন্তা ও রূপ-রসের রাজ্যে রাজত্ব বিস্তার করতে হাত বাড়িয়েছে। ব্যাপারটা যেন কতকটা মানুষের দৈনন্দিন বাজার-খরচের হিসাব দিয়ে তার আনন্দ-সত্তার তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা। এটা এত স্পষ্ট এবং এত বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড যে অল্পপাত-জ্ঞান, যথাযথ মূল্য-বোধ, যত্নগতের ঠিকানা সব যুগপৎ একসঙ্গে না হারালে কেউ ও ব্যাপারে জিন্দাবাদ উচ্চারণ করতে পারে না। ও ব্যাপার সত্য-ইয়ে উঠলে মানব-সভ্যতা যে বরবাদ হবে সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কেননা মানবীয় সভ্যতার আসল হিসাবটা হচ্ছে আনন্দের হিসাব—বাজার-খরচের হিসাব কদাপি নয়। কেননা এই স্থিতির সবকিছুই আনন্দ থেকেই জন্মেছে, আনন্দের দ্বারাই বেঁচে আছে এবং আনন্দেই প্রত্যাগমন করছে। ঔপনিষদিক ঋষিদের এই যে নিগূঢ়তম দর্শন, এই যে পরম সত্যের উপলব্ধি, পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক এই দর্শন এই উপলব্ধির অধিকারী হয় নি—এত বড় আনন্দের সংবাদ অল্প কোন দেশের মহাজনরা বহন করেন নি। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-থাকা এই আনন্দ পূর্ণতম গভীরতম সংহততম অবস্থায় ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে বিরাজিত—এই আনন্দের কিছু অংশকে আশ্রয় করে জন্ম-হয় সাহিত্য ও শিল্পকলার। এই কারণে ব্রহ্মানন্দ রস এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার আনন্দ-রসকে এক গোত্রীয় বলা যায়। ও দুইই আপনার অইহতুকী আনন্দ-রসে দীপ্যমান ও দীপ্তিমান।

কিন্তু আমি যদি ম্যালেরিয়াতে ভুগি এবং ব্রহ্ম আমার সেই ম্যালেরিয়া সারিয়ে দিয়ে যান তবে যেমন ব্রহ্মকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসক রূপে জানলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠরূপে জানা হয় না, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পকলা যদি রাজনৈতিক

বা সমাজনৈতিক সভায় সভাপতিত্ব করে বা অর্থনৈতিক বাজারে দালালী শুরু করে দেয় তবে সাহিত্য ও শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ রূপটি পাওয়া হয় না। ব্রহ্মের দান করবার ক্ষমতা ম্যালেরিয়ানাশক বড়ির চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার কাছ থেকে আদায়ী বস্তু উলার বা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত সমাজ-সংস্কারক বিলের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মকে ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসকরূপে জেনে এবং সাহিত্য ও শিল্পকলাকে জমা-খরচের হিসাব-রক্ষকরূপে পেয়ে হুটু হুওয়া কতকটা হীরককে কাঁচ ঠাউরে উল্লসিত হওয়ার মত। মানুষের আত্মার সামর্থ্য যখন খুব নিচু পরদায় নেমে আসে তখন সে নিচুকে উচু স্থানে বসিয়ে আপনার আত্মসম্মান বজায় রাখে। দুর্বল যারা তারাই প্রয়োজনকে পরম বলে জানে। কিন্তু শক্তিমানের মানদণ্ড ভিন্ন ধরণের, সে প্রয়োজনকে সহজেই অতিক্রম করে আনন্দলোকের সন্ধান করতে পারে। যে মহাজন মানুষের জীবনকে অমৃতত্বে পূর্ণ করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে মাত্র অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল টনিক আশা করা কিম্বা যে বিষয় সংসাররূপ বিষবৃক্ষের বিবাক্ত ছায়ায় রূপাভ্যরূপ অমৃত ফলের স্বাদ দিতে পারে তার কাছ থেকে মাত্র জমা-খরচের হিসাব আদায় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং শক্তিমানের ধর্ম নয় অপিচ কীতিমানের বৃত্তি নয়।

অবশ্য আমি জমা-খরচকে অবজ্ঞা করছি নে, জমা-খরচের হিসাবও রাখতে হবে কিন্তু সেটা খাজাঞ্জিখানায়, সাহিত্যের আসরে বা কাব্যের বাসরে নয়। জমা খরচের কবিতা শুভঙ্করীতেই শুভ—সাহিত্য-সভায় বা কাব্যের বৈঠকে তা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার—এমনকি সেটাকে কলেঙ্কারী ব্যাপারও বলতে পার।

কিন্তু বলছিলাম সাহিত্য সম্পর্কে গণতন্ত্রের কথা। সাহিত্যেও গণতন্ত্র আছে। কেননা এখানে যার পায়ের ধুলো নি তিনিও যদি কোন বেকাস কথা বলে ফেলেন তবে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করার অধিকার আছে। এইখানেই সাহিত্যের আসল গণতন্ত্র। এখানে সম্রাট ও সামন্ত এক তরীতে, এমনকি বাদশা ও বান্দাও এক বজরায়

—এখানে কাউকে কারো বলবার রীতি নেই—

ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরী,

আমারি খ্যাতির ধানে গিয়েছে ভরি।

নইলে সাহিত্যের গণতন্ত্র মানে এ নয় যে তার আন্দ-খানি নিয়ে গিয়ে পাততে হবে বটতলাতে, যাতে করে ঐ অঞ্চলের ছিদ্রাম মুদি, রতা নাপিত, স্ববল ধোপা প্রমুখ স্বধীবৃন্দ বিড়ি টানতে টানতে অসঙ্কোচে এসে সেই আসনের কাছ ঘেঁসে বসে যেতে পারে। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করা, গভীরকে হালকা করা, সুউচ্চকে বামন করা সাহিত্যের ধর্ম

নয়। সামান্যকে অসামান্য করা সাহিত্যের কীতি, অসামান্যকে সামান্য করা নয়।

ছিদ্রাম মুদি প্রমুখ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের বোধগম্যতার সংকীর্ণ গণ্ডির মাপে যদি সাহিত্য রচনা করতে হ'ত তবে কোনোদিন কোনো কবি

এক বিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল

এ তাজমহল

এমন কথা লিখতে পারতেন না। কেননা তাজমহলের মত একটা স্ববৃহৎ ইমারতকে যে কোন মানুষ কি ক'রে এক বিন্দু নয়নের জল বলে ভাবতে পারে, কেবল তাই নয়, ভেবে একটা বিপুল স্থখ পায় এবং মানব-সমাজে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যারা ঐ কথা শুনে কেবল যে স্থখ পান তাই নয়, তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—এ-সব ব্যাপার যে কোন যাহুবিচার বলে ঘটে থাকে তার হৃদিস ছিদ্রাম মুদিদের কাছে চিরকালই একটা রহস্য থেকে যেতে বাধ্য—অর্থাৎ যত দিন তাদের বর্তমান মন বুদ্ধি চিত্ত বিদ্যমান থাকবে। সাহিত্যে যারা এই ধরণের গণতন্ত্রের আদর্শের কথা বলেন তাঁরা আসলে হচ্ছেন শূদ্রধর্মী। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। শূদ্রকে অবজ্ঞা না করেও তার স্থান নির্দেশ করা যায়। শূদ্র হচ্ছে তামসিকতার প্রতীক। তার আত্মায় সেই শক্তি ভাগ্রত হয় নি যে শক্তির গতি উর্ধ্ব দিকে—যে শক্তি ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, তুচ্ছ থেকে মহতে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে ক্রমাগত যেতে চাচ্ছে—যা একটা বৃহত্তর আনন্দ-লোকের সন্ধানে ফিরছে। মানব নামক সম্প্রাণ প্রতিজ্ঞাটির মধ্যে যে একটা চিরন্তনের গতি আছে স্বল্প থেকে জুমার দিকে, শূদ্রের মধ্যে সেই গতি গতিশীল হয় নি। শূদ্রের দেহই নড়ে, কিন্তু মন নড়ে না। তাই শূদ্র হচ্ছে তামসধর্মী। তাই শূদ্র চায় সব কিছুকেই টেনে আপনার স্তরে নামিয়ে আনতে—আত্মশক্তিতে নিজেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে নয়। কিন্তু মানবের মানবত্ব শেষ বিশ্লেষণে শূদ্রত্ব নয়, দেবত্ব। কেননা তার অন্তরাত্মায় যে শক্তি আছে সে শক্তির সাজাত্য মাটির সঙ্গে নয়, আকাশের সঙ্গে। সে শক্তি অগ্নিধর্মী, উর্ধ্বদিকে যার গতি—সলিল-ধর্মী নয়, নিচু দিকে ছাড়া যা চলতে পারে না।

শূদ্রের—এবং আর সবারও—অন্নবস্ত্রের সূচাক্ষু ব্যবস্থা খুব ভাল কথা। সেটা সমাজপতিদের পরিদর্শনীয়। অন্নং ন নিন্দ্যং—অন্নের নিন্দা করবে না। অন্নং বহু কুবীত—বহু অন্ন অর্জন করবে। সেটা বৈষ্ণবদের অবশ্য-করণীয় কর্ম। কিন্তু তার চাইতে চিরকালের বড় কথা শূদ্রের—এবং আর সবারও—আত্মার উদ্বোধন—তার আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করা; ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, তুচ্ছ থেকে মহতে, স্থূল থেকে

স্বপ্নে যাবার যে গতির কথা পূর্বে বলেছি তার মধ্যে সেই গতি ক্রিয়াশীল হওয়া, এবং তা হবার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে যত বেশি হবে সমাজ উচ্চতর চিন্তা ভাব রসালুভূতি ইত্যাদির নিকটন—যত বেশি তাদের আস-বার সম্ভাবনা থাকবে ওই সবার সংস্পর্শে—যত তারা বাস করতে পারবে একটা উচ্চতর লোকের আবহাওয়ায়। বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলাই এই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে, ওই বিভব দিতে পারে। মানুষের সভ্যতা অল্পবস্ত্রে এসে শেষ হয় নি, ঐখান থেকে শুরু হয়েছে মাত্র।

সুতরাং যারা সাহিত্যকে বটতলায় বসিয়ে তার কানে আধপোড়া বিড়ি গুঁজে দিয়ে মনে করছেন যে জনগণের তথা বিশ্বমানবের তাঁরা একটা মহৎ উপকার করলেন, তাঁদের উপকার করবার ইচ্ছা আজ যেমন উদগ্রীব, জান-দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়—এবং উপকার করবার সামর্থ্যও তেমন বিরাট নয়। যারা মানুষকে তাঁর প্রাথমিক প্রয়ো-জনের মাপকাঠিতে মেপে তাকে সেইখানেই বসিয়ে রাখতে চান তাঁরা আসলে হচ্ছেন ঐ তামসধর্মী শূদ্র। মার্ক্সিজম, কমিউনিজম, সাম্যবাদ, গণ-সাহিত্যবাদ এ সবার পিছনে কাজ করছে ঐ শূদ্রত্বের তামসিকতা। যে শূদ্র বলে মাটির সঙ্গেই আমার চিরকালের আত্মীয়তা, দেহের তোয়াজেই আমার সকল সমস্তার শেষ। গল্প কবিতার প্রতি অত্যধিক প্রবণতা থেকে আরম্ভ করে নিরীশ্বরবাদের সমস্তাহীন জিজ্ঞাসাহীন জীবন পর্যন্ত, এ সমস্তের পিছনে রয়েছে শূদ্রধর্মের স্থলের জঘ্ন আকৃতি। মানুষের স্বপ্ন-বোধকে, তার স্বপ্নবোধের জগৎকে ধ্বংস করতে না পারলে মানব জাতির স্থল প্রয়োজনের ব্যবস্থা সূচ্যাক্রমে নির্বাহ হবে না—এটা হচ্ছে ঘোর উন্মাদের প্রলাপ বাক্য। এই প্রলাপ বাক্যই আজ মানব-সভ্যতাকে অধিকার করে বসতে চাচ্ছে। এবং আশ্চর্য্য এই যে, তাতে বহুলোক উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। আত্মার মৃত্যু এঁদের কাছে উল্লাসের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—পাগলের যেমন নৌকা ডুবিয়ে উল্লাস। কিন্তু মানুষের শেষ বিরামের স্থান বা পরম আরামের স্থান স্থল জগতের কোথাও নেই—সেটা আছে অগ্নয়। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য আছে তা আপনার উৎসেরই অনুসন্ধান করছে—অনুসন্ধান করছে একটা চরম রসলোকের একটা পরম আনন্দলোকের যার ভৌগোলিক স্থিতি স্থল জগতের কোথাও নেই। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ডিনারের সঙ্গে রোলস্ রয়েস্ কার জুড়ে দিলেও এর সন্ধান মেলে না। মানুষের খাওয়ার অনুসন্ধান যেমন দুর্নিবার এই অনুসন্ধানও তার চাইতে কম দুর্নিবার নয়। এই হসাব যারা ভুলেছেন পরম সত্যকেই তাঁরা ভুলেছেন।

জৈবধর্ম মানুষের মতের ধর্মমাত্র, কিন্তু মানুষের আত্মা অমতের অধিকারী। এ কথা যারা বিশ্বস্ত হন তাঁরা মানব-জাতির পরম বিভবকেই বিশ্বস্ত হন।

সুতরাং সাম্যবাদী গণ-সাহিত্যবাদী—সাহিত্যিক যখন উৎসাহিত হয়ে এমন কথা লেখেন—

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারী

অ'র ছুতোরেও মুটে মজুরের

—আমি কবি যত ইতঃপর—

তখন আমি উল্লসিত হয়ে উঠি নে। কেননা নিশ্চিত জানি কবি যদি ছুতোর কামারের কবি হয়ে ওঠেন ও তাদেরই বোধগম্যতার সীমানার ভিতরে কবিতা রচনা করতে থাকেন তবে তা দিয়ে মানব-জাতির কাব্যলোক বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। অপর পক্ষে তাতে করে যে ছুতোর কামারদের সাংসারিক জীবন উন্নত হয়ে উঠবে তাও নয়।

কিন্তু আসলে কোনো বড় কবিই তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভাকে অধীকার করে তাঁর লেখনীকে অশিক্ষিত বা অধীক্ষিত মানুষদের বোধগম্যতার সীমানায় আবদ্ধ রাখতে পারেন না, ইচ্ছা করলেও পারেন না—যেমন পারেন না বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোকার মতো আচরণ করতে। প্রতিভাবান কবির পক্ষে পতকার হওয়া তেমনি কষ্টকর, পদ্যকারের পক্ষে উচ্চদরের কবিতা রচনা যেমন অসাধ্য। যিনি যা তাঁর সেই রকমই প্রকাশ হয়—প্রকাশ হতে বাধ্য। প্রতিভা-প্রদীপ্ত কবির চিন্তা একটা রসলোকের, একটা আনন্দরাজ্যের অনুভূতি পায়, তাঁর কলমের মুখে এই রাজ্যেরই প্রকাশ হবে। কবির চোখ একটা জগতের সন্ধান পায়, সে-জগতের ভৌগোলিক স্থিতিটা সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জগতের কোথাও নয়—সে জগৎ যেমন রাজা মহারাজা বা নবাব নাইটের নয়, তেমনি কামার কাঁসারী বা ছুতোর মজুরেরও নয়।

আসলে কাব্য কাব্যই—তার একটা আপন রাজ্য, আপন সভা, আপন ধর্ম আছে। এই ধর্ম পালনেই তার অস্তিত্ব তার সাফল্য। এই হচ্ছে কাব্যের আসল ও শ্রেষ্ঠ পরিপন্থ—তা কোনো বাদ বা “ইজম”—এর নেজুড বা অনু-যজিক ব্যাপার নয়। সামাজিক কোনো বিপর্য্যেই কাব্য-ধর্মের মূল তত্ত্বে কোন বিপর্য্য ঘটে না, কেননা বিষয়টা সমাজোত্তর। সমাজের স্বপ্ন দুঃখের মাটি থেকে যে রস আহরণ করে কিম্বা কল্পলোকের আলোর রাজ্য থেকে আলোর দীপ্তি নিয়ে কবি-মন কাব্যে যে রূপ রস ও আনন্দের সৃষ্টি করে তা সমাজ-দেহের কোনোখানেই নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে যদি আজ বহু মহামারী বাড়-বাঁধা উদ্‌গাপাত শুরু হয়ে যায় তবু কাব্যের রূপ রস স্বাদ

গন্ধের মধ্যে কোনো 'প্রলয়' কাণ্ড ঘটবার কারণ ঘটে না, কেননা ব্যাপারটা প্রাকৃতিক সকল দুর্ভোগকে অতিক্রম করে সর্বকালের মধ্যে রয়েছে। সমাজের বিপর্যয়ে আমাদের মনে বিপর্যয় ঘটে বটে। আমাদের এই বিপর্যয় মনই তখন এমন সব কথা বলতে থাকে এমন সব ইডিয়-লজির আবিষ্কার করে যা প্রকৃতিস্থ লোকের দ্বারা কদাপি সম্ভব নয়, এবং যে-সব না সত্য না শিব।

মানুষের প্রতিদিনের বিক্ষুব্ধ জীবন-যাত্রার অন্তরালে তার গভীরতর চেতনা। যে একটা প্রবহমান স্বর, একটা দীপ্তিমান স্বপ্ন আছে সেই স্বর ও স্বপ্নকে ঘিরে যে একটা চিত্ত-চমৎকারী আনন্দ-রস বাক্যে বর্ণে নৃত্যে সঙ্গীতে অভি-ব্যক্ত হচ্ছে বা অভিব্যক্ত হতে চাচ্ছে সেই আনন্দ-রসকে যদি আজ থাকী শার্ট ও হাফ-হাতা শার্ট পরে ওমনিবাসের ষ্ট্রিয়ারিং ছইল ধরে বসতে হয় জনগণের হাট বাজার করবার সুবিধার জন্তে, তবে সেটাকে আর যাই বলা যাক না কেন মানব-সভ্যতার প্রগতি বলা যায় না। মানব-সভ্যতার প্রগতির আসল হিসাবটা স্থলের হিসাব নয়, সেটা স্বপ্নের হিসাব। মোটর গাড়ীটা যে মানব-সভ্যতার প্রগতির পরিচয় সেটা জড়-মোটর গাড়ীর জন্তে নয়, সেটা এইজন্যে যে মানুষের ধারালো বুদ্ধি ওটাকে আবিষ্কার করতে পেরেছে—কিন্তু ব্যাপারটাকে আরো স্বপ্ন তত্ত্বে পরিণত করে বলি যে, ওটা মানব-সভ্যতার প্রগতির পরিচয়, কেননা ওটা এই সত্য জ্ঞাপন করেছে যে, মানুষের বোধি বা ইন্টুইশান বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যের অন্তরে আরো খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছে। কাব্য আমাদের নিয়ে যায় বাহির থেকে অন্তরে, স্থূল থেকে স্বপ্নে, বুদ্ধি থেকে বোধিতে, বস্তু থেকে রসে। তাই কাব্য মানব-জাতির প্রগতির একটা মহা পরিচয়। স্মৃতবাং কাব্যকে তার আপন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করলে মানব-সভ্যতারই বিচ্যুতি ঘাবে।

এই সব কথাই গভীর ভাবে অনুধাবন করে দেখলে তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে “আমি কবি ভাই কামারের” ইত্যাদি ছত্রগুলির বিশেষ কোনো সমীচীন মানে হয় না। কিন্তু সমীচীন কোনো মানে না হলেও, ওর শিল্পনের মতলবটা বোঝা কঠিন নয়। লেখক পৃথিবীর দুর্গতদের দুর্গতি দেখে ব্যথিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের পক্ষ হয়ে একটা কিছু করে কেলবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। দুর্গতদের দুর্গতিতে ব্যাকুল হওয়া খুব ভাল কথা। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো ব্যথিত হওয়া আরো ভাল। দুর্গত-দের দুর্গতি মোচনের আসল উপায় খারাপ কবিতা লেখা নয়, বা আমি ও আমড়া'কে সমান জ্ঞান করা নয় কিন্তু মাত্র পৃথিবীটাকে মানুষের বিশ্ব মনে করা নয়। দেবী বীণাপাণির

হাত থেকে বীণা ও পুস্তক কেড়ে নিয়ে লালন ও ‘ভাউ-চার’ তুলে দিলে সকল সমস্যার সমাধান হবে না। আসলে দুর্গতদের দুর্গতি মোচনের পদ্ধতি ও কৌশল অন্য় রকমের। এই দিক থেকে রূপ কবি মায়াকভস্কির (যাঁর অহু করণেই সম্ভবতঃ বাংলা ঐ ছত্র কটি লেখা) এই যে কথা—

যুগ্মস্থ শ্রমিক

* * *

আমার মুখের শক্তি সব তোমাদের—

এর একটু সূচু অর্থ পাওয়া যায়। কবি এখানে তাঁর মুখের অর্থাৎ কলমের শক্তিকে নিয়োজিত করতে চান শ্রমিকদের কাজে, যে কাজ শ্রমিকদের সাধার মধ্যে নেই। তিনি মুখ শ্রমিকদের সপক্ষে হয়ে উঠতে চান বক্তা প্রচারক কর্মী। শ্রমিকদের পক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করবার পর তিনি নিশ্চয়ই এমন কথা ভাবছেন না—

রচিব গো মধুচক্র রূপজন যাহে

আনন্দে করিবে পান স্নান নিরবধি—

আর ভাবলেই তা সফল হবে না—কেননা ও কার্যের জগৎ-আলাদা, কৌশল আলাদা, মন আলাদা। মানুষের দেহের অঙ্গের ব্যবস্থা ও মনের বস্তুহীন আনন্দের ব্যবস্থা একই স্থানে দাঁড়িয়ে করা যায় না। বাঁশটা যখন বাঁশীই হয়ে ওঠে তখন সেটা গৃহস্থালীর কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু এক অজ্ঞাত আনন্দ লোক তার বুক বাসা বাঁধে। এই আনন্দ লোকের মানে ও মর্যাদা বিশ্বত হওয়া মানুষের আপনাকেই বিশ্বত হওয়া। কার্যক্ষেত্রের কৌশলটাকে যদি কাব্যক্ষেত্রের কৌশল বলে মনে করি তবে খনিজ দিয়ে ক্ষৌরকার্য করবার মত অবস্থা দাঁড়ায়।

কিন্তু “আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারীর” এই রকমের অসত্য দর্শন ও অসত্য ভাষণ দিয়ে দেশের আকাশ-বাতাস আজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, এবং এই সকল অসত্য কথাও চিন্তার সঙ্গে যে একটা শুভ ইচ্ছা জড়িয়ে আছে সেই শুভ ইচ্ছার জোরে সে সব বহুলোকের মন প্রাণ-চিত্ত অধিকার করে বসেছে। ঠিক ঐ কারণে এই সব অসত্য বেশী মর্যাদাক। কেননা এর পিছনের শুভ ইচ্ছাটা আমাদের দৃষ্টি এমন ভাবে আকৃষ্ট করে রাখে যে এর অসত্যতা আর আমাদের চোখে পড়ে না। এই সব অসত্যের বিষবাস্পে আজ দেশের বহু তরুণ-তরুণীর মনন-ক্রিয়ার যন্ত্র পদু হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে—আশঙ্কা, মন তাদের পাছে জন্মের মত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে—স্বপ্নবোধ তাদের জন্মের মত ছেড়ে চলে যায়। বলা বাহুল্য অসত্য থেকে মুক্ত হতে না পারলে মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নেই—কি মানুষের কি মানব-সভ্যতার।

কেননা গণতন্ত্র যেমন বংশতান্ত্রিক বা জন্মতান্ত্রিক নয়, তেমনি তা অন্নতান্ত্রিকও নয়। গণতন্ত্র যদি কেবল অন্নের উন্নতি করে মনের অবনতি ঘটায় তবে তা মানব-সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ হবে না, হবে অভিশাপ। মনের উন্নতি কেবল বিস্তারে নয়, গভীরতায়, সূক্ষ্মবোধে, অধ্যাত্ম-সত্যায়। জড় থেকে চৈতন্যের দিকে গতি—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম এ হচ্ছে মানুষের মনের উন্নতির মাপঘন্থ। যে রাজ্যে। ইতি—

তন্ত্র এই মাপঘন্থকে অস্বীকার করে সে তন্ত্রকে নিঃসংশয়ে কীত্তিনাশার ভলে ভাসিয়ে দিতে পার। কেননা সে তন্ত্রের মধ্যে নিশ্চিতরূপে মানব-সভ্যতার মৃত্যু লুকিয়ে আছে। মানুষের দালান কোঠা মোটর এগোপ্লেন ইত্যাদিকেই যদি মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞান বলে ধর তবে এ সবেরও জন্ম সূক্ষ্মলোকে অর্থাৎ মানুষের চিন্তার জগতে কল্পনার

—হসন্ত।

অপরাজিতা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

[রবীন্দ্রনাথের 'জয় পরাজয়' গল্পের রাজকুমারী]

তোমার সভার কোলাহল হ'লে সারা

একে একে যবে ডুবে যায় সব তারা,

নিশীথ গগনে আঁধার বাঁধন হারা

নাহিছে যখন সেই ক্ষণটুকু লাগি

অবিকশিতা

মোর শেষ গীতি শুনাতে প্রসাদ মাগি,

অপরাজিতা।

রাজসভামাঝে আছে কত কবিদল

সাজাইতে তব উৎসব ঝলমল ;

সবাই বিজয়ী, সবাই ধরণীতল

মোহিছে, লভিছে তোমার মুকুটমণি

সুপরিচिता ;

মোর সাধ শুধু শুনিতে নুপুরধ্বনি,

অপরাজিতা।

বহু দূর হতে আসে কত মধুকর,

বাতায়ন-পথে শুবগান নির্ঝর

প্রসারিয়া উঠে কত রাগে কত স্বর,

মোর স্বর নাই, গাহিতে জানি না, শুধু

অপরিমিতা

ছিল আশা আর তব আশ্বাস মধু,

অপরাজিতা।

সেদিন মুখর বর্ষা গোবুলি বেলা

রাজবাতায়নে সাজে নি প্রদীপমালা ;

কি জানি সহসা তব ধোলালের খেলা

চকিতে তোমার আঁখি-আহ্বান-বাণী

বিজলী-সিতা

জাগল আমার অপটু স্বদয়ধানি,

অপরাজিতা।

সে নিমেষ হতে নীরব আঁধার রাতে

হেরেছি লিখিত এ স্বদয়ে বেদনাতে

তোমার স্বীকার ভাষাহীন আঁখিপাতে,

সুদূর লোকের স্বপনের রাজ্যবালা

প্রণয়ভীতা,

বলিছে সমুখে অমল কণ্ঠমালা,

অপরাজিতা।

তার পরে নিতি রাজসভাগৃহ তলে

গোপন বারতা বাণী-পূজারতি ছলে

রচিয়াছি লয়ে আকাশকুসুম-দলে—

জানি না অলখে গ্রহণ করেছ কি না,

হে সূচরিতা,

কবিকুল হাসে শুনিয়া সরল বাণী

অপরাজিতা।

যে গান হেথায় অবুঝের মত ফিরে

রূপ নিতে চায় তোমার চরণ ধিরে

মানো না সভার পরিপাটী নিয়মেরে

সে গান ধামিবে আজিকে রাজ্যশেষে

ভীকু নমিতা,

ধ্যানেতে হেরিয়া তোমারে বধুর বেশে,

অপরাজিতা।

যে গান গেয়েছি যে কথা রছিল বাকী

যে স্তম্ভ লভেছি যে বেদনে মুখ ঢাকি

সাধ আশা সব সাধনার ধন রাখি

হাই সঁপি তোমা এড়ায়ে লোকের ভিড়ে,

মধুর চিতা,

সহসা স্মরিবে কখনো বা এ কবিরে,

অপরাজিতা।

সে ক্ষণটুকুরে করণ করো না, মোর

ব্যথার আভাস ন

এ বিভোর

জীবনের জ্যোতি নব বিকাশের ভোর,

তুমি চেয়েছিলে তাই গেয়েছিহু গান

গোপনে গীতা,

যা কিছু লভেছি তা-ও ত তোমারি দান,

অপরাজিতা।

পৃথিবীর আবহাওয়া

শ্রী অমিয়কুমার দত্ত, এম-এসসি

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পৃথিবীর অতীতের আবহাওয়ার বিবরণ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এই প্রয়াসে বৈজ্ঞানিকেরা বাধ্য হইয়া আনুমানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অবশ্য অনুমানটির যাহাতে বর্তমানের জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য থাকে তাহার দিকেও বৈজ্ঞানিকেরা যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে পাললিক শিলার (sedimentary rocks) গঠন ও প্রকৃতি এবং তন্মধ্যস্থ জীবাশ্ম (fossils) এইগুলি আবহাওয়ার মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এইগুলি দ্বারাই অতীতের আবহাওয়ার চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা হইয়াছে।

তাপমাত্রার ভারতম্য অনুসারে আবহাওয়াকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—অতি উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ও অতি-শীতল। ইহাদের প্রত্যেকেরই পাললিক শিলার উপর প্রভাব বিভিন্ন।

অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় পললের (sediments) বায়ুই একমাত্র বাহক। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বায়ুবাহিত পললের দাগগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার। বায়ুদ্বারা বহনকালে দানাগুলি নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে ঐরূপ গোলাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জল ও হিমবাহ (glacier) বাহিত দানাগুলি একটু কোণযুক্ত হয়; কারণ এ ক্ষেত্রে সব দিক হইতে সমভাবে ঘর্ষণ হওয়া সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় পললের দানাগুলি (বিশেষ করিয়া বায়ুকণা হইলে) সাধারণতঃ উজ্জ্বল হয়। পাললিক শিলার এলোমেলো স্তর-বিন্যাস (cross bedding) ঐরূপ আবহাওয়ার আর একটি বিশেষত্ব। অবশ্য ঐরূপ স্তরবিন্যাস অল্প জলে সব আবহাওয়াতেই হইতে পারে কিন্তু পুরোঁজ পাললিক শিলার আয়তন শেখোজ পাললিক শিলার আয়তন অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং আয়তন দেখিয়া এ ক্ষেত্রে আবহাওয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় কয়লাজাতীয় কোন কিছু সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বা গেলেও তাহার পরিমাণ অতি অল্প। লবণ জাতীয় পদার্থ ও লালমাটির স্তর সাধারণতঃ উষ্ণ আবহাওয়ার পরিচয় দান করে।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় প্রস্তরের ও খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ক্ষয় হয় খুব বেশী। ফেলস্পার (felspar) জাতীয় পদার্থ ঐরূপ আবহাওয়ায় মাটিতে পরিণত হয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় উদ্ভিদাদি হয় খুব প্রচুর এবং সেই জন্ত ঐরূপ আবহাওয়ায় পাললিক স্তরে আমরা কয়লার স্তর দেখিতে পাই। প্রবালগঠিত চূণাপাথরেও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাই।

কাল

আধুনিক বা হোলোসিন (Holocene)
প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)
প্লায়োসিন (Pliocene)

বয়স

১৫০০০ বৎসর
১,৫০০,০০০ ”
১৫,০০০,০০০ ”

আবহাওয়া

আধুনিক
শীতল হইতে হৈমবাহিক
শীতল

অতি শীতল আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হইল হিমবাহের সৃষ্টি এবং তাহা হইতে উদ্ভূত শিলার গঠন ও প্রকৃতি। হিমবাহ বাহিত প্রস্তরগুলি কখনও আয়তন ও গুরুত্ব হিসাবে সাজান নয়। এই প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ খুব মৃদু আর দাগকাটা। এই শেষেরটি অতি শীতল আবহাওয়ার একটি বিশেষত্ব।

প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপ ও শামুক জাতীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে ফার্ণ (fern) জাতীয় উদ্ভিদ আবহাওয়া নির্ণয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে জীবেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অতি আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়া যাইতে পারে—যেমন সাধারণ গভীর উষ্ণ প্রদেশবাসী কিন্তু লোমশ গভীর শীত প্রদেশবাসী। সেইজন্য সাধারণতঃ পাললিক শিলার উপর গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। অতীতের ঐরূপ শিলার রূপান্তরিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভব। এই কারণেই বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল।

এইগুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর ইতিহাসের বেশীর ভাগ সময়ে গিয়াছে নাতিশীতোষ্ণ বা ঈষদ্রুষ্ণ আবহাওয়া। এই সাধারণ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ছাড়া চারিটি অতি শীতল আবহাওয়ার অস্তিত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি ছিল প্রাক্-কেম্ব্রিয়ানের (pre-Cambrian) প্রথম, দ্বিতীয়টি ছিল প্রাক্-কেম্ব্রিয়ানের শেষে, তৃতীয়টি পার্মো-কার্বোনিফেরাস (permo-carboniferous) সময়ে ও চতুর্থটি প্লাইস্টোসিন (Pleistocene) সময়ে। (কেম্ব্রিয়ান, কার্বোনিফেরাস প্রভৃতি পৃথিবীর বয়সের এক একটি কাল। নিম্নের তালিকাটি হইতে উহাদের বয়স জানা যাইবে।) এগুলি ছাড়া সব সময়ই পৃথিবীর কোন-না-কোন স্থানে অল্প হৈমবাহিক আবহাওয়ার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই সব অতিশীতল আবহাওয়ার মধ্যে প্লাইস্টোসিনের আবহাওয়াই সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক এবং সর্বাপেক্ষা ভীষণ।

প্লাইস্টোসিনে যে সব সময়ই হৈমবাহিক আবহাওয়া ছিল তাহা নয়, কারণ ভূতত্ত্ববিদের নিকট এই সময়ের মধ্যে ঈষদ্রুষ্ণ আবহাওয়ারও অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। তখন বরফ পড়া শুরু হইয়াছে এবং পললে জল ও হিমবাহের যুগ্মপ্রভাব দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদের মতে এক হইতে তিনটি ঐরূপ ঈষদ্রুষ্ণ আন্তর্হৈমবাহিক (inter-glacial) আবহাওয়া ও দুই হইতে চারিটি হৈমবাহিক আবহাওয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

নিম্নে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের একটা আবহাওয়ার তালিকা দেওয়া গেল :

মায়োসিন (Miocene)	৩০,০০০,০০০	বংসর	নাতিশীতোষ্ণ
অলিগোসিন (Oligocene)	৪০,০০০,০০০	"	উষ্ণ হইতে নাতিশীতোষ্ণ
ইওসিন (Eocene)	৬০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ হইতে উষ্ণ
ক্রিটেশাস (Cretaceous)	১২০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ হইতে উষ্ণ
জুরাসিক (Jurassic)	১৫০,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ
ট্রায়াসিক (Triassic)	১৮০,০০০,০০০	"	উষ্ণ
পার্মিয়ান (Permian)	২২৫,০০০,০০০	"	হৈমবাহিক হইতে নাতিশীতোষ্ণ
কার্বোনিফেরাস (Carboniferous)	৩০০,০০০,০০০	"	হৈমবাহিক
ডেভোনিয়ান (Devonian)	৩৪৫,০০০,০০০	"	উষ্ণ হইতে নাতিশীতোষ্ণ
সাইলুরিয়ান (Silurian)	৩৭৫,০০০,০০০	"	নাতিশীতোষ্ণ
ওর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)	৪৩৫,০০০,০০০	"	শীতল হইতে নাতিশীতোষ্ণ
কেম্ব্রিয়ান (Cambrian)	৫৪০,০০০,০০০	"	শীতল হইতে নাতিশীতোষ্ণ
প্রাক-কেম্ব্রিয়ান (Pre-Cambrian)	১,০০০,০০০,০০০	হইতে	শেষের দিকে হৈমবাহিক
	২,০০০,০০০,০০০	"	

আমাদের বর্তমানের আবহাওয়া ঠিক শীতল হৈমবাহিক আবহাওয়ার পরের অবস্থা। ইহাতে শীতের বুঝ প্রাচুর্য না থাকিলেও ইহাকে কখনও উষ্ণ আবহাওয়া বলা চলে না। এখনও বহু পর্বতের উপরে ও মেরু-প্রদেশে বহু হিমবাহের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বলা যায় না যে আমাদের বর্তমানের আবহাওয়া একটি অন্তর্হৈমবাহিক আবহাওয়া কিনা এবং ইহার পরই আরার একটি অতি শীতল আবহাওয়া আসিবে কিনা।

ভবিষ্যতের আবহাওয়া সম্বন্ধে বলিতে হইলে সূর্যের তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। কারণ সূর্যের তাপ-বিকিরণের সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ নিকট। সৃষ্টির আদিমকাল হইতে সূর্য এখনও পর্যন্ত সমভাবে তাপ-বিকিরণ করিয়া আসিতেছে। এই বিকিরণে সূর্যের ক্ষয় হইতেছে প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ লক্ষ টন। এই পরিমাণে ক্ষয় হইতে থাকিলে বেশী দিন সূর্যের তাপ-বিকিরণ সম্ভবপর হইবে না। শুধু সঙ্কোচনের ফলে তাপ-বৃদ্ধি হেতু এ ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে না। অতীত বলা হইয়া থাকে যে বস্তুর ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত শক্তির দ্বারা এ ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে। সুতরাং সূর্যকে নিজেই জ্বালাই এই শক্তি জোগাইতে হইতেছে। অতএব এমন এক সময় আসিবে যখন সূর্যের আর ঐরূপ শক্তি বিকিরণ করা সম্ভব হইবে না। তখন পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস অনিবার্য; কারণ জীবের অস্তিত্বের পক্ষে আবহাওয়া, আর্দ্রতা, শৈত্য ও তাপের একটা নির্দিষ্টতা দরকার। এ সব কমটিই সূর্যের তাপের উপর নির্ভরশীল। জীব কখনই জলের বাষ্পীয় অবস্থায় অর্থাৎ ১০০° সেন্টিগ্রেড ও জলের বরফ অবস্থায় অর্থাৎ ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার আবহাওয়ার বেশীকাল থাকিতে পারে না। জীবাশ্মতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে জীব-সৃষ্টির পর হইতে এইরূপ অবস্থা কখনই পৃথিবীর সর্বত্র অধিক-কাল ব্যাপিয়া থাকে নাই। তাহা হইলে জীবের অস্তিত্ব লোপ পাইত। দৌররশ্মি বিকিরণের এই সমতা বুঝি আশ্চর্যের বিষয়। তাই যখন সূর্যের ক্ষয় হেতু এই সমতা থাকিবে না তখন জীব ধ্বংস পাইবে।

নক্ষত্রের ক্রমবিকাশ (evolution) একটি স্থিরীকৃত সত্য। নীহারিকার (nebula) পদার্থ হইতে নক্ষত্রের প্রথমে সৃষ্টি হয়। পরে সঙ্কোচনের ফলে প্রথমে রক্তাভ, পরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উহা নীলাভ স্বেতবর্ণ ধারণ করে। তাহার পর আবার শীতল হইতে আরম্ভ করে। তখন নীলাভ স্বেতবর্ণ হইতে প্রথমে হলুদবর্ণ, পরে রক্তাভ ও শেষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শীতল হইয়া যায়। আমাদের সূর্য এখন হলুদবর্ণের অবস্থায়। ইহা রক্তাভ হইয়া শেষে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শীতল হইয়া যাইবে। এখন ধরা যাইতে পারে যে সূর্য শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপে অনেক পরে সূর্যের তাপ-বিকিরণ ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। তখন পরিমিত তাপমাত্রা পাইবার জগৎ পৃথিবীকে সূর্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। গতি-বিজ্ঞানের (Dynamics) আলোচনায় দেখা যায় যে পৃথিবী অজ্ঞাত এই ও নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া শীতল হইবে। পদার্থবিজ্ঞান আমাদের একই কথা শুনাইতেছে। তাপ-বিজ্ঞানে বলা হয় যে এমন এক দিন আসিবে যখন জগতের সমস্ত তাপ সর্বত্র সমভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। এই তাপমাত্রা এত কম হইবে যে তাহাতে জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। মনে হয় জীবের ভাগ্যে এই শীত-মৃত্যু অনিবার্য। ভবিষ্যতে এমন এক শীতল আবহাওয়া আসিবে যখন জামা কাপড় কিছুতেই শীত নিবারণ করা যাইবে না। কয়লা তত দিনে শেষ হইয়া যাইবে। সব সময়ই সর্বত্র তুষারের আবরণ থাকিবে। শেষ মানব দেখিবে কিরূপে তার জাতির লোপ পাইল। দিনে ও রাতে সে দেখিতে থাকিবে উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জ। অবশেষে সে এক দিন প্রায় বৃক্ষলতাশূন্য পৃথিবীতে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইবে। অজ্ঞাত জীবেরও এই দশা হইবে। জানা যায় না যে এই ধ্বংস হইতে কোন মহত্তর সৃষ্টির কথা স্রষ্টার মনে জাগে কি না। তবে এ বিষয়ে একটা আশার কথা এই যে ভূতত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন, অতীতেও শীতল আবহাওয়া মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছে এবং তাহা হইতে জীব ও পৃথিবী রক্ষা পাইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী-বাসরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল; মহর্ষির বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিচিত্র গুণাবলীর সঙ্গে একত্র সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্তও কোন সাহিত্যরসবিচারকের দৃষ্টি সে দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। কিন্তু কথাটি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে বলিয়াই আজ দেবেন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমি সর্বপ্রথমে তাহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে তিনি “নূতন ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গ-ভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।” ইহা কেবল মাত্র পিতার প্রতি পুত্রের লৌকিক প্রশস্তি-বাচন নহে; ইহার মধ্যে একাধারে সাহিত্যিকের রসবোধ ও নিরপেক্ষ সমালোচকের স্বল্প বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব হয় তখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের শৈশব উত্তীর্ণ হয় নাই;—বাংলা গদ্য তখন পর্য্যন্তও সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই। দেবেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীদিগের মধ্যে বাংলা গদ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সাধারণতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে; কিন্তু রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়া বাংলা গদ্যের একটা সম্পূর্ণ নূতন দিকের বিকাশ হইলেও তাঁহার গদ্য-রচনার মধ্যে সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবি যে কিছুতেই পূর্ণ হয় নাই তাহা আজিকার দিনে কেহই অস্বীকার করিবেন না। রামমোহন বাংলা গদ্যে বিচার ও যুক্তিতর্কমূলক প্রবন্ধ-রচনার অগ্রদূত; তাঁহার রচনার মধ্যে সহজাত রস-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল; তিনি তাঁহার রচনায় অল্পভূতি অপেক্ষা যুক্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। এই ধরণের রচনায় একটা সাময়িক ব্যবহারিক মূল্য প্রকাশ পাইলেও যে রস-বিচার সাহিত্যিক রস-পিপাসার ভিত্তি ইহা দ্বারা কিছুতেই তাহার চরিতার্থতা হইতে পারে নাই।

রামমোহনের সমসাময়িক আর একজন বাংলা গদ্য লেখকের নাম বর্তমানে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে; তিনি যুক্ত্যঞ্জন বিদ্যালঙ্কার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈদেশিক শাসকবর্গকে এতদ্বন্দ্বীয় বিষয়াদিতে শিক্ষাদানের জন্ত কলিকাতায় কোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামক যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল যুক্ত্যঞ্জন বিদ্যালঙ্কার তাহার

অন্তর্গত বাংলা বিভাগের সর্কাপেক্ষা প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনা লইয়া কিছুকাল যাবৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে আলোচনা হইতেছে। যুক্ত্যঞ্জনের রচনার মধ্যে দুইখানি অনুবাদ, একখানি রামমোহনের রচনার অল্পরূপ বেদান্তদর্শন বিষয়ক রচনা, আর দুইখানি সংকলন-গ্রন্থ। কোন মৌলিক বিষয়-বস্তু লইয়া যুক্ত্যঞ্জন কোন স্বাধীন রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই;—তাঁহার একটি মাত্র গ্রন্থে রচনার দিক দিয়া অনেকখানি মৌলিকতা দেখাইলেও বিষয়-বস্তুর দিক হইতে পূর্বপ্রচলিত উপকরণই ব্যবহার করিয়াছেন। যুক্ত্যঞ্জনের মধ্যে শিল্পীর প্রতিভা ছিল সত্য, কিন্তু গদ্য-রচনায় তিনি নিজে যেমন কোন স্থির আদর্শের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই, তেমনই স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা বিশেষ কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাও তিনি করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনাবলীতে তিনি কেবলই বিভিন্ন রচনারীতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাবেই হউক, কিংবা অথ যেকোন কারণেই হউক তাঁহার রচনার কোন নিদর্শনকেই তিনি নিজেও চূড়ান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সকলই পাঠকের বিচার ও রসবোধের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বিচিত্র প্রয়াসের কোন কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র শিল্পী-স্বলভ শক্তির পরিচায়ক হইলেও সমগ্রভাবে তাঁহাকেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শৈশবাবস্থারই প্রতিপালক বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগে রামমোহন ও যুক্ত্যঞ্জনের নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করিতে হয়।

কালানুক্রমিক বিচার করিতে গেলে যুক্ত্যঞ্জন ও রামমোহনের পরই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগের প্রধান দুইজন গদ্য সাহিত্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ।

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই প্রথমতঃ দেবেন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্য-রচনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে হয়। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র তিনি যে একজন প্রধান লেখকই ছিলেন তাহা নহে; উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধই তিনি তাঁহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী সংশোধন করিয়া সহজ এবং সরল করিয়া লইতেন। তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে পণ্ডিত্য রীতির অপ্রতিহত প্রভাব, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রায় প্রথম হইতেই ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া বাংলা গদ্য-রচনায় একটি সাবলীল ও সহজ রীতির

প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি প্রথম হইতেই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ভাষা সংশোধন করিয়া লইতেন। এমন কি পত্রিকা-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার সমাস-বহুলতা তাঁহার সংশোধনের দ্বারাই অনেক সহজ হইয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ক্রমে যে কেবল তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক পারমার্থিক আলোচনায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহা নহে, ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সর্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠ মনীষারই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখকেরাই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ভিতর দিয়া তাঁহাদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করিতেন। এই ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র অঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হইলেও তাঁহার এক নিজস্ব আদর্শের বৈশিষ্ট্য পূর্ণাপরাজিত ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের রচনাসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে;—প্রথমতঃ তাঁহার আত্মজীবনী ও দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক রচনা। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইত তাহা ক্রমে ‘আত্মতত্ত্ব বিদ্যা’ (১৮৫০-৫১), ‘ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিধান’ (১৮৫০-৬০), ‘ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান’ (১৮৬০-৬১) এই সমস্ত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আত্মজীবনীকেও সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমতঃ আত্মদর্শনমূলক রচনা ও দ্বিতীয়তঃ নিসর্গদর্শন মূলক রচনা। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নানা দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রথমে ইহার সাহিত্যিক সার্থকতার বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মবিষয়ক অন্যান্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে তাঁহার ১৮ বৎসর হইতে মাত্র ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইলেও পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের অভিজ্ঞতালব্ধ বলিয়াই হউক, কিংবা অল্প যে-কোন কারণেই হউক, ইহার উপলব্ধি একেবারেই বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ নহে। বাস্তব জীবন ও প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক অতি নিবিড় বলিয়াই ইহার সাহিত্যিক আবেদনও তাঁহার অগাধ রচনা অপেক্ষা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। বাস্তব জীবনকে ইহার মধ্যে যে ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়, কিংবা প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধেও ইহার মধ্যে যে রকম কোতূহলের পরিচয় আছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আর কোন রচনার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধরণে কেবল আয়তচিত্রিত রচয়িতা-দিগের মধ্যেই যে শুধু সর্বপ্রথম তাহাই নহে, মানব-জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার মধ্যে তাঁহার যে একটি পরম বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সেই যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্ত বিশ্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্য-বিচারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর তিনটি দিক আছে—একটি ভাষার দিক, দ্বিতীয় ভাবের দিক ও তৃতীয় ব্যবহৃত উপকরণের দিক। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াই দেবেন্দ্রনাথের সহজ প্রত্যক্ষতা ও পরম বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-বিচারে ইহা তাঁহার পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবনের যে-কোন রচনা অপেক্ষাই শক্তিশালী।

ইহার ভাষা নিতান্ত সহজ, অথচ একটা পূর্ণতর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও প্রত্যক্ষতার নামে তাঁহার পূর্ববর্তী দুই একজন লেখক যেমন নিতান্ত গ্রাম্যতার প্রশংসা দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই; তাঁহার আধ্যাত্মিক বোধই সাহিত্য-রচনায় তাঁহার শিল্পবোধের কার্য করিয়াছে। তাঁহার ভাষার প্রাঞ্জলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

“দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকেও জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাট যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।”

নির্মল হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তিই এই অপূর্বমুন্দর ভাষা, সেইজন্ত ইহা এত স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ। অন্তরের নিতান্ত সহজ অনুভূতি বলিয়াই এই ভাষা অতি সহজে এই ভাবে মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে—

“তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং প্রতিদিন শালগ্রামের অল্প স্বল্পে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন; স্বর্ঘ্যোদয় হইতে স্বর্ঘ্যের অন্তকাল পর্যন্ত স্বর্ঘ্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময় ছাদের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম।”

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম মৌলিক রচনার মধ্যেই যে কি ভাবে তাঁহার নিজস্ব ঠাইলের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার উদ্ধৃত আত্মজীবনীর এই প্রথমার্শ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার অগতম প্রধান বিষয়। এমনকি বস্তুমাত্রকেও সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়, এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অনেক দূর

অগ্রসর হইলে পর তিনি তাঁহার নিজস্ব ঠাইলের সন্ধান পান। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ঠাইল লইয়াই বাংলা মৌলিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। রচনায় ঠাইলই রচয়িতার প্রতিভার বিশিষ্ট নিদর্শন। বাংলা রচনায় দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট ঠাইলের স্রষ্টা; ইহার পূর্বে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মধ্যে ইহার আংশিক ও অপূর্ণ উন্মেষ মাত্র দেখা গিয়াছিল। ঠাইল সাহিত্য-রচনার কৈশোর ও যৌবনেরই রূপ, শৈশবের রূপ নয়—দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত উক্তির সার্থকতা এখানেও বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বে বলিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ অনুভব করা যায়—একটির মধ্যে তাঁহার আত্মদর্শনের পরিচয়, আর একটির মধ্যে নিসর্গ-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অংশে তাঁহার আত্মদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যেও এমন একটি গিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে যাহার বাস্তব মূল্য সাহিত্যের দিক দিয়া অপরিসীম। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকেও মর্ত্য-পরিবেশের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগতের প্রত্যক্ষলোকে তিনি তখন পর্য্যন্তও তাঁহার আত্মার আকাজিক বস্তুকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। সংসারের ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যেও তিনি সেই অণু হইতে অণু এবং মহান হইতেও মহান শক্তিকে সন্ধান করিতেছেন, সেইজন্ম তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সম্মুখেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা উপেক্ষিত হইতেছে না, মানবাত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দনও অশ্রুত থাকিতেছে না। তাঁহার আত্মজীবনীর মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গভীর ভাবে অন্তর স্পর্শ করে তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—

“দিদিমার যখন স্বভূতাকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, ‘রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।’ অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্ত বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, ‘যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।’ কিন্তু লোকে তাহা শুনিলা না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, ‘তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব; আমি শীঘ্র মরিব না।’ গঙ্গাতীরে লইয়া একটি ধোলা চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন।”

আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াও এখানে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রার কোন রকম পারমাণ্বিক উদ্বেগ সন্ধান করিবার

পরিবর্তে যে তিনি যুযুৎসু স্বাকার অন্তরের মানবিক আকাঙ্ক্ষাটির একটি পরম সহানুভূতিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার আত্মজীবনীর যে অংশকে আত্মদর্শনমূলক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহার সর্বত্রই তাঁহার আত্মদর্শনের এই নিত্য মানবিক দিকটিরই সহজ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরম মানবিক অনুভূতি দ্বারা ই তাঁহার রচনার সাহিত্যিক পরিচয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

আত্মজীবনীর আর এক অংশকে নিসর্গ-দর্শনমূলক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সমগ্র প্রেরণাই এই নিসর্গলোক হইতেই লাভ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতি হইতে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিবার দৃষ্টান্ত ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, প্রকৃতির বাস্তব পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার একটি শিশু-মূলক কোতূহল চিরদিনই বর্তমান ছিল। যে লিপিকুশলতা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির জন্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালানো’ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙালী পাঠকের নিকট এত সমাদর লাভ করিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের নিসর্গ-দর্শনমূলক রচনার মধ্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রকৃতি স্তম্ভরী, যে প্রকৃতি ভীষণা, যে প্রকৃতি রহস্যময়ী তাহার নিগূঢ় অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া বিশ্লেষণ-পূর্বক দেখিবার যে একটি প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল তাহা বাংলা সাহিত্যে দুই একজন ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাও তাঁহার সৌন্দর্য্য-সন্ধানী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। তাঁহার নিকট প্রকৃতি কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকেই অনুভূতিসার ছিল না, তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী প্রকৃতির বিচিত্র আনন্দ লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। উচ্ছল আলোক, ফুলের গাঢ় রঙ, তিনি ভালবাসিতেন; বিরাট হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যভূমির মধ্যেই এই রকম আলো ও রঙের খেলা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন—

“পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে যুগ্মশীল রাজকুমার রত্নকুণ্ডল, হীরার কণ্ঠি, মুক্তার মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন। স্বর্ঘ্যের আভাতে তাঁহার সেই নবীন মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আমার বোধ হইল যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়া গেল; এই সে কাছে, এই সে দূরে; এই নীচে, এই পর্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি কষ্টে একটা ভাঙা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ করিয়া নির্বিঘ্নে সিমলার উপস্থিত হইলাম।”

“সিমলার উপরের পথে দেখি যে, সেই ফাস্তুন মাসেও

তথ্য বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা সকল শুষ্ক ও নীরস। বাঁশের অসার কফির মত বাতাসে তাহার। ঝনঝন করিতেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ফুলে সকল ভূমি একবারে মনোরম উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল।”

আর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

“অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের খেত, গীত, লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন বাসের রক্তকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছন্দ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া মধুবহন করিত, ...তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ব্বপুত্রী বলিয়া বোধ হইত।”

তাজমহলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,—

“আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদয় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। নীচে নীল যমুনা। মধ্যে শুভ্র, স্বচ্ছ তাজ সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে ঝসিয়া পড়িয়াছে।”

এমন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যসন্ধানী সৃষ্টির পরিচয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়। হিমালয়ের রহস্যনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে তিনি মুঠি মুঠি রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মজীবনীর ভিতর দিয়া এই রত্নমুঠি পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার এই দানের তুলনা নাই।

মার্জিত হাস্যরসবোধ দেবেন্দ্রনাথের আর একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার আত্মজীবনী তাহারই স্পর্শে স্থানে স্থানে অপূর্ব রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতিসংযমের মধ্য দিয়া ইহার বিকাশ হইলেও এই রসবোধ যে তাহার মনে কত গভীর ছিল তাহা আত্মজীবনীর দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিমলায় গুর্খার আক্রমণ হইবে শুনিয়া সকলেই যখন প্রাণ লইয়া পলাইতে লাগিল তখন তিনি তাঁহার এক জন পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট গিয়া দেখিলেন, “তিনি দেওয়ালের চূণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, গুর্খারা বায়ুন মানে।”

লোকচরিত্রে সুনিপুণ অভিজ্ঞতার পরিচয়ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর আর একটি বিশিষ্ট গুণ। লোকচরিত্র অঙ্কনে এমন

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ছোট রঙ যে সমস্ত চরিত্রকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেরই বাস্তব প্রকৃতিটি আত্মজীবনীতে তাহার বর্ণনা-গুণে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিষয়ক রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দেবেন্দ্রনাথের পূর্বে রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী এই সকল বিষয়ক আলোচনায় একান্ত ভাবে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মাহুতি-নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞানের উপরই নির্ভর করা হইত। সেইজন্য এই ধরনের আলোচনা একমাত্র নীরস তথ্য পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়”কেই ত্র্যক্ষের “পদ্ম-ভূমি” করিলেন। হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বর-বাদের যোগ স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার এই ধরনের আলোচনা মাহুষের বাস্তব অহুতির স্পর্শ লাভ করিয়া সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল। “ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান” তিনি ঈশ্বরের সর্বত্র প্রকাশমান প্রাণ-রূপ অহুভব করিয়া বলিতেছেন—

“যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেইরূপ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত—যক্ষের পত্রে, পক্ষীর পত্রে; সমুদ্রের গাভীরো, পর্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে।”

সৌন্দর্য্যবোধ হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক বোধের প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাও এমনই ভাবে রস-শিল্পের নিপুণ স্পর্শে সজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবি-মনকে তাঁহার আধ্যাত্মিক মন কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই বলিয়াই তাঁহার আধ্যাত্মিক অহুতি মাত্রই এমনই সহজ ও সরস। পরিদৃষ্ট-মান বিশ্ব-জগৎকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হ্রদীরীক্ষা আদর্শ-লোকে নিবদ্ধ হয় নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি জাগতিক সত্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল; সেইজন্যই তিনি বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মার প্রসাদ লাভ করিয়া ধৃত হইয়াছেন।*

* ঢাকা পূর্ব-বাংলা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শাধিক শততম মাধ্যমসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় পঠিত।



বিপরীত

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্বামী-স্ত্রীতে অতি সাধারণ কারণে একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। কারণ সামান্য। বিপ্রদাস বহু ইন্দ্রনীলের সহিত বিদেশ ভ্রমণে যাইবে, স্ত্রী মায়া সঙ্গী হইতে চায়। আপত্তিটা তার সেইখানে। কিন্তু মায়া মনে করে তার এলোমেলো-স্বভাব স্বামীকে একাকী বিদেশে যাইতে দেওয়া মানে সজ্ঞানে তার অনিষ্ট করা। যাঁহা সে প্রাণ গেলেও পারিবে না। বিপ্রদাস মনে করে, মায়ার এটা বাড়াবাড়ি। মায়া বলে, এ কথা বলিতে বিপ্রদাসের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল—নইলে যোগ্যতা যে তার কতখানি তাহা না জানে কে?

ব্যাপারটা হয়ত এইখানেই শেষ হইয়া যাইত যদি না বিপ্রদাস ভিতরে ভিতরে ইহা লইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইত এবং এই অসন্তুষ্ট সে কথায় প্রকাশ না করিলেও তার চলায় ফেরায় এমন কি প্রতিটি কাজে উগ্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল যাঁহা সাংসারিক আবহাওয়াকে ভারাক্রান্ত করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তাহার নিজের মনকেও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

স্বামীর এই অকারণ উত্তেজনা কিছুদিন যাবৎ মায়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু নিরর্থক চেষ্টামেচি করিতে ভালবাসে না বলিয়াই সে নীরব ছিল অথচ এমনি চূপ-চাপ করিয়াই বা কত দিন থাকা যায়। স্বামীকে একান্তে পাইয়া মায়া একটু ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, তোমার শরীরটা কি ভাল যাচ্ছে না?

বিপ্রদাস মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, কেন বল তো? আমার শরীর খারাপের কিছু দেখেছ নাকি?

মায়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল, ছ'চোখে তার নীরব ভ্রূসূচনা। কিন্তু মুখে কহিল, না হলেই বাঁচি। বেশী কথা কোন দিনই সে বলে না—বলিতে ভালবাসে না বলিয়াই বলে না। অকারণ মাখামাখি করাকে সে সম্বন্ধে এড়াইয়া চলে। এই লইয়া বহু অহুযোগ তার ভাগ্যে জুটিয়াছে। এমনকি স্বামীর তরফ হইতেও আসিয়াছে যুদ্ধ পরিহাসের রূপ ধরিয়া কিন্তু স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বামিহের জ্বরদন্তির কাছে কোন দিনই এতটুকু অবনমিত হইতে হয় নাই। তাহাতেই মায়া আজ রীতিমত বিম্বিত হইল বিপ্রদাস যখন একটু তিক্ত কণ্ঠেই কহিল, এ তোমার অকারণ ভাবপ্রবণতা।

মায়া যুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, অস্বীকার করছি না, কিন্তু তোমার অন্ততঃ তা নেই এ বিশ্বাস আমার ছিল। নইলে কি এমন হয়েছে যার জন্ত...

বাধা দিয়া বিপ্রদাস কহিল, সে বিশ্বাস নেই বুঝি এখন? মায়া সহজ গলায় কহিল, এ প্রশ্ন তুমি নিজেকেই করো। সে আর দাঁড়াইল না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

ঝগড়াঝাট যে স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্বে হয় নাই তাহা নহে। বরং কারণে-অকারণে একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা মিটিয়া যাইতেও বেশী দেরি হয় নাই। হয় একটু হাসি নয় খানিক চোখের জল। আজ কিন্তু এর কোনটাই প্রবেশ-পথ পায় নাই। দেখা দিয়াছে উভয় উভয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার স্বল্প বিচারলিপ্সা—যাঁহা নিরর্থক আবহাওয়াটাকে জটিল করিয়া তুলিল।

বিপ্রদাস মনে করিল, মায়ার ইহা অজ্ঞান জ্বরদন্তি—তার শান্তিপ্রিয় স্বভাবের অযোগ্য লওয়া।

কয়েক মুহূর্তেই মায়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং কোন প্রকার ছমিকানি করিয়াই কহিল, কিছুদিন থেকে তোমার যে কি হয়েছে সে তুমিই জান, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবেও না। আমার সত্যিই আর এ সব ভাল লাগে না।

বিপ্রদাস কহিল, আমিও ঠিক এ প্রশ্নই তোমায় করব ভেবেছিলাম কিন্তু বলে কোন লাভ নেই কেনেই চূপ করে আছি। কথাটা তুললে বলেই বলতে হ'ল।

স্বপ্নভাষী মায়ার আজ কি হইয়াছে জানি না, সহসা সে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, কি দেখেছ তুমি আমার, শুনি? কি অজ্ঞানতা করেছে আমি। নিজের যোগ্যতার তো বলাই নেই—তা আর জয়টাক পিটে দশজনাকে না জানালেও চলত। এই যে হাড় কাঁপুনে শীত, পরেছে কোর্টের নীচে একটা সোয়েটার, বেঁধেছ গলাবন্ধটা। ষড়যন্ত্র করে আমাকে...কথাটা মায়া শেষ করিতে পারিল না। গলাটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিল, বিয়ের পর থেকে অনেক কিছুই দেখলাম প্রতিবাদ আমি কোন দিন করি নি এখনও করছি না কিন্তু তুমি আমার এত বড় বিশ্বাসকে ভেঙে দিও না। আমার স্বপ্ন আমার কল্পনাকে মিশ্রিত হতে দিও না।

বিপ্রদাস বিষয়ে হতবাক হইয়া গেল। এ কেমন অভিযোগ। এর স্বত্র কোথায়? বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গে লইতে আপত্তি করার সহিত যে এই অভিযোগের কোথায় যোগাযোগ রহিয়াছে ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিপ্রদাস বোকার মত চাহিয়া রহিল। তার মিতভাষী স্ত্রীর এই আকস্মিক প্রগল্ভতায় সে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা প্রতিবাদ করিতে পর্য্যন্ত তুলিয়া গেল।

একটু থামিয়া মায়া পুনরায় বলিয়া চলিল, কত বড় দুর্ভাগ্য আমাদের বল তো। বিয়ের পরে আমাদের একটা নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়তে হয় অথচ এই নতুন সংসারের অসংখ্য দাবি মেটাতে গিয়ে কখনও যদি এতটুকু ক্রটিবিচ্যুতি

হয় তোমরা তা সহ্য করবে না। কিন্তু এ কথা তোমরা একবারও ভেবে দেখ না যে, স্নেহ-ভালবাসা অথবা কর্তব্যের সহজবুদ্ধি মানুষের মনে আপনি দেখা দেয় না। আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই তা জন্ম নেয়—তার স্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত পায়। তোমরা শিখেছ শুধু চোখ রাঙিয়ে সবকিছু আদায় করতে।

বিপ্রদাস এতক্ষণে কথা কহিল, নিরর্থক অনেক বাজে কথা তুমি বকে গেছ বার প্রতিবাদ করতে যাওয়াকেও আমি নীতি-বিরুদ্ধ মনে করি কিন্তু আর নয় তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ।

মায়া কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল, না অনাবশ্যক একটা কথাও আমি বলি নি—এগিয়েও যাই নি নইলে এত বোকা আমি নই যে কিছুই বুঝি না। কিসের জ্ঞান তুমি এমন করে এড়িয়ে চলতে চাও। এমন ত তুমি কোন দিন ছিলে না।

এই নিরর্থক অভিযোগে বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই কহিল, সেইখানেই মত্ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু যে ভুল এক বার করেছি তা আর দ্বিতীয় বার করব না এ কথাটা আমার ভাল করেই জেনে রেখ।

স্বামীর এমনি দৃঢ় কণ্ঠস্বর ইতিপূর্বে মায়া আর শুনিয়াছে বলিয়া তার মনে পড়ে না। মায়া আর মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘটনাবর্তী না ঘটলেই ছিল ভাল। বিপ্রদাস ভাবিতে বসিল। কিন্তু মায়ার মনে এ অভূত চিন্তাধারা স্থান পাইল কেমন করিয়া—যাহা অস্থগু নয় সহজ স্মন্দরও নয়। স্বামীকে সে কি অবিধাসের চোখে দেখিতেছে?

মায়ার চিন্তাধারা কিন্তু বিপরীত পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। তার মতে বিপ্রদাস স্ত্রীকে এড়াইয়া চলিতে চায়, নইলে একাকী বিদেশ ভ্রমণের কথা সে ভাবিতে পারিল কেমন করিয়া। কেমন করিয়া সে ভুলিয়া গেল অতীতের বহু স্মরণীয় ঘটনার কথা যা রজনীর নিস্তরতায় তারা দু'জনে রচনা করিত। যে কল্পনা তাদের কল্পলোক হইতে বর্গলোক পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে অগ্রসর হইয়া যাইত, দু'জনার আলাদা অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত যারা ভুলিয়া থাকিত, সে দিনের সে বাক্যচ্ছটা, কানে কানে কথা কওয়া...দু'জনার মধ্যে সহজ-ভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলা এ সবই কি শুধু কথার কথা? এই ক'টি গোনা বছরের মধ্যেই কি সব শেষ হইয়া গিয়াছে? মায়া যতই ভাবিতে চায় সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়।

মায়াকে পুনরায় এদিকে আসিতে দেখিয়া আলনা হইতে চাদরটা টানিয়া কাঁধের উপরে ফেলিয়া বিপ্রদাস ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মায়া অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর অপস্রিয়মান মুষ্টির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং অকস্মাৎ জোড়ে নিদ্রিত শিশুপুত্রকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। শিশুপুত্র নিদ্রিত অবস্থায় ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়া চমকাইয়া উঠিল।

আহা বেচারী...তেমন লাগে নি ত। স্বামীর প্রতি অভিমান সে মুহূর্তের জ্ঞান ভুলিয়া গেল।

* * *

বিপ্রদাস ডাকিল, ইন্দ্র আছ...ইন্দ্রনীল...

ইন্দ্রনীল সাড়া দিল, এস ভাই তোমার কথাই ভাবছিলাম—বাড়ী থেকে প্রায় ঘণ্টা ছুই আগে বেড়িয়েছি...কথা বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বিপ্রদাস মুহূর্তের জ্ঞান ঘরের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ সব কি—ঘরে ডাকাত পড়েছিল নাকি? আপাতত বিপ্রদাস তার নিজের কথা ভুলিয়া গেল। বস্তুতঃ ঘরের অবস্থা তখন এক জীবন্ত বিশৃঙ্খলা। এখানে একটা ট্রান্স খোলা, ওখানে একটা স্টুটকেন্স কাত হইয়া আছে—এখানে কিছু জামা সেখানে কিছু কাপড়।

বিপ্রদাস পুনরায় একই প্রশ্ন করিল।

ইন্দ্রনীল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, সে বরং ছিল ভাল—নিরুপায় জেনে সহ্য করে যেতাম। এ তা নয়—মুছলা...আমার স্ত্রী গিটালয় যাবেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তা না হয় যাবেন কিন্তু তাতে ঘরের উপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে যাবে কেন?

ইন্দ্রনীল যেন একটু অপ্রস্তুত হইল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া সহজ গলায় কহিল, আমার প্রশ্নও সেইটেই কিন্তু তার জবাব দেবে কে?

বিপ্রদাস সঠিক কিছুই আন্দাজ করিয়া উঠিতে পারিল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনীল কহিল, ও তুমি বুঝবে না বিপ্র আর সেইজন্মেই তোমার স্ত্রী-ভাগ্যের আমি হিংসা করি।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে এই কথাটাই বিপ্র বার বার চিন্তা করিয়াছে তাহা আর প্রকাশ করিল না। বরং সে যেন একটু অত্মমনস্ক হইয়া পড়িল কিন্তু সে মুহূর্তের জ্ঞান। নিজেই সামলাইয়া লইয়া বহুর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে নিজেও একটু অপ্রস্তুত হইল।

ইন্দ্রনীল দেওয়ালের প্রতি একাধ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া একজোড়া টিকটিকির গড়াই দেখিতেছে আর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে ক্রীমতী মুছলা—স্রীতিমত রণং দেখি মুগ্ধিত।

ব্যাপারটা যে অনেক দূর গড়াইয়াছে ইহা বিপ্রদাস অনুমান করিল এবং নিজে সে কতকটা অত্মমনস্ক না থাকিলে দেখিতে পাইত যে মুছলার গম্ভীর মুখের আড়ালে ধানিকটা মুছ হাসি খেলিয়া গেল।

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া মুছলা যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আপনারা আমাদের কি মনে করেন বলুন ত। বাস, বিছানা না আপনার কাঁধের ঐ চাদরখানা? যখন যেমন খুশী বেঁধে ছেঁদে অথবা কাঁধের

উপর ফেলে নিয়ে চললেই হ'ল। আমাদের কোন মতামতেরও দরকার নেই।

কথাগুলি যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা বুঝিয়াই ইন্দ্রনীল তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া আছে, দৃষ্টি তখনও দেওয়ালে নিবদ্ধ। টকটকি দুইটা যদিও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কথাগুলি বিপ্রদাসকেও কতকটা বিবিল। সে যুহু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আপনাদের ইচ্ছাতেই ত সংসারের সবকিছু হয়ে থাকে যুহুলা দেবী।

যুহুলা অপূর্ণ ভঙ্গীতে বিপ্রদাসের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—এত বড় নির্জলা মিথ্যেটা না বললেও পারতেন ঠাকুরপো। আপনাদের ইচ্ছে দিয়েই আমাদের ইচ্ছেকে সৃষ্টি করতে চান এর এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই আপনারা বেসামাল হয়ে পড়েন। শুধু তর্কই করবেন না ঠাকুরপো। সত্যকে অস্বীকার করলেই তা মিথ্যে হয়ে যায় না।

যুহুলা ধামিল, একটুখানি হাসিল, পরযুহুর্ভেই গভীর কণ্ঠে কহিল—ঘরের অবস্থাটা দেখেছেন ত? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে আমি জানি এবং কি উত্তর পেয়েছেন তাও আমি শুনেছি। কিন্তু সে সত্যি মিথ্যের হিসাব-নিকাশ না—হয় থাক।

ইন্দ্রনীলের স্থির দেহটা একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। যুহুলা পুনরায় বলিতে লাগিল, অন্তর্যটা কোথায় আপনিই বলুন ত। আপনার বন্ধুর ইচ্ছে আপনাদের বিদেশ ভ্রমণের আমি সঙ্গিনী হই—আমার ইচ্ছে এই সুযোগে একবার বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। এমনিতে সংসার কেলে ত নড়বার উপায় নেই। নাম করলেই অলংঘ্য অজুহাত—তার উপর আপনাদের মাথাধরা, পেটব্যথা—ঠাকুর চাকরের চুরি এমনি কত রকমের বিপত্তি এসে যে পথ বোধ করে দাঁড়ায় তার আর কত হিসেব আপনাকে দেব। তাই বলেছিলাম, তোমার কাপড় চোপড়গুলো যা আমার ড্রাকে আছে বের করে নাও। উনি এমনি করেই তা বের করে নিয়েছেন—বলিতে বলিতে অকস্মাৎ ধামিয়া একটু লজ্জিত কণ্ঠেই-যুহুলা কহিল—ঐ দেখুন শুধু নিজের কথাই বকে যাচ্ছি—একটু বহুচ চা করে নিয়ে আসছি ঠাকুরপো। যুহুলা চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনীলের দেহে প্রাণ আসিল—কণ্ঠে যোগাইল ভাষা, কহিল—বুঝলে বিপ্রদাস এই নিয়েই আমাকে ধর করতে হয়।

বিপ্রদাস কতখানি বুঝিল তা দে-ই জানে কিন্তু মনের পর্দায় যেন তার নিজ সংসারের একখানি সুস্পষ্ট ছবি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অত্মমনক ভাবে সে উত্তর দিল—কি বলছিলে তুমি?

ইন্দ্রনীল কহিল—বলছিলাম আমার সহধর্মিণীর কথা। কি করা যায় বল ত?

বিপ্রদাসও এমনি এক সমস্তার সমাধান করিতেই এখানে আসিয়াছিল। কে জানিত যে এখানে আসিয়া তাহাকে এক বিপরীত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

ইন্দ্রনীল কহিল—হঠাৎ যে যুহুলায় কি হ'ল সে-ই জানে। আশ্চর্যকাল পর্যন্তও তার মত পরিবর্তনের কোন আভাস দেয় নি। সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে কিরেই এই ঋণপ্রলয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটু ধামিয়া ইন্দ্রনীল পুনরায় বলিতে লাগিল, বায়ু পরিবর্তনে যাব—যেখানে জরী সাহচর্য্যই সব থেকে মূল্যবান এ কথাটা যুহুলা কিছুতেই বুঝবে না। অথচ ওরাই আবার বড় গলায় বলেন, ভালবাসাটা মেয়েদেরই একচেটিয়া—আমাদের যা-কিছু সব—

কথাটা ইন্দ্রনীল শেষ করিতে পারিল না। যুহুলা পুনরায় দেখা দিয়াছে। সঙ্গে আছে ভৃত্য, হাতে তার কিছু আহাৰ্য্য এবং চায়ের সাজসরঞ্জাম। হাতের আহাৰ্য্য টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিতেই যুহুলা ইঙ্গিতে ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে বলিয়া স্বামীর অসমাপ্ত কথার স্ত্র ধরিয়া কহিল, মিথ্যে বড় বড় কথা ব'লো না। তোমাদের কথায় আর কাজে যে কতখানি সামঞ্জস্য তা আর আমার জানতে বাকী নেই। খুব ত ভালবাসা বাসা করে বক্তৃতা করছিলে কিন্তু জিজ্ঞেস করি ভালবাসার কতটুকু তোমরা বোঝ—তার কতটুকু মর্যাদা তোমরা দাও?

ইন্দ্রনীল পুনরায় বোবা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিপ্রদাস কহিল, এটা কি নিতান্তই এক ভরসা হয়ে যাচ্ছে না যুহুলা দেবী?

যুহুলা তেমনি যুহু অথচ শান্ত কণ্ঠে কহিল, মোটেই নয় ঠাকুরপো। মুখের জোরে আপনারা বিশ্বাস করেন—অন্তরের যোগ সেখানে বড় কম তাই পলকেই তা ভেঙে যায় এবং সহজেই আবার জোড়া লাগে।

বিপ্রদাস কহিল, যদি তাই আপনারা সত্য বলে মনে থাকেন তবু কেন সেই পুরুষের—

তার মুখের কথা টানিয়া লইয়া যুহু হাসিয়া যুহুলা কহিল, পুরুষের কাছে ধরা দেয় এই ত? ঠাকুরপো এই আত্মদানের মধ্যেই যে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তা ছাড়া মেয়েরা আপনাদের মত অন্ধশাস্ত্রে অত পণ্ডিত নয় যে—

বিপ্রদাস যুহু যুহু হাসিতে লাগিল। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া যুহুলা কহিল, আপনি হাসছেন কেন?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখেই কহিল, যদি আপনার কথাই ঠিক হয়, অর্থাৎ পুরুষের কাছে হারমানারই যদি—

যুহুলা হাসিমুখেই কহিল, আত্মবঞ্চনা আর আত্মদান কি আপনি এক মনে করেন?

বিপ্রদাস সহজ ভাবেই যুহুলাকে মানিয়া লইয়া কহিল, কিন্তু অন্ধশাস্ত্রে যখন সত্যিই আপনারা পণ্ডিত নন তখন আর অত চুলচেরা হিসেব করতে নাইবা গেলেন।

ইন্দ্রনীল এতক্ষণে যেন একটা কথা কহিবার মত বিষয়-বস্তু পাইয়াছে। সে সবেগে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া কহিল, তুমি যথার্থ কথা বলেছ বিপ্র। তা ছাড়া একখাটা তুমি বুঝ না কেন য়ুহুলা যে, বিপ্র আমার বন্ধু হলেও তার জীর একলার উপর এই বিদেশে দু'জনার স্বক্তি চাপান ঝায়সদত হবে না, তার উপর তার কোলে একটি ছোট ছেলে। মানে আমাদের আবার সব দিক ভেবে কাজ করতে হয় কি না।

ইন্দ্রনীলের কথার ধরণে য়ুহুলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বুঝলে বিপ্র—য়ুহুলা হেসেছে...আমি বেঁচেছি।

য়ুহুলা তার গলার স্বর অনুকরণ করিয়া কহিল—থাক আর থাকামি করতে হবে না।

য়ুহুলা প্রস্থান করিল।

* * *

ইহার পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত :—

ইন্দ্রনীল কহিল—সেই রাজাই যখন হলে তখন মিথ্যে এত কাণ্ড কেন করলে য়ুহুলা।

য়ুহুলা হাসিয়া কহিল—অকস্মাৎ পণ্ডিত নয় যে—

আর বিপ্রদাস সোজা মাঝাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে ঠিকই বুঝিয়াছে। তার মত অগোছালো লোকের একলা বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার শুধু স্বপ্ন দেখাই উচিত। মায়া স্বামীর

কথা ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই এমনি ভাবে তার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া য়ুহু কণ্ঠে কহিল—তোমার জিনিষপত্র আমি আলাদা গোছগাছ করে রেখেছি। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম তোমার যখন অনিচ্ছে...আর মিথ্যে কতকগুলি টাকার অপব্যয়—

বিপ্রদাস আদর করিয়া জীর গাল টিপিয়া দিল, কহিল—অভিমান বুঝি?

মায়া এক হাতে বিপ্রদাসের হাত সরাইয়া দিয়া কহিল...

থাক—ওর ডাগর ছুটি চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কহিল—তুমি...পাগল...তুমি পাগল...

* * *

মাদ্রাজ মেল ছুটিয়া চলিয়াছে ওয়ালটেয়ারের পথে। মায়া একমুখ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত সহজে কেমন করে এ সম্ভব হ'ল য়ুহুলা।

য়ুহুলা একমুখ হাসিয়া কহিল—তোর টেলিফোন পেয়েই মাথায় একটা মতলব এল...খানিক অভিনয়...কতকগুলি বড় বড় কথার সৃষ্টি...তার পরে এক পেয়ালা চা কিছু মিষ্টিযোগ...বাস্। শুধু খাঁটি প্রেম দিয়েই পুরুষকে দিয়ে কাজ করান যায় না—মাঝে মাঝে একটু অভিনয়, একটু অস্ত্র কিছুরও দরকার হয় মায়া—য়ুহুলা এবং মায়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল।

পাশের কামরায় দুই বন্ধু তখন নিরুদ্ধেগে সিগারেট টানিতেছে...তাদের মনেও আর কোন ক্ষোভ নাই।

গায়ের মাটির পরশ আর কি পাবে?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঝড়ের পাখীরা দিগন্তের গায়ে গায়ে রেখা টানে

তরীখানি বেয়ে চলেছি দুজনে সূর্যর গায়ের পানে।

মহুর মেঘ উদার আকাশে বিছায় কাজল পাখা

বর্ষার নদী দুহুল হারিয়ে চলে;

ধানের ক্ষেতের আশে পাশে কাঁপে তরুণব শাখা

নীলাশ্বরের তলে।

যাত্রা মোদের কাল রাতে সুর কাকজ্যোছনায় নেমে,

শ্রাম বনানীর মর্ম্মরধনি তখন গিয়েছে থেমে,

ঘাটের কিনারে কেতকী বনের পেয়েছি সম্ভাষণ

ফুলমঞ্জরী বরেছে পথের পানে।

ধ্যানে সমাহিত রজনীরে করে জোনাকিরা আরাধন

নির্জন বালুচরে।

বয়ে যায় শ্রোত,—সুজের মত মনে হয় গন্ধটাকে

অশথের ডালে বসে আছে বক, চমকে মেঘের ডাকে।

খড়কুটো কত ভেসে চলে যায় ধূসর ফেনার সাথে

টেউয়ের দোলায় ছলিছে মোদের তরী।

তটভূমি আর পড়েনা'ক চোখে উদাস মলিন প্রাতে

উড়িছে বাদল-পরী।

গত রজনীর মন-মঞ্জুষা ভুলিতে পারি না আর

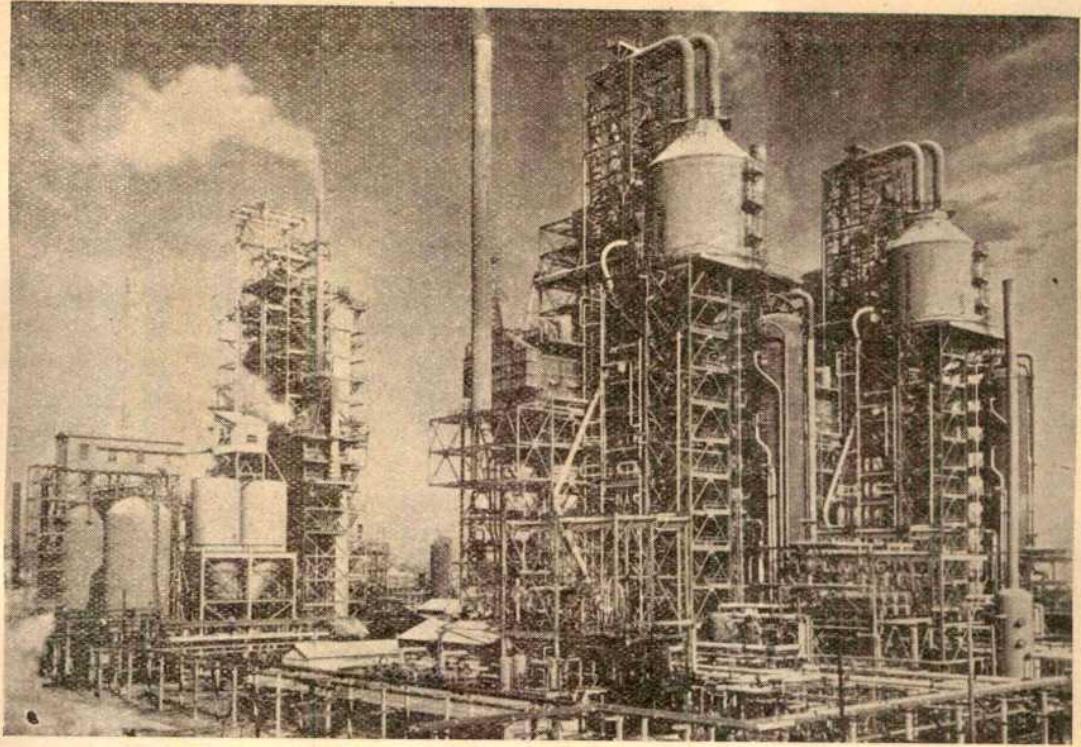
সমুখে ঝড়ের সঙ্কেত আসে ভয় হয় অনিবার।

দূরের ঘাটেতে ভিড়িবে কি এই ক্ষুদ্র তরীখানি।

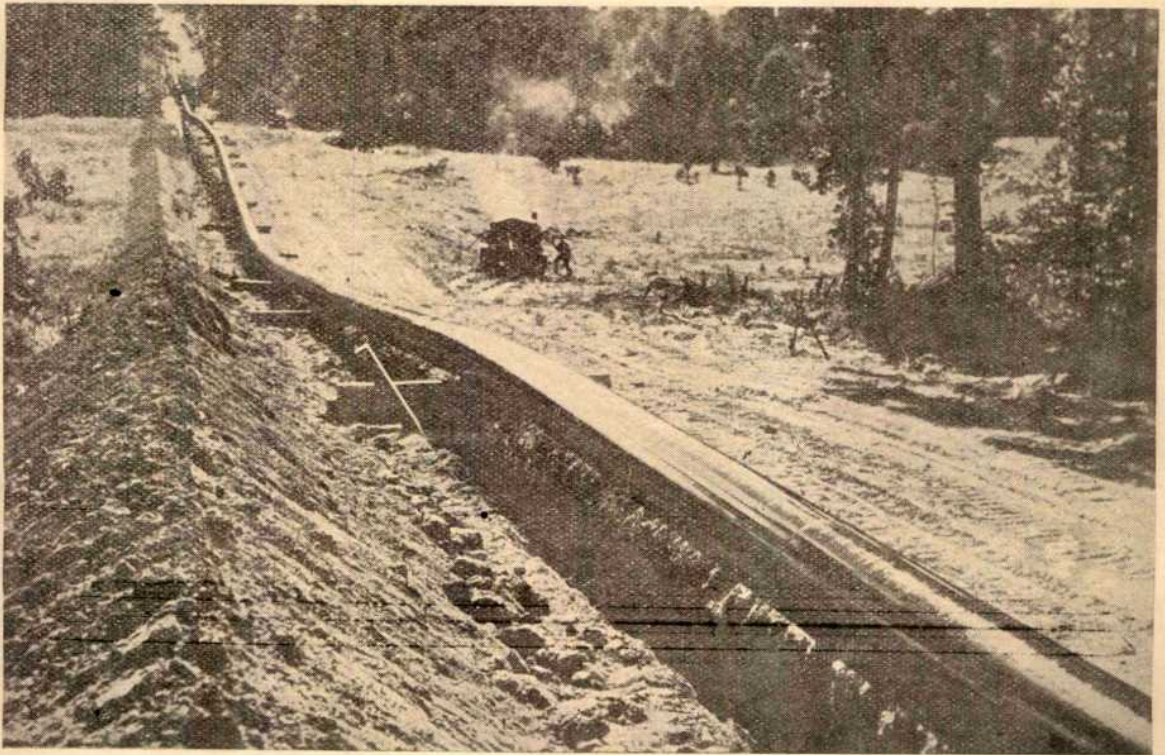
হয়তো যাত্রা হেথায় ফুয়ানে যাবে,

অশ্রুমাণ্য বিনিময় করি আমরা দুইটি প্রাণী,

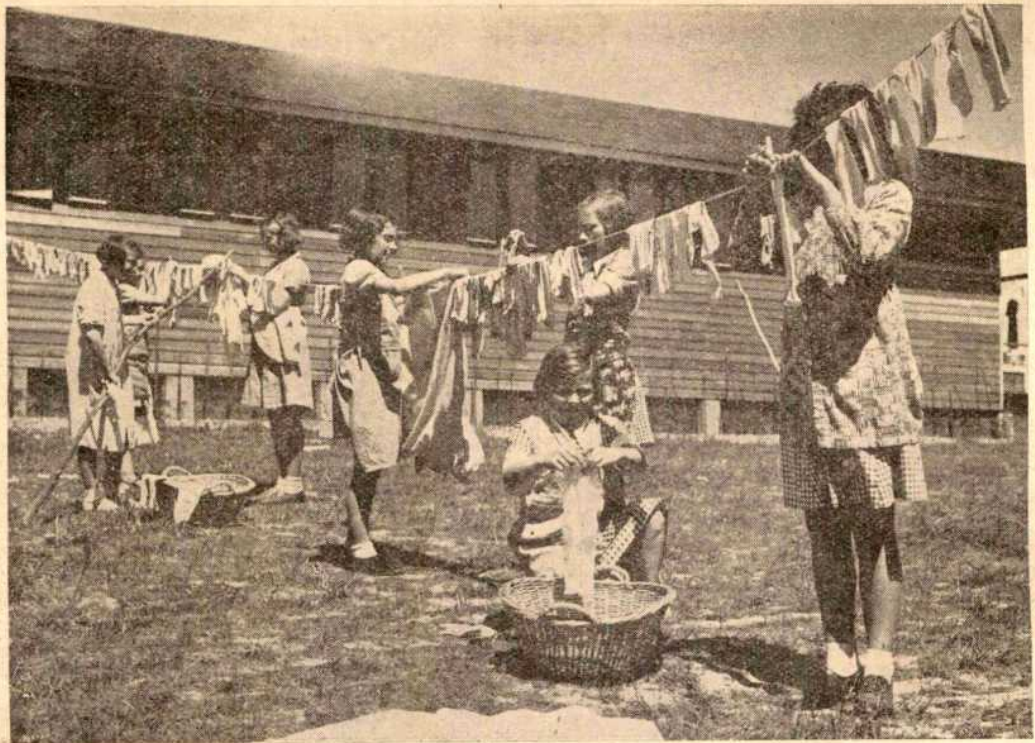
গায়ের মাটির পরশ আর কি পাবে?



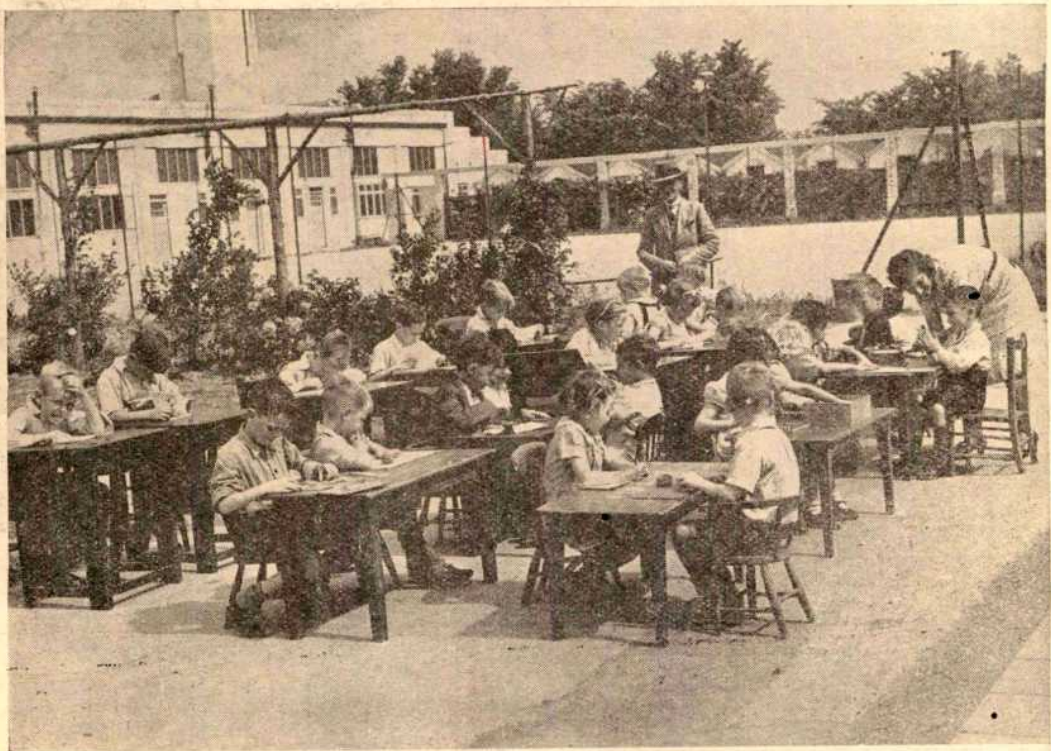
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-অঞ্চলস্থ লুইশিয়ানা স্টেটের একটি তৈলের কারখানায় গ্যাসোলিন উৎপাদক তিনটি যন্ত্র



২৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম তৈল-নালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ টেক্সাস স্টেট হইতে নিউইয়র্ক সিটি হইয়া ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত প্রসারিত এই তৈল-নালীর ভিতর দিয়া প্রত্যহ ৩০০,০০০ ব্যারেল তৈল চালনা করা হয়



ক্যাম্প-স্কুলে মেয়েরা নিজের নিজের কাজ করছে



ইংলণ্ডের সাগর-তীরের একটি শহরের খোলা হাওয়ায় ক্যাম্প স্কুল

ইংলণ্ডের কিশোর আন্দোলন

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

ইংলণ্ডের কিশোর আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে বর্তমান যুদ্ধের গোড়ার দিকে। যুদ্ধের আগেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'জাতীয় কিশোর আন্দোলন' (National youth Movement)

লায়ের সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রী কিশোর সঙ্ঘে যোগদান করে। তাদের জন্ম সর্বসম্মত ৭৬ রকম কাজের পরিকল্পনা করা হয়। প্রত্যেক দলের নিজস্ব কোয়ার্ড ও দলনেতা আছে। দেশে যখন সমরানল প্রবলিত হয়ে উঠল তখন সেখানকার ছেলেমেয়েরা

সুরু হয়। গ্রামে ও শহরে 'জাতীয় কিশোর প্রতিষ্ঠান' সমূহ গড়ে উঠে। তদাধ্যে ব্রিগেড্‌স্‌ ক্লাব, বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইড প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। এইসব সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্ম এগুলির কর্তৃপক্ষীনে 'জাতীয় কিশোর সমিতি' সংগঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও যে সব যুদ্ধকালীন কিশোর প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত ১৬ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ১৯৩৯ সালে বর্তমান যুদ্ধের আরম্ভে স্কাউট্যাণ্ডে ১৪ থেকে ২০ বছরের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে কিশোর সঙ্ঘে যোগ দেয়। ১৯৪১ সালে ইংলণ্ডের ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের বালকবালিকারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'জাতীয় কিশোর সমিতি' গড়ে তালে এবং নতুন ভাবে কিশোর আন্দোলন সুরু করে। বর্তমানে তাদের ১৩টি কিশোর সঙ্ঘ আছে। মাঝে মাঝে বাবতীয় সঙ্ঘসমূহের মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। সেগুলোর নাম নীচে দেওয়া গেল :—

- ১। জাতীয় কিশোর সঙ্ঘ,
- ২। জাতীয় নারী সঙ্ঘ, ৩। ওয়াই. এম. সি. এ, ৪। ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ, ৫। বয়-স্কাউট সঙ্ঘ, ৬। গার্ল গাইড সঙ্ঘ, ৭। জাতীয় কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান, ৮। ওয়েলন্স ছাত্র-সঙ্ঘ, ৯। দি বয়েজ ব্রিগেড্‌, ১০। দি চার্চ-স্যাড্‌স্‌ ব্রিগেড্‌, ১১। নারী বান্ধব সমিতি, ১২। দি গার্লস্‌ গিল্ড্‌, ১৩। দি গার্লস্‌ লাইফ্‌ ব্রিগেড্‌।

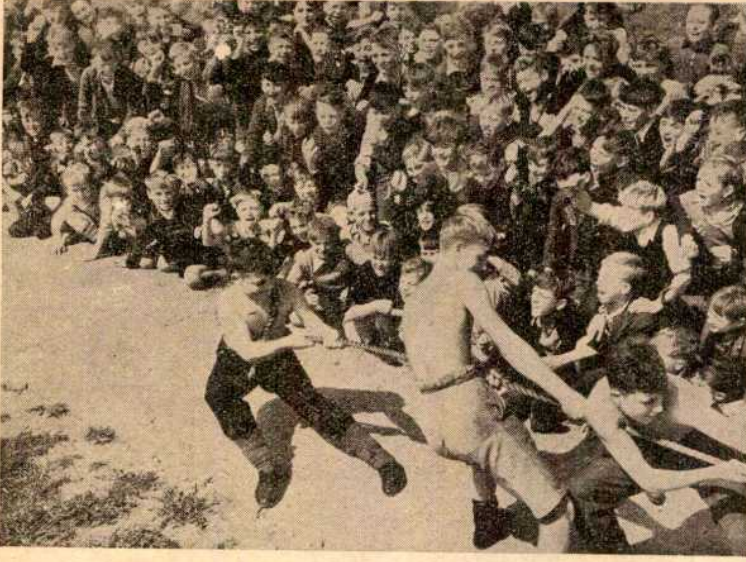
এইসব সঙ্ঘের কিশোর দলের পরিচালনার ভার জাতীয় কিশোর সমিতির ওপর। ১৯৪১ সালের সুরু থেকেই বিভা-



ইংলণ্ডের ক্যাম্প-স্কুলে ছেলেরা ক্ষেত্রের কাজ করছে

হাসিমুখে কত ব্যক্তিই বন্ধুর পথকে বরণ করে নিলে।

ইংলণ্ডের কিশোর সেবা দলের (Youth Service Corps) প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল, প্রত্যেকটি সন্ত্য ছেলেবেলা থেকেই যাতে দেশের ও দশের প্রতি কতব্য সধক্ষে সচেতন হয়, তাদের তদহুযায়ী শিক্ষা প্রদান। এদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দলনেতা হিসাবে নিজ



ইংলণ্ডের ছেলেদের আনন্দ-কেন্দ্র

নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। দলনেতারা গ্রামে ও শহরে ঘুরে ঘুরে প্রাচীরপত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রচার-কার্য করে এবং ১৪ থেকে ২০ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিশোর সন্মিলন গড়ে তোলে। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়সমূহে গিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভা বসিয়ে নিজেদের আদর্শ ব্যাখ্যা করে ও সকলের সমক্ষে সজ্জের কর্মতালিকা উপস্থাপিত করে। সব জায়গাতেই সভ্যরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে দল গঠন করে। নিজেদের ভিতর থেকেই তারা নেতা নির্বাচন করে। দলপতির বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। সহকারী নেতা নির্বাচন করাও হয়ে থাকে। প্রত্যেক সভ্যের কাছে কিশোর দলের 'বাজ' থাকে। সজ্জের সম্পাদকেরা বিভিন্ন দলের নেতার নিকট থেকে কাজের হিসাব নেয়। এবার তাদের কাজের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে।

(ক) 'হোম-গার্ডের' কর্মীদের কাজ হ'ল জামা কাপড় পরিষ্কার করা, মোজা ও গেম্বী বোনা, ট্রেক্স-ঝোঁড়া ও বালির বস্তা সাজানো, সংবাদ-দাতার কাজ, সৈন্যদের জুতা গল্লের বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করা, কারখানায় কুলিদের জুতা শাক-সবুজ সরবরাহ করা, কপাল বোনা, নৌ-বিহারের জুতা গানের রেকর্ড যোগাড় করা, ক্লাবে ক্লাবে নাচ গান জলদার আয়োজন করা ইত্যাদি।

(খ) দেশরক্ষার আংশিক দায়িত্বভার যাদের উপর ন্যস্ত হয় তাদের করণীয় হচ্ছে—প্রাথমিক চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, আগুন নেবানো, সংবাদদাতার কাজ, আগ্রহ-স্থান তৈরি করা, বোমাবিক্ষেপ অঞ্চলের লোকদের সাহায্য করা, রেড-ক্রসের কাজ, ছোটদের উপহারের জুতা খেলনা ও পুতুল তৈরি করা, চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কাজ প্রভৃতি।

(গ) যারা গ্রামের চাষীদের সঙ্গে কাজ করে তাদের ক্ষেতে চৌকি দেওয়া, ফসল কাটা, আলু ও গাজরের চাষ করা, মুরগী ও হাঁস প্রভৃতির জুতা খাদ্য সংগ্রহ করা, গো-শালার তত্ত্বাবধান, বনজঙ্গল সাফ করা প্রভৃতি বিবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়।

(ঘ) যারা ঘর-গৃহস্থালির কাজ করবে তাদের উত্তান-রচনা ও ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনার ভার নিতে হয়। তা ছাড়া হোটেল ও দোকানের কাজ, সৈন্যদের জুতা ফলমূল সংগ্রহ করা, হাসপাতালে নার্সের কাজ, আশ্রিত শিশুদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাদের গ্রহণ করতে হয়।

(ঙ) যারা কারখানার কাজ করবে তাদের কর্তব্য হ'ল ছেঁড়া কাগজ, লোহা ও টিনের টুকরো, কাঁচের বোতল, ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড ও

রেডিওর ব্যাটারি ইত্যাদি জড় করা, ওয়ার-বণ্ড বিক্রী করা, লাইব্রেরি ও পাঠাগারের কার্য-পরিচালনা, দুধ, খাবার ও সংবাদপত্র বিলি করা, পুলিশ বিভাগের সাহায্য করা, বিদ্যালয়সমূহে সন্ধ্যাকালীন ক্লাসে নাচ গান অভিনয় ও বহুতার আয়োজন করা, জীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, ক্রোয়াড নেতাদের পরিচালিত করা ইত্যাদি।

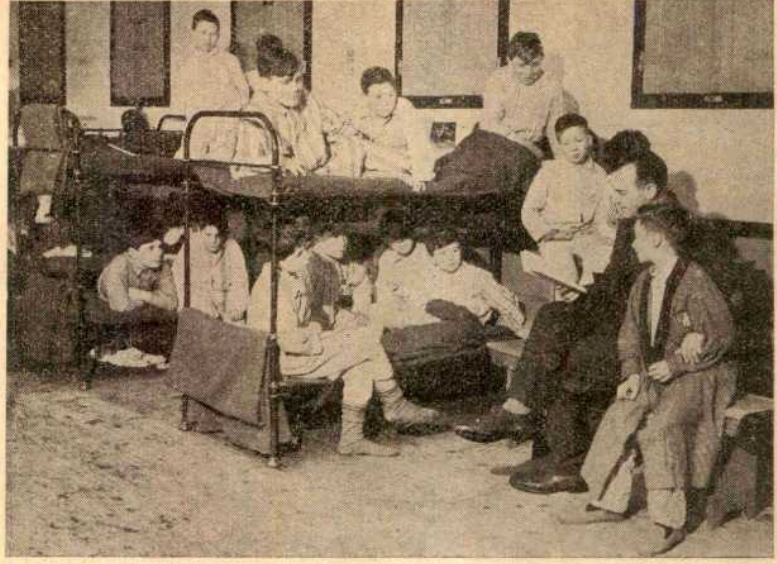
২

ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের সামরিক শিক্ষাদানের জুতা ১৯৪২ সালে কয়েকটি সমিতি গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নৌ-বিদ্যা শিক্ষাদানের জুতা একটি সন্মিলন গঠিত হয়। একে বলা হয় (ক্যাডেট কোর্স)। তা ছাড়া ১৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জুতা হোম গার্ড বিভাগ শোলা হয়, ১২ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জুতা বিমান-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর ১৯৪২ সালের একটি আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডের ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদের নিয়ে যে সকল 'জাতীয় নারী শিক্ষা সন্মিলন' গড়ে ওঠে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেক সভ্যকে নিয়মিত-ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, প্রাথমিক চিকিৎসা-প্রণালী, হাতের কাজ, চিঠিপত্র বিলি করা, ব্যায়ামাদি ও কেরানীর কাজ শেখানো হয়। দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত যেসব ১৬ বছরের ছেলে ও ১৮ বছরের মেয়ে মাসে ২৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আলাদা।

ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের ১৪ বছর বয়সে জুতা থেকে বেরিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জুতা বিভিন্ন শহরে সরকারী শিক্ষা-কেন্দ্রে চলে যায়। সাধারণতঃ পাঁচ মাস শিক্ষার সময়। কারখানার কাজ শিখতে লাগে দুই মাস।

ইংলণ্ডের কৃষি আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। তখন থেকেই দেশের নানা অংশে বহু কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ৫০০ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সভ্য সংখ্যা ২০ হাজার। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ১১-১২ বছরের ছেলেমেয়েদের মনকে দেশের কৃষি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এইসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার পক্ষে কতকটা সহায়করূপ হয়েছিল।



স্কুলের ছাত্রেরা যাতে ক্ষেতের কাজে চাষাদের সহায়তা করতে পারে, সেজন্য ১৯৪২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রায় ৫০০ 'ক্যাম্প' করা হয়। এইসব শিবিরে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক, বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইডরা অবস্থান করে। সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা তাদের কাজ করতে হয়। ছেলেদের প্রথম-মূল্য ঘণ্টায় আট আনা, মেয়েদের ঘণ্টায় সাত আনা।

ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই মেয়েদের জন্ম নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নার্সারি ইন্সুলের কাজ ও হাসপাতালের কাজ করবার জন্ম তাদের আলাদা শিক্ষায়তন আছে। ইংলণ্ডে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহযোগিতার জন্ম ১৬ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক বিরাট 'জাতীয় কিশোর সংঘ' (The National Association of Boys' Clubs) গড়ে ওঠে। ১৯৪০ সালের গোড়া থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যায়ামচর্চা, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি হয় এবং হাতের কাজও শেখানো হয়ে থাকে। সেগুলোতে সবরকম খেলাধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার ও শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ থাকে। 'জাতীয়-নারী-পরিষদ' নামে মেয়েদেরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সাকল্যে এদের প্রায় ৫০টি ইউনিয়ন আছে, ক্লাবের সংখ্যা ২৪০টি। ১৯৪১ সালের পর থেকে এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অদল-বদল হয় এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্মে এরা কিশোর কৃষি-প্রতিষ্ঠান, রেড-ক্রস ও নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করে।

ইংলণ্ডের ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ ১১-১৪, ১৪-১৮ বছরের মেয়েদের নিয়ে গঠিত এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এগুলোর বিভিন্ন কেন্দ্রস্থ ক্লাবসমূহে সভ্যদের জন্ম নির্দোষ আন্দোল-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে—অভিনয়-কেন্দ্র এবং ছেলেমেয়েদের জন্ম খেলাধুলার সবরকম ব্যবস্থাও সেগুলোতে বিদ্যমান।

ইংলণ্ডের ওয়াই. এম. সি-এর সভ্যেরা বর্তমানে কৃষি-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যাপৃত। দশ সপ্তাহ এদের শিক্ষার

স্কুলের ছেলেরা একমনে গল্প শুনছে

সময়। সেই সময় এরা দল বেঁধে নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে চাষাদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করে এবং তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হয়।

৩

যাবতীয় কিশোর আন্দোলনের ভেতর বয়-স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলনই সবচেয়ে প্রদার লাভ করেছে, ইংলণ্ডেই এর উদ্ভব। এই আন্দোলনের প্রবর্তক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৪১ সালে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্ম প্রায় ৬০ হাজার বয়-স্কাউট পুরস্কাররূপে জাশনাল সার্ভিস ব্যাজ পেয়েছে। আজকের দিনে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল গ্রামাঞ্চল থেকে ওষুধপত্র জোগাড় করা এবং চাষীদের ক্ষেতের কাজে সাহায্য করা। তা ছাড়া সি-স্কাউট আর এয়ার-স্কাউটরা দেশরক্ষার সাহায্য করেছে। বয়-স্কাউটদের উপার্জিত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের কাজে ব্যয়িত হয়।

গার্ল গাইডদের প্রধান কাজ হাসপাতালে রোগীদের এবং আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করা। তা ছাড়া হোমগার্ড ড্রিউ-ডি-এস এবং এ-আর-পি দলের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সাল থেকে এই বয়-স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন প্রত্যেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কাউট-ক্যাম্পে যোগ দেয়। ১৯১০ সালে এর সভ্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৪,০০০। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই বয়-স্কাউট আন্দোলন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে ইংলণ্ডের বয়-স্কাউটদের যে আন্তর্জাতিক 'জাম্বুবি' হয় তাতে বয়-স্কাউট সংঘের



বোমা-বিস্ফোরণ শহরের চীনা ছেলেরা ইতিহাস পড়ছে

অধিনায়ক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ২৩টি বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গোধন করে বলেছিলেন :—

“ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের পুণীমানে কাজ করতে বলছি। ভুলোনা যে, পৃথিবীর নানা দেশের লোকের ভাবে, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে পার্থক্য আছে। এই যুদ্ধ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যখন কোন সবল দেশ দুর্বল দেশের ওপর অত্যাচার চালায় তখন তার ফল ভাল হয় না। এই ‘জাপুরী’ থেকে আমরা শিখেছি যে, পরস্পরের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়েই একটা উন্নত আদর্শবাদের উৎপত্তি হয় ও পারস্পরিক সহায়-ত্ব ও প্রীতি জন্মায়। এস আমরা এই স্কাউট আন্দোলন পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিই, সবাইকে বন্ধু করে নিই। ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষেরা সবাই স্নেহ ও শান্তিতে বাস করুক।”

৪

বর্তমান যুদ্ধে ঋজু-উৎপাদনের কাজে ইংলণ্ডের স্কুলসমূহ বিশেষভাবেই সহযোগিতা করেছে। প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব ক্ষেত ও বাগান আছে। সেই সব বাগান ও ক্ষেতের ফুল ফল ও শাক-সবজি যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্ত সরবরাহ করা হ’ত। যে সমস্ত স্কুলে আগে শুধু ফুলের বাগান ছিল যুদ্ধকালে সে-গুলোকে চাষ-আবাদের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। এই সব স্কুলে যতটুকু ঋজু উৎপাদন করা হয়, তা থেকে আগে স্কুল ক্যাষ্টিনের প্রয়োজনমত পুথক করে রাখা হয়, বাকিটুকু বাইরে পাঠানো হয়। প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব ক্ষেত ও বাগান আছে। মুরগী, ছাগল, হাঁস, খরগোস, গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশুপক্ষী প্রতিপালনের ব্যবস্থাও আছে। অনেক স্কুলে সারা বছর আলুর চাষ হয়। নিজ নিজ স্কুলের বাগানে ও ক্ষেত্রে কাজ

করা ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী চাষীদের নানাভাবে সাহায্য করে। সেজন্ত দশ-বার বছরের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে কিছুকালের জন্ত ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন স্কুলে আবার এইজন্ত পায়োনিয়ার কোর ও ল্যাণ্ড ক্লাব আছে। এগুলোর সভ্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে ‘পিগ ক্লাব’গুলি ঋজু-উৎপাদনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১৯৩৪ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের ‘বি. এস. এ. এসে’র উত্তোগে ৭০০টি নৌ-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন

হয়। আজকের ইংলণ্ডের প্রত্যেক স্কুলেই হাতের কাজ একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত যে যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা করা হয় তাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সমান হুযোগ দেবার প্রস্তাব করা হয়। তাদের ‘চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা’ অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ইংলণ্ডে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর স্কুল থাকবে : প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয়। ৫ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৬ বছর বয়সে (আগে ছিল ১৫ বছর) স্কুলের শিক্ষা শেষ করতে হবে। জুনিয়র শিল্প স্কুলে ১৩ থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯ বছর বয়সে কলেজে যোগদান করতে হবে। সরকারী স্কুল ছাড়াও অনেক বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকবে, বোর্ডিং স্কুল ও পাবলিক স্কুলে নির্বাচিত ছাত্রদের নেওয়া হবে। স্কুলের কার্য নিরীহের দায়িত্ব-ভার থাকবে স্থানীয় শিক্ষা-সমিতির ওপর। প্রত্যেক স্কুলের জন্ত আলাদা ডাক্তার, নার্স, খাবার ব্যবস্থা ও খেলা-ধুলার সরঞ্জাম থাকবে। ছুটির সময় শহরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা হবে ক্যাম্প-স্কুল। যাদের মায়েরা-দিন রাত কারখানা ও ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের ২-৫ বছরের শিশুদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে শিশু-সদন। এইসব নার্সারি স্কুল শনিবার ও রবিবারে খোলা থাকবে। নতুন ভাবে ‘কিশোর-দল’ গড়তে হবে এবং বয়-স্কাউট, গার্ল গাইড, গার্লস ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার যুবকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে সেদেশে শিক্ষার জন্ত বছরে ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করবার কথা। এমনি ভাবে গড়ে উঠবে এক নতুন পৃথিবী, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার জন্ত ১৪ বছর বয়সের প্রায় ৪০০,০০০ ছাত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ক্যাডেট-কোর' আর ১৪ বৎসর বয়সী ১৩০,০০০ লক্ষ মেয়ে নিয়ে গঠিত হয়েছে 'জাতীয়-নারী-শিক্ষা-সংঘ'। সাধারণের অর্থ-সাহায্যে এদের কাজ সূচু ভাবে নির্বাহিত হয়।

ইংলণ্ডের কোন কোন স্কুলের ছাত্রেরা সকলে মিলে সোভিয়েট রাশিয়া কিংবা আমেরিকার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংস্কৃতির কথা নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করে। মাসের শেষে তারা 'আমেরিকা উইক' অথবা 'রাশিয়ান ডে' প্রতিপালন করে। কোন স্কুলে আবার কয়েক মাস ধরে হয়ত বা চেকোস্লোভাকিয়া সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলে। তারপর 'চেকোস্লোভাকিয়া কলিং' নাম দিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া দেশ-বিদেশের ছাত্র ও অধ্যাপকদেরও তাদের আসরে ডাক পড়ে।

কোন কোন শহরে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে 'সিটিজেন্স অফ দি ওয়ার্ল্ড' নামে এক আন্দোলন সূত্র হয়েছে। সেই সব স্কুলের শিক্ষকেরা সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, মহাচীন, নরওয়ে, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য জননায়কদের সঙ্গে ছুটির দিন কাটিয়ে আসেন।

যুদ্ধের দরুন ইংলণ্ডের যে সব শহরের স্কুল-গৃহ বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়েছিল—সেই সব স্কুলের ছাত্রদের জন্ত গ্রামাঞ্চলের নিরাপদ জায়গায় নতুন স্কুল খোলা হয়েছিল। মাঠের ধারে কি নদীর তীরে তাদের স্কুল বসত, অথবা শহর অঞ্চলের ভাঙা বাড়ীর তলায়—গির্জার 'হলে', ও হোটেলের স্কুলের কাজ হ'ত। সেইখানেই তাদের খাওয়া-পাচার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডে ক্যাম্প-বোর্ডিং-স্কুল খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধার জন্তে নানা স্থানে তাদের ক্যাম্প পড়ে। সেই সব 'হলি ডে ক্যাম্প' লেখাপড়া এবং অত্যাঁজ কাজও চলতে থাকে। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে তৈরি হয় কার্টের স্কল-বাড়ী—তার মধ্যেই তাদের ক্লাব ঘর, ড্রিল-শেড, খাবার ঘর, রান্নার ঘর, শিক্ষক-মহল, শোবার ঘর ও হাসপাতাল। 'জাতীয়-ক্যাম্প-প্রতিষ্ঠানে'র তরফ থেকে এদের ব্যয়ভার বহন করা হয়। শহরের মেয়েদের এই সব ক্যাম্প-স্কুল খুব ভাল লাগে—শহরের আবর্জনাময় ও ধোঁয়াটে আবহাওয়া থেকে হঠাৎ মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে তাদের আনন্দের সীমা থাকে না।

ভোর সাতটায় তাদের ঘুম ভেঙে যায়। তার পর মুখ-হাত ধোওয়া ও প্রাতর্ভোজন। খাবার পর মেয়েদের ঘরদোর ও বিছানা পরিষ্কার করতে হয়। সকাল নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত স্কুল। বারোটার মধ্যে ছোজনা। তার পর কিছুক্ষণ ছুটি। দুপুর বেলা মেয়েদের জমণ, খেলাধুলো ও বাগানের কাজ। বিকেল চারটার চা-জলখাবার। পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আবার স্কুল। সাতটার পর নৈশভোজন ও ছোটদের ঘুমাবার সময়। তার পর সাড়ে আটটা পর্যন্ত মেয়েদের সেলাই, বই পড়া ও গান।

ছেলেদের ক্যাম্প-স্কুলেও অনেকটা এই নিয়ম। শুধু তাদের জন্ত আলাদা ফুটবল ও ক্রিকেট-খেলা ও জিমনাসিয়ামের ব্যবস্থা থাকে। আজ এই সব স্কুলের ১৬০,০০০ লক্ষ শিক্ষক অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিণীম উৎসাহের সঙ্গে ইংলণ্ডের কিশোর সমাজের দেহমন ও আত্মার উন্নতির জন্ত অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করছেন।

পরমাণুর পরিণতি

নছিমউদ্দিন আহমদ, এম. এস.সি

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনীষীরা জড়ের (matter) চরম স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। গ্রীস দেশে, ভারতবর্ষে অতীতে দার্শনিক চিন্তাধারা অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। তৎকালেই মনীষীরা মনে করিতেন জড়ের চরম উপাদান এক অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিরেট পরমাণু যাহা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে। দৃশ্যমান জগতে সবকিছুই পরমাণুপুঞ্জ গঠিত। ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ প্রথমতঃ এই সমস্ত অদৃশ্য পরমাণু হইতে গঠিত হইয়াছে; অতঃপর এই সমস্ত মৌলিক পদার্থযোগে জড়জগতের সৃষ্টি।

অতীতের এই পরমাণুতত্ত্বের ভিত্তি ছিল দার্শনিক যুক্তি ও বিশ্বাস, কোন বাস্তব পরীক্ষা হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই। অতঃপর ইউরোপে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণসম্মত বিজ্ঞানের

উৎপত্তি হয়। তখন হইতে মনীষীরা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পূর্বক সৃষ্টির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে একের সন্ধানে কায়মন নিযুক্ত করেন। এই প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক ডালটন তাঁহার বিখ্যাত পরমাণুবাদ প্রকাশ করেন। ডালটন-প্রবর্তিত পরমাণুবাদকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ বলা হয়। ডালটনের মতে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুপুঞ্জ গঠিত; পরমাণু অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য এবং পদার্থের চরম উপাদান; একই মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু আকৃতি প্রকৃতি সর্ব বিষয়ে একই প্রকার কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু আপন আপন শক্তি প্রভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পদার্থের সৃষ্টি

করে। বহুদিন ধরিয়া বিজ্ঞান-জগতে ডালটনের পরমাণুবাদ একচ্ছত্র স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং তাহারই উপরে রসায়নের বিভিন্ন বিচিত্র দৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন দেখা দিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সার জে. জে. টমসন ইলেকট্রন (electron) আবিষ্কার করেন। একটি প্রায় বায়ুশূন্য পাত্রে বিদ্যুৎ-চালনা করিয়া টমসন এক আশ্চর্য্য রশ্মির সন্ধান পাইলেন এবং বিস্তার গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে স্থির নিশ্চিত, হইলেন যে এক চরম ক্ষুদ্র না-ধর্ম্মী (negative-) বিদ্যুৎ-কণা-সমষ্টির সহযোগে এই প্রবাহের সৃষ্টি এবং সমস্ত পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরেই এই বিদ্যুৎ-কণার অবস্থিতি। ইহারই নাম দেওয়া হইল ইলেকট্রন। টমসন মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে পদার্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘুভার হাইড্রোজেন, পরমাণুর প্রায় আঠারো শত ভাগের এক ভাগ ইলেকট্রনের ওজন।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে ডালটন-প্রবর্তিত পরমাণুর শাখ্যত রূপ ভাঙিয়া গেল। বৈজ্ঞানিক জগৎ কিন্তু সহজে তাঁহার আবিষ্কার মানিয়া লইতে চাহিল না। টমসন তখন তাঁহার এক শিষ্য উইলসনকে ডাকিয়া ইলেকট্রনের ছবি তুলিতে বলিলেন। এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিট তখন ইলেকট্রন-সন্ধান প্রযুক্ত হইগেন এবং অনেক পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফলে তাঁহার বিখ্যাত যন্ত্রটি (cloud chamber) আবিষ্কার করিলেন। এই যন্ত্রটির নির্মাণ-কৌশল ও ব্যবহার-বিধি এরূপ অদ্ভুত যে ইহার ভিতর দিয়া ইলেকট্রন ধাবিত হইলে মুক্তামালার মত জলবিন্দু-পথের সৃষ্টি হয়। ক্যামেরা সহযোগে অল্প সময়ে সেই পথের ছবি তোলা যায় এবং সেই সুন্দর ছবি হইতে ইলেকট্রনের সত্তা ও স্থিতি প্রমাণিত হয়। উইলসন-আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটির পরবর্ত্তীকালে অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পরমাণু-জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে উহা একটি অপরিহার্য্য উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইলেকট্রনের সহিত কি পরিমাণ না-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ জড়িত আছে তাহার একটা মোটামুটি মান নিরূপণ করেন টমসন নিজে। পরে বিজ্ঞানী মিলিক্যান একটু তৈলবিন্দুকে বিদ্যুৎ প্রযুক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহা হইতে ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-পরিমাণ নিরূপণ করেন (oil drop method)। ইহা ছাড়া ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-মান নিরূপণের আরও বহুবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগেও ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-মান নিরূপণ সম্ভবপূর্ণ এবং বর্ত্তমানে এই উপায়ে নির্ণীত মানই সর্বাপেক্ষা নিভুল ও যথার্থ মান হিসাবে বিবেচিত হয়। ইলেকট্রনের ওজনও বর্ত্তমানে নিভুলভাবে নিরূপিত হইয়াছে। উহা হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর প্রায় আঠার শত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

টমসন পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন

তাহা এইরূপ :—সম্পূর্ণ পরমাণুটি একটি গোলাকার হাঁ-ধর্ম্মী (positive) বিদ্যুৎযুক্ত জড়পিণ্ড এবং তাহার অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে ইলেকট্রন অবস্থান করে।

এই সময়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের (radio-active element-) আবিষ্কার হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরি বেকারেল দেখিতে পাইলেন যে ইউরেনিয়াম নামক ধাতু বা উক্ত ধাতুঘটিত পদার্থ হইতে অনবরত ইলেকট্রন রশ্মি বিনির্গত হইতেছে। ইহার অল্পকাল পরে বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম কুরী পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন। ইহা ছাড়া ধোরিয়াম, আয়োনিয়াম ইত্যাদি আরও অসংখ্য তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুরী, রাদারফোর্ড, সড়িড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করিয়া ইহাদের ধর্ম্ম ও গুণাগুণ ব্যাপকভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী এবং ইহাদের পরমাণু অনবরত ভাঙিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে তিন প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয় :—(১) আলফা কণা (α-particle), ইহার হিলিয়াম নামক গ্যাসের ইলেকট্রন বিহীন পরমাণুকে (২) বিটা কণা (β-particle), ইহা ইলেকট্রন; (৩) গামা রশ্মি (γ-ray) ইহা রঞ্জনরশ্মির মত প্রবাহ। এই সমস্ত কণা বা রশ্মি বিকিরণ করিয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি ক্রমশঃ স্থায়ী সোসকে পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয়-পদার্থ-নিঃসৃত আলফা-কণাসমূহ খুবই বেগবান এবং ইলেকট্রন হইতে অনেকগুণ ভারী; কাজেই বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ভাবিলেন, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে ইহা-দিগকে ছুঁড়িয়া মারিয়া পরমাণুর অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে। বিভিন্ন পদার্থের ভিতর দিয়া তেজস্ক্রিয়-পদার্থ-নিঃসৃত বেগবান আলফা-কণা প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে এই সমস্ত কণা পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া কোথায় যেন এক শক্ত পদার্থে প্রতিহত হইয়া ঠিকরাইয়া বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া আসে। আলফা-কণা নিজেও ওজনে এবং শক্তিতে কম নয়; কাজেই যাহার সহিত সংঘাত হইয়া পথ পরিবর্তন হইল তাহাও নিশ্চয়ই শক্ত কিছু হইবে। এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করিলেন যে টমসন-প্রবর্তিত পরমাণুতত্ত্বের সংস্কার সাধন দরকার। তিনি এই মতবাদ প্রচার করিলেন যে পরমাণু-গোলকের অধিকাংশ স্থান ফাঁকা; কেন্দ্রে রহিয়াছে হাঁ-বিদ্যুৎ-ধর্ম্মী মূল জড়পিণ্ড আর চতুর্দিকে ইলেকট্রনগুলি ঘুরিতেছে।

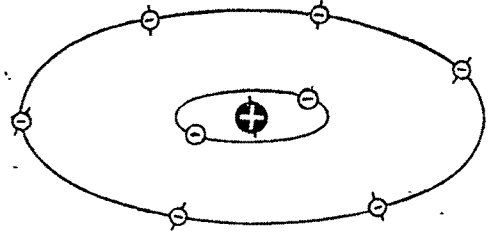
অতঃপর পরমাণু-জগতে প্রবেশ করিলেন বিজ্ঞানী বোর (Bohr)। তিনি দেখিলেন রাদারফোর্ড প্রবর্তিত পরমাণুবিজ্ঞান বস্তুজগতের ঘটনাবলীর সহিত মিল খায় না। কেন্দ্রে হাঁ-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ এবং বাহিরে না-ধর্ম্মী বিদ্যুতের পক্ষে পরস্পরকে আকর্ষণ

করিয়া মিলিত হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তাহা হয় না কেন? তাহা ছাড়া ইলেকট্রন যখন ঘুরিতে থাকে তখন তাহা হইতে ক্রমাগত শক্তির বিকিরণ হওয়া দরকার, ফলে ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পরমাণু-বিহীন ভাঙিয়া পড়িবে এবং পরমাণুর অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন হইবে। বোর তখন স্থায়ী পরমাণু-বিহীন গঠনের জন্য বিজ্ঞানী প্রাক্ষ-প্রবর্তিত কোয়ান্টাম থিওরি প্রয়োগ করিলেন। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, শক্তি একটানা ভাবে বিকীর্ণ হয়। কিন্তু প্রাক্ষ বলিলেন যে শক্তি ঋণ ঋণ ভাবে একক বা বহু-সংখ্যক একত্রে (quanta) বিকীর্ণ হয়। ইলেকট্রন যখন জড়কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে তখন উহাতে একটি বহিঃস্থ শক্তির (centrifugal force) উদ্ভব হয়। কোন স্থায়ী পথে ঘুরিতে হইলে এই উদ্ভূত শক্তি এবং ইলেকট্রন ও কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেনের আকর্ষণসম্প্রদায় শক্তিকে পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী হইতে হইবে। গতি-বিজ্ঞানের এই নিয়ম ও প্রাক্ষ-প্রবর্তিত কোয়ান্টাম থিওরি প্রয়োগে বোর পরমাণুর যে স্বরূপ নির্দেশ করিলেন তাহা এইরূপ :—সহজ ও সাধারণ অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রের বাহিরে যতগুলি ইলেকট্রন থাকিবে তাহার সমপরিমাণ হাইড্রোজেন কেন্দ্রস্থ জড়পিণ্ডে থাকিবে; ফলে সমস্ত পরমাণুটি তাড়িতশক্তিশূন্য (neutral) রহিবে। বহির্দেশে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন চক্রপথে পরিভ্রমণ করে, যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলি পরিভ্রমণ করে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইলেকট্রনের কক্ষপথ-গুলি যেন বিভিন্ন শক্তির সোপানস্বরূপ। ইলেকট্রনগুলি কক্ষ পরিবর্তনের ফলে পরমাণু-কর্তৃক শক্তি বিকীর্ণ অথবা শোষিত হয়। পরমাণুর এই কল্পিত চিত্রদ্বারা বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী (spectrum) যথার্থীতি ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু গোলযোগ বাধিল যখন এই চিত্র হিলিয়াম পরমাণু অথবা আরও ভারী ওজনের পরমাণুকে প্রয়োগে ব্যবহার করা হইল। এই সমস্ত সঙ্কট ও জটিলতার হাত এড়াইবার জ্ঞান সমারফেল্ড, উইলেন-বেক প্রমুখ বিজ্ঞানী বোর-প্রবর্তিত পরমাণুচিত্রের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন; তাহাতে এই সমস্ত পরমাণুর বর্ণালীর ব্যাখ্যা অনেকখানি সহজ হইয়া যায়।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট এন. লুই পরমাণুর এক নূতন চিত্র প্রকাশ করিলেন; তাহার চিত্রের বিশেষত্ব ইলেকট্রনগুলির অবস্থিতি। তিনি বলিলেন পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকার গলিপথে (cubical shell) পরিভ্রমণ করে। তিন বৎসর পরে আরভিং ল্যাংমুইর গিলবার্ট-প্রকাশিত চিত্রের একটু পরিবর্তন সাধন করেন; তিনি বলেন ইলেকট্রনগুলি এককেন্দ্রিক গলিপথে (concentric shell) পরিভ্রমণ করে। পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি এইরূপ চিত্রের প্রবর্তন করেন।

পরমাণুর বোর-সমারফেল্ড চিত্র অথবা গিলবার্ট-ল্যাংমুইর

চিত্র কোনটাই যথেষ্ট হইল না। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান জগতে আবার প্রবল আলোড়ন সূর্য হইল। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে করাসী



বোর-কল্পিত পরমাণু

বৈজ্ঞানিক দে-ব্রোগলী প্রচার করিলেন যে গতিশীল ইলেকট্রন তরঙ্গগুণসম্পন্ন অর্থাৎ তরঙ্গে যে সমস্ত গুণ আরোপ করা যায় ইলেকট্রনেও সেই সমস্ত গুণ আরোপ করা সম্ভবপর। তরঙ্গ প্রতিফলন (reflection), প্রতিসরণ (refraction) প্রভৃতি গুণ সর্বাঙ্গত; সুতরাং ইলেকট্রনও প্রতিফলিত অথবা প্রতি-সৃত হইতে পারে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিসন ও গার্মার এবং ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে জি. পি. টমসন ব্রোগলীর এই মতবাদ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। অতঃপর বিজ্ঞানী শ্রোয়ডিন্গার দে-ব্রোগলী প্রবর্তিত মতবাদের পরিবর্তন সাধন করিয়া যে গণিত বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিলেন তাহাকে ওয়েভ-মেকানিক্স বলা হয়। পরমাণুর রহস্য উদ্ঘাটনে এই গণিতের ব্যাপক ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে পরমাণুর অনেক জটিলতার সমস্তার মীমাংসা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোক পাত হইয়াছে। পরমাণুর ওয়েভ-মেকানিক্স চিত্র হইতে বোর-প্রবর্তিত পরমাণু চিত্র সহজেই বাহির হইয়া আসে।

পরমাণু-কেন্দ্র কি কি বস্তু দ্বারা গঠিত তাহা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নাই। আমরা দেখিয়াছি তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে আলফা-কণা, বিটা-কণা, এবং গামা-রশ্মি বাহির হয়। এই সমস্ত পদার্থের কণা বা রশ্মি বিকিরণ এবং ইহাদের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ আশ্রয়ে আনিতে পারেন নাই; তাপ, চাপ ইত্যাদি বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াও বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদের ভঙ্গুরত্ব রোধ করিতে অথবা বৃদ্ধি করিতে তিলমাত্র সমর্থ হন নাই। উদ্ভূত কণা বা রশ্মি তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রে অবস্থান করে অথবা অল্প কোন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় তাহা এখন পর্যন্ত যথার্থভাবে জানা যায় নাই।

পরমাণু-কেন্দ্র সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে হইলে কেন্দ্র-দুর্গের প্রাচীর ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, নতুবা সমস্ত অপরিজ্ঞাত থাকিবে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের তাই চরম লক্ষ্য হইয়াছে পরমাণুর রহস্য পুরাপুরিভাবে অবগত হওয়া। রাদারফোর্ড বহুপূর্বে এই প্রচেষ্টা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে জড়কেন্দ্র শক্ত স্ফূট পদার্থে গঠিত। বহুদিন ধরিয়া আলফা-কণা দ্বারা পরমাণুকে

আক্রমণ করিয়া অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড আবিষ্কার করিলেন আলফা-কণা নাইট্রোজেন গ্যাস পরমাণুকে আঘাত করিয়া দুইটি বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে—একটি প্রোটন বা ইলেকট্রন বিচ্যুত হাইড্রোজেন পরমাণু, আর একটি গুরুভার অক্সিজেন পরমাণু। রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে মৌলিক পদার্থ অপরিবর্তনীয় নহে; এক মৌলিক পদার্থ হইতে অল্প মৌলিক পদার্থের উদ্ভব সম্ভবপর। রাদারফোর্ড এই ধরনের আরও অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে অল্পতঃ একটি প্রোটন পাইয়াছেন।

রাদারফোর্ড-প্রদর্শিত পথে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া চলিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বোথে (Bothe) দেখিতে পাইলেন বেরিলিয়াম নামক ধাতব পদার্থকে আলফা-কণা দ্বারা আঘাত করিলে প্রোটনের পরিবর্তে এক প্রকার অদ্ভুত রশ্মি বাহির হইয়া আসে যাহা পদার্থের বহুদূর পর্যন্ত অবাধে চলিয়া যাইতে পারে। তিনি মনে করিলেন সম্ভবতঃ উহা এক প্রকার গামা-রশ্মি, কারণ গামা-রশ্মির পদার্থ-ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রবল। অতঃপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেব্রি জ বিখ-বিজ্ঞালয়ে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক (Chadwick) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে উদ্ভূত রশ্মি গামা-রশ্মি নহে, ইহা এমন এক প্রকার কণা-সমষ্টি যাহাদের জড়মান (mass) প্রোটনের হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রে সমান কিন্তু প্রোটনে যেমন ইলেকট্রনের সমান অথচ বিপরীত পরিমাণ ইলেকট্রনীয় বিদ্যুৎ থাকে এই সব কণাতে সেরূপ কোন প্রকার বিদ্যুৎ নাই—ইহারা বিদ্যুৎশূন্য (neutral)। চ্যাডউইক ইহাদের নামকরণ করিলেন নিউট্রন। পরবর্তীকালে অজ্ঞাত উপায়েও নিউট্রন উৎপন্ন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

নিউট্রন আবিষ্কারের তিন সপ্তাহ পূর্বে মার্কিন বিজ্ঞানী উরী গুরুভার হাইড্রোজেন (heavy hydrogen) আবিষ্কার করেন। ডালটনের মতানুসারে এক মৌলিক পদার্থের সমস্ত পরমাণু একই প্রকার কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ম্যাসটন তাঁহার ভরলিপি-যন্ত্রের (mass spectograph) সাহায্যে দেখাইলেন যে নিয়ন গ্যাস দুই প্রকার পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজন যদি ১ ধরা হয় তাহা হইলে সেই মাপকাঠিতে এই দুই প্রকার পরমাণুর ওজন যথাক্রমে ২০ ও ২২ এবং সাধারণতঃ যে নিয়ন গ্যাস দেখা যায় তাহার ওজন এই দুইয়ের গড়। এইরূপ দুই প্রকার পরমাণুকে একস্থানিক (isotope) বলা হয়। পরে দেখা গিয়াছে প্রায় অধিকাংশ মৌলিক পদার্থ কয়েক প্রকার একস্থানিক পরমাণু-সমন্বয়ে গঠিত। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন একস্থানিক পরমাণুগুলির ওজন বিভিন্ন হইলেও উহাদের কেন্দ্রস্থ বিদ্যুৎ-পরিমাণ অথবা বহিঃস্থ ইলেকট্রন সংখ্যা সমান, এবং যেহেতু ইহাদের উপরেই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ভর করে সেইজন্ত কোন মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন একস্থানিক

পরমাণুগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে পৃথক করা যায় না। এইজন্ত বহুবিধ যান্ত্রিক উপায়ে সাধারণতঃ ইহাদিগকে পৃথক করা হয়।

গুরুভার হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের একস্থানিক পরমাণু; সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজনের মাপকাঠিতে ইহার ওজন ২ এবং সাধারণ হাইড্রোজেনের সহিত ইহা অতি অল্প মাত্রায় বর্তমান থাকে (চারি হাজার ভাগে প্রায় এক ভাগ মাত্র)। পরবর্তীকালে উরী কার্বন ও নাইট্রোজেনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ একস্থানিক আবিষ্কার করিয়াছেন। গুরুভার হাইড্রোজেন এবং কার্বোন ও নাইট্রোজেনের একস্থানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যাধি-সংগ্রামে এবং জীববিজ্ঞানে প্রভূত ব্যবহার হইতেছে।

পরমাণুকেন্দ্রের ভূগ-প্রাচীর ভেদ করিবার জন্ত বিজ্ঞানীদের আলফা-কণা ছাড়া আরও প্রোটন নিউট্রন ও ডিউট্রন (ইলেকট্রন বিচ্যুত গুরুভার হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ গুরুভার হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র) জুটিল। বিজ্ঞানীরা তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন কি ভাবে এই সকল কণার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া বন্দুকের গুলীর মত ইহাদিগকে পরমাণুকেন্দ্রে প্রবেশ করানো যায়। এই চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানী লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন যাহার সাহায্যে অধিক সংখ্যক কণা প্রবলবেগে পরমাণুকেন্দ্রে নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের অব্যাহতি পূর্বে আমেরিকার বার্কলী নামক স্থানে এক বিরাট সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণ আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে তাহার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ আণবিক বোমা আবিষ্কার কার্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছে।

এই সাইক্লোট্রন দ্বারা তড়িত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থে উদ্ভূত কণা সহযোগে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে ভেদ করার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, ফলে অনেক মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রস্থ খবর বিশদভাবে জানা গিয়াছে। এক মৌলিক পদার্থকে অল্প মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের (artificial radio-elements) উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রসিন্স রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে আইরেন কুরী ও তাঁহার স্বামী জলিয়ট (স্বনামধন্য মাদাম কুরীর কন্যা ও জামাতা) প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা দেখিলেন যে এন্ট্রিমনিয়াম ধাতব পদার্থকে আলফা-কণাদ্বারা আঘাত করিলে এক প্রকার ফসফরাস পরমাণু ও নিউট্রন কণার উদ্ভব হয়। এই প্রকার ফসফরাস সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা সাধারণ ফসফরাসের একস্থানিক। এই উদ্ভূত ফসফরাসের আয়ু ক্ষণস্থায়ী ও স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের মত ইহা অল্পকাল পরে সিলিকন নামক ভিন্ন এক প্রকার পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। কৃত্রিম তেজ-

ক্রিয় ফসফরাস ছাড়া পরে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম ও আরও কতিপয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

উক্ত একই সালে (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ) মার্কিন বিজ্ঞানী এণ্ডারসন আর একটি নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করিলেন। ইতিপূর্বেই মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আকাশের কোন সূর্য প্রান্ত হইতে এক অভিনব রশ্মি প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কোথায় এর উৎপত্তি বিজ্ঞানী এ পর্যন্ত তাহার কোন সঠিক সন্ধান দিতে পারেন নাই। নানা মুন নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। তবে এই মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মি যে পৃথিবীর স্থপ্তিরহস্তের এক নূতন বার্তা আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'ক্লাউড চেম্বার' যন্ত্র সাহায্যে এণ্ডারসন এই সমস্ত রশ্মির গতিপথের ছবি তুলিয়া তৎসম্পর্কে গবেষণা করিতেছিলেন। চৌম্বক ক্ষেত্রে (magnetic field) যন্ত্রটি রাবিয়া ছবি তুলিয়া এণ্ডারসন দেখিতে পাইলেন যে কণাপথের কতকগুলি বক্রতা ইলেকট্রনপথের সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু অস্বাভাবিক দিক দিয়া ইহার ইলেকট্রনপথেরই ছায়া। কাজেই যে সকল কণা দ্বারা এই সমস্ত পথের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা সম্পূর্ণ ইলেকট্রনের অপরূপ, শুধু বিদ্যুৎ-মানের দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এক একটি কণা ইলেকট্রনের সমান হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ বহন করে। এই সমস্ত কণাকে পজিট্রন নাম দেওয়া হইল অর্থাৎ ইহার হাঁ-ধর্মী ইলেকট্রন। বিজ্ঞানী স্কোবেলজিন (Skobelzyn) এবং বিজ্ঞানী দম্পতি কুরী-জলিয়টও স্বতন্ত্রভাবে এই কণাটি আবিষ্কার করেন।

এই কণা আবিষ্কারের বহু পূর্বে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁহার দৃষ্টিগোচর গাণিতিক প্রক্রিয়া দ্বারা জগৎকে জানাইয়াছিলেন যে, এক্ষণে একটি কণার অস্তিত্ব সম্ভবপর। পরে কণাটি আবিষ্কৃত হইলে ডিরাক প্রচারিত তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এণ্ডারসনের আবিষ্কারের পরে মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মি ছাড়া আরও বিভিন্ন পজিট্রন-উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ হইতে পরীক্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পজিট্রন নিঃসৃত হয়।

একই ব্যক্তি (এণ্ডারসন) এই মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মি গবেষণাকালে আবার আর একটি নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করিলেন (১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি দেখিতে পাইলেন যে কশমিক রশ্মিতে ইলেকট্রনের সমান বিদ্যুৎ-সম্পন্ন এক প্রকার কণা বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ইলেকট্রন অপেক্ষা ইহাদের পদার্থ ভেদ করিবার ক্ষমতা প্রবল। এণ্ডারসন ইহাদের নামকরণ করিলেন 'মেসন' অর্থাৎ মাধ্যমিক ভরসম্পন্ন কণা, কারণ ইহাদের ভর (mass) সাধারণতঃ ইলেকট্রন ও

প্রোটনের ভরের নারামাণি। হাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী দুই প্রকার মেসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কণার উৎপত্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, মহাজাগতিক বা কশমিক রশ্মির ন্যায় সূর্য নভোমণ্ডলে নহে। কাজেই উহার পরমাণুর অংশ, তবে কি ভাবে উহার জন্মলাভ করে তাহা এখনও সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। আবিষ্কারের দিক দিয়া পজিট্রনের সহিত মেসনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। পজিট্রনের ন্যায় মেসনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আবিষ্কারের পূর্বে (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) বিজ্ঞানী জুকাওয়া (Yukawa) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। মেসন আবিষ্কৃত হইলে জুকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সকলে বুঝিতে পারিল।

পজিট্রন ও মেসন উভয় প্রকার কণাই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। জন্মলাভের কিয়ৎক্ষণ পরেই উহার অস্বাভাবিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের স্বাধীন সত্তা হারাইয়া ফেলে।

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মী ভাবিলেন মৌলিক পদার্থ মোট ৯২টি কেন? ৯২ নম্বরের মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের পর আর কোন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? ইতিপূর্বেই ফার্মী পরমাণুকে ভাঙনকার্যে নিউট্রন ব্যবহার করিতেছিলেন। নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ না থাকায় পদার্থ ভেদ করিবার সময় উহা কোনরূপ বিকষিত না হইয়া অবলীলাক্রমে পরমাণুর বহুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। এই নিউট্রন সাহায্যে ফার্মী অনেক পরমাণুকে ভাঙিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এখন ভাবিলেন নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে ভাঙা করিলে কি হয় দেখা যাক। আঘাতের ফলে তিনি কতকগুলি নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইলেন; তিনি সেইগুলির নাম দিলেন ট্রান্সইউরেনিক (Transuranic)। তিনি মনে করিলেন এই মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুকে ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বেশী পরিমাণ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ ও জড়মানসম্পন্ন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্লিনের কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানী হান ও ষ্ট্রাসমান ফার্মীর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিলেন, কিন্তু ফার্মীর মত ট্রান্সইউরেনিক মৌলিক পদার্থ না পাইয়া তৎপরিবর্তে যে দুইটি মৌলিক পদার্থ পাইলেন তাহারা হইতেছে ব্যারিয়াম ও জিফটন এবং তৎসহ দেখিতে পাইলেন যে সেগুলি হইতে প্রবল শক্তি বিকীর্ণ হয়। তাহাদের এই পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল প্রবলভাবে উজ্জীর্ণ হইল। তাহারা ভাবিলেন পরমাণুকে ভাঙার অপরিমিত শক্তি উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার একটা সন্ধান পাওয়া গেল। তখন জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ধীরে ধীরে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তখন এই আণবিক শক্তিকে যুদ্ধাঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তাহাই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি

যুদ্ধরত শক্তিশালী জাতিসমূহের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে ইটালী, জার্মানী ও জাপান-অধিকৃত দেশসমূহ হইতে কার্মা, মহিলা বিজ্ঞানী মেইটনার, বোর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রপতিরা সমরলিপ্ত ইংলণ্ড আণবিক গবেষণার ক্ষমতা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তথাকার গবেষণা-নিরত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-দিগকে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদিগের সহযোগিতা করিবার জন্ত আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। আমেরিকার কর্ণহারগণও ঐ ব্যাপারে রাশি রাশি অর্থ ঢালিলেন। অতঃপর তাঁহারা পরমাণু-ক্ষেত্রের শক্তিকে আণবিক বোমা হিসাবে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের যবনিকা টানিয়া দিলেন।

বিজ্ঞানীরা দেখিতে পাইলেন ইউরেনিয়াম মৌলিক পদার্থ তিনটি একস্থানিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। একটির ওজন ২৩৮ এবং ইহার পরিমাণই সর্বাপেক্ষা বেশী (শতকরা প্রায় ৯৯.৩ ভাগ), দ্বিতীয় একস্থানিকের ওজন ২৩৫ (শতকরা ০.৭ ভাগ), আর একটির ওজন ২৩৪ এবং অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় (শতকরা ০.০০৮ ভাগ)। আণবিক বোমা সৃষ্টিকার্য্যে প্রথম দুই প্রকার ইউরেনিয়াম খুবই প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়াম আবার বেশী কার্য্যকরী; কারণ নিউট্রন দ্বারা একবার ইহার পরমাণু ভাঙিতে পারিলে ভগ্নাবশেষ আবার নিউট্রন উৎপন্ন করিয়া পুনরায় ধ্বংসকার্য্য সাধন করিতে থাকে, এবং যতই ধ্বংস চলিতে থাকে ধ্বংসকারী নিউট্রনের ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং আরও প্রবলবেগে ধ্বংস চলিতে থাকে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত মূল পরমাণুসমূহ প্রায় শেষ হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বংস-লীলা বন্ধ হয় না। এই প্রকার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (chain-reaction) বলে। ইহার সুবিধা এইটুকু যে, একবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেই হইল তারপর আপনা হইতে প্রক্রিয়া চলিয়া আপনা হইতেই শেষ হইবে। ২৩৫ ওজনের একস্থানিক ইউরেনিয়ামে নিউট্রনের শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় যে অভাবনীয় শক্তির উদ্ভব হয় তাহার অস্তিত্ব শুধু নক্ষত্রলোকেই কল্পনা করা যায়। মাটির পৃথিবীতে তাহার কিরূপ সর্বনাশা ফল ঘটতে পারে জাপানের হিরোসিমো শহরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

এই ইউরেনিয়াম (২৩৫) সাধারণ ইউরেনিয়ামে অতি অল্প পরিমাণে থাকায় তাহা পৃথকী-করণ খুবই জটিল ব্যাপার। একস্থানিক পরমাণু পৃথক করিবার বিভিন্ন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে জার্মানীতে ক্লুসিয়াম নামক একজন পদার্থবিদ একটি বিশেষ কার্য্যকরী উপায় (Thermal diffusion method) উদ্ভাবন করেন। এই উপায়ে

অল্প সময়ে প্রভূত পরিমাণ একস্থানিক পরমাণুকে পৃথক করা যায়। আণবিক বোমা সৃষ্টিকার্য্যে বহুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম (২৩৫) সম্ভবতঃ এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হইয়াছিল।

আঘাতকারী নিউট্রন কোন পদ্ধতিতে আণবিক বোমায় ব্যবহৃত হইরাছে তাহা এখনও আমেরিকার গোপন তথ্য। রেডিয়াম ও ব্যারিয়াম একত্রে রাখিলেই সহজে নিউট্রন উৎপত্তি হয় কিন্তু ইহা খুবই ব্যয়সাধ্য, তবে আমেরিকার পক্ষে ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে। আর একটি সহজ উপায়—গুরুভার হাইড্রোজেন গ্যাসে ক্ষিপ্রগামী ডিউটেরন ছুঁড়িয়া মারিলে নিউট্রনের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি দরকার হয়। কিন্তু যে যন্ত্রপাতি ও সাহায্য দরকার হয় আণবিক বোমায় কি ভাবে তাহার ব্যবহার হইতে পারে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। মোট কথা এইরূপ কোন অপরিজাত পদ্ধতিতে আণবিক বোমায় নিউট্রন ব্যবহৃত হইয়াছে।

আণবিক শক্তিকে শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর কিনা সে সম্পর্কে আমেরিকার ব্যাপক গবেষণা ও প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিজ্ঞানীরা দেখিতে পাইয়াছেন যে মধ্যম শক্তি-সম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা ভারী ইউরেনিয়াম (২৩৮) পরমাণু-ক্ষেত্রে আঘাত করিলে প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউট্রনকে সবল ভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ওজনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোন ভাঙ্গন (fission) ঘটে না। এই বৃদ্ধিত ওজনের (২৩৯) ইউরেনিয়াম পরমাণু ক্ষণস্থায়ী। ইহা হইতে পর পর বিটা-কণা বাহির হইয়া ইহা প্রথমতঃ এক প্রকার অতি ক্ষণস্থায়ী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তৎপর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আর এক প্রকার মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমটির নাম দিয়াছেন নেপচুনিয়াম (Neptunium) এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়াছেন প্লটোনিয়াম (Plutonium)। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই প্লটোনিয়াম ইউরেনিয়ামের (২৩৫) প্রায় সমগুণসম্পন্ন এবং নিউট্রন দ্বারা ইহার পরমাণু ভাঙিয়া একই প্রকার প্রবল শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর। তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম হইতে প্লটোনিয়াম পৃথক করা সম্ভব—ইউরেনিয়াম ২৩৫ পৃথক করা যেরূপ কষ্টসাধ্য সেরূপ নহে। আণবিক বোমা নির্মাণ কার্য্যে সম্ভবতঃ ইউরেনিয়াম, ২৩৫ এবং প্লটোনিয়াম ২৩৯ দুই-ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইউরেনিয়াম ২৩৮ হইতে প্লটোনিয়াম উদ্ভবকালে এবং প্লটোনিয়ামের ভাঙন-কালে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাহার সুপ্রসিদ্ধ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) প্রচার করেন। সেই তত্ত্বের একটি মূল ধারামতে জড় ও শক্তির

পরস্পর রূপান্তর সম্ভবপর। কি পরিমাণ জড়ের বিলয়ে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে আইনষ্টাইন তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কারের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর জড় ও শক্তির পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। তাহাদের একীকরণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর জড় ও শক্তির নিত্যতাবাদ বিংশ শতাব্দীতে জড়-শক্তির নিত্যতাবাদে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ বিশ্বজগতে জড় ও শক্তির সমষ্টি চিরকাল একই পরিমাণ থাকিবে।

পরমাণুকে জড় ভাঙনের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয় সে শক্তি জড়ের সামান্য পরিমাণ বিলয়ের ফলে উদ্ভূত হয়। আইনষ্টাইনের গণনামতে যদি মাত্র এক পাউণ্ড বালি বা মাটিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ধ্বংসশক্তিতে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান প্রবল হইবে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে শক্তির উৎপত্তি হয় তাহাতে আইনষ্টাইনের হিসাবমতে এক হাজার ভাগের এক ভাগ জড়ও শক্তিতে পরিণত হয় কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর পরীক্ষাগারে যদি কোন দিন জড়ের শক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হয় সেদিন বিশ্বপ্রকৃতি কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কল্পনার বিষয়।

আমরা দেখিলাম পরমাণুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এযাবৎ ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, হাঁ-ধর্মী মেসন ও না-ধর্মী মেসন এই কয়টি মৌলিক কণার সন্ধান পাইয়াছেন। পরমাণুরাজ্যে এই সমস্ত কণার অবস্থান এবং উৎপত্তিতত্ত্বও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরমাণুকে রহিয়াছে প্রোটন ও নিউট্রন এবং বহিঃপ্রদেশে ইলেকট্রন। একটি প্রোটনের বিদ্যুৎমান ইলেকট্রনের বিদ্যুৎমানের সমান ও হাঁ-ধর্মী। যেহেতু নিউট্রন বিদ্যুৎশূন্য সেইজন্ত বহিঃপ্রদেশে যতগুলি ইলেকট্রন থাকিবে কেন্দ্রে প্রদেশেও সেই সংখ্যক প্রোটন থাকিয়া সম্পূর্ণ পরমাণুকে সাধারণ অবস্থায় তড়িৎশূন্য রাখিবে। নিউট্রন এবং প্রোটন একত্রে পরমাণুর ভর নির্দিষ্ট করে। কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ঠিক থাকিয়া নিউট্রনের সংখ্যা কমবেশী হওয়াতে মৌলিক পদার্থের একস্থানিক বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়। গুরুভার হাইড্রোজেনের পরমাণুকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে সেইজন্ত ইহার ওজন সাধারণ হাইড্রোজেনের ওজনের দ্বিগুণ কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে এক থাকায় রাসায়নিক গুণাগুণের দিক দিয়া উহারা অস্বরূপ, এইজন্ত উহাদিগকে একস্থানিক পরমাণু বলা হইয়াছে।

পরমাণুকে আলফা-কণা বাধীন সত্তা হিসাবে থাকে কিনা বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। দেখা গিয়াছে, ইলেকট্রন বিচ্যুত হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু অর্থাৎ হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুকে আর আলফা-কণা একই পদার্থ। একটি আলফা-কণা দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের স্ফুট সমন্বয়ে গঠিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে

আলফা-কণা নিঃসৃত হয়; সম্ভবতঃ গুরুভার তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রে নিউট্রন-প্রোটন মিলিত হইয়া আলফা-কণা বাধীন সত্তা হিসাবে বর্তমান থাকে।

বিজ্ঞানীরা নির্দেশ দিয়াছেন যে, কেন্দ্রস্থ প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে (exchange force)। এই শক্তির স্রষ্টা হয় নিউট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক রূপান্তরে। কেন্দ্রে কোন ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন বা গামা-রশ্মি থাকে না। উহারা তথায় স্রষ্ট হইতে পারে। টমসন যে সমস্ত ইলেকট্রন রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেগুলি পরমাণুর বহিঃপ্রদেশ হইতে নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে সমস্ত বিটা-কণা নির্গত হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন বেগসম্পন্ন কণা-শৃঙ্খল বর্তমান থাকে। রাদারফোর্ড ইহাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে কেন্দ্রে উৎপন্ন গামা-রশ্মি বহিঃপ্রদেশে ইলেকট্রনমণ্ডলী কর্তৃক শোষিত হইয়া এই সমস্ত বিভিন্ন বেগসম্পন্ন বিটা-কণা শৃঙ্খল (B-ray spectrum) স্রষ্ট করে। কিন্তু ইহা ছাড়াও একপ্রকার একটানা গতিসম্পন্ন বিটা-কণা প্রবাহ (B-ray continuum) তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হয় যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞানী পাওলী একটি নূতন মৌলিক কণার অস্তিত্বের কল্পনা করেন—তিনি ইহার নাম দিয়াছেন নিউট্রিনো। ইহাতে কোন বিদ্যুৎ নাই এবং ইলেকট্রন অপেক্ষা ইহার ভর এত কম যে ইহার কোন ভর নাই বলিলেও চলে। এরূপ ধরণের কণা এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

টমসন-কর্তৃক ডালটন-পরমাণু-বৃদ্ধ ভাঙিবার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পরমাণু ভগ্নাবশেষে অনেক মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাই আবিষ্কারের শেষ নহে; আরও কয়েক প্রকার মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, যথা—পূর্ববর্ণিত নিউট্রিনো, না-ধর্মী প্রোটন দ্বিগুণ ভার-সম্পন্ন নিউট্রন, গুরুভার হাইড্রোজেনের জায় গুরুভার হিলিয়াম এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্ত মৌলিক কণা এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়াই তত্ত্বাবেষী বিজ্ঞানীরা তাহাদের গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন বোধে উহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে ছাড়েন নাই। ইতিমধ্যে আইনষ্টাইন নক্ষত্রলোক ও পরমাণুলোকের সমস্ত ঘটনা এক সর্বব্যাপী তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার গাণিতিক প্রক্রিয়ায় নিউট্রনের এবং এক অদ্ভুত ভরশূন্য বৈদ্যুতিক পরমাণুর (electrical atom of zero mass) কল্পনা করিয়াছেন যাহাদের অস্তিত্বের কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

বিজ্ঞান এখন বৈদ্যুতিক যুগ ছাড়াইয়া আণুবীিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। এখনও পরমাণু-রহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। পদার্থ-বিজ্ঞান হয়ত বহুদিন পরমাণুরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে; কবে তথা হইতে বাহির হইয়া অজ্ঞ পথে ধাবিত হইবে কেহই তাহা এখন বলিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও রাজা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

কালচক্রের অগ্রগতির সহিত মানব-সমাজে বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হয়। সমাজের আদর্শ, শিক্ষার আদর্শ, রাষ্ট্রের আদর্শ, রাজার আদর্শ, 'উপনন্দ্য'র আদর্শ—সকল ক্ষেত্রেই বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। এই আদর্শের পরিবর্তন মানব-সমাজের চিরন্তন সাধনার ফল। জ্ঞানের আলোকে মানুষ এই সকল আদর্শকে বিচার করে দেখে এবং নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এমনই ভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যুগে যুগে আদর্শগুলির রূপান্তর সাধন হয়।

রাষ্ট্র ও রাজা এ দুটি কথা বর্তমানকালে সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় আগেকার দিনে সেরূপ ছিল না। পৌরাণিক কালের কথা আলোচনা না করে আমরা যদি শুধু বৌদ্ধ-যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুধাবন করি, তা হলেই দেখা যাবে যে রাষ্ট্র ও রাজা (রাষ্ট্রপতি) সম্পর্কে এখন যে সব আদর্শ পাশ্চাত্যে শিকড় গেড়ে বসেছে, রাশিয়া ও আমেরিকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে নবতম রূপ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করছে ভারতবাসীর নিকটে আসলে তা আদর্শে অভিনব নয়। ঐতিহাসিক আলোচনার এটাই প্রমাণিত হয় যে, অমূল্য নিয়ম-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রসমূহের গঠন হয়েছিল।

Buddhist India গ্রন্থে (পৃ ২২, লেখা আছে যে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ভারতে এগারোটি প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। সেগুলির নাম : (১) শাক্যরাজ্য—রাজধানীর নাম কপিলাবস্তু, (২) ভাঙ্গারাজ্য—রাজধানী সূসুমার পাণ্ড্য (৩) বুলিয়ারাজ্য—রাজধানী সজ্জকল্য, (৪) ফলাজ্য—রাজধানী কেশপুত্র, (৫) কোলিয়ারাজ্য—রাজধানী রামগ্রাম, (৬) মল্লরাজ্য—রাজধানী কুশীনারা, (৭) দ্বিতীয় মল্লরাজ্য—রাজধানী পাওয়া, (৮) তৃতীয় মল্লরাজ্য—রাজধানী কাশী, (৯) মৌর্যরাজ্য—রাজধানী পিছুপিন, (১০) বিদেহরাজ্য—রাজধানী মিথিলা, (১১) লিচ্ছবী রাজ্য—রাজধানী বৈশালী।

পূর্বে এই রাজ্যগুলি বর্তমান গোরক্ষপুর, বস্তী এবং মুজফ্ফরপুর জিলা ও বিহারের কিয়দংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই সব প্রজাতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে আটটির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। মল্লরাজ্যগুলির মধ্যে তিনটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণাদি পাওয়া যায়। মল্লদের এই তিনটি রাজ্যের রাজধানী কুশীনারা (কটীয়া গোরক্ষপুর), পাওয়া (রাজগৃহের নিকট-বর্তী) ও কাশীতে অবস্থিত ছিল। এই এগারোটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে শাক্য, বিদেহ ও লিচ্ছবী রাজ্য অপর রাজ্যগুলির চেয়ে উন্নত ও বিখ্যাত ছিল।

বিদেহ ও লিচ্ছবী কালক্রমে একটি যুক্ত (amalgamated) রাজ্যে পরিণত হয় এবং তার নতুন নামকরণ হয় বজ্জী (বজ্জী)।

এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে একটির সহিত অপরটির প্রায়শঃই বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। 'কুনাল জাতক' গ্রন্থে দেখা যায় যে একদা শাক্য ও কোলিয়ারাজ্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। উভয় রাজ্যই জলসেঁচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রোহিণী নদীর জলরাশি নিজ নিজ রাজ্যে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে আর তাই থেকে এই যুদ্ধের সূচনা হয়।

রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলির রাজা ও রাজকুমারগণ প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলির রাষ্ট্রনায়কদের বা প্রধানগণের মেনেদের বিবাহ করাকে অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করতেন। 'ভঙ্কশাল জাতকে' দেখা যায় যে, কোশলের রাজা পদেন্দী শাক্য প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাজ্যের নায়কের নিকটে আবেদন জানিয়েছিলেন যে তিনি যেন তাঁর এক কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন।

'একপন্ন জাতকে' লিচ্ছবী রাজ্যের রাজধানীর বিশদ বর্ণনা আছে। তাতে পাই এই নগরীর চতুর্পার্শ্বে তিনটি বৃহৎ ইষ্টক-বেষ্টনী ছিল এবং তার প্রত্যেকটি এক এক মাইল ব্যবধানে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক বেষ্টনীতে যাতায়াতের জন্ত অনেকগুলি বৃহৎ দ্বার ও তত্ত্বপরি বিরাটকায় গুহজ বিদ্যমান ছিল।

প্রজাতন্ত্র রাজ্যসমূহের মধ্যে শাক্য-রাজ্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কালক্রমে এই রাজ্যের নাম দেশকালের সীমা অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হয়েছিল। এই রাজ্যেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। আজ সমগ্র জগতের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলে শাক্য-রাজ্যের নামটি আজও কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছে।

এই প্রজাতন্ত্র রাজ্যেই গৌতমবুদ্ধের প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। *Buddhist India* গ্রন্থে (১৯, ২২ ও ৪১ পৃঃ) আছে যে, তাঁর পিতা শুদ্ধোদন এই রাজ্যের রাষ্ট্রপতি বা 'প্রধান' ছিলেন। রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ, পরিধি ৫০০ মাইল। বর্তমান নেপাল রাজ্যের 'তরাই'য়ের পূর্বপ্রান্তে শাক্য-রাজ্য অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। এই রাজ্যের শাসনকার্য্য এক সংসদ দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। এই সংসদের অধিবেশনাদি এক বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত হ'ত যাকে বলা হ'ত 'সংঘাগার'। বহু বুদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবক এই সংসদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। সকলে মিলে দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন সভাপতি নির্বাচিত করত, তাকে 'রাজা' আখ্যা দেওয়া হ'ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তখন রাজা কথ্যটি ভিন্নার্থ-দ্যোতক ছিল।

বজ্জীদের রাজ্য এক বিরাট প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান ছিল। এই প্রজাতন্ত্র রাজ্য আটটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের

সম্বন্ধে গঠিত হয়েছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালী। এই সম্মিলিত জাতিসংঘের মধ্যে দুইটি জাতি বহুমান্যস্পদ ও উন্নত বসে বিবেচিত হ'ত—তারা হচ্ছে 'লিচ্ছবী' ও 'বিদেহ' জাতি।

বিদেহ প্রথমে একটি রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্য ছিল। রামায়ণে ও উপনিষদে উল্লিখিত রাজর্ষি জনক এই বিদেহ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ২৬০০ মাইল ব্যাপী ভূখণ্ড জুড়িয়া এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। গোড়ার দিকে লিচ্ছবীদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, তারা নিজেদের মধ্য থেকে তিন জন লোক নির্বাচন করে যাবতীয় শাসনকার্যের ভার তাদের হাতে সমর্পণ করত। এই তিন প্রধানকে 'অগ্রণী' বলে অভিহিত করা হ'ত। লিচ্ছবীদের এক মহাসভা ছিল। সকল বয়সের লোক এই সভার সদস্য হতে পারত, তারা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী রাজকার্য পরিচালনে সহায়তা করত। "একপদ জাতক" ও "চূর কলিঙ্গ জাতকে" এই সভার সদস্য-সংখ্যা ৭৭০৭ বলে উল্লেখ আছে। এই সভার নায়কদের 'রাজা' বলে অভিহিত করা হ'ত। এই রাজারা শুধু রাজসভায় বসে আইন প্রণয়ন, সমস্তাদির আলোচনা ও প্রস্তাব পাস করেই ক্ষান্ত থাকতেন না; তাঁরা রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় জটিল বিষয়ের মীমাংসা, সৈন্ত-সামন্তদের তত্ত্বাবধান এবং রাজ্যের আয়-ব্যয় ইত্যাদির হিসাব পর্যালোচনা করতেন। মোটের উপর স্বর্ভূভাবে রাজ্য পরিচালনা ও শাসন, সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্বভার এই সভার উপর স্তম্ভ ছিল। এই সভা থেকে নয় জন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন করে আর একটি বিশেষ কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠন করা হ'ত এবং এই নয় জন প্রধানকে 'গণ-রাজানঃ' বলে অভিহিত করা হ'ত। তাঁরা সমস্ত জনগণের প্রতিনিধি বলে পরিগণিত হতেন।

'ভদ্রশাল জাতকে' বর্ণিত আছে যে এই সকল সমস্তের নির্দিষ্ট প্রধানুযায়ী জলাভিষেক করা হ'ত ও 'রাজা' পদবীতে ভূষিত করা হ'ত।

Ancient India as described by Megasthenes বইখানিতে (৪০ পৃ) উল্লিখিত আছে যে, মেগাস্থিনীস যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন কতিপয় প্রধান প্রধান নগর প্রজাতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে শাসিত হ'ত এবং এমন কয়েকটি জাতি ছিল যারা কোন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। নিজেদের শাসন এবং দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঐ পুস্তক থেকেই (১৪৩ ও ১৪৪ পৃ.) জানা যায় যে, ভারত অভিযান কালে আলেকজান্দারকে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে বহু প্রজাতন্ত্র রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছিল। নিম্নে সে সকল প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে :

(ক) আরটু (বা অরাট্টক)

তৎকালে উত্তর-ভারতে যে কয়েকটি জাতি প্রজাতন্ত্র রাজ্য বা স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল তন্মধ্যে একটি জাতির নাম আরটু বা অরাট্টক। লুঠতরাজ ও চুরি ডাকাতি করে এরা জীবিকা অর্জন করত। এদের কোন রাজা ছিল না। মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত এদের সহায়তায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। *Invasion of India by Alexander* গ্রন্থে (৩৮ ও ৪০৬ পৃ.) Mc Crindle বলেছেন যে, অরাট্টকদের সহায়তা না পেলে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে একচ্ছত্র রাজ্য গঠনে কিছুতেই সফলকাম হতে পারতেন না।

(খ) মালব ও ক্ষুদ্রক

মালব ও ক্ষুদ্রকের উল্লেখ মহাভারতেও দেখা যায়। কোরবদের সহিত মিলিত হয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। আলেকজান্দারের সহিত এই দুই জাতির প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

এদের অন্য নাম মল্লোই ও অক্সীডাকাই* ; এদের মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এরা বিক্রমশালী ও রণনিপুণ ছিল। এদের বাসস্থান রাবী, চেনাব ও ব্যাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল।

(গ) ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়গণ কোন রাজার অধীনে ছিল না। এদের মধ্যে অগ্রণী নির্বাচিত হ'ত। এদের নিজস্ব নৌবাহিনী ছিল, আলেকজান্দারের বিজয়লাভের পর এরা তাঁকে অনেকগুলি ভারতীয় পোত উপঢৌকন দিয়েছিল।†

এতদ্ব্যতীত অগরসুসই, অজ্জুনাগ ও বৃষ্টি নামধেয় আর কতিপয় প্রজাতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়।

এই সব রাজ্যের ইতিহাস ও শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এরা একনায়কত্বের অধীনে ছিল না। পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'আয়ারঙ্গ স্মৃত্ত' (বা আচারঙ্গ স্মৃত্ত) এই সব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তাতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুীদের পক্ষে নিষিদ্ধ দেশসমূহেরও উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, যে রাজ্য অরাজক, যে রাজ্যের রাজা অল্পবয়স্ক, যেখানে দুই জন রাজা আছেন অথবা যেখানে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান ভিক্ষু-ভিক্ষুীদের পক্ষে সে সকল দেশে গমন করা অস্বীকৃত।

'অবদান জাতক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থেও প্রজাতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে এক জায়গায় লিখিত আছে যে, একবার কতিপয় সপ্তদাগর বাণিজ্য ব্যাপদেশে দক্ষিণ দেশে গমন করেছিল। ঐ দেশবাসীগণ তাদের দেশে কিরূপ রাজ্য-শাসন-প্রণালী বিদ্যমান, সেকথা জিজ্ঞেস করলে ব্যবসায়ীরা

* *The Modern Review*, May, 1933 p 438.

† *Invasion of India by Alexander*—Mc Crindle.

বলেছিল—“কেচিদেশ গণাধীনা, কেচিদ্ভাজ্যাধীনা” অর্থাৎ—
কতকগুলি গণতন্ত্র ও কতকগুলি রাজতন্ত্র রাজ্য আমাদের দেশে
আছে।

বৌদ্ধ ভারতে এইরূপ গণতন্ত্র রাষ্ট্রের আধিক্য দেখা যায়।

সুবিখ্যাত ‘বিনয়পিটক’ গ্রন্থে যে সমস্ত গণপরিষদের
বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের এবং
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পরিষদ, সভা ও সম্মেলন—ইংলণ্ডের
পার্লিামেন্ট, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদসমূহ প্রভৃতির সাদৃশ্য
আছে। এই সব সম্মেলন বহু সদস্য নিরীক্ষিত হতেন। তাঁদের
নানা উচ্চপদে নিযুক্ত করা হ’ত। এঁদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে
নিয়ে গিয়ে বসাবার জন্তে এক জন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন,
তাকে বলা হ’ত ‘আসন প্রজ্ঞাপক’।

সভার অধিবেশনে প্রায় সকল সভ্য উপস্থিত থাকতেন।
যে সভ্য সভায় প্রস্তাবাদি উপস্থাপন করতেন তাঁকে নোটিশ
দিতে হ’ত, এই নোটিশকে বলা হ’ত ‘জপ্তি’। সভাপতি তখন
প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করে সভ্যদের মতামত জানতে
চাইতেন। তখন সভ্যগণ আলোচনা ও বাদানুবাদ করে সেই
প্রস্তাব সমর্থন বা প্রত্যাহার করতেন—এই আলোচনা, বিতর্ক
ও বাদানুবাদকে বলা হ’ত ‘কর্মব্যচ্য’। একাধিক বার প্রস্তাব
উপস্থিত করবার—‘জপ্তি দ্বিতীয়,’ ‘জপ্তি চতুর্থ’ ইত্যাদি বিভিন্ন
নাম ছিল।

সভায় মতামত (ভোট) নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং তার
আগে সভ্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হ’ত। ভোট লওয়ার প্রথা
ছিল নিম্নলিখিত রূপ : এক এক রকম মতের জন্ত এক এক
রকমের রঙীন শলাকা সভ্যদের হাতে দেওয়া হ’ত এবং তাঁরা
তাই দেখিয়ে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করতেন। যে সদস্য
নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতাবলম্বী তাঁকে ‘শলাকা গ্রাহক’ পদে
নিযুক্ত করা হ’ত, তিনি সদস্যদের মধ্যে শলাকা বিতরণ
করতেন,—অর্থাৎ শলাকা ছিল তখনকার ‘ভোটের টিকিট’।

প্রকাশ্য ভাবে ও আবহু্যক বোধে, গোপনেও ভোট লওয়া
হ’ত। কোন সদস্যের পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর না
হলে তিনি স্বীয় মত লিখে পাঠিয়ে দিতেন, এই লিখনকে বলা
হ’ত ‘হৃদ’।

নির্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হ’লে ‘কোরামের’ অভাবে
সভার অধিবেশন হত না। যাতে সভায় কোরাম হয়
তার জন্তে নানারূপ বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিল। বিভিন্ন প্রকার
কার্যের জন্তে বিভিন্ন সংখ্যক সদস্যদের কোরামের ব্যবস্থা
ছিল। সাধারণতঃ সভায় কুড়ি জনের উপস্থিতিতে কোরাম হ’ত।
কোন বিশেষ অধিবেশনে মাত্র চার জন সভ্য উপস্থিত থাকলেই
কোরাম হ’ত। কোরাম ব্যতীত সভা হলে তা অসম্পূর্ণ ও বিধি-
বহির্ভূত বলে নাকচ করা হ’ত। সভাপতি, সদস্য, এবং বিশেষ
সদস্য ব্যতীত ‘অনুপূরক’ বা হুইপও বিদ্যমান ছিল। সভায়
কোরাম ঠিক রাখার জন্ত ও সদস্যদের একত্রিত করার জন্ত
হুইপের উপর কঠোর আদেশ ছিল। প্রস্তাব পাশ, ভোট গ্রহণ,
কোরাম, ভোট প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় প্রথাই তখন ছিল।
গণতন্ত্র রাজ্যে ও সম্মেলন এই সকল নিয়ম প্রতিপালিত হ’ত।
আধুনিক শাসনতন্ত্রে এগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি ঠিক আগেকার
মতই আছে শুধু নামগুলিই পরিবর্তিত হয়েছে।

এ সমস্ত বিষয় বিশদ ভাবে ‘বিনয়পিটক’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ
আছে। এই বইখানির ইংরেজী অনুবাদও বেরিয়েছে।

মনে হয় গৌতম বুদ্ধকে এই সকল শব্দ ও সম্মেলন-
প্রণালী তাৎকালিক গণতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে
গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাষ্ট্রের ও রাজার যে আদর্শ বৌদ্ধযুগে
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে দেশকালপাত্রোপ-
যোগ্য ছিল বলেই মনে হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রের যে
আকার আমরা দেখছি নাম ও রূপের দিক দিয়ে প্রাচীন
ভারতের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এতদুত্তরের
মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তাতে সন্দেহ নেই।

স্পর্শ

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

চুপি চুপি এসে দাঁড়ালে আমার পাশে—
আঁখি ভুলে শুধু তাকালে মুখের পানে
এমন শান্ত নিরালা এ অবকাশে
কেন এলে তুমি একাকিনী এইখানে ?
তোমার হৃ’চোখে না-বলা কথার ভিড়,—
ধরতর কাঁপে অসহায় চোঁট ছুটি ;
ভ্রুবো নাবিকের মত ধোঁজে কোন তীর—

প্রথম প্রেমের ভীকু লাজ ওঠে ফুটি।
কি চাহ জানি না, না চাওয়ার অভিমানে
শুধু পাশে এসে মুখপানে চেয়ে থাকা—
প্রাণে মোর কি যে মদির-রস আনে,
তুমি আর আমি—আধখানি চাঁদ ঝাঁকা।
হৃথের পরশে তোমার ও মুখখানি
হঠাৎ আমার বুকেতে লুকালে রাগি।

নব-সন্ধ্যাস

ত্রিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১২

বালিগাড়ির অর্ধেক পথ হইতে চম্পা টুলুর সঙ্গে ফিরিল।

টুলু সামনে, চম্পা হাতচােরক পিছনে। স্তব্ধ রাত্রি, চারিটি পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই নাই কোথাও, শুধু চম্পার শাড়ি পায়ে এক এক বার বেশি জড়াইয়া গিয়া একটা মুহূর্ত থম্ থম্ শব্দ করিতেছে।...প্রায় ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিতে যে সময়টা লাগিল তাহাতে চাঁদ আকাশে আরও উঠিয়া আসায় জ্যোৎস্নাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটাও আর একটু চঞ্চল হইল, খানিকটা জ্বালা লইয়া চম্পার কবরীর মালায় গন্ধের আবর্ত সৃষ্টি করিয়া চলিল।

সমস্ত পথ দুই জনের মধ্যে আর একটি কথাও হইল না। স্থলের টিলায় উঠিয়া টুলু মাষ্টারমশাইয়ের বাসা ছাড়াইয়া স্থলের সামনে গিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—“বনমালীকে ডেকে দেব?”

চম্পা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—“তার যে অসুখ করে নি এটা না দেখলেও বিশ্বাস হবে আমার।”

টুলু বিজ্ঞপটা গ্রাহ্য করিল না, আবার প্রশ্ন করিল—“তাহ’লে?”

“আমি বাসায় ফিরে যাব; বসিতে।”

“সঙ্গে যাব?”

চম্পা মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল, একটু হাসিয়া বলিল—“পুরুষ হলে বলতাম সঙ্গে যেতে।” সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া নিজের কথাটার টীকা হিসাবেই যেন বলিল—“পুরুষ মানুষকে এরকম মিথ্যে বলতে কখনও শুনি নি, তাই...বেশ, এইবার আমি যাই।”

টুলু অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাষ্টারমশাইয়ের জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল—“শুভ, ঘুমোচ্ছেন?”

টীলা হইতে নামিয়া চম্পা বস্তির পায়ে-হাঁটা পথটা ধরিল। যেটার উপর দিয়া টুলু প্রথম দিন বসিতে যার। রাত্তার খানিকটা একটা খোয়াইয়ের ধার দিয়া গেছে—প্রায় একটি ক্ষুদ্র নদীর মতো; কিনারার একটা চ্যাটালো পাথরের উপর চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, শরীরের চেয়ে মনের ক্লান্তি অত্যন্ত বেশি। নানা রকম চিন্তা মনে আসিতেছে—কোনটা মিষ্ট, কোনটা তিক্ত, কোনটা আবার তিক্ত হইয়াও মিষ্ট—সবগুলারই একটা মোহ আছে; কোনটাকেই কিন্তু মনের মধ্যে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। একটা ধরে আবার ছাড়ে, আবার নূতন একটা ধরে, এই

ভাবে মনটা ক্রমে বড় বেশি আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং এক সময় অহেতুকভাবেই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নামিল।...চম্পা মুছিল না, সমস্ত মনটাকে দুইটি ধারার মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া কোলে দুইটি হাত জড়ো করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ গেল, কখন সে ধারা দুইটি বন্ধ হইয়া গেছে জানিতেও পারে নাই। সন্ধ্যা হইতেই একবার চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। শরীর-মন বেশ হাল্কা বোধ হইতেছে।

এর পর চিন্তা বেশ একটা স্পষ্ট গতি লইল, কিন্তু বিপরীত-মুখী। মুখটা ধীরে ধীরে কঠিন হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ এই ভাবেই গেল, তাহার পর সে কবরী হইতে মালাটা ধুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে দুই হাতে লুফিতে লাগিল—মুখটা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে, ঠোঁটের কোণ এক এক বার হইয়া উঠিতেছে কুঞ্চিত। চম্পা হঠাৎ হাত দুইটা আলগা করিয়া দিল, মালাটা নীচে পড়িয়া যাইতে দুই-পা দিয়া সেটাকে নির্মম ভাবে চাপিয়া ধরিল...বেশ লাগিতেছে, অধরের উপর ওঠটা চাপিয়া বসিয়াছে।...চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল; ছ’পায়ে কচলানো মালাগাছটা ডান পা দিয়া গভীর অবজ্ঞাভরে খোয়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ড হইতে নামিয়া পড়িল।

ধোকা হীরকের জুহু মনটা হঠাৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চম্পা হন-হন করিয়া বস্তির পানে চলিল। অহুভব করিল বুকে কিসে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে—মায়ের বুক হৃদে কি এই রকম তোলপাড় করিয়া উঠে? পা চালাইয়া দিল আরও জোরে। বস্তির ছিঁয়াভর নদীর বাসায় হীরক থাকে, সেই মেয়েটিরই কাছে—টুলু টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। ঝগড়ার উত্তেজনাটা কাটিয়া গেলে চম্পা বাসায় আসিয়া তাহারই হাতে পায়ে ধরিয়া আবার রাগী করিয়াছিল—মেয়েটি ভাল, প্রচুর দুধ, আর শরীরে কোন রোগ নাই; সেটা বেশি দরকারী কথা। আরও সুবিধা, ওর বাসাটাও একাশি নদীর কাছে। ব্যবস্থা হইয়াছে, চম্পা যখন খুশি লইয়া আসিবে, যখন খুশি দিয়া আসিবে; টাকটা দিবে সে-ই—মাসে পাঁচটি করিয়া; টুলুর কাছে বা কাহারও কাছেই ও হাত পাতিতে পারিবে না। চম্পা বলে—“আমার হীরাকে টাকা দিয়ে কে কিনবেক গো?—ইস, বড়া লোক, টাকার চকমকি দেখায়।”

মেয়েটির সঙ্গে ভাব করিয়া ‘মিষ্টিন’ পাতাইয়াছে, সব পাকা বন্দোবস্ত।

বস্তির ভিতরে পা দিতেই ধোকার কান্না কানে গেল। দুইটা ছেলের কান্নার প্রভেদটা খুব বেশি—হীরকের বয়সই ত মাত্র এই কয়েক ঘণ্টা। এক রকম দৌড়াইয়াই ছিঁয়াভর

নব্বের বারান্দায় উঠিয়া ছায়ায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল—“মিভিন গো, উঠবিক নি ?...মিভিন গো ।”

মেয়েটি আগেই উঠিয়াছে, হীরকের কান্না একেবারে থামে নাই, তবে অনেকটা চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুধার খুব বেশি রাগিয়া উঠিয়াছিল, এখন শুন যুখে পড়ায় গেঙাইতেছে এবং এক-এক বার মুখটা সরাইয়া লইয়া গলা ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে । ছুধের প্রাচুর্যে গেলানিটাও এক-এক বার বেশি অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে ।

বিত্তীয় বার ডাকে মেয়েটি উত্তর করিল—“ওঠা করেছি গো, তোর ছাওয়ালট দজ্জাল বটেক । রা—গ দেখ্ খো ছাওয়ালের । অঃ ।”

“ছয়ারটি খোল তুই আগে ।”

মেয়েটি হীরককে বুকে লইয়াই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল । চম্পা তাহাকে এক রকম কাড়িয়া লইয়াই নিজের বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“উ উর মা’টিকে দেখে নাই গো, কাদবেক নাই ? তুই দুধ দিন তো মা’টি হয় । গৈঁছিঙ্গ আর কি ।—ই—স গো ! নে, দুধ দে, আমি নিয়া যাব । মা’টি ছেড়ে কি করে থাকবেক গো ? তুর আপগুন ছাওয়ালটি পারেক ?”

ফিরাইয়া দিয়া একটু অপেক্ষা করিয়া রহিল । একটু হালকা রহস্তও হইল ; বেশভূষা লইয়া চম্পার সঙ্গে সাক্ষাতে কেহ আলোচনা করিতে সাহস করে না ; তবে এ মেয়েটির সাহস বাড়িয়াছে একটু । “মিভিন” হইয়া অবধি একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বার্থের এই যোগ, ও না হইলে অচল ; জানে একটু প্রশয় পাইবেই । অবশ্য আসল ব্যাপারের কিছু ভাঙিল না চম্পা । হীরকের দুধ খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া বুকে চাপিয়া লইয়া চলিয়া গেল ।

দরজায় কুলুপ লাগাইয়াই দিয়াছিল । চরণদাস ছোট বারান্দাটিতে উনানের কাছে পড়িয়া । রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; ওর নেশাও পাতলা হইয়া আসিয়াছে, ছয়ার খোলার শব্দে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“কে বটে ?”

চম্পা কোন উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল । চরণ হাতে ভর দিয়া একটু উঠিয়া আর একটু রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করিল—“কে বটে ?—কে বটে গো ?”

চম্পা ভিতর থেকে উত্তর করিল—“আমি, চূপ করে পড়ে থাক্ ক্যানে, রাত দুপুরে চিচ্চায় না ।”

চরণদাস ঘাড়টা শুঁজিয়াই কথাগুলার অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল ধানিকঙ্কণ, তাহার পর তর্কের ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতটা উল্টাইয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল—“রাত তিন পহরে চিচ্চায় না ।—ই আমার আপগুন বাঁসা নয় । যার খুশি চুকবেক—আমার আপগুন বাঁসাটি নয় ।...”

খুব রাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া বিমাইয়া পড়িল । একটু পরে আবার একটু সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল—“চম্পাটি বটেক গো ? কুখা গৈঁছিছিলি ?”

চম্পা হীরককে বিছানায় শোওয়াইয়া ডিবা জ্বালিল, হাত দিয়া বিছানাটা টানিয়া টানিয়া মশণ করিয়া দিতে দিতে ধমকের স্বরে বলিল—“তু ঘুমা ক্যানে । কুখা যাবে চম্পা ? তুর আপগুন ঠিকানা নাই বটে ।”

হীরককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চূপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বিড় বিড় করিতে করিতে চরণদাস আবার নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল ।

এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হীরককে যেন আবার নুতন করিয়া পাইয়াছে চম্পা, ক্রমাগতই চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া । সম্ভানের মতই ও যেন টুলু আর চম্পার মধ্যে একটা সেতু—এই অহুভুতিটাই অতি-নিবিড় একটা মমতার আকারে হীরকের উপর যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল । না কোন সম্বন্ধ থাক্, টুলুর স্পর্শ পর্যন্ত নাই থাক্ হীরকের গায়ে । তবু ঐ যে টুলু তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল ঐটুকুতেই তাহার মনের স্পর্শ যেন পাওয়া যায় সজ্জাত এই শিশুটির মধ্যে । ঠিক তাহারই মতই একটা স্নেহের ধারা, একটা সম্ভানের মায়াই তো টুলুর বুকে থেকে উৎসারিত হইয়া হীরককে অভিসিক্ত করিয়াছিল ? চম্পা নিজের স্নেহ দিয়া সেইটিকে অনুভব করিতে লাগিল,—মাঝখানে হীরা, তাহার ওদিকে আছে টুলু, এদিকে চম্পা নিজে । এ কি এক অগ্নিবর্ষা অভিনব অনুভূতি !—যাহাদের এই সম্বন্ধ তাহার সম্ভানের মধ্যে এইভাবে দুই দিক থেকে দুইটি স্নেহের ধারায় আসিয়া মেশে নাকি ?—চমৎকার ত !—চমৎকার !—কত নিপুণ ভাবে মিষ্ট হীরক—দুই জনের সঞ্চিত স্নেহে ! যেন অন্ত পাওয়া যায় না । অন্ত পাওয়ার জন্তই—এ অতলের তল পাওয়ার জন্তই যেন চম্পা হীরককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে লাগিল ।

তাহার পর এক সময় বালিয়াড়ি থেকে স্থল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই হুঁ চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল । চম্পা সমস্তটাই যেন স্পষ্টভাবে দেখিতেছে এইভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল । বারান্দার পথে নক্ষত্রখচিত এক কালি আকাশ, তাহার গায়ে সমস্তটুকু যেন একখানি চিত্রের আকারে আঁকা রহিয়াছে । নীরব নির্জনতার মধ্য দিয়া টুলু চলিয়াছে—সমস্ত শরীরটি একটা লাঠির মত সোজা, মাথাটা একটু সামনে নোয়ানো । জ্যোৎস্নায় ভরা আকাশ, বাতাস গন্ধে যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—টুলুর পিছনে হাত কয়েকের মধ্যেই বিলাস-সজ্জার একটা যুবতী ।—ধীর, দৃঢ়পদে টুলু চলিয়াছে, দীর্ঘ পথের মধ্যে একটু কথা বলিল না, একবারটি ফিরিয়া চাহিল না ।...এত বড় বিশ্বয় চম্পার অভিজ্ঞতায় জীবনে আর ঘটে নাই । আকাশলগ্ন ছবিটির দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না ।

এই পৌরুষকে চম্পা দিল কিনা বিচার ।

হীরকের চারিদিকে বাহুবল্লভটা আপনি কখন শিখিল হইয়া গেছে । তাহার স্তূপ চোখ দুইটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চম্পা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল । মনটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে, তাহার পর সেটা একেবারেই বিপরীত একটা চিন্তার ধারায় গড়াইয়া চলিল। নিজেকে যেন অত্যন্ত অজ্ঞতা বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে টুঙ্গুর মনের স্পর্শে এই নিপাপ শিশু যেন আরও শতগুণ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে স্পর্শ করা চলিবে না তাহার,—দেহ দিয়া তো নয়ই, এমন কি মনের ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষাটুকু দিয়াও না।

দুয়ারটা ভেদানোই ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া চম্পা আবার বাহিরে আসিল, চায় না যে একটু কোন শব্দ হয় আর বুড়ো চরণদাসের কচকচানি আরম্ভ হইয়া যায়। কথা কহিতেই কেমন একটা নিস্পৃহতা বোধ হইতেছে। ছিয়াত্তর মধুরের দরজায় আবার করাবাত করিল—“মি্তিন গো। হেই মি্তিন।”

মেয়েটির নিজের শিশু উঠিয়াছে, জাগিয়াইছিল—“ম—ম ক্যানে।” বলিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল; প্রশ্ন করিল—“কি বটেক? বোকাটি বুধা?”

“ঘুমাচ্ছে, তু নিয়া আসবি চল।”

“নিয়া আসবি চল। ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাক, তুও ঘুমাগ। এক রাতের ছাওয়াল টায়ে টায়ে শেষ করবেক গো। বড়ো মা হইছে।”

“তু চল বটে, আমি ঘুমাব, উ চিচ্চায়ে উঠায়ে দিবেক।”

“তা এনে দে, আমার আগুন খোঁকাটি চিচ্চায়ে।”

“তু যা মি্তিন, হেই গো, যা। উট বড়ো কচি বটে, ডর লাগে। তু যা গো, আমি তুর খোঁকােকে দেখছি...”

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়াই বাহির করিয়া দিল। মেয়েটি হাড় ফিরাইয়া একটু দাঁড়াইল, জরুটির সঙ্গে একটু হাসিয়া বলিল—“ম—ম ক্যানে। না বিয়ায়ে কানাইয়ের মা হবেক গো। ঢং।...”

মি্তিন চলিয়া গেলে চম্পা একটা তর্জনী দ্বাতে চাপিয়া চোকাঠের ওপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শিশুটি চীৎকার করিতেছে, হুঁস নাই। মি্তিন বারান্দায় উঠিয়া সেকথা বলিলও, তবুও হুঁস নাই যেন চম্পার, তর্জনী দ্বাতে কাম-ড়াইয়া সামনের দিকে চাহিয়া আছে। বড় অনিশ্চিত মেজাজ মেয়েটার, বিশেষ করিয়া এই রকম হঠাৎ গুম হইয়া গেলে কেহ আর ধাঁটাইতে সাহস করে না। মি্তিন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, চোকাঠ ডিঙাইতেই চম্পা ঘুরিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—“তু উকে ফিরায়ে নে গো মি্তিন, উ আমার কাছে বাচবেক নাই, আমার শরীরের পাপ, আমার মনের পাপ উকে পুড়ায় ফেলবেক, ছাইট করে দিবেক—উ হীরাটি বটে, উতে পাপটি সহিবেক নাই গো মি্তিন, তু উকে ফিরায়ে নে...”

১৩

উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, হুঃস্বপ্ন কি স্বপ্ন-স্বপ্ন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ঠিক

যেমন কালকের রাত্রিটা সুখের ছিল কি দুঃখের তাহারও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। উঠিয়া, দুই হাতে হাঁটু দুইট জড়াইয়া চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। কেমন একটা অলস, উদাস ভাব মনটা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কোন চিন্তার গোড়া বসিতেছে না।

আজ আর কাজে যাইবে না। অনেক বেলাও হইয়া গেছে, তাহা ভিন্ন শরীরটাও একেবারে ভাল নাই। কাজে না যাওয়া স্থির করার সঙ্গে একটি চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিল মনে—অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার পরেশবাবু তাহাকে বুঝিতেছে। ঠিক যে নাম ধরিয়া ডাকাডাকি এমন নয়, ছুতানাতা করিয়া এ-সুড়ঙ্গ ও-সুড়ঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ানো, যেখানে যেখানে চম্পার থাকা সম্ভব। আজ যত বেলা বাড়িবে, আরও অধীর হইয়া ঘুরিবে। ...চম্পার একটা পলকানুভূতি, আজকের স্বপ্ন কিম্বা কাল রাতের অনুভূতির মত ধোঁয়াটে কিছু নয়; বেশ স্পষ্ট একটি বিজয়ের আনন্দ একটুর মধ্যেই চম্পার অবসাদগ্রস্ত মনটাকে সচেতন করিয়া তুলিল; চম্পা যেন স্বামিনো নিজেসে ফিরিয়া পাইল।

নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই এই বিজয়ের পাশে কালকের রাতের পরাজয়ের স্মৃতিটা আসিয়া মনের একটা কোণ দখল করিয়া ফেলিল। টুঙ্গুর একটি নির্দেশে বাগিয়াড়ির পথ হইতে ফেরা থেকে স্থলের টিলার উপর তাহার নিকট হইতে বিদায় লওয়া—একটা একটানা পরাজয়। ...চম্পার চোখ দুইটা ধীরে ধীরে এদীপ্ত হইয়া উঠিল—নিজের দীপ্তিতেই যেন জ্বালা করিতেছে। বুকের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি যেন গর্জাইতেছে। বিজয় চাই, খুব বড় একটা বিজয় দিয়া এই পরাজয়ের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে ক্ষতি নাই—একেবারেই স্বস্তি নাই। ...তুঙ্গ? না, বেশ বুঝা যায় ওখানে পরাজয়ই যেন বাঁধা, টুঙ্গু যেন একটা বাজিকরের যন্ত্র, শুষ্ক, শুষ্ক একখানি হাড় যেন—দেখাও দরকার হয় না, চিন্তাতেই সর্পিণীর চক্র ছুইয়া আসে। ...আনত মুখ, পিঠের শিরদাঁড়াটি একেবারে নিধা, জ্যোৎস্নাপ্রসূত মধ্যযাম রজনীতে দীর্ঘপথ বাহিয়া টুঙ্গু চলিয়া আসিল—পিছনে অভিসার-সজ্জায় চম্পা। ...আগুনের মধ্য দিয়া যে শীকর-স্রোতের স্বচ্ছন্দতায় উঠিয়া আসিতে পারে তাহাকে পরাস্ত করিবার অজ্ঞ চম্পার তুণীরে নাই।

তবুও বিজয় চাই, বড় একটা, যৌবনের মর্যাদায় কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। ...

অনেকক্ষণ একভাবে চিন্তা করিয়া চম্পা একটা পদ্ম আবিষ্কার করিল, খুব নূতন না হোক, তবু বিশিষ্ট।

চম্পা হাত মুখ দুইয়া প্রসাধন করিল, খুব হালকা, স্বপ্ন, কিন্তু অমোঘ রহস্যটা ওর অধিকার করা আছে। চরণদাস অনেক পূর্বে কাজে গেছে, দরজায় একটা ক্লুপ আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যানেজার রতিকান্তবাবুকে বরাবর একটু রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছে চম্পার। লোকটি সাহাদের জামাই, প্রায় মাস ছয়েক হইল এখানে আসিয়াছেন। বয়স চল্লিশের ছ'এক বছর উপর বলিয়াই মনে হয়; সুপুরুষ, শৌখীন, আর চম্পা এইটুকু পর্যন্ত জানিয়াছে যে জিভটা বেশ একটু আলগা। তবে সে আলগাপনার একটা বিশিষ্টতা আছে—অত্যন্ত মুক্ত। চম্পা, আরও কয়েকটি মেয়ে, খনিচক্রের মধ্যে যাহাদের স্তন্যম নাই, আর যাহারা স্তন্যমের জন্ত মাথাও ঘামায় না, সবার সামনেই তাহাদের সঙ্গে একটু-আধটু হালকা রহস্য করিতে রতিকান্তের—ম্যানেজার হইয়াও, কর্তাদের বাড়ির জামাই হইয়াও—বাধে না—খনির মধ্যে, খনির বাহিরে, যেখানেই হোক। একটু পানদোষও আছে, যাহার জন্ত সকাল থেকে খানিকটা কাটরা রাজির সঙ্গে জুড়িয়া লইতে হয় রতিকান্তকে। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত রাশভারি, কাজের কথা আসিয়া পড়িলে একেবারে অল্প মাহুম হইয়া পড়িবার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতাও আছে। ম্যানেজারের হালকা রহস্য কান পাতিয়া, অল্প একটু হাসিয়া শোনা যায়, কিন্তু উত্তর দিতে সাহস হয় না, কিম্বা উত্তরে সামান্যও একটু সীমা লঙ্ঘন হইল কিনা সে বিষয়ে নিজের দিক থেকেই খুব বেশি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

আর একটা কথা, অ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার পরেশবাবুর মত তো নয়; একেবারে সর্বময় কর্তা, খুবই উচ্চ অবস্থিত, তাই ম্যানেজার রতিকান্তবাবুর কথা খুব বেশি মনেই হয় নাই কখনও চম্পার। আত্ম কিন্তু বিশেষ করিয়া সেইজন্তই তাহার কথা আগে মনে পড়িল।

একটা ওজুহাত চাই দেখা করিবার, চমৎকার ওজুহাত পাওয়া গেছে হীরককে লইয়া। বাঃ! হীরক, চম্পা ভাল-মাহুমি করিয়া না হয় ওঁদের খনির দায়িত্ব ভারই লইয়াছে, তাহার খরচ জোগাইবে কোথা হইতে?—নিজের পেটই চলা দায় এই বাজারে; একটা ব্যবস্থা না করিলে চলে? করিতেই হইবে একটা ব্যবস্থা।

বেশ অল্পকাল অবস্থায় পাওয়া গেল ম্যানেজারবাবুকে। চতুর শিল্পীর মতোই চম্পা এই আহুকল্যকে কাজে লাগাইয়া আনিতেছিল, এমন সময় টুলু আসিয়া উপস্থিত হইল। চম্পা একবার ফিরিয়া দেখিয়া নিজের কথা চালাইয়া গেল; ম্যানেজারকে দেখাইল টুলুকে চেনেই না, টুলুকে দেখাইল—আমি লোকটা যে কে দেখিয়া রাখ, ভাব কতদূর পর্যন্ত আমার দৌড়। ওর সামনেই ম্যানেজার টুলুকে ডাকায় চম্পার সাহস যেন আরও বাড়িয়া গেল, আরও একটু গা ঢালিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

তাহার পর আসিল মাষ্টারমশাইয়ের দরখাস্ত। ম্যানেজারের মুখের উপর থেকে সমস্ত লঘুতা নিরবশেষ হইয়া মুছিয়া গেল। চম্পা পড়িয়া রহিল একেবারে দূরে। ম্যানেজার দরখাস্তটা পড়িতেছেন—নত দৃষ্টি, সময় যাহা লইতেছেন

তাহাতে অমন এক ডজন দরখাস্ত পড়িয়া শেষ করা যায়। প্রগল্ভা চম্পা নিশ্চুপ হইয়া শক্তি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল—মুখের কোণায় কোন্ রেখাটুকু কি ভাবে ফুটিতেছে বা মিলাইতেছে। পরিচয় আরম্ভ হইল। চম্পা থামের গায়ে ঠেস দিয়া ক্রমে যেন অসাড় হইয়া যাইতেছে; দারোগার মত একাহারে টুলু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে—চম্পা চকিত তির্যক দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল।...অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট বিদ্রোহে গিয়া দাঁড়াইল; চিঠি ফিরাইয়া দেওয়ার কথায় টুলু চেয়ারের হাতল চাপিয়া দৃষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিল—“আমি অমন প্রতিজ্ঞা করি না, নিজের জিনিষ সম্বন্ধে।”

—মনটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে তবু চম্পা যেন একবার চমকিত হইয়া টুলুর পানে ফিরিয়া চাহিল।

তাহার পর আসিল মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি, চম্পা এই প্রথম টুলুর আসল পরিচয়টা পাইল। তাহার কঠিন শরীরটা ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে, কি অদ্ভুত সে অহুত্ব যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না; কয়েকবারই অবাধ্য দৃষ্টিটা টুলুর ওপর গিয়া পড়িল—মাষ্টারমশাইয়ের কথাগুলো তাহাকে যেন এক অপূর্ব নূতন আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। কোণাকার দেবদূত! এ কি অভিনব ব্রত লইয়া অবতরণ তাহার! তাহার ললাট ঘিরিয়া এ কি অপার্থিব বর্ণচ্ছটা!...তাহার পর চিঠির সেই কথাটি—“তৃতীয়টির নাম না করলেও চিনতে তোমার দেরি হবে না—” কে সেই তৃতীয়া, চম্পা মুহূর্তেই চিনিয়া লইল। এর পরেই, কিছু একটা ভাবিতে পারার পূর্বেই সেই চরম কথা কয়টি—“একটা মেয়ে শুধরে গেলে একটা জাতি শুধরে যেতে পারে—এই আমার বিশ্বাস টুলু।”

চম্পার মনে হইল এক মুহূর্তেই কে যেন তাহার শরীরে শত বশিকের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুত্তর প্রলেপ লাগাইয়া দিল। সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চ দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল, কি একটা অসহ্য সুখ-দুঃখের অহুত্ব চম্পা বাড়টা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। এদিকে আর চেতনা নাই, মনে হইতেছে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে সমস্ত শরীরটাকে কাঁপাইয়া হালকা করিয়া কে যেন—কি যেন তাহার মধ্যে থেকে আলাদা হইয়া যাইতেছে, সে নিজেই যেন পাথরের মত ভারী, কিসের থেকে হইয়া যাইতেছে পৃথক, পুলকের অসহনীয়তায় চোখ দুইটি আসিতেছে বুজিয়া।

চেতনা হইল ম্যানেজার যখন একেবারে উগ্র হইয়া একটা কি ইংরেজী বলিয়া উঠিয়াছেন। চম্পার সমস্ত শরীরটা তখন আবার কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার পর স্পষ্টই বচসা—এক দিকে উগ্র ছদ্ম্বার, এক দিকে অবিচলিত, ধীর, নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর—অধিকারের তারতম্য লইয়া টুলুর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা। চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারও যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছেন—অবশ্য দুই জনে দুই ভাবে। চম্পার কানে যেন লাগিয়া আছে—“আমারও তেমনি ওদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে রাখবার অধিকার

বোধ হয়. আরও বেশি।...চম্পার চোখ দুইটি আবার বুজিয়া আসিল।

তাহার পর ম্যানেজারের সেই প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াই ইংরেজীতে হুজার। একটা উৎকট আশঙ্কায় চম্পা আপনা হইতেই সামনে এক পা আগাইয়া গেল; জ্বী-মূলভ অল্প-প্রেরণাতেই হুজনের মধ্যে নিজেকে নিষ্কিঞ্চ করিতে গিয়া তখনই আবার টানিয়া লইল।

টুলু স্পর্ধিত বিক্রমে ম্যানেজারের আশ্চর্যের উত্তর দিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেলের দিকে অদৃষ্ট হইয়া গেল। চম্পা যেন চোখ না তুলিয়া পারিল না;—বালিয়াড়ি থেকে ফেরার পথের সেই ঋজু, নিষ্পন্দগতি—এতটা আবেগ, তবু তাহার চেয়ে এতটুকুও দ্রুত নয়।

টুলু চলিয়া গেলে হুজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। অভিনয়ের আসর গেছে ভাঙিয়া, কিন্তু পা উঠিতেছে না বলিয়া চম্পা যাইতে পারিতেছে না। ম্যানেজার স্থির-দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া আছেন, গাচ নিঃশ্বাস, বুকটা ওঠা-নামা করিতেছে। একটু পরে ঘুরিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—“এরই কাছ থেকে তুই ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েছিলি?”

চম্পা উত্তর করিল—“হ্যাঁ”

“যা, মাসহারা বরাদ্দ হয়ে যাবে ছেলেটার।”—বলিয়া ম্যানেজার উঠিয়া পদাি ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। দাঁতে-পেঁষা একটা ইংরেজী শব্দ চম্পার কানে আসিয়া বাজিল।

পঞ্চটা পরিষ্কার হওয়ায় চম্পা যেন বাঁচিল। ছুটিতে ইচ্ছা করিতেছে, তবু খুব সংযত পদক্ষেপেই গेट পর্যন্ত রাস্তাটা অতিক্রম করিল, পার হইয়া কিন্তু গতি যতটা সম্ভব দ্রুত করিয়া দিল। বাজারের পিছন দিয়া একটা পায়-হাঁটা পথ গল্লের উঁচু দিকে চম্বিয়া গেছে, আগাছার পাশ দিয়া, কয়েকটা খোয়াই পার হইয়া, কয়েকটা ছোট ছোট টিলা অতিক্রম করিয়া। লোকচলাচল খুব কম। চম্পা সেই পথ ধরিয়া চলিল। বাজার পিছনে ফেলিয়া পঞ্চটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার পর সেটা অতিক্রম করিয়া বস্তির দিকে চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা বালিয়াড়ির পথ; স্থল ডাহিনে রাখিয়া পাশ দিয়া নামিয়া গেছেন এই চৌমাথার উপর আসিয়া চম্পা একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। একবার নিজের শাড়িটার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া দেখিল; কি একটা বিধায় পড়িয়া গেছে। বহুদূরে স্থলটা দেখা যায়, একবার সেই দিকেও দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আরও দ্রুতপদে বস্তির পানে চলিল; অন্ততঃর জন্ত শরীরটা কাঁপিতেছে। ঘর খুলিয়া খুব ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লইল; যেটা পরিল সেটা ওর মজুরখাটার শাড়ি—মোটী, একটু খাটো; কমলার দাগও থাকিতে দেয় না;

তবু বেশ মলিন।...আবার দরজায় কুলুপ দিয়া স্থলের পথ ধরিল।

বস্তি হইতে বাহির হইয়া বাজার থেকে স্থল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রাস্তাটা দেখা যায়। চম্পা আগাগোড়া একবার দেখিয়া লইল। টুলুকে বুজিতেছে। চম্পা হাঁটাপথে নিজে যে রেটে আসিয়াছে তাহাতে বড় পথ ধরিয়া টুলু কখনই তাহার আগে পৌঁছিতে পারে না।...টুলুকে দেখা গেল,—যে চৌমাথাটা চম্পা এইমাত্র অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। চম্পা একরকম ছুটলই বলা চলে। একটা ছোট টিলা সামনে খানিকটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, সেটা যতক্ষণে অতিক্রম করিল, টুলু ততক্ষণে চৌমাথা পার হইয়া স্থলের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেছে। চম্পা পা চালাইয়া একটুর মধ্যে ধরিয়া ফেলিল, পিছন হইতেই বলিল—“গুহুন।”

টুলু ফিরিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মিনিট কুড়িও হয় নাই বোধ হয়, এর মধ্যে চেহারায় আর বেশে এত পরিবর্তন—সে নিজের দৃষ্টিতে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। চম্পা বলিল—“আমি চম্পাই, চরণদাসের আর মেয়ে নেই।...ইয়ে, আপনি ও বাড়িতে কোনমতে আর ঢুকবেন না।”

টুলু উত্তর না দিয়া চাহিয়াই রহিল, আগে চেহারা আর বেশের জন্ত বিষ্ময় ছিল, এখন আবার কথার জন্তও; জ্ব দুইটা শুধু আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

চম্পা বলিয়া চলিল—“ঢুকবেন না আপনি ও বাড়িতে। বড় ভীষণ লোক ও; এমনই এক রকম, চেনা যায় না, কাজের বেলায়—মানে, নিজের কাজ হাসিল করতে এমন কিছু নেই যা ও করতে পারে না—আমরা এই ছ-মাস থেকে দেখছি—কত ব্যাপার দেখেছি—এক একটার কথা মনে হলে শিউরে উঠতে হয়—যাবেন না আপনি—ও যে কত ভয়ঙ্কর।...”

রোদে, আবেশে চম্পার মুখ সিঁছর হইয়া উঠিয়াছে; কপালের চুল ঘামে ভিজিয়া কপালে, কানের গোড়ায় সাঁটিয়া সাঁটিয়া গেছে, চোখে একটা উগ্র আতঙ্ক, সেই সঙ্গে গভীর মিনতি।

টুলু শাস্ত কণ্ঠে বলিল—“যতই ভীষণ হোক ও, আমায় যেতেই হবে ও-বাড়িতে।”

চম্পা অসহায় দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিল, কোন পথিককেও যদি পায় তো যেন নিজের সাহায্যে টানে। চারিদিক নির্জন, চম্পা আরও মিনতির কণ্ঠে বলিল—“না, যাবেন না, কোন মতেই যাবেন না।”

“তুমি তো শুনেলেই ওখানে, বুন হওয়াকে আমি ভয় করি না, তার জন্তে আমি তৈরিই আছি।”

“হাঁ, শুনেছি; কিন্তু সে রাগের মাধ্যম বলেছিলেন বলে...খুন হওয়াকেও যদি ভয় করেন না বলছেন, তা হলে...”

“তার চেয়ে একটা বড় জিনিষ আছে, আমি সেইটেকে ভয় করি।”

“কিন্তু খুন হওয়ার চেয়ে আর বেশি ভয়ের কি আছে? মানুষের...”

উত্তেজনার কাঁপিতেছে। টুলু বলিল—“ডেবে দেখলে নিজেই কোন সময় বুঝতে পারবে সেকথা; এখন তোমার মন বড় চকল রয়েছে। আমার যেতে দাও চম্পা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।”

চম্পা নিজের নামের এই প্রথম উচ্চারণে যেন সামান্য একটু অস্বস্তি হইয়া গেল। তাহার পর আরও ব্যাকুলভাবে সামনের দিকে গিয়া কতকটা পথ-আগলানো গোছের করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“না, যাবেন না—কোন মতেই না—মাষ্টারমশাই পর্যন্ত বাসায় নেই যে...”

টুলু প্রশ্ন করিল—“আমার পথ আগলাচ্ছ তুমি?”

“যাবেন না, দয়া করে যাবেন না; এই পায়ে ধরছি আপনার।”

একটু ঝুঁকিতেই টুলু ছই পা পিছাইয়া গেল। চম্পা সোজা হইয়া মুহূর্তকয়েক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টিতে একটু কি পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পর বেশ ভাল ভাবেই মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“হ্যাঁ, আগলাচ্ছি পথ। আমি নোংরা, আমি নরক, আমার না ছুঁয়ে, আমার না মাড়িয়ে তো আপনি যেতে...”

অতিমাত্র উত্তেজনার একটু অস্বস্তি হইয়া গেছে, ভারী শাড়ির আঁচলটা গড়াইয়া মাটিতে ঠেকিতেই টুলু শান্তভাবে সেটা তুলিয়া চম্পার দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“নোংরা, না-হোঁওয়া—এসব কোন কথাই নয় চম্পা। আসল কথা, আমার যেতেই হবে ও বাসায়। সত্যি, একজন মেয়েছেলেকে ঠেলে তো আমি যেতে পারব না; আমার অহরোধ তুমি পথ ছেড়ে দাও আমার।”

চম্পা নিজের পরাভবটা ডান হাতে তুলিয়া লইল। আরও যেন অসহায় হইয়া গেছে। কোন উপায় নাই দেখিয়া ব্যাকুলভাবেই শান্ত হইয়া গেছে একটু; আঁচলটা যথাস্থানে তুলিয়া দিয়া বলিল—“কেন যাবেন বলুন আপনি?”

টুলু এবার তর্কের মোড় ফিরাইল, যদি এই দিক দিয়া বোঝানো যায় এই অশিক্ষিতা মেয়েটাকে; বলিল—“না গিয়ে কোথায় যার?—এখানে...”

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে স্থিরদৃষ্টি মুখে রাখিয়া বলিল—“আপনি ব্যানার্জি বাবুদের ভাইপো; ম্যানেজারবাবু জানেন না বলে, আর কেউ...”

হঠাৎ থামিয়া গেল; দৃষ্টিটা কিন্তু মুখ থেকে সরাইল না। টুলু বলিল—“বেশ, তা হলে আসল কথাটা বলি—যদিও বলার দরকার নেই, কেননা এফুনি ম্যানেজারবাবুর ওখানে শুনে—মাষ্টারমশাই আমার এই বাসায় থাকতে বলে গেছেন, তাঁর কথা...”

চম্পা জিতিতেছে; আবার বাধা দিয়া বলিল—“কিন্তু মাষ্টারমশাই জানতেন না তো যে ব্যাপারটা এই রকম হবে; দাছ চিঠিটা ভুল করে দিয়ে গিয়েছিল বলেই তো এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে?”

টুলুর মুখটা শান্ত; কিন্তু ভিতরের শান্তি হারাইতেছে; তবু একবার চেষ্টা করিল, বলিল—“তা হলেও—তাঁর হুকুম...”

চম্পা বিজয়িনীর মতোই একটু সিঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর কি—হইয়া আসিল তো; বলিল—“বাঃ, তিনি না কেনে হুকুম দিয়েছেন বলে আপনি কেনে শুনে এগিয়ে যাবেন?—আপনার বা সর্বনাশ তা থেকে কোন মতেই ফিরবেন না?”

টুলুর দৃষ্টি হঠাৎ যেন অগ্নিবর্ষা হইয়া উঠিল, কতকটা গর্জন করিয়াই বলিল—“মেয়েদের একটা বড় অস্ত্র অযথা তর্ক, তুমি তাই ধরেছ চম্পা; কিন্তু জিগ্যেস করি—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে?—তুমি ফিরেছ?—কাল তোমার সর্বনাশের একেবারে মধ্যস্থান থেকে তোমার ফিরিয়ে এনেছিলাম আমি, কিন্তু এলে কি করে?—আবার কি তুমি নেমে যাও নি?—বলো, কথা কইছ না কেন?—আজ এই একটু আগে ম্যানেজারের ওখানে যে...”

নিজেকে সংযত করিয়া লইল; সঙ্গে সঙ্গে চম্পার পাশ কাটাইয়া ফুলের টিলার দিকে পা বাড়াইয়া বলিল—“যাও, পথ ছেড়ে দাও আমার।”

ক্রমশঃ

সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাতি-সমস্যা এবং তাহার সমাধান

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

মুখ্যতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্র-সমবায়ের গঠিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বহু বিভিন্ন জাতির বাসভূমি। উত্তরে মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে ভারত-সীমান্ত পর্যন্ত এই বিশাল রাষ্ট্রের বিস্তার। রুশীয়, উক্রেণীয়, বায়েলো রুশীয়, উজবেক, জর্জীয়, কাজাক, আজার-বাইজানীয়, তুর্কমেনীয়, ইয়াকুত, বুরিয়াট, তাজিক, ইছদী, পোল,

নেনসি, ওসেটীয়, লেজখিন, গ্রীক, তাতার, কালমুক, চুচ্চি, ইয়ুকাবির, এলিয়ুট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এই যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতিগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাক-বিপ্লবকালে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অভাব-

অনটন ছিল এই সমস্ত জাতিগুলির নিত্যসংঘর্ষ। অসুখীন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ইহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। লেনিনের কথায় জার-শাসিত রুশিয়া ছিল একটি বিরাট ‘প্রিজন অব নেশনস’ (Prison of Nations)। সেই যুগে একমাত্র রুশীয় ব্যতীত রুশিয়ার অল্প সমুদয় জাতিকেই বিদেশীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। এই শোষণের কোনপ্রকার রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। রুশীয়গণের মধ্যেও মুষ্টিমেয় কয়েক জন মাত্র রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ ছিল প্রায়-দাস পর্যায়ভুক্ত।

অ-রুশীয় জাতিগুলি নানা ভাবে উৎপীড়িত এবং শোষিত হইত। প্রতিক্রিয়াপন্থী বিরূপ রাজশক্তির অবিচার, উৎপীড়ন এবং শোষণ এবং অনাধু ব্যবসায়ীগণের প্রতারণা ইহাদের জীবনকে বিষময় এবং দুঃস্বপ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজেদের স্বাধীনতার স্বপ্নের বিফল প্রয়াস করিয়া ককেসাসের পার্বত্য অধিবাসিগণ পর্তুগের দুর্গম অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে। মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের বহু কিরগিজ, তাজিক এবং অত্যাধিক অধিবাসী তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। মধ্য-এশিয়া এবং ককেসাসের অধিবাসিগণ বার বার জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছে। আর প্রতিবারই জার-সরকার কঠোর হস্তে দে বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। মুজিকামী অগণন শহীদের উচ্চ শোণিতে মাথা ধরিবার বক্ষ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ঐকান্তিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যত্নশূন্য। তাই দেখিতে পাই যে জার-শাসিত রুশিয়াতে অত্যাচারিত জাতিসমূহের কোন না কোনটির বিদ্রোহ ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্ত জার-সরকার কোন প্রকার চেষ্টা বা অপচেষ্টার ক্রটি করেন নাই। সমস্ত উপায় বখন ব্যর্থ হইল, তখন সরকার প্রধানতঃ ভেদনীতির উপর ভরসা দিলেন। ইহুদীর বিরুদ্ধে রুশীয়, আজার-বাইজানীয়ের বিরুদ্ধে আর্মেনীয়, এক কথায় এক জাতির বিরুদ্ধে অল্প জাতিকে উদ্ধায়া দিয়া এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া জার-সরকার জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে বহুলাংশে সফলকামও হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বতঃই মনে পড়ে ভারতবর্ষের কথা। এখানেও কি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একই দৃষ্টের অভিনয় হইতেছে না? পাকিস্তান, শিখিস্তান এবং অত্যাধিক বহুবিধ সম্ভব এবং অসম্ভব ‘স্থানের’ যে দাবি আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করিয়া দিতেছে তাহার মূলও ত রহিয়াছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস। তৃতীয় পক্ষ কি এই বিরোধ এবং অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া তাহাকে বহুদূর শাখাপল্লবিত করিয়া তোলে নাই? যে উৎকট প্রাদেশিকতা আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে প্রায় বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার মূল কারণই বা কি? তুলনীয়—

The British rulers helped the Indians to become abnormally conscious of their differences. By dwelling on these differences we persuaded ourselves and for a time we persuaded some Indians that rule was indispensable. Even now when events have driven us to promise its early end this theme of our sacred duty to the minorities constantly recurs in our official statements. —Subject India by, H. N. Brailsford.

বৃহদায়ত্তন প্রত্যেক রাষ্ট্রে চিরকালই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সমূহের সমস্যা (Minority problem) আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছে। সীমান্তের পরিবর্তন (Frontier revision), সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিয়া সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের একীকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। সমস্যা কিন্তু রহিয়াই গিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে জারের আমলে একমাত্র রুশীয় ভিন্ন সাম্রাজ্যের অধিবাসী অল্প সমস্ত জাতিকেই alien বা বিদেশীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। ইহাদের জাতীয় ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা করা হইত না এবং ইহাদের শিল্পোন্নতির পথকে সর্বপ্রকারে বিঘ্নস্তম্ভ করিয়া রাখা হইয়াছিল। উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, বাকিস্তান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত কাঁচামাল রুশিয়াতে রপ্তানি হইত। রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন প্রদেশের শিল্পোন্নতি এবং স্থানীয় শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে রুশীয় একাধিপত্যের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হইত।

রায় কর্তৃক অধুনা রাখিবার জন্ত জার-সরকার সাম্রাজ্যের সর্বত্র সামন্ত প্রথা (Feudalism) পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশেই গৃহসংগ্রাম আবির্ভাব হইয়াছিল। দৃষ্টান্তরূপে বোখারার আমিরের কথা বলা যাইতে পারে। সরকারের ক্রীড়নক এই নীরজাকরের দল জাতীয়-গৌরব এবং উন্নতি অপেক্ষা শ্রেণী-স্বার্থকেই বড় মনে করিত। ইহাদের সহিত ভারতের দেশীয় রাজস্বরূপের তুলনা চলিতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বিভ্রান্ত এবং ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে জার-তন্ত্র আর একটি অস্ত্র ব্যবহার করিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির দুঃখকষ্টের জন্ত পরস্পরকে দায়ী করিয়া কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমা নির্দিষ্ট করিয়া একই জাতির লোকের দুই বা ততোধিক প্রদেশে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া জার-সরকার জাতি-বৈরের সৃষ্টি করিতেন এবং সময়ে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন। আবার কোথাও বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের (pogrom) অনুষ্ঠান করিয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার চেষ্টা করা হইত।

ইহুদী, উজবেক, আজারবাইজানীয় এবং অত্যাধিক বহু জাতিকে পূর্বে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হইত না। বিশেষ করিয়া ইহুদীদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক বৈষম্যমূলক ব্যব-

হার করা হইত। তাহাদিগকে মধ্য-রুশিয়া, তদানীন্তন রাজধানী সেন্টপিটার্সবুর্গ এবং অন্যান্য কোন কোন নগরে বাস করিতে দেওয়া হইত না। রুশিয়ার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী লেভিটান। তিনি ইহুদী এই অপরাধে মক্কা হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। ইহুদীগণের কৃষিকার্য্য করিবার অধিকার ছিল না। মক্কা এবং সেন্টপিটার্সবুর্গের উচ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইহুদী ছাত্রসংখ্যা মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ এবং অন্যান্য নগরে শতকরা ৫ ভাগের অধিক হইতে পারিত না।

ষোড়শাচারী-জারতন্ত্রের যুগে বিভিন্ন জাতি-সমবায়ের গঠিত বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের বিরাট জনসমষ্টি স্বয়ং জার, ভূম্যধিকারী ও যাজক সম্প্রদায় এবং বণিকগণ কর্তৃক সমভাবে শোষিত এবং উৎপীড়িত হইত। প্রতিকার দূরের কথা, অধিকাংশক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের কোন বন্দোবস্তই জারের যুগে করা হয় নাই। অন্তর্হীন অজ্ঞান অন্ধকারে ইহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া রাখাই ছিল জার-সরকারের নীতি। প্রাক-বিপ্লব কিরখিজিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি শতে অর্দ্ধজন। কাজাকস্থান, কিরখিজিয়া এবং আর্ধেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশের কোথাও একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না। অ-রুশীয় জাতিগুলির স্বজনী প্রতিভাকে সর্বপ্রকারে চাপিয়া রাখা হইত। উক্রেইন, জর্জিয়া, আর্ধেনিয়া, কিরখিজিয়া প্রভৃতি প্রদেশের লোক-শিক্ষা এবং জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া গিয়াছিল। উক্রেইনবাসীদের নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার ছিল না। রাষ্ট্রে প্রচলিত প্রায় ৫০টি ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না।

১৯১৭ সালের অক্টোবর-বিপ্লব রুশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক নব যুগের সূচনা করে। এই বিপ্লবের ফলে জার-তন্ত্রের অবসান এবং রুশীয়গণ কর্তৃক সাম্রাজ্যের অধিবাসী অন্যান্য জাতির উপর অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিপ্লবের ফলেই আবার জার-শাসিত রুশিয়ার প্রত্যেকটি জাতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে।

১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বর লেনিন এবং ঠালিনের যুক্ত স্বাক্ষরে প্রচারিত “ডিক্লারেশন অব রাইটস অব দি পিপলস অব রাশিয়া”তে স্বীকার করা হইল যে—

১। ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সমান এবং সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী।

২। ইহাদের প্রত্যেকের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের এবং রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আছে।

৩। কোন জাতি বা ধর্মসম্প্রদায় কোন বিশেষ অধিকার

ভোগ করিবে না। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহারও করা হইবে না।

৪। সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাধীন বিকাশের অধিকার থাকিবে।

১৯২২ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান এবং রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী শক্তিসমূহের পরাজয়ের পর মক্কাতে আহৃত “অল-ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েটস”—এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র-গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির পক্ষে ইচ্ছামূলক বলিয়া ঘোষিত হইল। যোগদান করিবার পরও প্রদেশগুলির রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যুদ্ধ, বিপ্লব এবং গৃহ-যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরসনের জন্তই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল।

অক্টোবর-বিপ্লবের পররাষ্ট্রের কোন জাতিরই আর বিশেষ কোন অধিকার বা অক্ষমতা (disability) রহিল না সত্য, কিন্তু জার-তন্ত্রের অল্পস্বত নীতির ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্যের স্বষ্টি হইয়াছিল তাহা রহিয়াই গেল। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্ত রাষ্ট্র-নাগরিকগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে তাহারা বহুলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এমন বহু জাতি রহিয়াছে যাহারা বল-শৈথিক বিপ্লবোত্তর কিঞ্চিদধিক পাদ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যযুগীয় অল্পস্বত অবস্থা হইতে একেবারে আধুনিক অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুদূর এবং দুর্গম পল্লী অঞ্চলসমূহেও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিস্তার এবং বিকীরণ ঘটয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধীন প্রতিটি সাধারণ-তন্ত্র অভাবনীয় দ্রুতবেগে সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের খনিজ সম্ভার নিজেদের এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। প্রতি বৎসরই নূতন নূতন জায়গায় স্বর্ণ, দস্তা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, টিন, লৌহ, সীসা, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ সম্পদের সম্ভান পাওয়া যাইতেছে। কাজাকস্থানের কয়লা, তামা এবং সীসা, ট্রান্স-ককেসিয়ার ম্যাঙ্গানীজ, কিরখিজিয়ার কয়লা, ককেসাসের অন্তর্গত উত্তর-ওসেসিয়ার দস্তা এবং চেচেনো ইঙ্গুসেটিয়ার ও বস্কিরিয়ার তৈল সম্পদ আজ তত্ত্ব প্রদেশের শিল্পোন্নতির মূলীভূত কারণ।

খুব বেশী দিনের কথা নয় যখন কাজাকস্থানের খনিজ সম্পদকে কোন কাজে লাগানো যাইত না, প্রাক-বিপ্লব যুগে এই অঞ্চলে কোন রেলপথ ছিল না। ১৯২৮-৩২ সালে নির্মিত টার্কিসিভ কাজাকস্থানের সর্বপ্রথম রেলপথ। তুর্কি-

স্থান এবং সাইবেরিয়ার সংযোগ সাধন করিয়া এই রেলপথ একটি বিরাট অনগ্রসর অঞ্চলে নব যুগের সূচনা করিয়াছে। যুতপ্রায় এই অঞ্চল আজ প্রাণের প্রাচুর্য্যে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। অক্টোবর-বিপ্লব উজ্জবেকিস্থানেরও অর্থনৈতিক জীবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। এই প্রদেশে অনেকগুলি বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উন্নত ধরণের জলসেচ-প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া ইহার তুলার চাষেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

পূর্বে বাকুই ছিল আক্কারবাইজানের একমাত্র শ্রমশিল্প-কেন্দ্র। এই বাকু বরাবরই তৈলের আকরের জন্ম প্রসিদ্ধ। কিন্তু জারের আমলে এই তৈল সম্পদের যথেষ্ট অপচয় ঘটিত। খনির ক্ষীভোদর মালিকগণ প্রচুর লাভ করিতেন সত্য, কিন্তু দেশের জনসাধারণ দিন কাটাইত অনশন এবং অর্দ্ধাশনে। সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই আক্কারবাইজানের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বহু নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে আক্কারবাইজান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে পূর্বে আক্কারবাইজানের খনিসমৃদ্ধ হইতে যে পরিমাণ তৈল উত্তোলিত হইত, বর্তমানে তাহা অপেক্ষা তিন গুণেরও বেশী তৈল উত্তোলিত হয়।

এ দিকে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যৌথ কৃষিকার্যের ফলে গ্রামগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরে উক্রেনের কৃষিক্ষেত্রসমূহে সর্বমোট ৮৮,০০০ কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইত। ঐ বৎসর বায়েলোরুশিয়ার যৌথ এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে ৮১,০০০ কলের লাঙ্গল, ৪,০০০ শস্য মাজাইবার কল, ৪,০০০ ট্রাক এবং ১২০০ শণ তুলিবার কল ব্যবহৃত হইত। ঐ একই বৎসরে কিরখিজিয়া, তাজিকিস্তান এবং আক্কারবাইজানের কৃষিক্ষেত্রসমূহে যথাক্রমে ৩,৬৯৪, ৬,৮৮৫ এবং ৫,৫৬২টি কলের লাঙ্গলের সাহায্যে চাষের কাজ চলিত।

উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ফসলের চাষও আরম্ভ হইয়াছে। উক্রেনে ধাতুর চাষ প্রবর্তিত হইয়াছে। ট্র্যাল-ককেসিয়াতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে চা এবং লেবুজাতীয় ফল উৎপন্ন হয়। গৃহপালিত পশুগুলোরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মেষ হইতে এখন প্রথম শ্রেণীর পশম উৎপন্ন হয়।

শিল্প এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ কর্মীরও সৃষ্টি হইয়াছে। কাজাকস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্বে একজনও কামার, এঞ্জিনীয়র অথবা চিকিৎসক ছিল না। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। কাজাকস্থানে একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবর্তন কেবল কাজাক-স্থানেই সীমাবদ্ধ রহে নাই। ককেসাস, মধ্য-এশিয়া এবং সুদূর উত্তরে অবস্থিত প্রদেশসমূহেরও এই প্রকার রূপান্তর ঘটয়াছে।

সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নারীর অবস্থারও পরিবর্তন ঘটয়াছে। রাষ্ট্রে এবং সমাজে তাহার মর্যাদার আসন স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বে রুশিয়াধীন এশিয়ায় কঠোর-বিক্রয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। নারীহরণ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অপরিচিত পুরুষের মুখদর্শন নারীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। আক্কার-বাইজানের মেয়েদিগকে ‘চাদরা’ এবং তাজিকিস্তান ও উজ্জবেকিস্থানের মেয়েদিগকে ঘোড়ার লোমে প্রস্তুত ‘চড্‌চন’ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতে হইত। রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশসমূহে নারীর কোনও অধিকারই স্বীকৃত হইত না। তাহাদিগকে স্বামী, পিতা অথবা ভ্রাতার মন জোগাইয়া চলিতে হইত। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই সমস্ত অঞ্চলের নারীরা যুগযুগান্তের বদন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সোভিয়েট আইন নারী পুরুষে সমদর্শী। তাই আজ নারীদের মধ্যেও রাজনৈতিক কর্মী, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়র, বিমান-পরিচালিকা, শিক্ষাত্রতী এবং কৃষিবিদগণের অভাব নাই।

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাইতে সোভিয়েট সরকার চেষ্টার জট করেন নাই বা করিতেছেন না। রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই আক্কারবাইজান, তুর্কমেনিয়া, উজ্জবেকিস্থান, কাজাকস্থান, আর্জেনিয়া এবং কিরখিজিয়াতে বিজ্ঞান-গামী ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫, ৩৭, ৫৩, ৫৮, ৬৮ এবং ১৭২ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সব কয়টিই রুশিয়াতে অবস্থিত ছিল। সাম্রাজ্যের অধীন অনেক প্রদেশের নিকট তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত ছিল। আর ১৯৩৮-৩৯ সালে দেখা যায় যে বায়েলো রুশিয়াতে ২২টি, আক্কার-বাইজানে ১৩টি এবং কাজাকস্থানে ১৯টি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ বৎসর উক্রেনে ১৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আর প্রাক-বিপ্লব যুগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫। ১৯৩৮-৩৯ সালে জার্মানীর লোকসংখ্যা উক্রেনের দ্বিগুণ ছিল। অথচ সেই সময়কার জার্মানীতে উক্রেন অপেক্ষা অনেক কম উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল।

সোভিয়েট সরকারের অমূল্য নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির স্বজনী প্রতিভার বিকাশ এবং জাতীয় শিল্পের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি জাতির স্বষ্ট মানস-সম্পদ আজ সোভিয়েট ভূমির সম্পত্তি। উক্রেন, জর্জিয়া এবং আর্জেনিয়ার কবি এবং সাহিত্যিক-দিগের রচিত সাহিত্য সমগ্র জাতির সম্পদ। পক্ষান্তরে রুশীয়

এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির মন্দির-ঘর আজ প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিকের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। সোভিয়েট সংস্কৃতির উপর এই সংস্কৃতির প্রভাবকে অধীকার করিলে সত্যের মর্যাদা লজ্জিত হইবে। পুস্কিন, ডারউইন, সেক্সপীয়র, টলষ্টয়, মার্কস প্রভৃতির রচনাবলী সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

সোভিয়েট ভূমি বহু জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। অথচ অক্টোবর-বিপ্লবের পর সে দেশে যে অভিনব সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হইয়াছে, তাহা কোন বিশেষ ‘জাতীয়’ সংস্কৃতি নহে। এই সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রের সমস্ত জাতিরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর শাসনের লক্ষ্য ছিল একমাত্র রুশীয় ভিন্ন সমস্ত জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ। আর সোভিয়েট সরকার করিয়াছেন সমস্ত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন।

জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্যের সমগ্র ভারত-বর্ষেও বিদ্যমান। এই অজুহাতেই ভারতবর্ষে কেহ কেহ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিযুক্ত ‘স্থান’ গঠনের ধূম তুলিয়া-ছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদি বিভিন্ন পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিচিত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সোভিয়েট ভূমির অধিবাসিবৃন্দের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপে অক্ষুর রাখিয়াও একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস করা অসম্ভব না হয়, ভারতবর্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? উত্তরে যদি বলা হয় যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, প্রভুত্বপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ জার এবং জারের আশ্রিত ও সাহায্যপুষ্ট ভূম্যধিকারী এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনের ফলেই মাথা একদা অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল রুশিয়াতে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তবে স্বার্থবান শ্রেণী জটিল করিতে এবং রাজার আইন চোখ নাড়াইতে পারে কিন্তু সত্যের দেবতা প্রসন্ন হইবেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক জাতি ঠিক একই প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিধির ১২৩ সংখ্যক বিধানে এই অধিকারসাম্যের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তুলনীয়—

Equality of rights of citizens of the U.S.S.R., irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, state, cultural, social and political life, is an infeasible law.

Any direct or indirect restriction of the rights of, or conversely, any establishment of direct or indirect privileges for, citizens on account of their race or nationality, as well as any advocacy of racial or national exclusiveness or hatred and contempt, is punishable by law

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্র সমান

মর্যাদা এবং অধিকার ভোগ করে। ইহাদের প্রত্যেক শাসনতন্ত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অমুখ্যায়ী গঠিত হইলেও সোভিয়েট-বাদের সহিত তাহাদের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রের সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এবং স্বাধীনভাবে স্বকীয় বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার আছে। কোন সাধারণতন্ত্রের সম্মতি ব্যতীত তাহার সীমান্তের পরিবর্তন বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলে না।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদ “দি সুপ্রীম সোভিয়েট অব দি ইউ. এস. এস. আর” দুইটি কক্ষে বিভক্ত। এই কক্ষ দুইটি ‘সোভিয়েট অব দি ইউনিয়ন’ এবং ‘সোভিয়েট অব ট্রান্সনালিটিক’ নামে অভিহিত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র (Union Republic), স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র (autonomous republic), স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন অঞ্চল (autonomous region) এবং কোন বিশেষ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল (national area) ‘সোভিয়েট অব দি ট্রান্সনালিটিক’এ যথাক্রমে ২৫, ১০, ৫ এবং ১ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী। আচারবাহিজানের অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ এবং উক্তদের অধিবাসী সংখ্যা ৩ কোটির উপর হইলেও ইহারা প্রত্যেকেই ‘সোভিয়েট অব দি ট্রান্সনালিটিক’এ পঁচিশ জন করিয়া সদস্য পাঠাইবার অধিকারী। ইহার ফলে এক দিকে যেমন ইহাদের পরস্পরের সহিত সমতা স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদে ইহাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

এই ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে। শোষণ শ্রেণীর অস্তিত্ব জাতি-বৈরের একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ। শোষণের ফলেই প্রধানতঃ জাতি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জলিয়া উঠে। সর্বপ্রকার দাসত্বের শত্রু এবং আন্তর্জাতিক ভাব-ধারণার বাহক স্বতন্ত্রজীবী শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসিবার ফলে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে পারস্পরিক সহায়তার নীতি গৃহীত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত জাতির সাধনায় সুষ্ট মানস-সম্পদের প্রচার এবং প্রসারের জন্ত সোভিয়েট ভূমির অধিবাসী প্রতিটি জাতির মনোজগতে বিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে মৈত্রী এবং শ্রীতির এক মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে একটি অভিনব ছবির রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। বিশ্বের দৃষ্টি আজ তাহারই দিকে নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে রহিয়াছে ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং হতত বা কতকটা শ্রদ্ধা।

আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

শ্রীমনোজমোহন রায়, এম-এ

বর্তমানে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাदिতে আলোচনা হচ্ছে। এ সময়ে এমন কয়েকটি কথা সাধারণের গোচরে আনতে চাই যা ধারা শহরে ও গ্রামে শিক্ষকতা করেন নি তাঁরা জানেন না। এ প্রবন্ধ যদি সামান্যতম উদ্বেগ সাধন করতে পারে তা হলে আমার লেখা সার্থক হবে। এতে শিক্ষালয়ের দোষগুলোই প্রদর্শিত হচ্ছে সত্য; কিন্তু আশাবাদী না হলে এ প্রবন্ধ লিখতে বসতাম না। কলিকাতা শহরে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আমি গ্রাম্যবিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করব এবং সাধারণ ভাবেই বক্তব্য বলব—কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে একথা কেউ না মনে করেন।

বিদ্যালয়-গৃহ

প্রথমেই ধরা যাক, বিদ্যালয়িকার আলয়টিকে। বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্ণমেন্ট যতই না ছাত্র প্রতি আট থেকে দশ বর্গফুট স্থানের নির্দেশ দিন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সংখ্যানির্দেশ করে বিভাগ বা 'সেকশন' করার ব্যবস্থা করুন, কার্যক্ষেত্রে আমরা যে সব ক্ষেত্রে পড়িয়ে থাকি তার অধিকাংশ অস্বাভাবিক। পল্লীগ্রামের পথে শীতকালে যাতায়াত অপেক্ষা কৃত সহজ বলে যে সব স্কুলে পরিদর্শক শুভ-পদার্পণ করেন তাঁরা শীতেই আসেন, স্ততরাং বর্ষায় ও গ্রীষ্মে ছাত্রেরা কি অসুবিধা ভোগ করে তা তাঁরা বুঝতে পারেন না, তা ছাড়া স্কুল-কর্তৃপক্ষ এক আধ দিনের জুড় বিশেষ ব্যবস্থা করে ক্রটি চাপা দিয়ে থাকেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোই সাধারণতঃ বৎসরে একবার পরিদর্শিত হয়। বর্তমানে যে সব বাড়ী তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যেও গলদ রয়েছে, পুরাতন বাড়ীগুলোর তো কথাই নেই। বাহ্যতঃ নতুন বাড়িগুলো সুদৃঢ় হলেও তার সকল কক্ষ ব্যবহার্য নয়—এমন ঘরেও ক্লাস নেওয়া হয় যেখানে হাওরা চলাচল দূরের কথা প্রয়োজনীয় আলোও প্রবেশ করেনা। আজকাল 'L' বা তৃতীয় বন্ধনীর আকারে যে বাড়িগুলো তৈরি হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোণের ঘরগুলো অব্যবহার্য, তবু তাতেই ক্লাস বসে। সেই সব ঘরে চার-পাঁচ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারেই না। ক্লাস ফাইভ বা ক্লাস সেভেনে সাধারণতঃ বেশী ছাত্র হয়—যথাক্রমে ৩০ ও ৪০-এর বেশী ছাত্র হলেই 'সেকশন' করা রীতি, কিন্তু সেজ্ঞ অতিরিক্ত এক বা দু'জন শিক্ষক দরকার অথচ ছাত্রসংখ্যা এত বেশী হয় না যাতে উপযুক্ত বেতন পাওয়া যায়—কাজেই কর্তৃপক্ষ 'সেকশনের' হাত এড়িয়ে যান—মাইনেতে স্তুবিধা পায় যারা তাদের নাম খাতায়

থাকে না কিংবা খাতায় ত্রিশ জন বা চল্লিশ জনের বেশী ছাত্রকে উপস্থিত করা হয় না। তার ফল এই হয় যে, ছোট ঘরে বেশী ছাত্রকে বসতে হয়। তার উপর বারান্দা যদি না থাকে, রোদ ও জল থেকে আশ্রয় করা করার জুড় ছাত্রেরা যদি জানালা বন্ধ রাখে—তা হলে স্বাস্থ্য ভাল থাকতেই পারে না। বর্ষায় স্যাংসেঁতে ঘরে, শীতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘরে, গ্রীষ্মে অতিরিক্ত গরমে ছাত্রদিগকে 'নাজেহাল' হতে হয়। এমন খুব কম স্কুলই আছে যার বেশীর ভাগ ঘর আলো-হাওয়াযুক্ত, আর গ্রামে পচা ডোবার দুর্গন্ধ এড়িয়ে স্কুলগৃহ বিদ্যমান এ দৃশ্যও কচিং দেখা যায়। এর উপর বহু স্কুলে নিয়মিত ষাঁট পড়ে না—ইনস্পেক্টর যে যে স্থানের স্কুল পরিদর্শন করেন সেই সেই স্থানে তবু বৎসরে একবার সারা স্কুলটী পরিকার করা হয়, অন্যত্র তাও নয়। এক স্কুলে গিয়ে প্রত্যহ ষাঁট দেবার কথা বলায় চাকর বললে, "অত কম মাইনেতে এত কাজ করা যায় না—সকাল বিকেল ও ছুটির দিনে না। ষাঁটলে খাব কি? মাঝে মাঝে ষাঁট দিই—নইলে ছেলেরা ত সব সময়ে থাকে—ষাঁট দেব কখন" ইত্যাদি। স্কুলগৃহে পানীয় জলের ব্যবস্থার অভাবেও ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হয়—গ্রামে টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে বটে, কিন্তু নলকূপটি একবার খারাপ হলে মুশকিল—গাফিলতি, আলস্য, ইত্যাদি নানা কারণে—অপেক্ষ জল পান করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়—তারা রোগে ভোগে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ

স্কুল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা হেতু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখা-লেখি হয়ে থাকে—আর্বিট্রেশন বোর্ডের কার্যতালিকা দেখলেই তা সহজে বোঝা যায়। শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার গর্ব—অশিক্ষিত বা অধঃশিক্ষিত ধনী ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর হয়ে কর্তৃত্ব করতে এলেই সংঘাত বাধে। গরীব শিক্ষক অর্থগৌরবের প্রাধান্যের উপরে তাঁর বিদ্যাগৌরবের স্থান দিতে ব্যগ্র—ধনী "অধরিটি" টাকার জোরে কর্তৃত্ব করতে চান। অনেক ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশন মাত্র পাস কেউ কেউ প্রধান শিক্ষকদের বাজে সমালোচনা করেন। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাবটাই হুঃখের কারণ হয়। ধনীর ধনের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের ভোলা উচিত নয় এবং বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য সহায়ত্বত্বাঙ্গীল হওয়া, বিদ্যার প্রকৃত সম্মান দেওয়া, সকলের উচিত।

শিক্ষক

শিক্ষক সম্বন্ধে লিখতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রধান শিক্ষকের

সঙ্গে বহুক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকদের বনিবনাও হয় না। প্রধান শিক্ষক অসুস্থ দিক উপেক্ষা করে কেবলমাত্র তাঁর পদগৌরব বজায় রাখবার দিকেই দৃষ্টি রাখেন, তাতে মোটেই ফল পাওয়া যায় না। গ্রামের স্কুলে প্রধান শিক্ষককে খুব বেশী খাটতে হয়। সাধারণতঃ ৮টা ক্লাসে ১০ জন শিক্ষক—তাঁরই মধ্যে একজন কেরানী। কেরানীর কাজ বন্ধ না রাখলে অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে বর্তমানে প্রায় সমান খাটতে হয়। এতগুলো বিষয় পড়াতে হবে— একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তৎকথাই নেই, না থাকলেও প্রধান-শিক্ষককে সাত 'পিরিয়ড'র মধ্যে পাঁচ পিরিয়ড খাটতেই হবে। শহরের স্কুলে বা যেখানে ছাত্র-সংখ্যা বেশী থাকায় আটটা ক্লাসের জায়গায় সেকশন করে দশ-বারোটা হয়েছে—সেখানেই প্রধান শিক্ষক বেশী অবসর পান, নইলে আটটা ক্লাসের দশ জন শিক্ষকের স্কুলে তিনি না খাটলে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়—সহকারী শিক্ষকদের তা চক্ষুশূল হয়। একে বর্তমান বাজারে আর্থিক তারতম্যে সহজেই সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার হয়—তার উপর যদি প্রধান শিক্ষক পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হন তা হলে নিরতিশয় অসুস্থ হয়। বড় বড় স্কুলের দৃষ্টান্ত দেখে পল্লীর সাধারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা অবস্থা জটিল করে তোলেন। সহকর্মীদের প্রতি দরদের অভাব—কর্তৃপক্ষদের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা না করা—অসৌজন্য প্রকাশ পূর্বক নির্দেশ দেওয়া বা আজ্ঞা করা, ঘেঁষা-চারিতা ইত্যাদি নানা কারণে প্রধান শিক্ষক অসুস্থ শিক্ষকের অপ্রিয় হয়ে থাকেন। এতে করে দলাদলির উৎপত্তিও হয়ে থাকে। মতান্তরকে মেনে নিতে আমরা পারি না, মন কষাকষি এসে যায়। শিক্ষায়তনে শিক্ষাত্রতীদের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপার যে, কিরূপ অশোভন ও দুঃখজনক তা বলে শেষ করা যায় না। এ ছাড়া শিক্ষার মান ধারাপ হওয়ার জুহু শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষায়ও গলদ প্রচুর থাকে। একজন এজুয়েট শিক্ষক ছুটি চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছেন তাতেও ভাষা ও ব্যাকরণ ঘটিত মারাত্মক ভুল। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই মুণ্ডিমের। শিক্ষাত্রতী মাত্রকেই মনে রাখতে হবে যে, যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসমীচীন। পল্লীগ্রামের স্কুলের ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষকগণ প্রায়ই স্থানীয় লোক হন। ইউনিভার্সিটিতে ন্যূনপক্ষে ২৫ টাকা বেতন নির্ধারিত হলেও ১৯৪২ সালেও কোনো কোনো ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক ১০ টাকা মাইনেতে মাষ্টারী করেছেন, এমনও ১৮২০ টাকা বেতনে চাকরি করছেন। এটা বাড়িয়ে বলা নয়—এ হচ্ছে নিষ্ঠুর সত্য। পঞ্চাশের মরত্তরেও মাগুি ভাতা বাবদ কিছু নিয়ে এঁদের একাধারী থাকতে হ'ত। কোন রকমে সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্র পড়িয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা

করতেন। এ বাজারেও সাধারণতঃ এজুয়েট শিক্ষককে ৪০/৪৫ টাকার বেশী দেওয়া হয় না। এই স্বল্প-বেতনভোগীদের দ্বারা শিক্ষকতা কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহিত হতে পারে না। যোগ্য ব্যক্তি এত কম মাইনেতে মাষ্টারী করতে চান না, নিতান্ত আর কিছু না পেলেই তবে শিক্ষকতা অবলম্বন করেন, কাজেই স্থানীয় লোক দিয়ে কাজ চালানোর দিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেন তাতে খরচ কম হয় এবং শিক্ষকদের উপর জোর চলে। এই সব ব্যাপারে সকলে সজাগ না হলে শিক্ষকদের বাঁচোয়া নেই। একেই ত বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে গলদের অন্ত নেই—কম করে ন'দশ বছরের পরিশ্রমের ফলেও শতকরা নব্বই জন ছেলে কি বাংলা কি ইংরেজীতে শুদ্ধ করে একখানা পত্র পর্যন্ত লিখতে পারে না—অ আ ক খ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও এ বি সি ডি শেখে। বিদেশী ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম কিন্তু মাতৃভাষাতেও তাদের যে কি শোচনীয় অজ্ঞতা তা পরীক্ষার খাতাগুলো দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শহরের কয়েকজন ছাত্রকে দেখে বা গ্রামাঞ্চলের বিশেষ মেধাবী ছাত্রকে দেখে অনেকের ভুল ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু যারা মাষ্টারী করেন বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরীক্ষক তাঁরা আসল কথা জানেন। প্রায় অর্ধ লক্ষ ছাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হয়েছিল, এর মধ্যে ছ'তিন হাজারকে কোন রকমে ভাল বলে চালানো যায়। পত্রীতে পড়ার আবহাওয়া নেই বললেই হয়, ছাত্রেরা নামমাত্র স্কুলে আসে। পরীক্ষার সময়ই বা একটু পড়ার বৌক দেখা যায়। বহু ছাত্র উত্তরাধিকারস্বত্রে কিছু পায় না—বেশীর ভাগ ছাত্রেরই কোন লক্ষ্য নেই—কোনরকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করাই তাদের কাম্য। নানা রকম বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে শিক্ষকদের লড়াই করতে হয় সত্য, তবু এমন অবস্থার মধ্যেও ছাত্রদের যেটুকু শিক্ষা হতে পারত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাও হয় না। বাড়ীতে ছাত্রদের যত্ন নেবার ব্যবস্থা না থাকলে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ কাজ হবে না। শহরে বহু ছাত্রের গৃহশিক্ষক-থাকে—গ্রামে ঠিক তার উল্টো অবস্থা। গ্রামে শিক্ষকদের কাছে যে সব ছাত্র বাড়ীতে পড়ে, তাতে বিশেষ কিছু শিক্ষা হয় না; কারণ সেখানেও পাঠশালা বসে যায়। মাইনে কম দেয় বলে শিক্ষককে অনেকগুলি ছাত্রকে একত্রে পড়াতে হয় আর স্কুলের শিক্ষক ছাড়া গ্রামে অল্প গৃহশিক্ষকও পাওয়া যায় না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের কোর্স দু-বছরে শেষ করতে হলে তাড়াহড়ো করতেই হয়। ইংরেজীর কথাই ধরি: ৭টা গভ্যৎশ, ১৯টা পত্র, দুটো দ্রুত পঠনের বই, একটা পুরো নভেল জাতীয় বই, একবার করে রিডিং পড়তেই ক্লাসে দুটো বছর কেটে যায়—ভাল করে পড়াতে গেলে কি হয় ভুক্তভোগীরাই বোঝেন। শিক্ষকদের অক্ষমতাই যেমন শুধু নয়, শিক্ষকতার নানা অসুবিধাও তেমনই লক্ষণীয়।

শিক্ষককে তার শ্রমের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা যত দিন না দেওয়া হবে, “শিক্ষকতা করি” একথা বলতে মন হতে সন্তোষের ভাব যত দিন না দূরীভূত হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা যত দিন যথোপযুক্তভাবে পরিবর্তিত না হবে, তত দিন এরকম অবস্থা চলতে বাধ্য। শিক্ষকেরও সংসার আছে—২০১২৫৭ টাকায় সংসার চলে না এবং নীচের ক্লাসে পড়াতে হয় বলে ম্যাট্রিকুলেশন পাসই যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। ট্রেন্ড গ্রাজুয়েটদের দরকার ঐ নীচের ক্লাসেই। বিশেষ ধৈর্য, বুঝাবার বিশেষ দক্ষতা, শিশুমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ইত্যাদি থাকলেই তবে নীচের ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া যায়। “ম্যাট্রিক-টচার” রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না এবং একজন লোকের ছুবেলা পেট পুরে খাবার খরচও যদি শিক্ষক না পান তা হলে পড়ানো যে খারাপ হবেই তা বলা বাহুল্য।

পাঠ্য পুস্তক

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন এক বিরাট সমস্যা। উপরের দু-ক্লাসের বই বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করে দেন—সে বিষয়ে অনেক কিছু বলবার থাকলেও সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক নিশ্চিত থাকেন। নীচের ক্লাস নিয়েই যত গুণগোল। পদ্মীর অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রায় একই থাকে। ছাত্রের অভিভাবক-গণ বই কিনে দিতে অপারগ। পুরাতন বই চেয়ে নিয়ে বা কম দামে কিনে দেবেন ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে কমিটি নির্দেশ দেন নতুন বই পাঠ্যকালিকাত্তর করার প্রয়োজন নেই। প্রথম সংস্করণের বই ও তৃতীয় সংস্করণের বইয়ে অনেক সময় এত তফাৎ দেখা যায় যে ছ’রকম বই বললেই হয়—শিক্ষকদের পক্ষে পড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকাশকেরা দমা করে যে বই পাঠান তা ছাড়া বই আমরা পাই না—নামকরা বইয়ের জন্ত লিখে পাঠালেও পাওয়া যায় না। অধিকাংশ স্কুলে পাঠ্যপুস্তক কিনবারও সামর্থ্য নেই, লাইব্রেরির জন্তে বই কেনা ত দূরের কথা। ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত বই কেনাই অনেক সময় ছফর হয়ে ওঠে। গত চার বছর ত কাগজের ছড়িফের জন্ত স্কুলে বই পাঠানো বন্ধ আছে বললেই হয়। কাজেই হাতের কাছে আমরা যে, বই পাই তাই চালাতে হয়। বিমিত হতে হয় ভেবে যে, যিনি “গৌরীশঙ্কর” ও “এভারেস্ট” অভিন্ন মনে করেন তিনি কোন্‌ ছুঃসাহসে ভুগোল লিখতে বসেন এবং শিক্ষা-বিভাগই বা তার অনুমোদন করেন কেমন করে। ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ভুলের কথা না বলাই ভাল। স্কুলে প্রচলিত বাংলা বইগুলোর লেখাগুলো সুনর্বাচিত নয়।

স্কুলের আয়

ছ-এক ক্ষেত্রে স্কুলকে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে শোনা যায় বটে কিন্তু মিশনরি, গবর্ণমেন্ট, ও কলিকাতার কয়েকটি স্কুল ছাড়া অধিকাংশ স্কুলই কমিটির মেম্বরের চাঁদা

বা সাধারণের দানের উপর নির্ভর করে থাকে। ছাত্র-দত্ত বেতনে সব খরচ কুলায় না। কমপক্ষে দেড়শ জন ছাত্র থাকলে একটা হাই স্কুল করা যায় কিন্তু ঐ দেড়শ জন ছাত্রের মাইনের উপর নির্ভর করলে যুদ্ধপূর্ব যুগে মফস্বলের স্কুলে সাধারণতঃ শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হ’ত তার বেশী দেওয়া যেতে পারে না। প্রধান শিক্ষককে ৫০ টাকা ও সর্বনিম্ন শিক্ষকদের বেতন দশ টাকা—কথাটা মোটেই কাল্পনিক নয়। কমপক্ষে যে বেতন তা লিখে ঐ রকম বেতন নিতে হয়, কোথাও বা বাকি টাকা যেন স্কুলকে শিক্ষকগণ দান করছেন এই রকম লিখিয়ে নেওয়া হয়। ছাত্রদের অনেকে কম বেতনে পড়ে—বেতন না কমালে পড়া ছেড়ে দেবে কি না, অল্প বিদ্যালয়ে যাবে কি না ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে মাইনের ব্যবস্থা করতে হয়—অবস্থাপন্ন লোকেরাও ছেলেদের মাইনে কমাবার জন্ত দরখাস্ত করে, কম মাইনেতে পড়তে পাওয়া যে আগৌরবের সে ধারণাই নেই। বরং বলে থাকে, অধিকাংশ গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুলে মাইনে এক রকম আদায় করা হয়—সদর খাতায় অল্প রকম দেখানো হয়। ইন্সপেক্টর আসার দিন কয়েক জনকে আসতে বারণ করা হয়। অর্থাভাবে অধিকাংশ স্কুলে রিজার্ভ ফণ্ড, ভাল লাইব্রেরি নেই, প্রভিডেণ্ড ফণ্ড যা আছে তারও অনেক কিছু ভুয়ো।

পাঠ্য ও পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়

গ্রামে বহু ছাত্রকে ছ’তিন মাইল, কখনও কখনও পাঁচ-ছয় মাইল প্রত্যহ যাতায়াত করতে হয়, গ্রীষ্মে বর্ষায় তাদের কষ্ট বর্ণনাতীত। তার উপর সুনর্বাচিত পাঠ্য পুস্তকের অভাবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক ও পড়ার পরিবেশের অভাবে মফস্বলের স্কুলের ছাত্রদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। দেড়শ’ থেকে দুশ’ জন ছাত্রের স্কুলে আট দশ জন মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তন্মধ্যে ছ’এক জন ছাত্র মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করতে যায়, বাকি ছাত্রদের শিক্ষার সমাপ্তি এখানেই, সেই শিক্ষা যদি প্রকৃত শিক্ষা হ’ত খেদ থাকত না। কিন্তু খুব কম ছাত্রই প্রকৃত শিক্ষা পায়। কাজেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া পণ্ডিত্রম্ ছাড়া আর কি। পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়েও শুভলক্ষণ দেখা যায় না। অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য খারাপ। উপযুক্ত আলোহাওয়া খেলে এমন ধর না থাকায় সুপেয় জলের অভাবে, টিফিনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন চেষ্টা না থাকায় ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। স্কুলে নামমাত্র ড্রিল হয়, গ্রীষ্ম বর্ষায় ড্রিল প্রায়ই বাদ যায়, যখন সকালে স্কুল বসে তখন সমর্যভাবের অজু-হাতে ড্রিল বন্ধ থাকে, শীতের দিকে যা হয় সেও নীচের চার শ্রেণীতে, তাও সপ্তাহে মাত্র দু’পিরিয়ড, কাজেই ড্রিলের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যলাভের আশা করা যায় না। ব্রতচারী, স্কাউট-সিস্টেম, ম্যাট্রিকুলেশন ট্রেনিং ক্লাস প্রভৃতি যে কয়টির ব্যবস্থা অতি

অল্পসংখ্যক স্কুলে আছে, সেখানে কিছু হয়, নইলে অল্প কিছু হয় না। একটি মাত্র ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে ও ছাত্রদের শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়, তা ফুটবল খেলা। এামের ছেলেরা ভ্রমণ, পুতুরে সাঁতার কাটা, ইত্যাদি দ্বারা কোন রকমে স্বাস্থ্য বজায় রাখে। যে সব স্কুলে স্পোর্টস্‌ হয় তার সংখ্যাও অল্প আর স্পোর্টস্‌ দু'চার দিনের ব্যাপার মাত্র। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি আমরা উদাসীন, বরং একথা বলাই সম্ভব যে, সেদিকে কোন ব্যবস্থা না করে পাঠ্য পুস্তকের ভার চাপিয়ে তাদের স্বাস্থ্যহানির হেতু হয়ে দাঁড়াচ্ছি আমরা। কোন আমোদ-প্রমোদেরও বড় একটা ব্যবস্থা নেই। পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে (তাও সকল স্কুলে ব্যবস্থা নেই) আবৃত্তি অভিনয় আমরা করিয়ে থাকি—সে এত কম সময়ের মধ্যে যে তা না বলাই ভাল। কোথাও বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেই—হাতে লেখা পত্রিকা, বিতর্ক সভা ইত্যাদির

পরমায়ু অতি অল্প। যে শিক্ষকের উৎসাহে এগুলো আরম্ভ হয় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এ সময়ের পেছনে তিনি ছাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই, কাজেই সে সবার অকাল মৃত্যুই হয়ে থাকে। আমাদের ছাত্রেরা কি হতে পারে, কি কি পছন্দ খোলা রয়েছে তাই তারা জানে না। মন্তেসরি, ক্রম্বেল্‌স্‌, পেস্তালৎসি প্রভৃতির ধরণে পঠন-পাঠন কোন দিন প্রবর্তিত হতে পারে আমাদের দেশে এ যেন স্বপ্ন মনে হয়। খেলাধুলার মধ্যে, আমোদ-আহ্লাদের আবহাওয়ায়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে প্রাণের আনন্দে শিক্ষা সে শিক্ষার ব্যবস্থা কি হবে না? শহরে অভিজাত সমাজে, যেটা একটু আধটু চলতে আরম্ভ করেছে, তা কত দিনে গ্রামে গ্রামে পৌঁছবে?

এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান অবস্থার ইঙ্গিত দিলাম মাত্র। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যাপার পরিচালনা করবেন যারা তাঁরা যেন এ সব দিকে লক্ষ্য রাখেন এই কামনা।

গ্রীষ্মমণ্ডলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটি দিক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিষুব রেখার উত্তর পার্শ্বের দেশগুলি লইয়া গ্রীষ্মমণ্ডল। আঙ্গ পর্যন্ত এই মণ্ডলের অধিবাসিগণই সর্বপ্রকারে বেশী লুণ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির দান যেমন অসুরন্ত লোকেরাও সেই অনুপাতে অলস ও উদ্যমহীন। ইউরোপের জাতিগুলি এই মণ্ডলের ভূভাগগুলি (আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অবস্থিত) নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে, প্রকৃতির সম্পদ বেপরোয়া লুণ্ঠন করিতেছে ও দেশের আদিম লোকদিগকে নির্দয়ভাবে খাটাইয়া ও অত্যাচার করিয়া মৃত্যুর ও ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

রবার

গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৎসরে ৬০ হইতে ২০০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে খন বৃক্ষরাজি ও লতা-গুল্ম ঠেলিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। বৎসরের বারো মাসই এই সকল দেশ গরম থাকে এবং ইহাদের আবহাওয়া ষ্ট্রাংসেতে। এই সকল দেশে বছরকন্মের গাছ জন্মিয়া থাকে এবং প্রায় ১০০ রকম গাছ হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় যাহা হইতে রবার প্রস্তুত করা চলে। অবশ্য রবার সংগ্রহের জন্ত বিভিন্ন ব্রেসেলিমেসিস্‌ নামক বৃক্ষের বৃক্ষের নিয়ন্ত রসই সংগৃহীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার আমেজন নদীর জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণ ছিল এবং এইস্থানেই সর্বপ্রথমে বেপরোয়া ভাবে রবার সংগ্রহ ও আদিম লোকের উপর অত্যাচার শুরু হয়। রবার দ্রব্যটি বহুকাল হইতে জানা থাকিলেও বাইসাইকেল ও আরও পরে মোটর গাড়ী

আবিষ্কারের পর হইতেই ভয়ানকভাবে ইহার চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে।

আমেজন নদীর এক করদ-নদী পুটুমেও নদীর অববাহিকায় এই রবার সংগ্রহ গোড়ায় শুরু হয়। একদল কলম্বিয়ার ঔপনিবেশিক ইণ্ডিয়ান দ্বারা এই কার্য আরম্ভ করে। নানারূপে অত্যাচার করিয়া ইণ্ডিয়ানদিগকে এই রবার সংগ্রহে বাধ্য করা হইত। এবং কোন ইণ্ডিয়ানই এই কার্য হইতে রেহাই পাইত না। ইণ্ডিয়ানগণও এই অত্যাচারের ফলে বেপরোয়া ভাবে রবার সংগ্রহ করিত। রস বাহির করিবার জন্ত গাছের ছাল কাটয়া, ডাল এমন কি গাছ পর্যন্ত কাটয়া ফেলিত। কিন্তু ইহাতেও পুঁজিপতিরা খুসি ছিল না। আরও লাভের জন্ত গভীরতর বনে ইণ্ডিয়ানগণকে জোর করিয়া পাঠান হইত। ইহাতে লাভ বাড়িল বটে, কিন্তু বলিভিয়া ও পেরুর জঙ্গলের বহু রক্তাঙ্ক বহুলাংশে নির্মূল হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ানগণের সংখ্যাও অল্পে ৫০,০০০ হাজার হইতে কমিয়া ১০,০০০ দাঁড়াইল।

ব্রেজিল অঞ্চলের রবার সংগ্রহের রীতি একটু অভূত ধরণের ছিল। প্রথমে ইণ্ডিয়ানগণকে রবার সংগ্রহের যন্ত্রাদি ও খাদ্য দ্বারা দেওয়া হইত। দ্রব্যাদি যখন যাহা দরকার তাহাও কোম্পানীর নিকট হইতে লইতে হইত। রবার সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে এই সকলের মূল্য কাটয়া লওয়া হইত। ফল এই হইত যে তাহাদের দেনা কখনও পরিশোধ হইত না। পলায়নের পন্থা ছিল একমাত্র কোম্পানীর প্রীমার, স্তরায় সে

দিকও বন্ধ। এইরূপে জঙ্গল ও কোম্পানীর দাসত্বে তাহাদের জীবনের অবসান হইত। ব্রেজিল অঞ্চলের রবার এখন আর মালয়ে উৎপন্ন রবারের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতেছে না। বেপারোয়া ধ্বংসের উপর যে উৎপাদনের ভিত্তি ছিল তাহা ধ্বংসিয়া গিয়াছে। পুঁজিপতিরা এখন জঙ্গলের অগাছ দ্রব্যাদি বিশেষভাবে ব্রেজিলদেশীয় বাদাম সংগ্রহে মন দিয়াছে। ব্যক্তিগত অফ ব্রেজিল চেষ্টা করিয়াও আর রবার ব্যবসা বাঁচাইতে পারিতেছে না। দাম ও উৎপন্ন রবারের পরিমাণ অসম্ভব রকম হ্রাস পাইতেছে।

আফ্রিকা মহাদেশে রবার উৎপাদনের কাহিনীও কম করুণ নহে। মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অধিত্যকায় যে ধ্বংসের লীলা চলিতেছে তাহা রুশিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের মত একটা বিরাট দেশব্যাপী। এখানেও বহু রবারবৃক্ষ ও কয়েক প্রকার লতা হইতে রবার সংগৃহীত হয়।

এখানে বেলজিয়মবাসিগণ নানা অমামূল্যিক অত্যাচার দ্বারা নিগ্রোদিগকে জঙ্গল হইতে রবার সংগ্রহে বাধ্য করে। প্রাণের দায়ে নিগ্রোশ্রমিকেরা গাছ ও লতা কাটিয়া অর্থাৎ জঙ্গল নির্মূল করিয়া রবার-রস সংগ্রহ করে। আরও অদ্ভুত যে নিগ্রোগণকে তাহাদের দেশের একমাত্র ব্যবসা রবার ও হস্তিদন্তের কারবার করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি তাহাদিগকে চাষ-বাস করিতেও দেওয়া হয় না কারণ তাহা হইলে শ্রমিক মেলে না। ফলে সে দেশের গ্রাম ও কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত প্রায় ত্রিশ বৎসরের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসংখ্যা দুই কোটি কমিয়া ৮৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই ধ্বংসের ভিত্তির উপরেই প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কঙ্গো উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং কোম্পানীর অংশীদারগণ লাভে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

কঙ্গো ও আমেজুন অঞ্চলে যে উপায়ে রবার উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা কখনও ব্যবসা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাই আজ উভয় স্থানেই রবার উৎপাদন প্রতিযোগিতার মুখে অসম্ভব রকম কমিয়া গিয়াছে।

এখন রবারবৃক্ষের চাষের বিষয় দেখা যাউক। চাষের প্রশস্ত ক্ষেত্র উষ্ণমণ্ডলে স্থাপিত। মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা ও বোর্নিও প্রভৃতি স্থান রবার চাষের উত্তম স্থান। ব্রেজিল হইতে রবার বীজ আনাইয়া লণ্ডনের কিউ উদ্যানে বৃক্ষ জন্মান হয়। পরে সেই বৃক্ষের বীজ মালয় অঞ্চলে পরীক্ষার জন্ত আনিয়া সফল পাওয়া যায়। দেখা গেল ব্রেজিল অপেক্ষা মালয় দেশ রবার চাষের পক্ষে উপযুক্ত ও লাভজনক। ১৯১০ সনে এখানে ১১,০০০ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐ বৎসর জঙলা রবারের পরিমাণ ছিল ৮৩,০০০ টন। ১৯১৪ সনে জঙলা রবারের উৎপাদন আরও অনেক কমিয়া গেল এবং চাষের রবারের পরিমাণ উহা ছাড়াইয়া ৭০,০০০ টনে পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর রবার সরবরাহের দশ ভাগের

নয় ভাগ আসে চাষের রবার হইতে। এই উৎপাদনে প্রথম স্থান লইয়াছে ব্রিটেন অধিকৃত মালয় দেশ ও দ্বিতীয় স্থান ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপগুলি।

জঙ্গলে যে ভাবে রবার সংগ্রহ হয় চাষের রবার অবশ্য সে ভাবে সংগ্রহ হয় না, এক্ষণে অপচয় অনেক কম হয়। এখানে কার্য অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ভাবে হয়। এখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরবর্তী স্তরের দোষণগুলি লক্ষ্য করা যায় যথা—বেপারোয়া প্রতিযোগিতা, অতিরিক্ত উৎপাদন এবং মূল্যের অত্যধিক উত্থান-পতন।

যখন দেখা গেল রবার চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তখন ইংরেজের মূলধন মালয় দেশে ও ওলন্দাজের মূলধন ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বর্ধিত হইল। হাজার হাজার তামিল শ্রমিককে দক্ষিণ-ভারত হইতে ও জাভাবাসিকে এই সকল রবার চাষের জন্ত নেওয়া হইল। একদল চীনাও আসিয়া রবার চাষের কাজ শুরু করিয়া দিল; আবার দেশীয় লোকের ছোট ছোট রবারের বাগান তৈরি হইল। এই সকল বাগানে গাছ-গুলি ঘন ঘন রোপিত হইয়া থাকে এবং এই গাছ হইতে রবারও বেশী সংগৃহীত হয়। চীনা ও দেশীয় লোকের বাগানগুলি ইউরোপীয়েরা ক্রীতির চোখে দেখে নাই।

রবারের দাম ভয়ানক ভাবে চারি বৎসর চড়িয়া থাকায় ১৯১৪ সন নাগাদ ইংরেজ, ওলন্দাজ, চীনা ও দেশীয় রবার উৎপাদক বিশ লক্ষ একর জমিতে নূতন রবার গাছ পুঁতিল। ইহার ছয়-সাত বৎসর পরে এই সকল গাছ হইতে রবার উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে দেখা গেল উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা মোটেই বাড়ি নাই, ফলে সর্বাপেক্ষা চড়া দামের ১/৫ অংশে দাম কমিয়া আসিল। ইংরেজেরা উৎপাদন কমাতে চাহিল। কিন্তু ওলন্দাজেরা তাহাতে রাজী হইল না।

ইংরেজের চেষ্টার ফল হইল। দাম বাড়িলে উৎপাদন বাড়ান হইত এবং দাম কমিলে গাছ হইতে অল্প রবার সংগৃহীত হইত। কিছুকাল ভালই চলিল। ১৯২৬ সনে রবারের বাজার এতই ভাল হইল যে রবারের ব্যবসা মালয়ের অন্য সকল ব্যবসা ছাপাইয়া উঠিল। উৎপাদন নিয়ন্ত্রীকরণ এলাকার বাহিরে বোর্নিয়ো ও সুমাত্রার বহু দেশীয় উৎপাদক বেশ কিছু লাভ করিল এবং নূতন নূতন বৃক্ষ চাষ করিয়া যখন আবার বেশী মুনাফা পাইবে আশা করিয়াছিল তখন অপ্রত্যাশিতভাবে দাম কমিয়া গেল।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারেও ওলন্দাজেরা ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিল না। ১৯২৮ সনে ইংরেজেরা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিল। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাহার দাম এক শত টাকা ছিল তাহার দাম এক টাকায় নামিয়া আসিল। অনেক চেষ্টার পর ১৯৩৪ সনে ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয় গবর্ণমেন্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রীকরণে রাজী হইল এবং দেশী উৎপাদকগণের উপর রপ্তানী কর বসাইয়া রবারের দাম বাড়াইতে সক্ষম হইল।

এইরূপ বেপরোয়া রবার উৎপাদনের ফল হইল অপচয়। লাভের আশায় উৎপাদন এত বাড়িয়া যায় যে মূল্যের পতন অনিবার্য হয়, কারণ উৎপন্ন রবারের এক-চতুর্থাংশের বেশী চাহিদা তখন থাকে না। কাজে কাজেই এই উৎপাদন অনর্থক হইয়া পড়ে।

ইহার ফল ইউরোপীয়, চীনা ও সুমাত্রার উৎপাদনকারীগণের পক্ষে যেমন অশুভ, তামিল ও জাভার শ্রমিকগণের পক্ষে ততোধিক মর্মান্তিক। শ্রমিক সংখ্যা ১৯১০ ও ১৯২০ সনের মধ্যে ৭,০০,০০০ হইতে ৩৩,৫৮,০০০তে বাড়িয়া যায়। যখন মন্দা পড়িল নতুন শ্রমিক আনা বন্ধ হইল, এবং দুই বৎসর পর্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিল। ১৯২৬ হইতে আবার তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। আরও চারি বৎসরে সংখ্যা প্রায় ৫০,০০,০০০-এর কাছাকাছি হইল। ১৯৩২ সনের মন্দা দেখা দিলে হাজার হাজার তামিল ভারতে ফিরিয়া গেল।

রবারের দামের উঠানামার সহিত এই বিদেশী চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের মাথায় আসা-যাওয়ার যে কি মর্মান্তিক সম্বন্ধ তাহা বুঝা খুব শক্ত নহে।

বর্তমানে বিগত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ মাথায় ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা চরম দুর্দশায় পৌঁছিয়াছে। সাম্প্রতিক খবরে জানা যায় যে সমস্ত দিনের মজুরীতে একজন শ্রমিকের দুই পেয়লা চায়ের মূল্য মাত্র হইয়া থাকে। ভারত-গবর্ণমেন্টের এজেন্ট-জেনারেল কার্যতঃ শ্রমিকগণের বিশেষ কিছুই করিতে পারেন না, কারণ রবার-বাগানের মালিকগণের স্বার্থের প্রতি-কূলে যাওয়া তাহার সাধ্যাতীত। যত দিন না উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তিত হইতেছে, তত দিন শ্রমিকগণের অবস্থার পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাঁচা মালের মত তাহাদের শ্রমমূল্য ও চাহিদা মিটাইবার অনিশ্চিত টানাটানির মধ্যে দৌল্লামান থাকিবে।

ইক্ষু

গ্রীষ্মমণ্ডলে আর একটি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হয় ইক্ষু হইতে। আমেরিকার কিউবা দ্বীপ ইক্ষু উৎপাদনে বহুদিন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহার নীচেই জাভার স্থান। ইহার পর নাম করিতে হয় পোর্টোরিকো, ফিলিপিন ও হাওয়াই দ্বীপের। ভারতবর্ষের উৎপাদন পরিমাণ প্রচুর হইলেও বিদেশী বাণিজ্যে ইহার স্থান নাই।

দুইটি ভৌগোলিক কারণে কিউবা ইক্ষুচাষের জন্ম বিখ্যাত হইয়াছে, যথা, জমির উর্বরতা ও অল্পকাল আবহাওয়া। ইহা ছাড়া চিনির প্রধান খরিদার গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিকট বলিয়া কিউবা চিনি যোগানদারের প্রকৃষ্ট স্থান। যে হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত খুব বৃষ্টির সময় ইক্ষু গাছ বাড়িতে থাকে এবং যখন বৃষ্টি কমিয়া যায় তখন কাটিবার সময় আসে। এই সকল দেশে বার মাসই গ্রীষ্মকাল এবং কখনও কুয়াসা

দেখা যায় না। ইক্ষুর গাছ কাটিয়া লওয়া হয় কিন্তু মূলে হাত দেওয়া হয় না। মূল হইতে পুনরায় গাছ গজায়। এইরূপে একই মূল হইতে দশ-বার বৎসর পর্যন্ত ইক্ষু গাছ জন্মিয়া থাকে।

ইক্ষুর চাষ ও চিনি প্রস্তুত কিউবার অধিবাসিগণের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলা চলে। কিন্তু ধনতন্ত্রের নির্ধর্ম উৎপাদন-ব্যবস্থা কিউবা ও জাভা উভয় স্থানে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থনৈতিক শোষণই অবশ্য এই সকল দুর্দশার কারণ।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ইউরোপের বীট চিনির ব্যবসায় একেবারে বিপর্যস্ত হয়। কারণ বীট চিনির উৎপাদনক্ষেত্র জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় কিউবার ইক্ষু-চিনির ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত লাভ করে। যুদ্ধ শেষ হইলে ইউরোপের দেশে দেশে আরার বীটের চাষ আরম্ভ হয় যদিও ইহার চাষের ধরন ও চিনি উৎপাদন ব্যয় ছিল খুব বেশী। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেন্ট পুঁজিপতিগণকে অর্থ সাহায্যদ্বারা ও শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া সাহায্য করিল। জনসাধারণকে সন্তায় ইক্ষু চিনি ব্যবহার করিতে বাধ্য জম্মাইল। ফলে ইউরোপে লোকে চড়া দামে চিনি কিনিতে বাধ্য হইল এবং কিউবার চিনির ব্যবসায় ও ইক্ষু চাষে মন্দা দেখা দিল। কিউবার চিনির দাম যুদ্ধ সময়ের পূর্বে মূল্যের এক-পঞ্চমাংশে নামিয়া আসিল। ইহাতেও লাভ হইতেছিল, স্তত্রাং পুঁজিপতিরা কিউবার ইক্ষুর চাষ আরও বাড়াইতে লাগিল। ১৯২৫ সনে ইউরোপে বীটের চাষ ভাল হইয়াছিল স্তত্রাং কিউবার চিনির চাহিদা কমিয়া গেল। পুরাতন মজুত ও নতুন চিনির সরবরাহ মিলিয়া বাজারে এত চিনি জমিল যে বিক্রয় করা শক্ত হইল। দাম কমিয়া এক-চতুর্থাংশ হইল। প্রকৃতির দমায় দুর্দশা আরও বাড়িল, কারণ ১৯২৯ সনের ভাল আবহাওয়ার জন্ম ইক্ষুর ফসল খুব ভালই হইয়াছিল। উৎপাদন কমাইয়া দাম বাড়াইবার চেষ্টা করা হইল। প্রথমতঃ কিউবা পরে কিউবা ও জাভা উভয়ে মিলিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেও স্কুলের আশা রহিল না কারণ চিনির খরিদার গ্রেট ব্রিটেন (ব্রিটিশ সাম্রাজ্য) ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় চিনি উৎপাদন করিতেছিল। জাভা ও কিউবার উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ কমান হইল। বাড়তি চিনি দাঁড়াইয়াছিল ৭০,০০,০০০ লক্ষ টন, চারি বৎসরে পাঁচ ভাগের চারি ভাগ কমান হইল।

প্রত্যেক দেশ বেশী দাম দিয়া নিজের এলাকার চিনি পাইবে ইহাতে আর্থিক যুক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রিক যুক্তি বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহার মূল্য কিউবার চিনি অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী পড়ে, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া সাম্রাজ্যের চিনি আমদানী করিতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রও এই একই কারণে পোর্টোরিকো, হাওয়াই ও ফিলি-

পিনের চিনি ব্যবহার করিতে লাগিল যদিও ইহার দাম কিউবার চিনি অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ টাকা অধিক।

এইরূপে কিউবার ইক্ষুচাষের সর্বনাশ হইল এবং হাজার হাজার একর ভাল জমি চাষের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হইল। এখন দেখা যাউক অল্প স্থানে ইক্ষুর চাষ বাড়িয়া সাধারণের উপকার হইয়াছে কিনা? পোর্টোরিকো ১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসে। মার্কিন চিনির কোম্পানীগুলি সমুদ্রতটের নিকটবর্তী ইক্ষুর ক্ষেত্রগুলি ক্রমে ক্রমে কনিয়া লয়। সাধারণ লোকেরা ভূমিহীন মজুর মাত্র। তাহারা আমেরিকার কোম্পানীর অংশীদারগণের লাভ যোগাইবার জন্ত অপর কোন কৃষিকার্য না করিয়া ইক্ষুক্ষেত্রে বা চিনির কলে কাজ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা নিজেদের চাষের জন্ত জমি চাহিলে তাহাদিগকে পার্শ্বর্ত্য অনুর্রবের জমি দেখান হইল, কারণ উর্বর জমিগুলি সমস্তই চিনি-কোম্পানীর হাতে। এই অনুর্রবের জমিতে চাষ করিয়া গরীবের সম্ভান-সমুত্তি লইয়া পরিবার পালনের সম্ভাবনা ছিল না। চিনির কোম্পানীর অংশীদারের লাভ বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ফলে এক দিকের লাভ আর এক পক্ষের দুঃখ ও দুর্দশার কারণ হইল।

কোকো

ঐক্যমণ্ডলের আর একটা ব্যবসায় কোকোর চাষ। কোকোর আদিম বাসস্থান আমেরিকা। একপ্রকার ফলের বীজ হইতে কোকো সংগ্রহীত হয়। ব্রেজিলের বেহিয়া নামক ঠেট হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কোকো রপ্তানী হয়। আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট হইতেই অল্প সর্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানী হয়। পূর্বে জার্মান-অধিকৃত টোগো ও কেমেরুন দেশে ম্যাঙেটবলে অধিকার লাভ করিয়া গ্রেট ব্রিটেন কোকোর ব্যবসায় নিজেদের আধিপত্য বাড়াইয়াছে। ইহাতে জার্মান পুঁজিপতির ক্ষতি হইয়াছে, কারণ কোকোর চাহিদার পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পরই জার্মানীতে সর্বাপেক্ষা বেশী।

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ কোকো আফ্রিকায় জন্মে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগাল এই তিন সাম্রাজ্যবাদী জাতি ইহার মালিক। কোকো গরম দেশের জিনিষ এবং এই সকল দেশের অধিবাসীরা জাতিতে নিগ্রো। কোকোর উৎপাদন চুক্তিবদ্ধ বা বাধ্যতামূলক শ্রমদ্বারা কলঙ্কিত।

সর্বাপেক্ষা নিম্নম প্রথা পর্তুগীজের অ্যানথোম্ এবং প্রিন্সিপালিপের কোকোর বাগানে দেখা যায়। নিগ্রো শ্রমিকদিগকে এই সকল স্থানে পশ্চিম আফ্রিকা হইতে আমদানী করা হয়। হাজার হাজার লোককে একবার এখানে আনিয়া ফেলিলে আর তাহাদের পরিভ্রাণের উপায় থাকে না। এখানে বসবাসের অবস্থা এরূপ ভয়ানক যে এই সকল শ্রমিকের বার্ষিক মৃত্যুর হার হাজার করা একশতে উঠিয়াছিল। যখন এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে কতকগুলি আমেরিকান ও ইউরোপীয় কোম্পানী কোকো বর্জন করিল তখন এই সকল অবস্থার

সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে এখনও সেখানে বেগার প্রথা বিদ্যমান।

কফি

ঐক্যমণ্ডলের আর একটা বিশেষ পানীয় কফি। উচ্চভূমিতে—সমুদ্র হইতে ২০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চে—যেখানে ঐশ্বর্যের মাত্রা একটু কম, বৃষ্টিও কিছু কম সেখানে কফি বৃক্ষ ভাল জন্মে।

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ কফির গাছ ব্রেজিলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের মালভূমিতে রহিয়াছে। কিছু দিন হইল ব্রেজিলের প্রাধান্য কিছু কমিয়াছে, তবুও পৃথিবীর শতকরা ৬০ হইতে ৭০ অংশ কফি ব্রেজিল হইতে আসে। কিউবার পক্ষে চিনি যেমন ব্রেজিলের পক্ষে কফিও তেমনি, দেশের আর্থিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে এখিত। এখানে ব্যবসায়ের বিপর্যয় অল্প আর্থিক জাতীয়তার (economic nationalism) জন্ত নহে, অত্যধিক উৎপাদনের জন্য।

কফিচাষ গোড়া হইতেই অবাঞ্ছনীয় উপায়ে চলিয়াছে। মুনাফা অল্প কয়েকজন বড়লোকের পেটে যায়, তাহারা আবার দেশ ছাড়িয়া ইউরোপের বড় বড় রাজধানীতে বাস করে। এই সকল বাগানে স্থানীয় লোক এবং অন্ত দেশ হইতে নবাগত (immigrants) শ্রমিকেরা কাজ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত এই সকল বাগানে ক্রীতদাসেরা চাষ করিত। এখন ‘কোলোনো’ প্রথায় কাজ চলে। প্রথাটি এইরূপ। জমি কোলোনোদের অর্থাৎ কুলীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমি চাষের জন্য দায়ী থাকে। ইহাদের জমিতে কোন অধিকার নাই, লাভের অংশীদারও নহে এবং ইহাদের মজুরীও নিতান্ত কম।

প্রবাসী পুঁজিদারের স্বার্থ কেবলমাত্র ব্যবসায়ের মুনাফায়, এইজন্য যেনতেন প্রকারে লাভ বজায় রাখিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে ব্যবসা চাঞ্চা রাখিবার পক্ষে এরূপ চেষ্টা করায় যাহাতে তাহাদের লাভ বজায় থাকে কিন্তু সর্বসাধারণের স্বার্থের হানি হয়। এই ব্যবস্থার নাম ভোলেরাইজেশন। কোন কোন বৎসর খুব কফি জন্মায় কিন্তু পরের বৎসর মাত্র উহার অর্ধেক কফি পাওয়া যায়। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর উৎপাদনের বাড়তি কমতি নিবারণের জন্য, ব্যবসায়ীগণ এক দিকে যেমন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে যত্নবান হইল অন্য দিকে তেমনি বাড়তি কফি ধরিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্যবস্থা করিল। উদ্দেশ্য এই ব্যবস্থায় দাম বাড়িলে তখন কফির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে।

কিন্তু ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হইল। কফি ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ের দর চড়াইয়া দিয়া অত্যধিক মুনাফার জন্য ব্যগ্র হইল। অতিরিক্ত লাভের আশায় আবার চাষ বাড়াইয়া চলিল। মুনাফার টাকা অত্যধিক লাভের জন্ত কফি চাষে নিয়োগ করিল। ১৯২৭ সন হইতে উৎপাদন স্তর হইল। ঐ বৎসর ত্রিগুণ ফসল

হইল। অতিরিক্ত কফি গুদামজাত করা হইল এবং ব্যবসায়ীরা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে মোটা কর্জ পাইল। বাগান বাড়িয়া চলিল। মনে হইল ব্যবসার সুদিন আসিয়াছে। পরের বৎসর ১৯২৮ সনে ফসল কম হইল বটে, কিন্তু তাহাও খুব বেশী, আবার নূতন বাগানের কফি বাজারে আসিতে লাগিল। ১৯২৯ সনে আবার প্রচুর কফি ফলিল। অবিক্রীত কফি গুদামে আর ধরে না এরূপ অবস্থা। সরকারী টাকায় কফি কিনিয়া মজুত রাখার প্রথা ভোলেরাইজেশন ভাঙিয়া পড়িল। ১৯৩৬ সনে আবার কফির ফসল ভয়ানক বাড়িল যাহা পূর্বের বার্ষিককে ছাড়াইয়া গেল। এবারে ব্যবস্থা করা হইল যে মজুত কফির কতক নষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু এ কার্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীগণকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তাহারা হয়ত কফি নষ্ট করিবে না। অবশেষে গবর্ণমেন্টই এই বিষয়ে হাত দিল এবং ব্যবস্থামত কফি পোড়াইয়া নষ্ট করা হইতে লাগিল। তিন বৎসরে ৩,০০,০০,০০০ কোটি বস্তা পোড়াইয়া ফেলা হইল। এই পরিমাণ কফিদ্বারা সমস্ত পৃথিবীর লোকের দেড় বৎসর চলিত। এখনও প্রতি বৎসর কফির এই

ধ্বংসলীলা চলিতেছে। ইহাই উৎপাদনের নামে অপচয়—বেরোয়া ধনভাস্কিক উৎপাদনের অবগুস্তাবী ফল।

পাম অয়েল

ঐশ্ব্যমণ্ডলের আর একটি বিশেষ দ্রব্য পাম অয়েল। ইহা পশ্চিম-আফ্রিকার সমুদ্রকূলে সেনিগাল হইতে কঙ্গো পর্যন্ত সমগ্র দেশে প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের চাপে স্থানীয় নিগোগণ নানারূপ গর্হিত উপায়ে পাম অয়েল সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। অবশু ইহাতে নিগোগণের ক্ষতিই ভবিষ্যতে বেশী হইবে, কারণ পাম অয়েল তাহাদের প্রধান খাতির অন্যতম। ফল ও ফলের বীজ উভয় হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ফল সংগ্রহ করিয়া এরূপ বেরোয়াভাবে তৈল নিষ্কাশিত করা হয় যে ইহাতে অনেক অপচয় হইয়া থাকে। যতটা তৈল সংগ্রহ হয় তাহা অপেক্ষা বেশী নষ্ট হয়। নিগোরাই ইহা সমুদ্রতটে লইয়া গিয়া জাহাজ ভর্তি করে। অতঃপর ইহা চালান হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাবান, মারজারীন ও মোমবাতির কারখানায় বা দক্ষিণ-ওয়েল্‌সের টিনপ্লেট কারখানায় যায়।

মনঃসমীক্ষকের কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা

অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি প্রায় বিশ বছরের উপর প্রায়োগিক মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) চর্চা করছি। মনঃসমীক্ষণ কার্যে যে সব কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলব।

মনঃসমীক্ষণ, মনোবিদ্যা বিষয়ে একটি অভিনব প্রণালী। ইহা প্রায় ৫০ বছর পূর্বে ফ্রয়েড কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা দ্বারা চুঃসাক্ষ্য ও জটিল বহুবিধ মানসিক বিকৃতির চিকিৎসা করা যায়। রোগীকে স্বল্প অঙ্ককার ঘরে চোখ বুজে বিছানার ওপর সম্পূর্ণভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এলিয়ে দিয়ে শুতে বলা হয়। রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তিনি নিঃসঙ্কোচে, তাঁর মনে যা আসে সব কথা বলে যান। মনঃসমীক্ষক অর্থাৎ Psychoanalyst এমন ভাবে বসেন, যেন তিনি রোগীর সর্বদা লক্ষ্য করতে পারেন অথচ রোগী তাঁর মুখ দেখতে না পান। সমীক্ষক রোগীর সব কথা একটি খাতায় লিখে নেন। এরূপ অবস্থায় রোগী যে সব কথা বলেন, তা বিচার করে তা থেকে মনঃসমীক্ষক রোগীর মনের অন্তর্নিহিত গোপন কথা ধরতে পারেন। রোগীর মনের অজ্ঞাত ভাবের সমাধান করতে পারলে রোগ সারে। এই ব্যাপার দৈনন্দিন চলে। এই হল মনঃসমীক্ষণের প্রধান পদ্ধতি।

মনঃসমীক্ষণ-চিকিৎসার এক সর্ভ এই যে রোগীর মনে যে কথাই আসুক না কেন অকপটে তাই বলতে হবে, কিন্তু কার্য-

ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে রোগী বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করে। বাধার মূল কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথম, ব্যক্তিগত এবং নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনীয় যৌন-জীবনের ঘটনা। বিকৃত প্রবৃত্তি ও নানাবিধ সমাজবিরুদ্ধ ব্যাপার বিষয়ক রহস্য প্রকাশে অনিচ্ছা। দ্বিতীয় বাধা রোগীর অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়। শারীরিক পীড়ায় রোগী কামমনো-বাক্যে নীরোগ হবার চেষ্টা করে। কিন্তু মানসিক রোগের এক বৈশিষ্ট্য এই যে রোগী নিজেই আরোগ্য লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন সে রোগ আঁকড়ে আছে, ছাড়তে পাচ্ছে না।

আমাদের মনের সব বিষয় সর্বদা জ্ঞানগোচরে থাকে না। যা জ্ঞানগোচরে নাই, চেষ্টা করলে তার খানিকটা মনে করতে পারি সত্য, কিন্তু তা ছাড়া মনের একটি বৃহত্তর অংশ আছে যাকে 'নিজ্ঞান' বলে। চেষ্টা করলেও এই নিজ্ঞানে কিছু আছে তা মনে ধরা দেয় না। এই নিজ্ঞান ক্ষেত্র আমাদের যাবতীয় আদিম অসামাজিক সহজ প্রেরণার উৎস। নানাবিধ যৌন কামনা উহার মূল স্রোত। শিশুর প্রথম পাঁচ-ছয় বছরের জীবনের ঘটনাস্থলির উপকরণ নিয়ে নিজ্ঞান মনের অবয়ব অনেকাংশে গঠিত হয়। শৈশবের ঘটনা আমরা প্রায় সবই ভুলে যাই। মনঃসমীক্ষক দেখেছেন যে নিজ্ঞানে মাতাপিতার প্রতি কামভাব থাকে। এই নিজ্ঞান হতে আমাদের অজ্ঞাত

যাবতীয় সহজ প্রযুক্তি সম্ভ্রাত ইচ্ছারও উৎপত্তি হয়। নিজ্ঞানের অসামাজিক ইচ্ছা স্বপ্নে কখনও কখনও স্পষ্ট ভাবে এবং জাগ্রতাবস্থায় পরিবর্তিত আকারে ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়।

নিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য না বুঝলে, নিজ্ঞানের যবনিকা উন্মোচন করা যায় না। নিজ্ঞানের ইচ্ছা অনেক সময় প্রতীক বা symbol অবলম্বনে প্রকাশ পায়। নিজ্ঞানে যৌন কামনা-মূলক প্রতীকের বাহ্যিক দেখা যায়। ভাষাগত এবং জাতি ও দেশগত প্রভেদ থাকলেও প্রতীকের অর্থের পরিবর্তন দেখা যায় না।

দেড় বছর হতে আরম্ভ করে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে মানব-শিশুর মনে তার পিতামাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি একটি যৌন আকর্ষণমূলক ভালবাসা জন্মে এবং তা প্রতিরুদ্ধ হওয়ার বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। এই ভালবাসা ও বিদ্বেষ পরে নিজ্ঞানে চলে যায়। মাতাপিতার প্রতি কামমতাবে (Edipus Complex বলে। গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, Oedipus পরিচয় না জেনে নিজের বাপকে হত্যা করেন ও মাকে বিয়ে করেন। এই কামচেষ্টার সহিত নিজ্ঞানে সম ও বিসমলৈঙ্গিককামিতা (Homosexuality and Heterosexuality) সক্রিয় বা কর্তৃত্বাব ও সেব্যমান বা ভোগ্যবৃত্তিভাব (activity and passivity) এবং পুংবৎ ও স্ত্রীবৎ ভাবও দেখা যায়। পরিবারের মধ্যে পিতা মাতা ও অভিভাবকবর্গের এবং বৃহত্তর বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে শিশুর মনের এই সকল কামমতাব সংঘত হয় ও তার স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটে। সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে তার ব্যবহারিক জ্ঞানও বাড়তে থাকে। তার মনে ভালমন্দ হিতাহিত ও ধর্মজ্ঞানের আদর্শরূপ বিবেকের উৎপত্তি হয়; এই বিবেক সামাজিক আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিগত বাহ্যিক আচরণাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

বিচ্ছিন্ন লোকে মানুষের বাহ্যিক ভঙ্গী ও হাবভাব লক্ষ্য করে তার তৎকালীন মানসিক ভাবের সন্ধান পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে একটি চলিত শ্লোক আছে—

“আকারে রিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ

নেত্রবস্ত্র বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতে অন্তর্গতং মনঃ ॥”

অর্থাৎ মনুষ্যের আকার, ইঙ্গিত, গমনভঙ্গী, কপটচেষ্টা, বাক্য-প্রকাশিত ভাবদ্বারা এবং চক্ষু ও যুগ্মের বিকারে তাহার অন্তর্গত মন ধরা পড়ে। মনঃসমীক্ষকের কাছে প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর ও শরীর-চেষ্টার মানে আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

মনঃসমীক্ষক কালে এক দিন একটি যুবকের কথা শুন-ছিলাম। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ তার কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সে ক্রমাগত তার ডান চোখ রগড়াতে লাগল। আমি বললাম, “কিছু দেখবার চেষ্টা হচ্ছে কি? মনে যা উঠছে বলে যাও।” সে বললে, “দরজাতে চাবির ছিদ্র।” আমি বললাম, “চাবির ফুটো দিয়ে কিছু দেখছ কি?” সে তখন বলল, “দেখব কি? চাবির ছিদ্র দিয়ে কে যেন আমার চোখে একটা শলাকা

ফুটিয়ে দিতে আসছে।” আমি তখন তাকে বললাম—“হয়ত তুমি এমন কিছু দেখতে চেয়েছিলে, যেটা তোমার বিবেকের মতে দেখা উচিত নয়।” আমার কথা শুনে যুবকটি আবিষ্টের মত বাল্যকালের এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করলে যাতে তার রোগের আসল রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সে চার-পাঁচ বছর ক্রমাগত রোগে ভুগছিল। রোগের নানা প্রকার লক্ষণ তার শরীরে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বহুদিন ধরে তার হৃদযন্ত্রের বৈকল্যের চিকিৎসা করা হচ্ছিল। এপেন্ডিসাইটিস্ ও হার্ণিয়াল রোগ হয়েছে মনে করে, চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাকে অস্ত্রোপচার করাও হয়েছিল; কিন্তু কিছুতেই আসল রোগের উপশম হয় নাই। চলাফেরা করতে গেলে তার কোমরের নীচে, পৃষ্ঠদেশে অসহ্য যন্ত্রণা হ’ত।

সমীক্ষকের ফলে প্রকাশ পেল যে, সে বাল্যকালে, দরজার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার কোন নিকট-আত্মীয় এক দম্পতির যৌন সম্বোধনের ক্যাপার দেখতে চেষ্টা করেছিল। একবার টুলের ওপর টুল সাজিয়ে তাতে চড়ে পার্টিশন দেওয়ালের ওপর মুখ রেখে যখন সে আড়ি পাঁতছিল তখন ঘরের ভিতর থেকে স্বামী-স্ত্রী তাকে দেখতে পায় ও তাড়া করে। দ্রুতপদে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে সে গুরুতর আঘাত পায়; এই ঘটনা সাত বছর বয়সে ঘটেছিল। আঘাত-জনিত ব্যাধি ক্রমে সেরে যায় কিন্তু বহুকাল পরে কোমরের কষ্ট দেখা দেয়। বাল্যকালের হৃদয়ের অস্ত্র বিবেক দংশন থেকেই তার রোগের উৎপত্তি। রোগী নিজের অজ্ঞাতসারেই রোগ-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে নিজেকে শান্তি দিচ্ছিল। বি-এ পাস করার পর চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের সময় আমার কাছে সে আসে এবং লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধার হওয়ায় রোগমুক্ত হয়। মনঃসমীক্ষকের সাহায্যে দেড় বছর বয়সের স্মৃতি পর্যন্ত নিজ্ঞান হতে নির্গত হয় ও যৌবন, কৈশোর এবং বাল্যের কামজীবনের ইতিহাস ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

মনঃসমীক্ষককালে একদিন ঐ রোগীর অবাধ ভাবধারা পরম্পরা পর্যালোচনা করে আমার ধারণা হয় যে, জন্মের সময় সম্ভবতঃ তাকে সাঁড়াশী দিয়ে মাতৃকৃষ্ণি হতে বার করতে হয়েছিল। আমি উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করতে বিশেষ কূটবোধ করি, কারণ এ রকম ব্যাপার রোগীর অজানা থাকলেও যে সমীক্ষণে ধরা পড়ে তা আমি কোথাও পড়িনি। রোগী বিস্মিত হয়ে বললে, এরূপ কথা শুনেছে বলে তার মনে পড়ে না। পরদিন সে বাড়ীতে সন্ধান করে এনে বললে আমার কথাই ঠিক। এই ব্যাপারটি আমাকে খুব বিস্মিত করেছিল।

আর এক রোগী আমার কাছে আসেন। তিনি একটি লোক সঙ্গে না নিয়ে রাত্তায় বার হতে পারতেন না; একলা রাত্তায় বার হলেই হার্ট ফেল করে প্রাণবিয়োগ হবে, এরূপ আশঙ্কা তাঁর হ’ত। তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে আমার অনেক-বিশ্বাস্যকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদিন তিনি আমার

ঘরে ঢোকবার সময়, হঠাৎ স্থানীয় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর আমাকে বললেন, “আপনাকে যেন ভয়ানক হিংস্র বাঘের মত মনে হচ্ছে।” আমি অনেক অভয় দেবার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার ঘরে এসে নিজ স্থানে বসলেন। তাঁর মনে কিছু দিন ধরে তখন অত্যন্ত পিতৃদেহের ভাব চলছিল। সমীক্ষকের উপর সেই বিবেচ্য আরোপ করে তিনি ভয়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

সমীক্ষক রোগীর নিকট পিতৃপ্রতিম হয়ে পড়েন। ঐ দ্বিবস রোগীর পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির সহিত পূর্ব বিবেচ্যের আলোচনা হয়; ফলে তাঁর মনে যে আতঙ্ক হয়েছিল তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করেন। মনের নিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে তিনি অনেকটা শান্তি পেলেন।

এই ব্যক্তির মাতার প্রতি তাঁর কামভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবার পূর্বে একটা আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়েছিল। প্রায় দু’মাস ধরে তিনি প্রত্যহ বলতেন, “জাগ্রত অবস্থায় কে যেন তাঁকে ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যের মত সর্বদা ভয় দেখাচ্ছে ও তাড়না করছে।” মাতার প্রতি কামভাব থাকলে, পিতা ভয়ের কারণ হন। ভূত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি বৈরী পিতার প্রতীক।

আর একবার তিনি আমার ঘরে এমন অস্থিরতার সহিত এপাশ-ওপাশ এবং উঠাবসা করতে থাকেন যে, আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে তিনি গর্ভিনীর প্রসববেদনার অভিনয় করছেন। পুরুষের নিজস্ব ভাবে স্ত্রী ভাব থাকে, রোগীর আচরণে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।

বহুদিনের কথা, একবার একটি রোগীকে দেখবার জন্য আমাকে তাঁদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখি একটি যুবকের হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ নাকি সে এমনই ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আছে। রোগী নাকি বড়ই হৃদ্যন্ত। আমি বললুম, “বন্ধন খুলে দেওয়া হোক, না হলে কোন কথাই হবে না।” তার আশ্রয়ীয়েরা বললেন, “সেটা নিরাপদ নয়, কেননা রোগী প্রহার করতে পারে।” তাঁরা আশ্রয়ক্ষার জন্য একটি মোটা লোহার শিক

নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, “ও আপনাকে মারতে পারে, সাবধানে থাকবেন।” অবশেষে তাঁরা আমার কথা শুনে শিকল খুলে দিলেন। হঠাৎ আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখলুম। তার প্রতি আমার বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে সে অকস্মাৎ শ্রদ্ধা ও অহুরাগে অভিভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলল। শেষে জানতে পারি পরদিন বাড়িতে সে কোন গোলমাল করে নি। নিজের ইচ্ছায় গঙ্গা মদনমোহন কালী দর্শন করে আসে। তাকে আর বেঁধে রাখতে হয় নি। মাস দুয়েক পর তার পাঁহারাদারকে বিদায় করা হ’ল। মনঃ-সমীক্ষকের ফলে সে এখন আরোগ্য লাভ করেছে এবং নিজের চেষ্টায় জীবিকা পর্যাপ্ত অর্জন করেছে।

নিভূতে রহস্যপূর্ণ গোপনীয় কথার আলোচনার ফলে রোগীর মনে ক্রমে ক্রমে সমীক্ষকের প্রতি নানাবিধ অপূর্ণ ভাবের স্ফার হয়। পিতামাতার সম্বন্ধে বাল্যকালের নানা নিরুদ্ধ মনোভাব সমীক্ষকের উপর সংক্রামিত হয়। এই আরোপকে transference বা সংক্রমণ বলে। রোগীর নিকট কখনও বা সমীক্ষক অতিসাদু ব্যক্তি, এবং হিতকারী বলে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার পান। ইহাকে positive transference বলে। আবার কখনও বা রোগীর তরফ থেকে ঠিক বিপরীত আচরণ সমীক্ষকের ভাগ্যে জোটে। তিনি রোগীর নিকট নিরতিশয় সন্দেহভাজন, দুশ্চরিত্র ও লম্পট ব্যক্তি বলে প্রতীত হন এবং তাঁর প্রতি রোগী নানাবিধ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও গালিবর্ষণ করতে থাকে। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে negative transference বলে।

বিচক্ষণ সমীক্ষক দুই অবস্থাতেই মনোবিকারের সমস্ত সমাধানের প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। রোগী পিতৃস্থানীয় সমীক্ষকের উপর কখনও সমকামিতা প্রকাশ করে এবং কখনও সমীক্ষক রোগীর নিকট বি-সমকামিতার পাত্র বলিয়া প্রতীত হন। আমাকে পিতৃপ্রতীক ছাড়া দুই-চারিটি স্থলে রোগী, মাতা ও প্রণয়িনী প্রতিমারূপে দেখেছে। যে সমীক্ষকে একরূপ আরোপও অভ্যাস হয় না, তাহাতে অফল ফলতে অনেক বিলম্ব হয়।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত বক্তৃতা।

জিজ্ঞাসা

শ্রীরাণী চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের বলাকা ছিলো মনে মোর। তারা উড়িবারে
বারে বারে মেলে ছিলো পাখা, পদ চিহ্ন আঁকা
অনেক কবির চলা পথে। অদৃশ্যে কোথায়
শৃঙ্খল জড়িয়ে গেল পায়ে।

আমার আকাশে ছিলো তারা। শুদ্ধ অন্ধকার
আশা ছিলো পথ চিনিবারে।—(মধু-মদ মাখা
অনেক কবির চলা পথে।)—সে পথ কোথায়
মিলাইল অন্ধ মেঘ ছায়ে।

স্বপ্ন জলে ছিলো একদিন। তখন যৌবন;
মত্ততায় ভালো বেসেছি। ছিল আশা,
আমিও গাছিব কিছু গান। কুড়াইব কিছু ভালোবাসা।
সে আশা দূরশা।

কাদাম কাঁটায় খেরা পথ হারা মত্ত মোর মন।—
আজো সেখা পদচিহ্ন আঁকা। আশা নয়, শুধুই জিজ্ঞাসা।

মমতাহীন মৃত্যু

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পাশের বাড়ীটা অনেক দিন খালি ছিল। প্রায় মাস চারেক হবে। হঠাৎ সেদিন দেখি চুনকাম শুরু হয়েছে। বুঝলাম ভাড়াটে কেউ আসছে নিশ্চয়ই। দিনচারেক বাদে পাশের বাড়ীর কটকে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে। কোতুল অস্বাভাবিক নয়। ছ'জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক নামলেন। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই হবে। যত দূর অনুমান করলাম, তাঁরা ভাই হবেন বলেই বোধ হ'ল। বয়স এক জীবলোক নামলেন মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে। ঐ দুই ভায়েরই এক জনের স্ত্রী বোধ হয়। মেয়েও নামল এক জন। ঘোবনের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে ওর বয়স। খানিক পরে একটা বাসে করে নানান জিনিষ এসে হাজির—বাক্স-পেট্রা থেকে হাঁড়িকুড়ি সব।

কয়েকটা দিন চলে গেছে। পাশাপাশি দুই বাড়ী। অপরিস্রব কুয়াশা কাটিয়ে পরিচয়ের যোগসূত্র এখনও গাঁথা হয় নি। ভাবছি, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসা যাবে। ভাবনাটাকে কাজে রূপায়িত করবার সুযোগ হয়ে উঠছে না, আপিসের কাজের চাপে। তাই ভাবনা আপন গভীরেই রুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

রবিবারের সকাল। বাগানে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছি। ষ্টোভের আওয়াজ কানে আসছে বাড়ীর ভেতর থেকে—চায়ের জল চাপিয়েছে মিনতি।

কাগজের পাতা ওণ্টাচ্ছি। হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হতেই, চোখ গেল ফটকের কাছে। পাশের বাড়ীর নবাগত ভদ্রলোক। মাঝুলি পোশাক। মাথার কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়ানো। পা খালি। কাগজ এক পাশে সরিয়ে রেখে, সন্ধরে আস্থান করলাম—আহুন, আহুন।

—ক'দিন থেকেই ভাবছি আপনাদের সঙ্গে এসে আলাপ করি, কিন্তু এখন অবধি হয়েই উঠল না।

—হয়ে উঠবে না, তা জানি। তাইত নিজেই ইনিসিয়েটিভ নিয়ে দেখা করতে এলাম।—বলতে বলতে তিনি পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

—একজনে স্বত্ববাদ।

—নিশ্চয়ই। সে আর একবার বলতে, এক-শ বার। বাগানের চার দিকে তিনি চোখ ফেরালেন। সকালে রোজ বাগানের হাওয়া খান নাকি?

জানিলাম—হ্যাঁ।

—গুড্‌হাবিট। কিন্তু তার চেয়ে ভাল মর্পিং ওয়াক। আর তার চেয়ে ভাল মাইলটাক দৌড়ানো।

হেসে বললাম—কলেজে পড়ার সময় ওসব করতাম। এ বয়সে আর পোষায় না।

জবাবে তিনি কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। হঠাৎ এই ক্রুদ্ধ দৃষ্টির কারণ বুঝতে পারলাম না। অত্যা ত কিছুই বলা হয় নি।

প্রশ্ন করলেন—বয়স কত?

—আটাশ।

—বেশ। হাইট?

—পাঁচ ফুট সাত কি আট ইঞ্চি হবে।

মাথা নাড়লেন তিনি।—উঁহ, হবে-টবে বললে চলবে না।

একেবারে পারফেক্ট হতে হবে। ওয়েট?

—দু-মাস আগে এক-শ দশ পাউণ্ড ছিল।

—ছিল বললে হবে না। এখন কত?

জবাব দিলাম—ঠিক বলতে পারলাম না। ওর কিছু কমবেশি হবে হয়ত।

—ভেরি ব্যাড্‌, ভেরি ব্যাড্‌। প্রত্যেক মাসে এক বার করে এসব মেজার করে রাখা উচিত। এখুনি চলুন আমাদের বাড়ী; সব মেজার করে নোব। চলুন।

—ইয়ে,—আমতা আমতা করে জানালাম—এখন নয়।

আবার তিনি কটমট করে তাকালেন।—কেন?

—মানে, আমার একটু কাজ রয়েছে।

—কাজ। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে?

সভয়ে বললাম—তা জানি। তবু, মানে...

—নো আরগুমেন্ট। তবে থাক।

এত সহজে নিরস্ত হতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেশীক্ষণের জ্ঞান নয়। একটু বাদেই শোনা গেল, কিন্তু থাকলে তো চলবে না। তোমার হেল্‌থ্‌ সাউণ্ড নয় মোটেই। আটাশ বছর বয়স, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটে এক-শ দশ পাউণ্ড ওয়েট। ভেরি ব্যাড্‌। তোমার আগার-ওয়েট।

প্রশ্ন করলাম—আপনি কি করে জানলেন?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? চল, তোমায় আমি চার্ট দেখাচ্ছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—এস, কাম্‌ অন...

বাধা দিলাম—না না, এখন নয়। মানে...

—অল রাইট—তিনি আবার বসলেন।

বসতেই হাংস এনে বললাম—আমার হেল্‌থ্‌ ত খারাপ নয়।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।—নয়? কি করে জানলেন?

—অসুখ-বিসুখ হয় নি অনেকদিন।

—হয় নি বলেই ত হেল্‌থ্‌ খারাপ।—তিনি হাসলেন।

—যে কোন মুহুর্তে হতে পারে। দেহের মধ্যে টি.বি.,

টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা সব রোগেরই জ্বরম ঘুরছে কিলবিল করে। হতে কতক্ষণ একটা রোগ। হেল্‌থ্‌ সম্বন্ধে কোন রকম নেগলেক্ট আমি সহ্য করতে পারি না।

—আমি কি নেগলেক্ট করছি?

—অফ কোর্স। আর যাতে সেটা না করেন তাই আমার দেখা দরকার আজ এ ট্রি সিটজেন্‌, আজ এ নেবার। দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান...

চমকে উঠলাম।—দাঁড়াব?

—নিশ্চয়ই-দাঁড়াবেন।—দাঁড়ালাম ভয়ে ভয়ে।

—আটস্‌ রাইট। তিনি মনে মনে খুশি হয়েছেন বললাম।

—নিম্ন এবার দশটা ভন্‌ আর দশটা বৈঠক মারুন।

আদেশ শুনে ঢোক গিললাম। বলে কি ভদ্রলোক। বহু কষ্টে বললাম—ইয়ে, মানে ভন্‌ বৈঠক।

—বেশী নয়, দশ আর দশ কুড়ি। তার পর উইকলি পাঁচটা করে বাড়ালেই চলবে।

বাপ্রের বাপ। যেমে উঠলাম। ভন্‌-বৈঠকের হাত থেকে এখন কি করে ছাড়া পাই? হঠাৎ দেখি চায়ের পেয়ালা হাতে চাকরটা এদিকেই আসছে। তাই দেখে ধড়ে প্রাণ এল। চেয়ার টেনে আবার বললাম।—নিম্ন, চা খাওয়া যাক। হরি, আর এক কাপ নিয়ে আর।

তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন—চা?

—হ্যাঁ।

—না, চা চলবে না। সকালে ছোলা ভিজিয়ে খেতে হবে; তার পর এক পো কাঁচা জুহ। ব্যস।

—কিন্তু চা যে এতদিনের অভ্যেস।

—কোনো আরগুমেন্ট নয়। ব্যাড হাবিট; ছাড়তে হবে। চলুন, ডায়েটের একটা লিষ্ট আপনাকে দিচ্ছি...

সভয়ে বললাম—এখন থাক। মানে...

—আচ্ছা থাক। পরেই হবে।—বলতে বলতে হঠাৎ তিনি ছড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—কি হ'ল?

—শুনতে পাচ্ছেন না?

—কি শুনব।

—বিউগল বাজছে।

—বিউগল বাজছে। কোথায়?

—হলদিঘাটে। আজ সেখানে রাজপুত সোলজারদের মাস্‌ প্যারেড আছে। রাণী প্রতাপও আসবে।...বাজল কত, বলুন তো?

জবাব দিলাম—সার্ভে সাতটা।

—দশ মিনিটে পৌঁছানো যাবে না? কি বলেন?

হাসি চেপে বললাম—তা যাবে।

—তা হলেই হ'ল। ক্যাপটেন্‌ মাষ্ট বি পাংচুয়াল।—ভদ্রলোক বেগে বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে আমিও বাঁচলাম। চায়ের পেয়ালায় আরামের চুমুক দিয়ে চাঞ্চা হয়ে উঠলাম। ভাগ্যিস ভদ্রলোকের হলদিঘাটে প্যারেডের কথা মনে পড়ে গেল। নইলে ভন্‌-বৈঠকের হাত থেকে মুক্তি বোধ হয় কিছুতেই পাওয়া যেত না। সেই সঙ্গে সকালের চা খাওয়াটাও মাটি হ'ত।

বিকেলের দিকে আপিস থেকে বাড়ী ফিরছি। পাশের বাড়ীর গেটে চোখ পড়তেই দেখি, সেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দেখেই বুকটা কেঁপে উঠল। হনহন করে চলতে শুরু করলাম তাঁর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে। কিন্তু ফল হ'ল না। নজর পড়তেই ডাকলেন—শুনছেন?

আসতেই হ'ল। এগিয়ে এলাম ভয়ে ভয়ে।—বলুন।

স্বরটা নীচু করে বললেন—একশোটা টাকা হবে?

কুতূহলী হয়ে শুধালাম—কেন বলুন ত? কি দরকার?

—তাকে দিতে হবে। একটু বাদেই সে আসবে। রোজই

এই সময় সে আসে; একশ টাকা ধার নিয়ে যায়। তাকে রোজ একশ করে টাকা দিতে দিতে আমি সর্বস্ব হ'লাম। টাকা কি আমার কম ছিল। দেখো, আজ কিছু নেই। ছেঁড়া জামা-কাপড়, জুতো নেই পায়ে।

ভদ্রলোকের পোশাকও দেখি তাই,—ছেঁড়া, ময়লা। প্রশ্ন করলাম—সে কে?

তিনি আমার ধমকে উঠলেন—ইস্‌, আস্তে আস্তে...

চাপা গলায় আবার প্রশ্ন করলাম—সে কে?

তিনি চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার পর কানের কাছে মুখ এনে যুহুধরে বললেন—রাণী প্রতাপসিংহ।

জানলাম তেমনি ক্ষীণ স্বরেই—সে ত মারা গেছে।

—মারা গেছে। তুমি কি করে জানলে?

—জানি। আমি যে দেখে এলাম।

—কে, কে তাকে মারলে?—টেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। তুমি? কি দিয়ে মারলে? বিষ? তলোয়ার? তোমায় আমি এরেষ্ট করলাম। কোর্ট মার্শাল হবে এখুনি। কাম্‌ অন!—তিনি হাত ধরলেন।

—উত্তেজিত হবেন না। আমি মারি নি।

—তবে?

—তার নেচারল ডেথ্‌ হয়েছে। হলদিঘাটের যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁর যত্ন হয়।

তিনি সাবধান করে দিলেন—আস্তে আস্তে, চারদিকে স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সাবধান।...প্রতাপ তবে মারা গেছে?

—হ্যাঁ।

—তবে তো আমিই এখন রাজপুত আর্মির জেনারেল। নয় কি?

—নিশ্চয়ই।

—আমার এখন ভাণ্ট রেসপন্সিবিলিটি। চূপ করে তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন। পালাবার এই সুযোগটার সদ-ব্যবহার করব কিনা ভাবছি, এমন সময় আবার ডাক এল—শোনো...ভয় হ'ল। এই রে, আবার সকালের কথা মনে পড়েছে বুঝি! ভয়ে ভয়ে শুধালাম—কি?

—মেবারের আজ ঘোর দুর্দিন। ইয়ং ম্যান, আজ তোমার আমি হেল্প চাই। পাব কি বন্ধু?

—নিশ্চয়ই।

—ধ্যাক্ষ ইউ। প্রতাপ মরলেও চিতোর মরে নি, রাজপুত মরে নি। আমি আকবরের সঙ্গে ওয়ার ডিক্লেয়ার করলুম। এই নাও চিঠি; মেবারের দূত হয়ে আকবরের কাছে চলে যাও। কুইক, কুইক।

—নিশ্চয়ই।—তাড়াতাড়ি পা চাললাম।

রাতে খাবার সময় মিনতি বললে—জান, পাশের বাড়ীর ওদের সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল।

—কেমন লোক ওরা?

—বাড়ীর যে কর্তা, তার নাম ভূতনাথবাবু। লোকটির মাথা বেশ খারাপ। আমায় দেখেই বললে কি না, সেলাম ঝাঁসির রাণী।—মাগো, আমি ত লজ্জায় মরি!

হেসে উঠলাম।—বেশ ভালই বলেছে।

মিনতি জানালে—অমন ভাল বলায় আমার দরকার নেই।

—কেন মাথা খারাপ হয়েছে জান?

—ভূতনাথ বাবুর ছোট ভাই শিবনাথবাবুর স্ত্রী বলছিলেন, এক মাসের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী আর ছ'দুটো বড় ছেলে মারা যায়। পাগল নাকি সেই থেকেই।

—কি অসুখ হয়েছিল?

—তা জানি না। তবে বউ নাকি টি-বিতে মারা যায়।

—আর ছেলেশুলে নেই?

—একটা ছেলে, সে যুদ্ধে গেছে। মেয়েটা কাছেই আছে। ভারি চমৎকার মেয়ে, নাম কৃষ্ণা। বাপকে খুব ভালবাসে। ওরই জন্মে ভূতনাথবাবুকে কোন মেন্টাল হাস্পিটালে দেওয়া মুশকিল। বলে, ওখানে থাকলে বাবা আর বাঁচবে না। উনি নাকি বড় ডাক্তার ছিলেন; লাষ্ট ওয়ারে গিয়েছিলেন লড়াইতে।

আমি বললাম—ভূতনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। আজ সকালে এসেছিলেন।

—কি বললেন তোমায় দেখে? মিনতি সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

—রাজা-টাজা কিছু নয়।

—তবে?

—একসারসাইজ করতে বললেন। বহুকষ্টে তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে এখন আমি মেবারের দূত।

—সে আবার কি?

—সে অনেক।—ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হ'লেও

ডেনজারাস কিছু নয়, বরং মমতা জাগে।

—আমার ত কৃষ্ণা মেয়েটাকে দেখলে বুক কেটে যায়। আচ্ছা রে—

কিসের যেন ছুটি। আপিস বন্ধ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে দেহ এলিয়ে ছ'পেনি দামের একটা ডিটেক্টিভ নভেল পড়ছিলাম। হঠাৎ রাত্তায় চোখ পড়তে দেখি ভূতনাথবাবু এদিকেই আসছেন। পোশাকে নতুন কিছু নেই। ক্রমাল দিয়ে নাক চেপে অতি সন্তর্পণে তিনি হাঁটছেন।

কাছে আসতেই বই বন্ধ করলাম। শুধালাম—কি ব্যাপার? নাকে কি হ'ল?

চাপা গলায় জানালেন—হাওয়ার কিলবিল করে জ্বরম ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার কাঁক পেয়ে যদি নাকে চুকে যায় ত সর্বনাশ।

—কিসের জ্বরম?

—জানেন না? টি-বি, টি-বি।

হেসে বললাম—অমন করে নাক চেপে থাকলে কি দিয়ে নিশ্বাস নেবেন? দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন যে।

—দাঁড়ান ভেবে দেখি। ভূতনাথবাবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—সত্যিই ত আমার এটা মনে ছিল না। মেনি, ধ্যাক্স।—নাক থেকে ক্রমাল ছেড়ে পাশের চেয়ারে বসলেন।

খানিক বাদে বললেন—আপনি মশাই বেশ লোক। খুব ভাল লাগে আপনাকে।

—এ ত ভাল কথাই।

—আপনি দেখছি সবকিছুই বোঝেন।

সায় দিলাম—তা বুঝি।

—কি পাস করেছেন?

—বি-এস্‌সি।

—ভাল, ভাল। খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন ভূতনাথবাবু।

—বিয়ে কি হয়েছে?

—তা হয়েছে।

কোন কাজে মিনতি আমার খোঁজে বাইরে এসেছিল। ভূতনাথবাবুকে আমার পাশে দেখে, তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। মিনতি চলে যেতেই, তিনি প্রশ্ন করলেন—ঝাঁসির রাণী?

—হ্যাঁ।

—এটা কি তবে ঝাঁসির রাণীর প্যালেস?

—তাই।

ভূতনাথবাবু কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করলেন এখানে কোন টি-বির জ্বরম-টার্ম নেই ত?

—মোর্টেই না।

—দ্যাট্‌স রাইট। আমি যেখানে থাকি, সেখানে কিলবিল করছে টি-বির জ্বরম।—তারপর চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

নিষ্ফেপ করে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—ঝাঁসির রাণী আবার কি যুদ্ধে নামবেন ? সে সম্বন্ধে কিছু জানানো ?

—না।

—জেনে নেবেন। জেনে নিয়ে আমার হেড কোয়ার্টারে আজই খবর দেবেন। ভুলবেন না। আচ্ছা, এখন আমি চললাম; বিশেষ জরুরি কাজ আছে। চম্বার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

—কি কাজ ?

—দেখা করতে হবে তার সঙ্গে।

—কে সে ? রাণী প্রতাপ ?

—না, না।—তিনি মাথা নাড়লেন।—নেলসন।

—নেলসন ! তিনি ত মারা গেছেন।

—বিশ্বাস করো না। ওসব এনিমি প্রোপাগান্ডা।

নেলসন রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর সঙ্গে আমার একটা সিক্রেট ট্রিটও হয়ে গেছে। এই যে আমার একটা ছেলেকে যুদ্ধে পাঠালাম, নেলসনই ত পাঠাতে বললে। ভূতনাথবাবু চলে গেলেন।

ফর্টক অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন।—হ্যাঁ একটা কথা, ঝাঁসির রাণীকে আমার সেলাম দিও।

বিকেলের দিকে মিনতির খোঁজে পাশের বাড়ী গিয়েছিলাম। ড্রয়ারের চাবিটা দরকার।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই, ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা। বারান্দার চম্বারে বসে রয়েছেন চূপচাপ। আমায় দেখে শুধালেন—কে, কে তুমি ?

—আমি, চিনতে পারছেন না ?

একটু ভেবে বললেন—ঠিক। কোথায় যেন তোমায় দেখেছি।

বললাম—দেখেছেন বই কি। পাশের বাড়ীতেই থাকি আমি।

—না, না। তোমায় দেখেছি পলানীতে।

পলানীর কথা উঠবে আশা করি নি। একটু ভড়কে গেলাম।

—পলানী !

—হ্যাঁ, এবার তোমায় চিনেছি। তুমি মীরজাফর।

—না না, আমি মীরজাফর নই।

—নও ? তবে কে তুমি ?

—আমি, আমি...ভাবতে ভাবতে নামটা চট করে মনে এল—আমি মোহনলাল।

—মোহনলাল !—খুশিতে ভূতনাথবাবুর মুখ ঝলমল করে উঠল।

বললাম—হ্যাঁ।

—কাছে এস মোহনলাল, কাছে এস। যুদ্ধের কি খবর ? তখনি জবাব দিলাম—যুদ্ধে ইংরেজের হার হয়েছে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—তুমি বীর মোহনলাল, তুমি বীর।

ভূতনাথবাবুর আলিঙ্গন থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে এক পাশে সরে গেলাম। তিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাদলবাবু এসে হাজির হলেন। বাদলবাবু ছ'বাড়ীরই মালিক। বাদলবাবু আসতেই তাঁর দৃষ্টি গেল সেদিকে। আমি রেহাই পেলাম।

বাদলবাবুকে প্রশ্ন করা হ'ল—কে তুমি ? ইংরেজের দূত ? সন্ধির কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই। সন্ধি হবে না।

প্রশ্নগুলো শুনে রীতিমত দাবড়ে গেলেন বাদলবাবু। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমি ইংরেজের লোক নই, আর সন্ধির প্রস্তাব নিয়েও আসি নি।

—তবে ?

—শিবনাথবাবুর খোঁজে এসেছি। তিনি আছেন ?

—তাকে কি দরকার ?

—ভাড়াটার জন্তে এসেছিলাম।

—ভাড়া !—ভূতনাথবাবু কি যেন ভাবলেন। কিসের ভাড়া ?

—এই বাড়ীটার।

—কেন ?

বাদলবাবু বলেন—বাড়িটা আমার।

—তাতে কি ?

—তাতেই তো সব। আপনাদের থাকতে দিয়েছি।

—বেশ।

—তাই ভাড়া চাই।

—ও, তাই বলুন।—ভূতনাথবাবু মাথা দোলালেন।—আপনি বাড়িটা যে আমাদের দান করেছেন, সে দান নিঃস্বার্থ নয়। দানের বদলে প্রতিদান চান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাদলবাবু মুখ ঝাঁকালেন।

—কিন্তু ভাই তুমি তো জান আমাদের কিছু নেই।

ছেঁড়া পোশাকে ঘুরে বেড়াই। রাণীকে ধার দিয়ে আমরা সর্বস্বারা।

বাদলবাবু ভয়ানক চমকে উঠলেন।—রাণী, রাণী কে !

—রাণী প্রতাপসিংহ।

বাদলবাবু হেসে ফেললেন।—প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঠাটা করছেন, এখন বুঝি সত্যিই আপনার মাথা ধারাপ।

—কি বললেন, মাথা ধারাপ ?—ভূতনাথবাবু লাফিয়ে উঠলেন।—পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে এগিয়ে গেলেন বাদলবাবুর দিকে।—দোব নাকি বুকে ধাঁ ক'রে বসিয়ে, মশাই ?

ছুরি দেখে আতকে উঠে বাদলবাবু আঁ আঁ করে উঠলেন। সর্বনাশ ! ছুটে গিয়ে ভূতনাথবাবুর হাত ধরে ফেললাম। বাধা পেয়ে তিনি ফিরে তাকালেন। তুমি কে ?

—করছেন কি ? দূতকে মারছেন ?

—কেন, তাতে কি ?

—দূত যে অবধ্য।

—আরে হ্যাঁ, তাই তো। তুমি খুব মনে করিয়ে দিলে।

এখন এক কেলেঙ্কারি করছিলাম আর কি। থ্যাঙ্কস্—

তারপর বাদলবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—যাও, তুমি মুক্ত।

আমিও বাদলবাবুর কানে কানে বললাম—পালান মশাই, পালান। হ্যাঁ করে কি দেখছেন ? অস্ত্র কোন সময় আসবেন।

বাদলবাবু অনেকটা দৌড়েই পালালেন।

দিন কয়েক পর। রাত এগারোটো হবে। বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুমটা সবে এসেছে, হঠাৎ দরজার ধাক্কা পড়ল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

—কে ?

চাপা গলায় জবাব এল—আমি, নবাব। দরজা খোল।

উঠে দরজা খুলে দিলাম। ভূতনাথবাবু ভেতরে এলেন। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

—তুমি দিবা আরামে ঘুমোচ্ছিলে মোহনলাল। এদিকে আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

—কি হ'ল ?

—পলাশীর যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে।

—কি করে জানলেন ?

—পলাশী থেকেই ত আমি পালিয়ে আসছি মোহনলাল। দেখছ না কি রকম হাঁপাচ্ছি। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এমন সময় রুদ্ধ দ্বারে আবার আঘাত পড়ল সজোরে। সে শব্দে চমকে উঠে ভূতনাথবাবু দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে গেলেন। শুধালাম আমি—দরজা ঠেলছে কে ?

শিবনাথবাবুর গলা শোনা গেল—আমি, অপূর্ববাবু। দাদা এসেছে কি এখানে ?

বুঝলাম ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ী-ছাড়া। খোঁজাবুঁজি স্বর হয়ে গেছে। জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

—তবে দরজা খুলুন।

দরজা খুলতে যাব, টেচিয়ে উঠলেন ভূতনাথবাবু, ধবরদার। দরজা খোলো না।

—কেন ?

—গলা শুনেও চিনতে পারলে না, ও কে ?

—না তো। কে ?

—মীরজাফর। খোঁজ পেয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

একা এসেছে ভেবেছ ? মোটেই নয়। সঙ্গে উমিচাঁদ, ক্লাইভ আছে। ঢুকেই আমাদের বন্দী করবে।

—আপনি কি ভয় পেলেন ?

ভূতনাথবাবু জোরে হেসে উঠলেন।—ভয় ? বাংলার

নবাব সিরাজের ভয় ? শোনো, আমি দরজা খুলছি। তুমি বশুক ধরে রেডি হয়ে থাকো। ওরা ঢুকলেই, ব্যস...

আমি বললাম—সেই ভালো।

ভূতনাথবাবু এগিয়ে এসে দরজা খুললেন। শিবনাথবাবু ঘরে ঢুকেই ডাকলেন—দাদা—

—উঁহ। তোমার ও ছলনায় ভুলছি না মীরজাফর। মোহনলাল, বন্দী কর। একাই এসেছ ? তোমার সাহস আছে দেখছি।

শিবনাথবাবু বললেন—আমি মীরজাফর নই।

—নও ? বিশ্বাস কি ?

—দাদা, ঘরে চলো।

—আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে তুমি কি পরিহাস করছ মীরজাফর ? আমার ঘর নেই, সাম্রাজ্য নেই। সব হারিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি পলাশীর প্রান্তর থেকে।

—আমার ঘরে চল।

—তোমার ঘরে ? শত্রু-শিবিরে ? বন্দী হয়ে ?

—তুমি তো বন্দী নও নবাব।

—নই ? কি বিশ্বাস ?

শিবনাথবাবু ভায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—বিশ্বাস কর। কোরান হুঁয়ে বলছি।

তাকে এগোতে দেখে তিনি কয়েক পা পিছু হটে গেলেন। নিত্যসঙ্গী ছুরিটা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বার করে বললেন—সাবধান মীরজাফর কাছে এগিয়ে না। তোমায় আমি খুব চিনি। আর এক পা এগোলেই হাতের এই তলোয়ার...

হাবভাব দেখে শিবনাথবাবু আর কিছু বলবার সাহস পেলেন না। চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি এবার এগিয়ে এলাম।—নবাব—

—কে ?—ফিরে তাকালেন।

—মোহনলাল।

—ও, মোহনলাল। একে বন্দী কর।

ভূতনাথবাবুকে এ অবস্থায় ঠাণ্ডা করা শক্ত। কি কর্তব্য ভাবছি। ঠিক এমনি সময় কৃষ্ণা ছুটে এল।

—বাবা—

—কে, নবাবনন্দিনী ? আয় মা কাছে আয়।—ভূতনাথবাবু জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে।

কৃষ্ণা বললে—বাবা ঘরে চল...

—ঘর তো নেই মা। বাংলার নবাব আজ ভিখিরি।

—বেশ তো, ভিখিরির কুটরেই আমরা থাকব।

—তবে, তাই চল।

কৃষ্ণা বাপকে ঘর থেকে নিয়ে গেল। যাবার সময় শিবনাথবাবু বলে গেলেন, আর ত ঘরে রাখা চলে না—ডেন্জারাস্ হয়ে পড়েছে। পরশু রোববার আছে, সেদিনই রেখে আসব হাসপাতালে। আপনি কি বলেন ?

জানালাম, হ্যাঁ, তাই করুন। তবে কৃষ্ণা...

—ওরই জন্তে ত কিছু করা মুশকিল।

—বুঝিয়ে বললে ও কি রাজী হবে না? ওর বাপ যদি ভাল হয়ে ফিরে আসে, খুশী ত সবচেয়ে বেশী কৃষ্ণাই হবে। ও চায় না কি বাপ তার ভাল হোক?

—এ বিষয় আমি ঢের বুঝিয়েছি।

—আচ্ছা আমি কাল একবার ট্রাই করে দেখব।

—দেখুন।

বিকলে আপিস থেকে ফিরে জলখাবার খাচ্ছি। মিনতি বললে—শুনেছ?

—কি?

—ছপুরে আজ খবর এসেছে, যে ভূতনাথবাবু যে ছেলেটা যুদ্ধে গিয়েছিল প্লেন-ক্র্যাশে মরে গেছে।

—সে কি। ভূতনাথবাবু খবর পেয়েছেন?

—তা জানি না। পেয়েছে বোধ হয়।—মিনতি নিজের কাজে চলে গেল। খেতে পারলাম না আর। ক্ষিধে মরে গেল। মিষ্টি চা য়ুহুর্ভে তৈতো হয়ে উঠল।

উঠে গেলাম। বাইরে, বাগানে একা বসে ভূতনাথবাবুর কথাই ভাবছি; একটু বাদে তিনি নিজেই এসে হাজির।

—শুনেছেন মশাই?

—বললাম, হ্যাঁ।

—কে বললে?

—সকলেই বলছে। এসব কথা বলবার লোকের কি অভাব হয়?

—দ্যার্ট্‌স রাইট। ভূতনাথবাবু সায় দিলেন। এই দেখুন, কি লিখেছে নেলসন।

—কি?

—পড়ে দেখুন।

তিনি একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। তাতে কিছুই লেখা নেই। শুধু হিজিবিজি কালির দাগ।

—পড়তে পারছেন না? লিখেছে, হি ওয়াজ এ ব্রেড সোলজার।—বলেই হঠাৎ তিনি কঁদে উঠলেন।

তার কান্না দেখে আজ সত্যিই আশ্চর্য হলাম। শুধালাম, কি হ'ল? কঁাদছেন কেন?

—কঁাদব না? আমার ছেলে মরে গেল যে! কার জন্তে আর বেঁচে থাকব?

—আপনার মেয়ে রয়েছে ত।

—কে, নবাবনন্দিনী?

—হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি জান না, মা আমার ভিখারিণী সেজেছে। মা আমার ভিখারিণী সেজেছে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

শুধালাম—কোথায় চললেন?

—অনেক দূরে। নেলসন আমার জন্তে প্লেন নিয়ে হাজির হবে, তাতে করে ধোকাকে দেখতে যাব।—খানিক গিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি। বললেন—কেউ যদি নবাবের খোঁজ করে, বলে দিও যে বাংলার নবাব মারা গেছে।

ভূতনাথবাবু চলে গেছেন। বাগানে আবার আমি আগের মতই একা বসে। মনটা বেদনায় ভরপুর। সময়ের খেলা নেই। সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, তারায় তারায় ভরে গেছে রাতের আকাশ।

হঠাৎ ব্যস্তভাবে শিবনাথবাবু হাজির হলেন।

—দাদাকে দেখেছেন?

—কই, না তো।

—এখানে আসে নি?

—এসেছিলেন। তা প্রায় ছ'ঘণ্টার ওপর হবে।

—তাই তো। কোথায় গেল।

উদ্ভ্রান্তের মত তিনি পথে নামলেন। আমিও সঙ্গ নিলাম, প্রায় সারাটা রাত খোঁজাখুঁজি চলল। কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে স্টেশন থেকে খবর পাওয়া গেল, কে এক বাঙালী ভদ্রলোক নাকি ট্রেনে কাটা পড়েছে।

ছুটে গেলাম আমরা। ভূতনাথবাবুই। চেনা শব্দ। মাথাটা একপাশে ছিটকে পড়েছে। পা ছোটো ধোঁলে গিয়েছে।

সব শুনে মিনতি বলে উঠল—আহা রে!

পাশের বাড়ীর অসহায় মেয়েটার আহুল কান্না তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওর কান্নার চেয়েও আমার বুকে আঘাত হানছে ভদ্রলোকের শেষ কথাগুলো—বলে দিও যে বাংলার নবাব মারা গেছে।



যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দ্বিযাশী বংসর হইল আমেরিকার পূর্ব-উপকূলস্থ পেনসিলভানিয়া ষ্টেটের টিটস্‌ভিল অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের উৎস আবিষ্কৃত হইবার পরই বর্তমান পেট্রোলিয়াম শিল্পের প্রবর্তন হয়। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম-ভাণ্ডারের শতকরা ষাট ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলিয়ামের বিদ্যমানতার উপযোগী পার্শ্বত্যা অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শতকরা পনের ভাগ মাত্র। মধ্য-প্রাচ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপমালা পেট্রোলিয়ামের অত্যন্ত প্রধান ভাণ্ডার বলিয়া পরিগণিত।

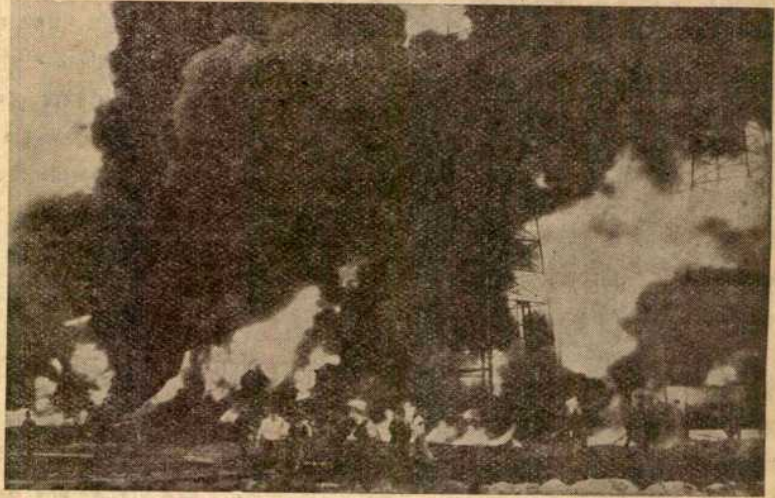
প্রাগ যুদ্ধ পৃথিবীতে প্রতি বংসর ২০,০০০ বেরেল পেট্রোলিয়াম খরচ হইত, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার অল্পপাতে মাথাপিছু এক বেরেল করিয়া লাগিত। যেহেতু যুদ্ধোত্তর-বহু লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নততর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে সেইজন্য প্রতি বংসর উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা তৈলের চাহিদা কয়েক গুণ বেশী বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

উৎস হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কৃত তৈলকে (Crude oil) বিশোধন করিয়া বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম-পদার্থে পরিণত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় চারি শতটি তৈল বিশোধনাগার আছে, সেগুলিতে আন্দাজ ১১০,০০০ জন রাসায়নিক, এঞ্জিনিয়ার এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অভিজ্ঞ কর্মী নিযুক্ত আছেন।

গোড়ায় তৈল পরিষ্কারের পদ্ধতি ছিল খুবই সহজ, সরল। তখন অপরিষ্কৃত তৈল পাম্প করিয়া একটি নলাকার বকযন্ত্রে নিক্ষেপ করণান্তর উত্তপ্ত করা হইত। ঐ তৈলের তাপ ক্রমবর্দ্ধমান হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে নীচেকার ফুটন্ত তৈলাংশকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া, একটি যন্ত্রের সাহায্যে উঁহাকে ঘনীকৃত করা হইত। তৎপর অপেক্ষাকৃত কম উদ্ভাবী (volatile) অংশসমূহকে পরিষ্কৃত করা হইত এবং যে পর্যন্ত না পরিষ্কারযোগ্য সমুদয় বস্তু অপসৃত হইত সেই পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিত। তখনকার দিনে যন্ত্রসমূহের জটিলনিবন্ধন বিভিন্ন পদার্থ প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উপচাইয়া পড়িত। তৈলের বিভিন্ন অংশসমূহকে সূক্ষ্মভাবে পৃথকীকরণের জন্য সাম্প্রতিক তৈল-বিশোধনাগারসমূহে এক ধরনের বুরুজ স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সমস্ত বুরুজে তৈল

পরিষ্কৃতিতে যে মূলনীতি অহুহৃত হয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ। যদি বিভিন্ন ফোর্ট-বিন্দু (boiling point) বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদার্থ একই সঙ্গে পরিষ্কৃত হইতে থাকে তাহা হইলে নিম্নতম ফোর্ট-বিন্দু বিশিষ্ট পদার্থটি সরাসরি বুরুজের একেবারে উপরিভাগে,—যেখানে তাপমান সর্বাপেক্ষা কম—উঠিয়া আসিবে; পক্ষান্তরে উচ্চতম ফোর্টবিন্দুযুক্ত পদার্থটি বুরুজের নিম্নভাগে, সর্বোচ্চ তাপমান সম্বলিত স্থানেই থাকিয়া যাইবে।

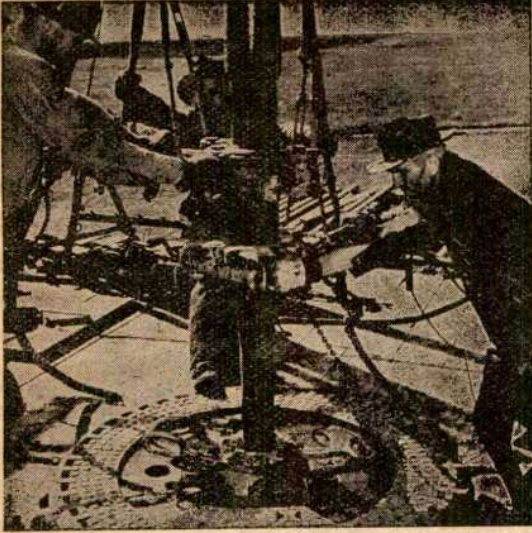
এমনিভাবে তৈল যথারীতি বাষ্পীকৃত হইবার পর তাহা



মধ্য-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে একটি তৈল-ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড

খজু, দীর্ঘ বুরুজের নিম্নাংশে পরস্পর সমান্তরালভাবে স্থাপিত কতকগুলি আধারে (tray) রাখা হয়। অপরিষ্কৃত তৈলের যে ক্ষুদ্র অংশের তাপমান নিম্নতম তাহা বাষ্পাকারে উঠিত হইয়া বুরুজের উচ্চতলে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমান সম্বলিত স্থানে সংস্থাপিত আধারগুলিতে গিয়া জমাট বাঁধে, আর যে অংশ সর্বোচ্চ ফোর্ট-বিন্দু সম্বলিত তাহা নিম্নতম-তলস্থ পাত্রগুলিতে গিয়া ঘনীকৃত হয়।

প্রত্যেক বেরেল অপরিষ্কৃত তৈল হইতে অধিকতর পরিমাণে গ্যাসোলিন পাইবার উদ্দেশ্যে বিদারণ (cracking) প্রক্রিয়া অহুহৃত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মৌলিক তৈলাণু-গুলিকে (original oil molecules) ভাঙিয়া নিম্নজ্জিত তাপ এবং চাপের (heat and pressure) যথায়থ প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী স্বতন্ত্র পদার্থে পরিণত করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়া কালে, কখন কখন আণবিক গঠনে (molecular structure)



যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ ওকিয়াহোমা ষ্টেটের
'ওয়াইল্ডকেট' নামক একটি সঞ্চার লোকেরা
একটি তৈল-কূপ খনন করিতেছে

পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে কোন যোগবাহী পদার্থ (catalyst) বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিকে যোগবাহী বিদারণক্রিয়া (catalytic cracking) বলা হয়।

পরিভ্রাণ প্রক্রিয়ায় বহু প্রকার-ভেদ আছে। যে-সমস্ত সর্বোদ্বাস্যপূর্ণ 'প্লাস্টে' পেট্রোলিয়ামের যাবতীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান, দেশগুলিতে শতকরা ১০০ ভাগ অপরিষ্কৃত তৈলকেই ব্যবহার্য পদার্থে পরিণত করিবার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হইতেছে (১) বিমানের গ্যাসোলিন চর্কি বা তৈলাদি (Lubricants), (২) মটর গ্যাসোলিন ও লুব্রিক্যান্ট, (৩) কেরোসিন, (৪) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হালকা জ্বালানি, (৫) বিবিধ প্রকার অঙ্গুরাগ, (৬) ক্রিম, (৭) নানাপ্রকার মলম (৮) ছাদের উপকরণাদি, (৯) বহু প্রকার তৈল এবং (১০) সিনথেটিক রবার ইত্যাদি।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোলিয়াম শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে ৬৫০,০০০ হইতে ৭০০,০০০ জন কর্মী নিযুক্ত আছে। কর্মীদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ফলে সেখানে এই শিল্পের প্রচুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধকালে মার্কিন সৈন্যবাহিনী এবং মিত্রশক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে তৈল সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল-নালিকা নির্মিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-ভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলস্থ টেক্সাস ষ্টেট হইতে পূর্ব-আটলান্টিক উপকূলস্থ তৈলপ্রধান অঞ্চল নিউইয়র্ক সিটি-ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত ১৪০০ মাইল জুড়িয়া এই সুদীর্ঘ তৈলনালী প্রসারিত।

বাংলাদেশে আউশ ধানের আবাদ

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি

ধবরের কাগজে আসন্ন ঋতুসঙ্কটের বিষয় যতই দেখছি ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। তারপর ঋতু*রেশনের বরাদ্দ কমে গিয়ে যে মাত্রায় দাঁড়াচ্ছে তাতে অনিবার্ণ কঠর-জ্বালায় সর্বদা অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করবার ক্ষমতা থাকবে বলে মনে হয় না। সেই নিদারুণ অবস্থা আসার আগেই মনে যে চিন্তা জেগেছে তা এখানে প্রকাশ করতে চাই।

কেউ কেউ মন্তব্য করছেন পদ্মার চরে ব্যাপক ভাবে আউশ ধানের চাষ করলে ঋতু-সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। জানি না, কয়জনের পদ্মার চর এবং সেই চরে উৎপন্ন আউশ ধানের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। ইচ্ছা করলেই পদ্মার চরে আউশ ধানের আবাদ বাড়ানো যায় না। অধিকাংশ নতুন চরই চক্চকে বালিতে গড়ে ওঠে। সেখানে ধান দূরে থাকুক কোন প্রকার খাদ্য জন্মাতে পারে না। কয়েক বৎসর এই চর ভেঙে না গেলে প্রত্যেক বর্ষার পর উঁচু হয়ে উঠতে থাকে এবং কাশ ও বুনা ঝাউ জন্মালে ক্রমে ক্রমে মাটি পড়ে এই চর চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। পদ্মার গভীর খাতে পলিমাটিযুক্ত নতুন চর কদাচিৎ দেখা যায়। দশ-

বিশ মাইলের মধ্যে হয়ত দুই-তিন বর্গমাইল ধান-চাষের উপযুক্ত উর্বর জমি উঠে থাকে। তখন যাদের জমি এই জায়গায় ছিল সাধারণতঃ সেই সব প্রজারা জমিদারকে নজর-সেলামী দিয়ে এই জমি বন্দোবস্ত করে ধানচাষ শুরু করে দেয়। বলা বাহুল্য, এবার যেখানে অপরিপুষ্ট ধান উৎপন্ন হ'ল পর বৎসর হয়তো সেখানে বালি পড়ে জমি নষ্ট হয়ে গেল। নদীর জলের ধারে উত্তম পলিমাটি সংযুক্ত চরে চাষীরা যে ধানের আবাদ করে তাকে তারা জলি ধান বলে। সম্ভবতঃ জলদি কষ্ট থেকে এই জলি কষ্টটি এসেছে। চাষের পদ্ধতি অনুসারে জলি ধানের চার প্রকার নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন রোয়া জলি, লেপা জলি, টেপা জলি এবং লাঙ্গলা জলি। পৌষের শেষ এবং মাঘের প্রথম অংশ জলিধান চাষের প্রকৃষ্ট সময়। উর্বর পলিযুক্ত চর সাধারণতঃ খুব ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে বেশী জলে নেমে যায়; সুতরাং হাঁটুজল পর্যন্ত জায়গাতেও যদি ভাল মাটি থাকে তবে চাষীরা বুকের নীচে কলাগাছ রেখে জলের মধ্যে বোঁরা ধানের চারা লাগিয়ে দেয়। মাটি এত ধলধলে যে কলাগাছে ভর না রাখলে মাছ পাঁকের

মধ্যে তলিয়ে যায়। জলের ঠিক উপরেই কাদার মধ্যে চাষীরা কলা গাছে ভর রেখে বীজ-ধান ছড়িয়ে হাত দিয়ে বর নিকানোর মত লেপে দেয়—এই কারণে এরূপ জমির ধানকে বলে লেপা জলি। এই ধলধলে কাদার ঠিক উপরেই যেখানে মাছ কানওরূপে বসতে পারে সেখানে চাষীরা আঁচল ভরে বীজধান নিয়ে সার বেঁধে ধান টিপে টিপে দিতে থাকে। একে বলে টেপা জলি। এর উপরে শুকনো মাটিতে সাধারণ ভাবে হাল-গরু ছুঁড়ে চাষ দিয়ে ধান ছিটিয়ে বুনেতে হয়। একে চাষীরা লাললা জলি বলে। অবশ্য এরূপ জমিতে চাষ দিতেও খুব বেগ পেতে হয়। কারণ নিরেট এঁটেল মাটি শুকানোর সময় তার ভিতর থেকে বাষ্প বের হবার কালে জমিতে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে খুব শাবধানে হাল-চালনা করতে হয়, তবু ফাটলের মধ্যে পা পড়ে গিয়ে অনেক সময় গরু জখম হয়ে থাকে। সুতরাং জলি ধানের চাষ অনেকটা সোজা হলেও এটা যে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। সুবিধার মধ্যে এই যে বীজ-ধান বোনা বা ধানের চারা রোপণ করার পর আর বিশেষ কোন যত্ন নেবার দরকার হয় না। ধানের চারাগুলি বড় হয়ে উঠলে তার মাঝে মাঝে কাশঝাড় বা বুনা ঝাউ চারা দেখা দিলে সেগুলি উপড়ে তুলে ফেলে দিলেই চলে।

এখন এই জলি-ধান চাষের প্রধান বিঘ্নের কথা বলা যাচ্ছে। যদিও আগে আগে মাঝ-কান্ধনের বৃষ্টির জল পেয়ে চাষ দিয়ে বোনা বীজ-ধান অঙ্কুরিত হ'ত এবং নীচের জমির চারাগুলিও সতেজ হয়ে বেড়ে উঠত, কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে এই সময় বৃষ্টি না হওয়ায় তা হতে পারছে না। ধানগাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে বৈশাখ মাসের মধ্যে না পাকলে বৈশাখ থেকে পদ্মার জল বেড়ে ওঠায় এই সব অতি নীচ জায়গার ধান ডুবে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এদিকে চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে ধানগাছ ফীত হওয়ার সময় বৃষ্টি না পেলে কৃষকের সকল মেহনত পণ্ড হয়ে যায়। গত বৎসর ভালবেড়ে, শিলাইদহ ও হাসিমপুরের নীচে পদ্মার চরে জলি ধান প্রথমতঃ খুব ভাল দেখা গেলেও ফীত হবার সময় বৃষ্টি না পাওয়ায় ধানের ফলন মোটেই ভাল হয় নাই। সময়মত বৃষ্টির জল পেলে এই সব চরে জলি ধানের ফলন সম্ভব বেশী হয়। বিধা প্রতি ২০ মণ ধান প্রায়ই ফলতে দেখা যায়। ইটালি দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের কলে বিধা প্রতি গড়ে সাড়ে আঠার মন ধান ফলে থাকে এবং পৃথিবীর মধ্যে ঐ দেশের ধানের ফলনই সবচেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে গড়পড়তা বিধা প্রতি ধানের ফলন মাত্র সাড়ে পাঁচ মণ। এই অতি উর্বর চরের জমিকে চাষীরা আদর করে বলে “আমাদের জমি ডাক দিলে কথা কয়।” কিন্তু সময়মত বৃষ্টি না হলে জমির এত কাছে পদ্মার অপরাধী জল থাকা সত্ত্বেও চাষীকে ঝালি হাতে ঘরে ফিরতে হয়। তাদের

সকল পরিশ্রম নিরর্থক হয়ে যায়—আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। শুনতে পাই হল্যাণ্ডে সমুদ্র-তীরে পর্যন্ত বাঁধ দিয়ে লোকে চাষাবাস করে। অপরাধী ফসল ফলিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় কিন্তু আমাদের দেশে হাতের কাছে জল থাকতেও আমরা সে জল কাজে লাগাতে পারি না—ফলে না বেয়ে অথবা আধ-পেটা খেয়ে আমাদের দিন কাটাতে হয়। চরের চাষীরা জমিতে জল দিয়ে ফসল কলানোর কথা ভাবতেই পারে না। তারা চাতকের মত আকাশের পানে চেয়ে থাকে, সময়মত দৈব যদি মুখ তুলে চান তবে অঠেল ফসল পায় নতুবা তাদের চোখের সামনেই ধানগাছগুলি শুকিয়ে নেতিয়ে যেতে থাকে—খোঁড় ধানের শীষ অল্প একটু বেরিয়েই গাছ তামাটে রং ধরে মরে যেতে থাকে। কোনও প্রতিকারের চেষ্টা তারা করে না—এর যে প্রতিকার করা যায় তা ভাবতেও তারা পারে না। সবই অদৃষ্ট আর ভগবানের হাত ভেবে সকল প্রকারের কষ্ট এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তারা বিনা প্রতিবাদে বরণ করে নেয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের তো এত সহ্য করা শোভা পায় না। আগে অনারবুটির দরুন শত্ৰুহানি পাঁচ-দশ বৎসরে একবার ঘটত কিন্তু এখন যখন এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে, অজ্ঞান ধাতাভাব যখন লেগেই আছে তখন এর প্রতিকার করতেই হবে। বিজ্ঞানের সামান্য সাহায্য নিয়ে অনারবুটির ক্রুটি-ভুলি সহজেই এড়ান যেতে পারে। গবর্ণমেন্ট একটু মনোযোগী হলেই বাংলার পদ্মার চরে যে সব জলি ধানের জমি আছে তাতে প্রচুর শত্ৰু উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। যুদ্ধের সময় এদেশে অনেক ট্রেলর-পাম্প এসেছে। ৩০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট একটি পাম্পে ঘণ্টায় দুই গ্যালন পেট্রল দরকার হয় এবং তাতে ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার গ্যালন জল তোলা যায়। এরূপ একটি পাম্পের দামও মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা। এখন চৈত্র মাস থেকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত যদি কয়েকটি ট্রেলর-পাম্প মোটর-লঞ্চে করে মালদহ থেকে আরম্ভ করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত পদ্মার মধ্যে ঘুরে যেখানে যেখানে জলিধানের জমিতে জলের দরকার সেখানে গবর্ণমেন্ট থেকে জল দেবার ব্যবস্থা হয় তবে ঐ ধান এত বেশী জন্মাতে পারে যে তাতে বহু লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থান হতে পারে। ঐ সব নতুন চরের বিস্তার সাধারণতঃ বেশী নয় বলে ঐ পাম্পের সাহায্যে জল দেওয়ার খুবই সুবিধা। তারপর পদ্মাতীরস্থ অপেক্ষাকৃত উঁচু চরে বৃষ্টির অভাবে চৈত্রের শেষে যেখানে ধান বুনা যাচ্ছে না অথচ দেরিতে বুনলে যে সব অল্পচর চরের ধান আষাঢ়ের শেষে ডুবে নষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা সে সব স্থানে পাম্পের সাহায্যে জল সেচন করলে খুব ভাল ফসল হতে পারে। শুধু পদ্মা নদী কেন বাংলা দেশের বহু নদী-স্রিহিত অল্পচর উর্বর চরগুলিতে এই ভাবে জল সেচনে আউশ ধানের চাষ খুব ভাল ভাবে করা যেতে পারে এবং তাতে দেশের

অগণিত চাষী ও অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের অস্বাভাব মিটিতে পারে। এ বিষয়ে এত দিন সরকারের দৃষ্টি পড়ে নাই তাই আক্ষেপ করে বলতে হয় এদেশের নিরক্ষর চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুরও মরণ-বাঁচন সমস্তার দৈবের পানে চেয়েই দিন কাটাচ্ছেন।

বাংলার চাষীরা নিরক্ষর হলেও নেমকহারাম নয়। উপকার পেলে প্রতিদান দিতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। স্তত্রাং গবর্ণমেন্ট যদি ঐ উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে তাদের ধানের ফলন বাড়িয়ে দিতে পারেন তবে ঐ দক্ষাং গবর্ণমেন্টের যে খরচা হবে উপকৃত চাষীদের নিকট টাঁদা করে অনায়াসেই তা আদায় করা যাবে। চরের জমি চাষের একটি মন্ত বড় সুবিধা এই যে এই সকল জমিতে কোনও সার দিতে হয় না। তারপর উন্মুক্ত প্রান্তরে চাষীদের বাস বলে তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই কম। পদ্মার চাঁটকা ইলিশ মাছ প্রভৃতি ধেতে পায় বলে তাদের শরীরও সাধারণতঃ নীরোগ ও বলিষ্ঠ। একমাত্র জলসেচনের সুব্যবস্থা হলেই চরের চাষীদের সম্বলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তাদের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট থাকে দেশের বহু লোকের খাজাভাব দূর করা যেতে পারে।

এর পর নদী থেকে দূরে এবং বার্ষিক প্রাবনে যে সব মাঠ ভেবে না সেখানে আউশ ধান চাষের কথা বলা যাচ্ছে। সুবৃষ্টি পেলে এবং পোশালাস সার প্রভৃতি মাঝে মাঝে দিলে ঐ সব মাঠেও ধান ভালই জন্মে। কলকাতার নিকটেই রাণাঘাট মহকুমায় প্রচুর আউশ ধান জন্মে এবং আড়ংঘাটা ষ্টেশন থেকে ঐ ধান বিভিন্ন স্থানে চালান যায়। এই সব স্থানে প্রাবনের পলি পড়ে না, স্তত্রাং জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক—তারপর এই সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও খুব বেশী। স্তত্রাং এই অঞ্চলে সন্তোষজনকভাবে আউশ ধানের চাষ করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার—জলসেচনের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত সার সুবিধা দরে সরবরাহ করা এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ করা। দেশে সাময়িক বৃষ্টি যখন ক্রমশই দুর্লভ হয়ে পড়ছে তখন এই সব স্থানে খাল ও বড় পুকুর কেটে বা মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে নলকূপ বসিয়ে উপযুক্ত পাম্পের সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভারতীয় কৃষিবিভাগের গবেষণায় স্থিরীকৃত হয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ জমিতে পটাশ এবং কস্ফেট সারের ঘাটতি বিশেষ নাই, প্রধান অভাব হচ্ছে নাইট্রোজেনযুক্ত উদ্ভিদ-বাদ্যের। এমোনিয়াম সালফেট এই শ্রেণীর সস্তা সার। পাণ্ডুরে কয়লা থেকে কোক তৈরির সময় অজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে যে এমোনিয়া গ্যাস জন্মে তা থেকে এমোনিয়াম সালফেট তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে এই উপায়ে বার্ষিক ২৬ হাজার টন মাত্র এমোনিয়াম সালফেট

তৈরি হয়ে থাকে। গত যুদ্ধের আগে বার্ষিক ৭৬ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট বিদেশ থেকে আসত। কিন্তু ভারত-বর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে এই পরিমাণ সার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিধাপ্রতি সাড়ে বার সের এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে ধানের ফলন শতকরা ৩৩ অংশ বাড়ান যায় বলে জানা গিয়েছে। আজকাল সকল সম্ভাব্যদেশেই সুবিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক হাবারের উদ্ভাবিত উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে লক্ষ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে এবং তার সাহায্যে পর্যাপ্ত ধাদ্যশস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ধানবাদের নিকট কারখানা স্থাপন করে বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট ঐ উপায়ে প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করেছেন। এতে দেশে ধাদ্যশস্ত্র উৎপাদনের যথেষ্ট সহায়তা হবে বলে আশা করা যায়।

এর পরে ম্যালেরিয়া নিবারণের কথা। বাংলাদেশের যে সব উঁচু গ্রামে বর্ষার জল প্রবেশ করে না সে সব গ্রাম ম্যালেরিয়ার ডিপো বলে সকলেই জানেন। এ সব গ্রামে কৃষকেরা বর্ষার পরেই ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়, অনেকে প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে থাকে তারাও গ্রীষ্ম যত্নের ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে কান্ডন মাস পর্যন্ত এর জ্বর চান। স্তত্রাং আউশ ধান কাটার পর রবিষন্দের চাষ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই সময় জমিতে তিন-চার বার চাষ দিয়ে মটর, ছোলা প্রভৃতি বুনলে জমি পরিকার থাকে, চাষীর ডালের লংহান হয়, আর এই সব শস্তের চাষ হেতু ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার জমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার সঞ্চিত হয় কিন্তু রোগপ্রিষ্ট চাষী এ সুযোগ নিতে না পারায় জমিতে কাশ, দুর্বা প্রভৃতি ঘাস গজিয়ে উঠে পরবর্তী ধানের ফসলেরও বিঘ্ন ঘটায়। মধ্য ও পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ফলে চাষীর অভাবে অনেক উর্বর জমি ক্রমশঃ পতিত জমিতে পরিণত হচ্ছে। শুনা যায়, ত্রাশদেশের যুদ্ধে সৈন্তপ্রেরণের পূর্বে বিমানপোত থেকে মশক-বিধ্বংসী ডি-ডি-টি নামক পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়াতে প্রেরিত সৈন্তদের মধ্যে ম্যালেরিয়া দেখা যায় নাই। অত্বরূপ উপায়ে বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামগুলি থেকে মশক তথা ম্যালেরিয়া দূর না করলে চাষীর অভাবে দেশের অনেক ভাল জমি অনাবাদী পড়ে থাকবে, ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে অভাব-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। ধাদ্যশস্ত্র-সমাধানের যে উপায়গুলির উল্লেখ করা হ'ল আশা করি গবর্ণমেন্ট সেগুলি অবিলম্বে কার্যে পরিণত করবেন। *

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা-কক্ষে পঠিত।

মহারাজ্ঞে নারী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মহারাজ্ঞে নারীর স্থান অনেক বিষয়েই বাঙালী নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহারাজ্ঞে পর্দাপ্রথা অতি সীমাবদ্ধ। সে দেশে কঠোর পর্দাপ্রথা শুধু জায়গীরদার, সর্দার প্রভৃতি সম্রাট কজ্রিয়-শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। রাজপরিবারের মধ্যে এই পর্দাপ্রথার আরও কড়া কড়ি। মহারানী-সাহেবা ও রাজ-অন্তঃপুরের অন্তঃ নারীরা কখনও জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হন না। মহারানী-সাহেবা যখন মোটরে করিয়া বেড়াইতে যান, তখন সুরহং বহু মূল্যবান গাড়ীর জানালা নেটের পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে; যখন চার ঘোড়ার গাড়ীতে যান তখনও তাঁহার জানালা রঙীন চিত্রকরা চিকে ঢাকা থাকে। কখনও দেখা যায় যে মহারানী-সাহেবার পুত্র গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, অথচ পথিকেরা সম্ভ্রম হইয়া স-সম্মুখে সেলাম ঠুকিতেছে, কারণ মহারানীকে কেহ দেখিতে পায় না, তাঁহার গাড়ী দেখিলেই তিনি যাইতেছেন ধরিয়া লয়। মহারানী-সাহেবা যখন রাজধানী হইতে অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন তখন মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিশিষ্ট রাজকর্ম-চারীরা তাঁহাকে সম্বর্জন করিতে ষ্টেশনে যান, কিন্তু হৃৎকের বিষয় মহারানীর দর্শন লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। কারণ রেল হইতে নামিবার সময় চোপদার ও সাজীরা রেলের কামরার দরজার সুরহং মশারি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মহারানী তাহার আড়াল দিয়া মোটরে উঠেন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্তঃপুর কর্মচারীরা মহারানীকে না দেখিয়াই কুনিশ করিয়া থাকেন।

বহু বৎসর পূর্বে একবার মহিলাদের এক বিশেষ সভায় মহারানীকে সভানেত্রী করা হইয়াছিল। আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। মহারানী আসিবার নির্দিষ্ট সময়ে চারিদিকে হৈ চৈ মহা কলরব পড়িয়া গেল। নকীব মহারানীর আগমন-বার্তা ঘোষণা করিলে মহিলাদের ও শিশুদের কলরব শান্ত হইল; অভ্যর্থনাকারিণীরা শশব্যস্তে মহারানী-সাহেবাকে আনিতে ছুটিলেন, ব্যাঙ বাজিয়া উঠিল, মোটরের দরজার দু-পাশে চোপদাররা মূল্যবান রেশমী বস্ত্র ধরিয়া হলের দরজা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল, মহারানীসাহেবা তাহার আড়ালে থাকিয়া সামু-বিছানো রাস্তা দিয়া হলে প্রবেশ করিলেন। এই দৃশ্যটা আমার কাছে বড়ই কৌতুকপূর্ণ মনে হওয়ায় তাহার স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে।

রাজরানী কঠোর পর্দার আড়ালে থাকিলেও রাজভগিনী কোন পর্দা মানেন না। সদর রাস্তা দিয়া ঘোড়ার চড়িয়া মহারাজ্ঞের সহিত প্রাতঃস্নানার্থে বাহির হইয়া থাকেন। পর্দা-প্রথাওয়লা সর্দার ও জায়গীরদার-গৃহিণীরাও সকলের সামনে বাহির হন না। আধুনিক যুগে তাঁহাদের প্রধান যান মোটর। তবে সময়বিশেষে ঘোড়ার গাড়ীতে বা বলদটোরা সজ্জ

গাড়ীতেও যাতায়াত করেন। সেই সব গাড়ীর জানালায় রঙীন চিক্ ফেলিয়া রাখা হয়, এবং আশপাশে ছই জন সিপাহী থাকে। ভিতরে আরোহিণী ও সঙ্গে খাদ-দাসী। যে গৃহে ধনাঢ্য গৃহিণী পদার্পণ করিবেন, সেই গৃহে চাপরাসীরা গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহিণীর আগমন-সংবাদ জানাইবে, গৃহের পুরুষেরা শশব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুর দিয়া গেলেন তবে শুদ্ধমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন। গৃহস্থানী বা গৃহের কোন পুরুষ মহিলাদিগকে কথাবার্তা বা সৌজন্যে আপ্যায়িত করিতে আসিবেন না। তবে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দু-চারটি পরিবার আধুনিক সভ্যতার অনুসরণ-কারী; জীলোকেরা পর্দা উঠাইয়া দিয়াছেন ও প্রকাশ্য ভাবে চলাকেরা করেন এবং সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। মারাঠা দেশে পর্দা থাকিলেও ঘোমটার বহর নাই। সে দেশের পর্দানশীনা নারীরা বাঙালী ও মাদ্রাসারী পুরুষ-ললনাদের মত সুদীর্ঘ ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখেন না। বরং তাঁহাদের সামান্য ঘোমটা মুখচক্ষুমাঝ সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

উপরে বর্ণিত সমাজের স্বল্পসংখ্যক নারীদের মধ্যে ছাড়া মহারাজ্ঞে পর্দা-প্রথার চলন নাই। অন্তঃপুরের নারীরা মুক্ত ভাবে চলাকেরা করেন। ব্রাহ্মণ জীলোকেরা মাথায় ঘোমটা পর্যন্ত দেন না। নিম্নশ্রেণীর জীলোকেরা সর্বদেশেই অব্যবহা-চলাকেরা করে, কিন্তু মহারাজ্ঞে সর্বশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের, পর্দার অভাবটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রকৃত্তে তাহাদের এমন সহজ সুলভ সরল গতি যে তাহাতে নিম্ননীয় কিছুই নাই। পুরুষদের আচরণও প্রশংসনীয়। রাস্তায় দলে দলে কত বয়সের কত রকমের মহিলা চলাকেরা করেন কিন্তু কোন পুরুষ কোন রূপ অভদ্র আচরণ বা অশিষ্ট ব্যবহারে মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে না।

মহারাজ্ঞীয় মহিলাদের পোশাকেরও বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁরা আমাদের দেশের মত সেমিজ পেটিকেট পরেন না। তাঁদের আসল পোশাক হইল আঠারো হাত রঙীন শাড়ী। তার আঁচল খুব চটকদার। তাঁরা শাড়ী কাছা দিয়ে পরেন এবং গায়ে ঢোলী দেন। ঢোলী অনেকটা আমাদের রাউন্ডের মত কিন্তু শুধু বক্ষদেশ আবৃত করিয়া রাখে, পিঠের ও পেটের কিছু অংশ অনাবৃত থাকে। তবে আজকাল তত্ত্ববৎসীয়ারা আমাদের মতই পুরাপুরি রাউন্ড পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহারাজ্ঞীয় মহিলারা সর্বদা রঙীন শাড়ীই পরেন, তারা সামান্য পক্ষপাতী নন, কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ পোশাকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষিতা মেয়েরা কাছা দিয়া শাড়ী পরিবার বিশেষ পক্ষপাতী নয়, তাহারা

বাঙালীদের দ্বারা স্থানীয় পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী এবং ব্লাউস পেটিকোট পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই আধুনিক বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয় মহিলার বিশেষ কোন পার্থক্য বোঝা যায় না।

মহারাষ্ট্রীয় নারীরা, কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা সবাই, বোঁপায় কুল গুঁজিতে ভালবাসে এবং রোজই স্নানান্তে প্রসাধন করিয়া বোঁপায় একটি গোলাপ, নয়ত এক শুঁছ বেলী বা চামেলী বা একটা চাপা, নিদেনপক্ষে এক টুকরা কেয়া পাভা ভাঁজ করিয়া দিবেই। তাহাদের কর্ণভূষণ আমাদের দেশীয় মূল বা কুল জাতীয় না হওয়ার বৈষম্য লক্ষিত হয়। তাহারা পাঁচটি মুক্তা-বসানো সোনার কুল কানে পরে। যাহারা খুব ধনী তাহারা মূল্যবান পাঁচটি হীরা-বসান কুল, আর মধ্যবিত্তেরা নকল মুক্তার কুল পরিয়া থাকে। তাহাদের গয়না প্রায় আমাদের দেশের মতই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা অত্যন্ত রমণীদের মতই অলঙ্কারপ্রিয়, হাতে কঁকন চুড়ি, গলায় হার, কানে কুল, নাকে নাকছাবি, তবে আমাদের দেশের মত নোলক নাই তার পরিবর্তে নখের খুব প্রচলন আছে। নখ এয়োজীর একটি লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ শুভাশুভানে গৃহিণীদের মুক্তা-বসানো নখ পরিতেই হয়, এবং বিবাহে নখ যোঁতুক দিতে হয়। আমাদের দেশে সখবার চিহ্ন হাতের নোয়া, ঐ দেশে সখবার চিহ্ন মঙ্গল-হস্ত। মঙ্গলহস্ত হইল এক রকম ছোট ছোট কাল পুঁতি স্থতার গাঁথিয়া গলায় পরিবার জন্ত তৈরি হার, অবস্থাপন্ন মেয়েরা সোনা দিয়া গাঁথিয়া ও ছোট লকেট লাগাইয়া হারটিকে সজ্জা করিয়া গলায় ধারণ করে। ঐ দেশে সিঁধিতে কেউ সিঁহুর পরে না, কিন্তু কুমারী ও সখবা উভয়েই কপালে সিঁহুরের কোঁটা দেয়, কাজেই একমাত্র মঙ্গলহস্ত দিয়া কুমারী ও সখবা-বিধবার পার্থক্য বোঝা যায়। দেশস্থ ব্রাহ্মণ মহিলারা কপালে খুব বড় সিঁহুরের কোঁটা পরে, কোকনস্থ ব্রাহ্মণীরা কিঞ্চিৎ ছোট কোঁটা পরে।

ঐ দেশে সখবার ও বিধবার পোশাকে কোন পার্থক্য নাই। যে শ্রেণীর এবং যে বয়সেরই বিধবা হউক না কেন, অত্যন্ত সখবাদের মত বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা থাকে, শুধু গলায় মঙ্গলহস্ত ও কপালে সিঁহুরের কোঁটা সখবা বিধবার প্রভেদ বুঝায়। ঐ দেশে বাদ্য বিষয়েও সখবা বিধবার কোন পার্থক্য নাই। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-সমাজ নিরামিষভোজী কিন্তু তাহারা পৈরাজ রত্নন খায়, কাজেই ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলাদেরও সেই একই বাদ্য।

কত্রিয়-সমাজ আমিষভোজী, তাহাদের বিধবারাও আমিষ-ভোজী। বিধবা হইলে আমাদের দেশের বিধবাদের মত নিরামিষ খাইতে হইবে এমন কোন বিধান তাহাদের নাই। সখবা-বিধবার একই বাদ্য, একই পোশাক, বিধবাদের জন্ত কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় না। আমাদের দেশের বিধবাদের আহারে আমিষ নিষিদ্ধ আছে, তাহার উপর ময়ূর ডাল, কলাই ডাল, পৈরাজ, রত্নন ইত্যাদিও বর্জন করা হয়।

বাংলাদেশে দেখা যায় যত আচার-নিয়ম, যত রকম সংযম-শিক্ষা, তার অধিকাংশই শুধু বিধবাদের জন্ত, মহারাষ্ট্রে সেরকম নয়। বাংলার প্রতি হিন্দুগৃহে সখবা ও বিধবার পার্থক্য সত্যত দৃষ্টিগোচর হয়। আশ্চর্যের বিষয় বাঙালী ছাড়া মারাঠী, মাদ্রাজী, গুজরাটী কাহারও মধ্যে বিধবার জন্ত এই কঠোর নিয়ম ও কৃচ্ছ সাধনের বিধান দেখি না।

মহারাষ্ট্রে সখবাবিধবার বাদ্য, পোশাক ও অলঙ্কারে বিশেষ কোন বৈষম্য না থাকায় বিধবাদের জীবনযাত্রা ক্লেশহারক হয় না। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে বিধবা মহিলারা সিঁহুর না ধেওয়ার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু কাল পূর্বে নাসিকে বিধবারা একত্র হইয়া হলদি কুহুম (ইহা এয়োজীদের জন্য) অশুষ্ঠান করিয়াছে এবং কপালে সিঁহুরের কোঁটা পরিয়া বৈষম্যের এই পার্থক্য দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে কপালে সিঁহুর পরা বিধবা দেখা যায়। তাহারা বলে, ‘আমরা জনসমাজে আমাদের রক্তক নাই একথা কেন জানাইব?’ তবে মহারাষ্ট্রীয় গৌড়া ব্রাহ্মণ-সমাজে এক প্রথা অল্পসারে বিধবারা মস্তক মুগুন করে, গায়ে কোন অন্তর্বাঁস ধারণ করে না, একথানা পাড়হীন লালশাড়ী দিয়া আপাদমস্তক আবৃত রাখে। আমাদের দেশের ষেতবসনা ও তাহাদের রক্তবসনা প্রায় একই রকমের।

দৈনন্দিন কর্মজীবনে মহারাষ্ট্রীয় নারীদের বাহিরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রের বহু স্থানে নিত্যন্ত জলাভাব, মারাঠি বধূরা বা কস্তারা হয় মাইলের পর মাইল পথ ভাঙিয়া নদী হইতে জল আনিতেছে, নয়ত ঐন্দের কুয়া হইতে দড়ি টানিয়া জল তুলিতেছে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ঐন্দের মেয়েরা নহরে মাখন ও তরিতরকারী বিক্রয় করিতে আসে, ক্রোশ ক্রোশ পথ ভাঙিয়া মধ্যাহ্নে একটা ভারি জোয়ারের রুট একটু আচার সহযোগে খাইয়া দিনান্তে হাসিমুখে বাড়ী ফিরিতেছে। মহারাষ্ট্র পার্শ্বত্যা দেশ, কাজেই পথ অতিক্রম করা অতি কষ্টসাধ্য। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌদিদেরও দেখা যায় হুদে বা নদীতে গিয়া তাহাদের আঁঠরো হাত শাড়ী কুচিতেছে, রাত্তার পাশে বা পাড়ার কাহারও বাড়িতে গিয়া টিউব-ওয়েল হইতে পাম্প করিয়া কলসী কলসী জল ভরিতেছে। কখনও কেহ কেহ ধলে হাতে করিয়া বাজার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের আহারে বিশেষ বাহুল্য নাই, কাজেই তাহাদের রন্ধন সংক্ষিপ্ত থাকায় সময়ভাব হয় না। বিকালে ধনী দরিদ্র অধিকাংশ গৃহের জী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েরা ভ্রমণে বাহির হইয়া যায়। এই বৈকালিক ভ্রমণ মেয়েদের জীবনে বৈচিত্র্য আনে, স্বাস্থ্য আনে। মুক্ত বায়ু মেয়েদের দেহ ও মন উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন করে।

এ ছাড়া মেয়েদের আরও বহু আনন্দের উপাদান আছে। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়া গুজিয়া দেবালয়ে যাওয়া একটা মহা আনন্দের ব্যাপার। যে-কোন বড় উৎসব

(যেমন দেওয়ালী, সংক্রান্তি, শিবরাত্রি, আষাঢ়ে একাদশী ইত্যাদি) উপলক্ষ্যে মেয়েদের শাড়ী ও অলঙ্কার দেখিবার বস্তু। বড় মন্দিরের অঙ্গন নানা বর্ণের নানা বয়সের মহিলায় পূর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের কাছা দেওয়া রঙীন শাড়ী, রঙীন আঁচল আর পুষ্পমালাশোভিত বোঁপা নওরোজ হাটের স্রষ্টা করে। মেয়েরা কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, কেহ পূজা দিতেছে, কেহ বা পরিচিতা বাস্তবীর দর্শন পাইয়া গল্পে-সঙ্গে ব্যস্ত, কেউ বা পার্শ্ববর্তী দোকান হইতে বেলনা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি কিনিতেছে, সকলেরই মনে আনন্দ ও উৎসাহ। তা ছাড়া কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে মেয়েদের মধ্যে নাচের প্রচলন আছে। বিবাহ বা অল্প কোন শুভ অমুষ্ঠানে ভদ্রবরের বৌবিরদের “কুগরী” নাচ ও গান হয়; দুই জন মেয়ে হাতে হাতে ধরিয়া এই নাচ নাচে। ইহা বড় সুন্দর ও শ্রমসাধ্য। গৌরীপূজা অর্থাৎ আমাদের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মাসাবধি মেয়েদের নাচগান চলিতে থাকে। সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে আঙ্ককাল এই নাচ কম। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে এই নাচগান খুব চলে। প্রচুর উৎসাহে তাহারা রাতের পর রাত গানের সঙ্গে সঙ্গে কুগরী ও অজ্ঞাত নাচ পুরাদমে নাচিয়া থাকে। শুধু যে ছোট মেয়েরাই নাচে তাহা নহে, বড়দেরও বেশ উৎসাহ দেখা যায়। সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা কুগরী নাচ, ব্যাং নাচ, তুলা নাচ, ঘোড়া নাচ ইত্যাদি নাচিয়া থাকে। প্রত্যেক নাচেই খুব পরিশ্রম হয়। নাচিবার আগে মেয়েরা গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করে ও তারপর নাচিতে থাকে এবং নাচের মধ্যে মধ্যে “কুই কুই” করিয়া মুখে বলিতে থাকে। আঙ্ককাল ‘ভগিনী’-সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্রাজ্ঞ মহিলারা কুগরী নাচ ও ‘কুই কুই’ নাচ নাচিয়া থাকেন এবং নাচে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পান।

এই নাচগুলি বিশেষ দর্শনীয়। আমি পাড়ার মেয়েদের নিকট হইতে কয়েকটি নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে গানের বিষয় গৃহস্থ-ঘরের দৈনন্দিন কাজ ও ঘটনা। বৌ দই হইতে মাধন তুলিতেছে, দইয়ের হাঁড়িটা উ-টাইয়া দই মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল, শান্তভী দেখিয়া খুব বকিতে লাগিল; বৌ তুলা ধুনিতে তুলা রোজে দিল, হাওয়ার তুলা উড়িয়া গেল—ইত্যাদি ছোট ছোট কৌতুকপ্রদ গল্প-গানের মধ্য দিয়া বলিয়া নেয় ও তারপর মেয়েরা ‘কুই কুই’ করিতে করিতে নাচিতে থাকে। এ সব নাচ বাস্তবিকই উপভোগ্য।

বর্ষায় যখন নূতন জল নদীর কূল ছাপাইয়া চারিদিক ডুবাইয়া দেয়, তখন দেখা যায় দলে দলে বৌবিররা তাহা দেখিতে ছুটিয়াছে। তা ছাড়া কবে কোথায় শোভাযাত্রা হইবে মেয়েরা তাহার খবর রাখে এবং শোভাযাত্রা দেখিতে যায়। এইভাবে তাহাদের জীবনে সাধারণ ও বিশেষ আনন্দের অভাব নাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকায় তাহাদের জীবনের গতি

সহজ স্বচ্ছন্দ ও তাহারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। মহারাষ্ট্রীয় নারীর ব্যক্তিত্বের কথা বলিতে গেলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার উল্লেখ করিতে হয়। মেয়েরা গ্রাম হইতে শহরের বাজারে গিয়া যে শাকসব্জী, মাখন ইত্যাদি বিক্রয় করে, তাহার আয় সাধারণতঃ মেয়েদেরই থাকে—এটা তাহাদের নিজস্ব স্ত্রী-ধন। তাহাতে পুরুষের অধিকার নাই। স্বাধীনতার মধ্যে বর্ধিত হইয়া মহারাষ্ট্রের নারীরা দেহ ও মনের স্বাধীনতার অধিকারিণী হয়। আর আমাদের দেশের বৌবিররা সারাদিন গৃহের হাড়তাক বাটুনী খাটিয়া গলদ্বন্দ্ব, তাহাতে না আছে বিশ্রাম, না আছে আনন্দ। আমি অবস্থা বনীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না, কারণ সর্ব দেশেই বড়-লোকের ঘরের মেয়েরা আনন্দ ও বিলাসের অধিকারিণী।

মহারাষ্ট্রের পুরানো শহরগুলিতে বাড়ীঘর বড় বিস্ত্রী, বহু জনতা পূর্ণ, রাস্তাখাট অতি নোংরা, ঘরে স্বর্যালোক বা মুক্ত-বায়ু অবাধে চলাফেরা করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা খুব কম। নূতন শহর ও আধুনিক রুচি অনুযায়ী বাড়ীগুলি অবশ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই ধরনের বাড়ীঘরের এখনও বহুল প্রচলন হয় নাই। তাই দেখা যায় পর্দা প্রথাওয়াল সর্কার-গৃহিণীদের মধ্যে বহু নারী স্বরোগে অকালমৃত্যু বরণ করেন, কারণ তাহারা মুক্তবায়ু ও স্বর্যালোকহীন গৃহে চিক পর্দা কেলিয়া এক রকম অস্বাস্থ্যমণ্ডা হইয়া থাকেন। শহরের বাকী অধিবাসিনীরা যদি তাহাদের মত পর্দানশীনা হইয়া থাকিত, বাড়ীর বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অবাধে চলাফেরা করিতে না পারিত, তবে তাহাদেরও পরিণাম প্রায় একই হইত।

স্বাস্থ্যের এই দিকটা বড় শহরের অধিবাসিনীদের পক্ষেও খার্টে। কারণ বড় শহরে, যেমন বোম্বাইয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা হয় বড় বাড়ীর এক-একটি ক্ষুদ্র অংশে নয়ত বসিতে বাস করে। কিন্তু দেখা যায় বিকালে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন সব শ্রেণীরই শত শত নারী—যে যার উৎকৃষ্ট সাজে সজ্জিত হইয়া সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতেছে বা বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। আমাদের দেশে এই জিনিষটির বড়ই অভাব। অবস্থা বনীদের ও নিম্ন শ্রেণীদের কথা আলাদা, কারণ আমাদের দেশেও মেছুনী বাউরী ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর নারীরা প্রকাশ্য ভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের বৌবিররা একরূপ বন্দিনী। বোম্বাই ও কলিকাতায় এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে দেখা যায়; বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা হইতে কম নয়।

পূর্বে আমাদের প্রদেশে অনেকের ধারণা ছিল যে ভারতের সর্বত্রই বোধ হয় এই রকম অবস্থা, শুধু একমাত্র বিলাতেই নারী স্বাধীন। কিন্তু ভারতেরই এক প্রান্তে বাট হিন্দুর মধ্যে যে এমন স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিতে পারে তাহা নিজের চোখে দেখিবার পূর্বে বিশ্বাস হয় নাই। মহারাষ্ট্র হইতে যে এই বিষয়ে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাংসী জুজারে

ক্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

(দক্ষিণ-আটলান্টিকে ভেলাবক্ষে ভাসমান হইবার পর লেখক আজমগণকারী নাংসী জুজারে বন্দী হন। আটলান্টিকে তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী আঘাট সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।)

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ডাউনিং ষ্ট্রিটের পরোক্ষ নির্দেশে নানা বর্ণে, নানা চিত্রে সূত্রোদ্ভূত ও বহু বিচিত্র কাহিনীতে অলঙ্কৃত যে অপকল্প 'জার্মান' কথা ও কাহিনী সংবাদপত্র নামক মিথ্যার বেসাতির বিক্রেতাগণ জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করছিল, যুদ্ধের অবসানে তার সকল তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তারপর একদা সহসা 'পনসন্বি' রাষ্ট্র-নৈতিক ধুরন্ধরদের যুদ্ধকালীন সকল মিথ্যাচার স্বর্যালোকে তুলে ধরলে সকলেই বোধ হয় ভেবেছিল, ভবিষ্যতে মানুষ আর কোন দিনই এ ধরণের কাহিনী বিশ্বাস করবে না। সেদিনের সে আলোড়নের সময় মিথ্যা-জালের উর্নান্ডেরা কথকিং বিচলিত হলেও বিন্দুমাত্র হতাশ হয় নি। সামান্য কিছু সরে গিয়ে কিছুকাল অপেক্ষার পর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে পুনরায় স্তম্ভ জাল বুনতে তৎপর হ'ল, মক্ষিকাকুল আবার জালে পড়তে শুরু করল।

নিজের দেশে বৈদেশিক-উৎপীড়নজনিত শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে নাংসীরা জার্মানীতে তাদের প্রতিপক্ষ বহু লোককে বন্দী করে অত্যাচার-উৎপীড়ন করছে, যুদ্ধের পূর্বে এ সংবাদে আমি খুব আশ্চর্য্যাব্বিত হই নি। বন্দীনিবাস-গুলোতে অসহায় বন্দীদের নাংসীরা অনেক ক্ষেত্রে হত্যা পর্য্যন্ত করেছে, এ ধরনেরও বিদেশীদের উপর খড়্গহস্ত হবার প্রয়োজন বোধ হয় না। পাশ্চাত্যের অজ্ঞাত জাতি যেভাবে এ সকল ঘটনাকে দেখছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি, জার্মানীর রাষ্ট্র-জগৎ ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে ইহুদীদের উৎসন্ন করার কাহিনীও আমাকে ততটা অভিভূত করতে পারে নি, কেননা নিজ বাসভূমিতে সহস্র চক্রান্তে বাঙালীকে কিভাবে উৎসন্ন করা হচ্ছে সে চিন্তাই আমার সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হ'ল, চতুরঙ্গ এ যুদ্ধে চলল জলে স্থলে আকাশে শত্রু বিমর্দনের সহস্র অভিযান। অসামু, অসম্ভব সোভিয়েট অকস্মাৎ আলাদীনের প্রদীপের স্পর্শে হয়ে গেল সাধু স্তম্ভ্য। এক অদৃষ্টনখটনপটীয়াসী ঐশ্বর্য্যজালিক প্রক্রিয়ায় যেন একটা অভিনব ব্যাপার ঘটে গেল। পনসন্বি যুদ্ধের পর্দা থেকে মুছে গেল, গত যুদ্ধকালের মিথ্যাচার নব মিথ্যাচারের ধূলিতে গৃহকোণে চাপা পড়ে গেল। জার্মান নাগরিক ভাল কিনা, ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক জার্মানই অত্যাচারী, না, নাংসীরাই কেবল বর্বর—এ জিজ্ঞাসার জবাব

হ'ল একমাত্র মৃত জার্মানই ভাল এই চমকপ্রদ তথ্যে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নয় পরন্তু নিছক রক্তলোলুপতার জন্তই জার্মানরা সর্বত্র বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে একথা কাগজে, চিত্রে, বেতার-তরঙ্গে সর্বত্র অবিশ্রাম ধ্বনিত হতে লাগল। সর্বত্রই নাংসী বিভীষিকা, জার্মান বিভীষিকা।

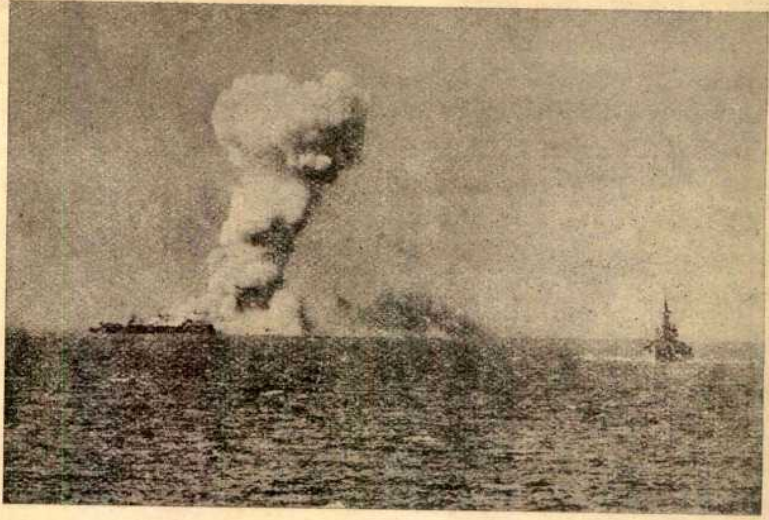
চেয়ে আছি এ স্বস্তিকার দিকে, ডেকের উপর দেখা যাচ্ছে নাংসী নো-সৈন্তেরা দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে। একটু আগেও লক্ষ্য-সাধনে যে নির্মমতা প্রত্যক্ষ করেছি, অপরিচিত অজ্ঞাত কিন্তু বহুশ্রুত তার প্রতীক দক্ষিণ-আটলান্টিক বক্ষে গর্ব্বোন্নত সেই কৃষ্ণ স্বস্তিক-পতাকা ক্রমেই কাছে আসছে। শ্বেতবর্ণ সমুদ্রচারীর মধ্যেই আছে পৃথিবীর সকল নৃশংসতা ও ভীষণতা—রক্ত মাংসে গঠিত নাংসীরূপ সব। তাই নাংসীরা মেশিনগান চালাতে পারে বলে স্নাইডিস যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ইতিপূর্বে শুনেও কখনও তা বিশ্বাস করি নি। তথাপি কখন কোন মুহূর্ত্তে আপনার অজ্ঞাতে সংশয় বৃষ্টি বাসা বেঁধেছিল, চোখের দৃষ্টিকে যত দূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি কোনও ধরণের আশ্রয়শ্রী এই ভেলার দিকেই মুখব্যাধান করে আছে কিনা।

আরো, আরো কাছে এসেছে ছদ্মবেশী নাংসী জুজার। কোন আশ্রয়শ্রীই চোখে পড়ছে না, ওপর থেকে কিশোর-বয়স্ক অনেকগুলি সৈনিক—পরশে ছোট ছোট হাফ প্যাণ্ট, গেঞ্জী, কোমরবন্ধে পিস্তল, আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। অমায়িকতার কোন ইঙ্গিতই-পাচ্ছি না এদের চোখে, মুখে বা হাবভাবে।

শত্রু দড়িতে বাঁধা একটি 'বম্বা' জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল আমাদের ভেলার উপর, ওপর থেকে ওরা ইসারা করছে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে 'স্নাইডিস' ও আমি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জুজারে উঠলাম। দন্ধানন মেসরুম বয় ও আহত লোকটির দড়ি ধরে উঠবার ক্ষমতা নেই, ভেলাতেই রয়েছে। সিঁড়ির কাছেই একজন নাংসী অফিসার দাঁড়িয়ে, মধ্যবয়স্ক পাতলা চেহারা, ক্রম-ওয়েলের রাউণ্ড হেডদের মত মুণ্ডিতমস্তক, চিবুকে কয়েক-গাছি শ্মশ্রু। দুর্গত উদ্ধার-পর্ব্বের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বলে বোধ হ'ল, আমরা কিছু বলবার পূর্বেই ওদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আহত ?

সব যেন প্রশস্ততাই ছিল, বড় বড় শব্দে রক্ত ধুরল, কপিকলে লাগানো মস্ত এক গদী আঁটা চুবড়ি নেমে গেল ভেলার কাছে, আগেই ছ'জন বলিষ্ঠ জার্মান নাবিক নীচে নেমে গিয়েছিল, সযত্নে ওদের ছ'জনকে চুবড়ির ভেতর শুইয়ে দিলে, আবার একটু বড় বড়—চুবড়ি ওপরে উঠে গেল হাসপাতালে।

ডেকের ওপর এক দিকে চেয়ার টেবিল পাতা। চেয়ারে বসে আছে এক নাৎসী কর্ম-চারী, তার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরই জাহাজের কাপ্তেন ও আরো জনকয়েক লোক। মাথা নেড়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে হ'ল। এক সারিতে সবাই দাঁড়িয়েছি, চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটি এক এক করে সবার নাম, ধাম, গোত্র পরিচয় নিচ্ছে। আমার ধাম 'ক্যালকাটা' শুনে জায়গাটা বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের কোন স্থানে হৃদিস পেলে না, বুঝিয়ে দিতেই হো হো করে সশব্দে হেসে শুধরে দিলে, 'ওঃ কাল-কুতা, কালকুতা' ? ডাক্তার এলেন, অঙ্গ থেকে সকলেরই খুলে ফেলতে হ'ল সকল আবরণ, আঙুর-ওয়ার পর্যন্ত শুধু স্থানচ্যুত নয়, শরীরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিবাক্তিত হয়ে



নাৎসী জুজার

লজ্জার মাথা খেয়ে এক পাশে পড়ে রইল। নানা দেশের, নানা জাতির এই বিচিত্র দিগধরদের শরীর পরীক্ষা করতে লাগলেন নাৎসী চিকিৎসক অতি সাবধানে, মাথার চুল থেকে পায়ের চোঁটো পর্যন্ত সর্বদেহে কোথাও কোন ব্যাধি আত্মগোপন করে আছে কিনা। চিরদিনই শুনেছি খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক সজাগ দৃষ্টি জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য। সংখ্যা হিসাবে প্রায় শূন্যে বিলীয়মান অতি ক্ষীণ ভগ্নাংশেও সঙ্গত দৃষ্টি না থাকলে যে গোটা অঙ্কটাই কষতে ভুল হয়ে যায়, এ শিক্ষা জীবনের প্রতি বিভাগে প্রয়োগ করতে ওরা যত্নশীল। পরিচ্ছদের বাহার নাই। আকাশপ্রমাণ অজ্ঞতা ঢেকে নিজেদের জাহির করবার যে ব্যর্থ প্রয়াস নিরত এক শ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে ধরা পড়ে তাদের রুদ্ধ ব্যবহারে ও কপট গাভীরো এ লোকটিতে তার একান্ত অভাব। সহজ সাধারণভাবে সকলের মুখগহ্বর পরীক্ষা করছেন, নিতান্ত ভদ্রভাবেই স্বাস-প্রশ্বাস নিতে বলছেন, কোন কথা তাঁর কেউ না বুঝলে ঠিক যেমনটি তিনি চান নিজেই বার বার সেই রকমটি দেখিয়ে দিচ্ছেন।

যে একাগ্রতা নিয়ে প্রত্যেক বন্দীর প্রতিটি অঙ্গ ডাক্তার যেন জগৎ-সংসার ভুলে গিয়ে পুখুপুখুরূপে পরীক্ষা করছিলেন, তাতে স্তম্ভ মানুষের পক্ষে বিরক্ত না হয়ে থাকা অসম্ভব।

তারপর এল গামলা গামলা গরম জল। গরম জল দিয়ে কি হবে ভাবছি, এমন সময় এক জন জার্মান নাবিক সাবান তোয়ালে নিয়ে এসে আমাদের হাতে দিয়ে ভাল করে স্নান দেবে নেবার ইঙ্গিত করলে।...আরো কিছু জল হলে ভাল হ'ত—চাওয়া সম্ভব হবে কিনা ইতস্ততঃ করছি—লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, আরো চাই কিনা?—আবার এল গরম জল।

আমার সঙ্গীরাও চাইলে। ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই লোকটির, মধ্যে মধ্যে নিজেই ইসারা করে তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা ধমতে বলছে, গামলা গামলা আরো জল এনে দিচ্ছে। বন্দীদের জন্মে এই বারবার যাওয়া-আসায় মিথ্যা অপমান-বোধের বালাই নাই, নাৎসী যুদ্ধজাহাজটিতে ঠিক এই মুহূর্তে তাকে যে নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে তা করে যাচ্ছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে জাহাজটির অঙ্গসজ্জা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি, কিছুই চোখে পড়ে না। খণ্টা জুই আগেও অনল-বৃষ্টি করছিল যে সব কামান কোথায় সেগুলো? বিমানই বা কোথায় রেখেছে? 'ক্যাটাপুট' বা জাহাজ থেকে বিমান নিক্ষেপের মঞ্চই বা কই? হয়তো সি-প্লেন এদের সঙ্গে আছে, কিন্তু কোন কামানই ত দেখছি না। নিতান্ত নিরাপদ সওদাগরী জাহাজ যেন, বাইরে থেকে কার সাধ্য বোঝে, এটা ছদ্মবেশী জুজার। পরে জেনেছিলাম এমনই একটি জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে অস্ট্রেলিয়ান জুজার 'সিডনী' ভারত-মহাসাগরে জলমগ্ন হয়েছিল। স্বস্তিকা পতাকাও কেবল 'সংঘর্ষের' সময় উড্ডীন করা হয়। নজরে পড়ল, ত্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে তখনও ফটোগ্রাফাররা বহিমান 'আউট্টে'র ফটো নিচ্ছে। বহু সহস্র মাইল দূরে শত্রু-জাহাজ ধ্বংস করলে তার প্রমাণও বোধ হয় দিতে হবে বার্লিনে।

মুণ্ডিতমণ্ডক নাৎসী লেফটেন্যান্ট তাঁর অহুগমন করতে ইসারা করলেন,—বললেন, এবার এস সবাই তোমাদের নব বাসস্থানে।

মুখ ফিরিয়ে শেষ বারের মত দেখে নিলাম 'আউট্টে'র চিতা।

* * * *

জুজারের পেটের ভেতর জলরেখার নীচে এক কক্ষে

আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। নিম্নতম ডেক থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি এসেছে এই ঘরে—চন্দ্রিশ ঘণ্টা বৈহুতিক আলো জ্বলে। বহির্জগতের সঙ্গে এই কক্ষটি সম্বন্ধহীন।

আমরাই প্রথম আশ্রিত নই, আরো দুটি নিমজ্জিত জাহাজের প্রায় সকল নাবিক রক্ষা পেয়েছিল, তারাও রয়েছে এখানে। একদল সাত দিন সাত রাত্রি ইতিমধ্যে এখানে কাটিয়েছে, দ্বিতীয় দল তিন দিন তিন রাত্রি। খান পাঁচ-ছয় বেক টেবিল পাতা সারা করে, পায়াল ও মঞ্চগুলোর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য নয়, প্রয়োজন হলে অবয়বগুলি খুলে এক পাশে রাখা যায়, অর্থাৎ কোলাপ সিবল বা বিচ্ছেদ্য। তখন টেবিল-গুলোতে খেলা চলছে—সতরঞ্চ, ড্রাকট বা তাস। এক টেবিলে তুমুল কোলাহল চলছে, সকালের উত্তম রুটির অংশ নিয়ে ছুঁজনে বগড়া করছে। পাঁচ-ছয় ধাপ সিঁড়ির মুখে ওপরে ঝাঁপের কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

নাৎসী কর্মচারীটি বাগ হুদ্রত বীরদ্বয়কে দেখে আর একটি বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা অমন করছে কেন?—হাত কচলে লোকটি বললে, একটু ঠাট্টা-তাঁমাশা করছে নিজেরদের মধ্যে, বগড়া নয় জ্ঞার।

এ লোকটি এখানে মোড়ল নিযুক্ত হয়েছে, একটি ইংরেজ জাহাজের কাপ্তেন। নবাগতদের দেখে বন্দীদের মধ্যে তার ব্যতীরা দেখাবার চেষ্টা একান্ত হয়ে দেখা দিল। আমার সহকারী কানাডিয়ানটি এক কানেক কানে কানে বলল, চেইন-ব্রেকদের সর্দার। নবাগত আমরা পুরাতনদের কাছে এখানকার রীতিনীতি শিখছি। দেয়ালে আঁকা বিজ্ঞপ্তিতে সব লেখাই আছে।

ছুরি, কাঁটা-চামচে, পেয়াল, বাটি ইত্যাদি একটি করে সবাইকে দেওয়া হ'ল। তারপর এল হামক, চাদর, কমল, প্যাঁট, মোজা, সার্ট বিতরণের পালা। সকল পর্ক শেষ হতে হতে ঝাঁপের মুখে বাঁশী বেজে উঠল—সন্ধ্যাহারের সময় হয়েছে। কালো রুটি, চর্কির মাখন, হ্যাম, কফি। চার-পাঁচ ঘণ্টা পূর্বককার আহার মনে পড়ছে। কি শক্ত রুটি এ, ছুরি দিয়ে কাটতে চায় না, গুঁড়ো হয়ে যায়। একখণ্ড মুখে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসলাম, খাওয়া অসাব্য। 'পুরাতন'রা পরম উৎসাহে আহারক্রিয়াটি উপভোগ করছে। নিরীহ ভালমাহুষ এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার—নাম ধরা যাক 'ক', বললে রুটি তো খারাপ নয়, প্রথম এক-আধ দিন কষ্ট হবে, পরে দেখা যেতে বেশ লাগবে।

আমি খাব না শুনে তিন জন পূর্বাগত হাত বাড়িয়েছে সেই রুটির দিকে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। রুটি নিয়ে আবার তুমুল বগড়া চলল তিন জনের মধ্যে অকথ্য কুকথা ভাষায়। বগড়া থামে না, আর এক টেবিলে মহা গুণ্ডগোল বেধে গেছে, ওদের প্রাপ্য জায়া মাখনের অংশ থেকে ওরা নাকি অভ্যাস ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। মাখনটুকু নিয়ে টেবিলে

টেবিলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সবার কাছে অহুরোধ করছে। আমাকে নিরপেক্ষ ভেবেই বুঝি অহুরোধ করল ওদের পাশের টেবিলের ঘাদের আজ বণ্টন করবার পালা ছিল তাদের সঙ্গে এদের অংশের কতখানি পার্থক্য তা দেখতে। সেদিকে চেয়ে দেখি চারিটি স্বার্থপর মূর্তিমান কুখা যেন বসে আছে, নির্বিকার চিত্তে, ওদের কাঁটা ছুরি চলছে, গ্রাহও করছে না এদের কথা। আবেদনকারীরা আমাদের সমর্থন পাবার জন্ত আবার বললে, 'তোমাদেরও কত কম দিয়েছে দেখ।' সত্যিই তাই। নতুন এই পরিবেশে কি ভাবে চলতে হবে বুঝলাম। সভ্যজগতের রীতিনীতি এখানে অচল, সামান্য আঘাতেই শিষ্টাচারের মুখোঁস খুলে গেছে, বললাম জাহাজে যাও সব, কে পাচ্ছে বা না পাচ্ছে সেই বুঝুক, কাল সকাল থেকে আমার বরাদ্দের মোল আনা চাই। আমাদের বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক রুটি ও মাখন সেই টেবিলের বণ্টনকারীরা আত্মসাৎ করেছিল। ওদেরই একজন বললে, তুমি তো যা দিয়েছি তাই খেতে পারলে না।

'পারি বা না পারি সে আমি বুঝব, আমার ভাগ চাই, না খেতে পারলে স্থানবিশেষে ফেলে দেব।' নাকিমুরে চিবিয়ে চিবিয়ে ওখান থেকে কে বলে উঠল 'খাবার জিনিষ ফেলে দিলে ওরা শাস্তি দেয়।'

বিশ্রী স্বরটা অহুসরণ করে দেখি সেই মোড়ল। বললাম, শাস্তি দেবার আবেদনকারীটি এখানে কে শুনি? প্রশ্নটা এড়িয়ে আবার তেমনি নাকিমুর কানে ভেদে এল, এটা বন্দী-ঘর, চালাকী চলবে না এখানে।—আমার দিক থেকে জবাব গেল, হঁ, ঠিক কথা আজ রাতের ভেতর পরকীয় অভ্যাস যদি না যায় তোমার তো কাল সকালে চালাকি চলবে না। মনে থাকবে?

'ক' চেপে হাসল। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নিয়ন্ত্রণে বললেন—ইতর, চোর।

কারো কাছে দেশলাই নেই, রাখা নিষিদ্ধ। নাৎসীরা সিগারেট দিয়েছে সপ্তাহে পঞ্চাশটি হিসাবে। আমার মাখন-টুকু আর এক জনকে দিয়ে তার কফির অর্ধেক নিয়েছি, নিজের তো আছেই। কফির সঙ্গে সঙ্গে যদি ধূমপানও করতে দিত। 'ক'কে বললাম, সিগারেট দেয় অথচ আগুন দেয় না আবার কি রকম? 'ক' উত্তর দিলে, দেবে, ওদের খুশিমত এসে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয় সিগারেটে।

এক জন প্রহরী ভিতরে এসেছে; খাচ্ছি না দেখে জিজ্ঞাসা করল ইস্তিতে, খাচ্ছি না কেন? শরীর ভাল নেই বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বুঝল কিনা ওই জানে। এ-ই সময় কোন অহুরোধ করবার। সিগারেট মুখে দিয়ে আগুন চাইছি ওর কাছে। লোকটি হেসে কি বলে চলে গেল। কফির পেয়ালটায় আশু আশু এক একবার চুমুক দিচ্ছি, একটু তাম্ব-কুটের ধোঁয়ায় বুঝি শারীরিক, মানসিক ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। জুস, সোডা, জল দিয়ে মেজ, টেবিল, বেঞ্চি সব পরিষ্কার করবার ধুম পড়ে গেল। পালান করে সবাইকে করতে হয় এক কাজ। নাৎসীরা অপরিচ্ছন্নতা একেবারে পছন্দ করে না। দু'দিন আগে যে তিন জনের পালা ছিল, টেবিল পরিষ্কার প্রক্রিয়াটি সুচারুরূপে তারা করে নি, ময়লা লেগে ছিল কোন কোন স্থানে, তাই শাস্তি পেয়েছিল নাৎসীদের কাছে, দু'দিন ধূমপান করতে পারে নি।

এক কোণ থেকে হঠাৎ ঘড়র ঘড়র একটা শব্দ হতে লাগল, একটু পরেই অপরিচিত কণ্ঠে ও ভাষায় সমস্ত কক্ষটি মুখরিত হয়ে উঠল। দেওয়ালের গায়ে রেডিও লাউড স্পীকার লাগান আছে এক ধারে, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। বার্লিন রেডিও থেকে ইংরেজী প্রোগ্রাম শুন্ছি, চার্টার্ড-রাজভেট সৌরমণ্ডল হতে এখন হিটলারের সৌরজগতে এসে পড়েছি। ইংরেজী ভাষীরা বলছে, যত সব মিথ্যা কথা। কোন কথা শুনতে চায় না ওরা। বি. বি. সি. ছাড়া অল্প কারও কথা শুনতে ভীষণ আপত্তি। কানে আঙুল দিতে বাকী থাকে। ভারতবর্ষের শত্রুদের সকল কথাও যদি এমনি করেই বিশেষ করে ভারতীয় 'শিক্ষিতেরা' শুনতে রাজী না হ'ত—ভাবি।

নাৎসী প্রহরীরা আবার এসেছে, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছে। 'ক' এসে বলল, আগুন দিতে এসেছে; বোধ হয় তোমাকে খুঁজছে।—রেডিও চলছে, নানা কণ্ঠের গুঞ্জন হচ্ছে, বকগুলির মধ্যে লম্বা একফালি জায়গায় দু'জন পায়চারি করছে, ইম্পাতের একটা ধাম ধরে এক জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে অনুমান করা খুব শক্ত নয়—ওর তিন দিন হয়েছে। ছোট ঘরটি মেছো হাট, জিনিষের অভাব পূরণ করছে কথার বেসাতিতে—নরক গুলজার।

সাত দিনের অভিজ্ঞ 'ক'কে জিজ্ঞাসা করি, এ ঘরে এই অবস্থায় ক্রমান্বয়ে সাত দিন আছ—সূর্য, আলো, আকাশ, সমুদ্র না দেখে? কি করে, কেমন করে আছ?

রোজই নিয়ে যায় ওপরে দু'বেলা দু-ঘণ্টার জুজ। 'ক' আশ্বাস দিলে।

আজও গিয়েছিলে তো?

'না, তোমাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল কি না, তাই।'

'নতুবা নিয়ে যায় তো রোজ?'

'দু-এক দিন বাদও যায়। তখন বোধ হয় নতুন শিকারের খোঁজ পেয়ে থাকে, বা নিজেরই কোন বিপদ সন্ধান।'

'কানাডা' এসে পাশে বসল—বলল, তোমায় একটা জিনিষ দেব। ও সিগারেট খায় না, বাজাট হাতে দিল। তার পর হেসে বলল, নিঃস্বার্থ ভাবে নয়: কিন্তু। তুমি যে জিনিষটি খেতে পছন্দ কর না আমাকে দেবে।

এ হাটেও বিনিময় চলছে; অর্থ আবিষ্কারের পূর্ব যুগের পদ্ধতিতে। পনীর আমি কোনদিনই পছন্দ করি না বোধ হয় তাই চাইছে। বললাম, বেশ তো পনীর যখন দেবে তুমিই নিয়ে।

তাড়াতাড়ি সে বললে, না, না তা বলছি না, যদি তুমি নিজে না খাও, তবেই দিয়ে। সবার সমান অবস্থা এখানে। এই সামান্য আহার থেকে সত্যিই আমি তোমায় বঞ্চিত করতে চাই না।

এক-শ সিগারেটের মালিক আমি। একটির পর একটি চলছে, সিঁড়ির ওপর প্রহরীটি দশটি আঙুল দেখিয়ে বলল, ধূমপানের আরো দশ মিনিট সময় আছে। আর এক জন আমাদের কাছে এসে বসল, জাহাজের রেডিও অফিসার—ইংরেজ ভদ্রলোক মোড়লের বিপরীত স্বভাব, ভদ্র, বিনয়ী। আরও দু'জন এল, তারাও রেডিও বিভাগের। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল কোথায়? কোন খবরই তো পাই নি তোমাদের সম্বন্ধে। দক্ষিণ-আটলান্টিক রেইডার জাহাজ আবার বেরিয়েছে বলে পাকা খবরও পাই নি কখনও।

বললে, খবর দেবার সুযোগ হয় নি একেবারেই। কোথেকে হঠাৎ একটা বিমান এসে এরিয়েলের তার ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় জাহাজের ওরাও সেই একই কথা বলে।

কত দিন আমাদের এ ভাবে থাকতে হবে বলেছে কিছু নাৎসীরা? জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না, বোধ হয় জার্মেনীতে না পৌঁছান পর্যন্ত'।... উত্তর দিল সে।

কিন্তু জার্মেনীতে যাবে এখন কেন? কতকগুলি বন্দীকে জার্মেনীতে পৌঁছে দেবার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে রেইডার বেরিয়েছে।...ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। দক্ষিণ-আটলান্টিকেই নিশ্চয় ঘুরে বেড়াবে এ জাহাজ এখনও কিছুকাল আরও শিকারের অন্বেষণে। এর চেয়ে শক্তিশালী স্নায়ু কোনও মিত্রপক্ষীয় রণতরীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখাও হতে পারে এর।

কানাডা বলে, আজ দুপুরের সেই নরক থেকে বেঁচেছি বটে, কিন্তু বিপদ এতটুকু কমে নি।

ইংরেজটি, নাম তার ধরা যাক 'গ' ওর উক্তি সমর্থন করলে, ইয়া, আরও মুশকিল, জলরেখার ঠিক নীচেই আমরা। মিত্র-পক্ষীয় কোন সাবমেরিন বা রণতরী যদি টর্পেডো ছোঁড়ে। ভীষণ ভীতির মধ্যে রয়েছে ওরা, নিরাপদে শত্রুর দেশে কোন যুদ্ধবন্দী শিবিরে পৌঁছতে চায়। ওদের বলি, কিন্তু সমুদ্রে যত বেশী দিন থাকা যাবে মুক্তির সম্ভাবনাও তত বেশী। এক বার এজিসের দেশে পৌঁছলে কয়েক বৎসরের ধাক্কা।

কথা বলতে ভাল ভাগছে না আর। ভারত মুখে জাপানী অগ্রগতির সহস্র অপ্রিয় সম্ভাবনা মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোতগুলির আনাচে কানাচে জড়িয়ে পড়ছে। কানাডাকে বললাম, দিন গুনছিলাম রোজ কতদিনে ভারতে পৌঁছব, নিয়তির কি পরিহাস দেখ এখন এইখানে, এই অবস্থায়।

‘একটা বাঁশী বেজে উঠল। হুড়মুড় করে সব উঠে পড়ল। বেক, টেবিল সব কতকগুলি কাঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ঘরটির সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি ছোট ঘর এতক্ষণ বন্ধ ছিল। খুলে গেল। গোটান হামক, চাদর কয়ল তুণীকৃত হয়ে আছে সেখানে। ছ’জন ভেতরে ঢুকে পড়ল। এক একটি বিছানা তুলছে আর উপরে লেখা নম্বর চোঁচিয়ে পড়ছে। নম্বর অনুযায়ী সবাই নিচ্ছে আপন আপন বিছানা। ঘরটি আমার পছন্দ হ’ল, ছ’জন শুতে পারে। কানাডা ও আমি সেখানেই মেজের উপর হামক, চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ সকালে উঠে কে ভেবেছিল সন্ধ্যায় এখানে এই অন্ধকার গৃহে, রক্ষ, অমার্জিত বহু লোকের মধ্যে ধারণাতীত এই অবস্থায় এসে পড়ব। একটু যদি নিরিবিলিও থাকত। পাশেই জাহাজের তেলের এঞ্জিন করছে গম্, গম্, গম্, মেজে কাঁপছে থব্, থব্, থব্, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের। পৃথিবীর কেউ জানে না, দক্ষিণ-আটলান্টিকে এই মুহূর্তে ইস্পাতের এক দৈত্য মাটির মাছের কতখানি ব্যথা বেদনা পুঞ্জীভূত করে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পাশে বিছানায় কেমন একটা চাপা শব্দ হচ্ছে। সন্তর্পণে কানাডা কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে। ‘কানাডা, ঘুমিয়েছ?’

‘না।’

ও অমন করছে কেন জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হয়, কারণটা নিজের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্বলতা সবারই আছে, হঠাৎ ও বলে, কি ভীষণ জীবন এ বল ত।

‘উপায় কি? সবই সহ্য হয়, এও হয়ে বাবে।’ বলছি বটে, কিন্তু কথাগুলি যেখান থেকে বেরচ্ছে, সেখানে ঘন অন্ধকার।

বিশ্রী, কর্কশ বাঁশীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠতে ইচ্ছে করে না একেবারেই। আর একটু যদি...বাঁশী বাবে বাবে বাজছে। অন্ধকার কুঠরি, তেমনি আলো জ্বলছে। মোড়ল বলছে, এই উঠ সব তাড়াতাড়ি। কি ক্ষতি হ’ত ওদের আমাদের আর একটু শুতে দিলে।

উঠতে হ’ল। বন্দীর ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই। সামান্য বিছানা পরিপাটি করে গুট্টয়ে গুছিয়ে রাখতে হ’ল।

সিঁড়ির কাছে এক একটি গামলা নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছি। উপর থেকে পরিষ্কার গরম জল দিচ্ছে মুখ, হাত, পা ধোবার জল। ছ’রকমের সাবান দিয়েছে কালই সমুদ্র জল ও ভাল জলের জল। আগেই যারা জল পেয়েছে ক্রস, পাউডার দিয়ে দাঁত মাজছে। আমাদের ত নেই। ‘ক’কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব সরঞ্জাম ওরা পেল কোথায়?

‘কেন, তোমাদের দেখ নি?’

‘না ত।’

‘চেয়ে নিও যখন লেফটেন্যান্ট আসবে।’ দত্তমার্জনী পাউডার নিজের থেকে খানিক দিয়ে বললে, আমার ক্রসটা ব্যবহার করতে পার।

সে কি। এক ক্রস ছ’জনে। আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

‘না, আমি ব্যবহার করি নি এক দিনও। ক্রস এনে দিতে দিতে হেসে বলে।

তোয়ালে? তোয়ালে ত কাল স্নানের পর ফেরত নিয়েছে। আবার জিজ্ঞেস করি ‘ক’কে। বললে, না, দেখ নি, দেবেও না। রুমাল দিয়ে সবাই তোয়ালের কাজ সারে। রুমালও নেই আমার, হুইডিস, কানাডীয়েও সেই দশা। শেষ পর্যন্ত ওদের আর মুখ ধোয়া হ’ল না। গায়ের গোল্লি খুলে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তোয়ালের অভাব পূরণ করলাম। বাঃ দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট আয়নাও যে আঁটা রয়েছে। প্রহরীর কাছে চিরুণী চাইলাম, ও ভাঙা আধখানা চিরুণী এনে দিল। আশ্চর্য! ছুর্ভাগ্যের যে চিত্রটি মুখের ওপর অঙ্কিত দেখব ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল না, অথচ এক রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গীদের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে।

নিত্যকার অভ্যাস মত সিগারেট মুখে দিয়েই রেখে দিলাম। কোন অভ্যাস রাখা বা না রাখাও যে অপরের কর্তৃত্বাধীন। কোলাহল স্রব হয়ে গেছে। লোকগুলি কি চুপ করে থাকতে জানে না? আশু কণা বলতেও কি শেখে নি কোন দিন? বিরক্ত হয়ে উঠছি ওদের ওপর।

প্রান্তঃকালীন আহাৰ এল—কালো রুটি, পনীর, জ্যাম, কফি। টেবিলগুলো থেকে এক জন করে প্রতিনিধি উঠে গেল বর্টনহানে। উপুড় হয়ে সকলে দেখছে সমান ভাগ হয় কিনা। তবু কিছু চোঁচামেচি, কথা-কাটাকাটি হয়, সকলের সাক্ষাতেই বর্টনকারীরা নিজেদের জল কিছু বেশী রাখে।

অনেকটা রুটি পড়ে রইল, পনীর কানাডাকে দিলাম। রুটির ওর আর প্রয়োজন নেই, অনেকটা উদ্বৃত্ত আছে, বললে, দেবে কেন কাউকে, রেখে দাও, বারটার আগেই খিদে পেলে চিবাবে। না, অধিকন্তু ক্ষুধা আমার এখানে হবে না। লুন্স দুগ্ধিত ছ’জন চেয়ে আছে, তাদের দিলাম। বললাম, ভাগ করে নাও ছ’জনে। ‘ধন্যবাদ।’ ভাবলাম চুলোর যাক তোমাদের ধন্যবাদ, ফেলে দিতে গেলে আবার উঠতে হবে তাই।

পরিষ্কারের পালা এবার। টেবিল, বেকি, মেঝে সব ঘষে মেজে ঝকঝকে করতে হবে। নাৎসীরা অনেক কিছু উপকরণ দিয়ে গেল। মুশকিল মেঝে পরিষ্কার করবার সময়। দাঁড়াই কোথা এতগুলি লোক? সে সমস্ত পূর্বাগতেরা আগেই সমাধান করেছে। যাদের পালা, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে জল ছড়াচ্ছে সবাই গিয়ে তারা পেছনে ভীড় করে দাঁড়ায়। তারপর এদিকটা হয়ে গেলে অগ্র। সারা যেকোনো ঘুরে ঘরের লোক

গুলিকে লাফিয়ে লাফিয়ে স্থান পরিবর্তন করতে হ'ল অনেক-বার।

শুকনো কাপড় ঘষার পূর্ব শেষ হলে টেবিল, বেঞ্চগুলি পূর্ব রূপ ফিরে পেল। ড্রাফট বেরল, সতরঞ্চ চলল, তাস এল—বাজার বসল আবার। ধূমপানের জন্ত অস্থির সকলে, কেউ কেউ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহরীর কাছে, সম্মতি মিলল না, আপন আপন স্থানে ফিরে এসে বসল। অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছে এই সুযোগে ধূমপানই ছেড়ে দেবে, দু-এক জন ছেড়েও ছিল শুনলাম দু-এক দিনের জন্ত, আবার সুরু করেছে পরে চেষ্টা করবে বলে।

দেওয়ালে একটা হাতে লেখা নাংসীদের দেওয়া ক্যালেন্ডার ঝুলছে, তারই খণ্ডগুলো এপ্রিল মাসের ১লা পর্যন্ত পেন্সিলে কাটা। এক জন আজকের তারিখ চিহ্নিত করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আজ কত তারিখ, কাল কেটেছিল কিনা মনে নেই। দিন রাত একাকার হয়ে গেছে। শোবার সময় মনে করে সে দিনের তারিখ চিহ্নিত না করলে পরে ঠাওর করা যায় না মাসের ক'দিন কেটেছে। আমরা সন্ত আগত, বাইরের স্থিতি এখনও লুপ্ত হয় নি, তাই বলতে পারলাম এক বার ঘুমিয়েছি এখানে এসে, ঘুমুবার আগে ছিল ৩রা এপ্রিল, এখন তবে ৪ঠাই হবে। আর দু'দিন বাদে আমরাও দিবারাজিহীন কালে ডুবে যাব।

লেকটেনাণ্ট এসেছেন, সঙ্গে আমাদের দেশের কুস্তিগীরদের মত দেখতে খালি গায়ে একটি লোক। তার বগলে কিছু কাপড়-চোপড়, হাতে লম্বা লম্বা দড়ি। নাম ধরে নবাগত কয়েকজনকে ডেকে কিছু কাপড়-চোপড় দিল—আর একটি করে সার্ট, গেম্ব্রী, প্যাণ্ট, মোজা, চিরুনী, টুথ ব্রাস, টুথ পাউডার। বললেন, এগুলি আমাদেরই হ'ল, কিন্তু বিছানাপত্তর ধার দিয়েছে যত দিন এখানে অতিথি আছি তত দিনের জন্ত, অল্পত্র বাবার সময় বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

বিতরণ শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন কারো কিছু বলবার আছে কিনা। সবাই চুপ করে আছে। আবার বললেন, কোন অসুবিধে, অসুযোগ থাকলে বলতে পার।

বললাম, এঞ্জিনের পাশেই ঘর, হাওয়া এতটুকু নেই, গরমে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

‘কেন?’ বাতাস আসছে না?’ অহুচ্চ সেলিঙে মোটা মোটা লোহার নলগুলির মুখে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। বাইরে থেকে ঘরে হাওয়া খেলবার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক, দেখছি বলে ওপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস পাচ্ছি। লেকটেনাণ্ট ফিরে এসে বললেন, এবার?’

‘হু’ অনেক ধন্যবাদ।’

লেকটেনাণ্ট বললেন, সময় কাটানো এখানে খুব শক্ত। তা এক কাজ কর, দিবারাজি চামড়ার জুতো পরে থাকা অসুবিধে,

দড়ি দিয়ে স্থানেল বানিয়ে নাও। সঙ্গে লোকটিকে বললেন দড়ির জুতো বোনা শিখিয়ে দিতে।

এক জন জিজ্ঞাসা করল, আজ ওপরে নিয়ে যাবেন না স্তর? ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।—‘সিগারেট স্তর?’

‘আচ্ছা, সিগারেট খেতে পার। পরে দেখি যদি সুবিধা হয় ওপরে যাবে।’ প্রহরীকে সিগারেটে আগুন দিতে বললেন। খাওয়া দাওয়া সবকিছু সময় গল্প করে ওপরে চলে গেলেন।

কি চমৎকার এই লোকটি, অনেকে বলে। কানাডীয়-সুইডিস সায় দেয়। আমি বললাম, জ্যান্ত জার্মানও ভাল হয়।

কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ দড়ির জুতো বুনছে, কেউ তাস খেলছে, গল্প করছে। স্বল্পাহত দুটি লোক এক কোণে শুয়ে রয়েছে, আঘাতের স্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এক জন অসুমনক হয়ে ছমড়ী খেয়ে গিয়ে পড়েছে আর এক জনের ওপর। লোকটি ওর বাপাস্ত করছে। অপরাধী ক্ষমা চাইছে তার ভুলের জন্ত, কিন্তু আহতের মুখ দিয়ে খারাপ কথা তুফতী ছুটছে। লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। এই যে লাগতে তো পারত সে সম্ভাবনা রীতিমত একটা শোকের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর পাশেই শায়িত লোকটি ওকে চুপ করতে বলছে। কে কার কথা শোনে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল সে স্থানে। আহত ও অপরাধী উভয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে দুটো দল দাঁড়িয়ে গেল। গোলমাল এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে ঝাঁপের মুখে জার্মান প্রহরী নেমে এসে ব্যাপার কি জানতে চাচ্ছে।

অগ্নান বদনে দু'পক্ষই বলে উঠল, আহতদের ক্ষত স্থানে ভীষণ যত্নগা হচ্ছে। দু'জনই তখন ওঃ ওঃ করছে। প্রহরী ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

এক জন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে তার মুখোয়া সাবান ও সিগারেটের বাক্স হস্তান্তরিত হয়েছে। সকলকে শাসাচ্ছে তার জিনিষ জায়গায় রেখে দেওয়া হোক। সবাই বলছে, নিজের সম্পদ ছাড়া অপরের খড়কুটোও তারা ছোঁয় না, দেখাচ্ছেও সাবান সিগারেট বার করে। কিন্তু সবই যে একই রকম দেখতে, বুঝবে কেমন করে। কেউ কেউ দেখাতেও গররাজী, বলছে যাও ভাগো বি'রাসে। মোড়ল বলছে, কে নিয়েছ দিয়ে দাও। দেখে, তারই জাহাজের এক খালাসীর কাছে হু' টুকরো সাবান। ‘এই টম তুমি নিয়েছ।’ টম নামের স্বত্বাধিকারী ছফার দিয়ে বলে, যাও, যাও, মাতব্বরী করতে হবে না, জার্মানদের চাকর।

আরো কিছু সময় চলত, ডাক্তার এসে পড়েছেন প্রায় ভাল হয়ে উঠেছে যারা হঠাৎ সে দু'জন একই সঙ্গে ওঃ ওঃ করছে কেন তার কারণ অসুস্থান করতে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। দেড় ঘণ্টারও ওপর ধূমপান চলছে, এখনও ধামাবার আদেশ আসে নি। একটির পর একটি চালিয়ে অনেকেই ক্লান্ত। তবু আগুন জালিয়ে

রাখা হচ্ছে মুখে মুখে। অন্ততঃ এক জনেরও মুখে জলন্ত সিগারেট থাকে। সে ক্লান্ত হলে টেচিয়ে বলে, নিভিয়ে ফেলছি এখন, কার চাই আগুন। দু-তিন জন ছুটে যায়।

বারটা প্রায় বাজে, মধ্যাহ্নের আহারের অপেক্ষায় আছি। মোড়ল ও আর দু'জন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। ঝাঁপ পর্যন্ত নাৎসীরি ধাবার পৌঁছে দেয়।

আবার গুঞ্জন, টেচামেচি, বর্টনকারীর চৌধু, কদর্য শব্দের অভিধান রচনা, পেয়ালার, ডিসের, ছুরি, কাঁচা, চামচের টুং-টাং। স্থপ, শূকরনাংস, আলু, পেঁয়াজ, শাক—আহারটা জমে উঠেছে, ওরা রীতিমত উপভোগ করছে। এক জন নাৎসী এসে বলল, আরো যদি চাও পাবে। আরো এল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত।...সরময় স্থপ, রুটির গুঁড়ো...আবার ধোয়া-মোছা।...সিগারেট? হ্যাঁ, চলতে পারে...মহাফুটি।

বেঞ্চের ওপর, টেবিলের ওপর, মেঝের ওপর অনেকেই ঘুমচ্ছে, ছ-চার জন চূপচাপ বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, নিম্নবরে কেউ কেউ কথা বলছে। জাখান প্রহরী এক বার এসে দেখে গেল, বোধ হয় আশ্চর্য হয়েছে গুঞ্জন অকস্মাৎ একেবারে থেমে যাওয়াতে।

...আবার কোলাহল। ঘণ্টাটিনেক বিশ্রামে ফুসফুসগুলি চাক্ষা হয়ে উঠেছে। উদ্ভূত রুটির পেষণ ক্রিয়ায় অনেকগুলি মুখ নড়ছে। তাস, ড্রাফ্ট, দাবা, হাসি, চীৎকার—সঙ্গে সঙ্গে অল্পমধুর।

চব্বিশ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছি। কালকের মত থাম ঘরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে—অন্ত কোন দূরের জগতে চেয়ে আছে যেন। পাশেই এঞ্জিনটা ক্লান্তিহীন ভাবে চলছে—গম্, গম্, গম্।

হিন্দী ভাষায় লিঙ্গপ্রকরণ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীই হোক আর হিন্দুস্থানীই হোক, সে ভাষার ব্যাকরণ যে হিন্দী ব্যাকরণকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।

হিন্দীর ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ আয়ত্ত করা অল্পভাষাভাষীর পক্ষে, বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইবে। একটা কথা আছে ইংরেজীর উচ্চারণ আর সংস্কৃতের লিঙ্গ-প্রকরণ বিশেষ কোন ধরাধরা নিয়ম মানিয়া চলে না, তাহারা আভিধানিক। কিন্তু হিন্দী লিঙ্গপ্রকরণের জটিলতার তুলনায় সংস্কৃত লিঙ্গপ্রকরণের জটিলতা কিছুই নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণে তবু ব্লীবলিঙ্গ বলিয়া একটা লিঙ্গ আছে এবং বহু শব্দ তাহার অন্তর্গত। কিন্তু হিন্দীতে নপুংসক বলিয়া একটা লিঙ্গের নাম থাকিলেও নপুংসক লিঙ্গবোধক শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

অল্প ভাষাভাষীকে হিন্দী বলিতে বা লিখিতে গিয়া লিঙ্গ-বিভ্রাটের জন্ত কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে তাহা অনুমান করিতে পারিবে না। হিন্দীতে বিশেষণ-পদ, সম্বন্ধ-পদ ও ক্রিয়া-পদ বিশেষ্যপদের লিঙ্গের অনুসরণ হইবে। কাজেই কোন্ শব্দটি কোন্ লিঙ্গ তাহা না জানা থাকিলে পদে পদে অশুদ্ধি ঘটবে।

হিন্দী ব্যাকরণের লিঙ্গপ্রকরণ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

১। “পুরুষবোধক সংজ্ঞাওঁকো ব্যাকরণ মে পুঞ্জিঙ্গ আওর স্ত্রীবোধক সংজ্ঞাকো স্ত্রীলিঙ্গ কহতে হ্যায়।” (পুঞ্জিঙ্গকে পুঞ্জিঙ্গ বলা হয়। হিন্দী ব্যাকরণেও পুঞ্জিঙ্গ দেখিতেছি)।

এট হইল সাধারণ সূত্র। লড়কা—লড়কী, ঘোড়া—ঘোড়ী, বাঘ—বাঘিনী ইত্যাদি প্রাণীবাচক শব্দের বেলায় এই সূত্র প্রযোজ্য।

২। তাহার পরেই বলা হইয়াছে :

“হিন্দী মে প্রাণিবাচক সংজ্ঞাওঁকে সমান অপ্রাণিবাচক সংজ্ঞাওঁ ভী পুঞ্জিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হোতী হ্যায়।”

পুং—কপড়া (কাপড়), ঘর, পথর (পাথর), পানী পেড় (গাছ)।

স্ত্রী—টোপী, ছত (ছাদ), ওস (শিশির), জড়।

৩। “কই এক মনুষ্যোত্তর প্রাণিবাচক সংজ্ঞাওঁ কেবল পুঞ্জিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হোতী হ্যায়।”

পুং—ভেড়িয়া (নেকড়ে), চীতা, উল্লু (পেঁচা), কলুআ (কছপ), খটমল (ছারপোকা)।

স্ত্রী—চীল, কোয়ল, তিস্তলী (প্রজাপতি), মকখী (মাছি), জোঁক।

৪। (ক) সাধারণতঃ অকারান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। অনাজ (ফসল), ঘর, সির (শির), গাঁব (গাঁও)।

(খ) উনবাচক শব্দ ব্যতীত আকারান্ত কতকগুলি শব্দ পুং-লিঙ্গ। কপড়া, পৈসা (পায়সা), গন্না (আঁধ), আটা, মাথা।

(গ) ভাববাচক শব্দের শেষে পন বা পা থাকিলে তাহা পুংলিঙ্গ হইবে। লড়কপন (ছেলেমি), বুঢ়াপা (বার্ধক্য)।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। আনা (আগমন), জানা (গমন), সোনা (শয়ন) ইত্যাদি।

(ঙ) আন ভাগান্ত কৃদন্ত পদ পুংলিঙ্গ। লগান, নহান, পিসান, উঠান, ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—পছান (চেনা), উড়ান, মুক্যান (মুচকি হাসা—ইহার স্ত্রীলিঙ্গ)।

৫। (ক) সাধারণতঃ ঈকারান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ। চিট্টী, নালী,

খেতী, মিটী (মাটি), টোপী। ব্যতিক্রম—পানী, খী, জী, দহী, মোতী—ইহার পুংলিঙ্গ।

(খ) আদি ভাগান্ত ভাববাচক শব্দ জীলিঙ্গ। ভলাই, বুলাই, উচাই, পিসাই, বুলাই।

(গ) ইয়া ভাগান্ত পদ জীলিঙ্গ। খটয়া, ডিবিয়া, ফুড়িয়া, পুড়িয়া, ঠিলিয়া, ডলিয়া।

(ঘ) উকারান্ত পদ জীলিঙ্গ। বালু, দারু (মদ), লু, বাড়, গের। ব্যতিক্রম—আলু, আশু (অক্ষ), টেশু (পলাশ), নিবু (লেবু)—ইহার পুংলিঙ্গ।

(ঙ) ত কারান্ত পদ জীলিঙ্গ। রাত, ছত (ছাদ), বাত (কথা, ঘটনা), লাত (লাথি), ভীত (ভিত্তি)। ব্যতিক্রম—ভাত, দাত, খেত, স্নত—ইহার পুংলিঙ্গ।

(চ) স কারান্ত পদ জীলিঙ্গ। প্যাস (পিপাসা), মিঠাস, কাস, সাস (শান্ত্তী)। ব্যতিক্রম—কাস, বাস (বীশ), নিকাস ইহার পুংলিঙ্গ।

(ছ) ন কারান্ত হ্রদন্ত পদ জীলিঙ্গ। জলন, সহন, রহন, ইত্যাদি।

(জ) ভাববাচক শব্দের শেষে ট, বট বা হট থাকিলে জীলিঙ্গ হইবে। বংবট (বঙাট), সজাবট (সাজগোজ), স্ববরাহট (স্বাবড়ান)।

৬। (ক) যে সকল উর্দ্ধ শব্দের অন্তে ‘আব’ আছে, সেগুলি পুংলিঙ্গ। গুলাব, জুলাব, হিসাব, জনাব, অসবাব (আসবাব) ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—কিতাব, শরাব, তাব (তাপ)—ইহার জীলিঙ্গ।

(খ) যে সকল উর্দ্ধ শব্দের অন্তে ‘আর’, ‘আন’ বা ‘আল’ আছে, সেগুলি পুংলিঙ্গ। বাজার, ইশতিহার, সবাল (সওয়ালা) হাল, মকান ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—দুকান, সরকার, তকরার (বিবাদ)—ইহার জীলিঙ্গ।

(গ) পরদা, গুসুসা (গোসা), রাস্তা, চশমা, কিসসা (কাহিনী) ইত্যাদি আকারান্ত উর্দ্ধ শব্দ পুংলিঙ্গ।

(ঘ) ঈকারান্ত উর্দ্ধ শব্দ জীলিঙ্গ। গরীবী, ঈমানদারী, গরমী, সরদী, বীমারী, চালাকী।

(ঙ) শ কারান্ত উর্দ্ধ শব্দ জীলিঙ্গ। নালিশ, কোশিশ (চেষ্ঠা), লাশ, তলাশ, মালিশ। ব্যতিক্রম—তাশ, হোশ (হুঁস)—ইহার পুংলিঙ্গ।

(চ) হবা (হাওয়া), দবা (দাওয়া), সজা (সাজা), জমা, ছুআ প্রভৃতি আকারান্ত উর্দ্ধ শব্দ জীলিঙ্গ। ব্যতি—দগা পুংলিঙ্গ।

(ছ) তসবীর (ছবি), তকদীর (ভাগ্য), তদবীর, তহসীল, তফসীল, জাগীর প্রভৃতি ঈর বা ঈল ভাগান্ত উর্দ্ধ শব্দ জীলিঙ্গ।

৭। অর্থভেদে কতকগুলি অপ্রাণীবাচক পুংলিঙ্গ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) দেশ, পর্বত ও সমুদ্রের নাম—ভারতবর্ষ, নেপাল, হিমালয়, লাল সমুদ্র, কালা সাগর।

(খ) গ্রহগণের নাম—সূর্য, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। ব্যতি—পৃথ্বী, জীলিঙ্গ।

(গ) সময়বোধক কয়েকটি শব্দ—বর্ষ, মাস, দিন, সপ্তাহ, পাখ (পক্ষ), পল। ব্যতি—সাঁঝ, রাত, ঘড়ী (ঘণ্টা), বেলা (বেলা)—জীলিঙ্গ।

(ঘ) ধাতুর নাম—তাঁবা, গীতল, কাঁসা, লোহা, সোনা, রূপা। ব্যতি—চাঁদী, জীলিঙ্গ।

(ঙ) রত্নসমূহের নাম—হীরা, পদ্মা, নীলম, মোতী, মুঁগা, মাণিক। ব্যতি—মণি, চুন্নী জীলিঙ্গ।

(চ) গাছের নাম—গীপল, বড়, সাগোঁন (সেগুন), কদম্ব, পাকর, জামুন (জাম)। ব্যতি—নীম, ইমলী, বেরী (বদরী) জীলিঙ্গ।

(ছ) শয্যাতির নাম—গেঁহু (গম), চাবল (চাওল), বাজরা, মটর, চনা (চানা)। ব্যতি—অরহর, মুঁগ, মশুর জীলিঙ্গ।

(জ) তরল পদার্থ—ঘী, তেল, পানী, দহী, দুধ। ব্যতি—কাঁজী জীলিঙ্গ।

(ঝ) ই, ঈ, এবং ঋ এই তিনটি বর্ণ জীলিঙ্গ, এই তিনটি ছাড়া অপর বর্ণ সকল পুংলিঙ্গ।

৮। অর্থভেদে কতকগুলি অপ্রাণীবাচক জীলিঙ্গ শব্দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) নদী ও হ্রদের নাম—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, চিঙ্গা।

(খ) তিথির নাম—পরিবা (প্রতিপদ), দুজ (দ্বিতীয়া), চৌথ, পূনো (পূর্ণিমা) অমাবস, (অমাবস্তা)।

(গ) নক্ষত্রের নাম—অশ্বিনী, ভরগী, কৃত্তিকা ইত্যাদি।

(ঘ) মশলা প্রভৃতির নাম—লোংগ (লবঙ্গ), ইলায়চী, সুপারী, কেসর, দালচীনী। ব্যতি—কপূর, তেজপাত পুংলিঙ্গ।

(ঙ) খাজদ্রব্যের নাম—রোচী, পুরী, কচোরী, খীর, দাল, খিচড়ী। ব্যতি—ভাত, লড্ডু, হলুআ পুংলিঙ্গ।

৯। আত্মা, কলম, বিনয়, গড়বড় (গোলমাল), বর্ক, খাস, সমাজ, চলন প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উভয় লিঙ্গ।

১০। হিন্দীতে কতকগুলি তৎসম এবং প্রায় সমস্ত তদ্ভব শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় লইয়া সবচেয়ে বেশী অন্ববিধায় পড়িতে হয়। অগ্নি ও রাশি পুংলিঙ্গ এবং বস্ত্র, আয়ু ও জয় ল্লীলিঙ্গ হইলেও হিন্দীতে ইহার জীলিঙ্গ। দেবতা ও তারা জীলিঙ্গ হইলেও হিন্দীতে ইহার পুং লিঙ্গ। তত্ত্ব, বাহ ও বিন্দু পুংলিঙ্গ হইলেও উহাদের অপভ্রংশ তাঁত, বাঁহ, ও বুঁদ শব্দ জীলিঙ্গ।

১১। সোজা, কেমরা (ক্যামেরা), কামা (comma), এলজবরা (Algebra), প্রভৃতি আকারান্ত ইংরেজী শব্দ হিন্দীতে পুংলিঙ্গ। আবার কংপনী (company), কমিটী (committee), চিমণী, গিণী, লায়ব্রেরী, জ্যামেট্রী (Geometry) প্রভৃতি ঈকারান্ত ইংরেজী শব্দ জীলিঙ্গ। কান্ট্রেন্স

(conference), টেন, সাইকল, ফীস জীলিঙ্গ ; কিন্তু কোট, কিন্তু হিন্দীতে ডেড়ার জীলিঙ্গ ডেড়। তৈঁসা পুংলিঙ্গ, বুট, নম্বর প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ। জীলিঙ্গে ডেঁস।

১২। পূর্ণকুটী জীলিঙ্গ, কিন্তু আনন্দভবন পুংলিঙ্গ। আগরা পুংলিঙ্গ, কিন্তু দিল্লী জীলিঙ্গ।

১৩। আমরা ডেড়াকে পুংলিঙ্গ ধরিয়া জীলিঙ্গে ডেড়ী করি,

১৪। সাঁড় (ষাঁড়) পুংলিঙ্গ; ইহা হইতে দুইটি জীলিঙ্গ শব্দ হয়, দুইটিরই অর্থ ভিন্নার্থবাচক—সাঁড়নী (উঁঠনী), সাঁড়িয়া (উটের বাচ্চা)।

মনবিহঙ্গ

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

হৃদয় কারায় বন্দী বিহঙ্গ মাধাকুটে নিরবধি
কেন সে বেদনা অন্ত পাইনে তার।
মনবিহঙ্গ তবুও মত্ত, হিমাচল অধুনি,
অবিরাম ছুটে নিমিষে হবে কি পার ?

জ্ঞান আলসে বেদমা-বন্দী দেহ-পিঞ্জর মোর,
সন্ধ্যা বাতাস, লুল-লুগন্ধে করে' ওঠে হাহাকার ;
ওরে নির্ধম এত আলো গান সব হয়ে যাবে ভোর,
মনবিহঙ্গ তবুও মত্ত, নিমিষে হবে কি পার ?

মেঘমহুর, স্ননিবিড় নভে ছরীর ঝটিকায়,
হাহাকার ওঠে, শ্যাম-অরণ্যে কাঁদে বনমধুর ;

বেদনাবন্দী দেহপিঞ্জর, ঘন ঘন মুরছায় ;
মনবিহঙ্গ অবিরাম ছুটে নাহি ভয় নাহি ডর।

ওরে বিহঙ্গ ! চঞ্চল পাখী তারুণ্যে ভরা প্রাণ,
বাধা না মানিস, লুটেপুটে নিস দুর্দাম ছরীর ;
জুধাতুর তুই গতিপথে দিস নব জাগরণী গান,
ঘন তমসায় পার হয়ে যান ছন্তর পারাবার।

শৃঙ্খলহীন, রে, চিরনবীন, মনবিহঙ্গ মোর,
অসীমের সাথে মিতালীর তরে, বরে বৃষ্টি আঁখিলোর।

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত হ্রদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে হ্রদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা হ্রদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহণপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিকিউকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকস"

ফোন ক্যাম ৩৩৮১

দক্ষিণ-খানপুরের প্রত্ন-সম্পদ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খানপুর খুলনা-বাগেরহাটের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক পল্লী। ইহার পরিমাণ অল্পমান ছয় বর্গমাইল। চক্ৰী-দুর্গাধ্যক্ষ মুমাজিম বেগের বীরত্বের এবং প্রভুত্বের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার অধ্যুষিত ভূখণ্ডকে “খানপুর” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। “খান” পারস্য শব্দজ—সেনাপতি অর্থ-সংজ্ঞক। খানপুর গ্রামটি স্বাধীন বাংলার বীর-স্মৃতি বহন করিতেছে।

এই গওগ্রাম বর্তমানে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে।—দক্ষিণ-খানপুর, উত্তর-খানপুর, পার-মুদিয়া এবং রণভূমি। দক্ষিণ-খানপুর রাজা বসন্ত রায় এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ৰী দুর্গের সান্নিধ্যে অবস্থিত।

এই দক্ষিণ-খানপুরে বহু পুরা কীর্তি-চিহ্ন বিজ্ঞান। প্রাচীন রাজপথ, রাজবাটি, প্রকাণ্ড দীধিকা, বেদের পুকুর, তেলির পুকুর, বাজাদারের পুকুর, বাবরচির পুকুর, খটক ভিটা, নাপিত ভিটা, বায়ুন ভিটা, বেদের মাঠ, হাতিবেড়ের পুকুর প্রভৃতি অতীত ঐশ্বর্য্যচক নিদর্শনসমূহ অদ্যাপি ঐতিহাসিকের হৃদয় পুলকপূর্ণ করে, মন আনন্দময় করে, এবং চিন্তাধারা কল্পনাময় করে।

রাজার আশ্রয়ে সাধু-সন্ন্যাসিগণ স্বচ্ছন্দে বাস করেন। পূর্বে ভগবচ্চিন্তানিরত জনহিতব্রতীদের যাহাতে অন্নচিন্তা-

জনিত ক্লেশ না হয় তজ্জন্ত-নিষ্কর ভূমি আদি এদান করিয়া ভূমিপতিগণ বর্ষকালের উৎসাহবর্ধন করিতেন। হাতী যেখানে থাকিত তাহার নাম হাতিবেড়। হাতিবেড়ের পার্শ্ববর্তী ভূমি বিধা পরিমিত সন্ন্যাসীর মাঠ আধিকার দিনে বিশেষ অন্নার চক্ষে দৃষ্ট হয়। সংসারত্যাগী, দেবোপম কোন সাধুসম্পন্ন এক-কালে এখানে ধ্যানধারণা করিতেন এবং রাজা এই ভূমি তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

নদীপরিবেষ্টিত, দীপসদৃশ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক শোভাক্ষেপে রাজা বসন্ত রায় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজকার্য্য পরিচালন করত দক্ষিণ-খানপুরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্রগণও থাকিতেন।

সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা বিবোধিত করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন তখন চক্ৰীর গৌরবগরিমা অধিকতর বর্ধিত হয়। মহারাজ দুর্গ পরিদর্শনাধ আগমন করিয়া বৃদ্ধতাত-নির্মিত বাটিতে অবস্থিতি করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬১০-১১ খ্রিষ্টাব্দে) মহারাজের পতন হইলে, বসন্ত রায়ের পুত্র রমাকান্ত এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কচু রায় তাঁহার বৈমাথ্রের ভাতা। ঐশ্বর্য্যশালী খানপুর রাজবাটি অধিকার



মাঃ! নিম্ন টুথপেস্টের গুণে খোবনের
দাঁত শুলি বেশ নির্দোষ হ'য়ে উঠেছে দেখছি!

ক্যালকেক মিকোর 'নিম্ন
টুথপেস্ট' আর নিম্নের গুঁড়া
মাজন 'মার্গোফ্রিস' সকল
বয়সেই দাঁতগুলিকে বেশ
মজবুদ ও উজ্জল করে রাখে।



ক্যালকাটা
কোমিক্যাল

করায় কচু রায় ইঁহাকে দেশস্থ অল্প সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। রমাকান্তের পর প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুটমণি এই প্রকৃতিসুন্দর স্থানে বাস করিতে থাকেন। তখন মোগল সৌভাগ্যরবি অন্তগমনোন্মুখ। সুতরাং মুকুটমণি খানপুরকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করিবার প্রয়াস পান। স্থানে স্থানে জলাশয়ের চিহ্ন তখনকার দিনের এক একটি বস্তুর পানীয় জলের আধার স্মৃতিত করে। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই এখানে সুলভ ছিল। প্রান্তদেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত যে গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল, উত্তরকালে দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের আধিক্য হেতু তাহা “বোম্বের হাট” নাম ধারণ করে।

মগদস্যদের অত্যাচারভয়ে মুকুটমণি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ উত্তরে উৎকল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-খানপুরও হতশ্রী হইয়া পড়ে। এই জনপদ অচিরকাল মধ্যে একরূপ জনশূন্য হইয়া যায়। যাহারা অবশিষ্ট রহিলেন নিদারুণ অর্থকষ্টে তাহা স্থানান্তর গমন তাঁহাদের অসাধ্য ছিল। পরিত্যক্ত স্থান এখন জলময়—পুষ্করিণীগন্ধব কৃষিকার্যের স্থল এবং কিকিদবশিষ্ট রাজপথ খাপদকুলের স্বচ্ছন্দ বিচরণভূমি।

উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানীর রাজত্বকালে খানপুরের ঐতিহাসিকতার মনোহারিত্বে এবং উর্বরতায় মুগ্ধ হইয়া

শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ এখানে নীলের চাষ এবং ব্যবসায় করেন। তাহার স্মৃতির ক্ষীণ অবশেষ এখনও গত বৈভবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী—গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশীয়গণ এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের নষ্ট সমৃদ্ধির উদ্ধারের জন্ত এখানে একটি ধর্ম্মাধিকরণ গঠন করেন। কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানটি আড়ম্বরের সহিত কার্য্য করিয়া ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান কালের অভিসম্পাতে ইহাও বিগতশ্রী।

প্রাচীন কালের গ্রাম্য দেবতার পূজাহান কালীবাড়ী নামে পরিচিত। তথায় সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে। গ্রামবাসিগণের উজোগে প্রতি বৎসর বিশেষ জাঁক-জমকের সহিত বারোয়ারি পূজা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষ্যে কবিগান হয়।

দক্ষিণ-খানপুরের অধিবাসিগণ নিজগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস-চ্যান্সেলর, গুরুসদয় দত্ত-প্রতিষ্ঠিত “ব্রতচারী” শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষকগণ, মহাকুমাপতি ও অমৃত্যু রাজ-কর্ম্মচারী এবং দেশস্থ অপরাপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাময়িক শুভাগমন প্রাণহীন নগরীর হৃদয়ে স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছে।

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাহার “শ্রী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

বাঙালোর বীরত্ব কাহিনী

(২)



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন

স্বাস্থ্যহীনতার গ্রাসি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সজ্ঞান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অশ্বচর লইয়া অতুত সাহস
ও বিক্রমের সহিত স্বদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া স্বীয় নামানুসারে
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাহাদুর সেই শৌর্য বীর্য আজ কাহিনীতে
পর্দাবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

একদশ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ . কলিকাতা

A. A. S.

পুস্তক-পরিচয়

নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী।
দ্বি বুক এম্পায়র লিমিটেড, ২২১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী এম-এ-র লেখা “নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা” বইখানি পড়িয়া বিশেষ ধূসী হইয়াছি। এই বইর এক-খানি বইয়ের আবশ্যকতা বাঙ্গালী পাঠকমহলে—বিশেষতঃ ছাত্র-মহলে—বহুদিন ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল; বিভাস বাবুর বই সেই আবশ্যকতা বহু পরিমাণে মিটাইয়াছে। ইহাতে নাটকের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে—আধুনিক সাহিত্য-চর্চার রীতি অনুসারে বিভিন্ন দিক হইতে নাট্য-সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি উপাদেয় ভাবে করা হইয়াছে। নাটকের যে বিষয় এবং প্রকাশগত বৈচিত্র্য আধুনিক সাহিত্যে আমাদের বিষয় উৎপাদন করে, সেই বৈচিত্র্য ভারতীয়, গ্রীক প্রভৃতি একটি জাতির প্রাচীন সাহিত্যে সমগ্রভাবে মিলে না। এইজন্য নাটকের সম্পূর্ণ আলোচনা, সর্বস্বর বা বিশ্বগ্রাসী আধুনিক সাহিত্যের (ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যের) আধাবেই সম্ভবপর হয়। গ্রন্থকার প্রায় সমগ্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের নাটকের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ‘ড্রাগোইদিয়া’ বা ‘ট্রাজেডী’ অর্থাৎ দুঃখময় নাটক, শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন রসের নাটক, সংস্কৃত রোমান্টিক কমেডী বা রম্যাসময় মিলনাস্তক নাটক, এইরূপ নানা নাটকীয় প্রকারভেদ অনুধাবন না করিতে পারিলে নাটকের রসের আনন্দ অর্পণ থাকিয়া যায়। সব কথাই সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় নাট্যোন্মাদীর নিকট বিশেষভাবে অপেক্ষিত। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাস্তিব্যব এই বইখানিতে বাঙ্গালী পাঠক সংক্ষেপে জানিবার ও চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য নাটক সম্বন্ধে মূখ্য কথা-গুলি পাইবেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পকালের মধ্যে আবশ্যক হওয়ায় বোঝা যায় যে, এই বইয়ের দ্বারা একটি অভাব পূরণ হইয়াছে। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আশা করি আরও লোকপ্রিয় হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী গান (২য় সংস্করণ)। কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীমানাথনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান অ্যানোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিঃ, ৮সি রয়ানাথ-মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৫২, মূল্য আট আনা।

বাংলায় দেশাত্মবোধের গান রচিত হইতে আরম্ভ হয়—প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের অগ্রদূত—চৈতন্যমেলার সময় হইতে (এপ্রিল ১৮৬৭)। মেলার জন্ত রচিত এবং মেলার গীত স্বদেশী গানগুলি চৈতন্যমেলার ২য়-৩য় বাৎসরিক বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল গানের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মিলে সব ভারত-সন্তান” ও মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে”—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় মেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র সেগুলি একত্র করিয়া, ‘স্বদেশাত্মবোধগোদীপক সঙ্গীত’ নামে প্রকাশ করেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)। এই হিন্দুমেলায় যুগে ঘাসকান্ধা গঙ্গোপাধ্যায়ও ‘জাতীয় সঙ্গীত’ নামে একটি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। অতঃপর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় অনেকগুলি স্বদেশী গানের সংগ্রহ প্রচারিত হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের দুই ভাগ ‘বন্দে মাতরম্’, জলধর সেনের ‘জাতীয় উচ্ছ্বাস’, যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মার ‘স্বদেশ সঙ্গীত’ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ত্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের দুই ভাগ ‘বন্দনা’র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গত বৎসর সাময়িক-পত্রে পড়িয়াছিলাম, নব-প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ একটি পুণ্যকর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা সমগ্র জাতীয় সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ সংকলন করিতেছেন। দেখিতেছি, তাঁহারা বোধ হয় সে সকল বর্জন করিয়াছেন এবং “স্বল্প পরিসরের মধ্যে সুপরিচিত অল্প কয়েকটি গান মাত্র একত্র করিয়া” আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণ করিয়া তাঁহারা ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তবে “এই সংগ্রহটি যে কোন দিক দিয়াই সম্পূর্ণতার দাবি করে না” ইহা সত্য। কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয়, আরও দু-একটি অতি-সুপরিচিত গানের অভাবই এই স্বল্প-পরিসর পুস্তকের গুণাপকর্ষণ করিয়াছে। কংগ্রেসে গীত কয়েকটি গান এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে; এমন কি, “বন্দে মাতরম্” গানের যে অংশটুকু কংগ্রেসে গাওয়া হয়, তারকা-চিহ্নিত করিয়া পাদটীকার সাহায্যে সম্পাদক সবচেয়ে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ডাক্তারেরা বলেন

ব্লাড-ভিটা

সর্বত্র মন্ডর বাবর
মেডিকেল রিসার্চ লেবোরেটরি
সি-২০, চন্দ্রান এডমিনিস্ট্রি, কলিকাতা

বিশ্ব এই কংগ্রেসেই গীত অন্ততঃ দুইটি অতি-সুপরিচিত গান যে কেমন করিয়া কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ-প্রচারিত 'স্বদেশী গানে' স্থানলাভে বঞ্চিত হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি বিজ্ঞেননাথ ঠাকুরের "মলিন যুগলমা ভারত তোমারি" অথবা মনোমোহন বসুর "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত স্বদেশী গানের কথা ছাড়িয়াই দিতেছি; যে-দুইটি গানের কথা বজিতেছি, তাহার একটি চৈত্রমেলা ও কংগ্রেসে সগৌরবে গীত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের ঘণাগান,"—যে গানটির সম্বন্ধে একদা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (চৈত্র ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন :— "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-বন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যদুনা দিল্লী নর্থনা গোদাবরী-তটে বৃক্ষে মধুরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গভীর গর্জনে মস্তীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর জন্ম-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!" অপর গানটি ১৯০১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গীত সরলা দেবী-রচিত "অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'! মহাসভা-উদ্বাদিনী মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'!"

সম্পাদক বাংলা গানের সংগ্রহের মধ্যে যখন দুই-তিনটি হিন্দী-উর্দু গানও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় সর্বত্র গীত এবং কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে ধ্বনিত, 'হিতবানো'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের "ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল" নামক সুপরিচিত হিন্দী গানটিও পুস্তকে মুদ্রিত করিলে ভালই করিতেন। গানটি একাধিক স্বদেশী গানের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপে সরস্বতী লাইব্রেরি-প্রকাশিত স্বরাজসঙ্গীত 'অর্ঘ্য'র নাম করা যাইতে পারে।

"এক স্তরে বাধিয়াছি সহস্রটি মন" গানটি সর্বপ্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুষ্কবিক্রম' নাটকের ২য় সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছিল; এই কারণেই বোধ হয়, গানটির রচয়িতা হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম বর্তমান পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান স্থান পাইয়াছে; আলাোচ্য গানটিও যে রবীন্দ্রনাথের, তাহা আমরা কবির মুখেই শুনিয়াছি এবং এ সংবাদ সাময়িক-পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্বদেশী গানে'র পরবর্তী সংস্করণে এই ভুলটির সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

আশা করি, আগামী সংস্করণে সম্পাদক পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীবিজ্ঞেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

মরা নদী—শ্রীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থকার হলেবক। ছোট গল্প লিখিয়া পৃথীশচন্দ্র কথ্যোক্তি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি উপস্থানে হাত দিয়াছেন। "মরা নদী" উপস্থান। বিষয়-বস্তু একটু নতুন ধরণের। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "হিন্দুসমাজ আগে বাহাদিগকে অনুন্নত রাখিয়া, বাহাদের উপর নির্ভর করিয়া শক্তিশালী ছিল, আজ তাহারাই নাই, তাই সমাজ-শুখলার তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।...কতাপণ-প্রথা হেতু দরিদ্র ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে নাই, অথবা বিপত্নীক বা অনূচ অবস্থার কোন বাল-বিধবার সহিত গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। সমাজ তাহার গৃহকে অস্বীকার করে নাই, কোন রকম একটা অজুহাতে ক্ষমা করিয়াছে। কিন্তু উহার সম্ভানকে কখনও স্বীকার করে নাই—তাই হিন্দু-পত্নী ক্রমশঃ পোড়ো ভিটায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।" কিন্তু মত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া গ্রন্থকার কোথাও কাহিনীকে ব্যাহত করেন নাই। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাহাদের পত্নীজীবনের সহিত নান্যক পরিচয় আছে তাহাদের নিকট গুরুচরণ, রসিক, কুহুম অথবা দিগম্বরী কেহই অপরিচিত নয়; বিরাট কুহুমসমাজ-ভুক্ত ইহার সকলেই পত্নীর আপন। বালবিধবা কুহুমের করণ কাহিনী মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়। উপস্থানস্থানি প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়াছে ২৬২ পৃষ্ঠায়, ইহার পর আর কয় পৃষ্ঠায় যে আকস্মিকতার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা-হয়ত ছোট গল্পে কখনও কখনও চলিতে পারে, উপস্থানে তাহা পরিহার্য। কুহুম-চরিত্রের পরিণতির পক্ষে ইহা আবশ্যক নহে। শুধু যে সমাজ-দরদীই পুস্তকখানির মধ্যে প্রচুর চিত্তার খোরাক পাইবেন তাহা নহে, পাঠক নতুন বিষয়-বস্তুর আশাদলাভে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদিত

কবিতা

কবিতা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক
আগামী আশ্বিনে দ্বাদশ বর্ষ আরম্ভ
বার্ষিক ৪০, বর্ষায় ৪১০, প্রতি সংখ্যা ১০

বৈশাখী

বার্ষিকী

গল্প প্রবন্ধ কবিতা কোতুক

সমালোচনা

১৩৫০ সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো

দেড় টাকা

১৩৫০, ৫১ ও ৫২ সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা দু' টাকা

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব—জীৱনগদ্যনন্দ বাজপেয়ী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। কবিতাগুলি জাতীয়তামূলক, বন্দীনিবাসে রচিত, এবং মোটেই গতানুগতিক নয়। আজিকার ছন্দহীনতার দিনে লেখকের ছন্দ এবং মিলের উপর আধিপত্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে হয়। কবিতা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহমান; সেগুলি শুধু আবেগময় নয়, তাহাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাহার কোতুকবোধ আছে এবং তিনি বিদ্রূপ করিতেও জানেন।

দেশের মাটিতে নাহি রয় যদি মানস-তরঙ্গ মূল
কোটে দুনিয়ার অস্থল তরুতে অলীক স্বপঙ্কল।

কবির প্রতি তিনি বলিতেছেন;

নিপীড়িত নর-আত্মার ব্যথা কঠে গুহ্মের রক্ত-বাক্

হে কবি, তোমার বাঁশরী-রঞ্জে মৌন সে ব্যথা মুক্তি পাক।

“জগন্দের জতু-গৃহ” ছালাময় কবিতা। “ডায়ালেক্টিক ড্রয়েট গান” উপভোগ্য। “বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব” পাঠকের মনে প্রেরণা এবং আনন্দের সঞ্চার করবে।

লুকিয়ে থাকে প্রেম—শ্রীচিত্রিতা দেবী। অর্চনা পাবলিশিং, ৮ বি রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ হইলেও প্রায় সব কট গল্পের অন্তর্মিহিত বার্তা নামটিকে সার্থক করিয়াছে। আজকাল সাময়িক পত্রে অবিরাম গতিতে গল্পের বহু বহিয়াছে, তৎসঙ্গেও ভাল ছোট গল্প পাইলে সাহিত্য-রসিকের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নবাগতা এই লেখিকার নিজস্বতা

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের

অপরিস্রব ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অর্দ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক

শ্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম, এস মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক
দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জন্য সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার
মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি
চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে।)

প্রাপ্তিস্থান:—হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং

১৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকারের নিকট, দিনাজপুর।

আছে। “রাজ্যের ঐশ্বর্যের জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে থেকে যে প্রেম বীরকে দিয়ে করিয়ে নেয় কঠিন সাধনা, সেই প্রেমই কবিকে দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে শোনায় তার শ্রিয়াকে।”—প্রথম গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে চিরদিনের এই সত্যটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গল্পেই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু শেষ গল্প “নারী”তে আনন্দ-বেদনা-স্নেহ-উৎকর্ষ-আশা-আকর্ষণময় বৈপরীত্যে অপূরণ মায়ের প্রাণ অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠকের চিত্তকে আনন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা,

ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের রাজনৈতিক
কর্মসূচী—কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম. এ., এম. এল. এ।
প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৮, মূল্য ৩ টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমস্ত জগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং দেশে দেশে যে জনজাগরণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাদের মূল্য ও সার্থকতাই বা কি, এক কথায় বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতা ও এই বাস্তবতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশের সন্ধান লওয়াই গ্রন্থকারের আলোচনার উদ্দেশ্য। জগতে কোন জিনিষই হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। বিপ্লবও ক্রমবিকাশেরই একটি রূপমাত্র—যদিও এই বিকাশের গতি খুবই দ্রুত। লেখক ইউরোপের নানা দেশ, বিশেষ ভাবে আয়ারল্যান্ড ও এলিসায়ার চীনের সহিত ভারতের-ভাগ্যের ও প্রগতির তুলনা করিয়া খুব নিপুণ ভাবে এই উভয় দেশেই সাম্রাজ্যবাদের লীলাখেলার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। আয়ারল্যান্ডের ও ভারতবর্ষের পাকিস্তানী পার্টিসন যুক্তির কি আশ্চর্য মিল! প্যালেস্টাইন, ইন্দোচীন, মালয় ও জাভা সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদের একই কূটনীতি। আজ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার নিজের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। কিন্তু গণশক্তির আঘাত না আসিলে যে আরও বহুকাল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চলিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক বলেন, “ইতিহাসের শিক্ষা হতেই আমরা দেখি যে সাম্রাজ্যবাদ আপনা আপনি যায় একথা কখনও সত্য নয়। বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত হবে এ কথা ভুল, জনমত উদ্ভূত হয়েছে বলে আজ যে কথা উঠেছে সে জনমত প্রকৃত বৈপ্লবিক কিনা সে কথা না বুঝে তার উপর ভরসা করা চলে না।” নানাদেশের বৈপ্লবিক

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউট

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেন্নারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

শ্রীমতী
শ্রীমতী
শ্রীমতী

শ্রীমতী কেশ তৈল

অনুম্পা কোমিক্যালঃ কলিকাতা



NAVANA

আন্দোলন হঠাতে ভারতবর্ষ শিক্ষালাভ করিয়াছে, নিজের দুঃখ, দৈহিক এবং শোষণ হইতেও সে শিখিয়াছে। আজ ভারত বিপ্লবের পথ বাছিয়া লইয়া থাকিলে (ইউক তাহা অহিংস) ইতিহাসের ধারাই এই পথের নির্দেশ দিয়াছে। পুস্তকে উদ্ধৃত বহু ইংরেজী ব্যক্তির অনুবাদ না দেওয়ায় ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের অসুবিধা হইবে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি দূর করা হইবে।

একটি সমরোপযোগী অথচ যুক্তিপূর্ণ এবং চিন্তামূলক গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকের মানসিক খোঁজক যোগাইবে ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আশা করি এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে।

কচুরী পানা—রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান—গ্লোব নাশ্যারি, শ্রামবাজার, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৪২, মূল্য ১০ আনা।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কচুরী পানা সংক্রান্ত সকল বিষয় অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কচুরী পানা বাংলাদেশের শস্য ও স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট করিতেছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এই বিষয়ে দেশের গবর্ণমেন্ট সজাগ হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষেও ইহাকে নিমূল করা সম্ভব নহে। কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েও ইহাকে ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার উচ্চতাপ্রধান দেশসমূহে পর্যাপ্ত কলকজা ও রাসায়নিক পদার্থের

সাহায্যেও ইহার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় নাই। লেখকের মতে ইহার বিনাশের একমাত্র উপায় “তোলো আর মারো”—এই সনাতন আদিম পদ্ধতি। কচুরী পানাকে ধ্বংস করিয়া ইহা হইতে জমির একপ্রকার সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিরূপে ইহা করা যায় লেখক সুন্দরভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকের প্রথমে কাজী নজরুল ইসলামের ‘কচুরী পানা’ শীর্ষক গানটি দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের শেষে পণ্ডিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “কচুরী পানার ছড়া” বইখানিকে সরস ও সুন্দর করিয়াছে। নিভান্ত প্রচার-পুস্তিকা হইলেও ইহাতে সাহিত্যরস আছে এবং এইজন্যই এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বাংলার প্রত্যেক গৃহে ও গ্রামগারে ইহা আদৃত হওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প—(প্রথম খণ্ড)
শ্রীধরশঙ্করকুমার গুপ্ত, কমলা পাবলিশিং হাউস, ৮-১ এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা। মূল্য ১২ টাকা।

বিদেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি গল্প বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জগৎ অনুবাদ করিয়া এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; অধিকন্তু গল্পগুলির লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

রেজিঃ অফিস—আখাউড়া

প্রধান অফিস—আগরগঞ্জ

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, ৫৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট (রাজকাটরা) •

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন— ৫০,০০০,০০/-

বিক্রীত মূলধন— ২২,৫০০,০০/-

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল— ১৪,৫০০,০০/- টাকার উপর

সংরক্ষিত তহবিল— ৩,৯৭,০০০,০০/- টাকার উপর

কার্যকরী তহবিল— ৩,৭০,০০০,০০/- টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—আজমিরীগঞ্জ, বদরপুর, বাজিতপুর, ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলচর, শ্রীহট্ট, ইক্ষিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, ময়মনসিংহ, মোলবীবাজার, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, তেজপুর, বেনারস, চাঁদপুর, টাংলা, গোয়ালঘাট, গোহাটা, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জনপাইগুড়ী, নর্থলক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেঁচুগঞ্জ, ডিক্রাগড়, শিলং।

ভিনসুকিয়া ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অন্যেকটি গল্পের উপরিভাগে ভিন্ন কালিতে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গল্পগুলি অনির্বাকিত, স্ব-অনুবাদিত এবং সচিত্র। ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম।

জাপানের বন্দী—শ্রী হুম্মীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৯ কুটিবাট রোড।

“সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী” লইয়া লিখিত ছোটদের উপন্যাস। লেখক গল্পটিতে যথেষ্ট গতিবেগ দান করিয়াছেন তাঁহার রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা। স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি এবং একদেশদশিতা দৃষ্ট হইলেও পরাধীনতার ব্যথা-বেদনা এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক কথাই মনকে নাড়া দেয়। কয়েকটি চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রশংসনীয়।

কথা চয়ন—সম্পাদক—শ্রী বজ্রিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১২, হরিতকী বাগান লেন, মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলার বিখ্যাত কয়েকজন গল্পলেখকের গল্প এবং কয়েকটি নবীন লেখকের রচনা দিয়া এই কথা-চয়নখানি গ্রথিত হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িয়া ভাল লাগিল। বাংলায় ছোট গল্পের আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সময় এইরূপ সংকলন-গ্রন্থ-প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ সুচারু।

শ্রী কান্ধুনী মুখোপাধ্যায়

কমনস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯১৩

গ্রাম : 'EKESAR'

পি ৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যাঙ্ক-
সমূহের মধ্যে অন্যতম।

আমাদের 'সিলভার জুবিলী পার্টিফিকেট' টাকা আমানত করিয়া বিশুণ অর্থলাভ করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় না।

মিঃ অশোককুমার সেন রায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

প্রকাশিত হ'লো
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

গুড আর্থ

সবল বাক

অনুবাদ ক'রেছেন পুষ্পময়ী বসু
...বাংলার দুর্গত, নিপীড়িত চাষীর সংগ্রাম, ব্যর্থতা, স্বথ-দুঃখ, আশা-নিরাশা রূপ নিয়েছে চাষীর ওয়াংএর মধ্যে। আর কর্বণ-ক্ষতা, সর্বস্বনাশ মুক বহুবার মত বাংলার মেয়ে লুকিয়ে আছে ওলান-এর মধ্যে। মহাচীনের মহামুক্তিকাম একত্র হ'রে মিশে আছে বাংলার অনাবৃত্তিতে দক্ষ, বহাদুর ভাসিয়ে-নিরে-বাওয়া বাংলার সোনা ফলা মাটি। 'গুড আর্থ' সেই সোনার মাটির ছবি...

- * ১৯৩৮-এ বহুমূল্য নোবেল প্রাইজ পাল বাক এই উপন্যাস লেখার জন্য পেয়েছেন।
 - * ১৯৩৬-এ 'গুড আর্থ' সবারক চিত্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু 'গুড আর্থ'এর আসল পরিচয় মূল পুস্তকে, ছায়-চিত্র অপূর্ব হলেও মূলের অপকৃষ্টতাতে নেই, নেই তাতে মূলের অপূর্ব স্বরূপ বিস্তার।
 - * বিশ্ববিখ্যাত পুন্টিজার প্রাইজ এবং হাওয়েল-স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে পাল বাককে সম্মানিত করা হয়।
 - * পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এই উপন্যাস প্রকাশিত হল।
 - * আমেরিকার বই বিক্রীর রাজ্যে 'গুড আর্থ' রেকর্ড স্থাপন করে।
- অনিন্দ্য অনুবাদ—অপূর্ব গঠনসজ্জা—উৎকৃষ্ট এ্যাটিক ডিমাই কাগজে ছাপা এই স্ববহু উপন্যাসের মূল্য : পাঁচ টাকা

মুদ্রকালীন সোভিয়েট সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অমর মানুষ

রচনা :

ডায়ামন্ড গ্রন্থমালা

অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ভূমিকা : গোপাল হালদার
বসুধারে অনুবাদ—বাকবাক ছাপা—সুদৃশ বাঁধাই। মূল্য আড়াই টাকা।

আর একটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

শীঘ্রই
প্রকাশিত
হবে

ফাল্গু

মূল্য : পাঁচ টাকা

অনুবাদ : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাজিক্যালবুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

মল্ল-মুখর—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রগতি প্রকাশনী, ১৮, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

মল্ল-মুখরের কাহিনী কোন মহৎ বা বৃহৎ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। ক্ষুদ্র করেকটি চরিত্র, খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ঘটনা, বহিমুখী ও অন্তর্মুখী ছুটি পথের কেন্দ্রস্থলে অনগ্রসর জেলার অনগ্রসর মহকুমা-শহর নিশ্চিন্ত নগর এই লইয়া কাহিনী। একদিন এই শহরের গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে আগষ্ট-আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া আঘাত করিল। নেতৃহীন গণ-বিপ্লবে শহরের রূপ বদলাইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চরিত্র, ঘটনা, অন্তর্মুখী ও বহিমুখী ছুটি পথ সেই অগিলীলার মুক্তিকামী ভারতবর্ষের মর্দংবেদনাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। এই বলি-বেদনাময় শক্তিকে অগাধ নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক উপভাসে চিত্রিত করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বদ্বিষ্ট প্রকাশভঙ্গি ও গভীর অনুভূতির গুণে উপভাসটি সজীব ও সার্থক হইয়াছে।

নীলালঙ্কার—শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ, ৯৯এ, তারক প্রামাণিক স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

নীলালঙ্কারের গল্পগুলি পড়িলে স্বতঃই মনে হয়—গল্প শুধু বিষয়বস্তু নির্বাচনের গুণে রস-সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয় না। লেখকের সংবেদনশীল মন, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ভাষার প্রসাদ-পারিপাট্য রসোত্তীর্ণ গল্পের অন্ততম উপাদান। এই সংগ্রহের অধিকাংশ গল্পে এই কয়টি উপকরণের কোন না কোনটি বিগ্ৰহমান। 'নীলালঙ্কার' ও 'লেখকের স্ত্রী' গল্প দুটির করণ রস বিশেষভাবেই মনকে নাড়া দেয়।

দেবী চৌধুরাণী—সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা। আশুতোষ লাইব্রেরি, এনং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মত এটিও সুসম্পাদিত, এবং জনাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বীরত্বের রাজটীকা—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৫০ আনা।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের 'জগৎ কোন্ পথে', 'সাহসীর জয়যাত্রা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলার কিশোর-কিশোরী-মহলে যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে সেগুলির সংস্করণ-বাহুল্যই তাহার প্রমাণ। বীরত্বের রাজটীকাও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা দেশোদ্ধারোদ্দীপক আর একখানি গ্রন্থ। মাত্র ২১৩ বৎসরের মধ্যে ইহারও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ার এখানিতেও যে লেখকের পূর্বকৃতিত্ব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তরুণ মনকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যোগেশ-বাবুর লেখনী পরিচালনার অত্যন্ত উদ্বেগ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, যোগেশবাবুর এই সমস্ত পুস্তক দ্বারা বাংলার সেই কিশোর-কিশোরীদের মনে জাতীয়তার বীজ উৎপাদিত হইতেছে, ফলে পরোক্ষভাবে স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গঠনের প্রাথমিক কার্যও সম্পন্ন হইতেছে।

যোগেশবাবুর 'বীরত্বের রাজটীকা' কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে

নবমুগোল দৃষ্টি ও সৃষ্টির পরিচয়

এঙ্গেলসের

সমাজতত্ত্ববাদ—

কম্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক ৫০/০

অনুবাদক—রেবতী বর্মণ

মার্ক্সবাদী ছাত্রের পক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত মৌলিক মার্ক্সবাদী বইখানি প্রাথমিক পাঠ হিসেবে একমাত্র অপরিহার্য।

লেনিনের

গ্রামের গরীবদের প্রতি ১/

বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র অনূদিত

কৃষকের সংগঠন ও তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে শক্তিশালী করে তোলা আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য। লেনিনের এই বিখ্যাত বইখানি তাঁর জন্তে একমাত্র সহায়।

বিশ্ববিখ্যাত যে-বইখানি বিক্রি হ'য়েছে ৮০ লক্ষ খানি—

ডীন অব ক্যান্টারবেরির সেই বই অবলম্বনে—

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা

সোভিয়েট দুনিয়া ২৥০

রাশিয়া সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীনাথনাল বুক এঙ্গেলসী লিমিটেড—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা

অর্থনীতির গোড়ার কথা ১।০

বাংলার বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক রেবতী বর্মণের এই বইখানি মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একমাত্র প্রাথমিক পুস্তক—যার অভাব এতদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক •

অমিত সেনের

ইতিহাসের ধারা ১।০

আদিম যুগ হইতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বাংলা ভাষায় একমাত্র মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ।

(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)

সুধাংশু দাশগুপ্তের

বিপ্লবী চীন ১/

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকোশলের সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে এই বইখানি বিশেষভাবে সাহায্য করবে। লেখক আধুনিক চীন-ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেক্ষাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিশ্বরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব সামুদ্রিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুগ্মরস্তুকালীন মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিভ্রমিত গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামান্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X X-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাম্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেবিতামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিন্ধুহস্ত। ইঁহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিবুল এবং দেশীয় নেতৃবুল ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবুলকে বৈরাগ্যভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তুরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সমগ্র প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অস্বাভাবিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুঃসারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমার জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়ার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুঃসূচের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আউগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হার্ব হাইনেস্ মাননীয় বটমাতা মহারাজী ক্রিপুরা ষ্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।” সম্ভোবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়দাহেব এম, এম, দাস বলেন—“তিনি আমার যুগপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যমণী মহামহোপাধ্যায় ভারতচর্চা মহাকবি শ্রীহরিন্দাস সিন্ধাস্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বঙ্গের নবীন হইলেন ও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এদেশলীর মেধার মাননীয় শ্রীযুক্ত সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি, মাথবন্স নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, ক্লচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাউন্ডলায়।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজত্বলাভ ঐশ্বর্য, মান, বংশ, প্রতিভা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তন্মাত্র) মূল্য ৭৫। অজুত শক্তিসম্পন্ন ও সমগ্র ফলপ্রসূ কল্পরক্ষতুল্য কুবের কবচ ২৯৫। প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ ক্তব্য। বর্গলাভকী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মায়াল মোকদ্দমার জয়লাভ, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সমস্ত রাশিয়া কম্যুনিস্ট্রিলাভে রক্ষা। মূল্য ২৫০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০। (এই কবচে ভাওয়াল সম্রাটী জয়লাভ করিয়াছেন)। বশীকল্পণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাচ্য) মূল্য ১১০, শক্তিশালী ও সমগ্র ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এট্রোলজিকেল এণ্ড এট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫-
সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা। লোক অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ইহাতে রাবেয়া, জোয়ান অফ আর্ক, মাদাম চিয়াং কাই-শেক, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ মলতান, রাণী অহল্যাবতী, রাণী ভবানী, কস্তুরবাই গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলী, লক্ষ্মী স্বামীনাথন—দেশবিদেশের এই বীর জন মহীয়সী মহিলার জীবন ও কৃতির কথা হৃদয়গ্রস্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী পরিচালিত ঝান্সীর রাণী বাহিনীর কথা এবং ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের নায়িকা অরুণা আসফ আলীর কাহিনী বর্তমান পরিবর্তিত সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকখানি বিশেষ সমরোপযোগীও হইয়াছে। বীরত্ব কথাটি যোগেশবাবু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে-সমস্ত নারী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া শত্রু নিধন করিয়াছেন—তাহাদের বীরত্ব কাহিনী তিনি যেমন আবেগমগ্ন ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, মহিষ্ঠতা, রাজ্যশাসনে দক্ষতা, প্রজ্ঞানুরঞ্জন, বদান্ততা প্রভৃতি সদগুণাবলী যে সকল বরাঙ্গনার ললাটে রাজ্যটাকা আঁকিয়া দিয়াছে তাহাদের পুণ্যচরিত-কথাও তেমনি আমাদের শুনাইয়াছেন। ঐতিহাসিকের তথ্যানুগত্য এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে সুপরিচ্ছট। কল্পনার রং চড়াইয়া লেখক সত্যকে বিকৃত করিয়া তোলে নাই, কলে ইহা জীবন-চরিত্রই হইয়াছে, জীবনোপগ্ৰাস হইয়াছে নাই। যোগেশবাবুর পুস্তকের আর একটি বৈশিষ্ট্য পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিপুণ বিশ্লেষণ এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। জোয়ান অফ আর্ক, দুর্গাবতী, চাঁদবিবি বা লক্ষ্মীবাইয়ের অভূতায় কার্য-কারণ সম্পর্ক-নিরপেক্ষ আকস্মিক ঘটনা নহে। জাতির চরম প্রয়োজনেই দেশের ধোর দুর্দিনে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই প্রয়োজনটি কি তাহা ‘দুর্গাবতীর দোসর’ প্রভৃতি কোনো কোনো অধ্যায়ে স্থলর ভাবে

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে ‘জোয়ানের চেয়েও বড়’ এবং ‘দুর্গাবতীর দোসর’ নামক দুইটি অধ্যায়। এই কাহিনী দুটি সাহিত্য-রসে ভরপুর, পড়িতে পড়িতে মনে অতীত হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে দুর্গাবতী আর চাঁদবিবি ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই উভয় জাতির নারী-শক্তির যুগল-প্রতীক যেন রক্তমাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সামনে পাশাপাশি আদিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই বহু চিত্রশোভিত, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং সাহিত্যরসপূর্ণ পুস্তকখানি বর্তমান সংস্করণও যে পাঠিকা ও পাঠক মহলে আশাভীত সমাদর লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলার বাইরে—ক্রীটপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১১বি, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ টাকা।

পুস্তকের শিরোভাগে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইহা উপন্যাসের ছাঁচে ঢালা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী। যাহারা ভ্রমণ-কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন, তাহারা ইহা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। গ্রন্থকার অথবা পুস্তকের নায়ক শিক্ষকতা, ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকতা ও নোটবুক লেখা প্রভৃতি কার্য-ব্যপদেশে বাংলার বাইরে নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন। মুম্বই, কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বুলন্দশহর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সুপরিচিত স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে পাঠককে আকৃষ্ট করিবার মত নূতন কিছুই নাই। কিন্তু জরপূরে অবস্থানকালে তিনি রাজপুতানার যে সকল

পানে পরম তৃপ্তি

স্নো ডিউ
দার্ডিঙ্গলিং চা

কমলালয় ষ্টোর্স লি:

শুভ

বিবাহের

জন্য

সর্বপ্রকার

প্রয়োজনীয়

সামগ্রী

আমাদের

ষ্টোর্সে

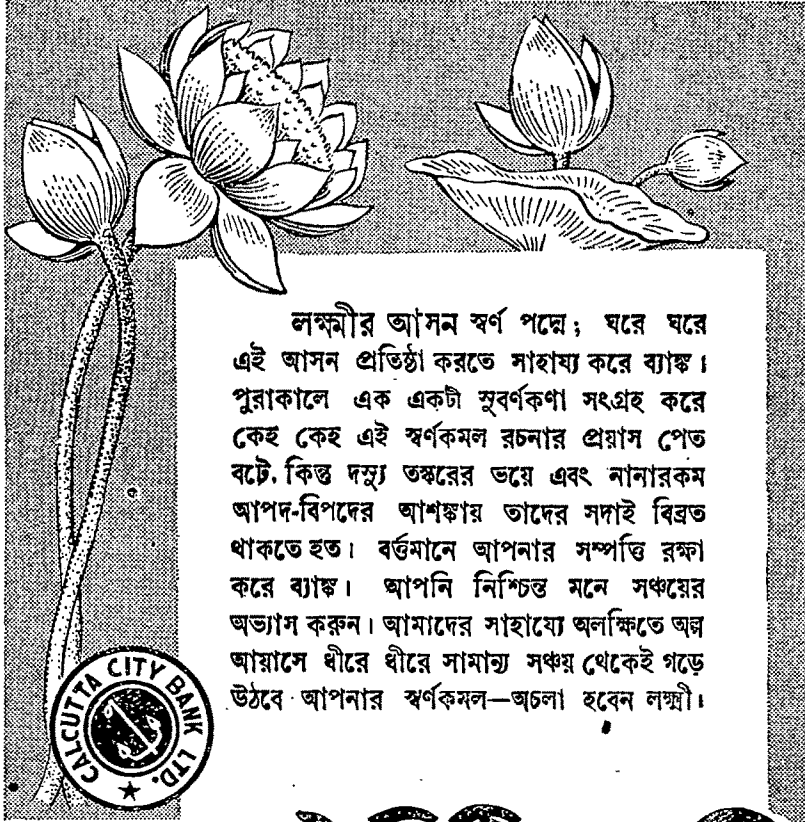
পাইবেন।

||

কমলালয় ষ্টোর্স

লিমিটেড,

ধর্মতলা, কলিকাতা।



লক্ষ্মীর আসন স্বর্ণ পদ্মে; ঘরে ঘরে
এই আসন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে ব্যাঙ্ক।
পুরাকালে এক একটা সুবর্ণকণা সংগ্রহ করে
কেহ কেহ এই স্বর্ণকমল রচনার প্রয়াস পেত
বটে, কিন্তু দক্ষ্য তত্ত্বের ভয়ে এবং নানারকম
আপদ-বিপদের আশঙ্কায় তাদের সদাই বিব্রত
থাকতে হত। বর্তমানে আপনার সম্পত্তি রক্ষা
করে ব্যাঙ্ক। আপনি নিশ্চিত মনে সঞ্চয়ের
অভ্যাস করুন। আমাদের সাহায্যে অলক্ষিতে অল্প
আয়্যাসে ধীরে ধীরে সামান্য সঞ্চয় থেকেই গড়ে
উঠবে আপনার স্বর্ণকমল—অচলা হবেন লক্ষ্মী।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লি:

১০২বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের ঐতিহাসিক তথ্য-পূর্ণ বিবরণই এই পুস্তকের বিশেষত্ব। জয়পুর রাজ্যের অতীত ও বর্তমানকালের ইতিহাস, জয়পুরে বাঙালীর প্রভাব ও কীটিকলাপ, আজমীর, ভরতপুর, রণথম্বর দুর্গ, বিরাটপুর বা বৈরাট, সম্বর হ্রদ, কোটা, টঙ্ক, বৃন্দী প্রভৃতি রাজপুতানার ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনা কেতুচলোদীপক হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থানে হিন্দু-স্থানী ভাষার প্রয়োগ পশ্চিমদেশীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার বাহিরে রুক্ষ উষ্মর হৃদর পশ্চিমের দেশগুলির বর্ণনা পড়িয়া পাঠক বেশ একটু নতনত্ব ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইবেন।

প্রাচ্যবাণী-মন্দির-প্রবন্ধাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড) —

প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের যুগ্ম-সম্পাদক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত। প্রাচ্যবাণী-মন্দির ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৮ টাকা।

সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা ও দর্শনাদি প্রাচ্য-বিজ্ঞানসমূহের আলোচনা ও অনুশীলনের সাগায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে যে সকল স্থনী ও বিদ্বজ্জনের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই খণ্ডে খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সাধারণ মাসিক পত্রিকায় অবশ্য এ সকল বিষয়ের আলোচনা প্রায়ই থাকে, কিন্তু বিশেষ ভাবে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার সহায়ক

প্রবন্ধাবলীর একত্র সমাবেশ এই ধরণের প্রচেষ্টা দ্বাৰাই সম্ভব। প্রথম খণ্ডে সন্ধ্যা ভাট্টার 'দেবতা উর্না'র ঋগ্বেদের সূক্ত সহিত বাংলা কবিতা-হুবাদ, ডক্টর চৌধুরীর 'যুগপ্রবর্তক রামমোহন', বিদ্যুদী রমা চৌধুরীর 'স্বামী মনসুজ', অধ্যাপক তমোনাশ, শমী-ভূষণ ও যোগেশচন্দ্রের নবীন সেনের কাব্যালোচনা এবং পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর 'দার্শনিক ভ্রমজ্ঞান ও অধ্যাসবাদ' উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে ডক্টর হুকুমার সেনের 'পাঁচালীর উৎপত্তি', মণীন্দ্রমোহনের 'চর্য্য সাহিত্যিক মূল্য', এবং হুকুবি জীবেন্দ্র-কুমার ও কামিনীকুমারের কাব্য-সমালোচনা উপভোগ্য হইয়াছে, হরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা' ও সম্পাদকের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংস্কৃত-সাহিত্যে দান' প্রবন্ধটি এই খণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিত বিখ্যাত স্বদেশী গান-রচয়িতা ত্রিপুরার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য (১২৭৮—১৩৫০) সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমাদের হুর্ভাগ্য তিনি 'সুখদা' ভিন্ন অন্য কোন কবিতার বই প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক যদি এই প্রতিভাবান কবির অপ্রকাশিত কবিতা সকল সম্পাদিত করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। সুযোগ্য কবির উপযুক্ত সমাদর দেশবাসী অবশ্যই করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

“বৃক্ষ ইব দিবি স্তব্ধ—”

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

গভীর নিশীথে একা হেরিলাম বাতায়নে আসি—
অষ্টমী চাঁদের আলো সস্রুণ উঠিছে উদ্ভাসি'
মাধবীর লতাফুলে শিমুলের শাখায় শাখায়—
সত্তফোটা যুথী-ফুলে ছুটি গুচ্ছ রজনীগন্ধার
নিমিলিত পত্রপুটে—তৃণদলে শোভন সুন্দর
শিশির পড়িছে বরি—তন্মাহীন ক্লাস্ত নিশাচর,
একাকী পাখীর ডাক—অকস্মাৎ পক্ষবিধুনন
সুগভীর নিশীথেই স্তব্ধতর করে ক্ষণে ক্ষণ।
দূরে দিক্‌প্রান্তে একা অশ্বখের দীর্ঘতর ছায়া
দিগন্তরেখার পটে বিলম্বিত—সমুদার কারা

রহস্তে গভীর ঘন—স্বপ্নসম মনে হয় থাকি,
বৃক্ষের মতন তুমি স্তব্ধ হির পরম একাকী,
একান্ত একেলা তুমি; চারিদিক অন্তহীন গতি
নক্ষত্রের আবর্তন কক্ষপথে—কোথায় বিরতি?
তৃণাঙ্কুর উর্দ্ধপানে মেলিয়াছে বীজের পতাকা—
জন্ম-মৃত্যু ফুলে-ফলে অমৃতের যাত্রাপথ আঁকা—
আত্মা চিরপলাতক—এ চলার নিত্যসঙ্গী আমি
বিচিত্র প্রকাশে রাপে অনুভব করি দিব্যামী—
স্তব্ধ শান্ত তুমি একা বৃক্ষসম পরম একাকী
তুমি রবে চিরদিন—আর কিছু রহিবে না বাকী।

দেশ-বিদেশের কথা

জীবনমোহন বসু

বিজয়পুরের অন্তর্গত মালখানগরের বসু-বংশের কালীচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র জীবনমোহন বসু ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত মনমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ তাঁহার মাতুল ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জীবনমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং তথায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তৎপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বদলি হন। সেখানে অনেক বৎসর গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন এবং কিছুকালের জন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদও লাভ করেন। অবশেষে রাজদাহী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি 'এভিয়েশ্যন' সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাহা বিলাতের 'নেচার' কাগজে প্রকাশিত হইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বিগত জাহ্নয়ারী মাসে তিনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। সৌজন্য, কত ব্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি নানা গুণের জন্ত সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।



জীবনমোহন বসু

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস- ৩/১ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-কলকাতা-১১২২, ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট, বড়বাজার, ল্যানসডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস

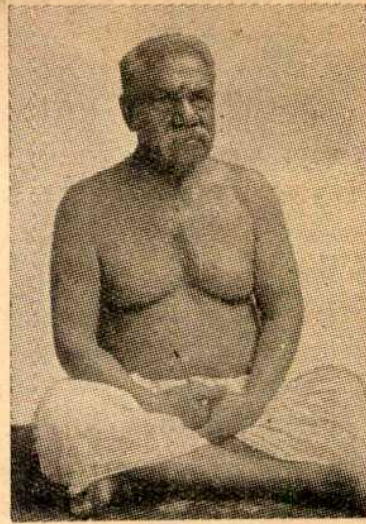
মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুশীল সেন, বি, এ

গোষ্ঠবিহারী দে

‘ইন্টার্ণ টাইপ কাউন্সারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডে’র প্রধান-পরিচালক গোষ্ঠবিহারী দে ১২ই আশ্বিন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি একজন ধর্মপ্রাণ, ভগবদ্ভক্ত ও ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং সহজ, সরল ও আত্মবিশ্বাসী জীবন-যাপন প্রণালী সকলকেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করিত। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্ম এবং বদান্ততার জন্ম সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাঁহার গোপন দান বহু অভাবগ্রস্ত লোকের হৃৎকম্পিত করিয়াছে। তিনি এক জন গ্রন্থকারও ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে “প্রিন্টার্স গাইড” বইখানি সুদীর্ঘ সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। মুদ্রণ সম্বন্ধীয় এইরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। অল্পদিন হইল যুবকরুদ্ধকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ-কার্য শিক্ষা দিবার জন্ম কলিকাতায় প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ইন্টার্ণ স্কুল অফ প্রিন্টিং নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



গোষ্ঠবিহারী দে

পথ

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে যাবার পথ
রোদে পোড়া যত কালো কালো ঘাসে ঢাকা,
কত লোক গেছে এই পথে পায়ে হেঁটে,
অনেক আশার স্বপ্নে এ পথ আঁকা।

কত লোক গেছে, কত লোক আজও যায়,
কত কামনার মুকুল এ পথে ফোটে,
তৃপ্তিবিহীন অনেক আশা আজো
সাধ্যাতীতের সন্ধানে শুধু ছোটে।

যারা যায় তারা ফিরে আসে নাকো কভু,
আশার নেশায় হারায়ে যে যায় কোথা,

যারা আসে তারা ধরে আসে নব রূপ,—
প্রাচীন বস্তু জানাতে না পারে কখনো।

যারা যায় তারা সমুখ-যাত্রাকালে
করে স্রষ্টার হাজারো অধীকার,
ফিরে এসে তারা মৃত্যু-মলিন মুখে
নিজ আশ্বাসে করে যে অধীকার।

দিন আসে যায়, রাত্রিও যায় চলে,
যাত্রীর ভিড় বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে,
গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে যাবার পথে
ব্যর্থ আশার জঞ্জাল ওঠে জমে।

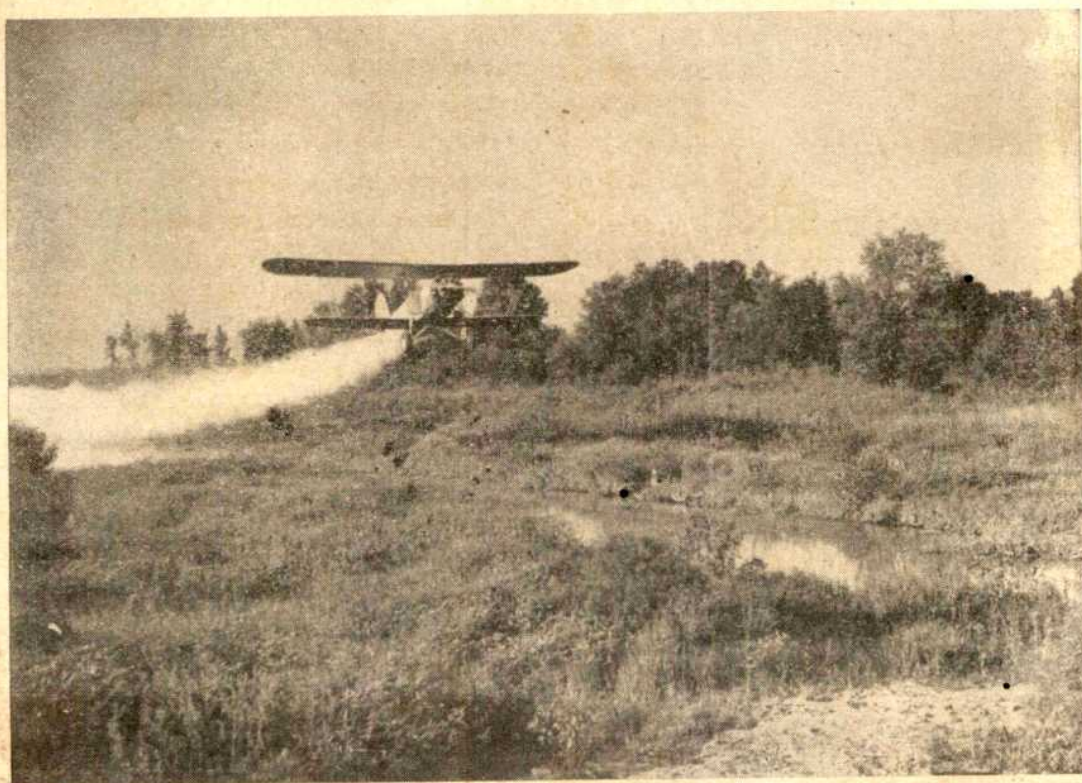


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রতীক্ষমাণা
শ্রীবেঙ্কনাথ দাস



ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণকল্পে মশকের উৎপত্তিস্থানে ডিডিটি চূর্ণ প্রয়োগ



বিমান হইতে মশকের উৎপত্তিস্থানে তরলীকৃত ডিডিটি নিক্ষেপ

একাত্তর

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫৩

৬৪ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নূতন জাতীয় গবর্নেন্ট

মুসলিম লীগের অর্থোজিক ও অবাস্তব দাবি পূরণ অসম্ভব বুঝিয়া ব্রিটেনের শ্রমিক গবর্নেন্ট শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ভার কংগ্রেসের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন। পণ্ডিত জব্বাহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে ছোট বড় অনেক বিষয় এখনও বিজ্ঞমান রহিয়াছে। জাতীয় সরকার গঠনের দ্বারা বৃহত্তম বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান একটি দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু আরও অনেক বাধা রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্বরূপ যে সব কর্মচারী রহিয়া গিয়াছে, লীগের পিছনে থাকিয়া তাহারা দেশে অশান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করিবে তাহার বহু লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষ পদানত রাণিবার জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার যে বিষয় এ দেশের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করাইয়াছে তাহাকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়া স্বাধীনতা লাভের পথ কষ্টকৃত করিবার জন্ম এবার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহিবে। লর্ড কার্জন ও লর্ড মিণ্টো হইতে শুরু করিয়া লর্ড আরউইন, লর্ড লিনলিথগো পর্যন্ত বহু বড়লাট লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদ দেশে কায়ম করিবার জন্ম চেষ্টার জট করেন নাই। বর্তমানে লর্ড ওয়াডেল লীগের গুণামির অজস্র প্রমাণ পাইয়াও দেশে অশান্তি ও দাঙ্গার আগুন জ্বালাইবার জন্ম লীগের মডয়ল ভাঙিতে অগ্রসর হন নাই। সাম্প্রদায়িকতার যে বিষয় ইংরেজের আয়দানী, তাহা দূর করিবার দায়িত্বও ইংরেজেরই। কিন্তু উহা না করিয়া এদেশের বড়লাট এবং ইংরেজ আই-সি-এস ও আই-পি-এস-এর কর্মচারীরা নিজের পক্ষপাতিত্বের দ্বারা এই পাপ দূরীকরণে কংগ্রেস এবং বিলাতের শ্রমিক গবর্নেন্টের মিলিত চেষ্টার বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতার কলুষ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্ম কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াছে। বহু দূর পর্যন্ত নত হইয়া কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ করিতে চাহিয়াছে। কংগ্রেসের আপোষের প্রত্যেক চেষ্টাকে মিঃ জিন্না দুর্বলতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার দাবি প্রতি ধাপে ক্রমাগত এমন ভাবে চড়াইয়া আসিয়াছেন যে মিলনের পথ তিনি অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। মিঃ জিন্নার সহিত আপোষের চেষ্টার জন্ম কংগ্রেসকে দেশবাসীর নিকট অনেক অপ্রিয় মন্তব্য সহিতে হইয়াছে, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে তুণ করা সম্ভব হয় নাই। এখন একথা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, তাহাকে সন্তুষ্ট করা কাহারও সাধ্যাত্ত নয়। “বদাত্তা”র স্থান তাহার নিকট নাই। মাইনরিটির কর্তৃক হইয়া তিনি সমগ্র দেশের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করিতে চাহেন। কংগ্রেস দেশের তিন-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্বরূপে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিলে তিনি উহাকে একদলীয় নায়কত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু তিনিই ১৬ই জুনের বড়লাটের প্রস্তাবের নিজের মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধি রূপে সমগ্র ভারতের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পারিলেন না বলিয়া ক্রুদ্ধ হন। মুসলমানের জন্মগত অধিকারের নামে তিনি লীগের একচ্ছত্র দাবি করিতে পক্ষমুখ কিন্তু হিন্দুর জন্মগত অধিকার স্বীকারে তিনি পরাশ্রুত। অপরের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে অন্যায় ভাবে গায়ের জোরে ও গলার জোরে অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিয়া নিজের পাওনা বাড়াইয়া লইবার যে চেষ্টা তিনি ক্রমাগত করিয়া আসিতেছেন তাহা কখনও সফল হইতে পারে না। জন্মগত অধিকার মুসলমানের যেমন আছে, হিন্দু, শিখ, পার্শী, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অপর সকলেরও ঠিক তেমনি আছে—মিঃ জিন্না ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসকে বদান্যতা দেখাইয়া লীগকে তুণ করিবার জন্য অহরোধ জানাইয়া এ দেশে ও

বিদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রসমূহে যে প্রচারকার্য চলিতেছে তাহার অন্তরালবর্তী প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়। এই মনোভাব অবসানের দিন আসিয়াছে। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধি কংগ্রেসকে এবার কঠোর হইতে হইবে। কাহারও কোন দাবি দেশের সমগ্র বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী হইলে তাহাতে কঠিন ভাবে বাধা দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে প্রতিক্রিয়ামূলকদের সংযত করিবার জ্ঞাত অপ্রিয় কঠোরতাও অবলম্বন করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছুঁইছুঁইপ্রণোদিত লোকেরা দেশে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা দমন করিবার জ্ঞাত কংগ্রেসকে এখনই অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু এবং তাঁহার সহকর্মীদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। জাতীয় সরকারের ভার ঠাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার দেশের আজীবন সেবক, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র। যোগ্যতম ব্যক্তিদের লইয়াই গবর্নমেন্ট গঠিত হইয়াছে, এর চেয়ে ভাল মনোনয়ন আর হইতে পারিত বলিয়া আমরা মনে করি না। দপ্তর বটন হইয়াছে এই ভাবে :

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু—বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ বিভাগ

সর্দার বলদেব সিংহ—দেশরক্ষা

সর্দার বলভভাই প্যাটেল—স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও বেতার

ডাঃ জন মাথাই—অর্থ

মিঃ আসফ আলি—যানবাহন

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কৃষি ও বাণিজ্য

শ্রীজগজীবনরাম—শ্রমিক

সার শাফাৎ আহমদ খাঁ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ললিতকলা

সৈয়দ আলি জাহির—আইন, ডাক ও বিমান

শ্রীশরণচন্দ্র বসু—খনি, বিদ্যুৎ ও পুত

শ্রীরাজাগোপালাচারিয়ার—শিল্প ও সরবরাহ

কুবেরজি হম্মুসজি ভাবা—বাণিজ্য।

জাতীয় সরকার বড়লাটের পূর্ববর্তী শাসন পরিষদের অহুকল্প হইবে না। প্রাক্তন শাসন পরিষদের সদস্যদের কোন মিলিত দায়িত্ব তো ছিলই না, ব্যক্তিগত দায়িত্বও ছিল না। জাতীয় সরকারের ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ছায় কেম্জীয় পরিষদের নিকট যুক্ত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব উভয়ই থাকিবে। বড়লাটের ডিটো পাওয়ার ব্যবহৃত হইবে না এ ব্যবস্থা তাঁহাদের পক্ষে করা কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বড়লাটের নিজস্ব দায়িত্ব বলিয়া যে সব বিধি ভারত-শাসন আইনে আছে এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতি তাঁহার যে সব কর্তব্য আছে—তাঁহার উপরে নেহেরু গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়ত কিছুদিন বেশী সময় লাগিবে। জাতীয় সরকার কার্যভার গ্রহণ করিয়াই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার

করিয়া নূতন ভাবে নব আদর্শে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। বহু অনুরোধ ও বাধাবিঘ্ন তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তবে দৃঢ় ও কঠোর কার্যের দ্বারা তাহা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে।

কলিকাতায় লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”

কলিকাতায় লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” উপলক্ষে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ হইয়া গিয়াছে, আধুনিক জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা ভার। ২৯শে জুলাই বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লীগ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা প্রত্যাখার করিয়া “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” ঘোষণা করা হয়। সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জ্ঞাত ভারতের সর্বত্র ১৬ই আগষ্ট তারিখ সংগ্রাম দিবসরূপে ঘোষিত হয়। সিভিল ওয়ারের ভয় দেখানো চলিতে থাকে এবং বিশেষভাবে হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধেই বিশোদ্ধার আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কথা হইলেও উহা যে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধেই আরম্ভ হইবে কয়েকদিনের মধ্যেই লীগ-নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং লীগ পরিচালিত পত্রিকাসমূহের মন্তব্য হইতেই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

বাংলায় ও সিদ্ধিতে লীগ-মন্ত্রিসভা বিচলিত। এই দুই মন্ত্রিসভা ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। সিদ্ধির গবর্নর লীগের পরম অহুকল্প হইলেও তিনি বুনা সিভিলিয়ান, ছুটির তাৎপর্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। দাঙ্গা বাধিতে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি ছুটি ঘোষণায় আপত্তি করেন এবং সিদ্ধির চীফ সেক্রেটারীর কত ব্যা-বোধ লীগ-প্রতির নীচে একেবারে তলাইয়া যায় নাই বলিয়া তিনি ছুটি বাতিল করিয়া দেন। এই অপমান হেদাযতুল্লা মন্ত্রিসভা নীরবে পরিপাক করিতে বাধ্য হন। বাংলার গবর্নর নবগত। তাঁহার পরামর্শদাতা সিভিলিয়ান কর্মচারী বা মন্ত্রী কাহারও মধ্যেই কত ব্যাপারায়ণ লোক নাই, কাজেই সুপরামর্শের অভাবে এবং অনভিজ্ঞতার দরুন তিনি ছুটি মঞ্জুর করিয়া বাংলায় অশান্তির আগুন জ্বালাইবার পথ করিয়া দেন। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ সুস্বাভাবিক মন্ত্রিসভার উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া এই ছুটির তীব্র প্রতিবাদ করেন। আইন-পরিষদের ইংরেজ নেতাও উহার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া ছুটি বাতিল করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শুভ পরামর্শ মন্ত্রীরা স্তনিলেন না।

১৬ই আগষ্টের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” উপলক্ষে দাঙ্গা বাধাইবার জন্য লীগ বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। লীগ-নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং লীগ-পত্রিকাসমূহের মন্তব্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দৈনিক “ভারত” তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। একটি উর্দু পুস্তিকায় লেখা হয় :

“এই রমজান মাসে ইসলাম ও কাকেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই মাসেই মুসলমানেরা জেহাদ ঘোষণার এবং কাকের হত্যার অজমতি লাভ করে। এই মাসেই ইসলাম বিজয়গৌরবে ভূষিত হয়। এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। এই মাসেই ইসলামের বনিয়াদ স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করিবার জন্য নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন।”

কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মহম্মদ ওসমানের স্বাক্ষরে এই পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়। এই মিঃ ওসমান কলিকাতার মেয়র। ১৬ই আগষ্টের পূর্বে রাত্রিতে লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা কুচকাওয়াজ করিয়াছে, জেহাদের কথা ঘোষণা করিয়া লরীযোগে মুসলমান পাড়াগুলিতে প্রচার-কার্য করিয়াছে এবং “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বনি সম্বরে চীংকার করিয়া পাড়ার হিন্দুদের গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

১৬ই শুক্রবার ভোর না হইতেই জেহাদ ঘোষণাকারীদের দল পথে পথে বাহির হইয়া পড়ে এবং কাহারও দোকান একটু খানি ধোলা দেখিলেই তাহা বন্ধ করিবার জন্য জিদ করে। দোকান লুঠ এবং দোকানের লোকদের প্রহার ও ছুরিকাঘাতও ভোর না হইতেই শুরু হইয়া যায়। মানিকতলা, রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, টেরিটবাজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতেই প্রথমে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। লীগ-নেতারা দাঙ্গার পরে সাফাই গাছিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে কলিকাতায় লীগ হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ, স্মৃতাং এখানে লীগ প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিতেই পারে না। কিন্তু দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার স্থান ও কাল লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, যে সব স্থলে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে সে সব স্থানেই হিন্দুরা সংখ্যায় নগণ্য। এই সব স্থানে হিন্দুরা আক্রমণ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিতেই পারে না। সর্বপ্রথমে লীগের লোকেরা মানিকতলার মোড়ে এক গোয়ালাকে প্রহার করে, তাহার দুধ রাস্তায় ঢালিয়া দেয় এবং দুগ্ধভাণ্ড প্রভৃতি ভাঙিয়া দেয়। তখন ভোর প্রায় ৬টা। তার পর দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক একটি খাবারের দোকান লুঠ করে এবং দোকানের লোকদের প্রহার করে। পুলিশ প্রথম ইহাতেই ছিল নিরপেক্ষ দর্শক। চক্ষের উপর লুণ্ঠন ও ছুরি লাঠির দ্বারা আঘাত দেখিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

সারাটা সকাল এই ভাবে গুণ্ডামি, লুটপাট চালাইয়া লীগের যোদ্ধারা শোভাযাত্রা সহকারে গড়ের মাঠের সভায় যাইতে আরম্ভ করে। ভোর না হইতেই যাহারা পথে বাহির হইয়াছে এবং শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া সভাকক্ষে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, ছোরা, তরবারি প্রভৃতি কোন-না-কোন অস্ত্র ছিল। লীগ-নেতারা

অস্ত্র বহনের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বহু ফটোগ্রাফে উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। দাঙ্গা উপলক্ষে লীগ-নেতারা মিথ্যা ভাষণে যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা পৃথিবীর কুড়াপি মিলিবে কিনা সন্দেহ। শোভাযাত্রীদের সঙ্গে উচ্চতে “জেহাদের ফয়সালা করিতে হইবে” এরূপ কথা লেখা বহুসংখ্যক পতাকা ছিল। ময়দানের সভায় কাকের হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া জালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভার পর জেহাদের সৈনিকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর দোকান লুণ্ঠন ও হিন্দু হত্যা আরম্ভ করে। চৌরঙ্গি এবং ধর্মতলার যে সব অংশ গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে দেখা যায় সেই সব স্থানে বড় বড় লাঠি লইয়া জেহাদের সৈনিকেরা হিন্দুর দোকানপাট ভাঙিয়া লুঠ করে। চৌরঙ্গি ধর্মতলার প্রায় মোড়ে কে. সি. বিধানসভার বন্দুকের দোকান লুঠ হয়। জালবাজারে পুলিশের প্রধান ঘাঁটি হইতে কয়েক গজ মাত্র দূরে একটি খড়ির দোকান লুঠ হয় এবং উহার প্রায় দুই কাল্ডের মধ্যে পোলক ষ্ট্রীটে এবং টেরিট বাজারে অনেক হিন্দু দোকানদার, দারোয়ান ও পথচারী নিহত হয়। গুণ্ডাদের সঙ্গে লাঠি, ছোরা, তরবারি তো ছিলই, প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল এবং কেরোসিন তেলও ছিল এবং লরী ও গাড়ীর অভাবও ছিল না। শহরের যে সব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, সেই সব স্থানে লরীযোগে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। সন্ধ্যার মধ্যেই শহরের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র আগুন জলিয়া উঠে। সর্বত্র মুসলমানেরা আক্রমণ চালাইতে থাকে এবং আক্রান্ত হিন্দুরা পুলিশকে টেলিফোন করিয়া ও সম্মুখে পুলিশ দেখিলে তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একই উত্তর পাইতে থাকে—রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই। পুলিশ সম্বন্ধে গুণ্ডাদের মনোভাব ছিল যেন “পুলিস আমাদের লোক, কিছু বলিবে না।” নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি পুলিশের চক্ষের উপর ঘটয়াছে। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ এবং সার্জেন্টরা লুণ্ঠের মালের ভাগ আদায় করিয়াছে।

১৬ই আগষ্টের পর

১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার মধ্যেই হিন্দুরা উপলব্ধি করিল যে পুলিশের সাহায্য তাহারা পাইবে না। ধন, প্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সম্ভবতঃ ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের ওজুহাত—পুলিস সংখ্যায় কম ছিল, এত বড় দাঙ্গা নিবারণের শক্তি তাহাদের ছিল না। ভাল কথা, কিন্তু পুলিশ একেবারেই কেন বাহির হইল না তার কোন কৈফিয়ৎ কেহ দেন নাই। ১৬ই সকালে অবস্থা আরও বাহিরে যায় নাই, ময়দানের সভা পর্যন্তও এমন অবস্থা ছিল যে পুলিশ চেষ্টা করিলে গুণ্ডার দলকে সংযত

করিতে পারিত। বোম্বাইয়ে দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়া পুলিশের উর্বরতন কর্মচারীরাও অনেকে আহত হইয়াছেন কিন্তু কলিকাতায় বড় অফিসার তো দূরের কথা একটি কনেষ্টবলের পিঠে পর্যন্ত একটি আঁচড় লাগে নাই। ১৭ই সকাল হইতে হিন্দু-পাড়ায় আক্রমণ হইলে হিন্দুরা সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাতে প্রথমে বাধা দান পরে পাণ্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। ১৭ই এবং ১৮ই এই দুই দিন আক্রমণ ও পাণ্টা আক্রমণ ভয়ানক ভাবে চলিতে থাকে, ১৮ই সন্ধ্যা নাগাদ গুণ্ডারা বুঝিতে পারে যে হিন্দুরা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বেশী দূর অগ্রসর হইলে জেহাদে পরাজয় বরণ করিয়াই ঘরে ফিরিতে হইবে। ১৭ই হইতে পাণ্টা আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়, তখনই লীগ মন্ত্রীরা মিলিটারী বাহির করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অহুরোধ রক্ষিত হয়, মুসলমানেরা যে সব স্থানে আক্রান্ত হইয়াছিল সেখানে মিলিটারি ধাবিত হয়; পড়িয়া থাকে মুসলমান পরিবেষ্টিত হিন্দু জনসাধারণ। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ পাণ্টা জবাবের নমুনা দেখিয়া লীগ-নেতাদের চৈতন্য কতকটা জাগ্রত হয়; সংগ্রাম বন্ধের জন্ত তাঁহারা চেষ্টা আরম্ভ করেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার প্রধান মন্ত্রীর হাত হইতে সামরিক কতৃপক্ষের হাতে চলিয়া যাওয়াও লীগের হতাশার অন্যতম কারণ। সোমবার ১৯শে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসে।

এই তিন দিনের হত্যাকাণ্ডে ছয় হইতে আট হাজার লোক নিহত হয়; ১৫ হইতে ২০ হাজার আহত হয় এবং প্রায় পাঁচ হইতে সাত কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই হিন্দুর।

এবার শুরু হইল লীগের মিথ্যাভাষণের পালা। মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রভৃতি সকলেই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য বিবৃতি প্রচার শুরু করিলেন। মুসলমানেরা নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল, তাহারা মোটেই আক্রমণ করে নাই, হিন্দুরাই তাহাদের মারিয়া শায়েস্তা করিয়াছে, হাতে মারিবার পর বয়কট করিয়া আবার তাতে মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে, হতাহতদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই মুসলমান ইত্যাদি প্রচারকার্য শুরু হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলমানদের নাচাইয়া বাহারা ঘরের বাহির করিয়াছিলেন, পাণ্টা আক্রমণে তাহাদের হৃদশা দেখিয়া লীগ-নেতারা তাঁহাদের সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের প্রত্যেক রাজনৈতিক কক্ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় এখানেও তাঁহারা উহাই করিতেছেন কিনা তাহা বুঝা মুশ্কিল। তবে এ কথা ঠিক যে কলিকাতায় সংগ্রাম আরম্ভ করিবার দায়িত্ব বাহাদের, বাহারা এই সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ থাকিবে না বলিয়া প্রকাশে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা সংগ্রামের পর উহার নায়কত্ব অস্বীকার করার তাঁহাদের চূড়ান্ত নৈতিক

পরাজয় প্রকটিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল মুসলমানেরা অনেকেই লীগ-নেতাদের এই ভীকতা ও পরাজয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

কংগ্রেসের সহজে লীগ যাচা বলিয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় প্রকারান্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রশংসাই করা হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ বাংলা কংগ্রেস দারুণ নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, দলাদলি লইয়া তাহার নেতারা সব সময়ে ব্যস্ত। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড সাধনের আয়োজন পূর্ব হইতে করিতে হইলে যে সজ্জাশক্তি ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন বর্তমান কংগ্রেস কমিটির তার বিশ ভাগের এক ভাগও আছে আমরা ইহা মানিতে প্রস্তুত নহি। না বুঝিয়া লীগ নিজের অজ্ঞাতসারে ইহাদের যে প্রশংসা করিয়া বসিয়াছেন তার জন্ত কংগ্রেস কমিটির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

“মুসলিম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতায় গত ১৬ই আগষ্ট এবং তাহার পরবর্তী কয়েক দিন যে সকল ঘটনা ঘটয়া গেল, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার বিবরণ অতীব দুঃখের সহিত পাঠ করিয়াছেন। কলিকাতায় ধন-প্রাণের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ নর নারী ও শিশুদিগকে যে পাশবিক ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। সম্প্রদায় এবং দল নির্বিশেষে নির্ধাতিত নরনারীর প্রতি কমিটি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। তাহাদিগকে সাহস, সহনশীলতা ও ধৈর্যের সহিত অবস্থার সন্মুখীন হইবার জন্ত কমিটি অহুরোধ জানাইতেছে।

লীগ ও বাংলা-সরকারের ভূমিকা

২৯শে জুলাই তারিখে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের’ সিদ্ধান্ত করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকটি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেওয়া হয়। ইহার পর লীগের দায়িত্বশীল সদস্য এবং মন্ত্রীগণ এমন কতকগুলি ভাষণ, বিবৃতি ও প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন এবং লীগের সংবাদপত্রগুলি এমন সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন যাহার ফলে বহু মুসলমান ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

বই প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাংলা-সরকার ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে এই ধারণাই সৃষ্টি হয় যে, ১৬ই আগষ্ট দিবস পালনের সহিত সরকারও সংশ্লিষ্ট এবং যাহারা ইহাতে যোগ দিবে না তাহারা গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইবে না।

দেখা যায় লীগ শোভাযাত্রীদের সহিত লাঠি, তলোয়ার, বল্লম, ছোরা, কুঠার প্রভৃতি ছিল। ১৬ই আগষ্ট সকাল হইতেই তাহারা এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের ভয় দেখাইয়া দোকানদারদিগকে দোকান বন্ধ করিতে আদেশ দেয়। যে কেহই দোকান বন্ধ

করিতে অধীকার করিয়াছে বা ইতস্ততঃ করিয়াছে শোভা-
যাত্রীরা তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে। সকাল
হইতেই ছুরিমাথা এবং লুণ্ঠন চলিতে থাকে। বহু জায়গায়
গুণ্ডারা বন্দুক পর্যন্ত ব্যবহার করে। ইহার পর নিত্য
পাশবিক ভাবে নরহত্যা এবং ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন ও গৃহাদিতে
অগ্নিসংযোগ চলিতে থাকে। এই নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ড
তিন-চারি দিন সমানে চলিতে থাকে। ফলে সহস্র সহস্র
লোক নিহত হয় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও
ভস্মীভূত হয়।

১৬ই আগষ্ট কোন পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত
একরূপ ছিলই না। মরম এবং অজ্ঞাত শোভাযাত্রা
ব্যাপারে যে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হইয়া থাকে,
তাহাও ঐ দিন করা হয় নাই। পুলিশ শেষ পর্যন্ত
আসিলেও তাহারা শান্তিপূর্ণ নাগরিকদিগকে কোন সাহায্যই
করে নাই। ধানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিকট
বারবার সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইলেও তাহারা
তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে জনগণকে যথাসাধ্য
আত্মরক্ষা করিতে হয়। প্রথম দুই দিন নৈশ চলাচল সম্পর্কে
নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও তাহা কার্যতরী হয় নাই।
জনসাধারণ কোন যানবাহন পায় নাই, কিন্তু গুণ্ডারা
মোটর গরী ব্যবহার করে। অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য
অবাধে পেট্রল ব্যবহার করা হয়। ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র
এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়। গুণ্ডারা যতদূর
সম্ভব বহু জিনিষপত্র লইয়া যায়। যতদেহে রাজপথ সমাকীর্ণ
হইয়া যায়। বহু যতদেহ এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভূগর্ভস্থ
পনঃপ্রণালীতে অথবা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। বহু তাণ্ডব-
লীলা চলার পরও শান্তি কিরাইয়া আনিবার জন্য সৈন্য-
বাহিনীকে আহ্বান করা হয় নাই। কোন কোন স্থানে
পুলিস পর্যন্ত লুণ্ঠনে ত্যাগ দেয়।

প্রথমে এই ভাবে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু
এবং অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে
সম্ভব সেখানেই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফলে বহু
মুসলমান নিহত হয়।

পরস্পরের এই হত্যা ও অমাহুষিক বর্বরতার মধ্যেও
দেখা গিয়াছে যে হিন্দুরা দুর্গত মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছে
এবং মুসলমানরাও বিপন্ন হিন্দুদিগকে আশ্রয় দিয়াছে।

দাঙ্গার বিস্তৃতি

ওয়ার্কিং কমিটি উদ্বোধনের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে
অজ্ঞাত স্থানেও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং
দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে। ফলে ঐ সকল স্থানেও বহু নরহত্যা
হইয়াছে। সকলেই আশঙ্কা করিতেছে ইহা আরও বিস্তৃত
হইতে পারে। সময় থাকিতে যদি ইহা প্রতিরোধ না করা
যায় তবে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা আরও ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

ইহা নিবারণ করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। শান্তিরক্ষা
করা এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের রক্ষা করা প্রত্যেক গবর্নমেন্টের
কর্তব্য।

তদন্ত করা প্রয়োজন

দাঙ্গাহাঙ্গামার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কমিটি মনে করে
যে, ১৬ই আগষ্টের পূর্বের ঐ দিনের ও তাহার পরের কয়েক
দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং দাঙ্গার পূর্বে ও পরে গবর্নমেন্টের
অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জনসাধারণের
আহ্বাতাজন একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করা
প্রয়োজন।

ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে, বাংলা-সরকার শান্তি রক্ষা
এবং শান্ত নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার
পরিচয় দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বিশ্বাস, যে আঘাত
হানা হইয়াছে তাহা শুধু দেহের উপরই নয়, মানুষের আত্মা
এবং আত্মমর্যাদার উপরও বটে। এই আঘাত মুছিতে দীর্ঘ
দিন লাগিবে। তথাপি জনগণের নিকট কমিটির আবেদন,
তাহারা যেন গত কয়েক দিনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ভুলিয়া
যায় এবং পরস্পরকে ক্ষমা করে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে
শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্য পুনঃস্থাপনের জন্য তাহারা যেন এই
ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সদ্যবহার করে। ওয়ার্কিং কমিটি মনে
করে, ভয় দেখাইয়া এবং হিংসাপ্রিত কার্যকলাপের দ্বারা
সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান করা যায় না। পারস্পরিক
বোঝাপড়া, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে উভয়
পক্ষের গ্রহণযোগ্য সালিশীর দ্বারাই শুধু এই সমস্তার সমাধান
করা যাইতে পারে।”—এ পি

কলিকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মুসলমানদের
অভিমত

কলিকাতার দাঙ্গার পর উহা লইয়া নানা জনে নানা ভাবে
আলোচনা করিয়াছে। এই দাঙ্গার গুণাশ্রেণীর মুসলমানেরা
লুণ্ঠের মাল হস্তগত করিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছে কিন্তু
সাধারণ মুসলমানের ইচ্ছাতে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কংগ্রেসকে
জব্দ করিবার জন্ত সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিয়া দাঙ্গা
যাহারা বাধাইতেছে তাহারা মুসলমান জনসাধারণের হিতা-
কাজী নহে, অনেকেই উহা বুঝিয়া প্রকাশে এই কথা প্রচার
করিতে সাহসী হইতেছেন। বর্তমান বোর দুর্ভোগের মধ্যে ইহা
আশার লক্ষণ। দাঙ্গার পর বাংলার মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের
নিকট আবেদন জানাইয়া বঙ্গীয় আজাদ মুসলমান ছাত্র
ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এম আনিশুজ্জমানের
একটি বিবৃতি ‘য়ুগান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে
তিনি লিখিতেছেন :

আমি এই বিবৃতিতে হিন্দু সমাজকে উদ্বেষ্ট করিয়া
কিছু বলিব না। মাত্র মুসলমান জনসাধারণকে—বিশেষ

করিয়া মুসলমান ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই। লীগপন্থী মুসলমান ভাইগণ ও উহার নেতৃবৃন্দ দাঙ্গার দায়িত্ব যতই অল্প কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে চাপাইবার চেষ্টা করুন না কেন, একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জনব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে, দাঙ্গার জন্ত মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী। এইরূপ দাঙ্গা চালাইবার জন্ত লীগের নেতৃবৃন্দ ১৬ই আগষ্টের পূর্ব হইতে বহু বিরূতি ও প্রচারণা প্রকাণ্ডভাবেই প্রচার করিতেছিলেন। ১৬ই তারিখের পূর্বে নাজিমুদ্দীন সাহেব, সোহরাওয়ার্দী সাহেব, মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব—এমন কি জিন্না সাহেব পর্যন্ত বিরূতি ছাপিয়া লীগপন্থী মুসলমানগণকে এইরূপ একটি হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এমন কি ইসলামের পবিত্র “জেহাদের” নাম ভাঙ্গাইয়াও তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখের “আজাদে” মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁর স্বনামে লিখিত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, অল্প ১৮ই রমজান। এই দিন হজরত মহম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে মুসলমানগণ কাকেরদেবির বিরুদ্ধে মদিনায় “জেহাদ” করিয়া যুদ্ধ করেন। আজও সেই ১৮ই রমজান, অতএব মুসলমানগণ অল্প “জেহাদের” জন্ত প্রস্তুত হও ইত্যাদি ধর্মের দোহাই দিয়া নানা ভাবে মুসলমানগণকে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উত্তেজিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, লীগ-মুসলমান গুণ্ডাদিগকে (যাহাদের অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছে) এই বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিল যে, বর্তমান বাংলার শাসনক্ষমতা লীগের করায়ত্ত। অতএব গুণ্ডাগণ খুশীমতন হিন্দুর দোকানপাঠ লুণ্ঠন, মারামারি, কাটাকাটি করিলে তাহাদের ভবিষ্যতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, কারণ মন্ত্রীরা পুলিশকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবে। কলংও যে তাহাই হইয়াছে ইহা কোন নিরপেক্ষ বিবেকবান ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারিবেন কি? আমরা দেখিয়াছি, ময়দানে সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী লীগওয়ালারা ছোরা ও লাঠিসহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি—সশস্ত্র পুলিশ ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে।

হানাহানিতে লাভ কাহার ?

এই হানাহানিতে লাভ কাহার হইল, এই ভাবে পাকিস্তান অর্জনই বা কতদূর সম্ভব হইল, রাজনীতির নামে নারী-নির্ধাতন, গৃহদাহ, লুণ্ঠরাজ ও গুণ্ডামি করিয়া মুসলমান সমাজের কি উপকার হইল—এই সব প্রশ্ন তুলিয়া মিঃ আনিবুল্লাহমান বলিতে-

ছেন “বর্তমান দাঙ্গা সংঘটিত করাইয়া লীগ নেতৃবৃন্দ কতদূর সমাজের উপকার করিলেন? যাহাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এত জঘন্য তাহারা কোন মুখে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের নেতৃত্বের বড়াই করেন?” তারপর তিনি লিখিতেছেন :

মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, পাকিস্তানী লড়াইয়ে নেতারা তাহাদিগকে ধ্বংসের কোন অতল তলে লইয়া যাইতেছেন তাহা কি তাহারা এখনও অনুভব করিতে পারেন নাই? নেতারা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন সে দাঙ্গার পরিণাম কি হইল তাহা তাহারা চিন্তা করিয়াছেন কি? তাহারা হয়ত বলিবেন—হিন্দুর দোকানপাঠ, বাড়ীর লুণ্ঠ হইয়াছে, হিন্দুর মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, এইবার সে পাকিস্তান প্রস্তাবে আর বাদ সাধিতে সাহস পাইবে না। কিন্তু আমি বলিব, না হিন্দুর মেরুদণ্ড পূর্বাশ্রয় আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। দুমস্ত সাপকে খোঁচা মারিয়া ফণা উত্তোলন করান হইয়াছে। বর্তমান দাঙ্গায় তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, আর সামাজিক মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে মুসলমানের। হিন্দুর কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, ডালিয়া প্রভৃতি লক্ষপতি কোটিপতিদের দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে হিন্দু সমাজের কি কোন ক্ষতি হইয়াছে? এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা ইন্সিওর করা রহিয়াছে। অতএব তাহারা দুই-এক মাসের মধ্যেই আবার পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমানের ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সমাজ বা জাতির মেরুদণ্ড। সেই মধ্যবিত্ত কলিকাতাবাসী মুসলমান আজ কোথায়? বিহারী ও পঞ্জাবী মুসলমানরা গুণ্ডামী ও লুণ্ঠরাজ করিয়া অনেক কিছু লুণ্ঠিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। আর হিন্দুর মার খাইয়াছে বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান। মুসলমান কিল্ডি-পান-সিগারেট-ওয়ালার, হোটেলওয়ালার, ছোটখাটো থালা বাসনের দোকানওয়ালার, ছোট কাটা-কাপড়ওয়ালার, মনোহারী দোকানওয়ালার, ফলওয়ালার যথাসর্বস্ব পরে এক এক করিয়া লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা কি আর কমলালয় বা তদনুরূপ অগাধ হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মতন দাঁড়াইতে পারিবে? পানবিড়িওয়ালার বাদে এই সমস্ত দোকান প্রায় সবই বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের। এই ছোট-খাটো ব্যবসায়ী মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ সর্বহার্য হইয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। তাই আজ কলিকাতায় আত্মনির্ভরশীল ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান বিলুপ্ত হইল। ইহাতে সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা জিন্না সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন, মঃ আকরাম খাঁ, ওহমান প্রমুখ সমাজ-দরদী(?) মুসলিম নেতারা ভাবিয়াছেন কি? তাহাদের আরম্ভ

ইহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ এই সমস্ত নেতার (৭) প্রয়োজন আজ আর সমাজের নাই। ইহা-দিগকে সমাজের পুরোভাগ হইতে বহিষ্কার করিতে পারিলে সমাজের মঙ্গল হইবে। ধর্মের দোহাই দিয়া এই দাঙ্গায় মুসলমানগণকে উত্তেজিত করান হইয়াছে। কিন্তু ধর্মের নামে 'অধর্মের এত-বড় লীলাখেলার অহুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কিনা তাহা একবার মুসলমান যুবকদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। নিরীহ নাগরিকের জীবন সংহার, তালাবদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া দোকান লুণ্ঠন, নারীর পবিত্র দেহে ছুরিকা-ঘাত এ কোন্ ধর্মসম্মত? এই সমস্ত বিষয়ে এছলামের যে কঠোর নির্দেশ রহিয়াছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন কি? আমাদের আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি একজন নিরীহ (সে যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন) মাহুষের প্রাণ সংহার করে সে দুনিয়ার সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবন-সংহারের অপরাধে অপরাধী। আর যে এক জন বিপন্ন মাহুষের জীবন রক্ষা করিয়াছে সেই মহৎ, সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবনরক্ষার পুণ্যভাগী।” এই দুটো অমূল্য সুরা চলিলে আজ যে অসংখ্য নাগরিকের জীবন বিপন্ন হইল ইহার জন্ত কি লীগ-নাযকরা সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবন-সংহারের পাপ অর্জন করেন নাই?

বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দুই রূপ

বাংলার প্রধান মন্ত্রী যে দৈতনীয় অমূল্য সুরা চলিয়াছেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর তাহার ফল বিষময় হইতেছে এবং গবর্নমেন্টের উপর জনসাধারণের আস্থা ক্রমশঃ আরও কমিয়া আসিতেছে। ১৬ই আগষ্ট গড়ের মাঠের সভায় মিঃ সুরাবর্দী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমান্ত সুরা করিবার প্রস্তাব যিনি তুলিয়াছেন, তিনিই প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী। ইহার কয়েক দিন আগে তিনিই এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস লীগকে বাদ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিলে বাংলাদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিবে। সিদ্ধান্তে মিঃ গজদারও অমূল্য বিবৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ গজদারের সহিত মিঃ সুরাবর্দীর পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত গবর্নমেন্টের কোন সম্পর্ক নাই, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী। বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দৈতনীয় রূপের এখানেই শেষ ন্যূন। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে পরস্পর বিরোধী দুই প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন। ২২শে আগষ্ট তিনি বাংলার জনসাধারণকে উল্লেখ করিয়া বলেন :

“প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, এবারকার (অর্থাৎ ১৬ই

আগষ্ট তারিখের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের) অহুষ্ঠান উপলক্ষে এই বিরাট নগরীকে যে সামাজিক ছুগতি ভোগ করিতে হইল তাহার জন্ত কাহাকেও দোষের ভাগী করিবার সময় এখনও আসে নাই। কোনও এক ব্যক্তিই—বিশেষ করিয়া গবর্নমেন্টের মধ্যে নাই এমন কোনও এক ব্যক্তিই—এই শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য অবগত নহে, সুতরাং কি ভাবে এবং কেন এই দাঙ্গা আরম্ভ হইল সে সম্বন্ধে কোনও রায় দিতে পারে না।

“কিবা গবর্নমেন্ট আর কিবা নাগরিকবর্গ এখন উভয়ের পক্ষেই প্রথম কাজ হইতেছে পারস্পরিক সন্তোষ এবং আস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। আমি একজন্ম বুঝি খাটিতেছি। আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি মাঝে মাঝে শান্তি সম্মেলন ডাকিয়াছি, তাহাতে বিভিন্ন দলের নেতারা যোগ দিয়াছেন, সে সমস্ত সভায় বর্তমান অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে। আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, গতকাল সম্মেলনে স্থির হইয়াছে, সকলে শান্তির চেষ্টায় শহর ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং লোককে আহ্বানকরে মত গুণামি, লুণ্ঠ ও নরহত্যা হইতে বিরত থাকিতে বলিবেন। ইহাতে যে চমৎকার সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি।

* * *

“এ সম্পর্কে আমি বর্তমানে কিছুই বলিতে চাহি না। কারণ ইহাতে শান্তি স্থাপনে ব্যাঘাত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে যাহারা শান্তি কামনা করে ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে তাহারা আমার বিরুদ্ধে যত খুশী নালিশ করিতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠা হইলে আমি সকল নালিশের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে এবং আসল ব্যাপার প্রকাশ করিতে পারিব।”

ঐ দিনই তিনি বিদেশী সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা ভারতবর্ষের কুদ্রাণ্ডি প্রকাশিত হইবে না ইহাই ছিল তাঁহার সত্য। সুতরাং এখনও উহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। দৈনিক ভারতের নিউ ইয়র্ক সংবাদদাতা উক্ত বক্তৃতার একখণ্ড নকল প্রেরণ করায় ৩০শে আগষ্ট তারিখের ‘ভারতে’ উহার সারাংশ প্রকাশিত হয়। ঈদের সময় কোন হাদ্দামা হইবে না এই মত ব্যক্ত করিয়া সুরাবর্দী বলেন :

“ঈদের পূর্বেই শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সহিত জড়িত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন ঐ শান্তি বেশী দিন টিকিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।”

তিনি কলিকাতার সাম্প্রতিক হাদ্দামার জন্ত হিন্দুদের

উপর দোষারোপ করেন। মিঃ সুরাবর্দী বলেন হিন্দুসাই কলিকাতাব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম শুরু করিয়াছেন এবং ভারতের এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী।

‘হিন্দু কংগ্রেস’ নাকি সংগ্রামের সুযোগ বুঝিতেছিল এবং সহজেই বুঝা যায় যে, তাহারাই হাঙ্গামা শুরু করিয়াছে। কংগ্রেস নাকি বাংলার মল্লিসভার মুখে চূড়-কালি দিবার জন্য হাঙ্গামা বাধাইয়া বাহিরে ঐ নিন্দাবাদ প্রচারের পক্ষে একটা সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করিয়া মিঃ সুরাবর্দী বলেন, “ব্রিটিশ সরকার, মজ্জী-মিশন এবং বড়লার্ড ভারতীয় স্বাধীনতা সমগ্র সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেলা-খেলা করায় বিদ্বেষ ভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।”

“প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” দিবসে মুসলমানগণ শান্তিপূর্ণ থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল এবং লড়াইয়ের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। প্রথম সংঘর্ষে একজন হিন্দুও নিহত বা আহত হয় নাই। মুসলমানরাই শুধু নিহত বা আহত হইয়াছে।

“ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে যে, নূতন পঞ্চ বাতলাইবার জন্য তাহাদের এদেশে থাকিতেই হইবে। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের কোন ইচ্ছাই নাই।”

লীগের এই দ্বৈত নীতি সমগ্র দেশের পক্ষে গভীর অকল্যাণের কারণ হইতে বাধ্য, হইয়াছেও তাই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে লীগের উচিত ছিল ব্যবস্থা পরিষদ বর্জন এবং মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ। কিন্তু তাহারা প্রথম হইতেই উহার বিপরীত আচরণ করিয়া আসিতেছেন। মজ্জীরা নিজেদের কথা ও মতের দ্বারা গুণ্ডা-শ্রেণীর মুসলমানদের বুঝিতে দিয়াছেন যে হিন্দুর প্রাণনাশ, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতিই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূল কথা। ইহা বুঝিয়াই গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ঢাকার ঘটনায় দেখা গিয়াছে মজ্জীরা কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করিয়া গুণ্ডা-মুসলমানদের দমন করিতে এখনও অনিচ্ছুক। কলিকাতায় নির্বিচারে প্রমাণ-প্রয়োগের প্রতি লেশমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া অতি নিয়ন্ত্রণের মুসলমানদেরও অভিযোগে ভদ্র হিন্দুদের পর্যন্ত বেপরোয়া ভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, অথচ হিন্দুরা নরহত্যার গুরুতর অভিযোগ করিয়াও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করাইতে পারিতেছে না। ঢাকায় প্রথমটা দাঙ্গাকারী ও দাঙ্গার সমর্থক মুসলমানদের উপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এবং বেশী করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য করায় দাঙ্গার প্রকোপ

অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কলিকাতায় উল্লেখ্যতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব পূর্ব অনুমত নীতি পরিবর্তিত হয়। মুসলমানকে আহত করার অভিযোগে যেখানে হিন্দুদের উপর পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়, হিন্দু হত্যার অভিযোগে সেখানে মুসলমানদের জরিমানা হয় মাত্র তিন শত টাকা। মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চলিতেছে যে জরিমানার টাকা আদায় হইবে না, বা আদায় হইলেও তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। ইহাতেও গুণ্ডাশ্রেণীর হুঁস্রুতি বাড়িয়া গিয়াছে।

বাংলার বর্তমান মজ্জীদের এই যে দ্বৈত নীতি ১৬ই আগষ্ট হইতে শুরু হইয়াছে, এখনও তাহা অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। লীগের জন্মাবধি অতি পরিষ্কার ভাবে দেখা গিয়াছে যে মুসলমান গুণ্ডারা সরকারের ও পুলিশের সমর্থন না পাইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কখনও বেশী দিন টেকে না। লীগের অতীত ও অস্বাভাবিক আব্দার গণনাম্পর্শী হইয়াছে সরকারী সমর্থন লাভের ফলে। গবর্নমেন্টের শাসন-যন্ত্র পিছনে থাকে বলিয়াই লীগ দেশের অনিষ্ট করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সহায়তা করিতে পারে। এখনও লীগের অন্তরালে রক্ষণশীল সিভিলিয়ান ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে ভাবে অকল্যাণ-গণতন্ত্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হইয়া লীগ-মজ্জীদের দ্বৈত নীতি এবং তাহাদের সকল অত্যাচার কার্য সমর্থন করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে লীগকে শিথলী করিয়া রক্ষণশীল দলের শক্ত-স্বরূপ সিভিলিয়ানতন্ত্র কর্তৃক বিলাতের শ্রমিক দল ও কংগ্রেসের গুণ্ডাশ্রেণী ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। “দাঙ্গার জন্য হিন্দু কংগ্রেস দায়ী” এই ঘৃণ্য মিথ্যার লেশমাত্র প্রমাণ লীগের নেতৃবর্গ কোন কিছুই দিতে পারেন নাই। উচ্চকণ্ঠে মিথ্যার প্রচার যাহাদের মূলনীতি সেই দলের কোনও ধর্মের দোহাই দেওয়া আশ্চর্য। অথচ এই ধর্মের দোহাই এদের একমাত্র সম্বল।

দাবির উগ্রতা অবাস্তব

মিঃ আনিসুজ্জামান মুসলমান যুবকদিগকে বর্তমান নেতৃত্বের ব্যর্থতা, নেতাদের বিষময় অদূরদর্শিতা ও “অভূতপূর্ব অধর্মচারণ” লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের জন্য নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিব। জন্য অস্বপ্নরূপে জানাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “চার্টারের মন্ত্রণা যে নেতৃত্বের নির্দেশ দেয় সে নেতৃত্ব দূরে নিক্ষেপ করিয়া সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এই নেতৃত্ব আজ সমাজকে কোন পুণ্ডিতগুরুময় স্তরে নামাইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে হইবে। শুধু দশ কোটি মুসলমানের নয়, চল্লিশ কোটি মনুষ্য সম্ভানের শোষণ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াই-ই প্রকৃত জেহাদ।”

বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ধরনের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী মুসলমানদের লিখিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেরাদুন হইতে লিখিত মিঃ কে. এফ. ইব্রাহিমের পত্রখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা ষ্টেইসম্যান পত্রে প্রকাশিত হয়।

“আমি লীগারও নই, জাতীয়তাবাদী মুসলমানও নই। আমি নিতান্তই সাধারণ মুসলমান, সত্য কথা বুঝিতে চাই। মুসলমানেরা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যায় এক চতুর্থাংশ মাত্র ইহা বাস্তব সত্য। সকলকে যাহা দেওয়া হয় তার এক-চতুর্থাংশ পাইলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকি। উচিত। আমরা নিজেদের জন্য যে ভাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি করিতেছি, অপরকে কি আমরা তাহাই দিতে পারিব? ক্যাবিনেট মিশনের প্লানের ‘বি’ গুপের শিখদের কি আমরা অস্ত্র যাহা আদায় করিব সেই অল্পপাতে সুবিধা দিতে রাজী হইব? যতই সাম্প্রদায়িক দরদ আমার মধ্যে থাকুক না কেন, মিঃ জিন্না যখন প্যারিটির কথা বলেন আমার সমগ্র অন্তরায় তাহা শুনিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্যারিটি আদায় করিয়া মিঃ জিন্না তাঁহার সুর আরও চড়াইয়া বাঁধিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে সুর চড়াইয়া সর্বোচ্চ গ্রামে বাঁধিতে গেলেই উহা ছিঁড়িবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

“সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাহাদের শ্রাঘ্য প্রাপ্যের বহু-লাংশ বেছিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার যেখানে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, লীগ-নেতারা সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বড় বড় নেতারা নিশ্চিন্ত আরামে বহু ঘরে বসিয়া ছুফু মিতে পারেন, মরিবার সময় মরে নিরীহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানবিবর্জিত মুসলমান।

“কলিকাতার হত্যাকাণ্ডে তাঁহার সম্প্রদায়ের কি দুর্দশা হইয়াছে তাহা জানিয়াও মিঃ জিন্না শিক্ষালাভ করিতে চাহিতেছেন না ইহা কি ছুঃখের বিষয় নয়? লীগ-নেতাদের প্ররোচনায় মুসলমানেরাই সম্ভবতঃ দাঙ্গা শুরু করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহারা হাক্কারে হাক্কারে গুরিয়াছে ইহা তো অস্বীকার করিয়া লাভ নাই? ছোরা নাচাইয়া আমাদের কি লাভ হইয়াছে? লীগ ছুরি মারিতে গেলে বিপক্ষ দলও ছুরি মারিতে পারে এবং হইতেছেও তাই। ইহাতে সারাটী দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া যাইবে এবং নির্বিরোধী হিন্দু মারমুখো হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিবে। গুণ্ডামির প্ররোচনা বন্ধ করিয়া সাধারণ মানুষকে বাঁচাইবার সময় আসিয়াছে।”

দাঙ্গায় সব মুসলমান যোগদান করেন নাই বহু ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সম্ভবতঃ ভাবে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলে এবং সাধারণ মুসলমানকে এই দ্বন্দ্বের বিকলতা ও বিপদ বুঝাইয়া দিতে অগ্রসর হইলে সফল কলিতে পারিত, কিন্তু তাহা অনেকে করিতে সাহসী হন নাই।

বর্তমান লীগ মন্ত্রি না ভাঙিলে বাঙালী হিন্দুর যেমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে, বাঙালী মুসলমানের বিপদের সম্ভাবনাও তেমন কম নয়। সুতরাং এই দলকে অপসারিত করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমান বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের কার্যে চিন্তাশীল মুসলমানদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে। এখনও শুধু মুসলমান বলিয়াই বর্তমান মন্ত্রিসভা ইহাদের সমর্থন পাইতে থাকিলে দেশের সকল সম্প্রদায়েরই মঙ্গল সুদূরপরাহত হইবে।

বাংলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা

বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উত্তোকে প্রদেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কি ভাবে উহা কার্যে পরিণত করা হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অত্র দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত উড়িষ্যার মন্ত্রীরাও নবীন উত্তম জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় আয়নিয়োগ করিয়াছেন। বাংলার অবস্থা আগে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। বাংলায় যাহারা গবর্নমেন্টের কর্ণধার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তাঁহাদের নিকট অনেক বড়। অত্যাচার প্রদেশের দেখাদেখি এখানেও অনেক বড় বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তার কোনটির সহিত কোনটির সামঞ্জস্য নাই। পুলিশের বাড়ী তৈরি হইতে শুরু করিয়া গবাদি পশুর উন্নতি প্রভৃতি সব কিছুই উহার মধ্যে আছে।

বাংলার পরিকল্পনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় অর্থব্যয়। এই পরিকল্পনাসমূহ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখনই আমরা উহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। উহা কার্যে পরিণত করিবার নামে একজন ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারের পদ সৃষ্ট হইয়াছে এবং যিনি বাংলার ও ভারতবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন এমন এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ানকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার কলিকাতার রোটারী ক্লাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। যথার্থি সিভিলিয়ান কায়দায় তিনি প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই একটি ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড গঠন এবং এই বিভাগে লোক নিয়োগ আবশ্যিক। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা-সরকার যে কোন বিভাগে উন্নয়ন বলিতে কর্মচারী বৃদ্ধি বুঝিয়া থাকেন। এই কর্মচারী বৃদ্ধি রাজনৈতিক কারণে অপরিহার্য। দল রাখিতে গেলেই দলের লোককে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তার জন্ত চাকুরি দিতে হয়; চাকুরি খালি না থাকিলে নতুন চাকুরি সৃষ্টি করিতে হয়। নতুন চাকুরি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অজুহাত প্রদেশের উন্নতির নামে পরিকল্পনা প্রণয়ন। ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার দেখাইয়াছেন যে বাংলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

মোট ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আপাততঃ হুগলী জেলার পোলবা থানায় এবং ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানায় উন্নতি সাধনের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যশোর জেলাতেও কিছু কাজ সুরু হইবে। এই সব পরীক্ষা সফল হইলে তারপর সমগ্র প্রদেশের উন্নয়ন কার্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার মধ্যে পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের ঘর-বাড়ী তৈরি, বেতন বৃদ্ধি, চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি—সেগুলি অবশ্যই চলিতে থাকিবে। ডেভেলপমেন্ট বিভাগের চাকুরিগুলিও খালি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

নৌকা-বিভাগের কীর্তি

নৌকা তৈরি করিয়া নদীমাতৃক বাংলার মাঝি ও মৎস্য-জীবীদের উদ্ধার করিবার যে স্বীম বাংলা-সরকার রচনা করিয়াছিলেন তাহা উন্নয়ন-পরিকল্পনার নামেই করা হইয়াছিল। এক-মাত্র নৌকা তৈরি ব্যাপারেই জনসাধারণের প্রায় ৮ কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে। এই কার্যে এখনও সরকারী নৌবহরের মাঝিমালাদের বেতন প্রভৃতি বাবদ অপচয় চলিতেছে। পরিকল্পনার নামে কোটি কোটি টাকা বাংলার লীগ মজীদদের হাতে পড়িলে তার কি গতি হইবে, নৌকা-বিলাসের ইতিহাস তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাদারীপুরে এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দিয়াছেন তাহা হইতেই লীগ-রাজত্বে দেশের উন্নতিসাধনের নমুনা বুঝা যাইবে।

খুলনার সিভিল সাপ্লাই আপিসের নৌকাবিভাগের কাজী সেকেন্দার আলি নামক জনৈক মাঝির প্রতি মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জি এন মণ্ডল দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা জরিমানার আদেশ দেন। রায়দান-প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট খুলনার সিভিল সাপ্লাই আপিসের নৌকা বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে, আদালতের শমন অগ্রাহ করিয়া এবং প্রামাণ্য কাগজপত্রাদি সরাইয়া রাখিয়া নৌকা-বিভাগ মামলার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আসামী সেকেন্দার আলির অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় আসামীর সহিত উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগাযোগ আছে। সিভিল সাপ্লাই আপিসের কর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন :

“শিলচর থানার দারোগার অহুরোধে খুলনার থানার সাব-ইন্সপেক্টর আবদাস শোভান খুলনার ৪৮৭ ঘাটের কয়েকজন অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও তাহাদের ঠিক-বুঝ লইয়া যাইতে চাহেন কিন্তু নৌকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ঐ হিসাববহি অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, উহা ডিপার্টমেন্টের সব সময়ে দরকার, তবে মামলার সময় উহা উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু এই দলিল উপস্থিত করিবার জন্ত শমন প্রেরিত হইলে উক্ত আপিসে শমনে উল্লিখিত নামে কোন ব্যক্তি নাই বলিয়া শমনট ফেরত আসে। ইহার পর সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রেস্তারী পরোয়ানা জারী করা হইলে তিনি

আদালতে হাজির হন কিন্তু উক্ত ঠিক-বুঝ উপস্থিত করেন নাই। খুলনার সিভিল সাপ্লাই বিভাগে ট্রান্সপোর্টেশন ও প্রোজেক্ট বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর মিঃ কোহেন জানান যে ঐ খাতাটি হারাইয়া যাইবার আশঙ্কায় ইন্সপেক্টরের হস্তে উহা দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ঐ ঠিক-বুঝসহ আদালতে উপস্থিত হইবার জন্ত মিঃ কোহেনের উপর শমন জারী করা হয়, কিন্তু মিঃ কোহেন নিজের দায়িত্ব এড়াইয়া খুলনার সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ জে. কে. লাহিড়ীর উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দেন। বহু দিবা-সন্ধ্যাচের পর মিঃ লাহিড়ী আদালতে হাজির হইয়া বলেন যে, উল্লিখিত খাতাটি নৌকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ এস. এম. আমেদের হেফাজতে আছে। মিঃ আমেদের নামে শমন জারী করা হইলে সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ এ. কে. এম. ফজলুল হক ধোপার হিসাবের খাতার ন্যায় একটি বাজে খাতা আদালতে উপস্থিত করেন। তদন্তকালে যে অংশে আসামীর ও পুলিশ কর্মচারীর স্বাক্ষর ছিল এই খাতায় তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। এই ফজলুল হক কিংবা ইন্সপেক্টর সত্যেন বিশ্বাসের হস্তে ইতিপূর্বে এই খাতা দেওয়া হয় নাই। নৌকা-বিভাগের মিঃ এস. এম. আমেদ এক চিঠিতে জানান যে, আসামী কাজী সেকেন্দার হস্তে খাতা হইতে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারীকে পুনরায় আদালতে উপস্থিত হইতে বলা হয়, তিনি বলেন যে তদন্তকালে ঐ বাজে খাতায় তিনি সন্নিহিত করেন নাই। তখন মিঃ এস. এম. আমেদের নামে শমন এমন কি প্রেস্তারী পরোয়ানা পর্যন্ত বাহির করা হয় কিন্তু খুলনার নৌকা-বিভাগে ঐ নামের কোন কর্মচারী না থাকায় পরোয়ানা জারী করা যায় নাই। নৌকা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর যদি কোন সন্ধান না পাওয়া যায় তবে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে এ বিভাগের অস্তিত্ব আছে কিনা। ১৯৪৫-এর জুলাই হইতে ১৯৪৬-এর জুন পর্যন্ত এই মামলা চলে, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আদালতে উপস্থিত করা সম্ভবপর হয় নাই। এই অফিসারদিগকেও যদি আসামী করিয়া এই মামলা চালান হইত তবেই ফরিমাদী পক্ষ সঙ্গত কার্য করিতেন।

ফরিদপুরের দায়রা জজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের রায় অনুমোদন করিয়া মন্তব্য করেন যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের বেয়ার্ডা কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ ও তীব্র মন্তব্য করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত কাজই করিয়াছেন।

ছুড়িফ নিবারণ সম্বন্ধে মার্কিন মিশনের অভিমত

মার্কিন ছুড়িফ মিশন ভারতের খাদ্যাবস্থা পর্যবেক্ষণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁহাদের সত্যমত জ্ঞাপন করেন। বিখ্যাত খাণ্ডতথ্যজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ডাঃ থিরোডর গুল্জ মিশনের বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

তাঁহারা বলেন, ভারতে জনপ্রতি মাত্র ১২ আউন্স খাদ্য

বরাদ্দ হইয়াছে। ভারতবাসী এই ভাবে আশ্বিনিভরশীল হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনশনের প্রাপ্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারত অন্যান্য দেশের নিকট হইতে যে পরিমাণ খাদ্য চাহিয়াছে তাহার প্রয়োজনের তুলনায় তাহাকে কোনমতেই অতিরিক্ত বলা চলে না।

তাহার উপর কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য কিছু মাল হাতে মজুদ রাখা প্রয়োজন। বাংলার খাদ্যসংক্রান্ত অবাবস্থার কুফলও উহা দ্বারা লাঘব করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত এবং যুক্তপ্রদেশে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য-বণ্টনের সুব্যবস্থা দেখিয়া মার্কিন মিশন চমৎকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় ঐ সকল প্রদেশের ব্যবস্থা উন্নততর। অপর কোথাও এত ভাল সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নাই। যুক্তপ্রদেশে খাদ্যসংগ্রহের কার্য আশাতিরিক্ত ভাবে সফল হওয়ায় মাল গুদামজাত করার ব্যাপার এক সমস্তার দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র দেশবাসী যে কংগ্রেসী সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন মার্কিন মিশন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

ডাঃ শুল্জ আরও বলেন যে বাংলার খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা তেমন সুনিয়ন্ত্রিত বা কার্যকরী নহে। পঞ্জাব এবং সিন্ধুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য থাকিলেও খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা সম্ভোষণক বা ক্রটিশূন্য নহে। কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মিশন স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে ভারত-সরকার যতটুকু দাবি করিয়াছেন বিদেশ হইতে অন্ততঃপক্ষে ততটা খাদ্য পাঠান নিতান্তই আবশ্যক।

মিশন আমেরিকাতে এই বিষয় প্রচার করিয়া জনমত জাগ্রত করিবেন।

আমেরিকাতে যথাযোগ্য সংবাদ ও তথ্যাদি পৌঁছায় নাই বলিয়াই ভারতের সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটয়াছে। ওয়াশিংটনের খাদ্য-সম্মেলনে ভারত ৪০ লক্ষ টন খাদ্য দাবি করাতে আমেরিকা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তাহারা বুঝিতেই পারে নাই যে সত্যি এতটা দরকার। আমেরিকা মনে করিয়াছিল যে ভারতের খাদ্যাভাবের কথা অনেক বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ না হওয়ায় তাহাদের ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। আমেরিকা জানিতেই পারিল না যে ভারতবাসী আহারের মাত্রা অর্দ্ধাশনের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়া মনস্তর হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

মিশন কি ভাবে জনমত জাগ্রত করিবেন তাহাও ডাঃ শুল্জ বর্ণনা করেন। তাঁহাদের দলে কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং এক জন ফটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁহারা যে পাঁচ হাজার ফটো তুলিয়াছেন সেগুলি লিখিত বিবরণসহ আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। তাহা

হইলেই মার্কিন জনসাধারণ বুঝিবে ভারতবাসী কত সামান্য ও নিকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া কোনমতে প্রাণ ধারণ করিতেছে।

রাজনৈতিক কারণে জাপানে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী খাদ্য পাঠান হইতেছে এ কথা অস্বীকার করিয়া ডাঃ শুল্জ বলেন যে সেখানে মাথাপিছু বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ এত কম যে মানুষ কোনমতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। খাদ্যের পরিমাণ আর একটু কম হইলেই তাহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু এবং মিঃ জিন্না সকলেই তাঁহাকে বলিয়াছেন যে খাদ্য-বণ্টনের ব্যাপারে জাপান এবং অপর সকল দেশকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। মিশনের কার্যে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য তিনি ভারতের সংবাদপত্রগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সিভিল সার্ভিস

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস দেশের স্বাধীনতার পথে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সব অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে তাহা এখন ইতি-হাসের বস্তু। কংগ্রেস ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই গুপ্ত ভাঙিবার আয়োজন করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা আদেশ দিয়াছেন তাঁহাদের আগেকার কোন সেক্রেটারী বড়লাটের নিকট কাহিল পেশ করিতে পারিবে না। এখানেই ধামিলে চলিবে না, ভারতবাসীর নিকট নবলব্ধ স্বাধীনতার বাস্তব ফল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে এবং এই স্বাধীনতা স্থায়ী করিতে হইলে সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ চক্রান্তকারী সিভিল সার্ভিস ভাঙিয়া দিয়া উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে ইহাও কংগ্রেসনায়কেরা উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীরূপে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার প্রথম বেতার-বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্রের এখন যে অবস্থা তাহাতে আর মেরামতের দ্বারা উহাকে সচল রাখিবার উপায় নাই, বর্তমান শাসনযন্ত্র ভাঙিয়া ফেলিয়া উহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

এই দুঃস্থ কার্য সাধন করিতে হইলে সর্বাপেক্ষে সিভিল সার্ভিসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে এখন সমস্যা প্রধানতঃ তিনটি—(১) ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের অবসর গ্রহণের জঙ্ক ‘কুইট নোটিশ’ দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ, (২) যাহারা অবসর গ্রহণ করিবে তাহাদের পেন্সনের আত্মপাতিক হার এবং যাহাদিগকে কর্মচ্যুত করা হইবে তাহাদের ক্ষতি-পূরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং (৩) সিভিল সার্ভিসের নূতন পরিচালন-ব্যবস্থা প্রণয়ন। যে সব সিভিলিয়ান ২২ বৎসরের অধিককাল কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইতিমধ্যেই এই মর্মে নোটিশ গিয়াছে যে ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা যেন তাঁহারা জানাইয়া দেন। এই তারিখকেই ‘কুইট

নোটেশ'র দিন ধরা যাইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। জাতীয় ভারত-সরকার কর্তৃক রচিত নূতন সত্বে ইহারাজ্য করিতে প্রস্তুত থাকিলে তাহাও তাঁহাদিগকে জানাইতে বলা হইতেছে।

বর্তমানে সিভিল সার্ভিসে মোট ১০৭৪ জন কর্মচারী আছেন। তাঁহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের অধীনে কাজ করেন। শতকরা ১৫ হইতে ২০ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ নবগঠিত সিভিল সার্ভিসের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থাকিবে কি না, থাকা উচিত কিনা তাহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সিভিল সার্ভিসের উপর কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের কিছু ক্ষমতা না থাকিলে অর্থনৈতিক এবং অন্তর্বিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা কার্যে পরিণত করা কঠিন হইয়া উঠিবে। ইহা বুঝিয়াই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইতেছে।

কংগ্রেস গন্যমেন্টে কর্মচারীদের বেতন

নেহরু মন্ত্রী-সভা সরকারী কর্মচারীদের মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিতে চাহিতেছেন এবং তাহাদের জ্ঞান নিম্নোক্তরূপ বেতনের হার নির্ধারণের কথাও বিবেচনা করিতেছেন। এই হার প্রবর্তিত হইলে বর্তমানে উচ্চ ও নিম্ন পদে বেতনের যে অস্বাভাবিক বৈষম্য প্রচলিত আছে তাহা দূর হইবে। ইহাতে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ এখন আছে তাহাও দূরীভূত হইবে। বেতনের প্রস্তাবিত হার এইরূপ,

বেহারী—	৩০১	৫১	১০০১
কেরাণী—	১০০১	১০১	২৫০১
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী—	২৬০১	২৫১	৭৫০১
প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী—	৪৫০১	৫০১	১৫০০১

বর্তমান সময়ে প্রচলিত পিয়ন, দপ্তরী প্রভৃতির নিয়োগ রহিত করা হইবে। কাইল এবং কাগজপত্র বহনের জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত বেহারী বহাল করা হইবে।

প্রত্যেক কেরাণীকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ছয় মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। স্টেনোগ্রাফার এবং ব্যক্তিগত সহকারীগণকে কেরাণী হিসাবে বেতন ব্যতিরেকেও অধিক ৫০% হইতে ১৫০% মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীগণকে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সমান ধরা হইবে। প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীগণকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সমান বলিয়া ধরা হইবে।

বর্তমানে ভারত-সরকারের এক জন এসিস্ট্যান্ট এক জন তহলীলদারের চেয়ে বেশী মাছিনা পাইয়া থাকে। কিন্তু দুই শ্রেণীর কর্মচারীর কাজের মধ্যে পার্থক্য নাই।

সরকারী কর্মচারীদের বেতনের ভবিষ্যৎ হার কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণের জ্ঞান ভারত-সরকার 'পে কমিশন'

নিযুক্ত করিয়াছেন। 'পে-কমিশন' বর্তমান জাতীয় সরকার কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই গঠিত হয়। এখন উহার চিন্তা ও কর্ম প্রণালী পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বেতনের যে বৈষম্যমূলক হার নির্ধারিত হইয়াছিল বর্তমান অবস্থায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া ভারত-বাসীর সর্বশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেতনের হার স্থির করা কর্তব্য। অল্প দিকে একথাও ঠিক যে যাহাদের হাতে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যচালনার ভার থাকিবে তাহাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে পারে সে দিকে সরকারের দৃষ্টি থাকা উচিত। বাসস্থান, যান-বাহন ও জীবন যাপনের অস্বাভাবিক সুবিধার যথাযথ ব্যবস্থা প্রথম হইতেই তাহাদের জ্ঞান করা উচিত। বিদেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার কর্মপরিচালক (একজিকিউটিভ) এই রূপে সংসার চালনায় সহায়তা পাওয়ার তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা যথাকার্যে নিয়োজিত হয়।

বোম্বাই সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা

বোম্বাইয়ের পরিকল্পনা-সচিব মিঃ এল. এম. পাতিল কংগ্রেস সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। বোম্বাই পরিষদে তিনি বলেন, প্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে সমগ্র বৎসর ধরিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা উহার অন্ততম অঙ্গ। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা আড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিলাসে মগ্ন থাকিতে পারেন না। তাহাদের যতটুকু কাজ করিবার শক্তি আছে শুধু ততটুকু লইয়াই তাহারা কথা বলিতে পারেন। পানীর জল সরবরাহের জ্ঞান যে সকল অঞ্চলে জলকষ্ট আছে তাহার হিসাব লওয়া হইতেছে। যেখানে জলকষ্ট সবচেয়ে বেশী সেখানেই প্রথমে কার্য আরম্ভ হইবে। • কুপ বা পুষ্করিণী খনন, টিউবওয়েল এবং বাঁধের ব্যবস্থা যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে ঠিক সেইরূপই করা হইবে। জরুরী কাজ পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ হইবার পূর্বেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

কুটীর-শিল্প ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার জ্ঞান মন্ত্রিসভা প্রথমই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার বে-সরকারী প্রচেষ্টায়ও তাহারা সাহায্য করিবেন। কাগজ, কাঁচ, এলুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সাইকেল, মোটর এবং নকল রেশমের কারখানা খুলিলে বোম্বাই সরকার তাহার মূলধনের কিসদংশ যোগাইবেন এবং নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধন থাকিতে পারে, কিন্তু কারখানা ও ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার বাধ্যতামূলক ভাবে ভারতীয়দের হাতে রাখিতে

হইবে। সার এম. বিদ্যেশ্বরায় মোটর নির্মাণের কারখানা খুলিতে চাহিলে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সরকারই সর্বপ্রথম তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বে-সরকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগে মোটর, সাইকেল এবং কাগজের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব মন্ত্রিসভার নিকট আসিয়াছে এবং তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন।

মিঃ পাতিজ বলেন, পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রণয়ন করিয়া ভারত-সরকারের নিকট প্রেরণ করা যাইবে বলিয়া মন্ত্রিসভা মনে করেন।

পুনর্গঠন বাবদ মোট ৬০ হইতে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ভারত-সরকার এক কালীন সাহায্য হিসাবে ২০ কোটি টাকা দিবেন বলিয়া বোম্বাই সরকার আশা করিতেছেন। পুনর্গঠন সম্পর্কে লিখিত বিবরণিতে মিঃ পাতিজ বলিয়াছেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্যে পরিণত হইবে এই হিসাবে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বৎসরে কতটা কাজ হইবে তাহাও পূর্বেই স্থির করিয়া ফেলা দরকার। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রথম বৎসরে কয়টি কুপ বা গুফরিগী খনন, কয়টি বাঁধ নির্মাণ, কয়টি খাল খনন, কয়টি হাসপাতাল বা বিতালয় স্থাপন করা হইবে তাহা স্থির করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহার পর বৎসরে বৎসরে পরিকল্পনা অগ্রযাত্রী কাজ শেষ করার উপযুক্ত দ্রুত এবং কর্মী ও কর্মপস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গ্রাম্য জীবনের সহিত পরিচিত গ্রামের অভাব-অভিযোগ স্থিতিতে সমর্থ এবং গ্রামবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল অর্থাৎ গ্রামবাসীদের সহিত একাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মী হিসাবে বাছিয়া লইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রাম এবং গ্রাম্য সমাজই বর্তমান পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়। সেইজন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্ভবপর হইলে গ্রামাঞ্চল হইতে শিক্ষার্থী আনিয়া এবং উপযুক্ত শিক্ষার পর পুনরায় তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদেরই উপর পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় কার্যে পরিণত করার ভার দিতে হইবে। পরিকল্পনাটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য মূলতঃ শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে। এজন্য আমাদের বহু সংখ্যক কর্মীকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। কাজেই বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ও অগ্রাগ্র পেশাদারী ও কার্যকরী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারসাধনও কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকারের বর্তমান আয় হইতে হয়ত ব্যয় সঙ্কুলান করা যাইবে না। কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই। সরকার এই কাজ শেষ করিবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা নূতন কর ধার্য্য করিয়া বা ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন। কংগ্রেস-সরকার বিচ্ছিতেই সম্মত নাই।

যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ

উড়িষ্যার পর যুক্তপ্রদেশও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের যানবাহন-সচিব হাজিজ মহম্মদ ইব্রাহিম জলবিদ্যুৎ প্রস্তুতের কারখানা নির্মাণের জন্য ৫,৫২,৭২,৪০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। এই পরিকল্পনা অগ্রযাত্রী কাজ হইলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের প্রভূত আর্থিক উন্নতি হইবে। প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে এবং প্রতি মাত্রা বিদ্যুতের মূল্য এক পাই অপেক্ষাও কম পড়িবে। জলসেচের সুবিধা পাইলে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে।

মন্ত্রীমহাশয় বলেন, নেয়ার বাঁধ নির্মিত হইলে গাড়োয়াল কান্ধীরের ছায় স্থানে পরিণত হইবে। শিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে ঐ অঞ্চল সুবৈশ্বব্যয়ের আকর হইবে। দুইটি বড় এবং কয়েকটি ছোট বাঁধ নির্মাণ বর্তমান বৎসরেই আরম্ভ হইবে। মীর্জাপুর জেলার রিহিন্দ বাঁধ তৈয়ারী হইলে ১,৬৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে এবং ৫,৭৩,০০০ একর জমী সেচের সুবিধা পাইবে। বালিয়া, বারানসী, জৌনপুর, গোড়া, গাজীপুর, আজমগড়, মীর্জাপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি, বাহমাইচ, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, রায়বেরিলী, এলাহাবাদ, কানপুর, উনাও, ফতেগড়, বান্দা, হামিরপুর এবং ঝাঁসি জেলা এই পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হইবে।

তাহার উপর টিউবওয়েল ও পাম্প খাল খননের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। গোগরা, রাপ্তি এবং গবাল খাল পরিবর্ধন করা হইবে। নিম্নমুখী কয়েকটি খাল খননের ফলে রায়বেরিলী প্রভৃতি জেলার আরও ১,৩৫,০০০ জমি সেচের সুবিধা হইবে। পার্বত্য গাড়োয়াল জেলার নেয়ার বাঁধ নির্মাণে সাত-আট বৎসর লাগিবে, কারণ উহার জন্য বিদেশ হইতে বহু যন্ত্রপাতি আমদানী করা প্রয়োজন।

কয়েকজন এঞ্জিনিয়ারকে হাতেকলমে শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠানো হইয়াছে এবং তাঁহারা দুই-তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেই কাজ আরম্ভ হইবে।

নেয়ার বাঁধ নির্মিত হইলে ৭৫,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং ৩৩,৮০,০০০ একর জমিতে জলসেচন করা চলিবে। মজুত জল দ্বারা গ্রীষ্মকালের সচরাচর শুষ্ক ঋণগুলিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাটির বিশেষত্ব। পরিকল্পিত ছোটখাট বাঁধগুলির মধ্যে সরমু বাঁধ ২০,০০,০০০ এবং নদক বাঁধ ২৪,০০০ একর জমি সেচের ব্যবস্থা করিবে।

রিহিন্দ অঞ্চল রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কাঁচা মাল, এলুমিনিয়াম এবং কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত তুণে পরিপূর্ণ। সেইজন্য যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকার বাঁধের নিকট ঐ সকল শিল্পের কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব

মাদ্রাজে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির দ্বাদশ বাৎসরিক সাধারণ সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভাপতি আলোচনা প্রসঙ্গে উৎপাদক দ্রব্যগুলির আমদানীর দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেন।

সার চিন্তামন বলেন যে যদিও গবর্নমেন্ট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত নানারকমে চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি এ পর্যন্ত (অর্থাৎ জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে,) কোন প্রকার দাম কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব।

তিনি আশা করেন যে এ্যাংলো-আমেরিকান ঋণচুক্তি কার্যকরী হইবার পর যে সমস্ত অঞ্চলে ষ্টার্লিং প্রধান মুদ্রা নহে সেই অঞ্চলে উৎপাদক দ্রব্যের অর্থাৎ যন্ত্রপাতির সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা কিঞ্চিৎ বাড়িবে। তিনি বলেন যে ভারতের কৃষিশিল্পগত উন্নতির কার্যে ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। তাহার লাভজনক ব্যবসায়গুলিতে সহায়তা করিয়া দেশের ধনসম্পদ বাড়াইতে পারে।

তিনি জোর দিয়া বলেন যে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক চালের জন্তই বর্তমানে টাকা এত সস্তা হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ বর্তমানে টাকার দাম সস্তা রাখিবার চেষ্টাই করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে টাকা সস্তা থাকিলে জনসাধারণের ঋণভারের চাপ কম থাকিবে, এবং নানাপ্রকার উৎপাদন উদ্দেশ্যে টাকা খাটান সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক প্রকৃতির সহিত সস্তা টাকাকে খাপ খাওয়াইয়া পরে সস্তা টাকা চলিত রাখা উচিত কিনা তাহা চিন্তা করা উচিত।

‘ব্রেটনউড চুক্তি’র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারত সেই সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাজী আছে। সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক সমস্তার নিরসন ব্যাপারে অনুকূল পোষকতা করিতে সম্মত ও দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন।

নিখিল বিশ্ব অর্থভাণ্ডার সমস্ত দেশের টাকা জমা রাখিয়া অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চিত অবস্থাকে স্বাভাবিক হইতে সাহায্য করিবে। ইহা যুদ্ধোত্তর সময়ের উন্নতিবিধানের জন্ত যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, সে বিষয়েও সাহায্য করিবে। ব্রেটনউড ব্যবস্থার তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, যাহাতে দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়মূল্যের স্বাভাবিক অবস্থা আসে; দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় যাহাতে সুবিধাজনক হয় এবং তৃতীয়তঃ দেশ-বিশেষের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করা।

ব্রিটেনের আমেরিকার নিকট ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বর্তমানে ব্রিটেন তাহার যুদ্ধকালীন আর্থিক অবস্থার সংশোধন, এবং এম্পায়ার ডলার পুলের ব্যবস্থা করিয়া

লিবার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছে। ডলার পুলের কথা

উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে যুদ্ধকালীন অবস্থা পরিচালনের জন্ত আমেরিকা যে ডলার সম্পদ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহার সহিত ভারতবর্ষও অত্যন্ত মিত্রদেশের হায়ে জড়িত। কিন্তু যুদ্ধ-প্রচেষ্টা জনিত কার্যগুলি শেষ হইবার পরে ভারতে নিজস্ব ব্যয়ের জন্ত ঋণের টাকার বরাদ্দ ভারতবর্ষ পাইবে কিনা তাহা একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে এবং ভবিষ্যতের ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন কমিবে, এবং উহার ফলে বর্ধিত মূল্য না কমিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। ভারতের ষ্টার্লিং ব্যালাল সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি বলেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এখন এই ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসিয়াছে। ইহাতে সুফললাভের সম্ভাবনা আছে।

সার চিন্তামন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কতকগুলি অন্যান্য ও ক্ষতিকর অভ্যাসের কথাও উল্লেখ করেন। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তাহাদের ব্যবসা বাড়াইবার জন্য অন্যান্য এলাকায় শাখা স্থাপন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি এলাকায় পূর্ব হইতেই অন্যান্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত আছে। এক একটি স্থানে প্রচুর ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ার আপত্তিঃ দৃষ্টিতে ব্যাঙ্কিং প্রধার উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার ফলেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অন্যান্য ও ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার অবসর ঘটিয়া থাকে।

এই প্রকার অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতের ব্যাঙ্কিং উন্নতির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপারের সংশোধন ও উন্নতি করিবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ আছে। যাহাতে অযথা শাখা স্থাপন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে অনুরোধ-উপরোধে অন্যান্য ভাবে একাউন্ট স্থানান্তরিত না হয় তাহাও রোধ করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত, গবর্নমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পরিদর্শন ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যবহৃত না হওয়ায় ব্যাঙ্কের এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সার চিন্তামন দেশমুখের অবিনায়ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে দেশের আর্থিক অবস্থার যতটা উন্নতি এত দিনে হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই ইহা দুঃখের বিষয়।

শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের নির্দেশ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশকে বহু প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। ১৯২৮ সালে মহাত্মা গান্ধী এক শ্রমিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন যে আমরা শ্রমিকদিগকে যাহা প্রদান করিব প্রতিদানে লাভ রূপে তাহার অনেক বেশী ফিরিয়া আসিবে। গত কিছু কাল হইতে শ্রমিকগণ জনসাধারণের সহায়ভূতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমনকি সমস্ত

সময় তাহারা এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে যে সামান্য কারণেই তাহারা ধর্মঘট করিতেছে। ফলে যুদ্ধোত্তর সময়ে এই প্রকার ধর্মঘটের ফলে কাপড়ের কলেই প্রায় ৭০ লক্ষ গজ কাপড় কম বোনা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে বোম্বাইয়ে ও অগ্নাত প্রদেশে যে পরিমাণে ধর্মঘট হইয়াছে তাহা কলকার-খানার উৎপাদন-ব্যবহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মন্তব্য অনুসারে বলিতে হয় যে জীবন-ধারণ ব্যয়ের যুদ্ধজনিত বৃদ্ধি ইহার একটি কারণ। তাহার উপর আবার বেতন ও বাজারের জিনিষপত্রের দামের বৈষম্য অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। ভবিষ্যতে এই বেতন ও বাজারের দাম সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য। শ্রমিকগণের ধর্মঘটের অধিকার আছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। কোন কোন সময়ে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে ধর্মঘট করা হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের কোন কারখানার মালিকের কচার বিবাহ উপলক্ষ্যে জলপানী না দেওয়ায় যে ধর্মঘট করা হইয়াছিল, ইহা সমর্থন করা যায় না। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে শ্রমিকসম্মত যে অথবা বিপথগামী হইতেছে তাহার একটা পরিষ্কৃত আভাস পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর মতে কোন ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না দিয়া রাজনীতি অথবা অন্য কোন উন্নত উদ্দেশ্য লইয়া চলিতে হইবে এবং শ্রমিকগণের অঙ্গতার সুযোগ গ্রহণ করিলে চলিবে না। হরিজন পত্রিকায় তিনি বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে গবর্নমেন্টের কেবলমাত্র কংগ্রেসের নির্দেশই গ্রহণ করা কর্তব্য।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশানুসারে, দেশের জীবিকার মীতিনীতি অনুসারে অর্থনৈতিক দিক বিচার করিয়া শ্রমিকগণের ন্যূনতম বেতন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমগ্র দেশের শ্রমিকগণের সংখ্যা গণিলে দেখা যায় যে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক আছে, কিন্তু তাহাদেরই উপার্জিত অর্থের মুখ চাহিয়া আছে প্রায় ৪ কোটি পরিজন। বর্তমানে ধর্মঘট প্রধী সরকার অথবা যাহারা লোক খাটায় তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের হাতের অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি চান না যে, যে সমস্ত ধর্মঘটের প্রকৃত প্রয়োজন নাই তাহাকে জনমত সমর্থন করুক। কংগ্রেস আরও অধিক পরিমাণে শ্রমিক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় ধর্মঘট ইত্যাদির উচিত্য স্থির করিয়া দিবে। এ বিষয়ে দেশীয় শ্রমিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে শ্রমিকগণ যে সমাজ-বিরোধী পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা সুরাহা হইবে। বিশেষ করিয়া যাহারা শ্রমিকগণকে ভাঙ্গাইয়া আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছিল, তাহারাও সংযত হইতে পারিবে।

কংগ্রেস ও লবণ-কর

২৫ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস লবণ-কর রহিত করিবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছে। যখনই হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে কংগ্রেস এই কর নিষিদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

লবণ আমাদের সাধারণ জীবন যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য হওয়ায় তাহার উপর যে শুল্ক ভার আরোপ করা হয় তাহা অত্যন্ত দরিদ্র লোকেরা পর্যন্ত এড়াইতে পারে না। এই কর স্থাপন ও সেই সম্বন্ধীয় অন্যান্য বৈষম্যিক ব্যবস্থার জন্যই লবণ তৈয়ার করা চাষীদের অবসর সময়ের জীবিকা অঙ্গনের উপায় হইয়াছিল, তাহাও আর এখন সম্ভবপর নাই। তাহার ফলে আমদানী লবণের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রার্থনা সভায় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের কার্যের দ্বারা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে দুর্বলতী গ্রামগুলিও যেন অনুভব করিতে পারে যে স্বাধীনতার স্বত্বপাত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নূতন সরকারের প্রধান কর্তব্যই লবণ-করের উচ্ছেদ সাধন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয় তালিকায় এই লবণশুল্ক যোগ করিলে যে পরিবর্তন হইবে তাহা আশ্চর্য্য করিবার মত নহে। ১৯৪৬-৪৭ সালের মোট লবণ-কর হিসাবে ৯,৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সরকারী লবণ বিক্রয়ের দ্বারা ৫২'৫৬ লক্ষ টাকা এবং ১৫২'১৫ লক্ষ টাকা লবণের শুল্ক হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। লবণ বিভাগটির জন্য যে ১৩২'৭৩ লক্ষ টাকা খাতে লবণ-শুল্ক উঠাইয়া দিলে তাহার আর প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং হিসাবে দেখা যায় যে ৬ কোটি টাকার অধিক আয় কমিবে না। বাৎসরিক সমগ্র আয়ব্যয় তালিকার মোট আয় ২৯৯'২৭ কোটি টাকার অঙ্কের তুলনায় এই ৬ কোটি টাকা সামান্যই।

মাদক দ্রব্যের উপর যে কর স্থাপিত আছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের এক দরিদ্র হরিজন শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর সামান্য কিছু অংশ ছাড়া ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় অবস্থাপন্ন সমাজে পান-অভ্যাস এক রকম নাই। সুতরাং যে কর আদায় করা হইয়া থাকে তাহার একটা মোটামুটি অংশ যাহারা পান-অভ্যাস নহে, এমন জনসাধারণের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই কর রহিত করিয়া দিলে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে মোট ৮৪'৭৪ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে আব্গারী কর আদায় হইয়াছিল ১৩'৫ কোটি টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রাদেশিক কর ২০৩'৫৪ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে তাহার ৪৩'১৬ কোটি টাকা আব্গারী কর হইতে পাওয়া যাইবে। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে যদি আব্গারী শুল্কের ব্যবস্থা একেবারেই তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অগ্নাত কর হইতে মোট আয় ১৯৩৮-৩৯ সালের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইবার পরে মাদ্রাজে সালেম জেলায় আব্গারী কর রহিত করিয়া দেওয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যে আরও দুই-তিনটি প্রদেশে অনুসরণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ত্যাগ করার পর চারিটি জেলাতেই আবার আব্গারী কর বসান হয়। পুনরায় ক্ষমতা পাইবার পর এপ্রিল মাসে মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী আবার সেই কর নিষিদ্ধ করনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে প্রদেশের সর্বত্র আব্গারী

কর তুলিয়া দেওয়ার দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত মাদ্রাস-সরকার স্থির করিয়াছে যে বর্তমান বৎসরে ৮টি জেলায় এবং আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে এই ব্যবস্থা পাকা করিয়া দেওয়া হইবে। নবগঠিত ভারত-সরকারের অর্থ-সচিব ডাঃ মাথাইয়ের অত্যন্ত প্রধান কর্তব্য হইবে, যথাশীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রদেশে গৃহীত আয়করের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে প্রাদেশিক আয়কর ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী ছিল, তাহা বর্তমান বৎসরের হিসাবে প্রায় সওয়া বাইশ কোটি টাকার পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক সরকারের যে ব্যয়ক্ষীতি জমিয়াছিল যুদ্ধোত্তর সময়ে এখন সেই পরিমাণের টাকা এই কর-রহিতকরণের জন্ত ব্যয় করা যাইতে পারে।

যাহাই হউক, লবণ-কর হ্রাস করাইবার এবং যত শীঘ্র সম্ভব একেবারেই তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার জন্ত অর্থনৈতিক অথবা অর্থ কোন কারণ বাধাবরূপ হইতে পারিবে না। কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগের কার্যকলাপে ইহাই সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষে যক্ষ্মা নিবারণ চেষ্টা

যুদ্ধের দরুন যক্ষ্মা নিবারণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল। এখন সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এই কাজে হাত দিয়াছেন। ভারত-সরকার ডাঃ বিশ্বনাথকে যক্ষ্মা সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার মেডিক্যাল কমিশনার বর্তমানে যে কার্য করেন তাহা ভারত-সরকারের নিজস্ব কর্মচারী দিয়া করাইবার জন্ত ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের জনস্বাস্থ্য-সচিব শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। তিনি ডেরাডুন ও পাওরী গাড়োয়ালে দুইটা যক্ষ্মা চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞ ডাঃ বেঞ্জামিন তাঁহার আমন্ত্রণক্রমে যুক্তপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া হাসপাতাল নির্মাণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

বাংলা-সরকার ৫০০ শয্যায়ুক্ত একটা মার্শিয় সামরিক হাসপাতাল ক্রয় করিয়া যক্ষ্মা চিকিৎসাগার স্থাপন করিতেছেন। লাহোরে যক্ষ্মা রোগের বিশেষ প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও পঞ্জাব-সরকার এ বিষয়ে কিছু করিতেছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

যক্ষ্মা নিবারণকল্পে যে সকল প্রাদেশিক সরকার ভোর কমিটির সুপারিশ পালন করিবেন তাঁহাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্ত টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন প্রাদেশিক শাখাগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। ভারত-সরকারের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রচার বিভাগ এবং টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন জনসাধারণকেও যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সচেতন ও সাবধান করিয়া দিবার জন্ত একসঙ্গে ভারতব্যাগী ব্যাপক প্রচার চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে

তাঁহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও বেতার-বক্তৃতার মারফত এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই সদাশয় ব্যক্তিবর্গ বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

কিন্তু এ সকল ব্যবস্থাই প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যথার্থ প্রতিকারের জন্ত ইহার বহুগুণ কাজ করা প্রয়োজন। যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রতিদিন ১৫০০ লোকের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। এই রোগে বৎসরে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনান্ত হয়। ইহার পাঁচ গুণ লোক যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে যক্ষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। বাংলার সর্বত্র দুর্ভিক্ষের অস্বপ্ন অবস্থা বর্তমান থাকায় বহু লোক অনশন ও অর্ধাশনে দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের জীবনী শক্তি ও যক্ষ্মা-প্রতিষেধ-ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া যায় এবং এই কারণে তাহারা সহজেই যক্ষ্মাক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও সংখ্যাজ্ঞানের অভাব সমস্তাটিকে আরও দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে যক্ষ্মাক্রান্তদের জন্ত সমগ্র ভারতে মোট ১২৪টি চিকিৎসাগার এবং ৭০টি হাসপাতাল আছে। তাহাতে মোট ৬০০০ রোগী থাকিতে পারে। ইহা ভারতবর্ষের প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৯০ অপেক্ষা অধিক নয়। অবশ্য আরও প্রায় ৩০০ জন যক্ষ্মা চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পাঠ লইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে যক্ষ্মারোগে বৎসরে যত জনের মৃত্যু হয় গড়ে তাহার তিন গুণ লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। অন্ততঃ পক্ষে বাৎসরিক মৃত্যুর সমসংখ্যক লোকের জন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা সর্বত্রই আছে। ভারতে প্রত্যেক ৬০,০০০ যক্ষ্মারোগীর মধ্যে মাত্র এক জন হাসপাতালে ভর্তি হইতে পারে কারণ সেখানে তাহার অধিক স্থান নাই। অথচ ৫০,০০০ অধিবাসী সম্বলিত প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে গ্রামাঞ্চলের লোকেও চিকিৎসার সুযোগ পাইবে।

যক্ষ্মা রোগে বৎসরে যত জনের মৃত্যু হয় শুধু এত জনের উপযুক্ত চিকিৎসালয় ও হাসপাতালে ততগুলি শয্যার ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে। কিন্তু শুধু একটি রোগের প্রতিকারে এত অর্থ ব্যয় করা শক্ত। বর্তমানে সেই স্থানে যক্ষ্মা চিকিৎসায় বৎসরে মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

যক্ষ্মারোগের সংক্রমণরোধের জন্ত ভোর কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) সংক্রামক রোগীদের লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন স্থানে রাখিয়া চিকিৎসার দ্বারা সংক্রামণ রোধ।

(২) রোগীদের সহিত এক গৃহে যাহারা বাস করেন নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

(৩) এবং রোগ মুক্তির পর বাসের জন্ত পৃথক বাড়ি স্থাপন।

বিষ্ণুর মৎস্য-অবতার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, একদিন রবিনন্দন মনু পিতৃ-তর্পণ করিতেছিলেন। তাহার হস্তে জলের সহিত এক শফরী পড়িয়াছিল। মনু দয়াপরবশ হইয়া শফরীকে তাহার করক (করুণা, বড়মুখ ঘটা) মধ্যে রাখিলেন। এক অহোরাত্রের মধ্যে শফরী বৃহৎ হইয়া উঠিল। মনু মৎসকে অলিঙ্গরে (জালায়), পরে কুপে, সরোবরে, গঙ্গায়, শেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্য সমুদ্রে ব্যাপিয়া উঠিল। মৎস্যের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ কলেবর দেখিয়া মনু ভীত হইলেন। মৎস্য-রূপী ভগবান কহিলেন, অচিরকালে সশৈল-কাননা মেদিনী জলমগ্ন হইবে। তুমি এক নৌকা নির্মাণ করিবে। প্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি যাবতীয় জীবকে নৌকায় রক্ষা করিবে। আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে। পরে প্রলয়-অস্তে সর্বচরাচরের প্রজাপতি হইবে। তুমি কৃত যুগের আদ্যে মনুস্তরাধিপ হইবে।

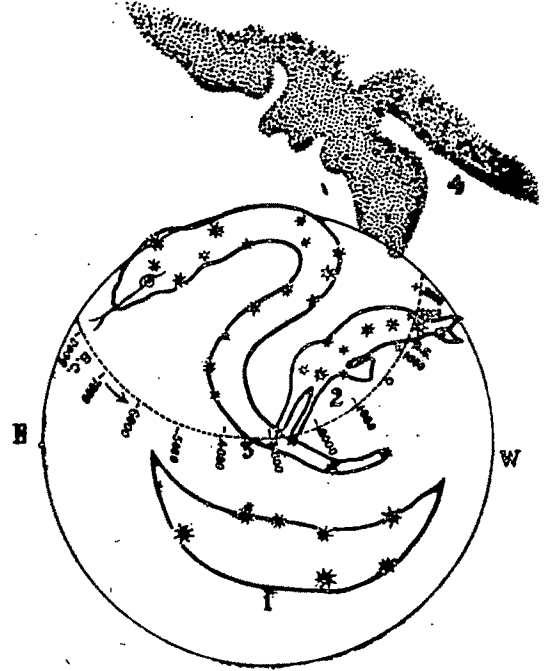
মৎস্য যেমন কহিয়াছিল, কিয়ৎকাল পরে প্রলয় উপস্থিত হইল। চরাচর ষষ্ঠ ও ভস্মীভূত হইল, প্রভূত বারিবর্ষণ দ্বারা একার্ণব হইল। মনু নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। এক ভূজঙ্গম ভাসিতেছিল। মনু ভূজঙ্গ-রজ্জুর দ্বারা সর্বভূতকে আকর্ষণপূর্বক সেই নৌকায় তুলিলেন এবং নৌকাকে মৎস্য-শৃঙ্গে বন্ধন করিলেন।

মৎস্য-পুরাণে এই উপাখ্যানের শেষ পর্যন্ত নাই, আর বাহা আছে তাহাও স্থানে স্থানে অসংবদ্ধ ও অসঙ্গত হইয়াছে। মনে হয় আদি উপাখ্যানে কেহ নূতন যোগ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে (১৮৬ অঃ) আছে, মনু নৌকা-নির্মাণ ও সমস্ত বীজ গ্রহণপূর্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগর সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। মনুকে চিন্তিত জানিয়া মৎস্য তথায় আবির্ভূত হইল। মনু মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন।

মৎস্য নৌকা টানিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর হিমালয়ের এক উন্নত শৃঙ্গের নিকটে নৌকা আশ্রিত হইল। মনু সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া কথিত আছে। ইহার পরে বৈবস্বত মনু স্বাবর জঙ্গম দেবাসুর মাল্লব প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। (মহাভারতের বর্ণনাতেও নূতন শ্লোক যোজিত হইয়াছিল। মৎস্য পুরাণ ও মহাভারত সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় তুলিয়াছেন। কিন্তু শেষে দেখিতেছি একমাত্র মনু জীবিত ছিলেন।)

শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানের মূল আছে। মাত্র একা মনু নৌকায় আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

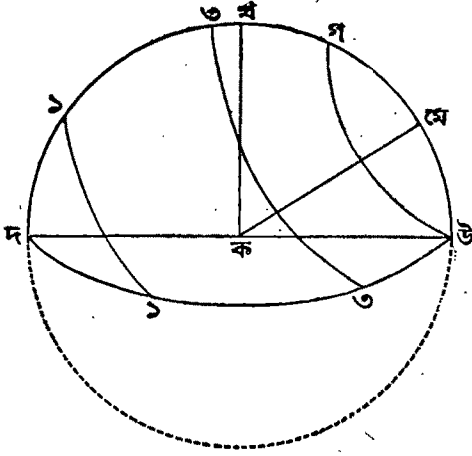


চিত্র ১। দিল্য নৌ, ২-শিশুমার, ৩-অজগর, ৪-সরস্বতী লাহোর পঞ্জাবের মধ্যস্থল মনে করিয়া খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দের পৌ-লোক প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষ্ণুময় যুগ, মেরুভ্রমণ পথ। কোন কালে মেরু আকাশে কোণায় ছিল, তাহা অন্ধার ঘেঁষিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

তিনি নৌকায় সমস্ত বীজ স্থাপন করেন নাই। উক্ত ব্রাহ্মণে “উত্তরগিরি”তে নৌ-বন্ধনের উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদেও হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে মনুর অবতরণের উল্লেখ আছে। উত্তরগিরি অর্থে পৌরাণিক হিমালয় বুঝিয়াছেন, এবং বাহা দিব্য ব্যাপার তাহাকে পার্থিব করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার কাল খ্রীষ্ট পূর্ব ষোড়শ শতাব্দী। অথর্ব বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ হইতে বিংশ শতাব্দী। অতএব অন্ততঃ সে সময় হইতে এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, একদা পঞ্জাবে বহুব্যাপী ভীষণ জল-প্রাবন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া অথবা স্মরণ করিয়া এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই দেখ, হিমালয়ের নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ, এই দেখ মনুর অবতরণ স্থান। বাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা নিশ্চয় অতীতের সাক্ষী।

একথা সত্য, সিন্ধু দেশ বারম্বার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। পুরাণে আছে, কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা জলমগ্ন হইয়াছে।



চিত্র ২। 'ক'-লাহোর, 'খ'-স্বস্তিক (শিরোবিন্দু)
'উ'-উত্তর, 'দ'-দক্ষিণ, 'মে'-মেরু,
উ-মে খ দ-যাম্যোত্তরবৃত্ত, উ মে গ-গো-লক,
১ ১-রবির দক্ষিণপথ,
৩ ৩-রবির উত্তর পথ,
দ ১ ১-অধঃস্বর্গ, পুরাণে নাম 'পাতাল'

এই পৌরাণিক কিস্মনন্তী সত্য বলিয়া মনে হয়। মোহন-জো-ডেরোর প্রাচীন অধিবাসীরা গৃহ ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু জলপ্লাবন হইতে নগর রক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাকার আবিক্ষিত পুরাকৃতি দেখিয়া প্রাজেরা বলিয়াছেন সে নগর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, নগরটি সিন্ধু নদের খাড়াইতে অবস্থিত ছিল। দুই কারণে সমুদ্রজল বৃদ্ধি পাইয়া সে দেশ ডুবাইয়া দিতে পারিত। (১) আরব সাগরে বাতাবর্ত সঞ্জাত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ খাড়ির দুই কূল ডুবাইয়া দিতে পারিত। (২) সিন্ধু দেশের দক্ষিণে সমুদ্রে বাড়বানল আছে। পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাও সত্য। অল্প দিন হইল দুইটি তন দ্বীপ উখিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সিন্ধু নদের মুখ, আর কোথায় বা হিমালয়ের শৃঙ্গ! সমুদ্রতরঙ্গ কদাপি সিন্ধু দেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবে উঠিতে পারিত না। পঞ্জাবের উত্তরাংশ এখন যত উচ্চ পূর্বকালে তদপেক্ষা বহু উচ্চ ছিল। অবিরল বারিবর্ষণ হইলেও জল দাঁড়াইতে পারিত না। এইরূপ ভূসংস্থান চিন্তা না করিয়া বিজ্ঞজনও উদ্ভ্রান্ত হইয়াছেন। কোনও উপাখ্যানের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার তত্ত্বাসন্ধান সমীচীন নয়। উপাখ্যানের সে মংস্ত্র কোথায়? মনু একা রক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবকুল কোথা হইতে জন্মিল?

ঋগ্বেদে এই মংস্ত্রের নাম শিশুমার, সংস্কৃত

শিশুমার, বাংলায় শিশুক। শিশুক গঙ্গায়, ব্রহ্মপুত্রে ও সিন্ধুনদে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের শিশুমার এই সব নদীর শিশুমার নয়। ঋগ্বেদের শিশুমার আকাশ-সমুদ্রের শিশুমার-রূপী নক্ষত্র, প্রতি রাত্রে উত্তরাকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুমারের পুচ্ছে যে তারা আছে, বর্তমানকালে তাহার দৈনিক আবর্তন নাই। সে তারা ধ্রুব (নিশ্চল), কিন্তু এই তারা চিরদিন ধ্রুব ছিল না। ভূ-গোল স্বীয় অক্ষে আবর্তিত হইতেছে। সেই হেতু দিবা-রাত্রি ঘটিতেছে। ভূ-পৃষ্ঠকে যেখানে ভূ-অক্ষ ভেদ করিয়াছে সে স্থানের নাম মেরু। উত্তর দিকের মেরুর নাম স্বমেরু। অক্ষকে বর্ধিত করিলে আকাশের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহার নামও মেরু। পৃথিবীর অক্ষের এই আকাশস্পর্শী মেরু চিরদিন একই তারার নিকট থাকে না। ইহা যত্ন গতিতে আকাশে পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে (চিত্র ১)। একবার পরিভ্রমণ করিতে ২৬২৭ হাজার বৎসর লাগে। মেরু যখন যে তারার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে তারা ধ্রুব হয়। মেরুর বৃত্তপথে কিংবা সন্নিকটে অতি অল্প তারাই আছে। বর্তমান কালে একটি পাইতেছি। আর খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে ঋগ্বেদের আর্ঘ্যগণ একটি পাইয়াছিলেন। সে তারা শিশুমারের তুণাগ্রে অবস্থিত। (চিত্র ১)।

মংস্ত্রাবতার বৃত্তিতে হইলে উত্তরাকাশের কয়েকটি নক্ষত্র চিনিতে হইবে। সেখানে সাতটি তারায় সপ্তর্ষি নামে একটি নক্ষত্র আছে। সর্ব পূর্ব দিকের তারার নাম মরীচি, তাহার পরের তারা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে, নাম অরুন্ধতী। সপ্তর্ষির সর্ব পশ্চিমের দুই তারার নাম ক্রতু ও পুলহ। উত্তর দিকের তারার নাম ক্রতু। দক্ষিণ দিকের পুলহ। ক্রতু ও পুলহ এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া উত্তর দিকে বাড়াইলে বর্তমান ধ্রুব তারা স্পর্শ করে। পূর্ব দিকস্থ মরীচি তারা হইতে উত্তর দিকে বর্তমান ধ্রুব পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখা প্রাচীন ধ্রুব তারার নিকট দিয়া যাইবে। এই প্রাচীন ধ্রুব তারা বশিষ্ঠ তারার নিকটবর্তী। উভয়ের অন্তর মাত্র ১১° ২৩' ১০"। প্রাচীন ধ্রুবের নিকটেও একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। বড় তারটি বৈবস্বত মনুর অধিষ্ঠান। এই তারাকে মনু বলিতে পারি। ক্ষুদ্রটি ইলা, মনুর দুহিতা। ইংরেজী তারাপটে মনুতারার নাম Alpha Draconis। প্রাচীন মিশরবাসী এই তারাকে 'খুবন' বলিত। মনু-তারা ও বর্তমান ধ্রুব তারার মধ্যে শিশুমার অবস্থিত। মনু-তারার উত্তরদিকে প্রথমেই দুইটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুই তারার বড়টির ঋগ্বেদোক্ত নাম যম, ছোটটির নাম যমী। যমের অপর পার্শ্বেও একটি ছোট

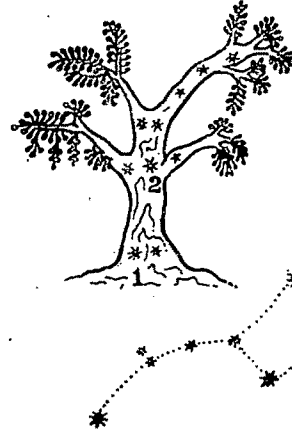
তার আছ। পুরাণে নানা নাম আছে। যেমন নারায়ণ ও নর, নারায়ণ ও লক্ষ্মী। একই তারা কিংবা নক্ষত্র সকল উপাখ্যানে একই নাম পায় নাই। শিশুমারে দশটি তারা সহজে গণিতে পারা যায়। ইহার শিশুমাররূপী ধর্মের পত্নী।

৮ই ফেব্রুয়ারি ভোর ৫টার সময় মল্ল তারা ও মরীচি তারা যামোন্তর বৃত্তে (meridian) দেখা যাইবে। তদন্তর প্রতি মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে ৮ই জুলাই রাত্রি ৭টায় দেখা যাইবে।- সেদিন ৬ ঘণ্টা পরে রাত্রি ১টায় পশ্চিম দিকে দেখা যাইবে। এই সঙ্কেত ধরিয়া অত্রাত্ত মাসে কখন কোন্ দিকে দেখা যাইবে তাহা অক্লেশে নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। বঙ্গদেশ হইতে সপ্তমিকে বার মাস দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ২৫° অক্ষাংশের (Latitude) উনস্থান হইতে মল্লতারাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

জল-প্লাবনের উপাখ্যান বৃষ্টিতে হইলে স্বরণ রাখিতে হইবে, ঋগ্বেদের ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্য দেখিতেন। ইহা অশ্বিনয়ের নৌ। অত্ৰ এক স্থানে ইহা অশ্বিনয়ের শকট। পুরাণে সপ্তর্ষি শকট শিবিকা, (দোলা, ডুলি), তাম্বুড় (কুকুট), ও শিখণ্ডী (ময়ূর)। ঋগ্বেদের কাল হইতে প্রাচীনরা মনে করিতেন, মেরু বা সূর্যের সর্বোচ্চ। ঋগ্বেদে সে স্থান তৃতীয় স্বর্গে। তৃতীয় স্বর্গের বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে জল-প্লাবন লিখিতেছি।—মংস্ত্র যে বৎসর নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, মল্ল সেই বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়া এবং প্রবাহ উথিত হইলে, তাহা আশ্রয় করিয়া ছিলেন। মংস্ত্র তাহার নিকটে ভাসিতে লাগিল। তিনি তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন এবং তাহার দ্বারা উত্তরগিরির উপরে গমন করিলেন। মংস্ত্র বলিল, আপনি বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করুন। জল যত নীচে নামিয়া যাইবে, আপনিও তত নীচে নামিবেন। তিনি তত নামিয়া ছিলেন, সেই জন্ত উত্তরগিরির নাম মল্লর অবতরণ। প্রবাহ সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মল্ল অবশিষ্ট ছিলেন।

এখানে সপ্তর্ষি নৌকা, উত্তরগিরি আকাশের সর্বোচ্চ স্থান। যে বৃক্ষে নৌকা-বন্ধন হইয়াছিল, শিশুমার সেই বৃক্ষ (পরে পশু)। শিশুমারের বৃকের পাখনা তাহার শৃঙ্গ। মংস্ত্র পুরাণ লিখিয়াছেন, নৌকার নিকটে এক ভূজঙ্গম ভাসিতেছিল। মল্ল তাহাকে নৌ-বন্ধনের রজ্জু করিয়া ছিলেন। ইহাও ঠিক। মল্ল তারা অজগররূপ নহবের পুচ্ছে অবস্থিত। রাজা যযাতির পিতা নহষ। অগস্ত্য ঋষির শাপে অজগর হইয়া আকাশে দীপ্যমান আছেন (চিত্র পশু)।

শিশুমার বিষ্ণুর অবতার। ঋগ্বেদে আছে, (১০।৮২।২) বিশ্বকর্মী যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি



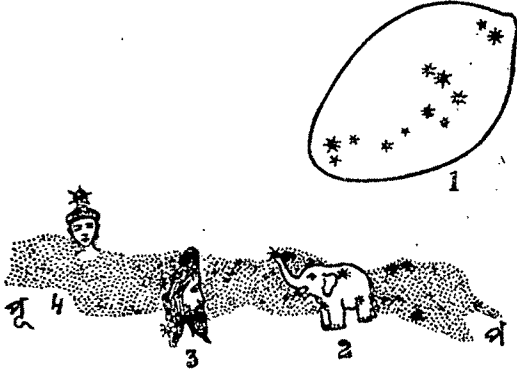
চিত্র ৩। উর্ধ্বমূল অবস্থা। ১-মল্লতারা সর্বোচ্চ। ২-যম।

নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্ত ঋষির পরবর্তী যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্গণ এইরূপ কহেন। যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অত্ৰ তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা-যুক্ত হয়। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা বৃষ্টিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বৃষ্টির ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ কল্পনা করিতেন। অধঃ মধ্য উর্ধ্ব (৪।৫৩.৫)। উর্ধ্ব স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ, ইহার বিশেষণ 'উত্তম' 'পরম' (৩।৩০)। সে স্থানই উৎ-তম, উর্ধ্বতম। যে স্থান উর্ধ্বতম, বিষ্ণুর 'পরম' পদ, পরম স্থান। এই কথাই পুরাণ লিখিয়াছেন। সেইখানেই বিষ্ণুর পরম পদ, শ্রীগণ ধ্যান যোগে দেখিতে পান। সপ্তর্ষির অপর পারে কি আছে? আমরা দেখিতেছি, শিশুমার। সেখানে শিশুমার-রূপী ভগবান আছেন। শিশুমার বটপত্র সদৃশ। মহার্ঘবের সলিলে নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। পুরাণে আছে, নার—জল, নার অয়ন আশ্রয় যার তিনি নারায়ণ। অত্ৰ ব্যুৎপত্তি নবের অয়ন গতি যিনি; শিশুমার নাগের ফণা সদৃশও বটে, সে নাগ অনন্ত। নারায়ণ অনন্ত-শয়নে থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, ঋষিদিগের উর্ধ্ব উত্তর দিকে যেখানে ঋব অবস্থিত, তাহাই বিষ্ণুর ভাস্বর তৃতীয় পদ (২।৮।৯৩)। পুনশ্চ, দিব্য লোকে ভগবান হরির শিশুমারাকৃতি তারাময় রূপ আছে। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ঋব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া শিশুমারের

পুচ্ছে অবস্থিত আছে (২১১,৪) সেই শিশুমারের উত্তর হ্রু উত্তানপাদ অধঃ হ্রু যজ্ঞ, মন্তক ধর্ম, হৃদয় নারায়ণ (২১২।৩১)।*



চিত্র ৪। ১-শ্বেতদ্বীপ, ২-স্বর্গদ্বার ঐরাবত, (cassiopeia) ৩-নারদ, (perseus) ৪-কপা, (capella)

ঋগ্বেদে শিশুমার একবৃক্ষ রূপে কল্পিত হইয়াছে। সে বৃক্ষের উপরে বসিয়া যমদেব অত্র দেবতাদিগের সহিত পান করেন (১০।১৩৫।১) অথর্ববেদে সে বৃক্ষ অশ্বখ। সেখানে যমের সহোদরা ভগিনী যমীও আছেন। ঋগ্বেদের যম-যমী সংবাদে (১০।১০) যমী যমকে বলিতেছেন, “বিস্তীর্ণ সমুদ্র-মধ্যবর্তী এই দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমি আমার সহচর।” তৃতীয় স্বর্গে দেবগণের আশ্রয়। সেখানে পুণ্যাত্মা পিতৃগণও বাস করেন। সেখানে সর্বদা আলোক আছে। বিস্তীর্ণ নদী [সরস্বতী] আছে। নাগ লোক

[অঙ্গর] আছে, বৈবস্বত রাজা (যম) আছেন। তথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারা যায় এবং সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় (২।১১)।*

এই অশ্বখ বৃক্ষই কি ভগবদগীতার অশ্বখ? ভগবদগীতায় “উর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখমশ্বখং প্রাহরব্যায়ম ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ (১৫।১) ভগবান বলিতেছেন, যে অশ্বখের মূল উর্দ্ধদিকে, যাহার শাখা অধোদিকে, যাহার পত্র বেদশ্লোক, সে অশ্বখ অব্যয়। ইহা যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। টীকাকারে এই শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বখটি যে বেদোক্ত অশ্বখ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ যিনি সেই অব্যয় অশ্বখকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

অশ্বখের মূল মনুতারা উর্দ্ধদিকে, শাখা অধোদিকে। শাখা প্রতিদিন মূলকে প্রদক্ষিণ করে। এই অভূত অশ্বখের কল্পনা মর্ত্যের অশ্বখ হইতে আসিতে পারে না।

পুরাণেও ঋমেক অতিশয় উচ্চ। ঋমেকের শিখরের চতুর্পার্শ্বে দেবগণের আশ্রয়। সেখানে সর্বদা আলোক। বেদোক্ত তৃতীয় স্বর্গই গো-লোক, সর্বদা আলোকময় স্থান। তৃতীয় স্বর্গের নক্ষত্রের উদয়াস্ত নাই।

পুরাণে এই শিশুমারের নাম শ্বেতদ্বীপ। একদা দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের আদি মূর্তি সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহাভারতের শাস্তি পর্বে (অঃ ৩৩৬) এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে। যথা, পূর্বে ঋমেক পর্বতে সপ্ত মহর্ষি অবস্থান করিতেন। তাহারা লোকের হিতকর বিষয় সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া, বেদ-সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। পূর্বকালে উপরিচয় নামে হরিভক্তিপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তিনি সূর্যমুখ-নিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা ও রাজ্য পালন করিতেন। ব্রহ্মার পুত্র হরিভক্তিপরায়ণ নারদ, সেই শাস্ত্র জানিতেন। একদিন তিনি গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মের পুত্র নরনারায়ণকে তপস্বী করিতে দেখিলেন। তিনি আশ্চর্য্যবিত হইলেন, নরনারায়ণ ঈশ্বরের দুই রূপ, তাহারা কাহার উপাসনা করিতেছেন? শুনিলেন, তাহারা তাহাদের পিতার উপাসনা করিতেছেন। শ্বেতদ্বীপে তাহা-

* বিষ্ণুপুরাণ প্রবন্ধে শিশুমারের পুচ্ছে বসাইয়াছেন। একবার নয়, দুই স্থানে দুই বার। পুচ্ছেস্থিত তারা বর্তমান কালের প্রব বটে, পূর্ব কালের নয়। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে এই তারা সের হইতে ১১° অংশ, পঞ্চম শতাব্দে ৮° অংশ দূরে ছিল। অতএব ইহা ভ্রমণ করিত। পুরাণ-কারও লিখিয়াছেন, প্রব নিজে ভ্রমণ করে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র বাতরজ্জ্বর দ্বারা প্রবে অবস্থ হইয়া ভ্রমণ করে। গ্রহগণের আশ্রয় স্থানকে নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। সূর্যই একমাত্র জগতের আধার। সেই সূর্যের আশ্রয় স্থান প্রবে ভগবান আছেন। কিন্তু এই উক্তির সহিত অস্ত্র উক্তির বিরোধ হইতেছে। (১) পুরাণ পূর্বে বলিয়াছেন, সপ্তর্ষির উত্তরে উর্দ্ধে প্রব অবস্থিত। (২) প্রব উপাখ্যানে উত্তানপাদ রাজার পুত্র প্রব বিষ্ণুর আরাধনা করিবার পূর্বে সপ্তর্ষিকে দেখিয়াছিলেন। প্রবের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহাকে সপ্তর্ষিদিগের উপরি ভাগে প্রব স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য উপনা এই লোক বলিয়াছেন, সপ্তর্ষি প্রবকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। প্রবের মাতা ও তারকা হইয়া নিকটে অবস্থান করিতেছেন (১।১২)।

পুরাণে আরও এক অসঙ্গতি দেখিতেছি। লিখিত আছে, শিশুমারের পুচ্ছেস্থিত প্রবসহ চারটি তারার উল্লেখ নাই। বিষ্ণুপুরাণ উত্তর ভারতে, বোধ হয় মথুরা অঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। সেখানে সমুদ্রার শিশুমারের উদয়াস্ত হইত না। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে সের হইতে মনুতারা ১০° অংশ ও পঞ্চম শতাব্দে ১১° অংশ দূরে ছিল। অতএব মথুরা হইতে দেখিলে সমগ্র শিশুমার প্রত্যেক রাতে দৃষ্টিগোচর হইত।

* উপরে লিখিয়াছি, ঋগ্বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ করিতেন। অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধ। কিন্তু সীমা বলেন নাই। দ্বিতীয় স্বর্গে, অর্থাৎ মধ্য স্বর্গে সর্বিভা বিচরণ করেন। উর্দ্ধ স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ। (চিত্র ২)। বোধ হয় অধঃ স্বর্গে রবির দক্ষিণ পথের দক্ষিণ ভাগে। লোহোরের অক্ষাংশ ৩২°। ইহাকে পঞ্জাবের মধ্য স্থল ধরিলে, উত্তর দিক্ চক্র হইতে উর্দ্ধদিকে ৩২° + ৩২° = ৬৪° পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গ মনে হয়। অধঃ স্বর্গ দক্ষিণ বিকৃচক্র উর্দ্ধদিকে ৩৪° অংশ থাকে। তদনুসারে চিত্র ২ লিখিত হইয়াছে। এই রূপে মধ্য স্বর্গ ১৮° - ২৮° = ১০° অংশ পাওয়া যায়।

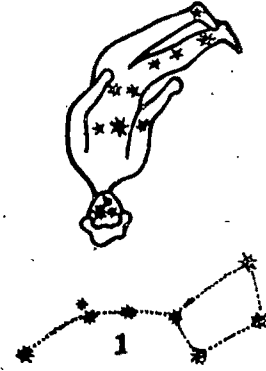
দের উপাস্য আদিনারায়ণের আশ্রয় আছে। নারদ স্বমেরু পর্বতের শিখর হইতে বায়ুকোণে দেখিলেন, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর দিকে খেতদ্বীপ রহিয়াছে। দ্বীপবাসীরা অভূত। তাহাদের প্রাকৃতিক স্থল দেহ নাই। শব্দাদি গ্রহণের ইন্দ্রিয় নাই। তাহারা নিশ্চেষ্ট, অগন্ধযুক্ত, চক্ষুর জ্বালা দীপ্তিমান। তাহাদের দেহ বজ্রাস্থির জ্বালা স্পষ্ট। মস্তক ছত্রাকার। তাহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত বাইটটি, দীর্ঘ দন্ত আটটি। তাহারা সেখানে ভগবান নারায়ণের অর্চনা করিতেছেন। দেবস নারদ একাগ্রচিত্তে সেই নিঃশব্দ বিশ্বময় নারায়ণের শব্দ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাঁর দিব্য চক্ষু হইল। কোন কোন পণ্ডিত স্বর্গলোকের খেত-দ্বীপকে মর্ত্য আনিয়াছেন। সত্য বটে, স্বমেরু দুইটি, ক্ষীরোদ সাগরও দুইটি, একটি স্বর্গে, একটি মর্ত্যে। মর্ত্যের স্বমেরু পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরে, মর্ত্যের ক্ষীরোদ সাগর আরল হ্রদ, তাহাতে অক্সাস নদী পড়িয়াছে। এই নদীর অপর নাম 'বীর দরিয়া,' ক্ষীর সাগর। হিমালয়ের পশ্চিম ভাগ হইতে এই ক্ষীরোদ সাগর বায়ু কোণেই বটে। আকাশের ছায়া-পথ ক্ষীরোদ সাগর। এই ক্ষীরোদ সাগর কুম্ অবতারে মণ্ডিত হইয়াছিল। জ্যোতিষে ব্রহ্মহর্য নামে এক উজ্জল তারা আছে। ইহার পূর্বতন নাম ব্রহ্মা। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা তারা হইতে অদূরে নারদ নক্ষত্র থাকা সম্ভব। সেখান হইতে শিশুমার বায়ু কোণে অবস্থিত বটে (চিত্র ৪)। নরনারায়ণ, ধর্মের পুত্র। শিশুমারই ধর্ম। মর্ত্যের শিশুমারের দেহ দেখিয়া খেতদ্বীপ-বাসীর দেহ কল্লিত হইয়াছে। শিশুমারের দেহ মস্তক, উজ্জল, স্পন্দনহীন। আশ্চর্যের বিষয় শিশুকের মুখের নীচের পাটিতে ৬০টি ছোট ছোট দাঁত আছে।*

ঋগ্বেদে জলপ্রাবণ ও তদনন্তর সৃষ্টি অগ্ন আকারে উক্ত হইয়াছে। সেখানে শিশুমার উত্তানপদ নাম পাইয়াছে। যথা—(২০।৭২।৩)। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ হইতে দিক সকল জন্মগ্রহণ করিল।

উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক-সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন।

হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন। ইহারা কল্যাণ-মূর্তি

ও অবিনাশী, দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।



চিত্র ৫। উত্তানপদ। ১-মহতারা।

আমি এই উক্তির অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বতন কালে এই বিশ্ব সলিলময় ছিল। প্রথমে উত্তানপদ জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ (বা উত্তানপাদ) যাহার পদদ্বয় উত্তান, বিস্তৃত (চিত্র ৫) ইহার মস্তকে মহতারা, পদে বর্তমান ধ্রুবতারা। ধ্রুব উপাখ্যানের ধ্রুব এই উত্তানপাদের পুত্র। উত্তানপদ হইতে দিকসকল জন্মিল। শিশুমার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই হেতু উত্তানপদ দেখিলে সকল দিক জানিতে পারা যায়। কতকাল পূর্বের কথা? যে কালে অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন। দক্ষ কাল-পুরুষ নক্ষত্র বা যুগ নক্ষত্র। অদিতি যুগ নক্ষত্রের পূর্ব দিকের ষট্‌তারা-সমন্বিত পুনর্বহু নক্ষত্র (চিত্র ৬)। প্রথমে পশ্চিমস্থ দক্ষের উদয় হয়। পরে পূর্বস্থিত অদিতির। এই পূর্বাপর জন্মহেতু দক্ষ পিতা, অদিতি কন্যা। কিন্তু দক্ষ সপ্ত আদিত্যের মধ্যে এক আদিত্য। অদিতি সকল আদিত্যের মাতা। এই হেতু অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন। এককালে অদিতি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ছয় ঋতু ও ঋতুর কর্তা আদিত্য কল্লিত হইয়াছিল। প্রথমে আদিত্যগণ, পরে অগ্ন দেবতা জন্মিয়াছিলেন। আদিত্যগণই প্রধান দেবতা। সূর্য আদিত্যের আধার। দেখা বাইতেছে, অতি প্রাচীন কালের কথা স্মৃত হইয়াছে। সেকাল ৮০০০ বৎসরের কম হইবে না। সে সময় কিন্তু মহতারা ধ্রুব হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত মহতারা ধ্রুব হইয়াছিল। বাস্তবিক খ্রী-পূ ২৮০০ অব্দে মহতারা নিকটে মেরু আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে ও পরে পাঁচ ছয় শত বৎসর নিকটে ছিল, ভ্রমণ বুঝিতে

* মহাত্মনতে "নারদ পঞ্চরাত্র"র এই ইতিহাস দেওয়া আছে। আনি নারদ পঞ্চরাত্র দেখি নাই। শুনিয়াছি ইহা একটি তন্ত্রশাস্ত্র। উপরিচর কয় চৈদি দেশের রাজা ছিলেন। তিনি ভারত বৃক্ষের পূর্বে ছিলেন। ইতিহাসটি পুরাতন হইতে পারে কিন্তু উপাখ্যান পুরাতন নয়। ইহাতে কবি এক অবতার।

পারা যাইত না। ইনি বৈবস্বত মনু। ইহার নামে বৈবস্বত মনুর নামে কাল গণনা প্রচলিত ছিল। এই কালের মধ্যে বৈবস্বত মনুর অধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। এই মনুস্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দে বৈবস্বত মনুস্তর আরম্ভ হইয়াছিল।

আর্য পিতামহগণ নক্ষত্র দেখিতেন কি? যদি দেখিতেন, কি দেখিতেন, কি ভাবিতেন? বরাহ মংশ কুম্ব বানম, বিষ্ণুর এই চারি দিব্য অবতার আলোচনায় তাহার কিকি উত্তর পাইয়াছি। দেখা গিয়াছে, বৈদিক গ্রন্থে এই চারি অবতার কল্পনার মূল আছে। পুরাণে দেব ঋষি মনুষ্য, এই তিন অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। দেব সম্বন্ধে উপাখ্যান বেদ-সম্মত। পৌরাণিক নিজের কল্পনা-বলে লিখেন নাই। আরও দেখা গিয়াছে, পুরাণ দ্বারা বেদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের অর্থ পাওয়া যায়।

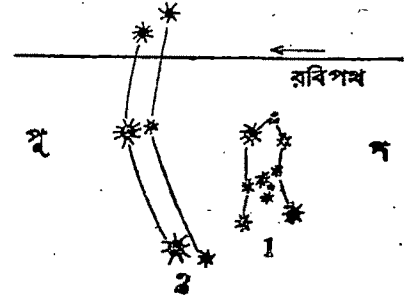
উক্ত চারি অবতারের যে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা সহজ সরল ও প্রাচীন কালের স্বল্প জ্যোতিষিক জ্ঞানের অনুযায়ী। আকাশে নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিলে, পিতামহগণের চিন্তা-গতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। পুরাণে কিছু আছে, নচেৎ তাহাও শুনিতে পাইতাম না।

অবতার-গ্রন্থে বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় করা গিয়াছে। সূর্য চক্র নক্ষত্র কাল-প্রবোধক যন্ত্র। যেখানে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কালও জানিতে পারা যায়। যন্ত্র দেখিয়া কাল পাইতে কিছু মাত্র কষ্ট নাই।

পশ্চিম দেশীয় বেদ-পাঠাঙ্গিরের বিদ্যার, পরিভ্রমের, অধ্যবসায়ের, সমাহরণ-নৈপুণ্যের তুলনা নাই। কিন্তু আমরা যাইাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করি, তাইারা এই যন্ত্রকে অবহেলা করিয়াছেন, অব্বেষণ করেন নাই। কেহ দেখাইয়া দিলে দেখিতে পান না, দেখিতে পাইলেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাইারা যে কাল শুনাইতেছেন, সেটা যে তাইাদের কল্পনা মাত্র, তাহাও বুঝিতে পারেন না। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত ঋবতারা ধরিয়া একটা উদাহরণ দিতেছি।

বহুকাল পূর্বে জার্মান প্রোফেসর যাকোবি লিখিয়াছিলেন, বৈদিক বিবাহে ঋব-দর্শন বিহিত ছিল। অতএব বৈদিক কালে ঋব তারা জানা ছিল। পূর্বকালে মাত্র একটা তারা ঋব হইতে পারিত। সে তারা খ্রী-পূ ৩০০০ অব্দে ঋব হইয়াছিল। অতএব ইহাকে বেদের কাল বলিতে হইবে।

আমেরিকার প্রোফেসর হুইটনি জ্যোতির্বেত্তা ও বেদ-পাঠক ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয়ের প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, একটা আচার ('folk-lore') প্রমাণ হইতে পারে না। প্রোফেসর ম্যাকডোনেল



চিত্র ৬। ১-রবি, ২-অধিতি।

নির্বাচক রহিলেন। প্রোফেসর কীথ মেরু ভ্রমণ পথের বহুদূরবর্তী একটা তারার নাম করিয়া তর্কটি চাপা দিলেন। প্রোফেসর উইন্টারনীংস তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রোফেসরকে একটা তারা নির্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। আর বোধ হয় বলিয়া দিলেন খ্রী-পূ দশম কি একাদশ শতাব্দে ঋব হইতে পারিত, এমন তারা খুঁজিয়া বাহির করুন। ইনি দুইটি তারার নাম করিলেন, কিন্তু এত যন্ত্র, চর্মচক্ষুর প্রায় অপোচর।

আমরা জানি, অত্য়পি ব্রাহ্মণের বিবাহে বহুকে বর ঋব দর্শন করাইয়া বলেন, তুমি পতিগৃহে ঋব হইয়া থাক। আমরা জানি, উত্তরাকাশে ঋব আছে, এই বিশ্বাসে এই বিধি চলিয়া আসিতেছে। যাইারা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না, তাইারা অক্ষর্য্য-দর্শনও বিহিত করিয়াছেন। যদি বিবাহে ঋব-দর্শন বিধি না থাকিত, এই প্রবন্ধের বিষয়সমূহ বুঝিবার নিমিত্ত ঋব-দর্শন আবশ্যক হইত। পশ্চিম দেশীয় বিদ্বানেরা সে দিক দেখেন নাই।*

* এই প্রবন্ধের চিত্র-লেখক শ্রীধরগীকুমার ষ্টাচার্ণ এক ইকুলের ছাত্র। অনেক ইকুলে চিত্র-লিখন শিখাইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনাদৃত। শত ছাত্রের মধ্যে মাত্র দুই তিন জন কিছু কিছু শিখে। ভগবদ্গুরু অক্ষর ব্যতীত চিত্র লিখিতে পারা যায় না। আমি এখানে চিত্রকর পাই নাই। যদি বা দুই এক জন আছেন, কেহ অবসর পাইলেন না, কেহ চিত্র না দেখিয়া লিখিতে পারেন না। বহু অবসরণের পর প্রথমে হৃকান্ত বহুকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে চিত্র সমান্ত করিবার অবসর পাইল না, কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন তাহার সহপাঠী ধরগীকুমারকে পাইয়াছি। তাহাকে না পাইলে অবতার প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারিত না। দুই জনই শান্ত, বিনীত, খরবুজি, এখন তারাণ্টে তারা দেখাইয়া আকৃতি খুঁজিতে বলিলে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পার। দুঃখ হইতেছে তাহাদের আত্ম শিক্ষা বাড়িবার সুযোগ হইবে না।

নব-সন্ধ্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৪)

মনটা এই যে একটা নতুন বাক্সা বাইল, আবার শুছাইয়া লইতে সময় লাগিল চম্পার। যে চায় না, যাহার কাছে অনাদর তাহার কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতেই চাহিল সে—কতকটা অভিমানে, কতকটা আক্রোশেও; আদর ত তাহার চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, তবে এ অকিঞ্চনযুক্তি কেন? অনেকক্ষণ এই কথাটাই রহিল মনে স্পষ্ট হইয়া, তাহার পর কখন যে বীরে বীরে মিলাইয়া গেল টেরও পাইল না। একটা উদ্বিগ্নেই মনটা রহিল ভরিয়া—টুলু আজ নিতান্তই বিপন্ন, বিপদটা যে-কোন আকারেই আজ রাতে উপস্থিত হইতে পারে, অথচ লোকালয় থেকে অন্তর্ভুক্ত দূরে সে প্রায় একাই। সবচেয়ে ভাবনার কথা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় টুলু—চম্পা অত করিয়া পারিলও না সচেতন করিতে; এখন একমাত্র উপায় ওর বিপদকে যদি কেহ আপন বিপদ করিয়া লয়। কে লইবে আপন করিয়া?

অতিমান, আক্রোশ সব গেল উবিয়া, এই প্রহরটির চারিদিকে মনটা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। কখন যে টুলুর বিপদ চম্পার আপন বিপদ হইয়া গেছে বুঝিতেও পারিল না, শুধু সকালের চেয়ে আরও একটা ভীতের উৎকণ্ঠায় মনটা অস্থির হইয়া উঠিল,—কি করা যায়? কি করিয়া বাঁচানো যায় টুলুকে এই নিদারুণ সম্বন্ধে? সে ত স্ত্রীলোক, অসহায়, কি করিবে?

লোকের দরকার; বেশ অল্প সবল পুরুষ মানুষের। কিন্তু ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে?—বিকাল হইয়া গেছে, আর সময়ই বা কুপাধায়? অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই টুলুর পাশে লোক থাকে দরকার; কে যাইবে, কাহাকে রাজী করা যায়?

মনের অস্থিরতায় চম্পা কয়েক বার ভিতর-বাহির করিল, তাহার পর তাহার মনে পড়িল চরণদাসের কথা। একটা অবলম্বন পাইয়া মনটা কতকটা যেন স্থির হইল—কেন যে চরণদাসের কথা গোড়াতেই মনে পড়ে নাই...কিন্তু চরণদাসকেই বা কি বলিয়া লইয়া যাওয়া যায়?

ঘরের চৌকাঠের ওপর চুপ করিয়া বসিয়া চম্পা ভাবিতে লাগিল, তাহার পর এক সময় হঠাৎ তাহার টুলুর কথা মনে পড়িয়া গেল—বালিয়াড়ির পথে চম্পাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে—“হ্যাঁ—ইয়ে—বনমালী—জুলের চাকর—তোমার ঠাকুরদাদা নয়?—তার ভয়ানক অসুখ—স্বল থেকেই আসছি আমি...”

—যতি, ভক্তি,—সবস্বল্প প্রত্যেকটি কথা অন্ধরে অন্ধরে

মনে আছে চম্পার, যেমন তাহার অন্ত সব কথাও আছে মনে রাখিয়া। একই মিথ্যা—এক জনের মুখে যদি দোষের না হয় ত অন্ত জনের মুখেই বা হইবে কেন? চম্পা ঐ মিথ্যাকেই বুনিয়া দিয়া তাহার ইতিকর্তব্যের একটি পরিপূর্ণ রূপ গঠন করিয়া লইল।

সন্ধ্যার একটু আগে বনিতে নামিয়া সে চরণদাসের স্নড়ঙ্গের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল—“একবার বাইরে আসবিক নাই?”

গাঁইতা রাখিয়া চরণদাস স্নড়ঙ্গের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কপালের ঘাম আঙুল দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—“ভুকে আজ সমস্ত দিন দেখি নাই ক্যানে গো? কাজে আসিস নাই, আমার ভাত আনিস নাই; আমি বাজার বেঁয়ে মুড়ি আনায়। ধোলাম বটে।”

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—“বাপের অসুখ, তুর কাজের বটা পড়ে গেঁইছে বটে, একজনকে রইতে ত হবেক উখানে?...”

“বুড়ার অসুখ। কই জানতে ত পারি নাই।”

“তু গাঁইতো চালা ক্যানে, জানতে পারবিক। সমস্ত দিনটি আমার নড়ে বৈসবিক দিলেক নাই, বিকালে একটু ঘুমোলেক, তুরে খবর দিতে আইছি তাড়াতাড়ি।”

চরণদাস গাঁইতা রাখিয়া সদ্যসদ্যই বাহির হইয়া আসিতেছিল, চম্পা বারণ করিল, কেননা তাহার একটু সময় দরকার, চরণ সঙ্গে গেলে তাহার উদ্বেগ সিদ্ধি হইবে না। বলিল—এর পর বেশিরকম ছুটি লইবার দরকার হইতে পারে, আপাতত সে যেন নিজের ডিউটিটুকু সারিয়াই আসে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, চম্পা আগাইয়া যাইতেছে। স্নড়ঙ্গের মুখের কাছটিতে চরণদাসের সুরার বোতলটি রাখা থাকে, ডিউটির মধ্যে অর্ধেকের কিছু উপরটা শেষ করে, তাহার পর বাসার পথে সেটাকে দোকান থেকে পূর্ণ করিয়া লয়—রাতের খোরাক, দোকানে যেটুকু খাইয়া লয় সে ত আলাদা।... চম্পা বোতলটি তুলিয়া লইল, একটু কড়া চোখেই বাপের দিকে চাহিয়া বলিল—“আমি ইট সঙ্গে নিলাম বটে, তু আজ দোকানেও খাবিক নি; বুড়া মরছে,...রাত্তি ডাক্তারবদি ডাকতে সে ত আমি যাবেক নাই?”

মেয়ের দৃষ্টির সামনে চরণ স্পষ্টই একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল যেন, আমতা আমতা করিয়া বলিল—“তু যাবিক ক্যানে গো?...তা নিয়া যা ক্যানে বোতলটা, দোকানে যাবেক নাই...উতে একটু আছে বটে, যেন নষ্টটি করিস নাই, দুকাল

যাবেক নাই, তু নষ্ট করিস নাই—লক্ষী বিটিট আমার...চম্পা বিটিট...”

বস্তিতে আসিয়া একেবারে ছিয়াত্তর নম্বরে গিয়া উপস্থিত হইল। মিতিন কাজে বাহির হয় না, শিশুটি বড়ই ছোট; অবশ্য ওর চেয়েও ছোট শিশু লইয়া বস্তিতে অনেককে গতর খাটাইতে হয়, কিন্তু মিতিনের স্বামী প্রহ্লাদ লোকটা ভাল,—নেশাটেশার দিকে খুব কম, আর স্ত্রীর খুব অল্পগত, ফলে উপার্জন যা করে তার প্রায় সবটুকুই ঘরে ওঠে, এই রকম সব অসময়ের জন্ত কিছু সঞ্চয়ও হয়।

চম্পা মিতিনের নিকট হইতে একটা রাতের জন্ত প্রহ্লাদকে চাহিয়া লইল,—ঠাকুরদাদার বড় অল্পখ, বাপকে লইয়া যাইতেছে, তবে একেবারে নির্জন জায়গা, গল্প ধেকে অতটা দূর, অন্তত ছুঁজন পুরুষও না থাকিলে ভরসা হয় না, ঘরো রাত তিন পছরে হঠাৎ ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিতে হইল, চরণ-দাসকে বাহিরে যাইতে হইল, একা স্ত্রীলোক রোগীর শিয়রে বসিয়া কি করিয়া কাটাইবে চম্পা?

—একটা পুরুষ বাড়ির মধ্যে কোথাও যদি পড়িয়াও থাকে, একটা ভরসা থাকে মনে।

পোছালো মেয়ে সবদিকেই পোছালো হয়, সব দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলে,—মিতিন চম্পার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সবটুকু শুনিল, সোজা ‘না’ বলিল না, তবে মাষ্টারমশাইয়ের কথা তুলিল, টুলুরও,—ছই জন পুরুষ তো রহিয়াছেই কাছে, কতটুকুই বা দূর জুল আর মাষ্টারমশাইয়ের ডেরায়?

চম্পা মুহূর্তখানেক মুখটা ঘুরে-ক ভাবিয়া লইল, মাষ্টারমশাইয়ের অল্পপস্থিতির কথা আর বলিল না, বলিল—ওরা বড়মানুষ, কথায় কথায় টাকার চকমকানি দেবায়, গরীবের ডাকে ওরা যদি সাড়া দিত তো ছুনিয়া উল্টাইয়া যাইত। এমনি ভাবি তো ভরসা, তাহার উপর ছেলে কাড়িয়া লইয়া চম্পা আবার ওদের শক্ত করিয়া জুলিয়াছে। চম্পা অভিমানের সঙ্গে একটু বিজ্ঞপ মিশাইয়া বলিল—কপালটি ভাঙলে এমনিটি হয় গো মিতিন, ভাল লোককে হুমম বানালাম বটে, নিজের মিতিন মুখ ঘুরায় নিবেক নাই? তুর জর লাগে তুর বরকে কেডা লিবেক, আঁচলে বেছে রাখ ক্যানে; কপালটি ভেঙেছে আমার, বড়া মরবেক, এ সময় কে আশ্রুন হবেক গো?

মিতিন মনে মনে হিসাব করিল; যে সত্যই কাড়িয়া লইতে পারে সে যখন চাহিয়া লইতেছে তখন রাজী হওয়াই স্ববুদ্ধির কাজ নয় কি? যুদ্ধের ভাবের চেয়ে শান্তির ভাবই ভাল, মাহুষের একটা বর্ণজান তো আছেই? হাসিয়া বলিল, “তা যাবে গো এত কথা ক্যানে? পাঠাইয়ে দিবেক রাইয়ের কুঞ্জে; আশুক ক্যানে, বাইয়া-বাইয়া যাবেক, কেডা নিবেক তো ডর কি আছে গো?”

যে হিসাবের ওপর চালায়, একটা রাহের খোয়াক

তাহার হিসাবের বাইরে পড়ে না, চম্পাও মোতটুকুর রাঙা খুলিয়াই রাখিল, হাসিয়াই বলিল—“রাইয়ের কুঞ্জে যাবেক তো কুজাবুড়ির ভাত ক্যানে খেজে যাবেক? রাইয়ের তো সবখানিই কলর, ই কলরটি ক্যানে খাড়া পেতে লিবেক পো?”

ছটি লোক হইল, প্রহ্লাদ আবার একটা লোকের মতো লোক। চম্পা হীরককে লইয়া একটু খাটাখাটি করিল, সমস্ত রাত দেখিতে আসিতে পারিবে না, বার বার কত করিয়া বলিয়া দিল। বলিল—“একটু জেগে ঘুমাস পো মিতিন, তুর ঘুমটি না চঙালটি বটে—উর মা কাছে থাকবেক নাই, তু একটু জেগে ঘুমাস বটে।”

সমস্ত দিনের নানা রকমের আবেগ মনে বেশ একটা চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, হঠাৎ চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল, গলা ভারী হইয়া উঠিল, হীরকের ছোট বুক মাথাটা রাখিয়া চম্পা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, বার দুই তিন একটু কৌপানির শব্দ হইল। মেয়েরা বোকে—এই সব জুল পথে হঠাৎ অশ্রুর পেছনে অনেক কথা লুকানো থাকে, মিতিন কিছু বলিল না।

একবার বাসায় গিয়া কিছু চালভাল আনু আর কয়েকটা টুকটাকি লইয়া দোরে তালা আঁটয়া চম্পা জুলের পথে বিদায় হইল। যখন পৌঁছিল, অন্ধকার একটু পাচ হইয়াছে। জুলের হাতাটা দেয়াল দিয়া ধেরা, তাহার একপাশে বনমালীর বাসা। দুইটা পাশাপাশি ঘর, নিচু ছাত, সামনে একটা বায়ান্না। একটা ঘরে বনমালী রান্না করে, একটায় থাকে। ফটকটা তেমনো ছিল, চম্পা প্রবেশ করিয়া যখন বাসার সামনে উপস্থিত হইল, বনমালী হাতে একটা টেমি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, উনান ধরিয়াছে, এইবার রান্নার ব্যবস্থা করিবে।

চম্পাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, একে দৃষ্টিশক্তি কমই তাহার উপর হাতে টেমিটা থাকায় একটু আলো-আঁধারি পোছের হইয়াছে, প্রশ্ন করিল—“কে বটে?”

চম্পা উত্তর করিল—আমি চম্পা।

বনমালী আলোটা চম্পার মুখের দিকে একটু বাড়াইয়া ধরিল, ঠাহর করিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে একটু মাথা নাড়িয়া বলিল—“হু তাইতো বটে; তা রাত-বিহারে? একা আইছিস নাকি? খবর কি আছে গো? চরণদাস...”

চম্পা বারান্দার উঠিয়া আসিল, জু দুইটা কুণ্ঠিত করিয়া গভীরভাবে বনমালীর পানে চাহিয়া বলিল—“খবর থাক, তুর না শক্ত বেমারি হইছে, তু রান্নার তরে যাচ্ছিস।

ঠাকুরদাদার দুর্বলতা নাতনীর ভাল রকমই জানা, তাহারই ভরসায় সন্ধ্যা হইতে এত তোড়জোড়; বনমালী একেবারে ভাবাচাকা খাইয়া গিয়া অপলকনেই চম্পার পানে চাহিয়া রহিল, খানিকক্ষণ বাকস্মৃতিই হইল না। অবস্থাটা স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্ত মাথার ডান দিকটা কয়েকবার চুলকাইয়া লইল, তাহার পর বলিল:

—শক্ত বেমারি। কৈ, আমি তো জানি নাই বটে।”

—“তু জানলে রান্না করতে যাস? তুর মাথায় কিছু আছে যে জানবিক?”

বনমালীর আরও গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল, একটু কম্পিত হস্তে টেমিটা জানালার বাঁজে রাখিয়া দিয়া বলিল—
“তুকে কে বললে?”

চম্পা একটু মুখঝামটা দিয়াই বলিল—“কে বললে সেই কথাটি এখন বলো বুড়াকে। কেউ বললেক নাই তো রাত-বিহারে আইছি” কি করে তাই ভাব ক্যানে।”

সত্যই তো কেহ না বলিলে চম্পা আসিবেই বা কেন, আর অস্থখ না হইলে কেহ বলিতেই বা কেন যাইবে? বন-মালীর মাথাটা আরও গুলাইয়া গেল, মুচ দৃষ্টিতে চম্পার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“তা হলে?”

“তা হলে শুয়ে থাক যেয়ে, বেমারিতে পাক করে কোন দেশে শুনেছি? আমি পাক সেরে তুকে দেখছি। বাবাকে আসতে বলেছি, পেলাদ আসবেক, উ হুজনে রাত্তিরে আসবেক বটে। তুর শুধু বুক হাঁইপাই করছে” কি মাজাতেও বিধা আছে বটে?”

আবার দুই জনের রাত্রে কাছে থাকিবাবও ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাপার এতটা সঙ্গীন দেখিয়া বনমালীর মুখ আরও শুকাইয়া গেল, একটা হাত বৃকে একটা হাত কোমরে দিয়া বলিল—“মাজাতেও তো রইছে” ব্যাধা,—হু, রইছে, বটে—রইছে...”

চম্পা আবার মুখঝামটা দিয়া বলিল—“রইছে” তো রাঁধ যেয়ে।...আয় ইদিকে।”

টেমিটা লইয়া পাশের ঘরে বনমালীর সংক্ষিপ্ত বিছানাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দড়ির ঝাটটাতে ভাল করিয়া বিছাইয়া দিল, বনমালী উঠিয়া শয়ন করিলে বলিল—“বাবা, পেলাদ এলে মাজার বিধার কষ্টও বুলচি, লুকাবিক নাই, দেবি তোর হাতটা।”

বনমালী বাড়াইয়া ধরিলে নাড়ীটা টিপিয়া বলিল—“লাড়িতে বেগ রইছে। বুড়া হ’ল, আগুন অস্থখ বৃকে না; দেখখো না গো।”

বনমালী একটু হতাশ ভাবেই বলিল—“বাঁচবোক নাই? ইয়ারে চম্পা?”

“মরতিস; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে? সবাই তো এসে গেলাম, চিকিচ্ছাটি সুর হয়ে গেল; আর বাঁচবিক নাই ক্যানে?...সুজির সেক দিব, বাড়িতে আটা আছে বটে—?”

“টুলু বাবুট রুটি খায়—উই যে মাষ্টারমশায়ের কে হয় বটে—উর জন্তে ‘আটা আনছি’...”

চম্পার জ-মুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—“উর পাক তুই করিস? তুর হাতে খায়?”

বনমালী বলিল—“খাবেক নাই? আমি বোষ্টমের পো,

খাবেক নাই? ডোম আছি, না, চাঞ্চালট আছি পো?—
খাবেক নাই ক্যানে?”

চম্পা একটু অশ্রমনক হইয়া গেছে, বানিকক্ষণ চূপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর একটু অশ্রমনক ভাবেই বলিল—“না, উরা বামুন, তাই বুলছিলাম, খায় না সবার হাতে।”

আরও একটু চূপ করিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দৃষ্টিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—“উরা আমাদের ধেনা করে যে—চাঞ্চালট না হই, নিচু জাত বটে তো গো?”

তাহার পর ইঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ার সচকিত হইয়া উঠিয়া বলিল—“তু একটু র’, আমি আসছি।”

ইঠাৎ সকালের কথা মনে পড়িয়া গেছে, ম্যানেজারের সেই রুদ্রমূর্তি; চম্পা তাড়াতাড়ি স্থলের গেট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে, অন্ধকার এখন ম্যানেজারের সহায়, এর মধ্যে কিছু হইয়া যায় নাই ত? নিঃশব্দে একটা জীবনের শিখা নির্বাপিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইবার মত মানুষের অভাব নাই ম্যানেজারের। চম্পা অতিমাত্রা চঞ্চল হইয়া উঠিল, রাস্তায় নামিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজের দৃষ্টিকে যত দূর পারিল প্রসারিত করিয়া দিল, কেহ কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে না ত?...কেহ আসিতেছে না ত? উদ্বেগে? কিছুদূর পর্যন্ত নামিয়াও গেল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টারমশাইয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইল। রাস্তার ধারের ঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে; চম্পা পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল, তাহার পর খুব সম্ভবপে জানালার পাঞ্জা আর চৌকাঠের কঁক দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল। টুলু চিং হইয়া শুইয়া গভীর অভিনিবেশে কি একখানা মোটা বই পড়িতেছে। চম্পা ধীরে ধীরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল, তাহার পর সেই সংকীর্ণ অবকাশের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। কি দেখিল সে-ই জানে, এক সময় নিচু হইয়া জানালার সামনেটা অতিক্রম করিয়া দেয়ালের বাহিরে বাহিরে চারিদিকটা ঘুরিয়া আবার স্থলের দিকে চলিয়া আসিল। একটা পাহারা শেষ করিয়া আবার ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

টুলু তাহা হইলে খায় বনমালীর হাতে। ছেলেবেলায় মিশন স্কুলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিল; ও সব লইয়া উত্তর জীবনে মাথা না ঘামাইলেও টুলু ব্রাহ্মণ হইয়াও যে খায় ওদের হাতে এ সংবাদটাতে ওর মনটা তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। টুলু বিশিষ্টই, আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠিল চম্পার চোখে; ও যেন এক-আকাশ তারার মধ্যে চাঁদ; এ চাঁদ শুধু বিশিষ্টই নয়, বড় আপন, বড় নিকটের, হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।...টুলু তা হলে চম্পার হাতে খাইবে।...

একটা অব্যক্ত পুলক বুকে করিয়া চম্পা রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল। কিন্তু আয়োজন বেশিদূর অগ্রসর হইবার আগেই টুলু যে কত দূর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কাল রাজিশেষের সেই অল্পভূতি আবার কোন্ দিক দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেই নিজেই অশুচি বলিয়া মনে হওয়া, যাহার জন্ত হীরক টুলুর মনের স্পর্শ পাইয়াছে বলিয়াই চম্পা তাকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিল না তখন। অল্পভূতিটি হয়তো স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, কিন্তু সময়ে অসময়ে কয়েকবারই উঁকি মারিয়া গেছে চম্পার মনে।...

খুব উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কুটনা কুটিল, মশলা বাটিল, আটা মাখিল,—টুলুকে রাখিয়া দিবে আজ...তাহার পর রুটি বেলিয়া ভাজিতে যাইবে, হাত-পা শুটাইয়া চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বনমালীর হাতে থাক, কিন্তু চম্পা-বনমালীতে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, টুলু তৎক্ষণাৎ হইবে। চম্পা মনকে অল্প ভাবও যে বুকাইতে চেষ্টা না করিল তেমন নয়, কিন্তু যেন সাহস হইল না অগ্রসর হইতে।

বনমালীকে আবার উঠাইল, বনমালী কলের মাহুস, ওর মাথার মধ্যে স্নকোশলে একটা আইডিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই হইল। রহস্তটা চতুরা নাতনীর ভালরকমই জানা আছে। বনমালীকে বুকাইল, তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে বামুনের রান্না করিয়া দেওয়া এসব রোগের একটা বড় চিকিৎসা। সুতরাং বনমালী একবার বুক হাত দিয়া, একবার কোমরে হাত দিয়া রুটি নৈকিয়া, তরকারি করিয়া দুধটুকু জাল দিয়া দিল। শেষ হইলে চম্পা চোখের ওপর চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—“কি বলিস—একটু ভাল বোধ হইছে না?”

বনমালী আর একবার বুক আর কোমরে হাত দিয়া রোগের অবস্থাটা অনুভব করিল, মাথা নাড়িয়া বলিল—“ই, আধাআধি কাবার হইছে বেমারিটা গো।”

“হবেক নাই? যা দিয়া আর ক্যানো। পুছ করলে বলবি তু বাসায় একাটি আছিস, বামুনকে মিছা বুলবিক নাই।” নাতনীর হাতে পড়িয়া বনমালীর আজ সত্য মিথ্যার জট পাকাইয়া গেছে, একটু মাথা চুলকাইয়া চম্পাকে যেন একটা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—“মিছা কেন বুলতে যাবো গো? বুলবো একাটি আছি বটে।”

“দিয়া আর, তুও দুখানা ব্যাতে দিয়া শুয়া পড়বি, বুক পিঠে সুজির সৈক দিয়া দিব।”

চরণদাস আর প্রহ্লাদ যখন আসিল, চম্পা তখন তাহাদের জন্ত রন্ধনে ব্যস্ত। বনমালী তখন নাতনীর হাতের সেবা পাইয়া গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। চম্পা বাপকে জানাইল, অবস্থাটা খুবই খারাপ হইয়াছিল, এখন লক্ষণ ভাল, রোগী ঘুমাইতেছে।

আহার করিয়া ওরা দুই জনে স্কুলের বারান্দায় শুইয়া

রহিল; চম্পার যতক্ষণে আহার শেষ হইল, ততক্ষণে ওরাও গাঢ় নিদ্রায় অটুতত্ত্ব।

নিদ্রা গেল না শুধু চম্পা। ওর মন অনেকটা প্রশান্ত—সবল ব্রহ্ম পুরুষ রক্ষী, তা ভিন্ন চম্পাও তো সর্বথ পথ করিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ কিছু ঘটতে দিবে না টুলুর উপর। টুলু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাৎ।

আহার শেষ করিয়া ফটকের মুখে একটা শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া বসিল, দিনের বেলা যখন স্কুল হইতে থাকে বনমালী এইখানটায় বসিয়া দ্বার রক্ষা করে। চম্পা সমস্ত রাত বসিয়া রহিল, গল্পের পথ বাহিয়া কখন কে আসে সেই অপেক্ষার—নিশ্চিন্ততার মধ্যেও একটা উদ্বেগ বুক লইয়া। এদিকটা বেশ গেল, তাহার পর গভীর রাত্রে দেখা গেল দুইটা লোক চড়াই বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। চম্পার সমস্ত চেতনা যেন দুইটা চক্ষু আসিয়া জড়ো হইয়াছে; বৃকের টিপ-টিপানিটা এত বাড়িয়া উঠিল যে শব্দটা যেন স্পষ্ট শোনা যায়। উহারা আগাইয়া আসিলে চম্পা উঠিয়া থামের আড়ালে দাঁড়াইল...ও লোকটার হাতে ওটা কি যেন?—একবার মনে হইল চরণদাস আর প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তোলে, তাহার পর আবার কি ভাবিয়া অসহ উৎকণ্ঠা লইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, নিশ্চিন্ত বিপদের সামনে যেন সম্মোহিত হইয়া গেছে। লোক দুইটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িতে আরও একটু আড়ালে চম্পা গেল। ভয়ে উৎকণ্ঠার এমন সংঘম হারাইয়াছে নিজের ওপর, বোধ হয় ডাকিয়াই ফেলিত ওদের, কিন্তু ঠিক এই সময় চরণদাস ডাকিয়া উঠিল—“চম্পা আছিস?”

কিছু নয়, ওর একটা অভ্যাস—বসিতে নেশার মধ্যে নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবেই এক আধবার ঐ রকম টেচাইয়া ওঠে, —মেয়ের খোঁজ নেয়। সাড়া পাইয়া চম্পার যেন সন্ধি ফিরিয়া আসিল। শরীরে, স্বল্প ভাবে আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল

স্কুল পার হইয়া লোক দুইটা আগাইয়া চলিল, চম্পা আবার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক পা এক পা করিয়া ফটকের বাহিরে আসিল, তাহার পর নীচ হইয়া চৌহদ্দির দেয়াল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইল।...না, ভয়ের কিছু নয়, বাসা পারাইয়া উহারা আগাইয়া গেল; একবার ফিরিয়াও চাহিল না এদিকে, ভিন্ন গাঁয়ের লোক, নিজের কাজে যাইতেছে উহারা—ওদিককার ঢালু পথে অনেকখানি নামিয়া গেলে চম্পা ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। কি ভীষণ কয়েকটা মুহূর্ত ই যে কাটিল।

ফিরিবার সময় জানালা আর চৌকাঠের অবকাশ-পথে আবার ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল—আলোটা সেই রকম জ্বলিতেছে, টুলু চিং হইয়া শুইয়া আছে, নিদ্রামগ্ন বৃকের ওপর সেই মোটা বইখানা, তাহার উপর দুইখানা হাত, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সবকটাই ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করিতেছে।

চম্পা আন্তে আন্তে আসিয়া আবার সেই শিলাখণ্ডটির উপর বসিল। সমস্ত রাত কাটিল এই বিচিত্র প্রহরায়।

একেবারে ভোরে—অন্ধকারের গহ্বর থেকে শুনিয়া পাহাড় যখন অল্প একটু আভ্যপ্রকাশ করিয়াছে, চম্পা গিয়া চরণদাস আর প্রজ্ঞাদকে তুলিয়া দিল এবং তাহারা কাছে বাহির হইয়া গেলে নিজেদের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন মিটাইয়া দিয়া চম্পাও বস্তির পথে অগ্রসর হইল।

উঠিয়া বিষয়ের ঘোর কাটিতে বনমালীর বেশ খানিকটা সময় লাগিল।...ইঠাং কি হইয়াছিল?—চম্পা...চরণ... প্রজ্ঞাদ...কোমবে ব্যথা...কোথায় সে সব? কোমরটা টিপিয়াও দেখিল—নাঃ, কোথায় কি? মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় যখন গেল, টুলুকে হাত মুখ নাড়িয়া বলিল—“কাল রেতে খানী এক স্বপ্ন দেখলাম গো বাবু মশায়—বুকেই বিথা। মাজাঁই বিথা। মরবার পায়া হইছি”; চম্পা আলেক সেক দিলেক সূজি ধিপায়...কুখা আর বিথা গো? এই তো চম্পা ফিরাটি করছি বটে যেন “সাইতাড়ার কুমার বাহাদুর।”

হাত দুইটা সামনে চিতাইয়া ধরিয়া একটু হাসিল। সেদিন সন্ধ্যায় চম্পা আসিলে তাহাকেও বলিল—কাল স্বপ্ন দেখিল তাহার যেন বেমায়া—চম্পা আসিয়াছে—আজকের মতই সেক দিল ইত্যাদি।

চম্পা ঈষৎ হাসির সহিত চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শুনিল, মাথায় নতুন একটা আইডিয়া আসিয়াছে, বলিল—“তা আর টুলু বাবুকে বলিস নাই তুই, স্বপ্নের কথা বললে ফলে যায় বটে, শেষে বুক আর মাজার বিধায় কেলেস পাবিক।”

বনমালী ক্রমাগত সাত দিন এই রকম স্বপ্ন দেখিল।

(১৫)

একাদিক্রমে সাত দিন কোন রকম সাড়াশব্দ না পাওয়ায় চম্পা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এসব ব্যাপারে ম্যানেজারের এত দেরি হয় না, তবে এই নিশ্চেষ্টতার কারণটা কি? ...একবার একটু খোঁজ না লইলে চলে না; ভয়ঙ্কর লোকের আওয়াজ-আফালনের চেয়ে মৌনই বেশী ভয়ঙ্কর যে।

প্রথমে কিন্তু সোজা ম্যানেজারের কাছে গেল না, গেল এসিষ্ট্যান্ট পরেশবাবুর কাছে। এর বাসাটা খনির কাছাকাছি। চাকর বামুন লইয়া একলাই থাকে, এখনও বিবাহ করে নাই। প্রকৃতিটা চাপা, ম্যানেজারের প্রকৃতির উন্টা। ম্যানেজার অন্তর থেকে বিশেষ কিছু চায় না বলিয়া যেমন তাহার ব্যবহারটা বেপন্থা, এসিষ্ট্যান্ট তেমনি অন্তর থেকেই বেশি চায় বলিয়া একটা অন্তরাল রচনা করিয়া চলিতে চায়—বেশ একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব আছে। একটা নতুন অভ্যাস হইয়াছে সন্ধ্যার সময় একটু সুরা সেবন—খুব সামান্যই। কিন্তু সেটা এখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই, পাছে প্রকাশ

পায় এইজন্য প্রভাবটুকু একেবারে না কাটিয়া গেলে বাসার বাহির হয় না।

রহস্যটুকু জানা আছে শুধু চম্পার।

সন্ধ্যার সময় সে গিয়া উপস্থিত হইল। পরেশ এই সময়টা বাড়ীর ভিতরেই থাকে, আগন্তুক বুঝিয়া বাহির হয় বা হয় না, চাকরের মুখে চম্পা আসিয়াছে শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল, প্রশ্ন করিল—“তুই? এর রকম অসময়ে যে।” বারান্দার ধামের গায়ে পা দুইটা ঠেকাইয়া একটা চেয়ারে বসিল। চম্পা পাশের ধামটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইল হাত দুইটা পিছনে করিয়া, হাসিয়া বলিল—“আমার এই সময়, বড়মাহুষের সময়ে আর গরীবের সময়ে কখনও মিল হতে পারে?—গতর খাটিয়ে ফুরসৎ হবে তবে তো আসতে পারব?”

“হঁ। তারপর? আসবার উদ্দেশ্যটা কি? কোন কাজ আছে?”

“শোন কথা ম্যানেজারবাবুর—কাজ না থাকলে এসেছি। ...কাজ মানে গরীবের ঘোড়া রোগ, শুনেছেন তো একটা হাদ্যাম করে বসেছি, সেদিন বদনদাসের বোঁটা একটা ছেলে প্রসব হয়ে মারা গেল, কেউ ঘেসে না দেখে নিজের ঘাড় তুলে নিলুম, এখন...”

পরেশ চোখ দুইটা তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল—“ঘেসবে না কেন?—মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো না কে হয় সেই তো ছেলেটাকে নিয়েছিল, ব্যবস্থাও করেছিল, তুই-ই বরং হৈ-হল্লা করে পেলাদের বোয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলি ছেলেটাকে—তাই তো শুনলাম।”

পরেশের পক্ষে ঘটনাটার একটা বিশেষ তাৎপর্ষ আছে, স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চম্পা স্মরণটা ছাড়িল না, চোখে চোখ রাখিয়াই বলিল—“কোথাকার এক জন কে ট্যাকা দেখিয়ে খনি থেকে আমাদের একটা ছেলেকে নিয়ে যাবে, মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে?...আমি তো...”

অনুসন্ধিগ্ন দৃষ্টি দিয়া যাহা খুঁজিতেছিল যেন পাইয়াছে পরেশ, আবার বাধা দিয়া কতকটা সঙ্কটভাবে বলিল—“বেশ, ঘাড় তুলে নিয়েছিস তারপর?”

“ঐ তো বললুম—গরীবের ঘোড়া রোগ; নিলুম তো বোঁকের মাথায়, কিন্তু ওসব হাপা কি আমরা সামলাতে পারি? বলে নিজের পেটই চলে না। তাই বড়কর্তাকে ধরেছিলাম একটা ব্যবস্থা করে দিতে কোম্পানী থেকে; বললেনও দোব, কিন্তু কই, সাত দিন হয়ে গেল এখনও তো কিছু টের পেলাম না, তাই জিপোস করতে এসেছিলাম আপনাকে যদি কিছু বলে থাকেন...”

এটা গেল ভূমিকা, দেখা করিয়া—কথা পাড়বার একটা অছিলা।

পরেশ বলিল—“কই না তো।”

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—

“তা হলে হয় নি বের হুঁমটা। মাহুঘের একটা কাজ থাক তবে তো; এত বড় তিন তিনটে খনি চালানো।...আবার শুনছি একটা নতুন উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে...”

“কি?”

প্রশ্নটা করিয়া পরেশ একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়া দেখিল চম্পাও ভীক্ষু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে। চোখা-চোখি হইতে সহজ বিশ্বাসের কণ্ঠে বলিল—“ঐ মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো না কে একদিন বড়কর্তার বাসায় গিয়ে ছমকি দিয়ে এসেছে আপনি কিছু জানেন না?”

দৃষ্টি আবার সেই রকম স্তব্ধ, প্রশ্নে ঠাসা; পরেশ বেশ সহজভাবেই বলিল—“কই না তো! ঔকে ছমকি দিয়ে গেল, অথচ কিছু ব্যবস্থা করলেন না যে?...কবেকার কথা?”

এই পর্যন্তই দরকার চম্পার, টের পাওয়া গেল কথাটা পরেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। এর পর বাড়াইতে গেলে তাহার নিজের সেখানে উপস্থিতির কথাটা আসিয়া পড়িবে, নানা কারণে যেটা আপাতত চায় না চম্পা; প্রশ্নটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—“তা হ’ল বইকি ক’দিন; মরুকগে আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরে দরকার কি?...আসলে যার জন্তে আসা,—ছেলেটার একটা ব্যবস্থা একটু করিয়ে দিতে হবে আপনাকে...”

“তোর আবদারই যখন শুনলেন না...”

“ঠাট্টা রাখুন...”—বলিয়া চম্পা একটু চুপ করিয়া গেল, কি যেন একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল—“আমার আবদার তো ঠাঁর শুনবার কথাও নয়, যিনি দয়া করে শুনেন তাঁর কাছে তাই করে গেলাম।”

আর দাঁড়াইল না, “এবার যাই, অনেকগুলো কাজ ফেলে এদেছি।...ভুললে চলবে না কিন্তু”—বলিয়া নামিয়া গেল।

পরেশ একটু বিস্মিত হইল। এর আগেও আসিয়াছে চম্পা কোন একটা ছুতানাতা লইয়া, এত তাড়াতাড়ি কখনও চলিয়া যায় নাই, এমন হঠাৎ তো নয়ই। কয়েক দিন হইতে তাহার মধ্যে একটা যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে।

ম্যানেজার রতিকান্তের সহিত দেখা হইবে সকালে দিনের আলোয়। রাত্রিটা চম্পার বড় অশান্তিতে কাটিল। বনমালীর স্বপ্ন রচনা আর তাহার পর ফটকের ধারে বসিয়া সেই ঠায় পথের দিকে চাহিয়া পাহারা—এসবের মধ্যে একটা প্রশ্ন তাহার মনটাকে বড়ই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিল—ম্যানেজার এসিষ্ট্যান্টকে কিছু বলেন নাই কেন? শান্তি, প্রতিশোধ, কিংবা কোন চক্রান্তে এসিষ্ট্যান্টকে প্রায়ই বলেন, জীহুলন্ত কৌতূহল মিটাইবার জন্তই পরেশের নিকট হইতে কত খবর কতবার পাইয়াছে চম্পা এর আগে; এবার এত গোপনের চেষ্টা কেন? চক্রান্তটা কি এতই গভীর? প্রতিশোধটা কি এবার এতই ভীষণভাবে লইতে চায় ম্যানেজার?

সকালে আবার সেই জায়গাটিতেই সাক্ষাৎ হইল।

ম্যানেজার নিবিষ্টচিত্তে একটা কাগজ পড়িতেছিলেন, শুধু নিবিষ্টই নয়, বেশ যেন চিন্তিতও—জ্ঞা দুইটা কৃষ্ণিত হইয়া রহিয়াছে, চম্পার উপস্থিতি সন্দেহও কোন খেলায় হইল না।

চম্পা নিজের জায়গায় নিজের ভঙ্গীতে হাত পিছনে রাখিয়া ধামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেই দৃষ্টি পড়িল। তখন আবার কাগজটা পাশে রাখিয়া আগেকার মতো সরস লঘুতার সঙ্গেই আরম্ভ করিলেন—“চম্পাবতী যে, কি মনে করে হঠাৎ শুভাগমন?” চম্পা ‘শুভাগমন’ কথাটার কাটানু দিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—“বিরক্ত আপনি হবেন কেনেতুনেও আসতে হয়, সেবারে বদনদাসের ছেলেটার খোরপোষের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন কোম্পানি থেকে, তা আজ পর্যন্ত...”

ম্যানেজার চোখ দুইটা একটু তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—“তার দরকার আছে আর?”

চম্পার বুকটা ধক করিয়া উঠিল, দুইটা ঢোক গেলার পর তবে প্রশ্নটা কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল—“কেন—ওকথা বললেন যে?”

“খোরপোষের ব্যবস্থাটুকু হওয়া নিয়ে বিষয়, কোম্পানিকেই যে করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।”

অনেক কষ্টে চম্পা মুখের সহজ ভাবটা ধরিয়া আছে, একটা উত্তর দিয়া হেঁয়ালিটাকে স্পষ্ট করিয়া লইতে যেন সাহস হইতেছে না। ইঞ্জিনেরাে বাড়টা এলাইয়া দিয়া ম্যানেজার মিঠে টানে একটা সিগারেট ফুঁকিতেছেন, দৃষ্টিটা চম্পার মুখের ওপর। হেঁয়ালিটা তিনি নিজেই আর একটু স্পষ্ট করিয়া দিলেন, বলিলেন—“খোরপোষের সঙ্গে যেখানে প্রাণের টান সেখানেই সেটা বরঞ্চ বেশি মিষ্টি নয় কি?”

যেন অমাহুতিক চেষ্টায় চম্পা মুখে এবার একটু হাসিও টানিয়া আনিল, উত্তর করিল—“সেই ভরসাতেই তো আপনার কাছে আসা, এখানে আপনিই সবার বাপ-মা, আপনার চেয়ে বেশি দরদ কার কাছে আশা করা যায়?”

ম্যানেজারের মুখেও হাসি ফুটিল, টোকা মারিয়া সিগারেটের ছাইটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—“শোন চম্পা, গাছের খাবি আবার তলারও কুড়ুবি তা হয় না।...আমি যদি বাপমা হই-ই তো সে সরকারী বাপ-মা, নিজের বাপমা যখন ওর রয়েছে...”

“বিপদের সামনাসামনি হইয়া এ অন্তরালটুকু চম্পা আর সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, যেন স্পষ্ট রূপটাই দেখিয়া লইবার জন্ম ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—“আমায় নিয়ে একি করছেন আপনি?—আপনার দাসীর দাসী হবারও যুগ্যি নই আমি—কি বলবেন স্পষ্ট করেই বলুন—কি কথা শুনেছেন আমার সন্দেহ?—জানেনই তো আমার শত্রুর অভাব নেই...”

“স্পষ্ট কথা তুই যদি বুকেও না বুঝিস আমি কি করব? তুই আবার মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় দেই ছোঁড়াটার সঙ্গে...”

চম্পা এমনভাবে চাহিয়া চোখ দুইটা হঠাৎ ম্যানেজারের

মুখের ওপর ফেলিল যে সব শেষের কদর্য কথাটা তাঁহার মুখে যেন আটকাইয়া গেল; পরের ব্যাপারটুকু চম্পাই সামলাইয়া লইল, ইঙ্গিতে যেটুকু কদর্যতা প্রকাশ পাইল সেটা যেন গা-সওয়া বলিয়া এাহের মধ্যেই আনিল না; দৃষ্টি পরমুহুর্তেই খুব সহজ করিয়া লইয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“তাই বলুন! আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছলাম—আবার নতুন করে কে আপনার কাছে কি লাগিয়েছে, শত্রুর তো অভাব নেই। তা আমি স্থলে ক’দিন থেকে তো যাচ্ছি—ঠাকুরদাদাটা ক’দিন ধরে অল্পে পড়ে গেছে, বিশেষ করে রেতের বেলা হয় বাড়াবাড়ি। যাচ্ছি ক’দিন থেকে—বাবাকে ডেকে নিই, কখন কি হয়, একলা মেয়েমানুষ।...তা এর মধ্যে মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় তাকে চুকিয়ে কে আপনার কাছে ফলাও করে কেছা গড়ে নিয়ে এসে লাগালো? বদনদাসের ছেলটাকে নিয়ে কি কাণ্ড একচোট হয়ে গেল তার সঙ্গে, আর কেউ না জাহুক, আপনি তো জানেন।...আপনার কাছে সেদিন ওরকম দাবড়ানি ধেয়ে সে রইলো কি ভাগলো তাও জানি না। বলিহারি মাথা লোকের।”

ম্যানেজার চেয়ারে সেই রকম ঝাড়টা এলাইয়া দিয়া স্থির প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। মুখে অল্প একটু হাসি—ভাবটা যেন—হ্যাঁ, সেখানে মেয়ে বটে।—এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট বরা পড়িয়া চম্পা। তাহার কৌশল বদলাইয়া ফেলিয়াছে, কত শীঘ্র যে, আর কত নিখুঁত ভাবে সেইটিই তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে, প্রশংসার পাশে পাশে একটা সংকল্পও তাঁহার স্থির হইয়া উঠিতেছিল—এ মেয়েকে হাতছাড়া করা চলিবে না।

সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—“শোন চম্পা, তুই হাজার বুদ্ধিমত্তী মনে করিস নিজেকে—না হয় স্বীকার করে নিলাম, তাই—কিন্তু আমার ওপরও কি টেকা দিয়ে যাবি? তবে দেখ যেতে পারছিস কিনা—তোর ঠাকুরদাদার অল্পক-টমুক, তোর ভাওতা—ও একটা আধপাগলা, পুরো পাগল হতে হতে মাঝখানে থেমে গেছে—কি করে—ওর মাথায় যদি চুকিয়ে দেওয়া যায় তুই বীর হুম্মান তো ছাত থেকে লাফ দিয়ে মরবে, আর যদি বলা যায় তুই একটা কোলের শিশু, এই সব জন্মেছিস, তো হাত পা ছুঁড়ে ওয়াও ওয়াও কান্না শুরু করে দেবে; তুই নাতনী, সেটা জানিস, কিন্তু আমিও তো ঐ স্থলের সেক্রেটারি। থাক।...সুধু তোর বাপ আসে না, পেলাদ সাধু আসে, কেন তাও বলব?”

চম্পা একটু হাসিয়া কতকটা অবহেলাভরে বলিল—“বলুন।...পেলাদের নামটা আমার ছেড়ে গেছল বটে। মাথার ঠিক থাকে তবে তো...”

“ছেড়ে যায় নি;—মাথার ঠিক বেশি রকম আছে বলেই

লুকিয়েছিল। যাক সে কথা। ওরা আসে ওই ছোঁড়াটাকে পাহারা দিতে...”

চম্পা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অল্প একটু গা নাড়া দিয়াই বলিল—“আমার বয়াদবি হয়ে যাচ্ছে আপনার সামনে, দোষ নেবেন না; কিন্তু আপনার চর চমৎকার খবর দিয়েছে আপনাকে। বাবা আর পেলাদ স্থলেই ঠাকুরদার বারান্দায় শুয়ে থাকে!”

ম্যানেজারের দৃষ্টিটা আবার নতুন করিয়া প্রশংসা হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে একটু মোহও আছে, রূপের সঙ্গে বুদ্ধির বিদ্যুৎকুরূপ দেখিলে যেটা আসিয়াই পড়ে।—চম্পা একটা অভিনয় করিল বটে, খাসা। কিন্তু চম্পার এ সব কথার উপর মন্তব্য না করিয়া নিজের কথার জের ধরিয়াই বলিলেন—“আর তুই সমস্ত রাত স্থলের দরজায় থাকিস জেগে বসে।”

চম্পার হাসি-হাসি ভাবটা যেন দপ করিয়া নিভিয়া গেল; সেও কিন্তু ক্ষণিক, অভিনয়ও ছাড়িল না। মুখটাকে চেপ্টা করিয়া আরও বিষন্ন করিয়া লইয়া বলিল—“আপনার মাথার মধ্যে যখন ঢুক গেছে—পাহারা দেবার জন্তই এই ব্যবস্থা—যার জন্তে আমার মতন একটা অসহায় মেয়েছেলেকেও মস্ত বড় একজন মন্ত্রী বলে আপনি ধরে নিয়েছেন, তখন আমি আর কি বলব? তর্ক যতটুকু করতে হ’ল, তাইতেই তো যথেষ্ট বয়াদবি হয়ে গেছে।...ছেলেটার সম্বন্ধে আর কোন আশা নেই তা হলে?”

“তুই যতটুকু আশা করে আছিস তার চেয়ে লাঞ্ছা শুণ বেশি ব্যবস্থা করে দোব তোর ছেলের।”

চম্পা অতিমাত্র আশ্চর্য এবং কতকটা বিমূঢ় হইয়া মুখের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—“আপনার দয়া, কিছু করতে হবে আমার?”

“কিছু না; যেমন আছিস তেমনি থাকতে হবে, শুধু আর একটু ভাল করে।”

“বুঝলাম না।”

“এখন শুধু রাস্তিরে থাকিস, দিনেও স্থলে থাকবি; স্থলে বলি কেন?—মাষ্টারমশাইয়ের বাসায়।”

চম্পা যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল—“কেন?”

“কেন, তা নিজেই ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি। এখন নাও যাস, মাষ্টারমশাই ফিরে এলেও গেলে চলবে।”

“চম্পার সমস্ত শরীরটা ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল। ম্যানেজারের হাসিটা হইয়া উঠিয়াছে বীভৎস, দৃষ্টিতে যেন একটা বিষের নীলাভা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; চম্পা অনেকক্ষণই চোখ ফিরাইতে পারিল না। কিন্তু সে খেলায় নামিয়াছে, পিছাইয়া গেল না, যে এত বড় ভুল করে, এত বড় একটা সুযোগ শত্রুর হাতে তুলিয়া দেয় সেও বুদ্ধির গুমর করে।

সত্যই তাহার একটু হাসি পাইল, সেইটাকেই কাজে লাগাইয়া একটু লজ্জার অভিনয় করিয়া বলিল—“আপনার যেমন-হুকুম—আমি ওখানে গিয়া উঠিলেই যদি আপনাদের কোন উপকার হয়...”

চম্পা চলিয়া গেলে ম্যানেজার আবার জ্র কুণ্ঠিত করিয়া খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিলেন, একটা খবরে সকাল থেকে তাঁহাকে বড় অস্তমনক করিয়া তুলিয়াছে—একেবারে দূরে কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলি-মজুরদের মধ্যে একটা খুব বিশ্রী রকম গুলতান আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই একটা চরমে আসিয়া দাঁড়াইবে এরূপ আশঙ্কা হয়।

এটুকু সাধারণ; ম্যানেজারের পক্ষে যা অসাধারণ, বিশিষ্ট—যাহার জ্ঞত জ্ঞকুন তাহা এই যে একজন আধা-সন্ন্যাসী গোছের লোক এর মূলে।...লোকটি মাঝবয়সী, গৌরবর্ণ, শীর্ণ, মাথায় বড় বড় চুল; সপ্তাহখানেকও আসে নাই; কিন্তু এরই মধ্যে কুলিমজুর-মহলে অগাধ প্রতিপত্তি।

খুব চিন্তিত ম্যানেজার,—লোকটির সঙ্গে সেই নির্বীহ স্ব-বাক্—মাষ্টারমশাইয়ের খুব একটা মিল পাওয়া যাইতেছে না?

(১৬)

ম্যানেজারের নিকট হইতে চলিয়া আসিতে এবারেও চম্পার যেন পা উঠিতেছিল না। একটা মোক্ষম হার হইয়াছে। অবশ্য সে হারটা স্বীকার করিল না, অভিনয়টা করিয়াই গেল, এবং আজকের দাবার চালে শেষ জয়টি রহিল তাহারই; তবুও এই সমস্ত সপ্তাহব্যাপী পরাজয়ের সঙ্কোচটা তাহার পা দুটিকে যেন আড়ষ্ট করিয়া রাখিলই খানিকটা পর্যন্ত; আসিতে আসিতে মনে হইতে লাগিল ম্যানেজারের বক্তৃতা হাসি এবং বিজ্ঞপে ভরা দুটি চোখের দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে বিদ্ধ করিতেছে।

কোন রকমে গেটের বাহির হইয়া এদিক দিয়া অনেকটা দ্রুতি অনুভব করিল; তখন বিষয়ের সঙ্গে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, এত সব কথা—প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত ম্যানেজার জানিতে পারিল কি করিয়া।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আজকাল দিনের বেলা শরীরে কিছু থাকে না, দেহজ্বর রান্নার হাঙ্গামটা আর রাখে না। মিতিনকে চাল-ডাল সব দিয়া আসে, সে-ই নিজের রান্নার সঙ্গে নামাইয়া দেয়। অল্প দিন চম্পা এই সময়টা ঘুমায়, আজ কিন্তু চিন্তায় তাহার ঘুম হইল না।...কি করিয়া টের পাইল ম্যানেজার, তাহার সারা রাত বসিয়া পাহারা দেওয়াটা পর্যন্ত।

ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার এক সময় যেন মনে হইল উত্তরটা পাওয়া গেছে। বনমালীর মস্তিষ্কের যে দুর্বলতার উপর তাহার সমস্ত ব্যবস্থাইটুকু গড়া সেই দুর্বলতাই ম্যানেজারও কাজে লাগায় নাই তো? চম্পার যা কিছু সব,

সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত। তাহার পর আর সমস্ত দিন ওদিক যাড়ায় না; ক্লান্তও থাকে, খনিতে কাজও আছে; তাহা ভিন্ন যাহা সবচেয়ে দরকারী কথা—ওর ইচ্ছা নয় যে টুলু জাহ্নক বনমালীর সঙ্গে চম্পা কোন রকম সংস্রব রাখিয়াছে—যাওয়া-আসা করে, কেননা এর আগে তাহাকে কখনও দেখে নাই ওখানে। এই দিনের বেলা তাহার অল্পপরিচিত বনমালীকে বাসার ডাকিয়া লইয়া, মন্তব্য করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লয় নাই তো ম্যানেজার? বনমালীর স্বপ্নে টুলু কোন সন্দেহ করে নাই, কেননা টুলুর ও রকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেই হয় নাই; ম্যানেজার অনেক কথা জানে, তাহা ভিন্ন বাহ্যিক ঔদাসীত্বের পিছনে চম্পার সহানুভূতি যে টুলুর দিকেই এটুকু ধরিয়া ফেলা তাহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়; সুতরাং বনমালীর স্বপ্ন যে আদতে কি সেটাও ধরিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইবার কথা নয়।

আহার করিয়া শরীরটা একেবারেই ভারী হইয়া পড়িল, তাহা ভিন্ন রৌদও অত্যন্ত কড়া, একটা ঘুম দিয়া চম্পা স্কুলের দিকেই পা বাড়াইল। এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার পরেশবাবু বাঁচিয়া থাকুক, খনিতে হাজরি সম্বন্ধে ওর তত ভাবনা নাই।

স্কুলের রাস্তা আর বস্তির মাঝামাঝি যে একটা ছোট টিলা আছে সেটার গোড়ায় আসিতে হঠাৎ স্কুলের দিকে নজর পড়ায় চম্পা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা লোক স্কুলের দেয়ালের বাহিরের দিকে পাশে পাশে আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, তাহার পর যেন খুব সন্তর্পণেই একবার এমুড়ো-ওমুড়ো চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া রাস্তার উপর উঠিয়া পড়িয়া খুব সহজ পদক্ষেপে গল্পের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় আশ্চর্য বোধ হইল চম্পার। স্কুলের পিছন দিকে একটা ছোট দোর আছে, যে-কোন কারণে হোক লোকটা যে সেই দোর দিয়া বাহির হইয়াছে ইহাতে স্ফার সন্দেহ নাই।

টিলার উপর একটা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বুনো স্কুলের গাছ, তাহার গায়ে কি একটা লতা উঠিয়া বেশ একটা আড়ালের সৃষ্টি করিয়াছে; চম্পা তাহার পাশটিতে বসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাস্তাটা প্রায় দুই শত গজ দূর দিয়া চলিয়া গেছে, লোকটা একটু কাছে আসিলে চম্পার বিষয় আরও বাড়িয়া গেল,—রাত্রে দেখা, তবু চলার ভঙ্গি এবং আরও দুই একটা বিষয়ে মনে হইল, প্রথম রাত্রে এবং পরে আরও তিন রাত্রে যে দুটি লোককে স্কুলের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল এক দিন, একটু অসাবধানতার জন্ত নিজের হঠাৎ যাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িয়াছিল, এ তাহাদেরই মধ্যে এক জন। চম্পা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—যতই কাছে আসিতেছে লোকটা ততই চম্পার সন্দেহটা কাটিয়া যাইতেছে। আবার এদিকে একটা ভয় লাগিয়া আছে—লোকটা যদি বস্তির পায়ে-হাঁটা এই পথে নামে, চম্পার আত্মগোপনের

কোন উপায়ই থাকিবে না।—কয়েকটা অসহ মুহূর্ত—সমস্ত মন ছুঁটি চক্ষে জড়ো করিয়া হাত পা যেন সিঁটকাইয়া বসিয়া রহিল চম্পা। ছুঁটি রাস্তার সঙ্গম যতই কাছে আসিতেছে ততই তাহার চৈতন্য তীব্র হইয়া উঠিতেছে—চম্পা ওর ধাপ শুনিতে লাগিল—লোকটা ঠিক চোখাধার কাছে আসিয়া মুহূর্ত খানেক ইতস্তত করিল—কোন দিকে যাইবে যেন স্থির করিতে পারিতেছে না, একবার ছমছমে দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—চম্পার বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে—তাহার পর সোজা গঞ্জের দিকেই অগ্রসর হইল।

একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল চম্পার, যতক্ষণ লোকটাকে দেখা গেল স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে বাজারের মোড়ে অদৃশ হইলেও একটু বসিয়া রহিল ওই দিকে চাহিয়াই—যদি লোকটা কোন কারণে ফেরে—কোনও কারণে—এ ধরণের লোকের পক্ষে যেন সবকিছুই সম্ভব...তাহার পর বেশ একটু দময় দিয়া কুলগাছের আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া স্থলের দিকে অগ্রসর হইল।

বড় রাস্তায় উঠিয়া চম্পাও ঠিক ঐ লোকটির পঙ্ক্তিতেই অবলম্বন করিল, সামনে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর মাষ্টারমশাইয়ের বাসাটা যাহাতে স্থলের আড়ালে পড়িয়া যায় এইভাবে রাস্তার ডানদিক ঘেঁষিয়া ক্রত-পদে অগ্রসর হইল। স্থলের কাছে আসিয়াও সে ঐ লোকটার মতোই দেওয়ালের পাশে চলিয়া গেল এবং সেই ভাবেই আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইয়া পিছনের ছোট কটকটি দয়া স্থলে প্রবেশ করিল।

—চম্পা এড়াইতেছে টুলুকে।

স্থল আজকাল সকালে; বনমালী বোধ হয় এতক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিল, দরজার চৌকাঠে সেটাকে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে যাইবে, চম্পা প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, “তু কেমনটি আছিস বটে গো?”

বনমালী বেশ একটু বাঁধায় পড়িয়া স্থিরনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দিনের বেলায় রাত্রের সমস্ত ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে চম্পাকে চোখের সামনে দেখিয়া সময়টা দিন কি রাত্রি, এ স্বপ্নের চম্পা কি বাস্তব যেন্ গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাহার; একটু ঠাহর করিয়া থাকিয়া বলিল, “চম্পা দেখি তো?”

তাহার পর দুপুরটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া বেশ ভাল রকম অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিল, “এত দুপুরে আইছিস যে?”

“শোন কথা বুড়ার! দুপুরে তো রোজ দিন আইছি; তু কুণায় যেরে বলে থাকিস তাই দেখাটি হয় না।”

—কথাটা বলিয়া খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বনমালী অনেকক্ষণ মাথায় ডান পাশটা টুলকাইল—স্থিতি

খুঁড়িয়া যেন কি বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, হার মানিয়া বলিল, “কুণা যাই গো?”

“তা ভাব ক্যান, তু যাবি আর আমি বুলব?...তুদের সেক্রেটারির বাঁসায় যাস নাই তো? আর কুণায় যাবি?”

বনমালী আবার খননকার্য আরম্ভ করিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, “সিক্রেটারির বাঁসায় কেন যাব গো? কি দরকার আছে বটে?”

তাহার পর ওখানে যে যায় না, তাহার প্রমাণটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল, “আমি উখানে যাই তো কে ভুর খশুরটির সঙ্গে তুর বিয়ার কথ্যাটি কয় গো?...?”

চম্পা একেবারে শিহরিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিল—“আমার খশুর? কে বটে?”

“হ, তুর খশুর। ছিল না—তো হবেক, কথ্যাটি চলবে। এতক্ষণটি তো ছিল গো, তু দেরি করলিস না তো দিখতিস—দিখতিস খশুরকে—কেমন বাবরি চুল, কেমন বৃকের ছাতি; কেমন টানা চোখ; ডান পাটি একটু ছোট বটেক; তা ভুর বরের পা ছোট লম্ব, ভাবনা ক্যান গো? আমি তল্লাস লিইছি, তু সমান পা পাবি বটে...”

নাতনির সঙ্গে রসিকতায় বনমালীর মুখে হাসি ফুটিল, পা লইয়া খশুর আর বরের প্রভেদটা নানা রকমে সরস করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চম্পা কাঠ হইয়া গেছে। ঐ লোকটা, রাত্রি এই পথে এক জন সঙ্গী লইয়া যে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে হন হন করিয়া চলিয়া যায়, এই মাত্রই যে স্থলের দেওয়াল ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া আসিয়া গঞ্জের পথে নামিয়া গেল। বনমালী দুপুরে ম্যানেজারের কাছে যায় কিনা জানিয়া লইয়া ওর কথ্যই কৌশলে তুলিতে যাইতেছিল চম্পা, প্রসঙ্গটা আপনই, আর অদ্ভুত আকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা তাহা হইলে কোন নিগূঢ় কারণে তাহার বিবাহের অভিল্লাষ এখানে জমাইয়া বসিয়াছে। ম্যানেজার যখন বনমালীকে বাসায় ডাকে না তখন এ লোকটি যে তাহারই চর তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। নিজের মূঢ়তায় তাহার একটু হাসিও পাইল—অমন বাহুল্যে ম্যানেজার, তাহাকে সে এত বোকা ভাবিলই বা কি করিয়া যে বনমালীকে দিনের বেলায় বাসায় ডাকিয়া এসব কথা আলোচনা করিতে যাইবে?

এইবার দরকার “খশুর”র রহস্য ভাল করিয়া ভেদ করা। বনমালীকে নিজের রেকর্ড ঘুরাইয়া যাইতে দিয়া চম্পা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল; এক সময় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, “তা খশুরের সঙ্গে তুর রোজ কি কথাটি হয় বটে; তুর তো একটি নাতনি গো?”

বনমালী হাসিয়া বলিল—“লাতজামাইও একটাই হবে বটে তু উর করিস ক্যানো? বিয়ার কথা যে গো লাগ কথাটি

হবেক, তবে তো ? তারা বর, কুল, বিট—ই সবের ধর লিবেক তবে তো ?”

“তাদের বিট তো গেছোঁ। বিট গো, শুনলে কেট বিয়া দিবেক তাই ক’ ?”

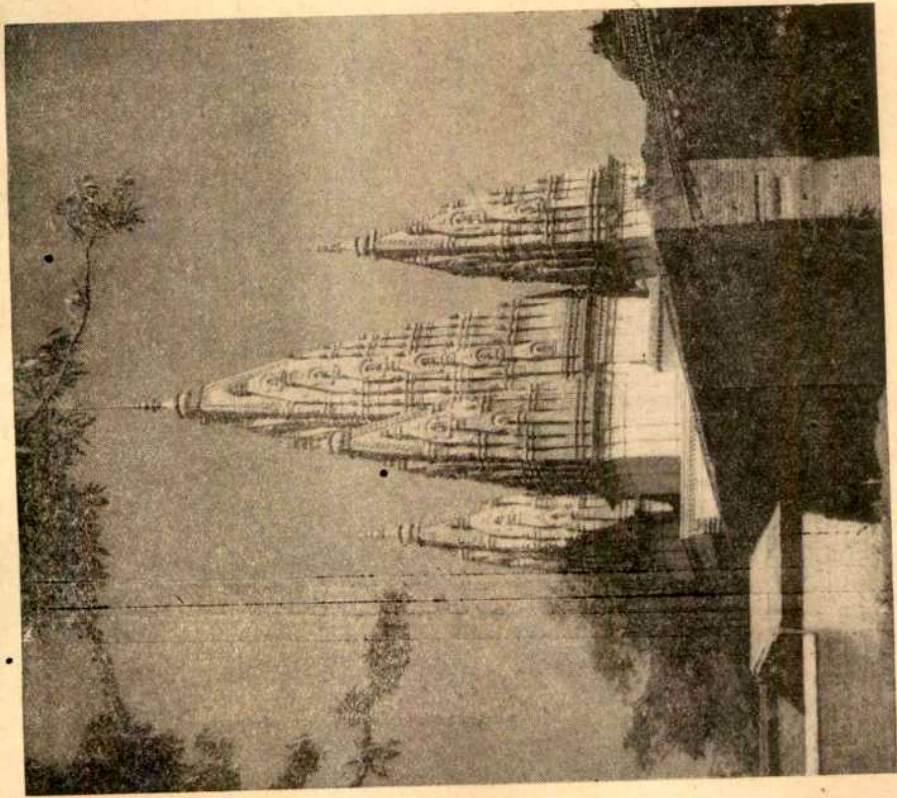
বনমালী একটু কি ভাবিল, তাহার পর কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে যে সে বিবাহের কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেছে বর্ণনা করিয়া চলিল। একটা স্বপ্ন দেখে বনমালী; সেইটাকে চম্পার ভাবী স্বপ্নরের কাছে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। আজই না হয় বনমালী বিষ হারাওয়াটা চোঁড়া সাপ হইয়া বসিয়াছে, নয় তো বিবাহ দিতে দিতে মাথার চুল পাকিল,—বোনদের বিবাহ দিল, চম্পার বাপখুড়া পিসিদের বিবাহ দিল, আর আজ চম্পার স্বপ্নরের কাছে হার মানিয়া যাইবে ?... বনমালী একটা স্বপ্ন দেখে আজকাল,—প্রতি রাতেই সেইটেকে বেশ শুছাইয়া-গুছাইয়া সত্য বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, আরে কত ওসব যা শুনিয়াছ একেবারে তুলিয়া যাও—গেরস্তর মেয়ে, তার সমর্থ মেয়ে, খনিতে গতর বাটাইয়া বাইতে হয়, ও ধরণের পাঁচ রকম কথা রটেই, তা বলি চম্পা কি সেই ধরণের মেয়ে নাকি ? এই তো অর্থব্ধ হইয়াছে, বনমালীর শরীরটা সন্ধ্যা হইতেই বিগড়াইয়া থাকে, তা রোজ সন্ধ্যা হইতেই চম্পা আসিয়া ঠাকুরদাদার হেপাজতে লাগিয়া যায়—রায়া করা, বিছানা পাটি করা, বাওয়ানো, সেক দেওয়া; হুজির সেক—সে সেবা এক দেখবারই জিনিষ। বাড়িতে বাপের জন্ত সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আবার এতটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ঠাকুরদাদার হেপাজত—চম্পার মতন মেয়ে আর হয় নাকি ? এতটা পথ একা আসে শুনিয়া পাছে চম্পার স্বপ্নরের মনে কোন খটকা লাগে বনমালী সে পথও মারিয়া রাখিয়াছে। আরে ছিঃ, গেরস্তর মেয়ে চম্পা—হলধর বোষ্টমের বংশের মেয়ে—মহাপ্রভু যখন স্থল্যবনে যান যে হলধর তাঁর জলের বাড়ি বহিত—সেই চম্পা কি সন্ধ্যার পর এতটা পথ কখনও একা আসিতে পারে ? সঙ্গে থাকে ওর বাপ চরণদাস আর পাঁচ-ছ’ জন তাহার বন্ধু—চম্পার দিকে কেউ চোখ তুলিলে সেই চোখস্থল তার ধড়টা তখন মাটিতে লুটাইতে থাকিবে না ? সমস্ত রাত সবাই এইখানে দেয় পাহারা। অবশ্য পাহারার এত আছেই বা কি ? চম্পা কি সেই ধরণের মেয়ে যে তাহাকে অষ্টপ্রহর পাহারার মধ্যে রাখিতে হইবে ? চম্পার স্বপ্নর ওসব যাচা শুনিয়াছে নিছক মিথ্যা—বদ লোকেদের কিছু একটা লইয়া থাকা চাই তো ? এ সব মিথ্যা রটনা লইয়া থাকে, কি আর করিবে ? রাত্রিটি শেষ হওয়া আর চম্পা বাপ আর তাহার সাথীদের সঙ্গে বসিতে নিজের

বাসার চলিয়া যায়—সেখানকার পাট আছে, তাহার পর খনির কাজ আছে—ই্যা, এ একা মেয়ে। ছু-ছুখান সংসার, তারপর আবার খনিতে ঐ হাড়ভাড়া ঝাটুনি সব একলাটি সামলাইয়া যাইতেছে। আর রূপের কথা ? নিজের নাতনী, কত আর তারিফ করিবে বনমালী—একটু কথাবার্তা অগ্রসর হোক, এইখানেই ডাকাইয়া আনিয়া এক দিন দেখাইয়া দিবে; সব মিলাইয়া বোঁ যে হইবে সে আর দেখিতে হইবে না। বিবাহ যে এত দিন হয় নাই—অথচ এত বয়স হইল—চম্পাই বলে বাপকে কেহ দেখিবার নাই, ঠাকুরদাদাও বুড়া হইল, বিবাহ করিবে না; বোষ্টমের মেয়ে, বিবাহ যে করিতেই হইবে তাহার মানে কি ? আসলে তাহাও নয়, ভাল পাত্র—মানে, চম্পার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না—বাপের ফুরসত নাই, বনমালীও অর্থব্ধ হইয়াছে, শরীরের সে জুং নাই যে বাহির হইয়া একটু হুজিয়া পাতিয়া দেখে এইবার এই ভাল পাত্র পাওয়া গেছে—বনমালীই ছাড়িবে নাকি ? বাড় ধরিয়া নাতনীর বিবাহ দিবে...

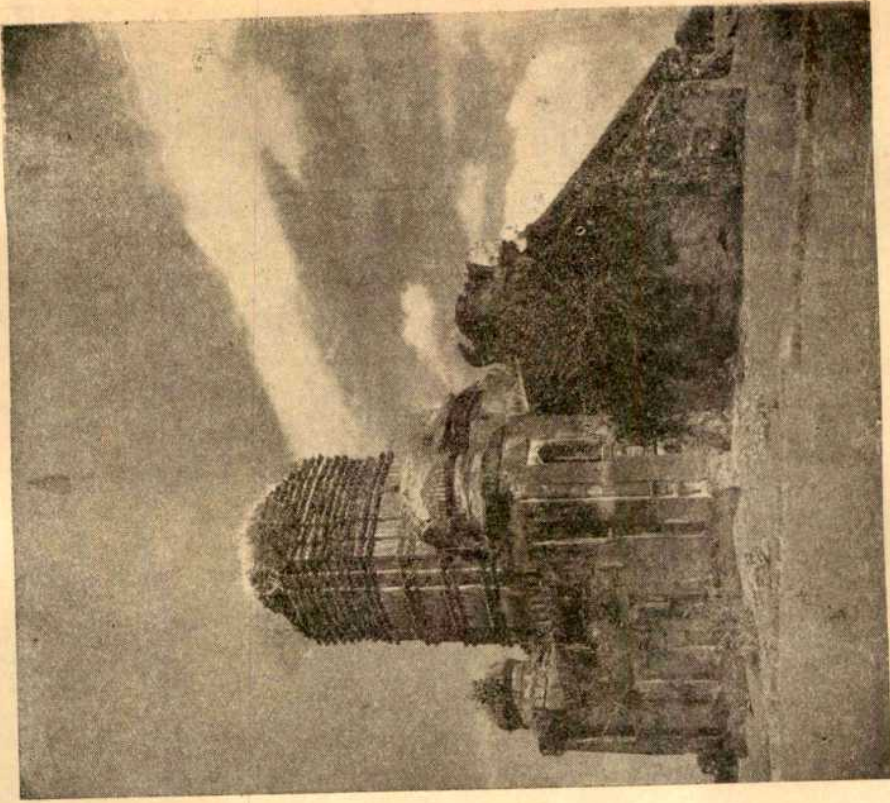
ছেলের বাপেরও খুব তারিফ করে বনমালী—অতিশয় ভাল লোক। ওরকম সচরাচর দেখা যায় না, কত রকম গল্প করে, এদিককার কথা তো আছেই; স্থলের, এমন কি মাঠারমশাইয়েরও, টুঙ্গুরও—যাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই—রোজ খোঁজটুকু লওয়া আছে—কোথায় আছেন মাঠারমশাই, কবে আসিবেন, কোন চিঠি আসে কিনা, টুল সমস্ত দিন কি করে, কি করিয়া ষাওয়া-দাওয়া হয় বেচারীর—চম্পার স্বপ্নর কোন রকম সাহায্য করিতে পারে কিনা তাহাকে—এই সব নানা কথা শুধু টুলবাবুর কাছে বলিতে মানা আছে—বিয়ের কথা পাঁচ কানে তুলিতে নাই কিনা। তা বনমালী চম্পার কাছেই বলিল আর এত দিন ত বলে নাই, আজই বলিল—কথাটা পাকা হইয়া আসিয়াছে ত ? আর চম্পা ত টুল নয়। আর সর্বোপরি কনের ঠাকুরদাদা বলিয়া কি ভক্তি বনমালীর ওপর। আসিয়াই সাষ্টাঙ্গ হইয়া একটি প্রণাম, পায়ের কাছে একতাল বিটুপরের এক নম্র তামাক রাখিয়া—প্রথম দিন, একটি টাকা দর্শনী সমেত...না বিশ্বাস হয় চম্পা নিজের চক্ষেই দেখুক না।

বনমালী উঠিয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া যা কিছু বলিল সমস্তই যেন বাস্তব প্রমাণ হাজির করিতেছে এই হিসাবে বলিতে বলিতে গেল—“হ, তু দেখ না গো, বুলবি ঠাকুরদাদা বুড়া হইছে, মিছা বলছে—ই টাকা দেখ, ই তামাক দেখ গমকে ধরটি মাং কর্যা দিছে বটে।”

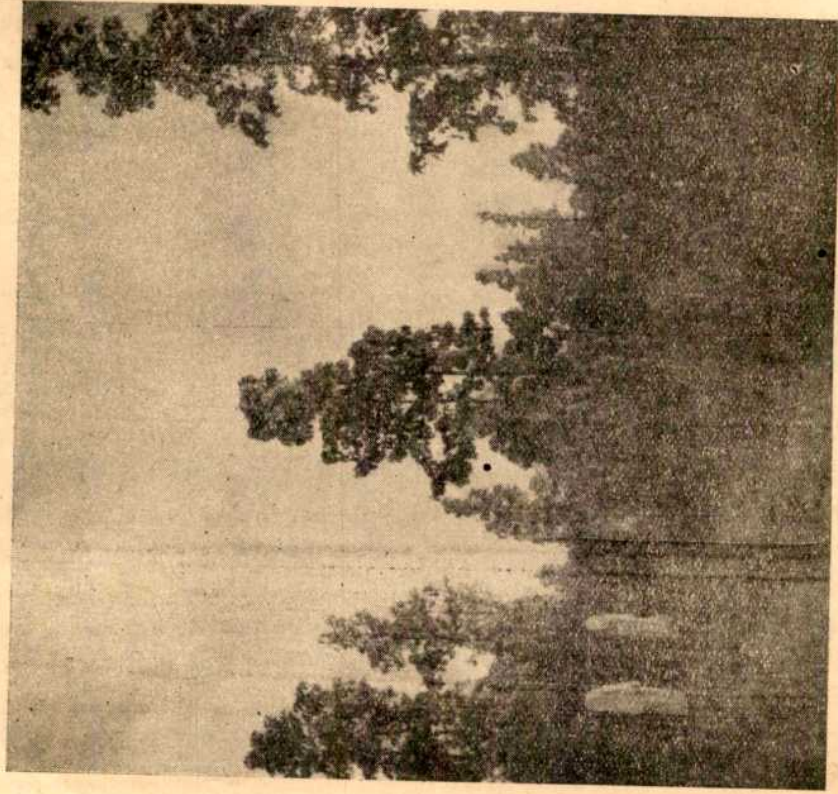
(ক্রমশঃ)



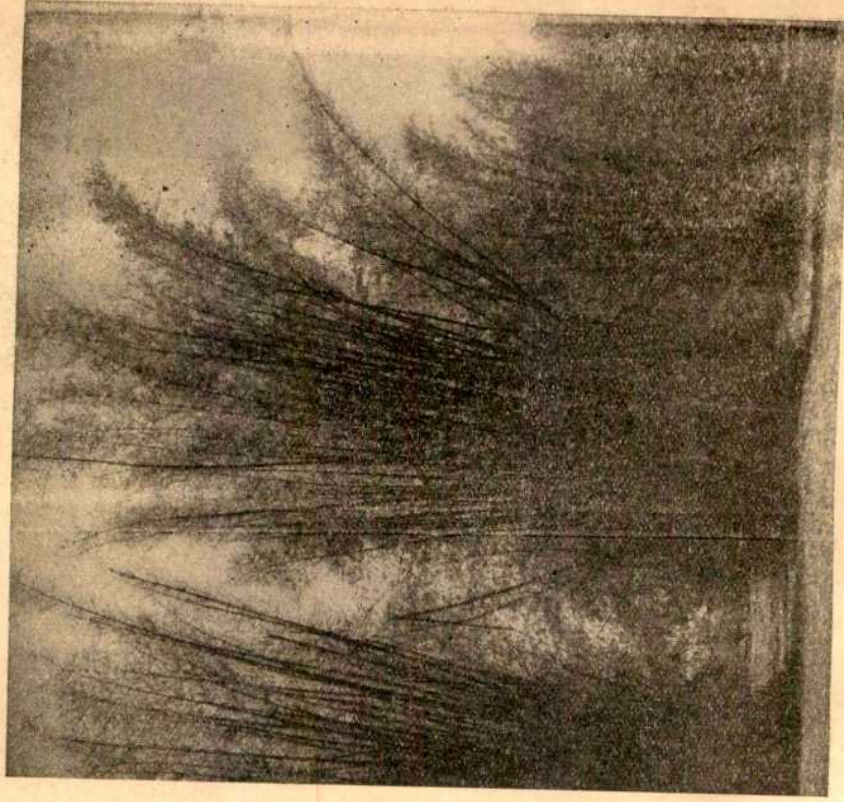
তেলীমন্দির (হাজারিবাগ)



রামগড় হইতে রাজকুশার পথে প্রাচীন শিবমন্দির (হাজারিবাগ)



সোনামুখ নদীপথে (হাজারিবাগ রোড)



বেণুবন (হাজারিবাগ)

হাজারিবাগ ভ্রমণ

ত্রীপরিমল গোস্বামী

(প্রথম পর্ব)

আজকের দিনে অন্ততপক্ষে ইউরোপ ভ্রমণ না লিখলে ভ্রমণ-কাহিনী লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাস করুন, বহুবীর ইউরোপ যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আলোচনা করছিলাম যুদ্ধপিষ্ট মনকে এইবার অন্তত কয়েক দিনের জঙ্কে শহরের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া দরকার। এত দিন কথায় কথায় গতে প্রবেশ ক'রে ক'রে প্রাণ ইপিয়ে উঠেছে, নিয়ন্ত্রিত অন্নবস্ত্রে, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরায়, কয়েদীর মতো জীবন কাটানো গেছে, এবারে মুক্তিদ্রবিস পালন করা দরকার।

মাসতিনেক ধরে আলোচনা করা গেল কোথায় যাওয়া যায়। পৃথিবীর ম্যাপ খুলে ভাল ভাল জায়গা চিহ্নিত করেছি তিন মাস ধরে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে ম্যাপখানা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এল, কোনো জায়গার নাম আর স্পষ্ট পড়া যায় না, তখন ঠিক হ'ল হাজারিবাগ যেতে হবে। যুক্তিগুলো ছিল সবই হাজারিবাগের অঙ্কুলে। কিন্তু সে সব যুক্তির স্বরূপ প্রকাশ করবার আগে আমি এই ভ্রমণ-কাহিনী আদৌ লিখছি কেন তার অঙ্কুলে কিছু যুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সর্বজনপরিচিত স্থানের ভৌগোলিক বিবরণেও অভিনবত্ব থাকবার কথা নয়, অতি পরিচিত পথ-যাত্রাতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্তু আমরা যারা একসঙ্গে এই অতি সাধারণ ভ্রমণ সাঙ্গ করেছি, সেই আমরা বিহারের মাটি-জল-হাওয়া-অরণ্য-পথ-প্রান্তরের সঙ্গে মিশে যদি একটি গল্প রচনা করি, তা হলে তা হবে নিতান্তই আমার নিজস্ব নিবেদন, যা কোনো টাইম-টেবল, গাইড-বুক বা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এটাকে ভ্রমণকাহিনী হিসাবে না দেখে শুধু কাহিনী হিসাবে দেখলে এর মধ্যে অসঙ্গতিও হয় তো কিছু পাওয়া যাবে না।

এই কাহিনীর উপকরণ যোগাচ্ছেন আমার সঙ্গীরা। সুবিধার জঙ্কে তাঁদের নামমাত্র উল্লেখ করছি, এবং এ কাহিনীতে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে দেখা দেবেন না, দেখা দেবেন নৈর্ব্যক্তিক চরিত্ররূপে। তা ছাড়া রাম, শ্যাম, যজ্ঞ, মধু, নামও তো মানুষেরই নাম।

হাজারিবাগ যাওয়া স্থির করলাম তাঁর প্রধান কারণ স্থানটি ইউরোপের মতো বহু দূরে নয়। দ্বিতীয়ত সেখানে র‍্যাশন-প্রথা নেই। তৃতীয়ত হাজারিবাগ রোড স্টেশনের প্রায়-সংলগ্ন একটি দখল-উপযোগী খালি বাড়ি আছে, এবং সে বাড়ির কলকাতা-বাসী মালিক ত্রীযুক্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে সুধাংশুপ্রকাশ ইচ্ছে করলেই চাবি চেয়ে নিতে পারেন। আরও আকর্ষণ ছিল। আমাদের সঙ্গী রবির বাড়ি ছিল হাজারিবাগ শহরে

—আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বিজেনবাবুর বাড়িতে, সুতরাং শহরে গেলেও নিরাশ্রয় হব না এ কল্পনাটি ভাল লাগল।

রোড স্টেশনের খালি বাড়িতে গিয়ে নিজেকেই রান্না ক'রে খেতে হবে এই হ'ল ব্যবস্থা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রাচুর্যের প্রাবল্য বয়ে যাবে, চার্চিলের যুদ্ধকালীন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও হাজারিবাগের মতো জায়গায় গিয়ে হঠাৎ যদি চাল ডাল না পাই এই আশঙ্কায় সুধাংশুপ্রকাশ নির্দেশ দিলেন সঙ্গে অন্তত এক দিনের মতো চাল ডাল ও চিনি নিয়ে যেতে হবে। যাবার তারিখ ঠিক করা হ'ল ১২ এপ্রিল শুক্রবার। সুধাংশু-প্রকাশ রেল-কম্পানির লোকদের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে জেনেছেন শুক্রবার দিন বোধে মেলে ভিড় কিছু কম থাকে। তার কারণ শুক্রবার দিন মাড়োয়ারী সম্প্রদায় নাকি স্থানান্তরে প্রায় যান না।

রাত আটটায় সুধাংশুপ্রকাশ এক ফীটনে চেপে আমাদের বাড়ির সম্মুখে এসে হাজির হলেন। আমি ব্যাগ বিছানা নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি সে এক মহাকাণ্ড। স্ট্রটেকস্ আর তাঁর বিছানার বাড়িতে ইতিমধ্যেই সে গাড়িতে স্থানান্তার ঘটেছে। কোনো রকমে সব ঠেলেঠেলে একটুখানি জায়গা করা গেল। আমার বিছানা ব্যাগ উঠের পিঠের শেষ বোঝার মতো সসঙ্কোচে চাপানো গেল সেই উদ্বেগপ্রকাশের বোঝার উপর।

জিজ্ঞাসা করলাম, “এ সমস্ত কি?”

সুধাংশুপ্রকাশ গম্ভীর সুরে বললেন, “র‍্যাশন, বাসন এবং বসন।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “কত দিনের?”

সুধাংশুপ্রকাশ বললেন, “যথাস্থানে গিয়ে দেখো।”

ট্রেনের মধ্যে ভিড় মোটামুটি ভালই হ'ল, কিন্তু তখনও অসহনীয়। আমি এবং রবি দু'বিছানা এক করে তাতে বসলাম। কিরণকুমার এবং সুধাংশু পৃথক বিছানা ক'রে দু'খানি বেকি দখল করলেন। বিছানা বিছিয়ে নেবার মতো অবস্থা তখনও ছিল। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই ভিড় বাড়ছে, এবং পৌনে দশটায় আমাদের দু'জনের এক বিছানা আধ-বিছানায়, এবং দশটায় সেই আধ-বিছানা সিকি-বিছানায় পরিণত ক'রে দু'জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে চাপা পড়লাম। সুধাংশু এবং কিরণকুমার গাড়িতে উঠেই স্তব্ধ পড়েছিলেন এবং ভান করতে করতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন। যাত্রীরা আশ্চর্য রকমের ভদ্র মনে হ'ল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের মালপত্রের উপর বসে রইলেন, অনেকে

গাড়িতে রইলেন, অনেকে ঘুমন্ত ছুটি যাত্রীর পাশ দিয়ে সার বেঁধে বসে গেলেন, তবু এঁদের উঠিয়ে দিলেন না।

যুদ্ধের শেষ তিন বছরের মধ্যে কখনও ট্রেনে চড়বার সুযোগ হয় নি, শুনেছিলাম ট্রেনে ওঠা যায় না। এতদিন পরে যুদ্ধোত্তর ভিড় দেখলাম। অবস্থা এর চেয়ে তখন কত খারাপ ছিল কল্পনা করা শক্ত হ'ল। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে ট্রেনে, সর্বত্র চরমতম হুর্দশা ভোগ আমাদের জাতিগত শিক্ষা, শুধু আমরা এর প্রতিকার-চেষ্টার অসুবিধাটুকু ভোগ করতে চাই না।

গাড়ি ছুটে চলেছে বোধে মেলোচিত বেগে। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে সুধাংশুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ বোজা অবস্থাতেই নিজের ক্রুতিত্ম স্মরণ ক'রে বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে ডেকে বললেন, “বলেছিলাম না, শুক্রবারে ভিড় কম হয়?” বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। শান্ত্রে একেই বোধ হয় বলে মোহ। আমি তাঁর মোহভঙ্গের চেষ্টা করলাম না।

রবি এবং আমি পাশাপাশি। আমরা দুজনেই ক্ষীণকায়। যাত্রীর চাপে আমাদের উভয়ের দেহাঙ্গি পরস্পরকে বিধতে লাগল, এবং ট্রেনের ঝাঁকানিতে মনে হ'ল যেন তা থেকে খট খট শব্দ হচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করছি যাতে ঘুমের ভিত্তর দিয়ে এই অবস্থাটি উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল আমার ক্যামেরা, সেটাকে কোলের উপর চেপে রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম বসে বসেই। সাফল্যও কিছু লাভ হ'ল। এইভাবে মাঝে মাঝে ঘুমোছি, মাঝে মাঝে জাগছি। গাড়ি বর্ধমান ছাড়বার সময় মনে হ'ল এইবার দম বন্ধ হরে মারা যাব। একখানি গাড়িতে এত ভিড় সত্যিই অসহ্য। কিন্তু নিত্য যাদের গাড়ি চড়া অভ্যাস, তারা এই অবস্থাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পারে ব'লে মনে হ'ল। যেখানে এক ইঞ্চি সরা অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল সেখানে ভিড়-অভ্যস্ত যাত্রীর চলাফেরার কৌশল দেখে বিম্বিত হলাম। ঘটনাস্থল আসানসোল। সেখানে ফেরিওয়ালাদের একজন ‘কেলা’ ‘কেলা’ ক'রে চীৎকার করতেই তার চতুর্গুণ বেশি তীব্রসুরে হঠাৎ আমার পায়ের নীচে থেকে কে ‘কেলা’ ‘কেলা’ ক'রে টেঁচিয়ে উঠল। চেয়ে দেখি একটি মাথা বেরিয়ে আসছে বেকির নীচে থেকে। মাথাকে অনুসরণ ক'রে একটি দেহ বেরিয়ে আসতে লাগল কচ্ছপের ভঙ্গীতে। কি আশ্চর্য কৌশলে ভক্তলোক বেকির নীচে প্রবেশ ক'রে এতক্ষণ ঘুমোছিলেন তা দেখি নি। তিনি বেরিয়ে এলেন আর এক যাত্রীর পিঠের উপর দিয়ে। উঠে দাঁড়ালেন একজনের পায়ের উপর। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আর একজনের পিঠের উপর। তারপর বাংকের শিকল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে শূন্য পথে তিন জন যাত্রীর মাথা ডিঙিয়ে দুখানা পা নামালেন এক জনের ঘাড়। সেখান থেকে দরজা ধ'রে, দরজার পাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কলাওয়লা গাড়িতে ছিল, তাকে বিজ্ঞাসা করলেন, “কোড়া কত?”

“কোড়া চার পয়সা।”

কলা হাতে নিয়ে ভক্তলোক কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললেন, “এই কলা চার পয়সা? দু পয়সা হবে?”

কলাওয়লা কোনো কথা না বলে কলা ফিরিয়ে নিয়ে আবার ‘কেলা’ ধ্বনি তুলে এগিয়ে যেতে লাগল। ভক্তলোকটিও পূর্বভঙ্গীর সবগুলো অহুকরণ ক'রে ফিরে এলেন যথাস্থানে এবং বেকির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটা গুণ্ডগালের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু দেখলাম কোনো যাত্রীই ভক্তলোককে কিছু বললেন না।

আমরা ভোর পাঁচটায় হাজারিবাগ রোডে এসে পৌঁছলাম। ট্রেনের মধ্যে আমরা দেখেছি বাঙালী যাত্রীরা অধিকাংশই হিন্দি বলার বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু ভাল হিন্দি জানি বা না জানি, আমরা বাংলাদেশের মধ্যে থেকেও যে কোনো উপলক্ষ্যে হিন্দি বলবার চেষ্টা করি, বাইরে এলে তো কথাই নেই। সেটা হিন্দি হয় কিনা তা অবশ্য ভাষাভিজ্ঞ বলতে পারেন, কিন্তু সেটা বাংলা নয় ব'লে আমরা তাকেই হিন্দি ব'লে জানি। বাঙালী উড়িয়ায় গিয়ে ওড়িয়াদের সঙ্গেও হিন্দি বলতে চেষ্টা করে, দাঙ্গিলিঙের পথে বাঙালীর সঙ্গেও বাঙালী হিন্দি বলতে চেষ্টা করেছে দেখেছি। সুতরাং হাজারিবাগে এসে এখানকার লোকদের সঙ্গে আমরা যে বাংলা বলব না এ এক রকম নিশ্চিত। রবি কিরণকুমারকে আগে থাকতেই সাবধান ক'রে দিলেন এই ব'লে যে যদি তাঁকে হিন্দি বলতেই হয় তা হলে তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে একটু পরিবর্তন করা দরকার হবে। কারণ তাঁর মুখে ইতিপূর্বে হু-একবার আমরা হিন্দি শুনেছিলাম।

কিন্তু হাজারিবাগে এসে আমরা সুবাই এ বিষয়ে জন্ম হয়ে গেলাম।

যে বাড়িতে এসে উঠলাম, সে বাড়ির রক্ষক বুধনকে আগে থাকতেই চিঠি দেওয়া ছিল। ভোরবেলা আমরা সেখানে পৌঁছে বুধনকে ডাকতে লাগলাম। ডাক শুনে বেরিয়ে এল তার দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এবং তার মতোই আরও দুই ছেলে। রাত্রে এরাই বাড়ি পাহারা দেয়। বুধনের ছেলে আমাদের হাতে খরের চাবি দিল, আমরা গৃহ প্রবেশ করলাম। এদের সঙ্গে হিন্দি বলতে গিয়েই আমরা প্রথম নিরাশ হই। আমাদের কথার উত্তরে তারা প্রত্যেকেই পরিষ্কার বাংলায় সব বলতে লাগল—একেবারে বাঙালী ছেলের মত। অথচ তারা সুবাই বিহারী এবং হাজারিবাগের বাসিন্দা। এর পর থেকে কোথায়ও আর হিন্দি বলবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

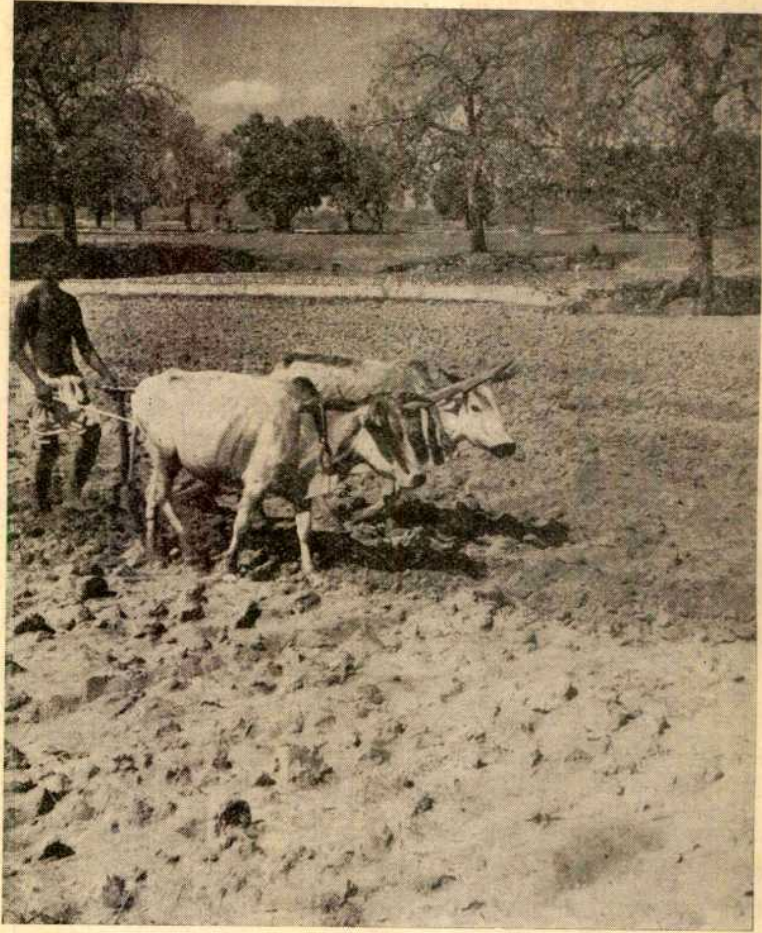
কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা চা খেয়ে এলাম টেশনের স্টল থেকে। তার পর রাত্রির আয়োজন। সুধাংশুপ্রকাশ

তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করলেন। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ডিম রুটি মাখন নানাবিধ মশলা তেল ছুন লঙ্কা ধালা বাটি গেলাস কেটলি চা চিনি জ্যাম জেলি বিস্কুট একে একে বেরোতে লাগল তাঁর স্টকেস আর বিছানার বাগিল থেকে। পর পর জিনিস-গুলো সাজিয়ে রাখতে অর্ধেক-ঘরের জায়গা লাগল। স্টকেসটি যেন গণপতির ম্যাজিক বক্স। তা থেকে সর্বশেষ নিষ্কাশিত হ'ল প্রকাণ্ড একখানা ছুরি।

রান্নার জন্তে বাদবাকী সব জোগাড়ের ভার ছেলে ছটির ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা বেড়াতে বেরুব পরামর্শ করতে লাগলাম। বাড়িটি টেশনের বিপরীত দিকে—কিন্তু মাঝখানে পাহাড়ের মতো রেললাইন বরাবর উঁচু চিবি ধাকাতো স্টেশনটি এখান থেকে দেখা যায় না। স্তরাং ঐ ঘেরা জায়গাটিতে অশুভি বোধ হওয়ায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। প্রায়কাল হওয়া সত্ত্বেও এখানে বেশ শীত করছিল, পথের দুধারের ঘাস শিশিরে ভেজা, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাড়ির পিছন দিকে বুধনের বাড়ি। সেখান থেকে খোলা মাঠের দৃশ্য অতি চমৎকার। সেই দিকে চাষের জমির আলের উপর দিয়ে দিয়ে যেতে বেশ লাগছিল।

ঘটাখানেক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু এই বেড়ানোর ফল হ'ল অতি বিষমকর। প্রত্যেকেই ক্ষিদেয় কাতর হয়ে পড়েছি এরই মধ্যে। বিনাবাক্যব্যয়ে রুটি মাখন ইত্যাদি একেবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের মতো পেটভরে খেয়ে তবে কিছু শান্ত হলাম।

জায়গার গুণে খিদে বাড়ে এটা প্রচলিত কথা। কিন্তু জায়গার গুণ এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের পাকস্থলীতে এমন উগ্রভাবে প্রকট হয় কি ক'রে তা ভেবে দেখবার মতো। একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ডও তো থাকা দরকার। আমার মনে হয়, শুধু জায়গার গুণ বললে অর্ধেক সত্য বলা হয়। কারণ, নতুন পরিবেশে প্রতিদিনের অভ্যস্ত একঘেয়ে জীবনের বাইরে এলে নতুনকৈ গ্রহণ করবার জন্তে ক্ষুধাতুর মন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তারই ফলে দেহমন দুইই সম্পূর্ণ বদলে যায়, দুইয়েরই স্বাস্থ্য ফিরে আসে—এবং একটু বেশি পরিমাণেই আসে নতুনত্বের প্রথম ঝোঁকে। নইলে চারজন শহরবাসী পরিমিত-ভোজী ব্যক্তি তাদের এক দিনের পুরো



চাষের কাজ (হাজারিবাগ)

র্যাশন একবেলায় একেবারে কণাহীনভাবে নিঃশেষ ক'রে ফেলল কি ক'রে? এরই ফলে নতুন জায়গার নৈসর্গিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রহণের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমাদের চার জনের মনে সমগ্র যে ঐকতান বেজে উঠল তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ধ্বনিত ও বিস্তারিত হতে দেখা গেল একই দিকে—হাজারিবাগ রোডের চালের আড়তের দিকে।

ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমরা এসেছি এ খবর যাদের জানবার তারা কি ক'রে জেনে ফেলেছে। কাঠওয়ালী এল কাঠ বেচতে, তরকারিওয়ালী এল তরকারি বেচতে—ঘরে বসে সব মিলতে লাগল এবং আমরা রাত্রের জন্তে সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা করে ফেললাম যা-কিছু দরকার সব কিনে। ভাবনা রইল মাছের, কিন্তু মাছও এসে গেল বাড়ির উপরেই। রুইমাছ দেখে কিরণকুমার উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশ্ন করলেন “সের কেতনা কর্কে?” মাছওয়ালী জবাব দিল, আজ্ঞে একটি মাছ আছে, হুঁসের হবে, আড়াই টাকা লাগবে। পরিষ্কার বাংলা কথা।

তার মানে মাছ-বিক্রেতা বাঙালী; গোমো থেকে এসেছে মাছ বেচতে।

কেরোসিন তেলের জ্বলে দোকানে একখানি আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দিলাম। ঐ সঙ্গে ইংরেজী বাংলা সব রকম খবরের কাগজও কিনতে পাঠানো গেল। তেল পাওয়া গেল, কিন্তু খবরের কাগজের বদলে পেলাম একখানা চিঠি। বাংলায় লেখা। বেশ বড় চিঠি। এজেন্ট লিখেছেন, “আজকের কাগজ পড়া মানে কাল কলকাতায় যা পড়েছেন তাই, সুতরাং কেন অকারণ কাগজ কিনবেন।” এইটাই হ’ল সে চিঠির মূল কথা। এজেন্ট নিশ্চয় ছোকরাদের কাছে শুনেছেন যে আমরা সেই দিনই কলকাতা থেকে এসেছি। কিন্তু তাঁর যে কথাটি লেখা উচিত ছিল তা হচ্ছে এই যে কাগজ সবই ফুরিয়ে গেছে, একখানাও নেই। পরদিন অবশু কাগজ পাওয়া গিয়েছিল।

রান্না শেষ করতে করতে বেলা ছুটো বেজে গেল। রাত্রে জ্বলন্ত মাছ ডাল তরকারি রান্না করে রাখা হ’ল। রান্না শেষে স্নান। ইঁদারার জল কনকনে ঠাণ্ডা। আমার বরাবর গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেই সর্দি, কিন্তু এখানে গরম জলের অল্পবিধা হওয়ায় অগত্যা সেই ঠাণ্ডা জলেই স্নান করতে হ’ল। ইতিমধ্যে পেটে এমন আগুন জ্বলে উঠেছে যে খেতে বসবার আগে স্বাস্থ্যবিধি চিন্তা করবার সময় ছিল না। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক হাঁড়ি ভাত শেষ হয়ে গেল এবং ঐ সঙ্গে রাত্রে জ্বলন্ত মাছ ডাল শেষ হয়েছিল তারও চিহ্নমাত্র রইল না, এবং খাওয়া শেষ করতে না করতে রাত্রে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছিল, বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে জ্বর বৃষ্টি আরম্ভ হ’ল। বাড়ির বাইরে পাহাড়ের জ্বলন্ত দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আশেপাশের বাড়ি-গুলোতে জনমানবের চিহ্ন নেই, এমনি সময়ে রীতিমতো প্রবাস-জনোচিত মনোভাবের উদয় হয়। আবহাওয়া ছিল তার সম্পূর্ণ অঙ্গুল। নিজেকে সত্যিই নির্বাসিত মনে হচ্ছিল সে সময়। সে অহুত্বভিত্তি বেদনা ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল। পাশের বাড়ির একমাত্র পেঁপেগাছগুলোর পাতা দেয়ালের উপর মাথা তুলে বৃষ্টির ছন্দে নাচাচ্ছিল—সমস্ত পার্শ্ব প্রকৃতির মধ্যে তখন ঐটুকুই মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু এমনি সময়েও একটি গভীর নৈরাশ্য একটি মাত্র বৃহৎ প্রস্তরের আকারে সবারই চিত্তকে উতলা করে তুলল, সবারই মনে এক প্রশ্ন—এ বেলা খাওয়া হবে কি?

এমন সময় কোথেকে এক ছাগলশিশু দৌড়ে এসে চুকে পড়ল আমাদের ঘরে। আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হ’ল প্রকাশ করা বাহ্যিক মাত্র। কিরণকুমার এক লাফে বিছানা থেকে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এমন বৃষ্টির দিনে

এই বস্তুই আমরা যেন মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম। মধ্য-কলকাতাবাসী রবি মধ্যাহ্ন-রবির মতো দীপ্ত হয়ে উঠলেন আনন্দের উগ্রতায়। সুধাংশুপ্রকাশ খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন আমি কিন্তু মশলা বাটতে পারব না, কিরণ যদি রাজি থাকে তা হলে রান্না করতে রাজি আছি। রবি বললেন, বুধনকে বললেই সে সব করে দেবে—হত্যা থেকে মশলা বাটা সব।

কাজটা যে এত সহজ তা আমাদের কারও মাথায় আসেনি। তাড়াতাড়ি আরম্ভ পর্ব শেষ করে ফেলবার জ্বলন্ত রবি অধীর হয়ে উঠলেন। এমন সময় বুধনের কণ্ঠস্বর।

“ছাগল বাচ্চাটা গেল কোথায়?”

রাত বারোটায় সেদিন এক বাট ডাল দিয়ে চার জনে এক হাঁড়ি ভাত খেয়েছিলাম, খারাপ লাগে নি কিছু।

পরদিন খুব সকালেই আবার বৃষ্টি শুরু হ’ল, সকালে আর বেড়ানোর আশা রইল না। মেঘ কাটতে কাটতে বেলা দশটা বেজে গেল। কিন্তু হাওয়া ঠাণ্ডা ছিল বলে অত বেলাতেও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বাজারের দিকে। বাজারের চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন, বিশেষ ভাল লাগছিল না, তবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানোতে ক্লান্তিও ছিল না কিছু। বাজার থেকে বেরিয়ে রেল-লাইন পার হয়ে ধানোয়ার রোডের মুখে এসে ঝানিকটা চুপচাপ বসে থাকি গেল। সেখানে বড় বড় গাছের নীচে বিশ্রামেরত কয়েকটি লোককে দেখা গেল—তারা ময়রের পালক বিক্রি করতে যাচ্ছে। সঙ্গে একশটি পালকের এক একটি আঁটি। দাম বলল ছ’টাকা আঁটি। কলকাতায় বোধ হয় ওগুলো একশটি পনেরো বিশ টাকা। শুনলাম ধানোয়ার রোড এখানকার সবচেয়ে প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন পথ। দীর্ঘও কম নয়। কিন্তু তখন আর সে পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বেলা তখন সাড়ে এগারোটো। ফিরে গিয়ে রান্না করে খেতে হবে। বাজার থেকে চাল এবং ডাল আনিতে রাখা হয়েছিল, তরকারি বাড়ির উপরেই কেনা ছিল, মাছ আর সেদিন জুটল না। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

• সাত-আট দিনের জ্বলে বাইরে এসে আমরা সাত-আট মাসের আনন্দ ঐ অল্প দিনের মধ্যে উপভোগ করে নেবার জ্বলন্ত প্রস্তুত ছলাম। প্রথমেই খাওয়া-শোয়ার সময় সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে মনে হতে লাগল যেন আমরা একেবারে নতুন জীবন লাভ করেছি। শুধু হাওয়া পরিবর্তন নয়, সমস্ত অভ্যাসের পরিবর্তন। ছুদিনেই সমস্ত দেহে একটা সজীবতা অহুত্ব করতে লাগলাম—একটা নতুন শক্তি, একটা নতুন কর্মোৎসাহ এবং উৎসাহ, যা এত অল্প সময়ে লাভ করা যায় কিনা জানা ছিল না।

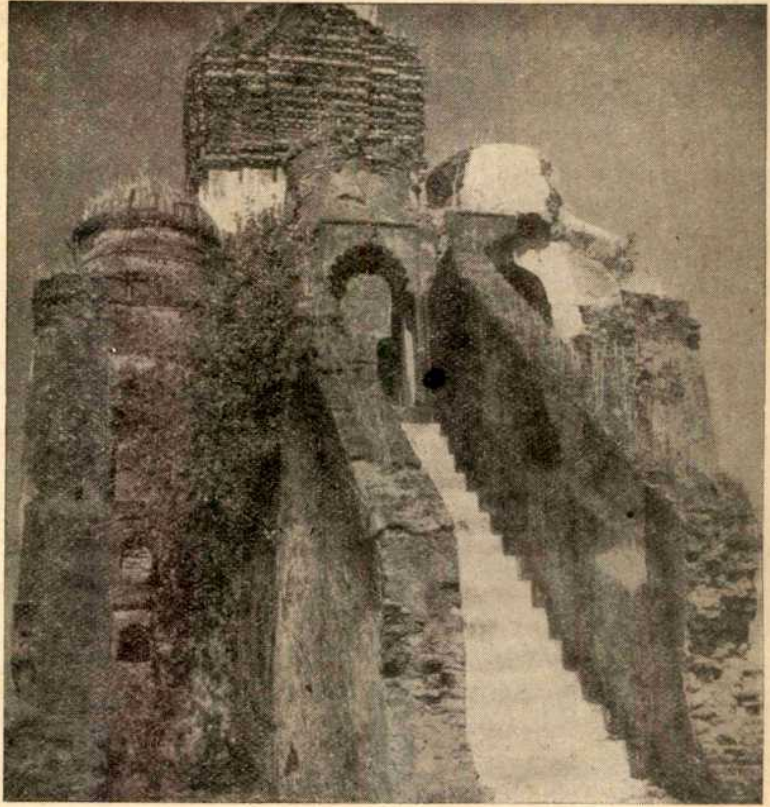
সেই দিন বিকেলে আবার বৃষ্টি। আকাশ গুঞ্জ গুঞ্জ

কালো মেঘে ছেয়ে গেছে।
বিহ্বাৎ সমস্ত আকাশে সাপের
মত খেলে বেড়াচ্ছে। ঝড়
উঠে এল অতি প্রবল বেগে।
এমন প্রবল ঝড় বহুদিন দেখি নি।
সমস্ত আকাশ জুড়ে একটা
করণ ক্ষন্দনধ্বনি—বাঁশির করণ
সুরের মত একটানা বেজে
চলেছে। ঝড়ের গর্জনে, বৃষ্টির
শব্দে, বিহ্বাতের আঁকাবঁকা
শিখায় মন মেতে উঠল। হাজারি-
বাগ রোডের সেই পাকস্থলীপিড়ক
আবহাওয়া সহসা যেন সেই
মুহুর্তে পার্থিব সব কিছুরকে সেই
ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিল। কিরণ-
কুমার বহুকাল পরে চাঁৎকার
করে রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতা
আবৃত্তি করতে লাগলেন।

রাত্রি আটটায় ঝড়বৃষ্টি থেমে
গেল। সুধাংশুপ্রকাশ প্রস্তাব
করলেন এইবার একটা নতুন পথে
বেড়ানো যাক। ষানোয়ার রোড
নয়—অল্প একটা পথ এবং সেই
পথে একটা নদীতে গিয়ে পৌঁছান
যায়। আকাশে ভাঙা মেঘের
কাঁকে কাঁকে চাঁদ দেখা দিচ্ছে—

পথে কিছু কিছু জল জমেছিল—কিন্তু সে অতি সামান্য।
আমরা স্টেশনের ওভারব্রিজের কাছ থেকে সোজা পূব দিকে
রওনা হলাম। দু' মিনিটের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা নতুন
রাজ্য আবিস্কৃত হ'ল সেই পুরানো জায়গায়। এমন অপূর্ব
সুন্দর পথ থাকতে আমরা দিনের বেলা যুধা ঘুরেছি বাজারের
দিকে। পথের দু'ধারে বাড়িগুলো ছবির মত সাজানো। চাঁদের
আলোয় বাড়ির গায়ে লেখা নামগুলো পড়া যাচ্ছিল, সমস্তই
বাংলায় লেখা, বাঙালীদের বাড়ি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই
লতাকুঞ্জ, ফুলের গাছ এবং দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের সারি,
সেই ঝাপসা চম্ভালোকে অপরূপ মনে হচ্ছিল। এই দূর দেশে
এত বড় একটা বাংলা পথে চলতে মন পুলকিত হয়ে উঠল।

পথের শেষে একটা বাক ঘুরেই উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে
পড়লাম। উঁচুনীচু জমি। পথের ধারেই গভীর খাল, বর্ষায়
স্রোত বয়ে যায় তার ভিতর দিয়ে। বহু দূর বিস্তৃত প্রান্তর,
ঘন জঙ্গলপূর্ণ। যে পথে চলছিলাম সে পথটি বেশ প্রশস্ত,
গোরুর গাড়ির চাকার চাপে গর্ত হয়ে তাতে জল জমেছে।
রাত্রি নটা, পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য। যত এগিয়ে চলেছি ছোট
ছোট শালগাছের ভিতর দিয়ে, ততই যেন জঙ্গলের গভীরতা
বাড়ছে। আবহা চাঁদের আলোয় সমস্ত জগৎ স্বপ্নাচ্ছন্ন।



শিবমন্দিরের নিকট-দৃশ্য (হাজারিবাগ)

আমরা অবিরাম এগিয়ে চলেছি, কিন্তু পথের শেষ কোথায়?
কিন্তু শেষ না থাক আমরা চলা থামাব না, আমাদের মন সেই
স্বপ্নে ডুবে গেছে, আমরা যেন দুমস্ত অবস্থায় হেঁটে চলেছি
জনহীন অরণ্যপথে।

রবি বললেন, “এই দিকটায় খুব বাধা চলাফেরা করে সেই]
জগে এ সময়ে এ পথে কেউ চলে না।”

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। চাঁদের আলো দ্রুত মলিন হয়ে এল
আমাদের চোখে। বিনা বাক্যব্যয়ে উণ্টো দিকে ফিরলাম।
কিন্তু এ পথের মায়া মনকে অধিকার করেই রইল সর্বক্ষণ
এবং পরদিনই বিকেলে আবার রওনা হলাম সেদিকে। সোনা-
হুত বা স্বর্ণহুত নদী আমাদের লক্ষ্যস্থল হ'ল। পূর্বদিন জ্যোৎস্নার
আলোয় পথের ধারে বাড়িগুলোর যে সৌন্দর্য দেখেছিলাম,
দিনের আলোয় আর তা তেমন অপূর্ব সুন্দর মনে হ'ল না।
সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষবস্তুর প্রায় থাকে না।
সব বস্তুই অবশ্য একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য-
স্বপ্নিতে বস্তু যেখানে মনের উপকরণমাত্র, তার বিস্তৃত উপকরণ-
রূপের মধ্যে মনোহারিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

আমরা এই পথের শেষে একটা বাক ঘুরে যখন অরণ্য-
পথে গিয়ে পড়লাম সে আর এক অভিজ্ঞতা।

উঁচু নীচ জমির উপর দিয়ে, ছোট ছোট শালগাছের মধ্যে দিয়ে, সম্পূর্ণ কাঁকা জায়গায় এসে উঠলাম। বহু দূর সমতল ভূমি, প্রকাণ্ড পথ। পথের পাশে জোড়া অশ্ব গাছ। পথের ডান দিকে যে অরণ্য ছিল একটু দূরে, ক্রমেই তা কাছে এসে পড়ল, এবং আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘন অরণ্যে প্রবেশ করলাম। সে পথও বেশ পরিচ্ছন্ন। দুধারের কোপও খুব নিবিড় নয়, পথের দুধারে ছোট ছোট কুলজাতীয় কাঁটা গাছ। প্রকাণ্ড যে পথটি আমরা ছেড়ে এলাম সে পথ দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সে পথের শেষে দিগন্ত-বলয় ঘিরে সবুজের সমুদ্র। দূরে ছোট ছোট পাহাড়। কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। যদি সেই জনহীন শব্দহীন স্থানে বসে কেউ কল্পনা করে সে লক্ষ বছর পূর্বের পৃথিবীতে ফিরে গেছে তা হলে তা অসম্ভব মনে হবে না। কালের চিহ্নহীন প্রকৃতির উদার বৃকে এই সীমাহীন মুক্তি মনকে অভিভূত না করে পারে না। বিশ্ব কি বিরাট, আর তার বৃকে মানুষ কত ছোট, কত অসহায়, এই বিস্মৃত সত্য এমন অবস্থায় হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শহরে থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে চার দিক দেখে শুনে হিসেব করে এক এক ধাপ এগিয়ে চলি, একটু অহমমগ্ন হবার উপায় নেই, প্রতি পদে ধাক্কা সামলে চলতে হয়, এবং এই নিয়ন্ত্রিত চলাই আমাদের প্রকৃতিগত। কিন্তু এখানে কোনো বিধিনিষেধ নেই, পথে শুয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক, অথবা ছুটোছুটি করে বেড়াও কেউ ঘণ্টা বাজাবে না; কোথাও কোনো নোটিস নেই—একেবারে দিগন্তবিহীন স্বাধীনতা। এ রকম অবস্থা হঠাৎ কল্পনা করাই কঠিন। বিশ্বপ্রকৃতির এমন উদার রূপ সমস্ত সত্তা দিয়ে ঠিক এমনভাবে আর কখনও উপলব্ধি করি নি, শালবনের এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যেও আর কখনও প্রবেশ করি নি।

সূর্য প্রায় অস্তগামী, সমস্ত পরিমণ্ডলে এক অনির্বচনীয়

প্রশান্তি। আমরা সবাই নীরবে এগিয়ে চলেছি স্বর্ণস্রুত নদীর দিকে। নদীটি এ সময়ে একটি ক্ষীণকায় ধারামাত্র। বর্ষায় এর যতখানি বিস্তার হয় ততখানির জন্তে বিছানা পাতা আছে। নদীপথ-রেখা শালবনের বৃক চিরে এঁকেবেঁকে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ক্যামেরাটি সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যের এই অমুহূর্তসাপেক্ষ সৌন্দর্যে ছবি নেবার মতো দুঃসাহস তার হয় নি। অরণ্যে প্রথম প্রবেশ-পথেই একখানি ছবি নিয়ে-ছিলাম।

কিছুক্ষণ চূপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম সেখান থেকে। বেরিয়ে এসে খোলাপথের ধারে একটু না বসে পারা গেল না। সৌন্দর্যের অতিভোজে মন আমাদের অবসন্ন। সে অবস্থায় শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমরা একেবারে শুয়ে পড়লাম সেখানে।

কাঠবোঝাই গোরুর গাড়িগুলো সমস্ত দিনের শেষে ঘরে ফিরছে। চাকা ঘোরার সঙ্গে এক রকম তীক্ষ্ণ করণ একটানা শব্দ হচ্ছে তা থেকে। মজুরের দল কাঠকাটার কাজ শেষ করে দূর অরণ্য থেকে ফিরছে দলে দলে। এদের ঝাপসা মূর্তি আকাশের বৃকে আঁকা হচ্ছে একের পর এক। মেঘের বাধা কাটিয়ে চাঁদও দৃশ্যমান হয়ে এল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলাম এখানে শুয়ে। দূরে বিলীয়-মান গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ তখনও কানে আসছে। মজুরেরা তখনও ঘরে ফিরছে সে পথে। তাদের কোলাহল, গাড়ির চাকার করণ শব্দ, এখানকার জল-মাটি-আলো-হাওয়ার সঙ্গে একমুহুরে বাঁধা। আমরা এখানে বেহরো। আমাদের শহরে পোষাক যেন এখানকার সহজ সুরের তাল কেটে দিচ্ছে।

এই উপলব্ধি সেদিনকার সত্য উপলব্ধি।

এখানকার বাতের ভয়ও অত্যন্ত সত্য।

(আগামীবারে শেষ পর্ব)

কান পেতে শুনি

ত্রিহিরণ্ময় তরফদার

পার্থের ঘুম এখনো কি ভাঙে নাই ?
কুফার বেগী ধুলায় লুটায় রবে।
'নিজবাসভূমে পরবাসী' দাস হ'য়ে,
দাবির অর আজো খুঁটে খেতে হবে ?

ভুলের ফসল অনেক হয়েছে বোনা ;
লাভের কোঠায় ভুমল পড়েছে বাকি।
কাঁকির কাঁকেতে হাঁহুর লুটিল সোনা—
কুরুকুল সাথে এখনো আপোষ নাকি ?

পাশার চালেতে রাজনীতি চালে যারা :
এখনো করুণা গলিছে তাদের তরে ?
চল্লিশ কোটি দমিচীর কঙ্কালে
দেখো নি বজ্র কি জ্বালায় জ্বলে মরে ?

জলুক ; জলুক ; আরো হোক দাউ দাউ—
সূর্য সাগর জানি হবে থৈ-থৈ।
কান পেতে শুনি কোন্‌দারের কোলাহল :
কুরুক্ষেত্র অদূরে ঘনায় ওই !!

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৪৩-১৮৯১

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম

১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর (১৬ কার্তিক ১২৫০) তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত (বর্তমান যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অধীন) বাগআঁচড়া গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষা; বিবাহ

ছয় বৎসর বয়সে গ্রামস্থ পাঠশালায় তারকনাথের হাতে-খড়ি হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি মাতৃহীন হন, কিন্তু মাতার অভাব তাঁহার জেঠাইমা-ই পূরণ করিয়াছিলেন। তারকনাথ পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া দশ বৎসর বয়সে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র অধিকাচরণের ভবানীপুরের বাসায় থাকিয়া স্থানীয় লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন।

ছাত্রাবস্থায় ১৪ বৎসর বয়সে তারকনাথের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—নিস্তারিণী দেবী, ২৪-পরগণার টোড়া-নিবাসী রাজনারায়ণ চক্রবর্তী নামে এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারকনাথ লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দ টাকা জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।*

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তারকনাথ পিতার ইচ্ছানুক্রমে ডাক্তারি শিখিবার জন্ত মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিক্যাল কলেজে তখন দুইটি বিভাগ ছিল; একটি বাংলা-বিভাগ, অপরটি ইংরেজী-বিভাগ। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইত। তারকনাথ বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন বলিয়া বিনা-বেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছেন,—

“আমি ও তারকবাবু ঘোবনে কলিকাতা* হিন্দু হোস্টেলে থাকিতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতাম, তারকবাবু মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন। তারকবাবুকে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পুস্তক পড়িতে অতি অল্প সময়ই দেখিতাম। তিনি অধিকাংশ সময়েই হয় ডিক্লেয়ার কোন উপস্থাস, না হয়

মেকলে কিম্বা গিবনের ইতিহাস পড়িতেন। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। একজ্ঞ আমরা অনেক সময়



ডাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্রূপ করিতাম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে রাসবিহারী (তার রাসবিহারী ঘোষ) তারকবাবুকে বলিতেন, তুমি ডাক্তার হবে, তোমার ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ার দরকার কি? তারকবাবু বলিতেন, সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল। এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি বায়ুনের ছেলে তোমাদের কাজ হচ্ছে তিনটি—উহুনে ফুঁ, কানে ফুঁ ও শাঁকে ফুঁ।”*

পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তারকনাথ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এল্. এম্. এস্. উপাধি লাভ করেন।

সরকারী চাকুরী

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারকনাথ ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে অতিরিক্ত অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জন-রূপে সরকারী কর্মে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিনি এই কর্ম খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ পদে কোথায় কত দিন কাজ

* General Report on Public Instruction...for 1863-64, Appendix C.

* ব্রজেনচন্দ্র নন্দী : “তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়”—‘সাহিত্য’, আশ্বিন ১৩২৯।

করিয়াছিলেন, সরকারী বিবরণের সাহায্যে তাহার হিসাব দিতেছি :—

স্থান	পদ	নিয়োগকাল
কলিকাতা	ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব সিভিল হস্পিটালের নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত (Supernumerary) অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী) ... ৬ জুলাই ১৮৬৯	
দাখিলিং	দাখিলিং-কেন্দ্রের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ভ্যাকসিনেশন্ (অস্থায়ী) ... ১৯ জুলাই ১৮৭১	
এ	ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ভ্যাকসিনেশন্ ... ৩০ অক্টোবর ১৮৭২	
জলপাইগুড়ি	অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন (৩য় শ্রেণী) ডিসপেনসারি ... ১৪ আগষ্ট ১৮৭৭	
যশোহর	এ (৩য় শ্রেণী) দাতব্য ঔষধালয় ... ২৮ মে ১৮৭৮	
এ	এ (২য় শ্রেণী) এ ... ১৩ নবেম্বর ১৮৭৯	
শাহাবাদের	এ এ বক্সার সেনট্রাল জেলের চিকিৎসক ... ১৪ জানুয়ারি ১৮৮২	
বক্সার	এ (১ম শ্রেণী) এ ... ১৬ মে ১৮৮৭।*	

‘স্বর্ণলতা’ রচনা

তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে বক্সিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশিত হয় (ইং ১৮৬৫)। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ রোমাল। বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ রোমাল পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

“এছকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বহুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বক্সিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন এছকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক এছকার মারা যাইতেন। বিস্ময়কর তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই লঘুপতনক জায়শাত্তরের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বক্সিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্বে এক যবনতনয়ার

মুখে হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় মুসল্য জাতীয় কামিনী-গণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।” —‘স্বর্ণলতা’, ২য় পরিচ্ছেদ।

বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বাঙালী সমাজের চিত্র অঙ্কনের সর্বত্র এই সময়ে তারকনাথের মনে উদ্ভিত হয়। এই সর্বত্র তিনি অদূর ভবিষ্যতে কাঁথ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ভ্যাকসিনেশন্-সুপারিন্টেন্ডেন্ট-রূপে তারকনাথের কার্য ছিল—উত্তর-বঙ্গের জেলাগুলি পর্য্যটন করিয়া অধীন কর্মচারী-বর্গের কর্মের তত্ত্বাবধান করা। এই উপলক্ষে তাঁহাকে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত দেখাশুনা ও মেলামেশা করিতে হইয়াছে; তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উদ্যম ‘স্বর্ণলতা’ উপন্যাস প্রধানতঃ এই অভিজ্ঞতারই ফল। কি অবস্থায় ‘স্বর্ণলতা’ রচিত হয়, সে-সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

“সরকারী কাঁথ্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী ঘোটে না, স্ততরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এই-রূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।”

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই ‘স্বর্ণলতা’ রচনা শেষ হয়। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই যে বাস্তব ভিত্তির উপর গঠিত, তারকনাথের ডায়েরি বা দৈনন্দিন-লিপিতেও তাহার উল্লেখ আছে; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

Finished my tale in the evening at about 8 p.m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends for ever. Monday, 7th July, 1873.

Some characters of my novel are from the real life. . . . My friend Suresh and Pareshe two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July 1873.*

তারকনাথ ও ‘জানাহুর’

‘স্বর্ণলতা’র প্রথম খণ্ড ত্রীকৃষ্ণ দাস-সম্পাদিত ‘জানাহুর’ পত্রের প্রথম বর্ষে (আশ্বিন ১২৭৯-ভাদ্র ১২৮০, ইং ১৮৭২-৭৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; রচনায় লেখকের নাম ছিল না। ‘জানাহুর’ রাজশাহী বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত হইত; তথায় ত্রীকৃষ্ণ দাসের সোনা-রূপার দোকান ছিল। তারকনাথের প্রভাবেই তিনি পত্রিকাখানি প্রচার

* History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal, July 1891.

* ‘তারকনাথ গদ্যোপাখ্যান’—‘সাহিত্য’, কাল্কট ১৩২৯।

করিয়ছিলেন। প্রথম বর্ষের ‘জ্ঞানাকুর’ দৈনিক (ইংরেজী-বাংলা) ছিল; ইহার প্রথম দুই সংখ্যা স্থানীয় মুদ্রায় মুদ্রিত হয়। তারকনাথের নিয়মিত সাহায্য ও সুপরামর্শে ‘জ্ঞানাকুর’ অচিরে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। এই ‘জ্ঞানাকুর’ের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা—‘বনফুল,’ ‘প্রলাপ’ ও প্রথম গল্প-রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল (৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ ঞ্চব্দ)। তারকনাথের নির্বাহাতিশ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে ‘জ্ঞানাকুর’ের জুই তাঁহার ‘কল্পতরু’ রচনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ ছিলেন তারকনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, উভয়ে একই বৎসরে এনট্রান্স পাস করেন। ১৮৭১-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রনাথ দিনাজপুরে ওকালতি করিতেন। কার্যব্যাপদেশে দিনাজপুর যাইতে হইলে তারকনাথ অগ্রে বন্ধুকে দর্শন দিতেন। ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

“১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জিলিং বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব বাকসিনেশন্স আমার প্রিয় সুহৃদ ‘স্বর্ণলতা’ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। ‘স্বর্ণলতা’র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের ‘জ্ঞানাকুর’ পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং ‘জ্ঞানাকুর’ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি ‘কল্পতরু’ লিখি।... ‘কল্পতরু’ রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন; তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধ উপস্থিত হইল,—পুস্তক ‘জ্ঞানাকুর’ প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটবেন, হয়ত আমিও চটব; প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অগ্রিয় কার্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু “ন যমৌ ন তসৌ” হইলেন। এজন্ত আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম; প্রায় ৫৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, ‘কল্পতরু’ উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা “ব্রহ্মের” নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা ‘জ্ঞানাকুর’ প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, ‘কল্পতরু’ ফিরিয়া পাইলাম।” (‘বঙ্গভাষার লেখক,’ পৃ. ৭৫৪-৫৫)

‘স্বর্ণলতা’র কল্যাণে ‘জ্ঞানাকুর’ের গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ‘স্বর্ণলতা’ই ‘জ্ঞানাকুর’ প্রকাশিত তারকনাথের একমাত্র রচনা নহে; তাঁহার গল্প-প্রবন্ধাদি আরও অনেক রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তারকনাথ কাব্যানুরাগীও ছিলেন; ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ এক সময়ে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা তাঁহাকে আনন্দ দান

করিত। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সরকারী কার্যে কলিকাতা হইতে বন্ধুবান্ধবহীন স্মরণ প্রবাসে আসিয়া প্রথমটা তিনি নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে করিতেন। “প্রিয়জন-বিরহে তারকনাথ আলেকজান্ডার সেন্‌স্‌কারের বিজ্ঞোক্তির অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতা ‘জ্ঞানাকুর’ প্রকাশিত হইয়াছিল। তারকনাথ লিখিতেছেন :—

কোথা বিজনতা তব সে মোহন বেশ—
যে বেশ ধারণ করি, কবি-চিত্ত লও হরি
এবে কেন কিছু তার নাহি দেখি লেশ ?”*

একবার তিনি বন্ধুগৃহে এক গানের মঞ্জলি সে বিদ্যাসুন্দরের “নাতনি তোর জুড়ে ভেবে ভেবে বাঁচি নে” সুরে সদ্য-সদ্য একটি গান রচনা করিয়া উকীল-প্রধান শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করিয়া ছিলেন। গানটি এইরূপ :—

মঞ্জল তোর জুড়ে ভেবে ভেবে বাঁচি নে।

পঞ্চপানে চেয়ে থাকি তবু ভূই আসিস নে ॥

ভাবি বুঝি অথ বাড়ী গেলি তুই আমার ছাড়ি

আমার বুঝি উঠনে হাঁড়ি জীবনে আর চড়ে না ॥

‘কল্পলতা’ সম্পাদন

সরকারী কার্যে যশোহরে অবস্থানকালে তারকনাথ নিজে ‘কল্পলতা’ নামে একখানি মাসিক-পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ভবানীপুর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত। ‘কল্পলতা’র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস। আমরা এই মাসিক-পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখি নাই; তবে ইহা যে তৃতীয় বৎসরেও (ইং ১৮৮৩) পদার্পণ করিয়াছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত তালিকায় তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। ‘কল্পলতা’র তারকনাথের ‘হরিশে বিষাদ’ উপন্যাসখানি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

‘স্বর্ণলতা’র সাক্ষ্যে উৎসাহিত হইয়া তারকনাথ আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। স্বর্ণলতা (সামাজিক উপন্যাস)। ১২৮১ সাল (২৮ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃ. ২৭৫।

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ‘ক্যালকার্টা রিভিউ’ ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে

* ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা,’ পৃ. ৫৮।

† সুরেশচন্দ্র নন্দী : “তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়”—‘সাহিত্য’, ফাল্গুন ১৩২৯।

লিখিয়াছিলেন—‘স্বর্ণলতা’ই বাংলায় একমাত্র ষাঁট উপভাস ; বঙ্কিমের বইগুলি উপভাস নহে,—কাব্য ।

“This is the only true novel we have read in Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels.”

‘স্বর্ণলতা’ একাধিক বার ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ।

২। **ললিত সৌদামিনী** (গল্প) । ১২৮৮ দাল (১৬ এপ্রিল ১৮৮২) । পৃ. ৪৪ ।

ইহা প্রথমে ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা ‘জ্ঞানদূর ও প্রতিবিম্ব’ প্রকাশিত হয় ।

৩। **হরিষে বিষাদ** অথবা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপভাস । ১২৯৪ দাল (২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭) । পৃ. ৩৩৮ ।

৪। **তিনটি গল্প** । ললিত সৌদামিনী, সুখ ও দুঃখ এবং নিধিরাম । ১২৯৫ দাল (২৭ অক্টোবর ১৮৮৯) । পৃ. ৯৪ ।

৫। **অদৃষ্ট** (সামাজিক উপভাস) । ১২৯৯ দাল (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯২) । পৃ. ৩১৫ ।

বিধিলিপি (উপভাস) :—প্রমদাচরণ সেন-প্রবর্তিত ‘সখা’র (মার্চ ১৮৯১-সেপ্টেম্বর ১৮৯১) এই উপভাসখানির যষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । তারকানাথের মৃত্যুতে ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় ।

রঙ্গালয়ে স্বর্ণলতা

তারকনাথের জীবিতকালে কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়ে ‘স্বর্ণলতা’র নাট্য-রূপ—‘সরলা’ প্রদর্শিত হয় । ‘স্বর্ণলতা’র প্রথমার্ধ অবলম্বন করিয়া রসরাজ অমৃতলাল বসু এই নাট্য-রূপ রচনা করেন । ঠাঁর থিয়েটার কর্তৃক ‘সরলা’র প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে । অপরেণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ‘রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর’ পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

“এই সরলা নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা যুগান্তর আনে । ইহার পূর্বে এরূপ ধরণের সামাজিক নাটক বাংলার কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই । সরলার অভিনয় প্রায় এক বৎসর সমান ভাবেই চলিয়াছিল, এবং ঠাঁর-সম্প্রদায় এই পুস্তকে প্রভুত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন ।” (পৃ. ১১২)

“এ পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপভাস নাটকাকারে পরি-বর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্ণীয় তারক-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ ভিন্ন কোন উপভাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ।” (পৃ. ১৪৯)

পত্নীবিয়োগ ; মৃত্যু

পেশ-জীবনে তারকনাথ জীপুত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া বক্সারে বাস করিতেছিলেন । এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় ।

“তারকনাথ ‘স্বর্ণলতা’তে বিধুব্রমণের যে চিত্র আঁকিয়া-ছিলেন সেই চিত্র তাঁহার-বৃহৎ কুটুম্বা উঠিল । তারক-নাথের পত্নী স্নানরী-ছিলেন না বলিয়া তারকনাথ কোনো দিন তাঁহাকে লইয়া স্ত্রী-হইতে পাদেন নাই । এবং অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে দেশে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন । বহুদিন পরে বক্সারে তাঁহাদের মিলন হইয়াছিল । কিন্তু অতঃপূর্বে সরলা যেমন বিধুব্রমণকে দেখিবার জন্য প্রাণ ধারণ করিয়া ছিল তেমনি তারকনাথের পত্নী অল্পকাল বক্সারে বাস করিবার পর পতিপুত্র পক্ষাতে কেলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন । ইহার পর তারকনাথের পিতৃবিয়োগ হইল । মানসিক অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত তারকনাথ পুনরায় স্ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।” (ইন্ডু-প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা’, ১৩১৪ সাল, পৃ. ৫৯)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে পক্ষাঘাত রোগে তারকনাথের মৃত্যু হয় । বক্সারের বিখ্যাত রামসেখা-বাটে তাঁহার নখর দেখ বিলীন হইয়াছে ।

তারকনাথ সদাপ্রহু, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন—সর্বো-পরি ছিলেন রহস্যপূর্ণ । প্রভাতকুমার লিখিয়াছেন :—

“চলিশ বৎসর বয়সের পূর্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটয়াছিল; কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই । কেহ এ বিষয়ে অহরোধ করিলে বলিতেন—“ক্ষেপেছ; বুড়ো বয়সে কি যুদ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি ক’রে যাব?” যুদ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম, জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আঙড়াইতেন :—

যুদ্ধমৎ সক্তিদানমৎ প্রিপত্য প্রণীয়েতে ।

যুদ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃত্যে ময়া ॥

তিনি বড় বড় গবর্ণমেন্টের কর্মচারী অপেক্ষা সামান্ত বেতনভোগী কেরাগী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অহরন্ত থাকিতেন । বলিতেন, ডেপুটি, মুনসিফ, লবজজ্ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহকারী । ‘হরিষে বিষাদে’ তাক্তার বাবুর বাগীতে নিমজ্জিতা মহিলা-মহলে এক কোন্সল বাধিয়াছে । মুনসিফ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,—“তেপুটি আবার হাকিম; আরতুলা আবার পাণ্ডা—আ আমার পোড়া কপাল ।” (‘দাসী’, আগষ্ট ১৮৯৬)

তারকনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র ‘আলালের ঘরের ছালালে’র সমালোচনা করিতে বলিয়া বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্যারীচাঁদ চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী লেখক যিনি বৈদেশিক বা ভিন্ন-ভাষার সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতেই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । প্যারীচাঁদ মিত্র সামাজিক চিত্র মাত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, উপভাস রচনা করেন নাই ।

বদেশ ও বসমাক হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপভাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ‘স্বর্ণলতা’ই বাংলা দেশের প্রথম সামাজিক উপভাস। এই একটি যাত্র উপভাসের দ্বারাই তারকনাথ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কবি থে য়েমন তাঁহার বিখ্যাত ‘এলিজি’ কাব্যের সাহায্যে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে চিরদিনের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তারকনাথও তেমনি তাঁহার ‘স্বর্ণলতা’র সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইটাই তাঁহার প্রথম রচনা। বিশ্বব্রহ্মের বিষয় এই যে, তাঁহার পরবর্তী আর কোনও রচনাই স্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারে নাই।

‘স্বর্ণলতা’ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী সমাজকে হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, সমাজের অনেক গ্লানি ও কালিমা দূর করিবার সহায় হইয়াছে। সেকালের ঈর্ষাদিপঙ্ক কলহপরায়ণ কুসংস্কার-মণ্ডিত সমাজের এমন বাস্তব জীবন্ত চিত্র আর কেহ তেমন

ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ তাঁহার জীবনীর মধ্যেই হুঁজিয়া পাওয়া যায়—তিনি তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন হইতে এই উপভাস রচনা করিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন, যথার্থভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভা তাঁহার ছিল। ‘স্বর্ণলতা’র বাস্তব অভিজ্ঞতার এই সূত্রে প্রয়োগ ঘটয়াছিল বলিয়াই বাংলা দেশ সরলার সুখ-দুঃখে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল; ‘স্বর্ণলতা’র যাবতীয় চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্তজ্ঞানে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল; আজও পর্য্যন্ত গভাচরচন্দ্র ও নীলকমল আমাদের প্রিয় পরিচিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আছে। এই বাস্তবমুখিতার জন্যই ‘সরলা’ নাটক দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। তারকনাথের পর আরও অনেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের চিত্র সাফল্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু ‘স্বর্ণলতা’র গৌরবকে কেহ ফুর করিতে পারেন নাই।

দ্বন্দ্ব

শ্রীমুবোধ রায়

মহুর আষাঢ়-দিন,—বর্ষণ-মুখর,
সারাদিন অবিশ্রান্ত বুলি বরষা বর।
ব’সে আছি বাতায়নে; ভিজ্জে ছাট আসে
জলতরঙ্গের ধ্বনি ভাসিছে বাতাসে।
দিনান্তের মন্দিরেতে আঁধার বনায়,
আকাশ মুখর আজি পৃথ্বী-বন্দনায়।
দীর্ঘ আষাঢ়ের বেলা—বর্ষণ-মুখর।

‘স্বর্ঘ্যে ও সমুদ্রে মিলি’ কি যাহুমন্তর
জাগায়ে ভুলিল আজি ধরণীর বুকে।
তাহারি আবেগ তৃণ-পল্লবের মুখে।
জীবনের সঙ্গীতের ধারা চারিধারে,
স্পন্দিত যা’ বিশ্ববীণে মল্লার-ঝঙ্কারে।
এ-বর্ষণ পুন যেষা বাধাবন্ধহারা,
প্রমত্ত তাত্ত্ববৃত্তে জাগাইয়া সাড়া
অট্টহাস্তে ছিন্ন করি’ তীরের শৃঙ্খল
ধেয়ে চলে অন্ধবেগে উন্মাদ, চঞ্চল;
সহসা থামিয়া যায় জীবনের গান,

ভীত ভ্রম্ভ অসহায় ধরণীর প্রাণ
ক্ষণতরে কেঁপে ওঠে,—তার পরে হার
প্রলয়-পন্নোদিতলে কোণার মিলায়।

এই ছায়াছবি হেরি জীবনের পটে,
মিশ্ররাগিণীর খেলা সম্পদে সঙ্কটে।
প্রেম যবে আপনার সীমা নাহি মানে,
ভাসায় দয়িতজনে দ্রাবনের টানে,
কামনার পক্ষকূণে দুর্গতি তাহার
জাগায় সবার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার।
মাতৃস্নেহ—জীবনের সুধারসধারা,
সেও যবে সংযমের পুণ্যসীমাহারা,—
সর্বগ্রাসী মোহরূপে আনে অকল্যাণ,
সন্তানেরে এাসে তাহা রাহুর সমান।

কে বুচাবে এই দ্বন্দ্ব—মিলাবে সংশয় ?
বিষামুতে ক্ষণে ক্ষণে স্থান-বিনিময়।
এপারে কাঁদিছে চৰা,—ওপার ছুত্তর,
এ-মিথুন লাগি’ কোথা সেতু-স্বয়ম্বর ?

উন্নতি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

চন্দ্রকুমাররা আসতেই পাড়ার মধ্যে একটা সাদা পড়ে গেল। এই সঙ্গীর্ণ প্রায়াককার মুখচোরা গলিটার পরম সৌভাগ্যই বুলতে হবে। স্বাস্থ্যনাশের অলুকুল প্রতিবেশ সৃষ্টি করে পিঠাপিঠি এতগুলি বাড়ি গলিটাকে ছ'ধার থেকে গলা টিপে মারবার যত্নবদ্ধ করলে হালের পৌর-আইনে অবশ্য বাধতো। এই গলি আর এই সব বাড়ি সুতাহুটি গোবিন্দ-পূরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে বলেই আইনের পাশ কাটিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছে। জন্মভিটার মমতা আর সম্ভা ভাড়া ছুটোই অধিবাসীদের আর সব বিষয়ে উদাসীন করে রেখেছে। এবং পৌর-ব্যবস্থাও এখানে অত্যন্ত রূপণ। রাস্তার মেরামতি কাজ কত বছর হয় নি বলা কঠিন। ছুটি মাত্র গ্যাসের আলো চারবার-পাক-খাওয়া গলির মধ্যে কোথায় ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে তা বুঝাই দুষ্কর। কলে জলের ধারা ক্ষীণ, গৃহস্থের অহযোগ অহোরাত্র চলছেই—সেই সঙ্গে ময়লা জলের ফুটো ট্যাক বেয়ে ছড় ছড় করে জলের ধারা পথ তাসিয়ে নোনা-ধরা দেওয়াল রসিয়ে তুলছে। এমন গলির মধ্যে চন্দ্রকুমার বসে কোন সুখসুবিধার জ্ঞান বাড়ি ভাড়া নিলেন—সেই আলোচনাই প্রতিবাসী মহলে প্রবল হয়ে উঠেছে।

হরিসাধনবাবু বাজারের ধলগাটা টিনঘেরা কালি বারান্দার মুখে নামিয়ে রজনরতা বিমলাকে বললেন, শুনেছ—মিষ্টিরদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল।

কুশতনু বলেই বিমলা অতি সঙ্গীর্ণ স্থানটিতে বসে চার পাশে রাস্তার সরঞ্জাম নিয়ে কোন রকমে ছ'বেলা পাকশাক করেন। শহরের সৌকর্যার্থে বড় পথের ধারে পুরোনো সব কুক্ষুচুড়া পাকুড় গাছ কাটিয়ে লোহার বেড়া ঘিরে বকুল কিংবা নাম-না-জানা গাছ লাগানো হয়েছিল—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। হরিসাধনের স্মৃতিতে সেই লোহার-ঘেরা আর সজ্জিত শাখার চারাগুলি ভেসে ওঠে—বিমলা যখন একদিকে দেওয়াল আর একদিকে রেলিঙের সঙ্গে টিন লাগানো জায়গাটার বসে ছ'বেলার অন্ন-আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য দেওয়ালের শাসনে বিমলা এমন কুশতনু লাভ করেন নি; শহরের জল-হাওয়ার 'অস্থল' রোগের সৃষ্টি হয়ে তাঁকে কাবু করেছে এমন ভাবে।

যাই হোক, খবরটা শুনে তিনিও যথেষ্ট বিস্মিত হলেন। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সন্তর্পণে বাড়ি ফিরিয়ে বললেন, মিষ্টিরদের বাড়ি। বল কি—কার এমন ভূতে ধরেছে যে এক গাদা টাকা খরচ করে ওই বাড়ি ভাড়া নেবে।

নিলে তো। হরিসাধন উবু হয়ে বসলেন সেই বারান্দার ভূঁড়িয়ার লোক—সরু বারান্দার ছ'ধারে আর ফাঁক রইল না।

বসে বললেন, যারা এসেছে—মস্ত বড়লোক। কি—চাকর—রাঁধুনী—দারোয়ান—আর মোটর আছে। মোটরটা অবিষ্টি গলির মধ্যে ঢুকলো না—বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

তা কত ভাড়া দেবে ওরা?

শুনলাম তো ছ'শো।

ছ'শো? একটা টোক গিলে বিমলা বললেন, তা কপাল ভাল মিষ্টিরগিরি। দেনার দারে মাথা বিকানো—তবু মাস মান একটা মোটা আয় হ'ল তো।

হরিসাধন বললেন, আয়ই হোক—আর যাই হোক দেনা শোধ করা চাটখানি কথা নয়।

একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ হওয়ায় বিমলা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—তরকারির জল কমে গেছে। তাড়াতাড়ি কড়াটা তিনি নামিয়ে নিলেন।

হরিসাধন বললেন, কুচো চিংড়ি আছে—বেছে দেব নাকি? দাও। তা হাঁ গা—বলছ ওদের মোটর আছে—কিন্তু এই গলিতে ঢুকবে কি করে।

বাইরে শব্দদের গ্যারাজটা ভাড়া নেবে।

তা কি করে কড়া? বড় জমিদার না চাকরো?

কি জানি, চালচলন দেখে তো মনে হয়—জমিদার।

বিমলা কড়ায় লজ্জা ফোড়ন দিয়ে মুখ মচকে বললেন, হ্যাঁ:—জমিদার। মিষ্টিররাও তো বলতো জমিদার—তার পর... হাঁচির চোটে কথাটা আর শেষ হ'ল না।

২

গলিটার আর একটু পরিচয় আবশ্যক। বড় রাস্তা থেকে সোজা পূর্ব মুখে হাত ত্রিশেক গিয়ে দক্ষিণে সে প্রথম পাক ধেকেছে। পূর্ব মুখের ঐ হাত ত্রিশেক জমির দুধারে শুষ্ক খোলার বস্তি। কাঠের কাজ, টিনের কাজ, বুরুশ তৈরির কাজ—এই সব গলিটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শব্দ-মুখর হয়ে থাকে। রাজিতেও এ গলিতে যারা ভিড় জমায়—তাদের পাশ কাটিয়ে ভিতরের দিকে যাওয়ায়—সম্ভ্রান্ত মানুষের সঙ্কোচ জাগবায়ই কথা। এ সব দুর্নীতি দমনের প্রয়াস যে, অস্তি স্তুতি-বায়ুগ্রস্ত ছ-এক জন ভাড়াটে ইতিপূর্বে না করেছিলেন তা নয়—কিন্তু বেশীর ভাগ বাসিন্দাই এটাকে দুর্নীতি বলে মনে করেন না। কেননা—ঐ নিম্নস্তরের মানুষগুলি এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে 'চলে—আপদ-বিপদে এদের মত প্রতিবেশীও বিরল। মেয়েগুলি পেটের দারে দেহকে পণ্য করলেও—হৈ হৈ হট্টগোল—ভদ্রমানুষের সুখশান্তিকে কোন দিন বিদ্বিত করেনি। থাকতে থাকতে সবই গা-সহা বা হাড-সহা হয়ে যায়। যেমন রূপণ আলো—অমেরামতি রাস্তা—অগ্রচর

জল—স্নাতসৈতে স্বন্ধকারমাথা বাড়িগুলি—টিন পেটার হৃদয়-বিদারক শব্দ ও সকাল সন্ধ্যার দমবন্ধ করা ধোঁয়া দিনযাপনের সঙ্গে বোমালুম মিশে গেছে।

গলিটা দ্বিতীয় বার পাক খেয়েছে—উমাপদদের বৈঠক-খানার গা ঘেঁসে। এইখান থেকে ভদ্র পাড়া আরম্ভ। সেখান থেকে পশ্চিমে হেলেছে ইন্দুভূষণদের বাড়িটা ঘিরে। চতুর্থ স্তরের পাকে হরিসাধন ও অতুলদের বাড়ি ছুটোকে ভাইনে বায়ে বেধে গলিটা শেষ হয়েছে—মিডির-বাড়ির সীমানে। ওঁরা এককালে জমিদার ছিলেন—আর রাস্তাটা হয় তো ওঁরাই তৈরি করেছিলেন। অন্তঃপুরের মর্যাদা হানি ঘটবে বলে বাড়ির ধানিকটা অংশ নষ্ট করে গলিটাকে এপারের বড় রাস্তা পর্যন্ত হয় তো টেনে আনেন নি। যা হোক, মর্যাদা তাঁদের শেষ পর্যন্ত থাকে নি। দেনার দায়ে লক্ষীর আসন টলে উঠতেই—বাড়িটা ভাঙা দিয়ে পাড়া ছেড়েছেন মিজগোষ্ঠী।

সাধারণত নতুন ভাড়াটেদের স্থায়ী বাসিন্দারা প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাদের ধনপ্রবাদ এদের ক্রমশঃ দূরেই সরিয়ে দেয়; আবার কোতুল টানে নিকটে। মাহুয সম্বন্ধে মাহুযের কোতুল অনেক সময় ভ্রততার সীমা লঙ্ঘন করে। যার প্রতি উপেক্ষা তাকে নীচুতে নামাবার উপকরণ না পেলে মন তৃপ্ত হয় না।

চন্দ্রকুমার এ কথা জানতেন বলেই বুকি ধনীর মর্যাদা নিয়ে প্রতিবেশীদের নিজের বৈঠকখানায় আহ্বান করলেন না, নিজেকে পথের মাঝে আলাপ জমালেন একে ওকে তাকে ধরে।

মিত্য অভ্যাস মত বাজারের ধলি নিয়ে হরিসাধন বাড়ির বার হতেই চন্দ্রকুমারের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। চোখোচোখি হতেই চন্দ্রকুমার প্রথমে হাত উঠিয়ে যুঁহু হাসির সঙ্গে অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললেন, নমস্কার। বাজারে যাচ্ছেন?

হরিসাধন কৃতার্থ হয়ে বললেন, হাঁ। আপনি—

হেসে বললেন চন্দ্রকুমার, আমিও চলছি বাজারে। চলুন—একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। পরন্তু এলুম অথচ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারি নি—সেজন্ত কিছু মনে করবেন না।

না—না—মনে করবো কি। আপনার মত লোক যে—ইত্যাদি বিনয় বাক্যগুলি অগোছালো ভাবে নির্গত হ'ল হরিসাধনের রসনা থেকে।

চলতে চলতে চন্দ্রকুমার বললেন, কর্পোরেশন ভারি নেগলেজ্ট করছে এই গলিটাকে। আপনারা রিপোর্ট করেন না কেন?

রিপোর্ট। করণ হেসে বললেন হরিসাধনবাবু, হু—এক বার যে হয় নি তা নয়—কিন্তু কেই-বা শোনে।

আচ্ছা যাতে শোনে তার ব্যবস্থা আমি করবো। কাউলিঙ্গারদের না ধরলে কোন ব্যবস্থাই হবে না। আমার বন্ধু হু—এক জন আছেন—

পুলকিত হয়ে উঠলেন হরিসাধনবাবু। বললেন, লোকের মত লোক না এলে পাড়ার উন্নতি হয় কখনও? করুন—তাই করুন।

চন্দ্রকুমার বললেন, আর গলিতে চুকবার মুখে ওই বস্তি-গুলো ভারি নোংরা। কি করে সহ করেন আপনারা টিন পেটানোর শব্দ।

হরিসাধন সম্মিত মুখে চেয়ে রইলেন চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে। অর্থাৎ সহ না করে উপায় কি।

চন্দ্রকুমার বললেন, কাল সন্ধ্যার সময় আসছিলাম গলি দিয়ে—চার-পাঁচটা মেয়ে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম ওই গ্যাস-পোষ্টের নীচে। এ সব তো ভাল নয়।

হরিসাধন অপ্রতিভ মুখে বললেন, ওরা কোন রকম গোল-মাল করে না।

না—ই করুক, কণ্ঠে জোর দিয়ে চন্দ্রকুমার বললেন, ভদ্র-লোকের পাড়ায় এ সব ভাল কি? আপনিই বলুন—আপনার জামাই কি বেয়াই যদি সন্ধ্যা বেলায় এদিকে আসেন আর এই সব দেখেন তো লজ্জায় আপনার মাথা কাটা যায় না কি?

হরিসাধন নিজের মান-সন্ত্রমকে এমন উগ্র করে কোন দিন দেখেন নি। ওঁর জামাই বেয়াই সন্ধ্যাবেলায় যে এ গলিতে আসেন নি কিংবা এই নীতিকলুষিত আবহাওয়া নিয়ে কোন দিন যুঁহু অহুযোগ করেন নি—তা নয়, কিন্তু হরিসাধনের মাথাটা লজ্জায় হুয়ে পড়ে নি। বরং মাথা উঁচু করে বলেছেন, কি করবো বেয়াই—পিতৃ-পুরুষের ভিটে ছেড়ে যাব কোথায়? ওরা আছে এক দিকে—আমরা আছি এক দিকে। ওদের তুলে দেবার আইন ত আমাদের হাতে নেই।

সে কথা কিন্তু চন্দ্রকুমারের সামনে বললেন না। আত্মীয়-কুটুম্বের অহুযোগের চেয়ে ওঁর প্রশ্নটাতেই হরিসাধনের মাথা নীচু হয়ে পড়ল। নরম গলায় বললেন, তা লজ্জা কি আর হয় না, কিন্তু কি করব বলুন—

চন্দ্রকুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা—এরও প্রতিকার করা যাবে। নিজেরা না হয় যা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়েছি—কিন্তু ছেলেমেয়েরা? তাদের চরিত্র-গঠনের মুখে আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত নয় কি?

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে হরিসাধন বললেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

৩

উমাপদদের জীর্ণ বৈঠকখানা ঘরে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পাশার আড্ডা বসে। রাত বারটা অবধি চলে কচে-বা ছ-তিন-নয়ের চীৎকার। চীৎকার না হলে গলিটার মর্যাদা বুকি বজায় থাকে না। দ্বিতীয় বাকের মোড়ে এই বৈঠক-খানা। তারপরেই গ্যাস-পোষ্টের নীচে দেখোপজীবিনী যে কাঁট মেয়ে নিজেদের গুঁড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে—তারাও চমকে ওঠে আড়ি-মারার চীৎকারে। নির্দোষিত দীপ

দোতলা ঘরের জানালাগুলির পাশে এরা এক-এক বার মুখ তুলে তাকায়, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে। কখনও হাসে—কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এদিকে পাশার আসর সরগরম হয়ে ওঠে—নানান গল্পে—মস্তব্যে। কোন দিন খেলাটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গল্পটা হয় দীর্ঘ, কোন দিন বা গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলে খেলা। তবে প্রতিদিনই সামান্য গল্প-গাছা হবার পর খেলা আরম্ভ হয়।

ধানিকটা গল্প হয়ে যাবার পর পাশার ছক কোলের কাছে টেনে নিয়ে উমাপদ বললেন, এইবার এক বাজী হোক।

অতুল্য দে বললেন, দূর ছাই—রাখ তোমার পাশা। আজ চন্দ্রকুমারবাবু কি বললেন জান ?

চন্দ্রকুমার। মুখখানা স্ফুটল করে কিসের আশ্রয় টেনে নিয়ে ইন্দুভূষণ বললেন, হাঁ—চন্দ্রকুমার, ঐ মিত্তির-বাড়ির ভাড়াটে। লোকটার পরস্যা আছে—অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। আজ সকালে আমার বাড়িতে এসে আলাপ করে বললেন—

উমাপদ বললেন, জানি। আমার বৈঠকখানায় উঁকি মেরে বললেন, পাশার আসর বসে বুঝি। বেশ বেশ, একদিন এসে—

অতুল্য উচ্চ হয়ে বললেন, তোমার ত পাশা বই আর চিহ্নে নেই। উনি কিন্তু পাড়াটার উন্নতি করতে চান। এরই মধ্যে দিখি একটা প্ল্যান করেছেন। আমায় বললেন, দেখুন দিকি—এই রকম চেহারার একটা পল্লী হলে আদর্শ পল্লী হয় কিনা। গলিতে ঢোকবার মুখেই ছোট এক-টুকরো বাগান—যেখানে এখন খোলার বস্তি রয়েছে—

হরিসাধন বললেন, হাঁ—হাঁ—আমাকেও বলেছেন—এসব ছুঁতামি চলবে না। ওদের উঠিয়ে দেবেন ওখান থেকে।

কেন, ওরা আবার কি দোষ করলে ? এক জল প্রশ্ন করতেই বাদানুবাদ ঝাঁজাল হয়ে উঠল।

সকলের মুখেই চন্দ্রকুমারের নাম, তাঁর স্মৃতি, তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও প্রতিবেশীর হিত কামনার কথা অল্পশ্রু উৎসাহিত হয়ে সেদিনের পাশার আসরটা জমতে দিলে না। কিন্তু সেজন্ত কেউ এতটুকু মনঃস্থুর হলেন না।

উমাপদ পাশার ছক কোলে করে এই বাদানুবাদ শুধু-ছিলেন। ঝড়িতে টং টং করে এগারোটা বাজতেই অভ্যাস-মত সচকিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেন ভক্তলোক ?

ইন্দুভূষণ বললেন, বিজ্ঞেনস। মস্ত বড় আয়রণ মার্কেট কিনা।

৪

ছ'মাস পরে হরিসাধনবাবু বাজারের ধলোটা সঙ্গীর্ণ রান্না-ঘরের সামনে রেখে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, ওগো—শুনছো ?

বিমলা তখন ভাতের কেন গালছিলেন; পিছন ফিরে না তাকিয়েই বললেন, বল।

আজ খোলার বস্তিতে নোটিশ লটকে গেল। এক মাসের মধ্যে বস্তিকে বস্তি সাক।

বস্তির লোকজনেরা যাবে কোথায় ?

কেন, পৃথিবীর আর কোথাও কি জায়গা নেই। যাক না ওরা যেখানে বুলা। আমাদের গলিটা নোংরা করে থাকবার ওদের এজিয়ার কি।

হরিসাধনের বিরজিপুর মস্তব্যে বিমলা মুখ ফিরিয়ে বললেন, চন্দ্রকুমার বাবুই বুঝি এই সব করছেন।

তা না ত কার এত ক্ষমতা। যাই বল—পাড়ার একজন বড়লোক না থাকলে পাড়ার উন্নতি হয় না।

বিমলা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, কাল ওঁর বক্ত মেয়ে দুপুরে বেড়াতে এসেছিল। বললে—বাবার ভাল লেগেছে পাড়াটা।

হরিসাধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, লাগবে মা। পাড়ার লোকগুলি কেমন ভাল। আমি বড় গলা করে বলছি—এ পাড়ার মত প্রতিবেশী শহরের কোন পাড়াতেই নেই।

বিমলা বললেন, মিত্তিররা নাকি বাড়ি বিক্রী করবে বলে ষড়ের বুঁজচে। চন্দ্রবাবুর মেয়ে তো বললে—বাবা সব চৈরে চড়া দাম দিয়েও বাড়িখানা কিনবেন।

ভাল—ভাল। উনি স্থায়ীভাবে পাড়ার থাকলে কত না উন্নতি হবে পাড়ার। আশ্রয়সাদে মাথা ছুলিয়ে হরিসাধন হেসে উঠলেন।

বিমলা বললেন, ঠাকুর-দেবতার ওপরও ওদের ভক্তি খুব। মেয়েটি বলছিল—বাড়িটা কেনা হয়ে গেলে বাবার ইচ্ছে এইখানে ছুপোঁসব করেন।

আহা মায়ের যদি ইচ্ছে হয়—তা হলে মা আসবেন বইকি এই পাড়ার। এ যে মায়ের চেনা জায়গা। আহা—সে কত দিন হ'ল—এই মিত্তির বাড়িতে মা আসতেন। আমরা তখন ছোট। নতুন কাপড় পরে যেতাম ঠাকুর দেখতে।

অতীতের স্মৃতিতে হরিসাধন গদগদ হয়ে উঠলেন।

উন্নতির প্রথম সোপানে পা দিল গলিটা। যাহুকরের যাহু-দেওর হোঁয়া পেয়ে অধিবাসীসমেত খোলার বস্তিগুলো এক দিন অদৃশ হ'ল। কাঁকা জমিটা কার দখলে এল—কেউ জানলে না। রাত্তার প্রথম বাকটা অদৃশ হতেই উমাপদদের বৈঠকখানা প্রচুর আলো ও হাওয়ায় ভরে উঠল।

আঃ—ইচ্ছে করে সারাটা রাত তোমার বৈঠকখানায় বসে পাশা চালি। হরিসাধন তাকিয়াটার ওপর আড় হয়ে পড়ে আরামের নিশ্বাস টানলেন।

অতুল্য বললেন, এখানে ফুলবাগান হলে দিব্যি ফুলের পত্র আসবে। তোমার বরাত ভাল উমাপদ।

উমাপদ বললেন, আমার কেমন বেত্নহো লাগছে তাই। বাড়িতেও এরা বলছিলেন, টিন পেটা—কাঠ পেটা এ সবের শব্দ শুনে শুনে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে ছুপুরটা কেমন কাঁকা-কাঁকা বোধ হয়।

তাহলে তোমার পাশার আসরও জমবে না। অতুল্য হেসে উঠলেন শব্দ করে।

আর শুনেছ—চন্ড্রকুমার বাবুই মিডির-বাড়িটা কিনে নেবেন ঠিক হয়েছে। যা দর উঠবে—তার চেয়ে এক হাজার বেশী অফার করেছেন উনি।

মিডিরের ভাগি ভাল।

যা হোক—গৃহপ্রবেশে ভাল-মন্দ খেয়ে মুখ বদলান যাবে—কি বল? হরিসাধন রসিকতার চেষ্টা করলেন।

ইন্দুভূষণ বললেন, সে বুঝি জান না? পরশুই চন্ড্রবাবু আমায় বললেন—বাড়িটা কেনা হয়ে গেলে আপনাদের পাঁচ জনকে নিয়ে এক দিন আমোদ-আহ্লাদ করব।

হা হা করে হেসে উঠলেন হরিসাধন বাবু। কেমন বলেছিলাম কি না। বলেছি মাহুষের চালই আলাদা। পাড়াটার হাল যদি এক বছরে বদলে না দেন উনি—ত কি বলেছি।

৬

হরিসাধনের অবিস্মৃতি মিথ্যা হ'ল না। গলিটা অত্যন্ত জনাকুল উন্নতির বাপগুলি অতিক্রম করতে লাগল। আরও চারটে প্যাসপোর্ট এল—মাদ্রাসার আমলের জলবাহী পাইপের পরিবর্তন হ'ল। তারপর একদিন জরাজীর্ণ বাড়ি-মালিকদের ওপর নোটিশ জারি হ'ল। ইমারতগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুসংস্কৃত না হলে পথচারীর প্রাণহানির দায়িত্ব বহন করতে হবে মালিকদের।

উমাপদ প্রমাদ গুণে বললেন, হ'ল ত! এবার আলো আর হাওয়া খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর সবাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অতুল্য বললেন, তাই ত, এঁ যে হিতে বিপরীত হ'ল হে! এরকম উন্নতি আরম্ভ করলে কারও ভিটেমাটি বজায় থাকবে কি?

ইন্দুভূষণ বললেন, আমি সেই কালেই বলেছিলাম তাই—খালু কেটে কুমীর ডেকে এনো না—এনো না—

উমাপদ বিচিয়ে উঠলেন, আমরা ডেকেছিলাম? বলেছিলাম গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করে—দয়াময় প্রভু—এ গলিতে এসে আমাদের উদ্ধার কর।

হরিসাধন বললেন, চল সকলে মিলে ওঁর কাছে যাই। বলিগে উন্নতিতে কাজ নেই চন্ড্রবাবু, আমরা বেশ আছি।

ইন্দুভূষণ বললেন, উন্নতির নেশা চাগলে রক্ষে নেই। শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে যে রেহাই পাব তা ভেব না।

যাই হউক চন্ড্রকুমার বাবুর কাছেই চল।

৭

সমস্ত শুনে একমুখ হেসে চন্ড্রকুমার বললেন, মশাই, কালের গতি সামনে না পেছনে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আওতার থেকে পলাণীর স্বপ্ন দেখলে চলে কখনও? যা আপনাদের তিনপুরুষের সাথে হয় নি—একার ক্ষমতায় তাই সম্ভব করেছে। এতে সহায় না হয়ে বাধা দেওয়াটা সত্যিই লজ্জার নয় কি? কর্পোরেশনের আইন ভাঙবার দাখ্য আমার নেই। বেশ ত, বেড়ে মেরামত করান বাড়ি-ঘর-দোর। পাড়ার শ্রী ফিরে যাক, মাং-লক্ষ্মী হাসতে থাকুন।

ইন্দুভূষণ বললেন, টাকা—টাকা পাব কোথায় আমরা?

টাকা। উচ্চহাস্ত করে উঠলেন চন্ড্রকুমার। টাকার ক্ষমতা ভাবনা কি। কত টাকা দরকার আপনাদের বসুন? আমি যখন রয়েছি—বলে আর একবার অমায়িক ভাবে হাসলেন।

বাড়ি ফিরে এসে উমাপদ রাগ করে বললেন, যার যাক ভদ্রাসন—ঋণ করে বাড়ি মেরামত করা ব না। শেষ পরে ওই মিডিরদের দশা হবে।

অতুল্য বললেন, দেনা ছনিয়াস্ত্র লোক করছে—আবার শোধও দিচ্ছে। তা বলে এক কথার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াও মূর্খতা নয় কি?

হরিসাধন বললেন, ঠিক বলেছ অতুল্য।—আমাদের অবস্থা চিরদিনই যে এই রকম থাকবে তার মানে কি।

উমাপদ বললেন, কলম পিষে লাথ টাকার স্বপ্ন তোমরা দেখতে চাও—দেখ, আমি দেখছি একটাই পথ। আজ ভিটে বেচে যে ক'টা টাকা পাব তাই দিয়ে অল্প কোথাও একখানা ঘর হয়ত বাঁধতে পারব, কোন পাড়ারগায়েও—কিছু দেনা করলে—

অতুল্য ও হরিসাধন প্রাণপণ যত্নে উমাপদকে বোকাতে লাগলেন।

উমাপদ মাথা নেড়ে বললেন, না ভাই, নিজের বুদ্ধিতে ককির হওয়া ভাল ত পরের বুদ্ধিতে আমীর হওয়া কিছু নয়। আমি বাড়ি বিক্রী করে দেব।

মাসধানেকের মধ্যে উমাপদরা বাড়ি বিক্রী করে পাড়া ছেড়ে চলে গেলেন। পথের দ্বিতীয় বাঁকটা ঘুচল।

তারপর তৃতীয় বাঁকটাও ঘুচল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। ইন্দুভূষণ উমাপদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবশ্য নয়—বাড়িটা ছাড়তে বাধ্য হইলেন।

৮

চতুর্থ বাঁকটাও হয়ত অবিলম্বে ঘুচত, কিন্তু হরিসাধন ও অতুল্য নবসম্বন্ধ গলিটার অবাধ আলো-হাওয়া দেখে প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে অল্প কোথাও গিয়ে নুতন করে ঘর গুছিয়ে বসবার সাহসও তাঁদের ছিল না।

চন্ড্রকুমার বললেন, না না, যাবেন না আপনারা। আপনারা গেলে কাকে নিয়ে থাকব পাড়াতে। বসুন কত

টাকা চাই। ভাল করে ডিৎ পত্তন করে নতুন করে তুলুন ইমারত। বাঁচার মত বাঁচুন।

তাই হ'ল। সম্পূর্ণ নতুন হয়ে বাড়ি ছুখানা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াল। ছ'পাশের আলো এসে তাকে কোলে টেনে নিলে, বায়ুর দাক্ষিণ্যে দেহমন পুলকিত হয়ে উঠল।

ছই বন্ধুতে গলিতে চুকবার মুখে প্রায়ই বলেন, দেখ—দেখ কেমন দেখাচ্ছে। কি সুন্দর।

হরিসাধন বললেন, সেদিন বেয়াই এসেছিলেন। বললেন, বাঃ এ যে স্বর্গে বাস করছেন বেয়াই। কি ছিল—কি হয়েছে। সত্যি উমাপদটা কি বোকা। অতুল্য হাসলেন।

২

চওড়া রাস্তার মধ্যস্থে সেদিন বাজারের ধলে রেখে হরিসাধন একখান পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলেন, বললেন আজ ভাল করে দই ইলিস রাঁধ দেখি। গঙ্গার টাটকা ইলিস—আর চিনি পাতা দই নিয়ে এলাম।

বিমলা হাসি মুখ ফিরিয়ে বললেন, তায় চেয়ে কাঁচা ঝাল দিয়ে রাঁধি কি স্নেহ করি।

যা তোমার খুশী। বলে হরিসাধন বাজারের থলিটা মেঝেয় উপুড় করলেন। রক্তবরণ নধর ইলিস মাছটা মেঝেয় পড়তেই লাল অক্সাইডের মেঝেটা হেসে উঠল সেই মুহূর্তে। মুগ্ধ লোভাভ দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে হরিসাধন বললেন, কি সুন্দর মাছটা। দেখ—

বিমলা মাছটার পানে চেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, সত্যিই সুন্দর। কত নিলে?

বল দেখি? বলে পরম স্নেহে মাছটার গায়ে হাত বুলিয়ে হরিসাধন অভিভূত হয়ে গেলেন। এমন সময় জানালা দিয়ে একটা দমকা বাতাস আসতেই একখানা কাগজ উড়ে এসে মাছটার গায়ে পড়ল।

বিমলা তাড়াতাড়ি বললেন, এই দেখ তুলো মন। কাগজটা এইমাতার গজু নিয়ে এল। বললে জরুরি, দেখতে ব'ল।

সেই হাতেই কাগজখানা তুলে নিলেন হরিসাধনবাবু।

বিমলা বললেন, আঃ, আশ করলে ত। তোমার ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি আছে।

হরিসাধন উলটে-পালটে তখন কাগজখানা দেখলেন। আদালতের মোহরযুক্ত নোটিশ। না পড়েও এর মর্মটি বলে দিতে পারেন তিনি। ইন্দুভূষণের হাতেও একদিন এই রকম কাগজ একখানা এসেছিল। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে মুচতা ও বেদনা সেদিন এমনই ঘন হয়ে ফুটেছিল। হরিশ—শশী—অচিন্ত্য আরও অনেক স্বপ্ন-স্বপ্নভোগী চন্দ্রকুমারের অধমণেরা এই রকম বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলেন একে একে। তারপর? তারপর গলিটার আরও উন্নতি হয়েছে। তৃতীয় বাঁকটাও ওর ঘুচে গিয়ে প্রশস্ত রাজপথ থেকে সরল বাহু মেলে নির্দেশ করছে হরিসাধন ও অতুল্যদের বাড়ী ছুখানাকে। এ বাধাও শীঘ্র ঘুচবে। এই বাহু আরও প্রসারিত হবে। হরিসাধন স্পষ্ট বুঝলেন, পরাহু—এহে যে বাড়ি পথের লক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে নৈপথ্যে পাঠাবার জন্তই এই পরোয়ানা। এই বাড়ি ছুখানার পিছনে যে নবনির্মিত প্রাসাদ চন্দ্রকুমারকে বুকে নিয়ে সগৌরবে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সেই এগিয়ে আসছে সামনে। অতঃপর পথকে সেই দেবে নির্দেশ। বলবে পথকে, তোমার সাধনা শেষ হয়েছে—আমি এসেছি। চেয়ে দেখ সবাই—আমি এসেছি।

কি গো—অমন ধ' মেরে রইলে যে? কিসের কাগজ ওখানা? বিমলা বিষয়ে প্রশ্ন করলেন।

হরিসাধন কোন কথা না বলে কাগজখানা হাতে করে দ্রুত বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

পথে অভুল্যের সঙ্গে দেখা। তাঁর হাতে ঐ জাতীয় এক-খানা কাগজ—মুখে হুশিভার কালিমা।

মুখোমুখি দাঁড়ালেন ছই বন্ধু। কারও মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। বলবার কথা ছিলই বা কি? কাগজের মারফত গলিটা তার নবজন্মের স্বাক্ষর পাঠিয়ে দিয়েছে। একটানা বাতাসের মারফত কাগজ ছুখানা পতর পতর শব্দে তাই ঘোষণা করতে লাগল।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্যা

শ্রীব্রজসুন্দর রায়

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসমস্যার সমাধান এখন প্রধান চিন্তার বিষয়। এই সম্বন্ধে চিন্তা বহুকাল পূর্বে, বিশেষতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, গভীর ভাবেই করিতেছি। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ-স্বরূপ যে জাতীয় শিক্ষা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত স্বর্গগত রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং সে দানকে ভিত্তি করিয়া একটা

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ অন্ততঃ বঙ্গদেশবাসীদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

সেই সময় বাংলাদেশে যে একটা নতুন প্রেরণা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া অনেক কাজ করিয়াছিলাম, অনেক মার খাইয়াছিলাম, ক্ষতি স্বীকারও করিয়াছিলাম, এখন

সেই সমস্ত সার্থক মনে হইতেছে। মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান-সব কার্যই ফলপ্রসূ হইয়াছে। এই দেশে তখন অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও বানরীপাড়াতে একটি তাহার সত্তা রক্ষা করিয়া বর্তমান আছে। স্বর্গীয় হরদয়াল নাগ মহাশয় চাঁদপুরে একটিকে বহু দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয়টি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় কিভাবে পড়ান হইত, সেই সম্বন্ধে কিছু খবর পাঠককে দিব। ইহাতে বুঝা যাইবে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাকে কোন আদর্শে গড়িতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজদের দানটি স্বীকারপূর্বক আমাদের প্রগতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের ভারতে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া অধিকাংশ লোক গবর্ণমেন্টের বা অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনতায় হাকিমী, কেরানীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারী ইত্যাদি কার্যের জন্ত যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে দেশের উন্নতিবিধানের জন্ত কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না; বাহারা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করেন, যথা আমাদের মাড়োয়ারী বহুগুণ, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ধার ধারেন না। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা ইংরেজ বনিয়া যাইবার স্বপ্নই দেখিতাম। বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, অধ্যাপকগণ সকলেই গবর্ণমেন্টের চাকর হইবার জন্ত ব্যগ্র থাকিতেন। আমাদের টোলের অধ্যাপকগণ এবং মাদ্রাসার জবরদস্ত মোলবীগণও ইংরেজ শাসকগণের অহুগ্রহাকাজী হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মেয়েরাও ইংরেজ মহিলারূপে পরিণত হইবেন, এই মনোভাব আমরা পোষণ করিতাম। জাতীয় শিক্ষায়তনে আমরা এই দাসস্থলভ মনোগতির সমালোচনা করিতাম, এবং এই মনোভাব যাহাতে পরিবর্তন করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তার অহুকুল গ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থা করিতাম।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীন স্কুলসমূহে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন (medium) করা হইয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষাকে compulsory second language রূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইতিহাস, ভূগোল, অস্ত্র প্রভৃতি বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। ইতিহাস শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক গল্পগাছার কথাও কিছু কিছু বলা হইত। ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস উভয়ই এমন ভাবে পড়ান হইত, যাহাতে ছাত্রগণ ইতিহাসের মূল সত্যগুলি বুঝিতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বেলা এগারোটাই হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অধ্যাপিত হইত। কিন্তু প্রাতে ছাত্রগণকে মধ্যে মধ্যে কাঠের ও লোহার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। এই কাজের ভার ছিল এক জন সুদক্ষ মিস্ত্রী এবং এক জন foreman mechanic পাস শিক্ষকের উপর। তাঁতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা রংপুরে কিছু করা হইয়াছিল। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গবর্ণমেন্টের অধীনে

চাকরী পাইবে না, সুতরাং তাহারা যাহাতে কোন ব্যবসায় বা কোন শিল্পকার্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহার জন্ত চেষ্টা করা হইত। অনেক সময় ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাহারা কি করিবে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদিগকে বলা হইত, “তোমার অস্ত্র শাণিত কর; অস্ত্র ধারাল হইলে সব জিনিষ তাহা দ্বারা কাটা যায়; তোমরাও প্রথমে জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা দেশের সব কাজ করিতে পারিবে।” এখন ত দেখিতেছি সেই সময় উপস্থিত, যখন আমাদের বংশধরেরা আর ইংরেজের “গোলাম” সাজিবার সুবিধা পাইবে না; তাহাদিগকে দেশের “সব কাজ” করিতে হইবে। তাহারা হবে স্বাধীন মানুষ। তাহারা যাহাতে স্বাধীন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে তদুপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। স্বাধীন দেশসমূহে যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যেভাবে সকল বালক-বালিকাকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রায় এক শত বৎসরে গঠিত চাকুরীজীবীর মনোবৃত্তির গঠন তিন কি চার পুরুষ ধরিয়া চলিতেছে। তাহার পরিবর্তে স্বাধীন মানুষের মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই পরিবর্তন কি ভাবে ঘটা হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমার ৪৪ বৎসরব্যাপী শিক্ষাদান-কার্যের অভিজ্ঞতা হইতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

আমাদের নুশন শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রত্যেক বালক যাহাতে তাহার নাগরিকের কার্য (civil এবং military duties) সম্পন্ন করার জন্ত প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবিকা সংগ্রহ পশুপক্ষীও করে, কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের পরিস্থিতি রক্ষা করা ও এই পরিস্থিতিকে অগ্রগতি করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া দেওয়ার জন্ত সকলেই চেষ্টা করিবে। ইহাই বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্ত তাহার নৈতিক চরিত্র-গঠনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। উদার ভাবে সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা না বলিয়া নৈতিক উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সময় সময় এই সব বিষয় সম্বন্ধেও ছাত্রগণের সহিত আলোচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। মতবিশেষের পোষক সাম্প্রদায়িক ধর্মকথা না বলিয়াও মানব-মানবের অন্তরে যে বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ মানবগণ সর্বদাই এই ভাবের ধর্মের কথা আজকাল বলেন। অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাও এই সব কথা বুঝিতে পারে। গ্রন্থ এবং প্রহ্লাদের উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। পূর্বে অষ্টম বর্ষবয়স্ক বালককে উপ-নয়ন দীক্ষাদান করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনকার আট বৎসরের বালক পূর্বের আট বৎসরের বালক অপেক্ষা অধিক বিকশিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বালক-বালিকারা বারো-তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত এক শিক্ষাই লাভ করিবে, ইহাই সমীচীন মত। বারো হইতে পনেরো কি ষোল পর্যন্ত বালিকাদিগকে কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

আধুনিক শিক্ষাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মৌখিক বক্তৃতাধারা বিজ্ঞানের অনেক কথা অতি সহজে বালক-বালিকাদিগকে বলা যায়। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞানশিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি একটি Syllabus প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া নিম্নস্থ প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উদ্ভিদতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃত্রিমতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গল্প বলিতেন। ছেলেরা বাড়ী হইতে ফুল এবং পাতা লইয়া আসিত, তাহাদের পাণ্ডি পণনা করিত, পাতার ছবি অঙ্কিত করিত, পশুপক্ষীরও ছবি অঙ্কিত করান হইত, তাহাদিগকে দূরস্থ অসুস্থমান করার জন্য একটি Chain ব্যবহার করা হইত, ওজন অসুস্থমান করার জন্য একটি বাটখুরা ও ইট-পাটকেল ব্যবহার করা হইত; aim করা শিক্ষাদানের জন্য কিছু দূরে প্রোথিত একটা লৌহদণ্ডকে ইটের টুকরা দিয়া তাক করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাদিগকে বৃক্ষারোহণেও অভ্যস্ত করা হইত। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করিয়া পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে কথা বলা হইত। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যার সময় মিলিত হইয়া ছাত্রগণ সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্নসমূহের আলোচনা করিত। একজন শিক্ষক বসিয়া তাহাদের আলোচনা শুনিতেন এবং আলোচনা যাহাতে প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে ঠিক পথে চলে, ইহা দেখিতেন। ছাত্রগণকে এই সব সম্বন্ধে উপযোগী পুস্তক পাঠ করিতেও উপদেশ দেওয়া হইত। ইহাতে ছাত্রগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক দেখা যাইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়াছেন। স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহাদিগকে পরীক্ষা পাস অপেক্ষা জ্ঞানার্জনে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উৎসাহ দেওয়া হইত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই শিক্ষা-প্রণালীর উজ্জ্বলিত প্রশংসা আমাদের নিকট করিয়া স্বকীয় ধ্বংসীকার করিয়াছেন।

প্রত্যেক স্কুলে যদি একটি Radio রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে দেশের সমস্ত স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বালকদিগকে নানা বিষয়ের তত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সপ্তাহে বা পক্ষে এক দিন বলাবার ব্যবস্থা খুব ব্যয়সাধ্য হইবে না। সিনেমাগুলিতেও সপ্তাহে বা পক্ষে এক দিন শিক্ষাবিষয়ক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার গতিকে দ্রুত পরিচালিত

করা যায়। পরীক্ষা করার রীতি পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সার্টিফিকেটের মূল্য আছে, কিন্তু কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করার পর সার্টিফিকেট দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট অধ্যাপকগণের দ্বারা সমস্ত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিবেন, এবং ছাত্রছাত্রীগণকে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে এই সব গ্রন্থাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষাদান করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ধনীলোকদিগের ধনের একটা অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া এই মহৎ কাজ করিলে কিছুই অস্বাভাবিক হইবে মনে করি না। জমিদারগণের জমিদারী কাড়িয়া লওয়ার ত ব্যবস্থা হইতেছে। অল্প প্রকার সম্পত্তির অংশও কাড়িয়া লইয়া দেশের আপামর সকলকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। খাজ উৎপাদনের জন্য যদি ধনী লোকের ধনের একটা অংশ কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাতে অস্বাভাবিক হইবে না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় ত “forced loans” লওয়া হইয়াছে। অজ্ঞতা অস্বরের বা দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীরূপ অস্বরের সহিত যুদ্ধে যদি “Benevolence”-এর দ্বারা কিছু কিছু ধন কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাতে পাপ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি চোর না হন এবং টাকার দেশের কাজে ব্যয় করেন, তবে দেশের লোকেরা আনন্দের সহিত সজ্জিত ধনের একটা অংশ দান করিবে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে যেভাবে Death Duty আদায় করা হয় এখানেও তাহা করা যাইতে পারে।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রিগণ যদি অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশকে তুলিয়া ধরার জন্য লক্ষ্য করেন, তাহাতে স্কুল হইবে বিশ্বাস করি। শিক্ষাদানের উত্তম ব্যবস্থা যাহাতে ঘটান যায়, তদ্বিষয়ে আমাদের সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। এখন ত চাকুরীর বা গোলামির জন্য উদ্ভাবিত হইতে হইবে না। যাহাতে দেশের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। যুদ্ধ-বিধাত্তও সকল যুবককেই শিক্ষাইতে হইবে। তজ্জনও বিপুল আয়োজন প্রয়োজন। Bank Balance বাড়ানো আর আমাদের সাম্প্রতিক প্রয়োজন নহে। দেশরক্ষা, মানুষকে মনুষ্যপদবীতে উন্নত করা ও দেশের চেহারা বদলাইয়া স্বাধীনতা মন্ত্রের সাধক সকলকে করিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য হইবে।



হটী বিদ্যালঙ্কার

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় বিদ্বতী রমণীগণের নামকীর্তনকালে আমরা পৌরাণিক যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি এবং ঐতিহাসিক যুগের মণ্ডন-মিশ্রপত্নী উভয়ভারতী, অহল্যাবাহি, রাণীভবানী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াই গৌরব বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গবিদ্বতী হটী বিদ্যালঙ্কারের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। ভারতীয় জ্ঞান-শিক্ষার ইতিহাসে তিনি একাকিনী এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছেন। বঙ্গদেশে টোল চতুষ্পাঠীর গৌরবময় যুগে যোজনাদেবী,* জয়ন্তী দেবী,† প্রিয়ম্বদা দেবী, আনন্দময়ী প্রভৃতি মহাবিদ্বতী মহিলার অসংখ্য বটে নাই। কিন্তু শব্দ তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের সম-সময়ে কাশীধামে বসিয়া “বিদ্যালঙ্কার” উপাধি গ্রহণপূর্বক স্মৃতিমত চতুষ্পাঠী করিয়া যিনি নানাদেশীয় বহু ছাত্রকে নব্য-জ্ঞানাদি হুঙ্কর শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্তি যেমন এক দিকে অনন্তসাধারণ তেমনই তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের কুসংস্কার-হীন উদারতাও অপর দিকে তাঁহার জীবনকাহিনী বিশেষ আশ্চর্য্য স্ফুটিত করে। এই বিদ্বতী রমণীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই প্রকাশস্বকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং প্রথমে ত্রিখণ্ড প্রজ্ঞেলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় সম্বাদ প্রকাশ করিলেও (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০৮) বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরালোচনা দ্বারা স্মৃতিরক্ষা স্ফুটিত হইল।

পাদরী ওয়ার্ড সাহেবের সুবিখ্যাত ‘হিন্দু’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ রচনাকালে হটী বিদ্যালঙ্কার জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবনকথায় লিখিত বিবরণটি অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

I am informed that at present there is a female philosopher at Benares, whose name is Hutee Vidyalkunkara. She was born in Bengal, her father was a koolinu bramhun; her husband also

was a koolinu. It is not the practice of the koolinu bramhuns, when they marry the daughters of koolinus, to take these wives to their own houses, but they stay with their parents. Thus it was with Hutee. Her father being a learned man instructed his daughter in the knowledge of several shastrus; he particularly taught her the sungskritu grammar, and the kavya shastrus. However ridiculous the notion may be, that if a woman pursue learning she will become a widow, the husband of Hutee left her a widow. Her father also died; and in consequence she fell into great distress. In these circumstances, like many others, who are tired of the world, he went to reside at Benares. Here she pursued learning afresh, and got some little knowledge of the smritee and other shastrus. At length she began to teach others, and obtained a number of pupils, who came to her from different parts; so that she is now universally known in those parts by the name of Hutee Vidyalkunkara, viz. learning is her ornament.

(Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos, Vol. I, Jan. 1811. p. 195-6.)

লক্ষ্য করিতে হইবে উক্ত বিবরণের দুই স্থলেই সাহেব হটীর উপাধি “বিদ্যালঙ্কারা” বলিয়া লিখিয়াছেন—ইহা বহু-জীহ্ব-নিষ্পন্ন জীলিঙ্গ শব্দ। উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে কিন্তু “বিদ্যালঙ্কার” (পুংলিঙ্গ) উপাধিই পাওয়া যায়—যজ্ঞতৎপুরুষ সমাসে তাহাও রিস্ত হইবে।

ওয়ার্ড সাহেবের এই গ্রন্থ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইলেও প্রথম খণ্ডের প্রকৃত রচনাকাল কিছু পূর্ববর্তী। কারণ, তৎকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও জীবিত ছিলেন (Vol. I, p. 200) এবং দ্বিতীয় খণ্ডে (p. 315) ১৭২৯ শকাব্দের (১৮০৭-৮ খ্রি:) পঞ্জীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় খণ্ডে (p. 251 f. n) জগন্নাথের যুগ্মসম্বাদ লিখিত হইয়াছে। স্মরণ্য প্রথমখণ্ডের রচনাকাল ১৮০৬-৭ সন বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায় এবং তৎকালে হটী বিদ্যালঙ্কার জীবিত ছিলেন। পঞ্চাশত্রে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ত্রীরাশপুর হইতে ১৮১৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে যে প্রকাশিত হয় তদ্ব্যে (pp. 598-99) হটী বিদ্যালঙ্কারের বিবরণে লেখা আছে—A few years ago, there lived... অর্থাৎ ১৮১৭ সনের কয়েক বৎসর পূর্বেরই

* কলাপপরিশিষ্টের টীকাকার সুবিখ্যাত গোপীনাথ তর্কচাৰ্য্যের মাতা এবং পণ্ডপতি আচার্য্যসিংহের পত্নী। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তিনি স্বামীর অমুপস্থিতিতে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণী, শাণ্ডিল্যগোত্র এবং প্রায় ১৫২৫ খ্রি: বিব্রমান ছিলেন।

† হরিশ্বেদ শাস্ত্রী রচিত “ভারতের শিক্ষিত মহিলা” নামক গ্রন্থে (১৩১৭) কোটালিগাড়া সমাজের এই তিন জন বিদ্বতীর বিবরণ মুদ্রিত হয়। জয়ন্তী দেবী (বৈজয়ন্তী নহে) স্বামীর সহিত একসঙ্গে “আনন্দলতিকা” নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (১৫৮৬ শক)। উক্ত গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিতপ্রায়। ‘অর্চনা’ পত্রিকায় (দশম খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫) জয়ন্তী দেবীর জীবনী উল্লেখ্য।

তিনি স্বর্গতা হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ছই খণ্ড ১৮১৭ সনে লণ্ডনে মুদ্রিত হইলেও এবং তাহার উৎসর্গপত্রে জুন ১৮১৫ সন. লিখিত থাকিলেও তৃতীয় সংস্করণের শেষ ছই খণ্ড উক্ত ত্রীরাশপুর সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র বটে (১৮২০ সনে) এবং যে অংশে হট্ট বিদ্যালয়কারের বিবরণ আছে তাহা ১৮১৭ সনেই রচিত—তৎপূর্বে নহে। এতদ্ব্যসারে হট্ট বিদ্যালয়কারের মৃত্যুকাল নিঃসন্দ্বিগ্ন রূপে প্রায় ১৮১০ সন নির্ণয় করা যায়। ফলে তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্যতীত তিনি যে দুই নব্যশাস্ত্রশাস্ত্রেও পঠন-পাঠনা করিয়াছেন, ওয়ার্ড সাহেব তাহাকে ‘দার্শনিক’ (philosopher) বলায় তাহা স্মৃতি হয় এবং নব্যন্যায়ের শেষ পরিণতির যুগে তাহার এই কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও আশ্চর্যজনক। তাহার পরিচয় সম্বন্ধে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে তাহার পিতা রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বর্ধমান জেলার “সোঞাই” গ্রামে তাহার বাড়ী ছিল। সোঞাই গ্রামে এক সময়ে বহু পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। সেখানে অহুসন্ধান করিয়া হট্টের পিতৃকুল ও পতিকুলের সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা যায় কিনা চেষ্টা করা উচিত।

‘শাস্তিপুর-পরিচয়’ গ্রন্থের ২য় ভাগে (১৩৪৯ সন.) লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৮৩-৪) শাস্তিপুরের সুবিখ্যাত গোবামী ভট্টাচার্য্য হট্ট বিদ্যালয়কারের নিকট শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হট্টও শাস্তিপুরনিবাসিনী ছিলেন, যদিও তাহার পূর্বনিবাস করিমপুর জেলায় ছিল। আমরা অহুসন্ধান জানিয়াছিলাম ইহা নিম্নমাণ প্রবাদ মাত্র। গোবামী ভট্টাচার্য্য কাশীধামে অধ্যয়ন করেন নাই, হট্টও দেশে থাকিতে অধ্যাপনা করেন নাই এবং তাহার পিত্রালয় ত নহেই, পতিগৃহও শাস্তিপুরে ছিল কি না তাহার কোনই প্রমাণ নাই। ওয়ার্ড সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন হট্ট কোন কালেই পতিগৃহে বাস করেন নাই।

আমরা ঐ সময়ের একজন মাত্র “হট্ট দেব্যা” নামক ব্রাহ্মণ বিধবার নাম দেখিয়াছি। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৬ সনে বেলপুথুরিয়া নিবাসী “দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার”কে ভূমিদান করেন (নদীয়া কালেক্টরীর ৪১০৮০ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। ১২০২ সনে ঐ ভূমির দখলকার ছিলেন দয়ারামের জ্ঞী “ত্ৰীমতী হট্ট দেব্যা”। তিনি হট্ট বিদ্যালয়কার হইতে অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন।

কালক্রমে বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে হট্ট বিদ্যালয়কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৪৯ সনে সিনিয়র কলারশিপ পরীক্ষায় বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ছিল “ভারতবর্ষীয় জীজ্ঞাতির বিদ্যাশিক্ষার ফল বর্ণনা কর।” উৎকৃষ্ট পাঁচটি উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘হুগলী বিদ্যালয়ে’র গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধের এক স্থলে আছে—“এক্ষণে জীলোকদিগের উৎকৃষ্ট কর্ত্তাভাবে যে কাল ব্যসনে ও নিদ্রায় ও কলহে ক্ষেপণ হয় তাহা কাব্যশাস্ত্রাদির বিনোদেতে যাইবে, এবং তদ্বারা অনেকে হট্টের তুল্য বিদ্যালয়কার হইবেন।” (Rep. of the General Committee of Publ. Instr., 1848-49, App. E, p. CCXLVI.)

“সখা” নামক মাসিক পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে (১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট সংখ্যা, পৃ. ১২৩-৫) গগনচন্দ্র হোম বর্ধমান জিলার ‘কলাইঝুটী’ গ্রাম নিবাসী অপর এক আধুনিক “হট্ট বিদ্যালয়কারের” জীবনী লিখিয়াছিলেন। নারায়ণদাস নামক এক বৈষ্ণবের চিরকুমারী এই কন্যার প্রকৃত নাম “রূপমঞ্জরী” এবং ১২৮২ সনের ১৫ পৌষ প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গতা হন। তিনি কাশীর দণ্ডীদের নিকট অব্যয়ন করিয়া দেশে আসিয়া পুরুষের ন্যায় শিক্ষা ও উত্তরীয় ধারণ করিতেন এবং সাহিত্য ও বৈদ্যক শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য তিনি প্রথম হট্ট বিদ্যালয়কারের সহিত অভিন্ন নহেন এবং তাহার প্রচলিত নাম ও উপাধি পূর্বতন মহাবিহুবার স্মৃতি বহন করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।

এ কিসের আলোড়ন

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

পুকুরের ঐ কালো ঘোলা জলে জীবনের আয়োজন ?

এ কিসের আলোড়ন ?

বাহির গাঙেতে জোয়ার এসেছে জানি,

কলকলকল ভেসে এসেছিল অফুট সেই বাণী,

—শুনি কান পেতে ; দেখি চোখ মেলে, নির্জীব নীল জলে

গোপনে কিসের এত আয়োজন চলে ?

কোন নালাপথে, কোন সে বেতারে হৃৎযুগ অবশেষে,

জীবনদেবতা এলে নটরাজ বেশে ?

আধমরা যত মাহুঘের বুকে, মুমূর্ষু ঘোলা জলে

বস্তার মত ছরস্তু বেগে বাঁধভাঙা কেন চলে ?

এস এস নটরাজ,

এ মরা পুকুরে, মাহুঘের বুকে হানো আগুনের বাছ

অলুক, পুড়ুক, থাক হ’য়ে থাক, উড়ো ছাই উড়ে থাক

বাঁধ দেওয়া জল এবার মুক্তি পাক,

জন্ম লভুক নতুন মাহুঘ নতুন মাটির কোলে

ভরুক আকাশ জীবনের কলরোলে।

ঐতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

সকল দেশে সকল যুগে জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আসে তরুণের কণ্ঠ থেকে। বিদ্রোহ করতে না পারলে নূতন সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টির জন্ম সকলের আগে বিদ্রোহের প্রয়োজন। বিদ্রোহ নূতনের আগমনের পথকে সূর্যম করে। আজ যুগসন্ধিক্ষণে চারদিক থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে এই সৃষ্টিমূলক বিদ্রোহের সুর। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রেও সে সুর ধ্বনিত।

সাধারণতঃ “ইতিহাস” বললে স্মৃতি হয় এমন একটা বিজ্ঞা বা বিষয় যেখানে অতীত কাহিনী ও ঘটনার কালাত্মক সমাবেশ রয়েছে। এই কাহিনী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হতে পারে বা সমষ্টিকে কেন্দ্র করে হতে পারে। এই ঘটনা জাতিকে ঘিরে হতে পারে বা রাষ্ট্রকে ঘিরে হতে পারে। মোট কথা এই বিচারে ইতিহাসের প্রধান কারবার অতীত ঘটনা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে। দেশের শিক্ষিত মহলের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই অল্পরূপ ধারণা পোষণ করে চলেছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে আজকাল নানা কণ্ঠেই প্রতিবাদ শোনা যায়।

জীবনকে বুঝবার প্রয়াস চলেছে মানুষের কত বিচিত্র পথে, কত বিচিত্র ধারায়। মানুষ যে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, কাব্য সৃষ্টি করে, দর্শন রচনা করে, এদের সকলের মধ্য দিয়েই চলেছে তার জীবনকে উপলব্ধির প্রয়াস। ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় না। ইতিহাসের ভেতর আমরা কোন্ ধরণের জীবন সন্ধান করি? সন্ধান করি “অতীত জীবন,”—তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত হোক। এখন প্রশ্ন উঠছে “জীবন” মানে কি? “জীবন” বললেই কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি বুঝায়, যদিও ঘটনার সমষ্টিই জীবন নয়। জীবন বললেই বুঝতে হবে দুটি জিনিষ; প্রথমতঃ, কতকগুলি ঘটনা; দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিহিত শক্তি। দার্শনিক পরিভাষায় প্রথমটিকে বলতে পারি “ফ্যাক্টস” (Facts), দ্বিতীয়টিকে “ফোর্সেস” (Forces)। এই দুইকে মিলিত করে “জীবন”। ঘটনাগুলি জীবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাদের বীজ রয়েছে অন্তরের গভীরে। মানবমনের সুগভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উদ্ভাবনা সর্বদাই তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্মের পথে। কর্মের ভেতরই রূপায়িত হয়ে ওঠে অন্তরের আশা ও আবেগগুলি। তাই কর্মের উৎস আবিষ্কার করতে হলে আমাদের ঘেতে হবে মানবমনে, তার তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ যেখানে নেই, সেখানে আমরা জীবনকেও যথার্থভাবে স্পর্শ করতে পারি না।

ইতিহাস আমরা পাঠ করি অতীত জীবনধারাকে বুঝবার জন্য একথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে যে,

ইতিহাসের ভেতর অতীত ঘটনাবলীর কালাত্মক সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই তাদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ। নচেৎ আলোচনাটা আর “ইতিহাসের” জ্বাতে উঠবে না, হয়ে থাকবে প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রত্নতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র অতীত কাহিনী সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্র তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। প্রত্নতত্ত্বকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক তার আলোচনা শুরু করলেও, উত্তরের কর্মক্ষেত্র এক নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে অতীত ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণই যথেষ্ট বা একমাত্র কাজ। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট ঘটনাবলীর কালাত্মক সমাবেশটাই গোঁণ; তাঁর প্রধান কারবার ঘটনাবৈচিত্র্যের ভিতর যোগ-সুত্র-স্থাপন এবং অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ। ইতিহাস লিখতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিশারদ হওয়া চাই-ই, যদিও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ হলেই কোনো গবেষক ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ান না। আমাদের দেশে বর্তমানে যারা “ঐতিহাসিক” নামে গণ্য ও পরিচিত, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত বিচারে ঐতিহাসিক নন—তারা প্রত্নতাত্ত্বিক। সেই সকল গবেষকের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শনও বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। ঐতিহাসিক এক শ্রেণীর পণ্ডিত; প্রত্নতাত্ত্বিক ভিন্ন শ্রেণীর—এ কথাই কেবল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ছোট-বড়র প্রশ্ন বর্তমানক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তব।

ইতিহাসের সুপ্রচলিত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ কোথায় ও কেন, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এবার অল্প এক অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমাদের দেশে সচরাচর আজও শিক্ষিত মহলের ধারণা যে, “ইতিহাস” বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয়। এ দেশের পণ্ডিতদের গবেষণা-প্রণালীর দ্বারা বিচার করলে দেখা যায়, তাঁদের ঐতিহাসিক লেখায় আজও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। ইউরোপেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দিন ইতিহাসের এ দৃগতি ছিল। দার্শনিক কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সময় থেকে ইতিহাসের এই দৃগতি-মোচন হয়েছে বলা চলে। মার্কসের পূর্ব পর্যন্ত পণ্ডিত-সমাজের বিচারে ইতিহাসটা ছিল শুধু ঘটনা-কঙ্কালের প্রাণহীন স্তূপ। মার্কস তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন ঘটনা-স্তূপের ভিতর জীবনের অস্তিত্ব, আবিষ্কার করলেন কাহিনীর সমারোহের ভিতর বিচিত্র শক্তিদ্বারা লীলা। এ ভাবে তিনি ইতিহাসকে যোলকলায় ভূষিত একটা সামাজিক বিজ্ঞানের মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কথা সত্য, মার্কস আবিষ্কৃত সকল ঐতিহাসিক সূত্র পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নি। নানা কণ্ঠ থেকে তাঁর প্রবর্তিত আলোচনা-

প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে। এই প্রতিবাদ শুনেছি মনোবী ব্রাউণ ও রাসেলের “ক্রীডম্ এণ্ড অরগেনাইজেশন্” (“স্বাধীনতা ও সংঘ,” লণ্ডন, ১৯৩৪) এছে, আবার আমাদের বিনয়কুমার সরকারের “জিলেজেন্স্ এণ্ড টাউন্স অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস্” (পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ম, ১৯৪১) পুস্তকে*। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু সকল দিক বিচার করে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কস আদি গুরু।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। অতীত বিজ্ঞানের মত এই শাস্ত্রেরও বিবিধ সূত্র বা নিয়ম বর্তমান। একথা সত্য, জড় বিজ্ঞানের নিয়মাবলী যে পরিমাণে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট, ইতিহাসের সূত্রগুলি ততটা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রশাস্ত্র ইত্যাদির মত ইতিহাসও অত্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক জীবন হিসাবে সংঘবদ্ধ মানুষের অতীত জীবন আলোচনাই এর লক্ষ্য।

বস্তুনিষ্ঠ বিচারে ইতিহাসের ভেতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূত্রের নাম : “বিশ্বশক্তির সন্ধ্যাবহার”।* একটা জাতির উত্থান বা পতন বিশ্বশক্তির সন্ধ্যাবহারের ক্ষমতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এক জন ব্যক্তির জীবন-বিকাশ যেমন নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্ভববিধ শক্তিশারার উপর, তেমনি একটা জাতির উন্নতি—আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি যে কোন ধরনেরই হোক না কেন,—নির্ভর করে দেশী ও বিদেশী শক্তিগুলির উপর। চারপাশের শক্তিকে যে সন্ধ্যাবহার করতে পারে, তারই উন্নতি ঘটে; যে পারে না, তার বিলুপ্তি অনিবার্য।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ স্থির ও নিশ্চল নয়। ধাবমান পৃথিবী মহাকাালের যাত্রাপথে অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন নতুন শক্তি সামাজিক গড়নে সৃষ্ট হচ্ছে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করছে; অল্প দিকে দুর্বল পুরাতন শক্তিগুলি নতনের প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত ও বিপর্যয় হচ্ছে। এই অবস্থায় যে মানুষ বা জাতি জীব পুরাতনকে বর্জন করে সবল নতুনকে বিচক্ষণভাবে গ্রহণ করতে পারে, পৃথিবীতে তারই সাক্ষ্য সুনিশ্চিত। কাজেই ইতিহাসের দ্বিতীয় সূত্র অর্থনিষ্ঠ “পরিবর্তন”।

তৃতীয়তঃ, পরিবর্তন সমগতিতে সর্বদা অগ্রসর হয় না। কখনও দ্রুতগতিতে পরিবর্তন আসে, কখনও আবার মন্থর গতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রণালীতে যে

পরিবর্তন, তার নাম বিপ্লব (Revolution)। দ্বিতীয় প্রণালীতে যে পরিবর্তন তার নাম বিবর্তন (Evolution)। পরিবর্তনের সময় নবজাত বা নবজাগ্রত শক্তিগুলিই যে কেবল ক্রমপরিণতি লাভ করে তা নয়, মাঝে মাঝে আকস্মিক ভাবে নতুন নতুন শক্তিও আবির্ভূত হয়। তখনই মানব-জীবনে বা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সুরু হয় বিপ্লবের অভিনয়, “ফান্ডামেন্টাল্ প্রবলেমস্ অব মার্কসিজম্” এছে (পৃঃ ১৫-১০৬) রাশিয়ান পণ্ডিত প্লেথানভ্ এ বিষয়টি অতি সুলভ ভাবে আলোচনা করেছেন।

চতুর্থতঃ, পরিবর্তনের মূল ষাণ্ডগুলি সকল দেশেই একরূপ। মানবজাতি মূলতঃ এক। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবজাতি বিভিন্নভাবে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু অভিব্যক্তির মূলগত ষাণ্ডগুলি স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল দেশেই মোটামুটিভাবে একরূপ। তবে একথা সত্য যে, অভিব্যক্তির স্তরগুলি অতিক্রম করতে সকল দেশের একরূপ সময় নাও লাগতে পারে।

পঞ্চমতঃ, সকল পরিবর্তনের মূলে কেবলমাত্র একটা শক্তি, আর্থিক বা যৌন বা আধ্যাত্মিক শক্তি—কাজ করে না। মানুষ মূলতঃ বহুনিষ্ঠ জীব। বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর তার রক্তের কণায় কণায়। অন্তরের এই বৈচিত্র্য-ধরা আকাঙ্ক্ষা ও আবেগগুলি তার জীবনকে, ইতিহাসের ধারাকে সর্বদাই বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে চলেছে।

ইতিহাসে আরও অনেক সূত্র আছে। তবে পূর্বোক্ত সূত্রগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দেখা যায় যে, কোন দৈবশক্তির প্রভাবে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ঘটে না। ইতিহাসের ধারায় আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক (Geographical) শক্তিও ক্রমবশি প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত মনেরও একটা প্রভাব আছে। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাতে নিহত যন্ত্র নয়। চারি পাশের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি অস্বীকৃত বা প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এ সবের সন্ধ্যাবহার করা বা না-করা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির উপর। অবশ্য এই ইচ্ছা এবং শক্তিও আবার অনেকাংশে পূর্ববর্তী আর্থিক-সামাজিক আবেগবাহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। তবুও মানুষের আত্মার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্বের স্বরাজ ঐতিহাসিক আলোচনার স্বতন্ত্রভাবে স্বীকারযোগ্য।

এই নির্দেশিত বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় ইতিহাস-আলোচনা এখনও এদেশে সুরু হয় নি। বোধ হয় তার সময়ও এখন উপস্থিত হয় নি। প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণা এদেশে যথার্থভাবে সুরু হয়েছে বহুদিনের কথা নয়। এ পর্যন্ত অতি-সামান্য তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। অসংখ্য তথ্য ও কাহিনী আজও অন্ধকারের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কাজেই যে প্রত্নতত্ত্বকে

* বর্তমান লেখক-প্রণীত “বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী” এছের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। বইখানি মার্কস বিরোধী বিশ্লেষণের সাক্ষ্য বহন করছে।

† The Science of History and Hope of Man-kind—Benoy Sarkar.

আশ্রয় করে ঐতিহাসিক ভার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আরম্ভ করতে পারেন, সেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বই আজ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। কাজেই যথার্থ ঐতিহাসিক আলোচনা এ দেশে বর্তমানে না-হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই কথাটা সকলেরই সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

তবে সেই সঙ্গে আবার এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস এক বিদ্যা নয়, আর বর্তমানে যা ইতিহাস নামে অভিহিত তা প্রত্নতপক্ষে ইতিহাসও নয়। বর্তমানের এই অভাব ও অসম্পূর্ণতার সন্ধে আজ প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তিরই সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

“মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে...”

অধ্যাপক ঐশ্বর্যশুবিমল মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ইতিহাসে দক্ষিণ-আফ্রিকার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মোট ঘে পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলিত হয় তাহার প্রায় অর্ধাংশ দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। কাজেই ইহার সমৃদ্ধি অনেকের ঈর্ষ্যার কারণ। এই দক্ষিণ-আফ্রিকা আবার প্রাচ্য এবং পশ্চাত্যের একটি প্রধান সংযোগস্থল এবং মিলনক্ষেত্র। স্মৃত্তরাং সমাজনীতির দিক হইতেও ইহার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন এবং বহুলাংশে বিরোধী জাতি এবং সংস্কৃতির মিলনভূমি। ইহাদের মধ্যে একটি—পাশ্চাত্য সভ্যতা। প্রতিদ্বন্দী সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া নিজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়টি ভারতীয় সভ্যতা। গর্বোদ্ধত পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সজর্বে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াই ইহা সঙ্কট। তৃতীয়টি স্থানীয় বার্টু সভ্যতা। অন্যকে জয় করিবার মত ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি ইহার নাই। কাজেই ইহার বর্তমান অবস্থা অনেকটা হিন্দু পুরাণোক্ত জিশঙ্কুর মত।

দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রক্ষমতা আজ ষেতজাতির কবলিত। শক্তিমদমত্ত ষেতান্সসমাজ নব নব বিধান প্রবর্তিত করিয়া অশ্বতকার জাতিসমূহকে ক্রমশঃ পঙ্ক করিয়া পরিণামে একেবারে ধ্বংস করিতে বহুপরিকর। স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা ভারতীয়গণের প্রতিই ইহাদের আকোশ বেশী বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণও খুব দুর্কোধ্য নহে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের অনেকেই বংশ-পরম্পরায় শ্রমিক হইলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা বহু বিষয়ে উন্নততর একটি সভ্যতার উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ষেতান্সগণের প্রতিদ্বন্দী।

১৯১০ সালে নাটাল, অরেঞ্জ জী টেট, ট্রান্সভাল এবং কেপ এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের সমবায়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র (Union of South Africa) গঠিত হয়। জেনারেল বোথা এই নবপ্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

অশ্বতকারদের প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকারের নীতি এবং ব্যবহার ষেত সভ্যতার একটি অবিস্মরণীয় অপকীর্তি।

মানব-বিদ্বেষ এবং সঙ্গীর্গতার অকুণ্ঠ নিরাজ প্রকাশ এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ইহার ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সভ্যতার নামে ‘প্রচণ্ড অত্যাচার’ ‘বলের বজ্রাঘাত’ বার বার ধর্মকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছে। আর এই অভিজ্ঞতা কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকাই অর্জন করে নাই। ষেতজাতি এবং সংস্কৃতি যেখানে অশ্বত জাতি এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়াছে সেখানেই বারবার এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটয়াছে।

১৮৪০ সালে কেপ প্রদেশের ইংরেজ শাসনকর্তা নাটাল অধিকার করিবার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে নাটালে অনুসৃত ইংরেজ নীতি বর্ণ, ধর্ম এবং সংস্কৃতি নিরপেক্ষ হইবে।

“There shall not be in the eye of the law any distinction or disqualification whatever founded upon mere distinction of colour, origin, language or creed, but the protection of the law, in letter and in substance, shall be extended impartially to all alike.” No. 20 of 1870.

১৮৭০ সালের বিংশতিতম আইনে নাটাল-সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যদি কোন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর বিনা ব্যয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার অধিকার ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে নাটালে জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে। নাটাল এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা-যুক্তরাষ্ট্র-সরকার কিন্তু পরবর্তী কালে বার বার মহারাণীর ঘোষণাপত্র এবং উল্লিখিত আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

১৮৬০ সালের কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে শ্রমিক-হুর্ভিক্ষের জন্ম দক্ষিণ-আফ্রিকার উদ্যান-উপনিবেশ (Garden-colony) নাটালের অর্থনৈতিক জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নাটালের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় নাটাল-সরকারের বিশেষ অহুরোধে ভারত-সরকার নাটালের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহে নিয়োগের জন্ম ভারতবর্ষ হইতে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক পাঠাইতে সম্মত হইলেন। এই ভাবে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার পর কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়ীও নাটালে গিয়া ঘর বাঁধিলেন। তাহারই ফলে নাটালে ভারতীয় সম্ভার অত্রপাত হইল। ট্রান্সভালেও কিছু কিছু ভারতীয় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কেপ প্রদেশের প্রতি ভারতীয়গণ কোনদিনই আকৃষ্ট হন নাই। এই কেপ প্রদেশেই কিন্তু প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের অগ্রাঙ্গ প্রদেশের তুলনায় সদয় এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইয়া থাকেন। ১৮৯১ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে অরেন্স ফ্রি স্টেটে ভারতীয়গণের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের ভারতীয় অধিবাসীর হার প্রতি শতে ২.৯ জন। ১৯০৬ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়গণ সংখ্যায় ২১৯৮৯৯ জন, ইহাদের মধ্যে ১৮৩৬৪৬ জন নাটালের, ২৫৫৬১ জন ট্রান্সভালের এবং ১০৬৯২ জন কেপ প্রদেশের বাসিন্দা।

ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় যায় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা নিজের প্রয়োজনে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়াছিল। প্রবাসী ভারতীয়গণ আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক এবং অর্থনীতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। জাতি-বৈরে অঙ্গ এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে বিচলিত স্বৈরাঙ্গ সম্প্রদায় আজ এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়াছে এবং ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক, ভারতীয়গণকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহে। অশ্বত্থকায়দিগকে সর্বপ্রকারে শোষণ এবং নিপেষণ করিয়া স্বৈরাঙ্গদিগের স্বার্থসংরক্ষণ এবং তাহাদিগের ক্ষীণতাদের অধিকতর ক্ষীণসাধন দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের অগ্রতম মূলমন্ত্র এবং ইহার অন্তর্গত নীতির অগ্রতম প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পদের দিনে দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয়গণের নিকট তাহার ঋণের কথা বেমানাম ভুলিয়া গেলেও এই ঋণের পরিমাণ কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। স্বৈরাঙ্গদিগের নিষেধের উজ্জ্বলতাই এই সত্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে। ১৮৬৫ সালের আনুমান্য মাসে 'নাটাল মার্কারি'তে (Natal Mercury) সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় যে, ভারতীয় শ্রমিকদিগের সহায়তা ব্যতীত নাটালে কফি চাষ সম্ভব হইত না।

"Had it not been for the coolie labour, we should not hear of coffee plantations springing in all hands and of the prosperity of the older ones being sustained."

সার লিজ হুলেট দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান শ্রমিক-ব্যবসায়ী। ১৯১০ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পূর্বে নাটাল ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয়গণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই নাটালের সমুদ্রোপকূল সমগ্র দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

"The condition of the colony before the immigration of Indian labour was one of gloom. The condition then was such that it threatened to extinguish the vitality of the country, and it was only by the help of the Government assisting immigration of labour that the country began at once to thrive. The coast has been turned into one of the most prosperous parts in South Africa. They could not find in the whole of the Cape and the Transvaal what they could find in the coast of Natal—ten thousand acres of land in one plot and with one crop—and that was entirely due to the importation of Indians. Durban was built up absolutely by the Indian population."—Sir J. Leige Hulett in the Natal Legislative Assembly in 1903.

কিন্তু কার্যকালে স্বৈরাঙ্গ শাসকসম্প্রদায় এই উপকারের কথা মনে রাখা প্রয়োজন মনে করে নাই। ১৮৮৫ সালে ট্রান্সভাল সরকার আইন করিলেন যে অতঃপর ভারতীয়গণ তাহাদের জন্ম নিদিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অগ্রজ বসবাস করিতে পারিবেন না (Law 3 of 1885, Transvaal)। এই সময়েই ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণ সর্ববিধ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিছুদিন পরে এই আইনের বিধান অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল করিয়া ভারতীয়গণকে সমস্ত রাজ-নৈতিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইল। স্থির হইল যে অতঃপর ভারতীয়গণের কোন হাবের সম্পত্তিতে অধিকার থাকিবে না। বিভিন্ন রাস্তা, সংরক্ষিত অঞ্চল এবং মহল্লায় ভারতীয়গণকে স্বৈরাঙ্গ সমাজ হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ঠিক দশ বৎসর পর ১৮৯৫ সালে নাটাল-সরকার আইন করিলেন যে, যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিকের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার যদি ভারতবর্ষে ফিরিয়া না যায় অথবা পুনরায় চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জন প্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড হারে কর দিতে হইবে (Law 17 of 1895, Natal)। অশ্বাচার্য্য কারা-দণ্ডভোগ করিতে হইবে অথবা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই আইনের ফলে বহু প্রবাসী ভারতীয় পরিবার ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতীয় শ্রমিকের নৈতিক অধঃপতন ঘটে (resulted in breaking up families

and driving men to crime and women to a life of shame—G. K. Gokhale)। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে নাটালের ভারতীয়গণকে আইনের বলে ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ১৮৯৭ সালে ভারতীয়গণের পক্ষে খেতাবিনীর পাণিগ্রহণ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল (Law 3 of 1897, Natal)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের অধিকার ধ্বংস করিবার জন্ত পর পর অনেকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯০৭ সালে ভারতীয়গণের ট্রান্সভালে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল (The Immigration Act No. 15, 1907)। এই বৎসরই আর একটি আইনের বলে ব্যবস্থা হইল যে, অতঃপর ট্রান্সভাল-প্রবাসী প্রত্যেক ভারতীয়কেই সরকারী দপ্তরে নিজের নাম রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। এই আইন অমাত্যের শাস্তি ছিল অনধিক ১০০ পাউণ্ড জরিমানা, অথবা অনধিক তিন মাস কারাদণ্ড (The Asiatic Land Amendment Act, 1907)। পর বৎসর আবার আইন করা হইল যে, ট্রান্সভালের ভারতীয়গণকে স্ব-স্ব নাম রেজিস্ট্রী করিতে এবং সর্বদা ছাড়পত্র (pass) সঙ্গে রাখিতে হইবে (Act 36 of 1908)। এই অবমাননাকর আইন, নাটালের ইণ্ডিয়ানস্‌স্‌ ভারতীয় শ্রমিকদিগের উপর জনপ্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর এবং আরও কতকগুলি বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যগ্রহ-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পশুবলের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের এই সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অতুলনীয় এবং অনন্যপূর্ব ঘটনা, এই সংগ্রামে পরিণামে আত্মিক বলই জয় লাভ করিল। ১৯১৪ সালে আইন-গান্ধী চুক্তির পর ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট (Indian Relief Act, 1914) বিধিবদ্ধ হইল। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার কর্তৃক তিন পাউণ্ড কর প্রত্যাহত এবং হিন্দু ও মুসলমান মতে বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হইল।

১৮৯৭ সালে নাটাল-সরকারের আদেশে ভারতীয়গণের নাটাল প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যে সমস্ত ভারতবাসী পূর্ব হইতেই নাটালে ছিলেন, তাহাদের গতিবিধিও এই সময় হইতে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। বিশেষ অসুখতিপ্রভু ব্যতীত তাহাদের ট্রান্সভাল প্রবেশের উপায় রহিল না। কেপ প্রদেশে এত দিন পর্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদার এবং সম্মানজনক ব্যবহার করা হইতেছিল। ফলে সেখানেও উগ্র ভারতীয় বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিল এবং ১৯০৬ সালে ভারতীয়গণের ঐ প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাব সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেন যে ভারতীয়গণকে চিরকাল অর্দ্ধদাস পর্যাযুক্ত করিয়া রাখিতে তাহারা কৃতসঙ্কল্প। এই প্রসঙ্গে

ফিল্ড মার্শাল আর্টসের একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালের ‘ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে’ গৃহীত একটি প্রস্তাব দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের পৌর অধিকার স্বীকার করিবার অল্পকূলে মত প্রকাশ করিল। আর্টস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন,

“The whole basis of our particular system in South Africa rests on inequality...it is the bed-rock of our constitution...you cannot deal with the Indians apart from the whole position in South Africa; you cannot give political rights to the Indians which you deny to the rest of the coloured citizens in South Africa.”

অর্থাৎ (বর্ণ এবং জাতি) “বৈষম্য দক্ষিণ-আফ্রিকার সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি...এই বৈষম্যই তাহার রাষ্ট্র-যন্ত্রেরও ভিত্তি। সমগ্রভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা পর্যালোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয়গণ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা চলিবে না। ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিলে দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যান্য অশ্বেতকায় জাতিসমূহকেও অল্পরূপ অধিকার দিতে হইবে।”

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮) দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ সাময়িকভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে হিমিত-তেজ ভারতীয় বিদ্বেষ-বিগুণ বেগে অগ্নিয়া উঠিল। একটর পর এক করিয়া ভারতীয়দিগের মর্যাদাহানিকর এবং তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। ১৯১৯ সালে আদেশ করা হইল যে ট্রান্সভালের ভারতীয়গণ কোন ঘোষণা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইতে পারিবেন না (Act 37 of 1919)। ১৯২৪ সালে নাটালের ভারতীয়গণকে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ১৮৯৬ সালে যখন নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়গণকে পার্লামেন্টের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তখন কিন্তু স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের মিউনিসিপ্যাল ভোটাধিকারে কোনদিনই হস্তক্ষেপ করা হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাব শাসকগণ বোধ হয় সব সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ডানকান ইউনিয়ন পার্লামেন্টে কুখ্যাত ‘ক্লাস এরিয়ান্স’ বিল উপস্থিত করিলেন। নাটাল-প্রবাসী ভারতীয়গণকে বসবাস, ব্যবসায় ও ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু এবং বিকল করিয়া দেওয়া এবং সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রস্তাবিত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আসন্ন হইয়া পড়ায় এই বিতর্কমূলক আইনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। নির্বাচনান্তে নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলে ডাঃ মালন স্বরাষ্ট্র

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। নির্বাচনের প্রাকালে পরি-
ত্যক্ত ভানকানের প্রস্তাবকে (Murderous Bill) সামান্য
সংশোধিত আকারে এবং ভিন্ন নামে পুনরায় পরিষদের
বিবেচনার জন্ত পেশ করা হইল। ইহাই মালনের 'এরিয়াস
রিজার্ভেসন বিল' (Areas Reservation Bill, 9.5.)।
ইহাতে প্রস্তাব করা হইল যে অতঃপর নগর অঞ্চলে এশিয়া-
বাসিগণ কেবল মাত্র তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট বিশেষ অঞ্চলসমূহ
ব্যতীত অত্র বসবাস, ব্যবসায় এবং বিষয়সম্পত্তি ক্রয় করিতে
পারিবেন না। এই প্রস্তাব প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তীব্র
বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। এই বিক্ষোভের ঢেউ ভারতবর্ষেও
আসিয়া পৌছিল এবং ভারত-সরকারের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট
থাকা সম্ভব হইল না। ফলে ১৯২৭ সালে কেপটাউনে দক্ষিণ-
আফ্রিকা এবং ভারত-সরকারের প্রতিনিধিসমূহী এক গোল
টেবিল বৈঠকে সমবেত হইলেন। এই বৈঠকে আলাপ-
আলোচনার ফলে 'কেপটাউন চুক্তি' (Cape Town Agree-
ment) সম্পাদিত হয়। 'এরিয়াস রিজার্ভেসন বিল' পরিত্যক্ত
হইল সত্য, কিন্তু জীবনযাত্রার পাশ্চাত্য মান রক্ষা করিবার
উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের সর্বপ্রকার বৈধ এবং
জায়াগ উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল
("to use all just and legitimate means for
the maintenance of western standards of life."
Article I, Cape Town Agreement)।

পাঁচ বৎসর পর ১৯৩২ সালে 'ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যান্ড
টেনিউর এক্ট', ১৯৩২, অথবা 'মালান এক্ট' (Transvaal
Asiatic Land Tenure Act, 1932 or Malan Act)
দ্বারা ভারতীয়গণের ট্রান্সভালে বাস এবং ব্যবসায়ের অধিকার
বিশেষ ভাবে খর্ব করিবার ব্যবস্থা হয়। এই আইনে বলা
হইল যে—

১। ভারতীয়গণ জোহানেসবার্গের রাও অঞ্চলে বসবাস
এবং জমি দখল করিবার অধিকারী নহে।

২। যে যে স্থানে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ উত্তালিত হইবে বলিয়া
সরকার ঘোষণা করিবেন তন্মধ্যে কোনও স্থানে ভারতীয়গণ
বাস করিতে বা জমি অধিকার করিতে পারিবেন না।

৩। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ইচ্ছা করিলে ভারতীয়গণের
বসবাসের জন্ত পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

৪। যে সমস্ত ভারতীয় 'স্বর্ণাঞ্চল' (Gold area)
ব্যবসায় করিতেছেন তাহাদিগকে পাঁচ বৎসর পরে উঠিয়া
যাইবার নোটিশ দেওয়া হইবে।

৫। ভারতীয়গণের স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের বা তাহার
মালিক হওয়ার অধিকার থাকিবে না ("must have no
right to make or own fixed property")।

৬। ভারতীয়গণ কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অত্র
ব্যবসায় করিতে পারিবেন না।

১৯৩৪ সালে এই আইন সংশোধিত করিয়া ভারতীয়গণের
ভূমি সংক্রান্ত অধিকার আরও সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইল।

১৯৩২ সালে ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ফিদাম
কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৬ সালে ট্রান্সভাল
এশিয়াটিক ল্যান্ড টেনিউর এমেন্ডমেন্ট এক্ট বা "ট্রুটাকোর্ড
এক্ট" বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে ব্যবস্থা হইল যে উক্ত
কমিশন কর্তৃক অহুমোদিত অঞ্চলসমূহে ভারতীয়গণের সম্পত্তি
অর্জন এবং ভোগের পরিপূর্ণ অধিকার থাকিবে। স্বরাষ্ট্রসচিব
কর্তৃক অহুমোদিত অঞ্চলসমূহেও ভারতীয়গণের অল্পরূপ
অধিকার থাকিবে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিবের অহুমোদন ব্যবস্থা-
পরিষদের সমর্থন সাপেক্ষ থাকিবে। এতদতিরিক্ত অত্র কোন
অঞ্চলে ভারতীয়গণের সম্পত্তিতে স্থায়ী অধিকার থাকিবে না।

এই আইনের ফলে মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর কিছু উপকার
হইল সত্য, কিন্তু ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণকে, তাহারা যে
যেতাদ্ধগণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে
বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ভারতীয়গণের সম্পত্তির অধিকার
খর্ব করিবার চেষ্টা ট্রান্সভালে নূতন নহে। ১৮৮৫ সালে
সর্বপ্রথম এই চেষ্টা করা হয়। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে
ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয়গণের ভূসম্পত্তির অধিকার খর্ব করিবার
প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যক্ত হয়।
কিন্তু ১৯৩৬-এর 'ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যান্ড টেনিউর
এমেন্ডমেন্ট এক্ট' বিধিবদ্ধ হইবার ফলে প্রবাসী ভারতীয়-
গণের ভূসম্পত্তিতে অধিকার সঙ্কোচের নীতি জরাজীর্ণ হইল।

ইহাতেও দক্ষিণ-আফ্রিকার যেতাদ্ধগণের মনস্তত্ত্ব হইল না।
এদিকে ভারত-সরকার অল্পস্বত স্বীকৃতির নীতি ইউনিয়ন
সরকারের স্পর্ধা এবং ঔদ্যত্যকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিতে-
ছিল। ১৯৪৩ সালে ইউনিয়ন পার্লামেন্ট কর্তৃক কুখ্যাত
'পেগিং এক্ট' বিধিবদ্ধ হইল। ব্যবস্থা হইল যে এই আইন
বিধিবদ্ধ হইবার সময় ভারতীয়গণ যে যে অঞ্চলে বাস
করিতেছে, পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বাহিরে
অত্র কোথাও তাহারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে
না। পর বৎসর নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে
কয়েক জন প্রতিনিধি ফিল্ড মার্শাল স্মার্টসের সহিত দেখা
করিয়া তাহাকে 'পেগিং এক্ট' রদ করিয়া দিবার অরুরোধ
কানাইলেন। তাহারা পরামর্শ দিলেন যে ইউরোপীয় এবং
এশিয়াবাসিগণের বাসস্থানের জন্ত লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা
হোক এবং এতদ্ব্যতীত একটি কমিটি গঠন করা হউক।

ফিল্ড মার্শাল স্মার্টস চতুর এবং বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি
দেখিলেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে
'পেগিং এক্ট'র মূলনীতি মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছেন।
তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করিলেন না। নাটাল
ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া তিনি
প্রিটোরিয়াতে এক বৈঠক করিলেন। বৈঠকে আলোচনার

ফলে ‘প্রটোরিয়া চুক্তি’ সম্পাদিত হয়। ইহার পর সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইল যে, নাটাল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অর্ডিন্যান্সের বলে বাসস্থানের লাইসেন্স দিবার জ্ঞান দুই জন ভারতীয় এবং দুই জন ইউরোপীয় সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইবে। অপর এক জন আইনজ্ঞ ইউরোপীয় প্রস্তাবিত বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। উল্লিখিত অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ হইবার পর সরকারী ঘোষণাপত্র দ্বারা ডারবানে ‘পেগিং এক্ট’র প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইবে।

“It was agreed that the situation would best be met by the introduction of an ordinance into the Natal Provincial Council. This ordinance would provide for the creation of a board consisting of two European and two Indian members under the chairmanship of a third European, who will be a man of legal training. The object of the legislation will be to create machinery for the board to control occupation by the licensing of dwelling in certain areas; and the application of the Pegging Act in Durban to be withdrawn by a proclamation on the passing of this ordinance.”—*The Tyranny of Colour* by P. S. Joshi, p. 330.)

সমস্ত বিধিবদ্ধ “এশিয়াটিক ল্যান্ড টেনিউর এণ্ড এশিয়াটিক রিপ্রেজেন্টেশন এক্ট” (Asiatic Land Tenure and Asiatic Representation Act) বা ‘ঘেটো এক্ট’ (Ghetto Act) দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসী-কর্তৃক কৃত উপকারের সর্বশেষ এবং অভিনব প্রতিদান। এই আইন দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ‘পেগিং এক্ট’ রদ করিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত অত্র ভারতবাসিগণ কর্তৃক সম্পত্তি অর্জন বা অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ‘ঘেটো এক্ট’র প্রয়োগক্ষেত্র ‘পেগিং এক্ট’ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। শেষোক্তটি কেবল মাত্র ডারবানেই প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে ‘ঘেটো এক্ট’ নাটালের সমুদয় পল্লী এবং নগর অঞ্চলে প্রযোজ্য। ‘পেগিং এক্ট’র বিধান অহুযায়ী কেবলমাত্র ভারতবাসী এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যেই স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ‘ঘেটো এক্ট’র বিধান অহুযায়ী ভারতবাসীর এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার অত্র সমস্ত জাতির—ইউরোপীয়, বার্টু, মালয়, চীনদেশীয়, মিশ্রজাতি ইত্যাদি—মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ইত্যাদি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। নাটাল এবং ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়-গণকে এই আইনের দ্বারা ১৫০ জনের অধিক সদস্যে গঠিত ইউনিয়ন পার্লামেন্টে তিন জন খেতাব প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নাটাল প্রবাসী ভারতীয়-গণও এই আইনের বলে প্রাদেশিক আইন-পরিষদে কয়েকজন খেতাব প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এই

অজ্ঞায় এবং অপমানজনক আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ ডাঃ নাইকার এবং ডাঃ দাহুর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের শোষিত এবং উৎপীড়িত মানব সমাজের সমস্ত উৎসুক দৃষ্টি আজ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতীতে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম দক্ষিণ-আফ্রিকায় জয়শ্রী মণ্ডিত হইয়াছে। “ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে”—বর্তমান ব্যাপারে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণকে পদে পদে যে সমস্ত অপমান এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সে কথা সবিস্তারে বলা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল তাহাদিগকে সামাজিক জীবনের প্রাথমিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মিউনিসিপ্যাল পুস্তকাগার এবং সন্তরণ-বাণীসমূহে ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইউরোপীয় পরিচালিত হোটেল এবং রেস্টোরাঁগুলির মধ্যে ২১টি ব্যতীত অত্রগুলিতে ভারতীয় এবং দেশীয় লোকদিগকে প্রাণ্য পরিবেশন করা হয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকার কোথাও প্রবাসী ভারতীয়গণের কোন বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিবার জ্ঞান বিশেষ শিক্ষা পাইতে পারেন। নাটাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে কোন ভারতীয় ছাত্র অথবা ছাত্রীকে ভর্তি করা হয় না। প্রবাসী ভারতীয়গণের আয়েসার ব্যবহারের অধিকার নাই। ১৯২৫ সালে বিধিবদ্ধ ‘কালার বার এক্ট’র বলে ইউরোপীয় ভিন্ন অত্র কোন শ্রমিককে বাষ্প এবং বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। দোকানপাটে সমস্ত খেতাব ক্রেতাকে বিদায় করিবার পর তবেই ভারতীয় ক্রেতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। অতি অল্পসংখ্যক আপিস এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়গণকে বৈহৃতিক ‘লিফট’ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। ভারত-সরকারের দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত প্রাক্তন ‘এজেন্ট-জেনারেল’গণের অগ্রতম সার রেজা আলি স্বয়ং এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার এক জন ভুক্তভোগী। ট্রাম এবং বাসের খেতাব-চালক এবং টিকেট রিক্রেতাগণ খুলীমত যে-কোন অজুহাতে ভারতীয়দের স্ব-স্ব যানে উঠিতে দিতে অস্বীকার করে। ট্রেনগুলির ভোজনকক্ষে ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার নাই। ডাক ও পুলিশ কর্মচারিগণ ভারতীয়দিগের প্রতি কোন প্রকার সৌজন্ম প্রকাশ দূরে থাক, সাধারণ ভদ্মতা প্রদর্শন করাও নিশ্চয়োজন মনে করে। অতি সাধারণ একজন ইউরোপীয়ও বিশিষ্ট ভারতীয়গণকে চোখ রাঙাইতে বা অপমান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। উচ্চতর সরকারী কার্যে, সিভিল সার্ভিস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয় না। কোন ভারতীয় দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের কোথাও রাসায়নিক বা হিসাব পরীক্ষকের ব্যৱসায় করিতে পারেন না। সাধারণ ভ্রমণস্থান,

সমুদ্রকূল, সরকারী-দপ্তর, ট্রেন, ট্রাম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সর্বস্থানেই ভারতীয়দিগের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার বহুস্থানেই ইউরোপীয় এবং অন্তর দেশীয়দিগের জন্ত পৃথক পৃথক যানবাহনের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি যানবাহন সর্বত্রই ভারতীয়গণকে ইউরোপীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ভারতীয়গণ সমপদস্থ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা কম বেতন পাইয়া থাকেন।

“Herrenvolk” অর্থাৎ বিধাতৃনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতির অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ বিশ্ব-সভ্যতার এক সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিক্ষণ। আমাদের পরিচিত পুরাতন পৃথিবীর রূপ অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকারের অল্পহত নীতিকে কোনক্রমেই যুগোপযোগী বলা চলে না। যুগবিশ্ববিরাগী নীতির অনুসরণে বিপ্লব অবশ্যস্বাভাবী হইয়া উঠে। দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতাব-শাসক-গোষ্ঠী যদি এখনও তাঁহাদের বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির মৌলিক পরিবর্তন না করেন, তাহা হইলে কি হইবে ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইহাদের অদূরদর্শিতা এবং অবিষ্ময়কারিতার ফলে বহুজন-আশঙ্কিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম স্কুলিঙ্গ দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা কে জানে। আর এই যুদ্ধের ফলে খেতাব-শাসক এবং অশেত শাসিত উভয়েই ‘চিতাভস্মে সবার সমান’ হইবে কিনা তাহাই বা কে জোর করিয়া বলিবে।

অমৃতের হেথা আসন পাতা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

অমৃতের তৃষা জেগেছিল যাহা জীবনের সেই আদিম প্রাতে,
জেগেছিল যাহা কলৌল-মূর্ধে, জেগেছিল যাহা সুরভি-সাথে,
পেয়েছিল যারে নীলের প্রান্তে, উর্ধ্ব-শোভিত বাপের কোলে,
মত্ত-মধুপ-গুঞ্জন-মুত কাণ্ড কোমল কুসুম-দোলে,
পেয়েছিল যারে রক্তিম রাগে রঞ্জিত নব উষার তীরে,
স্নেহ ও প্রেমের বেদনায় গলা বরে বরে পড়া অশ্রু-নীরে,
সে তৃষা আজিকে কোথায় হারায়, জেগে ওঠে হায় রক্ত-নেশা,
তাই ডেকে যায় কালকূট-ভরা কালো মেঘে ঘন অন্ধ-নিশা।

দিকে দিকে জাগে হিংস্র বাঘিনী, নাগিনী ছড়ায় মরণ-বিষ,
বীভৎসতার তাণ্ডবে ধরা ভরে ওঠে তাই অহর্নিশ।
সুধাকর আজ বিতরে কি সুধা, মেঘেরা বন্নিমে অমিয়-ধারা?
কুসুমের বৃকে মধুর গন্ধ ছুটিয়া চলে কি বাঁধন-হারা?
মাটির আড়াল সরিয়ে আজো কি সবুজের শোভা জাগিয়া ওঠে?
আজো কি হেথায় দেবতার পায় মাহুঘের মাথা আবেগে লোটে?
দেবতার আজ বাঁচিয়া আছে কি? মাহুঘেরা আজ বাঁচে কি ভাই?
যে দিকে তাকাই অমরেন্দ্র নাচে, দেবতা অথবা মাহুঘ নাই।

আকাশের আলো মুছিয়া গেল কি, পঙ্কে ভরিল জল-স্থল?
পাপিয়া-কণ্ঠ স্তব্ধ হ'ল কি, আকাশে উড়িল গৃধিনী-দল?
জ্যোৎস্নার বৃকে কে মাখালো মসী, কে মাখালো মসী ভায়ের
মেহে?
রুধিরের প্রতি লালসা জাগালো, দানবে জাগালো মানব-দেহে?
মাহুঘের সাধ তাহার সাধনা দানবে আজি কি হরিয়া লবে?
তুমি আর আমি মাতিয়া উঠিব মৃত্যুর মহা-মহোৎসবে?
আমার দেবতা তোমার দেবতা তোমার আমার রক্ত চায়?
নহিলে তাদের মিটিবে না তৃষা? সাধিয়া লব কি সে সাধনায়?

মাহুঘ মরেছে, ভুলেছে তাহার চিরসাধনার অমৃত বাণী,
ভুলেছে সীমার উর্দ্ধে অসীম চির-আরাধ্য আকাশখানি;
ভুলোক ভুলেছে আলোক হইতে অ-লোকের পথে যাত্রা তার,
সে পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে না দিবস অথবা অন্ধকার;
সে পথে রুদ্ধ ডমরু বাজে না, শিবের পূজায় মগ্ন সতী;
শত দীপ তুলি' সে পথে আঁধার আলোকের করে সন্সারতি;
ক্ষণেকের তরে থাম এই পথে, ক্ষণেকের তরে নোয়াও মাথা;
ক্ষণেকের তরে চেয়ে দেখ শুধু অমৃতের হেথা আসন পাতা।

সংক্রামক-ব্যাধি প্রতিষেধক ডিডিটি

শ্রীনগিনীকুমার ভদ্র

বিগত বিশ্বযুদ্ধে এক দিকে যেমন প্রাণধাতী মারণাস্রসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া অগণিত লোকের প্রাণহানির হেতু হইয়াছে, অত্র দিকে তেমনি এমন সব রাসায়নিক এবং অজবিধ পদার্থও উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহা যুদ্ধোত্তর কালেও মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই সমস্ত পদার্থের পরীক্ষণ প্রয়োগাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৎপরতার সহিত অগ্রগতি হইয়াছে এবং হইতেছে।

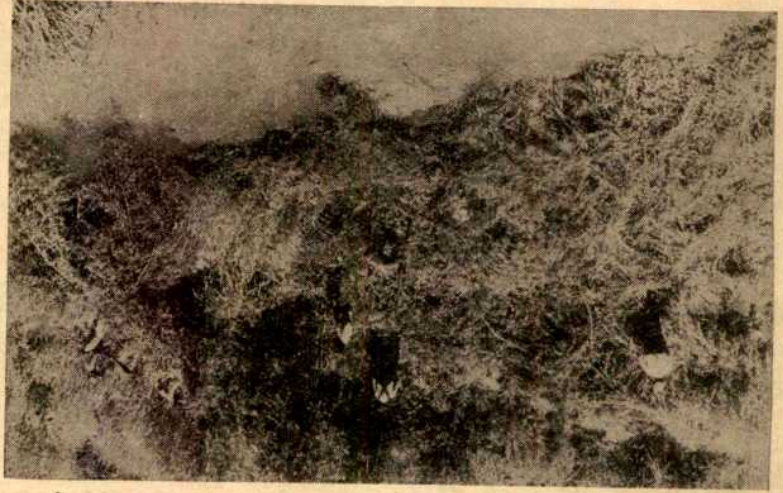
‘ডিডিটি’ যুদ্ধকালে আবিষ্কৃত এমনই ধরণের একটি শক্তিশালী কীটপতঙ্গ-বিনাশক পদার্থ। ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধে ইহার কার্যকারিতা অপরিসীম। বাংলা-দেশ তথা ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাধি এদেশবাসীর জীবনীশক্তি তিল তিল করিয়া হরণ করিতেছে। সুতরাং ম্যালেরিয়া নিমূল করিবার জন্ত এদেশে যাহাতে ব্যাপক ভাবে ডিডিটির প্রয়োগ হয় সেজন্য সরকার এবং জনস্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগের (Public Health Department) বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত।

ডিডিটি একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা ডাইক্লোরো-ডাই-ফিনাইল—ট্রাইক্লোরো-ফেন এই তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হইতে ইহার কথা বৈজ্ঞানিক মহলে জানা ছিল। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর পল লেঙ্গার এবং ডক্টর পল মুলার নামক দুই জন সুইস রাসায়নিক আবিষ্কার করেন যে, ইহা একটি পতঙ্গবিনাশক রাসায়নিক দ্রব্য—বিশেষতঃ মশক-কূল ধ্বংস করিবার পক্ষে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। তখন হইতেই ম্যালেরিয়া নিবারণে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ হয়। বিশ্ববরেখার ২৫ অংশ উত্তর এবং ২৫ অংশ দক্ষিণ দিকস্থ অঞ্চলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়।

মশক শুধু যে ম্যালেরিয়ার বাহক তাহা নয়, ইহার পীত জ্বর এবং গোদ প্রভৃতি ব্যাধিও সংক্রামিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত সংক্রামক রোগের বাহন মশককূল ধ্বংস করায় ডিডিটির জুড়ি মাই। তম্বু ছাড়া অত্যন্ত লোকক্ষয়কারী রোগ-বীজাণু-বাহক কীট-পতঙ্গাদিও ডিডিটি প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মোট কথা কীট-পতঙ্গবিনাশক পদার্থের মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠতম বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। বিগত কয়েক

বৎসরব্যাপী পরীক্ষণের ফলে ডিডিটি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুসংখ্যক সরকারী এজেন্সি সাধারণের উপকারার্থে তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত করিতেছেন।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে ডিডিটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিডিটির প্রয়োগ যাহাতে ফলপ্রসূ হইতে পারে তৎসম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা ও



ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উৎপত্তি নিবারণকল্পে শ্রমিকগণ কর্তৃক একটি জল-নির্গমের খাতের নিকটস্থ আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার

পরীক্ষণ হইয়াছে। এই সমস্ত গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট (Warm blooded) প্রাণীদের দেহে ডিডিটির বিষক্রিয়া প্যারিস গ্রিন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে, শীতলরক্ত-বিশিষ্ট (Cold blooded) প্রাণীদের দেহে একবার মাত্র ডিডিটি প্রয়োগ করিলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য। কতকগুলি গাছপাছড়ার উপরেও ইহার আশ্চর্য-জনক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ডিডিটি এক ধরণের স্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ পদার্থ। জীবদেহের বাহিরে এবং ভিতরে উভয়ত্রই ইহার বিষক্রিয়া হইয়া থাকে এবং বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা স্নায়ুমাণ্ডলীর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহার বিশিষ্ট ধর্ম হইতেছে স্থায়ী বিষক্রিয়া। কেননা ইহা দ্রব্যাদির গায়ে বা প্রাণীদের আঠার মত লাগিয়া থাকে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ব্যাপিয়া ইহার কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকে।

ক্ষেতে অথবা বাগানে ডিডিটি প্রয়োগকালে বিশেষ

সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। মাছ, সাপ, কঁাকড়া প্রভৃতি অন্যান্য শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর পক্ষে সামান্য পরিমাণ ডিডিটির বিষক্রিয়াও মারাত্মক। একবার পরীক্ষণ ব্যপদেশে একটি পুকুরের উপর ডিডিটি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুকুরের সমস্ত মাছ মরিয়া যায়।

তরিতরকারির বাগানে ডিডিটি প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে বিলাতি বেগুন, গোখুমাди শস, সিম, প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ব্যাধাত জন্মে এবং কোয়াশ, শশা এবং ফুটি ও তরমুজ খরমুজ প্রভৃতি গাছপালা মরিয়া যায়।

গৃহস্থ-পরিবারে ছারপোকা, মশা, মাছি ইত্যাদির বিনাশ-সাধনে ডিডিটির অমোঘ শক্তি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু আরমুলা, পিপীলিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরণের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ



শ্রমিকগণ কর্তৃক বনাঞ্চলে একটি জল-নির্গম-খাত নির্মাণ



ডিডিটিকে তরল বিন্দুতে পরিণত করিয়া তাহা দ্বারা ঘরের পর্দায় মশক বিনাশ। মশককুলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কোনো কোনো প্রাণিদেহেও ইহা তরল বিন্দু আকারে প্রয়োগ করা হয়

প্রয়োগে যেমন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। জমির উপর এক বার মাত্র ইহা প্রয়োগ করিলে ছই মরসুমের কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, ডিডিটিকে তরল বিন্দুতে পরিণত করিয়া ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করিলে জ্বর, ডেঙ্ক, টাইফাস, আমাশয়, কলেরা, প্রেগ প্রভৃতি কীট-পতঙ্গবাহিত ব্যাধিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুব্যবস্থা হইতে পারে।

ডিডিটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে উক্তবাহিত টাইফাস রোগ প্রতিষেধের কোনও পন্থা মানুষের জানা ছিল না। ঐ রোগ



তরলীকৃত ডিডিটিতে পূর্ণ একটি পেয়ালা। একটা গোটা পরিবারকে মশকের হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এই ধরণের ছই পেয়ালা ডিডিটিই যথেষ্ট

কোনও দেশে দেখা দিলে সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত, শতকরা চল্লিশ জন লোক এ ব্যাধির কবলে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কথিত আছে যে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালে এবং তাহার অব্যবহিত পরে সবুজ পাঁচ লক্ষ রুশীয় এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নেপলসে যখন টাইফাস রোগ দেখা দেয় তখন যুক্তরাষ্ট্রের ওরল্যাণ্ডো, ফ্লোরিডার কৃষি গবেষণা-বিভাগের ডিরেক্টর সমভিব্যাহারে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের টাইফাস কমিশন ডিডিটি পাউডারে ভর্তি অনেকগুলি পাত্রসহ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। (ওরল্যাণ্ডোর কৃষি-গবেষণাগারেই ডিডিটি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয় এবং পরীক্ষণাদি দ্বারা ইহার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়—এমনই ভাবে সেখানে সামান্য একটি রাসায়নিক ফরমুলা হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কীটপতঙ্গবিনাশক পদার্থ উদ্ভাবিত হয়।) উপরি-উক্ত মিশনের নেপলসে উপস্থিতির পূর্বেই ৬০ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, এই মহামারীর সময় অন্ততঃ ৫০০ জন প্রত্যহ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তেমনদ্বারা কিছু ঘটিল না।

কমিশন ৩০০,০০০ জন নেপালসবাসীর পায়জামার উপরে, জামার হাতার এবং কলারের নীচে ডিডিটি চূর্ণ লেপিয়া দিলেন। এই চূর্ণ নেপালসের সমস্ত উরুন ধবংস করিল। দুই মাসের মধ্যে উক্ত শহর সম্পূর্ণ রূপে সংক্রামক টাইফাস ব্যাধির কবল-

যুক্ত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম টাইফাস মহামারী মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল—মানুষ তাহার সংক্রামণকে প্রতিরোধ করিল একমাত্র ডিডিটির সাহায্যেই।

রামায়ণে সঙ্গীতের কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল কি-না? এ প্রশ্ন করার সাধারণতঃ কোন সার্থকতা দেখা যায় না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ তথা ঐতিহাসিক ধারা অহুশীলন করলে দেখা যায়, পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের রূপ ও গতি অব্যাহতই রয়েছে—তা সে যে আকারেই হোক। বৈদিক সামগণে নানা স্বরের প্রচলন হয়েছিল। অর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরাস্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ রূপের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হলেও সঙ্গীত বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। রামায়ণের যুগেও তার একটু বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের অভিযাত্রি অব্যাহত ছিল। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টির দিক দিয়ে তখনকার সমাজও সঙ্গীতকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল এ বিষয় অন্তত আলোচনা করে আমাদের দেখা উচিত।

সঙ্গীতের গোড়াকার কথা ছেড়ে দিলেও সঙ্গীতের কৌলিঙ্গ, ঐশ্বর্য ও পদ-মর্যাদার পরিচয় পাই আমরা প্রাতিশাখ্য ও বিশেষ করে শিকার ভেতরেই। শিকার পর রামায়ণ, তারপর মহাভারত, (১) হরিবংশ ও পুরাণের যুগ। রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের অভিযাত্রি ও রূপ কি রকম ছিল এ বিষয়ে অহুস্কান করে দেখলে দেখা যায়, সঙ্গীতের অহুশীলন ও প্রচলন সে সময়ে যেমনই থাকুক না কেন, রামায়ণ মহাকাব্যে অন্ততঃ সঙ্গীতের আশাহরুপ পরিচয় আমরা কিছুই পাই নি। তারপর একথাও আমরা স্বীকার করি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা যেভাবে সমাজের ভেতর দিয়ে ক্রমিক উন্নতির স্তরকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে, রামায়ণের যুগে সে বিকাশের গতি ও রূপের কিছু বৈলক্ষ্য্য হয়েছিল এবং সত্যি ক'লে বলতে গেলে সঙ্গীতের অনেক-কিছুরই পরিপূর্ণ মুক্তির কোন আভাস তখন আমরা পাই নি। অথচ রামায়ণের প্রণয়নকর্তা মহামুনি বাণ্মীকি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, আর সে-পারদর্শিতার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন লব ও কুশকে রামায়ণ-গান শিক্ষা দেবার সময়ে। অবশ্য এই লব ও কুশ সম্বন্ধে

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভেতর বেশ একটা মতবৈধও আছে এই নিয়ে যে, এরা সত্যিকারই শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র ছিল, কি বিভিন্ন দেশভ্রমণকারী 'গাথা'-গায়কই মাত্র ছিল? অনেকে আবার এদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব-নিষেধও সন্ধিহান হয়ে থাকেন। (২)

মোট কথা, রামায়ণের যুগে সমাজে ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনা যে ছিল একথা নানা দিক থেকে বিচার করে দেখলে তা স্বীকার করতেই হয়। তাই আশ্চর্যের বিষয় যে, রামায়ণ-প্রণেতা বাণ্মীকি নিজে গান্ধর্বকলায় সুপণ্ডিত হয়েও তাঁর লেখার ভেতর সঙ্গীতের খুঁটিনাটির কোন পরিচয় কেন দিলেন না। রহস্য বা উদ্দেশ্য তাঁর এ না-দেওয়ার বিষয়ে যাই থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু বলি—ঐতিহাসিক ও সত্যাহু-সন্ধিহনদের দরবারে এজ্ঞে তিনি কম বড় অপরাধী হন নি।

২। প্রোঃ উইটারনিজ্ ব'লেতে চেয়েছেন যে, লব ও কুশের কাহিনীকে রামায়ণিক আখ্যানে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ('interpolated') এবং শুধু লব ও কুশই নয়, এ রকম অনেক বায়াবর-বৃত্তিসম্পন্ন গায়কেরা রামায়ণের যুগে ছিল যাদের আবার রাজা-রাজভাদ্রদের সভাগায়ক ইত্যাদি রূপেও দেখা যায়। এ. হন্টম্যান, প্রোঃ জেকবি, প্রোঃ লেভি ও প্রোঃ হপকিন্স প্রভৃতি মনীষীদের অভিমতও তাই। প্রোঃ উইটারনিজ্ এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"Thus it is related in the *Ramayana*, though in a late, interpolated song, how the two sons of Rama, Kusha and Lava travelled about as wandering singers and recited in public assemblies the poem learned from the poet Valmiki" (—Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315.)

হন্টম্যান ও লব ও কুশকে "travelling singers called *Kushilavas*" ব'লে অভিহিত করেছেন যারা আবার সাধারণের কাছে বাণীক মঞ্চে সুর মিলিয়ে 'গাথা' গান করত। প্রোঃ জেকবি বলেছেন :

"The names Kusha and Lava were invented as a kind of etymological interpretation of the word *Kushilava*. * * who sang epic songs to the accompaniment of the lute." প্রোঃ উইটারনিজ্ প্রবৃত্ত *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315 প্রভৃতি।

১। পণ্ডিতদের ভেতর কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে এই নিয়ে যে, রামায়ণ আগে—কি মহাভারত আগে? আমরা অবশ্য এই ঐতিহাসিক আলোচনার বর্তমানে যোগ দেব না।

রামায়ণকে অনেকে বলতে চান নাকি আখ্যানমূলক সাহিত্য, শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও গুণকীর্তনেই কেবল ভরপুর। কিন্তু সত্যিকার ভাবে আলোচনা করলে এটা মোটেই অস্বীকার করা যাবে না যে, রামায়ণ সাহিত্য একটি ইতিহাসও বটে। রামায়ণের যুগে সমাজ, সাহিত্য, কলা, ভাস্কর্য, রাজনীতি, শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম ও আচারপ্রণালী সব-কিছুরই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা পেয়ে থাকি; কেবলই হৈয়ালী ও রূপকথায় এর পাতা ভর্তি নয়। তারপর অনেকে ধারা আবার রামায়ণের ঐতিহাসিকতাকে কোন রকমে মানতে রাজী হন, তাঁদের মতে হ'ল রামায়ণ-মহাকাব্য একখানি বই, যাতে আছে অসভ্য ও সুসভ্য এ দুটি জাতের মাত্র কুষ্টি, লড়াই, সভ্যতা ও ধর্ম-পরিচয়ের কথা। মাহুঘেরা ছিল সুসভ্য জাত (আর্য) ও রাক্ষসেরা ছিল অসভ্য (অনার্য); এদের ভেতর ক্রমাগতই লেপে থাকত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ। অবশ্য 'অসভ্য' বলতে তাঁরা বুঝে থাকেন মাত্র তাদের যাদের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির কোন বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এখনকার অনেক পণ্ডিতের অভিমত হল আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর্য ও অনার্য জাতি বলতে মোটেই বোঝায় না তাদের যাদের আমরা বলি মাহুঘ বা রাক্ষস-বংশীয়। অনার্যরা (non-Aryans) এসেছিল ভারতেরই বাইরে থেকে; সংস্কৃতি, শিক্ষা বা সভ্যতা তাদের নিক্ষেদের

৩। বাস্তবিক 'রাক্ষস' বলতে আমরা সাধারণত 'অসুস্থ' বুঝে থাকি। 'অসুস্থ' কথাটি কিন্তু আগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে দেবতাদের উল্লেখ্যেই ব্যবহৃত হ'ত। ঋগ্বেদের ৯-ম মণ্ডল পর্যন্ত দেখা যায়, 'অসুস্থ' বলতে সেখানে 'দেবতা'কেই বোঝাচ্ছে। বরুণ ও ইন্দ্র—এঁরাও সব 'অসুস্থ' নামেই অভিহিত হতেন; যেমন বরুণাসুস্থ, ইন্দ্রাসুস্থ, অর্থাৎ বরুণদেবতা, ইন্দ্রদেবতা। ঠিক ঠিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডলেই এই শব্দ বা কথাগুলির বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মোক্ষমূলার প্রমুখ পণ্ডিতেরাও স্থির করেছেন যে, ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডল লেখা হয়েছে ১ম—৯ম মণ্ডলের অনেক পরে। অসুস্থ ও দেবতা শব্দ নিয়ে পারসিক ধর্মে (Persian religion) দেখা যায় ঠিক বিপরীত। সেখানে 'অসুস্থ' অর্থাৎ 'অসুস্থ' শব্দ দেবতার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'অসুস্থ মন্বন' থেকে 'অসুস্থ বা অসুস্থ মজদ' নামকরণ করা হয়েছে। আর 'দেও' বা 'দেবতা' শব্দ তাদের বোঝার ভূত বা অপদেবতাকে। সুতরাং রামায়ণে যে রাবণকে অসুস্থরাপি বলা হয়েছে সেও সম্পূর্ণ আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন নৃপতি বলেই মনে করা হয়েছে যদিও আর্য-সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে সব আবার ভাগ ও ভিন্নতা ছিল। তা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও এমন কি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও 'অসুস্থ'কে আর্যদেরই একটি clan (বংশ) বা Tribe-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট কথা অসুস্থ বা রাক্ষস অনার্য কোন জাতি বা শাখার মোটেই অংশবিশেষ ছিল না, অসুস্থ আর্যদেরই একটি শাখা মাত্র, যাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দেবতা ও মাহুঘদেরই অনুরূপ, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

বলতে কিছুই ছিল না। যাযাবরের মতই তারা বাস করত এখানে সেখানে ঘুরে-ফিরে 'আর্য' তথা আদিম সুসভ্য ভারত-বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে। রাক্ষসেরাও ছিল কিন্তু এদেশেরই লোক। দেব, মাহুঘ ও রাক্ষস এ তিন বংশের ভেতর তারা ছিল রাক্ষস-বংশের অন্তর্ভুক্ত। (৩) রাক্ষসেরাও যুদ্ধ করতে জানত। তাদের উন্নত সমাজ ছিল, সমাজ-শাসন ছিল, নিয়মশৃঙ্খলা ও শান্তির আবহাওয়া ছিল। রাক্ষসদেরও হৃদয় ছিল; দয়া, মায়্যা ও প্রত্যাশার দেওয়ার দায়িত্ব-জ্ঞান ছিল। তাদেরও রাজা ছিল এবং রাষ্ট্র ছিল। তারাও তপস্যা করতে জানত এবং তপস্যার সন্তুষ্টি করে দেবতাদের নিকট থেকে বর-ভিক্ষা পেয়েছে; সুতরাং অসভ্য তারা মোটেই ছিল না। তবে অসভ্য ছিল সুসভ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদেশবাসীদের জ্ঞান ও গরিমার তুলনায় এই মাত্র যা বলা যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, রামায়ণের যুগে রাক্ষসেরা ছিল আমাদেরই মতন মাহুঘ; জ্ঞান, বীর্য ও গরিমায় বরণ আত্মাদের (তথাকথিত মাহুঘজাতির) চেয়েও তারা ছিল উন্নত। সুতরাং আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ—এ মিথ্যা-কাহিনীর অংশীদার কি মাহুঘ কি রাক্ষস কেউই ছিল না; কেননা রাজা রাবণই তার সাক্ষ্য বা উদাহরণ। দয়া, ধর্ম, তপস্যা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতিজ্ঞান, শিল্প ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি সাধনে প্রচেষ্টা, বিজ্ঞানের সম্মান প্রদর্শন—এ সকল বিষয়েই রাক্ষসরাজ অগ্রণী ছিলেন। রাজা দশরথের কাহিনী ও তাঁর রাষ্ট্রগৌরব; শ্রীরাম-চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা; সীতার আদর্শ নারীচরিত্র ও পতিভক্তি; ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃত্বভক্তি, শ্রদ্ধা ও আয়ত্যাগের অলঙ্ঘন নিদর্শন—এ সবই আবার উন্নত আর্য একটি ভারতীয় সমাজের পরিচয় দান করে। হুয়ুমানের বীর্য, কত ব্যপারায়ণতা ও দান্তভক্তি; অশ্রীব ও অঙ্গদের বুদ্ধিচাতুর্য, কলানৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রভৃতি তথাকথিক মধ্যভারতীয় অসভ্য সমাজেরই(?) আবার কলক দূর করেছে। রামায়ণের যুগে দেশ এবং দেশের চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণতি রামায়ণ পরিপূর্ণভাবেই বরণ অঙ্কিত করেছে। আর সেজন্মেই বলছি যে, সঙ্গীতের বেলায়ও তাই; রামায়ণ-রচয়িতা ঠিক সঙ্গীতের কথাকেও একেবারে অবহেলা করতে পারেন নি। কিন্তু তা হলেও একথা সত্যি যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে যতখানি আলোচনা করা দরকার অন্ততঃ ঐতিহাসিকদের জ্ঞান আর এতটুকু নিয়ুতি করার মতন ততখানি প্রচেষ্টা রামায়ণকার মোটেই করেন নি, সাধারণ পরিচিতির আলেখ্যই তিনি এঁকে গেছেন মাত্র।

রামায়ণকে দেখা যায় সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে, আর রামায়ণকার সে পরিচ্ছেদগুলির নাম দিয়েছেন 'কাণ্ড' বলে। যেমন—(১) বালকাণ্ড, (২) অযোধ্যাকাণ্ড, (৩) অরণ্যকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, (৫) সুন্দরাকাণ্ড, (৬) যুদ্ধকাণ্ড ও (৭) উত্তরাকাণ্ড। এই কাণ্ডগুলির ভেতর বিশেষ করে সঙ্গীতের আলোচনা পাই আমরা বালকাণ্ডে সামান্য, অযোধ্যা-

কাণ্ডে ও উত্তরাকাণ্ডে কিছু বেশী, আর অপরাপর কাণ্ডে খুব সামান্য। যেমন বালকাণ্ডে আছে,

“গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যন্ত রাধব।

আমোদ্যে পরমং জগদ্বরাভরণমুখ্যিতাঃ ॥”(৪)

এখানে নৃত্য, গীত ও বাজের কথাই বলা হয়েছে, শুধু গান বা গীতের কথা বলা হয় নি। সুতরাং একথা ঠিক যে, সঙ্গীতের সমবেত রূপ বলতে নৃত্য, গীত ও বাজের পরস্পর মিলন, যা আমরা বুঝি, রামায়ণের যুগেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এটাও ঠিক যে, ‘সঙ্গীত’ এই পরিভাষা নৃত্য, গীত ও বাজ বা নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতের গীত, বাজ ও নাট্যের সমবেত রূপের প্রতিনিধিরূপে তখনও ঠিক দেখা দেয় নি। ‘গান্ধর্ব’-সঙ্গীতের কথাও রামায়ণে নেই বললেই চলে, কেবল ছ’এক জায়গায় তার উল্লেখ মাত্র ছাড়া।

তার পর ৭৩ সর্গে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ও ধর্ষভঙ্গ হচ্ছে সেখানে বলা হয়েছে আবার,

“পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিকাং সুভাষরা।

দিব্যহুস্তম্ভিনির্বোধৈগীতবাদিনিঃশব্দৈঃ।

নমৃতুশ্চাপারঃ সংজ্ঞা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ ফলম্ ॥’৫)

এখানেও “গীতবাদিত্র” ও “নমৃতুঃ” কথাগুলির উল্লেখ থাকায় বর্তমান(৬) “সঙ্গীত” কথাটির প্রতিধ্বনি করা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া ‘হুস্তম্ভি’ বা ‘দেবহুস্তম্ভি’ তখনকার দিনে বেশ একটা পরিচিত বাজযন্ত্র ছিল একথাই বোঝা যায়। নৃত্যকারীদের ভেতর অপরা ও গন্ধর্বাও ছিলেন। অপরাবরা নৃত্যশীলা চক্কা ও গন্ধর্বগণ গীত ও বাজে সুনিপুণ ছিলেন।

এর পরই অযোধ্যাকাণ্ডের ভেতর পাই আমরা সঙ্গীতের একটু বিশদ রূপের পরিচয়। তবে এটাও ঠিক যে, এ বিশদতার অর্থ কেবল পরিচিতি বা বর্ণনামাত্রই পর্যবসিত; সঙ্গীতিক কোন ঔপপত্তিক (theoretical) বিষয় নিয়ে আলোচনা মোটেই করা হয় নি। এই অযোধ্যাকাণ্ডে পাই আমরা “মনঃকর্ণমুখাবাচ”(৭)। বা “শুশ্রাব” মানে “রাগ”—এর(৮) কথা যা স্বরসমষ্টির বিকাশ নিয়ে লোকের চিত্তরঞ্জন ক’রে থাকে। দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিম্বর ও নাগবংশীয় শিল্পীদের উল্লেখও পাওয়া যায়।(৯) ভিন্ন ভিন্ন গায়কসম্প্রদায়ের পরিচয়ও রামায়ণে দেওয়া হয়েছে; যেমন “গায়কাঃ * * নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥”(১০) এ থেকে গানের রীতি বা পদ্ধতি যে প্রতিশাখা-যুগের মতন অনেকাংশে ছিল তাও সহজে অনুমান করা যায়। রামায়ণে ক্রুতির কথাও আছে, অর্থাৎ গায়কসম্প্রদায়

রামায়ণের যুগে ক্রুতিবিভাগকে বেশ সাবধানতার সঙ্গেই রক্ষা ক’রে চলতেন এবং সেজন্তে তাঁরা ক্রুতিজ্ঞানে পারদর্শীই ছিলেন বলা যায়। রাজাদের উদ্দেশ্যে ‘শুব’ বা শুণকীর্তনের প্রথা তখনও ছিল। রামায়ণের যুগে রাজারা গায়কসম্প্রদায়কে ‘স্বাবক’শ্রেণী বা চারণদলভুক্ত ক’রে নিজেদের রাজসভায় বৃত্তি দিয়ে রাখতেন, আর এরকমের রীতির অনুসরণ করাটাও তখনকার দিনে রাজাদের পক্ষে অসম্ভব গৌরবের বিষয়ই ছিল।(১১) কেননা ৬৫ সর্গের ৬ শ্লোকেই উল্লেখ করা হয়েছে :—
“আশীর্গেয়ং চ গাথানাং পুরয়ামাস বৈশ্ব তৎ ॥” এখানে “গাথা” বলতে আশীর্বাদজ্ঞাপক গানকেই বোঝায়। টীকায়ও বলা হয়েছে : “গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মশীর্বাদ-প্রধানং গানম্। যত্র গাথা রাজ্যাং চরিত্রাদিপ্রতিপাদিক-স্তামাশীর্বাদবটীতং গানমিত্যর্থঃ ॥” সুতরাং রাজা বা সম্রাটদের সভায় স্বাবক বা চারণদলের বৈশিষ্ট্য মোটেই রামায়ণের যুগেও ছিল না একথা বুঝতে হবে।(১২)

বীণার প্রচলন তখন বেশীই ছিল। বীণা ও বেণু (বংশ) শুধু রামায়ণের যুগেই নয়, বৈদিক যুগেও গান, গীতি বা গাথার প্রধান সহায়ক ছিল।(১৩) ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী, এমন কি সহস্র-তন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধের কথাও নূতন নয়।(১৪) তবে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের যুগে যুদ্ধ বললে যুগ+অঙ্গ বা মাটি দিয়ে তৈরি বাজযন্ত্রই বোঝাত। মার্গ তথা অভিজাত গানে, বিশেষতঃ শেষের দিকে যোগল রাজত্বের আমলে যুদ্ধকে কাঠের প্রচলন হয়েছিল বলেই আমাদের অন্তত ধারণা।

৭। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ সর্গ ১৪ শ্লো:

৮। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে “রজকঃ স রাগঃ” বা “যো রজকো জনচিত্তানাম্ স রাগঃ” বলা হয়েছে (রাগবিবোধ ৪১ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য)। এই রাগ আবার স্বরসমষ্টিরই রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ‘স্বর’ অর্থেও সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা বলেছেন : “মনঃ স্বতো রজয়ন্তীতি” বা “স্বতো রজয়তি শ্রোতৃচিত্তং”(রাগবিবোধ ১, ১৪ ও টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫০ সর্গ ১৪ শ্লো:

১০। ঐ ৬৫ সর্গ ২ শ্লো:

১১। ঐ ঐ ৩ শ্লো:

১২। শ্লো: উইটারিন্স ও উল্লেখ করেছেন :

“The authors, reciters and preservers of this heroic poetry were the bards, usually called *Sutas*, who lived at the courts of kings and recited or sang their songs at great feasts in order to proclaim the glory of the princes. They also went forth into battle, in order to be able to sing of the heroic deeds of the warriors from their own observations.”—Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, p. 315.

৪। রামায়ণ (পুণ্য ৯১), ৩২ সর্গ, ১৩ শ্লো:

৫। ঐ ৭৩ সর্গ, ৩৭-৩৮ শ্লো:

৬। ‘বক্তমান’ বলতে এখানে বুঝতে হবে সঙ্গীতমকরন্দ বখন ‘সঙ্গীত’ এই শব্দটি গীত, বাজ ও নৃত্য—এ তিনের সমবেত রূপ হিসাবে প্রথম প্রচলন করলেন। সঙ্গীতমকরন্দের সময় ৭ম ও ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটাই অনুমান।

অযোধ্যাকাণ্ডে ৯২ সর্গে অঙ্গরা ও গন্ধর্বদের আবার বিশেষ ক'রে নাম করা হয়েছে। যেমন,

“আস্বয়ে দেবগন্ধর্বাস্থিধাবসুহাহাঃসুহু।

তথৈবাপরসো দেবগন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ ॥(১৫)

এখানে বিশ্বাবসু, হাহা, সুহু এঁরা সকলে গন্ধর্ব ও সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। ৯১ সর্গের ৪৬ শ্লোকে নারদ ও তুষ্কুর কথায় উল্লেখ করা হয়েছে : “নারদস্তুষ্কুরগোপঃ”। এই নারদ ও তুষ্কুর গন্ধর্বদের ভেতর প্রধান ছিলেন, কেননা রামায়ণকার নিজেকে স্বীকার করেছেন : “এতে গন্ধর্ব-রাজানো।” এখানে সঙ্গীতবিশেষজ্ঞা অঙ্গরাগণেরও নাম করা হয়েছে, যেমন স্মৃতাচী, বিখাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুশ (অলম্বুষা?), নাগদত্তা, হেমা, পুণ্ডরীক, বামনা প্রভৃতি। এই অঙ্গরাদের সঙ্গীতের আচার্য ছিলেন গন্ধর্বরাজ তুষ্কুর, কেননা “সর্বাভ্যুত্থুগা সার্বমাহায়ে সপরিচ্ছদাঃ” কথাগুলি থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণের ৯১ সর্গের ৪৭ শ্লোকে আবার উল্লেখ করা হয়েছে :

“অলম্বুষ মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাশ বামনা।

উপনৃত্যন্ত ভরতঃ ভরদ্বাজন্ত শাসনাং ॥”

এখানে ভরত ও ভরদ্বাজের নামের উল্লেখ থাকার জন্তে তুষ্কুর শিক্ষকতা করায় কোন বাধা নেই। “ভরতঃ ভরদ্বাজন্ত” বলতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও ভরদ্বাজের লিখিত কোন নাট্য-গ্রন্থের শাসনই বুঝতে হবে। ভরত আবার পাঁচ জন ছিলেন, যেমন বৃদ্ধভরত, নন্দীভরত ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ‘ভরত’ বলতে প্রসিদ্ধ ভরত নাট্যশাস্ত্রকারকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে ভরদ্বাজের নাট্যগ্রন্থ আমাদের এখন দৃষ্টিগোচর হয় নি।

যুদ্ধসঙ্গীতের প্রচলনও রামায়ণের যুগে ছিল, যেমন “নৃত্যন্তচ্চ হস্তন্তচ্চ” কথাগুলি অঙ্গরাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত হলেও “গায়ন্তশ্চৈব সৈনিক্যঃ” (১৬)—সৈনিকেরাও যে নৃত্য-গীতে যোগদান করত তা বোঝা যায়।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে সঙ্গীতের কথা সাধারণভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৪২ সর্গে দেখা যায়, রামচন্দ্র কুশাসনে উপবেশন ক'রে সীতাদেবীকে মধু, মাংস ও বিবিধ সুমিষ্ট ফল পরিবেশন করছেন, আর নৃত্যগীতবিশারদ অঙ্গরা

১৩। সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধের টীকা (২৪-৫) উল্লেখ করেছেন : “ব্রহ্মণো বীণাগাথিনো গায়তঃ ব্রাহ্মণোহজ্ঞো গায়েরিতি।” রাজবল্লভস্বতী “বীণাবাদনভজ্ঞ” বলে বীণার প্রচলন স্বীকার করেছেন। ঐতরেয় আরণ্যকে (৩।২) “অথ খদিয়ং নৈবী বীণা ভবতি * * মালুযী বীণা ভবতি”, বলে বীণার প্রচলনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

১৪। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮ সর্গ ৮ শ্লোঃ; ৯২ সর্গ ২৬ শ্লোঃ।

১৫। ঐ ঐ ৯১ ১৩ শ্লোঃ

১৬। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৯১ সর্গ ৬২ শ্লোঃ

ও কিন্নরেরা নাচ গান ক'রে রামচন্দ্র ও সীতার চিত্তবিনোদন করছে।(১৭) তারপর ৭১ সর্গের বর্ণনায় সাদৃশ্যিক রহস্তের ভাব একটু সুপরিষ্কৃটাই বলা যায়। সেখানে লব ও কুশ ছ'ভাই গান করছেন : “শুশ্রাব রামচরিতং” হাতে তাঁদের বীণা, ত্রিহান অর্থে মন্ত্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানযুক্ত ক'রে (“ত্রিহান করণাধিতম্”) এবং তাল, লয় ও মান রেখে (“সমতাল সমাধিতম্”) তাঁরা উত্তম পদযুক্ত “গীতি” (১৮) বা “গাথা” গান করছেন।

এর পরই পাই আমরা ৮৪ সর্গের বিবরণ। যেমন বলা হয়েছে,

“তাং স শ্রুশ্রাব কাকুতঃ পূর্বাচার্যবিনির্মিতাম।

অপূর্বাং পাঠ্যজ্ঞাতিং চ গেয়েন সমলঙ্কৃতাম ॥”

এখানে “পূর্বাচার্য” অর্থে টীকাকার বলেছেন : “ভরতেন” অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকার ভরত।

এই ভরতের সময় নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতেরা ঠিক এখনো একমত হতে পারেন নি। ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন : “Scholars assign the work (*Natyasastra*) variously to the period 2nd century B. C. to 2nd century A. D.” প্রোঃ এস. কে. দে-র মতে নাট্যশাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে শেষ হতে ৮ম শতাব্দীর (8th century A.D.) শেষ পর্যন্ত নিয়েছিল। (২০) অবশ্য প্রোঃ দে মহাশয় র্যাপসনের অভিমতই ছবছ উল্লেখ করেছেন বলতে হবে।(২১) শ্রদ্ধেয় হনুগুরু কৃষ্ণমাচারিয়ারের মতে ‘জ্ঞাতীগান’ যখন সমাজে প্রচলিত ছিল তখন, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের

১৭। “কুশাস্তরগসংভীর্থে রামঃ সংনিযাদ হ।

সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেষকং শুচি।

পায়দামাস কাকুতঃ শচীমিব পুংসৗঃ।

মাংসানি চ হমিঠানি ফলানি বিবিধানি চ ॥”

রামচন্দ্রকে ইঞ্জের সঙ্গে ও সীতাকে শচীদেবীর সঙ্গে তুলনা ক'রে রামায়ণকার স্বীকার করতে কুঠাবোধ করেন নি যে, তখনকার যুগে মধু ও মাংসভক্ষণের প্রথা বিশেষভাবেই সমাজে প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ রাজস্ববর্গের ভেতর তো বটেই। “মধুমৈরেষকং” শব্দ দুটির অর্থ করতে গিয়ে টীকাকার বলেছেন : “মৈরেষকং মধু মৈরেষকসংজ্ঞকং মধু মজম্।”

১৮। এখানে “গান্ধর্ব” গানকেই বোঝাচ্ছে।

১৯। “শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্ কালে যথা কৃতম্। তদ্বী-লয়সমায়ুক্তং ত্রিহানকরণাধিতম্। সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতাল-সমাধিতম্”

২০। আর এক জায়গায় প্রোঃ দে “4th century A. D.”-ও বলেছেন।

২১। Vide Rapson : *Art on Indian Drama in Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. V, p. 886.

সময়ে ভারত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন। পপলি (H. A. Popley) আবার ভারতের কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গোড়াকার দিকে বলতে চেয়েছেন। কুঞ্চারিয়ার রামায়ণ ও মহাভারতের সময় নির্ণয় করেছেন ১০০০-৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব। পপলি স্থির করেছেন খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর। অবশ্য এসব সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে অস্বীকৃতি প্রচেষ্টার এখনো ইতি হয় নি। ডাঃ রাঘবন ভারতের সময় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীই স্থির করেছেন। এম্. এন্স. রামচন্দ্রের মতে আবার ৫ম শতাব্দীতে (Circa 5th Century A.D.)। মিঃ স্ট্র্যাংগেইজ সাহেবও একবার সিদ্ধান্ত করেছেন ৭ম শতাব্দীতে, আবার নানা কারণ দেখিয়ে বলেছেন :

"There is a slight probability that it (*Natyasastra*) belongs to the late 5th Cent." (২২)

মোট কথা, নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের পরেই অভিনয়দর্পণকার নন্দীভরত বা নন্দীকেশ্বরকে নাট্যকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা দেখি। (২৩) নন্দীকেশ্বরের পরই বৃহদেক্ষীকার মতঙ্গ। মতঙ্গের সময় অনেকে ৯ম শতাব্দী বলে থাকেন। ডাঃ রাঘবন ও মিঃ রামচন্দ্রের মতেও তাই। রামায়ণের অধ্যাক্ষেপেই কিন্তু এই মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন "ঋষেত্ত্বয় বিধানাং তচ্চ কাননম।" মহাভারতের সভাপর্বেও তাই : "অগস্ত্যোহি মতঙ্গশ্চ"। মতঙ্গ কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের অনেক পরের লোক। মতঙ্গের সময় অনেকে আবার নির্ধারণ করতে চেয়েছেন ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত একখানি তামিল বইয়ের ওপর নির্ভর করে খ্রিষ্টীয় ৩য় শতাব্দী। (২৪) কিন্তু এ নির্ধারণ সম্পূর্ণ আত্মমানিক। মোট কথা, ভারতের সময় আমরা অস্বীকার করি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তারপর ভারত যে রামায়ণের যুগেরও অনেক আগেকার গ্রন্থকার এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই; কেননা মতঙ্গের কথাই শুধু যে রামায়ণে পাওয়া যায়—তা নয়ই; নারদ, তুষ্কুর্ক এঁদের নামেরও উল্লেখ আছে। তা ছাড়া রামায়ণের অধ্যাক্ষেপেই দেখা যায়,

"এতে গন্ধর্বরাজানো ভারতভাএতো জগতঃ।

* * *

উপন্যাস্ত ভারতং ভারতাজন্ত শাসনাং ॥" ২৫

প্রথম "ভারতজ" শব্দের চেয়ে শেষোক্ত "ভারতং ভারতাজন্ত শাসনাং" কথাগুলির ভেতর "ভারতং" শব্দটি নিঃসন্দেহে নাট্যশাস্ত্রকার ভারতকেই নির্দেশ করছে; সুতরাং রামায়ণের টীকাকরের মন্তব্য : "পূর্বাচার্যেন ভারতেন নির্মিতম্" কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বলেই আমরা মনে করি।

তারপর ঐ ৮৪ সর্গের ২য় শ্লোকে "পাঠ্যজাতিং" কথাটিরও সার্থকতা আছে। রামায়ণের সময়ে জাতিগানের যে প্রচলন ছিল তা এ থেকেই প্রমাণ হয়। (২৬) শুধু তাই নয়, রাগ ও রাগিণীদের রূপ ও বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি তখনও ঠিক হয় নি এটাই বোঝা যায়। রামায়ণ-টীকাকার "পাঠ্যজাতি" সম্বন্ধে বলেছেন : "পাঠ্যজাতিং পাঠ্য গৈয়ত্র জাতিং যজ্ঞাদিধররূপমিতি * * ।" জাতি ছিল ১৮টি। (২৭) একথা ভারত, দত্তিল, মতঙ্গ এঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন। এই জাতিগান আবার গ্রামভেদে বিভক্ত ছিল। কিন্তু রামায়ণে 'গ্রাম' বা 'জাতি'দের নামের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না; অথচ মহাভারতে 'গান্ধারাগ্রাম'-এর উল্লেখের কথা স্পষ্টই পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয়, রামায়ণকার এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মোটে চেষ্টাই করেন নি।

যাই হোক, এসব কথা ছেড়ে দিলেও রামায়ণের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবণরাজও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কেননা তাঁর রাজসভায় স্তাবকদলের অভাব ছিল না। তবে এ কথা অতি সত্যি যে, রামায়ণের আগে নাট্যশাস্ত্রকার ভারতেরও—এমন কি বৃহদেক্ষীকার মতঙ্গের ও শিক্ষাকার নারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লে রামায়ণ মহাকাব্যে সঙ্গীতের রূপ ও অভিব্যক্তি আমরা যেভাবে পাবার আশা করতে পারি রামায়ণকার সে আশা আমাদের পরিপূরণ করতে মোটেই পারেন নি, এবং এ না-পারার কারণও যে কি থাকতে পারে তা অনেক সময় আমরা নির্ণয় করতে অক্ষম। মহাভারতে সঙ্গীতের রূপের যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায়, রামায়ণে তার চেয়ে যথেষ্ট অস্পষ্ট বললেই চলে। অথচ রামায়ণের আগে ও পরে বৈচিত্র্য ও রূপের দীনতা সঙ্গীতে মোটেই ছিল না। অনেক পণ্ডিতেরই অভিমত যে, অনেক ওলটপালটের ভেতর দিয়ে এসে নতুন বহু-কিছুর সমাবেশ

২২। Strangways : *The Music of Hindostan*, p. 105.

২৩। ডাঃ রাঘবন বলেছেন, কাব্যমালা সংস্করণের যে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায় তার শেষভাগের নাম 'নন্দীভরত'। মিঃ রাইস্ মহীশূর ও কুর্গের ক্যাটালগে নাকি নন্দীভরতের এক খানি সঙ্গীতের গ্রন্থেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। তার পর এই নন্দীকেশ্বরই যে তত্ত্ব এও একটি মতের প্রচলন আছে। নন্দী প্রণীত 'ভরতার্ণব' নামেও একখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪। শাস্ত্রী : অভিনয়দর্পণ, পৃঃ ১০০।

২৫। রামায়ণ, অধ্যাক্ষেপে ৯১ সর্গ ৪৬-৪৭ শ্লোঃ

২৬। মিঃ পপলিও তাঁর *Music of India* পুস্তকে উল্লেখ করেছেন : *The Ramayana also mentions the jatis.* কিন্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণকার কোন 'জাতি' বা 'জাতিগান'-এর কথা বা রূপ কিছুই উল্লেখ করেন নি।

২৭। "জাতঘোহষ্টাদশৈব।"—নাট্যশাস্ত্র

মাত্রই হয়েছে রামায়ণের বর্তমান রূপ। প্রো: উইন্টারনিজ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন হন্টম্যান, প্রো: জেকবি, প্রো: হপকিন্স, প্রো: লেভি, প্রো: ভাণ্ডারকর প্রভৃতি মনীষীদের মতামত নজির হিসাবে তুলে। (২৮) তাছাড়া প্রো: উইন্টারনিজ নিজেই বলেছেন :

“There can be no doubt at all the original poem ended with Book VI, and that the following Book VII is a later edition.” “There can be no doubt that whole of Book VII of the *Ramayana* was added later to the work ; * * the whole of Book I cannot have belonged to the original work of Valmiki. * *. In Books II to IV, apart from a few passages which are doubtless interpolated.”

প্রো: সি. ডি. বৈজ্ঞ তাঁর *The Riddle of the Ramayana* এবং প্রো: ওয়েবারও তাঁর *Über das*

২৮। Vide *A History of Indian Literature*, vol. I, pp. 493-497.

Ramayana (ABA, 1870) প্রবন্ধে এই নিয়ে আলোচনা করে অনেকটা এরকমেরই সিদ্ধান্ত করেছেন। বাস্তবিক নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে মুদ্রিত ও পণ্ডিত বাসুদেব লক্ষণ-শাস্ত্রী পণ্ডীকর-সম্পাদিত রামায়ণের সংস্করণে (১৯০৯) দেখা যায়, প্রক্ষিপ্ত-সর্গেরও বহু উল্লেখ আছে। (২৯) সুতরাং এদিক দিয়ে মনে করা যায় যে, এত সব পরিবর্তন ও পরিবর্তনের ভেতর থেকে সঙ্গীতের ওপর কালের স্থবিচারের দৃষ্টিও শিথিল হওয়া কিছু অসম্ভাবিক নয়। তবে স্বল্প বিচার ও সত্যাসত্য নির্ণয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এ বিষয়ে এক মাত্র ঐতিহাসিকগণই, আমাদের পক্ষে রামায়ণকারের মৌনতা ও ঔদাসীন্যের নজির দেখিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই সমীচীন।

২৯। রামায়ণম্ (নির্ণয়সাগর সং), পৃ. ৩০৩, ৪৩৩, ১০০৮-১০১৫, ১০৭০-১০৮০

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সম্রাটের পাশে ওই স্বর্ণাসন ধার,
নব প্রতিভার তাঁর উদ্ভাসিত দিক।
নূতন পথের দৃপ্ত সাহসী পথিক,
তোমার নির্দেশ গুরু, করেছি স্বীকার।
দেখেছি প্রলীপ্ত প্রভা মধ্যাহ্নে তোমার,
দিবাধীন, অকুণ্ঠিত, প্রকাশে নির্ভীক,
ব্যক্ত করিয়াছ যাচা বুঝিয়াছ ঠিক,
সুতীক্ষ্ণ তীরের মত সে কথার ধার।
স্নেহে স্নকোমল তুমি তেজে সমুজ্জ্বল,
সমানই যে তব করে অসি ও লেখনী,
কখনো বা কবি তুমি, কতু বীরবল,
রচনা কুহুম কতু, কখনো অশনি।
তুমি এক, অদ্বিতীয় সাহিত্যের অরুণ,
তোমাতে প্রণাম করি, প্রমথ চৌধুরী।

স্বপ্নশেষ

শ্রীআশুতোষ সাহা

এ জীবনে স্বপ্ন যত দলে দলে আসিল জুটয়া,—
চূপে চূপে এলো তারা—চূপে চূপে গেল বাহিরিয়া।
ঘটা করে আসে নাই—ছটা হানি' দিক্চক্রবালে,
ওরা যেন বনফুল—ফুটেছিল বনের আড়ালে।

উতল-তটিনী-জলে টলমল জলবিশ্বপ্রায়—

নিমেষের তরে ওরা ছলিতে কি আসিল আমায় ?

কুহকিনী নারী যেন দিয়া ক্ষণ-অঞ্চল-আভাস,—

বিধারি' অধরপ্রান্তে কুন্দরুচি মন্দলীলা হাস—

গেল শুধু আধিকোণে কামনার ধরশর হানি ;

কেন এলো—কেন গেল আমি তাহা নাহি—নাহি জানি।

কল্পনা-মলয়-স্পর্শে হিল্লোলিত মন-উপবন,—

তারি মাঝে করি' পিক যুগ্মভের যুগ্ম কুহরণ—

গেল উড়ে চিরতরে পরিপূর্ণ মধুমােসে হায়,—

এসেছিল যদি পিক—কেন উড়ে গেল পুনরায় ?

যদি এলো আমারাতি নিয়ে তার সাজ অন্ধকার—

কোন্ প্রয়োজন ছিল এই শুভ্র মধু-জোছনার ?

আর একবার যদি ও-চঞ্চল স্বপ্নের দল

আসিয়া পরায়ে দিত চোখে সেই মায়ার কাজল।

ভূলাইয়া দিত যদি রুদ্ধ-তপ্ত বস্তুর সংসার—

আম্মার স্পন্দন মোর—অবিশ্রাম ব্যর্থ অভীপ্সার

পক্ষপ্রসারণ। যদি মনোবনে কুহরিত পিক,—

অপূর্ব আলোকে যদি হাসিয়া উঠিত চারিদিক।

কে ধূলিল আঁখি মোর তীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্রন শলাকায়,—

আর কি আসিবে মোর স্বপ্নদল ফিরে পুনরায় ?

শিয়রে জাগিছে সদা রক্ত-আঁখি বাস্তব জীষণ—

সম্মুখে পশ্চাতে মোর—এ-সংসার-কটকের বন।

আম্ম তবে ফিরে আয় পলাতক স্বপ্ন-আম্মার,

অলস কল্পনা-স্রোতে এ-জীবন-তরণী আবার

ভেসে যাক ছলে ছলে পাল তুলে নিরুদ্ধ পানে

এ বহুধা হ'তে দূরে—বহু দূর জোয়ারের টানে।



(নাটক)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পশ্চিমের কোন প্রাচীন শহরের এক পুরনো বাড়ী, তারই দোতলার একটা ছোট অন্ধকারময় ঘর; উত্তর দিকে একটা জানালা সেটা বন্ধ, দক্ষিণ দিকে একটা দরজা—সামনে একটু সরু বারান্দা, তার সঙ্গে নীচে নামবার সিঁড়ি। সেই অন্ধকার ঘরের এক দিকে কয়েকটা ছোটবড় মাটির হাঁড়ি আর এক দিকে একখানা জীর্ণ ষাটিয়া—তার উপরে ময়লা বিছানা পাতা, ধরময় আবর্জনা আর পোড়া বিভিন্ন টুকরো।

বন্ধ জানালার ওপাশে বেঁসাধেঁষি আর একখানা বাড়ী আর একখানি জানালা—জানালায় ধারে একটি তরুণী। তরুণীকে দেখা যাবে না, তরুণীর কথা হবে নেপথ্য থেকে।

ষাটিয়ায় শুয়ে একটা লোক বিড়ি টানে, একটু পরে বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে। সে রোগা কালো, দেহের কোথাও সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই—তার নাম অপূর্ব।

নেপথ্যে—তুমি আছ।

অপূর্ব—না, নেই।

নেপথ্যে—(হেসে) কি করছো ?

অপূর্ব—চোখ বুঁজে বসে আছি।

নেপথ্যে—কমা ক'রো, আমি তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম।

অপূর্ব—নিশ্চিন্ত হও, আমি বাইরে চোখ দুটো বন্ধ করে আছি বটে, কিন্তু ভিতরের চোখ মেলে চেয়ে আছি।

নেপথ্যে—কোন দিকে চেয়ে আছ ?

অপূর্ব—অতীতের দিকে।

নেপথ্যে—কি দেখছো ? পৃথিবীর শৈশব—একটা অত্যুচ্চ বস্ত্রপিণ্ড শূন্য ঘুরপাক খাচ্ছে ?

অপূর্ব—অতদূরে নয়।

নেপথ্যে—তবে কি দেখছো মানুষের পূর্বপুরুষ শাখা থেকে শাখান্তরে আনন্দে লক্ষ প্রদান করছে ?

অপূর্ব—(হেসে) এই গত আঘাত মাসের প্রথম দিনটির দিকে চেয়ে আছি।

নেপথ্যে—ঐ দিনে আমরা এ বাড়ীতে আসি, মনে পড়ে তোমার ?

অপূর্ব—মনে পড়ে।

নেপথ্যে—সারা বাড়ীতে এই ঘরখানা আমার পছন্দ হ'ল, পূর্বের জানালা খুললাম, আকাশ চোখে পড়লো, উত্তরের জানালা খুললাম, একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ চোখে পড়লো, দক্ষিণের জানালা খুললাম, চোখে পড়লো সরু গলির ওপাশে জরাজীর্ণ তোমার বাড়ীটা।

অপূর্ব—তুমি বললে কি পুরনো বাড়ী, যেন বৌদ্ধযুগে তৈরি হয়েছিল।

নেপথ্যে—বন্ধ জানালার আড়াল থেকে তুমি বললে বাড়ীটা প্রাচীন হলেও বাসিন্দারা প্রাচীন নয়।

অপূর্ব—কথাটা বলেই মনে হ'ল অজায়ব করছি।

নেপথ্যে—তুমি কমা চাইলে, এমনি করে আমাদের পরিচয় হুর হ'ল।

অপূর্ব—তারপরে এক এক দিন করে কয়েক মাস কেটে গেল।

নেপথ্যে—আর আমাদের পরিচয় নিবিড় হতে নিবিড়তর হ'ল।

অপূর্ব—অথচ আমরা কেউ কাউকে দেখলুম না।

নেপথ্যে—কি কঠিন তোমার পণ, জানালা কিছুতেই তুমি খুলবে না। আমার মন যে আর বাগ মানতে চায় না, যদি একটবার এক মিনিটের জন্যে খুলতে তা হলেও আমি খুশি হতুম।

অপূর্ব—আর সাতটা দিন তোমাকে বৈর্য ঘরে থাকতেই হবে, জানো তো তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা ? যত দিন এ উপন্যাস লেখা শেষ না হবে তত দিন আমার অজ্ঞাত বাস চলবে। এ তো লেখা নয় এ যেন আমার সাধনা, আমি এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করব যা দেখে বাংলা দেশ—বাংলা দেশ কেন



খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর

সমগ্র পৃথিবী অবাক হবে। এই সুদূর পশ্চিমে এত দিন তো লুকিয়ে আছি এরই জন্যে।

নেপথ্যে—তা জানি। তোমার লেখা প্রায় শেষ হয়ে এলো কেনে স্থবী হলুম, সাতটা দিন আমি অপেক্ষা করতে পারব।

অপূর্ব—(একটু হেসে) হ্যাঁ, প্রায় শেষ হয়ে এলো, শেষের অধ্যায় লেখা চলছে।

নেপথ্যে—সত্যিই, তোমার এ উপজ্ঞাস্থানা চমৎকার হবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হবে। উপজ্ঞাসের নায়ক বাসব এক অদ্বুত স্রষ্টা—বাহ্যহীন, রূপহীন, সহায়হীন, সম্পদহীন, অহরহ চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সে সংগ্রাম করে চলেছে।

অপূর্ব—তবু সে হার মানতে চায় না। আমি বাসবের বাইরেটা যেমন করেছি হুর্কল, ভিতরটা তেমনি করেছি সবল, বাইরেটা যেমন করেছি কুরূপ ভিতরটা তেমনি করেছি অপক্লপ, শরীর তার রূপ ভিতরীর মত কদর্য কিন্তু মন তার রাজপুত্রের মত সতেজ সুন্দর।

নেপথ্যে—চমৎকার।

অপূর্ব—হান হতে হানান্তরে সে ছুটে চলেছে—ভাবছে বুঝি এখানে নয় ওখানে, বুঝি ওখানে নয় আরো কোনোখানে তার সকলতা তার জয় কিন্তু একে একে সবখানে তার বিফলতা, তার পরাজয়।

নেপথ্যে—চমৎকার।

অপূর্ব—তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সমুদ্রের মাঝখানে নিমজ্জমান মাহুঘের কূল পাবার প্রচেষ্টা যেমন মর্ধ্যান্তিক, যেমন করুণ বাসবের এ সংগ্রামও তেমনি মর্ধ্যান্তিক, তেমনি করুণ।

নেপথ্যে—আহা।

অপূর্ব—তুমি ‘আহা’ বলছ, সত্যিই ‘আহা’ বলছ? এক দিন আমার এ বই পড়ে পৃথিবীর নরনারীর চোখ থেকে জল ঝরে পড়বে। আর সাতটা দিন পৃথিবীকে অপেক্ষা করতে হবে। (নিঃশব্দে হাসে)

নেপথ্যে—আর সাতটা দিন, তারপরে তুমি জানালা খুলবে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে দেখে বস্তু হব। মনে থাকে যেন—সাতটা দিন।

অপূর্ব—তোমার এত অধৈর্য কেন?

নেপথ্যে—আমার এ অধৈর্যের কি যথেষ্ট হেতু নাই? তোমার হয়তো আমাকে দেখবার ইচ্ছে হয় না কিন্তু তোমাকে দেখবার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল তা তুমি কেমন করে জানবে?

অপূর্ব—তোমাকে দেখবার জন্তে আমি অত অধীর নই কেন জান?

নেপথ্যে—হয়তো আমার সম্বন্ধে তোমার তেমন কৌতূহল নাই, আমি তো অসাধারণ নই, আমি যে একেবারে সাধারণ।

অপূর্ব—না, তা নয়—তোমাকে আমি দেখেছি, কল্পনার চোখে দেখছি। (উঠে গিয়ে বন্ধ জানালার কাঁক দিয়ে দেখে)

নেপথ্যে—বলো, কল্পনার চোখে তুমি আমাকে কেমন দেখেছ।

অপূর্ব—(ফিরে এসে) সুন্দর, ভারি সুন্দর। খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর, ছুটি চোখ স্বপ্নাতুর, সুকুমার অধরে একটু-খানি হাসির রেখা, চাপার মত গায়ের রং তার, তব্বী সে, নীল রঙের শাড়ি মানিয়েছে ভারি চমৎকার।

নেপথ্যে—কি আশ্চর্য্য, আমি যে সত্যিই নীল রঙের শাড়ি পরেছি। কিন্তু তবুও তুমি কল্পনায় আমাকে যত সুন্দর দেখেছ সত্যিকার আমি তত সুন্দর নই।

অপূর্ব—না, আমার ভিতরের চোখ ভুল দেখে নি, তুমি সুন্দর, তুমি খুব সুন্দর।

নেপথ্যে—তুমিও খুব—খুব সুন্দর।

অপূর্ব—(চমকে উঠে) তুমি কি আমাকে দেখেছ?

নেপথ্যে—দেখেছি বৈকি—কল্পনার চোখে দেখেছি।

অপূর্ব—কি রকম দেখেছ?

নেপথ্যে—দেখেছি দীর্ঘ, ঋজু, সবল গৌরবর্ণ দেহ, উন্নত ললাটে প্রতিভার আভা, চোখে উদার দৃষ্টি।

অপূর্ব—(উঠে দীর্ঘ হয়ে পড়া দেখে ঋজু করবার চেষ্টা করে) না, সবটা মেলে নি, দীর্ঘও বটে, ঋজুও বটে তবে গায়ের রংটা ঠিক গৌর বলা চলে না।

নেপথ্যে—তা না চলুক, তুমি সুন্দর, খুব সুন্দর।

অপূর্ব—হয়তো তোমার কথাই ঠিক—আমি সুন্দর। (এক-খানা হার্লল হাত চোখের সামনে তুলে ধরে) সবল, দীর্ঘ, ঋজু, গৌরবর্ণ—এইখানেই শেষ নয়, আরো আছে।

নেপথ্যে—আরো কি ?

অপূর্ব—(স্নানভাবে হেসে) উচ্চকূল, উচ্চশিক্ষা, অর্থ, যশ।

নেপথ্যে—তুমি ভাগ্যবান।

অপূর্ব—সে কথা বলতে পার—যা কিছু প্রেয় এবং শ্রেয় ভগবান তা যেন আমাকে অকাতরে দিয়েছেন।

নেপথ্যে—আমার অন্তর বার বার বলেছে তুমি সাধারণ নও।

অপূর্ব—(নিঃশব্দে হেসে) তোমার অন্তর সত্যি কথাই বলেছে আমি অসাধারণ, আমি অনন্ত।

নেপথ্যে—তুমি আরো উপরে উঠবে—হয়তো এত উপরে উঠবে যে আমরা তোমার কাছে পৌঁছতে পারব না।

অপূর্ব—ঠিক—আমার কাছে সবাই পৌঁছতে পারে না। আমি এত (খুব আশ্চর্য) নীচে।

(কাছাকাছি কোথাও ঘড়িতে তিনটে বাজে)

নেপথ্যে—এখন আমাকে যেতে হবে।

অপূর্ব—এলেই যেতে হয়—গেলে কিন্তু আবার আসতে হয়।

নেপথ্যে—কবে আসতে ভুল হয়েছিল—বলো।

অপূর্ব—(হেসে) বলতে পারলাম না।

নেপথ্যে—তুমি আবার চোখ বোজো।

অপূর্ব—আচ্ছা।

(অপূর্ব আবার শুয়ে পড়ে)

পটক্ষেপ

২য় দৃশ্য

স্থান একই, কাল সকাল, খাটিয়ার উপর উঁচু হয়ে বসে বিড়ি টানে অপূর্ব। নেপথ্যে জানালা খোলার আয়োজন হয়।

অপূর্ব—তুমি।

নেপথ্যে—(হেসে) না, আমি নই।

অপূর্ব—অনেকক্ষণ তোমার সারা পাই নি।

নেপথ্যে—আমি এলে যে তোমার লেখার ব্যাঘাত হয়।

অপূর্ব—তোমার সারা না পেলেই আমার লেখা এগোয় না।

নেপথ্যে—এটা কি সত্যি কথা ?

অপূর্ব—সত্যি কথা, তুমি যে আমার উৎসাহের উৎসসুখ।

তোমার কাছে আমি অনেক ঋণী, সে কথা পাঠকসমক্ষে আমি স্বীকার করব।

নেপথ্যে—দেনাপাওনার হিসেব পরে হবে। তোমার দেখা পেলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

অপূর্ব—আহা, এত সহজে যদি সব ঋণ শোধ করতে পারতাম।

নেপথ্যে—ওসব কথা থাক—এখন বলো কি লিখছিলে ?

অপূর্ব—কি লিখছিলাম ? (নিঃশব্দে হেসে) লিখছিলাম অন্ধকার ঘরটিতে জীর্ণ খাটিয়ার উপর উঁচু হয়ে বসে বাসব বিড়ি টানছে আর ভাবছে, এক মহা সমস্যায় পড়েছে সে। এক বেলা ধাবার মত একমুঠো চা'ল তার ঘরে আছে—এ বেলাই তা শেষ করে দেবে না সঞ্চয় করে রাখবে! গত দিনের অনশন-ক্লিষ্ট উদর যুক্তি মানতে রাজী হচ্ছে না, বলছে 'এখনই—আর দেরি নয়।' কিন্তু তারপরে ?

নেপথ্যে—তারপরে যাই হোক—এখন তোমার ঐ করুণ কাহিনী লেখা বন্ধ কর, উঃ, কি অহরহ অন্তর্জিজ্ঞাসা। কলম রেখে একবার বাইরের দিকে তাকাও, অন্ততঃ একটীবারও তাকাও।

অপূর্ব—কেন বল তো ?

নেপথ্যে—দেখ আজ আকাশ কত নীল, আলো কত স্বচ্ছ।

অপূর্ব—(আকাশ সে দেখতে পায় না, চোখের সামনে তার একটা ভাঙা পুরনো প্রাচীর, সেই প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) আহা, আকাশ কত নীল, চোখ ফেরাতে পারছি না।

নেপথ্যে—আর ঐ মেঘ, সাদা মেঘ।

অপূর্ব—(প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) আর ঐ সাদা মেঘ, অলস, মধুর মেঘ—নীলপটভূমির উপরে—এখানে ওখানে সাদার সমাবেশ সুন্দর।

নেপথ্যে—নীল সমুদ্রের বুকে যেন পাল-তোলা নৌকো।

অপূর্ব—(প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে) অসীম অবসরের নীল সরোবরের বুকে যেন রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে।

নেপথ্যে—আর এই স্বচ্ছ আলো।

অপূর্ব—(অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে) অপূর্ব, আজ যেন পৃথিবীর কোথাও এতটুকু অন্ধকার নাই।

নেপথ্যে—কোথাও যেন এতটুকু নিয়ানন্দ নাই।

অপূর্ব—ভয় নাই, ভাবনা নাই, রোগ নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই! কিন্তু আর বেশীক্ষণ তো আলোর সম্ভরণ করতে পারছি নে, এইবার অন্ধকারে ডুব মারতে হবে—আবার লেখা শুরু করতে হবে।

নেপথ্যে—আর কত দিন তুমি অন্ধকারে থাকবে, কবে আলোয় এসে দাঁড়াবে ?

অপূর্ব—হুটো দিন, আর হুটো দিন, তারপরে আখিরের প্রথম দিনে তোমাতে আমাতে দেখাওনো হবে।

নেপথ্যে—শরতের প্রভাতে আমরা মুখোমুখি দাঁড়াব।

অপূর্ব—আলো পড়বে তোমার খোলা চুলে।

নেপথ্যে—আলো পড়বে তোমার উন্নত ললাটে।

অপূর্ব—এইবার আমি লিখতে শুরু করি, তুমি অস্থমতি দাও।

নেপথ্যে—তুমি লেখো, আমি এইখানেই বসে থাকবো, চুপ করে বসে থাকবো, যখন আবার পড়ে শোনাবে তখন শুনবো।

অপূর্ব—সে বেশ হবে, তাই বোসো।

(অপূর্ব নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপরে বারান্দার ছোট উত্থানে আগুন ধরায়। কয়লা থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠে অন্ধকার হয়ে যায়, অপূর্ব বসে বসে ইঁপায় আর কাশে। ঝানিক পরে যখন উত্থান ধরে ওঠে তখন সে দরজা খোলে, একটা হাঁড়ি এনে উত্থানে চাপায় তারপরে আবার খাটটার উপর গিয়ে বসে।)

অপূর্ব—এখনও কি বসে আছ?

নেপথ্যে—যেতে চাইলেও যে যেতে পারি না। বলো কি লিখলে?

অপূর্ব—লিখলাম বাসবকে শেষে উদরের আবদারই মেনে নিতে হ'ল, ক্লান্তপদে উঠে গিয়ে সে উত্থানে আগুন দিল। কয়লা থেকে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল, সেইদিকে তাকিয়ে সে নির্জীবের মত বসে থাকলো। বাসবের যেন মনে হ'ল তারই মত অগণিত হতভাগাদের পুঙ্খভূত হতাশা পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে, তাতে ঘর ভরে গেল, বাড়ী ভরে গেল, ক্রমে ক্রমে শহর, প্রান্তর অবশেষে যেন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল—মুখ হুঃখ, অতীত ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট হ'ল, সময়ের গতি যেন থেমে গেল।

নেপথ্যে—তারপরে?

অপূর্ব—তারপর সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সে যেন আলোর স্পীণরেখা দেখতে পেলো, ক্রমে সে আলো উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। আর সেই আলোর মাঝখানে বাসব দেখতে পেলো একটা তরুণী মূর্তি—খোলা চুল পড়েছে কাঁধের উপর, ছুটি চোখ বগ্নাতুর, স্নকুমার অধরে একটুখানি হাসির রেখা, চাপার মত গায়ের রং তার—তরুণী সে—

নেপথ্যে—তারপরে?

অপূর্ব—তারপরে সেই অপূর্ব আলোয় ঘর ভরে গেল, বাড়ী ভরে গেল, ক্রমে ক্রমে শহর, প্রান্তর, অবশেষে যেন সমস্ত পৃথিবী আলোয় ভরে গেল।

নেপথ্যে—বাসব বুঝি তরুণীকে ভালবাসে?

অপূর্ব—ভালবাসে, খুব ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসা তার ভাড়া পাজরের নীচে চাপা পড়ে আছে—প্রকাশ পায় নি।

নেপথ্যে—কি করণ? তারপরে?

অপূর্ব—তারপরে বাসবের যখন স্বপ্ন ভাঙে তখন সে দেখে তার উত্থান জ্বলে যাচ্ছে; একটা হাঁড়িতে শেষমুঠো চাল চাপিয়ে দিয়ে সে ডাবতে বসে।

নেপথ্যে—কি ভাবে সে?

কি ভাবে? সমস্ত ডাবনার কেন্দ্র তখন তার ঐ হাঁড়িটার মধ্যে।

(সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ হয়, নীচে থেকে কে যেন উপরে উঠে আসে—ডাকে)

আগন্তুক—অপূর্ববাবু, ও মশাই ঘরে আছেন কি?

নেপথ্যে—কে যেন ডাকছে তোমাকে।

অপূর্ব—হ্যাঁ, আমাকেই ডাকছে, দেখি কে এলো এমন অসময়ে, কার এমন অসীম সাহস!

(ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়)

আগন্তুক—এই যে ঘরেই আছেন, ভাড়াটা দেবার কথা ছিল আজ, সেকথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

অপূর্ব—নিশ্চয়ই মনে আছে।

আগন্তুক—তা হলে দিয়ে দিন, তিন মাসের ভাড়া।

অপূর্ব—মনে থাকলেও ভাড়া আজ দিতে পারছি নে।

আগন্তুক—দিতে পারছেন না? তামাশা হাঙ্গল তা হলে? ভাড়া আজ দিতেই হবে।

অপূর্ব—দিতে পারব না, টাকা নেই।

আগন্তুক—টাকা নেই? তিন মাসের ঘরভাড়া ছ'টা টাকা তাও তোমার যোগাড় হ'ল না। বুকেছি ব্যাপারটা (চৈচিয়ে) তুমি জোঁচোর।

অপূর্ব—অত চৈচাবেন না, আমি জোঁচোর নই। টাকা থাকলে আপনাকে দিয়ে দিতাম, বোধ হয় আজকালের ভেতরেই আপনার দেনা শোধ করে দেব, তা না পারলে ১লা আশ্বিন থেকে ঘর ছেড়ে দেব।

আগন্তুক—(আরো চৈচিয়ে) টাকা তুমি যা দেবে তা বুকেতে পেরেছি, ঘর ছেড়ে দাও, সেই ভাল।

অপূর্ব—টাকা না দিতে পারলে ঘর ছেড়ে দেব।

আগন্তুক—(চিংকার করে) ঘর ছেড়ে না দিলে ঘাড় ধরে বার করে দেব, বুকেলে? ঘাড় ধরে বার করে দেব। (প্রস্থান)

(অপূর্ব দরজা খুলে ঘরে ঢোকে)

অপূর্ব—কি বিপদ।

নেপথ্যে—কে লোকটা? কি বলছিল?

অপূর্ব—কে লোকটা? কল্পনা করতে পার কে লোকটা?

নেপথ্যে—(হেসে) বন্ধু, আত্মীয়।

অপূর্ব—পারলে না।

নেপথ্যে—পুলিশ, বাড়ীওলা, কাবলীওলা।

অপূর্ব—পারলে না।

নেপথ্যে—আমি পারব না তুমি বলো।

অপূর্ব—কাগজের রিপোর্টার।

নেপথ্যে—রিপোর্টার। কি আশ্চর্য্য।

অপূর্ব—খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। কেমন করে খবর পেল আমি এইখানে লুকিয়ে বই লিখছি? এরা হচ্ছে সেই শ্রেণীর জীব যাদের জ্ঞানশক্তি অত্যন্ত প্রখর।

নেপথ্যে—কিন্তু অত চ্যাচাচ্ছিল কেন?

অপূর্ব—কে চ্যাচাচ্ছিল?

নেপথ্যে—রিপোর্টার।

অপূর্ব—রিপোর্টার নয়, চ্যাচাচ্ছিলাম আমি। আমি বড় চটে গিয়েছিলাম, চটবারই কথা, জগৎকে আমি হঠাৎ অবাক করে দিতে চাই, আমার এই স্বপ্নের খবর আমি শেষ পর্যন্ত গোপন রাখতে চাই—কিন্তু এরা তা করতে দেবে না।

নেপথ্যে—কিন্তু গলার আওয়াজ তো তোমার নয়, কেমন একটা মোটা কর্কশ গলা।

অপূর্ব—(হেসে) রাগলে আমার গলার আওয়াজ ঐ রকম হয়ে যায়, ঐ রকম কর্কশ আর মোটা। আমি ভয়ঙ্কর রেগে গিয়েছিলাম। আমার খ্যাতি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলে কি আমার গোপন কিছু থাকবে না।

নেপথ্যে—যথেষ্ট শিক্ষা ওর হয়ে গেছে। তুমি ওকে বাড় ধরে বার করে দিতে চাচ্ছিলে।

অপূর্ব—ঘাড় ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু ধরি নাই, কেননা প্রস্থানটা অতি দ্রুতবেগেই করেছিল।

নেপথ্যে—(হেসে) আমার খুব হাসি পাচ্ছে, ঘটনাটা ঘটলো খুবই হাস্যকর।

অপূর্ব—আমার তেমন হাসি পাচ্ছে না কারণ (হঠাৎ চোখ পড়ে উঠনে বসান হাঁড়িটার উপর) ওঃ...

নেপথ্যে—কি হ'ল।

অপূর্ব—(ব্যস্ত হয়ে) গল্প করে অনেকক্ষণ কাটলো, এখন আবার লিখতে হবে।

নেপথ্যে—কিন্তু আধঘণ্টার বেশী আমরা গল্প করি নি।

অপূর্ব—(হেসে) বোধ হয় ভুলে গেছ বাসব উঠনে ভাত চাপিয়েছে, সেটা হতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয়।

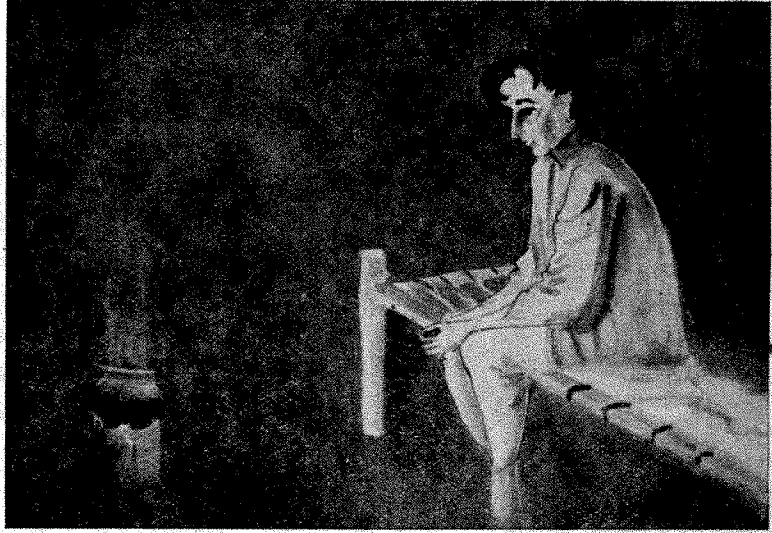
নেপথ্যে—(হেসে) তা হলে লেখ, আমি চলি।

অপূর্ব—তুমি চলে যাবে সেটাও যে ইচ্ছে করে না।

নেপথ্যে—মাত্র আর একটা দিন, তারপরে তোমার আমার মাঝখানে কিছুই ব্যবধান থাকবে না।

অপূর্ব—তা হলে কালকে এসো—লেখা পড়ে শোনাবো (হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে) কালকে, ছপুর বেলা।

নেপথ্যে—আচ্ছা, আমি চলি। (অপূর্ব উঠে) এসে



“সমস্ত ভাবনা কিন্তু ঐ হাঁড়িটার মধ্যে”

তাড়াতাড়ি উঠুন থেকে হাঁড়িটা নামায়)

পটক্ষেপ

৩য় দৃশ্য

একই স্থান, কাল ছপুর; অপূর্ব ক্লান্তভাবে ধরময় ঘুরে একটা বিড়ি ধোঁজে—পায় না—শেষে কোণ থেকে আধখানা পোড়াবিড়ি তুলে নেয়, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পায় না—নাই। অবশেষে খালি হাঁড়িগুলো নাড়াচাড়া করে, একটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে সশব্দে ভেঙে যায়—

নেপথ্যে—কি ভেঙে ফেললে?

অপূর্ব—তুমি কি ২৪ ঘণ্টা জানালার কাছে বসে থাক?

নেপথ্যে—থাকতে ইচ্ছে করে কিন্তু থাকতে পারি কই—

কি ভাঙলে?

অপূর্ব—পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

নেপথ্যে—জিনিষটা কি?

অপূর্ব—হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

নেপথ্যে—কি?

অপূর্ব—দামী—খুব দামী।

নেপথ্যে—লোকদান হয়ে গেল। কি ওটা?

অপূর্ব—খুব সখের।

নেপথ্যে—আচ্ছা। কিন্তু জিনিষটা কি?

অপূর্ব—আমার, আমার ক্যামেরাটা। যাক গে, যা যাবার তা যাবেই।

নেপথ্যে—তবুও ত সখের কিনিষটা গেল।

অপূর্ব—একটা গেল—আর একটা আসবে (খাটিরার উপর বসে) কি ভয়ঙ্কর ক্লান্তি বোধ করছি।

নেপথ্যে—খুব ঝাটছ বোধ হয়।

অপূর্ব—খুব, রাত দিন, ঝাঝার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর যে সময় নাই—শেষের অধ্যায়ের শেষ ক'খানা পাতা লিখছি।

নেপথ্যে—কি লিখছ?

অপূর্ব—শোন, লিখছি—দীর্ঘ ছত্রিশ খণ্ড বাসব অনাহারে রয়েছে—অবসাদে সমস্ত শরীর যেন ভেঙে পড়ছে, ক্রিষে বোধ কমে গেছে—পিপাসায় আকণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে, বারংবার জল খেয়েও সে পিপাসা যেন মিটেছে না (উঠে গিয়ে জল খায়)।

নেপথ্যে—হৃদশার শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

অপূর্ব—হৃদশার চরম সীমায় পৌঁছেছে বাসব। শীর্ণ শরীর আরও শীর্ণ হয়েছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, মাথার মধ্যে একটা ঝিকি পোকা নিরবচ্ছিন্ন ডেকে চলেছে (মাথায় হাত দেয়)। কেমন হচ্ছে?

নেপথ্যে—বেশ।

অপূর্ব—কিন্তু ভেঙে পড়লে ত চলবে না, এখনও যে সংগ্রামের শেষ হয় নাই। সে ওঠে, একটা বিড়ি ধোঁকে, বরময় ধোঁকে, পায় না, কোণ থেকে আধখানা গোড়াবিড়ি তুলে নেয়। কিন্তু ধরাবে কি দিয়ে? দেশলাই খালি। একটা ক্রোশ, একটা অল্প ক্রোশ মনের মধ্যে খনাতে থাকে—বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

নেপথ্যে—তারপরে।

অপূর্ব—তারপরে আসে চিন্তা—খামখেয়ালী চিন্তা, এলো-মেলো চিন্তা—অনশনক্লিষ্ট মস্তিষ্কের যুক্তিহীন চিন্তা। কি করবে সে? কোন কি উপায় নাই? চেষ্টার ত জট করে নাই—তবুও তার অন্ত ছোটে না কেন? একে একে অনেক পথই সে ঘুরে দেখে এল—আরও কি দেখা বাকি আছে? না—আর নেই—কোন দিকে কোন পথ নাই, বাসব খাটিরার উপর এলিয়ে পড়ে।

নেপথ্যে—শেষের দিকটা বড় সুন্দর হচ্ছে—তারপরে?

অপূর্ব—তারপরে প্রহর কেটে যায়—বাসবের পাকস্থলীর তলদেশ থেকে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অহুভূতি ধীরে ধীরে সর্কাসে ছড়িয়ে পড়ে। একটা কিছু করতেই হবে তাকে—একটা পথ আবিষ্কার করতেই হবে তাকে—হুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সে ভাবতে থাকে। হঠাৎ সে উঠে বসে—পেয়েছে পথ, আবিষ্কার করেছে উপায়, সে চুরি করবে।

নেপথ্যে—চুরি।

অপূর্ব—হ্যাঁ, চুরি। এতক্ষণ এমন সহজ উপায়টা তার মনে হয় নাই, কি আশ্চর্য্য! সহজ, খুব সহজ, চুরি করবে সে—বাঁচতে হবে তাকে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে বাসব—উঠে দাঁড়ায়, তার পা কাঁপতে থাকে। বড়ই হুর্কল বোধ হচ্ছে আজ। পারবে সে চুরি করতে? চুরি করতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি কোথায় তার? আবার বসে পড়ে বাসব।

নেপথ্যে—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চমৎকার হচ্ছে।

অপূর্ব—সত্যি বলছো চমৎকার হচ্ছে? ধত্তবাদ, শোন—আবার বসে পড়ে বাসব, আবার ভাবতে থাকে। এই বার সে পেয়েছে, তারই উপযুক্ত পথ সে পেয়েছে—শক্তির প্রয়োজন নাই, বিদ্যার প্রয়োজন নাই, বুদ্ধির প্রয়োজন নাই—অথচ পেট ভরে খেতে পাবে—ভিক্ষা করবে সে।

নেপথ্যে—সুন্দর, ছবি খুব বাস্তব হচ্ছে।

অপূর্ব—বাস্তব হতেই হবে—আমি যে বাস্তবের পূজারী। শোনো—বাসব আপনার শীর্ণ হাতখানা বারিয়ে দিয়ে বলে 'একটা পয়সা দাও—গরিবকে একটা পয়সা দাও'। এই তো—ঠিক পারবে সে। চেহারা হয়েছে ভিখারীরও অধম—পথে দাঁড়ালেই হ'ল। না খেয়ে আর মরতে হবে না—যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সে বসে।

নেপথ্যে—শেষ পর্যন্ত বাসবকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে?

অপূর্ব—না, ভিক্ষে করাব না, বাসব ভিক্ষে করতে পারে না। ওটা তার মনের সাময়িক হুর্কলতা—ওটা কেটে যাবে। তুমি তো জানো আমি বাসবের বাইরেটা যেমন করেছি হুর্কল, ভিতরটা তেমনি করেছি সবল, শরীর তার রুগ্ন ভিখারীর মত কদর্য্য কিন্তু মন তার রাজপুত্রের মত সতেজ সুন্দর। ভিতরে সেই রাজপুত্র বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—মরবে তবু সে ভিক্ষা করবে না।

নেপথ্যে—তারপর?

অপূর্ব—এই পর্যন্ত, এর পর আর লেখা হয় নাই। এখন তুমি বলো শেষটা কি রকম করি।

নেপথ্যে—আমি বলবো?

অপূর্ব—হ্যাঁ, তুমি বলো বাসব বাঁচবে না মরবে। কোন্টা সুন্দর, সুসঙ্গত, স্বাভাবিক হবে—জীবন, না মরণ?

নেপথ্যে—জীবন না মরণ, কঠিন প্রশ্ন। আটের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাসবকে মেরে ফেলাই সুন্দর হবে।

অপূর্ব—ঠিক বলেছ, মরণই সুন্দর, তাই হবে, বাসব মরবে। আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, বল তো মরবার আগে বাসব তার গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করবে কিনা?

নেপথ্যে—এটা আরো কঠিন প্রশ্ন।

অপূর্ব—বল তো বাসব যদি তার তরুণী প্রিয়াকে গিয়ে বলে 'ওগো তোমাকে আমি ভালবাসি' তা হলে কি উত্তর সে পাবে? তরুণী কি তাকে ভালবাসবে বলো।

নেপথ্যে—বলা খুব মুশকিল।

অপূর্ব—আমি সহজ করে দিচ্ছি—মনে করো তুমি হচ্ছে সেই তরুণী; বাসব—রুগ্ন, শীর্ণ, কদাকার, একটা ভিখারীর চেয়েও অধম বাসব যদি এসে তোমাকে বলে ‘আমি ভালবাসি তোমাকে’ তা হলে কি উত্তর তুমি দেবে? তুমি কি বাসবকে ভালবাসতে পারবে?

নেপথ্যে—মাগো—ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে! কাব্যে হয়তো সম্ভব হয় কিন্তু বাস্তব জগতে হয় না।

অপূর্ব—ঠিক বলেছ, বাস্তব জগতে সম্ভব হয় না, অতএব বাসবের প্রেম গুপ্তই থাকবে। এই বার লেখার কথা বন্ধ থাক—অল্প কথা হোক—নীল আকাশের কথা, সাদা মেঘের কথা।

নেপথ্যে—মনে আছে, কাল তুমি জানালা খুলবে।

অপূর্ব—মনে আছে—খুব মনে আছে, সে কথা কি ভুলতে পারি? কাল তুমি আর আমি মুখোমুখি দাঁড়াব।

নেপথ্যে—ভোরের আলো পড়বে তোমার ললাটে।

অপূর্ব—পড়বে তোমার খোলা চুলে।

নেপথ্যে—সারারাত আমার ঘুম হবে না।

অপূর্ব—আমি খুব ঘুমোবো—নিশ্চিত হয়ে ঘুমোবো।

নেপথ্যে—আজকের মত বিদায়

অপূর্ব—বিদায়।

(অন্ধকার ঘর আরো অন্ধকার হয়ে আসে)

পটক্ষেপ

৪র্থ দৃশ্য

স্থান একই, কাল—প্রায় ভোর হয়ে আসে, উত্তরের জানালাটা খোলা। ক্রমে অন্ধকার কমে আসে, আরো কমে আসে, উত্তরের জানালাটা দিয়ে একটু আলো ঘরে ঢোকে, তার পরে আরও একটু আলো ঢোকে—এই বার খাটিয়াখানার উপর আলো এসে ঢেলে পড়ে। বিছানায় ছুটিয়ে আছে অপূর্ব—দেছে প্রাণ নাই। আলো পড়ে তার ললাটে।

ও পাশের জানালাটা আন্তে খুলে যায়, একটি তরুণীর মুখ এগিয়ে আসে। হঠাৎ সেই সুন্দর মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, তার পরে ফুটে ওঠে ঘৃণার চিহ্ন। জানালাটা আবার আন্তে বন্ধ হয়ে যায়।

পটক্ষেপ

আলোচনা

“বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র”

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

প্রাচ্যের প্রবাসীতে শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সপাদ শত বৎসর পূর্বের মুদ্রিত পুস্তক হইতে সাতখানি চিত্র দেখাইয়াছেন। তাহা লিখিত পুথিতে পাই না, তাহা এই সাতখানি চিত্র হইতে পাইতেছি। কেশ, বেশ, আসন, মুখ কেমন ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমি দশভুজার চিত্রের জন্ম শিল্পী ও ব্রহ্মজীবকে ধর্মবাদ করিতেছি। ইহাতে মহিষাসুরের যে চিত্র আছে, বহুদিন হইতে আমি তাহা খুঁজিতেছিলাম। আমরা মহিষ-মর্দিনী দুর্গার পূজা করি। কিন্তু বর্তমান কালের প্রতিমায় মহিষ দেখিতে পাই না। দেখি এক ভীষণ-মূর্তি-ডাকাত। একটি ছোট মহিষ-মুণ্ড নিকটে স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন্ মহিষের ছিন্নমুণ্ড, তাহার নিদর্শন নাই। পুরোহিত মহাশয় যে ধ্যান আবৃত্তি করেন, তাহার সহিত প্রতিমার কিছুমাত্র ঐক্য নাই। ধ্যানে আছে মহিষের শিরচ্ছেদ হইলে তাহার স্বরূপ হইতে খড়্গ খেটক-ধর দ্বিভূজ অস্ত্র বহির্গত হইয়াছিল; নিম্নাঙ্গ মহিষ-রহিয়া গেল। শিল্পী বিশ্বস্ত

আচার্য চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই চিত্র তিনি ধ্যান হইতে লইয়াছেন, কি তৎকালে এইরূপ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় কোন কোন দশভুজা প্রতিমায় এইরূপ মহিষাসুর নির্মিত হইত। শিল্পী তৎকালের পক্ষে একে-বারে নূতন কল্পনা আনিতে সাহসী হইতেন না। মহিষাসুরের মূর্তি-নির্মাণে চারি অবস্থা ঘটয়াছে। প্রথম অবস্থায় পূর্ণাবয়ব মহিষ, দ্বিতীয় অবস্থায় উপরাজ মহিষের, নিম্নাঙ্গ মাল্লবের; তৃতীয় অবস্থায় উপরাজ নর, নিম্নাঙ্গ মহিষ, চতুর্থ অবস্থায় সম্পূর্ণ নর। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থায় অমুরূপ প্রতিমা নয়সিংহ ও ববাহ প্রতিমায় আছে। উপরাজ সিংহ বা ববাহ, নিম্নাঙ্গ নর। তৃতীয় অবস্থায় প্রতিমা কিম্বা চিত্র আমি দেখিতে পাই নাই। বিশ্বস্তর আচার্য-কৃত চিত্রদ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইল।

অপর চিত্রেও মধ্যে রাগ ভৈরবের চিত্র জীবন্ত দেখাইতেছে। ধ্যানের সহিত সুন্দর একা আছে। শিল্পীর নাম রামচাঁদ রায়। মাধবচন্দ্র দাস কৃত “রাজা বিক্রম সেনের রাজসভা” চিত্রে আকৃতি-গুলি মন্দ হয় নাই। কিন্তু পরিপ্রেক্ষণের (perspective) অভাব ঘটয়াছে।

অসমীয়াদের রন্ধন ও ভোজন-পদ্ধতি

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

সেকালের হিন্দুপরিবারে শুধু নিজের অথবা নিজের পত্নী-পুত্র-পরিজনাদির রসনা পরিভূক্তির উদ্দেশ্যে কোনও স্নান্ন অন্ন, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না; পরন্তু প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থকেই দেবদেবী, পিতৃগণ এবং অতিথিবৃন্দের ভূক্তির উদ্দেশ্যে ভোজ্যাদি নিত্য নিয়মিত ভাবে প্রস্তুত এবং অর্পণ করিতে হইত। গৃহিণী শুদ্ধ সংযত দেহ এবং মন লইয়া অতি শুচিতার সহিত পাক-শালায় প্রবেশ করতঃ নিজের সাধ্যানুসারে ঘড়রস-সম্বিত স্নান্ন নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টক, পরমান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন; গৃহ-কর্তা যথাকালে সেই ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি ইষ্টদেব-দেবী এবং পিতৃগণকে নিবেদন করিতেন। তাহার পর গৃহাগত ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী এবং অত্যাশ্রিত অতিথিকে নিয়মিত ভিক্ষা প্রদান ও ভোজন করাইয়া সর্বশেষে গীড়িত বা অক্ষম নরনারী হইতে কুহর, শৃগাল ও কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত যাবতীয় জীবকে অন্নজল দ্বারা যথাসাধ্য পরিভূক্ত করিয়া তবে নিজেরা অবশিষ্ট খাদ্যের অংশ গ্রহণ করিতেন। মংস্ত, মাংস, 'কুশর' (খিচুড়ী), পায়স এবং পিষ্টকাদি স্নান্ন খাদ্য কেবলমাত্র নিজের রসনা পরিভূক্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করানো অতিশয় পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। "যে ব্যক্তি শুধু আত্মভূক্তির জন্তই খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, সে কেবল পাপ করে"—এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই ভোজ্যবস্তু নিত্য দেবদেবী, পিতৃগণ এবং অতিথি প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। সেগুলিকে ঋষিরা যথাক্রমে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং বলিবৈশ্বদেব নামে পরিচিত করিয়াছেন। পুরাতন সদাচারসমূহ বর্তমান সময়ে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইলেও জনসাধারণের স্মৃতি এখনও সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিতে পারে নাই; তজ্জন্তই বাংলার পাড়ারগায়ের লোকে এখনও কোনও বৃহৎ ভোজন ব্যাপারকে "যগিয়া" (যজ্ঞ) এবং যে বাড়ীতে তাহা হয়, তাহাকে "যগিয়াবাড়ী" (যজ্ঞবাড়ী) বলিয়া থাকে। হিন্দুর গৃহে পাকশালা এখনও পর্যন্ত যজ্ঞ-শালার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া অশুচি অবস্থায় তথায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক স্নান্ন সমুন্নত সমাজে যাহাই দেখা যাউক; প্রকৃতি যে নারীর উপর তাহার পুত্র-কন্যা পরিজনাদির আহার সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করিবার গুরু-দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন, দেশ-বিদেশের আদিম বা অসভ্য বলিয়া পরিচিত জাতি-সমূহের সামাজিক ব্যবহার প্রতি দৃষ্টপাত করিলে, তাহা উক্ত

রূপে বুঝিতে পারা যায়। সেই সকল সমাজের স্নান্নকায় এবং বলিষ্ঠ পুরুষেরা সময়ে সময়ে শিকারের দ্বারা নানাবিধ পশু-পক্ষীর মাংস অথবা মৎস্তাদি সংগ্রহ করিলেও বনভূমির অমৃত-সম্মত ফলমূলদি সংগ্রহ নারীর পক্ষে নিত্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যগুলিকে অগ্নির সাহায্যে ভোজনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করাও যে তাঁহারই কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত মানব-সমাজে যুগ্মার অতিরিক্ত পশুপালনের প্রথা অল্পতর জীবিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুর দুগ্ধ দোহন এবং দুগ্ধ হইতে তরু, দধি, নবনীতাদি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের দায়িত্ব নারীই গ্রহণ করিয়াছেন। সভ্যতার অধিকতর ক্রমোন্নতির সহিত কৃষিকার্য্যের প্রচলন হইলে ফলমূল শাকসব্জী ও শস্যাদি হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার কার্য্য নারীই করিয়া আসিতেছেন। পাকপ্রণালী গোড়ায় খাদ্য-দ্রব্যকে কেবল কোমল করতঃ ভোজন এবং পরিপাক করিবার সাহায্যের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ এক উন্নত শিল্পবিদ্যায় পরিণত হইয়াছে।

এক এক দেশে একই খাদ্যদ্রব্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পাকপ্রণালী ও পরিবেশনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দেশের জলবায়ু অধিবাসী-বর্গের ধর্ম্মবিশ্বাস, বংশগত অভ্যাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব রন্ধনবিদ্যায় অভিজ্ঞতা—বিশেষ বিশেষ রুচি ইত্যাদি কারণে একই জাতীয় আমিশ, নিরামিশ খাদ্যদ্রব্য অসংখ্য প্রকারে প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত জনপ্রবাদ "আপরুচি খানা" (নিজের যেমন রুচি, তেমনি খাও) অনেক সময় গ্রহণীয় হইলেও সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রভাবে সর্বত্রই মানুষকে পরের রুচির দ্বারা পরিচালিত হইতে হয়। মানব-সমাজে প্রচলিত ভোজ্য-দ্রব্যের বিভিন্নতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। দুই-একটি দৃষ্টান্ত কেবল দিগ্‌দর্শনরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

কোন পর্য্যটক বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাঞ্চল-মুখে চলিতে চলিতে যদি স্থানীয় লোকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে করিতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, তিনি দেখিবেন যে, অন্ন প্রায় একরূপ থাকিলেও ব্যঞ্জনের আবাদ বিশিষ্টরূপে পরিবর্তিত হইতেছে; লঙ্কা-মরিচের ব্যবহার অধিক

হইতে হইতে অবশেষে পূর্বপ্রান্ত ত্রিহুট এবং চট্টগ্রামে ব্যঞ্জন একেবারে “লঙ্কাময়” বা “মরিচময়” হইয়া গিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারিণী বিধবা ভদ্র মহিলাগণের নিত্য ব্যবহার্য্য দাইল এবং ব্যঞ্জনে লঙ্কা-মরিচের একরূপ আধিপত্য যে ভোক্তাকে “চোখের জ্বলে, নাকের জ্বলে” ভাসিতে হয়, “হা—হা হু—হু” করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অথচ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অন্তিমাংশে পোর্ভুগীজ জাতির এদেশে আগমনের পূর্বে উক্ত মুখরোচক বস্তুটির অস্তিত্ব আমাদের দেশের কেহ জানিতেন না। তামাকুর মত লঙ্কা-মরিচও বিদেশের আমদানী। আমাদের সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে উহাদের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই দুইটি জিনিষ আমেরিকা হইতে স্পেনিশ এবং পোর্ভুগীজদের দ্বারা আনীত, গত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আমদানী জিনিষ—অথচ ঐ দুইটিই পৃথিবী জয় করিয়া বসিয়াছে।

সভ্য জাতির অপেক্ষা অসভ্য জাতির রন্ধন-প্রণালী অনেকটা সরল ও স্বাভাবিক স্তরায় স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। উহার আমিষ এবং নিরামিষ উভয় প্রকারই খাদ্য প্রধানতঃ আগুনে ঘি (সৈঁকা) অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া আহাৰ করিয়া থাকে।

সভ্যতার উন্নতির সহিত অথবা উন্নততর জাতির সংস্পর্শ এবং অহুকরণ-প্ররুতির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির মধ্যে বেশভূষার উৎকর্ষ বর্ধনের সহিত পাকবিভার পারিপাট্য ও জটিলতা বাড়িতে থাকে।

বিদেশী বিজেতৃ জাতির (মুসলমান এবং যুরোপীয়) সংসর্গে আসিবার পর হইতে নগরবাসী ধনী তথা শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু পরিবারে “মোগলাই খানা” “ফরাসী রান্না” বেশ চলিয়াছে। আধুনিক উন্নত নাগরিকগণ (গৃহে না হইলেও) হোটেল এবং রেস্তোরাঁ প্রভৃতি ভোজনালয়ে ঐ সকল বস্তুর (হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও) আবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখন আমরা অসমীয়া হিন্দুপরিবারে সর্বদা প্রচলিত পাক-পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করিবার প্রযত্ন করিতেছি। বাঙালীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে আসামের ভদ্র পরিবারে যে স্বদেশী পাকপ্রণালীর প্রচলন ছিল, তাহা তাহাদের দেশের জলবায়ু এবং পুরুষাভ্যু-ক্রমিক রুচির অনুরূপ—সম্ভবতঃ অধিকতর উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর ছিল। গত এক শত বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের প্রভাবে জল স্থল উভয় পথেই যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার ফলে প্রতিবেশী বাংলাদেশের অধিবাসীদিগের সহিত অসমীয়াগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতেছে এবং সঙ্গ্রে বাংলার আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, রন্ধন-ভোজনাদির যাবতীয়া রীতিনীতি আসাম-প্রদেশে বর্ধমূল হইতেছে। অন্য-

তত্ত্বের অসমীয়া ভদ্রগৃহের আসবাব, সাজসজ্জা, ধরণধারণ যেরূপ নব্যবঙ্গের জ্বহু নকলে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ অসমীয়া ভদ্রমহিলার পাকপ্রণালীও বৈশিষ্ট্য হারা হইয়া নবীনা বদনানীর রন্ধন-পদ্ধতির সহিত একাকার হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি, নগর হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামে না গেলে প্রকৃত বা ঠাঁটি অসমীয়া-রন্ধন বিভার নিদর্শন পাওয়া কঠিন ব্যাপার হইয়াছে।

বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের মত আমাদের নগরগুলিতে প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মীরাই পাকশালায় রন্ধনাদি করিলেও সেখান হইতে দূরবর্তী পল্লীগ্রামের উচ্চশ্রেণীর অসংখ্য বিবাহিত হিন্দু সাধারণতঃ স্বহস্তে নিজ নিজ রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। আসামের রন্ধন-প্রণালী বিশেষরূপে বিচিত্রতাহীন, অনেকটা সাদাসিধে ধরণের এবং সৌখীনতার অপেক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকতর অহুকূল বলিয়া বোধ হয়। তবে বড় বড় নগরে যে সমস্ত সুসভ্য বা সুশিক্ষিত অসমীয়া হিন্দুপরিবারে যুরোপীয় অথবা বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার প্রভাবে যে স্থানে মহিলারা পতি-পুত্রাদির সুবিধা বা স্বাস্থ্যের জন্য পাকশালায় পরিশ্রম স্বীকার করা হীনতাসূচক কাজ মনে করিয়া থাকেন, তথায় বেতনভূক্ পাচক অথবা পাচিকাই গৃহিণীর সেই পুরাতন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ পরিবারে বিশুদ্ধ দেশীয় পাকপ্রণালী নির্বাসিত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে মগ, মাদ্রাজী বা মুসলমান বাবুচিদিগের প্রবর্তিত মোগলাই, ফরাসী, ইংরেজী বা ফারসী প্রভৃতি উন্নততর সভ্যভব্য রন্ধন-পদ্ধতি রাজত্ব করিতেছে।

নগরবাসিনী বাঙালীর মেয়েরা সময়বিশেষে স্নান না করিয়া কেবল পূর্ব রাত্রির শয্যাবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া পাকশালায় প্রবেশপূর্বক রন্ধন করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লীগ্রামের কোনও অসমীয়া হিন্দু মহিলা স্নান না করিয়া কদাচ তাহা করেন না। মাসিক জীবধর্ম্মের সময়ে ছয় দিন পর্য্যন্ত তাহার পাকশালায় অথবা গোশালায় প্রবেশ করেন না কিংবা কোনও ব্যক্তিকে কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য অথবা জল দেন না। বাংলা দেশের অধিকাংশ নগরে শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে অনেক সময়ে পাকশালায় প্রবেশপূর্বক স্বতন্ত্রভাবে কুটন কুটার যে প্রথা দৃষ্ট হয় তাহা আধুনিক এবং পল্লীগ্রামের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই নিকট ঘৃণ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গো-শালায় সহিত আধুনিক বঙ্গবালার সম্বন্ধ অত্যন্ত কম অথবা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

ব্যঞ্জনের মশলা—মুখরোচক, সুন্দর, সুগন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাতে তৈল, ঘৃত, হরিদ্রা (অথবা কুসুম বা জাকরান) এবং নানাবিধ মশলা সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পরিমিত মশলা ব্যবহারের দ্বারা কোনও

খাদ্যব্যবহার বিকৃতি অথবা গুণহানি হয় না। পরন্তু উহার দ্বারা খাদ্য অধিকতর রুচিকর ও সহজপাচ্য হইয়া থাকে; কিন্তু উহাদের অধিকতর ব্যবহারে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটয়া থাকে। অসমীয়া ভদ্ৰমহিলারা রন্ধনের সময়ে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত মশলাগুলি ব্যবহার করেন, যথা :—গোলমরিচ, সরিষা, ধনে, আদা, ভেঙ্কপাতা, ‘জ্বনী’ (জোয়ান), হিং এবং জাবরাং (জাকরাং নহে)। প্রয়োজনানুসারে এই মশলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। আসামে যে গোলমরিচের ব্যবহার আছে, তাহা বাংলাদেশের গোলমরিচ অপেক্ষা আকারে ছোট। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে জিঁরার ব্যবহার নাই এবং তাঁহাদের ব্যঞ্জন কালের ব্যবহার কিছু কম। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের মহিলারা বাটা মশলার পরিবর্তে সাধারণতঃ মশলার গুঁড়া রন্ধনে ব্যবহার করেন। নিম্ন আসামে অনেক ক্ষেত্রে মশলা শিলে পিষিয়া তরকারিতে দেওয়া হয়। যাহা হউক, উক্ত “জাবরান্” নামক মশলাট ভূটানের পাহাড়ে জন্মে। ভূটীয়দিগের নিকট হইতে উহা ক্রয় করা হয়। মাংস রান্ধিবার সময়ে অসমীয়া মহিলারা ইহার ব্যবহার বুঝি করেন। কাঁচা অবস্থায় জাবরান্ এরূপ বিষাক্ত দ্রব্য যে, খাইলে প্রাণহানি হইয়া থাকে।

কামরূপ অঞ্চলের অধিকাংশ ভদ্ৰ পরিবারের মধ্যে একটু বেশী সিদ্ধ করা ভাত খাওয়ায় প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি—উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের লোকেরা এত গলা ভাত খান না। তাঁহারা বাঙালীদিগের মত সাধারণতঃ একটু শুদ্ধ ভাত খাইতে পছন্দ করেন। ভাতের সহিত ক্ষার খাওয়া অসমীয়া হিন্দুদিগের প্রারম্ভিক ভোজন। ইহার বিষয় নিম্নে বিবৃত করা হইল :—

তৈল ও লবণ আসাম প্রদেশের মধ্যে বড়পেটা এবং মাজুলি অঞ্চলে ও উত্তর-লখিমপুর মহকুমার গৌসাই গাঁও, ডাকুয়াখানা, তিলাহি ও নারায়ণপুরে প্রচুর সরিষা জন্মে। বড় বড় নগরে তেলের কলের প্রচলন হইয়াছে। মধ্য আসাম ও উপর-আসামের পল্লীবাসিনীরা “গছশাল” ও “বাধাশাল” নামক দেশীয় ঘানি হইতে প্রস্তুত যে বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করেন, অসমীয়ারা তাহাকে “পুকাতেল” বলেন। সরিষা ভাজিয়া একটু গরম থাকিতে ঘানিতে দিয়া তৈল বাহির করে বলিয়া এই তৈল হইতে এমন একটি গন্ধ বাহির হয়, যাহা পল্লীবাসী অসমীয়াদিগের বেশ তৃপ্তিকর হইলেও অনভ্যস্ত বাঙালীর নিকট রুচিজনক হয় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও নিম্ন-আসাম ও মধ্য-আসামে ভূটীয়া লবণ (ভূটানের পাহাড়-জাত লবণ) ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উপর-আসামে উহা ছুপ্পা ছিল। লখিমপুর জেলার জয়পুর মৌজার এবং ডিব্রুগড় মহকুমার কোন কোন স্থানে, শিবসাগর জেলার গোলাঘাট ও অভাঙ্গ কতকগুলি অঞ্চলে লবণাক্ত জলের উৎস আছে। অসমীয়ারা ইহাকে “পোণপুং” বলেন। সেই সকল স্থানের লোকে

বাঁশের চোড়ায় লোণা জল পুরিয়া আঙুনে ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের জলে লৌহ থাকায় অসমীয়ারা ক্ষার খাইয়া থাকেন। ইহার ব্যবহার দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া থাকে। অসমীয়ারা কলা ও কলার বাকল পুড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত ‘কলম শঠ’ (কখির ডাঁটা) প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ হইতে তিন-চারি রকম ক্ষার তাঁহারা প্রস্তুত করেন। কামরূপে উহাকে গটা ক্ষার বা “দখরা ক্ষার” বলা হয়। কামরূপ ও তেজপুর অঞ্চলের অনেকে ব্যঞ্জনে হলুদের পরিবর্তে ক্ষার ব্যবহার করেন। উজনি আসামের পল্লীগ্রাম-গুলিতে এখনও হলুদের ব্যবহার নাই। সেখানকার অসমীয়ারা হলুদকে “রং” বলেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—“ব্যঞ্জনে রং নাই বা করলাম।” যাহা হউক ক্ষার খাওয়া অসমীয়াদিগের একটা বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। তাহারা লাইশাক (সরিষা শাক), উরাহি (উচ্ছে) ও বেঙ্গেনার (বাঁড়াকুর) ব্যঞ্জনে, কলাই দাইলে ক্ষার সংযোগ করেন। বাঙালীরা মধ্যে মধ্যে যেমন তিক্ত ব্যঞ্জনাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসীরা তদ্রূপ মধ্যে মধ্যে ক্ষার খাইয়া থাকেন। ত্রিপুরা, কুচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক ক্ষারের প্রচলন আছে। অসমীয়ারা ক্ষার খান বলিয়া তাঁহাদের কোন কোন বাঙালী বন্ধু “ক্ষার খোয়া অসমীয়া” বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন। যাহা হউক অসমীয়ারা কলমী শাককে ‘কলম’ বলেন। তাঁহারা হেলক ও কলমী শাক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুড়াইয়া ছাই করিবার পর উহাকে বাঁশের চূপড়িতে ভর্তি করেন। অতঃপর ঐ চূপড়ির নিম্নে একটি থালা রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ছাইয়ের মধ্যভাগ একটু “খালা” করা হয়। খালার মধ্যে পরিমাণমত যে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা ছাইগুলিকে ভিজাইয়া নিম্নস্থ খালার আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলকে “ক্ষার” বলে। কলার ক্ষার অপেক্ষা কলমী ও হেলকের ক্ষার উৎকৃষ্ট। কামরূপের চাঁড়াল জাতীয় লোকেরা পুর্বেকৃত “গটা ক্ষার” প্রস্তুত করে। উহাও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং লবণসমৃদ্ধ।

অসমীয়ারা ভাতের সহিত “তৈল ক্ষারিণি” খাইয়া থাকেন। তেলের সহিত ক্ষার মাখাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। “তৈল ক্ষারিণি” খাইলে নাকি দেহে চর্বি জন্মিতে পারে না। অসমীয়া হিন্দু মহিলারা “আদ ক্ষরিয়া” নামক এক প্রকার ব্যঞ্জন করিয়া থাকেন। উহা ‘টেঙা’ (টক)ও নহে, ক্ষারও নহে। আদ শব্দে আধা বা অর্ধেক এবং “ক্ষরিয়া” শব্দে ক্ষার বুঝায়। কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে আদ ক্ষরিয়ার কোন মানে হয় না। অসমীয়াদিগের মধ্যে “মুলার আদ ক্ষরিয়া”র বেশ প্রচলন আছে।

অসমীয়া হিন্দুদিগের সমাজে কলাইয়ের দাইলের প্রচলন অধিক। ইহাকে তাঁহারা ‘মাকলাই’ বলেন। তাঁহাদের

মধ্যে ডালনা বা ষ্টোঁচ প্রচলন নাই। সেখানকার কোনও মহিলা এই দুইটি রাখিতেও জানেন না। আসামে পটলের চাষ নাই। তবে সে দেশের জঙ্গলে স্বাভাবিকত এক রকম পটল পাওয়া যায়। উহা আকারে ছোট এবং উহার শতকরা প্রায় ৩০টি তিজ হয়। বহু পটলের শাঁস নাই, বীজ অধিক—খাইতে পটলেরই মত এবং কতকগুলি ব্যতীত অত্যাধিক সুবাস। কুচবিহার রাজ্যের স্থানে স্থানে এই বুনো পটল পাওয়া যায়। জঙ্গলের পটলের গাছ ও পাতা কবিরাজেরা ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অসমীয়া মহিলারা তরকারিতে বুনো পটল ব্যবহার করেন। আসামে পোস্তদানার বেশ প্রচলন আছে। আকিঙের আর একটি নাম পোস্ত। উহার বীজের নাম পোস্তদানা। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে আসামে আকিঙের চাষ ছিল। স্ততরাং সে দেশে পোস্তদানা যথেষ্ট জমাইত এবং লোকের ব্যবহার্য ছিল। আসামে পাপরের (ইহা সংস্কৃত পপ্‌টি শব্দের অপভ্রংশ) প্রচলন নাই। মুগ বা মাসকলাইয়ের দাইল ইহার প্রধান উপাদান।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে কচি কচুপাতা হইতে অনেক রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়। অসমীয়া মহিলারা এই এক কচুপাতা হইতেই ‘ঝাল’ এবং টক ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। কচুপাতা সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণ ও অন্ন সংযোগ করিলে ‘টক’ এবং আদা, গোলমরিচ, লঙ্কাবাটা বা লঙ্কার গুঁড়া, লবণ দিলেই ঝাল হইল। অসমীয়ারা ভাতের সঙ্গে ভাজা ও সিদ্ধ কচু খাইয়া থাকেন। কচুর ডাঁটাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে রাখিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়ারা লাইশাক (সরিষা শাক) খুব খান। এই শাকের কয়েকটি প্রকারভেদ আছে যথা :—মেরলাই, টকোলাই, চীনালাই প্রভৃতি।

অসমীয়া হিন্দুরা পাটগাছকে “মরা গাছ” বলেন। সমগ্র আসামে তিন প্রকার পাটের চাষ হয়, যথা :—মিঠা মরা, টেকা মরা ও তিতা মরা। তিতা মরা শব্দের অর্থ তিজ পাট। অসমীয়া মহিলারা তিজ পাটের (নালিতার) শুক পাতা হইতে একপ্রকার তিজ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন। এই ব্যঞ্জনকে তাঁহারা “সোকোতা” বলেন। এই সোকোতা আমাদের “সুজপাতা” এবং পূর্ববঙ্গের “নালিতার পাতা”। সোকোতা খাইলে নাকি পিত্তাধিক্য প্রশমিত হয়। উত্তর-বঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে যত পাট উৎপন্ন হয়, সে ‘কলের’ (গাছের) পাতার আবাদ তিজ; উহার পাতা শুকাইয়া রাখিলেই ‘সুজপাতা’, ‘সোকোতা’ বা ‘নালিতার পাতা’ হয়। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা অঞ্চলে ঐরূপ পাট জন্মে না—বেনের দৌকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পাটের সহিত পূর্ব বা উত্তর-বঙ্গের পাটের (সিরাজগঞ্জী পাটের) প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের (পশ্চিম বঙ্গের) পাটের শুষ্ক লম্বা এবং পাতা তিজ নহে।

তিজ পাটের শুষ্ক প্রায় গোলাকার। সংস্কৃত ভাষায় তিজ পাটকে ‘নড়িচা’ বা ‘নলিতা’ এবং আমাদের দেশে ‘নালিতা’ বলে। কামরূপ অঞ্চলে এক রকম ছোট ভাতের মিঠ পাতার পাট শুধু শাক খাইবার উদ্দেশ্যেই চাষ করা হয়। উহাকে “ভোগাপাট” বলে। ভোগা = মিঠ বা উৎকৃষ্ট।

অসমীয়া হিন্দুরা কম পরিমাণে ঝোল ব্যবহার করেন। মংস্তের ঝোলে যথেষ্ট তরকারি দেওয়া হয়। তাঁহারা ঝোলকে “আঞ্জা” বলেন।

মধ্য-আসাম ও উপর আসামের হিন্দুরা ভাতের সহিত খিচিনি আহাৰ করিয়া ভোজন সমাপ্ত করেন। যাহারা খিচিনির ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, তাঁহারা দই-গুড় খাইয়া সেই উদ্দেশ্য (মধুরেণ সমাপয়েৎ) সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ভাতের সঙ্গে খি এবং চিনি ব্যবহার খুব পুরাতন এবং এখনও আশ্রা প্রদেশে (মধুরা, ইটা, আশ্রা প্রভৃতি জেলায়) সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বাড়ীতে নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে।

মংস্তের মধ্যে পিঠিয়া মাছ অসমীয়াদিগের প্রিয় খাদ্য। আসামের বড় বড় নদীতে ও বিলে এই মাছ পাওয়া যায়। পিঠিয়া মাছ এত বড় হয় যে, একটি লোক উহাকে বহন করিতে পারে না। এই মাছের আকার অনেকটা মৃগেল মাছের মত এবং উহার মাথাটা রুই মাছের মত। পিঠিয়া মাছের আঁশ খুব বড় হয়। ব্রহ্মপুত্রে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু উহার তেমন স্বাদ নাই। আসামে বাগদা চিংড়ী ছুপ্পা পায়। “শালে মূলে” বলিয়া আসামে একটি কথার প্রচলন আছে। ইহার অর্থ—মুলা ও শোল মাছ দিয়া রান্না তরকারি উৎকৃষ্ট। আসামবাসী হিন্দুরা মৃগেল, শাল ও শিকী মাছ খান না। এতদ্ব্যতীত যে সকল মংস্ত তাঁহাদের অভক্ষ্য সেগুলির নাম, যথা :—ফুটকাশাল, মরশাল, নাদিনী। সিরিকা, নেরিয়া, গরুয়া, রান্ধনী, ঘুমচা, ভেচেলী, বেন ও করিয়া।

অল্প দিয়া মাছের গা চিরিয়া ফেলিবার পর ‘দাগা’ (টুকরা টুকরা করিয়া) কাটা হয়। এইরূপ করাকে “কচি দিয়া” বলে। দরঙ্গ জেলা হইতে উপর-আসাম পর্যন্ত পল্লীগ্রামে প্রত্যেক পরিবারেই “কচি দিয়া” মাছ রাখা হয়। তত্রত্য অসমীয়ারা বলেন, “মাছের গা ভাল করিয়া চিরিয়া না দিলে উহাতে লবণ, তৈল ও মশলা ভালরূপে প্রবেশ করে না—উহা খাইলে সোম্বাদ পাওয়া যায় না।”

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে হরিদ্রা এবং লবণসংযুক্ত মংস্ত কলাপাতায় মুড়িয়া আগুনের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিবার পর বাহির করিয়া পাওয়া হয়। ইহাকে “পাতত দিয়া” বলে। এ দুই অঞ্চলে অনেকে লবণসংযুক্ত মংস্তকে বংশশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে সেঁকিয়া ব্যবহার করেন। কেহ কেহ বা ঐ সেঁকা মংস্ত আবার সর্বপ তৈলে ভাজিয়া লন। এইরূপে প্রস্তুত করাকে “খরকাটি দিয়া” বলে। কুচবিহারে রাজবংশী

জাতির মধ্যে আমরা “পাতত দিয়া” ও “খরকাটি দিয়া”র প্রচলন দেখিয়াছি। কোচবিহারে এই দুইটিকে যথাক্রমে “পাতত করা” ও “খরকাটি” বলে।

অসমীয়া ভদ্ৰ-মহিলাৰা সাধাৰণতঃ পেপিয়া ফলের অথবা ‘কোমরা’র (কুমড়ার) টুকরা দিয়া মাংস রাঁধিয়া থাকেন। অসমীয়াৰা পায়ৰাকে কপৌ বলেন। তাঁহারা বেশ তৃপ্তির সহিত উহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই পায়ৰার ডিম খান না। অসমীয়াৰা এক জাতীয় বড় পায়ৰাকে ‘পরঘুমা’ এবং হরিয়েলকে ‘হাইঠা’ বলেন। এই দুই জাতীয় পায়ৰার মাংস খাইতে খুব সুবাস্হ। পরঘুমা ও হরিয়েল (green pigeon) খুব গভীর জন্মলে থাকে। মাজুলি অঞ্চলের নদীতটে “নাকরখের কচুয়া” নামক এক জাতীয় পক্ষী আমরা দেখিয়াছি। উহার আকৃতি হাঁসের মত। কোনও অসমীয়া হিন্দু ইহার ডিম্ব খান, কিন্তু মাংস খান না। ‘বালিঘোড়া’ নামক এক জাতীয় বহু পক্ষী মাজুলী অঞ্চলের নদীর চড়াই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী দেখিতে সুন্দর। আকারে ইহা পশ্চিম বঙ্গের শালিক পাখী অপেক্ষা কিছু বড়। উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুৰাও ইহার ডিম খাইতে ভালবাসেন, কিন্তু ইহার মাংস কেহ খান না।

আপামে অসভ্য জাতির লোকেরা ‘নলছয়ার’ নামক কুশ্বিশেষের মাংস খায়, কিন্তু কোনও শ্রেণীর হিন্দু তাহা খায় না। কিন্তু সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দু ইহার ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। উজনি আসামের কোনও শ্রেণীর হিন্দু কর্কট খান না।

অসমীয়াৰা ভাদ্ৰ মাসে উদ্গত কচি “বাঁশের কৌড়া” (সংস্কৃত ‘বংশকরী’) ঢেঁকিতে কুটিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে গাজ, পকা গাজ, খরিচা, পকা খরিচা প্রস্তুত করিয়া ভোজন করেন। পকা গাজ শুকাইয়া লইলে খরিচা হয়। কামৰূপের দক্ষিণ দিকস্থ পার্বত্য অঞ্চলে এবং উজনি আসামে গজের প্রচলন অধিক। কামৰূপে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অতি অল্প লোকে জানেন।

অসমীয়াৰা বলিয়া থাকেন—টক না খাইলে তাঁহাদের শরীর ভাল থাকে না। আনাম অঞ্চলে যত রকম টক ফল পাওয়া যায়, ভারতের আর কোনও দেশে তত নাই। সে দেশে ‘থেকেরা’ নামক টক ফল খান নাই এমন লোক বিরল। অসমীয়াৰা বলেন—এই ফল খুবই উপকারী; এমন কি ইহার দ্বারা ‘প্রবাহিকা’ (রক্ত আমাশয়) এবং কফসংযুক্ত

জ্বরাদি (নিউমোনিয়া) রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। বাড়ীতে ভাল মাছ আসিলে অসমীয়া মহিলাৰা অল্পসংযুক্ত মংস্তের ব্যঞ্জন (মাছের অস্থল) রাঁধিতে ভালবাসেন। অসমীয়াৰা টকের ব্যঞ্জনে মিষ্ট ব্যবহার করেন না। বাহা হউক, কুচবিহার অঞ্চলে থেকেরাকে থৈকল এবং সংস্কৃত ভাষায় ‘অল্পবেতস’ বলে। রঙ্গপুর জেলায়ও প্রচুর থৈকল জন্মে। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্রে অল্পবেতসের উল্লেখ আছে।

অসমীয়া হিন্দু মহিলাৰা সরিষার সহিত কয়েকটি মশলা মিশ্রিত করিয়া চাটুনি জাতীয় কন্ধক প্রকার উত্তম আবাদযুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে একটির নাম “কাঁহদী” (আমাদের কান্ধদী এবং উত্তরবঙ্গে ইহাকে ‘কাসন’ বলে), আর একটির নাম ‘খারলী’ এবং আর একটির নাম ‘বেছয়াই’। অসমীয়াৰা রান্না করা মাংস এবং পাত্তা ভাতের সহিত ‘বেছয়াই’ মিশ্রিত করিয়া খাইতে ভালবাসেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, টক না খাইলে অসমীয়াদিগের শরীর ভাল থাকে না। ইহার কারণ আমরা অবগত নহি। আমরা দেখিতে পাই—রাঢ়ে ‘টক’, পূর্ববঙ্গে ঝাল এবং মাদ্রাজ প্রদেশে ‘টক এবং ঝাল’ (তৈতুল ও ঝাল) একত্রে ব্যঞ্জনে ব্যবহার করে। মাদ্রাজে লক্ষা এবং তৈতুল একত্রে গুলিয়া ভাতে মাখিয়া খায়, যিও মিশায়। ‘রাঢ়’ অঞ্চল কড়া জায়গা (ভিজা নহে—শুক) বলিয়া সেখানকার লোকে টক খায়; পূর্ববঙ্গের মাটি স্যাংসেতে বলিয়া ‘ঝাল’ খুব খায়—এরূপ যুক্তি চলে না, কেন না মারবাড়ের মরুভূমিতেও লোকে এত লক্ষা খায় যে, আমরা খাইলে মারা যাইব। ইহা সনাতন অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকাংশ মানুষের স্বভাবেই রজোগুণের আধিক্য; সেই জন্ত বেশীর ভাগ লোকেই মাছ মাংস, বেশী ঝাল, বেশী টক, তামাক, গাঁজা, মদ ইত্যাদি রজোগুণের উদ্দীপক দ্রব্য খাইতে স্বভাবতঃই ভালবাসে। পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি বিস্ত্রী হৃগ্নয়ুক্ত জিনিস, ডোরিয়ান নামক মালয় দেশের অতি হৃগ্ন ফল, শুকনা মাছ, শুকনা মাংস, Caviare নামক এক রকম শুকনা মাংস (যাহার এক গ্রামের মূল্য এক গিনি), কাম্পীয়ান ব্রদের ষ্টার্কিওন, মাছের লোণা এবং শুকনা ডিম, পনীর প্রভৃতি জিনিস পৃথিবীর অনেক লোক আদর করিয়া খায়। “মানুষের রুচিই বিচিত্র”—এই কথা ছাড়া ইহার আর অণু উত্তর নাই।

সোভিয়েট কৃষি-উন্নয়নে বিজ্ঞান

অধ্যাপক ত্রিজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃষকের জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ প্রায় সর্ব দেশেই খুব স্বল্প, আর-শাসিত রাশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামান্য কিছু থাকিলেও কৃষিকার্য ছিল বিজ্ঞানের সভায় অপাঙ্ক জ্ঞেয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষক যে পদ্ধতিতে হলচালনা করিয়া বীজবপন ও শস্য আহরণ করিত বহু সহস্র বর্ষ পরেও মানুষ প্রায় সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞান তাহাকে নূতন কোন পন্থা দেখায় নাই—এ কথা বলিলে খুব ভুল বলা হইবে না। মানুষের জীবনের অত্যন্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে পরিবর্তন আসিয়াছে কৃষি-পদ্ধতিতে তেমন কিছু হয় নাই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীনে বিজ্ঞান মানব-গোষ্ঠীর এই উপেক্ষিত অংশীদারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে এবং তাহারই ফলে বস্তুমতীর ভাঙার হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানেন—প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষ কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারে না, প্রকৃতি স্বতঃপ্রসূত হইয়া কোন দানই দিবে না, তাহার নিকট হইতে হিনাইয়া লইতে হইবে।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পকাল মধ্যে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে নব রূপ প্রদান করিবার জন্ত রাশিয়ায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় চৌদ্দ হাজার বৈজ্ঞানিক কর্মী কৃষিগবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত ১০টি গবেষণাগার, ৩৬৭টি পরীক্ষাকেন্দ্র এবং বহুসংখ্যক শাখা-প্রতিষ্ঠান-সম্মিলিত ৫০৭টি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। এতদ্ব্যতীত সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় বিশ হাজার ছোট ছোট লেবরটরী আছে, যেখানে বহুবিধ গবেষণার কার্য হইয়া থাকে।

কৃষি-উন্নয়ন ব্যাপারকে কয়েকটি বিভিন্ন কার্যে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন—ভাল বীজ বাছাই, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, উদ্ভিদের জীবনধারা পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ; জৈব উপদ্রব দূরীকরণ, উন্নতধরণের কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণ। সোভিয়েট রাষ্ট্র ইহার প্রত্যেকটি কার্য বৈজ্ঞানিক প্রণয়ন পরিচালিত হইয়া অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিয়াছে।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের বিবরণীতে জানা যায় যে সেই সময় সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অধীন ভূমির শতকরা ৭০টিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করা হইত। বীজ পরীক্ষার্থ রাষ্ট্রের অধীন দেড় হাজারের অধিকসংখ্যক পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে সেখানে বীজসংগ্রহ ও পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে এবং এই উপায়ে সর্বদাই ভাল বীজ বপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী উদ্ভিদের জীবন বড় সৌখীন, বিশেষ করিয়া শস্য ও ফলফুলের উদ্ভিদগুলির। ইহাদের প্রত্যেকটির জন্ত যথোপযুক্ত ভূমি, আবহাওয়া, রোজনপ্তি, শীতাতপ দরকার। কোন বিষয়ে কোন ক্ষুদ্র ঘটলে উদ্ভিদের জীবন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে কিংবা উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত হইবে। সকল শস্য সব দেশে হয় না, বৎসরের বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শস্য জন্মিয়া থাকে, ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। বিজ্ঞান এই রীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া এখানে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এই বিষয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীর কার্য উল্লেখযোগ্য।

এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে অপর জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের মৌনমিলন ঘটাইলে যে চারাগাছ বা বীজ উৎপন্ন হয় তাহাকে বর্গসঙ্কর বলা হয়। বংশানুকূল নিয়মানুযায়ী সন্তান পিতা ও মাতা উভয়েরই গুণের অধিকারী হইয়া থাকে। মানুষ চেষ্টাঘারা বা কৃত্রিম উপায়ে এই প্রকার বিরুদ্ধ মিলন ঘটাইয়া নানা প্রকার মিশ্রজাতীয় নবতম প্রকৃতিবিশিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছে, ইতিপূর্বে যাহাদের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ছিল না। পার্ভত্য অঞ্চলে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে সেইগুলি তদ্বৈশিষ্ট্য কঠিন মাটি, শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্ধিত হইতে অসমর্থ, আবার সমভূমির বৃক্ষলতাদির পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদের প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। রাশিয়ার পরলোকেগত আই. ডি. মিকুরীন প্রমাণ করিয়াছেন যে, অনুকূল পরিবেশাবীনে বর্গসঙ্কর উদ্ভিদকে যে-কোন বৈশিষ্ট্য প্রদান করা যায়। তিনি সাইবেরিয়া, কানাডা ও অন্যান্য পার্ভত্য প্রদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে রাশিয়ার দক্ষিণ-অঞ্চলের সমতল ভূমিজাত উদ্ভিদের মিলন ঘটাইয়া নানা জাতীয় বর্গসঙ্কর উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল উদ্ভিদে পার্ভত্য অঞ্চলের উদ্ভিদের মত কঠিন আবহাওয়া-সহনশীলতা; ব্যাধির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা সবই বিচ্যুত থাকে, উপরন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের উদ্ভিদসুলভ গুণ, যেমন ফলের স্বাদ, বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতিরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। তিনি প্রায় ৩০০ প্রকার নূতন ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল আবিকারের ফলে ফলবান বৃক্ষের চাষ ক্রমশঃ রাশিয়ার দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাংশে মেরু-প্রদেশের দিকে বিস্তৃত হইতেছে এবং এতাবৎকাল যেখানে ফলের চাষ সম্ভব ছিল না সেখানেও প্রচুর ফলোৎপাদন করা হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জেনীচেঙ্ক অঞ্চলে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে কোন ফলের বাগানই ছিল না, এখন সেখানে সহস্রাধিক একর জমিতে ফলের চাষ হইতেছে এবং ঐ পরিমাণ ভূমিতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রও রহিয়াছে। পশ্চিম ককেসাস

অঞ্চলের বেলাভূমিতে নতুন করিয়া অল্পবাদ ফল (লেবু, কমলালেবু) এবং চায়ের চাষ করা সম্ভব হইতেছে এবং এই কৃষি উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করিতেছে। জর্জিয়া অঞ্চলের লেবু-জাতীয় ফল গোটা দেশের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এই সম্ভাবনার মূলে রহিয়াছে মিকুরিনের আবিষ্কার ও তাঁহার সহকর্মী ও অল্পগামীদের বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

সোভিয়েট-কৃষির এই প্রকার উন্নতিবিধানে লিসেনকো (Lysenko) নামক বিজ্ঞানীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। তিনি আবিষ্কার করেন বর্ষজীবী উদ্ভিদদের জীবনধারা স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। প্রথম দুইটি স্তর কাটে উদ্ভাপ ও আলোর ক্রিয়ার ভিতর দিয়া। লিসেনকো বপনের পূর্বে বীজকে গৃহাভ্যন্তরে উদ্ভাপে রাখিয়া দেখিলেন যে ইহারই ফলে বীজ হইতে চারা বাহির হইবার কাল দুই-তিন দিন আগাইয়া যায় এবং প্রতি একরে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৯০ হইতে ১৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'ভারনা-লিজেসন' (Vernalisation)। এক্ষণে রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সিটসিন (Tsitsin) নামক একাডেমী অব সায়েন্সের এক জন সভ্য আর একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার তথ্যের গোড়ার কথা কৃষিজাত উদ্ভিদের সঙ্গে বহু উদ্ভিদের (আগাছা) মিলন ঘটানো। ইহাদ্বারা নানারকম অভিনব জিনিস উৎপন্ন হইয়াছে। গমের চারার সঙ্গে বহু 'কৌচ' ঘাসের মিলন সম্ভব একপ্রকার বীজ-গম পাওয়া যায়, তাহা হইতে যে চারাগাছ জন্মে তাহা বর্ষজীবী নহে, একবার বীজ বপন করিলে তাহাতে সাত-আট বৎসর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে এমনি ধরণের গুণদম্পন কোন গমের অস্তিত্ব ছিল না। এই দীর্ঘজীবী গমের আরও অনেক গুণ আছে—অনাযুগ্মিতও ইহাদের বৃদ্ধি ও শস্তোৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার অসম মিলনদ্বারা বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন নানা বীজগম উৎপন্ন করা হইয়াছে। ইহার ফলে যেখানে কখনও গমের চাষ সম্ভব ছিল না সেই সব অঞ্চলেও গমের চাষ করা হইতেছে। মধ্য-রাশিয়ায় 'রাই' ভিন্ন অল্প কোন শস্য জন্মিত না, সেখানে এখন গম জন্মে। গমের রুটি রাশিয়ায় এককালে ভোজনবিলাসীদেরই বিশেষ খাদ্য ছিল, চাষার ভাগ্যে তাহা কদাচিৎ জুটত। এখন গমের রুটি কৃষকের অপরিহার্য খাদ্য, কারণ যে-সব অঞ্চলে ইতিপূর্বে গম উৎপাদনের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না, বিজ্ঞানের সহায়তায় গমকে সেই আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখন গম সর্বত্রই সুলভ হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফলে উত্তরমেরু অঞ্চলে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। এতাবৎকাল ঐ অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল কম, কিন্তু খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হইবার

পর খনিসম্পর্কিত কার্যে সেখানে নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কারখানা ইত্যাদি গঠিত হইতেছে এবং মানুষের বসতি ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। এই কারণে খাদ্যসামগ্রী ও শস্তাদির চাহিদা বাড়িতেছে। প্রয়োজনের তাগিদে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গবেষণার ফলে মেরু অঞ্চলে চাষযোগ্য নতুন রকমের বাগি, ওট, আলু ও অন্যান্য মূলজাত খাদ্য, শাকসব্জী, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইয়াকুতিয়া রিপাবলিকের অধীন অঞ্চলগুলিতে প্রায় বার মাস বরফ পড়ে, সেখানেও নতুন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা হইতেছে। ওর্জোনিক্স (Orjonikidze) সম্মিলিত কৃষি-প্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত সেখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৯° মাত্র। এই স্থানেও প্রতি একরে ২২ টন বাঁধাকপি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ঐ সব অঞ্চলে কৃষি যে আদৌ সম্ভব একথা পঁচিশ বৎসর আগে কেহ কল্পনাও করে নাই। দেশের পরিপার্শ্ব উদ্ভিদের পক্ষে সহনীয় করিবার ব্যবস্থায় ব্যাপক সাফল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যে দেশে যে শস্য জন্মানো কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না সেখানে সেই শস্য জন্মাইবার উপায় যেন বিজ্ঞানীর হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে। পর্বতশৃঙ্গ, তুষারক্ষেত্র বা অরণ্য-প্রদেশ,—বৈজ্ঞানিক কৃষি সর্বত্র অভিযান শুরু করিয়াছে; কিউবান অঞ্চলে এক্ষণে চাউল, উত্তর-ককেশাস ও ইউক্রেন অঞ্চলে তুলার চাষ হইয়া থাকে। ৪৮° উত্তর অক্ষাংশ অঞ্চলে (অর্থাৎ ঐ রকম শীতল স্থানে) পৃথিবীর অল্প কোন দেশেই তুলার চাষ সম্ভব হয় নাই—সোভিয়েট রাশিয়া তাহাতেও সাফল্য লাভ করিয়াছে। আন্ডেরবাইজান ও তুর্কমেনিয়ায় নতুন ধরণের মিশরীয় তুলার চাষ হইতেছে। লম্বা আঁশওয়ালা আমেরিকান তুলার চাষও রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট নানা জাতের আলু সৃষ্টি করা হইয়াছে,—কোনটি গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী, কোনটি বা পরজীবী, তন্মধ্যে কীটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, সর্বোপরি সকল জাতের আলুরই উৎপাদন-হার বর্ধিত হইয়াছে। বীট হইতে চিনি তৈয়ারী করা হয়—নতুন ধরণের বীট উৎপন্ন করা হইতেছে, যাহাতে চিনির ভাগ বেগী থাকে। এই প্রকার সকল কৃষিরই উন্নতি করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিবিধ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিয়া মানুষ আজ শস্তোৎপাদনকে একান্তভাবে স্বীকৃত করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদ্ভিদের সুপ্রজনন বিদ্যা (genetics), প্রাকৃতিক নির্বাচন রীতি (Selection) ও বীজ হইতে অনুরোদগম-বিষয়ক গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানী এই সকল অদম্যবকে সম্ভব করিয়াছেন। সংমিশ্রণ উদ্ভিদের বংশগতিক পরিবর্তিত করানো, প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্রমে সহনীয় করিয়া তোলা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করানো—এই জাতীয় গবেষণার লক্ষ্য।

কৃষিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব হইতে রক্ষা করাও

এতদ্বিষয়ে অত্যন্ত কার্য। নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের বীজ, গাছ, পাতা ও ফলমূলকে বিনাশ করে এবং শস্তে মড়ক লাগায়। সোভিয়েট গবেষণাগারে নানাপ্রকার ব্যবস্থাদ্বারা এই সকল উপদ্রব নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও বহুপ্রকার পরজীবী কীটনাশক শস্তের শত্রুকে বিনাশ করিবার সহজ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

কৃত্রিম ও রাসায়নিক সার প্রদান করিয়া জমিকে উর্বর করিবার ব্যবস্থা নির্ধারণ অপূর্ণ এক দল কৃষি-রসায়নবিদের কার্য। এমোনিয়া-বর্টিত পদার্থকে সার হিসাবে ব্যবহার করা এতৎসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি উদ্ভিদের খাদ্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার (dixing) উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত কালে গাছকে বিভিন্ন সময়ে যথাপ্রয়োজন খাদ্য প্রদান করিলে গাছের পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে ব্যাপকভাবে এই উপায়ে গাছের পরিচর্যা করিয়া শস্তোৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো হইতেছে। জারের আমলে দেশের প্রতি একর জমিতে গড়ে এক চামচ খনিজ সারও দেওয়া হইত না। প্রকৃত পরিমাণে খনিজ সার পাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় এক্ষণে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপন্ন হইত ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সে তুলনায় দশ গুণ সার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নবোদ্ভাবিত ব্যাকটেরিয়া সার (Bacterial fertiliser) সোভিয়েট কৃষির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান। মটরশুঁটি জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, উহারা বাতাস হইতে খাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার জন্য শিকড়ে কতকগুলি গুটিকাতে একজাতীয় ব্যাকটেরিয়া পোষণ করে। উদ্ভিদেরা নিজেরা বাতাসের নাইট্রোজেনকে আয়ত্ত্ব করিতে পারে না। ব্যাকটেরিয়াগুলি বাতাস হইতে নাইট্রোজেন মুক্ত করিতে সমর্থ। এইরূপে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যবর্তিতায় বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের দেহে স্থান পায়। রাশিয়ায় এই প্রকার পরোক্ষভাবে গাছে সার দিবার ব্যবস্থা আছে। 'ব্যাকটেরিয়া' সাররূপে পরিচিত নাইট্রাজিন (Nitragin) ও এজোটোজেন (Azotogen) উল্লেখযোগ্য।

তারপর কৃষিজন্মের কথা। প্রাক-সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষিজন্ম বলিলে বুঝাইত একগুও কাঠের লাঙ্গল, যাহার ফালে কোন রকমে মাটিতে আঁচড় কাটা যাইত। কিন্তু এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটয়াছে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েট যুনিয়নে প্রায় ৫ লক্ষ কলের লাঙ্গল চলিত। এই খাত্তিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সহজ হইয়াছে। কলের লাঙ্গলে মাটিতে নয়-দশ ইঞ্চি গভীর চাষ করা সম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রে অনেক বেশী নিড়ানি দেওয়া সম্ভব। কৃষির সৌকর্যার্থে নানাপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বীজ বপন করিবার সময় যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়, ইহা বীজের অনুরোধগমে সহায়তা করিয়া থাকে। শস্য-আহরণের জন্তও কতকগুলি সুবিধাজনক যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে—যেগুলির

উদ্দেশ্য একাধারে কৃষকের শ্রমলাঘব করা এবং শস্যকেও নির্দোষরূপে ও লাভজনক পরিমাণে সংগ্রহ করা। তুলা, আলু, বীট প্রভৃতি প্রত্যেকটি শস্য আহরণের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে।

গবাদি গৃহপালিত পশুপালনের উন্নত ব্যবস্থা করাও সোভিয়েট কৃষি বিভাগের অত্যন্ত কার্য। এই ব্যাপারও রাশিয়ায় এখন পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন। মিশ্র প্রজননদ্বারা নানাবিধ সঙ্গর জাতীয় পশুর সৃষ্টি হইয়াছে। একটি মাত্র উপযুক্ত পুরুষ পশু হইতে গৃহীত পুং-জননবীজ দ্বারা বহু সংখ্যক স্ত্রী-পশুর গর্ভাধান কার্য (artificial insemination) সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। একটি ভাল জাতের ঘাঁড় এই ভাবে প্রতি বৎসর ১৫০০ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিতেছে, একটি ভেড়া এক বৎসরে ১৫০০০ শাবকের জন্মদান করিতেছে। এই প্রকার কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা দ্বারা ক্রমশঃ গবাদি পশুর বংশগত উন্নতি হইতেছে। হীনবীর্য, দুর্বল, অলস, অপুষ্ট পশু রাশিয়ায় নাই বলিলেই চলে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েট যুনিয়নের অধীন পাঁচ কোটি গবাদি পশুর কৃত্রিম গর্ভাধান করা হইয়াছিল।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছে। রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশ, ইউক্রেন ও কিউবান ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে দেশে শস্তাভাব দেখা দেয় নাই। নূতন অঞ্চলে নূতন অকর্মিত ভূমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সাফল্যে বিজ্ঞানের দানও কম নয়। নূতন ধরণের বীজ সরবরাহ করিয়া তাহা বপনের পর অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে শস্য আহরণ ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধজনিত ক্ষতি খুব শীঘ্রই পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। শান্তিকালে যে ব্যবস্থাগুলি গবেষণার ফলে জানা গিয়াছিল আপং-কালে তাহা জাতিকে মহাসমৃদ্ধি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। শস্যের নতুন বৈজ্ঞানিক বক্তা ও কর্মী গ্রামাঞ্চলে কৃষকে নানা প্রকার নূতন পদ্ধতি বিষয়ে নিরন্তর শিক্ষা দিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সামান্য কৃষকের জীবনের সঙ্গেও বিজ্ঞান অঙ্গাদিভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য যে সংগ্রাম চলিতেছে রাশিয়ায় সেই সংগ্রামে কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বিজ্ঞানী। প্রকৃতির খেলায় খুশীতে চাষীর জীবনে নিত্য জোরার-ভাটা খেলিতেছে, কখনও প্রায়টের মেঘভার দর্শনে প্রাণে তাহার আনন্দের স্রোত বহিয়া যায়, দারুণ গ্রীষ্মে আবার কখনও বা তাহার হৃদয়ের সকল সরসতা উষ্ম মরুভূমিতে রূপায়িত হয়। সেই একান্ত অসহায়, দেশে দেশে উপেক্ষিত, নিরানন্দ কৃষকের সেই মনোমরুভূমিতে রসের বহা প্রবাহিত করিয়াছেন বিজ্ঞানী। তাই জনগণ আজ সেখানে বিজ্ঞানের স্বজনীশক্তিতে মুগ্ধ, বিজ্ঞানের কল্যাণীমূর্তি আজ মাঠে মাঠে উদ্ভাসিত।

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

ভগবান্ বুদ্ধের বহুবিধ প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্তির সংখ্যাই সমধিক দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্করের সমসাময়িক কালেও বুদ্ধদেবের পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্তি বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হইত। দশাবতারের বর্ণনা প্রসঙ্গে নবম অবতার বুদ্ধদেবের বর্ণনায় আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

ধরাবদ্বপদ্মাসনস্থাস্ত্রি যষ্টগ্নিম্যানিলং তন্তনাসাংদৃষ্টঃ ।

য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোহস্তনিশ্চিতবর্তী ॥

‘যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে বদ্বপদ্মাসনে উপবেশন করতঃ প্রাণসংযম ও নাসাংগে দৃষ্ট স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং যিনি যোগিগণের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ভগবান্ আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন।’

পদ্মাসনস্থ ধ্যানীমূর্তিসমূহের মধ্যেও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই মূর্তিসমূহের কোনটিতে উভয় হস্ত উভয় জঙ্ঘার উপর, কোনটিতে দক্ষিণ হস্ত ছুম্পির্শমুদ্রায়, কোনটিতে তত্ত্বমুদ্রায়, আবার কোনটিতে সম্মুখে উত্তোলিত উভয় হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোন মূর্তির মস্তকে দীর্ঘকেশ চূড়াকারে বদ্ধ থাকে—উহা দেখিতে অনেকটা উক্ষীষের ছায়া, আবার কোন মূর্তি কেশবিহীন—মুণ্ডিত। বুদ্ধদেবের উত্তমাত্র শিরঃপ্রদেশে যে জটাজুট ছিল, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা;—

“শাস্ত্রং সত্য প্রাণিবধাতিভীতং

বুহুজ্জটাজুট-ধরোত্তমাদ্ধম্ ।

তরাংলসদ গৈরিক গৌরবজ্জম্

যোগীধ্বং বুদ্ধমহং ভজ্জয়ম্ ॥”

আবার এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই যে, তাঁহার শিরঃপ্রদেশ মুণ্ডিত ছিল। হুন্দরিকাভারদ্বাজনুভে ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে ‘মুণ্ডা’ বা ‘মুণ্ডী’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নেপালও তিব্বতে বুদ্ধমূর্তিসমূহ মুণ্ডিত দৃষ্ট হইলেও, অস্বদেশে এমন প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি এখনও অনেক আছে যাহাতে কেশগুলি চূড়াকারে বদ্ধ অবস্থায় উক্ষীষের ছায়া প্রতিভাত হয়।

জমালগটী, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে উক্ষীষযুক্ত বহু বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধমতে “বুদ্ধপ্রতিমা উক্ষীষযুক্ত। উক্ষীষযুক্ত শির দ্বািত্রিংশং মহাপুরুষ-লক্ষণের অন্ততম। বুদ্ধবোধের ব্যাখ্যাসারে বোধিসত্ত্বের মস্তকের গঠন স্বভাবতঃ উক্ষীষের আকারে ছিল।” উক্তর ত্রীযুক্ত বেগীমাধব বড়ুয়া মহোদয় বুদ্ধবোধের এইরূপ কল্পনাকে অসঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “ধ্যানস্থ হইলে মস্তকের শীর্ষভাগ উদ্ধত দেখায়। বুদ্ধপ্রতিমায় আমরা যে উক্ষীষ

বা উদ্ধত আকার দেখি, তাহা সমাধিস্থ-অবস্থায় বুদ্ধের লোকান্তর বিহার।” (উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৪৮, ১৮০ পৃঃ)। উক্তর বড়ুয়া মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তও নির্দিষ্টারে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সমাধি অবস্থায় মস্তকের শীর্ষভাগ উদ্ধত দেখাইবার সংবাদ অত্র কোন মহাপুরুষের জীবনীতে আমরা পাই নাই। কোন শাস্ত্রগ্রন্থেও ইদৃশ উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকেশ চূড়াকারে বাধিয়া রাখাতেই মস্তক উক্ষীষযুক্ত বোধ হইত—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

অস্বদেশে কোন কোন বুদ্ধমূর্তি যজ্ঞোপবীত চিহ্নিত দৃষ্ট হয়। এই যজ্ঞোপবীত বুদ্ধমূর্তির কণ্ঠদেশের নিম্নে মালাকারে চিহ্নিত থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে এতাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণকে ‘নিবীত’ বলে। এই কারণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও পদ্মপুরাণ নামক হিন্দুপুরাণদ্বয়ে বুদ্ধপূজার জন্ত ‘নির্দিষ্ট শালগ্রামশিলার লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

“অঙ্গুগহ্বরসংযুক্তং চক্রহীনং যথা ভবেৎ ।

নিবীতবুদ্ধসংজ্ঞা দদাতি পরমং পদম্ ॥”

উক্ত শ্লোকে বুদ্ধদেবকে ‘নিবীত’ অর্থাৎ ‘মালাকারে উপবীতধারী’ বলা হইয়াছে। বামস্তম্ব হইতে দক্ষিণ কৃক্ষি পর্যন্ত লম্বমান উপবীতধারী বুদ্ধমূর্তিও দেখা যায়। মালদহ জেলায় গৌড় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গুপ্তি নামক একটি বাদশাহী আমলের গৃহাভ্যন্তরে গবর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র একটি মিউজিয়ম আছে। উক্ত মিউজিয়মের প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তিসমূহের মধ্যে বুদ্ধদেবের একটি কণ্ঠ-প্রস্তরনির্মিত মূর্তি দৃষ্ট হয়। ঐ মূর্তির মস্তক কেশবহুল ও গাত্র, বাম স্তম্ব হইতে দক্ষিণ কৃক্ষি পর্যন্ত লম্বমান যজ্ঞোপবীত ভূষিত; দক্ষিণ হস্ত ছুম্পির্শমুদ্রায় অবস্থিত চীন, নেপাল, তিব্বতের বুদ্ধমূর্তিতেও ‘উপবীত’ কচিং দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতেও যজ্ঞোপবীত প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। বুদ্ধদেব যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার মূর্তিতে যজ্ঞোপবীত; বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধদেবতা—তাঁহার মূর্তিতেও যজ্ঞোপবীত। বিচিত্র ব্যাপার নহে কি?

ভারতীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের দেবদেবীমূর্তিকে যজ্ঞোপবীত ভূষিত করিতে অভ্যস্ত। বুদ্ধদেব ভারতীয় হিন্দুগণের নিকট নারায়ণের অবতাররূপে পূজিত হন। সুতরাং হিন্দুগণ তাঁহাদের বুদ্ধনারায়ণকেও যজ্ঞোপবীত ভূষিত করিয়া পূজা করেন। আর শাক্যক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ হেতু তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত। ভারতে প্রস্তুত বুদ্ধমূর্তিসমূহেই যজ্ঞোপবীত দেখা যায়। এখনকার হিন্দুগণ যেরূপ বুদ্ধদেবকে কেবলমাত্র বৌদ্ধগণের দেবতা বলিয়া মনে করেন, বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগের হিন্দুগণ কিন্তু সেরূপ

করিতেন না। তাঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মকে সার্বভৌম হিন্দু-ধর্মেরই একটি শাখা বলিয়া মনে করিতেন এবং হিন্দু বৌদ্ধ নিষিদ্ধে আপন আপন ভাবে বুদ্ধদেবের পূজা করিতেন। এখন হিন্দুদের মধ্যে যেমন কেহ বিষ্ণুভক্ত, কেহ শিবভক্ত, কেহ সূর্য্যোপাসক, প্রাচীন ভারতে ঠিক সেইরূপ হিন্দুদের মধ্যে, এমনকি একই পরিবারে, কেহ বিষ্ণুভক্ত, কেহ বুদ্ধভক্ত ছিলেন। এক কথায় তৎকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্মকে সনাতন ধর্মের একটি শাখা বলিয়াই মনে করিতেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী ভারতীয় হিন্দুগণ কর্তৃকই চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশু-হননের বিরোধী ছিলেন। যজ্ঞকে যে তিনি একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, এমন নহে। তবে তিনি হিংস্রাশ্রিত যজ্ঞ অপেক্ষা অহিংস্রাশ্রিত যজ্ঞের উপাদেয়তা বর্ণনা করিয়া উত্তরোত্তর দানাদিরূপ উৎকৃষ্ট যজ্ঞসমূহ দেখাইয়া শেষে বলিয়াছেন যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ যজ্ঞই সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মহাফলপ্রদ। (১) এরূপ কথা যে শুধু বুদ্ধদেবই বলিয়াছেন, তাহা নহে। পরন্তু বেদে এবং অতীত হিন্দুশাস্ত্রেও এই প্রকার উক্তি দেখা যায় এবং যাগযজ্ঞাদির প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দৃষ্ট হয়। (২) জপযজ্ঞকে অধম বলা হইয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। যথা—

উত্তমো ব্রহ্মসম্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ।

অধমো জপযজ্ঞস্ত বাহুপূজাধমাম্।

১। দীঘনিকায়, কুটদত্তবৃত্তে রাজা মহাবিজ্ঞিতের যজ্ঞ-বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধোক্তি দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৮,

বুদ্ধদেবের প্রকৃত মূর্তি কিরূপ ছিল, ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বুদ্ধদেবের তিরো-ভাবের অন্যান্য পাঁচ শত বৎসর পরে কুষাণ যুগে সর্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়। মহারাজ কনিষ্কই নাকি সর্বপ্রথমে বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্তুরাণ কুষাণ যুগের সময় হইতে পরবর্তী বুদ্ধমূর্তিসমূহকে বুদ্ধদেবের দেহের প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই মূর্তিগুলি ভাস্করের স্বীয় মনোভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে যে, গৌতমবুদ্ধ ১২ হাত (মতান্তরে ১৮ হাত) লম্বা ছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ অসম্ভব ব্যাপার যে কেহই বিশ্বাস করিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত। সিংহলে কাণ্ডির দস্ত-মন্দিরে বুদ্ধদেবের যে দস্ত আছে, উহা এরূপ বৃহৎ যে দেখারী মনুষ্যের দস্ত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। স্থানে স্থানে যে বুদ্ধপদসমূহ আছে ঐ সকলও বৃহৎ মনুষ্যের আকারোচিত নহে। বুদ্ধদেবের দেহের প্রতিকৃতি কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় না থাকিলেও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে তাঁহার দেহে বাহ ৩২টি মহাপুরুষ-লক্ষণ, ৮০টি অলুভিজ্ঞান এবং দুই চরণে ২১৬টি মাংসল্য লক্ষণ ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল সিংহনাদের ছায় গম্ভীর ও অস্পষ্ট। তাঁহার প্রকৃতি এত ধীর, গম্ভীর ও শান্ত ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই সমস্ত কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া মহাসাগরের ছায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিত।

৩৯ শ্লোকে দ্রব্যাদির যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ (১০-৮২-৭) মুণ্ডক উপনিষদ (১-২০৭) ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২-৪২, ৪৫) বৈদিক সাকাম্য যাগযজ্ঞাদির প্রতি অশ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়।

প্রেমসাধনা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

এখনো দিয়ো না কিছ্ ; অন্তরালে আরো কিছ্ দিন
অলখে দাঁড়ায়ে থেকো, মরীচিকা দূরপ্রান্তে লীন
হয়ে যাক দূরান্তরে, এনো না প্রসাদ-ডালা দীন
কোণে হেঁধাকার, কোন খেলালী নিমেঘে
অমর ক'রো না মোরে ভুলে ভালবেসে
বাসন্তী কুহুমসম অল্পম হেসে
সুধা দৃষ্টি পাতে
• অনন্তের সাথে
রাতে।

দূরে
রাজ্যে স্বপ্নপুরে ;
উষার নুপুরে
জাগে নি আলোর ছন্দ, ঘুচে নাই ভয়,
আসে নি মহেৎসব, হয় নি সময়,
আজিও টলে যে মন, তব বরাভয়
এখনো সাজে না মোরে, পূজাশেষে সব বাসনাই
পারি নি আছতি দিতে, ধ্যান মোর সাজ হয় নাই ;
চাহিতে পারি না কিছ্, হে চিন্ময়ী, দূরে থেকো তাই চ

সংস্কৃতির স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সাহা, এম-এ

মানুষ চির অতৃপ্ত জীব! পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবের অতৃপ্তি ঘোচে নাই। নবজাত মানবশিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে তার ভবিষ্যৎ জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অতৃপ্তিই সূচিত হয়। এই অতৃপ্তি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে চলেছে, তেমনি মানব সভ্যতাকে রূপ হতে রূপান্তরে পরিবর্তিত করেছে। মানব সভ্যতা কোথাও যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে চায় না। এক শতাব্দীর মানুষ বহু চেষ্টায় প্রচুর প্রাণশক্তি ব্যয় করে সভ্যতার যে ইমারত গড়ে তোলে, পরবর্তী যুগের মানুষ তাকে নির্মম ভাবে ভেঙে নতুন ইমারতের ভিত্তি স্থাপনে প্রস্তুত হয়।

অবিরত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, আপাততঃ তাকেই জীবনের গ্রহণীয় সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু এই সঞ্চয়ের মূলে একটা কঁকি থেকে যায়— কারণ মানুষ ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারে না। পরবর্তী কালে পূর্ন-সঞ্চিত কঁকি ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের সংগ্রাম একেবারে ব্যর্থ হয় না; কঁকির সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতায় শাশ্বত-কল্যাণকর উপাদানও কিছু কিছু এসে যায়। চলমান বিশ্ব-মানব আপন সঞ্চয়ের ধলি হাতে নিয়ে অবিরত চলছে—সম্মুখে যা পায় প্রথমে তাই সে নিষ্কিচারে ধলিতে তুলে রাখে। সে কেবল বহুমূল্য রত্নই সঞ্চয় করে না— অপ্রয়োজনীয় হুড়ি-পাথরও সে ভ্রমবশতঃ তুলে রাখে। মানবের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে যা মঙ্গলকিরণবর্ষী মহার্ঘ রত্ন তাই তার সংস্কৃতি।

“সংস্কৃতি” শব্দ আমরা দুই ভাবে প্রয়োগ করি—কখনও ব্যক্তির সঙ্গে, কখনও বা জাতি অথবা যুগের সঙ্গে। যেমন, যখন আমরা বলি,—“তিনি সংস্কৃতিবান ব্যক্তি”, তখন আমরা বুঝি,—উল্লিখিত ব্যক্তি শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা তাঁর বোধশক্তি, আচার-ব্যবহার এবং রুচির উৎকর্ষসাধন করেছেন। আবার যখন বলি,—“ভারতীয় সংস্কৃতি বা প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি”, তখন আমরা ভারতের কিংবা প্রাচীন যুগের মানব-গোষ্ঠীর পুরোক্ত উৎকর্ষ বুঝে থাকি।

কোন এক বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর সমষ্টিগত জীবনে নানা দিক থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি জাতির জীবন-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে; এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মূলবীজ কতকাংশে লুক্কায়িত থাকে জাতির ধমনীতে—রক্তে।

মানুষ যে সব সময় হিসাব ক’রে চলতে পারে তা নয়। চলার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, বংশানুক্রমে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি দিনকে নানা ঘটনায় পূর্ণ ক’রে দেয়। বিচিত্র ঘটনা-বলীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সঞ্চলিত হয় ইতিহাসের মূল্যবান

পৃষ্ঠাসমূহে। ইতিহাসের ঘটনাক্রমের তাৎপর্য বিচার ক’রে জাতির জীবন-প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়।

জীবনের প্রধানতম সমগ্র জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ। স্বপ্নের যাবতীয় জীব জীবিকা নির্বাহের চেষ্টায় নিরন্তর নিজ নিজ শক্তির বেশীর ভাগ নিয়োজিত করেছে। মানুষের জীবনে সে সমস্যা অনেক বেশী জটিল। সেইজন্মই মানুষের উপজীবিকা বিচিত্রতর। উপজীবিকা দুই প্রকারের। কতকগুলি উপজীবিকা অবলম্বনে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য অথবা জীবিকার অত্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করে। আবার কতকগুলি উপজীবিকার বিনিময়ে মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। সর্বপ্রকার উপজীবিকার মূলে একই প্রেরণা। জীবন-সংগ্রামের যে অনিবার্য তাগিদে কর্মকার কাণ্ডে প্রস্তুত করে, তন্তুবায় কাপড় বুন, ঠিক সেই জাতীয় তাগিদেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের সাধনা করেন— সাহিত্যিক রূপসৃষ্টি করেন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি—মানুষের মানস-সম্পদ। ইহাদের সাধনা উপ-জীবিকার পর্যায়ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক—সকলেই নিজ নিজ সাধনার বিনিময়ে সমাজের কাছে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যাশা করেন। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাও উপজীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমরা কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নি’ এইজন্য যে, ঐরূপ ব্যবস্থা আমাদের জীবিকা নির্বাহের প্রতিকূল নয়। সমাজগঠনের মূলেও আছে বাঁচবার উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন-বোধ। মানুষের পক্ষে সমাজে বাস করাই জীবিকা-অর্জনের সহজতর পথে প্রথম পদক্ষেপ।

আসল কথা এই যে, আমরা বাঁচতে চাই। বাঁচবার ব্যাকুল বাসনা আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করে—কর্মের বেদী-মূলে আমরা জীবনকে উৎসর্গ করি। জীবনকে আনন্দময় ও মাধুর্যমণ্ডিত করবার জন্য আমরা চারুকলার আশ্রয় নি’। জীবন-সংগ্রামকে সাফল্যলব্ধি করবার জন্য আমরা সমাজে বাস করি। এই ভাবে, আমাদের অজস্র কর্ম, শিল্পকলা এবং সমাজব্যবহার ভিতর দিয়ে সমষ্টিগত জীবনের পূর্ণ রূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে জীবনের উপকরণ প্রস্তুতকারী বিবিধ কর্ম, আনন্দবিধায়িনী বিবিধ প্রচেষ্টা এবং সমাজ-ব্যবহার ভিতর দিয়ে আমরা একটা সুপরিণত বোধশক্তি লাভ করি। এই বোধশক্তি আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার এবং রুচিকে প্রভাবান্বিত করে। অতএব, মানুষ চর্চাদ্বারা তার অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ-শক্তির কতখানি উৎকর্ষসাধন করেছে তাই হবে সংস্কৃতির আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ‘উৎকর্ষ’ কথাটা সধক্কে একটু আলোচনা করা

দরকার। যেহেতু বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটা সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর মনে অত্যন্ত প্রবল, যেহেতু মানুষ জীবনের জটিল সমস্যা-গুলোকে অধিকতর সরল করবার মানসেই যুগে যুগে উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা কামনা করে—অতএব তাই উৎকৃষ্ট বা মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের অঙ্গুল। কোন জাতির সংস্কৃতির আলোচনায় যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তা এই :

(১) আলোচ্য জাতির প্রাণকেন্দ্রে বিদ্যমান কোন কোন বীজ নিহিত রয়েছে ?

(২) সেই জাতির ইতিহাসের দ্বারা মানবের কোন কল্যাণকে সূচিত করে ?

(৩) সেই জাতি জীবনধারণের সমস্তার সমাধান করবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছে, তা বিধমানবের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর। তারা জীবনে কতখানি ত্রি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ? তাদের সমাজ-ব্যবস্থা জীবন সংগ্রামকে কতখানি সাহায্য করে ?

(৪) সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে আলোচনার দ্বারা প্রদর্শিত হয়—জাতির সমগ্র জীবন-শ্রোতের দোষ-ত্রুটির দিকে। জাতির মনকে সচেতন করে দেবার জন্যই দোষ-ত্রুটির আলোচনার প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, কোন রাষ্ট্রশক্তি বা সমাজশক্তি সংস্কৃতির আলোচনায় উৎসাহিত হয়—এবং সেই উৎসাহের পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে ; যেমন, জাতিকে “সঙ্গীর্ণ জাতীয়তাবোধে” ভাবিত করা। যে জাতীয়তাবোধ কোন জাতিকে অপর মানব-গোষ্ঠীর উপর অত্যাচার ও শোষণে উৎসাহিত করে, তাই সঙ্গীর্ণ জাতীয়তাবোধ। এরূপ আদর্শ পূর্ণাঙ্গ হয় না। এরূপ স্থলে আংশিক সত্যকে বড় করে

দেখানো হয়—অথবা অসত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়।

সংস্কৃতির আলোচনার ভিত্তি-ভূমি হবে সত্যনিষ্ঠা—নিরপেক্ষ ও সত্যসন্ধানী হবে সংস্কৃতির সমালোচকের মন। স্বীয় বংশপরিচয় সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে অভিজাত রক্তের সংশ্রব আবিষ্কার করতে পারলে আমরা আনন্দিত হই, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি রক্তধারার অবাঞ্ছনীয় উপাদান আবিষ্কৃত হয়, তবু যাতে মনে দৌর্দল্য না আসে, এরূপ ভাবে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। আবার তাক লাগিয়ে দেবার অর্ধ-চেতন প্রেরণায় কেবল অবাঞ্ছনীয় উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অহুমান করাও সমভাবেই দৃশ্যময়।

সংস্কৃতির আলোচনায় আরও বিদ্য আছে। জাতির সমষ্টি-গত ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে জাতির যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটা অন্ধ অনুরাগ ও সগ্রন্থ মনোভাব পোষণ করতে উৎসাহিত করে। যখন সমাজদেহের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়—অথবা জাতির সামগ্রিক বোধশক্তি, আচার-ব্যবহার ও রুচির উৎকর্ষ সম্বন্ধে নগ্ন সত্যকে ব্যক্ত করা যায়, তখন জাত্যাভিমান নির্গম ভাবে আহত হয়। অতএব সংস্কৃতির সমালোচকের পক্ষে সত্যকে প্রীতিকর রূপে প্রকাশ করতে পারলে ভাল হয়। তাঁর আলোচনায় মনে যেন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, তিনি কেবল পাণ্ডিত্যই প্রকাশ করেন না, তিনি জাতির কল্যাণকামী। সংস্কৃতির সম্যক আলোচনার ফলে কল্পনা-বিলাসিতা পরিহার করে আমরা যেন একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করি, মানবের ব্যাপক জীবন-সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করতে শিখি এবং বিধের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যেন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করি।

অদৃশ্য লিপি

মুনি ত্রীকান্তি সাগর

ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা এক সৌভাগ্যের বিষয় যে পুরাতন সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের জায় অত্যন্ত জটিল বিষয়ের প্রতি ভারতীয় বিদ্বান্গণের মনোযোগ প্রতিদিন বিশেষরূপে স্নাক্ষ হইতেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক উত্থানের ইহা এক শুভ লক্ষণ। প্রত্যেক দেশ ও সমাজের উত্থানের মূলগত তত্ত্ব প্রাচীন ও পাদিতে নিহিত আছে—যে সমস্ত শু পাদি আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐমে অত্যন্ত অব্যবহার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ভারতের পুনরুত্থান ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অধ্যয়ন ও অন্বেষণের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। পুরাতত্ত্ব মানব-জাতির সমক্ষে এমন এক সঙ্গীর্ণ চিত্র উপস্থিত করে যাহা তাহার পূর্ব বিহুতির স্মৃতি আনয়ন করিয়া বিগত ও লুপ্তপ্রায়

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বৈভবের প্রতি প্রদ্বার ভাব আনয়ন করে।

আমরা এখানে মুখল যুগের এমন এক নূতন লিখন-প্রণালীর পরিচয় দিবার ইচ্ছা করি যাহা ভারতীয় লিপি-কোশলের উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘রোহণখণ্ড’ নামক এক উন্নতিশীল নগর ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আরবী ও ফারসী ইতিহাসে ‘রোহণীখণ্ড’, ‘রোহণগিরি’, ‘রোহণাবাদ’ ইত্যাদি নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নগর খান্দেশ ও বেরারের ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। নিজাম শেহের সীমাও এই স্থানের অল্প দূরেই আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদেশিক

সীমা রক্ষার জন্ত এই নগরের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। মুঘল ও মারাঠাদিগের প্রধান প্রধান যুদ্ধসমূহ এই স্থলেই ঘটিয়াছিল। তৎকালীন ইতিহাস-গ্রন্থে এই সকল অবগত হওয়া যায়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে এখানে এক দিন অবস্থান করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল, এখানকার মুঘল শিল্প-কলার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত পুরাতন নিদর্শনসমূহ দেখিয়া ইহা সত্যই প্রতীত হইয়াছিল যে এই নগর কোন এক সময়ে নিশ্চয়ই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নগরের সন্নিকটে এক বিশাল মসজিদ নির্মিত আছে। নির্মাণকালস্বচক কোন লিপি সেই মসজিদে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার নির্মাণের সময় নির্দেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহার নির্মাণকৌশল ও প্রচলিত জন-শ্রুতি হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পরে ইহার নির্মাণ-কাল হইতে পারে না। এইরূপ কথিত আছে যে, আওরঙ্গজেবের এক কন্যা এখানে অবস্থান করিতেন এবং এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হইতে পারে যে তাঁহারই মৃত্যুরক্ষাকল্পে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

উক্ত মসজিদের নির্মাণকৌশল উচ্চাঙ্গের। ইহার শিল্প-চাতুর্যপূর্ণ অংশগুলি এখন পর্যন্তও সুরক্ষিত আছে। ভিতরের নমাজ পড়িবার স্থান, মূল স্থান ও আশপাশের প্রস্তরের 'জালি'-গুলির স্থাপত্যকলা গুজরাতে প্রচলিত মুঘল-কলার স্পষ্ট প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রাচীর-গায়ে বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প ও লতা উৎকীর্ণ আছে যাহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট নির্মাণ-সময়ের সমর্থন করিতেছে। এরূপ শিল্পকলাপূর্ণ অট্টালিকা দেখিয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে এত সুন্দর শিল্পকলাপূর্ণ মসজিদ এমন কোন্ ব্যক্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যিনি ইহাতে 'কোরানের' 'আয়ত'গুলিও খোদিত করান নাই? উত্তরে জনৈক মুসলমান জানাইলেন যে কেবলমাত্র কোরানের 'আয়ত'ই নহে কিন্তু মহাকাবি হাকেরের কবিতাগুলিও কৌশলে লিখিত আছে।

আমরা আশ্চর্য হইয়া বলিলাম যে, এখানে কেবলমাত্র পাষণ্ড ভিন্ন অল্প কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু সেই মুসলমান ভদ্রলোক যেমনই প্রাচীরের গায়ে জল সিকন করিতে

লাগিলেন তেমনি অঙ্কিত লিপিগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। যে যে স্থল জলের দ্বারা সিক্ত হইতে লাগিল সেই সেই স্থলেই লিপি প্রকট হইয়া উঠিল। জল শুষ্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিগুলিও বিলুপ্ত হইল। সেই ভদ্রলোকের নিকট অবগত হইলাম যে কোরানের বিশেষ বিশেষ 'আয়ত' এইখানে লিখিত আছে। এই লেখনকলা এত সুন্দর, স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক যে দেখিতে দেখিতেও চক্ষু ক্লান্ত হয় না। এক একটি 'আয়তে'র চারি দিকে অত্যন্ত মনোহর সীমা-রেখাগুলি পৃথক পৃথক রূপে অঙ্কিত আছে। এই লিপিগুলিতে গীত, কাল, সবুজ ও রক্ত বর্ণের মসীর সংযোগ হওয়ায় ইহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ প্রকার লিপি-কৌশল ইতিপূর্বে আর কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই লিখন-পদ্ধতি দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে অদ্য হইতে তিন শত বৎসর পূর্বের ভারতের লেখন-কলা কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই প্রকারের লিখন-প্রণালী ভারতে কোন্ সময় হইতে কোন সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; এবং কোন্ কোন্ স্থলে এই পদ্ধতির বিকাশ হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভারতের স্থাপত্যগুলির অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রাচীন সাহিত্য এই বিষয়ে মৌন; কিন্তু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন হস্তলিখিত পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সেই সমস্ত পত্রে আমাদের প্রশ্নের সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয় না, তথাপি সেইগুলি দ্বারা কতকাংশে আলোকপাত অবশ্যই হয়। এই প্রকারের গুপ্ত লিপি লিখিতে মোম, 'সিরবাটা' (?) ও তিলের তেলের বিশেষ দরকার হয়। লিখিবার সময় প্রস্তরের নিম্নে অগ্নি জালিয়া উত্তপ্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। কয়েক ঘণ্টা পরে লেবুর রসের দ্বারা সেই প্রস্তরটিকে ধোত করিয়া প্রাচীরের গায়ে লাগানো হয়। আমরা এই সমস্ত জিনিসের সহিত সাবান মিশ্রিত করিয়া এমন কয়েকটি পত্র লিখিয়াছিলাম বিচক্ষণ গুপ্তলিপি-পাঠকও যাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। আশা করি এই সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ববেত্তাগণ বিদ্বত ভাবে আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিবেন।

সঙ্গীত

শ্রীঅশ্বিনী পাল

আমার অন্তর মাঝে যে সমুদ্র দিবানিশি উর্ধ্ব-নৃত্য করে,
আজ বহুকাল ধরে,
শুনিবারে বুঝিবারে সেই তব সঙ্গীত মহান,
রাখিবে না আজি তার মান?
নয়ন সম্মুখে মোর ভাসি,
তব বাণী-ছন্দ দিয়ে মোর বক্ষবীণা-তারে বাজাবে না বাঁধি?
নাচাইয়া কাঁপাইয়া

উল্লাসিয়া ঝঙ্কারিয়া,
আমার পরাণ,
ধনিয়া উঠুক তব মহা-গীত-গান।
যেখানে রাতের বুক জলে শত তারা,
নীল-সিঁদু-বক্ষ পরে উঠে ঢেউ নাচে আশ্রহারা,
আজি সে সঙ্গীত-রব,
করে দেয় সর্ব প্রাণ শান্তিময় আনন্দ-নীরব।

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার

শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ভাগবতশাস্ত্রী

যাঁহারা নূতন দিনের আবাহন করিতে গিয়া নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্ত অসম্মান ও অধ্যাতির বোঝা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি। কারণ তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের জন্তই চিন্তা করিয়াছেন বা করিতেছেন।

অনেকেই হিন্দু আইন সংস্কারের শুভ বুদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ কামনায় এযাবৎ নানা প্রকার আলোচনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি ইহার একটি অংশের মাত্র আলোচনা করিতেছি—যে অংশটুকু আমাদের সর্বাঙ্গিক হইতেই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং সামাজিক জীবনের একমাত্র উন্নতির কারণ। ইহা হিন্দু বিবাহ।

এক দিন ছিল যখন দেশ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের দ্বারাই শাসিত হইত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রভাবে রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণের পরামর্শ না লইয়া রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সন্মুখীন হইতেন না। এক কথায় বলিতে গেলে তখন দেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ-শাসিত। এই যুগে ব্রাহ্মণের প্রভাবে, অহুষ্টিপের প্লোকে নানা পুরাণ-উপপুরাণের দোহাইয়ের তিলকাক্ষিত প্রচুর বিধি সমাজে প্রচলিত হইতে লাগিল। কেহ সমাজের উন্নতির জন্ত দূরদৃষ্টি প্রকাশ করিলেন, পাণ্ডিত্যভিনিধানী কেহ তাহা অস্বীকার করিলেন। দেশের গগন-পবন তর্কজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তাহাতে সমাজের নিখিল কল্যাণ-বুদ্ধি অভিদূরে ভাসিয়া গেল। সমাজ জ্ঞানের পথ হইতে নামিয়া অন্ধভাবে আনুষ্ঠানিক পথ বাছিয়া লইল। মত-উপমতের বিরোধে সে আর অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকাইবারও অবসর পাইল না। পুরাণশাসিত দেশ অন্ধকূল প্রতিকূল সংখ্যাভীতি বিধিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। শাস্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া রহিল। আর কেহ তাহার সন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিল না। গুণগত শ্রেণী বিভাগ বা বর্ণগত স্বর্ষ্য বিভাগেরও আর নামগন্ধ রক্ষিত হইল না। বিচারহীন আচরণের বিভ্রমনার অজ্ঞানের অন্ধকারে দেশ সমাচ্ছন্ন হইল।

বিশেষ করিয়া কিয়ংপরবর্তী মুসলমান যুগে ভাঙনের এই নির্মমতা আরও কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু বর্তমান ইংরেজ শাসন-প্রভাবিত সমাজে আর কোন বন্ধনই নিজেকে বাধিয়া রাখিতে পারিল না—দিনান্তে কুহুমের মত মলিন বিবর্ণ হইয়া সকল কিছুই খসিয়া পড়িল। মুসলমান যুগে যাহা ধট্টিয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি ছিল হিন্দুর সামগ্রিক সম্ভার, আর ইংরেজ শাসনে তাহার সামগ্রিক বরূপকে অস্বীকার করিয়া ধওড়পের স্বাতন্ত্র্যকে শাসনতন্ত্রেও মর্যাদা দিয়া হিন্দুর পৌনঃ-পুনিক ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে। একান্ত পরাধীন

দেশে দানত্বের শৃঙ্খলে—যে সর্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে তাহার আর তুলনা মিলিবে না। প্রকৃত শাস্ত্রশাসন ছদ্ম-অহু-পুণের অনেক অতীতে পড়িয়া রহিল। এ যুগের সমাজকে আধিকার বাস্তব-জীবনের হৃদ্যোগে এতটুকু সাহায্যও সে করিতে পারিল না। বাস্তব-জীবনের কঠোর সংঘর্ষে কয়েকটি মুহূর্তমাত্র কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার তীব্র ব্যস্ততার ‘কোথায় যাইতেছি’ তাহা ভাবিবারও অবসর আজি নাই। কেবল ‘পৈতৃক পূজাধামি যা’হোক করিতে হইবে’ এই কথাটির মত শাস্ত্র নির্দেশের নামে সাংসারিক অহুষ্ঠানের গডলিকাপ্রবাহ চলিতে লাগিল। এক অহুষ্ঠানেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, এমন কি একই পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পর্যন্ত আর কোনই মিল রহিল না। সমাজ যুক্তিহীন ‘কুলাচার’ আর ‘লোকাচারে’ ভরিয়া গেল। শাস্ত্রের শাসনে এই যে বিপ্লব ইহার ভাঙন আজ পর্যন্ত সমানভাবেই চলিয়াছে। যুগধর্মের প্রয়োজনে সমাজের নূতন পদক্ষেপটি বিবেচনা করিয়া আর কোনও শাস্ত্র-বিধি রচিত হইল না। অতীত শতাব্দীর সহিত বর্তমান শতাব্দী আর মিলিতেছে না। আমরা শুধু এই ভাঙনের বুকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম, সর্বনাশের একটা প্রবল স্রোতে গা চালিয়া ভাসিয়া চলিলাম। নড়িবার এতটুকু চেষ্টাও কি করিব না, পার্শ্বপরিবর্তনের আয়াসটুকুও কি স্বীকৃত হইবে না? আজ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পুনর্গঠনের শুভলগ্ন সমুপস্থিত। আবার পুরাতন শাস্ত্রের নূতন ব্যবহার সমাজ-সংসার সমৃদ্ধ-সুন্দর হইয়া উঠুক, উন্নতির সকল সম্ভাবনায় তাহার প্রাণশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক—এই ধারণায় আজ নব-স্মৃতির বিষয় আলোচনা করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বক্তব্য হিন্দুবিবাহ, বিশেষতঃ বাংলার হিন্দুবিবাহ। কারণ সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাই একমাত্র দেশ যাহা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং যে-কোনও বৈশিষ্ট্যকে সে একান্তভাবে আপন করিয়া অতি দ্রুত গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর সম্যক প্রতিপালনে সমাজ যে পরিমাণ প্রভাবিত, অল্প কোনও সংস্কারের দ্বারা আর তেমন নহে। ফলে বিবাহ-প্রণালীর উন্নতিতে সমাজের, দেশের উন্নতি—অবনতিতে ঘোর অবনতি ঘটবেই, এবং এই নিশ্চরতাকে এড়াইবার আর কোনও উপায় কাহারও জানা আছে বলিয়া এতাবৎকাল সভ্য সমাজে কোনই প্রমাণ-প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুবিবাহ তথা বাংলার হিন্দুবিবাহ আজ সম্পূর্ণতঃ উদ্বেগবিহীন, অস্বীকৃতির বিপ্লবে নিয়ত অশান্তিজর্জর এবং মাত্র ইজিয়-যজ্ঞের উপহার-রূপে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান বিবাহে ভোগের অধিরতা ও তারল্য ভিন্ন অল্প কিছুই দৃষ্ট

হইতেছে না। কল্যাণকর একনিষ্ঠতার তথা একনিষ্ঠা অর্জনের ক্ষমতার অভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া পড়িতেছে। জীবনে নানা অপূরণীয় সমস্যা দেখা দিয়াছে। সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাহার অগ্রগতি নিরো-
ধের বার্তা এই সমস্যাতেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নরনারীর সম্মিলিত জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এক চরম ‘লক্ষ্য’ পৌঁছানো। সমাজের সেবাধর্ম সাধনই এই চরম লক্ষ্য, তাহার সর্বোচ্চ উন্নতি বিধানই ইহার ব্রত। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা, পুত্রপিও প্রয়োজনম্” প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অর্থই হইতেছে সমাজ-সেবার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহার ব্যতিক্রমই হইতেছে পাপ, অকল্যাণ। তাই সমাজসেবার বিরুদ্ধ প্রণালী যাহাতে সমাজকে শুণু আবাত করাই চলে; সমাজের কল্যাণের, উন্নতির পথের যাহা সহায়ক নয়, তাহাকেই যুগে যুগে দৃঢ় ভাবে ব্যতিচার বলা হইয়াছে। যাহারা সমাজবিরোধী এই অকল্যাণকর ব্যতিচার করিয়া সমাজকে অধীকার করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে আহত করিয়াছে, শুণু সমাজের কল্যাণের জন্ত প্রায়শ্চিত্তের নামে সেই ব্যতিক্রমকে পুনরায় সমাজে স্ব-পদারূঢ় করিবার বিধি রচিত হইয়াছে। সামাজিক উন্নতির জন্ত, অধিকতর সেবা-
লাভের জন্ত তাই পৌরুষের নিকট কুলেরও পরাজয় হইয়াছে। মহাভারতে :—

“সুতো বা স্ততপুত্রো বা যো বা ভবাম্যহম্।

দেবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্॥

বলিয়া কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের যে ক্ষত্রিয় বীৰ্য্যের পরিচয় পাই, সমগ্র মহাভারতে তাহা তুলনারহিত, সুস্পষ্ট হইয়াই আছে। দানশীলতায়, মহাপ্রাণতায়, ছায়ধর্মের পরিপালনে, তাঁহার আদর্শ যেন যে কোনও মহাভারতীয় ব্যক্তির আদর্শের উর্জ্বলত্রে ধ্বনক্ষত্রের ছায় অচলোচ্ছল হইয়াই রহিয়াছে। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে ক্ষণিকের ঘৃণা প্রকাশের অবসরও আমরা বুঝিয়া পাই না। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণগুলি যেন এক কল্পনাভীত লোকে আমাদের লইয়া উপস্থিত করে।

অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়নে পণ্ডিতজনশিরোমণি ব্যাসদেবের সমাজসেবার আয়োজনগে তাঁহার জন্মকালের দিকে তুলিয়াও চাহি না, শ্রদ্ধা-অকুণ্ঠিত চিত্তে ‘কুলারবিন্দায়তপত্রনাম্রম্’ বলিয়া প্রণামই করি। অথ কিছু ভাবিতেই মন যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহাকে আমাদের মন কোর দিনই ব্যতিচার বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। শাস্ত্রে কুমারী কালে ঋতুমতিত্বই যেখানে বহুনির্দিষ্ট পাপ বলিয়া কীর্ণিত সেখানে সেই অবস্থায় সন্তান প্রজনন যে কিরূপ মহত্তর পাপ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত ছিল তাহা চিন্তা করাও কষ্টকর হইয়া উঠে। যম বলিয়াছেন :—

“কথা দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রদত্তা গৃহে বসেং।

ব্রহ্মহত্যা পিতৃশত্ৰু ইত্যাদি।

অর্থাৎ—যে পিতার গৃহে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা কথা বাস করে তাহার (পিতার) ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হয়।

অদ্বিরা বলিয়াছেন :—

“প্রাপ্তে তু দ্বাদশবর্ষে যদা কথা ন দীয়তে।

তদা তন্তান্ত কথায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥

এইরূপ অবিবাহিতা দ্বাদশবর্ষব্যবতী কথা সম্বন্ধে রাজমার্ত্তও—

“মাসি মাসি রজন্তন্তাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্।

অন্তত্র

“মাতা চৈব পিতা চৈব স্ত্রোষ্ঠ জাতা তৎপৈব চ।

ত্রয়ন্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কথাং রজন্ত্বলাম্॥

অত্র এবং কাশ্যপ ঋষিও বলিয়াছেন :—

“পিতৃর্গেহে চ যা কথা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।

ব্রহ্মহত্যা পিতৃশত্ৰুঃ সা কথা বুযলী স্তুতা॥”

এইরূপ কথার বিবাহও নিষিদ্ধ হইয়াছে :—

“যন্ত তাং বিবহেৎ কথাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।

অদন্তায়োহপাংস্তেজঃ সজ্জয়ঃ বুযলী-পতিঃ॥”

অনেক এয়েই এইরূপ কথার বিবাহের অহরূপ নিন্দাই কীর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই প্রমাণ বা নিন্দাক্রান্তিগুলিকে যদি মহাভারতেরও পূর্ববর্তী বিবেচনা করা যায় তবে বহুনির্দিষ্ট ঋতুমতিত্ব তো দূরের কথা; পিতৃগৃহে কথাকালে সন্তানপ্রজনন এবং তৎপরে সেই কথার (১) বিবাহের উদাহরণগুলিও একান্ত স্থলভ হইয়া উঠে কিরূপে? বিশ্বের বিষয়, কোনও শক্তিশালী ব্যবস্থাপক আর্তের বিধান সেদিন পাওয়া গেল না। যাহাতে ব্যাসদেব, কর্ণ প্রভৃতি সমাজপতিত অপাংক্ত্যের হইতে পারেন। পরন্তু এই কানীন কর্ণ দানশীলতায়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায়, সত্যবাদিতায় শৌর্য্যে মহাভারতের একটি বিশিষ্ট স্থানই অধীকার করিয়া আছেন। আর ব্যাসদেব? পরবর্তী সমাজের চলিবার পথ তিনিই নির্দিষ্ট করিয়া বাধিয়া দিলেন, যে পথ অধীকার করিবার মত ছঃসাহস আজ পর্য্যন্ত কাহারও হইল না। আসল কথা হইতেছে, সেবাবুদ্ধির সাধনায় সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি।

মহাস্মৃতি পার্শ্বে আমরা ক্ষেত্রজ সন্তান, দেবর কর্তৃক স্ত্রোতংপত্তি প্রভৃতি বিধি দেখিতে পাই—যাহা শাস্ত্রীয় বজ্রা সমাজ এক দিন গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজ কি আজ এই সব বিধি গ্রহণ ত দূরের কথা, অসঙ্কোচে চিন্তাও করিতে পারেন? অথচ তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিকেরা অসঙ্কোচেই এই সব বিধি পালন করিতেন—সন্দেহ নাই। শাস্ত্রীয় হইলেও আজ উহা আমাদের যেমন চিন্তারও বাহিরে তেমনিই লজ্জাজনক। দেখা যায়, কালক্রমে এই সব বিধি সমাজে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয় এবং এই সব অবৈধ বিধি পালনে কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা হয়। এখন আরও বেশী প্রমাণ বা আলোচনা গ্রহণ না করিয়াও আমরা

বাঙালোর বোর্ত্ত কাহিনো

২



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন

স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সন্তান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অশ্বচর লইয়া অদ্ভুত সাহস
ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া বীর নামাঙ্কসারে
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাদশাহীতে সেই শৌর্য বীর্য আজ কাহিনীতে
পর্ধ্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার জঘ্ন জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

একদশ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ কলিকাতা

A. A. S.

বুঝিতে পারি যে, এক দিন যাহা সমাজের কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই কালে অমঙ্গলজনক বলিয়া সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। হিন্দুধর্মের এই উদারতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্মই হিন্দু আজ হিন্দু বলিয়া অন্ততঃ দাবি করিবার পূর্ণাধিকার রাখিতে পারিয়াছে।

যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমাজে অতীতে এক দিন তাহারই কল্যাণ কামনায় অনেক বিধি ভাঙিয়া যাইত, অনেক বিধি গড়িয়া উঠিত, আজও সমাজের কল্যাণ কামনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বর্তমান সমাজে সেইরূপ পরিবর্তনের অনাবীকার্য প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে আজিকার সমাজ শুধু সবল হইতে পারে, তাহার প্রতি স্তরে একটি সক্রিয় শুভবুদ্ধির মঙ্গলস্পর্শ তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে, সকল সাম্প্রদায়িকতার একান্ত উর্দ্ধে নিজের মঙ্গলময় সরল পথে পরিচালিত হইতে পারে, তাহার জ্ঞাত বিশেষ করিয়া ভাবিবার এবং তদনুযায়ী কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবার শুভক্ষণ আজ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা যে আমাদের ভাঙিয়া চুরিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া বিগুপ্তির পথে লইয়া যাইতে পারে নাই আজ তাহাই আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে।

সমাজে এক দিন যাহা বৈধ ছিল তাহা যখনই নিষিদ্ধ হইল তখনই উহা অবৈধ অর্থাৎ ব্যভিচাররূপে গণ্য হইয়া থাকে, হইয়াছেও তাহাই। এখনও যে সমাজে কানীনপুত্র, ক্ষেত্রজ-পুত্র বা দেবরপুত্রাদির অভাব রহিয়াছে এ কথা ঠিক করিয়া বলা চলে না। তবে উহাকে সমাজ প্রকাশে বা অপ্রকাশে এখন সম্মত বলিয়া স্বীকার করে না। অনেক ছোট-বড় বংশের প্রতিষ্ঠা যে ইহাদের দ্বারা হয় নাই অথবা ইহারা যে অনেক বংশের বংশরক্ষক আদিপুরুষ নন এ কথা কে বলিবে?

শাস্ত্রে অ-ঋতুমতী কন্ডারই বিবাহ-ব্যবস্থা বৈধ। ঋতুমতী কন্ডার বিবাহ বিষয়ে যেরূপ নিন্দাক্রান্ত আছে তাহা প্রথমেই

উল্লিখিত হইয়াছে। এই সব কথা জানিয়া শুনিয়া কি ঋতুমতী কন্ডার বিবাহ দিতে কোনও পিতার মনে উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে? অথচ সমাজে এখন কি চলিতেছে? কয়জন পিতা গৌরী, রোহিণী বা 'কন্ডা' দানের ফল লাভ কামনায় দ্বাদশ বৎসরের নিম্নে পাত্রীকে পাত্রস্থ করিতে পারিতেছেন? বর্তমান সমাজে যে সব পারিপার্শ্বিক কারণে অ-ঋতুমতী বালিকার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি অস্বীকার করিয়া এড়াইয়া চলা যাইতে পারে? স্থিতি-শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইতেছে সবর্ণের মধ্যে, অসংগোত্রে, তথা অসম্বরে। এই বিধির দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও দিন সমাজে ইহার বিপরীত বিধিও চলিয়া থাকিবে। পূর্বে যে সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বৈধ ছিল তাহার বহু নিদর্শন আছে। মনুসংহিতায় :—

“যদি ষাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেবন যোষিতো দ্বিজাঃ।

তাসাং বর্ণক্রমেণ স্ত্রাজৈষ্ঠ্যং পুঞ্জা চ বৈশ্য চ ॥

নবম অধ্যায়, ৮৫ শ্লোক।

অর্থাৎ দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যদি সজাতীয়া বা বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে তাহার জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সন্মান ও আবাস-স্থান নিরূপণ করিবে। এইরূপ বিবাহে অধম বংশ হইতে গৃহীত স্ত্রীগণ যে ‘অমায়া’ ছিলেন তাহাও নহে। মনু বলেন :—

“অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা।

শারঙ্গী মন্দ পালেন জগামাভ্যাহীনীয়াতাম্ ॥” ৯.২৩

নিরুপ্ত বংশে জাতা অক্ষমালা এবং শারঙ্গী যথাক্রমে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরম মায়া হইয়াছিলেন। আরও—

“এতাশ্চাশ্চ লোকেহস্মিনপকৃষ্ট প্রস্তুতঃ।

উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ পৈঃপৈর্ভর্তৃগণৈঃশুভৈঃ।

মনু ৯.২৪

অর্থাৎ ইহারা (অক্ষমালা শারঙ্গী প্রভৃতি) এবং আরও অনেকে (সত্যবতী প্রভৃতি) অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও নিজ নিজ স্বামী-গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। অমূল্য বিবাহ বৈধ বলিয়া ইহাকে সমর্থন করিলেও উহাও যে একপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। মনু-বচনান্তরেও দেখা যায়—

“পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সর্বর্ণানুপদিষ্টতে।

অসবর্ণাশ্রয়ং জ্যেয়ো বিধিরদ্বাহকর্ষণি ॥

শরঃক্ষত্রিয়য়া গ্রাহঃ প্রতদোবৈশ্যকন্ডা।

বসনস্ত দশা গ্রাহাঃ শূদ্রয়োংকৃষ্ট বেদনে ॥”

অর্থাৎ সর্বর্ণা বিবাহেই কেবল পাণিগ্রহণ-সংস্কার উপদিষ্ট হইল। অসবর্ণার বিবাহ-কর্মে এই বিধি যে-ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নী শর গ্রহণ, বৈশ্য পাত্রনী, এবং উৎকৃষ্ট জাতির ভার্য্যা হইলে শূদ্রের কন্ডা বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। (অসবর্ণা



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক ‘SORCAR’
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

বিবাহে পাণিগ্রহণ সংস্কার নাই এখানে ইহাই প্রমাণিত হইল।) কাজেই অমূল্য বিবাহও যে শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই বৈধ এবং অসবর্ণ বিবাহ বলিয়াই গ্রাহ ছিল তাহাতে প্রমাণ-স্তরের প্রয়োজন নাই। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহে বর্ণসম্বন্ধ বিবেচনা হেতু নিষিদ্ধ থাকিলেও সমাজ উহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। ইহাদের জন্মই স্বতন্ত্র শ্রেণী বা সম্প্রদায় গঠন করিয়া হিন্দুর সামগ্রিক শক্তিকে আরও দুর্বল করা হইয়াছে মাত্র। পরন্তু বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

“দ্বিজহন্যাসবর্ণানু কন্যাস্বপমমন্তথা।”

বলিয়া কলিতে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য)-গণের অসবর্ণ কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অধিল শাস্ত্র বিনির্মিত পাপ কলিযুগের পূর্বেই সকল শাস্ত্রে অধিকতর প্রশংসাপ্রাপ্ত পুণ্যময় দ্বাপরাদি যুগে অসবর্ণ বিবাহ-বিধি সমাজগ্রাহ ছিল। উহা যদি তৎকালীন ধর্মপন্থের বিঘ্নরূপ বিবেচিত না হইয়া থাকে তবে আজ একই সংস্কৃতি-বিশিষ্ট একই শিক্ষা সভ্যতা প্রাপ্ত হিন্দুগণের সামগ্রিক কল্যাণের পথে কেন অধর্ম, পাপ তথা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে?

সবর্ণ বলিলে আমরা একই সংস্কৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কেই বুঝি। শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও তাহাই। একই সংস্কৃতি, একই শিক্ষার

মধ্যে পারস্পরিক আত্যন্তিক মিলনটি যাহাতে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংঘর্ষে উদ্বেগুহীন, ব্যর্থ হইয়া না উঠে সেইজন্যই সবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিবাহ সংস্কৃতিমূলকই হওয়া উচিত। এইজন্যই কালে অসবর্ণ শব্দস্থলে সবর্ণ শব্দ উপস্থিত হয়।

সগোত্রা বিবাহে যে দোষ নাই, ইহা বৈজ্ঞানিকদের মত। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সাম্প্রতিক সমাজগঠনে প্রাচীন স্মৃতির দোহাই দিয়া বিজ্ঞান-ভিত্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। বিবাহ সংস্কৃতিগত হইলে বরং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যই উহা স-গোত্র হওয়াই উচিত। কারণ একই গোত্রের সাংস্কৃতিক ধারা অনেকটা বেশী রকমেরই একরূপ হইবে। তবে স-গোত্রা বিবাহে আরও কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রয়োজন আছে যাহা পরে আলোচিত হইবে।

বর্তমান সমাজে যে সবর্ণ বিবাহ হইতেছে, উহা যদি সংস্কৃতিমূলকই হয় তবে এখন আর কেবল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের তথা বৈশ্য বৈশ্যের এবং শূদ্র শূদ্রের সবর্ণ হইতে পারে না। শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম ও আচরণ বর্ণগত কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল, জীবনযাত্রার পরিবর্তনে যে কারণেই হোক না কেন এখন প্রায়ই তাহা আর কেহই করিতে পারিতেছেন না। আজিকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সংস্কৃতির দিক



এই শুভ স্মৃতি লাইম ক্রীম ব্যবহারে কর্কশ চুল কোমল হয়, অবাধ্য চুল সংযত থাকে। মোটরে বেড়াবার সময় লাইজু চুলকে সুন্দরভাবে সংযত রাখে।



ক্যালকাটা কেমিক্যাল বালীগঞ্জ, কালিকাতা

হইতেই একবর্ণে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষায়, সভ্যতায়, রুচি ও জীবিকা অর্জন প্রচেষ্টায় পরস্পরের মধ্যে আর পার্থক্যের ভাণ্ডাংশটুকুও দেখা যাইতেছে না। এইরূপ সাংস্কৃতিক লক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব একই সর্বণ্ড বহন করে, এবং একথাও স্বাভাবিক যে, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের এবং বৈষ্ণব বৈষ্ণবের সর্বণ্ড হয় তবে 'দ্বিজ' (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব) কেন সামগ্রিকভাবে দ্বিজের সর্বণ্ড হইবে না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব ইহাদের দ্বিজ এই একত্রে গ্রহণের ফলে আজ আর সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কোনই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, বস্তুতঃ সর্বণ্ড শব্দের অর্থই হইতেছে সংস্কৃতিগত ভাবধারণার সমতা।

মোটের উপর শিক্ষায়, সভ্যতায়, প্রতিটি আচরণে, এমন কি চিন্তাধারার একতায় আমরা যেখানে এক হইয়া গিয়াছি সেইখানেই প্রকৃত সর্বণ্ড তাহার নির্দিষ্ট বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এবং এইরূপ 'সর্বণ্ড' গ্রহণের ফলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সর্বণ্ডবিবাহের সংস্কার ঠিকই থাকিবে। অসংগোত্রের বৈচিত্র্যও রক্ষিত হইবে। ইহাতে ষাঁহার ব্যভিচার আদিবে বলিয়া মনে করিতে পারেন তাঁহাদের সম্পর্কে উত্তরের কতকাংশ এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই দেওয়া হইয়াছে এবং উপসংহারের প্রথমও কতকটা দিয়াছি।

পূর্বে সংস্কৃতির তারতম্য হেতুই অল্পলোম প্রথানুসারে অসর্বণ্ড-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আজিকার প্রভাব, সংস্কৃতির সমতার জন্মই অল্পলোম ও বিলোমের সর্বণ্ড গ্রহণ করিয়া

বৈবাহিক সঙ্গকে পারস্পরিক মর্যাদা দান করিবার। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বর্তমানে দেশ অনেকটা উদার হইয়াছে। ইহার দরুন মন্ত্র ও আচারের মধ্য দিয়া অমুষ্ঠিত না হইয়াও জী-পুরুষের মিলন হইতেছে। ইহাকে 'ঐন্দ্রিয়িক' সংজ্ঞা দিলেও কোথাও কোথাও ইহার ফল শাস্ত্রীয় বিবাহের পরিণতি অপেক্ষা অন্তর্ভুক্ত দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এখানে তথাকথিত 'সর্বণ্ড' রক্ষিত না হইলেও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে। না হইলে ইহার পরিণাম অন্তর্ভুক্ত হইত।

দেবো মুনির্জিহোঁরাজা বৈষ্ণবঃ শূদ্রো নিষাদকঃ

পশু শ্লেচ্ছোহপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্তৃতাঃ ॥

অত্রি সংহিতা।

মহর্ষি অত্রি উপরোক্ত দশ প্রকারের ব্রাহ্মণের কথা বলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি বা সর্বণ্ড ব্রাহ্মণের সহিতই হইবে, একথা সামান্য ভাবে বলা চলে না। বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে,—বুত্তি অল্পসারেই মুনি-ব্রাহ্মণ মুনি-ব্রাহ্মণের, নিষাদ-ব্রাহ্মণ নিষাদ-ব্রাহ্মণেরই সর্বণ্ড হইতে পারে। ইহার বিপরীত হইলে সমান সংস্কৃতির অভাবেই যে-কোনও ব্রাহ্মণ যে-কোনও ব্রাহ্মণের সর্বণ্ড হইতে পারে না। অথচ সমাজে কি চলিতেছে? ব্রাহ্মণের পুত্রকন্ঠার সহিতই ব্রাহ্মণের পুত্রকন্ঠার বিবাহ নিষ্পন্ন হইতেছে। কন্ঠার পিতা, নিষাদ-ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ অথবা বর বা বরের পিতা

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস- ৩/১ ব্যাঙ্কপাল স্ট্রীট • কলিকাতা

ফোন-কলকাতা-১১২২ • ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট,
বড়বাজার, ল্যানসডাউন, খিদিরপুর, বেহালা,
বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার,
ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা,
বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্

সিঃ এন্স, বিশ্বাস, বি, কম সিঃ সুশীল সেন, বি, এ

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিল্পোন্নয়ন যোগবিদ্যাবিশেষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষাণব সাংযুক্তিকরত্ব, এম-আর-এ-এস (জন্মন) ; বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুক্তরাজ্যকালীন মহামাত্য ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিবর্তিত গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান হ্রাস হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাত্য ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে নাটান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯০৯) তারিখের ৩৬১৮ X X-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯০৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯০৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের শান্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিল্পোন্নয়ন মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইহার নিতুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি আশ্চর্য্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেবিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিএক এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ যোগাণের প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্য বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাব্দিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সমগ্র প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিল্পোন্নয়ন” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার-কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাপ হইতে রক্ষা, দ্রুতদৃষ্টির প্রতিভা, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল :

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার—মূগ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয় ষষ্ঠমাত্রা মহারাজা ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সভাই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সমস্তাবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়নাহেব এন, এম, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচর্চা মহাকবি শ্রীহরিন্দ্র সিন্ধাস্বামীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বর মাননীয় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি, মীথবন্স নাথার কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সভাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ জে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা নগর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার ক্ষণ ৭৫, পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অভ্যাসার্থ্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।
ধর্মক কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭৮০। অজুত শক্তিসম্পন্ন ও সমগ্র ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৮০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কতব্য। **বর্গলাভার্থী কবচ**—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা ক্রোকদ্দমায় হফলাভ, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সমস্ত রাখিয়া কর্মে নিরতিলাভে ব্রহ্মা। মূল্য ৯৮০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০। (এই কবচে ভাণ্ডারাল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকল্পণ কবচ** ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বার্থ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১০, শক্তিশালী ও সমগ্র ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এট্রোলজিকেল এণ্ড এট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
লাফাভের সম্মুখ—প্রাতে ৮০টা হইতে ১১০টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।
 ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সমগ্র—বৈকাল ৫০টা হইতে ৭০। **লণ্ডন অফিস** :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

মুনি-ব্রাহ্মণ না দেব-ব্রাহ্মণ কোন পক্ষই তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিরীক্সে এবং অসঙ্কেচে এক ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত অপর এক ব্রাহ্মণের কন্যার তা সে যে ব্রাহ্মণই হউক না কেন—বিবাহ সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু এখানে কি সর্বণ বিবাহ সম্পন্ন হইল? ইহা কি অসর্বণ বিবাহ বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে না? শাস্ত্রের এবং জীবনযাপন-প্রণালীর উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ইহাও অসর্বণ-বিবাহ। সমাজে এখনও সর্বণ-বিবাহের ছদ্মনামে অসর্বণ-বিবাহ চলিয়া যাইতেছে।

এখন অবশিষ্ট শূদ্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

বর্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্তই যে প্রস্তাব করা হইল, উহারই অমূল্যে এখন এই কথা বলা চলে যে, সমাজে মাত্র দুইটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী স্বীকৃত হইবে—একটি দ্বিজ এবং ইহার পরম্পর সর্বণ। দ্বিতীয়, শূদ্র—যাহারা অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে ভালবাসে, বিকৃতরুচি বা রুচিহীন এবং সতত সমাজের কল্যাণ-বিরোধী কর্ণে আসক্ত। তথাকথিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শূদ্র লক্ষণে লক্ষিত ব্যক্তি থাকিলে তিনিও শূদ্র হইবেন এবং বৈবাহিক সম্বন্ধে শূদ্রের সর্বণ অবশ্যই

শূদ্রই হইবে। তবে ইহা সত্য যে, কালক্রমে শিক্ষা-সভ্যতার সাধনায়, দ্বিজ-সম্প্রদায়ের অবিরাম আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই অমূল্য শূদ্র সম্প্রদায়ও দ্বিজের অধিকারী হইবেন। সমগ্র সমাজ শিক্ষিত সভ্য হইবে,—দেশের উন্নতি হইবে।

যাহারা জ্ঞানী-শুণী, স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণকামী তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন কিঞ্চিৎ ধৈর্যের সহিত এই প্রস্তাবটিকে বিচার করেন। আমি তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ মতামত চাহিতেছি।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই, ত্রিপুরা।

রেজিঃ অফিস—আখাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, ৫৭নং ক্লাইভ স্ট্রীট (রাজকাটরা)

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—

...

...

৫০,০০০,০০

বিক্রীত মূলধন—

...

...

২২,৫০০,০০

আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—

...

...

১৪,৫০০,০০ টাকার উপর

সংরক্ষিত তহবিল—

...

...

৩,১৭,০০০,০০ টাকার উপর

কার্যকরী তহবিল—

...

...

৩,৭০,০০০,০০ টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—আজমিরীগঞ্জ, বদরপুর, বাজিতপুৰ, ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলচর, শ্রীহট্ট, ইম্ফল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, মৌলবীবাজার, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, তেজপুর, বেনারস, চাঁদপুর, টাংলা, গোয়ালঘাট, গোহাটা, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাইগুড়ী, নর্থলক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেঁচুগঞ্জ, ডিব্রুগড়, শিলং।

ভিন্নসুকিয়া ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পুস্তক - পরিচয়

রামচরিতমানস— (গোবিন্দী তুলসীদাসকৃত রামায়ণ) শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত। খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২ ফাল্গুন। মোট ছয় শত পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় টাকা।

গোবিন্দী তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস এশিয়ার সাহিত্যে এক বিশিষ্ট আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছে। আমাদের দেশের বহু হিন্দু ইহা নিয়মিত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। ইহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা গবেষণামূলক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইহার সমগ্র-পাঠ বা পারায়ণ ভক্ত হিন্দুরা ব্রতবিশেষ অনুষ্ঠানের মত ভক্তিভাজ্য চিহ্নে সম্পন্ন করেন। কাব্যহিসাবেও ইহার সৌন্দর্য ও মাদুর্য সর্বজনবিস্তৃত।

বাংলাদেশে তুলসীদাসী রামায়ণের আদর আছে। একাধিক অনুবাদ বাজারে পাওয়াও যায়। কিন্তু অনলস অতলিত কর্মনায়ক সতীশবাবু মূল রামচরিতমানস বঙ্গাঙ্করে মুদ্রিত করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতি শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়া বাঙ্গালী পাঠককে মূলের আশ্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ভাল বাঁধা, ভাল ছাপা। বড় ও স্পষ্ট হরপ—পাঠকরা পড়িবার সময়ে অবশ্যই সতীশ বাবুর প্রতি মুক্তকণ্ঠে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের অকুন্নিম্ব সেবা করা হইয়াছে এবং হিন্দীভাষাভাবীদের সহিত সৌহার্দের সেতু বিস্তারিত হইয়াছে। ভূমিকায় রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রের গুণকীর্তন করিয়া ও বিষয়সূচী দিয়া সতীশ বাবু পাঠকের রসাস্বাদনে সাহায্য করিয়াছেন।

হুই-একটি বিষয়ে সতীশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মূল যখন বেণুয়া হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের একটি কাঠামো এবং হিন্দীতে প্রযুক্ত

বিশেষ কতকগুলি শব্দের তালিকা পুস্তকের শেষে দিলে ভাল হইত না কি? ছাপাইবার সময় 'তুলসিকামাল' ও 'তুলসিকা মাল' বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে অশ্রুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। কোনও কোনও জায়গায় শুদ্ধ অনুবাদ হইতে অর্থগ্রহণ করা কঠিন, 'নেগীরা নেগ-জোগ পাওনা পাইল' (২৪১ পৃঃ)—অবশ্য 'নেগী', 'নেগজোগ' ইহাদের অর্থ এই প্রসঙ্গে দিয়াছেন, তাহা হইলেও অনুবাদ সহজ বাংলায় করিলেই শোভন হইত। ১৫৩ পৃঃ 'কপটি মূনিপদ রহি মতি লীনী' অনুবাদ মূলের সহিত সঙ্গত হয় নাই বলিয়া মনে হইল।

রামচরিতমানসের বহুলপ্রচার কামনা করি, তাহাতে বাংলার বহুবিধ কল্যাণ হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রোড ব্যাক—এরিথ মারিয়া রেমার্ক। অনুবাদক—কুমারেশ ঘোষ। রোডস কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম—আড়াই টাকা।

মুত্র একখানি বই লিখিয়া পৃথিবীবাণী যশ অর্জন করিয়াছেন—এমন সৌভাগ্যবান বিরল লেখকদের মধ্যে এরিথ মারিয়া রেমার্ক অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই জার্মান সৈনিক—তখনও তাঁহার বয়স আঠারো পূর্ণ হয় নাই—পূরা চার বৎসর রণক্ষেত্রে থাকিয়া সৈনিক জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যুদ্ধ-বিরতির এগারো বৎসর পরে ১৯২০ সালে তাঁর 'অল কোয়ার্টেট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইখানি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বইখানি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

হওয়ায় রেমার্ক জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। ইহার দুই বৎসর পরে 'রোড ব্যাক' বইখানি প্রকাশিত হয়।

'অল কোয়ারেটে' রণক্ষেত্রে সৈনিক-জীবনের নির্মমতা—নীতিহীনতা ও যুদ্ধের পাশবিকতার বাস্তব চিত্র ফুটিয়াছে; 'রোড ব্যাকে' পাই রণনির্জিত ইতোদ্যম বিকলাঙ্গ সেই সব ঘরে-ফেরা সৈনিকের উত্তর-জীবনের অসহায় অবস্থার চিত্র। 'কয়টি বৎসর কঠোর সামরিক জীবন যাপনের পর পরিবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবহার সঙ্গে ইহার খাপ খায় নাই—পোঁর-আচারে ও প্রথায় প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে এই হত-ভাগ্যেরা। অশ্রুত হৃদয় ও স্বচ্ছন্দ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার দাবি ইহাদের; কাহারও চেয়ে কম নহে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই ধরণের বাস্তব কথাচিত্র বিশ্বদাহিত্যে বিরল।

দুইখানি বইয়ের মধ্যে খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। চিত্রগুলি দোষত্রুটি শূন্য নয়—কোন কোনটো তো রীতিমত কদর্ঘ্য, তথাপি এর মূল্য অনস্বীকার্য। এই খণ্ড-চিত্রগুলিকে একত্রে গাঁথিয়া—ক্ষমতা-লোভী মানুষের নয় স্বার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ও যুদ্ধের অন্তর্নিহিত অর্থকে সম্পূর্ণ করিয়া রেমার্ক বিশ্বশান্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই চিত্র যুদ্ধের প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধকে স্বতঃই বাড়াইয়া দেয়। যতদিন মনাকালোভী মানুষের চক্রান্তে পিতৃভূমির গৌরব-স্রষ্টি অব্যাহত ভাবে চলিবে—ততদিন রেমার্ক তাঁর স্মরণীয় বই দুখানির মধ্যে স্মরণ হইয়া থাকিবেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে একথা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

রোড ব্যাক বইখানি ছায়াবাদ হইলেও—ইহাতে মূলের রস বজায় আছে। স্বরস্বরে ভাষা, প্রাঞ্জল অনুবাদ। অনুবাদের কৃতিত্ব এর মধ্যে যথেষ্ট। বইখানি স্থধী সমাজে সমাদৃত হইবে।

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের

অপরিহার্য দুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অর্দ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক

শ্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম, এস মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জন্য সর্বত্র হাতের কাছে রাখিবার মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি চিত্রসহ ব্যাখ্যা হইয়াছে)

প্রাপ্তিস্থান :- হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং

১৬৫নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকারের নিকট, দিনাজপুর।

ভাই বোনেদের আসর—শ্রীবিজ্ঞানকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
সরস্বতী সাহিত্য-মন্দির। সোনারপুর, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

ভাই বোনেদের আসরের গল্পগুলি (একটি বাদে; মোট অবাস্তব এ্যাডভেঞ্চার জাতীয়।) আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আখ্যায়িকার কথা—বাঙ্গালী ছেলের জীবনে যে সব বাস্তব এ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কোনকালেই ঘটে না—বৈদেশিক রীতিতে তাহাই উগ্র পানীয়ে মত পরিবেশন করিয়া সুকুমারমতি ছেলের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস এগুলিতে নাই। লেখকের গল্প-রচনার ভঙ্গিটি ভারি মিষ্ট। কোতুক-বিশয়-উপদেশ মিশ্রিত এই ছোট গল্পগুলি লেখক দরদী মন লইয়া ছোটদের আসরে পরিবেশন করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের পণ্য—শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত। ৬ বি এসটন
রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৬, মূল্য ৪০।

গ্রন্থকার ভারতের পণ্য সম্বন্ধে পূর্বে দুই ভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থ ঐ পণ্যায়ের তৃতীয় ভাগ। এই খণ্ডে খনিজ পণ্য—লৌহ, টাংষ্টেন, ক্রোমাইট, ভ্যানোডিয়াম, মানগানিজ, মলিবডেনম। টাইটেনিয়াম, নিকেল এবং কয়লায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য এই খণ্ডে ভারতের সমস্ত খনিজ পণ্যের আলোচনা শেষ হয় নাই। গ্রন্থকার চতুর্থ খণ্ডে অবশিষ্টগুলির আলোচনা করিবেন এরূপ ভরসা দিয়াছেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও দেশের সম্পদ সম্বন্ধে অনেক সময় সঠিক সংবাদ রাখেন না এবং বাঁহারা এই বিষয়ে তথ্যাদি জানিতে চাহেন তাহারও কোন এক স্থানে এই সকল জ্ঞাতব্য না পাইয়া নিরাশ হন। শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী উভয়ের পক্ষেই তথ্যজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভারতের খনিজ সম্পদের তথ্যগুলি নানা পুস্তকে, সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নানা পুস্তিকায় ও সাময়িক পত্রে এরূপ-ভাবে ছড়াইয়া আছে যে বহুপরিশ্রমে এগুলি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখিলে তাহা সাধারণ পাঠকের কার্যোপযোগী হয়। বর্তমান গ্রন্থকার এই দুঃস্ব কাঁধে অতি নিপুণভাবে সম্পূর্ণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবাসী হিসাবে আমরা লৌহ, মানগানিজ এবং কয়লা এই তিনটি খনিজ জন্মের বিষয়ে জানিতে বিশেষ উৎসুক। লেখক আমাদের সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। লৌহ সম্বন্ধে এত কথা আছে যে সকল শ্রেণীর পাঠকই ইহাতে নিজেদের জ্ঞাতব্য বিধায় পাইবেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে উৎখাতন, উৎপাদন, আমদানী রপ্তানীর বতদূর সম্ভব সাম্প্রতিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনামূলক যে তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পাঠকের চোখ খুলিবে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

• হাওয়ার নিশানা—শ্রীচিন্তনরঞ্জন রায়। প্রকাশক শ্রীনিবন্ধ
পত্রী। ২৫, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

একখানি সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক উপন্যাস। গ্রন্থকার নবীন—তথাপি তাঁহার পুস্তকখানি পড়িয়া মনে হইল, সাধারণ উপন্যাস যে ভাবে লিখিত হয়, ইহা সে শ্রেণীর লেখা নহে। গভীর চিন্তাশীলতার সঙ্গে অন্তরের আবেগপ্রবণতা যুক্ত হইয়া বইখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে উদ্ভুদ্ধ করিবার মত প্রেরণার শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছে। লেখকের ভাষা সতেজ এবং সাবলীল। দুঃখের বিষয়, বইখানিতে ছাপার ভুল অনেক বেশি। বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট স্নোমরম।

শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

অনিন্দ
প্রসঙ্গের
প্রকাশ

স্বাস্থ্য কোষ

অনুগ্রহ কোমিক্যালঃ কলিকাতা



অক্ষয়কুমার বড়াল—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—

৫৬—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।
আপার মারকুলার রোড, কলিকাতা।

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ঊনষাট বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। অক্ষয়কুমারের জীবন ঘটনাবল্লেখ্য বলা যায় না, কিন্তু তিনি যে কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা সাধারণ নয়। প্রমথ চৌধুরী তাঁহাকে জাত-কবি আখ্যা দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাবলীর মধ্যেও যে যথেষ্ট তারতম্য বিদ্যমান তাহা আমরা অনেক সময়েই লক্ষ্য করি, কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে কবিত্বহীন পঙ্ক্তি আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রচনা অসংখ্য নয়, কিন্তু বাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাই কাব্যরসিক মনের উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কবিদের মধ্যে এমন শব্দশিল্পী অল্পই দেখা যায়।

“এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল।

গানে বাকি সুর দিতে ফুলে বাকি ভুলে নিতে
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল।”

এইটুকু উদ্ধৃতি হইতেই বড়াল-কবির কবিত্বের অনেকখানি বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বিহারীলালের কাব্যশিখা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইয়াও অক্ষয়কুমার আপন কবিত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

চরিতকার অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞাতব্য জীবনীর সহিত যে স্ননির্বাচিত কবিতাগুলি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পথের দেখা—শ্রীশান্তা দেবী। কমলা বুক ডিপো, ১৫,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪০। মূল্য দেড় টাকা।

আটটি গল্পের সংগ্রহ। প্রথম গল্পটির নাম ‘পথের দেখা’। লেখিকা সাহিত্য সৃষ্টিদ্বারা ইতিপূর্বে প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছেন,—‘পথের দেখা’ তাহার সেই যশ আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহার প্রতিটি গল্পেই পরিণত লেখনীর ছাপ স্পষ্টভিত্তি। ‘সন্তান,’ ‘মানসী’ ও ‘ছুটি’ নামক গল্পে নারীজগতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—কোন পুরুষ লেখকের দ্বারা উহা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ! ‘উপহার’ নামক গল্পে লেখিকা এক নতুন ধরণের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চিত্রজগতে ‘কমার্শিয়াল আর্ট’ বলিয়া এক বিশেষ ধরণের শিল্প আছে—বিজ্ঞপন ও প্রচারকার্য্যেই উহার সার্থকতা; সাহিত্যসৃষ্টিতেও এই ধরণের শিল্প যে কত উচ্চত্তরের হইতে পারে—‘উপহার’ গল্পটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই গল্পের ভিতর দিয়া হৃকোশলে গভীরে কোম্পানীর লোহার সিঁড়ির যে প্রচারকার্য্য সাধিত হইয়াছে,—উহার জন্ম লেখিকার নিকট কোম্পানীর চিরকৃতজ্ঞ থাকার উচিত। ‘পথের দেখা,’ ‘জীবন দয়া’ ও ‘পথবাসিনী’ও সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ ও উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থ—যেটা ইম্পেরিয়াল কাগজে ছাপা—বাঁধাই হুন্দর।

শ্রীতারাপদ রাহা

বুদ্ধদেব বসু-র

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ,

গল্পসংকলন

বাছাই করা আঠারোটি গল্প।

‘স্বদৃশ, স্মৃতিপাঠ, নানারসোজ্জ্বল—’

রাজশেখর বসু—‘প্রবাসী’

৫, ও ৬।

উত্তরতিরিশ

সরস প্রবন্ধ। গল্পের মতো উপভোগ্য। ৩।

বিশাখা নতুন উপন্যাস
২।

সাড়া লেখকের প্রথম উপন্যাসের
পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ। ৩।

কালের পুতুল

আধুনিক বাংলা কাব্যের সমালোচনা। ৪।

সব-পেয়েছির দেশে

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের আলেখ্য। ১৬।

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

একটি কি দুটি পাখি

লেখকের আধুনিকতম দুটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

১। ও ১।

লেখকের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও কবিতাবলীর
তালিকার লগ্ন পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন

কবিতাবলি
২০২ রাসবিহারী ঐতিহ্য
কলকাতা

বোধন বাঁশী—শ্রীহর্গাপ্রসাদ সাহ। পৃথগ পাবলিশার্স,
১৬৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কবিতাও বই। দেশের নিদারুণ শোচনীয় বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত
বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যে সকল হৃদয়বান স্রষ্টা নীরবে
অশ্রুপাত করিতেছেন এবং এই চরম দুর্গতির প্রতিকার-মানসে
দেশকে জাগাইয়া তুলিতে বোধনের বাঁশী বাজাইতেছেন, লেখক
তাঁহাদেরই সমগোষ্ঠী। তিনি অখ্যাত পল্লীগামের শিক্ষকমাত্র
এবং এই তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রথম সঞ্চারন হইলেও তাঁহার
দলিত বিদার্ত হৃদয় মথিত করিয়া সর্ব ছন্দে যে বোধন-বাঁশীর
স্বর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা সহজেই মর্মে পর্শ করে।

জয় শ্রী—শ্রীহরেশ্বরনাথ ভট্টাচার্য, বি. এ.। প্রকাশনী, ১৫৭
আমারচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছন্দশ্রীর পর 'জয়শ্রীর' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'জয়শ্রী'র
কবিতাগুলি কবির কাব্যসাধনাকে জয়যাত্রার পথে আগাইয়া
দিয়াছে। কবি তাঁহার সকল বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা
ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন ও নবীন
আশার আলোকে চলার পথে যাত্রা শুরু করিয়াছেন। ভাবের সঙ্গে
তাল রাখিয়া ছন্দ পূর্ণতরূপ ধারণ করিয়া কবির 'জয়শ্রী'কে
শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

জয় সুভাষ—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—
গ্রন্থকার, ৪২-বি শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট
আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন উপলক্ষে কতকগুলি
রণোদ্গাদনা ও দেশপ্রেমমূলক কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থকার আজাদ
হিন্দ ফৌজের বিখ্যাত গানটির একটি শব্দর বদল সুবাদ করিয়াছেন।
জয় সুভাষ, গান্ধীজী, মুক্তির অভিযান, রণসঙ্গীত, ময়নামত, বীরের
দল প্রভৃতি কবিতাগুলি তরুণ-হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে।
পরবর্তী সংস্করণে এই ধরণের কবিতার সংখ্যা আরও বাড়াইলে
বইটি স্থায়ীভাবে ছাত্রগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে
সহায়তা করিবে। কিশোরগণের নিকট স্বকবি প্যারীমোহনের
কবিতার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

সুভাষ-প্রশস্তি—শ্রীহরিশঙ্কর মজুমদার কাব্যনিধি।
প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৭৭ বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য দশ আনা।

সুভাষ-প্রশস্তি উপলক্ষে ইহার পূর্বাংশে কয়েকটি দেশাত্মবোধ-
মূলক সহজ সরল কবিতা সম্মিলিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশে
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি নেতাজীর বাণীর একটি প্রাঞ্জল
বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্থানের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :-

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তত্পরি ঐ টাকা শেষারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত
লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া
তাহা সুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে
আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট
লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকং"

ফোন ক্যান ৩৩৮১

বাংলা ভাষায় অ-বাংলা শব্দ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় নিত্য আমরা ব্যবহার করিতেছি। ঐ সকল অ-বাংলা শব্দের অধিকাংশই আমাদের হাতে পড়িয়া স্ব-রূপ পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক শব্দের অ-কার স্থানে আ-কার, উ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে; অনেকগুলির 'শ' স্থানে 'স', 'ই' স্থানে 'য়' হইয়াছে; আবার অনেকগুলি শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া আমরা আঘাদের মত করিয়া চালাইয়া লইয়াছি। এইরূপ আরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 'অহসান' হইয়াছে 'আসান', 'গুলাম' হইয়াছে 'গোলাম', 'নকশা' হইয়াছে 'নকসা', 'আফিনা' হইয়াছে 'আরনা', 'সিফ' হইয়াছে 'স্রেক'। কিন্তু রূপ পরিবর্তনে সবচেয়ে বাহ্যিকরি দেখাইয়াছে 'জিগীর', 'লোকসান' 'সখ' ইত্যাদি শব্দগুলি। 'জিগীর'-এর আদি রূপ 'জিক্র', 'লোকসান'-এর আদি রূপ 'লুকসান' আর 'সখ'-এর আদি রূপ 'শৌক'। যোগলের হাতে পড়িয়া থানা খাইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার মত বেচারী অ-বাংলা শব্দগুলি আমাদের হাতে পড়িয়া কি অপরূপ সাজেই না সজ্জিত হইয়াছে।

হিন্দী ভাষায় বাংলা ভাষার চেয়ে অনেক বেশি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ চলিতেছে। উচ্চারণের বেলায় হিন্দী ভাষাভাষীরা কোন কোন শব্দে একটু আধটু পরিবর্তন করিলেও লেখার সময় তাহার আসল শব্দটিই লেখে। এজন্য প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দী গ্রন্থাদি পড়িলে বাংলায় রূপান্তরিত শব্দগুলির আসল রূপ চিনিতে কষ্ট হয় না। আমি ঐরূপ অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি এবং বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছি। অকার হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শব্দের আলোচনা আজ করিব। শব্দের শেষে আ, পা, উ, হি, যথাক্রমে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী বুঝিতে হইবে।

অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ
অংগুষ্ঠী—হি	আংটি	অড্ডা—হি	আড্ডা
অংগুর—ফা	আঙ্গুর	অতর—ফা	আতর
অন্দাজ—ফা	আন্দাজ	অদব—আ	আদব
অরুল	আ	অদা—আ	আদায়
আকিল		অদালত—আ	আদালত
অবাড়া—হি	আবড়া	অধেলা, ধেলা—হি	আধলা
অবীর—আ	আবের	অধেলী—হি	আধুলি
অগবান	হি	অনলাস—হি	আনারস
উচ্চারণ—		অনাজ—হি	আনাজ
অগোয়ান	আগোয়ান	অনাড়ী—হি	আনাড়ী
অগাউ—হি	আগোয়া	অফমোস—ফা	আপশোষ
অচানক—হি	আচমকা	অবীর—আ	আবীর
অচার—ফা	আচার	অভী—হি	এবে
অছা—হি	আছা	অমড়া—হি	আমড়া
অজনবী—আ	আজনবী	অমলা—আ	আমলা
অজব—আ	আজব	অমানত—আ	আমানত
অটক—হি	আটক	অমীন—আ	আমীন
অটকন—হি	আটকান	অমীর—আ	আমীর
অটুট—হি	অটুট	অরক—আ	আরক
অড়হত	হি	অরজী—আ	আর্জী
আঢ়ত		অলকতরা—আ	আলকাতরা
অসবতা—আ	আসবৎ	আপস—উ	আপোষ
অলবান—আ	আলোয়ান	আবকারী—ফা	আবকারী
(উঃ—আলোয়ান)		আবদার—ফা	আবদার
অলহদা—আ	আলাদা	আবহুস—ফা	আবহুস
		আবরু—ফা	আবরু

পণ্ডিত ৩৪মানাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত

এবং

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

(সচিত্র ও যড়ঙ্গ) শ্রী শ্রীচণ্ডী ॥

অর্গলা, কীলক, কুবচ, মূলচণ্ডী, মুক্তাদি এবং রহস্যত্রয়ের সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পূজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'চন্ডী' বিষয়ক বহুল জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচীতে হসম্পূর্ণ।

প্রাপ্তিস্থান—সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক—১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকতা।

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত ও সম্পাদিত

অগ্ণ্যন্ত বই

ত্রিসন্ধ্যা দেশবন্ধুর বঙ্গবাণী স্তোত্রগীতা

(যজুঃ ও সামবেদীয়)
চার আনা

(সচিত্র জীবনী ও বাণী)
বার আনা

(দেবদেবীর স্তবগীতি)
আট আনা

শ্রীশ্রীদুর্গা

গঙ্গাপূজা ও তত্ত্ব

তর্পণ (দ্বিবেদীয়)

চার আনা

চার আনা

এক আনা

অসবাব—আ	আসবাব	আবহবা—ফা	আবহাওয়া	ইতেক } হি	এতেক	উসকানা } হি	উকানী
অসন—আ	আসন	(উঃ—আবহওয়া)		এতিক }		উসকনা }	
অসামী—আ	আসামী	আবা } আ	বাবা	ইন্তলা—আ	এন্তেলা	উন্তাদ—ফা	ওন্তাদ
		আকা }		ইধর—হি	এধার	এচা—হি	এডো
অহমক—আ	আহামক	আবাদ—ফা	আবাদ	ইমামদস্তা—উ	হামানদিস্তা	এবজ }	এয়োজ
অহসান—আ	আহসান	আমদনী—ফা	আমদানী	ইমারত—আ	ইমারত, এমারত (উঃ এওয়জ)	}	আ
অহিবাতী—হি	এহোতী	আরাম—ফা	আরাম	ইলাকা—আ	এলাকা, এলেকা ওছা—হি		ওছা
আঁচ—হি	আঁচ	আলু—আ	আলু	ইলামচী—হি	এলাচ, এলাচী ওঝা—হি		ওঝা
আঁচরা—হি	আঁচলা	আলুবুখারা—আ	আলুবুখরা	ইশারা—আ	ইসারা		
আঁটি—হি	আঁটি	আবাজ—ফা	আওয়াজ	ইশ্তহার—আ	ইস্তাহার	ওচনী—হি	উঁচনী
আঁগী—হি	আঁগী	(উঃ—আওয়াজ)		ইশ্তমান—আ	এস্তেমান		
		আশকারা—ফা	আস্তারা	ইস্তীফা—আ	ইস্তফা		
আইন—ফা	আইন	আহিস্তা—ফা }	আন্তে	ইজ্জা }			
আইনা—ফা	আইনা	আস্তে—হি }		উজ্জা }	হি	উজাড	
আচোট—হি	হুচোট	আসমান—ফা	আশমান	উজার }			
আজা—হি	আজা	আস্তীন—ফা	আস্তিন	উজান—হি	উজান		
আটা—হি	আটা	ইকরারনামা—আ	একরারনামা	উজীর			
আড়ী—হি	আড়ী	ইখতিয়ার—আ	এক্টিয়ার	বজীর			
		ইজমালী—আ	এজমালী	(উঃ—ওমজীর)			
আঢ (মাছ)—হি	{ আড়	ইজলাস—আ	এজলাম	উতা }			
	{ আইড			উতনা }	হি	অত	
আদত—আ	আদত	ইজহার—আ	এজহার, এবার				
ইতউত—হি	ইতিউতি	উধর—হি	ওধার	আরবী ‘অজ্জনবী’	হইতে বাংলা ‘আজ্জুবী’	এবং হিন্দী	
ইতনা } হি	এত	উপাডনা—হি	উপড়ান	‘আচোট’	হইতে বাংলা ‘হুচোট’	হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে	
এতা }		উলটপলট—হি	ওলটপালট	আমি নিঃসন্দেহ	নহি। শব্দ দুইটি	একরূপ অর্থেই ব্যবহৃত	
				হইতে দেখিয়াছি।			

দেশ-বিদেশের কথা

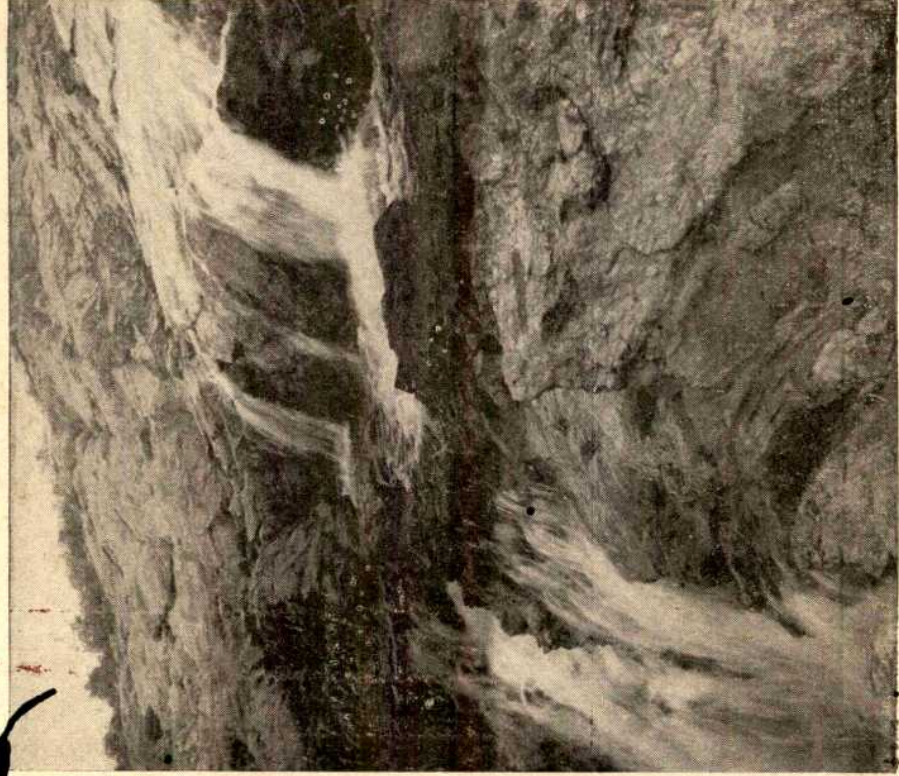
পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিগত ২৬শে ভাদ্র স্বহস্তত্বাবর কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পিতা গৈপুর্ন নিবাসী পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সামান্য রোগভোগের পর ২৫ বৎসর বয়সে নিজ বসতবাড়িতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রলীড়িত পল্লী অঞ্চলে মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত দৈহিক

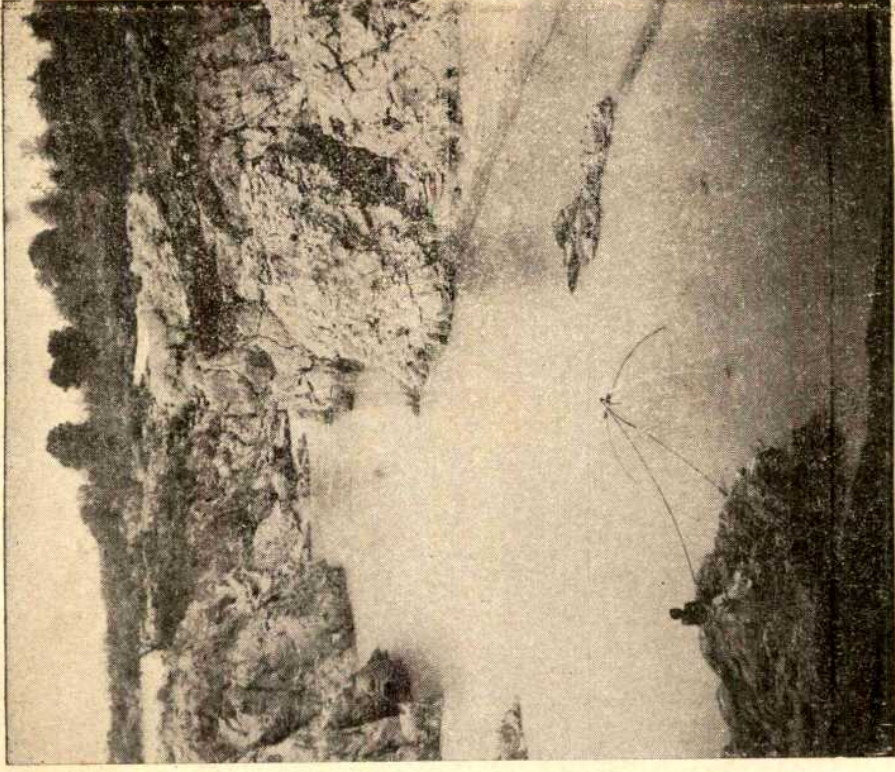
শক্তি না হারাইয়া ইঁহার ঞ্চার প্রায় শত বৎসর স্মৃতিতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সাধারণ বাঙালী সমাজের মধ্যে বিরল। ইনি পরম নির্ভাবান ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং তত্ত্বসাধক ছিলেন। বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনি অধ্যাত্মগুরুও ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন সত্যকার পণ্ডিত হারাইল। আমরা কবি অপূর্বকৃষ্ণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



রামকিরী
 প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা] শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীষ



হাজিগুয়া বারোদল নদে পল্লবদল নদ (হাজিগুয়া)



হাজিগুয়া বারোদল নদে আর একটি ছবি (হাজিগুয়া)

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

কাঙ্ক্ষিক, ১৩৫৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলা ও ভারত

“প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” একটি চরম উদ্বেগ বাংলাদেশে “পূর্ণ পাকিস্তান কায়ম” করা। বাংলাদেশে আজ দশ বৎসর যাবৎ যে অনাচার, অত্যাচার ও দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে তাহারই টেউয়ের শিখরে এই বর্তমান মাংসজ্ঞায় আসিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার পিছনে বাংলার বাহিরের লীগ যুদ্ধ-পরিষদের দীর্ঘকালের ব্যাপক ব্যবস্থা ও আয়োজন রহিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহ। আমাদের সম্মুখে যে স্পেস কমিশনের তদন্ত রহিয়াছে তাহাতে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা বলা যায় না, কেননা সেই তদন্ত নষ্ট করিবার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। প্রথমেই কমিশনের সেক্রেটারীরাপে এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যাহার কত ব্যক্তিগত ও সত্যতা সম্বন্ধে যোর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, কেননা এই যেতাদ্দ আই. সি. এসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তীব্র মন্তব্য এখনও আমাদের স্মরণে আছে। তাহার পর গোড়ায় চেষ্টা হইয়াছিল যাহাতে হিন্দু-সাধারণ কমিশনের সম্মুখে লিপিবদ্ধ বর্ণনা বা এজেন্ডার দাখিল করার জ্ঞাত যথেষ্ট সময় না পায় এবং যেটুকু দাখিল হয় তাহাও অসৎ রাজকর্মচারীদের হাতের কাছে পৌঁছায়। বর্তমানে লীগদলীয় পুলিশ ও অজ্ঞ রাজকর্মচারীর দল নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে তদন্তের ফলাফল জায়সদত না হয়। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে প্রধান হইল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কঠোরোধ। এই সকল সংবাদপত্রের সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে সরকারী অপকর্ম চালনা সহজ নহে তাহা বলা বাহুল্য; অতএব ঐ শ্রেণীর সংবাদপত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাদের কঠোরোধ করাই লীগদলের একমাত্র পথ।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চক্রান্তের ফলে বাংলাদেশে এখন তাহাদের অহুচরবর্গের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। দুর্নীতি, ঘুষ, যথেষ্টাচার ইত্যাদির ফলে বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন নহে। বাঙালী মুসলমান দুইজনে

মরিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ, নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে আরও অর্ধেকটি এবং এখন তাহাদের যে পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহাতে তাহাদের চরম দুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্য। পাকিস্তান কায়ম রাধিতে হইলে ইংরেজের প্রভুত্ব কায়ম রাধিতে হইবে, কেননা ইংরেজের অস্ত্রবলের জামানত ভিন্ন পাকিস্তানরূপ অবাস্তব ব্যবস্থার আয়ুষ্কাল তিন দিনও নহে। ইহা সম্ভব যে ইংরেজ চলিয়া গেলে বিপ্লবের রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া এদেশে কিছুকালের জ্ঞাত পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সব কিছুই ডুবু-ডুবু হইবে, কিন্তু তাহার শেষ নিষ্পত্তিতে এদেশে একমাত্র অখণ্ড স্বাধীন ভারত—যাহাতে সর্বধর্ম ও সকল জাতির সমান অধিকার থাকিবে—স্থাপিত হইতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদী ভারত আজ পঁচিশ বৎসরের সাধনা ত্যাগ ও অহিংস সংগ্রামের ফলে যেখানে পৌঁছাইয়াছে, ছয় মাস বা ছয় বৎসরের নিদারুণ কষ্টের ও দুর্দশার ভয়ে সেখান হইতে সে পশ্চাৎপদ হইবে একথা মনে স্থান দেওয়াও অহুচিত।

সমস্ত ভারতের হিতাহিতের সমষ্টির সম্মুখে বাংলাদেশের মরণ-বাঁচনের প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না একথা ঠিক। কিন্তু সমস্ত ভারতের কল্যাণ যে মূলনীতির উপর নির্ভর করে সে নীতিকে যদি দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সঙ্গে সংবদ্ধ না রাখা যায় তাহা হইলে বাংলার সর্বনাশের ফলে সমস্ত ভারত বিপর্যস্ত হইতে পারে একথা রাষ্ট্রনেতৃ-বর্গের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের একথা বলার উদ্বেগ এই যে বাংলাদেশকে রক্ষা করা বা বাঙালীকে সাহায্য করার জ্ঞাত সমস্ত ভারতের স্বাধীনতার পথে অগ্রগতি রোধ করার কথাকে মনে স্থানও দেওয়া অহুচিত। ভারতের স্বাধীনতার রথের গতি এখন এক মুহূর্তের জ্ঞাতও রোধ করা চলিতে পারে না, কেননা ইহার উপর শুধু ভারতের নহে, সমস্ত এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মুষ্টিগ্রে স্বাধীনেবী প্রতিক্রিয়াবাদীর দল ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের চোখে ধূলা দিয়া নাচাইয়া এদেশের দলীয় প্রায়ী করিবার যে চেষ্টা করিতেছে সে চেষ্টায় নির্গত বি

আজ জর্জরিত, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান অতিশয় বিপদগ্রস্ত—যদিও বাঙালী মুসলমান সেকথা এখনও ঠিক বুঝিতেছে না। কিন্তু সে কারণে, বাংলা ও বাঙালীকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত ভারত কল্যাণের ও প্রগতির পথ হইতে বিচলিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। কেননা ভারত স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেই সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাহাদের ক্রীতদাসের দল সফলকাম হইবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার ত্যাগ ও ক্ষতিস্বীকারের পরিমাণ সারা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বাঙালীর আত্মবলি ও আত্মতির উপরই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বাঙালীকে এখন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে হইবে যে, “আমাদের বাঁচাইবার ওজুহাতে তোমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, বাঙালী মরিলে যদি সমস্ত ভারত বাঁচে তবে তাহাই হউক।”

অজ দিকে যে সুবিধাবাদের পথে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস এত দিন চলিয়াছে তাহাতে সমস্ত ভারত অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে পারে একথাও ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না দিলে বাঙালীর আত্মবলি যথায় যাইবে। “বাঙালীকে এখনই সাহায্য করিতে পারা গেল না, কেননা আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা বা সময় ছিল না, সুতরাং সমস্ত ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা বাংলাকে বলি দিতে বাধ্য হইলাম”, ইহার অর্থ বুঝা যায়, এবং এরূপ বলি সার্থকও হইতে পারে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এবং বর্তমানেও—আমরা দেখিতেছি অগুরুপ ব্যবস্থা, যাহাকে সুবিধাবাদ ভিন্ন অজ কিছুই বলা চলে না। এই ব্যবস্থার অর্থ হইতেছে যে বাংলাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা, যদি তাহাতে সে নিরস্ত ও ক্ষান্ত হয়। বলা বাহুল্য এ আশা নিফল হইতে বাধ্য, কেননা কংগ্রেসের এই কাপুরুষতা দেখিয়া বিপক্ষের সাহস বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের দাবীর সীমা থাকিবে না। লীগ সর্বতোভাবে অক্ষমতার নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরবলোপতা, মিথ্যা প্রচার এবং হিংসার সীমা নাই, তাহার দাবী যতই মানিয়া লওয়া যাইবে ততই সে হিংস্র ও শক্তিশালী হইবে। অতএব কংগ্রেসের পক্ষে এখন “Peace at any price” (যে কোন মূল্যে শান্তি কামনা) নীতি গ্রহণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও নিরর্থক। কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় বলুন “আমাদের হাতে এখনও শক্তি নাই কেননা শক্তি গঠন সময়াপেক্ষ। সুতরাং আমরা বাংলাকে সাহায্য করিতে বর্তমানে অগম্য। সময় আসিলে সে চেষ্টা দেখিব, কিন্তু আমরা লীগের দাবী মানিতে কিছুতেই রাজী হইব না।” বাঙালী সেকথা বুঝিবে এবং যে পাকিস্থানরূপ মহা নরকের যন্ত্রণা সে দশ বৎসর ভোগ করিয়াছে তাহা আরও পাঁচ দশ বৎসর ভোগ করিবে এই আশায় যে, তাহার স্বার্থত্যাগের ও স্বাধীনতার ফলে সারা ভারতে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা হইবে এবং ভবিষ্যৎকালে তাহার সন্তান-সন্ততি

আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে।

বাংলাদেশ “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” রণাঙ্গন হিসাবে প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াবাদের নিকট যোগ্যতম ভূমি। এইখানে ইংরেজ আজ ৪৫ বৎসর সাম্রাজ্যবাদের “পরোক্ষ সংগ্রাম” চালাইয়াছে। এই প্রদেশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাসবর্গের এবং বিদেশী ও এদেশী শোষক ও তাহাদের শিবাদলের লীলাভূমিরূপেই দীর্ঘকাল রহিয়াছে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মান-সন্ত্রস্ত প্রদেশে বিন্দুমাত্র নাই এবং বাংলার বাহিরে তাহাদের কোনও সহায়ত্ব পাইবার লেশমাত্র সম্ভাবনাও নাই। ইংরেজ অনেকদিন আগেই বলিয়াছে “বাঙালীর পক্ষে আবেদন রখা” (“Bengalees need not apply”)—অবশ্য ক্রীতদাস দিগের। ব্যবস্থা আলাদা। কংগ্রেসেও একথা উঠিয়াছে যে, “বঙ্গাল উচ্ছন্ন গেলে কিবা আসে যায়” (“What matters if Bengal perishes”) এবং লীগের উচ্চতম অধিকারি-বর্গের ভালবাসার চিহ্ন বাঙালী মুসলমান পাইয়াছে হার্ডিফের মধ্যে, যখন এক জনও অবাঙালী মুসলমান, এ দেশের ছুংখ ছ-পয়সা উপভোগ্য করবার কথা দূরে থাকুক, এখানে আসিয়া ছ-কোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পারেন নাই। সুতরাং বাংলা-দেশে “প্রত্যক্ষ সংগ্রামে” প্রতিক্রিয়াবাদী দলের পথ সন্ধান হইতেই পরিষ্কার মনে করায় কিছুমাত্র ভুল নাই এবং যতটা চেষ্টা হইতেছে তাহাতে সে কথা লক্ষ্য বার প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। সুদূর করাচী পর্যন্ত বাংলাদেশের লুঠ পৌঁছিয়াছে, শত শত কোশ দূরে অপহৃত ও ধর্মিতা হিন্দু-লীলোকের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হইয়াছে যে লীগদল বিরূপ নির্বিবাদে ব্যাপক আয়োজন করিয়া “প্রত্যক্ষ সংগ্রামে” নামিয়াছিল।

বাঙালীকে এখন “রুকের পাজির জালিয়ে দিয়ে একলা চলো রে” শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। সহায়তা দূরের কথা সহায়ত্বও পাওয়া এখন সুদূরপর্যন্ত। কিন্তু মনে বিশ্বাস ও হৃদয়ে জোর থাকিলে ৪০ বৎসর আগে বাঙালী যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল আজও তাহা পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব

কলিকাতার দাখান মজ্লিমগুল এবং পুলিশ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যে শোচনীয় অক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহার সমালোচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি মূলত্ববী প্রস্তাব এবং ব্যবস্থা-পরিষদে দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ভোটারের জোরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ হইয়াছে কিন্তু বহুতা প্রসঙ্গে গবর্নেন্ট এবং পুলিশ উভয়েরই বহু গলদ ধরা পড়িয়াছে। দাখা সম্পর্কে লীগের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার যে প্রবল চেষ্টা শুরু হইয়াছে, বিতর্কের সময় লীগ-দলভুক্ত কোন কোন বিশিষ্ট সদস্য এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি স্বীকারোক্তিতে উহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।

ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসদল কর্তৃক দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, একটি সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলের অপরটি প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে। এই উপলক্ষে যে সব বক্তৃতা হয় তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিয়ে দেওয়া হইল।

কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার ত্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া বলেন,

লীগের বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতাই মুসলমানদিগকে আইন ভঙ্গ করিতে ও উপদ্রব করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখ সর্বসাধারণের ছুটির দিন ঘোষণা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে আইন ভঙ্গ করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কথ্য হইতেছে এই যে, আইন ভঙ্গ করাই যে মুসলিম লীগের নীতি সেই লীগের হাতে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিত থাকা যায় কি না। একাধারে আইনভঙ্গকারী ও রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী আইনের রক্ষক হিসাবে লীগ কাজ করিতে পারে না। কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করিয়া ত্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, কংগ্রেস যখন আইন অমান্য করা স্থির করিয়াছিল তখন কংগ্রেসী সদস্যগণ সরকারী পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন, তাহারা দোতরফা নীতি অবলম্বন করেন নাই।

আইন ভঙ্গ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের অধিকার যদি কোনও রাজনৈতিক দলের থাকে, তবে জনসাধারণেরও এই দাবী করার অধিকার রহিয়াছে যে, এরূপ দলের হাতে আইন রক্ষার ভার রাখা চলিবে না।

মন্ত্রীমণ্ডল মুসলমানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, জ্বরদত্তি করিয়া, লুণ্ঠতরাজ করিয়া, এমন কি প্রয়োজন হইলে লোককে হত্যা করিয়া ১৬ই আগষ্টের অল্পাধিক সফল করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। লীগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত কথ্যগুলি অধীকার করার উপায় নাই—

(১) হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৬ই আগষ্ট ছুটি ঘোষণা করা হইয়াছিল।

(২) ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতেই মুসলমানেরা লাঠি-সোটা ও ছুরিছোরা সহ মিছিল করিয়া বাহির হইয়াছিল এবং দোকানদারদিগকে নিজ নিজ দোকান বন্ধ করিবার জন্ত জোরজ্বরদত্তি করিয়াছিল।

(৩) অসহায় লোকেরা পুলিশের সাহায্য চাহিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। পুলিশের হাতে লোক থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বলিয়াছিল যে, তাহারা নিরুপায়, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার-গণের কাছে কোনও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সংবাদ দিলে তাহারা কোনও সাহায্য করেন নাই, বরং তাহারা লোককে যেমন করিয়া পারে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

(৪) মুসলমান গুণ্ডা ও ছুরি-স্তোত্রা অস্ত্র-শস্ত্র বহন করার জন্ত লরী ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ সুরাবর্দীর সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতেও তাহারা অস্ত্রশস্ত্র সহ লরী করিয়া গিয়াছিল।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিয়া ত্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ বলেন,

১৬ই আগষ্ট তারিখে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও আইন-ভঙ্গ করার প্রভূত আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিশ কমিশনার কেন কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬২ক ধারা অনুসারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না তাহা প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নির্ধারণ করিয়াছেন কি? এই ধারাতে বিহিত আছে যে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুবিধারক্ষার্থ যাহাতে শোভাযাত্রাসমূহে শৃঙ্খলা থাকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার পুলিশ কমিশনারের রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অতএব একটা সময়েচিত্ত জরুরী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাটি কি তাহা তিনি বুঝাইয়া বলিবেন কি? ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে লুণ্ঠতরাজ এবং হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তথাপি সেইদিন বিকালে প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের জনসমাবেশে কেন সভাপতিত্ব করিলেন? শুধু তাহাই নহে একটা উত্তেজিত জনতার সমক্ষে যাহাদের মধ্যে অনেকেই দারুণভাবে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমক্ষে বক্তৃতা করিয়া প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন কেন প্রধানমন্ত্রী তাহা বলিবেন কি? জাতি ও সম্প্রদায়নির্বাচন সর্বস্বত্রে জানেন যে, ১৬ই আগষ্ট তারিখ আইনভঙ্গ নগরবাসীরা পুলিশের সাহায্য চাহিয়াও কোন সাহায্য পায় নাই। অধিক কি কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ লুণ্ঠতরাজে যোগ দিয়াছিল। পুলিশের চক্ষের উপরই মারপিট হত্যাকাণ্ড এবং সম্পত্তি লুণ্ঠ হইয়াছে। পুলিশ কাঠপুতলিকার মত তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে। কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ সম্পর্কে টেরেটীবাজার লুণ্ঠন এবং আরও সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ সমস্ত অপরাধ পুলিশ-গ্রাহ্য। শুনিয়াছি যে, এই সমস্ত অপরাধ অগ্রাহ্য করাটা পুলিশের পক্ষেই অপরাধজনক। অতি বিশ্বস্তৃত্রে আমি জানিয়াছি যে, পুলিশের নিকট এমন কি বার বার পুলিশ-কর্মচারীর নিকট সাহায্য চাহিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। পুলিশগ্রাহ্য ব্যাপারে এই যুক্তি টিকিতে পারে না। এই সমস্ত ব্যাপারেও যদি পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুলিশকে হস্তক্ষেপ না করার জন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী অতএব যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যদি

এরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পুলিশ কমিশনারই তাহা দিয়াছিলেন।

২৩শে আগষ্ট তারিখে সাংবাদিকদের নিকট ব্রিগেডিয়ার সিক্সমিথ বলিয়াছেন যে, শুক্রবার বিকালেও পুলিশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। পুলিশ ফৌজ বৃদ্ধি করা যে দরকার সে সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং আমার হির বিশ্বাস যে, অপর পক্ষের সদস্তগণ এ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিবেন। কিন্তু কলিকাতার শোচনীয় ব্যাপারে প্রধান কথা হইল এই যে, গবর্নমেন্টের হাতে যে পুলিশ ফৌজ ছিল তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে নিযুক্ত করা হয় নাই কেন? যদি তাহা করা হইত, বিশেষ করিয়া জঙ্গী-ফৌজকে যখন ডাকিলেই পাওয়া যাইত তখন যদি তাহা করা হইত, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলিকাতায় এই বীভৎস কাণ্ড হইত না এবং বহু লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইত। আশঙ্কা-সঙ্কুল অঞ্চলগুলিতে পুলিশ ফৌজকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা হয় নাই কেন তাহা প্রধানমন্ত্রী বুঝাইয়া বলিবেন কি?

ব্রিগেডিয়ার সিক্সমিথ বলিয়াছেন যে, শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্যন্ত অঞ্চলটাই ছিল বিঘ্ন-সঙ্কুল।

জঙ্গী-সাহায্য পাইতে বিলম্বের হেতু স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী অজ্ঞত বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তাঁহার আসিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিক্সমিথ বলিয়াছেন ১৬ই তারিখ রাত্রি দ্বিপ্রহরের আগে তাঁহাকে ডাকাও হয় নাই এবং এমন কথাও জানান হয় নাই যে, সৈন্যদের সাহায্য ছাড়া পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবে না। প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সহিত ব্রিগেডিয়ার সিক্সমিথের উক্তির এই যে অদামগ্রস্ত রহিয়াছে তাহা প্রধানমন্ত্রী দূর করিবেন কি?

ডেপুটি স্পীকার লীগদলভুক্ত সদস্য মিঃ তফজ্জল আলি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন :

হাস্কামার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাটা আলোচনার বিষয় হইতে পারে বটে। ১৬ই এবং ১৭ই আগষ্ট তারিখ যে পুলিশ কিছু করে নাই তাহা জানা কথা। বক্তা নিজেই এক জন ডেপুটি কমিশনারের কথা জানেন যিনি হাস্কামার মধ্যে যাইতে সম্মত হন নাই।

অনাস্থা প্রস্তাব উপলক্ষে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন

অনাস্থা প্রস্তাব দুইট দুই দিন আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মৌলবী ফজলুল হক ও ডাঃ আম্রাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং মিঃ সুরাবর্দীর উক্ত। ত্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও ঐ দিন বক্তৃতা করেন। ডাঃ আম্রাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই আগষ্টের অস্থগত উপলক্ষে সব উত্তোগ আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করেন :

ঐদিন প্রাতে খবরের কাগজে লীগের এ্যাম্বুলেন্স কোর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এ্যাম্বুলেন্স কোর কিভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন থাকিবে তাহার নির্দেশ ঐ বিজ্ঞপ্তিতে ছিল। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানান হইয়াছিল যে, ১৭ই আগষ্ট হইতে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। লীগ যে সংগ্রামের ক্ষম প্রস্তুত হইয়াছিল ইহা কি তাহার প্রমাণ নহে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বোম্বাইয়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাভাব্য ঘোষণা করিতে যাইতেছেন। দেখিতেছি তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। যে মন্ত্রী তাহার স্বাধীন বেনতনখোর পুলিশ কমিশনারকে সংযত রাখিতে পারেন না, যে মন্ত্রী নাকি বলেন যে, তিনি নিরুপায়, পুলিশ কমিশনার তাঁহার কথা শোনে না, তিনিই কিনা বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা করার কথা বলেন। তিনি আবার বলেন যে তিনি আইন ও শৃঙ্খলা অমাত্য করিবেন। তিনিই কিনা হইতেছেন আমাদের আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের মন্ত্রী।

২৩শে আগষ্ট তারিখ সুরাবর্দী সাহেব এক শান্তির বাণী প্রচার করিলেন। আবার তাহার আশ বর্টা বাদেই বিদেশী সংবাদপত্রসমূহের জ্ঞত একটি বিশেষ বাণী দিলেন। এই বাণী তাঁহার শান্তির বাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যদি ঐ সমস্ত কথা বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে বাংলার লোকের কাছে শান্ত থাকিয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবার অনুরোধ জানাইবার বা অর্থ কি?

মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, তিনি পুলিশ কমিশনারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত উদাহরণ আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুরাবর্দী সাহেব পুলিশ অফিসারদের কার্যে এমন ভাষে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন যে, তাহা এই প্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিবের পক্ষে করা উচিত হয় নাই। রবিবার বৈকালে এক জন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার সাতটি গুলিতে পার্ক স্ট্রীট থানায় লইয়া যান। ১০ মিনিটের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দী থানায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া লন। তিনি একথা অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাহার পর মিঃ সুরাবর্দী আবার থানায় ফিরিয়া আসেন এবং থানার কর্মচারীদিগকে এক ঝুড়ি ডিম চুরির অভিযোগে দায়ী করেন। লীগদল গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ৫০০ গ্যালন পেট্রল চাহিয়াছিলেন। তাহা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মন্ত্রীদের নামে কুপন দেওয়া হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর নামে ১০০ শত স্পেশাল কুপন দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশের নাকের উপরেই এভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আয়োজন করা হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার এক-

চতুর্থাংশ। তাহারা মনে করে তাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, হিন্দুদের তাঁবেদারী করিতে তাহারা কদাপি সম্মত হইবে না। যদি সত্য সত্যই তাহারা উহা মনে করে, তবে তাহারা একথা কি করিয়া ভাবিতে পারে যে যেধানকার এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন সেই সম্প্রদায় অপরের তাঁবেদারী করিবে? যদি মুসলমানেরা মনে করে যে, তাহারা বাংলার হিন্দুদিগকে একেবারে উৎসাদিত করিয়া দিতে পারিবে তাহা হইলে আমি বলি যে, তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। সাড়ে তিন কোটি হিন্দুকে উৎসাদিত করা যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, তাহা করিতে গেলে ভারতের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু অধিবাসী শতকরা ২৫ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। সত্যকথা যখন এই এবং সকলকেই যখন মিলিয়া মিশিয়া এদেশে বাস করিতে হইবে তখন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের তাঁবেদার হইবে এই কথা না বলাই ভাল। ভারতের বিপুলসংখ্যক অধিবাসী যাহাতে ঐক্যে থাকিতে পারে সেইরূপ একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করাই ভাল।

আমার অভিযোগ এই যে, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল এই প্রদেশের শাসনতন্ত্রকে ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষয় নিয়োগ করিয়া শাসনের মর্যাদা নষ্ট করিতেছেন। সেই সংগ্রাম কলিকাতার সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক তীব্র হইবে। মৌলবী কজলুল হক দাঙ্গার পর পুনরায় লীগে যোগদান করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতায় তিনি বলেন :

আমি শুক্রবার সকালে হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকট হইতে কয়েকটি টেলিফোন পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, ভারতরাসীদের সহনশীলতার অভাবে মাঝে মাঝে যে সমস্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটয়া থাকে ব্যাপারটা বোধ হয় তাহারই একটি। পুলিশের নিকট সাহায্যের জ্ঞাত আবেদন জানান হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা উত্তর দেয় যে, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই। পুলিশের যদি কিছুই করিবার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের রাখা হইয়াছে কেন? তাহাদের কিসের জ্ঞাত বেতন দেওয়া হয়? শান্তিরক্ষা যদি তাহারা না করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি? আমার বাড়ী হইতে মল্লিকবাজার আধ মাইলের পথ। শুক্রবার বিকালে ঐ বাজার লুণ্ঠ হয়। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই যে চারদিক হইতে লুণ্ঠের মাল লইয়া লোকে দৌড়াইতেছে। পুলিশও সঙ্গে আছে। উম্মাদ জনতার সঙ্গে যোগ দিয়া পুলিশকে বেশ খুশীই দেখা গিয়াছিল। তাহার পর পার্কসার্কাসের বাজার লুণ্ঠ হয়। পুলিশের কাঁড়ীতে এক জন লোক পাঠান হয়। কাঁড়ীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন যে, কি ঘটতেছে না ঘটতেছে

তাহা দেখিবার মত সময় তাহার নাই। মনে হয় কলিকাতার পুলিশের মধ্যে যেন একটা পরিবর্তন ঘটয়াছে। আমার বাড়ীর ৪০ গজ দূরেই আর একটা বাড়ী আছে। ১৭ই তারিখ সেই বাড়ীটা লুণ্ঠ হয়। কাছেই আছে একটা পুলিশের কাঁড়ী, কাঁড়ীর লোক কিছুই করিল না। দেখিলাম লোকে লুণ্ঠের মাল লইয়া চলিয়া আসে। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের এক জন সদস্যকে দেখিলাম একখানি রূপার ট্রে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। আমি অবশ্য সমস্ত ব্যাপার দেখি নাই, তবে যতটা দেখিয়াছি তাহাতেই আমি বিবশ হইয়া পড়িয়াছি। শুধু তাহা আমার বাড়ীর দরজায় যা মারিতে-আরম্ভ করিয়া দেয়। আমি প্রতি মুহূর্তেই মনে করিতে-ছিলাম যে, এবার বুঝি আমাদের সকলের দফা নিকাশ হইল। আমার মনে হইতেছিল যে, ব্রিটিশ রাজত্ব ত চূলায় গিয়াছেই—না জানি কোন এক শিক্ষিত (“learned”) নাদিরশাহ কলিকাতা লুণ্ঠ করিতে আসিয়াছে। আমি পুলিশ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। জানি না কন্ট্রোল রুম কে কন্ট্রোল করিতেছিলেন। কিন্তু যখনই কোনপ্রকার সাহায্য চাহিয়াছি তখনই উত্তর আসিয়াছে—“আপনার অভিযোগ লিখিয়া রাখা হইল। যথাসময়ে যাহা করার করা হইবে।” গবর্ণরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলাম। উত্তর পাইলাম—সরকারী কর্মচারী ব্যতীত লাটপ্রাসাদে কাহারও টেলিফোন করিবার অধিকার নাই। কন্ট্রোল অফিস অবস্থা কন্ট্রোল করিতেছিলেন না। গবর্নেন্ট হাউস কোন কথার কাণ দিতে রাজী ছিলেন না। এই অবস্থার মধ্যে হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকিল। ১৬ই তারিখ যদি পুলিশ ও মিলিটারী শক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিত তাহা হইলে যে এই সমস্ত ব্যাপার আদৌ ঘটত না ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। ব্যাপারটা অল্পরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। কাজেই এই সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকা যায় না যে, এতগুলি লোকের প্রাণহানির জ্ঞাত পুলিশই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। যদি কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হয় আর এ সমস্ত পুলিশ অফিসার কে তাহা জানা যায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া নরহত্যা ও নরহত্যায় সাহায্য করার অপরাধে কাসি দেওয়া উচিত।

লিম্পটন কোম্পানীর ঘড়ীর দোকানটি লুণ্ঠের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ হক বলেন যে, এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া লুণ্ঠ চলিয়াছিল, পুলিশও এই লুণ্ঠে যোগ দিয়াছিল। অনেককে রিষ্টওয়াচ লইয়া দোকান হইতে বাহির হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুলিশের লোক। অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর
অনাস্থা প্রস্তাবের উত্তরদান প্রসঙ্গে মিঃ সুরাবদী যে বক্তৃতা করেন তার সারমর্ম এইরূপ :

কলিকাতায় যে বীভৎস ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে আধুনিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। অনেকে বলিয়াছেন আমি হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইতে চাহিয়াছিলাম; যদি তাই হইবে তবে আমি মুসলমান যেখানে সংখ্যালঘু সেই কলিকাতা শহর বাছিয়া লইব কেন? জীলোক ও শিশুদের ঘরে ফেলিয়া ময়দানের সভাতেই বা আসিতে বলিব কেন?

কোন কোন সদস্ত বলিয়াছেন মুসলমানেরাই দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিল। হাসপাতালে আহত মুসলমানেরাই সর্বাগ্রে ভর্তি হইয়াছে এই অকার্য্য সত্য উড়াইয়া দিবার চেষ্টা মিঃ রুড্রু করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মুসলমানেরাই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সত্যই কি আপনারা বলিতে চান যে হারিসন রোড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ প্রভৃতি হিন্দু প্রধান স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুর দোকান জোর করিয়া বন্ধ করিতে গিয়াছিল? হাওড়া হইতে আগত শোভাযাত্রা হারিসন রোড এবং ষ্ট্রীও রোডের মোড়ে আটকানো হয়। বেলা তিনটার সময় এক জন ডেপুটি কমিশনারের রক্ষণাধীনে টালিগঞ্জ হইতে আগত একটি শোভাযাত্রা রসা রোডে টালিগঞ্জ পুলের নিকট হিন্দুরা আটকাইয়া দেয়।

১৬ই তারিখ সকাল আটটা হইতেই পুলিশ কমিশনার জরুরী অবস্থার ডাহার যে কতব্য আছে তদনুসারে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিয়াছিলেন। পুলিশ কমিশনারের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া আমি সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার নিন্দা করিয়াছেন। (ব্যবস্থাপক সভায় মূলভূমী প্রস্তাবের উত্তর দানের সময় মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন, “কলিকাতার শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশ কমিশনারের, উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মঞ্জীদের নাই।”) আমি পরিকার ভাষায় জানাইতে চাই যে এরূপ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

অতঃপর পুলিশ কমিশনারের কার্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন,

“কোন কোন স্থানে পুলিশ যদি স্বীয় কতব্য পালন না করে তবে তাহার জঙ্ঘ আমি বা পুলিশ কমিশনার কেমন করিয়া দায়ী হইব?

গোলমালের দিন বহু স্থানে ঘুরিয়া স্বচক্ষে সকল অবস্থা দেখিয়া আমি বেলা ২টার সময় লালবাজারে আসি। উভয় দলের মনকষাকষি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল গোলমাল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। লালবাজারের কম্পাউন্ড তখন সশস্ত্র পুলিশ ও লরীতে ভর্তি ছিল। আমি তখনই পুলিশ কমিশনারকে বলি যে মিলিটারী ডাকা উচিত। বেলা পৌনে তিনটার সময় মিলিটারী কতৃপক্ষকে ডাকিবামাত্র আসিবার জঙ্ঘ প্রস্তুত থাকিতে

বলা হয়। বেলা সাড়ে চারটার সময় মিলিটারী আহ্বান করা হয় এবং তাহাদিগকে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি খোলা রাখিতে বলা হয় :

(ক) ক্যানিং ষ্ট্রীট—কলুটোলা ষ্ট্রীট—মির্জাপুর ষ্ট্রীট।

(খ) কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড় হইতে বিবেকানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত লোয়ার চিংপুর রোড।

(গ) অপার চিংপুর রোডের মোড় হইতে কলেজ (কর্ণওয়ালিস?) ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত বিবেকানন্দ রোড।

(ঘ) কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড় হইতে বিবেকানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত কলেজ ষ্ট্রীট।

(ঙ) হারিসন রোড।

(চ) বিবেকানন্দ রোডের মোড় হইতে কলুটোলা পর্যন্ত সেক্ট্রাল এভিনিউ।

দাঁড়ার দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন,

এই ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের তীব্রতা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ দৃঢ়তা ও উত্তেজনার সহিত তীব্রভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং গৃহযুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধিগণ এবং মঞ্জী-মিশন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরিকল্পনা ও অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত এই বিরোধ কাগজেপত্রের সীমাবদ্ধ ছিল।

মঞ্জীমিশনের প্রস্তাব উপলক্ষে কংগ্রেস ও লীগের কার্যকলাপ আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ সুরাবর্দী কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মন্তব্য করেন :

এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই বলিতে চাই না।

শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৬শে জুন তারিখে মঞ্জীমিশন কর্তৃক লীগ কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা এখন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার মুসলিম ভারত বিশ্বাসবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে কেহই কোন দিন স্বপ্নেও ধারণা করে নাই যে ব্রিটেনের তিন জন বিশেষ প্রতিনিধির দ্বারা তাহারা এমন নির্লজ্জভাবে প্রতারণিত হইবে। কিন্তু স্বপ্নে যাহা ধারণা করা যায় নাই কাণ্ডে তাহাই সম্ভবপর হইল। মঞ্জীমিশন যে ভাবে লীগকে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে আমি প্রত্যেক ইংরেজকে লজ্জার মাথা নত করিতে দেখিয়াছি। ব্রিটিশ পুরস্করণ এই ভাবে মুসলিম লীগকে প্রতারণিত করিয়া কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাতে মুসলমান জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা পাকিস্থান দাবীর সমাধি রচনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার পথ বাছিয়া লইল। এইরূপ চরম বিশ্বাসঘাতকতার দরুন মুসলমানেরা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জুদ্ধ হইয়া ওঠে।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যেই দাঙ্গার দায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। সেগুলি এইরূপ :

(১) দাঙ্গা বাধিবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন মন্ত্রীমিশন। তাঁহাদের কার্যে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং এইক্ষণেই তাহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ১৬ই জুনের ঘোষণার ৮ম ধারার ব্যাখ্যা করিয়া মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে বাদ দিয়া নিজেই সমগ্র অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রীমিশন মিঃ জিন্নার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে না পারায় এবং তাঁহার অসহযোগিতার ফলে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হওয়ায় লীগের বিক্ষোভের কারণ ঘটয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কংগ্রেস গবর্নমেন্ট দখল করিয়াছে, মিঃ জিন্না হইতে শুরু করিয়া বহু লীগ নেতা এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র এই কথা বলাও তাঁহাদের প্রচারকার্যের একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কংগ্রেস ইহা তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন কিন্তু দেখাইয়া দিয়াছেন হিন্দুকে। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে হিন্দুরা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই : ক্ষুব্ধ হইয়াছে মুসলমান। সুতরাং দাঙ্গার মূলে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব এই কথা স্বীকার করিলে আক্রমণ কাহার আগ্রহ করিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(২) ১৬ই তারিখ সকালেই পাকিস্তান এ্যাম্বুলেন্স কোর কেন প্রস্তুত হইয়া রাস্তার বাহির হইয়াছিল, কেনই বা তাহাদিগকে পূর্ব হইতে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহা জানিতে চাহিয়া জবাব পান নাই।

(৩) মিঃ সুরাবর্দী ১৬ই তারিখ বেলা ছইট পর্ধ্যন্ত চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়াছিলেন যে অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছে, দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িতেছে, উত্তেজনা এত গুরুতর হইয়াছে যে মিলিটারী ছাড়া পুলিশের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব। তথাপি অপরাহ্নে কেন তিনি ময়দানের সভা বন্ধ না করিয়া ইহার সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, ঐ সভায় কেন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে দিয়াছিলেন এবং কেনই বা লাঠি ছোরা লইয়া সভাক্ষেত্রে লোক আসিতে দেখিয়াও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই? ভোর না হইতেই যেখানে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বেলা ২টার মধ্যে যেখানে অবস্থা পুলিশের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সেই অবস্থায় গড়ের মাঠের সভা হইতে দিয়া উত্তেজনা আরও বাড়াইবার দায়িত্ব মিঃ সুরাবর্দী বা পুলিশ কমিশনার কিছুতেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(৪) হারিসন রোড, বহুবাজার, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা হিন্দু দোকান আক্রমণ করিবার সাহস পাইতে পারে না, এই কথা বলিয়া এবং হাওড়া পুলের নিকট শোভাযাত্রা আটকানো ও বেলা তিনটার সময় টালিগঞ্জের শোভাযাত্রায় বাধাদানের উল্লেখ করিয়া মিঃ

সুরাবর্দী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে হিন্দুরাই প্রথম আক্রমণ করিয়াছে। অথচ বক্তৃতায় তিনিই বলিয়াছেন যে বেলা ২টার মধ্যেই অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বেলা সাড়ে-চারটার সময় মিলিটারী পাহারার জন্ত তিনি যেসব রাস্তার নাম দিয়াছেন তার মধ্যে বহুবাজার, ক্লাইভ স্ট্রীট, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ, টালিগঞ্জ প্রভৃতির নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই এবং তালিকায় নির্দিষ্ট স্থানগুলির অধিকাংশই মুসলমান এলাকা।

(৫) হাসপাতালে আগত প্রথম মুসলমান মুসলমানের দ্বারাই আহত হইয়াছে এই কথা বলা হইলে মিঃ সুরাবর্দী উহা অস্বীকার করেন। বক্তাকে এজ্ঞ উপহাস করিতেও তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু উহা সত্য। মেডিকেল কলেজে নূর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে ১৬ই তারিখ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের সময় ভর্তি করা হয়। উহার ঠিকানা ৬২নং কেশব সেন স্ট্রীট এবং এই ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয় এক জন হিন্দু যুবক ও এক জন শিখ। রাজাবাজারের দিক হইতে আগত এক মুসলমান জনতা নূরমহম্মদকে দোকান বন্ধ করিতে বলিলে সে অস্বীকৃত হয়। তখন তাহাকে ছোরা মারা হয়। সেই এলাকা মুসলমান প্রধান, এখানে কোন হিন্দু নূর মহম্মদকে মারিয়া থাকিলে তাহার পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইত, এবং তখনই এই অঞ্চলে দাঙ্গা বাধিয়া যাইত। মেডিকেল কলেজ, ক্যান্সেল হাসপাতাল এবং বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৬ই তারিখে ভর্তি আহতদের হিসাব আমরা ‘মডার্ন রিভিউ’র সার্বেটের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। বাংলা সরকার উহার কোন প্রতিবাদ এখনও করেন নাই; ঐ হিসাব এইরূপ :

মেডিকেল কলেজ :

১৬ই সকাল ৭টা ১৫ মিঃ—প্রথম আসে মুসলমান (উপরোক্ত নূর মহম্মদ)

” ৭টা ৩৫ মিঃ—হিন্দু

সারাদিনে আসে হিন্দু—১৭৬

মুসলমান—২০৭

অজ্ঞাত—৫২

৪৩৫

ক্যান্সেল হাসপাতাল :

১৬ই সকাল ৯টা—প্রথম আসে হিন্দু

” ৯-৩০—এক জন হিন্দু এক জন মুসলমান

বেলা ১১টার মধ্যে ৭ জন হিন্দু ৭ জন মুসলমান আসে সারাদিনে আসে—হিন্দু ৬৭

মুসলমান ৬৫

বেলগাছিয়া হাসপাতাল :

১৬ই সকাল ৭টা ৪৫ মিঃ—প্রথম আসে হিন্দু

” ৮টা ৩০ মিঃ—হিন্দু

” ৯টা —২ জন হিন্দু

” ৯টা ৩০ মিঃ—এক জন হিন্দু

এক জন মুসলমান

বেলা ১২টা পর্যন্ত আসে—হিন্দু ১১

মুসলমান ৫

হাসপাতালের বিবরণের কথা আবছা ভাবে মিঃ সুরাবর্দী তুলিয়াছেন কিন্তু উহা তিনি দেন নাই। মুসলমানেরা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া দলে দলে হাসপাতালে আসিয়াছে যাহারা এই মিথ্যা চালাইতেছেন তাঁহাদের কথা সত্য হইলে মিঃ সুরাবর্দী উহার সপক্ষে নিশ্চয়ই হাসপাতালের বিবরণী দিতেন। এই বিবরণ তাঁহার নিকট অতিশয় সহজলভ্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়রের কৈফিয়ৎ

“প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” উপলক্ষে কলিকাতার মেয়র ওসমানের আচরণ সম্পর্কে তাঁহার কি বক্তব্য আছে জানিতে চাহিয়া ত্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর উহায় আলোচনা হয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল :

মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে তিনি কলিকাতা শহর মুসলিম লীগের সম্পাদক হিসাবে অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ বাণীসহ গুপ্ত ইত্যাহার প্রচার করিয়াছিলেন, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে ময়দানের সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ঐ দিনের অস্থানে কর্পোরেশনের লরীসমূহ ব্যবহৃত হইতে দিয়াছিলেন, সিভিল সাপ্লাই বিভাগ হইতে দশ হাজার লোকের এক মাসের মত খাদ্য লইয়াছিলেন এবং দাঙ্গায় যোগদানের অভিযোগে ধৃত কয়েকজন গুণ্ডাকে খালাস করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং এই কর্পোরেশন মনে করেন যে তিনি মুসলমান হইলেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তিনি প্রধান নাগরিক বলিয়া কর্পোরেশনের নিকট তাঁহার কার্যের কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।

উত্তরে মেয়র বলেন :

প্রথমেই আমি বলিয়া রাখিতেছি, প্রস্তাবের মধ্যে যে কয়টি অভিযোগ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহার সব কয়টিই সর্বৈব মিথ্যা। ১৬ই আগষ্ট তারিখে উপদ্রবের ক্ষয় মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া আমি একটি গোপন ইত্যাহার বিলি করিয়াছিলাম—এই অভিযোগের মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। ১৬ই আগষ্টের অস্থান সম্পর্কে যে সমস্ত প্রচারপত্র বিলি হইয়াছিল তাহা প্রকাশ্যেই বিলি করা হইয়াছিল। সে সমস্ত প্রচারপত্র সম্পূর্ণ নির্দোষ। উহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই। কোনও কোনও সংবাদপত্র এবং কোনও কোনও জন-নায়ক ঐ প্রচারপত্র হইতে ছই-একটি বাক্য বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ প্রচারপত্রের সমগ্র উদ্দেশ্যটাকেই ভুল বুঝাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অংশের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা আমার হিন্দু বন্ধুদের প্রাণে ব্যথা দিয়াছে জানিয়া আমি বড়ই ব্যথিত। এরূপ ভুল বুঝা তাঁহাদের উচিত ছিল না।

১৬ই আগষ্টের অস্থান উপলক্ষে যে সমস্ত প্রচারপত্র বিলি করা হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা ছিল না। আমার এই

কথার প্রতিবাদ করার সাধ্য কাহারও নাই। বরং কোনও দিক হইতে উত্তেজনার ছেতু উপস্থিত হইলেও মুসলমানদিগকে ধীর নির্বিকার এবং শান্ত থাকিতেই বলা হইয়াছিল। স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল যে, লীগের সংগ্রাম ভারতীয়দের কোনও দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নহে, উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

মেয়রের পুস্তিকায় নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল,

ইসলামের ইতিহাসে এবং কোরাণে রমজান পরিজ্ঞান মাস এবং উহার স্থান অতি উচ্চে। এই মাসে কোরান প্রণীত হয় এবং হজরত মহম্মদ নবীরূপে গৃহীত হন।

এই রমজান মাসেই মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং মুসলমানেরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া কাফের হত্যার অনুমতি লাভ করে। ইসলাম বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হয়। এই রমজান মাসেই আমরা মক্কার যুদ্ধে জয়ী হই এবং পৌত্তলিকদের নিমূল করিতে সক্ষম হই। এই মাসেই ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ ঘোষণার ক্ষয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ এই মাসটাই বাছিয়া লইয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু মেয়রের কৈফিয়ৎ শুনিবার পর কোন কাউন্সিলার পুস্তিকার উপরোক্ত অংশ সম্বন্ধে মিঃ ওসমানের কি বক্তব্য আছে তাহা জানিতে চাহেন নাই। ইহার পর মেয়র অপর অভিযোগের প্রত্যেকটি সরাসরি অস্বীকার করেন এবং প্রস্তাবের উত্থাপক, সমর্থক বা অপর কোন কাউন্সিলার সে সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার সময় প্রচলিত রীতি অনুসারে ত্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী কোন বক্তৃতা করেন নাই। যে সব অভিযোগ মেয়রের বিরুদ্ধে আনা হইয়াছে তাহা লইয়া পূর্বেই সংবাদপত্রে আলোচনা হইয়াছে এবং জনসাধারণের ধারণা সেগুলি অমূলক নয়। করদাতারা ইহাই আশা করিয়াছিল যে কাউন্সিলারেরা সে সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া এমন ভাবে প্রস্তাবটি আনিবেন যেন সভায় প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু কোন কাউন্সিলারই তাহা করেন নাই। কৈফিয়তের নামে মেয়রের সাফ অস্বীকৃতি শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যার করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু মহাসভার সদস্য ত্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাবের সংশোধক হিসাবে অনাহা প্রস্তাব আনিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু এরূপ কোন পৃথক প্রস্তাবের নোটশি তিনিও দেন নাই। মেয়রের কৈফিয়ৎ তলব উপলক্ষে কংগ্রেস নামধেয় এবং হিন্দু মহাসভা সদস্যদের যে আচরণ কর্পোরেশনের সভায় দেখা গিয়াছে তাহাকে বিশ্বাস্যকর ভণ্ডামি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। মেয়রের কৈফিয়ৎ তলবের নামে যে প্রহসন তাঁহার করিয়াছেন

করদাতারা তাহা ভুলিবে না। এই পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ঠ্যনের পশ্চাতে করদাতাদের স্বার্থরক্ষার চিন্তা বড় ছিল, না বর্তমান কাউন্সিলারদের ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রধান ছিল তাহা যাচাই করিবার দিন আসিবেই।

বাংলার দাঙ্গার সঠিক বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ

ভারত-রক্ষা আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগের দিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর, বাংলা সরকার সংবাদপত্রে বাংলার দাঙ্গার সঠিক বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া এক হুকুমনামা জারী করিয়াছেন। এই আদেশ বলে সংবাদপত্রে হতাহত ব্যক্তিগণ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, কোণায় কি ভাবে তাহারা নিহত বা আহত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা চলিবে না। নিহত বা আহত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ঘটনার সঠিক স্থান সম্বন্ধে সংবাদ না জানিলে উহার ফল হইবে এই যে হিন্দুরা হতাহত ব্যক্তিগণ হিন্দু মনে করিয়া ভুল করিবে এবং লীগগুণ্ডার-উহাদের সকলকেই মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়া অশান্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। লীগের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যতক্ষণ দাঙ্গা চলিবে ততক্ষণ শেষোক্ত ধরনের অপব্যবহার সম্ভাবমাই অনেক বেশী। বাঙ্গলা সরকারের আদেশের মর্ম মোটামুটি এইরূপ :

“বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে এমন কোনও বিবৃতি, বিজ্ঞাপন, নোটিশ, সংবাদ, মন্তব্য বা অত্যাচার বিষয় মুদ্রণ, প্রকাশ বা বিলি করা চলিবে না—যাহার মধ্যে কোন বিশেষ জেলা বা মহকুমার কোন স্থানে কিছু ঘটিলে সেই স্থানের নাম থাকিবে; কোনও লোক নিহত বা আহত হইলে কি ভাবে নিহত বা আহত হইল তাহার উল্লেখ থাকিবে; আততায়ী বা আক্রান্ত কোন সম্প্রদায়ের লোক তাহারও উল্লেখ থাকিবে; কোনও উপাসনালয় বা ধর্মস্থান অপবিত্র করা হইলে তাহার বিবরণ থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংক্রান্ত বা কোনও হতাহত সম্পর্কিত কোনও ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফের অনুলিপি ছবি, রেখাচিত্র বা কার্টুন স্বতন্ত্রভাবে বা কোনও সংবাদপত্রের মারফত কোনও সংবাদপত্রে, প্রচারপত্রের বা বিজ্ঞাপনের মারফত মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিলি করা চলিবে না।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাদেশিক সরকার বা বঙ্গীয় প্রেস এডভাইসরি কমিটি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ বাস্তব দিবেন তাহা এই হুকুমের আওতায়া আসিবে না।”

বাংলা সরকারের আদেশের প্রতিবাদ

২৬শে সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রী মিঃ শহীদ হুসাইন সাংবাদপত্রের সম্পাদকগণের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাঁহা-দিগকে উপরোক্ত আদেশের অনুলিপি প্রদর্শন করেন। ঐ সম্মেলনে স্থির হয় যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্যন্ত সম্পাদকগণকে উহা বিবেচনা করিবার জন্ত সময় দেওয়া

হইবে এবং সোমবার সম্পাদকগণের অভিমত অবগত হইবার পরে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তদনুসারে সম্পাদকেরা ২৮শে সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত সমবেত হন। দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন এবং স্থির করেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সকল কাগজের প্রতিনিধি ষ্টেটসম্যান অফিসে নিজ নিজ রিপোর্ট সহ সমবেত হইবেন। সমস্ত রিপোর্ট একত্র করিয়া একটি রিপোর্ট প্রস্তুত হইবে এবং সমস্ত সংবাদপত্রে শুধু উহাই প্রকাশিত হইবে। সন্ধ্যা সাতটার পরবর্তী কোন ঘটনা পরদিন প্রকাশিত হইবে না, পরের দিনের সভায় এগুলি যথারীতি উপস্থিত করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইলে অর্ডিনাল ছাড়াই সংবাদপত্রে সঠিক বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইত এবং ভুল ও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হইত। বোম্বাইয়ের সম্পাদকেরাও নিজেরা এই ভাবেই দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন এবং সেখানে গবর্নেন্ট কোন অর্ডিনাল জারী করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বৈরাচারী বাংলা সরকার এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষাও তাঁহারা করেন নাই। শনিবার দিনই অপরাহ্নে সম্পাদকদের পুনরায় আহ্বান করিয়া প্রধান মন্ত্রী জানাইয়া দেন যে অর্ডিনাল জারী হইবেই। রবিবার উহা ঘোষিত হয়।

এ সম্বন্ধে ক্রিয়াক্ষমত মাকনলাল সেন, তুষারকান্তি বোষ, হরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সম্পাদক-বর্গ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কলিকাতা ও বাংলার অত্র গোলযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বিষয়ে সাংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করার সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী গত ২৬শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ৫টার রাইটাস বিন্ডিঙে কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি বলেন যে, ভারত-রক্ষা বিধান অনুযায়ী গবর্নেন্ট এক আদেশে জারী করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি এই আদেশের মর্ম পাঠ করিয়া শুনান।

সম্মেলনে উপস্থিত সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিগণ এই আদেশের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রস্তাব করেন, ১লা অক্টোবর পর্যন্ত এই আদেশ জারী করা স্থগিত রাখা হউক। ইতিমধ্যে তাঁহারা সংবাদপত্রসমূহের মতামত জানাইয়া দিবেন। প্রধান মন্ত্রী ইহাতে সম্মত হন। এতদনুযায়ী নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক-মণ্ডলের সভাপতি ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ১০ টায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকা কার্যালয়ে প্রেস এডভাইসরি কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করেন। সংবাদপত্রসমূহের অত্যাচার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিও এই বৈঠকে যোগ দেন। আদেশটির সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয় ও এডভাইসরি কমিটি একটি প্রস্তাব করেন। সংবাদপত্র সম্পাদক-

মণ্ডলের সভাপতি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর নিকট সভার বিবরণ সহ এক পত্র লেখেন। প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন করিয়া সেইদিন অপরাহ্ন ৪ টায় রাইটাস বিল্ডিংয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন।

সরকারী আদেশের কয়েকটি দিক ও নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতির পত্র সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণের প্রস্তাবে নম্রত না হইয়া সরকারী আদেশ জারী করার জ্ঞপ্তি জ্ঞেদ করেন। তবে তিনি জানান যে, প্রেস এডভাইসরি কমিটি যদি মোটামুটি ভাবে আদেশ পালন করিয়া চলে তাহা হইলে কমিটি কর্তৃক প্রচারিত কোনও সংবাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লওয়া হইবে না, এইটুকু সুবিধা দিতে রাজী আছেন। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সংবাদপত্রের অধিকারের উপর ইহা অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। এই অবস্থায় একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমরা স্থির করিয়াছি, এই আদেশের বাধ্যবাধন মানিয়া আমরা দাঙ্গাহাদাঙ্গা ও গোলযোগ সম্পর্কে কোনও সংবাদ প্রকাশ করিব না। আমরা মনে করি, তথ্যপূর্ণ বিবরণ ও সঙ্গত মন্তব্য বন্ধ করাই এই আদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতি প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতেই প্রেস এডভাইসরি কমিটি ও সংবাদপত্র সম্পাদকদের মতামত জানা যাইবে। নিম্নে সেই পত্রের নকল দেওয়া হইল :—

প্রিয় গিঃ সুরাবর্দী, অজ্ঞপ্রাতে প্রেস এডভাইসরি কমিটির বৈঠক হয়। কমিটির সদস্য নছেন এমন কয়েকজন সম্পাদকও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আপনি যে আদেশ জারী করা স্থির করিয়াছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এক জন ব্যতীত আর সকলেই মনে করেন আদেশটি অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়, যে উদ্দেশ্যে ইহা জারী করা হইতেছে তাহা সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা সাধিত হইবে না। অতএব আমরা আপনার নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি :—

বিষয়টি সংবাদপত্রগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাত জন প্রতিনিধির এক সভায় সকল সংবাদ পেশ করা হইবে, এই কমিটির বৈঠকে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মোটামুটি একটি বিবরণ প্রস্তুত করা হইবে, কোনও সংবাদের সত্যতা ঠিকমত নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে পরদিনের সভার জ্ঞপ্তি উহা রাখিয়া দেওয়া হইবে, এই কমিটির মারফত প্রচারিত না হইলে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। সন্ধ্যা ৭টায় ষ্টেটসম্যান কার্যালয়ে কমিটির অধিবেশন হইবে।

পত্রটি যাহাতে আপনার নিকট যথাসম্ভব শীঘ্র পৌছিতে পারে সেজ্ঞ ইহা খুব তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইল। আমি আশা করি, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রস্তাবটি যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারিব।

অবদীয়—

(স্বঃ) তুবারকাস্তি ঘোষ, সভাপতি নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডল, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬।

শনিবারের সাংবাদিক বৈঠকে অর্ডিনাল জারীর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সম্পাদকেরা অমৃত বাজার পত্রিকার সিটি অফিসে সমবেত হন।

এই সভায় অর্ডিনালের প্রতিবাদস্বরূপ পত্রের প্রকাশ করা স্থির হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

বঙ্গীয় সংবাদপত্র পরামর্শ কমিটি (প্রেস এডভাইসরি কমিটি) গঠনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল বাংলা গবর্নমেন্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শান্তিস্থাপনের জন্ত সংবাদপত্রগুলি সরকার অপেক্ষা কোনক্রমেই কম সচেতন নহে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে যে অর্ডিনাল জারী করা হইবে তাহাতে স্বীয় উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। এইজন্ত কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গের এই সভা গবর্নমেন্টের আদেশের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর হইতে প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত সংবাদপত্রগুলিকে অরুরোধ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন শেষ হইবার পর-মুহুর্তে উপরোক্ত অর্ডিনাল জারী তাৎপর্যহীন নহে। বাংলা-দেশের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গবর্নমেন্টকে লীগের আবদার মানিয়া লইতে বাধ্য করাই বর্তমান দাঙ্গাহাদাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য। কলিকাতায় পুলিশের প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে লীগপন্থী মুসলমান কর্মচারী মোতায়েন করিয়া হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনার পূর্ণ আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গেও তাহাই করা হইয়াছে। পুলিশ হিন্দুকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা ত করেই না, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়ক্ষয় নিয়ুক্ত হিন্দুরাই পুলিশের গুলিতে আহত হয়, গ্রেপ্তার হয় এবং হিন্দু গ্রেপ্তার হইলে তাহার পক্ষে জামীনে মুক্তিলাভ পর্যন্ত চুরাক হয়। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে লীগের গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার পুলিশ অগ্রসর হয় নাই, মুসলমান জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ত পুলিশ গুলি চালায় নাই এবং লীগ গুণ্ডারা ধরা পড়িলেও জামীনে মুক্তি পায়। লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে হিন্দুকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা তো নাই-ই, বরং বেপরোয়া গ্রেপ্তার করিয়া আগ্নেয়ক্ষয় হিন্দু যেটুকু চেষ্টা করিতে পারিত তাহাও খর্ব করিয়া আনা হইতেছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যেখানে নিষ্ক্রিয়, সেখানে সংবাদপত্রই দেশবাসীর প্রধান ভরসা। ব্যবস্থা-পরিষদ

বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের অতিশয় যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া আউনাঙ্গের বগে দাঁড়ার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা আমরা কিছুতেই উদ্বেগবিহীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এখনই হাজার হাজার হিন্দু নরনারীর আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ আসিতেছে। বর্তমান অর্ডিনাল চাপু থাকিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নূতন প্রেস অর্ডিনাল্‌সে সংবাদ প্রকাশের নমুনা

প্রেস অর্ডিনাল জারী হইবার পর মঙ্গলবার ১লা অক্টোবর কলিকাতার দাদার সংবাদ নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

গতকল্য কলিকাতায় নয় জন আহত এবং দুই জন নিহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে পাঁচ জন পূর্ব কলিকাতায় দুই দল কুলির এক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল; সেখানে একটি চায়ের দোকানও লুণ্ঠ হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উত্তর কলিকাতায় পুলিশ এক দাঙ্গাকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে, ফলে দুই ব্যক্তি আহত হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে মোট হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৮ জন নিহত এবং ১৫২ জন আহত।

এই সংবাদ পড়িলেই প্রথমোক্ত ঘটনা শিয়ালদহে ঘটনাছে কি না সে সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে। দুই দল কুলিতে সংঘর্ষ, চায়ের দোকান লুণ্ঠ এবং ঘটনাস্থল পূর্ব কলিকাতা—এই তিনটি একত্র হইয়া লোকের মনে শিয়ালদহ সম্বন্ধে ভুল ধারণা অনায়াসেই জন্মিতে পারে। পূজা উপলক্ষে শহরের বহু লোক শিয়ালদহ স্টেশন হইয়া দেশে যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের উদ্দিগ্ন হইবার কারণও রহিয়াছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন এবং স্টেশনে যাওয়ার পথ নিরাপদ একরূপ ধারণা লোকের মনে জন্মিতে দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের পর বস্তুতঃই আমাদের নিকট একরূপ বহু প্রশ্ন আসিয়াছে, এবং আমরা প্রকৃত ঘটনাস্থল জানিতাম বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছি। কিন্তু সকলের ত সে সুরিধা নাই। শহরের অনেকগুলি স্থান সম্বন্ধেই লোকের মনে আশঙ্কা আছে। ঘটনার স্মৃতিক স্থানের সংবাদ চাপিয়া গিয়া সমস্ত এলাকার নাম করিলে লোকের মনে সমগ্র এলাকাটি সম্বন্ধেই ভ্রান্ত আশঙ্কার সৃষ্টি হইবে। ইহাতে বর্তমান অনিশ্চয়তা আরও বেশী বাড়িবে।

পাটের দর

ভারত-রক্ষা স্ট্রাইন অঙ্গসারে ভারত সরকার পাটের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর উহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। পাটের দর বাঁধা সম্বন্ধে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস সদস্যেরা দাবী করেন যে

সর্বনিম্ন দর ৪০ টাকার বাঁধিয়া দেওয়া হউক। মুসলিম লীগ সদস্যেরা তাঁহাদের এক বৈঠকে ইহার অনেক আগেই এক প্রস্তাব পাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে সর্বোচ্চ দর যেন বাঁধা না হয়। বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস গবর্নমেন্ট বিষয়টি সম্বন্ধে পাটচাষী এবং চটকল মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাটের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কোন দরই বাঁধা হইবে না, শুধু যে চট ও থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইবে তার মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ইহার কারণ এই যে ভারতবর্ষকে এখনও বিদেশ হইতে বহু খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবেই, ঐ সব দেশে জাতীয় মূল্যে চটের থলিয়া সরবরাহ করিতে না পারিলে খাদ্যবস্তু আমদানী অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যে আর্জেন্টিনা এতদিন ভারতবর্ষে ফসল রপ্তানী করিতে রাজী হয় নাই, সেই দেশও অতঃপর জাতীয় মূল্যে চট ও থলিয়া পাওয়ার আশায় গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ভারত সরকারকে যেমন বাঙালী পাটচাষীর স্বার্থ দেখিতে হইবে, তেমনি সমগ্রভাষে ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করিয়া চট ও থলিয়া রপ্তানীর সময় উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়া তাঁহারা অসদত কিছুই করেন নাই।

এই ব্যাপারে বাংলার লীগ-মজীমগুলি এবং লীগ পত্রিকা-সমূহ কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা আগেই বুঝা গিয়াছিল। ভারত সরকারের যে বৈঠকে পাটের মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হয় বাংলা সরকারের কোন প্রতিনিধি উহাতে যোগ দেন নাই। ভারত সরকার তাঁহাদের মত জানিবার জন্ত কলিকাতায় দূত পাঠাইয়াছিলেন, মজীরা তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই। প্রধান মজী জানাইয়াছেন যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সহিত তাঁহারা কোন সহযোগিতা করিবেন না। ভারত সরকারের নিকট হইতে অর্থ অথবা খাদ্য গ্রহণে তাঁহারা আপত্তি করিবেন কি না তাহা অবশ্য তিনি বলেন নাই। তবে পাটের যে ব্যাপারে বর্তমানে পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত তাঁহাদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক ছিল তাহা তাঁহারা করেন নাই। লীগ পত্রিকাগুলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ধূম ধরিয়াছেন যে কংগ্রেস চট ও থলিয়ার দাম বাঁধিয়া দেওয়ার পাটচাষীর সর্বনাশ হইবে, তাঁহারা পাটের জাতীয় দামে বঞ্চিত হইবে।

পাটচাষীর সঙ্গে লীগ মজীমগুলি ১৯৩৭ সাল হইতে যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহা কোনও ক্রমেই চাষীদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হয় নাই। প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইতেই পাটচাষী পাটের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়ার দাবী করিয়াছে কিন্তু ইংরেজ-ভোট হারাঁইবার ভয়ে খাজা-প্রজা কোয়ালিশন মজীমভা তাহা করিতে পারেন নাই। পরে লীগ মজীমগুলি গঠিত হইলে তাঁহারাও উহা করেন নাই। বর্তমানে লীগদল পরিষদে ইংরেজ-ভোটের উপর পূর্বের জায় নির্ভরশীল নহেন

সুতরাং কংগ্রেসের দাবী অল্পসারে পাটের সর্বনিম্ন দর তাঁহার বাধিয়া দিতে পারিতেন। তাহা করিলে ভারত সরকারকেও ঐ দর হিসাবেই চট ও বলিয়ার রপ্তানী মূল্য নির্ধারণ করিতে হইত কিন্তু তাঁহার তাহাও করেন নাই। কংগ্রেসের সহায়তায় পাট চাষীর স্বার্থ রক্ষা হয় সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার চাছেন না। চাষীর সর্বনাশ হয় হটক, তবু কংগ্রেসের সাহায্য তাঁহার লইবেন না।

পাটচাষীর সহিত ১৯৪০ সাল হইতে লীগদল মিথ্যাকার ও ছলনা করিতেছে। ঐ বৎসর বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত হইলে পাট চাষের জমি জরীপ করা হয়। কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ জরীপ বাতিল করিয়া পর বৎসর পুনরায় নতুন কঠিয়া জরীপ করা হয় এবং উহার পরিমাণ পূর্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায়। তদবধি ঐ জমির আট আনি পরিমাণ জমিতে চাষের অহুমতি দিয়া কার্যতঃ পূর্বের চাষের পরিমাণই বহাল রাখা হইয়াছে এবং তার জন্ত পাটের দাম বাড়িতে পারে নাই। উডহেড কমিশনও তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে ঐ জরীপ সঠিক মনে করিতে তাঁহার প্রস্তুত নহেন। ইহাতেও বাংলার লীগ নেতারা ধামেন নাই। যুদ্ধের সময় আমেরিকার চাপে পড়িয়া ভারত সরকার চট ও বলিয়ার সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেন এবং তদুপাসারে পাটেরও সর্বোচ্চ দর স্থির করিয়া দেন। বাংলার লীগ নেতারা ঐ সিদ্ধান্ত নতমস্তকে মানিয়া লইয়া ছিলেন। ইহার প্রতিবাদ পর্যন্ত তাঁহার করেন নাই। পাটচাষীর স্বার্থ তাঁহার গত দশ বৎসর নিজেরা রক্ষা করেন নাই। বরং ক্রমাগত নিজেদের দলগত স্বার্থরক্ষার খাতিরে উহা বিসর্জনই দিয়া আসিয়াছেন।

পাটচাষীর বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। দাঙ্গার আগে পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে দর উনিশ-কুড়ি টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, দাঙ্গার পর উহা নামিয়া পাঁচ-ছয় টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ আছে। পূর্ববঙ্গে লুণ্ঠতরাজ ও ও অরাজকতার ফলে পাট-ক্ষেতাদের দালালেরা হাজার হাজার নগদ টাকা লইয়া বাজারে বসিতে ভরসা পাইতেছে না। পাট যতক্ষণ কেনা না হয় ততক্ষণ উহা মুসলমানদের সম্পত্তি, কেনা হইলেই হইবে হিন্দুর সম্পত্তি। তখন উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে বাঁচাইবার কেহ থাকিবে না। এই জেগীর মনোভাব পূর্ব-বঙ্গের বহু স্থানে রহিয়াছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপন। বাংলা সরকার তাহা পারেন নাই, পারিতেছেনও না। বর্তমান অবস্থাতেও পাটচাষীকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস গবর্নেন্ট রপ্তানী চট প্রভৃতির যে দর নির্ধারণ করিবেন তাহা পূর্বাণেক্ষা বেশী হইবে। তদুপাসারে পাটের দর ২৫ টাকা বৈশী, এমন কি ৩০ টাকা কাছাকাছি

পড়িতে পারে। বাংলা সরকার চেষ্টা করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যাহাতে ঐ সর্বোচ্চ দরই চাষীর নিকট সর্বনিম্ন দর হইতে পারিত এবং চাষীও পাটের ন্যায্য দরই লাভ করিত। পাট ক্ষেতাদের নিরাপত্তার এবং ক্রীত পাট নিরাপদে কলিকাতায় আমদানীর ব্যবস্থা ভয়ানক কঠিন কিছু নয়, অসম্ভব তো নহেই। তাহা করিলে চাষী ঐ বৎসর পাটের ভাল দর পাইয়া হাঁফ ছাড়িতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান চাষীদের নিকট কংগ্রেসকে ছেঁয় করিবার জন্য যে অসহযোগ তাঁহার করিতে চলিয়াছেন তাহার ফলে চাষীর সর্বনাশ হইবে।

ভারতের খাদ্যবস্তু ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল বারি খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে প্রেস রিপোর্টারকে বলিয়াছেন যে, নানা কারণে দেশে খাদ্যসদ্যট দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই, যখন ভারতে চাষ-বাসের অবস্থা ভাল, বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করিয়া ডাল ইত্যাদি আমদানী করিতে হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ সকল বন্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সামরিক বিভাগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিতেছেন। এই সমস্ত ক্রীত খাদ্যবস্তুর যথেষ্ট পরিমাণ অংশ শোচনীয়ভাবে অপচয় হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণ ব্যতিরেকেও মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি কারণে খাদ্য-দ্রব্য বাজার হইতে সরিয়া যাইতেছে। লাভ করিবার লোভে বিক্রেতাগণ তাহাদের ধর্মবুদ্ধি এবং কতব্যবোধ ভুলিয়া যাইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, 'খাদ্য বাড়ানো' আন্দোলন আমাদের দেশে একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। সাধারণভাবে ইউরোপ অথবা আমেরিকার ক্ষেত হইতে যা শস্ত উঠে ভারতে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের মধ্যে বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও দ্বিগুণ পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইয়াছে।

জগতের সমস্ত বড় বড় দেশগুলি সমস্ত খাদ্যসম্পদ কিনিয়া সরকারী গুদামজাত করিতেছে। সেসব স্থলে সরকারই একচেটিয়া খাদ্য বণ্টক ও সরবরাহকারী। প্রাথমিক ভাবে যাহারা খাদ্য-শস্ত উৎপন্ন করিয়া থাকেন, সরকার সেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন। তাহার পর একটি দাম স্থির করিয়া সেই মূল্যে সকল কিছু অর্থাৎ খাদ্যবস্তু, বস্ত্র ইত্যাদি বণ্টন করিয়া দিতেছেন। ভারতবর্ষও যদি অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে তবেই বাঁচিতে পারিবে।

তিনি বলেন যে, বর্তমানে আমাদের সম্মুখে একটি কঠিন কতব্য রহিয়াছে। সরকারী সাহায্যে এবং আহুকুল্যে চাষের উপযুক্ত জমিগুলির যতটা সম্ভব উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া পণ্য-প্রস্তুতের জন্তও একটি সংস্কৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত পণ্য একটি বাঁধা

দামে বাজারে বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর কাপড়ের বিষয়েও এ কথা বলিতে হয় যে মাথাপিছু কাপড়ের বরাহ আরও বাড়ান দরকার। গ্রামে পঞ্চায়ত এবং শহরে ভদ্রব্যক্তিগণকে লইয়া সংসদ গঠন করিয়া বস্ত্র-বর্টনের ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে। কোন ক্রমেই যেন কোন কোন অঞ্চলে প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিমাণ না পাঠান হয়। এ বিষয়ে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে, যে সমস্ত ক্রমা কাপড় তৈরী অবস্থায় বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই বাজার হইতে উড়িয়া যায় এবং সুযোগ মত বিক্রেতাগণ গলাকাটা দাম আদায় করিয়া নেন।

তিনি বলেন যে, গবর্নমেন্টের একচেটিয়া ক্রয়নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমে যাহাদের হাত হইতে মাল বাহির হয়, তাহাদের কাছ হইতেই সব সংগ্রহ করিয়া ফেলিতে হইবে। শুধু ইহা করিলেই চলিবে না, বর্টন, সংগ্রহ, সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ প্রয়োজন।

পরিশেষে অধ্যাপক বারি বলেন যে, বর্তমান সময়ে মাল অযথা গুদামজাত করা, উচ্চ দামে বিক্রয় করা ও এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে জুয়াচুরী অতঃপক্ষে যে সমস্ত আইন ও ব্যবস্থা আছে তাহা উপযুক্ত নহে। বর্তমান খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যাদি বিষয়ে যে সবট দাঁড়াইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক জেলায় স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক জেলায় বার জন করিয়া উপযুক্ত নাগরিক অথবা আজাদ হিন্দ কৌজের সদস্য লইয়া 'স্পেশাল পুলিশ' গঠন করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারের কাজে এই 'স্পেশাল পুলিশ' মাথা ধামাইবে—তাহারা চোরাবাজার, জুয়াচুরী ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ করিয়া নজর দিবে। গবর্নমেন্টের এখন ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডভাইসরি কমিটি ভাঙিয়া ডিষ্ট্রিক্ট কর্টেপাল কমিটি গড়িয়া তোলা উচিত। এই কর্টেপাল কমিটি অন্ততঃপক্ষে (১) অনুমতিপত্র দেওয়া ও বাতিল করিয়া দেওয়া এবং (২) অযথা গুদামজাত মালগুলি বাজেয়াপ্ত করা ও পুনর্বর্টন ব্যাপারে ক্ষমতাসীল থাকিবে।

যুক্তপ্রদেশে খাত্তসংগ্রহ প্রচেষ্টা

যুক্তপ্রদেশের খাত্তসংগ্রহ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গত ৩১শে আগষ্ট তারিখ নাগাদ যে পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহের কথা ছিল তাহার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সরকারী গুদাম-জাত হইয়াছে। প্রথমে যখন এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন খাদ্যসংগ্রহ প্রচেষ্টার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। কৃষকেরা সহজেই চোরাবাজারে যে দাম পাইতে পারিত তাহার অপেক্ষা কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরকারকে বিক্রয় করার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল। কিন্তু কংগ্রেস গবর্নমেন্ট অত্যন্ত বৈর্যসহকারে এবং কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ধীরে ধীরে হাজার হাজার টন পরিমাণ শস্ত সংগ্রহ করিয়া গবর্নমেন্টের গুদামজাত করাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ হইতে ছুর্ভিক্ষের

বিভীষিকা এখন একেবারে অপসারিত হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে পণ্ডিত পন্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি যুক্তপ্রদেশে একটিও নরনারী অথবা শিশুকে অনাহারে মরিতে দিবেন না। তাহার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইয়াছে।

পণ্ডিত পন্থ এখন জনসাধারণের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থার আগাগোড়া সংস্কারের দিকে নজর দিয়াছেন। প্রথমে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী হাতে ক্ষমতা পাইল তখন সিভিল সাপ্লাইয়ের অবস্থা এবং ব্যবস্থা কতকটা ধাপছাড়া ধরণের ছিল। খাদ্যসংগ্রহ, বর্টন ও সরবরাহের ব্যবস্থা হুই জন প্রবীণ কর্মচারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই হুই কর্মচারীকে সেক্রেটারিয়েট এবং এম্বিকিউটিভ হুই ব্যাপারেই মাথা ধামাইতে হইত। কাজে-কাজেই আসল কাজের ব্যাপারে গণগোল উপস্থিত হইয়াছিল। পণ্ডিত পন্থ প্রথমে এই হুই কাঙ্ক্ষকে পরস্পর সংযোগহীন ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন এবং এক জন স্বতন্ত্র 'ফুড কমিশনার' নিযুক্ত করেন। এই ফুড কমিশনারের উপর খাত্তসংগ্রহ, খাত্তবর্টন, বেসামরিক-সরবরাহ, প্রাদেশিক বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও শর্করা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সিভিলিয়ানগণের অত্যন্ত বিশিষ্ট কর্মী ত্রীযুক্ত ভগবান সহায়ের উপর কাজটির ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

ফুড কমিশনারের অধীনে চারি জন কর্মচারী আছেন। এই চারি জন কর্মচারীকে খাত্তবর্টন এবং বেসামরিক সরবরাহের ডিপুটি ডাইরেক্টর বলা হয়। তাহারা যথাক্রমে খাত্তসংগ্রহ, খাত্তবর্টন, এবং বস্ত্র ও চিনি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। বেসামরিক খাদ্যসরবরাহের সেক্রেটারী এখন কেবলমাত্র কাগজপত্র সম্বন্ধীয় কাজই করিবেন।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে সুফল ফলিয়াছে এই যে অত্যন্ত বছর সামান্য ছুর্ভিক্ষ ও বত্বাদিকারণ ঘটিত অবস্থা আসিলেই জনসাধারণের কাতর আর্তনাদের অবধি থাকিত না। কিন্তু বর্তমান বৎসরে বালিয়া জেলার তিন-চতুর্থাংশ, গোরখপুর অঞ্চলের বহুস্থান, কান্ধী এবং আংশিকভাবে সীতারামপুরে প্রাণ হইলেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী আর একটি বিরাট সমস্তার সমাধান করিয়াছেন। জেলার সরবরাহ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা প্রায়শঃই স্বজন-প্রীতি ও অন্যান্য অপকার্যে হুই। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ত্রীযুক্ত চন্ড্রভান শ্রুপ্তের নেতৃত্বে একটি গুপ্ত কমিটির দ্বারা সম্যক পরিদর্শনের পর প্রত্যেক ব্যক্তি কতটা কাপড়, কোরোসিন, চিনি ইত্যাদি পাইতে পারে এবং বিশেষ পার্বণাদি উপলক্ষেই বা কতটা পাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে বাধাবাধি নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। জনসাধারণ-গঠিত একটি পুনর্বিচারি কমিটি ক্রমাগত

সরবরাহ স্বত্বীয় নিয়মাবলীর আলোচনা ও প্রয়োজনমত নিয়মাবলীর পরিবর্তনের সুপারিশ করিবে। লাইসেন্স কমিটি নামে আখ্যাত একটি কমিটি সমস্ত খাদ্য সরবরাহের দোকানগুলির বোঝাধর লইবে এবং তাহাদের হিসাবপত্র দেখিবে। তাহাদের অহুমোদনেই দোকানগুলিকে রেশন দ্রব্যাদি সরবরাহের অহুমতি-পত্র দেওয়া হইবে। তাহার ফলে সময় সময় যে রাজনৈতিক স্বার্থচুঁই নেতারা আত্মস্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহারও সুরাহা হইবে।

আরও একটি কমিটি গঠিত হইবে খাদ্যদ্রব্যের উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্ত। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্ত প্রদেশের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হইবে। খাদ্য সরবরাহের দোকান হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া যদি প্রয়োজন বোধ হয় তবে বাজার হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে।

সিভিলসাপ্লাই ব্যাপারের নানা কৰ্তব্যচ্যুতি এবং দুর্নীতি ইত্যাদির জন্ত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে এগার জন কর্মচারীর ইতিমধ্যেই শাস্তি হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্পের অবস্থা

ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের নূতন সংস্কার পরিকল্পনার কথা কঠিন-ওয়ার্কে পার্টের এক রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও তাহাকে বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সুস্থ ব্যবস্থা বলা যায় না, তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা হইতে আমাদেরও অনেক কিছু শিখিয়া লইবার আছে। কেবলমাত্র যে কলকারখানা বিষয়ের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা ইহাতে আছে তাহাই নহে, ইহার মধ্যে সমগ্র বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতিও নজর দেওয়া হইয়াছে।

শুধু আমাদের কেন, ব্রিটিশ বয়ন-শিল্পেরও বর্তমান ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলা যাইতে পারে। ১৯৩০ সালে যে অহুসন্ধান কার্য হইয়াছিল তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে বিলাতের প্রায় $\frac{১}{৩}$ হইতে $\frac{১}{২}$ অংশ পরিমাণ যন্ত্রাদি বিশ বছরেরও বেশী পুরাতন। আমাদের অবস্থা তো আরও খারাপ। মোটামুটি ভাবে যন্ত্রগুলি যে কেবলমাত্র পুরাতন তাহাই নহে, বর্তমান সময়ের হিসাবে এক রকম কাজের বাহিরেও বটে। সুতা কাটার ব্যাপারে যদিও 'মিউল স্পিণ্ডল' ব্যবহারের দ্বারা কতকটা আধুনিকতা বজায় আছে, বয়ন ব্যাপারে মোটেই সে কথা খাটে না। কারণ শতকরা ৫টি স্বয়ংক্রিয় মাকুর তাঁতের ব্যবহার আছে। এই হিসাবে আমেরিকায় শতকরা ৭৫টি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা। কেবলমাত্র বস্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেই যে সংস্কার সম্ভবিত আবশ্যিক তাহা নহে শ্রমিক চাকল্যের জন্যও ইহার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

যদি আমেরিকার পদ্ধতি অহুযায়ী নূতন যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার ব্যবস্থা করা হয় তবে সুতাকাটা বিভাগে শতকরা ৩৮ ভাগ, বয়ন বিভাগে শতকরা ৬২ ভাগ, এবং পরিচালন বিভাগে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। যে

গণ্ডাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হইবে তাহাতে শতকরা ৫২ই ভাগ এবং যে গণ্ডাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ হইবে, তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন থাকিবে না।

'প্লাট রিপোর্টের' অহুমোদন অহুসারে অন্যান্য সংস্কার-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বিশ্রাম করিবার জন্ত স্থান, বৈদ্যুতিক এয়ার-কন্ডিশন করার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের দুর্ঘটনার প্রতিকারে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য শ্রমব্যাপারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিবার আয়োজন হইতেছে। হিসাব করিলে দেখা যায় সুতাকাটার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি একরকম সম্পূর্ণ ভাবেই টেকসটাইল মেশিনারী লিমিটেডের হাতে। বর্তমান সময়ে এই কোম্পানীর সামর্থ্য অহুযায়ী বৎসরে ১০ লক্ষের কিছু বেশী সংখ্যক তক্কা পাওয়া সম্ভব। তবে এই কোম্পানী শীঘ্রই তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী বর্ধিত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। 'ওয়াইডিং ও ব্রিমিং' বিভাগের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয়, তাহাতে দেশের চাহিদা কোন প্রকারে মিটিতে পারে। সাধারণ অবস্থায় ওয়ার্প ওয়াইডিং যন্ত্রের শতকরা ৪৫ ভাগ এবং ওয়েকট ওয়াইডিং যন্ত্রের শতকরা ২৫ ভাগ বাহিরে রপ্তানী করা হইয়া থাকে। বয়ন বিভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির জন্ত নর্থপ-কোম্পানী ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ৬০০০ মাকু সরবরাহ করিবার আশা দেন। তাহার মধ্যে ২০০০ মাকু বাহিরে রপ্তানী হইবে। উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যেরই চাহিদা মিটান সম্ভব নহে। ফিনিশিং সেকশনের কাজের যন্ত্রাদির জন্ত ৬টি কারখানা আছে। ইহার বিভিন্ন প্রকারের ফিনিশিংয়ের যন্ত্রাদি তৈয়ার করিয়া থাকে। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের যেটুকু অভাব ঘটিত তাহা জার্মানী হইতে আনা হইয়া লওয়া হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঠিক পরিমাণ মত যন্ত্রাদি আমাদের ভাগ্যে মিলিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চাহিদা মিটাইবার পর ব্রিটেন হইতে যন্ত্রাদি রপ্তানীর জন্ত আর কিছুই উদ্বৃত্ত থাকা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট চিন্তা করিবার আছে, কারণ আমাদের দেশের নূতন যন্ত্র বসাইতে ও সংস্কার করিতে এই সমস্ত খুঁটিনাটির প্রভাব যথেষ্ট। নূতন যন্ত্র বসাইবার ব্যয় যথেষ্ট। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে যে ব্যয় সম্ভব ছিল, এখন তাহা হইতে সুতাকাটা যন্ত্রাদির ব্যাপারে ৬৫%, এবং স্বয়ংক্রিয় মাকু বসাইতে ৫০% ব্যয় অধিক পড়িবে। ল্যাক্সাশায়ার মার্কা মাকুর জন্ত ৭০% হইতে ৮০%, ওয়াইডিং ব্যাপারে ৭০% এবং ফিনিশিংয়ের যন্ত্রাদির জন্ত ৭৫% হইতে ১০০% ব্যয়ভার বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

দেশীয় বস্ত্রশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে প্রথমে বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক খুঁটিনাটি হিসাব লইতে হইবে। তাহার পরে নূতন যন্ত্র সংযোজন ও সংস্কার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বোম্বাইয়ের কমার্স পত্রিকা এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্ত দেশীয় কারখানাগুলির স্বত্বাধিকারিগণের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমিতি গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। যাহাতে ব্রিটেনের কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির উদ্ভূতগুলি এ দেশে আনা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে এক সঙ্গে সবকিছু করা সম্ভব নহে; সুতরাং যাহাতে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করিয়া উঠা যায় সেই চেষ্টাই আগে করা কর্তব্য।

বস্ত্রসরবরাহ সমস্যা

গত কিছুকাল হইতে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে জনসাধারণের নানা প্রকারের আপত্তি-আলোচনা শুনা যাইতেছে। যে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আজ প্রায় তিন বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়াও জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারিতেছে না, তাহার নিন্দা তো করিবারই কথা।

বোম্বাই মিল-মালিক সমিতির সভাপতি সার বিঠল চন্দা-বরকার গত সাপ্তাহিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের সরবরাহের সহিত এখন আর বিশেষ পার্থক্য থাকিবে না। সেই অল্পপাতে সরবরাহ করিতে মিলগুলি এখন প্রায় সমর্থ। এই উক্তির ফলে জনসাধারণ মনে করিয়াছিল যে তাহারা যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের মত এবং সেই পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু গত ৩৪ মাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে সার বিঠল চন্দাবরকারের দ্বারা বিশেষজ্ঞের আশা ফলবতী হয় নাই।

কাপড়ের কলগুলি এ বিষয়ে একমাত্র অপরাধী নহে। বর্তমান বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের ফলে কাপড়ের কলগুলি প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিমাণ মত বস্ত্র বয়ন করিতে পারিতেছে না। ইহার উপর আছে শ্রমিক ধর্মঘট এবং চোরা-বাজার। কোন কোন কারখানার বস্ত্র চোরাবাজারে যায় ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্প্রতি কতকগুলি কারখানা হাত-বদল হইয়াছে। এখানে অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে এই মালিক পরিবর্তনের দ্বারা কোন প্রকার চোরাবাজারী-সরবরাহের সুবিধা হইয়াছে কিনা।

বর্তমানে শহরগুলির খুচরা সরবরাহ ব্যাপারেও গণগোল। কতকগুলি পার্বত্য দেশীয় অঞ্চলে এবং কতকগুলি গ্রাম এলাকায় এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে সেখানে কেবল-মাত্র খুচরা সরবরাহ ব্যাপার ছাড়া পাইকারী বিক্রয়েও চোরাবাজার হইতেছে। যাহাই ঘটনা থাকুক এ বিষয়ে কোন প্রকার অবদোষিত করা সম্ভব কিনা তাহা প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা দরকার, বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সমিতির হাতে উহা ছাড়িয়া রাখা যায় না। দুই বৎসর আগে কতকগুলি প্রদেশ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নজির দেখাইয়া যাহাতে বস্ত্রবর্জন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে আসে

সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সমিতির সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে প্রদেশের হাতে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ভার আসার পরেও বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা যায় নাই।

কলিকাতা শহরের বস্ত্রবর্জন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে চোরাবাজার এবং নিয়ন্ত্রিত দোকান দুই প্রকারই সমানতালে চলিতেছে। কিন্তু বাংলা সরকার চোরাবাজার দমনের কোন প্রকারের ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। দোকানগুলিতে অনবরতই ভীড় ও লম্বা লাইন কেন হয় সে কথা কে বলিবে?

উড়িষ্যার রাজধানী

উড়িষ্যার রাজধানী শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে স্থাপিত করাই হির হইল। বহুদিন যাবৎ উড়িষ্যার রাজধানীর স্থান নির্বাচন চলিতেছিল, কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নাই। এতদিনে তাহা হইল। প্রথমে একটি কমিটি কর্তৃক তুলসীপুর অঞ্চলকে রাজধানীর জন্য নির্বাচন করিলেন। বিশেষজ্ঞরা উহা অনুমোদন করিলেন না। তারপর একবার বহরমপুরের নিকটবর্তী রাঙ্গাইলুড়া, একবার খুঁদার নাম হইল। কর্তৃকের নাম আবারও উঠিল। কিন্তু ইহাদের একটিও শেষ পর্যন্ত সর্বজনসম্মত হইল না। আবার কমিটি বসিল। হির হইল যে, ইহা কর্তৃকের বিপরীত দিকে মহানদীর অপর পারে চৌদ্দুয়ার রাজধানী হইবে। সম্প্রতি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহতাব এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিয়া ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা লাভও করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থিতি বিজড়িত পুরাতন স্থান। উড়িষ্যার রাজধানী নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা উহার আছে। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর কাল ধরিয়া রাজধানী নির্বাচনের পরিশ্রম এতদিনে সাফল্যমণ্ডিত হইল।

প্রমথ চৌধুরী

বিগত ১৬ই ভাদ্র, সোমবার রাতে ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে—পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সার আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। জন্মস্থান যশোহর হইলেও তাঁহার বাল্য ও কৈশোর কৃষ্ণনগরেই কাটে। প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া প্রমথ চৌধুরী বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিলেন কিন্তু কোর্টে কখনও প্র্যাকটিস করেন নাই। তিনি এক-সময়ে প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। এই দুই ভিন্নপ্রকৃতি পুরুষের

এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল ছিল; উভয়েই রবীন্দ্রনাথের একান্ত অমুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়াও উভয়েই নিজদের স্বাভাব্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সহিত প্রমথনাথের বিবাহ হয়। ফরাসী সাহিত্যের ভক্ত বলিয়া চৌধুরী-দম্পতির খ্যাতি আছে। এই ফরাসী সাহিত্যে অমুরাগ ও অভিজ্ঞতা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনার রূপে একটা অপূর্বতা এবং অভিনবত্ব আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। তিনি প্রবন্ধকার, সমালোচক, কথাসাহিত্যিক, দার্শনিক এবং কবি। “পদচারণ”, “সনেটপঞ্চাশৎ” প্রভৃতি তাঁহার কবিতার বই। শেষোক্ত পুস্তকের চতুর্দশপদীগুলি বাংলায় সনেটকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রমথনাথ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক হইয়াও কথাসাহিত্যে তাঁহার একান্ত নিজস্বতা তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দান করিয়াছে। ঘোষাল এবং নীললোহিতের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। “চারহাজারী কথা” সাহিত্যের এক অভিনব বস্তু। এমনতর ছোট গল্প তাঁহার পূর্বে বা পরে আর কেহ লেখে নাই, তিনিও আর লেখেন নাই। জীবনের প্রতি নূতন দৃষ্টি—শুধু গল্পকেই নয় তাঁহার সকল রচনাকেই অভিনবত্ব দান করিয়াছে। তিনি অনেক সময় “বীরবল” ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখিতেন। গদ্যে তিনি যে নবরীতির বাস্তবিক প্রবর্তন করেন তাহা “বীরবলী ভাষা” নামে পরিচিত। পূর্বে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, এমন কি যয়ৎ রবীন্দ্রনাথও চলিত ভাষায় লিখিবার রীতি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বীরবল চলিত ভাষাকে জাতে তুলিলেন। সাধু ও সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিয়া নয়, কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদকে লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ করিয়া তিনি ভাষাকে লঘুভার ও ক্ষিপ্ৰগতি করিলেন। রস, রসিকতা, ব্যঙ্গ ও বিজ্ঞপ প্রয়োগে “বীরবল” সিদ্ধহস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় সমকালে ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরী “সবুজপত্র” প্রতিষ্ঠা করেন। “সবুজপত্র”—প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে নব-যুগের সূচনা করে। এই পত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি চলিত ভাষায় লিখিবার রীতি প্রচার করেন। এই পত্রে তিনি শিক্ষাইলেন, সৃষ্টি করিয়া বলিতে পারিলে সকল বস্তুই উপভোগ্য হয়, বঙ্গীয় প্রজাবহু আইন হইতে ভারতবর্ষের ভূগোল পর্যন্ত সকল বিষয়কেই সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করা যায়। সাহিত্যে তাঁহার দানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে “জগদ্রাশিকী পদক” প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ততঃ্য হলে এক বিরাট সভায় “প্রমথ জয়ন্তী” অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার রচনারীতি, তাঁহার ভাব-স্বাভাব্য এবং তাঁহার

সৃষ্টি সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীকে অরণীয় করিয়া রাখিবে।

লালগোলায় মহারাজা

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলায় মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় গত ১৮ই আগষ্ট নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একশত ছয় বৎসর হইয়াছিল। আজীবন মিতাচার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের নিয়মাদি পালন হেতু তিনি এরূপ দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্তও তিনি সবল স্বস্থ ও কর্মক্ষম ছিলেন। বিপুল ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। স্বাভাবিক বিনয় ও ওদারদৃষ্টিতে তিনি আপামর-সাধারণের শ্রদ্ধাশ্রীতি অর্জন করেন। সাধারণ জমিদারদের ভায় কলিকাতার মত বড় শহরে ভীড় না জমাইয়া নিজ জমিদারী ও আবাসস্থল লালগোলায় তিনি আজীবন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়, বিশেষ করিয়া নিজ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত জনসমাজের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম বয়স হইতেই তিনি দানশীলতার পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু রাস্তাঘাট মন্দিরাদি নির্মাণ, পুরাতন পুস্তকিণী সংস্কার, নূতন জলাশয় খনন, এবং দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ইন্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেস, এমন কি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্বে যখন জেলায় জেলায় রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ হয় তখন বহরমপুরেও একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হইয়াছিল এবং যুবক যোগীন্দ্রনারায়ণ তাহার একজন উদ্যোগী কর্ণধার হন।

বঙ্গভারতীর প্রতীক কলিকাতার মূল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যোগীন্দ্রনারায়ণের নিকট অশেষ-ভাবে ঋণী। বর্তমান পরিষদ-ভবনের দ্বিতল নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেন। পরিষদ কর্তৃক বোদ্ধগান ও দোহা, সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (তিন খণ্ড) ও ব্রহ্মসূত্র বা-বেদান্ত দর্শন (পাঁচ খণ্ড) মুদ্রণ ও প্রকাশার্থ যাবতীয় ব্যয় অনুদান গ্রহণ হাজার টাকা যোগীন্দ্রনারায়ণ দান করিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তক প্রকাশের জন্যও তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাত হাজার নয় শত টাকা দান করেন। অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ডের হাজার টাকা দ্বারা পরিষদের একটি গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল গঠিত হয়। এই তহবিলের উপরস্থ হইতে বঙ্গীয়া শব্দকোষ (চারি খণ্ড), চণ্ডীদাসের পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, নেপালে বঙ্গালী নাটক, ন্যায়দর্শন (প্রথম ভাগ), সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুই খণ্ড) প্রভৃতি বাংলা ভাষার অমূল্য গ্রন্থরাজি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞা-সাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির সম্পূর্ণ বন্ধকী স্বত্ব পরিষদে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণে বাঙালী তথা বঙ্গভারতী একজন পরম হিতকারী বাহুব হারাইল।

বৈদিক আর্য এবং ইরানীয় আর্য

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

“বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য” প্রবন্ধে (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) ধর্মসংক্রান্ত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবাদে ফলে বৈদিক আর্যগণ ইরানীয় আর্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিক্ উপত্যকা অভিমুখে চলিয়া আসেন এবং এই বিবাদ জরাথুষ্ট্রের ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের মূল কারণ,—এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা—প্রসঙ্গে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে দেবধর্ম ও অহরাধর্মের মধ্যে যে বিরোধ আবেস্তার প্রাচীনতম অংশে দেখা যায় তাহা ইরানীয় বা আবেস্তিক আর্য এবং বৈদিক আর্যগণের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ বা বিচ্ছেদের সমসাময়িক ব্যাপার নহে, এই বিরোধ অনেক পরের ঘটনা। অর্থাৎ, কেহ কেহ যেরূপ মনে করেন, জরাথুষ্ট্রের আন্দোলনের ফলে বৈদিক আর্যগণ ইরান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই, ভারতীয় আর্যগণের ধর্মের প্রচার প্রতিরোধ করিবার জন্ত জরাথুষ্ট্রের আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বয়ংদে ও আবেস্তার ভাষা এবং ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হইতে এই অল্পমানের সপক্ষে যতখানি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ এই অল্পমানের সপক্ষে পাওয়া যায় কিনা দেখা প্রয়োজন।

বর্তমান প্রবন্ধে জরাথুষ্ট্রের ধর্মসংস্কারের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ইরানীয় আর্য ও বৈদিক আর্যগণের সম্পর্কের আলোচনা করা হইবে।

বৈদিক আর্যগণের সহিত তাহাদের ইরানীয় জ্ঞাতিদিগের বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল বালখে এইরূপ অল্পমানের কারণ সহজে বুঝা যায়। পূর্ব ইরান বা বালখ জরাথুষ্ট্রের জন্মভূমি এবং আবেস্তা ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বালখে। বৈদিক ভাষার সহিত যে সাদৃশ্য জরাথুষ্ট্রের রচনা বলিয়া অল্পমিত আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ গাথার ভাষায় দেখা যায় সেই গাথার ভাষা ইরানীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি পূর্বশাখাভুক্ত। গাথার রচনা কালে এই ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল। এই বিচ্ছেদ অবশ্য গাথা রচনার পূর্বেই ঘটয়াছিল, কারণ বৈদিক ভাষায় আদিভাষার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা যায় এইরূপ বলা হইয়াছে। জরাথুষ্ট্রের সময় পর্যন্ত বৈদিক আর্যগণ বালখে থাকিলে ভাষার এই বিচ্ছেদ ঘটবার কোনই কারণ থাকিত না। তারপর ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীর পশ্চিমশাখার ভাষার যে নিদর্শন হাকামনি সম্রাটগণের লেখনগুলিতে দেখা যায় পণ্ডিতগণের মতে পূর্ব-ইরানীয় ভাষার সহিত সম্পর্কিত হইলেও তাহা

কতকটা সেমিটিক মিশ্রিত। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে প্রাচীন ইরানীয় প্রচলিত মত গ্রহণ করিলে (খৃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে) এই সকল লেখনের সময় গাথার রচনার কাল হইতে দুই শত বৎসরের পরবর্তী দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে যে সকল প্রমাণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিচার করিলে জরাথুষ্ট্রের ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের সঙ্গে বৈদিক আর্যগণের সহিত ইরানীয় আর্যগণের বিচ্ছেদের কাহিনীকে কোনমতে যুক্ত করা যায় না। যুক্ত করা হইয়াছে আর্যবাদ সম্বন্ধে পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে।

সে যাহা হউক, ভাষায় আবেস্তার প্রাচীনতম অংশের সহিত এবং আবেস্তার ধর্মের সহিত বৈদিক ভাষা ও ধর্মের যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যাকটিয়া বা বালখ আবেস্তিক আর্য ও বৈদিক আর্য উভয় দলের প্রাচীন বাসভূমি ছিল। এই মূল আর্য জাতির উৎপত্তি বালখে অথবা তাহার অল্প কোন স্থান হইতে বালখে আসিয়াছিল কিনা এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে করা হইতেছে না।

বালখের যে আর্যজাতিকে আবেস্তিক আর্য বলা হইয়াছে তাহারা ইরানীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। বালখ বা ব্যাকটিয়া ইরান বলিতে যে অঞ্চল বুঝায় তাহার পূর্বাঞ্চলের একটি অংশ মাত্র। সাধারণতঃ ইরান অর্থে পারশ্ব মনে করা হয় কিন্তু পারশ্ব, পারশিশ, পার্শ বা ফার্স মিডিয়ায় দক্ষিণে, সুসার দক্ষিণ-পূর্বে ও কারমেনিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর ইরানের একটি প্রদেশ মাত্র। এই পার্শ্ব প্রদেশের নাম হইতে দেশের পারশ্ব নাম আসিয়াছে। বৃহত্তর ইরান ককেশাস হইতে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উচ্চভূমির অঞ্চল। বর্তমান পারশ্বের ভৌগোলিক সীমানা উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে কিছু পরিবর্তন সহ বৃহত্তর ইরানের সীমানা। এই অঞ্চলের পূর্বাংশে বালখ, স্বগদা আরিয়া বা হারি, আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা লইয়া গঠিত। পশ্চিমাংশে ইরাক আজেমী, কুর্দীস্থান, আজারবাইজান লইয়া গঠিত মিডিয়া। মিডিয়ায় উত্তর-পশ্চিম সীমানা আমেনিয়ার মধ্যে পর্যন্ত বিস্তৃত।

মিডিয়া হইতে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমির অধিবাসীদিগকে প্রাচীন ইরানীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বলা হয়। প্রাচীন ইরানীয় ভাষা-গোষ্ঠীর পূর্বশাখার ব্যাকটিয়ার ভাষা খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে অপ্রচলিত হইয়া যায়। জেন্দাবেষ্টার জেন্দ অংশের ভাষা পল্লবী। ব্যাকটিয়ার প্রাচীন ভাষা ব্যতীত স্বগদী (সগ্‌ডিয়ানায় ব্যবহৃত), আওলী

(জাবলিস্থানে ব্যবহৃত), স্কজাই (শকস্থানে ব্যবহৃত), হিরহবই (আরিয় বা হিরাট অঞ্চলে ব্যবহৃত) ভাষাও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম শাখার তিনটি মাত্র ভাষা প্রচলিত, ফার্সী (পারসিপোলিস বা ইস্তাখারে ব্যবহৃত), দারী বা প্রবীয়া ভাষা (বালখ, বোখারা, মার্ত ও বাদাকসানে ব্যবহৃত), এবং পহলবী (রায়, ইম্পাহান ও দিহুর জেলায়) ব্যবহৃত। কেহ কেহ বলেন দারী ও ফার্সী একই ভাষা। ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর এই সকল শাখা ব্যতীত সম্পর্কিত ভাষাও কতকগুলি আছে, পশ্চিম অঞ্চলের আর্মেনীয় ও ওসেটিক (ককেশাসের কয়েকটি ক্ষুদ্র উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত) ও পূর্বাঞ্চলের পুস্ত। পামীরের ও হিন্দুকুশের কতকগুলি উপজাতির ভাষা ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কিত।

প্রাচীন ইরানী ভাষার পূর্ব শাখার একটি মাত্র দলিল বর্তমান; উহা গাথা ও আবেস্তার ভাষা। পশ্চিম শাখার (পারশ ও মিডিয়ায় ব্যবহৃত) ভাষাগুলির মধ্যে মাত্র একটি প্রাচীন নিদর্শন অবশিষ্ট। ইহা হাকামনি সম্রাটদিগের লেখন। সামান্য আমলে পরিবর্তিত রূপে এই প্রাচীন ভাষা পহলবী নামে পরিচিত হয়। ইহার বর্তমান পরিবর্তিত রূপ ফার্সী ভাষা। কেহ কেহ বলেন, পহলবী ও প্রাচীন ফার্সী এক নহে, প্রাচীন ফার্সীর নাম ফার্সী কাদিন এবং পহলবী ও উহা পাশাপাশি বর্তমান ছিল।

ভাষার দিক দিয়া দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমে ককেশাস হইতে পূর্বে আকগানিস্থান অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইরানী ভাষাগোষ্ঠীর শাখা ও ঐ গোষ্ঠীর সম্পর্কিত ভাষাভাষীর অঞ্চল। বলা বাহুল্য ইরানী ভাষা-গোষ্ঠীর অধ্যুষিত এই অতি বিস্তৃত ভূভাগ প্রাচীন ইরানীয় আৰ্য জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল একথা বলা হয় না। না বলিবার কতকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সেমেটিক ও উত্তর-পূর্ব হইতে মোঙ্গল, উজ্জবেগ, শক, ছন প্রভৃতি বিভিন্ন যাযাবর জাতির তরঙ্গ পুনঃপুনঃ ইরান প্রাণিত করিয়াছে। এই সকল জাতির অনেকে ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত।

এইবার এই পটভূমিতে ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে।

সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মধ্যে ইরান বা পারশ একমাত্র দেশ যাহা স্বদূর অতীতকাল হইতে যুরোপের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম চালাইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিম-এশিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির অভ্যাদয় ঘটিয়াছে টাইগ্রিস ও

ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া। প্রাচীন বাবিলো-নীয় ও আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন হইলে মিডিয়ান সাম্রাজ্যের অভ্যাদয় হইল। ঐতিহাসিকগণের মতে ডিওসেন বা ডাজাকারু মিডিয়ান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আসিরীয় সম্রাট সারগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া আটক করেন খ্রিঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি পলায়ন করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসেন এবং একবাটানায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজা সমগ্র পারশিষ দখল করেন। আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভে অবরোধ করিবার কালে তিনি নিহত হন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাট (কিয়াকজারেস খৃঃ পূঃ ৬২৫-৫৮৫) নিনেভে অধিকার ও ধ্বংস করেন। আসিরীয় ব্যতীত আর্মেনীয় ও কাপাডোশিয়া (এশিয়া মাইনর) তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার রাজত্বকাল মিডিয়ান সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। তাঁহার পুত্র আষ্টিয়া-জেশের (বাবিলনীয় লেখনের ইস্ট ডিগ) রাজত্বকালে পারশের অন্তর্ভুক্ত আনসানের হাকামনি বংশীয় রাজা সাই-রাসের নেতৃত্বে পারশের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মিডিয়ান সম্রাটের সৈন্যদলের একাংশ বিদ্রোহী হইয়া সাই-রাসের সঙ্গে যোগদান করে ও সম্রাটকে বন্দী করিয়া সাই-রাসের হাতে সমর্পণ করে। এই ভাবে মিডিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল ও হাকামনি সাম্রাজ্যের অভ্যাদয় আরম্ভ হইল। (খ্রিঃ পূঃ ৫৫০) ঐতিহাসিকগণের মতে সাইরাস কর্তৃক মিডিয়া বিজয়ের অর্থ ইরানীয় সাম্রাজ্য ইরানীয় গোষ্ঠীর এক জাতির হাত হইতে অন্য জাতির হাতে গেল, ইহার অর্থ এই নহে যে মিডিয়ান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। পারশের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ব্যবস্থাসমূহ মিডিয়ান ব্যবস্থার অনুল্লকরণে গঠিত হইয়াছিল। সাইরাস রাজ্য লাভ করিয়া মিডিয়ান প্রসিদ্ধ রাজা ক্রিসাসকে পরাজিত করিয়া রাজধানী সার্ডিস অধিকার করিলেন। বাবিলোন, সিরিয়া ও ফিনিসীয়ার নগরগুলি তাঁহার দখলে আসিল। পূর্ব দিকে খাহবারিজম (খিভা), সুগদা (বোখারা ও সমরকন্দ) ও সম্ভবতঃ বালখ, আরিয়া (হিরাট) ও আরাকোশিয়া (কান্দাহার) সাইরাসের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরাথো ও নিয়ারকাসের মতে সাইরাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাকলালাভ করিতে পারেন নাই। সাই-রাসের মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। অল্পমান করা হয় ইরানের মালভূমির উত্তরের মরুভূমি অঞ্চলের দাহী বা অন্য কোন যাযাবর জাতির সহিত সংঘর্ষে আহত হইয়া সাইরাস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপরের বিবরণ হইতে তিনটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ইরানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ব ইরান

বা বালথ হইতে বহু দূরে, পশ্চিমে ককেশাস ও কাম্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে। দ্বিতীয়তঃ, ইরানীয় জাতি খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দের মধ্যে এশিয়া মাইনরের উপকূল পর্য্যন্ত গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া যুরোপীয়দিগের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার জন্য সাভিসে স্বদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপিত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সাইরাসের মৃত্যুর কাহিনী হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঐ স্বদূর প্রাচীন কালে উত্তরের মরু অঞ্চলের (নর্দান ডেজার্ট) যাযাবর গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে সামরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। অক্সাস নদীর বাম তীর হইতে পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত দাহী ও মিথিয়ান নামে পরিচিত যাযাবর গোষ্ঠীগুলির অধ্যুষিত অঞ্চল। মিডিয়ায় সম্রাট কিয়াকজারেস যখন নিনেভে অবরোধ করিয়াছিলেন এই মিথিয়ানগণ কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বতীর ধরিয়া হিরকানিয়ার মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়া মিডিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অবরোধ উঠাইয়া সম্রাটকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইরানী সাম্রাজ্যকে প্রথম হইতে এক চক্ষু এশিয়া মাইনরের দিকে ও অপর চক্ষু উত্তর-পূর্বের মরু অঞ্চলের দিকে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

একটা রাষ্ট্রবিস্তারের পরে প্রথম দারিয়ুস (দারায়্যাবাহ) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫২১)। রাজত্বকালের প্রথম দিকে তাঁহাকে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। পূর্ব-ইরানের বাহিয়জদাত (Vahyazdata) বিদ্রোহী হইয়া আরাকাশিয়া আক্রমণ করেন। তারপর চিত্রতাকের (Chitratahma) অধীনে সগরতিয়াইয়ের (Sagartui) যাযাবর জাতি (পার্সের উত্তর-পূর্বে) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতাদিগের নাম লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জার্মান পণ্ডিত স্পিগেল সাইরাসের অথবা কাইরুসের নাম (Kuru, Kurush) ভারতবর্ষের কুরু হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। সাইরাসের পরবর্তী কাম্বিসেসের (Cambyses) নাম দারিয়ুসের লেখনে কাম্বুজিয় (Kambujiya)। দারিয়ুসের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সহিত ইরানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম

সেনাপতি ফ্লাকস (জাতিতে গ্রীক) (Pactyans = Pakhtu)

অভি-

এশিয়া মাইনরের ঘাঁটির দিকে ফিরিলে দেখা যায় যে দারিয়ুস বসফোরস প্রণালীর উপর সেতু নির্মাণ করাইয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দানিউব নদী পর্য্যন্ত অভিযান করেন (খ্রীঃ পূঃ ৫১৫)। হেরোডোটাসের মতে এই অভিযান ডন ও ভল্গা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল মিথিয়ান জাতি। কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর ও দক্ষিণ তীর বাহিয়া ককেশাস অতিক্রম করিয়া মিথিয়ানগণ এই সময়ে দক্ষিণ রুশিয়ায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দারিয়ুসের সৈন্যবাহিনী হেলসপন্টের নগরগুলি, উপকূল ভাগের সকল গ্রীক নগর, থেস ও মাসিডন দখল করিল। ইহাই যুরোপের ভূভাগে ইরানীয় জাতির রাজ্য বিস্তৃতির শেষ সীমা। খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে মারথনের যুদ্ধে গ্রীকগণ ইরানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত করিল।

তার পর গ্রীক শক্তি সংহত হইয়া উঠিল মাসিডনের রাজা ফিলিপের অধীনে। মাসিডনের তরুণ বীর আলেকজান্ডার হেলসপন্ট অতিক্রম করিলেন খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে; মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া অতিক্রম করিয়া গ্রীকবাহিনী ঝটিকার বেগে আসিরীয়ায় উপস্থিত হইল। গোগামেলার প্রান্তরে তৃতীয় দারিয়ুসের অধীনে পারশ্ববাহিনী দ্বিতীয় বার পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, হাকামনি সম্রাট মিডিয়ায় পলায়ন করিলেন। আলেকজান্ডার বিনা আঘাতে বাবিলোন ও সূসা অধিকার করিলেন, পারসিপোলিসের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত, রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের অমূল্য গ্রন্থরাজি, এবং উহাদের রক্ষক পুরোহিত দলের সহিত সমগ্র রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত করা হইল। গোগামেলার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলেকজান্ডার আপনাকে এশিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভাগ্যাহত হাকামনি সম্রাট মিডিয়া হইতে ব্যাকট্রিয়ায় পলায়ন করিলেন। ব্যাকট্রিয়া ও সূর্য্যদার শাসনকর্তা বেসুস (Bessus) সম্রাটকে ধৃত করিয়া পার্থিয়ায় সরাইয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। হাকামনি রাজবংশ এইভাবে লুপ্ত হইল।

ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা বেসুসকে সাহায্য করিয়াছিলেন আরিয়ার শাসনকর্তা। প্রথম আর্তাজারেকসাসের রাজত্বকালে ব্যাকট্রিয়া একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। ইরানের এই বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তা বেসুস আলেকজান্ডারের আঘাতে পড়িলেন। একবার্তানায় লইয়া গিয়া

তৃতীয় দারিয়ুসকে হত্যা করা নয়, দারিয়ুসকে হত্যা করিয়া চতুর্থ আর্তাঙ্জারেকসস উপাধি ধারণ করিয়া বেষুশ আপনাকে পারশ্বের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

প্রথম দারিয়ুসের আমলে পূর্বাঞ্চলে সিদ্ধুদ পর্ধ্যন্ত সমগ্র আফগানিস্থান, উপজাতীয় এলাকা এবং সিদ্ধুদেশ ইরাণীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। উত্তরে সগডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া ও আরিয়া (হরিরুদ নদী পর্য্যন্ত), দক্ষিণে আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা, পূর্বে পারোপনিসাদি। সগডিয়ানা বর্তমান বোখারা ও সমরকন্দ, আরিয়া হিরাট, আরাকোশিয়া কান্দাহার, ড্রানজিয়ানা সিষ্টান ও পারোপনিসাদি কাবুল প্রদেশ। পূর্ব-ইরাণ-বলিতে কাবুল বাদে মোটামুটি এই কয়টি প্রদেশ ও বাসথ বুঝাইত। মোঘা আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা হিরাট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজনির তুর্কী রাজবংশের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত কাবুল প্রদেশ হিন্দুরাজাদিগের অধীনে ছিল। সে যাহা হউক, হাকামনি বংশের আমলে পূর্ব-ইরাণের সগডিয়ানা, ব্যাকট্রিয়া, আরিয়া প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া একবাটানা ও পারসিপোলিসের কেন্দ্রীয় শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। আলেকজান্ডার ব্যাকট্রিয়ায় প্রবেশ করিলে সগডিয়ানা ও আরিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সগডিয়ানার ১২০০০ স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীকে নিহত করিয়া আলেকজান্ডার নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন, সকল পুরুষ অধিবাসী হত হইল। আরিয়ার অধিবাসীদিগকে অতি নির্ধম শাসিত দেওয়া হইল। এদেশের স্থলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে পোরাসের প্রতি আলেকজান্ডারের উদার, সহৃদয় ব্যবহারের গল্প প্রশংসার সহিত স্থান পাইয়াছে। এই ব্যবহার গ্রীক বীরের উদার, সহৃদয় স্বভাবের পরিচায়ক নহে, কূটনীতির পরিচায়ক। মুক্তি পাইয়া পোরাস ইহার পরে তাঁহার স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সসৈন্যে আলেকজান্ডারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মানাগা চূর্ণের ৭০০০ ভারতীয় সৈন্যকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা (গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে, “এই নির্বিচার হত্যার কারণ ইহারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে বিদেশী বিজেতাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক ছিল”), সিবি (Sibi) ও মালব (Malli)-দিগকে বর্ষরোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা প্রভৃতি ঘটনা আলেকজান্ডারের উদারতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে।

হাকামনি সম্রাটগণের সিংহাসনে আসা

দরিদ্র মাসিডোনের অল্পবয়স্ক যোদ্ধার মাথা বিগড়াইয়া দিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। অবশেষে আপনাকে জুপিটরের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া আলেকজান্ডার নূতন সাম্রাজ্যের প্রজাদিগের নিকট দেবতার প্রাপ্য সম্মান দাবি করিলেন। পারশ্ব, মিডিয়া, এক কথায় সমগ্র পশ্চিম-ইরাণ এই দাবী বিনা বাক্যে মানিয়া লইল, আপত্তি জানাইল পূর্ব-ইরাণ। ঐতিহাসিকের ভাষায় “The eastern Iranians of Bactria, Sogdiana, Aria, Arachosia, Drangiana... opposed the conqueror. The Arians rose again and again.” ভারতবর্ষে, “In India the Brahmanas had been the soul of a still more vigorous resistance; they preached revolt to the rajahs of the Lower Indus and were the object of Alexander's special severity” অর্থাৎ ভারতবর্ষে আরও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ, দৃঢ় প্রতিরোধ জাগিয়া উঠিল। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণা যোগাইলেন ব্রাহ্মণগণ। সিদ্ধু উপত্যকার পশ্চিমভাগের রাজাদিগের ব্রাহ্মণগণ বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। এইজন্য আলেকজান্ডারের সকল আক্রোশ আসিয়া পড়িল ব্রাহ্মণদিগের উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্রীক অধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাকট্রিয়া ও সগডিয়ানার ইরাণীগণ তাহাদের পুরাতন শত্রু মক্কাবুলের যাযাবর জাতিদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিল। শক ও দাহীগণ বেষুশকে সাহায্য করিয়াছিল।

সেলুসিড বংশীয় আন্তিওকাসের রাজত্বকালের শেষের দিকে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা দিওনোতাস ব্যাকট্রিয়া, সগডিয়ানা ও মাজিয়ানা (অকসাস নদীর পশ্চিমে) লইয়া গঠিত নূতন ব্যাকট্রিয়ান রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২৪৬)। পূর্ব-ইরাণ একরকম স্থায়ী ভাবে পশ্চিম-ইরাণ হইতে পৃথক হইয়া গেল। ইহার পর অল্পসময়ের জন্য একবার আরসাকিডান বংশের প্রথম মিথ্রিদেতসের আমলে ও একবার সামানীয় বংশের প্রথম খসুর আমলে ব্যাকট্রিয়া পশ্চিম-ইরাণের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরের মক্কাবুল জাতিসমূহ পূর্ব-ইরাণ প্রাবিত করিয়া

এইবার ইরাণীয়

ড্রানজিয়ানা বা সিহান আফগানিস্থান ও পারশ্বের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সগডিয়ানা ও ব্যাকট্রিয়ায় উজ্জবেগগণ প্রবল। বাদাকদান ও ওয়াখান এখন একটি পৃথক প্রদেশ, অধিবাসীরা ফার্সী ভাষাভাষী। ওয়াখানের কতক অংশ এবং সমগ্র উত্তর-পার্মীর রুশিয়ার অধীন তাজিকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা ফার্সী ভাষাভাষী। আরিয়ায় চাহার আইমক, তাজিক ও হাজারাগণ সংখ্যায় প্রবল। ড্রানজিয়ানার অধিবাসীর মধ্যে আফগান, বেলুচ তাজিক প্রভৃতি আছে। জাতি হিসাবে এই কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে তাজিকগণকে প্রাচীন ইরানী জাতির বংশধর বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের ভাষা ফার্সী এবং হিরাটের তাজিকগণ আপনাদিগকে ফার্সীওয়ান বলিয়া পরিচয় দেয়।

জেন্দাবেস্তায় airyao danhavo অর্থাৎ আৰ্যদিগের দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই আৰ্যদিগের দেশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্যাকট্রিয়া, পার্শ্ব বা পারশ্ব ও মিডিয়া। অর্থাৎ বালখ বাদে সমগ্র পূর্ব-ইরান আৰ্যদেশের গণ্ডী হইতে বাহিরে পড়িতেছে। পূর্ব-ইরানের মাত্র ব্যাকট্রিয়া আৰ্যদিগের দেশ, এই মতের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না, জেন্দাবেস্তার সাক্ষ্য এই মতের কিছুমাত্র ভিত্তি নাই দেখা যায়। জেন্দাবেস্তার সাক্ষ্যের কথা পরে বলা হইবে, এখানে হাকামণি লেখনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পারশ্ব হাকামণি রাজবংশের উৎপত্তিস্থান। হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিয়ুস আত্মপরিচয় দিয়াছেন "Aryan, son of an Aryan; Persian, son of a Persian." এই আত্মপরিচয়ের কোন সন্দ্বিগ্ন অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় দারিয়ুস পারশীক বটেন, আৰ্যও বটেন কিন্তু পারশীক ও আৰ্য একার্থবোধক নহে; অর্থাৎ সকল পারশীক আৰ্য নহে হইতেও পারেন। পারশের সকল অধিবাসী আৰ্য হইলে দারিয়ুসের এইভাবে আত্মপরিচয় দিবার কোন অর্থ হয় না। শুধু দারিয়ুস যে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, হাকামণি-আমলের অনেক প্রধান ব্যক্তি আৰ্যপদের সহিত সংযুক্ত এইরূপ নাম গ্রহণ করিতেন, যথা, Ariobarzanes Ariyabanus

শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করে। বাবিলোনের বোরোসস একটি কিশদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন যে মীডগণ বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল এবং আট জন মীড রাজা ২০০ বৎসরের অধিককাল বাবিলোন শাসন করিয়াছিলেন। অল্পমান করা হয় যে ইহা খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের ব্যাপার। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৯২৬ অব্দে আনাতোলিয়া ও সিরিয়ার হিটাইটগণ হাম্মুরাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। কামাইটগণ একবার অল্পমান খ্রীঃ পূঃ ২০৭২ অব্দে বাবিলোন আক্রমণ করে, ৫০০ বৎসর পরে দক্ষিণ বাবিলোনের রাজা Ea-gamilকে পরাজিত করিয়া তাহারা স্থায়ীভাবে সমগ্র বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল। সে যাহা হউক, ইতিহাসে মীড ও পারশীক বরাবর স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত। মিডিয়া হইতে মীডগণ কোন সময়ে পূর্ব মুখে অভিযান করিয়া পূর্ব-ইরানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এ কথা বলা হয় নাই। কিন্তু দেখা যায় যে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসে মিডিয়ার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আজারবাইজানের প্রকৃত নাম আতরবাইজান। আতর অগ্নির ইরানীয় নাম। আতরবাইজানের অর্থ অগ্নির মন্দির। অর্থাৎ আজারবাইজান অগ্নি-উপাসনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। গ্রীক-আমলে আতরবাইজান Atropatene নামে পরিচিত হয়। সে যাহা হউক, হেরোডোটাসের উল্লিখিত Arioi নাম সম্ভবতঃ মীডগণ আৰ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল ইহা জানা যায় না। প্রথম দারিয়ুস যে আমি আৰ্য বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন সেই আৰ্যের সহিত মিডিয়ার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না, কারণ মিডিয়া তখন বিজিত প্রদেশ। তাহা ছাড়া দারিয়ুসের জন্মস্থান পার্শ্ব, মিডিয়া নহে।

দেখা যাইতেছে airyao danhavo বা আৰ্য দেশের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ ছিল তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মিডিয়া, পার্শ্ব ও ব্যাকট্রিয়া লইয়া আৰ্যদেশ গঠিত ছিল বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে পার্শ্ব এবং মিডিয়াকে আৰ্য দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে হেরোডোটাসের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি এবং মীড ও পারশীকগণ যে আৰ্যগোষ্ঠীর জাতি ছিল এই প্রচলিত মত ছাড়া আর কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না। মীড ও পারশীকগণ আৰ্যগোষ্ঠীর জাতি ছিল ভাষাবিজ্ঞানী নতদ্বিজ্ঞানীগণের এই মত অপ্রতিবাদে গ্রাহ্য। আৰ্য দেশের মধ্যে পার্শ্ব ও মিডিয়া ছিল কিনা এ প্রশ্নের প্রচুর অবসর রহিয়াছে।

গ্রীক নাম আরিয়া। আরিয়ার অধিবাসীর হৈর বা হারি হইতে আরবী নাম হিরাট আসিয়াছে। ষ্ট্রাবোর মতে আবেস্তার airyao danhavo বা airiyana বলিতে পূর্ব-ইরাণের অন্তর্ভুক্ত আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান প্রভৃতি বুঝায়। প্লিনি আরিয়ানা বা আইরিয়ানা এবং আবিয়া অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। গ্রীক আমলে হিরাটের অধিবাসী আরিয়ান (Arian) নামে পরিচিত ছিল। মিডিয়া হইতে পারশ্ব পর্যন্ত অঞ্চল যখন গ্রীকদিগের পদানত আরিয়া তখন পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করিয়াছে। সেলুকস নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া আরিয়া হইতে সরিয়া গেলেন, খোরাসানের সীমানা পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল।

আরিয়ার অধিবাসীদিগকে হৈরভ, হারে বা হারি বলা হইত। সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্কে হারি বা খারি (Harri, Khari) জাতির নাম উল্লেখিত হইয়াছে। হারি রাজা (মিটানী) Saussatar-এর নাম পণ্ডিত কোনোর মতে সংস্কৃত মৌক্ষত্র হইতে অভিন্ন। প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় এবং হিক্সস (Hyksos)-দিগের মধ্যে শাসকগোষ্ঠী ছিল হারি বা খারি এইরূপ বলা হইয়াছে। এই হারি বা খারিকে আর্থগোষ্ঠীয় বলা হইয়া থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে পূর্ব-ইরাণের এই হৈরভ বা হারির (পরে আরিয়ান) সঙ্গে খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দীর পশ্চিম-এশিয়ার ইতিহাসের হারি বা খারি গোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা? গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যাহা-দিগের নাম আর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপ একটি জাতিকে পশ্চিম-আফগানিস্তানে পাওয়া যাইতেছে ইহা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। সামান্য বংশকে কাদিসিয়া

এবং নেহাভেন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আরবগণ পারশ্ব সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পরে হিরাট তাহাদিগের পূর্বাঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি হইল। হিরাট অতিক্রম করিয়া আরব-শক্তি সহজপথে পূর্ব দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, পামীরের উত্তর দিয়া উত্তর-পূর্বের পথে আরবগণ মধ্য-এশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল। পশ্চিম-আফগানিস্তানের এই অঞ্চলের মধ্যে ইরাণীয় গোষ্ঠীর ও ফার্সী ভাষাভাষী জনসংখ্যা বর্তমানেও প্রবল। খুব সম্ভব গ্রীকদিগের আরিয়ান নাম ইরাণীয় গোষ্ঠীর এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্লিনি আবেস্তার আইরিয়ানা নাম আরিয়ার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন বলিয়া তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় একরূপ মনে করাতে প্লিনির বিশেষ ত্রুটি ঘটয়াছে বলা যায় না।

এই আরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ভেন্দিদাদে উল্লিখিত অহরামাজদারস্থিৎ যোলটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই যোলটি অঞ্চলকে যোলটি আর্থ-বসতি (Aryan settlements) বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে এবং জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে বৈদিক আর্থ ও ইরাণীয় আর্থ জাতির সম্পর্ক এবং আর্থ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা সম্ভব পরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যাইতে পারে যে ভেন্দিদাদের এই তালিকায় পারশ্বের রাঘ বা রাঘ জেলার পশ্চিমে অহরামাজদারস্থিৎ কোন অঞ্চল বা আর্থ বসতির উল্লেখ দেখা যায় না এবং অহরামাজদারস্থিৎ অঞ্চলগুলির তালিকায় মিডিয়ার কোন উল্লেখ নাই, পারশ্বের নামও নাই, উহা ভাষ্যকার যোগ করিয়াছেন।

হর্ষ-বিষাদ

শ্রীমহাদেব নায়

আকাশে-ভুবনে এ শুভ লগ্নে, হে শরৎ, তব স্মরণ-ছটা,
প্রান্তরে-বনে আগমনে তব শ্রাম-কান্তির বিপুল ঘটা,
বহু সন্তাপ সহিয়া অতীতে আসিয়াছ পুনঃ দীপ্ত বেশে
শ্রাম-মনোহর লাভণির ঢেউ বহিছে আবার সোহে

মুগ্ধ-দৃষ্টি দিগ-দিক

ট্রাইক

শ্রীতারাপদ রাহা

উপরে মিটিং হচ্ছে,—সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠের একসিকিউটিভ কমিটির মিটিং। মিনিট পনের আগে সেক্রেটারি এসে গেছেন। গালফুলো অধ্যাপক এসেছেন,—গুণ্ডা রায়বাহাদুর এসেছেন, রেশনের দোকানের ম্যানেজার মিঃ মজুমদার এসেছেন, সরকারের তরফ থেকে মিঃ আলি এসেছেন, ডাঃ বোস এসেছেন। স্কুলের হেড মাস্টার ও দুই জন রিপ্রেজেন্টেটিভও এসে গেছেন,—এবার দুই দিক থেকে—ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ রাহত ও প্রেসিডেন্ট মিঃ তলাপাত্রের মোটর এসে হাজির হ'ল।

নামলেন দু'জন মোটর থেকে,—দারোয়ান, দপ্তরী ও বেয়ারা দেলাম করে একপাশে সরে দাঁড়াল। ষটখটী জুতোর শব্দে নিজেদের আগমনবার্তা স্বচিত করে সিঁড়ি-পথে উপরে উঠে গেলেন তাঁরা।

নীচের আপিস ঘরের পাশের অন্ধকার কামরা থেকে দম্পর্ণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি মূর্তি। পাঁচটিই মাস্টার। ক্লার্ক আর দারোয়ানের সাথ আছে—এঁরা মিটিং ঘরের নীচে স্পাইরেল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিটিঙের আলোচনা শুনবেন : টিচার রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছে মিটিঙের কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলতে চান না,—বলেন, মানা আছে—সে সব 'এক্সট্রিমাল কন্ফিডেনসিয়াল'।

আরে রেখে দে তোর 'কন্ফিডেনসিয়াল'—মিটিঙে কি হ'ল যদি না-ই জানাবি তোরা—তবে যাস কেন তোরা মিটিঙে,—মাস্টারদের তরফ থেকে লোক পাঠাবার তবে দরকার কি ?

যাক্, এবার আর কেউ তাদের মুখাপেক্ষী নয়—মিটিঙের আলোচনা নিজেদের ক্রমে শুনবারই ব্যবস্থা করেছেন মাষ্টার মশায়রা। মিটিঙের আলোচ্য বিষয় মাষ্টারদের কাছে এবার জরুরী : আলোচ্যের মাঝে রুটির কথা আছে এবার,—তা ছাড়া কয়েকজনের ব্যক্তিগত দরখাস্ত আছে। ওঁরাও শুনতে এসেছেন।

অশোক—বেচারি অশোক—পয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায় আর মাগ্গি ভাতা আট টাকা। মাস তিনেক আগে বাপের শ্রাদ্ধে এন্ড্রিউজেন্ট ফাও থেকে দু-শ টাকা কর্জ করেছে সে। পয়ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টার বাপের আবার শ্রাদ্ধ কেন যে করে সেই আশ্চর্য। প্রতি মাসে বেতন থেকে দশ টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে তার। তার আবেদন—দশ টাকার বদলে পাঁচ টাকা করে কাটা হোক তার।

নরেশবাবুর মেয়ের বিয়ে। মাস্টারের মেয়ের বিয়ে আগে যেখানে পাঁচ-শ টাকার হ'ত—এখন লাগবে সেখানে

দু-হাজার। হোক দু-হাজার,—তিন বছর ধোঁকাবুজির পর মনোমত পাত্র যখন জুটেছে—তখন দিতে হব'ত বিয়ে। মাস্টারের মেয়েরাও আবার চিরকাল কুমারী থাকতে চান না। নরেশ বাবু তাই এন্ড্রিউজেন্ট ফাও থেকে চার-শ টাকা কর্জ চেয়েছেন।

নূতন মাস্টার শচীন ফাষ্ট ক্লাস বি. টি.। এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকায় তাকে চাকরি দিয়ে বলা হয় কনফার-মেশানের সময় তাকে আর দশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কনফারমেশান ছ-মাস পরেই হবার কথা ছিল,—হয় নি তা। আজ এক বছর পরে তার কনফারমেশানের কথা আবার উঠবে মিটিঙে। সেও শুনতে এসেছে।

আর এসেছেন হীরেনবাবু ও শ্রুশোভন।

পঞ্চান্ন বছরের পরই স্কুল থেকে রিটারার করবার কথা : একেবারে গবর্ণমেন্ট সার্ভিস আর কি। এর পর ধারা চাকরি করতে চান স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তাঁরা 'এক্সটেনসনে'র জন্ত দরখাস্ত করে দেখতে পারেন। হীরেনবাবুর পঞ্চান্ন পুরে গেছে—দরখাস্ত করে জানতে এসেছেন—ফলাফল।

শ্রুশোভন এসেছে—সবার মিলিত স্বার্থের কথা শুনতে। তারই চেষ্টায় দরখাস্ত গেছে সকল মাস্টারের স্বাক্ষর নিয়ে : প্রার্থনা—মাগ্গি ভাতার টাকারটা সবার বেতনভুক্ত করে দেওয়া হোক—তার উপর নূতন করে মাগ্গি ভাতা দেওয়া হোক দশ টাকা করে। ইচ্ছা করলে এ টাকারটা স্কুল দিতে পারে মাস্টারদের—কারণ গত দু-বৎসরে স্কুলে টাকা জমেছে প্রায় হাজার ত্রিশেক। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে অনেক।

মিটিং সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে গেল। পাঁচটি জীব স্পাইরালে কম্পিত বক্ষে কান ঝাড়া করে দাঁড়িয়ে।

প্রথমেই উঠল শচীনের কনফারমেশানের কথা। গুরু-গভীর কণ্ঠে মিঃ তলাপাত্র হাঁকলেন,—শচীন চক্ৰকোত্তির সম্বন্ধে হেড মাস্টারের রিপোর্ট কি ?

হেড মাস্টার নূতন লোক, এ স্থলে এসেছেন মাত্র মাস-তিনেক,—বললেন—আমি মাসতিনেক মাত্র তাঁকে দেখেছি—আমার 'ইম্প্রেশন'—মোটামুটি ভাল।

মাত্র মাসতিনেকের কারো সম্বন্ধে ঠিক ইম্প্রেশন হয় না,—আরও কিছু দিন দেখুন,—

চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল শচীনের : স্কাউট্রেল,—চীহ—ফাঁকি দিয়ে এক বছরের ওপর কাজ করিয়ে নিলে আমায়। রেজিগ্নেশান দেব আমি,—কালই দিচ্ছি, দেখি লোক কোথায় পায়,—চার চারটে কাগজে এক হপ্তা এ্যাড-ভার্টাইজমেন্ট দিয়ে ত এপ্লিকেশন আসে তিনধানা,—তার একটা কানা,—একটা ধোঁড়া, একটা হয়ত চলনসই।

মনে করেছেন সেই দিনই আছে : চিরকালই অত্যাচার চালাবেন একদল শিক্ষিত লোকের উপর।

সুশোভনের মুখ অসম্ভব গম্ভীর : বড়ের পূর্বাভাস।
হীরেনবাবুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিয়েছে : অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। অধ্যাপক মাস্টারের মুখ দেখে কিছু বুঝা যায় না।

এর পর উঠল নরেশবাবুর টাকা ধার নেওয়ার প্রশ্ন।

গম্ভীর কণ্ঠ ছড়ার দিলে—কত টাকা?

সেক্রেটারী এপ্রিকেশন দেখে বললেন, চার-শ টাকা
মেয়ের বিয়ের জন্য চেয়েছেন—হু-বছরে চব্বিশ ইনস্টলমেন্টে
শোধ দেবেন।

হুয়ের সময় কত টাকা নিয়েছেন?

ছ-শ।

আছে কত টাকা ঠর হিসাবে?

ছ-শ বিরাশি টাকা চৌদ্দ আনা ছ-পাই।

না,—অত টাকা পেতে পারেন না উনি। প্রভিডেন্ট
ফাও থেকে নিতে হলে—মাত্র একচল্লিশ টাকা সাত আনা
তিন পাই উনি পেতে পারেন। স্কুল কনট্রিবিউশনে হাত
দেবার অধিকার ত ঠর নেই—ঠর ভাগের ছ-শ টাকা ত
উনি এর আগে ধৈর্যে ফুরিয়েছেন।

টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ নন্দবাবু বিনীত ভাবে বললেন,—
কিন্তু ইমারজেন্সী পিরিয়ডে না খেয়ে ত উপায় ছিল না, সার!

হাঁ—ঠিক,—কিন্তু এখন আবার কেন? মেয়ের বিয়েতে
অত টাকা?—যার যেমন সামর্থ্য তেমনি বিয়েই দেওয়া
উচিত—

স্পাইরেল সিঁড়িতে—দপ্ করে ছলে উঠল একবার
নরেশবাবুর চোখ,—পূর্বপুরুষের সংস্কার মত পৈতৃক হাত
দিয়েছিলেন তিনি,—অভিশাপ দেবেন।—কিন্তু না—লাভ
নেই,—ক্ষমাই পরম ধর্ম, তা ছাড়া অভিশাপ কলে না
আজকাল,—যদি কলত তবে গত দুর্ভিক্ষে লক্ষ উপবাসীর
অভিশাপে তলাপাত্রের দল ভয় হয়ে যেত।

সুশোভন নিজে বিয়ে করে নি,—তবু নিজেকে নরেশ
বাবুর স্থানে বসিয়ে ভেবে নিলে একবার ব্যাপারটা। তার
ইচ্ছা করছিল উপরে ছুটে গিয়ে বাঘের মত একবার গলা
চেপে ধরে : টাকা দিবি নে,—তোরা বাপের টাকা?
মাষ্টারের টাকা মাষ্টারে নেবে—তা তোরা কি,—শহরের আর
ছুটো স্কুলের লক্ষ টাকার উপর—কি করে নিজের কাছে
লাগিয়েছিস,—জানে না শহরের লোক—না?

স্পাইরলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে নিষেধ ছিল—তবু একটু
করণ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নরেশবাবুর মুখ থেকে অহুস্রকণ্ঠে
বেরিয়ে এল,—নারায়ণ। হীরেনবাবু তার মুখে হাত দিয়ে
ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিলেন।

উপরে—তালপাত্রের একাদশ রত্নের সভায় নরেশবাবুর
মেয়ের বিয়েতে তাঁরই নিজের ফাও থেকে এক চল্লিশ টাকা

সাত আনা ন'পাই মঞ্জুর হ'ল। পরের আইটেম হচ্ছে—
মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি ও মাগ্গি ভাতা।

প্রেসিডেন্ট হাঁকলেন,—নেক্স্ট আইটেম প্লিজ?

সেক্রেটারী খাতা দেখে বললেন—এবার টিচারদের ইনক্রি-
মেন্ট আর ডিয়ারনেন্সের কথা আবেদন।

ডিয়ারনেন্স ত দেওয়া হচ্ছে তাদের।

হাঁ—হচ্ছে—ওর চেয়ে বেশি প্রার্থনা করছেন তারা?

কত?

ওদের দেওয়া হচ্ছিল আট টাকা—ওটা ফ্লাট রেটে
সবাইকে—ইনক্রিমেন্ট দিয়ে—অর্থাৎ পে-এর সঙ্গে কনসলিডে-
টেড করে নতুন করে ডিয়ারনেন্স চাইছেন—আরও দশ টাকা।

এক অদ্ভুত হাসিতে মিটিং ঘর কঁপে উঠল—যে হাসি শুধু
ঐ এক দল লোকই হাসতে পারে : ফ্লাট রেটে ইনক্রিমেন্ট—
মুড়িমুড়কির এক দর—আবার তার উপর ডিয়ারনেন্স।
প্রিপস্টারাস্।

স্পাইরেল সিঁড়িতে পাঁচটি মূর্তি দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে—
উজ্জ্বল্য তাঁদের সবার শরীরই কাঁপছে : এত টাকা রয়েছে
স্কুলের—মাষ্টারদের দিতে চায় না—টাকা দিয়ে ওরা করবে
কি!

টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ নন্দবাবু আমতা আমতা করে
বললেন—এ ছঃসময়ে সার—ওটা সবাইকে একটা 'রিলিফ'
বলে বিবেচনা করুন, সার—টিচারদের বাঁচিয়ে রাখুন।

বুঝলাম—কিন্তু মাত্রা আছে ত—আর সবাইকে সমান
কি করে হয়—গত ইনক্রিমেন্টে যারা এক টাকা পেয়েছে—
তারাও আট টাকা পাবে?—কেন?—তাদের নামে যে কন-
ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট আছে—আমার ত মনে হয় তারা কোন
ইনক্রিমেন্টই পাবে না।...আর সবাই আট টাকা—এ কি
মগের মূল্য না কি?

নন্দবাবুর স্বরে মিনতি করে পড়ছে যেন : কিন্তু সার—
বড্ড ছঃসময় পড়েছে যে,—in consideration of these
bad days—sir!

Bad days!—Don't you feel—worse days are
coming?

অন্ধকার স্পাইরলে পাঁচটি মূর্তির মনোভাব একমাত্র
ভগবানই বোধ হয় কিছু অল্পভব করতে পারবেন : অনেক
আশা করে এসেছেন আজ তারা। সুশোভনের চোখ দুটি
হিংস্র স্থাপদের মত জ্বলছে : শালা—কাউণ্ডেল—worse
days—এর চেয়ে worse days আবার কি আসবে—if
worse days come—better arrangement should be
made. ছেলেদের মাইনে বাড়িয়ে দিবি। লোকে—চালের
দাম, ডালের দাম, তরিতরকারি, মাছ জামা কাপড়ের
দাম—চার পাঁচ গুণ বেশি দিতে পারে—ছেলে পড়ানোর দাম
ভাল না হোক—দেড়গুণ দিতে বাধা কি?...প্রাইক্ করে না

এরা—ঐহিক।—কলি মজুর—বাটার কর্মচারী—পোষ্টাপিস—
ব্যাক—রেলওয়ে—ট্রাম—সবাই ঐহিক করতে পারে—
মাষ্টারেরা পারে না—কেন? এরা কি মানুষ নয়—মানুষের
মত বাচতে চায় না এরা...কি করা যায়—ঐহিক।—এখান
থেকে এই স্থল থেকেই শুরু করতে হবে ঐহিক—

উত্তেজনার কাঁপছে স্রোতধন। এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে
উঠে যাবে না কি সে।—গিয়ে আচ্ছা করে শুন্নিয়ে দিয়ে
আসবে। কেন আসে এরা কমিটিতে—দেশকালপাত্র ভেদে
বিবিব্যবস্থা করবার যাদের সাহস নেই—প্রাণ নেই।

ওদিকে নন্দাবাবু বলে চলছেন—কিন্তু, সার, ভেবে
দেখুন—আমাদের ভেতর এক জন মাত্র পয়ত্রিশ টাকা মাইনে
পান—এই ছদ্মদিনে—চার পাঁচটি ছেলেপিলে নিয়ে কি ঝাণ্ডা
চলে তাদের?

ছ'বেলা না হোক এক বেলাও ত চলে।

দাঁতে দাঁত ঘষা লাগল স্রোতধনের—মুখ থেকে—একটু
জ্বরেই বেরিয়ে এল—শালা।

নরেশ বাবু—ভান হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ধরলেন।

আর দাঁড়াতে চায় না স্রোতধন : নিজেই সে আর
সামলে রাখতে পারছে না—ঐহিক—একমাত্র ওষুধ ঐহিক—
কল থেকেই শুরু করতে হবে। টাকা থাকতে টাকা দেবে
না—এক বেলা থেকে না কি মাষ্টারি করতে হবে—শালা।।
সমস্ত শরীরের মাঝে যেন একটা বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। সবাইকে
হাত দিয়ে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল স্রোতধন—নরেশ
বাবু তার হাত ধরে ঠেকালেন—শেষ শুনে যান স্রোতধন
বাবু—আর বেশি দেরি নেই—

ও সব আপনারা শুধুন—আমার শোনা হয়ে গেছে।

স্রোতধন চলে গেল। আর চারটি মূর্তি দাঁড়িয়ে মিটিঙের
শেষ শুনে গেলেন। অশোকের মাইনে থেকে দশ টাকার
পরিবর্তে সাড়ে আট টাকা করে কেটে নেওয়া হবে—তা'লেই
ছ'বছরে শোধ হবে দেনা। স্বীরেন বাবু—এক বছরের একস্-
টেনসান পেলেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি আর হ'ল না—
মাগ'গি ভাতা বাড়ল—অতি কষ্টে আর ছ'টাকা। ডিয়ার-
নেস্কে—কনসলিডেটেড করলে—পার্ম্যানেন্ট একস্পেন্ডিচার
বেড়ে যায় : আর বছর যে স্থলের আর কমে যাবে না এ
কথা কে বলতে পারে—তা ছাড়া খরচ আছে না?—ছেলে
বাড়ছে—চারটি ঘর বাড়তে হবে—ফার্নিচার—তা ছাড়া—
সিফিং ফাণ্ড আছে—বেতন বৃদ্ধি অমনি বললেই হ'ল?—
স্থলের জুজু মাষ্টার—না মাষ্টার পুষতে স্থল?

অসহায় চারটি মূর্তি নিদারুণ গাত্রদাহ নিয়ে রাত্রি সাড়ে
ন'টায় ফিরে গেল। স্রোতধনটা যে কোথায় গেল।

স্রোতধন কিছু আগে বেরিয়েছে স্পাইরেল থেকে—
মনে মনে হিসাব করতে করতে চলেছে সে—কত টাকা
আছে তার—কৌণার্ম জীবনে—একটা সুবিধে হয়েছে তার—

কিছু টাকা হাতে আছে তার। কত দিন লড়তে পারবে সে
—ক'জন শিক্ষকের অন্ততঃ মাসখানেকেরও ডাল ভাতের
ব্যবস্থা করতে পারবে?—তা ছাড়া—তা ছাড়া সুমিত্রা আছে
—সুমিত্রা সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করতে রাজী আছে সে
—সুমিত্রা যদি তাকে সাহায্য করে। কত আছে তার।

ভাবতে ভাবতে চলল স্রোতধন।

রাত্রি ন'টার একটু পরে—একটি মেয়ে-বোর্ডিঙের
তেতালার গিয়ে হাজির হ'ল সে। তেতালার একটি মাত্র ঘরে
—একা থাকে সুমিত্রা বোস।

সুমিত্রা শিক্ষয়িত্রী—ঘরে দরজা দিয়ে স্থলের খাতা করেই
করছিল; দরজায় টোকা শুনে জিজ্ঞাসা করলে—কে?

অতি পরিচিত গভীর কণ্ঠস্বরে উত্তর হ'ল : দরজা খোল।

বুকটা একটু কঁপে উঠল : দেড় মাস আগে—একরকম
নির্লজ্জের মত সুমিত্রা যখন স্রোতধনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—
আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে তার—স্রোতধন একবার
তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল। বোঝাপড়া একরকম
শেষই হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার—

দরজা খুলে স্রোতধনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে
গেল সুমিত্রা—এ কি মুখ!—কি অসুখ করেছিল না কি
তোমার?

না—বেশ ভাল আছি। এক কাপ চা করো। বলে
জুতো খুলে স্রোতধন বিছানায় গা দিয়ে বাগিচা টেনে
নিলে।

সুমিত্রা কুজো থেকে কেটলিতে জল ঢেলে—স্টোভ ধরাতে
গেল। স্রোতধন তার দিকে চেয়ে বললে—নিজেরই বা এমন
চেছারা হয়েছে কেন?

তোমার গুণ।

আমার গুণ নয়—গুণ মাষ্টারির।

স্টোভের উপর কেটলি চাপিয়ে সুমিত্রা বললে—মাষ্টারি
কাজটা হয়ত নিজেও খারাপ মনে করো না—করলে নিজে
আসতে না এ লাইনে—আমিই না হয় বোকা মেয়ে—ভুল
করে না হয় আমি আসতে পারি...আর তা ছাড়া কি কর-
বারই বা আমার ছিল?

স্রোতধন ঠিক করে এসেছিল নিজেকে কিছুক্ষণ
চেপে রাখবে,—কোঁকের মাধ্যম কোন কিছু বলা ঠিক নয়।
তাই সে চুপ করে রইল।

সুমিত্রা জবাবের জুজু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে
বললে—এখন দেখছি বিয়ে করার আগে কোন মেয়ের এ
লাইনে আসা উচিত নয়।

কেন,—হঠাৎ এ কথা মনে হবার কারণ?

ব্যঙ্গ আর রহস্য মিশ্রিত অদ্ভুত এক হাসির রেখা খেলে
গেল সুমিত্রার ঠোঁটে : বিভা-দির কথা শোন নি?

না,—কি হ'ল আবার তার ?

এখানকার আশী টাকার চাকরি ছেড়ে—একশো টাকায় হেডমিস্ট্রেসের পদে গিয়েছিল মডেল গার্লস স্কুলে—প্রায় বছর-খানেক আগে,—মনে আছে ত ?

—হ্যাঁ।

সেখানে গিয়ে আরও উন্নতি হয়েছে তার।

কোন দিকে ?—মাইনে বেড়েছে ?

উন্নতি সব দিকেই : মাইনে ত বেড়েছেই,—তা ছাড়া—

হৈয়ালি রেখে খোলসা করেই বল না, বাপু !

মাসখানেক আগে সেক্রেটারিকে বিয়ে করতে হয়েছে তার।

আবার অস্বাভাবিক হয়ে উঠল স্ত্রীশোভনের চোখ মুখ : কত বয়স সেক্রেটারির ?

তা আর বলে না,—বয়স বছর পঞ্চান্ন,—বাড়ীতে আগেকার বুড়ি বউ,—ছ'সাতটা ছেলোমেয়ে।

স্কাউটুল,—ওকে গুলি করে মারা উচিত—

স্ত্রীশোভন শুয়ে ছিল,—উত্তেজনায় উঠে বসেছে এবার।

স্ত্রীমিত্রা গরম চায়ের পেয়ালা স্ত্রীশোভনের হাতে দিয়ে যুহু হেসে বললে,—নাও,—থেকে মাথা একটু ঠিক করে নাও,—খবর আরও আছে।

আবার কি খবর ?

চা শেষ না করলে—বলব না আমি,—বলে' স্ত্রীমিত্রা নিষেধ পেয়ালা তুলে নিলে।

নীরবে মিনিটখানেক ধরে চলল চা খাওয়া—স্ত্রীমিত্রা এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে স্ত্রীশোভনের দিকে,—স্ত্রীশোভন মুখ নীচু করে পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবছে।

পেয়ালা শেষ করে পাশের টিপয়ে ঠক করে রেখে স্ত্রীশোভন চোখ তুলে বললে,—এবার বল তোমার আরও খবর।

স্ত্রীমিত্রা স্ত্রীশোভনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, নমিতা-দি ছুটি নিয়েছে তিন মাসের, আমি এখন একটিং হেডমিস্ট্রেস।

বেশ ত—কনগ্রাচুলেশানস্।

জ্ঞ কুফিত করে স্ত্রীমিত্রা বললে,—তুমি ত প্রায় দেড় মাস এ যুথো হও না,—বছর মত যে একটু পরামর্শ দেবে—তাও আশা করতে পারি না—

তোমার পদোন্নতি,—সাময়িক পদোন্নতি হয়ত একদিন স্থায়ী হয়ে যাবে—এতে আবার পরামর্শ নেবার কি আছে ?

সব কথা জান না তুমি—তাই তুমি একথা বলতে পারছ।

বল,—সব খোলসা করেই বল,—আমিও আজ খোলসা কথাই বলতে এসেছি,—তোমার সব কথা শুনে...

যুহুতের জ্ঞ স্ত্রীমিত্রা একবার স্ত্রীশোভনের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব একটু বুঝতে চেষ্টা করলে—তারপর বললে,—স্কুলের টিচারদের আর এ মাইনেতে চলে না,—তাই নমিতা-দি সেক্রেটারির সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েছিলেন—

ব্যথিত হয়ে উঠল স্ত্রীমিত্রার মুখ।

কি,—ধামলে কেন,—বলে যাও—স্ত্রীশোভন তাড়া দিলে।

সেক্রেটারি তাকে অপমান করেছে।

মানে ?

মানে—তাকে বলছে,—দুপুরে আসবেন,—দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না,—তখন আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব।

স্ত্রীশোভন উত্তেজিত হয়েই ছিল—এ কথায় উত্তেজনা তার আরও বেড়ে গেল—তবু বাইরে তা প্রকাশ না করে সে বললে,—দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না মানে ?—

মানে,—সেক্রেটারি বিপত্নীক,—

শিকারী বাঘের মত ছুটা চোখ জলে উঠল স্ত্রীশোভনের। স্ত্রীমিত্রা দিকে চেয়ে বাঘের আওয়াজের মত আওয়াজ করে বললে,—দুপুরে দেখা করার ভার তোমার উপর পড়ল না কি তাই—

স্ত্রীমিত্রা দুই চোখও দপ করে জলে উঠল এবার : আমাকে এমনি করে অপমান করতে এসেছ না কি আজ ?

স্ত্রীশোভন স্ত্রী নামিয়ে—স্ত্রীমিত্রা হাত ধরে তার পাশে বসিয়ে বললে, ভুল—ভুল বুঝেছ তুমি—তোমার—স্বামী—তোমার কেন—তোমার আমার তোমাদের আমাদের সকল অপমানের জালা মিটিতে এসেছি আমি।

স্ত্রীমিত্রা বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল স্ত্রীশোভনের দিকে, কিছুই বুঝে না সে।

বলছি সব—তুমি বল ত তোমার স্কুলের টিচারদের বেতন বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা করেছে তুমি ?

স্ত্রীমিত্রা লান মুখে বললে—বিশেষ কিছুই হয় নি, দরখাস্ত করেছিলাম আমরা অনেক কিছুই দাবি করে। কিন্তু সব ভেঙ্গে গেল, সেক্রেটারী খাপ্পা হয়ে আছে—

কেন—খাপ্পা কেন ?

তাকা,—

ওঃ—তা নমিতাদির কথা নিয়ে তোমরা কমিটিতে তোলপাড় করলে না কেন ?

তোমরা পুরুষ—বুঝবে না, এ নিয়ে তোলপাড় করা ভাল নয়, যারা মাষ্টারি করতে আসে তারা সবাই ত আর চিরকাল কুমারী থেকে শুকিয়ে মরতে চায় না—তা ছাড়া জলে থেকে কুমারীর সঙ্গে বিবাদ করা চলে না।

স্ত্রীশোভন মনে মনে বললে—তা যায় কি না দেখে নিচ্ছি আমি। মুখে বললে—তা তোমাদের দরখাস্তের ফল কি হ'ল, বেতন ও মাগ্গিভাতা বাড়ল কিছু ?

বেতন কিছুই বাড়েনি—মাগ্গিভাতা দু' টাকা বেড়েছে, অথচ স্কুলে টাকা জমেছে অনেক—কলকাতায় ত লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

তা ও টাকা দিয়ে কি করবে ওরা,—তুমি ত হেড মিস্ট্রেস হয়ে মিটিং এ্যাটেণ্ড করছ।

হ্যাঁ করছি। ও টাকা দিয়ে স্কুলের বাড়ি করবে ওরা।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল অশোভন; তা বটেই ত—এই মাগ'গির বাজারে—বাড়ি 'ক্যা-ন'ট ওয়েট, রিকসাওয়ালা, সব'জিওয়ালা, মাছওয়ালা, পান-সুপারিওয়ালা 'ক্যা-ন'ট ওয়েট, ট্রাম, পোষ্টাপিস, ইন্ডন ইন্সুরিয়াল ব্যাঙ্ক ক্যা-ন'ট ওয়েট—ওনলি টিচার্স ক্যান—কি পেয়েছে ওরা আমাদের বল ত?...আর ওরা আসেই বা কেন কমিটিতে—বল ত?

অতি ছুৎবেও স্মিট্রা হাসলে : আসে মান বাড়িতে : কি, না আমি অমুক স্কুলের মেধার হয়েছি, সেক্রেটারি হয়েছি, প্রেসিডেন্ট হয়েছি—মিটিঙে যেতে হয় আমার।... তা ছাড়া মাষ্টার-মাষ্টারনীরা এসে সেলাম করে, বাড়িতে ধোরে। এসবে কি কম লোভ মাহুষের। যাদের 'মেরিট' আছে তারা নিজের শক্তিতে রিসার্চ করে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন করে, শিল্প সাহিত্য করে, দেশসেবা করে—মাহুষের কাছে বাহবা সম্মান পাওয়—অথচ সবাই হ'ত সে ক্ষমতা নেই, তাই এ সহজ পন্থা। আমি শুনেছি কি না মেয়েদের মুখে—আমি এক আত্মীয় বাড়িতে—বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ'ল—তিনি আমার পরিচয় শুনে বললেন—ও ঐ স্কুলে, ওখানে ত আমার স্বামী মেধার। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গভীর হয়ে গেল।

যেন বাড়ির এক দাসীর সঙ্গে খেতে বসেছেন তিনি এই রকম ভাব, তাই না?

অনেকটা তাই।

তা ত হবেই—রিকসাওয়ালা পর্যন্ত রূপার চক্ষে দেখে এদের। আমাদের স্কুলের অশোক এক রিকসা করে কিছু মাল আর বোনকে নিয়ে আসছিল তার বাড়িতে। পথে নেশা চেপেছে। লটবহর ডিঙিয়ে নামা হাক্কামা বলে রিকসাওয়ালাকে ছুটো পয়সা দিয়ে বললে—হু'পয়সার বিড়ি নিয়ে আর ত বাবা।

হুম পিয়েগা বাবু?—লিঙ্কিয়ে—বলে কতুয়ার পকেট থেকে দ্বিবি একটা পাসিংশো বের করে দিলে অশোকের হাতে।

অশোক ত অবাক। অশোক জিজ্ঞাসা করলে, রোজ কেতনা কামাতা তোম?

হুচ'টিক নেহি হৈ বাবু—কোডি দশ রূপেরা হোতা—কোডি আট নয় রূপেরা হোতা—দোবেলামে দো রূপেরা মালিককো দেনে পড়তা।

অশোক এসে আমাদের বললে—শুনে আমার মনের ভাব এমন হ'ল যে বলি—বাবা তুই রিকসে চেপে বস, আমিই টানি।

স্মিট্রা একদৃষ্টে অশোভনের মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল, এইবার বললে—শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়।

অশোভন বিপুল আত্মহে স্মিট্রার হাত ছুটি ধরে একরকম পাগলের মত বলে উঠল—সত্যি বলছ, রক্ত গরম হয় তোমার?

তা হয় বই কি—মাহুষ ত।

ওঃ বাঁচলাম,—আমরাও মাহুষ; আমাদেরও রক্ত গরম হয়।...তোমার কাছে আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমি, স্মিট্রা।

কি পাগলের মত বকছ,—তুমি আজ প্রকৃতিস্থ নেই দেখছি। প্রকৃতিস্থ আমি সত্যিই নেই,—কিন্তু পাগলের মত বকছি না আমি,—তোমার কাছে ভিক্ষা আমি সত্যিই চাই।

স্মিট্রা হেসে বললে,—কি চাই বল?

চাই আমি তোমার সব,—তোমার সাহায্য, তোমার অর্থ, তোমার পরিশ্রম—চাই আমি তোমার নিজেকে...

অশোভনের দুই বজ্রমুষ্টির মাঝে বন্দি স্মিট্রার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে,—চোখে এসে গেছে তার জল। সেই চোখেই সে অশোভনের দিকে চেয়ে বললে,—তোমার কথা ঠিক বুঝে উঠছি না যে আমি—

অশোভন স্মিট্রার হাতে আরও জোরে চাপ দিয়ে বলল,—আমার জীবনের ধর্ম খুঁজে পেয়েছি, স্মিট্রা—তা সাধন করতে সহধর্মিণী চাই,—তুমি আমার তাই হবে।

স্মিট্রা তবুও অশোভনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে দেখে সে পাগলের মত বলে উঠল,—কাল থেকে প্রাইক শুরু করতে চাই ইকুলে ইকুলে,—মেয়েদের স্কুলে চালাবে তুমি,—ছেলেদের স্কুলে আমি—

মাত্র দুই জনে?

হ্যাঁ,—ইচ্ছা থাকলে দুই জনেই হয়,—তুমি দলে নেবে দশ জনকে, আমি দশ জনকে,—দুই দশে কুড়ি—স্কুলের অধীক টিচার প্রাইক করলেই স্কুল হবে না,—তার পর দিন দেখবে—হু'শো,—পর দিন হু'হাজার, তার পর বিশ হাজার,—দশ দশ গুণ করে বেড়ে যাবে প্রতিদিন,—তুমি দেখে নিও—

কি করে চলবে এদের?

আধপেটা খেয়ে ত এরা আছেই,—না হয় সিকি পেটা কিছু দিন থাকবে,—তোমার আমার যা আছে তা দেব এদের—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্মিট্রা বললে,—সে আর কতটুকু?

ভিক্ষে করব এদের জন্তে,—তা ছাড়া টিউশন ত সবাই করতে হয়। তা দিয়ে কিছু দিন লড়তে পারবে।

স্মিট্রা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে,—ধীর চিন্তে ভেবে দেখ,—পারবে?

তুমি সাধী হলে নিশ্চয়ই পারবে।

আমি তোমার চিরকালের সকল কাজের সাথী।—কিন্তু আমাদের ত এসোসিয়েশন আছে—তাদের এক বার বলে কয়ে কাজে হাত দিলে হ'ত না ?

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আবার কঠোর হয়ে উঠল স্মৃশোভনের মুখ :—ওদের কেরামতি ইমারজেন্সি পিরিয়ডে দেখা গেছে—‘এ সেট অব্ ইমবেসিলস্’—ওরা জানে কেবল সরকারের কাছে—এক টাকা মাসিক ভিকার জগ্গে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে,—আর টেই-পেপার আর টেইকটুক ছাপিয়ে কয়েকটা খয়ের খাঁ পুষতে।...ও সব দিয়ে চলবে না,—দুর্গত,—অবমানিত,—অনাহারক্লিষ্ট টিচারদের নিয়ে আমরাই নতুন এসোসিয়েশন গড়ে তুলব।

তোমার মনে হয় তারা সাড়া দেবে ?

নিশ্চয়,—শত বার সহস্র বার সাড়া দেবে তারা,—নানা জালায় জলে তারা শুকনো ঝড় হয়ে আছে—শুধু একটা ফুলিঙ্গ চাই।...তুমিই ত একটু আগে বললে—রক্ত গরম হয়ে ওঠে,—কারণ তুমি মাহুষ।—তারাও মাহুষ।...লেখাপড়া শিখে মাহুষ হয়েছে,—আর দশ জন মাহুষের মত বাঁচতে চায় তারা—

কিন্তু মাহুষের মত বাঁচবার দাম কে দেবে তাদের—সরকার ?

সরকার কেন,—যারা রিকসাওয়ালাকে দিয়েছে, সবজি-ওয়ালাকে দিয়েছে, মাছওয়ালাকে দিয়েছে,—তরাই। শুধু চাইতে জানা চাই,—knock and the door will be opened.

স্বার্থগুণু দুরন্ত সভ্যতা !

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সাম্রাটের স্নিগ্ধ বাণী সৌহার্দ্যের শান্ত সুর,
ভ্রাতৃত্বের স্নেহ অলুরাগ
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিনে ছিল নাক’ লেশ মাত্র ভাগ,
নৃশংস হত্যার মোহে লুণ্ঠনের সমারোহে।
রক্তস্নাত দিকচক্রবালে
হিংসার কুটিল মেঘে ভয়াতুর দিবস-শরীরী
শ্রেণী-স্বার্থ কুটচক্রজালে লক্ষ নর হত্যা করি
গৃহহারা পথ হারা অনাথার অভিলাষ বরি
হে পাশবিক সভ্যতা ! এ কি রূপে দিলে দেখা তুমি
দধি করি মোর জন্মভূমি।

স্বজন বিরহে আজ জীবনের ভগ্ন ঘাটে
অসহায় শিশু সম আমি,
লক্ষ লক্ষ অভাগার আর্তনাদ শুনি দিবামামী।
আশ্রয় ধুঁজিয়া মরে প্রাণধারণের তরে
আহত বিহঙ্গ অবিরত ;
বিরাই ধ্বংসের বৃকে রাজপথ বিধুর বিনত।

এ বঙ্গের রাজধানী ভস্মীভূত হৃদয়ালে,
শব্দ পে রাজ্যলক্ষ্মী কঁাদে।
ঈদের রজনী যায় মৌন অশ্রু বরিষণ সাথে,
চাঁদে কালো ঘন ছায়া পড়ে।

স্বদেশের ভাগ্যাকাশে তারা-দল ওঠে জ্বলে ;
কে জানে কখন বন্ধু ! আশ্বিনের রক্ত ঝড়ে
কেতকীর বনে মোর এনে দিবে পুতিগন্ধময়
প্রেতের উল্লাস রক্তধাস ভরা পথে।
সোনার সংসার ভাঙি কুলবধু এনে গৃহ হ’তে
করেছ কতনা হত্যা ! কত শিশু-শোণিতের স্রোতে
ভাসিয়েছ দেশ ! একি তব পৈশাচিক পরিচয়
স্বার্থগুণু দুরন্ত সভ্যতা !
বীভৎস উগ্রতা তব নির্বাসিত করে মানবতা।

পাশাপাশি ভিন্নধর্মী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যারা
শান্তির স্নিগ্ধতা লয়ে সখ্যস্বত্রে করে এলো বাস,
অবিবাহে দ্রুত হ’ল তারা।
এ বঙ্গের জলবায়ু স্বভিকারে নিয়ে বারো মাস
করেছে সংসার। এই ঠামা জননীর স্তম্ভপানে
হয়েছে বন্ধিত,—দুরন্ত সভ্যতা ! কেন পৃথ্যাচার
শিখিয়েছ শান্তি-স্নিগ্ধ নিরীহ মানব-প্রাণে ?
ইতিহাসে র’বে লেখা কলঙ্কিত তব ব্যবহার ;
ভাবী যুগ-যাত্রাপথে দিলে বন্ধু ! অশ্রু-অন্ধকার
তব দিবা-স্বপ্ন অবসানে।

আধারের দূরবীন

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নৈসর্গিক ঘটনাবলীর খুবই সামান্য অংশ মানুষের অহুভূতির কাছে ধরা পড়ে। বিধাতা চাহিয়াছিলেন তাঁহার সৃষ্টিকে 'বিচিত্র ছলনা-জালে ঢাকিয়া' রহস্যজনক করিয়া রাখিতে, মানুষের বোধের শক্তি তাই সীমাবদ্ধ। আমরা চোখে যাহা দেখি,



সুপারসকোপ

আমেরিকায় ব্যবহৃত আধারের দূরবীন

কর্ণে যাহা শ্রবণ করি, স্পর্শ করিয়া যাহা অহুভব করি তাহার বাহিরেও রহিয়াছে কত না ঘটনা—মানুষের ইন্দ্রিয়কে তাহার ক্ষমতা দিয়া চলে। শুধু বিধাতার দান লইয়া ছরাকাজ্ঞ মানব চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। যান্ত্রিক আবিষ্কারের অগ্রগতি মানুষের বোধের সীমাকে বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছে, তাই প্রকৃতির বিধানে যাহারা গোপন সন্ধারে আনাগোনা করিত তাহাদের অনেকে ধরা পড়িয়াছে যন্ত্র-বান্দে। মানুষের দৃষ্টি আজ প্রসারিত হইয়াছে দূরত্বের বাধা ও আধারের অন্তরালকে অগ্রাহ করিয়া।

গ্যালিলিও দূরবীন নির্মাণ করিয়াছিলেন সে কাহিনী পুরাতন। সেদিন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল সত্য কিন্তু তখনও বিধাতা বোধ হয় আপাত পরাজয় সত্ত্বেও মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিলেন। মানুষের যান্ত্রিক চক্ষু দূরবীন, দূরকে নিকটে লইয়া আসিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেও এই সাক্ষ্যের গভী ছিল

সঙ্গীর্ণ। আমাদের দৃষ্টিশক্তির মূল কথা আলো। দূরবীনের সাহায্যে এমন সব বস্তুকেই দেখা সম্ভব ছিল যাহারা নিজেরা জ্যোতিষ্মান হইয়া কিংবা অল্প কোন আলোর উৎস হইতে আলো গ্রহণ করিয়া থাকিলেও দূরত্বের জন্ত উহাদের দেহ হইতে আগত স্বল্প আলোক আমাদের চক্ষুতে কোন সাড়া জাগাইতে সক্ষম ছিল না; দূরবীনের মধ্যবর্তিতায় এই জাতীয় দূরের বস্তু হইতে আগত আলো একসঙ্গে বেশী করিয়া ধরিয়া লইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু আলো যেখানে নাই নয়ন সেখানে অন্ধ, দূরবীনের সহায়তা সেখানে নিষ্ফল ও অর্থহীন। এত করিয়াও মানুষ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আটিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বিরতি নাই, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি পরাভব মানিতে জানে না। তাই মানুষের চোখের শক্তি আজ অন্ধকারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে না। বাইনোকুলার যন্ত্রের মতনই একটি যন্ত্র চক্ষুতে লাগাইয়া মানুষ আজ অন্ধকারের ভিতরেও দূরবর্তী বস্তু দেখিতে পাইতেছে। হেড লাইট ছাড়াও মোটর গাড়ী অন্ধকারের ভিতর ছুটিয়া চলিতেছে।

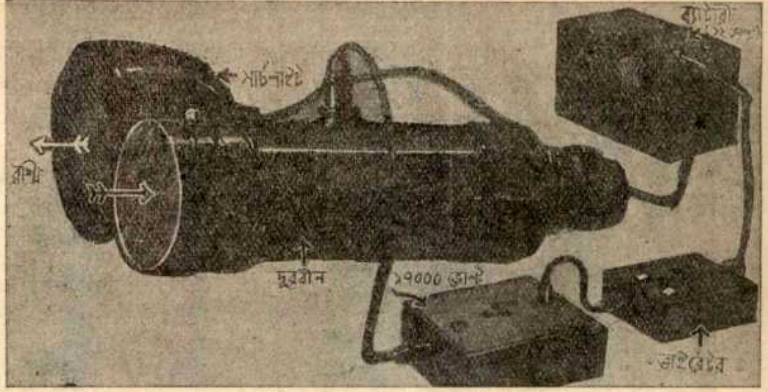
অন্ধকারে কোন বস্তুকে দেখিতে হইলে তাহার উপর আলো নিক্ষেপ করিতে হয়। আলো নিক্ষেপের ব্যবস্থা অবশ্য ক্রমে উন্নত হইয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক দূরে অবস্থিত বস্তুর উপরেও আলো ফেলিয়া অন্ধকারকে আংশিক জয় করা সম্ভব হইয়াছে। সার্চ লাইট, টর্চের আলো ইহারা এমনই অন্ধকারকে পরাভূত করিবার উপায় স্বরূপ এবং এগুলির দ্বারা অন্ধকারে অবস্থিত বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব। সন্ধানী আলোর সহযোগিতায় অন্ধকারেও পশুপক্ষী শিকার করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। অহুরূপ প্রক্রিয়াকে অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্ত ব্যবহার করিতে গিয়া দেখা গেল যে উহা সর্বথা কার্যকরী নহে। কারণ সন্ধানী আলো ফেলিবারাত্র অপর পক্ষ আততায়ীর অস্তিত্ব টের পাইয়া গেল এবং আত্মরক্ষার সুযোগ পাইল। অন্ধকারের গোপনতার ভিতর শত্রু নিপাত করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইতে পারে যদি আক্রমণকারীর দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের চক্ষু সে ক্ষমতা কোথায়? কোন কোন স্থাপদ নাকি আধারেই ভাল দেখে। প্রাকৃতিক বিধানে মানুষ কিন্তু সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কিন্তু এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিধাতার পরিকল্পনা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অথবা বলিতে পারি, পরস্পরের সহিত বিবদমান তথাকথিত আধুনিক সভ্য মানুষ স্থাপদের বৈশিষ্ট্য-টুকুও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। পশুর মত হানাহানি যেখানে করিতে হইবে সেখানে পশু-ধর্ম পালন না করিলে চলিবে

ইনফ্রা-রেড রশ্মি অদৃশ্য হইলেও উহার। দৃশ্য আলোকের মত গুণবিশিষ্ট। উহার।ও কোন বস্তুর উপর পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হয়, কিংবা লেন্সের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া উহাদিগকেও আলোকরশ্মির মত 'ফোকাস' বা কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। আধারে ব্যবহৃত দূরবীনের কয়েকটি পৃথক পৃথক অঙ্গ আছে। ইহার একটি অংশে অদৃশ্য লালউজানী আলো উৎপন্ন করিয়া তাহাকে সার্চলাইটের মত প্রতিফলকের সাহায্যে লক্ষ্য বস্তুর উপর ফেলা হয়। লক্ষ্যবস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া যে রশ্মিগুলি ফিরিয়া আসে তাহাদিগকে

সাধারণ দূরবীনের মতই লেন্সের সাহায্যে ধরিয়া লওয়া হইল। লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত রশ্মি অতঃপর পতিত হয় একটি বিশেষরূপে নির্মিত পর্দার উপরে। সাধারণ দৃশ্যমান আলো এই প্রকার লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত হইলে কেন্দ্রস্থানে লক্ষ্যবস্তুর একটি ক্ষুদ্র অথচ খুব উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব রচনা করিত এবং সেই প্রতিবিম্বের আলো দূরবীনের পশ্চাদ্ভাগের লেন্সে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর প্রতিবিম্বে পরিণত হইত ও লেন্সের পিছনে চোখ রাখিয়া উহাকে দেখা যাইত। ইনফ্রা-রেড রশ্মিরও অতঃপর অবস্থা ঘটে কিন্তু সমুখস্থ লেন্সের প্রভাবে উহার যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় উহা মানুষের চোখে ধরা পড়িবার মতন নয়। সেইজন্য পিছনের লেন্সে পাঠাইবার পূর্বে ইহাকে ইন্ডিয়াক্স করিবার জন্ম অল্প প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সোডিয়াম পটাসিয়াম, সিজিয়াম জাতীয় কতকগুলি পদার্থ আছে উহাদের বিশেষ গুণ এই যে উহাদের উপর সাধারণ দৃশ্যমান আলো ফেলিলে উহার। ইলেকট্রন মুক্ত করিয়া দেয়। দৃশ্য আলোক ভিন্ন লালউজানী আলোর এ-ধরণের ক্ষমতা ছিল না বলিয়াই জানা ছিল। সম্প্রতি উদ্ভাবিত আধারের দূরবীনে পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করিবার জন্ম এমন ধরণের আবিষ্কার করিতে হইয়াছে যাহাতে ইনফ্রা-রেড রশ্মির প্রভাবেও কোন না কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন মোচন করা সম্ভব হইয়াছে। এই আবিষ্কারের স্বরূপ এখনও সম্যক জানা যায় নাই—তবে খুব সম্ভব ইনফ্রা-রেড রশ্মি প্রভাবে ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার জন্ম সিজিয়াম ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত লেন্সদ্বারা কেন্দ্রীভূত ইনফ্রা-রেড রশ্মির প্রতি-বিম্বকে এবিধ পদার্থে নির্মিত পর্দার উপরে ফেলা হয়। এই পর্দার নাম ফোটো-ক্যাথোড। লক্ষ্যবস্তুর যে স্থান হইতে যে পরিমাণ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে ফোটো-ক্যাথোডের উপরকার ইনফ্রা-রেড প্রতিবিম্বের অতঃপর অংশে তদনুযায়ী রশ্মি কমবেশি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইনফ্রা-রেড



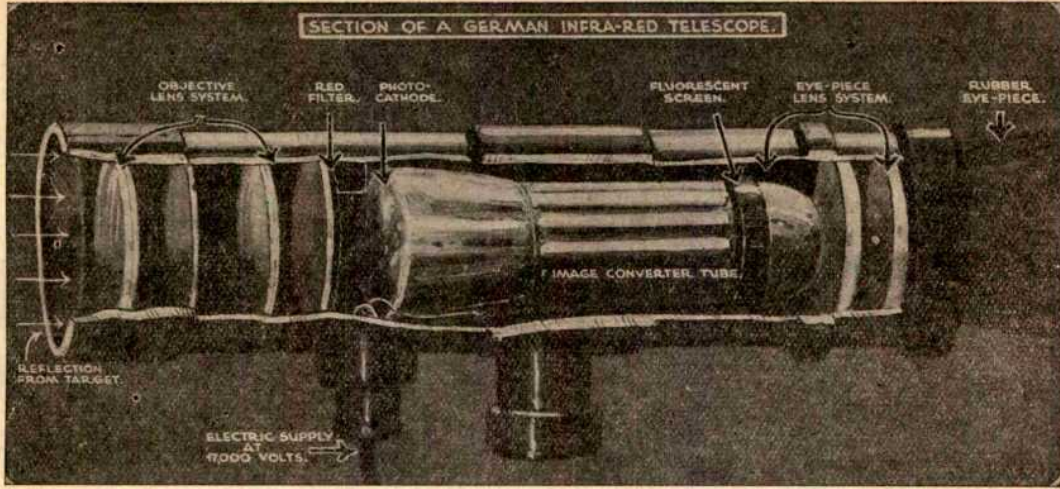
ইনফ্রা-রেড দূরবীনের বিভিন্ন সরঞ্জাম

রশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী পর্দার বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত। ইলেকট্রনের সংখ্যা কমবেশি হইয়া থাকে। পর্দা হইতে বিমুক্ত ইলেকট্রন-শ্রোতকে শক্তিশালী (সতর হাজার ভোল্ট) তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়া সমুখ দিকে চালিত করা হয়। এই ইলেকট্রন রশ্মিকে আবার কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

তড়িৎ বা চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রন শ্রোতকে বাঁকানো বা নোয়ানো যায়। এই উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে স্থাপিত তড়িৎ-ক্ষেত্রের নাম বৈদ্যুত লেন্স। যেমন করিয়া আলোর রশ্মিকে কাচের লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে তেমনি ইলেকট্রন রশ্মিকেও চৌম্বক লেন্সের প্রভাবে আবার অল্প একটি পর্দার উপরে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে। এই পর্দায় এমন জিনিষ থাকে যাহারা ইলেকট্রনের আঘাতে আলোক প্রদান করে। যেখানে ইলেকট্রন আসিয়া থাকা যায় সেখানেই দৃশ্য আলোক উৎপন্ন হয় কিন্তু ইলেকট্রনের সংখ্যানুযায়ী আলোর ওজ্জ্বল্য বাড়তে কমে। এই আলোকের জন্ম পর্দার উপরে একটি ছবি ফুটিয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে পর্দার ছবির আলোকবিভাসের জন্ম দায়ী ইলেকট্রন রশ্মি, আবার ইলেকট্রন রশ্মির নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে লক্ষ্যবস্তু হইতে প্রতিফলিত ইনফ্রা-রেড রশ্মিদ্বারা। সুতরাং পর্দায় আলোছায়ার যে ছবি তৈয়ারি হইতেছে উহা লক্ষ্য-বস্তুর অবিকল প্রতিকৃতি বটে।

সাধারণ দৃশ্য আলোকের দূরবীনের সঙ্গে এই দূরবীনের কার্যপ্রণালীর ও বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য থাকিলেও ইনফ্রা-রেড রশ্মিকে ইলেকট্রনরশ্মি ও তৎপর আলোতে রূপান্তরিত করিবার জন্ম ইহার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত অংশ জুড়িয়া দিতে হইয়াছে। পর্দায় যে আলোছায়ার ছবি ফুটিয়া উঠে উহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্ম যে ব্যবস্থা তাহা সাধারণ দূরবীনে ব্যবহৃত পশ্চাদ্ভাগের লেন্সের ব্যবস্থার অনুরূপ।

বিগত মহাসমরের সময়ে জার্মানী এবং অস্ট্রা দেশে এই প্রকার দূরবীন নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে



জার্মান ইনফ্রা-রেড দূরবীনের অভ্যন্তর ভাগ

অন্ধকারে শত্রুকে আক্রমণ করা সম্ভব হইয়াছিল। রাইফেল, মেশিনগান কিংবা ট্যাঙ্কের সঙ্গে এইগুলিকে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাইফেলে ব্যবহৃত যন্ত্রের নামও দেওয়া হইয়াছিল 'ভ্যামপীর'। সকল সরঞ্জামসহ ভ্যামপীরের ওজন ছিল পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। এক জন পদাতিক সৈনিকের পক্ষে এই ভার বহন কষ্টসাধ্য ছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু ইহার অল্প কোন উপায়ও ছিল না, কারণ দূরবীনকে চালু করিবার জন্ত কয়েকটি বিভিন্ন যন্ত্র দরকার। ইনফ্রা-রেড রশ্মি ও সতর হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার জন্ত একটি বার ভোল্টের ব্যাটারী ও ভাইব্রেটর যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইগুলি বহন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ভ্যামপীর যন্ত্রের সাহায্যে সত্তর গজ দূর হইতে অন্ধকারে বন্দুকের নিশানা করা চলে। মোটর গাড়ী বা ট্যাঙ্ক শুধু এই দূরবীনের সাহায্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভিতরেও ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলিতে পারে। ট্যাঙ্কের সহিত ইনফ্রা-রেড সার্কেলাইট সংযোগ করিয়া হাজার গজ দূর হইতে শত্রুর সন্ধান করা সম্ভব। সমুদ্রোপকূলে আরও বৃহদাকার সার্চ-

লাইটের সাহায্যে সাত মাইল দূরবর্তী জাহাজকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।

জাপানী যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরাও এই প্রকার দূরবীন ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে নৈশ আক্রমণ-কার্ধ্যে এই দূরবীন সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইনফ্রা-রেড বা তাপরশ্মির সাহায্যে ফোটা তোলার কাজ ইতিপূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার ফলে কুয়াসা, ধোঁয়া কিংবা ধূলাবালির অন্তরালে দূরবর্তী অস্ত্র দৃশ্যের স্পন্দর ফোটা তোলা চলিত। ইনফ্রা-রেড দূরবীনের আবিষ্কারে এক্ষণে এই সকল দৃষ্ট চোখেই দেখা যাইবে। সুতরাং সাময়িক প্রয়োজনীয়তায় এই আবিষ্কারের স্বচনা হইয়া থাকিলেও সাধারণ মানুষের জীবনেও ইহার উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। পুলিশের পক্ষে অন্ধকারে চোরডাকাত প্রভৃতির উপর নজর রাখিতে বা সন্ধান করিতে এই যন্ত্র সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিবার সুযোগ আছে।



সার্জেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার ইতিহাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের রিপোর্টের (সার্জেণ্ট-স্কীমের) মত এত ব্যাপক পরিকল্পনা পূর্বে রচিত হয় নাই। প্রায় দুই শত বৎসরকাল ইংরেজ রাজত্ব চলিতেছে, ইহার মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বহু রিপোর্ট রচিত, প্রকাশিত এবং লাল ফিতার বন্ধনে সমাধিস্থ হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনা উডের ডেসপ্যাচ হইতে স্ট্রাডলার কমিশন ও বিস্ সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্ট পর্যন্ত—ভারতীয় শিক্ষার কোন কোন অংশে আলোক সম্পাত করিয়া যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার সাধনের নির্দেশ করিয়াছিল। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষের শিক্ষাকে একটি ক্রমগতিশীল, নিরবচ্ছিন্ন ধারা (continuous process) মনে করিয়া জীবনের প্রায় সকল স্তরের শিক্ষাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তাই দেখা যায় নার্সারি শিক্ষা হইতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, টেকনিকাল ও চারুশিল্প শিক্ষা, শিক্ষকের ট্রেনিং, গণশিক্ষা, ইষ্টুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য, মুক-বধির প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষা, ক্রীড়া-কৌতুক, যুবকদিগের কর্মপ্রাপ্তিতে সহায়তা করিবার জ্ঞান নিয়োগ-কমিটি (Employment Bureaux) এবং শিক্ষাপরিচালন (administration) সমস্তা বিবেচনা করিয়া শিক্ষাবোর্ড ভারতবাসীর জাতীয় শিক্ষাকে সমগ্রভাবে ধরিয়া স্থনির্দিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ পরিকল্পনার ক্রটি হিসাবে দেখাইয়াছেন যে ইহাতে ধর্মশিক্ষা, বালিকা-দিগের শিক্ষা, পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী আলোচিত হয় নাই।

এই পরিকল্পনাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইহাতে আশা করিলে ভুল করা হইবে। তাহা ছাড়া পরিকল্পনা কাগজে কলমে নিখুঁত হইলেই আপনা হইতেই তাহা সার্থক হইয়া উঠে না; তাহাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়া অবস্থা বরিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত বাস্তববাদীর কর্মপ্রণালী। ভারতের গ্রাম বহুধর্মের দেশে বিদ্যালয়ে দলগত ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিক্ষাবোর্ড বিবেচনা করিয়া পরে এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবেন। সমগ্র পরিকল্পনা বিচার করিয়া এ কথা অসংকোচে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক কাঠামো রচনার কাজে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড যে বলিষ্ঠ প্রেরণার

পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্ম তাহারা দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার যোগ্য। বোর্ডের ৪১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন ইউরোপীয় এবং ২৭ জন ভারতীয়।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার আন্তরিকতা। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, ইহার অধিবাসীরা দরিদ্র, অধিকাংশ অশিক্ষিত, বিদ্যার অভাবে জ্ঞান মুক, অর্থাভাবে নিরানন্দ দুঃখময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ইহাদিগকে স্বাস্থ্য সম্পদে বলীয়ান করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা দেশে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইবে। পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, অর্থাভাবের ওজুহাতে বহুদিন হইতে এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করিতেছে। জগতের অগ্রাগ্র সভ্য স্বাধীন দেশ যখন শিক্ষাপ্রসার দ্বারা প্রজা-সাধারণকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, তখন ভারতবর্ষ যদি শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে সচেতন না হয় তবে চিরদিন তাহাকে সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ভারতের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষে যেরূপ শিক্ষা ন্যূনতম প্রয়োজন তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায়। ইহার ফল স্বদূর-প্রসারী এবং ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। ভারতের ভাবী নাগরিকগণ যখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আবশ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কতক বা মাধ্যমিক ইষ্টুলে, শিল্প বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির কাজে ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে তখন ভারতবর্ষের অবস্থা বর্তমানের মত স্রিয়মাণ, হীন থাকিবে না। ভারতবর্ষ যদি শিক্ষায় অগ্রসর ও আর্থিক অবস্থায় সচ্ছল হইয়া উঠে তবে তাহার ফল শুধু ভারতের সমাজের উপরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। কাশ্মীর ও জম্মুতেটের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কে জি সৈয়দীন বলিয়াছেন :

You cannot possibly keep the one-fifth of the human race—once it has been educated—in poverty, ill-health and political subjection. They will demand—and get—their legitimate cultural, social and material rights.

একবার শিক্ষিত হইয়া উঠিলে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জনগণকে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে দাবাইয়া রাখা সম্ভব নয়। তাহারা তাহাদের জাতি-সম্মত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাগ্যতিক অধিকার দাবি করিবে এবং আদায় করিয়া ছাড়িবে।

এ দেশের আর্থিক ছরবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারতের কল্যাণের জন্ত জনসাধারণের যে শিক্ষার নিম্নতম প্রয়োজন (Minimum requirement) তাহারই বিষয় পরিকল্পনায় আলোচিত হইয়াছে। তবু দেখা গিয়াছে, পরিকল্পনা পূর্ণভাবে চালাইবার সময় বার্ষিক খরচ পড়িবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। প্রজ্ঞার পালন এবং তাহার সর্বাধিক উন্নতির ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য; প্রজ্ঞার শিক্ষার স্ববন্দোবস্ত করাও গবর্ণমেন্টের নৈতিক দায়িত্ব। ভীষণ অর্থনীতিক হয়ত এত মোটা টাকার অঙ্ক দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু অত্যাশ্রিত দেশের শিক্ষাবাদ ব্যয়ের তুলনায় ৩০০ কোটি টাকা খুব বেশী নয়। ভারতবর্ষে শিক্ষার খরচ জনসংখ্যার মাথাপিছু বার্ষিক ১১৫, ইংলণ্ডে বার্ষিক খরচ অধিবাসীর মাথাপিছু ৩২৬। ব্রিটিশ ভারতে প্রায় ৩০ কোটি লোকের জন্ত বৎসরে সরকারী তহবিল হইতে খরচ হয় ১৬৮ কোটি টাকার মত; কেবল বৃহত্তর লণ্ডনেরই শিক্ষার ব্যয় ইহার চেয়ে বেশী! ব্রিটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর জন্ত বার্ষিক খরচ হয় ১৫০ কোটি টাকা। ইহার উপর যুদ্ধোত্তর যুগে আরও ১০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই টাকার প্রশ্ন তুলিয়া অত্যধিক খরচের ওজুহাতে পরিকল্পনাকে চাপা দেওয়া চলিবে না। এতদিন সস্তার শিক্ষাব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে; সস্তার যে অবস্থা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মিঃ সার্জেণ্ট বলিয়াছেন যে, ভারত যদি প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা চায় তবে তাহাকে অত্যাশ্রিত দেশের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া যথোপযুক্ত ব্যয় করিতেই হইবে। এখানেই হইবে সরকারের সদিচ্ছার অগ্নিপরীক্ষা।

শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যও শিক্ষাবাদ খরচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষা দেশবাসীর পক্ষে বিলাসমাত্র নয়; ইহা সমাজের এবং দেশের সর্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অত্যাশ্রিত স্বাধীন দেশে শিক্ষার খরচকে মনে করা হয় জাতীয় কল্যাণকামনায় মানুষ তৈয়ার করার জন্ত অগ্রিম দান (national investment); দেশ শিক্ষার জন্ত যে পরিমাণ টাকা খরচ করে, শিক্ষিত নাগরিক তাহাদের প্রতিভাকে পূর্ণতা দিবার সুযোগ পাইয়া কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে দিয়া প্রতিমানে তাহার বহু গুণ ফিরাইয়া দেয়। আমাদের দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দুইয়ে একটি চুইচক্র রচনা করিয়াছে। ভারতবাসী অশিক্ষিত—কারণ দরিদ্র বলিয়া তাহার অধিবাসীরা শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিতেছে না। ভারত দরিদ্র, কারণ অশিক্ষিত বলিয়া জনগণ অর্থোপার্জন করিবার সুযোগ পাইতেছে না। সাহসিকতার সঙ্গে এই চুইচক্র ভেদ করিয়া

জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিতে পারা পর্যন্ত এই আর্থিক অসচ্ছলতা ও অসহায় অবস্থা অনন্তকাল ধরিয়াই চলিতে থাকিবে, কেননা, যাহারা দেশের প্রকৃত ধন উৎপাদক তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রভূত অর্থোপাদানে নিয়োজিত না করা হইলে আর্থিক সচ্ছলতা কোথা হইতে আসিবে? দেশবাসীর সুশিক্ষার জন্ত শিক্ষাখাতে অর্থ দান না করিয়া কোন দেশই জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার প্রাক্কালে বিলাতে এক ভোজনভাষ্য ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে আশার বাণী প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালীন আপদ দূর করিবার জন্ত সময়-রত দেশসকল উন্নতির মত অকাতরে অর্থ ব্যয় করে কিন্তু শান্তিকালীন আপদ (evils of peace) যথা অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, রাস্তাঘাটের অসুবিধা, দারিদ্র্য প্রভৃতি দূর করিবার জন্তও অনুরূপভাবে অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। এতৎসঙ্গেও ভারতের সকল রকম ‘আপদ’ শিক্ষাবাদ নাবিকের ঘাড়ে অপদেবতার মত অচল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কোন পরিকল্পনা নিখুঁত ভাবে রচিত হইলেই তাহার উপকারে আসে না। মানুষের কল্যাণে তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়াতেই পরিকল্পনার সার্থকতা। ইহার জন্ত যেমন সহায়ভূতিশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গবর্ণমেন্টের কর্তব্যনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের প্রবল আকাজক্ষা ও সহযোগিতা। আমাদের জুর্ভাগ্য এই যে: বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্থলে ব্যাপক এবং দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ শিক্ষার জন্ত তীব্র আন্দোলন এখন পর্যন্ত দেশবাসী আরম্ভ করে নাই। সত্য বটে, নেতাদের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন দেশের গবর্ণমেন্ট লোকাগত না হইলে জাতিগঠনমূলক কোন কাজ আশানুরূপ ভাবে করা যাইবে না, অপর দেশ শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মাত্রই জানে শাসিতের অজ্ঞতার মধ্যেই শাসকের শক্তি নিহিত; কাজেই পরাধীন জাতিকে শিক্ষায় উন্নত করিয়া তোলার অর্থই হইল আপন হাতে সাম্রাজ্যবাদের মূল উচ্ছেদ করা। এরূপ অবস্থায়, রাজনৈতিক নেতাদিগের মতে, স্বাধীনতা লাভের জন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া দেখিবার আছে। স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যের অবাধ সুযোগ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু স্বরাজের মধ্যে এমন কোন বাহুদণ্ড নাই যাহার প্রভাবে রাতারাতি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া ধরায় স্বর্গধাম স্থাপিত হইতে পারে। বরং বহু জটিল এবং অচিন্তিতপূর্ব সমস্যা বাধভাঙা বস্তার জলের মত নূতন গবর্ণমেন্টকে চারিদিক হইতে অভিভূত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে।

স্বরাজ লাভের পর জাতিগঠনমূলক কাজে অগ্রসর হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হইলে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে সার মরিস গায়ার নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যে স্থিতিস্থিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য। স্বাধীনতা অঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল অভাব অসুবিধা হাওয়ায় মিলাইয়া যায় না, বা তাহাদের মীমাংসা সহজ হইয়া আসে না, এবং পূর্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলে অনেক সময় যে নব-অর্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন ও দেশ বিশৃঙ্খলার কবলে নিপতিত হয় তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সার মরিস বর্তমানের দুইটি দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি চীন দেশ। শুধানে মহা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে একটি সুপ্রাচীন রাজবংশের ক্ষমতা লোপ করিয়া গণতন্ত্র (রিপাব্লিক) স্থাপিত হইল, কিন্তু এরূপ বিরাট পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট জাতিগঠন সংক্রান্ত অত্যন্ত পরিবর্তনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে না থাকায় বা তদনুযায়ী কোন কাজ পূর্বাহ্নেই আরম্ভ না হওয়ায় প্রায় দুই দশক ধরিয়া গৃহযুদ্ধ, ভূভিক্ষ, মহামারী অশান্তি লাগিয়াই আছে। নতুন অবস্থার মধ্যে সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া এক মহাজাতি গঠন করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া দেশকে উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, চেকোস্লোভাকিয়া। অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের অধীন থাকা কাল হইতেই এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে এবং বেনেস, মাসারিক প্রভৃতি দূরদর্শী নেতার পরিচালনায় স্বরাজসাধনার অঙ্গ হিসাবে ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের জন্ত কর্মপন্থা নির্ধারিত ও অনুসৃত হইতে থাকে। এই ভাবে পরাধীন থাকা অবস্থাতেই চেকগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ অন্তঃকলহ, বিশৃঙ্খলা বা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি না করিয়াই তাহারা ইউরোপের অগ্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির অগ্রতম বলিয়া পরিগণিত হইল।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদেরকে এখন হইতেই কর্মতৎপর হইতে হইবে। স্বরাজ লাভের পর

সকল সমস্তার সমাধান হইবে বলিয়া ভ্রান্ত আশায় বসিয়া না থাকিয়া সংগঠন-পরিকল্পনাকে এখন হইতে কাজে রূপান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যিক। ইহার জন্ত প্রবল জনমত গঠন করা দরকার আর চাই শিক্ষা-সংস্কারের দাবি করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন। অর্থাভাবের ওজুহাতে পরিকল্পনাটি বাহাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত সরকারী দপ্তরে সমাহিত না থাকে সে বিষয়ে জনসাধারণকে সজাগ হইতে হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাকে একই সঙ্গে সারা দেশে চালু করা সহজসাধ্য নয়; কাজেই বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া নির্বাচিত অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কথা উঠিতে পারে যে সকলের পক্ষে সমান সুবিধা দেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীর জন্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে কি? কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা অল্পপরিসর স্থানেও নূতন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে, তাহাতে বাস্তবের নিকষপাথরে পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে; দেশের পক্ষে আদর্শ স্থল কিরূপ, আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থাই বা কিরূপ হইবে তাহার নমুনা দেখিতে পাইলে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া শিক্ষাপ্রসারের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবে। এই ভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত করিয়া নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমগ্র দেশেই ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

বর্তমান ভারত ভাবী এক নূতন জীবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছে। বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন তাহার সম্মুখে, কিন্তু পথ কোমল কুসুমাস্তীর্ণ নহে। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বহুবিধ সমস্তার কণ্টক-জালে আচ্ছন্ন ভূমিতে ভারতবাসীকে বলিষ্ঠ দেশপ্রীতি ও উদার গুণবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া সাম্য, মৈত্রী ও একতার ফসল ফলাইতে হইবে। দেশবাসীর শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া বঙ্গাঙ্গুর জীবনের মধ্যেও দেশবাসীকে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। কেননা, প্রচেষ্টাবিহীন জনগণের স্বনির্ভর অতিবাহিত রজনীর শেষে উন্নতির স্বথস্ব আপনাআপনি আসিয়া উদয় হয় না। যেমন চেষ্টা তদনুরূপ তার সিদ্ধি একথা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য কোন দেশের জাতীয় জীবনেও তেমনি অমোঘভাবে সত্য।

শিম্পের দরদ

শ্রীশ্বর্গপ্রভা সেন

বহু প্রাচীন কালে লুং মেন পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল কিরি গাছ—অরণ্যের সত্যিকারের রাজা। গাছটি যেন আকাশের তারার সঙ্গে কথা বলার জন্তেই মাথা উঁচু করে ছিল আর তার বাদামী রঙের শিকড়গুলি চালিয়ে দিয়েছিল মাটির বুকে যেখানে গভীরে গুয়ে আছে রূপালি দৈত্য। এক দিন ঘটনাচক্রে এক মত্ত যাত্রীকর ঐ বিশাল বনস্পতিকে কেটে এক অপূর্ব বীণাযন্ত্র তৈরি করলেন—এর তন্ত্রীতে সুরের স্বাক্ষর তুলতে পারবে শুধু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার।

বহুকাল বীণাটি চীনের সত্রাট্‌ পরম যত্নে সাদরে রক্ষা করলেন—কত গুণী বীণাটি বাজাতে চেষ্টাও করলেন, কিন্তু বিফল হল সকল প্রয়াস। তাঁদের চরম সাধনার ফলে যে ব্যক্তির সুর বীণার তারে ধ্বনিত হ'ত তাই দিয়ে তাদের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা চলত না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, বীণা কারো কাছে মাথা নোয়াল না।

অবশেষে এক দিন এলেন গুণীর সেবা গুণী Pei Woh—কোমল করে তিনি তুলে নিলেন যন্ত্রটিকে। পাকা সওয়ার হুসু অবাধ্য ঘোড়াকে যেমন করে পোষ মানায় তেমনি করে পরম স্নেহে তিনি বীণাটির তারে যত্ন যত্ন আঘাত করলেন। তাঁর হাতের হাঁওয়া লেগে বীণার বুকে জেগে উঠল সুরের স্বাক্ষর—গানের মূর্ছনা। সে গানে ছিল প্রকৃতির বর্ণনা, বিশাল পর্বতের কথা, নিঝরিণীর কলতানের বারতা। বাজনা শুনে গাছের সব পুরনো স্থিতি জেগে উঠল। তার শাখায় শাখায় বসন্তের মধুর হিজল খেলে গেল। কোথাও বরষার জলধারা উথলে উঠছে, নেচে নেচে তারা যেন ফুলের কুঁড়িতে কুঁড়িতে হাসির তুফান তুলে গেল। তার পর বীণা গায়ে উঠল ঐশ্বরের গান—অগণিত পতঙ্গের গুন গুন ধ্বনি। বৃষ্টি-ধারার মৃদু গুঞ্জন, কোকিলের কুহতান, সবটা মিলে এক মায়ালোকের স্বপ্ন হ'ল। আবার ঐ শোন, বাঘের গর্জন, আর পাহাড়ের উপত্যকা থেকে তার প্রতিধ্বনি। শরৎকাল, নিয়ুম রাতে শিশিরভেজা ঘাসে ঘাসে চাঁদের আলো ধারাল ছুরির মতো চক্‌ চক্‌ করে উঠছে। তার পর আসে শীত; হিমের হাওয়ার দলে দলে হাঁস উড়ে চলে, আর গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় হয় শিলাবৃষ্টির শব্দ—যেন কার আকুল আনন্দের প্রকাশ।

এবার Pei Woh তাঁর সুর বদলে ধরলেন প্রেমের গান। গভীর চিন্তায় মগ্ন, প্রেমে বিভোর বালকের মতো অরণ্যানী হেলছে ছলছে। উর্ধ্ব আকাশের গায়ে উজ্জ্বল এক খণ্ড মেঘ যেন কোন গরবিণী; কিন্তু আস্তে আস্তে মেঘের ছায়া ছায়াশার মত কালো হয়ে ওঠে। আবার পরিবর্তন; এবার গুণী

গাইলেন যুদ্ধের গান—বেজে উঠল অস্ত্রের কনকনা, ঘোড়ার পায়ের খটখটাখট। এবার উঠল লুং মেনের ঝড়, পাহাড়ের বুকে শত শত বাজ ভেঙ্গে পড়ে যেন, যেন আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে আসে বিদ্যুৎ। বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, গুণীর এই সিদ্ধির মূলে কি সে রহস্য? “সত্রাট্‌”, তিনি বললেন, “তারা গিয়েছিলেন নিজেদের গান, তাই বিফল হয়েছিল তাঁদের প্রয়াস। আমি বীণাকেই পথ ছেড়ে দিয়েছিলাম—বেছে নিক সে গানের যোগ্য বিষয়, আর বীণা বাজাতে গিয়ে আমার খেয়ালই ছিল না কে যন্ত্র আর কে যন্ত্রী, কে বীণা আর কে বীণকার।” এই গল্পটি থেকে শিল্পের রসবোধের রহস্য কি তা বোঝা যায়। আমাদের স্মৃতিময় অল্পবয়সের তন্ত্রীগুলি যাতে একতালে বেজে ওঠে তাতেই হ'ল শিল্পের চরম সার্থকতা। Pei Woh হলেন প্রকৃত শিল্প আর আমরা লুং মেনের বীণা। স্মৃতির মোহন তুলির যাত্রা স্পর্শে আমাদের জীবনের গোপন স্তম্ভ তন্ত্রীগুলি জেগে ওঠে। তার আশ্রানে আমাদের হৃদয়-বীণা স্পন্দিত হয়, ধ্বনিত হয়। মন থেকে মনে চলে কথা। অব্যক্তকে শূন্য আর অজ্ঞেয় দিকে চেয়ে থাকি। গুণী আমাদের হৃদয়ের স্মৃতি তন্ত্রীতে আঘাত দেন যার খবর আমাদের অজানা। দীর্ঘ-কালের কত বিস্মৃত ঘটনা তখন নূতন অর্থ নিয়ে সামনে এসে ভিড় করে। ভয়ের কবলে রুদ্ধ কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন নূতন বেশে সর্গোরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আমাদের মনই হ'ল শিল্পীর পট—আমাদের স্মৃতি হুংখ তাঁর তুলির রং; আর আনন্দের আলো, হুংখের ছায়া—এই হ'ল তাঁর শিল্পের বিষয়-বস্তু। আমাদের নিয়েই শ্রেষ্ঠ শিল্পী মেলে দেন তাঁর সৃষ্টির মেলা, আমাদের হৃদয়েই চলেছে তাঁর রসের খেলা আবার আমরাই দেখছি তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূলে। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি আমাদের, আবার আমরাও শিল্পীর।

শিল্প-সন্তোষের জন্ম চাই শিল্পীর মনের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা—“একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দু'জনা।” স্রষ্টা যেমন দেবার কৌশলটি জানবেন, স্রষ্টা মনেরও থাকা চাই এমন অবস্থা যাতে শিল্পীর হাত থেকে দান গ্রহণ করবার যোগ্য অধিকারী তিনি হন। চা-শিল্পী Kobori Eushu নিজে এক জন বাক্যরসিক, বড় সুন্দর কথা কবি বলে গিয়েছেন, খুব সুন্দর একখানা ছবি দেখতে হলে এমন ভাবে যাবে যেন মত্ত কোন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি বুঝতে হলে তার কাছে নিজেকে নত করে, রুদ্ধ স্বাসে শুনতে হবে তার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাটুকি। বিখ্যাত এক জন সুং সমালোচক একটা ভারি চমৎকার স্বীকারোক্তি করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যখন বয়স অল্প ছিল ভাল

ছবি দেখলে চিত্রকরের স্মৃতিচিহ্ন করেছি, আর আজ পরিণত বয়সে নিজেরই তারিফ করি যে এমন গুণীরা আমাদের আকর্ষণ করেছিলেন। ভারি ছুঃখের কথা যে আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই শিল্পীদের মনের ভাবটিকে বুঝবার চেষ্টা করি। বদ্ধমূল অজ্ঞতার বশে আমরা তাঁদের এতকু সৌজ্ঞেয় দেখাই না আর সেজ্ঞেই সৌন্দর্যের বিপুল সম্ভার আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। গুণীর হাতে অক্ষরস্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু রসবোধের অভাবে সুধাসাগরের পারে বসেও আমরা থাকি তৃপ্ত।

রসের অহুভূতি যার আছে, সুন্দর তার কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে আর শিল্পীর সঙ্গে তার নিবিড় সৌহার্দের বন্ধন গড়ে ওঠে। গুণীরা, শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অমর, কারণ তাঁদের স্নেহ, প্রেম, আশা-আশঙ্কা সবকিছুই যুগে যুগে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে। বীণাবাদকের হাতের চেয়ে তার হৃদয়টি, বাজনার আঙ্গিকের চেয়ে বাদক লোকটি আমাদের মনকে বেশী স্পর্শ করে—শিল্পীর আত্মনা যত মানবতার আদর্শে পূর্ণ হবে ততই গভীর সাদা তিনি পাবেন আমাদের কাছ থেকে। শিল্পীর সঙ্গে আমাদের এই গোপন বোঝাপড়াটি আছে বলেই না কাব্যে উপহাসে নায়কনায়িকার স্মৃতি আমরা হাসি আর তাঁদের ছুঃখ কাঁদি। চিকামাৎসু (জাপানের সেক্সপীয়র) বলেন যে, নাটক রচনার একটি প্রধান গুণ হ'ল নাট্যকারের সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতার ঐকান্তিক যোগাযোগ। তাঁর অনেক শিশু নাটক লিখে তাঁকে দেখান, কিন্তু মোটে একটি নাটক তাঁর মনোমত হয়েছিল। সেই নাটকটি অনেকটা সেক্সপীয়রের *Comedy of Errors*-এর মত—অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্ম হুটী যমজ ভাইয়ের নাকাল হওয়ার কাহিনী। চিকামাৎসু বলেন, এতে নাটকের প্রকৃত ভাবটি রক্ষা হয়েছে, কারণ এর মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা বিবেচনা করা হয়েছে। অভিনেতাদের চেয়ে দর্শকেরা বেশী জানে তারা বুঝতে পারছে কোথায় ভুল হচ্ছে আর তাই যে বেচারীরা ভুল করে ছুঃখের ভুগছে তাদের জন্তে ছুঃখ পাচ্ছে।

দর্শক ও শ্রোতার সহানুভূতি পেতে হলে ইসারা-ইঙ্গিতের কত দরকার তা বড় বড় শিল্পীরা প্রাচ্য, প্রতীচ্য সর্বত্রই কখনো ভোলেন নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আমাদের কাছে যে গভীর চিন্তা ও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন কে না তার বিশালতায় বিস্মিত হয়? তাঁরা যেন আমাদের কত আপনার আর কত তাঁদের দরদ—সে তুলনায় বর্তমানের ক্ষুদ্র শিল্পীদের দান কত তুচ্ছ কত প্রাণহীন। তাঁদের মধ্যে ছিল প্রাণ থেকে প্রাণে সজীব আবেদন আর এঁদের যেন আইনমাস্কি অভিবাদন। আঙ্গিকে বদ্ধদৃষ্টি আধুনিক শিল্পী নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। লুৎ মেনের বীণা বাজাতে যারা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তাদেরই মত সে কেবল নিজের কথা বলে। তার সৃষ্টি হয়ত অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু অন্তরের আবেদন যে ততই কম। আমাদের জাপানীদের একটি প্রবাদ আছে যে, নিতান্ত অহঙ্কারী লোককে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে

না। কেননা, তার মনে এমন কাক কোথায় যেখানে নাকি ভালবাসার জায়গা হবে, শিল্পেও আত্মাভিমানের স্থান নেই—শিল্পশ্রুটি বা দর্শক কারো পক্ষেই তা শুভ নয়। শিল্পসন্তোষের জন্ম সমধর্মী আত্মার মিলনের মত সুন্দর জিনিষ আর নেই। এই মিলনের ক্ষণটিতে শিল্পাহুরাগী আপনাকে অতিক্রম করে যান। তিনি তখন বাস্তবজগতে থেকেও যেন থাকেন না। অনন্ত তাঁকে আভাসে ধরা দেয়, কিন্তু সে আনন্দ তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ চোখের যে বাণী নেই। বাস্তবের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে তিনি ভাবলোকে ছন্দের জগতে বিচরণ করেন। তখনই তো শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে ওঠে অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত আর মানুষকে মহৎ করে তোলে। এজ্ঞেই তো শ্রেষ্ঠ শিল্পশ্রুটি পবিত্র জিনিষ। প্রাচীনকালে জাপানীরা শিল্পীর অবদানকে পরম সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। চা-শিল্পীরা আধ্যাত্মিক সম্পদের মত সঞ্চেপনে তাঁদের সম্পদগুলিকে রক্ষা করতেন—অনেক সময় একটার পর একটা, একটার মধ্যে আর একটা, এমনি করে বিশ্বের বাজার খুলে তবে পাওয়া যেত সেই মণিকোঠা যেখানে রেশমের নরম আবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত রাখা হয়েছে সেই পরম পবিত্র রত্ন। লোকচক্ষু কচিং কখনো তা দেখতে পেত—যদি কখনো খোলা হ'ত সে কেবল দীক্ষার্থীর জন্তে।

চা-গৌরবের যুগে টাইকোর সেনাপতিরা যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে জায়গীর পেলে তত খুশী হ'ত না যত হ'ত উৎকৃষ্ট শিল্পের একটা নিদর্শন পেলে। এমনি সব সেরা বস্তুর হারিয়ে যাওয়া আর ফিরে পাওয়া নিয়েই তো আমাদের বহু জনপ্রিয় নাটক লেখা হয়েছে। এক নাটকে আছে, একদিন সামুরাইয়ের অসাবধানতার দরুন রাজা Hosokawa প্রাসাদে আগুন লেগে গেল—এ রাজবাড়ীতেই রক্ষিত ছিল Sesoon-এর আঁকা বিখ্যাত Dharumার ছবিখানা। সামুরাই ঠিক করলেন যেমন করেই হোক ছবিখানা বাঁচাতে হবে; অলস্ত আগুনের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়ে ছবিটি খুলে ফেললেন কিন্তু দেখেন, তখন বেরবার সব পথই অগ্নিশিখায় অবরুদ্ধ। ছবিটি রক্ষা করা ছাড়া অল্প চিন্তা তাঁর নেই, পাগলের মত তিনি তরবারি দিয়ে নিজের পেট চিরে ফেলে নিজের জামার হাতা ছুটি দিয়ে তাকে মুড়ে পেটের মধ্যে পুরে দিলেন। আগুন নিভল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেল সেই সামুরাইয়ের অর্দ্ধদেহ শবদেহ—আর দেখা গেল তার পেটের মধ্যে ছবিটি রয়েছে অটুট। এসব গল্প অবশ্য অতি বীভৎস, কিন্তু আমরা দেখি, কি গভীর আদর ছিল শিল্পের আর কি গভীর শিল্পাহুরাগ এই বিখ্যাতী রক্ষক সামুরাইয়ের।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, শিল্পের মূল্য নির্ণয় হবে তার আবেদনের পরিমাণে—এ আবেদন, শিল্পের ভাষা সার্বজনীন হতে পারত যদি আমাদের অহুভূতি আর ভাবগুলি সার্বজনীন হ'ত। আমাদের সহজ প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও আচারের

প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বংশগত পার্থক্য এরা সবাই আমাদের রসবোধের গভীর ছোট করে আনে। আমাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও এক হিসেবে বুদ্ধিকে সন্নিহীন করে ফেলে; আর তখন আমাদের মধ্যে সৃষ্টি রয়েছে যে সৌন্দর্যবোধ তা অতীতের সৃষ্টির মধ্যে নিজের চরিতার্থতা খুঁজে নেয়। এক কথা সত্যি যে চর্চা করলে আমাদের শিল্পসম্ভোগের শক্তি বাড়ে আর তার ফলে আগে যাতে আনন্দ পাই নি, তখন তাতে সৌন্দর্য আর রসের সম্মান পাই। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বিশ্বযুদ্ধের আমরা নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখি, কে কি দেখবে তা নির্ভর করে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। চা-শিল্পীদের সম্বন্ধে শুধু নিজেদের অহুসার বৃক্ক রত্ন সংগ্রহ করে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে Kobori Enshu-র একটা গল্প মনে পড়ে গেল। Enshu-র অপূর্ব সংগ্রহ দেখে শিযেরা তাঁর রুচির সূখ্যাতি করছিল। তারা বলছিল, “এর প্রতিটি জিনিস এমন যে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। দেখা যাচ্ছে, Rikyū-র চাইতে আপনার রুচি অনেক ভাল, কারণ তার জিনিস হাজারে মোটে এক জন লোকের ভাল লাগে।” গভীর দুঃখে Enshu বললেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে আমি কি সামান্য। মহান শিল্পী Rikyū-র সাহস ছিল কেবল নিজের রুচি অহুসারী জিনিসকে ভালবাসবার—আর আমি অজ্ঞাতসারে করে গেছি পাঁচ জনের মনস্তৃষ্টি। বাস্তবিক Rikyū ছিলেন চা-শিল্পীদের মধ্যে হাজারে এক জন।

ছুৎকের বিষয়, বর্তমান সময়ে আটের জন্ম যে উৎসাহ দেখা যায় তা বাস্তবিক। তার মূলে অন্তরের অল্পহুতির একান্ত অভাব। আমাদের এই বর্তমান ডিমোক্রাসির যুগে লোকে খোঁজে কোন জিনিসটি জনপ্রিয়—নিজের মনের ভাব সম্বন্ধে থাকে উদাসীন। তারা চায় দামী জিনিস, ফ্যানসানমাসিক জিনিস—চায় না সুন্দরকে, খোঁজে না শোভন বস্তুকে। জনসাধারণের কাছে তো প্রাচীন ইতালীয় ছবি বা Ashikage শিল্পীদের ছবির চাইতে সচিত্র সাময়িক পত্রিকায় আঁকা আধুনিক কালের বাণিজ্যশিল্পের দাম বেশী—এ সবই তাদের চোখ ভুলায়, মনের খোরাক জোগায় কিনা সন্দেহ। ভাল ছবির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্পীর নামই তাদের কাছে বড়। তাই দেখেই চীনের এক বিখ্যাত রসজ্ঞ সমালোচক অভিযোগ করে বলেছিলেন, লোকে চিত্র-সমালোচনা করে কান দিয়ে। সত্যিকারের এই রসবোধের অভাবই আজ সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে শিল্প-সমালোচনার নামে বিকৃত রুচির পরিচয়।

আর একটা ভুল সাধারণত করা হয় আমরা আটের সঙ্গে প্রভুত্বকে তুল করে মিলিয়ে ফেলি। পুরাতনের প্রতি

শ্রদ্ধা ও দরদ মানবচরিত্রের একটি অমূল্য সম্পদ—পারলে এ গুণটি আরও বাড়ান উচিত। ভবিষ্যতের জ্ঞানের পথ খুলে দেবার জন্ম অতীতের গুণীগণ আমাদের চির নমস্কার। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সমালোচনার পরেও যে তাঁরা সগৌরবে অটুট খ্যাতি ভোগ করে আসছেন, এটাই তো তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। কিন্তু কেবল কালের প্রাচীনত্বই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিরিখ হতে পারে না। সৌন্দর্যের মাপকাঠির দিকে চেয়ে ইতিহাসের মানদণ্ডকে যদি আমরা বড় করি তা হলে ভুল করব। শিল্পীর মৃত্যুর পর তার সমাধিতে ফুল দিয়ে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তা ছাড়া বিদ্যমানবাদের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা জাতি দেখতে গিয়ে ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ দেখার চোখ হারিয়ে ফেলেছি। সংগ্রহ-কারক নমুনা-সংগ্রহ-ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ভুলে যান একটা বিশিষ্ট সময় বা জাতির জীবনের মর্ম কথা বুঝতে হলে মাঝারি গোছের দশটি নমুনার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারবেন যদি সে যুগের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। শিল্পসৃষ্টিকে বিশেষ কোন গোষ্ঠীতে ফেলার জন্ম অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে আমরা আনন্দ পাই বড় কম। সৌন্দর্যের মাপকাঠির চেয়ে বিজ্ঞানের আঙ্গিক অহুসারী সাক্ষাতে গিয়ে অনেক মিউজিয়মের সৌষ্ঠবের হানি হয়েছে।

জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই সমসাময়িক শিল্পের আবেদনকে অগ্রাহ করা চলে না। আজকের যা শিল্পসৃষ্টি তাই তো সত্যি আমাদের নিজস্ব; হোক না তা আমাদের প্রতিচ্ছবি। তার নিন্দায় আমাদেরই ক্রটি ধরা পড়ে। আমরা বলি এ যুগের শিল্পসৃষ্টি হয় নি : সেজন্ম দায়ী কারা? আর একটা সত্যি লজ্জার কথা যে আমরা পুরাতনের এত বড়াই করি, কিন্তু নিজেদের সম্ভাবনার বিষয়ে অন্ধ হয়ে আছি। কত উদীয়মান শিল্পী সমসাময়িক বিরুদ্ধ সমালোচনার গীড়িত ও বিক্রপবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভাবে, তার উত্থানের আশা সূদূরপর্যন্ত। আত্মকেন্দ্রিক যুগে আমরা তাদের কি অহুসারণা দিচ্ছি? আমাদের রুচির দৈন্ত দেখে অতীত কাল হ্রত আমাদের জন্ম অহুসারী বোধ করে আর ভাবী কাল নিশ্চয় আমাদের শিল্পের দৈন্য দেখে ব্যঙ্গ করবে। জীবনে সুন্দরকে হত্যা করে আমরা আটকেই বিনাশ করছি। মনে সশব্দ হয় আমাদের এই সমাজযুদ্ধের কাণ্ড থেকে আজ তৈরি হোক এক মহান বীণা, আর প্রতিভার যাহুস্পর্শে তার তন্ত্রীগুলি সুরে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।*

*জাপানী লেখক ওকাকুরার রচনা হইতে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৭

আজ আট দিন হইল টুলু মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় অন্তরীণ হইয়া আছে, একেবারেই বাহির হয় না। অবশ্য স্ব-ইচ্ছায়ই, তবে ইচ্ছাটা অবস্থাগতিকে। বাড়ি থেকে বাহির হইতে সাহস হয় না। প্রাণের ভয়—না, সে ভয়বরণ এইখানেই বেশী, সঙ্গীর মধ্যে তো ঐ এক পাগল—তাও দেড়শ' হাত দূরে, একটা কিছু ঘটলে বাইরের জগতে তাহার এতটুকুও সাড়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। টুলু এ বিপদের দিকটা ভাবেও না একরকম; ঠিক সাহস নয়, তবে এই ক'টা দিনের অভিজ্ঞতায় নিজের সম্বন্ধে এক ধরণের বৈরাগ্য আসিয়াছে। কাজ লইয়া একটা নেশা জাগিয়াছে মনে—আরও বেশী কাজ, আরও বড় কাজ; কিন্তু সেই কাজের জুই যে প্রাণটাকে চারি দিক থেকে ঘিরিয়া-ঘুরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এ কথা কখনও মনে হয় না। অবস্থাটাকে বৈরাগ্য না বলিয়া এক ধরণের বিন্মুতি বলাই ভাল, তীব্র কর্মলিপ্সার মধ্যে অথ কিছুই আর মনে থাকে না। কড়া আলোর ছায়াও হয় ঘন—প্রাণের অহুভুতি। সেই ঘন ছায়ায় পড়িয়া গেছে।

টুলু বাড়ি ছাড়ে না অথ কারণে; ওর ভয়—বাসা ছাড়িলেই ম্যানেজার নিজের লোক বসাইয়া দিবে, তা যদি নাও করে সদর দরজায় নিজের তালা বুলাইয়া তাহাকে বেদখল করিবে। উকিলের ছেলে, টুলু অন্তত এটুকু জানে যে এ বাসায় তাহার কোন অধিকার নাই। একটু অধিকার বোধ হয় দিয়াছিল মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি—তাও 'বোধ হয়'—খুব কৃতনিশ্চয় নয় টুলু; তা সে চিঠিও তো ম্যানেজার হস্তগত করিয়াছে। আর সে হাত যে কত শক্ত হওয়া সম্ভব টুলু তাহা ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবাতাতেও বুঝিয়াছে, তাহার পর চম্পার কাছেও আঁচ পাইয়াছে।

সমস্ত দিন বাসায় বসিয়া বসিয়া হাঁপ ধরে। যে কাজের জুই এত আকৃতি তাহার যেন নাগালই পাইতেছে না। খনিতে প্রবেশ করিয়া যেন মনে হইয়াছিল এবার আরম্ভ করা গেল কিছু হীরককে অবলম্বন করিয়া; হীরক কিন্তু হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ফসকাইয়া গেল। বস্তির পথ বন্ধ। ম্যানেজার লক্ষ্য-মত বাধা দিবে। বাধা অগ্রাহ করিয়াও টুলু নামিত কাজে, কেননা তাহার কাজই দাঁড়াইল তো বাধা অগ্রাহ করা; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাসা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। বাকি ছিল চম্পা—মাষ্টারমশাই চিঠিতে যে তিনটি কাজের ইঙ্গিত দিয়া-ছিলেন তাহার মধ্যে অত্যন্ত। বেশ ভাল ভাবেই আরম্ভ করিয়াছিল; চম্পাকে বালিয়াড়ির পথ থেকে যে রাডে ফিরাইয়া আনে, সে রাডের পলক-স্পন্দনের কথা টুলু কখনও ভুলিবে না; একটা রাজ্য জয় করার উল্লাস বোধ হয় এই

ধরণেরই কিছু। সে উল্লাস কিন্তু পরদিনই ভাঙিয়া গেল ম্যানেজারের বাসায়। সে দিন সেখানে চম্পার নির্লজ্জ মোহ-বিস্তারের চেষ্টা দেখিয়া নিরুপায় নীরবতার মধ্যে একটা সংকুত প্রবাদ বারবারই মনে পড়িতেছিল—অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনদ্বং ন মুকুতি—অঙ্গারের খনিতে চম্পার একেবারে অন্ত-গুল পর্যন্ত অঙ্গার হইয়া গেছে, ও কালিমা ঘুচিবে না, কোন উপায় নাই। টুলুর রাডের জয় করা রাজ্য দিন হইতে না হইতে ধুলিসাং হইয়া গেল।...কিছু হয়তো বলিত না টুলু—বলার আর সম্বন্ধই নাই কোন, তবু স্থলের পথে চম্পা আবার জোর করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—শেষ পর্যন্ত অন্তরের বিজ্ঞাটা টুলু না প্রকাশ করিয়া পারিল না।...ওদিকেও আর কাজ নাই। যোগসূত্র ছিঁড়িয়া গেছে।

তাহা ভিন্ন আর একটা কথা; চম্পাকে টুলুর যেন ভয় হয় আজকাল—হীরক...বেশ একটা স্পষ্ট কাজ, বস্তিও স্পষ্ট কাজ, কিন্তু চম্পা একটা রহস্য। বালিয়াড়ির পথের চম্পা, খনির চম্পা, ম্যানেজারের বাসার চম্পা, আর—আর টিলার পথের চম্পা—সব যেন আলাদা। কে জানে এ রহস্যের আরও কত রূপ আছে? একটা অর্ধস্মিত জাগায়, মনে হয় ও দূরে দূরেই থাক, যদি কাছে আসিয়াই পড়ে, সেসময় যেন মাষ্টারমশাইও থাকেন টুলুর কাছেপিঠে—কেন যে এমনটা মনে হয় টুলু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

চারি দিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে বেশ বুঝা যায় আসল গোল বাধিয়াছে মাষ্টারমশাইয়ের অল্পস্থিতি লইয়া। যেমন সূত্রপাত হইয়াছিল, তিনি উপস্থিত থাকিলে আজ অনেকটা পথই অগ্রসর হইতে পারিত। ঠিকানা পর্যন্ত রাখিয়া গেলেন না যে সে অবস্থাটা জানায় টুলু, পরামর্শ লয়। কি ভাবিয়া যে কি কাজ করেন মাষ্টারমশাই, বোঝা যায় না।

যতটা পারে সময়টা বই পড়িয়া কাটায়। বইগুলো বেশীর ভাগ দুঃস্বপ্ন—রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এই সব লইয়া মোটা মোটা ইংরেজী বই বেশির ভাগ; কিছু কিছু কৌতূহল উদ্দেক করে—তবে বুঝিবার চেষ্টাতেই প্রায় সব শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। তবু সম্বল বলিতে, সাথী বলিতে ঐ ক'খানি।

একটি জায়গায় যাইতে লোভ হইত, স্থলে। আজকাল গরমের জুই সকালে স্থল বসিতেছে। প্রত্যুষে গল্পের দিক থেকে ছেলেরা আসে, টিলার রাত্তাটা মুখের করিয়া; বস্তির দিক থেকেও কিছু কিছু আসে, আর মাত্র দুটো ছেলে যায় তাহার বাসার সামনে দিয়া; বালিয়াড়ির পথে, অনেক দূরে নাকরেল বলিয়া একটা গ্রাম আছে—সেইখান থেকে আসে তাহার। এক দিন ডাকিল টুলু, পরিচয় লইল, একটু গল্পও করিল। রাত থাকিতে তাহাদের মা উঠাইয়া দেয়, ভোর

হওয়ার আগেই মুড়ি-মুড়কি খাইয়া উছারা বাহির হইয়া পড়ে, আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে।...উছারা জাতিতে মাছিয়—বাপ রাণীগঞ্জের একটা কি খনির আপিসে কেরানী ছিল। গত বৎসর মারা গেছে। সেই থেকে উছারা গ্রামে চলিয়া আসিয়াছে—মা, একটি বড় বোন—স্কুলে পড়িত রাণীগঞ্জে, আর তারা এই ছুটি ভাই।...হু'জনেই খনির ম্যানেজার হইবে—মার তাই ইচ্ছা।...ছোট গ্রাম তাহাদের; না, আর কেহই পড়িতে আসে না তাহাদের গ্রাম হইতে।...বড় ছেলেটিই বেশী গল্প করিতেছে, ছোটটি বলিল—“আগের মাস থেকে তো আরও আসবে দাদা, সে কথা বললে না?” বড়টি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“সে যখন আসবে তখন আসবে, কি বলেন?” দিদি সবাব বাড়ি গিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে বলে না তাহাদের?—ও সেই কথা বলছে।”

স্কুলের ঘণ্টা বাজিতে ছেলে ছুটি চলিয়া গেল।

বড় স্তম্ভর লাগিল টুলুর। হাফপ্যান্ট আর কামিজ-পরা ছেলে ছুটি, ভাল করিয়া চুল আঁচড়ানো, ঘরে তৈয়ারি সাচেলের মতো থলে, তাতেই বই স্নেট, ছুটি থলের ওপরই নামের তিনটি ইংরেজী আঙু অক্ষর রঙীন স্বতা দিয়া তোলা। এই আধা পাড়ারগায়ে ছেলে ছুটি একটু বেমানান; শুধু তাই নয়, অঙ্গপাড়ারগায়ে এর চেয়ে বেমানান একটি কুণ্ডলসম্পন্ন ছোট পরিবারের ছবি চোখের সামনে আনিয়া দেয়—বড় কৌতূহল হয়।

বিকালে কিছু বিকুট আনাইয়া রাখিল। পরদিন সকালে ছেলে দুটিকে দিল। একটি সলজ্জ হাসির সঙ্গে তাহারা গ্রহণ করিল। আরও গল্প হইল আজ—বাড়ির গল্প, গ্রামের আরও সবাইদের গল্প। ছোট ছেলেটি বেশীর ভাগ বাড়ি হেঁট করিয়াই ছিল, হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া কুণ্ডিত ভাবে বড়টির দিকে চাহিয়া বলিল—“দাদা।”

বড়টি ফিরিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল; ছোটটি চোখের একটু ইঙ্গিতের মতো করিয়া আরও কুণ্ডিত ভাবে বলিল—“সেই যে...সেকেও মাষ্টারমশাই বলেছিলেন—”

“ও।” বলিয়া একটা যেন ভুল শুধরাইয়া লইয়া ছেলেটি উঠিয়া পড়িল, ছোটটিও উঠিল। টুলু বলিল—“বোস’ না খোকা আর একটু, এখনও ত ঘণ্টা হয় নি।”

বড়টি যেন একেবারে কি রকম হইয়া গেল, ষাড়টি অল্প ঝাঁকাইয়া স্নান হাসিয়া বলিল—“না, আমরা যাই। আপনি ফুল নেবেন?”

কি একটা মিষ্ট গন্ধের বুনা ফুল কাণ হাতে দেখিয়া টুলু প্রশংসা করিয়াছিল, আজ একগোছা আনিয়াছে, চোকির উপর রাখিয়া, আর একবার বাড়ি ফিরাইয়া অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উছারা চলিয়া যাইতে টুলু হাঁস হইল। সেকেও মাষ্টার

আজকাল হেড মাষ্টারের জায়গায় কাজ করিতেছেন, উপর হইতে তাঁহার উপর কোন আদেশ পৌছিয়াছে, টুলুর সঙ্গে ছেলেদের মেশা মানা। ম্যানেজারের সঙ্গে যে দিন দেখা হয় তাহার পর তৃতীয় দিনের কথা এটা, টুলুর ইচ্ছা ছিল সকাল বেলাটা স্কুলে গিয়া কাটাইবে, জনচারেক শিক্ষক আছেন, আলাপ করিবে, এক আধটা ক্লাসও লইবে সেকেও মাষ্টারকে বলিয়া—বেশ কাটিয়া যাইবে সকালটা। স্কুল জিনিসটা কুট-নীতির সঙ্গে এত নিঃসম্পর্কিত বলিয়া ওর বিশ্বাস ছিল যে, এ সম্ভাবনার কথাটা মনেই উদয় হয় নাই।—যাক, অত হুমকির পরেও দুই দিন ম্যানেজারের তরফ থেকে কোন সাদা শব্দ না আসায় টুলু বেশ একটু ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহা হইলে এখন যেরূপ দেখিতেছে একেবারে বসিয়া নাই সে। তবে, শত্রু হিসাবেও লোকটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু আক্রোশ মিটাইবার পদ্ধতি দেখিয়া সে এন্টার অনেক-খানিটাই নষ্ট হইয়া গেল। ম্যানেজার অমন গম্ভীর ব্যাপার-টাকে যেন মেয়েলি কাণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েরাই পরস্পরের সঙ্গে কণ্ডা হইলে নিজের নিজের সন্তান-দের বলিয়া দেয়—ওর বাড়ি যাঁস নি, কথা কসনি ওদের সঙ্গে...সকালটা এখন এমনই কাটে, বসিয়া গড়াইয়া, খানিকটা বই পড়িয়া। স্কুল বন্ধ হইবার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বনমালী আসে; সমস্ত দিনের মধ্যে এই সময়টুকু টুলুর যা একটু ভাল ভাবে কাটে, আহাযের স্বাদিষ্টতার জন্ত নয়—কোনটাতে মন কম, কোনটাতে ভাল বেশি, কোনটা আবার মনের চোটে মুখে দেওয়া যায় না। সময়টুকু শোভনীয় বন-মালীর গল্পের জন্ত। গল্পের বিষয়ও এমন কিছু নয়, তবে ভাষা।—বড় চমৎকার লাগে এখানকার ভাষাটা টুলুর—বড় স্বরেলা।—একটু অল্পস্বরের ছুটী বেশি, মাঝে মাঝে শব্দগুলা হঠাৎ দ্বিধ হইয়া যায় আর তার সঙ্গে থাকে একটি চমৎকার টান; হাজারই বুড়ো হোক কেউ, মনে হয় যেন ছেলেমানুষের আধ-আধ বুলি; বাংলা বিহারের সীমান্তমির ভাষা বলিয়া এক আধটা হিন্দি শব্দও আসিয়া পড়ে মাঝে মাঝে—“স্বপন দিখলাম বিমারিট হইছে, তা আপ্ন—ন নাতনি দিখবেক নাই? কি কথা—টি বুলছ তুমি।...”

শুধু ভাষার জন্তই অল্প এক এক সময়ও ডাকিয়া লয়। নিজেও বলিবার চেষ্টা করে।

বনমালী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলে—“উ তুমি পারবেক নাই। ই আমাদের মেটেঁ ভাষা আছে, তুমাদের লরো—ম জবানে আসবেক কুখা থিকে গো?”

কষ্ট হয় বিকাল বেলাটার। দিনের মধ্যে বিকাল সময়টাই বড় উদাস, এ সময় মানুষ নিজের নিজের কাজের শেষটুকু গুটাইয়া আনিতে থাকে ব্যস্ত, পরস্পরকে সঙ্গ দিতে পারে না; এ দিকে প্রকৃতিকেও বায় না পাওয়া, কাজের ক্ষিপ্ততার মধ্যে ও মানুষের নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। বাহার

হাতে কাজ নাই সে তো নিষ্কের কাছে নিজে ছুঁবই হইয়া পড়ে।...বনমালা এই সময়টা পরদিনের জন্ত স্থলে ঝাঁট-পাট দেয়, বেশিগুলো গুছাইয়া-সুছাইয়া রাখে। একটু বাগানের মত আছে স্থলের সঙ্গে, সেইটুকুতেও এই সময়টাতেই দেখিয়া শুনিয়া নিষ্কের দিনের মজুরি শেষ করে। টুলু বিছানায় পড়িয়া জানালা-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে; চেউ-খেলানো নিচু জমির উপর দিয়া অনেক দূর দৃষ্টি যায়; সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপর দিয়াও।...কি করিতেছে জীবনটাকে লইয়া?—এখন পর্যন্ত ত এই তরঙ্গায়িত উষ্ম ভূখণ্ডের মতোই নিষ্কল; কখনও কি ফল ফলিবে এ জীবনে?...এক এক দিন নৈরাশ্র আরও নিবিড় হইয়া গিয়া ওঁদাসীয়ে দাঁড়ায়, কল ফলিয়াই বা ফল কি? সম্রাসীদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া যদি কিছু পাইতই, ধরো যদি চরম বস্তুই পাইত ত কি সার্থকতা ছিল তাহাতে? আর আজ ছুটিয়াছে কর্মের উদ্ভাদনায়, ধরা যাক চম্পারা কিরিয়াছে, চরণদাসেরা নেশা ছাড়িয়া একটা উন্নত জীবনের সন্ধান পাইয়াছে, শিশুরা স্বপ্ন, সুখলালিত শিক্ষার সংস্পর্শে তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে কল্যাণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাতে টুলুর কি?—কি পাইল সে?—যশ? প্রতিপত্তি? অথ কোন জীবনের পাণ্ডে—অন্য কোন লোকে?...কি ফল তাহাতেই বা?...বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হয় জীবনকে—কি যে চায়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—কেনই বা যে চায়।

সন্ধ্যার একটু আগে স্থল আর সামনে খানিকটা বাসার পায়চারি করে, এই সময় এক আধজন লোক চলে,—বেশীর ভাগই গল্পের দিক থেকে বালিয়াড়ির দিকে। মাহুশ না দেখিয়া দেখিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই নিত্যদিনের অতি-সাধারণ মাহুশগুলিকেও বড় চমৎকার লাগে—সুখ চলায় পথে তাহাদের ঐ অদ্ভুত, পায়ে পায়ে তাহাদের বাড়ির দিকে আগাইয়া যাওয়া—এইটুকুই যেন পরমাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়; টুলু একটু দূরে থাকিয়া পিছনে পিছনে যায়, সত্য দৃষ্টিতে দেখে—টিলা ঘুরিয়া ঐ নামিয়া গেল, আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে, তাহার পর দূরের ঐ টিলা—তাহার পিছনেই অদৃশ্য হইয়া গেল—কর্মজীবন আরও দূরে, আরও দূরে—গৃহের শান্তি আরও নিকটে আসিয়া পড়িতেছে; বৈকালের এই নিরর্থক জীবনই সন্ধ্যাস্থে যেন একটু অর্থবান হইয়া ওঠে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিলে, টুলু কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া বসে। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এই সময়টুকুর দিকে যেন সত্য নমনে থাকে চাহিয়া। পশ্চিমে ঋতুমেঘের মধ্যে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে সূর্য অস্ত যায়, দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর খুব হালকা একটা গোলাপী আভা কাঁপিতে থাকে। বস্তিটার ধরে-কেরা আর গৃহস্থালীর একটা অস্পষ্ট চাক্ষু্য উঠে। বালিয়াড়ির পথে লোকের-চলাচল আর একটু যায় বাড়িয়া,

গতি আর একটু হইয়া পড়ে অস্ত।...এদিকে একটা মিষ্ট হাওয়া উঠে, তার নরম দোলনিতে এক-আধটা কাঞ্চনের ফুল টুপ টুপ করিয়া পড়ে ঝরিয়া।

জীবনের যেটুকু পায় তাহা পূর্ণও নয়, স্পষ্টও নয়—দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া একটু আধটু আভাস দিয়া যায় মাত্র; কিন্তু লাগে বড় চমৎকার; এই বিরাটের মধ্যে বসিয়া জীবনে যেটুকু পায় তাহার একটা পূর্ণ, বিরাট রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে। থাকিয়া থাকিয়া নিত্যন্ত অহেতুক ভাবেই মনটা আনন্দের আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠে—টুলু বারবারই মনে মনে প্রার্থনা জানায়—হে দেব, যশ নয়, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নয়, কোন অমৃত-লোকের পাণ্ডেও আমি চাই না; আমার শুধু চারি দিকের এই জীবনকে পূর্ণতর করে তুলতে দাও, আমার জীবনের সার্থকতাই হোক এইটুকু—ওর অতীত আর কি চাইবারই বা আছে দেখি না ত...

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই এই সংসার আবার অন্য রূপ ধরে,—ভয় হয় ম্যানেজারের লোক আসিয়া বাড়ি দখল করিল না ত?...ধীরে ধীরে সব দরজায় নিষ্কের কলুপ আঁটয়া তাহাকে নিতান্তই নিঃসাড় বেদখল করিয়া গেল না ত?

একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া টুলু ধীরে ধীরে নামিয়া আসে।

১৮

আট দিনের দিন মাষ্টারমশাইয়ের নিকট হইতে একটা খাম পাওয়া গেল। ভিতরে সেক্রেটারির নামে আর একখানি দরখাস্ত, আরও দশ দিনের ছুটির জন্য। টুলুকে লেখা চিঠি বলিতে কিছু নাই, একটা ছোট কাগজে, সেক্রেটারির কাছে নিষ্কে বা বনমালাকে দিয়া দরখাস্তটা পৌছাইয়া দিবার কথা; তাহার পরেই আশীর্বাদ। আগের চিঠির মতই ঠিকানার নামগন্ধ নাই। খামের উপর বর্তমান পোষ্ট আপিসের ছাপ।

চিঠি না পাওয়ায় মনটা ধারাপ ছিল, পাইয়া কিন্তু আরও ধারাপ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া কোন ঠিকানা না থাকার জন্য। প্রথমটা মনে হইল মাষ্টারমশাইয়ের এটা অবিবাস; না অবিবাস হয়, অবহেলা।...মনকে বুঝাইল—ভুলও হইতে পারে, কিন্তু দরকার মনে করেন নাই। এতেও কিন্তু যে অনাস্বীয়তার ভাবটা ফুটিয়া রহিল তাহা পীড়াই দিল মনকে, একটা অভিমান লাগিয়া রহিল।

চিঠিতে আর একটা জিনিস যাহা দাঁড় করাইল তাহা অবৈধ। যে সপ্তাহটা কাটিয়াছে সেটাও বেশ শান্তিতে কাটে নাই, তবে একটা আশা ছিল—একটা সপ্তাহ—কোন রকমে কাটিয়া যাইবে, তাহার পর মাষ্টারমশাই ত আসিয়াই যাইতেছেন। আরও দশ দিনের ছুটির কথায় হাঁপ ধরিয়া গেল, মনে হইল সে যেন একটা জায়গায় বন্দী হইয়া গেছে। বন্দী

মনের প্রতিজ্ঞা বিদ্রোহ, টুলু মরিয়া হইয়া উঠিল,—না, দশটা দিনের কথা দূরে থাক, সে আর একটা দিনও এ ভাবে কাটাইতে পারিবে না। আজ বাহির হইবেই। বাড়ি বেদখল হয়, আসিয়া উৎপাত লাগাইবে, একাই হোক, পাঁচ জনকে জড়ো করিয়াই হোক; তাহার পরিণাম যাহা হয় হোক না কেন। এরকম নিশ্চেষ্ট জীবন আর এক দিনও সে সহ্য করিতে পারিবে না।

চিঠিটা পাইল বেলা প্রায় বারোটার সময়। তখনই একটা রসিদ লিখিয়া বনমালীকে ম্যানেজারের বাদাম পাঠাইয়া দিল; বলিল রসিদটা যেন দত্তখত করাইয়া ফিরাইয়া আনে।

বনমালী ফিরিল প্রায় চারিটার সময়, বলিল—“রসিদটি দিলেক নাই।”

“তুই তা হলে...” বলিয়া টুলু চুপ করিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল বনমালী তাহা হইলে চিঠিটা দিল কেন; প্রশ্নটা নিরর্থক জানিয়া আর শেষ করিল না। রাগে কান দুইটা পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, মনে হইতেছে যে বনমালীর মারফত এই অপমানটা পৌছিল তাহার কাছে; তাহাকে দিয়াই স্তূদে আসলে নেটা ফেরত দেয়,—টুকটুকটুকিই। কি উপায়ে, ভাবিতে গিয়া এখনই যে সঙ্কল্পটা মনে মনে আঁটিতেছিল তাহার কথা মনে পড়িয়া গেল, বনমালীর দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিল—“আমি একটু বাইরে যাব আজ বনমালী, তুই বাড়িটা একটু আগলাতে পারবি?”

বনমালী বলিল—“তা যাও না ক্যানে, আমিও ত তাই বুঝিলাম, জোমান মরদু হুয়ে” বারুটি নতুন বোয়ের মুতোন ধরে বসে থাকে ক্যানে গো?...তুমি যাও, বাড়ি কুখায় যাবে?”

টুলুর একটু হাসিও পাইল, দুঃখও হইল—তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণাটা দাঁড়াইয়াছে ত বনমালীর মনে। বলিল—“বাড়ি আর কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে? তা নয়, তবে জিনিসপত্র সব ফেলে ছড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছেন মাষ্টারমশাই, লক্ষ্য রাখতে হবে ত?”

“তা তুমি যাও, তেনার জিনিসে কে হাতট দেয় আমি দিখবো বটে—সে আমি দিখবো, তুমি যাও, মাষ্টারমশাইয়ের জিনিসে কে হাতট দিবেক গো? বনমালী বোষ্টোম জিন্দা থাকতে...তুমি যাও ক্যানে—কোন সন্ধ্যুটি হাত দেয় আমি দিখবো না? ইঁ।—বনমালী মরে গেইছে গো?”

টুলু একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। বনমালী রীতিমত চটমাই উঠিয়াছে, চাটালো বুক আর ছিনে মাঝা লইয়া গোখরোসাপের ফণার মত তাহার ঈষৎ বক্র শরীরটা অনেকটা সোজা হইয়া উঠিয়াছে, মুখটা রাজা, চোখে বিছাৎ—ফণা যেন ছোবল মারিতে উদ্যত হইয়াছে।...বড় আশ্চর্য বোধ হইল টুলুর, কোথায় চোর, কোথায় মাষ্টারমশাইয়ের শত্রু তাহার ঠিক নাই, শুধু উল্লেখই এই রকম নিরীহগোছের লোকটা

একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।...টুলু মুখটা ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিল—অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া গেছে—বহুদূর চলিয়া গেছে তাহার মনটা। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে যেন, সেইটাকে বিরিয়া তাহার কল্পনা হইয়া উঠিয়াছে সচেতন। সেই কল্পনা বাস্তবে কি রকম দাঁড়াইবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই টুলু মুখটা ঘুরাইয়া বলিল—“মাষ্টারমশাইকে তুমি কি রকম ভক্তি কর আমার অজানা নেই বনমালী, কিন্তু তুমি ত একা, ধর উপর খনির কোন লোক বা কয়েকজন লোক এসে হঠাৎ বাড়িটার ওপর চড়াই করলে...”

বনমালী অতিরিক্ত বিষয়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু, যেন বাকস্মৃতির মত অবস্থা হইলে বলিল—“তুমি কি বুলছ বাবুমশয়? খনির লোক মাষ্টারমশাইয়ের বাসায় চড়াইট করবেক। উ তো দেবতাটি আঁছে গো, খনির কোন্ সন্ধ্যু উর উবগারট না পাইছে? বিন্দাবনের বোয়ের বেমারিতে মাষ্টারমশাই ডাগদর-দাবাইয়ের পাই-পাইটি খরচ দিলেক নাই? দুর্ভের ছাওয়াল যখন মরবার পারা, উ মাষ্টারমশাই আপ্লুনি থেঁয়ে বাঁচালেক নাই? লক্ষ্য পাঁজার ঘর জলে গেলোক, সিটি না হয় কোম্পানী আবার তুলে দিলেক, জিনিষ-পত্রের কে ট্যাণ্ড দিয়ে কিনে দিলেক গো?...”

টুলু নিশ্চল হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল, বনমালী লম্বা একটা ফিরিস্তি আওড়াইয়া বলিল—“হ, মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি চড়াই করবেক। উ ঢাক বাজায় দিলেক নাই তো কি? আমি ই হাতে করে দিয়ঁ এসেছি বটে, আমি জানি না?—আর উ জানে না? উ গো, যিটি উপরে বসে বসে ভালো মন্দ সবটি খাতায় জমা করছে...”

কতকটা রাগের ওপরই এই পর্যন্ত বলিয়া বনমালী একটু ঠাণ্ডা হইল; তাহার পর টুলুকে আশ্বাস দিয়া বলিল—“না গো, আপ্লুনি যাও ক্যানে কুখা যাবে, উ দেবতাটি আছে, সারা খনি উকে দেবতাটি মনে করে, উর বাড়িতে কে ঢুকবেক গো?”

টুলু আবার একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—“তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ধর উনি বাড়ি নেই, শত্রুতা করে কেউ লোক লাগিয়ে দিলে—খনির লোক না হোক, অল্প লোকদেরই।

বনমালী আবার বিষ্মিতভাবে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—“হ। উনির শত্রু কে বটে গো? উনির শত্রু কে বটে?”

“শত্রু সবাই হয় বনমালী, মানুষ মাষ্টারই শত্রু আছে।”

“মানুষের থাকবেক নাই কেন গো? মানুষের আছে, কিন্তু উ তো দেবতা বটে।”

একটা মস্ত বড় স্মরণোপায় আপনা হইতে হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু কোন রকমে পাকেপ্রকারে ম্যানেজারের

কথাটা আনিয়া ফেলিয়া ভাবগতিকটা একটু বুঝিয়া লইতে চায়; বলিল—“কিন্তু দেবতারও তো শত্রু আছে বনমালী।”

“দেবতার শত্রু কে গো? তুমি কি কথাটা বুলছ?”

“কেন, দত্তিরা, রাক্ষসেরা; রামচন্দ্রের শত্রু রাক্ষসদের রাজা রাবণ ছিল না?”

“হু ছিল, থাকবেক নাই ক্যানে? তা হিথায় রাক্ষোস

কুখা মিলবে বটে?”

অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু একটু চূপ করিল, আর কতটা অগ্রসর হওয়া চলে যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না, তাহার পর বলিল, “রাবণের ভাই অহি রাবণের নাম শুনেছ বনমালী।”

“হু, পাতালের রাজা অহি রাবণ; নাম শুনবোক নাই? কত যাত্রা দিখলাম বটে, ই গল্পডিহিতেই কত যাত্রা দিখলাম।”

খুব পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে, টুলু আবার একটু ধামিল, তাহার পর বলিল—“এখানে যেমন যাত্রা দেখেছিলে তেমনি পাতালও তো রয়েছে।”

বনমালী মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল—“কেন তোমাদের খনি; পাতাল তো আর গাছে ফলে না।”

বনমালী একটু ভাবিয়া যেন মিলাইয়া লইয়া চোখ দুইটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—“হু, খনিট পাতাল বটে; খনিটি পাতাল বটে...তা রাজা কুখা গো?”

প্রশ্নটা করিয়াই বনমালীর চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মুখটা উজ্জল হইয়া উঠিল, ওর মতো দুর্বল মস্তিষ্কেও এক এক সময় হঠাৎ বুদ্ধির স্মরণও হয়; মাথাটা ছুলাইয়া ছুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—“হু বুঝি, আপুনি ম্যানেজার বাবুকে বুলছ—ম্যানেজারবাবুট রাজা হইছে” অহি রাবণ হইছে আমি বুঝি...”

শেষটা এই রকম আপুনা হতেই হঠাৎ আসিয়া পড়ায় টুলু একটু খতমত খাইয়া গেল, সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“না তা কি বলতে পারি? রাজা না হয় হ’ল, তা বলে অহি রাবণ কি বলতে পারি?”...

বনমালী কিন্তু নিজের তালেই চলিয়াছে, বলিল—“তা বুঝবেক নাই ক্যানে গো? আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি, বুলবোক নাই ক্যানে? উ লোকটি মন্দ বটে, কত খুন করেছে, কত সন্দনাশট করেছে, আপুনি জানো নাই তাই বুলবেক নাই, আমরা জানি বুলবেক নাই ক্যানে গো?”

টুলু ধানিকক্ষণ বলিয়া যাইতে দিল, তাহার পর আসল কথাটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—“আমি অবশ্য বলছি না অহি রাবণ, তবে তোমার কথাই ধরে বলি—বেশ, ম্যানেজারই যদি কোন কারণে লোক পাঠিয়ে শত্রুতা করতে চায়, অত কথা কি, এই আমিই মাষ্টারমশাইয়ের ছকুমে তাঁর বাড়ি আগলাছি—

আমাকেই যদি ওঁর পছন্দ না হয় বাড়ি ছাড়া করতে চায় লোক পাঠিয়ে...”

বনমালী আবার বুকে চাড়া দিয়া কতকটা সোজা হইয়া উঠিল, চোখ মুখ সেই রকম উজ্জল হইয়া উঠিল, বলিল—“হু, পাঠাক ক্যানে লোক, বনমালী মরে গেইছে বটে। আজতক আমায় খনির লোক বনমালী খুঁড়ো বলে ডাকে, আমার ছেলে চরণকে সর্দার বলে মানে বটে। আপুনি এমন কথাটা বুলো নাই বাবুশয়, আমার মাথাটা কাটা যায় বটে। মাষ্টার-মশাই আপুনিকে হুকু আমার হাঁথে রেখে গেল—বুঝলে বনমালী, ই ছোকরাটি আমার আগুন জন—ছাওয়ালের পারা, তুমি দেখবেক!...আপুনিকে বাড়িছাড়া করে কুন হুকুদী আমি দিখবোঁ—হু দিখবোঁ আমি।”

১০

অনেকগুলি কথা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জানা গেল, মাষ্টারমশাইয়ের চরিত্রের একটা গভীরতম রহস্য পর্যন্ত; অবশ্য বেশি আশ্চর্য হইল না টুলু।

বাহির হইয়া প্রথমে গেল কতাপাড়ায় কাকার বাড়ি। দিন-চারেক হইল মেয়েরা হঠাৎ দেশে চলিয়া গেছে। কাকার সঙ্গে দেখা হইল, দোকানে বাহির হইবার জন্ত তৈয়ার হইতেছিলেন। মুখটা বেশ ভার ভার। বলিলেন—“চিরকালটা ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়াবি—কেন বাড়িতে থেকে সেবাব্রত হয় না?”

সেবাব্রত কথাটায় বেশ জোর দিলেন।

টুলু মাথা নিচু করিয়া চূপ করিয়াই রহিল।

কাকা একটু ধামিয়া বলিলেন—“ম্যানেজার বাবুর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু আমার এখানে যা কিছু ঐ খনির ভরসাতেই...”

টুলুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল—“তা হলে কি এ বাড়ি বন্ধ হ’ল আমার?”

কাকা অসংযতভাবেই চিংকার করিয়া উঠিলেন—“তাঁর মানে তাই হ’ল? খুব তর্কিক হয়েছিস মাষ্টারের শাকরেদি করে?—যাদের নিয়ে সব, তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হবে না? এই ছশো মাইল দূরে কত কাঠখড় পুড়িয়ে, লোকের কত সাদিসাধনা করে একটা আশুনা লাড় করিয়েছি, হাথরেরদের সঙ্গে হাথরে হতে গিয়ে সেটা নষ্ট করতে হবে? দাদাকে লিখেছি, এইখানে এসে থাক, ওসব চলবে না।”

রাগের ঝোঁকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

ঠাকুর চাকর ছিল, ভালরকম করিয়া কিছু জলযোগ তৈয়ার করাইয়া পরিতৃপ্তভাবে আহার করিয়া টুলু বাহির হইয়া গেল। আজ মনটা বেশ প্রফুল্ল, কোন কথা গায়ে মাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অনির্দিষ্টভাবে খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল—বাজারে শুধু কাকার দোকানের দিকটা বাদ দিয়া। রোদ মন্দ কড়া নয় তখনও, কিন্তু কড়া কথার মতো রোদও আজ যেন কড়া লাগিতেছে না, মনে হইতেছে এসব অবাস্তব, ঘাড়ে আসিয়া পড়িবেই, তবে গা পাতিয়া লইয়া আঁকারা দিবার দরকার নাই।...ভিতর থেকে জাগিতেছে কাজ করার আনন্দ—না পাইয়াও যাহাতে এত আনন্দ, সমস্ত মন আজ যেন তাহাই হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে।

বাজার থেকে গেল বস্তির দিকে। প্রথমটা মনে হইল ভিতরে প্রবেশ করিবে না, তাহার পর কি ভাবিয়া প্রবেশ করিয়াই ফেলিল। প্রবেশ করিয়াই সেদিনকার আসা আর আজকের আসার মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ উপলব্ধি করিল। আজ অনেকের দৃষ্টিতে কৌতূহলের সঙ্গে একটা সম্মের ভাব রহিয়াছে। সেদিনে খনির মধ্যে হীরক সম্পর্কিত ব্যাপারে অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছিল, টুলকে দেখিয়াছিল, টুল বুঝিল এ তাহারই জের। কয়েকজনই বর্ষায়ান তাহাকে বেশ খুঁকিয়া প্রণাম করিল, এক জন বারান্দা হইতে একটু নামিয়া যুহু হাত সহকারে প্রশ্ন করিল, “কোথায় আগমন হলেন কতীর?”

টুল বলিল—“এই একটু বাজার থেকে ফিরছি—ভাবলাম এ দিক হয়েই যাই না হয়।”

একেবারে অকারণে এই রৌদ্রে এতটা পথ ঘুরিয়া যাওয়া নিজের কাছেই কেমন বোধ হওয়ায় কতকটা যেন অজ্ঞাতসারেই জুড়িয়া দিল—“সেই খোকাটি কেমন আছে?”

লোকটি অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল, আরও আগাইয়া আসিয়া বলিল—দিখবেন তারে? তাই বলি, কতখানো আমোদ রোদে বসিতে আনেন ক্যানে...”

এতটা ভাবিয়া বলে নাই, টুলর মুখটা একেবারে শুকাইয়া গেল,—মনে পড়িল ছেলে লইয়া চম্পার সেই উগ্র মূর্তি মেয়েটির মুখ খামচানো,—আসিয়া আলুখালু বেশে নালাশ করিতেছে—“দেখো, ছাওয়াল কেড়ে নিলেক। আমার জাম্মা ছিড়্যা দিলেক।...আমার চুল ছিড়্যা দিলেক।...উই চম্পা—চরণদাসের বিটি।...”

আমতা আমতা করিয়া লোকটাকে বলিল—“না, ইয়ে—দেখবার তত দরকার নেই...তোমার গিয়ে আছে কেমন ছেলেটি?...”

লোকটি বুঝিল, একটু ভয়-ভাঙানো-গোছের হাসির সঙ্গে বলিল—“না, আপুনি আহুন আজ্ঞে—চরণদাসের বিটি পাগলি আছে—সিদিনটি খেলার মাথায় অমোনটি করেছিল—কিছু বুলবেক নাই...আপুনি আহুন আজ্ঞে—দিখবেন বৈকি...”

বসিতে এখনও সবাই কাজ থেকে ফেরে নাই, তবু মেয়ে পুরুষে ছেলের বড়োয় অনেকগুলি লোক জমা হইল। এক জন জীলোক বলিল—“আর উ তো পেলাদের বোকেই আবার দিয়া দিলেক গো।”

লোকটি বলিল—“ঐ শুন্ন আজ্ঞে; উ পাগলীটি আছে। আপুনি দিখুন—অতো দয়াটি করলেন—দিখবেন নাই?”

আর একটা মেয়ে সাহস দিবার ভঙ্গিতে বলিল—“আর চম্পা এখন কোথায় গো?—সে তো খনিতে বটে।”

সবাই অগ্রসর হইল। পিছনে চাপা গলায় আলোচনা হইতেছে—“ই, ই বাবুই তো ট্যাকা দিলেক, বুললে আরও দিবো তু পুষ ক্যানে...”

“ইরা দেবতা আছে গো, মানুষটি নয়...”

“তা হবেক নাই?—মাষ্টারমশাইর আপুনি জন যে... ফুলটিতেই থাকা করে...”

কয়েকটা বাসার বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা জুস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া গিয়া মায়েদের ডাকিয়া আনিল, কেহ চেনে, কেহ চেনে না, কেহ শুধু কৌতূহল লইয়া, কেহ কৌতূহলের সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার মিত হাতের সঙ্গে আসিয়া বারান্দার খুঁটা ধরিয়া দাঁড়াইল, কেহ নামিয়া আসিয়া সদ লইল। চাপা প্রশ্ন হইতেছে—“কে বটে গো? কি হইছে?” চাপা উত্তর হইতেছে।

সন্ধ্যা বোধ হইতেছে, তবু বড় ভাল লাগিতেছে টুলর; সবাই গরীব, বেশীর ভাগই ঝাকড়া-পরা, অপরিচ্ছন্ন; তবে সবার মধ্যে থেকে একটি অনাবিল শ্রদ্ধা আর শ্রীতির ধারা তাহার উপর উজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে—কথায়, চাহনিতে, হাসিতে এমন কি সঙ্গে থাকার আগ্রহের মধ্যেও।

ছিয়াত্তর নম্বরের সামনে আসিয়া পড়িল।

“কুখা গো বো—ছাওয়ালটিকে বের কর...চম্পার ছাওয়ালটিকে বের কর...হীরাটিকে বের কর...” বলিতে বলিতে কয়েকজন মেয়ে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, কয়েকজন ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই পেলাদের বউ একটু ফুলকাটা পরিষ্কার কাঁধায় মোড়া, রাজা সাঙ্গুর জামা পরানো চোখে কাজলটানা শিশুকে কোলে করিয়া সামনে আসিয়া যুহু হাসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইল। এক জন বর্ষায়ান বলিল—“ঈসু রে। চম্পার দশ দিনের পোলার ভান্ধো—ন’টি দিখো।...অ রে।”

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটা অদ্ভুত ধরণের—নিতান্তই নূতন ধরণের অল্পভূতিতে টুলর মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—এই শিশুটিকেই না সে সেদিন কয়লার ধূলি থেকে নিজের করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল?—তারপর চম্পা লইল কাড়িয়া।...সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। সেদিন যাহা করিয়াছিল এত কিছু ভাবিয়া করে নাই, খনির সেই আবহাওয়ার মধ্যে অত বড় একটা ট্রাজেডিতে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তুলিয়া লইয়াছিল ছেলেটি। আজ একেবারে অতর্কম, মনের ভাবটা গোলমালের মধ্যে গুছাইয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তবে মনে হইতেছে—সেদিনের দম্মা আজ কি করিয়া মমতার পরিণত হইয়া গেছে—কেউ নয় অথচ মনে হইতেছে আমারই তো—আমারই তো—আমিই তো তুলিয়া লইয়াছিলাম...

আর, চমৎকার ছেলেটিও, যেন টানিতেছে; অতঃপর ভাবেই টুলু ছই.পা আগাইয়া যাইতে মেয়েটিও ভুল বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিল, বারান্দা থেকে নামিয়া পড়িয়া ছেলেটিকে সামনে বাড়াইয়া ধরিল। টুলু একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণ-মাত্রের জ্ঞান একটা দ্বিধায় পড়িয়া গেল, তাহার পরই হাতটা বাড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল—“দেবে?—তা দাও।...কি চমৎকার হয়েছে ছেলেটি।” স্নন্দর চুলের...” শেষের কথাটি বলিতে বলিতে সবার দিকে ঘুরিয়া চাহিতেই আরও অপ্রতিভ হইয়া চূপ করিয়া গেল: সমস্ত দলটি—ছেলে বুড়ো সবাই, একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেছে—আর মুখে বিস্ময়, প্রশংসা আর আনন্দের কি যে একটা অপূর্ণ মিশ্রণ—যেন সবাই সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত, কল্পনার অতীত কোন দৈব লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

একটুর মধ্যে ফিস্ফিসানি আর চাপা মন্তব্য আরম্ভ হইয়া গেল—“দেবতাই তো আছে গো, উনিদের কাছে ছোট বড়োটি আছে নাকি?...হঁ, তুয়া কি বলিস গো।...চম্পা কেড়ে নিলেক, না তো উ তো রাজ্জাটি হোত বটে...আর, পোলা—তারা তো দেবতা গো, দেবতার কোলটি পালেক নাই...”

টুলু এমন একটা সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া গেছে, কি যে করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় আর একটি শিশু-কণ্ঠে কায়ার রব উঠিল। প্রজ্ঞাদের ছেলেটি বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া উঠিয়া মাকে কাছে না পাইয়া চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে।

টুলু যেন বাঁচিল, ছেলেটিকে বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—“ওট বুঝি তোমার ছেলে?”

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া লইতে লইতে মুখটা একটু নিচু করিয়া হাসিল, কিছু উত্তর করিল না।

ছেলেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সে সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া গেছে; একটু হাসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিল—“তা নিয়ে এসো, ওটকেও একবার দেখি।”

দলটা আবার নিশ্চুপ হইয়া গেল।...দেবতার লীলার কি শেষ নাই?

মেয়েটি কিছু না বলিয়া একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু হাসিটি যেন একটু স্থান, সেই বর্ষাঝান লোকটি বলিল—“নিয়ে আয় না গো, বাবুশয় বুলছে...”

মেয়েটি নড়িল না, বলিল—“ই, আমার পোলা উনি কি দিখবেন?—উ মিতিনের পোলায় পারা নাকি?—গরীবটি—কালোটি—জামা নেই শরীলে...”

টুলু হাসিয়া বলিল—“তা হোক, নিয়ে এসো, না দেখে নড়ব না আমি।”

একটা চাকল্য পড়িয়া গেল। মেয়েদেরও কয়েকজন তাগাদা দিল—“আয় না নিয়!...আবার দাঁড়ায় থাকে দেখো।...”

একটি মেয়ে মায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ভিতরে

চলিয়া গেল এবং ছেলেটিকে উঠাইয়া আনিল। মাস পাঁচ-ছয়ের ছেলেটি। কালোই, কিন্তু স্বাস্থ্যের দৌন্দর্যে যেন ভরপুর হইয়া আছে। জামাটামা গায়ে নাই, তবে কোমরে একটা রূপার গোট বন্ধ করিতেছে। বাহিরে আসিয়া হঠাৎ এরকম ভিড় দেখিয়া টানা টানা চোখে ক্যাল ক্যাল করিয়া অবোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

“দাও আমায়।”—বলিয়া টুলু বেশ সহজেই ছেলেটিকে চাহিয়া লইল; হীরকের মতো একেবারে কাদার ডালা নয়, একটু প্রাণের চাকল্য আছে, বেশ সহজেই টুলু একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আদর করিল, প্রকৃতই শিশু-সদ্বের আনন্দে বুকে বারহুয়েক চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বোধ হয় মনের আবেগে এদের ভাষা নকল করিয়াই বলিল—“ইটি তো নাড়-গোপালটি আছে বটে গো।”

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবে অন্তরের আনন্দকে মুক্ত করিয়া দিবার এক সুযোগ পাইয়াই যেন সমস্ত দলটা হাসিতে ভাঙিয়া পড়িল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দের চোটে কুজ হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ছলিয়া ছলিয়া বলিতে লাগিল—“আমাদের কথা? বুলছে গো বাবুটি...নাড়ু-গোপালটি আছে বটে—নাড়ু-গোপালটি আছে বটে...টুলু যেন একে-বারেই মিশিয়া গেছে এদের সঙ্গে, সঙ্কোচের আর এতটুকুও কোথাও নাই, চারি দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—“এত হাসি কেন তোমাদের গো? নয় নাড়ু-গোপালের মতন? কেমন গোল গোল হাত, গোল গোল পা—”

মেয়েটি লজ্জিতভাবে বারান্দার এক পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টুলু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—“তোমার ছেলের দিবিয় করে চূড়া বেঁধে দিও গো, ঠিক নাড়ু-গোপালটির মতন দেখতে হবে।”

হাসির যেন পথ খুঁজিতেছে সবাই—আবার হাসি ছল-ছলিয়া উঠিল।...চূড়া বেঁধে দিস...খোঁকাটির চূড়া বেঁধে দিবে।”

টুলু ছেলেটিকে ফিরাইয়া দিয়া, তাহার পর পকেটে হাত দিয়া ভিতরেই ব্যাগের মুখে খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিল, মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া বলিল—“এই ধরো, তোমার ছেলেটিকে হীরার মতন একটা জামা করে দিও...নাও, নেবে বৈকি...”

মেয়েটি নড়িল না, একবার দেখিয়া লইয়া লজ্জিতভাবে মুখটি শুঁকিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। যে মেয়েটি শিশুটিকে লইয়া ছিল সে শিশুর হাতটা বাড়াইয়া ধরিল, বলিল—“লিবেক, লিবেক নাই ক্যানে গো? আপুনি দাও ক্যানে, জামা করায় দিবেক।”

টাকা পাইয়া শিশুটি মুখে পুরিতেই এক জন বলিয়া উঠিল—“ই, জামা পেটের মধ্যে ঢুকলোক।”

আবার একটা হাসির লহর উঠিল।

টুলু আবার পকেটে হাত দিয়েছে, সমস্ত অন্তরায় চাহিতেছে হীরকের হাতেও ছুটি টাকা দেয়, কিন্তু কোথা থেকে সেই সন্ধ্যা আসিয়া জুটিয়াছে আবার, হাতটা কোন মতেই যেন বাহির করিতে পারিতেছে না। একটি মেয়ে বলিল—“আর হীরটির কি দোষ হইছে গো?”—বলিয়াই হাসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

“হীরা বাবুরও চাই? তা এই নে।...ওর বরং একটা গেট করে দিস, কেউ কান্নার হিংসে করবে না তা হলে।”

ছুইটা টাকা বাহির করিয়া দিতে অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—“হু ট্যাকায় গেট হয় নাকি গো?”

—বলিয়াই হাসিয়া প্রথম মেয়েটির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া দিল।

হয় না যে টুলুর নেটা জানা, তবে ছুই শিশুর মধ্যে ইতর-বিশেষ কথিতে রাজি হইল না। হাসিয়া বলিল—“হ্যাঁ, আমি বেশি দিই আর তোদের চম্পা এসে সেদিনকার মতন রসাতল কাণ্ড করুক—“বড়, মানুষট হইছে।—ট্যাকার গুমোর দেখাইছে।”

নিজের হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওদের কেহও বাদ গেল না।...হাসির জাত নাই, হাসিতে হাসিতে সব যেন একাকার হইয়া গেল।

বস্তি থেকে এদিক-দিয়া জ্বলে যাইবার পায়ে-হাঁটা পথ আছে ছুইটা,—একটা একটু সোজা, সেটা দিয়া চম্পা রোজ যায়, আর একটা একটু ঘুরিয়া। বোধ হয় এত শীঘ্র বাসায় ফিরিবার ইচ্ছা না থাকায় টুলু দ্বিতীয় পথটাই ধরিল। এই পথে বস্তি আর জ্বলের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বট গাছ আছে, এই বিরলপাদপ দেশে বড় বিশিষ্ট দেখায়। তাহার তলাটিতে আসিয়া টুলু একটা পাথরের উপর বসিল। মনটা আজ পূর্ণ হইয়া আছে—এ ধরণের পূর্ণতা টুলু জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই। এই পূর্ণতার পরিধির মধ্যে আজ সমস্তকেই টানিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে—কোথাও কিছু একটুকুও বাদ না দিয়া—। অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছে (কাহার সন্ধান ঘর ছাড়িয়া হইয়া-ছিলাম বাহির) আজ বস্তির মাঝে মনে মনে ঐ বাধাহীন, জাতিহীন, পূর্ণ মিলনের মধ্যে যার আনন্দময় রূপকে প্রত্যক্ষ করিলাম, আশ্রমে আশ্রমে কি তাঁহার সন্ধানই রূপ। অহেষণে ঘুরিয়া মরিয়াছি? এত সহজের জন্ত অত তপস্কার কিই বা প্রয়োজন? তিনি যখন এমনি করিয়া পথের ধূলা মাড়াইয়া চলিয়াছেন তখন কি ফল তোমার দৃষ্টিকে অমন আকাংক্ষা করিয়া?

জায়গাটি বড় স্নিগ্ধ। বস্তির আর এদিক ওদিকের যত কিছু গর-বাহুর, ছাগল, ভেড়া এই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত দিন থাকে চরিতে, তাদের রক্ষী ছেলেমেয়েরা এর ছায়ায় করে খেলা। টুলু নিজের আনন্দকে কেন্দ্র করিয়া অনেকক্ষণ রহিল বসিয়া। আর সব খেলা সাধারণ, একটি খেলার দিকে বিশেষ

করিয়া টুলুর নজর গেল, বড় নতুন ধরণের খেলা, যেমন নতুন, তেমনি মর্মস্পর্শী।

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা করিতেছে। বটগাছের ধারেই একটা খোয়াই, স্ততার মতো একটা জলের ধারা আছে, কোথাও কোথাও তাহাই একটু মোটা হইয়া গিয়া খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে; এইটা হইয়াছে বরাকর গাঁও, এক দল যেন সেই গাঙে মেলায় নান করিতে যাইতেছে, আর পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে—যাহারা একেবারেই থাকড়া-পরা তাহারা হইয়াছে ভিখারী; সারি সারি বসিয়াছে, যাত্রীদের কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—যে যত বিনাইয়া বলিতে পারিতেছে তাহার যেন তত বাধাহরি—“এ বাবুশয় গো, একটা পয়সা দি—ন বটে, দু’দিন খেতে পাই নাই গো...দাঁও মা, তুমার কোলে রাজা পোলা দিবেক মা গদা—ছুটি পয়সা দাঁও বটে গো—”

একটা ছেলের মাথায় নতুন আইডিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং কোমরের থাকড়াটুকু খুলিয়া ফেলিয়া সামনে বিছাইয়া বসিল, বাস্তবের সঙ্গে কতটা মিল আনিয়া ফেলিয়াছে সেই গর্বে সবার দিকে চাহিয়া বলিল—“তুবা দেখ, কাপড়টা না থাকলে উরা দিবে কুখায়?”

তিনটি ছেলে, বাকি ছেলে দুইটিও বিবস্ত্র হইয়া সামনে কাপড় পাতিল। ছুটি মেয়ে একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া আরও গুটাইয়া-ছুটাইয়া বসিল। আবার ভিক্ষা চাওয়া চলিল। একটু মেয়ে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং পাশের ছেলেটির থাকড়াটা খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া খোয়াইয়ের দিকে ছুটিল। ছেলেটি ওর ভাই—“দিদি, দিদি গো।”—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েটি দাঁড়াইল না—“তু বোস ক্যানে, আমি সবাইকে হারারে” দিব, তু দিখবি...” বলিতে বলিতে ছুটয়া গেল। একটুর মধ্যেই থাকড়াটা ভিজাইয়া সবার বিন্মিত দৃষ্টির সামনে সেটা গায়ে মাথায় জড়াইয়া বসিয়া পড়িল এবং হুলিয়া হুলিয়া কাতরানি আরম্ভ করিয়া দিল। একটি যাত্রীছেলে আহ্লাদে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—“হু—তু ঠিক তুর দিদিমার পারা হইছিস বটে।”

বড় কৌতূহল হইল টুলুর; মেয়েটিকে ডাকিল। সে একটু ভাৎচাকা খাইয়া গেলে ছেলেটি বলিল—“যা না, কিছু বুলবেক নাই।”

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত পদে আসিয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত করিল—“তুই কার মেয়ে?”

মেয়েটি খাড়া নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আড়চোখে এক বার সঙ্গীদের পানে চাহিল, ছেলেটি বলিল—“উ কারুর মেয়ে লয়: গা, উর দিদিমার লাভনি বটে।”

টুলু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—“তোর বাপ মা নেই?”

মেয়েটি এক বার ঘাড় নাড়িল, তাহার পর বলিল—“না।”

“দিদি’মা কি করে ?”

“ভিক্ষে ।”

ছেলেটি বলিল—“সিটি আগে বনিতো কাজ করত ; চোখ গেইছে ।”

টুলু মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—

“কোথায় ভিক্ষে করে ?”

“বাজারে ।”

“খনির বাবু’রা খেতে দেয় না ?—ম্যানেজার বাবু ?”

মেয়েটি একটু অবোধভাবে শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল ।

ছেলেটি বলিল—“উ কাজ করে নাই, খেতে দিবেক ক্যানে গো ?”

টুলু আবার মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—

“উটি তোর ভাই ?”

“হঁ ।”

“কোথায় থাকিস তোরা ?”

“কুখাও লয় ।”

“গায়ে ভিক্ষে থাকড়া জড়িয়েছিস কেন ।”

“দিদিমাটি জড়ায় বটে ।”

“কেন ?”

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল সেই ছেলেটি, বলিল—

“চণ্ডাল রোদটি বটে যে গো, সিথানে গাছ নাই, ভিক্ষা কাপ্পোড়টি জড়ায় বসে থাকে ।...বুড়ি কতো চালাকটি বটে ।”

এত গাভীৰ্ব গুর সহিতে পারে না, শেষের কথায় সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল । দলটি আসিয়া জমিয়াছিল—“চালাকটি বটে ।...বুড়ি চালাকটি বটে ।”—বলিতে বলিতে সমস্ত দলটি যেন হাসিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িল ।

টুলু শুভিত হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে, যা বোধ হয় বহু—বহু দিনই হয় নাই উহার । মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া একটু কাছে টানিয়া লইল, বলিল—“না, ওরকম করে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলিস নি...মা-লক্ষ্মী তা হলে ভিক্ষে দেন না ।”

শেষের কথাতায় নিজেই একটু যেন চমকিত হইল,—মাষ্টারমশাইয়ের মুখের এমন ঠাকুর-দেবতা খেলা ব্যঙ্গটা তাহার মুখে ঠাণ্ড আসিয়া পড়িল কি করিয়া ।

একটু অজমনক ভাবে বসিয়া রহিল, হাতটি পিঠেই আছে ; তাহার পর বলিল—“তোরা দিদিমাকে কাল সকালে মাষ্টার-মশাইয়ের বাসায় নিয়ে আসবি ।...ঐ স্কুল দেখতে পাচ্ছিস তো ?—তার পাশেই ওই বাসা ।”

ক্রমশঃ

পারাবত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

উড়ে যায় শাদা পারাবত ।

নীল শূন্য ভেঙে দিয়ে ডানায় ডানায়

ভেসে চ’লে যায় :

স্বর্গগামী রথ ।

ডানার কাপট লেগে : রথের চাকার তলে গুঁড়ো-

গুঁড়ো পথ ।

উড়ে যায়, উড়ে যায় শাদা পারাবত ।

স্বর্গ সে কোথায় ?

শুধুই অসীম শূন্যে ডানা কাপ টায়

পারাবত ছুটি শাদা-শাদা ;

(স্বর্গ কি কোথাও আছে ? সে প্রশ্নের হয় না সমাধা)

তবু বুঝি স্বর্গ থাকে নীল-নীল মেঘে-মেঘে বাঁধা ।

পারাবত উঠে চ’লে গেছে,

উড়ে-উড়ে স্বর্গ-সিঁড়ি পার কি হয়েছে ?

গুঁড়ো ক’রে দিয়েছে কি বাধা সৈ তারার,—

শত-শত মেঘ-অন্ধকার ?

তারপর বুঝি আছে স্বর্গের সীমানা ।

জানি না, উধাও শুধু পারাবত-ডানা ।

পারাবত নয়-নয় আমাদের মন,

স্বদয়ের নীল শূন্য করে বিচরণ ।

কামিনী রায়

(১৮৬৪-১৯৩০)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কামিনী রায়ের জীবদ্দশায়, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় "আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী" নামে একটি অলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহা সম্ভবতঃ সম্পাদিকা স্বর্ণ-কুমারী দেবীর রচনা। ইহা হইতে কামিনী রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈষ্ণব-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামধন্যত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী দেবীর পিতামহ ও পিতামহী অতিশয় ধর্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎপরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অহরন্তরিত হইয়াছে।

"কামিনীর চারি বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ ও শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বইখানি আত্মোপাস্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাখিতেন বা শস্ত্রের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটির দোয়াতে স্বগৃহে ও স্বহস্তে নির্মিত এক দোয়াত কালি ও এক তাল তালপাতা ও একটা খাকের কলম লইয়া লিখিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটা বন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তল্পপরি কলম রাখিয়া ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া নিয়মলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

"লাগ লাগ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক
আমার ভাগ্যে গুরুর যশ
দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে যাক।"
"হুং হুং সরস্বতী নির্মল বরণে
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণে
উজ্জ্বল মুকুতা গজমতিহারে
দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

"স্কুলে আসিবার কিছু দিন পরেই অপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে কেহই গণিতে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের

গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় কামিনীর পিতা জলপাইগুড়ির মুন্সেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন।

"বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন।

"অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুতুরাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে হইলে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত; সপরিবার তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী ও কন্যাগণকে কেশবাবুর ভারতাপ্রমো রাখিয়া পিতা একাই কর্মস্থানে গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে কামিনী [মিস একুয়েড-প্রতিষ্ঠিত] হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয় মাস কাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্তী দেড় বৎসর কাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতি দিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অল্প কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ কন্যার পাঠের জন্ত নির্দেশ করিয়া দিতেন; *Morning & Evening Meditations* নামক পুস্তক হইতেও প্রতি দিন একটু করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিং পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে সর্বদাই মনে রাখিবে যে, "My life has a mission."

"ষোড়শ বর্ষে [১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই [১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুল হইতে] F. A. পরীক্ষা দেন এবং [দ্বিতীয়

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া] সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে [১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল হইতে] B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাস অনার পাইয়াছিলেন।...

“১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত ‘আলো ও ছায়া’ ১৮৮৯ সালে বাহির হয়।...কোন সমাজের কোন দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা-প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।

“১৮৯৪ সালে ষাটটাকারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহুপূর্বে হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ‘আলো ও ছায়া’ প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি পুস্তক ‘গুণ্ডন’ বাহির হইয়াছে। কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কোন বস্তু অহুযোগ করাতো, কামিনী তাঁহার সন্তানগুলিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “এইগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।” স্বামিসেবা, গৃহকর্ম ও সন্তানপালনই তাঁহার একট পত্নী ও জননীর প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাঁহার সমুদয় অবসর ও শক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে।”

কামিনী রায়ের স্বপ্নের সংসারে সহসা শোকের গভীর ছায়া পড়িল। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। ইহার চার বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকেরও মৃত্যু হয়। আবারের পর আবারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত শোক-হঃখের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। শেষ জীবনে তিনি জনহিতকর কার্যে

—বিশেষ করিয়া নারীকল্যাণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ (১১ আশ্বিন ১৩৪০) তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।



কবি কামিনী রায়

সাহিত্য-সেবা

কামিনী সেন আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ‘সুখ’ নামে সুপরিচিত কবিতাটি এন্টাল পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পূর্বে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে রচিত হয়। পর-বৎসর তাঁহার পিতা মেদিনীপুরে বদলি হন। এই সময়ে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র ‘মেদিনী’তেই বোধ হয় তাঁহার রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

“মেদিনী” নামে মেদিনীপুরে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্ম আমাকে কবিতা দিতে অগ্ররোধ করেন। তদনুসারে “প্রার্থনা” ও “উদাসিনী” শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও ‘আলো ও ছায়া’র স্থান পায় নাই।... ‘আলোচনা’ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসন্নময়ী দেবীর লিখিত “কেন মালা গাঁথি—কুমারীর চিন্তা” শীর্ষক কবিতা পড়িয়া আসিয়া পর দিন “সঞ্জীবনী-মালা” লিখি। প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা—কুমারীর চিন্তা লিখিলেন, আমি কুমারী হইয়া প্রবীণার মত তাহার উত্তর দিলাম। এ এক তামাসা।”* (‘বঙ্গের মহিলা কবি’, পৃ. ৮১)

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কামিনী সেনের ‘আলো ও ছায়া’ প্রকাশিত হয়। পুস্তকে রচয়িত্রী-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, “প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালোচনা বা উপেক্ষার ভয়ে নহে, এক দারুণ লজ্জাবশতই আপনার নিহৃত চিন্তাগুলি অবগুণ্ঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। সেই লজ্জা ও ভীর্ণতা দূর করিবার জন্ম আমার নাম, ধাম ও নারীত্ব গোপন রাখিয়া, কোন পুজনীয় পিতৃবন্ধু কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ‘আলো ও ছায়া’র পাণ্ডুলিপি লইয়া যান” (‘অম্বা’ : নিবেদন)। হেমচন্দ্রের লিখিত ভূমিকা সহ পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ভূমিকার হেমচন্দ্র লেখেন :—

“এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

কবিতাগুলি আজকালের ‘ছাঁচে’ ঢালা।...বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রচনার নিপুণতা, এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।”

‘আলো ও ছায়া’র এমন কোন কোন কবিতা আছে যাহা বিষয়-গৌরবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। কবি একখানি পত্র গ্রীষ্মক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে জানাইয়াছিলেন :—

“আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পকু ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি,

কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্বদাই দেখি। অশ্বখ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ কুমড়া শশা অল্প শাকাদি সে রকম হয় না। ছ দিনে বাড়ে ছ দিন বাদে মরে। যে সব ছেলে precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা precocity ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।”—‘বঙ্গের মহিলা কবি’, পৃ. ৮৩-৮৪।

‘আলো ও ছায়া’ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল; কবির নাম বেশী দিন গোপন রহিল না। কাব্যখানি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। অতঃপর মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় ‘আলো ও ছায়া’-রচয়িত্রীর রচনা মাঝে মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ‘সাহিত্য’ প্রকাশিত হইলে, উহার প্রথম বর্ষে (ইং ১৮৯০) কামিনী সেনের ‘যমুনা-কল্পনা’ ও চতুর্থ বর্ষে (ইং ১৮৯৩) “ধৃষ্টদ্যায়ের প্রতি দ্রোণ” প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘মালা ও নির্দ্বালা’ তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; তিনি মহিলা-কবিদের শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

শেষের দিন সমীপবর্তী হইতেছে দেখিয়া কবি তাঁহার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিকিপ্ত রচনাগুলি কোনরূপ নির্বাচন না-করিয়াই ‘দীপ ও ধূপ’ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার যশ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—কেহ কেহ এরূপ অহযোগ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন :—

“যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্তন নাই, তাহার জন্ম উদ্ভূত হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহু দিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সত্ত্বের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দা ক্লেশ ভাবে না, অজ্ঞতঃ কিছু দিন কাজে আসিবে বা অলিঙ্গ লাগিবে এই মনে করিয়াই খুশী হয়, আমার এই কবিতাগুলিও সেইভাবেই দিয়া আমি খুশী।”

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,

বুঝি না জমেছে গীত যত;

কি যে তার দামী, কি যে খেলো, •

কি যে শুধু কথা এলোমেলো,

কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

(“অনির্বাচন”)

* ‘নীহারিকা’-রচয়িত্রীর (প্রসন্নময়ীর) রচনাটি ১৯০২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা (ইং ১৮৮৫) ‘আলোচনা’র প্রকাশিত হয়। উত্তরে কামিনী সেন পরবর্তী ভাদ্র-সংখ্যা ‘আলোচনা’র “জনৈক বঙ্গ মহিলা” এই নামে “কোন প্রাণে গাঁথ মালা আর ? (সন্ন্যাসিনীর উক্তি)” লিখিয়াছিলেন; ইহাই “সঞ্জীবনী মালা” নামে ‘আলো ও ছায়া’র মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে সম্মান

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় 'জগদ্বারিণী সুবর্ণ-পদক' দান করিয়া কামিনী রায়কে সম্মানিত করেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্ভারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

কামিনী রায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বঙ্গনীমধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সম্বলিত মুদ্রিত-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। আলো ও ছায়া (কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।

ইহার পরিশিষ্ট ভাগে দুইটি খণ্ডকাব্য—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক মুদ্রিত হইয়াছে।

২। নির্মাল্য (কাব্য)। ? (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।

৩। পৌরাণিকী (কাব্য)। ১৮৯৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৬০।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সমালোচিত।

৪। গুঞ্জন (শিশুরাজ্যের কবিতা)। ১৩১১ সাল (১৫ মে ১৯০৫)। পৃ. ৬৬।

৫। ধর্ম্মপুত্র (গল্প)। ১৩১৪ সাল (১৫ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ৪২।

"কাউন্ট টলষ্টয় প্রণীত [Godson] গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনুবাদিত।"

৬। অশোক-স্মৃতি (জীবনী)। (২ জুন ১৯১৩)। পৃ. ৩২।

৭। শ্রাদ্ধিকী অর্থাৎ শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩।

ইহাতে কবির পিতা—চণ্ডীচরণ সেনের জীবনচরিতও আছে।

৮। মাল্য ও নির্মাল্য (কাব্য)। ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৬০।

৯। অশোক-সঙ্গীত (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৮।

"অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত হৃদয় হইতে উথিত।"

১০। অম্বা (নাট্যকাব্য)। ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।

ইং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

১১। সিত্তিমা (গদ্য নাটিকা)। ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।

১২। Some Thoughts on the Education of our Women. 1918. p. 27.

১৩। বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্তমান (নিবন্ধ)। ? (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫।

১৪। ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা)। ? (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ. ২৩।

১৫। দীপ ও ধূপ (কাব্য)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৬।

১৬। জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০।

পত্রাবলী
আমরা কামিনী রায়ের দুইখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। পত্র দুইখানি 'হেমচন্দ্র'র গ্রন্থকার শ্রীমম্বাধনাথ ঘোষকে লিখিত। কি স্ত্রে হেমচন্দ্রের সহিত কবির আলাপ-পরিচয় হয় এবং হেমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাই বা কিরূপ ছিল, পত্র দুইখানি হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

হাজারিবাগ

২রা মার্চ, ১৯১৮

মাত্তবরয়—

আপনি কবির হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনের কথা কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের 'বন্ধু' ছিলেন ঠিক এক কথাও বলা যায় না। আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় তিনি হেমবাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছেন এই কথা শুনিয়াছি।

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। তখন 'আলো ও ছায়া' যন্ত্রস্থ।

আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় ইতিপূর্বে আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে দেন এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি অবশ্য ইহার বিশদ-বিসর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. রায়কেই দেখিতে দিয়াছিলাম।—কবির কতগুলি কবিতার উপরে 'সুন্দর' Beautiful ইত্যাদি এবং খাতার উপরে A true poet লিখিয়া দুর্গামোহন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটিকে কে হে?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন "ছেলে নয় মেয়ে।" তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত লোকের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন জানিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না। যখন কয়েক ফন্দি ছাপা

হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি. কে. রায় (৩৮গ-মোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা) আমার জন্ম গাভী পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে কবিরকে তাঁহার আহ্বানের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটি লইয়া তাঁহাদের রডন স্ট্রীটস্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হেমচন্দ্রের সহিত উমাকালী মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা আসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার নব-রচিত গদ্য-ভাষ্যটি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আহ্বানের পর উমাকালী বাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে “হায় বনুসুখা তোমার কপালে” ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, “না, মিস সেনের কবিতা হইতে পড়ি।” তখন খুব ভাবের সহিত ‘বর্ষ-সঙ্গীত’ পড়িয়া শুনাইলেন।

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার হৃদ্যাগ্রক্রেমে সে স্নেহপূর্ণ চিঠিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিঠি পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার গল্প-রচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসল কথা তিনি দোষ খুঁজিতেন না, গুণ খুঁজিতেন; সৌন্দর্য্য দেবির চোখা থাকিলে সর্বত্রই দেখা যায়।

তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপত্তি হয়। তিনি সেই জন্ম দ্বিতীয় বার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। উহাই ‘আলো ও ছায়া’র দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিশ্বাস।

তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত ‘আলো ও ছায়া’র সমালোচনাগুলির জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং কোন কাগজে সমালোচনা বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি চিঠি লেখা কেন বন্ধ করিলেন জানি না। একবার উত্তর না পাওয়াতে আমিও আর লিখিতে সাহস পাই নাই। ‘নির্মাল্য’ ও ‘পৌরাণিক’ প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই। হয়তো চক্ষুগীড়ার জন্মই চিঠি লিখিতে পারেন নাই।

আমি বাল্যকালে কল্পনা-জগতে, আমার দিবাসপ্নে তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া কল্পনা করিতাম। সত্য সত্যই তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন এ কথা আমার ‘নিশার স্বপ্নের’ও অগোচর ছিল। কি স্বপ্নে তাঁহার উজ্জ্বল নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত এখিত হইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আমি তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পূর্ণ। তাঁহার বাক্যই আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

তাই বিশ বৎসর পরে, ‘আলো ও ছায়া’র ৬ষ্ঠ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই ‘আলো ও ছায়া’ উৎসর্গ করিলাম।”

আমি তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া ‘আলো ও ছায়া’র কথাই লিখিলাম। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিতেছি না। সমযান্তরে লিখিব। ইতি—

সত্যধিনি

শ্রীকামিনী রায়

৯৮, বেলতলা রোড, কালীবাট, কলিকাতা।

১১ই জুলাই ১৯২০।

মাঝবরেমু—....

হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ ‘আলো ও ছায়া’তে তাঁহার প্রথম লিখিত ভূমিকা পড়িবার পর, তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যাহা পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছা কখনও হয় নাই, এখনও হইতেছে না। পিতা মাতা বা ধাত্রীকে যেমন মানুষ চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করে না, আমারও কতকটা সেই রকম।

হেমচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা করিয়া বর্তমানে কাহাকেও তাঁহার কাব্যের প্রতি অমুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার নাই। যাহারা তাঁহার কবিতা পূর্বে ভালবাসিয়াছেন,

* ৬ষ্ঠ সংস্করণের ‘আলো ও ছায়া’ “পিতৃপ্রতিম ভক্তিতাজ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়”কে এই ভাবে উৎসর্গ করি হইয়াছে :—

বিশাল তরুর ধন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তরু, ঢালে গীতধার
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি’
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি বুলি কণ্ঠ, প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিশ্রুতি বরষ ধরি’ যেই গীতহার,
আজ লোকান্তর হ’তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে :—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য ত’ নয় ;
বিশ্ব বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে ভূমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌছে ধরণীর বার্তা মৃত্যুর ওপার।

তাঁহার এখনও ভালবাসিতেছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্য-বিলাসীগণ তাঁহার খুঁতগুলিই ধরবেন এবং হয়তো গুণের যথেষ্ট সমাদর করিবেন না। সেজ্ঞ আপনার আমার জুর হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ ধরনের লেখা সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠে। আজকাল রবীন্দ্র যুগ—এ যুগে ‘আর্টে’র দিকেই, বিশেষ রবীন্দ্রের আর্টের দিকেই মানুষের অধিক মনোযোগ। কবিতার প্রভাব (effect) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় কি না কেহ দেখে না।

রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জলন্ত স্বদেশপ্রেম, নারীজাতির প্রতি তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও বিকার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্রোধ ও লজ্জাবোধ—এ সকল তাঁহার মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলা-কুশলতা (art) হইতে কবির উদ্দীপিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার জলদগম্ভীর ভাষা শুনিয়া আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়া আপনাকে ঠেলিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল যেন বাহা বাহা বাঁধা বুলি আগে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তা ও ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বসাইবার চেষ্টা হয়। সেই জন্ত ভাব জমাট হয় না, ভাষা ভাষা থাকিয়া যায়। কবিতাটি অনেককণ নাড়িয়া চাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া, চক্ষে কর্ণে কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গভীর সাড়া পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভুল বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন আমি রবীন্দ্রনাথকে অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, গীত-রচনায় অদ্বুত অনন্তসাধারণ ক্ষমতা, কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার লেখনীস্পর্শে গুরু বিষয়ও সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাঁহার কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়, সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্তু গীতি-রচনায় তাঁহাকে মাপকাঠি করিয়া অন্ত সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ব্যবহৃত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা রচনা করিতে গেলে পূর্ব-কবিদের প্রতি এবং নিজেদের প্রতি অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে। তিনি যে রচির স্বপ্ন করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে ‘স্কলের’ প্রবর্তক, তাহা গভীরতা ও সজীবতার তত সন্ধান করে না, মিষ্টতা চাহে, স্পষ্টতা চাহে না। ছন্দ, সুর, নিখুঁত মিল, উপলব্ধি গিরি-স্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইন্দ্রিয়ের নানা বর্ণের

ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক উপাদান। এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানবজীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে—এবং তাহার একটা সরল সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং স্পষ্টকে অস্পষ্ট ও সরলকে জটিলও হয়তো করিলাম। এইখানে অজ্ঞকার মত শেষ করি।

কাল চিঠিখানা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। অজ্ঞ কাজে উঠিয়া যাইতে হয়। আজ লিখিতে বসিয়া অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা কথা বাকী রহিয়া গেল, সেটা এই, ‘মহাকাব্য’ এখন out of fashion. কবিতার গুণ দোষ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা গীতি-কবিতারই কথা।

বিনীত

শ্রীকামিনী রায় *

কামিনী রায় ও বাংলা-সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে যে-কয়জন মহিলা-কবি বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী রায়ের স্থান তাহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উজ্জ্বলতার সংযোগ ঘটাতাই তাঁহার রচনা মার্জিত ও শিল্পমুখ্যমণ্ডিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ পাদে ‘আলো ও ছায়া’-রচয়িত্রী বাংলা-সাহিত্য-সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহা অনুমান করিতে পারিব না। কবির হেমচন্দ্র-লিখিত ‘আলো ও ছায়া’র ভূমিকাতেই সাহিত্যরসিকদের তৎকালীন হৃৎ-বিস্ময়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

“আধারের কীটাপু আমরা

দু-দণ্ড আধারে করি খেলা,

অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট,

জীবন ও মরণের মেলা।”

অথবা

“পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,

এ জীবন মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?

আপনার কথা ভুলিয়া যাও।”

* পত্র দুইখানি ১৩৪২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা ‘বিচিত্রা’ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বাঙালী নারীকণ্ঠে এই সরল মধুর ও বিচিত্র সুর রবীন্দ্র-প্রতিভার নব-অভ্যুদয়-যুগে বিস্ময়কর চৈকিবার কথাই। “চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ,” “মহাশ্বেতা,” “পুণ্ডরীক” প্রভৃতি সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র-বিষয়ক কবিতাও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছিল। হুঃখের বিষয়, কবি

কামিনী রায় যে সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী কীর্তি তদনুযায়ী হয় নাই। তথাপি ‘আলো ও ছায়া,’ ‘মাল্য ও নির্মাল্য’ ও ‘দীপ ও ধূপের’ কবি কামিনী রায় চিরদিন সগৌরবে বাংলা-কাব্য-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

হাজারিবাগ ভ্রমণ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শেষ পর্ব

হাজারিবাগ রোডে ধানোয়ার রোডই সবচেয়ে প্রশস্ত এবং দীর্ঘ। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় এই পথে বেড়িয়ে এলাম। এ পথের দুধারেও অনেক বাঙালীর বাড়ি। এক মাইলের কিছু বেশী গিয়ে আমরা দু-জনে একটা কালভার্ট-ব্রিজের উপর বসলাম, আর দু-জন আরও দূরে চলে গেলেন। পূর্ব আকাশে কালো মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সমস্ত প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা। পথে লোকজন তখন খুব সামান্যই চলছে। দু-এক জন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলাকে দেখা গেল সেই অন্ধকার পথে দীর্ঘ দূর ভ্রমণ করতে। পথে যাবার সময় ডানদিকের বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি দেখলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাইন। উঁচু-নীচু পথ, লোকালয় ছাড়িয়ে শূন্য প্রান্তরের বুকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই অন্ধকারে, তা আর দেখা গেল না। হাওয়া বেশ জ্বরে বইছিল, আর কি ঠাণ্ডা সে হাওয়া, একটু বসতেই বেশ শীত করতে লাগল। এপ্রিল মাসের ষোল তারিখেও এখানে এমন ঠাণ্ডা থাকতে পারে তা ভাবতে পারি নি। শুনলাম সাধারণত এ রকম থাকে না, এবারেই শুধু ঐশ্বর আসতে একটু দেরি আছে।

আমাদের হাজারিবাগ রোডে থাকার এইটেই শেষ দিন। পরদিনই আমরা হাজারিবাগ শহরে যাব এই রকম আলোচনা করছিলাম, কিন্তু কে কোথায় গিয়ে উঠবে সেই হ'ল এক সমস্যা।

প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ওঠবার জায়গা আছে, কিন্তু হাজারিবাগের মতো শহরে সবাই ইতস্তত বিকিঞ্চ হয়ে

থাকলে প্রত্যেকেরই মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, কারণ হাজারিবাগ শহরে এসে কি কি দেখবে, কোন্ কোন্ জায়গায় যাব, তার কোনোটাই আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না, প্রতি মুহূর্তে আলোপ-আলোচনা করে সে সব ঠিক করছিলাম। সেজন্তে সব সময়েই আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার, অন্তত কাছাকাছি।



রাজরূপা ছিত্রমতী মন্দিরের পাশে দামোদর
'গর্জ' (হাজারিবাগ)

স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে ওঠবার একটা দায় ছিল আমার, কেননা তাঁর নিমন্ত্রণ আমি বহু পূর্বেই

গ্রহণ করেছিলাম। শহরে ঘেখানেই উঠি, তাঁদের বাড়িতে অন্তত এক দিনের জন্তেও আমাকে থাকতে হবে এটা প্রায় ঠিক ছিল। সমস্তা হ'ল কি ক'রে সবাই কাছাকাছি থাকা যায়। এ সমস্তার একটা মীমাংসাও হয়ে গেল। ধানোয়ার রোডে আমাদের সাক্ষ্যভ্রমণের শেষে আকাশে মেঘের আড়ালে যে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সে চাঁদ দৃশ্যমান হতে দেরি হ'ল বটে, কিন্তু তার আগে এই পথে যাত্রারস্ত্রে আর এক চাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে হাজারিবাগ শহরের সমস্তাটা সমাধানের একটা কিনারায় এসে গেল। চাঁদ রবির বন্ধু। তিনিও পরদিন সকালে শহরে যাবেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁদের বাড়িতে উঠতে হবে এই রকম অহরোধ করলেন। কিন্তু তাকে অহরোধ না বলে প্রায় আদেশ বলা চলে। আমি যে অস্ত্র উঠব তা তখন আর তাঁকে বললাম না।

আমরা সেই রাতেই স্টেশনে এসে বাস কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলে সীট রিজার্ভ করে এলাম।

স্টেশন থেকে ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথমে যে বাস শহরে যায় তাতে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ যে সব ট্রেন-প্যাসেঞ্জার একবারে হাজারিবাগ শহরের টিকিট কেনে তাদের জন্তে জায়গা ছেড়ে দিতে এই মোটর কোম্পানি বাধ্য। সে রকম প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কত হবে তা না দেখে এরা আগে কোন কথা দিতে পারেন না। সেজন্যে আমরা দ্বিতীয় আর একটা বাস কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম। এরা হচ্ছে মাড়োয়ারি মোটর-প্রতিষ্ঠান। শুনলাম এদের গাড়ি সকাল আটটায় ছাড়বে।

১৭ তারিখে যথাসময়ে এসে বাসে উঠলাম। তার আগে স্টেশনের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। চন্দাবার আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ওখান থেকে প্রকাণ্ড এক মাছ সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাসে। বাস ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে আটটা হয়ে গেল। সে দিনও সকালে বেশ শীত ছিল, তাই কোনো কষ্টই হ'ল না শহরের পথে এগিয়ে যেতে। সদা-হাঙ্গাম চাঁদের সদ আমাদের সবাইকে পুলকিত করল, তিনি সমস্ত পথ নানা রকম গল্প করে আমাদের পথশ্রম লাঘব করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হাজারিবাগ শহরের পথে আমাদের অদৃষ্টে সে দিন যে সামান্য

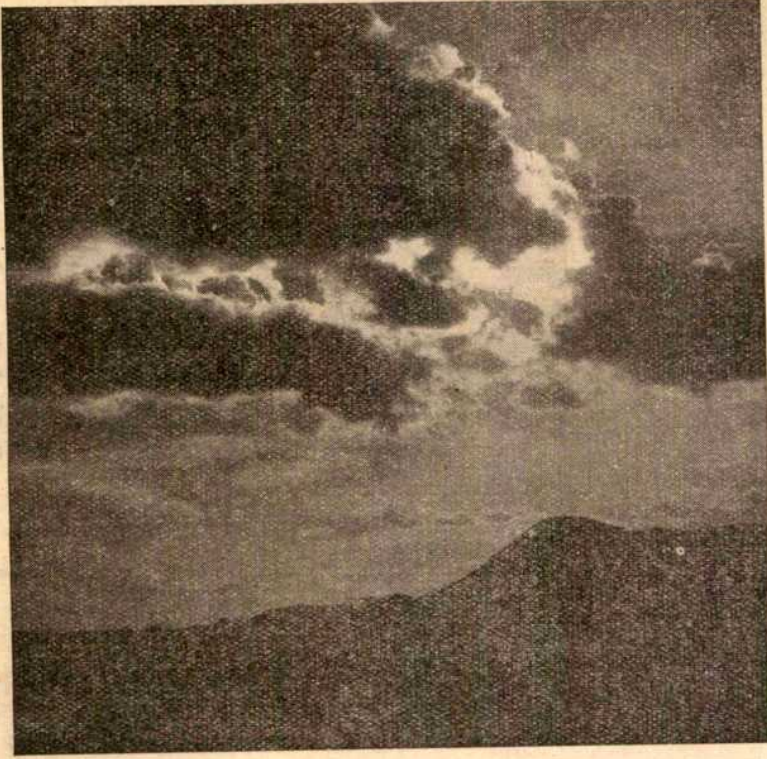


রাজারজা চিরমন্তর প্রাচীন মন্দির (হাজারিবাগ)

কিছু হুঁজুগ ছিল তা তিনি খণ্ডন করতে পারলেন না। আমাদের বাহক-বাসখানা ঘটাখানেক এগিয়ে যাবার পরেই বিগড়ে গেল। শোনা গেল চাকা বুলে নতুন চাকা পরাতে হবে। সব শেষ হতে আধঘণ্টা লাগল। কিন্তু আবার কিছু দূর গিয়েই গাড়ির ইঞ্জিন আর চলে না। তখন যন্ত্রীরা ইঞ্জিন ঘেরামতের কাজে লাগল। এইভাবে, পথের মাঝখানে, বাসের সাধারণ থামবার জায়গার বাইরে, ইঞ্জিন ও চাকার গোলমালে আমাদের চার বার থামতে হয়েছিল। পথের মাঝখানে এ ভাবে অকারণ থামায় আমাদের অন্য কোনো রকম অসুবিধা হয় নি একমাত্র দেরি হওয়া ছাড়া। পথের দৃশ্য এতই চমৎকার যে ওর যে-কোন জায়গায় নেমে কিছুকাল কাটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

পথের দুধারে বড় বড় বটগাছ, নিমগাছ এবং আমের গাছের সারি। কখনও শালবন, কখনও খোলামাঠ—দূরে ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর, বেলা বাড়ছে কিন্তু সে পরিমাণে গরম বাড়ছে না বলে আমাদের কোন কষ্টই হচ্ছিল না।

বাংলাদেশ থেকে নতুন এ পথে এলে এ রকম অভিনব আবহাওয়া, এ রকম পাহাড়-অরণ্যের দৃশ্য, এ রকম চলতি



টাতানগরের পথে (হাজারিবাগ)

পথের ক্রম পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য যে খুবই ভাল লাগবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম তরঙ্গায়িত পাহাড়িয়া পথের কল্পনা বাংলাদেশে বসে করা যায় না। লোকালয়ের চিহ্ন-হীন উদ্দাম অরণ্যশোভা প্রতিমুহূর্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল মনের মধ্যে। সমস্ত আকাশ কালোমেঘে ছেয়ে গিয়ে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চললে নিজেকে যেমন পরিচিত জগৎ থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হয়, এখানকার অরণ্যবৃক্ষেও মনে তেমনি উদাস করা এবং পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি গভীর বেদনামিশ্রিত আনন্দের উদয় হয়। অত্যন্ত আধুনিক কালের মোটর বাসে আমরা আধুনিক কালের যাত্রীরা শহরে চলেছি এ ঘটনা নিতান্তই অবাস্তব, নিতান্তই বাইরের। মনোজগতের বিরাটত্বের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ। নতুনকে হঠাৎ এহণ করা বিষয়ে মনের রূপগতা আছে বলে যে একটি কথা শুনতে পাওয়া যায় সে কথার কি কোন দাম আছে? মনে তো বিনা বাধায় এই আদিম পৃথিবীর উদ্দাম উদার রূপকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে এহণ করলে। কিংবা এ চির পুরাতন, এরই সঙ্গে মনের চির আত্মীয়তা। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম অপরিচয়ের বাধা ঘুচিয়ে জীবনের যে-কোন লগ্নে বা তিথিতে অকস্মাৎ যদি তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান যায় তা হলে তাকে

পরম আত্মীয় বলে চিনে নিতে তার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। বিদেশে নতুন পারিপার্শ্বিকে হঠাৎ যদি আমাদের দৈনন্দিন কাজের সহস্র দ্বুতিবিচ্ছিন্ন অতিপরিচিত আপিস-গৃহটি আবির্ভূত হ'ত তা হলে মনের অবস্থা কি হ'ত তা কল্পনা করতে বেগ পেতে হবে না। অথচ আমাদের জীবনে আপিস কত সত্য।

হাজারিবাগ শহরে পৌঁছে আমরা বাস-স্টেশন থেকেই পৃথক হয়ে গেলাম। চাঁদবাবু শেষ পর্যন্ত মাছের দোহাই পাড়লেন, বললেন শহরে এরকম মাছ জ্বলভ, আপনি আপন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমি একখানি রিক্স নিয়ে দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে এসে উঠলাম বারোটার কিছু পরে। রোজ স্টেশন থেকে শহরে আসবার বাস-পথ চলিশ মাইলের কিছু বেশি হবে। এতটা পথ এসেও মনে বা দেহে কোনো ক্লান্তিই অনুভব করি নি, এটা আমার মতো ক্ষীণজীবীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে

হবে। আরও একটি ভয় ছিল, ভেবেছিলাম, চার দিন হাজারিবাগ রোডে কাটিয়ে নতুন জায়গার দৃশ্যে মনের ক্ষুধা যে পরিমাণে নিবৃত্ত হয়েছিল, পাকস্থলীর ক্ষুধা সেই পরিমাণে বেড়ে যাওয়াতে শহরে এসে বিপদে পড়ব, হয় তো অতিথি হিসাবে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারব না, শেষ পর্যন্ত একটি বেদনাময় স্থিতি নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল দেহের সম্মানজ্ঞান মনের চেয়ে কিকিঞ্চি বেশী। শহরে এসে কোন্ অজ্ঞাত কারণে পাকস্থলী অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে লাগল, কলকাতা থাকতে যেমন, এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি, সে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করেই খুশি হ'ল। সঙ্গীদের কাছে পরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানতে পারি, তাঁদের অবস্থাও ঠিক আমারই মতো। শহরে এসে তাঁদেরও আহ্বারের পরিমাণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছিল।

দ্বিজেনবাবু কিছুকাল পূর্বে অস্থগে ভুগেছিলেন, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি, গিয়ে দেখলাম শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়ে আছেন। অতিথিবৎসলকে এ ভাবে দেখে বড় দুঃখ হ'ল। তাঁর কন্যা শ্রীমতী মায়ী 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে "বিহারের লোক-সঙ্গীত" লিখছিলেন। সেইগুলো পড়ে বিহারের পল্লীজীবনের প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই উপলক্ষে হাজারিবাগ থেকে

ওদের পল্লীজীবনের কিছু ছবি তুলব, কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল না। দ্বিজেনবাবু অস্থির ছিলেন, তত্পরি আমাদের সময় ছিল অত্যন্ত কম। ওখানে গিয়ে বোঝা গেল বেশ কিছুকাল ওখানে না থাকলে দূর পল্লীতে গিয়ে পল্লীজীবনের কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ঐ গানগুলোর ভিতর দিয়ে বিহারের জলমায়টির কাছাকাছি যে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস ক'রে এসেছে, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার একটি অপূর্ণ ছবি ফুটে ওঠে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের সঙ্গে ওদের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। ওদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের এমন সরল সহজ মধুর গান যে সব অজ্ঞাত অখ্যাত কবি রচনা করেছেন, তাদের কথা ভাবলে বিষন্ন লাগে।

হাজারিবাগ শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। শহরের ভিতরে একটি বড় মন্দির ছিল, নাম তেলীমন্দির, সেইটির ছবি নেওয়া গেল। লেকের ধারে গিয়েছিলাম এক দিন, কিন্তু তার কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেইখানে সরু বাঁশের একটা ঝাড় পর পর অনেকগুলো ছিল—দেখতে বেশ লাগল। তারই মাঝে একটি ছবি নিলাম। ১৯ তারিখের সকালে এসেছিলাম এদিকে। সেই দিনই আমরা হাজারিবাগ ছাড়ব এই রকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হাজারিবাগ শহরে এসে এখান থেকে কি ভাবে কোথায় যাব তা আগে কিছুই ঠিক করা সম্ভব হয় নি। অনেক সময় গল্প বা উপন্যাস আরম্ভের সময় কি ভাবে তা শেষ হবে, লেখকেরও তা জানা থাকে না, লিখতে লিখতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তার পর একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঠেলে নেওয়া যায়। আমাদের এই ভ্রমণও অনেকটা সেই রকম। হাজারিবাগ শহর পর্যন্ত এসে, এখান থেকে নানা অবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রে ঠিক হ'ল আমরা রামগড় হয়ে কলকাতা যাব। নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় এজ্ঞে যে উদারতা দেখালেন তার জন্তেই আমাদের এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারল। পূর্ব দিন সন্ধ্যায় ঠিক হয়ে গেল আমার সঙ্গী বজুরা বেলা বারোটার আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন দ্বিজেনবাবুর বাড়ি থেকে।

এলাহাবাদের কংগ্রেস-কর্মী ভূতপূর্ব কাকোরীবন্দী মন্মথ গুপ্ত সজ্জতি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হাজারিবাগে দ্বিজেন বাবুর বাড়িতে। হিন্দি ভাষায় উপভাস এবং গল্প লেখক হিসেবে ইনি খ্যাত। উর্দু জানেন, বাংলাও ভাল জানেন। ইনি বাংলা ছোট গল্প অনেক অস্বাদ করেছেন হিন্দি সাময়িক পত্রিকার জন্তে। আমাদের অনেকের গল্পই হিন্দিতে অস্বাদ হয়ে বহু হিন্দি মাসিকপত্র ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। প্রকাশকেরা সেজ্ঞে ঋণ পরিশোধ অথবা ঋণ স্বীকার দূরের কথা, মূল লেখককে এক সংখ্যা কাগজও পাঠানো দরকার মনে করেন না, এটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হ'ল। মন্মথ বাবুর কাছ থেকে

এই সংবাদটি পাবার পর আমার মনে হয়েছে বাঙালী লেখক-দের তরফ থেকে এ বিষয়ে অসহস্কান হওয়া বাহনীয়। লেখা-বাদের পেশা, তাঁদের লেখার কপিরাইট অগ্রাহ্য ক'রে হিন্দি সাহিত্যের ব্যবসায়ী ছ'পয়সা ক'রে নিচ্ছেন, ঠকছেন বাঙালী লেখকেরা। বাঙালী লেখককে না জানিয়ে তাঁদের অনূদিত গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে কি না কে জানে।

২০ এপ্রিল তারিখে বেলা ১টায় হাজারিবাগ থেকে নীরদ বাবুর গাড়িতে আমরা চার জন রামগড় রওনা হলাম। এ পথের দৃশ্য আরও চমৎকার। একেবারে শালবনের ভিতর দিয়ে পাহাড়িয়া পথ। একবার উপরের দিকে উঠছি, একবার নীচের দিকে নামছি। ঢেউ-বেলানো আঁকাবাঁকা পথ পাহাড় কেটে কেটে তৈরি হয়েছে। এই রকম গ্রিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা পৌঁছে গেলাম রামগড়ের দামোদর-সেতুর উপরে। এইখানে গাড়ি থেকে একটুখানির জন্তে নামা গেল। এখানে নদী বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তখন জল খুব বেশি ছিল না। শুকনো নদীর পাথরের বিছানা বেরিয়ে পড়েছে চূপাশে। সেতুর অপর পারে বন্ধুধারী প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে।

কংগ্রেস অধিবেশনে বিখ্যাত রামগড় যুদ্ধ উপলক্ষে সেনা-নিবাসে পরিণত হয়েছে। নদী পার হয়ে দেখি সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। রামগড় যেন একটি প্রকাণ্ড শহর। অতি প্রশস্ত পাশিশ করা পথ। পথে অবিরাম মিলিটারি লরি যাতায়াত করছে। ব্রিটিশ সৈন্যরা চলাফেরা করছে। রাস্তার ধারে কত রকম দোকান। হেয়ার-কাটিং সেলুন, রেডিও যন্ত্র মেসারামতের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। পথের বাঁ পাশে পুরনো রামগড়, ডান পাশে নতুন রামগড়।

আমাদের গাড়ি বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ের দিকের একটি পথে গিয়ে নীরদ বাবুর কাঠের গোলায় গিয়ে হাজির হলাম। নীরদ বাবু আমাদের জন্তে শুধু গাড়িই দেন নি, রামগড়ে থাক-বার জায়গা এবং খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমরা তাঁদের আপিস-ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সোজা রওনা হলাম রাজকুন্নার অভিমুখে। সেইখানকার বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির নাকি দেখবার মতো জিনিস। রামগড় থেকে জায়গাটা ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু পথ সব জায়গায় ভাল নয়। এক এক জায়গায় বহু নীচে নেমে প্রায় খাড়া উপরে উঠতে হয়। তিন চার জায়গায় এই রকম সব খাল পার হতে হয়। তা ছাড়া সে পথে আর কোনো অসুবিধা নেই। পথের দু-ধারের দৃশ্য নতুন ক'রে বর্ণনা করব না। পথে অনেকগুলো বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীর পরনে হলুদ রঙের জামা ও ধুতি। এ রকম দশ-বারোটা দল দেখা গেল।

গোলাবাজার নামক একটি জনবহুল জায়গার ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হ'ল। বেলা তখন চারটে হবে। সেখানে হাট বসে গেছে। বহু লোকের ভিড়।

গোলাবাজার ছাড়িয়ে খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। কিন্তু সেই মহয়া-অরণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অনেক সাঁওতাল মেয়েকে বোকা মাথায় হাটের পথে আসতে দেখা গেল, কিন্তু মোটর গাড়ি আসতে দেখে বহু দূর থেকে তারা সবাই প্রাণভয়ে উল্লসিত হয়ে উঠে পালাতে লাগল। যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম, সে পথ মোটর গাড়ি যাবারই পথ, বহুকাল ধরে অনেকেই সে পথে মোটর গাড়িতে যাতায়াত করেছে এবং সাঁওতাল মেয়েরাও সেখানকার নতুন লোক নয়। তবে কেন এ রকম হ'ল। ভেবে একমাত্র উত্তরই মনে আসে। যুদ্ধের সময় হয় তো সৈন্যদের বা সামরিক বিভাগের লোকদের হাতে এরা এমন উৎসাহিত হয়েছে যার ফলে মোটর গাড়ি এদের কাছে এখন বিভীষিকা। রামগড়ও এ রকম অত্যাচার হয়েছে পরে শুনেছি। সেখানকার পুরনো বাজারের প্রবেশপথে সৈন্যদের প্রবেশ নিষেধ সাইন দেওয়া আছে দেখলাম। সেটা নিরর্থক নয়। বিশেষ করে চীনা সৈন্যদের সম্পর্কে এখানকার লোকদের ধারণা খুব ভাল নয়। সামরিক বিভাগের দৌলী লোকেরাও এখানকার জীলোকদের প্রতি কি রকম দুর্ব্যবহার করে তার নমুনা কিছু নিজের চোখেও দেখেছি।

ছিন্নমস্তা মন্দির দামোদর নদীর গর্জ-এর উপর অবস্থিত। আর একটা নদী এসে পড়ছে দামোদরের এই বাদে মন্দিরের সমুখ দিয়ে। সে নদীটী এখন ক্ষীণ ধারা মাত্র কিন্তু তার প্রশস্ত বন্ধের স্রোতে পালিশ-করা প্রকাণ্ড এক এক খণ্ড পাথর পাশা-পাশি উল্লুজ হয়ে পড়ে আছে। ক্ষীণ স্রোত এঁকে-বঁেকে তার ভিতর দিয়ে গিয়ে দামোদরে পড়ছে। এক জায়গায় এই জলধারা প্রচণ্ড বেগে জলপ্রপাতের আকারে গিয়ে চলে পড়ছে গর্জ-এর মধ্যে। আমরা খুব সাবধানে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে পার হয়ে যাচ্ছিলাম। পা ফড়ালে মাথা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইখানকার দৃশ্য সব দিকেই অতি চমৎকার। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তরুপরি সূর্য ছিল মেঘে ঢাকা; সে জেতে এখানকার ফোটোগ্রাফ আলো-ছায়ার মিলনে যতখানি জীবন্ত হতে পারত তা হ'ল না। তবু চার-পাঁচখানা ছবি নিলাম সেই ক্ষীণ আলোতে।

মন্দিরের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাচীন মন্দির, কিন্তু তার সিঁড়ি ও সমুখ ভাগের সমস্তটা গাঁথুনিই আধুনিক কালের। মন্দিরের পাশে যাত্রীদের থাকবার মতো একখানি ঘর আছে। মন্দিরের পূজারী বাঙালী।

আমরা সেখানে আধ ঘণ্টা থাকবার পরেই আকাশে বৃষ্টির মেঘ জমে এল, কাজেই তখনই ফিরে আসতে হল ওখানকার সব কিছু ভাল ক'রে না দেখেই। ক'দিন ধরেই হাজারিবাগে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, হাওয়াও সেজজে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। রাতে খাবার জেতে আমাদের কিছু ভাবতে হয় নি—খাঁদের উপর সে চিন্তার ভার ছিল, তাঁদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণ ক'রে

আমরা চার জনেই এক দিন পরে আবার হাজারিবাগ রোডের মাজার আহার করলাম। সমস্ত দিনে প্রায় আশী মাইল মোটর ভ্রমণ ক'রে এবং রাতে অতিমাত্রায় ভোজন ক'রে ভেবেছিলাম রাতে খুব ঘুম হবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত হ'ল। আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হ'ল—বিষয়গুলো কিছু নতুন নয়—তবু তাতে যা উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ল তা নিদ্রার পরিপন্থী। তর্কের প্রধান বিষয় ছিল আর্ট ও আর্টিস্ট। এর প্রধান উদ্যোক্তা কিরণকুমার এবং আমি। রবি বিষয়টি অর্থনীতির দিকে টানতে লাগলেন এবং সুধাংশুপ্রকাশ বিজ্ঞানের দিকে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সুধাংশুপ্রকাশের নাক ডাকতে লাগল, তাতে তর্কটা এক-চতুর্থাংশ মাত্র সরল হ'ল। যে তিন-চতুর্থাংশ জটিলতা অবশিষ্ট রইল তাতেই রাত্রি শেষ হয়ে এল।

রাজকল্পা যাবার পথে রামগড় থেকে মাইলদেড়েক দূরে চমৎকার একটি শিবমন্দির দেখেছিলাম। সকালে বেরিয়ে গিয়ে তার ছবি নিতে হবে ঠিক করলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। এই মন্দিরটি কাঁকা মাঠের মধ্যে বড় রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট প্রাচীন মন্দির অনেক আছে। পূজারী সবই বাঙালী এবং জানা গেল এই উপলক্ষে এইখানে এক-শ' ঘরের বেশী বাঙালী ব্রাহ্মণ এখন স্থায়ী ভাবে বাস করছে। মন্দিরসংখ্যা তিন-শ' থেকে চার-শ'। সে রকম ছোট ছোট মন্দির অনেকগুলো দেখলাম, কিন্তু এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম আগে। বিগ্রহের সম্মুখে কাঁকা উঠান এবং চারদিকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ। চারদিকেই ঘুরে ঘুরে বহু দূরের দৃশ্য দেখা যায়। নীচের তলাতেও অনেকগুলো কুঠরি। মন্দির পুরনো হয়ে এসেছে। নিয়মিত পূজো হয় না। কোনো ভক্ত মাঝে মাঝে এসে হয় তো কিছু নিবেদন ক'রে যায়। মন্দিরের বাইরে সবটাই চাষের জমি। জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান বুনবে বলে দু-এক খণ্ড জমি চাষ করা হচ্ছিল, তারই একটা ছবি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

রামগড়ের প্রকাণ্ড হাট বসছিল তখন থেকেই। চারদিক থেকে বহু গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে জিনিসপত্র আসছিল। বেলা তখন সাড়ে এগারোটো। এরই মধ্যে দেখি হাটের জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। আমরা বারোটোর মধ্যেই ফিরে এলাম আমাদের আন্তানায়। সেই দিনই অপরাহ্নে কলকাতা ফেরবার ট্রেন বি এন আর লাইনের। ওখানে ই আই আর লাইনেরও স্টেশন আছে, কিন্তু বি এন আর বেশী সুবিধাজনক মনে হওয়াতে এই পথেই আসা ঠিক হ'ল।

হাজারিবাগ গিয়েছিলাম ই আই আর-এর মধ্যম শ্রেণীতে, ফিরলাম বি এন আর-এর তৃতীয় শ্রেণীতে। রামগড় স্টেশনে খুবই ভিড় ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় কমে গেল, আমরা বাকের উপর বিছানা পেতে রাখলাম। এই পথের দৃশ্যও অতি চমৎকার, বিশেষ করে সুরি জংশনের পর থেকে বড়

বড় পাহাড়ের দৃষ্ট ছবিতে ধরে রাখবার মতো। এই পাহাড়-গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল—এতে গাছপালার চিহ্ন নেই। সম্মার কাছাকাছি সময়ে এই পাহাড়ের দৃষ্ট চিহ্ন ছবিতে দেখা বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপের দৃষ্টকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। চলন্ত ট্রেনের ভিতর থেকেই একখানি ছবি তুলে নিলাম। স্বর্ষ মেঘে ঢাকা পড়েছিল পাহাড়ের মাথায়। সেই দিকেই ক্যামেরা ফিরিয়ে তুললাম সেই পাহাড় ও মেঘের সিলুয়েট।

ইতিমধ্যে দেখি রবি আমাদের এক ভ্রমণ-সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। সে এখানকার আদিবাসী। তারা একদল মেয়েপুরুষ তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বছরদিন পরে দেশে

ফিরে চলেছে। বাংলা ভাষাতেই সে কথা বলছিল, অবশ্য তাদের নিজস্ব উচ্চারণে। নাম তার বনমালী। দেশে তার বাড়ি আছে, দু-এক খণ্ড জমি আছে—তারই ‘মায়াজালে’ সে আবদ্ধ। তার মুখে তার অতি সরল উচ্চারণে এই ‘মায়াজাল’ কথাটিতে চমকিত হলাম। যে সংস্কৃতির পরিচয়, যে জীবন-দর্শনের সহজ সরল রূপ আমরা আমাদের দেশের অশিক্ষিত পল্লী-কবির গানে শুনি—যা সরল পল্লীবাসীর সমস্ত জীবনের অঙ্গ—তারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠল বনমালীর ঐ কথাটির ভিতর দিয়ে। প্রাচীন ভারতের একটি ছোঁরা চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অপরূপ মাদুর্যমণ্ডিত তার রূপ। মনে হ’ল হাজারিবাগ ভ্রমণ সম্পূর্ণ সার্থক হ’ল।

দুর্নীতি

আর্থকুমার সেন

বিধাতাপুরুষের রচিত গল্পে সব সময়ে নীতিকথার অবকাশ থাকে না, কারণ তিনি ইসপ অথবা বিজ্ঞান নহেন। মাহুয়ের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়া বিধাতার কার্যকলাপের ভালমন্দের বিচার করার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া শুধু যেমন খটয়াছিল, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। নীতি-উপদেশ ইহার মধ্যে নাই, থাকিতে পারে না।

কালচাঁদ জাতিতে বৈষ্ণব, সাবেক পেশা পালোয়ানী, হাল পেশা চোরাই আফিমের আমদানী ও বিতরণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তিক পেশা হিসাবে গুণ্ডার সর্দারি। কারণ চোরাই আফিমের কারবার কলেজে-পড়া কেরানী দিয়া সম্পন্ন করানো সম্ভব নহে, ফলে বাধ্য হইয়া গুণ্ডার সহায়তা লইতে হয়। সাবেক নিবাস নবদ্বীপ, বর্তমান বাসস্থান শ্রামবাজার।

কালু শেখের জাতির পরিচয় প্রদান নিম্নরোজন, সাবেক পেশা পালোয়ানী, বর্তমান পেশা চোরাই কোকেনের আমদানী ও বিতরণ; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডার সর্দারি। যেহেতু আফিম ও কোকেন, দুইটি জিনিসের ব্যবসায়েরই কার্যপদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকারের, কালুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে গুণ্ডার সহায়তা অপরিহার্য। হাল সাকিন চিংপুর। সাবেক সাকিন সম্ভবত বাংলাদেশেরই কোন অঞ্চলে, বর্তমানে উচ্চারণটি একটু উর্দু ঘেঁষা হইয়া পড়ায় নির্ণয় করা দুঃস্থ।

উভয়েরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। উভয়েই কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে একই গুণ্ডাদের কাছে কুস্তি করিতে এবং শরীর চর্চা করিতে শিখিয়াছিল। তাহার পরবর্তী যুগের শিক্ষা কাহার পদপ্রাপ্তে বসিয়া, কেহ জানে না। কর্মপ্রবাহে হ’লেন দুই দিকে ভাসিয়া গেল, দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হইত না। এক জনের মূলধন কোকেন, অপরের আফিম, সুতরাং

জীবিকা অর্জন ক্ষেত্রে রেযারেশি ছিল না। বরং এক গুণ্ডাদের সাকরেদ বলিয়া যতটা বন্ধুত্ব থাকা উচিত, খানিকটা ছিল।

কালচাঁদ পরম বৈষ্ণব, কাজেই ছোরাছুরি প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না। বিশেষ করিয়া, লাঠির খায়ে এবং কখনও কখনও শুধু গলা টিপিয়া এবং বিনা রক্তপাতে যখন একটা লোককে অন্যারসে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করা যায়, তখন ছোরার ব্যবহার নিম্নরোজন। নেহাৎ দায় ঠেকিলে অগত্যা কালচাঁদ ছোরা ব্যবহার করিত, কিন্তু কাটাছুটির ব্যাপারে “জাতবৈষ্ণব” মূলভ বিতৃষ্ণা থাকায় বলিত “বানানো”।

কালু শেখের অবশ্য ওসব অর্থহীন প্রেজুডিস ছিল না। লাঠি হাতে বাহির হইলে লোকে দেখিতে পায়, ছোরা অক্লেশে লুকাইয়া রাখা চলে। সম্মুখদিকে লাঠি ব্যবহার করার সুবিধা বেশী, আচমকা জঘম করিতে হইলে ছোরাই প্রশস্ত। কালু অপক্ষপাতে দুইই ব্যবহার করিত।

কালু দীর্ঘকায়, ক্ষীণকটি, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। কালচাঁদ অপেক্ষাকৃত খর্বদেহ, বিশালবক্ষ, ক্ষীণকটি, এবং মাথা কামানো। উভয়ের দেখাশোনা বড় একটা হইত না, কিন্তু পরস্পরের নামের উপরে শ্রদ্ধা ছিল।

পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় পুরুষ জাতির মধ্যে তথাকথিত অবলা নারী জাতি সর্বদাই বিভেদ রচনা করিয়া থাকে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ডের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই, সম্ভবত ভবিষ্যতেও হইবে না। এক্ষেত্রেও হইল না।

শহরে নূতন নারীরত্নের আবির্ভাব হইল, নাম চাঁদবাই। সে হিন্দুও নহে, মুসলমানও নহে, পতিতা। লক্ষ্যে অঞ্চলের কোনও হিন্দু রইসের গুরসে (সম্ভবত, কারণ

এ সকল কথা জোর করিয়া বলা কঠিন) জন্মেকা বাইজীর গর্ভে তাহার জন্ম। স্তত্রাং ধর্মের কোনও বালাই তাহার ছিল না, এবং মায়ের দূরদৃষ্টি বশত নামও এমন পাইয়াছিল, যাহা হিন্দুও হইতে পারে, মুসলমানের হওয়াও আশ্চর্য নয়।

এই চাঁদবাইকে লইয়া কালু শেখ ও কাল্যাচাঁদের বিরোধ বাধিল। গোটাকরেক মাথা ও অসংখ্য সোড়ার বোতল ফাটিবার পর উভয়েই লক্ষ্য করিল, এ রমণীর তাহাদের কাহারও জন্ত নহে, প্রবাদ-প্রসিদ্ধ “নেপো” আসিয়া আগেই দই মারিয়াছে। এক্ষেত্রে নেপো আসিল বোঝাইয়ের ইসমাইল ফিল্ম কোম্পানীরূপে। চাঁদবাই নাম বদলাইয়া দময়ন্তী দেবী হইল, এবং “মহাসতী সাবিত্রী” নামধেয় ছবিতে সাবিত্রীর ভূমিকায় মর্মাস্তিক অভিনয় করিয়া নাম করিয়া ফেলিল। ফলে অচিরকাল মধ্যে সে জনৈক ফিল্ম-ডাইরেটরের পরিগীতা স্ত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে হিজ্ হাইনেস্ অব্ বোম্বাইয়ের রক্ষিতা হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিল। অর্থাৎ কাল্যাচাঁদ অথবা কালু শেখ, কাহারও অত্যাচারিণী হইল না।

কলহের বিষয়বস্ত্র নেপো কর্তৃক অপহৃত হওয়ার যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল, ধবনের কাগজে যাহাকে বলে সশস্ত্র নিক্ষেপিত। গত কয়েক বছরে মধ্যে মধ্যে ষণ্ডযুদ্ধ ঘটয়াছে, দুই দলের দলপতির গায়ে আঁচড়ও লাগে নাই। মরিল উভয় পক্ষের কতকগুলি নিরীহ আফিম ও কোকেন বিক্রেতা, চাঁদবাই সহজে ঔৎসুক্য থাকিলেও আশা যাহাদের কোনদিনই ছিল না।

কয়েক বছর কাটিল। যুদ্ধের সময়ে আফিম ও কোকেনের হুপ্রাপ্যতা সত্ত্বেও উভয়ের আর্থিক কোনরূপ অসচ্ছলতা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ দুই ব্যবসায়ের সমগোত্রীয় যুদ্ধ-কালীন ব্যবসায় অসংখ্য ছিল, হইতে পারে তাহাদেরই কোনও একটা অবলম্বন করিয়া উভয়ে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করিয়াছে।

অবশেষে একটি বিশেষ সময় আসিল। সাল ও তারিখ শিশুতেও জানে, কাজেই পরিষ্কার করিয়া লেখা অনাবশ্যক।

কালু থাকিত মুসলমানপাড়ায় এবং কাল্যাচাঁদ থাকিত হিন্দুপাড়ায়। উভয়েই ডাবিল চাঁদবাই সংক্রান্ত ব্যাপারটার শোক ভুলিবার সুযোগ আসিয়াছে। ফলে কালুর সাক্ষরদগণ ছোরা শানাইতে লাগিল এবং বৈষ্ণব কাল্যাচাঁদের দেহরক্ষিগণ লাঠিতে তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল।

একদা রাতে কাল্যাচাঁদ তাহার শিষ্যবৃন্দকে ডাকিয়া কহিল, “বন্ধুগণ, যুদ্ধকাল উপস্থিত। বিশ্বস্তত্বে সংবাদ পাইয়াছি কালু শেখের পাড়ায় তিনটি হিন্দুনারীকে “বানাইয়া” শিককাবাবে পরিণত করা হইয়াছে। এ গুণামির উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।”

শিষ্যগণ লাঠি আফালন করিয়া স্ব স্ব রুচি অহুসারে বলিল, “হর হর মহাদেও”, “জয় কালী কল্কাতাওয়ারী।” পরম

বৈষ্ণব কাল্যাচাঁদ যথারীতি নিঃশব্দ ত্যাগ করিয়া কানে আঙুল দিল।

ওদিকে কালু শেখ সাক্ষরদগণকে ডাকিয়া বলিল, “পেয়ারে ভাইসব, কাল্যাচাঁদের পাড়ায় নিরীহ মুসলমানগণের উপরে তুমুল অত্যাচার হইয়াছে। চারিটি মুসলমান শিশুকে তাহার কালীর নিকট বলি দিয়া কোষ্ঠাকারী বানাইয়া খাইয়াছে। এ গুণামির শাস্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।”

সাক্ষরদগণ জিকির দিল, “আল্লা হো আকবর।” কালু কোনো কথা না বলিয়া নিবিকার ভাবে গড়গড়া টানিতে লাগিল।

বলা নিম্প্রয়োজন, দুইটি সংবাদই মিথ্যা। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়?

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, এবং গভীর রজনীতে কালু শেখ চল্লিশ জন প্রিয় সাক্ষরদকে লরীতে বোঝাই করিয়া শ্যামবাজার অভিমুখে, এবং কাল্যাচাঁদ সমসংখ্যক প্রিয় শিষ্যকে লরী বোঝাই করিয়া চিৎপুর অভিমুখে চলিল। জন-শূন্য রাত্তা ধর্মসংক্রান্ত বাণীতে মুখর হইয়া উঠিল, এবং ভীত নগরবাসিগণ দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উভয় পক্ষের লেখা হইল মাঝপথে বড় রাস্তার উপরে।

আবার “আল্লাহো আকবর” এবং “হর হর মহাদেও” ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, এবং বীরগণ লরি হইতে লাকাইয়া পড়িয়া সমুদ্র সমরে অবতীর্ণ হইল।

নিমেষে গোটাকতক মাথা কাটিল, এবং কতকগুলি পঙ্করে ছুরি বিধিল। কাল্যাচাঁদ কালুর মাথার লাঠির বাড়ি মারিল, কিন্তু কালু ছাঁশিয়ার লোক, মাথা বাঁচাইবার বন্দোবস্ত পূর্বাঙ্কুই করিয়া রাখিয়াছিল। অদূরদর্শী কাল্যাচাঁদ ন্যাড়া-মাথা ঢাকিবার কোনো চেষ্টা করে নাই, কাঁধে এক বা ছোরা খাইয়াও লড়িতেছিল, কিন্তু কেশবিহীন মস্তকে ভীমবেগে দুই তিন বা লাঠি খাইয়া সে ধরাশায়ী হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত ছুটিল।

ব্যাপারটা কত দূর গড়াইত বলা যায় না, সহসা কে যেন বলিল “পুলিস।” নিমেষে লরী দুইটি অদৃশ্য হইল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে রাস্তার গোটাকরেক রক্তাক্ত হত ও আহত দেহ ভিন্ন আর কিছু রহিল না। কালু শেখ একটা অস্ত্রত কাক করিয়া বলিল। রাস্তার ধারের একটা ছোট দরজা কাঁধের এক থাকায় ডাকিয়া কাল্যাচাঁদের হতচেতন দেহটা অবলীলা-ক্রমে তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

পুলিশ নহে, মিলিটারি। একটা ব্রেন্ড ও দুইটা স্টেনগানের গুলি ছুটিল, পঞ্চচারী একটা নিরীহ কুকুর মরিল, এবং কতব্য সমাপনান্তে সাক্ষরগণ গাড়ি চলিয়া গেল। এ পাড়াটা সেই রাত পর্যন্ত মোটামুটি শান্ত ছিল, অকস্মাৎ কয়েক মিনিটে প্রলয় ঘটয়া গেল। পাড়ার লোকে তারকদ্রুম নামে কপিতে লাগিল।

জান হইলে চোখ মেলিয়া কালাচাঁদ ভাবিল নিজেরই বাড়ি। মাথাটা তখনও পরিষ্কার হয় নাই এবং দেওয়ালে টাঙানো কার্বানীতে ছাপা নয় নারীমূর্তিগুলি তাহার পরিচিত। কালাচাঁদ ও কালু শেখের শিল্প বিষয়ে কচি একই প্রকারের।

কাঁধে ও মাথায় অসহ যন্ত্রণা, তবু মুখ ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বুঝিল, এ তাহার ঘর নহে। কারণ তাহার ঘরে উভয় পার্শ্বে নারীমূর্তির মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের মৃগল মিলনের একখানি ছবি আছে, এখানে তাহা নাই।

কালাচাঁদ যে কয়েক বা খাইয়াছিল, তাহা সাধারণ বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে পরলোকে পাঠাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু সে সাধারণ মানুষ নহে, হতজ্ঞান হইলেও কোঁৎ হইবার কোন লক্ষণ দেখায় নাই।

বেলা অনেক হইয়াছে, জানালা দিয়া ঘরে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। কালাচাঁদ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অসুট আর্দ্রনাদ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল কালু শেখ।

এক মুহূর্তে রাজের ব্যাপারের অনেকাংশই কালাচাঁদের মনে পড়িয়া গেল। কালু কহিল, “এই যে, হোঁশ্ হুয়েছে, ধোঁধা রেখেছেন।”

কালাচাঁদ কহিল, “না—লা। আমাকে এখানে গুম্ব কর-ছিদ্ব খুন করবার জন্তে।”

একটা টুল টানিয়া বসিয়া কালু বলিল, “তওবা, খুন কর-বার হলে অনেক আগেই খতম করে দিতে পারতাম।”

“তবে আমাকে এখানে এনেছি কেন? কি করে আনিলি?”

“সে সব কথা পরে হবে। এখন তুই শালা একটু খেয়ে নে দেখি।”

চটখা কালাচাঁদ বলিল, “আমি জাত বোষ্টম, আমি তোরা বাড়িতে খাব? কি করব, নেহাৎ জখম হয়ে পড়ে আছি, না হলে তোরা জিবটা টেনে ছিঁড়তাম।”

হাসিয়া কালু বলিল, “পাগল হলি নাকি? তোকে কি আমি গোস্ ত্ খেতে বলছি, না ভাত খেতে বলছি? কাঁচা ছুধ আর মেওয়া আনানো আছে, ওতে তোদের জাত যায় না। নে খেয়ে কেল।”

কালাচাঁদ কিছুক্ষণ ভাবিল, তার পর বলিল, “কই, দে।”

“এ যে কুরশীর উপরে আছে, উঠে খা।”

কালাচাঁদ অতি কষ্টে উঠিল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সের ছই কাঁচা ছুধ, দশ-বারোটা আপেল, গোটা আঠেক কলা এবং পরিশেষে চার বোতল সোডা খাইয়া শুইয়া পড়িল।

কালু কহিল, এখন কেমন লাগছে?

মন্দ না। তবে কাঁধটা টনটন করছে আর মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

যাবেই ত। তুই শালা এত দুখ লোক আর তুই এলি

কিনা খালি মাথায় লড়তে। আর পড়লি শেষটার শালা রমজানের চোট খেয়ে। তওবা।

কালাচাঁদ চূপ করিয়া রহিল।

কালু আপন মনে বলিতে লাগিল, গোলাম হোসেনের কাছে ছুজনে একসঙ্গে সাক্ষরেদি করেছি, চোট খেতিস আমার হাতের, আফশোষ ছিল না। ঐ শালা রমজান, যাক শালা টেঁসেছে।

কালাচাঁদ কহিল—আমাকে এখানে আনিলি কি করে?

সে অনেক কথা, পরে শুনি। কালু শেখ পারে না এমন কাজ নেই। কেবল ঐ সাজোয়া গাড়ির গুলিগুলো হজম হয় না। শুনেছি বড় লাগে।

তুই জনে একসঙ্গে হাসিল। অনেক বছর আগের মত।

কালাচাঁদ কহিল—এটা তোর বাড়ি?

যাড হেলাইয়া কালু জানাইল হাঁ।

তুই ছিঁহুকে রেখেছি কুউ জানে?

কালুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। কহিল, জানে কয়েক শালা। কিন্তু তুই ডাবিস্ নে, কালু শেখের হাত থেকে মানুষ ছিনিয়ে নিতে মোধ ডর খায় বুঝিলি?

খানিকক্ষণ উভয়েই চূপ করিয়া রহিল, পরে কালাচাঁদ কহিল, ডাক্তার ডাকিস নি ত?

পাগল। ও সব ঝামেলায় গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। দরকার কি? গোলাম হোসেন ওস্তাদের সাক্ষরেদ তুই, ঐটুকু জখমের জন্তে তোর ডাক্তার হেকিম লাগে না।

খুশি হইয়া কালাচাঁদ কহিল, ঠিক বলেছি। কিন্তু আমাকে এখানে আনিলি কেন তা ত বলিলি নে? এক ওস্তাদের সাক্ষরেদ বলে?

তাতে ধোঁড়াই বয়ে গেছে। আসল কথা হচ্ছে তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া কাজিয়া আছে, খুনোখুনি করতে হয় আমরা করব। তুই রমজানের লাঠি আর সাজোয়াগাড়ির গুলিতে মরলে আমার চলে কি করে? লড়ব কার সাপে? ঐ শেয়ালগুলোর সঙ্গে?

সহসা কালাচাঁদ ডাকিল দোস্ত।

কালু চমকিত হইয়া বলিল, চোপ রও শালা, কে তোর দোস্ত? আমি তোর ছুমণ।

সহাস্ত্রে কালাচাঁদ কহিল—ঠিক কথা। তুই আমার ছুমণ, আমি তোর ছুমণ। দোস্তি টোস্তি পোষায় না আমাদের। এখন আমি জখমি, তুই গোলাম হোসেনের সাক্ষরেদ, জখমী লোককে মারতে তোর হাত উঠে না (কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে)। আমরা হলাম গিয়ে শের, শেয়ালের সঙ্গে মারপিট করা আমাদের চলে না। আমাদের ছুজনের দাঙ্গা আর এক দিনের জন্তে মূলত্বি রইল।

বলিয়া বৈষ্ণব কালাচাঁদ মুসলমান কালু শেখের শয়নগৃহে তাহারই শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পরম নির্ভরতার সহিত ঘুমাইয়া পড়িল।

মার্কিন বৈমানিক বাণিজ্য-পথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রে বৈমানিক বাণিজ্য পথের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রাগ-যুদ্ধ কালের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে শুধু যে বিমান-যাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহা নয়, আকাশ-পথে পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানির সুবিধার জ্ঞাতও সেদেশে বিশেষ কর্তৃত্বপূর্ণতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই নানা কোম্পানি গড়িয়া উঠিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে মাল ভাড়া অবশ্য রেলপথের তুলনায় সামান্য বেশী পড়ে, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়ে ইহা প্রচুর লাভজনক। কাজেই এই বিষয়ে ব্যবসায়ীমহলে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। তদুপরি সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব বৈমানিকগণ কর্তৃক বহুসংখ্যক নূতন বিমান-পথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিমান-যোগে মাল প্রেরণের কাজ পুরাদমে চলিতেছে এবং ইহাতে বিশেষ প্রতিযোগিতার ভাবও দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ তাজা তরিতরকারির, এবং পুষ্প এবং ফলমূলাদির কারবারীগণ বিমানযোগে মালপ্রেরণের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিকতর ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বৃষ্টিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে অনেক মূল্যবান সময় বাঁচে, জাহাজে করিয়া দূরদূরান্তের গঞ্জে মাল পাঠাইবার সময় তাহা পচিয়া যাইবার যে আশঙ্কা থাকে এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহাও নিরাকৃত হয় এবং যে সমস্ত বাজারে মাল প্রেরণ করিতে আগে বহু সময় লাগিত এখন সেই সকল স্থানে আকাশ-পথে তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঠানো যায়।

একটি আকাশ-যানে সাধারণতঃ সাড়ে ছয় টন মাল বোঝাই করা হইয়া থাকে। আকাশ-পথে মাল চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে যাহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা বলেন যে, ভবিষ্যতে মাল ভাড়া আরও কমিবার সম্ভাবনা আছে যদি না মাল বোঝাই করার খরচ অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই ক্রমোন্নতিশীল শিশু-শিল্পের পরিপূষ্টির জন্ত সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা এবং ইহার উন্নতির সহায়ক আইন প্রণয়ন যে অত্যাবশ্যক সে-কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

যুদ্ধের পূর্বে আকাশ-পথে যাতায়াতকারী মালগাড়ীর সংখ্যা ছিল খুব কম। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও বাণিজ্য ব্যপদেশে আকাশ-পথে যাতায়াত বা বিমানে মাল প্রেরণের বিশেষ রেওয়াজ না থাকিলেও সৈন্ত এবং নৌ-বাহিনী বিমানযোগে সমরোপকরণ সরবরাহ করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। কলে আকাশ-পথে মাল প্রেরণের উপযোগিতাও প্রমাণিত হইয়াছিল। যুদ্ধকালে কতকগুলি বিমান-পথের উপর দিয়া মাঝে মাঝে প্রচার-কার্য ব্যপদেশে কতকগুলি আকাশ-যান যাতায়াত করিত। যুদ্ধোত্তে

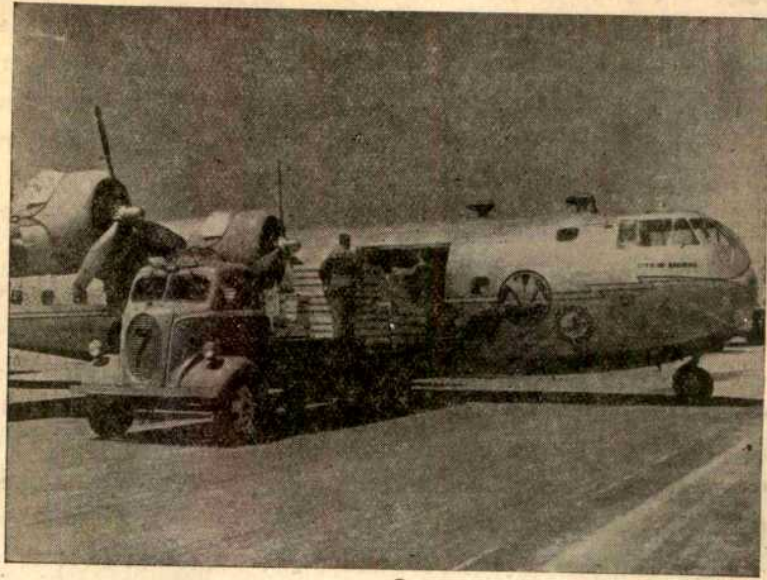
দেখা গেল যে, এই সমস্ত পথকে অব্যবহৃত অবস্থায় না রাখিয়া এগুলির উপর দিয়া পণ্যদ্রব্য বোঝাই মালগাড়ীসমূহ চলাইবার ব্যবস্থা করিলে বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নবপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক বিমান-পথের কর্তৃপক্ষ, 'মেইন স্টেট' হইতে নিউ ইয়র্ক সিটি পর্যন্ত জীবন্ত গলদা চিংড়ী আকাশ-যানে চালান দেওয়া ইত্যাদি কোন কোন ব্যবসায় যে কিরূপ লাভজনক হইতে পারে গোড়ার দিকেই তাহা ঠাঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। রেলপথে এই সমস্ত চালানী মৎস্য যথাস্থানে পৌঁছিতে বহু সময় লাগে এবং গাণ্ডীভাড়ার অর্ধেকেরও বেশী খরচ পড়ে আত্মশয়িক চুপি, বরফ এবং সামুদ্রিক গাছগাছড়া ইত্যাদির জন্য। একে তো রেলপথে এই সমস্ত মৎস্য প্রেরণ ব্যয়সাধ্য, তদুপরি ১৮ ঘণ্টা ট্রেনে বাজবন্দী থাকার দরুন পচিয়া যাওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান। আকাশ-পথে কিন্তু যে সমস্ত মোটা কাগজের আধারে করিয়া চিংড়ী মৎস্য চালান দেওয়া হয় সেগুলিতে বরফ দিবার দরকার হয় না, এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় লাগে বলিয়া সেগুলি পচে না কিংবা শুকাইয়াও যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক বিমান-পথের পরিকল্পনাকারীগণ ছোট ছোট মালগাড়ীর পরিবর্তে ১০০ হইতে ৫,০০০ পাউণ্ড মাল বহনক্ষম বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশ-যান চালু করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতকাল যাত্রী-বিমানের সহিত সংশ্লিষ্ট আধারগুলিতেই কিছু কিছু মাল বোঝাই করা হইত। কিন্তু যাত্রী-বিমানের সঙ্গে যাহাতে মালবোঝাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'এয়ার ক্র্যাফট' জুড়িয়া দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই বিশেষ ভাবে চলিতেছে। ইতিমধ্যে যাবতীয় বিমান-পথের কর্তৃপক্ষগণ মালভাড়ার তালিকাও প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কার্যের স্বচনা হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হইতেই বিশেষ-জগণ বাজার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, পচনধর্মী দ্রব্যাদি টাটকা রাখিবার উপায় উদ্ভাবন, প্যাকিং তৈরি এবং বিমানে মাল চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন।

আকাশ-পথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাবী প্রসার নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (১) দ্রুত মালভাড়া হ্রাস করা, (২) বিক্রয়-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৩) বিমানপথে মালগাড়ী চলাচলের সুব্যবস্থা। এখন যে অতিরিক্ত পরিমাণ ভাড়ার হার নির্দিষ্ট আছে তাহা যদি বহুল পরিমাণে কমাতে হয় তাহা হইলে নব-পরিকল্পিত 'অল-কারগো এয়ারক্র্যাফট'গুলিকে চালু করিতে হইবে। সম্প্রতি যে একশতটি ছোট ছোট আকাশ-পথে মালগাড়ী চলাচলের জন্ত উৎসাহী ব্যক্তিগণ টাকা খাটাইতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশের জন্তই খুব অল্প মূলধন আবশ্যক।

ভূতপূর্ব সামরিক বিভাগের বৈমানিকগণ আশা করেন যে, ২৫,০০০,০০০ ডলার মূলধন দ্বারাই মাল বোঝাই দুই তিনটি বিমান চলাচলের উপযোগী একটি লাইন নির্মাণ এবং তাহাকে চালু রাখা সম্ভবপর। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্রুত মাল চলাচলের জন্ত এক একটি লাইনে দুই কিংবা তিনটি বিমান যথেষ্ট নহে। অভিজ্ঞ বৈমানিকগণের অভিমত এই যে হুঁহুভাবে কার্য পরিচালনার্থে প্রত্যেক লাইনের জন্য অন্ততঃ ছয়টি কি সাতটি এয়ার-ক্র্যাফ্ট আবশ্যক।



ভবিষ্যতে বিমানযোগে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির মান্ডল এবং ভাড়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হস্তক্ষেপের

মালগাড়ীবাহী বিমানে একটি ট্রাক হইতে ক্যালিফোর্নিয়ার ফলমূল ও তরিতরকারী বোঝাই করা হইতেছে। পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের গল্পগুলিতে এই সমস্ত মাল খালাস করা হইবে।

সম্ভাবনা আছে। এ পর্যন্ত সরকারী বিমান বিভাগ এ বিষয়ে আর্দে অবহিত হন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই সমস্ত মালবাহী আকাশ-যানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং বিমান-পথসমূহও রেলগাড়ী প্রকৃতি সাধারণ যানবাহনের লাইনগুলির সমপর্যায় উপনীত হইতেছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেন্ট যেমন রেলপথে এবং রাজপথে যাতায়াতকারী মালবাহী গাড়ীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তেমনি সবগুলি না হইলেও, অন্ততঃ কতকগুলি 'কারগো লাইনকে' নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন স্থিরিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারেন।

চালানী পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যত বাড়িবে এবং মালগাড়ীকে যতই বৃহদাকারে তৈরি করা হইবে ভাড়াও সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি একটি সি-৫৪ মালবাহী বিমান ১৮,০০০ হইতে ১২,০০০ পাউণ্ড মাল বহন করিয়া থাকে। ইহাতে নিম্নতম ভাড়া লাগে প্রত্যেক টন-মাইলে ১৩ সেন্ট হিসাবে। কোন কোন লাইনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন সি-৪৭ বিমান, ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ পাউণ্ড মাল বহন করিয়া যাতায়াত করে। সেগুলিতে ভাড়া লাগে প্রতি টন-মাইলে ২০ সেন্ট করিয়া। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বিমানগুলিতে ভাড়ার হার আরও বেশী, প্রতি টন-মাইলে ২৭ সেন্ট করিয়া। এই সকল মালগাড়ীতে করিয়া কত যে রকমারি পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়া হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই, যথা—পোশাক-পরিচ্ছদ, বড়ী, ফলমূল ও পুষ্পাদি। যে সকল পচনধর্মী পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয় ডেকের পা তাহাদের অন্যতম।

বর্তমানে বিমান-মাল গাড়ী যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে যাবতীয় পণ্যদ্রব্য উৎপত্তি-স্থান হইতে সরাসরি বিমানযোগেই লক্ষ্যস্থলে পাঠানো হইবে। অন্য কোনও যানবাহনের প্রয়োজন হইবে না। ভবিষ্যতে গ্লাইডারসমূহ কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনও করা হয় নাই। বিমান-মালগাড়ীর পরিচালকগণ একথাও মনে করেন না যে, আকস্মিক কারণ ব্যতীত মালপত্রাদি নামানোর জন্য বর্তমানে প্যারামাউট ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মার্কিন রেলপথের মালিকরাই আকাশ-পথে এই অভিনব ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী কুতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছেন যে, বিমান-পথ চালু হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই তাহাদের শতকরা ষোল ভাগ যাত্রী কমিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্সপ্রেসযোগে দ্রুত মাল আমদানি-রপ্তানির লাভজনক ব্যবসা দ্বারা এতদিন তাহারা বেশ জু-পয়সা কামাইতেন। এখন বৈমানিক প্রতিযোগিতার দরুন এই ব্যবসায়ের কি পরিমাণ যে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিনব ব্যবহার দরুন পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মালপত্র বহনকারী বাষ্পীয় বাহনসমূহের উপর অহরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিমান-পথে

ব্যাপকভাবে মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রাগ-যুদ্ধকালে সমুদ্রের উপর দিয়া মাত্র ৮০,০০০ মাইল ব্যাপী আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু যুদ্ধকালে মার্কিন বিমান-বহরের কর্তৃপক্ষ সৈন্য এবং নৌ-বাহিনীর সহযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ২০০,০০০ মাইল বিমান-পথ নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি সমুদ্রপারের বিভিন্ন দেশ হইতে মার্কিন সিভিল বিমান-বিভাগের দপ্তরে যে একশতটি আবেদনপত্র আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর-কালে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতে হইলে ১৪০,০০০ মাইল বৈদেশিক বিমান-পথ নির্মাণই যথেষ্ট। ইহা কার্যে পরিণত হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মার্কিন শিল্পপতিদের সমুদ্রের পরপারবর্তী দেশদুহের গল্পগুলিতে দ্রুত মাল চালান দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

মার্কিন 'এয়ার ট্রান্সপোর্ট' এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৬ ইংরেজীর শেষ ভাগে অথবা ১৯৪৭-এর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের দেশচর এবং সমুদ্র-পরপারগামী এই উভয়বিধ বিমানের সংখ্যা হইবে ১২৩৯ খানি এবং তাহা সবসম্মত ৪২,৭৫৭ জন যাত্রীকে লইয়া বৎসরে ১০,০০০০,০০০ মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ যুদ্ধের আগেকার তুলনায় যুদ্ধোত্তরকালে বিমান-বহরের সংখ্যা তিন গুণ এবং তাহাভের যাত্রীবহন-ক্ষমতা সাত গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

যাত্রী এবং মালগাড়ীবাহী বিমান-পথ সম্প্রসারণের বিপুল ব্যয় সম্মুখানের জন্ত ১৯৪৬ ইংরেজীর ১০ই মে তারিখে যুক্ত-রাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্বাক্ষরিত একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহাতে আগামী সাত বৎসরকাল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-বন্দর নির্মাণের জন্ত মোট ৫০০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর হইয়াছে। বর্তমানে ১৬,০০০টি বিমান-পথের জন্ত মাত্র ৪১,০০টি বিমান-ঘাঁটি আছে। বিগত দশ বৎসর বিমানের কার্যকারিতা আগেকার তুলনায় হাজার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যাত্রীদের অবতরণের এবং বোঝাই মাল বালাস করা ইত্যাদির সুব্যবস্থা কিছুমাত্র বাড়ি নাই বলিলেই চলে।

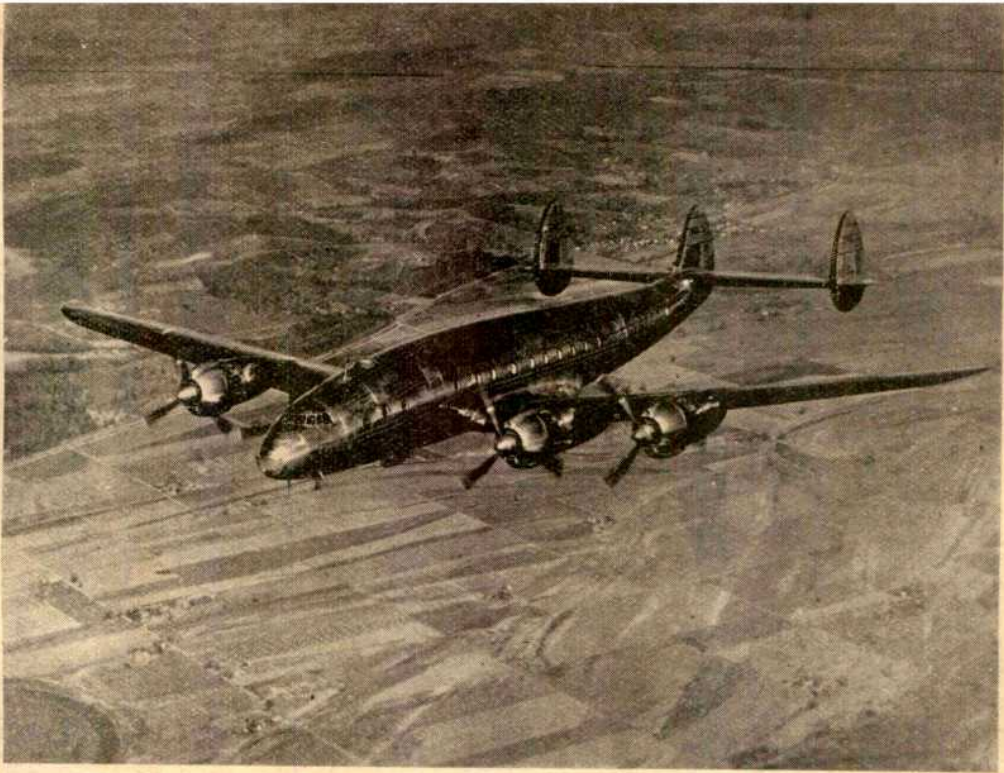
উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-জগতে নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছে। যদিও ইহা এখনো পরিকল্পনাকারীদের আশার অম্লরূপ উন্নতি লাভ করে নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, ইহার অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে এবং সকল দিক দিয়াই আকাশ-যানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত হইতেছে। বর্তমান সময়, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থার সফলতা সম্বন্ধে যতই সংশয় বিদ্যমান থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে কিন্তু তিলমাত্রও সংশয় নাই। তাহা এই যে, ভাড়া যদি হ্রাস পায় এবং বিমান-পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতি হয় তাহা হইলে মার্কিন ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ বহুদূরবিস্তৃত আকাশ-পথে দ্রুত মাল চালান দেওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা লাভ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হইবে।

নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ

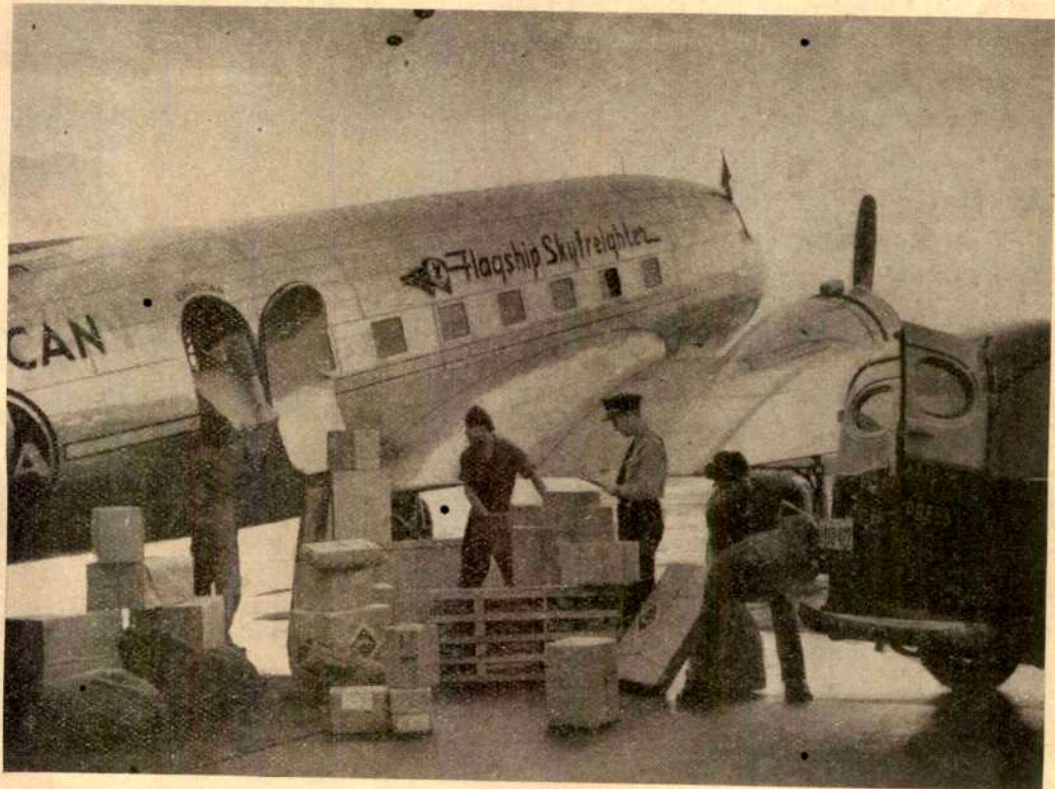
ত্রিহেমলতা ঠাকুর

আত্মার বলে বলীয়ান যারা তারাই প্রকৃত বীর,
সত্যের বলে সাধনা তাদের ধৈর্যের বলে ধীর।
অসহ্য ক্লেশ সহিতে তাদের আত্মার রহে বল,
স্বাধীন আত্মা তাদেরই লভ্য বলহীনে নিফল।
সত্যে যাদের অচল শ্রদ্ধা তারা আলোকের স্তম্ভ,
সত্য যুগের তারাই সাক্ষী, নাশে মিথ্যার দম্ভ।
হত্যা করিয়া নিজে হত হয় রক্তে জিজ্ঞাস্য মাটি
স্বহৃদর দ্বারে দাঁড়াইয়া করে পাপ লয়ে খাঁটোখাঁটি।

বিলুপ্ত তারা বিম্বত তারা, তারা ধ্বংসের শেষ,
নিঃশেষে তারা মুছি চলে যায় চিহ্ন রাখে না দেশ।
সত্যের জয় হবে নিশ্চয় অক্ষয় বীজ মন্ত্র
এস মন্ত্র-বলে কি অকৌশলে গাণা এ বিশ্ব-তন্ত্র।
তার পানে চাও দৃষ্টি মিলাও যজ্ঞে যোগাও হবি
আত্মার সবে সাক্ষাৎ পাবে সত্য দৃষ্টি লভি।

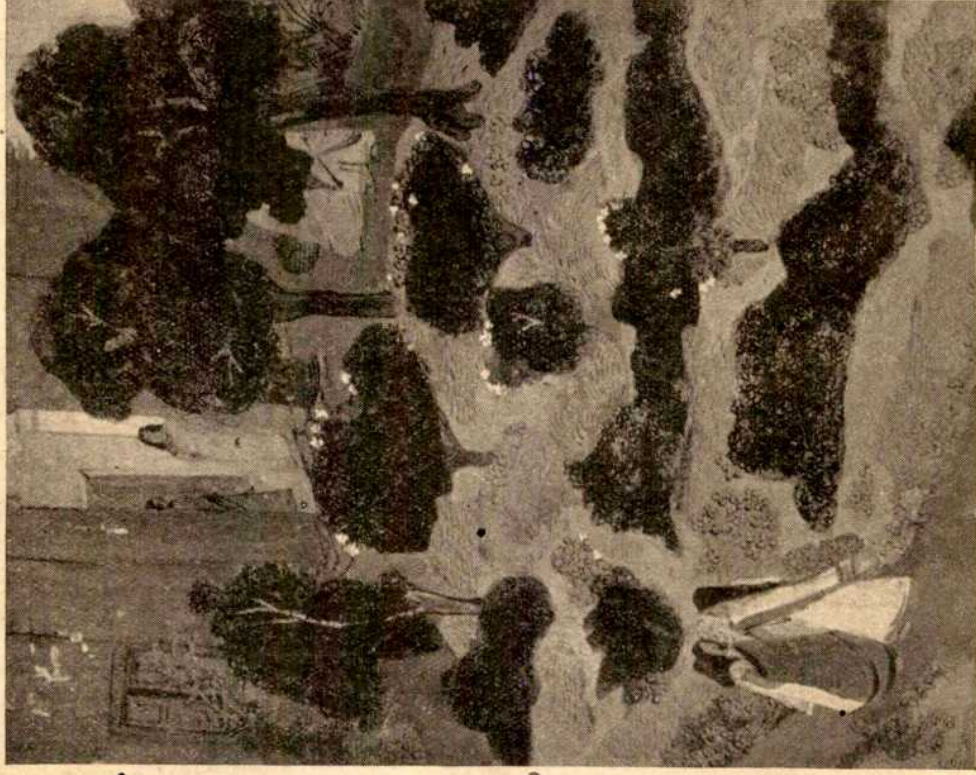


৬০ জন যাত্রী অথবা ১৬ টন মাল বহনক্ষম চারিটি এঞ্জিনবিশিষ্ট মার্বিন বিমান। ইহা ৩০,০০০ ফুট উর্ধ্বে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে উড়িতে পারে

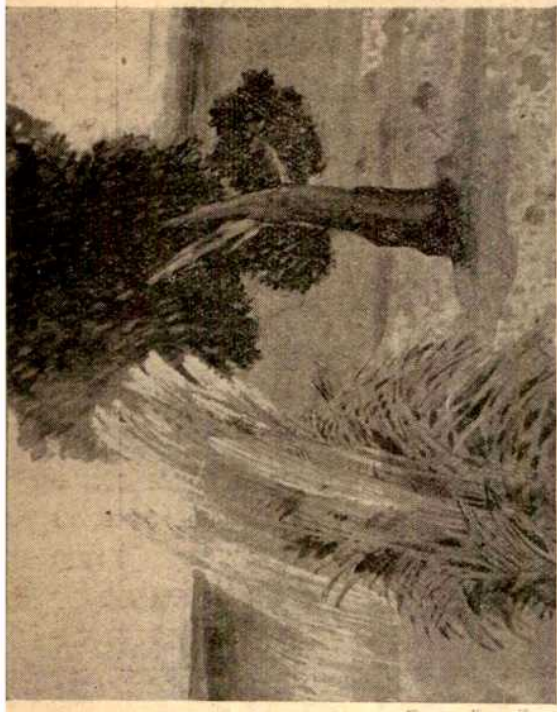


যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দেওয়ার জন্ত একটি মালবাহী বিমানে পার্শেল বোকাই করা হইতেছে

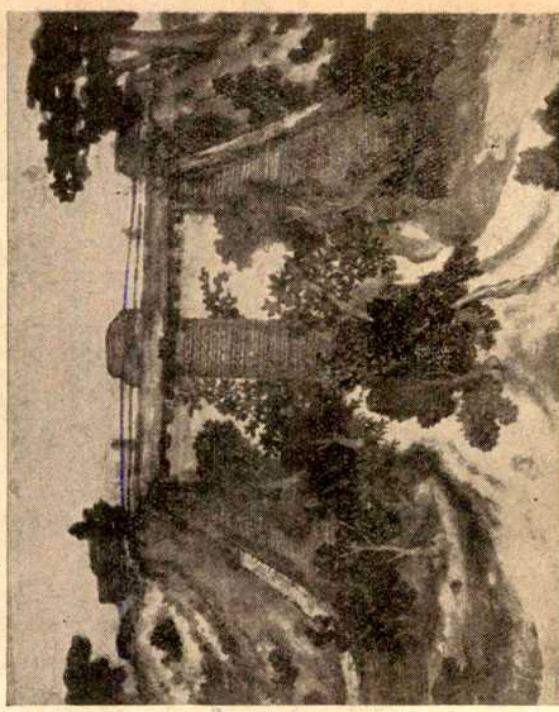
শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
অঙ্কিত দৃশ্য-চিত্রাবলী



শান্তিনিকেতন কল্যাণভবনের সম্মুখস্থ তরবীধিকা (কাঠের উপরে আঁকা)



প্রান্তর ও দিগন্ত (কাপড়ের উপরে আঁকা)



শেতু (কাপড়ের উপরে আঁকা)

দুর্গোৎসব-প্রশ্ন

(প্রথম প্রকরণ)

ত্রিযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

বহু বিজ্ঞ জনে দুর্গাপূজার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিজ্ঞা দশমীর শব্দোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মার্গিত হইয়া দুর্গাপূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবপত্রিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, শরৎকালে আশ্বাচ্ছ সংগ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবান্নের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তাগমে আমরা যেমন বসন্তোৎসব করি, শরৎ ঋতু দেখিয়া তেমন শরদোৎসব করি। এইরূপ, যিনি দুর্গোৎসবের যে অঙ্গ দেখিয়াছেন, তিনি তেমন অঙ্গের হস্তী-দর্শন করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইতে দুর্গাপূজার পূর্বে ভক্ত ও ভাবুক দেবীর পূর্বোক্ত মহিমা কীর্তন করিতেছেন। কোন কোন পণ্ডিত বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণে দেবীর নামোল্লেখ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্বারা দেবী-কল্পনার প্রাচীনতা জানিতে পারিতেছি, কিন্তু দুর্গাপূজা ও উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ পাইতেছি না।

বাস্তবিক প্রশ্নটি সোজা নয়। দুর্গাপূজা ও তৎকালীন উৎসব, এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও প্রকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের আত্মপুর্বিক ইতিহাস সন্ধান দুঃশস্য। কারণ আমাদের অধিকাংশ পূজার বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত আছে। সে প্রাচীন যে কোন অতীত কালের সাক্ষী, কোন মানব-চিত্ত বস্তুর বাহ্য প্রকাশ, তাহা বলিবার উপায় নাই। কালে কালে দেশে দেশে পূজা-পদ্ধতির পরিবর্তন অরম্ভস্তাবী। পুরাতন অনুষ্ঠান গিয়াছে, নতুন আসিয়াছে, তথাপি নতুন পুরাতনের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। কারণ মানবের স্বভাব এই, নতুন কিছু করিতে হইলে পুরাতনকে আশ্রয় করে।

দেবীর পূজার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে পূজা-প্রকরণ অনুধাবন কর্তব্য। কিন্তু পূর্বকালের পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানা নাই। এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। যথা—(১.) আশ্বিন শুক্ল নবমীতে ষোড়শোপচারে সমারোহে দেবীর পূজা বিহিত, কিন্তু পূজা-বস্ত্রের কয়েকটি দিন আছে। তবে অষ্টমী নবমীর মাহাত্ম্য সন্ধিক্ষণে, কেন? ভাদ্র কৃষ্ণ নবমী, আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী হইতে পূজা আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দিনে পূজারস্ত্রের হেতু কি? কেবল

অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পূজা করা যাইতে পারে। এত দিনের মধ্যে সপ্তমী অষ্টমী নবমী মাত্র এই তিন দিন প্রতিমায় পূজা হইয়া থাকে। অধিকাংশ গৃহে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দিনে জলপূর্ণ ঘটে দেবীর পূজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখ আশ্র-পদ্মব, কিসের দ্যোতক? ঘটে পটে প্রতিমার দেবীর পূজা করা যাইতে পারে। যদি ঘটে পূজা সিদ্ধ হয়, প্রতিমার প্রয়োজন থাকে না। ষষ্ঠীর সাংকালে বিশ্ববৃক্ষমূলে, তদভাবে যুগলকলযুক্ত বিশ্ব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আম-দ্বগ ও অধিবাস হয়। ইহার অর্থ কি? তবে কি প্রতিপদ হইতে, পঞ্চমী পর্যন্ত পূজা বুঝা হইতেছিল? বোধন শব্দের অর্থ কি? দেবীকে জাগরিত করা? তিনি কি এত দিন নিদ্রিত ছিলেন? নিদ্রা হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী জগজ্জননী তাঁহার নিদ্রায় প্রলয় হয়। বোধন সময়ে বিশ্ববৃক্ষে পূজা করিতে হয়। বিশ্ববৃক্ষ অধিকার প্রিয়। ইহার কারণ কি? আরও, বিশ্ববৃক্ষের সমীপে নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি বৃক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা বজ্রের দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপিত হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই—রস্তা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিশ্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধাতু। নব পত্রিকার অর্থ কি? বাঁকুড়ায় কেহ কেহ প্রতিমায় পূজা না করিয়া নবপত্রিকায় পূজা করেন। অতএব মনে হয়, নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োজন কি? নবদুর্গাই বা কি? বিশ্বশাখা ও নবপত্রিকা স্থাপনের নিমিত্ত চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পৃথক এক স্থানে সূত্র-বেষ্টনদ্বারা এক বজ্র-গৃহ নির্মিত হয়। ইহারই বা হেতু কি? এই গৃহে অলঙ্কার, সূত্র ও ছুরিকা রাখা হয়। এ সকলের প্রয়োজন কি? সপ্তমীতে নবপত্রিকা চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ পূজিত হয়। নবমীতে পূজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে (কোথাও পরে) ইক্ষু ও কুম্ভাণ্ড বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পশুবলির সহিত এই দুই উদ্ভিদের বলি বিসদৃশ নয় কি? কুমারী পূজা দুর্গাপূজার এক বিশেষ অঙ্গ। কুমারী পূজার হেতু কি? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উদ্ভিত হয়।

উৎসব সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে। দুর্গাপূজার পূর্বে পথ-

ঘাট গৃহ পরিত্যক্ত, চণ্ডীমণ্ডপে বনমালা লব্ধিত, মণ্ডপের দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাকালে ধ্বজা উত্তোলিত হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববস্ত্র পরিধান উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ। আমরা লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করি, কিন্তু তদুপলক্ষে নববস্ত্র পরিধানের রীতি নাই। স্থান-বিশেষে শ্রামা-পূজার সময় ও বিষ্ণুর দোলযাত্রার সময় নব-বস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জনের পর নদীতে কিম্বা তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিবশাখা ও নবপত্রিকা নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদা পরস্পরের গাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষা প্রয়োগদ্বারা শবরোৎসব হয়। ইহা উৎসবের এক অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে। [দক্ষিণ রাঢ়ে জল কর্দম নিক্ষেপ ও ক্রীড়া-কৌতুক আছে, কিন্তু অল্পীল ভাষা প্রয়োগ কখনও শুনি নাই। কতু প্রচলিত ছিল কিনা, সন্দেহ।] তদনন্তর গৃহে আসিয়া গুরুজনকে প্রণাম, বন্ধুজনের পরস্পরের কুশল-সম্ভাষণ ও সকলে সিদ্ধি-পানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞাস্য অথ দেবীর পূজায় শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না। দুর্গোৎসবে হয় কেন? দশমীতে দেবীর রাজ্যে নীরাজন হয়। যুদ্ধের অন্তঃশস্ত্র মার্জিত, তৈললিপ্ত, অশ্ব-গজাদির গাত্র ধোত, অলঙ্কৃত, পদাতি রণসজ্জায় ভূষিত হয়। মন্ত্রদ্বারা তাহাদের পূজা হয়। অপরাহ্নে রাজা কিম্বা সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্যক কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

সিংহ-বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী রণচণ্ডী রূপে দশভুজার পূজা হয়। প্রতিমায় যে বীর ও রৌদ্রবস প্রকটিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হইয়াছে। কবে হইতে কেন চণ্ডী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাস-বেত্তারা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। যজ্ঞমান গৃহী ও গৃহিণী মনে করেন, পার্বতী উমা পিতৃগৃহে তিন দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্যা স্বস্তর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহিণী কন্যাকে নির্মলক* করেন। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, মা আসছে বছর আবার আসিবে। পাঞ্জিতে দুর্গা-প্রতিমার চিত্রে শিবের অল্পচর নন্দীকে যেলানি মোট বাধিতে দেখা যায়। এ সব কোথা হইতে কবে আসিল?

* লোকে বলে, বরণ। কিন্তু বিসর্জনকালে বরণ হইতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যে “নিছিয়া ফেলিল পান” সেই কথ। আমরা ভোজ্য ভাদুল প্রভৃতি দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ধরিয়া প্রতিমার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সব যক্ষ ষাছু পূজায়। কেহ কেহ নিম্নহীন বলেন। কিন্তু মন্ত্র ষাছু আছে কি?

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্ম পর্বে, দুই স্থানে দুর্গার স্তব আছে। মহাভারতে এই দুই স্তব প্রাক্ষিপ্ত বিবেচিত হয়। প্রাক্ষিপ্ত হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। সেই দুই স্তব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন উদ্ভিত হয়। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—বিরাট পর্বের ৬এর অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “হে যশোদা-নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কংসধ্বংসকারিণি কৃষ্ণে, হে কালার্ক সদৃশে চতুর্ভুজে! বিদ্ব্যাচল আপনার শাস্ত বাস-স্থান।” দুর্গা যশোদা-গর্ভসন্তুতা, ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও অগ্নি পুরাণেও আছে। ইনি কংসাসুর বধ করিয়াছিলেন? দুর্গার এক নাম বিদ্ব্যবাসিনী কেন হইল? সেইখানেই আছে, কংস তাঁহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উত্তত হইলে তিনি আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। ভীষ্মপর্বে [২৩-এর অধ্যায়] অর্জুন বাসুদেবের বাক্যামুসারে স্তব করিতেছেন, “হে গোপেন্দ্রাজ্ঞে, নন্দগোপকুলসম্ভবে, কোকমুখ! তুমি জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষের সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ আমরা করিতে সমর্থ হই।” দুর্গা চতুর্মুখ। ব্রহ্মা চতুর্মুখ। কারণ চারি বেদ তাঁহার মুখ-কমল হইতে নির্গত হইয়াছে। মহেশ্বর মহাকাল, চতুষ্পদ নিরাক্ষর করেন। দুর্গা কালী তাঁহারও চতুর্মুখ হইতে পারে। কিন্তু এমন প্রতিমা দেখিতে পাই না। দুর্গা কোকমুখ। কোক, বহুকুল্লুর বলা হইয়াছে, দুর্গার মুখ কুল্লুরের তুল্য। শিবা শব্দে দুর্গা ও শৃগালী বুঝায় ইহার কারণ কি? তিনি থাকেন কোথায়? কান্তারে জম্বু, কটক ও চৈত্যবৃক্ষ সন্নিধানে। জম্বুগাছ জামগাছ, কটক—কতক, অরিষ্ট, রিঠা, চৈত্যবৃক্ষ অশ্বখ বোধ হয়। দুর্গা ও কালী স্বরূপতঃ একই। বঙ্গদেশে অনেক স্থানে শ্মশান-কালীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মূর্তি নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্মশানকালী নাম আছে। বোধ হয় কান্তারে ঐ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে শ্মশান-কালী নাম পাইয়াছেন। কোন্ প্রদেশে এই দুই স্তব রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে (২২-এর অধ্যায়) আরও আশ্চর্য কথা আছে। দুর্গা মহিষাসুর বধ করেন নাই, কার্তিকেয় করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরাণ-কারেরা বলেন কল্লাস্তরে দেবী নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা অস্ত্র বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্লাস্তর সামান্য কথা নয়। ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্ল। ব্রহ্মার সৃষ্টি-বত কাল থাকে তত কাল এক সৃষ্টি লয় পাইয়া আর এক সৃষ্টি আরম্ভ হইলে কল্লাস্তর বলা যায়। আমরা দুই-চারি শত বর্ষের কথা স্মরণ রাখিতে পারি না। কল্লাস্তরে কি হইয়াছিল কে

জানিতে পারে? - বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে দুর্গার কীর্তির সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল পুরাণ-কারেরা সে সকল স্ব স্ব বুদ্ধি ও কল্পনাবলে লিখিয়া গিয়াছেন। পরে স্মার্ত ভট্টাচার্যেরা পূজা-পদ্ধতিও দুর্গা-মাহাত্ম্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কালী ও দুর্গাপূজায় জাতিবর্ণনির্বিষয়ে সকলেরই অধিকার আছে। শাস্ত্রকারেরা দেবী পূজায় এই অধিকার দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না। সঙ্কটকালে ও যুদ্ধোত্তরে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অধিক কালের কথা নয়, ডাকাতেরা কাটারীতে কালী পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বঙ্গালী কালী পূজা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেবল দেশে কালীপূজা বহু প্রচলিত আছে। এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে কালীপূজা ও তৎসম্পর্কে উৎসব হয় না।* ভারতের পূর্বোত্তর অংশে আসামে ও বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে একই দেবীর পূজায় প্রায় একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু আসাম বিহার ও বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাপি মুম্বয়ী দশভুজার পূজা হয় না। ইহারই বা হেতু কি?

দুর্গাপূজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গোৎসব তত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। তিনি কোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে পারেন নাই। সে সে স্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। দেশাচারের উৎপত্তি নির্ণয় দুঃসাধ্য। দেশাচার ব্যতীত কুলাচার আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিত-বংশের এক এক দুর্গা-পূজার পদ্ধতির পুঁথি আছে। তদনুসারে পুরোহিত যজ্ঞ-মানের দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। সপ্তমীতে, পশু বলির

বিধান নাই। কিন্তু কোন কোন বাড়ীতে ছাগ বলি হইয়া থাকে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম এত প্রচলিত করিয়াছিলেন যে দুর্গাপূজায় পশু বলি উঠিয়া গিয়াছে। এক কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে নবপত্রিকায় দুর্গা-পূজা হয়, পশু বলি হয় না। কিন্তু অন্ন ও মাগুর মাছের ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্যের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। ধাতুনির্মিত দশভুজা প্রতিমা আছে। তদুপরি একটি মুম্বয়ী নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে। ইহার নাম মুণ্ড পূজা। পশু বলি নাই, কিন্তু বিসর্জনের সময় পান্ত-ভাত ও পোড়া চেন মাছ জামিরের রস ও ছন মাখিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কণ্ঠা পতি-গৃহে ঘাইতেছেন, অন্ন ভোজন করিয়া ঘাইবার রীতি নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার করিয়া যান। এইরূপ নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিমা-নির্মাণেও দেশাচার প্রচল হইয়াছে। রাঢ় দেশে স্তম্ভধর প্রতিমা-নির্মাণ করে। কারণ স্তম্ভধর সেকালের ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিমা-নির্মাণে মাপ-জোখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে কুস্তকার এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচার্য প্রতিমা-নির্মাণ করেন। প্রতিমা-নির্মাণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকর্মীর পূজা না করিলে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না।

বঙ্গদেশে মুম্বয়ী দশভুজার পূজা অধিক পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। ষাঁহার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহার শূলপাণি কৃত “দুর্গোৎসব বিবেক” নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। শূলপাণি বঙ্গীয় নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। মিথিলার কবি বিদ্যা-পতি “দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী” লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই শতাব্দে ছিলেন। ইহাদের পূর্বে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার মুম্বয়ী মূর্তি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তিনি কতিপয় পূর্ববর্তী স্মৃতি-কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পূজার লিখিত নিদর্শন দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দীর সেরদিকে পাওয়া যায় নাই। এই পূজা কোথা হইতে আসিল?

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত ছিল না। লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পূজা সম্পন্ন হইতে পারিত না। ইহার পরিবর্তে লোকে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা করিত। এই পূজা আট দিনে সম্পন্ন হইত।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। বর্তমানে তাহার এক আনা মাত্র আছে কিনা সন্দেহ। শরৎঋতু যমদংষ্ট্রা, লক্ষ্মী ও চঞ্চলা। ম্যালেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব ত্রিহীন ও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে।

* Kali Cult in Kerala—Bulletin no. 4 of the Sri Rama Varma Research Institute—Cochin. এই প্রবন্ধে অনেক মালয়লী শব্দ আছে, সমুদয় বিবরণ বুঝিতে পারা যায় না। ইহার পরে Kali Worship in Kerala by Dr. C. Achyuta Menon M.A., Ph.D. Published by the Madras University, English Translation of the Original Malayali Text বাহির হইয়াছে। আমি দেখি নাই। কেবল বই-পড়ায় ব্যাপার সম্পন্ন হইবে না। কালী পূজায় অভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী কেবল দেশে গিয়া পূজা ও উৎসব দেখিয়া দুই দেশের অনুষ্ঠান মিলাইলে বঙ্গের ইতিহাসের একটা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। কেরলের কালী পূজায় তাত্ত্বিকমন্ত্র কোথা হইতে গিয়াছে? কেরলীয়ের সহিত বাঙ্গালীর আরও সাদৃশ্য আছে।

পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশভুজার পূজা হইয়া থাকে। সে দেশ নিশ্চয় ধর্ম। হুংখের বিষয় আমি সে দেশের দুর্গাপূজা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। পশ্চিম-বঙ্গের আর সে দিন নাই। এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। সে উৎসাহ সে ভক্তি সে আনন্দ সে 'দীপ্যতাং ভূজ্যতাম' ধ্বনি আর নাই। "গিরি হে, গৌরী আমার এসেছিল," এই হৃদয়স্পর্শী গানও নাই। এখন যাহারা পূজা করিতে-ছেন, তাহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতে-ছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন।

কয়েক বৎসর হইতে নগরে নগরে সার্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। সে কালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলিতাম এখন তাহা সার্বজনীন নাম পাইয়াছে। কারণ বার শব্দ সংস্কৃত। ইহার অর্থ সমূহ, সমূহ মিলিয়া যে পূজা, তাহা বার-আরি, বারোয়ারি পূজা। বারোয়ারি কালীপূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপূজা করিত। বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া রক্ষা-কালীর পূজা করিত। সার্বজনীন হউক, বারোয়ারি হউক, কবি বলিয়াছেন "শক্তিপূজা মুখের কথা নয়।"

এখনকার ইংরেজী পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পূজার অর্থ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার। অনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না। মনে করে পুষ্প নৈবেদ্য না দিলে পূজা হয় না। মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিলে সহস্র সহস্র নরনারী তাহার পূজা করিয়াছিল। আচরণ দ্বারা, কেহ তাহার প্রিয় চরকায় স্নাতা কাটিয়া, কেহ তাহার কর্ম নির্বাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পূজা করিয়াছিল। লার্টসাহেব নগরে আসিবার পূর্বে পথ পরিষ্কৃত ও জলসিক্ত, পথের দুই পাশে বনমালা লবিত, স্থানে স্থানে ভোরণ

নির্মিত, সভামণ্ডপ স্থসজ্জিত হয়। আগমন কালে তুর্ধ্বনি হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাহার স্তব করেন, তাহার গুণ ও কর্ম কীর্তন করেন। ইংরেজীতে বলি address পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা করেন। আমাদের জলকষ্ট হইয়াছে, জল দান করুন, আমরা ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিউন ইত্যাদি। আমরা গুরুজনের পূজা করি, বন্ধুর পূজা করি। আচরণদ্বারা প্রসন্ন করিয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের সহায়তা কামনা করি। যাহা হইতে উপকার আশা করি, তাহা আমাদের পূজার্ত। আমরা গাভীর পূজা করি। গাভীর দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, তাহা স্মরণ করি। গৃহের অন্ধনে তুলসী গাছ পালন করি, দেখিলে হরি স্মরণ হয়। ইহার মধ্যে কু কোথায়? বর্ষে বর্ষে এক নির্দিষ্ট দিনে রবীন্দ্রনাথের পূজা হইতেছে। তাহার চিত্র পুষ্পমালা বেষ্টিত হইয়া উচ্চ মঞ্চে স্থাপিত হইতেছে। ভক্তেরা তাহার স্তব করেন। কেহ কি চিত্রের পূজা করেন? তবে চিত্র কেন? পুষ্পমালা কেন?

দুর্গাপূজা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার এত কল্লাস্তর ও আবুযদিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই পূজা একদেশে প্রবর্তিত ও বর্ধিত হয় নাই। নানা দেশের প্রচলিত বিধি ও আচার যুক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা এই সকল আগন্তুক অগুষ্ঠান দেখিয়া উৎপত্তি চিন্তা করিয়াছেন। কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এইরূপ ভ্রম অবশ্যস্বাভাবী। আমি ছয়টি প্রবন্ধে মূল ও মূল হইতে শাখা অঙ্গসন্ধান করিতে যাইতেছি। ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। স্বধী ও স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়েরা রূপাপূর্বক ভ্রমসংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

খবর : সাইবেরিয়ায়

(পুস্তকের "Message to Siberia"র অনুবাদ)

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাইবেরিয়ায় গহন বনীর গহবরে
ধৈর্য্য তোমার গর্বে রহুক উন্নত;
তিক্ত প্রেমের শেষ নহে তীক্ষ্ণ ব্যর্থতা—
বিদ্রোহী মন করে না কখনো মাধানত।

বোবা অসহায় চাপা আধারেই মুখ রেখে
হৃদগায়ের ভগিনী সে আশা নন্দিতা,
হৃদয়ে তোমার সাহসদীপ্ত হানে কথা—
শোন গো বন্ধু, আসছে সে দিন বাঙ্কিত।

বাধীন আমার সঙ্গীত আর উচ্ছ্বাস—
স্পর্শ-উছল ভালবাসা তার, মিতালি যার,
অতিক্রান্ত অন্ধকারের সব দুয়ার;
ছুঁয়েছে সে প্রেমে শয্যা তোমার লাঙ্কিত।

ভারি শৃঙ্খল বুলেছে উচ্ছে, ছিঁড়ে সে—
ফুৎকারে হবে সকল দেয়াল-কম্পিত;
প্রভাতে মুক্তি করবে ও অভিনন্দিত—
ভ্রাতা ফিরে দেবে তরবারি তব, দক্ষ দীপ্ত হে স্তম্ভ।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম-এ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ বহু শতাব্দীর। বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতবর্ষ বহুকাল অবধি করিয়া আসিয়াছে। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী বণিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়ে কোটিল্যের বিবরণ হইতে এই সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ জানা যায় :—

“... The Government did its best to foster foreign trade by inviting merchants from abroad to reside in its territory or finding out markets for the goods produced at home.

To encourage foreign merchants, they were invited and privileges and exemptions were granted to them . . .

The existence and the settlement of foreign merchants in the country is also testified by the Greeks who visited India. According to a fragment of Megasthenes one of the Boards of the Municipal Administration of the city of Pataliputra was in charge of the property of foreigners in case of their death in India, and provided arrangements for their safety during their stay in India.”

(Kautilya—Narayan Chandra Bandyopadhyaya)

তাৎপর্য :—“বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিতে সরকার হইতে সর্বপ্রকার সহায়তা করা হইত। বিদেশী বণিকগণকে রাজ্য মধ্যে বাস করিবার ও দেশীয় বাণিজ্যের সহিত কারবার চালাইবার জন্ত সাদরে আহ্বান করা হইত।

বিদেশী বণিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত তাহাদিগকে বিবিধ সুবিধা প্রদান ও কর হইতেও অব্যাহতি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রীক পর্যটকদিগের বিবরণ হইতেও ভারতে বিদেশী বণিকগণের অস্তিত্ব ও বসতি সম্বন্ধে জানা যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণের কোন অংশ হইতে ইহাও জানা যায় যে পাটলিপুত্রের পৌর সভার অত্যন্ত কার্যনির্বাহক সংসদের হস্তে বিদেশীগণের যত্নের পর উহাদের সম্পত্তির ব্যবস্থা অথবা উহাদের কীবিত্ত কালে ধন সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থার ভার অর্পিত ছিল।”

খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত রোম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। এই বাণিজ্য জল ও স্থল উভয় পথেই চলিত। প্রাচীনকালে উট প্রভৃতির দ্বারা বাণিজ্য চালান হইত। স্থলপথে ব্যবসায়ের কিয়দংশ আফগানিস্তান, পারস্য ও এশিয়া মাইনরের ভিতর পড়িয়াছিল। আরব, তুর্কী ও তাতার জাতীয় লোকেরা যখন এই সকল দেশ জয় করিয়া লইল সেই সময় ইউরোপীয় বণিকদের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য লোপ পায় এবং পুরাতন পথে মাল চলাচলও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয়

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই বাণিজ্য কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবিত হইলেও সপ্তম শতাব্দীতে শিশর ও পারস্য আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে সকল আদান প্রদানের হস্ত ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময় ভারতীয় পণ্যসম্বল মুসলমান বণিকগণের মারফত পাশ্চাত্য বণিকদের হাতে পৌঁছিতে লাগিল এবং ভিনিসের বন্দরে এই সকল মাল আসিয়া পৌঁছিত বলিয়া ভিনিসীয় বণিক ও মুসলমান বণিকগণের একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া পড়ায় ইহাদিগের প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। মাল চলাচলের স্থলপথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ইউরোপীয় বণিকগণ জলপথে মাল প্রেরণের ও ব্যবসার চালাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণের ভিনিসীয় অর্থ-সম্পদের ও বাণিজ্যের প্রতি ঈর্ষা-মূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠে এবং এই অতি লাভজনক বাণিজ্যের অংশ কি উপায়ে ইহারা গ্রহণ করিতে পারে ইহাও তাহারা চিন্তা করিতে থাকে। পর্তুগালের প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটর ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে সরাসরি জলপথ আবিষ্কারের জন্ত সারা জীবন চেষ্টা করেন এবং ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সাহসিক নাবিকবৃন্দ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর বার্বাল-মিউ ডিয়াজ বাতায়ত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়াছিলেন এবং ইহার দশ বৎসর পর ডাঙ্কো-ডা-গামা জাঞ্জিবারের দুই শত মাইল উত্তরে পৌঁছিয়া তথায় সুদক্ষ নাবিকগণের সহায়তা লাভ করেন এবং সুরাটের হিন্দু নাবিকেরাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে লইয়া আসে। এইরূপে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত হন। কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী হিন্দুরাজা তাঁহার সহিত সদ্যবহার করেন। পূর্ববর্তীদের রীতি অনুযায়ী ইনিও বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পরাণমুখ হইলেন না। পর্তুগালের রাজার নিকট ডাঙ্কো-ডা-গামার হস্তে তিনি নিম্নোক্তরূপ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

“In my Kingdom there is plenty of cinnamon, cloves, peper and ginger. I seek from thy Kingdom gold, silver, coral and scarlet cloth.”
—E. Marsden.

তাৎপর্য :—“আমার রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি, লবঙ্গ, মরিচ এবং আদা আছে। ইহার পরিবর্তে আপনার রাজ্য হইতে আমি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লালবর্ণের রঞ্জিত বস্ত্র পাইতে চাহি।”

কিন্তু পরবর্তী পর্তুগীজগণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ইহারা যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নের উক্তি হইতে বুঝা যাইবে :—

“This Portuguese adventurer (Albuquerque), afterwards Governor, captured Goa in 1506 and in 1510 plundered the town of Calicut and burnt the palaces of its Kings, thus showing gratitude to the Zamorin who patronised the Portuguese in their endeavour to trade with India—Major B. D. Basu.

তাৎপর্য :—“উদ্যোগী পর্তুগীজ নেতা আলবুকার্ক পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্তারূপে যথাক্রমে ১৫০৬ ও ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ানগরী অবরোধ ও লুণ্ঠন করিয়া, রাজ-প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া দিয়া, জামোরিন রাজগণের পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য প্রতিদান দিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।”

১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক শত বৎসর ভারত-বর্ষের সহিত পর্তুগীজদের একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল (১)। মিশর, আরব ও ভারতের মুসলমানেরা পূর্বে ভারত মহাসমুদ্রের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছিল। পর্তুগীজদের সহিত এই সময় উহাদের প্রবল বিরোধ বাধিল। পর্তুগীজদের মধ্যে প্রবল মুসলমান বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে ভারত সম্বন্ধে পর্তুগাল নৃপতির মনোভাব ও ভারতীয়দের প্রতি পর্তুগীজদের আচরণ সম্বন্ধে নিম্নের উক্তি হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায় :—

“The Portuguese, who hated all Musalmans, and killed them without mercy, usually were on good terms with the Hindus. The King of Portugal, with papal sanction, assumed the lofty style of ‘Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India’—a proceeding which shows that his ambition was not limited solely to commercial gain”—Vincent A. Smith.

তাৎপর্য :—“পর্তুগীজগণ মুসলমান-বিদ্বেষী ছিল এবং মুসলমানদিগকে নির্ধর্মভাবে হত্যা করিত; তবে সাধারণতঃ মোটা মুটভাবে ইহারা হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্নই ছিল। পোপের অনুমতিক্রমে ‘পর্তুগালরাজ ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের রাজ্য, নৌ ও বাণিজ্যের সর্বাধিনায়ক’ এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন—ইহার দ্বারা কেবল যে বাণিজ্যলব্ধ ঐশ্বর্যের মধ্যেই তাঁহার উচ্চাভিলাষ নীমান্বত ছিল না তাহাও বুঝিতে পারা যায়।”

পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের দ্বিতীয় গভর্নর আলবুকার্ক

(1) They came out with the intention of trading in the East and they were content when they succeeded in that object. For over a century they monopolised the profitable traffic of the Indian Seas and the Portuguese adventurers astonished Europe with the colossal and gigantic fortunes they had rapidly amassed—*Rise of the Christian Power in India.*—By Major B. D. Basu.

পূর্বাঞ্চলে এক পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র বাণিজ্য অধিকার হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিয়া সম্পূর্ণ বাণিজ্য বাহাতে ইউরোপীয় বণিকদিগের করায়ত্ত হইতে পারে সেই দিকেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রাচ্যে পর্তুগীজদের প্রভাব ও বাণিজ্যে উহাদের বিরূপ লাভের কথা অজ্ঞাত ইউরোপীয় বণিকদের কর্ণগোচর হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইল না। সম্পদের আতিশয্য যে তাহাদের প্রতিপত্তি-হীনতার কারণ ঘটাইয়াছিল *Rise of the Christian Power in India* গ্রন্থে সেই সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায় :—

“The Portuguese waved in importance in the East as they grew rich and rolled in wealth.” The Portuguese . . . “entered India with the sword in one hand and the crucifix in the other; finding much gold, they laid aside the crucifix to fill their pockets, and not being able to hold them up with one hand—they were grown so heavy, they dropped the sword too; being found in this posture by those who came after, they were easily overcome”.

তাৎপর্য :—“ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যে ভাসমান পর্তুগীজগণের প্রাচ্যে অধিকার শীঘ্রই হ্রাস পাইল; ইহারা এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে ক্রুশ ধারণ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের সম্পদের আতিশয্য দেখিয়া ইহারা ক্রুশ পরিত্যাগ-পূর্বক পকেট পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এই অগাধ সম্পদ এক হস্তে ধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া এবং নিজেদের সম্পদাতিশয্যে ও জনরুদ্ধি হইবার দরুনও অতঃপর তরবারিও পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ইহাদের পরবর্ত্তীদিগের পক্ষে ইহাদিগকে পরাজিত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইল।”

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, পর্তুগীজদের প্রাচ্য বাণিজ্য-লব্ধ বিরূপ ঐশ্বর্যের কাহিনী অজ্ঞাত ইউরোপীয় বণিকদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। অতঃপর ইহারাও এই অতিলাভজনক একচেটিয়া বাণিজ্যের অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হইয়া উঠিল এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ এই জন্ত তৎপর হইয়া উঠিল।

এই সময় ইংলণ্ডে রাগী এলিজাবেথের যুগ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুগ এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে শক্তিশালী ইংলণ্ডে এই সময়ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। স্পেনের অজ্ঞেয় নৌবাহিনী বিজিত হওয়ায় সমুদ্র-রাণী ইংলণ্ড নৌশক্তিতে ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হইল। ফলে ইংরেজের বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। ষোড়শ শতাব্দের “সমুদ্র-কুকুরগণ” (Sea dogs) ও সার ফ্রানসিস ডেক, হকিল, মার্টিন ফ্রিয়ার, সার ওয়ালটার র্যায়ে প্রমুখ ইংরেজগণ এই যুগে ইংলণ্ডের ব্যবসা তথা সাম্রাজ্য বিস্তারের

পথ উন্মুক্ত করিলেন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে লিসবন-গামী একখানা পর্তুগীজ জাহাজ সার জ্যাকবিস ডেক কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এই লুণ্ঠনের দ্বারা প্রাপ্ত চাট হইতে তাঁহার উত্তমাংশ অন্তরীপ হইয়া ভারতের গুপ্ত-সমুদ্র পথের সন্ধান লাভ করিলেন। “By land and sea a Virgin queen I reign”—এই উক্তি দ্বারা যোগ্য পরিচয়, সেই রানী এলিজাবেথ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর) “Society of Adventurers” অথবা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটা ব্যবসায়ী সম্বন্ধে এক সনন্দ দান করিয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া পত্তন করিয়া যান। (২)

২১৭ জন অংশীদার ৬৮৩৭৩ পাউণ্ড মূলধন দিয়া এই কোম্পানী গঠন করে; তখন ইহার নাম ছিল The Governor and the Company of Merchants of London Trading with the East Indies”; পনর বৎসরের জন্য ইহার প্রথম একচেটিয়া অধিকার পায়। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে সতাই আকবরের রাজত্বকালে সুরাট বন্দরের তাহার ক্যান্টরি বা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। সুরাট বন্দরের এই বাণিজ্যকুঠিই ভারতের ভারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বপ্রথম অবিকৃত ভূমিখণ্ড (“The site of this factory was the first piece of land owned by the Englishmen in India”)। ইহার যে সকল জিনিষের ব্যবসা করিত তাহা এই:—

Pepper, rice, cotton, indigo, ginger, spices, cocoanuts and the poppy and sugar cane from which opium and sugar are made, do not grow in cold countries like England; and in old times beautiful muslin and cotton and silk cloths were made in India better than in England. On the other hand, these traders brought to India wolen cloth and copper and quick silver and iron and steel goods which could not be had in this country.”—E. Marsden.

তাৎপর্য্য:—“মরিচ, ধান্য, তুলা, নীল, আদা, মশলা, নারিকেল, আফিম ও চিনি প্রভৃতির জন্য ইক্ষু ও পোস্ত ইংলণ্ডের ন্যায় শীত প্রধান দেশে জন্মিতে পারে না। প্রাচীন

(2) The Directors of this company, on consultation, resolved, “not to employ any gentleman in any place of charge” and requested “that they might be allowed to sort their business with men of their own quality lest the suspicion of the employment of gentlemen being taken hold upon by the generalite, do drive a great number of adventurers to withdraw their contributions” (Minues, 3rd October, 1690 quoted in Bruce’s Annals of the Hon’ble East India Company, Vol I, page 128).—*Rise of the Christian Power in India*—by Major B. D. Basu.

কালে ভারতে ইংলণ্ড হইতে উৎকৃষ্টতর মসলিন, স্বতি ও রেশমী বস্ত্র নিৰ্ম্মিত হইত। অপর পক্ষে এই সকল বণিক ইয়োরোপ হইতে পশমী কাপড়, তাম্র, পারদ, লৌহ এবং ইস্পাত-নিৰ্ম্মিত পণ্য ভারতে পাওয়া যাইত না বলিয়া ঐ সকল এদেশে লইয়া আসিত।”

ইতিপূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দিতার জন্য ইউরোপের কয়েকটি জাতিই তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ-স্বষ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিন্ন এই সকল দেশেও বণিকসংঘ গড়িয়া ওঠে ও পর্তুগীজদের তদানীন্তন ছক্কলতার সুযোগও ইহার উত্তমরূপে গ্রহণ করে।

“But towards the end of the century, the plundering of the Portuguese and Spanish empires had begun. By Drake’s attack on Nombre de Dios, the Spanish treasure city, in 1572, his voyage round the world (1577-1580), and the work of Sir John Hawkins in establishing England’s share in the profitable slave trade, the supremacy of Spain was eventually overthrown. Meanwhile the weakness of the Portuguese empire encouraged the Dutch and the English to trade in the East Indies and eventually to rob Portugal of all his possessions . . .”—*Concise History of the World*—by Sir J. A. R. Marriott).

(ক) ইংরেজের পর প্রাচ্য বাণিজ্য ব্যপদেশে ওলন্দাজ-গণের ডাচ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপের বাটাভিয়া এই কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার্স রূপে গড়িয়া উঠে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা, মশলা দ্বীপ ও সিংহলে ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর অবসান হয় ও ওলন্দাজ সরকারের অধীনে চলিয়া যায়।

(খ) ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। বাংলাদেশের ত্রিরাশপুর্বে দিনেমার অবিকৃত স্থান ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ক্যান্টরীগুলি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট বিক্রীত হয়।

(গ) ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে La Compagnie des Indes—ফরাসী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ক্যান্টরী স্থাপিত হয় এবং কয়েকমুগল উপকূলে ইহার পণ্ডিচেরী প্রাপ্ত হয়। তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণে ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধের কাহিনী ও ফরাসী পরাজয়ের ঘটনা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

(ঘ) ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আইডিস ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

(ঙ) অস্ট্রেলিড্ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্ট্রিয়ান বণিকসংঘ কর্তৃক ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-দিগকে খুশী করিবার জন্য সতাই বর্ষ চার্লস ইহা বন্ধ করিয়া দেন। (৩)

(৩) (১) জ্ঞান-ভারতী—ঐপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(২) Oxford History of India—V. A. Smith

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ইংরেজগণ সুরাট বন্দরে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এই স্থানে তাহারা পর্ভুগীজদের নিকট হইতে প্রবল বাধা পায়। অতঃপর ইহারা গুজরাটের মোগলশাসকের নিকট হইতে সুরাট, ক্যাম্বে প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। এই সময় পর্ভুগীজদের সহিত ইহাদের এক বিরাট জলযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইরূপে কালক্রমে ইংরেজের প্রথম অধিকৃত ও আশ্রয় স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হয়। সুরাটস্থিত ক্যাস্ট্রীতে ইংরেজ বণিকেরা সারা বৎসর যাবৎ বিবিধ দেশীয় পণ্যদ্রব্য দেশীয় ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখিত এবং ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিলে ঐ সকল জাহাজে আনীত মালগুলি পূর্বোক্ত স্থানে গুদামে রাখিয়া সর্বসময় ব্যাপী মজুত গুদামের মাল ঐ সকল জাহাজেই স্বদেশে প্রেরণ করিত। কুঠি ও গুদাম দ্বারা আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত চারি পাশে সুরাট প্রাচীর নির্মাণ করিয়া বন্দুকাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত রাখিত।

অতঃপর ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্ভুগীজদের সহিত ইংরেজদের যে নৌযুদ্ধ ঘটে ইহাতে পর্ভুগীজগণ নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে এবং ফলে ইংরেজগণের পর্ভুগীজ-ভীতি চিরতরে লোপ পায়। এই খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ সত্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় সার টমাস রোকে দূত প্রেরণ করেন; ইনি কোম্পানীর জ্ঞাত বিবিধ সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে ইংরেজগণ ভারতের পশ্চিম-উপকূলে ও ত্রিবাঙ্করে কুঠি নির্মাণ এবং বঙ্গোপসাগরে নিজেদের পথ সুগম করিতে সমর্থ হয়।

এদিকে প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায় দৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচুর লাভ হইতেছে দেখিয়া অজ্ঞাত ইংরেজ-বণিকেরাও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে এবং তাহারা আরও কোম্পানী গঠন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ভারতে ব্যবসা আরম্ভ করে। প্রায় এক শত বৎসর বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১৭০২ হইতে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত কোম্পানী একত্রিত হইয়া যায় এবং ইহার নাম ইউনাইটেড দৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অথবা অনারেবল দৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইয়া যায়। কথিত আছে, সেকালের সাধারণ ভারতীয়গণ ইহাকে “জেহান্নু কোম্পানী বাহাদুর”ও বলিত এবং সাধারণের ধারণা ছিল ইহা ইংলণ্ডের কোন ধনী অভিজাত ব্যক্তি অথবা রাজকুমারের আখ্যা-বিশেষ।

বর্তমান ভারতের তিনটি সর্বপ্রধান বন্দর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা সত্রাট আক্রমণের সময় অজ্ঞাত, অখ্যাত, ক্ষুদ্র নগর্য গ্রাম ছিল। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের চন্দ্রসিরির রাজার নিকট হইতে ক্ষুদ্র অংস্যজীবীদের গ্রাম মাদ্রাজ ক্রয় করিয়া নিজেদিগকে সুরক্ষিত করিবার জন্ত কোম্পানী সেন্ট

জর্জ নামক সুরাট দুর্গ নির্মাণ করে। সুরাট ইংরেজদের সর্বপ্রথম লব্ধ ভূমিভাগ; মাদ্রাজও সেইরূপ ইংরেজের সর্বপ্রথম অধিকৃত ভূভাগ এবং ইহাই উত্তরকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হয়। (“Thus England acquired her first proprietary holding on Indian soil and the foundation of the Presidency of Madras was laid”)। সেই বিশৃঙ্খলার দিনে বহু হিন্দু অধিবাসীও কোম্পানীর সুরক্ষিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে; ঐ স্থানে তাহারা ব্যবসায়াদি কাজকর্মও করিতে থাকে। ইংরেজ ক্যাস্ট্রীর যে অংশে এই সকল ভারতীয় বণিক ও অজ্ঞাত লোক বাস করিত সেই স্থানগুলিকে কোম্পানী হইতে বলা হইত “Black Town”।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের ষোড়শবর্ষক ট্যানজিয়ার ও বোম্বাই লাভ করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বার্ষিক মাত্র দশ পাউণ্ড খাজনার বোম্বাই দ্বীপ লাভ করে।

সত্রাট শাহজাহানের হুহিতা জাহানারা এই সময় গুরুতররূপে অগ্নিদগ্ধ হন। দরবারের চিকিৎসকবৃন্দ তাঁহাকে আরোগ্য করিতে অকৃতকার্য হইলে সত্রাট এক জন সুবিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসক পাঠাইবার জন্ত সুরাট বন্দরে সংবাদ প্রেরণ করেন। জেম্রিয়েল বাউটন নামক এক জন ইংরেজ চিকিৎসক প্রেরিত হন এবং ইহার সুকিচিংসার গুণে সত্রাট-হুহিতা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন। সত্রাট যোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দেশপ্রেমিক ইংরেজ চিকিৎসক কোম্পানীর তরফ হইতে বাংলায় ব্যবসা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অজ্ঞাত করেকটি সুবিধাও বাংলার ব্যবসায়ের জন্ত চাহিয়া লন। সত্রাট সানন্দে ফরমান প্রদান করিলে বাউটন স্বয়ং উহা সহ বাংলার সুবাদার সত্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাহান রাজমহল-স্থিত দরবারে উপস্থিত হন। শাহজাহান অজ্ঞাতমাত্রা রুম্মা মহিষীকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিলে তথা হইতেও ইনি কোম্পানীর জন্য বাংলায় ব্যবসা করিবার যাবতীয় সুবিধা লাভ করেন (*Rise of the Christian Power in India*—Major B. D. Basu.)

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্মচারী জব চার্লস কলিকাতা নগরীর পত্তন করিলেন। সত্রাট শাহজাহানের জীবিত কাল পর্যন্ত ইংরেজগণ বাংলায় বিনা বাধায় ব্যবসায় চালাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু আওরংজেবের রাজত্ব-কালে শাস্ত্রোক্তা ইহাদিগকে প্রচুর শুল্ক দিতে বাধ্য করার ইহাদিগকে বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু ক্রম হইতে রেবাই পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া ইংরেজগণ ফিরিয়া আসিয়া ছগলী হইতে পুনরু জোশ

দূরে তিনটি গ্রাম ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রতিষ্ঠা করে।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল ইংরেজ বণিকেরা সে সম্বন্ধে মাথা ঘামায় নাই। কলিকাতার জন্য বাংলার নবাবকে এবং মাদ্রাজের জন্য কর্ণাটের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া ব্যবসা লইয়া আবদ্ধ থাকাই তাহাদের কাজ ছিল।

“The merchants of the East India Company were too busy piling up wealth to harbour any thoughts of gaining political glory”—Harold Wheeler.

১৬৮০ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবসায় ভিন্ন ইংরেজদের আর কিছুই ছিল না। প্রতিদ্বন্দী পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদিগের সহিত জলযুদ্ধ, দস্যুদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ ও ভারতীয় নৃপতিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ভিন্ন আর কোন যুদ্ধে ইহারা লিপ্ত হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজী কর্তৃক সুরাট ও কারওয়ার আক্রান্ত হইলে সার জর্জ স্পিন্ডেন মারাঠদিগের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করায় আওরঙ্গজেবের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শিবাজী ছয় দিন যাবৎ সুরাট গুপ্তন করিয়াছিলেন। ঢাকা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, আমেদাবাদ, বরোচ, টেলিচারি, কোচিন, মসলিপত্তন, ভিজিগাপটম প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের ক্যাস্ট্রি স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি নগর অসংখ্য গুদামে পূর্ণ হইত এবং দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত রাখা হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোম্পানীর ব্যবসা নিষ্ফলকরূপে চলিতে থাকে; কিন্তু এই সময় একটি গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের ফরাসীদের সহিত যে যুদ্ধ বাধে তাহা শেষ হইতে না হইতেই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাণীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয়ের পর কোম্পানী কর্তৃক বৃষ্ট নূতন নবাব মীরজাফর কোম্পানীর হস্তে ২৪ পরগণার জমিদারী সমর্পণ করেন। ভারতে ইহাই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি।

ইহার পর এক শত বৎসর পর্যন্ত (১৭৫৭-১৮৫৭) কোম্পানী কর্তৃক ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার সর্বজনবিদিত। ক্লাইভের সময় হইতে লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে সময়ের যুদ্ধ করিয়া কোম্পানী ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে ঐ সকলই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল। সমগ্র ভারত-শাসনের কর্ত্তব্য তখন পর্যন্ত কোম্পানী করিয়া-ছিল বলিয়া অস্বীকার হয় না। তবে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার

স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়ার ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেই ক্ষতিপূরণের অভি-প্রায় ব্রিটিশ জাতির ছিল বলিয়া *Rise of the Christian Power in India* গ্রন্থে লেখক নিম্নোক্ত রূপ লিখিয়াছেন :—

“The ministry, at the head of which was Mr. Pitt, were crest-fallen on the loss of their American colonies. To compensate for this loss, they were dreaming of founding an Indian empire”.

তাৎপর্য :—“যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কর্ণধার ছিলেন মিঃ পিট, আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হস্তচ্যুত হওয়ার উহা একেবারে মর্মান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তব্য করিতে আরম্ভ করেন।”

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই যুদ্ধবিজয়ের দ্বারা কোম্পানীর রাজ্যসীমা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (৪) কিন্তু ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির নীতিসমূহই ভারতে ব্রিটিশ রাজচক্রবর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছিল। উহার পর লর্ড ডালহাউসির কার্যধারাই ভারতের অবশিষ্ট অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত করে।

এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যবসায়ীসংঘ মাত্র ছিল—উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নহে। ইহা ইংরেজ বণিক-শ্রেণীর একটি প্রাইভেট কোম্পানী এবং অংশীদারদের দ্বারা নির্বাচিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ কর্তৃক পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডের ডিক, আর্ল, লর্ড শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়গণ গঠিত এই সকল অংশীদারকে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পার্লামেন্ট হইতে রাজকীয় সনন্দ লইতে হইত। এই সনন্দের বলে ইহারা সৈন্য সংগ্রহ, নৌবহর সংরক্ষণ, মুদ্রা প্রস্তুত, দুর্গ-নির্মাণ ইত্যাদি কার্যগুলি করিতে অধিকারী হয়। এইরূপ সনন্দ প্রাপ্তি ব্যতীত ইহারা ব্যবসায় চালাইবারও অধিকার লাভ করিতে পারিত না। রাজী এলিজাবেথের নিকট হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর বৎসরের জন্ম ইহারা প্রথম সনন্দ লাভ করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সনন্দ অনির্দিষ্ট কালের জন্মই কোম্পানীকে এইরূপ অধিকার প্রদান করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হইবার পর প্রতি বৃদ্ধি বৎসর অন্তর কোম্পানীর নূতন সনন্দ প্রাপ্তির দ্বারা যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা এইরূপ :—

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথম রাজ্যাধিকার ক্ষমতা হাতে পাইবার পর ব্যবসায় ও মূলধন সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধার

(8) He (Lord Cornwallis) was the first Governor General to add territories to the company's dominions by means of conquest: Neither Clive nor Warren Hastings obtained an inch of land in India by conquest—Major B. D. Basu.

সম্মুখীন হইতে হয়। পূর্বে কোম্পানীর কর্মচারীগণ যেরূপ সর্বাত্মকরণে ব্যবসায়ের জ্ঞান মনোনিবেশ করিতে পারিত অতঃপর তাহা করিতে না পারায় ব্যবসায় তথা শাসনসংক্রান্ত অসুবিধার দরুন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এক্ট পাস হয়।

কোম্পানীর গবর্নর-জেনারেল পার্লামেন্ট হইতে নিযুক্ত হইলেও তিনি কোম্পানীরই বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। যুগপৎ শাসন ও ব্যবসায় উভয়ই তাঁহাকে করিতে হইত (“He had both to trade and to rule”)। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিটের ইন্ডিয়া বিল পাস হইবার পরও কোম্পানী দেশের শাসক ও বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারী হইয়াই থাকিল। গবর্নর-জেনারেলকে দুই কার্যই করিতে হইত। (“The Governor-General still had to trade as well as to rule”)। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পুনরায় সনন্দ প্রদান করা হয়। পূর্বোক্ত কারণে কোম্পানী ব্যবসায়ের অধিক উন্নতি করিতে পারে নাই। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বহু ইংরেজ বণিকের অস্তিত্বও সে সময় ছিল এবং এই সকল বণিক ভারতবর্ষের সহিত স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক ছিল। সুতরাং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সনন্দ বদলের সময় প্রত্যেক ইংরেজ স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার পায় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। কিন্তু ইহাতেও অস্বাভাবিক ইংরেজ বণিকেরা উপকৃত হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সনন্দ প্রদত্ত হয় ইহা দ্বারা কোম্পানী আর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না—এই আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়া গেল; ইহার পর যে কোন বণিক কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যতীতই ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকারী হইল। (৫)

ইহার পর ব্রিটিশ বণিকদের ব্যবসায় প্রভুত লাভ হইতে লাগিল। ইহারা স্বাধীন ইংরেজ বণিক ছিল বলিয়া অতঃপর ব্যবসায়েই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিল; দেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থা রহিল ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপর। এখন হইতে গবর্নর-জেনারেলের দেশ-শাসনই কর্তব্য হইল।

(৫) ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বহু ইংরেজের ঈর্ষার কারণ অমৌলিক নহে—ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের উক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। নিম্নের উক্তিও উহারই যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে :—

(a) “To the bulk of the English people India was a remote, fantastic, almost inaccessible land to which adventurous poor young men went out, to return after many years very rich and very choleric old gentleman”.

(b) “Englishmen at home were perplexed when presently these generals and officials came back to make dark accusations against each other of extortions and cruelties”.—*The Outline of History*—H. G. Wells.

(“From the year 1833 the Governor-General had only to rule not to trade”.)

প্রাচীনকালে প্রতীচ্যের সহিত ভারতবর্ষ রেশম, মসলিন, মূল্যবান মণিযুক্তা, মশলা, হস্তিদন্ত ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় করিত, কিন্তু এই সময় হইতে ভারতের রপ্তানী দ্রব্য সবই কাঁচা মাল এবং ভারতে আগত পণ্যদ্রব্য সবই শিল্প-জাত দ্রব্য হইতে লাগিল। এই সকল ব্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষ কেবল মাত্র রুখি-প্রধান দেশ এবং বিলাত শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইল।

সর্বশেষ সনন্দ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। ইহার প্রধান পরিবর্তনদ্বারা ভারত-সরকারের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা পার্লামেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার পূর্বে এই সকল নিয়োগ ব্যাপারে ডিরেক্টরগণের স্বজন-পোষণ-নীতি প্রচলিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের এক শত বৎসর পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের রাজ্যশাসন-নীতি সমর্থন করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি হাউস অফ কমন্স-এ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি হাউস অফ লর্ডস-এ সুরক্ষা আবেদন-পত্র দাখিল করিলেন, কিন্তু উহা অগ্রাহ হইল এবং ঐ খ্রীষ্টাব্দেই পার্লামেন্টে “ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতর শাসনের জ্ঞান আইন” পাস হইল। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য ভাবে ইংলণ্ডের রাজশক্তি তথা পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীন হইল। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে গঠিত ক্ষুদ্র এক বণিকসংঘ রাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য উপহার দিল। এই সাম্রাজ্য-প্রাপ্তির গৌরব ব্রিটিশ রাজশক্তির নহে; কারণ রাজশক্তি ইহা অর্জন করে নাই। বণিকেরা বণিকবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়া কি ভাবে এবং কি উপায়ে ইহা অর্জন করিয়াছিল নিয়োক্ত উক্তির দ্বারা তাহা প্রকট হইয়া উঠে :—

“These successes were not gained directly by the forces of the King of England; they were gained by the East India Trading Company, which had been originally at the time of its incorporation under Queen Elizabeth no more than a company of sea adventurers. . . . And now this trading company with its tradition of gain, found itself dealing not merely in spices and dyes and tea and jewels, but in the revenues and territories of princes and the destinies of India. It had come to buy and sell, and found itself achieving a tremendous piracy. There was no one to challenge its proceedings. Is it any wonder that its captains and commanders and officials, nay even its clerks and common soldiers came back to England loaded with spoils? Men under such circumstances, with a great wealthy land at their mercy, could not determine what they might or might not do.”—*Outline of History*—H. G. Wells.

তাৎপর্য :—“ইংলণ্ডের রাজশক্তি দ্বারা এই সমুদ্র সাফল্য অর্জিত হয় নাই। রাজা এলিজাবেথের সময়ে অহুমোদন প্রাপ্ত সমুদ্র অভিযানকারীদের দ্বারা গঠিত একটি বণিক-সংঘ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যবসায়ী সংঘদ্বারাই—ইহা অর্জিত। অধুনা এই সকল বণিক অসীম লাভের মধ্যে উপলব্ধি করিল কেবলমাত্র মশলা, রং, চা, কিম্বা মণিযুক্তার ভিতরেই তাহাদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ নাই; ভারতের রাজ্য, রাজত্ব এবং ভারতের ভাগ্যেরও তাহারা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। ইহারা ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রচণ্ড লুণ্ঠনগুলির মধ্যে নিজদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের কার্যাবলীকে প্রতিরোধ করিবার কেহই ছিল না। ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে, সামরিক বেসামরিক পদস্থ

কর্মচারিবৃন্দ এমন কি সামান্য কেরানী, সাধারণ সৈনিকও বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ ইংলণ্ডে প্রত্যাভর্তন করিত। এই রূপ অবস্থা ও ঘটনাপ্রসঙ্গপ্রায় বিশাল ও ঐতিহাসিক দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া কোন্টি করণীয় এবং কোন্টি করণীয় নহে তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া কোন লোকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে।”

যে বণিক সম্প্রদায়ের প্রথম প্রাপ্ত ভূখণ্ড সুরাট বন্দর, প্রথম অধিকার মাদ্রাজ ও প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি ২৪ পরগণার জমিদারী, সেইরূপ একটি বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাপ্তি জগতের ইতি-হাসের অজ্ঞাতম বিচিত্র কাহিনী।

সন্তরণে স্বাস্থ্যরক্ষা

শ্রীশান্তি পাল

আমরা ভাঙার মানুষ হইলেও জলের সহিত আমাদের মিতালি সৃষ্টির প্রথম হইতেই আছে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় জলের উপর কাটিয়া যায়। জলের দৌলতে তাহারা তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে। স্ততরাং জলে বাস করিতে গেলে সন্তরণ-বিজ্ঞা ভাল করিয়া শিখিয়া রাখা একান্ত আবশ্যিক। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় মানুষ কখন হইতে সঁতার কাটিতেছে।

সেই আদিম বর্কর যুগে গিরি-গুহাবাসী মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী যেদ্রুপ ছিল তাহাতে আমরা সহজে ধরিয়া লইতে পারি যে, যখন তাহারা পাখর হইতে অল্প নির্গাণ করিয়া পশু-পক্ষী শিকার করিত, চকমকি ঠুকিয়া আঙন জালিত, বৃক্ষ-বৃকল ও পশুশল্য পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত তাহার পূর্বেই স্বাভাবিক সংস্কারবশে তাহারা সঁতার কাটিতে শিখিয়াছিল। কেননা, মানুষ জন্মের পর হইতেই যে কোন অবস্থায়ই চেষ্টা করে বাঁচিয়া থাকিতে। এই বাঁচিয়া থাকার জন্ত সে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিতে চায়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া মানুষ আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সন্তরণ সেই আদিম যুগ হইতেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে আজকাল সঁতারের অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন হওয়ায় ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। দেশে দেশে বালক-বালিকা প্রৌঢ়-যুবা সকলের মধ্যে সন্তরণের

অহুশীলন এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ দেখা দিয়াছে।



এক-হাতি পিঠ পাড়ি—লীলা হালদার

সঁতার বলিতে আমরা কি বুঝি? যে কৌশলের সাহায্যে মানুষ জলের উপর স্বচ্ছন্দে ভাসিতে, ঘুরিতে-ফিরিতে, এবং নিজেকে নিরাপদে পরিচালিত করিতে পারে সঁতার বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝি। এই সন্তরণ-বিজ্ঞা মানুষকে শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু জীবজন্তুদিগের মধ্যে ইহা সহজাত সংস্কার। শারীরবৃত্তবিদেরা বলেন যে, মানুষের শরীর জল অপেক্ষা লঘু। জীব-জন্তুর শরীরও তাই। তবে মানুষের বিপদ হইল তাহার মাথা লইয়া। শরীরের

মধ্যে মাহুঘের মাথার দিকটা নাকি জল অপেক্ষা আগ্নতনের অহুপাতে কিঞ্চিৎ ভারী।



বাঁক-ফেরের শেষ ভঙ্গী—লীলা হালদার

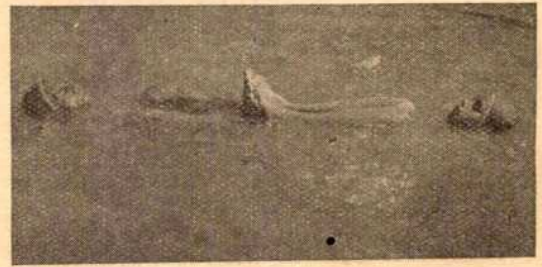
মাহুঘের দেহ জলে ছাড়িয়া দিলে তাহার মাথা এবং পা বুলিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে মাহুঘ তো বাঁচিতে পারে না, জল খাইয়া, পেট ফুলিয়া ও দম বন্ধ হইয়া মাহুঘের মৃত্যু হয়। সেইজন্ত কেমন করিয়া জলের উপর মাথা তুলিয়া, দেহটিকে ভাসাইয়া রাখিতে পারা যায় তাহা মাহুঘকে শিক্ষা করিতে হয়। ইহাই হইল সন্তরণের বর্ণপরিচয়। তবে অধিকাংশ জন্তুজানোয়ারদের সুবিধা হইল এই যে, তাহাদের শরীরের মাথার দিকটা মাহুঘের মাথার মত এতটা ভারী নহে। তাই তাহাদের জলে ছাড়িয়া দিলে মাথাটা জলের উপর স্বাভাবতঃই ভাসিয়া থাকে। সেইজন্ত তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে বা গ্রহণ করিতে কোনই কষ্ট হয় না।

জল-ক্রীড়ায় আনন্দ পাইতে গেলে ভাল করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। সেই সনাতন পদ্ধতির সাঁতার নহে—আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত সাঁতার। জলময় অঞ্চলে বাস করা অথবা যাতায়াত করিবার কথা ছাড়িয়া দিই, স্বাভাবিক দিক হইতেও সাঁতার কাটা একান্ত আবশ্যক। সন্তরণ অপেক্ষা ভাল ব্যায়াম আজ পর্যন্তও পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয় নাই। একথা বলিলে বোধ করি অত্যাশ্চর্য্য হয় না। শারীরবৃত্তবিদগণ বলেন যে, জলের উপরকার বাতাসে প্রচুর ‘অক্সিজেন’ আছে। সেই বায়ুমণ্ডলে নাকি রোগ-বীজাণুর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তবে এখানে জল বলিতে আমরা সমুদ্র, বড় নদী, হ্রদ, স্বচ্ছসলিলা প্রশস্ত দীর্ঘিকা প্রকৃতির নির্মল বারির কথা বলিতেছি—কাঁচা কুয়া ও এঁদো-পুকুরের জলকে বুঝাইতেছি না। সাঁতারে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম যথেষ্ট হয়।

সাঁতারের সময় প্রচুর অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া রক্তকে পরিশুদ্ধ করে, নির্মল করে, তাজা করে। সন্তরণ দ্বারা আর একটি সুফল লাভ হয়। সাঁতার কাটিলে শরীরের

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীগুলিতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং সেগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। সাঁতারে পায়ের ‘সোলিয়াস’ ও ‘গ্যাস-ট্রোক-নেমিয়াস’ সক্রিয় হওয়ায় পায়ের ডিম বেশ হুড়োল হয়। বুকের ‘পেকটোরালিস’ পেশীদ্বয় এবং বাহুর ‘ডেলটয়েড’ ‘টাই-সেপ্‌স’, ‘বাইসেপ্‌স’, ‘ক্লেক্সোরাস-ডিজিটোরাস’ প্রকৃতি পেশীগুলি বেশ পরিপুষ্ট হয়। শরীরের কোন চর্মরোগ হয় না। সাঁতারদিগকে অত্যন্ত ব্যায়াম অহুশীলনকারীদের তুলনায় অধিকতর দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সন্তরণে কোন বিশিষ্ট পদ্ধতিটি সাঁতারুর গ্রহণ করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় প্রথমেই ‘ফ্রল’ সাঁতার শিক্ষা করা সমীচীন। আমরা এই ফ্রল সাঁতারের নাম ‘মকর-পাড়ি’ বা ‘হামা-পাড়ি’ দিয়াছি। এই হামা-পাড়িতে কি অল্প পথ, কি দূর পথ স্বচ্ছন্দে সাবলীল গতিতে ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে যাওয়া যায়। আমরা পঞ্চাশ গজ হইতে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত জলপথ এই পদ্ধতিতে অতিক্রম করিয়াছি। ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। শচীন নাগ, মদন সিং, রাজারাম সাহু, প্রফুল্ল ঘোষ, দিলীপ মিত্র, হুগাদাস, লীলা হালদার, বাণী ঘোষ প্রভৃতি বিখ্যাত সন্তরণকুশলীরা এই হামা-পাড়িতে নৈপুণ্যের ফলেই বাংলার সন্তরণ-গৌরব অক্ষুর রাখিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সন্তরণ-অহুশীলন করিয়া অটুট স্বাস্থ্য, শক্তি ও দেহদোষের অধিকারী হইয়াছেন।



শান্তি পাল ও লীলা হালদার

এই সকল সন্তরণবিদের দ্বায় কুশলতা লাভ করিতে গেলে সাঁতারকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যাহারা ‘কম্পিটিশন’ বা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন তাহাদের এই নিয়মগুলি না মানিলে চলিবে না। প্রথমতঃ, হাত-পাড়ি বা পা-পাড়িগুলি সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। তারপর সন্তরণ-প্রতিযোগিতার জলপথের দূরত্বটি পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া ক্ষিপ্ততার চর্চা করা বিধেয়। এই সকল বিষয়ে নিজ নিজ সমিতির শিক্ষকদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সন্তরণ-প্রতিযোগিতার সময় কখনই মানসিক সৈর্য্য হারানো উচিত নহে। ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করিয়া

এরূপ গতিতে পাড়ি দেওয়া উচিত, যাহাতে সহজে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বেই যেন সঁতারের গতিবেগ মন্দীভূত না হয়, মধ্যপথে সে যেন হাঁপাইয়া না পড়ে। প্রতিযোগিতায় এই ভাবে গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া আগাইয়া যাওয়া অবশ্য খুবই কঠিন ব্যাপার; দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইহা আয়ত্ত হয়।



লেখক

দৌড়ের সময় দম ও শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো পর্যন্ত তাহার সদ্যবহার করা যায়। দমের অপব্যয়, অতি-ব্যয় ও অতিরিক্ত কার্ণণ—এই তিনটিই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের অন্তরায়।

আমরা অনেক প্রতিযোগিতায় দেখিয়াছি সঁতার প্রথমেই পুরা দমে সঁতার সুরু করিয়া দিয়াছে, ফলে লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বেই সে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আবার কখনও বা এমন একটি আশ্চর্যকর্মের 'সমাপ্তি' দিয়াও আশাহরূপ ফল পাইল না। ইহার কারণ কি? কারণ, শেষের দিকে জোর দিবে বলিয়া দমটি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সময় মত কাজে লাগাইতে পারিল না। অত্যাধ সঁতারের পূর্বেই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গেল। উক্ত দম সঞ্চয়কারীর 'ফিনিশ' বা সমাপ্তি দেওয়া হইল না। সঁতারের সবচেয়ে বড় গুণ হইল ধৈর্য। দ্বিতীয় গুণ গতির মান নিয়ন্ত্রণ, এবং তৃতীয় গুণ হইল কৌশল।

আর একটি বিষয় সঁতারের বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা উচিত। তাহা হইল পরিমিত আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম। জীবনীশক্তি উপাদান, দৈহিক ক্ষয়পূরণ ও উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন। খাওয়াগুলি টাটকা ও সহজপাচ্য হওয়া চাই। সঁতারের প্রাত্যহিক খাওয়ার মধ্যে কিছু কাঁচা

বা সিদ্ধ শাক-সবজী থাকিলে খুব ভাল হয়। আমাদের খাওয়া-দ্রব্যের ভিতর নিম্নলিখিত ছয় প্রকার উপাদান থাকিতে দেখা যায়, যথা (১) শর্করা জাতীয়, (২) আমিষ জাতীয়, (৩) স্নেহ জাতীয়, (৪) ধাতবলবণাদি,—‘সোডিয়াম’, ‘পটাশিয়াম’, ‘ক্যাল-সিয়াম’ ‘ম্যাগনেসিয়াম’ লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটিত লবণ, (৫) জল, ও (৬) ভিটামিন।

সঁতারের নিত্যকার খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত উপাদান-গুলিই যাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় থাকে, সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। শর্করা ও স্নেহ জাতীয় উপাদান শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী থাকিলে সেই অতিরিক্ত উপাদান অনাবশ্যক চর্কিতে পরিণত হইয়া পেশীসমূহের উপরিভাগে সঞ্চিত হয়। নিত্যকার সঁতার অভ্যাসে শরীরের অন্তঃস্থ চর্কি তেমন কিছু ক্ষতিকর হয় না বটে, কিন্তু কিছুদিন সঁতার অভ্যাস না করিয়া শরীরে অধিক মাত্রায় চর্কি জমিতে দিলে সঁতারের অল্প দিনের মধ্যেই সন্তরণ এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে অপটু হইয়া পড়ে। অধিক চর্কি শরীরকে শুষ্ক অস্থি হই করে না, ভারীও করে। ইহা সঁতারের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

সঁতারের পরিশ্রমের গুরুত্ব অহুযায়ী সাধারণ খাওয়া অপেক্ষা সামান্য বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সঁতারের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু অযথা কতকগুলি গুরুপাক খাদ্য খাইয়া পরিপাক-যন্ত্রকে পীড়িত করা কখনই উচিত



এলোপাড়ির একটি ভঙ্গী—লীলা হালদার

নহে। সঁতারের সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, যাহারা অত্যন্ত ব্যায়ামাদির চর্চা করেন তাহাদের জায় ততটা প্রচুর খাদ্যের আবশ্যক তাঁদের হয় না। স্থূলকায় বা মেদবহুল দেহ না হইলে সঁতারের পক্ষে নিত্য কিছু কিছু জুগ, ঘি, মাখন প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় নিরামিষ খাদ্য খাওয়া দরকার। আমিষ জাতীয় খাদ্য—ডিম, মাছ, ছানা, মাংস প্রভৃতি সঁতারের

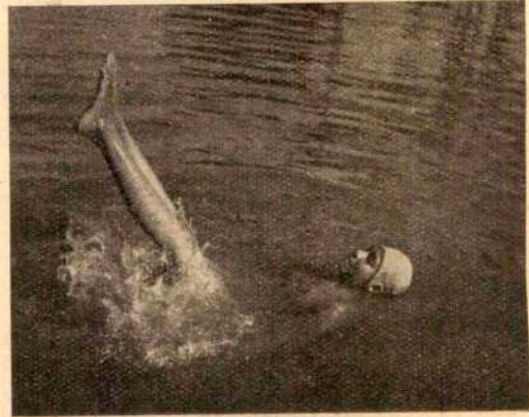
প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত নিজ নিজ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী খাওয়াই উচিত।

গোড়ার দিকে সঁতারের পক্ষে দেহের ওজন স্বাভাবিক ওজনের অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়। কারণ, অতিরিক্ত সঁতারজনিত ক্ষয়ে দেহ যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার। নানা প্রকার খাদ্যব্যা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন খাদ্যে বেশী পরিমাণে শর্করা 'কার্বোহাইড্রেট', কোন খাদ্যে বেশী পরিমাণে আমিষ 'প্রোটিন' আবার কোনটিতে বেশী পরিমাণে স্নেহ 'ফ্যাট' জাতীয় উপাদান আছে। দাল, কড়াই, ছোলা, মটর প্রভৃতি খাদ্যে কয়েক প্রকার লবণ ব্যতীত আমিষ ও স্নেহসার বা শর্করা জাতীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ আছে। দালে যে প্রোটিন জাতীয় উপাদান থাকে তাহা মাছ ও মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা অধিকতর ছুপাচ্য। এক পোয়া মাছ বা মাংস অথবা দুইটি ডিমের ভিতর যেটুকু আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে সেই পরিমাণ আমিষ উপাদান প্রায় দেড় পোয়া দালের মধ্যে থাকে। অথচ প্রথমোক্তগুলির যে কোনটি স্নেহকায় ব্যক্তি মাট্রেই অতি সহজেই খাইয়া হজম করিতে পারে; কিন্তু এক বা দেড় পোয়া দাল অতিবড় ব্যায়াম-বীরের পক্ষেও হজম করা অতিশয় কঠিন। ছোলা মুগ প্রভৃতি কড়াই জাতীয় খাদ্য অল্প জলে এক দিন ভিজাইয়া রাখিলে কল বা অল্পর বাহির হয়। সেইরূপ কলযুক্ত ছোলা বা মুগে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সঁতারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য।

সঁতারকে সকাল বেলায় সঁতার অহুশীলনের পর এক মুঠা কলযুক্ত ছোলা বা মুগ-ভিজা কিংবা আখের গুড় বা মধু মিশ্রিত করিয়া খুব চিবাইয়া খাইতে হইবে। বাজারের প্রস্তুত ভেজাল দি-তেলে ভাজা কোন খাবার ভুলেও খাওয়া উচিত নয়। প্রাত্যহিক আহারের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মাত্রায় জল খাওয়া অহুচিত। দুই-এক ঘণ্টা পরে যত খুশী জল পান করা চলে। তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিত-কর। কাগজী বাদামের সরবৎ কিংবা কাঁচা ছুধ মিশাইয়া সস্তরগ অহুশীলনের অব্যবহিত পরে খাইতে পারা যায়। কিম্বা নিজের রুচি ও ধাত অনুযায়ী 'এগাকলিপস'—এক পোয়া হইতে আধসের গরম ছুধে একটি কাঁচা মুরগীর ডিম ভাল করিয়া ঘুটিয়া—খাওয়া চলে। মাখন-মিছরি, টোষ্ট বা মোহন-ভোগ জাতীয় খাদ্যও নিষিদ্ধ নহে। তবে যি মাখন যেন ভেজাল না হয় এবং অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া না হয়।

সঁতারের আহার্যের নিত্য পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা সস্তরগ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বিশেষ করিয়া তাহারা যেন এই সকল নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে। প্রতিযোগিতার দিন তাহারা যেন উদরপূর্তি করিয়া আহার্য গ্রহণ না করে। প্রতিযোগিতায় নামিবার অন্ততঃ

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্বে প্রতিযোগী তাহার নিত্যকার আহার সমাধা করিয়া লইবে। সিগারেট, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি একেবারে বর্জন করিতে পারিলে সঁতারের পক্ষে ভাল হয়। মাদকদ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।



দোনলা জাহাজ—বাহারি-সঁতারের একটি ভঙ্গী

সঁতারের খাদ্য সম্পর্কে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, ব্যায়াম সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অবহিত হওয়া দরকার। শারীরবৃত্তবিদগণ বলেন যে, ব্যায়ামে মাংসপেশীর দেহযন্ত্রে যুগ্ম দহনক্রিয়া সুরু হয়, ফলে পেশীতে বেশী পরিমাণে 'কার্বন ডায়কসাইড' সঞ্চিত হয়। ঐ গ্যাস রক্ত প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শ্বাস-যন্ত্রে যায়। সেখান হইতে তাহা নিশ্বাসরূপে বহির্গত হয়। সন্ধে সন্ধে বায়ু হইতে অক্সিজেন দ্বারা শ্বাস-যন্ত্র পরিপূরিত হইয়া উঠে, এবং সেখান হইতে তাহা রক্তপ্রবাহদ্বারা সমস্ত শরীরে চলাচল করে। এই কার্বন ডায়কসাইড গভীর ও বন ধন নিশ্বাসের সহিত দ্রুত নির্গত না করিলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তের মধ্যে বিঘক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যায়ামের পর পেশীগুলি অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ ও পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। জলে থাকার জন্ত এই উত্তাপবৃদ্ধি সাধারণতঃ বুঝিতে পারা যায় না। আনন্দের আধিক্যবশতঃ বেশীক্ষণ সঁতার কাটিলে শরীরও অজ্ঞাতদ্বারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সঁতারের পক্ষে প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার, রিং, বারবেল, ডাম্বল প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়ামের চর্চা নিষিদ্ধ, সস্তরগ-কুশলতা লাভ করিবার ও সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা কেবলমাত্র সঁতারের দ্বারাই লাভ করা যায়, সেজন্ত অল্প ব্যায়ামের চর্চা অনাবশ্যক। তবে শীতকালে প্রতিদিন বেশ খানিকটা জোরে

হাঁটা, একটু আধটু লাফ-ধাঁপ দেওয়া, আঙুলে আঙুলে দৌড়ান, অথবা সুবিধা থাকিলে নৌকায় দাঁড়টানা—এই ধরনের



লীলা হালদার

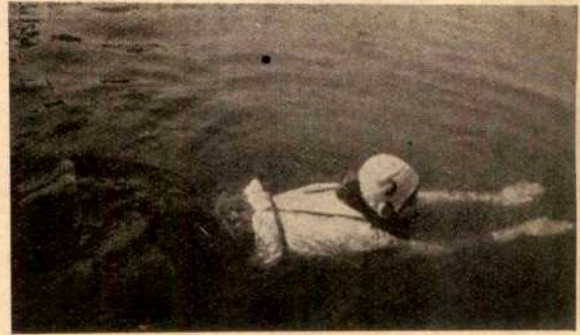
কিছু কিছু ব্যায়ামের চর্চা করা যাইতে পারে। সীতারুর শরীরের পেশীগুলি রবারের মত স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লঘু ব্যায়ামে শরীর খুব কশ্মঠ থাকে এবং শীতাস্তে নূতন শক্তি ও আগ্রহে পুনরায় সীতার অস্থূললন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে নিত্য স্নানের পূর্বে সরিষার তৈল মর্দন করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। সীতারুর সীতার অস্থূললনের সময় সঙ্গন্ধেও নিয়মাবলী মানিয়া চলা উচিত। প্রতিদিন একই সময়ে নিজের শক্তি ও দম অস্থায়ী পরিমিত মাত্রায় সীতার কাটা আবশ্যক। যে কোন সময়ে ও অপরিমিত মাত্রায় সীতার কাটা এবং অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘকাল জলে পড়িয়া থাকা এই সমস্তই স্বাস্থ্যের পক্ষে সমান ক্ষতিকর।

নিদ্রার কারণ সঙ্গন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কম হইলে ঘুম আসে। আমরা যখন জাগ্রত থাকি বা চিন্তায় মগ্ন থাকি তখন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত বেশী হইতে থাকে এবং সে সময় শরীরের অঙ্গ স্থানের রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত অবস্থায় ক্রমাগত বহির্জগতের সংস্পর্শে আসায় ও পেশীসমূহকে ক্রিয়ামূলক রাখিতে রাখিতে দিনান্তে মস্তিষ্ক অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে মস্তিষ্কে পূর্বের মত রক্ত যায় না এবং ইচ্ছা না থাকিলেও ঘুম আসিয়া পড়ে।

সীতারুর ঘুমের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

সীতারুর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিতে একমাত্র সুনিদ্রাই পারে। সুনিদ্রাই শরীরকে ক্লান্ত অবস্থা হইতে পুনরায় চাঙ্গা ও কশ্মঠ করিয়া তোলে। রাতিকালে আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে এবং মধ্য রাত্রে অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যা গ্রহণ করা স্বাস্থ্যপ্রদ। স্বর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্তরগে-প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে দিবানিদ্রা যেমন পরিবর্জনীয় তেমনি রাতিকালীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা বাঞ্ছনীয়। সীতারনবিশ দৈনন্দিন সীতার অস্থূললনের পর অন্তত পক্ষে অর্ধ ঘণ্টাকাল সমস্ত শরীরকে এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করিবে। এমন কি এ সময় কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করাই সমীচীন। এই নিয়মটি প্রতিপালন করিলে সীতারুর শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

সীতারুর সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, সাত-আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াও যদি সে বুঝিতে পারে যে, শরীরের অবসাদ বা গ্লানি সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই তাহা হইলে সেই দিন তাহার প্রাত্যহিক সীতার অস্থূললন একেবারে বন্ধ রাখা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনই জলে নামা বিধেয় নহে। ইহার অঙ্গাধার করিলে সীতারে দক্ষতালাভ বা ক্ষিপ্ততাবৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা বরং বিপরীত ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ডাঙায় অর্ধ ঘণ্টাকাল ব্যায়ামচর্চা



বাকফেরের একটি ভঙ্গী—লীলা হালদার

করিলে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয় তাহার চতুর্গুণ হয় এই পরিমাণ সময় সত্তরগে। সত্তরগে অত্যন্ত ব্যায়াম অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যাই। তাহার ফলে জড়তা আসে, স্নায়ুগুলি ঝিমাইয়া পড়ে। আবগাহন জানে স্নায়ুগুলি শীতল হওয়ার স্বভাবতই মাহুসকে যেমন কর্তে উদ্যমশীল করে তেমনি কখনো তাহার সুনিদ্রা লাভেরও সহায়তা করে। সত্তরগে মাংসপেশীর অত্যধিক সঞ্চালনের জন্ত শরীরে নিত্য-সঙ্গাত আবর্জনারাশি ধর্ম ও নিষ্যাসের মধ্য দিয়া নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়।

সংঘাত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভ্রাতৃপুত্র মিহিরবিকাশের উপনয়ন নিরীক্সে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের পরের দিন—চারিপাশে উৎসবের আবর্জনা কমিয়া বাড়ীটাকে বড়ই মলিন করিয়া তুলিয়াছে। মিহির ব্রহ্মচারী অবস্থায় একক এক কক্ষে বাস করিতেছে। যাহাকে যিরিয়া এতদিন উৎসব চলিয়াছে সে আজ নির্বাসিত, তাই মনটা বস্তাবতঃই কেমন যেন একটা অশুভি অশুভব করে।

বৈঠকখানায় বসিয়া তিন ভাই আড্ডা দিতেছিলাম—যে অমুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইল কিনা তাহাই বিতর্কের কথা। ছানার কালিয়াটা আর একটু ঝাল হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত কিনা এই সভায় তাহাই হিরীকৃত হইতেছিল। যাহাই হউক প্রতিবেশীরা প্রত্যক্ষে অন্ততঃ কোন ক্রটি ধরেন নাই ইহাই পরম পরিতোষের বিষয়।

বড়দারই ছেলে মিহির। বড়দা সহসা বলিলেন—যাক্ এবারটা ঠিক মনের মত হয় নি, মিহিরের বিয়ের পরে বোভাতটা যা দেব তাতে আর কিছু বাকি রাখবো না। মিষ্টিই অন্ততঃ দশটা পদ থাকবে—

বীরে বীরে মিহিরের বিবাহের বোভাত কিরূপ হইবে এই প্রশ্ন ক্রমে বো কি রকম হইবে এই প্রশ্নে রূপান্তরিত হইল। বড়দার কনে নির্বাচন ব্যাপারে আমার কোন আস্থা ছিল না তাই বলিলাম—বোভাত কেমন হুবে তা না হয় ঠিক ক'রো কিন্তু বোমাটিকে আর তুমি ঠিক করতে যেও না। ওটা আমার হাতেই দিও। দুটো বিয়ে ত দিলে তাতেই তোমার সব পরিচয় পাওয়া গেছে।

দুইটি বিবাহ বলিতে আমার ও মেজদার বিবাহ—এই দুইটিই যে খুব সুখের হয় নাই এ অভিযোগ আমরা উভয়েই করিয়া থাকি, সম্ভবতঃ সকলেই বিবাহের কর্তৃপক্ষকে এরূপ বলিয়া থাকে। মেজদা আমাকে তাই অল্পমোদন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, ওটা তুমি পারো না। যেহেতু দেখে শুনে আনার ভার আমাদেরই রইল।

বড়দা হাসিয়া বলিলেন—শিক্ষিতা, ছ'চারটে পাসকরা বো নিয়ে যে সকলেই স্বর্গমুখ ভোগ করছে এমনও ত মনে হয় না। সুখশান্তি ভাগ্য—

—ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবে বাজারের হিসাবটা অন্ততঃ রাখতে পারে কিনা, চিঠির ঠিকানা লিখলে যথাস্থানে পৌছায় কিনা এটা দেখে ত ঠিক পাওয়া যায়।

বড়দা বলিলেন—ধাম, সবই দেখা গেছে—প্রজাপতি-নির্বিজ্ঞ সবই।

আমি বলিলাম—তা হোক, মিহিরের বো অন্ততঃ বি-এ পাস না হলে হবেই না, সেই সন্দেহ দেখতে হবে মা-লক্ষ্মীটি একটু গান জানবে, একটু সেতার বাজাতে জানবে। সংসারের সমস্ত ধবরদারী করতে হবে ত। সে যখন সংসারের বড়বো—

বড়দা বলিলেন—ওসব হয় হোক, কিন্তু যখন সন্ধ্যায় আমার আফিঙের নেশাটা জমবে তখন বোমাটিকেই ত কল্কে ভরে দিতে হবে। ওরা ত কোঠির মতে বহু আগেই সরে পড়ছেন—

মেজদা কহিলেন—না, তোমার আইডিয়াটাই বড় ইন্ডিসেন্ট। এজুয়েট বোমা সে তোমার তামাক সাক্বে, চাকর থাকুক না একটা। ছেলে যখন সাতাশ বছর বয়সে এক হাজার টাকা রোজগার করবে, তখন চাকরই ত থাকবে—

—ওইটেই ত বুঝলে না। ঠাকুর ত একটা আমিও রাখতে পারি কিন্তু তোমার বোদি তবে রাখেন কেন? ওতে তৃপ্তি নেই, তা হলে হোটেলের বাদ করা আর সংসার করা এক কথাই হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলিলাম—না, ওসব হবে না। বরং বোমা সন্ধ্যায় নিত্য গান শোনাবে, শুনতে শুনতে ঝিমিও, এটা তবু যেন মানায়—

বড়দা সহসা অজমনক হইয়া কহিলেন—তত দিন কি আর বেঁচে থাকবো? ধর আরও পনয় বছর। পঞ্চায় বছর—এত আয়ু ত আমাদের বংশে কারও নেই। আর বিয়ে দিতে যেতে পারবো না,—তোমরাই ত দেবে—

আলোচনার কথাটা ক্রমে গুরুত্ব লাভ করিল—প্রসঙ্গ হইল শিক্ষিতা বধু সংসারের পক্ষে ভাল না স্বল্পশিক্ষিত বধুই ভাল। বড়দা ভাগ্যবাদী, তাঁহার কোন মতামত নাই। মেজদা ও আমি শিক্ষিতা বধুর পক্ষপাতী। আমি বলিলাম—বোমা সংসারের ম্যানেজার হবে, শিশুগণের শিক্ষার ভার নেবে, হিসাবপত্র রাখবে—

বড়দা বলিলেন—বেশ, তবে কষ্ট করে ছেলে মানুষ করলাম তার লাভটা কি? যদি বুড়োত্বয়সে সেবা-শুক্রযাই একটু না পেলাম।

—সেটা পাবে বই কি? তবে তামাক সাক্কা নয়—

বাড়ীর ভিতরে আহারের ডাক পড়িল, আলোচনাটা তখনও চলিতেছিল। বড়বোদি কহিলেন—হ্যাঁ, বি-এ পাস বো আন, আর আমাদের খেয়া করুক, আমরা ওসব চাই না। এমন বো আনতে হবে যে সংসারের কাজে লাগে—

এমন আলোচনা আজ নূতন নয়, বহু দিন বহু ভাবে হইয়া গিয়াছে। মিহির বহু টাকা পাইবে এবং আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আফিং বাবদ যথেষ্ট পেনসন দিবে এটা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল, এখন বোমাকে লইয়াই গোলযোগ। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম শিশুর নখের উপর পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। আমাদের জীবনের যত ব্যর্থতা তাহা যেন মিহির ও তাহার পত্নীর চারি পাশ, যিরিয়া সার্থক হইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—তাই এই আলোচনা নিত্যই আমরা

করিয়া থাকি এবং এই আলোচনার মাঝেই যেন জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণ হইয়া উঠে।

দিন চলিয়া যায়—ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় সেদিন যে শিশু ছিল আজ সে কেমন ভদ্রলোক হইয়াছে। মানুষ যেন বাইশ বছর পর্যন্ত পরিবর্তনশীল, তাহার পরই অকস্মাৎ এক দিন সে বৃদ্ধ হইয়া যায়। মিহিরও দেখিতে দেখিতে যুবক হইয়া উঠিল, পাস করিল এবং কোষ্ঠির মতামতায়ী হাজার না ইউক ষাচ শত টাকা বোজগার করিবে। সে ইঞ্জিনিয়ার—বিস্বারের লোহকারখানার চাকুরীর সংবাদ আজই মাত্র আসিয়াছে—

মনে মনে একটু ক্ষোভ না ছিল এমন নয়। ধর-সংসার করি, দেখ-মমতাও আছে তবুও পত্নী যথেষ্ট শিক্ষিত নয় বলিয়া একটা ক্ষোভ হয়ত নির্জান মনে আছে, তাই মিহিরের জীবনে বি-এ পাস বোমা আরোপ করিয়া আমরা আনন্দ পাইতে চাই। আমি চাই বোমাটিকে সঙ্গীতজ্ঞা ও সুর্য গৃহকর্তা রূপে, মেজদা চান তার নথিপত্র ঠিকঠাক গোছাইয়া রাখিতে, আইনের কেতাব ঠিকঠাক আনিয়া দিতে, বড়দা সন্ধ্যার সময় চান এক ছিলিম তামাক, আফিঙের তল্লাকে মধুরতর করিতে। মিহিরের কর্মক্ষম হইবার সঙ্গে আমাদের মাথা শাদা হইয়া উঠিয়াছে।

মিহিরের এইবার বিবাহ দিতে হইবে—

বৈঠকখানায় আবার তেমনি আলাপ হইতেছিল। বড়দা বলিলেন—এবার তা হলে মেয়ে দেখো। আমার পছন্দ ত বারিষ্ক হয়ে গেছে, এবার তোমরা—

মেজদা কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার ও তামাদি হয়ে গেছে, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে—বি-এ পাস ত চাই—তা ছাড়া গানবাজনা জানা, দেখতে সুন্দরী—

আমি বলিলাম—সর্বদা দেখতে হবে, বনেদি বংশ কি না। হঠাৎ-বড়লোক বংশকে বড় ভয় করি—তাদের মত সঙ্গীর্ণ মন আর হয় না—

—সেটা ত নিশ্চয়ই,—আর তোমাদের বৌদিদিদের যদি কিছু করমাইল থাকে—

আমি কহিলাম—বিবাহ ঠিক হচ্ছে এ সংবাদটা মিহিরকে জানিয়ে, আজকালকার ছেলে, মতামত নিয়ে তবে মেয়ে দেখলে হয় না—বড়দা গড়গড়ার নল ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—আমার ছেলে আমি বিয়ে দেব, তোমাদের ভাই-পো তোমরা বিয়ে দেবে—এতে আবার তার মতটা কি?

—কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মত যদি বলে বসে ব্যাচিলর থাকব—

—থাকলেই হ'ল, টাকা পয়সা খরচ করে মানুষ করলাম, আর বিয়ে করার মত সহজ কাজটা করেও ছেলে আমাদের উপকার করকেন না—বেশ।

মেজদা কহিলেন—ওটা ক্যাসন হয়েছে কিনা। যাই হোক, ছোটবোকে দিয়ে জানিয়ে দাও যেন ছুটির যোগাড় রাখে, বিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়দা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—থাম্ হরি থাম্, টাকা ত চাচ্ছি না—আমরা, বিয়ে করে বৌ এনে দিতে বলছি—বৌ না হয় নাই সে চাইবে—কয়েকটা মল্লই না হয় সে দয়া করে পড়ে দেবে।

মেয়ে দেখা আরম্ভ হইল।

মেজদা তাঁহার প্র্যাক্টিস ফেলিয়া ছুটেন, আমি চাকুরী ফেলিয়া ছুট। বড়দা মোতাত ফেলিয়া চিঠি লেখেন। এমনি ব্যস্ততার মধ্যে একদিন অকস্মাৎ পত্র আসিল—

মিহির লিখিয়াছে—আমাদের আদেশে সে সব কাজই করিতে প্রস্তুত কিন্তু ঐ বিবাহটা ব্যতীত। যদি প্রয়োজন হয় সে ব্যবস্থা সে নিজেই করিবে। আমাদের ব্যস্ত হইবার কিছু নাই।

বড়দা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—আমার ছেলের বিয়ে ব্যস্ত আমি হব না—সে হবে? ওসব কিছু না—তোমরা ঠিক করে ফেল কান ধরে নিয়ে এসে বিয়ে দেব।

আমরা সমস্ত আশঙ্কা করিয়া মিহিরকে দীর্ঘ পত্র দিলাম। কিন্তু চিরবাধ্য মিহির দৃঢ়ভাবে তাহাও অধীকার করিল। তাহার কি যুক্তি আছে সে-ই জানে।

বড়দাকে সংবাদটা স্পষ্টতঃ বলিলাম না কিন্তু ঘুরাইয়া বলিলাম। বড়দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিল,—আর ক-বছর? না হয় পাঁচ বছরই বাঁচব, সেটাও যদি সারা জীবনের মতই যায়—তাতেই বা আর অভিযোগ কি?

মেজদা ক্ষণেক বসিয়া থাকিয়া কহিলেন—আমারও হয়ত আর ছ-চার বছর আছে। বোজ সন্ধ্যায় ভাবি কি জান? বোমা টেবিলে চা দিতে যাবে, আমি বলব, বোমা রেজিষ্ট্রেশন এক্ট দাও ত। আবার বলব—বোমা এডিভেল এক্ট। এই সামান্য জিনিষটা জীবনে হবে না মনে করে যেন মনে হচ্ছে জীবনটাই যুগ। ঐ একটা আকাজক্ষা নিয়েই যেন বেঁচে-ছিলাম জীবনে—আমার ত ছেলে নেই।

আমার মনের গহনে সন্ধান করিয়া দেখিলাম—সন্ধ্যায় গানের আসরটি হবে না মনে করিয়া যেন জীবনটাকে ব্যর্থ মনে হইতেছে। আশ্চর্য্য! আমরা কি জীবনে অমনি এক একটা ক্ষুদ্র আশাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছি—নিজের জীবনের অতীতে অজ্ঞের জীবন ঘেরিয়া আপনার আকাজক্ষাকে আরোপ করিয়াছি এবং তাহাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছি?

জীবনটার মাঝে গভীর দৃষ্টি দিয়া দেখিলে যেন তাহাকে সত্যই খুব রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়—রঙীন কাচের মাঝ দিয়া ছেলেমেয়েকে আমরা যেন কত সুন্দরই দেখি। ভাবিতে ভাবিতে বড়দার প্রতি কল্পনা হয়।

হঠাৎ মেজদার অস্থখ হইল এবং দুই-তিন দিনের মধ্যেই

চিকিৎসকগণ গুরুতর বলিয়া যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অসুস্থতা গুরুতর হইলেই তাহার কলাকল অমোঘ হইতে পারে, তাই মেজদা যেন বড়ই ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহার একটা ধারণা হইল যে এবার তাঁহার রক্ষা নাই, জীবনের এই শেষ রোগ।

মাঝে মাঝেই মেজদা বলিতেন—সকলকে টেলিগ্রাম কর, একবার দেখে যাই। মিহিরকে টেলিগ্রাম কর।

কিন্তু একদিন মেজদার অবস্থা সত্যি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল এবং আমরা তাঁহার ইচ্ছামত টেলিগ্রামও করিলাম।

মেজদা মাঝে মাঝে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছিলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, কি?

দাদা বলিলেন—মিহির এসেছে?

—না, সন্ধ্যার গাড়ীতে আসতে পারে।

একটু ধামিয়া কহিলেন—বোঁমাটিকে আর দেখে যেতে পারলাম না।

মনে হয় ঐ একটা মাত্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে, কিছুতেই বাহির হইতেছে না। পরের মেয়ে ঘরে আসিবে, ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, তথাপি কি হুজুহ আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন একটু বিকল বলিয়া মনে হইল, মেজদা তজ্জাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, তবে ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে ভয়ের কিছু নাই। হঠাৎ মিহির আসিয়া উপস্থিত হইল, অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহার নিজাভঙ্গ করিতে নিবেদন করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দাদা জাগিয়া পানীয় চাহিলেন—পানীয় দিলাম এবং ইঙ্গিতে মিহিরকে নিকটে ডাকিলেন। মিহিরের কোলের উপরে হাতখানি রাখিয়া দাদা চুপ করিয়া রহিলেন—বোগপাণ্ডুর মুখের কোটরগত চক্ষু দুইটি যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন—মিহির, তোর বউ দেখতে পেলাম না বলেই যেন প্রাণটা বেরুচ্ছে না—

বড়দার চক্ষুও সজল হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বলিলেন—না না, তুই সেরে ওঠ, মিহির নিশ্চয়ই বিয়ে করবে—

মিহির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল মাত্র—কোন জবাব দিল না।

যাহাই হউক মেজদা আরোগ্য লাভ করিলেন।

মিহির বাড়ী হইতে যাইবার আগে নাকি বলিয়া গিয়াছে বোঁমার জন্তে যদি প্রাণটা আর কিছুদিন আটকে থাকে, ছ'চার বছর বেঁচে থাকেন সেইটেই ত লাভের।

বাঙালীর ছেলে কোন দিনই নিজের জ্ঞাত বিবাহ করে না, নেহাৎ বাপ-মায়ের জুতাই করে। মিহিরও তেমনি একদিন আমাদের জন্তই বিবাহ করিতে রাজি হইল—সঙ্গে সঙ্গে

আমিও কনে দেখিতে লাগিয়া গেলাম এবং বি-এ পা মেয়েও পাওয়া গেল।

আমি কনে দেখিতে গেলাম।

সত্যি সুন্দরী, বি-এ পাস করিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাস করিবার কি আছে, তবুও কড়াপক্ষের ইচ্ছায় তাহার সেতা বাজনা শুনিলাম। আসিবার আগে মালম্ভীকে ডাকি বলিলাম—মালম্ভী কি বা বলব। তোমাকে ঘরে নিজে পারলে সত্যিই খুশী হব। আমাদের ঘর-সংসারের সঙ্ক কথাই হরত শুনেছ, তোমার শস্তর তিন জনও শিক্ষিত যদি নেহাৎ সেকলে।

মেয়েটি সামনে একখানা তক্তাপোষে বসিয়া আছে, কথারি শুনিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া যেন একটু হাসিল।

—তোমার যে তিনটি শস্তর হবে তাদের জন্তে তোমা কিন্ত যথেষ্ট হুজুহ কর্তব্য আছে, এই তিনটি অর্থ বৃদ্ধির জন্তে তা কি করতে পারবে?

কড়াপক্ষের অনেকেই বলিলেন, নিশ্চয়ই পারবে, সেব পরায়ণতাই ওর বিশেষ গুণ।

আমি বলিলাম—তা নয়, মীর মুখেরি শুন্তে চাই মেয়েটি শ্রিতহাস্তে কহিল—

—না কেনেই যখন বললে—পারবো তখনই সন্দেহ কর্তব্য হুজুহ—তোমার যিনি আপন শস্তর হবেন, তাঁর বি-এ পাস বোঁমার হাতের এক ছিলিম তামাক খাবেন—চাকরের হাতের তামাক আর ভাল লাগে না। মেজ শস্তরে ইচ্ছা তাঁর আইনের বই তুমি এগিয়ে দেবে, আর আমার ইচ্ছা সন্ধ্যার তুমি গান শোনাবে,—এত বদখেয়াল কি তুমি এ সামলাতে পারবে?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে মেয়ে শ্রিতহাস্তে সলাজ কণ্ঠে কহিল—পারব।

—ব্যস, তবে ত আর অন্তরায় নেই। হ্যাঁ, তবে ভর তোমার এই যে এ বৃদ্ধো তিনটে খুব বেশীকাল ধরাধ থাকবে না।

খেজায় সে জবাব দিল,—থাকবেন বৈ কি?

সানন্দে কিরিয়া আসিলাম এবং এক শুভদিনে শুভমুহু বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

• আগ্রহের আতিশয্যে নব-বধূমাতাকে দ্বিরাগমনের অবিলম্বেই আনা হইল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তা অবাধ্য কর্তব্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বড়দা তাহ ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—বোঁমা, তোমার প্রথম কর্তব্য জানো? যার জন্তে বেঁচে আছি—সন্ধ্যার সময় যখন আঁকি ঝিমটুই বেশ জমে ওঠে তখন তোমাকে ছিলিম দিতে হবে আমি থাকবো—পারবে? কেমন করে কি ক হয় আজ শিখে নেবে—কেমন?

বোমা বলিল, হ্যাঁ, পারব বই কি।

মেজদা বলিলেন—তোমার আইডিয়াটা বড় ইনডিসেন্ট।
তামাক রাস্মা সাজবে বরং বোমা অস্ত্র কিছু করুক না।

বড়দা একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—তা যদিও একটু
বেমানান হয়—তা—আচ্ছা তুমি কাগজ পড়বে আমি
সুনবো—

বোমা একটু হাসিয়া কহিল—কেন? তামাক সাজলে ত
অপমান নেই কিছু—

মেজদা কহিলেন—না থাক, ওটা ভাল দেখায় না—হ্যাঁ,
সন্ধ্যায় আমার এক কাপ চা দেবে আর ডাকলেই আইনের
বই বের করে দেবে। এস লাইব্রেরিতে, কোণায় কি আছে
দেখিয়ে দিতে হবে ত।

আমি বলিলাম—তাই করো না কেন; বোমা যখন গান
করবে তখন কিন্তু ডাকতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি—

—আচ্ছা, তা—হবে—

আমাদের দাবি জানানো হইয়া গেল—বোমা স্মিতহাস্তে
লের প্রস্তাবই গ্রহণ করিল। কয়েক দিন পরে—

বোমা বড়দার নিকটে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা
নু ক্রিতে ক্রিতে ডাকিলেন, বোমা এন্ট্রিডেন্স এন্ট্রি-
খানা দাও ত?

বোমা বই দিয়া পুনরায় কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা উঠিয়া
আসিয়া কহিল—দাদা, তোমার কি অস্ত্রার বল ত। ছেলে-
মানুষ, এত বড় একখানা কাগজের আগাগোড়া মায় বিজ্ঞাপন
পর্যন্ত তোমাকে পড়ে শোনাতে হবে, এ কি ও পারে?

বড়দা বলিলেন, ও, তাই ত, আচ্ছা, তবে—

মেজদা বলিলেন, এস বোমা, আমার ধরে বসে বই পড়,
বইটাই এগিয়ে দেবে—

বোমা একটু হাসিয়া মেজদার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল,
বড়দা করুণ ভাবে একটু চুপিয়া থাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা,
আমিই পড়ছি কাগজ, কাগজে কিছু থাকে না—

মেজদার ধরে বসিয়া বোমা কি যেন একটা সেলাই
করিতেছিল, মেজদা বলিলেন—রেজিষ্ট্রেশন এন্ট্রিখানা দাও ত—

বোমা ভারী বইখানা দাদার টেবিলে রাখিয়া আবার
সেলাই করিতে বসিতেছিল আমি বলিলাম—মেজদা, বোমা
ছেলে, মানুষ, সত্যবড় কাগজখানা যদি সে না পড়তে পারে
তবে ওই আশ্রমণ বইগুলো টেনে আনতে পারে? এস
বোমা, ওসব তোমার দরকার নেই তুমি গান করবে এস।

মেজদা একটু হাসিয়া বলিলেন—তা যাও বোমা,
বইগুলো সত্যিই বড় ভারী।

বোমা হাসিয়া কহিল—চলুন।

আমি বলিলাম, এই কি একটা ব্যবস্থা, সকলে এমন টানা-
টানি করলে কি ছেলেমানুষের প্রাণ বাঁচে—এক মুহূর্ত অবসর
নেই।

মেজদা বলিলেন, আচ্ছা যাও, যাও বোমা, তবে চা-টা
তুমিই দিও।

মোটের উপর বোমাটির অবসর রহিল না। তিন শতকের
আকারের অস্ত্র নাই, শাশুড়ীগণের চিঠিপত্র লিখিতে হয়, বড়-
গিন্নীকে মহাভারত শুনাইতে হয়। আমার একটু ফুলবাগান
ছিল, বোমার নিকটে না শুনিয়া যেন গাছ লাগানো সম্ভব হয়
না। কিন্তু বোমাটি আমাদের হাসিয়া সকলেরই আদেশ
পালন করে, কোন ক্ষোভ নাই, বিরক্তি নাই, আলস্য নাই।

সে শিক্ষিতা—হয়ত সে জানে, বোঝে যে এই বাড়ীর
প্রাণীগুলি মিহিরকে বিরিয়া যে স্বপ্ন রচনা করিয়াছে আজ
বোমাটির কাছে যেন তাহা পাইতে চাহিতেছে। তাহার
সাহচর্য্য তাহার সান্নিধ্য যে বাড়ীখানির সঙ্গে একটা আনন্দ ও
সুখাবেশের প্রলেপ দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে
এই কাড়াকাড়ি, এই একটু সেবা ও সান্নিধ্য পাইবার আগ্রহকে
সে যেন অন্তর দিয়া দেখিয়াছে তাই তাহার ক্রান্তি নাই—
আপনাকে বিলাইয়া দিয়া সে সকলকেই খুশী করিয়াছে,
করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত জানে, জীবনের শত ব্যর্থতা
শত বেদনায় পছ এই বৃদ্ধ অন্তরগুলি যেন তাহারই অপেক্ষায়
বাঁচিয়া আছে—তাই তাহারও কার্পণ্য নাই।

বড়দা বলেন—মা আমাদের সাম্রাজ্য লক্ষী, জগদ্ধাত্রী।
মেজদা বলেন, অভয়দাত্রী, আজকাল যে সওয়াল-জবাব করি,
একবার শুনে এস—বোমা বই দেখ, আমি পড়ি—আর কি
মামলায় হারি করবও। বোমা আসবার পর পচা মোকদ্দমাও
তাজা করেছি—আয় বেড়েছে কত।

আমি শুধু বলি, আমার বাগানে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে
দেখ—নাইট্রোট, এমোনিয়াম সালফেট দিয়ে যা হয় নি—

আমরা যেন বোমার সান্নিধ্যের মাঝেই জীবনের পরিপূর্ণতা
পাইয়াছি—

মিহির পত্র দিয়াছে।

বাসার ঠাকুর পলাইয়াছে, চাকর চুরি করে। খাওয়া-
দাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি কিন্তু কি হইলে যে এ
সমস্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে তাহা কিছুই জানায় নাই।
আমি বড়দাকে বলিলাম—মিহিরের বিদেশে কষ্ট হচ্ছে,
বোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে—

বড়দা একটু ভাবিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, দরকারই ত।

মেজদা বলিলেন—না না, খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট হ'লে স্বাস্থ্য
টিকবে কেন? তা ত বটেই—

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাদের মত বুড়োদের আশ্রয়
রক্ষার জন্তেই ত ওদের জীবন নয়, ওদেরও ত সাধ-আশ্বাদ
আছে—

বড়দা একটা দীর্ঘশ্বাস কেলিয়া কহিলেন—হ্যাঁ পাঠিয়েই
দাও।

কথাটা জানাজানি হইল। বৌমা কহিল—থাকি না আরও কিছুদিন, আপনাদের বড় কষ্ট হবে যে।

বড়দা একটু হাসিয়া বলিলেন—এতদিন সে কষ্ট যে দেখেছে সে-ই এখনও দেখবে মা, তাই বলে কি মিহির কষ্ট পাবে আমরা বেঁচে থাকতে—

মেজদা বলিলেন—তুমি আর কি করবে মা, একা ত আর সব কুল রক্ষা করা যায় না—

মাইবার দিন স্থির হইল।

প্রাঙ্গণে পাকী অপেক্ষা করিতেছে, গৃহদেবতা ও শাস্ত্রী-গণকে প্রণাম করিয়া বৌমা আমাদের নিকটবর্তী হইয়া প্রণাম করিল। সজল চোখ দুইটি মেলিয়া কহিল—আপনাদের বড় কষ্ট হবে, আমাকে আবার কবে আনবেন?

মেজদা কহিলেন, আনব বৈ কি মা, দু-এক মাস পরেই নিয়ে আসব—

বড়দা কহিলেন—এস বৌমা, গৃহলক্ষ্মী আবার গৃহে আনব, আবার আনন্দ হবে—কথাটার শেষের দিকটা যেন জড়াইয়া আসিল, বড়দা যেন আশা করিতে পারিতেছেন না যে পুনরাগমন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন। পুনরায় আর আনা হইবে না—

পাকীতে উঠিবার সময় বড়দা মাথায় উপরে কম্পিত হাত-খানি রাখিয়া কহিলেন—তোমরা সুখী হ'য়ো—আশীর্বাদ করি।

পাকী ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাস্তায় পড়িল। গৃহীগণ অন্তরে ফিরিয়া গেলেন। বড়দা আসিয়া তাঁহার কক্ষে ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন, চাকর তামাক দিয়া গেল কিন্তু তবুও কেন যেন উদাস দৃষ্টিতে কোন দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাকর কহিল, বাবু তায়ুক—

বড়দা কহিলেন—থাক, তায়ুক খাব না।

মেজদা তাঁহার লাইব্রেরি-কক্ষে দাঁড়াইয়া করণ চক্ষে বই-গুলির দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহারা যেন কয়েকদিনের জন্ম প্রাণ পাইয়াছিল আজ অকস্মাৎ নিশ্চাণ হইয়া গিয়াছে।

অদূরে তখনও পাকীর ও-হো-হো অস্পষ্ট শোনা যাইতেছে। ওই বেহারারা যেন স্বপ্নের পঞ্চবর্ণের গুঁড়ায় রচিত শতদল ছিন্নভিন্ন করিয়া, পদতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—অত্যন্ত নির্ঘম পদক্ষেপে। শূন্যগৃহকোণে বড়দার অশ্রুসজল দীনকণ্ঠ যেন বার বার আশীর্বাদ করিতেছে—‘তোমরা সুখী হ'য়ো, তোমরা সুখী হ'য়ো’।

স্বাধীনতা-সূর্য্য

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এ কি এ হুর্যোগ। আজ চারিদিকে নামে অন্ধকার,
অন্ধকার নেমে আসে অসহায় মানুষের মনে,
পথচারী ভ্রম পথে, বস্তি নাই শান্ত গৃহকোণে,
নগর অরণ্য সম, শুদ্ধ পল্লী শঙ্কার আধার।
ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব কারা মোহে মত্ত করে অস্বীকার?
হিংস্র তমিস্রার জীব বাঁকে বাঁকে রহি' সন্ধ্যোপনে
শোণিত-লোলুপ ফেরে অলক্ষিতে নিঃশব্দ-চরণে।
দীর্ঘ শতাব্দীর তাগ—আজ কোন মূল্য নাই তার?
আধার ঘনায় যদি বিদ্যুৎ আকাশ কেলে চিরি,
অবিস্বাসী মন ভরে সন্দেহ ও বিদেহ-জঙ্ঘালে,
অগ্রসর হও পথে, যেয়ো না যেয়ো না আর ফিরি,
সকল কলঙ্ক হবে বিধৌত প্রবহমান কালে।
কে বলে বিলুপ্ত দিক—তমসা দিগন্ত ফেলে ঘিরি?
স্বাধীনতা-সূর্য্য ওই উঁকি মারে মেঘ-অন্তরালে।

বৃহত্তের পরিচয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বৃহত্তে চেনো নি তুমি, ক্ষুদ্রে তব হ'ল পরিচয়।
সম্প্রদায়গত স্বার্থ—সেই হ'ল সকলের বড়,
তারি লাগি আত্মদ্রোহ, তারি লাগি হানাহানি কর?
যে দেশে তোমার বাস সে দেশ তোমার দেশ নয়?
পিতৃভূমি পুণ্যস্থান, অথ ভূমি জন্মভূমি হয়?
পূর্বে ও পশ্চিমে বৃথা আপনার স্থান খুঁজে মর,
মন হোক মোহমুক্ত, আদর্শ সে হোক মহত্তর,
দল নয়—দেখ দেশ, সমগ্র জাতির হোক জয়।
হিংসার ভাণ্ডবে শুধু বাড়িবে দেশের দুর্ব্বলতা,
কার লাভ হবে এতে? অন্তর্দ্বন্দ্ব এ কি রক্তক্ষয়ী!
নিরপেক্ষ হাসি হেসে ভেদ চায় যাহারা সর্ব্বধা,
আমি নয়—তুমি নয়, হে বিমূঢ়, তারা হবে জয়ী।
দেশ সত্য, ভেদ মিথ্যা, দূর হোক ব্যর্থতার ব্যথা,
হে জয়দা জন্মভূমি, নম নম, হে মহিমময়ী।

বাদশাহী আমলের কাহিনী

ডক্টর শ্রীকালিকারজন কানুনগো

১

সৈয়দ মুসা বাদশাহী দরবারে চাকরি করিতেন, নিবাস বর্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কান্নী শহর, বাপের নাম সৈয়দ মৌকরী। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি একদিন সৈয়দ মুসা একাকী আগ্রা শহরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। তাহার শিকারী চোখ দুইটি ডাইনে বাঁয়ে গৃহস্থ বাড়ীর ছাদ ও জানালার ফাঁকে কি যেন অন্বেষণ করিতেছিল। হিন্দু মহল্লার মধ্য দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এক বাড়ীর ছাদের উপর মোহিনীকে দেখিয়া মুসা প্রেমে পড়িলেন, অথচ উভয়ের মধ্যে দূরত্বক্রমে ব্যবধান। মোহিনী হিন্দু গৃহস্থের কুলবধু, স্বর্ণকারের মেয়ে, সোনার মত রং, ছাঁচে ঢালা গড়ন—অপূর্ব সুন্দরী। সেই যুগে আগ্রা শহরের স্বর্ণকার মহিলাগণের রূপের খ্যাতি ছিল।*

২

বাদশাহী ফৌজের সহিত জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত বন্থস্থোরে যাত্রা করিবার জন্ত সৈয়দ মুসার উপর হুকুম হইয়াছিল। মোহিনীকে দেখিয়া তাহার যাত্রা ভঙ্গ হইল। কোন অছিলায় সৈয়দ মুসা আগ্রা শহরে থাকিয়া গেলেন। মোহিনীর বাড়ীর কাছেই যমুনার ধারে তিনি এক বাড়ী ভাড়া করিলেন, নিকটেই তাহার বন্ধু মীর সৈয়দ জালাল উদ্দীন মৃত্যুওয়াঙ্কিলের বাড়ী। মুসা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাহার অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইয়া উঠিল। কয়েকজন দরদী বন্ধুর সহিত দুই-এক বার নৈশ অভিসার করিয়া তিনি হয় পাহারাওয়ালা না হয় মোহিনীর বাড়ীর লোকজনের হাতে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পিঠের ব্যথা সারিলেই আবার তাহার অবস্থা মন কেমন করে। এই ভাবে দুই বৎসর চারি মাস কাটিয়া গেল। দূর হইতে মোহিনীকে তিনি দেখিয়াছেন, মোহিনী সাড়া দিয়াছে, মালিনী মাসী মারফত খবরাখবর চলিয়াছে।

* বৈরাম খাঁর পুত্র খান-খানান আব্দুর রহীম “নগর শোভা” নামক হিন্দী কবিতায় লিখিয়াছেন—

পরমরূপ কঙ্কনবরণ, শোভিত নারী সুনারি
মার্নোঁ সাঁচে চারিকে, বিধি না গড়ী সুনারি।

[অর্থাৎ পরমরূপবতী কাকুনবরণী স্বর্ণকার-নারীকে বিধাতা যেন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন।]

৩

এক দিন রাজ্যের অন্ধকারে মোহিনী বাড়ীর ছাদ হইতে নীচে দড়ি ঝুলাইয়া দিল। দড়ি বাহিয়া সৈয়দ সাহেব উপরে উঠিলেন, মোহিনী সৈয়দ মুসার সহিত গৃহ ত্যাগ করিল। এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহারা তিন দিন পলাইয়া রহিল। সৈয়দ মুসা এবং মোহিনীর জিরাজ নিবন্ধে অতিবাহিত হয় নাই। মোহিনীর স্বপ্নরপক্ষের লোকজন খবর পাইয়া ঐ বাড়ীর চারি দিকে কড়া পাহারা বসাইল এবং কোতোয়ালীতে মাংসাশ্রয় করিবার ভয় দেখাইল। নানা রকম মিথ্যা কথা বলিয়া মুসার ছোট ভাই হিন্দুদিগকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিল। ইংরেজ আইনে এইরূপ ব্যাপার লইয়া কোন মোকদ্দমাই চলিতে পারে না—মোহিনী সুন্দরী বোরখা পরিয়া আদালতের কাছে একবার মনের কথা খুলিয়া বলিলেই আসামী খালাস, অধিকন্তু শোভাযাত্রা সহ নগর পরিক্রমা। কিন্তু এই প্রকার প্রেমের বাতিক দমন করিবার জন্ত আকবর বাদশাহ আইন জারি করিয়াছিলেন, কোন হিন্দু স্ত্রীলোক মুসলমানের সঙ্গে পলাইয়া গেলে, কিম্বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া তাহার পরিবারবর্গকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।* ইহার উপর কাজীর আদালতে মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমানের জন্ত ব্যভিচারের দণ্ড। স্বতরাং কোন প্রকারে অব্যাহতি নাই দেখিয়া মোহিনীর মাথায় নূতন বুদ্ধি গজাইল। সৈয়দ মুসাকে কোন প্রকারে প্রবেশ দিয়া গোপনে রহস্তজনক ভাবে মোহিনী রাজ্যের অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাধ করিল। ভাব-গোপন, প্রত্যাশপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিতপটুত্ব স্বষ্টির মধ্যে স্ত্রীজাতির সমকক্ষ নাই। মোহিনী নিবন্ধকার চিত্রে অনর্গল এক পরীর গল্প শুনাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিল। যথা—

• দ্রষ্টব্য—If a Hindu woman fell in love with a Musalman and entered the Muslim religion, she should be taken away by force from her husband and restored to her family. [Lowe, Badayuni Eng. trans. vol. II, p. 406]

কোন অবস্থায় বাদশাহকে এই আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল উহা উল্লেখ না করিয়া ঐতিহাসিক আকবরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

“সেই দিন রাত্রিতে যখন আমি ঘুমাইতেছিলাম হঠাৎ জাগিয়া দেখিতে পাইলাম ঘরের মধ্যে এক অপূর্ণ সুন্দর পুরুষ সবই মানুষের মত কিন্তু ডানা পালক আছে। সে আমাকে বাহু করিয়া পাথার উপর তুলিয়া উড়িয়া চলিল। ইহার পর দেখিতে পাইলাম পরীর আজব শহর—চারি দিকে দিব্যপরী, সুন্দরী পরীরা আমার সেবা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আমি কিন্তু কান্নাকাটি করিয়া অস্থির। মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বাহির হইতে চায়, ভায়ের শোকে ছাতি ফাটিবার উপক্রম, বাবাজীর কথা মনে পড়িতেই হৃৎথের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে। তিন দিন অবশান্ত কান্না এবং ছটফটানি। পরীর অবশেষে দয়াপর্বণ হইয়া ডানায় তুলিয়া এই জায়গায় আমাকে আবার রাখিয়া গিয়াছে।”

বলা বাহুল্য, প্রগতির যুগে পরীর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে ইহাদের কথা শুনা যায়। কিন্তু মুসলমান আমলে যত্র তত্র “দেও”, পরী জীন। ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বোকা হিন্দুরা মোহিনীর এই গালগল্প বিশ্বাস করিয়া বসিল; কিন্তু তবুও জালিম কাকেরগণ সাতরাজার মাণিক মোহিনীকে উপরের তলায় এক কোঠার তাল চাবি বন্ধ করিয়া রাখিত। ওদিকে আসল ব্যাপার লইয়া মহম্মার লোকজন কান্নাঘুমা করিতে লাগিল। কেলেকারী প্রকাশ হইবার ভয়ে মোহিনী সুন্দরী দূতীর মারফত সৈয়দ মুসাকে খবর পাঠাইল, “ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে। তুমি শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও। একজন বন্ধুকে বলিয়া যাইও যেন আমার কথা দিনের দিন তোমাকে জানাইতে পারে।”

৪

মোহিনীর কথা মত সৈয়দ মুসা আগ্রা ছাড়িয়া রাজপুতানার দিকে শাহী ডেরায় গা ঢাকা দিলেন। শহর হইতে আপদ দূর হওয়ায় মোহিনীর ঘরে তাল চাবির প্রয়োজন ফুরাইল। এই সুযোগে সৈয়দ মুসার আগ্রানিবাসী বন্ধুর সহিত মোহিনী দ্বিতীয় বার বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। বন্ধু ছদ্মবেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইতেই ভিখারী বিদায়ের অছিলায় মোহিনী নীচে গিয়াছিল, আর ফিরিল না। তিন দিন এক দরদী আশ্রয়-দাতার গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সৈয়দ মুসার সহিত মিলিত হইবার জন্য মোহিনীকে বোরখা পরাইয়া বন্ধু বিয়ানা ও ফতেপুর সিক্রীর দিকে চলিয়াছিল। নাহোড়বান্দা স্বর্ণকারেরা সন্ধান পাইয়া আসামী ধরিবার জন্য ছুটিল। বোরখার ভিতর হইতে মোহিনীর রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। হিন্দুরা চেষ্টামিচি করিতেই শহর-কোতোয়াল পালায়ান জামালের সাক্ষীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা মোহিনীকে হিন্দুগণের হেফাজতে ছাড়িয়া দিয়া দোস্তকে শ্রীঘরে লইয়া চলিল। অনেক দিন আহুযাদিক আরামের

সহিত কয়েদখানায় থাকিয়া বন্ধু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল।

সৈয়দ মুসা এই সময় বাদশাহী ফৌজের সহিত সফর করিতেছিলেন। দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি আগ্রা শহরে ফিরিলেন, শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বিরহতাপে মজিয়া বদায়ুনীর ভাষায় মুসার দেহ কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের ত্রায় সুরু হইয়া গেল। সৈয়দ মুসার উম্মাদ-অবস্থা। কখনও নিজের গলায় ছুরি বসাইতে চায়, কখনও পাগলের যত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মোহিনীকে দেখিবার জন্য রাস্তার ছুটিয়া যায়। তাহার ভাই-বোয়াদরগণ কখনও ভাল কথা, কখনও গালাগালি, কখনও বা ভয়প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিত। কারণ, এইবার আশার ঘরে মোহিনী সুন্দরীর হাতে শিকল পড়িয়াছে; চারি দিকে জটিল কুটিলার পাহারা।

৫

সৈয়দ মুসার এই অবস্থা দেখিয়া তাহার আর এক জন অতি দরদী বন্ধু কাজী জামালের দয়া হইল। কাজী সাহেবের নিবাস সরকার কান্নীর শিব-কানপুর পরগণা, কার্যোপলক্ষে আগ্রায় থাকিতেন। কাজী জামালের কিঞ্চিৎ কবিত্বাতি ছিল, হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। এইবার তিনি মোহিনী হরণের ভূমিকায় নামিলেন।

একদিন স্বর্ধ্যাস্তে মগরীবের নমাজের পর আগ্রা শহরে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। শহরের রাস্তার মধ্য দিয়া এক অশ্বারোহী বায়ুবগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, অশ্বারোহীর পশ্চাতে উপবিষ্টা এক জন যুবতী স্ত্রীলোক। এক দল হিন্দু তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, তামাশা দেখিবার জন্য লোকজন চারি দিক হইতে বাহির হইয়া রাস্তার মোড়ে ভিড় জমাইয়া সাবাস সাবাস চীৎকার ছাড়িতেছে। অশ্বারোহী বেগতিক দেখিয়া শহরের বাহিরে উত্তরগামী কাঁচা রাস্তা ধরিল। জমিতে জনসৈন্য করিবার জন্য কৃষকেরা রাস্তার ধারে নালা কাটিয়াছিল, ভয়চকিত অশ্ব আরোহীদ্বয়কে লইয়া এক পাদে পড়িয়া গেল। পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া যুবতী ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গীকে বলিল, “জান বাঁচাও, খবর দিও।” গর্ভে পতিত বউচোর কাজী জামালের কি দশা হইল জানা নাই, তবে মোহিনীকে শিকলে কুলাইবে না বুঝিতে পারিয়া এই বার তাহার পায়ে বেড়ী দেওয়া হইল। এই সংবাদ পাইয়া সৈয়দ মুসার নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল।

৬

মোহিনীর কি হইল? তাহার জামিনবার জন্য উৎসুক তাহার Lowে সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত বদায়ুনীর ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ (পৃ: ১২০-২৫) পাঠ করিতে

পারেন; কিন্তু মূল উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা পরিশিষ্টে নাই। সৈয়দ মুসার ছোট ভাই সৈয়দ শাহী মুসা-মোহিনীর কলেঙ্কারী অবলম্বন করিয়া একটি ফার্সী কবিতা লিখিয়াছিলেন, নাম 'দিলফেরেব' বা 'মন-মোহিনী'। উক্ত অংশে বদায়ুনী দিলফেরেব হইতে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মোহিনীর কাল্পনিক পরিণাম মূল উপাখ্যানে সংযোজনা করিলে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় উহা সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"ছুনিয়ার হাট হইতে দোকানপাট গুটাইবার পর সৈয়দ মুসার 'জনাঙ্গ' বা শবাজ্জগমনের মিছিল বাহির হইল। মোহিনীর বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরিয়া শবযাত্রা অগ্রসর হইবার সময় ছাদের উপর হইতে পায়ে শিকল-বাঁধা মোহিনী কিছুক্ষণ 'প্রেমের শহীদ' সৈয়দ মুসার শেষ যাত্রা দেখিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া মোহিনী ছাদ হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল, শিকল কাটিল, তবু পা মচকাইল না। মোহিনী এইবার সোজা মুসার কবরের দিকে দৌড়াইল, পাগলিনীকে কেহ বাধা দিল না। মোহিনী নির্জনে কবরের ধারে বসিয়া এক খণ্ড পাথর দিয়া বুক আঘাত করিত, মুখে মুসার নাম, এবং রাই উম্মাদিনী পালার বিষহ বলাপ। এই অবস্থায় এক দিন মোহিনী পাগলী ধার্মিক মীর সৈয়দ [সেই কাজী?] জ্বালের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্বায়েতের সামনে কলমা পরিয়া ইসলাম কবুল করিল এবং 'মুসা' 'মুসা' ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে মরিয়া গেল।"

আকবরশাহী আমলে মুসলমান সমাজে প্রেমব্যাবির প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হয়। যৌবনে স্বয়ং আকবর বাদশাহ আশ্রয় লইয়া কিছু কিছু দুর্কর্ম করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মোল্লাদের মধ্যে প্রবীণ দল অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুরচরিত্র ছিলেন, বুদ্ধেরা যাহাকে বাতিচার মনে করিতেন, বদায়ুনী-প্রমুখ নবীন দল সেই ব্যাপারকে প্রেমের বিকার বলিতেন। একজন শেখজাদা দরবারী আমীর মকবুল খাঁ নর্তকীকে চুরি করিয়াছিল কিন্তু পরিজনবর্গের আপত্তিতে তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। নবীনের দল [বয়সে নয়, ভাবে] কতোয়্যা দিলেন, আত্মহত্যাকারী "প্রেমের শহীদ" মহাপুণ্যবান, স্তবরাং যে স্থানে যে অবস্থায় শেখজাদা নর্তকীর জঘ নিজে বুক ছুরি চালাইয়াছে সেই জায়গায় রক্তমাখা কাপড়চোপড় সমেত তাহাকে মাটি দিতে হইবে। কিন্তু প্রধান সদর বৃদ্ধ শেখ আবদুল্লাহ প্রেমের মহাত্মা বৃত্তিতে না পারিয়া ধমকাইলেন, মৃত ব্যক্তি অশুচি এবং ব্যাভিচার পাণে লিপ্ত হইয়া মরিয়াছে। এই প্রকার প্রেম-ব্যাবির একমাত্র প্রতিষেধক সংঘবদ্ধ সমাজ এবং দারুণ

প্রহার। এই কথা সরলপ্রাণ ঐতিহাসিক বদায়ুনী নিজে অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—

মোল্লা বদায়ুনী কিছুদিন কনোজের অন্তর্গত কসবা মাকনপুরে শাহ-মাদার সাহেবের "মজার" বা কবর-তীর্থের তত্ত্বাবধায়ক (মহাস্ত) ছিলেন। সমাগত যাত্রিগণের সাহায্য এবং গরীব দুখীকে দান-খয়রাত দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। পরিষ্কার করিয়া না বলিলেও বুঝা যায় তাঁহার একটু রূপের নেশা ছিল—উহার উপর আবার সুফিয়ানা মোতাজ, তবে তিনি কোন দিন হারামের পথে পা দেন নাই।

একদিন মাদার সাহেবের মকবরায় যাত্রিগণের মধ্যে এক অসামান্য হুন্দরী মুসলমান যুবতীকে দেখিয়া মোল্লা সাহেবের মতিভ্রম উপস্থিত হইল। ইহার কলে একটা হাদ্দামা বাধিল এবং যুবতীর আত্মীয় পুরুষগণ মোল্লা সাহেবের মাথায় হাতে পিঠে তলোয়ারের নয়টা কোপ বসাইয়া দিল। মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন উহার মধ্যে সাতটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেবল চামড়া কাটা। কিন্তু অষ্টম কোপে তাঁহার বা হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর শিরাগুলি কাটিয়া গিয়াছিল এবং নবম কোপে মাথার খুলি কাটিয়া মস্তিষ্কের কিছু বি বাহির হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কেয়ামতের পূর্বে মোল্লা সাহেব আর জাগিবে ন না ভাবিয়াই তাঁহার মাণ্ডুক বা প্রিয়তমার গোঁয়ার সদ্দীদল বোধ হয় মুণ্ডটি না কাটিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তাঁহার ধর্মবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি শপথ করিলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইলে মক্কা যাইবেন এবং হজ্জ সমাপ্ত করিয়া নবজাত শিশুর মত "মাহুম" বা নিষ্পাপ হইয়া ফিরিবেন। কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া মোল্লা সাহেব নিজ বাট বদায়ুনী শহরে ফিরিলেন। সেখানে আবার পীড়িত হওয়ায় এক জন অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার মাথার খুলির ঘায়ে আবার অস্ত্রোপচার করিল—মোল্লা সাহেব প্রায় যাইবার পথে এই সময়ে একদিন স্থপ্তি অবস্থায় তাঁহাকে ফেরত বা দেবদূতগণ আশ্রয়নে উঠাইয়া বাদশাহী দরবারের মত এক আদালতে উপস্থিত করিল। সেখানে চারি দিকে বাকায়দা সিপাহী-সাজী, দস্তরী-ফেরাণী লেখার কাজে ব্যস্ত মনদের উপর একটি কিতাব।*

যাহা ইউক্, ইহার পরে আকবর বাদশাহ চাকরি আরং কিছু দিন বাহাল রাখিবার জন্ত যমদূতগণ মোল্লা সাহেবকে আবার ছুনিয়ার ফেরত লইয়া আসিয়াছিল। ইহা ন হইলে "মোহিনীর প্রেম" মাঠে মারা যাইত, কোন ইতিহাসে উহার হদিস মিলিত না।

বাঙালী-প্রতিভা

শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি

যুদ্ধ, মনস্তত্ত্ব, মহামারী ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে জর্জরিত বাংলার মহাশ্মশানে বসিয়া বাঙালী প্রতিভারই বন্দনাগীতি গাহিতে বসিয়াছি। বিদেশী শাসকের সাম্প্রদায়িকতারূপ মহা আয়ুধে যে জাতির অস্তিত্বই হয়ত অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, তাহার প্রতিভার কথা লিখিতে চেষ্টা করা হয়ত বাতুলতারই নামান্তর।

বাঙালী যে জাতি হিসাবে মরিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এ জাতির প্রাণশক্তির যদি বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইলে সদ্য-সমাপ্ত মহাযুদ্ধের কালে সে যে চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছে তাহা দিত না। বিদেশী শাসকের সামরিক প্রয়োজনে সে তাহার ক্ষেত-খামার এমন কি বাস্তুভিত্তি পর্যন্ত কখনও বিনামূল্যে, কখনও বা নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবাদের একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত করে নাই। অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে এই জাতির তরুণ-তরুণী যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা হীন কাজই করিয়াছে। ভারতবর্ষের অগ্রাঙ্ক প্রদেশবাসী যখন যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক কার্য—যথা মারণাস্ত্র লইয়া বিদেশী রাজার শত্রুসংহার করিয়াছে, বাঙালী তখন সেই বিদেশী রাজার স্বার্থের জন্ত আগ্নেয়াস্ত্রবিহীন ইউনিফর্ম সজ্জিত হইয়া কেবল মিস্ত্রী ও কেরাণীর ক্রাজ করিয়াছে। ১৩৫০-এর মহামারিতে একমুষ্টি অন্নের অভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিনা প্রতিবাদে পথের প্রান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু জীবন ধারণের মত খাণ্ডকণাটুকুরও দাবী জানায় নাই। কলিকাতার রাজপথে একদিকে কঙ্কালসার ডেপুটিউটদিগের শোভাযাত্রা, অপরদিকে বাঙালী বিত্তশালীগণের স্তবেশে সজ্জিত হইয়া পথ অতিবাহন—রঙ্গালয়গুলির দ্বারে দ্বারে আর্টপিপাসু মনুষ্যগণের জনতা। জাতির এমন ধোর দুর্দিনে একদিনের জন্তও জাতির অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা তাহাদের আনন্দ-বিলাস স্থগিত রাখেন নাই। জনগণের খাদ্য ও বস্ত্র লইয়া যে নিষ্ঠুর লীলা চলিয়াছে, সেই ছরপনেন্ন কলঙ্কের একটা মোটা রকমের অংশীদার কি বাঙালীই নহে?

এ জাতির এবস্থিৎ মৃত্যু যে আসন্ন, তাহা বহুপূর্বেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জানাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙালী যেক্রপ বংশগতভাবে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতেই যে তাহার মেরুদণ্ডে ঘৃণ ধরিবে, তিনি তাহা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার কোনরূপ অতিক্রম করিয়া যে কোন রকমের একটি চাকুরী সংগ্রহ করার জন্ত এমন লজ্জাজনক অগ্রহ ভারতের অগ্র প্রদেশবাসীগণ দেখায় নাই। সত্যকার জীবনযুদ্ধে, প্রতিযোগিতার নির্মম দ্বন্দ্বে যে ইহাই তাহার 'কাল' হইবে, বাঙালী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইবার কৌশলই বাঙালী ছাত্রগণ আয়ত্ত করিয়াছে; জ্ঞানার্জনের কোন প্রয়াসই তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্ত বাঙালী ছাত্রেরা যেমন লজ্জাহুভব করে না, তেমনই সেই জ্ঞানের পরিচয়পত্র-দাতা বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়েরও কোন লজ্জার বোলাই নাই। অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও দোষযুক্ত শিক্ষার জন্ত বাঙালী ছাত্র যদি জীবন-যুদ্ধে হারিয়া যায় তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের কি আসে যায়? তাঁহারা ত আর শুধু দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃক্ষ্মা-ধারী নহেন। বিদেশী ভারতীয় প্রসাদলাভের নানা পরিচয় তাঁহাদের নামের শেষে শোভা পাইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের অসম্পূর্ণ বিদ্যা বিদেশ হইতে সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন, দেশের গবর্ণমেন্ট না হয় বিদেশী অধ্যুষিত, কিন্তু যেখানে স্বদেশীয়দিগের যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে—সেখানে এমন অনাচার এমন অপ্রতিহতভাবে চলে কি করিয়া? যে জাতির মৃত্যু আসন্ন, সেই জাতিই শিক্ষার হায়া এমন একটা জীবন-মরণের সমন্বয় এ হেন অবিস্মৃষ্টকারিতার পরিচয় দিতে পারে।

সত্যকার জ্ঞান লাভের প্রতি অবজ্ঞার ফলে আমরা শুধু যে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছি তাহা নয়, আমরা আদর্শহীনও হইয়া পড়িয়াছি। বাঙালী মহাপুরুষগণের জীবন ও কীর্তিকাহিনী আজ বাঙালীর কাছে অবজ্ঞার বিষয়। এদিকে জীবনযুদ্ধে বাঙালী যতই পিছু হটতে লাগিল, ততই তাহার জাতীয়তাবোধ লোপ পাইতে লাগিল। সে এক মেকী বিশ্বমানবতার উপাসক হইয়া পড়িল। এই চারিত্রিক অধঃপতন ও আদর্শহীনতা অনিবার্যরূপে তাহার দেহ ও স্বাস্থ্য পর্যন্ত নষ্ট করিল। তাহার সাহিত্য, শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, কোন কিছুই এই চারিত্রিক অধঃপতন ও আদর্শহীনতার অবগুস্তাবী প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইল না। বাঙালীর সর্বনাশের ডালা পূর্ণ হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী প্রতিভার যে অপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল কালক্রমে তাহার ধারকগণের প্রায় সকলেরই তিরোধান ঘটিল। সেই গৌরবময় যুগের স্মৃতিই আমাদের হৃৎ ও সান্ত্বনার একমাত্র অবলম্বন হইল।

বাংলার শেষ গৌরবরবি অন্তিমিত হইবার পর, আমরা একরূপ নৈরাশ্য ও সংশয়ের ঘনাকারেই দিনাতিপাত করিতেছিলাম। জাতির জীবনে যে আবার কোন দিন শুভলগ্ন আসিবে, আবার যে মুহূর্ত্ত বাঙালী কোন মহাপুরুষের বাণী ও ব্যক্তিত্বের মায়াদও স্পর্শে বিহ্ব্যৎপুষ্টের মত জাগিয়া উঠিবে, সে আশা আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম রামমোহন, বিদ্যাগাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভৃতি ভারতের নব জাগরণের

যে শ্রোতাবারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বুঝি জাতির কর্মদোষে তাহা এমন শোচনীয় ভাবে অকালেই শুকাইয়া গেল। কিন্তু আমাদের সমস্ত আশঙ্কা ও সন্দেহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া একদা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত সুভাষচন্দ্র এক মহনীয় রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সবিষ্ময়ে জাতি দেখিল, তাহার প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ না থাকিলেও, অন্তঃসলিলা ফুল্লর মত আজও তাহা প্রবহমান ও এখনও এক মহাসৃষ্টির বীজাধার। আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ প্রচেষ্টার বিষয়কর কাহিনীতে আজ ভারতের প্রতি গৃহ মুখরিত। সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা নিম্প্রয়োজন। কেবল উত্তমচাঁদবর্ণিত নেতাজীর পলায়নকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে পড়িয়াছে, অতীতে কতকটা এমন ভাবেই আর এক জন বাঙালী মহাপুরুষ জাতির সংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়াছিলেন। গৈরিকবসন পরিহিত পরিব্রাজক বিবেকানন্দের প্রতিভা উজ্জ্বল মুখখানির কথা মনে পড়িল। নিঃস, সহায়সম্বলহীন বিবেকানন্দ সেদিন এমন ভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছুঃখিনী ভারতের মর্ম্মকথা বিশ্বের দরবারে ব্যক্ত করিবার জ্ঞান ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। মনে পড়িল “আস’নেল অব ডেমোক্রেসী” আমেরিকার হোটেলে আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হইয়া শীতের তুষারাতীর্ণ রাজপথে তাহার রাড্রিযাপনের কাহিনী, আমরা বুঝিলাম জাতি হিসাবে বাঙালী মরিলেও যে দুর্ব্বীর প্রাণশক্তি তাহার অতীতকে এত গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার অফুরন্ত ধারা আজও তাহার ধমনীতে প্রবাহিত; তাহার স্পন্দন আজও ধামিয়া যায় নাই। জাতির নবজাগরণের রক্তিম উদ্যায় এক জন অবাঙালী মনীষী বাঙালীর ললাটে বিজয়টিকা দিয়া বলিয়াছিলেন, “What Bengal thinks today India thinks tomorrow”। ১৩৫৩ সালের প্রারম্ভে দেখিলাম বাঙালীর সে গৌরব অক্ষুর আছে।

বাঙালী প্রতিভার মূলকথা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই জাতির যুগবিপ্লবকারী কার্যকলাপের পশ্চাতে এমন একটা গভীর ভাবাবেগ আছে—যাহা পর্যন্তকন্দের হইতে বহির্গত সিজুগামিনী প্রবলা শ্রোতাবিনীর মত দুর্জয় বেগে ছুই তীর প্রাবিত করিয়া ভাবের বহা আনয়ন করে। এই ভাবাবেগের খরস্রোতে রাধার ঐরাবতও তৃণধণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাঙালী মহাপুরুষের চরিত্রে এবম্প্রকার ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়, কবি তাহার কাব্য সৃষ্টির পূর্বে মুহূর্ত্তে যে বেদনা ও প্রেরণা অনুভব করেন, তাহাই বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহার সহিত কবির স্বজনী প্রতিভার এক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাঙালী কবির জাতি।

ইংরেজাধিকারের পূর্বে বাংলা ব্যতীত ভারতের অগ্রাঙ্গ প্রদেশে কাব্য ও গানের এত উন্নতি হয় নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকারগণের মন্দিরা-নিষ্ঠগে তখন

বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত; বাউলের একতারায়, রাম-প্রসাদী ও কীর্ত্তনের যুগধ্বতালে, ভাটিয়ালির ছল ছল সুরে বাংলার পঞ্চ-প্রান্তর, মন্দির-অঙ্গন, নদীতীর গুঞ্জরিত; রাখালের মেঠো সুরে ও বাঁশের বাঁশীতে প্রভাত সন্ধ্যা সব সময়ই গীতিমুখর, অর্থাৎ ইংরেজাধিকারের পূর্বে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস এই কাব্য ও গানের ইতিহাস, কবিস্বর্গ বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহা তাহার অস্থিমজ্জায় অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত।

ইংরেজাধিকারের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী সংস্কৃতির এই একমুখী ধারা বৈচিত্র্যের আবর্ত রচিয়া বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, বাঙালী বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির অনুশীলন আরম্ভ করিল। শুধু যে লব্ধ জ্ঞানের অর্জনেই সে মনপ্রাণ নিয়োজিত করিল তাহা নহে, ঐ সব ক্ষেত্রে সে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার বিষয়কর পরিচয় দিল।

তাহার সাহিত্যসাধনার নবজন্ম হইল। গীতিকাব্য নানা রূপে রূপায়িত হইল। মাইকেল মধুসূদন গুণিবার অজ্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য “মেঘনাদ বধ” রচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ দীনা বাংলা ভাষাকে বিশ্ব-সভায় বরণীয়া করিয়া তুলিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অজস্র কবির কলকাকলীতে বাংলা-শ্রামলকুণ্ড বহুত হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যে ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কর্তৃক বাংলা গদ্যের মর্ম্মর প্রাসাদ নির্মিত হইল। এতদিন বাংলার ললিতকলা আলিপনা, ঘট ও পটেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, স্রুধাংশুশেখর চৌধুরী প্রভৃতির সাধনায় তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। দর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অরবিন্দ ঘোষ, বিজ্ঞানে রাধানাথ শিকদার, আনন্দমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। শিক্ষা, সমাজসেবা, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্রজবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, স্রুবোধ বসুমল্লিক, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী, শিশুকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি অগণিত বীর ভক্ত সন্তান বঙ্গজননীর চরণকমলে অর্ঘ্যদান

করিলেন। কবির মঞ্চে যে যুগ্মজয়ী বীরেরা জীবনের জয়-গান গাহিলেন—সেই ক্ষুদ্রাকার বসু, প্রফুল্লকুমার চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালীরই সন্তান। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বাঙালী জাতির নবজাগরণের বা রেনেসাঁরই ইতিহাস।

এই অসাধ্য সাধন এই বিপুল বিজয়-গৌরব লাভ বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাহার এই ভাবাবেগ ও প্রেরণার জন্ত যাহাকে আমি ষাঁটি কবিধর্মের সহিত তুলনা করিয়াছি। কবি যেমন হিঙ্গাব করিয়া কাব্য রচনা করেন না, একটি পর্যায়ে ভাবাবেশের ফলেই যেমন তাহার “মানস তরঙ্গতলে বাণীর সঙ্গীত শতদল” জাগিয়া উঠে—বাঙালীও তেমনি একটি মহান আদর্শ বক্ষে লইয়া সম্পূর্ণ বেহিসাবীর মতোই কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে; ত্রুত উদ্‌যাপনের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করে।

বাঙালী তাহার বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই প্রাধান্য দিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কোন বাঙালী মনীষীর কার্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইলেও ভিতরে তিনি হৃদয়াবেগই অনুভব করিয়াছেন। তর্কের বাক্যজাল অপেক্ষা প্রেমের মন্ত্রকেই বাঙালী সাধনার উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সে কখনও ষাঁটি রাজনীতিক বা diplomat হইতে পারিবে না। সে আসলে প্রেমিক, সে তাহার হৃদয় দিয়াই জাতির তথা বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে। বাঙালী বিপ্লবী কিন্তু সেই বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে বাঙালীর হৃদয়াবেগ, প্রেম ও কবিসুলভ সৃষ্টিধর্ম।

তাই দেখি বাঙালীর সর্ববিধ সাধনার সহিত তাহার সাহিত্যসাধনাও পাশাপাশি চলিয়াছে। যখন সে সমাজ-সেবা করিয়াছে তখনও সাহিত্য তাহার অন্তরের বস্তু। বিদ্যাভাগ্যের জীবনীতে দেখি যখন তিনি সরকারী কার্যে বা সমাজ-সংস্কারে ব্যস্ত তখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার কবিমানসের সৃষ্টিকার্য চলিয়াছে। “শকুন্তলা” ও “সীতার বনবাস” তাহার ফল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে দেখি, যখন তিনি পদার্থবিদ্যার দুর্ভ্রম প্রশ্ন সমাধানে ব্যস্ত বা উদ্ভিদ জীবনের গভীরতম রহস্যের দারোন্দাটনের জন্ত সাধনারত তখনও তাঁহার কবিধর্ম অলস হইয়া থাকে নাই। অবসর সময়ে তিনি চলিয়াছেন “ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে”, তাহার

“অব্যক্ত”, “রাগী সন্দর্শনে” প্রভৃতি রচনা তাঁহার কবিচিন্তারই প্রকাশ। চিত্তরঞ্জন যখন মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির ছুরিকাজনা লইয়া সর্বদেহের বিনিময়ে দুঃখ ও বেদনাকেই বরণ করিয়া লইলেন, তখনও সেই অসহ দুঃখকষ্টের দুর্গিবাস্ত্যার মধ্যেও তাঁহার কবিচিন্তার সৃষ্টিসাধনা চলিয়াছে। “সাগর-সঙ্গীত” প্রভৃতি এই তাহার নিদর্শন। মানবীর জ্ঞানের সর্ববিধ শাখায় যিনি পারদ্রুম, সেই ঋষি জ্ঞানতপস্বী ত্রৈলোক্যনাথ শীল যে “The Quest Eternal.” রচনা করিলেন সে ত বাঙালী প্রতিভার কবিধর্মেরই সাক্ষাৎ ফল। বাঙালীকে জাতীয়তাবোধ শিক্ষা দিতে গিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী “বঙ্গলক্ষ্মীর ত্রুত কথা”র যাহা লিখিলেন সে ত উৎকৃষ্ট কাব্যই। নীরস রাজকার্যে ব্যাপ্ত থাকে কালেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দ ঘোষ দর্শনের যে পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন তাহাদের ভাষা কাব্যেরই ভাষা, বাংলার নবজাগরণের অদ্বীত দামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলি সাহিত্যের দিক দিয়াও অমর সৃষ্টি। ইহারা যদি কেবলমাত্র সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হইতেন, তাহা হইলে ইহারা ইহাদের অমূল্য চিন্তারশি নীরস গদ্যেই লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। কিন্তু যেহেতু ইহারা বাঙালী সেই হেতু ইহাদের প্রেরাজি একদিকে যেমন অসাধারণ চিন্তার আধার, অতদিকে তেমনি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। বাংলাসাহিত্যের যদি সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস কোনদিন লেখা হয় তাহা হইলে ঐতিহাসিককে ইহাদের রচনার কথা উল্লেখ করিতেই হইবে।

পরিশেষে আমি এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই যে বাঙালী প্রতিভার অজুতম বৈশিষ্ট্য তাহার চিত্তের গভীর ভাবাবেগ, প্রেম ও কবিসুলভ এক উদ্ভাদিনী শক্তি যাহা তাহাকে যুগে যুগে নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; ঘর-ছাড়া, লক্ষীছাড়া করিয়া সত্য ও স্নান্যের কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছে। এই কবিধর্মের জন্তই সে বারে বারে নূতনের স্বপন দেখিয়াছে, তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে; শুদ্ধ কল্যাণকর বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। বাঙালী যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে এই অজয়ের প্রাণশক্তি, গভীর ভাবাবেগ, সর্বজয়ী আত্মবিশ্বস্তকারী প্রেম ও অনন্ত-সাধারণ কবিসুলভ স্বজনীশক্তির জন্তই বাঁচিয়া থাকিবে।

বিহারের লোকসঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিবাহ

বিহারের বিবাহ-উৎসব সঙ্গীতের পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। তার কিছু সংযোজন প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গে বিবাহে সঙ্গীতের প্রচলন আছে—ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এর জনপ্রিয়তা। ব্রাহ্ম বিবাহে সমন্বিত উৎকৃষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি। প্রচলিত লোকসঙ্গীতকে বহু দূরে অতিক্রম করে এগুলি কাব্যধারার প্রগতিকে অগ্রসর করে এনেছে। বিশেষতঃ কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে এ সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করে এগুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

বিহারের বিবাহ-সঙ্গীতে একদা এই চিত্তহারিণী গুণাবলী ছিল এবং সেকালের রুচিবোধে গাইবার ভঙ্গী, গানের ভাষা ও ভাব সবই মনোহর ছিল। কাল অগ্রসর হয়েছে, মানুষের রুচি পরিবর্তিত হয়েছে, তার জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত, কোথাও বা পরিবর্তিত হয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে তার রুচি উন্নত-তর হয়েছে। কিন্তু লোকসঙ্গীতে বিপ্লবকারী পরিবর্তন হয় নি। এই সকল কারণে লোকসঙ্গীত যে ভাবে গাওয়া হয় তা আধুনিক চিত্তে বহুক্ষেত্রেই মনোহারী হয় না। কাব্যদেবী অপকৃপ সুরভ্রংশের চাপে দমবদ্ধ হয়ে পড়েন, সুরও বহু স্বাধীন কর্তার প্রত্যাপে লঙ্ঘিত হয়ে প্রস্থান করেন এবং গায়িকামণ্ডলীর অজ্ঞতা-বশতঃ অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়ে ভাষা অর্থহীন বাক্য হয়ে থাকেন—হয়ত বা নিরর্থক হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে বুদ্ধারা যথেষ্ট সজাগ ও অপেক্ষাকৃত নিভুল।

একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি প্রথমে। বিবাহ মণ্ডপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

করিল জনকে বাঁশ কাটায়াইব
বন বৃন্দ লাকে বাঁশ মণ্ডা ছাওয়ার রে,
উপরে চুরয়ে হনুদ খেত রে।
গাইল গোবর অঙ্গন নিপামল
গজমোতি চৌকে পুরায়ল রে।
আনি বৈঠায়ো ছলারু ছলারু
মোতি অঞ্জুরী ভরয়ো রে।
আনি বৈঠায়ো ছলারী বৈটরা
সিন্দুর মাংগে ভরয়ো রে।

“করিল (কচি বাঁশের মুকুলকে করিল বলে) বনের বাঁশ কেটে বনবৃন্দের (?) বাঁশে মণ্ডপ ছাওয়া হ’ল, উপরে ছলছে খেত হংস। গোবর দিয়ে অঙ্গন লিপ্ত করা হ’ল, মুগ্ধ গজগুলি সাজান হ’ল মণ্ডপের তলে।

বরকে এনে মণ্ডপে বসান হ’ল, তাকে অঞ্জলী ভরে রত্ন

দান করা হ’ল, আদরিণী কন্যাকে এনে বসান হ’ল, তাঁর সিঁধীতে সিন্দুর ঢালা হ’ল।”

মাটির হাতী তৈয়ারী করে বিবাহ মণ্ডপে রাখা এখানে প্রচলিত। হস্তীগুলির মাপ এক একট বড় ভেড়ার মত হয়ে থাকে। পুরাকালে রাজকীয় বিবাহ-সমারোহে হাতী ঘোড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বর্তমানেও এইরূপ আছে। অথবা এও হতে পারে যে হাতী সুলক্ষণ জন্ত বলে ভারতে এবং প্রাচ্য জগতের বহু দেশে সমাদৃত, সেইজন্তই বিবাহ উৎসবে মুগ্ধ হাতী রাখা থাকে সম্প্রদানকালে।

আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি। বিবাহের সূচনায় গানটি রচিত। নামগুলিতে রামায়ণের স্পর্শ আছে। বহু সঙ্গীতই এই রীতিতে রচনা হয়েছে—

কোন বন বোলৈ কারী কোয়লিয়া,

কোন বন বোলৈ ময়ূর।

দরবারে বোলে রাজা জনক

শিখা ডেলৈ বিহাবন যোগ।

বিজুবন বোলৈ অরা ডারে কোয়লিয়া

আপন মহলে বোলে বাণী

শিখা ডেলৈ বিহাবন যোগ।

চার বন খোজলু হে বেটি

কঁহা ন মিলৈ জামাইয়া।

যাইও হে রাজা অযোধ্যা নগরীয়া

বঁহা হৈ সুন্দর রঘুনাথ।

শাঁবর বাবা মত জহু বোলিহো

শাঁবর হৈ রঘুনাথ।

বসন্তের সমাগমে কন্যা মিলনব্যকুল, পিতা মাতা বুকেছেন কন্যা বিবাহযোগ্য হয়েছেন। কিন্তু বুঁজে বুঁজে বর পাওয়া যায় না। কন্যা বলছেন, “হে পিতা অযোধ্যা নগরে রঘুনাথের সংবাদ নাও। কিন্তু রঘুনাথ শ্রামবর্ণ বলে যেন তুমি অপছন্দ ক’রো না।”

কন্যার এমন সপ্রতিভ ব্যবহার এই গানটির একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। গানটি classic পর্যায়ের।

আর একটি গান আছে সেটি মহাদেবকে বিষয়বস্তু ক’রে। বরটি নেহাত মহাদেবের মতই বামছাল পরা—

ভৈঁসোয়া চচল আয়ে মহাদেব বর

বাখছাল পিন্দল হে।

যিনি বর খোজলৈ বাবা, জনম ভিখারী

সেহ মোর বৈরী হে।

কোন নিরবুধি ভরল হঁকার হে ?

জননী কন্ঠার অভিযোগ শুনে উত্তর দিচ্ছেন—

তোমার লাগি বেটী মাখ নাহাইলুঁ

তোমার লাগি করলুঁ এতোরার হে।

তোমার মিলে জয় গোবিন্দ হে।

জনমল দেলুঁ বেটী করম আপন

কা বিধি লিখল লিলাস হে।

সোনাবা আনিয়ৈ ভিখুঁ দৈতে যো বেটী

মিলি সৈস্তো রাজু কুঁআর হে।

সুপহ ঝারকে ভিখ দেলা হে বেটী

মিলি গেলো জনম ভিখারী হে।

“মহিষারোহণ করে মহাদেব বিবাহ করতে এসেছেন, পরিধানে ব্যাজচর্মা। কন্ঠা ফোভে বলছেন, ‘যিনি আমার পতি মনোনয়ন করেছেন তিনি আমার বৈরী। কোন নিরোধ এই বিবাহে মত দিয়েছে?’”

জননী কন্ঠার অস্থযোগ শুনে উত্তরে বলছেন, “বাছা তোমার জন্মে মাখ মাসের দারুণ শীতে স্নান করেছি, পুণ্য রবিবার ব্রত পালন করেছি, যাতে তোমার নারায়ণের মত স্বামী লাভ হয়। কিন্তু তোমার জন্মের সঙ্গে নিজ কৰ্মফলের যোগ্য ললাটের লিখন নিয়ে এসেছ। যদি স্বর্ণ ভিক্ষা দিতে তবে রাজপুত্র স্বামী লাভ করতে। কিন্তু তুমি স্বর্ণ বেড়ে ভিক্ষা দিয়েছ তাই তোমার ভিক্ষুক স্বামী লাভ হয়েছে।”

তারপর কন্ঠা মুখের অঞ্চল সরিয়ে বরের মুখ দর্শন করলেন, দেখলেন বর ‘কাকন কুমার’। জ্ঞানতে পারলেন বর বৃদ্ধ নয়। তখন উল্লাসে গদগদ হয়ে যে বর খুঁজেছে তাকে বরদান করতে তৈরী হলেন, পিতার চরণে মার্জনা ভিক্ষা করলেন—

“আঁচর আড়ত দেখে ছলহিন উমর বরকে,

লহসি চরণ ছুঁয়ে জনক কে,

ব্রাহ্মণে দেই রতন ভার।”

এ গানটী যেন কতকটা সান্ত্বনা। বর অসজ্জিত, কিন্তু বুদ্ধ বা কুরূপ নয় এ কথা জানার আনন্দ কম নয়। হয়ত কন্ঠার মনে আশার সঞ্চার করবার জন্মেই এই সঙ্গীতটি। হয়ত এমন একটি সুরও প্রচ্ছন্ন আছে যা বলে—আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর বা তার অন্তরালে অনন্ত মাধুর্য লুকিয়ে আছে, সুতরাং নিরাশ হ’য়ো না।

অল্প বয়সের বর-কন্ঠার অভাব অপ্রতুলতা এখনও বিহারে নেই, এমন কি সরদা আইন সত্ত্বেও বছরে বহু শিশু-বিবাহ হয়ে থাকে। কিছুকাল পূর্বে তো যৌবন বিবাহের প্রচলনই ছিল না, শৈশবেই অথবা কৈশোরেই বিবাহ হয়ে যেত। বিপত্নীকের বিবাহে খুব ধুমধাম বড় হয় না। তথাকথিত ছোট জাতির ঘরে বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তার দ্বিতীয় বার বিবাহের রীতি আছে, তবে তা নেহাতই ‘সাগাই’—বিবাহের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, অস্থায়ী বর্টা নেই।

শিশু বর কন্ঠার কিছু পরিচয়, পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত গানগুলিতে—

রাহে বাটে অহে মালিন, পোখর কাটার লৈ

উড়ত খুগা পউটী চটি বৈঠলে,

খুগাওয়া লে খৈবো বরিয়াত।

তারপর— অহি সবে পরছন আয়লৈ

বেটী মায় মুহাবা নিরখ,

এসন ছলার বর কবহ ন দেখলুঁ

সুগা লেলৈ এলে বরিশত।

অভিমানে কিশোর বর পাখীটা ছেড়ে দিয়ে বলছে—

বনকে খুগাওয়া অব বন চলি গেলা

কোন কলক হমে লাগে?

বিবাহ মণ্ডপের কাছে কিছু গর্ত খুঁড়ে জল ভরা হয়, অর্থাৎ পুকুরের পরিবর্তে এতেই কাজ চলে। সেখানে যখন বরযাত্রী এল একটি টিয়াপাখী এসে বসল বরের হাতে, বর ঐ টিয়া পাখী নিয়েই বিবাহের আসনে বসেছেন।

তারপর বর বরণ করতে যখন সব এলেন, শ্রদ্ধামাতা এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে রুষ্ট হয়ে বলছেন, এমন আহুরে বরও জন্মে দেখি নি—পাখী হাতে বিবাহ করতে এসেছে।

অভিমানে পাখীটা ছেড়ে দিয়ে বর বললেন—বনের পাখী বনেই চলে গেল আর তো আমার কোন কলক দেবার নেই।

সুন্দর চিত্রটি। শ্রদ্ধামাতা এক্ষেত্রে প্রয়োজনতিরিক্তি কর্তোরা হয়েছেন সন্দেহ নেই। একমাত্র কিশোর জামাইকেই এইরূপ বাক্য-বর্ষণে আপ্যায়িত করা যেতে পারে, বয়ঃপ্রাপ্ত জামাতাকে এরূপ সম্ভাষণ করবার ছুঁসাহস তাঁর হ’ত না হয়ত।

আর একটি গান আছে—বর বিবাহের পর কোহবার (বাসর) ঘরে যাবেন না—কি চাই? চাই একটি ছুরী, সেটি ‘নিয়ে তবে তিনি ছাড়বেন বর বৈকে বসিলেন—’

ভেঁলে বিহা বর কোহবার না যায়

ছুরী লাগি রুমল দামাদ ভারী হে

ছুরীয়া যে দেলহ তাক হাঁথ

লহসি চলল কোহবার হে।

শিশু বরকে ছ’কথা শুনিয়া দেওয়া যায় বটে, কিন্তু বৈকে বসলেও বিপদ।

তারপর কন্ঠা বিদায়ের চিরন্তন অশ্রুস্রব ছবি। এ ছবি ঠিক বাংলার মতই সমস্ত ঘরে ঘরে। একদা পঞ্জাবের একটি বিবাহ দেখবার স্ত্রীযোগ হয়েছিল, কন্ঠা-বিদায়ের সময়কার দৃশ্য দেখে হঠাৎ ভুলই হয়ে গিয়েছিল যে এই বিচিত্র বেশধারিণী কন্ঠা জননী, আত্মীয়ামণ্ডলী বঙ্গনারী বা বিহারিণী নয়—বিহার ও বঙ্গদেশ হতে বহু দূরে পঞ্জাব।

কন্ঠা-বিদায়ের গানের পরিচয় এখানে দেওয়া হ’ল।

গীরি হে কমল দাহ, উঠিয়ে গেলো রে চাঁদ,

সম্ভী বিদায় মাগে পহলিয়ে সাঁঝ।

সাঁহর অঙ্গন বহুত পরিবার,

জামাই অঙ্গনে রহে ঠাট—

জলদিসে থিয়া সাঁপার।

কমল শুকিয়ে গেল দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, চাঁদ উঠে
গেল আকাশে, বৈবাহিক মহাশয় সম্ভার পূর্বেই বধু নিয়ে
প্রস্থান করবার জন্ত উৎসুক হয়েছেন। ছোট অঙ্গনে পরিবারের
আত্মীয় বন্ধু সব দাঁড়িয়ে আছেন—বিদায়দৃশ্য দেখতে। এবার
কথা বিদায় কর।

দান দাছেজ বাবা বহুত দেলো রে

থিয়া সাঁপরিয়া সঙে বুলায়ে।

“গাইয়া বান্ধিরো বাবা বুটাওয়া লাগাল

ধেথুয়া হমর সঙ্গে চলি যায়।”

লালে লাল ডোলিয়া সবুজ ওহার

বহি পর চলল রে থিয়া শস্তার।

প্রচুর দানদানগ্রীর সঙ্গে পিতা কণ্ঠা সমর্পন করেছেন—
কণ্ঠাকে বিদায় দিচ্ছেন। কণ্ঠার বিদায় হচ্ছে লাল পালকীতে,
তার ঢাকনা সবুজ রঙের। কণ্ঠা যাত্রা করেছেন, বাড়ীর গাভী
কণ্ঠার পিছনে পিছনে চলে যাচ্ছে দেখে কণ্ঠা পিতাকে ডেকে
বলছেন, বাবা আমার আদরের গাভীটিকে ডেকে খুঁটিতে বেঁধে
রাখ, না হলে আমার সঙ্গে সে ত্যাগ করবে না।

তারপর— এক কোশ যায় বেটা দুয়ে কোশ যায়,
ভাঙিয়া উধারি চিতাবে নৈহর পরিবার।

সাহরে ভাইয়া ধর ঘুরিহে,

রোয়ত হৈ ঘর বৈসি যায়।

তোহার লিখল ভাইয়া বাবাকে হে রাজ।

হমর লিখল এ হে পরদেশ।

পালকী চলেছে এক ফ্রোশ দুই ফ্রোশ, পিতৃগৃহের আত্মীয়েরা
সঙ্গে চলেছেন, ছাড়তে প্রাণ চায় না। পালকীর টোপ তুলে
আদরিণী কণ্ঠাকে বার বার দেখছেন।

কণ্ঠা বলছেন, ভাই, এবার ঘরে ফিরে যাও, ঘরে বসে জননী
কাঁদছেন। তুমি গৃহে থাকতে পারবে, কারণ তুমি পুত্রসন্তান
—আমার অদৃষ্টে সকলকে ছেড়ে পরদেশই আছে।

জননী কাঁদছেন—

কাহা তোহে ছোড়ল হে ভিয়ারা হমার।

শিনী সাত্বনা দিচ্ছেন—

“বাহা বাছোয়া সেহ লেলে যায়”

রোয়ে রুহুমিনি মায়

বটী তোর হুপূর বন্ধার।

“ঘরে পাঠালে”—প্রতিবেশিনী সাত্বনা

সঙ্গে তাকে বাঁধলে তারাই কণ্ঠাকে নিয়ে

যানে না—মা কাঁদছেন ‘বাহা তোর

অঙ্গনে পাইনে।’

নবজাতক

পূর্বে একবার সোহর গানের কিছু পরিচয় দিয়েছি,
এখানে সোহর গানের কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। শিশুর
আগমনে উৎসবের সমারোহ পড়ে যায়, দরিদ্র গৃহেও এর
ব্যতিক্রম হয় না। তবে আয়োজন সেখানে নেই, আছে গৃহ-
পরিবার ও প্রতিবেশিগণের শুভেচ্ছা। জননী ও শিশুকে
অভিনন্দন জানাবার জন্ত যে সমবেত সঙ্গীত গাওয়া হয় সে-
গুলির নাম ‘সোহর’।

সোহরের বিচিত্র গান আছে। কখনও প্রস্তুতি যেন
গাইছেন, কখনও পৌত্রের মুখদর্শন করে পিতামহী গাইছেন,
কখনও বা অত্যাশ্রয় আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবী ও
প্রতিবেশিনীরা গান করছেন।

এই গানটি নব প্রসূতির পক্ষ হতে গাওয়া হয়, এ তাঁর পুত্র
কামনার কাহিনী।—

অঙ্গন বৈসালু দেব সুরয মানাই

এক পুত দেহ, চৌকা চট বৈঠু হে।

সুরয মানাওলু, বাবু জনম লৈ

বাজে আনন্দ বাধাওয়া।

ঘোড়ীয়া পকাই লৈ ঘোড় সারিয়া

ভৈঁস পাঝাই লৈ বাধান।

চত লাল ঘোড়া বাছোয়া পর

খেলতৈ চিকন কড়কয়া।

“অঙ্গনে উপবেশন করে সুর্যদেবের আরাধনা করেছি পুত্র
লাভের জন্ত। পুত্রবতী হয়ে শুদ্ধ হব এবং রক্ষন করে সকলকে
ভোজন করাবার অধিকার লাভ করব। সুর্য-রূপায় পুত্র
লাভ করেছি, আনন্দধ্বনি হচ্ছে। আমার শিশুর জন্মের সঙ্গে
ঘোড়কী এবং বাধানে মহিষেরও শাবক জন্মাল। আমার
বাছা ঘোড়ার শাবকের উপর চড়বে এবং চিকন মহিষ শাবকের
সঙ্গে খেলা করবে।”

মঞ্চা বলছেন—

ঘোড়ীয়াকে দেবৈ ঘাস ভুয়া,

ভৈঁষিয়া মহিলওয়া।

বহুয়াকে দেব আদরক, মধ, পিপার হে।

“ঘাটকীকে ঘাস ভুষি দেব, মহিষকে দেব খোল এবং
বধূমাতাকে দেব আদরক, মধ, পিপুল (প্রসূতির পথ্য)।”
এই গানটিতে মানব-শিশু ও পশু-শাবকের মধ্যে এক বন্ধনের
পরিচয় আছে।

এবার একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি। গানটি সন্দিগ্ধচিত্ত
মঞ্চা ও কৌতুকময়ী বধুর গান।

ঘর পৈসী বছরিয়া নেহারল শাও,

“চিঠি আয়ল চিঠি আয়ল।

বহুয়া কোন চোর আয়ল ঘর তোর

রতনারী রহল গরভ।”

বধূ বলছেন—

“শান্ত সোনেকে জালওয়া বানায়ব

চোরওয়া বাঝাব,

লানবৈ শান্ত তোর পাশ।

এবং পূর্ণকারকে ডেকে অহরোধ করছেন,

“মোর লাগি সোনার ভাই, জালি বনা দেহ

বাঝাব চোর,

চিন্‌হায়ব শান্ত কোন চোর আয়ে ধর মোর।”

তারপর—

“আগরাতি বিতালৈ পহর রাতি বিতালৈ,

ললনা ভৌরকে রূপে চোর আকে পৈসালৈ,

সোনে জাল বাঝাই গেল।”

চোর ধরে শত্রুকে ডেকে বেহায়া বধূ বলছেন—

“কনে গেলা কিয়া ভেলা

শান্তহে ঠাকুরাইন

এহি চোর ধর মোর চুকালৈ।”

জালবদ্ধ পুত্রকে দেখে লজ্জিত ও পরাক্রান্ত শত্রু বলছেন—

“হে বেটী ধর এইলে,

পুতছ বড় সেমান,

ছিন্‌লেতো বেটোয়া হমার।”

শত্রু দেখছেন বধূ গর্ভবতী। বলছেন বধূ বড়ই মন্দ, বড়ই বেহায়া—তুমি কার সন্তানের জননী?

বধূ বলছেন, সেই চোরকে ধরে তোমায় এনে দেব। হে শত্রুমাতা আমায় একটি জাল তৈরী করিয়ে দাও। পূর্ণকারকে ডেকে বললেন, ভাই আমায় চোরধরা সোনার জাল তৈরী করে এনে দাও, চোর ধরে শত্রুমাতাকে তার পরিচয় দেব।

তারপর রাত্রি গভীর হয়েছে, শত্রু ভ্রমর ধরে এসেছে এবং যথাবিধি জালে আটকা পড়েছে। লজ্জাহীন বধূ শত্রুকে ডেকে বলছেন—ওগো শত্রুঠাকুরাণী তুমি কোথায়। এসে দেখো এই সেই চোর যার সন্তানের আমি জননী।

অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ জননী জালবদ্ধ পুত্রকে দেখে অভিযোগ করছেন, বাছা ধরে এলে তুমি, বধূ বড় চালাক, আমার বাছাকে কেড়ে নিয়েছে।

শত্রুর নিরুপায় মুখচ্ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বধুর হাতে জ্বর হয়েছে। যেমন শত্রু তেমনি তাঁর যোগ্য বধূ। শান্তভী-বৌয়ের চিরন্তন অধিকার-সমস্তা এই ধরোয়া গানটিতে ফুটে উঠেছে। প্রোচা জননী পুত্রের উপর আধিপত্য হারাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বধুর প্রতি বিরাগ পোষণ করছেন। অপর দিকে যুবতী বধূ এর প্রতিবাদে সগৌরবে

শত্রুপুত্রের হৃদয় হরণ করে বিজয়িনী হচ্ছেন। করুণ এবং কৌতুক রসে গানটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আধুনিক রসবিচারে গানটিতে কিছু অশ্লীলতার আভাস প্রকট হয়েছে মনে হয়। স্বরণ রাখতে হবে যে এ গান-গুলিতে পুরুষদের বিশেষ স্থান নেই, অঙ্গনে গাওয়া হয় নারীমহলে। পুরুষেরা এ গানগুলি অবহিত চিত্তে শোনবার সুযোগ কমই পেয়ে থাকেন। বধূ ও শত্রুর বাগ্মণ কৌতুকপ্রিয় প্রতিবেশিনীদের সরস রঙ্গ-রচনা।

এবার আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি, গানটি যেন একটি বিশেষ কাহিনী। জঙ্গলে দেখা হ'ল, নারী নৃত্য করে আগন্তকের চিত্ত জয় করলেন, এবং একত্র বসবাস আরম্ভ হ'ল। ভগ্নী গৃহ হতে ভাইকে পত্র লিখছেন, “ভাই জংলী জীকে পরিত্যাগ করে চলে এস, না হলে জাতিচ্যুত হবে।” ভাই লিখছেন ‘না বোন, জংলী জীকে ত্যাগ করতে পারি না, জাতি যায় যাক। আমার নয়নাভিরাম পুত্রের জননীকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।’

কঁহাকে জংলী পাতুরিয়া

কঁহাকে রে নায়ি,

নাচে লাগল জংলী পাতুরিয়া

রিঝারল চিত নাচি নাচিরে।

ভগ্নী লিখলেন—ভাই ছোড় দেহ জংলী তিরিয়া

ধরম বাচত তবহি।

ভাই লিখলেন—নাহি ছোড়ব জংলী তিরিয়া

ধরমবা বাচে না বাচে

জংলীকে জনমল হরিলবা দৈশ

আঁখে সোহন লাগে।”

শিশুর জন্মের প্রভাব জননীর সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে যথেষ্ট। একদা দৃঢ় অহুশাসন দ্বারা জনমত তৈরি করে প্রজা-বুদ্ধির উদ্দেশ্যে যে নীতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ তারই নিদর্শন। তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে স্নেহ বা প্রীতির সম্পর্ক বহুক্ষেত্রে তৃতীয় জনকে কেন্দ্র করে নীবিড় হয় এবং সেই কারণেই নবজাতকের এত মাহাত্ম্য।

ভারতের বহু প্রদেশেই প্রচলন আছে কথার সন্তান জন্মাবার পূর্বে তার গৃহে কথার পিতামাতা অরুণ হ'লেও না। এ রীতির মূলে যে বস্তু আছে তা হল প্রেম। অন্তর্গত যে শিশুর গৃহে কথার প্রেম জননীরূপে, কেবলমাত্র বধুরূপে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত পিতা করতে কুণ্ঠিত হন।

শিশু-নাট্য ও তাহার ব্যবহার

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার আরম্ভ থেকেই মানুষের মনে গল্প শোনবার স্পৃহা সঞ্চার হয়েছে এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সহিত যুক্ত হয়েছে “গতি”মূলক গল্প অথবা নাটক দেখার প্রবৃত্তি। নাটক দেখার কালে মানুষের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের লোভে মঞ্চ ও তৎসংযুক্ত শিল্পকে সে বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে, যে-কোন প্রকারেই হোক না কেন, নাটক বা অনুরূপ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সকল জাতির মানুষই অনুভব করেছে এবং নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সাহায্যে সেই প্রয়োজনীয়তাকে শিল্প-রূপ দিয়েছে। নাটকের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস এক হিসাবে সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস।

শিশুর মনেও সেই প্রবৃত্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পুতুল-খেলায় ভেতর, তাদের নানা ক্রীড়া-কৌতুকের ভেতর আমরা মানুষের অভিনয়-বৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখতে পাই। প্রায় প্রত্যেক শিশুই শৈশবে নানা ব্যাপারের অভিনয় করে থাকে। শিশুদের জগৎ কল্পনা দিয়ে গড়া, শিশুর সঙ্গে তার মিল নেই। এই কল্পনাশক্তির প্রাচুর্যের জন্যই তারা মলিন বস্ত্রধারী বালককে “রাজা” বলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে; ভক্তার পিতার জামা-কাপড় পরিধান করে কত বালকই না তার ভগ্নীর পুতুল-শিশুর রোগ উপশম করতে আসে। এ সমস্তের পেছনে রয়েছে সেই প্রবৃত্তি যাকে ইংরেজীতে বলা চলে “impersonate” করবার অর্থাৎ অল্প ব্যক্তি সাজবার ইচ্ছা, যার যথার্থ পরিণতি বটে অভিনয়ে। কল্পনাশক্তির সহায়তায় অবাস্তব ব্যক্তি বা ঘটনাও তাদের নিকট এত সত্য ও জীবন্ত হয়ে ওঠে যে সেগুলোর অস্তিত্ব সম্ভব কিনা সে প্রশ্নও তাদের মনে উদয় হয় না। যে ক্ষমতার সাহায্যে উত্তর জীবনে বড় অভিনেতা হওয়া যায়, এটা তারই পূর্বাভাস। কিন্তু ছুংখের বিষয় এই যে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুদের এই সহজাত ক্ষমতার স্বাভাবিক বিকাশের কোনো ব্যবস্থাই নাই।

উপরোক্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে সুপ্ত থাকে “spirit of exhibitionism” অর্থাৎ নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা। সে সর্বদাই দেখাতে চায় সে একজন কেউ-কেউ—সে অবজ্ঞা বা উপেক্ষার পাত্র নয়। তারও যে একটা বিশেষ মূল্য আছে প্রতি পদে সে সকলের কাছে তা প্রকাশ করতে চায়। ভাল পোশাক বা খেলার জিনিষ পেলে তো কথাই নেই, সে তার বন্ধুদের ঐ সমস্ত বস্তু দেখায়। বিশেষতঃ নিজের কৃতিত্ব বা বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে সে গর্ব অনুভব করে। ভুল পথে চালিত হলে এই আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়, অহমিকা, দম্ভ প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিতে

পরিণত হয়। সংপথে পরিচালিত হলে কিন্তু এই আত্মপ্রচার প্রবৃত্তি শিশুর ব্যক্তি-বিকাশে সাহায্য করে, তাকে আত্ম-নির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে আত্মবিশ্বাস করে তোলে। এখন কথা হচ্ছে যে, আমরা শিশুদের এই স্বাভাবিক বৃত্তি-গুলিকে কিরূপে ঠিক পথে চালিত করতে পারি? এর উত্তর হচ্ছে, তাদের উপযোগী অভিনয় শিক্ষাদান দ্বারা। আমরা যদি স্কুলে পড়বার সময়ই বালক-বালিকাকে বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করবার সুযোগ ও সুব্যবস্থা করে দি তা হলে এই ইচ্ছাগুলো ঠিক পথে পরিচালিত হয়ে তাদের জীবনকে সাক্ষাৎলাভের পথে অনেক দূর এগিয়ে দেবে। এমন কি, উপযুক্ত অভিনয়-কলা শিক্ষাদ্বারা অনেক মুখ-চোরা লাভুক ও ভীষ্ম শিশুও ভীষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং চটপটে হয়ে উঠতে পারে। শিশু-নাট্য অভিনয়ের সার্থকতা সেইখানেই। স্কুলের গতানুগতিক নীরস পাঠ্যতালিকার চাপে তাদের যে-সকল শক্তি নিষ্পেষিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি বিকশিত হয় অভিনয়-কলার সাহায্যে। তাতে তারা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ-দুই-ই লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বা শৈক্ষণীয়ের নাটকগুলো তাদের কাছে কত উপভোগ্য হয়ে উঠে, যখন তাদের অভিনয়ের উপযোগী করে সেগুলোর নাট্য-রূপ দান করা হয় এবং তারা নিজেরা সেগুলোর অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কথা ওঠে—শিশুদের জন্য কিরূপ নাটক লিখিত হবে। একথা বলা অনাবশ্যক যে বড়দের নাটক তাদের উপযোগী নয়। ‘হামলেট’, ‘ম্যাকবেথ’, ‘বলিদান’ বা ‘দুর্গাদাস’ প্রভৃতির মত নাটক তাদের কাছে শুধু অচলই নয়, এগুলো তাদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকরও বটে। রোমাঞ্চ, প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ইত্যাদিই অধিকাংশ সামাজিক নাটকের উপজীব্য। শিশু-নাট্যশালায় সেগুলোর অভিনয় কিছুতেই চলতে পারে না। শিশুদের নির্মূল চিত্তে এগুলোর অভিনয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিম্নোক্ত। সুতরাং কিরূপ নাটক শিশুদের উপযোগী সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা করা দরকার। শিশুদের জ্ঞান সামাজিক নাটক লেখায় নাট্যকারকে বিশেষ সাবধানী হতে হবে। ঐতিহাসিক কাহিনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক বিবরণ এমন কি রূপকথা অবলম্বনেও শিশু-নাট্য রচিত হতে পারে। শিশুদের জ্ঞান লিখিত ঐতিহাসিক নাটক এরূপ হওয়া উচিত যে তা শুধু তাদের বীরত্বের আদর্শই অনুপ্রাণিত করবে না, ভারতীয় তথা জাগতিক সভ্যতার পেছনে যে বিরাট শক্তি ক্রিয়াশীল তার প্রতিও তাদের প্রদর্শন করে তুলবে, বিধ-সভ্যতার বহুবিচিত্র বিকাশ তার মনে যুগপৎ আনন্দ ও

বিশ্বয়ের সঞ্চার করবে। বিশেষতঃ ভারতের বৈজ্ঞানিকদের এবং শিল্পী ও লেখকদের জীবনী থেকে তারা শুধু কণ্ঠের প্রেরণা লাভ করবে না, তারা শিখবে নিজেদের ভিতরকার মহত্বকে প্রকাশ করতে—মাহুযজ্ঞাতির শুভ বুদ্ধিতে আত্মবান হতে। এরূপ নাটকের অভিনয় দর্শনের ফলে শিশুদের মনের ভেতরকার সুপ্ত সংপ্রস্তুতিমূহ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং এই সমস্ত মহৎ জীবনাদর্শ থেকে তারাও মহত্তর জীবন গঠনের প্রেরণা লাভ করবে—এক কথায় সে বড় হতে শিখবে। তার Complex বা গুঁটোবাগুটি দূরীভূত হয়ে তার সমস্ত শক্তির Sublimation বা বিশোধন তখনই সম্ভব হয়ে উঠবে।

সামাজিক নাটকও শিশুরা অভিনয় করতে পারে। যে সমস্ত নীতি সর্বদেশের ও সর্ব কালের মনুষ্য-সমাজকে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করছে সেই সব নীতির প্রচার শিশুনাট্যে থাকা উচিত, অবশ্য নাটকের রস যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। অভিনয়-কলার সাহায্যে শৈশবে যদি এ সমস্ত নীতিকথা তাদের কোমল অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া যায় তা হলে সেগুলো হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অমূল্য পাথর।

তার পরের প্রশ্ন—শিশু-নাট্যের চরিত্রগুলি কিরূপ ভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত? খুব জটিল চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যা-প্রতিবাতের স্বক্সতা শিশুর পক্ষে দুর্বোধ্য। শিশুর পছন্দ করে এরূপ চরিত্র—যারা শৌর্য, বীর্য, উদ্যমশীলতা ইত্যাদি গুণের দরুন তাদের কল্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রামায়ণ-মহাভারতের বহু চরিত্রেই এই সকল গুণ আছে বলে তারা শিশুদের কাছে বিশেষ প্রিয়। রূপকথার কাহিনীও শিশুকে বাস্তব জগতের উর্দ্ধে কল্পলোকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ দান করে বলে সকল দেশেই শিশুমহলে রূপকথার এত আদর। শিশুদের মনস্তত্ত্বের সহিত খনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকলে সার্থক শিশু-নাট্য রচনা করা যায় না। ইংরেজী নাটক peter pan বা বেলজিয়ান নাট্যকার মেটার-লিকের ‘রুবার্ডে’র পেছনে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও শিশু-মনস্তত্ত্বের সহিত নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন সুপরিষ্কৃত। শিশুদের ‘emotional values’ বা ভাবাবেগের মূল্য এবং শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে শিশু-নাট্য রচনায় সাকল্য লাভ করা যায় না। প্রথমেই নাট্য রচনা-রীতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রচলিত শিশু-নাটকগুলি রচনা-রীতি ইত্যাদির দিক দিয়ে সাধারণ নাটকেরই অল্পরূপ। বিভিন্ন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, সংলাপ ও গীত-বাণ—শিশু-নাট্যে এগুলিরও প্রয়োগ অবশ্যই থাকবে। তবে বড়দের নাটকে কাহিনীর যে জটিলতা থাকে, শিশু-নাট্যে তা না থাকাই সমীচীন এবং সংলাপের ভাষাও অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বীভৎস দৃশ্য

শিশু-নাট্যে না থাকাই শ্রেয়ঃ। সর্বোপরি শিশু-নাট্য রচনায় নাট্যকারকে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শিশুদের অভিনয়ের জগৎ আত্মগুবি কাহিনী পূর্ণ নাটক রচনা করা কিছুতেই চলবে না। বাংলার অনেক আধুনিক শিশু-নাট্যকারই এ বিষয়ে অবহিত নন। শিশুদের মনে যে কৌতুহল থাকে, নাটক পাঠে বা নাট্যাভিনয়ে তা যাতে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হয় সেই দিকেই নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এবার আসে শিশু-নাট্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত সে প্রশ্ন। অনেক নাট্যকারের পক্ষে এইটাই সর্বোপেক্ষা দুর্লভ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শিশুদের উপযোগী নাটকে কিরূপ শব্দ ব্যবহার করা যায় অনেক সময় তার সুনির্দিষ্ট ধারণা অনেক নাট্যকারেরই থাকে না। তাঁরা ভুলে যান যে, অধিকাংশ শিশুরই শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি কম এবং অধিকাংশ গাল-ভরা সংস্কৃত শব্দের মানে তাদের না জানাই সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, গড় অপেক্ষা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শিশুর কাছে অধিকতর প্রিয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে দুষ্কর। অতএব নাট্যকারকে, যতদূর সম্ভব সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করে, ছন্দোবদ্ধ বাক্যে এমন ভাষায় নাটক রচনা করতে হবে, যা শিশুমনকে শুধু এক অপূর্ণ রস-মাধুর্য্যেই পরিপূর্ণ করবে না, তার মুখ দিয়ে স্পষ্টরূপে উচ্চারিতও হবে। সাধারণ নাট্যকারের পক্ষে এরূপ ভাষার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রসের পরিবেশন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে; কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্যের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হতে হয়। “ডাকঘর” নাটকে অমল ও সুধার মুখ দিয়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সরল মাধুর্য্য অননুকারণীয়, তাতে কঠিন শব্দের ব্যবহারও খুব কম, “শারদোৎসবে”ও তাই। কিন্তু এই ভাষা শুষ্ক, নীরস ও বৈচিত্র্যহীন নয়—তা অপূর্ণ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এবং শিশুর মনকে দোলা দিতে সমর্থ। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের ভাষায় এই সরলতা ও প্রাণমাতানো শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর গানের ভাষার কথাও মনে পড়ে। এত অল্প কথায় এরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি আর কল্পজন কবি করতে পেরেছেন—

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়

গুঁকোচুরি খেলা।

নীল আকাশে কে ভাসালে

সাদা মেঘের ডেলা।

বা,

লেগেছে অমল, ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া

দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরলী বাওয়া।...ইত্যাদি ভাষার পরেই আসে সংলাপের কথা। অনেক শিশু-নাট্যে

দেখি পাত্র-পাত্রীর সংলাপ এত বেশী দীর্ঘ ও জটিল যে শিশু বা বালকদের পক্ষে তা মনে রেখে মঞ্চে আয়ত্তি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশু-নাট্যের সংলাপ কখনও এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এক জনের মুখে প্রতিবারে দুই তিনটি বাক্য—এই যথেষ্ট এবং সেগুলো যেন এরূপভাবে রচনা করা হয় যে, পূর্বের কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার যোগসূত্রটি কুলকেরা সহজে ভুলে না যায়। অতি দীর্ঘ যুগত উক্তিও বর্জনীয়। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে এক নিশ্বাসে এক শ' লাইন 'সলিলোকি' আওড়ানো শিশুদের পক্ষে বিরজিকর এবং শিশু-নাট্য দর্শকদের পক্ষে হাত্তকর। নাট্য-রচনা কালে নাট্যকার যেন এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হন। আর একটি কথা। শিশু-নাট্য কত দীর্ঘ হওয়া উচিত? পঞ্চাশ নাটক হওয়া উচিত না একাত্তিক? আমরা জানি যে, শিশুরা সাধারণতঃ চক্ৰলম্বিত ও কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করতে পারে না। সে অবস্থায় দীর্ঘ পঞ্চাশ নাটক মঞ্চ করবার বা অভিনয় দেখবার ঐর্ঘ্য তাদের নেই। সুতরাং শিশু-নাট্য এরূপ হবে যে তাতে শিশুদের ঐর্ঘ্যচ্যুতি না ঘটে—সাধারণতঃ দু' ঘণ্টায় নাটক শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। অভিনয়ের দিক থেকে দেখতে গেলেও ক্ষুদ্র নাটকের আবহুত্ব বেশী—কারণ এক সঙ্গে অনেকক্ষণ অভিনয় করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণ শিশু-নাট্যের বিষয়বস্তু, ভাষা ও রূপের কথা বললাম। এবার আসে নাটককে মঞ্চ করবার কথা এবং সেটি বিশেষভাবে স্কুলের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোন সময় ও কোন অবকাশে নাটকের অভিনয় হবে। পাঠ্যপুস্তকের চাপে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সময় খুব কম, তার ভিতর আবার তারা অভিনয়ই বা কখন করবে? প্রাতে ছাত্রেরা সাধারণতঃ লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে, সন্ধ্যায় খেলাধুলা করে। এমতাবস্থায় অভিনয়ের সুযোগ বা অবসর তাদের কোথায়? কাজেই ছুটিগুলোই অভিনয় করবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। আমাদের স্কুলগুলিতে ছুটির সংখ্যা কম নয় এবং ছুটির সময়টা নষ্ট না করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ডেকে এনে যদি মহড়া দেওয়ার এবং অভিনয় করানোর ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে হয়ত বা কতকটা সুবিধা হয়। বিশেষ করে দুর্গাপূজা, বড়দিন ইত্যাদি দীর্ঘ অবকাশগুলোতে এ ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। সময় সময় ভূগোল ইতিহাস বা বিজ্ঞানের ঘটনা পড়ানো বাদ দিয়েও ছেলেদের দিয়ে মহড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে।

এবার রঙ্গমঞ্চের কথা সন্দেহে আলোচনা করব। ভাড়া করে মঞ্চের আসবাবপত্র এনে মঞ্চ প্রস্তুত করে অভিনয় করা

ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব স্কুলে স্থায়ী ষ্টেজ থাকা আবশ্যক। প্রথমেই হয়ত প্রত্যেক স্কুলের পক্ষে মঞ্চ প্রস্তুত করানো সম্ভব নয়, সেই অবস্থায় কয়েকটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ সমবেত চেষ্টায় কোন বিশেষ স্কুলে নাট্যগৃহ নির্মাণ করতে পারেন। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেরা সেখানেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অভিনয় করতে পারে। অবশ্য, প্রত্যেক স্কুলেরই নিজস্ব নাট্যগৃহ থাকা প্রয়োজন। দৃশ্যপট ও রূপসজ্জা সন্দেহেও সেই কথা। প্রয়োজন হলে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর সরকারী ব্যয়ে দৃশ্যপট তৈরি করিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনমত বিভাগের স্কুলগুলোকে সামান্য ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিতে পারেন। তা হলে ছেলেদের আর বাজার থেকে সস্তা দরে কেনা ওঁচা দৃশ্যপট ব্যবহার করতে হবে না। প্রেক্ষাগৃহ প্রস্তুত করবার সময়ে সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে সকলের পেছনের সারিতে উপবিষ্ট দর্শকেরাও যেন শিশু-কণ্ঠের অভিনয় শ্রবণ করতে পারে। সুতরাং হলগুলো বড় আকারের হওয়া সমীচীন।

এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, শিশু-নাটকগুলির প্রযোজনা কারা করবেন এবং নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় বালক-অভিনেতা নির্বাচনই বা কি প্রণালীতে হবে। অবশ্য, স্কুলের নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের অভিনয়ে নাটকের প্রযোজনা শিক্ষক মহাশয়দেরই করতে হবে, যদিও সময় সময় উচ্চশ্রেণীর কৃতী বালকদের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর বালকদের ভূমিকা সুবহু করানোর কাজ চলতে পারে। এরূপ হ'ল একটি ছাত্র প্রত্যেক স্কুলেই পাওয়া যাবে, যাদের স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতা আছে—অভিনয়ে তাদের সহায়তা অপরিহার্য। ভূমিকা বিতরণের সময় ছাত্রদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হলে শিক্ষক-মহাশয়েরা যেন ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে, নাটকে রাজার ভূমিকা যেকোন প্রযোজনীয় ভিখারীর ভূমিকাও সেইরূপ। সুযোগ ও সুবিধা থাকলে বালিকা বিভাগলয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে একযোগেও ছেলেরা নাটকের অভিনয় করতে পারে।

উপসংহারে এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে নাট্যগৃহ প্রায় সকল বিদ্যালয়েরই অপরিহার্য অঙ্গ। শিশু-নাট্যাভিনয় আন্দোলন প্রসারলাভ করলে শিশুদের ভিতর পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি তো হবেই, উপরন্তু বহিরাগত দর্শকবৃন্দের সহিতও তাদের যোগস্বজ স্থাপিত হবে। আমাদের দেশের শক্তিশালী নাট্যকারেরাও তাঁদের শক্তি বিকাশের নূতন পথ খুঁজে পাবেন। শিশু-নাট্যের সাধকতা সেইখানেই।

আধুনিক মারাঠী কবি

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বাংলাদেশের নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে প্রচলিত হিন্দী, উর্দু, আসামী ও উড়িয়া ভাষার কবিদের কাব্যের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় সাধিত হয়েছে, কিন্তু স্বদূর মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের কবিদের অবদান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। উক্ত-কবি তুকারাম সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় ছ'একটি কবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মারাঠী কবিদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নেই। ঐ সব ভাষায়ও বর্তমানে বহু প্রতিভাশালী কবি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত কাব্যগ্রন্থ উপরোক্ত ভাষাসমূহকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে।

বর্তমান মারাঠী সাহিত্য প্রগতিশীলতার জন্মে খুব প্রসিদ্ধ না হলেও, তাতে এমন সব শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়েছে, যাদের লেখনী পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল জাতিগঠন ও জনগণের কল্যাণসাধন। তাঁদের জীবনও দেশহিতে উৎসর্গীকৃত।

যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ ও প্রকাশভঙ্গী বদলায়—এই পরিবর্তন ঘটে সমসাময়িক জীবনযাত্রার আদর্শ ও সামাজিক বিবর্তন অনুসারে। দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

পুরাতন ও নূতন মারাঠী সাহিত্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আজ যা নূতন ও চমকপ্রদ, ছ-দিন বাদে তা পুরনো, মলিন ও নিপ্রভ হয়ে যায়। বর্তমান প্রবন্ধে, প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলে কুমুদগ্রন্থ প্রভৃতি পুরনো আমলের কবিদের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী কবিদের কথাই এখানে উল্লেখ করব।

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মারাঠী কাব্যে ভগ্নদূত শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি ছন্দে রচিত কবিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতা এত নিখুঁত, স্ফুটমধুর ও বাণীলাবণ্যমণ্ডিত হয়েছে যে পড়তে গেলেই কাণ ও মন উভয়েই যুগপৎ মুগ্ধ হয়ে যায়। চতুর্দশদী কবিতা বা সনেটও মারাঠী সাহিত্যে অল্পসংখ্যক রচিত হয়েছে।

এ ছাড়া কোনও কোনও কবি সম্পূর্ণ নিজস্ব নব নব ছন্দেরও প্রবর্তন করেছেন—সেগুলোও বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান মহারাষ্ট্রে ছোট বড় অনেক কবিই আছেন, কিন্তু যশোবন্ত, মাধব জুলিয়ন, গিরীশ ও বীর বিনায়ক সাভারকার—এই চারজনই হচ্ছেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী কবি। এঁদের রচিত কাব্য কালজয়ী হবার দাবি রাখে।

বীর সাভারকারকে আমরা হিন্দুস্বাধীনতার প্রখ্যাত সভাপতি ও প্রখ্যাতনামা বিদ্রোহী নেতা বলেই জানি, কিন্তু তিনি

যে বর্তমান মারাঠী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলেও মহারাষ্ট্র-দেশে সর্বজনসমাদৃত—তা আমরা অনেকেই জানি না। একথা মানতেই হবে যে, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর স্থান প্রতিভাশালী কবি আর কেউ নেই। এই বিদ্রোহী কবির জ্বালাময়ী অপূর্ব কবিতাসমূহে দেশমাতৃকার বন্দনা গান উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ও আত্মবিস্ময়নার শ্লানি থেকে তাঁর প্রিয় জম্বুভূমি যেন অচিরে মুক্তিলাভ করে—তাঁর মনের এই একান্ত কামনাই তাঁর কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

মারাঠী সাহিত্যের বর্তমান উন্নতি বীর সাভারকারের ঐকান্তিক ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে স্বদেশ ও সাহিত্যের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিচ্ছিন্ন—স্বদেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে সাহিত্যের বিনিয়াদ দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু, ছন্দবৈচিত্র্য সবই তাঁর একান্ত নিজস্ব—অন্য কবির ছাপ তাঁর কবিতায় পড়েনি। তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বিচিত্র ও লালিত্য-পূর্ণ ছন্দ মারাঠী সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেছে। এ ছন্দের নাম 'বৈনায়ক' ছন্দ। এই ছন্দে রচিত কবিতা তাঁর পঠন-পাঠনে মারাঠী কাব্যরসিকদের অপার আনন্দ দান করে। সাভারকারের কবিতা থেকে তাঁরা শুধু যে কাব্যাত্মক রসাস্বাদনই করেন তা নয়, সেগুলো তাঁদের দেশাত্মবোধেও অমুপ্রাণিত করে তোলে।

আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, কারারুদ্ধ সাভারকারকে জীবনে অশেষ দুঃখ বরণ করে নিতে হয়েছিল; এক সময় এমন সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল যে তিনি আর মুক্ত আকাশের নীচে এসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন না, কারাগারকারের অভ্যন্তরেই তাঁর অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই সঙ্কট সময়ে শৃঙ্খলিত দেশজননী ও মুক্তিসন্ধানী দেশবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সব ভাবনার উদ্রেক হয়েছিল সেগুলোকেই কাব্যরূপ দান করে তিনি স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। তাঁর রচিত অবিল হিন্দু-বিজয়ধাম নামক বিখ্যাত সঙ্গীত সমগ্র ভারতে সমাদৃত এবং বহু জনসভায় গীত হয়েছে। সাভারকারকে যখন তাঁর জম্বুভূমি থেকে চিরতরে বিদেশে নির্বাসিত করা হয় তখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করার প্রাক্কালে তিনি সাগর তলমলনা নামক যে কবিতাটি রচনা করেন—ভাষার ঐশ্বর্যে প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে বিষয়বস্তুর গৌরবে তা অমর হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে ভারতের নরনারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

কবির যশোবন্ত (মারাঠী ভাষায় বলে যশ ও শুভ) আধুনিক

মারাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রচিত বহু কাব্যগ্রন্থ মহারাষ্ট্র দেশে সর্বত্র সমাদৃত। কিছুদিন আগে প্রকাশিত তাঁর কাব্যকীর্তি নামক কাব্যগ্রন্থ বরোদার গায়কোয়ারের নিকট অজ্ঞাত ও অস্বাচিত পুরস্কার লাভ করেছে। প্রজা ও জনসংঘের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বতন্ত্রতা লাভ, এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য। অনেক মারাসী সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে, যশোবন্তের প্রধান কৃতিত্ব হ'ল তাঁর অপূর্ণ প্রকাশ-ভঙ্গী, ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনামূল্য যা পাঠকের মনে অপরিণীত প্রভাব বিস্তার করে।

কবি মাধব জুলিয়ন মারাসী সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তকদের অগ্রতম। তিনি একাধারে গীতিকার ও কবি। গভীর সহৃদয়তা, এবং বিচিত্র মধুর শব্দচয়ননৈপুণ্য তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর আধুনিক রুচিসম্মত কবিতাবলী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সমাজ-সংস্কার-প্রয়াসী কবি গিরীশ গেন্বেছেন জন-জাগরণের গান। পুরাভিন সমাজের ইমারত এখন জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়, সুতরাং তাকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি চান নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে—যা দেশের দরিদ্রতম অধিবাসীকেও রক্ষা

করতে পারবে। মারাসী সাহিত্যের এক জন সমঝদার তাঁকে অতি আধুনিক উগ্রপন্থী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচিত বহু কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। সব চাইতে অধিক প্রশংসা পেয়েছে তাঁর আধুনিকতম গ্রন্থ 'মানস লেখ'—যাতে তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় সুপরিষ্কৃত।

মাধব রাও তাণ্ডে আর এক জন বড় মারাসী কবি। এই প্রগতিপন্থী কবির কবিতা আধুনিক যুগোপযোগী বলে বিশেষ লোকপ্রিয় হয়েছে। মহারাষ্ট্রের এই জনপ্রিয় কবি অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁর যুত্বাতে দেশে হাহাকার পড়ে যায়—বিশেষ করে তরুণদের মনে কবির অকাল প্রয়াণ গভীর রেখাপাত করে। কিন্তু তাণ্ডে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর মধুর মর্মস্পর্শী গানগুলোর ভেতর দিয়ে। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পুস্তক 'কি ব্যঞ্জনা' জনগণের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করবে। এ পুস্তকের গানের ভাষা, রচনা, সুর ও তাল সবই তাঁর নিজের সৃষ্টি।

মারাসী সাহিত্যে সম্ভাব্য প্রভাব অপরিণীত। এমন কি আধুনিক কবিগণও সে প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি।

সাহিত্য

শ্রীমদুস্টান চট্টোপাধ্যায়

নিজের পানে যখন চাহি তখন মনে হয়
কালের বুঝি শাসন এসে তুলিছে বৃকে ঝড়,
তোমার পানে যখন চাহি, সে ভাবে আসে ক্ষয়—
কাণ্ডেতে পশে কেমন যেন কানন-মর্মর।

ছায়ার দেশে ছলনা বশে ঘুরে যে যায় দৃষ্টী—
তার সে বাণী জানি না জানি আভাসে বুঝি সুর,

ঐশ্বর্য তাপে দগ্ধ দেহে জ্বালায় অহুসুতি
তোমার দেহের শীতল হোঁয়ায় হ'ল কি স্তম্ভুর।

কতো না হ্রদ, কতো না শীলা, কতো সে শাল-বন
বিজন পথে স্থতির সাথে গড়িল মন্দির,
আমারে তারাই বিদায়-বেলার পরালো অঞ্জন,
তোমারি তবু ভরিয়া পেছ তাদেরি মঞ্জীর।

প্রথিতযশা লেখিকা শান্তা দেবী প্রণীত

১। অলখ-ঝোরা (উপন্যাস)	...	মূল্য ৩/-
২। হুহিতা (উপন্যাস)	...	১/-
৩। সিঁথির সিঁছর	...	১১/-
৪। বধুবরণ	...	১৬/-

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী দেবী প্রণীত

১। ক্ষবিকের অতিথি (উপন্যাস)	...	২১/-
২। নিরেট গুরুত্ব কাহিনী (ছোটদের গল্প)	...	৬/-

শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীমতী দেবী প্রণীত

১। হিন্দুস্থানী উপকথা (বহু চিত্রযুক্ত)	...	২১/-
২। সাতরাজার ধন (ঐ)	...	১১/-

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশান্তা দেবীর নিকট

পি-২৬, রাজা বসন্ত রাই রোড, কলিকাতা ও
সমস্ত বিখ্যাত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রী প্রকাশিত হইতেছে

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা

বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্তমান যুগের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ

মনোবীর জীবনাবলীর হৃদয়পূর্ণ বর্ণন ও বিশ্লেষণ।

এবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোভিত, বাংলা-সাহিত্যে অভিনব জীবনচিত্রিত। ইহা একাধারে মনোবীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী এবং সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি যাবতীয় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তক-বানি অপরিহার্য।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০১২, আপনার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে একটি উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অস্থি হইউক বা স্থস্থ অবস্থাতেই হউক, যখন কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটি টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহাৰ্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটি দোষ এই যে উহা দ্বারা কোনো স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র স্থানীকীৰ্তিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীৰ্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

আনা-ভিটা এই সকল কারণেই একটি আদর্শ পানীয় রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাকৃতিক ক্ষমতা ও ক্ষতি পূরণ হইয়া ও শক্তি ও উদ্যমের এক অক্ষুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া ওঠে।

আনা-ভিটা স্থানীকীৰ্তিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের স্বল্প সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মন্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা স্থস্থ কি অস্থস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ কথিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্কিকো এবং বার্কিকু শিশু ও মস্তিষ্কজীবির পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া আনা-ভিটা রোগান্তে ও বার্কিকু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিশেষে শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায় তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে আনা-ভিটা মস্তিষ্ক,

পেশী ও অস্থি গঠনও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

আনা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কর পুষ্টি ও শক্তি-বর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মন্টযুক্ত সয়াসীম আনা-ভিটার আর একটি অপূর্ণ সম্পদ। বস্তুতঃ পক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিশেষ্যকর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। আনা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুগুণীর স্বর্ভূ পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের স্থানীকীৰ্তিত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের দের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১.৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ আনা-ভিটাতে অগ্নাত্ত নানা মূল্যবান উপাদান ছাড়াও একটি ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ আনা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মন্ট ও সয়াসীম থাকাতে আনা-ভিটা কেবল যে স্বচ্ছাচ্ছ ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অগ্নাত্ত খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ণ খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্বে ও পরে জ-নীদেব স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অন্তঃ উৎসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। আনা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অগ্নাত্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিত্যস্ব স্বহজপাচ্য অবস্থায় আনা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

আনা-ভিটা কি স্থস্থ কি অস্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। আনা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী

(২)



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচর”

ল্যাডকোভাইন
স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সন্তান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত অল্পের লইয়া অদ্বুত সাহস
ও বিক্রমের সহিত হুদর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
জয় পতাকা প্রোথিত করিয়া স্বীয় নামাঙ্কন
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাঙ্গালীর সেই শৌর্য বীরা আজ কাহিনীতে
পর্যবলিত—স্বাস্থ্যহীনতার জন্ম জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

অদম্য টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টসেপটিকস্ কলিকাতা

A. A. S.

বিজ্ঞানের মর্যাদা

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের বিষবাপ্পের জ্বালে বিজ্ঞানের চর্চা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, সাধারণ লোক বিজ্ঞান ও মারণ-শাস্ত্রকে এক পর্যায়ে ফেলিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ যে জীবনযাপন করিতেছি তাহার দ্রব্যসত্তার যে বিজ্ঞানের দান তাহা ভাবিয়া দেখি না। মাথার উপরে বৈজ্ঞানিক আলো, করাচীর ব্যবসায়ীর সহিত নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আলোচনা, বোম্বাই হইতে এরোপ্লেনে পেনিসিলিন আনা, মহামারীর হাত হইতে পরিত্রাণের জুড় ভ্যাক্সিন ইত্যাদি আমাদের সুখসুবিধা বিজ্ঞানীর দান। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিপদ এড়াইবার জুড় বিজ্ঞানচর্চার ও বিজ্ঞানীর সমাদর হয় এবং তাহাদের সর্ব চেষ্টা রাজনীতির কূটজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। ফলে বিজ্ঞানের ভীষণ রূপটা আমাদের চোখে পড়ে। গত যুদ্ধ (১৯১৪-১৮) হইতেই বিজ্ঞানের কৌশলে যে অনেক অসম্ভাব্য ব্যাপার সহজ করা যায় সেই বোধ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে জাগিয়াছিল, প্রয়োজনের তাগিদটা এই যুদ্ধে খুব অনুভব হয় এবং সেইজন্মই গবেষণার কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্রের নিজ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের চর্চার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনেও

স্বাভাবিক কৌতূহল জাগিয়াছে এবং সেইজন্ম 'এটম বম'-এর বিভীষিকার ছায়ায় বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। বিজ্ঞানকে যুদ্ধের সময় আমরা যে রকম ঝাঁটাই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেই অল্পপাতে তাহাকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে প্রায় তাড়াইয়াই আড়ালে রাখি এবং রোগ, ছুভিক্ষ, মহামারীর দিকে লোককে নিঃশব্দে আগাইয়া দিই।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মুখে বহুবিধ লোকের মিলিত সাধনা রহিয়াছে। এই মিলন দেশপাত্র তুলিয়া শুধু জাতিবার কোতূহলের বলে গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সংঘর্ষের মাঝে বিজ্ঞানের মিলন যে জগতের সম্প্রীতির পথে আমাদের অনেক ধাপ আগাইয়া দিয়াছে তাহা খুব স্পষ্ট হয় নাই। মানুষের সভ্যতা যেমন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে সেইভাবে মানুষের জ্ঞানের স্বাধীন মিলনই সভ্যতার সঙ্কটকে দূরে রাখিতে পারিবে।

ভারতে বিজ্ঞান সাধনার গতি অতি শ্লথ। জ্ঞানীর জাগতিক প্রয়োজন অতি অল্প—এই বোধেই মনে হয় যে, যে অল্পকূল অবস্থার প্রয়োজন সেই রকম ব্যবস্থা বিজ্ঞানের ছাত্র পায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোনক্রমে কাঠামো বজায়

মানুষের রূপচর্চার প্রয়াস^{*} অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। ঐতিহাসিক যুগের প্রসাধনের রসদ যোগাতো প্রকৃতি। বিজ্ঞান আধুনিকাদের সাজাবার ভার নিয়েছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত রেসমের প্রসাধনাবলী আপনার রূপসৃষ্টিকে সার্থক করবে।



Rayon's

an aid to your Beauty

৩৭, হারিসন রোড, কলিকাতা

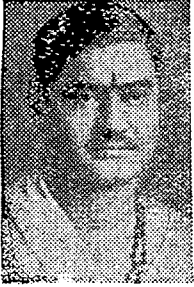


অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতিষবিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্র আচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও বোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিজ্ঞান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সামুদ্রিকব্রত, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিশ্ববিখ্যাত অজ-ইণ্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এণ্ড এট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুদ্ধারম্ভকালীন মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিবর্তিত গণনা কারয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

"বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।"

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহারা যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X X-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাম্বুজ্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবার মাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিজ্জহস্ত। ইঁহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের নবপতিত্ব এবং বৈদ্যের নেতৃত্ব লাভ ও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষবিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ যোগ্যের প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ বটা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আটটারজা বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

... ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই "জ্যোতিষশিরোমণি" উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অস্বাভাবিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার,

কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদূষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিঙ্গ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার—যুদ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয় বটমাতা মহারাজী জিপুরা ষ্টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্ত্রীর মম্বনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্নানমধস্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রত্বেই সম্ভব।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্ত্রীর মম্বনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্ট, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনবুর্গ হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে একগুণ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য মনোবী মহামোহোপাধ্যায় ভাবত্যাচার্য মহাকবি শ্রীহরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বরষে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্ৰী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের শ্রিষ্ট কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্ত্রীর সি. মাথবম্ নায়ার কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপাল বলেন—“আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

প্রথম কবচ—মনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও রাজত্বলা ইর্ষা, মান, বশ, প্রতিষ্ঠা, হুপুজ ও শ্রী লাভ করেন। (তথ্যস্রোত) মূল্য ৭১।০। অকৃত শক্তিসম্পন্ন ও সর্বদা ফলপ্রসূ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।০। প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য। **বর্ণলাব্ধ কবচ**—প্রদীপিত কবীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিহ্র মনিবকে সমুদ্র রাশিয়ার কর্মসূচিলাভে ব্রহ্মাঙ্গ। মূল্য ২১।০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪।০ (এই কবচে ভাওরাল সম্রাটী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বলীকরণ কবচ** ধারণে সবাই বলীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাচা) মূল্য ১১।০, শক্তিশালী ও সর্বদা ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪।০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এট্রোলজিকেল এণ্ড এট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রীট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
লাফাডের লময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।
ফোন : কলি : ৭৭৪২। **সময়**—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। **লণ্ডন অফিস** :—মিঃ এম, এ, কার্টস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

রাখিতে পারিয়াছে কিন্তু দেশের শিল্পনেতারা বা রাষ্ট্রনেতারা দেশের কল্যাণে বিজ্ঞানের দান যে কিছু আছে এবং হইতে পারে তাহা ভাবেন নাই। বিদেশীর অনুকরণে বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম আনিয়া ‘দেশী’ ছাপে মাল বিকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন শিল্পপতিরা এবং তাঁহাদের এই ভঙ্গুর ব্যবস্থার স্থিতি ও “উন্নতি” কল্পে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ কর (protective tax) বসাইয়া রাষ্ট্রনেতারা কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিদেশে যেমন রাষ্ট্রের অর্থায়নকৃত গবেষণার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, শিল্পপতিরাও তাঁহাদের নিজ নিজ শিল্পের উৎকর্ষের জন্য নিজস্ব কেন্দ্র বা সমর্থপীঠা একত্র হইয়া এক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন। এ ছাড়া কোন ধনী সাধারণ গবেষণার জন্য (অর্থাৎ কোন বিশেষ শিল্পদ্রব্যের উদ্দেশ্যে নহে) -বিপুল ব্যয়ে বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন করিয়া সেই দেশের বিজ্ঞানীদের অগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ দিয়াছেন। নূতন শিল্পও সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের শাসনব্যবস্থা জটিল—প্রাদেশিক ঈর্ষা, সম্প্রদায়-গত হীনবুদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের জোড়াতালি—এই সব প্রতি-কূল ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ যাত্রা সম্ভব নয়। বিলাত হইতে রয়েল সোসাইটির সম্পাদক ও পার্লামেন্টের সভ্য অধ্যাপক ছিলকে ভারত-সরকার আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাধনাকে কাজে লাগাইয়া মধ্যযুগীয় ভারতকে কতকটা আধুনিক

করিবার প্রয়াসে উপায় নির্ধারণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার আগে অবশ্য সরকারী দপ্তরে সার এন. এস. ভাটনগরকে ডিরেক্টর করিয়া এক গবেষণার বোর্ড তৈয়ারী হইয়া যুদ্ধের টুকিটাকি তাগিদ মিটাইবার জন্য কাজ করিতেছিল। এই বোর্ডের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহার গঠনতন্ত্র সাময়িক প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল। হিল সাহেব বড়লাটের সভার সভ্য আর এক জন বাড়াইয়া সেই আসনে বিজ্ঞানের এক পুরোহিতকে বসাইবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় এবং রাজস্বের শতকরা এক ভাগ ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে মর্যাদা যদি বিজ্ঞানকে পাইতে হয় তাহা হইলে খালি সরকারী আওতায় ২০০।২৫০ বিজ্ঞান-কর্মীর কাজের সৃষ্টি করিলেই চলিবে না, দেশময় যেখানে বিজ্ঞানের গবেষণা হয় বা হইতে পারে এবং যেখানে বিজ্ঞানের স্থান হয় নাই বা প্রয়োজনটা আতিশয্য বলিয়া মনে হইয়াছে কিন্তু হওয়া অতি প্রয়োজনীয় সেই সব কেন্দ্রে তদারক ও অর্থপুষ্টি করিবার ব্যবস্থা আগে দরকার। আমরা বিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্র কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কৃষি বিভাগে শিল্পকেন্দ্র, স্বাস্থ্য (কেবল রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা নয়, রোগের কারণ উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা) বিভাগ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রাস্তা-ঘাট দেশরক্ষা, ইত্যাদি সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই আমাদের

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্তরের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেষোক্ত খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা সুদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিন্ডিকেট

লিনিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম “হনিকথ”

ফোন ক্যাম ৩৩০১

ভোমোপের ভেবগণেশ



এটা নেই, ওটা নেই—প্রয়োজনীয় জিনিষের দুস্রাপ্যতার আলোচনায় আলাপের প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্বাদ চেকে। তবুও কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিচিত গন্ধ মনকে মাতাল করে তোলে। ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ যে বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কেশচর্চায় অপরিহার্য “লক্ষ্মীবিলাস”—সহস্র অস্রবিধা সত্ত্বেও আজ সকলের দাবী মিটিয়ে চলেছে সমানে।



লক্ষ্মীবিলাস

☆ চতুর্দশ শতাব্দীর পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত

এম. এল. বসু এণ্ড কোং. লি.

কলিকাতা

সম্মে এখনও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ফুটিয়া উঠে নাই। ১৮৯০।৯৫ সালে যে ব্যবস্থা ও আয়োজন ছিল সেই ব্যবস্থা বজায় রাখাই যেন ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কর্মলিপ্ত বিজ্ঞানীদের কাজ। আপিস ও ফাইল লইয়া বিজ্ঞানচর্চার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্যই সরকারী কর্মকর্তাগণ কোন ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক ‘অকেজো’ বিভাগে হাঁটাই করেন। একদিকে যেমন অর্থহীনতার জন্ত উদ্যম ও উৎসাহ নিবিয়া যায় আর একদিকে যেটুকু অর্থ সরকার বাহ্যিকর জোগান তাহারও কোন ফল দর্শায় না বলিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর শোচনীয় দশা দেখি এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে।

সরকারী দপ্তরে বর্তমানে বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেশের উন্নতিতে নিয়োগ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা চলিতেছে। কোন কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে সর্ব-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা করা সম্ভবসাধ্য হইবে না। আবার প্রাদেশিক ভিত্তিতে বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব নহে। অনেক ব্যাপারের মূলনীতি ঠিক করিতে হইবে অবিভাজ্য ভারত হিসাবে, কিন্তু তাহার প্রয়োগকালে ব্যবহার ভারতম্য করিতে হইবে প্রদেশের বজানীদের। গবেষণার কেন্দ্র প্রদেশে প্রদেশে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সবজাতা সিভিল সার্ভিসের ছায়া যাহাঁতে বিজ্ঞানের আলোককে ঢাকিয়া রাখিতে না পারে সেইজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বিজ্ঞানীর পরামর্শকে ভিত্তি করিয়া কাজ করিতে হইবে। শতকরা ১ টাকা হিসাবে প্রথম দিকে মোট রাজস্ব হইতে বিজ্ঞানের জন্ত বরাদ্দের কথা ছিল—সাহেব বলিয়া গিয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিসের বার মাসের আর্থিক অনটনের চাপের ভিতরে যেন বিজ্ঞানের জন্ত এই সামান্য অর্থের ব্যবস্থাটা না মারা পড়ে। দেশকে যদি গড়িতে হয় তাহা হইলে নূতন দৃষ্টি লইয়া কাজে নামিতে হইবে। সেই স্বপ্নের অভাব আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের চোখেও।

প্র্যানিং বা ডেভেলপমেন্ট এই নামে বিভাগ খুলিয়া অতি অর্ধাচীন বা অল্প লোকের হাতে সামান্য টাকা দিয়া থান-কয়েক রিপোর্ট লিখিয়া সুদিনের আশায় বসিয়া আছি। কিন্তু সুদিন যে গড়াইয়া যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি না। বিলাত হইতে কল কিনিয়া চিমনি বসাইয়া দেশে টাকা রোজগার করিলে যখন রাজস্ব বাড়িবে তখন বিজ্ঞানের “জায়-সম্পত্ত” মর্যাদা দিব এই ভাবে আমরা বিভোর হইয়া আছি।

অধিকার ভেদ এবং মর্যাদাবোধ আমাদের মনোজগতে নাই। টাকার কুমীর সর্ববিদ্যার ছাপ লইয়া বসিয়া আছে, কারণ তাহার টাকার জোরে অনেক পণ্ডিতকে সে কাছে লাগাইতে পারে। বর্ধার নদীকে অর্থের বিনিময়ে লোক খাটাইয়া বাধ দিয়া জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সেই জলের ভোড়ে শক্তি উৎপাদন করা বা জল দিয়া পাশের অহুর্কের জমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোলা জ্ঞানের অধিকারীর কর্মস্থল। বিজ্ঞানীকে মর্যাদা আমরা দিতে পারি নাই এবং তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রেও ঢুকিতে দিই নাই। বিজ্ঞানের চর্চাকে নিভৃত চিন্তার সামিল বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি এবং দেশের কাছে বিজ্ঞানীর কাজ প্রয়োজনীয় বলিয়া ভাবি নাই। আজ আমেরিকার নদীর জলের ঐশ্বর্যসম্ভার (টেনিসিডালি অধরিতর কার্যকলাপ) দেখিয়া বিজ্ঞানীর খোঁজ করিতে যাই বাহিরে। আমাদের দেশের লোকের সংখ্যাহুপাতে শিক্ষক নাই, চিকিৎসক নাই, তাই উপযুক্ত সংখ্যক ও কর্মস্থল বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কথা ত ভাবিতেই পারি না। বিরূপ আকাশের নক্ষত্র-ধতিত রূপ আমাদের সামনে নাই। কয়েকটি ধূমকেতুর আলোকজটায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি এই আলো ম্লান হইয়া যাইতেছে কেন। বিদেশের মানুষ বৈজ্ঞানিকের মেলা বসাইতে পারিল কেনন করিয়া ৭ সভ্যতার নীর্বে আমরা হিলাম আর আজ সভ্যতার সরঞ্জাম জোগাড় করিবার জন্ত বিদেশে ছুটিতে হইতেছে। সামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটাও ভরিয়া রাখিতে পারি নাই।

কাঁকড়া বিছের রস

রসকার—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শার্দুলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আঁতে ঘা না লাগিলে বস্ত্রব্য ও ত্রুটব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অত্যাশ শূল বেদনার সম্ভাবন্য আছে। বাহারা রসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞর্প রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞ্ছনীয়।

‘কাঁকড়া বিছের রস’ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে।

বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন।

এনিথ
এলফেব্র
একশন

স্বাস্থ্য কেশ তৈল

অনুম্পা কোমিক্যালঃ কলিকাতা

ANANDA



লুপুংগু - পাণ্ডিত্য

লুপুংগুট্ট—জীননীমাধব চৌধুরী। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

লুপুংগুট্ট গল্পের বই। নয়টি ছোট গল্প ইহাতে আছে। প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। নামটি একটু অদ্ভুত ধরণের। কোল ভাষায় ‘গুট্ট’র অর্থ গ্রাম। লুপুংগুট্ট চাইবাসার নিকটবর্তী একটি কোলগল্পীর নাম। দাদার বিবাহের পর ছুটিতে বৌদিদির সঙ্গে মল্লু অর্থাৎ তাহার ক্ষুদ্র দেবরটিও সিংভূমে বেড়াইতে গিয়াছিল। গল্পের মধ্যে এই প্রথরবন্ধি সরল তৌতুক-প্রিয় শিশুশ্রুতি বালকটি উজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ননীমাধব বাবুর প্রবন্ধ অনেকেই পড়িয়াছেন। কিন্তু সে সব রচনা তাঁহাকে বৈদিক গবেষকরূপেই পরিচিত করিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে মোপাসাঁ ও রুশোর অনুবাদক বলিয়াও জানেন। কিন্তু তাঁহার গল্পের হাত যে কত মিষ্ট এই বইখানি না পড়িলে তাহা বুঝা বাইবে না। সবগুলি গল্পই স্রাব চোদ পনের বৎসর পূর্বে রচিত। অনেকগুলি লেখা অধুনালুপ্ত ‘ছোট গল্পে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত ‘কর্তিনারায়ণ’ গল্পটিতে প্রাচীন জমিদার বংশের অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই ধরণের

রচনা ইহা অগ্রদূত বঙ্গিলেও চলে। ‘হুমতি’, ‘সপোখিতা’, ‘সত্যানুসন্ধান’, ‘যুগশ্রবর্তক’ প্রভৃতি গল্পে লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রোপের ক্ষমতাও প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ গল্প ‘কনকলেখা’র লেখক হিন্দুযুগের একটি ছবি আঁকিয়াছেন, রচনাভঙ্গীর মধ্য দিয়েও সে যুগের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়। গল্পগুলি মোটেই গতানুগতিক নয়। কল্পনার বৈচিত্র্য এবং রচনাভঙ্গীর অভিনবত্বে ‘লুপুংগুট্ট’ গল্পগুলি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। ‘লুপুংগুট্ট’ ছোটগল্পলেখক হিণাবে গ্রন্থকারকে উচ্চাসনে আসীন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা

নিশার স্বপন—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৪ বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা, পৃ ১২৫।

লেখক ইহার পূর্বে আরও দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস। আশা করিয়াছিলাম পাকা হাতের রসঘন কাহিনী পড়িয়া আনন্দলাভ করিব,—কিন্তু বইখানি পড়িয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনা-কাল বিগত তেরশ পঞ্চাশ সাল, পটভূমি বাংলার পল্লী, বিশিষ্ট চরিত্র—গ্রামের সেবারতী তরুণ সম্প্রদায়, ধ্বংসোন্মুখ জমিদার ও তাঁর ভাগিনেরী,—হালের বড়লোক মিলিটারী কনট্রাক্টর প্রভৃতি—কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করিবার যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও লেখক

প্রকাশিত হইল !

প্রকাশিত হইল !!

বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী
কবি সার্বিজীতপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চার অধ্যায়ে সমাপ্ত ঘটনাবল্লি ‘বিপ্লবী জীবনের’ স্ববৃহৎ ইতিহাস। উপন্যাসের মত ধারাবাহিক গতি। অপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গী ও বিচিত্র বিস্তার উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। কংগ্রেস আন্দোলনের উজ্জল ইতিহাস। বহু অজ্ঞাত ঘটনার উদ্ঘাটনে ও বহু অপ্রকাশিত চিত্রে সমৃদ্ধ। ‘সুভাষচন্দ্র’ ও ‘নেতাজী’ সত্যকার পরিচয় হিসাবে ইতিপূর্বে প্রকাশিত সকল পুস্তক হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এষ্টিক কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত কিশোরদের বিশ্বকবি

যার প্রতিভায় সমগ্র জগৎ মুগ্ধ, যিনি বাঙালী জাতিকে ও বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে আসন দান করিয়াছেন সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর জীবনকথা কিশোরদের উপযোগী করিয়া রচিত। সুন্দর এষ্টিক কাগজে ছাপা, বহু চিত্রে শোভিত। মূল্য দু’ টাকা।

কাটিং ও সূচি-শিল্প শিক্ষা—

সুভাষিনী দেবী ও উপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ... ১৫০

জনতা (উপন্যাস)—আশালতা দেবী ... ১৫০

পলাতক (উপন্যাস)—ঐ ... ১৫০

মজার পাত (ছোটদের জগৎ)—

শ্রীপ্যারীমোহন মেনগুপ্ত ... ১৫০

দৈত্যে মানুষে (ছোটদের জগৎ)—

শ্রীগোপালনাথ বিজ্ঞানবিনোদ ... ১৫০

নালন্দা প্রেস—১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

রসসৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ভাষা দুর্বল। বানান ভুল অল্প,—
যথা—রাশিকৃত, দারিদ্র, স্বাস্থ্য, বস্ত্রা, উপর্যোপরি,—ইত্যাদি।

বন্ধনহীন গ্রন্থ—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। দেবপ্রী সাহিত্য
সমিতি। ২২ এ, ভারত প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

লেখক নবীন। কাহিনী-গ্রন্থে বা প্রকাশ-ভঙ্গীতে নিজস্ব একটি
রীতি এখনও তাঁর আরম্ভ হয় নাই। শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির দ্বারা তিনি
অত্যধিক প্রভাবিত। তথাপি ছোট ছোট ঘটনাগুলি বিশেষভাবে দেখিবার
দৃষ্টি তাঁর আছে। লেখার মধ্যে দরদ এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে,
টাইপ স্ট্রের চেষ্টাও প্রশংসনীয়। জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে
এগুলি যুক্ত হইলে তিনি যশ অর্জন করিতে পারিবেন।

সপ্তস্বরী—শ্রীমৎসনাথ হালদার। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, নং
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্পগুলি ভারতী মাসিক পত্রিকায় ১৩০৩ হইতে ১৩১১ সালের
মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঠক-সমাজে এগুলি
যে ভাবেই সমাদৃত হউক—পড়িতে বসিয়া আজিকার দিনেও রীতিমত
বিস্ময় লাগে। কোন গল্প ভাবের অভিনবত্বে—কোনটি বা বাচন-ভঙ্গীর
বৈশিষ্ট্যে ও মাধুর্য্যে বাংলা কথা-সাহিত্যের এক প্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া
আছে। এ কালের মন লইয়া সে কালের কথা-সাহিত্যের বিচার সহজ-
সাধ্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ গল্পই যে রসোত্তীর্ণ একথা অস্বীকার করা
চলে না। এই রচনাগুলির মধ্যে লেখক বহুকাল জীবিত থাকিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার নবজাগরণ—স্বধাণ্ড সাহিত্য মন্দির। ৭০ বি,
ক্লিফোর্ড স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২, মূল্য ১।০০।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ
ও অন্যান্য দেশের জাগরণের কথা বলিতে গিয়া আলোচ্য পুস্তকে
স্বদেশের তরুণগণকে এই জাগরণে সাজা দিবার জন্য আহ্বান
করা হইয়াছে। এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ সমস্তই আজাদ হিন্দ
ফৌজ সাহায্য-ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

বাংলার কুটীর-শিল্প—শ্রীনগোপাল চক্রবর্তী। প্রকাশক—
অনন্তোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য ১।০০।

‘জ্ঞান-ভারতী’ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। পৃথিবীতে যত্নের যুগ চলিয়াছে,
কিন্তু পাশ্চাত্যের তুলনায় বাংলাদেশ আজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।
কোন কোন শহরে অধুনিক যন্ত্রপাতির কারখানা চলিতেছে সন্দেহ নাই।
কিন্তু এই বিরাট দেশের অগণিত পল্লীতে জনসাধারণ দারিদ্র্য, দুঃখ,
অভাব, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যে কালযাপন করিতেছে। অথচ
ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলা
দেশ শিল্পীর দেশ ছিল। অবশ্য যে শিল্প তখন ছিল তাহা কুটীর বা
গৃহ-শিল্প। পাশ্চাত্যের যন্ত্রশিল্প যে শিল্প-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার
প্লাবনে এ দেশের কেন, পৃথিবীর সব দেশের গৃহ-শিল্প ভাসিয়া গিয়াছে।
একমাত্র জাপানই আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহিত গৃহ-শিল্পের
পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে। এই গরীব দেশে জাতিকে
বাঁচাইতে হইলে গৃহ-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে আবশ্যিক তাহা সকলেই
স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন
হইবে ততদিন গৃহ-শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব নহে। দেশকে ভালবাসিলে
উহার শিল্প ও শিল্পীকে ভালবাসিতে হয়। লেখক ইহাই বুঝাইতে
চেষ্টা করিয়াছেন। বস্ত্র-শিল্প, শর্করা-শিল্প, খাত্ত-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাগজ-
শিল্প, দারু-শিল্প, লবণ-শিল্প, চর্মে-শিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প যথা

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও
তাহার “শ্রী” মার্কী স্বতের নূতন পরিচয় বাংলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা
স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

প্রকাশিত হ'লো
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

গুড আর্থ
সত্য বাক

অনুবাদ ক'রেছেন পুষ্পময়ী বসু

...বাংলার দুর্গত, নিপীড়িত চাষীর সংগ্রাম, ব্যর্থতা, স্থখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা রূপ নিয়েছে চীনের চাষী ওয়াংএর মধ্যে। আর কর্ণ-ক্ষতা, সর্বসহা মুক বহুবার মত বাংলার মেয়ে লুকিয়ে আছে ওলান-এর মধ্যে। মহাচীনের মহামৃত্তিকায় একত্র হ'য়ে মিশে আছে বাংলার অনাবৃত্তিতে দক্ষ, বস্তায় ভাসিয়ে-নিয়ে-বাওয়া বাংলার সোনা ফলা মাটি। 'গুড আর্থ' সেই সোনার মাটির ছবি...

- * ১৯৩৮-এ বহুমূল্য নোবেল প্রাইজ পাল' বাক এই উপন্যাস লেখার জন্ম পেয়েছেন।
 - * ১৯৩৬-এ 'গুড আর্থ' সবার চিত্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু 'গুড আর্থ'-এর আসল পরিচয় মূল পুস্তকে, ছায়া-চিত্র অর্পণ হলেও মূলের অপরূপত্ব তাতে নেই, নেই তাতে মূলের অর্পণ হৃদয় বিস্তার।
 - * বিশ্ববিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবং হাওয়ার্ড-অর্থপদক উপহার দিয়ে পাল' বাককে সম্মানিত করা হয়।
 - * পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম এই উপন্যাস প্রকাশিত হল।
 - * আমেরিকার বই বিক্রয় র‍্যাঙ্ক 'গুড আর্থ' রেকর্ড স্থাপন করে।
- অনিম্ন্য অনুবাদ—অপূর্ব গঠনসজ্জা—উৎকৃষ্ট গ্রাফিক ডিমায়ে কাগজে ছাপা এই সুবৃহৎ উপন্যাসের মূল্য : পাঁচ টাকা।

হুগো
মূলতঃ হুগো ম্যান্স

অনুবাদ : গুণেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

একটি ভারতীয় কুলির জীবনী অবলম্বনে এই বিখ্যাত উপন্যাস রচিত। আমাদের দেশে এই উপন্যাস এতদিন প্রচলনে বাধা ছিল। ইংরেজী ভাষায় এই উপন্যাস কয়েক লক্ষের উপর বিক্রয় হয়েছে এবং রুশ ভাষায় ৩০ লক্ষের উপর বিক্রয় হয়েছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় এই উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। আশা করি বাংলা সাহিত্যেও বিশেষ আদর পাবে।
হুম্বর বাঁধাই : দাম চার টাকা চার আনা

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

পাটি, বাঁশ, বেত, সোনার জিনিষ, হকা-কল্কে প্রভৃতির কথা, টোল ও ছাতার বাট ও মিষ্টান্ন প্রভৃতির কথা লেখক হুম্বর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক সঙ্গীর্ণ অর্থে 'শিল্প' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি বলিতে চান যে, বাংলার কুটার-শিল্প এতদিন প্রকৃতই বাঙালীর অভাব পূরণ করিত এবং চাহিদার যোগান দিত। আজ বাঙালী তাহার কুটারজাত স্বদেশী জবোর প্রতি দরদ হারাইয়াছে, বিশেষ ভাবে পাঁচাত্তোর পণ্যসম্ভার-মোহে মজিয়াছে। বিদেশী শাসিত রক্ষণ-শুষ্ক বর্জিত দেশে একমাত্র দেশের লোকের দরদ ও নিষ্ঠাই স্বদেশী কুটার-শিল্পের জীবনদান করিতে পারে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মহাপরিনিব্বান সূত্র—রাজগুরু শ্রীধর্মরত্নমহাশয়ের বিনয় বিশারদ সংকলিত ও অনূদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমং প্রিয়দর্শী ভিক্ষু, সন্ধর্মোদয় পালি টোল, রাজানগর, পোঃ আঃ রাজাজুবন, চট্টগ্রাম। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে মহাপরিনিব্বান সূত্রের পালি মূল ও টীকা-টিপ্পনী-সহ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী, সিংহলী ও বর্মী-অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক হইতে পাঠান্তর পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুবাদ হুবাধ্যাক্রিয়ার উদ্দেশ্যে পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানাদি দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য দার্শনিক-তত্ত্ববহুল গ্রন্থ কখনও সাধারণ গ্রন্থের মত সরল ও সহজবোধ্য হইতে পারে না; তথাপি আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় মধ্যে মধ্যে যে কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইল তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি, অনুবাদক মহাশয় ভবিষ্যতে এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে এই জাতীয় গ্রন্থের দ্বারা বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডার প্রকৃত পুষ্টিলাভ করিবে।

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের
অপরিহার্য দুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অর্দ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক
শ্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম্, এন্ মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক
দর্শন ও ক্রমিক ডিগ্রিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জন্ম সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার
মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি
চিত্রসহ বুঝান হইয়াছে)

প্রাপ্তিস্থান :—হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং

১৬৫নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকাবের নিকট, দিনাজপুর।

সত্য বটে, কিছু কিছু বৌদ্ধগ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হইয়াছে। কিন্তু বিশাল বৌদ্ধ-সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও বাঙালী পাঠকের নিকট অপরিচিত। শুধু ব্যক্তিগত বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে এই অভাব সহজে ও গীত্র দূরীভূত হইবার আশা নাই—এজন্য চাই সংযবদ্ধ স্থানীয়কৃত ব্যাপক প্রচেষ্টা।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ফ্রেড ও মনঃসমীক্ষণ—শ্রীমুনীচন্দ্র বিশী ও শ্রীঅসিত-কুমার রায়। প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া থ্রেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য : ১০ টাকা।

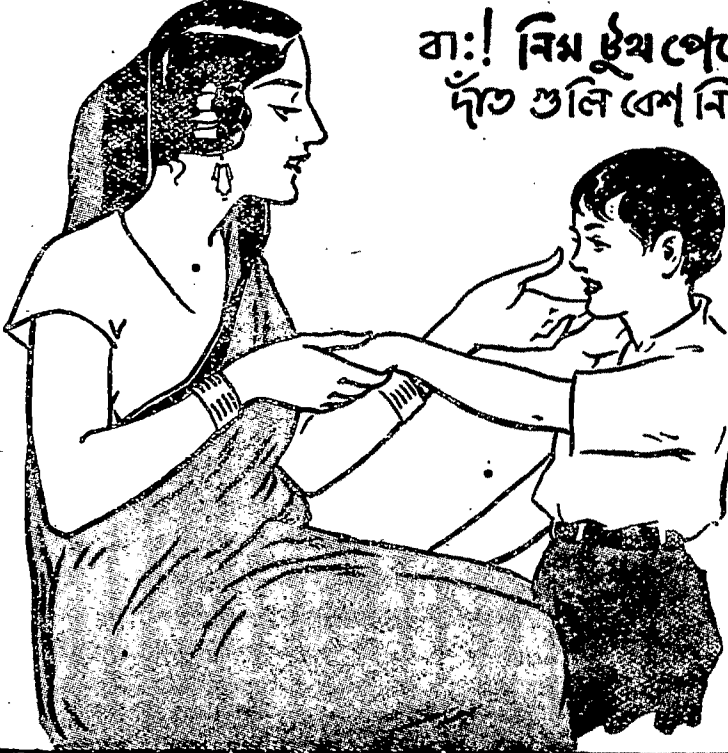
নিজ্ঞান মনের রহস্য আবিষ্কার বর্তমান জগতের অত্যন্ত প্রধান যুগান্ত-কারী বৈজ্ঞানিক বিষয়। ইহা মনোবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। ইহার আবিষ্কারী ফ্রেড চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। নিজ্ঞানে মানুষের মনের গহনে হস্ত পশু প্রযুক্তির নগ্ন স্বরূপকে পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি অনেকেরই নিন্দাভাজন হইয়াছেন সত্য, কিন্তু একথাও যৌকার্য্য যে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত হইতেছে। বাংলা-সাহিত্যে ফ্রেড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডক্টর হৃদয়চন্দ্র মিত্র প্রধান। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় দু-একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের উপযোগী আরো পুস্তকাদি রচিত হওয়া আবশ্যিক। স্থলের বিষয় বিজ্ঞান-বিভাগের কোনো কোনো ছাত্রও সম্প্রতি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি ডক্টর ক্লিফোর্ড এ্যালেন এম, ডি প্রণীত *Modern Discoveries in Medical Psychology* গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়ের (চতুর্থ ও পঞ্চম)

অনুবাদ। ইহাতে ফ্রেডের আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণ, কামশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য, স্বপ্নবিশ্লেষণ, ভুল-ভ্রান্তি, রসিকতা, মানসিক রোগ-লক্ষণ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ও মনঃসমীক্ষকদের আবিষ্কৃত বিবিধ তথ্য—এক কথায় মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রায় সকল তথ্যই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই ছুগ্নহ এবং তটিল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ দুটির অনুবাদ এত সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকেরও অনায়াসে বিষয়-জ্ঞান হইবে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ফ্রেডের জীবন-কথাও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ফ্রেডের একটি রেখা-চিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে এবং ডক্টর হৃদয়চন্দ্র মিত্রের হস্তিখিত ভূমিকাটি এর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশিষ্টে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষার একটি নির্ধৃত দেওয়ান পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। মূদ্রণ-পারিপাট্য এবং বিষয়-বস্তু নির্বাচন ইত্যাদি নানা দিক দিয়া 'বাংলা বর্ধলিপি'র প্রকাশক সংস্কৃতি বৈঠক বাংলাদেশে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

ইতালীর সেরা গল্প—অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। বুক ষ্ট্যান্ড, ১:১১১, বঙ্কিম চাটাজ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২০ টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের একটি শুভ লক্ষণ এই যে ইহার অনুবাদ বিভাগ দিন দিন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। ফলে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যেই বিশ্ব সাহিত্যের বহু অমূল্য গ্রন্থের রসাস্বাদন করিবার স্বযোগ হইয়াছে। যুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, রুশীয় এবং নবওয়েস্টার্ন কথ্য-সাহিত্যের সহিতই আমাদের বনিষ্ঠ পরিচয়। মোপাসাঁর গল্প, টলষ্টয় ও গোকির উপন্যাস, টুর্গেনিভের গল্প,

মাতঃ! নিম্ন টুথপেস্টের শুভে খোজনের
দাঁত শুলি বেশ নির্দোষ হইবে উঠেছে দেখাচ্ছি!



ক্যাল কেমিক্যালের 'নিম্ন টুথপেস্ট' আর নিম্নের শুভা মাজন 'মার্গোফ্রিস' সকল বয়সেই দাঁতগুলিকে বেশ যত্নবুদ ও উজ্জল করে রাখে।



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

হুট হামসনের উপাঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা সাময়িক পত্রাদিতে আলোচনা হইয়াছে প্রচুর এবং এই সকল লেখকের রচনার কিছু কিছু অনুবাদও হইয়াছে। সে তুলনায় ইতালীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় তত গভীর নয়, অথচ দুনিয়ার সাহিত্য ও শিক্ষা-কলার ভাণ্ডারে ইতালীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু ইতালীয় কথা-সাহিত্যের একটা দিকের সহিত বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয় সাধন করাইবার উদ্দেশ্যে যে কয়টি গল্প অনুবাদ করিয়াছেন সেগুলি শুধু ইতালীয় কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা গল্পের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রবীন্দ্রবাবু নিজে শিল্পী এবং সাহিত্য-রসিক বলিয়া এই গল্প-সঙ্কলনে নিখুঁত নির্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সব কয়টি গল্পই মনে গভীর বেধাপাত্ত করে এবং মানুষের মন যে পৃথিবীর সর্বত্রই এক সেকথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদেশীয় সাহিত্যের আকর হইতে রত্নরাজি আহরণপূর্বক মালাকাথে গ্রথিত করিয়া লেখক বঙ্গ-বাণীর গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প জননৎসিওর (ডেনানৎসিও নহে) 'ক্যানডিয়ার শেষ পরিণতি' যেন এই মণিহারে মধ্যমণির মত দোহল্যমান।

আজকাল অনেক অনুবাদ-গ্রন্থে দেখিতে পাই, অনুবাদকের নামের আড়ালে আসল লেখক চাপা পড়িয়া যান। অনুবাদকের নাম মূল গ্রন্থের লেখকরূপে যেন পুস্তকের মলাটে এবং ললাটে নিরঙ্জিতাবে জল জল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত

করে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু পণ্ডিত মালকে নিজের বলিয়া চালাইবার এ অপকৌশল অবলম্বন করেন নাই। টাইটেল পেজে নিজের নামের আগে অনুবাদক কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

নেতাজী—শ্রীগোপাল ভোমিক। শ্রী পাবলিশিং কোং, ২০৩.৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকতা। ১৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২/-।

আজাদ হিন্দ কোজ ও নেতাজীর সম্বন্ধে অসংখ্য বই বাজারে বাহির হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুজুঘটপত্রের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী-সম্বলিত হুলিখিত ও হুচিহ্নিত বই বাংলাভাষায় দু-একখানি বেশী চোখে পড়ে না। বহু আয়াস ও শ্রম স্বীকারপূর্বক একখানি নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ হুজুঘ-জীবনী রচনা করিয়া গ্রন্থকার সত্যই আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। জগৎ হইতে তিরোধান পর্যন্ত নেতাজীর আত্মোপাস্ত জীবন-কাহিনীর প্রায় সমস্ত উপাদানই লেখক একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন, তদুপরি তাঁহার জীবনের সংঘনা ও মূলনীতি, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ ও পন্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের পথে তাঁহার অবদানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন হুকবিও হলেখক, সাংবাদিক মহলে তাঁহার নাম আছে, হুতরাং তাঁহার লিখিত জীবনীখানি যে সাধারণ পাঠক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে ইহা আশা করা যায়। নেতাজীর কয়েকখানি হুনের প্রতিকৃতি পুস্তকের শোভা-বর্ধনকরিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে নেতাজীর সর্বোচ্চাধিকার বংশ

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মালিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজি: অফিস—আধাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

ডিপোজিট, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকতা ব্রাঞ্চ—৬নং ক্লাইভ স্ট্রিট, ৫৭নং, ক্লাইভ স্ট্রিট (রাজকাটরা) .

১৮৮০ ৩ ২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং নোভাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

মূলধন—

৫০,০০০,০০/-

বিক্রীত মূলধন—

২২,৫০০,০০/-

অনিবারিত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল—

২৪,৫০০,০০/-

টাকার উপর

সংরক্ষিত তহবিল—

৩,৯৭,০০০,০০/-

টাকার উপর

কার্যকরী তহবিল—

৩,৭০,০০০,০০/-

টাকার উপর

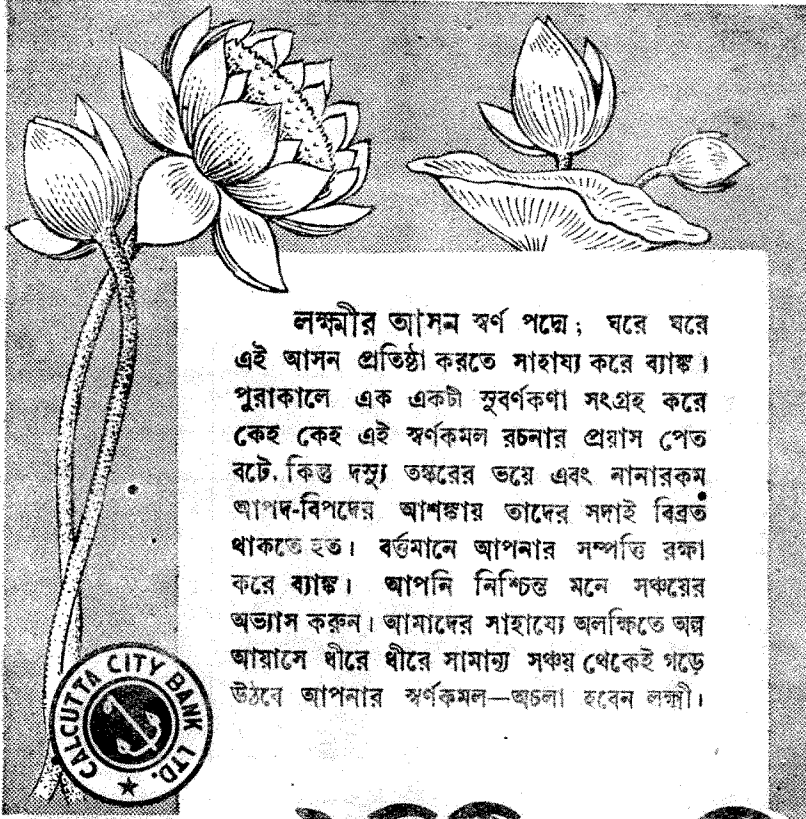
ব্রাঞ্চসমূহ—মাটিয়াগঞ্জ, বদরপুর, বাজিতপুর, ঝাড়গ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, শিলচর, শ্রীহট্ট, ইক্ষল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, মৌলবীবাজার, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, নবদ্বীপ, তেজপুর, বেনারস, চাঁদপুর, ট্যাংলা, গোয়ালঘাট, গোহাটা, হবিগঞ্জ, হাইলাকান্দী, জলপাইগুড়, নখলদীপুর, নেত্রকোণা, নীরাইগঞ্জ, পুরী, শ্রীমঙ্গল, ফেচুগঞ্জ, ডিব্রুগড়, শিলং।

ভানসুকিয়া ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইবে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর



লক্ষ্মীর ভাসন স্বর্ণ পদ্মে; ঘরে ঘরে
এই আসন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে ব্যাঙ্ক।
পুরাকালে এক একটা সুবর্ণকণা সংগ্রহ করে
কেহ কেহ এই স্বর্ণকমল রচনার প্রয়াস পেত
বটে, কিন্তু দস্যু তক্ষরের ভয়ে এবং নানারকম
আপদ-বিপদের আশঙ্কায় তাদের সদাই বিব্রত
থাকতে হত। বর্তমানে আপনার সম্পত্তি রক্ষা
করে ব্যাঙ্ক। আপনি নিশ্চিত মনে সঞ্চয়ের
অভ্যাস করুন। আমাদের সাহায্যে অলক্ষিতে অল্প
আয়্যাসে ধীরে ধীরে সামান্য সঞ্চয় থেকেই গড়ে
উঠবে আপনার স্বর্ণকমল—অঁচলা হবেন লক্ষ্মী।



ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
১০২বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

স্থপরিচিত একখানি আবক্ষ ও একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি পুস্তকের কোথাও চোখে পড়িল না, এই হিসাবে গ্রন্থখানি বিবম ক্রটিপূর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—ক্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। অবর্তক পাবলিশার্স, ৩১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১.০।

যদি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রকৃত পুস্তকের মধ্যে এমন একখানির নাম করিতে বলা যায়, বাহা প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে জীবন্ত ও প্রাণবান, হৃদয় সমালোচনা ও বিশ্লেষণের গুণে ধারাল মন্তব্যে পূর্ণ, মহত্বের প্রতি প্রজ্ঞা-নিবেদনে অকুণ্ঠ ও মুক্তকণ্ঠ, তবে দেশবন্ধু ও যতীন্দ্রমোহনের প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী কংগ্রেসকর্মী কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকখানির নাম করিতে হইবে। লেখক সুদীর্ঘকাল সুভাষচন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নেতাজীর চরিত্র ঠাডি বা অধ্যয়ন করিবার পক্ষে প্রচুর সুযোগ ঘটিয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীর মুখে সুভাষ-চরিত্রের নানা বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে দেশের চিন্তাশীল ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পাঠকমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি।

বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি—ক্রীসুভাষচন্দ্র বহু। প্রকাশক—ভারত সম্পদশ্রী লিঃ, ১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।

নেতাজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ উক্ত নামে বেণু পত্রিকায় ১৩৩৭ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হইয়া ছিল। গ্রন্থকার নানা টীকা-টীপনী সংযোগে ঐ প্রবন্ধটির ব্যাখ্যাপূর্বক সমগ্র প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন, পরিশিষ্টে বাংলার তরুণী, ছাত্রী ও জননীদেব উদ্দেশ্যে তাঁহার রচিত নানা পুস্তক হইতে তাঁহার বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তরুণ বাংলার ছাত্র ও ছাত্রী সমাজের মুখপাত্র ও হৃদয়ান্ত বিপ্লবী বোবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের প্রত্যেক রচনাই এখন বেদাক্ষর জ্ঞানে তরুণ বাংলার অবস্থাপাঠ্য। বিশেষতঃ নারীবাহিনী ও নারীকর্মী সংগঠনে তাঁহার উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয়। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বাঁসীর রাণীবাহিনীর কুমারী বেলা দত্ত, রেবা, সিধা, মায়ী গাঙ্গুলী ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের মত বীরঙ্গনাগণ ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বাঁসীর রাণী-বাহিনী—শ্রীকালিদাস ঘোষাল। গ্রন্থস্থল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন স্ট্রিট কলিকাতা। মূল্য ৫।

বাঁসীর রাণী-বাহিনীভুক্ত একজন নারী-দৈবিকা ও মৈনিকের ডায়েরী বা দিনলিপি—উপগ্রাস অপেক্ষা যোমাকর—আজাদ হিন্দ ফৌজের অপূর্ব কীর্তিকাহিনীর বর্ণনায় নাটকের মত চমকপ্রদ—ভারতের মুক্তি-কামনার উল্লেখ সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের উন্মাদনা ও উদ্দীপনাপূর্ণ দিনগুলি ইহাতে অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যভূষণতা ও পারস্পর্য্য রক্ষা করিয়া কবিত্বপূর্ণ ভাব ও ভাষার রঙীন মনোহর স্তরে গাঁথিয়া গ্রন্থকার প্রত্যক্ষদর্শী নারী-দৈনিকের এই অনবদ্য রোজনাম্ভার ডালি সাজাইয়াছেন, প্রচুর চিত্র ইহার বাহ্যশোভা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়াছে। মূল্য কিছু কম করিলে ইহার অধিক প্রচার হইত।

আজাদ হিন্দ ফৌজ—ক্রীবিনয়েন্দ্রনাথ রায় ও পরিচোষ ধর। গ্রন্থস্থল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ১।

ইহাতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বহু তথ্য ও সংবাদ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবে। অনেকগুলি কবিতা ও প্রতিলিপি পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সর্বসাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র—ক্রীকবিশ্বনাথ রায় ও মণি বাগচি। বুকষ্ট্যাণ্ড, ১১১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ২।



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
যাহুক ক্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

ডাক্তারেরা বলেন

ব্রাড-ভিটা

দুর্দলতা ও ক্ষয়প্রাপ্তিতে যে দেশে রোগের আদর্শ চলিত ও বড় শত্রু

সর্বজনীন স্বাস্থ্যের
মেডিকেল রিসার্চ ল্যাবরেটরি
সি-২০, জেনারেল এডমিট, কলিকাতা

উচ্চাঙ্গের শিল্পী-পরিকল্পিত এই গ্রন্থের মলাটের সৌন্দর্য্য প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ইহার মূদ্রণ-পারিপাট্য ও আভিজাত্য পাঠকের দ্বিতীয় লক্ষ্যীয় বস্তু। পরিশেষে ইহার প্রকৃষ্টলিপুত, উদ্ভূত অথচ সংহত লিপিকুশলতা পাঠকে সচকল ও ভাবোবেলিত করিবে। প্রথমে সংক্ষেপে হুতাষচন্দ্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া পরে তাঁহার শেষজীবনের কীর্ত্তিশূভ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠনে সর্বাধিনায়ক হুতাষচন্দ্রের সর্বোচ্চ কৰ্ম্মকুশলতা বাখ্যাত হইয়াছে। 'এদের নমস্কার' অধ্যায়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং, রাস-বিহারী বহু, শ্যামলাল, সোমল, বীলন ও লক্ষ্মী স্বামীনাথন, বেলা দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট নায়কনায়িকাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে হুতাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রচারিত বাণী পুস্তকের মধ্যদ্বারা যুক্তি করিয়াছে। মূল্য কিছু কম করিলে ভাল হইত।

নেতাজী—শ্রীশালেশ বিনী। প্রবর্তক পাবলিসার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০।

নেতাজীর জীবনের ঘটনাসকল নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ, হুতাষ তাঁহার সম্বন্ধে নাটকখানি রচনা করিয়া গ্রন্থকার মনোমতায় পরিচয় দিয়াছেন। নাটকীয় সংলাপ, দৃশ্যসংস্থান, চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবিজ্ঞাসে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করিলে দর্শক-মহলে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে, ইতিমধ্যে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠক তৃপ্তলাভ করিবেন।

ছোটদের নেতাজী—শ্রীসত্যকুমার নাগ। চয়নিকা পাব-লিশিং হাউস, ৪২, নীতারাং ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০।

ছোটদের জন্য লিখিত নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে দ্রুত সংক্ষিপ্ত রচনা।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত, ১২০১২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, মূল্য দশ পয়সা।

পুস্তিকাতে লক্ষ্মী-সঙ্গীত, পূজা-বিধি, ভ্রতকথা, স্তবস্ততি একাধারে থাকায় লক্ষ্মীভক্ত নরনারীর খুবই উপকারে লাগিবে।

চ.

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি. সি. দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস-৭/১ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-কলিকাতা-১১২২, ১১২৩

শাখা অফিস

কালীঘাট, শ্যামবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রীট, বড়বাজার, ল্যান্সডাউন, খিদিরপুর, বেহালা, বরানগর, বাটানগর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, কারশিয়াং, ঘাটশীলা, বিষ্ণুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্

মিঃ এস, বিশ্বাস, বি, কম

মিঃ সুশীল সেন, বি, এ

দেশ-বিদেশের কথা

ভবানীচরণ লাহা

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লাহা বিগত ১৭ই ভাদ্র ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যে শুধু একজন প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীই ছিলেন তাহা নয়, তাঁহার জায়গার সমস্ত শিল্প-সমালোচক, বাস্তব শিল্পকলা সম্বন্ধে পৃষ্ঠপোষকও বিরল। তিনি ইন্ডিয়ান একাডেমি অব ফাইন আর্টস, আর্ট ইন ইন্ডিয়া একজিভিশন প্রভৃতি বহু অস্থান-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গবর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস' ইত্যাদি নানা কলাশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ ছিল। নিজের যোগ্যতার দরুন তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার অঙ্কিত বহু ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। তা' ছাড়া তিনি চিত্রকলাবিষয়ক একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর পরোপকারবৃত্তিও ছিল প্রবল। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সক্রিয় সংশ্লিষ্ট ছিল।

ভাগীরথী শিল্পাশ্রম

গত পঞ্চাশের মধ্যভাগের সময় ভাগীরথী শিল্পাশ্রম নামক অনাধ আশ্রমটি কর্ণেল ডি. এন. ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই আশ্রমে ১৬৮টি বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার সহিত তাঁত, রেশমকটী পালন প্রভৃতি নানাবিধ কুটির-শিল্প শিক্ষালাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাগণকে প্রয়োজনীয় খরবাত্তী সমন্বিত জমিজমা দিয়া একটি আদর্শ গ্রাম গঠন করা এই আশ্রমের অন্ততম উদ্দেশ্য।

ভাগীরথী নদীর তীরে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্থানে, কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূরে বি. এ. রেলওয়ের শিমুরালী স্টেশন হইতে ১ মাইল ব্যবধানে ৩০/ বিঘা জমির উপর এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পিতৃমাতৃহীন এবং অসহায় হইয়া পড়িয়াছে এরূপ ২০১২৫টি (৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকাকে আশ্রমে ভর্তি করিয়া লইতে চাহেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে আশ্রমের সুপারিন্টে-

ডেন্ট শ্রীমুক্তা লাবণ্যকণা বহুর সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, পোঃ শিমুরালী, নদীয়া।



পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সহ প্রমথ চৌধুরী
(ইহার সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)

চিত্রপরিচয়

রামকিরী একটি রাগিণীবিশেষ। মতান্তরে ইহাকে রাম-করীও বলা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার ধ্যান নিম্নলিখিতরূপ :—

হেমপ্রভা ভাসুরভূষণা চ

নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী

কান্তে সমীপে কমনীয়কণা

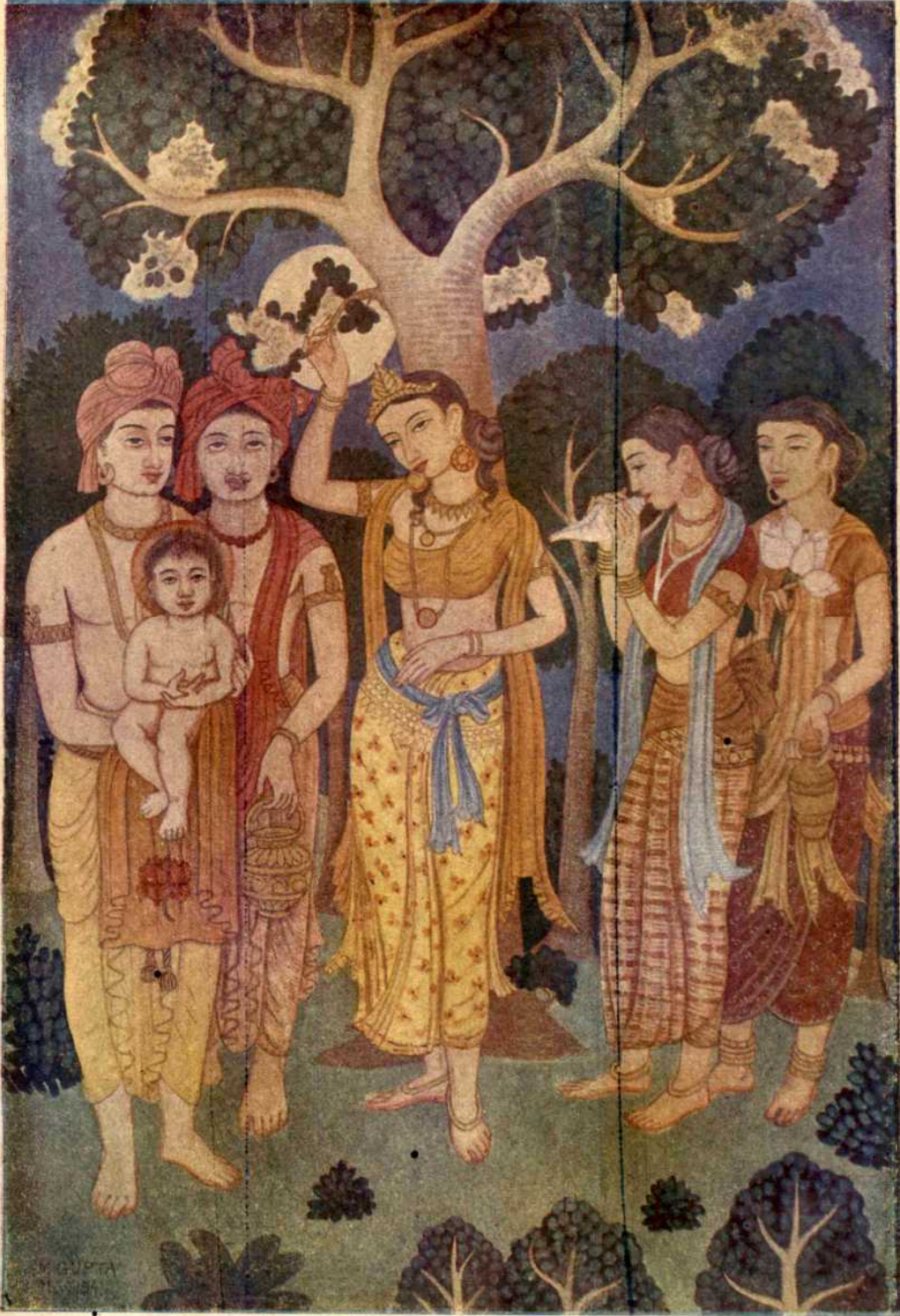
মানোন্নতা রামকিরী মতেয়ম্ ॥

• অর্থাৎ হেমকান্তি হ্যুতিমণ্ডিত ভূষণধারিণী নীলবসনী কমনীয়কণা মানোন্নতা রামকিরী কান্তসকাশে বিরাজমানা।

দামোদর মিশ্রকৃত সঙ্গীতদর্পণ

চরিত্রচরিত্রাভ্যাস

মুদ্রক, ড. প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০১২ আশার দায়হুলার রোড, কলিকাতা



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বুদ্ধদেবের জাতক
শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ শর্মা



ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে পদভ্রজে গান্ধীজীর গোপাইরবাগ যাত্রা



লাকসাম ষ্টেশনে সমবেত হিন্দু-মুসলমান জনতার সম্মুখে গান্ধীজী বহুতা করিতেছেন

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’র অবতারণায় আমরা লিখিয়াছিলাম, “অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা বাংলা, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান বাঙালীর বাসভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে পারে কিন্তু বাঙালীর অস্তিত্ব লোপ অসম্ভব নহে, এবং সে ঘটনা সুদূরভবিষ্যতে ঘটবে এ কথা ভাবিয়া মনকে আশ্বাস দেওয়া চলে না।” লিখিবার সময় আমরা বুঝিয়াই লিখিয়াছিলাম যে বাঙালীর মরণ-বাঁচনের সন্ধিক্ষণ আসিতে খুব বেশী দেরি নাই, তবে ইহা সত্য যে আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই যে উহা আসন্ন প্রায়।

লীগ দলের কার্যক্রম-হিটলার-মুসোলিনীর অক্ষশক্তির অঙ্ক-করণে পরিকল্পিত। মেকি ও সাক্কার পার্থক্যের জ্ঞান সকল প্রকার বাদসাদ দিয়াও যাহা থাকে তাহাও অতি ভয়ঙ্কর, কেননা, ঐ মেকির পিছনে আছে বিদেশীর তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাশ বংশেরের আয়োজন। লীগের অভিযান প্রতিরোধের জ্ঞান কি ব্যবস্থা, কি আয়োজন আমাদের আছে তাহার বিচার অপ্রিয় হইলেও, করা প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলার কর্ণধারগণ এতদিনে “নিজের দল ভারী করা” ও চক্রান্তকারী চেলা-চামুড়ার উদরপূর্তি ভিন্ন আর কিছু ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি? আমরা বুদ্ধিমান জাতি, কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তির অবতারণায় আমরা সকলেই পঞ্চানন। তাহার সঙ্গে আছে স্থলকলেজ বন্ধ করা, ট্রাইক, হরতাল ইত্যাদি ধীরে পিতামাতা ও কর্মচালকদিগের পূর্বজন্মের ঋণ পরিশোধের সহজ ব্যবস্থা, তাহাতেও যদি কিছু না হয় তবে আছে ভাবের উজ্জ্বাস ও সর্বশেষে আত্মনাদ। স্বপক্ষের লোকের দোষত্রুটি—তাহা সত্যই হট্টক বা মিথ্যাই হট্টক—প্রচার করিয়া, উচ্চ মাথা নত করাইয়া, ও মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করিয়া, সহজেই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। এই ত সেদিন কত সহজে পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে প্রচুর মিথ্যার অভিযান চলিয়া গেল কিন্তু সে অভিযানের লাভ-লোকসান হিসাব করিল কে? “বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি” এ কথা বাঙালীর মাথায় ঢুকিবে

কবে? বর্তমানে আমাদের অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ সুতরাং আক্ষেপে সময় নষ্ট করা যুগ্ম। এখনও যদি আমরা স্থির ভাবে কি কতব্য কি উপায়, তাহা ভাবিতে না পারি তবে সর্বনাশ। এতদিন আমরা কল্পনার রাজ্যে বিহার করিয়াছি, এখন বাস্তব জগতে কিরিয়া আসা নিতান্তই প্রয়োজন।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান

বাংলার সীমানা লইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘প্রবাসী’তে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। গণপরিষদের অধিবেশন আসন্ন। উহা বর্তমান প্রাদেশিক সীমারেখা মানিয়া লইয়া উহারই ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই সীমারেখাগুলি কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে অঙ্কিত হয় নাই, উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকদের সুবিধানুসারে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কংগ্রেসের গঠন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রবাহনুসারে প্রদেশ বিভাগ করা হয় নাই, উহা অনেকটা অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা এক ও অবিভক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলা অবিভক্ত রাখিবার বিরুদ্ধে দুইটি বৃহৎ যুক্তি দেখা যাইতেছে এবং কিছু দিন যাবৎ উহা প্রকাশে আলোচিতও হইতেছে। প্রথমটি অন্ধ ধর্মোন্মাদ-গত, দ্বিতীয়টি শাসনতান্ত্রিক। নোরাখালীর ঘটনায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের শতকরা ৯০ জন ধর্মাস্ত্রিত মুসলমান ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যাইতেছে হিন্দুবিদ্বেষ তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। বাংলার মুসলমান আমাদের ইতিহাস রিয়ারজুস সালাতিন গ্রন্থে দেখা যায় দুই বার এখানে ব্যাপক ধর্মাস্ত্রিকরণের চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই দুই অভিযানেরই নায়ক ছিলেন ধর্মাস্ত্রিত হিন্দু সন্তান, এক জন রাজা গণেশের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন, অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-তনয় মুর্শিদকুলি খাঁ। মুসলমান সমাজে এখন যাহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ সব চেয়ে বেশী লক্ষণীয়—প্রথম, পূর্বধর্মের প্রতি তাহার গভীর বিদ্বেষ; দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্মের অপহৃত্য নারীকে গৃহে আনয়ন করায় আগ্রহ। মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পর হইতেই হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়।

ইংরেজের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুনর্বীর জাগিলে পরে এত দিন এদেশে মন্দির ভাঙাই চলিতেছিল, গত দুই মাসে উহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে দুই সম্প্রদায়েরই পরস্পরের ধর্মস্থানের উপর আঘাতে। প্রভেদ এই যে, পরিবারের কোন তরুণ কোন নারীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া ধরে আনিয়া তুলিবে, বাঙালী হিন্দু ইহা কল্পনা করিতেও পারে না কিন্তু মুসলমান সমাজে ইহা স্বাভাবিক ঘটনা দাঁড়াইতেছে।

নোয়াখালির উপকৃত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু “বিশিষ্ট” মুসলমানও হিন্দু নারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে। নর-হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অপেক্ষা এই দুই ঘটনাকেই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। পূর্ববর্ণিত ইতিহাস মনে রাখিলে ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন হইবে না। বাংলার হিন্দুই শুধু মুসলমানকে ভাই বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত রক্তের সম্পর্ক খুঁজিয়া লইয়া তাহাকে আপন ভাবিতে চাহিবে, আর মুসলমান শুধু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বধর্ম বিস্তারের সুযোগ খুঁজিবে—এই মনোবৃত্তি বজায় থাকিতে দুই সম্প্রদায়ে মিলনের আশা সুদূরপর্যন্ত। নোয়াখালির আঘাতেই বোধ হয় হিন্দু বাংলার ইতিহাসে প্রথম বার ভাব-রাজ্য হইতে বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। এই প্রথম সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ ধর্মান্তরিত হিন্দুকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্বধর্মে ফিরিবার অনুরূতি দিলেন এবং বাংলার হিন্দু সমাজ অপহৃত্য নারীকে নিজ নিজ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথ খুলিয়া দিল। ধর্মান্তরকরণ ও নারীহরণ দ্বারা মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টার পথে এত দিনে কাঁটা পড়িল।

বাংলার জনবসতিতে নূতন সমস্যা

বাংলার হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি এত বিদ্বেষ বৃদ্ধি লইয়া বর্তমানে একসঙ্গে বাস করিতে পারিবে কি না তাহা বিশেষভাবে বিবেচনার বস্তু। ভাষা ও সংস্কৃতিতে সব বাঙালী এক ইহা ঠিক, কিন্তু ধর্মের নামে যে বিচ্ছেদ ও বিবাদ আজ দাবানলের ছায় জলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কি অস্বীকার করা চলিবে? বিদ্বেষ মুসলমান সমাজে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে আজও যেন ইঁহারা সজীর্ণ গভীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা তুরস্ক, আরব, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রকে বিশ্বসভায় পাঁচ জনের হইয়া বা দশ জনের স্বার্থ লইয়া কথা বলিতে দেখি না। এদেশের তো কথাই নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমানেরা ইংরেজী বিদ্যালয় বর্জন করিলেন, ফল বিষয় হইল তাঁহাদেরই পক্ষে। এই তিষ্ঠা অভিজ্ঞতার পরেও আজ মৌলবী ফজলুল হক অধ্যাপক জুবেরি প্রভৃতিকে দেখি স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দশ জনের সহিত একই বিদ্যালয়ে ও কলেজে পড়িয়া মুসলমান ছাত্রেরা যে সময় অতের সমকক্ষতা অর্জন করিতেছে, ঠিক সেই সময় স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের কুপের মধ্যে তাহাদিগকে তেলিয়া দেওয়ার অর্থ বাংলার মুসলমান সমাজকে আরও এক শতাব্দীর পিছনে রাখিয়া দেওয়া।

বাংলার মুসলমান সমাজে যে চাকল্য দেখা দিয়াছে অনেক সময় তাহাকেই নবজাগরণ বলিয়া ভুল করা হয়। বস্তুত, ইহা নবজাগরণ নহে। ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারার কল্যাণে মুসলিম লীগের হাতে দেশের শাসনযন্ত্র আসিয়া গিয়াছে, ফলে সমগ্র বাংলার রাজস্ব আজ লীগের করায়ত্ত। এই রাজস্ব এবং সমগ্র শাসনযন্ত্র লীগের হাতে আসিবার পর তাঁহাদের সহস্র সহস্র অহুচরের পক্ষে চাকুরী ও নানাবিধ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগ ঘটয়াছে। চাকুরীর মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৮০টি সাময়িক; কন্ট্রোল ও রেশন প্রভৃতির পরিসমাপ্তি ঘটিলেই এই সমস্ত লোক বেকার হইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসাদারদের অবস্থাও তাহাই। ইহাদ্বারা কতকগুলি লোক অর্থবান হইয়াছে কিন্তু মুসলমান-পরিচালিত শিল্প বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইহার দ্বারা বেশী বাড়ে নাই। কন্ট্রোল ও রেশন উঠিয়া গেলেই ইহারও অবসান ঘটবে। শাসনযন্ত্র লীগের করায়ত্ত হওয়ার ফল হইয়াছে এই যে নিজের দেশের সরকারী চাকুরী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর প্রবেশ-পথ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। হিন্দুর ভাগে বড় বড় ব্যবসায়ের যে সামান্য কয়েকটি লাইসেন্স জোটে তাহাও বাঙালী হিন্দু পায় না, পায় অবাঙালী ডিম্ব প্রদেশবাসী। সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক কারণে অযোগ্য লোক নিয়োগ ও যোগ্যতর লোককে অতিক্রম করার ফলে সমগ্র শাসনযন্ত্রের দক্ষতা তো কমিয়াছেই, লীগ-কর্তৃক নিযুক্ত ও লীগের প্রতি অহুচর কর্মচারীদের দ্বারা উহা অবিকৃত হওয়ায় শাসনযন্ত্র বর্তমানে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের সেবক না হইয়া শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থবাহী ও অপর সম্প্রদায়ের গীড়নের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসায়ের উপর আক্রমণ কিছুদিন যাবৎ বেশ পরিকল্পিত ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। এবার এই আক্রমণ সর্বপ্রাঙ্গী রূপ ধারণ করিয়াছে। লীগ মুখপত্রগুলি বাঙালী হিন্দুকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রকাশে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে ভারতবর্ষের হিন্দুপ্রধান প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের বাংলায় আনিয়া বসানো হইবে, কাজেই বাঙালী হিন্দুর স্থান বাংলায় হইবে না। ‘আজাদ’ পত্রিকার এই প্রকাশ প্রচারে ইহাদের চোখ খোলে নাই, ইহার পর কিসে ও কবে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে তাহা আমরা জানি না। বিহারের ঘটনার পর বাংলা-সরকার কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ এন. এম. খাঁকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিহার-সরকার আপত্তি করায় তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। সংবাদপত্রে

প্রকাশ, মিঃ খাঁর সেখানে যাওয়ার অত্যন্ত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিহারী মুসলমানদের বুখাইয়া পশ্চিম বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতে রাজী করান। এই চেষ্টার যে বিবরণ দৈনিক 'ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :

বিহারের দাক্ষিণ্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতিকে লীগ-নেতারা রাজনৈতিক সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। উহারা এখন প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানেরা বাস করিতে পারে না এবং হিন্দুরাও পারে না যেখানে মুসলমান বেশী সেখানে মুসলমানদের সহিত বাস করিতে।

লীগনেতারা ধরিয়া লইয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান আর কখনও একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারিবে না। তাই তাঁহারা মুসলমানদের একত্রে এক জায়গায় রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, লীগের বড় বড় নেতারা তিনটি প্রাণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রাণ অল্পসারে মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীদের বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতে বলা হইবে। প্রকাশ, বাংলার প্রধান মন্ত্রী সহীদ সাহেব এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বর্ধমানের পানাগড়ে আমেরিকান সৈন্যদের জন্ত যে মিলিটারী শহর তৈরি হইয়াছিল কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের নিকট হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের সেখানে স্থান দেওয়ার অল্পমতি পাওয়া যাইবে। সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের স্থান হইতে পারে। ঐ লোকদের জন্ত কিছু পতিত জমি চাষের যোগ্য করার সম্ভাবনাও আছে। বিহারের কোন কোন লীগনেতা মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গে একবার স্থান পাইলে জমি দখল করিতে তাহাদের বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

লীগের দ্বিতীয় প্রাণ হইতেছে আশ্রয়প্রার্থীদের পুণিয়ার স্থান করিয়া দেওয়া। পুণিয়ার মুসলমানেরা অত্যন্ত এলাকার তুলনায় কিছু বেশী আছে। উহা মুসলমান-প্রধান উত্তর বঙ্গের সংলগ্নও বটে।

তৃতীয় প্রাণটি হইল মুসলমানদের কয়েকটি গ্রামে একত্র করা। হিন্দু-প্রধান বিহারে উহা কয়েকটি দীপের মতন হইবে।

পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু। পশ্চিমবঙ্গেই শুধু তাহারা সংখ্যালঘু। উপরোক্ত উপায়ে গবর্নমেন্টের সহায়তায় পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমান বসাইয়া ঐগুলিকেও মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলায় পরিণত করিতে পারিলে সমগ্র বাংলার বাঙালী হিন্দুর স্থান কোথাও থাকিবে না। বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা দুইটিকে এই ভাবে মুসলমান সংখ্যাগুরুতে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ হইলেও

হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও বীরভূমের চেহারা বদলাইয়া স্কেল খুব কঠিন-কাজ হইবে না। গবর্নমেন্ট হাতে থাকিলে বাধা দিবারও কেহ থাকিবে না।

বাংলার সীমানা

বাঙালী হিন্দুর উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ রোধ করিবার উপায় কি? নোয়াখালীর ব্যাপারে বাংলার লীগ গবর্নমেন্টের উদ্বেগ ও পক্ষপাতিত্ব যে-ভাবে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, শাসনযন্ত্রের চূড়ান্ত অপব্যবহারকেও লীগ সর্বাধিনায়কেরা যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী হিন্দু এখনও সাবধান না হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ত বাঁচিবেই না, সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজকেও ঐ সঙ্গে গলার পাথর বাঁধিয়া বন্ধোপসাগরে ডুবিতে হইবে। সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজ কি উপায়ে রক্ষা পায় তাহাই আজ সর্বাঙ্গে বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব ও উপায়ে বিষয় স্থির ভাবে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে হিন্দুর রাজস্ব যে ভাবে হিন্দু দলনকার্য চলিতেছে অবিলম্বে তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বাংলার রাজস্বের শতকরা তিন-চতুর্থাংশ অথবা তারও বেশী হিন্দুরা দিয়া থাকে। যথায় যথ্যভাবে বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে ঐ রাজস্বের উপর লীগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে না।

দ্বিতীয় যুক্তি বাঙালী হিন্দুর ভাষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি-ক্রিয়ালীলতার ও অনাবশ্যক বৈদেশিকতার যে ছাপ লীগ শাসনের ফলে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার ফলে সুশিক্ষা দান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণাম এখনই অল্পভূত হইতেছে, অধিকাংশ বাঙালী তরুণ কৃষিকার ফলে চপল ও তরলমতি হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন স্থায়ী সংকার্য তাহাদের দ্বারা করানো কঠিন হইতেছে।

তৃতীয় যুক্তি বঙ্গবিচ্ছেদের ফলে পশ্চিমের বাঙালী হিন্দু শক্তিশালী হইয়া উঠিবে ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারিবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আজ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করা ছাড়া আর কোন পথ হুঁজিয়া পায় না। কলিকাতার দাক্ষিণ্যের পর লীগ গবর্নমেন্ট আসাম ও উড়িষ্যাবাসীদের নিরাপত্তা সহজে অনেক বেশী সচেতন হইয়াছে। বিহারের ঘটনার পর বিহারী-দের উপর অত্যাচার নিবারণেও হয়ত তৎপর হইবে কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দু দলনে বাধা পাওয়ার ভয় তাহার নাই।

আপাততঃ এই তিনটি যুক্তিই আমরা বঙ্গবিভাগের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এখনই ইহাতে অগ্রসর না হইলে বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব আবাসভূমি (Homeland) পর্যন্ত বন্ধায় থাকা কঠিন হইবে। এ ক্ষেত্রে শুধু এই কথা বিবেচ্য যে ইহা-দ্বারা পাকিস্থান মানিয়া লওয়া হইল কি না। পাকিস্থানের অর্থ স্বতন্ত্র ও পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের

সহিত যাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বাংলার সীমানা মূতন করিয়া আকিয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ছই প্রদেশে পরিণত করিলে ভারতবর্ষে প্রদেশের সংখ্যা একাদশটির স্থলে দ্বাদশটি হইবে, তার বেশী কিছু হইবে না।

অন্তর্বর্তী গবর্নেন্টে মুসলিম লীগের প্রবেশ

মন্ত্রীমিশন তাঁহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাপত্রে মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবিকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর সকলের আগে মুসলিম লীগই ঐ ঘোষণা গ্রহণ করেন। মিঃ জিন্না ১৬ই জুনের ঘোষণাপত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই গানিয়া লইয়া লীগের হাতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ভার ছাড়িয়া না দেওয়ার লীগনায়ক জুঙ্গ লইয়া বোম্বাইয়ে লীগ কাউন্সিলের সভা ডাকিয়া মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুন দুই তারিখের দুইটি প্রস্তাবই পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কংগ্রেসের হাতে অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইলে মিঃ জিন্না উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করিয়াই অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের পাঁচ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। লীগ-বিরোধী কোন মুসলমানকে অন্তর্বর্তী সরকারে সং করা হইবে না বলিয়া মিঃ জিন্না যে জিদ ধরিয়া ছিলেন, তাহাও টিকিল না, মিঃ আসফ আলি রহিয়া গেলেন। মিঃ আবেদকরের সাহায্যে বিলাতের চার্চিল দল হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরাইবার যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ত্রীযোগেজনাথ মণ্ডলকে লীগ প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রেরণ করিয়া মিঃ জিন্নাও আবার একবার সেই একই খেলা দেখাইয়াছেন। দৈনিক 'ভারতে' লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার সারাংশ এইরূপ :

মন্ত্রীমিশন ১৬ই জুন তারিখে যে প্রস্তাব করেন তাহাতে মুসলিম লীগের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে অস্বীকার করা হয়। তাহার পরই আরম্ভ হয় একটা কুংসিত চক্রান্ত। যখন তদায়কী সরকার গঠনের কথা হয় তখন কায়মী স্বার্থে স্বার্থ-বান ব্যক্তিবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু তার পরই যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় তখন কলিকাতায় মহাহত্যালাীলা সংঘটিত হয়। মুসলিম লীগের সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত যাহাতে কংগ্রেস রাজকার্য গ্রহণ না করে তাহার জন্ত তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু অকুতোভয় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তৎপ্রতি দুঃপাত না করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন।

অবস্থাদৃষ্টে প্রগতিবিরোধী দল তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ কত্বেন। ফলে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যবনিকার অন্তরালে একটা অপচেষ্টা চলিতে থাকিল। শোনা যায়, শ্রমিক

গবর্নেন্ট বলিয়াছিলেন যে, মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না হইবে তাহা একমাত্র নেহরু-গবর্নেন্টেরই বিবেচ্য। বড়লাট পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যদি লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত কথা পাড়েন তাহা হইলে পণ্ডিতজীর কোন আপত্তি আছে কিনা। পণ্ডিত নেহরু নাকি উত্তর দেন যে, মুসলিম লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারকে মন্ত্রিমণ্ডল হিসাবে গণ্য করিয়া লয় এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ মানিয়া লয় তাহা হইলে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

কিছুকাল পর পণ্ডিত নেহরুকে জানান হয় যে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সরল-প্রকৃতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ধরিয়া লন যে, লীগ পূর্ব-কথিত সত্য মানিয়া লইয়াছে। তার পর যখন দপ্তর বটনের কথা ওঠে তখন পণ্ডিত নেহরু বিস্মিত হইয়া পড়েন। তিনি পররাষ্ট্র বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং রেলওয়ে বিভাগের দপ্তর লীগের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বর্তমানে লীগ সদস্যগণ যে কয়টি বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন সেই কয়টি বিভাগ তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হন। শুনা যায় যে, স্বরাষ্ট্র বিভাগ লইয়া খুব একটা টানা-হ্যাঁচড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ বিভাগটি মুসলিম লীগের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব কেহ কেহ সদার প্যাটেলের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ বলিয়া গণ্য করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অনমনীয় ভাব অবলম্বন করেন এবং বড়লাটকে বলেন তিনি যেন ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে জানাইয়া দেন যে, যদি তাঁহার প্রস্তাব সমর্থিত না হয় তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিবেন। প্রথম প্রথম বড়লাট নাকি বলেন যে, তিনি তাহাই করিবেন। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অবস্থাটা সঙ্গীন হইয়া পড়িত। তাহা করিলে হয় মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে হইত নতুবা বড়লাটকে লাটগিরি ছাড়িয়া যাইতে হইত। শেষ পর্যন্ত বড়লাট আর অত দূর অগ্রসর হইলেন না।

কিন্তু মিঃ লিয়াকৎ আলি খান যখন সাংবাদিকদের নিকট বলিলেন যে, অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট বড়লাটের শাসন-পরিষদ ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বড়লাট এই সরকারের প্রধান তখন পণ্ডিত নেহরুর চক্ষু খুলিয়া গেল। নেহরু গবর্নেন্ট ইহার একটা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পার্লামেন্টে গত অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার সময় রাজা ঘোষণা করেন যে, নবগঠিত ভারত-সরকার অন্তর্বর্তী সরকাররূপে এবং মন্ত্রিমণ্ডলরূপে গণ্য হইবে। এই ঘোষণার পর এ সম্পর্কে বিতণ্ডার অবসান ঘটিল। রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণ এক বাক্যে এ কথা বলিতেছেন যে, পণ্ডিত নেহরু এখানে অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

গণপরিষদ পাণ্ড করার চক্রান্ত

অতঃপর ভারত লিখিতেছেন :

১৬ই আগষ্ট এবং তৎপরবর্তীকালের কলিকাতায় যে

দুইপাক ঘটনা গিয়াছে সে সমস্ত ঘটনার পর পণ্ডিত জবাহর-লাল দেখিতে পান যে, কলিকাতাবাসীদিগকে তিনি কোন সাহায্যই করিতে সমর্থ নহেন—এ বিষয়ে তাঁহার হাত পা বাঁধা। পণ্ডিতজী এক জন উচ্ছ্বাসপ্রবণ লোক; সুতরাং উক্ত অবস্থায় পড়িয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পাইবার জন্ত তিনি ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। এই আলোচনার শেষ না হইতেই নোয়াখালির ঘটনা সমগ্র পৃথিবীকে সচকিত করিয়া তুলিল। অল্পকাল মধ্যেই উপদ্রব প্রসার লাভ করিল—কলিকাতা মহা-নগরীতে দ্বিতীয় দফা উপদ্রব আরম্ভ হইল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জানাইলেন যে, যথোচিত ক্ষমতা পাইলেই অথবা দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ বড়লাটের যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে সেই দায়িত্ব পালনে বড়লাটকে সম্মত করাইতে পারিলেই তিনি কলিকাতায় আসিতে প্রস্তুত। পণ্ডিতজী এই দৃঢ়তার ফলে শেষ পর্যন্ত নাকি এই মর্মে একটা আপোষরক্ষা হয় যে, মন্ত্রিমণ্ডলের পরামর্শ অনুসারেই বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে বড়লাটের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ খর্ব হইল বটে, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের হাতেও কিছুটা ক্ষমতা আসিল। এই ক্ষমতা লাভের পর পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আসিলেন।

জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কি ভাবে চলে তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দেশ-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া বলেন যে, উপদ্রব নিবারণের জন্ত দৈন্যদিগকে কি ভাবে নিয়োগ করা হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। একটা কথা উঠিয়াছিল যে, বাংলা-সরকারই যখন সৈন্ত নিয়োগ কার্য পরিচালনা করিতেছেন তখন দেশরক্ষা-সচিবের এ বিষয়ে কিছু করিবার অধিকার নাই কিন্তু দেশরক্ষা-সচিবের উক্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব হস্ত কি প্রকারে কার্য করিতেছিল।

পণ্ডিত নেহরু কলিকাতা হইতে বিমানযোগে পাটনার গমন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যদি উচ্ছ্বলতা বন্ধ না হয় তাহা হইলে সামরিক বিভাগ আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ পর্যন্ত করিতে পারে। সম্প্রতি ভারতসচিব কমল সভায় বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার যদি ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে তিনি বাধা দিবেন না। এই উক্তি তাৎপর্য এই যে, আপৎকালীন অবস্থায় ভারত-সরকারের যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

রাজনৈতিক পূর্ববেক্ষকদের মতে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় যখন হাঙ্গামা শুরু হয় তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নেহরু গবর্নমেন্টের ছিল না। এ বিষয়ে বড়লাটকে অবহিত করিবার ক্ষমতা নেহরু গবর্নমেন্ট গত অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে লাভ করেন এবং সেই ক্ষমতা বিধিমত প্রয়োগ

করেন। বিহারে নাকি সামরিক আইন জারী করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিত নেহরু উহাতে দৃঢ় অসম্মতি জানাইবার ফলেই ঐ আইন জারী হয় নাই।

কংগ্রেস-বিরোধীরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, গণ-উপদ্রবের দ্বারা ভারতের প্রগতি বন্ধ করা যাইবে না এবং সেজন্যই নাকি তাহারা রব তুলিয়াছে যে, একটা বড় সম্প্র-দায়কে বাদ দিয়া যেন গণ-পরিষদের অধিবেশন না করা হয়। এই রবের মুখ বন্ধ করিবার জন্য নেহরু গবর্নমেন্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাইতে বন্ধপরিষ্কার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পার্লামেন্টের উদ্বোধন দিবসে রাজ্যের অভিভাষণে। অবহিত পূর্ববেক্ষকগণ দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিতেছেন যে, রাজ্যের পর পর দুইটি অভিভাষণের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতের প্রমুখ ব্রিটিশ সরকারের নিকট আজ একটা বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা বলেন যে, অতঃপর ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্নমেন্টের অকপটতা সত্ত্বে আর কোন প্রশ্ন করা চলে না।

এক্ষণে গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনের পথ উন্মুক্ত। আয়কলহের দোহাই দিয়া ভেদনীতির সেই পুরাতন খেলা শেষ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমল সভায় সাক্ষি বলিয়া দিয়াছেন যে, সকল গবর্নমেন্টের আমলেই ভারতে ঐরূপ হাঙ্গামা ঘটয়াছে। এ কথার অর্থ এই যে, এ সমস্ত হাঙ্গামার ফলে প্রভাবিত পণ্ড পরিষ্কার করা হইবে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও চূড়ান্তদিগের চেষ্টার ফলটাই নাই। প্রশ্ন তোলা হইয়াছে যে, গণপরিষদ আহ্বান করিবে কে এবং কে-ই বা উহার উদ্বোধন করিবে। রাজনীতিক মহল বলেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা-প্রণয়নকারী পরিষদের নির্বৃত্ত ক্ষমতা যখন শ্রমিক গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তখন আর এ বিষয়ে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের কোন হাতই নাই।

প্রগতিবিরোধীদের বেলার আর একটা দিক আছে। বিলাতের সানডে টাইমস্-এর নয়াদিল্লীস্থ প্রতিনিধি সেই দিকটা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগ নাকি গণপরিষদে যোগ দিবার মূল্য-স্বরূপ সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দাবি করিতেছেন। তাহারা নাকি তলে তলে এই ভয় দেখাইয়াছেন যে, অশুভায়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রসার লাভ করিবে। কংগ্রেসের সোজা উত্তর নাকি এই যে, যদি সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অভিলাষ মুসলিম লীগের থাকে তাহা হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে সে প্রার্থনা কংগ্রেসকে জানাইতে হইবে।

লীগের আর একটা দাবি হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে গণপরিষদের 'খ' খণ্ড গঠন করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিহীন করিতে দিতে হইবে। রাজনৈতিক মহল এই চালের মধ্যে চূড়ান্ত

পাঠানদের সমর্থনলাভের জন্ত লীগের চেম্বার আভাস দেখিতেছে। এ সম্পর্কে কেহ কেহ হুঃখ করিয়া বলিতেছেন যে ব্রিটিশ ভাইসরয় সঙ্গত কার্য করিতেছেন না।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রূপে মিঃ টেরেল সোনের আগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে। ভারত সম্পর্কে তাঁহার কার্যের স্বরূপ কি হইবে, এখন হইতে শ্রমিক গবর্নমেন্টের নিকট ভারতীয় ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকিবেন, না বড়লাট দায়ী থাকিবেন—এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। মিঃ সোন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বেই এক জন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার নিয়োগ একটা বিরাট পরিবর্তনের লক্ষণ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের জন্ত একটা সর্বসম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে আপোষ-আলোচনার জন্তই তিনি এদেশে আসিয়াছেন।

পণ্ডিত নেহরু নাকি ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করিবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার। স্মরণার্থ্য পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, ঐ তারিখে নিশ্চয়ই গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং ভারতের ইতিহাসে একটা যুগপরিবর্তন হইবে।

ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক বিবর্তনের মর্ম বুঝিতে হইলে দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম কথা এই যে, নেহরু গবর্নমেন্ট গঠন করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ক্ষমতাহস্তান্তর সম্পর্কে প্রথম সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের দ্বারা এই গবর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই নিজ ক্ষমতা প্রসার করিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক্ষণে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব এবং গণপরিষদ গঠন তাহার প্রমাণ। বহুকালের বহু জয়-পরাজয়ের পর আজ একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য গণপরিষদকে বহু বিদ্রুতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের নবজীবনের ধারা নির্দেশ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে, অনেক সময় লাগিবে, কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ছুদিনের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবাসীরা এবার জয়ের শিখরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে।

ব্রিটিশ সাংবাদিক কতৃক লীগের সমালোচনা

মিঃ এইচ এন ব্রেলসফোর্ড স্বনামখ্যাত সাংবাদিক। মিঃ জিন্না ও লীগের বর্তমান কার্যকলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া তাঁহার এক প্রবন্ধ সম্রাতি কলিকাতার 'হিন্দুস্তান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সর্বত্রই পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, যে নৈতিক

সাহস তাঁহাকে ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কটক্ষেপে নেতার আসন গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস আজিকার জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তি পণ্ডিত নেহরু।

পণ্ডিতজী যে পদে আসীন তাহা গর্ব করার মতই। তাঁহার তুল্য দায়িত্বসম্পন্ন পদ কোন ভারতবাসীই বহুদিন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটন, মস্কো, লন্ডন ও নানকিঙে তাঁহার মত লোক তিন-চার জনের বেশী নাই। তাঁহার মত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই জবাহরলালের মত নূতন করিয়া কিছু গড়িবার সুযোগ পান নাই। লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত চলিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে একটা নূতন জাতি গড়িয়া তোলার বিরাট কাজে আর কে হাত দিয়াছেন? আজিকার ভারতের সকল সমস্তার দিকে তাকাইলে একথা বলিতেই হয় যে বীরোচিত সাহস বিনা এমন কাজে হাত দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। বর্তমানে ভারতবর্ষকে তাহার দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে ভারতের উপর যে সমস্ত ব্যাপার ষটিয়াছে তাহা আজ মনে রাখিয়া নিজ প্রগতিক ব্যাহত করা মুক্তিযুদ্ধ হইবে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য।

এই অনৈক্য রূপ গ্রহণ করিয়াছে অত্যন্ত অল্প কয়দিন আগে। পেশোয়ারে যখন মুসলিম লীগ পতাকা তলে সমবেত জনতা জবাহরলালকে 'ফিরিয়া যাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে তখনই এই অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। তখন তাহারা কি ভাবিয়াছিল যে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মন্ত্রীকে তাহারা এই প্রকারে কি অপমান করিয়াছে? শুধু কি তিনি দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী, মহাত্মা গান্ধীর পরে তিনিই দেশের প্রধান নাগরিক। যে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচিত 'ডেলিগেশন' আমেরিকার ইউনাইটেড নেশনের অধিবেশনের উদ্দেশ্যে সবেমাত্র যাত্রা করিয়াছে তখনই তাহারা এই কাণ্ড করিয়া বসিল।

মুসলিম লীগ যদি দেশের এক জন জাতীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহা হইলে তাহার দেশ-প্রেম সন্দেহ সংশয় স্বাভাবিক কথাই। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় এমন কি ফ্রান্সের দলগত রাজনৈতিক রীতিনীতি অনুসারে এই ব্যাপার অত্যন্ত গর্হিত। কারণ দেশের জাতীয় প্রধান-মন্ত্রীর সহিত কোন দলই এমন ব্যবহার করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে জবাহরলালের ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, মুসলিম লীগ কুখ্যাত হইয়াছে সংশয় নাই, তবে সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে সমগ্র ভারতবর্ষ জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলীম লীগ সদস্যেরা যোগদান করিবে, এই খবর যখন ব্রিটেনে প্রচারিত হইল তখন ইংরেজ জনসাধারণ ক্ষণকালের জন্য এক স্বস্তিকর সন্তোষ অনুভব করিয়াছিল। ভারতে দুই দলের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে দুষ্কৃতিগুলি ঘটয়াছে তাহার পরে দুই দলের মধ্যে এমন অপ্রীতিকর মানসিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা আগে কখনও ছিল না। ভূপালের নবাব মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে আপোষের জন্য ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন তাহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করিবার সময় জবাবদারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই; লর্ড ওয়াডেলের আমন্ত্রণেই আসিয়াছে।

ইহার অর্থও অত্যন্ত পরিষ্কার। লীগ কংগ্রেসের সহিত কোয়ালিশন করে নাই। তাহারা কোন সাধারণ নীতি বা কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইয়া সরকারে যোগ দেয় নাই। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, দুইটি দলে যৌথ দায়িত্বের কথার চেয়ে দুই বিরোধী দলের মধ্যে সম্বন্ধের কথাই এখানে বড় হইয়া উঠিবে। দুই দলের সদস্য পালাক্রমে একবার করিয়া শাসন-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করিবেন, লীগের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে এই কথাই মনে হয় যে, অন্তর্বর্তী গবর্নেন্টে কোন প্রধান মন্ত্রী রাখা ইহাদের অভিপ্রেত নহে।

তাহা হইলে ব্যাপারটি দাঁড়াইল এই যে শাসনকার্যে বিরোধ বাধাইবার এবং ওয়াডেলের সালিশীতে উহা মিটাইবার আয়োজনই ইহাতে করা হইল। এই ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, বরং পিছাইয়াই যাইবে।

মুসলীম লীগের প্রচারপত্র 'ডেন' প্রকাশিত হইয়াছে যে, লীগ কংগ্রেসের মতই স্বাধীনতাকামী। এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে জিন্নার নেতৃত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই, যতই না কেন তাহার ব্যক্তিগত আকর্ষণী ক্ষমতা থাকুক। আসলে বিশাল হিন্দু কৃষক শ্রমিক ও দরিদ্র জনগণের মতই মুসলমানগণও আর বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন সহ্য করিতে রাজী নহে।

মিঃ জিন্নার অবলম্বিত পন্থার অর্থ আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। হয় তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাধীনতাকে ঠেকাইবেন, না হয় চিরদিনের জন্য তাহার পথ বন্ধ করিয়া বসিবেন।

যদি তাহার মতলব এই হয় যে তিনি মরিয়া হইয়া টোরা দলকে সমর্থন করিবেন তাহা হইলে তিনি বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহার চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। যে সম্প্রদায় চায় যে হিন্দু-মুসলমানের শান্তি বিধানের জন্য চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকুক তাহারা কোন দিনই এতটুকু শান্তি আনিতে পারিবে না। ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পূর্ববঙ্গের বর্বরোচিত ঘটনাগুলিতে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ

হইলেও আমার কথার অর্থ এই নহে যে মুসলীম লীগের 'হাইকমান্ড' এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়ী। তবে এ কথা সত্য যে লীগ-প্রচারিত বাণীর ফলেই ঐ ভয়াবহ কাজের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। দেশের ইতিহাস-প্রণেতা এই কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন যে মিঃ জিন্না এই বিপর্যয় রোধ করিবার জন্য কি ব্যবস্থা পূর্ব হইতে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের কোন মুক্তিবিরাধী ষড়যন্ত্রকারীর মতলব অনুসারে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটয়া থাকিলেও তাহা তাঁর ভাষায় নিন্দনীয়। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার নামে এমন একটি অস্ত্র তৈরি হইয়াছে, যে অস্ত্রের দৌলতে মিঃ চাট্টিল একদা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উভয় সম্প্রদায়কেই ইচ্ছামত চালাইয়াছেন।

আমার মনে হয় এই প্রকারের নীতি কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারে না। মিঃ চাট্টিল ব্রিটিশ জনসাধারণের চিন্তাধারা হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছাইয়া গিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ নহে, মিশরের উপর হইতেও পরাধীনতার জোয়াল তুলিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ের দ্বারা ব্রিটেন তাহার বর্তমান জনমত প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছে যে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে গায়ে পড়িয়া তাহার উপর মোড়লী করিতে যাওয়া সুখকর হইবে না।

মিঃ জিন্না হয়ত মনে করেন যে টোরা সম্প্রদায় আবার ভবিষ্যতে ক্ষমতা লাভ করিবে। এই ধারণা ভ্রান্তিকর। তাহা ছাড়া যদিও টোরা সম্প্রদায় সত্যই ক্ষমতা পায় তাহা হইলেও পাকিস্থানের আশা নিরর্থক। কারণ সময় কাটিয়া গেলেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ও আকৃতি বদলাইয়া যাইবে না। তাহা ছাড়া টোরা গবর্নেন্টও শ্রমিক গবর্নেন্টের মতই সামরিক কর্তৃপক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ অথবা রাধা সম্বন্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষ একমত।

পাকিস্থানের সম্ভাবনা একেবারেই নাই। গত কিছু দিনের পরিস্থিতি পাকিস্থানের সম্ভাবনাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। বাংলাদেশের লীগ সরকারের কার্যাবলী হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে লীগ সরকার হয় খুনখুনি হাদ্দামা নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, নয় অক্ষম।

আমি মিঃ জিন্নাকে এই কথাই বলিতে পারি যে মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গা-বিদ্রোহ অঞ্চলে যাওয়ার পরিবর্তে যদি তিনি সেই সমস্ত স্থানে যাইতেন তাহা হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিত।

কংগ্রেস দুর্গতদের সাহায্য করিতেছে। অথচ মুসলীম লীগেরই এই কার্যগুলি কল্পা উচিত ছিল। এই প্রকারে মুসলীম লীগ আপনার অতীতের কলঙ্ক অপনোদন করিতে পারিত।

গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু

বিলাতের 'সোসালিস্ট লীডার' পত্রে এক প্রবন্ধে মিঃ কেনার ব্রকওয়ে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরুর কার্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সারমর্ম প্রদত্ত হইল। ব্রকওয়ে লিখিতেছেন :

“পণ্ডিত জবাহরলাল শুধু মাত্র নূতন ভারতবর্ষের স্রষ্টা বলিয়াই নয়, নূতন পৃথিবীর স্রষ্টা বলিয়াও ভবিষ্যতের ইতিহাসে সম্মান লাভ করিবেন—যে আন্তর্জাতিক আদর্শবাদ আজ পৃথিবীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, একমাত্র নেহরুরই সেই মনোভাব বর্তমান। সম্মিলিত জাতিসংঘেও তাঁহার কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনিই তাঁহার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারিবেন।...পণ্ডিতজীকে বলা যাইতে পারে, ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। কিছু কাল পূর্বেও ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ান স্টেটস লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবেই থাকিতে প্রস্তুত ছিল। পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার নেতৃত্বে নবীন ভারত স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কিছুতেই মিটমাট হইবে না।...গান্ধীজী ভারতবর্ষে আত্মমর্যাদাবোধ, মানবিক ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির চেতনা জাগ্রত করিয়াছেন বলিয়া চিরকাল স্মরণীয় থাকিবেন। গান্ধীজী জনমনকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। জবাহরলাল তাঁহার স্বপ্নধর্ম মন লইয়া ভাবী ভারতের যে পথ নির্মাণ করিলেন, সেই পথে গান্ধীজীর উদ্বোধিত জনগণ যাত্রা করিবে। জবাহরলালের মত গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞানদম্পন রাজনীতিক আর একজনও বর্তমান পৃথিবীতে আছেন কিনা সম্ভেদ করি। শুধু মাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে নয়, বিভিন্ন দেশ-বাসীর জীবনধারা সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান গভীর। পৃথিবীর সর্বত্র নিগীড়িত মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। অতীতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীকে কি নূতন পথনির্দেশ করিতে পারেন—তাঁহা দিয়াই জবাহরলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে।”

সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাংলার রেলপথ

ভারত-সরকারের রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিঃ আসফ আলি ও ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর যে বিবরণ ক্রিয়ুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্বন্ধে বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কতক অঞ্চলের রেলপথ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন অঞ্চল রক্ষা করিবার যত্নস্বত্ব পুলিসের ব্যবহার অর্থাৎ ঘটনাই ছিল।

আসাম-বাংলা রেলপথের পূর্ববঙ্গভাগের রেলওয়ের শৃঙ্খলা

রক্ষার অর্থ যে পুলিস আছে তাহা উপযুক্ত নহে—হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিলে উঠিলে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন। রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র উন্নত ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

রেলপথ-সচিব বলেন যে, গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রামে রেল কর্মচারীদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ২৯শে আগষ্ট এক দল জনতা কর্মচারীগণের কোয়ার্টারগুলি আক্রমণ করে ও লুণ্ঠপাট চলিতে থাকে। পূর্ববঙ্গের আরও একটি স্টেশনের নিকট ২০০ সংখ্যক গুপ্তার একটি দল অপেক্ষা করিতে থাকায় সেই স্টেশনের কাজ বন্ধ রাখা হয়।

কলিকাতা ও অমৃতসর বহু অঞ্চলে রেলকর্মচারীগণ হাঙ্গামার জন্ত কর্মে যোগ দিতে পারে নাই। গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে মৈমনসিংহের বাহাছরাবাদ স্টেশনটি লুণ্ঠিত হয়। শিয়ালদহ স্টেশনের ‘পারশেল-শেডে’ ১৭ তারিখ হইতে ১৯ তারিখের মধ্যে যে লুণ্ঠপাট হইয়াছিল তাহাতে আনুমানিক তিন লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মিঃ আসফ আলি জানান যে, চলন্ত রেলগাড়ী অথবা স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি স্থানে নিহত ও আহত যাত্রীদের সংখ্যা সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। তবে একটি ঘটনা জানা যায় : কোন রেলকর্মচারীকে সন্ত্রাসীক রেলভ্রমণকালে ট্রেন হইতে জোর করিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বহু যাত্রী আহত ও নিহত হইয়াছে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কখনও রেল-কামরা হইতে নামিবার সময় কখনও বা প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইবার সময় ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে। এই সমস্ত ছাড়া ট্রেনে লুণ্ঠপাট, আক্রমণ ও স্ত্রী অপহরণের বহু ঘটনা ঘটিয়াছে মিঃ আসফ আলি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলেন।

মিঃ আসফ আলিকে আর একটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছেন যে ভারত-সরকার রেলপথের শৃঙ্খলা শাসন ও আক্রমণিক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করেন। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের অত্যাচারিত অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযোজ্য।

সচিব মহাশয় আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে গত আগষ্ট মাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটবার আগেও আসাম-বাংলা রেলপথের ঢাকা ও মৈমনসিংহের কোন অঞ্চলে প্রায়ই দলবদ্ধ গুপ্তা-আক্রমণ দেখা যাইত। তিনি বলেন যে আসাম-বাংলা রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারের রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে উক্ত বিভাগে গুপ্তামি, অত্যাচার ও অমৃতসর অপকর্মের ফলে রেল চলাচল অনেক সময়েই ব্যাহত হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজারের মতে মৈমনসিংহের ভৈরববাজার

অঞ্চলে রেল-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অস্ত্র-সজ্জিত পুলিশ ব্যবস্থার প্রয়োজন। রেলওয়ের রক্ষা কার্যের জ্ঞাত অন্ততঃ দুই শত জন সামরিক প্রহরীর ব্যবস্থা এখানে অবশ্য প্রয়োজন।

সচিব মহাশয় বলেন যে জেনারেল ম্যানেজারের এই নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ শান্তির সময়ে রেলওয়ের শাসনের জ্ঞাত সামরিক কর্মচারীর ব্যবস্থা আইনসম্মত নহে। অবশ্য এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বারংবার সাহায্যের জ্ঞাত অহরোধ জানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তৈরববাহারে অস্ত্রসজ্জিত সামরিক প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে আসাম-বাংলা রেলপথের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ভার সামরিক প্রধান প্রধান কর্মচারিগণের উপর থাকিত। রেলওয়ের অনেক প্রধান কর্মচারীও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। এখনকার অবস্থায় সরকারের স্থির করা কর্তব্য যে সেই মিলিটারী নীতি অবলম্বন করা হইবে কিনা। রেলওয়ে এবং অজ্ঞাত জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখন একান্তই প্রয়োজন।

বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে রেলপথ ও যানবাহনের অসুবিধার জ্ঞাত ডাক বিভাগেরও বহু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক বিভাগ পুলিশ সাহায্য ব্যতীত নিজেদের কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। পূর্ব-বঙ্গের বহু জেলা পুলিশ হেড কোয়ার্টার হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে রেলওয়ের মত ডাক বিভাগেও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। এখানেও এখন অতরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

বাংলা-সরকারের হতে পাটচাষীর স্বার্থ

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের ভার গ্রহণ করিবার পরেই তাঁহাদিগকে পাটের দর নির্ধারণ করা হইবে কি না এই প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয়। যুদ্ধের সময় বাংলা-সরকারের সম্মতিক্রমে বড়লাটের শাসন পরিষদ পাটের দর এমন ভাবে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন যে উহাতে ষোল আনা লাভ ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকার ক্ষতি হইয়াছে চাষীর। ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বে বহুবার করিয়াছি। অতীর্ঘ কংগ্রেস গবর্নেন্ট কার্যভার গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হইবার কথা, স্বতরাং নুতন করিয়া তাঁহাদিগকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে স্থান আছে তাহা এবং বিদেশ হইতে বাদ্য আমদানীর কথা বিবেচনা করিয়া রপ্তানী চট ও বস্তার মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া রাধা কংগ্রেস গবর্নেন্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সমগ্র বিষয়টি আলোচনার জ্ঞাত বাংলা-সরকারকে আহ্বান

করেন। বাংলা-সরকার এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী দল পাটের নিম্নতম মূল্য চল্লিশ টাকা নির্ধারণের জ্ঞাত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে লীগের ভোটের জোরে উহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। কলিকাতার দাঙ্গা এবং পূর্ব-বঙ্গে অনিশ্চিত অবস্থার জ্ঞাত পাটের দর অসম্ভবকম পড়িয়া যায়। বাংলার লীগ সরকার ইহা দেখিয়াও কোন প্রতিকারে অগ্রণী হইলেন না। কিছুদিন হাত গুটাইবার পর অবাঙালী দালালেরা যখন দেখিল যে পাটের মূল্য অসম্ভব নামিয়া গিয়াছে তখন তাহারা ক্রয় আরম্ভ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যে দরিদ্র চাষীর সারা বৎসরের একমাত্র অর্থকরী ফসল পড়তারও কমে হাতছাড়া হইয়া গেল। এইভাবে চাষীর হাতের মোট তিন-চতুর্থাংশ পাট বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াও প্রধান মন্ত্রী বহুতা ছাড়া উহা রোধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে মণকরা তের-চৌদ্দ টাকা দরে পাট ক্রয় দালালদের পক্ষে কঠিন হইত।

পাটচাষীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের দুর্দশা ভাঙাইয়া যাহাদের রাজনীতি, সেই লীগ-নেতারা চাষীর সাহায্যে অগ্রসর না হইয়া এবারও তাহাদেরই দুর্দশাকে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের মূলধন করিয়া তুলিতে ছাড়েন নাই। কংগ্রেস গবর্নেন্টের মূল্য নির্ধারণের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু মূল্যের পরিমাণ তাঁহারা বাংলা-সরকারের সহিত পরামর্শক্রমেই স্থির করিতে চাহিয়া ছিলেন। বাংলা-সরকার উহাতে যোগ না দিয়া কংগ্রেসের সহিত কেবল বাক্যাচ্ছেদ প্রবৃত্ত হন এবং উহার দ্বারা অথবা কালক্ষেপ করিয়া অবাঙালী দালালদের সম্মত পাট কিনিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এই অবস্থা দেখিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ভারত-সরকার জানাইয়া দেন যে রপ্তানীযোগ্য চট ও বস্তার দরও তাঁহারা বাধিবেন না। চাষীকে জায্য দর পাইতে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে বাংলা-সরকারের, ভারত-সরকারের নহে। বাংলা-সরকার ভারত-সরকারের নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা পাইয়াছেন কিন্তু চাষী পাটের দর পায় নাই। ফলে দালালদের আশার অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির পথ খুলিয়া গিয়াছে। লীগওয়াল ও অবাঙালী দালালদের পক্ষে ইহা অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ। এই দুইয়ের মধ্যে মিলনের অভাব গত দুর্ভিক্ষের বা যুদ্ধের সময়েও দেখা যায় নাই। বাংলা-সরকার এ বৎসর পাট লইয়া যাহা করিলেন তাহার পিছনে যে গভীরতর কোন কারণ ছিল না, কার্যদেখিয়া তাহা বলা কঠিন।

সুন্দরবনের ভাগচাষী

চব্বিশ পরগণা জেলা কৃষক-সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন :

চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের অধি-

বাসীদের শতকরা প্রায় ৮০ জন ভাগচাষী। ইহারাই বহু-জন্তুর সহিত লড়াই করিয়া এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আঁজ সুন্দরবনকে আবাদী করিয়াছে। জমিদার এবং তাহাদের নায়ের ও সাঙ্গপাঙ্গের শোষণ ও জুলুমে সুন্দর-বন যাহারা হানিল করিল তাহারা সব হারা, ভাগচাষীতে পরিণত হইয়াছে।

মধ্যস্থত্ব লোপ করিয়া গোটা সুন্দরবন সরকার কর্তৃক খাস করার প্রাথমিক কাজরূপে গত ১২ই অক্টোবর হইতে চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে জরিপের কাজ শুরু হইয়াছে। গত ১৯২৪-৩০ সালের সার্ভে ও সেটেল-মেন্টের সময় ডিরেক্টর অব ল্যান্ড-রেকর্ড নির্দেশ দেন যে, সকল ভাগচাষীর নামে খতিয়ান খুলিতে হইবে। ফলে 'এ' ও 'বি' ব্লকের ৮৭৮টি খতিয়ানের মধ্যে ৬৮০টি ভাগ-চাষীর নামে খতিয়ান হয়। বাকী ১৯৮টির মধ্যে ১৪০টি ক্যানিং এলাকায়। যখন 'সি' ব্লকের খতিয়ান হইতেছিল তখন প্রজাপ্রভু আইনের ৩ (১৭) ধারামত ভাগচাষীদের অধীকার করা হইল। ফলে অতি অল্প খতিয়ান ভাগ-চাষীর নামে হইল।

গত ১লা নবেম্বর তারিখে, ভাগচাষীদের সম্মুখে সরকারী মনোভাব জানার জন্ত জেলা কৃষক-সমিতির তরফ হইতে ত্রিভাসবিহারী বোম সুন্দরবন সেটেলমেন্ট অফিসারের সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, বর্তমান আইনে ভাগচাষীর স্বত্বের কোন উল্লেখ না থাকায় ভাগ-চাষীর নামে খতিয়ান হইবে না। তিনি আরও বলেন, সেটেলমেন্ট শেষ হইতে প্রায় ৩ বৎসর সময় লাগিবে। ভাগচাষীর স্বত্ব যাহাতে স্বীকৃত হয় সেজন্ত কৃষক-সমিতি আন্দোলন করার সম্বল গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশা করেন যে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

বাংলা-সরকারের অন্যান্য কাজের ন্যায় এই কার্যেও প্রথম হইতেই শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্ত জমি জরীপ চারিটি স্থানে শুরু হইয়াছে কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় কর্মকর্তাদের কাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা গোড়া হইতেই দেখা দিতেছে। ভবিষ্যৎ ভূমি-ব্যবস্থায় ভাগচাষীর স্বত্ব কি হইবে তাহা লইয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ গুণ্ডা আলোচনাই চলিতেছে।

সামরিক বিভাগের উদ্ধৃত্ত মাল বিক্রয়

আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অব্যবহৃত অনেক উদ্ধৃত্ত সামরিক দ্রব্যাদি এখনও ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। আমেরিকান গবর্নমেন্টের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ভারত-সরকার কিনিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিলি-বন্দোবস্ত এবং বিক্রয়-ব্যবহার জন্ত অন্তর্ভুক্ত সরকার এক 'ডিসপোজাল

কমিটি' গঠন করিয়াছেন। কমিটির সদস্য সর মরিস গম্বার, ত্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচার্য এবং ত্রীযুক্ত বৃথালিঙ্গম এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই দ্রব্যাদি ছড়াইয়া আছে। অনেক মাল আসাম ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তের দুর্গম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এই বিষয়ে যে মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আমেরিকার ৬,২৮,০০০ টন এবং ব্রিটিশের ১৫,১৩,০০০ টন পরিমাণ মাল অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উদ্ধৃত্ত মালের দাম প্রায় ২১৯ কোটি টাকা বলিয়া বলা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যে মালের দাম ৩৪ কোটি টাকা তাহা ২৪ কোটি টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। ডিসপোজাল কমিটির অধীনে ১৩৪ জন গেজেটেড কর্মচারী ও এই বিষয়ক অস্থায় কার্যের জন্ত ২০০০ কর্মচারী লওয়া হইয়াছে।

ডিসপোজাল কমিটির ব্যবস্থাদির কার্যে অনেক অসুবিধা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কাজের অসাধুতারও অবসর যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ, মালপত্রের মধ্যে অনেক মজ-পাতি বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সমস্ত জিনিষ একত্র না করিলে তাহার সঠিক মূল্যও বুঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, ডিসপোজাল বোর্ড এই সমস্ত জিনিষপত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বা অনেক সময়েই পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারে না। কাজে কাজেই ক্রেতার পক্ষে অনেক সময় জিনিষ-পত্র কেনা এক কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি এই জিনিষপত্রগুলি বিক্রয় করিবার পূর্বে অনেক কিছুই ভাবি-বার আছে। আবার দীর্ঘ দিন ধরিয়া 'টেণ্ডার' আহ্বান করিয়া মালপত্র বিক্রয় করাও মুশকিলের ব্যাপার। গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে নিয়ম করিয়াছেন যে যাহারা পূর্বে দাবি করিবেন তাহারা পরবর্তী ধরিকারের চেয়ে আগে এবং কম দামে জিনিষগুলি পাইবেন। এ বিষয়ে ডিসপোজাল ডাইরেক্টরেট যাহাকে পূর্বের দাবিদার বলিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। ইহারই মধ্যে অসাধুতার ফাঁক রহিয়া গিয়াছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। অনেকেই বাংলা এবং আসাম অঞ্চলের ৩৫০০০ আমেরিকান ড্যান লরীগুলির বিক্রয় ব্যপারটিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন ডিস-পোজাল বোর্ডের কার্যকলাপ সন্দেহজনক হইয়া উঠাতেই কংগ্রেস গবর্নমেন্ট বর্তমান কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নূতন ডিসপোজাল কমিটির একটি কর্তব্য হইবে সমস্ত অসাধুতা ও অস্থায় ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া এবং যাহাতে ভবিষ্যতে ঘুম, চুরি ও পক্ষপাতিত্ব আর ঘটতে না পারে তাহার প্রতি যত্নবীল হওয়া। ঘুম ও চুরির তদন্তের জন্ত এই বিভাগের সহিত জড়িত নহেন এমন ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন আছে। তাহারা

খুঁটিনাটি বিষয়ে দেখাশুনা করিলে জনসাধারণের মনে আস্থা জন্মিবে। তাহা ছাড়া, এই কমিটির অপর একটি কতব্য বড় বড় বিক্রয় ও সেই সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর মাসিক ও পাক্ষিক বিবরণী সকলের নিকট প্রকাশ করা। জনসাধারণ সেই রিপোর্টের দ্বারা আশ্রয়সহকারে অপেক্ষা করিবে এবং এই ভাবে রিপোর্ট প্রকাশ আরম্ভ হইলে ডিসপোজালের পুঙ্খমুখী বন্ধ হইবার পথ হইবে। গত যুক্তের মিউনিশন বোর্ডের কেলেকারির পুনরুত্থান এবারও সমান তাগে হইতে থাকিলে ইতিহাসের শিক্ষার কোনই মূল্য থাকে না।

শর্করা উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্যা

কানপুরে 'সুগার টেকনোলজিষ্ট এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া'র পঞ্চদশ বাৎসরিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আর. সি. শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ও শুষ্ক-নীতির সংশোধন এবং দেশে যে সমস্ত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে তাহার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিলে চিনির ও অজাঙ্ঘ শিল্পাদির অবশুস্বার্থী উন্নতি দেখা দিবে।

শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯,৪৮,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ও ১৯৪৬-৪৭ সালে যথাক্রমে ১১,৭১,০০০ টন ও ১২,৭০,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গ বাহ্য যে ১৯৪৫-৪৬ সালের চিনির উৎপাদনই সবচেয়ে কম। সারা ভারতে যে জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে, তাহা ৪২'৫ লক্ষ একর হইতে ৩৮'৪ লক্ষ একরে নামিয়া আসিয়াছে। আখের চাষের এই হিসাবে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ কমিয়াছে যুক্ত প্রদেশে। যুক্ত প্রদেশই চিনি উৎপাদনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কম জমিতে চাষ হওয়ার অনেক কারণ দেখান হইয়াছে—শীতকালের বর্ষাভাব তন্মধ্যে প্রধান। কিন্তু শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব মনে করেন যে অজাঙ্ঘ দ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া যাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। খাদ্যবস্তুর দুপ্রাপ্যতা এবং বেশী দাম হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, আখ-চাষীদের পক্ষে অধিক ব্যাপকভাবে আখের চাষ সম্ভবপর হইবে এবং সহজেই চিনির কারখানাগুলি অধিক পরিমাণে সরবরাহ পাইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালের সামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যে ৯৯,০০০ টন চিনির প্রয়োজন ছিল তাহা ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৫,০০০ টনে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এই উদ্ভূত অংশটি বে-সামরিক ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান বৎসরে আখের দাম মণকরা ১১০ আনা করিয়া ধার্য হওয়াই স্বাভাবিক।

গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত সুগার-প্যান্ডালে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে সুগার-প্যান্ডাল আগামী

বৎসরে চিনির উৎপাদন বাড়াইবার কথা অমুসোলন করিয়াছে। যদিও সুগার-প্যান্ডালের রিপোর্ট এখন প্রকাশ্যে বাহির হয় নাই তবু তিনি আশা করেন যে, ১৮,৫০,০০০ টন পরিমাণ চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। আরও বেশী পরিমাণ চিনি উৎপাদন করিবার জন্য নতুন কলকারখানাও স্থাপন করা হইবে। নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে স্থির হইয়াছে বাংলা, বোম্বাই, পঞ্জাব ও মাদ্রাজে তিনটি করিয়া এবং আসাম, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, সিন্ধু, বরোদা, হায়দ্রাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে একটি করিয়া কারখানা স্থাপন করা হইবে। মোট ২০টি নতুন কারখানা স্থাপন করার কথা হইয়াছে।

এ বিষয়ে যন্ত্রপাতির অভাব একটি সমস্যার কথা এবং উহা সংগ্রহ এক দুর্লভ ব্যাপার। বর্তমানে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় তাহার মূল্য যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় অত্যধিক। তাহা ছাড়া অর্ডার দিলেও এই সমস্ত মাল অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া কঠিন। ভারতবর্ষে যদি এই সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারি না হয় তবে অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করার কথা হইতেছে তাহা সম্ভবপর হইবে না। এখন আমাদের উচিত যাহাতে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় অন্তর্গত সরকার পুরাতন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সংস্কারে মন দিয়াছেন। গত মাসে 'ট্রেড পলিসি কমিটি'তে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের কথা ভাবিয়াই তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি স্থির করা হইবে। আন্তর্জাতিক সভার আলোচনার সুর ধরিয়া ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে আর কখনও ব্রিটেন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করিবে না। যাহাই হউক, কারখানা স্থাপনের জন্য অবিলম্বে যন্ত্রপাতি আমদানী অত্যন্ত প্রয়োজন সে কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

চিনির কারখানার শ্রমিক সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে যুদ্ধোত্তর সময়ে অজাঙ্ঘ কারখানার ছায় ভারতের কয়েকটি চিনির কারখানাতেও গোলযোগ দেখা যায়। বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এই গোলযোগ জটিল হইয়া উঠে। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত সিব্বনলাল সাক্সানা এ্যাজুডিকেকটারের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মালিকের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব বলেন যে প্রত্যেক শ্রমিকের সহিতই উপযুক্ত সহদর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস গবর্নমেন্ট যদি আখ-চাষীদের সুবিধার জন্য উপযুক্ত দাম বাধিয়া দেন তাহা হইলে কারখানাগুলিও তাহার শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি নুজর দিবার সুযোগ পাইবে। বর্তমানে কারখানাগুলি ইচ্ছা করিলে শ্রমিকগণের প্রাপ্য মজুরি বাড়াইয়া দিয়াও যথেষ্ট লাভ রাখিতে পারে। যে

কোন সভ্য দেশের পক্ষে শ্রমিক সম্প্রদায় অপরিহার্য প্রয়োজন। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাদের চাষা মজুরি বাড়াইবার জন্ত চিনির উৎপাদন-ব্যয় সামান্য কিছু বাড়িলেও তাহাতে আপত্তি করা উচিত নয়। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের জীবন ধারণের পদ্ধতিই যদি উচ্চতর না হয় তাহা উঠে তবে সে দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার অল্পসংখ্যক নীতিলক্ষ্য করিবার মত। সেখানে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্ত পৃথিবীর অসংখ্য দেশের চেয়ে চিনির দাম বেশী রাখা হইয়াছে।

খাদ্য-পরিস্থিতি

আইন-পরিষদে খাদ্য সম্বন্ধীয় এক বিতর্ক সভার উদ্বোধন করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ খাদ্য-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক হিসাবনিকাশ দাখিল করিয়া ভারতবর্ষ গত দুই মাসে প্রায় অনশনের মুখ হইতে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করেন। প্রথম দিকে ধারণা করা হইয়াছিল যে ৭০ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি পড়িবে—তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল বিদেশ হইতে আমদানী করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আমদানীর পরিমাণ কিছুতেই ১৭ লক্ষ টনের বেশী করা যায় নাই। ভাগ্যক্রমে আমদানী চাউলের অভাব দেশের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহের দ্বারা মিটানো গিয়াছে। যাহাই হউক, দেশে কংক্রিট গবর্নমেন্টগুলির নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমদানী চাউলের দ্বিগুণ পরিমাণ চাউল দেশের মধ্যে হইতেই সরকারের গুদামজাত হইয়াছে। ইহাতেই বর্তমান বৎসরের গুদামস্থ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে।

আগামী দুই মাসের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত ১৯৪৭ সাল রীতিমত সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এই সাবধানতা আরও পরবর্তী সময়ের জন্তও অবলম্বন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগের যদি আর একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ বছরেই খাদ্য-সঙ্কট প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইত। আগে হইতে তাহারা কিছুই করেন নাই বলিয়া সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর। পৃথিবীর আর কোন দেশেই খাদ্য রেশন অথবা সেই সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিতে এত দীর্ঘ সময় লাগে নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে ১,৫০ লক্ষ লোকই কেবলমাত্র খাদ্য-রেশন ব্যবস্থার অধীনে আসিয়াছে। কেবল মাত্র যাহারা শহর অঞ্চলের অধিবাসী তাহারাই ব্যক্তিগত ভাবে এই সুবিধা ভোগ করিতেছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের এ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটিতেছে তাহা অসুধাবন-যোগ্য। তাহারা অনিয়মিত ভাবে যে সামান্য চার পাঁচ আউল চাউল পাইয়া থাকে তাহাকে হাল্কা ব্যবস্থা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে বাজারে যে ২৪০ লক্ষ টন পরিমাণ উৎকৃষ্ট চাউল

বিক্রয়ের জন্ত আসিয়া থাকে তাহাও মধ্যে কেবলমাত্র ৪০ লক্ষ টন পরিমাণ থাকে বটন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাদ্যবিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী বছরের জন্ত আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

একটু কথা ভুলিলে চলিবে না যে কৃষিপ্রধান দেশে একচেটিয়া খাদ্যসংগ্রহ ও বটন সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নহে। বরং অস্বাভাবিকই বটে। যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন এ কথা দ্বিবি সত্য যে যাহাতে দেশ আমদানী ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী না হয়, এবং খাদ্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে তাহাই কাম্য। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী দুই প্রকারেরই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ব্যাপকভাবে জল-সেচনের বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে অব্যবহৃত চাষের ক্ষমতাসমূহের সদ্যবহার করা যায় ও উন্নত চাষাবাস-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যায় তাহার উপায় গ্রহণ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে চাষের উন্নতির জন্ত যে সব বড় বড় জল-সেচন ব্যবস্থা হইবে তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। জল-সেচনের জন্ত বড় বড় পরিকল্পনা ছাড়াও ছোটখাট সাহায্যের জন্ত কুপ, পুষ্করিণী ও টিউবওয়েল বসাইতে হইবে।

কৃষকেরা যাহাতে সস্তার জমির সার পায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইবে। তবে ভারত-সরকারের কার্যপদ্ধতি এত মন্দ যে তাহাদের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাগুলি শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী হইয়া পড়ে। আর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সেক্রেটারী-মেন্টের ফাইল ও খোপেরেই বন্দী হইয়া থাকে—বাস্তবতার সহিত সম্পর্ক বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। উন্নত পরিকল্পনা বজায় করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং কি ভাবে কতটা অগ্রসর হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দেশে অ্যামোনিয়াম-সালফেটের অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু আজও পর্যন্ত ঠিক নাই যে কবে অ্যামোনিয়াম-সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার

খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীর পুর্না ইনস্টিটিউটে একটি বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ভাণ্ডারের সুব্যবহার অভাবে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে যদিও এই ক্ষতিটি সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা সম্ভবপর নহে তাহা হইলেও সঞ্চিত ফসল জমা রাখিবার জন্য ভাল গুদাম নির্মিত হইলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু বাঁচিয়া যাইতে পারে।

তিনি দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলির গুদাম কর্মচারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আপনারা যে সমস্তার সহিত বিজড়িত তাহা আজিকার ভারতের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যে পরিমাণ খাজবস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু যদি সেই পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশও রক্ষা পায় তাহা হইলে প্রায় ৭০ লক্ষ লোকের খাজের অভাব মিটিয়া যাইবে। আমাদের উদ্দেশ্য খাজবস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইয়া যায় সেই চেষ্টাই করা। আমাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করার ব্যাপারে একটি উপায় হইবে যাহাতে খাজবস্ত কোন প্রকারে অপচয় বা নষ্ট না হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে শত উৎপাদিত হয় তাহা চাষী সম্প্রদায়ের নিকটই প্রথম দিকে থাকিয়া যায়। কেবলমাত্র এই উৎপাদিত শস্তের সামান্য একটি অংশ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে। সুতরাং ভাণ্ডার-ব্যবহার দুইটি দিকের কথা আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রত্যেক ছোটখাট চাষীরই খাজবস্ত গুদামজাত করিয়া রাখার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে যাহাতে পোকামাকড়, জলবৃষ্টি বা অন্যান্য আবহাওয়াজাত কারণে ইহা নষ্ট না হইয়া যায়। তাহাদের এমন ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অর্ধব্যয় ও অজ্ঞাত দিক হইতে কোন অসুবিধা উপস্থিত না হয়। আর যে সমস্ত বড় চাষী বা বড়দের ব্যবসায়ী ও গবর্নেন্ট শস্তের গুদাম করিবেন তাহাদেরও একই সমস্তা, যদিও তাহাদের ছোটখাট চাষী বা ব্যবসায়ীদের চেয়ে সব দিক দিয়াই সুবিধা বেশী।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, আমি জানি আমাদের কৃষক সম্প্রদায় এই সমস্তার সুব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞ নহে। একথাও বলা চলে না যে আমাদের চাষীরা এ বিষয়ে ঊদাসীন্য দেখাইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিজ বুদ্ধি অসুযায়ী ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও কোন কোন স্থানে তাহারা সাফল্যও লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার বৈষম্য অসু্যারে বিভিন্ন অঞ্চলে খাজবস্ত বিভিন্ন গুণের হইয়া থাকে। কাজেকাজেই কোন একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া সকল সমস্তার সুরক্ষা করা সম্ভব নহে।

গুদামসমূহের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের একটি প্রধান কর্তব্য—ছোটখাট চাষীগণ যে পদ্ধতিতে মাল ভাণ্ডারজাত করিয়া থাকে তাহার উন্নতি বিধান করা। গুদাম-কর্মচারীদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদের আরও একটি কর্তব্য—মাল গুদামজাত করার ব্যাপারে কতকগুলি রীতি হাতে-নাতে শিখাইয়া দেওয়া, কেন না কতকগুলি পুরাতন অচল পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন উন্নত ধরণের পন্থা শিখান প্রয়োজন।

খাদ্যবস্তু উপযুক্ত ভাবে ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখার ব্যাপারটি ব্যবসায়ীদের 'কোঠা' এবং 'বাট্টিবে'র দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে বেশী প্রয়োজন। সাধারণ লোকদের, সহজ

ভাষায় ও ধৈর্যসহকারে, হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কাজে কাজেই গ্রাম্য চাষীদের সহিত যাহাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকা দরকার।

তিনি বলেন, একটি কেন্দ্রস্থানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্ত ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখার বিষয়ে আমি বলিয়াছি। একটি স্থানে খাদ্য গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমস্তা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতিকারের উপায় গুদাম কর্মচারীগণের অজানা নাই। ইহাদের কর্তব্য অসীম। গবর্নেন্টের হাতে যত দিন খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে, শুধু যে তত দিনই তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতার দরকার তাহা নহে, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবার পরেও দেশের খাদ্যবস্তুর সঞ্চয় অপচয় ব্যাপারে তাহাদের বহু কর্তব্য আছে।

তিনি আশা করেন যে কর্মচারীগণ যখন নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাহারা যে শিক্ষা ও নির্দেশ লাভ করিলেন তাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থার সহিত হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এ বিষয়ে কতকগুলি অসুবিধা আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, তিনি অসুবিধার কথাগুলি এড়াইয়া যাইতে চাহেন না। গুদাম কর্মচারীগণ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উন্নত পদ্ধতি সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিবেন।

আমাদের দেশেও ইউনাইটেড নেশন্স ফুড এণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেশন বর্ণিত বিশ্ব-খাদ্যভাণ্ডারের অসুস্থরূপ একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। হঠাৎ প্রয়োজন ঘটিলে ও আকস্মিক ভাবে বিপদ আসিলে সেই ভাণ্ডার হইতে খাদ্য এহণ করা হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হইবে যাহাতে এই ভাণ্ডারের জল মূল্যের অথবা উত্থান বা পতন না ঘটে। যাহাই হউক, ভারতে যে আধুনিক পদ্ধতিতে শস্ত-ভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজন আছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিক্ষার পুনর্গঠন

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে সার্জেন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে এই রিপোর্টে প্রদত্ত নীতি ও উদ্দেশ্যগুলিকে স্বীকার করিতেই ভারত-সরকারের প্রায় দুই বছরকাল সময় লাগিয়াছে। তাহার পর প্রাদেশিক সরকারগুলি যাহাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই আরও এক বছর কাটয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে ত্রিযুক্ত রাজাগোপালাচাৰী যে বিয়তি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় মোটামুটিভাবে এই কার্যে ১২৫ কোটি টাকা লাগিবে। এই বিয়তিতে আরও প্রকাশ যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত অনেক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উপযুক্ত মনে হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে সেগুলি কার্যকরী হইবে। যাহাই হউক, বুনিন্দী শিক্ষার উন্নতির জন্ত যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে সর্বসম্মত ৫৬.৯৫ কোটি

টাকা ব্যয় হইবে। প্রাথমিক মূলধন হিসাবে ২০'৫২ কোটি টাকা ও পরে ধারাবাহিক ভাবে খরচ হইবে ৩৬'৪৩ কোটি টাকা। প্রদেশগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়ার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে তাহা লইয়া মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে। প্রস্তাব আসিয়াছে একেবারেই ৬ হইতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ইহাকে দুইটি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রথমে ৬ হইতে ১১ বছর পর্যন্ত ও পরে ১১ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত আলাদা ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথম বিভাগের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের অক্ষর পরিচয় করানো। অনেকের ধারণা যে ৬ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের যদি একই বিভাগে লইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে হয়ত ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কারণ যদি কোন কোন অঞ্চলে অর্থাভাবে বা অল্প কোন কারণে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে সেইস্থান পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হইতে পিছাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সহজেই অনুমেয় যে শহর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে উহা করিয়া তোলা ঢের বেশী শক্ত। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দিবে একথা ভাবিলে কিছু অস্বস্তি করা হইবে না। তাহার চেয়ে যদি ৬ হইতে ১১ বছরের ছেলেদের জ্ঞান বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা ও পরবর্তী বয়সের জ্ঞান সাবালকী-শিক্ষার (Adult Education) ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে উন্নতির আশা আছে। এই ব্যবস্থা সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে তবেই আশু উন্নতি সম্ভব হইবে।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার আর একটি অংশের অনুমোদন অনুসারে স্থির হইয়াছে যে ব্যবহারিক ও বাণিজ্য শিক্ষার জ্ঞান প্রতি বছর ৫০০ ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে তাহারা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫ বছরে মোটামুটিভাবে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আমরা আশঙ্কা করি যে জনসাধারণের অর্থ এই প্রকারে অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সত্য যে এই সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সকলেই যে তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে তাহাদের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। দেখা গিয়াছে যে এই সব ছাত্র বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশে আসিয়া এখনও সকলের আগে চাকুরির সন্ধান করে। নূতন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ইহাদেরই আগ্রহ সবচেয়ে কম। এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ভাবে বিবেচনা করা উচিত। যে সব ছাত্রের গবেষণার দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় এদেশে পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগকে বিদেশে পাঠান উচিত নয়। যে সমস্ত ছাত্রকে প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয়

সরকারের অধীনে কার্য প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে অথবা যাহারা নিশ্চিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিবে বলিয়া জানা যাইবে কেবল তাহাদেরই ব্যবহারিক ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হউক। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্ভার ও স্থলভ সুযোগগুলির সাহায্যে যাহাতে দেশেই গবেষণা-কেন্দ্র খুলিয়া ছাত্রদের উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষই এক দিন এশিয়ার ব্যবহারিক শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। টেকনিকাল স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে শীঘ্রই স্থাপিত হইতে বা পুনর্গঠিত হইতে পারে তাহার আশু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রাদেশিক-সরকারগুলি যে সাবালকী শিক্ষার পরিকল্পনা খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই তাহা বুঝা যায় যখন দেখি সমস্ত দেশের জন্য প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র ২'১০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এ বিষয়ে আর একটি কথা, গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চলে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যাহাতে উপযুক্ত পাঠাগার গড়িয়া উঠে তাহার দিকেও নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের কার্যকরী-পন্থা নির্ধারণের জ্ঞান একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

দুই মাসকাল পূর্বে যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন স্থির হইয়াছিল যে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটির সদস্য নিয়োগে প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যুক্তপ্রদেশ সরকার সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরভাবে এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে ইচ্ছুক।

এই কমিটি প্রায় ২০,০০,০০০ জমিদারের ভাগ্য-নির্ণয় করিবে। কমিটিতে জমিদারী সম্বন্ধে অধিত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস ও সরকারী সদস্যের সংখ্যার অনুপাত সে তুলনায় অনেক বেশী।

এই কমিটি জমিদারী প্রথা বিলোপসাধন সম্বন্ধীয় বুটিনাট-কর্তব্যগুলি স্থির করিবে। রাষ্ট্র ও চাষীর মাঝখানে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি যতরকমের মধ্যবর্তী উপস্থিতি আছে তাহাদের সকলের অপসারণের পন্থা কমিটি নির্ধারণ করিবে। এই কমিটি জমিদারী প্রথার পরিবর্তে অল্প উপযুক্ত প্রথা, অথবা নূতন পন্থায় জমি বিলিব্যবস্থা বিবেচনা করিবে না। “চাষী ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী উপস্থিতিভোগী” এক ব্যাপক সংজ্ঞা। অযোধ্যার তালুকদার হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্রার জমিদার এবং কুমায়ূনের চাষী সম্প্রদায় সকলেই ইহার অন্তর্গত। মধ্যবর্তীভোগী বলিতে ঠিক কাহারো সেকথা পরিষ্কার করিয়া বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত জমিদার নিজের জমি নিজেরাই চাষাবাস করিয়া থাকেন তাহারাও মধ্য-

স্বত্বভোগীর পর্যায়ে পড়িবেন কি না কমিটি তাহা স্থির করিবেন। কমিটির প্রথম এবং প্রধান কৰ্তব্য মধ্যস্বত্বভোগী বলিতে কি বুঝায় তাহার একটি নির্দিষ্ট অর্থ স্থির করা।

তাহা ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারিত করিলে জমির অধিকারী হইবে কে? যদি চাষী জমির অধিকারী না হইয়া গবর্নমেন্ট জমির মালিক হন তাহা হইলে চাষীরা হয় তো সন্তুষ্ট হইবে না। কারণ কংগ্রেস তাহাদের আগে হইতেই বুঝাই-
য়াছে যে জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেলে জমি চাষীদেরই হইবে।

বাজেয়াপ্ত জমিদারীর ক্ষতিপূরণের পরিমাপ স্থির করাও একটি কঠিন ব্যাপার। সম্পত্তির বাৎসরিক দামের দশ হইতে বিশগুণ পর্যন্ত মূল্যের মাফে ক্ষতিপূরণ স্থির করিলে অধোক্তিক হইবে না। বাংলাদেশে ক্লাউড কমিশনও তাহাই করিয়া-
ছেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণটি এককালীন ভাবে দেওয়া হইবে না। মিঃ রফি আহমদ কিদওয়াই বলিয়াছেন যে অল্পবিত্ত জমিদারগণকে ধনী জমিদারগণের তুলনায় বেশী অল্পপাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

ক্ষতিপূরণ ও সেই সম্বন্ধীয় অজ্ঞান ব্যবস্থা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মফস্বল অঞ্চলের শাসন ও রাজস্ব আদারে কি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা যায় কমিটিকে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের ফলে জমিদারগণ পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবেন। এত দিন এই সম্পত্তিই তাঁহাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় ছিল। এ বিষয়ে আপত্তি জানান হইয়াছে ও দুই-একটি প্রতিবাদ সভাও ডাকা হইয়াছে। অনেক স্থলেই বলা হইয়াছে যে স্বেচ্ছাচারী কংগ্রেস সমাজের একটি অংশের উপর অজ্ঞান ও অবিচার করিতেছে। জমিদার-
গণের দাবির একটি খসড়া ও একটি প্রতিনিধিদল মহাত্মা গান্ধীর নিকট পাঠাইবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া জমিদারেরা বিরোধের পথ পরিহার করিয়া কংগ্রেস গবর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহা দিবেন, তাহাই লইতে মনস্থ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে ভবিষ্যতে যদি বামপন্থী কংগ্রেস মজিমাঙলী গঠিত হয় তবে তাহাদের কাছে হয়ত বর্তমান মজিমাঙলীর চেয়ে কম সহ-
মুভূতিই मिलিবে। কমিটির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে ১৯৩৮ সাল হইতেই জমিদারী বিলোপের আয়োজন চলিতেছে কিন্তু উহা এখনও কাগজেপেই সীমা-
বদ্ধ। ১৯৪০ সালে ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিয়া-
ছেন, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করিবার কোন আন্তরিক ইচ্ছা বাংলা-সরকার প্রকাশ করেন নাই।

পরলোকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া

অষ্ট শতাব্দীরও অধিককাল স্বদেশসেবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া ২৬শে কার্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৪-১০

মিনিটের সময় কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যুত্বকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর।

অবিচলিত নিষ্ঠার দ্বারা একজন মাহুষ কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন, মালবীয়াজীর সাধনা ভবিষ্যৎ বংশীয়-
দিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবে। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বুতভাবে গঠনমূলক কাজও করিয়া যাইতেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অমরকীর্তি। মালবীয়াজী কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সহিত অনুরক্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহাতে অনেকে বিষয় বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশপ্রেমের সহিত স্বজাতি-হিতৈষণার মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। তাই দেশপ্রেমিক হইয়াও তিনি স্বজাতিসেবকও হইতে পারিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন মিঃ জিন্নাও লীগ ও কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অজুতম শ্রেষ্ঠ বাহক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মালবীয়াজীর স্বজাতি-হিতৈষণায় ক্ষুদ্রতা বা সন্ধীর্ণতার বাস্পমাত্রাও ছিল না, তাই তিনি স্বজাতির সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশেরও অক্লান্ত সেবক হইতে পারিয়াছিলেন এবং এইজন্যই অনেক বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রগাঢ় নৈহাদ্য প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অমলিন থাকিতে পারিয়াছিল।

১৮৬১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মালবীয়াজী জন্মগ্রহণ করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি অধ্যাধ্যায় “হিন্দুস্থানী” নামক দৈনিক হিন্দী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। আড়াই বৎসর দক্ষতার সহিত “হিন্দুস্থানী” সম্পাদনার পর তিনি আইন পরীক্ষা পাস করেন। ৩১ বৎসর বয়সে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন।

১৮৮৬ সাল হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া প্রায় প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন। স্বায়ত্ত-
শাসনের জন্ত তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। ১৯০২ সালে তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও দৃঢ়ভাবে জাতীয় সম্মান ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া সরকারের দমন-
নীতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে।

ভারত সচিব লর্ড মর্লি কার্ভার গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের দিকে মনঃসংযোগ করেন। আমলাতন্ত্র পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু লর্ড মর্লি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সংযুক্ত ও পৃথক—এর মাঝামাঝি এক নূতন ধরনের নির্বাচনের সুপারিশ করেন। কিন্তু বড়লার্ট লর্ড মিণ্টো ও আমলাতন্ত্রের বিরোধিতায় তাহা কার্যে পরিণত হইতে

পারে নাই। ফলে ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতিসহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় ১৯১১ সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং তীব্র ভাষায় মর্গি-মির্কো শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করেন। তৎপর বৎসর (১৯১০) তিনি বড়লাটের আইন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া সরকারের মুদ্রাবন্ত্র নিয়ামক আইন ও রাজস্বোৎপাদক আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারই প্রতিবাদের ফলে ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের ব্যবস্থা রহিত হয়। ১৯১৬ সালের ১৭ই নবেম্বর লীগ-কংগ্রেস যুগ্ম কমিটি ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কারের ধসড়া প্রণয়ন করেন। অক্টোবর মাসে পণ্ডিত মালবীয়া প্রমুখ বড়লাটের আইন-পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য যুদ্ধপর্যবর্তী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এক লিপি সরকারে পেশ করেন। পণ্ডিত মালবীয়া সমগ্র ভারতবর্ষ সফর করিয়া অসীম ধৈর্যের সহিত কংগ্রেসের দাবি প্রচার করিতে থাকেন। এই সময় হঠাৎ মিসেস এনি বেসান্ট অন্তরীণ হন। ১৯১৭ সালে ১০ই আগষ্ট পণ্ডিত মালবীয়া এলাহাবাদের এক জনসভায় তীব্র ভাষায় সরকারের এই গণিত কার্যের প্রতিবাদ করেন। সরকারের দমননীতিতে বিচলিত না হইয়া নির্ভীক পণ্ডিত মালবীয়া শাসন-সংস্কারের জন্ত জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন। ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে মিঃ মর্টেগু শাসন-সংস্কার সম্বলিত প্রস্তাবের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত মালবীয়া প্রস্তাবটি সংশোধনের দাবি জানাইয়া এক দীর্ঘলিপি প্রকাশ করেন।

মর্টেগু শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এক দল প্রস্তাবটি বর্জন ও আর এক দল গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিত মালবীয়া উভয় দলের মধ্যে সাময়িক বিধানের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়ে লোকমাজ তিলক দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করাতে পণ্ডিত মালবীয়াকেই দিল্লী কংগ্রেসের মূল সভাপতি করা হয়। পণ্ডিত মালবীয়া সভাপতি হিসাবে যুক্ত কর্মপন্থার উপর জোর দিয়া এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসন অধিকার দাবি করিয়া ওজধিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মর্টেগু চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পণ্ডিত মালবীয়া ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্ত পঞ্জাব প্রবেশ করিতে যাইয়া বার্ষিকাম হন। অবশেষে কংগ্রেস সাব-কমিটি মালবীয়ায় সহায়তায় ডায়ারী অনাচারের লোমহর্ষক বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করেন। দেশের এই দুর্দিনে কংগ্রেস তথা জাতি মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করে। পণ্ডিত মালবীয়া দুই বার

কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃ-বৃন্দের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

পণ্ডিত মালবীয়া কংগ্রেসসেবী হইলেও হিন্দু বোধকে কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি শুদ্ধিসংগঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এক্য স্থাপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হরিজনদের জন্ত তিনি একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজের অগ্রতম সন্ত বলিয়া মনে করিত।

কানীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার মনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বপ্ন জাগে। তাঁহার বন্ধু মুন্সী মাধোলাল তাঁহার মনোভাব জানিয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহার অল্প পরই কানীতে সেক্টাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার পরিকল্পনা তখন কার্যকরী হয় না। কিন্তু ১৯০৪ সালে কানীতে কানীর মহারাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তাঁহার নূতন একটি পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষা এবং সংস্কৃত পঠনের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু যুবকদিগকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদ্বারা জীবনযাপন করার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী অহুমোদন লাভের প্রর উঠিলে বেদাধ্যয়ন শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়।

অতঃপর মালবীয়ায় কি ভাবে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা সুবিদিত। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে সতত কর্মব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় তাঁহাকে বিরাট আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হইল। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইল এবং ভারত-সরকার বিষয়টি হাতে লইলেন। তরানীতন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া প্রকৃত ভারত-বন্ধুর কাজ করেন। অবশেষে ১৯১৫ সালে ২২শে মার্চ কানী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিল পরিষদে উপস্থাপিত হইল এবং যথাকালে উহা আইনে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মালবীয়ায় উহার উন্নতিকল্পে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা ছিলেন।

কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাহার উপর নোয়াখালীতে দাঙ্গাদাঙ্গামার বিবরণ শুনিবার পরই তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। নোয়াখালীর ঘটনায় তাঁহার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি সবিশেষ মর্মবেদনা অনুভব করেন। এই অসুস্থতাই ক্রমে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

শাহজাদা দারাসুকের জীবনী

শ্রীকালিকারজন কালুনগো

তৃতীয় অধ্যায়

দারার মনসব ও স্ববাদারী

১

• দারার মনসব ও স্ববাদারী আলোচনা করিবার পূর্বে মোগল সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণী সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা বলা আবশ্যক। মোগল সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; পুরুষাভ্যুক্রমিক ভূস্বামীবর্গ এবং সম্রাট দরবারের উপাধিপ্রাপ্ত সামরিক অসামরিক উচ্চ শ্রেণীর রাজপুরুষগণ। প্রথমোক্ত অভিজাতবর্গের মধ্যে সাধারণতঃ হিন্দু সামন্তরাজগণই ছিলেন প্রধান। মুসলমান আমলে মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষপরম্পরা জন্মগত অধিকারে সৃষ্ট কোন জমিদার শ্রেণী ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যে স্বয়ং সম্রাটই একমাত্র প্রভু, যুবরাজ হইতে দীনতম ব্যক্তি সকলেই প্রজা এবং আজীবন ভূত্য। তিনি অন্নদাতা, নিমকের মালিক, প্রজার ধন মান-ইজ্জৎ, এবং ধর্মের রক্ষক। প্রজাগণের মধ্যেই গুণ কর্ম এবং স্বভাব অনুযায়ী শ্রেণীসংস্থাপনে তাঁহারই একমাত্র অধিকার, রাজসেবা ছিল আভিজাত্য লাভের প্রশস্ত পথ, এবং রাজার নিকটতম অতি বিশ্বস্ত অল্পচরবর্গকে রাজসংসারে এক-একটি “পোষাকী” পদ ও কার্যভার প্রদান করা হইত। ইয়োয়োরোপের মধ্যযুগের সামন্ত দরবার এবং মিশরের ফাতেমী খলিফার দরবারের, গ্রায় হিন্দুস্থানে সুলতানী আমলে স্বল্পতানের খাস ভূত্যগণ অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন, পদবীও প্রায় অনুরূপ ছিল। সুলতানী দস্তার-খানের (আধুনিক খানার টেবিল) চাশনীগীর (যিনি প্রত্যেক পেয়াল বা খালি পরিবেশনের পূর্বে চাখিয়া দেখিতেন), সর্ব-দোয়াতদার (প্রধান মস্তাধার রক্ষক), হস্তী ও অশ্বশালার রক্ষকের পদ অতি সম্মানজনক ছিল। সম্রাট প্রথম চার্লস শিকার হইতে ফিরিবার পর তাঁহার ডান পায়ের এবং বাঁ পায়ের বুট জুতা খুলিবার পুরুষাভ্যুক্রমিক অধিকার (Grand Jack boot of the Empire) যেমন আভিজাত্যসূচক ছিল, সুলতানী আমলে সুলতানের ঘোড়ার অস্থায়ী সহস্রের পদও (মীর আখোর) তদ্রূপ একটি বিশেষ অধিকার এবং শ্লাঘনীয় পদ বিবেচিত হইত। মোগল আমলে সম্রাটই ছিলেন সাম্রাজ্য, বাদশাহী দরবার শাহীমহলের প্রতিচ্ছবি এবং বিরাট সংস্করণ মাত্র। মোগল দরবারের মীর-সামান পদে নিযুক্ত হইতেন এক জন

অতি উচ্চপদস্থ আমীর; কাগজে-কলমে শাহীমহলের যাবতীয় মরঞ্জাম—বাদশাহী “তোষাখানা”র (Wardrobe) সকল জিনিষের তত্ত্বাবধায়ক। অতীতকে উপহাস করিয়া “মীর সামান” বা “খান-ই-সামান” “খানসামান” প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে বড়লোক সাহেব-সুবার অনুরূপ পরিচর্যা করিতেছে। প্রাক-মোগল যুগের “সরবত-দার” পানীয় পরিবেশক ইত্যাদি খেতাব মোগল যুগে না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে উচ্চপদস্থ আমীরগণ ঐ কাজ করিতেন।

সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম স্মৃতিস্মৃদ্ধ ভাবে অভিজাতবর্গের মধ্যে “শ্রেণী” বা “জাত” এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে লিখিত গরিষ্ঠ স্থান নির্ণয় এবং বেতন নির্ধারণের জন্ত সওয়ার নির্দিষ্ট করিয়া মনসবদারী প্রথা প্রবর্তিত করেন। মনসবদারীর বাহিরে অত্র অত্র কোন শ্রেণীর পদের অস্তিত্ব ছিল না। সরকারী বেতনভুক্ত অসামরিক এবং সামরিক উভয় শ্রেণীর কর্ম্মাধ্যক্ষ, এমন কি খ্যাতনামা কবি, চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী, রাজস্ব বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারীবর্গ, কবুতরখানার ভূত্যবর্গ পর্যন্ত সকলেই ক্রমশঃ এই মনসবদারী ব্যবস্থার আওতায় আসিয়া পড়িল। সামরিক বিভাগে অখারোহী ঘোড়ার অধিনায়কগণ আকবরশাহী “দহ-বাসী” হইতে “দহ-হাজারী” পর্যন্ত ছেষটি ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ কোন সামন্ত কিংবা সেনানায়ককে “পাঁচ হাজারী”র উর্দ্ধে মনসব প্রদান করা হইত না। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে মনসব ক্রমশঃ ফাঁপিয়া ষাট হাজারী পর্যন্ত হইল, কিন্তু সাত হাজারীর উর্দ্ধতন মনসব সম্রাটের পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, শ্বশুর কিংবা সম্রাজ্ঞী ভিন্ন প্রজাসাধারণকে দেওয়া হইত না। সামরিক বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীর মনসবদারকে কোন্ শ্রেণীর কয়টা ঘোড়া, হাতী, উট, খচ্চর এবং গরুর গাড়ী রাখিতে হইবে নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু কয় জন অখারোহী সৈন্ত কোন্ শ্রেণীর মনসবদার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার “তাবিন” (Contingent) অনুযায়ী রাখিতেন উহার হিসাব আজ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে “সদী” [একশতী মনসবদার] হইতে উর্দ্ধতন প্রত্যেক মনসব বা Command একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক ইউনিট ছিল। নমুনাধরূপ আইন-ই-আকবরী হইতে আমরা “সদী”, “হাজারী” এবং “দহ-হাজারী” মনসবদারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) “সদী”—ঘোড়ার সংখ্যা ও শ্রেণী—

ইরাকী ২+মুজন্নস ২+তুর্কী ২+ইয়াবু ২+
তাজী ২=১০টি ঘোড়া
হাতী বিভিন্ন শ্রেণীর ৪টি
উট ২টি
গরুর গাড়ী ৫টি

মাসিক বেতন—

প্রথম শ্রেণী—৭০০
দ্বিতীয় ” —৬০০
তৃতীয় ” —৫০০

(২) “হাজারী”

ঘোড়া—(ইরাকী ১০+মুজন্নস ১০+তুর্কী ২১+
ইয়াবু ২১+তাজী ২১+জঙ্গলা ২১)=
মোট ৪

হাতী—(শেরগীর ৭+সাদা (শ্বেতবর্ণ নয়) ৮+
মঞ্জোলা ৭+করাহা ৭+কাগুরকিয়া ২)=
মোট ৩১

উট—২১ কাতার অর্থাৎ ২১টা

খচ্চর—৪৫ কাতার (বোধ হয় ৫টিতে এক কাতার)
অর্থাৎ ২১টা

গরুর গাড়ী—৪২

মাসিক বেতন—

প্রথম শ্রেণী—৮২০০
দ্বিতীয় ” —৮১০০
তৃতীয় ” —৮০০০

[৩] দহ বা “দশ হাজারী”

ঘোড়া—ইরাকী ৬৮+মুজন্নস ৬৮+তুর্কী ১৩৬+
ইয়াবু ১৩৬+জঙ্গলা ১৩৬)=মোট ৫৪৪

হাতী—(শেরগীর ৪০+সাদা ৬০+মঞ্জোলা ৪০+
করাহা ৪০+কাগুরকিয়া ২০)=মোট ২০০

উট—১৬০ (কাতার)

খচ্চর—৪০ কাতার অর্থাৎ আনুমানিক ২০০

গরুর গাড়ী—৩২০

মাসিক বেতন ৬০,০০০ টাকা।

আকবরনামার “পরিশিষ্ট” আইন-ই-আকবরী পুস্তকের
সরকারী হিসাব অনুযায়ী এক-এক জন মনসবদারের আনু-
মানিক মাসিক ব্যয় :—

(ক) ঘোড়া

একটি ইরাকী [অর্থাৎ আরব দেশজাত কিংবা তাদুশ
গুণসম্পন্ন] ঘোড়ার মাসিক খাদ্য-ব্যয়—৭২০ দাম
বা ১৮

[যথা দৈনিক ৬ সের দানা ২২ দাম ; ঘি ২ দাম ;
চিনি ১৭৥ এবং ১/৫ সের ঘাস ৩ দাম । ইহা ছাড়া “জীন”
খরচ (ঘোড়ার চিরুণী, নাল, গামছা ইত্যাদি বাবত মোট)
৭০ দাম বা ১৮০)

একটি মুজন্নস (ইরাকী-তুর্কী দো-আশলা) ঘোড়ার
মাসিক ব্যয় ১৪৮ (৫৬০ দাম)

একটি তুর্কী (তুরান দেশ হইতে আমদানী) ঘোড়ার
মাসিক ব্যয় ১২৮

একটি ইয়াবু (তুর্কী এবং হিন্দুস্থানী দো-আশলা)
ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১০৮

একটি তাজী (মদ্রজঙ্গ ভবেত্তাজী) মদ্র অর্থাৎ পশ্চিম
পঞ্চনদ দেশজাত উৎকৃষ্ট ঘোটকী ৮৮

একটি জঙ্গলা (দেশী মাঝারি) ৬৮

(খ) হাতী

শেরগীর শ্রেণী—মাসিক ব্যয় ৩০০ (১২১০ দাম)

সাদা (সাধারণ)—মাসিক ব্যয় ২০৮

মঞ্জোলা ” ” ১৫৮

করাহা ” ” ১৩৮

কাগুরকিয়া ” ” ৭১০

(গ) উট

একটির মাসিক ব্যয় ৮৮

(ঘ) গরুর গাড়ী

প্রত্যেক গাড়ীর জন্ত বরাদ্দ ১৫৮ (৪টি বলদের খোরাকী
১২৮, চাকার চর্কি, মোরামত ইত্যাদি ৩০)

উল্লিখিত খরচবাদ ঘোড়সওয়ার, চাকর-বাকর ইত্যাদির
বেতন ও মজুরি মোটামুটি নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) অশ্বারোহী, ইরাকী-তুরাকী মাসিক ২৫৮ ; হিন্দু-
স্থানী ২০৮

(২) একটি শেরগীর অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতীর
মাছত, “ভৈ”, মেঠ ইত্যাদি পাঁচ জন চাকর।
মাছতের মাসিক বেতন ৪১০ ; “ভৈ” মাসিক
বেতন ২১/০, মেঠ দৈনিক মজুরী চারি দাম
বা ২১০

(৩) প্রত্যেক দুইটি ঘোড়ার জন্ত একজন সহসি,
মাসিক বেতন ৩১০

আস্তাবলের ডিস্তারী (১৫ ঘোড়ার আস্তাবল)

মাসিক বেতন ২১০

আস্তাবলের ফরশাশ (সরঞ্জাম রক্ষক)

মাসিক বেতন ৩১০

আস্তাবলের বাড়ুদার ” ” ১৮০/১০

কুলীর মজুরি দৈনিক ২ দাম আনুমানিক ২১৭৥

[৪০ দামে এক টাকা হিসাবে]

(৪) প্রত্যেক ৫০টি উটের জন্ত একজন “সর্বান”, এবং উহার অধীনে পাঁচ জন চাকর।

“সর্বানে”র বেতন মাসিক ৫,

প্রত্যেক চাকর দৈনিক ২ দাম বা ১০

ধরচপত্র বাদ দিয়া মনসবদারগণের লাভ বিশেষ কিছুই থাকিত না। এ জন্ত প্রথম প্রথম মনসবদারগণ মিলিটারী ঠিকাদারগণের ছায় সরকারকে ঠকাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিতেন, বদায়ুনীর ইতিহাসে উহার সবিস্তার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তীকালে সামরিক বিভাগে ছুর্নীতি দমন করিবার উদ্দেশ্যে আকবর বাদশাহ স্থলতানী আমলের “দাগ” [ঘোড়ার গায়ে সরকারী মার্ক] এবং “চেহারা” [সিপাহীর অঙ্গাবয়ব বর্ণনা বা ছবিয়া] পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। এক জন পাঁচ হাজারী মনসবদার সাধারণতঃ এক হাজার অশ্বারোহী নিজ তাবিনে রাখিলেই বোধ হয় পাঁচ হাজারীর বেতন পাইতেন। ছোট বড় সকল মনসবদার একমাত্র সম্রাটের আজাদীন। প্রয়োজনমত কোন অভিযানে দশ হাজারী মনসবদারের অধীনে এক হাজারী, সাত হাজারীর অধীনে সাত শতী মনসবদারকে কাজ করিবার হুকুম সম্রাট দিতে পারিতেন, কখনও কখনও এক জন উচ্চপদস্থ সর্বাধিনায়কের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবার হুকুম দুই বা ততোধিক কিংবা নিম্নপদস্থ (যথা এক জন সাত হাজারীর অধীনে “চার হাজারী” হইতে “হাজারী” পর্য্যন্ত) মনসবদার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে এই অধীনস্থ মনসবদারগণকে “কৌমকী” বা সাহায্যকারী সেনানায়ক বলা হইত। প্রধান সেনাপতি সাধারণতঃ এইরূপ “কৌমকী” মনসবদারের কোনরূপ গুরুতর শাস্তিবিধান করিতে পারিতেন না, সম্রাটের কাছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা শাস্তির সময়ে প্রত্যেক মনসবদারকে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের যানবাহন, রসদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত। বাদশাহ হুকুমজারি করিয়াই প্রায় খালাস। এইজন্যই পাঁচ হাজারী মনসবদারকে এক হাজার ঘোড়ার জন্ত পাঁচ হাজারীর বেতন দেওয়া হইত।

২

বাদশাহী আমলে সরকারী কোষাগার হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্ত দুই রকম বৃত্তি এবং বেতনের ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ প্রথমে দৈনিক ভাতা পাইতেন (যথা, উজীর সাহুল খাঁ) পরে তাঁহারা মনসবদার পদে উন্নীত হইতেন। ষাহারা ভাতা পাইতেন তাঁহাদিগকে “রোজিনাদার” বলা হইত। মনসবপ্রাপ্তির পূর্বে পর্য্যন্ত শাহজাদাগণ দৈনিক ভাতা পাইতেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর

পর্য্যন্ত শাহজাদা দারা দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতার “রোজিনাদার” ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাশুজাকে শাহজাদাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম দশ হাজারী মনসব প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর শাহজাহানের চান্দ মাসাফুয়ায়ী জন্ম দিনের দরবারে দারা প্রথম মনসব লাভ করিলেন—বার-হাজারী [“জাত”] ছয় হাজার “সওয়ার” এই উচ্চতম পদমর্যাদার সহিত দিল্লী সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদাকে সরকার হিসাবের (বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত) ফৌজদারী প্রদত্ত হইল। হুমায়ূ বাদশাহ হইতে শাহজাহান পর্য্যন্ত সম্রাটগণ রাজ্যারোহণের পূর্বে স্ব স্ব পিতার নিকট হইতে সরকার হিসাব জায়গীরস্বরূপ পাইয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য “ফৌজদার-ই-হিসাব” যেন শাহী আমলের প্রিন্স অব ওয়েলস অর্থাৎ সম্রাটের মনোনীত যুবরাজ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নিউ ইয়ার্স ডে এবং সম্রাটের জন্মদিন গেজেটের ছায় সম্রাট আকবরের সময় হইতে নওরোজ-দরবার, এবং নৌর ও চান্দ মাস অনুসারে গণিত সম্রাটের জন্মতিথিদিয় উপলক্ষে অল্পচিহ্নিত “ওজন-ই-শমসী” এবং “ওজন-ই-কমরী”—এই তিন বার প্রতি বৎসরে মনসব, খেতাব ও ইজাফার (মনসবদারগণের পদবৃদ্ধি) তালিকা বাহির হইত। জন্মতিথিদিয় “ওজন” বা তুলাপুরুষ-দানের মাসলিক অস্থান আকবর বাদশাহ প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,* এবং উহা আলমগীরশাহী আমলের প্রথম কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই জন্মতিথিদিয়ের প্রকাশ্য দরবারে “নওরোজ” দরবারের ছায় অভিজাতবর্গ এবং প্রত্যাগীণের নিকট হইতে বাদশাহ নজর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে খেলাত প্রদান করিতেন, এবং “ওজন”র দ্রব্যটি দীনদুখী ফকিরকে খয়রাত এবং সাধারণের হিতার্থে চিকিৎসক ও আলেমগণকে দান করা হইত। রাজস্ব এবং বিজয়লঙ্ক

* সৌর জন্মতিথিতে সম্রাট আকবরকে নিম্নলিখিত দ্রব্যের দ্বারা ওজন করা হইত—যথা স্বর্ণ, পারদ, রেশম, গন্ধদ্রব্য, জেজুউষধি, ঘি, লৌহ, পায়সার, সাতপ্রকার খাণ্ডশস্ত্র, লবণ, তুতিয়া [Ruh-i-tutiya ?] ইত্যাদি। এই দিনে সম্রাটের যত বৎসর বয়স পূর্ণ হইত তত সংখ্যক ভেড়া ছাগল ও পাখী,—যাহারা এই সমস্ত প্রতিপালন করে তাহাদিগকে দান করা হইত, এবং বহুসংখ্যক ছোট জানোয়ারকে বন্ধনমুক্ত দেওয়া হইত। চান্দ জন্মতিথিতে সম্রাটকে রোণা, বস্ত্র (tin), বস্ত্র, সীসা, ফল, তরিতরকারী এবং সরিষা তৈলের দ্বারা ওজন করা হইত। উভয় পূর্বেই সাল-গিরা উৎসব হইত। অন্যর মহলে রক্ষিত একটি রজুতে প্রতি বৎসর সৌর-চান্দ বৎসর হিসাবে এক-একটি গ্রন্থি যোগ করিয়া বয়সের হিসাব রাখা হইত। আকবরের সময় দানসামগ্রীর অধিকাংশ ব্রাহ্মগণ পাইতেন। শাহজাহানের রাজত্বে ব্রাহ্মগণের ভাগ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে শাহজাহানের রাজত্বে শূণ্য পরিণত হইল (লাহোরী, বাদশাহনামা)। [ওজনের জন্ত দ্রব্য *Dim, ii*—Blochmann, p. 266-67, footnote.]

ধনের এক অংশ দিল্লীস্থর এই ভাবে প্রজাগণকে পুনঃপ্রদান করিতেন—“সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদন্তে হি রসং রবিঃ।”

৩

ইহার পর শাহজাদা দারার মনসব অস্বাভাবিক রকম দ্রুত গতিতে বাড়িয়া কয়েকটি ইজাফা বা প্রমোশনের পর পাঁচ বৎসর পরে দাঁড়াইল, বিশ হাজারী জাত ও দশ হাজার সওয়ার। এই পাঁচ বৎসরের পরবর্তী দশ বৎসর অর্থাৎ ১৬৩৮ হইতে ১৬৪৮ পর্য্যন্ত যুবরাজের “জাত” বাড়ে কমে নাই বটে, কিন্তু “সওয়ার” কয়েকবার বাড়িয়াছিল, এবং এই “সওয়ার”-এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার “দো-আস্পাহ”, “সে আস্পাহ”। মনসবের শ্রেণী বা “জাত” না বাড়াইয়া অল্পগৃহীত কিংবা হৃদক্ষ মনসবদারের বেতন ও জায়গীর বৃদ্ধি করিয়া পুরস্কৃত করিবার ইহাই ছিল ব্যবস্থা। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দারার “জাত” বিশ হাজারী হইতে ত্রিশ হাজারী এবং আট বৎসর পরে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাজারী হইতে চল্লিশ হাজারী হইয়া গেল। এই সময়ে শুজা ও আওরঙ্গজেবের মনসব একুনে দারার মনসব অপেক্ষা কম ছিল। কনিষ্ঠ হইলেও দাক্ষিণাত্য এবং মধ্য এশিয়া অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আওরঙ্গজেব অপেক্ষাকৃত অল্প স্বভাব শুজার সহিত সমান পদমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। দারাকে সর্ব-বিষয়ে সম্রাট কনিষ্ঠ কুমারগণের নাগালের বাহিরে, প্রতি-দ্বন্দ্বিভার উর্দ্ধে রাখিয়াছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহানের ভাগ্য বিপর্যয়ের অন্তত স্বচনা-স্বরূপ রোগশয্যা গ্রহণের কয়েক দিন পরে “পিতৃভক্তি ও গুপ্তস্বা”র পুরস্কারস্বরূপ শাহজাদা দারা পিতার নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজারী মনসব এবং আত্মবিরোধের প্রাকালে ষাট হাজারী “জাত”, চল্লিশ হাজার “সওয়ার” (উহার মধ্যে ত্রিশ হাজার “দো-আস্পাহ”, “সে-আস্পাহ”) লাভ করিয়াছিলেন।

দারার মনসবের হিসাব-নিকাশ হইতেই বুঝা যায় বাদশাহী আমলের ইতিহাস এই যুগে কি প্রকার দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মনসবদারী প্রথার “জাত”, “সওয়ার”, “দো-আস্পাহ”, “সে আস্পাহ” ইত্যাদি মারপ্যাচ বুঝিবার মত কাগজপত্র বোধ হয় উজীর সাদুল্লা খাঁর পেশদস্ত বা পেশকার রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ* আগুন পোহাইয়া

নিঃশেষ করিয়াছেন। জয়পুরে শেষ পর্য্যন্ত বাহা ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন নিজাম বাহাদুরের অজ্ঞাত পুরাতন দস্তুর একমাত্র ভরসা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্রকম্যান এবং ডাঃ পল হর্গ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত গবেষকগণ “জাত”, “সওয়ার”, “দো-আস্পাহ” (দুই ঘোড়া), “সে-আস্পাহ” (তিন ঘোড়া) ইত্যাদির বেতন, প্রত্যেক মনসব অল্পমাত্রা ঘোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার সংখ্যা নিরূপণ করিতে গিয়া বিভ্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় অধিক আলোকপাত হইবে কিনা ভবিষ্যৎই বলিতে পারেন।

৪

সম্রাট শাহজাহানের ৬৬তম চান্দ্র জন্মতিথি (শনিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) শাহজাদা দারার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মহারাণা রাজসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাহানশাহ তাঁহার নব-নির্মিত রাজধানী দিল্লী-শাহজাহানাবাদের দেওয়ান-ই-আম প্রাশাদে এই জন্মতিথি উৎসবের দরবারে শাহজাদা দারাকে “শাহ-বুলন্দ-ইকবাল” উপাধি দান করিয়াছিলেন। দরবার বসিবার পূর্বে শাহী “জামদারখানা”* বা বসনাগার হইতে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাখচিত বাদশাহী পোষাক দারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শাহজাদা সম্রাটের তুলাপুরুষ-দান অল্পষ্টানে উপস্থিত হইলেন। “ওজন” ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর শাহান-শাহ তাঁহার উফ্বীষ হইতে “সর্ববন্দ” [উফ্বীষ বন্ধনী] খুলিয়া নিজ হস্তে পুত্রের পাগড়ীতে বাঁধিয়া দিলেন। দুই লহর দামী মুক্তার মালা এবং গোলাপী রঙের একটি বড় বৈদ্যুর্মণি [কবী] এই সর্ববন্দে ছিল—মূল্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা। উক্ত খেলাত এবং “সর্ববন্দ” ব্যতীত নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা শাহজাদাকে “ইনাম” দেওয়া হইল। মসনদ-বারোকা বা সিংহাসন-অলিন্দে সেই দিন ময়ূর-সিংহাসনের পাশ্বে শাহানশাহর হুকুমে একটি স্বর্ণনির্মিত রাজপীঠ স্থাপিত হইয়াছিল। শাহানশাহ পুত্রকে “শাহ-বুলন্দ ইকবাল” উপাধি দ্বারা অভিহিত করিয়া উক্ত স্বর্ণপীঠে উপকেশন করিবার আদেশ দিলেন। স্বভাবনম্র যুবরাজ সম্রাটের সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিতে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ

* কটক শহরে সার যদুনাথের প্রতিবেশী ছিলেন রাজা রঘুনাথের অন্ততম বংশধর লালা ত্রিজনারায়ণ। রঘুনাথের পরিবারের এক শাখা নিজাম-উল-মুলুকের সহিত দাক্ষিণাত্য চলিয়া গিয়াছিলেন। এই শাখার শেষ খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন পরলোকগত মহারাজ সারু কিষণপ্রসাদজী। ত্রিজনারায়ণজীর কাছে তাঁহার পূর্বজগণের এক বংশতালিকা দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার আমল পর্য্যন্ত ঘরবোঝাই বাদশাহী

সেরেসতার কাগজপত্র তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল। তাঁহারা ছোট কালে-নষ্টপ্রায় ঐ সমস্ত কাগজ পোড়াইয়া অগ্নিসেবা করিয়াছেন।

* “জামদারখানা” বা বসনাগার—রাজব্যবহারকোষ

+ ময়ূর সিংহাসন কিংবা মুসলমান আমলের কোন মসনদের পায়ের সিংহমূর্তি ছিল না এবং উহার গঠনও চেয়ারের মত নহে (Vide Sarkar, *Studies in Mughal India*.)

করিয়া আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু পিতার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধে তাঁহাকে বসিতেই হইল।

ঐতিহাসিক ওয়ারেন্স লিখিত বাদশাহনামায় এই ঘটনার যেরূপ বর্ণনা আছে শাহজাদার পীর মোল্লা শাহ বদখশীর নিকট লিখিত দারার এক চিঠিতে উহাই সঠিক এবং বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। দারা গুরুকে জানাইতে—

[দরবারে খেলাত বিতরণ, পদোন্নতি ইত্যাদির পর]
আলা হুদয়ত বলিলেন, “বৎস! আমি সঙ্কল্প করিয়াছি আজ হইতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হাত দেওয়া হইবে না। খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে তোমার মত পুত্র পাইয়াছি, ইহার জন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।” দরবারের পর শাহানুশাহ ওমরাহ এবং দরবারীগণকে হুকুম দিলেন তাঁহারা শাহজাদাকে এই নূতন সম্মানপ্রাপ্তির জন্ত মোবারকবাদ জানাইতে পারেন। বিশ দিন পরে (২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ ইং) স্বয়ং সপরিষদ সম্রাট শাহজাদা দারার দৌলতখানায় পদার্পণ করিয়া পুত্রকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। [সেকালের] নূতন দিল্লীতে যমুনাতীরে যে অনুপম প্রাসাদে শাহজাদা বাস করিতেন, তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন “নিগমবোধ-মঞ্জিল”। এইখানে তিনি এই সময় উপস্থিত অর্থ এবং ভাবী অনর্থকে উপেক্ষা করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, অবশুস্তাবী ভ্রাতৃবিবোধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আয়োজন না করিয়া শাহজাদা তখন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবদ্গীতা এবং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন।

৫

শাহজাদা দারাগুজোর স্বাদারী—

১। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে রাজশালক শায়েস্তা খাঁর স্থলে যুবরাজ দারা হুবে এলাহাবাদের স্বাদার নিযুক্ত হইলেন। আকবরশাহী আমলে হুবে এলাহাবাদের পূর্ব সীমা হুবে বিহার, পশ্চিমে হুবে আগ্রা, উত্তরে হুবে আউধ বা অযোধ্যা, দক্ষিণে “বন্ধু” বা বর্তমান বান্দা জিলা। হুবে এলাহাবাদ দশটি সরকার এবং ১৭৭ পরগণায় বিভক্ত। ইহার রাজস্ব ২১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭,৪১২ দাঁম বা আনুমানিক টাকা ৫৩,১০,৬০৫।২ পাই* চূণার, কাশী, গাজীপুর, জৌনপুর, কালঞ্জর, কারা-মানিকপুর কোরা (ফতেপুর) প্রভৃতি এই স্ববার অন্তর্গত। পিতা শাহজাহান প্রিয়তম পুত্র দারাকে দরবারে রাখিয়া নায়েব-সুবেদার দ্বারা স্ববার শাসনকার্য চালাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে

শাহজাদা তাঁহার অন্তঃপুররক্ষী বিশ্বস্ত খোজা বাকী বেগকে হুবে এলাহাবাদের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক দৃষ্টিতে শাহজাদা তাঁহার অধীনস্থ কোন প্রদেশের মূল্য যাচাই করিতেন না। এলাহাবাদের স্বাদারী লাভ করিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধ উদার মতাবলম্বী সূফী সাধক শেখ মুহিবুল্লা এলাহাবাদীকে এক পত্র লিখিয়া সম্বন্ধনা জানাইয়াছিলেন। পরে দারা ইহাকে উপ-গুরু রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দারা-মুহিবুল্লার তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ক পত্রাবলী অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ। এই স্ববার অগ্রতম আকর্ষণ ছিল কাশীধাম* এবং তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলী। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রতি দারার শ্রদ্ধা ও দাক্ষিণ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ (তৈলঙ্গবাসী) বাদশাহী দরবারে গমন করিয়াছিলেন।

২। এলাহাবাদের স্বাদারীর দুই বৎসর পরে (মার্চ ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) হুবে লাহোর অর্থাৎ পঞ্চনদ প্রদেশ শাহজাদা দারাকে দেওয়া হইল। এই প্রদেশের পশ্চিমে মূলতানের উপরিভাগে সিক্কুনদ, পূর্বে শতজঙ্গ, উত্তরে কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার ভীষর গিরিবন্ধ, দক্ষিণে বিকানীর ও রাজপুতানার মরুভূমি। আকবরশাহী আমলে ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ বড় ছিল।

এই সময়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেব প্রধান সেনাপতি রূপে মধ্য-এশিয়ার বলখ রাজ্য জয়ে নিযুক্ত ছিলেন। কুমার দারাকে লাহোরে রাখিয়া আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সম্রাট কাবুল শহরে বৎসরাধিককাল ডেরা করিয়াছিলেন। রণসস্তার, খাণ্ডজব্যাধি সরবরাহ করিবার ভার ছিল লাহোরের স্বাদারের উপর। ভাগ্য বিপর্যয়ের পূর্ব পর্যন্ত এলাহাবাদের ত্রায় পঞ্চনদ প্রদেশও দারার অধীনে ছিল। লাহোরের উপকণ্ঠে অধুনাতন মিয়ামীর স্টেশনের নিকট ছিল শাহজাদার “দাদাপীর” মিয়া-মীরের আস্থানা। ইহার শিষ্য মোলানা শাহ বদখশী দারার দীক্ষা-গুরু। লাহোর শহরের নিম্নলো নোলাখা মহল্লায় যোগসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী বাবা লালের সহিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে রায় চন্দ্রভান

* কাশীতে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তথাকার “দারানগর” মহল্লায় বসিয়া দারাগুজো ১০৮ জন পণ্ডিতের সাহায্যে উপনিষদের ফার্সি ভাষায় করিয়াছিলেন (Benares District Gaz. p. 196)। হুপণ্ডিত মহেশ দাস তাঁহার এক প্রবন্ধে অকাটা প্রমাণ দিয়াছেন “উপনিষদ” দিল্লীতেই অনূদিত হইয়াছিল, কাশীতে নহে (Vide Modi Memorial Volume, pp. 622-638; Bombay, 1930)। আমি সম্ভাবনাময়িক কোন ইতিহাসে দারার কাশীযাত্রার হাদিস পাই নাই, কিন্তু এই বিষয়ে নেভিল সাহেবের জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিলাম; পরে সংশোধন করিয়াছি (Vide Dara Shukoh p. 22. footnote, p. 150)।

* Aïn-i-Akbari, Blochmann & Jernett, part ii, pp. 157-168.

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শাহজাদার নয় দিন ব্যাপী তর্ক চলিয়াছিল। রায় যাবদ্যাস কর্তৃক উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর নাদির-উল-মুকাতে নামক পুস্তিকায় ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। নানা কারণে লাহোরের সহিত দারার বহু স্থিতি বিজড়িত। শহরের উন্নতি কল্পে তিনি কয়েকটি “চক্” (একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে নির্মিত স্থপরিসর বাজার) নির্মাণ করিয়াছিলেন। লাহোরবাসিগণ উদারহৃদয় দানশীল দারাকে মনেপ্রাণে ভালবাসিত। সাম্রাজ্য লাভ করিবার পর “কাফের” দারার স্থিতি লাহোরবাসীরা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আওরঙ্গজেব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিরাট “বাদশাহী মসজিদ” নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, লাহোরবাসী মুসলমানগণের নিকট এই মসজিদ “আক্কেল-দমা” নামে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শিখগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ইংরেজ সরকার মুসলমানদিগকে এই মসজিদের অধিকার দান করিবার পরেও আক্কেল গুড্রুম হইবার ভয়ে কুসংস্কারাবদ্ধ কোন কোন মুসলমান এইখানে নমাজ করিতে আপত্তি করিত* বলিয়া এক সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।

৩। সুবে গুজরাট—

১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত দুই সুবার সহিত সুবে গুজরাটের শাসনভার যুবরাজ দারার উপর অপিত হইয়াছিল। সুবে গুজরাটের আয়তন বুরহানপুর হইতে দারকা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩০২ ক্রোশ; বিস্তৃতি রাজপুতানার জালোর হইতে কাশ্মীর উপনগরের তীরবর্তী বন্দর “দামন” (বর্তমানে পর্তুগীজ অধিকার) পর্যন্ত ২৬০ ক্রোশ এবং “ইউর” রাজ্য হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত ৭০ ক্রোশ। আকবরশাহী আমলে ইহার রাজস্ব ছিল এক কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার পাঁচ শত সাতান্ন টাকা আট আনা (কাফি খান)। গুজরাটের নিতান্ত বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে শাহজাদা দারা তাহার স্বদক্ষ নায়ব-সুবাদার বাকী বেগকে সুবে এলাহাবাদ হইতে গুজরাটে বদলী করিলেন। শাহজাদার সুপারিশ অনুসারে শাহান্শাহ বাকী বেগকে বাহাদুর খাঁ খেতাব দান করিয়াছিলেন। দারা স্বয়ং গুজরাটে পদার্পণ করেন নাই। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে শায়স্তা খাঁ এবং দুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ শাহজাদা মুরাদ-বখশ গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই সুবে গুজরাটের বদলে সুবে মুলতান এবং কাবুল দারাকে দেওয়া হইল।

আকবরশাহী আমলে সিন্ধু প্রদেশ জয়ের পূর্বে মুলতান স্বতন্ত্র সুবা ছিল না; লাহোরের অধীনে উহা একটি “সরকার” বা জিলা হিসাবে গণ্য হইত। সিন্ধুর স্বাধীন

নরপতি মীর্জা জানী বেগ রাজ্যচ্যুত হইবার পর সিন্ধু এবং মুলতানকে লইয়া সুবে মুলতান গঠিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর হইতে কচ্ছগাওবা (বেলুচিস্তান) এবং মকরাণের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত এই সুবার দৈর্ঘ্য ৬৬০ ক্রোশ, এবং মুলতানের নিকটবর্তী খটপুর হইতে জয়সল্মীর রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃতি ১০৮ ক্রোশ। এই প্রদেশের রাজস্ব তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচ শত নব্বই টাকা আট আনা।

আকবরশাহী আমলে কাশ্মীর ও কান্দাহার কাবুল সুবার অন্তর্গত ছিল। শাহজাহানের সময়ে কাশ্মীর একটি স্বতন্ত্র সুবা হইয়াছিল। শাহজাহানের সময় অচিরস্থায়ী সুবে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়ায় পর কাবুল, গজনী, পেশাওয়ার, সওয়াত উপত্যকা এবং বম্মু জিলা লইয়াই সুবে কাবুল বহাল রহিল। দারার কান্দাহার অভিযানের সময় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান শুকো কাবুলের নায়ব-সুবাদার ছিলেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার অভিযানে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিবার সময় দারা সুলেমান শুকোর স্থলে বাহাদুর খাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাহাদুর খাঁ লাহোরে বদলী হওয়ায় তাহার স্থানে রুস্তম খাঁ বাহাদুর ফিরোজ-জঙ্গ কাবুলের নায়ব-সুবাদার নিযুক্ত হইলেন।

বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার শাহ গুজা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুবে বিহার পাইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। তিন সুবা হাতে পাইলে শাহ গুজা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এই আশঙ্কায় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পিতার নিকট হইতে বিহার প্রদেশ দারা নিজের নামে লিখাইয়া লইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বেই শাহ গুজা বিজ্রোহী হইয়া বলপূর্বক বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন।

উপরিকথিত সুবাসমূহ ব্যতীত সম্রাট যুবরাজ দারাকে আরও দুইটি লাভজনক পদ প্রদান করিয়াছিলেন। কোয়েল (বর্তমান আলীগড়) সরকারের ফৌজদারী এবং আগ্রা-দিল্লীর মধ্যবর্তী বাদশাহী রাস্তার “রাহদারী” বা পথরক্ষক পদের আয় ছিল মোট সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দারাকে অর্পণ করিয়া শাহজাহান পরোক্ষ ভাবে রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার ঐক্যতা তাঁহাকেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কোয়েল (আলীগড়) সরকারের ফৌজদার ছিল প্রকৃত পক্ষে যমুনার অপর পারে আগ্রা ও দিল্লীর পূর্বদিকবর্তী দোয়াব-জিলার সর্বময় কর্তা। চম্বল নদীর তীরবর্তী আগ্রার অনতিদূরে ঢোলপুর ঘাট হইতে বাদলী (দিল্লীর ছয় মাইল উত্তরে) পর্যন্ত বাদশাহী রাস্তার “রাহদার” উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে রাজধানীদ্বয়ের প্রবেশ-পথে গ্রহরীক্ষরূপ। সুবে এলাহাবাদ, মালব, আজ-

মীর লাহোর হইতে কোন শত্রুর পক্ষে বর্তমান আলীগড় জিলার ফৌজদার এবং উক্ত বাদশাহী সড়কের প্রহরীকে এড়াইয়া দিল্লী-আগ্রা প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। সরকারী ডাক চলাচলের ইহাই ছিল প্রধান রাস্তা। সম্রাট শাহজাহান কুমার চতুর্দশের স্বভাব এবং মতিগতি লক্ষ্য করিয়া যেন ভাবী অনর্থের আশঙ্কায় শাহজাদা দারাকে এই উভয় পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে এই

কার্যের জন্ত দারা যোগ্যতম না হইলেও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যক্তি। যোদ্ধা এবং শাসক হিসাবে দারার জীবন ঘটনাবলি কিংবা বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। আকবরশাহী আমলের শাসনতন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া দারার অল্পপস্থিতি এবং অমনোযোগ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের প্রধান সুবাসমূহ তাঁহার নামে নায়েব-সুবাদারগণ নির্বিঘ্নে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

উলুখড়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বদ্যিনাথ নাপিতের বাড়িটা গ্রামের একটেরে। ওর বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়েছে ছ'কোশবাগী বিলের মাঠ। তার আগে কেরামত মিঞার গোটা ছুই বাঁশঝাড়ের পিঠে চাটুজ্যেদের দেড় হাজারী আমবাগান। দক্ষিণ দিকে পড়ে মুসলমান পাড়া। বলতে গেলে কোঠাঘর ওদের কারও নেই। কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ গরুর গাড়ির গাড়োয়ান; কেউ বা করাতি আর ঘরামিস্ত্রি করে দিন গুজরাণ করে। মেয়েরাও বসে থাকে না।

কোশটাক পথ গেলেই গঙ্গার ওপারে বর্ধমান জেলা পড়ে। সেখানে ধান আর আলু পাওয়া যায় সম্ভাব্য। গরুর গাড়ি বোঝাই করে এপারের গাড়োয়ানরা ওপার থেকে আলু আর ধান নিয়ে আসে। আলুটা সম্পন্ন গৃহস্থেরা বেশি করেই কিনে রাখেন, বাজারে বিক্রীর জন্ত ফড়েরাও কেনে। আর ধান কিনে দিনমজুরি করে ধায় যে সব লোক—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলেই। না কিনলে সকালে পাড়া ভাত আর বিকেলে মজুরি করে এসে তপ্ত ভাত—এক এক জনের প্রায় এক সের চালের দাম সামান্য দিনমজুরির পরদাম কুলোবে কি করে। কাজেই প্রায় সকলের বাড়িতে টেকি আছে। মেয়েরা ধান ভানে।

কিন্তু সে সব সোনার দিনও আর নেই। চালের বরাদ্দ হয়েছে—ছ' বছরের ওপর। শহরে মজুররা তো আধ-পেটা খেয়ে আছে—পাড়াগাঁয়েও অগ্নিমূল্যে কিনতে হচ্ছে। অবস্থা মজুরিও হয়েছে আবার ডবল। কিন্তু জিনিসের দাম বা বেড়েছে—তাতেও মজুরি বাড়লেই বা ছুঁৎ ঘুচছে কই। তার উপর আর এক উৎপাত এক বছরের ওপর হুর্ক হয়েছে। এক জেলা থেকে আর এক জেলার ধান চাল কিছুই নাকি ওপর-ওয়ালার হুকুম ভিন্ন নিয়ে যাওয়া চলবে না। গাড়োয়ানরা প্রথম প্রথম আলুর বস্তার সঙ্গে ধানের বস্তা পাচার করত। তার পর ঘাটে বসেছে পুলিশ পাহারা। তা সে সব কাটাবার মন্ত্রণ ওরা জেনে নিয়ে মাল গন্ত করত। তার পর পুলিশের

বড়কর্তা এক দিন নিজে এসে আস্তানা গাড়লেন পারঘাটায়। এ সত্ত্বেও মাল যে আসছে না তা নয়—কিন্তু চুনোপুঁটীদের পক্ষে সেদিকে হাত বাড়ানো বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মত। নিরুপায় শ্রমিক-বধুরা ওপর পানে চেয়ে নালিশ জানায়—গালি-দেয় তাদের—যারা মাহুষের অন্ত মারবার জন্ত এমন ষড়যন্ত্র করেছে। তারা ভেবেই পায় না—মাত্র এক কোশ দূরের ওই শহর থেকে মাল আনা নিষিদ্ধ হয়েছে কোন্ কাহ্ননের বলে। মাঝখানে একটা নদী আর পারানির ব্যবস্থা না থাকিলে ওরা কাহ্ননকে কি আমলে আনত। রাতারাতি ঝগি করে ফেলতে পারত গুদাম। কিন্তু পারানি নৌকা ভিন্ন আরও নৌকা রয়েছে, রাত-বিরেতে পারঘাটা না হোক আটাঘাট নৌকা লাগিয়ে—ধান বা পাটের জমি ভেঙ্গে মাল আনার চেষ্টা যে না হয়েছিল তা নয়, বেশি দিন চলে নি সে কৌশল। আজকাল মহাজনের আড়তে বসেছে পাহারা—নদীর ঘাটে-জঘাটে আছে পাহারা। ওরা আগে এত সতর্ক ছিল না, কিন্তু রাত-বিরেতে একটু কষ্ট করে বার হতে পারলেই ট্যাক ভারি হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট—তাই কষ্টকে ওরা কষ্ট বলে গ্রাহ্যই করে না।

যাই হোক, মজুররা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। এ বিষয়ে বদ্যিনাথ আর রহমতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বলতে গেলে পিঠাপিঠি বাস ছ'জনের। মাঝখানে ফালি মত এক টুকরো জমিতে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা অশ্বখ গাছ। তার নীচের আধ ভাগ দরজা। এক কালে হয়তো ওর কদর ছিল—আজকাল এখানে শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন বড় একটা দেখা যায় না। আসলে অশ্বখতলার প্রত্যহ যা জমে—তা নাপিত-বাড়ি আর করাতি-ঘরামি-মিস্ত্রি বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার আসর। রহমতের ছেলেমেয়েরা আনে কাঠের গুঁড়ো—যা কাজ শেষে ধলে বোঝাই করে রহমৎ বাড়িতে নিয়ে আসে উপরিপাওনা হিসাবে। এগুলি যারা ধূপ তৈরি করে—তাদের বেচে দিলে ট্যাকেও কিছু আসে। বদ্যিনাথের

ছেলেমেয়েরা ছোট খোঁতা বা শাবল এনে অশ্রুতলা খুঁড়ে মাটি বার করে—পেতলের ঘটিতে করে আনে জল। তারপর জলে মাটিতে মেখে তৈরি করে ছোট ছোট কাদার গুলি। তার চার ধারে কাঠের গুঁড়ো মাখিয়ে দিব্যি লাড্ডু বানিয়ে ময়রা দোকানের কেনা-বেচা শুরু করে। আরও অনেক খেলা আছে—তার মধ্যে এইটি হ'ল প্রধানতম। সংগৃহীত কাঠের গুঁড়ো কমলে রহমৎ যা তা বলে গাল দেয় ছেলে-মেয়েদের—আর তাতেই ওদের খেলার আমোদটী হয়তো বাড়িয়ে দেয়।

বদ্যিনাথ বলে, ১৩ গুরোটীর জাতই ওই রকম করাতি ভাই। কোথায় বাঁদাড়ে একটা লাউয়ের চারা লকলকে ডগা মেলে কাদা মাখামাখি হচ্ছিল—তুলে এনে উঠানের এক ধারে বসালাম—দিব্যি মাচা তৈরি করে দিলাম—আর গুরো-টারি কিনা তাই উপড়ে রান্না রান্না খেলা করছে। ক্ষেতি অপচো ওদের ধন্য।

রহমৎ বলে, সাধ করে গাল দেই ভাই, রোজি রোজ-গারের তো এই ছিঁরি। চালে আগুন লেগেছে, ছুনিয়ার জিনিসে আগুন লেগেছে—এমন করে খোদা সব দিক দিয়ে আমাদের মারছে।

বজিনাথ বলে—খোদা নয়রে ভাই মালুমই মারছে। এই তো এককোশও নয় কাছনা, মানুষে ধান চাল আনতে পারে না কেন? ষেং তোর আইন—বলে একটা অন্নীল উক্তি করলে।

রহমৎ বলে, দেখে নিয়ো বদি ভাই—এমন ধারা গোন (গুনাহ) চিরকাল থাকবে না।

আরও অনেক আক্ষেপ কটুক্তিতে ওদের আলাপ-আলোচনা সুদীর্ঘ হতে পারত—কিন্তু বদ্যিনাথের বউয়ের তীক্ষ্ণ গলার স্বর ভেসে এল, মাগো মা, জাত জন্ম সব গেল। এ পাড়ায় বাস করলে শতকোষার হবে না তো কি তোলা থাকবে।

বদ্যিনাথের মেয়ের গলা শোনা গেল, কি মা, কি হয়েছে? কি হয়েছে। চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাওনা ছিঁরি কোথাকার। একটু রোদ হয়েছে দেখে ধানগুনো রোয়াকে দিয়েছিলাম শুকোতে, কোথা থেকে এক পাল কুকড়ো এসে গব গব করে গিলতে শুরু করেছে। মর মর এখানে কেন, মনিবের সঙ্গে কবরধানায় যাও না।

রহমৎ হেসে বললে, জরু বড় রেগেছে বদি ভাই। আর সত্যি—এত জ্বালাতন করে কুকড়োতে—থুয়ে যেতে দেয় না।

বদ্যিনাথ বললে, তা যাই বল—ভারি মোংরা কিন্তু। ওসব না পোষাই ভাল।

রহমৎ বললে, না পুষলে খাব কি। ডিম বল—ধাড়ী বল বেচে টেচে পরণের কানিটা আদটা যোগাড় করতে হয়—আর মাংস তো আর পরসি দিয়ে কেনবার সামথ্য নেই—

মাঝে মাঝে মুখ বদলানোও চলে। পরে হেসে বললে, খাবে একদিন সাফাং—ভারি উত্তম মাংস।

বদ্যিনাথ প্যাচ প্যাচ করে মাটিতে খুঁখু ফেলে বললে, ওয়াকু থু—শুনলে বসি আসে।

রহমৎ হাসতে হাসতে বললে, বড় বড় বাবুভাইরা তোপা-তাল্লা করে দিচ্ছে রলেই তো কুকড়োর দাম আগুন। মনিয়া জন্মে সব জিনিস যদি না খেলে তো খোদাকে জবাব দেবে কি?

বদ্যিনাথের গরু গিয়েও এক একদিন রহমতের নড়বড়ে বেড়া ভেঙ্গে ঝিন্ডের চারায় লাউয়ের ডগায় মুখ দেয়। রহমতের বউও ছেড়ে কথা কয় না—বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলে গাল দেয়। বদ্যিনাথের বাড়ির প্রান্ত থেকে সে গাল প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এদ্ব ঘটে ছপ্পরের মুখে। বদ্যিনাথ আর রহমৎ কাজে বেরিয়ে গেলেই—হাতে যদি ধান সেদ্ধ কাপড় সেদ্ধ আর টুকিটাকি কাজ না থাকে তো ছ'পক্ষের বাক্যমুদ্র দীর্ঘতরই হয়। প্রতিবেশীরা সহ্যহুত্বিত দেখানোর ছলে ছ'পক্ষে যোগ দিয়ে ব্যাপারটাকে খোরালো করে তোলে। হিন্দুর দেবতা—বা মুসলমানের আচার-আচরণ এসব এমন ইতর গালিগালাজের মারকত ছড়িয়ে পড়ে—যার এক কথা কানে গেলে মাথার রক্ত চড়ে ওঠে। কিন্তু ঝগড়া শুধু ঝগড়াই। ওর মধ্যে দেবতা ধর্ম আচার আচরণকে টেনে আনলেও কেউ সেটা গভীরভাবে গ্রহণ করে না।

রহমৎ বলে, মাগীনরা অমনি সারাদিন টেঁচিয়ে মরে—ভাল করে খেতেও পারে না। হেসে বলে, তা সে ভালই—একটা দিনের খোরাক বাঁচলে লাভ বৈ লোকসান নেই।

বজিনাথ বলে, ধর্মের ওরা বোঝেই বা কি—তাই গলা ফাটিয়ে পাড়া মাত করে।

ধর্মের মর্ম বদ্যিনাথ বা রহমৎ যা বোঝে তা গীরের দরগায় শিরগি দেওয়া—বারোয়ারি তলায় মীথা নোয়ানো—সকোর সময় বা সকালে—নমাজ পড়া—পূজো করা আর কোরাণ শরীফ বা ভাগবত স্তনতে বসে ধান চাল কাঠ কলাই—নিজ নিজ সংসারের কথা ফুসফাস করে আলোচনা। এর বেশি বোঝবার অবসরই বা কোথায় এদের। যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—তিনিই তো তাদের কাঁধে চাপিয়েছেন নানান রকমের ঝগড়া। উদয়াস্ত পরিশ্রম না করলে তিনি তো আর আসমান থেকে আশরফি বোঝাই কলসীটা উপুড় করে ঢেলে দেবেন না ওদের কুঁড়েঘরের জুঁঠরে। সমাজের ধারা বড়লোক—ভাঁরা কত রকমের জাঁকজমকের মধ্যে ধর্মকে কাঁপিয়ে তুলছেন। নতুন মন্দির বন, মসজিদ বন, গরীব কাঙালী খাওয়ানো বন, কোরান পাঠ বা কথকতা দেওয়াই বন—কি না করছেন তাঁরা। মেহেরবান খোদা যাদের দৌলতখানার ওপর আশরফির জালাটা উপুড় করেই রেখেছেন—তাঁরা করবেন বৈ কি এসব। খেঁটে-খাওয়া দিন-

মহুরের পয়সায় ছু' পয়সার বাতাসা বা পাটালি কিনে হরির মুট বা গীরের শিরনি দেওয়া ছাড়া—এদের দ্বারা কতটুকুই বা সম্ভব।

যাই হোক—যা এরা বোঝে না বা জীবনধারণের অল্পপান হিসেবে কচিং কচাচিং ব্যবহার করে তার জ্ঞান এদের মাথা-ব্যথাও কম।

কিন্তু সম্প্রতি মাথাব্যথা শুরু হয়েছে।

এক দিন বড়িনাথ রহমতকে বললে, আচ্ছা ভাই—আজ-কাল তোমার ছেলেমেয়েদের অমন বিটকেল বিটকেল নাম রাখ কেন?

রহমৎ বললে, মৌলবীরা বলে দিয়েছে যে। বলে—থবরদার হিঁহু নাম রাখিস নে।

বড়িনাথ হেসে বললে, জাত যাবে বুঝি?

রহমৎ বললে, তুমিও যেমন বড়ি ভাই—নাম নিয়ে ত মানুষের ভারি কাম—রাখলেই হ'ল একটা। এই যে ছাগলটাকে ডাকি—আয় হিলি পাতা খাবি আয়। প্যা প্যা করতে করতে ওকি ছুটে আসে না? বলে হা হা করে হাসতে থাকে।

পাশাপাশি বাস করতে গেলেই ঝগড়াটা আসটা লেগেই থাকে—তা বলে ছু' বাড়ির ভাব-সাবও কম নয়। বড়িনাথের ছেলেমেয়ের আমায় করলে রহমতের বউ ষট করে ছাগলের দুধ নিয়ে আসে, রহমতদের অশুখবিস্ত্রণে বড়িনাথের বউও গরুর দুধ দিয়ে সাহায্য করে। এ ছাড়া চাল-ডাল আনাজ-পাতির বিনিময় তো আছেই। চিরাচরিত সংস্কারবশতঃ হোয়াহু'রির বিধানটা এরা মানে। তবে সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মত তার মধ্যে দোষের কিছু দেখে না। মেয়েদের মধ্যেই জাত-বিচারটা বেশি। রহমতের বাড়ি থেকে এলেই বড়িনাথের বউ মাথায় খড়াকতক জল ঢালবেই—আর গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব কিছু শুদ্ধ করে নেবেই। ছেলে-মেয়েরা অনবরত মেশামেশি করে বলে, অতটা শুদ্ধাচারে তাদের রাখা চলে না। তবে হাত পা ধোয়া বা মাথায় গঙ্গাজল ছিটানো—এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো নেই। বড়িনাথের বউ ভাঙ্গা চালাটায় বসে রাঁধলেও সদর দরজার ওপর দৃষ্টি ওর প্রথর। কে আসছে—কে বার হয়ে যাচ্ছে, এক দিকে রান্না সামলে অপর দিকে সেটুকু তার নজর এড়াবার জো নেই। ঘাহোক, আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত টুক টুক করতে হয় না। ওরা বাড়িতে ঢুকেই দাওয়ায় বসল খড়ার জলে পা ধুয়ে—কুলুঙ্গির ওপর গঙ্গাজলের খটটি থেকে অল্প একটু জল মাথায় ছিটায় তবে ঘরে ঢোকে। পুরুষদের অত ঝালাই নেই বিচারের। ওরা দোকানের খাবার পর্যন্ত এক সারে বসে খায়—কেবল তামাক খাবার সময় হুকোটীর দিকে একটু নজর রাখে। কলকেশ যে আগুন জ্বলে তা সব

সময়েই শুদ্ধ—আর হুকোতে জল না থাকলে জাত-বিচারে বাধে না। আর হোয়া-লেপার বিধি-বিধান মানতে গেলে বড়িনাথের জাত-ব্যবসায় তুলে দিতে হয়। বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত শুচি-অশুচি, ভদ্র-অভদ্র যে-কোন লোককে ক্ষৌরি করে—এক পয়সার তেল ব্রহ্মতান্ত্রিতে দিয়ে—পুঙ্খের নান করে তবে ও বাড়িতে ফেরে। এত বেলা পর্যন্ত বিড়ি তামাক না খেয়ে একটানা কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি? মাঝখানে এই অবস্থাতেই জলখাবার (মুড়ি, পকার বা জিড়ে গজা) খেয়ে বাটি দুই জলও তো খেতে হয়। না খেলে ...কিন্তু এসব নিয়ে ওদের মাথা ঘামে না। ধর্মের একটা বাঁধাধরা ছক আছে—সামাজিক নিয়মে বা জাত-ব্যবসায়ের চাপে যেটুকু অবিধা অশুবিধা তা দেখ-ধর্মের অন্তর্গত বলেই সেই ছকের দাগে পা ফেলে চলতে পারলেই এরা ইহকাল ও পরকাল দুই করা হ'ল ভেবে রুশীমনে দিন কাটায়। তার বাইরে যেটা—সেই নিয়েই আন্দোলন বা মাথাব্যথা।

আজকাল দিন বড় খারাপ পড়েছে। এই বাঁধা-ধরা ছকের দাগগুলো জোর করে মুছে দেবার চেষ্টা চলছে। কারা চেষ্টা করছে তা বড়িনাথ বা রহমৎরা জানে না। বহুপুরুষ পাশাপাশি বাস করে—এমন নির্ভর ও নিশ্চিন্ত ওরা ছিল যে ভাবতেই পারে নি, তুচ্ছ সব ব্যাপার এমন ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে।

সেবার কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়ে গেল। বড়িনাথের বয়স তখন পঁচিশ, রহমতেরও ঐ বয়স। ওরা তো হেসেই অস্থির।

রহমৎ বলেছিল, ওসব বদলোকের কাজ বড়ি ভাই।

বড়িনাথ বলেছিল, না মিঞা, শহরের আঙ্গব কারখানা। কে কার-কড়ি ধারে কেনে—কাজেই তোমার জান পেল কি আমার দৌলত গেল ওদের তো কচু।

রহমৎ বলেছিল, ওরা কারা ভাই?

বড়িনাথ বানিক ভেবে জবাব দিয়েছিল, ওরা—হ'ল গিয়ে শুভা। লোককে খুনজখম করা হল ওদের ব্যবসা।

রহমৎ বলেছিল, তাই বল, নইলে মানুষ কখনো মানুষকে ধামকা মারতে পারে। মানুষের খুন দেখলে মানুষের কল্জে ঠাণ্ডা মেয়ে যায় না।

তার পর কত বছর গেছে। শহর এগিয়ে এসেছে এই পাড়াগাঁর পানে। রহমৎ বড়িনাথরা অনেক কিছু দেখেছে—শুনছে, তবু ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না—এও সম্ভব কিনা। চিরকাল প্রতিমা বিসর্জনের সময় হিন্দুরা মসজিদের নামনে বাজনা বাজিয়ে যায়। বিজয়া দেবতে হিন্দু ছেলে-যেদের সঙ্গে মুসলমান ছেলেমেয়েরাও ডিড় জমায়। এটাকে ওরা দেশের পরব বলেই জানে—জাতির পরব বলে আমল দেয় না। সবাই তেলে ভাঙ্গা খাবার কিনে খায়, এক পয়সায়

বাণী বা বেজুন কিনে আমোদ করে, বিশেষ রকমের সাজসজ্জা করে ঠাকুর দেখতে আসে। একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে ধনী-মনে ঘরে ফিরে এই বিষয়ের আলোচনাও করে বহুক্ষণ পর্যন্ত।

বহুর কতক আগে মসজিদের সামনে বাজনার আপত্তি উঠল। অবশেষে আপোষ হ'ল—সারা রাত্তা বাজনা বাজিয়ে মসজিদের বিশ হাত আগে ও বিশ হাত পিছে বাজনাটা ধামাতে হবে। একটা বিদারণ-রেষা মনের মধ্যে যে পড়ল—সেকথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

বদ্যিনাথ বললে, এটা কি ঠিক হ'ল রহমৎ ভাই।

রহমৎ বললে, আমরা আর কতটুকু বুঝি বদি ভাই, যারা বুঝে—কালুনওয়ালা—

বদ্যিনাথ চটে উঠে বললে, ছুতোরি কালুন। যা চিরকাল হয়ে আসছে—

রহমৎও অশ্রাব্য গাল দিয়ে চিরকালের বিধানকে উণ্টে দেবার চেষ্টা করলে। কথান্তর হতে মনান্তর হ'লই। পুরো একটি দিন বদ্যিনাথের ছেলেমেয়েরা দরগাতলায় খেলা করতে গেল না। ওদের বাড়ির উত্তরে যে বগীচলা আছে—আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে জুটিয়ে খেলা করলে। কিন্তু তাতে ওদের খেলা জমল না।

পরের দিন দরগাতলায় গিয়ে বদ্যিনাথের আট বছরের মেয়ে সুবি বললে, এই দেলজান—খেলবি?

দেলজান টোট ফুলিয়ে বললে, না ভাই—বাপজান মানা করেছে।

দেলজানের মা দাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে বললে, হ—মানা করেছে। তামাম দিন ঘরে বসে বসে আমার জ্ঞান খাও। যা—বলছি।

দেলজানের এতটুকু আপত্তি ছিল না। ছুটে যেতে যেতে বললে, বাপজান যদি শুদোয়—

দেলজানের মা ঝড়ার দিয়ে উঠল, শুদোবে। ইঃ—বলে মরদের ইদিকে নেই উদিকে মুরোদ কত। ইঃ—

তার পর দিন রহমৎ বললে, ও বদি ভাই—দাড়িটা বানিয়ে দাও না।

বদ্যিনাথ ফুর ভাঁড় নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, হুয়টুকু টেঁচে তুলে দেব কিন্তু।

রহমৎ বললে, চাচা কি বলছিল জ্ঞান—ওসব বড় বড় কথা বড় বড় নোকরা বুঝুক গে। আমরা খেটে খাই আমাদের অত হ্যাংনামে কাজ কি।

যা বলছে। বদ্যিনাথও হাসলে।

দিনকতক পরে হাদ্ধামা একটু বাধল। শালের ব্যবসায়ের কিছু টাকা পুঁজি করে বিলায়েৎ হোসেন ফিরে এল দেশে। সব দেখে শুনে সে বললে, ছি ছি—একি অবস্থা তোদের। হিন্দু বাড়ি দাস্তবিত্তি করে আছিল বলে ধর্মকে একেবারে

বরবাদ দিয়েছিস। পাঁচ ওস্তা নমাজ পড়িসনে—রোজাটাও পালিস নে। ছি—ছি।

দরগায় দরগায় খটা করে একদিন শিরণি দেওয়া হ'ল। মসজিদে মসজিদে কোরানের বয়েং পাঠ আরম্ভ হ'ল। বেশ উৎসাহের সঞ্চার হ'ল চারদিকে।

বদ্যিনাথ বললে, এসব ভাল মিঞা। ধর্মের আলোচনা যত বেশি হয়—

রহমৎ বললে, আলবৎ। কিন্তু বড় শক্ত ধর্মেরে ভাই। একটু ফুসফাস করবার যো নেই—মিয়ারা চটে আশুন।

বাই হোক—ধর্মের মধ্য দিয়ে এক্যবোধ সবার মনেই ক্রিয়া শুরু করলে।

সব পাড়ায় অবাধগতি বদ্যিনাথের। একদিন হিন্দু পাড়ার সমাজপতি কালীপ্রসাদ তাঁর বৈঠকখানা থেকে ডাকলেন বদ্যিনাথকে। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘর—লোকে ভর্তি। কি একটা আলোচনা হচ্ছিল হঠাৎ থেমে গেছে—তার থমথমে ভাবটা এখনও মিলায় নি—সেটা ঘরে ঢুকেই বদ্যিনাথ অতুণ্ডব করলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ও মেঝের এক ধারে বসল। তার পর বদ্যিনাথ—দেশের হালচাল কি!—গড়গড়ার নলটা তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়ে রেখে কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে—আপনাদের ছি-চরণের আশীর্বাদে খবর ভালই। কালীপ্রসাদ একটু চড়া গলায় বললেন, তোমার কথা জিজ্ঞেস করি নি। সে তো দেখছিই চোখে—হিন্দু-মুসলমান মুচি-মুদফরাস সবাইকে ক্ষোরি করে বেশ ছ' পরস্যা ট্যাঁকে তুলছে। বলি একটা হাদ্ধামা বাধলে টাকার সামলে রাখতে পারবে তো?

জাতিগত ধূর্তামির প্রবাদটা মিথ্যা নয়—বদ্যিনাথ বিনীত হাস্যে ষাড় নামিয়ে বললে, আজ্ঞে আপনাদের কৃপা থাকলে—কালীপ্রসাদ নলটা তুলে নিয়ে সজোরে কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, তাই রেখো। তোমার সাদ্ধাংরা ক্ষেপলে কে তোমায় বাঁচায় দেখা যাবে। বলি নাপিতের ছেলে হয়ে—এমন আকাট তো দেখি নি বাপু। ওদের মধ্যে ফিসফাস সলাপরামর্শ কি সব চলছে খবর রাখ—না ফুরভাঁড় বগলে করে গলা কাটবে এই ফিকিরে টো টো করে ঘোরো?

বদ্যিনাথ বললে, আজ্ঞে—একথা ঠিক, আগেকার মত মনের মিল কারও নেই। ফুসফাস—হাঁ—তা হয় বৈ কি। কিন্তু সত্যি বলতে কি সবাই তো বড় বড় কথা বোঝে না।

না বুঝুক—কিন্তু বুকে ছুরি বসাবার আগে মুখের শয়তানী হাসি তো বুঝতে পারে। একটু থেমে বললেন, তোমার সাদ্ধাংদের বোলা—বিলায়েৎ হোসেনকে যেন প্রবার কমিশনার ইলেকশনে ভোট না দেয়। নজর মিঞা অশিক্ষিত হলেও দিলটা ওর ভাল, ওকে যেন ভোট দেয়।

আজ্ঞে তা বলবো।

আর শোন। কালীপ্রসাদ বদ্যিনাথের দিকে একটু সরে এলেন—বদ্যিনাথও উদ্যতকণ্ঠ সাপের মত তক্তপোষের ধার ঘেঁষে ঘাড়টাকে কাণ করলে। তারপর ফুসফাস সলা-পরামর্শ অনেকক্ষণ ধরে চলল।

ইলেকশনটা কোনরকমে কেটে গেল। বিলায়েৎ হোসেনেরই জয় হ'ল। কি করে জয় হ'ল এ অবাস্তব প্রশ্ন করে লাভ নেই—তবে সকলেই বলাবলি করতে লাগল নজর মিঞার নজর আর একটু উঁচু হলে কি হ'ত বলা যায় না। ভোটনদী পার হবার উদ্যোগ ওর ভেতন ছিল না। সেকালের ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে লোক বসিয়ে—একখিলি পান ও গোটাকতক বিড়ি—বদনায় করে খানিকটা জ্বল—আর থেলো হুকোটা (তাও মাঝ একটা) বারকতক হাত ফেরাকিরি করলেই ও-নদী পার হওয়া যায় না। বড় বড় খাসি কেটে সোজা লেনেন্ড পান সিগারেট—অটেল বিলিয়ে—গাড়িতে চাপিয়ে—মুখে চোঙ লাগিয়ে চিংকার করে অপর পক্ষ এক এলাহী কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল, যার ফলে...মোট কথা ফল যাই হোক মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেও দলীয় মনোভাব পৌর ব্যক্তিকে পঙ্ক করে দেবার জন্ত ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

বদ্যিনাথ বললে, তোমাদের আকার মন্দ নয় রহমৎ—চাঁষের জমি কমিয়ে কবরের জমি বাড়িয়ে দাও।

রহমৎ বললে, আকার কিসে! কবরের জমি না হলে মানুষকে কি করে গোর দেবে?

উত্তর একটা বদ্যিনাথের ঠোঁটের আগায় আসছিল—সামলে নিলে। আজকাল রহমৎ একরকম হয়ে গেছে। ঠাট্টা-তামাশা বোঝে না—গোসা করে শুধু শুধু।

বদ্যিনাথ বললে, ওর চেয়ে আমাদের ব্যবস্থা ভাল, জমি নষ্ট হয় না।

রহমৎ বললে, তুমি আমি তো সবই বুঝি, ওসব বিষয়ের কথা না বলাই ভাল।

বদ্যিনাথ বললে, আমরা ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি না? বাঃ রে একটু থেমে বললে, এবার কোরবানিতে নাকি উট জবাই হবে।

হেসে বললে রহমৎ, হাঁ—উটের মাংস নাকি খেতে ভাল।

কালে কালে কতই দেখব—বলে বদ্যিনাথ মুখ ফিরিয়ে এল গেল।

বিলায়েৎ যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। কাছে এসে বললে, নাপতের পো কি বলছিল রে রহমৎ?

রহমৎ বললে, না—ও একটু কথা।

কথা তো জানি—কিন্তু কথটা কি। ধমকের সুরে বিলায়েৎ প্রশ্ন করলে।

ধমক খেয়ে ধাবড়ে গেল রহমৎ। আমতা আমতা করে বললে, এই কবরে অনেক জমি যায়—

হঁ—তা বলবে বৈ কি। ওরা চায় আমাদের ঐ ঘরকে

উচ্ছেদ করে গাঁয়ে একাধিপত্য করে। শোন। না—চ দেখি পাড়ার মধ্যে সবাইকে নিয়ে মজলিস বসাতে হবে।

রহমৎ বেগতিক দেখে সরে পড়ছিল—বিলায়েৎ খপ করে ওর হাতখানা সাপটে ধরে বললে, চল।

তারপর দিনকতক কালীপ্রসাদের বৈঠকখানায় আর বিলায়েৎদের দরগাতলায় রীতিমত সলাপরামর্শ চলতে লাগল। গুজবের পাখায় ভর করে আসন্ন সপ্তক দ্রুত এখার-ওখার আনাগোনা শুরু করে দিলে।

তার পর এল সুভাষ-জয়তিধি। জয় হিন্দ—আর বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি পাড়া কাঁপিয়ে গাঁ কাঁপিয়ে উত্তেজনার ঝড় বইয়ে দিলে।

তারপর মজ্লীমিশন এলেন বিলাত থেকে। বড় কিছু একটা জিনিষ—সেটা স্বাধীনতাই হবে—দেবার জন্ত হিন্দু-মুসলমানদের ভেতর থেকে বাছা বাছা লোকদের ডাকলেন দিল্লীতে। বাদ-বিত্তার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। সেখানকার গরম আবহাওয়াতে ভিঠোতে না পেরে সিমলার ঠাণ্ডায় টেনে নিয়ে গেলেন বৈঠক। সেখানেও প্যাঁচ কষাকষি দরদস্তুর টীকা-টপ্পনিত বৈঠক কেসে যায় যায় হ'ল। কংগ্রেস মুখ ফেরালে—লীগ হাত বাড়ালে। কিন্তু হেস্তনেস্ত একটা করবার জন্ত ওদেশের কর্তারা পণ করে বসলেন। সংখ্যা-সাম্যের ভিত্তিটা শিথিল হতেই কংগ্রেসের বিরোধিতা কেটে গেল কিন্তু লীগের হ'ল গোসা। মজ্লীমিশন কোন রকমে নিজেদের দায়িত্ব বড়-লাটের বিবেচনার ওপর ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন—গরম দেশের গরম আবহাওয়া থেকে।

এত যে খবর—সত্য অর্দ্ধসত্য মিথ্যা গুজব ইত্যাদি জাতিতত্ত্ব ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কাগজে আর লোকের মুখে পরিবেশিত হতে লাগল—তার ক্রিয়া ব্যর্থ হ'ল না। কোথায় দিল্লীর দপ্তরে ছুই দলের মনকষাকষির ব্যাপার—গুজবে সংবাদে গড়িয়ে এল এই গাঁয়ের বুকে। ছড়িয়ে পড়ল লোকের মনে মনে—বিষের ক্রিয়া শুরু হ'ল। আত্মগোঁরবে খা লাগল—ওদের দল এদের দলের উপর টেকা মারলে বলে। স্বাধীনতার অর্থ কি যারা মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারে না—তারাই চোখা চোখা বুলি আওড়াতে লাগল।

একদিন বতিনাথ বললে, কি রহমৎ ভাই, চুল ছাঁটবে না?

না।

দাড়ি কামাবে না?

না।

কেন ভাই—গোসা কিসের?

গোসা কিসের আবার—কামাব না—খুশী আমার। ব্যস। রহমৎ চলে গেল।

বতিনাথের পাশে এসে দাঁড়াল তার জাতি ভাই-পো রতন। বললে, কাকা—ওদের নাপিত এসেছে আলাদা, সেই ত কামাচ্ছে।

বটে।

ওরা বলছে—হিঁদুদের সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্ট থাকবে না।

বজিনাথ হুঁ চোখ কপালে ভুলে রতনের কথা শুনতে লাগল।

বিষয় আরও বাড়ল—একা বজিনাথের নয় সারা গাঁয়ের—যখন শুনলে ক'দিন ধরে কলকাতার বুকের ওপর একটা দানবীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। ক'দিন পরে কাগজ এলে জানা গেল—এই কাণ্ডে লোক মরেছে পাঁচ হাজারের ওপর—জখম হয়েছে প্রায় পনেরো হাজার।

সবাই বললে, কাগজে কি আর বেশী করে লিখতে পারে, আদ্যেক কলকাতাই হয়ত-বা সাবাড় হয়ে গেল। হিসাব আরম্ভ হ'ল কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন। কারা আগে আক্রমণ করেছে কোন্ দলকে। পুলিশ আছে—দৈম্য আছে আইন-কাহ্ননের ভার নিয়ে স্বয়ং লাটসাহেব ও মন্ত্রীরা আছেন যেখানে—সেখানে এমন নৃশংস ব্যাপার ঘটল কি করে? গ্রামের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

কালীপ্রসাদ বজিনাথ আর তার জাতি-গোষ্ঠীদের ডাকিয়ে বললেন, শুনেছিস তো সব—এখন কি করবি ঠিক করলি?

বজিনাথ হাত ছোঁড় করে বললে, কি করব হুজুর—কল-কাতার মত হলে—

কালীপ্রসাদ বললেন, বাস করিস ত ওদের পাড়ার গায়ে—কোন্ সাহসে মেয়েছেলে নিয়ে এখনও দিব্যি ঘুম মারছিস রাতে?

বজিনাথ কাঁপতে লাগল ঠক ঠক করে। কাঁদকাঁদ স্বরে বললে, কোথায় সরাব মেয়েছেলে—কোন কুলে ত কেউ নেই। তা ছাড়া গরু—হুঁ-চারখানা বাসন—কোসন—বাক্স-বিছানা—একটা লাউগাছ—

হুতোরি লাউগাছ। যদি বাচিস পরাণে ত লাউ খাবি—না—আহামুখ কোথাকার, যেখানে হোক ওদের সরিয়ে দে—ভলান্টিয়ার দলে নাম লেখ।

বাড়ি আসতেই বজিনাথের বউ বললে, ওগো এই মাতুর রহমতের বউরা চলে গেল। বললে, বুন—এখানে থেকে না—দিনকতক গা-ঢাকা দাও। হাংনাম মিটলে এসো।

কোথায় গেল?

কে জানে—ওর ফুফুর বাড়ি না খালার বাড়ি।

বিকলে নাপিত পাড়াটা ধালি হয়ে গেল।

আজকের সন্ধ্যায় অন্ধকার বড় বেশি ঘন হয়ে গাঁয়ের মাথায় চেপেছে। আকাশ পঙ্কিয়ার—নক্ষত্রে ঠাসা—ভাঙ মাসের গুমোট গাছের পাতাটি নড়ছে না। ওধারে মুসলমান পাড়াটাও ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। না-দেখা যায় ছিটে-

বেড়ার কাঁকে কেরোসিন ডিবিয়ার হাওয়ার-কাঁপা বিচ্ছিন্ন আলো—না শোনা যায় রুগ্ন ছেলের ভাত খাবার জ্বল ঘ্যান-ঘেনে বায়না। মুরগী আর ছাগলগুলোকে পর্যন্ত বিপদের গভীর ওপারে সরানো হয়েছে। বিরাট অস্থির গাছটা সজাগ প্রহরীর মত এপাড়া ওপাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুঁ-পাড়ার ভাবগতিক দেখছে। ওর শাখা থেকে—পাতা থেকে অন্ধকার-মাখা সারা দেহ থেকে সন্দেহ-বিষের বাষ্প এধারে-ওধারে ছড়িয়ে পড়ছে।

বজিনাথের পাশে রতন এসে দাঁড়াল। হাতে তার একখানা দা। বললে, যদি আসে ত এর বাড়ি কবে এক দা বসালে—

বজিনাথ নিঃশব্দে হেসে বললে, তার চেয়ে লম্বা লাঠি এক গাছা তৈরি করে নিস রতনা—পাল্লায় অনেক দূর পাবি। আমার বগ্নমটা দেখেছিস ত?

বাঃ—দিব্য শান দিয়েছ ত কাকা।

বজিনাথ আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, আজ সারা দিন পাথরের ওপর বালি দিয়ে দিয়ে ঘষেছি—শান কি অমনই হয়।

ওদিকে রহমতের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবেশী রহিম।

রহিম বললে, নাপিতের পো ইয়া সড়কি বানিয়েছে—দেখিস নি?

রহমৎ বললে, সড়কি। এই ধান হাঁটের কাছে আরিজুরি চলবে না কারও—হঁ।

আচ্ছা ওদের দলের কাছে পারব ত আমরা?

আলবৎ পারব। তকরা থেকে ভাল দেখে ধান হাঁট বোকাই কর দিকি দরগাতলায়।

মাই বল রহিম চাচা—আমার মাছ-মারা কাঁচাটা নেব—এক দা বসালে কোন সুমুন্দির আর ট্যা-কো করতে হবে না। বলে আর একজন হাসলে।

এ ধানের লোক দেখলে অন্ধকারে কয়েকটা ছায়া চলা-ফেরা করছে—ওধারের লোকেরা গুপতে সুরু করেছে ততক্ষণ, এক—দুই—তিন—

অস্থির গাছের মোটা গুঁড়ির কাঁকে এক জোড়া চোখ জল জল করে জলে উঠল।

বজিনাথ বগ্নমটা উচিয়ে ধরে কিস্ কিস্ করে বললে, রহমৎ না?

আগুন নিভে গেল—খুবদ শব্দ উঠল কিছু চলে যাওয়ার। রতন হেসে বললে, দূর—ও একটা শেয়াল।

বজিনাথ আশ্চর্য হয়ে ভাবলে শেয়ালের চোখ অত বিস্তী ভাবে জলে? মাহুকের মনের আগুন পশুর চোখে আশ্রয় নিয়েছে কোন্ লগে? আশ্চর্য বলতে হবে।

দিনের আলোক তবে সাহস আসে। সারারাত ভেবে

শরীর টলছে—মাথা ঘুরছে। নিজেদের ঘরে নিশ্চিন্তে শুয়ে একটু চোখ বুঝবে সে ভরসাটুকুও আজ নেই।

এামের মাঝামাঝি বারোয়ারি তলায় ছ' দলের বৈঠক বসেছে। শান্তি-বৈঠক। সমাজের মাথা ঘারা তাঁরা একটু উঁচু মত জায়গায় চাতালের ওপর বসেছেন—তাঁদের ঘিরে বসেছে বদ্যিনাথ-রহমতের মত কম-বুঝিয়েদের দল। ওরা ভাবছে এতকাল পাশাপাশি বাস করে সুখে-দুঃখে কলছে আড্ডা-ইয়ার্কি দিয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি—আশ্চর্য্য বলতে হবে। যাতে ভুল না বুঝে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে তারই আলোচনা করছেন সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা। এত দিনের স্নেহ-সখ্য-প্রীতির মধুর সম্পর্কে এক মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়ে যে হুশমনটা এগিয়ে এসেছে—তাকে মিলিত শক্তি নিয়ে হট্টয়ে দিতে হবে এামের বাইরে। এ হুশমন চাইছে এক পক্ষ দিয়ে অস্ত্র পক্ষকে উচ্ছেদ করতে। এক পক্ষের উচ্ছেদ হলই অস্ত্র পক্ষের শান্তি ফিরে আসবে? না—না। শহরে যে আগুন ছড়িয়ে শহরকে—তার মাহুষকে—মাহুষের মাহুষকে—ভায় নীতি ধর্ম বিবেক সব কিছুকে

খুড়িয়ে ছাড়বার করে দিয়েছে সে আগুনকে যে করে হোক গায়ের সীমানা পার হতে দেওয়া হবে না। ভাই সব—পণ কর—

এমদাদ মিক্রা, মৌলবী রহিমুজ্জা, বিলায়েৎ, কালীপ্রসাদ, বরদা নন্দী, হরিশ মুখোপাধ্যায় এঁরা বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে ভাববিভোর জনতার মন থেকে সন্দেহের অহুর নষ্ট করার ভ্রম প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

রহমৎ বললে রহিমের কানে কানে, দেখ চাচা, কালীবাবুর পৌক কেমন নেতিয়ে পড়েছে—

বদ্যিনাথ বললে, দেখ রতন—বিলায়েতের চোখ হুটৌ যেন কিমিয়ে আসছে। বক্ত্রিমে করছে না টুলছে?

বক্ত্রতায় কারও মন গলছে কিনা কে বলবে। ছ' পক্ষের হাতের লাঠির ডগা অল্প-অল্প কাঁপছে। ভাবের ঘোরে কিংবা অজানা ভয়ে অথবা সুপ্রোবিত কোন বৃত্তির তাড়নায়। কত দিনের প্রস্তুতিতে ঝড় উঠেছে কে তার হিসাব রাখে। এ ঝড় থামানো কারও সাধ্যায়ত্ত কিনা সে বিচারও ভবিষ্যতের—তবে এই মুহূর্তে এই ধরনের বক্ত্রতা ছাড়া শান্তি-সম্মেলনের নেতারা আর কিই-বা করতে পারেন।

জয়ী কারা ?

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

একই দেশে কমলভূমি জ্যোত্স্নাতার ঐক্যস্নেহের দাবী

নিত্য যারা করল অধীকার,

সভ্যতারি স্রষ্টা ভাতার সৃষ্টিকরা কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির 'পরে

আবাত যারা হান্গো বায়ংবার।

অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছন্দহারা নিত্য যারা মগ্ন ছিল ঘুমে

তখন তাদের উদ্বোধনের গানে,

আগিয়েছিল জ্যোত্স্না যারা, কমলভূমির মুক্তি লাগি' স্বাধীনতার বেদী

করল গঠন আশ্রয়বলিদানে।

অগ্রগামীরা সাহিত্য ও শিল্প দিয়া মন্ডো করি দীর্ঘবছর ধরি

উঠলো যারা ক্রোধোত্তির ধাপে,

তারাই যদি হিংসাতে হয় হত্যারত কৃষ্টিগুরু রক্তপানের লাগি'

লিখতে সে লাজ হস্ত আজি কাঁপে।

মুক্তিদিনের রাষ্ট্রবেদীর জ্যোত্স্নাতার ঐক্যস্নেহের মৈত্রীদাবী যারা

হুর্নীতিতে করল অধীকার,

সভ্যতারি মুখোদ থেকে বর্বরতার স্বরূপ খুলি' গুণ্ডা এবং ছোরার

সকল ঋণের দিল পুরস্কার।

এক দিকেতে বিজ্ঞাজ্ঞানে সিদ্ধমহান নির্ঘাতিত তাপস বড়ো ভাই

অস্ত্র দিকে হত্যাদীলার জয়,

ব্যাঙ্গনীতির দন্তনধের মানবনীতির সঙ্গে রণে আজকে কেবা জয়ী?

ব্যাঙ্গজয়ী?—কক্ষণো তা' নয়।

মানব চেয়ে ব্যাঙ্গ বলি, মানব তবু শ্রেষ্ঠ হ'ল সোনার সমাজ রচি'

ব্যাঙ্গ তবু থাকলো মহাবনে,

ব্যাঙ্গ হ'ল দুর্জয় অতি, জ্ঞানার্জনে মানব হ'ল নীতির বলে বলী,

ব্যাঙ্গ তবু ক্ষিতিলো না কো রণে।

ধর্ম জ্ঞানে তপস্জাতে নীতির সূতার লক্ষ কোটি জীবন যেথায় রাখা

মানবসমাজ সেই তো পুণ্যধাম,

হিংসা এবং বর্বরতার গুণ্ডামিতে পূর্ণ যেথা সে তো পশুর সমাজ

কলঙ্কিত থাকবে তারি নাম।

মর্ত্য যদিই মন্তে চলে হত্যা, এবং বর্বরতা মংগ্ৰী নখের খেলা,

মানব তাতে করবে নাকো ভয়,

ব্যাঙ্গনীতির দম্ভ্যতাতে গুণ্ডামি ও ছোরার ধারে মহান মানবতার

কক্ষণো না ঘটবে পরাজয়।

লেলিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্গে সাপে কোনও জাতির ধ্বংস লাগি'

চালায় যারা শাসন

তারাই শেষে ভিশে হবে হীন,

অজ্ঞবিহীন হয়েও যারা শ্রেষ্ঠ নীতিসভ্যতাতে, সর্বজয়ীর বেশে

মর্ত্য তারাই বাঁচবে চিরদিন।

পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি

নূরুল আলিম চৌধুরী

আকস্মিকতা আর দৈব এ দুটি শব্দের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক অর্থে একটা মিল রয়েছে। মাহুষের জীবনে আকস্মিকতা ও দৈবের মূল্য বা প্রভাব অনস্বীকার্য। দৈবের প্রভাবে মাহুষের জীবনে কোন সময় ধ্রুপদিত হয় সুমধুর ছন্দের কলগীতি, আবার কোন কোন সময় সেই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই মাহুষের জীবন হুসিত্তা আর বিরক্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জীবনে আকস্মিকতার মূল্যও ঠিক তদ্রূপ, তাও এক সময়ে আনে সুখ, কোলাহল ও আনন্দ আবার অল্প সময়ে এর প্রভাবে মাহুষের সঙ্কল জীবনগতিতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে সেই জীবন হয়ে ওঠে দুঃখময়, তবুও আকস্মিকতা ও দৈব এ দুটির মধ্যেই রয়েছে রোমাঞ্চ—কোন কোন সময় নূতনত্বের আগ্রহ।



গৌরী মন্দির, ভুবনেশ্বর

আমার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয় শাক্তাহান আজ এক সপ্তাহ হ'ল আমার কার্যস্থল জলপাইগুড়িতে বেড়াতে এসেছে। ৩রা ফেব্রুয়ারি রবিবার ছু'জনে প্রাতে চা খাচ্ছি। হঠাৎ শাক্তাহান প্রস্তাব করলে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যেতে হবে। বন্ধুর আকস্মিক প্রস্তাব মনটা সত্যিই সাড়া দিয়ে উঠল এবং সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে মনে অনুভব করলাম অপরিসীম আগ্রহ। একেই বলে আকস্মিকতা—

এক মুহূর্ত পূর্বে যার কোন নামগন্ধ নাই অথচ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে যা মনে এনে দেয় চঞ্চলতার একটা গভীর আলোড়ন। অপর কথায় এই আকস্মিকতার প্রভাবেই মনে সৃষ্টি হয় অদ্বিত-পূর্ব্ব একটা রোমাঞ্চ বা পুলক। কর্ম্মক্রান্ত দিবসের মধ্য থেকে কয়েক দিনের অবসর নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল সত্য; কিন্তু সেই প্রয়োজনের তাগিদেই চেয়েও প্রবল হয়েছিল আর একটা তাগিদ যাকে বলা যেতে পারে মানসিক। শারীরিক তাগিদ বহুদিনই উপেক্ষা করে এসেছি; কিন্তু আজ আকস্মিক আহ্বানে ছন্দহীন জীবনে ছন্দের যে কলধ্বনি ভেসে এল তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একাধারে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য ও মহিমার একাংশ এবং প্রেমের অবতার ক্রীচৈতন্যের অচ্যুতম লীলাক্ষেত্র দেখবার জন্ম মনটা চকল হয়ে উঠল।

এখানে একটা বিষয় বলে রাখা বোধ হয় অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না, বরঞ্চ আমার দিক থেকে সেটাই নিরাপদ। পুরীতে যখন যাই তখন ভাবি নি যে, সেই ভ্রমণ-কাহিনী কোন দিন লিখব। কাজেই আমার দ্রষ্টব্য হান ও অভিজ্ঞতাগুলোও সে সময় নোট-কইয়ে টুকে রাখি নি। আজ হঠাৎ কোন কারণে মনে একটা আবেগ এসেছে। এটাও আকস্মিক। তাই আজ তিন মাস পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত লেখবার জন্ম লেখনী ধরেছি, কাজেই সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার শক্তি আমার হবে না, সব কিছু চিন্তা করে মানস-নয়নে আনা আজ অসম্ভব হবে। মন যার গুরুত্ব স্বীকার করেছে—যে সব চিন্তা, ভাব মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং মন-প্রাণ যাকে তখন মনে রাখবার উপযুক্ত বলে স্বীকার করেছিল, আজ শুধু তাই মনে আছে। হয়ত সে সময় মন এমন অনেক আকস্মিক আঘাত পেয়েছে যার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু কোন দাগ বসাতে পারে নি—তা আজ বিস্মৃতির অতল গহবরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অভিজ্ঞতা পুরনো হলে আলোচনা করতে মনে একটা পুলক জাগে, স্মৃতিরসে নিমজ্জিত ঘটনাগুলো সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট থেকে মিষ্টতর হয়ে ওঠে।

এক মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৪৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাত্রি পৌনে দশটার দার্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি ছাড়লাম এবং পরদিন ভোর সাতটার সময় লৌহদানব আমাদেবের শিয়ালদহে এনে হাজির করল। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছে এক বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ল। সুভাষচন্দ্র কর্তৃক গঠিত আই.এন.এ.-র ক্যাপ্টেন আব্দুর রসিদের দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন সূত্র হয় তার প্রচণ্ড আঘাতে

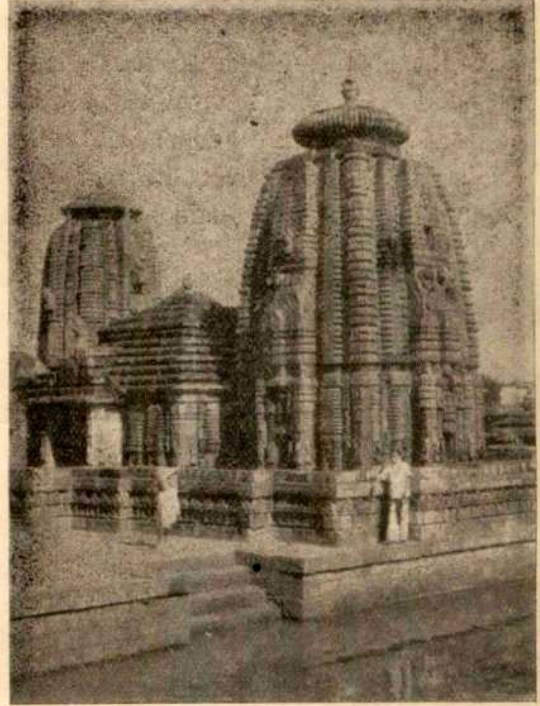
তখন কলকাতার নাগরিক জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়ে সেখানে বিরাজ করতে থাকে শব্দ ও ক্ষোভের বহি, আজ কয়েকদিন থেকে সেই বিক্ষোভের দরুন কলিকাতার বুকে যানবাহন চলাচলও একরূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শান্তিপ্ৰিয় নাগরিক জীবনে বয়ে যাচ্ছে অশান্তির ঢেউ। ট্রাম বাস একদম বন্ধ, ভাড়াটে খোড়ার গাড়ী ও রিক্সা ছ' একখানা যা চলেছে তার চালকগণ সুবিধা পেয়ে জ্বায়া ভাড়ার পাঁচ-সাত গুণ বেশী হাঁকছে। পূর্বেই ঠিক হয়েছিল কলকাতায় কয়েকদিন অপেক্ষা করে শাক্যাহানের ছুটি মঞ্জুর হলে ছ'জনে একসঙ্গে পুরীর দিকে যাত্রা করব। এখন গন্তব্য স্থল ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনস্থ আমাদের কলকাতার বাসা; কিন্তু গাড়ী পাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, অগত্যা পায়ে হেঁটে বাসার অভিমুখে রওনা হলাম।

যাক, মহানগরীর অশান্ত ভাব কতকটা শান্ত হয়ে এলে ১৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার পুরী রওনা হব স্থির হ'ল। কিন্তু যার আকস্মিক প্রভাবে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে সুরের মূর্ছনা বেজে উঠে ভ্রমণের নেশায় আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে আর সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল না; কেননা, অনিবার্য কারণবশতঃ সে ছুটি পায় নি। কি আর করি! অগত্যা সঙ্গীহীন একাই যাব মনস্থ করলাম।

রাত পোনে নটায় পুরী এক্সপ্রেস ছাড়বে। কাজেই যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি আহারাদি পর্র সমাধা করে বাসা থেকে বের হলাম, বিদায় দিতে সঙ্গে চলল শাক্যাহান, ভাই মেজু, আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঝিলন। কি একটা পর্র দিন, প্ল্যাটফর্মে ভয়ানক ভিড়, গাড়ী ছাড়বার দেড় ঘণ্টা পূর্বে আমরা ষ্টেশনে পৌছি, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হ'ল না, প্ল্যাটফর্মের গেট তখনও খোলা হয় নি। যাত্রীরা ভয়ানক উৎকর্ষা নিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও গেটের প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে গেট খুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গেটটা মাঝে মাঝে সামান্য খুলছে আবার তখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু কৌতূহল হওয়ায় ব্যাপার কি দেখবার জন্ম অতি কণ্ঠে ভিড় ঠেলে গেটের নিকট-বর্তী হলাম, দেখি একজন রেলকর্মচারী অতিরিক্ত গাভীয়া নিয়ে গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছেন। অভিজ্ঞ যাত্রীরা, যারা ভাল-মন্দ জ্বায়-অজ্বায় বিচার করে সময় বা সুযোগ নষ্ট করবার পক্ষপাতী নন, তারা সেই দণ্ডায়মান রেলকর্মচারীটির গা ঘেঁষে কি গোপন আলোচনা করছেন। ছ' মিনিট পরেই তাঁদের জন্ম গেট খুলে যায় এবং তাঁরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই গেট আবার পূর্ববৎ বন্ধ হয়ে যায়, রেলের মহাপ্রভুটিও পৃথিবীর সমস্ত গাভীয়া মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড দেখছিলাম, কি আর করব! এক ঘণ্টা পর গাড়ী ছাড়বার নির্দিষ্ট সময়ের যখন আশ ঘণ্টা বাকী তখন প্ল্যাটফর্মের গেট খুলে গেল। অগণিত

যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গাড়ী সবেমাত্র প্ল্যাটফর্মে এসেছে; কিন্তু এরই মধ্যে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর সব কয়টি কামরাই ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা ভিড় ঠেলে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ভিড় দেখে মনে হ'ল যাত্রীদের চেয়ে তাদের বিদায় দিতে বীর

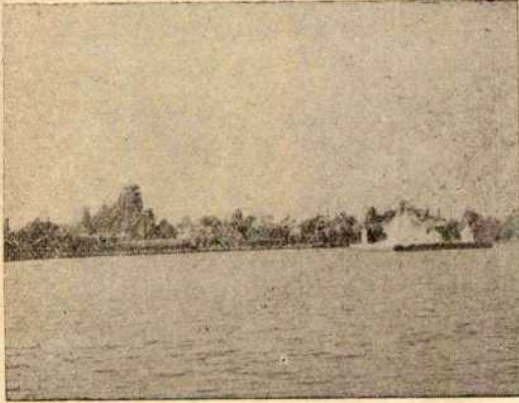


সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ভুবনেশ্বর। পাশে লেখক দণ্ডায়মান।

এসেছেন—তাদের সংখ্যাই বেশী। নতুবা প্ল্যাটফর্মে যে পরিমাণ লোক-সমাগম হয়েছিল পাঁচটা রেল গাড়ীতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হ'ত কিনা সন্দেহ। সর্বত্রই ঠেলাঠেলি ছড়োছড়ি। অত্যধিক ভিড়জনিত কষ্ট হলেও নানা শ্রেণীর যাত্রীদের টেনে ওঠানামা, কুলির সঙ্গে ভাড়ার দর নিয়ে বচসা এবং সর্বোপরি তাদের অকারণ ব্যস্ততা সত্যি উপভোগ্য হয়েছিল। যাক, কোনক্রমে এঞ্জিনের নিকটবর্তী একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় বসবার মত একটু স্থান করে নিলাম। গাড়ীতে ভয়ানক ভিড়। গাড়ীর মধ্যে বিশ-পঁচিশ জন লোক স্থানাভাবে দাঁড়িয়েও রয়েছে এবং তার মধ্যে চাব-পাঁচ জন মহিলাও আছে।

জানালা খুলে দেখি বাইরে ভীষণ অন্ধকার। অগত্যা কামরার যাত্রীদের ওপর দৃষ্টি নিষ্কেপ করলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী কৌণ কৌণ শব্দে চলেছে। সময়ও একে একে প্রহর পরিণত হয়েছে। গাড়ী ছাড়বার সময় যে-ভাবে বসেছিলাম ঠিক সেই ভাবেই বসে আছি, একটু উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের জড়তাটা দূর করে নেবার ভরসাও হ'ল না—

পাছে অগ্নে জায়গাটুকু দখল করে নেয়। গাড়ী বড়গপুর, বালেশ্বর, কটক—একটির পর আর একটি ষ্টেশন পার হয়ে চলল। এত কষ্টের মধ্যেও অপরিচিত অঞ্চলে ভ্রমণ কালে অনাধারিত রাসের পরিচয় লাভের আনন্দে আমার মন ভরপুর হয়ে উঠেছিল। শেষ রাতে শ্রান্তি অমুভব করে জানালায় মাথা রেখেছিলাম, একটু তন্দ্রার আমেজও এসেছে। গাড়ী



ভুবনেশ্বর মন্দির ও বিন্দু সরোবর

কখন যে বুঝা জংশনে এসে পৌঁছল টের পাই নি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম শুব আকাশে সূর্যের লাল আভা দেখা দিয়েছে। একটু পরেই গাছের ডগায় আলোর হুকোমল পরশ লাগিয়ে নিচ্ছেরই রঙে রাঙানো মেঘের কঁক দিয়ে রবি ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে। তাকিয়ে দেখি সিঁকের পাঞ্জাবী গায়ে ও মাথায় টেরী কাটা এক পাণ্ডা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মনে মনে বিরক্ত ছলাম। শুধালাম, ‘তোমার কি প্রয়োজন?’

সে নাছোড়বান্দা। ‘বাবু আমি পুরীর জগন্নাথদেবের পাণ্ডা। জগন্নাথজী দর্শন করানোই আমাদের কর্তব্য।’

—‘আমার পাণ্ডা লাগবে না।’

বিরক্তিপ্রকাশ করলেও লোকটি যাবে না, কি মুশকিল। —‘যাও বললেই কি চলবে ছড়র; পুণ্য স্থানে পুণ্য করতে যাচ্ছেন, রাগ করলে কি চলে।’

কিন্তু আমার কাছ থেকে সাদা না পেয়ে শেষে পাণ্ডা মহারাজ চলে যায়।

পুরী ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই হুলির মাথায় বিছানা আর দুটোকেসটি চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। সেই মুহূর্তেই একটা লোক প্রশ্ন করলে—‘কোন হোটেলে যাবেন বাবু?’ বলেই একথানা ছাপানো হাওবিল আমার হাতে দিলে। হাওবিলটি আমার গন্তব্যস্থল বীচ হোটেলের। একটু নিশ্চিত হয়ে বললাম, —‘আমি তো বীচ হোটেলেরই যাচ্ছি।’

—‘তবে আপনি কি জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন।’

উত্তর দিলাম—‘হ্যাঁ’।

‘ও। তা হলে আপনাকে নেবার জগেই ম্যানেজার বাবু আমায় পাঠিয়েছেন’— বলেই ষ্টেশনের দরজা পেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে দিল। আমি উঠে বসলে গাড়ী মস্তুর গতিতে বীচ হোটেলের দিকে চলল। তদয় হয়ে রাস্তার দু’ধারের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। পুরুরের প্রায় মধ্যেই মন্দির দেখতে পেলাম। উড়িয়ায় একেই বলে চন্দনমাত্রার মন্দির—কিছু দূর যাবার পরেই বৃক্ষকাণ্ডের কঁকে কঁকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। এরই জন্ত পুরীধাম আজ হিন্দুদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই চূড়া দর্শনেই ভাবাবেগে অধীর হয়ে ত্রিগোঁরাদের সমস্ত দেহ ধর ধর করে কঁপে উঠেছিল—তিনি মুগ্ধিত হয়ে পড়েছিলেন। পুরী ষ্টেশন থেকে বীচ হোটেল যাতায়াত পথে গাছপালার ও বাড়ীঘরের কঁকে কঁকে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তীর্ণ বারিরাশি নয়নপথে পড়ছিল। নূতন পরিচয়ের আশায় ও আনন্দে মন পুলকে শিউরে উঠল।

বীচ হোটেল একেবারে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ষ্টেশন থেকে হোটেলের দূরত্ব দু’ মাইলের অধিক হবে না; কিন্তু আমাদের সেখানে পৌঁছতে লাগল প্রায় ৪০ মিনিট।

হোটেলের প্রোপ্রাইটার-ম্যানেজার বেশ অমায়িক লোক। তাকে পূর্বেই পত্র লিখেছিলাম। দোতলায় কোন সিট খালি ছিল না। কাজেই নীচের তলাতেই দু’ সীটের একটি কামরায় আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ’ল। সমুদ্রের জানালা দিয়ে তাকালেই অগাধ বারিরাশি ও নীল তরঙ্গের খেলা নয়নপথে পড়ে মনে এনে দেয় অক্লান্ত স্নিগ্ধ আবেশ। সমুদ্রের যে এত দৌন্দর্য্য তা কল্পনাও করতে পারি নি। এখানে প্রকৃতির অসীম উদারতা ও ধীর প্রশান্ত গাভীর মতো মধ্যে কবি-মনের অফুরন্ত খোরাক জুড়ায়িত রয়েছে, যার আবাদ লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

অল্পক্ষণ পরেই চা এল। চা-পর্ব সমাধা করে স্নানের জন্ত তৈরি হয়ে নিলাম। হৃদয়ে অপরিণীম আগ্রহ, অথচ মনে ভয়ের সঞ্চারও যে হয়েছিল তা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। যাক, শুনলাম এখানকার হুলিয়ারা স্নানার্থীদের অতি সাবধানে স্নান করিয়ে দেয়। এদের আসল ব্যবসা সমুদ্রে মাছ-ধরা। এরা খুব বলিষ্ঠ, এদের দেহ নিকষকালো, ম্যানেজারবাবুকে বলায় তিনিই আমায় স্নান করাবার জন্ত সম্যাদী নামে একটা হুলিয়াকে নিযুক্ত করে দিলেন।

সমুদ্রের তীরে গেলাম, স্থষ্টির বিচিত্র লীলা দেবে মন বিষয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোন্ অনন্ত পারাবার থেকে তরঙ্গগুলো গর্জন করতে করতে ছুটে এসে বাপুচরে লুটিয়ে পড়ছে! এত ক্ষোভ, এত রোষ যেন মস্তবলে শান্ত হয়ে যাচ্ছে এক নিমেষে। দেখতে ও ভাবতে সত্যই চমৎকার। দেখলাম এক স্থানে দু’জন মহিলা দুটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে নিয়ে স্নান

করছেন সঙ্গে একটি হুলিয়াও রয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা যে এদের আছে তা স্নানের ভঙ্গী দেখলেই উপলব্ধি করা যায়। আমার হুলিয়াটির নিকট থেকে জানতে পারি, এরা আমাদের হোটেলের অদূরবর্তী 'ইওর হোম' নামে আর একটি হোটেলের বাসিন্দা। বেশী লোক এক সঙ্গে স্নান করাতে মনে একটু সাহস পাওয়া যায়, তাই হুলিয়ার পরামর্শে ঐ দলের নিকটবর্তী হয়ে সমুদ্র-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলাম। ঢেউগুলো একটির পর একটি অবিরাম আসছে। হুলিয়ার পরামর্শ মত কোন সময় লাফ দিই, কোন সময় ডুব দিই। লাফ দেওয়া আর ডুব দেওয়া নির্ভর করে ঢেউয়ের রকমফেরের ওপর। অল্পক্ষণ মধ্যেই কৌশলটা শিখে নিলাম। আজকে যতক্ষণ সমুদ্রে ছিলাম হুলিয়ার হাত ধরেই রেখেছিলাম, পরে অবশ্য আর ওর হাত ধরে স্নান করতে হয় নি, দে অদূরে দাঁড়াত, আর আমি নিশ্চিন্ত ভাবে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করতাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পর হোটেল ফিরলাম। সমুদ্রের জল ভয়ানক লবণাক্ত। সমস্ত গা লবণে ভরে গেছে। কাজেই বাথরুমে গিয়ে কুয়োর জলে শরীরটা পুনরায় ধুয়ে ফেললাম। তারপর আহার-পর্ব শেষ হলে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নেওয়ার জন্ত বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। বহু জী-পুরুষ সমুদ্রের ধারে ধারে বেড়াচ্ছেন, সীজন টাইম বলে এখন যাত্রীদের সমাগম বুঝেই বেশী। ভারতের বহু প্রদেশের লোকই দেখলাম, তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নছে। কত রকমের লোকই না সমুদ্রতটে দৃষ্ট হয়! জীবনের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে বৃদ্ধ এসেছেন বাতের আক্রমণের লাভব করতে, চাকুরীজীবী ভদ্রলোক এসেছেন কর্মজীবনের মাঝবান থেকে বিরাম নিয়ে একটু শান্তির আকাজক্ষায়, কলেজের ছাত্রেরা এসেছেন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে, আর নব-বিবাহিত দম্পতি এসেছেন প্রকৃতির খেলা-বরে 'মধুচন্দ্র' যাপন করবার উদ্দেশ্যে। মোটের ওপর প্রত্যেকের হৃদয়েই রয়েছে অসীম আশ্রয় ও অতীতপূর্ব আনন্দ। দেখতে দেখতে গোধূলি নেমে এল। পশ্চিম-গগনের ললাটে দেখা দিল শুষ্ক তারা। তার নীচে অতি ক্ষীণ লালের রেখা দেখিয়ে দিচ্ছিল রবির বিদায়ের পথ। আমি বেড়াতে বেড়াতে হোটেল থেকে বেশ দূরে এসে পড়লাম। বি. এন. আর. হোটেলের নিকটবর্তী একটি নির্জন স্থানে বালুর ওপর পা ছড়িয়ে বসলাম। এরই মধ্যে চারদিকে চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একাকী মনোহর দৃশ্য দেখতে থাকি। ছ-বছর আগে আমার একজন আয়ীয়া পুরীতে গিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে সমুদ্রের দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এক পত্র লিখেছিলেন, "বহু নীল আকাশের সঙ্গে গভীর কালো সমুদ্রের মিল দেখলে মনে হয় আকাশ যেন সমুদ্রকে গভীর স্নেহের সঙ্গে চুম্বন করছে। তাদের মধ্যে যে অনন্ত প্রেম তা

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, আকাশ অসীম ও চিরস্থায়ী, সমুদ্রও তাই, ঠিক তেমনই আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে যে প্রেম তাও অসীম ও অনন্ত।" আজ নির্জনে রূপালী চাঁদনির নীচে সমুদ্রতটে বসে তাঁর সেই কথা কয়টি মনে হচ্ছে। চতুর্দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। অনন্ত নীল আকাশ নিকমকালো সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে; সত্য সত্যই অপূরণ।



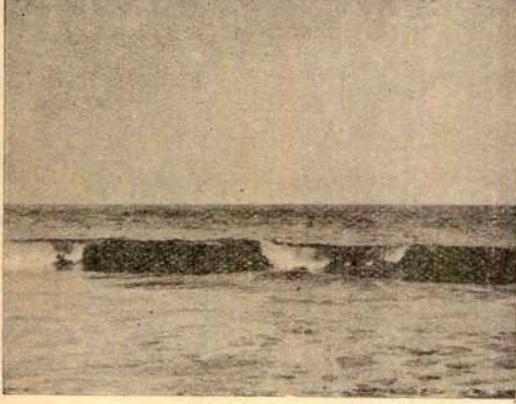
স্বর্ঘ্যোদয়ের দৃশ্য—পুরী

ফেনিল ঢেউগুলো সমুদ্রের বুকে চিরে হঠাৎ আয়প্রকাশ করে যখন কালো বহু সমুদ্রের বুকে একটা রূপোর লাইন টেনে দেয় তখন দৃশ্যটা দেখতে এত সুন্দর যে ভাষায় মনের ভাবের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃতির একগুটি উজ্জ্বল প্রসারে এমন সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় যার তুলনা নেই। আমি তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সেই অপূরণ রূপ কতক্ষণ উপভোগ করেছিলাম সঠিক ভাবে বলতে পারব না।

সেই রাতেই একজন বোর্ডারের নিকট শুনলাম যে এখানে প্রাতে স্বর্ঘ্যোদয়ের দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার। এ দৃশ্য উপভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না এবং যে ভাবেই হোক কাল প্রাতে স্বর্ঘ্য ওঠার পূর্বে উঠতেই হবে মনে মনে সঙ্কল্প করে আহািরাদির পর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

অতিমাত্র উৎসাহের জন্ত রাতে ভাল করে ঘুম হয় নি। প্রাতে পৌনে পাঁচটার সময়েই ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে নিলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দেখে গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে স্বর্ঘ্যোদয়ের বহু পূর্বেই আমাদের হোটেলের সম্মুখে বালুচরে গিয়ে বসলাম। আমার হৃদয়ে গভীর আশ্রয়; অনাখাদিত আনন্দরস পান করতে আমি উৎসুক। রাত্রির অন্ধকার বীরে বীরে তরল হয়ে গেল, পূর্ব দিকটা বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। কিন্তু চতুর্দিকের খোলাটে ভাবটা তখনও কাটে নি। বাঁ দিকে ছোট-বড় বাড়ীগুলো একটির পর একটা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে তরঙ্গগুলো ক্রমাগত গর্জন করছে। সে কটা

অলৌকিক মুহূর্ত। পৃথিবীর ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, অভিজুতের মত পূর্ব দিকে তাকিয়ে আছি, মুহূর্ত পরে দেখা গেল, সমুদ্রের এক স্থান থেকে নানা বর্ণের কয়েকটি রশ্মি আকাশের গায়ে ওপর দিকে ছিটকে পড়ছে। তার পরেই সমুদ্রের ডেউগুলোর মধ্য থেকে বেরুল একটি রক্ত পিণ্ড; সেই পিণ্ডটি কোন অদৃশ্য যাহ্নকের মন্ত্রবলে



সমুদ্রের ডেউ ভাঙছে

ক্রমশঃ বড় হতে হতে কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই প্রথমে একটি থালা ও তৎপর গোলাকৃতি ধারণ করল। এরূপে সূর্য্যদেব ধীর মন্থর গতিতে আবির্ভূত হয়ে পূর্ণশস্যময় মণ্ডিত হয়ে উঠলেন। আমি তন্ময় হয়ে ঐ অপূর্ণ দৃশ্য দেখতে দেখতে যেন সন্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, মানুষ এমন মনোরম প্রভাত যদি জীবনে একদিনও উপভোগ করতে না পারে তবে তার বুধাই পৃথিবীতে আগমন।

এভাবে প্রকৃতির খেলা দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। অল্প কোন কাজ নেই, ভাবনা নেই।

হোটেলের মাণিক সেন নামে আমার সমবয়সী একটি যুবকের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হ'ল।

এ পর্য্যন্ত পুরীর অত্যাশ্চর্য স্থানগুলো দেখবার সময় বা সুযোগ করে উঠতে পারি নি। এখানে আসার অষ্টম দিবসে বেলা ১১টার সময় আমি ও মাণিক একধানা বোড়ার গাড়ী করে বের হই, প্রথমেই আমরা জগন্নাথদেবের মন্দির, দেখতে যাই। চারি শত বৎসর পূর্বে এই মন্দিরের সম্মুখস্থ সিংহদ্বারেই ত্রিচৈতন্য ভাবাবেগ সংবরণ করতে না পেরে মুগ্ধিত হয়ে পড়েছিলেন বলে কথিত আছে। প্রকাণ্ড মন্দির, আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন পাণ্ডা পিছু নিয়ে প্রাণটা কণ্ঠাগত করবার উপক্রম করেছিল আর কি। অতিকষ্টে তাদের হাত এড়িয়ে অগ্রসর হলাম। মন্দিরগাঙ্গে বহু মিথুন-মুষ্টি ঝোড়িত রয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য ও কলাকুশলতার

প্রমাণ এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ, আয়তন ২২২ X ২৯৩ গজ। এই প্রাঙ্গণটি সুউচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। বাইরের প্রাচীরের পর মধ্যে অল্প একটি প্রাচীরের অভ্যন্তরে মূল মন্দির অবস্থিত। জগন্নাথের মন্দির প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত—বিমান, দর্শনগৃহ, নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপ। মূল মন্দিরটারই নাম দেওয়া হয়েছে বিমান, এরই অভ্যন্তরে রয়েছে আসল মূর্তি—উচ্চতা ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট আরো কয়েকটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সঠিকভাবে জানা না গেলেও খ্রীষ্টাব্দের ১১০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে উড়িষ্যারাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক ঐ মন্দির নির্মিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

এর পর আমরা মার্কাণ্ড সরোবর দেখতে চললাম, সরোবরের দৃশ্য দেখে মনটা সত্যিই পুলকিত হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড সরোবর, চারিটি পাড়ই পাথর দিয়ে বাধানো; আর উপর থেকে জলের ভিতর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাড়ই রয়েছে থাকে থাকে সিঁড়ি। সম্মুখে দেখলাম একটি ছোট কুঠরি। প্রদ্বার করে জানলাম, ওটা নাকি যমের মাসী আর পিসির মন্দির।

সেখান থেকে আমাদের গাড়ী পূর্ব দিকে চলল। অল্পক্ষণ পরেই নরেন্দ্র সরোবর-তীরে পৌছলাম, এটি মার্কাণ্ড সরোবর অপেক্ষা অনেক বড়, দৈর্ঘ্যে ২৯১ গজ ও প্রস্থে ২৪৮ গজ। এই সরোবরেরও চারিদিক পাথরে বাধানো এবং চারি পাড়ই রয়েছে পাথরের সিঁড়ি। নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপের ওপর চন্দনযাত্রার মন্দির আর গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। পুরীতে এই নরেন্দ্র সরোবরের সঙ্গেই চৈতন্যদেবের স্মৃতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। চৈতন্যদেবের জলকেলির স্মৃতি এর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই সরোবর-তীরে বৈষ্ণবগণ পাথরের বাধানো ঘাটে একত্রিত হয়ে ভাগবৎ পাঠ করতেন; আর তৎ-শ্রবণে ত্রিচৈতন্য ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়তেন। তাঁর হুঁচোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অহুভব করলাম যেন চতুর্দিকে একটা পবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময় আবহাওয়া বিরাজ করছে।

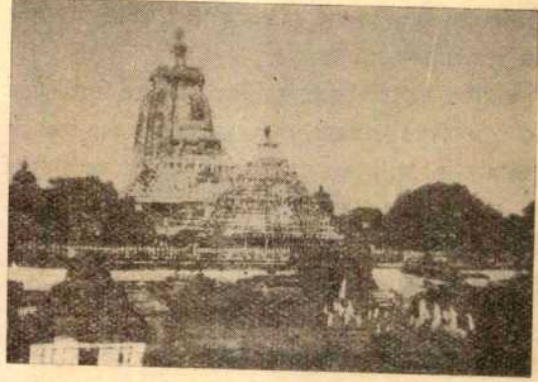
এর পর আমাদের অষ্টব্য স্থান হ'ল আঠার নালা। এটি একটি পাথরের পোল এবং পুরীর সিংহদ্বার-ধরূপ। বাংলাদেশ থেকে একটি পথ এই আঠার নালা উপর দিয়েই এসে পুরীতে প্রবেশ করেছে। মুটিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর উপর অবস্থিত এই পোলটি ২৯০ ফুট লম্বা—খ্রীষ্টীয় ঐশ্ব্যোদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ঐ পোল দেখার পর আমাদের গাড়ী চলল গুণ্ডিচাবাড়ীর দিকে। এটাকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ীও বলা হয়। এর চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত, সিংহ-দরজার মাথায় মন্দিরের মত চূড়া, মন্দির-প্রাকারে কতকগুলো হুহমান বসে রয়েছে দেখতে পেলাম। আমরা জগন্নাথের মন্দির দেখে আসবার সময় পাশের দোকান থেকে কিছু মোয়া

সঙ্গে করে এনেছিলাম। এবার গাড়ীর মধ্যে বসেই সেগুলো খাওয়ার উদ্দেশ্যে টুকরিটি হাতে নিলাম। কিন্তু ছায়! মোয়া আমাদের ভাগ্যে নেই! টুকরিটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি হুম্মান এক লক্ষ দিয়ে গাড়ীতে উঠে এসে নিমেষে মোয়ার টুকরিটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। হুম্মানটি মন্দির-প্রাকারে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তভাবে মোয়া গলাধঃকরণ করতে আরম্ভ করল; কি আর করি! হতভম্ব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। যাক এরপর আমরা মন্দিরদর্শনে মনোযোগ দিলাম। এটি নাকি পূর্বের কার্ঠের তৈরি ছিল। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বর্তমানে এটি প্রস্তর-নির্মিত একটি চূড়াবিহীন আড়ম্বরহীন মন্দির। গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ছোট মন্দির উপর জুখানি পদচিহ্ন দেখা যায়। লোকের নিকট প্রশ্ন করে জানলাম সেগুলো নাকি ত্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন। কথিত আছে, ত্রীচৈতন্য নাকি স্বহস্তে গুণ্ডিচা মার্জন করতেন। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই গুণ্ডিচা মন্দির-প্রাঙ্গণেই ত্রীচৈতন্যের দেহ সমাহিত হয়। তারা পদচিহ্নদ্বয়কে চৈতন্যদেবের সমাধির নিদর্শন বলে মনে করেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, আমরা আর কোথাও না গিয়ে গাড়ী করে হোটেল ফিরে এলাম।

পুরীতে আগমনের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে আর একটি বাঙালী হিন্দু ভ্রমণ পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। 'ইওর হোম' নামক হোটেলের যে পরিবারটিকে প্রথম দিবসে সমুদ্রে স্নান করতে দেখেছিলাম আমি তাদের কথাই বলছি। সেদিন থেকে প্রায় প্রত্যহই স্নানের সময় তাদের দেখতে পাই। ক্রমে একদিন সমুদ্র-সৈকতেই স্নানের সময় ছোট বালিকা দুটি বুলু ও টুগুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এর পর পুরীতে যে ক'দিন ছিলাম প্রত্যহ একসঙ্গে সমুদ্রের নীল তরঙ্গের সঙ্গে খেলা করতাম। ক্রমে ক্রমে ওদের সঙ্গে ভাব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রাতে ও বিকেলে সমুদ্র-সৈকতে বেড়ানোর সময় তারাই হ'ল আমার সাথী। প্রত্যহ এদের শিশুশুলভ সহজ ভাব-ভঙ্গী দর্শনে, প্রাতে সমুদ্রের ধারে ঝিঙ্ক কুড়োবার সময় এদের কচি মনের স্মৃতি ও আগ্রহ দেখে আমার নিজের মনও হালকা হয়ে এসেছিল। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-বিছানো বালু-চরে বসে বুলু, টুগু ও তাদের ছোট ভাই কালু ও মনুর সঙ্গে গল্প করতাম। ভুতের গল্প থেকে আরম্ভ করে শিকারের গল্প কিছুই বাকী থাকত না। প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়েছি তারা ভুতের গল্প শুনবে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদের শিশু-মনের সরলতা আমার হৃদয় এরূপভাবে আকর্ষণ করল যে এদের মধ্যেই এ বিদেশে আমার ছোট ভাইবোনের সন্ধান পেলাম। ওদের মশ, বাবা, দিদি, মাসি সকলেই পুরীতে এক সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সময় ও সুযোগ অভাবে তাদের সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারি নি। পুরীর বালুচরে এদের হুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমার ছোট

বন্ধু, সাথী, আর ভাই-বোন হিসেবে, তাই আজ ভুলতে পারি নি এদের কথা।

এখানে এসে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং তাদের আমন্ত্রণে ২রা মার্চ শনিবার



বিরাট প্রাকার বেষ্টিত জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী

ফটো—এন, এ, চৌধুরী

লোকনাথের মেলা দর্শন উদ্দেশ্যে বের হই। আমার সঙ্গে ছিল বন্ধু মণিক, আমাদের হোটেল থেকে লোকনাথের দূরত্ব প্রায় চার মাইল হবে। আমরা একখানা রিক্সা ভাড়া করে অপরাহ্ন ৩টার সময় যাত্রা করি, লোকনাথে পৌঁছতে আমাদের ছ' ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল। লোকনাথের মেলা পুরীর শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎসবগুলোর মধ্যে একটি, এবার এখানে যে মেলা হয়ে গেল, এত অধিক জনসমাগম নাকি ইতিপূর্বে লোকনাথে আর কোন দিন হয় নি। জনসংখ্যা হিসেব করে বলবার উপায় নেই, রাস্তার দু-পাশে এবং চারদিকে তাঁবু ও অস্থায়ী ঘর-বাড়ী তৈরি করে মেলা বসেছে। চারদিক জনাকীর্ণ। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। পথচলা কষ্টিন, জন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হ'ল, ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মেলায় পুরুষের তুলনায় উড়িয়া নারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, সন্ধ্যার পর দেখা গেল স্থানে স্থানে নারীরা তেলের ছোট ছোট প্রদীপ জালিয়ে মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। এভাবে প্রদীপ জালিয়ে জাগরণেই নাকি তারা রাত্রি যাপন করবে। প্রশ্ন করে জানলাম শিবকে তুষ্ট করবার এটা একটা প্রথা। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে এদের কার্যকলাপ, যাত্রীদের গতিবিধি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। এদের অনেকেই এসেছে পুণ্যসঞ্চয় করতে; আর আমার উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা অর্জন ও আনন্দ উপভোগ। অসংখ্য ধর্ম-পিপাসু নরনারীর ঐকান্তিক ধর্ম-নিষ্ঠার নিদর্শন দেখাও আমার কম লাভ নহে। যেখানে মেলা বসেছে তার অদূরেই লোকনাথের মন্দির এবং তারি পাশে দেখতে পেলাম একটি সুন্দর সরোবর; রাত্রি হয়ে গেল বলে মন্দিরটি ভাল করে দেখবার সুযোগ হ'ল

না। মেলায় এক প্রান্তে পুরীর বিভিন্ন সরকারী আপিসের কর্মচারীরা আলাদা আলাদা তাবু খাটিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্মচারীরা আহ্বার করতে অহরোধ করা সত্ত্বেও অধিক রাত হয়ে গেল বলে তাদের অহরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। মেলা থেকে বের হয়ে যখন হোটেল ফিরি তখন রাত প্রায় নয়টা।

আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, শীঘ্রই কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। ভুবনেশ্বর দেখবার আর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। আমি ও বন্ধু মাণিক ৯ই মার্চ প্রাতের গাড়ীতে সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এবার আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীরই টিকিট কাটলাম; প্রায় ৮টার সময় ট্রেন খুদা রোড জংসনে পৌঁছল। এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম, আবার ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম। সঙ্গে কোন মালপত্র ছিল না, শুধু একটি ছোট জীপ-ব্যাগ। সেটি হাতে নিয়ে প্রাটফরমে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিন-চারটি পাণ্ডা এসে আমাদের বিদে ধরল। প্রত্যেকের একই অহরোধ, তাকেই যেন আমাদের গাইড করে সঙ্গে নিয়ে যাই। এত করে বুঝলাম যে আমাদের গাইডের কোন দরকার নেই তবুও তারা ছাড়বে না, অতঃপর একটিকে সঙ্গে নিতেই হ'ল।

ছোট্ট একটি ষ্টেশন, তার বাইরেই রিজা পাওয়া যায়, এক থানা রিজা বার আনা ভাড়া ঠিক করে আমি ও মাণিক তাতে উঠে বসলাম। আর পাণ্ডা রিজার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল। মাথার উপরে রোদ এরি মধ্যে বেশ কড়া হয়ে এসেছে। লাল কাঁকর বিছান পথ, পথের দুই পার্শ্বে কোন কোন স্থানে বড় বড় বৃক্ষ, আবার কোন স্থানে রয়েছে কাঁকা ধু ধু মাঠ, পথে লোকসমাগম খুবই কম, চতুর্দিকে বিরাজ করছে নিমগ্ন শান্তি, অদূরেই ডানদিকে রয়েছে রেল-লাইন। দেখলাম আমরা যে ট্রেনে এসেছি সেখানে সপিল গতিতে এঁকে বেকে নিজ গন্তব্য স্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিয়দূর অগ্রসর হয়ে বৃক্ষের আশেপাশে ছ' চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখতে পেলাম। আমরা নীরবে ছ' পাশের দৃষ্টাবলী দর্শন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছি, কারও মুখেই কোন কথা নেই, চতুর্দিক নীরব নিমগ্ন, মাঝে মাঝে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে বিরহী পাখীর 'বউ কণা কণ' 'বউ কণা কণ' ডাক ভেসে এসে ঐ নীরবতা ভঙ্গ করেছে। মোটের উপর পথের দৃশ্য পরম রমণীয় ও উপভোগ্য। এ ভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরবর্তী বেশ বড় প্রস্তরনির্মিত একটি মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। এটি রাস্তার ডান পার্শ্বেই অবস্থিত, পাণ্ডাটির নিকট প্রৱণ করে জানলাম ঐ মন্দিরের নাম ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী।

ভুবনেশ্বরের জলবায়ু অতি চমৎকার, পেটের অস্থখে এখানকার করণার জল মহৌষধ বিশেষ। তাই অনেক

বাঙালী পরিবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন। ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী থেকে অগ্রসর হয়ে আমরা পথের ধারে একপাছু-চারটি বাঙালী পরিবারের বাস-স্থান দেখতে পেলাম। আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল; কিন্তু সময় হয়ে উঠবে না বলে ক্ষান্ত হলাম, উড়িয়া ধর্মশালার জন্ত বিখ্যাত। ভুবনেশ্বরেও কয়েকটা বেশ বড় বড় ধর্মশালা আছে, সেগুলোতেও নাকি অনেক বাঙালী পরিবার থাকেন। বিদেশে বাঙালীর সন্ধান পেলে হৃদয়ে যেন একটা অকারণ আনন্দাধুতুরি সঞ্চার হয়। যাক, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই গৌরী মন্দিরের নিকটবর্তী হলাম। মন্দিরটি বেশী বড় নয়। এরই প্রাকার-সংলগ্ন কয়েকটি কামরায় বাস করে কয়েকটি পরিবার। গৌরী মন্দিরের সংলগ্ন গৌরীকুণ্ডের জল অতি স্বচ্ছ।

এর পর আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির—এটি গৌরী মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত, মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আর গৌরী মন্দিরে গঠনকৌশল প্রায় এক রকম। মন্দিরসংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। এই সিদ্ধেশ্বরী আর গৌরীকুণ্ডের জলই নাকি ভুবনেশ্বরের মধ্যে বিখ্যাত। পুরীতে হোটেল দেখেছি লোকেরা এই কুণ্ডগুলোর জলই হাঁড়িতে করে সেখানে নিয়ে যায় বিক্রয় করতে। আমাদের সঙ্গে একটি জলের বোতল ছিল, সিদ্ধেশ্বরী কুণ্ড থেকে জল নিয়ে নিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে আমরা হেঁটেই অগ্রসর হলাম ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে—খুব বেশী দূরে নয়, মাত্র পোয়া মাইল হতে পারে। ভুবনেশ্বরের বাজারের ওপর দিয়ে অদূর-বর্তী ভুবনেশ্বর মন্দিরের পথে অগ্রসর হলাম। মন্দিরটি আকারে বৃহৎ, চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। এটি তৈরি করতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। মন্দিরের সদর দরজা কেন জানিনে বন্ধ ছিল; এর এক দিকে রয়েছে মিনারের মত একটি উচ্চ স্থান। আমরা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সমগ্র ভুবনেশ্বরের দৃশ্য দেখতে পেলাম, ঠিক যেন ছবির মত। বাজারে জনস্রোত চলেছে সার বেঁধে। এক দিকে দেখলাম, যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ বৃক্ষ; লতাপাতা—কে যেন একটি দিগন্তপ্রসারী সবুজ আচ্ছরণ বিছিয়ে রেখেছে। ওরই মাঝে মাঝে বাড়ীঘরের কাঁকে কাঁকে ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী, গৌরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের চূড়াগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের নিকটবর্তী বৃহৎ বিন্দু সরোবরটি দেখতে সত্যি অতি মনোরম। তা নয়নকে মুগ্ধ করে, মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূর কল্পলোকে। উড়িয়ার অমৃত্যু সরোবরের মত এই বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলেও একটি দ্বীপ রয়েছে—চন্দনযাত্রার একটি সাদা মন্দির। এ সব নয়নমুগ্ধকর রমণীয় দৃশ্য দর্শনে আমার সৌন্দর্য্যবোধ পরিতৃপ্ত হ'ল।

যাক, ট্রেনের সময় হয়ে এল বলে এবার আর বিশেষ কিছু দেববার সুযোগ হ'ল না। পাণ্ডাকে এক টাকা বখশিস দিয়ে অপরাহ্ন তিনটার সময় পুনরায় রিক্সা করে আমরা ছুঁজনে স্টেশনের দিকে যাত্রা করলাম। স্টেশনে পৌঁছে দেখি, পুরীগামী ট্রেন আসতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকী। স্টেশনের একটি বাঙালী হোটেলের কোনক্রমে আহারপর্ব শেষ করে নিলাম, যথাসময়ে ট্রেন এলে তাতে উঠে বসলাম।

পুরীতে এর পর মাত্র এক দিন ছিলাম, ১১ই মার্চ পুরী এক্সপ্রেসে পুরী ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করলাম। সেখানে যাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল, জানি নে জীবনে আর কোন দিন তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে কিনা।

আমি চললাম আমার গন্তব্যস্থলে। কারো স্মৃতি হয়তো অচিরেই বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যাবে; আবার কারো স্মৃতি হয়তো জীবনভোর হৃদয়ে বয়ে নিয়ে জীবনপথে চলতে হবে। জগতের রীতিই এই! মোটের উপর পুরীতে তিন সপ্তাহ অবস্থান করে ঐ স্থান ত্যাগ করবার সময় মনে হ'ল যেন নানা ভাবে সেখানকার সঙ্গে আমার মন মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়েছে।*

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রথম পাঁচখানি আলোকচিত্র শ্রীমাণিক সেন কর্তৃক গৃহীত।

সমাবর্তন অভিভাষণ

শ্রীব্রজসুন্দর রায়

অধুনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাবর্তন উপলক্ষে দেশের প্রসিদ্ধ বক্তা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রকার উপদেশদান একটি অতীত প্রাচীন রীতি। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র যখন গৃহহাশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইতেন, তখন অধ্যাপক গৃহহাশ্রম প্রবেশার্থী ছাত্রকে এই নূতন জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া একটা কর্তব্য মনে করিতেন। কেননা, এই সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্র অনভিজ্ঞ এবং এই প্রকার উপদেশ তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্রাবস্থায় বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলেও ছাত্রগণ যে গৃহহাশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইতে পারে নাই, তাহা অধ্যাপকগণ জানিতেন। ভবিষ্যৎ জীবন অজ্ঞাত এবং বিপদ-আপদ ঘটা অসম্ভব নহে। তজ্জন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্যদিগকে কতকগুলি সাবধানবাণী বলিতে চেষ্টা করিতেন। ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় তাহারা হয়ত কি আদর্শের সেবা করিবেন এবং কিরূপে জীবিকার্জন করিবেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ নাও করিতে পারেন। তথাপি সমীতি ও সদ্ধর্ম বিষয়ে মানুষের সর্বদাই দৃষ্টির প্রসারতা আবশ্যক। মানুষ অবশ্য সকল বিষয়েই নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিবে, ইহাই অতীর্ণিত; তথাপি জ্ঞানবুদ্ধি হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের উপদেশে আমাদের উপকারই হয়। মানুষের পতন সকল অবস্থায়ই সম্ভব, সুতরাং কেহ যদি সেই পতন হইতে রক্ষা করার জন্ত চেষ্টা করেন, তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রাচীন সময়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এদেশের চিন্তা-প্রণালীতে এখনকার জায় অনিশ্চয়তা ছিল না। কোন প্রকার সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ও বিজ্ঞগণ চিন্তা করিতেন না।

জীবিকা অর্জনের জন্ত কতকগুলি পন্থা নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপকগণ এবং তাঁহাদের অন্তর্বাসী ছাত্রগণ তজ্জন্ত শাস্ত্র-গামী ছিলেন এবং জ্ঞান ও ধর্মের অনুশীলনই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখন আমাদের জীবিকা সংগ্রহের পথ নিজের বিজ্ঞা বুদ্ধি এবং সুযোগ অনুসারে নির্ধারণ করিতে হয়। অনেকে পথ দেখিতেই পাই না এবং সমস্ত জীবন অপথে-কুপথে বিচরণ করি। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল বিষয়েই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। পূর্বতন ছাত্রগণের জীবন আমাদের জীবন অপেক্ষা অনেক নিরাপদ ছিল। সুতরাং আমাদের জন্ত যে আরও অধিক উপদেশের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল রাজনীতি বা ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই ছাত্রগণের প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। তাহাদিগকে এরূপ কিছু বলা আবশ্যক যাহাতে তাহারা কিঞ্চিৎ স্থায়ী পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারে। যে শিক্ষা তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ করিতেছেন, বা করিয়াছেন, তাহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা সম্বন্ধেও তাহাদিগকে উপদেশ দান অপ্ৰয়োজনীয় নহে। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ের শিক্ষা যে আমাদের দেশীয় নীতি ও ধর্মের সঙ্গে কি ভাবে সমন্বিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কথার বিশেষ মূল্য আছে। এখন বিজ্ঞ উপদেষ্টাগণ সমাবর্তন উপলক্ষে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা দ্বারা আমাদের ছাত্রগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহাও মনে হয় না। অনেক উপদেষ্টার বক্তব্য বিষয় অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। নিজে আমি উপনিষদ্ হইতে একটি সমাবর্তন অভিভাষণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে এই উপদেশটিতে এমন কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,

যদ্বারা ছাত্রগণ আজও উপকৃত হইবেন। ইহাতে ছাত্রগণ যে জানার্জনে উৎসাহিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশে জানলাভে অদম্য উৎসাহ ছিল এবং জানলাভ করিয়াই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে হয়, এমন কি জানে আত্মিক মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ ধারণা ছাত্রগণ পোষণ করিতেন। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া অধিকাংশ ছাত্র জানলাভে বীতশুশ্ৰূ হইয়া পড়ে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আঃ বাচিলাম মনে করেন।

উপদেশ

বেদমহুচাচার্যোহন্তেবাদিনমহুশান্তি। সত্যংবদ। ধর্ম্মকর। স্বাধ্যায়ান্না প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেংসীঃ। সত্যায় প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মায় প্রমদিতব্যম্। কুশলায় প্রমদিতব্যম্। ভূতৈন্য প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবোভব। পিতৃদেব ভব। আচার্য্য দেবো ভব। অতিথি-দেবো ভব। যাশ্চনবদ্যানি কর্ম্মানি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যাশ্চম্বাকং সূচরিতানি। তানি ত্বয়ো পাস্তানি। নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছে য়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেযাং ত্বয়াসনেন প্রমদিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া-হদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা জ্ঞাং। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্ত্যঃ। যথাতে তত্র বর্ভেরন্। তথা তত্র বর্ভেধাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেযু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্ত্যঃ। যথা তে তেযু বর্ভেরন্। তথা তেযু বর্ভেধাঃ। এষঃ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অনুবাদ

বেদাধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঐদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণা-স্বরূপ দান করিয়া অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা দানান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্তানস্বত্র কর্তন করিবে না। অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায় অবলম্বন করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ত্বলাভে ঐদাস্য করিবে

না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপননে ঐদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঐদাস্য করিবে না। মাতাকে দেববৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা করিবে। অতিথিকে দেববৎ পূজা করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্ম করিবে। অজ্ঞ অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ম্ম গৎ সে সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম কর্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসনাদিধারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে। [পাত্রাপাত্র বিবেচনা কর্তব্য]। লজ্জা অর্থাৎ বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। মিত্রভাবের সহিত [অর্থাৎ সহানুভূতির সহিত] দান করিবে। যদি তোমার কর্ম্ম বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অজুর-মতি, ধর্ম্মকাম, অজ্ঞকর্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। কোন কোন ব্যক্তি দ্বারা অভিযুক্ত কর্ম্ম বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অজুরমতি, ধর্ম্মকাম, অজ্ঞকর্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত, বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে যেরূপ আচরণ করিবে।

ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ।—(তত্ত্বভূষণ)

এই উপদেশটি আমাদের নিকট অমূল্যই মনে হয়, কেননা, মানুষের পক্ষে সর্ব্বদাই এইরূপ উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। যাঁহারা সমাবর্তন-উপদেশ ছাত্রগণকে দান করার জন্ত আহুত হয়েন, তাঁহারা যদি ঋষির এই উপদেশটি মনের সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রগণকে আজকালের সময়োপযোগী কথা বলেন, তাহাতে যুবক যুবতীগণ উপকৃত হইবেন, আশা করা যায়। জানী এবং অভিজ্ঞ লোকেরা ছাত্রগণকে আরও জানার্জনে উৎসাহ দিলে, ফল ভাল হইবে। সংসারধর্ম্ম কিভাবে তাহারা আচরণ করিলে, সমাজের মঙ্গল হইবে, সেই বিষয়েও জান-বুদ্ধির কথা মূল্য আছে। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ত লোকেরা আগ্রহের সহিত শুনেন, কেননা তাহারা বিশ্বাস করে তিনি তাহাদের মঙ্গলকামী। উপদেষ্টারা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা যুবকযুবতীদিগকে প্রেমের সহিত বলিতে পারেন, তবে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পুঁজিপতিদের উৎপাদন-অপচয় ও দারিদ্র্য

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

গ্রীষ্মমণ্ডলের কিঞ্চিৎ বাহিরের মণ্ডলকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলা হয়। এই ভূভাগের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়ার মত শক্তিশালী নহে। আর সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা এ মণ্ডলে দেখা যায় না। বৎসরে অনধিক চারি মাস এই মণ্ডলে শীতকাল থাকে—শীত খুব বেশী না পড়িলেও এই সময় গরম খুব কম থাকে। এই মণ্ডলের কোন কোন অংশে শীত-কালে কুয়াশাও দেখা যায় এবং এই সময় বৃষ্টিাদির উৎপাদনও সাময়িক ভাবে হ্রাস পায়।

তুলা

এই মণ্ডলে যথেষ্ট সূর্যালোক পাওয়া যায় বলিয়া এবং গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে যথেষ্ট বারিপাত হওয়ার দরুন প্রভূত পরিমাণ তুলার চাষ হয়। তুলা ব্যতীত সভ্য মানুষের চলে না। ভারতের আবিষ্কৃত এই তুলাই সভ্যতার আদিম যুগ হইতে মানুষের নগ্নতা ঢাকিবার জন্য বহু প্রকারের বস্ত্র ও আভরণ যোগাইতেছে। আজ প্রায় পৃথিবীর এক শতটা দেশে তুলার চাষ হয়। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একাই মোট উৎপাদনের এক শত ভাগের ষাট ভাগ সরবরাহ করে। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল হইতে তুলার চাষ প্রায় ১৪০০ মাইল পশ্চিম পর্যন্ত চলিয়াছে। মেক্সিকো উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে ৪০০ মাইল পর্যন্ত এই তুলার চাষ বিস্তৃত। এই তুলার চাষের বিস্তৃত ভূভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কটন বেল্ট নামে পরিচিত। বৎসরে এই স্থানে এক কোটি হইতে এক কোটি ষাট লক্ষ গাট তুলা উৎপন্ন হয়। আমেরিকার পরেই তুলা উৎপাদনের দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে ভারতবর্ষ—যদিও পরিমাণে ইহা আমেরিকার অর্ধেক মাত্র। আমেরিকায় উৎপন্ন তুলার তিন-চতুর্থাংশ বিদেশে চালান হয় এবং এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর তুলার বাজার নিয়ন্ত্রিত করে।

আমেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন ঔপনিবেশিকেরা বেপরোয়া ভাবে তুলার চাষ চালায়। ফলে কষিত জমি অল্পবর্ষ হইয়া পড়িতে থাকে। ঔপনিবেশিকেরা এই ভাবে ভার্জিনিয়া হইতে টেক্সাস পর্যন্ত নির্ঘম চাষ চালাইয়া যায়। অফুরন্ত জমি এইরূপে পতিত ও অল্পবর্ষ হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া তখন ঔপনিবেশিকগণ তুলার ‘ক্ষেতি চাষ’ আরম্ভ করে। কিন্তু খেতাব্দ শ্রমিক সম্ভার পাওয়া যাইত না। কাজে কাজেই জাহাজ ভর্তি নিম্নো দাসগণকে আফ্রিকা হইতে আনা হইতে লাগিল। এইরূপে আমদানী-করা নিম্নো এবং তাহাদের হতভাগ্য কংশধর ক্রীতদাসেরা ২৫০ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার তুলা-চাষীর শ্রমিক যোগাইল। তুলা চাষের ব্যাপারে ক্রীতদাস পদ্ধতি নিত্যই যেন স্বাভাবিক পরিণতি হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত ক্রীতদাস ছাড়া এত সম্ভার তুলা

সংগ্রহ কে করিবে? একজন কর্মঠ নিম্নো ক্রীতদাসের জন্য বার্ষিক খরচ হইত মাত্র ১৫ ডলার। প্রথমে যে সকল খেতাব্দ চাষী নীতির দিক দিয়া ক্রীতদাস নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিল তাহারাও প্রতিযোগিতার চাপে নিজেদের বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া দাস ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা তাহাতে রাজী হইল না তাহাদিগকে তুলা চাষের জমি বিক্রয় করিয়া দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল।

বড় বড় তুলা চাষের মালিকেরা দূরে শহরে বাস করিত এবং খেতাকায় তত্ত্ববধায়কগণের উপর কার্যের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। ইহাতেই এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার অমানুষিকতা ও ক্রীতদাসের প্রতি অত্যাচার বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কচিং কখনও চাষের মালিকেরা আবহাওয়া শ্রীতিকর থাকিলে তাহাদের ‘এষ্টেট’ের কাজকর্ম দেখিতে আসিত কিন্তু এরূপ সাময়িক পরিদর্শন দ্বারা তুলা চাষের অপব্যয় ও নিম্নো দাসের প্রতি নিষ্ঠুরতার কিছুমাত্র লাঘব হইত না।

আইনের চোখে ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পাইয়াছে কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থার অনেক দোষত্রুটি আজ পর্যন্ত লোপ পায় নাই। জমি, বীজ, চাষের যন্ত্রাদি এবং জানোয়ারের মালিক একই ব্যক্তি এবং উৎপন্ন তুলার একটা মোটা অংশই তাহার প্রাপ্য। চাষের জমিগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং এখানে দশ লক্ষেরও বেশী লোক চাষীর কাজ করে। তাহাদের অধিকাংশই নিম্নো। ইহাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিজেরাই জমির মালিক আর সকলে রাজনা দিয়া জমি চাষ করে।

রায়ত ও জমির মালিক হিসাবে এই দুই রকম ব্যবস্থার সাধারণতঃ চাষের কার্য চলিয়া থাকে। এক শ্রেণীর রায়তের নাম ‘ক্রোপার’ (cropper)। ইহারা জমির সারের ও তুলার জাঁট ছাড়াইবার (ginning) খরচের অর্ধেক নিজেরা বহন করে এবং উৎপাদিত তুলার অর্ধেক পাইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর রায়তকে ‘ভাগী রায়ত’ (share tenants) বলা চলে। ইহাদের তুলা ছাড়াইবার (mule) ও অস্ত্রাস্ত্র যন্ত্রাদি আছে। ইহারা ‘ক্রোপার’ অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর। উৎপন্ন তুলার এক-চতুর্থাংশ ইহারা জমির মালিককে দিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ভূমি ও মূলধন-হীন নেহাতই দিনমজুর মাত্র।

ভাগী রায়ত, ‘ক্রোপার’ ও দিনমজুর—চাষের কয়েক মাস ইহাদের কাহারও বিশ্রাম নাই। ইহাদের পরিবারে সকলেই স্বর্গোদয় হইতে স্বর্গ্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে। এত পরিশ্রমেও ‘ক্রোপার’ের দেনার ভার কখনও লাঘব হয় না। কাঠের তৈরি ছোট ঘরে তাহার বাস। গ্রীষ্মকালে সে গরমে ছটফট করে এবং প্রচণ্ড শীতে গৃহ গরম করিবার সঙ্গতি পর্যন্ত তাহার নাই।

তুলাচাষীকে প্রথম শোষণ করে অবশ্য জমির মালিক। দক্ষিণ দেশের কোন এক ষ্টেটের গবর্নর সত্যই বলিয়াছেন যে ‘নিগ্রো ছাল ছাড়ায় (বেপরোয়া চাষ দ্বারা), জমির মালিক ছাল ছাড়ায় নিগ্রোর... (চাষীর)।’ দারিদ্র্যের দরুন চাষী স্থানীয় দোকানদার (store keeper) অথবা মহাজনের নিকট হইতে ক্ষেতের উৎপন্ন তুলা বন্ধকী রাখিয়া উচ্চ সুদে কর্জ করে। দৈনন্দিন খরচ যোগাইবার জন্ত বাধ্য হইয়া সে দোকানদারের নিকট উৎপন্ন তুলার কিয়দংশ বিক্রয় করে। এইরূপে গ্রাম্য দোকানদার তুলার ব্যাপারী হইয়া দাঁড়ায়। অল্প বলিয়া চাষী পৃথিবীর বাজারদরের খবর রাখে না, স্তত্রাং অল্প মূল্যে বিক্রয় করে।

তুলার ব্যাপারীর পরবর্ত্তী মুনাফাখোর তুলার ফাটকা ব্যবসায়ী। সে তুলার দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেশী মুনাফা কামায়। ফপার বড় জোর ভবিষ্যতে ‘ভাগী রায়ত’ হইতে পারে। কতকটা দেনার ভার কমাতেও সক্ষম হয়। ইহার বেশী শোভাগ্য তাহার হয় না। কিন্তু মুনাফাখোরের দল বাড়িয়াই চলে, ফাটকা ব্যবসায়ীর পর আসে বিদেশে চালানকারী। তাহারও পরে আরও এক দল আছে যাহারা তুলা হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে। এতগুলি মুনাফাখোরের পাল্লায় পড়িয়া তুলার চাষী আজও প্রায় শতাব্দী পূর্বের নিগ্রো ক্রীতদাসের মতই অসহায় ও নিষ্পেষিত।

অথচ তুলার উৎপাদক ও সর্বশেষে তুলাজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ খাদকদের (consumer) মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকায়, তুলাচাষীর মন্দ ভাগ্য তুলার দামের উঠা-নামার অনিশ্চয়তার উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের মন্দার সময় তুলার দাম বারো বৎসর পূর্বের উচ্চ মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে দরের উঠা-নামা চলিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে আবার দাম একেবারে উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। দাম বাড়িলেই চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে। তুলার উৎপাদন অতিরিক্ত বাড়িলে আবার দাম পড়িয়া যায়, স্তত্রাং অনেক তুলা মাঠ হইতে সংগ্রহই করা হয় না এবং এইরূপে দাম পড়িয়া যাওয়া নিবারণ করা হয়। এইরূপে তুলার উৎপাদন কমাইয়া দাম বাড়ানো হয়। ইহার উপর আবহাওয়ার দরুন উৎপাদনের বাড়তি-কমতি আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর তুলার দর বাড়িলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত পরের চৌদ্দ বৎসর অনেক অবিক্রীত তুলা মজুত থাকিতে আরম্ভ হয়। ১৯২৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট স্থির করেন যে, অতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ৬০ লক্ষ গাঁট তুলা সরকারী খরচায় কিনিয়া ধরিয়া রাখা হইবে। যদিও ঐ মালের দাম তুলার মালিকগণকে অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। খাদকের

চাহিদা হ্রাস পাইলেও গুদামের মাল বাড়িয়াই চলিল। ১৯৩২ সালে দেখা গেল হাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ তুলার গাঁট জমিয়াছে—ইহা প্রায় এক বৎসরের উৎপাদনের সমান।

তিন বৎসর অবশ্য পোকা লাগিয়া (boll weevil) তুলার উৎপাদন-হ্রাসে কতকটা সাহায্য করিয়াছিল। শেষকালে সরকারকে অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করিবার জন্ত চেষ্টা হইতে হইল। চারি বৎসর পর্যন্ত উৎপাদকগণের নিকট হইতে তুলা কিনিয়া গুদামজাত তুলা বিক্রয়ে অসমর্থ হইলে পর গবর্ণমেন্ট সরকারী অর্থ খরচ করিয়া তুলা চাষ বন্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তুলাচাষীগণকে পূর্বাপেক্ষা কম জমিতে চাষ করিতে বলা হইল এবং গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক অকর্মিত একর পিছু ২০ ডলার পর্যন্ত খেসারত দিলেন। এই ব্যয়ের কিয়দংশ তুলা-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর কর বসাইয়া আদায় করা হইল। একজ্ঞ আবার তুলানির্মিত দ্রব্যের দাম বাড়িল এবং তুলাজাত দ্রব্য কম বিক্রয় হইল। ফলে কাঁচা তুলার চাহিদা আরও হ্রাস পাইল।

উক্ত ব্যবস্থায় প্রথম বৎসর ১ কোটি ৫ লক্ষ একর জমি চাষ করা হইল এবং চাষীদিগকে জমি চাষ না করার জন্ত খেসারত দেওয়া হইল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। কিন্তু তুলা উৎপাদনের পরিমাণ অতি ধীরে ধীরে কমিয়াছিল। খারাপ আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত ঐশ্র্য, ক্রমাগতই অনেকগুলি ধূলি-ঝটিকা (dust storm) এই তুলা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে মাছের সহায় হইয়াছিল। ১৯৩৪ সালে তুলার জন্ত চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ করা হইল। ইহাও পরিকল্পনার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংলও তাহার সাম্রাজ্যের ব্যবসা বজায় রাখিবার জন্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলার আমদানী কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের তুলার ব্যবসায়ের ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। ইহা ব্যতীত ইঙ্গ-মিশরীয় সূদান, উগান্ডাতেও তুলার চাষ শুরু হইয়াছে। ব্রেক্সিল তুলার চাষ আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার তুলা চাষের জমির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিক। ব্রেক্সিলে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে বহু তুলার কলও স্থাপিত হইয়াছে।

তামাক

তুলাচাষের প্রসঙ্গে তামাকের কথাও আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে তামাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বলাই বাহুল্য। তামাক উৎপাদন ও রপ্তানি বিষয়েও আমেরিকা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তামাকের চাষ কটন বেল্টের পূর্বাংশের অর্ধেক দেশ জুড়িয়া এবং আরও কিছু উত্তরের গ্রেট-সমূহে হইয়া থাকে। তুলার চাষ যে সকল অবস্থা, অপব্যয়, অনাচারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তামাকের চাষও সেইরূপ ভাবেই হইয়াছে। কিছু দিন হইল তামাক ব্যবসায়ও অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্ত মন্দায় পড়িয়াছে—১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা

পৃথিবীর বাজারে অবিক্রীত পড়িয়া ছিল। হাজার হাজার একর জমির তামাকচাষ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সিগারেট প্রস্তুতকারিগণের উপর কর বসাইয়া তামাক-চাষের জমির মালিকগণকে খেদারত দেওয়া হইয়াছিল।

তুলা ও তামাক উভয় দ্রব্যের ব্যাপারেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছিয়াছে, পৃথিবীর বাজার লইয়া সর্বদা কাড়াকাড়ি। শেষ পর্যন্ত এই বাণিজ্যিক লড়াই মহাযুদ্ধে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি শুষ্ক (dry) দেশগুলি অর্থাৎ গ্রীস ও তুরস্ক এক প্রকার তামাক উৎপাদন করে বাহা বাজারে 'টাকিন' বলিয়া পরিচিত। ইহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের 'ভার্জিনিয়া'র কোন প্রতিযোগিতা নাই। এককালে ইটালী যুক্তরাষ্ট্রের বড় খরিদার ছিল, এখন গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে এদেশ তামাকচাষের উৎসাহ দিতেছে এবং আমেরিকা হইতে তামাক আমদানী বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। ইংলও ও ফ্রান্স ইটালীর পথ ধরিয়াছে। ইংলও দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেসিয়ায় এবং ফ্রান্স আলজিরিয়ায় তামাকের চাষ বাড়াইয়া চলিয়াছে। অবশ্য এই সকল স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের মত আবহাওয়া বা চাষের সুবিধা নাই তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এই অপচয়মূলক তামাকের চাষ বাড়িয়া চলিয়াছে। ধনতত্ত্বের ইহাই উৎপাদন রীতি—সঙ্গে চলে অন্ধ ও স্বার্থহুস্ত জাতীয়তার মোহে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপচয়।

ধাতু

অর্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলের আর্দ্র দেশসমূহে উৎপন্ন আর একটি খনিজ-শস্ত্র ধাতু। খেতজাতির প্রধান ধাতু যেরূপ গম, দক্ষিণ-এশিয়ার বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর প্রধান খাদ্য পেরুপ চাউল। সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন ধান্যের তিন-চতুর্থাংশ ভারতবর্ষ ও চীনদেশে জন্মে অথচ এই-বিপুল পরিমাণ ধান্য পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে না, উৎপাদিত হইয়া নিজ নিজ দেশেই খাতিয়াক্রমে ব্যবহৃত হয়। বরং জনসংখ্যার অনুপাতে এই সকল দেশে ধান্য উৎপাদন কম হয় এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়।

চীনদেশে অগণিত ছোট ছোট ক্ষেত্রে ধানের চাষ হয়। চাষীর অতি দরিদ্র, আধুনিক যন্ত্রপাতির ধার ধারে না। বহুপুরাতন দেশে স্বভাবতঃই ভূমির উর্বরতা কম এছাড়া কৃষকেরা মালুষের এবং সকল রকম জানোয়ারের পুরিষপচাইয়া জমির সাররূপে ব্যবহার করে। চীনে জমির সারের জ্ঞান মালুষের পুরিষ বিক্রয় হয়। ভূপর্যটক ক্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস সাইকেলে চীনের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময় এইরূপ সার-প্রয়োগে কৃষিকার্য নিজেদের চোখে দেখিয়া আসিয়াছেন। পরিশ্রমী চীনা চাষী পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ চালাইয়া সুবৎসরে কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে—হয়ত বা কিয়ৎ-পরিমাণ ধাতু বিক্রয় করিতেও সক্ষম হয়। ফসলের সময় চাষী এক পিকুল (Picul) ধান দশ ডলারে বিক্রয় করে। উহাই

আবার বৎসরের অল্প সময়ে—যখন চাউলের দর চড়ে, আটাশ ডলার দরে কিনিতে বাধ্য হয়। দুর্বৎসরে এই পরিশ্রমী চীনা কৃষকের পুরস্কার ক্ষুধা, অনশন ও মৃত্যু।

অথচ চীনদেশের গ্রামে লোকসংখ্যা বিপুল, কোন কোন স্থানে এক বর্গমাইলে ৭০০০ জন। এইজন্ত দুর্ভিক্ষের করাল মুক্তি অতি ভয়ঙ্কর। অবশ্য অনাবৃষ্টি এবং বহুরাজ্য চীনদেশে ফলন নষ্ট হয় এবং দুর্ভিক্ষ হয়।

যখন দৈবদুর্ঘটনা ঘটে তখন লোকের আর বাঁচিবার উপায় থাকে না। আইনকে কাঁকি দিয়া মহাজনেরা সে দুর্দিনেও জাপানে বেনী লাভের আশায় চাউল চালান দেয়। গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলি চাউল কিনিবার জন্ত কৃষককে শতকরা এক শত টাকা বা উহারও বেশী সুদে টাকা ধার দেয়। যখন সকল খাদ্যই নিঃশেষ হইয়া যায় তখন চীনা চাষী গৃহের দ্রব্যাদি, বাড়ীঘর, এমন কি সন্তান বিক্রয় পর্যন্ত করিয়া খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতেও না কুলাইলে তাহাকে অনশনে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মঘন্তরে বাঙালী এইরূপ দৃষ্টই নিজ দেশে দেখিয়াছে। অবশ্য বাল খনন, অরণ্য রোপণ (afforestation), কর্ক পাইবার ব্যবস্থা এবং চলা-চল-ব্যবহার উন্নতিদ্বারা দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে দেশে বিদেশী পুঁজিপতির স্বার্থ প্রবল সেখানে জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেরও এই একই ভাগ্য, এই চরম দুর্গতি। নামে মাত্র চীন স্বাধীন, আসলে সে দেশ পাশ্চাত্য পুঁজিপতিদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

অথচ ধাতুচাষের ও চাষীর স্বাবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। আমেরিকার 'কটন বেটের' দক্ষিণে এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা আধুনিক পদ্ধতিতে ধাতুর চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শ্রমিককে অতিরিক্ত মজুরি এবং সুখ-সুবিধা দিয়াও ধানের চাষ লাভজনক হইতে পারে। এই অঞ্চল হইতে এশিয়ার বাজারের প্রতিযোগিতায় কিছু পরিমাণ চাউল রপ্তানী সম্ভব হওয়াতে প্রমাণিত হয় যে চাষীকে বঞ্চিত না করিয়াও ধাতু চাষ ও ধাতুচাষীর অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর।

চীনা চাষীর কথা বলিতেই হিন্দুস্থানের চাষীর কথা আসিয়া পড়ে। তাহারও অবস্থা চীনা চাষী হইতে উন্নত নহে। জমিদার বা গবর্ণমেন্টের খাজনা দিয়া এবং মহাজনের সুদ দিয়া তাহার জীবনধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে চাষের জ্ঞান আধুনিক যন্ত্রাদির বা জমিতে সারের ব্যবহারের প্রশ্ন আসে না। চাউলের উৎপাদন ও খাদ্যরূপে ব্যবহার হিসাবে চীনের পরই ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষে উৎপাদিত চাউল তথা খাদ্যশস্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বেও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী না করিলে চলিত না। মহাযুদ্ধের পর অবস্থা আরও বদলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের বাড়তি চাউলের আশা

প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুতরাং ডিম্বাপাত্র হস্তে ভারত-বাসী জাভা, ঞাম, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন এবং রুশিয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত পৃথিবী যখন খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন তখনও পুঁজিপতিগণের মুনাফার বিরাম নাই, বাড়তি অঞ্চলের অপচয় ও অপব্যয় সমভাবেই চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

চা

এই মণ্ডলের আর একটি উৎপন্ন পণ্য চা। আসাম চা-উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের তথা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। এখানে চা-কুলীর শোষণ কথ্যাত চা-চাষের সহিত একপভাবে সংশ্লিষ্ট যে এ বিষয়ে নতুন করিয়া বলা বাহুল্য। উত্তর ও মধ্য ভারত হইতে অল্প জমী-পুরুষকে আড়কাঠীগণ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া যাইত। একবার ইহাদের হাতে পড়িলে আর নিষ্কৃতি ছিল না। আসামের চুক্তিবদ্ধ কুলীপ্রথা দাসত্বপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। বর্তমান

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চায়ের বাজার মন্দা হইলে চা-বাগানের মজুরদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বহু আন্দোলনের পর ১৯৩৩ সনের আইন বলে চা-কুলী এখন জমী-পুত্রসহ তিন বৎসর বাগানে কাজ করিবার পর দেশে ফিরিবার অধিকার পাইয়াছে। ভারতীয় শ্রমিককে শোষণ করিয়া এবং আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে ইউরোপীয় চা-ব্যবসায়ী পৃথিবীর বাজারে চীন দেশীয় চাকে হঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৬৯ সালে ইংলণ্ড ভারতের এক কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছিল। ঐ বৎসর চীন হইতে আমদানী হয় দশ কোটি পাউণ্ডের অধিক। ত্রিশ বৎসরে ভারতীয় চায়ের আমদানী চৌদ্দ গুণ বাড়িয়া যায় এবং চীনা চায়ের আমদানী চারি ভাগের তিন ভাগ হ্রাস পায়। বর্তমান মহামুদ্রের পূর্বেই ভারতের চায়ের রপ্তানী ত্রিশ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ের উন্নতির অল্পপাতে চা-কুলীর ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নাই। পুঁজিপতিগণের সম্পদস্বদ্ধি ও শ্রমিকের দারিদ্র্য ইহাই বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ঋতুলক্ষ্মী

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

চলে যায় ঐ যে মেয়ে
নির্ঝরিনী ছন্দে গেয়ে—
ঘোবনেরি মর্মবাণী
জানি ভাই সত্যি জানি
সেই সে বাণী
সে যেন চোখের হাসি
দূরের বাঁশী
দখিন হাওয়ার মর্মরানি
অশোকের ফুটল কলি
পলাশের আগুন রাঙা—
ফুলে তার বন রেঙেছে
চরণের আলতা রাঙা
বুঝি তার ছাপ লেগেছে
তাই রেঙেছে—
ভিজ়ে পায় বুলিয়ে গেছে
দিগবিদিকে—
পাগল পরী আগল ভাঙা।
চাতকী উঠল মেতে—
ঈশানের কাজল নিশান
উড়ল মেখের বৃষ্টি পেতে
যদি না বিন্দুবারি
পায় সে তারি—
হর্দে লোডে উড়বে তবু

পোড়ে তো পুড়বে পাখা
বজ্রশিখায়—
হায় রে পুড়ে মরবে তবু।
ফাগুনের আগুন গেল
মলয়ের শিহর তোলা
মাধবীর কুঞ্জ বনে
দোলো ঐ দোলন দোলা
সবুজের দোবুজা গায়ে—
এল আজ মেঘলা ছায়ে—
ঘন ঘোর কালবোশেখী
তাইতো দেখি—
ঝড়ের লহর উথলে পায়
ভূলে আজ বর্ষারাগীর
ঝরঝরাগির—
বৃত্যলহর ডাইনে বাঁয়ে
চলে যায় ঐ সে মেয়ে—
ঐ যে মেয়ে—
যায় সে চলে—
এগিয়ে চলে
যেন কোন মুক্ত বেগী—
বৈরাগিণী
পিছন ফিরে—
যায় না চেয়ে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন

শ্রীরমা চৌধুরী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পরিণত করাই উচিত কি না, এ বিষয়ে বর্তমানে অনেকেই আলোচনা করছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর কিছু পরিবর্তন যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কারণ, এই পরীক্ষার অবশ্যপঠনীয় বিষয়ের সংখ্যা ও পঠনীয় অংশ যে সূক্ষ্মারমতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটু গুরু ভারই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গেই সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক বিষয়ের তালিকা থেকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন করে, ছাত্রছাত্রীদের ভার লাঘব করার প্রশ্ন উঠেছে।

এস্থলে প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক বিষয় নির্বাচনের মূল নিয়মটি কি? এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যে যে বিষয়ের অন্ততঃ কিছু জ্ঞান সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই-সেই বিষয়ই কেবল বাধ্যতামূলক করা হওয়া সম্ভব। আমাদের বিশ্বাস যে, এই অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার কষ্টপাথরে যাচাই করেই ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়কে প্রবেশিকা স্তর পর্য্যন্ত, এবং ইংরেজী ও বাংলাকে 'ইন্টারমিডিয়েট' পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তারপরে, এ স্থলে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে যে, 'অবশ্য প্রয়োজনীয়তা'র প্রকৃত অর্থই বা কি? সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি যে, যা মানুষকে 'মানুষ' হতে সাহায্য করে, তাই হ'ল মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। পুনরায় এস্থলে প্রশ্ন উঠে, 'মানুষ হওয়া'র প্রকৃত অর্থটাই বা কি? এস্থলেও, সাধারণ ভাবে আমরা আর্থিক উন্নতি করাকেই 'মানুষ হওয়া' বলি। যেমন, আমরা বলি 'অমুক' বিধবার ছেলেটি মানুষ হয়ে মায়ের হুঁখ ঘুচিয়েছে।' এখানে মানুষ হওয়ার অর্থ—বেশ ভাল একটি চাকুরী জুটিয়ে মায়ের অর্থচিন্তা দূর করা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এইটাই হ'ল চরম 'মানুষ হওয়া'।

অবশ্য এরকম 'মানুষ হওয়া'কে আমরা তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য ফিরতে পারি না। কারণ, সকল যুগেই জগতের মূল কথা হ'ল বাঁচবার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence), এবং এই সংগ্রাম জয়ের প্রথম কথাই হ'ল আর্থিক সাচ্ছল্য, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান—এ হলে তবেই অজ্ঞ সব কথা উঠে। আর্থিক সাচ্ছল্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও, দৈহিক কষ্ট সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও যে মানুষ বড় হয়ে নি, তা নয়—সকল দেশেই সকল যুগেই তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে যে এ নিয়ম খাটে না, তা বলাই বাহুল্য। সেজন্য সাধারণ ভাবে এই আর্থিক উন্নতিকে মানুষের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির

মধ্যে একটি প্রধান উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার উপায়গুলির মধ্যে একটি প্রথম উপায় বলে মেনে আমাদের নিতেই হবে নিঃসন্দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও কিন্তু সমান সত্য যে, আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজনই মানুষের প্রয়োজনের সবটুকু নয়। মানুষ পশুর হায় দেহধারী হ'লেও দেহস্বর্কষ নয়। দেহ ছাড়াও মানুষের যা আছে আর পশুর যা নেই, তাকে আমরা বলি বিচার-বুদ্ধি, এবং যার জন্য এই বিচারবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাকে বলা হয় মন ও আত্মা। সেজন্য দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে যেমন মানুষ অন্নবস্ত্রের সন্ধানে ছোটো, তেমনি আত্মার প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে ছুটতে হয় দর্শন, ধর্ম, কাব্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির পশ্চাতে। সুতরাং মানুষের যা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তার দুটো সমান দিক—দৈহিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রয়োজন। এ কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে কি কি বিষয়ে জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক, এই আলোচনা ও বিচার কালে এই দুই রকমের প্রয়োজনই স্মরণে রাখা উচিত। কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণের যে আত্মিক প্রয়োজন কিছুই নেই, এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। তারাই হ'ল জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা স্থল—সেজন্য তাদের সূক্ষ্মাঙ্গী উন্নতিই হওয়া উচিত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য। তাদের এমন ভাবে গড়ে দিতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেকে অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিজেরা করে নিতে পারে। এছাড়া, তাদের এমন ভাবেও অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা কেবল আত্মবিনয় অন্নবস্ত্রের চিন্তাতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত না থেকে অন্তত উচ্চ দিকেও মনোনিবেশ করতে পারে।

এখন দেখা যাক, সংস্কৃতের পঠনপাঠন এই দুই দিক থেকে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় কি না। প্রথমতঃ, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বর্তমানে সংস্কৃত পাঠের আর্থিক মূল্য 'কাণাকড়ি'ও নেই। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী, এমনকি, বাংলাতেও 'ডিগ্রি' থাকলে যেহলে নানা বিভাগে ভাল চাকুরী পাওয়া সহজ হয়, সেহলে সংস্কৃতের 'ডিগ্রি'ধারীর চাকুরীর আশা অতি অল্পই। প্রথমতঃ, সংস্কৃতে 'ডিগ্রি'ধারীর কেবল শিক্ষাবিভাগেই যা একটু চাকুরী পাবার আশা আছে—'স্কুল-কলেজে' শিক্ষক বা অধ্যাপকরূপেই মাত্র—কিন্তু সাধারণতঃ অজ্ঞ কোনো বিভাগের উপযুক্ত বলে তিনি বিবেচিত হন না। অথচ ইংরেজী বা ইতিহাসে ডিগ্রিধারীর শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও অত্যান্য বহু সাধারণ বিভাগে (ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরি অপিস, কারখানা প্রভৃতি) চাকুরী পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিভাগেও অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে

সংস্কৃত শিক্ষক বা অধ্যাপকের সংখ্যা বহু কম, বেতনও কম, পদমর্যাদাও তাই। যেহেতু অন্যান্য বিষয়ে নূতন পদের সৃষ্টি করা হয়, সেহেতু সংস্কৃতের পদ বাড়ান ত দূরে থাক্, ছাত্রসংখ্যার অভাবতার ওজুহাতে তা কমানই হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতে 'ডিজি'র মূল্য যে কিছুই নয়, এই ভাবটিও যেন লোকের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এটা যেন অতি তুচ্ছ, অতি সহজ বিষয়, এর প্রথম শ্রেণী যেন ইংরেজী বা অর্থনীতির প্রথম শ্রেণীর থেকে অনেকটাই নীচ। অপরপক্ষে সংস্কৃতভিজ্ঞ লোক যে 'টিকিয়ারী' অর্ধাচীন পণ্ডিত অর্থাৎ পণ্ডিতমুখই মাত্র, চাকুরী ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, এই মনোভাবও আজকাল অতি ব্যাপক। পূর্বে অন্ততঃ বাংলা ভাষার দিক থেকে সংস্কৃতের অবস্থা প্রয়োজনীয়তাস্বীকার করা হ'ত, কারণ সংস্কৃতকেই বাংলার মূল-ভিত্তি বা প্রাণশক্তি বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করতেন না। কিন্তু সম্প্রতি হয়েছে আর এক নূতন বিপদ—বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকগণ সংস্কৃতকে আর কোন মতেই বাংলার মূলভিত্তি বলে মেনে নিতে রাজী নন। উপরন্তু, বাংলা যে সর্বপ্রকারেই সংস্কৃত-নিরপেক্ষা, সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাষা, তাই প্রমাণ করতে তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এমনকি, আজকাল বাংলা লিখতে গেলে (দর্শন প্রভৃতি নিগূঢ় বিষয়েও) অতি সাবধানে লিখতে হয় শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দাদি যথাসম্ভব পরিবর্তন করে, না হলেই সর্বনাশ। 'পণ্ডিত কচকচি' নামে তা অশেষ নিন্দাভাজন ও সর্বজনবর্জনীয় হবে। এই ভাবে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু উভয়ের অহেতুক আক্রমণে উদ্যস্ত জননী দেবভাষা হয়ে পড়েছেন একেবারেই 'একঘরে'।

সুতরাং বর্তমানে যে সংস্কৃত পড়ে আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক সম্মানের বিন্দুমাত্র আশা নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেইজন্যই যে প্রবেশিকা স্তরেও পর্যাপ্ত সংস্কৃতকে সম্পূর্ণ ইচ্ছামূলক করতে হবে, সেও ত কোন স্নায়ুজির কথা নয়। স্নায়ুজির কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে, সংস্কৃত পাঠে চাকুরী ও যশের আশা নেই বলে সংস্কৃতকেই সমূলে উছিন্ন না করে, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তন ও উন্নতি করা উচিত যাতে সংস্কৃতভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অগ্রাঙ্ক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক অগ্রবিধা ভোগ করতে না হয়। সংস্কৃত শিক্ষাকে যদি অগ্রাঙ্ক সব দিক থেকে অত্যাৱশ্যক বলেই গ্রহণ করা হয়, তা হলে বর্তমানে সমাজ তাকে কোনই মর্যাদা দিচ্ছে না এই ওজুহাতে তার মর্যাদা আরও কম করবার চেষ্টা না করে সে যাতে পূর্বে সম্মান ফিরে পায় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

এখন আমাদের এই প্রধান প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে—বর্তমান যুগেও অগ্রবিস্তার সংস্কৃত জ্ঞান অন্ততঃ সকল হিন্দুর পক্ষেই অত্যাৱশ্যক কিনা। জানি, অনেকেই এ কথায় শিউরে উঠবেন জানি, সকলের মাঝখানে আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ চাপা

পড়ে যাবে, তবুও সেই ক্ষীণকণ্ঠেই আমরা যথাসম্ভব জোরেরেই বলব যে, সংস্কৃত পাঠ আমাদের পক্ষে অতি মঙ্গলজনকই শুধু নয়, অত্যাৱশ্যকও। অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করছি :

(১) সংস্কৃতই হ'ল আমাদের যুগযুগান্তব্যাপী প্রাচীন সভ্যতার প্রধান বাহন। 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' প্রভৃতি কথাগুলি আজ লোকের মুখে মুখে, কিন্তু সত্যি 'কৃষ্টি' প্রভৃতির কতটুকু মর্যাদা আমরা দিচ্ছি যখন আমাদের অতি নিজস্ব কৃষ্টিকেই আজ আমরা করছি এই ভাবে অবহেলা? প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আমাদের কৃষ্টির মানেই বা কি থাকবে, তাও ত বোঝা দুস্বর। অবশ্য, কেবল প্রাচীনকেই আঁকড়ে ধেকে, কেবল বিগত সুখ-সৌভাগ্যের জগৎ হা-হতাশ করেই আমাদের জীবনটা কাটুক, এ কথা বলা আমাদের একবারও উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের ও ব্যবসায়ের যুগের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু অপর দিকে, প্রাচীনকে কেবল প্রাচীন বলেই ঘৃণা ও ত্যাগ করাও চরম নিবৃত্তিতা সন্দেহ নেই। বিশেষ ভাবে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে কেবল 'মৃত' ভাষা বলে অবহেলা করার চেয়ে অগ্রাঙ্ক আর কিছুই হতে পারে না। কারণ, সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য জগতে দ্বিতীয় আর নেই। দেশে সংস্কৃতের আদর না থাকলেও, কতিপয় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের অক্লান্ত উদ্যমে যে সব সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে, তার সংখ্যাও কম নয়, লক্ষাধিক ত হবেই। এ ছাড়া কত লক্ষ সংস্কৃত পুঁথি আজও অমুদ্রিত, অনানুত হয়ে পড়ে রয়েছে; এর চেয়েও অনেক বেশী কত লক্ষ যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারও ত ইয়ত্তা নেই। এই ত গেল সংখ্যার কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের কথা ভাবলেও ঠিক তেমনি বিষয়ে হতবাক হতে হয়। প্রথমে কেবল ধর্ম ও দর্শন বিভাগের কথাই ধরা যাক। বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রাচীন-গৃহ-ধর্ম-সূত্র, যজুর্দর্শন, ব্যাকরণ, শৈব-বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি তাদের ভাষা, ঠিক ইত্যাদি সমেত যে অতি বিশাল, অতি নিগূঢ় সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, তার সঠিক ধারণা করাও কঠিন। বস্তুতঃ, কেবল ধর্ম ও দর্শনেই ভারতের পুণ্যশ্লোক ধর্মীদের যে দান, তার তুলন্য জগতের ইতিহাসেই নেই। এ ছাড়া, অগ্রাঙ্ক অসংখ্য বিভাগেও তাঁদের দান অতুলনীয়—মধা, কাব্য, গল্প, স্মৃতি, পুরাণ, অলঙ্কার, ছন্দ, সমাজতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, অভিধান, শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ, কামশাস্ত্র, এমনকি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকেংশই কালের প্রকোপে আমাদের নিকট থেকে চির বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যা জানা গেছে তার থেকেও জোর করে বলা চলে যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগেই ভারতীয় মনীষীদের দান অতি বিশাল। বস্তুতঃ, সংখ্যার দিক থেকে এরূপ বিপুল প্রাচুর্য, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এরূপ

অনীয় বৈচিত্র্য, ভাবের দিক থেকে এরূপ সুগভীর নিগূঢ়তা, ভাষার দিক থেকে এরূপ মনোহারী মাধুর্য্য পৃথিবীর কোনো ভাষারই নেই। কেবল প্রাচীন বলেই কি এই অপূর্ণ রত্ন-ধনিকে—যা আমরা অতি সৌভাগ্যক্রমে উত্তরাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত হয়েছি—এরূপে অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করতে হবে? আর সব কথা ছেড়ে দিলেও, ‘জ্ঞানের জন্মেই জ্ঞান’ এই দিক থেকেও ত সংস্কৃত পাঠের মূল্য অসীম। যা জাগতিক দিক থেকে মূল্যবান বা অর্থকরী নয়, যা ব্যবহারিক দিক থেকে কার্য্যকরী নয়, তাই যে সম্পূর্ণ অবহেলার যোগ্য—এ মত যে আমাদের ভ্রান্ত বলে মনে হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, কল্যাণ—মানব জীবনের এই তিনটি শাশ্বত প্রেরণা বা উদ্দেশ্য। এদের সাহায্যে যদি ধন-দৌলত, স্বাস্থ্য-যশ প্রভৃতি ব্যবহারিক লাভ হয় তা ভালই, কিন্তু এদের একমাত্র মূল্য কেবল তাতেই নয় নিশ্চয়ই। যথা, দর্শনালোচনায় বা কাব্য পাঠে যে অপাৰ্থিব আনন্দ লাভ করা যায়, তা সাধারণ সংজ্ঞা-দুসারে ব্যবহারিক বা অর্থকরী না হলেও, কে তাকে মূল্যহীন বলতে সাহস করবে? সুতরাং, যা তত্ত্বীয় বা অব্যবহারিক (theoretical), যা ব্যবহারিক, বা দৈহিক ও পার্থিব প্রয়োজনের সাধক (practical) নয়, তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। সেইহেতু সংস্কৃত পাঠ কেবল তত্ত্বীয় দিক থেকে মূল্যবান হলেও, তার অবশুপ্রয়োজনীয়তা কম হ’ত না। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেহাশ্রবান্, মানবের কাছে দৈহিক ও পার্থিব মুখ ও উন্নতিই সর্বটুকু নয়—আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ও উন্নতিও অনেকটা। সেইজন্মেই নানা দেশের দার্শনিক, ধর্ম্মপিপাসু, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ লাভের আশায় আমাদের এই সংস্কৃতের নিকটই যুগে যুগে হাত পাতে লক্ষ্য বোধ করেন নি।

(২) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত পাঠের মূল্য কেবল তত্ত্বের দিক থেকেই নয়, এর একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার দিকও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন এক দিকে ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি উচ্চ, নিগূঢ়, স্বস্বাভিস্ব স্বালোচনাদি আছে, যার সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক, ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্ক অতি অল্পই, তেমনি অল্প দিকে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বহু কার্য্যকরী বিচার বিবরণও আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাই। যথা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, স্থাপত্য, কৃষি, আয়ুর্বেদ, পশু চিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প; নৃত্যগীত, অভিনয়, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলা। সাধারণতঃ, কেবল বিদেশিগণের নয়, আমাদের নিজেরদেরও সংস্কৃত সভ্যতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে যে, এ কেবল তর্ক শাস্ত্রের স্বস্বাভিস্ব ‘কচকচি’ মাত্র, কিন্তু মানব জীবনের প্রাত্যহিক সমস্তা সম্বন্ধে এ সম্পূর্ণ নীরব। এহেতু আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেবল জপতপে কালক্ষেপ করতেন এবং জগৎকে মিথ্যা মাত্রা বলে সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করতেন—দর্শন ও ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকলেও, সাধারণ ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিলেন তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এই ধারণা যে কত দূর মিথ্যা তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা কেবল জ্ঞানীই ছিলেন না, কর্ম্মীও ছিলেন; কেবল সংসারত্যাগী তপস্বীই ছিলেন না, সাম্রাজ্যকামী রাজা ও যোদ্ধাও ছিলেন; কেবল ভাব-বিলাসী কবিই ছিলেন না, রক্ততান্ত্রিক ব্যবসায়ীও ছিলেন। তত্ত্বের দিক থেকে যেমন তাঁরা অতুলনীয় দর্শন ও ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য প্রপঞ্চিত করে গেছেন, ব্যবহারের দিক থেকেও তেমনি তাঁরা বহু প্রয়োজনীয় শিল্পাদি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন। যথা, বাংশাস্ত্রমের “কামসূত্র” অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এতে নারীদের শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে—এর মধ্যে রন্ধন, বেষ্ট্রশিল্প, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), যন্ত্রপরিচালন, স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি বহু কার্য্যকরী বিদ্যা; নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন; মালাগ্রন্থন, কাব্য রচনা, তিলকরচনা প্রভৃতি ললিতকলা ও নানাবিধ ক্রীড়া ব্যায়াম ও যন্ত্রবিদ্যার উল্লেখ আছে। অজ্ঞান গ্রন্থেও এ সবেব উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং, সংস্কৃত সভ্যতা যে সম্পূর্ণ রূপে অব্যবহারিক ও পার্থিব দিক থেকে নিষ্প্রয়োজন, এ ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূতই মাত্র। এ কথা অধীকার করবার উপায় নেই যে, সংস্কৃত পাঠের ব্যবহারিক মূল্যও প্রচুর।

(৩) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিক থেকেও অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাৱশ্যক। আজ পর্যন্ত আমাদের সব ধর্ম্মাচারই—যাগযজ্ঞ, হোমতর্পণ, শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি সবই সংস্কৃতের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। কারণ, পূজার্তনায়, বিবাহাদি শাস্ত্রীয় সংস্কারে উচ্চাৰ্য্য মন্ত্র, পঠনীয় শ্লোক প্রভৃতি বেদ, উপনিষদ, গৃহসূত্র প্রভৃতি থেকেই গৃহীত। কিন্তু সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ আমাদের কাছে এ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছে কতগুলি অৱোধ্য কথার ‘কচকচানিই’ মাত্র। ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অধিকার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার এবং এই অধিকার তিনিই পেতেন যিনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান-কুশল। ভারতীয় নারীরা-জ্ঞানবিজ্ঞানে পেছিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে (নিজেরদের দোষে অবশ্য নয়, সামাজিক অবস্থার প্রকোপে) মন্ত্রোচ্চারণেরও অধিকার হারিয়েছিলেন। আজ আমরা জীপুরুষ নির্বিশেষে হয়ে দাঁড়িয়েছি এই অনধিকারী-দেরই দলভুক্ত। কারণ, মন্ত্রাদির নিগূঢ় অর্থের কথা ত দুয়ে থাক, সংস্কৃত শব্দের সোজা অর্থ পর্যন্ত আজ আমরা বুঝি না। গৃহসূত্রাদির মতে অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করা অতি বোরস্তর পাপ। আমরা কি এই পাপ প্রত্যাহই করছি না? অতএব, মন্ত্র, শ্লোকাদি বুঝবার মত সংস্কৃত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষেই অত্যাৱশ্যক। যদি এই সব ধর্ম্মাচারকে একেবারে বাদ দিতে চান, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি এ সব রাখতে হয় তা ভাল

করেই রাখা কর্তব্য। মন্তাদি অবশ্য বাংলায় অহুবাদ করা চলে, কিন্তু তাতে মূলের গাভীর্ষ ও মাধুর্যের অবশিষ্ট আর কিছুই থাকবে না, স্থানিষ্ঠ।

(৪) পরিশেষে আর একটা কথা সভয়ে নিবেদন করতে চাই, অর্থাৎ বাংলা ভাষার দিক থেকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এককালে যেমন বাংলা না জানাটাই ছিল শিক্ষিত সমাজের প্রধান গর্বের বস্তু, আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃত না জানাটা ঠিক সেই রকম। আজ তাই বহু বাঙালী সাহিত্যিক—তারা যে এক অক্ষরও সংস্কৃত জানেন না এবং কোনও সংস্কৃত নিয়মাদি মানেন না, এই কথা সময়ে অসময়ে প্রচার করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু আমরা ত তাদের এই অহেতুক সংস্কৃত-বিদ্বেষের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। কারণ, যিনি যাই বলুন না কেন, বাংলা ভাষা চিরদিনই সংস্কৃতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সংস্কৃতই বাংলার প্রাণশক্তি। বাংলার অধিকাংশ শব্দই শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বা তার রূপভেদ, বানানও তাই। বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, লিঙ্গ প্রভৃতির নিয়ম আজও বহু ক্ষেত্রে মানা হয়। নবনির্মিত বাংলা পরিভাষা প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত পরিভাষা বা তার রূপান্তর মাত্র। এক্ষেত্রে সংস্কৃতকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন করে বাংলার প্রগতি অসম্ভব। অবশ্য, এ কথা আমাদের বলা উচিত নয় যে বাংলা ও সংস্কৃত এক ও অভিন্ন। অপরাপর ভাষার মত বাংলারও একটি নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে। সব বাংলা শব্দই সংস্কৃত নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক বিভক্তিসম্বন্ধীয় সব নিয়মও বাংলায় সর্বত্র খাটে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এও অবশ্যস্বীকার্য যে বাংলা ভাষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সংস্কৃত ভাষারই আশ্রিত, এবং এই আশ্রয়েই তার গৌরব বর্ধিত ও প্রকৃত প্রগতি সাধিত হবে। বাংলাকে সংস্কৃতের জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী বলেই পরিগণনা করা হয়। মায়ের কাছে সন্তানের ঋণ স্বীকারে যেমন লজ্জার কিছুই নেই, সংস্কৃতের কাছে বাংলার ঋণ স্বীকারেও ভেমনি বাংলার অগৌরবের কিছুই নেই। উপরন্তু এরূপ একটি অতি সযুক্ত ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে বাংলারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। এরূপ সুকঠোর নিয়মবদ্ধ অথচ এরূপ সুমিষ্ট, এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগর্ভ ভাষা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা যদি বাংলাকে শব্দসম্পদে ধনী, ব্যঞ্জনার সুগভীর ও শ্রুতিতে সুমধুর করতে চাই ত সংস্কৃতই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। অতএব বাংলা ভাষা শিক্ষার দিক থেকেও সংস্কৃত শিক্ষার মূল্য সমধিক।

এরূপে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, প্রাত্যহিক ও ভাষাসম্বন্ধীয় প্রত্যেক দিক থেকেই সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজন কম নয়। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রছাত্রী যাতে অন্ততঃ কিছু সংস্কৃত বাধ্যতামূলক ভাবেই শেখে তার ব্যবস্থা রাখা

প্রয়োজন। এক্ষণে প্রবেশিকা পর্যায় সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক বিষয় রূপেই রাখা কর্তব্য। অবশ্য, প্রবেশিকা পর্যায় যে সংস্কৃতজ্ঞান ছাত্রছাত্রীরা লাভ করে, বিশাল সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনায় সে অতি সামান্য। কিন্তু অন্য সব বিষয়ের সম্বন্ধেও ত সেই একই কথা খাটে। একবার ভাল করে 'গোড়াপত্তন' করিয়ে দিতে পারলে, অনেক ছাত্র-ছাত্রীই পরে দেখায় আরও বিশদভাবে সংস্কৃতচর্চায় অবহিত হবেন, নিঃসন্দেহ।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, এমন করে জোর করে শেখান, ধরে বেঁধে গেলানর কোন সার্থকতা নেই—সংস্কৃত না হয় ইচ্ছামূলকই রইল, যার সেদিকে প্রাণের টান আছে, সে তা দেখাতেই নেবে। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে ইংরেজী বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিকেই বা বাধ্যতামূলক করার দরকারটা কি? অনেক ছাত্রকেই ত অঙ্ক বা ইতিহাস প্রভৃতি বেঁধে ধরেই শুধু নয়, মেরে ধরেও শেখাতে বা গেলাতে হয়। একই ভাবে সংস্কৃতশিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে, ছাত্রছাত্রীদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলকই রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতকে ছাত্রপ্রিয় করবার চেষ্টাতেও অবিলম্বে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। অত্যাশ বিষয়ে যেমন নানারকম বিজ্ঞানসম্মত, উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন করা হচ্ছে, সংস্কৃতেও অবিলম্বে তাই করা উচিত। তা হলে যে সংস্কৃতের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিরাগ বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে, সমাজেও যাতে সংস্কৃতের সম্মান ও অর্থ-নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা কর্তব্য। তা হলেও আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। যা হোক, এই সব ব্যবস্থা সময় ও ব্যয়সাধ্য—বর্তমানে অল্প সময়ে হবার আশা নেই। কিন্তু সেজ্ঞ ছাত্রছাত্রী ও সাধারণের বিরাগ ও তাচ্ছিল্যের ওজুহাতে যদি আজ সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয়ে মাত্র পর্যাবসিত করা হয়, তা হলে বর্তমান অবস্থায় সংস্কৃতের পঠনপাঠন যে বাংলা দেশ থেকে অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেটা যে হবে জাতির পক্ষে কত বড় দুর্ঘটনা, তা বলা অসম্ভব। বিশেষতঃ, এই বাংলা দেশই ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অত্যন্ত প্রধান গুণ্ডরূপে সেই কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহন সংস্কৃতকে চিরকাল অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীদের দান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। বিখ্যাত বৈদিক ঋষি দ্বীর্ঘতমা, সাংখ্যদর্শন প্রবর্তক মহামুনি কপিল, বৈশেষিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ত্রীধর, সুবিখ্যাত মীমাংসকার ভবদেব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব, তাত্ত্বিকগণ, নব্যচ্যায়কারণ, নব্যস্মার্তবুদ্ধ, বহু বৈষ্ণব ও শৈব লেখক, প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ-প্রণেতা চক্রপাণি, বিখ্যাত ছন্দকার গঙ্গাদাস, শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যকার জয়দেব, প্রাচীন দূতকাব্যকার

ধোয়ী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বাঙালী। এমনপে বাঙালীরা চির-কালই ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষায় অগ্রণী, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বহু বিভাগই তাঁদের অতুলনীয় দানে পরিপুষ্ট হয়েছে। দেব-ভাষাপূত সেই দেশ থেকে যে আজ সংস্কৃতের পঠনপাঠন ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে ছুংখের বিষয় আর কি

হতে পারে? সেজ্ঞ আমরা দেশের সব সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে ইচ্ছামূলক বিষয় মাত্রে পর্য্যবসিত করে বাংলা দেশে সংস্কৃত শিক্ষায় মৃত্যুবাণ না হানেন।

পদ্মলোচন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

নূতন চাকরটাকে নিয়ে মহা বিপদেই পড়া গেল। ভাল করে কথা বোঝে না, বোঝবার কোন চেষ্টা যে আছে, তাও মনে হয় না।

চাকরটার নাম পদ্মলোচন। লোচন-পদ্মের মত ত নয়ই, বরঞ্চ একে 'কুং-কুতে' বলা যেতে পারে, এ বললে অত্যাঁও হয় না। অত্যন্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছুটি চোখ। চোখের জ্রু অতিশয় সরু এবং অস্পষ্ট। কষ্ট করে দেখলে, তবে নজরে পড়ে।

পদ্মলোচনের ছুটামি বুদ্ধিরও অন্ত নেই। বাড়ীর বি-শঙ্করী এবং বাবুন হরিঠাকুরের সঙ্গে সময়ে-অসময়ে ঝগড়া করা ওর একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। একটা না একটা ছুতো করে ওদের পেছনে লাগে।

সেদিন শঙ্করী বাবুন মেজের রোম্বাকের ওপর ঘুরে রাখছিল আর পদ্মলোচন পরিষ্কার ফর্সা নেকড়া দিয়ে সেগুলো মুছে রান্নাঘরে পৌঁছে দেবার জেতে প্রস্তুত হচ্ছিল। এক সময়ে ও হঠাৎ বলে উঠল, হঁ! বাবুন মেজেরে। গতরটাই যা দেখতে। কাজের বেলায় কিছু নয়। বাবুন মাজা বলে একে? সর্কড়ি তো কড়-কড় করছে।

কথাটা শঙ্করীর কানে গেল। কলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পদ্মলোচনের পুানে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে, বললে—কি বললি?

পদ্মলোচন তৎক্ষণাৎ বললে, যা বলবার তা বলেছি। কিন্তু তুমি যে বড় চোখ পাকিয়ে কথা বলছ। কেন, মারবে নাকি?

শঙ্করীর তুলনায় পদ্মলোচন বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট। শঙ্করী বললে, মারতে পারি নে মনে করেছিস? ঐ তো তোর হাড়িগিলের মত চেহারা। এক চড়েই মুণ্ডু পারি ঘুরিয়ে দিতে। বাবনে সর্কড়ি কড়-কড় করছে। মাজ না তুই বাবন হত-ভাগা।

ওদিকে রান্নাঘরের মধ্যে হরিঠাকুর তখন ছোট পিঁড়েটা একটা তাক থেকে পেড়ে নিয়ে বসবার উপক্রম করছিল। শঙ্করীর কথা শুনে ফিক করে নিঃশব্দেই একটুখানি হাসল। বললে, শঙ্করী ঠিকই বলেছ। কাল থেকে পদ্মলোচনকেই বাবন মাজতে দিও। আর ওর কাজটা তুমিই করো।

শঙ্করী এবং হরিঠাকুরের মধ্যে মনে হয়, একটা ত্রীতির ভাব আছে। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। আমার বাড়ীতে ওরা দু'জনেই বহু বছর ধরে কাজ করে আসছে। সেইজন্মে ঐ নূতন চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে শঙ্করী হয় হরিঠাকুরের পক্ষ নেয়, নয়তো হরিঠাকুর শঙ্করীর হয়ে চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া করে। ফলে দেখা যায়, পদ্মলোচনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে ওঠে। বেচারী একা আর কৃতক্ষণ এদের ছ'জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে?

পদ্মলোচন কিন্তু হরিঠাকুরের কথা শুনে নিরতিশয় অপ্রসন্ন এবং জুঁজ হয়ে উঠল। ছ'হাত ছ'দিকে প্রসারিত করে বললে, তুমি ধাম হরিঠাকুর, তোমায় তো কোন কথা বলি নি।

হরিঠাকুর গিঁড়ির ওপর ভাল করে বসে বিহ্বল হয়ে বললে, ধামব? কেন ধামব শুনি? তুই তো সেদিন চুকে-হিস্ এ বাড়ীতে। আমরা এখানে ক'বছর আছি জানিস? দশ বছর। দশ বছর এখানে কাজ করছি। ওর হয়ে কথা বলব না তো তোর হয়ে কথা বলব?

পদ্মলোচন বাবনের বোকা বয়ে রান্নাঘরে নিয়ে আসতে আসতে হরিঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, ঠাকুর, বেশী বক্ব করো না বলছি। রাগলে রক্ষা থাকবে না। রাগলে একেবারে জাত কেটে।

শঙ্করীর এতক্ষণে বাবন ধোয়া শেষ হয়েছে, সে চৌবাচ্চার ছিঁদের নেকড়া ঝুলতে ঝুলতে পদ্মলোচনকে লক্ষ্য করে বললে, এখানে মরতে এসেছিস কেনে হতভাগা? যা না, দেশের জঙ্গলে।

শঙ্করীর স্বেষোক্তি শুনে রাগের মাধ্যম পদ্মলোচন ছম্ করে রান্নাঘরের এক কোণে হাতের বাবনগুলি নামিয়ে রাখলে। তারপর শঙ্করীর দিকে মুখ করে রক্তচক্ষে বললে, ভাল হবে না কিন্তু শঙ্করীদি, আমার পেছনে লাগা?

ওদের দু'জনের ঝগড়ার মধ্যে, ওদিকে হরিঠাকুর বাবন-গুলো কখন না-জানি শুঁছিন্তে দেয়ালের ধারে রাখছিল। হঠাৎ একখানা ঝালার দিকে নজর পড়ায় সে শঙ্করীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, ঝালাখানা ফাটলে কে?

চৌবাচ্চায় নূতন নেকড়া লাগিয়ে শঙ্করী সোজা হয়ে

দাঁড়াল। হরিঠাকুরের দিকে মুখ করে বললে, থালা ফেটেছে? তা হলে ওটা পদ্মলোচনেরই কাজ। বাসনগুলো রাগের মাধ্যম ও-ই তো একটু আগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

হরিঠাকুর শঙ্করীর কথা সমর্থন করল। গাল ফুলিয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললে, তাই তো। এ তো পদ্মলোচনেরই কন্ম দেখছি। বাবা, পদ্মলোচন। এবার চল দেখি গিন্নীমার কাছে। চল, শেষে হয়তো আমাদেরই ছুঁকনের ওপর দোষ পড়বে।

এই বলে হরিঠাকুর সত্য সত্যই পদ্মলোচনের একখানা হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে লাগল ওপরে।

বারান্দায় চেয়ারে বসে ওদের ঝগড়া শুনছিলাম। কি, চাকর আর ঠাকুরের ঝগড়ায় কোন দিনই আমি কথা বলি নে। চাকরটা আমার এখানে মাস তিনেক হ'ল এসেছে। পূর্বে কোন জায়গায় কাজ করে নি। আমার এখানেই হাতেখড়ি। বয়স বছর বাইশের বেশী নয়। আমাদের পাড়ায়ই বাজার, কিন্তু দোকানগুলো এখনও ভাল করে চেনে না। বোকা, কিন্তু বোকাই আমার ভাল। আমার যেমন পদ্মলোচনের ওপর একটা মায়্যা পড়ে গিয়েছে, গৃহিণীরও তদ্রূপ। ধর মুহুর্তে বললে, পদ্মলোচন বালুতি বালুতি জল ঢেলে সারা ঘরখানায়ই নদী-নালা বইয়ে দেয়। জামা লগ্নীতে কাচতে দিয়ে আসতে যদি ওকে বলা হয়, তবে ও জামার পরিবর্তে সজ-পাতা পরিষ্কার ধুবধে চাদরখানা ধুবমাগুম তুলে নিয়ে সেখানে দিয়ে আসে। কাপড় ছাড় থেকে তুলে, কুঁচিয়ে রাখতে বললে, পদ্মলোচন কলে গিরে শুকনো কাপড় ভিজিয়ে এনে আবার শুকোতে দিয়ে আসে। এমন সব অনাস্থা কাণ্ড ওর। গৃহিণী এসব সহ করতে পারেন না। অত্যন্ত তিরস্কার করেন, কিন্তু তিরস্কার করে নিজেই ব্যথিত হয়ে পড়েন।

তা যাই হোক, হরিঠাকুরে টানতে টানতে পদ্মলোচনকে আমার স্নমুখেই এনে হাজির করল। বললে, থালাখানা পদ্মলোচন আছড়ে ভেঙেছে বাবু।

আমি কথা বলবার পূর্বেই গৃহিণী ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি বলতো, ঠাকুর? খেটে-খেটে একটুখানি শুয়ে ছুঁ চোখ বুজবারও উপায় নেই তোমাদের জন্যে? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে। দিনরাত্রি খালি ঝগড়া আর ঝগড়া। বাড়ী থেকে লক্ষ্মী ভাড়াবার মতলব?

হরিঠাকুর ধমক খেয়ে একটা টোক গিলে বললে, আমার কোন দোষ নেই গিন্নীমা। ঐ পদ্মলোচনটাই যত নষ্টের গোড়া। খালি শঙ্করীর পেছনে লাগে।

পদ্মলোচন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শঙ্করীর পেছনে লাগি? কেন লাগব না শুনি? একশ বার লাগব। বাসন মাছে, না ছাই। শুধু একবার হাতখানা বুলিয়েই, জল দিয়ে ধুয়ে তুলে দেয়। বলব না? বেশ করব, বলব।

হরিঠাকুর গৃহিণীর মুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করে বললে দেখলেন, কথার রকমটা একবার দেখলেন গিন্নীমা?

—দেখছি।

এই বলে গৃহিণী মুখ ফিরিয়ে চাকরটার দিকে চাইলেন। বললেন, তুই হতভাগা ওদের সঙ্গে লাগতে যাস কেন বলত?

পদ্মলোচন মুখভার করে বললে, আমি লেগেছি নাকি? গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন। বললেন, কের মিথ্যে কথা? এই তো তুই বললি, একশ বার লাগব।

—আজ্ঞে, একশ বার লাগব বলেছি নাকি গিন্নীমা।

হরিঠাকুর বললে, মিথ্যে কথা। আমাদের সঙ্গে ও একটা না একটা ছুতা করে ঝগড়া করে। ওকে মানা করে দিন গিন্নীমা। আজকে ঝগড়ার মাধ্যম, রাগ করে আপনার ভাত খাবার থালাখানাই ভেঙে ফেলেচে। নিয়ে আসব, দেখবেন?

এই বলে সে অমুমতির অপেক্ষামাত্র না করেই ঝড়ের বেগে ধর থেকে বেরিয়ে গেল।

শঙ্করী আর হরিঠাকুর মনে মনে ভেবেছিল—ঐ থালাখানাকে কেন্দ্র করে পদ্মলোচনের তিরস্কার এবং লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। বস্তুতঃ ওরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। ওরা এ বাড়ীতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে। কিন্তু দেখা-যাচ্ছে পদ্মলোচনেরই জোর বরাত। তাই ওরাও মনে মনে তাকে হিংসা করে।

কিন্তু পদ্মলোচনকে তিরস্কার বা লাঞ্ছনা কোনটাই ভোগ করতে হ'ল না। এদের নালিশ সত্ত্বেও আসল ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে গৃহিণীর দেরি হ'ল না। শঙ্করীকেও কিছু বললেন না। শুধু আর একখানা থালা কার্ঠার সিঁদুক খুলে বের করে দিলেন।

দিন কয়েক পরে, একদিন ছুপুরে বিছানার শুয়ে কাগজ পত্র দেখছিলাম। এমনই সময়ে হঠাৎ পদ্মলোচন কঁাদতে কঁাদতে আমার ঘরে ঢুকল। ওকে এই অবস্থায় আশা করি নি। বললাম, কি রে কি হ'ল?

পদ্মলোচন হাউ-মাউ করে কঁাদে উঠল, বললে—আমার চৈতন কেটে নিয়েছে বাবু।

এই বলে ও আমার দিকে পিছন ফিরে মাথাটা দেখালে। সত্যি তো! বেচারার অমন সাধের শিবাটির মধ্যে দিয়ে কে কাঁচি চালিয়ে দিয়েছে। হাসি পেল, কিন্তু হাসি চেপে ধর করলাম, কে তোমার টিকি কাটলো রে?

পদ্মলোচন সেই ডাবেই কঁাদতে কঁাদতে বললে, শঙ্করী-দিদি কেটে নিয়েছে, বাবু।

—কি করে কাটলো?

—কাঁচি দিয়ে বাবু।

কাঁচি দিয়ে টিকিটা কেটে নিয়ে গেল, আর তুমি চুপ করে রইলে?

—কি করব বাবু। আমি কি জানতে পেরেছিলাম?

ঘুমছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি হাতে একটা কাঁচি, শঙ্করীদিদি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলাম ওর হাতে চুলের গোছার মত কি একটা। তখন উঠে বসে মাথার হাত দিয়ে দেখলাম—আমার চৈতন নেই। কি সর্বনাশ হ'ল বাবু। আমার মানত করা চৈতন।

—মানত করা চৈতন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু। মানত করা চৈতন। বাবা তারকনাথকে দেবার চৈতন। আজ পাঁচ বছর ধরে রেখে আসছি, বাবু। আমার কি সর্বনাশ হ'ল বাবু।

টেচামেটি শুনে গৃহিণী ছুটে এলেন ঘরে। বললেন, কি হ'ল রে, পদ্মলোচন? টেচাচ্ছিস কেন?

পদ্মলোচন গৃহিণীর পায়ে নীচে বসে পড়ল। ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বললে, আমার চৈতন নেই।

—চৈতন নেই?

গৃহিণী আমার দিকে চাইলেন।

হাসি গোপন করে ব্যাপারটা খুলে বললাম।

শুনে গৃহিণী হাসি চাপতে পারলেন না।

পদ্মলোচনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাতে আর হয়েছে কি বাবা? চৈতন গেছে, আবার হবে। এবার আরো বড় করে চৈতন রেখ। বাবা তারকনাথ তখন ডবল চৈতন নিয়ে, তোমায় আশীর্বাদ করবেন।

পদ্মলোচন হাতের উণ্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, তা কি হয়, গিরিমা। কিন্তু আমি আর এখানে থাকব না। আমার মাইনে দিন চুকিয়ে। শঙ্করীদিদি আপনাদের পুরনো লোক, আপনাদের আদরের। আমার চৈতন গেল অথচ ওকে আপনারা কিছু বললেন না।

এবার হাসলাম। বললাম, আচ্ছা তুই এখন যা। শঙ্করীর বিচার পরে হবে। তুই যা।

—আমার মাইনে, বাবু?

ধমক দিলাম। বললাম, ধাম হতভাগা। টিকির জন্মে তুই চাকরি ছাড়বি? যাবি কোথায় শুনি? দেশে? দেশ তো দুর্ভিক্ষে ছারেখারে যাবার জোগাড়। খাবি কি?

পদ্মলোচন মাথার পিছনে হাত বুলোতে বুলোতে নিঃসঙ্কোচে বললে আজ্ঞে বাবু, দেশে যাব না তো। দেশে যাব কার টানে? কেউ তো নেই। অজ জায়গায় কাজ করব বাবু।

আমি কথা বলবার পূর্বেই গৃহিণী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, পাখা গজিয়েছে তোমার। কাজ শিখে এখন অজ স্থানে কাজ করব বাবু। আশ্পর্কী বেড়েছে।

গৃহিণীর এই তিরস্কার শুনে পদ্মলোচন ক্ষণকাল নীরবে আনত মুখে বসে থেকে হঠাৎ এক সময়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার চৈতন গেল এখানে থেকে আর করব কি, গিরিমা? আমি এখুনি চললাম। আমায় শুধু তারকে ঘরে যাবার ভাড়াটা দিন।

বললাম, তারকে ঘরে কি করতে যাবি?

—মাথার চুল দিয়ে আসতে। চৈতন গেছে—মাথার চুল নিয়ে বাবা তারকনাথ যদি ভুঁই হন।

বেটার বুদ্ধির দৌড় দেখে চুঃখ হ'ল, হাসিও পেল। বললাম, আচ্ছা, তাই না হয় দেওয়া যাবে'ধন। এখন তুই একবার বাজারে যা, দেখি। বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

এই বলে একটা টাকা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

পদ্মলোচন কোন আপত্তি করল না। টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চলে গেলে ওরই কথা ভাবতে লাগলাম। যেমন বোকা তেমনি অকর্ম্মা পদ্মলোচন তবুও ওর ওপর কেমন একটা মায়্যা পড়ে গিয়েছে। শঙ্করী এবং হরিঠাকুর আমার এখানে বহুদিন যাবৎ কাজ-কর্ম্ম করে আসছে কিন্তু ওদের ওপর এমন মায়্যা তো হয় নি। ওরা কাজের লোক, কাজ করে ভাল। পদ্মলোচন কাজের পরিবর্তে অকাজই করেছে। তব্রাচ ওকেই যেন বেশী ভাল লাগে। বোধ হয় ওর সরলতার জেই ওকে এমন ভাল লাগে।...

চৈতন কাটা যাওয়ায়, দিনকয়েক শঙ্করী এবং হরিঠাকুরের সঙ্গে পদ্মলোচন কথা কয় নি। এখন আবার একটু একটু করে কথাবার্তা চলতে লাগল।

* * *

টিপ-টিপ করে সেদিন বেলা বারোটার পর থেকে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল। শঙ্করী যখন কাছে এল, তখন বেলা ছোটো। বৃষ্টি তখনও ধামে নি। বরঞ্চ বৃষ্টির কৌটা পূর্বের চেয়ে আকারে বড় বলা যেতে পারে। পদ্মলোচন বাসন মাজার শব্দ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, শঙ্করীদিদি, ভিক্ষে ভিক্ষে বাসন মাজছে। সন্ধিতে তো গলার স্বর ভেঙে গেছে। শেষে জরে পড়বে?

শঙ্করী ফিক করে একটু হাসল। বললে, ওরে বাসরে! দরদ যে উথলে পড়ছে গো! এত দরদ কোথায় ছিল? মাজ না তুই বাসন। দেখি, তোর দরদটা সাজা কিনা।

—পারি না? নিশ্চয় পারি। উঠে এস তুমি।

শঙ্করী বাসন মাজতে মাজতে বললে, থাক! ঐ ভাল। আর বাসন মাজতে হবে না। বাবুর পেয়ারের চাকর। অত কষ্ট করতে দেখলে, এখুনি বাবু বকাবকি করবেন।

পদ্মলোচন দাঁড়িয়ে ছিল সিমেন্ট করা চাতালটার ওপর। এবার তারই এক পাশে বসে পড়ল। বললে, সত্যি, বাবু আমায় খুব ভালবাসেন। সেদিন তুমি আমার তারকনাথের মানত করা চৈতনটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে পালালে বাবুর কাছে কেঁদে পড়লাম আমি। উনি আমায় দয়া করলেন। গত সোমবার দিন বটা করে আমার কাটা চৈতনের কল্যাণে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো পাঠিয়ে দিলেন।

আমি যেতে চাইলাম। গিন্নীমা রাজী হলেন না, বললেন—
তুই পথ-খাট চিনিস নে। শেষে কি হারিয়ে যাবি ?

শঙ্করী আবার হাসল। বললে, কি বরাত করেই না তুই
এ-বাড়ী চুকেছিলি। তোর চৈতন কেটে নিয়ে গেল ইঁহুরে,
ঘুমের ঘোরে তুই হতভাগা সব দোষ চাপালি আমার ঘাড়ে।
আমি বহুনি ধৈর্যে মরসুম। তুমি হচ্ছ কর্তাগিন্নির আছুরে
চাকর। তোমার জন্তে তারকনাথে ঘটা করে পুজো পাঠানো
হ'ল। সত্যি বলছি পদ্মলোচন, তোর মত বোকা যদি
হতুম।

পদ্মলোচন সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, ইঁহুরে চৈতন
কেটে নিয়েছে মানে ?

—ইঁহুরেই তো কেটেছে।

—হঁ, ইঁহুরে কেটেছে। কেটেছে তুমি। আমি নিজের
চোখে দেখলাম।

—ছাই দেখেছ। বগে এখানকার ইঁহুরগুলো ঘুমিয়ে পড়া
মাহুষের ঠ্যাং পর্য্যন্ত কামড়ে ধরে।

পদ্মলোচন কণাটা বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে,
বেং। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নে।

—না করলি তো বয়েই গেল।

এই বলে শঙ্করী পুরু পুরু ঠোট ছুঁনি ঈষৎ প্রসারিত
করল।

এর পর মিনিট কয়েক নীরবতায় কেটে গেল।

একসময়ে পদ্মলোচন বলে উঠল, শঙ্করীদিদি, তোমার
বাসাটা কোথায় গো ?

শঙ্করী বললে, কেন বল দেখি।

পদ্মলোচন জবাব দিলে, মাহুষের অস্থ-বিস্থ আছে ত।
ধরো তোমার হ'ল অস্থ। তুমি কান্ন করতে এলে না। তখন
তোমার বাসাটা জানলে আমি খোঁজ-খবর নিতে পারি ত ?

—ওঃ এই। বলে শঙ্করী আবার দাঁত বের করে
নিঃশব্দেই হাসল।

—হাসছে যে ?

—এমনি। হাসি পেল, তাই হাসছি। দেখ পদ্ম, তুই
অসম্ভব বোকা। এত বোকা মাহুষের কলকাতায় না আসাই
উচিত ছিল।

এই বলে শঙ্করী ঝাঁটা দিয়ে উঠানের জল নর্দমার দিকে
ঠেলে দিতে লাগল।

দিন পনেরর মধ্যেই পদ্মলোচনের বেশ কিছু পরিবর্তন
দেখা গেল। আগে ছোট-ছোট চুল ছিল মাথায়। এখন
বড় বড় চুলের মধ্যখান দিয়ে লম্বা টেরী কাটে। চৈতনের
বালাই আর নেই। পূর্বে যে ওর চৈতন ছিল, এখন তা
বুঝা যায় না। আগে সব সময়েই ওকে বাড়ীতে পাওয়া যেত।
এখন কান্নের সময়েও দেখা পাওয়া যায় না। হট করে
গিয়ে উঠে শঙ্করীর বাড়ীতে। পদ্মলোচন আবার সুর

ভাঁজতেও সুর করে দিয়েছে। কান্নে-অকান্নে ওর মুখে গানের
সুর শোনা যায়।

সেদিন বাইরে বেরিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি পদ্মলোচন
ড্রেসিং টেবিলের স্রুখে গদীমোড়া চেয়ারটার ওপর বসে,
আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে, পাউডার মাখছে। ফিটকাট
জামা কাপড়। ভাল করে নিরীক্ষণ করলুম। পাঞ্জাবী
এবং ধুতি আমারই। কাল লণ্ডী থেকে আনিয়ে চেয়ারটার
ওপর রেখেছিলুম। তুলতে বোধ করি গৃহিণীর খেয়াল হয়
নি। কান্নের চাপে ভুলে গেছেন মনে হ'ল।

নিঃশব্দে ধরে চুকেই বজ্রগভীর সুরে ডাকলুম, পদ্মলোচন ?
পদ্মলোচন অকস্মাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইল এবং পর-
মুহুর্তেই চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ্ঞে ?

—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা কোথাকার। এ কি হচ্ছে তুমি ?
পদ্মলোচনের লজ্জা হওয়া ত দূরের কথা, দাঁত বার করে
হাসতে লাগল। বললে, কি বাবু ?

বলেই চোখ নীচু করে নিজের দেহের ওপর দিয়ে একবার
চোখ বুজিয়ে নিলে। বললে, আজ্ঞে বাবু, আজ শঙ্করীদিদি
নেমস্তন করেছে কি না। ওর বাড়ীতে খেতে হবে। আমার
জামা-কাপড় একেবারে ছেঁড়া, বাবু। তাই, আপনার ধুতি
আর পাঞ্জাবী পরেছি।

কণাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার ডান হাতখানা
পদ্মলোচনের শীর্ণ গালের উপর বজ্রের মত গিয়ে পড়ল।
সে প্রচণ্ড চপেটাঘাত ও বরদাস্ত করতে পারলে না। ছিটকে
গিয়ে পড়ল ওদিককার দরজার ওপরে এবং খোলা একখানা
পাল্লার খোঁচায়, চক্ষের পলকেই পদ্মলোচনের কপালের এক
পাশ কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

রাগের মাথায় এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলাম। শেষে ডাক্তার
ডাকতে হ'ল, ঔষধ দিয়ে কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ল,
আচ্ছা এক ফ্যাসাদে পড়া গেল।

এই প্রহারের তাড়সে পদ্মলোচনের জ্বর এল। খুব
জ্বর।...

শঙ্করী একদিন পদ্মলোচনের ঘরে চুকে তার শিয়রের
পাশে বসল। বললে, পদ্ম, এখন কেমন আছিস ?

পদ্মলোচন লেপের ভিতর থেকে মুখটা বের করে, চিঁ চিঁ
করে বললে, ভালই আছি। শঙ্করীদিদি তবু ভাল যে তুমি
আমায় দেখতে এলে।

শঙ্করী ওর গায়ের লেপটা সরিয়ে একপাশে রাখলে।
বললে, লেপ গায়ে দিয়ে পড়ে আছিস কেন ? শীত করছে ?

—এখন করছে না। আগে করছিল।

শঙ্করী সে কথার জবাব দিলে না। শুধু ওর মুখের দিকে
একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

পদ্মলোচন বললে, অমন করে কি দেখছ, শঙ্করীদিদি ?
শঙ্করী চোখ ফিরিয়ে অল্প দিকে চাইলে। একটা ক্ষুদ্র

নিঃশ্বাস ওর বুকখানা মথিত করে বাইরে বেরিয়ে এল।

বললে, তুই কত রোগী হয়ে গেছিস পদ্ম।

—রোগী? কই না তো।

—না হলেই ভাল।

কিছুক্ষণ চূপ চাপ।

—পদ্মলোচন বললে, লেপটা গায়ে দিয়ে দেবে, শঙ্করীদিদি?

—কেন, আবার নীত করছে?

—হ্যাঁ।

শঙ্করী ভাল করে লেপটা চাপা দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসল। বললে, তুই ভাল হয়ে ওঠ পদ্ম, তোকে আমি পয়সা খরচ করে ‘নদের নিমাই’ যাত্রা শোনাব।

—সত্যি? সত্যি বলছ, শঙ্করীদিদি?

—হ্যাঁ রে সত্যি কথা।

পদ্মলোচন নিরুত্তরে শুধু লেপটা ওপর দিকে একটু টেনে নিলে।

ক্ষণকাল পরে পদ্মলোচন বললে, পা ছুটো যেন দেহ থেকে বসে যাচ্ছে, শঙ্করীদিদি। অসহ্য কামড়ানি।

—পা কামড়াচ্ছে? টিপে দেব?

এই বলে শঙ্করী উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করে পদ্মলোচনের পা টিপে দিতে লাগল।

পদ্মলোচন হাঁ হাঁ করে উঠল। বললে, কর কি শঙ্করী-দিদি? আমার পায়ে হাত দিও না।

শঙ্করী সে কথায় কণপাতও করল না। পদ্মলোচনের পা টিপে দিতে দিতে বললে, তা হোক, তুই এখন চূপ করে শো' দেখি। অনেকক্ষণ বকর-বকর করছিল। এখন একটু ঘুমা।

এই সময়ে হরিঠাকুরের পারের খড়মের শব্দ একটু একটু করে ঘরখানার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল এবং ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, সে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ভিতর পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে তখনই রাগে ফুলতে ফুলতে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিকেই মুখ করে ফিরে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার পর টেম্পারেচার নিতে এসে দেখি, তখনও শঙ্করী বিছানার এক পাশে বসে পদ্মলোচনের পদসেবা করছে।

বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী ছুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের বিভীষিকা দেখিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর সবেমাত্র শেষ হই-
য়াছে, কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৃতীয় মহাসমরের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি প্রবাল-বলয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম আণবিক বোমার যে জম্বীকালো মহড়া হইয়া গেল ইহা ঘনায়মান তৃতীয় মহাযুদ্ধের কৃষ্ণছায়াই সূচনা করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে বিয়ান্নিশটি ছোটবড় জাতি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি সনদ সই করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও পৃথিবীর পরাধীন, পরতন্ত্র ও পরপদানত জাতিগুলির মনে এই সনদের স্বায়িত্ব এবং পরিণাম সম্বন্ধে যথেষ্ট অশঙ্কা ও সন্দেহ জাগিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনিভা সম্মেলন, জাতি-সম্মেলন, নিরস্ত্রীকরণ-সভা, কেলগ্-প্যাক্ট প্রভৃতির শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিয়া সানফ্রান্সিস্কোতে রচিত সনদের পরিণাম সম্বন্ধেও মনে সংশয় জাগিলে কোন দোষ দেওয়া যায় না। এবারও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা-সভাগুলিতে এবং প্যারিসে আহুত শান্তি সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের (আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়া) মতিগতি দেখিয়া বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে বোর সন্দেহই জাগিতেছে। যতদিন প্রবল

প্রতাপশালী প্রবান রাষ্ট্রগুলির পররাজ্যলোলুপতা, সাম্রাজ্যবাদী নীতি, লুণ্ঠন, শোষণ ও পীড়নের ছদ্মবেশে দুর্বল জাতিগুলির উপর অছিগিরি, কৃষ্ণকায় জাতিগুলির প্রতি ধ্বংসাত্মক জাতি-গুলির তথাকথিত ভগবদ্ভক্ত দায়িত্ব প্রভৃতি হীন স্বার্থকল্পবিত উগ্র সাম্রাজ্যবোধ বিদ্যমান থাকিবে তত দিন পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা যুথ। বৃহৎ শক্তিদ্বয় জাতিবর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে সকল জাতির স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমান অধিকারের প্রতি কি প্রকৃতপক্ষেই আগ্রহশীল? যদি তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সহিত পৃথিবীর প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন তবেই তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুদ্ধের বীভৎস রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শুক্রনীতিসার, কামন্দকীয় নীতিসার, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাসংহিতা, মহাভারত, গোতম ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান কালের মত প্রাচীন কালেও জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভে যুদ্ধ হইত। সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি সম্বন্ধে

মহুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে তাহাদিগকে জলে, স্থলে, আকাশে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাদের অভিযান-পথ সুপষ্টরূপে পরিকল্পিত, অঙ্কিত ও নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; স্থলে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য, জলে যুদ্ধজাহাজ এবং আকাশে বিমান অগ্রসর হইবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অষ্টম ও দশম অধ্যায়ে উক্ত আছে, “ভূগর্ভে পরিখা খনন করিয়া এবং তথায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে।” গত মহাযুদ্ধের পূর্বে আকাশ ও পরিখা-যুদ্ধকে বর্তমান যুগের লোকেরা আজগুবি কল্পনা বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ইহা এখন বাস্তব ব্যাপার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের চোখের সামনে জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নরহত্যার তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হইয়াছে, নিত্য নূতন ভীষণ মারণাস্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং সেগুলির নির্ভর ও নির্বিচার প্রয়োগদ্বারা ধ্বংস-কার্যের অমাহুষিক লীলা ব্যাপকভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ছুপনেয় কলঙ্ক-কালিমা চিরতরে লিপ্ত হইয়াছে।

কৌশল, কূটনীতি ও চাতুর্যের প্রয়োগ যুদ্ধের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এইগুলি যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য। পরিকল্পনা সুচিন্তিত হইলে সাধারণতঃ উদ্বেগ ব্যর্থ হয় না। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহে এরূপ দৃষ্টান্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। যুধিষ্ঠির, দ্রুপদ ও তাত্ত্বিকের বধ করিবার জন্য ইক্ষ্বাক, রাম এবং কুরু কৌশল, চাতুর্য ও কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরাক্রমশালী বালী, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বাতাপী, ইন্দ্রল প্রভৃতিও এইরূপে নিহত হইয়াছিল। কূটনীতির প্রয়োগ দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। কামন্দকীয় নীতিসারে প্রাচীনকালের কূটযুদ্ধের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কূটযুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন—“দেশ ও কাল অহুকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি-ভেদ করিতে পারিলে রাজা প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজা কূটযুদ্ধ করিবেন। গিরিকন্দরাদি-পথে অভূমিষ্ঠ (উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়) অতএব অসাবধান শত্রু-সৈন্যকে বধ করিবে। আর ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রু-সৈন্যকে উপজ্ঞাপ করিয়া বধ করিবে। সম্মুখে এক দল সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং আর একদল বলবান্ বেগগামী বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাদিক হইতে শত্রুসৈন্যদলকে আক্রমণ-পূর্বক দুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে। অথবা পশ্চাদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে শক্তিশালী সৈন্যদ্বারা আক্রমণপূর্বক বিদ্রুত করিয়া বধ করিবে। ইহাও দুই দিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান্ হইয়া বধ করিবে; আর পশ্চাৎ দিক বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে। এইরূপে পার্শ্বের বিষয়ও বুঝিতে হইবে। অসার সৈন্যের

মধ্যে সারবান্ সৈন্যবল লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে অসার সৈন্যের বিনাশে শত্রুসৈন্য শিথিলপ্রযত্ন হইলে তখন ঐ শত্রুসৈন্যকে সিংহের চার উল্লম্বন করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা নিহত করিবে। কুয়াসা, অন্ধকার, কাল-পরিচ্ছদ, গর্ভ, অগ্নি, পর্বত, বন, নদী—এই সকলের ছায়ে বা ছলে কূটযুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাজয় বা বিনাশ করিবে। চরদ্বারা শত্রুর প্রচার অবগত হইয়া রাজা অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শত্রুবধ করিবেন, শত্রুর নিকট হইতেও সতর্ক রাজা তদ্রূপ স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা করিবেন।”

যুদ্ধ-বিগ্রহ যে অতিশয় নির্ভর ও ধ্বংসকারী ব্যাপার তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যুদ্ধের মত নির্ভর ও প্রলয়ঙ্কর কার্যও সর্বজনকল্যাণবিধায়ক ধর্মের প্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত হইত। বর্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধের আদর্শ বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাকালে স্বজনগণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ক্ষত্রিয়বীর অর্জুন বিষম হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। কর্তব্যাকর্তব্য ও ধর্মার্থ নিরূপণে অসমর্থ অর্জুন ক্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার উপদেশ ভিক্ষা করিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিদ দার্শনিক ও তত্ত্বদর্শী ক্রীকৃষ্ণ বেদান্তের অতীমমন্ত্রদ্বারা অর্জুনের ক্লেশ ও হৃদয়দৌর্বল্য দূর করিয়া তাঁহার অন্তরে আত্মবিশ্বাস ও শক্তিসঞ্চার করিলেন। আত্মা অবিনশ্বর, দেহের সহিত ইহা বিনষ্ট হয় না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে যোগদান পরম ধর্ম। ধর্মযুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ হয়, আর জয়ী হইলে পৃথিবীতে প্রভুত্ব ও যশঃ অর্জিত হয়। যুদ্ধের পূর্বে কোনো দেশের যোদ্ধাগণ এরূপ ধর্মনীতির উপদেশ শুনিতে পায় নাই। প্রকৃতপক্ষেই এরূপ উচ্চ নীতি-জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধ বর্তমানকালে দেখা যায় না।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফল কখনও শুভ হয় না—ধ্বংস ইহার অপরিহার্য পরিণতি। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথা, আইন-কাহ্ন ও সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধে ধ্বংসের পরিমাণকে অনেকাংশে লঘু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রচলিত আইন-কাহ্ন ও সমাজনীতিগুলি উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ পরিচালিত হইলে জনগণের দিক হইতে তীব্র সমালোচনা, বিক্ষোভ ও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিত। জনগণের ঈদৃশ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সম্বন্ধে ব্যাপ্তি ও সমষ্টির বিবেকবুদ্ধি সম্যকরূপে সচেতন ছিল এবং ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইত। তৎকালে নিন্দা এবং লজ্জার আশঙ্কাও ছিল। আজকাল এগুলি কল্পনার মেয়াল বলিয়া উপেক্ষিত হয়। এগুলি মানিয়া চলিলে নাকি নারীহুলভ দুর্বলতার প্রভাব দেওয়া হয় এবং লোকের নিকট হাত্তাস্পদ হইতে হয়। নির্দোষ নিরস্ত্র নাগরিক ও গ্রামবাসিগণের উপর

অতিশয় মারাত্মক বিক্ষোভের নির্বিকার বর্ষণ আধুনিক যুদ্ধে বিজয় লাভের এক মহা গৌরবজনক উপায় বলিয়া অভিনন্দিত হয়। আজকাল বিক্ষোভের আক্রমণ হইতে নারীকেও বাদ দেওয়া হয় না; নির্দোষ শিশুরও অব্যাহতি নাই। সাহসী ও বলবানেরা ইহাকেই হয়তো বীর-ধর্ম বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে যুদ্ধ হইত সমানে সমানে—ইহাই ছিল প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা। আজকাল ইহা বৈজ্ঞানিক কৌশল, কৃতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরীক্ষা এবং আকাশমার্গ হইতে নির্বিচার, নিষ্করণ ও অমাত্মিক নরহত্যার তাণ্ডবলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ কি কি ধর্ম্মানুমোদিত ও মর্যাদাসম্পন্ন উপায়ে পরিচালিত হইত উহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের শাস্ত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং তাহাতে আমরা পররাজ্যপ্রাসী, পরগীড়ক, দরিদ্রশোষক, বসন্তাত্তিক আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভুলনায় হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্পষ্টরূপে জানিতে পারিব।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যুদ্ধে ধর্ম্মের অনুশাসন মানিতে হইবে কেন? ধর্ম্মানুমোদিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধপরিচালনা কি শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়ে না? যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় শত্রুর পরাজয় ও নিপাত, তবে কি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত দয়ামায়া বিসর্জন দিয়া সকল প্রকার সুযোগ, কৌশল, চাতুরী, কূটনীতি ও কার্যকর উপায় অবলম্বনীয় নহে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন ভারত কন্মুঠে বলিতেছে—যুদ্ধ-ধর্ম্ম-নীতি-শাস্ত্র-সত্য-ধর্ম্মাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তবেই যুদ্ধের মত অনিবার্য অশুভ বস্তু হইতেও মানবকল্যাণকর উচ্চ উদ্দেশ্য দাখিত হইতে পারে। আদিম অসভ্য জাতিসকলের হিংস্র যুদ্ধের নির্ভর প্রথাগুলিকে চিরতরে বিদায় দিয়া সভ্য মানবের ধর্ম্মাদাসম্পন্ন সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্ম-নীতি-শাস্ত্র-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুনগুলি অবলম্বন করিলেই মানব-কল্যাণ দাখিত হইতে পারে।

আধুনিক অনেক ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষ প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের উচ্চ আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ব্যূহরচনা বর্তমান সমরকৌশল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। মহুসংহিতায় বরাহ, মকর, স্বচী, পদ্ম প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ আছে এবং তদুপযোগী যুদ্ধের বিস্তৃত নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। যেদিক হইতে বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশী সেই দিকেই সেনাধ্যক্ষ তাঁহার সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সৈন্য পরিচালনা করিবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আট দিকেই সৈন্য প্রেরণ করিবার তৎপরতা দেখাইবেন। যেদিক হইতে শত্রুর আক্রমণ আসে সেই দিকেই সৈন্যগণ অগ্রসর হইবে।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণ ঘাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্ত পাশের দিকে এবং পশ্চাৎ ভাগেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। শত্রু যদি সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর পরাক্রমশালী হয়, তবে শত্রুর সম্মুখে বেশীসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাড়াতাড়ি সৈন্যদলকে সরাইয়া লইতে হইবে। শহর অথবা দুর্গ দখল করিতে হইলে, অথবা শত্রুসৈন্যের ব্যূহ-মধ্যে পথ করিয়া যাইতে হইলে দুই দিকে ধারালো তরবারির আকারে বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া আক্রমণ করিতে হইবে। কামানও গোলাগুলির মুখে আক্রমণ করিতে হইলে সর্পর্যূহের আকারে আক্রমণ করিতে হইবে অর্থাৎ সৈন্যগণ মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইবে অথবা যুদ্ধ পক্ষ অথারোহী সৈন্যগণকে পুরোভাগে এবং যুবা সৈন্যগণকে মধ্যভাগে স্থাপন করিবে। গোলন্দাজ, অথারোহী, রথারোহী সৈন্যগণ সমতল ক্ষেত্রে, নৌ-সৈন্য জলে, হস্তী অগভীর জলে, তীরন্দাজগণ বন-প্রদেশে, ঢাল-তরবারিধারী সৈন্যগণ মরুভূমিতে যুদ্ধ করিবে। মহুসংহিতায় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্কিংশেষে সকল শ্রেণীর লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তম খাদ্য দিতে হইবে, বিশ্রাম উপভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং যুদ্ধকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে।

কোটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সৈন্যগণের গুণাবলীর মান বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “পুরুষ পরম্পরাগত শৌর্য্য বীর্য, অগুণত স্বভাব, সন্তোষ, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা, অপরাধের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সর্বপ্রকার যুদ্ধে বিচক্ষণ-কৌশল, বিপর্যয়ের ভিতরও অবিচল রাজানুগত্য”—এই সকল গুণের অধিকারী হইবে সৈন্যগণ। যাহারা যুদ্ধবিজ্ঞান সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ, শাস্ত্রপরায়ণ, নির্ভীক, ভাবপ্রবণতাশূন্য এবং যুদ্ধের মত অবিচল তাঁহারাই সেনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, বিজ্ঞান বা কলা হিসাবে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ কিরূপে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিরূপে মহাবীর সেকেন্দর যুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে প্রতীচ্য লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিরূপে ইউরোপীয় দেশগুলি স্থানীয় অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন করিয়া ও বাপ খাওয়াইয়া অত্যাধি ভারতীয় যুদ্ধনীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের যুদ্ধের অনন্যসাধারণত্ব কেবল উহার উচ্চ মান ও আদর্শে নিহিত নয়। এই উচ্চ মান ও আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ এক উন্নততর নৈতিক পবিত্রতা ও শুদ্ধতার উচ্চ বৈদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় যুদ্ধের জন্য এই সকল সভ্য রীতি-নীতি

নির্ধারিত ও উপদিষ্ট হইয়াছিল—সমশ্রেণীভূক্ত সৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিবে; যোগ্যতা, উত্তম, শক্তি এবং যুগুৎসা বিবেচনা করিতে হইবে। যথোচিত বিজ্ঞপ্তি না দিয়া আক্রমণ করিবে না। ভয়ে লুণ্ঠিত জনগণকে আক্রমণ করিবে না। নিরস্ত্রীকৃত অথবা যুদ্ধে পরাশ্রয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। রথচালক, বাদক, রসদ-বাহকদিগকে আক্রমণ করিবে না। মনুষ্যহিতায় উক্ত আছে—গোপন অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিষ-প্রয়োগের দ্বারা শত্রুকে বধ করিবে না। ভূমিতে শায়িত, উপবিষ্ট, করঘোড়ে অবস্থিত, উলঙ্গ, ক্ষীর্ণ-শীর্ণ, নিদ্রিত, অরক্ষিত আলুলায়িত কেশ, আশ্রিত, দশকমাত্র, অন্যের সঙ্গীমাত্র, বিপন্ন, অসহায়, ভয়াকুল, সাংঘাতিকরূপে আহত, যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়নপর শত্রুকে বধ করিবে না। পৌত্তম্য ধর্ম্মসূত্র নির্দেশ করিতেছে—নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে, যতদূর সম্ভব ঘৃণা ও হিংসার ভাব পরিবর্জন করিবে। যে শত্রু নিরস্ত্র, অথ ও সারথিবিহীন, করঘোড়ে দণ্ডায়মান, আলুলায়িতকেশ, যুদ্ধে অনিচ্ছুক, ভূমিতে বা যুদ্ধোপরি উপবিষ্ট তাহাকে, বার্তাবাহকে এবং ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না। মহাভারতের ভীষ্ম ও দ্রোণপর্বের উক্ত আছে—শত্রুপক্ষীয় ভূপাতিত এবং আহত সৈন্যগণকেও সমস্তে শুদ্ধা করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেবল দৈহিক বল অপেক্ষা সত্য, দয়্য ও ধর্ম্মানুসরণের দ্বারা যুদ্ধে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। যদিও সকল বর্ণের লোকই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিত, তথাপি যুদ্ধ একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্মগত অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। যুদ্ধ শত্রুকে পরাজিত করিবার অধম উপায়, ভেদনীতি মধ্যম উপায়, এবং শত্রুর নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাব ও কর গ্রহণ উত্তম উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। মহাভারতের শান্তি পর্বের সাম, দান বা ভেদনীতি দ্বারা এবং যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হয় কেবল সেখানে শেষ অবলম্বন-যুদ্ধ যুদ্ধ পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের প্রশমন করিবার জন্য রাজগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যহিতায়ও এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যখন যুদ্ধ অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া উঠিত, তখন প্রাচীন ভারতের রাজহবর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে মনোনিতি করিতেন, যোদ্ধগণের শিবির সমিবেশ করিতেন এবং শুভ দিন দেখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন। অর্য্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিত। অর্য্যোদয়ে রাজা, সেনাপতি ও সৈন্তগণ উপাসনা, প্রার্থনা, দান, ধ্যান ও তর্পণাদি সম্পন্ন করিতেন এবং তৎপর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। সূর্যাস্তে সেনাপতিগণ বিশ্রামের আদেশ দিতেন। মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি, যুদ্ধক্ষেত্রে মহাসময়ে প্রতিদিনের যুদ্ধশেষে পাণ্ডব ও কৌরবগণ স্ব-স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন, স্মৃতি জলে স্নান করিতেন, স্বল্পকাল গান ও অত্যাঁজ নির্দেশ আমোদ-প্রমোদ করিতেন এবং তৎপর নিদ্রা যাইতেন। দুই পক্ষের উজ্জল মশালের আলোকে

উদ্ভাসিত শিবিরের মধ্যে সৈন্য, অশ্ব এবং হস্তীসকল নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। বিশ্বাসঘাতকতা-রূপে আক্রমণের কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। এই সময়ে তাহার শত্রুতা প্রায় ভুলিয়া যাইত। এক দিনকার দৃষ্টবৃত্তি উদ্বীপনাময়। যেদিন জয়দ্রথ যুদ্ধে নিহত হইলেন, সেদিন সংগ্রাম খুব কঠোর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং অর্জুন তাহার সৈন্তগণকে অপরাহ্নে অত্যধিক ক্লান্ত, অবসন্ন ও ধূল্যাবলুণ্ঠিত দেখিয়া নিদ্রা যাইতে অমুমতি দিলেন। ছুর্য্যোদনও তদ্রূপ আদেশ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের বেলায় উভয় পক্ষকে একপে পাশাপাশি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত দেখা একটা অভূতপূর্ব দৃষ্ট। রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাহার নির্বিঘ্নে নিদ্রাভিভূত ছিল। তারপর সৈন্তগণ নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন এবং রাজা ও সেনাপতিগণ ব্যতীত কেহই পরদিন প্রাতঃকালের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইলেন না। যোদ্ধগণ আবার জয়লাভের নিমিত্ত দেবতা-গণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শুদ্ধ, সৌম্য ও শান্ত অর্জুন ক্রীড়ার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিগ্রহে আর একট বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যুদ্ধ করিবার সময়েও তরুণেরা বয়োক্রোষ্ঠ ও গুরুগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। ছুর্য্যোদনের নিকট হইতে বিরাতের গোদন-উদ্ধারের জন্য মংস্ত্র-দেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে অর্জুন যুধামন্যুজর হস্তবেশে উত্তরকে সারথি করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে এরূপ কৌশলের সহিত তাঁহার তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে প্রথমতঃ দুইটি তীর দ্রোণের পাদস্পর্শ করিল এবং অপর দুটি তাঁর কর্ণ প্রায় স্পর্শ করিয়া সবেগে ছুটিয়া গেল। তীর দুটি যেন দ্রোণের কর্ণে চুপি চুপি অর্জুনের শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করিল। ভীষ্ম, অশ্বখামা ও কৃপের প্রতিও তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুযুধান সৈন্তগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহার রথ হইতে অবতরণ করিয়া, সংঘতবাক হইয়া করঘোড়ে শত্রুর মধ্যভাগে অবস্থিত ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার আশীর্বাদ ও যুদ্ধের অমুমতি ভিক্ষা করিলেন। দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের নিকটও তিনি পর পর এরূপ আশীর্বাদ ও অমুমতি চাহিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, বর্তমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান যুদ্ধ হইতে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, নীতি, মানবতা সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে সমরনায়কগণই ঈশ্বরের আসন দখল করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দেশ ও আদেশই এখন যুদ্ধ পরিচালনার একমাত্র নিয়ামক—উহা যতই ধর্ম্ম, নীতি ও মানবতার বিরোধী হউক। গোপন অস্ত্র, বিষাক্ত বাপ্প, আণবিক বোমা, রাসায়নিক যুদ্ধ,

যথাযথ। নির্বিচারে বোমাবর্ষণের দ্বারা লোকালয় ধ্বংস—
এগুলিই আধুনিক যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার। দুর্বীর ঘৃণা, হিংসা,
লোভ ও জিহাংসা চরিতার্থ করিবার তাগব লীলাভূমি আধুনিক
যুদ্ধক্ষেত্র।

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধরত লোকদিগকে শান্তিপ্ৰিয় সাধারণ
অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইত। কিন্তু বর্তমান
যুদ্ধে যুযুধান ও অ-যুযুধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।
সকলকেই যুদ্ধে কোন-না-কোন অংশ গ্রহণ করিতে হয়,
কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। চক্ষের পলকে ইহা
পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে।
প্রাচীনকালে শত্রু সাধারণতঃ ঘৃণিতরাঞ্জে লিপ্ত হইত না অথবা
কোন জাতির খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট করিত না। লোকালয় হইতে
বহুদূরে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারিত হইত। আধুনিক যুদ্ধে জনাকীর্ণ
নগর, শত্রুভাণ্ডার, শিল্পালয়, কলকারখানাই আক্রমণের প্রথম
ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু। কোন দেশ বা জাতির কৃষি বাণিজ্য ও
শিল্পসম্পদ নষ্ট করিয়া দেওয়াই শত্রুর প্রধান লক্ষ্য থাকে।

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরন্তন
প্রাণবস্তু। এই আধ্যাত্মিকতাই সত্য প্রেম ন্যায় সৌভ্রাত

সদিচ্ছা এবং মানবতাই ভারতীয় জীবনের প্রতি শ্বরে, এমন
কি যুদ্ধবিগ্রহেও ভারতীয়গণের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহাই
মানবীয় সভ্যতার বিবর্তনে হিন্দু-চিন্তাধারার বিশিষ্ট অবদান।
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভিতর ভোগের উগ্রতা দেখিয়া স্বামী
বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—“পাশ্চাত্য জাতিগুলি যেন সজীব
আগ্নেয়গিরির যুগে অবস্থান করিতেছে। আমি দিব্য চক্ষু
দেখিতেছি পাশ্চাত্য জাতিগুলি যদি তাহাদের উগ্র ভোগের
আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ না করে আগামী
পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।” অন্তর্দৃষ্টি
সম্পন্ন ধর্মির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। গত মহাসমরে
ইউরোপীয় জাতিগুলি পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসের শেষসীমায়
উপনীত হইয়াছে। যত দিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সমরনায়ক ও
রাষ্ট্রনেতৃগণ ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা গ্রহণ না করিবেন,
তত দিন তাহাদের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ-বিগ্রহ মানবের অনিষ্ট
সাধনই করিবে, এবং তাহাদের শান্তিস্থাপনের সমস্ত প্রচেষ্টাই
নিষ্ফল হইবে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই জগতকে যুদ্ধ-বিগ্রহ
হইতে রক্ষা করিবে। নাশ: পশা বিজতেহয়নায়—ইহা ব্যতীত
অন্য উপায় নাই।

শীতকালের শাকসজ্জী উৎপাদন

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

বর্তমান দুর্ভিক্ষাভা এবং দুপ্রাপ্যতার দিনে “বেশী খাদ্যশস্ত্র
জন্মাও”—“বেশী করে শাকসজ্জী ফলাও” বলে সকলেই ফতোয়া
দিচ্ছেন, কিন্তু হাতে-কলমে করার উপদেশ খুব কমই শুনে
পাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু জানালে
অনেকের উপকার হতে পারে ভরসা আমি কয়েকটি কথা
বলতে চাই। জমির সার, জল ও ভাল বীজ ছাড়া উপযুক্ত
সময় একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ভাল বীজের চারা, উত্তম
সার ও উপযুক্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা হলেও উপযুক্ত সময়ে
নির্দিষ্ট বীজ বোনা বা চারা লাগানো না হলে যোল আনার
জায়গায় দুই আনা ফলন হওয়া যে অসম্ভব সে বিষয়ের সুস্পষ্ট
ধারণা খুব বেশী লোকের আছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ
শহরতলী বা অল্প জায়গায় চাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-
বর্জিত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যারা বেশী শাকসজ্জী ফলানোর
উপদেশ শুনে নিজেদের বসতবাগী-সংলগ্ন অল্প জায়গাটুকুর
সদ্যব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস হয়ে উঠেছেন তাঁদের পক্ষে
কয়েকটি কথা জেনে রাখা বিশেষ দরকার বলে মনে করি।
শীতকালের শাকসজ্জীর মধ্যে ফুলকপি, মুলো, পালংশাক,
টম্যাটো, পেঁয়াজ এবং ওলকপির চাষ খুব সোজা এবং বাড়ীর
প্রাঙ্গণে সময়মত চাষ করলে এগুলি প্রায়ই বিকল হয় না।

ফুলকপির চাষে সময় একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। একই
জমিতে পনের-কুড়ি দিনের বিলম্বে বসানো চারা কিছুতেই
আগে লাগানো চারার সঙ্গে পেরে ওঠে না। ভাদ্র
মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে বসানো জলদি ফুলকপির চারা
কার্তিক মাসের শেষের দিক থেকেই ফুল দিতে আরম্ভ করে।
খানিকটা গোবরের সার দিয়েও মাঝে মাঝে গাছগুলোর গোড়া
আলগা করে দিয়ে নতুন মাটি একটু শুকিয়ে উঠলেই নিড়ানি
দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়। বৃষ্টির পরে পাতাগুলির
দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এক প্রকার সবুজ
রঙের লম্বা লম্বা পোকা পাতাগুলি খেতে থাকে। সাধারণতঃ
সকালবেলায় তারা পাতার নীচে আশ্রয়গোপন করে থাকে।
কোন সুন্দর সতেজ পাতার ছিদ্র দেখলে বা কাল কাল বড়ি
বড়ি মল দেখলেই পাতাগুলো উলটে দেখা দরকার। সাধা-
রণতঃ বসতবাগী-সংলগ্ন স্থানের ফুলকপির চারায়, বিশেষতঃ
কার্তিকের শিশির পড়ার আগে, এই পোকাগুলির দোঁরায়া
বেশী হয়—সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করে সাধারণতঃ বেশী বৃষ্টির
পরেই। এই সময় শুয়াপোকাও ফুলকপির চারা খেয়ে নষ্ট
করে দেয়। সুতরাং ভাল জমি, প্রচুর সার থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত
তদারকের অভাবে ফুলকপির চাষে ব্যর্থমানোর হতে হয়।

অনেকে বলতে পারেন ভাদ্রমাসে প্রায়শঃ বৃষ্টি হয়, সুতরাং জলদি ফুলকপি লাগানোর ক্ষমিতে চাষের ব্যবস্থা হবে কি করে? বেশী জমি হলে চাষের প্রশ্ন আসে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বসতবাগী-সংলগ্ন উঁচু এবং বড়জোর কয়েক কাঠা মাত্র জমির উদ্দেশ্য করেই প্রধানতঃ বলছি। সাধারণতঃ এসব জমিতে বর্ষাকালে নটে ডাঁটা, টেঁড়স বা বর্ষাতি মূল্যে থাকে। সুতরাং ভাদ্রের প্রথমে সেগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসে বা সামান্য যা অবশিষ্ট থাকে তা তুলে ফেলে দিয়ে কিছু ঘাস থাকলে পরিষ্কার করে রৌদ্রবহুল দিন দেখে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলেই চলে। এ সময় সার না দিলেও ক্ষতি নাই। কোদাল দিয়ে বেশী মাটি কোপাবারও দরকার নাই। তারপর শুকনো ঝটখুটে দিন দেখে পূর্বে থেকে নিজে ফুলকপির চারা না করলে বাজার থেকে চারা এনে বিকেলে এই জমিতে দেড় হাত তফাতে তফাতে বসাতে হয়। পরদিন যদি বেশী রৌদ্র হয় তবে সকালে রৌদ্র উঠার আগেই চারা-গুলো কলার ধোলা কেটে বা কাগজের চোঙা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। অবশ্য বিকালে রোদ পড়ে গেলেই ঢাকনাগুলো আবার খুলে দিতে হয়। পর পর তিন-চার দিন পর্যন্ত এই ভাবে চারাগুলো ঢেকে দেওয়া দরকার। তারপর চারাগুলো দাঁড়িয়ে গেলে নীচের দু-একটি পাতা ঝরে যায় ও নতুন পাতা গজাতে থাকে। দিনসাতেক পরে চারাগুলোর গোড়া খুব সাবধানে নিড়ানি বা খুরপি দিয়ে আলগা করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বা অজ আগাছা জন্মালে সেগুলো তুলে ফেলে দেওয়া ভাল। শেষে বেশী বৃষ্টির পরগাছের গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে রৌদ্র উঠার পর মাটি একটু শুকিয়ে গেলে আবার নিড়ানি দিয়ে সাবধানে আলগা করে দিতে হয়। এইভাবে চারাগুলো বেড়ে প্রায় আধ হাত উঁচু হলেই প্রত্যেক চারার গোড়া থেকে দুই ইঞ্চি দূরে চারিপাশ খুঁড়ে, তিন-চার ইঞ্চি গভীর ও দুই-তিন ইঞ্চি প্রশস্ত গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পচা গোবরের সার দিয়ে সেগুলো আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে পরে বৃষ্টি পেয়ে বা বৃষ্টি না হলে মাটি শুকিয়ে গেলে জল দিলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারাগুলো সতেজ সবুজ পাতা মেলে উঠতে থাকে। আগেই বলেছি শুঁয়ো পোকা বা ফড়িং প্রভৃতির উপদ্রব হচ্ছে কি না দেখার জন্ত রোজই সকালে একবার বাগানে গিয়ে গাছগুলো তদারক করা দরকার। পাকা পাতাগুলোকে গাছের তলায় জমতে না দিয়ে পৃথক একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে পাতা-সার হয়—তারপর গাছের গোড়ায় পাতা পড়লে পোকার উপদ্রবও বেশী হতে পারে। মাস দেড়েক পরে গাছগুলোর চারপাশে এবার আরও একটু দূরে এবং অপেক্ষাকৃত গভীর গর্ত করে গোবরের সারে ভর্তি করে বুরো মাটি চাপা দিলে এবং নিয়মিত জল দিলে ফুলকপির ফলন খুব ভাল হয়। যাদের জায়গা কম তাঁরা এই পদ্ধতিতে চাষ করলে এক এক ফুট ব্যবধানে চারা বসিয়েও

ভাল ফসল পেতে পারেন। আমার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক পর্যাপ্ত গোবরের সার প্রয়োগে খুব ঘন ঘন চারা বসিয়ে পাঁচ-ছয় হাত প্রশস্ত ও দশ-বার হাত লম্বা এক ফালি জায়গা থেকে অপরিপাক ফুলকপি উৎপন্ন করতেন। অবশ্য গাছ বেশী ঘন হলে ফুল খুব বড় হয় না তবে অল্প লোকের পরিবারে এ প্রকার ফুল প্রত্যেক দিনই দু-একটি পাওয়াতে বেশ পুষিয়ে যায়। ভাদ্রের প্রথম দিকে চারা লাগালেও শতকরা কুড়ি-পঁচিশটার বেশী বাঁচানো বড় শক্ত, বিশেষতঃ যদি চারা বসানোর পরেই উপযুক্ত পরিপাক কয়েক দিন প্রচুর জল হয়। অবশ্য এ সময়ে চারা বসালে ফুল আগে পাওয়া যায় এবং গাছগুলো বড় হওয়ায় ফুলও তদনুপাতে বড় বড় হয়। তার পর এই ফুলকপি উঠে গেলে লেট ফুলকপি বা ওলকপি এই জায়গায় বসানো যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত একটু বেশী জায়গা থাকলে একবারে সব জায়গায় চারা না বসিয়ে তিন-চার বারে ৫০:১০০ করে চারা কিনে পনের-কুড়ি দিন পর পর বসানো ভাল। নতুবা একসঙ্গে লাগালে অধিকাংশ গাছে একসঙ্গে ফুল ফুটে যায়—কিন্তু এরূপ সময়ের ব্যবধানে লাগালে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত বাগানে কপি পাওয়া যেতে পারে। যে ফুলকপিতে মাঘ মাসে ফুল ধরে সে সব চারাও আশ্বিনের শেষ থেকে কা্তিকের মধ্যেই বসিয়ে দিতে হয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকপির চারাগুলো সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে তবুও দেখা গেছে কা্তিকের রৌদ্র পেয়ে চারা-গুলো শুষ্ক হয়ে না উঠলে শিশিরে সম্যক বেড়ে উঠতে পারে না। একই বীজ থেকে উৎপন্ন চারা আশ্বিনের মাঝামাঝি ও অগ্রহায়ণের শেষভাগে বসিয়ে ফুলের অসম্ভব পার্থক্য দেখা গেছে। শেষোক্ত সময়ে বসালে চারাগুলো সরু সরু হয়ে উঠে পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই স্থপারির আকারের ছোট ছোট ফুল ধরে।

ফুলকপির চারা সংগ্রহের কথা

কলকাতার নামকরা নাশারির লেবেল-ডাঁটা বীজ থেকে উৎপন্ন চারা এবং কলকাতার হাটের চারার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখি নি। তবে হাটের চারা থেকে যুদ্ধপূর্ব কয়েক-বৎসর যেরূপ বিরটি আকারের ফুলকপি পেয়েছি—যুদ্ধের কয়েক বৎসর অহরূপ ভাবে চাষ করেও এই চারা থেকে আর আশের মত বড় ফুল পাই নি। সম্ভবতঃ বাইরের আমদানী বীজের অভাবে এরূপ ঘটেছে। ইতিমধ্যে নাশারির বীজের চারা করেও ভাল ফুল দেখা যায় নি। যাদের জায়গা অল্প তাদের পক্ষে হাটের চারা কিনে লাগালেই ভাল মনে হয়। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ভাদ্র মাসে চারা বসাতে হলে আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে চারা সংগ্রহ করা আবশ্যিক। কয়েক দিন বেশী বৃষ্টির পর যখন বোঝা যাবে যে আগামী পাঁচ-ছয় দিন আর বৃষ্টির আশঙ্কা নাই সেই সুযোগে চারা বসানো প্রয়োজন। কারণ চারা বসানোর পরই বেশী বৃষ্টি হলে চারা-

গুলো পচে যায়। যদি আবহাওয়া নির্ভারগে ভুল হয়ে যায়—
চারার কিনে আনার পরই বৃষ্টিবাতল শুরু হয় তা হলে চারাগুলো
যথাস্থানে না বসিয়ে খানিকটা বেশী উঁচু জায়গায় দেখে তিন-
চার ইঞ্চি দূরে দূরে সব চারা বসিয়ে রাখতে হবে। বৃষ্টি
হেড়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের কর্দমাক্ত ভাব কেটে মাটি অনেকটা
বুরবুরে হলে সেই উঁচু জায়গাতে সাময়িক ভাবে বসানো
চারাগুলো মাটিসমেত তুলে এনে ক্ষেতে যথাস্থানে সারি করে
বসিয়ে দিতে হবে। যদি ক্ষেত বেশী স্যাঁতসেঁতে থাকে তবে
চারাগুলো ধ'রে গিয়ে কয়েকটি নতুন পাতা বার হবার পর
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে বসানোর বিশ-পঁচিশ দিন পরেও ঐ
ভাবে তুলে এনে ক্ষেতে উপযুক্ত গর্ত করে ভিতরে চারার চার
পাশে গোবরের সার দিয়ে—সারমাটি চাপা দিলে চারা
তাড়াতাড়ি সতেজে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়। ফলতঃ সময়
চলে যাচ্ছে অথচ জমির স্যাঁতসেঁতে কর্দমাক্ত ভাব কাটছে না
দেখলে এরূপ ভাবে চারা তৈরি করে নিলে সময়ের অসুবিধা
বেশী ক্ষতি করতে পারে না। গোবরের সার বেশী পাওয়া না
গেলে অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা ভদভাবে অ্যামোনিয়াম সালাফেট
ধূলায়মাটির সঙ্গে পাতলা করে মিশিয়ে ঐভাবে দেওয়া যেতে
পারে। অবশ্য সকল রকম সারই যাতে গাছের গায়ে না লাগে
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ গোবরসার খেল বা কৃত্রিম
সার গাছের কাণ্ডের গায়ে ঠেকলে তার ঝাঁজে গাছ মরে যায়।
নতুন ধারা চাষ করেন জল সম্বন্ধেও তাঁদের শিক্ষণীয় আছে।
জল দরকার বলেই বেশী জল ঢেলে কাদা করে ফেলা সঙ্গত
নয়। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় মাটি দিয়ে
ঢেকে দিলে গাছে জোর বাঁধে। বসন্তবাড়ী-সংলগ্ন উঁচু জমিতে
প্রায় রোজই একবার, সাধারণতঃ বিকেলে জল দেওয়া ভাল।
অবশ্য অপরিপাক্ত জলে সার দ্রবীভূত হয়ে বেশী মাটির নীচে চলে
গেলে গাছগুলো সারের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।
যে-কোনও ফসলেই, বিশেষতঃ ফুলকপি ক্ষেতে রৌদ্রের খুব
দরকার। ক্ষেতের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বড় গাছ বা বড় ঘর
থাকলে তার ছায়া যতদূর পড়ে ততদূর ভাল ফুলের আশা
কম—সুতরাং সরুপ জায়গায় টম্যাটোর চারা বসিয়ে দেওয়া
যেতে পারে। ঐ গাছগুলো কম রৌদ্রোৎসাহী ফল দিতে
পারে। কাণ্ডিকের মধ্যে চারা না পুঁতলে টম্যাটো গাছ
ভাল হয় না—ফলও ভাল দেয় না। ধাঁদের জায়গার অভাব
তাঁরা টবেও টম্যাটোর চারা বসিয়ে ফল পেতে পারেন। গত
বৎসর আমার বাসায় ২ ফুট লম্বা ও ১ ফুট ব্যাসযুক্ত একটি
টিনে (ড্রামে) বসানো একটি টম্যাটো গাছ থেকে অনেক ফল
পেয়েছি। টম্যাটো লতাগুলি ঠেকনা দিয়ে খাড়া করে রাখা
দরকার। ছাদ্বাতে উৎপন্ন লতানো গাছের টম্যাটো অপেক্ষা
খাড়া গাছের ও রৌদ্রবহুল জায়গার টম্যাটোতে ভিটামিন
'সি' বেশী থাকে। ভিটামিন 'সি' এবং 'এ'-র আধার হিসাবে
টম্যাটো বড় উপকারী ফল। অবশ্য বিবিধ লবণ পদার্থ ও

শর্করাও টম্যাটোতে বেশ পাওয়া যায়। ভিটামিন 'সি' দাঁত
ভাল রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে ও কানের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে,
ভিটামিন 'এ' চোখের পক্ষে উপকারী, সুতরাং শীতকালে
সকলেরই, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের রোজই টম্যাটো খেতে
দেওয়া ভাল। পালং শাকেও ভিটামিন 'সি' এবং ক্যারোটিন
থাকে—এই ক্যারোটিন থেকেই মানুষের শরীরের মধ্যে
ভিটামিন 'এ' জন্মে। তড়িৎ পালং শাকে লবণ পদার্থ অনেকটা
পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে স্যাপোনিন (saponin) নামে যে
পদার্থটি থাকে তাতে কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে। সুতরাং
প্রত্যয় কিছু কিছু শাক খাওয়া সকলের পক্ষেই দরকার।
বিশেষতঃ মাছের তেল সহযোগে ঘর্ট করলে পালং শাকে খুবই
উপকার হয়। কারণ ক্যারোটিন তেলে দ্রবীভূত হয়েই শরীরে
প্রবেশ করে। ধাঁদের জায়গা নিতান্তই অল্প তাঁরা ফুলকপির
সারির মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাতে পালঙের
বীজ বুনে দিতে পারেন। কপিতে ফুল ধরার আগেই
শাক খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। পালং উঠে গেলে জায়গাটি
ভাল করে বুঁড়ে মাটি ছধারে ফুলকপির গাছের গোড়ায় দেওয়া
যেতে পারে। পালং বীজগুলি শক্ত আবরণের মধ্যে থাকায়
বীজ বুনার আগে এক দিন ভিজিয়ে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি
অঙ্কুর বার হয়। বাগানে চড়ুই পাখীর উপদ্রব থাকলে কয়েক
দিন নারিকেলের পাতা বা অল্প কিছু দিয়ে পালঙের চারাগুলি
ঢেকে রাখা দরকার—নতুবা পাখীতে খেয়ে ফেলে। পালংও
আগ্নেয় মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে কাণ্ডিকের মাঝামাঝি
বুনলে ভাল শাক হয়। মাটি খুব সারালো হলে অগ্রহায়ণ
মাসে বুনেও শাক ভালই পাওয়া যেতে পারে—অথবা গাছ-
গুলোতে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে যায়। এর পরে আসে মূলোর
চাষের কথা। মূলোর বীজও পালঙের মত আগ্নেয় মাঝা-
মাঝি থেকে কাণ্ডিকের মধ্যে বুনলে ফসল ভাল হয়। মূলোর
চাষে মাটি খুব ধূলা ধূলা হওয়া ভাল। চার-পাঁচ পাতা
হলেই দুর্বল চারাগুলি তুলে শাক খাওয়া উচিত। ফাঁকা
জায়গা বুঁড়ে দিলে অপর মূলোগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।
মূলোর ক্ষেতে কপিক্ষেতের মত বেশী জল দেওয়ার দরকার হয়
না।

বীট ও গাজরের চারাও তৈরি মাটিতে কাণ্ডিক মাসের
মধ্যেই বসানো ভাল। বেশী দেরি হলে শীতের মধ্যে গাছের
বৃদ্ধি ভাল হয় না, কাজেই ফলনও সন্তোষজনক হয় না। শাক-
সজ্জী যখন শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তখন ধাঁদের
জায়গা প্রায় নাই তাঁরা উঠানে বা ছাদে মাটি ফেলে—তিন-
চার ইঞ্চি গভীর মাটি হলেই চলে—পেঁয়াজ লাগিয়ে দিতে
পারেন। পেঁয়াজপাতা শীত শীত পাওয়া যায়। অল্প শাকের
সঙ্গে মিলিয়ে ভেজে খেলে বেশ মুখরোচকও বটে। তারপর
পেঁয়াজ-কলিও খুব উপাদেয়। কলকাতার পাশে ধাঁদের বাড়ী
বা বাসা তাঁরা বীজ-পেঁয়াজ কিনতে গেলে দেখবেন সের পিছু

দশ বার আনা দাম চাইবে কিন্তু যদি আখিনের মাঝামাঝি বা কাঠিকে বাজারের পাঁচ পৈয়াজের দোকানে যান তবে চার-পাঁচ আনা বা দু-তিন আনা সেরেই পাবেন। যদি শক্ত ও মাঝারি সাইজের এই পাঁচ পৈয়াজ এনে বসানো হয় তবে শতকরা দশটি পৈয়াজ পচে গেলেও এতে পুষ্টিয়ে যায়। মাটি সরস থাকলে পৈয়াজ-ক্ষেতে, বিশেষতঃ চারা বার হবার সময় কদাচ জল দিবেন না। গত বৎসর তিন হাত চওড়া-পাঁচ হাত লম্বা একটি জায়গায় বাজারের দুই সের পাঁচ পৈয়াজ চার আনা সের দরে বসিয়ে আমি বহু দিন পৈয়াজপাতা এবং অনেক পৈয়াজকলি পেয়েছি—শেষে পৈয়াজও পাঁচ-ছয় সের হয়েছিল। অবশ্য ঐ জায়গায় পূর্ব বৎসর গোবরের সার দেওয়া ছিল এবং গাছগুলো বড় হয়ে উঠলে যখনই ক্ষেত শুকিয়ে গেছে কিছু কিছু জল দেওয়া হ'ত। বেশী জায়গা না থাকলে বীজ থেকে চারা করে পৈয়াজের চাষের আয়োজন না করাই উচিত।

ওলকপির চাষ সবচেয়ে সোজা। জমিতে সামান্য সার থাকলেই বেশ ওলকপি জন্মে। আখিনের শেষ সপ্তাহ থেকে কাঠিক মাসের মধ্যে ওলকপির চারা বসান ভাল। কার্ণ শীতের মধ্যে যে ওলকপি পাওয়া যায় তার স্বাদ ভাল হয়। ফুলকপি উঠে গেলে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও ওলকপির চারা বসিয়ে ওলকপি পাওয়া যায়। এমন কি বৈশাখ পর্যন্তও আমার বাগানের ওলকপি খেয়েছি। গরম পড়ে গেলে ওলকপির স্বাদ ভাল হয় না তবে পৈয়াজ-সহযোগে কুচি করে কাটা ওলকপি ভেজে খেতে বেশ ভাল লাগে।

ফুলকপি উঠে গেলে সেই ক্ষেতে ওলকপি ভিন্ন বৈশাখী বেগুনের চারাও বসানো যেতে পারে। লেট ফুলকপি উঠে গেলে সেই জায়গায় টেঁড়স বসালে ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্র মাস থেকেই টেঁড়স পাওয়া যায়।

যাতক ও পালক

শ্রীমহাদেব রায়

তীক্ষ্ণ-তরবারি-করে নর-কধিরের
পিপাসা উন্মাসে, দন্তে করিয়া প্রকাশ,
দলে-দলে মত্ততায় আশায় কিসের
ছুটল যাতক-কুল দানবের দাস ?

দুষ্ক-পোষ্য—জননীর স্নেহের আধার
ক্ষীরাধারে লগ্ন-মুখ উঠে চমকিয়া,
ক্ষীর-ধারা বহিবে কি, বহে রক্ত-ধার—
খড়াধাতে তুণ্ড তব পিশাচের হিয়া।

মর্মদাহী উরঃ-ক্ষত যাতনা ভুলিয়া,
কাতরে কাঁদিল মাভা—লহ প্রাণ মোর
লহ বিত্ত, এ কুস্রমে নিও না ছিঁড়িয়া,
করিলে না কর্ণপাত নির্মম কঠোর।

অগ্নি-রুণ্ডে দিয়া স্নেহ-পুত্তলিরে বলি,
আহত মাতার বক্ষে পুনঃ খড়া হানি,
গৃহে-গৃহে বিচরিলে শত প্রাণ দলি,—
এ হিংস্র নির্দেশ কোথা কে দিল না জানি।

অভিনব হত্যালীলা মহানগরীর
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি' করে খাদ-যজ্ঞ-রোধ,
বিলুপ্তনে, অগ্নিদাহে স্বপ্ন-বাসীর
অকাতরে সর্বনাশ সাধিলে নির্বোধ।

রাজ-রক্ষী সন্নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে।
এ লীলার অন্তরালে রক্ষক ভক্ষক,
মিথ্যা রক্ষণের ছল। ভক্ষণের আশে
পুণ-বাসে গর্ভকোষে লুকায়ে তক্ষক।

ইন্দ্রন যোগালো যারা হিংসার বহিতে,
রচিত্তে নিষ্ঠুর হস্তে এ মহাশ্মশান,
উন্মাদের রাষ্ট্র অপকোশলে রচিত্তে,
লোভ-হত বিজ্ঞতার ভানে হত-জ্ঞান,

আজও কি প্রত্যক্ষ নাহি করে—মেলি আঁখি,
চালক-পালক পোষ্য শাসিত-কুলের ?
সাধিতে আপন ধ্বংস আর কত বাকি
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রচি' অহি-নকুলের ?

করিবে কে পরিমাণ এ সর্বনাশের ?
অগ্নি-গর্ভে অমূল্য সম্পদ রাশি-রাশি
হইয়াছে ভস্ম-শেষ—মহাতরঙ্গের
গর্ভে লুপ্ত কত প্রাণ, কত যায় ভাসি।

রাজপথ শব-শয্যা—যেন প্রেতপুরী
নামিল অবনীতলে ধরি রক্ষক বেশ ;
লুপ্তনের সঙ্কল্প করিয়া ভুরিভুরি
হইবে রচনা কোথা সুবর্ণের দেশ ?

কাঁদিছে সোদর কত আশ্রয়-আশায়,
'খোদা'-'ভগবান' ডাক শোন পাশাপাশি,
মাতৃজাতি পীড়নের তীর বেদনায়
গোপনে খসিছে বিসর্জিয়া অশ্রুরাশি।

সমাপ্তি কোথা এ ঘৃণ্য মহাপাতকের ?
হেঁ যাতক ! এ নাটের গুরুদের আরো
কি লীলা দেখিবে বিশ্ব ? বিশ্ব-পালকের
এখনও নির্দেশ শুনি' শোনাতে কি পারো ?

শ্রীশ্রীদুর্গা

(দ্বিতীয় প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

অনেক পুরাণে দুর্গার স্তবে, দুর্গা কে তাহা বিশদরূপে
বর্ণিত আছে। যে শক্তি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া
আছেন, পরমাণু হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,—যাহার আদি নাই,
যাহার অন্ত নাই, যাহার মধ্য নাই, যাহা চিন্তার অতীত,
যেখানে দিক নাই, কাল নাই, তাহা যে শক্তির প্রকাশ,
তিনিই দুর্গা। শক্তি ব্যতিরেকে কৰ্ম হয় না। এই যে
বিশ্ব সৃষ্টি, তৃণ জন্মিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সূর্য তাপ
দিতেছে, রাত্রে চন্দ্র উঠিতেছে, তারা দীপ্তি পাইতেছে,
শক্তি ব্যতীত সম্ভবিত পাবে না। তিনি আমাদের ক্ষুধা,
তৃষ্ণা, স্নেহ, দয়া, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত
হইতেছেন। কত কাল হইতে এই ভাবনা (conception)
আমাদের পূর্বপিতামহ আৰ্যগণের চিত্তে উদ্ভিত হইয়াছিল?

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২০-এর সূক্ত দেবী-সূক্ত
দ্বারা খ্যাত (সূক্ত, স্তোত্র)। ইহাতে আটটি ঋক (মন্ত্র)
আছে। রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধার
করিতেছি।

১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি,
আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে
থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই
ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ
করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই
সহায়তাতে সেই সকল কার্য করেন।

৭। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি, সেই
আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে
আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত
হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি
স্পর্শ করি।

৮। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে
বায়ুর গ্রায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ
হইয়াছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও
অতিক্রম করিয়াছে।

রুদ্র, বসু, আদিত্য, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিদ্বয়
প্রভৃতি দেবতা প্রকৃতির এক এক শক্তির নাম। তিনিই
তাবৎ শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই তাবৎ
ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর গ্রায় বহমান
হইতেছেন। তিনি সলিলময় আকাশ-সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়া

আছেন। ইত্যাদি। তিনিই দুর্গা নামে অভিহিত
হইয়াছেন।

এই সূক্তের বক্তা কে? নিশ্চয় তিনি দুর্গা। ঋগ্বেদে
তাহাকে বাক্ বলা হইয়াছে। অবশ্য কোন ঋষি প্রজ্ঞা-রূপা
বাক্‌দেবীর দ্বারা আবিষ্ট হইয়া এই মহিমা কীর্তন
করিয়াছেন।

দুর্গা ভাবনার মূল পাইলাম। কতকাল পূর্বে এই
মূলের উৎপত্তি? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তিম সূক্ত
পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক রুদ্রের অন্তিম কালে
এই সূক্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সে কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০
হইতে ২৫০০ অব্দ। খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ যজুর্বেদ,
সামবেদ ও অথর্ববেদের কাল। ঋগ্বেদ হইতে এই তিন
বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সব কাল-নির্ণয়ে পশ্চিমযুগী
পাঠকেরা বিস্মিত হইতে পারেন। যখন তাহারাই মহিষাসুর-
বধ বৃত্তান্ত শুনিবেন, তখন আরও বিস্মিত হইবেন।

এই সূক্তই যে দেবীপূজার মূল, তাহার প্রমাণ দিতেছি।
(১) মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে আছে, রাজা
সুরথ চণ্ডীপূজার সময় দেবীসূক্ত জপ করিতেন। তদ্বারা
তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। (২) মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত
চণ্ডীমাহাত্ম্যে দেবীসূক্তের বিস্তার। বেদ-পাঠে ও শ্রবণে
যাহাদের অধিকার ছিল না, তাহাদের শ্রবণনিমিত্ত পুরাণ-
কার দেবীসূক্তের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের
প্রতীতির নিমিত্ত অসুরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও অসুর-
পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র দেবগণের রাজা। দেবগণকে লইয়া ইন্দ্র মহিষা-
সুরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর হইতে তেজঃ নির্গত
হইল। সকল তেজঃ মিলিত হইয়া জলনশীল পর্বতের
গ্রায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে সেই তেজোরাশি এক
নারীরূপে আবির্ভূত হইল। তিনিই মহিষাসুর বধ করেন।
এইজন্ত তাহার নাম মহিষমর্দিনী। তিনি সকল দেবের
সম্মিলিত শক্তি, বিশ্বশক্তি। এই কারণে দুর্গাপূজায় চণ্ডী-
পাঠ অবশ্যকর্তব্য হইয়াছে। (৩) পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও
তামিল দেশে দুর্গাপূজা হয় না, সে সময়ে সরস্বতী পূজা
হয়। আমরা বঙ্গদেশে যেমন শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা
করি, সে সে দেশের বিদ্যার্থীরা আশ্বিন শুক্ল সপ্তমী, অষ্টমী,
নবমীতে সরস্বতীর পূজা করে। অতএব দেবীসূক্তের বাক্
দুর্গারই নামান্তর।

কার এই শক্তি? কেন-উপনিষদ নামে একখানি উপনিষদ আছে।

তাহার প্রথমে 'কেন' শব্দ আছে। এই হেতু সেই উপনিষদের নাম কেন-উপনিষদ। এই উপনিষদে উক্ত প্রশ্নের বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে।

কে মনকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়, কে প্রাণকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়? কার ইচ্ছাতে লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ দেবই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন? তিনি (ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন।

একদা দেবান্নর-সংগ্রামে দেবগণ জয়ী হইলেন। তাহাঁরা মনে করিলেন, এই বিজয় তাহাঁদেরই। তিনি জানিতে পারিলেন, তাহাঁদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু এই মহদুত কে, ইহা তাহাঁরা জানিতে পারিলেন না।

তাহাঁরা অগ্নিকে বলিলেন, “হে সর্বজ্ঞ, এই মহদুত কে, তুমি জানিয়া আইস।” অগ্নি তাহাঁর নিকটে গমন করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন,

“তুমি কে? তোমাতে কি শক্তি আছে?”

“আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি।”

“ইহা দগ্ধ কর,” এই বলিয়া ব্রহ্ম তাহাঁকে একটি তৃণ দিলেন।

অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন।

“তুমি কে?”

“আমি বায়ু, মাতরিখা (আমি আকাশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করি।) অর্থাৎ আমি বহমান বায়ু।)

“তোমার কি শক্তি আছে?”

“পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পারি।”

“এই তৃণটি গ্রহণ কর।”

বায়ু সমুদয় বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র গিয়া দেখিলেন সেই আকাশে স্ত্রীকপিণী অতিসৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমা আবির্ভূতা। ইন্দ্র তাহাঁর নিকটবর্তী হইয়া তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“ইনি কে?”

“ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।”

ইন্দ্রাদি দেবতা যাহাঁকে জানিতে পারিলেন না, তাহাঁকে কিরূপে উমা জানিলেন? উমা কে? তিনি হিমালয়ের

কন্ঠাই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মধরুপিণী, নচেৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারিতেন না। তিনি ব্রহ্মের শক্তি। সে শক্তি আত্মপ্রকৃতি, আত্মশক্তি। আত্মশক্তি ইন্দ্রকে ব্রহ্ম দেখাইয়াছিলেন। অতএব আত্মশক্তির উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। তত্ত্বশাস্ত্রেও এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার আ-
কি উপায় আছে।

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্ম-দ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ, ইহা আধুনিক ভূতবিদ্যাবেত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কল্পনা দ্বারা অগ্নি ও ইহার দাহিকা-শক্তি পৃথক্ ভাবিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ করিতে পারি না।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ অগ্নিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। অগ্নির এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম জাতবেদা, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, তিনি সব জানেন। বিশ্ববিৎ, তাহাঁর আর এক বৈদিক নাম। তিনি বিশ্ববেত্তা। তিনি কেমন করিয়া জানেন? কারণ তিনি সকল পদার্থেই আছেন। ঋগ্বেদে ঋষিগণ বৃষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। বলিতেছেন, “হে ইন্দ্র! তুমি এই যজ্ঞে উপস্থিত হও, আর আমাদের প্রদত্ত হব্য-কব্যা গ্রহণ কর। এই সোমরস পান কর।” এই বলিয়া তাহাঁরা অগ্নিতে সে সে দ্রব্য অর্পণ করিতেন। কারণ ইন্দ্র এক শক্তি, অগ্নি ইন্দ্রশক্তির প্রতিনিধি। অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্য অগ্নিতে যাহা অর্পিত হয় তাহা ইন্দ্র পাইয়া থাকেন। ঋগ্বেদ হইতে (রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ) অগ্নির গুণ ও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় তুলিতেছি।

অগ্নি সমস্ত ভুবন পর্যবেক্ষণ করেন। (১০।১৮।১৪)। হে অগ্নি। কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্তুতি সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। (৪।১।১৩)। হে অগ্নি! তুমি শক্তি-পুত্র, যুবা, যবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা) জ্ঞান-সম্পন্ন। (৬।৫।১)। হে জাতবেদা! তুমি মহত্ত্ব দ্বারা দেবগণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ। (৭।১।৩২)। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। (৮।৪।২১)। অগ্নির মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক। (১।৫২।৫)। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। তুমি বরুণ, তুমি শত্রু-বিনাশক মিত্র, তুমি আকাশের অস্থর রুদ্র, (২।১।৩০০৭)। তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ। হে অগ্নি! তোমাতে সমস্ত দেব-

গণ অবস্থিতি করেন। (৫।৩।১)। তুমি অমিত তেজোরলে অপরিমিত অমোনির্মিত নগরীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। সেই জাতবেদা নিজ মহেশ্বর দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, সত্যকারী সনাতন সর্বজ্ঞ। হে শক্তি-পুত্র! তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর, আমাদের রিপুগণকে জয় কর। (৬।৪।৪)। অগ্নি ভ্রাতা। (৮।৪।১৬)। তিনি পিতৃমাতৃ স্থানীয়। (৬।১।৫)। তিনি স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন। (৭।১।১৫)। ইত্যাদি

এইরূপ অগ্নি-স্ততি অনেক আছে। অগ্নি শক্তি-পুত্র বা বলের পুত্র। মূলে আছে, 'সহসো সূহুং।' 'সহসো বলস্ত সূহুং পুত্রম্'। সাযন বুঝিয়াছেন, যেহেতু মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, সেই হেতু এই নাম। (৬।৫।১)। এই ব্যাখ্যা ঠিক মনে হয় না। কারণ বালকেও অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। "শক্তির পুত্র", ইহার অর্থ শক্তিমান। যেমন, মিত্র বরুণকে মহান বলের পৌত্র ও বেংগের পুত্র বলা হইয়াছে। (৮।২।৫)। এই সকল সূক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম সংক্ষেপে দেবীসূক্তেও হইয়াছে, পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সবিস্তারে হইয়াছে। অতএব দুর্গাতে যে শক্তি, অগ্নিতেও সেই শক্তি অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অগ্নি তেজোময় (তেজঃ—radiant energy)। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অন্তর্ভব করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে পার্থিব অগ্নিরও বর্ণনা আছে। কাষ্ঠাগ্নি, বাঁড়বাগ্নি, পাষাণাগ্নি, বিদ্যুদাগ্নি, সূর্য্যাগ্নি, সকল অগ্নিরই দাহিকা শক্তি আছে। সকল অগ্নি মূলতঃ এক। কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নির পৃথক্ ভাবনা হইয়াছিল।

নারায়ণ উপনিষদ নামে এক উপনিষদ আছে। তাহাতে আছে,

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং
বৈরোচনীয়াং কর্ম ফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ ॥

যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপ দ্বারা জলন্তী, যিনি স্ব-প্রকাশা, যিনি কর্মফলের নিমিত্ত উপাসিতা, সে দুর্গাদেবীর শরণ লইতেছি। সেই সংসার তরণের হেতু তারিণীকে নমস্কার।

বেদের ঋষিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকে বিশ্বশক্তির প্রতিনিধি ভাবিয়াছিলেন এবং সেই হেতু অগ্নিকে ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ ইত্যাদি দেব বলিয়াছিলেন। কারণ এক এক দেব বিশ্বশক্তির অংশাংশ মাত্র। নারায়ণ উপনিষদ সে শক্তিকে দুর্গা বলিয়াছেন। (এই উপনিষদ তত

পুরাতন বোধ হয় না। পুরাতন নাই হউক, বেদোক্ত বর্ণনা হইতে এই মন্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে।)

যদি দুর্গার পূজা করিতে হয়, কোন্ দেবের যজ্ঞায়ির পূজা করিব? ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেব কেহই ঈশ্বর নাম পান নাই। কেবল রুদ্র, মহেশ্বর, মহাদেব এই এই নাম পাইয়াছিলেন। অতএব রুদ্র যজ্ঞায়িকে দুর্গা রূপে পূজা করিতে পারি। ঋগ্বেদে রুদ্র, মহেশ্বর রূপে পূজিত না হইলেও তিনি শিব। (মঙ্গলময়) বিবেচিত হইয়াছিলেন। বিশেষ্বর, ভুবনেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, রামেশ্বর ইত্যাদি মহাদেবের নামে ঈশ্বর আছে, অত আর কোন দেবের নামে নাই। মহেশ্বরের যজ্ঞায়ি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী। ইন্দ্রায়ি ইন্দ্রশক্তি, ইন্দ্রাণী। বরুণায়ি বরুণ-শক্তি বরুণাণী, বিষ্ণু-শক্তি বিষ্ণুবাণী। মহেশ্বর ও মহেশ্বরী রুদ্র ও রুদ্রাণী ইত্যাদি নাম হইতে দুই পৃথক্ মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ ভাব কাল্পনিক, বাস্তবিক নয়। অতএব রুদ্রের যে গুণ ও কর্ম রুদ্রাণীরও তাই। দেব ও তাঁহার অগ্নিকে পতি পত্নী কিম্বা ভ্রাতা ভগিনী, দুইই কল্পনা করা যাইতে পারে। এক উদ্দেশ্যে দেবের স্তুতি ও অগ্নির সাহায্য আবশ্যক হয়। এই হেতু রুদ্রায়িকে রুদ্রের ভগিনী বলিতে পারা যায়। যজুর্বেদে ইহাই আছে।

কোন্ ঋতুতে রুদ্র-যজ্ঞ হইত, ঋগ্বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কোন দেবতারই নাই। কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় শরৎ ঋতুর আরম্ভে রুদ্র-যজ্ঞ হইত। ইহার বিশেষ প্রমাণ যজুর্বেদে আছে। সেখানে রুদ্রাণী অধিকা নামে উক্ত হইয়াছেন। এক স্থানে শরৎ ঋতু অধিকারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। জিজ্ঞাস্য পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়" প্রবন্ধাবলীর "যজুর্বেদের কাল" পড়িতে পাবেন। সেকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দ। অথর্ব বেদেরও সেই কাল।

শরৎ ঋতু কোন্টি। আশ্বিন কার্তিক শরৎ ঋতু চিরকাল ছিল না। যে মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস আশ্বিন মাস, যে মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাস কার্তিক। চন্দ্র ও নক্ষত্র যুক্ত করিয়া আশ্বিনাদি মাসের নাম হইয়াছে। কিন্তু সূর্য ঋতু বিধান করেন, চন্দ্র করেন না। কোন নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া সে নক্ষত্রে পুনরাগত হইলে সূর্যের এক বৎসর হয়। বৎসরে দুই অয়ন, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে তিন ঋতু, শিশির (শীত), বসন্ত, গ্রীষ্ম। দক্ষিণায়নে তিন ঋতু, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। দুই মাসে এক ঋতু। অতএব বর্ষা ঋতু গতে অর্থাৎ

দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইতে দুই মাস গতে শরৎ ঋতুর প্রথম মাস। বেদের কালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে বৎসর ধরা হইত। আমাদের কোন কোন ধর্ম-কৃত্যে সে বৎসর ধরিতে হয়। ঋগ্বেদের আদ্যকালে এই গণনা ছিল। হিম, (শীত) ঋতু হইতে আরম্ভ বলিয়া ঋষিগণ বৎসরকে 'হিম' বলিতেন। তাহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন আমরা শতহিম জীবিত থাকি। পরে, বোধ হয় রুদ্র-যজ্ঞ কাল হেতু শরৎ-ঋতু হইতে আর এক বৎসর আরম্ভ করিতেন। সে বৎসরের নাম শরৎ ছিল। ঋষিগণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমরা যেন শত শরৎ জীবিত থাকি। সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ বৎসর হইয়া গিয়াছে। যথা, অমরকোষে, সম্বৎসরো বৎসরোহকো হায়নোহস্তী শরৎসমাঃ। অতএব শারদীয় উৎসব কেবল দুর্গোৎসব নহে, নববর্ষ প্রবেশের উৎসবও বটে। এই কারণে দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য বাড়িয়া গিয়াছে।

কোন নক্ষত্র হইতে সে নক্ষত্রে সূর্যের পুনরাগমন কাল এক বৎসর; অতএব ইহা নাক্ষত্রিক বৎসর। পূর্বকালে ৩৬৬ দিনে এক নাক্ষত্রিক বৎসর ধরা হইত। অমাবস্তা হইতে অমাবস্তা, কিম্বা পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক চান্দ্র মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে ৩৬০ তিথি, কিন্তু ৩৫৪ দিন। অতএব দ্বাদশ চান্দ্র দ্বারা বৎসর পূর্ণ করিতে হইলে আরও (৩৬৬-৩৫৪) ১২ দিন আবশ্যক হয়। ১২ দিন ১২ তিথি। মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া বার মাসে বার তিথি। বৈদিক পাজিতে এই গণনা ছিল।

কবে শরৎ ঋতুর আরম্ভ, এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। হিম-বৎসরের আট চান্দ্র মাস গতে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।

কোন দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ? দিক্চক্রে সূর্যোদয় কিম্বা সূর্যাস্ত স্থান দেখিয়া বলিতে পারা যায়, কিন্তু যজ্ঞাদি ধর্মকৃত্যের আয়োজন আছে পূর্বে না জানিলে যথাদিবসে কর্ম নির্বাহ হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে আসিলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এই কারণে সে নক্ষত্র জানা আবশ্যক হইয়াছিল। দৈবক্রমে চিরদিন একই নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদি (উত্তরায়ণ আরম্ভ) হয় না। ২৬০ বৎসর পূর্বে যে নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এখন সে নক্ষত্রে হয় না, পশ্চিম দিকের নক্ষত্রে হইতেছে। অর্থাৎ উত্তরায়ণাদি পিছাইয়া আসিতেছে। নক্ষত্র স্থির; অয়নাদি শটনঃ শটনঃ পশ্চিম-

গামী হইতেছে। বর্ষ-চক্র বিষ্ণু-চক্র। দুই অয়নাদি ও দুই বিষ্ণু, এই চারি স্থান চারি বিষ্ণুপদ। একটির যে পরিমাণ পশ্চাৎ গমন হয়, অপর তিনটিরও সেই পরিমাণ হয়। নক্ষত্র স্থির আছে, স্ততরাং মাস ও বর্ষচক্রের যথা-স্থানে আছে। ঋতু পিছাইতেছে। শতাব্দিক দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছায়। আমরা সবাই জানি অধুনা ৭ই আশ্বিন শারদ বিষ্ণু হয়। ষোল শত বৎসর পূর্বে ৩০শে আশ্বিন হইত। বস্তুতঃ সৌরমাস গণনায় এখন ৭ই ভাদ্রে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হইতেছে। বিষ্ণু পদের পশ্চাৎ গতি আছে বলিয়াই বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে।

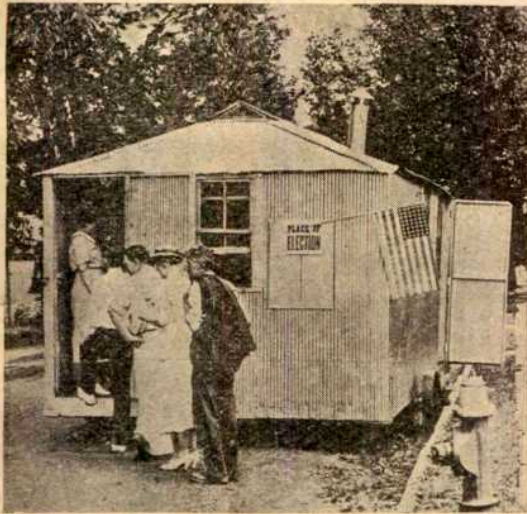
পরে দেখা যাইবে কালপুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের প্রতিমা। কালপুরুষ নাম বাঙ্গলা, সংস্কৃত নাম যুগ নক্ষত্র। কত শত বৎসর পূর্বে শরৎ ঋতুর আরম্ভে সন্ধ্যায় পর এই নক্ষত্রের উদয় হইত? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়। আমরা অগ্রহায়ণ মাস জানি। ভারতের তাবৎ স্থানে এই মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। যে মাসে যুগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪ সূক্তে সোম ও রুদ্র একসঙ্গে আহূত হইয়াছেন। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, "তোমাদের যজ্ঞ ব্যাপ্ত হউক।" এখানে সোম অর্থে চন্দ্র, সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র, অর্থাৎ যুগ নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে রুদ্রযজ্ঞ হইত। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে) পূর্বলিখিত নির্বচন অনুসারে কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহার ২০০০ বৎসর অর্থাৎ খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে অগ্রহায়ণ মাস শরৎ বৎসরের প্রথম মাস হইয়াছিল। এই কথাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম্", আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ নামের অর্থও তাই। হায়ণ বৎসর, ব্রহ্মসরের অগ্র, প্রথম মাস। পরে দেখা যাইবে, যজুর্বেদের কালে ও তাহারও পূর্বে শরৎ ঋতুর আরম্ভে মধ্য রাত্রে দেবীর সহিত মহিষা-স্বরের যুদ্ধ হইয়াছিল।

দুর্গা কে? ইহার ত্রিবিধ উত্তর পাইয়াছি। আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নি-রূপা। ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। ইহা আধিদৈবিক অর্থ। রুদ্রদেবের শক্তি, রুদ্র যজ্ঞীয়াগ্নি। সে অগ্নি নানা রূপে খ্রী-পূ ৪৫০০ অব্দ হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নির্বাচন-পর্ব

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

বর্তমান বৎসরের পাঁচই নভেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় শহর এবং পল্লী অঞ্চলের ভোটদাতাগণ কর্তৃক এক সাধারণ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সভ্যমণ্ডলী নির্বাচিত হইবেন। শাসন-পরিষদের এই সকল সদস্য আগামী কয়েক বৎসর দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, বহুল পরিমাণে ইহার আর্থিক উন্নয়ন, এবং বৈদেশিক সম্পর্কে দৃঢ়ীকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবেন।



মার্কিন ভোট-দাতাগণ নির্বাচন দিবসে ভোট দিবার জল লাইন করিয়া দাঁড়াইয়াছে

প্রত্যেক দুই বৎসর পরে একবার (যুগ্মসংখ্যক বৎসরে) যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটি ষ্টেট হইতে কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচন ব্যাপার অহুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসরেই প্রতিনিধি-পরিষদের (House of Representatives) মোট ৪৩৫ জন সদস্য গণ-ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। সিনেটের মেয়াদ অবশ্য প্রতি-বারে ছয় বৎসর, কিন্তু ইহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, প্রতি দুই বৎসরে ইহার ১৬টি আসনের এক তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যায় এবং প্রত্যেক দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে উক্ত শূন্য আসন পূর্ণ করিতে হয়।

কংগ্রেসী সদস্য, সিনেটর, প্রতিনিধিবর্গ এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে পদগত মর্যাদা এবং স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কাল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের দরুন গবর্নমেন্টের শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ এই দুইটি বিভাগের মধ্যে কখনো কখনো রাজ-নৈতিক বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে। কোনো প্রেসিডেন্টের আমলে যদি অন্তর্কর্তৃত্বকালে নির্বাচন-পর্ব অহুষ্ঠিত হয় (যেমন বর্তমান বৎসরে হইতেছে) তাহা হইলে কংগ্রেসী দলের

পক্ষে—বিশেষ ভাবে নিম্ন পরিষদে, (Lower House) হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধিদের হাত হইতে কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসরের কংগ্রেসী নির্বাচনের গুরুত্ব যে এত বেশী উপরি-উক্ত বিষয়টি তাহার অস্বতম প্রধান কারণ। বিগত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে যত নির্বাচন-পর্ব অহুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকটিতে পুরোধা রূপে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-লিন ডেলানি রজ্জশেট উপস্থিত থাকিতেন। কাজেই বর্তমান ব্যাপারে তাহার অজ্ঞাব ডেমোক্র্যাটিক কর্তৃক বিশেষ ভাবে অহুভূত হইবে। এখন গণতন্ত্রী (Democrats) ও রিপাব্লিকান এই দুইটি প্রধান প্রতিযোগী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। শেযোক্ত দল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত, কাজেই এবার তাহারা সে অধিকার লাভ করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিবে। রাজনীতি-বিশারদগণ ইহাকে ‘মরণ-পণ’ প্রতিযোগিতা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। নভেম্বরে যদি গণতন্ত্রীদল ভোটাধিক্যের বলে পুনর্নির্বাচিত না হয় তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে যে কংগ্রেসের কর্তৃত্বরূপে রাষ্ট্র-পরিচালনা করিতে হইবে তাহাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলেরই প্রাধান্য থাকিবে। কাজেই বর্তমান কংগ্রেসী নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি ইহাই স্থচিত করিতেছে যে, আগামী প্রেসি-



যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে গ্রামবাসীগণ কর্তৃক ভোট-পত্রের (Ballot-paper) সাহায্যে ভোট প্রদান

ডেট নির্বাচনেও কঠোর প্রতিযোগিতা এবং তুফল ভোট-সংগ্রাম হইবে। সেই ভাবী ভোট-সমরাদ্বয়ের সীমারেখাও ইতিমধ্যেই প্রায় নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।



নির্বাচক মণ্ডলীর কর্মচারীগণ কর্তৃক জনৈক তরুণীর ভোট গ্রহণ। পিছনে স্ব স্ব ভোটদানের জায়গা প্রতীক্ষারত তরুণ-তরুণীগণ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমগ্র দেশের জনগণের অর্থও মনোযোগ একান্ত ভাবে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, কিন্তু কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচনে ৪৮টি ষ্টেটের পৃথক পৃথক নির্বাচন-পরিষদের (electorate) স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। সমগ্র দেশের ষ্টেটসমূহ জুড়িয়া কংগ্রেসী নির্বাচনের সংগ্রামক্ষেত্র প্রসারিত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যাবতীয় বিষয়ই ইহার কর্ম-তালিকার অন্তর্গত। বিভিন্ন ষ্টেটের জনগণ তাঁহাদিগকেই কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত করে, যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে আসন লাভ করিয়া তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণসাধনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লন।

প্রেসিডেন্ট হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় জনগণের একক প্রতিনিধিত্বরূপ, কিন্তু কংগ্রেসী সদস্য রাষ্ট্রের সহিত তাঁহার নিজের ষ্টেটের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার কার্যে যোগসুত্ররূপ। অবশ্য নভেম্বরের ভোটাভুটি দ্বারাই কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচন-পর্বের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক রদমক্ষে পটপরিবর্তন এবং বিচিগ্র দৃষ্টিাদির অবতারণা সূত্র হয় পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকাল হইতেই এবং আকস্মিক দ্রুততায় এই রাজনৈতিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হয় শরৎকালে। আমেরিকার নির্বাচন-সংগ্রামের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষাংশে পর্যন্ত বিভিন্ন ষ্টেটে অনুষ্ঠিত “দলগত প্রাথমিক নির্বাচন”। তাহাতে কংগ্রেসী সদস্য পদপ্রার্থীগণ ব্যতীত ষ্টেটের উচ্চ সরকারী পদপ্রার্থীগণের নামও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

প্রাথমিক নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অহুগামীরা

যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ-প্রার্থীদের মধ্য হইতে নিজেদের প্রতিনিধিত্বরূপ এমন কয়েকজনকে নির্বাচিত করে যাহাদের পক্ষে অধিকসংখ্যক ভোটের জোরে নভেম্বরের নির্বাচনে ষ্টেট, কাউন্টি ও শহরের উচ্চ সরকারী পদ লাভ করা এবং কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। এইরূপে প্রত্যেক ষ্টেটের গণতন্ত্রীগণ প্রাথমিক নির্বাচনে তাহাদের মনোনীত নামগুলির সপক্ষে ভোট দিয়া ষ্টেটের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী উচ্চপদপ্রার্থিদগকে নির্বাচিত করে। প্ররিাবিকানরাও এই একই কর্তব্যপন্থা অনুসরণ করিয়া চলে। তার পর নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ষ্টেট ইলেক্টরেটে এই বিভিন্ন দলের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে



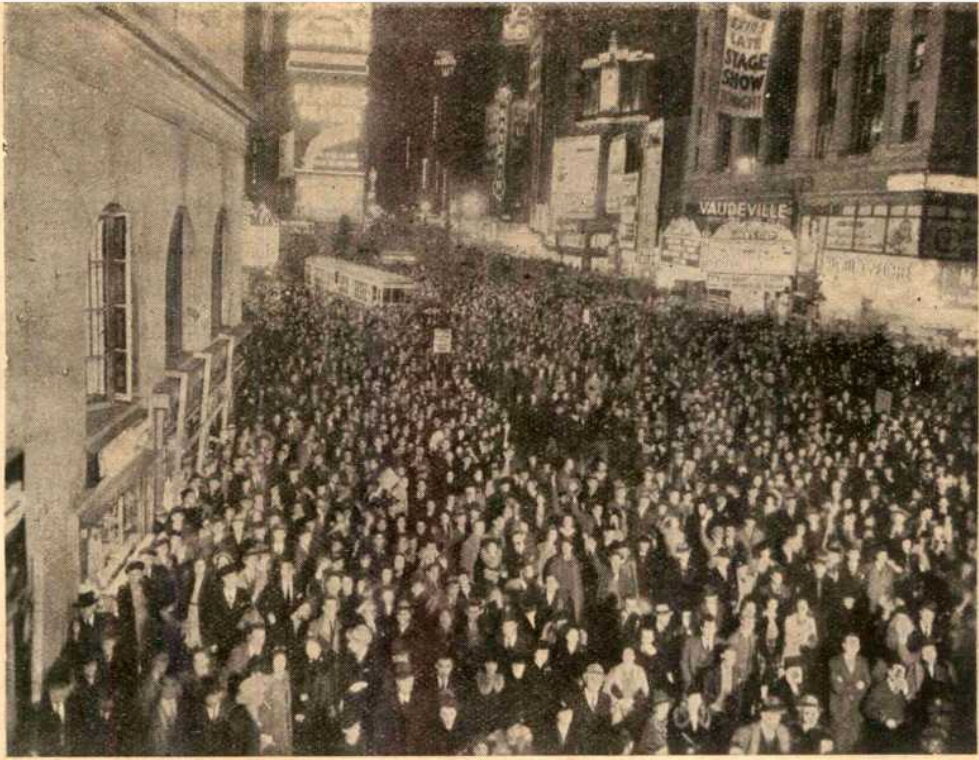
ভোট-যন্ত্রের সাহায্যে ভোট প্রদানরত জনৈক মহিলা।

বর্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ষ্টেটে এই

যন্ত্রের সাহায্যেই ভোট দেওয়া হয়

রাষ্ট্রীয় উচ্চপদসমূহের জয় কর্মচারী নির্বাচিত করেন। এমনি ভাবে ষ্টেট ইলেক্টরেটে কর্তৃক নির্বাচিত দলের লোকেরাই প্রত্যেক ষ্টেটে কর্তৃত্ব করেন এবং এই বিশেষ অধিকার লাভ করার দরুন তাহারাই জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

সাধারণ নির্বাচনে গ্রীষ্মকালীন ভোটাভিযান পর্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটসমূহে



নিউ ইয়র্ক সিটির জাম টাইমস কোয়ার্টারে মধ্যরাতে ভোটের ফলাফল শুনিবার জন্য প্রতীক্ষমান জনতা

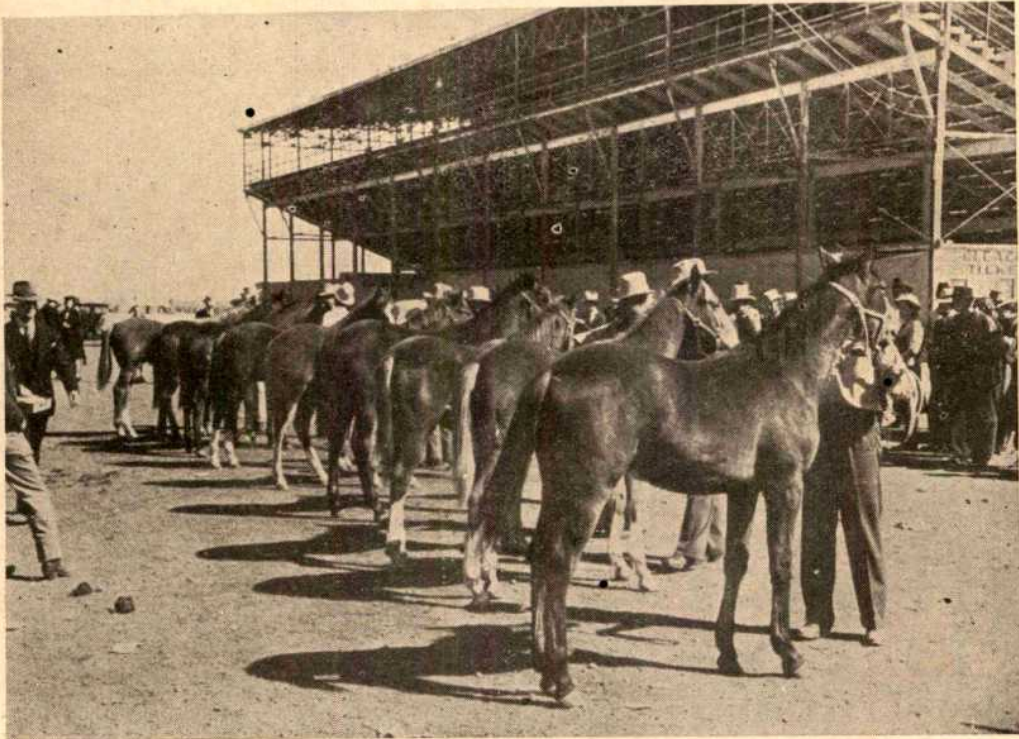


মালাকান্দের 'মালিক' উপজাতিদের সভায় বক্তৃতা প্রদান রত পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু

যুক্তরাষ্ট্রে 'হরিহর-ছত্র'র মেলা।



টেক্সাস স্টেটের সান এঞ্জেলোর মেলা-প্রাঙ্গণে সমবেত জনতা



টেক্সাস স্টেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি বার্ষিক মেলায় শ্রেণীবদ্ধ অশ্ব-প্রদর্শনী

এই সময়েই সদস্য-পদপ্রার্থীদের মধ্যে ভোট সংগ্রহের জ্ঞান বিশেষ কর্তৃত্বপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। তখন তাঁহারা অদম্য উৎসাহে দ্রুতম পল্লী অঞ্চলে গিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচন-দিবসে নিকটবর্তী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সপক্ষে ভোট দিবার জ্ঞান সনির্বন্ধ অহরোধ জ্ঞাপন করেন। যাহারা দোটার্নায় পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতে থাকে তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জ্ঞান তাঁহাদের চেষ্টার আর অন্ত থাকে না। এমনি ভাবে প্রত্যেক ভোটদাতার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া অবশেষে তাঁহার শহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে বিস্তৃত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে হয়। কারণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদপ্রার্থী যদি না যথেষ্টসংখ্যক লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে দলে টানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নির্বাচন-সংগ্রামে জয়ের আশা সূদূরপর্যায় হইয়া দাঁড়ায়, কেননা, আমেরিকান ইলেক্টরেট এত বিশাল যে, কোন সদস্য-পদপ্রার্থীর পক্ষেই অসংখ্য ভোটদাতাদের একটি ক্ষুদ্র অংশের উপর মাত্র ভরসা করিয়া নিশ্চিন্তমনে ভোট-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া চলে না। এই উভয় ভোট-সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে। তখন হইতে ভোটের ফলাফল জনসাধারণের জ্ঞতিগোচর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভোটসমূহের নির্বচীকরণ (Tabulation) অন্ত্যস্ত দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয়। নির্বাচন-পরিষদের যাবতীয় কর্মচারীই কোন্ কোন্ প্রার্থীর সকলকাম হওয়ার সম্ভাব্যতা আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সেদিন ক্রমাগত জেলায় প্রদানকেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাইতে থাকেন।

ওদিকে কোনো কেন্দ্রের ভোটসংখ্যা হেড কোয়ার্টার্সে প্রেরিত হইবামাত্র তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং রেডিও যোগেও সর্বত্র প্রচারিত হয়। এমনি ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জনসাধারণ এবং সদস্য-পদপ্রার্থীদিগকে প্রতিযোগিতার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়। কঠোর প্রতিযোগিতা-মূলক ভোটগ্রহণে, যে পর্যন্ত না শেষ ভোটটি সম্বন্ধে যথাযথ রিপোর্ট বাহির হয় সে পর্যন্ত প্রার্থীগণ নির্বাচন ব্যাপারে সাক্ষাৎলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন না। কেননা এমনও দেখা যায় যে, বিপুলসংখ্যক ভোট লাভ করিয়া জয় লাভ সম্বন্ধে যিনি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন, শেষ মুহুর্তে বিপক্ষ

দলের একটিমাত্র অধিক ভোটের দরুন তাঁহার নির্বাচন-তরুণী বানচাল হইয়া গেল।

৬ই নভেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি ঐতিহাসিক কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচন-পর্ব অনুষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ভাগ্য এই নির্বাচন-সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া দোহুল্যমান বলিয়া ইহার গুরুত্ব সমধিক। আটচল্লিশটি ষ্টেটের ভোটদাতাগণ নিজেদের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জ্ঞান যে নির্বাচন-সংগ্রামের স্বচনা করিয়াছিল অচিরেই তাহার অবদান হইবে এবং তাঁহাদের নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-প্রণেতা রূপে, অন্ততঃ পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের প্রাকাল পর্যন্ত দেশের ও দশের সেবার রত থাকিবেন। ভোট প্রদান কালে জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে যে গৃহাই অবলম্বন করুক এবং যাহার পক্ষেই ভোট দিক না কেন, নূতন নির্বাচনজনিত শাসন-ব্যবস্থা চালু হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মতকেই সকলে নির্বিচারে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সদস্যগণও সমগ্র জাতির জ্ঞাত জনমতকেই প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে নিজ নিজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন, তারপর যখন পুনর্নির্বাচনের সময় আসে তখন আবার পুরনো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে একটু অদল-বদল কবিয়া নূতন করিয়া গড়া হয়।*

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রায় পুরাপুরি খবরই বাহির হইয়াছে। ইহাতে রিপাব্লিকান দল প্রতিনিধি-পরিষদে ২৪৫টি আসন দখল করিয়াছে। সিনেটে রিপাব্লিকানরা ৫১টি আসন দখল করিয়াছে। কাজেই এবারকার নির্বাচনে রিপাব্লিকানরাই যুক্তরাষ্ট্র-কংগ্রেসে ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। রিপাব্লিকান দলকর্তৃক কংগ্রেস অধিকৃত হওয়ার ডেমোক্র্যাটিক দলভুক্ত সিনেটর মিঃ উইলিয়াম ফুলরাইট প্রেসিডেন্টের পদ হইতে মিঃ ট্রুম্যানের পদত্যাগ দাবি করিয়াছিলেন, কিন্তু ৭ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ যে তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

এই নির্বাচন-সংগ্রামে মিঃ ডিউই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ অধিক ভোট পাইয়া রেকর্ড স্থাপন পূর্বক পুনরায় নিউ ইয়র্কের গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া রাজনীতি-বিশারদগণ মনে করেন।

কাব্যে পশুপক্ষীর নাম

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (১৩৪৯, ভাদ্র) বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছিলেন—“প্রাচীন কোন কবির মহাকাব্য নাটক প্রভৃতিতে যত বেশী পশু-পক্ষীর নাম পাওয়া যায়, প্রকৃতির সহিত তাহার বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচয় অনুমিত হইতে পারে। উক্তর সত্যচরণ লাহা ‘কালিদাসের পাখী’ নামক গ্রন্থে কালিদাসের গ্রন্থনুসারে যত পাখীর উল্লেখ আছে, সমুদয় একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন। অল্প সংস্কৃত কবিদের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এরূপ কিছু করিয়াছেন কিনা জানি না।

“বাংলা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অন্ততঃ বড় বড় লেখকদের গ্রন্থাবলীতে কোন কোন পাখীর উল্লেখ আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইলে পরে বুঝা যাইতে পারে প্রকৃতির সহিত কোন লেখকের সংস্পর্শ ও পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ। কোন পাখী বা পশুর উল্লেখ থাকিলে যদি তাহার স্বভাব ও অভ্যাসের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক কিনা তাহারও বিচার হইতে পারে।”

তিন বৎসর পূর্বে যখন এই আলোচনা ‘প্রবাসী’ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। নানা দিক দিয়া সম্বন্ধ বন্ধ-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে কিনা বলিতে পারিব না। একটি উৎকলীয় কবির কাব্য হইতে এ বিষয়ে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব। প্রাচীন ও নবীন উৎকলীয় কবির কাব্যে ও খণ্ড কবিতায় পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে আদরে স্থান দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর উৎকলীয় লেখক রাধানাথ রায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাধানাথ উৎকলবাসী বঙ্গ-সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর হইতে আসিয়া উৎকলের বালেশ্বর জেলার কেদারপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামে রাধানাথ ১৮৪৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘকাল কর্ম করিয়া বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন এবং স্কুল ইন্সপেক্টরের পদ লাভ করিয়া প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে গীর্ঘস্থান অধিকার করেন। তাঁহার লিখিত কাব্য, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী সমগ্র উৎকলভাষী অঞ্চলে আজও সমাদৃত হইতেছে। রাধানাথ উৎকলবাসী হইলেও সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকার কালে বাংলাদেশের বাঁহুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষা বিভাগে কর্ম করিয়াছিলেন। বঙ্গের স্বসন্তান ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ রাধানাথ সাদরে গ্রহণ করিতেন। ভূদেব-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রিকায় রাধানাথের বাংলা লেখা

প্রকাশিত হইত। সেই রচনা দেখিয়া ভূদেববাবু মুগ্ধ হন এবং উৎকলবাসী কবি রাধানাথকে উৎকলীয় ভাষায় লিখিতে উৎসাহ দান করেন। ভূদেবের পরামর্শে রাধানাথ উৎকলীয় সাহিত্য-চর্চার মনোযোগী হইলেন। রাধানাথের কবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া ভূদেব তাঁহাকে একটি কবিতা দ্বারা আশীর্বাদ করেন। ইহা ‘এডুকেশন গেজেটে’ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত কবিতা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধার করিতেছি—

১

“রাধানাথ উড়িষ্যার গৌরব কেতন,
উদার বিনীত-বীর স্ববোধ স্বজন,
নানাতাষা বিদ্বষিত,
নানাশাস্ত্র অপরিত,
কবিতা-কাননে পিকবর প্রিয়বর,
স্বর্গীয় স্বভাবে পুত তোমার অন্তর।

২

সেই দিন রাধানাথ, আছে তব মনে,
সেই দিন প্রিয়বর, মম সন্নিধান
বসিয়া অগাধ সুখে
হরষিত মিতমুখে,
উপেল ভঞ্জে সেই কবিতা সুন্দর,
শুনারে মোহিয়াছিলে আমার অন্তর।”

উড়িষ্যার নন্দনদী, সাগর, হ্রদ, বন, পর্বত, মন্দির, দেবালয়, পশুপক্ষী ও কিংবদন্তী, শিল্প-কলা এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য রাধানাথের রচনার মধ্যে নিহিত আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনে এবং পশুপক্ষীর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শনে রাধানাথ যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন অল্প তাহা স্মরণ্য নহে। বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অনন্তসাধারণ। কেবল উৎকল ভ্রমণে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বঙ্গ-বিহার, অযোধ্যা, কাশী ও দার্জিলিং প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তত্ত্ব স্থানের নৈসর্গিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন যত্নের সহিত সেই সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি রাধানাথ মরমী, স্বপ্নদর্শী ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতার মধ্যে পশুপক্ষী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা আছে তাহা হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম,

(১)

“বিমলা তটিনী-তট-কাননে
বসন্তে কোকিল ভ্রমরস্বনে

নদী কল কল শুনি চঞ্চল
ছয়ই-তোমন, চাটু বচনে
নদীকূ রহত ভায়ু বিকসনে ॥

(২)

বাসর যৌবনে বিটপীতলে
বসন্তি কলাপিকুল কুশলে,
রতনবচিত্ত—পূচ্ছ আন্দোলিত
করুত সেকালে বহি শীতলে,
সে ছবি রসিক রসনা বলে ।

(৩)

অন্তগামী রবি বিভা ঝটকিলা
বড়দেউল জিশূলে,
ভাগবী পুলিহু হংসরালী(১) উড়ি
গলে ঝগরি-চূলে ।

(৪)

বিন্দু সরোবরে সিন্দুর লহরী
ধেলিলা মন্দ সমীরে,
রথাদ-মিথুন দীপ দণ্ডি ছাড়ি
গলে বিপরীত ভীরে ।

(৫)

সহসা ভীষণ শার্দুল আসিলা
মৃগমারি সে নিরুপরে,
শোণিতে আগ্নুত নব দন্ত তার,
মুখর শোণিত ক্ষরে ।

(৬)

বাসন্ত দেখি ভীক গহ্বর ভিতরে
লুচিলা-ভ্রম-বিহবলে,
তর তরে যাউ উত্তরীয় দেহ
খসি পড়িলা ভূতলে ।

(৭)

জল পিই বনে বাহুভঙ্গে ব্যাঘ্র
ভেটলা দেহি বসন,
রক্তলিপ্ত মুখে ঝগ ঝগ করি
পকাইলা সেহিক্ষণ ।

(৮)

মৃৎ মৃৎ হোই ভ্রমন্তি
নানা রঙ্গে হরিণ
তরঙ্গ চাহানি চাহান্তি
চাকু গ্রীবা তোলিণ ।

(৯)

হেমাদ্র হলদীবসন্ত(২)
দেখি যেহে সঞ্চান(৩)

অন্তরীক্ষে ধাত্র সলসে
ক্ষণপ্রভা সমান ।

(১০)

মুহু চক্ষু মুন সঞ্চান
পচ্ছ করে বিস্তার,
মনে করগত পলকে
পরাহেলা শীকার ।

(১১)

হলদীবসন্ত একান্ত
প্রাণভয়ে অস্থির,
ক্ষণে ধৃত ক্ষণে মুকত
মনে নিজ শরীর ।

(১২)

কাঞ্চন পুচ্ছকু সঞ্চান
চক্ষুক্ষণে পরশে,
চঞ্চলে এড়াই শীকার
ধরো তির্যকে খসে ।

(১৩)

কাহি অধারোহী ঘেনি অধবর
কদমে বুলাই দিওই চকর ।

(১৪)

অবগাহুচ্ছন্তি করী দলে দলে
বিষম পরারে দিশি শ্রোতজলে ।

(১৫)

দাসেরক(৪) আশ্রা করি তরুতল
চোবাউছি গ্রীবা টেকি নিষদল ।

(১৬)

ভারবাহী যেতে গর্দভাদি করি
ভ্রমুচ্ছন্তি দূরে দলে দলে চরি ।

(১৭)

কুস্তাচীমা(৫) ঝগ প্রভাত ভগরা
রঙ্গে বজাইলা কানন নাগরা ।

(১৮)

বিহিলে কাঙারে কুজুট কোশিক(৬)
চমাপুঅ(৭) মিলি উষা-তোষ্যজিক ।

(১৯)

মন্দানিলে বুলুঅছি সিংহাসন,
বর্ষ তোলি বর্ষা তাওবে যেসন ।

(২০)

তা সঙ্গে মিশিলা ভ্রমরসঙ্গীত,
বনবিহঙ্গর কাকলি ললিত ।

(২১)

হংস চক্রবাক জলে অবতরি
বেড়িণ দেবীক্ষি বুলিলে পছঁরি ।
য়গয়গী তীরে তৃণাহার ছাড়ি
উদ্যেবে চাহিলে হোই ষাড়াধাড়ি ।

(২২)

কপোতে রাবিলে তরুশে গুচি,
পত্র অন্তরালে রাবিলে গুজুচি(৮) ।
অচলে কোচিলাখাইঙ্গর(৯) রাব
প্রচারিলা বনে মধ্যাহ্ন প্রভাব ।
নদীকুলে গুণি স্বজাতির স্বর
নদীকুলবন্ধু(১০) দেলা প্রত্যুত্তর ।

(২৩)

রথাকী ভাসই কাঠঘোড়ি নীরে
ধরে কাণ্ডে, ধরে অনাই মিহিরে
পটআদহরা পক্ষী দলে দলে,
উড়ি আশুচ্ছন্তি নভে কোলাহলে ;
গউড়ে মধুরে মুক্তলী বজাই
পঠার গৌঠকু আশুচ্ছন্তি গাই ।

(২৪)

তেমুহাগী নামে গুহস্থান এবে বিদিত লোকে,
তজীকুঞ্জে জায়া সঙ্গে রঙ্গে যিহ ক্রীড়ন্তি কোকে(১১) ।

(২৫)

পারিষিকি বিজে হেলে নরবর আরোহী দন্তী(১২)
কুমারিকী সঙ্গে অমারীরে যেনি বিজে দুঅন্তি,
প্রতিদিন উষা এহিরূপে যাই নৃপগহনে
দেখুখাই বনে যুগয়া কোশল নিবিষ্ট মনে ;
দেখুখাই বন—পশুপক্ষীর চেষ্টা ইঙ্গিত,
সাহস, সাধস, স্নেহ, মায়া আদি যিহি সূচিত ;
কৌতুকে কাননে কলুখাই মনে রাজেন্দ্র সূতা
য়গয় কুলর দেশ-কাল-জ্ঞান হস্ত-লঘুতা,
নিতি দেখি রঙ্গ এহিরূপে মধু হস্তী উপর
য়গয়া হুঃখকু স্নাঘ্য গণিলা সে গৃহ-সুধর ।

(২৬)

প্রদেশে সঙ্গীতব্রাত্রে বিজে করি সূচিত্র পোতে
করুখাই নক্স(১৩) সংস্কার বলাঙ্গী হরিত শ্রোতে ।

(২৭)

অদূরে যাহার বিরাজই শারী গুআ পক্ষত
শারিগুআ(১৪) রবে ঝঙ্কারিত যার গুহা সতত ।

(২৮)

কইসারিলতা—শ্রামলসিকতা—কুদেবিহার
করুখান্তি যিহি কৃষ্ণসার সঙ্গে কুরঙ্গী(১৫) বার,

(২৯)

তরঙ্গে গুলটি জুর-রঙ্গে করি মুখবাদান
নক্স শিশুমার(১৬) শোষিনে উষান্তি নাবিক প্রাণ ।

(৩০)

নীড়কোড়ে বসি সারস-দম্পতি যিহিনিরোলে
প্রাংশু-তৃণ-বনে দোলুখান্তি সিদ্ধ বায়ুহিল্লোলে ।

(৩১)

খিলি-ঝঙ্কারিত—মহারণ্য তহিখিলা দেকালে,
সদা সুনীতল নানা বনম্পতি—ব্রততী-মালে ।

(৩২)

মীনলোভে কলা পাণিকাক(১৭) বুড়ি আলোড়ে জল,
দীর্ঘ গ্রীবা টেকি স্থানে স্থানে বক ধ্যানে নিশ্চল ।
নিকাকনে রহি, নিঃশব্দে বিহরি চাহান্তি নাহি
কক্স(১৮) হংসরালী যহ গোড় কাড়িযিবাকু কাই

(৩৩)

সহস্র করে সে ভূতলে ফিসিলে অনলগুণ্ডি,
তরুশে গুচি সঘনে রটলা সিদ্ধুরগুণ্ডী(১৯) ।

(৩৪)

উড়িয়াউচ্ছন্তি হংসে বোলা হোই রক্ত অংশুকে
কুলীর অরুণ(২০) পূর্ব পারাবার পুলিন-মুখে ।

(৩৫)

রক্তনীর গর্ভ উজলি উজলি দিগ-গগন
ফণী-ফণা পরিবাতে দৌহলিলা চিতা দহন ;
খিলিলে পবন যেকুে নিশীথিনী করুণস্বর
ঝিল্লিরব শুনি কলা সে দৃষ্টকু গভীরতর ।

(৩৬)

উড়ুচ্ছন্তি সৌর করে প্রজাপতি
স্নাত ইন্দ্রধনু বর্ণে,
উড়ু উড়ু ধরে বসি পড়ুচ্ছন্তি
কেড়েপুষ্পে কেড়ে পর্ণে ।

ভরতিয়া(২১) নিজ প্রিয়া সঙ্গে নাট্য
তরঙ্গে ময় নাটুআ,
ইন্দ্রধনু খণ্ড পাত্র খণ্ডি উড়া
দই বলে বালিশুআ(২২) ।

পাদটীকা

- ১। হংসরালী—whistling teal
- ২। হলদীবসন্ত—Black headed oride
- ৩। সফান—Falcon
- ৪। দাসেরক—উট্ট
- ৫। কুস্তাটুয়া—কুখা Treepie

৬। কৌশিক—পক্ষীবিশেষ	১৪। শারি—সারিকা ও তোতাপাখী
৭। চষাপুঅ—পক্ষীবিশেষ, বর্ধাগমে টাঁদনী রাতে 'আমি চাষার ছেলে, চাষার ছেলে' বলিয়া চীৎকার করিয়া আকাশে উড়ে।	১৫। কুরঙ্গী—মৃগী
৮। গুণ্ডুচী—কাঠবিড়াল	১৬। শিশুমার—শুশুক, 'জলজন্তুবিশেষ
৯। কোচিলাধাই—Horn-bill	১৭। পাণিকাক—Coromorant dorer
১০। নদীকুলবন্ধু—পক্ষীবিশেষ	১৮। কঙ্ক—হাড়গিলা পক্ষী
১১। কোকে—জলচর পক্ষীবিশেষ	১৯। সিন্দুরমুণ্ডী—পক্ষীবিশেষ Rose fing
১২। দন্তী—হস্তী	২০। কুলীর অরুণ—কাঁকড়া বিছা
১৩। নক্র—কুমীর	২১। ভরতিআ—ভরতপক্ষী
	২২। বালি শুআ—পক্ষীবিশেষ Sand dove

সভ্যতার সমন্বয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা অতি সহজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা যে অসাধ্য সাধনের মত এ কথাটা ভাবিয়া দেখি না। দার্শনিক পণ্ডিত আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, সত্য বলিতে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের মিলন কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সমন্বয় সত্যই একটা দুর্লভ ব্যাপার, সহানুভূতির দৃষ্টি যদি থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট পাইলাম বলিতে হইবে। এক জাতি অপর জাতিকে বুঝিতে চেষ্টা করে না; ইহার নানা অন্তরায়। ভাষা ধর্ম আচার নীতি প্রভৃতি বাধারূপ দাঁড়াইয়া আছে। সুতরাং এই বিরূপ গভীকে পার হইবার মত মন না থাকিলে কোন জাতির কৃষ্টির মর্ম্মকথা আমরা বুঝি না। এই যে বাধার কথা বলিয়াছি, জাতীয়তা বা অর্থনৈতিক স্বার্থ আসিয়া সেই বাধাকে দিন দিন দুর্লভ্য করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং দিন যতই যাইতেছে নানা উপায়ে এক জাতি অল্প জাতি হইতে পৃথক হইয়া যাইবার আশঙ্কাই তত বেশী হইতেছে। অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, স্থান কালের অতীত হইয়া, জড়ত্ব ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পরধর্ম্মকে বুঝিবার মত ওদার্য্য হই—এক জন মনীষীর হইতেছে। কিন্তু রক্তজনীতি-বিদ্দের চালে পড়িয়া এমন লোকদের উপর জাতির অধিকাংশ লোকই বিরূপ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহা মনীষী রমণী রোলার কথা। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়; সুতরাং ফরাসী-জার্মানীর যুদ্ধ তিনি অন্তর হইতে অপছন্দ করিতেন; এই কারণেই তিনি ছিলেন দেশের অপ্রিয়। আবার দেখা যায়, দেশের স্বার্থে রাজনীতিবিদ পরস্পর পরস্পর করিতেছেন, অপর দেশের বাঁচিবার অধিকার পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে বিলোপ করিতে চাহিতেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা বিবেকবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি নিগূহীত জাতির প্রতি ব্যবহারের সময়

তাঁহার ভুলিয়া যান। ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডের শিক্ষিত রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখিলে এ কথা যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ এই মিলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এ সভ্যতার পরিবর্তন বা ধ্বংস না হইলে যে মিলন হইতে পারে তাহা মনে হয় না।

এ সভ্যতার মর্ম্মস্থলে যে অপরকে উৎসাদিত করিয়া আপনার ভোগের পথকে উন্মুক্ত করিবার একটা উৎকট চেষ্টা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতে এই চেষ্টা রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্ম্মস্থল হইতেছে তাহার রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ভাল জাতির ভাল; রাষ্ট্রের মন্দ জাতির মন্দ। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রেই সমষ্টির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থের মিল নাই। মিল না থাকার জন্ত দলে দলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানির বিরাম নাই। যত দিন রাষ্ট্র থাকিবে জাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মূলে তত দিন এই শক্তিকে করায়ত্ত করিবার জন্ত হানাহানি মারামারি চলিবেই চলিবে। আবার ব্যক্তির স্বার্থকে অবলম্বন করিয়া এক জাতি অল্প জাতির ক্ষতি করিয়া আপনার স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বলেন বাণিজ্যিক সভ্যতার এই পরিণতি বা জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রেরও এই একই পরিণতি।

সুতরাং এই পরিণতির হাত হইতে জগৎকে বাঁচাইবার পথ কেহ কেহ খুঁজিয়াছেন আন্তর্জাতিকতায়, আবার কেহ বা খুঁজিয়াছেন পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদে। বার্ট্রাও রাসেল এ সভ্যতা যে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য তাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়া নুতন আদর্শে জগৎকে গড়িতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মূল কথা, জাতীয়তার বিনাশসাধন ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। সঙ্গে সঙ্গে নুতন আদর্শে নুতন শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে নুতন সমাজ সৃষ্টি করিয়া একটা

শক্তিমান আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হুন্দর সভ্যতা তিনি গড়িতে চাহেন। এখানে শক্তি থাকিবে জানী ও মানব-প্রেমিকদের হাতে বাঁহারা জগতের চেহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে বদলাইয়া দিবেন। রাশিয়া যে আদর্শ পাশ্চাত্য দেশে আনিয়াছে তাহা অভিনব বটে, কিন্তু তাহাও পরীক্ষামূলক ভাবে চলিতেছে ও ব্যক্তিবাদীনতা সেখানে যথেষ্ট ক্ষুদ্র হইয়াছে। তবে রাশিয়া সম্বন্ধে আশার কথা এই যে, তাহাদের চেষ্টা নিরর্থক নয়। তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে দিয়াছে। প্রেম ও সেবার উপর না হইয়া তাহাদের রাষ্ট্র যদি অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে জার্মানীর সম্মুখে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। রাশিয়ার আদর্শ জড়বাদী পাশ্চাত্যের নিকট ভাল হইলেও তাহাই যে সভ্যতার শেষ কথা নয় তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। রাশিয়ার আদর্শ আমাদের বর্তমান অবস্থায় আশার আলো হয়ত দেখাইতেছে, কিন্তু আদর্শ যদি লইতেই হয় তাহা হইলে জড়বাদীর আদর্শ আদৌ লইব কিনা বিচার করিয়া দেখা উচিত। মনোবী এইচ. জি. ওয়েলস বলিয়াছেন—“ইউরোপের প্রাধান্য মাত্র দুই তিন শত বৎসরের; জগতের ইতিহাসে ইহা ধর্মব্যবহী নয়। ইউরোপ ছুঃস্বপ্নের ঘোরে যে ক্রাফেনষ্টাইন গড়িয়াছে রাশিয়া তাহা বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল। তাহার কৌশল একটা বিপদ এড়াইবার কৌশল মাত্র। তাহা দিয়া যে জীবনকে গড়িতে পারে যাইবে, জগতে শান্তি আনা যাইবে, মানুষের আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইবে তাহা মনে হয় না। তবে একটা বাঁচিবার প্রয়াস হিসাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করি এ কথা বলিলে অপলাপ হইবে না।

যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান ধনিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আত্মরিক পরিবেশে সত্য বলিয়া মনে হইলেও তাহা যে মিথ্যা তাহা রাশিয়া কথঞ্চিৎ প্রমাণ করিয়াছে। মানুষের স্বভাবে স্বার্থ বা পশুভাব থাকিলেও তাহার যে দেবভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবস্থা-বিশেষে এই সদ্ভাবের যথেষ্ট বিকাশ হইতে পারে। বর্তমান সভ্যতায় ইহার সুযোগ কম, কিন্তু ইহাকে বিকশিত করিবার সমস্তাই বর্তমান সভ্যতার সমস্তা বলা যাইতে পারে। প্রেমের মধ্যে, সেবার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এক কথায় ধর্মবোধের মধ্যেই জগতের সকল সমস্তার সমাধান রহিয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন যথোপযুক্ত জ্ঞান। প্রেম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়াই জগতের মুক্তি। মনোবী রাসেল এই কথাই তাঁহার নানা গ্রন্থে বারবার বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মনে হয় অধ্যাত্মবাদী ভারত প্রেমের দ্বারা সেবার দ্বারা ও ত্যাগের দ্বারা প্রকৃতই যে পরকে আপন করিতে পারা যায় তাহা বুঝিয়াছে ও জগৎকে বুঝাইয়াছে। ভারতে বহু ধর্ম, বহু ভাষা ও আদর্শের সম্মিলিত হইলেও সে সকলকে স্বীকার করিয়া যথাযোগ্য স্থান দিয়াছে। ভারতের ধর্ম ও অধিকারীভেদের যে

পরম উদার মত দেখা যায় তাহাও ভারতের, ভারতীয় মনের বিশ্বতোষুখিতার পরিচায়ক। ভারতীয় মনোবীরা ইহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী হইয়াই হুদেব যুগোপাধ্যায় ভারতের এই সনাতন ধর্মকে স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই বাণী, জগতের সকল ধর্মের বাহা সার-হুত তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ তাহা পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ ভারতের এই আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইউরোপের মনোবীরা ইহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ভারতের বাণী ইউরোপকে নূতন করিয়া শুনাইতেছেন। সে বাণী যে ইউরোপীয়দের স্বপ্নে স্পন্দন আনিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞান যে সকল সমস্তার সমাধান করিতে পারে নাই, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া অতৃপ্ত ইউরোপকে নিজেকে নূতন করিয়া চিনিতে হইবে ও প্রকাশ করিতে হইবে এই ধারণার কথা শুনা যাইতেছে। *Counter-attack form the East* নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থে অধ্যাপক জোন্নাড পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোথায় ব্যর্থতা ও প্রাচ্য দর্শন কেমন করিয়া সেই ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই জীবনে সার্থকতা আনিতে চায় এবং সত্যই বহু ব্যক্তির জীবনে তাহা আনিতে পারিয়াছে তাহা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের বাণী মহামনোবী রোম্যা রোল্লা ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও তাহার মধ্যে অতৃপ্ত ইউরোপ শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইবে ইহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা জানি শ্রীঅরবিন্দও ভারতের বাণী জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন ও নব দেব-মানবের এক বিরাট আদর্শ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। অ্যানি বেশান্ত ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি ভারতের ধর্মের সহিত প্রতীচ্যকে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ফলও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যকার অমুসন্ধিৎসুগণ ভারতের বাণী শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছেন ও বিভ্রান্ত জগৎকে তাহা শুনাইতে চাহিতেছেন। আমরা জানি বিশ্বাত বিজ্ঞানী হান্সলি আঙ্ক তর্কের পুথ ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান করিতেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন এই উদার ভিত্তিতেই হইবে। ইহাই প্রকৃত মিলন বা সমন্বয়। অবশ্য সমন্বয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ হয় না, হয় পূর্ণতর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জানী ও ধ্যানী বাঁহারা তাঁহারা ভারতের মনোবী ও আচার্যদের কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছেন। মিলন বা সমন্বয় আঙ্কও ঘটে নাই। ইহার পথ প্রস্তুত হইতেছে মাত্র। মনে হয় এক একটা বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধে এই মিলনের পথ প্রশস্ততর হইতেছে। রাজনীতিকেরা যে মিলন বা সমন্বয় চাহেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এ যুদ্ধ যখন শেষ

হইল তখন কত আশাই না করা গিয়াছিল যে বিশ্ব-সৌভ্রাতৃ এইবার জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু হিংসা, সংশয় ও শক্তি-দম্ব যেমন এক পক্ষকে করিল অন্ধ, তেমনি হিংসা ও স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অপর পক্ষ ইহাকে দংশন করিয়া চলিয়াছে। ইহার পরিণতি বোধ হয় আর এক যুদ্ধে। ওয়েনডেল উইলকি *One World* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে কারণে যুদ্ধ হয় সেই মূল কারণকে উৎখাত করিতে না পারিলে এ যুদ্ধে বিজয়লাভ ঘটিলেও জেতারাই প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। অনগ্রসর পুঁজিবাদী মনোয়ত্তি নেতাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যাহারা মিলন চাহেন তাঁহাদের সংখ্যা এত কম ও কুচক্রী রাজনীতিবিদদের শক্তি এত বেশী যে মিলনের চেষ্টা ক্রমশঃই ব্যাহত হইয়া যাইতেছে।

ভারতীয় আদর্শ বিরাট হইলেও, ইংরেজ আগমনের সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এদেশবাসীর মধ্যে তাহা প্রচলনের উদ্দেশ্যে রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবন আনিয়াছে, আমাদের অবস্থার কথা ভাবাইতে শিখাইয়াছে, জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্ম একটা অহুসারাগ আগাইয়াছে। ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আপনাদের চিনিয়াছি; বুঝিয়াছি স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন না হইলে আমাদের জীবন ব্যর্থ। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, আধ্যাত্মিকতার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, শুধু আমাদের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মিটাইবার জন্ম নহে পরন্তু জগতের মধ্যে নূতন আদর্শ প্রচারের জন্মও বটে—এ কথা আমরা ইংরেজদের সাহচর্য্যে আসিয়া বুঝিয়াছি। ইংরেজদের সাহচর্য্য আমাদের যে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি দিয়াছে তাহা সুন্দর হইলেও খুব বড় কথা নয়। ইহার ভাল ও মন্দ উভয় দিকই আছে। ইংরেজের সংস্পর্শে ব্যবসাবাণিজ্য বা industrialism পাইয়াছি। ইহাতে প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়া যাইতে বসিয়াছে অথচ নূতন করিয়া গড়িবার শক্তি আমাদের নাই। নূতন ও পুরাতনের প্রবল সন্নিবেশে আমরা যে আদর্শের সমন্বয়ের জন্ম চেষ্টা করিতেছি তাহাকে জোড়াতালি দেওয়া ভিন্ন অল্প কিছুই বলা চলে না। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার নাই অথচ সন্নিবেশ নিরন্তর ভীষণতর হইয়া আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আসিতেছে ইহাই ভারতবাসীর জীবনের শোচনীয় দিক। বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমস্তার সমাধানের যে চেষ্টা তাহা রাশিয়ার আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা যে আমাদেরও আদর্শ তাহা বলিতে পারা যায় না। কমিউনিজম্ যে আমাদেরও রাগে মকরক্ষকের কাজ করিবে তাহা কেমন করিয়া জানিলাম? আমাদের সাহিত্যে কাঙালপনা ও চরম দৈহ প্রাচীন আদর্শ ধুলায় লুটাইয়া যেমন সদন্তে আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে, মনে হয় অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি যাহারা কাঙাল ও দীন তাহারাই

রাশিয়ার মাহুলি ভারতের হাতে দিয়া ভারতের সর্ব্বস্বোগ দূষ করিতে চাহে। ইহা আমার মনগড়া কথা হইতে পারে কিন্তু ঐতিহ্যকে যাহারা মানে না, আদর্শে যাহারা বিশ্বাসবান নহে তাহাদের বিশ্বাস করি কেমন করিয়া?

আমরা দেখিয়াছি ভারতে সভ্যতার সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা তাহা যথেষ্ট নয়। কতকটা কাজ হইয়াছে শিক্ষিত ও মনীষীদের দ্বারা। ইউরোপের রাজনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য আমাদের দেশে মর্মান্তিক ধুংসের কারণ হইয়াছে। সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছি, কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও জীবনকে সার্থক করিতে যে আমাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন ইহার বোধই আমাদের শ্রেষ্ঠ লাভ। স্বাধীনতা যদি লাভ করি আমাদের সমাজ, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি সমস্তই সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝায় যে, ইউরোপ যে রাজনৈতিক ভাবে ও যে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে মাহুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে আমাদেরও তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। মনে হয়, ইউরোপের সহিত আমাদের মিলন বা সমন্বয়ের তাগিদ আসিবে এই বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির দিক দিয়া। আমরা ভারতের চঞ্জিশ কোটি নর-নারীর জন্ম যে শিল্প-ব্যবস্থা চাই তাহাতে যেন পুঁজিপতিদের লুপ্ত দৃষ্টি না থাকে। বিপ্লব না আনিয়াও কেমন করিয়া তাহা সম্ভব করা যায় তাহাই বিচার্য্য। এখনো যন্ত্র-শিল্প খুব প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং যদি এদেশে রাষ্ট্রের হাতে বৃহৎ শিল্পগুলি প্রথম হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে শ্রেণী-সম্মতকে এড়ানো যাইতে পারে।

মোটের উপর ইউরোপ ও এশিয়ার সম্বন্ধ সমানে সমানে নয়। এ সম্বন্ধ ভক্ষ্য ও ভক্ষকের সম্বন্ধ। ইংরেজ ভারতে যাহা করিয়াছে তাহাতে ভারত খুশী নয়; ইংরেজও নয়। শ্রদ্ধা ও দরদ না থাকিলে কোনো জাতির মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। ইংরেজ কবি কিপলিং ভারতে বহুদিন ছিলেন কিন্তু সাহিত্যিক হইয়াও এ জাতের মর্গ-কথা বুঝিতে চান নাই বা পারেন নাই। তাঁহার স্বীকারোক্তি,

O the East is East, the West is West

And the twain shall never meet

বা তাঁহার কথা,

You'll never plumb the oriental mind,

And if you did it, it isn't worth the toil.

Think of a sleek French priest in Canada.

Divide by twenty half breeds. Multiply

By twice the Sphinx's silence.

. There's your East,

And you're as wise as ever.

প্রভৃতি হইতে বা তাঁহার উপাখ্যান *Kim* ও বহু রচনা

পাঠ করিয়া বুঝি—যে ভালবাসা বা প্রেমের স্পর্শে হৃদয় আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, সে স্পর্শ কবি হইলেও কিপ্লিঙের ছিল না ও এ দেশীয় শাসক বা ব্যবসাদার ইংরেজের নাই। তাঁহাদের ব্যবহারে হৃদয়ের পরিচয় নাই। তাঁহারা এ দেশে থাকিয়াও পরদেশী। অথচ মিলনের পথ কত সহজেই ইহার। সূগম করিতে পারিতেন। ভালবাসিয়া বিদেশীও ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছেন; দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ইহার উদাহরণ। ইংরেজ বিচার দিয়াছে; আমরা বিচার চাহি না, চাহি তাহার হৃদয়। কিন্তু লোভ ও শক্তিদ্বন্দ্ব ইংরেজ আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। লর্ড একটন বলিতেন, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” ইংরেজও শক্তিদ্বন্দ্ব শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ আমাদের সহিত রাখে নাই। কাজেই সেই দিক দিয়া তিক্ততা যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং দেখিতেছি সভ্যতার সমন্বয় ছুরুহ ব্যাপার। যদি উভয় জাতি এক হইতে চায়, পরস্পরকে শ্রদ্ধার সহিত বুঝিতে চায় ও তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা সমান হয় তবেই এ মিলন বা সমন্বয় ঘটতে পারে। এক জাতি ছোট হইলে মিলন হয় বিড়ম্বনার কারণ, যেহেতু তাহার

মিলন-বিষয়ে আগ্রহ ও অত্যাগ থাকে না। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জগতের সমন্বয় বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়—তাহা ভারত ও পাশ্চাত্য জগৎ কাহারও উপকার করিবে না। এ সমন্বয় দেশের গভীর প্রয়োজনের তাগিদে আসা আবশ্যক, তাহা না হইলে মিলন হইবে বিড়ম্বনার কারণ। এ মিলনের অবস্থা এখনও বহুদূরে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহা-মনীষীরা এখন ইহার স্বপ্ন দেখিতেছেন ও পথ প্রস্তত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী আমরা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে চাই, কেননা পরাধীন ও লাঞ্চিত ভারত এখনও যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রায়মোহন, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মত মহাত্মানবদের জন্মদান করিতে পারে ইহাতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় জগৎকে শুনাইবার মত বাণী নিশ্চয়ই ভারতের আছে :—“আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘযুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মূল আয়প্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পুরীচালের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।” পাশ্চাত্য জগৎও আজ এই আশাই করুক। তাহার সভ্যতা নূতন রূপ লাভ করুক। রোম্যাঁ রোলান স্বপ্ন সার্থক হউক। ইউরোপ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করুক আর ভারত লাভ করুক বিজ্ঞানের প্রদার ও কর্মোন্মাদনা।

জলে নোয়াখালি

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

হয়তো শুনেছ বন্ধু, আমার বাংলা দেশ
সুজলা ফুললা, শস্যভাষা উপনিবেশ।
হাসি আর গানে, স্বর্ণাভ ধানে, কলোচ্ছল
স্নেহে আর প্রেমে, নারীদের চোখে, নীলোৎপল।
আকাশে প্রদীপ, বাতাসেতে মধু, পূর্ণ মন—
দিনের সূর্য, রাতের জ্যোৎস্না, মধু স্বপন।
তালীবন, আর নারিকেলবনে, নামে আবেশ—
শুনেছ বন্ধু, দেখে যাও এসে, বাংলা দেশ।

জলে নোয়াখালি, জলে কলকাতা, জলছে ঢাকা,
জলে ধানবন, জলে নারীদের অশ্রুধারা।
পুড়ে গেল ঘর, সারা প্রান্তর, অগ্নিরাগে—
লাল হয়ে গেছে; তোমারো চোখে কি সে আঁচ লাগে?
ঢাকছো কি চোখ?—মধ্যে বন্ধু কানেতে ভাই—
শিশুবৃদ্ধের আত্মনাদের রেশ যে পাই।
শেষ চীৎকার, আত্মজনের, লাগছে বেশ।
দেখছে পৃথিবী, দেখছে ভারত বাংলা দেশ।

চমকাও কেন? ঠেকল কি কিছু পায়ের তল?
কিছু নয় ভাই হয় তো রক্ত, হয় তো জল
সজোবিধবা তাদেদি চোখের সম্ভবতঃ;
যেও না এখনি, সামান্য এতো দেখবে কতো।
জলে নোয়াখালি জলে সন্দীপ, ক্ষতি কাহার?
বিংশ শতকী সভ্যতা-তলে রংবাহার।
ধর্মের নামে চলিয়াছে একি বিষম দ্বৈশ?
লজ্জা কিসের? অগ্নি উজল বাংলা দেশ।

গলিত শবের, মাংসে তুষ্ট শকুনিদল—
অনেক উঁচুতে, রাজ আবাসের শৈলাচল।
সেখানে বন্ধু, পৌঁছবে নাভো, দীর্ঘশ্বাসে
পাইনবনের মাঝেতে হাসছে শৈলাবাস।
প্রতি চক্ষের নীলোৎপলেতে কি সংশয়।
আকাশে বাতাসে অশরীরি কারা। নেইক' ভয়
জলে নোয়াখালি, জলে কলকাতা, জলছে বেশ।
বন্ধু আমার; এসো এসো দেখো—বাংলা দেশ।

নব-সন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২০

এত করিয়া সঞ্চিত মনের স্নিগ্ধতা কিন্তু এক মুহূর্তেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

স্বর্ধাস্ত হইয়া গিয়াছে, ঘুর পথ পৌঁছিতেও সময় লাগিবে; টুলু উঠিল। পকেটে ভান হাতটা দিয়া ব্যাগটা ধরিল, সবাইয়ের হাতে ছুটা করিয়া পয়সা দিলে কেমন হয় ?... একটু ভাবিল, তাহার পর হাতটা বাহির করিয়া লইল, “ভিক্ষে ভিক্ষে” খেলার পর এ যেন নেহাত ভিক্ষা দেওয়াই হইবে; দেওয়ার আনন্দটুকুকে এভাবে কলুষিত করিতে মন সরিতেছে না আজ। বলিল, “কাল আসবি, তোদের দিদিমাকে নিয়ে—নিশ্চয় বুঝি?”

হাওয়াটা চমৎকার লাগিতেছে, নিজেকে তাগিদ দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ধরো যদি গিয়া দেখেই ম্যানেজারের লোক আসিয়া ভিতরে বাহিরে তাল। লাগাইয়া দিয়াছে, বনমালী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। টুলু প্রসন্ন মনেই প্রার্থনাকে গ্রহণ করিয়া প্রতিকারে লাগিয়া যাইবে, প্রসন্ন মনে আজ ভাল মন্দ সব কিছুকেই তাহার দান বলিয়াই মাথা পাতিয়া লইতে ইচ্ছা করিতেছে যিনি অযাচিত ভাবেই অঞ্জলি ভরিয়া এতখানি দিলেন। আঁকা-বাঁকা নির্জন পথের সব মাটিটুকু মাড়াইয়া টুলু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

যখন স্থলের কাছাকাছি, তখন অন্ধকার বেশ গা-ঢাকা গোছের হইয়া আসিয়াছে। পথের ধারটিতে একটি বুনো স্থলের গাছ, একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিল সাকরেলের সেই ছেলেটি যে ফুল সেদিন উপহার দিয়াছিল এ সেই ফুল। বোধ হয় ছেলেটির মিষ্ট স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়াই একটা মায়াম ভরা কোতুল হইল। বড় কাঁটা গাছটায়। হাত বাঁচাইয়া এক মুঠা ফুল সংগ্রহ করিতে খানিকটা সময় লাগিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবার স্থলের দিকে পা বাড়াইবে, সামনে খানিকটা দূরে স্থলের উঁচু রাস্তার উপর নজর পড়ায় একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িল।

একটি শ্রীলোক—নিঃসঙ্গ—টিলার পথ বাহিয়া সামনে গিয়াছে; অন্ধকারে সামান্য একটু সন্দেহের পরই টুলু বুঝিতে পারিল শ্রীলোকটি চম্পা। চম্পার গতি জ্ঞাত, মাঝে মাঝে চারি দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছে; হালকা অন্ধকারে যে গোপনতাই দিতেছে সেটা যেন যথেষ্ট নয়।

মুহূর্তেই টুলুর মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। সেদিন পথ আগলাইতে চম্পাকে অমন করিয়া বলিলেও টুলুর কোথায় একটু বিশ্বাস লাগিয়াছিল সে একেবারে না ফিরুক কিন্তু ফিরিতেছে; আজ আবার এই সন্ধ্যায় তাহাকে সেই কালিয়াড়ির

পথে দেখিয়া তাহার মনটা ঘুরায় আক্রোশে যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। এই একটু আগেই যে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল ভালমন্দ আজ যাই আসুক সমান ভাবেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবে। সেটা কোথায় তলাইয়া গেল, মনে হইল এ পৃথিবী অনিবার্য ভাবেই অভিশপ্ত, এখানে কিছুই করিবার নাই তাহার, ছুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যভিচারের ক্রন্দ অঙ্গে লেপিয়া চলিবেই এ নিজের পথে, নিবারণের চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল। ...পাছে দুর্বলতার জ্ঞান আবার ফিরাইতে যায় চম্পাকে এই জন্য টুলু যেন জোর করিয়া পা দুইটা পুঁতিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ...যাক পাণীয়সী নিজের পথে।

স্থলের কাছাকাছি গিয়া চম্পা যেন গতিবেগ ধ্রুপ করিয়া দিল; শুধু তাই নয়, রাস্তার এধার থেকে ওধার চলিয়া গেল, এবং টুলুর ছ-এক বার যেন মনে হইল, গলা একটু বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল মাষ্টার মশাইয়ের বাসা থেকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। একটু আশ্চর্য বোধ হইল, কিন্তু একটা কিছু আন্দাজ করিবার পূর্বেই চম্পা হঠাৎ স্থলের দেয়ালের পাশে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বর্ধিত বিষয়ে টুলু সামনে পা বাড়াইল। একবার শিহরিয়া উঠিল এই ভাবিয়া কে পিশাচী স্থলটাকেই তাহার পাপের নিক্তন করিয়া তুলিল না তো! কিন্তু যে কারণেই হউক মন যেন এ চিন্তাটাকে প্রস্র দিতে চাহিল না। বেশ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া টিলার উঁচু রাস্তায় উঠিল, তাহার পর গতিটা খুব সহজ করিয়া দিল,—চম্পা যদি দেখেই তাহাকে তো এটা যেন সন্দেহ না করে যে টুলু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। নেহাতই যেন বেড়াইয়া আসিল এইভাবে ধীরে ধীরে শিকল খুলিয়া বাসায় প্রবেশ করিল; কেহ তাল লাগাইয়া যায় নাই।

একবার মনে হইল বনমালীকে ডাকে, কিন্তু কি ভাবিয়া সন্ত সন্ত ডাকিল না; সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু ভাবিল, তাহার পর অন্ধকার আর একটু গাঢ় হইলে ঠিক করিল নিজেই গোয়েন্দাগিরি করিবে।

উঠানের তেপার উপর বসিয়া গোয়েন্দাগিরি প্রায় কষিতে কষিতে হঠাৎ হন্ হন্ হইল নিঃসাড়েই বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেছে। বনমালী তখনও ঘরে আলো জালিয়া দিয়া যায় নাই। আর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নাতনি আসিয়া নিশ্চয় কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জ্ঞান বনমালীর এই ভুল, নয়তো প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে ঘর ছাড়ার ঋতি দিয়া এ কাজটুকু শেষ করিয়া চলিয়া যায়। টুলু বসিয়া বসিয়া আরও খানিকটা ভাবিল। তাহার চিন্তা

নয়, তবু যেন সমস্তাটা টানিতেছে মনকে। আরও প্রায় আধ ঘণ্টাটুক বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া নিজের এই কৌতূহলে টুলুর নিজের মনেই হাসি পাইল; এমন কি ব্যাপার হইয়াছে যে একটা বিরাট সমস্তা খাড়া করিয়া সে এমন উৎকর্ষ ভাবে উৎকর্ষিত। এখানে বনমালী থাকে—চম্পার ঠাকুরদাদা সে, কোন কারণে খনির ছুটির পর চম্পা দেখা করিতে আসিয়াছে, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ওদের, এর মধ্যে এত মাথা ঘামাইবার আছে কি? কাজ হইয়া গেলেই চলিয়া যাইবে, হয়তো এতক্ষণ গেছেই চলিয়া, না হয় থাকিবেই—তাহার মধ্যেই বা সমস্তার এমন কি? ...ওর আসার মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব ছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন।...কিন্তু আসলে ছিল কি?—দূর হইতে অন্ধকারে দেখা তো। মনটা হালকা হওয়ায় টুলু মনে মনে হাসিয়া নিজের কাছেই স্বীকার পাইল যে যেহেতুই এমন, তাহার প্রত্যেক গতিবিধি টুলুর রহস্যময়, বোধ হয় যেন একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। টুলু উঠিয়া দাঁড়াইল, সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে গিয়া বেশ সহজ কর্তেই বনমালীকে ডাক দিল, একটু পরেই দেখা গেল হাত দুইটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বনমালী কটক হইতে বাহির হইল; টুলুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, ও হাঙ্গামটা চুকিলেই পৌছাইয়া যাইবে; তাহার পর কোমরে পিঠে দারুণ ব্যথা লইয়া অল্পস্থ হইয়া পড়িবে, চম্পা তাহাদের রান্না শেষ করিয়া শাহাকে আসিয়া খাওয়াইবে, শেক দিবে, সেবা করিবে...তাহার পর গাঢ় নিদ্রার প্রলেপে সমস্ত ব্যাপারটি স্বপ্নে রূপায়িত করিয়া বনমালী সকালে উঠিবে জাগিয়া...এর মধ্যে সে শয্যা লইবার পর কখন নাকি চরণ আর পেন্সাদও আসে, কিন্তু এমনই রোগের ধকল, কখনও দেখা হয় নাই তাহাদের সাথে।

টুলু বলিল—বনমালী এখনও যে আলো জ্বালো নি আমার ধরে; দেশলাইটাও পাচ্ছি না।

বনমালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হন হন করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, বলিতে বলিতে গেল—“তুমি ছিলেক নাই, আলো জ্বলে কার উবগারটি কুরতাম গো? তেল খরচ হয় না? তেল কিনতে পরস্যা লাগে না?”

টুলুর মুখে একটু হাসি ফুটল, তাও তো বটে। বনমালী যে হঠাৎ এক এক সময় অতিমাত্র বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হইয়া ওঠে? চম্পার কথা জিজ্ঞাসা করিবে কিনা বা কিভাবে করিবে মনে মনে ভাবিতেছিল টুলু, স্থির করিবার পূর্বেই আলোটা জ্বালিয়া তেমনই হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল বনমালী। টুলু রাত্তার ধারে জানালার খাঞ্জে আলোটা রাখিয়া একটা ইংরেজী বই লইয়া শুইয়া পড়িল।

পাঁচ মিনিটও গেল না, বনমালী খাবার লইয়া আসিল।

রাঙেও বসে না, বসার দরকারই হয় না, কেননা টুলু খাইতে রাজি করে, বনমালী ঠাই করিয়া খাবারটা ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। বৃদ্ধা মানুষ ক্রান্ত থাকে বলিয়া টুলুও রাঙে গল্পের জুগ আটকায় না। আজ কিন্তু নিজের ক্রান্ত ছিল, ঠাই করিয়া খাবারের থালটা রাখিতেই উঠিয়া পড়িল, আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিল—“খেয়েই নিই, অনেক ঘুরে শরীরটা ঠিক নেই; বনমালী ব্যস্ত আজ নাকি একটু আজ? প্রশ্নটা এমনই বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই করিল; হয়তো ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল আজ একটু গল্প করিবার, মনটা আছে ভাল। বনমালী ঢাকনাটা বসাইতে যাইতেছিল; হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিল—“না, ব্যস্ত থাকব ক্যানো?”

হঠাৎ ছেলেমানুষী কৌতূহল জাগিল টুলুর মনে—চম্পার কথাটা না হয় তোলাই যাক না, প্রশ্ন করিল—“তোমার নাতনিকে আসতে দেখলাম, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।”

বনমালী হকচকিয়ে টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল একটু। রাঙের ঘটনাগুলি নিজার ওদিকে স্বপ্ন হইয়া পড়িলেও এদিকে থাকে বাস্তবই; কারণটা ভাল করিয়া না বুঝিলেও এর কোন অংশই যে টুলুর কানে তোলা মানা এটা তাহার সর্বদাই মনে থাকে। টুলু কখনও প্রশ্ন না করায় তোলাও দরকার হয় নাই কোন দিন, আজ টুলু স্বয়ং দেখিয়া কথাটা উত্থাপন করিল, এ অবস্থায় এখন কি করা যায়?

অনেক দিন থেকে দেখিতেছে বনমালীকে, টুলু মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল ব্যাপারটার মধ্যে কিছু রহস্য আছে, আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হইবে কিনা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই কিন্তু বনমালী সামনেটাতে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া বসিয়া পড়িল, বলিল—“তা দিখবেক নাই ক্যানো গো? ইর মধ্যে লুকুবার কি আছে বটে? দিখেছ তো হইছে কি?”

এই ধরনের ছর্বল মস্তিষ্ক, যা অপরের সঙ্কেতেই চলে বৈশীর ভাগ, সমস্তার মুখে বিচারের ক্ষমতা রাখে না। বনমালীর পক্ষে মাত্র দুইটি জিনিষ সম্ভব ছিল, হয় সাধ্যমত চূপ করিয়া থাকা, না হয় আগাগোড়া সব প্রকাশ করিয়া দেওয়া।—টুলু যখন স্বয়ং দেখিয়াছে চম্পাকে তখন চূপ করিয়া থাকার পথ বন্ধ। বনমালী আজকের রাঙের চম্পার আসার সঙ্গে আগেকার কয়েক রাতের স্বপ্নকাহিনী মিলাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি খুঁটিয়া বুটিয়া বলিয়া গেল। বিবরণ একটু অদ্ভুতই হইল তবে টুলুর আর এটা আন্দাজ করিতে বেগ পাইতে হইল না যে, যে কারণেই হোক আজ কয়েক রাত্রি হইতে চম্পা বাপ আর প্রহ্লাদকে লইয়া জ্বলে আস্তানা গাড়িতেছে। তাহারও মাথা গুলাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার পর আরও গুলাইয়া গেল যখন রেকর্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনমালী তাহার দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী আনিয়া ফেলিল—অর্থাৎ চম্পার ভাবী খন্ডরের আনাগোনার কথা।

টুলু কিন্তু কৌতূহল দমন করিয়া চূপ করিয়াই আহাির সাধ

করিল, তাহার মনে হইল ভিতরের কথা যাধাই হোক, প্রশ্ন করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাটী ঠিক উচিত হয় না। আহার শেষ হইলে বনমলী জায়গাটা নিকাইয়া এঁটো বাসন-গুলি মাজিয়া রাখিয়া নিজের বাসায় চলিয়া গেল।

কোতুহল হইতে টুলু কিন্তু এত সহজে পরিজ্ঞান পাইল না, কক্ষক অবস্থায় সেটা ক্রমেই বাড়িয়া গেল। যতই ভাবিতে লাগিল মনে হইল ব্যাপারটা পারিবারিক কিছু নয়, কোন উদ্দেশ্যে একটা যেন সাজানো ব্যাপার। কিন্তু কে এর শিল্পী, তাহার উদ্দেশ্যট বা কি? যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল টুলুর অসন্তোষ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শুইয়া ছিল, কিন্তু নিদ্রা হইতেছে না, রাত্রিটাই গরম, নিদ্রার অভাবে আরও গরম বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানেও গরম, ছয়ার খুলিয়া রাত্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উল্লুখ জায়গার একটা প্রভাব আছে মনের উপর, টুলুর

মনে হইল লুকাচুরি না খেলিয়া সোজা হুজি ব্যাপারটার সম্মুখীন হইলে কেমন হয়। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্ৰত্যক্ষভাবে তাহার বা মাষ্টারমশাইয়ের অথবা উভয়েরই একটা বিপদের অঙ্কুরও থাকিতে পারে; সে ধরিতে পারিতেছে না, তবে এটা ঠিক যে চম্পায়-ম্যানেজারে গঞ্জডিহি জায়গাটা একটু অদ্ভুত। আর ইতস্ততঃ না করিয়া টুলু স্থলের দিকে পা বাড়াইল। একটু যাইতেই দেখে ফটকের এদিকের ধামটিতে পিঠ দিয়া ওদিকে মুখ করিয়া একটি জীলোক পাথরের বৈঠকটার উপর বসিয়া আছে, চম্পাই যে সন্মহ করিবার কোন কারণ নাই; টুলু অগ্রসর হইল।

একটু যাইতেই কঁাকরের উপর চট-ছুতার শব্দে চম্পা চকিত হইয়া ঘুরিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আরও ছুই পদ অগ্রসর হইতে একটু যেন স্তির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—
“ও, আপনি।”

ক্রমশঃ

জীবন-দর্শন

শ্রীসম্মা ভাইডী

কে বলে জীবন মায়াময় শুধু সত্য নয়,
কে বলে কেবল মরীচিকা হয় প্রান্তরে,
অমর জীবন আমি দেখিলাম অনিত্যেই,
চরম সত্য, মিথ্যা ধোয়ার জাল ছিঁড়ে।
একটি নিমেষে অনন্ত কাল হ'ল দেখা,
একটি আননে নিখিল প্রেমের সোনা লেখা,
একটি জীবনে সব জীবনের আলো বরে ॥

আশা ভঙ্গের সুখ ভঙ্গের চিরময়
ইতিহাসখানি যদিও চক্ষে এনেছে জল,
তার। সব নয়, তার। সব নয়—পিছনে তার
একটি কোমল দৃষ্টিপ্রদীপ শান্তিময়।
একটি কোমল দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বলেছে আলো
মুছি' নিঃশেষে পুঞ্জ পুঞ্জ ভিমির কালো,
একখানি মেঘ দিগন্ত কোণে ছায়ামজল ॥

সাধনা-লব্ধ আশ্রয়ানের পথ কোথায়,
কোথা জীবনের সব প্রশ্নের হয়েছে শেষ,
লক্ষ্য কোথায়—দীর্ঘ দিনেতে বুঁজে বুঁজে
সহস্র পলকে দেখিছ জীবনে দেখিছ সব।

আশা আনন্দ কামনা ব্যাধার শতেক দল
একসাথে জেগে নয়নে আমার এনেছে জল,
জ্ঞানমার্গের সোপান-বীথিকা নিরুদ্দেশ ॥

আঁখি-কোণে তব ও কিসের আলো অমর্ত্যের,
বিদ্যা-শিখা, তবুও ক্ষণিকে দেখিছ হায়
আমার জীবন-মরণের ইতিবৃত্তখানি,
কোথাও তাহার নাহিক মিথ্যা নাহিক কঁাক।
প্রতিদিনকার আশা নিরাশার দম্বহীন
চিরকারণে ভরেছে রজনী ভরেছে দিন,
সব তৃষ্ণার শেষ নির্বাণ টানে কোথায় ॥

আমি তো দেখিনি এত সুন্দর এই জীবন,
যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে আছে এত আশা,
এত আনন্দ ব'রে পড়ে মোর পাশে পাশে,
ব্যাকুল হৃদয় সাড়া পায় নব বন্দনাতে।
আর সংশয় নাই, নাই আর কোন গ্লানি,
অমৃতের ভাগী যত্নে পার হব জানি,
জীবন-তীর্থে নিয়ে যাব মোরে ভালবাসা ॥

শাদুল কর্ণাবদান

শ্রীশুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “চণ্ডালিকা” শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। ইহা বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে ভারতের অগ্রদূত বহুবীর নৃত্যগীতসহ অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে অপূর্ব আনন্দ দান করিয়াছে।

এই প্রসিদ্ধ রচনার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ শাদুল কর্ণাবদানের ভূমিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই অবদানখানি অতি প্রাচীন। ন্যূনপক্ষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নিকটবর্তী কোনো সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল।* রচয়িতা কে তাহা অজ্ঞাত। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ—

‘ও রত্নদ্রয়কে (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে) প্রণাম করি। আমি শ্রবণ করিয়াছি, এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উত্তানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুত্থান আনন্দ একদিন পূর্বাহ্নে চীবর পরিধানপূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জয় প্রবেশ করেন। আয়ুত্থান নগরে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভোজন সমাপনপূর্বক এক কূপের নিকট আগমন করিলেন। সেই সময় প্রকৃতি নামে এক চণ্ডাল কণ্ঠা (মাতঙ্গদারিকা) সেই কূপ হইতে পানীয় সংগ্রহ করিতেছিল। আয়ুত্থান আনন্দ সেই চণ্ডাল-কণ্ঠা প্রকৃতিকে বলিলেন : ভগিনী আমাকে পানীয় দাও, পান করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি আনন্দকে বলিলেন : ভদন্ত আনন্দ, আমি চণ্ডাল-কণ্ঠা। আনন্দ বলিলেন : ভগিনী, আমি তোমার জাতি জিজ্ঞাসা করিতেছি না—পানীয় দাও, পান করিব। অতঃপর কুমারী প্রকৃতি আনন্দকে জল দান করিল। আনন্দ জল পান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আনন্দ তো প্রস্থান করিলেন। কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে তিনি তৃফান তুলিয়া গেলেন। তাঁহার আকৃতি, তাঁহার মুখ, তাঁহার কর্ণবর প্রকৃতির চিত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া গেল। প্রকৃতি তাঁহাকে ভালবাসিল। “আর্থ আনন্দ যদি আমার স্বামী হন” এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিল। “মাতা আমার মহা ব্রিথাধরী, তিনি (মন্ত্রবলে) আনন্দকে আনিতে পারেন” এই তাহার একমাত্র আশা।

অতঃপর সেই চণ্ডাল-কণ্ঠা প্রকৃতি কূপ হইতে কলস গ্রহণপূর্বক গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাহা একান্তে পরিত্যাগ করিয়া, জননীকে বলিল : মা, মহাশ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ

* এই অবদানখানির চারিটি চীনা ও একটি তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহার মধ্যে একটি চীনা অনুবাদ ১৪৮-১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ও বাকিগুলি ২২২ হইতে ৩১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়। অনুবাদের সময় দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা প্রথম শতাব্দী বা তাহারও পূর্বে রচিত হইয়াছিল। Cf. Nanjio catalogue Nos: 643-46.

আনন্দকে আমি বিবাহ করিতে চাই। তুমি তাহাকে (মন্ত্রবলে) আনয়ন কর। মাতা বলিল : আমি আনন্দকে আনিতে পারি। কিন্তু কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রমণ গৌতমের আদি অঙ্গুত ভক্ত, তিনি যদি এ কথা জানিতে পারেন তবে চণ্ডাল-কুলের অনর্থ ঘটবে। কেবল ইহা নহে, শুনিয়াছি শ্রমণ-গৌতম বীতরাগ। বীতরাগের মন্ত্র অঙ্গ সমস্ত মন্ত্রকে পরাহৃত করে।

মাতা ইহা বলিলে, কণ্ঠা উত্তর দিল : শ্রমণ গৌতম যদি বীতরাগ হন এবং সেইজন্ম তাঁহার নিকট হইতে যদি শ্রমণ আনন্দকে না পাই, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব।

ভয়ের অপেক্ষা স্নেহের শক্তি অধিক। মাতা উত্তর দিল : তোমাকে মরিতে দিব না—আনন্দকে আনিব।

ইহার পর মাতঙ্গিনীর অভিচারক্রিয়া আরম্ভ হইল। গৃহাঙ্গনের মধ্যভাগ গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যে বেদী প্রস্তুত হইল। সেই বেদীতে আলিঙ্গন আঁকিয়া কুশসমূহ সজ্জিত করা হইল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহার পর অষ্ট শততম অর্কপুষ্প গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক চণ্ডালী একে একে সেই পুষ্পসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অভিচারের ফল ফলিল। আয়ুত্থান আনন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি বিহার হইতে বাহির হইয়া চণ্ডালপল্লীর দিকে চলিতে লাগিলেন। চণ্ডালী তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃতিকে বলিল : ঐ শ্রমণ আনন্দ আসিতেছে। শয্যা রচনা কর। তখন চণ্ডালিকা প্রকৃতি প্রযুদিত হইয়া হস্তচিহ্নে আনন্দের জয় শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এদিকে আনন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বেদীর নিকট একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্ষিযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন : আমি বিপদে পতিত হইতেছি, ভগবান আমাকে নিবৃত্ত করিতেছেন না। তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। তিনি সম্বুদ্ধ-মন্ত্রে চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত করিলেন।

অতঃপর আনন্দ চণ্ডালগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিহারী-ভিক্ষুগণে চলিতে লাগিলেন। মাতঙ্গকণ্ঠা প্রকৃতি তাহা দেখিল, সে জননীকে বলিল : মা, ঐ দেখ, শ্রমণ আনন্দ চলিয়া যাইতেছে। জননী উত্তর দিল : শ্রমণ গৌতমের মন্ত্র আমাদের মন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। অতএব উপায় নাই।

এদিকে শ্রমণ আনন্দ ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া অবনত শিরে তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান বলিলেন : আনন্দ, তুমি এই যজ্ঞধরী বিদ্যা গ্রহণ কর। ইহা পাঠ কর। এই যজ্ঞধরী বিদ্যা, দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং ছয় জন সম্যক্ সম্বুদ্ধ উদ্ধারণ করিয়াছেন।

ইহা তুমি তোমার নিজে হিতসুখের জন্ত এবং সমস্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকার (গৃহস্থগণের) হিতসুখের জন্ত অধিগত হও। ইহার শক্তি অপরিমিত। ইহা অসাধ্যসাধন করিতে পারে।

এদিকে 'চণ্ডালিকা' কিন্তু আনন্দকে ভুলিতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত অন্তর আনন্দ-প্রেমে আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। সে প্রভাতে স্নান করিয়া শুচি হইয়া নগরদ্বারের কপাটমূলে আয়ত্মান আনন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

'এই পথেই আনন্দ আসিবেন' ইহাই তাহার আশা। তাহার আশা পূর্ণ করিয়া আনন্দ ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডালিকা তাঁহাকে অনুসরণ করিল। 'তিনি চলিতে থাকিলে সে চলিতে থাকে, তিনি উপবিষ্ট হইলে সে উপবেশন করে, তিনি দণ্ডায়মান হইলে সে উখিত হয়। যে গৃহে আনন্দ ভিক্ষার জন্ত প্রবেশ করেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে সে মৌনভাবে আবস্থান করে।

আনন্দ ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি দুঃখিত ও দুর্গুণা হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আবৃত্তি হইতে বাহিরে আসিয়া জেতবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অবলুণ্ঠিত মস্তকে বুদ্ধের চরণ বন্দনাপূর্বক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। অবশেষে কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলেন : ভগবান, আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে সুগত, আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন : মা ভৈঃ। আনন্দ, ভয় করিও না।

অতঃপর এক দিন ভগবান বুদ্ধ মাতঙ্গদারিকা প্রকৃতিকে বলিলেন : প্রকৃতি, আনন্দ ভিক্ষুকে তোমার কি প্রয়োজন? সরলা চণ্ডাল-বালিকা নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল : ভদন্ত আনন্দকে পতিত্বে বরণ করিতে চাই। ভগবান প্রশ্ন করিলেন : তোমার পিতামাতা কি ইহা অনুমোদন করিয়াছে। প্রকৃতি বলিল : হাঁ ভগবান সুগত, তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন। ভগবান বলিলেন : আমার সম্মুখে তাহাদের দ্বারা ইহা অনুমোদন করাও।

অতঃপর চণ্ডালিকা তাহার পিতামাতার সহিত বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইল। বুদ্ধ এ বিষয়ে তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিঃসঙ্কোচে উহা অনুমোদন করিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন : তাহা হইলে প্রকৃতিকে এখানে রাখিয়া তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহারা সেই আদেশ পালন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক গৃহে গমন করিল। তখন ভগবান প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : সত্যই কি তুমি আনন্দকে প্রার্থনা কর। প্রকৃতি বলিল, হাঁ ভগবান সুগত, আমি তাঁহাকে প্রার্থনা করি। ভগবান বলিলেন : তাহা হইলে প্রকৃতি, আনন্দের যাহা বেশ, তাহা তোমাকে ধারণ করিতে হইবে। প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল : হাঁ সুগত, আনন্দের যাহা বেশ, তাহা আমি ধারণ করিব। ভগবান, আমাকে প্রভৃজ্যা দান করুন। আমি প্রভৃজ্যা গ্রহণ করিব।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ নীচগতিদায়ক সমস্ত পূর্বসঞ্চিত পাপ

নিঃশেষে পরিশোধন পূর্বক চণ্ডালজাতি (বা চণ্ডাল জন্ম) হইতে মুক্ত করিয়া* শুদ্ধপ্রকৃতি প্রকৃতিকে বলিলেন : হে, ভিক্ষুণী তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

এই বলিয়া তাহাকে মুণ্ডিত করাইয়া কাষার বসন দান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ তখন সেই চণ্ডালকন্যাকে তাঁহার অপূর্ব ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে গভীরতর ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে প্রমুদিতা প্রহরিতা চণ্ডালিকা বলিয়া উঠিলেন : যুচ্ছামি, শিস্তামি। তাই আনন্দকে স্বামী রূপে চাহিয়াছিলাম। আজ আমি অজায়কে অজায় রূপেই দেখিতেছি। ভগবানও আমার অজায়কে অজায় রূপেই দর্শন করুন।

ভগবান বলিলেন : প্রকৃতি কল্যাণধর্ম্মের বৃত্তিই তোমার কামনা করা উচিত। উহার হানি প্রার্থনা তোমার কর্তব্য নহে।

এই ভাবে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ভিক্ষু আনন্দকে ভালবাসিয়া বেচ্ছায় সঙ্কষ্ট চিত্তে প্রিয়তমের যাহা প্রিয় সেই সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণীদমাজের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

তাহাতে কিন্তু মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সমাজ ইহাকে এত সহজে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ চক্কল হইয়া উঠিলেন : কি আশ্চর্য্য। চণ্ডাল কন্যা ভিক্ষুণী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের গৃহে প্রবেশ করিবে। রাজা প্রসেনজিৎও তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন : সে কি। চণ্ডালকন্যা ভিক্ষুণী হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহে প্রবেশ করিবে।

এত বড় ভয়ঙ্কর কথা। সমস্ত নগরে হৈ হৈ রব উঠিল। রাজা তাহার রথে চড়িয়া ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত্ত হইয়া জেতবনে গমন করিলেন। সেখানে যান হইতে অবতরণ করতঃ পদভঞ্জে ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্বক একান্তে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণও নতশিরে ভগবানের চরণ-বন্দনা করিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সুগতের সহিত বিচিত্র বার্তালাপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা পিতামাতার নামগোত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেহ বা নীরবে অবস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের আগমনের অভিপ্রায়, তাঁহারা প্রকাশ করিবার পূর্বেই অবগত হইলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে সঙ্ঘোদন করিয়া বলিলেন : ভিক্ষুগণ, তোমরা কি ভিক্ষুণী প্রকৃতির পূর্ব জীবনের কথা শুনিতে চাও?

ভিক্ষুগণ আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভগবান বলিতে লাগিলেন : পুরাকালে, গঙ্গাতীরে, অশ্রিতমুক্ত, কদলী, পাটল ও আমলকী

* বৌদ্ধগণের চিত্তেও চণ্ডাল জাতির প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছিল। এখানে উহা প্রকাশ পাইয়াছে।

বনপূর্ণ গহন প্রদেশে সহস্র মাতঙ্গের সহিত ত্রিশঙ্কু নামে মাতঙ্গ-রাজ্যবাস করিতেন। সেই মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কুর স্থতিপটে তাঁহার পূর্বজন্মাধীত বেদান্ত অঙ্কিত ছিল। তিনি অঙ্গোপাঙ্গ রহস্ত নিষট্ঠকৈটভ* সহিত (চতুর্) বেদে ও পাঠভেদে সহ ইতিহাস পঞ্চমে (পঞ্চম বেদে মহাভারতে ?) তথা অত্র শাস্ত্রে নিষ্কাত ছিলেন। সেই চণ্ডালরাজের শাদুলকর্ণ নামে এক রূপবান ও পরম গুণবান পুত্র ছিল।

মাতঙ্গরাজ তাঁহার সেই পুত্রকে তাঁহার পূর্বজন্মাধীত অঙ্গোপাঙ্গাদি সহ বেদ ও অস্ত্রাশ্ত্র শাস্ত্র-ভাষ্য সহ শিক্ষা দিয়া-ছিলেন।

কুমার শাদুলকর্ণ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলে ত্রিশঙ্কু তাঁহার বিবাহের জন্য অল্পরূপ কন্যার অল্পসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় পুষ্করসারী নামে একজন বেদজ্ঞ সর্ব-শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ উত্তর-পূর্বদেশে রাজ্য অগ্নিদত্ত-প্রদত্ত উৎকট নামক (চারি শত গ্রাম পরিমাণ) ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিতে-ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি নামে এক পরম রূপ-গুণসম্পন্ন শীলবতী কণ্ঠা ছিল। ত্রিশঙ্কু দেখিলেন এই ব্রাহ্মণ-কন্যা প্রকৃতিই সর্বদিক হইতে শাদুলকর্ণের অল্পরূপা ভাষা হইতে পারে।

এক দিন অতি প্রত্যুষে মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু সর্বস্তুক্লা বড়বায়ুত রথে আরোহণ করিয়া বিরাট স্বপাকদণ্ড ও অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া উৎকটান্তিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর তিনি বিবিধ ষ্ণাক্ষর, বিচিত্র কুসুমাবিত, নানা বিহঙ্গম-কুজিত দেবগণের নন্দন-কানন সম এক উজানে উপস্থিত হইলেন। সেই রমণীয় স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি ব্রাহ্মণ পুষ্কর-সারীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি অবগত ছিলেন অধ্যাপক বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে আগমন করিবেন।

অবশেষে নিশাবসানে প্রত্যুষ সময়ে ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী সর্বস্তুক্লা বড়বায়ুত রথে আরোহণপূর্বক পঞ্চশত বিদ্যার্থী শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া উৎকট হইতে বহির্গত হইলেন।

মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু, উদীয়মান সূর্যের ন্যায়, জলন্ত অগ্নির ন্যায়, ব্রাহ্মণ-পরিবৃত যজ্ঞের ন্যায়, দাক্ষায়ণী-পরিবৃত দক্ষের ন্যায়, দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায়, ওষধি-সমবিত হিমাচলের ন্যায়, রত্নপরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায়, নক্ষত্রসহ চন্দের ন্যায়, যক্ষগণসহ বৈশ্রবণের ন্যায়, দেবর্ষি-পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণকে দূরে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক কহিলেন : স্বাগত। ভো পুষ্করসারী স্বাগত। আপনার শুভাগমন হউক।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী বলিলেন : হে (ভো) ত্রিশঙ্কু। তুমি ব্রাহ্মণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিতে পার না। ত্রিশঙ্কু বলিলেন : হে (ভো) পুষ্করসারী, আমি 'ভো'।

* কৈটভ—এক শ্রেণীর রচনা। উহা কি, ঠিক জানা যায় নাই।

বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। আপাততঃ একটি কার্যের কথা শ্রবণ করুন। দেখুন, কোন কার্যের আরম্ভ চারি প্রকার প্রয়োজনে হয়। যথা, নিজের প্রয়োজনে, পরের প্রয়োজনে, আত্মীয়ের জন্য এবং সর্বজীবের জন্য। এখানে একটি মহত্তর কার্যের বিষয় বলিতেছি—শ্রবণ করুন। আমাদের পুত্র শাদুলকর্ণের জন্ত আপনার কণ্ঠা প্রকৃতিকে দান করুন। আপনার কুলানুযায়ী কণ্ঠাপণ, যাহা আপনার উচিত মনে হয় তাহাই আমি দিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া বেদপারগ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর মনের অবস্থা যাহা হইল তাহা আপনারা কল্পনা করুন। তিনি মহাকুপিত হইয়া অতি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিলেন। ললাটে তাঁহার ত্রিশিখা ত্র্যকুটী অঙ্কিত হইল। অক্ষিযুগল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নকুলপিঙ্গল দৃষ্টিতে ত্রিশঙ্কুর দিকে চাহিয়া তিনি কর্কশগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : ধিক্। গ্রাম্য চণ্ডাল ধিক্। তুই নিতান্ত দুর্মতি। হীন চণ্ডালকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কিনা তুই অবমান করিতে চাস। অপ্রার্থনীরাকে তুই প্রার্থনা করিতেছিস। বায়ুকে তুই পাশের দ্বারা বন্ধন করিতে চাস। তুই সর্বলোকের রূপার্থ, যুগ্ম অধম চণ্ডাল। তুই স্বপাক (কুস্করভক্ষী), বুঘল (বুঘহত্যাকারী)। 'দূর হ'। কেন আমাদের অবমান করিতেছিস।

ইহার উত্তরে মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু বলিলেন : হে পুষ্করসারী, ব্রাহ্মণ ও অত্র জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আলোকে এবং অন্ধকারে, ভস্মে এবং স্বর্ণে যেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ও অত্র জাতিতে কি তেমন কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় ?

ব্রাহ্মণগণ আকাশ হইতে অথবা বায়ু হইতে আবির্ভূত হন নাই, কিংবা পৃথিবী ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন নাই। চণ্ডালাদির হার ইঁহারাত্তি যোনিজ। জন্মে সকলেই এইরূপ এক। মৃত্যুতেও সকলেই এক। চণ্ডালাদি অত্র বর্ণের হার, ব্রাহ্মণগণও তখন পরিত্যক্ত হন—জুগুপ্সিত, অশুচি বলিয়া গণ্য হন।

জীবলোকের পীড়াদায়ক যত কিছু নৃশংস পাপকর্ম (চণ্ডালগণ নহে) ব্রাহ্মণগণই আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হইল, অগ্নি বিধি প্রস্তুত হইল—'মন্ত্রপূর্বক বলিদান দিলে ছাগমেঘাদি স্বর্গে গমন করে।'

ইহাই যদি স্বর্গের বস্তু হয়, তবে ব্রাহ্মণগণ কেন আপনা-দিককে কিংবা আত্মীয়বন্ধুকে, মন্ত্রপূর্বক বলিদান দেন না। কেন ইঁহারাত্তি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, ভাষা ও পুত্র-কণ্ঠাগণকে এই ভাবে বলিদানপূর্বক স্বর্গে প্রেরণ করেন না। জাতি বন্ধু অল্পগত প্রজাবর্গ সকলেই তো এই ভাবে সদগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। পশুদের সদগতির জন্ত কেন আপনারা যজ্ঞ করিতেছেন ? নিজেকে কেন যজ্ঞ বলিদান দিতেছেন না ?

হে ব্রাহ্মণ ! ইহা কখনও স্বর্গের পথ নহে। রুদ্ধচিত্ত

ব্রাহ্মণগণ মাংস ভক্ষণের জন্ত এই ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।

দেখ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি, সংজ্ঞামাত্র। ইহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। সমস্ত এক জানিয়া আমার পুত্রের জন্ত তোমার কণা প্রত্যেকে দান কর। তোমার কুলানুযায়ী কণাপণ যাহা তোমার উচিত মনে হয় তাহাই আমি তোমাকে দিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারী পূর্ববৎ ক্রোধ-মুচ্ছিত হইয়া কহিলেন : শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতীয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র এই তিন জাতীয়, বৈশ্যের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই জাতীয়, এবং শূদ্রের শূদ্র এই এক জাতীয় ভাষার ব্যবস্থা আছে।

এইরূপ ব্রাহ্মণের চারি জাতীয়, ক্ষত্রিয়ের তিন জাতীয়, বৈশ্যের দুই জাতীয় এবং শূদ্রের মাত্র এক জাতীয় পুত্র হয়।

ব্রাহ্মণ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারি বর্ণের চতুর্ধ বর্ণও তোমার স্থান নাই। অধম বৃষল তুমি। তুমি কিনা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাও। তুমি সত্ত্বর ধ্বংস হও।

অতঃপর মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু উত্তর দিলেন : হে ব্রাহ্মণ। তোমাদের চতুর্ধ ক্রুরূপ তাহা শ্রবণ কর।

শিশুগণ রাজপথে ধূলি লইয়া ক্রীড়া করে। সেই ধূলির শিঙ প্রসৃত করিয়া তাহারা কাহাকেও ক্ষীর, কাহাকেও দধি, কাহাকেও মাংস, কাহাকেও ঘৃত সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

দেখ, বালকের বাক্যে ধূলি কদাচ ঐ সমস্ত খাদ্যে পরিণত হয় না। হে ব্রাহ্মণ। তোমাদের চতুর্ধও ঐরূপ।

সকল মানবই একই প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেশ, কর্ণ, শীর্ষ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা, ঐবা, বাহু, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, হস্ত, পদ, নখ, স্বর, বর্ণ ইত্যাদি কোনও বিষয়েই চতুর্ধের প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

দেখ, গো, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর মধ্যে যেমন প্রভেদ দৃষ্ট হয়, চতুর্ধের মধ্যে তেমন কোনও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

আত্ম, জঘ্ন, খড়্গ, পনস ইত্যাদি বৃক্ষের মূলে, স্তম্বে, ত্রুকে, সারে, পত্রে, পুষ্পে, সর্বত্র যে রূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুর্ধের মধ্যে সে রূপ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

সুখে, দুঃখে, পক্ষ ইঞ্জিয়ে, আহারে, বিহারে, মৃত্রে, পুরীষে, চতুর্ধের কোথাও কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।* সুত্তরাং বর্ণ এক—চার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালাদি সংজ্ঞামাত্র। সেইজন্তই বলিতেছি—হে পুঙ্করসারী, আমার

পুত্রকে কণা দান কর। তোমার কুলানুযায়ী কণাপণ দান করিব।

ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারী এবার আর পূর্ববৎ ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনি কি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন? যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন? সামবেদ, আয়ুর্বেদ, অথর্ববেদ, কল্প কি আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন? অধ্যায়বিদ্যা, যুগচক্র, নক্ষত্রবিদ্যা, তিথিক্রম, কর্মচক্র অথবা অঙ্কবিদ্যা, বস্ত্রবিদ্যা, শিবাবিদ্যা, শূনিবিদ্যা, রাহুচরিত, শুক্র-চরিত, এছরিত, লোকায়াত, জায় আদি বিজ্ঞা কি আপনি অধিগত হইয়াছেন?

ইহার উত্তরে মাতঙ্গরাজ কহিলেন : হে পুঙ্করসারী, ঐ সমস্তই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। উহার অধিকও আমি অবগত আছি।

দেখুন, পূর্বে কেবল এক বর্ণ ছিল। তখন ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা ছিল না। পরে বৃত্তির দ্বারা নরগণের এই সংজ্ঞাভেদ হইল। যাহারা পরিগ্রহকে রোগের ভায়, শল্যের ভায় বর্জনীয় মনে করিয়া, তাহা পরিভ্যাগপূর্বক, অরণ্যে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া পরমার্থের ধ্যান করিতে লাগিলেন—তাহারা ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। যাহারা শালিক্ষেত্রাদি রক্ষা করিতে লাগিলেন, সেখানে বীজাদি বপন করিতে লাগিলেন, তাহারা ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়) সংজ্ঞালাভ করিলেন। যাহারা বিবেচনাপূর্বক যথাসময়ে কর্ম করিয়া সেই কর্ম হইতে নানারূপ অর্থসম্পদ লাভ করিতে লাগিলেন তাহারা বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। অথ যাহারা ক্ষুদ্র কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন তাহারা শূদ্র* সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন।

ইহার পর মাতঙ্গরাজ বেদবৈদিক, আচার্য, তাহাদের সম্প্রদায়ভেদ, বেদের শাখাভেদ সম্বন্ধে নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিলেন এবং পুনরায় পুত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারীর কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন।

পুঙ্করসারী ত্রিশঙ্কুর ঐ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া মৌনভাবে, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তখন ত্রিশঙ্কু বলিলেন : হে ব্রাহ্মণ আপনি যদি আশঙ্কা করেন যে, আপনার কণার অসদৃশ পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইবে তবে অবগত হউন, আমার পুত্র শাদুলকর্ণের শ্রুতি শীলাদি শ্রেষ্ঠ গুণরাশি সমস্তই রহিয়াছে। আপনাকে পুনরায় বলিতেছি—যজ্ঞাদি প্রাণী-হিংসামূলক কর্ম স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ

* ক্ষুদ্র (কৃ ক্ষুদ্র) হইতে শূদ্র। শূদ্র শব্দের এইরূপ ব্যাং-পত্তিই যুক্তিযুক্ত। মদীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বহুপূর্বে তাঁহার এক প্রবন্ধে শূদ্র শব্দের এইরূপ ব্যাংপত্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র হইতেই শূদ্র শব্দের উৎপত্তি—ইহা তাঁহার মত।

* তুলনীয় : ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪১।৩৫-৪৩; অথ-ধোঘের বজ্রসূচী।

নহে। শ্রদ্ধা, শীল, তপ, ত্যাগ, শ্রুতি, জ্ঞান, তথা সর্ববেদের অর্থদর্শনই স্বর্গের কারণ। আমার পুত্রের তাহা রহিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত আপনার কৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। ধার্মিক চণ্ডাল ঘৃণার যোগ্য নহে।

ইহাতেও পুত্রসারী কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তিনি পৃথিব্যে যৌনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাহা লক্ষ্য করিয়া মাতঙ্গরাজ বলিলেন : দেখুন, ব্রাহ্মণ মুখ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ কল্পনা করিবেন না। উহা দোষাবহ। কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হয়।* ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে ভাৰ্য্যা সম্পর্ক পশুধর্ম—মানবধর্ম নহে।

আমাদের চণ্ডালকুলেও বহু বেদপারগ ঋষি মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনারদেরও বহু ঋষি মহর্ষির মাতা ছিলেন অত্রাহণী। ঋষি-কপিঞ্জলাদের মাতা ছিলেন চণ্ডালী।† পরম তেজস্বী বৈশ্যপয়ন ঋষির মাতা ছিলেন নিষাদী। ক্ষত্রিয় রেবুকা সর্বশাস্ত্রবিদ পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পরশুরামকে প্রসব করিয়াছিলেন—সুতরাং তিনিও অত্রাহণী-পুত্র।

হে ব্রাহ্মণ! আমি পুনরায় বলিতেছি—এই বর্ণভেদ সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং আমার পুত্র শাদুলকণ্ঠকে আপনি কন্যা দান করুন।

ইহার পর পুত্রসারী ত্রিশঙ্কুকে তাহার গোত্র প্রবরাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিশঙ্কু তাহার বিস্তারিত উত্তর দিলেন। তাহার পর তিনি সাবিত্রীর (গায়ত্রীর) উৎপত্তির ইতিহাস, তথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈজ্ঞ, শূত্রের পৃথক পৃথক সাবিত্রী পুত্রসারীকে শ্রবণ করাইলেন।

অতঃপর পুত্রসারী ত্রিশঙ্কুকে একে একে বহুবিধ বিদ্যার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশঙ্কু তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

জ্যোতিষের বিস্তৃত আলোচনা চলিল। অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রের প্রত্যেকের কয়টি তারা; কত মুহূর্ত যোগ, কিরূপ সংস্থান, কি আহার, কি দেবতা, কি গোত্র। তাহাদের কে পূর্বদারিক, কে পশ্চিমদারিক, কে উত্তরদারিক, কে দক্ষিণদারিক ইত্যাদি।

গ্রহের কথা। রাত্রি দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি, পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতুর আলোচনা। ক্ষণ, লব ও মুহূর্তের পরিমাণ। মুহূর্তের কত প্রকার নাম। স্থান, কাল ও বস্তুর পরিমাণ ও পরিমাপের বিস্তৃত বিবরণ।

কোন নক্ষত্রে কিরূপ চরিত্রের মানব জন্মগ্রহণ করে।

* তুলনীয় : “ব্রাহ্মণ মুখ হইতে যদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়, তবে ব্রাহ্মণীর জন্ম কোথা হইতে হইল? নিশ্চয় ঐ মুখ হইতেই। তবে তো ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ভগিনী হইলেন।”

অথর্বশেষের বজ্রসূচী।

† মহাভারত, অশ্বশাসনপর্ব, অধ্যায়, ২১ (ভাষ্যের সং)।

নক্ষত্রবিশেষে নগর স্থাপনের ফলাফল। কোন নক্ষত্রে, কোন দেশ বা জাতিবিশেষের উপর আধিপত্য করে। কোন ঋতুতে বৃষ্টি হইলে, কত (আটক বা আঁচা) পরিমাণ বৃষ্টি হয়। তখন কিরূপ কৃষিকর্ম করিতে হয়। গ্রহণের কথা—উহার প্রকারভেদে দেশ বা মনুষ্যবিশেষের উপর তাহার ফলাফল। কোন নক্ষত্রে কোন কর্ম করণীয় তাহার আলোচনা।

ভূমিকম্পের কথা—কোন নক্ষত্রে ভূমিকম্প হইলে, কোন শ্রেণীর লোকের, কোন দেশের, কোন জাতির কিরূপ ক্ষতি হয়। নানারূপ ভূমিকম্পের নাম, যথা—জলকম্পিতা, বায়ুকম্পিতা, অগ্নিকম্পিতা ইত্যাদি। তাহাদের লক্ষণ—যথা, অগ্নিকম্পিতা ভূমিকম্পে ভীষণ উদ্‌গাপাত হয়। অগ্নি রক্ষিত-ধন ও কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, ধূমশিখর দৃষ্ট হয়। সমস্ত ভূমিকম্পের মধ্যে এই অগ্নিকম্পিতাই অধম বা জঘন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ব্যাদি সমুখান—কোন নক্ষত্রে ব্যাদি হইলে, তাহা কত দিন স্থায়ী হয়, তাহার ফলাফল কিরূপ।

বন্ধন নির্মোক্ষ—নক্ষত্র বিশেষে কারাবন্ধনাদির ফলাফল। তিলক (বা তিলকালক) অধ্যায়—শরীরের নানা স্থানস্থিত নানারূপ তিলের শুভাশুভ ফল।

নক্ষত্র জয়গুণ—নক্ষত্রবিশেষে জয়ের ফল।

উৎপাতচক্রাধ্যায়—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈবাত্মক উৎপাতের কথা।

পুরুষপিণ্ডাধ্যায় বা পিণ্ডাধ্যায়—নানাবর্ণযুক্ত ব্রণকে (বা ব্রণের ছায় চিহ্নবিশেষকে) পিণ্ড (বা পিছ) বলা হইয়াছে। নক্ষত্রবিশেষে জাত স্ত্রীপুরুষের অঙ্গবিশেষে দৃষ্টপিণ্ডের শুভাশুভ ফল।

পিটিকাধ্যায়—দাহ ও আঘাত (তিল) চিহ্নকে এবং (নানাবর্ণের) বিস্ফোটককে পিটিক বলা হইয়াছে। শরীরে স্থানভেদে উৎপন্ন নানারূপ পিটিকের শুভাশুভ ফল।*

বর্ণাধ্যায়—নানাবিধ বস্ত্রের বিবিধ ফলাফল।

মাস পরীক্ষা—মাসবিশেষে মেঘগর্জন, বর্ষণ ও গ্রহণাদির ফলাফল।

ধঞ্জরীটক জ্ঞান—ধঞ্জন পক্ষীকে নানা স্থানে নানাভাবে দর্শনের শুভাশুভ ফল।

* বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার ৫২ অধ্যায়ে, পিটিকের আলোচনা আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থের কোথাও পিছের কথা নাই। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে পিণ্ড বা পিছ শব্দ পাওয়া যায় না।

বৃহৎসংহিতার ৫২ অধ্যায়ের শেষে যে ব্রণের উল্লেখ আছে, মনে হয় উহা পিণ্ডার্থক বা পিণ্ডের প্রতিশব্দ। কেননা আলোচ্য গ্রন্থের পিণ্ডাধ্যায়ে কখনও পিণ্ড বা পিছ, কখনও বা তাহার স্থানে ব্রণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং পিণ্ড (বা পিছ)-কে ব্রণ (বা আঁচিল) বলা যাইতে পারে।

শিবাকৃত জ্ঞান—শৃগালের নানা স্থানে, নানা যুগে, নানা
রূপ ডাকের ফলাফল।

পাণিলেখা—বা করতল লেখাধ্যায়।

বায়সরূত জ্ঞান—বায়সের নানারূপ ডাকের শুভাশুভ
ফল। তাহার পর দারলক্ষণ, দ্বাদশ রাশিজ্ঞান, কছালক্ষণ,
বজ্রাধ্যায়।

লুপ্তাধ্যায়—বীজ করূপে উৎপন্ন হইল। কিভাবে তাহা
বপন করিতে হয়। কোন্ নক্ষত্রযোগে, কোন্ ঋতুতে কিরূপ
বীজ বপন করিতে হইবে ইত্যাদি আলোচনা। তাহার পর
'ধূমিকাধ্যায়' বা অগ্নিহোত্র এবং তাহার পর তিথিকর্ম
নির্দেশ।

এই সমস্ত বিজ্ঞাবিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত করিয়া মাতঙ্গ-
রাজ ত্রিশঙ্কু বলিলেন : আমি জাতিস্মর। বিগত বহুজন্মের
কাহিনী আমার চিত্তে অঙ্কিত আছে। এই বলিয়া তিনি
অতীত অনেক জন্মের কাহিনী বিবৃত করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারী বলিলেন, ভগবান ত্রিশঙ্কু ! আপনি
শ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ। আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, আপনি
দেবলোকের মহাজ্ঞানী হইয়াছেন। আপনি আপনার পুত্রের ভাষার
নিমিত্ত আমার কথা প্রকৃতিকে গ্রহণ করুন। শীলরূপ ও
শুণসম্পন্ন শাদুলকর্ণ ও ভদ্রা প্রকৃতি পরম্পরকে আনন্দদান
করুন ইহাই আমার অভিলাষ।

ইহা শ্রবণ মাত্র সেই পঞ্চ শত বিদ্যার্থী উচ্চস্বরে মহা-
কোলাহলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন : হে উপাধ্যায় ! না না !
ইহা কদাচ করিবেন না। ব্রাহ্মণ বর্তমান থাকিতে চণ্ডালের
সহিত সম্বন্ধ আপনার কর্তব্য নহে।

পুঙ্করসারী তাহাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন :
জাতি সম্বন্ধে ত্রিশঙ্কু যাহা বলিলেন, তাহা অবিতর্ক সত্য।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি কোথায় ? কর্মবশে সর্বজীব সর্ব-
যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিতেছে। কোন জীবই (আকাশ বা)

বায়ু হইতে জন্মগ্রহণ করে না। সর্ব বর্ণেই অন্ধ, বধু, কুঠরোগী
সমানভাবে রহিয়াছে। সকলেই শুদ্ধ, কৃষ্ণ, শ্রীমবর্ণ। অস্থি,
চর্ম, কেশ, নখাদি সকলেরই একরূপ। মাংস, মূত্র, পুরীষাদিও
ভিন্ন নহে—এক। সুখ দুঃখাদিও এক। সুতরাং বর্ণ এক—
চারি নহে।* কর্মেরই এখানে প্রাধান্য। এই মাতঙ্গরাজ
পরম জ্ঞানবান, সর্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইনি শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট।
ইহার অনুরূপ শীল ও শুণসম্পন্ন শাদুলকর্ণকেই আমার কথা
প্রকৃতিকে দান করিতেছি।

ইহার পর শাদুলকর্ণের সহিত প্রকৃতির পরিণয় হইল।
এই উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া ভগবান বুদ্ধ বলিলেন : ভিক্ষুগণ !
পূর্বজন্মে আমি ছিলাম মাতঙ্গরাজ ত্রিশঙ্কু। শারদত্তী পুত্র (বা
শারিপুত্র) ছিলেন ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারী। আনন্দ ছিলেন শাদুল-
কর্ণ। এবং চণ্ডালকথা প্রকৃতি ছিলেন ব্রাহ্মণ পুঙ্করসারীর
কন্যা।

এই প্রকৃতি তাঁহার পূর্বজন্মের সেই স্নেহ ও প্রেমের
আকর্ষণে আনন্দের প্রতি অনুরক্ত। ছায়ার ন্যায় তাঁহার
অনুগামী। এই বলিয়া ভগবান এই গাথা উচ্চারণ করিলেন :
পূর্বকণ নিবাসেন প্রভুত্বপনেন তেন চ।

এতেন জায়তে প্রেম চন্দ্রস্ত কুয়ুদে যথা ॥

‘প্রাক্তন এবং বর্তমান এই উভয় জন্মকে অবলম্বন করিয়া
প্রেম উৎপন্ন হয়। কুয়ুদিনীর প্রতি চন্দ্রের অনুরাগ উহার
উদাহরণ।’

অতঃপর ভগবানকর্তৃক চতুর্বার্ষদ্যোত ও তাহা অবগত
হইবার উপায় কথিত হইল। সমস্ত ভিক্ষু সম্প্রদায় তাঁহার
অভিভাষণ অভিনন্দিত করিলেন।

* ভুলনীয় : ভবিষ্যপুরণ, ব্রাহ্ম, ৪০।২৩-২৯ ; ৪১।৩৫-
৪৩। মহাভারত, শান্তি, ১৮।৭-৮। বজ্রমূচ্যপরিষদ।

† চতুর্বার্ষদ্যোত :—১। হুঃব, ২। হুঃখের কারণ,
৩। হুঃখের নিরোধ, ৪। হুঃখ নিরোধের পথ।

ক্ষণ শাস্ত্রী

শ্রীনীলহরকান্তি ঘোষ দস্তিদার

শেষ রাত এল : কদলীপাতায় ঝরিছে হিমের আঁখি—
আর ক্ষণকাল প্রণয় মোদের : প্রভাতের নাহি বাকি।
তোমার স্বপ্ন এখনো রঙীন কাঁচের মতন হাসে...
বিরহী-জীবন ? রহস্য সে-কথা স্বপনের উচ্ছ্বাসে।
মোর এ মানসী-উপবনে নীল-বাদামী কুঞ্জ কত
করেছি রচনা : তুমি তাহে বসি দিবানিশি অবিরত,
তব নিশাসের আবশে মধুর কামনার জালে বোনা—
মদির পবন দিল্লিছ ঢালিয়া : করে তারা আনাগোনা।

চঞ্চল কেন ? ঐ পূব দিকে ফিকে আবির্ভাবের ঝড়...
যত্নের মতো নীরব মোদের এই ক্ষণ অবসর।
ভাঙিবে কি তাকে ? শিহরিবে উষা : সহিতে
পারিবে তাহা ?

মিনতি আমার প্রেম নিয়ে যাও এনেছি যতনে যাহা।
প্রভাত হয়েছে : আলোর ওপারে ধরণী রয়েছে তব।
ঘন রজনীর শীতল পরশে তুমি তাই অভিনব।

অবলম্বন

ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনসমাজের বাহিরে হুন্দর একখানি বাঙালো। হয়ত আজ আর নাই, কিন্তু এক দিন ছিল। আর ছিল মানব-মনের ভাবধারার এক অপূর্ণ সমাবেশ। আদান-প্রদানের এক অভিনব প্রাণময় নিঃশব্দ প্রকাশ। কিন্তু সাধারণে তার কোন খবর রাখিত না। রাখিবার কথাও নয়। সমাজের বাহিরে অরণ্যানীর কোলে এর অবস্থিতি, ঘনভাবে মিশিয়া আছে প্রকৃতির সহিত। হয়ত এমনি অখ্যাত অজ্ঞাতই সে আমার কাছেও চিরকাল থাকিয়া যাইত যদি না ঘটনাচক্র আমাদের আকর্ষণ করিত।

সেই কথাই বলিব।

বয়স তখন আমার খুবই কম। কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে। প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ, চলার গতি বেগবান প্রাণবন্ত। একটা কিছু হাতের কাছে পাইলেই হইল। চেহারটাও তখন নাকি ভালই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা লইয়া আলোচনা করা বুধ। তা ছাড়া ভালও লাগে না নিজের বর্তমান অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতার কঠিন নিষ্পেষণে সে দিনের কথা এখন রূপকথা বলিয়াই মনে হয়। তুলিয়া থাকিতেই চাই, কিন্তু পারি না, নিজের অজ্ঞাতেই আসিয়া চেতনার মণিকোঠায় যুদ্ধ টোকা দেয়। জানাইয়া দেয় তাদের অস্তিত্ব। তারা আছে থাকিবেও। কিন্তু যাক সে সব কথা।

বন্ধু দেবব্রত এবং ডুমুর একান্ত অনুরোধে বাহির হইয়া পড়িব স্থির করিলাম। প্রথম গন্তব্য স্থান আমাদের কুচবিহার মেকলিগঞ্জে, সেখানে দিন কয়েক কাটাইয়া গ্রামশিৎ পর্বতে যাইব এল্প সিদ্ধান্ত আমরা পূর্বাহ্নেই করিয়া লইলাম। দেবব্রতের দেশ মেকলিগঞ্জে। ডুমুর বাবা গ্রামশিৎ অঞ্চলের একটা বড় চা-বাগানের সর্বময় কর্তা।

যাত্রা করিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা। অসংখ্য অনুবিধা থাকিলেও বর্তমান যুগের সহিত সে দিনের তুলনা হয় না। টিকিট-চেকারের উপদ্রব, ভিখারীদের করুণা আকর্ষণের দলবদ্ধ আক্রমণ কিংবা আবিষ্কারকদের অভিনব আবিষ্কারের বিজ্ঞাপনের জীবন্ত আবির্ভাব সে যুগে তেমন ছিল না। মোটের উপর অডাব-অনটনের তখন একটা মাত্রা ছিল। স্মৃধার জালায় অথবা বজ্রভাবে আত্মহত্যার কাহিনী তখনকার দিনে কেহ কল্পনা করিতেও পারিত না। বর্তমানের সত্য সে যুগে ছিল নরক-কল্পনা। তাই ত আজ বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতি চোখ ফিরাইয়া বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হইতেছে যে, আমরা কি অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি না ভবিষ্যত আরও নীরব অন্ধকারের দিকে আমাদের বংশধরদের ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে। আজ, অতীতের কাহিনী বলিতে বসিয়া কত কথাই না মনে পড়িতেছে

কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই আণবিক যুগের বীভৎসতা আর উল্লেখ করিয়া দেখাইব না। আমি সে যুগের মানুষ হইলেও যুগধর্মের সহিত সমতালে না চলিয়া উপায়কি। কিন্তু—না আর নয়, বিস্ময় মন অনেক দূরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। এবারে আসল কথা বলিব।

বার দুই গাড়ী বদল করিয়া পরদিন মেকলিগঞ্জে পৌছিলাম। সেখানে সপ্তাহখানেক বেশ আনন্দে কাটাইয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। আমাদের এবারের অভিযান গ্রামশিৎ পর্বতে। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা। প্রায় সাত-আট ঘণ্টার পথ যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। জীবনে সেই আমার প্রথম পর্বত দর্শন। পরবর্তী জীবনে সে সুযোগ বহু বার আমার আসিয়াছে কিন্তু সে চোখে কোনদিন আর পর্বতকে দেখি নাই। সে দিনের সে স্মৃতি ফুলশয্যারাজির ক্ষণস্থায়ী এক টুকরা অত্যন্ত অল্পভূতির মত আজিও মনের কোণে জড়াইয়া আছে।

গ্রামশিৎ পৌছিলাম শেষ বেলায়। ডুমুর বাবাকে পূর্বেই জানাইয়া রাখা হইয়াছিল। ব্যবস্থার তিনি কোন ত্রুটি রাখেন নাই। পথের সকল কাটাইয়া উঠিয়া একটু গোছগাছ করিয়া লইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে রাতটা নিছক বৈচিত্র্য হীন ভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষেই তিন বন্ধু একপ্রহর পর্বত প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। পার্বত্য নদী মৃত্তিমতীর শুভ্র জলোচ্ছ্বাস ছু' চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। ডুমুর জানাইল, হরিণ শিকারের এটি প্রধান কেন্দ্র। গোটা দুই পর্বতের শেষপ্রান্তে গভীর অরণ্য, যেখানে দলবদ্ধভাবে ছাড়া যাইবার উপায় নাই।

পরদিবস বৈকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে চমৎকার মিঠে রোদ দেখা দিল। ডুমুরকে দেখিলেই বেশ চক্কল হইয়া উঠিয়াছে। তার বাবার সঙ্গে ষানিক কি পরামর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের প্রস্তুত হইতে বলিল। হরিণ শিকারে বাহির হইব। শিকারে আমার নূতন হাতেখড়ি হইয়াছে মেকলিগঞ্জে, তাই সবচেয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম আমি। তিন বন্ধু তিনটা দোনলা বন্দুক এবং জনকয়েক পাহাড়ী পথপ্রদর্শক সহ বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য পর্বতের আড়ালে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে। একটা শিকারও পাইলাম না। ডুমুরকে ব্যঙ্গ করিলাম। পথপ্রদর্শকদের তাদের অবোধ ভাষায় ক্লেষ করিলাম। শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টকে বিদ্যার দিয়া নীরব হইলাম। কিন্তু পায়ের গতি তখনও আমাদের মন্থর ভাবে সন্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। ডুমুর কিরিবার তাগিদ দিল—দেবব্রত সাথ দিল। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় আমার সজাগ থাকিলেও দৃষ্টি তদপেক্ষা প্রবল ছিল। উহাদের ইঙ্গিতে

নীরব থাকিতে বলিয়া বন্দুকটা তাক করিয়া ধরিলাম। এক জোড়া ভাগর চোখের দ্রুত চাহনি—পরমুহূর্তেই বন্দুক করিয়া একটা শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গেই টিগারে আঁচলের চাপ। কিছুক্ষণ চূপচাপ, পরমুহূর্তে আর একটা শব্দ। আমি পাগলের মত অহুসরণ করিলাম। শিকার আহত হইয়াছে ইহা বুঝিলাম তার পলায়নের গতিবেগে। নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম। আমার খুনের নেশা লাগিয়াছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি কখনও ভাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও সন্মুখে। কিন্তু নেশা আমার কাটিয়া গেল রাত্রির ঘনাকারে। আমি পথ হারাইয়াছি। সঙ্গীদের কোন চিহ্ন নাই। বৃকে সাঁহস এবং হাতে দোনলা থাকিলেও এই অন্ধকার অরণ্যানীর মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল। গাটা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। নিজের অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। অরণ্যের এ আর এক রূপ, অপূর্ণ, ভয়াবহ। হিংস্র জন্তুর সুরোষ গর্জনে চমকাইয়া উঠিলাম। অন্তরায় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত হইলাম না। এই বিপৎসঙ্কুল অরণ্যে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার নিপদ যে কতখানি তাহা বুঝিয়াও অন্ধের মত পথ চলিতে লাগিলাম। মাথার উপরে একটি নিশাচর পাখী কর্কশরবে ডাকিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসিল, মৃদুস্বাকর্ষণের সুতীক্ষ্ণ হাসি। হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে চমকাইয়া উঠিলাম কিন্তু ভিতরে ভিতরে খানিক ভরসাও পাইলাম। দ্রুতপদে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া গেলাম এবং পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করিলাম যে, আমি একটি বাঙলার সীমানার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। আর অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছেন এক শুভ্র শ্রমোন্মত্ত দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। সমস্ত দেহটা সোলার মত হালকা ঠেকিল। ব্যগ্রভাবে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম।

বৃদ্ধ আমার আবেদন শুনিয়াছেন কিনা ঠিক বুঝিলাম না। আমি পুনরায় কাতর কণ্ঠে কহিলাম, আমি বিপন্ন এবং পরিশ্রান্ত। একটু আশ্রয় এবং বিশ্রামের সত্যই আমার বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মানসিক উত্তেজনার এতক্ষণ সে কথা মনে হয় নাই। মানুষ এবং বাঙলার সন্ধান পাইয়া দেহ তার দাবি জানাইতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিল না।

বৃদ্ধ এতক্ষণে কথা কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি নইলে এই আশ্রয় রাতে কি আর কেউ সন্ধান করে এখানে বেড়াতে আসে? তিনি এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়া আমার সারা দেহটা যেন লেখন করিতে লাগিলেন। তাঁর দৃষ্টির অস্বাভাবিকতায় আমি একটু চাঁকল্য বোধ করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। তিনি ইঙ্গিতে আমায় অহুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। দুইখানি জীর্ণ বেতের মোড়ায় দুই জনে যুথোয়ুথি হইয়া বসিলাম। হাতের দোনলাটি

এক পাশে কাত করিয়া রাখিলাম। ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম। মুষ্টিমান বিশৃঙ্খলা একপাশে এক রাশ বোতল গাদা হইয়া পড়িয়া আছে। অপর পাশে রাশি রাশি বইয়ের স্তুপ। অকস্মাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম আশে-পাশে কোথাও চাপা কারার শব্দ, এবং আমি সবিম্বয়ে লক্ষ্য করিলাম বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেদনার সুস্পষ্ট আভাস দেখা দিয়াছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, এবং খানিক নিঃশব্দে কাটিবার পর পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিলেন, এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর আমার নেই যুবক—একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু বিশ্রাম করার সুযোগ তুমি পাবে না। এখানকার আবহাওয়া তার অসহ্যকূল নয়। এই ব্রাঙ লোকানাকে ঘিরে রাতের পর রাত যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি তা সাধারণ দশ জনে বিশ্বাস করবে না। রাতের অন্ধকারেই এর জীবনমন্দন সত্য রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। অতৃপ্ত আকাজ্ঞা এবং অপূর্ণ ভালবাসাকে কেন্দ্র করে এখানে এক অপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাঁটি ভাল-বাসার স্বাদ বনের পশুও ভোলে না। তাই রোজই রাতের অন্ধকারে ওদের এখানে আবির্ভাব। ওরা খুঁজে ফেরে ওদের হারানো বস্তুকে, পায় না। তাই ওরা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তীব্র গর্জন করে। ফিরে যায়। আবার আসে। অবোধ জীব আজও বুঝল না যে সে নেই।

বৃদ্ধ ক্রমশঃই হুর্কোষ্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোন প্রকার প্রশ্ন করিয়া ব্যস্ত করিতে মন সরিতেছিল না। কেন তাহা আমি নিজেও বুঝিলাম না। তিনিও হয়তো কথাটা বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, সেই কাহিনীই তোমাকে আজ আমি শোনাব, হয়তো এমনি এক মাহেত্রক্ষণ আর জীবনে পাব না। বুঝলে যুবক।

তিনি একটু থামিয়া পুনরায় শুরু করিলেন,—যাকে নিয়ে আমার এই গল্প তার নাম ছিল সুকুমার। ভাল ঘরের শিক্ষিত ছেলে। সাহিত্যসাধনা এবং চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য তাকে নিজের স্বাভাবিক সন্ধেও অচেতন করে রেখেছিল। স্বভাব ছিল অত্যন্ত ধামখেয়ালী এবং একরোখা। যখন যেটা মাথায় চুকত তাই নিয়েই মাতাল হয়ে উঠত। যুক্তি-তর্কের দার দারত না। কিন্তু মনটা ছিল তার ফুলের মত নরম। তাই আজ তুমি এখানে আমি এখানে। পৃথিবীর যাকিছু সুন্দর যাকিছু ভাল তাতেই ওর প্রবল আকর্ষণ। অহুসরণে ওর তীব্র বিতৃষ্ণা তাই বৃষ্টি ময়ূর-ব্যাধি ওর দেহে আশ্রয় নিলে। সুকুমারের হল বাইসিস।

সুকুমারের বাবা ডাক্তার, দাদা ডাক্তার, তারা ওর আলাদা ব্যবস্থা করলেন। সুকুমার প্রবল বাধা দিলে। বললে, মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গেই যদি তাঁকে ত্যাগ করতে হয় তা হলে এমন কোথাও সে যাবে যেখানে পদে পদে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দ সংঘর্ষ বাধবে না।

সুকুমারের দাদা অসন্তুষ্ট হলেন। বাবা অনেক বুঝালেন। মা কান্নাকাটি করে বাড়ীর আবহাওয়াটাকেই ভারী করে তুললেন। সকলকেই সে যুঁহু হাসি দিয়ে উপেক্ষা করলে, শুধু তার বাবাকে একান্তে ডেকে বললে, তুমি ডাক্তার, তোমাকে আমার বুঝাতে হবে না। সবদিক বেষ করে ভেবেই আমি এ কথা বলছি, এমন কোথাও আমার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দাও যেখানে পদে পদে আমাকে মানুষের সংসর্গ লোভাতুর করে তুলবে না। তাদের মধ্যে বাস করে নিজেকে পুরোপুরি নির্বাসন দিতে আমি পারব না। হয়তো আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর ছুটো সুস্থ মানুষের অনিষ্ট করে বসব।

কথাটা সুকুমারের দাদার কানেও গেল। তিনি বললেন, জীবনটা সাহিত্য নয়। এতটা ভাবপ্রবণতা সাংসারিক জীবনে অচল। কিন্তু তার বাবা সুকুমারের হুজিকে এক কথায় অবহেলা করতে পারেন নি। তিনি শান্ত কণ্ঠে বড় ছেলেকে বলেছিলেন, তোমার দিক থেকে এ কথা তুমি বলতে পার সমর, কিন্তু সুকুমারের দিকটাও আমাদের একবার ভাল করে ভেবে দেখা কর্তব্য। সে তরুণ। যে সময়টা মানুষ রঙীন কল্পনায় ফুটন্ত, জীবনের সত্যিকারের আরম্ভের উন্মাদনায় চঞ্চল, সেই শুভ মুহূর্তটিকে আমরা এত সহজে ভুলতে পারলেও সে যদি তা না পারে আর এই না-পারার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জ্ঞান সুকুমার যদি কতকটা ভাবপ্রবণ হয়েও থাকে আমি বাপ হয়ে তাকে এক কণ্ঠ্য বাতিল করে দিই কেমন করে।

সমর তার মিতভাবী পিতাকে জানত। তাই মিথ্যা বাজে কথা'র স্বষ্টি সে করে নি। বরং সে তার পিতার কাজে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে সহায়তাই করেছে।

এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই সুকুমারকে নিয়ে তার মা এবং বাবা এই পরীতথণ্ডে অরণ্যানীর কোলে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। নতুন করে আরম্ভ করলেন তাঁদের জীবনযাত্রা, একটা সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যে। কিন্তু সুকুমার তার জীবনযাপন-প্রণালী এক ভিন্নপথ ধরে আরম্ভ করলে। সুকুমারের মনের অপরিষ্কৃত ভালবাসা নবরূপে সজীব হয়ে উঠল। সুকুমারের সাহিত্য এবং শিল্পীমনের অকস্মাৎ গ্রহণ ঘটল। ছবির হয়ে উঠল এক নবচেতনায়। ওর পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটল। এক কথায় সুকুমার হয়ে উঠল বহু—উচ্ছ্বল। সে তার মা-বাবার কাছ থেকেও বীরে বীরে সরে যেতে লাগল। তাঁরা হুঁর হুঁতেন, তাঁদের মেহপ্রবণ মন আহত হ'ত। সুকুমার তা টের পেয়ে মাকে হেসে বলত, শুধুই ত নিচ্ছি মা, করার ত আমার কিছু নেই তাই বড় ভারী ঠেকে। বইবার শক্তি কম কিনা তাই একটু সাবধান হচ্ছি।

মা তার মুখের প্রতি চেয়ে থাকেন। অতশত বোঝেন না তিনি—বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু বাপের চোখে-

মুখে নীরব ভংসনা প্রকাশ পায়। যদিও তিনি একটি প্রতিবাদের কথাও মুখে আনেন না। সুকুমার হয়তো একটু লজ্জা পায়, বাপকে একান্তে ডেকে বলে মিথ্যে আমি বলি নি বাবা। কিন্তু মাকে ঠকাতে পারলেও তোমাকে আমি পারব না সে আমি জানি। আমার অসংখ্য উপাত্তের মত এটাও ক্ষমা করে যেও। সুকুমার একটু থেমে প্রসঙ্গান্তরে এল, বললে, একটা ভাল্লুকের বাচ্চা নিয়ে এলাম বাবা। ওরা মানুষের মত কথা কইতে পারবে না—স্বস্তি আশ্ববোধশক্তি কোন দিন হবে না। আমার যোগ্য সহচর। সুকুমার কেমন এক প্রকার হেসে প্রশ্নান করলে।

বুদ্ধ কিছুক্ষণের জ্ঞান থামিলেন। আমার একাগ্রতায় বাধা পড়িল। ঠিক পাশেই চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলাম। নিজের অজান্তেই দোনলাটা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিলাম। বুদ্ধ হয়তো আগাগোড়াই আমার লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। হাত তুলিয়া বাধা দিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, থাম যুবক—ওরা বহু হলেও মানুষের যথার্থ ভালবাসা পেয়েছে। যার অমর্যাদা ওরা কোনদিন করে নি—আজও করবে না। ওটা সুকুমারের সেই বাচ্চা ভালুকটা। তার তিল তিল ভালবাসা ওকে এত বড়ট হবার সুযোগ দিয়েছে। সেই হারানো বস্তুই ওরা খুঁজে বেড়ায়।

ভালুকটি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। একটা কথাও আমার মুখ হইতে বাহির হইল না। বিস্ময় বোধ করিলাম। ভাবিতেছিলাম মানব-মনের বিচিত্র ভাবধারার কথা। কত পথ ধরিয়াই না ইহার আজপ্রকাশ। দেওয়ার মধ্যেই এর সার্থকতা।

বুদ্ধ একটু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, সুকুমারের জীবজন্তু-প্রীতি দিনে দিনে একটা ব্যাধিতে রূপান্তরিত হ'ল। কোথা থেকে নিয়ে এল এক জোড়া চিতাবাঘ, ডজনখানেক ময়ূর। যোগাড় করলে ছুটো বাদর, ছুটো হরিণ, গোটাকয়েক বহু মেঘ। সেই সঙ্গে এল দুজনা পাহাড়ী ভূত্য। সে কি তার কর্মব্যস্ততা, কোথায় কেমন করে তাদের গৃহ নির্মাণ হবে। কোন্ কামরাটা কোন্ জন্তু-বিশেষের জন্ত করা হ'ল—কতটুকু লগ্না কতটুকু প্রস্থ হলে চিতাবাঘের কামরাটি আরামদায়ক হবে—মোট কথা ওদের সুখ-সুবিধার জন্ত নিজেকে সে ভুলে গেল। নিজেকে এক তিল অবকাশ দিতে সে নারাজ। ঐ শিশু জীবব্রাজ্যের সে হ'ল একচ্ছত্র অভিভাবক। ওদের স্নানাহার থেকে আরম্ভ করে সবকিছুর তদ্বিরের ভার সে নিজে হাতে তুলে নিল। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। এক নতুন চেতনায় আত্মভোলা।

বুদ্ধ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া অঙ্গুর হইয়া চলিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। পাশের ঘরে আসিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে

সর্বপ্রথমে চোখে পড়িল ছ' জোড়া চলমান জলন্ত চোখ।
মাহুঘের সাড়া পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। নিজের অজান্তেই
চমকাইয়া উঠিলাম। বুদ্ধ কহিলেন, ভয় নেই আলো জ্বালাচ্ছি।

একখানি বহুদিনের অব্যবহৃত শস্যার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জ্ঞান লইতেছে একজোড়া চিতাবাঘ। বাদর দুইটা দুর্বোধ্য
ভাষায় এক প্রকার শব্দ করিয়া ঘরময় লাফাইয়া ফিরিতেছে।
কয়েকটা বন্যমেঘ নির্বোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। গোটা-
কয়েক ময়ূর, দুইটা হরিণ এবং ভালুকটাও এদের দলপুষ্ট
করিয়াছে। উহার জাতিগত পার্থক্য এবং স্বভাবগত হিংসাকে
ভুলিয়াছে। উদ্বেগ উহাদের এক, তাই হয়তো বিভেদ নাই
অথবা ভালবাসার যাহুস্পর্শে উহার এক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত
হইয়াছে। আমাদের উপস্থিতি ক্ষণিকের জন্য উহাদের
গতিরোধ করিল। চিতাবাঘ দুইটা একবার চোখ তুলিয়া
চাহিল। বাদর দুইটা বারকয়েক আমাদের কাপড় ধরিয়া
টানটানি করিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল। আমি শুদ্ধ বিষয়ে
দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ
করিয়া কহিলেন, স্কুমারের কবরের পাষাণ তার অন্তিমকে
চাপা দিয়েছে তাই ওদের আসক্তি তার শোবার ঘরে। বিশেষ
করে স্কুমারের শস্যার উপর।

আমি চূপ করিয়া রহিলাম। বুদ্ধ কহিলেন, চল—

পুনরায় দুই জনে যুথোয়ুথি বসিলাম। বুদ্ধ শুদ্ধ হইয়া
বসিয়া আছেন। ভিতরে যেন একটা প্রবল ঝড় চলিতেছে।
তার মুখ দেখিয়া অহুমান করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণেই সে
ভাব কাটাইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন :

তাদের নিম্প্রাণ বাড়ীখানা সহসা প্রাণচাকল্যে মুখর হয়ে
উঠল। হাঁক-ডাক চেঁচামেচি লেগেই আছে। স্কুমার বলে,
চাকর দুটো কাজ করে শুধু পয়সার জ্ঞ। নইলে দয়ামায়া বলে
কোন পদার্থ ওদের নেই; অবোলা জীব, ওদের খাওয়াদাওয়ার
উপরও চুরি। তাই নিজেকেই তার সবকিছু দেখতে হয়।
পাছে তার অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমে তার মা বাবা আপত্তি
করেন এ তারই মুখবন্ধ। বাপকে গিয়ে অত্যন্ত সন্ধ্যাপনে
বললে, মাহুঘ-চিকিৎসা এবার ছেড়ে দাও বাবা, পোষ্য ভোমার
এখন জীবন্তই বেশী। পশুচিকিৎসার খানকয়েক বই আনিয়ে
নাও বাবা।—বই তার বাবাকে আনাতেই হয়। না এনে
উপায় কি। আজ ওর চিতাবাঘের সর্দি, কাল ভালুকের জ্বর
আর এই নিয়ে স্কুমারের রাত্রি জাগরণ। বাপ হয়ে তিনি
এটা চোখের উপর দেখেন কি করে।

স্কুমারের মা শেষ পর্যন্ত গোলমাল বাধালেন, এ তুমি
করছ কি? তুমি বাধা দিতে পার না? এই অনিয়ম অত্যাচার
ঐ রূপ শরীরে—তিনি কথাটা শেষ না করেই কান্নাকাটি শুরু
করেন। স্কুমারের বাবা চূপ করে থাকেন। কি জবাব
দেবেন তিনি।

পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার হিসাবনিকাশ সে যদি এমনি

করে করতে চায় করুক। স্কুমারের বুকের বুদ্ধিফিত
ভালবাসার বেগ যারা বিচার করতে বসবে না তাদেরই
সে বেছে নিয়েছে। কেমন করে এ সম্বলটুকু তিনি তার
কাছ থেকে কেড়ে নেবেন।

স্কুমারের মা কোন কিছুই তলিয়ে দেখবেন না। শুধু
একটা নির্ভর আশঙ্কা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। শুধু বেঁচে
থাকাটাই জীবনে সব নয়—আম্মার দাবি যে তার চেতনার
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যার একটাকে বাদ দিলে
অপরটা নিরর্থক হয়ে যায় এ কথা তাকে বোঝাবে কে?

স্কুমারের মা বলেন, এমনি করে সত্যিই আমি আর
পারছি না।

বুদ্ধ কিছুক্ষণের জ্ঞা থামিলেন। চোখ বুজিয়া কি চিন্তা
করিয়া লইয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, স্কুমারের মাকে বেশী
দিন সহ করতে হ'ল না। একদিন হঠাৎ তিনি চিরতরে
চলে গেলেন।

স্কুমারের বাবা এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিহ্বল হয়ে
পড়লেন। স্কুমার কিন্তু কোন প্রকার চাকল্য প্রকাশ করলে
না। অতি সহজভাবেই যুতটাকে গ্রহণ করেছে এমনি একটি
ভাব প্রকাশ করলে। কিন্তু সে তার মাকে দাছ করতে দিলে
না। বাপ তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এত বড় ধর্ম-
বিরোধী এবং নীতিবিরুদ্ধ কাজ তিনি করতে দিতে পারেন
না। কিন্তু স্কুমার একেবারে ইম্পাতের মত কঠিন, তাকে
কিছুতেই ভাঙা গেল না। সে তার বাপের কথায় প্রতিবাদ
করে বললে, ধর্ম, জ্ঞা, নীতি ও সব সমাজের জীবদের জ্ঞা,
আমাদের জ্ঞা নয়। অন্তরের দাবিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
তার ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করবার জ্ঞা কোন অহুশাসন ত
আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে নেই বাবা যে তাদের মানতে
হবে। আমাদের মন যা চায় সেই আমাদের ধর্ম, আমাদের
জ্ঞার গভী।

এর পরে স্কুমারের বাবা আর বাধা দেন নি। মোট কথা
বাধা দেবার কোন শক্তিই তাঁর ছিল না।

স্কুমার তার মাকে মাটির তলায় শুইয়ে রাখলে।
সেখানে নিজ হাতে গড়ে তুললে এক স্মৃতিসৌধ। তারপর...
তারপর সেই হতভাগা পাষাণ কি বললে জান—

বুদ্ধ যুহুর্ডের জ্ঞা থামিলেন। মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা
কর্কশ কঠিন হইয়া উঠিল। চোখের চাহনিতে একটা পাগল
উদ্ভ্রান্ত ভঙ্গী। আগাগোড়াই তিনি যেন একটি ভিন্ন মাহুঘ।
কণ্ঠধরে দেখা দিল উত্তেজনা। তিনি পুনরায় কথা কহিয়া
উঠিলেন, সেই দুর্ভাগ্য ছেলেটা তার বাপকে বললে, মার পাশে
আর একটা সৌধ করে রেখেছি বাবা আমাকেও তুমি ওখানেই
শুইয়ে রেখ।

বুদ্ধ হাঁপাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুক্ষণেই সে ভাবটা
কাটাইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,

কথাটা বলতে সুরুমারের কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপে নি। তার মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হয় নি। ও কসাই—হৃদয়হীন কসাই। তার এই নির্ভুর আঘাতে সুরুমারের বাবা চিংকার করে উঠেছিলেন—কুমার—তঁার সমস্ত শরীর থব্ থব্ করে তখন কাঁপছিল।

আমি লক্ষ্য করিলাম বুদ্ধের সমস্ত শরীরটাও তখন ছলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ মনের কোণে যে সম্ভ্রমটা আনাগোনা করিতেছিল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলাম। এরা আমার কেউ নয়—আগামী কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে চলিয়া যাইব। হয়তো জীবনে আর কোন দিনও সাক্ষাৎ ঘটবে না। কিন্তু তথাপি বড় বেদনা বোধ করিলাম। বুদ্ধ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁর পদভারে চতুর্দিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সহসা তিনি আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিলেন, সুরুমার মরেছে। তাঁর শেষ ইচ্ছা আমি নিজ হাতে পূরণ করেছি। আমি বাপ হয়ে তাকে নিজ হাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি—

আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁর দু'চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে, পরমুহূর্তেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম একটা বিকট ভয়াবহ অট-হাস্তে। তাঁর হাসির সঙ্গে সমতা রাখিয়া আমার আশেপাশে গর্জন করিয়া উঠিল এক জোড়া চিতাবাঘ—আর সুরুমারের অস্তিত্ব পোস্তবুদ্ধ যারা তার ভালবাসার স্পর্শের সন্ধানে এই কুণীর আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সুরুমার নাই—কিন্তু ভালবাসা দিয়া ষাঁদের সে জয় করিয়া গিয়াছে

তারা নাকি রোজই আসিয়া এই বাড়ীর অঙ্গনে উপস্থিত হয়। বুজিয়া ফেরে তাদের হারানো বস্তুকে। পায় না। চলিয়া যায়। আবার ফিরিয়া আসে।

* * *

পরদিবস অতি প্রত্যুষে ফিরিয়া আসিলাম। ডুহু আমাকে জড়াইয়া ধরিল। দেবব্রত খুশী হইলেও, গৌয়ার বাক্য অনুবলিয়া উপহাস করিল। ডুহুর বাবা বলিলেন যে, সাহস থাকে ভাল কিন্তু অতি সাহস গৌয়ার্তুমির নামান্তর যা প্রায় সব সময়ই বিপদ ডেকে আনে। আমার মা-বাবার নাকি অত্যন্ত পুণ্যের জোর তাই জীবন্ত ফিরিয়া আসিয়াছি।

বুখিলাম আমার আশা তিনি এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়া ছিলেন। ইহার পরে আমাকে সম্মুখীন হইতে হইল ডুহুর এবং দেবব্রতের অসংখ্য প্রশ্নের, যার উত্তর দিতে গিয়া আমাকে গত রাত্রের কাহিনী আগাগোড়া বিবৃত করিতে হইল।

ডুহু এবং দেবব্রত অবিবাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়িল। ডুহুর বাবা একমুখ হাসিয়া কহিলেন, তাই বল। সেই পাংলা বুড়োর পালায় পড়েছিল। একেবারে বন্ধ উম্মাদ—

কিন্তু উহাদের বিশ্বাস অবিবাস অথবা টীকাটগ্নীতে আমার কিছুই আসিয়া যাইবে না। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেহ এবং ভালবাসার যে সত্য রূপ আমার চোখের সম্মুখে জীবন্ত মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল তাহাকে উহার যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন আমার কাছে চিরদিন তাহা শাশ্বত অমর হইয়া থাকিবে।

কোন পথে ?

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্-এ

আণবিক বোমার বিস্ফোরণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটায়ছে আর ভবিষ্যতের বিভীষিকাভীত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে—কোন পথে ? এ প্রশ্নের ঠিক মত উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে মানুষের প্রগতি এত দিন কোন পথে হয়েছে, মানুষ কি চেয়েছে আর কি পেয়েছে, আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সে কি চায়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় মানুষের মনের ইচ্ছা সুখে-শান্তিতে স্বচ্ছন্দে বাস করা। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বার বারই এই জগৎ লড়াই করে আসতে হয়েছে প্রতিবেশীর সঙ্গে। প্রথম যুগে তাকে খাওয়া-দাওয়া আর বেঁচে থাকার তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে বহু জঙ্গল সঙ্গে, হাজার হাজার বছর ধরে। তার পর বুদ্ধি খাটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে আর চাষ-বাস করে যখন একটু নিরাপদ হ'ল আর সভ্যতা গড়তে লাগল, তখন থেকে আবার শুরু হ'ল লড়াই পরস্পরের মধ্যে। ইতিহাসের পাতা উন্টালে দেখি ছবির পর্দায়

যেন চলেছে যোদ্ধার সারি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—হামারুকি, পারাগন, দারিয়ুস, আলেকজান্ডার, হানিবল, সিজার, চের্সিৎস, সার্লের্ম, নেপোলিয়ন, কাইসার, হিটলার এঁদের বিরাট বাহিনীর নানা যুগের নানা অস্ত্রশোভিত অভিযানের এক বিপুল সমারোহ সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে। কোন যুগে কোন দেশে যুদ্ধ ছাড়া যেন গতি নাই। এই যুদ্ধের মূল-স্বত্রে মধ্যে, এরই কারণের মধ্যে নিহত আছে মানুষের চাওয়া।

এই যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে চাওয়াই মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নয়। সে চায় বড় হয়ে উঠতে। ব্যক্তিগত ভাবে বড় হয়ে উঠবার জন্ত যুদ্ধ ছিল প্রধান উপায় আদি যুগে ও মধ্য যুগে। তখন রাজাদের মধ্যে, সামন্তদের মধ্যে এই নিয়ে হয়েছে যুদ্ধ এবং তাঁদের অধীন প্রজাদের হতে হয়েছে বাধ্য হয়ে তাঁদের সহযাত্রী যোদ্ধা। তার

পর বর্ধমান যুগে যখন এক একটা দেশ এক এক রাজার অধীন কিম্বা শক্তিশালী এক শাসন-ব্যবস্থায় একটা পরিধি নিয়ে এক জাতি রূপে দানা বেঁধে উঠেছে তখন থেকে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছে আর জাতিতে জাতিতে বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ হয়েছে। যেমন ইংরেজ আর ফরাসীদের বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় লড়াই হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এবং তাতে জয়লাভ করে ইংরেজ জগতের বাজারে জেঁকে বসতে পেরেছে। তার পর এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় জার্মানী। অটোভন বিসমার্ক অতুলনীয় প্রতিভা ও কূটনীতি-বলে জার্মানীর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলোকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে মিলিত করেন; জার্মান সামন্তদের এক রাষ্ট্রের পতাকাভালে এনে গড়ে তোলেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জার্মান জাতিকে। তার পর থেকে এক উদগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে বড় হওয়ার জ্ঞপ্তি ও উপনিবেশ স্থাপনের জ্ঞপ্তি সুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় যে, একক এক দেশ আর এক দেশকে এঁটে উঠতে পারছে না। দুই তিনটি শক্তিশালী দেশ নিয়ে এক একটা মিলিত প্রতিরোধ তৈরি হতে লাগল এই প্রতিযোগিতায়। বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধই এইরূপ মিলিত জাতিসমষ্টির মধ্যে ঘটে। গত পূর্ব বারে এক দিকে ছিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুর্কী—আর এক দিকে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি (প্রথম দিকে) ও আমেরিকা। আর এবারে জার্মানী, ইতালী, জাপান একদিকে—আর একদিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন। ইংরেজদের পক্ষ জিতেছে; ফলে জগতের প্রভুত্ব এখন ইংরেজ, আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে এসে পড়েছে। এবার এই তিন বন্ধু মিলে মিশে সকল মানুষের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক অখণ্ড শান্তিময় মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলবার কাজে লাগবে, না প্রভুত্বের নেশায় যার যার পাতে বোল টানবার সেই পুরাতন অবস্থার জের টেনে আবার যুদ্ধকে জাগিয়ে তুলবে ?

আদর্শের দিক থেকে দেখলে এই তিন বন্ধু এখন আসলে দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা এবং ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী কতকটা এক রকম—সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্য গড়ার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আলাদা—সকল মানুষের সমানাধিকার এবং শ্রায়সঙ্গত ধন-বটনের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণতন্ত্রের ধারা। এই দুই বিভিন্ন আদর্শবাদের দল গত মহাযুদ্ধে মিলেছিল প্রবল পরাক্রান্ত জার্মানীর হাত থেকে রেহাই পাবার তাগিদে। সেই প্রয়োজন ফুরাতেই এখন পরস্পরের আদর্শগত বিরোধ—উক্ত মিতাগিতে ফাটল ধরাতে সুরু করেছে। স্পষ্ট যেন দেখা যাচ্ছে দুই দলে আবার একটা ভাল রকম ঠোকাঠুকি

হয়ে এক দলই শেষে জয়ী হবে, যার পতাকাভালে বা যাকে আশ্রয় করে জগতে তার পর আসবে অখণ্ড মানবগোষ্ঠীর মিলন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, গোড়া থেকেই মানুষের মিলনের পরিধি ক্রমে বেড়েই চলেছে। আদিম যুগে দলপতির অধীন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মানব হচ্ছিল সম্ভবতঃ। তার পর মধ্য যুগে দলপতিদের কেউ কেউ পরাক্রান্ত হয়ে কয়েক গোষ্ঠী বা দলকে নিজের অধীন করে সামন্তরাজ্যে মানুষের দলকে আরো বড় পরিধিতে মেলাতে থাকে। এক একটা দেশে কয়েকজন সামন্তরাজ জায়গায় জায়গায় দুর্গ-প্রাকার তৈরি করে স্ব-স্ব রাজ্যে স্বাধীন ভাবে থাকতেন এবং সেই অঞ্চলের লোকদের নিজের অধীনে পরিচালিত করতেন। হাজার বছর ধরে জগতের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ ইউরোপে এই ধারা চলে। একে ইতিহাসে মধ্য-যুগ বলে। পরের যুগে (পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে) এই সব সামন্তরাজ্যদের মিলতে দেখা যায় এক এক জন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে, আর তখন থেকে এক একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠতে দেখা যায়—যেমন ইংলণ্ড রাজা ক্যাম্ব্রিজের অধীনে, ফ্রান্স লুগ ক্যাপেটের অধীনে, জার্মানী ফ্রেডারিকের অধীনে। এই সব পরাক্রান্ত রাজাদের অধীনে এক একটা দেশ নিয়ে দানা বেঁধে উঠতে থাকে জাতীয়তার যুগ। মানুষের মিলনের ক্ষেত্র সামন্ততন্ত্র থেকে জাতীয়তার বৃহত্তর পরিধিতে বর্ধিত হতে থাকে। সময় সময় অবশ্য দেখা গিয়েছে, আলেকজান্ডার, সিজার, চেন্সিস ঝাঁ, নেপোলিয়নের মত প্রবল পরাক্রান্ত এক এক জনের দিগ্বিজয়-অভিযানের মধ্যে মানবসমাজকে কয়েক দেশ জুড়ে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রে মেলাবার চেষ্টা। আজ আমরা যুদ্ধকে যতই নিন্দা করি না কেন, এই যুদ্ধ এবং বড় হওয়ার প্রয়াসের মধ্যে, এই সব বিখ্যাত বিজয়ীদের বিপুল অভিযানের মধ্যে, প্রাচীন ভারতে রাজত্ব যজ্ঞ করে রাজচক্রবর্তী হওয়ার মধ্যে, দেখা যায় মানব-গোষ্ঠীকে বৃহত্তর পরিধিতে মেলাবার প্রয়াস। কিন্তু মিলনের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ না হওয়ার স্বেচ্ছা প্রয়াস সফল হয়ে ওঠে নি। মনের দিক থেকেও মানুষ তৈরি হয়ে ওঠে নি আর চলাচলের বাইরের বাধাও দূর হয় নি আজ যেমন এরোপ্লেন, বেতার পৃথিবীতে ব্যবধানের বাধা দূর করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখা গিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রাচীর মানব-গোষ্ঠীর মহামিলনের এক ছত্তর প্রতিবন্ধকবরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দুই মহাসমর সেই প্রাচীর যেন ভেঙে দিয়েছে। জার্মানী ও জাপানের শোচনীয় ব্যর্থতায় সেই মোহ কেটে যাচ্ছে। ক্রমবিকাশের ধারায় 'গোষ্ঠীর', 'সামন্ততন্ত্রের', 'রাজ্য'দের খেলা শেষ হয়েছে, আর শেষ হয়েছে এক জাতির সামরিক শক্তিতে বঞ্জীমান হয়ে অপূর্ণ জাতির ওপর প্রভুত্ব করার প্রয়াস। জার্মানী সামরিক শক্তিতে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, জগতে কোন এক

জাতি একক তাহার সমকক্ষ হতে পারে নি, কিন্তু তারও আন্তরিক শক্তিতে জগতে প্রভুত্ব করার নেশা বিনষ্ট হয়েছে। এখন আরো বৃহত্তর রাষ্ট্র-গঠনের যুগ এসেছে—আমেরিকার প্রভাবাধীন জগৎ আর রুশিয়ার প্রভাবাধীন জগৎ ইতিমধ্যেই যেন গড়া হয়েছে।

এখন দেখা যাক, শুধু বড় হয়ে ওঠার প্রয়াস ছাড়া আর মানুষের মিলনের অঙ্গ পাওয়া গিয়েছে কিনা। ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবগোষ্ঠীকে ক্রমে বৃহত্তর মিলনের পথে নিয়ে চলেছেন আর একদিকে তার শৃঙ্খল-মোচনও ক্রমশঃ করে চলেছেন। আগের যুগের রাজাদের ও সামন্তদের অত্যাচার ও প্রভুত্ব অচল হয়ে এসেছে। ফরাসী বিপ্লবের বহিরেধায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে জনসাধারণের শৃঙ্খলমোচনের যে মন্ত্র ফুটে ওঠে তা পরবর্তী-কালে ক্রমে রূপ নিতে থাকে আর মানুষের শৃঙ্খলমোচন হতে থাকে। অনেক দেশে সাধারণতন্ত্র ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর যে সব দেশে রাজা আছেন তাঁকেও সাক্ষী-গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে, আসল ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে এসেছে। বর্তমান যুগে রাজাদের জায়গায় কলকারখানা ও বড় ব্যবসায়ের মালিকেরা অর্থনীতির ভিত্তিতে অনেক মানুষকে শ্রমিকে পরিণত করেছে। এর পরের ধাপে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবের প্রাচীর ভেঙে যদি শুধু একক রাশিয়ার প্রভাবই সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা কণাই নেই। মানুষের চেতনায় ভ্রাম্যবোধের ধারা ক্রমেই জাগ্রত হয়ে উঠছে। এমন এক দিন ছিল, জগতের বড় বড় সভ্য জাতির আফ্রিকা ও অল্প দেশ থেকে মানুষ ধরে নিয়ে দাস-ব্যবসা করত, কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের ভ্রাম্যবোধ জাগ্রত হয়ে তা জগৎ থেকে একবারে দূর করে দিয়েছে। এক জাতির আর এক জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার দিনও ফুরিয়ে এসেছে। মানুষের দীপ্ত ভ্রাম্যবোধের কাছে সকল দেশেই পরাধীনতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ আর কিছুতেই পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করবে না। অগণিক বোমার অধিকারী হয়েও আর কেউ কাউকে পরাধীন রাখতে পারবে না। ক্রমবিবর্তনের ধারায় শৃঙ্খলযুক্ত এক মহামানব-গোষ্ঠীর মিলন যেন জগতে রূপ নেবার অঙ্গ প্রতীক্ষা রয়েছে।

মানুষের প্রগতির ধারায় সামন্ততন্ত্র বহুদিন অচল হয়েছে, রাজতন্ত্রের দশাও তাই। যে জাতীয়তা-বোধ এত দিন তাকে প্রেরণা দিয়ে বড় বড় যুদ্ধের ধোঁয়ায় ঘুগিয়েছে তাও আজ অচল হতে চলেছে। আজ তার সম্মুখে ভাসছে মহামানবের মিলনের মহামন্ত্র। পুরাতন খাতে নিজেকেই শুধু বড় করবার, নিজের জাতিকেই শুধু বড় করবার আয়োজন করলে তা ব্যর্থতাই আনবে। সকল মানুষের মিলনের ও কল্যাণের, সকল মানুষ মিলে বড় হবার প্রয়াসের মধ্যেই আছে ভাবীকালের আশ্রয়। আর বহু যুগের সাধনায় মানুষের শৃঙ্খল, মানুষের

ওপর মানুষের প্রভুত্ব, জাতির ওপর জাতির প্রভুত্ব আজ যুক্ত হতে চলেছে। মানুষ যদি আবার সেই পুরানো মোহ আঁকড়ে থাকতে চায়, অগণিক বোমার বিস্ফোরণ তার সেই মোহ ঘুচাবে। আজ তাই সর্বপ্রযত্নে সকল জাতির স্বাধীনতার সম্মিলিত চেষ্টাই প্রকৃষ্ট পথ। সকল স্বাধীন জাতি মিলে গড়ে তুলবে মহামানব-সমাজ এটাই হচ্ছে মহাকাালের ইঙ্গিত।

কিন্তু এখনও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরতি ধ্বংসলীলার পরও মানুষের প্রকৃত চৈতন্য হয়েছে বলে মনে হয় না। মানুষের প্রগতি যখন সকল ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে ঐক্য ও বন্ধনযুক্তির দিকে চলেছে, যখন তার সুনীড়িষ্ট ইঙ্গিতে জাতীয়তার প্রাকার ভেঙে পড়তে চলেছে তখন পাকিস্থানের গভী টেনে মিলনের পথে বিভেদ ঘটতে কিংবা সভীনের খোঁচার কোন জাতির বন্ধন-যুক্তির চেষ্টাকে ব্যাহত করবার প্রয়াস দেখা গেলে এই সন্দেহই মনে জাগে, মানুষের চৈতন্য কি কখনও হবে না? অথচ পশ্চিমের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের বিমল আলোকে চলবার পথে মানুষের চেষ্টা কম হয় নি। বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও নির্দ্বন্দ্বযুক্তি, খ্রীষ্টের প্রেম ও স্বর্গরাজ্য, মহম্মদের একেশ্বরবাদের পতাকাভালে মহান্ন এক সাম্যমন্ত্র এক দিন মানুষের মনে দীপ্ত প্রেরণা এনেছিল। এঁদের প্রত্যেকের আবির্ভাবের পর চার-পাঁচ শত বৎসর ধরে জগতে বিপুল আলোড়ন হয়েছে, মানুষ পেয়েছে উর্দ্ধলোকের প্রেরণা, জলন্ত বিশ্বাসীর দল দিকে দিকে সেই মহাবাণী প্রচার করেছে, অগণিত শহীদ জীবন দিয়েছে মহান্ন আদর্শের জয়। ত্যাগে জানে কর্মে মানুষ মহীয়ান্ন হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে কালক্রমে মানুষের মন থেকে যুছে গিয়েছে সেই সব মহান্ন আদর্শের ধারা—মানুষ আবার হয়ে পড়েছে পশুর মত। সেই সব মহাপুরুষ-প্রবর্তিত ধর্ম এখন কতকগুলি বাহ্য আচার-নিয়মের গভীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তাঁদের ধর্ম-মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবের মহামিলনের পথে চূর্ণজ্য বাধা। এই দিক থেকে ভারত তার যুগযুগান্তের সাধনা ও সংস্কৃতি থেকে বর্তমান যুগে শ্রীমদ্ভক্তদেবের ভিতর দিয়ে সর্বধর্ম-সমন্বেশের যে মহাবাণী জগতকে দিয়েছে তা অনেকখানি পথ দেখাতে পারবে। তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান সভ্যতার দরবারে বেদান্তের মহান্ন সার্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে মিলনের বাণী দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে ঋষিদের বাণী ভারতের উপনিষদ নবরূপ নিয়েছে, বর্তমান যুগের মানুষের অন্তরলোকে সাদ্রা জাগিয়েছে সেই স্বর্গীয় স্বাক্ষর। আর শ্রীঅরবিন্দের ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও আদর্শ এক অপূর্ব সার্বকর্তব্য মিলিত হতে চলেছে। এই ভারতের তপঃক্ষেত্রে আজ বিরোধ ও বন্ধনের গুঞ্জীভূত মেঘের আড়ালে সেই মহান্ন আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে যা মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সার্বকর্তব্য দিকে।

সার্জেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

(দ্বিতীয় পর্ব)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

সাধক কবি রামপ্রসাদের রচিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক একটি গান আছে :

মন তুমি কৃষিকাজ জান না ;

এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত

সোনা ।...

মানুষ ভক্তি প্রেম নিষ্ঠার দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারে সাধক তাহাই বুঝাইতে-ছেন। চীনদেশে অমূল্য একটি স্তম্ভের প্রবাদ আছে। আধ্যাত্মিক জগতে নয়, বস্তুতাত্ত্বিক সামাজিক জীবনক্ষেত্রে সমষ্টিগত সাফল্য ও উন্নতির চেষ্টায় এই হিতবাণীর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

“If you are planning for a year, plant grain ;
If you are planning for ten years, plant trees ;
If you are planning for a hundred years,
plant men.”

বাংলা,—

এক বৎসরের জন্য ফললাভের পরিকল্পনা করিলে শস্য বপন কর ;
দশ বৎসরের জন্য ফললাভ আশা করিলে বৃক্ষ রোপণ কর ;
শতবর্ষব্যাপী ফললাভ কামনা করিলে মানুষের আবাদ কর।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উপসংহারে এই প্রবাদটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রিপোর্টের রচয়িতারা বলিয়াছেন, ভারতের সমুদ্রযে উজ্জল ভবিষ্যৎ আসিতেছে তাহাকে সর্বপ্রকারে সার্থক, মহান করিয়া তুলিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই দেশে মানুষের আবাদ করিতে হইবে। কথটি খুবই সত্য এবং মনোহারী। মানুষই দেশের সম্পদ ; মানুষই দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা রচনা করে, মানুষের সাধনা ও অন্তরের দীপ্তিতেই দেশ আলোকিত হয় ; মানুষের ত্যাগ, প্রীতি ও মহাহুভবতার নিকট বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় হয় নতশির।

সকল সভ্য দেশেই সুপরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জাতিগঠনমূলক কার্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান গণ্য করা হয়। কৈশরী, ইহার মধ্য দিয়াই হয় এমন মানুষের আবাদ যাহারী আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা দেশের সংস্কৃতি ও অগ্রগতিকে আরও আগাইয়া লইয়া চলে। যুদ্ধোত্তর কালে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মানুষের চাষের স্ববন্দোবস্ত হইতেছে, দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। জাতির কল্যাণ যে জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এ কথা ইহার মধ্যে বহু ভাবে ব্যক্ত। ১৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টের মধ্যে

‘জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা’ কথটির উল্লেখ আছে ৫৫ বার। বলা হইয়াছে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন, অস্বাভাবিক এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অপারগ ; ইহার স্থলে জীবন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা দেশবাসীকে জানে, স্বাস্থ্যে, ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতি বর্ধনে সকল দিক দিয়াই সমর্থ করিয়া তোলে। এ সবই আশার কথা, কিন্তু একটা বিষয়ে কেমন খটকা লাগিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিতে থাকিলে সে শিক্ষাকেও কি ‘জাতীয় শিক্ষা’ আখ্যা দিতে হইবে ?

পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা অন্তে কর্মজীবনের বিভিন্ন শাখায় আয়নিয়োগ করিবে। অল্প সংখ্যক মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিবে। মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজীকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা এখনকার মতই সম্বিধানীয় বিরাজ করিতে থাকিবে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশীয় মাতৃভাষার প্রতি কি ইহা দ্বারা অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় নাই ? বিলাতের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে লাতিন, ফরাসী, অথবা জার্মান ভাষায় পঠনপাঠন চালাইলে তাহাকে কি ‘জাতীয়’ শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হইত ?

ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ভাষাগুলির অত্যন্তম একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাষায় রচিত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যথেষ্ট মূল্যবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার উপযোগিতা প্রচুর, কিন্তু তবু ইহা আমাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এত দিন ইংরেজী যে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে তাহার কারণ ইহা আমাদের শাসক-জাতির ভাষা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশবাসীর মান-মর্যাদা, উচ্চ সরকারী চাকুরী সবই এই ভাষায় দক্ষতা দেখাইয়া লাভ করিতে হইয়াছে। এই সব কারণে ইংরেজী ভাষা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে পৃথক এক নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া শিক্ষাকে হজম করিয়া নিজস্ব করিয়া লওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যর্থতার জন্য বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার বাধাও যে অনেকখানি দায়ী সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নূতন যুগের স্বচনায় নূতন ভাবে রচিত-জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও যদি এই বাধাকে অচল করিয়া

রাখিবার ব্যবস্থাই করা হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করি নাই।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে দেশীয় ভাষা কিংবা ইংরেজী কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হইবে এই বিতর্ক উঠিয়াছিল। লর্ড উইলিয়াম বেট্টস মেকলের পরামর্শানুসারে ১৮৩৫ সালে দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা ফলে নাই। ভারতীয়েরা আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়, নীতিজ্ঞানে ইংরেজ না বনিয়া গিয়া ভারতীয়ই রহিয়া গিয়াছে। ইহার এক শতাব্দীর অধিক কাল পরে সার্জেন্ট পরিকল্পনাতেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য অটুট রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় ভাষাসমূহের কত উন্নতি হইয়াছে; বাংলা ভাষা বঙ্গিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জয়মাল্য অর্জন করিয়া জগতের সমৃদ্ধ ভাষাগুলির সমমর্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষা শুধু কাব্যের নয়, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েরই যে যোগ্য বাহন হইতে পারে তাহা সার যত্নাধ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অধুনা নানা ভাষার নানা বিষয়ক গ্রন্থের সরস সাবলীল অনুবাদ কি বাংলা ভাষার প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে না? বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জ্ঞান-মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া বিদেশী ভাষা অবলম্বনে যদি 'জাতীয়' শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তাহা শেষ পর্যন্ত দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। মাতৃভাষার দাবি আমরা ছাড়িতে পারি না।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ ভাষার মাধ্যমেই সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সম্প্রতি লক্ষ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ও অনুরূপ বলিষ্ঠ মনোভাব দেখাইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের শিক্ষাই হিন্দী-ভাষার মাধ্যমে দিবার আয়োজন করিতেছেন। এ বিষয়ে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে বাংলাদেশই পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে।

গত সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমরা সার্জেন্ট পরিকল্পনার আর্থিক দিকের কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরিকল্পনা-বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অনেকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত না করিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্নেন্টকে নিজ নিজ প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতাদানের মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। সর্ব ভারতীয় পরি-

কল্পনাকে প্রদেশগুলি নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ অনুযায়ী গ্রহণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টকে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাখাতে অর্থসাহায্য করিতে হইবে ইহা বলা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক সম্বলতার উপরই যদি প্রধানতঃ যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা নির্ভর করে তবে আমাদের এই প্রদেশের রাজস্ব-তহবিলের অবস্থা কিরূপ, স্তরভিত্তিক শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টার সম্ভাবনাই বা কতদূর এ কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। গত আগষ্ট মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ত্রিযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ভারতের অগ্রাঙ্ক প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজস্বের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এখানকার অবস্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। গত ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত কয়েক বৎসরের যুদ্ধ, ভূভিত্তিক প্রভৃতি হেতু সকল প্রদেশে যখন কোটি কোটি টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে, বাংলার রাজস্ব ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ (১২৩৮) হইতে বাড়িতে বাড়িতে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠিলেও এই কয়েক বছরে ৪৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। পঞ্চাশের বোম্বাই জমাইয়াছে ৯ কোটি, পঞ্জাব ১০ কোটি, বিহার ৬ কোটি ৬০ লক্ষ। এইরূপ কমবেশী সকলেরই কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে, শুধু উড়িষ্যার ঘাটতি এক লক্ষ টাকা।

বহু প্রকার করের বোকা দেশবাসীর উপর চাপাইয়া ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার রাজস্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা কিন্তু খরচের বরাদ্দ হইয়াছে তাহার চেয়ে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা বেশী। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বাংলা দেশের শিক্ষা বাবদ বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব ৫৭ কোটি টাকা। বর্তমানে যেখানে তিন কোটি টাকার মত শিক্ষা বাবদ খরচ করা হয় সেখানে ৫৭ কোটি টাকা খরচ করিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইলে বাংলার রাজস্ব ১৯ গুণ বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ মানুষের অর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তত ২৫ গুণ বর্ধিত হওয়া চাই।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি আর্থিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের শিক্ষার জ্ঞান ব্যয়ের অঙ্কের সঙ্গে তুলনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বরং দেখিতে হইবে ঐ সব দেশে মোট রাজস্বের কত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়। সে অনুপাত প্রবর্তন করিতে গেলে গবর্নেন্টের অনেক বিভাগের টাকা ছাড়াই করিয়া শিক্ষার জ্ঞান বরাদ্দ বাড়াইতে হয়। বিলাতের নূতন শিক্ষা আইনে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা বিভাগে প্রতিভাবান লোক আকৃষ্ট করিতে হইলে বেতন, পদ-মর্যাদা প্রভৃতির দিক দিয়া সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের চাকরীর সমতা স্থাপন প্রয়োজন। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি; অভাব শুধু প্রকৃত মানুষের আবাদ প্রবর্তন করিতে সক্ষম কামাল আতা-তুর্কের মত যোগ্য ব্যক্তির যিনি হীন স্বার্থবুদ্ধির বহু উর্ধ্বে থাকিয়া দেশোন্নয়নবোধের প্রেরণাময় দীপ্তিতে জাতিকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারেন।

যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমুদয়ের মধ্যে কৃষির উন্নতির প্রতি আমাদের সর্বপ্রাথমিক মনোযোগ দিতে হবে; আমাদের দেশের প্রচলিত কথা হচ্ছে “ভাতকাপড়” অর্থাৎ আগে ভাতের দরকার, তারপর কাপড়ের দরকার; এর মানে এই যে, আগে কৃষি তারপর বস্ত্র-শিল্প।

অনেকের ধারণা এই যে, শিল্পের উন্নতি সাধনের দ্বারাই দেশকে ধনী করা যায়, এবং এর দ্বারা দেশ ধনী হলে অজ্ঞাত বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে দেশকে উন্নত করবার জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার অভাব ঘটে না। কথাটা খুবই সত্যি, কিন্তু কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষের বেলায় এ মত সম্পূর্ণ ভাবে খাটে কিনা সেটা একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। ভারতবর্ষের চার ভাগ লোকের মধ্যে তিন ভাগ লোক কৃষির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে; সুতরাং এই কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হোক তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেখতে হবে যে, তার দ্বারা কৃষির উন্নতি এবং প্রসারের পথে যেন কোন বাধা না ঘটে। এই সম্পর্কেই প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, কৃষক যে পণ্য উৎপাদন করবে, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সে যেন সচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করতে পারে অর্থাৎ সে যেন তার বর্তমান জীবন-ধারণার প্রণালী ও মান উন্নত করতে পারে। কেবল তাই নয়, বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উন্নতির জন্ত তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্তও তাকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে। মোট কথা তার কৃষিজাত পণ্যের উচিত মূল্য তাকে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে তাকে নিঃসন্দেহ করতে হবে; অর্থাৎ তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, সে সব সময়ই তার পণ্যের উচিত মূল্য পাবে। কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনাতাই এ বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না।

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। কৃষি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ বিচিত্র। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার মাটি, জলবায়ু এবং অজ্ঞাত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অল্পাধিক্যে এর কৃষিপদ্ধতি বিভিন্ন এবং কৃষিজাত পণ্যের জমির পরিমাণ এবং ফলনও বিভিন্ন; সুতরাং একই প্রকারের কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা সকল অংশে প্রয়োগ করা চলবে না। বিভিন্ন স্থানের জন্ত বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে; কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রস্তুতের পূর্বে স্থানীয় কৃষি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যিক। কিন্তু হুঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সে জ্ঞানের একান্ত অভাব দেখা যায়; সুতরাং এই জ্ঞান অর্জনের জন্ত বিভিন্ন স্থানের কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অসুসন্ধান আগে দরকার। এই তথ্য অসুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে হবে যে, প্রত্যেক

স্থানে কৃষির উন্নতির পথে কি কি বাধা বিদ্যমান আছে, কোন শস্তের জমির পরিমাণ কত, কোন শস্তের কত ফলন ইত্যাদি সম্বন্ধেও বর্তমানে আমাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। বর্তমান কৃষির সঠিক তথ্যের উপরেই কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকাংশে নির্ভর করবে।

এই সকল তথ্যসংগ্রহের পর বিভিন্ন স্থানের উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকার গবেষণার দ্বারা কৃষির উন্নতির পন্থা নির্ধারণ করতে হবে; কেবল গবেষণা করলেই হবে না। ব্যাপক ভাবে পরীক্ষার দ্বারা দেখতে হবে গবেষণার ফল কৃষকদের মাঠে মাঠে কিরূপ কার্যকরী হয়; এই পরীক্ষার দ্বারা যদি জানা যায় যে, কোন গবেষণার ফল স্থানীয় সর্বপ্রকার অবস্থার উপযুক্ত তাহলে ব্যাপকভাবে উহার প্রদর্শনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; অর্থাৎ এর ফলাফল প্রত্যেক অঞ্চলের কৃষকদের চোখের সামনে দেখাতে হবে; সুতরাং এই তিন দফা কাজের জন্ত আমাদের চাই কৃষি-বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল পরীক্ষা করবার জন্ত উপযুক্ত কর্মচারী এবং প্রদর্শন-কার্যের জন্ত উপযুক্ত প্রদর্শকের দল। বর্তমানে আমাদের দেশে কোনও দফার কাজের জন্ত উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নেই বললেই চলে। কৃষির উন্নতির পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে যে সর্বপ্রাথমিক প্রত্যেক দফা কাজের জন্ত উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারীর দরকার সে বিষয়ে মতের অনৈক্য থাকতে পারে না। কর্মচারীগণের দক্ষতা সম্বন্ধে রাজকীয় কৃষি কমিশন এই মত প্রকাশ করেছিলেন, “কৃষিবিভাগের কর্মচারীগণের উপদেশ সম্বন্ধে কৃষকদের বিশ্বাসের অভাব কেবল যে কর্মচারীগণের দক্ষতা বিষয়ে ‘মারাত্মক’ তা নয়, এর দ্বারা কৃষকেরা, কৃষি-বিভাগের প্রতিও বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ে।” কাজে কাজেই কৃষির উন্নতির পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরের ভার উপযুক্ত কর্মচারীর উপর হস্ত করতে হবে; তা না করলে সবই পণ্ড্রমে পরিণত হবে। বর্তমানে গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হয়েছেন এবং উপযুক্ত শিক্ষার জন্ত কৃষি-বিভাগের কর্মচারী ও যুবক-গণকে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, সকল বিষয়ে বিদেশের শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে উপযুক্ত বা কার্যকরী হবে কিনা, এ বিষয়ে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ সন্ডোষজনক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অল্প দেশের সব প্রণালী গ্রহণ নকল করলে এদেশের চলবে না। আমাদের অবস্থার ও যোগ্যতার অরূপ করে তার অদলবদল করতে হবে। আমাদের দেশে সহজে যা পাওয়া যায় বা সহজে যা উৎপন্ন করা যায়, তা দ্বারাই কৃষির উন্নতি করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে পারি যে, ভারতবর্ষেই কৃত্রিম সার প্রস্তুত

করে কৃষকদের আয়ত্তের মধ্যে তা উপস্থিত করতে হবে— অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, যে সকল যুবককে বৈদেশিক শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা হবে কৃষকদের সঙ্গে অবশ্যই মেলামেশা করবার, তাদের মধ্যে বসবাস করবার, তাদের মনের ভাব বোঝবার ক্ষমতা ঐ সকল যুবকের আছে কিনা। এ না থাকলে কৃষকদের বিশ্বাস অর্জন করা কঠিন হবে। এ বিষয়ে আমাদের ইংরেজ মিশনারীদের দৃষ্টান্ত অমূল্য করতে হবে। সুদূর পল্লীগ্রামে কৃষকদের মধ্যে তাঁরা যেভাবে অবস্থান করেন, যে ভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, যে ভাবে তাদের সর্ববিষয়ে উন্নত করবার চেষ্টা করেন, তা দেখলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা মাথা নত হয়ে যায়। এই রকম মনোভাব নিয়েই কৃষকদের মধ্যে কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। উন্নত শ্রেণীর বীজের প্রচলন, জল সেচন এবং সার প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারাই ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ভারতে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক বৎসর এই ৫০ লক্ষ শিশুর জন্ম এবং ভারতের অধিবাসীদের পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ বাড়ার জন্য ৭০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন; ছই কোটি একর জমিতে জল সেচনের সুব্যবস্থা দ্বারা এই অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, ভারতের অধিবাসীদের জন্য ৬ কোটি টন ধানজাতীয় খাদ্যশস্যের এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ডালজাতীয় খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়; এবং উন্নত শ্রেণীর বীজের প্রচলন, উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচন এবং সার প্রয়োগের দ্বারা উভয় জাতীয় খাদ্যশস্য ভারতবর্ষে উৎপাদন করা যায়। ডাল-ভাতের জন্য ভারতকে অল্প দেশের ওপর মোটেই নির্ভর করতে হয় না।

ভারতবর্ষে প্যাংসেঁতে বা জলা জমির পরিমাণও কম নয়। এই সকল জমিকে শুষ্ক করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযুক্ত করতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে জলস্রোত বা বৃষ্টির দ্বারা জমির যে প্রচুর ক্ষয় হচ্ছে এবং জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নিবারণ করতে হবে। সুতরাং কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নিয়ন্তাই যুক্ত করতে হবে এবং সেই যুক্তি আমরা যে সব সময়েই জয়ী হব তা বলা যায় না; তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে অত্যন্ত দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আমরা যদি আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে কৃষির উন্নতিকল্পে কাজে লাগাতে পারি, অবশ্য আমাদের অবস্থা অসুখ্যায়ী—তা হলে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

কৃষির উন্নতির জন্য “সমবায়” একান্ত দরকার, এ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতবৈধ নেই। যৌথ প্রণয় কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ দরকার; ইতিপূর্বে কৃষির উন্নতির জন্য সমবায়

প্রণালীর প্রয়োগ উপযুক্ত ভাবে করা হয় নি বললে বিশেষ ভুল হবে না, কিন্তু সমবায় প্রণালীর দ্বারা কৃষির যে প্রভূত উন্নতি করা যায় তার দৃষ্টান্ত এ দেশেও আছে; সুতরাং এ দিকেও আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকেরা যাতে যৌথভাবে কৃষিজাত পণ্য ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, যৌথ ভাবে কৃষিযন্ত্র, সার, বীজ প্রভৃতি ক্রয় করতে পারে, যৌথভাবে জলসেচনের বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে—আর mixed farming অর্থাৎ নানারকম কসল উৎপাদন ও তৎসংশ্লিষ্ট কুটিরশিল্পের প্রতি তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে হবে।

বর্তমানে পোকামাকড়, রোগ ইত্যাদির দ্বারা খাদ্যশস্যের যে বিরাট ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধেও কৃষকদের সচেতন করে তুলতে হবে এবং এই ক্ষতি নিবারণের জন্য তাদের সহজসাধ্য প্রণালী শেখাতে হবে।

আর একটা কথা এই যে, প্রত্যেক কৃষক-পরিবার যাতে সুসম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়েও তাদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব প্রত্যেক গৃহস্থ তার পরিবারের প্রয়োজন মত যাতে সুসম খাদ্য উৎপাদন করতে পারে সে সম্বন্ধেও তাকে উপদেশ ও সুযোগ দিতে হবে।

পরিশেষে বলা দরকার যে, কৃষির সম্পূর্ণ উন্নতির জন্য বর্তমান প্রজন্মের বা জমির স্বত্বের আমূল সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে হবে। এটা খুবই জটিল প্রশ্ন; কিন্তু আমরা সকলেই আশা করছি যে, এ প্রশ্ন যতই জটিল হোক না কেন এর সমাধান একেবারে অর্পণ্য নয়।

দেশের উন্নতির যে-কোন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার কথা স্বতঃই এসে পড়ে। কাজেই দেশের উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত আবশ্যক। এদিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এন্সকোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিন্দ্যাবিজুন্স পণ্ডিত শ্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব দাম্বজিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুগ্মরত্নকালীন মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিচিতি গণনা করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার যথাক্রমে ২২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩২-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাম্বুজামান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেবীবালায় মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের নরপতিত্ব এবং দেশীয় নেতৃত্ব লাভাও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বৈরাগ্যভাবে চমৎকৃত ও বিম্বিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ বোম্বার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ বর্ষ মধ্য ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অস্বাভাবিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার,

কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৈর্ঘ্য প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—যুদ্ধ ও বিম্বিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয় ষষ্ঠমাত্রা মহারাজা জিপুরা স্টেট বলেন—“তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যি তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মনমথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলায়। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিম্বিত।” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচাঁদ মহাকবি শ্রীহরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্ৰী ও সেনেশ্বরী মেধার মাননীয় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্সি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি. মাধবু নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যি তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীয় মিঃ কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রবন্ধে উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলায়।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদান কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজত্বলাভ প্রার্থ, মান, যশ; প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (ভদ্রোক্ত) মূল্য ৭১০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সফর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষত্বলা বৃহৎ কবচ ২৯১০, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য। **বর্ষলক্ষ্মী কবচ**—শুদ্ধিগণকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় হফজলাভ, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিহ মনবকে সমস্ত ঋণিমা কর্মে ব্রিটিশাভে ব্রহ্মা। মূল্য ২০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০। (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন।) **বশীকরণ কবচ** ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বার্থ সাধনযোগ্য হয়। (শিববালা) মূল্য ১১০, শক্তিশালী ও সফর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
লাফাভের সম্মুখ—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১।০টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সাধনের অন্তরায়—প্রচলিত

বিবাহ-বিধান

শ্রীরজনকুমার দত্ত

বগুড়ার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের সহিত গঠনমূলক কার্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রচলিত বিবাহ-বিধানের কথাও ওঠে এবং তিনি যে এ বিষয়ে বহু পূর্ব থেকেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করে আসছেন তার আভাসও পাই। গত জাহ্নবীর মাসে গান্ধীজীর সোদপুর্বে অবস্থান কালে এক দিন যতীনবাবু কথাপ্রসঙ্গে এই অভিমতই প্রকাশ করেন যে, অগাধ ধর্মের লোকেদের মধ্যে সামাজিক সংহতি যেমন সুদূর হিন্দু সংহতিও তেমনি সুদূর হওয়া দরকার। অগাধ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নুগ্ন হয়ে যাবে, এই বিনষ্ট কেউ রোধ করতে পারবে না। তাঁর এই উক্তি বিষয়টি ভেবে দেখতে আমাকে উৎসাহিত করে।

বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে দেশাচার ও সামাজিক সংস্কারসমূহকে সংশোধিত করে ব্যাপকত্ব দান করতে হবে। তা নইলে এ সমাজের অবনতি ও বিলোপ অবশ্যস্তাবী।

রাজা রায়মোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীরা প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন সমাজের পত্তন করেন বটে, কিন্তু সে-সমাজের স্বতন্ত্র নামকরণ করায় হিন্দু সমাজের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। উক্ত সমাজ নতুন নামে পরিচিত না হয়ে হিন্দু নামেই আখ্যায়িত হলে জনসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একেই আলিঙ্গন করত; কেননা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নানানভাবে নির্যাতিত, শোষিত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছিল। তাদের কাছে মুক্তির বাতী নিয়ে যে সমাজই অগ্রসর হবে তাকেই তারা সোৎসাহে আশ্রয় করবে।

শাস্ত্র-আলোড়ন করে অনেক পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রবিৎ স্ব স্ব অভিমতের সমর্থনে শাস্ত্র-বচন উল্লেখ করে বিরুদ্ধ অভিমত এবং মুক্তিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মুক্তি সমর্থনে একই শাস্ত্র থেকে বৈষম্যমূলক শাস্ত্রোক্তির উল্লেখ দেবে এই কথাই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের যুগে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণোদ্দেশ্যে অপর বর্ণ বা শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করে সুত্র রচনাপূর্বক পৌরাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত করেছিলেন। ফলে মূল শাস্ত্রোক্ত বিধানের সহিত অসমঞ্জস মুক্তির সমাবেশও লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এই ‘জগাধিচূড়ী’ শাস্ত্রাদি মন্থন করতে না গিয়ে নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবে একের বিচারে বিচার-বিভ্রম ঘটতে পারে, এইজন্মে যারা বর্তমান যুগোপযোগী করে হিন্দু সমাজকে অনাচার ও কালিমামুক্ত করে তার সত্যরূপের

প্রতিষ্ঠা করার সহায়ক তাঁদেরই ওপর এই ভার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি এমন হয় যে যারা এই নারকত্বের দায় গ্রহণ করবেন তাঁরাও রক্ষণশীল সমাজপতিদের দায় দরিত্র অশিক্ষিত ও উপেক্ষিত জনসাধারণের প্রতি অবিচার অহায় করতে থাকেন তবে তাঁদের দেওয়া বিধানও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষ পরাধীন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-কৃত বৈরাচারমূলক সমাজ-বিধান এই পরাধীনতার অগ্রতম কারণ নয় কি? ব্রাহ্মণ তথা সমাজপতিরা সমাজের প্রভুত্ব ও নারকত্ব নিজেদের হাতে রাখতে গিয়ে বর্ণবিভাগকে কুলগত পর্যায়ে রূপান্তরিত করেন। ব্রাহ্মণের বা বিশেষ করে বৈষ্ণব শূদ্র শ্রেণীর লোকেরদের সংস্রব ত্যাগ করায় ও তাদের প্রতি অপরি-সীম অত্যাচার ও অবিচার অমুষ্ঠিত হওয়ায় বর্ণহিন্দু ও অহুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সুদূর ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর বিধানের বলে মানুষের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করবার আয়োজন হয়েছে। সমাজের মুচি, মেধর, ধান্ড, নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত বর্ণ-হিন্দুদের কতটুকু মেলোমেশা ও ভ্রাতৃত্বাব আছে? তারা যে আজ বিদ্রোহ করবে না এটা আশা করাই নিরুদ্ভিতার পরিচায়ক। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষা ও সভ্যতায় যতই কেননা উন্নত হোক, তারা বর্ণ-হিন্দুদের কাছে আজও বহু ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞেয় বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক ব্যবহারে সম-পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কোন পথ খোঁলা রাখা হয় নি তাদের জন্তে।

ধর্মের নামে এমনি ধারা অধর্ম ও বৈরাচারের কলে হিন্দু সংহতি বিনষ্ট হওয়াতেই অতীতে মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীর পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয় সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের অত্যাচারে ও অনাদরে উৎপীড়িত ও উত্ত্যক্ত হয়ে অনার্যগণ তথা শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা দলে দলে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান হতে থাকে; এই ভাবে কয়েক শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে ভারতের পাঁচ কোটির ওপর লোক ইসলাম ধর্মের আশ্রয় লয়। একি কম আপশোষের কথা?

আজ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত না হওয়ায় হরিজন ও অহুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। কেন তারা ধর্মান্তরিত হয়? ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তন হওয়ায়? তা ত নয়। হিন্দু সমাজের অনাদর, উপেক্ষা ও শোষণকে বরদাস্ত করতে না পেরেই তারা অপর ধর্মাবলম্বনে বাধ্য হয়।

এখনও বাঁচবার পথ আছে। যারা সেকথা ভাবছেন

এসিও
এসিও
এসিও

স্বাস্থ্য কোষ

অনুগ্রহ কোষিকালঃ কলিকাতা



NAKANDA

তার ইতিমধ্যেই ক্ষয় নিবারণের ত্রুট প্রদর্শন করেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, হিন্দুমিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আর্থসমাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা তো ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিচ্ছেন মাত্র, প্রতিদিন হিন্দুসমাজে যে নুতন নুতন ক্ষত দেখা দিচ্ছে তার প্রতিকার কে করবে? তাই যাতে নুতন ক্ষতের সূচনা না ঘটে, সেজন্মে বর্ণহিন্দুদের আর মিথ্যা কুলগত বর্ণমাহাত্ম্যের প্রচার না করে ঋণ ও কর্মগত বর্ণ-মাহাত্ম্যের প্রতি প্রত্যাশীল হয়ে সকল শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে মাহাত্ম্য মাত্রের প্রতিই প্রত্যাশীল হওয়া উচিত। নইলে হিন্দুর ধ্বংস অনিবার্য।

আজকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার ও শূদ্রাচারে যুব বেশী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অথচ শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণ কুলগত ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা নিয়ে ব্রাহ্মণত্বের শ্রেণীর লোকদের নিপীড়ন করছে মিথ্যা বিধানের বলে ও পরকালে কাল্পনিক দণ্ডভোগের ক্ষতোয়া জারী করে। এই দুর্নীতি ও অস্পৃশ্যতা ব্রাহ্মণাচার থেকে বিদূরিত না হলে হিন্দু সমাজের ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় আদিতে বিবাহ বলে কোন প্রথা ছিল না। বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হয় পরে। মনুসংহিতায় বিবাহের যতগুলি বিধান আছে তার মধ্যে যেগুলি ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হ'ল স্বয়ম্বর,

গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস প্রথা। এ ছাড়া বীৰ্যশুদ্ধে বিবাহ বিধানের দৃষ্টান্তও পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবশ্য মনু-সংহিতায় এর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই পঞ্চ বিধানে বিবাহ সংঘটনের দৃষ্টান্তও আছে।

দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতির স্বয়ম্বরের কথা সকলেই জানেন। পৌরাণিক যুগের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখতে পাই, হিন্দু-সমাজ-সংহতিতে যখন কেবলমাত্র ভাঙ্গন সূত্র হয়েছে তখনও রাজা জমিদারদের কন্যা সংযুক্তা পৃথীরাড়ের মূর্তির গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে স্বামিঘে বরণ করেছিলেন।

গান্ধর্ব বিবাহ-প্রসঙ্গে যম্যতি-দেবযানী, ছয়মন্ত-শকুন্তলা, অনার্য নারী শর্মিষ্ঠা, এই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। বীৰ্যশুদ্ধে যে বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রমাণ-স্বরূপ রামায়ণের জীরামচন্দ্রের সহিত সীতার মিলন অথবা মহাভারতের অর্জুনের দ্রৌপদী লাভ উল্লেখযোগ্য। আর্য শাস্ত্র ও অনার্য সত্যবতীর মিলন আসুর প্রথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই সব ঔদ্বাহিক সম্পর্কে আর্য অনার্য বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণব শূদ্র ইত্যাদির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা ছিল না। জমী-পুরুষ উভয়ের ইচ্ছা বা সম্মতিতে এই সব বিবাহ কার্যকরী হ'ত। বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, অবশ্য বরের সম্মতিও বিবাহ-সম্পর্কের অপরিহার্য অংশ।

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজি: অফিস—আখাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

(বি, এও এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০২।১, ক্লাইভ স্ট্রিট, ৫৭নং, ক্লাইভ স্ট্রিট (রাজকাটরা) ৭

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—	...	...	৫০,০০০,০০
বিক্রীত মূলধন—	...	...	২২,৫০০,০০
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল—	...	...	১৪,৯৫০,০০ টাকার উপর
আমানত	...	...	৩,৫০,০০০,০০ টাকার উপর
কার্যকরী তহবিল—	...	...	৪,০০,০০০,০০ টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুচি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ফেঁচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, বদরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মোলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইক্ষুল, শিবসাগর, গোলাঘাট, তিনসুকিয়া, নর্থলক্ষ্মীপুর, টাংলা, গোহাটা, ডিব্রুগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এখন সামাজিক প্রথা এমন যে, বিবাহে কন্যার স্বাধীনতা তো দূরের কথা, সম্মতিরও অপেক্ষা রাখা হয় না। ফলে কন্যা পণ্য-বস্তুর সামিল হয়ে পড়েছে। বিবাহের পর স্বামী কনের মনোমত হোক বা না-হোক স্বামীর ইচ্ছার কাছে তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে হয়। নারীরও যে বিবেক-বুদ্ধি আছে, একথা সমাজপতিরা ভুলে যান। তাঁরা তাঁদের জড়সড় জ্ঞান করেন এবং বোঝা বলেই মনে করেন। অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর্য সভ্যতারই একটা উজ্জ্বল দিক।

আজ যেমন হিন্দুধর্মের মেয়েছেলেরা কলিকাতার রাজপথে প্রকাণ্ড দিবালোকে অসঙ্কেচে পায়ে হেঁটে বা ট্রামে বাসে স্কুল কলেজে যাতায়াত করছে, সমাজ যখন ব্রাহ্মণ্য-বৈরাচারের কঠোর শাসনের কবলিত ছিল—তখন কি এমন দৃশ্য কেউ দেখেছে? যা স্বাভাবিক ও সত্য তাকে কখনও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বেশী দূর যাওয়া চলে না। তাই আজ মিথ্যা সনাতনী ধর্মের ভড়ং দেখিয়ে যে ব্রাহ্মণ্য বৈরাচার হিন্দু সভ্যতার ওপর ধ্বংসকারি করেছে—তাকে আর এখন মেনে চলা সম্ভব নয়। সমাজের এই ধ্বংসকারিকে অগ্রাহ্য করে ভারতের নারীসমাজ আজ শূন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলন আজ এতটা অগ্রসর। কার আস্থানে অবগুণ্ঠন ফলে ভারতের নারী দলে দলে পুলিশের গুলির স্রুখে স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন? কার

আস্থান সে নারী জাগরণের উৎস? তিনি আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। সেই মানুষটি মহাত্মা গান্ধী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ কিন্তু গান্ধীজীকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলবেন—এ পাশ্চাত্য শিক্ষারই ফল। বস্তুতঃ তা নয়। যা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী তাকে দীর্ঘদিন গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের বৈরাচারমূলক সমাজ-শাসন-ব্যবস্থা আপনা হতেই ভেঙে পড়ছে।

যে কালে বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা অক্ষুর ছিল অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল (উক্ত পাঁচ প্রকার বিবাহে কন্যারও সম্মতির আবশ্যকতা ছিল) তখন অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। আর কুলগত বর্ণের তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। যখন কুলগত বর্ণের মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও স্বয়ম্বর, গান্ধর্ব, আশুর, রাক্ষস ও বীর্যশুদ্ধ প্রণয় কুলগত বর্ণবৈষম্য তেমন গণ্য করা হ'ত না। কেননা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে যেমন শূদ্রাচারী হতে দেখা যায়, তেমনি শূদ্র-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ্যচারী ও সদগুণবিশিষ্ট হতে দেখা যায়। কাজেই কুলগত বর্ণের মর্যাদা থাকার কোন সম্ভব কারণ নেই। কাজেই ওটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে গুণ ও কর্ম-ভেদে বর্ণবৈষম্য মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকুলের সন্তানসন্ততির ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি কুলোদ্ভব সন্তানসন্ততির সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের আদান-প্রদান চলতে কোন বাধা হতে পারে বলে মনে করি না। গুণ ও কর্ম-

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কা স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নপ্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীমুভাষ চন্দ্র বসু

সারেই মেলামেশা, শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারে সমতা আছে এমন শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ-প্রচলন অনুমোদিত হওয়া সঙ্গত। বর বা কেনে যে শ্রেণীরই হোক না কেন তাতে অনুৎকর্ষের আশঙ্কা নেই; বরং এর ফলে জাতি অধিকতর উদার ও শক্তিশালী হবে। শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার যে মাত্রায় ব্যাপক হওয়া লাভ করেছে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডও সেই মাত্রায় উদারতার পথে এগিয়ে চলেছে। বস্তুতঃ অসবর্ণ বিবাহ আজ কোন কোন স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠছে, কিন্তু সমাজানুমোদিত এখনও হয় নি। গৌড়ী হিন্দু সমাজের চক্ষু এখনও খোলে নি। তাই তাঁরা এখনও ইতস্ততঃ করছেন, গৌড়ামির নিষ্পেষণে সমাজের নরনারী যে হাঁপিয়ে উঠেছে সেদিকে কারও হাঁস নেই। এদিকে দিন দিন হিন্দু সমাজ যে ক্ষয়িষ্ঠতার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে? কত হিন্দু ইতিমধ্যে বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে সে হিসাব কে রাখে?

স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তসংশ্লিষ্টতার ফলে একটামাত্র জাতির অস্তিত্বই স্বীকৃত হবে—যে সমাজের বনিয়াদ ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতিকে স্বীকার করে চলবে, তাকেই সকল লোকে সাধারণ গ্রহণ করবে। হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা যদি মনে করেন যে, তাঁদের বিধান ও দেশাচারই সকল

লোকের গ্রহণযোগ্য, তবে বলব তাঁদের ধারণা ভ্রান্তিমূলক। হিন্দু আচারকে সকলের সমর্থনযোগ্য করতে হলে সর্বত্রই হিন্দু সমাজাচার ও সমাজবিধি থেকে আবর্জনা সাফ করে ফেলা দরকার। সঙ্কীর্ণতা ও স্বৈরাচার পরিহার করে সর্বগ্রাহ্য সমাজাচার, ও উদারতা অবলম্বন করাই সমাজকে শক্তিশালী করার একমাত্র উপায়। সমাজপতিদের কুসংস্কার ও গৌড়ামি ত্যাগ করতে হবে, নতুবা নতুন পৃথিবীতে তাদেরই কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে। এ অতি সত্য কথা।

আজ সমাজে প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহের বহুল প্রচলন হলে (অবশ্য এ ক্ষেত্রে কতটা বর উভয়ের সম্মতি সর্বত্রই বিচার্য) এক দিকে যেমন পণপ্রথার বন্ধনরজ্জু দরিদ্র পিতামাতা বা অভিভাবকের গলায় চেপে বসবে না, অতীতকে তেমনি একই হিন্দু সমাজের মধ্যে আজকে যে বৈষম্যমূলক ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব জাতিকে, সমাজকে ধ্বংসের মুখে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করছে না তা ঘুচে যাবে ও হিন্দুসংহতি অদ্বুতপূর্ব শক্তিশালীতে সমর্থ হবে।

অসবর্ণ বিবাহ, প্রতিলোম বা অনুলোম বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল। এর বিরুদ্ধে যে-সব শাস্ত্রোক্তি তা বিশ্বাসাত্মক তথা সার্বজনীনতার প্রতিকূল, কাজেই বলা যেতে পারে এ সকল যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী; অতএব আমাদের পরিত্যাজ্য। প্রাচীনকালে প্রতি-

আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্তরের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাণ্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেষোক্ত খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষোক্ত ও সিকিউরিটি ক্রেয়-বিক্রেয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহণপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিজিটিকেট
লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকব"

ফোন ক্যাল ৩৩৮১

বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী

(২)



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন

স্বাস্থ্যহীনতার শ্রানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় বীর সন্তান
বিজয়সিংহ মাত্র সাত শত বছর লইয়া অমৃত সাহস
ও বিক্রমের সহিত স্বপ্ন লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
অমর পতাকা প্রোথিত করিয়া স্বীয় নামাঙ্কন্যে
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাঙ্গালীর সেই শৌর্য বীর্য আজ কাহিনীতে
পর্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার অন্ধ জাতীয় স্বীকরণ
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

অদর্শ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টসেপটিকস্ কলিকাতা

লোম বা অনুলোম বিবাহের ফলে জাত সন্তান অস্পৃহ ছিল না, বরং ক্ষেত্রপ্রাধান্যে মাতৃনামে বা বীজপ্রাধান্যে পরিচিত হ'ত। এই ধরণের দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

কণ্ডার সম্মতি পেলে বরের পছন্দমত কণ্ডার পাণিগ্রহণ করা বা কণ্ডার যাকে ইচ্ছা বামিতে বরণ করতে পারা, অথবা স্বয়ম্বর-প্রথায় বিবাহ সংঘটিত হওয়া—অন্ততঃপক্ষে এই ত্রিবিধ বিবাহপ্রথা সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া দরকার। এইরূপ বিবাহে বর্ণবিচারের বাধা উপেক্ষণীয়। এতে শোষণ, কোলিতের আভিজাত্যবোধ, পণপ্রথা প্রভৃতি হানিকর ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাগুলোর উচ্ছেদসাধন সহজ হবে এবং মানব-সমাজ পারস্পরিক ঐক্যস্থলে আবদ্ধ হয়ে সমাজের পরম কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারবে।

এই পরিবর্তনের মুখে অর্থাৎ অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ প্রচলনে আমাদের একটি মাত্র অসুবিধার পড়তে হচ্ছে। সেটি হচ্ছে পৈত্রিক ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পথে আইনগত বাধা। এই বাধা অপসারণ করতে খুব বেশী বেগ পাওয়ার কথা নয়। কেননা হিন্দু আইন সংশোধনের আন্দোলন তো ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। সমাজপতিরা ঊর্দ্বার্যের সহিত অগ্রসর হলেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হয়।

তার পরের প্রশ্ন মুসলমান সমাজ। হিন্দু যদি স্ব-সমাজের মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্কে এই বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করতে পারে ও হিন্দুসমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবৈষম্য চলছে তা ভুলে দিতে পারে তবে মুসলমান সমাজের সহিতও তার বিরোধ অনেক পরিমাণে কমে আসে। একই পিতামাতার পাঁচটি সন্তান

যদি পাঁচটি ধর্মের আশ্রয়ও নেয় তা হলেও এই বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসী হয়েও তারা একই বাড়ীর পাঁচটি অংশে স্বচ্ছন্দে বস-বাস করতে পারে। এইজন্তে মানবগোষ্ঠীর প্রগতিপরায়ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বিবেচনা করলে সমাচারী সমশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের মধ্যেও ঊর্দ্বাবাহিক সম্পর্কের প্রচলন অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

সুধীজন, শাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিদিগের আমার সাহসন্বয়ী অনুরোধ যে তাঁরা এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সমাজবিধান-গুলোর সংস্কার-সাধনে দ্রুতী হবেন।



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম
যাহুকর শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

ডাকেরেরা বলেন

ব্রাড-ভিটা

সর্বজন মনোরম
মেডিকেল রিসার্চ ল্যাবরেটরি
দি-১০, সেলুলোজ এডমিট, কলিকাতা

পুস্তক - পারিচয়

জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ—শ্রীযোগেশ-
চন্দ্র বাগল। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার মিত্র, ১২ নারিকেল বাগান
লেন, কলিকাতা। ক্রাউন অষ্টাংশিত ২২২ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

যাঁরা আজকাল রাজনীতির চর্চা করেন কিন্তু বুদ্ধ নন, তাঁরা অনেকেই
জানেন না কতকালে কাদের যত্নে কোন্ উপায়ে আমাদের দেশাত্মবোধের
উন্মেষ হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ অধিকার হাতে এসেছে। স্বদেশের
পূর্বকল্পীদের চেষ্টার এই ইতিহাস না জানলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে।
আলোচ্য পুস্তকটি বিগত শতাব্দের প্রথম থেকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল
পর্যন্ত বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস।
এই পুস্তকের বর্ণনীর বিষয়—ব্রিটিশ শাসক ও বণিক সম্প্রদায় এবং
ভারতীয় প্রজার বার্ষিক সংঘাত। দুই জাতির এই বিরোধকে বহুমুখ
'জাতিবৈর' বলেছেন, তদনুসারে লেখক তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন।
লেখক বহু পরিভ্রমণে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যথাক্রমে বিশ্লিষ্ট
করে মনোজ্ঞ ভাষায় এই ইতিহাস লিখেছেন। 'জাতিবৈর' সুখপাঠ্য ও
অবগুপাঠ্য গ্রন্থ, এর বহু প্রচার কামনা করি।

রাজশেখর বসু

গুড আর্থ—পাল বাক। অনুবাদ : শ্রীপুষ্পময়ী বহ।
রেডিক্যাল বুক ক্লাব। বঙ্কিম চ্যাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।
এখমেই বলা উচিত যে, যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহার শক্তি গুড
আর্থের মত পুস্তক অনুবাদ করিবার পক্ষেও অনুকূল এবং পর্যাপ্ত। গুড
আর্থের পরিচয় সুখী পাঠক-সমাজে অনাবশ্যক। গ্রন্থখানি যুগান্তরকারী।
ইহার ভাষা, ভাব, আখ্যানভাগ ও প্রকাশভঙ্গী এমন বিশ্বজনীন অখচ

যরোয়া যে তাহার ছন্দ বজায় রাখিয়া তাহাকে অল্প একটি ভিন্ন গোত্রের
ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া তাহার স্বকীয় আবহাটা রক্ষা করা অল্প
সাহিত্যিক প্রতিভার কর্ম্য নহে। লেখিকার অনুবাদে সেই প্রতিভার
আভাস পাইয়া আশাবিত হইয়াছি। লেখনী নবীন, কিন্তু সাহিত্যের
পাকা খাতার অচিরেই তাঁহার নানজারী হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের
অবসর নাই। প্রকাশকের একটি কর্তব্য বিষয়োপযোগী লেখক নির্বাচন ;
এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থখানিতে লেখিকার নিজের লিখিত
কোনও বক্তব্য প্রকাশ করার আবশ্যকতা প্রকাশকগণ বোধ করেন নাই।
অখচ পেরাহাণটির অন্দরমহল জুড়িয়া গদগদ ভঙ্গীতে উচ্চাঙ্গের "আবোল
তাবোল"—এর উন্মত্ত কীর্তন। "মহাচীনের মহামুক্তিকার মহাজাতি";
যেন, মহাকালের মহানীচা মহাত্মাঙ্কণের হাতে পড়িয়াছে মহাসদগতির
জন্ত। "অনাবৃষ্টিতে দগ্ধ বাংলার মৌনাকলা মাটি", "বাংলার চাষী ও বাংলার
মেয়ে ওয়াং ও ওলানের মধ্যে লুকিয়ে আছে"—এই সব ভাবাকুলতা
বা বিপদায়ের পরিবর্তে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকা
নায়ী সন্দর্ভটি সন্নিবিষ্ট হইলেই শোভন হইত।

লেখক নির্বাচন ছাড়া, প্রকাশক অত্যন্ত কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ দারিদ্র-
জানের পরিচয় দেন নাই। গ্রাম্যতা, প্রাদেশিকতা এবং বানান ও ভাব-
ঘটিত ভ্রমগ্রন্থাদে গ্রন্থখানি কটকিত; যথা :—১নং (র ও ড বিভ্রাট) উপর
নয় উপড়; ভেঙ্গেচুড়ে নয় ভেঙ্গেচুরে; জুতা পড়া নয় পরা—সেইরূপ গরেছে
হামাগুরি, হোমরা চোমড়া, ছেঁড়াবোরা ইত্যাদি অনেক আছে। ২ নং
(বানান বিভ্রাট) আকরে পরে=আঁকড়ে পাড়ে; এক গাদী=গাদা; যেসে
=যেবে; সুর ভাজে=ভাজে, কুড়ে=কুঁড়ে, সেইরূপ কাধা, ছকো,



দুর্লভ নয় মোটেই—

তরুদেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য
স্বপ্নমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-
বস্তুরূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিকৈজ্ঞানিক যুগে নারীর
পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে 'ক্যাল-
কেমিকো'র সম্বন্ধে প্রস্তুত উপসাদানী দেহের সৌন্দর্য্যকে
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

ক্যালকাটা
কেমিক্যাল



তুহিনী বিউটিফিক
সেপুকা টয়লেট পার্ফ্যুর
লাবনী স্নো এবং ক্রীম

পায়ে ফোঁটে; টাক, ভাড়া, আতুড়ে ইত্যাদি। ৩ নং (ভাষা বিভাগ) টোটকাটা মানে যাহার কিছু বলিতে বাধে না, স্পষ্ট বক্তা; হইবে গল্পকাটা। পরন্তু রোদ হইবে পড়ন্ত; রোদ; দীর্ঘায়িত চুল হইবে দীর্ঘায়ত; দৃষ্টি যোরাতে হইবে চোখ যোরাতে; বেঙ্গলঘের হইবে নিরন্তর; ছায়া কথা হইবে ছেদো কথা; ফাইফরমাস করবে হইবে ষাটবে; ঐ সবে নীলমণি তুই হইবে সবে ধন নীলমণি তুই; ইত্যাদি। ৪ নং (বানান বিভাগ) চোক্ষ; বীনা; প্রেম-নিশিন্দ অনবরতঃ; শিখীল; কাঠিণা; শুপ; শৃণি; ভাড়া; বিজপ; বেষ্টনী; অতীষ্ঠ ইত্যাদি। ৫ নং ভাষাবিভাগ—আজ কি পেল ও; স্থির সঙ্করণে চলছে ত্বকু চুকে, প্রচুর দেহা; বুকখানা পড়ে নিল; যুইয়ের কথা কোনো বিশেষ ভাবে নি; ইত্যাদি বিস্তর।

যাহা হোক, গ্রন্থখানির কাগজ বাঁধাই ও ছাপা বেশ ভাল এবং দামও সে অনুপাতে অতিরিক্ত নয়। বাঙালী পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে।

শ্রীজীবনময় রায়

কংগ্রেসের পথ—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি, ১৮-১৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৪, মূল্য দেড় টাকা।

আজ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ভারতের ভাগ্য কোন দিকে চলিয়াছে তাহা ভাবিবার ও বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সমস্ত জগৎ এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞে ব্যাপ্ত ছিল তখনও ভারতীয় কংগ্রেস অহিংসার আদর্শ পরিভাগ করে নাই। শত নির্দাতনেও কংগ্রেস গান্ধীজীর নির্দেশিত পথই বাছিয়া লইয়াছিল। আজ জাতির জীবনে চরম পরীক্ষার দিন সমুপস্থিত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও তাহার সহায়ক মুসলীম লীগ উভয়েই হিংসার বিধানী এবং এই জন্য আজ কংগ্রেসকে চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যে অহিংসার আদর্শের পতাকা উড্ডীন রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্তমান পুস্তকে লেখক পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের আদর্শ-কর্মপদ্ধতি, বৈপ্লবিক রূপ, অহিংসার শক্তি ও পার্থক্যতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদের যে লজ্জাকর সহায়তা করিয়াছে তাহা অতি স্থলর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হিস ও অহিংস বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তটি দ্বারা স্বাধীনতালাভ হইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন দল বা শ্রেণীবিশেষের হাতে পড়ে, এজন্য প্রকৃত "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর সকল বিপ্লবের ইতিহাসই এই শিক্ষাদায়ক। তাই মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংসার পথে বিপ্লব ঘটাইয়া প্রকৃতই মজুর-কৃষকের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

লেখক অতি সরলভাবে কংগ্রেসের মত ও পথের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করলে কংগ্রেস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার

নিরসন হইবে। বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন ঘোষ একটি স্বন্দর 'পরিচয়' লিখিয়া এই পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভক্তের ভগবান—পঞ্চতীর্থ শ্রীহরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত-শাস্ত্রী। জুল সান্নাই কোং, সদরঘাট, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীভূমিকা বর্জিত ছেলেদের নাটক। চল্লহাস নামক হরিভক্ত রাজপুত্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কতকটা যাত্রার ধরণে রচিত ভাব উন্নত এবং হনীতিসম্মত।

মণিমালা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। ভাব ও ভাষা মন্দ নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের

অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অর্দ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত রায়, এল, এম্, এস মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জন্য সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি চিত্রসহ ব্রহ্মান হইয়াছে।)

প্রাপ্তিস্থান :—হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং

১৬৫নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকারের নিকট, দিনাজপুর।

কাঁ ক ডা বিছে র র স

রসকার—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শার্দূলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আঁতে যা না লাগিলে বক্তব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অন্ত্যায় শূল বেদনার সন্তাবনা আছে। যাহারা রসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞাণ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞ্ছনীয়।

'কাঁকড়া বিছে র র স' শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে।

বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন।

মায়াজাল—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরামেশ

বোশাল, ৩৫, বাহুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বর্তমান বাংলার নাগরিক জীবন নানা কৃত্রিমতার পরিপূর্ণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই কৃত্রিমতার ছাপ পড়িরাছে। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসাদিতে যে-সমস্ত পাত্রপাত্রীর চিত্র অঙ্কিত হয় তন্মধ্যে সবগুলিকে সত্যচিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে মন দিবাগ্রস্ত হয়। কিন্তু রামপদবাবুর কথাসাহিত্য ঠিক সে জাতীয় নহে। ধার করা জিনিষ লইয়া তিনি কার-বার করেন না। স্থূল পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং মানুষের প্রকৃত পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত কথাসাহিত্যে আমরা বাংলাদেশের স্থল্পন্দন স্তুনিতে পাই।

‘মায়াজালে’ বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার দাবি রাখে। গৃহকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার নারীর জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া যুগ্ম পরিণতি লাভ করে। বাংলার যে গৃহলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “হে কল্যাণী, নিত্য রত আছ গৃহকাজে”, যোগমায়া সেই কল্যাণী বধু-মূর্তিরই প্রতীক। বাংলার বধু যেদিন স্বামীর সংসারে আসিয়া প্রবেশ করে সেইদিন হইতেই শুরু হয় গৃহকপোতীর মত তাহার নীড় রচনার পাল। ক্রমে গৃহ আর গৃহিণী পরিণত হয় এক অভিন্ন সম্ভায়। স্বামীর ভিটার সঙ্গে বাংলার নারীর এই একাত্মবোধ যে কিরূপ হৃনিবিড় তাহাই পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে ‘মায়াজালের’ যোগমায়ায় আচরণে আর উক্তিতে। সত্যই ‘বাড়ীর মধ্যদিকে নিজে মধ্যদা হইতে পৃথক করিয়া ভাবিবার অবসর যোগমায়া কোনোদিন পান নাই।’ নিজের জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত, যুত্মাশোক ইত্যাদি বিবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষাই তিনি লাভ করিলেন যে, স্বামীর ভিটাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, তাঁহার জীবনের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা-ভূমি। সংসারের এই বন্ধন হইতে, এই ‘মায়াজাল’ হইতে তাঁহার নিকৃতি নাই।

নিভৃত বঙ্গ-পলীর তরুজ্বালাময়িক শান্তিপূর্ণ পটভূমিকায় অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক নারীদের মহিমাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোথাও তাঁহাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। পুস্তকটিতে নারীচরিত্র-গুলিই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে এবং সেগুলি যে চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে সার্থক ও জীবন্ত হইয়াছে তাহার অস্বতম প্রধান কারণ ‘ডায়লগ’ লেখায় লেখকের অসাধারণ দক্ষতা। বাংলার মেয়েদের যন্ত্রোন্মাদ এবং ঘরকন্নার কথাবার্তার বিশিষ্ট ভঙ্গীটুকু কেমন করিয়া তিনি আয়ত্ত করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীনিলাকুমার ভদ্র

পণ্ডিত ৩৪মানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত এবং
তত্ত্ববোধিনী পুস্তকালয় চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

সচিত্র ও যজ্ঞ) শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১০

অর্গল, কীলক, কবচ, মূলচণ্ডী, স্তূপাদি এবং রহস্যজ্ঞের সরল বঙ্গোপাধি
ও ব্যাখ্যা, পূজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে ‘চন্ডী’ বিষয়ক বহুল
জাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণালুকৃতিক প্রাকৃষ্টীতে সুসম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা ৬/১০ ত্রিসন্ধ্যা ১০

প্রাপ্তিস্থান—সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক—১২০১২ আপার
সারকুলার রোড, কলিকাতা।

হুন্দি

মূল্য ৩০০ আনন্দ

অনুবাদ : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

...বুটিশ শাসনের ফলে আজ ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়ছে, আর সেই ভাঙ্গা সমাজের বুকের ওপর বসে যুরোপীয় সমাজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ, দেশী বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং শাসক-সম্প্রদায় কি ভাবে তার অন্তিম সংকারের আয়োজনে ব্যস্ত, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্নহীন, বস্ত্রহীন কোটি কোটি মানুষ কি ভাবে কলের পুতুলের মত এই অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতাদের পরিকল্পনা-কৌশলে নিজেদের চিতা নিজেই সাজিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে মূল্য রাজ আনন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে...

দাম চার টাকা আট আনা

প্রকাশিত হ'লো

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

গুড আর্থ

পাল বাক

অনুবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বসু

* ১৯৩৮-এ বহুমূল্য নোবেল প্রাইজ পাল বাক এই উপন্যাস লেখার জন্য পেয়েছেন।

* ১৯৩৬-এ ‘গুড আর্থ’ সবাক চিত্রে রূপান্তরিত হয়।

* বিশ্ববিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবং হাওয়ার্ড-জর্নপদক উপহার দিয়ে পাল বাককে সম্মানিত করা হয়।

* পৃথিবীর একশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

* আমেরিকার বই বিক্রীর রাজ্যে ‘গুড আর্থ’ রেকর্ড স্থাপন করে।

অনিলা অনুবাদ—অপূর্ব গঠনসজ্জা—উৎকৃষ্ট এ্যাটিক ডিমায়ে কাগজে
ছাপা এই স্বরূপ উপন্যাসের মূল্য : পাঁচ টাকা।

র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

দেশ-বিদেশের কথা

কিশোরীমোহন চৌধুরী

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল ও রাজনীতিক নেতা কিশোরী-মোহন চৌধুরী ১০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। উক্ত শহরের উকীল সভার সভাপতিরূপে যাবতীয় জনহিতকর আন্দোলনের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাকে তিনি তাঁহার জীবনের অত্যন্ত প্রধান ভ্রত বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে প্রায় ৮০ জন ছাত্র তাঁহার পরিবারে থাকিয়া বিজ্ঞানভ্যাস করিত।

মালতী শ্যাম

শিলচরের উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের পত্নী মালতী শ্যাম বিগত ১৩ই কার্তিক পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩২ সাল হইতে তিনি জনহিতকর কার্যে



মালতী শ্যাম

আত্মনিয়োগ করেন। শিলচরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া নারীসমাজকে সজ্জবদ্ধ করিয়া সভাসমিতির অস্থানে রত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি “শিলচর নারী-কল্যাণ সমিতি” স্থাপন করেন। ১৯৪০ সালে এই সমিতি নিখিল-ভারত মুহিলা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দরিদ্র ভদ্রবরের মহিলাগণের হিতসাধনকল্পে তিনি নিজে

পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক কষ্ট শক্তি দ্বারা শিলচরের নারীসমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলায় আমরাল গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ৩১ বৎসর বয়সে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাঁকুড়া জেলা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি বাঁকুড়া দেওয়ানী আদালতে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত আইন-ব্যবসায়ের রত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীন-চেতা, সত্যনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বিরল। গত ৭ই ভাদ্র ৭৮ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া শহরে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীমতী লীলা রায়

পূর্বের উইমেন্স কলেজ কলিকাতা এবং অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী বিভাগের ব্যায়াম পরিচালিকা শ্রীমতী লীলা রায় বি-এ, বি-টি বাংলা গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক রুত্তি পাইয়া মেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যচর্চা সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষালাভার্থ দুই



শ্রীলীলা রায়

বৎসরের জ্ঞান কানাডায় যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইমেন্স ইন্টার-কলেজিয়েট এথলেটিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী লীলা নাট্যকায় শ্রীযুক্ত মনমথ রায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।



নবগ্রহা পূজা সমাপনান্তে প্রথম প্রিয়া-সন্তান
 প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা (প্রাচীন কাংড়া চিত্র)



নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নামমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার ভবিষ্যৎ

বাঙালীর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা চরম অবনতির পথে কত দূর পৌঁছিয়াছি এবং কিরূপ দ্রুত বেগে সে পথেই চলিয়াছি তাহার বিচার-ক্ষমতাও আমাদের লোপ পাইতেছে। জাতির প্রগতির পথনির্দেশ করেন তাহার নেতা বা নেতৃবর্গ, নেতৃবর্গ দেশের ও দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থার বিচার করেন জাতির সমস্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া যথাযথভাবে পরামর্শ করিয়া। এই নেতৃবর্গ ও তাঁহাদের পরামর্শদাতাদিগের যোগ্যতার বিচার করে জাতির জনমত এবং এই শেষ বিচারের কণ্ঠস্বর হইল দেশের পরিস্থিতি। ইহাই জগতের নিয়ম এবং যেখানেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে সেখানেই জাতির দুর্দশার আরম্ভও হইয়াছে। বাংলায় জাতীয়তাবাদের দুর্দশার অন্ত নাই এ কথা কে অধীকার করিতে পারে? অথচ আমাদের চলিয়াছে সেই এক ঢোল এক কাঁসি, সেই পুরানো অযোগ্য অকর্মণ্য নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের চালক সেই স্বার্থায়েবী চেলা-চামুড়ার দল। দুই যুগব্যাপী চক্রান্ত ও দলাদলির ফলে এই মহাশয় ব্যক্তিগণ দেশকে কোথায় আনিয়াছেন এবং পথ দেখাইবার ছলে কোথায় লইয়া চলিয়াছেন তাহার বিচার যাহাতে না হয় তাহার জন্ত নানা প্রকার হুঁদা নানা রকমের উচ্ছ্বাস ও আবেগময় কার্যক্রম ইহারা নিত্যই চালাইতেছেন, দেশ তিমির হইতে ধোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। নিজের কলঙ্ক নিজের অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্ত অস্ত্রের ওপর কর্দম নিক্ষেপ ও মিথ্যা দোষারোপ এবং নিজের অযোগ্যতার কারণে দেশের ও জাতির অবনতির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে, অস্ত্রের ক্ষেত্রে ফেলিতে ইহারা বিশেষ কুশলী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহাতে এই অভাগা দেশের ভবিষ্যতের পথ কোন মুখে চলিয়াছে? জাতীয়তাবাদী বাংলার ভবিষ্যতের এক প্রধান অংশ তাঁহাদেরই হাতে, বাঁহাদের এই দুর্ভাগ্য জাতি নিজেদের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছে রাষ্ট্র পরিষদে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বায়স্থাপক সভায় ও গণ-পরিষদে। জাতীয়তাবাদী বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে নেতৃবর্গের নির্দেশ অনুসারে, স্তম্ভর নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদের। বিশ সংসদ পূর্বে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলার আসন ছিল শূন্য-

হলে। আজ এই সকল প্রতিনিধি নিয়োগের ফলে বাংলার স্থান কোথায় নামিয়াছে তাহা ভাবিতেও লজ্জা করে। সবে-মাত্র যে প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্ত নির্বাচন করা হইল তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে খুঁজিয়া না পাওয়া গিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে বাংলাদেশের দুর্গতি চরমে পৌঁছিয়াছে।

বাঙালীর পরিচয় তবেই সম্ভব যদি সে সেই মিথ্যার জাল কাটিয়া বাহির হইতে পারে যাহার দ্বারা তাহার হাত-পা জড়াইয়া গিয়াছে। কত অভিজ্ঞতা, ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণ, পরকী-কাতর বাঙালীর অস্তিত্বের ডাক আসিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ বা দাসত্ব অনিবার্য। বাংলাদেশে যদি আগেকার মত বিশ্বস্ত, নির্ভীক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা বঙ্গসন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তবেই এদেশ উদ্ধার পাইবে। দেশে এখন অরাজকতা এবং এ অবস্থার প্রতিকার আমাদেরই করিতে হইবে, অথচ দেশে সক্রিয় রহিয়াছে মাত্র দুইটি শক্তি যে দুইটিই জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিষতুল্য। তাহার একটি রাজকীয় যাহার প্রয়োগ অতি প্রবলভাবে চলিয়াছে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের জন্ত এবং অচ্যুত, বিভিন্ন নামে ও নানারূপ ছদ্মবেশে গণশক্তির অপপ্রয়োগে জাতীয়তাবাদের ধ্বংসেরই সহায়তা করিয়া চলিতেছে। উদ্ধাম বিশৃঙ্খলার জয়-জয়কার চারি দিকেই দেখা যায়, মিথ্যার আবরণে সেই মেকি চলিতেছে এখন জাতীয়তাবাদের নামে। এই মিথ্যার প্লাবনে বাঁধ দিবে কে?

প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণ

গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বদিন নয়-দিনীতে এক সম্মেলনে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের বিষয় আলোচিত হয়। ডাঃ পটৌ সীতা-রামিয়া এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন যে ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করিবার সমন্বয়ই গণ-পরিষদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হইবে। প্রদেশের সীমা যথাযথ ভাবে নির্ধারিত না হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিরর্থক হইয়া পড়ে—ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করিলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি সুসম্বন্ধ ভাবে গঠিত হইতে পারিবে।

ডাঃ সীতারামিয়া বলেন, যে সকল প্রদেশ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নাই সেগুলির তালিকা সংশ্লিষ্ট একটি প্রস্তাব গণ-পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং মাইনরিটি কমিটি, দেশীয় রাজ্য কমিটি প্রভৃতির সহিত এক-যোগে যথাসম্ভব ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে আর্থিক ও বৈষয়িক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অক্ষর রাখিয়া প্রদেশগুলির সীমা নূতন করিয়া নির্ধারণ করিবার জন্ত একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। ডাঃ সীতারামিয়া প্রস্তাব করেন যে এই সংকল কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে গণ-পরিষদ যে সকল নীতি নির্ধারণ করিয়া দিবে অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে সেইগুলি বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে।

সম্মেলনের সম্পাদক ত্রীশঙ্কররাও দেও বলেন যে ভারতের জন্ত যখন একটি নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণীত হইতেছে সেই সময়ে লোকে যুক্তিসম্মত কোন ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের বিষয় চিন্তা করিবে ইহা স্বাভাবিক। এ যাবৎ ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সীমা একরূপ কোন ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বহু পূর্বে, ১৯২০ সালে, কংগ্রেস ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমা পুনর্নির্ধারণের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কংগ্রেস নিজের গঠনবিধিতে এই সীমা মানিয়া লইয়াছে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনী ইত্তাহারেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক অঞ্চল বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া নিজেদের বিশিষ্ট জীবন ও সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিবে। এই স্বাধীনতা কংগ্রেস বরাবরই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

“যেহেতু ভারতের পূর্বতন শাসকদের অপসারণ ও তাহাদের শাসিত রাজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষকে ইতস্তত ভাবে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হইয়াছে; যেহেতু স্বাভাবিক-বিশিষ্ট ও সচেতন সুনীতিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশগুলিকে উহার শিক্ষা, আইন, শাসন ও সংস্কৃতি বিষয়ক কতব্য যথোচিত ভাবে পালন করিতে হইলে এক ভাষাভাষী ও এক সংস্কৃতিবিশিষ্ট অধিবাসীদিগকে লইয়া প্রদেশগুলি গঠিত হওয়া প্রয়োজন, সেইজন্ত গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি স্থানীয় সদস্যগণ এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব সমর্থনকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদিগের এই সম্মেলন গণ-পরিষদের নিকট প্রস্তাব করিতেছে, উহার বর্তমান পূর্ণ অধিবেশনে উপরোক্ত নীতি স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার ও ভারত-ব্রিটিশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।”

সম্মেলনে ডাঃ জয়াকর, সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, ত্রীশঙ্কররাও দেও, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ত্রীযুক্ত কে এম মুন্সী, কে শান্তনম, লালো দেশবন্ধু ওষ্ঠ, কে মাধব মেনন, গোপীনাথ

বরদলই, শেঠ গোবিন্দদাস, আর আর দিবাকর, এস নিজলিঙ্গাপ্পা, চৌধুরী চরণ সিং, মুকুটবিহারী লাল, রায় বাহাদুর সুরমল, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোষ, ডাঃ পি বি দেশমুখ এবং কে বেঙ্কট রাওকে (আস্থায়ক) লইয়া একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

বাংলার সমস্ত আলোচনা। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারিত হইলেও বাংলার সীমা পুনর্নির্ধারণে বাধা পড়ে না। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি মূলতঃ এক হইলেও সাম্প্রদায়িক বিষয়ের ফলে মনো-বৃত্তিতে যে বিষয় পার্থক্য আসিয়াছে—এই অপ্রিয় সত্য অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক সমস্তা এক, জীবনযাত্রার ধরণও কতকটা মিল তাহাদের মধ্যে আছে, কতক শ্রেণীর মুসলমান এখনও কিছু কিছু হিন্দু আচার পালন করে সবই সত্য, কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে লীগপন্থীদের মনের কোণে ভিন্ন ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ সন্দোপনে রহিয়াছে সুযোগ পাইলেই তাহা উগ্র হইয়া উঠে। পরধর্মের প্রতি হিন্দুর যে উদার সহনশীলতা আছে পৃথিবীর অপর কোন ধর্মের রেলাতেই তাহা দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে মধ্যযুগে যে দুঃস্বপ্ন প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বর্তমান ছুঁদার জন্ত উহাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দায়ী। মুসলমানের স্পর্শে হিন্দুর জাত গিয়াছে, হিন্দুনারী অপহৃত হইলে সমাজে আর তাহার স্থান হয় নাই। এই দুই পাশে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে। নোয়াখালীর আখাতের পর হিন্দু সমাজ তাহার ক্ষত-চৈতন্ত ফিরিয়া পাইয়াছে। অপহৃত নারী সমাজে স্থান পাইয়াছে এবং ধর্মান্তরে প্রায়শ্চিত্ত বিধি মম্ব সত্যই দিয়াছিলেন কি না পণ্ডিতেরা তাহাও সন্দেহ চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মম্বর সময়ে ঋগ্বেদ ও ইসলামের জন্ম পর্যন্ত হয় নাই, উহার ভারতবর্ষে আদেও নাই। সুতরাং ধর্মান্তরকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

বাঙালী হিন্দুর বর্জনশীলতা বন্ধ হইয়াছে, এবার তাহাকে নিজস্ব বাসভূমির কথা চিন্তা করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতির নামে বাংলা অঞ্চল রাখিলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহার কিছু পরিচয় আমরা গত সংখ্যায় দিয়াছি। এই ভিত্তিতে বাংলার সহিত বিহার ও আগামের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সংযুক্ত করিলেও বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা বাড়ে না। মুসলমান সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় হিন্দু তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, ১৯০১ সাল হইতে বাংলার সেলস রিপোর্টগুলি ভাল করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৯৩১ ও ১৯৪১-এর সেলসে ‘তুল’ থাকিতে পারে কিন্তু ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১-এর সেলস মিথ্যা কথা বলিবে না।

বাঙালী হিন্দুকে তার প্রাচীন বাসভূমি হইতে উচ্ছেদের নোটশ মুসলিম লীগ দিয়া দিয়াছে, এই নোটশ কার্বে পরিণত করিবার বিবিধত আয়োজনও শুরু হইয়া গিয়াছে। গণ-পরিষদে এই সমস্তা উপস্থাপনের প্রাকালোচ যদি আমরা নীরব

ধাকি তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুর ধ্বংস অব্যক্ত্যবী। বর্তমান
বাস্তব যুগে ভাবপ্রবণতা পরিহার না করিলে বাঙালী
বাঁচিবে না।

গণ-পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

মূল পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

কংগ্রেস	সংখ্যা
সাধারণ	২০১
মুসলিম	৪
শিব	১
মুসলিম লীগ	৭৪
ইউনিয়নিষ্ট	৩
সাধারণ	২
মুসলিম	১
কম্যুনিষ্ট	১
সাধারণ	১
তপস্বী ফেডারেশন	১
সাধারণ	১
অমৃত জাতি	২
সাধারণ	২
জমিদারগণ	৩
সাধারণ	৩
বাণিজ্য ও শিল্প (স্বতন্ত্র)	২
সাধারণ	২
শহীদ জীর্গা (বেঙ্গলিহান)	১
মুসলিম	১
পস্থ অকালী	৩
শিব	৩
দেগীষ রাজ্যসমূহ (সর্বোচ্চ)	১৩

মোট—

৩৮৯

গণ-পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত

শ্রেণী—এ

মোট আসন—১১০

কংগ্রেস	সংখ্যা
মাদ্রাজ (সাধারণ)	৪৫
বোম্বাই (সাধারণ)	১৯
মুক্তপ্রদেশ (সাধারণ)	৪৪
(মুসলিম)	১
বিহার (সাধারণ)	২৮
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	১৬
উড়িষ্যা (সাধারণ)	৮

কুর্গ	১
দিল্লী	১
আজমীঢ়-মাহোয়াড়	১

মোট—

১৬৪

মুসলিম লীগ	৮
মাদ্রাজ	১
মধ্যপ্রদেশ	২
বোম্বাই	৭
মুক্তপ্রদেশ	৫
বিহার	৫

মোট—

১৯

অমৃত শ্রেণী	১
বিহার (সাধারণ)	১
উড়িষ্যা (সাধারণ)	১

মোট—

২

জমিদারগণ	১
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	২
বিহার (সাধারণ)	২

মোট—

৩

শিল্প ও বাণিজ্য (স্বতন্ত্র)	২
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ)	২

মোট—

২

সর্বমুদ্র—

১১০

শ্রেণী—বি

মোট আসন—৩৬

কংগ্রেস—পঞ্জাব (সাধারণ)	৬
শিব	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (মুসলিম)	২
সিঙ্গু (সাধারণ)	১

মোট—

১০

মুসলিম লীগ—পঞ্জাব	১৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১
সিঙ্গু	৩

মোট—

১৯

ইউনিয়নিষ্ট—পঞ্জাব (সাধারণ)	২
মুসলিম	১

মোট—

৩

শহীদ জীর্গা—বেঙ্গলিহান (মুসলিম)	১
-----------------------------------	---

মোট—

১

পহু অকালী—পঞ্জাব	৩
মোট—	৩
সর্বশুদ্ধ—৩৬	
শ্রেণী—সি	
মোট আসন—৭০	
কংগ্রেস—বাংলা (সাধারণ)	২৫
আসাম (সাধারণ)	৭
মোট—	৩২
মুসলিম লীগ—বাংলা	৩৩
আসাম	৩
মোট—	৩৬
কম্যুনিষ্ট—বাংলা (সাধারণ)	১
মোট—	১
তপশীলী ফেডারেশন—বাংলা (সাধারণ)	১
মোট—	১
সর্বশুদ্ধ—৭০	
বিভিন্ন দল (সম্প্রদায় এবং স্বার্থহিসাবে)	
হিন্দু তপশীলী সম্প্রদায় বাদে	
কংগ্রেস—	১৫৬
ইউনিয়নিষ্ট	১
কম্যুনিষ্ট	১
জমিদার	৩
শিল্প ও বাণিজ্য	২
মোট—	১৬৩
তপশীলী শ্রেণী—কংগ্রেস	২২
তপশীলী শ্রেণী	১
ইউনিয়নিষ্ট	১
মোট—	৩১
মুসলমান	
মুসলিম লীগ	৭৪
কংগ্রেস	৪
ইউনিয়নিষ্ট	১
সহীদ জীর্গা	১
মোট—	৮০
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—কংগ্রেস	৩
মোট—	৩
ভারতীয় খ্রীষ্টান—কংগ্রেস	৬
মোট—	৬

পার্শ্বী সম্প্রদায়—

কংগ্রেস	৩
অনুন্নত শ্রেণী—	
কংগ্রেস	৪
স্বতন্ত্র	২
মোট—	৬
শিব—কংগ্রেস	১
পহু অকালী	৩
মোট—	৪
সর্বশুদ্ধ—২১৬	

গণ-পরিষদ

ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল এবং মুসলিম লীগের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের উদ্বোধন হইয়াছে। পার্লামেন্টে বিতর্কে রক্ষণশীল দলের নেতারা লীগ-নায়কদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গণ-পরিষদকে একটা হিন্দু সম্মেলন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দাবি তুলিয়াছিলেন যে এই পরিষদ কতৃক রচিত রাষ্ট্রবিধি গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হউক। মিঃ চার্চিল, লর্ড উইনটারটন, লর্ড সাইমন এবং লর্ড টেম্পল উড (প্রাক্তন সার সামুয়েল হোর) কমন্স এবং লর্ডস সভায় লীগের হইয়া লড়িয়াছেন, কমন্স সভায় বিতর্কের সময় দর্শকদের আসনে মিঃ জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। মিঃ আলেকজান্ডার এবং লর্ড পেনিক লরেন্স উভয়েই এই দাবির জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অনুসারে গণ-পরিষদ কতৃক নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইলে তাহা বিধিবহিত হইবে না, তবে মিঃ এটলীর ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা অনুসারে মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিলে ভারতবর্ষের যে-সব অংশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। কমন্স সভায় বিতর্কের উদ্বোধনকালে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসও এই কথাই বলিয়াছেন। মিঃ আলেকজান্ডার বলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে হইয়াছে কি না, নূতন রাষ্ট্রবিধি রচিত হইলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এ বিষয়ে সীমাহীন বিতর্ক চালাইয়া যাওয়া অপেক্ষা গণ-পরিষদ নবরচিত রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্ত কি বন্দোবস্ত করেন তাহা দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করাই তাহার মতে সুবিবেচনার কার্য হইবে। মিঃ আলেকজান্ডারের উক্তি এইরূপ :—

মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার বলা হইয়াছে যে, গণ-পরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর তাহাকে কার্যকরী

করার ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্নেন্ট পার্লামেন্টের নিকট বিল সুপারিশ করিবেন। তবে ইহার পূর্বে দুইটি সত্ৰ মানিতে হইবে। একটি হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ক্ষমতাশাসনতন্ত্রের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা—মন্ত্রী-মিশনের এই সত্ৰ ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মানিতে সম্মত হইয়াছেন। সেইজন্য গণ-পরিষদে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতা উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন কারণ দেখি না।

এই সময় মিঃ বাটলার প্রশ্ন করেন যে, গণ-পরিষদের ক্ষমতা কত দূর এবং তাঁহারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারেন কি না।

মিঃ আলেকজান্ডার বলেন, আমরা মোটামুটিভাবে কতকগুলি যে মূল জিনিসের খসড়া করিয়া দিয়াছি, উপযুক্তভাবে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সদস্যরা যদি সে-সব বিষয়ে একমত হন তবে একটা ভাল শাসনতন্ত্রই রচিত হইবে। তবে একথা ঠিক যে, পার্লামেন্টকে সুপারিশ করার পূর্বে রচিত শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিব।

লর্ড সডার্স বিতর্কে লর্ড সাইমন নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন করেন :

(১) ১৬ই মে মন্ত্রী-মিশনের যে প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হইয়াছিল তাহাতে কি এই কথা বলা হয় নাই যে উক্ত সম্প্রদায়কেই কয়েকটি মূল বিষয় মানিয়া লইতে হইবে ?

(২) দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে অধিবেশন চলিতেছে লীগ-সদস্যেরা তাহাতে যোগ দেন নাই, এই অবস্থায় উক্ত পরিষদকে মিশন-প্রস্তাবে বর্ণিত গণ-পরিষদ বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে কি ? মুসলমানেরা যদি শেষ পর্যন্ত উহাতে যোগদান না করে তাহা হইলে ঐ গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রাষ্ট্রবিধিকে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট কি ভারতীয়গণ কর্তৃক সকল ভারতবাসীর জন্য প্রণীত রাষ্ট্রবিধি বলিয়া স্বীকার করিবেন ?

(৩) মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুসারেই দিল্লীর বর্তমান গণ-পরিষদকে রাষ্ট্রবিধি রচনা করিতেই হইবে এমন কোন কথা আছে কি ? মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাষ্ট্রবিধির যে খসড়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নূতন ভাবে রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার গণ-পরিষদের আছে কি ?

লর্ড পেরিক লরেল উত্তরে বলেন, “স্বাভাবিক অবস্থায় গণ-পরিষদের কাঙ্ক্ষ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন উঠিয়াছে তার জবাব আমি দিব। মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাষ্ট্রবিধির যে মূল খসড়া করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার দিল্লীর বর্তমান গণ-পরিষদের আছে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যে খসড়া দেওয়া হইয়াছে তাহার বাহিরে কিছু করিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের

অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি প্রয়োজন হইবে; তাহা না পাইলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের বাহিরে যাওয়া চলিবে না। প্রস্তাবের ১৫ ধারায় উল্লিখিত বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোট গ্রহণ আবশ্যক হইবে।”

মুসলীম লীগ-গণ-পরিষদ নির্বাচনে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু লীগ-সদস্যেরা গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে বিরত রহিয়াছেন, ইহাতে গণ-পরিষদকে সকল দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না এই কথা মানিয়া লইয়াও লর্ড পেরিক লরেল জানাইয়া দিয়াছেন যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের অধিকার বর্তমান গণ-পরিষদের অব্যাহতই রহিয়াছে। পার্লামেন্টের বিতর্ক হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া গেল যে, গণ-পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিবে না, লীগ উহাতে শেষ পর্যন্ত যোগদান না করিলেও যে রাষ্ট্রবিধি প্রণীত হইবে তাহাতে সংখ্যালঘুদের ক্ষমতা কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই বিবেচিত হইবে এবং ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধি ও সংখ্যালঘুদের ক্ষমতা রাষ্ট্রবিধির মধ্যে সংযোজিত রক্ষাকবচ ব্রিটিশ গবর্নেন্টের মনঃপুত হইলে নবরচিত রাষ্ট্রবিধি শিরোমণি করিয়া লইতে আপত্তি হইবে না। তবে মিঃ এটলীর ঘোষণা অনুসারে এইটুকু কথা রহিল যে, এই রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নে লীগ যোগদান না করিলে লীগ-অধিকৃত অঞ্চলে অর্থাৎ পুঞ্জাবে, বাংলায় ও সিন্ধুতে উহা প্রযোজ্য হইবে না।

মিঃ এটলীর ঘোষণা ও গ্রুপিং

গণ-পরিষদের উদ্বোধনের প্রাকালে মিঃ এটলী বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। সেখানে কংগ্রেসের সহিত লীগের মিটমাটের একটা চেষ্টা হয় কিন্তু মিঃ জিন্নার চিরায়ত অসংযত জ্বিদের ক্ষমতা কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। লণ্ডন বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রুপিং। শেষ পর্যন্ত মিঃ এটলী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় বলেন যে, গ্রুপিং সম্বন্ধে তাঁহার ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইনজ্ঞের পরামর্শ লইয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, সেকশনের অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, গ্রুপে প্রবেশ করা না করা প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং গ্রুপে প্রবেশ করিলেও নূতন রাষ্ট্রবিধি অনুসারে প্রথম যে নির্বাচন হইবে তদনুসারে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ গ্রুপ পরিত্যাগের নোটিশ দিতে পারিবে। মন্ত্রী-মিশনের মূল প্রস্তাবানুসারে এই নোটিশ অবশ্য দশ বৎসর পরে কার্যকরী হইবে। সেকসনে উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত হইলে বি ও সি সেকসনের পক্ষে উহা বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায় কারণ এই উভয়টিতেই লীগ সদস্যদের সংখ্যা অধিক। আসাম এবং সীমান্ত প্রদেশ গ্রুপে প্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন

করিয়াছে। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে ও সম্বন্ধে ভারতবাসীরা ইচ্ছা করিলে ফেডারেল কোর্টের নিকট আপীল করিতে পারে। মিঃ জিন্না ইহাতে আপত্তি করেন এবং ভারত-সচিবও পরে লর্ডস সভায় বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে জানাইয়া দেন যে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত তাঁহারাও মানিতে প্রস্তুত নহেন, ব্রিটিশ গবর্নেন্টের ব্যাখ্যাই তাঁহারা চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন।

মিঃ এটলীর সংক্ষিপ্ত ঘোষণার শেষ অল্পদেহটুকু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের একটা বড় অংশে প্রতিনিধিগণ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অল্পপস্থিত থাকিলে যে রাষ্ট্রবিধি রচিত হইবে তাহা দেশের অনিচ্ছুক অংশগুলির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। শাঁখের করাভের ছায় এই উক্তি ছ-দিকে কাটে। মূল গণ-পরিষদে যেমন লীগ অল্পপস্থিত থাকিলে উহাতে গৃহীত রাষ্ট্রবিধি বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধুর উপর জোর করিয়া চাপানো হইবে না, তেমনি বি অথবা সি সেকশনে লীগ যোগদান করিয়া গণতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নে উদ্যত হইলে উহা হইতে হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিরা বাহির হইয়া গেলে লীগ-কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রবিধি হিন্দু ও শিখদের উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে না। আপাতদৃষ্টিতে মিঃ এটলীর ঘোষণা লীগের অগ্রকূল বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক উগা তাহা নহে—মিঃ জিন্না এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই ইহুর পরেও গণ-পরিষদে যোগদানে সম্মত হন নাই। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বর্ণিত অনিচ্ছুক অংশের অনিচ্ছা কি ভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা বলা হয় নাই, সেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে। সেকশনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে এই অনিচ্ছা নির্দিষ্ট হইলে বাংলা, পঞ্জাব ও সিন্ধু বাদ পড়িবে কিন্তু গণ-ভোটে মত প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে পঞ্জাবে লীগের পরাজয় ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কংগ্রেস, শিখ ও ইউনিয়নিষ্ট দলের মিলিত শক্তি এখনও সেখানে লীগের চেয়ে বেশী।

এই প্রদেশগুলি আপাততঃ নূতন রাষ্ট্রবিধির বাহিরে পড়িয়া গেলেও পাকিস্তান হইবে না। মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণায় মূল সূত্র দুইটি—(১) ভারতবর্ষে বণ্ডিত হইতে পারিবে না এবং (২) প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হইবে। মিঃ জিন্না দুইটি পৃথক গণ-পরিষদ গঠনের যে দাবি এখনও আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন প্রথমটির দ্বারা তাহা বাতিল হইয়া যায়। ভারতবর্ষে “স্বাধীন ও সার্বভৌম” পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইবে না এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্মরণ্য যে প্রদেশগুলি আপাততঃ বাহিরে থাকিবে সেগুলিকে কেন্দ্রীয় শাসন মানিয়া চলিতেই হইবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লীগ-প্রদেশে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে চলিবে, অজ্ঞাত প্রদেশ চলিবে ১৯৪৭ সালের নূতন ভারতশাসন আইনে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা

রহিয়াছে নূতন রাষ্ট্রবিধিতে তাহা কমিবার কথা, স্মরণ্য নূতন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে লীগের আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষে বণ্ডিত হইবে না এই মূলনীতি ব্রিটিশ গবর্নেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পর লীগ-প্রদেশের পক্ষে নূতন কেন্দ্রীয় গবর্নেন্টকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও থাকিবে না। অবস্থাটা মোটামুটি এই দাঁড়াইতে পারে যে বর্তমানে যেখানে প্রাদেশিক শাসন চলে ১৯৩৫ সালের এবং কেন্দ্রীয় শাসন চলে ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে, ভবিষ্যতে কিছুদিনের জন্য বড় জোর তিনটি প্রদেশ শাসিত হইবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অপর সমস্ত প্রদেশ অমুসরণ করিবে ১৯৪৭ সালের নূতন রাষ্ট্রবিধি। নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইলেই ইংরেজের ভারত-ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে, তখন “অনিচ্ছুক” প্রদেশগুলির অনিচ্ছা দূর করিবার ভার পড়িবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কংগ্রেস এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। মিশনের প্রস্তাবে ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারার এক অভিশাপ weightage গিয়াছে, পৃথক নির্বাচনের স্থলে নূতন রাষ্ট্রবিধিতে যৌথনির্বাচন প্রবর্তিত হইলে দ্বিতীয় অভিশাপও দূর হইবে—সাম্প্রদায়িক সমতা সমাধান তখনই সহজ হইয়া আসিবে।

“স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র”—

ভারতবাসীর লক্ষ্য

গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছেন :

“এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে। ব্রিটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের বহির্ভূত অপরাপর অংশ এবং অজ্ঞাত যে সমুদয় অঞ্চল স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প এই গণ-পরিষদ ঘোষণা করিতেছে।

“ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ (তাহাদের বর্তমান সীমানাসহ অথবা গণ-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানাসহ অথবা শাসনতন্ত্র-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত সীমানাসহ) আন্বকর্তৃত্বশীল অঞ্চল হইবে। উহারা অসংজ্ঞিত ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপরে অপিত ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে স্বাভাবিকই যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহাতে গিয়া বর্তে, সে সমুদয় ব্যতীত অপর সমুদয় শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে।

“স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, অঙ্গরাজ্যসমূহ এবং শাসনযন্ত্রের সমুদয় মূলধার হইতেছে জনসাধারণ। এই যুক্তরাষ্ট্রে এবং অঙ্গরাজ্যসমূহে ভারতের জনগণের অর্থ-

নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভায়বিচার, সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান ব্যবহার পাইবার অধিকার থাকিবে। বাক্যের, ধর্মের, বৃত্তির, উপাসনার, জন্মগঠনের স্বাধীনতাও তাহাদের থাকিবে এবং সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও খণ্ডজাতীয় অঞ্চল এবং অমরত শ্রেণীগুলির ক্ষয় উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সুখ ও অখণ্ড থাকিবে। সভ্যজাতির আইনকাহন অগ্রদারে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার থাকিবে। এই সু-প্রাচীন দেশ বিশ্বের দরবারে তাহার জায আসন লাভ করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণসাধনে ভ্রতী হইবে।”

প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া পণ্ডিতজী একটি উদ্বীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “আমরা এক নূতন যুগের সমীপবর্তী হইয়াছি। আমরা কি করিতে ইচ্ছা করি এই প্রস্তাবে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী তথা বিশ্ববাসীর সহিত অন্তরের যোগস্থাপনই আমাদের অভিপ্রায়। প্রস্তাবটি একটি সহজ-বাক্যের ভায়, সুকল্প পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। যত্নের ছায়ায় আচ্ছাদিত পথ আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আমরা আবারও সেই পথে চলিব। সর্বশ্রেণীর দেশবাসীর যথাসম্ভব সহযোগিতা অর্জনের জন্ত আমরা অবশ্যই সর্বপ্রকার চেষ্টা করিব কিন্তু আমাদের মূল আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিসর্জন দিয়া সে চেষ্টা করিব না।”

প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে গণ-পরিষদে যোগদানে লীগের আগন্তি আরও দৃঢ় হইতে পারে এই আশঙ্কায় ডাঃ জয়াকর উহা স্থগিত রাখিবার জন্ত অগ্ররোধ করিয়াছেন। কিন্তু গণ-পরিষদের প্রায় সকল সদস্যই উহা স্থগিত রাখিতে অনিচ্ছুক এই কারণে যে, নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করা অত্যাৱশ্যক। অত্যাৱ উদারনৈতিক নেতাদের মধ্যে সার গোপালবাসী আয়েদার এবং সার আল্লাদী কুরবাসী আয়ার উহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মত দিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিশ

মিঃ জিন্না লণ্ডনে জনসভায় বলিয়াছেন যে কলিকাতায় যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু—তাহারা হিসাবে শতকরা ২৬ জন—সেখানে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিতে চাহিবে ইহা চিন্তা করাও ভুল। কিন্তু কলিকাতা পুলিশের উচ্চতম পদগুলি কি ভাবে লীগ দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে ঐ যুক্তি কতটা ভিত্তিহীন, কেননা এখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে।

মুসলিম লীগের হাতে বাংলার গবর্নমেন্টের রাজস্ব ও ক্ষমতা কিরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কিছু নিদর্শন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সরকারী শাসনযন্ত্রের অপব্যবহারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন কলিকাতা পুলিশ। কলিকাতা পুলিশ শুধু কলিকাতা শহরের শান্তিরক্ষার জন্ত গঠিত হইয়াছে, প্রাদেশিক পুলিশের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। শহরে মুসলমান অধিবাসীর অসু-পাত শতকরা মাত্র ২৪ জন, কিন্তু পুলিশের উচ্চতম ক্ষমতাপূর্ণ পদের প্রায় সব কর্ণটিই তাহাদের অধিকারে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লীগের লোক মোতায়েন করা ছাড়া কলিকাতাতেই অপরাধ লম্বী, পেটোল প্রভৃতি প্রাপ্তির সুবিধাও রহিয়াছে, যাতায়াতের রাস্তাঘাট এখানেই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, এখানেই লীগের ও গবর্নমেন্টের প্রধান কেন্দ্র, স্মরণ নেতৃবৃন্দ ও তদ্বির উভয়েরই সুবিধা।

কলিকাতা পুলিশের গঠনপ্রণালী এইরূপ : সকলের উপরে আছেন পুলিশ কমিশনার, তাঁর অধীনে বর্তমানে ১৬ জন ডেপুটি কমিশনার আছেন :

ডেপুটি কমিশনার	হেড কোয়ার্টার্স	ইংরেজ
"	(অতিরিক্ত)	"
"	(স্পেশাল)	"
"	সশস্ত্র পুলিশ	"
"	পোর্ট	"
"	(দুই জন) সিকিউরিটি কর্ণেল	"
"	স্পেশাল ব্রাঞ্চ	"
"	রিসিভারশিপ	হিন্দু
"	ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট	"
"	এনফোর্সমেন্ট	"
"	পাবলিক হেলথ	"
"	উত্তর বিভাগ	মুসলমান
"	দক্ষিণ বিভাগ	"
"	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (অতিরিক্ত)	"
"	শান্তি	"

ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদ দুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শহরের ২৫টি থানা ইহাদের অধীনে, থানায় দারোগা মোতায়েন করা ইহাদের কাজ। ইহার পরেই গুরুত্বপূর্ণ পদ স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, শহরের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহের ভার ইহার উপর। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদই লীগের অধিকারে রহিয়াছে। দাদার পূর্বে উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে একজন অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কঠোর হস্তে দাঙ্গাকারীদের শাসনোত্তাপ করিয়া এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ইনি নিজ বিভাগেই শান্তি স্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে এই-উত্তর বিভাগেই শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত কল্যাণীশান,

লালাবাগান, ফুলবাগান, রাজাবাজার প্রভৃতি গুড়ার আড়া অবস্থিত। ইহার শাসন জীগের মনঃপূত না হওয়ায় অবিলম্বে ইহাকে সরাইয়া এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে জনৈক অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ মুসলমান কর্মচারীকে বেঙ্গল পুলিশ হইতে আনা হয়। এই পরিবর্তনকে গুড়ারা জয়লাভের নিদর্শন বলিয়া মনে করে এবং নূতন ডেপুটি কমিশনারের কার্যভার গ্রহণের পর হইতেই আবার দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যায়। ষানাতলাসী, গ্রেগার, আসামী চালান ও প্রাথমিক তদন্তের পর আসামীকে মুক্তিদানের ক্ষমতা ছই বিভাগীয় কমিশনারের আছে এবং এই সব কার্যেই দাঙ্গার পর হইতে বিষম পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারদের অধীনে ছই জন করিয়া এসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছেন। দাঙ্গার সময় ইহাদের তিন জন ছিলেন হিন্দু, একজন মুসলমান। সম্প্রতি একজন হিন্দুকে সরাইয়া সাম্প্রদায়িক হার সমান সমান করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে হিন্দু এসিস্ট্যান্ট কমিশনারটিকে সরানো হইয়াছে তিনিই দাঙ্গার সময় সবচেয়ে বেশী সাহস ও নিরপেক্ষ কত ব্যপরাগততার পরিচয় দিয়াছিলেন।

অপরাধের তদন্তের জন্ত কলিকাতা শহরকে সাতটি উপ-বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক জন করিয়া ডিভিসনাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মোতায়েন করা হইয়াছে। ইহাদের সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন মুসলমান, দুই জন হিন্দু। কোন মুসলমান এলাকার হিন্দু ইন্সপেক্টর নাই, কিন্তু হিন্দু এলাকায় মুসলমান ইন্সপেক্টর আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের বেলায় এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট।

তারপর থানা অফিসার। দাঙ্গার সময় ইহাদের সাম্প্রদায়িক অহুপাত ছিল নিম্নোক্তরূপ :

থানার নম্বর	এলাকা	ভারপ্রাপ্ত দারোগা
এ	ছামপুকুর	হিন্দু
বি	ছোড়াবাগান	মুসলমান
সি	বটতলা	"
ডি	বড়বাজার	"
ই	ঘোড়াসাঁকো	হিন্দু
এফ	সুকিয়া প্লট	"
জি	হেমার প্লট	মুসলমান
এইচ	বোবাজার	হিন্দু
আই	মুচিপাড়া	মুসলমান
জে	তালতলা	"
কে	পার্ক প্লট	হিন্দু
এল	হেপ্টিংস	মুসলমান
এম	কাশীপুর	হিন্দু
এন	চিংপুর	"

থানার নম্বর	এলাকা	ভারপ্রাপ্ত দারোগা
ও	মাণিকতলা	মুসলমান
পি	বেলেঘাটা	"
কিউ	এন্টালি	হিন্দু
আর	বেনিয়াপুকুর	মুসলমান
এস	বালিগঞ্জ	হিন্দু
টি	ভবানীপুর	"
ইউ	টালিগঞ্জ	মুসলমান
ডি	আলিপুর	"
ডব্লিউ	ওয়ার্ডগঞ্জ	"
ডব্লিউ ও পি	একবালপুর	"
এক্স	গার্ডেন রীচ	হিন্দু

শ্যামপুকুর, ছোড়াবাগান, বটতলা, বড়বাজার, সুকিয়া প্লট, মুচিপাড়া, কাশীপুর, চিংপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ ও আলিপুর এলাকায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। এই ১১টি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু ছয় জন মুসলমান।

তালতলা, মাণিকতলা, বেলেঘাটা, এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ডগঞ্জ এবং একবালপুর এলাকায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী। এই সব থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে এক জন মাত্র হিন্দু।

ছোড়াসাঁকো, হেমার প্লট, বোবাজার, পার্ক প্লট, হেপ্টিংস, ভবানীপুর ও গার্ডেন রীচ থানার এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের লোক প্রায় সমান সমান। এই সাতটি থানার পাঁচটিতে হিন্দু অফিসার।

দাঙ্গার সময় ২৫টি থানার মধ্যে ১৪টিতেই মুসলমান দারোগা মোতায়েন করা হইয়া গিয়াছিল, হিন্দু ছিল মাত্র ১১টি থানায়। দাঙ্গার পর ইহার আরও পরিবর্তন ঘটয়াছে, বর্তমানে ১৭টি থানার মুসলমান ও মাত্র ৮টিতে হিন্দু অফিসার আছেন। অথচ কলিকাতার মোট অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ হিন্দু।

থানায় মুসলমান দারোগার সংখ্যা বাড়াইবার জন্ত যোগ্যতার মাপকাঠি অনেক কমানো হইয়াছে। আগে অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর ভিন্ন বড় থানার ভার অপরকে দেওয়া হইত না, ছোট থানায় অন্ততঃ স্থায়ী ও অভিজ্ঞ সাব-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হইত। এই দুই পদে মুসলমানের সংখ্যা কম বলিয়া এ. এস. আইকে অস্থায়ী সাব-ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত করিয়া তাহাকেও বড়বাজারের ছায় থানার ভার দেওয়া হইয়াছে। বড়বাজার শুধু কলিকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তম থানা। অযোগ্যতা এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব আজকাল কলিকাতা পুলিশে উচ্চপদ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সুপারিশ হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুলিসে পক্ষপাতিত্ব

মুসলমান নিয়োগমাত্রই আমাদের আপত্তি ইহা মনে করা অমৌজিক। আমরা জানি কোন কোন মুসলমান অফিসার নিরপেক্ষতার সহিত কতব্য পালন করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উপরিওয়ালাদের জ্ঞত তাহা করিতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের সুবিধার জ্ঞত অযোগ্য এবং অসামান্য কর্মচারীদেরও উচ্চপদে বহাল রাখায় আমাদের আপত্তি।

শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশের আচরণ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিলে নাগরিক সাধারণের কি অবস্থা হয় কলিকাতার তিন-চতুর্থাংশ লোক তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। ২৫টি থানার ১৭টিতে মুসলমান অফিসার এবং তাঁহাদের উপরিওয়ালারাই ছই জনই লীগওয়ালার। এই অবস্থার থানায় একাধার লিপিবদ্ধ করা, তদন্ত, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, জামিনে মুক্তিদান, প্রাথমিক তদন্তের পর মুক্তিদান, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব চলিতে পারে, চলিতেছেও। অভিযোক্তা মুসলমান হইলেই নাম মাত্র অছিলার পাইকারী হারে গ্রেপ্তার চলে অথচ মুসলমান এলাকার হিন্দু নিহত হইলেও তার কোন প্রতিকার হয় না। ১৬ই আগষ্ট হইতে এই যে পক্ষপাতিত্ব শুরু হইয়াছে আজও তাহা অব্যাহতই রহিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে এ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। বরং দাঙ্গার সময় পুলিশের দায়িত্বপূর্ণ পদে এক্রপ কর্মচারীর অহুপাত যাহা ছিল এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে।

পুলিস কমিশনারের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সকলের নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মহরমের দিন শিয়া শোভাযাত্রাগুলি ধীর ও শান্তভাবে রাস্তাপথ অতিক্রম করিয়াছে, কোথাও সাধারণতঃ গোলযোগও হয় নাই; পথের দুই পার্শ্বে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া লোকে উহা দেখিয়াছে। কিন্তু সারকুলার রোড ধরিয়৷ অপরাক্তে স্ত্রীদিদের প্রায় লাঞ্ছনামূলক লোকের যে শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহাতে প্রায় সকলের হাতেই লাঠি ও মশাল ছিল এবং ইহার বহুস্থানে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেরা চিল ছুড়িয়া বাড়ীর লোকের নামে দোষ দিয়াছে এবং কোন কোনস্থানে আক্রমণও করিয়াছে। এই গোলযোগে অল্প সংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান আহত এবং নিহতও হয়। অথচ পুলিশ কমিশনারের আদেশে আক্রান্তদের পাড়াতেই ব্যাপক খানাতল্লাসী হইল, বহুসংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হইল, অত্যন্ত চড়া হারে পাইকারী জরিমানাও বসিল। পূর্ব কলিকাতার এটালি, বেনিয়াপুঙ্কর প্রভৃতি এলাকায় হত্যা ও মৃতদেহ প্রাপ্তির পরেও খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতি কিছুই হইল না। মহরমের দিন সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় কংগ্রেসকর্মী ননী সেন নিহত হন, এই হত্যারও কোন কিনারা আজও হইল না এবং যে অঞ্চলে দিবা দ্বিপ্রহরে ইহা ঘটিল সেখানেও কোন কিছুই হইল না।

একদিকে শহরের শান্তিরক্ষা অপর দিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা এই দুটোনার পড়িয়া পুলিস কমিশনার নিত্য মৃত্যু পথ অবলম্বন করিতেছেন। এবং পরস্পর-বিরোধী আদেশ দেন ঘন ঘন জারি হইতেছে। দাঙ্গার মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের আদেশ দেওয়া হইল যে দাঙ্গাকারীদের উপর বলপ্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা যেন উহাদিগকে মিষ্ট কথায় নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া যাইবার তিন সপ্তাহ পরে ৬ই সেপ্টেম্বর ইনস্পেক্টর ও সার্জেন্টরা অস্ত্র ব্যবহারে অমুমতি লাভ করিলেন। চিল সম্বন্ধে প্রথমে আদেশ হইল ইষ্টকণ্ঠ বাড়ীতে পাওয়া গেলে তার স্বত্ব কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক দিন পরেই উহা বাতিল করিয়া প্রকুম হইল, যে বাড়ীতে ইন্টের টুকরা মিলিবে সেখানকার লোকজনকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। পূর্বে যেখানে বড় থানার ভার অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টর এবং ছোট থানার ভার অভিজ্ঞ সাব-ইনস্পেক্টর তিন আর কাহাকেও দেওয়া হইত না, সেখানে এখন এসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর অর্থাৎ ছোট কনষ্টেবল পর্যায়ের লোককে বৃহত্তম থানার ভার পর্যন্ত দেওয়া হইতেছে। ইহার কারণ উচ্চপদে মুসলমানের সংখ্যান্বতা। থানার ভার বেশী করিয়া মুসলমান কর্মচারীদেরই হাতে দেওয়ার জ্ঞত সমগ্র পুলিশবাহিনীর যোগ্যতা এইভাবে নামাইয়া আনা হইয়াছে। অকর্মণ্যতা ও পক্ষপাতিত্ব ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইবে তাহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই। এই ব্যবস্থার শহরের শান্তিরক্ষা চলিতে পারে না, অথচ পুলিস কমিশনার পূর্বানুসৃত নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতেও অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। মৃতরাং থানাগুলি লীগের হাতে রাখিবার জন্য তাঁহাকে ঘন ঘন মত পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। বর্তমান থানার অফিসারেরা শান্তিরক্ষায় একেবারেই অক্ষম, পদে পদে ইহা প্রতিপন্ন হইতে দেখিয়া অক্টোবর মাসে পুলিস কমিশনার গোলযোগপূর্ণ কয়েকটি এলাকার থানায় ইনস্পেক্টর পাঠাইয়া উহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। এই শক্তিবৃদ্ধিও পরিকল্পিত ভাবেই করা হইল যাহাতে লীগের শক্তি অব্যাহত থাকে। মুসলমান যে অল্প কয়েকটি ইনস্পেক্টর আছেন তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া মুসলমান এলাকায় মোতায়েন করা হইল। উত্তর বিভাগের মুসলমান ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিতে আরম্ভ করার সেখানে একজন ইংরেজকে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনাররূপে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু আন্দোলন মন্দীভূত হওয়া মাত্র তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, পুলিস কমিশনার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। পুলিশের অত্যাচার রীতিমত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওয়েলিংটন প্লাটে পুলিস কতৃক মৃত লরীর উপর দণ্ডায়মান একটি লোক তিন জন পুলিস কর্মচারীর রিকলবারের গুলীতে নিহত হয় এবং তিন

ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হওয়ার কথা, কিন্তু কিছুই হয় নাই। উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে এক বাড়ীর অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া এক উড়িয়া মালীকে রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন বলিয়া শিয়ালদহ আদালতে অভিযোগ আসে কিন্তু সরকারের বিনা অগ্রুমতিতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। মানিকতলা থানার এক সার্কেলের বিরুদ্ধে ঘরে ঢুকিয়া গুলিচালনা ও মারপিটের অভিযোগে মামলা চলিতেছে। এই সমস্ত ঘটনার পর পুলিশের স্বৈচ্ছাচারিতা বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকার যেরূপ আদেশ দেন তাহাতে উহাদের কোনও দায়িত্বের বাধা রহিল না। স্বাভাবিক অবস্থাতে যে সময়ে সংঘের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সেই সময়ে এই শ্রেণীর ঢালা হুকুম পাইলে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে পরিপূর্ণ পুলিশ কর্মচারী জনসাধারণের নিকট অভিলাপ-স্বরূপ হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই।

শ্রমসচিব ও শ্রম-সম্বন্ধীয় নীতির খসড়া

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত-সরকারের শ্রমসচিব ত্রিযুক্ত জগজীবনরাম মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বলিয়াছেন যে, মানবসমাজের সুখ ও কল্যাণের মূলে শ্রমিকেরা রসদ জোগাইতেছে। তাহার মাছুষের নানা অভাব মিটাইতেছে। সেইজন্য সমাজেরও কর্তব্য যাহাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় তাহা দেখা। এই সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান অরগানাইজেশন অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ারস, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব এমপ্লয়ারস, অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার-এর প্রতিনিধিগণকে শ্রমসম্বন্ধীয় আইনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল।

পরিকল্পনাটিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের এবং তাহাদের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা বৃদ্ধির ও পরিণামে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের শ্রম-মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে।

ত্রিযুক্ত জগজীবনরাম বলেন, এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অচুসারে খণ্ড খণ্ড ভাবে যেন শ্রমবিষয়ক আইন পাস না হয় ও অমনোযোগের সহিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির নামে খাপছাড়া ভাবে যাহাতে কিছু করা না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্ত বৃদ্ধ বয়সে পেনশন ও বেকার অবস্থার জন্ত যে ব্যবস্থা আছে, ও সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের যে রীতি আছে, আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা যাহাতে অবিলম্বে প্রবর্তন

করা যাইতে পারে সেই প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যতটা সম্ভব এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত চেষ্টার ক্রটি হইবে না। “আমি এই সঙ্গে জোর করিয়া বলি যে এখন আমাদের উৎপাদন কেবলই বাড়াইয়া তোলা প্রয়োজন।”

দেশীয় শ্রমিকদের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আমাদের শ্রমিক সম্প্রদায় কাহারও হইতে এতটুকু পিছাইয়া নাই। তবে সমস্তার কথা এই যে ভারতীয় শ্রমিকগণ উপযুক্ত শৃঙ্খলা, সরঞ্জাম ও সুসম্বন্ধতার অভাবে উন্নতিশীল হইতে পারিতেছে না। আমেরিকানগণ যাহাকে বলে, ‘কান্দা’ (know how) তাহা আমাদের শ্রমিকগণের জ্ঞান নাই। যখন আমরা এই সকল ক্রটি সংশোধন করিয়া প্রচুর উৎপাদন করিতে পারিব তখন আমাদের জীবনযাত্রার মান আশাহরূপ উন্নত করিবার সুযোগ মিলিবে। “আমরা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করি, তবেই সাধারণ শ্রমীর লোকেরা জিনিষপত্র পাইবে। পৃথিবীর সমস্ত ধনিকই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন যে শ্রমিকগণই তাঁহাদের সবচেয়ে বড় ধরিকার, যদি তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহারা জিনিষপত্র ইচ্ছানুরূপ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। অতরাং আমাদের বাণী হউক,—জনসাধারণ ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়ান।

“আমাদের কর্তব্য নির্ধর্তের একটি প্রধান কথা হইতেছে শ্রমিকগণের জীবিকার মান বাড়ান। আমি কয়লার খনির শ্রমিকদের বেতন প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার জন্ত একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। এই কমিটি কয়লার খনির শ্রমিক ও অজ্ঞাত শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকগণের বেতন সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন করিবেন আমি পরবর্তী কনফারেন্সে তাহার উপরভিত্তি করিয়া শ্রমিকগণের বেতন বিবেচনা করিব।

“একমাত্র বেতনবৃদ্ধির ফলেই জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। তবে যদি বেতন বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকেরা কাজ কম করে তাহা হইলে তাহার নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। বেতন বৃদ্ধির ফলে যদি তাহার শিল্পদ্রব্যাদি কিনিতে এবং অজ্ঞাত সুবিধার জন্ত তাহা ব্যয় করিতে না পারে তাহা হইলে বেতন বৃদ্ধি বৃথা হইবে।

“আমি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছি, কারণ ইহার অভাবে বিপদের আশঙ্কা আছে। আমার একথা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। এখনও পর্যন্ত দেশে নানা প্রকার শ্রমিক চাকল্য ও আন্দোলন দেখা যাইতেছে। কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার ফলে আমাদের যতটা প্রয়োজন আছে সেই পরিমিত জিনিষ বাজারে কিনিতে পাইতেছি না। উদাহরণস্বরূপ, কয়লার কথা ধরা যাইতে পারে। যদি কয়লার উৎপাদন কম হয় তাহা হইলে যানবাহন, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি যথাযথ ভাবে চালান সম্ভব হইবে না। ইহা হইতে ইম্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতিরও অহরূপ

অভাব পড়িবে। ইম্পাত ও সিমেন্ট না হইলে কেবলমাত্র যে বাড়ীঘর তোলা যায় না তাহা নহে, ইহার অভাবে বৃহৎ শিল্প-গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং ফলে আরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।”

জীবনযাত্রার মানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে না পারিলে মজুরী বৃদ্ধি যথা ত হইবেই, উহা ক্ষতিকরও হইয়া উঠিতে পারে। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যক কিন্তু উহা সুপরিকল্পিত ভাবে না হইলে উহার মূল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

প্রমের ও উৎপাদন শক্তির মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এ বিষয়ে আমাদের দেশে দুই মত থাকিতে পারে না। কিন্তু আলস্তের অবকাশ বাড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রয়-মূল্য বাড়াইয়া দিলে এ দেশের শ্রমিকদিগের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হইবে। এ কথা যাহারা বুঝিয়াও বুঝেন না তাহারাই শ্রমিকদিগের প্রধান শত্রু। ত্রীমুখ জগজীবনরামের উপদেশ তাহাদের কাণে কিরূপ ঠেকিবে তাহাই প্রশ্ন।

সার্জেন্ট রিপোর্ট

ভারত-সরকার সার্জেন্ট রিপোর্টের মূলনীতি এত দিনে স্বীকার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রদেশসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে আর সকল প্রদেশই এই পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-প্রণালী গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন স্থানগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ইহা ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারগুলির পরিকল্পিত প্রণালীও ইহার সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইতে আন্দাজ ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত অনুমোদন করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার আর একবার বিষয়টিকে বুটিয়া দেখিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত বহু প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যাহা হউক, শীঘ্রই সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় তাহা এখনই আরম্ভ করিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, উচ্চ ধরনের টেকনিক্যাল শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিং ব্যবস্থা এবং যাহারা বহুদিন ধরিয়া কাজ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে তাহাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে একে একে শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা : প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রণালী অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি স্থির হইয়াছে :

(১) ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলকে বিনামূল্যে আবশ্যিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই-ই) দেওয়া হইবে। কিন্তু সকল প্রদেশে এই ব্যবস্থা হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে এই সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের বালক-বালিকা নির্বিশেষে দেওয়া হইবে। অষ্টাঞ্চ প্রদেশগুলিতে ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা তাহা পরিকল্পনা করিয়া বলা হয় নাই। তবে ৬ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার কথা উল্লিখিত আছে। প্রাদেশিক সরকারগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্ত মোটামুটি ভাবে ৫৬.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে কাজ আরম্ভের জন্ত ২০.৫২ কোটি ও ধারাবাহিক ধরচা হিসাবে ৩৬.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত হইয়াছে।

(২) টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত নিম্নলিখিত উপায় অনুসরণ করা হইবে :

প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার কম-বেশী ৫০০ ছাত্রকে প্রতি বৎসর টেকনিক্যাল শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত বাহিরে পাঠাইবেন। একটি অল-ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার কার্য হইবে বর্তমানে কি প্রণালী ও পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত তাহা স্থির করা। প্রাদেশিক সরকারগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যোগ করিয়াছে—

(১) ১৬০টি নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। তাহার মধ্যে ১০৫টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ভোকেশ্যনাল স্কুল, ৩৫টি টেকনিক্যাল হাই স্কুল, ১৬টি পলিটেকনিক ও ৪টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হইবে।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্ত ৭ কোটিটাকার অধিক ব্যয় হইবে। প্রতি বৎসরের চলতি ব্যয় হিসাবে মোট ৪.৪৩ কোটি টাকা পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত উহা কমিয়া ২.১৪ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রস্তাব অনুসারে অধুনিপুণ শিল্পী ও মিস্ত্রীদের, ফ্যাব্রিক্যানদের, টেকনোলজিষ্টদের উচ্চ এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ এমন ভাবে দেওয়া হইবে যাহাতে তাহার পরে কলকারখানার দায়িত্ব লইতে পারে। সেইজন্ত যে টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইবে তাহা হইতে প্রতি বৎসর হাজার এঞ্জিনিয়ার তৈয়ার হইতে পারিবে। ইহার গোড়াপত্তনের জন্ত ৩ কোটি টাকা

এবং বাৎসরিক চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্ত ০.৪৬ কোটি টাকা লাগিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজে বঙ্গালোরের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' ও 'দিল্লীর পলিটেকনিক' সাহায্য করিবে। এই চারটি প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা স্থাপিত কলেজ হইতে প্রতি বৎসর ৪০০০ এঞ্জিনিয়ার বাহির হইবে। টেকনিক্যাল শিক্ষার শিক্ষকদের জন্ত টেকনিক্যাল টিচার ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হইবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রাথমিক গোড়াপত্তনের জন্ত প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা ও বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্ত মোটের উপর ২৩ কোটি টাকা ব্যয় (তাহার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা গোড়াপত্তন ও ৭ কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয়) পড়িবে।

(৩) সাবালকী শিক্ষার জন্ত যে ব্যয়-ভার প্রাদেশিক গবর্নেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাতে ২.১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার শতকরা ২২ ভাগ প্রাদেশিক শিক্ষা পরি-কল্পনা অহুসারে ব্যয়িত হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার জন্ত মোটামুটি ভাবে ২.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ১.১৪ কোটি, আলীগড় ৭০ লক্ষ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্ত সাহায্য পাইবে। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনা প্রণালীর সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে অধ্যাপকদের ট্রেনিং বিদ্যালয়, শিক্ষকদের ট্রেনিং বিদ্যালয় ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও যোগ করা হইয়াছে। জীশিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ আরও কতকগুলি বিষয় ইহার সহিত যোগ করিয়াছে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং ও শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্বভারতীকে শিক্ষক ট্রেনিংয়ের জন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াকে সাহায্য দেওয়া হইবে।

সমবায় পরিকল্পনা সমিতির রিপোর্ট

ভারত-সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবায় পরিকল্পনা সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে মণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার প্রধান উপায় হইতেছে সমবায় সমিতি। বোম্বাই প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুত আর. জি. সরাসাইয়ের নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহার প্রদত্ত যে বিবৃতি

সর্বসাধারণে প্রকাশের জন্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, চাষবাস ও কল-উৎপাদন, পশুপালন, মাছের চাষ, কল বিক্রয়, কৃষিঋণ এবং অবসর সময়ের উপজীবিকা-রূপ শিল্পব্যবসায় ও মফঃস্বলের ঋণ-প্রদান ব্যবস্থা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি সব বিষয়েই রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই কমিটি সমবায় সমিতির গঠিতে যে সকল কার্যই পড়ে তাহার সকল কিছু লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং অবস্থিতে যাহাতে সব ব্যাপারে উন্নতি করিতে পারা যায় তাহার জন্ত উন্নত পরিকল্পনার খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছেন। কমিটির মতে পূর্ব ভূমিকাধরূপ যদি দেশে দায়িত্ববোধসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সরকার ও শিক্ষা-প্রচার ব্যবস্থা না থাকে তবে সমবায় সমিতি কোনক্রমেই সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

যদিও সমবায় নীতি অহুসারে কাহাকেও জোর করিয়া সমিতিতে যোগদানে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয় নহে তথাপি একথাও সত্য যে কতকগুলি বিষয়ে বাধ্যবাধকতার বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আছে। কমিটির প্রস্তাবিত উপায়ে সমবায় পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে ৫০ কোটি টাকা লাগিবে। সমগ্র দেশের উন্নতির হিসাবে এই টাকার অঙ্কটিকে মোটেই মোটা বলা যায় না। সমবায় প্রথা অর্থনৈতিক সকল কাজের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া সরকার কর্তৃক যে পরিমাণ টাকাই সমবায় সমিতির উন্নতি সাধনে ব্যয় করা হউক না কেন, তাহা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিতে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই কমিটির অহুমোদিত কয়েকটি পন্থা এইরূপ :

• সমবায় সমিতি গঠনে সরকারী সাহায্য ও নির্দেশের প্রয়োজনকে অগ্রাহ করা চলে না। যাহাতে দেশের জনমত সমবায় নীতির উপযোগী হইয়া উঠে তাহার জন্ত সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতি পরিচালনায় এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাহাতে সমিতির সরকারী কর্মচারীদের সহিত বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও পরামর্শের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে।

প্রাদেশিক সরকারগুলির একটি কর্তব্য জরীপ-করিয়া দেখা যে কি পরিমাণ চাষযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় আছে এবং চাষবাস ও কল-উৎপাদনে তাহার কতটা সম্ভাবহার করা যাইতে পারে। জলসেচনের ব্যাপারটি একমাত্র সরকার কর্তৃকই পালিত হইতে পারে, কারণ সরকারী ব্যবস্থা ও অর্থ সাহায্য ছাড়া কৃষকগণের হাত দিয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।

চাষবাসে ও চাষীর জীবনে সকল প্রকার ঝুঁকিয়া যাহাতে বজায় থাকে এইরূপ সকল কার্যই সমবায় প্রণালী দ্বারা স্থির হওয়া উচিত এবং যাহাতে সদস্যগণের বাসস্থানের উন্নতি করা যায় তাহার জন্তও একটি সমিতি স্থাপন করা উচিত।

যাহাতে গ্রামগুলির অধিক ও গ্রামবাসিগণের শতকরা ৩০ জন সুশৃঙ্খল সমবায় ব্যবহার অধীনে দশ বছরের মধ্যে আসিতে পারে তাহার আয়োজন করা একান্ত কৰ্তব্য।

চাষের জন্ম রুহৎ ক্ষেত্র গঠন করিলে বহু ব্যাপারে আশা-প্রদ ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ফল ও সজীর চাষের ব্যাপারে উৎপাদন-ক্ষেত্র বড় করিলে বিশেষ সুফল পাইবার আশা আছে। অরণ্য-রক্ষা ও তাহার বন্দোবস্তের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সরকারী দায়িত্বে হওয়াই উচিত। পশু-পালন-বিভাগ ও পশুস্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগের কেন্দ্রগুলি এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক গো-স্বামী তাহার সাহায্য পাইবার পুরোপুরি সুযোগ ভোগ করিতে পারে। সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দুগ্ধ-সরবরাহ কেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট শহর হইতে ৩০ মাইল পরিধির মধ্যে হওয়া দরকার। শহরে দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করিবার জন্ম অন্ততঃ ৩০০টি দুগ্ধ-সরবরাহ সমিতির প্রতিষ্ঠা পাঁচ বছরের মধ্যে করা প্রয়োজন। ইহার জন্ম প্রথমে যে ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণ ও পরের বাৎসরিক ব্যয়ের অধিক সরকারকে দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে হাঁস-মুরগির চাষ ও পালন ব্যবস্থা করিবার জন্ম প্রাদেশিক গবর্নমেন্টকে খরচ যোগাইতে হইবে।

বিক্রয়যোগ্য শস্তাদি ও চাষবাস সম্বন্ধীয় জিনিষপত্রের বাৎসরিক উৎপত্তির শতকরা ২৫ ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে বিক্রয় করা যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্মও চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে।

সারা ভারতবর্ষের বিক্রয়ের সামগ্রিক বিধানের জন্ম একটি নিখিল-ভারত সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করা উচিত। এই সমিতি সকল প্রাদেশিক সমবায় বিক্রয়-সমিতির সংযোগসাধন ও সামগ্রিক বিধান করিবেন এবং অনেকটা ব্যাক্তের 'ক্লিয়ারিং হাউস'র মত চাষবাস সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আদান-প্রদান রক্ষা ও খোঁজ-খবর দেওয়ার কাজ করিবে।

স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, অবসর সময়ের উপজীবিকার জন্ম শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গৃহশিল্পের জন্ম প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় উন্নতিবিধায়িনী সমিতি স্থাপন করা যাহাতে পারে।

প্রত্যেক শহরেই সমবায় ব্যাংক স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক সমবায় বিভাগেই একজন করিয়া জীলোক বিশেষ কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ইহাতে মহিলা সমাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের সহযোগিতা প্ৰাপ্ত হইয়া উঠিবে।

বিশ্বসভায় ভারতের জয়লাভ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে ফ্রান্স ও মেক্সিকোর প্রস্তাব আলোচনার উপস্থিতি হইলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি

নিধি সার হাটলি শক্ৰস জেনারেল স্মার্টসকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। বিষয়টি স্থিরভাবে বিবেচনার জন্ম অমুরোধ জানাইয়া তিনি বলেন, "ইহার ফল কি হইবে তাহা প্রশ্ন নয়—এই বিষয়ে আমাদের কি ক্ষমতা আছে তাহাই বিবেচ্য। ভাবের আতিশয্যে একটা কিছু করিয়া বসা উচিত হইবে না।" দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি স্মার্টস গবর্নমেন্ট যে ব্যবহার করিতেছেন বিশ্বসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে তাহা যুক্তি-সম্মত প্রতিপন্ন করা সহজ হইবে না বুঝিয়াই ব্রিটিশ প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে ক্ষমতা নাই বলিয়া ধূম্রা ভুলিয়া সমস্তা এড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন। কোন দেশের প্রতিনিধিই এই মনোভাব পছন্দ করেন নাই। বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচারদালতে প্রেরণ করিয়া সমগ্র সমস্তাটিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে আইনের গণ্ডিতে সরাইয়া দেওয়ার যে চেষ্টা জেনারেল স্মার্টস করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মিশরের প্রতিনিধি হাসান পাশা বলেন যে আন্তর্জাতিক বিচারদালতে প্রেরণ করিবার কোন কারণই ইহাতে থাকিতে পারে না। সোভিয়েট প্রতিনিধিও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ত্রিমুখী বিশ্বলক্ষী পণ্ডিত সার হাটলির উক্তির সমুচিত জবাব দেন। তিনি বলেন—

দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বর্ণবৈষম্য এবং পৃথক্করণের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহাদের এই ব্যবহার বিশ্বসভার মূল সনদের বিরোধী। এই অভিযোগের যৌক্তিকতা তাহাদের এই স্বীকৃতির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

বহু বৎসর ধরিয়া ভারত-সরকার আবেদন জানাইয়াছেন, অভিযোগ করিয়াছেন, প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, আপোষ-মীমাংসার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ভারত-সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন এবং পৃথিবীর জনমতের সম্মুখে বিষয়টি বিচারের জন্ম আনয়ন করেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা-সরকার এখনও এসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বিশ্বসভার অধিবেশন চলার সময়ও তাহাদের ঐ অত্যাচার আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথাও তাহারা বলেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার বিশ্বসভার সনদের মূল সত্যকে স্বীকার করিয়া তাহার অবমাননা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সরকার এমাবৎ বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও অচ্চ কর্মচারীর বিবৃতি মারফৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় বিবেচকের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। এই অবস্থায় বিশ্বসভার সভ্য হিসাবে আমাদের যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমাদেরকে স্মরণ রাখিতে হইবে। নূতন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা যদি প্রাচীন সংস্কার ও মত অমুসারী পথ চলিতে চেষ্টা করি, তাহা

হইলে আমাদের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। লক্ষ লক্ষ লোক কেবলমাত্র বর্ণ ও সম্প্রদায়ের দোষে সমাজের নিম্নস্তরে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। তাহারা কণ্ঠহারা হইয়া সুবিচারের আশায় আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র আশুবিচারের ভিত্তিতেই আমরা পৃথিবীতে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারি। ভারতের, এশিয়ার অজ্ঞাত স্থলের ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ লোকের মন আজ সর্বপ্রকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের নগ্ন রূপ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য সম্বন্ধে সার হার্টলি শক্স যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি সুরুচির পরিচয় দেন নাই। তিনি নিজেই জানেন যে, এই সকল অনৈক্য বাড়াইয়া তুলিবার ব্যাপারে ব্রিটেন কি খেলা খেলিয়াছে। তথাপি এই সকল বিভেদের কথা বলিতে তিনি তাঁহার মনের আনন্দ একটুও গোপন করেন নাই। এ বিষয়ে পরিষদ কি মত গঠন করিবেন তাহা আমি তাঁহাদের উপরই ছাড়িয়া দিতেছি। ভারত আজ স্বাধীনতার পথ ধরিয়া একান্ত চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ সমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জ্ঞও সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

যে সকল সদস্য-রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ত্রীযুক্তা পণ্ডিত সভাপতি ডাঃ স্নাকের দিকে ফিরিয়া বলেন, “আপনাকে এবং এই পরিষদকে এই বিষয়ে কতব্য পালনের জ্ঞ জ্ঞান দিতেছি। আমরা এ কথা চিরদিন স্মরণ রাখিব যে সত্য ও জ্ঞানের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই চিরকাল সমর্থন লাভ সম্ভব।

ভারতীয় প্রভাবে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরোধিতাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক এই দুই দেশ এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর খেতপ্রাচীর ও অস্ত্রবলসম্বল রাজনীতির মোহ ছাড়িতে পারে নাই—পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা অশুভ লক্ষণ।

বিশ্বসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা

নিউ ইয়র্ক যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে প্রতিনিধিদলের অধিনেত্রী ত্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন,

“মানুষের যে মূল অধিকার বজায় থাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর যে সকল নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা দূর করা ও যে সকল মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার তাঁহাদের আছে,

তাহা যাহাতে তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে তাহারই প্রচেষ্টা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস যত দিন একটি জাতি অপর জাতির সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে তত দিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই উদ্দেশ্য ও আশা সাফল্যলাভের সুযোগ পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাব-কমিটিতে ও সাধারণ সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্পে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইন্স প্রস্তাবটির প্রচণ্ড বিরোধিতা করিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার কোন আপত্তিই টিকিতে পারে নাই। জেনারেল আইন্স যে সকল যুক্তি ও দাবী তাঁহার ক্রসেলেস বক্তৃতায় উল্লেখ করেন ত্রীযুক্তা পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলেন, “তিনি (জেনারেল আইন্স) বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যাতে ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দেখাইবার জ্ঞ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা তাঁহাদের ঘরোয়া সমস্যা নহে। আমরা ইহাকে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা বলিয়া মনে করি।”

তিনি জেনারেল আইন্স কথিত ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর নেতৃত্বের দাবির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, “ইউরোপের বাহিরেও জগতে বহু দেশ আছে। তাহাদের দান ষেতান্দের অপেক্ষা কম নহে। এই ভাবে তাহাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। ভবিষ্যতের নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবার জ্ঞ সমস্ত জাতি সম-অংশীদার হিসাবে সহ-যোগিতা করিবে—ইহার উপরেই শান্তি নির্ভর করে। এই সহজ সত্য গৃহীত না হইলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে।” দক্ষিণ-আফ্রিকার দিকে তাকানোর আগে ভারতবর্ষ নিজের অস্পৃশ্যতা দূর করুক এই উক্তির জবাবে ত্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী বলেন, “ভারতের অল্পমত শ্রেণীর সমস্যা জাতিগত সমস্যা নহে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার মধ্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত আছে। স্বকেষ-বর্ণ যৈত, নম্ন বলিয়াই সে খেতজাতির প্রভুত্ব মানিয়া লইবে না।”

পরিশেষে তিনি বলেন, “ভারতবর্ষ দক্ষিণ-আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের জ্ঞভূমি—ইহাদের জ্ঞ বিশেষ দরদ অল্পভব করা ভারতবাসীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

১৩ই নবেম্বর তারিখে ফিল্ড মার্শাল আইন্স যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিগণের বিবৃতিকে আক্রমণ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি সার মহারাজা সিং তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন, “তিনি (জেনারেল আইন্স)

হয়ত এই কারণেই বেশী চট্টায়েছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আঙ্গাসং করিবার জন্য তিনি যে প্রস্তাব আনিয়াছেন, এনিয়ার এক প্রতিনিধি তাহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল আর্টস্ যে একা পড়িয়াছেন, তাহাতে আমি সহানুভূতি জানাইতেছি। একমাত্র ব্রিটেন তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছে। হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী তাহাদের দেশকে রিপাব্লিকে পরিণত করিতে চাহে ইহা বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ ব্রিটেন ইউনাইটেড কিংডম ও দক্ষিণ-আফ্রিকার যোগাযোগ রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট স্তর বলিয়া আর্টস্কে মনে করেন।”

ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়া আর্টস্ বলিয়াছেন যে যেহেতু ভারতে জাতিভেদ বর্তমান সেইজন্য ভারত-বর্ষের দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার নাই, ইহার উত্তরে সার মহারাজ সিং বলেন, “ফিল্ড মার্শাল আর্টস্ ভারতের জাতিবৈষম্য ও তপশীলী সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, ভারতে প্রত্যেক অধিবাসীর আইন, রাজনীতি, মিউনিসিপ্যাল ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাপারে সমান অধিকার আছে।” দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন, “ভারতের যে প্রতিনিধিদল জাতি-পুঞ্জের অধিবেশনে গিয়াছে তাহার ২০ জনের মধ্যে তিনটি পৃথক ধর্মাবলম্বী ও বহু জাতির লোকই আছে। বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য প্রত্যেক মন্ত্রীসভায়ই একাধিক তথাকথিত তপশীলী শ্রেণীর লোক মন্ত্রীরূপে অষ্টাশ মন্ত্রীদের সহিত সমমর্যাদা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চালাইতেছেন।...ফিল্ড মার্শাল আর্টস্ কি তাহার দেশে আফ্রিকান বা অষ্টাশ জ-ইউরোপীয়ানদের সম্পর্কে এইরূপ কোন ব্যবস্থার কথা বলিতে পারেন? তাহারা কি ব্রিটিশদের সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পাইয়া থাকে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মুখে তিনি যে প্রতিনিধিদল লইয়া আসিয়াছেন তাহার মধ্যে একজনও আফ্রিকান প্রতিনিধি নাই কেন? আসলে আমাদের মত তাহার সাহস নাই।”

তিনি আরও বলেন, “দুই জন ইউরোপীয়, দুই জন মার্কিন, দুই জন এসিয়াটিক এবং দুই জন আফ্রিকানকে লইয়া একটি প্রতিনিধি দল (অবশ্য ইহারাই ইউনিয়নের বাহিরের লোক হইবেন) দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করিয়া দেখিয়া আশ্রন সেখানে কি ঘটতেছে এবং সেখানকার আফ্রিকানদের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের সহিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা যুক্ত হওয়া উচিত কি না।”

২৫শে নবেম্বর তারিখে জেনারেল আর্টসের প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিবাদপ্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি বিচারপতি চাগলা এক জবাব দিয়াছেন। বিচারপতি চাগলা বলেন, “যাহারা এসিয়াবাসী নহে, এই ব্যাপারটিকে তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে।” রাজনৈতিক ও আইন

কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন যে, এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অন্তিম নির্ভর করিতেছে।

তিনি আরও বলেন, “একথাটি সর্বপ্রায়েই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্নমেন্টের জরুরী অহরোধ জন্মেই তাহারা সেখানে গিয়াছিল। ঘরছাড়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তাহারা সেখানে যায় নাই। ফিল্ড মার্শাল আর্টস্কে আমি এইজন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি আমাদের দেশীয় লোকদের একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন নাই।”

অতঃপর বিচারপতি চাগলা বলেন, “জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্রত্যেকটি দেশ অভ্যন্তরীণ সনদ অনুসারেই যোগদান করিয়াছে। উক্ত সনদের চুক্তি সকলকেই মানিয়া চলিতে হইবে। এক কথা কি কেহ বলিতে চাহিবেন যে, স্বাক্ষরকারী কোন দেশ সনদের সত্য না মানিলেও তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের নাই? অভ্যন্তরীণ সনদের ভাঙ্গা যদি ইহাই হয় তবে উহাকে একখানি বাজে কাগজ মনে করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে।”

বিচারপতি চাগলা ইহার পর কমিটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, “কেহ কি বলিবেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকা দাসত্বপ্রথা প্রবর্তন করিলেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না? শুধু এইজন্যই ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বারংবার বলিতেছে উহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সমস্যা, আইনগত প্রশ্ন নহে। সমস্যাটি নিতান্তই ঘোঁরা ব্যাপার কিনা তাহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিণতির উপরই নির্ভর করিতেছে। স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে একথা বলা প্রয়োজন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার মত ভারতে এমন কোন আইন নাই যাহাতে অহুন্নত সম্প্রদায় ও অষ্টাশ অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে... ভারতে অহুন্নত সম্প্রদায়কে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে সে সকল অধিকার যদি দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের দেওয়া হয় তবে ভারতবর্ষ ইউনিয়ন গবর্নমেন্টের সহিত মীমাংসার আলোচনা চালাইবে।”

২৭শে নবেম্বর তারিখে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অধিনেত্রী জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক ও আইনগত কমিটির বৈঠকে আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ হিটন নিকলসের বিষয়িত ও বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, মিঃ নিকলসের যুক্তিগুলি যেমন দুর্বল তেমনি আপত্তিকর। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া সোভিয়েট প্রতিনিধি ম° এণ্ড্রি গামিকো দক্ষিণ-আফ্রিকাকে জাতিগত বৈষম্য প্রদর্শনের দ্বারা সম্মিলিত-জাতি সনদের চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত করেন। বক্তৃতার শেষে সোভিয়েট প্রতিনিধি ত্রীযুক্তা পণ্ডিতকে করমর্দন করিয়া জানান যে, তিনি ভারতীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া ভোট দিবেন।

অতঃপর রাজনৈতিক ও আইন কমিটির বৈঠকে মেক্সিকো ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব ২৪-১৯ ভোট

গৃহীত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে উভয় দেশকে অর্থাৎ ভারত ও আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্পে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরেও অনেকেরই সংশয় ছিল যে প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত হইবে কিনা। কারণ এই সভাতে যদি প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের অধিক্যে গৃহীত না হয় তবে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল ম্যাটসের চূড়ান্তক্রমে প্রস্তাবটি সাধারণ সভায় ৩২-১৫ ভোট গৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বেত

স্বেচ্ছাচারের অন্তরূপে ব্যবহার

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের শ্বেত স্বেচ্ছাচারের একটি প্রধান অন্তরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার শিক্ষাপদ্ধতিকে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষকায় অধিবাসীদের জ্ঞান যেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে তাহাকে শুল্ক শিক্ষা তো কোনক্রমেই বলা চলে না বরং যাহাতে কৃষকায় বালক-বালিকাগণ ভবিষ্যতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ক্রীতদাস হইয়া উঠিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার দূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মালান একদা জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের জন-সমাজ যদি শিক্ষিত হয় ও জ্ঞান লাভ করে তাহা হইলে ইউরোপীয়দের সহিত জ্ঞানবুদ্ধির সমপর্যায়ে দাঁড়াইয়া তাহারা ইউরোপীয়দের চেয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে।

কোন দেশ একটি প্রধান সম্প্রদায়কে ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া জীবন-সংগ্রামে অপরিস্রবণ যে শিক্ষা তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া মালুমকে অসহায় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করাও কঠিন; কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহাই ঘটতেছে। কোন লোক যদি দক্ষিণ-আফ্রিকায় সপ্তাহ কয়েক মাত্র কাটাওয়া আসেন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে সত্যকে কেন কল্পনার চেয়ে বেশী অদ্ভুত বলা হয়।

ইউনিয়নের চারিটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীদের জ্ঞান আলাদা বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক শ্বেতকায় সম্প্রদায়ভুক্ত বালক-বালিকাদের (১৬ বছর পর্যন্ত) বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি প্রদেশে বাধ্যতামূলক না হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাও বিনা বেতনে দেওয়া হয়। ছাত্র-দের বিনা পয়সায় পুস্তকাদি সরবরাহও করা হয়—ছাত্রাবাসের সুবন্দোবস্তের কোন জট্র নাই। পয়সার অভাব অথবা স্কুল হইতে বাসস্থানের দূরত্ব কিছুই তাহাদের শিক্ষালাভের প্রতি-বন্ধকতা করিতে পারে না।

এশিয়াবাসী সম্প্রদায়ের জ্ঞান কিন্তু এ ধরনের কোন ব্যবস্থাই

নাই। এমনকি সামান্যতম পরিমাণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক-শিক্ষাও তাহাদের জ্ঞান বাধ্যতামূলক নহে। যে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই কৃষকায় ক্রীতদাস সম্প্রদায় তাহাদের ক্রীতদাসত্বের কতব্য সম্পন্ন করিবার জ্ঞান পটু হইয়া উঠিতে পারে সেইটুকুর বেশী শিক্ষা তাহাদের দেওয়া হয় না।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষকায় সম্প্রদায়ের সামান্য যে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার ব্যয় ইউনিয়ন গবর্নেন্ট বহন করে না। ছাত্রদের কাছ হইতে যে বেতন পাওয়া যায় তাহা হইতে অথবা কোন উদার মিশনারী সম্প্রদায় বা কোন কৃষকায় সম্প্রদায়ের নিছক ব্যয়ে এই সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত। জার্বানে ভারতীয়গণ নিচ্ছেদের উৎসাহে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি একটা উন্নত ধরনের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে যেন এ কথা মনে না করা হয় যে দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্নেন্ট কৃষকায় সম্প্রদায়ের শিক্ষালাভ সুনজরে দেখিয়া থাকে। বরং গবর্নেন্ট কৃষকায় সম্প্রদায়ের শিক্ষার উৎসাহ নিবাইয়া দেওয়ার চেষ্টাই সর্বপ্রকারে করিয়া থাকে। আফ্রিকার শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬৬ জনের বেশী শিক্ষালাভের সুযোগই পায় না। যাহারা পায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪ জন পঞ্চমমান (Class five standard) পর্যন্ত পৌঁছায় না। ১৯৪৩ সালে আফ্রিকাতে মাত্র ১৯৩ জন প্রবেশিকা ধাপ পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল। শতকরা হিসাব করিলে দেখা যায় তাহা জনসংখ্যার ০৩৫টি মাত্র। শতকরা ৯০ জন কৃষকায় ও এশিয়াবাসী সম্প্রদায়েরই ছাত্র স্কুলে ভর্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা ১০ জনও তৃতীয়মান (Class III) পর্যন্ত পৌঁছায় না।

১৯৪৫ সালে ইউনিয়নের ফোর্ট হেন্সারে অবস্থিত কলেজ-গুলিতে কৃষকায় সম্প্রদায়ভুক্ত ৫০৭ জন ছাত্র ভর্তি হইতে গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ২৭০ জন আফ্রিকান ও বাকী সকলে অন্যান্য কৃষকায় সম্প্রদায়ের ছাত্র। কৃষকায় বলিয়া ইহাদের কাহাকেও কলেজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। জেনারেল ম্যাটসের “উদারনৈতিক” গবর্নেন্ট এই বলিয়া সাফাই গাধিয়াছেন যে কৃষকায়দের শিক্ষা-বিভাগের জ্ঞান দায়ী অর্থাভাব। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে বিভাগীয় রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ইউরোপীয়দের শিক্ষার ব্যয় কৃষকায় সম্প্রদায়ের জ্ঞান মাথাপিছু যে ব্যয় হয় তাহার দশ গুণ। ইহাই কি অর্থাভাবের নমুনা?

শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভাগীয় কমিটি পরিষ্কারই বলিয়াছে যে, সাদা চামড়ার শিশুদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা প্রভু সমাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে এবং কাল চামড়ার শিক্ষার যাহাতে তাহাদের পদতলে থাকে সেই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা কৃষকায়দের জ্ঞান টিক করা হইয়াছে।

মহিষমর্দিনী

(তৃতীয় প্রকরণ)

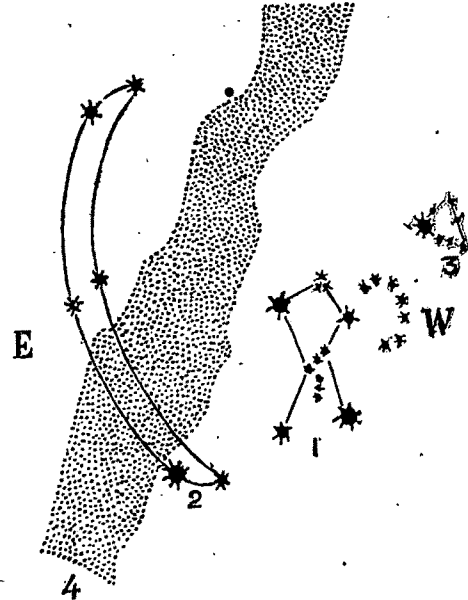
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

দুর্গাদেবী মহিষমর্দিনী-রূপে ভাবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এক অস্ত্রের আকার মহিষের তুল্য ছিল, অথবা সে অস্ত্রের মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দেবী তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

দেবী রুদ্রের শক্তি, রুদ্রাণী। দেবের যে রূপ, যে গুণ, যে কর্ম, যে আয়ুধ, যে বাহন, দেবীরও তাহাই। রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা। রুদ্র নামেই প্রকাশ, তিনি মানুষকে বোদন করাইতেন। (বোদয়তি মল্লযান্—ভালুজি দীক্ষিত)। ঋগ্বেদের-আর্ঘ্যগণ এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ও আর্ত হইয়া মনে করিতেন, রুদ্র সেই রোগের কর্তা, তাহার নিকট রোগের ভেষজ আছে, তিনি প্রসন্ন হইলে মহামারী উপশান্ত হইবে। ঋগ্বেদের অন্তিম কালে সেই রুদ্র, শিব (মঙ্গল-ময়) হইয়াছিলেন। ষড়্ভূর্বেদে তিনি মহেশ্বর, মহাদেব, সর্ব, ভব ইত্যাদি অনেক নাম পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া রুদ্রদেব শিব হইলেন, কেমন করিয়াই বা মরুৎগণের পিতা হইলেন, ইত্যাদি বিচিত্র পরিবর্তন হইল, তাহার সম্যক আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। এখানে সংক্ষেপে ষৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

মৃগ নক্ষত্রে রুদ্রের অধিষ্ঠান। অতএব মৃগ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় আমরা এই নক্ষত্রকে কালপুরুষ বলি। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভোর ৪ টার সময় এই নক্ষত্র উঠিতে দেখা যাইবে। তদনন্তর উদয়-কাল মাসে মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১২টার সময় এবং অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টার সময় এই নক্ষত্রের উদয় দেখা যাইবে। মাঘ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৩টায়, চৈত্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১১টায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টায় অস্ত যাইতে দেখা যাইবে। কালপুরুষের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে আছে। জ্যোতিষে নাম মৃগশিরা বা মৃগ-শীর্ষ। দুই বাহুতে দুইটি, দুই পদে দুইটি বড় বড় তারা আছে। দক্ষিণ বাহুর তারা উজ্জল তাম্রবর্ণ, জ্যোতিষে ইহার নাম আর্দ্রা। কটিতে তিনটি তারকা এক ত্রিধক রেখায় আছে। নাম ইলকা। ইহাদের নিকটে আর দুইটি তারা আছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট। কটির দক্ষিণে ও মধ্যস্থলে তিনটি তারা আছে, মধ্যেরটি এক নীহারিকা, ক্ষুদ্র খেত মেঘখণ্ডের মত দেখায়। এই তিন তারাকে

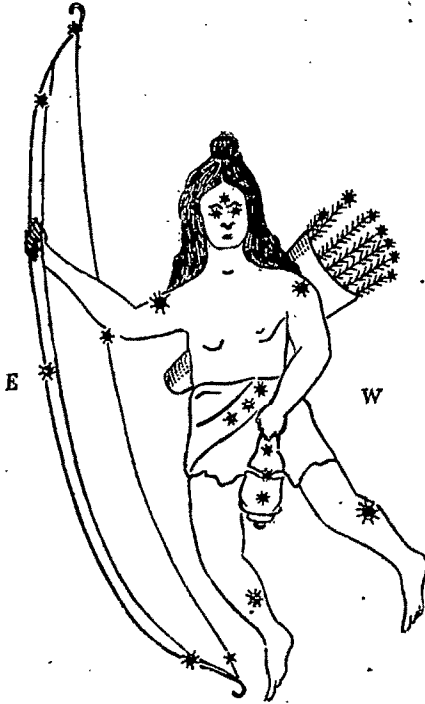
কালপুরুষের বস্ত্রাঞ্চল বলা যাইতে পারে। (এই তিন তারায় রুদ্রের জ্যোতির্লিঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল)। এই তেরটি তারা আধার করিয়া রুদ্রের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। কালপুরুষের পূর্ব দিকে বক্রাকারে ছয়টি তারায় হরধমুঃ, জ্যোতিষে নাম পুনর্বসু। এই ছয় তারার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তারাটি অতিশয় উজ্জল। আকাশে ইহার তুল্য উজ্জল তারা আর একটিও নাই। জ্যোতিষে ইহার নাম ব্যাধ বা মৃগ-ব্যাধ। সেখানে ছায়াপথ অর্থাৎ স্বরগঙ্গা ত্রিধক ভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। কালপুরুষের পশ্চিম দিকে কতকগুলি ছোট ছোট তারা ধনুর আকারে দেখা যাইবে। চিত্র দেখিলে এই সব তারা চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না (চিত্র ১)। দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র দেখিতে হইবে, অর্থাৎ চিত্রের বাম পার্শ্ব পূর্ব দিক, দক্ষিণ পার্শ্ব পশ্চিম দিক।



চিত্র ১। ১—রুদ্র, ২—ধমুঃ, ৩—রোহিণী, ৪—স্বর্গঙ্গা।

কালপুরুষের ত্রয়োদশ তারা লইয়া মৃগ নক্ষত্র। মস্তকের তিনটি তারা মৃগশীর্ষ বা মৃগশিরা। চারি পদে চারিটি, পুচ্ছে তিনটি, উদরে তিন তারা একটি বাণ, ব্যাধ নিক্ষেপ করিয়াছে। পুরাণে মৃগ নক্ষত্র অবলম্বন করিয়া দশ-বারটি উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। রুদ্রের একটি দুইটি বিশেষণ কিম্বা উপমা এই সব উপাখ্যান রচনার আশ্রয় হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রুদ্র দেবের প্রতিকৃতি লিখিত হইল (চিত্র ২)।



চিত্র ২। পিণ্ডক-পাণি রুদ্র।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৩৩-এর সূক্তের দেবতা রুদ্র। এই সূক্তে রুদ্রের রূপ ও তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা আছে। যথা—(রমেশ দত্তের বঙ্গানুবাদ),—রুদ্র বজ্র-বাহু, কোমলোদর বক্রবর্ণ, স্নানাসিক, দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, হিরণ্যয় অলঙ্কার-শোভিত, আরণ্য পশুর ত্রায় ভয়ঙ্কর, ধনুর্বাণধারী, অতিশয় প্রবুদ্ধ, যুবা, নিষ্কার্যকারী, সমস্ত ভুবনের অধিপতি ('ঈশান') ও ভর্তা। তিনি নানা রূপ-বিশিষ্ট ('বিশ্ব-রূপ')। তিনি রথস্থিত যুবা, তাঁহার সেনা আছে।

রুদ্রের নিকট বর প্রার্থনা।—তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর। সর্ব শরীর ব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। পাপ বিদূরিত কর। শত্রু বিনাশ কর। আমাদিগকে তোমার জিহ্বাসারুত্তির বিষয়াভূত করিও না। তোমার স্বথকর ওষধি দ্বারা শত হিম (বর্ষ) ('শতং হিমাঃ') জীবিত রাখ, তোমার মহতী দুর্ঘতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর।

প্রথম মণ্ডলের ১১৪-এর সূক্তে রুদ্রের রূপ।—রুদ্র কপদী, বীরনাশী, স্বর্গীয় বরূহ, মরুৎগণের পিতা, দীপ্তিমান।

প্রার্থনা।—আমরা রক্ষার জন্ত দীপ্তিমান ও যজ্ঞসাধক

ও কুটিলগতি ও মেধাবী রুদ্রকে আহ্বান করি। যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ কুশলে থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না। গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, আমাদের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদের প্রিয় শরীরকে বধ করিও না। আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না। আমাদিগের অগ্র মনুষ্যকে হিংসা করিও না। গো ও অশ্ব হিংসা করিও না, বীরদিগকে হিংসা করিও না, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪-এর সূক্তের দেবতা সোম ও রুদ্র।—“হে সোম ও রুদ্র! যজ্ঞ সকল প্রতি গৃহে তোমাদিগকে পর্যাপ্ত রূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের স্বথকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের স্বথকর হও। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিয়োজিত কর। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্ত ভেষজ ধারণ কর। আমাদিগের শরীর পাপ হইতে মুক্ত কর।”

উপরি-উক্ত তিন সূক্ত হইতে রুদ্রের রূপ ও গুণের পরিচয় পাইতেছি। তিনি কপদী অর্থাৎ তাহার মস্তকে জটা আছে। তাহার নাসিকা স্তম্বর, উদর কোমল (লম্বোদর)। তিনি সপ্ত রত্ন ধারণ করিতেছেন, দুই বাহুতে দুই, দুই পদে দুই, বক্ষে তিন, এই সাত রত্ন। বক্ষের তিনটি রত্ন তিন নিক (স্ববর্ণমুদ্রা) কণ্ঠ হইতে মালাকারে শোভিত হইয়াছে। তিনি ধনুর্বাণধারী। পূর্ব দিকের ছয়টি তারায় ধনুঃ, পশ্চিম দিকের কয়েকটি তারা তাঁহার বাণ। তাহার 'হেতি' (অস্ত্র) আছে। * তাঁহার বাম হস্তে বজ্র। তিনি দীপ্তিমান, কারণ তারকাময়। তিনি বক্র অর্থাৎ অরুণবর্ণ, আর্দ্রা তারা। জ্যোতিষে রুদ্র আর্দ্রা তারার অধিপতি, মস্তকের উপরে সোম (চন্দ্র)। জ্যোতিষে যুগ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। ঋগ্বেদে মস্তকের তিনটি তারার উল্লেখ বোধ হয় নাই। দুইটিতে নেত্র, একটিতে মুখ বুঝিতে হইবে। এক স্থানে (৭।৫২।১২) তাঁহাকে ত্র্যশ্বক বলা হইয়াছে। ত্র্যশ্বক শব্দের বহুবিধ অর্থ আছে; যথা—যাঁহার তিন মাতা আছেন, যিনি ত্রিলোকের অধ—পিতা, ইত্যাদি। অনেকে ত্র্যশ্বক অর্থে ত্রিনয়ন বুঝিয়াছেন। তিনি বহুরূপ-বিশিষ্ট যেহেতু উদয়কালে কালপুরুষের যে রূপ দেখা যায়, মধ্য আকাশে সে রূপ দেখা যায় না, অন্তকালে আর এক রূপ দেখা যায়। অপিচ, তিনি যুবা, যবিশ্ঠ (অতিশয় যুবা), আবার প্রবুদ্ধ অপেক্ষাও প্রবুদ্ধ [বুড়া

শিব]। তিনি উগ্র, তিনি দিবা অম্বর, দিবা বরাহ। তিনি আরণ্য বরাহ, মহিষ ও সিংহের তুল্য ভয়ঙ্কর। তেরটি তারা লইয়া বহুবিধ আকার কল্পনা করা যাইতে পারে। রুদ্র কেমন করিয়া মরুংগণের পিতা হইলেন তাহা পরে বলিতেছি।

রুদ্র উগ্রদেব। তিনি মনুষ্য ও গবাদি গ্রাম্য পশুর হিংসা করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদেরকে ব্যাধি-মুক্ত করিতে পারেন। তিনি ভিষগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [ইনিই আয়ুর্বেদের ধনুস্তরি। ধনুস্তরি ধনুর্বাণধারী। পুরাণে ইনিই ক্ষীরোদ সাগর-মন্ডনে হস্তে অমৃত-ভাণ্ড লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চন্দ্র স্বধাময়, অমৃত-ভাণ্ড।]

যজুর্বেদ হইতে বুঝিতেছি, শরৎ ঋতুর আরম্ভে আর্ধগণ সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতেন। কি রোগ, জানিতে আমাদের কৌতূহল হয়, কিন্তু তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। কোন্ অতীত যুগের কথা, তাহা পঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব। তথাপি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বর্ষার শেষে সে-দেশে গোরুর মড়ক হয়। কখন কখন বঙ্গদেশেও হয়, সংক্রামক মারাত্মক গুটীরোগ।

পঞ্জাবে বসন্ত রোগ প্রায় বার মাসই আছে। কিন্তু মনে হয় বেদোক্ত রোগ ব্রণরোগ নয়, মেলেরিয়া হইতে পারে। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে শরৎই রুদ্রের অধিকা ভগিনী। রুদ্র তাঁহারই দ্বারা হিংসা করেন। সাধারণ লিখিয়াছেন, শরৎ কালে পীনস রোগ (শরদী) উৎপাদন হেতু হিংসক। এই কারণে অধিকা হিংসিকা। শুক্ল যজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন, অধিকা শরৎ রূপ গ্রহণ করিয়া কাস জ্বরাদি উৎপাদন করেন। এই দুই ভাষ্যকার ব্রণ সম্ভাবনা করেন নাই।*

* কোন ঋতুতে ব্যাধি হইত, তাহা ঋগ্বেদ হইতেও জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদে রুদ্রদোষের একত্র-স্তব আছে। অথর্ববেদেও আছে। এই সোম ভোরগাজের কলাচন্দ্র, না সন্ধ্যা-রাজের পূর্ণচ ? যদি কলাচন্দ্র, তবে বসন্ত ঋতু, যদি পূর্ণচন্দ্র, তবে শরৎ ঋতু। অজ্ঞ ঋতুতে হইতে পারিত না। বসন্ত ঋতুতে ভোর রাজে যুগ দৃষ্ট হইলে সূর্য পুনর্বস্তুতে থাকিত। এই নক্ষত্রের কোন দোষ বর্ণিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যারাজে পূর্ণচন্দ্রের সহিত যুগ নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে যুগের বিপরীত দিকে চতুর্দশ নক্ষত্রে, মূলানক্ষত্রে সূর্য থাকিত। মূলা বৃশ্চিকের পুচ্ছ। ঋগ্বেদে মূলার নাম নিখতি। নিখতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সাধারণ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। ঋগ্বেদের ঋষিগণ নিখতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। কারণ, যে সময়ে মূলা দেখা যাইত না, সে সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। এক মাস পরে যখন দেখা যাইত, তখন রোগের হ্রাস হইত। পরে যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের কালে (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দে) কৃত্তিকায়ুক্ত পূর্ণিমা শারদ বিসুব্দ হইত; সূর্য বিশাখায় থাকিত। তখন মূলার রোগ-নিদানও দোষ

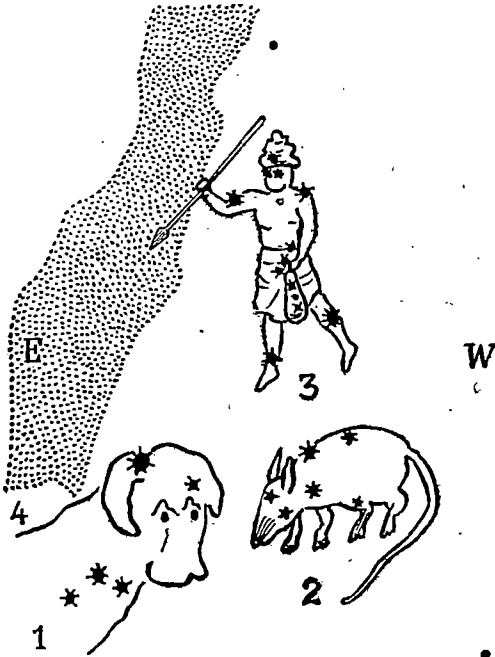
কিন্তু ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঋতুর দোষ না দিয়া রুদ্রের ক্রোধ ও দুর্মতি কেন সন্দেহ করিয়াছিলেন? কারণ, তাহারা দেখিয়াছিলেন, যে সময়ে রুদ্রের উদয় হয়, সে সময়ে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও ঘটে। রুদ্রের সহিত ব্যাধির নিত্য সম্বন্ধ হেতু তাহারা রুদ্রকেই ব্যাধির কারণ অনুমান করিয়া ছিলেন। দুই এক মাস পরে রুদ্রের উদয় হইত না, ব্যাধিরও উপশম হইত। ফলজ্যোতিষের ভিত্তিও এই। পৃথিবীর যাহা কিছু সব একই আছে, কিন্তু আকাশে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যহ একই নক্ষত্র রাত্রির একই সময়ে একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আকাশের গ্রহ নক্ষত্রই পার্থিব ব্যাপারের কারণ।

দুই বিসুব্দ কালে ৬টার সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। সে সময় যে নক্ষত্র ভোর ৫টার উঠিতে দেখা যায়, পাঁচ মাস পরে সে নক্ষত্র ১০ ঘট্টা আগে সন্ধ্যা ৭টার উঠে। যে কালে শরৎ ঋতুর আরম্ভে সূর্যাস্তের পরে রুদ্রের উদয় দেখা যাইত, সে কালে পাঁচ মাস পূর্বে বসন্ত ঋতুতে রুদ্র সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা যাইত। সহস্রাব্দিক বৎসর পরে রুদ্রকে গ্রীষ্ম কালে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা যাইত। গ্রীষ্ম ঋতু ঋণ্ণাবাতের ঋতু। মরুংগণ ঋণ্ণাবাত, বিশেষতঃ বাতাবর্তের দেবতা। এই কারণে মরুংগণ রুদ্রপুত্র। তাঁহারা রুদ্রিয়। ঋগ্বেদে মরুংগণের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা অবিকল রুদ্রের রূপ। তাঁহাদের হস্তে রুদ্রিয় ভেষজ আছে। প্রভেদের মধ্যে মরুংগণের এক বাহন কল্পিত হইয়াছে। সে বাহন পৃথবী (চিত্র হরিণ) (২।৩৪।৩)। ঋণ্ণাবাতের সহিত বৃষ্টি হইতে লাগিল, উগ্রদেব জল বর্ষণদ্বারা শিব, হইলেন (১০।২২।২), ক্রমে যজুর্বেদের কালে বর্ষারম্ভে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং শরদায়ে মধ্য রাত্রে রুদ্রকে উদিত হইতে দেখা যাইত।

যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে রুদ্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শুক্ল যজুর্বেদে (২২।৮) অগ্নি, অশনি, পশুপতি, ঈশান, মহা-

কাটিয়া গেল, বৃশ্চিকের পুচ্ছের দুইটি তারা লইয়া 'বিচৃত্তো' নামে নক্ষত্র হইল। এই নামের অর্থ মোচন-কর্তা, রোগ-পাণ-মোক্ষক। অথর্ববেদে (২।৮, ৩।৭) 'ক্ষেত্রিয়' নামে এক রোগের চিকিৎসা ও শাস্তির বিধান আছে। সাধারণ 'ক্ষেত্রিয়' শব্দে বুঝিয়াছেন, কুলাগত ক্ষয় কুষ্ঠাপম্বাদি পিতামাতা হইতে পুত্র কন্যার সঞ্চারী রোগ। ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ। ঋষিগণ এই রোগের চিকিৎসা করিতেন, যখন 'বিচৃত্তো' (দ্বিঘটনাস্ত) পূর্বদিকে প্রথম উদিত হইত। তখন "শুভকাল স্তবর্গে ভগবতী বিচৃত্তো"। গণিত দ্বারা জানিতেছি খ্রি-পূ ৪০০ অব্দে বিচৃত্তো অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভ, এবং খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দে পনের দিন পরে প্রথম উঠিতে দেখা যাইত। ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে ব্যাধির প্রকোপে কাতর হইয়া রুদ্রের নিকট ভেষজ প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'ক্ষেত্রিয়' মনে হয় না। দেহান্তর-সঞ্চারী ব্যাধির কালকাল নাই।

দেব ইত্যাদি রুদ্রের বিভিন্ন মূর্তির নাম। তিনি কৃত্তিবাস, পিনাকপাণি, গিরিশ (পর্বতবাসী) (১৬২১৪)। মূজুবান্ পর্বতের সেদিকে তাঁহার বাস (৬:৭৪)। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৪১৫) কৃষ্ণাধ্যায়ে রুদ্রের অসংখ্য লীলা-বিগ্রহ বর্ণিত আছে। বিশ্বভুবনে যত কিছু আছে, সব, বিশ্বরূপ রুদ্র। তিনি সেনাপতি, দিকপতি, বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, সভাপতি, মন্ত্রী, বণিক। তিনি স্থপতিচোরপতি, তক্ষরপতি, বঞ্চক, ব্রাতপতি, গমপতি ইত্যাদি। তিনি সর্বত্র সঞ্চরণ করেন। তাঁহাকে শাস্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন। “মা হিংসী: পুরুষং জগং,” পুরুষ মনুষ্য জগং, গবাদি পশু, মা হিংসী—বধ করিও না। “তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ করিয়া শিবা তনু ধারণ করিয়া আইস।” ঋগ্বেদে রুদ্রদেবের রূপ ও গুণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে তাহার বিস্তার ঘটয়াছে, কিছু কিছু নূতনও আসিয়াছে। মৃগ নক্ষত্রের তারা সম্মিলিত দেখিলে সহজে তাহা বিকটাকার মনে হইতে পারে। আর, বিকটাকার মনুষ্য দেখিলে যেমন তাহার বিকৃত গুণ অনুমান করি, সেই স্বাভাবিক ক্রমে রুদ্রেরও নিম্ননীয় স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল। অথর্ববেদে রুদ্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বৃহৎ মুখবিবরবিশিষ্ট কুকুর লইয়া বেড়ান। (চিত্র ৩) শুক্ল যজুর্বেদে লিখিয়া-



চিত্র ৩। ১—মনু, ২—মৃষিক, ৩—কিরাতরূপী রুদ্র, ৪—মূজুবান্ পর্বত।

ছেন, এক ‘আখু’ (ইন্দুর) রুদ্রের প্রিয় পশু। রুদ্র ও তাহার ভগিনীকে পুরোড়াশ (যবচূর্ণের পিষ্টকবিশেষ)

দেওয়া হইত। তাহার প্রিয় পশুকেও ভাগ দেওয়া হইত। এই পাথেয় লইয়া রুদ্রকে মূজুবান্ পর্বতের সে পারে স্বীয় আলয়ে যাইতে বলা হইত।*

ঋগ্বেদের কাল হইতে যজুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদের আর্যগণ স্বর্গের ব্যাপার মর্মে আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এক স্থটির পূর্বে বিশ্বভুবন সজ্জ-মগ্ন হইয়াছিল। যজুর্বেদের কালে তাহা পার্থিব জল-প্লাবন হইয়াছিল। বৈবস্বত মনু এক নৌকায় আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘প্রবাসী’তে বিষ্ণুর মৎসাবতার পশ্চ।) তিনি সর্বোচ্চ স্থানে হিমালয়ে নৌকা বাঁধিয়াছিলেন। যজুর্বেদে তাহার নাম নৌবন্ধন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ঋগ্বেদে দিব্য সরস্বতী বা স্বর্-নদী পুরাণে কভু ধবল পর্বত, কভু পুষ্পিত মুঞ্জ বা শরবন রূপে কল্পিত হইয়াছিল। দিব্য সরস্বতী (ছায়াপথ) খেত হিমালয়। তাহারই দক্ষিণ-পশ্চিম পারে কালপুরুষ নক্ষত্র। যিনি রুদ্র, তিনিই কৃষ্ণাণী, হিমালয়-দুহিতা হইয়াছেন। পুরাণে কাটিকেয় শরাচ্ছাদিত খেত পর্বতে জন্মিয়াছিলেন। সে শরবন হিমালয়ের মুঞ্জবন, বাস্তবিক স্বর্-নদী।

কালপুরুষের মস্তকের তিনটো তারা ত্রিভুজাকারে অবস্থিত। বোধ হয় এই আকার দেখিয়া শুক্ল যজুর্বেদে (১৬২৮) রুদ্রের মুখ কুকুরের তুল্য বলা হইয়াছে। ইহা

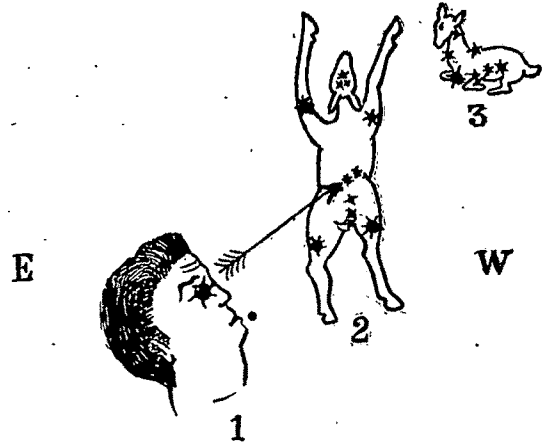
* আমরা যাহাকে কালপুরুষ বলি, গ্রীকেরা তাহাকে ‘ওরয়ন’ (Orion) বলিত। ওরয়ন কিরাত। তাহারও সঙ্গে এক কুকুর থাকিত, সে কুকুর Sirius তারা। ঋগ্বেদেরও এক স্থানে এই তারা কুকুর। মৃগ-নক্ষত্রের দক্ষিণে কয়েকটি তারা আছে, তাহাতে গ্রীকেরা শশক দেখিত। এই নক্ষত্রের ইংরেজী নাম Lepus। যজুর্বেদে তাহা মৃষিক। গ্রীক পুরাণে ওরয়ন নক্ষত্রের উপস্থিতি কিম্বা তাহার কম সন্মুখে বিশেষ উপাখ্যান নাই। আর্যগণের ও গ্রীকদিগের কিরাত, তাহার ষা ও শশক বা ইন্দুর কাহারো কাহার নিকট পাইয়াছিল? আমার মতে গ্রীকেরা আর্যদিগের নিকট শিখিয়াছিল। এই একটো নয় অনেক। আমার বন্ধু ত্রিতারাগ্রন্থ বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হিমালয়ে মুঞ্জত্বণের অরণ্য দেখিয়াছিলেন। মুঞ্জ আমাদের পরিচিত শর গাছের তুল্য। মুঞ্জের শুক্ল দ্বারা মুঞ্জরজ্জ নামক মন্থণ দীর্ঘকাল স্থায়ী রজ্জু নিমিত হয়। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে মুঞ্জ-মেথলা পরিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দোড়িকে শর-মাঞ্জা বলে। তারপর আমার বন্ধু হিমালয়ের সে পারে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃহদাকার ইন্দুর দেখিয়াছিলেন। এত বৃহৎ যে তিনি দূর হইতে শশক মনে করিয়াছিলেন। তারপর ক্রম দক্ষ ও তাহাদের ভীষণাকার হিংস্র কুকুরের সন্মুখে পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহাতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বর্ণনার সহিত যজুর্বেদোক্ত বর্ণনার আশ্চর্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যজুর্বেদের আর্যগণ কৈলাস দর্শন করিয়াছিলেন।

হইতে মহাভারতের দুর্গাস্তবে দুর্গা কোকমুখা হইয়াছেন। কুক্করের মুখ হইতে শৃঙ্গালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্রই শিবা হইয়াছে। রুদ্রের নাসিকা সুন্দর, বোধ হয় দীর্ঘ। রুদ্র মুগ (আরণ্য পশুর) তুল্য ভীম। রুদ্রের নাসিকা দীর্ঘ করিয়া বরাহ কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের গণ আছে। তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন। তিনি রুদ্রের বিয়বিনাশন মূর্তি। কালপুরুষ নক্ষত্রে গজ-মুণ্ড কল্পনা যেন বিক্রপ মনে হয়। হস্তী ত্রিবিধ—মৃগ, মন্দ, ভদ্র। এক প্রকার হস্তীর নাম মুগ আছে। বোধ হয় মুগ শব্দে হস্তী বুঝিয়া গজানন আসিয়াছে। আর্দ্রা তারা অরুণবর্ণ। গণেশ মূর্তিতে তাহা হিঙ্গুলবর্ণ হইয়াছে। রুদ্রের প্রিয় আখু, গণেশের মুখিক বাহন। গণেশ ত্রিলোচন। তাহার পিতা মাতা নাই। বস্তুতঃ যে দেব বা দেবী প্রতিমার ত্রিলোচন দেখা যায় তাহা রুদ্র-প্রতিমার রূপান্তর।

একদা দক্ষ প্রজাপতি হইয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সে যজ্ঞে ঐশ্বর্যবান দেব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্র হন নাই। দক্ষের সকল কন্যা যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রুদ্রাণী হন নাই। পুরাণে রুদ্রাণী সতী নাম পাইয়াছেন। সতী পিত্রালয়ে গিয়া অপমানিতা হইয়া যজ্ঞায়িতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ক্রোধে রুদ্র বীরভদ্র উৎপাদন করিলেন। বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন এবং দক্ষের ছাগ-মুখ করিয়া দিলেন। এই বহু প্রচলিত উপাখ্যানে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, রুদ্র যজ্ঞভাগী ছিলেন না। বাস্তবিক আমরা ঋগ্বেদে দেখিয়াছি, রুদ্রযজ্ঞ বহু-প্রচলিত ছিল। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে উৎপাত-শাস্তির নিমিত্ত রুদ্রহোম বিহিত ছিল। প্রজাপতি, যজ্ঞপতি, বর্ষপতি, অর্থাৎ প্রজাপতি কালের নাম। যে কাল সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতেছেন, সেই কাল। কালপুরুষ নক্ষত্রই কালের প্রতিমা এবং দক্ষ। মুগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষ্ণু হইত। ক্রমে পশ্চাদ্গত হইয়া খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে, রোহিণীতে উপস্থিত হইল। দক্ষের প্রজাপতিত্ব বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদ বলিতে বস্তুতঃ ঋগ্বেদ সংহিতা বুঝিয়া আসিতেছি। সংহিতায় মন্ত্র আছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা, প্রয়োগের বিচার ও আখ্যায়িকা আছে। এইরূপ অপর তিন বেদসংহিতারও ব্রাহ্মণ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩১৩৯)। যথা—পুরা কালে প্রজাপতি আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ঋগ্ধরুপ ধরিয়া রোহিণীরূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড

দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহারা তাহাদের ঘোরতর শরীর একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাহার নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্কে বলিলেন, প্রজাপতিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। ভূতবান্ দেবগণের নিকট পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাহার নাম পশুমান্। তিনি বাণ দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি উর্ধ্বে উৎপত্তিত হইলেন। তাহাকে লোকে মুগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মুগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মুগ ব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোহিণী। আর যাহা বাণ, তাহা ত্রিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত) বাণ হইয়াছে (চিত্র ৪)। এই উপাখ্যানের মূল ঋগ্বেদে আছে (১০।৬১)।



চিত্র ৪। ১—রুদ্র, ২—ঋগ্ধ, ৩—রোহিত মুগ।

রোহিণী তারা লোহিতবর্ণ। মুগব্যাধ হইতে রোহিণী পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখায় ত্রিভারক (বাণ) দেখা যায়। [ঋগ্ধ মুগ হরিণ নয়। ইহার চলিত নাম নীল গাই। সংস্কৃতে নীলাঙ্গ, গবয়। ইহা গো নয়, ছাগ নয়। আকারে বাছুরের মত।]

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) প্রজাপতি মুগনক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রে গিয়াছিলেন। (২) রুদ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাহার পশুপতি নাম মুগ-ব্যাধ তারায় আরোপিত হইয়াছিল। মুগব্যাধ তারা অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা দেখিয়া তাহা দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ কল্পিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এই উপাখ্যানের মূল আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও পুরাতন। বোধ হয় খ্রি-পূ অষ্টাদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তৎপূর্বে খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারায় বাসন্ত বিষ্ণু হইত। তৎকালে নক্ষত্র-চক্রে রোহিণীর প্রাধান্য হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে

(২২৯ অঃ) ইহার উল্লেখ আছে। পূর্বে অভিজিৎ লইয়া অষ্টবিংশতি নক্ষত্র গণনা হইত, এখন অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়া সপ্তবিংশতি নক্ষত্র হইল। পুরাকালে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠাদি মাসের নাম ছিল না। বুধবার স্থবিধার নিমিত্ত সে সে নাম লিখিতেছি।

রোহিণীর বিপরীত দিকে জ্যোষ্ঠা। অতএব রোহিণীতে সূর্য আসিলে জ্যোষ্ঠায় পূর্ণিমা হয়। জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে, সে পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষ্ণু ধরা হইত। অর্থাৎ জ্যোষ্ঠ মাস বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস ছিল। জ্যোষ্ঠ এই নামেই প্রকাশ, জ্যোষ্ঠা নক্ষত্র প্রধান গণ্য হইত। আষাঢ় মাস হইতে পাঁচ মাস গতে মার্গ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। ইহা নূতন কথা নয়, পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঋতু এক মাস পিছাইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর লাগে। জ্যোষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যজুর্বেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষ্ণু ঘটতে লাগিল। জ্যোষ্ঠ হইতে পাঁচ মাস গতে কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস হইল।

দুই সহস্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। এখন কার্তিক মাসে শরৎ বৎসরের আরম্ভ আদিয়া পড়িল। যজুর্বেদের ঋষিগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কৃত্তিকাকে নক্ষত্র-চক্রের আদি করিয়াছিলেন। বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষ্ণু স্বীকার করিলেন।

পরিবর্তনটি সামান্য নয়। দুই সহস্র বৎসর মার্গশীর্ষ বর্ষ-চক্রের প্রথম মাস গণ্য হইয়া আসিতেছিল, এখন কার্তিক মাস প্রথম ধরিতে হইল। উপাখ্যান রচিত হইল। মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কার্তিকেয় দেবের জন্ম ও কর্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি অগ্নির পুত্র অগ্নি-কুমার। এই জন্ত তিনি কুমার (যুবা)। তাহাঁকে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রে অস্থিষ্ঠিত যজ্ঞের অগ্নি। মন্ত্রপুরাণে প্রকৃত ব্যাপার রহস্ত্যাবৃত হইয়াছে। সেখানে কুমার রুদ্র-স্থানীয় মৃগব্যাধ তারা হইয়াছেন। রুদ্রের প্রকৃত দেহ মৃগ নক্ষত্র। তাহা এই উপাখ্যানে এক অশ্বর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে স্বর্গের অশ্বর বলা হইয়াছে। অশ্বরের দেহ তারায় গঠিত। এই হেতু নাম তারকাস্বর। এই তারকাস্বর বধের নিমিত্ত কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ বধ করিতে পারেন নাই। যে তারকাস্বর, সেই মহিষাসুর। তাহার আকার আরণ্য মহিষের তুল্য। এই হেতু মহাভারতে (বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুর বধ করিয়াছেন।

কবে তারকাস্বর নিহত হইয়াছিল? মহাভারত বলিতে-ছেন, অগ্রহায়ণ শুক্ল প্রতিপদে কুমারের জন্ম হইয়াছিল।

তিনি ছয় দিনের মধ্যেই তেজোয়ান হইয়া উঠিলেন। শুক্ল পঞ্চমী-যুক্ত ষষ্ঠীর দিনে তিনি দেবসেনা-পতি পদে বৃত্ত হইলেন। পাঁজিতে সে দিন গুহ ষষ্ঠী নামে খ্যাত। গুহ কার্তিকেয়।

চান্দ্র মাস গণনার দুই রীতি আছে। কেহ অমাবস্তা হইতে অমাবস্তা, কেহ পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা মাস গণনা করেন। পাঁজিতে অমাস্ত মাসের নাম মুখ্য চান্দ্র এবং পূর্ণিমাস্ত মাসের নাম গৌণ চান্দ্র। বৈশাখ অমায় বাসন্ত বিষ্ণু হইলে ছয় মাস গতে অর্থাৎ কার্তিক অমাবস্তা গতে অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী ষষ্ঠীতে শারদ বিষ্ণু হয়। ছয় মাসে ছয় তিথি পূর্ণ হয় না। পঞ্চমী গতে ষষ্ঠীর কিঞ্চিদধিক একত্রিশ দণ্ড হয়।*

এখন পট পরিবর্তন করিতে হইবে। কার্তিকেয় অগ্নির পুত্র, অর্থাৎ অগ্নি-কুমার। অগ্নিকে স্ত্রীরূপ কল্পনা করিলে তিনি কুমারী। রুদ্র অগ্নিও বটেন, অতএব কুমারী রুদ্রাণী। তিনি মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই অশ্বর-হন্তা। বৃষ্টি-বোধকারী অশ্বর বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র বর্ষণ করিতে পারিতেন। সে দিন অম্বুবাচি, দক্ষিণায়ন-আরম্ভ। যজুর্বেদের কাল হইতে কেবল ইন্দ্র নহেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ এক পক্ষের, অশ্বরগণ আর এক পক্ষে সংগ্রাম করিতেন। দুই পক্ষের রাজ্যের সীমা লইয়া সংগ্রাম হইত। দেবগণ অশ্বরগণের দ্বারা প্রায়ই পরাজিত হইতেন। তখন অশ্বরবিজয়ী দেব কিশা দেবী আবির্ভূত হইয়া অশ্বর পরাজয় করিতেন। কার্তিকেয় সেইরূপ এক সেনাপতি। তিনি দেবসেনা-পতি। দুর্গা তাহার স্থানে আসিয়া অশ্বর বধ করিয়াছিলেন। অশ্বর বিনাশের প্রকৃত অর্থ এই যে, ভোর রায়ে নক্ষত্ররূপী অশ্বরকে উঠিতে দেখা যাইত এবং উদীয়মান সূর্যের রশ্মি দ্বারা অচিরে অদৃশ্য হইত। সেখানে সূর্যরূপ ইন্দ্র অশ্বর বিনাশ করিতেন। কার্তিকেয় ইন্দ্র নহেন, তিনি তেমন ভাবে তারকাস্বর বধ করিতে পারেন নাই। শরৎ কালে যুদ্ধও হইত না। শরৎ যুদ্ধের পক্ষে অকাল।

গণিত দ্বারা জানিতেছি, যজুর্বেদ কালে ও তাহারও পূর্বে উত্তর ভারত (২৮°-৩০° অক্ষাংশ) হইতে দেখিলে শরদায়ে মধ্য রায়ে ব্যাধনহ মৃগনক্ষত্রের উদয় হইত। দুই

* ইহা হইতে অল্পশেষে তারকাস্বর বধের কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়। এখন ৭ই আশ্বিন শারদ বিষ্ণু হইতেছে। তখন অগ্রহায়ণ মাসের ৬ই হইত। অতএব তদবধি অগ্নিনেত্র ২৩+ কার্তিকের ৩০+ অগ্রহায়ণের ৬ দিন=৫৯ দিন। বিষ্ণু ৭৩ বৎসরে এক দিন পিছাইত। অতএব তদবধি ৫৯×৭৩=৪৩০৭ বৎসর গত হইয়াছে; অর্থাৎ খ্রি-পূ ৪৩০৭-১৯৪৫=২৩৬২ অব্দের কথা।

এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই যুগয়া ব্যাপার দেখা বাইত, যেন ব্যাধরূপিণী চণ্ডী মহিষরূপী অসুর বধ করিতে-ছেন। বোধ হয় পৌরাণিক ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর-বধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে দেখা গেল, এক ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল মহীকুহের উৎপত্তি হইয়াছে। ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে আৰ্য-পিতামহগণ এক রোগের শাস্তির নিমিত্ত রুদ্রদেবের উদ্দেশে শরৎ ঋতু যজ্ঞ করিতেন। তাঁহারা রুদ্রের এক তারাময় প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রুতগামী কাল সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিল। শরৎ ঋতুতে যুগের উদয় হইল না, রোহিণীর উদয় হইল। এক উপাখ্যান রচিত হইল, কাল-রূপ

প্রজাপতির দুঃকৃত মনে হইল, প্রজাপতি রোহিণীতে পলায়ন করিলেন। এখানেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, কৃত্তিকাতে চালায়া গেলেন। খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের কথা। রুদ্রের দেহে এক অসুর কলিত হইল, রুদ্র স্থানে রুদ্রাণী আসিলেন, রুদ্রের তারাময় প্রাচীন প্রতিমায় অসুর ও রুদ্রাণী, উভয়েই স্থান পাইলেন। অতএব বর্তমান দুর্গা-প্রতিমা কল্পনায় যজুর্বেদের কালের ঘটনা আশ্রয় হইয়াছে। সুর-গঙ্গার সন্নিহিতে রুদ্র ও রুদ্রাণীর প্রতিমা। সুর-গঙ্গা স্বেত হিমবান্ পর্বত। রুদ্রাণী হৈমবতী উষা হইলেন। কিন্তু উষা মহিষাসুর বধ করেন নাই। যিনি করিয়াছেন, তিনি অ-শরীরী যাবতীয় দেবের সন্মিলিত তেজঃপুঞ্জ।

নব-সন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২১

যে অবস্থায় দেখা, টুলুর মুখে একটা রূঢ় প্রশ্ন আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা আর উচ্চারণ করিল না, নিজে কে সামলাইয়া লইয়া বলিল—“তুমি এখন এখানে! প্রায় ছপূর রাত যে।”

চম্পাও এইটুকুতে প্রথম ঝোকটা সামলাইয়া লইয়াছে, অল্প হাসিয়া বলিল—“রাত ছপূর ত আপনার পক্ষেও, জেগে থাকবার কথা নয় ত।”

টুলু বুকিল কথার কাটান দিয়া চম্পা ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়; জানে ওর সে ক্ষমতাটা বেশ আছে, ঘুরাইয়া রহস্যটা বাহির করিতে গেলে ও বেশ খানিকটা এড়াইবার চেষ্টা করিবে। সেদিকে না গিয়া একেবারে সোজাঝুজি প্রশ্নটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—“শোন চম্পা, তুমি কয়েক দিন থেকেই এখানে রাতিরে এসে কি একটা করছ, তোমার বাবা থাকে, কে একজন পেলাদ থাকে। এত দিন জানতাম না, লুকানো ছিল, আজ তোমার ঠাকুরদাদার কাছে শুনলাম।”

চম্পা মুখের পানে চাহিয়া নিতান্ত সহজ কণ্ঠে বলিল—“ঠাকুরদাদার রোজ অসুখ হচ্ছে...”

টুলু বাধা দিয়াই বলিল—“দে ত শুনেছি, বিশ্বাস হ'ল না বলেই ত যাচ্ছিলাম নিজে সন্ধান নিতে।”

ওর লুকাইবার চেষ্টায় বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই কথাটা বলিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চম্পা বলিল—“বিশ্বাস না করলে আন্দাজ করে নেওয়াই ভাল, আবার যে আমি মিথ্যেই বলব না কি করে জানলেন? কিন্তু আপনি একটা ভুল করছেন—আমার সঙ্গে এ সময়ে

এ ভাবে টাড়িয়ে কথা কওয়াটা...কখনো কখনো এ পথে লোক এসে পড়ে হঠাৎ...তা ভিন্ন বাবা, ঠাকুরদাদা...”

টুলু উত্তর করিল—“আমি যে পথের পথিক, তাতে আমার ওসব গ্রাহ্য করলে চলে না।”

“কিন্তু আমি?...মানে, আমার যদি দেখেন?”

প্রশ্নটা সোজা আনিয়া ফেলা সত্ত্বেও চম্পার আবার অল্প কথা আনিয়া চাপা দেওয়ার চেষ্টায় টুলু উত্তর হইয়া উঠিতে-ছিল, এবার যে রূঢ় মন্তব্যটা মুখে আসিল সেটা চাপিতে পারিল না, তবে যথাসম্ভব ছোট করিয়া বলিল—“ক্ষতি হবে?”

চম্পার চক্ষু ছুইটা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই টুলু বলিল—“শোন, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে; কি ব্যাপারটা হচ্ছে আমার স্পষ্ট করে বল।”

তাহার পর একটু ছক্কমের স্বরে বলিল—“আমি শুনতে চাই।”

চম্পার চুপ্তি ছিল টুলুর মুখের উপর, ফিরাইয়া সামনে শূন্যে নিবদ্ধ করিল, কোন উত্তর নাই, তবে মন আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম স্তব্ধ রাত্রে, এই বির্যাই পরিপূর্ণ শান্তির পিছনে যে শাস্ত অশান্তি থাকে প্রচ্ছন্ন, মুহূর্তের মধ্যে সেটা উঠিল জাগিয়া। বালিয়াড়ি হইতে সেদিন ফেরার রাত্রিও ছিল এইরূপ, এইরূপ কেন, আরও উদ্ভাদ; কিন্তু সেদিন একটা কথাও বলে নাই চম্পা, তাই হয়ত সেটা ছিল নিষ্ফল। আজ বন্ধুক, না বন্ধুক—তোমারই জ্ঞান আমার এই বিনীত রজনীর সাধনা; তোমারই জ্ঞান মরণ পণ করে বসে আছি—এত কঠিন, এ রকম বধির তুমি হয়ে থেকে না আর...

টুলু একটু অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিল—“আমি বলব তবে?”

“বলুন না।”

“আমায় তুমি সেদিনে বাড়ি ছাড়তে বলেছিলে, দেখলে রাজী হলাম না, এখন ভয় দেখিয়ে আমার সরাবার চেষ্টা করছ তুমি। কি করছ তা জানি না, তবে ভয় দেখাবার জোগাড় বোধ হয় পুরোমাত্রায় করে উঠতে পার নি এখনও। কিন্তু এটা তুমি খুব ছেনো কোন রকম ভয় দেখিয়েই তুমি আমায় আমার সঙ্গ থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। কেন তাও বলি...”

চুপ করিল। চম্পা বলিল—“বলুন।”

“এক সময় আমার একটু মনে হয়েছিল তুমি আমার কল্যাণের জেতেই মানা করছ আমায়—অবশ্য তবুও আমি স্তন্যভাষ্য না—কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে ম্যানেজার তোমায় লাগিয়েছে এই কাজে—ভেবেছে যদি কোন হাদ্যাম না করে, অল্প-বিস্তর ভয় দেখানোর উপরই কাজ হয়ে যায় ত...”

চম্পার মুখটা বেদনায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত দুইটা একত্র করিয়া চাপিয়া বলিল—“আর থাক।...একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করি,—আপনি এখনি আমায় স্পষ্ট করে বলতে বলছিলেন, আপনি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে পারবেন কি?”

“কি কথা?”

“এই যে কথাটা বললেন—এই যে আপনার সন্দেহ, এটা কি সত্যি, না, অপবাদ দিয়ে আমায় সরাবার জেতে এটা বললেন?”

টুলু একটু ধতমত খাইয়াই চুপ করিয়া গেল।

“বলুন না। যদি সত্যি হয় তো আমি কথা দিচ্ছি আপনি আর কখনও আমায় দেখতে পাবেন না এখানে...বা অন্য কোথাও?”

গলা যেন একটু সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। টুলু আর একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—“কিন্তু তুমি ত আমায় সত্যি কথা বল নি যে আমার কাছে শোনবার আশা করছ।”

চম্পার এই দ্বিতীয় সূযোগ, আরও ভাল ভাবে আসিয়াছে, কিন্তু ঐ যে আঘাতটুকু পাইয়া একটু অশ্রু উদ্গত হইয়াছে; ঐ টুকুতেই মনের কালিমা দিয়াছে ধুইয়া। এক বারও, এক মুহুর্তের জন্তও যে মনে হইয়াছিল তাহার রাত জাগার কারণটা বলিয়া টুলুর মন ভিজাইবে—তাহাকে ব্রতচ্যুত করিবার জন্তই—এটুকুর চিন্তাতেই সে নিজের কাছেই স্নেহ লজ্জায় মরিয়া গেল। অত বড় তপস্যা, অত পবিত্র সম্পদ কি করিয়া সে বাজারের পণ্যে পরিণত করিতে যাইতেছিল?

মনটা আরও স্বচ্ছ হইয়াছে, টুলুর ধতমত খাওয়াতে-বুঝিয়াছে ওটা ওর মনের কথা নয়, মিথ্যা অপবাদই। চম্পা নিজেও আর ঘুরপ্যাচের দিকে গেল না, টুলুর কথায় একটু

নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—“আমার স্পষ্ট বা সত্যি কথা এই যে আমি এখানে এভাবে আসবার সত্যিকার কারণ আপনাকে কখনও বলতে পারব না।...আর সেটা এমন কিছু নয় যার জেতে আপনার মাথা ঘামাবার হেতু আছে। শুধু দয়া করে এইটুকু বিখাগ করুন যে, আমি ম্যানেজারের চর নয়—অন্তত হই নি এখনও, তবে...”

হঠাৎ চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল। টুলু প্রশ্ন করিল—“ধামলে যে?”

চম্পা মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—“এখান থেকে একটু আড়ালে যাই চলুন, অনেক কথা। আপনার সন্তানের খেয়াল আপনার না থাকে, আমার আছে, আমি সেটা নষ্ট হতে দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন?”

টুলু বলিল—“আমার বাদ্য চল।”

চম্পা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একটু কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—“বেশ তাই চলুন।”

‘বাদ্য আসিয়া টুলু বাদ্যর একটা চেয়ারে বসিল, চম্পা সামনের ধামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“বলছিলাম চর হই নি, তবে হব বলে কথা দিয়ে এসেছি আজ।”

“কর কাছে।”

“ম্যানেজারের কাছে।”

“কি রকম?”

চম্পা আর একবার একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর আজ সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে যে যে কথা হইয়াছে—হীরকের জন্ত খোরপোষের ব্যবহার কথা থেকে মাষ্টারমশাইয়ের এখানে চম্পার আসিয়া থাকার নির্দেশ পর্যন্ত—সমস্ত টুলুকে বলিয়া গেল।

টুলু নিধাস বন্ধ করিয়া শুনিয়া গেল; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া আছে। যেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ এক জন নূতন মানুষ তাহার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আভ্যপ্রকাশ করিতেছে। সেই সঙ্গে একটা চিন্তাবারাও চলিয়াছে টুলুর—চম্পা এসব করে কেন?...শেষ হইলে বোধ হয় একটু অশ্রু-মনস্ক হইয়াই শুনিতেছিল বলিয়া প্রশ্ন করিল—“কিন্তু ক্ষতি কি তাতে?”

চম্পা চুপ করিয়া রহিল।

টুলু আবার বলিল—“তুমি ত আমাদের কথা পৌছে দিচ্ছ না ওর কাছে, বরং অন্যকে না রেখে তোমায় রেখেছে সেই ভাল।”

“আমি সেই জেতেই ওকে জানিয়ে এসেছি যে ওর কথায় রাজী হলাম, থাকব এখানে এসে; কিন্তু ওর চালটা কি ভয়ঙ্কর তা ত বুঝতে পারছি। জেনে শুনে আপনাদের সর্বনাশ কি করে করব?”

“সর্বনাশটা কি?”

প্রশ্নটা করার পরই উত্তরটা কিন্তু তাহার আপনা হইতেই

জোগাইয়া গেল, বলিল—“ও বুঝেছি ; কিন্তু এর জবাব ত তোমায় আগেই দিয়েছি—আমরা যে পথের পথিক তাতে এ সব গ্রাহ্য করলে চলে না আমাদের, আর মাষ্টারমশাই—তিনি ত দেবতার কাছাকাছি।”

“মানুষের মন কত পলক জানেন না কি ? মাষ্টারমশাই...আপনার দেবতাকে দেবতাই থাকবেন, কিন্তু আমাকে এখানে দেখলেই লোকের মন যাবে বদলে।...আমি সেদিন ত শুন্লাম মাষ্টারমশাইয়ের চিঠিটা—যাদের মধ্যে আপনাকে কাজ করতে বলেছেন তিনি, তাদের অত তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই, তারা যেই দেখবে আমি বা আমার মত কেউ মাষ্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে, অমনি তাদের মন যাবে ভেঙে। আর তাদের মধ্যে কাজ করা চলবে না। এই হচ্ছে ম্যানেজার বাবুর চাল। আপনি আজ হুপুরের একটু পরে বস্তিতে গিয়েছিলেন, তাদের যে কি আশ্লাদ বলে বোঝানো যায় না, সত্যি কোন দেবতা নেমে এলেও এ রকম সাড়া পড়ে যেত না বোধ হয় ; যার সঙ্গেই দেখা হয়, যার কাছেই বসি, শুধু—”

টুপু বাধা দিয়া বলিল—“ও থাক ; তুমি সেদিন চিঠিটা শুনেছিলে—তিনটে বিষয় নিয়ে কাজ করবার কথা লিখেছিলেন—হলিদের মধ্যে ; শিশু নিয়ে, আর—”

একটু ধামিয়া যাইতে চম্পা নিজেই পুরণ করিয়া দিল—“আর আমাদের নিয়ে।”

“তোমাদের সরিয়ে রেখে তোমাদের নিয়ে কি করে কাজ হবে।...চম্পা, সেই চিঠিতেই ত দেখেছিলে মাষ্টারমশাইয়ের কত বড় আশা ?”

চম্পার মনে পড়িল—“একটা মেয়ে হুধুরে গেলে একটা জাতি বেঁচে যেতে পারে।”—ওরও যে কত বড় আশা কি করিয়া জানায় ? কতকটা মনের পূর্ণতায়, কতকটা কুণ্ঠায় চূপ করিয়া দৃষ্টি নত করিল।

টুপু হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইল, বলিল—“কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হচ্ছি চম্পা, এখানে থাকবে বলে তুমি নিজে ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলে, এখন আবার থাকবার বিরুদ্ধেই তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ।”

চম্পা একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—“আমায় মাক করবেন, আবার পুরানো কথা এনে ফেলছি, আপনি এখান থেকে যান। ম্যানেজারকে কথা দিয়ে আসবার পর অনেকটা সময় গেছে, আমি ভেবে দেখলাম আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার ; শুধু আপনার কেন, আপনার আর মাষ্টারমশাইয়ের—হুজনেরই। কাজের জীবন আপনাদের, কাজ আপনারা যেখানে যাবেন সেখানেই করবেন। অনেক ভেবে দেখলাম ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলেও আমার এখানে আসা চলবে না, অথচ আপনারা যদি থাকেনই ত আমার না এসে উপায় নেই।”

যে পাহারা দিবার কথাটা গোপন করিতে চাহিতেছিল সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার মুখে আসিয়া চম্পা চূপ করিয়া গেল। টুপু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—“কেন ?—না এসে উপায় নেই ?”

চম্পা ততক্ষণে আবার সামলাইয়া লইয়াছে, বলিল—“ঐ যে, ম্যানেজারকে কথা দিয়েছি।”

কিছু যে একটা গোপন করিয়া ফেলিল টুপু সেটা বুঝিতে পারিল, একটু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চম্পা তাড়াতাড়ি অল্প কথা আনিয়া ফেলিল—সেই পুরানো কথাই, বলিল—“না, আপনারা যান এখান থেকে, সত্যি অনেক বিপদ।”

টুপু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল—“আবার ভুতের ভয় দেখাচ্ছ—”

চম্পা ব্যাকুল ভাবে বলিল—“ভয় নয় সত্যি।”

“কি রকম ?”

“আপনার পেছনে লোক লেগেছে। আপনাকে আমি এখনও সব কথা বলি নি, ভেবেছিলাম বলবার দরকার হবে না। হুপুরে যে লোকটা দাহুর কাছে আসে সে ম্যানেজারের চর, চর বললে ঠিক বোঝায় না, চরের কাজ খবর নেওয়া, ওর উদ্দেশ্য কিন্তু অল্প রকম।”

“বুন জখম ?”

“আশ্চর্য হবার কিছু নেই।”

“কি করে জানলে ?”

“ওকে আমি দেখেছি এই পথ দিয়ে গভীর রাত্তিরে যেতে। হুজন থাকে। তিন দিন দেখেছি।”

“একটা লোক এই পথ দিয়ে যায় বলে ত এটা প্রমাণ হয় না সে বুন করবার মতলবেই ঘুরে বেড়ায়।”

“কিন্তু ঠিক সেই লোকটাই দিনের বেলা নিত্য দাহুর কাছে এসে কেন অত খোঁজখবর নেবে ?”

“হয় ত—”

বলার উদ্দেশ্য ছিল—হয় ত লোকটা সত্যিই চম্পার বিবাহের কথার জখম আসে, কিন্তু বলা ঠিক হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া একটু চোখ তুলিয়া চাহিতেই দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল।

শোবার ঘরের দোরটা খোলা ; দেখিল বিছানার মাথার কাছে রাত্তার দিকে যে জানালাটা তাহার ছইটা গরাদ ধরিয়া একটা লোক মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘরের ভিতরটা দেখিতেছে। বেশ সবল চেহারা, চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

“কি দেখছেন ?”—বলিয়া চম্পা টুপু দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই লোকটা একবার মুখ তুলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নামাইয়া লইল।

“কে ?”—বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টুপু অগ্রসর হইতেই চম্পা গেলির নিচেটা টানিয়া ধরিল, বলিল—“যাবেন না, সেই লোকটা।”

—ভয়ে এক মুহূর্তেই তাহার চেহারা অল্প রকম হইয়া গেছে।

আটকা পড়িয়া টুল একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছু না পাইয়া চেয়ারের নড়বড়ে হাতলটা ভাঙিয়া লইয়া পেঙ্কিটাতে একটা টান দিয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, চম্পা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। হাঁপাইতেছে, তাহারই মধ্যে চাপা স্বরে বলিল—“সেই লোকটা; আজ স্থলে কাউকে না দেখে...”

টুল প্রশ্ন করিল—“কেন স্থলে ওরা কেউ নেই? এই বললে...”

চম্পা হকচকিয়া গেল, বলিল—“না...সে কথা নয়... মানে...চলুন আপনি, ওদের তুলিগে।”

টুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া ওর এই অসংলগ্ন কথাগুলো শুনিতেছিল; একটু অবিল, তাহার পর বলিল—“না, তুলে কাজ নেই, অথবা একটা গোলমাল হয়ে ওদের মুখ দিয়ে খনি, বস্তি—সারা গল্পডিহিতে ছড়িয়ে পড়বে কথটা। এই পর্যন্তই থাক না, ও আর আসবে না। চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।”

চম্পা কতকটা তিরস্কারের স্বরেই বলিল—“পৌঁছে দিয়ে আপনি কিরে আসবেন এখানে?—তার মানে?”

“বেশ, তবে ভেতরেই এস; তোমার সঙ্গে কথাগুলো এখনও শেষ হয় নি।”

“এ একটা ভাঙা চেয়ারের হাতলের ওপর গুরসা করে?”

টুল একটু হাসিয়া বলিল—“তুমি এসেই না, আমি নিজে ত ভাঙা নয়। তা ভিন্ন আছে অল্প ঘরে, তাড়াতাড়িতে খেয়াল হয় নি।”

আবার সেই ভাবে ছইজনে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া রহিল। কথা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল না। টুলের মুখটা বড় কঠিন, একটা বাধা পাইয়া ভিতরের প্রতিজ্ঞা যেন কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, যেন কোন কঠোর উত্তর আশঙ্কা করিয়াই চম্পা আর কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না।

ছই জনের মধ্য দিয়া শুরু রাত্রি গড়াইয়া চলিয়াছে। এক সময় যখন শেষ রাত্রের সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাটুকু স্নান হইয়া আসিয়াছে, চম্পা বলিল—“এবার আমায় যেতে হবে; একটা কথা জিঞ্জেস করি, এর পরেও আপনি থাকবেন এখানে?”

“না থাকার কথা কোথা থেকে আসে?”

“আজ রাত্রে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আপনি।”

টুলের দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, বলিল—“কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাত্রে সেটা ত তোমার চোখে পড়ছে না।...থাকবার লোভও ঢের বেড়ে গেছে আমার। তবে হ্যাঁ, প্রাণটাকে আগলে রাখতে হবে বৈকি। তার উপায়ই ভাবছিলাম এতক্ষণ।”

“কি?”

“সকালে আর একবার ম্যানেজারের কাছে যেও, ব'লো তুমি হীরককে ত ছেড়ে থাকতে পারবে না, তিনি যেন পেলাদ আর পেলাদের জীকেও এখানে এসে থাকতে হুকুম দেন। ব'লো আমায় রাজী করিয়েছ, আমাদের যে চাকরের ঘরটা আছে তাইতে এসে থাকবে।”

“তাতে কি হবে?”

“তাতে অনেক কিছুই হবে, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, পরে দেখতেও পাবে। আপাততঃ এই হবে যে তোমায় সারারাত স্থলের দরজায় বসে পাহারা দিতে হবে না, হীরক আর প্রফাাদের ছেলে গলাবান্ধি করে সে কাজটা বেশ ভাল ভাবেই করে যেতে পারবে।”

টুলের স্নিগ্ধ ঈষৎ-হাসিত দৃষ্টির উপর নিরতিশয় বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেলিয়া চম্পা প্রশ্ন করিল—“আমি বসে বসে পাহারা দিই?—বাঃ কে বললে?”

“তোমার সঙ্গে এত কথা হবার পরেও সেটা অজ্ঞের কাছে জানতে হবে চম্পা?...যাও এবার ভোর হয়ে এসেছে।”

২২

টুল এবং চম্পার নজর পড়িতে যে লোকটি জানালার নিচে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহার নাম নিবারণ। এই লোকটিকেই চম্পা গভীর রাত্রে বারচাকরক বালিয়াড়ির পথে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল এবং এ-ই প্রতিদিন ছুপুরে আসিয়া বনমালীর কাছে তাহার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল। নিবারণের সঙ্গে ম্যানেজার রতিকান্তের পরিচয় এবং সম্বন্ধের ইতিহাস একটু নূতন ধরণের :

কলিকাতায় এক দিন সন্ধ্যায় ট্রাম হইতে নামিয়া বাসায় আসিবার সময় রতিকান্ত টের পাইলেন সোনার চেনে গাথা তাগাটা অন্তর্হিত হইয়াছে। গরমের জল পাঞ্জাবীর হাতাটা কলুই পর্যন্ত লুটানো ছিল, এই সন্ধ্যোগেই কে হাতসাক্ষাই করিয়াছে। ট্রাম থেকে বাড়িটা অল্প দূরেই, গেট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন, একটা লোক খুব সম্রমের সহিত হুইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“হজুরের সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে।”

রতিকান্ত প্রশ্ন করিলেন, “কি প্রয়োজন?”

লোকটা এক নজরে এক বার চারি দিকটা দেখিয়া লইয়া বলিল—“একটু নিরিবিলা না হলে হবে না।” রাস্তাটা একটু গিয়াই একটা পড়ো জমিতে পড়িয়াছে, নিজেই বলিল—“এখানটা মন্দ হবে না।”

রতিকান্তের একটু কি রকম মনে হইল বটে, রাত হইয়াছে, তার পাড়াটা একটু নির্জন, তবু অগ্রসর হইলেন। সামান্যসামনি হইয়া দাঁড়াইলে লোকটা কামিজটা তুলিয়া ফতুরার পকেট হইতে চেনসুদ্র তাগাটা বাহির করিয়া একটু হাসিয়া বলিল—“হজুরেরই মাল, চিনে লেন।”

চেনটা একজায়গায় শুধু কাটা; হাতে লইয়া রতিকান্ত
অতিমাত্র বিম্মিত হইয়া বলিলেন—“তুমি কোথায় গেলে?”

লোকটা একটু দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—
“হজুরের শরীল থেকে।”

“তুমিই সরিয়েছ?—নিজে তুমি?”

“হজুর আর নজ্জা দেবেন না, এমন আর কি বাহাছুরির
কাজ?”

রতিকান্তের আর কথা জোগাইল না খানিকক্ষণ, চুপ
করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর প্রশ্ন
করিলেন—“আবার কিরিয়ে দিলে যে?”

“হজুরের কাছে যদি কোন চাকরি পাই...”

“কি চাকরি?”

“অধীন কি দরের লোক একটা লমুনো দিলাম হজুরকে,
ভরসা পাই ত কাল সার্টিফিকেট হাজির করতে পারি, দেখে
ব্যবস্থা করবেন।”

“সার্টিফিকেট!...বিস্ময়ের উপর আর এক চোট বিম্মিত
হইয়া রতিকান্ত একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার
পর বলিলেন—“কিন্তু আমি ত গাঁটকাটার সর্দার নয়।”

লোকটা জিভ কাটল, তাহার পর বুঁকিয়া ডান হাতটা
রতিকান্তের পায়ে কাছাকাছি লইয়া গিয়া আবার নিজের
মাথায় ঠেকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—“অমন কথা
শুনলেও পাপ হজুর; হজুরদের কলকেতায়, বাইরে ফলাও
কারখানা, অনেক রকম ভাল-মন্দ লোকের প্রয়োজন, তাই
দ্বারস্ত হয়েছে গোলাম—একখানি লোমুনো দেখিয়ে। এর
চেয়ে বড় কাজেও গোলামের কারিগুরি আছে—সার্টিফিকেট
দেখলেই বুঝতে পারবেন হজুর।”

রতিকান্ত আর একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন—“বেশ এনো
তোমার সার্টিফিকেট।”

“কাল এই সময়, এইখানে।”

“বেশ, এস।”

গেট পর্যন্ত আসিল লোকটা, তাহার পর বিদায় লইয়া
খানিকটা আগাইয়া গেলে, রতিকান্ত আবার গেটের বাহিরে
আসিয়া ডাকিলেন, কাছে আসিলে বলিলেন—“বেশ পরিষ্কার
ভাবে সরিয়ে আবার দিয়ে তো গেলে, তোমাকে পুলিশে
ধরিয়ে দিতে তো পারতাম—অন্তত কাল ত তার ব্যবস্থা
করতে পারি।”

লোকটা মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু নতুন ধরনের
হাসি হাসিল, বলিল—“সে লোক নয় আপনি হজুর,—এটুকু
না বুঝলে আমাদের ব্যবসা চলে কি করে?” তাহার পর
আবার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন যথাসময়ে রতিকান্তের হাতে সার্টিফিকেটটা
পৌছিল। প্রায় ছয় ইঞ্চি X ছয় ইঞ্চি একখানি পার্চমেন্টের
কাগজ, বাঁ দিকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছাপা সার্টিফিকেটের

গণ, ডান দিকে হাতে লেখা। রতিকান্ত বিম্মিত নয়নে পড়িয়া
গেলেন:

নাম—নিবারণ পালবি

বয়স—চল্লিশ

ওজন—এক মণ সাতাশ সের

ছাতি—চল্লিশ ইঞ্চি

হাত সাফাইয়ের দাম

হাল তারিখ তক—আড়াই হাজার

খুন হাল তারিখ তক—তিন

বিশেষ—কানের পিছনে চোব।

সর্দার কালুরাম

পিসিডেন্ট

সার্টিফিকেটের মাঝখানে যথারীতি একটা বাদামি ষ্ট্যাম্প
মারা, উপরে লেখা ‘সর্দার কালুরামের আখরা’, নিচে
লেখা ‘হাড়কাটা লেন গলি’; মাঝখানটায় সেই দিনের তারিখ
বসানো।

এরকম অদ্ভুত ব্যাপার রতিকান্তের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম,
তিন-চার বার কাগজটা পড়িয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে নিবারণ
খুব ঘটা করিয়া সেলাম করিয়া একটু দম্ব বিকশিত করিল।
রতিকান্ত প্রশ্ন করিলেন—“তা হলে তোমার নাম নিবারণ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ হজুর।”

“হাড়কাটার গলিতে তোমাদের আখড়া?”

নিবারণ একটু হাসিয়া বলিল—“তা হলে কি সার্টিফিকেটে
লেখা থাকত হজুর? অত কাঁচা কাজ কেউ করে? দিবি
গালভরা পছন্দসই নাম তাই সর্দারজী ইষ্টাম্পোরে বসিয়ে
দিয়েছেন, যে রকম আপিস-পাড়া হ’ল ড্যালহৌসি স্কোয়ার
সেই রকম,—গলির নামটাতে সার্টিফিকেটের ম্যেডা বাডল, এই
আর কি।”

“আর কালুরাম?”

নিবারণ আবার জিভ কামড়াইয়া বলিল—“তিনি জলজ্যান্ত
মহাপুরুষ। অধীনের ওপর নেকনজর হলে কোন-না-কোন
সময় সাক্ষাৎ হবে।”

“কি চাকরি চাও?”

“বাঁধা চাকরি নয় হজুর, বুঝতেই ত পারেন। সার্টিফিকেট
দেখা রইল, যেমন যেমন গোলামের দরকার পড়বে বলবেন,
গোলাম খেদমতে হাজির হবে; এই আর কি।...কাজ দেখে
বকশিশ, তার পর রূপা হয় কিছু বাঁধা খোরাকীর হুকুম করে
দেবেন, হজুরদের ভরসাতেই তো বেঁচে থাকা?”

সমস্ত ব্যাপারটা কোতুক-গান্ধীর্বে মেশানো, শেষের
কথাটতে বিশেষ করিয়া একটু কোতুক বোধ হওয়ায়
রতিকান্ত একটু মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিলেন। তাহার পর
প্রশ্ন করিলেন—“কিন্তু তোমার ঠিকানা? পাব কোথায়
তোমার।”

“এবার সুযোগ করে নিতিহাই হাজরি দেব হজুর। কুপা একটু কায়েমী হয়ে গেলেই ঠিকানা লোট করিয়ে দেবে গোলাম। হুঁজন হুঁজনকে ভালো রকম না চেনা পয্যন্ত—বুঝতেই পারেন হজুর...”

হাসিল একটু।

গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় লইবার সময় বলিল—“আজ থেকে হজুরের সব মাল সদারজীর হেফাজতে জানবেন, রাশায় পড়ে থাকলেও কারুর খুঁটে নেবার বুকুর পাটা নেই কলকোতা শহরে।...গেটা-পাঁচেক ট্যাঁকা হজুর, লোতুন চাকরির ভেট দিতে হবে সদারজীকে। কপাল-জোরে লব্বর এক কেলাসের চাকরি হ’ল কিনা, পাঁচ টাকা।”

পকেটেই ছিল, একটা পাঁচ টাকার নোট রতিকান্ত নিবারণের হাতে দিলেন।

আজও নিবারণ খানিকটা গেলে রতিকান্ত গেটের বাহিরে আসিয়া আবার ডাকিলেন, ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—“একটা কথা নিবারণ, সার্টফিকেটে তোমার বিশেষ গুণের মধ্যে লেখা আছে—কানের পেছনে চোখ, ব্যাপারটা বুঝলাম না ত।”

নিবারণ আবার একটু দস্ত বিকশিত করিয়া হাসিল, তাহাতে তাহার ভাঁটার মত চোখ দুইটা আরও যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল—“হজুর এখানে দাঁড়ান।”

নিজের আট-দশ হাত তফাতে চলিয়া গেল, তাহার পর বলিল—“এই বার যটা বুশি আঙুল তুলুন হজুর।”

রতিকান্ত বুড়া আঙুল আর কড়ে আঙুল গুটাইয়া লইয়া ডান হাতটা একটু তুলিলেন। নিবারণের মুখ উণ্টা দিকেই, ঘাড়টা একেবারেই সিঁধা, টের পাওয়া যায় না যে কোন দিকে একটুও ঘোরানো, বলিল—“হজুর তিনটে আঙুল তুলে ধরছেন।”

তাহার পর ফিরিয়া কাছে আসিয়া সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—“ভগবান এইটুকু ধ্যামতা ফালতু দিয়েছেন হজুর, জানেন লোকটাকে করে খেতে হবে ত। মানে পিছনকার জিনিস ঘুরে দেখতে হয় না, তবে ঐ হাত-কয়েক তফাৎ চাই।”

এর পূর্বে কাজ লইয়া নিবারণের কয়েকবার গঞ্জডিহিতে আসা হইয়া গেছে। দু-একটা ছোটখাটো কাজ ছাড়া সার্টফিকেটে আরও দুইটি খুন জমা হইয়াছে। পরিষ্কার হাত, গতিবিধি খুব প্রচ্ছন্ন। কানের পিছনে চোখ আছে বলিয়া বেশ নিলিগু ভাব বজায় রাখিয়া অনেক খবর রাগিতে পারে। এই ক্ষমতার জুই স্থলের গেট পার হইয়া প্রথম দিনই টের পাইল স্থলের গেটে চম্পা। চম্পার একটু সন্দেহেরও অবকাশ হইতে দিল না যে সে ধরা পড়িয়া গেছে।...এর পর স্বস্তর

সাজিয়া তাগ খুঁজিতে লাগিল, অবশ্য বুঝিটা কতকটা ম্যানেজার রতিকান্তের।

ম্যানেজারের সঙ্গে নিবারণ দেখা করে গভীর রাতে, তার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

সকালে চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারের সে ব্যবস্থা ঠিক হইল। তাহার পর নিবারণের এ যাত্রায় গঞ্জডিহিতে কাজ স্থগিত রহিল। কথাটা কিন্তু নিবারণকে বলা হয় নাই। যেখানে তাহার থাকার ব্যবস্থা সেখানে কয়েকবার লোক পাঠাইয়া-ছিলেন ডাকিয়া আনিবার জন্ত, দেখা পায় নাই। ম্যানেজার একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় রাত যখন প্রায় আড়াইটা, নিবারণ আসিয়া উপস্থিত হইল, সেলাম করিয়া বলিল—“আজও হ’ল না হজুর, তবে একটা বড় জবর সংবাদ আছে।”

ম্যানেজার প্রশ্ন করিলেন—“কি।”

“আজ যুগল মূর্তি দেখলাম, ছুঁড়িটা ওরই বাসায়।”

ম্যানেজার এই সময় গোলাপী নেশায় থাকেন, একটু যেন চকিত হইয়াই সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—“তাই নাকি।” গাভীঘের মধ্যে ভিতরের আনন্দটা একটু ফুটিয়া বাহির হইল।

নিবারণ বলিল—“এতে সুবিধে এই হ’ল হজুর সে দুটোকে একসঙ্গে পাচার করে দিলে কারুর আর সন্দেহ করবার থাকবে না কিছুই—আপনি সব রটে যাবে দুটোতে ভেগেচে। এখন হজুরের হুকুমের যা দেবি, তবে আর একজন লোক চাই। একটু খলিফা গোছেয়।”

ম্যানেজারের আনন্দের কারণ গ্ল্যানটা এত দ্রুত সফল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া; চম্পা যে এত দ্বারায় কাজে নামিয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এতটা সফল হইবে আশা করিতে পারেন নাই। শুধু যে আনন্দিত হইলেন তাহাই না, বেশ খানিকটা স্বস্তিও বোধ হইল, কেননাকতকটা প্রয়োজনে এবং কতকটা আক্রোশের বশে টুলুর পিছনে নিবারণকে লাগাইলেও এটা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে অল্প খুনে আর এ খুনে তফাৎ অনেক। টুলু ব্যানার্জি কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর ভাই-পো, তাহার এটাও জানা যে, ম্যানেজার টুলুর উপর চটা—কিছু একটা ঘটিলে তাহার উপরই সন্দেহ হইবে। আরও টের পাইয়াছেন টুলুর পিতা রাজসাহীর বেশ বড় উকিল এক জন। খনি-নিষ্কটক করিতে বোধ হয় অল্প কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গুরুতরই হইবার সম্ভাবনা ছিল। এখন এ বেশ হইল, চরিত্রের গলদ লইয়া ও সব বড় কাজ চলবে না টুলুর, আমলই পাইবে না কাহারও কাছে; এদিকে মাষ্টার-মশাই আসিলে তাঁহাকেও জড়াইয়া স্থলের সুনামের জন্ত তাঁহাকে স্তম্ভ সরাইয়া পথ পরিষ্কার করা সহজ হইবে; চিঠি ত রহিলই।...ব্যাপারটি বড় মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে;

গোলাপী নেশার সঙ্গে বেশ মিলাইয়া মিলাইয়া উপভোগ করিলেন নিজের চালের এই সফলতাটুকু, তাহার পর নিবারণকে বলিলেন—“এটা আপাতত তোলা রইল নিবারণ, তোমাকে একটু অল্প কাজে যেতে হবে...”

নিবারণ একটু বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—“তোলা রইল কি হজুর!—এমন একটা দাঁও আপনি হ’তে পথ বেয়ে এল!...”

বেশ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াই করিল প্রশ্নটা—একেবারে ডবল বকশিশের আশায় ছাই পড়ে...

ম্যানেজার সব কথা ভাবিলেন না, বলিলেন—মেয়েটা এসেই গোল বাধালো যে, বড় ঝগড়া, শুকে আমার হাতে রাখতে হবে নিবারণ, আপাততঃ কিছুদিন।

অবশ্য তা বলে তোমার বকশিশের জন্তে ভাবনা নেই; বরং ফিরে যাবার আগে আর একটু কাজ করে যাও, কাংরাস গড়ের দিকে ষ্ট্রাইকের গোলমাল হব হব করছে, কে করছে; কিভাবে করছে দেখে আসতে হবে, স্কুলের হেড মাষ্টারকে ত তুমি দেখেছ। সেই লোকটাই কিনা একটু জানা বিশেষ দরকার। যত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু, আমায় একটু বাইরে বেরতে হবে।

২৩

পরদিন সকালে চম্পা আসিয়া, প্রহ্লাদ আর প্রহ্লাদের বোয়ের স্কুলে আসিয়া থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, আবদার করিয়া বলিল, সে হীরককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।

ম্যানেজারের মনটা খুব ভাল ছিল, হুকুমটা সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল। রহস্য করিয়া বলিলেন—“তুই যাকে যাকে ছেড়ে থাকতে পারবি নি সব এক জায়গায় করে দিচ্ছি চম্পা।”

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল—“এ হীরাকে নিয়েই যার সঙ্গে এমন আড়াআড়িটা হয়ে গেল জোর করে তো তার সঙ্গেই এক রকম এক ছাতের নীচে থাকতে হচ্ছে—কি যে আপনাদের উৎসাহ হবে জানি না—তার ওপর ঠাটা করে কাটা খায়ে রুনের ছিটে দিন...”

নিবারণের কাছে, ‘আড়াআড়ি’ যে কত দূর সে-খবর পাওয়ার পর অভিনয়টা বেশ উপভোগ্যই করিলেন ম্যানেজার, শুধু একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন—“নে, তোর হীরার ব্যবস্থাও করে দিই।”

সামান্য একটু থামিয়া অল্প দিনের চেয়ে একটু বেশী প্রশ্রয় দিয়াই বলিলেন—“ঘরের ভেতর থেকে আমার অফিস লেটারের প্যাডটা নিয়ে আস; চিনতে পারবি তো? আর ফাউন্টেন পেনটা।”

চম্পা আনিয়া দিলে একটু হাসিয়া বলিলেন—“না চিনলে

চলবে কোথা থেকে? তোকে যে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি করছি।”

চম্পা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“ঠাটা রেখে কাজ করুন এখন।”

“তাও ভাবি আবার,—তুই হুকুম করবার মানুষ, তাই থাকবি কি করে।”

লিখিতে লিখিতে কথাটা বলিয়া এক জায়গায় একটু দাঁড়াইয়া অল্প একটু ভাবিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—“টাকাটা কি লিখি বন্দিকিন?”

চম্পা আবার রাগ করিয়া বলিল—“কিছু না বললেও তো বদনাম দিচ্ছেন যে হুকুম করছি...”

“তবু বলই না।”

“আপনাদের তো হাত ঝাড়লে পাহাড়—গোটা দশ টাকা দিন না অন্তত।”

“অফিস ষ্ট্যাম্প আর কপির প্যাডটা নিয়ে আস, পাকা ব্যবস্থাই করে দিই তোর ছেলের।”

আনিলে হুকুমনামাটা শেষ করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—“দেখ, সায়েবি স্কুলে ছ’বছর পড়েছিলি তো, কিছু কিছু বুঝবি। নে, এবার ষ্ট্যাম্পটা বসিয়ে দে।”

আর কিছু না বুঝুক, সংখ্যাটা দেখিয়াই বলিল চম্পা—গনের টাকা। একটু যেন অস্বস্তিক হইয়া গেল, তখনই সে ভাবটা চাপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—“আপনার দয়া।”

ম্যানেজার চেয়ারে গা তালিয়া দিয়া স্থিরভাবে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন, তাহার পর বলিলেন—“চম্পা, তোকে একটা বড় কাজ দিয়েছি, তার মর্মও তুই বুঝিস, আর ভালো ভাবে আরম্ভও করেছিস। এখন তোকে ভেতরের কথা একটু বলার মতো সাহস পাচ্ছি।”

চম্পা বলিল—“বলুন।”

“খনিতে একটা বিপদ আসছে, বাইরে বাইরে এসে পড়েছে, এখানেও আসবে, আর সেটার বাহন যে মাষ্টারমশাই আর এই ছেলেটা সেটা নিশ্চয় তুইও বুঝতে পেরেছিস।”

চুপ করিলেন, চম্পাও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—“কথা ক’স না যে?”

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—“আমরা অত বুঝি?...তবে, হুকুমকেই একটু কিরকম কিরকম মনে হয় বটে।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তরটা শুনিয়া বলিলেন—“এবার নিজের ঘরের কথা তোকে বলি একটু, আমায় দিন কতকের জন্ত বাইরে যেতে হবে—আপাততঃ দিন দশেকের জন্তে যাচ্ছি, বোঝা হয় আরও কিছুদিন হয়ে যাবে। অনেকদিন থেকেই ভাবছি বেরুব, কিন্তু উৎপাত ঘটতে পারে বলে বেরুই নি, এখন তুই এ কাজটুকু হাতে তুলে নিলে ভাবছি বেরুব।”

একটু হাসিয়া বলিলেন—“মানে, তুই-ই ম্যানেজার হয়ে রইলি আর কি।”

চম্পাও একটু হাসিয়া বলিল—“গম্ভীরকে বাড়াচ্ছেন তো অনেকখানি, কিন্তু কি চাল দিয়ে ওরা কি কাজ করে সে কি আর আমি বুঝতে পারব ?”

“তোকে কিছু বুঝতে হবে না, কিছু করতে হবে না, তুই শুধু আগলে থাকবি, সেখানে তো তোর চাল পাকাই, মানে, যাকে বলে অব্যর্থ ?”

সিগারেটটা নিভিয়া যাওয়ার ধরাইতে ধরাইতে কথাটা বলিলেন ম্যানেজার, তাই দেখিতে পাইলেন না চম্পার মুখটা হঠাৎ গম্ভীর আর আরক্তিম হইয়া উঠিল; মুখটা ঘুরাইয়া লইলও একটু।

এর পরে বাজে কথা বলিয়াই আটকাইয়া রাখিলেন অনেকক্ষণ, লঘু রহস্য, কষ্টিনাষ্ট—এই সব; অতদিনের চেয়ে একটু বেশি আঁকারা দিয়া। চম্পা যোগ দিয়াও গেল, তবে ম্যানেজারের যেন মনে হইল কোথায় কিসের একটা অভাব ঘটিয়াছে, আর এটা স্পষ্ট অনুভব করিলেন রহস্যের মধ্যেও কথার মোড় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শালীনতার একটা সীমা বজায় রাখিয়া গেল, তাহার বেশি আগাইতে দিবে না তাঁহাকে; অবশ্য খুব স্বস্তির সঙ্গে। বেশ একটু নতন ঠেকিল। চলিয়া গেলে নিজের মনেই বলিলেন—“মেয়েটা সত্যিই মজল নাকি ?”

অনেকক্ষণই একদৃষ্টে চাহিয়া অত্মমনস্ক হইয়া রহিলেন। একটা মিশ্র চিন্তার প্রোত মনে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কি একটা বেদনারও রেশ আছে—অথচ তিনি তো চানই যে, চম্পা খুব অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়া টুলুকে নীচে টানিয়া আঁহুক।

চিন্তাটাকে অত দিকে ফিরাইয়া লইলেন, কাজের দিকে। যদি তাই হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি হৃদয়ের ব্যাপার আসিয়া গিয়া থাকে তো চম্পার হাতে এমন গুরুতর ব্যাপারটা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া বসা চলিবে কি ?...আবার একটা নতন সিগারেট পুড়িল, তাহার পরে একটা কথা মনে হইল—যাইবার আগে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু জানাজানি করিয়া দিলে মন্দ হয় না—এই যে চম্পার মত একটা যুবতী, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ টুলুর সাম্রাধ্যকামী হইয়া পড়িল।...কিন্তু কি করিয়া করা যায় ?

ভাবিতে ভাবিতে উপায়ও ঠাহর হইয়া গেল। বেশ স্বস্তি অথচ ভদ্র উপায়—অতি সহজেই গঞ্জডিহির ভদ্রসমাজের নজর টুলুর উপর নিবদ্ধ হইয়া পড়িবে, আপাততঃ টুলুর উপর, এর পর মাষ্টারমশাইয়ের উপরও। তাহার অনুপস্থিতিতে আপাততঃ অনেকটা কাজ হইবে, তাহার পর শেষ পর্যন্ত মাষ্টারমশাইকে সরাইতেও গোলমাল হইবে না।

ম্যানেজার পরের দিন বৈকালে জুল কমিটির মিটিং ডাকিলেন। ছোট জায়গার জুলে মুখ দেখাদেখি করিতে করিতে মেসার হইয়া পড়ে অনেক, অর্থাৎ বিশিষ্ট কেহই বাদ পড়ে না। মিটিঙে সবাই আসিতে না পারিলেও, জন বারো

লোক হইল—ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বাজারের কয়েকজন বিশিষ্ট আড়ম্বাদর, গঞ্জডিহির বাহিরেই একটি ক্ষমিদারি কুঠি আছে, তাহার নামেব আরও সব। ম্যানেজার ছাড়া খনির তরফ থেকে আছেন পরেশবাবু। সবাই যে ম্যানেজারের সপক্ষে এমন নয়, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসী লোক, আর সবার মতো সব কথাতেই সায় দিয়া যায় না। আরও দু-এক জন আছে এই রকম, খদ্দর পরে, মাঝে মাঝে বেতুরা গায়। তবে ম্যানেজারের প্রতিপত্তি খুব বেশী, তাহার প্রস্তাবটাই বেশী খাটে।

মিটিঙের কাজ বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ বনমালীর বাসায় শিশুকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল। প্রহ্লাদের বোঁ তাহার আগের দিনই আসিয়া গেছে, হীরক বোধ হয় ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। মেসারদের অনেকেই বিস্মিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল, দু-এক জন প্রশ্ন করিল—“কচি ছেলের গলা যে হঠাৎ ?”

ম্যানেজার একটা সুরোগ খুঁজিতেই ছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—“ও! সেই যে আমাদের খনির সেই ছেলেটা, সেই মেয়েটা যেটাকে adopt করেছে।”

পরেশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“কি নাম মেয়েটার—পরেশবাবু ?”

পরেশবাবুও নাম জানেন না মোটেই, বলিলেন—“ও, চরণদাসের মেয়েটা ?”

এ সব মিটিঙে কাজের চেয়ে অকাজের কথাই বেশী চলে, তাহারই সন্ধান পাইয়া একজন বলিল—“তা এখানে এসে জুটল যে ?...মেয়েটার ভেমন সুনাম নেই গঞ্জডিহিতে তাই জিগ্যেস করছি।”

অপর একজন বলিল—“মেয়েটা শুনেছি জুলের চাকরটার নাতনি। তাই বোধ হয়...”

ম্যানেজার একটা প্রস্তাব লিখিতেছিলেন, একটু ঠোট ঝাঁকাইয়া হাসিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—“তাই কি ঠিক ?...পরেশবাবু বলুন না, আপনি ত ব্যাপারটা জানেন ?”

তাহার পর নিজেই কলমটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—“আসলে ছেলেটিকে নেম প্রথমে অত এক জন, মাষ্টারমশাইয়ের বাসাভেঁই থাকে, আমার ত তাঁর আত্মীয় বলেই পরিচয় দিয়েছিল। সেই বোধ হয় কোন একটা বন্দোবস্ত করেছে।”

খদ্দরধারী একজন যুবক একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, বলিল—“সে ছোকরা ব্যানার্জি কোম্পানির অনুপমবাবুর ভাইপো। মাষ্টারমশাই-ই আমার বলেন।”

ম্যানেজার বলিলেন—“ও! তা হবে; আমার বললে মাষ্টারমশাইয়েরই আত্মীয়।”

এক জন প্রশ্ন করিল—“তা এ রকম লুকোচুরি খেলবার মানে ?”

ম্যানেজার আবার কলম তুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—“অত মানে খুঁজে ফেরবার ফুরসত নেই আমার।” লেখার মাঝে একবার একটু কলম ধামাইয়া বলিলেন—“মানে নিশ্চয় আধ্যাত্মিক নয়।”

এটেই আজকের মিটিঙে শেষ প্রস্তাব ছিল, লিখিয়া ফেলিয়া বলিলেন—“এই হ’ল, আপনারা শুধুন সবাই।”

কাজ শেষ হওয়ার পরও কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে গল্পের ছেরটা চলিল একটু। বুব ভাল—বিশেষ করিয়া চরিত্রের দিক দিয়া বুব ভাল, এমন লোক আবার অনেকের চক্ষুশূল। একজন বলিল—“তা কতদিনকার ব্যাপার এটা? আমরা ত জানতাম যে মাষ্টারমশাই...”

খবরধারী দু’বাটি বেশ একটু জানাইয়া বাধা দিল, বলিল—“তিনি দেবতা।”

ম্যানেজার এমন স্তব্ধগাটা হাতছাড়া করিলেন না। কাজ হইয়া গেছে, চেয়ার তেলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন—“আমি ত সেইজন্মেই ও নিয়ে মাধা ধামাই নি। তাঁকে দেব-চরিত্র বলেই জানি, তিনি এসেই একটা ব্যবস্থা করবেন...মানে সরিয়ে-টরিয়ে দেবেন এদের।”

সামান্য একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—“কিন্তু তা যদি না করেন...”

নায়েববাবু প্রত্নতির মুখের উপর একবার দৃষ্টিটা বুলাইয়া আনিয়া বলিলেন—“চলুন, সে পরের কথা পরে হবে।—আমি আবার কয়েক দিনের জন্তে বাইরে যাচ্ছি। একবার কম্পাউণ্ডটা ঘুরে আসি চলুন, সেকেন্ড মাষ্টার মশাই বলছিলেন—মাষ্টারমশাইয়ের বানার বাইরের দেয়াল ঝানিকটা ভেঙে গেছে—”

উদ্দেশ্য ছিল টুলের চেহারাও এক বার সবাইকে দেখাইয়া দেওয়া, একটু বোধ হয় আশা ছিল চম্পাকেও এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। চম্পা ছিল না, আসে নাই খনি হইতে।

টুলু ঘরে ছিল, বাহিরে আসিয়া অনির্দিষ্ট ভাবেই হাত তুলিয়া সবাইকে নমস্কার করিল, দৃষ্টিটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের উপরই গিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—“আপনি তা হলে এখানেই আছেন। মাষ্টারমশাই ত আজও এলেন না, ব্যাপারখানা কি? আপনাকে নতুন করে কিছু লেখেন নি আর?”

—অতি স্নেহ একটু ব্যঙ্গের হাসি; টুলু স্পষ্ট করিয়াই হাসিয়া উত্তর দিল—“আজ্ঞে না, পুরনো কথা নতুন করে আর কবার লিখতে হয় মানুষকে?”

এর তিজ্ঞাস্বাদটি অবশ্য মুখে আসিয়া রহিল; তবে সাধুনা রহিল যে, বেশী গুলতন না করিয়া ইসারায়-ইঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটি সবার সামনে বেশ ধরিয়া দেওয়া হইল। এর পর পথ নিশ্চয় সহজ হইবে।

নিবারণ আসিল তিন দিন পরে। খবর দিল গোলমাল ওদিকে প্রচুর। কিন্তু যে লোকটি আগুন লাগাইয়াছে সে দিন পাঁচেক আগে ওখান থেকে কোথায় চলিয়া গেছে। চেহারার যা বর্ণনা শুনি, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে অনেকটা মেলে বটে।

তাহা হইলে মাষ্টারমশাই এই বার ফিরিলেন। দেখা হওয়া নিতান্ত দরকার, ম্যানেজার আরও দু-এক দিন রহিয়া যাওয়া স্থির করিলেন।

পরদিনই কিন্তু বনমালী আবার একটা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিল, আরও দিন-সাতেকের ছুটি চাহিতেছেন মাষ্টার-মশাই, অর্থাৎ ঐশ্ব্যাবকাশ পর্যন্ত। ঐশ্ব্যাবকাশটাও বাহিরেই কাটাইতে চান, অহুমতি চাহিয়াছেন।

কতকটা নিশ্চিত্ত এবং কতকটা নিরাশ ও বিমূঢ় হইয়া ম্যানেজার তাহার পরদিনই যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন।

ক্রমশঃ

নূতন কালের যাত্রী

শ্রীকরুণাময় বসু

দেখছি অনেক চাঁদ, এই চাঁদ সম্পূর্ণ নূতন
আকাশ-গাঙের জলে ভেসে আসা স্বর্ণাভ বরণ
মন্দির স্বপ্নের প্রায়; বনাস্তের অশান্ত বাতাস
মুহুরিত আত্মকুণ্ডে রেখে যায় কথার আভাস
অক্ষুট গানের মতো; পুষ্প গন্ধে আমহুর পথ
দু-জনে রয়েছে বসে, ধ্যানভক্ত রাত্রির জগৎ।
পাখীরা গিয়াছে নীড়ে, ঝিকিমিকি শ্রান নদীজল,
ছায়াপথে যেতে যেতে কারে ঝোঁকে নক্ষত্র সকল।
পথ কি হ’ল না শেষ; আমাদেরো যেতে হবে দূরে
অদূর পথের বাঁকে, নবধন নীল শৈলচূড়ে,

বিষ্ফুর্ত সমুদ্র প্রান্তে। এ জীবনে রয়েছে প্রাচীর,—
প্রসারিত রুদ্ধজাল, ডানাগুলি হয়েছে অস্থির,
খুঁজিতে নূতন দেশ, অত্যাশ্রয় যেন স্বর্ণযুগ,
স্বপ্নের আলোর স্নাত বিকশিত লক্ষ হাসিখুশি,
দুর্জয় সাহসী প্রাণ, যুত্বকীর্ণ রক্তের অক্ষরে
নূতন জীবন আঁকে,—যাত্রী যোরা নূতন বন্দরে।

আয়কেন্দ্র ভালোবাসা আজ নয়, মাহুধের হাতে
নূতন কালের রাখী বেঁধে দিহু নূতন প্রভাতে।

স্বরাজ-সাধনা বনাম সিভিল সার্ভিস

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিগত ২১শে ও ২২শে অক্টোবর অন্তর্কর্ত্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই পটেলের আহ্বানে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীগণ নিউ দিল্লীতে সমবেত হইয়া আলাপ-আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্মচারীমণ্ডলী নিয়োগের দায়িত্ব ভারত-সচিবের পরিবর্তে ভারতের জাতীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণ আশু কর্তব্য। বর্তমান বর্ষের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল সিভিলিয়ান কর্মচারীকেই সরকারকে জানাইতে হইবে তাহারা নূতন সংস্থায় নূতন সত্তে কর্ম করিবে কি না। যাহারা জাতীয় সরকারের অধীনে কর্ম করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে পূর্বচুক্তি মত ক্ষতি-পূরণ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবাসী মাঝেই এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াছেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব তথা শাসনের একটা মস্ত বড় স্তম্ভ—ইহাকে চিরতরে অব্যাহত রাখিবার একটা প্রধান উপায়। লয়েড জর্জ ইহাকে ‘পীল ফ্রেম’ বা ইস্পাতের কাঠামো আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সার্ভিসে প্রবেশলাভ করিয়া দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বরাজ-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস প্রথম অধিবেশন হইতেই এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে জনমত গঠন করিতে অগ্রসর হন। আজ কংগ্রেস তথা ভারতীয় মহাজাতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে। এই সময় এই শাসক-গোষ্ঠীর পূর্বেরকার ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ইহার ধাত-প্রতিধাত সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি হইতে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলের শাসনকার্য্য দেশী-বিদেশী ভাগ্যাবেধীদের উপরই স্তম্ভ ছিল। তাহারা জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থই বড় করিয়া দেখিত। এ কারণ শাসনে অনাচার ও অব্যবস্থা চরমে উঠে। বিলাতের কর্তৃপক্ষের তখন যত ক্রোধ ভারতবাসীদের উপর গিয়া পড়ে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে এই মর্মে এক আদেশ জারি করেন যে, ভারতীয় রক্ত যাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত এরকম লোকদের সামরিক, অসামরিক বা নৌবিভাগীয় কোন কর্মেই নিয়োজিত করা হইবে না। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হয়। এই সনের সনন্দে এ সম্বন্ধে আরও দুইটি ধারা যুক্ত হয়। ইহার একটিতে স্থির হয় যে, ইংরেজাধিকারের মধ্যে যে-সব পদ শূন্য হইবে তাহা যথাসময়ে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে জানাইতে হইবে এবং তাহারা লোক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। অষ্টটিতে বলা হয় যে, কাউন্সিলের সদস্য

ছাড়া অল্প সকল কর্মচারীই চাকরির বয়স এবং যোগ্যতা অনুসারে উপরিতন পদে উন্নীত হইবে। এ বৎসর হইতেই এই নিয়মে কার্য্য আরম্ভ হইল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভিত্তি এইরূপে স্থাপিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের ওজুহাতে এই সময় হইতে সরকারী কার্য্যে ভারতীয়দের একেবারেই বাদ দেওয়া হইল। রাজা রামমোহন রায়ের মত যোগ্য লোকও সরকারের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, ইংরেজ কলেজটারের অধীনে সাময়িক ভাবে কিছুকাল দেওয়ানের কার্য্য মাত্র করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরে কোন ভারতীয়ই পূর্ব ব্যবস্থা মত সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয় নাই। তবে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের আদেশ মতে ভারতীয়েরা দেওয়ানী বিভাগের ছোটখাট পদ লাভের অধিকার পায়। ইহার পর মুন্সেফ ও সদর আমিনের পদে তাহারা নিয়োজিত হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ এই সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি এতাদৃশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির পূর্বে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৩১-৩২ সালে ভারত-শাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা চলে। এই সময় রাজা রামমোহন রায় বিলাতে উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটি দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সম্বন্ধে নিজ মত লিখিয়া পাঠান। সিলেক্ট কমিটি সব দিক বিবেচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, অযোগ্যতা বা অবিষম্মতার ওজুহাতে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া মোটেই উচিত হয় নাই। কমিটি ভারতীয় নিয়োগের সম্পর্কে যে চারিটি কারণ উল্লেখ করেন তাহার দুইটি এখনও প্রযোজ্য—যথা, সুবিচার ও ব্যয়সংক্ষেপ। ঐ সময়েও সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন ছিল অসম্ভবরকম বেশী। চারি বৎসর একটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে-কোন সিভিলিয়ান কর্মচারী পাইত বৎসরে পনের হাজার টাকা, আর দশ বৎসর পরে প্রত্যেকের বেতন হইত বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের সনন্দে স্থিরীকৃত হইল যে, উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ যে-কোন পদেই ভারতীয় নিয়োগ করা চলিবে। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চক্রান্তে সনন্দের এই ধারা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। সে যুগে বিলাতে গিয়া সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রস্থানীয় রাজারাম বিলাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ অস্তে অল্পরূপে যোগ্যতা অর্জন করিলে কোর্ট অব

ডিরেক্টর তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগে সম্মতি দেন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার কোম্পানীর সনন্দ লাভের সময় হয়। পূর্বে প্রথমত হাউস অফ কমন্স সিলেক্ট কমিটির উপর ইহার কার্য্যাকার্য্যের তদন্তের ভার অর্পণ করেন। বিংশতি বৎসর অতীত হইলেও ১৮৩৩ সালের সনন্দ অনুসারে সিভিল সার্ভিস তথা উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ পদে কেন একজনও ভারতীয় নিয়োগ করা হয় নাই এ সম্বন্ধে কমিটিতে স্বভাবতঃই আলোচনা উপস্থিত হয়। এ যাবৎ সিভিল সার্ভিসে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের আত্মীয়-বন্ধনেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিল, আত্মীয়-পোষণ বেতু অতাদের ইহাতে বড় একটা স্থান হইত না। ইংরেজ জনসাধারণ ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল এবং দাবি করিল যে, এরূপ ব্যবস্থা করা হউক যাহাতে সকল যোগ্য লোকেরই ইহাতে স্থান হইতে পারে। কমিটি এই দাবি পূরণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করিলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ভারতবাসীদের নিকটও স্বতঃই ইহার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু এ সময়ে এক শ্রেণীর লোক এই বলিয়া ইহার প্রতিবাদ করে যে, ভারতবাসীরা দেওয়ানী কার্য্যে অধিকতর যোগ্য, শাসনবিভাগে তাহাদের নিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইবে না, কেননা এ বিভাগে তাহাদের দক্ষতা প্রমাণিত হয় নাই। বঙ্গের প্রথম লেঃ গবর্নর এবং ঝাড়ু সিভিলিয়ান সার ফ্রেডারিক হেলিডে কমিটির সম্মুখে এই মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবাসীরা ঈর্ষাপরায়ণ, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সর্বপ্রথম একজন বাঙালী নিযুক্ত হওয়ার তাহার বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব দেখা দিয়াছে। এই প্রথম বাঙালী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর। হেলিডের এই উক্তির উপযুক্ত জবাব প্রসিদ্ধ বাম্বী ও জননেত্র রামগোপাল ঘোষ সনন্দ আইন সম্পর্কে অস্থিত আলোচনা সভায় যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের নিয়োজিত সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্মচারীগণ ভারতবাসীদের এ যুগলীতে প্রবেশ করিতে দিতে যে একান্ত অনিচ্ছুক, হেলিডে প্রমুখ ব্যক্তিদের অযথা উক্তি তাহার প্রমাণ। যাহা হউক, পার্লামেন্টে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সিভিল সার্ভিসে কর্মী নিয়োগ ধার্য হইল এবং ভারতবাসীও ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। এ সময়ে পার্লামেন্টে এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় যে, ভারতবাসীদের পক্ষে এই পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যাইবার প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু ইহা ভোটে টিকে নাই।

কিন্তু ইহার সপক্ষে ভারতবর্ষে শীঘ্রই আলোচনা সুরু হইল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (বা 'ভারতবর্ষীয় সভা') বিলাতে বোর্ড অফ কন্ট্রোলার সভাপতির নিকট এক-

খানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতে এই মর্মে লেখা হইল যে, '১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে ভারতবাসীদের সরকারী উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত আদৌ কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। ইহার পক্ষে প্রধান দুইটি বাধা হইল—(১) বিলাতে গিয়া ভারতবাসীদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বাধ্য হওয়া এবং (২) পরীক্ষার বিষয়সমূহে নব্বয়ের তারতম্য। স্মারকলিপিতে এই পরামর্শ দেওয়া হইল যে, ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্সি শহরসমূহে বিলাতের মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক, আর পরীক্ষার বিষয়গুলির নব্বয়ের তারতম্য হ্রাস করিয়া সমতা স্থাপন করা হউক। স্থানীয় ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে এই স্মারকলিপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইল। তাহার আরও বলিতে লাগিল যে, সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসী প্রবেশ করিলে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হইবে। 'হিন্দু পেট্রিফ' ভারতবাসীর যুগপাত্ত রূপে এ কথা যোগ্য উত্তর দেন। 'পেট্রিফ'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন,

"The close Civil Service, the instrument of a temporary policy, and an institution un-rooted in the deeper parts of the social frame, must make way for an agency less pretentious and better suited to the altered requirements of the time." (Feb. 12, 1857.)

অর্থাৎ, সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধিকল্পে কেবলমাত্র ইংরেজদের লইয়া যে সিভিল সার্ভিস গঠিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মূল কখনও প্রোথিত হয় নাই, সমরোপযোগী করিয়া এরূপ শাসন-কাঠামোর পরিবর্তন সাধন আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই কর্মচারীমণ্ডলী দেশবাসীর সর্বপ্রকার উন্নতির পথে তখনই কিরূপ বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া হরিশ্চন্দ্র লিখিতেছেন,

"From the first it has offered a passive but determined resistance to the progress of constitutionalism—the true form in which British political action manifests itself wherever it is allowed fairly to operate. From the first it has proclaimed itself the governing agency of an Asiatic power, of an Oriental despotism. From the first it has denied the capacity of the people of India to participate in the political progress of the rest of the British dominions. From the first it has opposed the introduction of 'English ideas' into the internal policy of the country. It has discountenanced English education, the spread of English language, and the adoption of external forms of European civilization. It has discouraged special progress except in the direction of material prosperity. Lastly, it has monopolised political power, and exercised a sort of social tyranny intolerable alike to natives and Europeans. For these grave offences it deserves the penalty of extinction it has incurred. These offences are

the defects of the system, and the system must therefore be broken up." (March 13, 1857.)

পেট্রি-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র যে সকল গুরুতর অপরাধে সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্মচারীমণ্ডলীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইহার উচ্ছেদসাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শত বৎসর পরে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই ইহারা এদেশে বৈর-শাসন চালাইতে আরম্ভ করে এবং সর্বপ্রকার নিয়মাহুগ শাসন প্রবর্তনে বিঘ্ন ঘটাইতে থাকে। পাছে পাশ্চাত্য ভাব-ধারা ভারতবাসীদের মনে গাঁথিয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করে এই আশঙ্কায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে ইহারা বরাবর বাধা দিয়াছে। অত্যাঁচ ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহে যেরূপ বাধিকারমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে এখানে তদনুরূপ কিছু যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় উজ্জ্বল ইহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। সর্বোপরি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইহারা পরিচালিত করায় দেশী বিদেশী সকলের পক্ষেই তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে 'সিভিল সার্ভিস' ব্যবস্থা শীঘ্র তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু তুলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, এই মণ্ডলীতে ভারত-বাসীদের নিয়োগ দ্বারা ইহার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধনেও কর্তৃপক্ষ বাধা দিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় এ সম্পর্কে আলোচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে। এই বিদ্রোহের শেষের দিকে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তখন তিনি ভারত-শাসন সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেন তাহাতেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে যে, জাতি-বর্ণ-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীদিগকে দেশ-শাসন ব্যাপারে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। বিদ্রোহের অবসানে বিলাতের নূতন কর্তৃপক্ষ 'সিভিল সার্ভিস' সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। তাহাদের নিযুক্ত ইণ্ডিয়া আপিস কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীদের 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা ভারতবর্ষে বসিয়াই গ্রহণ করা সমীচীন। কর্তৃপক্ষ এই সম্মত সুপারিশটি অগ্রাহ্য করিলেন। এত দিন সংস্কৃত ও আরবী—প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান নন্দর ছিল ৩৭৫, পরন্তু গ্রীক ও লাতিনের প্রত্যেকটির নন্দর ছিল ৭৫০ করিয়া। কমিটি সংস্কৃত ও আরবী নন্দর বাড়াইয়া ৫০০ করিবার সুপারিশ করিলেন। কমিটির এই সুপারিশটি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন।

ইহার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনিই ভারত-বাসীদের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান। তাহার সঙ্গী ও বন্ধু মনোমোহন ঘোষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে ভারতবাসীরা যেমন উৎফুল্ল হইল, ইংরেজেরা ততো-ধিক বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কেননা, তাহাদের এককালের এক-চেট্টা অধিকারে ভারতবাসীরা ভাগ বসাইতে অগ্রসর

হইয়াছে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ অতিক্রান্ত পূর্ব-ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া সংস্কৃত ও আরবী নন্দর পুনরায় ৩৭৫-এ নামাইয়া দিলেন। মনোমোহন ঘোষ ইহার পরে পরীক্ষায় আর উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, অবশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৯ সালের মধ্যে যোল জন ভারত-বাসী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেও সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। উক্ত নিয়ম পরিবর্তনই ইহার প্রধান কারণ।

যাহা হউক, ১৮৬৮ সাল হইতে কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীদের প্রতি কতকটা দয়াপরবশ হইলেন। ভারত-শাসনে ইংরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবাসীদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-সমূহ কিরূপে অংশতও পালন করা যায় ইহাই হইল তাহাদের ভাবনা। অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৮৭০ সালে তাহারা পার্লামেন্ট দ্বারা এই মর্মে একটি আইন করাইয়া লন যে, ভারতে বসিয়াই যোগ্য ভারতবাসীদিগকে উচ্চ ও দায়িত্ব-পূর্ণ পদে ভারত-সরকার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ভারত-সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ তাহারা এই উদ্দেশ্যে নিয়মাবলী রচনা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু তাহাদের উপর নিয়মাবলী রচনার ভার দেওয়া হইল তাহারা যে ভারতবাসীদের কোনরূপ শাসনক্ষমতা দানের বিরোধী। বিলাত হইতে বার বার অনুরোধ হইয়া ভারত-সরকার অবশেষে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার নয় বৎসর পরে ১৮৭৯ সালে ভারত-সরকার ভারত-সচিব দ্বারা অনুমোদন করাইয়া 'গ্ৰ্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস' নামে একটি বিশিষ্ট কর্ম্মামণ্ডলী গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল যে, ভারতবাসীদের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকিবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রায় সমান সমান হইলেও সিভিলিয়ান কর্মচারীদের মত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি পদে তাহাদের নিয়োগ করা চলিবে না, দেওয়ানি বিভাগেই তাহাদের বেশীর ভাগের স্থান হইবে। তাহাদের বেতন হইবে উহাদের দুই-তৃতীয়াংশ। শাসন-বিভাগের কোন উচ্চতর পদে তাহাদের নিয়োগ করিতে হইলে ভারত-সরকারের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। ভারতবাসীরা এত দিন যাহা চাহিয়াছিল এ ব্যবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শাসন-বিভাগের উচ্চতর পদ হইতে ভারত-বাসীদের বঞ্চিত করিবার ইহা এক অপকৌশল বলিয়াও তাহারা বুঝিতে পারিল।

সিভিলিয়ান-তন্ত্র পরিচালিত ভারত-সরকারের নিকট হইতে উক্তরূপ ব্যবস্থা ব্যতীত আর কিই-বা আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের মূলে আরও যথেষ্ট কারণ ছিল। বিলাত-প্রবাস এবং পাঠ্যতালিকার পক্ষপাতিত্বজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও ১৮৭০-৭১ সাল হইতে ভারতবাসীরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় দলে বোম্বাইয়ের ত্রীপদ বাবাজী ঠাকুর এবং বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারী-লাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত সিভিলিয়ান হইয়া ১৮৭১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরও কেহ কেহ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে এদেশে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান-তন্ত্র ও বিলাতে রক্ষণশীল ইংরেজগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সামান্য কারণে সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতিতে তাহাদের মনোভাব সুস্থিষ্টই বুঝা গেল। ‘ষ্টাটুটরী সিভিল সার্ভিস’ গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্ররোচনায় ভারত-সরকার এরূপও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আর ভারতবাসীদের দিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়াও আবশ্যক হইল না। কেননা, বিলাতের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ১৮৭৬ সালে এই মর্মে এক হুকুম জারি করিলেন যে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উর্দ্ধতন বয়স একুশ বৎসরের স্থলে উনিশ বৎসর করা হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এত অল্প বয়সে ভারতবাসীরা আর বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে না, ভারতের শাসকগোষ্ঠী বরাবর ইংরেজই থাকিয়া যাইবে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হিসাব করিয়া দেখান যে, উক্ত হুকুম জারি হইবার পর সাত-আট বৎসরের মধ্যে একজন মাত্র ভারতবাসী সিভিলিয়ান হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের তৎকালীন বড়লার্ট লর্ড লিটনের উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্মে লেখেন,—

“আমরা সকলেই জানি যে, ভারতবাসীদের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের দাবি কখনও পূরণ হইতে পারে না বা হইবে না। কাজেই তাহাদের এই দাবি প্রকাশে অস্বীকার করা ও তাহাদের বঞ্চনা করা—এই দুইটির একটি পথ আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয়টি অবলম্বন করিয়াছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা—আইনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার সুস্পষ্ট ও স্পষ্টচিত্ত অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নহে। যেহেতু এ পত্রখানি গোপনীয় সেহেতু একথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত-সরকার কেহই এই অভিযোগের উত্তর দিতে পারিবেন না : আমরা যথেষ্ট অস্বীকার করিয়াছি কাজে তাহা ষোল আনা ভঙ্গ করিতেছি।”

বারংবার আঘাতে ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক বুদ্ধি ইতিমধ্যেই কতকটা জাগ্রত হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালের সরকারী ব্যবস্থা, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স হ্রাস করিয়া উনিশ বৎসরে নামানো, ভারতবাসীরা বিনা

প্রতিবাদে প্রবর্তিত হইতে দেয় নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ যাবৎ শুধু কর্তৃপক্ষের নিকট আরকলিপি প্রেরণ করিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিতেন। কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা জনসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ শুদ্ধমাত্র আরকলিপি প্রেরণে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইহার প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের স্রোতপাত করিলেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যাপক আন্দোলন ভারতবর্ষে এই প্রথম আরম্ভ হইল। উক্ত সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ কলিকাতা টাউনহলে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের সভাপতিত্বে ভারত-সভা এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ধর্ম-নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও সভার উপস্থিত থাকিয়া ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায়ই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রহিল না, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতে সভা সমিতি করিয়া ইহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ভারত-সভার পক্ষে দেশপুঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বার-বার সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। বিলাতেও প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হইল। ভারত-সভা বিখ্যাত বাম্পী লালমোহন ঘোষকে এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালে বিলাতে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন জনসভায় মর্মস্পর্শী ভাষায় ভারতবাসীর অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাহার কার্যে বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা পার্লামেন্ট সদস্য ভারত-বন্ধু জন ব্রাইট বিশেষ সহায় হন এবং একটি সভায় সভাপতিত্ব করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু এত আন্দোলন সত্ত্বেও কি বিলাতে কি এ দেশে সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ অটল রহিলেন।

ভারত-সভা নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া পুনরায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার মারফত ভারত-সচিবের নিকট এক আরকলিপি প্রেরণ করিলেন। তৎকালীন বড়লার্ট লর্ড রিপন এবং ব্যবহার-সচিব সার কোর্টনে ইলবার্ট ইহার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য উক্ত আরকলিপির সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখনও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স উনিশ বৎসরের উর্দ্ধে বাড়াইতে এবং ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইলেন না। এই সময়কার ইলবার্ট আন্দোলনের মুহুর্তে যে ঐ একই মনোভাব কার্য্য করিয়াছিল তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন। প্রথমতঃ ভারতবাসী ইংরেজদের মত শাসন-বিভাগে আসীন হইবার অধিকার লাভ করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহারা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সমান ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইবে ইহা ইংরেজ শাসকমণ্ডলীর অসহ্য হইয়া

উঠিয়াছিল। ভারত-শাসনের যন্ত্র সিবিলিয়ান-গোষ্ঠীতে স্থান না হইলে শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এ কারণ কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই এই জনমত প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

প্রথম কংগ্রেসের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা হইল। সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা একই কালে বিলাতে ও ভারতবর্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, গুণানুসারে পরীক্ষার্থী ব্যক্তিদের একই তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। ইহার পর ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া আরও আবশ্যিক পরীক্ষাদি দিয়া আসিবে। পরীক্ষার্থীদের উর্ধ্বতম বয়স বার্ষ্য করিতে হইবে তেইশ বৎসর। প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে, ছোট-খাট কাজ ছাড়া সকল বড় সরকারী চাকরিতেই প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে আর অধিক দিন চূপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পর বৎসরই (১৮৮৬ সাল) একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বসাইয়া তাহার উপর এ সব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। কমিশন দুই বৎসর কাল সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কমিশন ষ্টাটুট্যারি সিবিল সার্ভিস তুলিয়া দিবার সপক্ষে মত দিলেন। তাহারা সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ বৎসরই বার্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু এদেশে পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাহারা এই মতের অন্তর্কূলে কারণ দর্শাইলেন যে, প্রথমতঃ হিন্দুরাই এ ব্যবস্থা চাহিতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষায় উন্নত হিন্দুরা উপকৃত হইবে, শিক্ষায় অগ্রনৃত মুসলমানদের ইহাতে কোন সুবিধা হইবে না। ভারতের জাতীয়তাবোধের উদ্যোগ কালে শাসন-কার্যে ভারতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই যুক্তি কতখানি দৃশ্যমান তাহা পরে ভারতবাসী সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে। কমিশনের মুসলমান সদস্য সার সৈয়দ আহমদ খাঁ এই যুক্তির যথার্থ স্বীকার করিয়া অধিকাংশের মতেই মত দিলেন। হিন্দু সদস্যগণ এই যুক্তি স্বীকার করিতে না পারিয়া এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত জ্ঞাপন করিলেন। সব দিক আলোচনা করিয়া এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষ এই কমিশনই প্রথম ছড়াইয়া দিয়া যান।

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে কংগ্রেস পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনে ইহার উপর নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নেতৃবন্দ সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উর্ধ্বতম বয়স তেইশ বৎসরে উন্নীত করার আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একইকালে বিলাতের মত এদেশে পরীক্ষা গ্রহণে কমিশনের আপত্তিতে ক্ষুব্ধ হইলেন। ইহার পর ১৮৯৩ সালের ২রা জুন পার্লামেন্টে সরকার পক্ষে সহকারী

ভারত-সচিবের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, ভারতবর্ষেও সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দাদাভাই নৌরজী তখন পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি ইহার অন্তর্কূলে এরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেন যে, সদস্যগণ তাহা অগ্রাহ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেস পরবর্ত্তী অধিবেশনে এজন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইলেন যাহাতে এই প্রস্তাব শীঘ্র কার্যে পরিণত করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে ইহার একান্ত বিরোধী। ভারত-সচিব প্রকাণ্ডে পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ করিতে না পারিয়া ভারত-সরকারের নিকট মতামত চাহিয়া ইহার নকল পাঠাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্যের অবতারণা করিলেন যাহা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সিবিলিয়ান-তন্ত্র-পরিচালিত ভারত-সরকারের পক্ষে ভারত-সচিবের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা যথারীতি প্রাদেশিক সরকারসমূহের মতামত গ্রহণ করিলেন এবং ইহার বিরুদ্ধে দীর্ঘ মত লিপিবদ্ধ করিয়া ভারত-সচিবের দরবারে পাঠাইলেন। পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবও কিরূপে কর্তব্যাক্তিদের চক্ষুস্তে অকোঁজা করিয়া তোলা যায় এই ব্যাপারটি তাহার একটি চমৎকার উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। তাহার আমলে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে। তিনি মনে করিতেন, ইংরেজরাই চিরকাল ভারত শাসন করিবে। সুতরাং সিবিলিয়ান-তন্ত্রে শ্রেষ্ঠকর্মদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে তিনি ক্রমশঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসল উদ্দেশ্য চাপা দিয়া ভারতবাসীদের ধোঁকা দিবার জন্য তিনি এমন কথাও বলিয়া-ছিলেন যে, যত সব সরকারী কর্মচারী আছে তাহার ত অধিকাংশই ভারতবাসী, কাজেই তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় সিবিল সার্ভিস কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ বসাইবার কোন হেতুই নাই। কিন্তু এ কথা অতি সাধারণ লোকেরও বুঝিতে পারে যে, শাসন-ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে যত দেরি হইবে, আমাদের উন্নতিও তত বিলম্বিত হইবে। এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেস মারফত ভারতবাসী চাহিয়াছিল। এই কর্তৃত্ব সিবি-লিয়ান-তন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত হয়। লর্ড কার্জনের উক্তি দ্বারা ওই কথাই প্রমাণিত হইল যে, কর্তৃপক্ষ এই কর্তৃত্ব-অংশতঃ ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। ভারতবাসীর দাবি যতই প্রবল হইয়া উঠিল ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্র ততই ভারতীয়দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহা ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের সময় সিবিলিয়ান-তন্ত্রের অপকীর্তি আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই সময় হিন্দুকে ছুরো রাণী এবং মুসলমানকে সুরো রাণী পর্যায়ে ফেলিয়া, প্রথমটিকে দাবাইয়া রাখিয়া দ্বিতীয়টিকে বাড়াইয়া তুলিতে তাহারা অহরহ চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের এই

অপচেষ্টার এক দিক ১৯০৯ সালে প্রবর্তিত মর্গি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্বাচনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

সিবিলিয়ান পদে ভারতীয় নিয়োগের নানারূপ বাধা পূর্ববৎই রহিয়া গেল। দেশের জননেতারা ইংরেজ শাসক-বর্গের কারসাজি ধরিয়া কেলিলেন। কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে এত দিন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়া আসিয়াছে, মর্গি-মিন্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর কেন্দ্রীয় আইন সভায়ও এ বিষয়ে জীষণ তর্ক উঠিল। এবারেও জনমত এত প্রবল হয় যে, সরকার অবশেষে ১৯১২ সালে লর্ড ইসলিংটনের সভাপতিত্বে একটি রয়্যাল কমিশন গঠন করিয়া তাহার উপর এ বিষয়ে অনুসন্ধান এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণের ভার দিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিশনে সদস্য ছিলেন সার আবদার রহিম, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, হার্বার্ট ফিশার, রায়সে ম্যাকডোনাল্ড এবং লর্ড রোণাল্ডসে। কমিশনের কার্য কিয়দূর অগ্রসর হইলে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মারা যান। যুদ্ধের গতিকে কার্য শেষ হইবার এক বৎসর পরে ১৯১৭ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিলেন। রিপোর্টে সাক্ষ্যদান কালে ভারতীয় মুষ্টিমেয় সিবি-লিয়ানদের উপর ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্রের আক্রোশ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভারতীয়েরা বিচারকার্যে ভাল, কিন্তু শাসন ব্যাপারে তাহাদের যোগ্যতা নাই—প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বেকার সার ফ্রেডারিক হেলিডের কথা এবারেও ইংরেজ রাজপুরুষদের মুখে শুনা গেল। অথচ যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভারতীয় সিবিলিয়ান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম যোগ্যতা প্রদর্শন করেন নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতাই দেখাইয়াছেন। তবে সরকারী চক্ৰান্তে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাঁহাদিকে দেওয়া হয় নাই, কাজেই তাহারা যোগ্য কি অযোগ্য তাহার একান্তই প্রমাণাভাব। ভারতীয় সিবিলিয়ানদের মুখপাত্র রূপে জানেন্দ্রনাথ গুপ্ত কমিশনের সমক্ষে উক্ত মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। এদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের সপক্ষে ভারতবাসী মাঝেই মত দিয়াছিলেন। পরে আইন-সভায় ইহা লইয়া যখন প্রশ্ন উঠে তখনও সরকার পক্ষে আগেকার যুক্তি উত্থাপিত করিয়া বলা হয় যে, কোন কোন সম্প্রদায় অধিকতর শিক্ষিত হইয়া এই মণ্ডলীতে তাহাদেরই স্থান হইবে। ইহার উত্তরে তখন মহম্মদ আলী জিন্নাও কিন্তু বলিয়াছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা তাহারা এখন আর শিক্ষায় অগ্রসর নয়। যাহা হউক, ইসলিংটন কমিশন রিপোর্টে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন তদনুযায়ী কার্য করা হইলে ভারতবাসীদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়া যাইত। অথচ তখন যুদ্ধের যেকোন অবস্থা তাহাতে ভারতবাসীদের সন্তুষ্ট রাখা ব্রিটেনের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে ভারত-সচিব এডুইন মন্টেগু এবং বডলাট লর্ড চেমস-

ফোর্ড কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না। পরন্তু মন্টেগু সাহেব ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে একটি সরকারী ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীদের জানাইয়া দিলেন যে, ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের শীঘ্র ব্যবস্থা করা হইবে।

এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১৯ সালে পার্লামেন্টে নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইল, আর এই অনুসারে কার্য আরম্ভ হইল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে। ইংরেজ সিবিলিয়ান-পুঙ্খবেরা এ ব্যবস্থায় মোটেই খুশী হইতে পারে নাই। তাহারা কেহ কেহ এদেশে হইতে তখন বিদায় লইল বটে, কিন্তু অধিকাংশই চাকুরির মায়্যা ছাড়িতে না পারিয়া নব-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বপদ আঁকড়াইয়া রহিল। অবশ্য তাহারা যখন নূতন ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের প্রদত্ত ক্ষমতার স্বল্পতা বুঝিতে পারিল তখন তাহাদের ক্ষোভের আর কোন কারণ রহিল না। তাহারা ধাস ভারত-সচিবের অধীন, লার্ট-বেলাটের সঙ্গেও সরকারী কাজে মোলাকাতে কোন বাধা নাই, কাজেই প্রাদেশিক মন্ত্রীদের তাহারা একরূপ আমলেও আনিল না। ওদিকে কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রতি নির্মম ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া নূতন শাসন-সংস্কার বর্জনপূর্বক অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা প্রচেষ্টা-সমূহের প্রতি ব্রিটিশ সিবিলিয়ান-তন্ত্রের বিরোধিতা সুবিদিত। তাহারা এবারে কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিয়া গেল। সরকারের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের দুর্বীর শক্তি অল্পহুত হইতে লাগিল।

নূতন শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের অধিকার যতই সামান্য হউক, প্রচলিত সিবিলিয়ান-তন্ত্র ইহার সঙ্গে মোটেই খাপ খাওয়াইতে পারিল না। এক দিকে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা, অল্প দিকে ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্র অটুট রাখা—দুই-ই সরকারের দৃষ্টিতে বেমানান ঠেকিল। এহেতু যাহাতে সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী অন্তঃপরি নিয়োজিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের ৩০শে মে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ও ডনেল প্রাদেশিক সরকারসমূহকে একখানি পত্র লেখেন। প্রাদেশিক সরকার-গুলির উচ্চতন পদসমূহও সিভিল সার্ভিসমণ্ডলী কর্তৃক অধিকৃত। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, হয়ত-বা এই গোপীতে ইংরেজ সিবিলিয়ান নিয়োগ অচিরে বন্ধ হইয়া যাইবে। মনোগত ভাব, যাহাই হউক, সিভিল সার্ভিসমণ্ডলী তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়া বডলাট মারফৎ বিলাতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নিকট একখানা পান্টা স্মরণকলিপি প্রেরণ করিল। এই স্মরণকলিপি পাইয়া ইংরেজ সিবিলিয়ান-তন্ত্রকে আশ্বাস দিবার জন্য পার্লামেন্টে ১৯২২, ২রা আগষ্ট লয়েড জর্জ এক বক্তৃতা

করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে 'প্লিন ফ্রেম' বা ইম্পাতের কাঠামো বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ভারত-শাসনে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের কথন যে প্রয়োজন হইবে না তাহা ভাবা আদৌ কল্পনাসাম্য নহে। বস্তুতঃ ও'ডেন্স-সাকুলারে সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রস্তাবই করা হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের পরেও দেখা যায়, ১৯২২ সালে মোট সিভিলিয়ান কর্মচারীর শতকরা মাত্র তের জন ছিল ভারতীয়। লয়েড জর্জ বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, এই বৎসরের শেষ দিকে লন্ডনের নেতৃত্বে একটি রয়্যাল কমিশন পাঠাইয়া সিভিলিয়ানগোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবারও ব্যবস্থা করিলেন। লী কমিশন তিন-চার মাসের মধ্যে অতি দ্রুত অনুসন্ধান কার্য সারিয়া ১৯২৩, মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করিলেন। তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ততোধিক তৎপরতার সহিত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বেতনের হার ও ভাতা বৃদ্ধি এবং সরকারী খরচে কর্মকালে অন্ততঃ চারি বার সপরিবারে প্রথম শ্রেণীতে বিলাতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়া গেল। কমিশন সুপারিশ করিলেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মোট সংখ্যার অর্ধেক ইংরেজ এবং অর্ধেক ভারতীয় হইবে। কিন্তু প্রতি বৎসর যে হারে নূতন নিয়োগের ব্যবস্থা হইল তাহাতে পনের বৎসর পরে, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী নাগাদ এই সমতা লাভ ঘটবে এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। লী কমিশন যে একটি সাঙ্কান ব্যাপার তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ইংরেজ সিভিলিয়ান-তন্ত্র এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারত-শাসনে মন দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-সৌধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, ১৯২৩-৪ সাল হইতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হেতু তাহা দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে সুরু হইল। সিভিলিয়ান-তন্ত্রের অপ্রকাশ্য হস্ত ইহার মধ্যে কতখানি ছিল তাহা পরিমাপ করা কঠিন নহে। স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকালে ভারতে ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অহুষ্ঠিত হয় তাহা ব্যাহত করিবার জন্ত ইহাদের চেষ্টা কাহারও অবিরত নাই। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এক সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে অগ্রাহ্য প্রদর্শন করিয়া তাহাকে পক্ষে টানিতেও ইহার সচেষ্ট হইল। ইহার পরিণতি কি হইয়াছে আদ্য আশ্রয় তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সমবেত দাবি অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সরকার-মনোনীত ইংরেজ ও ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া বিলাতে শাসন-পরিকল্পনা নির্ণয়ের জন্ত কয়েকবার গোলটেবিল বৈঠক বসে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিয়াছিলেন, প্রথম ও তৃতীয় বৈঠককালে তিনি ছিলেন জেলে। গোলটেবিল

বৈঠক শেষ হইবার পর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটিতে শাসন-ব্যবস্থার রূপ দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার ইম্পাত-কাঠামো সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। তখন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হয় যে, নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পাঁচ বৎসর পরে সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে নূতন করিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন ভারত-শাসন আইন ১৯৩৫ সালে বিধিবদ্ধ হয় এবং প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭, এপ্রিল মাস হইতে কার্যকরী হয়। কংগ্রেসের অবিরত আন্দোলনের ফলে শাসন-ব্যাপারে ভারতবাসীর এতাদৃশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনার পর অধিকাংশ প্রদেশেই তাহার মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ইহাও সিভিলিয়ান-তন্ত্রের মনঃপূত হয় নাই। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে ইউরোপে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। কংগ্রেস ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে একমত হইতে না পারায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন, সিভিলিয়ান-তন্ত্রও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর জাতির পক্ষে কংগ্রেস কয়েক বার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয় ১৯৪২ সালের আগষ্ট-আন্দোলন। ভারতবর্ষে ইংরেজ কর্তৃত্বের বিলোপ চাই—ইহাই ছিল কংগ্রেসের দাবি। এবার সিবিডিয়ান গোষ্ঠী বজ্রমুষ্টিতে আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইল। এই সময়ে তাহাদের অনাচার-অত্যাচারের বহর সম্প্রতি কতকটা জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্ব নির্দেশমত নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের গতিকে তাহা হইতে পারে নাই। সিভিল সার্ভিসে নূতন নিয়োগও এই সময় হইতে বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যুদ্ধের মধ্যেই নূতন করিয়া আলাপ-আলোচনা হইতে থাকে। কংগ্রেস ব্রিটিশের মতে মত না দেওয়ায়, বরং ব্রিটিশের কাজে সাফাং ভাবে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়ায় সরকার ইহাকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক রাখেন। সিভিলিয়ান-তন্ত্র ইত্যবসরে নিজ অভিরুচি মত সকল কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে ভারত-বাসী জাহি জাহি রব ছাড়িতে থাকে। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্ত দায়ী কে, ভূভিক্ষ কমিশন বসানো সত্ত্বেও প্রকৃত ভাবে জানা যায় নাই। ইহার মুখে সিবিডি তন্ত্রের কঠোর হস্তের ক্রিয়া যখন সত্যাকার ইতিহাস লেখা হইবে তখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে নিশ্চয়। যাহা হউক, যুদ্ধের শেষে নেতৃবৃন্দকে কারামুক্তি দেওয়া হয় এবং কয়েকটি বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের পর ভারতের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যে অত্যাশঙ্কক তাহা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়। বিলাতে শ্রমিক দল নির্বাচনে অগ্র-

নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রথমে পালিমেটারী প্রতিনিধি-দল প্রেরণ পূর্বক সকল বিষয় অবগত হইয়া মন্ত্রিসভা এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারত-সচিব লর্ড পেশিক লরেলের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট-মিশন প্রেরণ করেন। তাঁহারা বহুদিন যাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা-আলোচনার পর নেতৃবৃন্দকে লইয়া অন্তর্কর্ত্তী সরকার স্থাপন এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্ত শাসন-তন্ত্র রচনা কমিটি গঠনের উপায় নির্ণয় করেন। তাঁহাদের প্রস্তাব মত যে অন্তর্কর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী নূতন শাসকমণ্ডলী গঠনে অগ্রণী হইয়াছেন।

সম্প্রতি প্রকাশ, সিভিল সার্ভিস সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মচারী

নিয়োগের ভার ভারত-সচিব ভারত-সরকারের হস্তে নীড়ই অর্পণ করিবেন। ভারতীয় জনমত তথা কংগ্রেসের প্রচেষ্টা এত দিনে অস্বয়যুক্ত হইতে চলিল।*

* প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ হইতে বিশেষ সাহায্য লইয়াছি,—

(1) *Selections from the Writings of Hurrish Chunder Mukherjee.*

(2) *Speeches of Ram Gopal Ghose.*

(3) *Speeches of Lal Mohun Ghose.*

(4) *Indian Civil Service—Nares Chandra Roy*

(৫) মুক্তির সন্ধানে ভারত—বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক।

নবজন্ম

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জীবন-স্বপ্নের মাঝে তারাসম কাঁপিয়া কাঁপিয়া
কাটায়েছি কত নিশি আঁধার ব্যাপিয়া
সুখক্লোতিহীন,
অসাড় রয়েছি ভুলে যোগনিজালীন;
সহসা এ কি এ হ'ল, নবীন আলোক
পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক,
ঘুম ভাঙে, মোহ টুটে, মরণ নমিয়া সরে দূরে,
সহস্র জীবনহীন আঁধার জগৎ ঘুরে ঘুরে
চেতনা যে এই লভিলাম;
লহ এ প্রণাম।

অচল পাষণ-শৈলে কঠিন তুমার
গলিল কল্লোল রোলে, ছুটে পারাবার,
বাধন লুটায় পড়ে, ভয়ে-কাঁপে শত হুংখ ভুল,
প্লাবি' প্রাণকূল
তরঙ্গ তুলিয়া নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ আঁকি',
অশান্তি হুংখের দাহ নাহি নাহি বাকি;
পূরে মনস্কাম,
লহ এ প্রণাম।

স্বর্গমন্দাকিনী হ'তে ধারা ঝরি' ঝরি'
তুলিয়া লয়েছে শুচি করি'
যুক্তিস্থানে মম উৎসমুখ,
তরঙ্গিত চকল এ বুক
নিঃসীম নির্ঝল নীল ছায়া নিল নিখিল গগনে,
জয়যাত্রা-গানে,

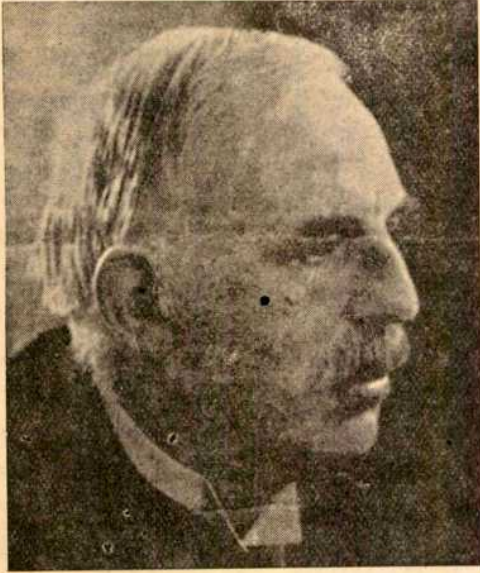
সন্ধ্যার গৈরিক রাগ উষার উষনী স্মৃতিদীপ
ক্লান্ত ভালে দিল স্নেহ-টিপ,
মলিনতা মুছে লয়ে পূর্ণতার প্রাণ হতে প্রাণে
ছন্দে গানে
আসিয়াছি নব মহিমায়
রূপ হতে অরূপ সীমায়;
আঁধারের রাজ্যপারে আলো গাহে তব মন্ত্রনাম;
লহ এ প্রণাম।

অতীত সঞ্চয়-গেহে পূর্বজন্ম-পদচিহ্নগুলি
লেপিয়া মুছিয়া দিল হতাশাস রটিকার হুলি';
অবসন্ন স্মৃতিনদী হয়েছে মুব্বর,
মহাশ্রোতে শূণ্যতার জরিল অন্তর,
সে সব অয়েষি' ধীরে কত তাপ সহি'
এই তীরে এসেছি বিরহী;
কত দূর জন্মান্তর নাহি জানা কত সিন্ধু পার
অপরিচয়ের পথে লজিয়া প্রাকার
এই হেথা আসিলাম,—এ কি মুগ্ধ শোভা,
ক্লান্ত মনোলোভা।
অনন্ত জীবনশ্রোত বরে গলি' গলি',
দিহু তাহে আপনা অল্পলি,—
নবপ্রাণ নবপ্রেমে এই সঁপিলাম,
লহ এ প্রণাম—
এ প্রাণের পূর্ণ পরিণাম।

প্লুটোনিয়ম

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিস্ময়কর আবিষ্কারের নাম করিতে বলিলে পরমাণু-বোমার কথাই উল্লেখ করা স্বাভাবিক, কিন্তু সৃষ্টি-সাক্ষ্যের কথা ভাবিলে একথা অনস্বীকার্য মনে হইবে যে, বিজ্ঞানের পরম প্রাপ্তি পরমাণু-বোমা নয়, প্লুটোনিয়ম। পরমাণু-বোমার আবিষ্কারে মানুষ প্রকৃতির অল্পসরণে অমিত তেজ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে যত প্রচণ্ড বিস্ময়ই থাকুক না কেন, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী প্রতিভা এখানে প্রকৃতিকে পরাভূত করিতে পারে নাই, অল্পকরণ করিয়াছে মাত্র, কারণ প্রাকৃতিক তেজের প্রচণ্ড উৎস স্বয়ং এখনও অমান গৌরবে বিরাজমান। অপরাপর সকল আবিষ্কারের ভিতরেও এই ব্যাপারই দেখা



লর্ড রাদারফোর্ড

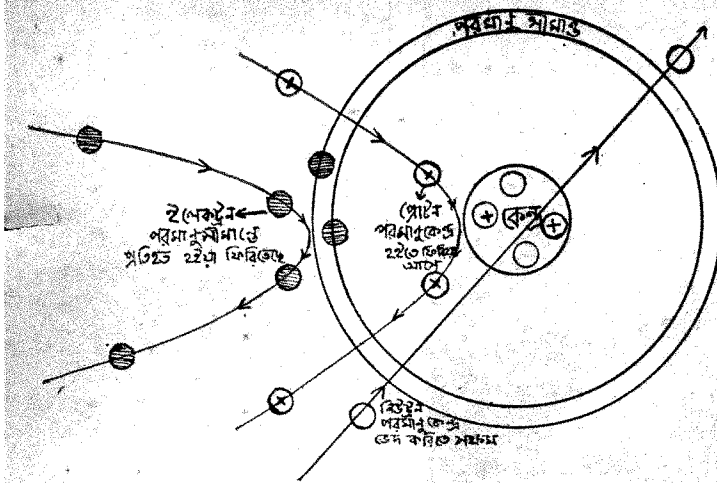
আলফা-কণিকার সাহায্যে সর্বপ্রথম পরমাণু চূর্ণ করেন

যাইবে যে, মানুষের চিরন্তন প্রচেষ্টা হইয়াছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কিন্তু অগণিত সাক্ষ্যের ভিতর দিয়াও মানুষ বড়জোর প্রকৃতির সমকক্ষতায় পৌঁছিয়াছিল, তাহার চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু প্লুটোনিয়ম নামক নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়াতে মানুষ প্রকৃতির পরিকল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে একথা বলা চলে।

পৃথিবীতে পদার্থ অগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগে পদার্থগুলি প্রধানত দুই জাতের—মৌলিক এবং মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ। মিশ্র কিংবা যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে একাধিক এমন উপাদান পাওয়া যাইবে অতঃপর যাহারা অবিভাজ্য। জল এমনই একটা পদার্থ।

বিশ্লেষণ দ্বারা উহা হইতে পাওয়া যাইবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, ইহাদের কিন্তু সহজে ভাঙা যায় না। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ। এই রকম মৌলিক পদার্থের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, মাত্র বিরানব্বইটি। এতাব্যবসায় একথা অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে, বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ ভিন্ন আর কোন কিছুর স্বাধীন সত্তা নাই। এই পদার্থগুলি সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান। যদিও বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে দুই একটির সন্ধান আজও অজাত, কিন্তু একথা অবিসন্দ্বাদিত সত্য বলিয়াই জানা ছিল যে, যে-কোন কারণেই হউক ত্রিনবতিতম পদার্থের প্রাকৃতিক অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির পরিকল্পনার গভীর বাহিরে গিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে দুইটি নবতম পদার্থ, নেপচুনিয়ম ও প্লুটোনিয়ম।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির স্ব স্ব গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ঊনবিংশ শতকের শেষে রেডি জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের পর একথা জানা গিয়াছিল যে, মৌলিক পদার্থগুলিও বিভাজ্য বটে। এতদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বীরে বীরে বর্ধিত হইয়াছে। এখন একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণু মোটামুটি তিন প্রকার কণিকায় নির্মিত। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। প্রোটন ও ইলেকট্রন যে বিশেষ গুণ আছে উহার অভিব্যক্তি দুই কণিকায় বিপরীতধর্মী। এই গুণকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়া বলা হয়; প্রোটন পজিটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত ও ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত। নিউট্রনে অধুনা কোন গুণ নাই বলিয়া ইহাতে কোন রকম তড়িৎের প্রকাশ নাই। নিউট্রনে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন অদ্বাদ্ধভাবে ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া জড়িত রহিয়াছে এবং কার্যত নিউট্রন মৌলিক কণিকা রূপে কাজ করিলেও মূলত উহাও মৌলিক নহে। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমরা যে সকল তড়িৎক্রিয়া দেখি তাহাদের সবই পরমাণু-বিযুক্ত ইলেকট্রন বা প্রোটনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। মৌলিক কণিকা-গুলির সঁধে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের তড়িৎ-সংস্থান সমান হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া প্রোটন অনেক ভারী এবং উহার তুলনায় ইলেকট্রন প্রায় ভরশূন্য। বিভিন্ন মৌলিক পরমাণুর বিভিন্নতার কারণ পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা-ভারতম্য। প্রত্যেক পরমাণুতেই ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যাসাম্য রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সমাবেশ ও মোট সংখ্যার বিভেদই মৌলিক পদার্থের একটি হইতে অপরটিকে পৃথক জাতের করিয়া রাখিয়াছে। হাইড্রোজেন পরমাণু সবচেয়ে হাল্কা, উহাতে রহিয়াছে মাত্র



মৌলিক কণিকা (ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন) পরমাণুর দিকে নিক্ষেপ হইলে উহারা কতক অংশে বিভক্ত হইতে সক্ষম।

একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন; সবচেয়ে ভারী পরমাণু যুরেনিয়ামের এবং এইটি মৌলিক পদার্থের তালিকায় সর্বশেষ স্থানে অবস্থিত—যুরেনিয়ামের পরমাণুতে আছে বিরানবইটি প্রোটন। এক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে একটি করিয়া বেশী প্রোটন দিয়া গঠিত হইয়াছে মোট বিরানবইটি মৌলিক পদার্থ। কিন্তু তিরানবইটি বা ততোধিক প্রোটনে তৈয়ারী পরমাণুর স্বাভাবিক অস্থির নাই।

পরমাণুর গঠনের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পরমাণুর ভিতর দুইটি পৃথক অংশ রহিয়াছে—নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র, সেখানে প্রোটন ও নিউট্রন জোট বাঁধিয়া থাকে, আর কেন্দ্রের বাহিরে অনেকটা দূরে রহিয়াছে দূর্যমান ইলেকট্রনের প্রাচীর। পরমাণু-কেন্দ্রে অনেক সময় প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত অবস্থায় থাকিয়া মৌলিক কণিকার স্বায় আচরণ করে। একটি প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হইয়া যে কণিকা গঠন করে উহার নাম ডেউট্রন। আবার দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন সমাবেশেও এক প্রকার কণিকা পাওয়া যায়—তাহার নাম আলফা-কণিকা। রেডিয়ম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে এই কণিকা বহুই নির্গত হয়।

পরমাণুর সকল গুণ ও বর্মের অভিব্যক্তির জন্ম দাতী পূর্বেজ দূর্যমান ইলেকট্রনসমূহ। উহাদের কার্যকারিতার ফলেই পদার্থের বিভিন্ন গুণাবলী আত্মপ্রকাশ করে এবং ইহাদের সংখ্যা ও বিভাদের উপর উহাদের কার্য নির্ভর করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সংখ্যা ও বিভাস নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রের প্রোটনগোষ্ঠী। রাসায়নিক বা অজ প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণুকে যে পরিবর্তনের ভিতরেই লইয়া আসি না কেন তাহার সবই বহিঃ ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াজনিত। সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা কেন্দ্রকে স্পর্শ করিতেও পারি না। সমগ্র পরমাণু হইতে বহিঃ ইলেকট্রনের দুই একটিকে

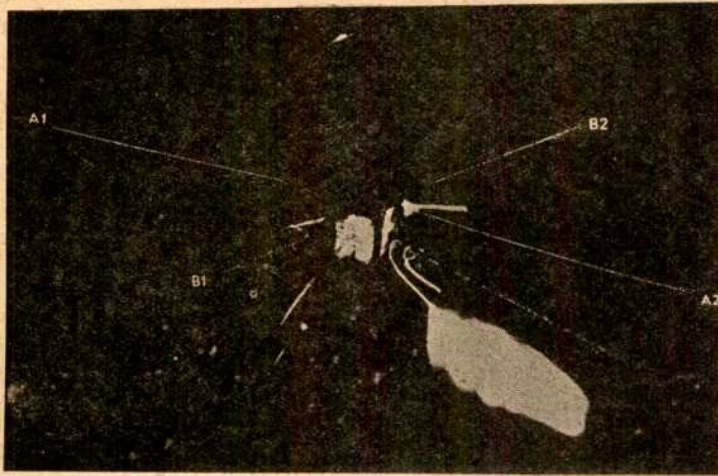
নানা কোণে একেবারে বিমুক্ত করিয়া আনাও সম্ভব, কিন্তু বহিঃ ইলেকট্রনের সংখ্যা হ্রাসে পরমাণুর স্বরূপ বদলায় না অর্থাৎ এক পদার্থ অজ পদার্থে রূপান্তরিত হয় না, কেবল মাত্র ইলেকট্রনের অভাবে অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যা-ধিক্যে পরমাণুটি তড়িৎ-প্রবাহ হইয়া পড়ে। আবার কোন প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থের এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুতে ধারাবাহিক ভাবে ইলেকট্রন চালনা করিতে পারিলে সেই পদার্থের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ চলে।

পরমাণুর বহিরঙ্গনস্থিত ইলেকট্রনদের স্থানচ্যুত করিলে পদার্থের মৌলিক চরিত্র বদলায় না, কারণ বহিঃ ইলেকট্রনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রের শাসনে। যতক্ষণ কেন্দ্রের গঠন অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ পরমাণুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। তাই এক

পদার্থের পরমাণুকে অপর পদার্থে পরিবর্তন করিতে হইলে কেন্দ্রের গঠন বদলাইতে হইবে। কিন্তু এই কার্য খুব সহজ নয়। ইলেকট্রন-প্রাচীর যেন পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত। ইলেকট্রন-সেনানীরা স্ব-স্ব রাজ্যের ক্ষমতা লইয়া সেখানে সক্রিয় রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, কেন্দ্রীয় শক্তির উহাদের নিয়ামক। রাজ্যের ওলটপালট করার বা নীতি বদলাইবার জন্ম কেন্দ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সীমান্তের সৈন্যবাহু ভেদ করিয়া কেন্দ্রে পৌছানোও সম্ভব নহে। পরমাণুর কেন্দ্রে পরিবর্তন সংঘটন করিতে হইলে দেখানকার প্রোটন-সংখ্যা কমানো-বাড়ানো দরকার। কিন্তু সীমান্তের ইলেকট্রনের প্রত্যেক অতিক্রম করিয়া পরমাণুকে মৌলিক কণিকা পাঠাইবার উপায় বহু দিন আমাদের জানা ছিল না।

কয়েক বৎসর আগে ফার্মি চেষ্টা করিয়াছিলেন সীমান্তের প্রহরীকে কাকি দিয়া কেন্দ্রে নিউট্রন ঢুকাইতে। তাঁহারই চেষ্টায় পরবর্তীকালে জয় হইয়াছে প্লুটোনিয়ামের।

পরমাণুকে কেন্দ্রের গঠনরীতি বদলাইতে হইলে দুই প্রকারে এই কার্য করা সম্ভব। কোন প্রকার আঘাতে কেন্দ্রকে ভাঙিয়া ফেলিয়া উহার প্রোটন-সংখ্যা কমানো যাইতে পারে কিংবা অজ কোন উপায়ে বাহির হইতে প্রোটন সরবরাহ করিয়া কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা চলিতে পারে। কেন্দ্রকে ভাঙিতে হইলে পরমাণুর গায়ে মৌলিক কণিকার (ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন) ঢিল নিক্ষেপ করা চলে। ইলেকট্রনকে পরমাণুর দিকে ছুঁড়িয়া দিলে, সে যত ভোরেই হোক না কেন, এই বহিরাগত ইলেকট্রন পরমাণুর সীমান্তবাসী ইলেকট্রনদের বিকর্ষণ প্রভাবে পরমাণুর কেন্দ্রে পৌছান তো দূরের কথা সীমান্ত হইতেই হালকা খাইয়া ফিরিয়া আসিবে। ইলেকট্রনের পরিবর্তে বাহিরের দিক হইতে প্রোটন ছুঁড়িয়া



বেগযুক্ত প্রোটনের আঘাতে লিথিয়াম পরমাণু চূর্ণীকৃত হইয়া বিভিন্ন দিকে আলফা-কণিকা রূপে ছিটকাইয়া যাঁতেছে

দিলে উহারা সীমান্তস্থিত ইলেকট্রন কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইবে না * (কারণ বিপরীতবর্গী কণিকারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে), বরং কেন্দ্রের সমগোত্রীয় বলিয়া সীমান্তের প্রহরীরা সমগ্রমে খাঁটি ছাড়িয়াই দিবে, কিন্তু উহারা প্রতিহত হইবে একেবারে কেন্দ্রের সন্মুখীন হইয়া—কেন্দ্রের প্রোটন বাহিরের প্রোটনকে বিকর্ষণ করিবে। এতদ্ব্যতীত নিউট্রন নির্গত তথা অদলীয় বলিয়া উহা সহজেই কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম।

রাদারফোর্ড এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯১৯)। রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ হইতে যতই বেগযুক্ত শক্তিশালী ইলেকট্রন ও আলফা-কণিকা চিলের মতই নির্গত হয়। এই প্রকারে প্রাপ্ত তীব্র বেগযুক্ত আলফা-কণিকাক পদমাণুর উপর সংঘর্ষ ঘটাইতে শিখা রাদারফোর্ড সংগ্রহ্য নাইট্রোজেন ও গ্র্যানু'মনিয়ম পরমাণুকে জাতিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আলফা-কণিকাও খুব ভারী পরমাণু-কেন্দ্রে সংঘর্ষ ঘটাইতে অনর্থক। আলফা-কণিকা দীর্ঘস্থায়ী ইলেকট্রন-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কেন্দ্রের সন্মুখীন হইলেই কেন্দ্রস্থিত প্রোটনগুলি উহাদের অগ্রদর হইতে দেখ না, তখন পারস্পরিক বিকর্ষণ সক্রিয় হইয়া উঠে। কেন্দ্রের প্রোটন-গোষ্ঠী সংখ্যায় যত বেশী হয়, বহিরাগত প্রোটনের পক্ষে কেন্দ্রে পৌঁছানো তত অসম্ভব হয়। প্রোটনদ্বারা কেন্দ্রে সংঘর্ষ ঘটাইতে হইলে উহাদের প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেশী করিতে হইবে। রেডিয়াম-সি হইতে প্রাপ্ত আলফা কণিকার এমনই গতি আছে। অতঃপর বেগযুক্ত প্রোটন পাইবার জন্য রাদারফোর্ডের সহকারী কব্রফট এক যন্ত্র নির্মাণ করেন (১৯৩২) এবং তাহা হই সাহায্যে হাইড্রোজেন-পরমাণু-কেন্দ্রে বেগযুক্ত করিয়া তিনি লিথিয়াম পরমাণুকে জাতিতে সমর্থ হন।

মৌলিক কণিকাকে বেগযুক্ত করিবার জন্য অতঃপর আরও

কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে লরেন্স-নির্মিত সাইক্লোট্রোন সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, ডিউট্রন বা আলফা-কণিকাকে ইচ্ছামত গতিশীল করা যাইতে পারে।

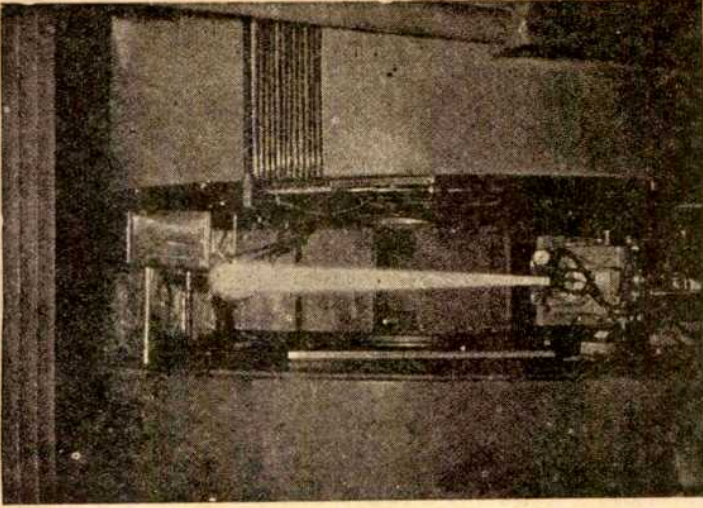
ইতিমধ্যে চ্যাড উইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন (১৯৩২)। ইহার কোন তড়িৎসংধান নাই বলিয়া নিউট্রন পরমাণু-কেন্দ্রে অভিযান করিবার বেশী উপযুক্ত। পোলোনিয়ম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিলিয়ামের সঙ্গে রাখিয়া দিলে নিউট্রন নির্গত হয়। এই সকল আবিষ্কারের পরে জুলিয়ে তনীয় পত্নী আইরীন কুরীর সহযোগিতায় বিভিন্ন পরমাণু জাতিতে সমর্থ হন (১৯৩৩) এবং তাহাদের

চৌতই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পওয়া যায়। এক পদার্থের পরমাণু মৌলিক কণিকার আঘাতে জাতিয়া যাইবার



সাইক্লোট্রন নির্মাতা, আর্নেস্ট ও লরেন্স

সময়ে বেগযুক্ত প্রোটন, ইলেকট্রন বা নিউট্রন*ত্যাগ করে এবং এইরূপে ইহারা রেডিয়ামের চাহ বাৎসর করিয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগকে কখনও 'কৃত্রিম রেডিয়াম' বলিয়া অভিহিত করা হয়।



সাইক্লোট্রন হইতে বেগপ্রাপ্ত প্রোটিন কণিকা বিক্ষিপ্ত করিতেছে

পরমাণুর রূপান্তর সম্ভব হইতেছে অর্থাৎ পরমাণু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রোটিন বা নিউট্রন সংযোগ করা চলে দেখিয়া ফার্মি এক নূতন পরিণয়মা লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন (১৯৩৪)। বিদ্যানন্দইটি প্রোটিন ও এক শত ভেটিক্যালি নিউট্রনে গঠিত সংযোগের ভাৱী যুরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন যোগ করিয়া দিয়া উহাকে আরও ভাৱী করা চলে কিনা ইহাই ছিল ফার্মির গবেষণার বিষয়। তিনি যুরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রনের আঘাতের সম্মুখীন করিয়া দেখিলেন যে, যুরেনিয়াম পরমাণু পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি যুরেনিয়াম হইতেও ভাৱী পরমাণু ও নবতম পদার্থ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা বিদ্যানন্দইয়ের বেশী।

কয়েক বৎসর এই বিষয় পীড়া চলিবার পর অটোহান, স্ট্রানমান ও মীটনার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ফার্মির দাবি সত্য নহে—নিউট্রনের আঘাতে যুরেনিয়াম পরমাণু নূতন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয় নাই (১৯৩৯)। তবে তাঁহারা ইহাও বলিলেন, ফার্মির পরীক্ষায় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা আরও বিশ্বাসকর—যুরেনিয়াম পরমাণু ভাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া দুইটি অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে। এই হালকা পরমাণুগুলিকেই ফার্মি নবতম পদার্থ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় ইহাও দেখা গেল যে, যুরেনিয়াম পরমাণু ভাঙিবার ফলে প্রচুত তেজ উৎপন্ন হয়। পদার্থ কালে এই তেজই পরমাণু-বামার প্রলম্বন শক্তি জোগাইতে ব্যবহার করা হইয়াছে।

যুরেনিয়ামকে ভাঙিয়া দুই টুকরা করিয়া যে তেজ পাওয়া গেল উহাকে সহজলভ্য করিবার জন্ত চেষ্টা চলিতেছিল। যুরেনিয়াম পরমাণুর দুই-তিনটি রকমারি আছে। ৯২টি প্রোটিন-

গণনা করিতেছিলেন তাঁহারা এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বেখা গেল যথেষ্ট পরমাণু যুরেনিয়াম-২৩৫



নিউট্রন আবিষ্কর্তা ডাক্তার জেমস চ্যাডউইক

সংগ্রহ করিতে পারিলে খুব সহজেই প্রচুত তেজ উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু যুরেনিয়াম-২৩৫ সংগ্রহ করা জটিল ব্যাপার। খনিজ প্রস্তর হইতে যে যুরেনিয়াম উদ্ধার করা হয় তাহাতে ভাৱী যুরেনিয়ামের সঙ্গে হালকা যুরেনিয়াম থাকে মোটামুটি ১৪০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র। ইহাকে পৃথক করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

যুক্ত পরমাণুমাঝেই যুরেনিয়াম-২৩৫। সাধারণত বেখার ভাগ যুরেনিয়াম পরমাণুতেই ৯২টি প্রোটনের সঙ্গে ১৪৬টি নিউট্রন থাকে। ইহারা ভাৱী যুরেনিয়াম বা যুরেনিয়াম-২৩৮। আবার এমন যুরেনিয়াম পরমাণু আছে যাহার কেন্দ্রে ১৪৩টি নিউট্রন থাকে—ইহারা হালকা যুরেনিয়াম বা যুরেনিয়াম-২৩৫। এই দুই জাতীয় যুরেনিয়াম পরমাণু দর্শনিক দিয়াই অভিন্ন, কেবল উহাদের ভর সামান্য কম-বেশী। নীয়েলস বোর আবিষ্কার করেন যে, হালকা যুরেনিয়ামের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, নিউট্রনের আঘাতে উহা খুব সহজে ভাঙে (১৯৩৯)। তেজ উৎপাদন কার্যের জন্ত ইহারা যুরেনিয়াম-বিভাজন বিষয়ে



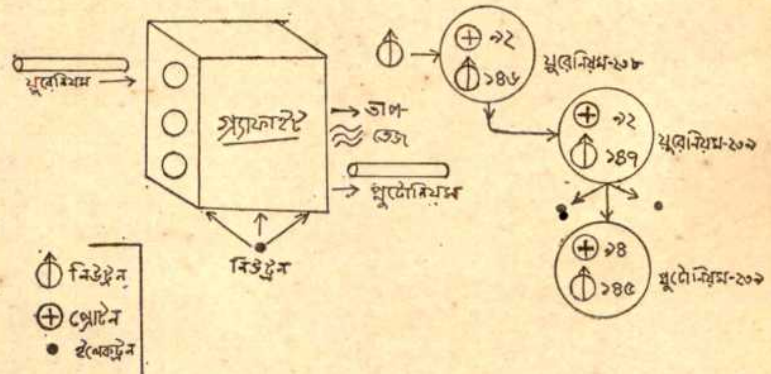
নীয়েলস বোর

পরমাণু-বোমা নির্মাণ করিবার জন্ত যুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ করা অপরিহার্য হইয়া উঠিল। অনেক ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যবস্থায় যুরেনিয়ম-২৩৫ সংগৃহীত হইতেছিল। এদিকে ফার্মি স্বীয় পরিকল্পনাতেই গবেষণা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি দেখাইলেন যে, নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করিয়া তদ্বারা যুরেনিয়ম-২৩৫কে আঘাত করিলে যুরেনিয়ম পরমাণু না ভাঙিয়া এমন নবতম পদার্থে রূপান্তরিত হয় যাহা ৯৪টি প্রোটনে গঠিত। এই পদার্থের নাম দেওয়া হইল প্লুটোনিয়ম। ইহাকেও যুরেনিয়ম-২৩৫ এর মত সহজেই ভাঙিয়া ফেলা যায়। উপরন্তু, এই পদার্থ যুরেনিয়ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা যুরেনিয়ম হইতে পৃথক করিয়া লওয়া সহজ। পরমাণু-বোমার নির্মাণকল্পে যাহারা যুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহকর্তৃক ব্যাপৃত ছিলেন তাহারা এখন প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

যুরেনিয়ম-২৩৮ এর পরমাণু-কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে এই নিউট্রন-কেন্দ্রে গিয়া বাধা

পায়, ফলে তখন পরমাণু-কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৭টি নিউট্রনের সমাবেশ ঘটে। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নিউট্রনে রহিয়াছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। অবস্থা-বিশেষে নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বহিরাগত নিউট্রনটি কেন্দ্রে গিয়া আটকা পড়িলেও উহারই আঘাতে কেন্দ্রস্থিত দুইটি নিউট্রন একে একে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হইলে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৩। এই পরমাণু নূতন সৃষ্টি। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে নেপচুনিয়ম। ইহা অস্থায়ী পদার্থ। কেন্দ্রের অপর একটি নিউট্রনও ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৪ ও নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৫। ইহাই প্লুটোনিয়মের পরমাণু-কেন্দ্র। ইহাও একটি নূতন পদার্থ। এই পদার্থের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিবার পর ইহার নিজস্ব গুণ ও ধর্মাদি গবেষণাদ্বারা স্থির করা হইতেছে।

পরমাণু-বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্যেই ব্যাপকভাবে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরে যে পরমাণু-বোমা নির্মিত হইয়াছে তাহা সবই প্লুটোনিয়মে তৈয়ারী। যুরেনিয়ম অপেক্ষ প্লুটোনিয়ম বেশী ভগ্নপ্রবণ ও উহার বিভাজনে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ তেজ বিমোচিত হয়। প্রত্যেকটি পরমাণু-বোমার জন্ত নাকি এক শত পাউণ্ড প্লুটোনিয়ম প্রয়োজন হয়।



যুরেনিয়ম হইতে বিভাবে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা হয়

পরমাণু-বোমার জন্ত যে ব্যবস্থা দ্বারা প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফার্মি দেখাইয়াছিলেন যে মন্থরগতি নিউট্রনের আঘাতেই ভারী যুরেনিয়মকে প্লুটোনিয়মে পরিণত করা সম্ভব। সাধারণত পোলোনিয়ম বা অম্লরূপ পদার্থ হইতে যে নিউট্রন পাওয়া যায় তাহার গতিবেগ কোন ক্ষেত্রেই মন্থর নহে। অতএব প্লুটোনিয়ম তৈয়ারীর জন্ত এইগুলির গতি মন্দীভূত করা প্রয়োজন। এক খণ্ড কার্বন বা গ্রাফাইটের ফলকের ভিতর

দিয়া চালনা করিয়া দিলে নিউটন উহা ভেদ করিয়া আসিতে সক্ষম হয়, কিন্তু চলার পথে কারবন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইহার বেগ কমিয়া আসে। প্লুটোনিয়ম তৈয়ারীর জন্ত ষাট যুরেনিয়ম লইয়া উহাকে গ্র্যাফাইটের ভিতরে ভরিয়া দেওয়া হয়। বাহিরের দিক হইতে নিউট্রনকে উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলে নিউট্রনের গতি মন্দীভূত হয় এবং ইহার। যুরেনিয়ম-২৩৮কে প্লুটোনিয়মে পরিণত করে। যুরেনিয়ম-২৩৫ এর পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হইলে নিউট্রন এই পরমাণুকে ভাঙিয়া ফেলিবে এবং এই ভাঙনের ফলে যুরেনিয়ম-২৩৫ হইতে আবার নূতন নিউট্রন মুক্ত হইবে এবং ইহার। আবার যুরেনিয়ম-২৩৮ এর উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম। এইরূপে যুরেনিয়মকে প্লুটোনিয়মে রূপান্তরিত করণের হার ক্রমে বাড়িয়া চলে।

এই রকম ব্যবস্থায় সর্বশেষে যুরেনিয়ম হইতে যে দুইটি ইলেকট্রন বাহির হইয়া আসে তাহারা তেজ বহন করিয়া আনে এবং ইহারই ফলে বিপুল তাপের উদ্ভব হয়। এই কারণে প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিবার সময় যন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন আছে। আমেরিকার হানকোর্ডে পরমাণু-বোমা তৈয়ারীর জন্ত যে সুরক্ষণ কারখানা আছে সেখানে। এতদুদ্দেশ্যে কলম্বিয়া নদীর সমগ্র জলস্রোতকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইখানে প্রত্যাহ দুই-তিন পাউণ্ড পরিমাণ প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করা সম্ভব।

প্লুটোনিয়ম তৈয়ারী করিয়া মাহুষ নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিদ্যের সৃষ্টিরহস্তে ইহা সত্যই অভিনব ও অশাবনীয়। নূতন পদার্থ সৃষ্টির পর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নবতম জীব সৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইলেও বিশ্বাসের কিছু নাই।

আখি

ঐরবি গুপ্ত

যে আখির নীলিম আভা

হৃদয়ের পরশ লহে,

যে আখির কালো তারা

স্বপনের সুবাস বহে,

উষনী তাদের পরে

ঢেলেছে সোনার করে ;

কত যে এমন আখি

দুঃমিমে মাটির বুকে,

আজিও অরুণ ওঠে,

পড়ে না তাদের মুখে।

দিবসের প্রান্ত-হণি—

নিশীথের মধুরতা,

জলেছে নয়ন-তলে

ভরিয়া নীরবতা ;

আকাশের তারার আভা

অবিরাম ছন্দে কাঁপা।

নয়নের মুক্ত-পথে

নামিল অনুলিখা,

রচিল ছায়ায় ভরি'

আধারের যবনিকা।

ধরণীর জামল-ছবি

তারা কি হারায় তবে ?

দীপিকা আলো-বহান

কেমনে সত্য হবে ?

নয়নের উজ্জল ধারায়

তমসা আপন হারায় ;

ভুযে

দৃষ্টি তাদের

নিরেছে ভিন্ন লেখা,

ধরণীর

আখির তারায়

ষাদেরে যায় না দেখা।

আকাশের

তারার মাল্য

কে জানে কোন্ গহনে

চলে যায়

অন্তাচলে

তবু ত রয় গগনে।

তাদেরও চোখের তারা

আধারে হয় নি হারা

কোন এক

ভুবন 'পরে

সবুজের উৎসধারা,

কেমনে

বলি তারে,

হয়েছে ধ্বংস তারা।

যে আখির

নীলিম আভা

হৃদয়ের পরশ লহে,

যে আখির

কালো-তারা

স্বপনের সুবাস বহে ;

অনাদি আলোর কোলে

তারা যে নয়ন খোলে,

• মরণের

অঙ্কুরালে

যে আখি বহু আজি

তাদেরি

তারার বীণায়

আলো যে উঠল বাজি।

মানকুমারী বসু

১৮৬০—১৯৪৩

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানকুমারী জীবিতকালে “আমার অতীত জীবন” নাম দিয়া আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (‘উত্তরা’, ২য় বর্ষ, কাহ্নি-অগ্রহায়ণ ১৯৩০ স্ট্রব)। তাহার জীবনী বচনায় ‘হাট খামারের প্রপান উপদ্রব্য।

বংশ-পরিচয়; বাল্য-জীবন

তিনি বাল্য-জীবনের কথা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায় সান-তাণ্ডের এক-আধটু গুণগোল থাকা স্বাভাবিক। মান-কুমারীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতৃত্ব—সুনার উদ্যোগ শ্রীচন্দ্রনাথ নাগ দেশাইয় দিয়াছেন যে, তাহার জন্ম-তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১০ মাঘ ১২৬৩ (২৫ জানুয়ারি ১৮৬০),—১০ মাঘ ১২৭১ ন.হ।—

“তাঁহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর জীবন-কাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহার উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৩রাধামোহন দত্ত চৌধুরীর কথা অবগত মনে রাখিয়াছেন; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত-বংশের নৌজুগা-প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই আমার পিতামহদেব। তাঁহার প্রথম পত্নী বালিকা বধূসে গতাত্ম হইলে, দ্বিতীয় বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র আমার পিতৃদেব ৩ধানন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের বংশোদ্ভব জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৩বনমালী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীমুক্তেশ্বরী শান্তমণি দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতাপিতা বিবাহিত হন। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর। আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়।...চতুর্থ আমি—মানকুমারী সর্বকনিষ্ঠ।... ১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়।...শিশুকালে আমাকে “অভিমানবী” বুঝিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল।...আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরষ-প্রকৃতি অথবা পুরাণের শিবশক্তির মতই দেখিতে পাইয়া-ছিলাম। বাবা পুস্তক-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রাঙ্গোচনা, শিবপূজা, পুণ্যস্থানাদিগের নিকটে পুণ্য পাঠ, বালিকাদিগকে সহুপদেশ দান এবং শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সব করিতেন। আর মা কার্য্যকারণকিন্তু উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতিচেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, গৃহকর্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন।...

আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার এক শিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। উৎকার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম। দ্বিতীয় ভাগের মুক্তাকর শীঘ্র দ্ববর হইবে বলিধা বাবা আমার সহিত সর্বদা বানান করিয়া কথা কহিতেন। মুক্তাকর পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা-বিদ্যালয় হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিচয় করিয়া কথা-মালা লইয়া পড়িতে স্থলে চললাম।...বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে বাবার আদেশমত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া-ছিলাম। তাঁহারই রূপায় পাঠ আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম; কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না।...এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া বাবার পুস্তক সকল অর্থাৎ কানীরাং দাসের মহাভারত, কুন্তিবাসের রামায়ণ, কানীরাং, হর-পার্বতী-মঙ্গল প্রকৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনী-দিগের অধুকাণে, বাবা মা দাদা প্রকৃতি আশ্রয়দিগের উচ্চৈশ্বর্য পত্র লিখিতাম।...আমার দাদা শ্রী-শঙ্কর অনুবাসী ছিলেন।...আমার সবদা ভ্রাতৃত্বায় ‘বামাবোধিনী’র গ্রন্থিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারও গদ্য-পদ্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমরাও “রচনা” করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত।...

আমি তাঁদের জ্যেষ্ঠতায় বসিয়া উপকথা রচনা করিয়া খাতায় লিখিতাম।...পত্র বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না, তাহার ভিতর রচনার ছুইটি ছত্র মাঝে আমার স্বরণ আছে, তাহা এই :—

“রাখ রাখ সব ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।”

গদ্য রচনারও একটু নমুনা দিলাম; “এক রাজ-কহার বারাগায় এক কাক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে হাক-কড়া একটু পাখী ধরিয়াছিলেন; তাহার গায়ে রং লাল, সবুজ, হলুদে, আর কালো; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটা বাহুড়।” এই রচনা দেখিয়া আমার ভ্রাতৃত্বায় হৃদয় গড়াগড়ি দিয়া-ছিলেন, আমি ভগ্নানক অপ্রতিভ হইয়াছিলাম; নৌকায়ের শেষ উপমেয় “বাহুড়” হওয়া যে এত হাস্যবাহক কথা তাহা আমি মোটেই বুঝি নাই, কারণ “বাহুড়” আমি তখন মোটেই দেখি নাই।”

বিবাহ ও বৈধব্য

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যানন্দকাটি গ্রাম-নিবাসী বিদ্যুৎসর

বহুত সহিত ১০ বৎসর বয়সে মানকুমারীর বিবাহ হয়। বিবাহে তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন আমি-গৃহ লেখেন নাই; দশ বৎসর ঘাইতে না-ঘাইতেই তিনি একটি কন্যা লইয়া বিধবা হন। তাঁহার আত্মকথায় প্রকাশ :-

“আমার পিতৃালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী বিদ্যানন্দকাটা গ্রাম। সেখানকার বহু মহাশয়েরা ধন, মান, বিদ্যাবত্তা এবং লোকহিতকর কাজের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের ছুইট কন্যা এই বহু মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই দিদিদিগের কয়েক দেবর কার্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে সেই পাত্রের সহিত আমার বিবাহের সন্ধ ক করেন।...বাবা তাঁহার স্নেহের কথাকে মহাসংসারোৎসর্গক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।...বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন স্বস্তুরালয় গিয়া স্বস্তুর, শান্তী, নন্দা, জা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট আদর হইয়া মাতৃ-কোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।...

তেরো বৎসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবামাত্র আমাকে দ্বিতীয় বার স্বস্তুরালয়ে ঘাইতে হইয়াছিল।...আমার স্বস্তুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহার বৃহৎ পরিবার।...সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে “অদ্ভুত জীব” দেখিয়া অর্থাৎ আশ্চর্য্যজনক করিতে অক্ষয়, ছলনা-চাতুরীতে অনন্ত্যত এবং গৃহ-কর্মে অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিক্রপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নছি, বহুগুণের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে “মাহুষ” হইতে হয়।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞাত্ববর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনের আমার প্রতি দৃষ্টি হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া নন্দা প্রভৃতি সর্বাংকণ আমাকে স্ত্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন।...যাহা আমি এক প্রেমি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রেম করিতে এবং গৃহকর্ম্ম শিখিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার গোষ্ঠী জা শিল্পকাজে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটিতে বাগী আসিয়া আমার নন্দাদিগের নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক-একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। তিনি যে আমার পরম স্বস্তুর-বাগীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। ক্রমশঃ তাঁহাকে পুত্র ও সংগে করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য

হইয়া উঠিল। অতঃপর তাঁহার অভিশ্রমস্বারে আমি সহস্র গৃহকর্ম্মের মধ্যে দিনের বেলায় এক একট পদ্য লিখিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে “উপহার” দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই



মানকুমারী বসু

“লক্ষ্মী”র, বড়ই “অসমসাহসে”র এবং “বিরক্তি”র বিষয় হইত। যাহা হউক রাবী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যুষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বহুগুণ সেই কবিতার খ্যাতি করিতেন; কিন্তু আমি পাছে খ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠি, এজন্য আমি অত্যন্ত সতর্ক হইতেন। পরবর্তী কালে তিনি আমার নিকটে—যিনি আমাদের বহু-মহিল-কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই ‘দীপ-নির্ধাণ’ ‘ছিন্নমূল’ রচয়িত্রী, সুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি বিহ্বলমহিলাগণের আদর্শ রচনাশক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, দেহের অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায়ই থাকিতেন; যে সময়ে বাগী আনিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লক্ষ্যের অহবোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময়ে যখন শয়ন-গৃহে ঘাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অবস্থার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেইজন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি “পুন্ডরের প্রতি ইন্দুবালা” শীর্ষক অমিতাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি কবিতা লিখিয়া ধামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

“দুঃস্বপ্ন যবন যবে ভারত জিতরে
পশিগ আসিয়া, পুন্ডর মংগলী

কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
ইশুবালা কেমনে বা করিলা বিনায় ?
কৃপা করি কহ মোরে হে করনা দেবী।
কেমনে বিনায় বীর হ'ল প্রিয়া কাছে।”

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কলিকাতার বঙ্গগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটি ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ লেখা।

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক গীর্জা লিখিয়াছিলেন, “আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতৃপুত্রী; ইনি ইঁহার পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।”

ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, “লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন; তুমি তাঁহার উপগ্রন্থ ভ্রাতৃপুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। জ্বালোকের রচনা বলিয়া সকলে এতটা প্রশংসা করে।”

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া ছুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি নীতিকাব্য, ঐক্যকাব্য এবং উপদ্রাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম; তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী লিখিবার জন্ত অহুরোধ করেন। তাঁহার আবেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একবান্য বাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাগীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সত্তর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কণ্ঠাটী ভূমিষ্ঠা হয় [৩০ ডিসেম্বর ১৮৮০]। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম। আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ডাঙ্গাইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম। তার পর অনেক দিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর বৎসর [ইং ১৮৮২] স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এন্স. এম. এন্স. (L.M.S.) উপাধিপ্রাপ্ত হন।...কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও মৌজাগ্য কেহী দিন সহিল না। আমার স্বত্তরবর্ষের অহুরোধে এবং কয়েকটি সন্তান বন্ধু-বান্ধবের নির্ব্বাতিপথে স্বামী সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে “হৃদয় চিকিৎসক”

বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। ছ'মাসেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, “এইবার আশ্বিন মাস হইতে তোমাকে, বুকীকে এবং আমার ছোট ভাই ছুটীকে আমার কাছে লইয়া যাইব।” আমার এক নন্দা পীড়িতা হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই তিন দিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশ্বিন মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার স্বত্তর, আমার অন্যতম ভ্রাতার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধু, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবানকে ডাকিলাম...তার পরে আর কি বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমণী-জীবনের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু দেবপ্রতিম পতি-বহু, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে অগতের দ্বাধারে হস্তাগিনী করিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। ঠিক সেই মুহুর্তে বিদ্যানন্দকাঙ্গারি বাগীতে থাকিয়া আমি ঐক্লপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাড়ে আঠারো।”

সাহিত্য ও সমাজ সেবা

বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে মানকুমারীর মন বসিত না; তিনি শেষে কবিত্বশক্তির অহুশীলনে ও সমাজ-সেবার আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

“অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-সুখাদি কর্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সম্বন্ধান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্যকাব্য ‘প্রিয় প্রসঙ্গ’ রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কৃতবিদ্যা আত্মীয় তাঁহার জীর নিকট হইতে ঐ হস্তলিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমণীগণের একটা সান্ত্বনার জিনিস হইবে এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার গণীয় পতিদেবের একটি স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক

হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, তাঁহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া আত্মীয়ের নিকটে উহার মৃত্যুজনের ভার প্রদান করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার ঘেরকম লজ্জা সঙ্কোচাদি ছিল, তাহাতে যদি আমার মন সেরূপ অপ্রকৃতিস্থ না হইত, তবে আমি 'প্রিয় প্রসঙ্গ' ছাপুইতে পারিতাম না। যাহা হউক, 'প্রিয় প্রসঙ্গ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, বেয়ালাহুনা ও গল্পনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের 'প্রিয় প্রসঙ্গ'ও সাধারণের কাছে আদৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অনেক দিন জানিতে পারিলেন না।...

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটুকি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যাভরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অল্পশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ব-বিধাতার কাজে আয়োজ্যগ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্টফল আমি পাইলাম। ইহাতে আমার দুট বিখ্যাস হইল। আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অক্লিষ্টকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এই সময় আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আত্মদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারিলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের কবিতা, এবং সাহিত্য-শুভ বক্তৃতাগুলির অনেক গ্রন্থ পড়িতাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' পড়িতে আমার স্বদেশ ও স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের জন্য অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত; সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালয়ে থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজী পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম।...এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কান পুরুষের সন্মুখীন হইতাম না; কোন আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না; এবং প্রীতিলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যলাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর

দৃষ্ট সর্বদাই আমার উপরে নিপতিত আছে ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে 'সখা' নামক মাসিকপত্র আসিত। সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন দেশের বালক-বালিকাদিগকে জানানু-শীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া গঠিত-চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে 'সখা' প্রবর্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কাজের সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। 'সখা'র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যতপূর্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছু দিন পর্যন্ত 'সখা'র লিখিতে লাগিলাম।* কিছু দিন পরে প্রমদাবাবু ইহ-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-দৃষ্ট বঙ্গুর মৃত্যু-সংবাদে আমি মনে মনে বড় শোকাবুল হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহ্যভূতি করিবে না বলিয়া কাহাকেও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া 'সখা'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলাম। প্রমদাবাবুর ভ্রাতা এবং 'সখা'র রক্ষক বাবু প্রমদাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি 'সখা'র [আগষ্ট ১৮৮৫] প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্ম কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা-শ্রেণীভুক্ত হইলাম।† কিছু দিন বামাবোধিনীতে কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশ্যে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে তত্ত্বিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় উহার জন্ম "জুবিলী" করেন। সেই সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন-চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতি-যোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে 'বনবাসিনী' নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনীর জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্বের বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্তব্য বিষয়ে আমি অনেক

* প্রমদাচরণ সেন-সম্পাদিত ৩য় বর্ষের 'সখা'র (১৮৮৫, জ্যৈষ্ঠমাস ও মে সংখ্যা) "জৈনিক বঙ্গ মহিলা" নামে মানকুমারীর "সোহাগ" ও "নববর্ষ" শীর্ষক দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

† বামাবোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারীর প্রথম রচনা—"আমার দেবতা" নামে একটি কবিতা। ১২৯৩ সালের ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্মের আত্মগঠন করিয়া ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে দর্শনীয় বামীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জাতীয় ভগিনীগণের উন্নতিসাধন, শিশুদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে ‘বনবাসিনী’ লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন। ‘বনবাসিনী’র প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় “দাসাশ্রম” প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উক্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখেন, “মা। তোমার ‘বনবাসিনী’ কল্পনা সফল হইয়াছে”—ইত্যাদি। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকটে খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই “জুবিলী” সময় হইতে বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিম্ন কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণসাধন, তাঁহার কর্তব্যকর্ম্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সম্পাদকীয় গুণ্ডে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। আমাকে যেরূপ স্বেচ্ছাপ্রদেয় দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রাণনীয় সেইরূপ দৃষ্টপ্রাপ্য। তিনি ধার্মিকাগ্রগণ্য এবং দেবতুল্য চরিত্র-বান্ জামিয়া তাঁহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সন্দেহ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃ-দেবের মত ভক্তি করিতাম। এই গম্বু হইতে বামাবোধিনীতে আমি পঞ্চ অপেক্ষা গড় প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং রাজ্যের আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুপ্ততা নিবারণ জন্তও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অসংখ্য মাসিকপত্রে ছই-চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ “বাকালী রমণী-দিগের গৃহধর্ম” রচনার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায়, আমি ১২৯৬ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার কল্পন আত্মীয় “যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী” সভার বিজ্ঞাপনানুসারে “বিবাহিতা রমণীর কর্তব্য” বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অহরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস বি. দে. প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল পাইয়াছিলাম। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত সম্মিলনীর কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া নিম্ন সহৃদয়তায় একান্ত আনন্দিত হন, এবং আমাকে বিশেষ

উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মহাশয় ডাক্তার যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় (ধাতী-শিক্ষা-প্রণেতা) তাঁহার ‘বাকালী মেয়ের নীতিশিক্ষা’ পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ গৌরবসূচক এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার পরে আরও দুই বারে আমি যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীতে “সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্তব্য” এবং “মহৎ জীবনী” নামক প্রবন্ধ রচনার প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যার-পর-নাই স্নেহ ও অনুরোধ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিক-তর মনোযোগপূর্বক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্বক একান্ত চেষ্টা করিতেছিলাম। একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগরী অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম। যেদিন আমার ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যেদিন টীকা দেখিয়া কুমারসম্ভব পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দিন ঐ মহাশয়দ্বয় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মাতৃ-পিতৃ-স্নেহলব্ধ যেমন অপরিশোধনীয়, ঐ ছই আরাধ্যতমের স্নেহের স্বর্ণও আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।...

এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। দ্রাক্ষ মুহূর্তে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গীতা পাঠ করিতাম। আমার গীতাপাঠ শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। তখন আমি ব্যাকরণ কোমুদীর খানিকটা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহকর্ম্য করিতাম। আহারের সময় বেশী খাইলে পাছে শরীরে আলস্য হয় সেই ভয়ে সামান্য রূপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় ৩৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫৬ ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম। আহার শিদ্ধা বিষয়ে বিশেষ সংযত হইয়াছিলাম। কিন্তু বেশী দিন ইহা সহিল না—সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমার “শারীরিক বৃত্তি সকল যথোচিত অল্পলীলিত” হইয়াছিল না, তাই কিছু দিন মধ্যে আমার শরীর ভাদিয়া গেল।

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্বক কাব্যকুসুমমাঞ্জলি নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং উহার বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেন। ইহার পরে স্নেহময় কবিরত্ন মহাশয়ের আগ্রহ ও অনুরোধে আমার ‘কনকাজলি’ ‘প্রিয়-প্রসঙ্গ’ (২য় সংস্করণ), ‘বীরকুমার-বধ কাব্য’ জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল,

আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে “বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণী-দিগের অবস্থা”-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন; সেবারেও আমি কয়েক জন পুরুষ ও রমণীর সহিত প্রতियোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অধিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের “ভক্তিযোগ” পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যুষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের স্থায় ভক্তি করিতাম।... এই বঙ্গদেশে যাহারা সমাজ-শিক্ষকরূপে পরিগণিত,— যাহারা ধর্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব-লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)। আমি এই সকল লোকের নিকট ঋণী। এইরূপে নব্যভারতের অত্যন্ত সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের করিত্বশক্তি এবং গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর। কেবল সাহিত্য-শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অপ্রত্যক্ষ ধর্মতত্ত্ব-প্রণেতা আচার্যদেবকে আমি গুরুদেবের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে আত্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি।”

গ্রন্থাবলী

মানকুমারী যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিচ্ছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল, বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। প্রিয় প্রসঙ্গ। বা হারানো প্রণয় (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৩০।

পুস্তকে লেখিকার নাম ছিল না; ইহা “কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত” ও “এস্কে লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।” প্রকাশকের নিবেদনটি এইরূপ :—“নবীনা বঙ্গবালার তরুণ শোকোচ্ছ্বাস বঙ্গরাসীর সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।... গ্রন্থকারী পল্লীগোমে শিক্ষিতা, উচ্চ শিক্ষা বিবর্জিতা, বিধবার কি মধ্যমিক যাতনা তাহাই চিত্রিত করা নবীনা লেখিকার উদ্দেশ্য, পরিমার্জিত ভাষার সহায়তায় হীন বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান তাহার ইচ্ছা নহে ইহা যেন সকলে স্মরণ রাখেন।”

‘প্রিয় প্রসঙ্গ’ এই কল্পিত রচনা আছে :—“দুর্গোৎসব, ভূমি কোষায়?, চিত্রপট, যুদ্ধের যুদ্ধ, পিঞ্জরে বিহগী, মরুভূমে মরীচিকা, অরণ্যে রোদন (কবিতা), একাদশী।

পনর বৎসর পরে তারাকুমার কবিরত্ন এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে “সাতক্ষীরায়” নামে একটি কবিতা অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে।

২। বনবাসিনী (উপন্যাস)। ভাদ্র ১২৯৫ (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ২৩।

‘প্রিয়প্রসঙ্গ’-রচয়িত্রী প্রণীত এই উপন্যাসখানি বামাবোধিনীর জুবিলী উপহার হিসাবে বিতরিত হইয়াছিল। ইহা প্রথমে ১২৯৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় মুদ্রিত হয়।

৩। বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম (সম্বর্ত্ত)। (১৫ জুলাই ১৮৯০)। পৃ. ১২।

ইহা “ব্রহ্মমোহন দত্ত-পুরস্কার”প্রাপ্ত রচনা; প্রথমে ১২৯৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৪। স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরোধে শোকোচ্ছ্বাস। ৭ [ইং ১৮৯১] পৃ. ৮।

পুস্তিকাখানি বামাবোধিনী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ও বিতরিত হয়। ইহাতে মানকুমারীর তিনটি রচনা—“শোকোচ্ছ্বাস” (গদ্য), এবং “শোকাতুরা মা” ও “বিসর্জন” নামে দুইটি কবিতা আছে। এগুলি ১২৯৮ সালের গ্রাবণ ও ভাদ্র-সংখ্যা ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৫। দুইটি প্রবন্ধ। ২২৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ৩২।

যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী সভা কর্তৃক পুরস্কৃত ‘প্রিয়প্রসঙ্গ’-রচয়িত্রীর দুইটি রচনা—“বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য” (‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ আধুন ১২৯৭ দ্রষ্টব্য) ও “সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্তব্য”—এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

৬। কাব্যকুসুমাজলি। ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ. ২৭১।

এই পুস্তকে ৬৮টি কবিতা এবং বিভাসাগরের স্বত্ব উপলক্ষে “শোকোচ্ছ্বাস” নামে একটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবন্ধটির পরিবর্তে “ভালবাসি” ও “সাতক্ষীরায়” নামে দুইটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়। পরবর্তী কালে, ডিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত “অভিষেক” নামে আরও একটি কবিতা ‘কাব্যকুসুমাজলি’তে যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি আবার “সাধের মরণ” নামে কবিতাটি বর্জিত হইয়াছে।

৭। কনকাজলি (কাব্য)। ১৩০৩ সাল (২৯ অক্টোবর ১৮৯৬)। পৃ. ২৬০।

“হেমার-প্রাইজ্ এসে ফুণ্ড” হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

৮। বীরকুমার-বধ কাব্য। ১৩১০ সাল (১০ মে ১৯০৪)। পৃ. ২৩৫।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই কাব্যের বিষয়—অভিমত-বধ।

৯। শুভ সাধনা (গদ্য-পদ্য)। ইং ১৯১১। পৃ. ১৮৪।

“এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ, বছরদিন পূর্বে প্রথমে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।...“সাধক”-শীর্ষক কবিতাটি মংকৃত ‘কাব্যকুসুমাজ্জলি’ হইতে গৃহীত।”

সূচী :—রাজা ও প্রজা, সহানুভূতি, পঞ্চ যজ্ঞ, উন্নতি, দর্শন (পদ্য), চরিত্র, আত্মদানের দাম্পত্য-জীবন, পুত্র-ভিক্ষা (পদ্য), আত্ম-মহিলা শৈব্যা, স্বার্থে পরার্থ, গুণগ্রাহিতা শক্তি, অভাব, ছুইখানি ছবি, নিম্নুক, আত্মসংযম, ক্ষমা, ভক্তি, সাধক (পদ্য)।

‘শুভ সাধনা’ অনেক দিন বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

১০। বিভূতি (কাব্য)। চৈত্র ১৩৩০ (১২ এপ্রিল ১৯২৪)। পৃ. ৩১১+১ শুদ্ধিপত্র।

১১। মোনার সাথী (কাব্য)। ১ (২ মে ১৯২৭)। পৃ. ৫০।

১২। পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা)। ১ (২৫ জুলাই ১৯৩৬)। পৃ. ১৩১।

সূচী :—গৃহলক্ষ্মী, মাতৃহৃদয়, বিমাতা, শৈশব সঙ্গিনী, বন্ধু ও পত্নী, মহামুহূর্ত, ভিখারিণীর গীতি।

* * *

ছোট গল্প রচনার মানকুমারী সিব্বহস্ত ছিলেন। ১ম বর্ষের (১৩০৩ সাল) কুন্তলীন-পুরস্কার—‘গল্প ও কবিতা’ পুস্তকে প্রকাশিত তাঁহার “রাজলক্ষ্মী” গল্পটি “বিশেষ পুরস্কার ১৫ টাকা”, এবং ৩য় বর্ষের (১৩০৫ সাল) কুন্তলীন-পুরস্কার—‘গল্প ও ছড়া’ পুস্তকে প্রকাশিত “অদৃষ্ট চক্র” গল্পটি “সপ্তম পুরস্কার—৫” লাভ করিয়াছিল। ২য় ও ৪র্থ বর্ষের কুন্তলীন-পুরস্কার-পুস্তক দেখি নাই; তাহাতেও মানকুমারীর রচনা থাকিতে পারে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মান

মানকুমারীর সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত-সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে তাঁহাকে যত্নকাল পর্যন্ত মাসিক ৩০ (পরে ৩৪) রুপি দিবার ব্যবস্থা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩৪৩) চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিষ্ঠান হয়। মানকুমারী এই সম্মিলনে ‘কাব্য-সাহিত্য’ শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই সর্ব-প্রথম ‘ভুবনমোহিনী স্বর্ণ-পদক’ ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ‘জগদীশ্বরী স্বর্ণ-পদক’ দান করিয়া সম্মানিত করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই খ্রীযুক্ত অমরুপা দেবীর সভানেত্রীত্বে গুণযুক্ত স্বদেশবাসী কর্তৃক খুলনায় মানকুমারীর জন্মশত-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

মৃত্যু

মানকুমারী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৫০) মধ্যরাত্রে ৮১ বৎসর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন করেন। তিনি জামাতার গৃহে দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগের সহিত বাস করিতেন। একমাত্র কন্যা শ্রীমতীকে হারাইয়া (মৃত্যুঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) তিনি শেষজীবনে এক প্রকার জীবন্ত হইয়া ছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে তিনি “আর কেন না” নামে যে মর্মস্পর্শী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আর কেন ডাকো।

যে যুগে মা বীণাপাণি করেছিল পুজারিণী

সে যুগের বীণাতান কেন মনে রাখো।

ভালবেসেছিলে বুঝি, তাই এ সায়াকে বুজি

পুনঃ আসিয়াছে কাছে,—নীরবেই থাকো।

সে যে গো অনেক দিন নাহি তার কোন চিন্,

সে পুরানো স্মৃতি কেন আজি বুকে মাখো।

সে বসন্ত, সে বরষা, সে আনন্দ, সে ভরসা,

আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবে নাকো।

এখন কিসের দাবী? হারায়ে গিয়াছে চাবি,

ভেঙে গেছে বীণা বাঁশী—আর হবে নাকো।

আজি বৈতরণী নীরে তরণী লাগিছে তীরে

ডাকিছে পারের মাঝি,—সবে স্মৃতি থাকো।

বিদায়, বিদায়, ভাই। আর কেন ডাকো।

মানকুমারী বস্তু ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা দেশে যে-কর জন মহিলা-কবি সর্বজনবিদিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, মধুসূদন-ভ্রাতৃপুত্রী কবি মানকুমারী বস্তু তাঁহাদের অতম। তিনি দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই বৎসর পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ আমাদের কালেও বিবিধ পুস্তক ও সাময়িক-পত্রের মারফৎ তিনি সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজের সহিত যোগসূত্র রাখিতে পারিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিরোধ-বেদনায় মধুর। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বামিস্বত্ববঞ্চিত হইয়া তিনি যে ছুঃখের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অসুস্থ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে এই কারণেই তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার ‘কাব্যকুসুমাজ্জলি’ হইতে “একা” কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

একা

১

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন ছ'দিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে ছরাশা
ভুলে যুছিল না শুধু কপালের লেখা ।

২

একা আমি এ-অবনীতলে
কেহ নাই “আপনার” ব'লে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে ।
সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোট্টে তারি টেউ মরমের তলে ।

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তারা,
ভাসিলে নয়ন-নীরে
দেয় না মাথার কিরে
হাসিলে আসে না কাছে টেলে সুধাধারা ।
একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা স'ই
সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি—জগতের পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,

আমার উঠানে ভুলে

হাসে না কুসুমকুলে

ঢালে না কো কলকণ্ঠ মধুমাখা দর ;

সে, হেন একার ঘরে

কেন অধিকার করে

প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার “দোসর” কেন হবে ?
শ্মশান-সৈকত-বৃকে
একাই ঘুমাব সুখে
জগৎ সংসার মোর শত দূরে র'বে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয় নি—দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে ছ'দিন দিল দেখা ।
এখন বাসনা তাই
কোট পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্ফলকরি কপালের লেখা ।
তারি লাগি বহুক্ষরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের মূল তবু তারি লাগি শেখা ।
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ ।
ও পারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা ।
যে কদিন থাকে প্রাণ ।
এই কোরো ভগবান্ ।
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা ।



শব ও ককাল

ত্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সম্বলপুরের নিঃসম্বল ভিখারীর দল—পথই ওদের ঘর।

লৌহনগরীর দক্ষিণ প্রান্তসীমা দিয়ে যে পায়ে চলার সরু রাস্তাটা খড়কাই নদীতটভিত্তিতে চলে গিয়েছে তার এক পাশে সার বীধা কতকগুলো গাছের নীচে এসে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। নগরোপ্রান্তের এ দিকটা নির্জন। এখানে-সেখানে পুষ্পখচিত ছোট ছোট বন-রোপ আর ঘনসন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণী স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে মহাবনকে ধ্বংস করে সিংহভয়ের পার্শ্বত্যাগে অঞ্চলে বিরূপ শিল্প-নগরী গড়ে উঠেছে, এই তরুশ্রেণীর শ্রামলতা থেকে সেই অনন্তপ্রসারিত অরণ্যানীর বিলুপ্ত মহিমার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

লোকালয়ের বাইরে, নদীতীরস্থ এই নিবৃত্ত স্থানে গড়ে উঠেছে এক দল ভিখারীর সংসার—বিচিত্র সংসার। গাছ-তলার ধানিকটা জায়গা তারা সাক্ষ করে পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মাটিতে দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা হেঁড়া কাঁথা বিছানো, গাছের ডালে দড়ির সাহায্যে টাঙানো হাঁড়ি-কুড়ি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে পথের প্রান্তে চলেছে গৃহহীন-দের গৃহহালি, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার প্রাণান্তকর প্রয়াস। পাশাপাশি চলেছে জন্মমৃত্যুর বিচিত্র লীলা। এ দিকে মাটির বুকে জন্ম নিচ্ছে হতভাগ্য শিশু চিরন্তন অভিশাপ ললাটে নিয়ে, আর তার পাশেই কোনো বুদ্ধিহীন দুর্ভাগ্যর অভিশপ্ত জীবনের হচ্ছে অকাল অবসান। জীবন এদের নিকট ভাগ্যের নির্ভর নির্ময় বেলা, মৃত্যুর সঙ্গে এদের মিতালি। দুর্ভাগ্য এদের সবাইকে একত্র টেনে এনে পথে দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু স্বাভাব্যবোধকে লুপ্ত করতে পারে নি। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি-জ্ঞান হয়ে উঠেছে টনটনে। এরই মধ্যে গণ্ডী-রেখা টেনে দিয়ে এক একট পরিবার নিজ নিজ এলাকা টিক করে নিয়েছে। কেউ বিনা অহুমতিতে অপরের এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করলে একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। ভূমিহীনদের জমির অধিকার নিয়ে কলহ-বিবাদে আর অন্ত নেই।

এই বিচিত্র জগতে স্বামী-স্ত্রী আর বছর চারেকের ছোট একটি শিশু—এই তিন জনের এক পরিবার। পথবাসী হলেও মনে হয়, প্রায় পশুর স্তরে উপনীত এই ভিখারীর দল থেকে এরা যেন একটু স্বতন্ত্র। ওদের থেকে ঈষৎ ব্যবধানে একটা গাছতলায় হাঁড়িকুড়ি নিয়ে নিজেদের সংসার ফেঁদেছে। হয়তো সদ্য ভাগ্যবিপর্যয়ে ওরা অনন্তোপায় হয়ে যাবার ভিখারী-দলের সঙ্গে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তা হলেও কিন্তু, ওরা নিজেদের স্বাভাব্য রক্ষা করে চলেছে, ওদের দলে সম্পূর্ণভাবে মিশে নির্জঙ্ঘ বর্বরতার শেষ সীমায় নেমে যেতে পারে নি। তাই মানুষের মনে

রেহ-প্রেম আনন্দ-বেদনার যে বিচিত্র অহুত্বিত খেলে যায়, মাঝে মাঝে যেন তার ছাপ ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে।

পুরুষটি সারাদিন ভিক্ষা করে আহার্য যোগায়, মেয়েটি ঘর-সংসারের (৭) কাজকর্ম করে—ছেলেকে আগলায়। একমাত্র সম্ভানকে কেন্দ্র করে এই ভাগ্যহত তরুতলাশ্রয়ী দম্পতি ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে, তাদের বঞ্চিত জীবনের সকল নিষ্ফল কামনা এই শিশুটিকে আশ্রয় করে সফলতার পথ খুঁজে মরে। দূরে লৌহনগরীর কারখানার অজ্ঞেয় চিমনিগুলোর পানে তাকিয়ে পুরুষটি আকাশ-কুহুমের স্বপ্ন দেখে। মনে হয়, কুবেরের ভাণ্ডার যেন যন্ত্রপূরী প্রকার-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। কিন্তু তার বয়স নেই, স্বাস্থ্য নেই, সামর্থ্য নেই। তাই লৌহনগরীর রত্নপূরীর সিংহদ্বার তার নিকট অর্গলবদ্ধই থেকে যাবে। কিন্তু তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে তুলবে তার ছেলে। তাকে সে নিজের দেহের রক্ত তিল তিল করে জল করে মাছুর করে তুলবে। ছেলে বড় হলে কোনো বড়লোকের খোশামোদ করে যদি সে তাকে কারখানায় চুকিয়ে দিতে পারে তা হলে আর ভাবনা কি?

বৌকে সম্বোধন করে সে বলে—“বুঝলি বাঁশমতী, ডান্ডর হলে কলিয়াক কারখানায় ঢুকাই দেখি। তেখেন কলিয়া কেতে টকা রুজি করিব।”

বৌটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আপন শীর্ণ বক্ষে কলিয়াকে চেপে ধরে মনের আনন্দে গান ধরে—

“খণ্ড খণ্ড দহিবড়া মণ্ড মণ্ড দিলা

আর রাজবাড়ী থানা মেরা রাজবাড়ী থানা”

ভবিষ্যতে ছেলের দৌলতে রাজবাড়ীর আহার্য খণ্ড খণ্ড দহিবড়ার আশায় উপবাসক্লিষ্ট কলিয়ার মায়ের শুদ্ধ রসনা লালায়িত হয়ে উঠে। কলিয়াকে বুকে করে যুছ দোলা দিতে দিতে গুন্ গুন্ সুরে বার বার সেই একই গানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

ওদিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রদানবের ক্ষুধা হয়ে উঠল ক্রমবর্দ্ধমান, সুর হ'ল খড়কাই নদীর উপর পোল নির্মাণ আর ওপারের শাল-বন ধ্বংসের অয়োজন। প্রকৃতির শ্রাম-সমারোহকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল নৃতন কারখানা নির্মাণের তোড়জোড়।

যে সফীর্ণ রাস্তাটির পাশে ভিখারীর দল এসে সংসার পেতেছিল মোটির লরী চলাচলের জঙ্গে সেটিকে প্রশস্ততর করতে হবে, কাজেই দু'ধারের বনরোপ আর স্বক্ষশ্রেণীর ওপর

পড়তে লাগল হাতিয়ারের কোপ। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ পার্শ্বত্যা প্রান্তরের বুকে যে শ্রাম তরুণী স্নিগ্ধস্বারা তলে ছুঃখতাপ্রাপ্তি ভিখারীদের আশ্রয় দিয়েছিল, দেখতে দেখতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে এল। সেখানে পিচালা রাজপথ নির্মাণে ব্যাপৃত হ'ল মজুরদল। নিভৃত আরণ্যভূমিতে যন্ত্ররাজের বিজয়-অভিযান পরিচালনার পথ প্রশস্ত হ'ল বটে, কিন্তু ওদিকে ভিখারীদের জগৎ হয়ে এল অপরিমর। সূর্য হ'ল তাদের নীড়ভাঙার পালা। পৌটিলাপুটলি, ছেঁড়া জাতা-কাঁথা আর হাঁড়িকুড়ি গুটিয়ে নিয়ে তারা রওনা হ'ল নূতন আশ্রয়-স্থলের সন্ধানে। ঘরে যাদের ঠাই হ'ল না, সারাজীবন পথেই তাদের বাঁধতে হবে ঘর। আবার নূতন জায়গায় তরুতল আশ্রয় করে গড়ে উঠবে এদের সংসার। এই তাদের জীবন। কোথাও স্থির হয়ে বেণী দিন বাস করবার জো নেই, অবিরাম তাদের এগিয়ে চলতে হয়, ধ্বংসের পথে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। কারও পুনে ফিরে তাকাবার অবসর তাদের নেই। দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে পথের পাশে একান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে ওদের বুকে এতটুকুও ব্যথা বাজে না, মনে জাগে না লেশমাত্র অমুখপ্পা—বিধাতার মতই ওরা বিকারহীন।

চলে গেল সবাই, যেতে পারলে না শুধু জী-পুত্রকে নিয়ে কলিমার বাবা। কয়দিন ধরে কলিমার মা মারাত্মক ব্যামোতে ভুগছে। গাছতলায় পড়ে সে দু'কছে, অস্থিচর্খসার দেহের মধ্যে তার ক্ষীণ প্রাণটুকু থুপথুপ করছে। এ অবস্থায় তাকে নিয়ে এক পা এগোনোও তো সম্ভব নয়। কাজেই ছেলে-বোকে নিয়ে সঙ্গীসাবী-পরিত্যক্ত কলিমার বাবাকে পথের প্রান্তেই পড়ে থাকতে হ'ল। সবাই চলে গেলে নিতান্ত অবোধ শিশুটিকে কোলে নিয়ে তরুতলে মৃত্যুপথযাত্রিনী জীর পাশে বসে কলিমার বাবা আজ প্রথম উপলব্ধি করলে, এত বড় বিশ্ব-সংসারে সে কত অসহায়, কিরূপ নিঃসঙ্গ। যারা তাকে ফেলে চলে গেল তাদের কারুরই মনে তার প্রতি মেহজীতি বা সমবেদনার লেশমাত্র ছিল না। সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র তাদের সাহচর্যের মূল্যই যে ছিল যথেষ্ট। তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে মাহুয যে মাহুষের কত প্রিয় তাই সে আজ সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলে, একান্ত অসহায়ভাবে একবার উর্ধ্বপানে তাকালে,—সেখান থেকে কানো সাঙ্গনার বাণী তার কাছে পৌঁছলো কিনা কে জানে ?

খড়কাই নদীতীরের নবনির্মিত তক্ততকে ঝকঝকে পিচালা প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে সূর্য হ'ল দিনরাত অনবরত মজুরবোঝাই মোটর লরীর আনাগোনা। দিন-কতকের মধ্যেই নদীর ওপারের শালবন নির্মূল হয়ে যন্ত্রপূরীর ভিত্তি পত্তন হ'ল।

মোটর লরীতে করে প্রতিদিন মজুর আর কর্মীদের জুড়ে অপরিাপ্ত ষাণ্ডদব্য নিয়ে যাওয়া হয়, ওপারের নির্মায়মান কারখানায়। এই প্রাচুর্যের দিকে কলিমার বাবা প্রমুদ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সংসারে এত আছে অথচ তাদের অদৃষ্টে তার এক কণাও জোটে না। ওপারের বনজঙ্গল কেটে মাহুয তাদের বসবাসের জগতের পরিধিকে বাড়িয়ে নিচ্ছে। শুধু তাদেরই তিনটি প্রাণীর সঙ্গী পৃথিবী হয়ে এল সঙ্গীর্ঘতর।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। নিবিড় অন্ধকারের কৃষ্ণাঙ্কল-তলে চরাচর গভীর স্তম্ভিতে মগ্ন—মাঝে মাঝে লৌহনগরীর কারখানার ডুলে প্রাক্টের স্তম্ভের আলোয় দূরদূরান্তের মাঠ-বন-গরি-নদী সব কিছু আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই অগ্নি-শিখার চকিতের মত কারখানার সারিবাঁধা অভভেদী চিমনি-গুলো দৃঢ়মান হয়—মনে হয়, অতিকায় যন্ত্রদানবসমূহ যেন আকাশস্পর্শী লকলকে অগ্নিজিহবা মেলে চরাচরকে গ্রাস করতে উজ্জত। পরক্ষণেই দিগ্দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায় গভীরতর অন্ধকারে। মাঝে মাঝে উজ্জুরে হাওয়া যেন কার দীর্ঘশ্বাসের মত জনহীন পার্শ্বত্যা প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে ছ হ করে বয়ে যায়।

এই শীতজর্জর অন্ধ তামসীরাত্রি জনমানবহীন খড়কাই নদীতীরে পথ-প্রান্তে ভূমিশযায় নিদ্রামগ্ন তিনটি প্রাণী—কলিমা, তার বাবা আর মা। সবাই গভীর নিদ্রায় অচেতন।

নিত্যকার মত কলিমা শুয়েছে তার মায়ের বুকে। কিন্তু মা তার আজ জ্বরের ঘোরে বেহুঁস, অচেতন। তার শীর্ণ-বক্ষ্যুত হয়ে কখন যে কলিমা গড়াতে গড়াতে রাজপথের ওপর গিয়ে রাজশয্যা গ্রহণ করেছে তা সে টেরও পায় নি।

শেষরাত্রি মোটর লরীর বর্ষরক্ষণিতে রাত্রির আকাশ মুখরিত হয়ে উঠে। মজুরদলকে নিয়ে একাঙ লরী চলেছে নদীর ওপারের নূতন কারখানার দিকে। ছুরীর তার গতি। রাজপথের উপরে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রাতুর কলিমাকে নম্পিষ্ট করে যন্ত্ররাজের বাহন এগিয়ে চলে যন্ত্রপূরীর দিকে। যন্ত্র-রাজের বিপুল শক্তির এ নিছক অপচয়। এই ক্ষীণপ্রাণ শিশুর ইহলীলা সাজ করবার জুড়ে, এত বড় আয়োজনের, এত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের কোনোই দরকার ছিল না। বিধাতার সৃষ্টিতে এত বড় এক নির্মম শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল, কিন্তু চরাচরে তার সাক্ষী কেউ রইল না। কলিমার অন্তিম মুহূর্তের মর্মান্তিক যন্ত্রপাক্ষিষ্ট মুখচ্ছবি রাত্রির অন্ধকার-পটেই চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। মোটরের প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে তার শেষ মুহূর্তের আর্ত ক্রন্দন অনন্ত আকাশে নির্বিকার বিধাতার দরবারে গিয়ে পৌঁছলো না।

পৃথিবীতে চরম নিষ্ঠুর ব্যাপার অমুষ্টিত হ'ল রাত্রির অন্ধ-কারে, সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

পরদিন খড়কাই নদীতীরে প্রভাত এল—অসহায় নিরপরাধ শিশুর রক্তে রঞ্জিত প্রভাত। দূরে পূর্বদিকে কারখানার

পেছনের ধুমলিন আকাশে অরুণরাগের মতই পিচঢালা কালো রাজপথের উপর লেগে রয়েছে টাটকা রক্তের দাগ, আর তারই পাশে থেঁতলানো একদলা মাংসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে কঙ্কালসার নগ্নপ্রায় এক নারীমূর্তি। মুখ তার ভাবলেশহীন, তাতে দুঃখ বেদনা শোকাবেগ কিছুই যেন অভিব্যক্তি নেই। তার কোটরগত চোখ দুটোর নিষ্পলক দৃষ্টি

রক্তরঞ্জিত রাজপথের উপর নিবদ্ধ—নিষ্পদ দেহ থেকে প্রাণচেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায়।

বিকৃত শবকে আগলে বসে আছে জীবন্ত কঙ্কাল—সৃষ্টির চরমতম বীভৎস-করণ দৃশ্য।

দূরে শোনা যায় মোটর লরীর ধ্বংস ধ্বনি। শব ও কঙ্কালের উপর দিয়েই চলবে কি যন্ত্রদানবের জয়-রথ ?

কারাবন্ধন

শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্যশাসনের বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে। কিন্তু শাসনপন্থা যে ধরনেরই হউক, সব শাসন-তন্ত্রের আইন-কানূনের মধ্যেই অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপের একটা ব্যবস্থা আছে। কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া উচিত আর সে কারাদণ্ড কি রকম হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ সশ্রম না বিনাশ্রম, ছ'মাস, এক বছর না যাবজ্জীবনের জেদ, প্রত্যেক দেশের অপরাধ-আইন পুস্তকের বিবিধ ধারায় সে সব কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথাটি অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। জনসাধারণের সকলেই এটা এমন ভাবে মেনে নিয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কারুর মনে কোন রকম প্রশ্নই বড় একটা জাগে না, যদিও বা কখনও এ সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনা হয় ত সে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে ছোট ছোট গভীর ভেতর। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে কারাবাসের সময়ের সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোন্ কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড অসমীচীন, কিংবা আরও কোন্ কোন্ অপরাধে কারাদণ্ড হওয়া বিধেয়, এই জাতীয় আলোচনা মাঝে মাঝে হতে দেখা গেছে। কিন্তু কারাদণ্ড আদৌ হওয়া উচিত কিনা, কিংবা যে উদ্দেশ্যে এই শাস্তি দেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্য কারাবাসের ফলে কতখানি সাধিত হয়, কারাগারের আন্তঃস্বর্গীয় ব্যবস্থা কি রকম হওয়া প্রয়োজন এই সমস্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার আলোচনা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই হয় নি। একথা জোর করেই বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান নব আবিষ্কৃত তথ্যগুলির বহুল প্রচারের ফলেই শাসনকর্তাদের, সমাজনেতাদের, বিচারকদের এবং আইন-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এদিকে সম্প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এই সব সম্বন্ধে অল্পসন্ধান, আলোচনা এবং প্রয়োজনমত প্রতিকারের চেষ্টার সূচনা দেখা যাচ্ছে। জানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি, আইন-কানুন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে সমাজে অমঙ্গল প্রবেশ করে, রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, গৃহ অশান্তিতে ভরে ওঠে।

আমাদের দেশে কারাদণ্ডের প্রথা বহুকালের প্রথা। অনেকের ধারণা আছে প্রাচীন ভারতবর্ষে কারাগার ছিল

না। সে ধারণা ঠিক নয়। মহাভারতে দেখা যায়, জরাসন্ধ অনেক রাজা-মহারাজাকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দিয়েছিলেন। কংস রাজা দৈববাণীকে বিফল করবার অভিপ্রায়ে দৈবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে শুধু আটক রাখাটাই বোধ হয় তখন কারাগারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্য দেশে পুরাকালে কারাগারের যে ব্যবস্থা ছিল না তা নয়, তবে কারাদণ্ডের প্রচলন খুব কমই ছিল বলা যায়। ইংলণ্ডে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই কারাদণ্ডের বিশেষ প্রচলন আরম্ভ হয়। জরিমানা আদায়ের একটা বিশেষ উপায় হিসাবেই কিন্তু প্রথম প্রথম এই দণ্ড দেওয়া হ'ত। সেই সময়ের অল্পাংশ দেশের আইন এবং শাস্তির ব্যবস্থা অল্পসন্ধান করলে এই ধারণাই হয় যে, যদিও খুব প্রাচীন কালে অসভ্য জাতিদের ভিতরেও কারাদণ্ডের ধারণা একটা ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অপরাধের শাস্তি হিসাবে এর বহুল প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই আরম্ভ হয়। সেকালের ধর্ম-সম্প্রদায়ের কর্তারাও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতেন। যত্নাদণ্ড দেবার অধিকার তাঁদের ছিল না বলেই তাঁরা এই দণ্ডের যথেষ্ট ব্যবহার করতেন। কাউকে একেবারে নির্জ্ঞান ধরে একলা আবদ্ধ করে রাখা হ'ত, বাক্যে বলে 'সলিটারী কনফাইনমেন্ট'—আবার কাউকে কাউকে অল্প কয়েকদীর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হ'ত। ক্রমশঃ কয়েকদীর কাছে লাগানোর কথা মনে হয় এবং যে সব অপরাধী কার্যক্রম তাঁদের আটক না রেখে জোর করে কোন কাজে লাগানো হ'ত। জীলোক, রোগী, বৃদ্ধ বা যারা অল্প কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম তাদেরই শুধু আবদ্ধ রাখা হ'ত। এই সময় থেকেই একটা নতুন ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। লণ্ডনের একজন বিশপ, রিড্লে তাঁর নাম, তিনি একটা আন্দোলন আরম্ভ করেন যে, শহরের অশিক্ষিত বলিষ্ঠ ছেলেরা—যারা কোন কিছু করে না বরং মার-ধোর, গুণ্ডামি, ছোটখাট চুরি—ছিঁচকে চুরি আর কি, যৌন ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্ম করেই বেড়ায় তাদের দিনকতক আটক রেখে শোধরাবার ব্যবস্থা করা

উচিত। এই আন্দোলনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পার্লামেন্টে এই মর্মে এক আইন পাস হয় যে, প্রত্যেক 'কাউন্টি'তে একটা করে 'সংশোধনাগার' (House of Correction) স্থাপন করা হবে এবং খুঁজে পেতে ঐ ধরনের বদমাইস, ভবঘুরে, কুঁড়ে—এবং দুশ্চরিত্রদের ধরে এনে সেই-খানে আবদ্ধ করে রাখা হবে। সংশোধনাগার অনেক কাউন্টিতেই স্থাপিত হ'ল এবং কাজও বেশ চলতে লাগল। ক্রমশঃ অল্প ধরনের অপরাধীদেরও সংশোধনাগারে আটকে রাখা হতে লাগল। সাধারণ জেল আর সংশোধনাগারের ভিতর তফাৎ আর বেশী রইল না। দু'জায়গাতেই চাবুক এবং লোহার শৃঙ্খলের ব্যবস্থা ছিল। এই সংশোধনাগারের ভিত্তিতে যে চিন্তা এবং উদ্দেশ্য ছিল, ইউরোপের অষ্ট্রাশ দেশের মনীরী এবং হুদয়বান লোকেরা তার গভীরতা এবং কার্যকারিতা সহজেই উপলব্ধি করলেন। কাজেই সমস্ত ইউরোপেই তখন সংশোধনাগার নির্মিত হতে লাগল। দ্বার্ষিকীতে এই সংশোধনাগারগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়ে উঠল। তবে ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত সংশোধনাগার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামের অন্তর্গত ব্রেক্সেল শহরে স্থাপিত হয়।

সংশোধনাগারের পর এল জেল-সংশোধনের চেষ্টা। এই সম্বন্ধে প্রথমেই নাম করতে হয় জন হাওয়ার্ডের। নিজে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রায় সমস্ত জেলই পরিদর্শন করে তিনি ১৭৭৭ সালে *State Prisons in England* বলে যে বইখানি লিখেছিলেন তাতে তুলুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখনকার জেল সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, অল্পবয়স্ক পঞ্চদশদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়াই ম্যাজিস্ট্রেটদের যদি অভিপ্রায় হয় তা হলে এই সব জেলে আটক রাখার চেয়ে কার্যকরী উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করতে পারবেন না। কারণ এমন কোন পাপাচার নেই যা এই সব জেলে হয় না।—তাঁর এই কঠোর মন্তব্যের পর জেল-সংশোধনের একটা সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিকে কতকগুলি কারা-সংস্কার সমিতি (Prison Reform Societies) স্থাপিত হতে লাগল। স্বীকার করতেই হবে, এই সব সমিতির চেষ্টায় জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার অনেক পরিবর্তন, অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এমন কি কিছুদিন পরে একজন ত ছুঃখ করেই লিখলেন—হায় রে! জেল আর সে জেল নেই, লোকে এখন জেলের ভয় আর করে না বরং অনেকে বাইরের কষ্টকর স্বাধীন জীবনের চেয়ে জেলের আরামের পরাধীন জীবনই বেশী পছন্দ করে। একথা তিনি বলেছিলেন এক শ' বছরেরও আগে ১৮২১ সালে। আজ ১৯৪৬ সাল। জেল বা কারাদণ্ড সম্বন্ধে আজকে আর কি কিছু বলবার নেই—সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে—সব উন্নতিই কি করা শেষ হয়ে গেছে। তা মনে করা একেবারেই সমীচীন নয়। সমাজ গতিশীল। এক শ' বছরে সমাজের আচার-

ব্যবহার এবং সামাজিক আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখনকার দিনে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল, এখনও আছে কিনা সেটা ভাববার কথা। আর এখন যা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য কতখানি সফল হচ্ছে, তারও বিচার করা দরকার। ঠিক আগেকার মত জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, তা সে ব্যবস্থা যত ভালই হউক, এখনকার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার। যদি না পারে তা হলে আবার সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। এখন এই সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রধান উদ্দেশ্য আইনভঙ্গ যে করেছে, অপরাধ যে করেছে তাকে আটক রাখা। আটক রেখে কি লাভ হয়? আটক রাখার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে মোটা-মুটি তিনটি। প্রথম, তাকে আটকে রাখলে সে সমাজের অনিষ্টকর কাজ করতে অক্ষম হবে। তাতে সমাজের উপকার হবে। দ্বিতীয়, তার শাস্তি দেখে অল্প লোকে ঐ রকম অনিষ্টকর কাজ থেকে ভয় পেয়ে বিরত হবে এবং তৃতীয়—এই শাস্তি ভোগ করার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন, এবং ছাড়া পাবার পর অপরাধ করবার প্রবৃত্তি তার আর থাকবে না।

প্রথম যুক্তিট সহজেই মনে নেওয়া যায়। বাস্তবিকই যে সমাজের বাইরে একটা ছোট গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল সে আর সমাজের অনিষ্টকর কাজ কি করে করতে পারবে। কিন্তু এখানেও একটু ভাববার কথা আছে। এ রকম ঘটনা বেশী হয় ত ঘটে না কিন্তু তবুও কয়েদী জেলের গার্ডকে কিম্বা অল্প কয়েদীকে মার-ধোর করলে, এমন কি খুন পর্যন্ত করলে—এ ধরনের ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়। তা ছাড়া পরস্পরের বিকৃত ঘোঁরাচার অনেক সময়ই লক্ষিত হয়েছে। জেলের গার্ড যদি একটু সহায় হয় তা হলে আরও অনেক রকমের অপরাধ জেলের ভিতর বসে বসেও করা যায়। জেল থেকে পালানো যায়ই। একবার আমেরিকায় অনেক মেকি মুদ্রা বাজারে চলতে থাকে। পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ঐ মেকি মুদ্রা সেখানকার এক জেলের ভেতর কয়েকজন কয়েদী মিলে তৈরি করে এবং জেলের গার্ডের সাহায্যে বাইরে চালায়। সমাজ জেলের গার্ডের উপর অনেকখানি দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। গার্ড যদি সে দায়িত্ব বহন করবার উপযোগী না হয়, তা হলে অপরাধীকে আটক রাখা সত্ত্বেও সমাজ তার অপকারের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না পেতেও পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটির সার্থকতা প্রথমটির চেয়ে ঢের কম একথা বলতেই হবে। একজন একটা কাজ করে জেলে গেল দেখে আর একজন সেই কাজ থেকে বিরত হবে তা ধরে নেওয়া যায় না। চুরির অপরাধে জেলে ত অনেকেই যাচ্ছে—তাতে চুরি বন্ধ হচ্ছে কি? কোন ফলই যে হয় না একথা অবশ্য

বলছি না। কিন্তু যারা বিরত হয় তারা ঠিক আটক থাকবার ভয়েই বিরত হয় কিনা তা বলা যায় না। বিচার হবে, পাঁচ জনের সামনে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে—কারাবাসের হুকুম হয়েছে বলে সবাই জানবে—এই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা ভাব হয়, শুধু আটক থাকবার সম্ভাবনাটাই বিরতির কারণ নাও হতে পারে।

তৃতীয় যুক্তিটি সবচেয়ে দুর্বল। আটক থাকার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন হবে এবং বাইরে এসে সে আর অপরাধ করবে না—এটা একটা কল্পনামাত্র। বাস্তব ভিত্তি এর নেই। একটি রিফরমটরী থেকে ৫১০ জন পর পর ছাড়া পায়। পাঁচ বছর বাদে দেখা গেল তাদের ৩১৬ জন আবার নানা রকম অপরাধে ধরা পড়েছে। শিকাগোতে ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি যে ৩০০ বালককে একটা বিশেষ স্কুলে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, ১৯৩৩ সালে দেখা গেল তাদের মধ্যে ১৮৭ জন জেল খাটছে, দুই জনের মূনের অপরাধে ফাঁসি হয়ে গেছে, সাতচল্লিশ জন নিরুদ্দেশ ইত্যাদি; কেবলমাত্র আঠার জন সংপর্মে থেকে সহজ জীবন যাপন করছে। অপরাধ করার এবং অপরাধ থেকে বিরত হবার প্রবৃত্তি অনেকটা মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু শুধু আটক থাকায় অপরাধ করার প্রবৃত্তি কতটুকু কমে বা আরো কমে কিনা, তা নির্ণয় অসম্ভবমানসাপেক্ষ।

অনেক কয়েদী কারাগার সমুদ্রে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ করে গেছে। একজন বলছে—উন্নতির সত্যিকারের আঙুরিক চেষ্টাকে কারাগার পদে পদে বাধা দেয় এবং উন্নতির সব পথই একেবারে বন্ধ করে দেয়। আর একজন বলছে, এগার বছর বয়সে আমাকে ছুঁ ছেলেদের একটা স্কুলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে একজন বেশ ভাল পকেটমার হয়ে আমি ফিরি। সতের বছর বয়সে আমার রিফরমটরীতে পাঠানো হ'ল, সেখান থেকে একজন পাকা সিঁদেল চোর হয়ে বেরলাম। তার পর জেলে গেলাম, সেখান থেকে চূড়ান্ত রকমের অপরাধী হয়ে বেরিয়ে এসেছি। সাধারণতঃ অপরাধীরা যে সব অপরাধ করে থাকে সে সবই আমি করেছি এবং অপরাধী হয়েই মরব এই আশাই করি।

এই ধরনের অনেক বিবৃতি সংগৃহীত আছে। মনে হতে পারে এগুলি একতরফা। আটক থাকার ফলে ভাল হয়েছে এর রকম মতও হয় তা আছে। একেবারে নেই তা নয়। প্রথমতঃ তার সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন হয় কিনা মতের চেয়ে কাজের ভিতর দিয়েই তা বেশী প্রকাশ পায়। একবার যারা জেলে গেছে তারা কি রকম হয়েছে তা অনুসন্ধান করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধারাপ ফলই দেখা গেছে। জেল-কর্তৃপক্ষের অনেকের মতই কয়েদীদের প্রতিকূল মতেরই অগ্রদূত। একজন বলেছেন, "Imprisonment as it exists to-day, is worst crime than any of these

committed by its victims." আর একজন লিখেছেন, "if absolutely innocent individuals were put under prison conditions they would tend to develop anti-social conceptions of conduct."

এই আলোচিত মতামত থেকে এইটাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কারাগারে মনের এবং চরিত্রের পরিবর্তন বিশেষ হয় না, সংশোধন কোন রকম ত হয়ই না বরং ধারাপ হয়। কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে, জেল থেকে অপরাধী ভাল হয়েই ফিরবে। ভাল হবে বলেই ত তাকে জেলে পাঠানো, ফিরে এসে যদি সে আবার অনিষ্টকর কাজই করতে থাকে তা হলে সমাজ-সংরক্ষণ কি করে হবে? এ পর্যন্ত মানসিক পরিবর্তনের কোন সুবিধা কারাগার যদি না করে দিয়ে থাকতে পারে তা হলে কারাগার-ব্যবস্থার কোথায় ফ্রট-গলদ আছে তা অনুসন্ধান করা আবশ্যিক এবং তার সংস্কার প্রয়োজন, এবং সংশোধন দরকার।

এই সমস্যা এইখন কারা-সংস্কারকদের গবেষণার বিষয়। দেখা যাক, তাঁরা কি ভাবে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথমেই অনুধাবন করবার কথা হচ্ছে এই যে, কারাগার-ব্যবস্থাটা এমনই একটা ব্যবস্থা যে তার সঙ্গে উন্নতির পথের কতকগুলি প্রতিবন্ধক স্বতঃই জড়িয়ে থাকে। কতকগুলি বাহ্যিক—যেমন ছোট অস্বাস্থ্যকর ঘর, দুর্গন্ধ, পোকামাকড় অলসতা প্রভৃতি। এগুলির পরিবর্তন সহজেই করা যায়। কিন্তু কতকগুলির ভিত্তি আরও গভীর, সহজে বদলানো যায় না।

অনেক সময় উপযুক্ত লোকের অভাবে জেলের কাজ সুচারুরূপে চালাবার ব্যবস্থা হয় না। আমরা আশা করছি যে জেল থেকে অপরাধী সংশোধিত হয়ে ফিরবে, কিন্তু সেই সংশোধনের তার কার ওপর দিচ্ছি সেটা বিবেচনা করা উচিত নয় কি? কারা-কর্তৃপক্ষের অপরাধীদের মনের কার্যাবলী, তাদের মানসিক গতির ধারা প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তাদের মনের পরিবর্তন কি তাঁরা করতে সমর্থ হবেন? এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক যাতে নিযুক্ত হয় সকলের তা দেখা উচিত। তারপর শুধু জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী হলেই হবে না। অর্থ, জিনিষপত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কাজে যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হলে উন্নতির আশা অসুদূরপরাহত।

জেলে কয়েদীদের নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মাত্ম-বর্তিতা একটা মন্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং এই নিয়ম গাড এবং কয়েদীদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি প্রায়ই হয়। কোন কয়েদী হয় তা গাডকে দেখে উঠে দাঁড়াল না বা সেলাম করলে না, গাড মনে করলেন তাঁর মানের হানি হ'ল, তিনি সাজা দিতে উত্তর হলেন, লাভের মধ্যে

মনকষাকষি বেড়েই চলল। এই বাইরের জিনিষ ছাড়াও মনোবিজ্ঞান দিক থেকে কয়েদীদের নিয়মাহু-বর্তিতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার বিষয় আছে।

কয়েদীদের নিয়মাহু-বর্তিতা মানে তাদের দৈনিক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা। কখন উঠবে, কখন বসবে, কখন খাবে, কি খাবে, কি করবে, কি করবে না সমস্তই ওপরওয়ালার হুকুম এবং নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা গেছে, এর ফল সাধারণতঃ দু-রকমের হয়। কেউ কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করে না। খুব সহজেই তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলাই তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে। গাভ্রের কাজের তাতে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু এই ধরনের অনেক কয়েদীই তাদের সমস্ত মানসিক শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে, কোন রকম কর্মপ্রেরণা বা উত্তম তাদের আর থাকে না। তারা কেবল দিবানিশ্র দেখে, কল্লনার রাজ্যে বিচরণ করে। এই বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে কল্লনার রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া এবং এই বাস্তবতার থেকে দূরে সরে থাকার অভ্যাস মনের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায়।

আর একদল কয়েদী কিছুতেই এই নিয়ম-কাহনের মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে পারে না, তারা সারাক্ষণই নিয়ম ভঙ্গ করছে এবং ফলে অনবরত শাস্তি ভোগ করছে। এতে তাদের মনে অপরিণীম একটি বিদ্বেষ ভাব সঞ্চারিত হয়। এতে থাকে এবং সকলের ওপর একটি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্বেগ হয়।

সুতরাং নিয়ম মাহুক আর নাই মাহুক মনের দিকে দৃষ্টিরই পরিণাম একই। সে পরিণাম হচ্ছে মানসিক বিকার-এক হওয়া বা এক রকম পাগল হয়ে যাওয়া। মৌলিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারাবাস কালের ওপর এই বিকার অনেকখানি নির্ভর করে। জেলে আসবার সময় যাদের মন স্বাভাবিকই ছিল এক মাস কারাবাসের পর তাদের মধ্যে যত জনের মানসিক বিকার হয়েছিল এক বছরের পর তার চল্লিশ ওপ লোক পাগল হয়েছিল।

এখন এ প্রশ্ন সম্মুখীন হয়: ওঠে, তা হলে কি নিয়মাহু-বর্তিতার এই কঠোরতা মন্দীভূত করা বা নিয়মাহু-বর্তিতা একেবারে তুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইয়া কি না বলে এর জবাব দেওয়া চলে না। হঠাৎ কোন একটি সিদ্ধান্তের বশীভূত হয়ে কিছু করে ফেলাও সমীচীন নয়। প্রথমে ভেবে দেখা উচিত নিয়মাহু-বর্তিতার খারাপ ফল কি কারণে হয়, তার পর ধীরে ধীরে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

নিয়মাহু-বর্তিতার খারাপ ফলের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কয়েদীকে স্বাধীন চিন্তা করবার কোন রকম অবকাশ দেওয়া হয় না। জোর করে তাকে নিয়ম মানানো হয়। এর পেছনে এই তথ্য রয়েছে যে, নিয়ম মানা একবার তার

অভ্যাস হয়ে গেলে জেলের বাইরে এসেও সে সামাজিক সব নিয়ম মেনে চলবে; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল, এর কোন ভিত্তিই নেই। নিয়মাহু-বর্তিতার অভ্যাস করতে হলে যে স্বাধীন চিন্তা বর্জন করতেই হবে তার কোন প্রমাণই নেই। ধারা স্বাধীন চিন্তা করেন তারা যে নিয়মাহু-বর্তী হতে পারেন না তা ত বলা যায় না। সুতরাং স্বাধীন চিন্তা করবার সুযোগ দিলে কয়েদীরা নিয়মাহু-বর্তী হবে না এটা ধরে নেওয়া আজকাল আর চলে না। জেল-কর্মচারীদের কয়েদীদের প্রতি মনোভাব এবং ব্যবহারের ওপর কয়েদীদের মানসিক পরিবর্তন ও উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। তারা যদি শুধু কর্তৃত্ব করবে এই ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তারা যদি একটু দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন তা হলে কয়েদীদের সংশোধনের কাজ অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। একটা শক্ত প্রশ্ন কিন্তু এখানে থেকে যায়। কারাকর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হচ্ছে কয়েদীদের আটকে রাখা এবং অনেক কয়েদীর প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে জেল থেকে পালানো। সুতরাং এই দুই দলের মধ্যে মূলগত একটা বিদ্বেষের ভাব থাকেই; কিন্তু এটা ভবিষ্যতে লাঘব করা যেতে পারবে বলে বিশ্বাস।

সংশোধনের একটি মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর যে একগোষ্ঠী-বোধ (group feeling বা Esprit de corps) সৃষ্টি হয় তাই। কয়েদীদের ভাব চিন্তা প্রভৃতি অল্প কয়েদীদের মতামতের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। যে খুব বড় রকমের অসামাজিক কাজের ফলে জেলে এসেছে অল্প কয়েদীরা তাকে সম্মানের চোখে দেখে। বাইরে যেমন ভাল কাজ করলে লোকের প্রশংসা-ভক্তি আকর্ষণ করা যায়, জেলের ভিতর তেমনই যে যত বেশী খারাপ কাজ করে সে ততই অল্প কয়েদীদের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং যে ভাল কাজ করে সে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধের উপর ভিত্তি করেই কয়েদীদের পরস্পরের ভিতর মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে যে মনোভাব গড়ে ওঠে সেটা অতিক্রম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

এই সবের প্রতিকারকল্পে এখন একটি উপায়ের পরীক্ষা চলছে বলা যায়। সেটা হচ্ছে কয়েদীদের স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করা। অস্বোর্ণ এই ব্যবস্থা চালাবার একজন প্রধান উদ্ভোক্তা। আমেরিকার বিখ্যাত সিং-সিং জেলে তিনি এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কয়েদীরা নিজেদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করবে, কে কখন কি রকম ভাবে কোন কাজ করবে। তারা শুধু এক একটা নথর, যন্ত্রবিশেষ, তাদের কোন দায়িত্ব নেই এ ভাবটা চলে গিয়ে যখনই কয়েদীরা মনে করতে আরম্ভ করবে যে তারা প্রত্যেকেই, অল্প সকলের—তাদের সঙ্গীদের—ভাল-মন্দের জন্য বানিকটা দায়ী তখনই তাদের মনের পরিবর্তন হতে আরম্ভ হবে। এই ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কাজে পরিণত করা যে খুব সহজ তা নয় কিন্তু অনেক

জেলে ইতিমধ্যেই এই প্রথা চলছে এবং তাতে ভাল ফলই পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও এই পরীক্ষা চালানো যায় না কি?

পরিশেষে একটা কথা বলি। জেলগুলি শুধু আটক

রাখবার জায়গা না হয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র হওয়া উচিত। তা হলে অহুসন্ধানের সুযোগ যথেষ্ট বেড়ে যাবে। সমাজের পক্ষে সে ব্যবস্থা কল্যাণকরই হবে।

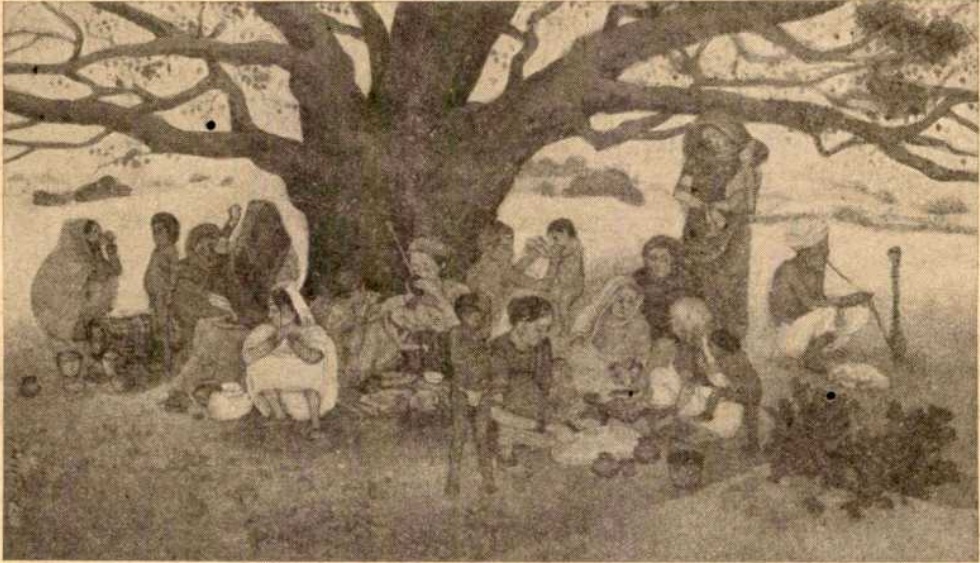
শিম্প-প্রসঙ্গে আচার্য্য নন্দলাল

শ্রীমানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার রীতি-নীতি এবং বিষয়বস্তুর দ্বারা আজ বহুদূরী হয়ে পড়েছে। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় ভারতের চিত্রকলা আবার রূপে রসে সমৃদ্ধীভূত হয়ে উঠেছে—তার প্রবর্তিত শিল্পধারা আজ বহু শাখা-প্রশাখা অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁদের নিজ নিজ ভাব ও কল্পনা অহুযায়ী রঙে ও রেখায় রসসৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁদের অনেকেই শিল্প-স্থিতিতে স্বকীয়তার পরিচয় পরিস্ফুট।

বাস্তবিক আমাদের শিল্পস্থিতিতে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বিশেষ ভাবেই নজরে পড়ে।

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। নূতন ভাবপ্রবোতে যে পলিমাটি পড়ে, তাতে শিল্পীমণ্ডল উর্বর হয়—শিল্পের জগতে নব নব রূপ রস আদ্রিক ও আদর্শে স্থষ্টির গোড়াপত্তন হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—“ধরাবীণা বস্তুর মধ্যে বা style-এর মধ্যে এক এক সময় এক একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা, চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার



তীর্থযাত্রী •

—লেখক কর্তৃক অঙ্কিত

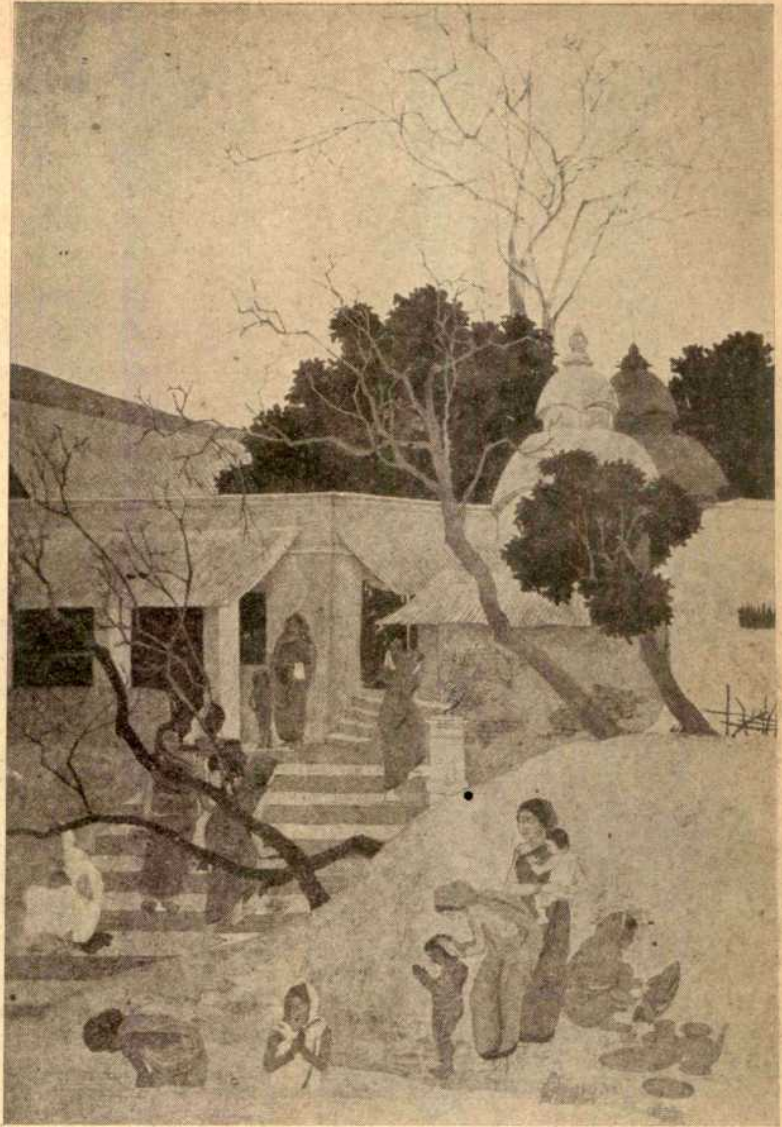
আজকের দিনে সকল দেশেই শিল্পজগতে যুগোপযোগী পরিবর্তনের সাদা জেগেছে। আমাদের দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত এবং চিত্রকলাও বৈদেশিক প্রভাবের ছোঁয়াচ থেকে মুক্তি থাকতে পারে নি। কিন্তু অজ্ঞাত দেশে গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার জ্ঞান শিল্পীদের যে চেষ্টা দেখা যায়, তাদের ছবিতে যেমন আদ্রিক ও নূতন বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষণের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের দেশে তা বিরল বললে অত্যাঙ্গ হয় না।

ভাষা সবসময়ই এক গতিক। যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জেনে জেনে কালে-কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাধা পড়ল নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে। নূতন কবি, নূতন আর্টিষ্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উন্টে পান্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে।”

শিল্পকলার সাধনায় ত্রুতী যারা তাদের মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমরা কোন্ পথে চলছি। আমরা কি লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়ে ভুল পথে চলেছি ? পরিবর্তন তো রবিবর্ষা, বিখ্যাত খুবধর প্রমুখ শিল্পীদের ছবিতেও এসেছিল; এঁদের তুলিতে জোর ছিল—কিন্তু ছবিতে তো রসের ধারা প্রবাহিত হয় নি। আজকের দিনের শিক্ষিত (trained) চোখে এঁদের ছবির মেকিত সহজেই ধরা পড়ে এবং সেগুলো যে সৃষ্টি হিসেবে সার্থক হয় নি তা বুঝতে পারা যায়। ইউরোপীয় শিল্পের স্বাস্থীকরণ (assimilation) এঁদের দ্বারা হয়ে ওঠে নি বলে, নূতন রসসৃষ্টি এঁরা করতে পারেন নি, করেছিলেন ব্যর্থ অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আচার্য্য নন্দলালের কথা। উপদেশ প্রদানক্ষেত্রে একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, “দেশবিশেষের নানারকম ছবি বেশ ভাল করে দেখ।

একে যাও ছবি—ছবিতে দরদ দাও। আঙ্গিক (technic) আপনি তোমার স্বকীয়তায় সৃষ্টি হবে। আর ছবি করবে তোমার শিল্প-দৃষ্টিতে—ফটোর মত নয়।” তাঁর আঁকা একখানি দৃশ্যচিত্র (landscape) “শান্তিনিকেতন” দেখিয়ে বললেন, “এই দেখ, এতে তো বিষয়-বস্তু সবই বোঝা যায়—গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী—কিন্তু এ তো ফটো নয়; এ হ’ল ও জায়গাটার ছবির রূপ। এতে আমি যেমন দেখেছি, যা আমার মনে লেগেছে—এ হ’ল তারই রূপ।”



ঘাট

—লেখক

আমার কয়েকখানা ছবি তাঁকে দেখালাম। আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললাম, “আমি ছবি আঁকা ভাল করে শিখতে চাই, আমার কোথায় ভুল থেকে যাচ্ছে, আর কি করে সেগুলো শোধরানো যাবে সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ পাব এই আকাঙ্ক্ষা।” তিনি হেসে বললেন, “তোমায় নিজের ছবি সম্বন্ধে বলছি কাজেই কিছু আবার মনে করো না শেন। তোমার ড্রয়িং তো ভালই। কিন্তু এই যে একেছ, এতে তো কম্পোজিশনের ছন্দ নেই। কবিতায় যেমন মিল আছে, ছন্দ আছে, ছবিরও তাই; সোজায় সোজায় মিল হ’ল একরূপ, আবার বাঁকায় সোজায়

মিলে হ’ল অরূপ—এ রকম নানা মিল আছে। এ ছন্দ-বোধটা থাকা চাই। একটা ছবি দেখলে সহজে বুঝতে পারবে।”—বলে তাঁর আঁকা “ঝড়” ছবিটি দেখিয়ে বললেন, “এই দেখ, সোজা সোজা তালগাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ি পড়ছে, ছুটে চলেছে মানুষ সবই সোজা সোজা। এ হ’ল সোজায় সোজায় মিল। কিন্তু চোখে তো লাগছে না—কারণ এর ছন্দ সব ঠিক আছে।”

শুনে অবনীন্দ্রনাথের ‘রূপ’ প্রবন্ধের কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ল। তাতে আছে—“বাঁকা” দিলে একরূপ, সোজা দিলে অরূপ, বাঁকায় বাঁকায় মিলে একরূপ, সোজায় বাঁকায়



রবীন্দ্রনাথের 'কান্তনু' নাটকের জন্ম শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট

মিলে অঙ্ক—এমনি নানা ভেদ রূপের। মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু—সে একটিমাত্র রঙীন আলোর বাক, তার সঙ্গে আর একটা উপযুক্ত রকম সোজা তীর তো ছোড়া হ'ল না, শুধু আলো-অন্ধকার, রৌদ্র ও মেঘের ভেদাভেদ নিয়ে সুন্দর ফুটল রূপটী...। সমুদ্রতীরে রূপের ভেদাভেদ শব্দ করে ফুটল আর স্থিতি ও গতি ধরে ফুটল ঠিক সঙ্গীতের মতই আকাশ—নিভর নিথর নীল এবং সমুদ্র—সচল সশব্দ নীল।...রূপের ঘেরে বন্দী আমরা শোড়া থেকেই, এই বাঁধন থেকে মুক্তি হচ্ছে রূপমুক্তির সাধনা রূপকারের।”

আবার নন্দলালের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। খানিক চুপ

করে থেকে তিনি পুনরায় বলে চললেন, “আর একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখবে—তুমি ছবিতে যে জিনিসটা ফোটাতে চাও সেটাকে করবে স্পষ্ট করে—বাকীগুলো সব দরকারমত ফুটিয়ে তুলবে। তোমার চোখ একটা জিনিসকে বিশেষ করে দেখছে, আরও কিছু সে দেখছে, কিন্তু তা ততটা স্পষ্ট করে নয়। ছবি আঁকার বেলায়ও তাই—তুমি যা’ দেখাতে চাও, সেটির দিকে বিশেষ করে নজর দাও—বাকীগুলোকে দরকারমত সব ঘর ঘর জায়গায় বসিয়ে দাও। দেখবে, তাতে ছবি ফুটবে ভাল। তুমি যে একেছ, তাতে সবগুলো জিনিসের দিকেই যেন তোমার সমান নজর। সবগুলোকেই তুমি ভাল করে ফোটাতে চেয়েছ, দূরের গাছের প্রতিটি পাতা পর্যন্ত—এতে ছবির সবটাই একসঙ্গে নজরে পড়ছে। ফলে প্রধান বিষয় চাপা পড়েছে।”

তার বাড়ীর পিছনের দিকের বারান্দায় বসেছিলাম। তিন দিকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সেটি তার বিশ্রাম করবার স্থান, সেখানে ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। সামনে বহুদূর-বিস্তীর্ণ মাঠ, উঁচু-নীচু ডেউ-খেলানো লাল কক্করময় জমি। মাঝে মাঝে তালগাছের সারি দেখা যাচ্ছে—এখানে ওখানে ছ’একটা বাবলা গাছও রয়েছে। সে দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি আবার শুরু করলেন, “মনে কর, ঐ যে তালগাছটা দেখা যাচ্ছে—এটে তুমি আঁকছ—ওর সামনে পেছনে গাছপালা মাঠ সব রয়েছে। এখন তোমার দৃষ্টিতে তাল-গাছটা হ’ল রাজা-বাদশা—আর ওর সভাসদেরা সভা জমিয়ে নিজ নিজ নির্দিষ্ট জায়গায় সব বসেছে। ছবির মধ্যেও এমনি রাজা-বাদশা, সভাসদ রয়েছে। তোমার শিল্প-দৃষ্টিতে যেটা প্রধান—সেই ‘রাজা-বাদশাকে’ ছবিতে যথোচিত মর্যাদায় বসায়, তারপরে তার সভার

মধ্যে যথাস্থানে সভাসদদের বসায়—ছবি তাতে জমবে ভাল। এই ত হ’ল ছবির আসল কথা।”

উপমাটি বেশ জুগুসই মনে হ’ল। খানিক পরে আবার আমার ছবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, বললেন—“তোমার ছবিগুলোতে একটা ‘ফটো ফটো’ ভাব রয়েছে। গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী—শারীরস্থানের (anatomy) হিসেবমত এরা ঠিকই আছে। কিন্তু এঁদের প্রাণ তো চাই। সব যেন কলের পুতুলের মত বসানো হয়েছে। ছবি তো কটো নয়, ছবি দেখলেই মনে হবে ছবি দেখছি—কোন কিছুর কটো নয়। কটোতে তো ছবির রস নেই, প্রাণ নেই; কটো হ’ল বাইরের ছাপ, আর অন্তরের ছাপ হ’ল ছবি।”

আর্ট স্কুলে বরাবর নেচার থেকে স্কেচ করে ছবি আঁকার নির্দেশই পেয়ে এসেছি। তাই বোধ হয় বরাবর চোখ দেখে আসছে “স্কফং কাঠং”, কিন্তু “এ যে তরুণ রসের বিহনে দহে” এরূপ দেখার মত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়ে ওঠে নি। এই রসহীন পরিবেশের মধ্যে কলের পুতুলের মত কাজ করার ছাপ পড়েছে সব ছবিতে। গতানুগতিকভাবে ছবি, মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করতে করতে হাত উঠেছে পাকা হয়ে, কিন্তু মন রয়ে গেছে উপবাসী।

নন্দলালকে জানালাম যে স্কেচ করে তাই থেকে সব ছবি এঁকেছি—ছবি যে প্রাণহীন হয় সেইটে এর একটা কারণ হতে পারে। তিনি বললেন, “নেচার থেকে স্কেচ করবে সেটা ভাল। স্কেচ তো আমরাও করি; তালগাছ, খেজুরগাছ জন্তু-জানোয়ার সব আমাদের স্কেচ করা আছে। কিন্তু ছবি তো আঁকি মন থেকে। ছবি আঁকার বোলায় সেগুলো সাহায্য করে মাত্র।”

“কিছুদিন mythological subject (পৌরাণিক বিষয়)

নিরে ছবি আঁক, ছবিতে দরদ দাও, প্রাণ ঢেলে দাও। তা হলে এ অভাবটা দূর হবে। তোমার ছবি বেশীর ভাগই ইংরেজীতে যাকে বলে genre painting, কলাভবনে যেয়ো—বিদেশী genre painting কিছু তোমার দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেব।”

পরদিন কলাভবনে অনেকগুলো জাপানী ও বিলাতী ছবি দেখলাম। নন্দলাল বললেন, “এ রকম আঁকতে পার। এগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির মিল রয়েছে, কিন্তু ছবির রস এগুলোর মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে—জীবন্ত মানুষও হয়েছে—ছবিও হয়েছে। ছবিও আঁক, আর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ভাল ভাল বই পড়ে মনকেও পুষ্ট কর।”

আমি একজন সামান্য শিক্ষার্থী। আমার সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনের ফ্রেন্ডস্‌ এন্ড মডেলিং কতগুলো দেখালেন এবং সেগুলোর রস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

কত বড় শিল্পী তিনি, তাই শিল্পীমাত্রেই তাঁর একান্ত আপনার জন, তাদের প্রতি তাঁর কত দরদ।

ভালই তো

শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন রায়

পরীক্ষার পর ছাত্রজীবনে মুক্তির যে জোয়ার আসিয়া পড়ে তাহাতে প্রাণ খুলিয়া সাড়া না দিয়া পারে ক'জন। সেই একঘেয়ে পড়াশুনার মাঝে যখন নতুনদের আহ্বান আসিয়া দ্বারে আঘাত করে, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ মন বুঝি রুদ্ধ ছয়রের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া ছুটিয়া চলে অসীম মুক্তির সন্ধানে। পড়াশুনার সেই বাঁধাধরা সময় নাই, কলেজে যাইবার না আছে তাড়াহুড়ো, না আছে একটা বিরক্তিকর কর্তব্যবোধ। এই মুক্তির মাঝে হিসাবী দোকানীর মত গুনিয়া গুনিয়া সতর্কভাবে দিন কাটাইতে আর যেন ইচ্ছা করে না।

বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু কোথায় যাইব? শহরের এই কোলাহলের বাইরে একটু নির্জনতা কি পাওয়া যাইবে না কোথাও? অনেক টাইম-টেবিলের পৃষ্ঠা উন্টাইয়া, অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেষ পর্যন্ত বড়দার কণ্ঠাটাই বেশ মনোমত্ত হইল, দেশেই যাইব। চূর্ণা নদীর তীরে ছোট নির্জন গ্রামটির আকর্ষণ যেন কিসের এক অদৃষ্ট টানে আমাকে টানিয়া লইল, কিন্তু মুশকিল বাধিল যে। থাকিব কোথায় গিয়া। আমাদের দেশের বাড়ীতে তো তালা পড়িয়া আছে সেই কবে হইতে। বড়দা বলিলেন—“কুছ পয়োয়া নেই। অমুর বাড়ীতে গিয়ে উঠবি।” অমুরা দাদার বাল্যবন্ধু—গ্রাম-সম্পর্কে আমাদের জাতিও বটে।

মোটঘাট বাঁধিয়া রওনা হইয়া গেলাম বহুদিন-না-মাওয়া, শান্ত পরীজননীর কোড়ে আশ্রয়ের লোভে।

...উঃ। কতদিন পরে না আজ আবার নৌকায় উঠিলাম। ছোট নদীটির তীরে বেঁধিয়া নৌকা চলিয়াছে। বাইরে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ উঠিয়াছে আকাশে, ফুটফুটে জ্যোৎস্না, তার নীচে রূপালী ছোট নদী কুলকুল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে যেন দয়িতের কাছে প্রেমগুণ্ডনের আশায়। আর নৌকার মধ্যে আমি চুপটি করিয়া বসিয়া আছি। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মাঝে ছইয়ের মধ্যে বসিয়া থাকা আর চলে না।

মাঝি বারণ করিল—বাবু বাইরে হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।—তা বটে। ওর ধারণা কলিকাতার বাবু একটু হিমেই জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে হয় তো।

...সৌন্দর্যের কি বিরহী রূপ। গোলা ছধের পৌঁচ লাগিয়াছে গাছের পাতায়, আকাশের গারে, নদীর জলে। নদীর পাড়ে বাঁশবনের ঝোপ, হোঁগলা বনের জঙ্গল...গাছের পাতায় চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি, নদীর জলে তরল রূপার ছোট ছোট ঢেউগুলি...মাঝে মাঝে শোয়ালের ডাক, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, আকাশে মাথার উপর দিয়া কত রকম পাখীর উড়িয়া যাওয়ার সেই মনোরম দৃশ্যটি, মাঝে মাঝে ছই-একটি কুঁদর...দূর হইতে ভাসিয়া-আসা বাউলের গান আজ আমার মনকে

কোথায় যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এমনটি তো দেখি নাই কোন দিন। কলিকাতার বিজলী বাতির সমারোহে প্রকৃতি-রাণীর এমন রূপটি তো দেখি নাই আর। ইচ্ছা হয় হাত ছোঁড় করিয়া বলিয়া উঠি—‘হে সুন্দর! তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।’

...ঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে বেশ খানিকটা রাত হইয়া গেল, আগেই চিঠি পাইয়া অমুদা নিজেই আসিয়াছেন ঘাটে।

প্রণাম করিতেই দুই হাত দিয়া জড়াইয়া বৃকে চাপিয়া ধরিলেন—ওমা, কত বড়ট হয়েছি তুই। সেই ছোটটি ছিলি, কি রকম আধ-আধ কথা বলতিস।...একটু থামিয়া, তা কম দিন তো আর হ’ল না। কেউ কি আর গাঁ-মুখো হবে তোমরা!

বাড়ী আসিয়া বৌদিকে প্রণাম করিলাম, কত কথা, কত অহুযোগ-অভিযোগ। কেন গ্রামে আসি না আমরা, শহর ছাড়িয়া আসিতে ভাল লাগে না বৃকি, মাঝে মাঝে গরীব দাদা-বৌদিকে স্মরণ করিলে এমন আর কি জমিদারী নিলাম হইয়া যাইত। তাঁহাদের কথা মুখ বুজিয়া সহ করিলাম। কি করিয়া তাঁহাদের বুঝাইব, অবহেলা নয়, পিঞ্জর হইতে মুক্তি না পাইলে আসিব কি করিয়া। আর তা ছাড়া যে খোঁড়া তুলি-আঁটিয়া পথ চলে, সে কি করিয়া সম্মান রাখিবে তাহার সঙ্গীর্ণ দৃষ্টিপথের বাহিরেও আছে আর একটু বিরাট জগৎ।

...সকালে একটু দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠা আমার বহুদিনের অভ্যাস। হঠাৎ পায়ে কিসের স্ফুটন্ত লাগিতেই সজোড়ে পা ঝাড়া দিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম, সাপখোপ নয় তো। না, যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহা নয়। দেবীলাম একটা বিড়াল ছিটকাইয়া পড়িল গিয়া একেবারে ঘরের ঐ কোণটায়, মহানন্দে আসিয়া শুইয়াছিল আমার বিছানায়।

তাহার মিউ মিউ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ‘কি হয়েছে রে পুষি।’ বলিতে বলিতে একটা পাঁচ-ছয় বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পুষি ততক্ষণে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, গা ঝাড়া দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ডাকিয়া উঠিল,—মিউ। কি হইয়াছে তাহার জবাবটা সে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিল, মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া তাহার স্নডোল দুটি হাত দিয়া পুষিকে কোলে তুলিয়া লইল, তারপর আমার দিকে রুদ্ধনেত্রে তাকাইয়া বলিল, ‘পুষিকে তুমি মেরেছ?’

আমি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম, ‘আমি তো দেখতে পাই নি, পা-টা যেই একটু সরিয়েছি—’

কথা শেষ হইবার আগেই সে ফাটিয়া পড়িল—পা একটু সরিয়েছ আর অমন পুষি ওরকম ছিটকে এক কোশ দূরে পড়ল গিয়ে? বলি, পুষি কি আমার ক্রানা বেলুন নাকি এঁা? উত্তর দিব কি, এই এক ফোঁটা মেয়েটির ডেঁপোমি দেখিয়া হাসির চোটে আমার সর্বশরীর ছলিয়া ছলিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু হাসিলে পাছে আরও কিছু অনর্থ বাধিয়া বসে তাই নেহাত গো-বেচারীর মত মুখ করিয়া আবার বলিলাম, ‘আমি কি বুঝেছি যে ও ছিটকে পড়বে—আর আমি তো ভেবেছিলাম সাপ-টা প বৃকি।’

আমার কথা শুনিয়া মেয়েটি এবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—বেরালকে সাপ ভাববে না। ভীমরতি আর বলে কাকে।

কার সঙ্গে কথা বলছিলাম রে মঞ্জু—বলিয়া বৌদি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—‘সকাল না হতেই এসে ঢুকেছ এখানে,’ ...আমার দিকে তাকাইয়া : ‘আমার মেয়ে মঞ্জু। এই প্রণাম কর, তোর কাকা যে।’ মঞ্জু তো অবাক। কৈ কাকা তো তাহার ছিল না কোন দিন। রাতারাতি মাটি ফুঁড়িয়া কাকা গজায় নাকি আজকাল। কাল তো রাতে শুইবার আগে পর্যন্ত এমন স্তম্ভিত্তা কাকা দেখে নাই সে। যে কাকা বেড়ালকে সাপ ভাবিয়া লাধি মারিয়া বসে, যে কাকা রোদ উঠিয়া গেলেও কুস্তকর্ণের মত ঘুমাতে থাকে।...আবার মঞ্জুর রাজা চুকচুক চোঁটের উপর মিষ্টি হাসি নামিয়া আসে।

‘কি রে প্রণাম করলি নে?’ বৌদির কণ্ঠ আবার বন্ধার তোলে। মঞ্জু একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর পুষিকে মাটিতে বসাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আগাইয়া আসিল প্রণাম করিতে। আমি দুই হাত দিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলাম—‘ধাক, আর প্রণাম করতে হবে না, বাঃ বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি তো তোমার বৌদি। যেমন চেহারাটি তেমনি মিষ্টি নামটি—মঞ্জু।’

মঞ্জু ফিক্ করিয়া হাসিয়া মার দিকে কটাক্ষ হানিয়া সলজ্জ কণ্ঠে বলিল ‘মিষ্টি না ছাই। মিষ্টি হলে কি আর মা আমার মুখপুড়ী বলে ডাকত কখনও। তুমিই বল না কাকা—হঠাৎ কথার তোড়ে এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলায় মঞ্জু লজ্জায় আমারই বৃকে মুখ গুঁজিয়া লসিল। তাহার কৌক-ডানো চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম ‘আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল তো মঞ্জুরাণী। পুষিকে আর কোনদিন মারব না, কেমন? মঞ্জুও ষাড় নাড়িয়া সায় দিল।’

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, ‘ভাব তো হ’ল এবার মেয়ের পাকামোর ঠেলায় পাগল না হয়ে যাও।’ তিনি হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এমনি করিয়া ক’টা দিন যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল কে জানে। শীতের অলস মধ্যাহ্নে মঞ্জুর বহুনি শুনিতে শুনিতে কখনও ঘুমাইয়া পড়ি, আবার রোদ পড়িয়া আসিলে কখন যে তাহার তাড়া খাইয়া উঠিয়া পড়ি—তা যেন নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তারপর দুই জনে গিয়া বসি চূর্ণা নদীর তীরে। ছোট নদীটি, কতরকম ছোট বড় নৌকা ভাসিয়া

যাইতেছে নদীর বুকের উপর দিয়া, মঞ্জু কল্লনার রং চড়াইয়া কত কথাই না বলিয়া যাইতেছে।

‘এ’ যে দেখেছ বড় নৌকোটা পাল টেনে যাচ্ছে ওতে আছে এক রাজার ছেলে বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাচ্ছে,’—তারপর কোলে উপবিষ্ট পুষ্টির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে, ‘আমার পুষ্টিরগাও যাবে একদিন ঐ রকম একটা পেলায় নৌকোয় চড়ে খন্ডর বাড়ী, নারে পুষ্টি—’

—‘মিউ’

গাঢ় কণ্ঠে মঞ্জু বলিয়া চলল—‘দেখেছ কাকামণি, পুষ্টি আমার সব কথা বোঝে’—তাহার এই জলন্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করিতেও সাহস হইল না, শুধু যুহু হাসিয়া সায় দিলাম। মেয়েটার কল্লনার রং যেন ক্রমেই চড়িয়া যাইতেছে।

—‘কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান, কাকামণি।’ জিজ্ঞাসা-নেত্রে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকাইলাম। মঞ্জু একটি দুর্ঝাখাস দাঁতে কাটিতে কাটিতে নেহাত গিন্নীবান্নীর মত চিন্তিত মুখে বলিল, ‘বিনে পণে ত কেউ আর মেয়ে নেবে না। দু-পাঁচ শ নইলে বাবুদের আর মনই ওঠে না যে।’ একটা দোক গিলিয়া... ‘সেই যে টাপা আছে না, ওর ছতুমকে তো তুমি দেখেছ। সেই যে গো কালো ড্যাবড্যাবে চোখ। সে-ও চায় আড়াই শ, কত বললাম দু’শ কর না সহ। ওর সেই এক কথা, বলে, ভদ্রলোকের মেয়ের এক কথা—আচ্ছা বাবু, আমিও দেখি দু’শ টাকায় আমার পুষ্টির পাত্তর জোটে কি না। পুষ্টি আমার কি ক্যালনা মেয়ে। না রে পুষ্টি।’

—‘মিউ।’

আর সামলাইতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বলিলাম, ‘দু’শ টাকাই বা পাখি কোথায় রে।’

মঞ্জু কথাটা শুনি, কতক্ষণ হা করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর কি রকম মধুর হাসিয়া ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিল, ‘নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু। একটুও বুদ্ধি নেই তোমার, কাকামণি। সত্যি সত্যি টাকার কথা কে বলেছে তোমাকে—সে যে খোলাম-কুচির টাকা গো।’

আশ্চর্য হইলাম। নিজের ভুল শোধরাইবার জন্ত তাড়া-তাড়ি বলিয়া উঠিলাম, ‘খোলামকুচির টাকাই যদি, তবে আড়াই শ’তে আর আপত্তি করছ কেন?’

মঞ্জু ভরজ্ঞানী দিয়া স্বীয় চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, ‘ওমা, তুমি বলছ কি গো। খোলামকুচি বলে কি পঞ্চাশটা টাকা তোমার গায়েই লাগল না।’

এই রে, সর্বনাশ। একটা ভুল শুধরাইতে গিয়া ক্রমেই ভুলের মাঝে বাড়াইয়া চলিয়াছি। জু কুঁচকাইয়া গভীর মুখে ভারিঙ্গী চালে বলিলাম, ‘সত্যিই তো পঞ্চাশ টাকা বেশীই বা দিতে যাবে কেন? মেয়ে তোমার রুৎসিত নয়। দু’শর বেশী এক পয়সাও দিও না কাউকে।’

মঞ্জু যুহু হাসিয়া স্নেহে বলিল, ‘সবই বুঝি কাকামণি, কিন্তু ক’টা টাকার জেজে কি অমন ভাল পাত্তর হাতছাড়া করতে আছে? মাহুষের জেজেই ও টাকা, কি বল, এ্যা?’

কথাটা তাহার নিজের কানেই বুঝি কেমন বেধাঙ্গা শুনাইল, তাই আবার বলিল, ‘পুষ্টি আমার মাহুষের মতোই। ওদেরও তো সুখদুঃখ আছে, কি বল?’

কি আর বলিব, বলিলেও বিপদ, না বলিলেও, তাই বুদ্ধিমানের মত শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। নিকটে-দূরে শাঁখের আওয়াজ, মন্দিরের কাসর-ঘণ্টা এমন সময়টিকে যেন বড় মধুর করিয়া তোলে।

—চল রে মঞ্জু, সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ী যাই চল। হাত ধরাধরি করিয়া দু-জনে বাড়ীর পথে পা বাড়াইলাম।

সেদিন ছপুরে ঘুমাইয়া আছি, হঠাৎ মঞ্জুর ঠেলা বাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলাম—‘কি রে, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি।’

মঞ্জু কি রকম অপ্রস্তুত হইয়া গেল, ‘ও তুমি বুঝি ঘুমোচ্ছিলে?’

ঘুমন্ত লোককে ঘুম হইতে জাগাইয়া তাহাকে ঘুমের কথা জিজ্ঞাসা করাটা কি রকম একটু অভিনব বোধ হইল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, অহুমান তাহার মিথ্যা হয় নাই। আমি ঘুমাইতেছিলামই বটে।

মঞ্জু আমার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, ‘মাথা টিপে দেবো কাকামণি।’

বলিলাম, ‘কেন রে, কাকামণির ওপর বড় দরদ যে। কোন অত্যাচার করে এসেছ বুঝি।’

আমার কথা কানে না তুলিয়া মঞ্জু বলিয়া চলিল, ‘আজ-কালকার কাপ প্লেটগুলো দেখেছ কাকামণি। ধরেছ কি ভেঙেছে, জাপানী মাল কিনা।’

—‘দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মজা। দোষ করে আগে থেকেই সাফাই গাওয়া হচ্ছে।’ বৌদি যে কখন আসিয়া ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন, তাহা আমরা দু’জনে কেহই এতক্ষণ দেখি নাই।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। মঞ্জু আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহাকে কোলের কাছে নিবিড় করিয়া লইয়া বৌদিকে বলিলাম,—‘থাক বৌদি, এবারকার মত মাপ কর ওকে। ছেলেরামুষ ভেঙে ফেলেছে একটা জিনিষ—’

—‘সে জেজেই তো আকারা পেয়ে যায়-ও, এদিকে পাকা-মোতে তো একেবারে ঠানদি—’ বৌদি চলিয়া গেলেন।

মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিলাম, ‘হ্যা রে, দিন দিন বড় হচ্ছে—একটুও পড়াশুনো করবি নে।’

মঞ্জু ঘর ছাড়িয়া যাইতে যাইতে ঝঙ্কার দিয়া বলে, 'ইঁা, পড়াশুনো করবার সময় আমার গড়াগড়ি দিচ্ছে কিনা! আর মেয়েমানুষ পড়াশুনো করে কি হাকিমী করবে, এঁা?...' একটু ধামিয়া,—

'যাই দেখি, মেয়েটা আবার কোথায় পাড়া টহল দিতে বেরিয়েছে—' মঞ্জু পুষির উদ্দেশে ধীরমহুর গতিতে হেলিয়া ছলিয়া বাহির হইয়া গেল।

...এইরূপে দিনগুলি বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। আর তো এখানে বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

তারপর এক দিন বিছানা-বাক্স লইয়া ফিরিয়া চলিলাম। যাইবার সময় বৌদি ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, 'আবার এসো ভাই! মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাবে, উঠে যে কি কাণ্ডটাই বাধিয়ে তুলবে, তাই ভাবছি।'

রাত্রে মঞ্জু ঘুমাইয়া পড়িলে পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। দিনেও যাওয়া চলিত, কিন্তু মঞ্জুর সামনে দিয়া নৌকায় উঠিবার মত বুকের পাটা আমার কোথায়? হুঃ এই, যাইবার সময় মেয়েটার সঙ্গে দেখাও হইল না।

* * *

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে এই কাহিনীর যবনিকা আজ আবার তুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে সংসারের কত পরিবর্তনই না হইয়া গেল: বাবা মারা গেলেন, আমিও বি-এ পাস করিয়া উচ্চশিক্ষার অভিলাষ ছাড়িয়া চাকরির জোয়ালে জুড়িয়া গেলাম। তারপর সেই দশটা পাঁচটা করিয়া রঙীন পৃথিবীটাকে কবে যে অন্তঃসারশূন্য আখের ছিবড়ার মত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা আমি নিজেই বুঝি জানি না। যাক সে কথা।

দশ বৎসর পরে সদলবলে আজ আমরা আবার দেশে ফিরিতেছি পূজার উৎসবে। কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে যে পথে যাইতে যাইতে কত রঙীন স্বপ্ন, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা আমার নবীন মনকে দোলাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল, আজ যেন তাহার শতাংশের একাংশও নিছকের মনে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কিন্তু নৌকায় উঠিয়াই প্রথমে মনে হইয়াছে একটি ছোট্ট মেয়ের কথা।

মঞ্জু! নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে...খুব রাগ করিয়াছে সে। এতদিন একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখি নাই তাহার কাছে! প্রথম সে কথা বলিবে না...কিছুতেই বলিবে না। আমিও প্রস্তুত হইয়াছি।

আসিয়াছি। শিমুলতলার মেলা হইতে একটা কুস্তকর্ণের মূর্তি কিনিয়া আনিয়াছি মঞ্জুর জন্ত। দাড়ি-গোঁফওয়ালা বিরাটাকার এক পুরুষ শুইয়া আছে, তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই তিনটা ক্ষুদে রাক্ষস ঢাক ঢোল বাজাইবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান, বাজ্ঞে ভরিবার আগেই মূর্তিটার নাকটা বাজ্ঞের কোণায় লাগিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। মঞ্জুর হাসির বেগু, হয়ত আরও বর্ধিত হইবে ইহাতে। কল্পনায় যেন সে দৃশ্যটা ভাসিয়া উঠিল। মঞ্জু যেন মাথা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে...এমন সময় সেই মূর্তিটি তাহার সামনে ধরিয়া বলিলাম, 'এই দেখ তোমার বর!' ইহার পর আর সে হাসি চাপিতে পারিবে না, কিছুতেই পারিবে না। ব্যস, দুই জনে আবার ভাব হইয়া যাইবে।...ভারি তো মঞ্জু! তাহার রাগ ভাঙাইতে আর কতক্ষণই বা লাগিবে?

সেই রাত্রে ষাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘুমাইতে অনেক রাত হইয়া গেল। পরদিন হাতখুঁধু হইয়া চা খাইয়া অমুদার বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেলাম।

ডাক শুনিয়া দাদা-বৌদি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই জনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। বৌদি আসিয়া বলিলেন, 'ভাল আছ ত ভাই?' বাড়ি নাড়িয়া উত্তরটা সারিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাম, বৌদি হয়ত মনের কথা বুঝিলেন, বলিলেন—'ও মঞ্জু দেখে যা, তোর কাকা এসেছে যে!'

একটি শাড়ীপরা মেয়ে ধীর নম্রভাবে বাহির হইয়া আসিল এবং একটা প্রণাম করিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন অভিমানের আভাস, কোন রাগের চাপা ইঙ্গিতই ত তাহার মুখে নাই, বরং একজন অপরিচিতের সামনে দাঁড়াইয়া সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

একটু পরে ধীরে ধীরে সেই ভিতরে চলিয়া গেল। কোন কথাই তাহাকে বলা হইল না, কলিকাতার কোন মূর্তিটাও তো তাহাকে দেখানো হইল না, যে মূর্তি দেখাইয়া তাহার রাগ ভাঙাইয়া আবার ভাব করিয়া ফেলিবার সঙ্গর মনে মনে আঁটিয়া আসিয়াছিলাম।

সেই শূন্য স্থানটির দিকে চাহিয়া শুধু মনে হইল, সত্যিই, মঞ্জু বড় হইয়াছে, এখন কি আর তাহার বাজ্ঞে কথা বলিবার সময় আছে, যেমনটি ছিল দশ বছর আগে। তাহার যে এখন অনেক কাজ...অ-নে-ক। মঞ্জু বড় হইয়াছে। সুখের কথা, ভাল কথা, ভালই ত। সে কি চির দিনই ছোট্ট বুকাটি থাকিবে নাকি!

ঋগ্বেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ঋগ্বেদে কয়েকজন দেবতা, কয়েকটি ঋষিকুল ও ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ঋষির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। অপর পক্ষের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ, আত্মশাখা ও কোন কোন ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে যুক্তবিগ্রহে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাখ্যাভাগে ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ঋগ্বেদকে আৰ্যজাতির অথবা আৰ্যজাতির ভারতীয় শাখার প্রাচীনতম প্রামাণ্য দলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়া যাহারা আৰ্যজাতির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এই দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে তাৎপর্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তে ক্রটি ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচারের বিষয়।

এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদীয় দেবতাদিগের মধ্যে ও স্তম্ভকার ঋষিদিগের মধ্যে এই অন্তর্বিবাদের কাহিনীর কিছু আলোচনা হইবে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু-ধর্মে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের বিরোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তিন মত তিন জন দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত। লক্ষ্য করিতে হইবে যে কলহ বিবাদ এই তিনটি মতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, তিন জন দেবতার মধ্যে কলহ ও সংগ্রামের বিবরণ তিন সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ মাহুঘের বিবাদ দেবতায় আরোপিত হইয়াছে। স্তম্ভকাং যেখানে দেবতায় দেবতায় বিরোধের কথা বলা হয় সেখানে উহাকে কল্পনা মাত্র বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করিয়া এইরূপ অহমান করা চলে যে বিভিন্ন মতের মধ্যে সংঘাতের কথা বলা হইতেছে। এই সংঘাতের ইতিহাস অহুসন্ধিস্থর পক্ষে মূল্যবান একথা বলা বাহুল্য। স্তম্ভকার ঋষিগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী ঋগ্বেদের আমলে সামাজিক অবস্থার উপর খানিকটা আলোকপাত করে। ঋগ্বেদকে যাহারা যাযাবর, পশুপালক, অর্ধসভ্য আৰ্যজাতির কবিগণের বিচিত্র, অস্পষ্ট-বোধ্য, কাব্যউচ্ছ্বাস অথবা ভারতবর্ষের আৰ্যজাতীয় বৈদেশিক বিজ্ঞেতাগণের কাল্পনিক বা অর্ধ-কাল্পনিক বিবরণ বলিয়া দূরে সরাইয়া না রাখিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের একটি অত্যন্ত প্রাচীন, মূল্যবান মানবীয় দলিল হিসাবে বুঝিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট ঋগ্বেদ সম্পর্কে এই প্রকারের ইতিহাসের যতটুকু পুনর্গঠন করা সম্ভব তাহাই বিশেষ মূল্যবান মনে করা যাইতে পারে। বলা প্রয়োজন যে প্রবন্ধে ঋগ্বেদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একটি দলিল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথমে দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেবতায় দেবতায় বিবাদ ও সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে এত সংক্ষিপ্ত, সময়ে সময়ে এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় যে এইরূপ বিবাদের বিবরণের অন্তরালে কি কথা বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা ধরিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া এই প্রকার বিবাদের আত্মপূর্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-একটি কথায় প্রাচীন কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উষার বিবাহের কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশম মণ্ডলে ৮৫ স্তোত্রে উষার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া ঋগ্বেদের আমলের বিবাহ-পদ্ধতির একটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্রে উষার পাণি-গ্রহণের জন্ত দেবতাদিগের মধ্যে একটি রথ চালনার প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিয়া অশ্বিদ্বয় উষাকে লাভ করেন। অকৃতকার্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অশ্বিদ্বয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচীনত্ব ও খানিকটা রূপক ছাড়া আর কোন বিশেষ অর্থ আছে কিনা জানা যায় না। অশ্বিদ্বয় বা নাসত্য ঋগ্বেদে ১৫ শতাব্দীর মিটানী লেখনে ও ক্ষেমদেবতায় উল্লিখিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের প্রাচীন কীর্তিসমূহের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল কীর্তির বেশীর ভাগ অশ্ব বা বিপদগ্রস্ত ঋষি ও রাজাদিগকে রোগ ও বিপদ হইতে মুক্ত করিবার কাহিনী। এরূপভাবে এই সকল কীর্তির প্রায় একই প্রকার তালিকা পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করা হইয়াছে যে মনে হয় বহুপূর্ব হইতে এই সকল কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অভিষবকালে দেবতাদিগের প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী স্মরণ করিবার বিধি ছিল। দেবগণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ অগ্নির জলমধ্যে লুক্কায়িত হওয়া ও দেবদূত মাতরিখা কর্তৃক অগ্নিকে আনয়ন আর একটি রূপক মিশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী।

রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ কয়েকটি ঋকে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের একত্র উপাসনায় আপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি স্তোত্রে মরুৎগণকে তরুণ বয়স্ক বলা হইতেছে। ইন্দ্রের মুখ দিয়া বলা হইতেছে—উহার কি মনে করিয়া কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল? অগস্ত্য মরুৎগণের পক্ষ লইয়া ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—হে ইন্দ্র, তুমি কি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা, উহাদিগের সহিত স্তম্ভে যজ্ঞভাগ সেবা কর। ইন্দ্র অগস্ত্যকে বলিতেছেন, তুমি সখা হইয়া কেন আমাদিগকে অপলাপ করিতেছ? তুমি আমাদিগকে যজ্ঞভাগ দিতে ইচ্ছুক নহ। অগস্ত্য অত্যাচার বলিতেছেন যে দূরে মরুৎগণের জন্ত তিনি হব্য সংস্কৃত করিয়াছেন। ইহার অর্থ ইন্দ্র ও মরুৎগণের জন্ত

পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিকে দেখা যায় বশিষ্ঠ মরুং-গণকে বৃদ্ধদেবগণ বলিতেছেন। কথকুল মরুংগণের সহিত একসঙ্গে ইন্দ্রের স্ততি করিতেছেন দেখা যায়। কথকুলের এক জন ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তোমরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে; কোন সময়ে ইহা ঘটয়াছিল? ঋগ্বেদের কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ স্বস্ত্র মরুংগণের স্তোত্রের মধ্যে দেখা যায়। ইন্দ্রের সহিত মরুংগণের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। সম্ভবতঃ অগস্ত্যের চেষ্টায় মরুংগণ প্রধান দেবগণের সঙ্গে সমান মর্যাদা লাভ করেন, তাহার পূর্বে কুলীন দেবগণের সঙ্গে অপাণ্ডিত্য ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্বের কাসাইট লেখনে মরুত্তাস নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হইয়াছে কাসাইট জাতির উপাত্ত এই মরুত্তাস ও বৈদিক মরুং অভিন্ন।

স্বর্ঘ্যের সহিত ইন্দ্রের বিরোধের একটা কাহিনী ঋগ্বেদ রচনার কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে এতশের সহিত স্বর্ঘ্যের যুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক এতশের পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার কথা আছে। ঋগ্বেদে স্বর্ঘ্য পুত্র স্বর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্বনের ব্যাখ্যা এই যে পুত্র কামনা করিয়া স্বর্ঘ্য রাজা স্বর্ঘ্যের উপাসনা করিলে স্বর্ঘ্য তাঁহার পুত্র হইয়া অম্ব গ্রহণ করেন। দেবতা তুষ্ট হইয়া ভক্তের পুত্র বা কন্যা হইয়া অম্বগ্রহণ করেন এই বিশ্বাস ঋগ্বেদের আমলে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং যুগশ্চ রাজার কথা হইয়া অম্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কথার নাম ছিল মেনা। সে যাহা হউক, স্বর্ঘ্য পুত্রের সহিত সোমোত্তিষবকারী এতশ ঋষির বিবাদের হেতু জানা নাই। তাঁহার সহিত এতশের যুদ্ধকে স্বর্ঘ্যের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের এই যুদ্ধে যোগদানের কারণ শরণাগত রক্ষা এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট মনে হইতে পারে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের একটি ঋকে দেখা যাইতেছে যে অগ্নিও এতশের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। স্ত্রুতরাং এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে স্বর্ঘ্য-উপাসক স্বর্ঘ্য রাজা সম্ভবতঃ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রতি অহরক্ত ছিলেন না। ইন্দ্রের সহিত তুষ্টার বিরোধ ও তুষ্টার পুত্রকে হত্যা করিবার কাহিনীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

এক দেবতার প্রতি অহরক্ত ঋষি বা রাজা অম্ব দেবতার প্রতি উদাসীন এরূপ ব্যাপার ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু ইহাই নহে, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ দেবতাদিগের উপাসনার বিরোধী, ইন্দ্রের অন্তিথে সংশয়ী ব্যক্তি ঋষিকুলগুলির মধ্যে ছিল এরূপ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পট্টর বলা হইতেছে।

দেবতাদিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গে ইন্দ্র ও উষার মধ্যে বিরোধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায় বামদেবকুলের রচিত চতুর্থ মণ্ডলে।

বামদেব পরিবারের উষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের উগ্রতা হঠাৎ চোখে পড়িলে অহৈতুক ও হতবুদ্ধিকর মনে হয়। উষা বিজ্রোহিণী, হিংসাকারিণী, ইন্দ্রহীনা (দ্রুহং জিঘাংসন ধ্বংস-সমনিত্রা), তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্ত ইন্দ্র অস্ত্র তীক্ষ্ণ করেন। ইন্দ্র দ্যুলোকের কথা, হননাভিলাষিণী জীকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি উষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়াছিলেন। ভীতা উষা রথ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। চূর্ণীকৃত রথ বিপাশতীরে পড়িয়া রহিল, উষা দূরে অপসৃত হইলেন। (এতদন্তা অনঃশমে স্তুসংপিষ্টং বিপাশা। সমার সীং পরাবতঃ)। বিপাশ আর্জাকীয়া নামে ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমানে ইহা বিয়স নামে পরিচিত। কুলু উপত্যকার রোহটাং গিরিপথ হইতে বাহির হইয়া অম্বতসর ও কপূরতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা শতদ্রুতে মিশিয়াছে। বিয়সের প্রাচীন পথ ছিল লাহোর ও মটোগোমারী জেলার মধ্য দিয়া। এই পথে স্ত্রজাবাদের নিকটে বিয়স চেনাবের সহিত মিলিত হইত। বিপাশের তীরে উষার ভগ্ন রথ পড়িয়া রহিল, তিনি দূরে অপসৃত হইলেন, ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে বিপাশ বামদেব ঋষির নিকট প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ নদী। ইন্দ্র কর্তৃক উষার রথ করিবার কাহিনী আরও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। উষাকে অম্বজ ব্যাধের মত নির্ভর, ভ্রাদায়িনী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত উষার বিরোধের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। এই সব বিবরণ মিলাইয়া উষাদেবীর উপাসনার একটি প্রবল বিরোধী দল ছিল অনুমান করা যায় এবং বামদেব গোত্রীয় ঋষিগণ সম্ভবতঃ এই বিরোধিতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ঋগ্বী-দেবতাদিগের মধ্যে উষা প্রধান। উষার বর্ণনায় ঋগ্বেদীয় কবির কবিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় উষার চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। উষা প্রগলভা, সুনন্দী তরুণী, বিশ্ব-পালয়িত্রী, মহীয়সী মাতা ও যুদ্ধপটীয়া দেবী। লজ্জাহীনা যুবতীর ছায় উষা স্বর্ঘ্যের সম্মুখে আগমন করেন। উষা নর্তকীর ছায় রূপ প্রকাশ করেন। উষা শুভ্রবর্ণা, নিত্যযৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবসনা। উষা অভিসারিকা যুবতীর ছায় হাচ্চ করিয়া বক্ষদেশে অনাবৃত করেন। উষার কথাত্বের উল্লেখ কয়েক বার করা হইয়াছে। উষা সুবেশা, সজন্মাতা তরুী; মাতা বাহার অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করাইয়া দিয়াছেন সেই কস্তার ছায় উষার উজ্জ্বল সৌন্দর্য। উষা অস্ত্রধারী যোদ্ধার ছায়। তিনি গোপ্রচরণভূমি ভয়শূন্য করেন, দেশকারিগণকে পৃথক করেন, দৈবব্রত অবিলম্ব করেন। উষা মহতী দেবী, সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, অন্নসম্পাদিকা, দেবগণের মাতা, মনুষ্যের নেত্রী। পূর্বকালীন পিতা অগ্নিরাগণ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাহুভূতা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠগণ সকলের প্রথমে উষাদেবীকে শুভ ও

গোতম দ্বারা প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। গোতম বংশীয়গণ উষার শ্রব করেন।

উষা ইন্দো-য়ুরোপীয়ান আমলের আৰ্যজাতির প্রাচীন উপাস্তদেবতা, গ্রীকদিগের ইওস (Eos) ও ল্যাটিনদিগের অরোরা (Aurora) উভয় নামের রূপান্তর এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে—“Her names in the Rigveda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, Saranya and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Brises, Daphne, Eos, Helen and Erinyes.” উষার অহনা নাম রূপান্তরিত হইয়া গ্রীকদিগের Athena হইয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে। অত্যন্ত সরলভাবে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে গ্রীক ও হিন্দু ভিন্ন জাতি হইয়া যাইবার পূর্বে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ উষাকে এই সকল নাম দিয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানীগণের আবিষ্কৃত আৰ্যজাতি ও এই জাতির ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অবান্তর। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রাচীন বৈদিক আৰ্যদিগের সহিত বাহাদের বনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রাচীন ইরাণীয় আৰ্যদিগের মধ্যে উষার অনুরূপ কোন দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। উষার কল্পনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে দেখা যায় তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কয়েকটি ভিন্ন প্রকৃতির দেবীর কল্পনার সমাবেশে ঋগ্বেদীয় উষার উৎপত্তি হইয়াছে। যে সকল দেবীর বৈশিষ্ট্য উষাতে আরোপিত হইয়াছে তাঁহাদের উপাসনা সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের আমলে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। উষার যে সকল নাম ঋগ্বেদে দেখা যায় সেই নামগুলি সম্ভবতঃ ঐ সকল প্রাচীন, ঋগ্বেদীয় আমলে লুপ্ত দেবীর নিকটে প্রাপ্ত। ইহা ছাড়া উষার কল্পনায় অনেকটা রূপকও রহিয়াছে। সকল বহু-ঈশ্বরবাদী প্রাচীন বর্ষে এইরূপ ব্যাপার ঘটয়াছে। সে যাহা হউক, ইন্দ্রের সহিত উষার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ হইতে সম্ভবতঃ এই অনুমান করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরে উষাদেবীর উপাসনা প্রবর্তিত হয় এবং গৌড়া ইন্দ্র-উপাসকগণ এই উপাসনার প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন। এই অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম দিকে যজ্ঞের সহিত উষার বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না; শেষের দিকে উষাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্ত আহ্বান করা হইতেছে দেখা যায়। সম্ভবতঃ অগ্নিরাগণ অথবা বসিষ্ঠকুল এই নূতন উপাসনার প্রচলন করেন। কিন্তু নূতন দেবতার উপাসনার প্রবর্তন করিলেও ইঁহার ইন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না।

এখানে উষার উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে যে অনুমান করা হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে ঋগ্বেদের আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

অদিতি ঋগ্বেদীয় প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে একজন। কখন অনন্ত আকাশ, কখন সর্বসহা পৃথিবী, কখন বিশ্বরূপা গাভীরূপে তিনি কল্পিত হইয়াছেন। তিনি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রধান দেবতাদিগের মাতা; এজন্ত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দেবমাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। দেবগণের সম্মানীয়া মাতারূপে তাঁহার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; এজন্ত তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি অদ্বয়া ও অনর্বা অর্থাৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত। অদিতির চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঋগ্বেদে কয়েকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, তিনি অহিংস ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী এবং শত্রুহীনা। বৈদিক ঋষিগণ বা আৰ্যগণ যজ্ঞে পশুবধ করিতেন প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ। কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় যে অহিংসাবাদী এক দল ঋষি গোড়া হইতে বর্তমান ছিলেন এবং অহিংস বা পশুবধ না করিয়া যজ্ঞ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের আমলের পরেও যে এই অহিংসাবাদের দ্বারা অনুরূপ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতের নারায়ণীয় অংশে বহু উপরিচরের কাহিনীতে ও পঞ্চরাত্র মতবাদের ব্যাখ্যায়। নানা উৎস হইতে প্রবাহিত বারিরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়া এই প্রাচীন দ্বারা মহানদীতে পরিণত হইয়াছিল গোতমবৃক্ষের ধর্ম।

সে যাহা হউক, দেখা যায় যে এই প্রাচীন, অদ্বয়া ও অনর্বা দেবমাতা অদিতির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল। অগ্নিরা গোত্রীয় কুংস ঋষি বলিতেছেন, মাতা দেবানামদিতেরনোকং; হে উষা। তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির প্রতি-স্পর্ধিনী। তুমি সকলের বরগীয়া (বিশ্ববারা)। অদিতি ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, আর্গমান, আদিত্যগণের ও রুদ্রগণের মাতা, সূতরাং যথার্থ দেবমাতা, কিন্তু কোন দেবতাকে উষার পুত্র বলা হয় নাই। উষাকে সূর্যের মাতা বলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্যের কথারূপে এবং কোন কোন স্থানে সূর্যের জ্বী বা প্রণয়িত্রীরূপেও তিনি উল্লিখিত হইয়াছেন। দেখা যাইতেছে কোন দেবতার মাতা না হইয়াও উষা দেবগণের মাতা ও অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী বলিয়া সম্বোধিত হইতেছেন। সূতরাং এ অনুমান সহজেই করা যায় যে দেবগণের মাতৃপদের উচ্চ মর্যাদা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়।

ইন্দ্রের সহিত বিরোধ ও সংগ্রাম এবং অহিংসব্রতের ঈশ্বরী ও শত্রুহীনা দেবমাতা অদিতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদীয় দেবতা গোষ্ঠীর মধ্যে উষার অভ্যুদয় একটি ঋণীয় ঘটনা এবং ইন্দ্রের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে বিদ্রোহের উপলক্ষ একজন জীদেবতা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকে মত-প্রকাশ করিয়াছেন যে আৰ্যজাতি পুরুষ দেবতাদিগের ভক্ত

ছিলেন, হিন্দু ধর্মে জ্ঞী দেবতার উপাসনার আমদানী হইয়াছে অনার্য ধর্ম হইতে। অনার্য জাতির ধর্মে জ্ঞী-দেবতার প্রাধান্য ঘটে তাহাদের সমাজ-ব্যবহার জ্ঞীজাতির প্রাধান্য হইতে (matriarchal society)। এই জাতীয় মতের ভিত্তি অসম্ভব যাত্র, কোনপ্রকার প্রমাণ নহে এবং কোন প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিবার দায়িত্ব স্বীকার করা হয় না। ঋগ্বেদে অদিতি, উষা, সরস্বতী, বাহু ও পৃথিবীর স্তুতি-গুণিতে যে ভাব ও চিন্তার উৎকর্ষ ও কবিত্বশক্তির প্রকাশ দেখা যায় কোন পুরুষ দেবতার স্তুতিতে এরূপ উৎকর্ষ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

উপরে উষার উপাসনার প্রবর্তন সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও ঋগ্বেদের কয়েকজন প্রধান দেবতার উপাসনার বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রমাণ দুই প্রকারের। কোন কোন ঋষি ও দেবতার মধ্যে শত্রুতা ও সংঘর্ষের উল্লেখ দেখা যায়। আবার কোন কোন দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ করা হইয়াছে ও সাময়িক ভাবে কোন কোন দেবতার উপাসনা অপ্রচলিত হইয়াছিল এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে ঋগ্বেদের দুই জন প্রধান দেবতা, ইন্দ্র ও অগ্নির সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋষি ও দেবতাদিগের মধ্যে শত্রুতার দৃষ্টান্তসমূহ হইতে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ ইন্দের সঙ্গেই শত্রুতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গিরাস গোত্রীয় কুংস ঋষির সঙ্গে ইন্দের সখ্য প্রসিদ্ধ। পণিগণের সহিত যুদ্ধে, অজ্ঞান দম্যগণের সঙ্গে বিরোধে কুংস ও ইন্দের সহযোগিতার কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। হঠাৎ একটি ঋকে দেখা যায় যে কুংস ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন বলা হইতেছে। ইহার কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। প্রাচীন ও সন্মানীয় পিতৃগণের শ্রেণী-ভুক্ত অধর্ষন ঋষি ইন্দের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। কথঞ্চিৎ পিতার নাম নৃষদ। একস্থানে বলা হইয়াছে ইন্দ্র নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন। ইন্দের এই কার্যের কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ভৃগুকুল প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের স্ত্রুতকার গুংসমদ ভৃগুকুলে জন্মিয়াছিলেন, পরে অঙ্গিরাসকুলে গৃহীত হন। অগ্নি উপাসনার প্রবর্তনে ভৃগুকুল অধর্ষন ও অঙ্গিরাস কুলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ৭ম মণ্ডলে দেখা যায় যে ভৃগুগণকে ইন্দ্র জলে নিমজ্জিত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ভৃগুগণ অহু ও ক্র্যহ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়া সূদাসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভৃগুকুলের নেম ঋষি বলিতেছেন, ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কাহাকে আমরা স্তুতি করিব?

নেম ঋষির এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে ইন্দের মত মর্যাদাশালী দেবতার অস্তিত্বে সংশয়ী লোক ঋষিকুলগুলির

মধ্যে ছিল। ভরদ্বাজ ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,— যদি তোমার সেরূপ বল হইয়া থাকে, সেরূপ ক্ষমতা থাকে তবে মধ্যে মধ্যে কার্যের দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত। অত্রিকুলের রচিত ৫ম মণ্ডলে ইন্দের প্রতি শ্রদ্ধারহিত ও তাঁহার সহিত সংশ্রবহীন লোকের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। একটি ঋকে বলা হইতেছে, যে ইন্দ্র যুদ্ধ বধাদি কার্য করিয়াছিলেন তিনি কোন্ স্থানে ও কোন্ লোকের মধ্যে থাকেন? প্রসিদ্ধ দশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায় যে ত্রিংশু, ভরত, স্বশ্রয় এবং সম্ভবতঃ পুরু গোষ্ঠী বাদে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় যজ্ঞমান গোষ্ঠীগুলিকে ইন্দ্রহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভরদ্বাজ গোত্রীয় গর্গ ঋষির একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দের প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের প্রতি ঘৃণা করিয়া নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন। ভরদ্বাজগণ ঋষিকুলগুলির মধ্যে একটু বেশী উন্নাসিক প্রকৃতির। অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতা দেবতাদিগের জন্ত যজ্ঞভাগ বহন করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্য ভয়প্রযুক্ত অগ্নি দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে শত্রুপক্ষের বিরোধিতার ফলে কোন্ সময়ে অগ্নির উপাসনা সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়াছিল এই ইঙ্গিত করা হইতেছে। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি একটি ঋকে বলিতেছেন, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, আমরা অগ্নিরহিত, এক্ষণে সোম অভিযুক্ত হইলে তাহার জন্ত একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব। এখানে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে কোন কোন ঋষিকুলের মধ্যেও ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসনা সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

ঋষিগণের মধ্যে প্রাচীন, মধ্যকালীন, ইদানীন্তন ও অর্ধাচীন এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণের মধ্যেও বৃদ্ধদেবতা, নবীন দেবতা ও অর্ধক দেবতা এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। কোন কোন দেবতার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁহারা মনুষ্যপদ হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহু স্থানে অঙ্গিরাস ও অগ্নিকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অঙ্গিরাস গোত্রীয় সূর্য্য ঋষির পুত্রগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঋতু নামে পরিচিত হইয়াছেন। একটি ঋকে বলা হইয়াছে যে, মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, প্রশংসনীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বায়ু ও ইন্দ্রকে কোন কোন স্থানে “নরা” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এবার ঋষিদিগের মধ্যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে।

ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধ কুলগত কোন ক্ষেত্রে এই

বিরোধ যজ্ঞের নেতা বা প্রধান ঋষিকের পদ লইয়া; কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ স্বীয় গোত্র বা কুলের প্রাধাত্য প্রচারের অভিলাষ এবং কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত।

ঋষিদিগের মধ্যে বিরোধের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে বৈদিক ধর্ম যজ্ঞস্থান ও স্তুতিকে কিরূপ প্রাধাত্য দেওয়া হইত তাহা বুঝিতে হইবে। স্তুতির দ্বারা ঋষি দেবতাদিগের বহুত্ব লাভ করেন, ইন্দ্রাদি দেবতার বলবৃদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের ক্ষম্য নিরোধ করেন, আপনাদের অতীষ্ট লাভ করেন। স্তুতি পাইবার জন্ত দেবতার কালাহল করিয়া যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। দেবতার যজ্ঞ হইতে উদ্ধৃত, ঋষিগণ যজ্ঞের জীব। যজ্ঞের দ্বারা ঋষি, পৃথিবী ও আকাশ পবিত্র করিয়াছেন, স্বর্ষকে তাঁহার স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, পৃথিবীকে বিত্তীর্ণ করিয়াছেন। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে অতীষ্ট প্রদানে বাধ্য করা হয়। শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার, তাহাদিগের ধন সংগ্রহ করিবার উপায় যজ্ঞ ও স্তুতি; গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুকুরবাহিত বিপুল দক্ষিণা লাভ করিবার উপায় যজ্ঞ। যজ্ঞশূন্য ব্যক্তি পুঙ্খনীয় হইয়া দেবগণ তাহাকে বধ করেন। যে হব্য দেয় না তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ছায় পদদ্বারা দলন করেন।

ঋগ্বেদে যুদ্ধ-কাহিনীর ছড়াছড়ি। এই সকল যুদ্ধ ঘটনা-ছিল প্রধানতঃ জল ও উর্বরা ভূমির অধিকার লইয়া, অপরের রাজ্যভ্রম ও বিপুল ধনরাশি লুণ্ঠন করিবার লোভ হইতে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্ত দেবতাদিগের সাহায্য প্রয়োজন হইত। দেবতাদিগের সাহায্য পাইবার একমাত্র উপায় ছিল যজ্ঞ ও স্তুতি। স্তুতি ও যজ্ঞ পারদর্শী ও যজ্ঞের নেতা ছিলেন ঋষিকুল। এই জন্ত যজ্ঞার্থী রাজত্বগোষ্ঠীর নিকট অভিজ্ঞ ও ব্যাতনামা ঋষিগণের সমাদরের অন্ত ছিল না। দক্ষিণার পরিমাণও ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে অসামান্য। একজন ঋষি গর্ব করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহার দক্ষিণার পরিমাণ ছিল চারি সংখ্যায়, অর্থাৎ হাজারের উপর। গো, অশ্ব, রথ, উষ্ট্র, স্তবর্ণ, বস্ত্র, দাস ও সালঙ্কারা রাজকর্ত্তা দক্ষিণা দেওয়া হইত। দানশীল যজ্ঞমানের প্রশংসা স্বজ্ঞকারগণ পঞ্চমুখে করিয়াছেন। পুষ্যর নিকট একটি প্রার্থনা বেশ চিত্তাকর্ষক। “হে পুষ্য! তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর, তুমি রূপধের পথ দেখাইয়া কোমল কর।” কোন কোন যজ্ঞমানগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট পুরোহিতকুল ছিল। ত্রিংশ রাজা সূদাসের পুরোহিত ছিলেন ঋষিগণ, স্বজ্ঞরদিগের ভরদ্বাজগণ, পুরুদিগের কথকুল। কিন্তু কোন দানশীল রাজা যজ্ঞ করিবেন জানিতে পারিলে কখন কখন ঋষিগণ অনাহত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। এবম্ব ঋষি কুরুশ্রবণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, —আপনি যজ্ঞ করিবেন, আপনার জন্ত আমি তিনটি শোত্র চান করিয়াছি। আমি আপনার পিতার প্রশস্তিকার, আপনি আমার নিকট আসুন।

যজ্ঞের প্রাধাত্য ও বিপুল দক্ষিণা লাভের আশায় ঋষিগণের মধ্যে যজ্ঞ নেতৃত্ব করিবার আশ্রয় হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে এই ব্যাপার লইয়া ঋষিকুল বা ঋষিগণের মধ্যে কি প্রকার ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিঙ্গের উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল। ঋগ্বেদে এই ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিঙ্গের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋষিদিগের মধ্যে কুলগত শত্রুতার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বংশীয়গণ। কেহ কেহ অনুমান করেন সম্মিলিত ত্রিংশ-ভরত গোষ্ঠীর পৌরোহিত্য করিবার দাবি এই শত্রুতার কারণ। যজ্ঞ নেতৃত্ব করিবার দাবি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদাহরণ হিসাবে ভরদ্বাজগোষ্ঠীয় ঋজিখা ও অতিষাজের মধ্যে কলহের উল্লেখ করা যায়। ঋজিখা প্রথমে বলিতেছেন, অতিষাজের যজ্ঞ স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের যোগ্য নহে, উহা আমি যে যজ্ঞ করি তাহার তুল্য নহে। তার পর অতিষাজ ও তাঁহার ঋষিকগণ লাক্ষিত হটক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তার পর মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া যে আপনাকে ঋজিখা যে কুলে উদ্ধৃত হইয়াছেন সেই কুল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহাকে শাস্তি প্রদানের জন্ত অনুরোধ করা হইতেছে। ইহাই শেষ নহে। তারপর সোমকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—তুমি আমাদের রক্ষক; যখন শত্রু আমাদের ঋষিগণের কুংসা রটনা করে কি হেতু তুমি উদাসীন থাক? ব্রহ্মদ্বিষকে বিনাশ করিবার জন্ত অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ব্রহ্মদ্বিষ কথার অর্থ স্তুতি-বিষেবী। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিকে এই গালি দেওয়া হইতেছে। দেখা যায় যে একটি ঠকে বলা হইতেছে দুই জন বিবাদকারীর মধ্যে যাহার ঋষিকগণ যজ্ঞ ইঞ্জের শুব করেন সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন যে তাঁহার পৌরোহিত্যের ফলে সূদাস শত্রুগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।

ঋজিখার উক্তিতে কুলের অহঙ্কার করা হইয়াছে। একজন ঋষি বলিতেছেন, যে আমাদের ঋষিকে ঘেষ করে সে নিহত হইয়া পতিত হউক। অপর একজন ঋষি অগ্নিকে বলিতেছেন, যে কেহ আমাদের হিংসা করে তাহাদের যজ্ঞ যাইও না, তোমার অগ্নি বহুর যজ্ঞে যাইও না। একজন প্রার্থনা করিতেছেন, যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে দূর করিয়া দাও। আত্মীয় ও অনাত্মীয় শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্ত কোন কোন ঋষি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই আত্মীয় শত্রুগণ যে সম্পর্কিত কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি তাহাতে সন্দেহ নাই। ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্ত প্রার্থনা করা হইতেছে। ধার্মিক উপদ্রবকারী ঋষি-কুলভুক্ত একরূপ মনে করা যাইতে পারে। একজন ঋষি বলিতেছেন, আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ মনে করে তাহাকে বধ কর। দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষার কারণ হইয়াছে। “অন্ত দেবে অনাসক্ত” বলিয়া কোন ঋষি গর্ভ প্রকাশ করিতেছেন। কথ গোত্রীয় একজন ঋষি বলিতেছেন,—আমরা ভিন্ন অজ্ঞ কেহ কি অধি-
দ্বয়ের গুতি অবগত আছ ?

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা ও শত্রুতা কিরূপ ব্যাপক ছিল তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরোক্ষে তাহা ঋষিদিগের মধ্যে ঐক্য মতের অভাব প্রমাণ করে। এই সকল প্রমাণকে ঋষিকুল-
গুলির মর্যাদার হানিকর বা ঋষিদিগের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঋগ্বেদীয় সমাজের যে চিত্র এই সকল প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় সেই চিত্রের সম্বন্ধে ধীর ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। এই চিত্রের সমুখ ভাগে রহিয়াছেন পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ঋষিকুল, মধ্য ভাগে তাঁহাদের যজমান গোষ্ঠী বা রাজত্ববর্গ। দেবতাদিগের গুতি, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও রাজ্যদিগের প্রশস্তি রচনা করিয়া অন্ন ও যশ অর্জন করা ঋষিদিগের লক্ষ্য; পুরোহিতের সহায়তায় যাগযজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়া শত্রুর ঘন অপহরণ ও রাজ্য জয় করা রাজ্যব্যবগের লক্ষ্য। এই চিত্রের পশ্চাৎভাগে রহিয়াছে শত্রুগোষ্ঠী। দাস, দম্বা, আর্য, যজমান গোষ্ঠী, ঋষি—সকলকে জইয়া এই শত্রুগোষ্ঠী গঠিত। ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ, শত্রু-
দিগের সহিত বিবাদ, দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, নানাপ্রকার বিবাদের কোলাহলে সমগ্র ঋগ্বেদ মুখরিত।

ঋগ্বেদ ও বৈদিক আৰ্যজাতি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল মতবাদের সহিত এই চিত্রের সঙ্গতি দেখা যায় কিনা বিচার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ শ্লোক ভারতবর্ষের বাহিরে, মেসোপটেমিয়ায় বা ইরানে রচিত হইয়াছিল, আর্য জাতি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ শতকে শেষ হয়, আর্য জাতি আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি মতবাদে অনেকে দৃঢ়বিশ্বাসী। ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে দেখা যাইতেছে যে ঋষিদিগের পৌরোহিত্য ও রাজত্ববর্গের রাজত্ব পুরুষাভ্যুত্থানিক। রাজত্ব গোষ্ঠীগুলি আপনাদিগের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপ্ত। বর্গ ও দেবগণের প্রসাদ পাইবার উপায় ঋষিগণের করায়ত্ত বলিয়া যজমানগোষ্ঠীগুলি সন্তত তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্ত সচেষ্ট। ঋগ্বেদের রচনা-
কালকে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০, কাহ্নাও মতে খ্রীঃপূঃ ২০০০ বা ২৫০০ শতক হইতে খ্রীঃপূঃ ৮০০ শতক পর্যন্ত টানা হইলেও দেখা যায় যে ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে উপরের বর্ণিত অবস্থা বর্তমান। যে পুরুষাভ্যুত্থানিক পৌরোহিত্যের প্রচলন ঋগ্বেদের প্রথমাবধি

দেখা যায় তাহা গড়িয়া উঠিতে যে বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া-
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ঋগ্বেদ রচনার অন্তিমিত সময়কে আৰ্যগণের ভারতে প্রবেশের অন্তিমিত সময়ের অনেক পবে লইয়া যাইতে হয়। সেক্ষেত্রে ঋগ্বেদের কোন অংশ ভারত-
বর্ষের বাহিরে রচিত হইবার কথা উঠে না। অথবা এই অনুমান করিতে হয় যে সংঘবদ্ধ পুরোহিত গোষ্ঠীগুলি বাহির হইতে আসিয়া এদেশে বসবাস ও দেশীয় রাজত্ব গোষ্ঠীগুলিকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। একটি বিদেশীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিহীন হইয়া আপনাদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে কায়মী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রসঙ্গে পারশ্যের হাকামনীয় ও সাসানীয় আমলের Magi বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উঠাইয়াছেন। তাঁহার মতে মিডিয়ায় এই পুরোহিত সম্প্রদায় পারশ্যের রাজবংশকে আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পারশ্যে আপনাদিগের পুরুষাভ্যুত্থানিক পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদীয় পুরোহিতগোষ্ঠীও এইরূপ কার্য করিয়াছিলেন। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে Magi পুরোহিত-
গণ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেন নাই, মিডিয়ায় [redacted] হইয়া তাঁহারা সূর্য পূর্বাঙ্কলের বালধে উদ্ভূত ধর্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং সাইরাসের সময়ে মিডিয়া ও পারশ্য এক রাজ বংশের অধীনে আসিলে তাঁহারা পৌরোহিত্যের দাবি করেন ও এই দাবি হাকামনি সম্রাটগণ স্বীকার করেন। মিডিয়ায় পৌছবার পূর্বে এই ধর্ম যে পারশ্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইতিহাসের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় ঋষি কুলের অবস্থার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

আর একটি অনুমান এই হইতে পারে যে ঋগ্বেদীয় পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান এ দেশীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসা-
বশেষের উপর গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি ছিল; শুধু উহা ঋগ্বেদীয় ঋষিকুলের হাতে চলিয়া যায়। এইরূপ মতের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের শেষ দিকের রচনায়। তাঁহার মত এই যে সিঙ্ঘ সভ্যতার আমল হইতে এই পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান চলিয়া আসিতেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই।

ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে পুরুষাভ্যুত্থানিক পুরোহিতগোষ্ঠী রাজত্বগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে বিবাদ এবং ঋষিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা প্রভৃতির বিবরণ হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় তাহার অনেকখানি ঋগ্বেদ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। ঋগ্বেদে দেবতা অপেক্ষা যজ্ঞের প্রাধান্য দৃষ্টি আকর্ষ করে। সুতরাং বৈদিক ধর্মের যজ্ঞাংশকে যদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে যজ্ঞাংশের প্রবর্তন

সহিত পৌরোহিত্যের প্রবর্তন সমসাময়িক বলিয়া মনে করা যায়। এই অনুমান গ্রাহ্য হইলে দাঁড়ায় যে ঋগ্বেদীয় দেবদেবী-গণের উপাসনা ঋগ্বেদ রচিত হইবার পূর্বেও, যাহাদের লইয়া ঋগ্বেদীয় সমাজ গঠিত, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ এখানে এই ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, যে সমাজের চিত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায় সেই সমাজ ঋগ্বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

ঋগ্বেদ সহজে যে সকল ধারণা প্রচলিত আছে এই মত সেই সকল ধারণার বিরোধী, এই মত গ্রহণ করাইতে হইলে বিস্তারিত প্রমাণ করা আবশ্যিক এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু মাত্র এই মত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন আর্থজাতি সংক্রান্ত সমগ্র সমস্ত নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিতে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা দিক হইতে সমস্তর উপর আলোক প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সে যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে এই তথ্যটুকু পাওয়া যাইতেছে যে ঋগ্বেদকে আর্থজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের সহিত যুক্ত করিবার কোন স্ত্রে পাওয়া যায় না। আর্থজাতি কোন সময়ে বাহির হইতে সিদ্ধ-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করিলেও, বলিতে হয় যে ঋগ্বেদ তাহার বহুকাল পরে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আর্থজাতি যে বাহির হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিবার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক* বা অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখা যায় না।

* আগষ্ট, ১৯৪৬এর *Science and Culture* এ লেখকের "Were the Vedic Aryans Proto-Nordics?" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতের উপর ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির চাপ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের একটি প্রধান সামরিক ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যোগদান করা ভারতবর্ষের উচিত কিনা এবং সত্য সত্যই আধুনিক যুদ্ধ চালাইবার মত ভারতবর্ষের সঙ্গতি ছিল কিনা, ভারতবাসীকে সে সহজে চিন্তা করিবার বা মত প্রকাশ করিবার সুযোগ না দিয়াই ভারত-সরকার এদেশকে যুদ্ধের জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষের এই দৈরাচ্যের ফল হইয়াছে এই যে, সাধারণ ভোগ্যপণ্যাদির জন্ত পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষকে যুদ্ধের কয়েক বৎসর (যুদ্ধ শেষ হইলেও এখনও অবস্থা প্রায় একই রূপ চলিতেছে) সর্ববিধ পণ্যের অভাবে দুঃসহ কষ্ট সহ করিতে হইয়াছে এবং যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিতে এই দরিদ্র দেশ নিঃশেষ ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এদেশে শিল্পপ্রসার আশাশূন্য হয় নাই বলিয়া বিবিধ ভোগ্যপণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া ভারতবাসীর চাহিদা মিটাইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় এই পণ্য আমদানী ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমদানী যখন প্রায় বন্ধ এবং অন্তর্দেশীয় সাধারণ পণ্যাব্যয় যখন প্রবল, তখন যুগমান ভারতে নৈস্তব্ধ বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ সুরু হয়। ব্রিটিশ, মার্কিন প্রভৃতি বিদেশী সেনারাও প্রাচ্য মহাযুদ্ধের ঘাটি হিসাবে ভারতবর্ষে ভিড় করিয়া আসিতে থাকে। এ অবস্থায় সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সামরিক বিভাগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রদত্ত বড় করিয়া দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এই সব সেনাবাহিনী ও সেনাবাহিনী সংশ্লিষ্ট লোকদের চাহিদা

মিটাইতে ভারতের নগণ্য পরিমাণ পণ্যের অধিকাংশই ফুরাইয়া যায়। কাজেই অনামরিক দেশবাসী এই সময় শোচনীয় পণ্যভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে থাকে। যুদ্ধের কল্যাণে কাজ-করিবার করিয়া ইহাদেরই মধ্যে যাহারা ছুঁপয়সা করে তুলিয়াছে, বাজারের সামান্য পরিমাণ পণ্য আয়ত্ত করিতে তাহাদের দিক হইতে অপচেষ্টার অভাব হয় নাই। সচ্ছল ব্যক্তিদের এই ভোগ্যকাজ শেষ পর্যন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীকে অর্জাশন-অনশনে এবং দারুণ অভাব-অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য করিয়াছে। সমরপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে ভারত-সরকার এই সময় টাকাকে টাকা বলিয়াই গ্রাহ্য করেন নাই। এই টাকা দেশের এক শ্রেণীর লোককে রাতারাতি লক্ষপতি করিয়া তুলিয়াছে এবং কারবারী বড়-লোকদের ব্যাঙ্ক-ব্যালাল এই সময় হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। অতরিক্তে চাহিদা ও জোগানের উপর পণ্যমূল্য নির্ভর করে বলিয়া এই সমস্ত টাকার মাহাত্ম্যে ভারতের বাজারে সর্বপ্রকার ভোগ্যপণ্য দেখিতে দেখিতে অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধকালীন এই ফাঁপাই টাকা ও নিদারুণ পণ্য-ভাবের যুগকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির যুগ। যুদ্ধ শেষ হইলেও এ পর্যন্ত টাকার বাজারের নরম ভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অভাব প্রায় একই রূপ আছে, কাজেই এখনও ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের যুগ চলিতেছে বলা চলে।

আধুনিক যুদ্ধে যে দেশই অংশ গ্রহণ করে, তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতির অসুবিধা সহ করিতে হয়। যুগমান দেশে প্রচলিত মুদ্রার প্রাচুর্য ঘটে দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের

প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট অসংখ্য লোককে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন এবং এই সকল লোককে বেতন হিসাবে বহু অর্থ দিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া সাময়িক পণ্যাদি এবং সমরবিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে কোন মূল্যে কিনিয়া থাকেন। পণ্যের অভাব ঘটায় এই সময় পণ্যসমূহের মূল্যরেখা এমনিই অনেকখানি উপরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধের অবিস্থাশ্রুত খরচ চালাইতে শেষ পর্যন্ত নোট ছাপানোর ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের রক্ষণশীলতা রক্ষিত হয় না। ভারতেও মহাসমরের ফলে এই অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের ছয় বৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের প্রয়োজনে দেশে নোট বাড়িয়াছে হাজার কোটি টাকার বেশী, অথচ আগে যেমন নোটের জামিন হিসাবে সরকারী কোষাগারে স্বর্ণসম্পদ রক্ষা করা হইত, এই বাড়তি হাজার কোটি টাকার নোটের বেলা সে নিয়ম মানা হয় নাই। যুদ্ধের ঠিক আগে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিলীকৃত নোটের পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটি টাকা এবং এই নোটের পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা ছিল ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ। এই স্বর্ণ আবার তখনকার বাজার অপেক্ষা অনেক কম দরে কেনা ছিল এবং ইহার ক্রয়মূল্যই এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিলীকৃত এই নোটের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৬ সালের ১৫ই নভেম্বর ১২৫৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে, অথচ বিশ্বয়ের কথা যে, এই পর্বতপ্রমাণ নোটের পরিবর্তে সঞ্চিত স্বর্ণসম্পদ এক কাণাকড়িও বাড়ে নাই। এখনকার নোটের জামিন ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় সঞ্চিত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি কবে পাওয়া যাইবে এবং পুরোপুরি সবটা পাওয়া যাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই বলা যায় না। যুদ্ধের ষাট্যয় হস্তসর্বস্ব ভারতবর্ষ নিজেই বঞ্চিত করিয়া ব্রিটেনকে ধারে পণ্যাদি কোণাইয়া সাহায্য করিয়াছে, এই আত্মবঞ্চনার ফলে ভারতে খ্রিশ-পয়খ্রিশ লক্ষ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলি জমিয়া উঠিয়াছে এই বিচিত্র সাহায্যদানের বিনিময়ে। হাং হটক, মোটের উপর ষ্টার্লিং সিকিউরিটি এখন একেজো কাগজী ঋণপত্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং ভারতের সহস্রাধিক কোটি টাকার প্রচলিত নোটের জামিন হিসাবে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে রক্ষা করা ভারতের মুদ্রানীতির পক্ষে শুধু অসম্মানই নয়, ইহা মুদ্রানীতির নিরাপত্তার দিক হইতেও বিপজ্জনক।

এক বৎসরের বেশী হইল যুদ্ধ ধামিরাছে, পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশ ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করিবার জটীল নানা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন; অত্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গের কথা এদিক হইতে ভারত-সরকারের আশীর্বাদে কোন কর্মকুশলতা এখনও

দেখা যাইতেছে না। ষ্টার্লিং পাওনা জমিতে দেওয়া ভারতের শোচনীয় মুদ্রাস্ফীতির অত্যন্ত প্রধান কারণ। ভারতবর্ষ ধারীন হইলে এই অজায় পাওনা জমিতেই পারিত না, আর কার্য-গতিকে জমিলেও যুদ্ধ ধামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাওনা অবিলম্বে আদায় করিবার জন্ত ভারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, আগের মতই এখনও সর্বদ্বারা ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে পণ্যাদি যোগাইয়া চলিয়াছে এবং ফলে ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এখনও বাড়িতেছে। ভারতের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় এবং সাধারণভাবে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করিলেও সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, তজ্জন্তও ভারত হইতে এইরূপ ধারে পণ্যপ্রেরণ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। ভারতের যুদ্ধকালীন পণ্যাব্যয় এখনও এতটুকু কমে নাই, বরং খাদ্যদ্রব্যাদির স্বচকসংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, দেশের গরীব ও মধ্যবিত্তের দল এখন যুদ্ধের সময়কার তুলনায় আরও বেশী কষ্টে দিন কাটাইতেছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দর ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১০০ ধরিলে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্বে খাদ্যমূল্যের এই স্বচকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৪, অথচ যুদ্ধ শেষ হইবার বৎসরাধিক কাল পরে ১৯৪৬ সালের ১৬ই নবেম্বর খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যহারের স্বচকসংখ্যা ২৬২ হইয়াছে। এদিকে সাময়িক প্রয়োজন শেষ হওয়ার এখন প্রত্যহই বহু লোক বেকার হইতেছে। দেশের আর্থিক বাজারে যখন এই ভাবে মন্দাভাব প্রসার লাভ করিতেছে, তখন মুদ্রাস্ফীতি অবিলম্বে প্রতিরোধ করা গবর্ণমেন্টের অবশ্য কর্তব্য। গবর্ণমেন্ট খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাদির দাম যখন অন্ততঃ তিন গুণ, তখন এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীকে তুষ্ট করা কেমন করিয়া সম্ভব? ইহার উপর আবার বাহাদুর হাতে পণ্যনিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের সততার উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায় না। কাজে কাজেই এক দিকে যখন শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে দেশে বেকার সমস্তা ও মন্দা বাজারের দ্রুত আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইতেছে, অত্র দিকে তখন খাদ্যাদি বিবিধ ভোগ্যপণ্যের অনটন তথা মূল্যবৃদ্ধি সমান ভালে চলিতেছে। উপরে খাদ্যমূল্যের যে স্বচকসংখ্যা দেখা হইল তাহা ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার বিজ্ঞপ্তি হইতে উদ্ধৃত। এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত এবং কেবল মাত্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যতালিকা হইতে জিনিষ-পত্রের দাম ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। বলা বাহুল্য, শহর অঞ্চলে এবং বিশেষ করিয়া বাংলা প্রভৃতি যুদ্ধের সহিত খনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত প্রদেশে অসাময়িক অধিবাসীর পক্ষে এই মূল্যহিসাবে খাদ্যাদি লাভ করা সম্ভব নহে। এখন যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্তা ও আর্থিক মন্দাবাজারের চাপে দেশ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে,

এখন এই মূল্যরেখার ক্ষীতি নিঃসন্দেহে অসংখ্য দেশবাসীর জীবনধারণ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত করিয়া তুলিবে।

ভারতে যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিতে হইলে বর্তমান কাঁপাই টাকার বাজারের উপর গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। ভারতের অসংখ্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত অধিবাসীর আয় যখন কমিতেছে এবং ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্ত পণ্যমূল্যরেখা যখন নামিতেছে না, তখন ধনীদেব বা অবহাণর দেশবাসীর হাতে টাকা বাড়িতে দিলে দেশে চোরাবাজারের প্রসার, ক্রমবর্ধমান পণ্যভাব এবং পণ্য-মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। ছুংখের বিষয়, ধনীদেব হাতের নগদ টাকা কমাইবার জন্ত ভারত-সরকার এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ভারতে তাঁহারা যদি এখন যথেষ্ট শিল্প-প্রসারের সুযোগ দিতেন, তাহা হইলে এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ধনীদেব বহু টাকা আটক পড়িতে পারিত। অবশ্য ভারতের বর্তমান অন্তর্ভুক্ত সরকার এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইন্ড্র মারফৎ ভারত-সরকারের এ সম্বন্ধে কর্তৃনীতি অত্যন্ত হতাশাজনক। ভারতে সোনার দর যদি অপেক্ষাকৃত কম হইত, তাহা হইলেও ধনীরা সোনা কিনিয়া কিছু টাকা হস্তান্তর করিতেন। ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে আঠারো শত কোটি টাকার ষ্টালিং পাওনা লগুনে একেজো ভাবে আটকাইয়া আছে, তাহা অবিলম্বে ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা হইলে এবং তদ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইলে ভারতে নূতন শিল্পযুগের প্রবর্তন করা যায় এবং এই শিল্পবিপ্লব সম্ভব হইলে এক দিকে যেমন অসংখ্য দেশবাসীর কর্মসংস্থান তথা জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, অল্প দিকে তেমনই বিবিধ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া পণ্যের মূল্যরেখা অবশ্যই নামিয়া আসে। মোটের উপর ভারত-সরকারের এখন সুস্পষ্ট একটি মুদ্রাসঙ্কোচন নীতির একান্ত দরকার। ভারতে যত দ্রুত যন্ত্রশিল্পের প্রসার হইবে, ততই বাজারে পণ্যের জোগান এবং অর্থের অন্তর্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা একটু ভাল হইবে। এইভাবেই বর্তমান সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুর্ভোগ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটাইবার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত অত্যাৱশ্যক ভোগ্যপণ্য কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক। জনসাধারণের আয়ভাধীন মূল্যরেখার সকলের মধ্যে সমান হারে এই সব জিনিস বণ্টিত হইবার ব্যবস্থা হইলে শিল্পপ্রসারে সমস্ত দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা লাভ সহজ হইবে, অত্যাৱশ্য দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী যদি ঈর্ষাক্রিষ্ট হইয়া যত্নমুখী হয়, তবে এই শোচনীয় পরিস্থিতি দেশের সমগ্র ব্যবসায়িক ও অর্থনীতির উপর তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। ভারতবর্ষের পণ্য বা পণ্যমূল্য

নিয়ন্ত্রণ নীতি ধাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের কর্মনিষ্ঠা বা যোগ্যতার উপর দেশবাসীর কোন শ্রদ্ধা নাই। পণ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমানে সুপরিচালিত হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যাৱশ্যক এবং এই ব্যবস্থা সার্থক করিতে হইলে যোগ্য, নির্লোভ ও চারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের হাতে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের উপর ভারতের মুদ্রা-নীতি ও মুদ্রাবিনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার লগু। যুদ্ধোত্তর কালে এখনও তাঁহারা যেভাবে মুদ্রানীতি পরিচালনা করিতেছেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে কেহই অভিনন্দিত করিবে না। ভারত-সরকার অত্যন্ত অত্যাৱভাবে যুদ্ধোত্তরকালে এখনও নিরন্তর ভারত হইতে ব্রিটেনকে ধারে মাল পাঠাইতেছেন এবং তৎ-পরিবর্তে একেজো কাগজী-প্রতিশ্রুতিপত্র ষ্টালিং সিকিউরিটির অঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের কর্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার নীতির পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ শীঘ্র কমিবে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতের ছায় অসম ধনবর্তন-ব্যবস্থা সমন্বিত দেশে মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইলে ধনীদেব হাতের নগদ টাকা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে করিতেই হইবে। ভারতের আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার দরিদ্রদের মুখ চাহিয়া কোনকালে কাজ করেন নাই, একেজোও ধনীদেব হাতের টাকা কমাইয়া বর্তমান চড়াবাজারে দরিদ্র ও মধ্য-বিত্তদের কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দিতে তাঁহাদের অনিচ্ছাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতিরিক্ত মুনাফা-কর উঠিয়া গিয়াছে, আয়করের হার কমিয়াছে, মোটের উপর ধনীদেব অবস্থা সচ্ছলতর করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত-সরকার টাকার বাজার সম্পর্কেও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সরকারী ঋণপত্রসমূহের সুদের হার উপর দিকে থাকিলে বিভ্রাটী ব্যক্তিরা সহজেই বেনী লাভের আশায় অল্প টাকা সরকারী ঋণপত্রাদিতে লগ্নী করিতেন; ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্ত ভারত-সরকারের এই টাকার এখন প্রয়োজনও আছে যথেষ্ট। শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারিত না হওয়ায়, বলিতে গেলে ধনীরা এখন টাকা খাটাইবার জায়গাই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভারত-সরকার কিন্তু এই সময় হঠাৎ ঋণপত্রসমূহের সুদের হার কমাইয়া দিতে সুরু করিয়াছেন। এই ভাবে মেয়াদহীন সাড়ে তিন টাকা সুদের কেঁপানীর কাগজ তাঁহারা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা সুদের ঋণপত্র বাজারে ছাড়িতেছেন। এখন টাকার বাজার যেরূপ নরম তাহাতে এই সমস্ত টাকার বাজারে সুবিধা গ্রহণের ফলে সরকারের সুদের দরুন বৎসরে কয়েক কোটি টাকা অবশ্যই বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু বৎসরে চার-পাঁচ কোটি টাকা বাঁচাই-

বার মোহে তাঁহারা দেশের সমগ্র অর্থনীতির অনিবার্য বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। সরকারী ঋণপত্রের অল্প হ্রদের জ্ঞাত ধনিক সম্প্রদায়ের এই ঋণপত্র সবচেয়ে উৎসাহ্য ধাক্কার কথা নয়, অথচ তাঁহারা হাতের বিরাট পরিমাণ টাকা একেবারে একেজো ভাবে বসাইয়া রাখিতে পারেন না। কাজেই একাংশ ব্যাঙ্কে রাখিয়া এবং সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতিতে লগ্নী করিয়া বাকী টাকা তাঁহারা বাড়ী, জমি, ভোগ্যপণ্য, সোনাকল্প বা শস্যের বাজারে খাটাইতেছেন। তাঁহাদের এই খুঁকিদারী কারবারের ফলে প্রত্যেক জিনিষেরই অবিখ্যাতভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সবই অগ্রিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য যদি চাহিদার চাপে শস্য বা মোটর গাড়ীর দর বাড়ি তাহাতে সাধারণ লোকের তেমন কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু চাহিদা বাড়িবার জ্ঞাত বাড়ী, জমি, সোনাকল্প এবং বিবিধ প্রকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাওয়ায় গরীব-গৃহস্থ দেশবাসী বর্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অল্প কয়েকজন ধনীর ধার্থে দেশের অসংখ্য লোককে এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে দেওয়া যে গভর্ণমেন্টের পক্ষে কৃতিত্বের কথা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৪০ লক্ষ লোক বেকার হইতেছে। ইহারা ছাড়া আরও অনেকের আশ্রয় যুদ্ধবিরতির জ্ঞাত সঙ্কচিত হইয়াছে। পণ্যের বাজার সজ্জা হয় নাই বলিয়া সপরিবার এই সব কর্মহীন ব্যক্তি জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ভার-বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন এখনও বন্ধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এদেশের কয়েক কোটি লোকের জীবিকা-নির্বাহ ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। এদিকে গবর্ণমেন্ট শুধু ধনীদিগের হাত হইতে টাকা টানিয়া লইবার জ্ঞাত বেপরোয়াভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বাড়াইতে চলিলেও দেশের আর্থিক বাজারে মন্দাভাব দেখা দিবে এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পাওয়ার জ্ঞাত পণ্যাদি উৎপাদন করিতেই লোকে ভয় পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ অনিবার্য এবং তাহাতে বেকার সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্ত আরও জটিল হইয়া উঠিবে। কাজে কাজেই এখন দেশবাসীকে সাধারণভাবে বাঁচিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের মধ্যপন

অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার গবর্ণমেন্টের ব্যয় অনেক কমিয়াছে, এখন আশ্রয় বীরে বীরে কমানিয়া গবর্ণমেন্টের উচিত উদ্বৃত্ত অর্থ দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের জ্ঞাত উৎসাহ দেওয়া। এদেশে কল-কারখানা বাড়িলে বহু বেকারের কর্ম-সংস্থান হইবে, কৃষিনাতি সংস্কৃত হইবার ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইবে, পণ্য উৎপাদন ও লোকের ক্রয়-ক্ষমতা একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধা তখন আর থাকিবে না। ব্রিটেনকে ধারে পণ্য-জোগাইয়া বুড়ুকু ভারতকে যত্নের যুগে ঠেলিয়া দেওয়ার আর কোন অর্থ নাই, ভারতের সর্বনাশের বিনিময়ে যে ঠালিং পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাও আর ফেলিয়া রাখা অযৌক্তিক। এই ঠালিং সিকিউরিটি সঙ্কল্প বন্ধ করিয়া ভারত-সরকার যদি যথাসম্ভব পাওনা ঠালিংগুলি আদায়ের জ্ঞাত ব্রিটেনের সহিত বোঝাপড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই ঠালিং বিনিময়ে তাঁহারা বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকার যন্ত্রপাতি, ষাণ্ডার্য ও বিবিধ অত্যাৱজ্ঞক ভোগ্যপণ্য আমদানী করিয়া অল্পকালের মধ্যেই দেশবাসীর হাত হইতে কয়েক শত কোটি টাকা টানিয়া লইতে পারেন। এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলে ভারতে যে বাড়তি টাকা থাকিবে, তাহা কাজে-কারবারে লগ্নী থাকিয়া ও দেশবাসীর উপকারে আসিয়া মুনাকা উৎপাদন করিবে। এইভাবে অর্থের প্রচলনগতি যদি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ, দেশে বাড়তি টাকার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পণ্য-উৎপাদনবৃদ্ধি চলে এবং সার্বজনীন কর্মসংস্থানের দৌলতে সাধারণ দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, সেই অবস্থাকে অবস্থাই মুদ্রাস্ফীতির যুগ বলা চলিবে না। ভারতবর্ষের জায় বিংশদে দেশে বাজারে কয়েক শত কোটি টাকার নোট চালু হওয়া সমস্তাই নয়, যদি সেই মুদ্রাস্ফীতির সহিত সমান হারে দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ি এবং নিরন্তর অসংখ্য দেশবাসীর প্রসারিত শিল্প-বাণিজ্যে কর্মসংস্থান হয়। ভারতে শুষ্কতর রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটতেছে। আশা করা যায়, জনগণের প্রতিনিধিমূলক সরকার অতঃপর পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার কর্তৃক অহুস্ত নীতি পরিত্যাগ করিবেন এবং দেশ-বাসীর মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন সমস্যার সমাধান করিবেন।



বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

ঝুমুর গান

উচ্চ বর্ণের মধ্যে ঝুমুরের বিশেষ প্রচলন নেই; ঝুমুর চলে তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যে। মুচি, ভোম, মেথর; অদিবাসীর মধ্যে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা—এদের সকলের মধ্যেই বিভিন্ন ঝুমুরগানের প্রচলন আছে। কাংরা জাতির মধ্যে মেয়েরা মাঝে মাঝে ঝুমুর গায়। পাল-পত্রে ঝুমুর হয়ে থাকে, তবে ঝুমুরের আদর সবচেয়ে বেশী হোলির সময় এবং তারপর করমা, জিতিয়াতে। বিবাহ এবং সন্তান-জন্মোৎসবেও সমাজের দশ জন একত্রিত হয়ে ঝাওয়া-দাওয়া যখন হয়, তখন ঝুমুর চলে প্রায় সমস্ত রাত্রি। নিম্ন জাতির মধ্যে মেয়েপুরুষ একত্রিত হয়ে ঝুমুর গায়—সঙ্গে বাজ মাদল কখনও-বা এক-আধটা বাঁশীও থাকে। অদিবাসীদের মধ্যে মাদল ও বাঁশীর প্রচলন বেশী এবং বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এ দুটির যিষ্টতা অল্প কোন বাদ্যযন্ত্র থেকে কম নয়। বিহারে উচ্চবর্ণে গৃহে মাদলের শব্দ কখনও শুনি নি, কিছুটা বাঁশীর সুরও শুনেছি; কিন্তু এদের বেলায় সে কথা বলা চলে না।

একত্রিত হয়ে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে স্বল্প অঙ্গভঙ্গী সহকারে মেয়েপুরুষে ঝুমুর গায়। প্রধান গায়ক বা গায়িকা গান আরম্ভ করে, তারপর সকলে ধুয়ো ধরে—একটি পদ বারকয়েক গাওয়ার পর অল্প পদ থাওয়া হয়। ঝুমুর ওলি সাধারণতঃই খুব ছোট-ছোট হয়।

বিহার ও বাংলায় দীঘরেখা হীন হলে ঝুমুরের প্রলেব আছে খুব বেশী। বাংলা ঝুমুর-গান শুনেছি মানচুম পুন্ডলিয়ার গাওয়া হয়। সত্য বলতে কি ঝুমুরের বাংলা, তথা টেট হিন্দির সঙ্গে পার্থক্য খুব বেশী নেই। আমার মনে হয় হিন্দী ভাষায় অল্প লোকও কিছু কিছু বুগতে পারবেন এ ভাষা। এই স্বত্রে মনে পড়ল দু-ছত্রের একটি ঝুমুর-গান—গেয়েছিল একটি তরুণী, জাতিতে মেথর; মেয়েটি বাঙালী নয়, সম্পূর্ণই বিহারী। গানটি শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ঐ মানচুম পুন্ডলিয়ার কোন বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে হয়ত গানটি তার শেখা। উচ্চারণে ‘স’-এর বাংলা উচ্চারণ না করে প্রকৃত উচ্চারণ করলে যেমন শোনায় ঠিক সেই উচ্চারণে গানটি গাওয়া হয়েছিল। উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

“এক পরসার পুঁটি মাছ দুয়ারে বসে বাছি গো
তাঁহার দিগে পিঠ করে নন্দ সঙ্গে হাসি গো।”

শুধু শব্দ নয়, বিভক্তি যোগও বাংলা ভাষায় অস্বাভাবিক। অবশ্য ভাষার মহাশয়ের সামান্যসামান্য হাসা—বাংলা, তথা বিহারে সর্বত্রই নিষিদ্ধ। বিধানও এক—পেছন ফিরে যদি বলা যায় তবে হাসা চলতে পারে।

চক্রাকারে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে গান চলে। তালে

তালে দু-তিন পর এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া হয়। কখনও বা সামনে ঝুঁকে নাচের ভঙ্গীতে হস্ত-সঞ্চালনও হয় যেমন—কোমরে দুটি হাত অথবা একটি হাত নিঃসর চিবুক, অপরটি কোমরে, অথবা একটি হাত কোমরে অল্প হাতটি বিভিন্ন ভঙ্গীতে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে, এই ভাবেই অঙ্গভঙ্গী চলে ঝুমুরের সঙ্গে। মেয়েরা সাধারণতঃ এক দিকে এবং পুরুষেরা অপর দিকে দাঁড়ায়। কখনও মেয়েরা পরস্পরের কোমর ধরে নাচে। সবচেয়ে সুন্দর দেখতে তাদের পদক্ষেপ, একেবারে মাথা-জোখা এবং নিখুঁত তালে ওঠে পড়ে পায়ালি। এই মনোহর ভঙ্গীসমূহ ব্যতিক্রম নয়—অদিবাসী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই নিখুঁত নাচই স্বাভাবিক। তরুণ-তরুণী থেকে আরম্ভ করে মধ্যবয়সী, এমন কি স্বল্প-বৃদ্ধারাও নাচগানে যোগ দেয় এবং তা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি বয়স্কদের মধ্যে ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে থাকে তবে তো তার খ্যাতির ইঙ্গার বন্ধ। স্পষ্ট দেখা যায়, সকলে তাকে খোশামোদ করছে রীতিমত এবং তার কাছে ধমক খেয়ে হাসিমুখে ভুল শুধরে নিচ্ছে।

ঝুমুর-গানের শেষ পঙ্ক্তিকে ‘ভণিতা’ বলে। একই ভণিতা বহু বিভিন্ন পদের শেষে গাওয়া হয়,—

যে দিন রাজা রসিক মরলৈ।

রাজা হো—আখাড়া তো শুনা হো গেলৈ।

মাটিকে মন্দরবা হো মধুরী বিয়া গেলৈ

বাঁশ রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ।

(ভণিতা)—নারায়ণ সিংগা বোনে—এ বুধা গোবিন্দা জানে
রাজাহো বাঁশ রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ।

গানট করুণ রসের। বেদিন রাজা রসিকের মৃত্যু হ’ল—
‘আখাড়া’ (রাজপ্রাসাদ নয়) শূণ্য হয়ে গেল। তাঁর
মৃত্তিকানির্মিত বাদ্যযন্ত্র মাদলে পোকা-মাকড়ের বাস হ’ল
আর তাঁর বাঁশের বাঁশরীতে ঘুণ ধরে গেল। ভণিতা হচ্ছে :
নারায়ণ জানেন (সিংগা বোনে—সম্ভবতঃ সাঁওতালী ভাষা)
এবং গোবিন্দও (?) জানেন যে বাঁশীতে ঘুণ ধরে গেল
ইত্যাদি।

“হরদি হরদি পুরা পাটন গো—

বাসি বৈতৈ কৌসালি রাংগাবা।

খোরী মাঝে কুঁয়ার খোঁড়াবা দৌড়ায়লে

গিন্ন গেলো তোহার ফুলহার।”

“আবহি আছে কুঁইয়া পানিহার,

বিছি দেহো হমর ফুলবা কে হার।”

“মাইয়া তোরা বিছতো, বহনিয়া তোরা বিছতো

বিছি দেতো তোরা বারি বিহারিয়া।”

জল-কর্ধমপিছিল পথে কুমার খোঁড়ায় চড়ে চলেছেন। তাঁর

ফুলহার পড়ে গেল কণ্ঠ হতে। হৃদয়ে লাল রঙে রঙানো বজ্রাদি খারাপ হয়ে যাবে তাই তিনি যারা কুপে জল তুলতে এসেছে সেই মেয়েদের ডেকে বলছেন—“ওগো পানিহারীরা, আমার মালাটা তুলে দাও।”—মেয়েরা রেগে উঠে উত্তর দিচ্ছেন, “তোমার মা বোন তোমার হার খুঁজে দিক—তোমার প্রথম বিবাহের যে বধূ সে খুঁজে দিক—আমাদের কি দায়?”

গানটির ‘ফুলহার’ অবশ্যই রূপক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, না হলে অকারণে মেয়েরা এত চটেই বা যাবেন কেন, এবং ফুলহারের জন্তে কুমারই বা এত ব্যাকুল হয়ে মেয়েদের অহরোধ-উপরোধ করতে যাবেন কেন?

বলা বাহুল্য, কুমুর-গান সবই প্রায় তরল সুর ও ভাবে রচিত। তা ছাড়া নরনারীর প্রেমই অধিকাংশ গানের বিষয়-বস্তু। শোক-সঙ্গীতের এই গানগুলিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

হাঁথে গুলালিয়া মুখে মুরলীয়া,

চিরিয়া মারায় গেলে পিয়া।

সভে চিরাইয়া মারিহো হে পিয়া

কৈল চিরিয়া না মার।

ভাঁসিহে সিঁধা পুর বিছাইবো হে পিয়া

শুন না নহি করিহো অম্বা ভার।

হাতে গুলতি মুখে বাঁশী নিয়ে প্রিয় যাচ্ছেন পাখী-শিকারে। বধূ বলছেন—“সব পাখী মের, কিন্তু কোয়েল মের না। কচি কচি পাতা দিয়ে যখন শয্যা রচনা করব তখন আমার ডালে যদি কোয়েলের গান না শোনা যায় তবে বড়ই খেদের বিষয় হবে।”

চন্দনগাছ বড়ি সেবলো,

সজ্জনী হে সে হো ভেলো সিঁধাকে গাছ।

ফুলবা ফুটলৈ কচনাল।

লুভু দল ভুমরে পচাশ

রস লৈলে উড়ল আকাশ।

“কত যত্নে চন্দনগাছ করলাম, হে সখী, দেখলাম সে গাছ সিঁধার। ফুল ফুটলো কচনাল। ফুলের লোভে ভ্রমরেরা এল এবং মধু নিয়ে উড়ে গেল—”

“এহি পারে গঙ্গা, ওহি পার যমুনা

বিচ গাঙ্গে ফুটলৈ গৈদা ফুল গো।

ওনেসে আওয়ে মালিনী বেটীয়া

তোড় দিহা ওহি গৈদা ফুল গো।”

“কৈসে তোড়টৈ ওহি গৈদা ফুলবা

সরপাহি ডাঁসত হমে গো।”

“পূরব পশ্চিম সে বৈদ মাগাটৈ

হাঁধ রসে বিষ্ ঝারটৈ গো।”

“গঙ্গা-যমুনার মাঝ গাঙ্গে গাঁদা ফুল ফুটেছে—মালিনীকে বলা হচ্ছে ঐ ফুল এনে দাও। মালিনী উত্তর দিচ্ছে, ওখানে সাপ

আছে, আমার কাটবে। উত্তর হ’ল, পূর্ব-পশ্চিম হতে বৈদ্য আনাব সাপের বিষ ঝাড়বার জন্তে।”

“ভেলো ভিন সারিয়া মুরগা দেলো বান্

ধনী হে জিয়ালাম।

কোরিল বেটী অদন বাঢ়াবে গো।

অদন বাঢ়াতে আঁচর খরক গেলৈ

কুমার কান্ধে আয়ে গো।

কি তোহি রাজা কান্ধী চালামবে

হমরে আঁচর বিধ মাভল্।

তোহারি আঁচর বিধ্ মাভল হে—

ধনী জিয়ালাম

অঁতরি মঁতরি বিধা মারবৈ গো।”

ভোর হয়েছে—মুরগীর ডাক শোনা গেল। ধনী (বধূ) অদন খাট দিতে আরম্ভ করেছে। নীচু হয়ে হয়ে কাজ করতে করতে তার অঞ্চল সরে গেল। কুমার কটাক্ষপাত করছে। তা দেখে ধনী বলছেন—“আমার অঞ্চলে বিষ আছে—কটাক্ষপাত করে আর কি করবে? উত্তর হ’ল, “ধনি। তোমার অঞ্চলে বিষ মাখানো আছে বটে, কিন্তু আমি মজ্র দিয়ে বিষ নষ্ট করব।”

“অম্বা পাতা লম্বী লম্বী বেলপাতা চাকর

কৈসন বরে দেলে বাবা মোছ দাড়ী পাক।”

কছার সবেদ-উজ্জি শুনে বর তাকে খোশামোদ করছে—

“যে ভো টাকা লাগে গুনগারী

গো ভালো নারী।

এবে না ছোড়িব জিমেদারী।

ছয়ারে বান্ধিব হাতী আনিব শতলারী।”

“ওগো ভাল মেয়ে, যত টাকাই লাগুক আর তোমায় ছাড়ছি না। ছয়ারে হাতী বাঁধবো, তোমার জন্তে শতনরী হার আনব যাতে তুমি ভুট্ট হও।”

ছয়ারে হাতী বাঁধা হলে এবং শতনরী হার পেলে বুদ্ধ বরের খেদ নিশ্চয় আর থাকবে না।

“ঘুমতে ফিরাতে রহে বিচে ডাহরী

চুন চুন বান্ধত রহে টেট পাগড়ী।

• পানিয়াকে যাত্ রহি শিরে গাগরী

বিচ্ ঠিনা ভেলো ভেট

কৈসন মস্ধরী।

রৌরে কে কাঁচে উমর,

হমরো কাবরী।

রৌরে হমরে লাল

কৈসন মস্ধরী।”

“মাঝরাত্তায় ঘোরা-ফেরা করছে—সৌখিন করে মাধায় পাগড়ী বাঁধছে। আমি যাচ্ছি মাধায় কলসী নিয়ে জল আনতে

এমন সময় দেখা হ'ল পথে। এ কেমন আচরণ। তোমার হ'ল অন্ন বয়স, আমার বয়স বেণী, তোমার সঙ্গে আমার আবার হাসি-ঠাট্টার সম্বন্ধ কি ?”

কাঁহা শোভে বাজুবন্ধ কাঁহা কদনবা

কাঁহা শোভে নীল সাড়ী

হো গৌরী কে বদনবা।

বাহে শোভে বাজু হাঁথে কদনবা

অঙ্গে শোভে নীল সাড়ী।

গৌরীকে হো বদন

ক্ষণে ক্ষণে মন পরে হো সজ্জন।

বাজুবন্ধের এত শোভা কোথায়—কঙ্কণেরই বা এত শোভা কোথায়, আর নীল শাড়ী—সে আমার প্রিয়। তার উপর গৌর মুখখানি। বাহুতে বাজু, হাতে কঙ্কণ, অঙ্গে নীল শাড়ী আর গৌর মুখখানি, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে সেই মুখ।

সেই বদন ন দেখি ছুনিয়া আঁধারি

গৌরী কে বদন যৈসে ফুল চম্পাকলি।

কানে কুণ্ডল শোভে নাকে বেশরী

ভোহারি সুরত হুঁ বিসরে ন পারি।

ধরতী পর ঠায় ভেঙ্গু ধরতী কাঁপলি

যৈসে ছুনিয়া আঁধারি।

“সেই গৌর মুখখানি না দেখে ছুনিয়া অন্ধকার, গৌরীর মুখখানি যেন চাঁপার কলি। কানে কুণ্ডল, নাকে বেশর। হায়, তোমার মুখখানি আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয়, জগৎ অন্ধকার আর পায়ের তলায় ছুঁমি কাঁপছে।”

অত্ন দিকে বিরহিণী গাইছেন—

“পরল বিপত্তি দূতী

ক্ষণ ক্ষণ মন পরে শাঁবল মুরতী।

বড় ছুঁ পরল প্রাণ

হরি গেল মধু বন।

নিতি পাবন পিষি বৈবু জ্বর পিষি

কেদলী সরিখে মোর যৈসে কাঁপে প্রাণ।”

“বড়ই বিপত্তি হ'ল—ক্ষণে ক্ষণে সেই স্থামল মুরতি মনে

পড়ে। হরি মধুবনে গেছেন—প্রাণে বড়ই দুঃখ। আমি বিষ খাব, এ বিরহ সহ্য হয় না—আমার প্রাণ অহরহ কদলী-বৃক্ষের মত কাঁপছে।”

তারপর—

“সবদিন হে হরি,

শুনলু আপন করি,

আজ রৌরে তো শুনলি বিরান।

রৌরে বিনা তো ন বসে পরান।

দয়া করো সার্ব বিহান।”

চিরদিন আপন বলে মেনেছ আজ পর করে দিলে। তোমায় ছেড়ে তো প্রাণ বাঁচেনা, সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় কৃপা কর।

ভাদ্র মাসের ‘করমা’ পর্বের বুয়ুর গাওয়া হয়—সেগুলি একটু গভীর ভাবের গান। তার থেকে দুটি গান এখানে দেওয়া হচ্ছে।

“আঁহতর জরো রাধা দিন রাত

অহে সুন্দর সাধী।

ধন মাধে ধান,

সম্পত্তি মাধে গাই,

বেটী নহিতো সভ ধন ছাই।”

বক্ষ্য রমণী গাইছেন—“দিবারাত্র আমার অন্তর জলে পুড়ে গেল। ধনের সেরা হ'ল ধান আর সম্পত্তির সেরা হ'ল গাভী। কিন্তু পুত্রসন্তান যদি না থাকে তবে সব ধন-সম্পত্তিই বৃথা।”

“যেদিন কৃষ্ণ তোহার জনম ভেলো

ভরলে ভাদোয়া কে রাত

আগিয়া খোজাতে কাঠীয়া ন মিলেই

বড়ি ছুঁখে কাটবৈ হো রাত।

জিরাওয়া জোয়াইন কে বরসি ভরবো হে—

মহরি মহরি উঠে বাস—

ছুঁখে ন কাটাইবে হে রাত।”

“শিশু কৃষ্ণ জন্মালেন ওরা ভাদ্রের রাতে, আগুন নেই, বড় কষ্টেই রাজি কাটাতে হবে।—অন্তে বলছেন, জিরা জোয়ান দিয়ে আগুন তৈরি করবো, সুগন্ধে ঘর ভরে যাবে—রাজি তোমার ছুঁখে কাটাতে হবে না।”

নব আবির্ভাব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বহু, বহু দিন পরে—। যার লাগি এত অধেষণ,
সুহৃৎ পথে যাত্রা, যার তরে হুঃসাধ্য সাধনা,
সুহৃৎ এই ভ্রত, যার লাগি এত আরাধনা,
যার তরে এ তপস্বী, যুগে যুগে এত আয়োজন,
সে কি এল কাছে? এল, এল না কি সেই শুভক্ষণ?
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগমনী তার গেছে শোনা?
হবে কি সার্থক আজ সব দুঃখ, সকল সাধনা?
বাহুভের পাব দেখা? চরিতার্থ হবে কি জীবন?

হে ভ্রতী কোরো না ভয়, পূর্ণ ভ্রত হবে এত দিনে,

শোন অভয়ের বাণী, দূর হোক সংশয়ের ব্যাধা,

দীর্ঘ বিস্মরণ পরে চিরপ্রিয় লহ আজ চিনে

—চির পরিচিত। দেখ, নববেশে এল সে দেবতা।

জামিল মুচ্ছিত প্রাণ, বাজে বার্তা হৃদয়ের বীণে—

এল সে, এল সে আজ, যুগান্তরে এল স্বাধীনতা।

যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-ঘাটি সম্প্রসারণ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক সম্প্রতি আমেরিকার সর্বত্র বিমান-ঘাটি নির্মাণের জন্য ৫০০০ লক্ষ ডলার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া এক আইন পাস হইয়াছে। তদনুসারে আগামী সাত বৎসর ধরিয়া বিমান-ঘাটি নির্মাণ-প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে, স্থির হইয়াছে তিন হাজারেরও অধিক বিমান-ঘাটি নির্মিত হইবে। উক্ত বিধি অনুসারে একদিকে যেমন নূতন ঘাটি নির্মাণ করিতে হইবে, অপরদিকে যেমন পুরনো ঘাটিগুলিরও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। এই উভয়বিধ কার্যের জন্য ষ্টেট এবং মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহকে ১,০০০০ লক্ষ ডলার খরচ করিতে হইবে। ষ্টেটসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন এবং লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই অর্থের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিতরণ করিবেন। এই সঙ্গে আলাস্কা, হাওয়াই এবং পোর্টো রিকোর বিমান-পথের জগুও আরো ২০০ লক্ষ ডলার ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ ঘাটি লক্ষ লোক বৈমানিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। সময় জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা সাতাশ ভাগ বিমানযোগে উড়িতে ইচ্ছুক। সরকারী বিমান বিভাগের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০ আর ব্যক্তিগত-ভাবে ৩২,২০০ জন লোকের বিমান আছে।

বিগত বিশ্ব বৎসর যাবৎ বৈমানিক বাণিজ্যের কার্য-কারিতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে মাত্র ৫০০টি ছোট ছোট বিমান-ঘাটি ছিল, আর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশের সর্বত্র চার হাজার বিরাট বিমানবন্দর স্থাপিত হইল। এই পনের বৎসরের মধ্যেই ২,৫০০,০০০ মাইল ব্যাপী বিমান-পথ ২৫,৫০০,০০০ মাইল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইল, আর যাত্রীসংখ্যা ২০ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৫,১৩৮,০০০তে দাঁড়াইল।

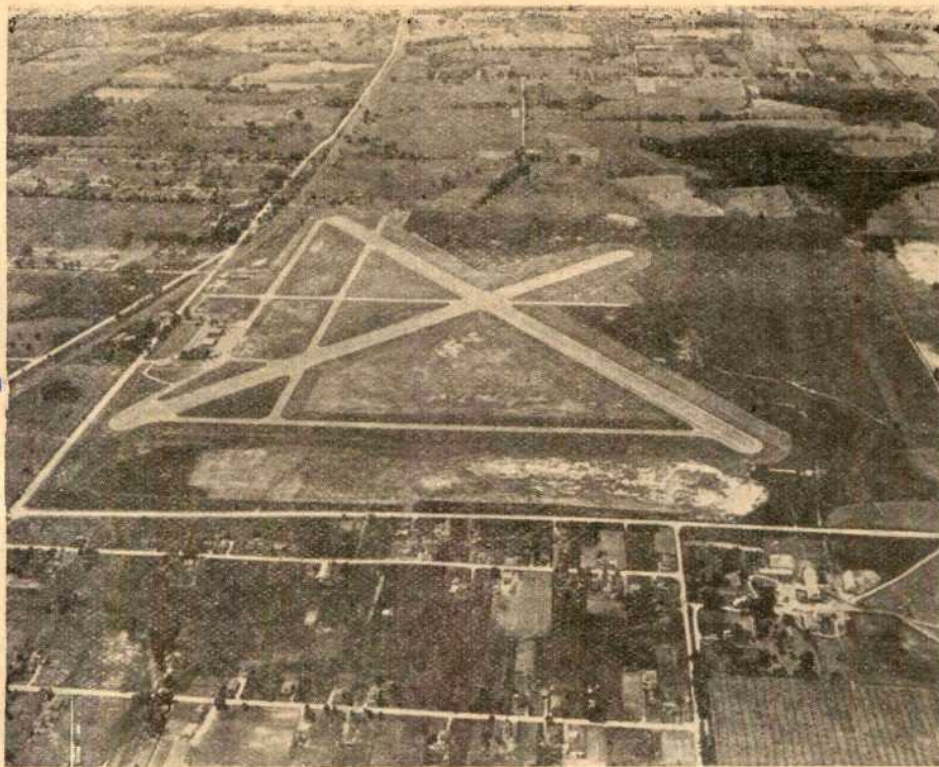
বিমান বিভাগের ভাবী বিপুল সম্ভাবনা ও উন্নতির কথা পূর্বাঙ্কেই আঁচ করিতে পারিয়া অধিকাংশ ষ্টেটই নিজস্ব বৈমানিক-সংসদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমার্কলের ইন্ডিয়ানা এবং কান্সাস প্রভৃতি কয়েকটি ষ্টেট এখনো এ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। পক্ষান্তরে, সময়বিভাগ কৃতপূর্ব বিমানবাহিনীর কতকগুলি ঘাটিকে উন্নত বলিয়া ঘোষণা করায় ক্যালিফোর্নিয়া এবং ফ্লোরিডা ষ্টেটের গবর্নরেন্ট তাহা হস্তগত করিবার জগু তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ লুইসিয়ানার বিমান-ঘাটি সম্পর্কিত প্রোগ্রামই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বমূলক। উক্ত প্রোগ্রামে একটি

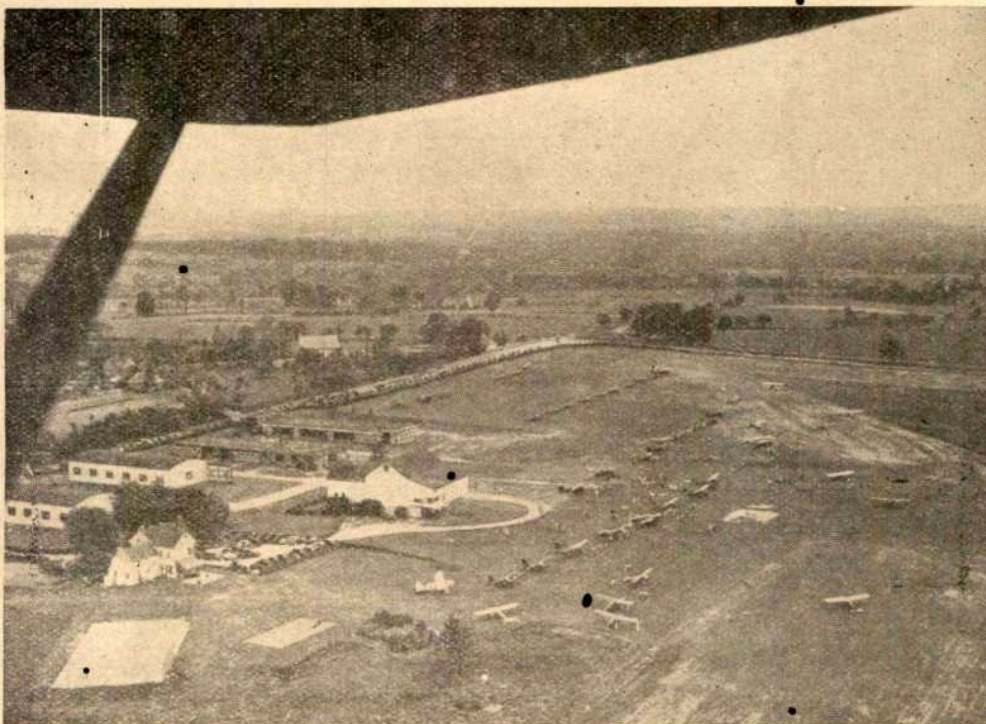
দশ-বার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া ৭০টি নূতন ঘাটি নির্মাণের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কুড়িটির নির্মাণ-কার্যের অচনা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। আগামী রাজ্য-বর্ষের মধ্যেই এই সমস্ত প্রচেষ্টায় কুড়ি লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইবে। মিশিগান, টেক্সাস ষ্টেট, ওহিও এবং উচাতেশও এ বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে একমাত্র টেক্সাস ষ্টেটেই ৫৩২টি বিমান-বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত ষ্টেটে বর্তমানে ৩১৯টি বিমান-ঘাটি আছে, তন্মধ্যে ১৯৬টির সংস্কার করা আবশ্যক। ক্যালিফোর্নিয়ার বিমানের সংখ্যা হইবে ৪২৫; এই বৈমানিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পেনসিলভানিয়া দখল করিবে তৃতীয় স্থান—তাহার বিমানের সংখ্যা হইবে ২৭১; আর এই প্রতিযোগী ষ্টেটসমূহের মধ্যে ফ্লোরিডার স্থান সর্বনিম্নে, তাহার বিমানের সংখ্যা ২৪৯। অত্যাশ্চর্য যে সমস্ত ষ্টেট এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদের বিমানের সংখ্যা ২০০ কিংবা তাহারও কম।

বিমান-ঘাটিগুলিতে যাসের চাপড়া এবং ক্ষমতাকাদি লাগানোর প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী মার্কিন এঞ্জিনিয়ারগণ সম্প্রতি সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রস্তাবিত 'মার্কিন জগৎ গবেষণাগার' অর্চিরেই এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহে এবং পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইবেন। বিমান-ঘাটের প্রাঙ্গণ শান দিয়া বাঁধানো অপেক্ষা তৃণাচ্ছাদিত করিতে অনেক কম খরচ পড়ে। যে স্থলে কংক্রিটের বিমান-প্রাঙ্গণে একর-প্রতি ৯,০০০ হইতে ২০,০০০ ডলার পর্যন্ত খরচ পড়ে সেই স্থলে তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একর-প্রতি খরচ পড়ে ৫০ হইতে ৭৫০ ডলার মাত্র।

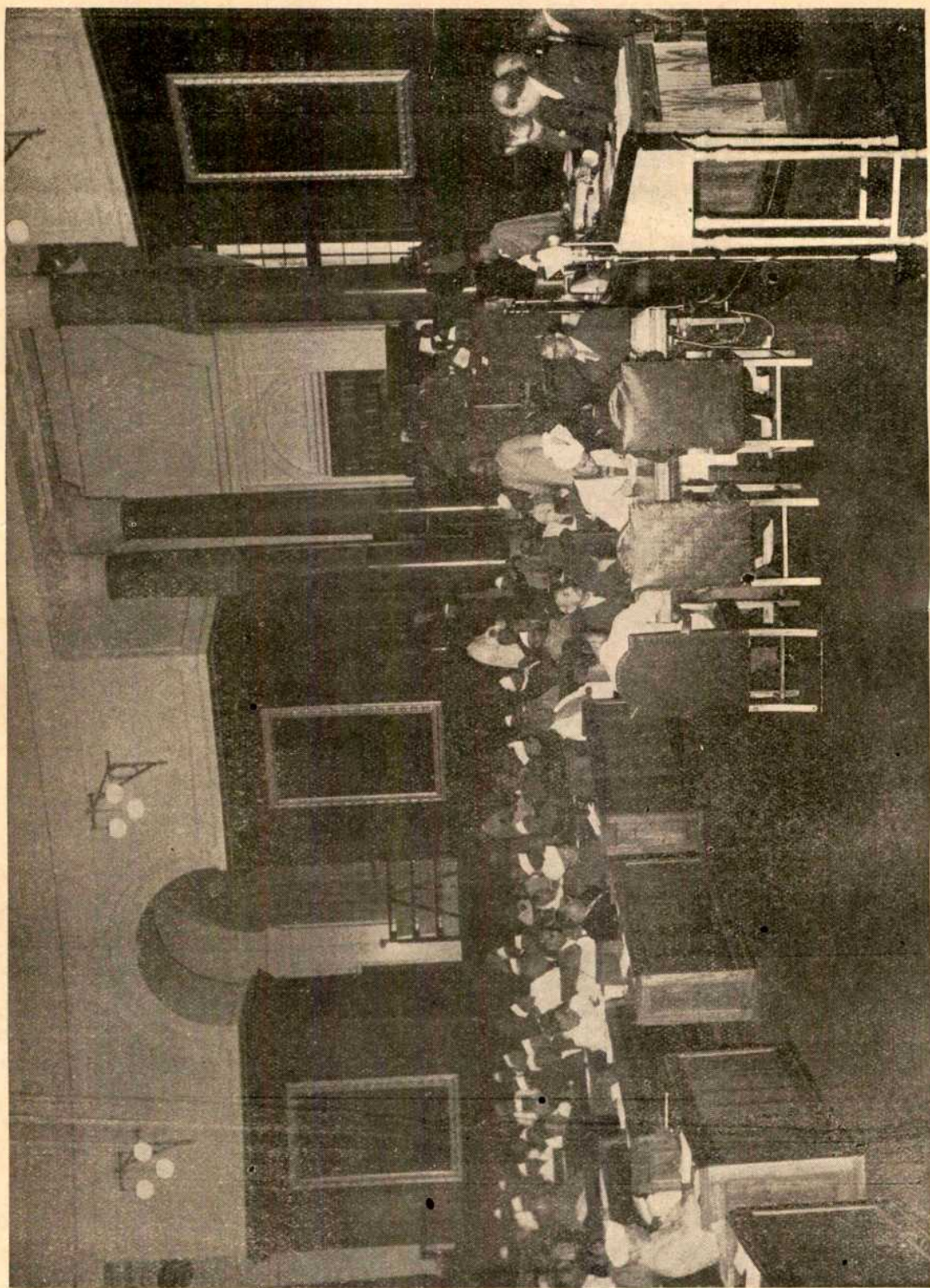
প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর মোটর-গাড়ী ইত্যাদি স্বল্প গতিশীল শকট-শিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর, আগামী সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় বৈমানিক উন্নতি হইবে, তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। আশা করা যায় যে, ব্যক্তিগতভাবে বিমান ক্রয় করিবার পুঙ্খ লোকেদের উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে, কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ছোট ছোট বহু বৈমানিক সম্প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের সর্বত্র বিমানযোগে ডাক চলাচলের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। অপর ভবিষ্যতে বিমানের এই বাহুল্য দেখিয়া আমেরিকাকে "উড্ডীয়মান দেশ" আখ্যা দিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।



মিশিগান ষ্টেটের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে কনক্রিটের প্রাঙ্গণযুক্ত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমান ঘাঁটি



পেনসিলভানিয়ার পূর্বাঞ্চলে একটি প্রথম শ্রেণীর বিমান-ঘাঁটি



ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণ-পরিষদের আঞ্চলিক পরিবেশন—মাইকেল সমুদ্রে রাষ্ট্রপতি জ্ঞাপানী

বর্তমান রেশনের ক্যালোরি ও পুষ্টিকারিতা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম. এসসি.

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একখানি বিলিভী পত্রিকা ধূলতেই দেখি প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধের নাম “শুকের জাতির ভিটামিনের চাহিদা।” এই বিরাট প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে শুকের খাদ্য সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণার তালিকা। শুনে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই তালিকাতে রয়েছে ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের উল্লেখ, যেগুলি থেকে লেখক তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। যারা ইতর-প্রাণীর স্বাস্থ্যের কল্যাণসাধনে এতদূর যত্নবান তাঁরা তাঁদের দেশের মানুষ-সম্প্রদায়ের শারীরিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান-কল্পে কত দূর আগ্রহান্বিত তাহা সহজেই অনুমেয়। আর আমাদের হতভাগ্য দেশের লোকেরা আজ ভিটামিন ঘূরের কথা ছুবেলা দুমুঠো ভাতেরও কাঙাল হয়ে পড়েছে। এই চরম দুর্দশার জন্ত কে বা কারা দায়ী তার গবেষণার জন্ত খুব মাথা ঘামানোর দরকার নাই, তবে তার প্রতিকারের পন্থা যে জটিল তা আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

আমাদের বর্তমান রেশনের খাদ্য শরীর রক্ষার পক্ষে যে সম্পূর্ণরূপে অসুপযোগী তা বুঝবার জন্ত খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনাবশ্যক। হুসিমজুব, নৌকার মাঝিমাঝা, চৌল্লাগাড়ী ও রিকশা-চালক, ছুতোর, কামার, চাষী এবং অত্যাধ দিনমজুর, যাদের গতরে খেটে রোজপার করতে হয় তাদের প্রত্যেক বেলায়ই যে আধ সের তিন পোয়া চালের ভাত বা আটার রুটি দরকার তা বুঝিয়ে বলা নিশ্চয়োজন। পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে, যারা ঘরে বসে কাজ করেন সেই দোকানী, কেরানী বা শিক্ষক প্রভৃতির প্রতি বেলা তিন ছটাক বা একপোয়া চালের ভাতই যথেষ্ট। ফলতঃ পরিশ্রমের অনুপাতে যে আহাৰ্য্য বেশী লাগে তা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং বর্তমান রেশন-ব্যবস্থার ধীন দেখি কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে যাদের জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁরাও আটা চাউলে একুনে দৈনিক আধসেরেরও কম পাচ্ছেন তখন এর পরিণাম যে কতদূর মারাত্মক হতে পারে ভেবে আতঙ্কিত হই। এতে তাঁদের শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ে। ভাঙা শরীরে ব্যাধির আক্রমণ বেশী হয়, ফলে লোকের কর্মশক্তি হ্রাস পায়। কর্মশক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও সেই অনুপাতে কমে থাকে; পরিণামে লোকেরা দারিদ্র্যের নিয়ন্ত্রণ স্তরে ক্রমশঃ নেমে আসে এবং জাতির ধ্বংস ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে মেজর জেনারল সার জন মেগ (Megaw) লিখেছেন—ভারতের এই অনাভাবের মূল কারণ হচ্ছে ভারতীয়দের অত্যধিক সন্তান-প্রজনন। পঞ্চাশের প্রলয়ঙ্কর মহাশয়ের মধ্যেও নাকি বাংলাদেশে জন্মের

হার কমে নাই। তিনি আরও বলেছেন যে, লোকসমাজের সচ্ছল অবস্থা হলে জন্মের হার স্বাভাবিক কমে আসে; কিন্তু ব্রিটানের রাজ্যে অনুশাসন এবং তজ্জনিত সচ্ছলতা সত্ত্বেও সেখানে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ৫০ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে সচ্ছল বা অসচ্ছল কোনও অবস্থায়ই জন্মের হার কমে না বলে তিনি হুঃখের সহিত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ভারতে শস্ত্র উপাদান বাড়িয়ে কোনও স্বামী লাভ হবে না যতদিন না এদেশের লোকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে অবহিত হন। যদি তাঁর কথা সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায় তবু একথা স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে শিশুস্বত্বের আধিক্যের দরুন লোকসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধির হার পাঁচাত্তোর অনেক দেশের চেয়েই ঢের কম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, খাদ্যাভাব সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি?

আমাদের ত মনে হয়, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারপূর্বক জনগণের দায়িত্বজ্ঞান ও কর্মস্পৃহা উদ্দীপিত করলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ করে চাষীদের কর্মশক্তি বাড়িয়ে তুললে, কৃত্রিম সার প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে হুলস্থলে ব্যবহারের ব্যবস্থা হলে এবং অতিরিক্ত ও অনাবৃষ্টি জনিত শস্ত্রহানি রোধ করলে দেশে জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলেও খাদ্যাভাবের আদৌ আশঙ্কা থাকবে না।

আপাততঃ আমাদের বর্তমান রেশনের খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা যাক। খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বা খাদ্য মান সম্বন্ধে বুঝতে হলে খাদ্যের উপাদান এবং বিভিন্ন খাদ্য কি ভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ফলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও গুণাগুণ এবং আমাদের শরীর গঠন ও পোষণে তাদের ক্রিয়াও স্থিরীকৃত হয়েছে। খাদ্যোপাদানগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা ও খেতসার, মেহপদার্থ, প্রোটিন বা আমিষ পদার্থ, ভিটামিন, লবণ-পদার্থ ও জল। এর মধ্যে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে প্রথমোক্ত তিনটি উপাদান—যদিও প্রোটিনের প্রথম ক্রিয়া হচ্ছে লবণ-পদার্থের মতই গঠনমূলক। আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার অধিকাংশের মধ্যেই খাদ্যের একাধিক উপাদান বিদ্যমান থাকে। ডালের মধ্যে আমরা অবশ্য সচরাচর কেবল মাত্র মনুর ডালকেই আমিষ বলে ধরে থাকি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নির্ণীত হয়েছে যে, সকল জাতীয় ডালেই শতকরা

প্রায় ২৫ অংশ থাকে আমিষ পদার্থ। এমন কি চাল, আটা, গোলআলুর মধ্যেও যথাক্রমে শতকরা সাড়ে ছয়, সাড়ে তের ও দুই ভাগ আমিষ পদার্থ থাকে। চাল, আটা ও ডালের অবশিষ্ট প্রায় সবটুকুই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। গোলআলুর ত আশী ভাগই জল, অবশিষ্ট দুই ভাগ আমিষ পদার্থ বাদে প্রায় সবটাই বেতসার (কার্বোহাইড্রেট)। নির্জলা চিনি বা গ্লুকোজ বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট এবং বিশুদ্ধ বি বা চর্বিতে যোল আনা স্নেহপদার্থ বিদ্যমান। অবশ্য ভাল বিতে স্নেহপদার্থ ছাড়া ভিটামিন এ এবং ডি থাকে, তবে তার পরিমাণ এত কম যে সমুদ্রে জলবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয়। স্বভাব-জাত কোনও খাদ্যেই মানুষের শরীর রক্ষার উপযোগী সমৃদ্ধ খাদ্যোপাদান থাকে না। এ বিষয়ে দুইই একমাত্র ব্যতিক্রম। দুধে কার্বোহাইড্রেট (ল্যাকটোজ বা দুগ্ধশর্করা), প্রোটিন (ছানা ও ল্যাকট আলবুমিন), স্নেহপদার্থ (মাখন), লবণ-পদার্থ, কয়েকটি ভিটামিন ও জল—সবই বিদ্যমান। তবে পরিণতবয়স্কের পক্ষে ঐ খাদ্যোপাদানগুলি যে অল্পপাতে আবদ্ধকৃত দুধে সেই পরিমাণে না থাকায় এবং অনেক প্রকার ভিটামিন ও লবণ-পদার্থের অভাব নিবন্ধন শুধু দুগ্ধ পান করে বয়স্ক মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম, এখন তাপ ও শক্তি সঞ্চয়কারী উপাদানগুলির কার্যকারিতা ও শরীর রক্ষায় তাদের উপযোগিতার বিষয় জানতে চেষ্টা করব।

তাপ ও শক্তির একটিকে যে অপরটিতে রূপান্তরিত করা যায় সে কথা অনেকেই জানা আছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ করলে শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পায়—তাপের প্রভাবে শক্তি উৎপাদনের অল্পতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কয়লার তাপে জলকে বাষ্প করে তদ্বারা রেলগাড়ী চালানো। তাপের পরিমাণ যে 'মানে' মাপা হয় তাকে বলে ক্যালোরি। এক তোলা বিশুদ্ধ নির্জলা চিনি বা ময়দা পোড়ালে মোটামুটি হিসাবে ৪৫ ক্যালোরি তাপ পাওয়া যায়। ১ তোলা বিশুদ্ধ নির্জলা মাছ বা মাংস পোড়ালেও ঐ পরিমাণ তাপ জন্মে। পক্ষান্তরে ১ তোলা বিশুদ্ধ বি বা চর্বি দগ্ধ করলে তা থেকে প্রায় ১০০ ক্যালোরি-তাপ পাওয়া যায়। চিনি পুড়ে গেল বলতে রাসায়নিক ভাবে এক কথাই বুঝতে হবে যে, চিনির অণুতে যে কার্বন থাকে তা বাতাসের অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণে কার্বন ডাই-অক্সাইডে এবং চিনির হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অল্পরূপ মিশ্রণের ফলে জলে পরিণত হয় এবং ঐ রাসায়নিক সংমিশ্রণ যখন ঘটে তখন অনেকটা তাপ নির্গত হয়ে থাকে। বি চিনি প্রভৃতি খাদ্যবস্তু আমরা যখন গ্রহণ করি তখন সেগুলি পরিপাক-যন্ত্রের বিভিন্ন রসের ক্রিয়াতে নূতন ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে পরিণত হয় এবং এইগুলি রক্তস্রোতে প্রবেশ করলে রক্তের লোহিত কণিকা বাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে তাদের কার্বন ও হাইড্রোজেন রাসায়নিক সম্মিলনে যথাক্রমে কার্বন ডাই-

অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপ নির্গত হয়। এ যেন বিনা আগুনে দহনক্রিয়া। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই (বাহিরে পোড়ালে বা শরীরের মধ্যে রূপান্তরিত হলে) সম-পরিমাণ পদার্থ থেকে ঐক্য সমান পরিমাণ তাপই পাওয়া যায়।

এইমাত্র উল্লেখ করা হ'ল যে, খাদ্যোপাদানগুলি পরিপাকান্তে ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। কার্বোহাইড্রেট থেকে যে রূপান্তরিত নূতন পদার্থ জন্মে তার নাম গ্লুকোজ। আমিষ পদার্থ থেকে পাওয়া যায় বিভিন্ন অ্যামিনো এসিড এবং স্নেহপদার্থের শেষ পরিণতি হচ্ছে গ্লিসারিন ও কয়েক প্রকার জৈব অ্যাসিডে। গ্লুকোজ, গ্লিসারিন এবং জৈব অ্যাসিড পুরোজাতাবে দগ্ধ হয়ে শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে কিন্তু প্রোটিনজাত অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি প্রধানতঃ নূতন মাংসপেশী গঠন ও ক্ষয়প্রাপ্ত পুরনো পেশীগুলোর ক্ষতিপূরণ করে এবং তদতিরিক্ত অংশ গ্লুকোজের মতই দগ্ধ হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। এই কারণে মাছ-মাংস বেশী পরিমাণে খেয়ে হজম করতে পারলে তাতে অনেকটা ভাতরুটি খাওয়ার ফল পাওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে শরীরের চাহিদামত অ্যামিনো-অ্যাসিড যদি খাদ্য থেকে না-পাওয়া যায় তবে শরীরের মাংসপেশী ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এই শোচনীয় অবস্থা শরীরে ভাঙন ধরারই নামান্তর। মাছ দুধ ক্রমশঃ যে ভাবে আমাদের আয়তনের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে স্বাস্থ্যের শোচনীয় পরিণতি যে অনিবার্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেকে কিজাসা করিতে পারেন শরীরের মধ্যেও যখন দহন-ক্রিয়াই চলছে তখন ভাতের বদলে কয়লা বা পেট্রোলে ঐ কাজ চলতে পারে কি না। একধার উত্তর এই, শরীরের যন্ত্রাদির গঠন এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অল্প কিছু ধমনীর রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে বা দগ্ধ হতে পারে না। কয়লা যত গুড়ো করেই খাওয়া যাক তা হজম হবে না, কাজেই রক্তস্রোতে পৌঁছতে পারবে না—পেট্রোলের বেলাতেও ঐরূপ। তারপর কত যে জাত এবং অজাত পদার্থের সহযোগিতায় এই দহন-কার্য চলবে, তার প্রকৃত রহস্য এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয় নি। পক্ষান্তরে সম পরিমাণ খাদ্য কয়েকজন সমবয়সী ব্যক্তিকে খাওয়ালেই যে তাতে সমান পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হবে একথাও বলা যায় না। যার পরিপাকশক্তি যত অধিক তার রক্তস্রোতে ঐ খাদ্যের জীব অংশ তত বেশী পরিমাণে যাবে, কাজেই সে ঐ খাদ্য থেকে বেশী শক্তি আহরণ করতে পারবে এবং অধিকতর শক্তিমান ও কর্মক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেছেন, বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী এবং পুরুষের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কত ক্যালোরি-শক্তি খরচ হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিশ্রমের দরুনই বা ক্যালোরি-শক্তির ব্যয় কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে নিষ্ক্রিয়

অবস্থায় আবার শক্তি খরচ হবে কেন? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষ যখন চুপচাপ বসে থাকে তখনও তাহার কুসকুস প্রতি-
নিত্য বাতাস গ্রহণ ও বর্জন করছে, ছুপিও রক্ত পাম্প করে
সারা শরীরে সঞ্চালিত করছে, পরিপাকশক্তি সক্রিয় রয়েছে,
মস্তিষ্ক চিন্তা করছে—এইরূপ বিভিন্ন শারীরঘটনের ক্রিয়া-পরি-
চালনায় ও শরীরের তাপরক্ষায় শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। পূর্বেই
বলেছি খাদ্যোপাদানগুলি শরীরে দগ্ধ হয়ে এই তাপ জন্মে
এবং কোন্ প্রকার খাদ্যে কত ক্যালোরি তাপ দিতে পারে
তাও নির্ণীত হয়েছে, সুতরাং যখন বুঝতে পারি রাম বা শ্রামের
দৈনিক দু'হাজার ক্যালোরি দরকার তখন তাদের কতটা
চাল, ডাল, তেল ইত্যাদির প্রয়োজন তা অল্প কষে বার করা
যায়। নিম্নে বয়সভেদে ক্যালোরির চাহিদার হিসাব দেওয়া
হচ্ছে :—

১৩ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক পুরুষের যদি ১০০ ক্যালোরি ধরা যায় তবে	"	"	স্ত্রীলোকের লাগে ৮৩ ক্যালোরী
"	"	"	নিম্নতম বালিকবালিকার " ৭০ "
৬ "	"	"	শিশুদের " ৫০ "

অবশ্য শারীরিক পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে পরিণত-
বয়স্কের উপরোক্ত ১০০ ক্যালোরির স্থলে ১২৫ বা ১৫০, যুব
কঠিন পরিশ্রমকারীর পক্ষে ২০০ বা ততোধিক ক্যালোরি
পর্যন্ত দরকার হয়ে থাকে। একটি কথা মনে রাখা উচিত
যে, বেশী শারীরিক পরিশ্রমে আমিষ পদার্থের পরিমাণ না
বাড়িয়ে কেবলমাত্র স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ
বাড়িয়ে ক্যালোরির পরিমাণ পুষিয়ে নিলেই চলে। তারপর
যাঁর শরীরের ওজন যত বেশী তাঁর তত বেশী ক্যালোরি এবং
শীতকালে গ্রীষ্মকালের চেয়ে বেশী ক্যালোরি আবশ্যিক হয়।
আমাদের মধ্যে যন্ত্র শারীরিক পরিশ্রম যারা করেন যেমন,
কেরানী, দোকানী, শিক্ষক প্রভৃতির দৈনিক দু-হাজার সওয়া
দু-হাজার ক্যালোরি দরকার। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে যারা
হাতে-কলমে কাজ করেন এবং যে-সকল কুলি মাঝারি
রকমের পরিশ্রম করে তাদের প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি
এবং যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের প্রায় চার
হাজার ক্যালোরী আবশ্যিক।

এখন বর্তমান রেশন-ব্যবস্থায় সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক এক-
একজন ভ্রাতৃলোকের জন্য যে পরিমাণ আটা, চিনি ও সরিষার
তৈল বরাদ্দ আছে তাতে দৈনিক কত ক্যালোরি হয় হিসাব
করে দেখা যাক।

চাউল দৈনিক ১৫ তোলা অর্থাৎ ৫৮৬ ক্যালোরি	
আটা " ১০ " " ৩৯১ ক্যালোরি	
চিনি " ২'১৪ " " ৯৭ "	
সঃ তৈল " ১'৪২ " " ১৪৫ "	

একুনে ১২১৯ ক্যালোরি

(অবশ্য রেশনের সরিষার তৈল যদি গায়ে না মেখে
য়ান্নার সবটাই ব্যবহার করা হয়।)

বলা বাহুল্য, চাউল আটা বাদে যে পরিমাণ ক্যালোরি
ধরা হ'ল কার্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা পাওয়া যাবে না, কারণ
রেশনের আটা চাউলে ধুলো-বালি কাঁকর-ভূষি প্রভৃতি মিশ্রিত
থাকে। সেগুলো বাদ দিলে ওজন অনেকটা কম হবে।
দৈনিক এক ছটাক ডাল, এক ছটাক মাছ এবং গোল আলু,
রাঙা আলু, কচু, কাঁচাকালা, পেঁপে, মুলো ইত্যাদি সংযোগে
যদি অন্ততঃ আরও এক পোয়া খাওয়া যায় তা হলে অতিরিক্ত
৪২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাবে। তাহলে একুনে গিয়ে দাঁড়ায়
১৬৪৪ ক্যালোরি, সুতরাং দু-হাজার ক্যালোরিতে পৌঁছতে
আরও প্রায় সাড়ে তিন শত ক্যালোরি আবশ্যিক। যদি
প্রত্যহ সকালে-বিকালে অন্ততঃ আধ পোয়া চিড়া বা মুড়ি
অথবা খোসা ছাড়ানো এক ছটাক চিনাবাদাম দিয়ে জলযোগ
করা যায় তবে টায়-টোয় দু-হাজার ক্যালোরিতে উঠতে
পারে। অবশ্য উপরোক্ত খাদ্য-তালিকায় সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারক
অনেক ভিটামিন এবং লবণ-পদার্থের অভাব বিদ্যমান। সেই
ঘাটতি কথঞ্চিৎ পূরণ করতে হলে রোজই কিছু টাটকা শাক-
সব্জী ও একটি পাতিনেবু খেতে হবে এবং অবস্থায় কুলোলে
মাঝে মাঝে দুধ, ডিম এবং অন্ততঃ চুনো মাছের মাছা বাড়িয়ে
দেওয়া প্রয়োজন।

যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন, যাদের দৈনিক
তিন হাজার থেকে চার হাজার ক্যালোরি দরকার তাঁরা
বর্তমান রেশনে কত ক্যালোরি পাচ্ছেন দেখা যাক।

দৈনিক বরাদ্দ চাউল আটা চিনি তেল সব কিছুতে মিলিয়ে
এঁদের ১৬৩০ ক্যালোরি হয়, অবশ্য চাউল প্রভৃতির ভেজালের
দরুন-কিছু বাদ যাবে। এঁরা যদি দৈনিক ডাল দু-ছটাক,
আধ পোয়া রাঙা আলু, কচু, মুলো ইত্যাদি তরিতরকারি
রন্ধন করে খান এবং প্রত্যহ আধ ছটাক মাছ খান তবে আরও
৫১০ ক্যালোরি পেয়ে একুনে দৈনিক ২১৪০ ক্যালোরির
যোগান দিতে পারেন। সুতরাং যারা কঠিন শারীরিক শ্রম
করেন বর্তমান রেশন ব্যবস্থানুযায়ী যা খাদ্য তাঁরা গ্রহণ
করেন তাকে আধ-পেটা খাওয়া বলে গণ্য করা যেতে পারে।
কাজেই রেশনের খাদ্যের অতিরিক্ত উপরোক্ত ডাল তরি-
তরকারি ছাড়া এর উপরে এঁরা দৈনিক এক পোয়া ছাতু বা
চিড়া খেলে প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি পেতে পারেন।
সামর্থ্যে কুলোলে এঁরা যদি এঁর ওপর খোসা ছাড়ানো এক
ছটিক চিনাবাদাম দৈনিক খেতে পারেন তবে প্রায় ৩৩০০
ক্যালোরির সংস্থান হতে পারে। এঁদের খাদ্য সম্বন্ধে যে
ব্যবহার কথা বলা হ'ল এতে ক্যালোরি-সমস্তার অনেকটা
সমাধান হলেও কতকগুলি অত্যাবশ্যিক ভিটামিন ও লবণ-
পদার্থ থেকে এঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এজন্য এঁদের রোজই শাক,
কাঁচা মুলো, কাঁচা পেঁয়াজ বা পেয়ারা প্রভৃতি সমন্বয়যোগ্য

কলমূল খাওয়া উচিত। মাঝে মাঝে পুঁটি, টেংরা প্রভৃতি ছোট মাছ পরিপাক শক্তি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য করে খাওয়া এঁদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত নিতান্তই অপরিহার্য।

এই রেশনের একটি প্রধান ক্রটি সরিষার তেলের অল্পতা। বাংলা দেশের অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ শীতকালে, গায়ে সরিষার তেল মাখেন; অনেকে মাথায়ও এই তেলই দিয়া থাকেন। অথচ রেশনের তেলে একটি ডাল ও একটি তরকারি রাখা করলে গায়ে মাখার তেলই থাকে না, সুতরাং কি দিয়ে আর গৃহিণীরা শাক বা চুনোমাছ রান্না করবেন? অথচ শেষোক্ত জিনিষগুলি না খেলে ক্যালোরির বিশেষ ঘাটতি না হলেও ভিটামিন ও লবণ-পদার্থের অভাবেই শরীর ভেঙে পড়বে। এই কারণে ধারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন তাঁদের জন্ত মার্গারিন জাতীয় কোনও সম্ভা স্নেহপদার্থ রেশনের অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থা করা নিতান্তই আবশ্যিক। যদিও দেখা গেছে শরীরের তাপে যে সকল স্নেহপদার্থ তরল অবস্থায় থাকে সেগুলিই সহজপাচ্য। শীতকালে রেশনে চিনির বরাদ্দ বাড়ানো বা সম্ভার ডাল গুড়ের ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই বলেছি শীতের জন্ত বৈশিষ্ট্য ক্যালোরি খরচ হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলাদেশে পূর্বে শীতকালে পায়ের, পিঠে প্রভৃতির প্রচুর প্রচলন ছিল যার দ্বারা আত্মও বহন করে চলেছে পৌষপাক্ষণ কথটি। নারকেল, ছুঁচ, ক্ষীর, গুড় বা চিনি পিষ্টকের প্রধান উপাদান এবং এগুলি ক্যালোরি এবং সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারিতার দিক থেকে খুব উপাদেয় উপকরণ তা সকলেই জানেন।

আমি কঠোর পরিশ্রমকারীদের খাদ্যে ছাতু, চিনাবাদাম, ছোলাভাজা, চিড়া প্রভৃতি দিয়ে ক্যালোরি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছি, তবে যেখানে ছাতুর সরিষা বার আনা, এক টাকা সেখানে এ উপদেশ কতটা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুঁটি, টেংরা, বেলে, ঝুলে প্রভৃতি মাছ এবং মূলা, নটে, পালাং, কলমি প্রভৃতি শাক আহার করে লবণ-পদার্থ ও ভিটামিন সংগ্রহের কথা বলেছি কিন্তু যেখানে পুঁটির সরিষা দেড় টাকা, ছুঁচ টাকা সেখানে গরিবের পক্ষে পুষ্টিকর আহাৰ্য্য যোগাড় করা যে কত কঠিন তা বলাই বাহুল্য।

যে সময়ে আমরা জিনিষের দুস্পাপ্যতা এবং দুস্প্যাপ্যতার জন্ত চিনাবাদাম, ছোলা-ভাজা, ছাতু ও পুঁটিমাছ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর খাদ্যসামগ্রীর সাহায্যে শরীর রক্ষার উপায় চিন্তা করছি ঠিক সেই সময়ে বিলাতে আদর্শ খাদ্যের বরাদ্দ কি ধরা হয়েছে নিম্নের তালিকায় তা দেওয়া হ'ল। এ কথা হস্ত অনেকেই

জানেন যে, ওদেশের রেশনের মান উন্নত করে ইতিমধ্যেই এ আদর্শ কার্যে পরিণত করার সূচনা হয়েছে।

দৈনিক একজন প্রাপ্তবয়স্কের বরাদ্দ	ক্যালোরি
ছয় ছটাক দুধ	১৯০
১টি ডিম বা ২ ছটাক কডু মাছ	৮৫
আধ পোয়া চর্বিহীন মাংস	১৭০
এক ছটাক পনির	২৪০
আধ পোয়া মাখন বা মার্গারিন	৯২০
৯ ছটাক আটার রুটি	১২৩০
১ ছটাক চিনি	২৩০
দেড় পোয়া গোল আলু	২৮৮
১টি কমলালেবু বা ২টি আপেল ও ১টি কলা	৩৫
সুলাড	১০
আধ পোয়া রান্না-করা শাকসব্জী	২২

৩৪২০

বলা বাহুল্য, এই খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লবণ-পদার্থগুলিও পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়।

অনেকে হস্ত বলবেন এ খাদ্য কি বাঙালীরা হজম করতে পারবে। আমি বলি নিশ্চয়ই পারবে, বরং এর চেয়ে পরিমাণে অধিক এবং অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য সেদিন পর্যন্তও বাংলার মধ্যবিত্ত ও জোতদার-জমিদার শ্রেণীর লোক অনায়াসে হজম করতেন এবং শক্তিও রাখতেন তাঁরা অসামান্য। আমিষ-নিরামিষ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থলে বলেছেন—“সেকালে পাড়ারগেয়ে জমিদার এককথায় দশ কোশ হেঁটে দিত, দুই কুড়ি কই মাছ কাঁটাতুই চিবিয়ে ছাড়ত, এক-শ বছর বাঁচত। এখন আমাদের দেশের উদযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া—উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সম্ভা খাওয়া। পূর্বে বাংলার ওদের নকল কর যত পার।”

আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞান একথা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যে জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও শৌর্যবীর্য্য প্রধানতঃ আমিষ খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। প্রচলিত আমিষ খাদ্য যদি ক্রমশঃ দুস্পাপ্য ও দুস্প্যাপ্য হতে থাকে তবে জাতিকে বাঁচার মত বাঁচতে হলে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে জরী হতে হলে, আবশ্যিক বোধে রুচি এবং সংস্কারের আমূল পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত, বিভিন্ন প্রাণীর মাংসাহারের প্রচলন করতে হবে।

দারিকানাথ ঠাকুর

(১৭৯৬—১৮৪৬)

শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ

বাঙালী আত্মবিশ্মৃত জাতি—এই বহু-প্রচলিত প্রবচনের সমর্থনে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার উল্লেখ না করিলেও চলে। মাত্র শত বৎসর পূর্বে বিদেশে যে একজন দিকপাল বাঙ্গালীর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে তাঁহার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা বা ঊদাসীণ এই প্রবচনকে সমর্থন করে।

দারিকানাথের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ঊদাসীণের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, চাকুরীগত প্রাণ মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীদারী ব্রাহ্মণ-বংশীয় বণিকের আবির্ভাব একটু দুর্বোধ্য ও স্বভাবতঃই দুর্জয় ব্যাপার। দারিকানাথ ভারতে আধুনিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথপ্রদর্শকদের এবং আধুনিক শিল্পের প্রবর্তকদের অন্তর্গত। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সতীদাহ নিবারণ বা প্রেস আইন সম্পর্কে তাঁহার কার্যকলাপ সুবিদিত। বর্তমান প্রবন্ধে এই কার্যাবলী বাদ দিয়া কেবল তাঁহার বণিকজীবন সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে দারিকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দারিকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামলোচন বালক দারিকানাথের শিক্ষার জন্ত তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ শিক্ষক ও মৌলবী নিযুক্ত করেন এবং বাগ্যানবধি দারিকানাথ ইংরেজ বণিকদের সহিত সহজে মেলামেশা করিতে অভ্যস্ত হন। দারিকানাথ কৈশোরেই পৈতৃক ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। ভূমিস্বত্ব আইন সম্পর্কে তাঁহার এমন ব্যুৎপত্তি জন্মে যে বাংলা ও বাংলার বাহিরে বর্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলের বহু জমিদার তাঁহাকে আইনঘটিত বিষয়ে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বহু ভূম্যধিকারীর বিবিধ বৈষয়িক কার্যের জন্ত “এজেন্ট” নিযুক্ত হন এবং স্বীয় ভূসম্পত্তির উৎপন্ন পণ্যের ব্যবসায়ও এই সঙ্গে চালু করেন। ঠাকুর-পরিবার ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের কারবার কলিকাতা আগমনের পরই শুরু করিয়াছিলেন। দক্ষ দারিকানাথ এক্ষেত্রেও নীগ্রহী সুনাম অর্জন করেন।

দারিকানাথের বয়স যখন ত্রিশ সেই সময় কোম্পানীর রাজস্ব ও লবণ বিভাগে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় এবং তাঁহারা দারিকানাথকে ইহা গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ তখনই ইংরেজী শিক্ষার আবেগে পড়িয়া কোম্পানীর চাকুরীর মহিমা স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন। তখন প্রাচীন বণিকশ্রেণী লোপ পাইতেছিল, জগৎ শেঠের সন্তান-সন্ততি তখন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কোম্পানীর চাকুরী ভক্ষা করিতেছিল, অপর পক্ষে তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার নূতন অভিজাতশ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল। দারিকানাথের পিতামহ ইংরেজ কোম্পানীর আমলাতন্ত্রে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরূপ পরি-স্থিতিতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দারিকানাথের চাকুরী গ্রহণ একটা অভাবনীয় ঘটনা নহে। অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল আরও আট বৎসর পরে যখন তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কর্মকুশলতার ও সততায় দারিকানাথ কয়েক বৎসরের মধ্যেই শুদ্ধ, লবণ ও রাজস্ব বোর্ডের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। শত বৎসর পরে এই পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করিতে হইলে কোম্পানীর তদানীন্তন শাসনতন্ত্রের অবস্থা জানা প্রয়োজন। দারিকানাথ এই গুরুত্বপূর্ণ পদের সকল কার্য দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়াও নিজ সম্পত্তি রক্ষণে এবং ব্যবসায়াদি পরিচালনে অবহেলা করেন নাই, এমন কি নব প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও তিনি প্রথম হইতেই একজন গৃহপোষক ছিলেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব অর্জন অসম্ভব বোধ হওয়ায় আটত্রিশ বৎসর বয়সে দারিকানাথ আমলাতন্ত্রের সহজ ও সুনির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার অনিশ্চিত ও বহুরূপী পথ গ্রহণ করিলেন। যদি বাঙালীর ইতিহাসবোধ থাকিত তাহা হইলে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বেটিং-মেকলে-প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অপেক্ষা আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এদেশে ইংরেজ-প্রবর্তিত ম্যানেজিং এজেন্সির আদর্শে একটি ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করেন এবং দুই জন ইংরেজ বণিকের সহিত সমান অংশীদার হিসাবে “কার ঠাকুর কোম্পানী” নামে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তদানীন্তন বড়লাট উইলিয়ম বেটিং এবং বহু ইংরেজ দারিকানাথকে এজন্ম স্বর্দানা করেন। কার ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা দারিকানাথ যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন ঔপনিবেশিক ধনিকতন্ত্রের মুখপত্র (Fi-hers' Colonial Magazine) বিশ্লেষের সহিত স্বীকার করে। ১৮৩০-৩৪ সালে, কলিকাতায় ইংরেজ পরিচালিত কয়েকটি প্রাচীন ‘এজেন্সি হাউস’ের পতন ঘটে এবং তাহার ফলে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের জগতে বেশ মন্দা পড়ে। এমনই সময় একজন বাঙালী কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া একটি বিরাট ‘এজেন্সি হাউস’ের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইউরোপের সহিত যোগস্বাক্ষর ব্যবস্থা করিয়া একটি অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ ধনিক সম্প্রদায় পর্যন্ত বিশ্লেষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ১৮২৯ সালে যুনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়, দারিকানাথ তখন কোম্পানীর কর্মচারী হইলেও উহাতে অংশীদার

হিসাবে যোগ দেন; হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী জমিদার ও কয়েকজন ইংরেজ বণিক এই আধুনিক ব্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যখন কলিকাতার ব্যবসায়ী-মহলে ইংরেজ এজেন্সি হাউসগুলির পতনের ফলে আতঙ্কের সঞ্চার হইল এবং যুনিয়ন ব্যাককেও তাহা স্পর্শ করিল তখন দ্বারিকানাথ ডিরেক্টররূপে এই ব্যাকের পুরোভাগে আসিলেন; তখনও তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল ছিলেন। চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি এই ব্যাকের কর্ণধার হইলেন। কার ঠাকুর কোম্পানী ও যুনিয়ন ব্যাক এই দুই প্রতিষ্ঠান মারফত তিনি অচিরে তদানীন্তন সমগ্র বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে তাঁহার কার্যাবলী সম্প্রসারিত করিলেন। বোম্বাইয়ের দুই-একটি পার্শী বণিক ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার সমকক্ষ কোনও দেশীয় বণিক রহিল না।

কার ঠাকুর কোম্পানীকে পুরাপুরি চালু করিবার পূর্ব হইতেই দ্বারিকানাথ তাঁহার নিজ ব্যবসায়লব্ধ অর্থ বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে জমিদারী ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রজাবিলি ও খাজানা সংগ্রহই তাঁহার ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন হয় নাই। উত্তর-ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশাল ভূসম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল পাইকারী ভাবে রেশম, নীল ও শর্করা উৎপাদন। আধুনিক প্রথায় পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে এক জনের মূলধন বা মহাজনী কারবারে চলে না এবং আমদানী ও রপ্তানীর জগতে জমিদারী কাহ্নন অচল এ সত্য তাঁহার জানা ছিল। এজ্ঞ যুনিয়ন ব্যাক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াই তিনি আধুনিক প্রথায় পাইকারী উৎপাদন ও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে উত্তোঙ্গী হইলেন। শর্করা-শিল্পে তিনি দেশীয় ইক্ষু ব্যতীত চীন ও মরিশসের ইক্ষু উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শর্করা-রুঠীতে বিবিধ বৈদেশিক প্রণালীর প্রবর্তন করেন। কুলী চালান সম্পর্কে 'অফিসিয়াল কমিশনে' তাঁহার সাক্ষ্য প্রসঙ্গক্রমে দ্বারিকানাথ বলেন যে, ভারতবর্ষে তিনিই পাশ্চাত্য প্রণালীতে ইক্ষুচাষ ও শর্করা উৎপাদন প্রবর্তন করেন। বারুইপুর, গাজীপুর ও পাবনাস্থিত রুঠীতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে

শর্করা উৎপাদন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেন। বাপ্পীয় শক্তিতে শর্করা প্রস্তুত এদেশে তিনিই প্রবর্তন করেন। দ্বারিকানাথের ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের খতিয়ানে জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার সাহস ও প্রচেষ্টার মূল্য নিরূপিত হইবে না। যখন কোনও ইংরেজ কোম্পানী রাণীগঞ্জে তাহাদের কয়লার খনি চালাইতে অসমর্থ হয় তখন প্রকান্ত নীলামে দ্বারিকানাথ তাহা ক্রয় করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমুদ্রপথে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে নদীপথে ঈষৎ সার্ভিস প্রবর্তনে যাহারা উত্তোঙ্গী হন দ্বারিকানাথ তাঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন। আরও একটি ক্ষেত্রে দ্বারিকানাথ তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। পার্ট চাষ প্রসারের জন্ত তিনি বিশেষ আন্দোলন করেন এবং ইংরেজ বণিকদের সহ-যোগিতায় আধুনিক ভাবে পাইকারী হারে পার্ট-উৎপাদন শিক্ষার জন্ত একটি শিল্প-বিদ্যালয় গঠনে প্রয়াসী হন। উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে ও হঠাৎ তাঁহার ইংলণ্ড গমনে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই পণ্যক্রবোর জন্ত যে একটি বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হইতে পারে দ্বারিকানাথের এই ধারণা তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। যখন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিল তখন রুশ-দেশজাত শনের অভাবে ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি হইল। তখন হইতে বাংলার পার্ট ডানডির পণ্যশালায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক্রিয়। অবশ্য বাংলার কৃষকের অন্ন-সংস্থানে তাহা সাহায্য করে নাই একথা সত্য; তাহার কারণ নির্ণয় এ প্রবন্ধে অবাস্তব।

দ্বারিকানাথ সৌধিন ছিলেন এবং পরদৃষ্টমোচনে ও সমাজের হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়াই হউক বা তদানীন্তন অভিজাত-সমাজের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই হউক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়গুলি তাঁহার মৃত্যুর পর বেশী দিন চলে নাই। কিন্তু যেদিন বাঙালীর আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত হইবে তখন তাঁহাকে যোগ্য মর্যাদা দান করিতেই হইবে।

পুরীর পুরান্বত্ত

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল বিভাগের অধিকাংশ জনগণ বা অস্থানীর আত্মপুষ্কিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেগুলি বারম্বার দ্ব্যবিত ও পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গুজরাট অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তিক দ্বারকাপুরী বা দ্বারাবতীর ও দক্ষিণ বাংলার নানা প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের

দক্ষিণ বাংলার ভূ-সংগঠন, জনবসতি, প্লাবন ও পুনরুদ্ধার-সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না কেবল উড়িষ্যার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্তী পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, বিশেষ ভাবে “পুর” শব্দ (যাহার গ্রীক প্রতিশব্দ polles.)

প্রাচীনকালে নদীতীরবর্তী অধিষ্ঠানগুলি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত, এবং তদনুযায়ী বন্দরার্থে পত্তন শব্দ ও পার্বত্য অধিষ্ঠান বুঝাইতে গিরি শব্দ প্রয়োগ করা হইত। তাহার কারণ, বর্তমান কালের স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন কেন্দ্রিক সভ্যতার অরূপ নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রচলন ছিল। কালক্রমে উক্ত পুর শব্দ “ই”-কার দ্বারা বিশেষিত হইতে থাকে, যেমন, হস্তিনাপুর/হস্তিনাপুরী; মাহিষ্যতীপুর/মাহিষ্যতীপুরী; মথুরাপুরী; দ্বারকাপুরী ইত্যাদি; আবার পার্টলী-পুত্র < পার্টলীপুত্র < পার্টালী > পত্তন; নাগপত্তন; বিশাখাপত্তন ইত্যাদি ও দেবগিরি; ব্রহ্মগিরি; গিরিব্রজ ইত্যাদি।^{১২}

আমাদের আলোচ্য বিষয়—পুরী বা ত্রীক্ষেত্রের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলেও, যত দূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে ঐতিহাসিক যুগেই কয়েকবার প্রাবলিত ও পুনরুত্থিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। তিনটি বিভিন্ন পর্বে ইহার তিনটি বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল। প্রথমে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পর্যটক ফা-হিয়ান (মোক্ষদেব) তাঁহার ভারত পরিভ্রমণ কালে উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, উহা একটি বৌদ্ধতীর্থ ছিল এবং উহার নাম ছিল “ননি-গইনা।”^{১৩} এখন উক্ত ননি-গইনা সংস্কৃত “নীলাঙ্গন”, “লুনাঙ্গন” ও প্রাকৃত “লোনাগন”, “নীলাগন”র কথাই মনে করাইয়া দেয়। অর্থ বুঝাইত, সমুদ্রের তীরবর্তী স্থান; যেমন তীরভূক্তি, সমতট ইত্যাদি শব্দ। উক্ত স্থান বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদিগের একটি বাসস্থান ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল এবং এখানে স্বল্পসংখ্যক স্তূপ ও বিহার ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারও পূর্বযুগের বিবরণ যাহা মহাভারত হইতে টলেমি ও প্লিনির ভৌগোলিক বিবরণে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তাহার সহিত চীনা পর্যটকদের প্রদত্ত বিবরণের দূরত্ব, মিথুনিয় বিষয়ে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় গ্রহণযোগ্য নহে। তবে একথা বলিলে বা মানিয়া লইলে ভুল হয় না যে, দ্রাবিড়ীয় “পলৌর” বা “পালৌর”, মহাভারত ও হরিবংশের “দন্তকূর” বা “দন্তকুর” ও বৌদ্ধশাস্ত্র দীঘ-নিকায়, দাঠাবংশ প্রভৃতির “দন্তপুর” ও তাহার নিকটবর্তী “সিদ্ধান্তম্” বা “সিদ্ধার্থক গ্রাম”, “ভুতুর” বা “ভিক্ষুপুর”, “ধৌলি” বা “ধবলী”, “বিমলা পত্তন” ও “বিশাখা পত্তন” প্রভৃতি পুরী-ভুবনেশ্বর অঞ্চলের বৌদ্ধ প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয়।^{১৪}

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা পর্যটক হু-এন-সাঙ (মহাযানদেব) ভারতবর্ষে আসেন। ফা-হিয়েন ও হু-এন-সাঙের কাল-ব্যবধান প্রায় দুই শত বৎসর। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই দেখা যায় যে উক্ত স্থানের নাম ননি-গইনা পরিবর্তিত হইয়া “চরিত্রপুরে” দাঁড়াইয়াছে।^{১৫} অথচ এই পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা যে বৌদ্ধ মহাযান তীর্থে পরিণত হইয়াছে সেবিষয়ে নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। মহাযান-মতের দেব-দেবী—বিমলা,

লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী, জম্বলা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রথযাত্রা উৎসবেরও প্রচলন হইয়াছে।^{১৬}

ইহার পর ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গ বংশোদ্ভূত তৃতীয় অনন্ত ভীমদেব কর্তৃক তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণের প্রারম্ভ মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই জনশ্রুতি হইতে উক্ত তীর্থ বৌদ্ধ হইতে হিন্দুতীর্থে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় এবং তাহা খ্রীষ্টীয় একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটনা থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, বৌদ্ধ-মহাযান মত বা সংস্কৃত বৌদ্ধমত হিন্দু-বৈষ্ণব মতের সংগোষ্ঠী। উভয়েই নানা বিষয়ে পরস্পরের নিকট ঋণী। উপরন্তু মহাযান মতোদ্ভূত মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু শাস্ত্র ও বৈষ্ণব মতের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ণ সহজযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের ক্রিষ ও সত্যনামায়ণ পূজা প্রাক্তন অবলোকিতেশ্বরের পূজার অপভ্রষ্ট সংস্করণ। বৌদ্ধ জম্বলা দেবীই হিন্দু জম্বলা রাক্ষসী, যাহার নামে “অন্তি গোদাবরী তীরে জম্বলা নারী রাক্ষসী। তন্তা নাম অরণ-মাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ ॥”^{১৭} শ্লোক কীর্তিত আছে। হিন্দু শাস্ত্র মতের তন্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমী তন্ত্র যে বিশেষভাবে বৌদ্ধদিগের সম্পত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তদুপরি নাথ ধর্ম, যোগী (=যুগী)-দিগের দার্শনিক মত ও সাধন-ভঙ্গন প্রণালী জৈন ও বৌদ্ধমতের মিশ্রিত ও ছদ্ম সংস্করণ।^{১৮} এবিধ নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা ধরিয়া লওয়া যায়, উক্ত তীর্থ বৌদ্ধমহাযান মত হইতে বজ্রযান-কাল চক্রযান-সহজযান হইয়া শেষ পর্যন্ত হিন্দু-বৈষ্ণবমতের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। তদনুযায়ী ইহার চরিত্রপুর নাম বিচ্ছিন্ন হইয়া পুরীতে এবং মঞ্জুত্রীক্ষেত্র নাম ত্রীক্ষেত্রে পর্যাবসিত হইয়াছিল।^{১৯}

আবার খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কলিঙ্গাধিপতি কাকতীয় বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উক্ত তীর্থের বাসুপ্রাস হইতে উদ্ধার উদ্ধার পুনর্জন্মের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কিয়ৎকাল ব্যবধানে রাজা ইন্দ্রদ্বায় কর্তৃক উক্ত তীর্থের বিবিধ সংস্কারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই কালাপাহাড় কর্তৃক পুরীর মন্দিরের দেববিগ্রহগুলির অবমাননার কাল নির্দেশিত হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রীচৈতন্যকর্তৃক নব্য বৈষ্ণবমত প্রচলনের যুগ। জীবনের শেষভাগে তাঁহার এখানে আসিয়া বসবাস ও আত্মমুখিক সঙ্কীর্ণন, দীক্ষাদান প্রভৃতি ব্যাপার যে কতদূর ইহার মাধ্যম্য বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক।

এখন লুপ্ত বৌদ্ধেতিহাসের চিহ্ন-প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্তমান মূল মন্দিরের সম্মুখস্থিত অরুণ-শস্ত্র বা গুরুড়-শস্ত্র যে অশোক-শস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা বলা বাহুল্য। মূল মন্দিরের শিখরস্থিত চক্র, যাহা

বিষ্ণুচক্র নামে কথিত হয় ও দ্বারভাগে অবস্থিত সিংহমূর্তি “বৌদ্ধ ধর্ম চক্র প্রবর্তন স্তম্ভের” চক্র বা চক্র ও “সিংহনাদে”র প্রতীক সিং বা সিংহই। মন্দিরের পশ্চাট্টাগে অবস্থিত হনুমানের মূর্তি মূলতঃ কালভৈরব বা মহাকালের মূর্তিই ছিল। মন্দিরগাত্রে আজিও যে সকল নগ্ন মূর্তি বোদিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধশিল্পেরই অবশিষ্ট চিহ্ন। লোকনাথ ও বিমলা নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ মহাযান মতের দেব-দেবী। বিষ্ণুপঙ্কর যাছা কৃষ্ণের বক্ষপঙ্কর বলিয়া বিদিত তাহা যে কতদূর মিথ্যা সে কথা ক্রীমদ্ভাগবতেই পাওয়া যায়। স্তুরাং উহা ভগবান তথাগতের কোনও দেহাবশিষ্ট হওয়াই সম্ভবপর। ত্রি-বিগ্রহ অর্থাৎ জগন্নাথ-সুভদ্রা ও বলরাম প্রকৃতপক্ষে (ক) বুদ্ধ ধর্ম ও সজ্জের বা (খ) স্তুর বিনয় ও অভিধর্মপিটকের বা (গ) মঞ্জুশ্রী-প্রজাপারমিতা ও অবলোকিতেশ্বরের, অথবা (ঘ) গৌতম বুদ্ধ মৈত্রেয় বুদ্ধ ও শক্তির (=কানন বা কান-ইনের) প্রতীক ছিল। রথযাত্রা উৎসব যে হু-এন্ সাঙ পরিদৃষ্ট বুদ্ধ-ধর্ম ও সজ্জের প্রতীক লইয়া রথযাত্রা তাহা বলাই বাহুল্য। খুব সম্ভবতঃ ইহা কুমাণ রাজবংশ কর্তৃক খোঁটান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবর্তিত হইয়া হর্ববর্দ্ধন-শিলাদিত্যের রাজত্বকালে এতদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। সর্বশেষে জগন্নাথের সমার্থক ভুবনেশ্বরের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেই প্রবন্ধ পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করি। স্তুরাং ভুবনেশ্বর তীর্থের বহুসংখ্যক শিবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত রহৎ লিঙ্গমূর্তিগুলি য়াহাদিগকে অশোক-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়, সেগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহার অনতিদূরবর্তী ঋগ্মিরি ও উদয়-গিরি স্তুরাগাড়ের ১০ ব্রাহ্মীলিপি ও ধৌলী পর্বতগাড়ের অশোকাস্থশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাদটীকা

- ১। আমি Jarl Charpentier পরিকল্পিত “পাটলীপুত্র” বিধান করি না। কারণ উহা অস্তর ও অজ্ঞ আর দৃষ্ট হয় না।
- ২। পুর-পুরী, নগর, পত্তন, গ্রাম-গিরি, কুট-কোটা,

আগার প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রাচীনকালে শহর ও বন্দরগুলির নামকরণ হইত।

৩। রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের “প্রাচীন ভারত” ও *Travels of Fa-Hien*—translated and edited by Landresse, Klaproth and Remusat দ্রষ্টব্য।

৪। দ্রষ্টব্য—“*Pre-Dravidians & Pre-Aryans in India*” by Jean Przyluski, Sylvain Levi and Jules Bloch—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, pp. 167-172.

৫। দ্রষ্টব্য—রামপ্রাণ গুপ্তের “প্রাচীন ভারত” ও “*Huen-tsang*” (*Yuan-Chwang*) by Watters & S. Beal

৬। স্নানযাত্রা-উৎসবও ইহার সমকালীন কিনা সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৭। যে আকারে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ এবং তাহা এই—“অস্তি গোদাবরী তীরে জন্তলা নাম রাক্ষসী। যন্তা নাম অরণ্যমাঞ্জে গন্ডিগী বিশল্যা ভবেৎ।”

৮। দ্রষ্টব্য—*Discovery of Living Buddhism in Bengal* by H. P. Sastri; *Modern Buddhism in Orissa and its Followers*—by N. N. Vasu ও অন্যান্য মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

৯। হিন্দুদিগের মতে শ্রী অর্থে লক্ষ্মী; স্তুরাং-সুভদ্রা নহে। ভগ্নী ও শ্রী একই বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দেবজ্ঞ স্তুরাদার নামানুযায়ী ইহার শ্রীক্ষেত্র নামকরণ হইয়াছিল, এরূপও বলা যায় না।

১০। দ্রষ্টব্য—*Old Brahmi Inscriptions in the Caves of Khandagiri and Udayagiri*: Introduction by Dr. B. M. Barua.

সেইটুকু বল ভাই

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

বন্ধু, আজিকে বল,
ভরা গঙ্গার কূলে কূলে জল করে নাকি টলমল ?
ও আঁধি কিনারে প্রেমের মিনতি হ’য়ে যাক নির্বাক
ছলছল চোখে ফিরে ফিরে মোরে, দিও না, দিও না ডাক।
আজ শুধু তুমি বল,
ঘনায়িত ঘন বজার বেগে হও নাকি চঞ্চল ?
কত না প্রাণের সবুজ শিখায় হঠাৎ ঝঞ্ঝা লেগে
উন্মুখ প্রাণ কেঁপে কেঁপে ওঠে জেগে,

তারই কল্পিত শিখায় শিখায় নৃতনের আস্থান,
জীবনের অভিধান—
কত না সাগর পাড়ি দিল এরা, কত না দরিয়া পার,
কাভার, গিরি, ছত্তর পারাবার,
কে করে তাহার হিসাব নিকাশ, কেবা করে গণনাই,
অচেনা পথিক রয়ে গেল চির রহস্য অজানাই।
যদি জেনে থাক এ প্রাণের কোন গোপন মর্মকথা
সেইটুকু বল ভাই।

গুরু-দক্ষিণা

শ্রী অবনীনাথ রায়

মাহুঘের যত বয়স বাড়ে সে তত অতীতের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। অতীত তার চোখে যে মোহ-অঙ্কন লাগিয়ে দেয় বর্তমান তার তুলনায় ফিকে এবং হালকা বলে বোধ হয়।

তরুণ এবং প্রৌঢ়ের মধ্যে এখানেই প্রভেদের সীমারেখা। অতীতে যে মহত্ত্ব দেখেছি এবং মানবতার সংস্পর্শে এসেছি তার তুলনায় বর্তমানকে কঠোর এবং নীরস বলে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে জানবার সৌভাগ্য সেই মহত্ত্বের স্মৃতির প্রধান বাহক।

আমাদের দেশকে কে কে বড় করেছেন, আমাদের জাতিকে স্থপ্তি থেকে উদ্বোধিত করে তুলেছেন তাঁদের আজ স্মরণ করি। চার জন মহাপুরুষের কথা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়—বঙ্কিমচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ। রাক্ষাস রামমোহন জাতির আত্মসম্মিতির ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জাতি গড়ে যেতে পারেন নি। বঙ্কিম তাঁর অহুলনীয় কথা-সাহিত্যে জাতির সামনে তুলে ধরলেন উজ্জ্বল আদর্শ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দিলেন সংকল্প, রবীন্দ্রনাথ দিলেন ভাব ও ভাষা, রচি এবং শালীনতা। জাতির ক্রমবিকাশের পথ দিয়ে

এইরূপই প্রয়োজন ছিল। এই চার জন মহাপুরুষ ছাড়া আরো অনেকে জাতির আত্মচেতনার যজ্ঞে সমিধ জুগিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কল্যাণের সীমা-রেখাকেই স্পর্শ করেছিলেন, জাতির আত্মাকে মূলগত ভাবে আন্দোলিত করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’, ‘সীতারাম’, ‘দেবীচৌধুরাণী’, ‘চন্দ্রশেখর’ প্রভৃতি উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন করলেন জাতির মনে কালক্রমে তা পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। স্বামী বিবেকানন্দ ‘বর্তমান ভারত’ প্রভৃতি গুণ্ডকে এবং তাঁর জীবনের উদাহরণ দিয়ে এই বীজের মূলে জলনিষেক করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হলেন তখন জাতির মন ধানিকটী প্রবৃত্ত হয়েছিল, তখন তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সময়টা জাতীয় জীবনে একটা সফট-মুহূর্ত—কেননা, এই সময়ে পঞ্চ ভুল হলে উন্নতির বদলে রসাতলের পঞ্চ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব নিলেন। দেশের জনমনের অন্তর্গত বেদনা এবং আনন্দকে তিনি ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে ছড়িয়ে



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দুর্লভ নয় মোটেই—

তরুণের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ‘ক্যালকেমিকো’র সযত্নে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

☆ তুহি না বিউটিফিক
☆ হেনুকা টয়লেট পাউডার
☆ লাবনী স্নো এবং ক্রীম

দিলেন। আমরা অমুভব করতে পারলাম যে, আমাদেরও গৌরবময় অতীত ছিল, আমাদের ভবিষ্যৎ আছে। এই যে মবলক শক্তি এ বিপথে যেতে পারত—রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বাণী এবং মাধুর্যের স্পর্শ আমাদের সত্য-পথ দেখিয়ে দিলে। আমাদের জাতির বিবর্তনের ইতিহাস, অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার সত্য ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই দানটী তাঁর অমূল্যম শ্রেষ্ঠ দান বলে ঘোষিত হবে এই আমার বিশ্বাস।

আমি রবীন্দ্রনাথকে নিকটের থেকে জেনেছি, তাই আমার এ সংশয় কিছুতেই মেটে না যে তিনি কবি হিসাবে বড় ছিলেন, কিংবা তিনি মানুষ হিসাবে বড় ছিলেন। কবিত্বের পরিমাপ বড় বড় রসজ্ঞেরাই করতে পারবেন কিন্তু আমি তাঁকে মানুষ হিসাবেই জেনেছি। তাঁর জন্ম যে শ্রদ্ধা, যে আকর্ষণ অমুভব করেছি, তার তুলনা নেই। তাই সেদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ্র লিখিত “My Master in his Slippers” শীর্ষক লেখা “অমৃত বাজার পত্রিকা”র যখন পড়ি তখন মনের মধ্যে মধু বর্ষণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের

ব্যক্তিত্বের যে কি দুর্দমনীয় আকর্ষণ তা যিনি তাঁর নিকট-সংস্পর্শে না এসেছেন তিনি কিছুতেই অহুমান করতে পারবেন না। তিনি একাধারে ছিলেন মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা। তাঁর স্নেহের, তাঁর সহানুভূতির অনাবিল স্রোতে কত নরনারী যে অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছেন তার হিসাব আজ করা শক্ত। বিধাতা দেহের যে সৌন্দর্য দিয়ে তাঁকে গড়েছিলেন তা জগতের সকলের চোখেই ধরা পড়েছে, কিন্তু মনের যে সৌন্দর্য দিয়ে তাঁকে উদ্বোধিত করে তুলেছিলেন তার খবর যারা তাঁর স্নেহের অংশীদার না হয়েছেন তাঁরা অহুমান করতে পারবেন না। তাঁর কথাবার্তা—তাঁর ধরণধারণ, তাঁর চাহনি, তাঁর স্মৃষ্টি কর্তব্য—সমস্ত মিলে এমন একটি জ্যোতির্দয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করত যার সাক্ষাৎ আর দ্বিতীয় বার পাই নি। কৌতুকপ্রিয়তার কি অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁর বাণীর মধ্যে বিজড়িত হয়ে রসস্রোত বইয়ে দিত তা আজ যখন ভাবি তখন কেমন আশ্চর্য লাগে। মনে হয় তাঁকে অদ্বিতীয় করে রাখবেন বলেই বুঝি বিধাতা আর তাঁর সমান করে কাউকে সৃষ্টি করলেন না। যত

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজি: অফিস—আখাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা ষ্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০২।১, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, ৫৭নং, ক্লাইভ ষ্ট্রিট (রাজকাটরা)

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—	...	...	৫০,০০০,০০
বিক্রীত মূলধন—	...	...	২২,৫০০,০০
আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল—	...	...	১৪,৯৫০,০০ টাকার উপর
আমানত	...	...	৩,৫০,০০০,০০ টাকার উপর
কার্যকরী তহবিল—	...	...	৪,০০,০০০,০০ টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুটী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ফেঁচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, বদরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মোলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইন্দুল, শিবসাগর, গোলাঘাট, তিনহুকিয়া, নর্থলক্ষ্মীপুর, ট্যাংলা, গোহাটা, ডিব্রুগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, ঝাঙ্কগ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অল্পথেষ্ট হটক বা স্বাস্থ্য অবস্থাতেই হটক, যখন কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহাৰ্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হটক না কেন তাহার একটা দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র স্থানীকীৰ্তিত কোনো খাদ্যদ্বারা ই দৈহিক পরিপুষ্টির সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীৰ্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

আনা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

আনা-ভিটা স্থানীকীৰ্তিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের স্বল্প সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্কিকো এবং বর্ধিক্ষু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া আনা-ভিটা রোগান্তে ও বর্ধিক্ষু শিশুদের পক্ষে একটা আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে আনা-ভিটা মস্তিষ্ক,

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ়-করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

আনা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম আনা-ভিটার আর একটি অপূর্ণ সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যভেদের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। আনা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুগুলীর স্বচ্ছ পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ আনা-ভিটাতে অগ্নাগ্ন নানা মূল্যবান উপাদান ছাড়াও দুইটা ভিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ আনা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে আনা-ভিটা কেবল যে স্বাস্থ্য ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অগ্নাগ্ন খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ণ খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদেব স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। আনা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অগ্নাগ্ন মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্কি, প্রোটিন, লোহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় আনা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

আনা-ভিটা কি স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। আনা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যাক না কেন, প্রসন্ন হান্তে এবং সান্ত্বনার প্রলেপে তিনি সে বিষয়টা দূর করে দিতেন। আমাদের যখন অল্প বয়স, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা বুঝবার যখন আমাদের সময় হয় নি তখন তাঁর ধৈর্যের উপর, তাঁর মূল্যবান সময়ের উপর কত জুলুম যে করেছি তা আজ মনে পড়লে লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তিনি তাঁর অপরিণীত ওঁদার্য্যে আমাদের সেই ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দিতেন, আমাদের লেখা কবিতা সংশোধন করে দিতেন। কোনদিন সময়ভাবের অভূহাত তোলেন নি। আজ তাই যখন চারিদিকে—‘আমার সময় নেই’, এই কথাই অবিরাম শুনি তখন মনে হয় যে, যে-লোকটি পোনে এক শতাব্দী ধরে নিরলস চিন্তে দেশমাতৃকার এবং বাণীর পূজা করে গেলেন—বিখের দরবারে পূজা-উপচার সাজিয়ে বঙ্গ-ভারতীকে বিশ্ববরেণ্য করে তুললেন, অক্ষুরন্ত সময় কি কেবল ছিল তাঁরই?

আজ মনে হয় যেন এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মর্যাদা দিতে জানতেন, মূল্য দিতে জানতেন। বয়সে ছোট, বিদ্যায় খাটো, সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় অহ্নেখ-যোগ্য কাউকেই তিনি ভুজ্জ করতে পারেন নি। তাই

কারুর প্রার্থনার উত্তরেই তিনি ‘না’ বলতে পারতেন না, বেদনা দিতে তাঁর সঙ্কোচ হ’ত। এর জেতে নিজে বেদনা পেয়েছেন কিন্তু তবু প্রার্থীকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আজ যখন অহ্নযোগ্য শুনি যে, শান্তিনিকেতনের কোন ছাত্র সরকারী বড় চাকরি করে না, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও কারুর দেশদেশান্তরে প্রচারিত হয় নি, দেশনেতার উচ্চাসন কারও ভাগ্যে লব্ধ হয় নি, তখন ভাবি যে এ অহ্নযোগ্য অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথ সকলকে সাধারণ সহজ মানুষ করতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা যদি সর্ব দেশের মানুষকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, নিজেদের জীবনকে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট উন্মুক্ত করে ধরতে পারে, যদি তারা আচরণে ভদ্র হয়, অকারণে অপরকে আঘাত করবার দুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে, তাদের জীবনে এবং ব্যবহারে যদি সুরচিত্র, শালীনতার এবং মাধুর্য্যের পরিচয় থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের বাণী তারা জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে বলে মনে হবে।

কি ভাষায় প্রগতি জ্ঞানালে তাঁর স্মৃতির যোগ্য সমাদর হবে খুঁজে পাই নে। তিনি ছিলেন আমাদের গুরু—

উৎকৃষ্টতম উপায়ে

টাকা খাটাইতে চাহেন?

আমাদের “স্বাস্থী আশ্রিত” জমা রাখুন

সুদের হার			
১	বৎসরের জন্ম শতকরা ৩৥০	৭	বৎসরের জন্ম শতকরা ৪৮০
২	" " " ৪৮	৮	" " " ৫৮
৩ ও ৪	" " " ৪১০	৯	" " " ৫১০
৫ ও ৬	" " " ৪১০	১০	" " " ৫১০

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিঃ

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”,—কলিকাতা।

= উপহারের ভাল ভাল বই =

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

শতাব্দীর জ্ঞান

অভিনব কিশোর উপন্যাস : সচিত্র। মূল্য ২৮ টাকা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

আণবিক বোমা

আণবিক বোমার আত্মপুঙ্খিক কাহিনী-চিত্রবহুল। মূল্য ৩৮

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত

য্যাং-ব্যাং

ছোটদের জ্ঞান ছবি, ছড়া ও ছোট গল্প—দুই রঙে ছাপা। মূল্য ১১০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত

কবি-ভীষ্মের পাঁচালী

মনোহর কাব্যগ্রন্থ—সচিত্র। মূল্য ২১০

ঠগী-সর্দার

১১০

কাফি-মুন্সুকে

১৮

ছুটিতে কলকাতায়

১১০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

জীবন জেগেছে যার ১১০

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র প্রণীত

অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক ১১০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

যারা ছিল দ্বিগিজরী ২৮

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অজানা দেশের যাত্রী ১১০

সংক্ষেপিত বঙ্কিম-গ্রন্থমালা

সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম-এ

এই গ্রন্থমালার নিম্নোক্ত কথখানি বাহির হইয়াছে :

আনন্দমঠ : কপালকুণ্ডলা : চন্দ্রশেখর

রজনী : রাজসিংহ : দেবী চৌধুরাণী :

ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী (একত্রে)

সীতারাম : মৃণালিনী

প্রত্যেকখানা ১৮ এক টাকা

সংক্ষিপ্ত রমেশ-গ্রন্থমালা

সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী

ভারতগৌরব মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসমালা মূল্যের বস অব্যাহত রাখিয়া ষষ্ঠাংশের ছোট আকারে বাহির করা হইতেছে। উপন্যাসিকের ভাষা কোথাও বিকৃত করা হয় নাই।

প্রত্যেকখানা ১৮ টাকা

এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ—

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

বাহির হইল।

জ্ঞান-ভারতী গ্রন্থমালা

বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রবহুল গ্রন্থের ডালি—ছোটদের শিক্ষা ও আনন্দের খনি। প্রত্যেকখানি ১৮/০

শ্রীনীলগোপাল চক্রবর্তীর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের

বাংলার কুটীর-শিল্প বিজ্ঞানী ও বোজাণু.

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্তের

মহাকাশ বাংলা সাহিত্যের কাহিনী

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত

মহাশূন্যের দান

টেকচাঁদ ঠাকুরের

আলালের ঘরের দুলাল

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ। মূল্যের ভাষা ও বস অব্যাহত রহিয়াছে; চিত্রভূষিত অভিনব সংস্করণ। মূল্য ১১০

শ্রীভারতপদ রাহা প্রণীত

প্রিমের রূপকথা

‘গ্রিমস্ ফেয়ারী টেলস’ গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অংবাদ : সচিত্র। মূল্য ১১০

সহজ শ্রাব্য রবীন্দ্রনাথ ১৫০ রবিন হুড ১৫০

পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১৫০ খেলার সাথী ১৫০

নোল আকাশের অভিযাত্রী ১১০

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৩৮, জনসন রোড, ঢাকা

শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁকে ‘গুরুদেব’ বলে ডাকবার রীতি ছিল, কিন্তু বহু লোকের মনোমন্দিরে তিনি গুরুরূপে পূজা পেয়ে আসছেন। তার কারণ তিনি আমাদের অনেকের জীবনকে প্রাত্যহিকতার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা, বাঙালীরা যে অর্থে জীবনের একমাত্র উপাত্ত দেবতা বলে মনে করি নে, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি ভাবাবেগ যে আমাদের মনে আলোড়ন জাগাতে পারে, যে-কোন প্রকারে নিজের স্বার্থসংসিদ্ধি যে আমাদের মনঃপূত হয় না—শিল্প, সঙ্গীত যে আমাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করতে পারে—এই সব কারণেই ভারত-বর্ষের মধ্যে আমরা এক বিশিষ্ট জাতি। এই বৈশিষ্ট্য যদি আমাদের না থাকত তবে আমরা গতানুগতিক জীবনের তুচ্ছতার উর্দ্ধে উঠতে পারতাম না—প্রতিদিনকার জীবন আমাদের নিকট একটি অখণ্ড আনন্দের সৃষ্টিতে দেখা দিত না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাতৃক জীবনযাত্রার এই পৌনঃপুনিক আবর্তন থেকে বাঁচিয়েছেন। এইখানে তিনি

আমাদের গুরু। দেশের লোক আজকের দিনে এই ধারণা যদি স্মরণ করেন তবে তাঁদের উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে।

শ্রীঅই প্রকাশিত হইতেছে প্রতিভা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা

বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্তমান যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনদর্শনের হৃদয়বর্ণন ও বিশ্লেষণ।

প্রবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোভিত, বাংলা-সাহিত্যে অভিনব জীবনচরিত। ইহা একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী এবং সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি যাবতীয় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তক-খানি অপরিহার্য। প্রবাসী কার্যালয়

১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন?

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

“স্বামী আমানতে” জমা রাখুন।

সুদের হার			
৩ মাসের জন্ম	... ২½%	৫ ও ৬ বৎসরের জন্ম	... ৫%.
৬ " "	... ৩%.	৭ " "	... ৫½%.
৯ " "	... ৩½%.	৮ " "	... ৫½%.
১ ও ২ বৎসরের	... ৪½%.	৯ " "	... ৫½%.
৩ ও ৪ " "	... ৪¾%.	১০ " "	... ৬%.

নিরাপত্তা?

কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও সম্ভ্রান্তিআমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় এবং হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্শ্বে ও মধ্যে আরও বহু জমি খরিদ করিয়াছি। এই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

স্থাপিতঃ ১৯৪১

—নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটি ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

হেড অফিসঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোনসঃ—কালঃ ১৪৬৪—৬৫

টেলিগ্রামঃ—“Aryplants”

পুস্তক-পরিচয়

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীললিতাকুমার ভদ্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড। ৮ মি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
সচিত্র। মূল্য দুই টাকা।

এই ভ্রমণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। আমাদের ঘরের পাশেই মণিপুর, তাহার সম্বন্ধে কত কম খবর আমরা রাখি। মণিপুর হিন্দুরাজ্য, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সব চেয়ে পুণ্যের ঘাট। এখানকার হিন্দুধর্ম আমাদের বাঙ্গালা দেশের চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। এই ধর্ম বাঙ্গালার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ-সুত্ররূপে বিভক্ত। এ ছাড়া, বাঙ্গালার সংস্কৃতির অল্প প্রভাবও মণিপুরে পৌঁছিয়াছে। মণিপুরের প্রধান জাতি, রাজার জাতির ভাষা মেইতেই বাঙ্গালা লিপিতে লিখিত হয়, যদিও ভাষাটি আর্য্যগোষ্ঠীর নহে, ভোট বা তিব্বতী এবং বর্মার মগোত্রীয়। বাঙ্গালার পাশে হইলেও মণিপুরে যাওয়া সহজ নহে এবং ভারতীয় জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বলিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও কাহারও নাই। এই ভ্রমণ-কথার লেখক মণিপুরে গিয়া নিজের চোখে বাহা দেখিয়াছেন তাহা আমাদের শুনাইয়াছেন। বইখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখকের দেখিবার চোখ আছে, সরস করিয়া বলিবার শক্তিও তাহার আছে। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে মেইতেইদের বৌদ্ধধর্ম মিশ্র যে নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল, তাহারই আধারের উপর ইহাদের আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। মণিপুর রাজ্য এতাবৎ কাল বাহাকে বলে unspoiled তাহা ছিল—অর্থাৎ

অত্যধিক সভ্যতা-বাধি-গ্রস্ত ছিল না। দেশটি হৃদয়, দেশের লোকদের জীবন-যাত্রা সাবেক কালের, সরল এবং সহজ সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল। নলিনীবাবুর বর্ণনা পড়িয়া আমার প্রতিপদে বলিষীপের কথা মনে হইতেছিল। রাজধানী ইম্ফলের কথা খুঁটিনাটির সঙ্গে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, মণিপুরের বিবাহ এবং মণিপুরের বিশিষ্ট নৃত্যের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন, মণিপুরের ইতিহাসের কথা, রাজকুমার টিকেজ্রাজিতের কথা শুনাইয়াছেন, আর আমার কাছে বা সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে মণিপুরের বিখ্যাত প্রণয়-গাথা রাজকুমারী থাইবি ও বীর খাখার উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই হৃদয় প্রেম-কাহিনীটি তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছেন। মোটের উপর মণিপুরের অনেক জ্ঞাতব্য কথা তিনি এই বইয়ে দিয়াছেন। বইখানির সার্থকতা এইখানে যে, তাহার বর্ণনা পড়িয়া মণিপুর দেশ ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা হয়।

মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা যে বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান পরিবর্তিত সংস্করণে (১) মইরাঙের কাহিনী, (২) হুমিত কাপা, (৩) মণিপুরের ইতিবৃত্ত (৪) মণিপুর অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয়বাহিনী—এই চারিটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। ফলে পুস্তকখানি সর্বোত্তম-সম্পূর্ণ এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্মৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কী স্মৃতির নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্মৃতির ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্মৃতির যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্মৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্মৃত ব্যবসায়ী মাত্রেই অনুকরণীয়।

শ্রীঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

প্রকাশিত হ'লো

ফাল্গুনী

মূলক রাজা আনন্দ

অনুবাদ : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

যে বই ইংলন্ড সহ্য ক'রতে পারে নি,
তাই তার প্রকাশ এতদিন নিষিদ্ধ ছিল—
যে বই চায় আজ তরুণ ভারত,
তাই এলো আজ বাংলা ভাষার অন্তঃপুরে...

...বুটিশ শাসনের ফলে আজ ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়ছে, আর সেই ভাঙ্গা সমাজের বকের ওপর বসে যুরোপীয় সমাজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ, বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং শাসক-সম্প্রদায় কিভাবে তার অস্থির সংস্কারের আয়োচনে বাস্তব, এবং সেই ঘাট-প্রতিঘাতে অগ্রহীন, বস্ত্রহীন কোটি কোটি মানুষ কিভাবে কলের পুতুলের মত এই অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতাদের পরিকল্পনা-কৌশলে নিজেদের চিতা নিজেরাই সাজিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে মূলক রাজা আনন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে।

দাম চার টাকা আট আনা

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

গুড আর্থ

সত্য বাবু

অনুবাদ ক'রেছেন পুষ্পময়ী বসু

- * ১৯৩৮-এ বহুমূল্য নোবেল প্রাইজ পাল' বাক এই উপন্যাস লেখার জন্য পেয়েছেন।
- * ১৯৩৬-এ 'গুড আর্থ' সবার চিত্রে রূপান্তরিত হয়।
- * বিশ্ববিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবং হাওয়ার্ড-স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে পাল' বাককে সম্মানিত করা হয়।
- * পৃথিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।
- * আমেরিকার বই বিক্রয় রাজ্যে 'গুড আর্থ' রেকর্ড স্থাপন করে।

অনিম্য অনুবাদ—অপূর্ব গঠনসজ্জা—উৎকৃষ্ট এ্যাটিক ডিমাই কাগজে
ছাপা এই হৃৎকৃত উপন্যাসের মূল্য : পাঁচ টাকা

ন্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

কথা শুদ্ধ—শ্রীধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

পুস্তকখানি খ্যাতনামা ছোটগল্প-লেখকদের রচনার সংগ্রহ। বাংলায় এইরূপ একটি কথা-সঞ্চয়নেব প্রয়োজন ছিল। এক যুগ পূর্বে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়। তার পর বহু স্মৃতিস্তম্ভিক ভাল ছোট গল্প লিখিয়াছেন। কাজেই নূতন সংস্করণে সঞ্চয়ন নূতনতর এবং সম্পূর্ণতর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেশ-কুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরশুরাম, বেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প সঞ্চয়িত হইয়াছে। অলুকা দেবী, শাস্তা দেবী, সৌতা দেবী, নবশচন্দ্র, সৌরীন্দ্র-মোহন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাদ্বার আতর্ষী, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও ইহাতে আছে। তারাস্থর প্রমথ আধুনিক কথা-সাহিত্যিকগণের রচনাসমুহেও ইহা সমৃদ্ধ। গোড়ায় ভূমিকাস্বরূপ প্রমথ চৌধুরী লিখিত ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি স্বল্পর নিবন্ধ আছে। শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় লিখিত লেখক-পরিচিতে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সম্পাদক ঠিকই লিখিয়াছেন, সকলের মাপকাঠি এক নয়। শ্রেষ্ঠ গল্পের নির্ধারনে বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। কিন্তু "কথা শুদ্ধ" অসম্পাদিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও, এরূপ সঞ্চয়ন বাংলা গল্প-সাহিত্যের দিগ্-নির্ঘণ্ডে সাহায্য করিবে বলিয়াই বলিতেছি, বিগত যুগের নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিশাধন মুখোপাধ্যায়, বোগীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি লেখিকার রচনা ইহাকে পূর্ণতর করিতে পারিত। "পরিচিতি"তে লেখকবর্গ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৯০৪ সালে নয়, ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র রেজুনে যান এবং তাঁহার রেজুন পরিচয়গণিত্য তারিখ ১৯১৩ নয়, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রভাতকুমারের জন্ম-তারিখ—নয় বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে; ১২৭০ সালে নয়, ১২৭৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ যোল বৎসর আগাইয়া আসিয়াছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "সাধনা" সম্পাদন আরম্ভ করেন, কাজেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম সম্ভব-পর নয়; ১৮৬৯ খ্রীঃ তাঁহার জন্মবৎসর। বহু স্থলেলেখকের রচনা-সমৃদ্ধ "কথা শুদ্ধ"র গল্পগুলি পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"কালোর আলো"—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। দি আশনাল লিটারেচার কোং ১০৫ কটন স্ট্রিট। কলিকাতা।

নিষ্কর আঘাত এবং নিবিড় ছুঁথের মধ্য দিয়া মানুষের এক এক সময় দিয়াদুটি ফোটে, সুখের দিনে যে-কল্যাণকে অবহেলা করিল হঠাৎ তাহার সত্য মূল্য বৃদ্ধিতে পাবে। ধনী মেয়ে সিদ্ধুর জীবনে লেখক এই সত্যটিকে রূপায়িত করিয়াছেন। স্বামী প্রমুখ পাড়ারগে বড় ভাই আর ব্রাহ্মজায়ার মেহে মানুষ হইল—ভাল ছেলে, শহরে ধনীকন্যা সিদ্ধুর

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অশ্রুতিবন্দী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিজ্ঞান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সাম্বাদিকরজ, এম-আর-এ-এস (লন্ডন) ; বিশ্বখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুগ্মরস্তুকালীন মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা; কারয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাণ্ড ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার বধাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের শান্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় ইঁহার নিভুল গণনা, অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির আরও একটি জাম্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাজ্যের নরপতিত্ব এবং দেশীয় নেতৃত্ব লাভের ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ত্বরিত্বের স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আঠারজন বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সমগ্র প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইঁহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার,

কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোক্ষদায়ক জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা—মুগ্ধ ও বিস্মিত।” হারু হাইনেস্ মাননীয় বর্ধমাতা মহারাজী জিপুরা ট্রেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।” সম্ভাব্যের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের সন্নী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রাণ পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র মহাকবি শ্রীহরীদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বর মাননীয় শ্রীযুক্ত সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্তার সি, মাধবম্ নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচগল বলেন—“আপনার তিনটি প্রবন্ধের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ষে বর্ষে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পুত্রের জন্ম ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।
ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে মুক্ত ব্যক্তিও রাজত্বলাভ প্রার্থ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তন্মূল্য ৭।০।)
অভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্ত্বর ফলপ্রদ কবচকৃত্তলা বৃহৎ কবচ ২৯।০।/প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা ধারণ কতব্য। বর্গলান্ধবী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোক্ষদায়ক ফললাভ, আকস্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিহৃ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মজ্ঞ। মূল্য ৯০।/শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪।০। (এই কবচে ভাওয়াল সম্রাটী জয়লাভ করিয়াছেন)। বশীকরণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বার্থ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাচ্য) মূল্য ১১।০। শক্তিশালী ও সত্ত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪।০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিসঃ—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রিট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
লাফ্রাভের সম্মুখ—প্রাণে ৮।০টা হইতে ১১।০টা। ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রিট, (শ্বেলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সম্মুখ—বৈকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিসঃ—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

সহিত হইল তাহার বিবাহ। এর পর নবানুরাগের মোহের সঙ্গে সিদ্ধুর কাঞ্চন-কৌলীন্তের দর্প মিলিয়া প্রফুল্লকে ধীরে ধীরে নিজের গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। দাদা আর বৌদিদির নৈরাশ্র আর বেদনার কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল বধূকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিল।

এর পর শ্রায় আকস্মিকভাবেই প্রফুল্ল মারা গেল, এবং তাহার পর কয়েকটি ঘটনায় সিদ্ধু প্রকৃত স্নেহ আর দরদ কোথায় এবং স্ত্রীলোকের প্রকৃত অধিকার কোন্‌খানে সেটা বুঝিতে পারিয়া সম্ভানদের লইয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া স্বস্তরের ভিটায়ে ভাহুরের সংসারে চলিয়া গেল।

প্রফুল্লর দাদা এবং জাতজারীর বেদনাতুর স্নেহের চিত্রগুলি বড়ই করুণ। প্রফুল্লও দোতানার মধ্যে চরিত্রগত একটি সামঞ্জস্য বেশ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু গল্পের প্রথমাংশের দিকে, সিদ্ধুবালার চরিত্রে কাঠিষ্ঠ বা উগ্রতাটা স্রায়গায় স্রায়গায় একটু অব্যবহারিক হইয়া পড়িয়াছে এবং শেষের দিকে তাহার পিতার সহিত ব্যবহারে অব্যবহারি একটি নাটকীয় আড়ম্বর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা বইখানির তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা করিলাম। সর্ব-সাধারণ্যে বইখানি সুখপাঠ্য এবং বাঙালী-চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার সহিত বেশ খাপ খাওয়াইয়া লেখা।

তেপান্তর—শ্রীচরণদাস ঘোষ। আর এইচ শ্রীমানী এণ্ড সন্স। ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন মাসিক বহুমতীতে “স্ত্রী” নামে তাহার একটি গল্প প্রকাশিত হয়। তাহার পর হঠাৎ একদিন পড়িয়া সেখেন গল্পটিতে—“আরও অনেক কিছু বলবার কথা যেন বাকী রয়ে গেছে।” সেইজন্য গল্পটিকে একটি উপস্থাপনে পরিণত করিয়াছেন।

গল্পটি পড়ি নাই, তবে লেখকের এ দুঃখিত না হইলেই ভাল হইত। চরিত্র, ঘটনা, সবই এমন সামঞ্জস্যহীন যে, মনে হয় যেন একদল পাণ্ডলের কাণ্ড। কি উদ্দেশ্য লইয়া লেখক গল্পটি টানিয়া বাড়াইয়াছেন কিছু বোঝা গেল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্ট্যান্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৪; মূল্য তিন টাকা।

লেখক তেরটি অধ্যায়ে এই পুস্তকে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলন, ইসলামের আদর্শ ও পাকিস্থান, ভারতের গণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর ব্যক্তিগত

সম্প্রীতি সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নেতাজী একদা মহাত্মার এবং কংগ্রেসের আত্মগতা স্বীকার করিলেও আজ তাহার মত ও পথ প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট স্থাপ্ত। গান্ধীজীর নিকট অহিংসার আদর্শ স্বাধীনতা হইতেও অধিকতর কামা, কিন্তু স্বভাষ-চন্দ্রের আদর্শ হিংসাত্মক উপায়েও স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন। বিগত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতেছেন, ইহা সত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসকে আইন-সভায় প্রবেশ করাইয়া ও নেতাজী করওয়াল্ড ব্রক এবং আজাদ হিন্দ সরকার ও সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া জনগণকে নতুন পথে চালাইতে ও নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, গান্ধীজীর প্রাণপণ চেষ্টারও ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে এক করিতে পারে নাই, কিন্তু নেতাজী খাঁয় পন্থা অনুসরণ করিয়া এই কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাঁহার মরণজয়ী আজাদ হিন্দ কোজই ইহার সাক্ষ্য। নেতাজী জীবিত কি মৃত তাহা লইয়া আজ বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। আজ জাতির এই মহা হৃদ্বিন্দে স্বভাষচন্দ্রের আদর্শ দেশবাসীকে নতুন আলোক দেখাইতে পারে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মা-কালীর খাঁড়া—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীশ্রী লিটারেচার কোম্পানি—১০৫ নং কটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

সেকালের প্রভাবশালী জমিদারের সঙ্গে মা-কালীর খাঁড়া নামধেয় দণ্ডদলের সংঘর্ষ-কাহিনী লইয়া এই শিশু উপন্যাসখানি রচিত। বরষের ভাষায় প্রতিটি অধ্যায়ে রহস্যের জাল বুনিয়া লেখক শিশুচিত্তকে কুতূহলী করিয়া তুলিয়াছেন। এই ডাকাতের দলপতি অনেকটা রঘু ডাকাতের মত; ছুটের দমন ও শিপের পালনই তাঁর ধর্ম। কাহিনীর উত্তেজনা ছাড়া এই উপন্যাসে শিশুচিত্ত গঠনের উপযোগী শিক্ষাও আছে। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় বুঝা যায়, ইহা ছোটদের মনোরঞ্জন করিয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বর্গীয় পণ্ডিত রমানাথ চক্রবর্তী-সঙ্কলিত এবং কলিকাতা ১২০২ আপার সারকুলার রোড হইতে ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪ + ২০০ মূল্য ১০ দেড় টাকা।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিটিউরেন্স

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেন্নারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার
আই, সি, এস (রিটার্ড)

‘বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ’

নব-নারী নিবিশেষে বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে বিভিন্ন মতাবলম্বী বাঙালীদের মধ্যে পত্র-মারফৎ ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে ‘বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বাহন হইবে বাঙলা ভাষা। নিয়মাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

শান্তি দেবী, সম্পাদিকা

বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ

১৭, অবৈত মল্লিক লেন, কলিকাতা

আলোচ্য ত্রিঐচণ্ডী গ্রন্থখানি ভারতীয় ঋষিগণের ভক্তিভাবপূর্ণ দেবদেবী মাহাত্ম্যের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অতীব সমাদরের বস্তু। এই গ্রন্থ স্বকীয় গৌরবে হিন্দু সমাজের চিরপূজ্য। ত্রিঐং ভাগবত, ভগবদ্গীতা, ত্রিঐচণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি জনসমাজে ভারতীয় ঋষিগণের ভক্তি ভাবধারা প্রকাশে অতি উপাদেয় নিদর্শন। অধুনা শক্তিতত্ত্ব আলোচনার শিক্ষিত নরনারী মাজেরই সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক। বহুদিন হইতেই নানা বিষয়ে বাঙালীদের দুর্বলতা দেখা যাইতেছে। বর্তমান সময়ে বাহাতে বাঙালীর দেহে, মনে ও হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে সে বিষয়ে সকলেরই অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি কেহ ত্রিঐচণ্ডীর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের দ্বারা এবং সর্বত্রই সুবিশেষ-সমাধির প্রয়োজনের দ্বারা বাঙালী জাতির কল্যাণের পথ মুক্ত করিতেন তবে এদেশবাসী দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হইত। কেবল বাহুবলই বল নহে, মানসিক বল যথেষ্ট না থাকিলে বাহুবল পাশব বলের দ্বারা অনর্থকর ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

ত্রিঐচণ্ডীর শক্তি-সাধনা এবং শিক্ষা একদা এদেশবাসীর পক্ষে অতীব ফলপ্রসূ হইয়াছিল, নানা কারণে সেই শিক্ষা এখন অন্তহিত হইয়াছে। জাতির এই সঙ্কট-সময়ে আমি এই গ্রন্থখানির অভিনব সংস্করণ দেখিয়া ও আভ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া বস্তুতই আশাবিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় সকল বিষয়েই যুষ্টি রাখিয়া এই সংস্করণটিকে সর্বোৎকৃষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে হৃদীয় 'আলোচনা'র এদেশে চণ্ডীপাঠের বিভিন্ন রীতি, মাতৃভাবে ভগবদারাবাদনা এবং চণ্ডীবিষয়ক বহুল জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন সূক্ত ও বড়ঙ্গসহ মূল চণ্ডীর সরল বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থশেষে বর্ণাঙ্কমিক শ্লোকসূচী থাকায় গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়াছে।

বাহাতে গৃহে গৃহে এই গ্রন্থখানি সমাদরে সংরক্ষিত ও পঠিত হয় তদ্রূপ যত্ন আমাদের সমাজ-মঙ্গলেছু ব্যক্তিমাজেরই করা একান্ত কর্তব্য।

বিদ্যাভূষণ ত্রীসিকমোহন শর্মা

পথের বাঁশী—কাজী আকরম হোসেন। ইতিকথা, বুক ডিপো, কলিকাতা। পাঁচ টাকা।



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর ত্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে engage করিতে হইলে এখানেই পত্র দিবেন।

ফেডমার্ক 'SORCAR' বানান লিখিতে ভুল করিবেন না।

কবি নানা দেশের সৌন্দর্য ও গৌরবের গান গেয়েছেন। প্রথম কবিতা 'জাহান আরার সমাধি'। তারপর আছে আগরা, বুলাবন, বৈশাখের পদ্মা, চেরাপুঞ্জী, কলিঙ্গা, আরব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা-মালা। বিষয় নির্বাচনে মানসিক উদার এবং রচনার মার্জিত ত্রি প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা বাঙালী—কাজী আকরম হোসেন। ইতিকথা বুক ডিপো। দুই টাকা।

সরল প্রতিকর করেকটি কবিতা। ভাব ও বিষয়বস্তু সাধারণ—ছাড়া-বাড়ি, মসজিদ, ফলের বাগান, ওকু ভাই প্রভৃতি। একাংশদ্বীতেও চমক লাগাবার কোন চেষ্টা নেই। সহজ সরল বোধ লাগে। আর ভালো লাগে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বিপর্যয়ের দিনে, 'আমরা বাঙালী'—কবির এই বাস্তবিক হৃদয় মনোভাব।

প্রথম—ঐ অরবিন্দ ঘোষ। ৩২-এ, ল্যান্ডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ভূমিকার রচয়িতা "কবিতা কি"—এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "কবি সব সময়েই সচেতন শিল্পী। আবেগের প্রেরণায় সে কখনও লেখে না।" আলোচ্য কবিতাগুলিতে "সচেতন" প্রশাসের পরিচয় আছে, "আবেগের প্রেরণা" নেই।

ভক্তের ভগবান—পঞ্চতীর্থ ত্রীহরেক্ষমোহন ভট্টাচার্য বেদান্ত শাস্ত্রী। স্কুল সাপ্লাই কোং, সদর বাট, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত ছেলের নটক। চন্দ্রহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

ত্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকের

অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই

অর্দ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের স্বপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক

ত্রীযুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম, এম মহাশয়ের

১। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব ২।

(বাঙলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গানন, হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ)

২। সরল হোমিওপ্যাথি ৪।

(গৃহ চিকিৎসার জন্য সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি চিত্রসহ ব্রহ্মান হইয়াছে)

প্রাপ্তিস্থান :—হ্যানিম্যান পাৰলিশিং কোং

১৬৫নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ও

গ্রন্থকরের নিকট, দিনাজপুর।

আমার দেশকে আমি ভালবাসি—শ্রীকান্ত কর।
দি গ্রাশনাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য
এক টাকা।

এই বইখানি ছাত্রগণের ভক্ত পারিতোষিক-গ্রন্থ রূপে নির্বাচিত
করিলে অভিভাবকগণ ভারীকালের দেশসেবক গঠনে সহায়তা করি-
বেন। ইহার অনেকগুলি কবিতা ইতিপূর্বে 'বংশমালা' প্রকাশিত
হইয়াছিল। আশাবাদী কবির বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি দেশের নূতন
রূপ ধ্যান করিয়া তরুণগণকে কর্ণধর, বলীয়ান ও গণচেতনার
নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ছন্দের মাত্রা
ও ব্যক্তিগতরূপের দিকে অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের আবেগ-
প্রবণ গতিশীলতার সহিত তাল রাখিয়া কবি কবিতাগুলির শব্দ-
চয়ন ও ছন্দবিভাগ করিয়াছেন। এই যুগ্ম ক্রটি ছাড়িয়া দিলে
কবিতাগুলি মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। রয়াল সাইজ,
বোর্ড বাধাই ও উৎকৃষ্ট কাগজ ইত্যাদি দ্বারা বইটিকে ছাত্রদের
পক্ষে লোভনীয় করা হইয়াছে।

অন্ধকারের আফ্রিকা—ভূপাঠক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস।
পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য আড়াই টাকা।
পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য আড়াই টাকা।

রামনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী বাহিরের দুনিয়া
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনোদ্দেশ্যে একরূপ বিনা সম্বলে ভূপাঠক
দ্বারা বাঙালীর সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। সর্বপ্রকার কুসংস্কার-
বর্জিত হইয়া ও নির্যাতিত মানবের প্রতি অভেদ-উদার দৃষ্টিভঙ্গী
লইয়া বিশ্বাস মহাশয় গভীর দরদের সহিত দুনিয়ার হালচাল লক্ষ্য
করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা 'ভয়ংকর
আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থ পূর্ব
আফ্রিকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান
ইষ্ট-আফ্রিকা ব্রিটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত একটি দেশে
পরিণত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে কেনিয়া প্রদেশস্থ মোম্বাসা হইতে
আরম্ভ করিয়া টাঙ্গার পথে লবঙ্গের দেশ জাজিবার, তথা হইতে
টাঙ্গানিয়াকার রাজধানী দার-এ-সালাম হইয়া অরণ্য-পথে ঘুরিয়া
জাসালেগু পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শেষ করিয়াছেন। প্রথমে
আরব, পরে বুয়র ইংরেজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির হস্তে পত্তবৎ
নিগূহীত নিগ্রোদের দুর্দশার কাহিনী লিখিতে বসিয়া আফ্রিকাবাসী

কোন কোন ভারতীয়ের সম্বন্ধে এক অতি সত্য কথা বোঝাস
করিয়াছেন—'এক ঘৃণিত আর ঘৃণিতকে ঘৃণা করে।' ইউরোপ
ও এশিয়ায় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বর্তমানের আফ্রিকা প্রাচীন
কালের আর্ধ্য এবং অনাধ্যদের প্রতি বর্ণসঙ্কর ভীতিজনিত সঙ্কীর্ণ
মনোভাবের পুনরাবৃত্তির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান। নবীন খেতাজ
আধ্যগণকে প্রাচীন আধ্যগণ অপেক্ষা অধিক উদারভাবাপন্ন করনা
করা দুঃখ।

হাসি আর নক্সা—শ্রীপঞ্চানন্দ ভট্টাচার্য (বজ্রানন্দ
শর্মা)। আরতি এজেন্সি, ৯ম শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য চৌদ্দ আনা।

হাসির কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা চিত্রিত করা হইয়াছে।
ছোট কবিতাগুলি উপভোগ্য ও সরস হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতা-
গুলিকে কবিতায় হাসির গল্প বলা চলে। এরূপ দীর্ঘ কবিতা হাস্য-
রসের কবিতায় অচল।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বাংলার সাধনা—শ্রীক্ষতিমোহন সেন। বিশ্ববিজ্ঞা-
সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চ্যাট্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।
মূল্য আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল সরস লোক-
বক্তব্য ভঙ্গীতে ভারতীয় চিন্তা-ধারায়, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও দর্শনে

পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত এবং
ভক্তিবর্ধী শ্রীউমেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

(সচিত্র ও যড়ঙ্গ) শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৥০

অর্গলা, কীলক, কবচ, মূলচণ্ডী, যুক্তাদি এবং রহস্যত্রয়ের সরল বঙ্গানুবাদ
ও ব্যাখ্যা, পূজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'চন্ডী' বিষয়ক বহুল
জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচীতে হৃদসম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা ৬১০ ত্রিসংখ্যা ১০

প্রাপ্তিস্থান—সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক—১২০২ আপার
মারকুলার রোড, কলিকাতা।

ডাকারেরা বলেন

ব্রাদ-ভিটা

দুর্দৈত্য ও ক্রমবর্ধিত যে কোন রোগের আলাদা চিকিৎসা বড় দ্রুত

সর্বত্র মনুষ্য মানব
মেডিকেল রিসার্চ ল্যাবরেটরি
নিঃসৃত, সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা

—বাঙ্গালীর দানের ও তাহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের মতে বাংলার যোগী, শৈব, শক্তি, বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যে যে কায়্যাসাধনা—উপাস্ত-উপাসকের যে ঘনিষ্ঠ মানবীয় সম্বন্ধ ও প্রেমভক্তির প্রচলন রহিয়াছে তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য নিহিত। এই দিক দিয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ কোনও আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। তাই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিস্তৃততর আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হে বীর পূর্ণ কর—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। প্রাণ্ডিস্থান, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

“হে বীর পূর্ণ কর” যুগোপযোগী জাতীয়তামূলক নাটক। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহ নাটকীয় দ্রুততায় আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই অন্তস্ত পরিস্থিতির মধ্যেই নব নব জীবনবীজ এবং আদর্শ-সজ্জাতের ভিতর দিয়া জাতি হির লক্ষ্যে, অনমনীয় দৃঢ়তায় মুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সমালোচ্য নাটকের ‘শঙ্কর’ আর ‘অশোক’ সেই মুক্তি-পাণ্ডল তরুণ বাংলারই প্রতীক। মৃত্যুপথযাত্রী সর্বভাষী শত্রুর মর্গস্থল মথিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে পরাধীনতার বিবে জর্জরিত, নিপীড়িত বাংলার মর্গবাণী—“এ রক্ত আমার বুক থেকে উঠছে না, এ রক্ত উঠছে দেশের বুক থেকে, জাতির হৃৎপিণ্ড হিঁড়ে। আমি যে বাণী পৌছে দিতে পারলাম না, যে কাজ শেষ করতে পারলাম না—তোমরা তাই করো, তোমরা সে অসমাপ্ত বাণীকে পৌছে দিও—গ্রাম থেকে গ্রামে, সারা বাংলায়, সারা দেশে...”

শুরুর তাহার আরক ব্রত উদ্‌ঘাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার আসন কি শূন্য পড়িয়া থাকিবে? কোন্‌ সে মহাবীরের জন্ত সমগ্র দেশ প্রতীক্ষমাণ যিনি সে আসন পূর্ণ করিয়া বাংলা, তথা সমগ্র ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে অদূর ভবিষ্যতে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবেন।

মন্মথকুমারের কৃতিত্ব এইখানে যে উদ্দেশ্যমূলক হইলেও নাটক-খানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। নটকের পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠে নানা আদর্শের জয়গানই উদ্‌গীত হইয়াছে কিন্তু কোন মতবাদের প্রতিই নাট্যকারের অত্যাসক্তি প্রকাশ পায় নাই—নিরপেক্ষ দর্শকের মতই তিনি নিরাসক্ত। আর অপূর্ণ তাহার সংলাপ—তাহা ভাবাবেগে উদ্‌গীত, আবেগমুখর অথচ

সর্বপ্রকার বাহুলা এবং উজ্জ্বলবর্জিত। এই সংলাপ-রচনার কৌশলই ‘হে বীর পূর্ণ কর’কে অতি-নাটকীয়তা এবং প্রচারধর্মিতার অপঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই নাটকের আর একটি আকর্ষণ যুগলকান্তি দাশ রচিত গীতাবলী। নাটকখানিতে সংলাপ ও সঙ্গীতের মণিকাক্ষন সংযোগ হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীমলিনীকুমার ভদ্র

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে ‘নিশার স্বপন’ নামক পুস্তকের সমালোচনা শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় কৃত নহে, সমালোচনা করিয়াছিলেন শ্রীতারাপদ রাহা।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস : ১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ্‌ সার্টিফিকেট

প্রচার মূল্য

টাকা ৮১৬/০

টাকা ৮৬০

টাকা ৮৬২১/০

মেয়াদ অন্তে

টাকা ১০৮

টাকা ১০০৮

টাকা ১০০৮

মুদ :

চলুতি হিসাব

৪ ১/২

সেভিংস হিসাব

১ ১/২

এক বৎসরের জন্ম স্থায়ী আমানত ৩ ১/২

ক্রিয়ারিং-এর যাবতীয় সুবিধামূলক প্রথম শ্রেণীর উন্নততম জাতীয় ব্যাঙ্ক।

বিশেষ বিবরণের জন্ম লিখুন।

ফোন : ক্যাল ৩৪৪৭

কাঁ ক ডা . বিছে র র স

রসকার—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শার্দূলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আঁতে ঘা না লাগিলে বক্তব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে হৃৎথের মাঝেও আনন্দ দিবে। অশ্রুথায় শূল বেদনার সম্ভাবনা আছে। যাহারা রসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞান রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞ্ছনীয়।

‘কাঁকড়া বিছে র রস’ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে।

বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন।

দেশ-বিদেশের কথা

মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ মনোবিদ ও মনঃসমীক্ষক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫ই নবেম্বর তারিখে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক মন্মথনাথ ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়-



মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গণের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রবীদের অন্যতম ছিলেন; বস্তুতঃ তিনিই এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম M.Sc.—ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের দ্বারা বৃত্তিনির্বাচন (Vocational Selection) ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যে কত উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে তিনিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা আংশিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়। ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি ও তৎসংলগ্ন মানসিক চিকিৎসালয়ের তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা; অচনা হইতেই তিনি এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার স্থধীমহলে সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের 'নেশন্যাল ইন্টেলিটুট অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি'র তিনি 'অনারারী কন্সাল্টেন্ট' ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মনোবিজ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ সত্যাস্রয়ী আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত দর্শন, যোগ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বি. এল. ঘোষ

সুবিখ্যাত টিস এণ্ড সন্স নামক চা কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মিঃ বি. এল. ঘোষ বিগত ২৮শে নবেম্বর তারিখে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। টিস এণ্ড সন্স কোম্পানীর

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত হ্রদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে হ্রদ ও তত্ক্ষণেই ঐ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা হ্রদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিনিজিট

লিমিটেড

৫৫১নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকথ"

ফোন ক্যাল ৩৩০১

কথা-শিল্প

বাংলার কথা-শিল্প সাহিত্যে নূতন অভিযান

শ্রীযুক্ত রাধারানী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত

বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীগণের মধ্যে চৌদ্দজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ...	... ইতিহাস
আশাপূর্ণা দেবীর ...	... বাজে খরচ
সুবোধ বসুর ...	... আজাদী
‘বনফুলের’ ...	... অর্জুন মণ্ডল
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের.....	বুড়ো হাজারী কথা কয়
অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ...	... দ্বিখণ্ড
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ...	... ফুলেশ্বরী
সরোজ রায়চৌধুরীর ...	... অকাল বসন্ত
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ...	... প্রেরণা
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ...	... চক্রান্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়ের ...	... রূপ দর্শন
প্রবোধকুমার সান্যালের ...	... প্রশ্ন
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ...	... কামধেনু
বাণী রায়ের ...	ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী

প্রত্যেকটি রচনা সম্পূর্ণ নূতন এবং শিল্পীর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক। এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প না বলে ‘নভেলেট’ বা ‘স্কুড্র উপন্যাস’ বলা চলে। ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসে এগুলি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য হবার সম্ভাবনা রাখে। প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে শিল্পীর প্রতিকৃতি, হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংলগ্ন হয়েছে।

মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা

হাজার টাকা পুরস্কার !

যে গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে সেই গল্পের লেখককে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে তাঁদের রসবোধের পরিচয় দেবেন।

ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে

এন, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা .

সাকল্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহারই ব্যবসায়বুদ্ধি এবং কর্ম-শক্তি। তিনি সক্রীত এবং খেলাধুলায়ও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও তাঁহার দানের পরিমাণ কম ছিল না।

অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন

বিগত ২২শে অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ভুবন-মোহন সেন মহাশয় খুলনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে



অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন

এম. এ. ডিগ্রি লাভ করিয়া তঁাকি কলিকাতা সিটি কলেজে যোগদান করেন। সেখানে আট মাস অধ্যাপনা করিবার পর তিনি আসাম শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং গোঁহাটি কটন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবনে এবং উত্তরকালে অধ্যাপকরূপে তিনি উক্তর এইচ. সি. মুখার্জি, পরলোকগত কে. এন. দাশগুপ্ত এবং হেরথচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। আসামেই তাঁহার কর্মজীবনের সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর অতি-বাহিত হয়।

অধ্যক্ষ সেন একজন মুরসিক, ক্ষিপ্তভাবী বক্তাও ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে মত্তমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইতিহাস এবং রাজনীতি এই উভয় বিষয়েই তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা এবং অসমীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার জানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ চিন্তাশীল মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। আসামের ইতিহাস-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী। অধ্যাপক আর. সি. পক্ষিনের সহযোগিতায় লিখিত তাঁহার *Stories from Assamese History* নামক পুস্তকখানি আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'Rock-bottom of Communalism and Rewriting of History' নামক প্রবন্ধটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়া-

ছিল। তা ছাড়া তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গোঁহাটিতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনকে সাকল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। খেলাধুলায়ও অধ্যক্ষ সেনের বিশেষ উৎসাহ ছিল।

বাংলার ব্যাঙ্ক

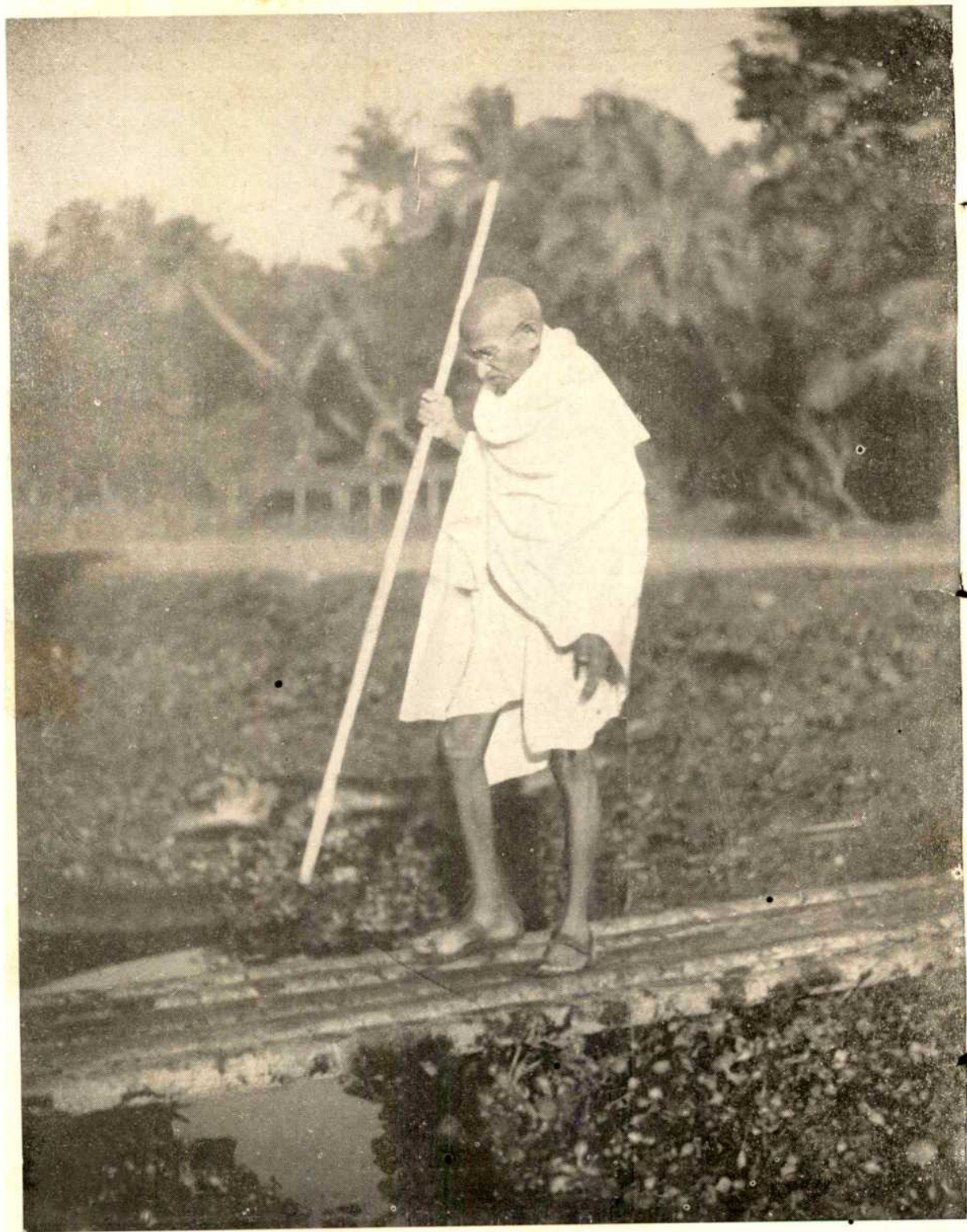
সম্প্রতি বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপর 'রান' অর্থাৎ একসঙ্গে টাকা তোলায় হুজুগ হইয়াছিল, কিন্তু মোটে তিনটি ছোট ব্যাঙ্কে লেনদেন বন্ধ করিতে হইয়াছে। লাল হরকিমণ লাল শিল্প কমিশনের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পিপলস ব্যাঙ্ক যখন 'ফেল' হয় তখন লাহোরে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীর বাড়ীতে ভোজে আনন্দপ্রকাশ করা হয়। পরে জানা যায় এই কর্মচারী পঞ্জাবের লার্ড ছিলেন। এবারও শুনা যাইতেছে ইংরেজ-পরিচালিত কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ভিতরে ভিতরে প্রচারকার্যের দ্বারা এই 'রান' করাইয়া দিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মিঃ ভার্গব বলিয়াছেন, কয়েকটি ব্যাঙ্কে অনিয়মের জন্ত 'দোষী'র তালিকায় বহু পূর্বে ফেলা হইয়াছে। এই তালিকা ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্ত, অথচ হঠাৎ ইহা এই সময়ে সাধারণের মধ্যে কেন প্রচারিত হইতেছে তাহা তিনি জানেন না। কোনও ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ধারাপ হইলে এক সঙ্গে টাকা তোলায় উহা একেবারে নষ্ট হইবে, বরং কিছু সময় পাইলে ক্ষতি-পূরণ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। যে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদ ভাবে লগ্নি করা হইয়াছে এক সঙ্গে টাকা দিতে হইলে তাহাকেও বিপর হইতে হয়। সুতরাং এই ভাবে টাকা তোলা কোনও দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। জাতীয়তা-বাদী প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র ও ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু টাকা তুলিতে নিষেধ করার হিড়িক মন্দীভূত হয়। ইংরেজ বণিকসমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' ২৮শে নবেম্বর তারিখে এমন সব কথা লিখিয়াছেন যাহাতে বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপকার না হইয়া অপকার হইতে পারে। ইহারা পূর্বেই মিঃ ভার্গবের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর ব্যাঙ্কে আশী কোটি টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। ইহার জোরে ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে বাঙালী কম বৎসরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। ইংরেজের অনেক পাটকল, লোহের কারখানা মাড়োয়ারীরা কিনিয়া লইয়াছে। বাঙালী যাহাতে এই সময় পিছাইয়া না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। মহাজনী আইন ও চারীখাতক আইন করিয়া লীগ সচিব-সম্মত বাঙালী হিন্দুর এক শত কোটি টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছে। এখন আশী কোটি টাকা নষ্ট করিবার জন্ত বিদেশীদের অপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

ত্রিগিৎস্বর চট্টোপাধ্যায়



• প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা
শ্রীঅনিল পাল



একক পল্লী পরিভ্রমণ কালে গান্ধীজীর একটি সাক্ষাৎ অতিক্রমণ

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামমাশ্রয় ব্রহ্মহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাস, ১৩৫৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৬ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—

“নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির ২২শে ডিসেম্বরের প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছে। উহাতে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে কমিটি তাহার সহিত একমত।

কংগ্রেস সর্বদাই ফেডারেল কোর্টের রায় মানিবে বলিয়া জানাইয়াছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের স্পষ্টোক্তির পর ফেডারেল কোর্টে যাওয়া নিরর্থক। উভয়-সম্মত সিদ্ধান্ত হইলে এবং সকলে ফেডারেল কোর্টের রায় মানিতে প্রস্তুত হইলেই শুধু উহাতে যাওয়া চলে।

কমিটির বিশ্বাস যত দূর সম্ভব মতৈক্যের ভিত্তিতেই স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিধি রচিত হওয়া উচিত। এই কার্যে বাহিরের হস্তক্ষেপ অথবা কোন প্রদেশ কর্তৃক অপর প্রদেশের উপর জোর খাটানো চলিবে না। ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মের প্রস্তাবে আসাম, সীমান্ত প্রদেশ এবং শিখদের যে অনুবিধায় ফেলা হইয়াছে কমিটি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় এই অনুবিধা আরও বাড়ানো হইয়াছে। এই সব অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে কোন কিছু বলপূর্বক চাপাইয়া দিতে গেলে কমিটি কখনও তাহা সমর্থন করিতে পারে না; ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট নিজেও বল-প্রয়োগের নীতি অগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কমিটির ইচ্ছা গণ-পরিষদ দেশের সর্বদলের শুভেচ্ছা লইয়া স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনা করিতে থাকুক। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দ্বারা যে মতবিরোধ চলিতেছে তাহার অবসান ঘটাইবার জন্ত কমিটি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সেকসনের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা মানিয়া লইবার পরামর্শ দিতেছেন।

তবে একথা স্পষ্ট ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এরূপ করিতে পিয়া কোন প্রদেশের উপর জোর খাটান বা পঞ্জাবের শিখদের স্বার্থবিরোধী কাজ যেন না ঘটে। জোর খাটাইতে গেলে কোন প্রদেশ বা উহার অংশ

বিশেষের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার থাকিবে। ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর উপর কার্যপদ্ধতি নির্ভর করিবে, সুতরাং কমিটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার জন্ত ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দেশ দান করিতেছে।”

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উক্ত প্রস্তাবে আসাম, সীমান্ত প্রদেশ এবং শিখদের বিশেষ অনুবিধায় ফেলা হইয়াছে ইহা তাঁহারা বলিয়াছেন কিন্তু বাংলায় জাতীয়তাবাদের কি অবস্থা হইবে একথা কেহ ভাবেন নাই, বলেনও নাই। আমাদের প্রতিনিধিরূপে যে মহাশয়গণ উক্ত কমিটিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই বলা বাহুল্য। সুতরাং যদি কংগ্রেসের এই “চাল ফেরত” করার ফলে পাকিস্তানপন্থীদের পথ খুলিয়া যায়—যাহা মোটেই অসম্ভব নহে—তবে বাঙালী হিন্দুর মৃত্যুদণ্ড একতরফা ডিক্রী হিসাবেই হইবে।

আসামের কতব্য কি সে বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই নির্দেশ দিয়াছেন :—

“আমি বরদলৈকে বলিয়াছি যে কংগ্রেস কমিটি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ যদি না দেয় তবে আসাম যেন সেকসনের বৈঠকে যোগদান না করে। প্রতিবাদ জানাইয়া আসাম যেন গণ-পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসে। কংগ্রেসের মঙ্গলের জন্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইহা সত্যগ্রহ-স্বরূপ হইবে। আসাম যদি নীরব থাকে তবে তাহার অভিজ্ঞ পর্যন্ত মুছিয়া যাইবে। আসাম যাহা চায় না তাহাকে দিয়া জোর করিয়া উহা করাইয়া লওয়ার অধিকার তাহারও নাই। আসাম বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীন। তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আয়ত্বহীন-সম্পন্ন হইতে হইবে। সে সাহস ও দৃঢ়তা আপনাদের আছে কি না আমি জানি না। আপনারা ইহা বলিতে পারেন। আপনারা এ কথা জোর পুজায় বলিতে পারিলে চমৎকার হইবে। গণ-পরিষদ সেকসনে বিভক্ত হইলেই আসাম যেন বলিতে পারে—‘ভদ্রমহোদয়গণ, আসাম বিদায় গ্রহণ করিল’। একমাত্র এই পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ যেন স্বাধীন ভাবে কতব্য নির্ধারণ ও কাজ করিতে পারে।”

গান্ধীজী আসামকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে স্বাধীনতার পথনির্দেশ অতি স্পষ্ট রহিয়াছে। বাংলায় কংগ্রেস নেতৃবর্গ কি বাঙালীর স্বাধীনতা দাম্পত্য লিখিয়া লীগ দলের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন? তাহাদের কত ব্যাভাষ্য তা স্পষ্ট। এখন প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীকে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহাদের আদেশের ক্ষমতা মরণ পণ যুক্তিতে। পাঞ্জাবে শিখেরা চাহিতেছে তাহাদের পিতৃভূমি স্বরূপে কয়টি জেলাকে পৃথক করিয়া এক ভিন্ন প্রদেশ গড়িতে। বাংলায় এখন প্রয়োজন ঐরূপ আন্দোলনের, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। উড়ো যুক্তিতর্কের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবন-মরণ সমস্যা। শিখেরা তাহাদের কত ব্যাভাষ্য নির্ধারণের ক্ষমতা সজ্জাবদ্ধভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত সংবাদেই দেখা যাইতেছে :

“গত ১১ই জ্যৈষ্ঠাষী অমৃতসরে শিখদের প্রতিনিধি পন্থিক বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ৬ই জ্যৈষ্ঠাষীতে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

“প্রতিনিধি পন্থিক বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ১৯৪৬, ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি-সম্পর্কে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সম্যক বিবেচনা করিয়াছেন। কমিটি অতীত দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে শিখদের অবস্থা ভয়ানক ধারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

কমিটি পন্থকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ১৯৪৭ সনের ২৬শে জ্যৈষ্ঠাষী সকাল ১১টার সময় জেনারেল কমিটির একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র গঠনে শিখদের অভিমত গ্রহণ কল্পে তাহাদের দাবি সমর্থনের যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূরণ করিতে কমিটি কংগ্রেসকে আহ্বান করিতেছেন।”

লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ কণ্টকময় করিয়া তুলিয়াছে। এই অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী এবং এক দল চক্রান্তকারীও তাহাদের সহযোগিতা করিতেছে। অথচ ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ আরম্ভ করিল বাঙালী, সেই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বলি দিল বাঙালী, কিন্তু হিসাব-নিকাশে সম্পূর্ণ ঝাঁকিতে পড়িল সেই বাঙালী। সোভিয়েটের এক অংশে ৫০ হাজার লোকের জনসমষ্টিরও স্বাভাবিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পাকিস্থানে আড়াই কোটি জাতীয়তাবাদী বাঙালীর দাসত্ব ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা নাই। সোভিয়েটে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও তুল ধারণা যাহাদের আছে তাহারা বর্তমান বংসরের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে অনেক নুতন তথ্য পাইবেন।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতি অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্তীর সহিত যাহারা সোভিয়েটের রাষ্ট্রবিধি ও উহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার তুলনা করেন, তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রবিধির মূল তত্ত্বই বুঝিতে পারেন নাই। সোভিয়েট শাসনপ্রণালীতে কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকার কতখানি তাহাও তাহাদের জানা নাই। রাশিয়ার

কমিউনিষ্ট পার্টি একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল, পার্টির সমস্ত ক্ষমতা নেতাদের হাতে সীমাবদ্ধ, নেতাদের আদেশে নির্দেশে বা অমরোদেই সকলকে চলিতে হয় এবং এই নেতারা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। গবর্নমেন্ট পরিচালনে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। সিভিল এবং বিয়েট্ট স ওয়েবও তাহাদের বিখ্যাত গ্রন্থ “সোভিয়েট কমিউনিজম” বলিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি শাসন-যন্ত্র কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহার পরিমাপ করা দুঃস্ব, তবে ইহা ঠিক যে রাশিয়ার কুড়ি বা ত্রিশ লক্ষ লোকের এই দলটি সর্বহারাদের বিবেক রক্ষকরূপে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল দায়িত্ব করায়ত্ত করিয়াছে। ষ্টালিন নিজেও বলিয়াছেন, “সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা গঠনমূলক সমস্যাই পার্টির নির্দেশ না লইয়া মীমাংসা করা হয় না। এই হিসাবে সর্বহারাদের ডিক্টেটরশিপকে আমরা পার্টির ডিক্টেটরশিপ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। পার্টিই সর্বহারাদের নিয়ন্তা।” অটোক্র্যাটকে ভক্তি করা রুশ জনসাধারণের স্বভাবসিদ্ধ, বীরকে তাহারা পূজা করে, সাধারণ লোকের এই মনোভাবের পূর্ণ সদ্যবহার গবর্নমেন্টের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্ণ মাত্রায় করিয়া থাকেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তাহাকে প্রায় ঈশ্বরের দূতের পর্যায়ে তুলিয়া ধরা হয়, তাহার রচনাবলীকে পবিত্র রচনা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় যে উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু প্রতিবাদ চলিবে না। রাশিয়ার ১৬ কোটি লোক যাহাকে অন্ধভাবে ভক্তি করিতে পারে লেনিনের মৃত্যুর পর এমন একজনকে খাড়া করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। দলের নেতারা ঠিক করিলেন যে, ষ্টালিনকেই দলের, রাষ্ট্রের এবং সর্বহারাদের অধিতায় নেতারূপে দাঁড় করানো হইবে। তাঁর ছবি ও আবক্ষ ছোট ছোট মূর্তি লাখে লাখে বিতরণ করা হইল, মার্কস ও লেনিনের ছবির পার্শ্বে উহার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। সোভিয়েট শাসনপদ্ধতির সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়াই এই কথার উল্লেখ করা হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের স্থান কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের মূল রাশিয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মূল রাশিয়ার আয়তন শতকরা ৯০ ভাগ এবং লোকসংখ্যা অর্ধেকের বেশী।

এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে নামেই সোভিয়েট ইউনিয়ন “স্বতঃপ্রণোদিত ইউনিয়ন” এবং অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝাইয়া দেন যে, এই কথা বলিতে গিয়া তিনি সোভিয়েটের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের সংস্কৃতি রক্ষার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে ছোট করিয়া দেখাইতে চাহেন না। এই অধিকার তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং আন্তরিকতার সহিত পালন করা হইতেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে-যদি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সংস্কৃতি রক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা বুঝায় তবে এ দেশেও অনান্যসে এই ধরনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

পদত্বজে গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রমা

নগপদে একটি ষষ্ঠি মাত্র সন্ধ্যা করিয়া গান্ধীজী একাকী নোয়াখালীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রোষহীন, ক্ষেপ্তহীন, ভয়লেশহীন অন্তরে সকল মানসিক বিকার মুক্ত গান্ধীজী বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার সাধনার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। গান্ধীজীর ডাঙী যাত্রার সহিত এই যাত্রার পার্থক্য অনেক। তাঁর এই অভিযান দেশবাসীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়, ইহার মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। যে বলিষ্ঠ অহিংসা গান্ধীজীকে অমিত শক্তির অধিকারী করিয়াছে তাহার স্পর্শে সাধারণ লোকের মনের ভয় ও পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীভূত করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা তাঁহার লক্ষ্য। এক দলের হিংসা ও অপর দলের কাপুরুষতা দূর করাই সাম্প্রদায়িক সমস্তা মীমাংসার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই বিশ্বাসে গান্ধীজী নিজেকে এবং নিজের অনুসৃত অহিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নোয়াখালীর গ্রাম পরিক্রমার তাৎপর্য অপরিণীম। এ কথাই গান্ধীজী কয়েক দিন আগে এক নিম্নস্তর সন্ধ্যা পঞ্জীর পথে পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ সঙ্গীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন,

“এবার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর; আমার দায়িত্ব অসীম। পূর্বে আমি যত বার সত্যাগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই আমার সমক্ষে একটা সুস্পষ্ট অজ্ঞার প্রতিমূর্তি ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, আমি সেই অজ্ঞার প্রতিকারের জন্তই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি। সেই সংগ্রামে আমি পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দিক হইতে আমার নিগূহীত দেশবাসীরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

“আমি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও ইহাদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সাহুনা ও শক্তি জোগাইয়াছে কিন্তু আজ আমি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহার রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি সরকার-অনুষ্ঠিত কোন অবিচারের প্রতিকার করিতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব আমি সারাজীবন যে অহিংসার সাধনা করিয়া আসিয়াছি সেই অহিংসা দ্বারা আমি মানুষের মনের অমাহুষিকতা দূর করিতে পারি কিনা। মানুষ যে মানুষ যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে হিংসা-দেষ, মানুষ হইতে মানুষের যে ভয়, বিরাগ সেই বিকার মানুষের মন হইতে দূর করিতে আমার অহিংসা কতটা কার্যকরী আমি জীবন-সাম্রাজ্যে তাহাই যাচাই করিয়া যাইব। এ কাজ বহুতে মিলিয়া করার নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করিতে হইবে। তাই আজ আমি একা চলিয়াছি, আজ আমার পশ্চাতে আমার পাশে শতসহস্র অনুচরের প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর

করিতে হইবে। তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হইতে হইবে হিংসা-দেষ বিমুক্ত অন্তর লইয়া। আমার অন্তরে কোন কলুষ থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। তাই আমি দীন-ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমার মন হইতে সকল কালিমা দূর করেন, আমার আত্মায় যেন তিনি শক্তি দান করেন।

“ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার-মুক্ত হইয়া সর্বদা দান করিতে করিতে দীনভাবে নগপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রার আদর্শ। তাই আজ আমি নগপদে চলিয়াছি আমার তীর্থ-পরিক্রমায়।”

এক দিকে কাপুরুষতা অপর দিকে হিংসার মহাপন্থ হইতে মানুষকে উপরে টানিয়া তুলিবার জন্তই গান্ধীজীর এই অভিযান। তাঁহার ধারণা সফলতা বা বিফলতা কোন কার্যেরই চূড়ান্ত কণ্ঠিপাথর নহে, সিদ্ধিলাভের জন্ত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে ইহাই হইল কার্যের একমাত্র ঠীট কণ্ঠিপাথর।

নোয়াখালীর হাঙ্গামার মূল কারণ পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা

নোয়াখালীতে মাসিমপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যখন ‘রামধূন’ গীত হইতেছিল তখন একদল মুসলমান সভ্যক্ষেত্র হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া গান্ধীজী জানিতে পারেন যে রামনামে তাঁহাদের আপত্তি আছে। ঐ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন—

“আমি জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক রামনাম লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। মুসলমানরা রামনাম পছন্দ করেন না। ইহার জন্তও আমি আনন্দিত। কারণ ইহার দ্বারা আমার অবস্থাটা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মুসলমানরা ভাবেন, ভগবানকে একমাত্র ‘খোদা’ নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে। গত অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে যাহা ঘটয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে পরধর্মের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হইলেও তাঁহাদের জানা প্রয়োজন যে, যিনি রাম, তিনিই খোদা। ইউরোপীয়রা বলেন, ‘গড’, হিন্দুরা বলেন, ‘রাম’ এবং অজান্তরা অজা জ্ঞ নামে ভগবানকে অভিহিত করেন। আমি শুনিয়াছি পাকিস্থানে সকলেই স্ব-স্ব ধর্ম অনুসরণ করিতে পারিবে। নিজের ধর্ম পালনে কাহাকেও বাধা দেওয়া হইবে না। কিন্তু এখানে আমি আজ যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞরূপ। এখানে হিন্দুদিগকে হিন্দু তুলিয়া ভগবানকে খোদা বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। সকল ধর্মই সমান। বিভিন্ন ধর্ম যুদ্ধের বিভিন্ন পত্র। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকিতে পারে না।”

এই অসহিষ্ণুতার ঐক্যনৈমি শেষ হয় নাই, লীগ পত্রিকায় ইহা লইয়া তীব্র সমালোচনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে

যে গান্ধীজী মুসলমানদের অবতারবাদ শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামধ্বনের মধ্যে অবতারবাদ বা পৌত্তলিকতার পরিবর্তে গান্ধীজী উহার মূলগত একেশ্বরবাদই ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সুতরাং ইহাতে মুসলমানদেরও কোন আপত্তি থাকিবার সম্ভব কারণ নাই।

জগৎপূরের প্রার্থনা-সভাতেও এই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার কথা আলোচিত হয়। গান্ধীজী বলেন,—

“আমি কিছুদিন ধরিয়া ভ্রমিত হইয়াছি যে, মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বলে ‘তোমাদের ধর্মপ্রাণ বাঁচাইতে হইলে ইসলাম গ্রহণ কর’ আর সেই কথা শুনিয়া হিন্দুরা যদি মুসলমান হয় তবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বা চাপ দিয়া ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা বলা চলে না। আমি এই উক্তির সত্যাসত্য সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই না, এমন কি সে কথা মুক্ততের জয়ও ভাবি না। তবে আমি এক কথা বলিব যে, এসকল ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনই ইসলাম গ্রহণের কারণ। কিন্তু প্রকৃত ধর্মাস্তর গ্রহণের জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এই ধরনের কথা শুনিলে স্বতই সেইসব তথাকথিত খ্রীষ্টান প্রচারকদের কথা মনে পড়িয়া যায় যাহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে অনাথ শিশুদের কিনিয়া আনিয়া খ্রীষ্টান হিসাবে লালনপালন করিতেন। এটাকে কোনমতেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বলা চলে না। সুতরাং বৈধ ও প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রত্যেককে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিতে হইবে। জোর করিয়া ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া যায় না। তাহার উপর সত্য-কারের দীক্ষা লাভের জন্য দীক্ষার্থীর পক্ষে নিজ ধর্ম ও নূতন ধর্ম উভয়েরই সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার সামনে যে সকল শিশু ও নরনারীকে দেখিতেছি তাহাদের এইভাবে ধর্মাস্তর গ্রহণের সম্ভাবনা দেখি না। ধর্মাস্তরকরণের রীতিতে আমার বিশ্বাস নাই। আমি নিজে হিন্দু কিন্তু এই কারণে বহুদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বলি না।”

তারপর তিনি বলেন, “আমার কর্মব্যস্ত জীবনে মুসলমান সাধকদের লেখা ইসলামের ইতিহাস যতটা সম্ভব পাঠ করিয়াছি কিন্তু কোথাও বলপূর্বক ধর্মাস্তরকরণের সমর্থনে একটি কথাও পাই নাই। এই দোষ তাহারা কেহই করেন নাই।” ইসলামের সাধকেরা শান্তভাবে সত্যানুসরণের শিক্ষা দিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযানের প্রাকালে বিন কাশিমও ইহা পালন করেন নাই, নোয়াখালীর অসহিষ্ণুতা ও বলপূর্বক ধর্মাস্তরকরণও নূতন নহে। হিন্দুর কাপুরুষতা এই কার্য সহজ করিয়া দিয়াছে, কাপুরুষতা দূর না হইলে বলপূর্বক ধর্মাস্তরকরণ বন্ধ করা কঠিন হইবে।

নোয়াখালীতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি

১২ই জানুয়ারী তারিখের হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে জীপ্যারেল লিখিয়াছেন—কলিকাতার এক বহু কয়েকজন

সহকর্মীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সহকর্মীদের মধ্যে এক জন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মন্তব্য করেন যে রাজ-নৈতিক দাবা খেলায় বাংলাদেশকে পণ-হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। গান্ধীজী উত্তর দেন—“না”, তার পর বলেন,—“বাংলা বাংলা বলিয়াই আজ পুরোডাগে দাঁড়াইয়া আছে। বাংলাদেশেই বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অজ্ঞাপার লুণ্ঠনের বীরগণ বাংলাতেই জন্মিয়াছেন—যদিও আমার চোখে তাহাদের কর্মপন্থা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এক কথা আপনাদিগকে আজ বুঝিতেই হইবে যে বাংলা যদি আজ তাহার খেলা ঠিকমত খেলিতে পারে, তাহা হইলে বাংলাই ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসা করিবে। এই জন্যই আমি আজ বাঙালী হইয়াছি। যে বাংলায় এমন মানুষ জন্মিয়াছে সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন?”

আগন্তুক বলেন, “ঠিক কথা। যখন দেখি ধর্মস্থানগুলি ভগ্ন ও কলুষিত হইয়াছে তখন মনে হয় সেই স্থানের প্রত্যেকটি পুরুষ নারী ও শিশু মিলিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিল না কেন?”

গান্ধীজী বলিলেন, “তাহারা যদি সেরূপ করিত তাহা হইলে আপনাদের আর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হইত না। নোয়াখালীর নেতাগণ আজ নোয়াখালীতে নাই—তাহারা বিপদের সম্মুখে যাইতে চান না, নিজেদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া আসিয়াছেন। নেতৃস্থানীয় যাহারা নিজেদের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহারা যদি কিরেন তো ভালই, নতুবা সাধারণ লোকদেরই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। আজ সাধারণ লোকেরই যুগ আসিয়া পড়িয়াছে।”

কলিকাতায় যে-সব বাঙালী শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার লোক বহু আছেন। নোয়াখালী ও চাঁদপুরের হাঙ্গামার পর ইহাদের কেহ কেহ সাড়ম্বরে বিমানযোগে সেখানে গিয়াছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় কেহই গ্রামে ঢোকেন নাই। স্থানীয় বর্ধিষু লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন না, তবে গ্রামের সহিত এত দিন তাহারা ধানিকটী যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, পূজা-পার্বণে দেশে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। গত হাঙ্গামার পর সেটুকুও ঘুচিয়াছে, গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া ইহারা সম্পূর্ণরূপে কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। দরিদ্র গ্রাম-বাসীরা যাহাদিগকে ভরসা ও আশ্রয়স্থল বলিয়া মনে করিয়াছে তাহাদিগকে এই ভাবে স্বার্থপর কাপুরুষের ছায় পলায়ন করিতে দেখিলে তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায়। নোয়াখালীতে ইহাই ঘটতেছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, গান্ধীজীও গভীর বেদনার সঙ্গেই এই কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কথাস্বার্থেও ইহাদের কাপুরুষতা দূর হইবে কি না বলা কঠিন। বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই অপবাদ

দূর করিবার ভার গ্রহণ না করিলে ইতিহাসের এক পরম সন্ধিক্ষেপে বাংলার ইতিহাস কালিমালিপ্ত হইয়া থাকিবে।

অধিবাসী বিনিময়

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের নিজ নিজ সংখ্যা-গরিষ্ঠ এলাকায় সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে মিঃ জিন্না যে প্রস্তাব করিয়াছেন বিজ্ঞজনমাজেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন উহা অসম্ভব ও সর্বথা অব্যাহীনীয়। পঞ্জাবের গবর্ণর সার এডাল্ড জেক্সিসও এক সভায় এ সম্বন্ধে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে হিটলারও একদা এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। লোক-বিনিময়ের নামে বিহার হইতে তদ্বির করিয়া লোক আমদানী করিয়া তাহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অযোগ্য করিয়া দিয়া কি ভাবে পশ্চিম-বাংলাকেও মুসলমানগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত করিবার আয়োজন শুরু হইয়াছে তাহা এতদিনে অনেকেই ছদ্মস্তম্ভ করিতে পারিতেছেন। এ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনাও করিয়াছি।

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, “লোক-বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি না; আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব।” যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, অথবা আর কোন ধর্ম বিধাসী হউন, তিনি ভারতবাসী। পাকিস্তান যদি পূরাপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয় তথাপি এ সত্য পাঁচটাইবে না। আমার মতে এই রকমের কোন ব্যবস্থা রাজনৈতিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের চূড়ান্ত দৈর্ঘের পরিচায়ক। বর্তমান অব্যবস্থিত অবস্থাতেও এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কারণ আমি দেখি না। সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ রূপে হতাশ হইলেই শুধু অধিবাসী-বিনিময়ের প্রস্তাব উঠিতে পারে। সুতরাং সর্বশেষ পন্থা হিসাবে কচিং কখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা অবলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যে কি তাহা কল্পনায় আনাও উদ্ভূত।”

গান্ধীজীর স্থায় আমরাও পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দুর বাস্ত-ভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার খোর বিরোধী, এবং ইহারই জন্ত আমরা বঙ্গ-বিভাগের পক্ষপাতী। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বাধা পড়িয়াছে। সেখানে সৈন্ত গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্ত। নূতন রাষ্ট্র-বিধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আরও কমিবে, প্রদেশের ক্ষমতা বাড়িবে। সুতরাং নূতন আমলে পূর্ব বাংলার হিন্দুর সাহায্য প্রাপ্তির পথ আরও বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। সৈন্ত বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব বাংলার হিন্দু অনন্তকাল বসিয়া থাকিতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত উগ্র ভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ

প্রচার করিতেছিলেন বিহারের ঘটনার পর তাহারা কতকটা সংযত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই সংযম কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। তা ছাড়া বিহারের পুনরুজ্জী সর্বথা অব্যাহীনীয় এবং দেশের সমগ্র স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা এখনও মনে করি না যে নোয়াখালীর প্রতিশোধ গ্রহণই বিহারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; কলিকাতার দাঙ্গার বহু বিহারী নিহত আহত ও সর্বহাস্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ বিহারী মুসলমান শুভা শ্রেণীর লোকের দ্বারাই এই কার্য সংঘটিত হইয়াছে। কলিকাতার আক্রান্ত বিহারীদের অনেকে দেশে ফিরিয়া ইহা প্রচার করিয়াছে এবং সেখানে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে, “তোমার আত্মীয় আমার আত্মীয়কে মারিয়াছে” এই ধরনের। ইহার ফলেই বিহারের ব্যাপার এত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিহারে বাঙালীদের সহিত যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা স্মরণ করিলে শুধু বাঙালীদের প্রতি প্রীতি বশতঃ বিহারের ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল ইহা মনে করা কঠিন হয়। পূর্ব বাংলার হিন্দুর উপর অত্যাচার হইলেই ভারতবর্ষের সর্বত্র বিহারের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ইহা আমরা মনে করি না এবং উহা ঘটুক ইহাও আমরা প্রার্থনা করি না। পূর্ব বাংলার হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য এমন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার দ্বারা অপরের রক্তপাত বা অনিষ্ট না হয় অথচ হিন্দুরাও বাঁচে।

বাংলার শাসনতন্ত্র যত দিন মুসলিম লীগের হাতে থাকিবে এবং যত দিন উহা শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের গীড়নের কারণ হইয়া রহিবে, তত দিন পূর্ব বাংলার হিন্দু যেমন স্বস্তি পাইবে না, তেমনি সমগ্র বাংলার হিন্দুও ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকিবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তিকে নিষেদের মধ্যে পাইয়াও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আজও নিরাপদ বোধ করিতে পারিতেছে না। গান্ধীজীও তাহাদের মনে আশ্বাস সঞ্চার করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের মনে স্বস্তির সঞ্চার করিবার জন্তই এই অশীতিপর বৃদ্ধকে একাকী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গবর্নমেন্টের ক্ষমতার প্রতীক পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিপদে সাহায্য এবং বিচারাদালতে সুবিচার প্রাপ্তির বাস্তব ভরসা না পাওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীর একাকী ভ্রমণেও স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হইবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান অবস্থায় ইহা নাই এবং অদূর বা দূর ভবিষ্যতেও উহা লাভ করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সরকারের প্রতিটি আদেশপ্রয়োগের ভিতর দিয়া এখনও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে এবং যত দিন উহা চলিতে থাকিবে তত দিন সমাজদ্রোহী লোকদের সামাজিক শৃঙ্খলা নাশের চেষ্টা অব্যাহতই থাকিবে। আপাত স্বার্থে মুক্ত পাকিস্তানকামী সম্প্রদায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিতে-

ছেন, যে ভাবে সুপ্রকল্পিত উপায়ে হিন্দু-দলন পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাতে হিন্দু বাংলার স্বতন্ত্র গবর্নেন্ট অনতি-বিলম্বে গঠিত না হইলে পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঁচিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙালী হিন্দুও ধ্বংস হইবে। বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব গবর্নেন্ট মুসলমানকে চলিয়া যাইতে বলিবে না, অত্যাচারও করিবে না। বাঙালী হিন্দু নিজের এলাকায় বাঙালী মুসলমান-দের সর্ববিধ উন্নতির সুযোগ করিয়া দিয়া পূর্ব বাংলার হিন্দুর প্রতি তাহাদের কত ব্যবসার জাগ্রত করিয়া দিবার সুযোগ যেমন পাইবে, তেমনি সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হইলে বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব গবর্নেন্ট প্রতিকারের চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ অগ্রণী হইতে পারিবে। পূর্ব বাংলার হিন্দুকে তখন বিপদের দিনে সহায়-সম্বলহীন বাঙালী হিন্দুর জনমত অথবা নেতাদের বিমান-বিহারমাত্র সম্বল করিয়া সশস্ত্র চিত্তে বাস করিতে হইবে না। গোড় ও বঙ্গ বহুকাল স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। আবারও একবার কিছুদিনের জন্য বর্তমান বাংলাকে ভাঙিয়া গোড় ও বঙ্গে পরিণত করিলে যদি বাঙালীর বাঁচিবার পথ হয় তবে আমরা তাহাতে কোন ক্ষতি দেখি না। গোড় ও আসামের দৃষ্টান্তে বঙ্গ যদি অনুপ্রাণিত হয় তখন পুনর্মিলনের পথেও বাধা থাকিবে না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভি-ভাষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়া ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ও নতুন রাষ্ট্র গঠনের দাবি অযৌক্তিক, অসঙ্গত এবং অবাস্তব। বিহারের ঘটনার জন্য পূর্বোক্ত নীতির অপব্যবস্থা ও অপ-প্রচারকে দায়ী করিয়া তিনি বলেন, কয়েকটি জটিলিচ্ছাতি সংশোধন করিয়া লইলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অস্বাভাবিক অথও ভারতীয় স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব হইবে এবং তাহাই হইবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জগতের অনেক সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে, সংখ্যাগুরু ও উন্নত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতার জন্য বিশেষভাবে এই নীতির অপব্যবস্থা ও অপপ্রয়োগই দায়ী। এই নীতিরই দোহাই দিয়া ভারত বিভাগের দাবি তোলা হইতেছে।

১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন যখন প্রথম এই নীতির কথা ঘোষণা করেন, তখনই অনেকে বলিয়াছিলেন যে, ইহার অপব্যবস্থা ও অপপ্রয়োগের ফলে জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার ক্ষতি হইতে পারে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে উইলসন আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির কথা উত্থাপন করিলে তাঁহারই পররাষ্ট্র-সচিব রবার্ট লানসিং উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া-

ছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজজীবনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার ডিনামাইটের ছায় সংশ্লিষ্ট থাকিবে; এক দিন উহা কাটিবেই এবং সেদিন আর কেহ ইহার হাত হইতে পরিভ্রাণ লাভের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। লানসিং বলেন, “এই নীতি মানুষের মনে যে আশা জাগাইবে তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বরং ইহা সহস্র সহস্র মানুষের জীবন-হানির কারণই হইয়া উঠিবে।” লানসিং চোখে আবুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমেরিকা ও কানাডা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পৃথক হওয়ার অধিকার স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ তাহারা বর্তমান শক্তির অধিকারী। যদি মানিত, তবে আমেরিকাকে আজ আমরা দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত দেখিতে পাইতাম এবং কানাডারও ফরাসী অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া কানাডার চিরদুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া রহিত। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চোরাবালিতে একবার পদক্ষেপ করিলেই সংখ্যালঘুর পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর থাকে না। এই সমস্যা এড়াইবার জন্যই ছেনেভার জাতি-সংজ্ঞার মাইনরিটি নীতি এই ছিল যে, সংখ্যালঘু যতক্ষণ দেশ ও জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণই শুধু তাহাদের অতিরিক্ত সুবিধা দাবি করিবার অধিকার থাকিবে। জাতি-সংজ্ঞা অবশ্য এই ব্যাখ্যা সঠিক ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে নাই। সাম্রাজ্য-বাদের প্রয়োজনে বড় বড় দেশগুলি ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে নিজ নিজ স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে কণ্টক রোপণের জন্য ব্যবহার করিয়াছে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে ইহা লইয়া যখন আলোচনা হয় সেই সময় উইলসন নিজেও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে অপরিহার্য মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় পুঙ্ক-ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময় এই নীতি বহুলাংশে যেমন অনুসরণ করা হইয়াছে, উহার অপপ্রয়োগও ঠিক তেমনি ভাবে হইয়াছে। বলকান রাষ্ট্রসমূহের সীমা নতুন করিয়া নির্ধারণ করিবার সময় স্ক্রকোশলে এমন ভাবে এক একটি দেশে মাইনরিটি চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে সমগ্র দেশটির রাজনীতি কলুষিত হইয়া চিরবিবাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির প্রয়োগের কথা পর্যালোচনা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—ঠিক কোন ক্ষেত্রে এবং কি অবস্থায় কোন জাতি, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করিতে পারে তাহার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা-নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আদ্যতন অন্ততঃ পক্ষে কতটা হইলে কোন ভূখণ্ড আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া অতিশয় দুর্লব। অধ্যাপক হারল্ড টেম্পারলি বলিয়াছেন—এই নীতির

এক দিকে যেমন একা স্বষ্টির ক্ষমতা আছে, অপর দিকে তেমনি ইহা বিভেদ স্বষ্টিও করিতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বেশী প্রচুর পাইলে শেষ অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি পর্যন্ত হয়তো পাঁচ শতাব্দীর বন্ধন কাটাইয়া রাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া যাইতে চাহিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেওয়ার বিপদ এইখানেই। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বৈষয়িক স্বার্থকে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপরে স্থান দিতে হইবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন—“আত্মনিয়ন্ত্রণ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে না এ কথা অনেকে ভুলিয়া যান। এই নীতি কেবল মাত্র ভূখণ্ডের প্রতি প্রযোজ্য—কোন জাতির প্রতি নয়। ইহাকে জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গেলে বিভেদ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। কোন দেশের অধিবাসীর কতকাংশের প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে ইহা প্রয়োগ করিতে গেলে তাহা মুক্ততার পরিচায়ক হইয়া দেশের পরম ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিবে। কারণ, তখন এই সকল অঞ্চলের মাইনরিটিরাও একই নীতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করিবে এবং ফলে একই অঞ্চলে মেজরিটি ও মাইনরিটির পৃথক পৃথক গবর্নর্মেণ্ট গঠনের ছায় একটি অবাস্তব ও অসম্ভব অবস্থা দেখা দিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে যদি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন বুঝায় তবে সেই অধিকার কেবল ভৌগোলিক, বৈষয়িক এবং সাময়িক ভাবে অথবা ভূভাগের থাকিতে পারে। দেশের বা অধিবাসীদের একাংশ এই অধিকার দাবি করিতে পারে না, করিলে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের শতকরা ২৪ জন যদি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া এই অধিকার দাবি করেন তবে বাংলার শতকরা ৪৪ জন, আসামের শতকরা ৬৬ জন এবং উত্তর প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার ৪৯ জন অধিবাসী হিন্দু বলিয়া একই যুক্তিবলে অসংখ্য অধিকার দাবি করিবে এবং দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই ইহা শুভ লক্ষণ। তাহার পাঠ্যস্থান দাবি বর্জন করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের অমৌজিক দাবী মিশনের প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই।”

যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার গড়িয়া উঠিলে তাহা তত ক্ষতিকর হয় না, যত ক্ষতির কারণ হয় পৃথক নির্বাচনের পথে। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্ত ভারতবর্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে, ফলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এক দুর্লভ্য ব্যবধান রচিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ শাসকবর্গ সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের বা তাহাদিগকে পর্যাপ্ত শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার

জন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই, অথচ বেশী বেশী করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহ নিজেরা উপরুত হয় নাই কিন্তু প্রগতিশীল সম্প্রদায়সমূহের অগ্রগতিতে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের অল্পসংখ্যক লোক প্রভূত লাভবান হইয়াছে, কিন্তু ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছে দেশের ও সেই সব সম্প্রদায়েরই আপামর জনসাধারণের। ইহাদের রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা কিছুই ঘুচে নাই, শুধু উহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কতক লোকের ছোট বড় নানাবিধ চাকুরী হইয়াছে। ইহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন ইংরেজ শাসকদের ইচ্ছাও নয় কারণ এক দল অনগ্রসর লোক ও স্বার্থাশ্রয়ী তল্লাবাহকের দলের সাহায্যে প্রগতিশীল দেশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় বাধা দেওয়া যত সহজ এমন আর কিছুতে নহে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রেঘারেঘি জাগাইয়া তুলিয়া আভ্যন্তরীণ কলহের সৃষ্টি করিলে দেশেরই এক দল লোক ইংরেজের হইয়া সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইবে। অজবল ও দমননীতির প্রয়োগের চেয়ে এই ব্যবস্থা সহজ ও সমান সুফলপ্রসূ। এই অভিসন্ধি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ত্রফাজ হইয়াছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত না হইলে ইহা হইতে পরিজ্ঞান লাভের উপায় নাই।

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের মূল ভিত্তির প্রশংসা করিয়া তিনি উহার কয়েকটি ত্রুটি ধরিয়া দিয়াছেন। গণ-পরিষদের সদস্যদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রাদেশিক ও প্রদেশমণ্ডলের শাসনতন্ত্র রচনার পর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার যে ব্যবস্থা মিশনের প্রস্তাবে করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

এখন সমস্তা ঠাঁড়াইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পূর্বে কি করিয়া প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা যায়? যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতি সম্যক নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশ ও প্রদেশমণ্ডলের ক্ষমতা নির্ধারিত হইতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে তাহার নিজ নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নও করিতে পারে না। রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন করিতে হইলে শুধু শাসনযন্ত্রের রূপ নির্দেশ করিলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ না হইলে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র গঠন সম্ভবপর নয়।

ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে মুদ্রা-ব্যবস্থা, মূলশিল্প এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রভৃতির সহিত মন্ত্রী-মিশন-নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ ?

রাষ্ট্রনীতির একটি মূল সূত্র হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কোন ক্ষমতা কাহারও উপর অর্পিত হইলে তাহার যথাযোগ্য প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজনীয় অপর সকল ক্ষমতা নির্দিষ্ট না করিয়া দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মতে আসল সমস্তার মূলই হইল ঐখানে।

পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিভাগের আওতায় কোন্ কোন্ বিষয় পড়ে তাহা কি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ? ঐ সংজ্ঞাগুলির প্রকৃত অর্থ কি ? বৈদেশিক বাণিজ্য, বাণিজ্যচুক্তি, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, স্বতঃই আনুষঙ্গিকভাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং ইহাই সর্বজনস্বীকৃত নীতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, বিচারক কুলিজ বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্রে এই অনির্দিষ্ট আনুষঙ্গিক ক্ষমতার গুরুত্ব খুবই বেশী। কাহাকেও কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণ করিলে তাহা পালনের জন্ত প্রয়োজনীয় অপরাপর সকল ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে এ কথা স্বতঃসিদ্ধের স্থায় স্বীকৃত হয়। একজ্ঞ সাক্ষ্য-নক্ষিরের কোন প্রয়োজন নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যাহা সত্য তাহা ভারতের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রী-মিশন হয়ত ইচ্ছা করিয়াই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা বা তুচ্ছ সিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্তু গণ-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনে সফল হইতে হইলে তাঁহাদের সর্বাঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষমতা যতটা সম্ভব একমত হইয়া নির্ধারিত করিতে হইবে। নতুবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা অর্থহীন হইয়া পড়িবে। তাহাতে নানা অনর্থের উৎপত্তি হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের একটি জট প্রমাণ হইবে। গণ-পরিষদ এই জটটি সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তাহা নিবারণের দায়িত্ব কাহার এবং কি উপায়েই বা তাহা করা হইবে, মিশন-প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ নাই। অথচ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,

“যদি কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার গোলযোগ নিবারণ করিতে না পারেন বা না চাহেন এবং খোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা হইলে কি হইবে ? এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশূন্য করিয়া রাখা কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। তাহাকে শান্তিহাপনের জন্ত হস্তক্ষেপের শাসনতান্ত্রিক অধিকার অবশ্যই দিতে হইবে। একজ্ঞ সুইজারল্যান্ডের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যবস্থার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করিতে হইবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না, তাহারা শান্তিতে দিনযাপন করিতে চায়। তাহার ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য। বিহার ও নোয়াখালির ঘটনাবলীর পর আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপের অধিকার দান সম্পর্কে) কাহারও আপত্তি হইবে না বলিয়াই মনে করি।

এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। সুইজারল্যান্ডের স্থায় ব্যবস্থা-পরিষদের সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যৌথ শাসন-পরিষদের ব্যবস্থা করাও গণ-পরিষদের কর্তব্য। তবে যদি বলা যায় যে, মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে দেশরক্ষা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলাও বুঝায় তবে সে কথা স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহাতে ভবিষ্যতে বহু গোলযোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।”

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপসংহারে বলেন, “অপর সকল দেশের স্থায় আমরাও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিব।” আমরাও বিশ্বাস করি কংগ্রেস দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া ভারতবর্ষের নিজস্ব রাষ্ট্রবিধি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। গণ-পরিষদের কাজ পণ্ড করিবার জন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও প্রতিক্রিয়াপন্থী লীগের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।

পাকিস্তান সম্বন্ধে রাশিয়ার অভিমত

মস্কো বেতারে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে রুশ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ ব্রিটিশের চক্রান্ত, ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে সমস্তা আরও জটিল হইবে। তিনি বলেন, ইংরেজরা যে ভাবে ভারতে নুতন গবর্নেন্ট গঠনের খেলা খেলিতেছে তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ এবং রক্তপাত অনিবার্য। বিলাতের অনেক সংবাদপত্রও ভারতীয় সমস্তার সমাধান হিসাবে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত করিবার জন্ত প্রচারণা চালাইতেছে। এই ভাবে দেশ ভাগ করিলে ভারতীয়

সমস্তার সমাধান তো হইবেই না, বরং সমস্তা আরও জটিল হইয়াই উঠিবে। তিনি আরও বলেন, “যখনই ইংরেজরা কোনরূপ শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিতে গিয়াছে তখনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও হানাহানি হইয়াছে। কারণ হিসাবে ইংরেজরা বলে যে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি পৃথক। কিন্তু কথা হইতেছে যে গত ৮০০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানেরা ভারতবর্ষে মিশ্র ভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে, এমন ধারা হানাহানি তো হইত না। ইংরেজও সে কথা স্বীকার করেন। গত শতাব্দীতেও এই অবস্থা ছিল না। এই শতাব্দী হইতেই ইহা এক সর্বভারতীয় সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে।

“সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার হিসাবে মুসলমানেরা শতকরা ২৩ জন। পাকিস্তানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে, কিন্তু হিন্দু এবং শিখ মিলিয়া হইবে জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। এবং সংখ্যালঘু হইলেও হিন্দু ও শিখরা সব বিষয়ে মুসলমানদের অপেক্ষা উন্নত এবং সম্ভব। কাজেই ইহাদের মধ্যে সজ্ঞা লাগিয়াই থাকিবে। ভারত বিভাগের কূটক্রান্ত যাহাদের মাধ্যম ঘুরিতেছে, তাহারাও এমন স্থায়ী হানাহানিই চায়, তাহাতেই তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি। কারণ স্থায়ীভাবে দেশে সজ্ঞা এবং বিশ্বশ্রদ্ধা জিয়াইয়া রাখিতে পারিলে সর্বদাই ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ ইংরেজের থাকিবে এবং এই ভাবেই তাহারা ভারতের উপর তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিবে।”

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং আজও উহাকেই নানাভাবে বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে কটকট রোপণ করা হইতেছে এই সভ্য সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্মত করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উৎকানি দিয়া সংখ্যাগুরুর উন্নতি বন্ধ করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির অপপ্রয়োগ, কি ভাবে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ভারতবর্ষ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নূতন ভাবে প্রদেশ গঠন করিয়া দিলে পাকিস্তানের পথ যেমন বন্ধ হইবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধও তেমন কমিয়া আসিবার উপায় হইবে। পঞ্জাবে ও বাংলায় শতকরা ৫৫ জন যতক্ষণ সর্বতোভাবে শতকরা ৪৫-এর সকল দাবি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধান অসম্ভব।

পণ্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিভাষণ

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনে ভারতের

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহ-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব প্রসঙ্গে বলেন যে, বিজ্ঞানের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। ভারতের ৪০ কোটি বুদ্ধি জনগণের নানা বিষয়ের সমস্তার সমাধানই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কর্তব্য।

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তিনি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের নবরূপ পরিগ্রহণের সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। তিনি মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সহিত বিশ্ববিজ্ঞানের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা যেমন দরকারী তেমনই উচিত। ভারতবর্ষেরও একান্ত ভাবে কর্তব্য বিশ্ববিজ্ঞানের সহিত পা মিলাইয়া চলা।

যদি বর্তমানের নব উদ্ভুদ্ধ ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের পথকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহা পথ হারাইয়া যাইবে।

বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে ভারতবর্ষ আপনাকে ঠাই করিয়া লইয়াছে। তথাপি আমাদের বিজ্ঞান-সমালোচকদের মতকে সমর্থন করিয়া আমিও বলি যে ভারতবর্ষের যতখানি করা উচিত তাহা ভারত করিতে পারে নাই।

ভারতের বিশাল জনগণের কাছে যখন সকল প্রকার সুযোগের দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে তখন আমরা যাহা করিতে পারি তাহা করিয়া উঠিবার উপায় লাভ করিব। যে প্রতিভা ক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া লোপ পাইয়া যাইতেছে তাহার শতকরা ৫ ভাগও আমরা যদি কাজে লাগাইতে পারি তাহা হইলেও ভারতে বৈজ্ঞানিকের ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইবে। আজ আমরা শতকরা একটি প্রতিভাবান লোককেও কাজে লাগাইতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হটুক যাহাতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল-বিচ্ছাদিতগুলি দূরীভূত হইয়া আমরা সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারি।

অতঃপর পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলেন যে তিনি একথা একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন, ভারতের তথা পৃথিবীর সমস্তাগুলি উপযুক্ত সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। তিনি বলেন যে অনেক বৈজ্ঞানিকই তাহাদের গবেষণাগার হইতে বাহিরে আসিয়া জীবনের অস্তিত্ব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নীতির অগ্রগতি ভাবে কার্যরস্ত করিতে ভুলিয়া যান। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বৈজ্ঞানিক নীতিতে কার্যরস্ত করিলেই আমরা সাক্ষ্য অর্জন করিতে পারিব।

পণ্ডিত জবাহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন, যখন আমরা কোন বিশেষ ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিব তখন যেন তাহার সামগ্রিক পটভূমিকাসহ আলোচনা করি। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সহিত বিজ্ঞানও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাহাকে বাদ দিয়া কাজ চলিতে পারে না।

গত দুই বছর আগে হিরোশিমাতে একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের

আজ মনে হইতেছে, আমাদের গতি কোন্ দিকে। সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি? আণবিক বোমার প্রয়োজন ছিল কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা যে একটি বিষয়ে মানুষকে জমাগত ভাবাইয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধ্বংসের জন্য যে কোন উপায়কেই গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহাই চিন্তার বিষয়। হিরোশিমার বিপর্যয় অকথ্য, অবর্ণনীয়। হয় তো একথা সত্য যে যাহা উদ্দেশ্য ছিল তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে কিন্তু এইখানে কথটি বিজ্ঞানীগণকে অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিতে হইবেই।

বিজ্ঞানের দুইটি দিক আছে, একটি সৃষ্টির অপরটি ধ্বংসের। হিরোশিমাকে দুই সংগ্রামের একটি রূপক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বসভার আণবিক শক্তি-সংসদের মন্তব্য যাহাই হউক এবং তাহা যদি আমরা গ্রহণও করি তথাপি মানুষের মনে সেই প্রশ্নই মাথা তুলিতে থাকে যে আমাদের গতি কোন্ দিকে?

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইলে কোন্ পথে চলিবে তাহা আমি জানি না। আমি একটি পথের কথা জানি, ভারতবর্ষ সে পথ লইলে আমি খুশি হইব—ভারতকে সেই পথ গ্রহণ করানই আমার ব্রত। একটি প্রাচীন বনম্পতি ছিন্নমূল হইলে উহার মূলস্থ যুতিকার বহু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভারতে আজ বহু পুরাতন মহীরূহ উন্মূলিত—কোটি কোটি লোক স্বাধীনতা লাভ করিলে বহু আবদ্ধ শক্তি মুক্তি পাইবে। তাহারা কোন্ পথ ধরিবে তাহা বলা কঠিন। ভারতের জড়-জনতা আজ গতিশক্তি লাভ করিতেছে। এই গতি-মুক্তির পটভূমিকায় যে সংগ্রাম দেখা যাইতেছে তাহা তুচ্ছ—যদিও তাহা আমাদের কাছে সাময়িক ভাবে বড় মনে হইতে পারে। আজকের ভারতে সত্যি বিরাক্টের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বিশাল জনতা আজ গতিশীল। হঠাৎ মুক্তবন্ধন জড়-জনতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তবু সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাহা গতিবেগের অধিকারী হইয়াছে, যে ভুলই তাহারা করুক, তাহারা আবার যথাস্থান খুঁজিয়া লইতে পারিবে, কারণ তাহারা গতিময় ও শক্তিশালী। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রধান কতব্য ইহার কেন্দ্রগত সামঞ্জস্য বিধান করা।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে মানুষের শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত সুযোগ করিয়া দেওয়া। ভারত-সরকারের একটি প্রধান ক্রটিই এই যে তাহার কোন সুসমঞ্জস কেন্দ্রগত যোগাযোগ নাই। প্রত্যেক বিভাগই মনে করে যে, অপর বিভাগের ব্যাপারে তাহার মাথা ঘামাইবার কিছু নাই। এই সমস্ত সমাধানের জন্ত ‘ভাশনাল প্ল্যানিং কমিটি’ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক ও অজ্ঞাত কারণে এই কমিটি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইহার পর পণ্ডিতজী বলেন যে বর্তমানের স্বাধীনতাযুধী

ভারতবাসীর পক্ষে বহুলতর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন (scientific-minded) হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের একটি সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে একান্তই প্রয়োজন। একটি ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সত্যের মূল্য খুব বেশী নয়। যখন দেশ ঋণ-ভাবে মৃত্যুমুখী তখন সত্য, ভগবান বা আরো অনেক জিনিষ উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। আগে আমাদের তাহাদের জন্ত অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার পর তাহাদের কাছে ভগবৎ-দর্শন ব্যাখ্যা চলিবে।

বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একথা আমি অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়াই বলি যে আমরা যুদ্ধে যোগদান করিব না। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না। ভবিষ্যতের কথা বলিবার অথবা ভবিষ্যতে ভারত কি করিবে তাহার বাধ্যবাধক ছক বাধিয়া দিবার অধিকার আমার নাই। তবে গত মহাযুদ্ধের পর যখন আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা উঠিতেছে তখন হয়ত আবার বিজ্ঞানবিদগণকে যুদ্ধের কাজে অপব্যবহার করা হইতে পারে। আমি মনে করি যে বিজ্ঞানী নরনারীগণ যেন একথাও ভাবিয়া দেখেন কি নীচ অভিপ্রায়ে তাহাদের ব্যবহার করা হইতেছে ও তাহারা যেন আর সেই কু-অভিপ্রায় সমর্থন না করেন। অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে, যে বিরাট শক্তিসম্ভার-গুলিকে বিশ্ব কল্যাণে সদ্যবহার করিলে মানুষের জীবন যুগ্ম-সুখময় উন্নতি, তাহা না করিয়া মানুষ কেবল মারামারি কাটাকাটির কথাই ভাবিতে থাকিবে।

পরিশেষে তিনি সমবেত বিজ্ঞানীগণকে সোধোধন করিয়া বলেন, আপনারা ভারতে ৪০ কোটি লোকের কল্যাণ-বিধায়ক হউন। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের প্রগতি ও শান্তির ব্যাপারে আপনারদের সহায়ত্ব করুন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এবারকার প্রধান বিশেষণ এই যে, রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ হইতে খ্যাত-নামা বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া উহাতে যোগদান করিয়াছেন। গবেষণার ক্ষমতায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বের কোন দেশের বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ন্যূন নহেন, ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করিবার যে দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের আছে, তাহারা তাহা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা বিলাত ও আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চা পরিদর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। যথেষ্ট সুযোগ হাতে থাকা সত্ত্বেও ইহা হয় নাই।

ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্ত সর্বাপেক্ষে আমাদের দেশে একটি ব্যাপক ভূমি-পরীক্ষা (Soil Survey) হওয়া দরকার। এই

প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অহুত হইতেছে। ইম্পিরিয়াল কৃষি-গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্যন্ত ইহা করেন নাই। কৃষকের সহিত তাঁহাদের কোন যোগাযোগ নাই। তাঁহাদের গবেষণা প্রভৃতি প্রকাশিত হয় ইংরেজী পত্রে, ইংরেজী ভাষায়, কৃষকের নিকট উহা অনধিগম্য। আমেরিকায় যে-কোন চাষী কৃষি গবেষণাগারে উপস্থিত হইয়া অল্পবিধার কথা বলিতে পারে এবং উহার প্রতিকারও লাভ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে অশিক্ষিত সাধারণ কৃষকের তো কথাই নাই, কৃষিকার্ষে রত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও কৃষি-গবেষণাগারের সহায়তা লাভ করা দুর্লভ। ঢাকায় উৎপন্ন তুলার ঢাকাই মসলিন তৈরি হইত ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, অথচ এই তুলার গাছ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিক এই গাছ খুঁজিয়া বাহির করিবার অথবা ঢাকাই মসলিনের জন্ম ব্যবহৃত দীর্ঘ-আঁশ তুলা আবার ঢাকায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইংরেজ বলিয়া দিয়াছে ভারতবর্ষে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মে না, অতএব উহাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘকাল নিম্নিত ছিলেন। তুলা-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পর এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু বাংলার তুলা গাছগুলি উদ্ধারের জন্ত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। গবাদি পশু সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইম্পিরিয়াল পশু-গবেষণাগার মন্টগোমারী গাভী লইয়া ব্যস্ত। সারা দেশের গবাদি পশু বর্ধকালে পা ও যুগের খাম্বে ভুগিয়া মরিতেছে তাহার কোন প্রতিকার আজও হইল না। চরকার উন্নতির জন্য খাদ্য কর্মীরা যে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন, কোন বৈজ্ঞানিককে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে দেখি না। কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজ বড় বড় কারখানাওয়ালাদের জন্য যে উৎসাহের সহিত গবেষণা করিয়া দেন, কুটির শিল্পের জন্য তাহার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনস্টিটিউট সরকারী অর্থসাহায্য সংগ্রহ করিয়া সরকারের কাজ করিয়া দেন, কিন্তু দেশের যেটুকু উপকার তাঁহারা করিতে পারেন তাহা কণামাত্রও করেন না। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া বাংলার নমশূদ্র, কৈবর্ত, বাঙ্গী প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার শুধু যে বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা নহে, উহা একান্ত আবশ্যকও বটে। রাঁচীতে শরণ চন্দ্র রায় অথবা মধ্যপ্রদেশে ডেরিয়ার এলউইন একাকী স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ল্যাবরেটরী বাংলার বিভিন্ন অল্পজাত জাতি সম্বন্ধে তাহা করিতে পারিতেন। এরূপ গবেষণা ভিন্ন ইহাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা অতিশয় কঠিন হইবে, বিজ্ঞান সম্মত হইবে না বলিয়া এরূপ উন্নতির স্থায়িত্বও হইবে না। বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ শ্রেণীর গবেষণায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার কতকাংশ

জন-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না দেখাইলে আপামর সাধারণ বিজ্ঞানের কল্যাণময় ফলভোগে বঞ্চিত হইয়াই থাকিবে।

আসামের পার্বত্য জাতি

‘আসাম ট্রিবিউন’ পত্রিকার গোহাটিঙ্গ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভারত-সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের গোপন নির্দেশ অনুসারে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা আসামের পার্বত্য জাতিদের লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের জন্ত আবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদ পার্বত্য জাতির নেতাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, এক জন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী আসামের পার্বত্য জাতির নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, আসামের পার্বত্য জাতিদের লইয়া যদি একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয় তবে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত ব্রিটিশ গবর্নেন্ট চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির হাত হইতে রক্ষা করিবেন। এই পরিকল্পনায় পার্বত্য জাতির নেতাদের নিকট হইতে সমর্থন পাওয়ার জন্ত কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের এই চক্রান্তের কথা পণ্ডিত নেহরুও সম্ভবতঃ জানেন। পণ্ডিত নেহরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভ্রমণের সময় ব্রিটিশ রাজনৈতিক দপ্তরের গোপন কার্যকলাপের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের এই দুই সীমান্তের পার্বত্য জাতিদের খাড়ে চাপিয়া বসিয়া ব্রিটিশ গবর্নেন্ট এ ছুটি স্থানকে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পিছুলাপে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন, ইহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মিঃ জিন্না ইহাই চাহিয়াছিলেন, তাঁহার পাকিস্তান পরিকল্পনার মূলে ইহাই ছিল অজ্ঞাতম অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ার পর উহার এই অংশটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিভাগ কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের কাজে ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন। কখনও বোমা কখনও বা চাউল আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়া পার্বত্য জাতিকে দলে রাধা ইংরেজের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সংবাদে তাহারই যথেষ্ট ইঙ্গিত মিলিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভূমি-বিষয়ক নূতন বিল

পশ্চিম-বাংলার হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে মুসলমানপ্রধান জেলায় পরিণত করিয়া বাংলার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে বলিয়া আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। প্রকাশ, বাংলা-সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনেই একটি আইন পাস করাইয়া পশ্চিম বঙ্গের ১৪ লক্ষ একর

অনাবাদী জমি দখল করিয়া উহাতে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা করিবেন। বলা বাহুল্য, আদাম হইতে বিভাজিত এবং বিহার হইতে আত্মত লোকদের পশ্চিম বঙ্গে বসাইবার ক্ষমতা এই আয়োজন।

কত অল্প লোক বসাইলে বর্ধমান বিভাগের ছয়টির মধ্যে চারিটি জেলাকে মুসলমানপ্রধান করিয়া ফেলা যায়। নিম্ন লিখিত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে :-

	হিন্দু	মুসলমান
বর্ধমান—	১৩,৯৩,৮২০ (৭৩.৭২%)	৩,৩৬,৬৬৫ (১৭.৮১%)
বীরভূম—	৬,৮৬,৪৩৬ (৬৫.৪৮%)	২,৮৭,৩১০ (২৭.৪১%)
বাঁকুড়া—	১০,৭৮,৫৫৯ (৮৩.৬৩%)	৫৫,৫৬৪ (৪.৩১%)
মেদিনীপুর—	২৬,৮১,২৬৩ (৮৪.০৬%)	২,৪৬,৫৫৯ (৭.৭৩%)
হুগলী—	১০,৯৯,৫৪৪ (৭৯.৮১%)	২,০৭,০৭৭ (১৫.০৩%)
হাওড়া—	১১,৮৪,৮৬৩ (৭৯.৫০%)	২,৯৬,৩২৫ (১৯.৮৮%)

লীগ মন্ত্রীদের প্রজা-দরদের এই আকস্মিক অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ কঠিন নয়। ১৪ লক্ষ একর কর্ণযোগ্য অনাবাদী জমি অধিকার করা হইতেছে। এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমি গড়ে পাঁচ জন লোকের একটি পরিবারকে বিলি করিলে ৭০ লক্ষ লোক আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। পূর্ববঙ্গে মুসলমান ভূমিহীন দিনমজুরদের পক্ষে ইহা কম লোভনীয় প্রস্তাব নয়, যাহারা আসামের দুর্গম স্থানে গিয়া আসাম-সরকারের ক্রকুট অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়া জমি দখলের ইচ্ছা রাখে, এই প্রস্তাব যে তাহারা উপেক্ষা করিবে আমরা ইহা ভাবিতে প্রস্তুত নহি। বর্ধমান জেলায় ১২ লক্ষ, বীরভূমে ৫ লক্ষ, হুগলীতে ১০ লক্ষ এবং হাওড়ায় ১০ লক্ষ মোট ৩৭ লক্ষ লোক বসাইতে পারিলেই এই চারিটি জেলা “অধিকার” করা যায়। এই লোক সংগ্রহ করিতে খুব বেশী দিন লাগিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

রাংলায় বাঙালী হিন্দুকে অব্যাহতি “বিদেশী” আখ্যা দিয়া এখনই তাহাকে অজ্ঞ বর খুঁজিবার নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত আয়োজন সফল করিতে পারিলে তাহার ভাণ্ডে কি ঘটবে নোয়াখালিতে তাহার পূর্ণ পরিচয় মিলিয়াছে, এখনও মিলিতেছে।

দামোদর-পরিকল্পনা

দামোদর-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলা ও বিহার সরকারের যে আলোচনা

চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে, তিন জনে একমত হইয়া কাজ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার ফলে সীওতাল পরগণা এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেক উন্নতি হইবে।

দামোদর-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে বিত্তীয় এলাকার জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে এবং উহার ফলে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতি হইবে। ক্ষেতের জল কৃষকেরা যেমন জল পাইবে, ছোট-বড় শিল্পের উত্তোজনাগণও তেমনই সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শক্তি হাতে পাইয়া নানাবিধ শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিবে। কলিকাতা পর্যন্ত সকলেই সম্ভবতঃ এক আনা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে।

দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং তদনুসারে গবর্নেন্ট পরিবর্তনের জন্ত পরিকল্পনার কাজ যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তদ্বৎক্ষেত্রে আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির ছায় একটি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের উপর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি আইনে পরিণত করিয়া লওয়ার কথা হইয়াছে। পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পূর্ণ দায়িত্ব উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে থাকা উচিত এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। ইহার জন্ত মোট ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে বাংলা-সরকার দিবে ২৮ কোটি, কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ কোটি এবং বিহার ১১ কোটি।

মূল পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এখন উহার খুঁটিনাটি দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আবশ্যক। দামোদরের জল হইতে যে বিরাট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহাকে যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাইতে হইলে এই অঞ্চলে কোথায় কিরূপ কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ দরকার। ৫৫ কোটি টাকা লগ্নী করিয়া যে বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে তাহার জন্ত বার্ষিক চলতি ব্যয় বড় কম হইবে না। টাকার সুদ, ক্ষয়পূরণ, মেরামত এবং কর্মচারী প্রভৃতির বেতন বাবদ বার্ষিক ছয়-সাত কোটি টাকা ইহার জন্ত ব্যয় হইবে। এই টাকাত তুলিতেই হইবে, লগ্নী টাকাও ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং এমন ভাবে জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে বার্ষিক অন্ততঃ দশ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান হইতে পারে। এই Load Survey অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক, এবং স্থানীয় অঞ্চলদল সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে সেইরূপ বাঙালী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইলেই উহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যে প্রযুক্ত হইবার পূর্বে, এমন কি একটি মাত্র কারখানাও স্থাপনের পূর্বে বৈদ্যুতিক গ্রেড পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। গ্রেড পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের

সাইনগুলি আগে হইতে ঠিক করিয়া না দিলে ঋণছাড়া ভাবে কারখানা বসান আরম্ভ হইবে এবং পরে উহা ক্ষতি ও বিভ্রাটের কারণ হইয়া উঠিবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে এখনও যথোপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

এই বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যের উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের অভাবে আপাততঃ বিদেশ হইতে বিশেষতঃ টেনেসি অ্যালির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ আনাইবার প্রয়োজনীয়তা তিন পর্বতের টাই স্বীকার করিয়াছেন, অপরেও করিবেন। কিন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার সময়েই উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদেরও উহাতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত। ভারতবর্ষে বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত সিলি, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগ্য লোক বাছিয়া লইয়া ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা গোড়া হইতেই হওয়া দরকার, কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র পরিকল্পনার কার্যে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হওয়া উচিত। কর্ণেল ইভালকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এ দেশে থাকিবেন না, চাকুরির কট্টাঠি শেষ হইলেই সম্ভবতঃ চলিয়া যাইবেন। আমরা মনে করি প্রথম হইতেই কর্ণেল ইভালের সহকারী হিসাবে একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত। দুই কারণে ইহা করা দরকার। প্রথমতঃ, তাঁহার পরবর্তী ডিরেক্টর তাঁহারই সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া সমগ্র পরিকল্পনা নথ্যদর্পণে আনিয়া ফেলিতে পারিবেন, দ্বিতীয়তঃ, এক জন বাঙালী এই পদে সমাসীন থাকিলে দেশের বৈষয়িক ও সামাজিক সমস্যার সহিত পরিকল্পনার কোথাও অমিল ঘটিলে তাহারও সমাধান করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন বিদেশী, কার্যে পরিণত করিবার ভারও পড়িয়াছে বিদেশীর উপর। দেশের ভৌগোলিক, বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থার সহিত ইহাদের অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত-সুফলপ্রসূ না হইয়া অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঈষ্ট ইন্ডিয়ান রেলের লাইন এবং উত্তর-বঙ্গের রেল-লাইন ইহার দুইটি জাঙ্কল্যমান দৃষ্টান্ত। এই বিরাট কাজগুলি ষাঁহারা করিয়াছেন বাহবা লইয়া তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, দুর্ভোগ ভুগিতেছে এ দেশের লোক। দামোদর-পরিকল্পনা অতি বিরাট ব্যাপার হইবে এবং বহু লক্ষ লোকের মঙ্গলামঙ্গল উহার উপর নির্ভর করিবে। আমেরিকান আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও টেনেসি অ্যালি ফ্রীম সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। আমাদের দেশে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কার্যের ফল ক্রটিহীন হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সুতরাং প্রথম হইতেই এক জন উপযুক্ত বাঙালীকে এই কার্যের সঙ্গে রাখা উচিত।

বাংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ

বাংলাদেশের অত্রাণ বিভাগগুলির স্থায় শিক্ষা-বিভাগেও সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ সম্বন্ধে প্রায়ই গুরুতর অভিযোগ উঠিতেছে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কার্যকলাপে, বিশেষতঃ নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কারণে হস্তক্ষেপ করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষা-বিভাগের কয়েকজন অমূল্যমান ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারী কথায় কথায় বিভাগীয় দৈনন্দিন কাজে সাম্প্রদায়িক কারণে মল্লীমহাশয়ের হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া শিক্ষা-বিভাগ ছাড়িয়া অত্রাণ চলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগে যে-সব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহাদেরও কেহ কেহ এই স্বৈচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দু এবং খ্রীষ্টান, ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয়েই আছেন।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা উপলক্ষে বিভাগীয় উপযুক্ত কর্মচারীদের সহিত মল্লী মহাশয়ের বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয় যে সর্বপ্রথমে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করিবার জন্য একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের ট্রেনিং কলেজ গঠিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। সার্জেন্ট-পরিকল্পনাতেও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের অত্যাশঙ্কতা ও গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য সর্বাঙ্গে প্রস্তাবিত কলেজের জন্য ২৮ জন ভাবী অধ্যাপক বাছাই করা হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ১২ জনকে ইংলণ্ডে এবং ১৬ জনকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিলাতে প্রেরিত ১২ জনের মধ্যে ৪ জন এবং অবশিষ্ট ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন মূল্যমান। সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক এই সব প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং সিলেকশন বোর্ডে উপযুক্ত মূল্যমান সদস্য ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্য প্রার্থীকে সাম্প্রদায়িক কারণে নিযুক্ত করিতে গেলে শিক্ষাবিস্তারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে ইহা বুঝিয়া এই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক দাবির বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে হইতে মাসিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাতেই কে কতখানি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্ল্যানিং এডভাইসর মিঃ জ্যাকেরিয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষজ্ঞ মিসেস ব্লাগডেন এই সমস্ত রিপোর্ট রাখিতেন এবং প্রার্থীদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দান করিতেন। ভারতবর্ষে ষাঁহারা জানলাভ করিতেছিলেন তাঁহাদের শান্তিনিকেতনে গিয়া কুটীরশিল্প শিক্ষাদান প্রণালী পর্যবেক্ষণ করার কথা ছিল; মূল্যমান প্রার্থীসকল সাম্প্রদায়িক কারণে সেখানে যান নাই এবং সে দিক দিয়া ইহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

প্রার্থীদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং ইহাদিগকে লইয়া প্রস্তাবিত কলেজ দুইটি গঠনের সময় আসিয়াছে। প্রত্যেক কলেজে এক জন করিয়া প্রিন্সিপাল ও এক জন ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। কয়েকজন অধ্যাপক বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের সিনিয়র গ্রেডে নিযুক্ত হইবেন। সাম্প্রদায়িক কারণে দাবি উঠিয়াছে যে বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান প্রার্থী চতুষ্ঠয়কে কলেজ দুইটির প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হউক এবং অবশিষ্ট তিন জন মুসলমানকে প্রথম হইতেই সিনিয়র গ্রেড দেওয়া হউক। মিঃ জ্যাকেরিয়া এবং মিসেস রাগডেন প্রত্যেকটি প্রার্থীর যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মতে প্রস্তাবিত নিয়োগ খোরতর অন্যায্য হইবে। যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য লোককে উচ্চতম পদগুলিতে বসাইয়া সাম্প্রদায়িকতার অন্যায্য দাবি প্রথম হইতেই মানিয়া লইলে শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইহা বুঝিয়া তাঁহার উভয়েই উক্তরূপ নিয়োগের আপত্তি করেন। এই আপত্তি শিক্ষামন্ত্রীর মনঃপূত হয় নাই, তিনি সাম্প্রদায়িক অন্যায্য জিদেরই সমর্থন করিতেছেন। মিঃ জ্যাকেরিয়া কিছুদিন আগেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন, মিসেস রাগডেনও শিক্ষামন্ত্রীর কার্যের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রার্থীদের কার্যের রেকর্ড দেখিয়া নিয়োগ করা হউক, ইহাই ছিল বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু তাহা করিতে গেলে মুসলমান প্রার্থীদের উচ্চতম পদগুলিতে অধিষ্ঠিত করা চলে না, সুতরাং মন্ত্রীমহাশয় এই অতিশয় সঙ্গত প্রস্তাব মানিতে পারিলেন না। তিনি জানাইলেন যে তিনি স্বয়ং প্রার্থীদের ডাকিয়া পরীক্ষা করিয়া নিয়োগের আদেশ দিবেন। ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত লোক নহেন। অথচ এই সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ জ্যাকেরিয়া বা মিসেস রাগডেনের ছায় এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও উপস্থিত থাকিতে বলা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ঘটিতে পারে এই সন্দেহ স্বভাবতই লোকে করিবে।

মন্ত্রীমহাশয় এই নিয়োগ স্বয়ং না করিয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর প্রার্থী নির্বাচনের ভার ছাড়িয়া দিলেই সর্বাঙ্গীণ সঙ্গত ও শোভন কাজ হইত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনায় যে টাকা ব্যয় হইবে তাহার অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিবেন, সুতরাং সে দিক দিয়া এই নিয়োগে হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁহাদের অবশ্যই থাকিতে পারে। এই অধিকার প্রয়োগ করাও তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দানে জাতিগঠন বাধা প্রাপ্ত হইবে, দেশের পক্ষে উহা সবচেয়ে মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকিবে।

বাঙালী ব্যাঙ্কের বিপদ

কলিকাতার ছোট ব্যাঙ্কগুলির উপর দিয়া কিছুদিন যাবৎ বড় বহিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি ব্যাঙ্কও ইতিমধ্যেই ফেল হইয়াছে। ব্যাঙ্কের উপর 'রান' আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আজও উহা দেশের ছোট বড় সমস্ত ব্যাঙ্ককে আপন তত্ত্বাবধানে আনিতে পারে নাই। অল্প কয়েকটি ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত করিয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট রহিয়াছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় গড়িয়া তোলার চেষ্টা এদেশে এখনও পর্যন্ত হয় নাই, অথচ পৃথিবীর আর পাঁচটা সত্য দেশে গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই এরূপ আয়োজন হইয়াছে।

কলিকাতার ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা তোলার হিড়িক সুরু হওয়ার পর হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে তপশীলী ও অ-তপশীলী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রচার করার চেষ্টা হইয়াছিল যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কই নিরাপদ, বিপদ শুধু শেষোক্তগুলির। আমরা ইহা অতিশয় অত্যাচার বলিয়া মনে করি। ছোট ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে স্বকীয় দক্ষতাগুণে বড় হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলে স্থান লাভ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলে নাম আছে কি না ইহাই ব্যাঙ্কের প্রকৃত পরিচয় নয়, ব্যাঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব ও দৃঢ়তা নির্ভর করে তাহার পরিচালকাদিগের সততা, কর্মদক্ষতা, সতর্কতা ও নিষ্ঠার উপর। বড় অ-তপশীলী ছোট ব্যাঙ্কের এই সব গুণ আছে এবং ইহারাই ধীরে ধীরে অতি সামান্যভাবে কারবার আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ্কিং জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করে। কলিকাতার কয়েকটি সূদূর ও সুপরিচিত ব্যাঙ্ক এইরূপে মফঃস্বল শহরে সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজেদের চেষ্টায় আজ সকলের আস্থাভাজন হইয়া বাঙালীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে উহার তত্ত্বাবধানে আনিয়া সুগঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু উহা কার্যে পরিণত এখনও হয় নাই। বর্তমানে কলিকাতায় টাকা তোলার যে হিড়িক চলিতেছে তাহা হইতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিও বাদ পড়ে নাই, এইরূপ একটি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্ককেও ছুট লোকের বদনাম রটানোর ফলে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া অপরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। কিছুদিন আগে কলিকাতাতেই একটি ব্যাঙ্কে বড়রকমের চুরি হওয়ার ফলে উহাতে 'রান' হয়। আমানতকারীদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার জন্য বিশিষ্ট জননায়কেরা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান, তথাপি ব্যাঙ্কটি ফেল পড়ে। পরে ব্যাঙ্কটি নিজের পাওনা আদায় করিয়া লইবার পর আমানতকারী এবং পাওনাদারদের পাই-

পয়সা মিটাইয়া দিয়াছে। এইভাবে অহেতুকী চাকল্যের জ্ঞা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় ব্যাঙ্কও নষ্ট হইয়া যায়। ব্যাঙ্কে হঠাৎ ‘রান’ হইলে অতি বড় ব্যাঙ্ককেও বিপদে পড়িতে হয়, আমানতকারীদের দরজায় দাঁড় করাইয়া মুহূর্তের মধ্যে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া লম্বী টাকা আদায় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়। অথচ একটু সময় পাইলেই ব্যাঙ্ক সামলাইয়া লইয়া সকলের টাকা শোধ করিয়া দিতে পারে। ব্যাঙ্কে ‘রান’ চরম স্বার্থপরতার পরিচায়ক, ইহাতে আমানতকারী, ব্যাঙ্ক এবং সেই ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সকলেরই সমান ক্ষতি। একটা ব্যাঙ্কে ‘রান’ হইলেই সম-অবস্থাপন্ন আর পাঁচটা ব্যাঙ্কেরও আমানতকারীরা চঞ্চল হইয়া উঠে, ফলে সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় জীবনে বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইলে ব্যাঙ্কের ‘রান’ বন্ধ করিবার জ্ঞা অগ্রসর হইত। এই ক্ষমতা যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভিন্ন আর কাহারও নাই ইহা ভবানী-পুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ব্যাপারেই ভাল ভাবে দেখা গিয়াছে। ছোট ব্যাঙ্কের মধ্যে অসাধু ব্যাঙ্ক থাকে, সময় থাকিতে এই সব ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা করেন না। তাঁহারা ছোট ব্যাঙ্কের ভার জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। অথচ এ কাজ প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নহে। ভাগ্যবশী, অসাধু ও অপরিণামদর্শী লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক খোলা নিষিদ্ধ করা এবং খুলিলেও বন্ধী ক্ষতি করিবার পূর্বেই উহাদিগকে অপসারিত করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই থাকা উচিত। বর্তমানে যুদ্ধোত্তর চড়া বাজার চলিতেছে, মন্দা দেখা দিতে আর বেশী দেরি নাই। মন্দার বাজার আরম্ভ হইলেই বহু শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ককে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং এখন হইতেই সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। একটা ব্যাঙ্কও যাহাতে ফেল না পড়ে সে বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি রাখা দরকার, যথোপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে না থাকিলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ড ভারত-সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়া আইন প্রণয়নের অগ্রদূত করিতে পারেন। ভারত-সরকার উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাঙালী ব্যাঙ্কের উপর দিয়া যে বড় সম্প্রতি বহিয়া গিয়াছে, যাহা আসিতেছে তার তুলনায় উহা নগণ্য বলিয়াই আমাদের ধারণা।

লবণ-কর তুলিয়া দেওয়ায় বিলম্ব

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অর্থনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে করাচীতে সমবেত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ লবণ-কর রদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে

যোগ দিবার পর হইতে লবণ-কর রদের ব্যাপার লইয়া লোক-চক্ষুর অনুরালে অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস ও লীগ দলের মধ্যে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার কথা তাঁহারা হয়তো তেমন কিছু জানেনই না। ডাঃ জন মাধাই অর্থসচিব থাকাকালে যথাসম্ভব শীঘ্র লবণ-কর রদের সিদ্ধান্ত করা হয়।

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিবার পর মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থসচিব হন। তিনি পূর্বতন অর্থসচিবের ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে নানা ছুতা তুলিয়া গরিমসি করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে একটা কিছু করিবার জ্ঞা বলা হইলে লীগদল পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পান্টাইবার কথা বলেন। কিন্তু কংগ্রেস উহাতে রাজি না হওয়ায় তাঁহারা বলেন যে, লবণ-কর সম্পর্কে কি করা হইবে না হইবে, তাহা আগামী বর্ষের বাজেট তৈয়ারীর সময়ই স্থির করা হইবে।

কংগ্রেস পক্ষ হইতে বলা হয় যে, বিশেষ বিচার বিবেচনার পরই লবণকর রদের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। উহা কার্যকরী করিতেই হইবে। কিন্তু অর্থদপ্তরের ভার এক জন লীগ সদস্যের উপর থাকায় তিনি (অর্থসচিব) নানা ভাবে টাল-বাহনা করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, লবণ-কর রদ করা হইলে কংগ্রেসের মর্যাদা বাড়িয়া যাইবে।

অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদানের প্রধান উদ্দেশ্য কংগ্রেসের জনকল্যাণমূলক সকল চেষ্টায় বাধা দান ইহা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। অর্থ-বিভাগ লীগের হাতে থাকায় বাধা দেওয়ার সুযোগও যথেষ্টই আছে। লীগবর্জিত অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, লীগ উহাতে প্রবেশ করিবার পর তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশের স্বাধীনতা বা কল্যাণ ইহাদের কাম্য ত নহেই, স্বীয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণের উপকার করিতে গেলে যদি তাহা সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের অংশ হইয়া পড়ে তবে লীগ-নেতারা তাহাতেও ইচ্ছুক নহেন। লবণ-কর রহিত হইলে উপকৃত হইবে দরিদ্রের। তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু তবু লীগ তাহা করিবেন না। কারণ কংগ্রেস লবণ-কর তুলিয়া দেওয়ার জ্ঞা ঘোল বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিয়াছে অর্থ-সচিব নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর আমলে লবণ-কর উঠিয়া গেলেও উহাতে নাম হইবে কংগ্রেসের এই ভয়।

চরকার সূতা

ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ত্রীমুখ্ত ধর্মবীর ব্রোহাইয়ের সম্মিলনীতে বস্ত্রের অবস্থার সম্বন্ধে বিবৃতি প্রসঙ্গে সকল প্রদেশকেই হাতে-কাটা সূতা উৎপাদনের দিকে বেশী করিয়া নজর দিতে বলিয়াছেন। ত্রীমুখ্ত ধর্মবীর বলেন যে, প্রথমে যখন দেশে উৎপন্ন সূতা ভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তখন মাসে ৭০,০০০ গাইট পরিমাণ সূতা বিলি করা হইত। পরে সেই অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইলে এই

বরাহ বাড়িয়া মাসে ৮৩,৩০৪ গাঁইটে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সরবরাহের এই পরিমাণ বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। এখন অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বরাহের পরিমাণ পূর্ণাপেক্ষা অনেক কমাইয়া আনিতে হইয়াছে। ইহার কারণ-স্বরূপ শ্রমিক ধর্মঘট, দাঙ্গাখাঙ্গামা ও পরিশেষে শ্রম-সময়ের হ্রাস প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ধর্মবীর এই সম্বন্ধে হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতেছেন। তবে তিনি বলেন যে, আমেরিকা ও বিলাত হইতে যে পরিমাণ নকল সিকের ও তুলার সূতা আসিতে পারে তাহা সামান্যই। এইজন্য শ্রীযুক্ত ধর্মবীর হাতে সূতা কাটার উপর বেশী করিয়া জোর দিতেছেন। তিনি বলেন, “দেশগুলি যাহাতে ব্যাপক ভাবে এই দিকে নজর দিতে পারে তাহাই করা উচিত। প্রাক-যন্ত্ররূপে ভারতের তাঁতীরা হাতে এমন সূতা কাটিত যাহা যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন সেইরূপ পারদর্শিতা না হউক, মোটা কাপড় তৈয়ারী করাও কেন সম্ভব হইবে না? ইহাতে চাষী সম্প্রদায়ের লোকেরা অবসর সময়ের জুতা কাজ পাইবে এবং ইহার দ্বারা তাহাদের জীবিকারও যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ইংরেজ আগমনের পূর্বে ঠিক এইভাবেই গঠিত ছিল। কুটীরে কুটীরে চরকা ও তাঁত চলিত এবং তাহার দ্বারাই দেশের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়া এত উদ্বৃত্ত থাকিত যে ব্রিটেনে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইত। ইহা চাষীদের একটি অতিরিক্ত আয়ের পন্থা ছিল; অজন্মায় ধান না হইলে আয়ের অন্ততঃ একটি পঞ্চ তাহাদের সম্মুখে খোলা থাকিত। বিলাতী সস্তা কাপড় আমদানীতে ভারতীয় নিজস্ব বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহারাই ল্যাক্সাশায়ারের স্থান গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ কাপড় সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাপড় সামরিক প্রয়োজনে কাড়িয়া লওয়ায় নাগরিকদের বস্ত্র প্রাপ্তি দুর্ঘট হয়। বৎসরাধিককাল যুদ্ধ থামিয়াছে, তথাপি বস্ত্রাভাব ঘুচে নাই। বরং আবার নতুন করিয়া ল্যাক্সাশায়ারের উপর ভারতবাসীকে বস্ত্রের জন্য নির্ভরশীল করিবার আয়োজন শুরু হইয়াছে, টেক্স-টাইল কমিশনার আমদানী বিলাতী সূতার জন্য সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ভারতীয় মিলের কাপড়ের এই যদি পরিণাম হয়, একটু অসুবিধা ঘটিলেই যদি বস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় তবে এই বস্ত্রশিল্প বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন আছে দেশবাসীকে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। বিপদের দিনের জ্ঞাপকত্ব হিসাবে যদি মিল ছাড়িয়া চরকা ও তাঁতের শরণাপন্ন হইতে হয় তবে চরকা ও তাঁতকেই উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া ধরে ধরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইবে না কেন? জাপান যে ভাবে কুটীরে কুটীরে বিদ্যুৎচালিত তাঁত বসাইয়া বড়

বড় কারখানার উপর ভরসা না রাখিয়া ধরে ধরে বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে, ভারতবর্ষও তাহা হইতে পারে। সম্ভাব্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বহু স্থানে হইয়াছে, অজ্ঞাত স্থানেও হইতেছে সুতরাং একাজ আর আমাদের পক্ষেও কঠিন নহে। আমেরিকা বস্ত্র-উৎপাদনের উন্নত পন্থা আবিষ্কার করিয়া একটি লোকের দ্বারা বহু কাপড় তৈরি করাইতে পারিতেছে কিন্তু বিশ্বের ক্ষুধা মিটাইতে সে-ও অক্ষম। তপ হাড়া মানুষকে বাদ দিয়া যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে মানুষ যন্ত্রেরই দাস হইয়া উঠিয়া সভ্যতার বিপন্ন আনিবে। উৎপাদনের ব্যবস্থা সকল দেশে সকল ক্ষেত্রেই এমন হওয়া উচিত যাহাতে সবচেয়ে বেশী লোক কাজ পায়, যন্ত্র যাহাতে মানুষকে কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত না করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। দশ জন লোক বিতাড়িত করিয়া তাহাদের করণীয় কাজ একটি যন্ত্রের দ্বারা করাইয়া লওয়া লাভজনক হইতে পারে কিন্তু সে লাভ অল্প লোকের, দেশের নয়। দেশের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়াই এই লাভের অঙ্ক সঞ্চিত হয়। শ্রীযুক্ত ধর্মবীর গ্রামের লোকের দৃষ্টিতে, বস্ত্র-সম্ভার প্রতি তাকাইলে উহার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধানের পথ পাইবেন।

সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী

বাংলার খ্যাতনামা মুসলিম নেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ধুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার তেঁতুলিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি রিগন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৮ সালে বাঘ শিকার করিতে গিয়া আহত হওয়ার তাহার একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়। হাসেমী সাহেব ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে যশোরের এবং ১৯২৬ সালে দিনাজপুরে রাজকোষমূলক বন্ধুতা করায় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন এবং চারি বার কারাবরণ করেন। তিনি বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবাস কালে সার ষ্টানলি জ্যাকসন তাঁহার পরিষদের সদস্য-পদ খারিজ করিয়া দেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পুনরায় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে তিনি উহার ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে কৃষক-প্রজাঙ্গলে যোগদান করেন। পদ-মর্যাদা ও নেতৃত্বের লোভে এবং কলিকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর লীগের ভয়ে বহু কৃষক-প্রজা কর্মী ও নেতা দল ত্যাগ করিয়া লীগে যোগ দিয়াছেন; মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলিম নেতা লোভে বা ভয়ে স্বীয় মত ও পথ ত্যাগ করেন নাই, সৈয়দ জালালুদ্দীন তাঁহাদেরই এক জন ছিলেন।

দুর্গার প্রতিমা

(চতুর্থ প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

মোহন-জো-ডেরো স্থানে আবিষ্কৃত পুরাকৃতির মধ্যে কতকগুলি মুন্সয় ছোট ছোট নারী-পুতলিকা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি ভূষণে অলঙ্কৃত, কিন্তু নগ্ন। প্রাজেরা বলিতেছেন, মাতৃদেবীর মূর্তি, ভাবকেরা বলিতেছেন দুর্গা কিম্বা দুর্গার পূর্বরূপ। ইহাদের উক্তিভেদে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় সে সব ছেলেখেলার পুতুল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি বঙ্গদেশের গ্রামের ও কটকের জাতে (মেলায়) তেমন পুতুল অনেক দেখিয়াছিলাম। সেগুলি অলঙ্কৃত ও বস্ত্রাবৃত। মোহন-জো-ডেরোর আবিষ্কৃত নারীমূর্তি যে ছেলেদের পুতুল নয়, তাহার প্রমাণ কি? ভারত-পুরাকৃতির অধ্যক্ষ শ্রীযুত দীক্ষিত মহাশয়কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিতে পারেন নাই, কারণ পূজার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি যে পুতুল দেখিয়াছি সে পুতুল কোথায় পাওয়া যায়।

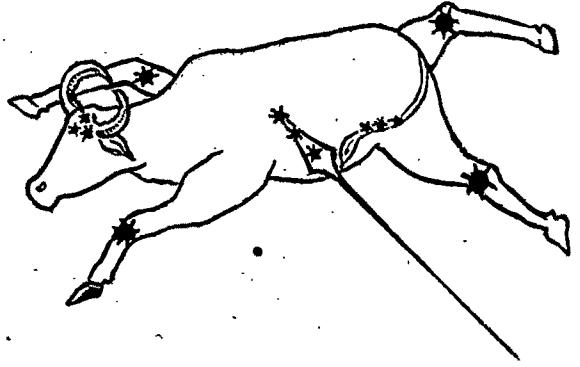
পুরাকৃতির সঙ্গে অনেক লিঙ্গচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীন সিদ্ধুবাসী লিঙ্গোপাসক ছিল। ঋগ্বেদে লিঙ্গোপাসকের নিন্দা আছে। ঋগ্বেদে রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা। ভয়ে কেহ তাহার নাম করিত না। রুদ্রাণীর উল্লেখ নাই। থাকিলে তিনিও ভয়ঙ্করী হইতেন, মাতৃমূর্তি হইতেন না।

যাহারা মনে করিয়াছেন, সে সব পুতলিকা দুর্গা কিম্বা তদনুরূপ আর্ঘদেবীমূর্তি, তাহারাও এই অনুমানের প্রমাণ দেন নাই। ঋগ্বেদে কয়েকটি দেবীর নাম আছে এবং কয়েকটির স্ততিও আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই দুর্গা-স্থানীয় হইতে পারেন না। ঋগ্বেদের উষা বহুস্তত হইয়াছেন, কিন্তু উষা এক প্রাকৃতিক আলোক। দুর্গার গুণ ও কর্ম উষাতে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় মাতৃদেবী-পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যদি মিশর ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের দুর্গাপূজা আসিয়া না থাকে, তাহা হইলে কোন দেশে মাতৃদেবীর পূজা ছিল, কোন দেশে ছিল না, তাহা জানিয়া দুর্গাপূজার ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। নারী-মূর্তি-পূজা সহজাত সংস্কার নয় যে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিবে।

বস্তুতঃ আমরা মাতৃদেবীর পূজা করি না, মহিষমর্দিনীর পূজা করি, চণ্ডীর করি। তাহাকে অধিকা বলিতেছি

বটে, কিন্তু তিনি অস্বামূর্তিতে পূজিত হন না। পূর্ব প্রকরণে দেখিয়াছি, মহিষমর্দিনী রুদ্রের যজ্ঞাগ্নি। রূপকে তিনি অধিকা। যিনি রুদ্র, তিনিই অধিকা। ঋগ্বেদে যুগনক্ষত্র রুদ্রপ্রতিমা-কল্পনার আশ্রয় হইয়াছিল। ঋগ্বেদের অন্তিমকালে খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দে ব্যাধরূপে পশুপতি বাণদ্বারা যুগ বধ করিতেছেন। ঋগ্বেদে এই যুগ ভীম। যেমন আরণ্য বরাহ, আরণ্য মহিষ। সেই পৃথক-ভূত রুদ্র বা রুদ্রাণী মহিষমর্দিনী হইয়াছেন। যাহা পূর্বকালে রুদ্রের শরীর ছিল, তাহা মহিষের শরীর হইয়াছিল। ব্যাধ, যুগ-ব্যাধ তারা, দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ। পশুপতি স্থানে চণ্ডী



৫। মহিষাসুর

আসিয়া শূলদ্বারা মহিষাকার অশুরের দেহ বিদ্ধ করিতেছেন (চিত্র ৫)। ইহা নিত্য ব্যাপার।

কালান্তরে এই মূলের কিছু কিছু রূপান্তর অবশ্যস্বাভাবী, তথাপি মূলের লক্ষণ থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহেশের ধ্যান স্মরণ করি। তিনি চতুর্হস্ত। তিনি “পরশুযুগ-বরাভীতি-হস্ত।” তাহার হস্তে পরশু, যুগ, বর ও অভয় আছে। এইরূপ চতুর্হস্ত মহেশপ্রতিমা আছে। তিনি কোথা হইতে পরশু ও যুগ পাইলেন? রুদ্রিয় মরুদগণের হস্তে বাসি (ছুতারের বাইস) আছে। সেই বাসি মহেশের পরশু। যুগ, যে যুগ আকাশে পলায়ন করিতেছে। তাহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। এই ব্যাঘ্র চিত্র-ব্যাঘ্র। মরুদগণের মাতা পৃথতী (চিত্রযুগ), (কারণ যুগ-নক্ষত্র তারাময়)। ইহা হইতে মহেশ ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। মহেশের রূপ বৈদিক কল্পনা। বিশেষতঃ তিনি বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিল-ভয়হর, প্রসন্ন। দুর্গাও বিশ্বের

আদি, বিশ্বের বীজ, ও নিখিল-ভয়-হারিণী, ভক্তের প্রতি প্রসন্ন। এই কারণে আমরা দুর্গাপূজা করিয়া থাকি।

বস্তুতঃ আমরা ভাবের পূজা করি, মূর্তির পূজা করি না। দুর্গার মূর্তি থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাহার অবয়ব। তিনি প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান। সে অবয়ব তাহার প্রতীক। আমরা দুর্গার মূর্তি বলি না, বলি দুর্গার প্রতিমা, গুণ ও কর্মের প্রতিমা। প্রতিমা শব্দ গুরু ষজুর্বেদে (৩২।৩) আছে। “ন তস্ম প্রতিমা অস্তি।” অত্র মহীধর,—তস্ম পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানম্ কিঞ্চিদবশ্য নাস্তি।” পুরুষের প্রতিমা নাই, প্রকৃতির আছে। প্রতিমা জড়ময়ী না হইয়া বাঙময়ী হইতে পারে। আর যিনি ধ্যানে অগম্য তাহার পূজাও নাই। কিন্তু কেবা তাহার গুণ ও কর্মের ইয়ত্তা করিতে পারে? প্রতিমা ভাবক্ষুরণের আশ্রয় মাত্র। মহিষমর্দিনী প্রতিমা দেখিলে ভক্তের মনে হয়, তিনি বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইলে তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দ্বারা রক্ষা করিবেন।



৬। মহিষমর্দিনী—মধ্যভারতে নাগোড় রাজ্যে আবিষ্কৃত। পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দীতে নির্মিত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা)

মহিষমর্দিনী-প্রতিমায় উগ্রচণ্ডী শূলদ্বারা এক মহিষ বিদ্ধ করিতেছেন। ইহাই মূলরূপ। এইরূপ প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৬, ৭)। মহিষ যে অসুর, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত মস্তকটি মহিষের, নিম্নাঙ্গ নর্যাকার হইবার কথা। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিমাও আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র ৮)। ইহা নূতন নয়। বরাহ অবতারের প্রতিমায় মস্তকটি বরাহের, নিম্নাঙ্গ মনুষ্যের। দশভূজা দুর্গার ধ্যানে অসুরের উদ্ধার দ্বিভুজ, খড়্গ-খেটকধারী, নিম্নাঙ্গ চতুষ্পদ



৭। মহিষমর্দিনী।—দক্ষিণ আর্কট ডিল্লীতে আবিষ্কৃত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা)

মহিষ। বঙ্গদেশে এইরূপ প্রতিমা নির্মিত হইত। শত বৎসর পূর্বেও ছিল (চিত্র ৯)। এখন পূর্ববঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে কদাচিত্ আছে। প্রথমে সিংহ বাহন ছিল না। পরে রক্তের কুকুর সিংহ হইয়াছে।

কালিকা পুরাণে (৬০।১৫৫) চন্দ্রশেখর চণ্ডিকাকে বলিয়াছেন, “হে জগন্ময়ী দেবি! মহিষারীর আমারই। পূর্বে তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, পুরেও করিবে।” পশ্চিম-বঙ্গে বর্তমান দশভূজা-প্রতিমায় ছিন্ন মহিষমুণ্ড পৃথক প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু সে মুণ্ড যে শূলবিদ্ধ অসুরের, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোথাও শিল্পীরা এই মহিষ-মুণ্ড ত্রিনয়ন না করিয়া দ্বিনয়ন করিয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়।

বর্তমানে দুর্গাপ্রতিমার সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের প্রতিমাও সন্নিবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গারই শক্তি। স্তবরাং তাহাদের প্রতিমা প্রদর্শনের হেতু নাই। কার্তিক গণেশ প্রতিমাও অকারণ আসিয়াছে। এই চারি প্রতিমা-সন্নিবেশ দ্বারা দুর্গার মহিমা খর্ব হইয়াছে। দুর্গা কুমারী। তাহার পুত্রকণ্ঠা নাই। এই কারণে দুর্গাপূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে। পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গার কণ্ঠা নহেন। দুর্গা কার্তিক গণেশের



৮। মহিষমর্দিনী।—দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আবিষ্কৃত। ভারত-পুরাণে ভবনে রক্ষিত। একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে নির্মিত।
(অমৃতবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা)

মাতা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ গণেশ বিঘ্নবিনাশন রুদ্রেরই বিকৃত মূর্তি। কার্তিকের মাতা কৃত্তিকা, পিতা অগ্নি। চারি শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের পূজার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় শত বৎসর পূর্বে এই চারি প্রতিমা-দশভূজা প্রতিমার সহিত নির্মিত হইত না (চিত্র ৯)। অদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন জব্বলপুরে, সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভূজার প্রতিমার পার্শ্বে অত্র প্রতিমা নির্মিত হয় না।

এই পর্যন্ত দুর্গাপ্রতিমা বুঝিতে কষ্ট নাই। কিন্তু মহাভারতোক্ত দুর্গাস্তবে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে দুর্গা যশোদা-গর্ভ-সম্ভূতা। তিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ কালী-রূপা। কেমন করিয়া তিনি দুর্গা হইলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। কে যশোদা, কিছুই জানি না।

কথাটি সামান্য নয়। একটু বিস্তার করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভদ্রকালীর উৎপত্তি লিখিতেছি। পুরাণ-পাঠক জানেন, মুখ্যচান্দ্র (অমাস্ত) শ্রাবণমাসে কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে ভগবান্ হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সেই রাত্রে নবমীতে জগতের ধাত্রী “যোগনিদ্রা মহামায়া” যশোদার কণ্ঠ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, “বিষ্ণুরূপ সূর্য আবির্ভূত হইলেন।” বহুদেব স্বীয় বালককে যশোদার শয্যায়

রাখিয়া যশোদার “নীলোৎপলদলশ্যামা” কণ্ঠ্যকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। কংস সে কণ্ঠ্যকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কণ্ঠ্য আকাশে রহিলেন এবং আয়ুধের সহিত অষ্টমহাভূজবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ পূর্বক আকাশ-মার্গে অন্তর্হিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, যশোদার এই কণ্ঠ্য নীলবর্ণী, অষ্টভূজা মহাকালী। ইন্দ্র মহাকালীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রকালী শূন্ত নিশূন্ত প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণও এই কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত মতে তিনি কংসাস্ত্রঘাতিনী। মথুরার রাজা কংস অস্ত্র ছিলেন অথবা কংসাস্ত্র নামে কোন অস্ত্র উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। শূন্ত-নিশূন্ত নামের দৈত্য-কল্পনার মূলে নিশ্চয় কোন নক্ষত্র ছিল।

এখন কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি। গোপাল কৃষ্ণ ইন্দ্র, ইহা ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের “ভারতবর্ষে” প্রতিপন্ন করিয়াছি। মুখ্য শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে অম্বুবাচি হইত। এই কারণে যোর দুর্ধোগ, সেদিন গোপালের জন্ম হইয়াছিল। অষ্টমী গতে নবমীতে ভদ্রকালী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞ-রূপা। ধূম অগ্নির পতাকা, ঋগ্বেদে আছে। যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নিও আছে। এই ঋগ্বেদে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্তুতঃ তিনি যজ্ঞীয় অগ্নি। ইন্দ্র-রূপ কৃষ্ণ কংস-রূপ অস্ত্র-বধ করিয়াছিলেন। পুরাণ ভদ্রকালীর আবির্ভাবের হেতু বলেন নাই। দেখা যাইতেছে, বৈদিক কালের ইন্দ্রকর্তৃক অস্ত্রবধ ও ইন্দ্র-যজ্ঞ স্মরণ করিয়াছেন।

দেখি, কতকাল পূর্বের ঘটনা। ঋজুর্বেদের কাল হইতে কার্তিকপূর্ণিমায় শারদ বিসুব ধরা হইত। ইহা হইতে গণিয়া গেলে শ্রাবণপূর্ণিমায় নয় চান্দ্র মাস হয়। নয় চান্দ্র-মাস গতে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী-নবমীতে অম্বুবাচি ঘটে। সেদিন ভোর রাত্রে ভদ্রকালী আকাশে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, মৃগ নক্ষত্রই ভদ্রকালী কল্পনার আধার হইয়াছিল। ব্যাধ তারা লইয়া গণিত দ্বারা জানিতেছি, ঋজুর্বেদের কালে এই নক্ষত্র দক্ষিণায়ণ-আরম্ভ কালে ভোর ৪টার সময় উদিত হইত। প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ। রবিকরে প্রথমে মৃগ, পরে ব্যাধ অদৃশ্য হইত, যেন ব্যাধ মৃগ বধ করিয়াছে। দুই এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এইরূপ দেখা যাইত। বর্ষা ঋতুর সূচনা করিত বলিয়া আকাশে উদয় নিরীক্ষিত হইত। অম্বুবাচির দিন যজ্ঞ হইবার কথা। অগ্নি দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হইত। সেই অগ্নি ভদ্রকালী, অধর-অরুণি (পাতন) যশোদা। সে

নক্ষত্র শরৎ ঋতু-আরম্ভে মধ্যরাত্রে উঠিত। বোধ হয় এইরূপে অম্বুবাতির ভদ্র-কালী পরে দুর্গা হইয়াছেন। আরও মনে হয় দুর্গাপূজা-প্রচলনের পূর্বে ভদ্রকালীর পূজা হইত। পরে দুর্গা-পূজা আসিয়াছে, কিন্তু শরৎ ঋতুতে।

মথুরায় পুরাকৃতি-ভবন আছে। সেখানে মথুরা অঞ্চলে আবিষ্কৃত মহিষমর্দিনী প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে। অবৈষ্ণব মহাশয় জানাইয়া-ছেন, সেসব প্রতিমা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, খ্রিষ্ট শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে বোধ হয় অবেষণ করিলে খ্রিষ্টাব্দের দুই এক শত বৎসর পূর্বের ভদ্রকালীর প্রতিমা পাওয়া যাইবে। বিদ্যাচলে এক দেবী প্রতিমা আছেন। কোন্ দেবী প্রতিমা, কত কালের প্রতিমা, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। তিনি পুরাণোক্ত বিদ্যাবাসিনী হইতে পারেন।

এক্ষণে বর্তমান প্রচলিত দশভুজা দুর্গার প্রতিমা অবলোকন করিতেছি। মৎস্যপুরাণে নানা দেবদেবীর

প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত আছে, দশভুজা দুর্গারও আছে। সেখানে দুর্গা অতসীপুষ্পবর্ণাভা। দুর্গাপ্রতিমার কি বর্ণ হইবে? অতসীপুষ্প আ-নীল। অতসীর বাঙ্গলা নাম তিসী? নদীয়া জেলায় ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহার বীজের নাম মশ্ণা, বাঙ্গলায় মসিনা। মসিনার তেল রং মিশাইতে লাগে। এ কারণে বঙ্গের নানা স্থানে তিসীর চাষ আছে। শ্রীকৃষ্ণ অতসীকুহুম-শ্রাম। ইহা প্রসিদ্ধ। বৃহৎ সংহিতায় উজ্জয়িনীর বরাহমিহির (ষষ্ঠ খ্রিষ্টশতাব্দী) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীর এই বর্ণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের যে বর্ণ, মৎস্য পুরাণের মতে দুর্গারও সেই বর্ণ। যশোদা-গর্ভসমুতা ভদ্রকালীরও সেইবর্ণ। কালিকা পুরাণে ভদ্রকালী অতসী-পুষ্পবর্ণা। ভদ্রকালী অবশ্য কালী (কৃষ্ণা)। দক্ষিণ



৯। মহিষমর্দিনী। শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গে চিত্রিত। (“প্রবাসী”; ১৩৫৩, শ্রাবণ)

ভারতের চিত্রকারেরা দুর্গা চিত্রের সেই বর্ণই করেন।*

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইন্দ্রাদির স্তবে দেবীর বর্ণ লিখিত হইয়াছে। “উগ্ৰচ্ছাঙ্কসদৃশ্ছবি”—গোপাল চক্রবর্তীর টীকা অনুসারে অর্থ, উঠিবার সময় পূর্ণচন্দ্রের ঘে বর্ণ দেখা-যায়, সেই বর্ণ। (“ক্রোধেনারক্তীভূতস্বাৎ”)। সে বর্ণ আরক্তপীত। দেবীর দেহের কান্তি “কনকোত্তম-কান্তি”

* আমার কাছে অজ্ঞাত দেবদেবীর সহিত “শ্রীদুর্গা”র এই বর্ণের চিত্র আছে। নাম “ভূগোল চিত্রা।” মহেশ্বর মহারাজার পরিপোষিত “কৃষ্ণ মৃতগাচার্যের বিরচিত প্রকাশিতম্।”

Sole proprietor :—

P. Rajagopaul Naidu.

Bidens garden Vepery. Madras.

সদৃশ। উৎকৃষ্ট স্ববর্ণের ঘেমন কান্তি, দীপ্তি। তদনুসারে কালিকা-পুরাণে দুর্গা “তপ্তকাক্ষনবর্ণাভা”। বঙ্গদেশের দুর্গা প্রতিমা এই বর্ণের হয়। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য “দুর্গাচন-পদ্ধতি” লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মৎস্য পুরাণোক্ত কাত্যায়নী দশভুজার প্রতিমালক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গা “অতসীপুষ্প-বর্ণাভা”। কিন্তু তিনি অতসী শব্দে শণ বুঝিয়াছেন। অতসীপুষ্প আ-নীল বর্ণ। কোন কোন ফুলে রক্তের আভা মিশ্রিত হইয়া থাকে। শণ শুদ্ধ পীত বর্ণ। দোড়ির নিমিত্ত শণের বিস্তর চাষ হয়।*

ধ্যানে আছে, জটাজুট-সমায়ুক্ত। প্রতিমায় জট দেখিতে পাই না। অধেন্দু শিরোভূষণও দেখি নাই। ধ্যানের সহিত পশ্চিম বঙ্গের মহিষাসুরের-দেহের ঐক্য নাই, পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মৎস্যপুরাণ প্রতিমার লক্ষণ দিয়াছেন, ধ্যানমগ্ন দেন নাই। এই কারণে “ত্রিশূলং দক্ষিণে দত্তাং, পরশুং সন্নিবেশয়েৎ, মহিষং বিশিরক্ষং প্রদর্শয়েৎ, সিংহং প্রদর্শয়েৎ” ইত্যাদি কর্মসূচক ক্রিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত দশভুজার রূপ পাইতেছি। তাহার গুণের কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। পণ্ডিত শ্রীশ্রামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ইহাকে কারিকা (বিবরণ) বলিয়াছেন, মন্ত্ৰ বলেন নাই।

* বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের বর্ণ অতসীকৃষ্ণ তুল্য। শ্যামদাস লিখিয়াছেন, “অতসীকৃষ্ণ জিনি তম্বু,—সতীশচন্দ্র রায় কতৃক সম্পাদিত অপ্রকাশিত “পদরত্নাবলী”। পূর্ববঙ্গে এক বিষয়কর ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ভাস্কর্য্যের পূর্বপার্থ হইতে ত্রিপুরা মৈয়মনসিং পর্বন্ত শণ-পুষ্পীর নাম অতসী হইয়া গিয়াছে। অমরকোশে, “অতসী স্তাং উমা ক্ষুমা।” অতসীর নাম উমা ও ক্ষুমা। ক্ষুমার অংগ হইতে উৎপন্ন বজ্রের নাম কোম। তিন-চারি শত বৎসর কোম অজ্ঞাত হইয়াছে। হিমালয়-দুহিতার নাম উমা ছিল। তিনি কৃষ্ণা ছিলেন, “নীলোৎপলদলজ্জ্বলি।” মৎস্য পুরাণে ও কালিকা পুরাণে বিস্তারিত আছে। বোধ হয় সেই বর্ণহেতু অতসীর এক নাম উমা হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ভিদ উমার কোন প্রয়োগ পাই নাই। অমরকোশে শণ পুষ্পীর এক নাম ঘটারবা। ইহা বন্যবৃক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে নাম বনশণা, বনঝনা বা বুনঝনি। ইহার ফল শন ফুলের তুল্য, উজ্জল পীতবর্ণ। ফল শুটী, পাকিয়া শুখাইলে বাতাসে নড়িয়া বন্‌বন্‌ শব্দ করে। এক কবি খেদ কল্পিতছেন, “স্ববর্ণসদৃশ পুষ্প ফলে রত্ন ভবিষ্যতি। আশ্রয় সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ বনঝনায়তে।” স্ববর্ণ-সদৃশ পুষ্প দেখিয়া মনে হইল ইহার ফল রত্ন হইবে, এই আশায় বৃক্ষটির সেবা করিতে থাকিলাম। কিন্তু ফল স্থপক হইলে বন্‌বন্‌ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই হইল না।

গুনিয়াছি, কোথাও কোথাও শিল্পী দুর্গা প্রতিমাকে চম্পকবর্ণা করেন, ইহা অশাস্ত্রীয়। যিনি অগ্নিবর্ণা, অগ্নি-স্বরূপা, তিনি চম্পকবর্ণা কিছুতেই হইতে পারেন না।

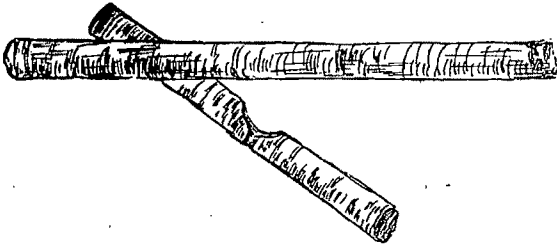
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই ধ্যান অনুসারে সকল মহিষ-মর্দিনী-প্রতিমা নির্মিত হইত না, কিন্তু অল্প লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অরুণি

পরে অরুণি আবশ্যক হইবে। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে অরুণি অজ্ঞাত। এই হেতু অরুণি-নির্মাণ সবিস্তার লিখিতেছি। বহুকালপূর্বে আমি কটকে গণিয়ারি ও অশ্বখের অরুণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। অশ্বখের দুই জাতি আছে। এক জাতির পাতার আকার পানের মত। অগ্রভাগ দীর্ঘ, ইহাই প্রকৃত অশ্বখ। অন্য জাতির পাতা হ্রস্ব, অগ্র দীর্ঘ নয়। ইহার সংস্কৃত নাম অশ্বখী, গজাশ্বখ; বাদলা নাম গয়া-আশুত। দুই অশ্বখই গজদক্ষ, কিন্তু ইহার কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম। এই হেতু গজের আরও প্রিয়। নরম কাঠের অরুণি ভাল হয় না। গণিয়ারি বৃক্ষের সংস্কৃত নাম গণিকারিকা। (অ-গ্নি-কারিকা), অপর নাম অগ্নিমহ, অরুণি, জয়া, জয়ন্তী। অগ্নিমহ চিরহরিৎ ছোট তরু। কাঠ স্নগন্ধ, পাতাও স্নগন্ধ। ডাল সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। আয়ুর্বেদে দশমূল পাচনে ইহার মূল লাগে। ইহা সর্বত্র জন্মে না। বঙ্গদেশের কবিরাজেরা ইহার এক সগোত্র অল্প এক গাছকে গণিয়ারি বলেন। ইহার কাঁটা আছে। গণিকারিকার কাঁটা নাই। অগ্নিমহ হইতে ওড়িয়া নাম অগবথু। বৈজ্ঞানিক নাম *Premna integrifolia*.

ওড়িয়ার বহু স্থান জাঙ্গল, বাঁকুড়ারও অনেক স্থান জাঙ্গল। জাঙ্গল দেশে অরুণি বহু প্রচলিত আছে। অরুণিকে বাঁকুড়ায় ‘আগুন খাড়ি’ অর্থাৎ আগুন কাটি বলে। রাখাল বালকেরা বনের ধারে গরু চরাইতে যায়। আগুন খাড়ি দিয়া আগুন করিয়া ‘চুটি’ (শাল পাতায় জড়ান তাম্বক পাতা) খায়। সাঁওতালেরা আগুন করিতে দক্ষ। অড়হর, বিশেষতঃ টুম্ব (অড়হরের বড় জাত), কুড়চি (সংস্কৃত নাম কুটজ), শাওড়া, আশুত, কদাচিৎ বেল ও বাবলা প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ যে কোন নাতিঘন, নাতিকঠিন, নাতি-কোমল কাঠে অরুণি হইতে পারে।

ইহার নির্মাণক্রম এই। দুইখানি কাঠে অরুণি হয়। একখানি মোটা, অপর খানি আঙ্গুলের তুল্য সরু সোজা, তিন পোয়া লম্বা। মোটা কাঠে একটি অগভীর গর্ত করিয়া, গর্ত হইতে কাঠের পাশ পর্যন্ত একটি ত্রিকোণ নালী কাটিতে হয়। (চিত্র ১০)। এই কাঠের নাম পাতন। পাতনের তলায় শুখা পাতা রাখা হয়। দুই পায়ের আঙ্গুল দিয়া পাতন টিপিয়া ধরিয়া নালী কোলের দিকে রাখিয়া, কাঠখানির মোটা মুখ গর্তে চাপিয়া দুই হাতে



১০। অরুণি

মথিতে হয়। উপর হইতে নীচে হাত চলিতে থাকে। বর্ষণে কাঠের 'ভুরা' (ধূলা) হয়, ভুরায় আগুন ধরে, নালী দিয়া পাতায় পড়ে, পাতা জলিয়া উঠে। দুই মিনিটে আগুন পাওয়া যায়। সরু কাঠটির নাম দাঁড়া। সংস্কৃতে পাতনের নাম অধর-অরুণি (নিম্নস্থ অরুণি), দাঁড়ার নাম উত্তর-অরুণি (উর্ধ্ব-অরুণি), অপর নাম প্রমস্থ। এইটি নর, নীচেরটি নারী। এই দুই নাম সাঁওতালের মুখে ও ওড়িয়ায় শুনিয়াছি। নর-নারীর সংযোগে গর্ভ হয়, গর্ভই অগ্নি। নর-নারী এক গাছের কাঠের না হইয়া দুই গাছের হইতে পারে। ঋগ্বেদে নর-নারীর নাম পিতামাতা, অগ্নি শিশু, কুমার। দুই হাতের দশ অঙ্গুলিকে দশ ভগিনী বলা হইত।

দুই জন লাগিলে পরিশ্রম কম হয়। এক জন প্রমস্থের মাথায় একটা কঠিন কাঠের গর্ত চাপিয়া ধরে। অগ্ন এক জন দোড়ী দিয়া প্রমস্থ এদিক-ওদিক 'দধিমস্থনের মতন টানিতে থাকে। প্রমস্থ মোটা করিতে হয়, মোটা কাঠে আগুন বেশী হয়। বোধ হয় বৈদিককালে অরুণি-নির্মাণ এই পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত "শত পথ ব্রাহ্মণের" বঙ্গানুবাদের পরিশিষ্টে চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন।

আমি পূর্বে বেল কাঠের অরুণি শুনি পাই। বেলকাঠ ঘন ও কঠিন। ইহার অরুণি দ্বারা আগুন করা সোজা মনে হয় নাই। এক ভাঙ্গমাসে স্ত্রধরের ভ্রমরবস্ত্রের লোহার ফলার স্থানে বেলকাঠের সরু ফলা আটিয়া বেলকাঠের পাতনে মথিয়া আগুন পাইয়াছি। দুইটি কাঠই রসা ছিল। বগ্ন বিল ও গ্রাম্য বিল, দুই জাত। বগ্ন বিল পাহাড়ে ও উচ্চ বনভূমিতে জন্মে। পাতা কাটা ও ফল দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। অরুণির পক্ষে ইহার বিশেষ গুণ আছে কিনা দেখা হয় নাই।

ধর্ম ঠাকুরের গাজনে 'গামার কাটা' এক বৃহৎ পর্ব। কেহ ইহার প্রয়োজন জানে না। আমার বোধ হয় অরুণি নির্মাণের নিমিত্ত এই কাঠ খুঁজিতে হয়। গামার সংস্কৃত নাম গম্ভারি। কিন্তু গামার কাঠ হালকা, নরম। ভ্রমর

দ্বারা রসা কাঠে পরীক্ষা করিয়া দেখি, বর্ষণে ও চাপে যুগ্ম স্থান মসৃণ হইয়া গেল, ভুরা বাহির হইল না। তখন অল্প বালি দিতে আগুন বাহির হইল। ধর্মের গাজন গ্রীষ্মকালে হয়। তখন কাঠ শুষ্ক না থাকে, ভুরাও বাহির হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্নিগর্ভা শমী প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শমী কাঠে অগ্নি আছে। ঋগ্বেদে শমীর অরুণির উল্লেখ আছে। শমী বাবলা গাছের তুল্য। (চিত্র ১১)। ইহার কাটা ছোট সোজা শক্ত। এত গাছ থাকিতে ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই কটকী বৃক্ষের অরুণি কেন করিতেন, প্রথমে বুঝিতে



১১। শমী (ব্রহ্মীকৃত)

পারি নাই। পরে জানিয়াছি পঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর অঞ্চলে শমী বৃক্ষ অপরিপুষ্ট। অশ্বখ দুর্লভ, পূর্বকালে অশ্বখ ছিল না। সেখানে অশ্বখ রোপন ও পালন করিতে হয়, যত্নতর আপনি জন্মে না। উর্বশী-পুরুরবা-সংবাদ হইতে জানিতেছি, গন্ধর্বেরা পুরুরবাকে অশ্বখের অরুণি করিতে শিখাইয়াছিল। পুরুরবার দেশ আগ্রা প্রদেশ, পঞ্জাব হইতে পারে না। অথর্ববেদের দেশও সেই দেশ, পঞ্জাব নয়। সে বেদে অশ্বখ বট পকটীর নাম আছে। এই সকল বৃক্ষ পঞ্জাবের নয়, উত্তর ভারতের। বিরটনগরে প্রবেশের পূর্বে পাণ্ডবেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া এক শমীবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। শমীর বাঙ্গালা নাম শাই, বৈজ্ঞানিক নাম Prosopis spicigera.

ভারতের পশ্চিমাধে শমীবৃক্ষ জন্মে। পূর্বাধে কদাচিত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে শমীর অরুণি লিখিত হইয়াছে। অতএব সে পুরাণ ভারতের পশ্চিমাধে কোথাও রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুবৃক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মে। দেবী ভারতের পূর্বাংশে বোধ হয় পার্বত্য প্রদেশে বিল-বাসিনী হইয়াছিলেন। পূজার মন্ত্রেও বিলকে পার্বত্য

আবাস হইতে আসিতে বলা হয়। পশ্চিম ভারতে শমী দেবীর পবিত্র বৃক্ষ। রাজারা নীরাঙ্গন করিবার সময় আবাস হইতে দুই তিন মাইল দূরে রোপিত শমীবৃক্ষের পত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিজয়াদশমীর পর বন্ধু-বর্গের মধ্যে শুভ কামনায় শমী পত্রের আদানপ্রদান রীতি আছে। এক বিজয়াদশমীর পরে আমার এক মরাসী বন্ধুকে পত্রে তাহার বিজয় কামনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি পত্রের উপরিভাগে কুকুমলিপ্ত একটি ছোট পাতা পাঠাইয়াছিলেন। সে পাতা স্বেত কাঞ্চনের। তিনি শমী পাতা পান নাই। সেই পাতা শমীর প্রতিনিধি হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে শমী দুর্লভ। বাঁকুড়ায় শমীবৃক্ষ আছে কিনা অল্পসন্ধান করিয়াছিলাম। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উৎসাহী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিমিত্ত শমীবৃক্ষ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই নগর হইতে ৬৭ মাইল দূরে ঈশান কোণে নড়রা নামে গ্রাম আছে। তাহার নিকটবর্তী শিবরামপুর গ্রামে দুইটি শমীবৃক্ষ আছে। দৈবজ্ঞেরা পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহারা বলেন যজ্ঞকালে শমীর অরণি আবশ্যক হয়। বাঁকুড়া জেলায় আরও অনেক স্থানে শমীবৃক্ষ আছে। ইন্দপুর থানার অন্তর্গত শানডিহা গ্রামে গণকেরা দুইটি বৃক্ষ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহারা বলেন, হোমে শমীকাষ্ঠ আবশ্যক হয়। দেখা যাইতেছে, গ্রাহ্যার্থেরাই প্রাচীন স্মৃতি পালন করিয়া আসিতেছেন। ইঞ্জিনিয়ার আমাকে শমীর ডাল আনিয়া দিয়াছিলেন। এক সাঁওতালকে সেই কাঠের অরণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দিয়াছিলাম। আগুন

বাহির করিতে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অশ্বখের অরণিতে অজ্ঞায়াসে আগুন বাহির হয়। তথাপি ঋগ্বেদের কাল হইতে শমীর অরণি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, শমী-গর্ভ শব্দের অর্থও অগ্নি হইয়া গিয়াছে। শমী-গর্ভ অশ্বখ, যে অশ্বখে অগ্নি আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতী দিয়াশলাই তুষ্পাপ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ চকুমকি পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু ইম্পাতও তুমুল্য। তখন মনে হইয়াছিল, অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদন করিতে হইবে। উদ্যোগী বণিক ভ্রমর-অরণি নির্মাণ করিয়া দিয়াশলাইর অভাব পূরণ করিবেন, আমাদের পূর্বকালের অবস্থা হইবে। সভ্যতায় লোকে পরবশ হয়, অরণি দ্বারা আত্মবশ হইতে পারিবে। অশ্বখ-বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কেন পুণ্য কর্ম, এখন বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রামে কত ঘর বাস করে, কত অরণি চাই। এই হেতু অশ্বখবৃক্ষ কাটিতে ও পোড়াইতে নাই, শুধুনা ডাল কাটিতে দোষ নাই।*

* দুর্গোৎসবের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে ১১খানি চিত্র মুদ্রিত হইল। নবম চিত্র প্রবাসী প্রেস দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১০ খানি চিত্র বাঁকুড়া কেন্দ্রীপ—চলিত নাম কেন্দ্রুভি—; নিবাসী বালক ক্রীধরীকুমার ভট্টাচার্য লিখিয়াছে। কয়েকখানি দুর্গাপ্রতিমার চিত্র “অমৃতবাজার পত্রিকা”র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্র দৃষ্টে প্রতিলিখিত হইয়াছে। পত্রিকায় সালের উল্লেখ ছিল না, আমি লিখিয়া রাখি নাই। বোধ হয় ১৯৩৬—১৯৪০ সালের মধ্যে এক সংখ্যায় ছিল। লেখকের নামও ছিল না। বোধ হয় তিনি পুরাতত্ত্ববিদ্যা বিভাগে কর্ম করিতেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জমির সার সংরক্ষণের সাম্প্রতিক পদ্ধতি

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

বিগত কয়েক বৎসর ধাবৎ ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বোয়াই এবং পঙ্খাব প্রদেশে, জমির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সার-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক জমির সারের অপচয় নিবারণের জন্ত প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এই দিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্রে কি ধরণের কাজ হইতেছে তাহা জানিবার জন্ত ভারতের কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তিদের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, গবাদি পশুর উপযুক্ত পরিচর্যা এবং সার-সংরক্ষণ এই তিনটির সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইওবা ষ্টেটের পশ্চিম অঞ্চলস্থ বহু কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষতা এবং উৎপাদিকা শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আইওবা ষ্টেটে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের অগ্রণী হইতেছেন মিঃ জেনসেন। এই প্রণালীতে কর্তৃত ক্ষেত্রগুলি উপরে উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া এবং সেগুলির চতুষ্পার্শ্বে ঘাসের উপর দিয়া জলধারা প্রবাহিত। এই বাঁধের দরুন ক্ষেত্র হইতে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না, এবং সারও সংরক্ষিত হয়। কেহ এই ধরণের কৃষিপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করিলে ইয়ং হাসিয়া মিঃ জেনসেন জবাব দেন—“এর চাইতে উন্নত ধরণের কৃষির কথা আমি তো কল্পনাও করিতে পারি না।”

অভূবনের সওয়া দুই মাইল দূরে জেনসেনের স্মৃদ্রপ্রসারী কৃষিক্ষেত্র অবস্থিত। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে গিয়া তিনি চাষ-

আবাদের স্থচনা করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জমির সার-সংরক্ষণ সম্বন্ধে দীর্ঘকালের এক পরিকল্পনা লইয়া কর্ত্তে প্রেরিত হন। তাঁহার পরিকল্পনা যে কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ কৃষিক্ষেত্র হইতে আগে যে স্থলে ৭৫ বুশেল শস্ত এবং ৪৫ বুশেল ওট পাওয়া যাইত সেই স্থলে আজ ১০০ বুশেল শস্ত এবং প্রায় সমপরিমাণ ওট উৎপন্ন হইতেছে।

জেনসেন যে নিজে কৃষিকার্য্যের কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তবে তিনি এতদূর সাফল্যকাম হইলেন কিসে? একবার উত্তর এই যে, পূর্বাভিজ্ঞত পদ্ধতিগুলিকেই কার্য্যক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ করিয়া তিনি জমির উৎপাদিকা-শক্তি চূড়ান্তভাবে বাড়াইতে এবং সার-সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কৃষিকর্ম্মের পদ্ধতি হইল নিম্নলিখিতরূপ : প্রথমতঃ পাহাড়ের চূড়ার অথবা চূড়ার নিকটে গড়ানে জায়গাগুলিতে উঁচু মাটির টিবি তৈরি করা হয়। ইহাতে পর্ব্বতগাত্র অনেকটা সমতলাকার হওয়ায় জমির সার পাহাড়েই সংরক্ষিত হয়, পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নীচে চূঁয়াইয়া যাইতে পারে না, উপরন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল ক্ষেত্রে জমা হওয়ায় ফসলের পরিপুষ্টি ও পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা হয়। পর্ব্বতগাত্রই এই ধরণের নমুনা ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দুই মাইল।

যে জলধারা উপচাইয়া পড়ে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত করাইবার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো জায়গায় জলনালী কাটিয়া দেওয়া হয়। এই জলধারা নিম্নতম সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে গিয়া পতিত হয়। জমির সার যাহাতে বহির্গত না হইতে পারে সেই জন্ত এই সমস্ত জলনালীতে প্রচুর পরিমাণে ঘন-

সন্নিবিষ্ট ভাবে ঘাসের চাষ করা হয়। জলনালীগুলি ষোল হইতে পঁচিশ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া। জেনসেন শস্তক্ষেত্র এবং ওটক্ষেতের উভয় প্রান্ত-সীমায় ষোল ফিট চওড়া এক এক ফালি জমিতে ঘাস লাগাইয়া থাকেন। ফলে ক্ষেত্রপার্শ্বই যে সমস্ত জায়গা বে-ফায়দা পড়িয়া থাকিত গবাদি পশু আজ সেখানে চরিয়া খায়। এই সমস্ত পশুদের চারণ-ক্ষেত্রের পরিমাণ পনর হইতে আঠার একর। এই তৃণক্ষেত্র হইতেও তাঁহার লাভ হয় প্রচুর। জমির সার আটকাইয়া রাখিবার জন্ত আলফালফা নামক শস্তের সঙ্গে ব্রোম নামক এক জাতীয় ঘাসও লাগানো হয়।

ঘাস শস্ত এবং ওট প্রভৃতি কাটা হইলে পর জেনসেন তাঁর গরু-বাছুর এবং শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুকে ক্ষেত সাফ করিবার কাজে লাগাইয়া দেন। যন্ত্রের সাহায্যে যে সমস্ত গাছের শিকড় উৎপাটিত করা যায় না এই উপায়ে তাহা নিশ্চুল হইয়া যায়।

বিগত চার বৎসর যাবৎ জেনসেন আইওবা ষ্টেটের 'জমির 'সার-সংরক্ষণ' সমিতির সভাপদে নিযুক্ত আছেন। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে আইওবা ষ্টেটের উৎকৃষ্ট জমিতে ফলন আরও অনেক বেশী হইবে। আইওবাতে প্রযুক্ত এই সমস্ত আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্ম্ম যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তার একটি প্রমাণ এই যে, সরকারী হিসাবমতে উক্ত ষ্টেটের এ বছরকার উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ৭০০,০০০,০০০ বুশেল—প্রত্যেক একরে ৬১ বুশেল করিয়া শস্ত জন্মিয়াছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রে শস্ত-উৎপাদন-ক্ষেত্রে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

যোগাযোগ

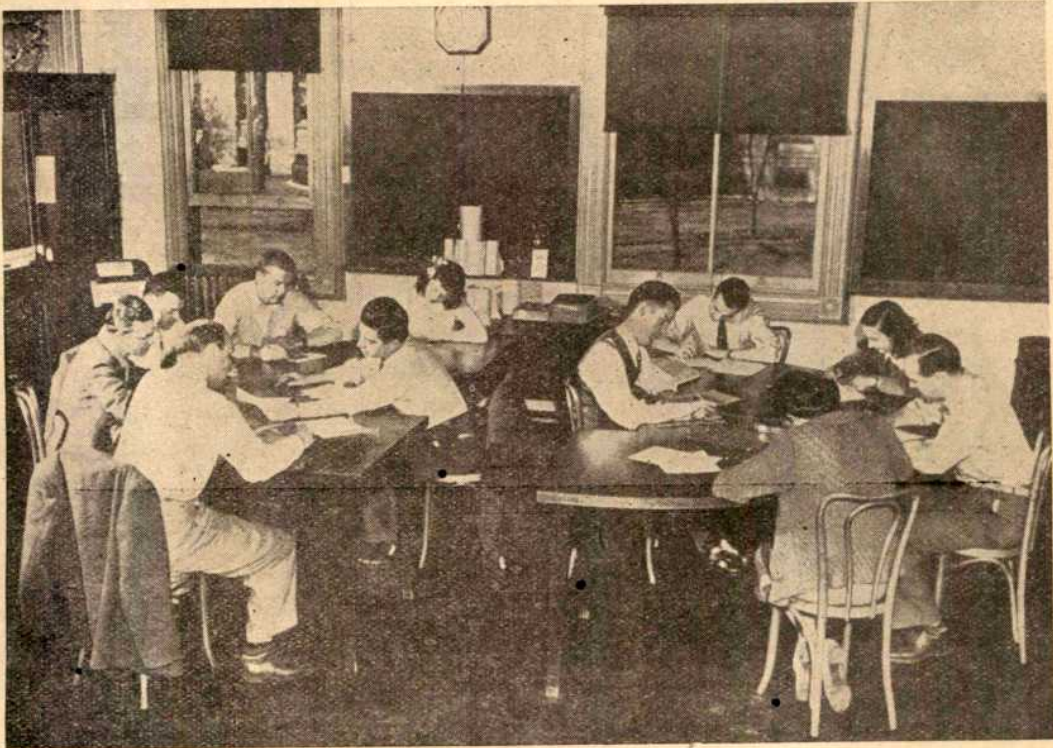
এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

জানি তার অন্ত নাই যে আনন্দ উচ্ছলিত রসে ;
শত বর্গ গন্ধ গানে ছঃখ-স্বপ্নে বরষে বরষে
প্রত্যহর পরিপূর্ণ মুখরিত পলকের দল,
আমার ভাবনামাণি নিত্য রাত্রে করেছে চঞ্চল।
একান্ত একেলা রসি-বাতায়নে কান পেতে রাধি
কে বা আসে কে বা যায়—ডাকে কোন্ নিশাচর পাখী ;
ফুলে ফলে অগণন গগনের স্তম্ভ তারাদলে,
বিচিত্র তরুর বৃকে নিত্য নব প্রসাধন চলে
পুরাতন ধরণীর ; ফুল ফোটে, ঝরে যায় পুন,
বর্ষা আসে-পুষ্পগুচ্ছে মঞ্জুরিয়া, মন্দির ফাঙনও
ফিরে চলে যায় কোথা। ধরণীর নিত্য আবর্তন—
জীবনের পূর্ণ করে জন্ম আর মধুর মরণ।

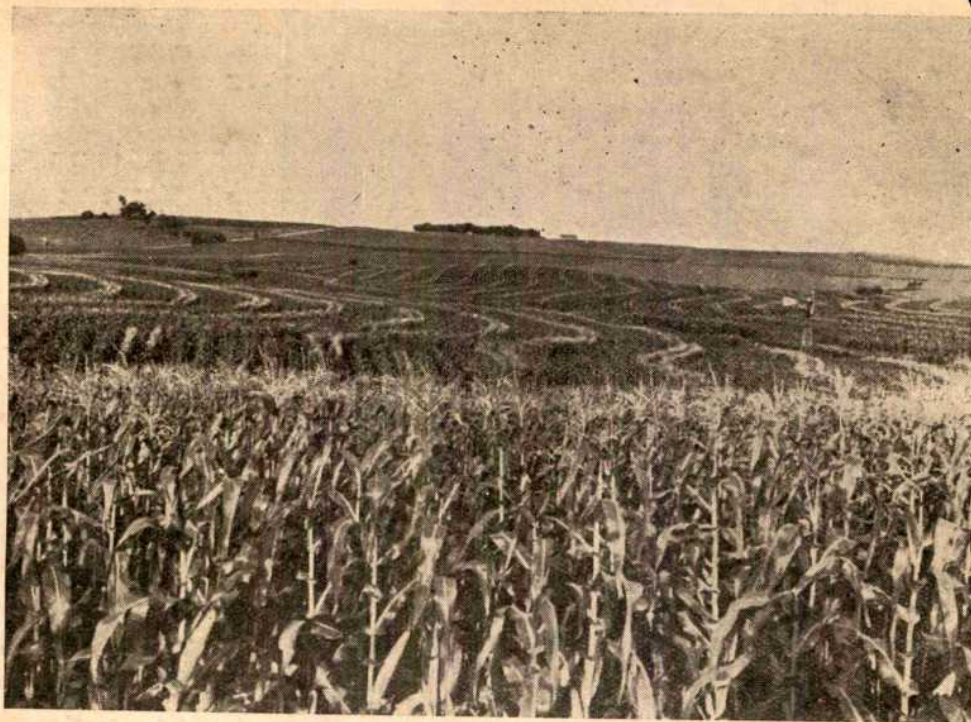
ওই মাধবীর লতা, অঙ্গনের প্রান্তে গাঁদা ফুল
ধরণীর ধূলিরাশি-মুক্তিকারে করিয়া আঁকুল
ছলিছে আলমুত্তরে—রজনীগন্ধার গুচ্ছ সবে
মেলিয়াছে উর্ধ্বে তার প্রাণশিখা বিপুল গৌরবে ;
কত রূপে কত রসে কোন্ অতি-মানসের লীলা
প্রকাশ করিছে রিখ—সাগরের মুক্তামণিনীলা
আর তুচ্ছ তৃণদল। পরিপূর্ণ আমার চেতন
অনুভব করে তার নিত্য চলা, নিত্য আগমন।
বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে অন্তহীন কল্পনার তাঁর
আমাদের রয়েছে স্থান যোগাযোগ আনন্দ বিহার ;
আমাদের বীণার তারে সুরের রাগী বাজে ফণে
জীবনের গুহাতলে—কোলাহল তন্ময় জাগরণে।



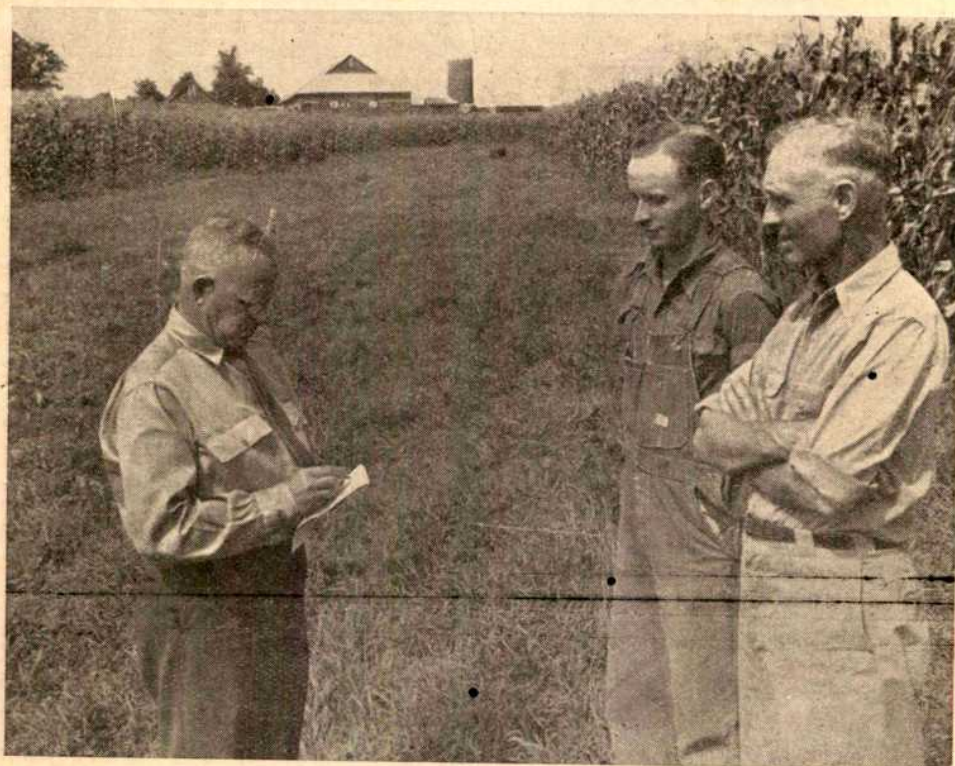
প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-সজ্জার অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ।
 পৰিষ্ট (বাম হইতে) : ডাঃ ভাবা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ। দণ্ডায়মান : কে.জি. দৈয়িদাইন, রাজকুমারী অমৃত কাউর, সার জন সার্জেণ্ট



ইলিনয়সের 'মেডিকেল স্কুল অব জার্নালিজম'ের ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শিক্ষাদান



যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক পদ্ধতির কৃষিক্ষেত্রে 'জেনসেন ফার্মে'র একটি দৃশ্য



আইওবা স্টেটেব অডুবনের নিকটবর্তী কৃষিক্ষেত্রে সার-সংরক্ষণ এজেন্ট জে. এইচ. লেন্টিনার (বামে)
ও 'জেনসেন ফার্মে'র মালিক মিঃ জেনসেন

কৃত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

স্টেশন হইতে বাড়ি পাকা তিন মাইল পথ। রাত্তি পাকা হইলেও—এক যুগ অ-মেরামতিতে—চলিবার কালে মানুষকে পিছনেই ঠেলিতে থাকে; অন্ধকার রাত্রিতে হোঁচট খাওয়া তো অত্যন্ত মূল্য ব্যাপার। আগে আগে শনিবারের দিন কলিকাতা হইতে একখানি পেঞ্চাল ট্রেন ছাড়িত বেলা সাড়ে তিনটায়, দুইয়ের তৃতীয় বার্ষিকে সেটা বন্ধ হইয়াছে। এখন সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ছাড়া পত্যন্তর নাই। রাত আটটার কম সে ট্রেন স্টেশনে আসে না। পথের দুর্দশার কথা ভাবিয়া ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারের পরসা দিতেই হয়। প্রত্যেক শনিবারে বিজয় শেয়ারের গাড়িতে বাড়ি আসে—সেই জুজ গাড়োয়ানরা তাকে খাতির করে বেশী। যারা গাড়ি চড়ে না, অন্ধকারে ওই দুর্গম পথ হাঁটিয়াই পার হয়—তাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় গাড়োয়ানরা নিজেদের গাড়িগুলিকে বেশী জোরে হাঁকাইয়া প্রচুর-খুলা উড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠে। যারা অগ্নিসে চাকরি করে অথচ গাড়ি ভাড়া দিবার প্রবৃত্তি নাই—তাদের উপেক্ষা বা ক্ষম করার ঐ একটি মাত্র উপায়ই ওরা জানে। বিজয়কে ওরা খাতির করে। বাড়ির দুয়ারে গাড়ি থাকিলে মণিবাগ বাহির করিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিলে বিজয়কে ওরা সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া যায়। এই সম্মানটুকু পাইয়া বিজয় মনে মনে খুশি হয়।

এক শনিবার বিজয়ের খুশির পরিমাণ কুল ছাপাইয়া গেল। সেদিন শশী গাড়োয়ান ভাড়া তো লইলই না—উপরন্তু একখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—এটা রোশ দিন বাবু, কাল দুপুরে আসবো আপনার কাছে—পরামর্শ আছে।

বিজয়ের আনন্দ হইবারই কথা। শুধু বিশ্বাস নহে, পরামর্শ লইবে বলিয়াছে। যারা ঘোড়ার গাড়ি চালায় তাদের ভাল রকমেই জানে ও। পাঁচ শা'র ভাড়িখানাটা ঠিকিয়া আছে ওই গাড়োয়ান কয়জনের দৌলতেই। সকালে দুপুরে সম্ভ্যর বা রাত্রিতে অবসর পাইলেই ওরা দোকানে গিয়া তাড়ি গিলিবেই। কাঁচা গরুরা রোজগার,—হিসাব নিকাশের বুলাই নাই। গাড়ির মালিক কিছু গাড়োয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে পারেন না সারাদিন। রোজ বরাদ্দ কোনদিন কোনদিন ওরা মালিকের হাতে কিছু দেয়, কোনদিন দেয় না, তাড়ির দোকানে চলে। মিথ্যা বলিতে ওদের একটুও বাধে না। নিজের সংসারে ওদের অভাব লাগিয়াই আছে। চাল জুটিল তো পরণের কাপড় জোটে না; বাড়ি ধর-দুয়ার অধিকাংশেরই নাই। গাড়ি ঘোড়া বা খাটুনি কোনটাই নিজের সংস্থানকে বাড়াই না, মালিককেও যে সম্বর্ধ করে এমন নয়। সস্তা

নেশায়—তাড়িতে গাঁজাতে আর জুয়াখেলায় সর্ব্বর উড়াইয়া দিয়া ছন্নছাড়া জীবনযাপন করাতেই ওদের আনন্দ।

রাত্রিতে শুইয়া বিজয় ভাবিল, এমনই উন্মাদগামী একটি জীবনকে যদি সং উপদেশ দিয়া ও সুপরিচালিত করিয়া ভ্রম গ্রহণে পরিবর্তিত করা যায়—তার চেয়ে বেশী আমন্দ আর কিই বা লাভ হইবে। সে প্রতিজ্ঞা করিল, শশীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে।

দুপুরবেলায় শশী আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া মেঝের উপর বসিল। অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত ছোঁড় করিয়া কহিল, বাবু আমার একটা গতি করে দিন, না হলে পরের গাড়ি ভাড়া নিয়ে কতকাল আর কাটািব। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল—ওর নিয়ে দিতে হবে।

বিজয় বলিল, তোমরা তো উপায় মন্দ কর না শুনি—মালিকের পাওনা মিটিয়ে কিছু জমে না কেন?

শশী বলিল, কি করে জমবে হুজুর, ভাড়া আমার জুটুক না জুটুক মালিককে দৈনিক দিতে হয় দু'টাকা। একটা সন্দিগ্ধ ঘোড়া ডলাই মলাই করে, মাঠ থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে আসে, তাকে দিতে হয় দৈনিক দশ আনা খাওয়া-পরা ইন্তক। তার পর ছোটো ঘোড়ার ছোলা লাগে আট দশ-সের। ঘোল টাকা ছোলার মণ। তারপর আজ টায়ার ছিঁড়ছে—কাল চাকা ভাঙছে, এসব তো আছেই। আগে ভাল রবার পাওয়া যেত—এক পাট রবারে ছ'মাস চলতো। তা' ছাড়া রাস্তা ছিল ভাল। আজ কাল খোয়া ওঠা রাস্তায় বাজে টায়ার পনের দ্বিগুণ যেতে না যেতে—ব্যস। দাম আগেকার চারগুণ। তারপর মিনসিপালির আইনে ফাইন তো লেগেই আছে।

বিজয় বলিল, ফাইন দাও কেন—যা নিয়ম সেই রকম লোক নিলে ত হাদ্যামা থাকে না।

শশী হাসিয়া বলিল, তা'হলে আমাদের পোষাবে কেন বাবু। এই বলে পুলিশের হাত তেলা করে ফাইন দিয়ে গাড়ি প্রতি তিন টাকা থাকে। দিনে চারটে ক্ষেপে—গড়পড়তা দশটা টাকা—

অব তোমাদের টাকা জমে না কেন?

অজ্ঞে—খেতে যে পরিবার, ছেলেপিলে নিয়ে দশটি প্রাণী। ধরুন চালের দাম—কাপড়ের দাম...

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, আর তাড়িও ত যথেষ্ট গেল।

শশী মাথা নামাইয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে যা মেহন্নত হয়—তাতে একটু-আধটু নেশা না করলে খাটতে পারব কেন বাবু।

একটু-আধটু ? শুনেছি যতবার স্টেশন থেকে ফেপ মার...

শশী নত মস্তকেই প্রতিবাদ করিল, না বাবু, এই উপাঞ্জন এর মধ্যে যত খুশি খেলেই হ'ল। তাড়ির দাম তাই বলে এক গেলাস..., এ প্রসঙ্গ অশোভন বলিয়াই সে সহসা চূপ করিল। খানিক মেঝেতে আঙুল দিয়া আঁক কাটতে কাটতে বলিল, নেশা খারাপ জিনিষ—খুবই খারাপ। তাই ত ভাবলাম—আপনাদের ছিচরণে উপাঞ্জনের টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি হব। আমার গোছগাছ করে দিন বাবু।

এই কথায় বিজয় বিগলিত হইল। নিজেকে এক জন সংস্কারক মনে করিয়া কহিল, পারি তোমায় মাহুষ ক'রে দিতে—যদি আমার কথা শোন।

আলবৎ শুনব বাবু। না শুনি তো আপনি আমার কান ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারবেন গালে। আমার পাঁচ জনের সামনে...

আচ্ছা। প্রত্যেক সপ্তাহে যখন বাড়ি আসব—আমাকে অন্তত দশটা করে টাকা দেবে—অবশ্য তোমার সংসার খরচ বাদে। ওই টাকা আমি পোষ্ট আপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখব। যখন গাড়ি মেরামতির দরকার হবে নেবে তাই থেকে।

সে ত উত্তম কথা বাবু। কিন্তু নিজের গাড়ি না হলে কাজে ক'র্তি হবে কেন বাবু। আপনি আমায় একখানা গাড়ি ক'রে দিন।

দেব। এই ভাবে টাকা জমলে তিন মাসে তোর গাড়ি-ঘোড়া সব হবে।

শশী মেঝের সটান শুইয়া পড়িয়া ভক্তি গদগদচিত্তে বিজয়ের পা ছুইয়া বলিল, গরীবের ওপর একটু নেকমজর রাখবেন বাবু।

শশী গমনোত্তত হইতেই বিজয় বলিল, আর শোন—মদ খাওয়া তোমায় ছাড়তে হবে। না হ'লে তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

শশী এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পর আবার সটান শুইয়া পড়িল মেঝের। বিজয়ের মানা সত্ত্বেও তাহার পা খাবলাইয়া বলিল, এই পিতিজ্ঞে করলাম আজ থেকে নেশা আমার হারাম। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছ'টা কান মলিয়া গট্গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেলে।

শশী চলিয়া গেলে বিজয়ের মা ধরে ঢুকিয়া বলিলেন, শশেটা আজও মাতাল হয়ে এসেছিল বুঝি ?

না মা—ওর মতি ফিরেছে। ও জীবনে আর মদ খাবে না প্রতিজ্ঞা করলে—আর দশটা টাকা আমার কাছে জমা রাখলে।

বিজয়ের মা বলিলেন, ওদের আবার প্রতিজ্ঞা—তুইও যেমন। আজেক দিন বউটাকে বেঁচে দেয় না, মারে। কালও বউটা আমাদের বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে গেল।

আচ্ছা দেখ মা—ওকে আমি শুধরে তুলবই।

মা হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ, এখন খাবি আর।

৩

পরের শনিবারে শশী বিজয়ের হাতে দশ টাকা দিল। তারপরের সপ্তাহে সাত টাকা।

বিজয় বলিল, এবার সাত টাকা যে ? আবার বুঝি...

কান মলিয়া শশী বলিল, আপনার পা ছুইয়ে পিতিজ্ঞে করছি বাবু—মদ হারাম। এবার উপাঞ্জন কম হয় নি, তবে হঠাৎ মফস্বলে বিয়ের বাসনা নিয়ে—মেঠো পথে গাড়ির ইম্পিরিং গেল ভেঙ্গে। আপনাকে শনিবার ছাড়া তো পাব না—তাই মেরামত করিয়ে নিয়েছি পরশু।

বিজয় খুশি হইয়া কহিল, বেশ।

শশী হাত জোড় করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আর বুঝি সব্বশ্য যায় বাবু। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস করে মরতে হয়।

কেন—কেন ?

মহাজন কড়া তাগাদা দিয়াছে—পরশু থেকে গাড়ি কেড়ে নেবে।

কেন—রোজকের রোজ ভাড়া দিস না বুঝি ?

দিচ্ছি তো বাবু। কিন্তু আগেকার পাওনা ওর পেরায়-পকাশ টাকা—তারই জন্তে গাড়ি কেড়ে নেবার ভয় দেখায়।

তা আগের এত পাওনা হ'ল কি করে ?

শশী মাথা নামাইয়া বলিল, আগে তো আমার চরিত্রের ভাল ছিল না—নেশাটা ভাদ্ টা অমজল করেছি—তারই দরুন, বলিয়া সে বিজয়ের পায়ের উপর পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিজয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিল, আঃ—কাঁদিস কেন ? কি করতে হবে—তাই বল।

শশী বলিল, আমায় একখানা গাড়ি কিনে দিয়ে বাঁচান।

বিজয় বলিল, তা গাড়ি কেনবার এত টাকা কোথায় ? মোটে তো সাতাশটা টাকা—

আপনি কিছু দিন বাবু—না হ'লে আমার—

আমি ! বিজয় চমকাইয়া উঠিল।

হাঁ বাবু। ছ' মাসে আপনার দেনা যদি শোধ না করতে পারি তো—আমায় জুতোপেটা করবেন বাবু। আমার কান কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাবু।

অবশ্য এই কঠিন শপথে আবশ্য হইয়া নহে—পরোপকার প্ররুতির প্রাবল্যে বিজয়ের মনও অল্পে অল্পে দ্রব হইতেছিল।

শশী আড়চোখে বিজয়ের অস্থূল মুখভাব পাঠ করিয়া কহিল, বিখাস আমায় করবেন না বাবু। গাড়ি ঘোড়া সবই আপনার নামে রাখুন। যেমন হস্তায় হস্তায় আপনাকে টাকা দিচ্ছি—ভেমনি দিয়ে যাব। আপনাদের দ্বায়ে দরকারে গাড়ি ভাড়াটাও লাগবে না—আর আমার পরিবারও রক্ষে হবে।

তাহার অশ্রুজল অহুময় ও প্রতিশ্রুতি আরও কিছুক্ষণ চলার পর বিজয় বলিল, আচ্ছা—আসছে সপ্তাহে যা হয় বলব। শশী ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

৪

তিন দফায় টাকা পাইয়া শশীর উপর বিজয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। শশী এবার ঠেকিয়া শিখিয়াছে। যৌবনের উদ্দাম আনন্দে নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট করা ওদের জন্মগত স্বভাব। দুর্বলচিত্ত শশীও তার প্রভাব কাটাতে পারে নাই। আজ সে উদ্দামতা ওর নাই। ক্রম-বর্দ্ধমান সংসারের চাপে এবং রক্ত গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এমনটা না হওয়াই বরং আশ্চর্যের। শশীর মনে সংসারের অভিযোগ ও আঘাত লাগিয়া এই পরিবর্তন হয়ত কিছুদিন হইতেই শুরু হইয়াছিল। তবু অভ্যাসবশতঃ নেশাটা সে ছাড়িতে পারে নাই। বিজয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ওর চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে এবং বিজয়ের পা ছুঁইয়া শপথ করার পর হইতেই ও সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়াছে। নেশার ঝোক থাকিলে তিন দফায় এই ক'টি টাকা কখনই শশী বিজয়ের কাছে গচ্ছিত রাখিতে পারিত না। বিজয় সন্তুষ্ট করিল, শশীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

এই চিন্তার তলায় আর একটি স্বপ্ন চিন্তার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল—সেটিও বিজয়কে খুশির স্বর্গে তুলিয়া দিল। নিজের নামে গাড়ি থাকিবে, যখন ইচ্ছা নিজেদের প্রয়োজনে এখানে ওখানে যাওয়া চলিবে, আর প্রতি শনিবার স্টেশন হইতে বাড়ি আসার জন্ত কাহারও ধোসামোদ করিতে হইবে না, যত ইচ্ছা মাল লইতে পারিবে—যে ক'জন বন্ধুকে খুশি গাড়িতে তুলিতে পারিবে। নিজের একখানি গাড়ি থাকা কম গৌরবের নহে।

সে স্থির করিল গাড়ি কিনিবার জন্ত বাকী টাকাটা শশীকে দিবে। দিতে যখন হইবেই তখন মিছামিছি বিলম্ব করিয়া লাভ কি?

ছুই—এক জন বন্ধুকে সঙ্কল্পের কথা জানাইতেই তাহার আনন্দে পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, বেশ ত, আমাদেরও এক-এক দিন গাড়ি চড়া হবে। গাড়ির লাইসেন্স তোমার নামে থাকবে—আর ও যখন শুধরেছে তখন টাকাটাও চটপট শোধ হয়ে যাবে। খুব ভাল কাজ করলি বিজু, একটা পরিবারকে এ ভাবে বাঁচানো—সত্যি খুব ভাল কাজ।

বিজয়ের জী বলিল, গাড়িখানা কার নামে থাকবে?

মনে করছি তোমার নামেই রাখব।

জী মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিল, শশীকে বলে দিমা কি হুগায় এই বুধ বিয়দ্বারের আমাদের যেন টকি দেখিয়ে আনেন। আর মাঝে মাঝে গঙ্গান্নান করব।

বেশ ত, গাড়ি হ'লে সবই হবে।

মাও আনন্দিত হইয়া বলিলেন, অনেকদিন বাবলার পাট

দেখা হয়নি—আর একদিন বাগাঁচড়ায় মা বাকুদেবীর মানত শোধ করতে যাব।

বেশ ত।

হাঁরে—ফুলে নবলা অবধি গাড়ি যদি যায় ত এবার কুড়ি-বাসের মেলায় নিয়ে যাস আমাদের।

সবই হবে—গাড়ি আমাদেরই থাকবে। যে ক'দিন দেনা শোধ না হয়—যেখানে ইচ্ছে যাবে।

একা বিজয়ের নয়—সকলেরই কল্লনায় অল্প-বিস্তর রং ধরিল।

৫

পরের শনিবার স্টেশনের পথের ধূলার উপর শশী বিজয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—আরও কয়েকজন গাড়োয়ান আসিয়া বিজয়ের পায়ের ধূলা লইল।

কেহ বলিল, বড়বাবু আপনার নাম আমরা যত দিন বেঁচে থাকব করব। শশেটাকে আপনি ছেলের মত মানুষ করে দিলেন।

কেহ বলিল, আমাদেরও একটা গতি করে দিতে হবে আপনাকে। রোজ রোজ পুলিশের হাঙ্গামা, বড়লোকের জুলুম—কম ভাড়া দেওয়া এ সবের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। আপনাকে পিসিডেন হতে হবে।

রহমৎ বলিয়া একজন গাড়োয়ান শশীর কাঁধে হাতা দিয়া কহিল, সে শালা—ভাল করে বাবুর পায়ের ধূলা সে। তোর জন্তে বাবু যা করল।

আত্মপ্রসাদে ক্ষীত হইয়া বিজয় বাড়ি পৌছিল।

পরদিন সকালে শশী আসিয়া বলিল, গাড়ি এনেছি বাবু—আপনাকে একটু কষ্ট করে গোপালপুর যেতে হবে—না হ'লে গাড়িখানা বিক্রী হয়ে যাবে।

কত দর ঠিক করলি?

দেড় শ'র কমে ছাড়তে চান না বাবু—আপনি যদি বলে কয়ে কিছু কমাতে পারেন।

মাস কাবারের পুরা মাহিনার টাকাটা হাতে লইয়া বিজয় গাড়িতে গিয়া উঠিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সে ফিরিলে জী বলিল, হাঁ গা—গাড়ি কেনা হ'ল?

বিজয় হাসিমুখে বলিল, হাঁ—হুগা বলে বেরিয়েছি যখন—না কিনে কি ফিরি।

বেশ হয়েছে—মা সিন্ধুগরীর পুজো পাঠিয়ে দিই গে।

বিজয় বলিল, শশী বলছিল—আজ বিকেলে তোমাদের সিনেমা দেখিয়ে আনবে। যাবে?

যাব না আবার—কি যে বল! আনন্দে পাক খাইয়া বউ বাহির হইয়া গেল। পরমুহুর্তে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাড়ার ছ-এক জনকে নিয়ে যাব কিন্তু।

বন্ধু সনৎ বলিল, তুমি এখন একজন বিগম্যান বিজয়—
খাইয়ে দাও আমাদের।

বিজয় হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, যাঃ—কি যে বলিল।

পঞ্চ দিয়া চলিবার কালে দোকানী বলে, বাবু—এই বার
মানিয়েছে আপনাকে। গাড়ি না হলে চাকরি করে লাভ কি।

অথ গাড়োয়ানরা সেলাম করে—কেহ কেহ কোচবান্দ
হইতে নামিয়া পায়ের ধুলাও লয়।

পাড়াতেও সকলে আমদপ্রকাশ করিয়াছে, তবে আনন্দের
তলায় ইঁদায় ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়।

অ হবে বৈকি গাড়ি—চাকরির পয়সা, উপরিও ত আছে।

যখন হয় এমনই হয়—গাড়িটার একটা আয় টাডাল।

দেখেছে আজকাল বাজার করে আনে তাও গাড়ি চড়ে।
পয়সা ত লাগে না।

মেয়েরাও বলে, বউয়ের ত গরবে পা পড়ে না মাটিতে।
গাড়ি মেরে পদ্মান। কালে কালে কতই দেখব।

প্রকাশে সকলেই বিজয়ের খাতির করিয়া চলে। সামান্য
কাজের এই অসামান্য ফল লাভে বিজয়ও যথেষ্ট ক্ষীত
হইরাছে। সেও বুঝিয়াছে—যার মহিমাই মানুষ মুখে প্রচার
করুক অন্তরে অন্তরে সে ঐশ্ব্যের ভক্ত। শ্রদ্ধা সম্মান ভাল-
বাসা—এ সবেরই নিরিখ টাকা।

৬ •

এমনই ক্ষীত জোয়ারের জলে পরিবারবর্গসহ বিজয় ভাসিতে
লাগিল। ধনগর্ব ঠিক নহে—অথচ গাড়িতে চাপিলেই মনে
হয় এ গাড়িখানি আমার। এখানি যেখানে যতক্ষণ ধুশি
ব্যবহার করিতে পারি। ভাড়া লইয়া কেহ বচসা করিবে না
—টাকার হিসাব করিয়া মনও সন্তুষ্ট হইবে না। আর পঞ্চ
দিশা চলিবার কালে ছ'পাশের লোকের বিষয় ভক্তি হুড়াইয়া
পাওয়া, সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা। বিজয় যে একজন
ছদ্মছাড়া হস্তভাগ্যকে পরিবারবর্গসহ সর্বনাশের মুখ হইতে
রক্ষা করিয়াছে—এই সাধুবাদই কি ওই নীরব ভক্তি বিষয়
মাধানো দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠে না সর্বক্ষণ? এর চেয়ে বড়
পুরস্কার মানুষের জীবনে কিই-বা আছে।

মাস দুই পরে একদিন সনৎ বলিল, ওহে খুব ত নাম বার
করেছ চার দিকে—গাড়ির হিসেব-পত্তর কিছু রাখছ?

বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, গাড়ির আবার হিসেব-পত্তর কি?

সনৎ হাসিয়া বলিল, অবশ্য পরোপকার-প্ররুতি ভাল।
তবে আমার যেন মনে হচ্ছে মাস মাস টাকা দিয়ে শশী
তোমার ধার শোধ করবে। তুল শুনেছিলাম কি?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ঠিক বলেছ ভাই, গাড়িখানা
কিনে মেরামত করতেও কিছু খরচ ইয়েছে ওর—তাই টাকা
চাই নি।

সনৎ বলিল, ভাল কর নি। রাশ আলগা দিলে ছুই বোড়া
ঠিক পথে চলে না—একটু হ'ল রেখ।

সোমবারে কলিকাতা যাইবার মুখে বিজয় শশীকে বলিল,
হাঁ রে ছ'মাস হ'ল আমার ত কিছু দিলি নে। দেনা শোধ
করবি কি করে?

শশী বলিল, তাবছেন কেন বাবু—চোত মাসে ভাড়া মন্দা
চলে, আনুক বোশেখ মাস—এক মাসেই ডবল টাকা
তুলে দেখ। উঠুন—ভাল হয়ে বসুন বাবু। সঙ্গে
বোড়ার গিঠে চাবুক কশাইয়া দে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

বৈশাখের ছ'সপ্তাহ পরে বিজয় একটু চড়া গলায় বলিল,
এসব ত ভাল নয় শশী, টাকা উপায় নয় অথচ ধারশোধের
মায় নেই।

শশী কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিল, কোথায় উপায় বাবু,
দিন দিন জিনিষের দর যা চড়েছে—

বিজয় বলিল, আজকাল মদও নাকি খাচ্ছে?

শশী তাহার পায়ের গোড়ার সটান শুইয়া পড়িয়া কহিল,
যে হারামজাদা আমার নামে লাগিয়েছে—

বিজয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, যে যাই বলুক—আসছে
সপ্তাহে তোমার কাছ থেকে দশটি টাকা চাই, না হলে গাড়ি
আটকে রাখব জানবে।

সে সপ্তাহে শশীর গাড়ি স্টেশনে পাওয়া গেল না।

মতি গাড়োয়ান বলিল, বাবু, আমার গাড়িতে আনুন—
শশী কেটনগরে গেছে ভাড়া দিয়ে।

রবিবারেও শশী ফিরিল না। সোমবারে হাঁটিয়াই বিজয়
স্টেশনে গেল।

পরের শনিবারেও শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল না। মতি
গাড়োয়ান বলিল, আনুন বাবু।

শশীর কি হ'ল?

মতি মুচকি হাসিয়া বলিল, আর বাবু বেটা তিন দিন থেকে
নেশা করে পড়ে আছে—গাড়িও বার করছে না—আর
বোড়াকেও খেতে দিচ্ছে না।

বাড়ি পৌছিয়াই বিজয় শশীর ঘোঁষে আস্তাবলে গিয়া
দেখিল তাহার বাহজান নাই—বউকে খিঁচি করিয়া গাল
দিতেছে।

বিজয় কঠিন কণ্ঠে ডাকিল, শশী—

শশী টলিতে টলিতে তাহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া
কাদিয়া উঠিল।

কিছু বলা বৃথা বুঝিয়া বিজয় বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

পরের শনিবার শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল। বিজয়ের
পা ছুইয়া প্রণাম করিয়া সে কহিল, বাবু মাপ করুন।

বিজয় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে কিছু বলিল না।

জলযোগের পর মা বলিলেন, হাঁরে বিজু, গাড়িখানা তোমার
না শশীর?

কেন মা ?

পরশ বলে পাঠালাম বাগীচডায় নিয়ে যেতে—তা বললে কিনা আজ হবে না। কাল গঙ্গান্নানে নিয়ে যাবার কথায় বললে, ভাড়া আছে। নিজেদের দরকারে যদি নাই পাওয়া যায় গাড়ি—তো এক কাঁড়ি টাকা ঢাললি কি জুড়ে শুনি ? টাকা কি তোর বাজ্ঞে ধরছিল না ?

বিজয় বলিল, ঠাঁড়াও—কাল দেখাছি মজা।

সনৎকে ডাকিয়া সে বলিল, কি করা যায় বল দেখি তাই ? গাড়িখানা আটক করব ?

সনৎ বলিল, তোমার ত আত্মবল মেই—গাড়ি রাখবে কোথায় ? আর ঘোড়া ছুঁটোরই বা কি ব্যবস্থা হবে ?

বিজয় বলিল, লাইসেন্স নেয়া আছে বউয়ের নামে—তাতেও ত গোলমাল হতে পারে।

পারে বৈকি—ও ব্যাটা শয়তান। শুনলাম বাইরে ছুঁ-তিন জায়গায় এই রকম করে তোর কাঁধে চেপেছে।

তা'হলে উপায় ?

মিষ্ট কথায় ওকে বশ করে টাকা আদায় করতে হবে।

শশীকে ডাকিয়া বিজয় যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলিল। যদিও ওর ইচ্ছা হইতেছিল শশীর ভক্তিদগ্ধ শঠতা-মাধানো-মুখে গায়ের ঝাল মিটাইয়া গোটাটক চড় কসাইয়া দেয়। চড় মারিলে টাকা আদায় হইবে না। সত্য কিন্তু, টাকা ফিরিয়া পাওয়ার চেয়ে তাহাই বেশী তুষ্ণিকর মনে হইতেছে।

শশী বিনয়ে বিজয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দিল। যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া গায়ের ধূলা লইতেও ভুলিল না।

৭

মিষ্ট ব্যবহারের দেনা-পাওনার আরও ক'টি মাস গেল। কোন বার শশী ছুঁটাকা জমা দেয়—কোন বার তার উপবাসী বউ কাঁদিয়া কাটিয়া ছার টাকা ধার লইয়া যায়। বলে, আমরা তোমাদের আশ্রিত মা ! ওটা কি মানুষ ?—তা'হলে তোমাদের টাকা খেয়ে এত ছুঃখ দেয় আমাদের ? খালি নেশা মা—খালি নেশা। আমরা ম'লাম কি রইলাম চেয়েও দেখে না।

এ সব ঘটে সপ্তাহের মধ্যবর্তী দিনে। শনিবারে বাড়ি আসিয়া সব শুনিয়া বিজয় বলে, কেন দিলে ওকে টাকা ?

মা বলেন, শশেটা হতভাগা—কিন্তু বউ-ছেলেমেয়েগুলো কি দোষ করলে বাবা ? যা হোক—আমাদের গাড়ি নিয়েই ত চলছে ওদের সংসার।

হিসাবে পাওনাটা ভারি হইতে থাকে দিন দিন।...অবশেষে বিজয় সঙ্কল্প করিল, একটা হেতুনেস্ত আঁজ করিবেই।

সনৎ শুনিয়া বলিল, তাই কর—তোর নিন্দে আর শুনতে পারি নে।

নিন্দে ? বিজয়-বিস্মিত কণ্ঠে বলে, নিন্দে করবার মত কি কাজ করলাম আমি।

সনৎ বলিল,—সেদিন বাজ্ঞারে বসে মদ খেয়ে তোর নামে যাচ্ছে তাই বলছিল। তোর দেনা নাকি কোন্ কালে শোধ হয়ে গেছে। গাড়ি কিনে ইস্তক টকি দেখানো—গঙ্গান্নান করা—এখানে ওখানে যাওয়া—তোকে স্টেশন থেকে ফি সপ্তাহে বাড়ি আনা—এসব হিসেব করলে ওরকম গাড়ি নাকি তিরখানা কেনা যায়।

বলিস কি ! শয়তান এই সব বলছে ?

হাঁ। আরও বলছে—বাবু এমন অর্থপিশাচ যে, শনিবারে এসে সব টাকা কেড়ে-কুড়ে নেয়, ওর বউ ছেলেরা খেতে পায় না। লোকেও বলছে—তা হবেই ত। বড়লোকেরা আর কোন্‌কালে চায় গরীবদের মুখের পানে।

বিজয় স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিল। টাকার জুড় ওর ছুঃখ হইল, কিন্তু সে ছুঃখের চেয়ে নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করিল।

আরম্ভের ক্ষীণ বেলুন কুৎসার ছিদ্রপথে কখন চূপসাইয়া গেছে।

সোমবার বিজয় আপিস গেল না। নিজের বৈঠকখানায় শশীকে ডাকাইল—সনৎ ও আর এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকেও ডাকিল।

সকলের সামনে বিজয় বলিল, শশী, আমার কাছে কত তোমার পাওনা বল ? জাজ্জ কড়ায়-গড়ায় সব শোধ হয়ে যাক।

শশী যথারীতি কাঁদিয়া বিজয়ের পা জড়াইয়া বলিল, আপনি মাগিক—

চূপ। বিজয় গর্জন করিয়া উঠিল। কত হয়েছে আমার কাছে পাওনা বল ? বল ?

আশ্চর্য—এত নেশা করা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশটি মাসের নির্ভুল হিসাব শশী আঙুল গণিয়া বলিয়া দিল।

সনৎ বলিল, যা দেখছি—তাতে দেনা-পাওনা সমান সমান ঠাঁড়ায় যে।

বিজয় বলিল, আন কাগজ-কলম—গাড়ি আমি ওর নামে লেখাপড়া করে দেব। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না আর।

লেখাপড়া শেষ হইলে শশী পদগদ চিত্তে আর একবার বিজয়ের গায়ের ধূলা লইতে গেল। বিজয় পা সরাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, গেট আউট—গেট আউট।

এক মাস পরে এক শনিবারে মতি গাড়োয়ান বিজয়কে বাড়ির ছয়দ্বারে নামাইয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, বাবু একটা নিবেদন আছে।

তাহার হাতে গাড়িভাড়া দিয়া বিজয় বলিল, কি ?

মতি বলিল, শরীর হিল্লো করে দিলেন—সে কথা
সবাই বলাবলি করে। আপনি ওর বাপের কাজ করে-
ছেন। আমিও দেখুন, পরের গাড়ি নিয়ে ব্যাগার খাটছি—

বিজয় কটমট চক্ষে মতির মুখের পানে কয়েক মিনিট

তাকাইয়া রহিল। পরে শ্বেদ-মাখানো স্বরে বলিল, টাকা
চাই, না? আচ্ছা বলতে পার মতি, মাহুদ ক'বার ঠকে?

বলিয়া উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করিয়া সে হুহু করিয়া
বাড়ির মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ-বৎসর-বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী
কলেজের সিনিয়র ডিভিশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই
সময়ে তাঁহার বাল্য-রচনার সূত্রপাত হয়। কবির
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন কলেজের ছাত্রবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনের
জন্ত তাহাদের রচনা স্বীয় পত্রে স্থান দিতেন। তাঁহার
প্রশস্তি-সমেত হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দু কলেজের
দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী
প্রভৃতির প্রথম রচনাগুলি ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সংবাদ
সাধুরঞ্জন’ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে ১৮৫২-৫৩
সনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বাল্য রচনাই
মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার আরও দুইটি রচনার
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সে দুইটি নিয়ে মুদ্রিত হইল :—

[‘সংবাদ সাধুরঞ্জন,’ ৩ অক্টোবর ১৮৫৩]

শরদ্বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন।

কামিনী।

নলিত।

আ মরি, আ মরি মরি, আজিকার বিভাবরী,
নাথ কি দেখেছি শোভা, আ মরি আ মরি হে,
নিরমল নীলাবরে, ধীরে চলে শশধরে,
বিমল কোমল করে, সার আলো করে হে।
অসীম-বিমল নীলে, বিধু কর গেছে মিলে,
মাঝে তারা পূর্ণশশী, শত শোভা ধরি হে।
গেছে জলদের কঁাদ, শরতের পূর্ণচাঁদ,
অমল মোহন শোভা, ধরা ব্যৱ পরি হে।
ঘোবনে নবীন নদী, ধীরে ধীরে নিম্নবধি,
প্রেম গান যুহু গেয়ে, চলিছে সুন্দরী হে।
নিরমল বুকে তার, শশী তারা ছায়াকার,
সমীরণ নেচে যায়, যেন প্রেমধরী হে।
তৃণপূর্ণ তটে তার, ফুল নাচে অনিবার,
শশী কিবা শোভা পায়, হৃদয় উপরি হে।
অর বুঝি সেই স্থানে, নিরেছিল ধনুর্কাণে,
মারিল আমার প্রাণে, যাতনায় মরি হে।

পতি।

আমিও দেখেছি সখি, তেমতি প্রকার।
সকলি তেমতি মত, শরীরে তোমার।
চল চল দেখ-নদী, নবীন হিল্লোলে।
মাঝে তার মুখখানি, শশধর দোলে।
নিখাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে।
কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে।
জোর বায়ু লয় প্রাণ, পাগেতে কি কায।
বুকের বসন পাল, না বাতে কি লাজ।
অমনি চলিবে তরি, কাঙারির গুণে।
কায নাই পাগে সখি, কায নাই গুণে।
চল সখি বার যাই, গভীর সলিলে।
ভবে মরি সেও ভাল, স্বর্গ তাহে মিলে।
সে বরং ভাল সখি, জল খেয়ে মরি।
চড়ায় ঠেকিলে তরি, উপায় কি করি।
এ যে বড় দায় দেখি, বাণির চড়ায়।
জল দে জল দে সখি, তুষায় পোড়ায়।
হা জল যো জল করি, চারি পাশে চাই।
কেবলি যে বাণি আর, বোলাজল পাই।
দেও লো রমণি মণি, এক বিন্দু জল।
তুষায় বাঁচুক প্রাণ, হই লো শীতল।
নির্দয় অন্তর তুমি, স্বভাবত স্নারী।
তুষা কি জান লো আগে, তবে দেবে বারি।
আ মরি রেগো না ধনি, আমার উপরে।
বালিকা বলেছি শুধু, রাগাবার তরে।
আসিতেছে এই সবে, ঘোবন জুয়ার।
পুরুক পুরুক ধনি, দিব লো সীতার।
হবে কি এমন দিন, কপাল আমার।
এ নদী কাঁপিয়া হবে, অকুল পাথার।
ঝড় কালে ঝড় হবে, তুলিয়ে তরঙ্গ।
করিবে নিখাস-বায়ু, হৃদি মাঝে রঙ্গ।
তরঙ্গে ছলিবে নদী, ঢেউ ভুলে ভুলে।
আমার কলার ডেলা, যাবে ছলে ছলে।
রেগো না রেগো না ধনি, মরি, রেগো না লো।
বড় নদী বলি নাই, বলিয়াছি ভালো।

কে জানে যদ্যপি এই, শরতের কালে ।
 এক টানা ভাঁটা পাছে, ঘটে লো কপালে ॥
 ভরা গাঙ্গে পাল দিয়ে, ভেলা যেতে চোড়ে ।
 দয়ে পোড়ে যাবে ধনি, কপালে দ-পোড়ে ॥
 যাক যাক রাগাবো না, আর লো তোমায় ।
 কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষমা কর তায় ॥
 ঐশ্বর্য দেখেছ দেখেছ তুমি, দৃষ্ট চমৎকার ।
 তেমতি দেখেছি ধনি, স্বরূপ তাহার ॥
 ঢল ঢল দেহ-নদী, যৌবন হিল্লোলে ।
 তার মাঝে আঁখি মুখ, তারা শশী দোলে ॥
 নিখাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে ।
 কাঁপায় নদীর নীর, হৃদয় মণ্ডলে ॥
 ফুলগুলি আশে পাশে, অলঙ্কার ভার ।
 কি কব রূপের কথা, নদীর আমার ॥
 মদন ছিল না, কিন্তু, তবু কাম কিসে ।
 অন্তর ফেলিল বিধে, তার শর বিধে ॥
 পয়োধরে পঙ্কশর, কেনেছিল হর ।
 বুঝি এসেছিল তথা, করিতে সমর ॥
 রণে কাম পরাজয়, যেখানেতে ভব ।
 ধনুক্ষণ ফেলে গেছে, জ্বা কটাক্ষে তব ॥

কামিনী ।

যাও যাও কায নাই, কথা কয়ে আর ।
 ভরা গাঙ্গ বুঁকে নিয়ে, দেও গে সঁতার ॥

পতি ।

মরি এ নয় সোজা, রমণীর মন বোকা,
 কি কথায় করিয়াছ রোষ ।
 ছিছি ছিছি ছিছি প্রাণ, ছাড় ছাড় ছাড় মান,
 ক্ষম মোর যদি থাকে দোষ ॥
 মুখ স্নান দেখে শশী, গগন মণ্ডলে বসি,
 হাসিতেছে প্রফুল্ল বদনে ।
 ছিছি ছিছি করি মান, তাহারি বাড়িল মান,
 অপমান কেবলি আপনে ॥
 পায় ধরি রসবতি, কথা কও প্রাণ ।
 কেন লো যুবতি সতি, কেন কেন মান ॥
 দেখে দেখি প্রাণেশ্বরী, কুসুমিনী জলে ।
 হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, প্রেমস্বখে গলে ॥

কামিনী ।

না হে না হে না হে প্রাণ, দেও যে কোরেছে মান,
 ছায়া ছলে অধোমুখ করি ।
 তাই শশী ছায়া ছলে, পায় ধরে গিয়ে জলে,
 তবু মানে রহিল স্তম্ভরী ॥
 কাঁদে চাঁদ যাতনায়, জলে বুক ভেসে যায়,
 ঐ কলঙ্ক অশ্রুধারা দাগ ।

ছাড়ে খাস দুখ ভরে, কাঁপে শশী কলেবরে,
 জলে ঐ দেখে ছাড় রাগ ॥

পতি ।

তা নয় তা নয় প্রাণ, তার ভরে নয় ।
 তার ভরে নাই জলে, শশধর রয় ॥
 তোমার বদন শোভা, দেখি শশধর ।
 লজ্জায় ডুবিয়া মরে, জলের ভিতর ॥
 যাইতে জলের মাঝ নিবারি তোমায় ।
 পাছে তব মুখছায়া জল মাঝে যায় ॥
 জলে ডুবে তবু চাঁদ, হোয়ে অপমান ।
 সে ভয়ে ঐ দেখ শশী, জলে কম্পমান ॥
 মনেতে ভাবিয়া দেখে, ডুবিয়াছে জলে ।
 তথাপি নিস্তার নাই, লজ্জার অনলে ॥
 তাই বুঝি ছার প্রাণ, রাখিবে না আর ।
 হৃদয়ে করিয়ে ছিল, অন্তের প্রহার ॥
 ক্রমির পড়েছে তারি, ধারে ধারে বৃকে ।
 তার চিহ্নে কলঙ্ক, বলিছে সবে মুখে ॥
 যদি বল চাঁদ যদি, ডুবে গেছে জলে ।
 কি ওই প্রকাশে শোভা গগন মণ্ডলে ॥
 সে তোমার মুখছায়া, পড়েছে আকাশে ।
 তোমারি মুখের মত, শোভা প্রকাশে ॥
 চিকণ চাঁচর কালো, যদি পড়ে গালে ।
 ছায়াতেও সেই দাগ, হয় সেই কালে ॥
 কালো কেশ ছায়া পড়ি, কালো দাগ হয় ।
 না কেনে কলঙ্ক চিহ্ন, মুখলোকে কয় ॥
 কতমত করি রাখ, বদনে বসন ।
 কতু পূর্ণ কতু কিছ, ঢাকহ বদন ॥
 তাই হয় কমী বেশী, আকাশের ছায়া ।
 লোকে বলে তিথি শুণে, বাড়ে চাঁদ কায় ॥
 কিন্তু আর মিছে কথা, কায নাই কোয়ে ।
 শরদ যামিনী যায়, মিছে মিছি বোয়ে ॥
 কেন আর প্রাণেশ্বরী, বাহিরেতে রহ ।
 এখন আসিবে রবি, কমলিনী সহ ॥
 দেখিব তখন ফের, স্বভাবের ছবি ।
 প্রথর ক্রমেতে হবে, শরদের রবি ॥
 সোহাগিনী কমলিনী, মোহিনী সাজিবে ।
 হেসে হেসে মনস্বখে, মরমে মজিবে ॥

কামিনী ।

বরষা কালেতে রবি, ছিল হে মলিন ছবি,
 শরদে প্রথর কেন হবে ।
 তখন নলিনীচর্যে, ছিল হে মলিনী হয়ে,
 এখন প্রফুল্ল কেন হবে ॥

পতি ।

দ্বিপ্রহরে দিনমণি, প্রেমসীর পানে ।
 চেয়ে দেখে প্রেমভরে, গদ গদ প্রাণে ॥
 দেখে কোথা থেকে আসে, কমলিনী কাছে ।
 আর এক দিনমণি, জলে পড়ে আছে ॥
 না কেনে আপন ছায়া, মনে রাগিয়াছে ।
 বলে বুঝি পদী ছুঁড়ী, এর সঙ্গে আছে ॥
 রাগেতে প্রচণ্ড ভেজ, মৃগী ভয়ঙ্কর ।
 হইয়াছে দিনমণি, কমল উপর ॥
 মনে ভাবে মাপ চাবে, দাঁতে করি কটো ।
 পদী বলে হোলো ভালো, মিলে গেল ছুটো ॥
 এই ভেবে মহানন্দে, হাসি-ভরা মুখ ।
 এমনে জানে না ছুঁড়ী, উপপতি ছুখ ॥

শ্রীবক্তিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

হুগলী কালেক্টরী ছাত্র ।

‘সংবাদ সাধুগুণ’, ২৪ অক্টোবর ১৮৫৩]

রূপক

বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন

পতি ।

বসন্ত বাসরে মরি, যায় রবি ধরা হরি,
 ধরণী কি শোভা ধরি, দেখ না লো দেখ না ।
 মই লো মোহিল মনে, মোহিনি লো সঙ্গোপনে ।
 বিনে তাহা দরশনে, থেকে না লো থেকে না ॥

স্ত্রী ।

বসন্তে বিষম স্মর, কালের কুহুম শর,
 লক্ষ করে বক্ষোপরি, যাব না হে যাব না ।
 সহজে অবলা নারী, জালা সহিবারে নারি ।
 সে বাণে নির্ঝাণ বারি, চাব না হে চাব না ॥

পতি ।

স্মর শরে প্রাণেশ্বরী, কেন সরে মন ।
 কি ভয় থাকতে আমি, তব নিকেতন ॥
 মারে যদি মার শর, তব বক্ষোপরি ।
 হৃদে হৃদি দিয়ে আমি, সব বাণ ধরি ॥
 কহলো নিরখি সখি, কেমন কোশল ।
 মইর সুশোভা শত, সবল সকল ॥
 সুধাকরে সুধা করে, হাসে ফিরে বার ।
 এখনো বদন-চন্দ্র, দেখেনি তোমার ॥
 দেখাও দেখাও সখি, দেখাও বদন ।
 পূর্ণেন্দু পড়িয়ে লাজে, পলাবে এখন ॥
 না লো না লো থাক শশী, বিহরি গগনে ।
 নহিলে মহিলা ভূমি, মজিবে আপনে ॥

গগন মণ্ডল মাঝে, নিশাকর বিনে ।
 আসিতে গগন গ্রহ, গ্রহণের দিনে ॥
 প্রবল পামর রাহ, আইলে বাইয়ে ।
 যখন যামিনীনাথ, দেখা না পাইয়ে ॥
 তব মুখ-শশী ভ্রমে, পাছে আপি আসে ।
 গগনে থাকুক চন্দ্র, বলি সেই আসে ॥
 কিন্তু লো তা হোলো রাহ, বাঁচিবে না আর ।
 বেণী-কণি বিষ খেয়ে, বাঁচে সাধ্য কার ॥
 দেখ প্রিয়ে প্রভাকর, প্রখর প্রচণ্ড ।
 অহঙ্কার চূর্ণ তার, কর এই দণ্ড ॥
 বাহিরে এসো লো প্রাণ, এসো লো বাহিরে ।
 টাচার নীরদ ভয়ে, তাড়াও মিহিরে ॥
 নলিনী হইতে চায়, উপমা তোমার ।
 নাথেরে না দেখে লবে, গরবিনী আর ।
 না লো না লো এসো না লো, থাকিতে তপন ।
 তা হোলো পাব না তব, মুখ দরশন ॥
 বদন চন্দ্রমা হোলো, দিনেশ নিকটে ।
 রবি চন্দ্র মিলনেতে, পাছে কুহু ঘটে ॥
 তথাপি লো প্রাণেশ্বরী, তাড়াও মিহিরে ।
 বাহিরো বাহিরো প্রাণ, বাহিরো বাহিরে ॥
 কমল কলিকা কুল, বসন্ত বাতাসে ।
 সর্ব গর্ব খর্ব কর, বদন প্রকাশে ॥
 না লো শশিমুখি মালা, তা করিতে করি ।
 সলিলে সরোজ থাক, যাক প্রাণেশ্বরী ॥
 মধুপানে মধুকর, আসিবে যখন ।
 যদি নিজ কমলিনী, না করি দর্শন ॥
 ভ্রমে ভ্রমি তব মুখে, ভ্রমে সে ভ্রমরে ।
 জানি পল্ল মুখে পাছে, মধুপান করে ॥
 তবু এসো এসো সখি, এসো লো তথাপি ।
 তোমা বিনা রহিবারে, না পারি কদাপি ॥

স্ত্রী ।

কিন্তু যে মলয় বয়, সুশীতল অভিষেক,
 অগ্নিমাত্র নাই সঙ্গে তার ।
 বিরহে সখা না পায়, সখার সন্ধান চায়,
 সমীরের বিরহ বিকার ॥
 বিরহি সে সমীরণ, করিব না পরশন,
 বিরহির গায়ের বাতাস ।
 ওই শুন তার তরে, কে যে, ‘কুহু কুহু’ করে,
 কুণ্ড বায়ু কয় তব পাশ ॥

পতি ।

কুহু কুহু শুন যাহা, স্মৃতির স্বর ।
 তব ধনি প্রতিধ্বনি, অতি মোহকর ॥

মানবমণ্ডলী মূঢ়, না জেনে সকলে ।
কোকিল কলনা কুহু, সে ধ্বনিকে বলে ॥

স্ত্রী ।

রহস্য ছাড়িয়া দাও, আমার হে মাথা খাও,
কেন কর উন্নত প্রলাপ ।
যদি প্রতিধ্বনি হবে, — ওই দেখ কুহু রবে,
কুজিতেছে কোকিল কলাপ ॥

পতি ।

আকাশে বিকাশে প্রিয়ে, দেখি দিবাকর ।
ধরায় হতেছে ধরা, তব কলেবর ॥
বদনে বিকাশে বিধু, তোমার প্রেমসি ।
সরোজিনী সখা সহ, সপ্রকাশ শশী ॥
রবি শশী একত্রেতে, বুঝি কুহু হয় ।
তাই লো কোকিলকুল, কুহু কুহু কর ॥

স্ত্রী ।

বল দেখি তরুদল, কি কারণ বলমল,
করিতেছে নবীন পল্লবে ।
বোধ হয় সেই ছলে, নবীন পল্লবদলে,
নব বেশ পরিয়াছে সবে ॥

পতি ।

বসন্ত যৌবন দিন, পেয়ে সবে রসাবীন,
হোলো তরু নব লতা আর ।
পুষ্পেতে পুরিল নব, হইয়াছে পুষ্পোৎসব,
ফুল ফুটিয়াছে সবাকার ॥
সে কারণে রীতিমত, তরুগণে প্রথমত,
শিশিরেতে করিয়াছে স্নান ।
পরে বৃক্ষ লতাদলে, করেছে নবীন দলে,
নব বেশ ভূষা পরিধান ॥

স্ত্রী ।

গুপ্তরে ভ্রমর কেন, নিকুঞ্জ নিকরে ।
“গুণ গুণ” করি ঔলি নিকরে কি করে ॥

পতি ।

যতেক নাগর কুলে, প্রফুল্ল কুসুম তুলে,
নাহি দেয় মধু মধুকরে ।
অলি তায় ক্রোধভরে, অজ্ঞ অধেষণ করে,
জালা দিতে নাগর নিকরে ॥
করিতে মানস পূর্ণ, দর্শন করিল তুর্ণ,
তব জ্ঞ মদন ধনু মত ।
কিন্তু তাহে গুণ নাই, গুণ চেয়ে ভ্রমে তাই,
গুণ গুণ রবে অবিরত ॥

কামিনী ।

নিরমল নীলাকাশ, শশধর সপ্রকাশ,
অবসন্তের বিভাবরী, কিবা শোভা ধরিছে ।

কেন দরশন করি, শশাঙ্ক গগনোপরি,
পাশে লক্ষ তারাগণ, কত শোভা করিছে ॥

পতি ।

গগন তোমার রূপ, কোরে দরশন ।
সহস্র তারার চেয়ে, সহস্র নয়ন ॥
শশাঙ্কের দীপ জ্বলে, দেখে ভাল করি ।
বায়ু শব্দে প্রশংসায়, বলে মরি মরি ॥

কামিনী ।

দেখ দেখ প্রাণ সখা, কুসুম নিকরে ।
নেচে নেচে হেলে ছলে, কত শোভা করে ॥
কেহ রাজা, কেহ নীল, কেত কেহ কেহ ।
বিমল কোমল কিবা তাহাদের দেহ ॥

পতি ।

শুনিয়ে তোমারি ভূষণ রব ।
মনে করেছিল কুসুম সব ॥
দল বেঁধে বুঝি আনি নিকরে ।
এসেছে বুঝিবা মধুর তরে ॥
মনে করিয়াছে দিবে না মধু ।
ছলে বাড় নাড়ে ‘না না না বঁধু’ ॥
কারো কারো ছিল বরণে তম ।
বলে কেহ নাই আমার সম ॥
কিন্তু তোমা দেখি সে লাজ পায় ।
অধোমুখে দেখে কি বর্ণ পায় ॥
তাই হেঁট মাথা কুসুমচয় ।
কেহ অভিমানে বৃক্ষে না রয় ॥
বরণ নাশিতে ভ্রমেতে পড়ি ।
কাদা মাখি দেয় ঐ গড়াগড়ি ॥

কামিনী ।

মলিন ছিল হে কমল শীতে
বসন্তে কেমন সুপ্রকাশিতে ॥
কেমন সুন্দর আ মরি মরি ।
মনে হয় যেন হৃদয়ে ধরি ॥
ফুটেছে সকল কমলদল ।
রক্তিম শ্বেতাজ্ঞ সুনিরমল ॥
তাহার উপর নীহার কণা ।
আশে পাশে শোভে দেখ দেখ না ।

পতি ।

সরোজিনী সদা ঘেষেতে মরে ।
তোমার সমান হবার তরে ॥
দেখেছে তোমার বদনোপরে ।
পাশে স্বর্ণ ভূষা কিরণ করে ॥
তেমনি কিরণ দিবার আশে ।
নীহারের কণা রেখেছে পাশে ॥

• ত্রিবিক্রমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হুগলি কলেজের ছাত্র ।

বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার ও বোধিসত্ত্বের আদর্শ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পৌত্তম বুদ্ধ তাঁহার পূর্বজীবনে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। জাতকে দেখিতে পাই, এই বোধিসত্ত্বাবস্থায় তিনি সর্বদা সর্বপ্রাণীর হিতসুখ সাধনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সর্বজীব-জগতের সুখ ও কল্যাণের জন্ত নিজের সর্বদা, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে তিনি সতত উদ্যত ছিলেন। বোধিসত্ত্বের আদর্শ কি, তাহা জাতকে কথিত বুদ্ধের পূর্বজীবনের ঐ কথিকাসমূহ হইতে কতক বুঝা যাইবে।

‘বোধি’ অর্থাৎ বোধ বা জ্ঞান। সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী। “জ্ঞানের জন্ত যে প্রাণী (প্রচেষ্টা করিতেছেন)” তিনি বোধিসত্ত্ব। ইহা হইল বোধিসত্ত্ব শব্দের আক্ষরিক অর্থ। বোধিসত্ত্বের আদর্শ যেখানে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাযান বৌদ্ধগণের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক সেই ‘বোধিচর্যাবতার’ গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—“সর্বজীবের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বোধিপ্রাপ্তি নিমিত্ত যে সংকল্প এবং সেই সংকল্পসাধনের জন্ত যে-প্রয়াস, তাহার নাম বোধিচিহ্ন।”^১ এই বোধিচিহ্ন যিনি বরণ করিয়াছেন (বা এই বোধিচিহ্ন স্বীকার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে), তিনি বোধিসত্ত্ব।”

সংস্কৃত, চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় রচিত ও অনুদিত মহাযান বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সর্বত্র এই বোধিসত্ত্বের আদর্শ, এবং কোথাও কোথাও আত্মত্যাগী বোধিসত্ত্বের অপূর্ব মহিমামণ্ডিত জীবনকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বোধিসত্ত্ব একাধারে জ্ঞান লাভ করিবেন ও কর্ম করিবেন, জ্ঞানলাভের জন্ত কর্ম করিবেন এবং কর্ম করিবার জন্তও জ্ঞানলাভ করিবেন, একটিকে ছাড়িয়া অটুত হইবার নহে। সেইজন্ত আমরা দেখিতে পাই, বোধিসত্ত্ব একদিকে যেমন ধ্যান করিতেছেন অতদিকে তেমনি জীবসেবাদি কর্মও করিতেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানের নয় প্রকার স্তর বা সমাধির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ নয়টি অবস্থার বিষয় উল্লিখিত আছে। বুদ্ধদেব নিজে এই নয়টি স্তরের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন।^২ এই

নয়টি স্তরের প্রথম স্তর প্রাপ্ত হইবার জন্ত যাহা যাহা ধ্যানের অবলম্বনরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদের একটি হইল—“অপরিস্রব চিত্ত।” মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই গুণ চতুষ্টয়কে “অপরিস্রব চিত্ত” বা “ব্রহ্মবিহার”^৩ বলিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৈদিক ও বৌদ্ধগণ উভয়েই এই চারিটি “মনোভাবকে” যোগসাধনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন।^৪ তবে বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে অধিকতর ব্যাপক এবং কখনও বা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। “মাতা যে ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবগণের জন্ত চিত্তকে সেই ‘অপরিস্রব ভাবে’ ভাবান্বিত কর।” সুত্তনিপাত, ১।৮।৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৬।

এইরূপ (পরিমার্জনীয়) মনোভাবকেই “অপরিস্রব চিত্ত” বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে পুত্র প্রেমারূপ প্রেমকে মৈত্রী বলা হয় :—গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোন গৃহস্থামীর মজ্জাগত প্রেম, সমস্ত জীবের উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেমই হইল মৈত্রী।

এই মৈত্রী যখন বিরাত্রিরূপ ধারণ করিয়া মহা মৈত্রীরূপে কাহারো চিত্তে উৎপন্ন হয় তখন তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন নিজের সমস্ত কল্যাণের মূল (কুশলমূল)^৫ পর্যন্ত সমস্ত জীবজগৎকে দান করেন; অথচ তাহার কোন প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না। শিকাসমুচ্চয়, ১৪৬, ২৮৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৬-১৭।

নির্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই, তিনি “সংজ্ঞাবৈদিতনিরোধ” সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। ব্রহ্মবিহার—“ব্রহ্মবিহার” শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে :—ব্রহ্মার চিত্ত বিশুদ্ধ নির্দোষ। তিনি নির্দোষ চিত্তে বিহার করেন। এই মৈত্রী করুণাদি দ্বারা যোগিগণও ব্রহ্মদম হইয়া নির্দোষ চিত্তে বিহার করেন। সুত্তরাং ইহা “ব্রহ্মবিহার।” বিহুজ্জিময়, ৯ম, পরি, মহাযানীদের বোধিচর্যাবতারের ৯ম পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে, চিত্তের ‘ব্রহ্মতা’ বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

৫। যাহারা হৃৎপ্রাণ করিতেছে তাহাদের সুখে হৃৎ (বহুকৃত্য আচরণ বা মৈত্রী), যাহারা হৃৎপ্রাণ করিতেছে তাহাদের হৃৎপ্রাণ (করুণা), যাহারা পুণ্যাত্মা, তাহাদের পুণ্যকর্ম আনন্দ (মুদিতা) এবং যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, অথবা যাহারা পাপী, তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য (উপেক্ষা), এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে মন প্রশান্ত, প্রশান্ত হইয়া যাইবে (এবং তখনই) তাহা একান্ত করা সম্ভব হইবে।^৬ পাতঞ্জলদর্শন, ১।৩৩।

৬। জোষ, লোভ ও মোহের অভাবকে বৌদ্ধশাস্ত্রে “কুশলমূল” বলা হইয়াছে। এই তিন বৃত্তির অভাব বা নিবৃত্তিই সমস্ত কুশলের (বা কল্যাণের) মূল বা উৎস।

১। বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ ৬-১৫।

২। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটিতে রূপের (Matter) উপলব্ধি হয়। অবশিষ্টগুলিতে রূপের উপলব্ধি হয় না। নবমটি হইতেছে সমাধির সর্বশেষ অবস্থা, যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণ ভাবে নিরুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় মৃতের সহিত সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, তাঁহার দেহ উষ্ণ থাকে, প্রাণ বহির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নষ্ট হয় না।

৩। দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে ধ্যানের এই স্তরে প্রবেশ করেন। আনন্দের তখন ধারণা হয়, তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া ভদ্রস্ত অহরহকে প্রশ্ন করেন : ভদ্রস্ত অহরহ, ভগবান কি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন? অহরহ বলিলেন : আনন্দ, ভগবান

অতঃপুত্রের প্রতি পিতার যে প্রেম, (অতঃ) জগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই হইল করুণা।—বোধিচর্যাবতার, ৯।৭৬। এই করুণা যখন পরিবর্তিত হইয়া কাহারো অন্তরে মহা-করুণারূপে উদ্ভিত হয়, তখন (অতঃ পুত্রের পিতা যেমন নিজের কণা না ভাবিয়া সর্বপ্রথম পুত্রের আরোগ্য কামনা করেন, সেইরূপ) তিনি সর্বপ্রথম জগতের অল্প সমস্ত প্রাণীর বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের নহে। শিক্ষা, পৃ. ১৪৬। মৈত্রী, পৃ. ১৭।

অন্তের সুখে যে সুখপ্রাপ্তি, অন্তের আনন্দে যে আনন্দলাভ তাহাই হইল মুদিতা।

উপেক্ষা—(১) ঔদাসীন্ধ্য (২) সুখাহুত্ব বা দুঃখাহুত্বের অভাব। (৩) অনাসক্তি। প্রেম ও করুণায় প্রাণ ভরপুর রহিবে কিন্তু আসক্তি রহিবে না, ইহাই বোধিসত্ত্বের সাধনা।

এই অপরিমিত চিত্তের ভাবনার দ্বারা ধ্যানের প্রথম স্তর, বা সমাধির প্রথম অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ৭”

বোধিসত্ত্বের শিক্ষা ও কর্ম আরম্ভ হয় এই চারি “অপরিমিত চিত্তের” অভ্যাস ও প্রয়োগের দ্বারা। এই শিক্ষা তাঁহার জীবনে এরূপ চরিতার্থতা লাভ করে যে, তাঁহার দেহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও বেদনা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তখনও তিনি সর্বজীবের জন্ত মৈত্রী বিস্তার করেন।—শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ. ১৮৭। যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তাহাদের মুক্তির জন্তই তিনি সমস্ত সহ করেন। ঐ পৃ. ১৮৭। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৯। প্রেমের গভীরতা এবং ঐকান্ত্যের সমাধি-প্রাপ্তির দ্বারা ইহা সম্ভব হয়।

বোধিসত্ত্ব বলেন :—প্রাণিগণ বড় অসহায়। ক্রোধ, লোভ ও মোহ তাহাদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এমন কোন কুশল-কর্ম করিবার শক্তি তাহাদের নাই, যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদের উদ্ধার করিবে। তাহারা যখন নিজেদেরই উদ্ধার করিতে পারে না, তখন অন্তকে উদ্ধার করিবে কিরূপে ?

৭। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা অপেক্ষাও উপেক্ষা উৎপন্ন করা অধিকতর কঠিন। তবে উপেক্ষা ব্যতীতও কেবলমাত্র মৈত্রী, করুণা ও মুদিতায় দ্বায়াই ধ্যানের প্রথম স্তর, এমন কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত প্রাপ্তি হয়। উপেক্ষার দ্বারা (যেহেতু উহা চিত্তের উন্নততর অবস্থায় উৎপন্ন হয়) চতুর্থ স্তর পর্যন্ত লাভ হয়।

৮। বোধি-শাস্ত্রে আছে—“চিত্তবৃত্তি” নামক একপ্রকার সমাধি প্রাপ্ত হইলে মাত্ৰ সর্ব ব্যাপারেই আনন্দলাভ করে। তখন আনন্দ ভিন্ন অল্প কোনো অল্পভূতি চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন হস্ত, পদ, কণ, নাসিকা ছিন্ন বা চক্ষু উৎপাটিত হইতে থাকিলেও ব্যথা প্রাপ্তি হয় না। ইক্ষুর ছায় নিষ্পেষিত বা তপ্ততৈলে নিষিক্ত হইলেও তখন বেদনা হয় না।—শিক্ষা সমুচ্চয়, পৃ. ১৮১।

“সুতরাং আমিই সকলের দুঃখের ভার গ্রহণ করিতেছি। জগতের সমস্ত প্রাণিকে আমার মুক্ত করিতে হইবে। সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিতে হইবে।—শিক্ষা, পৃ. ২৮০-৮২; মৈত্রী, পৃ. ২০-২২। “আতুর যাহারা আমি তাহাদের ঔষধ হইব। বৈদ্য হইব। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের শয্যাপার্থচারী পরিচারক হইব। “দরিদ্রগণের অক্ষয় নিধি-স্বরূপ হইয়া নানা উপকরণরূপে আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিব।” “আমি অনাথের নাথ, পথিকগণের পথ-প্রদর্শক এবং নদনদী উত্তরণকারীর নৌকা-ও সেতু হইব।” “আমি দীপাকাজীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা এবং দাসাকাজীর দাস হইব।” “এই ভাবে অনন্ত আকাশপ্রমাণ অপরিমিত জীবগণের আমি (পঞ্চভূতের ছায়) নানারূপ ভোগের উপাদান হইব। যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব নির্বাণ-লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত আমি তাহাদের উপজীবিকার উপায় হইব।”—বোধিচর্যাবতার, ৩।৭—২১; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ২২—২৪।

বোধিসত্ত্ব বীর-সাধক। তাঁহার ধর্ম বীর-ধর্ম। বলহীনদের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইবার নহে। শাস্ত্রে আছে, ‘বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে, সেইরূপ বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নহে। বীর্য বিনা ক্ষমাও অর্জন হয় না। সুতরাং বীর্যবান হইয়া ক্ষমা অভ্যাস করিবে। বীর্যেই বুদ্ধত্ব অবস্থান করিতেছে। বোধিচর্যাবতার, ৭।১। “যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অল্প সকলেও যেন বুদ্ধত্ব লাভ করে। “সর্ব-জীবের যথেষ্ট সুখলাভের জন্ত আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি।—ঐ, ৩।১২-১৬। মৈত্রী, ২৪-২৫।

বীর বিনা এমন কথা কে বলিতে পারে? ইহা শুধু কথার কথা নহে, ইহা জীবনে সার্থক করিয়া গিয়াছেন, এমন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শত্রু যখন শূন্তবাদী বোধিসত্ত্ব আর্ষদেবকে হত্যার উদ্দেশে মারাত্মক অস্ত্রাঘাত করিল—তিনি তখন তাহাকে শান্তভাবে উপদেশ দিলেন; “বৎস, ঐ দেহ আমার কাষায় বস্ত্র। ঐ আমার ভিক্ষাপাত্র। উহা লইয়া ভিক্ষুর বেশে সজ্জিত হইয়া এখনই ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন কর।”

● শত্রু মরণাপন্ন। শিষ্যগণ চতুর্দিকে রোদন করিতেছে। কেহ কেহ মর্মভেদী করণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—“কে হত্যা করিল? এমন নৃশংস অত্যাচার করিল কে?” “মুমূর্শু গুরু প্রশান্ত বদনে উত্তর দিলেন :—

“নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা নাহি অত্যাচার।

জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ, দুঃখ হাহাকার।

কে তোমার প্রিয়জন? কার ভরে কর অশ্রুপাত?
কে মারিল? কে মরিল? কে করিল কারে অশ্রাবাত?
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব। মিথ্যা দৃষ্টি হোক তিরোহিত।
মহা ব্যোম-সমান-শূন্যতা-শান্ত-শিবপ্রপঞ্চ-অতীত।”

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯।

অনেকের ধারণা, ভারতীয়গণের যাছা কিছু সাধনা সমস্তই নিজের মোক্ষলাভের জন্ত। মৈত্রী, করুণার অভ্যাস বা জীব-সেবাদি সমস্ত শুভকর্মেরই এই একমাত্র লক্ষ্য। উহার দ্বারা নিজের মোক্ষলাভ হয় বলিয়াই উহা করা হয়। উহা নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, পরের জন্ত নহে।

সর্বদেশে, সর্বজাতির মধ্যে, সর্বসময়েই এইরূপ একদল সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কেবল নিজের মুক্তির জন্তই সাধনা করিয়াছেন বা করিতেছেন। কিন্তু “ভারতীয় সাধকগণ সকলে নিজের মোক্ষের জন্তই সাধনা করিয়াছেন”— এইরূপ ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতাগ্রস্ত।

“আত্মর অভ্যাসগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাহি না।—ভাগবত, ৭।৯।৪৪। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ২১। “আমি স্বর্গ চাহিনা, মুক্তি চাহি না—সমস্ত জগতের দুঃখ দৈত্য-ক্লেশকেই আমি বরণ করিতে চাই। যত দিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে, তত দিন পর্যন্ত বার-বার এই বিধে জন্মগ্রহণ করিতে চাই।”—ভাগবত, ৯।২।১।২। মৈত্রী, পৃ. ৬৪। “একটি প্রাণীর জন্ত সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত আমি এই জগতে অবস্থান করিব।”—শিক্ষা সমুচ্চয়, পৃ. ১৪। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ৬২। জীবগণ যখন দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়— তাহাই পর্যাণ্ট। রসহীন শুষ্ক মোক্ষে কি প্রয়োজন?” এই, পৃ. ৩৬০; বোধিসত্ত্ববতার, ৮।১০৮। মৈত্রীসাধনা, পৃ. ৬২।

ইহা ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণই বলিয়া গিয়াছেন। বোধিসত্ত্বগণের এই সাধনা যে কতদূর পরার্থপর তাহা নিয়ে আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে:—“ইহারা যে ধর্মজীবন যাপন করেন, নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাহা স্বর্গের জন্ত বা ইন্দ্রভূলাভের জন্য নহে। কোন ভোগ, কোন ঐর্ষ্য, দেহের বিশেষ বর্ণ, রূপ বা সৌন্দর্যলাভের জন্য, যশের জন্ত কিংবা পশুজন্ম বা নরকাদির ভয়ে তাহা ইহারা করেন না। সর্বজীবের হিতের জন্য, স্বথের জন্য, কল্যাণের জন্তই ইহারা ধর্মজীবন যাপন করেন। নিজের চরিত্র রক্ষা করেন।”—শিক্ষা, পৃ. ১৪৭, মৈত্রী পৃ. ১৮। ইহারা প্রত্যেকে বলেন, “আমি যে এই অমৃতের সম্যক সর্বাধিকার জন্ত যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, উহা কোনরূপ ইন্দ্রিয়স্বর্থের আশায় নহে, কামোপভোগের জন্ত নহে। আমার সর্বজ্ঞতা উৎপাদন সর্বজীবজগতের উদ্ধারের জন্ত।”—শিক্ষা, পৃ. ২৮১। “জগতের সকল জীবের জন্ত আমি আমার কুশলমূল উৎপন্ন করিতেছি, উহাকে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত করাইতেছি। উহা

সকলের উদ্ধারের জন্ত নিয়োগ করিব।” শিক্ষা, ২৮২। আমি আমার কুশলমূলকে এমন ভাবে পূর্ণতায় পরিণত করিব, যাহাতে সমস্ত প্রাণী পরম সুখলাভ করে। অনন্তত্ব আনন্দ অধিগত হয়। সর্বজ্ঞতার আনন্দ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা, ২৮১। জগতের সর্বজীবের দুর্গতিতে অবস্থান করা অপেক্ষা বরং আমি একাকীই দুঃখ ভোগ করি। আমি পেছায় নিজেকে বন্ধক রাখিয়া তাহার পরিবর্তে সমস্ত জগতকে নরক হইতে, পশুজন্ম হইতে, যমলোক হইতে উদ্ধার করিব। সর্বজীবের হিতের জন্ত সমস্ত দুঃখ-বেদনা আমি আমার এই নিজের দেহেই ভোগ করিব। শিক্ষা, পৃ. ২৮১। মহাবান অজ্ঞানকার, ১৩।১৪। আমি আমার এই দেহ সর্বজীবের জন্ত উৎসর্গ করিয়াছি। আমার সর্ব বাহুসম্পদ, যাহার যাহা কাজে লাগিবে তাহা তাহাকেই দান করিব। হস্ত, পদ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, মজ্জা, মস্তক এবং অস্ত্রাশ্রয়-প্রত্যঙ্গ, যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকেই তাহা দান করিব। ধন-দ্রব্য, শস্তাদি, স্বর্ণ রৌপ্যাদি, মণি-মুক্তাদি, অশ্ব, রথ, শকট, গ্রাম, নগর, রাজ্য, দাস-দাসী, পুত্র-কন্যাাদি বাহু বস্তুর আর কথা কি—আমার যাহা কিছু যতক্ষণ বিচ্যমান থাকিবে ততক্ষণ যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকেই তাহা দান করিব। অন্নতাপ না করিয়া ক্ষোভ-বর্জিত হৃদয়ে কোনোরূপ প্রতিদানাকাজা পরিত্যাগপূর্বক, নিরাসক্ত ভাবে সর্বজীবের প্রতি করুণা ও অহুকম্পা বশত আমি এই সমস্ত দান করিব। শিক্ষা, পৃ. ২১। যে কুশলমূল বা ধর্মজ্ঞাননৈপুণ্য সর্বজীবের প্রয়োজনে আসিবে না তাহা যেন আমার মধ্যে উৎপন্ন না হয়। এই, পৃ. ৩৩। পুণ্যভ্যাগেও যদি পুণ্য অর্জন হয় তবে তাহাও আমি নিজের জন্য কামনা করি না, তাহাও পরেরই জন্য। এই, পৃ. ১৪৭।

সর্বজগতের সর্বজীবের প্রত্যেকটি দুঃখ-বিপদ দূর করিবার জন্য আমি এই জগতে অনন্ত কাল অবস্থান করিতে উজ্জত রহিয়াছি।” এই, পৃ. ২৮১।

শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবিবে কেমন করিয়া? আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? আমার পরম শত্রুকেও ভালবাসিব কেন? কেন তাহার কুশল কামনা করিব? আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগে, বোধিসত্ত্বগণ এই ভাবে তাহার উত্তর দেন:—

“যখন কেহ কোনো দণ্ড বা অন্য কোনো অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহারই উপর ক্রুদ্ধ হই। অতএব ঘেঘের দ্বারা প্রেরিত জীব যখন আমাকে আঘাত করে, তখন জীবের উপর ঘেঘ না করিয়া, ঘেঘের উপরই আমার ঘেঘ করা উচিত। যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই সেই দেহ, এই উভয়েই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ

হইব? যাঁহাদিগকে আমি অপকারী মনে করি, তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ক্রমাগত ক্ষমা করিতে করিতে) আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। আমি আমার পরম প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাগুণ লাভ করি। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের হিংসাদেহাদি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের অবনতি ও দুর্গতির অন্ত থাকে না। তাঁহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমি যাঁহাদিগকে অপকারী মনে করি, বস্তুত তাঁহারা আমার উপকারী এবং আমিই তাঁহাদের অপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ?—বোধিচর্যাবতার, ৬৪১-৪২; মৈত্রীসাধনা, পৃ ৩৭-৩৮।

ত্যাগের মধ্যে যশ ও সম্মান ত্যাগই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দুঃখ। এমন অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা সর্বত্র ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ যশ ও সম্মানের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বোধিসত্ত্ব কিন্তু, ঐই যশ ও সম্মানকে বন্ধন মনে করেন, তাঁহার যশ ও সম্মান যাঁহারা নষ্ট করে, তাঁহাদিগকে তিনি যুক্তিদ্বারা বন্ধু মনে করেন। তিনি বলেন :—

“আমি যুক্তিকামী। লাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার যোগ্য নহে। যাঁহারা আমাকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করে, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে? আমার জ্ঞতি, যশ ও সম্মানাদির ব্যাধাতের জন্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা আমাকে অপায়-পতন হইতে পরিত্রাণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুঃখে প্রবেশকামী আমার সম্মুখে তাঁহারা রুদ্ধ কপাটরূপে বিরাজিত হইলেন। উহা যেন মহা কারুণিক বুদ্ধের প্রভাব বশতই সম্ভব হইল। এইরূপ উপকারী যাঁহারা, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে? ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল, এইরূপ মনে করিয়াও কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য নাই এবং ঐ ব্যক্তির জন্যই সেই পুণ্যের সুযোগ উপস্থিত হইল। অসহিষ্ণু আমি, যদি তখন নিজের দোষে তাঁহাকে ক্ষমা না করি, তবে আমা দ্বারাই আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল। পুণ্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমি পুণ্য অর্জন করিলাম না।”

যদি কেহ বলেন, আমার ক্ষমারূপ পুণ্য অর্জন হউক, এরূপ কোনো সদ অভিপ্রায় শত্রুর নাই। অধিকন্তু অপকার করিবার দৃষ্ট অভিপ্রায়ই তাহার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বোধিসত্ত্ব তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন :—

“অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমা-সিদ্ধির কারণ। অপকারের অভিপ্রায় না হইয়া, যদি বৈজ্ঞের মত তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে কি তাঁহার উপর আমার ঘেঁষের দস্তাবেজ থাকিত, না ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত? তাঁহার দৃষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়; অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ। তিনি আমার সন্ধর্মের

দ্বার পূজনীয়। ৯ ঐ, ৬।১০০-১১১। মৈত্রীসাধনা, ৪১-৪৫। এই মহাত্মাগণের চরিত্রসমূহ অলৌকিক অদ্ভুত। ইঁহারা কাঁহাকেও দুঃখ দেন না। সকলের সকল দুঃখ দূর করেন। দুঃখের মধ্যেই ইঁহারা বাস করেন। কিন্তু দুঃখকে ভয় করেন না। দুঃখের মধ্যে বাস করিলেও (বাসনামুক্ত বলিয়া) ইঁহারা দুঃখ হইতে মুক্ত। কল্পনাতেও ইঁহাদের দুঃখ নাই, অথচ দুঃখকেই ইঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন।—মহাযান সূত্রাংকার, ১৯৬৮। মৈত্রী, পৃ, ৬১। ইঁহাদের সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। জীবগণের জন্ম বার-বার নরক-বাসেও ইঁহাদের কষ্ট হয় না। ঐ, ৪।২২; ১৩।১৪। মৈত্রী, পৃ, ৬১। যাঁহার জন্ম মানুষ ধন আকাঙ্ক্ষা করে, ইঁহারা তাঁহাই সকলকে দান করেন। দেহরক্ষার জন্মই লোকে ধন আকাঙ্ক্ষা করে, অথচ সেই দেহই ইঁহারা শত শত বার (পরের জন্ম) বিসর্জন দেন। দেহ দান করিয়াও ইঁহাদের দুঃখ হয় না, ধনদানের কথা কি। ইঁহা সত্যই অলৌকিক। কিন্তু ইঁহা অপেক্ষাও অলৌকিক হইতেছে সেই আনন্দ, যাঁহা ইঁহারা সেই (বলিদানের) দুঃখের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।—মহাযানসূত্র—১৬।৫৮।৫৯; মৈত্রী, পৃ, ৬১-৬৩।

বোধিসত্ত্বের আয়োৎসর্গের এই সাধনা এখনও বৌদ্ধদের মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। তিব্বতীয় সাধকগণ আজিও অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এই সাধনা অভ্যাস করিতেছেন। সাধক গভীর রাত্রে, নির্জন অরণ্যে অথবা শ্মশানে, সাধনোদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে গিয়া শতিনি ভাবনা করিতে থাকেন যে, তাঁহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাধাদি হিংস্র জন্তু ও রাক্ষস-পিশাচাদি রক্ত-মাংসলোলুপ প্রাণীর ক্ষুধিত্তির জন্ম তিনি বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে দান করিতেছেন। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সেই নির্জন অরণ্যে অথবা শ্মশানভূমি সচকিত করিয়া তিনি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকেন :—

“হে অনশনক্রিষ্ট, ক্ষুধাত, তৃষ্ণাত প্রাণিগণ। কোথায় তোমরা? সত্ত্বর এখানে আগমন কর। আমার দেহের এই মাংসের দ্বারা তোমাদের ক্ষুধা শান্ত হোক, আমার শোণিতের দ্বারা তোমাদের পিপাসা দূর হোক। হস্ত ও চরণযুগল ছিন্ন করিয়া আমি তোমাদের দান করিতেছি। চক্ষু ও হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া, মূত্রা, যকৃৎ ও অন্ত্রসমূহ কতর্ন করিয়া, তোমাদিগকে সমর্পণ করিতেছি। মাংস, অস্থি, মজ্জাসমূহ তোমাদের সম্মুখে স্তূপীকৃত করিতেছি। অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া শোণিত দান করিতেছি। তোমাদের অনশনকষ্ট দূর হোক। তোমাদের পিপাসার জ্বালা শান্ত হোক। তোমরা পরিতৃপ্ত হও, সুখী হও। কাঁহারো যেন কোনো দুঃখ না থাকে।”

বিজ্ঞান অরণ্যে, নির্জন শ্মশানে, নিস্তরু নিশীথে, সেই অগূঢ় আবেষ্টনীতে, এইরূপ ভাবনা ও আবৃত্তি করিতে

৯। অর্থাৎ সন্ধর্মের সেবা কাঁহারা যত্ন লাভ হয়, শত্রু হইতেও তাঁহাচই লাভ হয়, সেই জগৎ শত্রুও সন্ধর্মের দ্বার পূজনীয়।

করিতে, সাধক এমন অবস্থায় উপনীত হন, যখন তিনি স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করেন—ব্যাজাদি হিংস্র জন্তুগণ, পিশাচাদি অশরীরিগণ, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাহার মাংস ও শোণিতে তাহাদের বুজুক্ষা ও পিপাসা নিবৃত্ত করিতেছে। মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অস্থি চৰ্বণ করিতেছে। শোণিত শোষণ করিতেছে। অঙ্গসমূহ চোষণ করিতেছে। তখন যদি তিনি বেদনা অনুভব না করেন, ব্যথা না পান, অন্ততঃ না হন, যদি তিনি তাহাদের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হন, তাহাদের মুখে সুখী হন, তাহাদের হর্ষে হর্ষ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন।” ১০

১০। বলা বাহুল্য, এই সাধনা অসম্ভব কঠিন। ইহা অভ্যাস

ভারতেও এই বোধিসত্ত্বের সাধনা তিরোহিত হয় নাই। আজিও ভারতে বোধিসত্ত্ব রহিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ঝাশান-ভূমি তাহার সাধনক্ষেত্র। সেই সাধনক্ষেত্রে এইরূপ অপূর্ণ আত্মোৎসর্গের সাধনায় তিনি মগ্ন রহিয়াছেন। কৌপীনধারী, সর্বস্বত্যাগী, সর্ববাহুসম্পদহীন, দেহমাত্রসম্বল এই বোধিসত্ত্ব তাহার দেহের শেষ অস্থিখণ্ড পর্যন্ত জীবসেবায় উৎসর্গ করিতে সতত উত্তত রহিয়াছেন। সমস্ত জগৎ বিশ্বয়ে বিমুক্ত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

করিতে করিতে, কেহ বা উন্মাদ হইয়া যান, কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, কেহ বা স্বাভাৱ হাবাইয়া বিযাদগ্রস্ত বোগাক্রান্ত জীবন যাপন করেন।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৪

প্রাণ হারাইতে বসার কথা বলায় টুলু উত্তর করিয়াছিল—কি হারাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখেছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাতে সেটা তো তোমার চোখে পড়েছে না।

সেই থেকে সব কাজের মধ্যে চম্পার মন এই কথা করটির চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। শুধু কথাই নয়, টুলুর কণ্ঠেও ছিল অপরাধ নিশ্চয়তা। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এমন কিছু পাওয়ার ব্যাপার তো চোখে পড়ে না চম্পার সমস্ত জিজ্ঞাসন হুঁজিয়া। তবে ?...

এক হয় উদ্যোগের সফলতা, ব্রতসিদ্ধি, সব কথা শুনিয়া টুলু কি নিঃসন্দেহ হইল যে, তাহার চেষ্টা ফলিয়াছে,—চম্পা শেষ বান্ধের মত ফিরিয়াছে ? সেদিন ম্যানেজারের ওখান থেকে ফিরিবার পথে চম্পা যখন টুলুকে আটকায়, টুলু দারুণ বিতৃষ্ণায় বলিয়াছিল—কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে ? তুমি কিরূপে ?

শেলের মত বিঁধিয়াছিল চম্পার মনে সেকথা, কেননা ও সেই থেকেই ফিরিয়াছে, কিন্তু বলিবার তো উপায় ছিল না। টুলু যদি এত বিলম্বেও সে সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এই সম্ভাবনার আনন্দটুকু চম্পার সব কাজে রহিল মিশিয়া। প্রথমটা সে তাহার নূতন গৃহস্থালি গুছানোর লাগিয়া গেল। মিতিনকে বস্তি হইতে লইয়া আসিতে বেগ পাইতে হইল না। প্রথমত গোছালো মাহুম চায়ই একটু ভালভাবে থাকিতে, সেদিক দিয়া নূতন জায়গা পছন্দই মিতিনের, তাহার উপর হীরককে লইয়া সে যেন জোড়াগাঁথা হইয়া গেছে চম্পার সঙ্গে, এক ধরণের আত্মীয়তা হইয়াছেই, সেই সঙ্গে আছে টাকার স্বার্থ। চম্পা আবার পাঁচ টাকাটাকে দশ টাকা করিয়া দিল—টাকা লইয়া তাহার বরাবর একটা উদারতা আছে—হীরকের

ঝোরপোষের বাকি পাঁচটা টাকা নিজের হাতে রাখিল, পোশাক-পরিচ্ছদের জন্ত। প্রহ্লাদের একটু অনিচ্ছা ছিল, খনিটা হইয়া যাইতেছে বেশ একটু দূর। কিন্তু থতাইয়া দেখিল শ্রী কাছে থাকিলেই আর সবের দূরত্ব অগ্রাহ করা যায়।

বস্তিতে একটু চাঞ্চল্য উঠিল, তবে কৌতূহল সে রকম সন্দিক হইয়া উঠিল না। ভিতরকার ব্যাপারটা কাহারও জানা নাই। ছেলে লইয়া চম্পার সঙ্গে টুলুর যা সম্বন্ধ সেটা বৈরিতারই; তাহা ভিন্ন মাষ্টার মশাই যে এখানে নাই, টুলু একলা, সেকথাও প্রায় কেহই জানে না। মাষ্টার-মশাইকে আর টুলুকে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে, এরা মাহুমের ধারাপ দিকটাই সচরাচর দেখিতে পায় বলিয়া তাহাদের দেবতার কাছাকাছিই মনে হয়। মোট কথা, কোন কুটিল সন্দেহের পথে যাইবার অবসরই পাইল না বস্তির মনটা। চম্পা বলিল—ঠাকুরদাদা ঝড়া হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া থাকটা অধর্ম হয়, এই তো এক চোট ভুগিল খুব। লোকে বেশ বুঝিল; চম্পার স্মৃতি হইয়াছে দেখিয়া রুচি অনুযায়ী প্রশংসা করিল বা ঠোট উল্টাইল।

চম্পা জানে এ ওজুহাত টিকিবে না বেশী দিন, ভাবিল তবুও এই করিয়া ম্যানেজারের উদ্দেশ্যটা যত দিন ব্যর্থ করা যায়। এখন আর বলিবারই বা কি ছিল তাহার ?

প্রহ্লাদের শ্রীকে আনাইয়া লইবার কথায় প্রথম একটু ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল চম্পার, মনে হইয়াছিল, টুলু বদনামের আর একটা ধর বাড়াইল; কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিল উদ্দেশ্যটা,—চম্পার সঙ্গে আরও একটা পরিবার থাকায়ই বরং বদনামের আশঙ্কাটা কমিল। টুলু এর দ্বারা ম্যানেজারের চালের খানিকটা কাটান দিয়াছে।

ছুইটির জায়গায় আবার তিনটি পরিবার হইল, অত্যুক্তি হইলেও ছোট একটি পাড়া বলা যায়।

যেদিন মিটিং হইল জুলের, যেদিন প্রহ্লাদের পরিবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর দিনের কথা। রবিবার, জুল বসে নাই; খনিতে সবাই একটা দিন করিয়া ছুটি পায়, চম্পা পায় বুধবার, নূতন গৃহস্থালি পাতিবার জন্ত একটি সঙ্গিনীর সঙ্গে বদল করিয়া লইয়াছে ছুটিটা, বুধবার তাহার হইয়া খাটিয়া আসিবে। দুইটি সংসারের জিনিষপত্র কাল খানিক খানিক আসিয়াছিল, বাকিগুলি আজ সকালে বনমালী, চরণ আর প্রহ্লাদ আনিয়া হাজির করিয়াছে। বনমালীর বাসার উঠানে ডাঁই করা আছে, চম্পা আর তাহার মিতিন তুলিয়া তুলিয়া গোছগোছ করিতেছে। অল্প জ্ঞানগা—সে অল্পপাতে জিনিষ বেশী, কেননা দুইটি পরিবারই বস্তির হিসাবে একটু সম্পদ; তোলা-পাড়া গোছগাছ করার সঙ্গে একটু মাথাও ঘামাইতে হইতেছে।

এরা আসিয়াছে পর্যন্ত টুল আসে নাই এদিকে। আসিবার তো কোন দরকার নাই, নিলিগু ভাব বজায় রাখাই মনে হইল শোভন। দুইটা শিশুর পালা করিয়া, কখনও বা সমতানে কান্নায় একটু হইল আশ্রয়; জানালা দিয়া দেখিল একে, দুয়ে, তিনে জুল নূতন লোক সব আসিতেছে, ম্যানেজারও তাহার মোটরে আসিয়া জন দুয়েককে লইয়া নামিল; টুল বুঝিল মিটিং হইবে, আর যাওয়া হইল না। মিটিং ভাঙিবার পর ম্যানেজার এদিকে আসিল, মাষ্টার মশাইয়ের উপদেশ লইয়া একটু ব্যঙ্গোক্তি করিল, তাহার সমুচিত উত্তর দিলেও সম্মার পর হইতে যতক্ষণ জাগিয়া রহিল টুলের মনটা রহিল বিষাইয়া। বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না।

ঠিক করিল আজ সকালে যাইবে। সকালটি বড় চমৎকার আজ—এক একটা সকাল যেমন আসে মনের সমস্ত সঙ্কোচ সঙ্কীর্ণতা মুছিয়া দিয়া। মনে হইল ওদের এক রকম ডাকিয়াই আনিয়াছে, এহণ করার সহজ হাসি লইয়া দাঁড়াইতে হইবে বৈকি ওদের উঠানে।...আনন্দের জোয়ারই ওকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

আনন্দ কিন্তু হঠকাঙ্গী, চারি দিক ভাবিয়া দেখে না। বেশ লঘু পদেই গেট পার হইয়া যখন বনমালীর বাসার একেবারে কাছাকাছি আসিয়াছে, টুলের হাঁস হইল এ ভাবে গিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়ানো চলিবে না তো। সে চম্পার সঙ্গে পরিচয়ের জোরে বাইতেছিল, কিন্তু চম্পার সঙ্গে তাহার এত খনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাটা তো আর কেহই জানে না, কেননা তাহার সবটাই হইয়াছে এদের দুষ্টির অন্তরালে। বনমালীর কথা বাদ দেওয়া চলে, কতকটা না হয় চরণদাসেরও, কিন্তু প্রহ্লাদ রহিয়াছে, আর বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রী—টুলের এ রকম ওপর-পড়া হইয়া হঠাৎ উঠানে আসিয়া দাঁড়ানোটা ওরা কি ভাবে লইবে। এর ওপর চম্পা যদি আবার তাহাদের নূতন খনিষ্ঠতার ঐক্য ধরিয়া বেশ সহজ আলাপেই কোন কথা বলিয়া বসে—বলিবেই, এটাও ঠিক—তো সে কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে ওদের সবার চোখে।

টুল নির্দারুণ কুণ্ডায় বামিয়া উঠিল যেন, আগাইতেও পারে না, অথচ চলিয়া আসিতেও পা ওঠে না,—ওদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া দেখিলে কি মনে করিবে? কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় বনমালী বাহির হইয়া আসিল এবং তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—“ছোটবাবু যে। কি দরকার বটে?”

একবার একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তরটা জোগাইয়া গেল টুলের, বলিল—“ইয়ে, তোমার বাসার হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে ভাবলাম...”

বনমালীর মনটা কাল থেকেই ভরটা হইয়া আছে, একে-বারে উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল—“আজ্ঞে লাভনি এলোক যে, আমার সেবাটি করবেক—তার ছাওয়া কালো—হ্যাঁ আমার লাভনির ছাওয়া, আনুন আপুনিকে দিখাই, যা ভাবচেন সিটি নয় আজ্ঞে, আনুন ভিতরে পায়ের ধুলো দিন, আপুনিকে বলি সব কথা—সে রকম দোষের কথা নয় আজ্ঞে—আর পেঙ্গাদের বোঁ এলোক, পেঙ্গাদ এলোক...”

“কে বটে গো? কার সঙ্গে কথা বলছ?”

বলিতে বলিতে চরণও আসিয়া উপস্থিত হইল, টুলকে দেখিয়া কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া বলিল—“আপুনি? আমি কই বুড়া কার সঙ্গে কথাটি বলে।”

প্রহ্লাদও বাহির হইয়া আসিল। বনমালী বলিল, “তা আনুন আজ্ঞে ভিতরে পায়ের ধুলো দেন, আজ আপুনির আলীদাদে আমার ঘর ভরে গেলোক।”

জীবনে যে নিরীহ প্রবঞ্চনার দরকার মাঝে মাঝে সেটা টুলের ততক্ষণে উপলব্ধি হইয়াছে, একটু কি ভাবিয়া বলিল—মেয়েরা রয়েছে বনমালী—ধাক না এখন—আবার না হয়...”

বনমালী গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল—“হঁ, রইছে। রাজস্বাধি গো। আপুনির কাছে লজ্জা।”

গর গর করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল, এবং তখনই নেহাং টানিয়া না আনুক, কতকটা জোর করিয়া চম্পা আর তাহার মিতিনকে ডাকিয়া আনিয়া দরজার কাছে দাঁড় করাইল। চম্পা টুলের গলা শুনিয়াই ভিতরে কান বাড়া করিয়াছিল, আসিয়া এমন একটা গুঁদাঙ্গী লইয়া দাঁড়াইল যেন লোকটাকে পথের বাঁকে কোথাও দেখিয়া থাকিবে, এর বেশী নয়। টুল একবার চাছিল, কত শীঘ্র যে চম্পা অবস্থাটা বুঝিয়া নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য হইল।

বনমালী ওদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, ডান হাতটা চম্পার পিঠে দিয়া বলিল—“ই চম্পাটি আছে, আমার লাভনি, আপুনি শুনেছেন ইর কথা, কিন্তু দিখেন নাই, বড়ো ভালো মেয়েটি বটে...”

চূপ করিয়া না দেখার কথাই মানিয়া লইত টুল, কিন্তু দেখার সাক্ষী সামনে রহিয়াছে, প্রহ্লাদের বউ, টুল সভ্যে

মিথ্যায় মিলাইয়া বলিল—“না, দেখেছি একবার বনমালী, খনিতে।”

তাহার পর হাসিয়া বলিল—“কিন্তু তাতে খুব ভাল মেয়ে বলে তো মনে হয় নি, না হয় এই মেয়েটিকে জিগ্যেস করো না?”

নাতনির তাহার বিশেষ সুনাম নাই; টুলুর ইঙ্গিতটা নিশ্চয় সেই দিক দিয়াই মনে করিয়া বনমালী উচ্ছ্বাসের মুখে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়াই কিন্তু চার জনের মুখেই হাসি দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—“কি কথাটি আছে তোরা বুলবিক নাই বুঢ়াকে?”

চরণদাস সে দিন ছিল না, তবে ব্যাপারটা জানে, বলিল—“গল্পটির সবাই জানে, তু জানিস না তো কি হবেক?—উ ছাওয়ালটি তো বাবুই নিইছেলো, পেলাদের বউকে পুষবার তরে দিলেক, ট্যাকা দিলেক, তা তর লাতনি কেড়ে লিলেক নাই?”

প্রহ্লাদের বউ মুখটা চম্পার বাড়ের পিছনে লুকাইয়া বলিল, “আমাকে মারলেক নাই? গালি দিলেক নাই?—আমার জামা ছিড়ে দিলেক নাই?—ই, বড়ো ভাল মেয়ে বুঢ়ার লাতনি?”

সে নিজেও হাসিয়া উঠিল এবং অল্প সবার হাসিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—অবশ্য বনমালী ছাড়া। তাহার মুখটা গভীর হইয়া উঠিয়াছে, চম্পার পানে চাহিয়া তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলিল—“ইকি শুনি গো! পরের ছাওয়াল আপন বলে চালাস?—উকে মারলিক! হ।।।”

হীরক কান্না জুড়িয়াছে, চম্পা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিল, বনমালীর পানে একটু বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“তা উনিকে দিয়া দে ক্যানে, কে এমন ছাওয়ালকে রাখবেক গো?”

পরিচয় গোপন করিয়া নতুন পরিচয় হইল। এ নিরীহ প্রবঞ্চনাটুকুর দরকার ছিল; নহ্ন সত্য সব সময় চলে না জীবনে, সময় বুঝিয়া তাহার সঙ্গে একটু আড় টানিয়া দিতেই হয়।

এর পর কিন্তু টুলু আর কোন ব্যবধানই রাখিল না। “এস তোমার নতুন গেরস্থালি দেখি বনমালী”—বলিয়া নিজেই আগাইয়া গেল। সবাই যেন কৃতার্থ হইয়াই আগে-পিছে হইয়া তাহার সঙ্গে ভিতরে আসিল।

উঠানে পা দিয়াই টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল। একরাশ জিনিসপত্র উঠানে গাদা করা—শিলনোড়া বাসনপত্রের সঙ্গে, চৌকি, খাটুসি, বাস, ছ’একখানা অল্পবিস্তর সৌখিন আসবাব পর্যন্ত—আলনা, ত্র্যাকেট, নিশ্চয় চম্পার।” ঘরের ভিতরেও মেঝেতে কিছু কিছু ছড়ানো? চারি দিকটা একবার চাহিয়া লইয়া টুলু বিস্মিত ভাবে বলিল—“এ কি ব্যাপার?”

চম্পা হাসিয়া বলিল—“আপনি গরিবদের জিনিসের ওপর নজর দিচ্ছেন? একে ভয়ই না।”

টুলু বলিল—“কিন্তু তোমার ঠাকুরদাদার বাসার কথাও একটু ভাবা উচিত তোমাদের। ঐ তো ছুখানি ঘর।...তা নয়, আমি বলছিলাম মাষ্টার মশাইয়ের ত একটা চাকরের বাসা আছে, কিছু না হয় সেখানে গিয়ে ওঠ না।”

চরণ বোধ হয় সমর্থন করিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই চম্পা হাসিয়া বলিল—“ঠাকুরদার ঘর ভরল দেখে আপনার হিংসে হচ্ছে...”

টুলু উত্তর করিল—“হিংসে? এর কম করে ঘর যেন আমার কখনই না ভরে, ঘরের মালিককেই যাতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।...কি বল গো বনমালী?”

একটু হাসি যা উঠিল, বনমালী একটু রসিকতা করিয়া সেটাকে বাড়াইয়া দিল—“আজ্ঞে, লাতনিকে ঘর ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়াব—সিট ত ভাগ্যির কথা বটে।”

হাসির মধ্যেই টুলু বলিল—“আমার নাতনী নেই, সেই জেতে বোধ হয় তোমার ভাগ্যির কথা বুঝব না, তবুও এ ভাগ্যির হিংসে করি না বনমালী। যাক, একেবারে রাস্তায় না দাঁড়িয়ে না হয় আমার কাছেই চলে এস, আমার তবু সঙ্গী হবে এক জন।”

চম্পা একবার মুখের পানে দেখিয়া লইয়া বলিল—“আর এদিকে ঠাকুরদাদার জেতেই আমরা এলাম—বুড়ো হয়েছে, নিত্য অসুখ—মিতিমদের পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলাম। আপনার সঙ্গীর ব্যবস্থা আমরা আগেই করেছি,—বাবা আর পেলাদ-ভাই আপনার ওখানেই থাকবে, অবশ্য আমাদের মতন খনির কুলি-মজুরদের থাকা মানে রাতটুকু কাটানো।”

চরণ বলিয়া উঠিল—“আমি ক্যানে গো? আমার ছাড়া দে। পেলাদ যাবে বটে, উনি একজন সঙ্গী চাইছেন, তু ছজন চাপাচ্চিস—কষ্ট হবেক নাই?”

ওর শরিত্ত বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া চম্পা একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিল, বলিল—“তুর রোগের কথা জানেন উনি।... তা রপ্তে রপ্তে ছাড়তে হবেক নাই উ অব্যেসটি?”

চরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেছে দেখিয়া টুলু বলিল—“না, তোমার মেয়ের মতন অব্যেস নিয়ে আমি খোঁটা দেবার লোক নয় চরণ, তুমি আমার দলেই এস।...অব্যেস অব্যেসই, যখন চাইবে এক দিনেই ছেড়ে দেবে তুমি।”

বনমালী হাতমুখ নাড়িয়া বলিল—“তুর বাবার উ অব্যেসটি ছিলোক নাই? ভাব ক্যানে।”

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে সবাই হাসিয়া উঠিল।

প্রহ্লাদ আর তাহার স্ত্রী, দুজনেই একটু লাজুক প্রকৃতির, নিঃশব্দে সবার কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছিল। আর মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে হাসিতে যোগ দিতেছিল, টুলু তাহাদেরও কথাবার্তার মধ্যে টানিল, প্রহ্লাদকে টানিল তাহার কাজের

পরিচয় লইয়া, ওর জীকে, সেদিন বস্তিতে গিয়া ছেলে দেখার জন্ত তাহাদের বাসার যাওয়ার কথা লইয়া। জিজ্ঞাসা করিল টাকা যে দিয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার ছেলের জামা কেনা হইয়াছে ত ?

ছেলেটি ঘরে ঘুমাইতেছে—একটু ঘুমায় বেশী, চম্পা ছেলেটিকে দেখাইবার জন্তই মিতিনকে একটু ঠেলিয়া বলিল—“তু আশাটি পরায়” নিয়ে আর গো, উনির ধোঁকা হবেক নি ?”

হীরকের কোমরের গোটের জন্তও দুইটা টাকা দিয়াছিল টুলু; অবশ্য দুটাকায় গোট হয় না, তবুও কিন্তু নজরটা একবার তাহার খালি কোমরে গিয়া পড়িল।

প্রহ্লাদের বউ সেটা লক্ষ্য করিল, বাসার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, চম্পার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—“তু হীরার গোটের টাকার হিসাব দে উনিকে।”

চম্পা একটু হঠামির হাসি চোটে আনিয়া বলিল—“আমি তুর মতন বোকা নাকি গো ? ছেলের উপার্জনের টাকা পেটে ধোঁজি। খাবো নাই ? তুর মতন বোকা নাকি ?”

হাসিভরা দৃষ্টিটা একবার টুলুর মুখের উপর দিয়াও বুলাইয়া লইয়া গেল।

জুলের গেট হইতে বাহির হইয়াই দেখে সদর দরজার সামনে রাত্তার ধারটিতে এক বুড়ী একটা ছোঁড়া কাঁধা জুড়াইয়া জবুজবু হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটা ছোট মেয়ে, একটা ছোট ছেলে রাত্তার অন্ধধারে বোধ হয় হুড়ি সঞ্চয় করিতেছে। টুলুকে দেখিয়া মেয়েটি বুড়ীকে কি বলিতেই সে মুখটা তুলিয়া একটু যেন প্রস্তুত হইয়া বসিল। টুলুর মনে পড়িল বটতলার সেই মেয়েটি, তাহার দিদিমাকে লইয়া আসিয়াছে; পা চালাইয়া দিল।

একটু কাছে আসিতেই বুড়ী পায়ের শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটা টুলুর মুখের পানে তুলিয়া ধরিল এবং ডান হাতটা বাড়াইয়া ও মুখের ভাবটা যতদূর সম্ভব করণ করিয়া আরম্ভ করিল—“দেন গো রাজাবাবু, কিছু দেন গরিব বুড়ীকে—একটু লাভনি, একটু লাভি—খেতে পাই না...হুদিন ধেকে...”

টুলু লক্ষ্য করিল মেয়েটি বৈষ্ণবা আসিয়া গা ঠেলিতেছে—উদ্দেশ্য নিশ্চয়, ভাষা এবং ভঙ্গী আরও করণ করিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করা। ছেলেটিও আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। টুলু আসিয়া পড়িল, মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল—“তোকে না পরশ আসতে বলেছিলাম ?”

মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওর দিদিমা মুখে ধোসামোদের হাসি ফুটাইয়া আরম্ভ করণ কর্তে বলিল—“উয়ার দোষ নাই গো রাজাবাবু, উ বুলছে,

আমার বুখারটি হ'ল, আসতে পারলাম নাই, উয়ার দোষটি নাই।”

টুলু একটু যেন কি রকম হইয়া গেছে; ডিখানীও দেখিয়াছে চের এর আগে, মন কঠিন নয়, যথাসাধ্য দেয়ও, কিন্তু দারিদ্র্যের এমন মর্মগত ছবি এর আগে যেন দেখে নাই। হইতে পারে দৃষ্টি আত্মকাল এদিকে সজাগ বলিয়াই এমন মনে হইল; গলা যথাসম্ভব নরম করিয়া বলিল—“না গো বাছা, আমি সেজ্ঞে বলছি না, দোষ কেন হবে ?...তা জর-গায়ে এলে কেন এতটা পথ বেয়ে ? এই রোদুর...”

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—“না গো, জরকালে রোদুর উর মিঠা লাগে বটে...উর...”

মেয়েটি হাতে একটা চাপ দিয়া ইসারায় থামাইয়া দিল, ওর ভয় যেন বুড়ী আর ছোট ভাইয়ে মিলিয়া কিছু বেকাঁস বলিয়া এমন একটা স্রোযোগ নষ্ট করিয়া না ফেলে। টুলু ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর বুড়ীকে বলিল—“জরগায়ে না এলেই পারতে, যাক এসেছ ভালই হয়েছে, ভেতরে এস...”

বুড়ীর হাত ধরিয়া তুলিয়া দরজার মধ্যে পা দিল। ছেলেটি আর মেয়েটি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘুরিয়া বলিল—“আর তোরাও, বাঃ !”

মাঠার মশাইয়ের বাসার দেয়ালের বাহিরেই চাকরের বাসা, পাশাপাশি দুইটি ঘর, ঝড়িকির দরজার পাশেই পড়ে, উঠানের দেয়ালটাই ঘর দুইটার পিছনের দেয়াল। সেইখানে লইয়া গিয়া বলিল—“তোমরা এইখানটায় থাকবে, পাশেই আমি রইলাম।”

তিন জনেই কি রকম হইয়া গেছে। বুড়ী হির, দীপ্তিহীন চক্ষু মুখটা আন্দাজে টুলুর মুখের দিকে তুলিয়া একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—“ধাকব।”

একটা ছোট সিঁড়ি, তাহার পরেই এক ফালি বারান্দা, টুলু তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—“হ্যাঁ...তোমাদের জিনিস-পত্র কিছু আছে ?”

মেয়েটি হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—“আছে গো ! আছে; আনি গিয়া ?”

বুড়ী এই হঠাৎ সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, লোভ-আশঙ্কা মেশানো কর্তে অলিত ভাবে বলিল—“রাখবেন ?...কিন্তু আমি তো কানা আছি...কাজ তো কুরতাম...আর দিখতে পারি না...”

মেয়েটি জিনিসপত্র আনিতে যাঁইবার জন্ত পা বাড়াইয়াছিল, শঙ্কিত ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার বুকি সব কাঁচিয়া যায়।—টুলু তাহার পানে চাহিয়াই বুড়ীকে বলিল—“কেন তোমার নাটনী রয়েছে তো, কাজ করবে আমার...কি রে পারবি নি ?”

মেয়েটির পা সামনের দিকেই বাড়ানো আছে যেন চারি

দিকেই সামলাইবার চেষ্টা; বলিল, “ই পারব, পারব বটে...”

ভাই সিঁড়ির উপর উঠিয়া চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া সুপারিশ করিল—“উ রাত্রে, দিদিমা যিদিন চাল আনে, উ রাত্রে; সিজাই করতে পারে...”

ভ্রাতালয়ে আসিবার ঋতিয়েই হোক অথবা আনন্দেই হোক, মেয়েটি তাহার জীর্ণ কাপড়টাকে একটু মেরামত করিয়া লইয়াছে, এক জায়গায় অপেক্ষাকৃত একটা ফরসা তালিও দেখা যায়। বোধ হয় ভাই তাহারই উপর টুল্লর দৃষ্টি টানিয়া আনিল ভাবিয়া একটু গুটাইয়া স্টাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ওর চলিয়া যাওয়ার একটু পরে টুলু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—“কি আছে তোদের সেখানে?”

উত্তর হইল—“আমার কাঁধা আছে, উর কাঁধা আছে, বুড়ির নোহার সানকি আছে, নোহার গিলাসটি আছে।”

“কোথায় আছে?”

“চরণদাসের বাঁসার পিছনটিতে হুকানো।”

আন্দাজ আশ যত্ন পরে প্রায় ইন্ধুলের কাছাকাছি একটা করার শব্দ উঠিল—“আমাদের সব নিইছে, সব চুরি কর্যা নিইছে।”

“দিদি আইছো।” বলিয়া ছেলেটা ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া গেল। বুড়ী মাথাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একটু শুনিয়া, তাহার পর গভীর নিরাশায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—“যা, সব গেলোক।”

কান্নার আওয়াজটা নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং একটু পরেই মেয়েটি আকুল ভাবে কাদিতে কাদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল—“আমাদের কাঁধা নিইছে, আমাদের থালা নিইছে। গিলাস নিইছে।”

চম্পা প্রথমে গ্রাহ্য করে নাই, এ ধরনের কান্না বস্তির নিত্যকার ব্যাপার একটা; তাহার পর আওয়াজটা মাঠার মশাইয়ের বাসায় ঢুকিল দেখিয়া একটু কান পাতিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল। আসিয়া দেখে বুড়ী কাঁধাঝুড়ি দিয়া ছলিয়া ছলিয়া কাঁপিতেছে, ছেলেটা কাঁঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মেয়েটা ব্যাকুল কণ্ঠে কাদিয়া যাইতেছে আর টুলু তাহার একটা হাত ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া সাহুনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। পিছন ফিরিয়া ছিল বলিয়া চম্পাকে দেখিতে পায় নাই, চম্পা স্থির হইয়া খানিকক্ষণ দেখিল, তাহার পর একটু আগাইয়া সামনে আসিতে টুলু ফিরিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে।

চম্পা শাস্তকণ্ঠে একটু অহযোগের সহিতই বলিল—“এত অল্পতেই যদি চোখের জল ফেলেন...”

টুলু চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিবার

চেষ্টা করিয়া বলিল—“তা নয় চম্পা, আমি মনে করেছিলাম দুঃখ-দারিদ্র্যের এরাই চরম, এদের জিনিস চুরি করবার মতনও মাহুস তা’হলে আছে পৃথিবীতে? ছোটো ভাড়া লোহার বাসন আর ছুখানি কাঁধা—তার নয়না ঐ সামনেই দেখ না।”

২৫

বুড়ীর কাঁপুনিটা বাড়িয়াছে; অল্পখটা বাড়িয়াছে নিশ্চয়। তাহার পর এই নূতন অবস্থায় হরিষে-বিবাদ। চম্পার পারে একটু কৃণ্ডা যেন চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটিয়া উঠিল, তাহার পর সে সোজাই উঠিয়া গিয়া বুড়ীর মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—“কাঁপিস কেন এত রাঙা ঠানদি?” সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা কপালে চাপিয়া টুল্লর দিকে চাহিয়া বলিল—“জর হয়েছে দেখছি যে।”

টুলু বলিল—“হ্যাঁ, এতটা হেঁটে এসে বোধ হয় বাড়লও। বুড়ী তোমার জানা দেখছি যে...”

বুড়ী কাঁধাটা একটু টানিয়া জড়াইয়া বাড় গৌন্ডা অবস্থাতেই কাঁপা কণ্ঠে বলিল—“চম্পির গলা না?...এতোটুকু দেখছি...এতোটুকু...”

কতটুকু সেটা দেখাইবার জন্ত ডান হাতটা বাহির করিয়া একটু তুলিয়া ধরিল। একটু পরে সেটা কাঁপিতে কাঁপিতে আপনিই নামিয়া গেল।

বোধ হয় অদরকার বোধেই চম্পা আর টুল্লর কথার উত্তর দিল না। “দাঁড়াও আসি—” বলিয়া টুল্লর দিক থেকে একটু মুখটা ঘুরাইয়াই বাসার দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে এমন করিল গলার স্বরে সেটুকু বুঝিতে আর টুল্লর বাকি রহিল না।

মেয়েটি চুপ করিয়াছে, বোধ হয় নূতন অবস্থায় অভিভূত হইয়াই। বুড়ী বিড় বিড় করিয়া কয়েকবার কি বকিল—বোঝা গেল না, জরের তাড়সে ছ’একটা স্পষ্ট অক্ষরের সঙ্গে হিস হিস করিয়া শব্দ হইয়া মিলাইয়া গেল মাত্র। টুলু আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—“কিছু বলছ আমার?” বুড়ী একটু জোরেই বলিল এবার। ছেলেটি কাছেই ছিল, টুলু বুঝিতে না পারায় তাহার পানে চাহিতে বলিল—“বুলছে আগে সবাই রাঙা ঠানদিই বুলত।”

টুলু একটু ভাবিল—তাহার পর প্রশ্ন করিল—“এখন কি বলে?”

“রাঙি বুড়ী।”

মেয়েটি একটু তর্কের স্বরে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, “না, কানা বুড়ি...কানা ভিখ-উলিও বুলে।”

যেন অনেক দিনের নাগিশ একজন বিচারক পাইয়া জানাইয়া দিতেছে। ছেলেটি বলিল—“ই, তাও বুলে।”

বুড়ী আবার একটা কি বলিল—টুলু আবার প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই মেয়েটি বলিল—“বুললে—মিঠা লাগল তাই বুললাম।”

বুড়ী একটা কম্পিত অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল—“একটি বছরে”...
প্রানো একটা ডাকে মনটা বড় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে,
ছাড়িতে পারিতেছে না প্রসঙ্গটা।

টুলু এবার ওর কথাটা বুঝিল, মনে মনে ওর বক্তব্যটা পূর্ণ
করিয়া লইল—একটি বছরে রাঙা ঠানদি থেকে কানা ভিখ-
টলি।...একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

চম্পা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মাহুরের মধ্যে
শুটানো একটা কবল আর বাগিস আনিয়াছে, এর অতিরিক্ত
নিজেকেও আনিয়াছে বদলাইয়া, নূতন দৃশ্যটাতে যে একটু
অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ভাবটা আর নাই, এবার বেশ
সপ্রতিভ। আসিয়াই একটু বিষয়ের ভান করিয়া বলিল—
“এখানেই দাঁড়িয়ে এখনও আপনি! যান এবার, নিজের কাজ
আছে তো।”

টুলু একটু হাসিয়া বলিল—“কাজ তো দেখছ...আমার
সামনেই...এনে তো ফেললাম, এখন...”

“ঐ এনে ফেলা পর্যন্তই আপনাদের কাজ, এখন আমার
এলাকা, আপনি যান।...হাঁ তখন কি যেন জিজ্ঞেস করলেন—
বুড়ীকে জানি কি না, জানি বৈকি, বস্তুরই তো মানুষ, ধনি
ছেড়েছে অনেক দিন, বছরখানেক আগে পর্যন্ত এর ওর
ফরমাস খেঁটে বেশ চালিয়ে এসেছিল।...বছর খানেকই হ’ল,
না গা রাঙাঠানদি?”

বুড়ী বলিল—“উ শাওনে পেলোক চম্পু।”

চম্পা বলিল—“আর এটা এই জুপি।...অদেষ্ট।”

একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, একটু অশ্রুমনস্ক হইয়া গেল,
তাহার পর টুলুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—“নি, এবার
যান আপনি...বেটাছেলের জায়গায়।”

টুলু যাইবার জন্ত পা বাড়াইয়া আবার ঘুরিয়া বলিল—“কিন্তু
...বেশ জর রয়েছে।”

বুড়ী কি ভাবিয়া মাথা ছ’ তিনবার নাড়িল। মেয়েটি
বলিল—“উর জর থাকেক আই...ভিখ মাঙতে হয় কিনা।”

চম্পা বলিল—“ঐ শুহুন থাকে না জর; জর থাকলে
পেট চলবে কি করে? আন্নার না তো।...যান আপনি।”

বিড়কি দিয়া টুলু ভিতরের উঠানে পা দিয়াছে, চম্পা
নামিয়া আসিয়া ডাকিল—“শুহুন।”

নিজের আগাইয়া গেল, বলিল—“জরের কথা মনে পড়ল,
—মাষ্টার মশাই তো ওয়ুধ দিতেন,—হোমিওপ্যাথি। নিশ্চয়
আছে বাজ় ধরে।”

টুলু বলিল—“আমি একেবারেই জানি না যে...”

“ওতে একেবারেই জানবার কিছু নেই, বই দেখে দেখে
লক্ষণ মিলিয়ে দেখ, আমি অনেককে দেখেছি। বইও নিশ্চয়
আছে তা’হলে; দেখুন না একবার।...লক্ষণ জর কাঁপুনি।...
গারে ব্যাথাও আছে রাঙা ঠানদি?...বলছে আছে। দেখুন
গিয়ে এবার। আর যা ওয়ুধ, ভুল হলে ভয়ের কিছু নেই।”

আছে খানতিনেক হোমিওপ্যাথির বই। টুলু একবার
এটা একবার ওটা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। কৌতুক
জাগাইতেছে। হোমিওপ্যাথির বিচারগুলো পড়িল, তিনটা
বইয়েই, তাহার পর ওয়ুধ, রোগ-লক্ষণ। এক এক সময় বেশ
লাগিতেছে, এক এক সময় বড় অশ্রুমনস্ক হইয়া যাইতেছে—
মনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে বুড়ী, ছেলেমেয়ে ছুটি,
চম্পা; বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে চম্পাকে—তাহার আবার
একটি রূপ নয়, কত দিনের কত রূপেই যে আসিয়া দাঁড়াই-
তেছে সামনে!...মন আবার অল্প দিকে ছুটিতেছে—আনিল
তো তিনটি প্রাণিকে ডাকিয়া, রাখিতে পারিবে ধরিয়া এদের
দায়িত্ব?...আর একটা কথা—চম্পা বড় বেশী কাছে আসিয়া
পড়িল না? বুঝিতে পারিতেছে না টুলু, অল্পভূতিটা সফলতার
আনন্দ, কি অনিশ্চয়তার অস্থিতি।...বইয়ে আবার মন
দিতেছে, কিন্তু বড় গোলমালে ব্যাপার—ওয়ুধে ওয়ুধে জড়া-
জড়ি হইয়া যাইতেছে—শুধু কাঁপুনি, জর আর গায়ের ব্যাথাতে
কুলাইবে না, রোগীকে আরও একরাশ প্রশ্ন করা দরকার।...
কিন্তু চম্পা এমনভাবে দখল করিয়াছে জায়গাটা যে যাইতে যেন
সাহস হইতেছে না, একজন দিগ্‌গজ ডাক্তারের মত গিয়া বুড়ি
বুড়ি প্রশ্ন করিতেও সন্কোচ হইতেছে—চম্পা ঠাট্টাও করিতে
পারে—কর্ষের মধ্যে এই নূতন রূপে সে যেন একটু রহস্য-
প্রবণও হইয়া উঠিয়াছে, টুলু গিয়া স্বেযোগই সৃষ্টি করিবে তো।

বই পড়িতে পড়িতে একবার কয়েকটি পায়ের শব্দে রাস্তার
দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখে চম্পা ছেলেমেয়ে দুটিকে লইয়া
স্কুলের দিকে যাইতেছে। একটু আগাইয়া গিয়া জানালা দিয়া
দেখিল, গতিতে নূতন উৎসাহ ছেলেমেয়ে দুটিরও—পিছন
হইতে দেখা হইলেও বেশ বুঝা যায় তাহারা এর মধ্যেই
অনেকটা বদলাইয়া গেছে, যেন কাহার যাত্রাপর্শেই। উহারা
স্কুলের ভিতর চলিয়া গেলে টুলু আবার ফিরিয়া বইয়ে মন
দিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই স্বেযোগে
বুড়ীকে লক্ষণ সব জিজ্ঞাসা করিয়া আসা যাক না।

গিয়া দেখিল জায়গাটিতেও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে
ইতিমধ্যে। ছ’টি ঘর-বারান্দা বেশ পরিষ্কার ঝাঁট দেওয়া, নিচে
খানিকটা দূর পর্যন্ত আগাছাগুলো কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার
করা। একটা মাহুরের ওপর কবল পাতা বিছানায়
বুড়ী শুইয়া আছে, এক দিকে খুরি ঢাকা একটি কলসীতে
জল।

আরামে বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এক ডাকে উত্তর
পাওঝু গেল না। টুলু চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিল,
বোধ হয় ভাবিল, এমন স্বেযোগ না পাওয়া যাইতেও পারে।
একটু জোরে ডাক দিতে বুড়ী জাগিয়া উঠিল। অনেকগুলি
প্রশ্ন, তার বেশীর ভাগই জটিল,—ডান দিকে ফিরিয়া শুইতে
ভাল লাগে, কি বাঁ দিকে ফিরিয়া,—এ সব প্রশ্নের উত্তর স্নহ
মানুষেরই পক্ষে দেওয়া শক্ত ত একটা অর্থব বুড়ী, গায়ে বোধ

হয় একশো তিন ডিগ্রি জ্বর। তবুও খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেল।

একটা রাত্তা হওয়ার ঔষধ-নির্বাচনে এবারে বেশ মন বসিল। ধরিয়া ছাড়িয়া ধরিয়া ছাড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড় করাইল, অবশ্য অনেকটা সময় গেল। ঔষধটা লইয়া দিতে যাইবে, দেখে চম্পা খিড়কি দিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন করিল—“পারলে না একটা কিছু ঠিক করতে?”

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া বলিল—“না পেরে থাকেন একোনাইট দেবেন—সব রোগেতেই লাগে দেখেছি।”

টুলু বলিল—“না, ঠিক করেছি একটা, চলো।”

“আমাকেই দিন, খাইয়ে দিচ্ছি।”

টুলু একটু ভাবিয়া বলিল—“আমিই দিয়ে আসি চলো। বুড়ী ভাববে ডেকে নিয়ে এলো, তারপর দেখা নেই; ভাববে না? মানে, অস্থখ-শরীরে মনটা যত ভাল থাকে ততই ভাল, নয় কি?”

এইটুকু খাতিরের অভাবে মন ধারাপ হবে না ওর, অত উচুদের কেউ নয়।

—চম্পার মুখটা হঠাৎ বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে, একটু কঠিনও, টুলু বিন্মিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“তোমার যেন রাগের ভাব চম্পা—হঠাৎ কি হ’ল?”

চম্পা সেইভাবে বলিল—“রাগের কথাই হয়েছে একটু—আপনি যত রাজ্যের জঞ্জাল-ওরকম করে এনে জড়ো করবেন না, আর করলেও খাটখাট করবেন না। এই একটা রোগা বুড়ী, কি রোগ তার ঠিক নেই...তখন এই মেয়েটাকে একেবারে প্রায় বুক জড়িয়ে আপনি ভুলুচ্ছিলেন, কত রোগের বীজ যে ওর শরীরে আছে...সেবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?”

টুলু একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল—“চম্পা, আমি প্রথমে খাদের সেবা করতাম তাঁরা নিত্য স্নান করেন, নিত্য কাচা কাপড় পড়েন, নিত্য ফুলচন্দনের মধ্যে থাকেন, মাষ্টার মশাই আমায় তাদের থেকে সরে এসে এদের সেবা করতে বলেছেন, আজ আবার তুমি এদের ছেড়ে সেই চন্দনের-সাবানের দিকে যেতে বলছ। এর বুঝা-পড়া তিনি এলে তাঁর সঙ্গেই করো’খন। আপাতত পথ ছাড়ো; এ কি, পথ আগলানো তোমার একটা রোগে দাঁড়াল নাকি?”

চম্পা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল সে ছয়য়ার সামনেই দাঁড়াইয়া আছে বটে, একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা ওধারে গিয়া টুলু ফিরিয়া বলিল—“বাঃ, তুমিও এস, দাঁড়িয়ে রইলে যে?”

চম্পা আসিয়া কতকটা নির্লিপ্ত ভাবেই বাইরের একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

রোগীর ঘরে আরও একটু ত্রী ফুটিয়াছে, এবারে অল্পভাবে। মেয়েটি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে; ছেলেটি পায়ের কাছে

বসিয়া আছে, বোধ হয় পা টিপবার কাজ পাইয়াছে কিন্তু মন বসাইতে পারিতেছে না। সেবার এই ছবিটুকু কিন্তু আরও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে অল্প ব্যাপারে—হু’জনেই তেল মাখিয়া স্নান করিয়া, পরিষ্কার হইয়াছে আর হু’জনেরই পরিধানে একখানি করিয়া আস্ত কাপড়, কতকটা পরিষ্কার। আস্ত অবশ্য সে হিসাবে নয়, নিজের কোন পুরানো শাড়ী থেকে ওদের যোগ্য করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে চম্পা। তবে সেটা আর বোঝা যায় না; তাহার বাইরের প্রমাণ এই যে, ছেলেটির কাপড়ের পাড়টা চওড়া। রোগীর গায়েও সে কাঁথাটি নাই, তাহার স্থানে একটা সুজনী; পুরাতন, জায়গায় জায়গায় সূতা আলগা হইয়া গেছে কিন্তু পরিষ্কার; এটা একেবারে ধোপদস্ত।

টুলুর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে, তিনটিকে আশ্রয় দিয়া সে বেশ একটু দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল মনে মনে—বিশেষ করিয়া বুড়ীর অস্থখের জ্ঞতা। চম্পা যে শুধু সমস্তটা মিটাইয়া দিয়াছে তাই নয়, এই অস্থখকে কেন্দ্র করিয়াই একটি সৌন্দর্যের পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। বেশ সুবিল টুলু এ ধরণের একটা কল্পনাই ওর মাথায় আসিত না।

বুড়ীকে তুলিয়া ঔষধটা বাওয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চম্পা যেন একটা কথা কহিবার জুই বলিল—“তুমি যে উণ্টো করে বললে,—সোজা করে বারণ করলে আমি এ ঘরে ঢুকতাম না।”

চম্পা একটু জ্ব কুঁচকাইয়া বলিল—“বুঝলাম না।”

“তোমার বলা উচিত ছিল আমার ছোঁয়াচে বরণ এদের অস্থখ হবার সম্ভাবনা আছে, আমার ঘরও এদের ঘরের মতন পরিষ্কার নয়। আজ নিজেও এদের কাছে দাঁড়াতে পারি না—তুমি যা দাঁড় করিয়েছ আর কি।...থাক একথা, একবার আমার ঘরে এস।”

ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—“এই পাঁচটা টাকা রাখ আপাতত, এদের খরচ।”

চম্পা হাতটা না বাড়াইয়া বলিল—“আমরা কি খাচ্ছি না এক মুঠো।—তার সঙ্গে এই এক কোঁটা এক কোঁটা ছুটো পেট, বুড়ীর আপাতত হু’বেলা হু’পয়সার সাবু।”

টুলু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“চম্পা, তা’হলে কথাটা বলি—আজ সকাল থেকে, মানে এদের তিন জনের ভার নেওয়া অবধি, একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই যে, যদি এ ধরণের কাজ আমি করতে চাই তো তোমায় কাছে পাওয়া আমার একান্ত দরকার, নইলে আমার বিভ্রম না তো বটেই, যাদের তুলব টেনে তাদের আরও বিভ্রম।”

চম্পার মনে হইল অণুরের মধ্যে কি একটা অপূর্ব মধুর স্বাদে চোখ দুইটি যেন বুজিয়া আসিতেছে, মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—“আমি আবার কি করলাম বুঝি না তো।”

টুলু নিজের কথার জের টানিয়া বলিল—“সত্যি, কাজ আমার একলার করতে গেলে সে কাজ অচল হয়ে পড়বে,

তুমিই যদি হাত দাও তবেই ভরসা। তা তুমি ত তোমার টুকু ভাল ভাবেই করছ, আমার একবার ডেকে বলতে হ'ল না। কিছু তো কতিও হ'ল—কাপড়ে বিছানায়, তাতেও আপাতত আমি কিছু বলব না, কিন্তু টাকার অংশটাও তোমার ওপর চাপাতে পারব না চম্পা, আমার বোলোও না, কেননা তাতে আমার পৌরুষে যা পড়বে বুঝতেই পারো এ কথাটার।... নাও, ধরো।”

চম্পা হাত বাড়াইয়া টাকাটা লইল, তারপর বলিল—
“একটা কথা জিজ্ঞেস করি।”

“করো।”

“অজ্ঞায় হবে, তবুও জিজ্ঞেস করছি—আপনি টাকা পাবেন কোথায়? উপার্জনের দিকে তো ঝোঁক নেই।”

“তুমি এই একটু আগে বুড়ীর মতন যত সব জঞ্জাল টেনে আনবার কথা বলছিলে। যত জঞ্জাল সব টেনে তোলবার আমার ক্ষমতা নেই, তবে এই রকম এক আধ জনকে—আরও ছ'এক জনকে নিয়ে চেষ্টা করতে পারি বোধ হয়।”

চম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া বলিল—“আমি ধর-পালানো ছেলে, তবে বাপ-মায়ের খেদানো নয়, তাঁদের মান্না, মমতা আমার বিরে থাকেই সব জায়গায়; বিশেষ করে মায়ের। টাকার আমার অভাব হয় না ভতটা, ভগবান বাবাকে ওদিক দিয়ে সামর্থ্য দিয়েছেন, বিশ্বাস করেন বলে আমি একটু প্রসন্ন পাই, বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে।”

চম্পা চূপ করিয়া আছে।

টুকু বলিল—“জানি এর বিরুদ্ধে বড় একটা যুক্তি আছে, বাপ-মায়ের টাকা এভাবে খরচ করা মান্য না—উপযুক্ত ছেলের।”

একটু হাসিয়া বলিল—“কিন্তু যে ছেলে অল্পযুক্ত অপদার্থ তার যে সবই মান্য, আর সবই মাপ। কি, তর্কটাতে তবুও ভুল আছে?....এর বেশী ভাবি, না চম্পা।...তুমি এবার যাও। বনমালীকে একটু পাঠিয়ে দেবে।

ক্রমশঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগৌরীহর মিত্র

আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীশিবকিন্দর সামন্ত মহাশয়ের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয় আলোচনা হয় এবং তিনি তাঁহার নিকট মহর্ষির ধ্যানস্থ ও রাজসিক যুক্তির অপ্রকাশিত ফটো, দার্জিলিং হইতে জামাতা জানকীনাথ ঘোষালকে লিখিত মহর্ষিদেবের চিঠির নকল ও দার্জিলিং এবং চুঁচুড়ার বাগীতে ব্যবহৃত তাঁহার রূপার বাসনকোসন এবং শীতবস্ত্রাদির তালিকা, জমা-খরচের নকল ও মহর্ষির কতকগুলি রচনাংশের *কপি ইত্যাদি থাকার কথা উল্লেখ করেন। আমি পরদিন শিববাবুর বাড়ী গিয়া ঐ সব জিনিষ স্বচক্ষে দেখিলাম এবং তাঁহাকে ঐগুলি কিছু দিনের অল্প ধার দিতে অস্বরোধ জানাইলাম। তিনি সানন্দে এই সমস্ত জিনিষ আমাকে ধার দিয়াছেন।

শিববাবুর পিতা রামনাথ সামন্ত মহাশয় সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মহর্ষির নিকট দশ বৎসরকাল কাজ করেন। মহর্ষি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। সামন্ত মহাশয় যখন তাঁহার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, মহর্ষিদেব তখন স্বহস্তে নিজের এই ফটোগুলি এবং তিনি যে অতি সাধারণ কেদারাটিতে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেটিও তাঁহাকে উপহার দেন। এক্ষণে শিববাবুর অস্বাস্থ্য ও সৌজন্ত উপরিউক্ত ফটো এবং পত্রাদি প্রকাশিত করিতে পারিয়া নিজেকে বড় মনে করিতেছি।

মহর্ষির পত্র ও রচনাংশসমূহ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে :

ও

২৬ বৈশাখ, দার্জিলিং

প্রাণাধিক জানকীনাথ,

আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই পৃথিবীতে আর অতি অল্প দিনই আছি। আমার এখানকার দিনের প্রায় অবদান হইয়াছে এবং এখান হইতেই আমার নবতর কল্যাণতর দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি। এখন আমার সম্যকরূপে যতির ধর্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন; অতএব পরিজনদের সঙ্গ হইতে বিবর্জিত হইয়া এখানে নির্জনে তাঁর সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পরিজনদের সঙ্গ চিত্তকে সমাহিত করিবার অন্তরায়। সহজেই সংসারের ধূলি আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুষিত করে। অতএব এই ভগবদীতার শ্লোকের অমুসরণ করিয়া আমাকে অবস্থান করিতে হইবে—

“যোগী যুক্তীত সততমাত্মানং রহসি দ্বিতঃ

একাকী যতচিত্তায়া নিরানীরপরিগ্রহঃ।”

অতএব তোমরা এখন এখানে আসিতে কান্ড থাকিয়া আমার এই যোগের আত্মকল্যাণ করিলে পরম সন্তোষলাভ

করিব। তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হউক এই
আমার শুভ আশীর্বাদ। ইতি ২৬ বৈশাখ ৫৮

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দায়জিলিং

মহাবির বিখ্যস্ত রচনা ও উদ্ধৃতি :

বর্ষ্য বুধা জ্ঞান বুধা জ্ঞান বিনা বল,
প্রীতি বিনা বর্ষ্য কর্তব্য বুধাছি কেবল। (মহাবি)

“ন সাম্প্রায়ঃ প্রতিভাতি বলং প্রসাদন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ং
অয়ং লোকোনাতি পরহৃতি মানী পুনঃ পুনর্বলমাপত্ততেম ॥”



মহাবির ধ্যানস্থ মূর্তি

“প্রসাদী ও ধনমদে মূঢ় নিকোঁধের নিকটে পরলোক
সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে,
পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে তাহারা পুনঃপুনঃ
আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আইসে।”

বৈঠিয়ে না বাহা তাঁহা কুসঙ্গ সঙ্গীয়া যাহা কায়ের কা
সঙ্গ হুর ভাগে পার ভাগে। কাজরকা কুঠরী মে কেসো
সীয়ান বসে কাজের কা এক দাগ লাগে পায় লাগে। কুলন
কা বাসন মে বৈঠি নেই নসন্মে কামীনকা কী সঙ্গ কাম
জাগে পায় জাগে। কামন কাহ বড় বৈঠ বৈরাগী নাই
হোণা হয়, মায়াকী এক কান্দ লাগে পায় লাগে।

সাবু সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোই,
অবত বাত কৈল গৈ জানত সব কোই,
মোর গিরিধারী গোপাল দুসরে ন কোই।

পরমাত্মার অনন্ত মূর্তি
জীবাত্মার অনন্ত গতি

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮

এক দিন আত্মা নীড়ে মাতার ডানার নীচে ছিল।
এখন ক্রমে তাহার পাখা উঠিতেছে এবং সেই দিন দুনিয়া
আসিতেছে যখন বাসা ছাড়িয়া মাতার সঙ্গে সে যুক্ত আকাশে
বিচরণ করিবে। (মহাবি)

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো ব্যোমা পরোয়ং।
কিমাৱরীবঃ কুহ কন্ত শর্মনংভঃ কিমাসীদগহনং গভীরং ॥১।

‘তদানীং’ সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্বে ‘ন অসং আসীং’
অসং ছিল না। ‘নো সৎ আসীং’ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ
তাহাও ছিল না। ‘ন আসীং রজঃ’ এক কণা রেণুও ছিল
না। ‘ন ব্যোমা’ ঐ মহা আকাশও ছিল না। নাপি ‘পরোয়ং’
উপরে যে স্থলোক তাহাও ছিল না। ‘কিং আবরীব’ যেমন
আকাশকে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রাহিয়াছে,
যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই
বা কোথায়? ‘কুহ কন্ত শর্মনং’ কোথায় বা কাহার এই সকল
ভোগ্য বস্তু। ‘অন্তঃ কিং আসীং গহনং গভীরং’ এই যে গহন
গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল ॥১।

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্বে অসং ছিল না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই
মহান আকাশও ছিল না। উপরে যে স্থলোক তাহাও ছিল
না। যেমন আকাশকে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ
করিয়া রাহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না, তখন আকাশের
এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই
সকল ভোগ্যবস্তু? এই যে গহনগভীর সমুদ্র তাহাও কি
তখন ছিল ॥১।

মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তর্হি ন রাজা অহু আসীং প্রকেতঃ।

আনীদবাতং স্বধরা তদেকং তস্মাদাত্তন্নপরঃ কিংচ নাশ ॥২॥

‘মৃত্যু আসীং অমৃতং ন তর্হি’ মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল
না। ‘ন রাজা অহু আসীং’ রাজার সহিত দিনও ছিল না।
‘ন প্রকেতঃ’ প্রজ্ঞানও ছিল না। ‘আনীং অবাতং স্বধরা
তদেকং’ তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক
ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। ‘তস্মাৎ হ অজ্ঞং ন কিকি ন আশ’ তাহা
ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ‘ন পরঃ’ এই বর্তমান জগৎও
ছিল না ॥২।

মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাজার সহিত দিনও
ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত
অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাহা ভিন্ন
আর কিছুই ছিল না, এই বর্তমান জগৎও ছিল না ॥২।

তম আসীত্তমসাগুচ্চ মগ্নেৎপ্রকেতং সলিলং সর্বমাহমং।

তুচ্ছে নাতু পিহিতং যদাসীত্তপসত্ত্বহিনাভ্যন্তরিতকং ॥৩॥

‘তম আসীং তমসা গুচ্চ অগ্নে’—অগ্নে সৃষ্টির পূর্বে

অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকৃতেঃ সলিলং সর্বং আঃ ইদং' এই সমুদায় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন মহাশূন্য সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছেন আতু অপহিতং যং আদীং' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্যের বীজ ছিল 'তং' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩।

অগ্রে সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদায় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন মহাশূন্য সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্বকার্যের বীজ ছিল তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩।

আমি জানিতেছি আমি পরিমিত জ্ঞান। আর আমি জানিতেছি যে আমি অনন্ত জ্ঞান হইতে হইয়াছি। আমি তাহাতে রহিয়াছি। তিনি আমার অন্তর্যামী, আমার জ্ঞান ধর্মের উন্নতির জন্য আমি এই দেহযন্ত্র এবং কর্মক্ষেত্র, এই পৃথিবীলোক পাইয়াছি। দেহ অবসান হইলে আমি আমার অন্তর্যামীকে লইয়া পৃথিবীলোক হইতে চলিয়া যাইব এবং আমার জ্ঞানধর্মের উন্নতি অহুসারে আমার গতি হইবে।

ব্রহ্ম রূপাধি কেবলং ব্রহ্ম রূপাধি কেবলং ব্রহ্ম রূপাধি কেবলং পাপ নাশ হেতুরেব নতু বিচার বাগ্ বলাং। দর্শনস্ত দর্শনেন নেমেনতু নির্মলঃ ॥ বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানেন ভবতি তাত কিং ফলং ॥ পুণ্যপুঞ্জেন প্রেমধনং কোপিলভে তস্ত তুচ্ছং সকলং যাতি মোহাৎ তমঃ প্রেম রবেরভ্যদয়েভ্যাতিতত্ত্বং বিমলং ॥ প্রেমমুখ্যো যদি ভাতিক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং ॥

(নীচের রচনাংশটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ)

যে তাহাকে তাহার লক্ষ্য এই থাকে তাহার আদর্শ লইয়া মদন? আমার দেবতা যিনি সেই দেবতার সাদৃশ্য যে তার আমি কতক উপলব্ধি করিতে পারি আমি যে তোমার দরজায় আসিয়াছি।

তাহা হইতে পরিজ্ঞান পাই তোমার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারি



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাজসিক মূর্তি)

তিনিও অপহৃত পাপা? আছেন তাহা একবার এই ফল যে যখন আমার আত্মাকে পাপমনা মনে করিয়া তাহার কাছে কাছে যাইতে পারিব।

তাহার সাদৃশ্য করা ও পাপমনাছান করা তিনি যেমন অমূর্ত আমিও সেইরূপ অমূর্ত কিন্তু আমার আত্মা পাপমনা দ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে

আমার আত্মাকে অপহৃত পাপা করা যতদূর পারি চেষ্টা করা..... আনন্দরূপ.....

তাহার যখন জরা নাই, শোক নাই, যত্ন নাই সত্য-কাম, সত্য সঙ্গ এই যখন জানিবে তখন তোমার যেমন— (আর লেখা নাই)

বঙ্গে ধর্মাস্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা

(শতবর্ষ পূর্বে ও পরে)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

সম্প্রতি বোম্বাইতে অসহায় হিন্দু নরনারীকে যে ভাবে কোরপূরক ধর্মাস্তর গ্রহণ, নিষিদ্ধ ষাণ্ড-ভক্ষণ এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করানো হইয়াছে তাহাতে দেশের মধ্যে বর্তমানে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এবং সমাজের নেতৃবর্গ এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, উক্তরূপ ধর্মাস্তর গ্রহণ এবং বিবাহাদি রূপ নিগ্রহে ধর্মাস্তরিত ঐ 'বিবাহিত' নরনারী 'পতিত' বা স্বধর্মহীন হইবে না, তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে হিন্দু সমাজের নেতাদের একটি বিষয় বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। একথা অবজ্ঞা করিবার করিবার উপায় নাই যে, হিন্দু সমাজ-মধ্যে এমন বহু ক্ষত রহিয়াছে যাহার সুযোগ লইয়া অজ্ঞ ধর্মাবলম্বিগণ যুগে যুগে হিন্দুদিগকে এইরূপ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত ও সাহসী হইয়াছে। রাজশক্তি যখন যে সমাজের অস্থূল থাকে, তাহার প্রভাব অজ্ঞদের উপরও নানা রূপে আশ্রয়-প্রকাশ করে। পূর্বে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ধর্মাস্তরকরণ রাজশক্তির সহায়েই হইয়াছে। আধুনিক কালে ও-রূপটি ছব্ব না খটিলেও অসুস্থ মন এখনও একথা ভাবিয়া উৎফুল্ল হয় যে, রাজশক্তি যখন সপক্ষে তখন বৃষ্টি নির্বিরোধেই এই কার্য সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ 'শাসিত', তাহারা ঐক্যবদ্ধ না হইলে প্রবলতর পক্ষকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। হিন্দু-সমাজে এখনও এমন সব বিধিনিষেধ আছে যাহার দ্বারা তাহার সমাজশক্তি স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছে না। এই সব বিধিনিষেধের বেড়াছাল একেবারে না ভাঙিতে পারিলে বা আত্মল সংস্কার না করিয়া লইলে প্রবলতর পক্ষের লোলুপ দৃষ্টি পূর্বের ভায় বর্তমানেও হিন্দু সমাজের উপর পড়িতে থাকিবে। সাময়িক ভাবে কোনরূপ নির্দেশ বা পাতি দেওয়া অত্যাশঙ্কক সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে হইলে সর্জনসাধারণের মনে এই দৃঢ় প্রভীতি জন্মানো প্রয়োজন যে, ধর্মাস্তর গ্রহণে যে ব্যক্তি 'পতিত' তাহাকে স্ব-সমাজে কিরাইয়া লইতে কোনই বাধা নাই। এই মনোভাব সাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইলে পরধর্মীরা হিন্দুদের উপর অত্যাশঙ্কক এমন লোলুপ দৃষ্টি হানিবে না। শতবর্ষ পূর্বে এই উদ্দেশ্যে একটি সমাজ প্রচেষ্টার সূচনা হয়। ইহা তখন খ্রীষ্টধর্মের স্রোত রোধ করিতে বহুলাংশে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্বগামী-দের উক্ত প্রচেষ্টা আজিকার দিনে কর্তব্য নির্ণয়ে সহায়তা করিবে।

২

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয় ১৮৩৫ সনে। ইহার পূর্বেই খ্রীষ্টান পাণ্ডুরা ইংরেজী শিক্ষার আইন করিয়া ভারতবাসীদের, বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রণী হয়। ঐ বৎসর ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ভার যখন সরকার গ্রহণ করিলেন তখন তাহারা স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার অবহেলা হইবে ভাবিয়া প্রাচীনপন্থীরা শঙ্কিত হইলেন। তখন কলিকাতার বহু গণ্যমান্য মুসলমান নেতা ও মৌলবী সরকারের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তাহারা এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, হিন্দু এবং মুসলমানদের খ্রীষ্টান করাই এরূপ শিক্ষা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য।* হিন্দুরা বরাবর ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী হইলেও, মুসলমানেরা এ কারণ ইহা হইতে বিরত থাকে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের মূলে ছিলেন সরকারের ব্যবস্থা-সচিব টমাস বেবিংটন মেকলে। তিনি রাজনীতিতে উদার মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ভারতবাসীদের এবং তাহাদের স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহার মত মোটেই উদার ছিল না। খ্রীষ্টান পাণ্ডীদের মত তিনিও চাহিতেন, ইংরেজী শিক্ষার মারফত পাশ্চাত্য ভাবধারা আয়ত্ত করিয়া ভারতবাসীরা যেন খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানদের ঐ ধারণা যে একেবারে অমূলক ছিল না, বিলাতে পিতাকে লিখিত মেকলের একখানি পত্র হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। তিনি লেখেন—

"The effect of this [English] education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo who has received English education, ever remain sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy; but many profess themselves as deist, and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plan of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without efforts to proselytize; . . ."

* হোরেশ হেমান উইলসন ১৮৫৩, ১৮ই জুলাই পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির স্পক্ষে সাক্ষ্যদান কালে এই আবেদন-খানির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—

"After objecting to it upon general principles, they said that the evident object of the government was the conversion of the natives; that they encouraged English exclusively and discouraged Mohammedan and Hindu studies, because they wanted the people to become Christians."

মেকলে বলেন, “হিন্দুদের উপর ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অসাধারণ। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কোন লোক নাই যে তাহার নিজের ধর্মে সত্য সত্যই আস্থাশীল। কেহ কেহ ঐহিক সুবিধার জন্য নিজেকে হিন্দু বলে বটে, কিন্তু অনেকে ইতিমধ্যেই একেশ্বরবাদী হইয়াছে এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার পরিকল্পনাটি যদি ঠিক ঠিক অনুসৃত হয় তাহা হইলে আগামী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একজনও পৌত্তলিক থাকিবে না, আর খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কোন চেষ্টা না করিয়াই এমনটি ঘটয়া যাইবে।”

মেকলের সহকর্মী এবং তৎপ্রবর্তিত শিক্ষানীতির অগ্রদূত ও সমর্থক সার চার্লস ট্রেভিনিয়ামও ১৮৫৩ সনে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে বলেন—

“Educated in the same way, interested in the same pursuits with ourselves, they become more English than Hindoos just as the Roman provincials became more Roman than Gauls or Italians.”

কিন্তু মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনাটি ঠিক ঠিক কার্যে পরিণত করিতে হইলে খ্রীষ্টান মিশনারী বা পাদ্রীদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের পরামর্শমত কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাদি রচনায় আর বাধীনতা রহিল না। শিক্ষা-কমিটি পাদ্রী ইয়েটসের পরামর্শানুসারে স্থির করিলেন যে, বাংলা প্রকৃতি দেশ-ভাষায় যে-যে পুস্তক মুদ্রিত হইবে তৎসমুদয়ই প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করাইয়া কমিটির অগ্রমোদন লাভের পর ঐ ঐ ভাষায় অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে।* এরূপ করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—প্রাচ্য ভাব ও দর্শনবাদ পাঠ্য পুস্তকে যাহাতে না প্রবেশ লাভ করে তাহাই তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল।

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” (ফাল্গুন ১৭৬৭ শক) যে সকল হিন্দু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, খ্রীষ্টানদের প্রদত্ত তাহার সংখ্যার একটি তালিকা দিয়াছেন। পত্রিকার মন্তব্যসহ এই তালিকাটি দিলাম—

আগড়পাড়া গ্রামে ৮৫ জন। কাটোয়াতে ১৩৭ জন। কার্গাসভাড়াতে ৯৬০। কৃষ্ণনগরে ৩১০। কৃষ্ণপুরে ১০০। ষাড়িতে ১০০। গাঙ্গরাই স্থানে ১৭৫। চাটগাঁতে ১০৬। চাপড়াতে ৪২২। জলেশ্বরে ৪১। জাননগরে ১৯০। টালিগঞ্জ ৫৪৪। ঠাকুরপুরে ২১৭। ঢাকায় ১৮। তমলুকে ১১১। দিনাজপুরে ৬৮। নসিমাচকে ২৭৩। বরিশালে ৭০। বর্ডমানে ১৮৬। বহরমপুরে ১০০। বালেশ্বরে ১৫। বারিপুরে ১৩১২। মলয়াপুরে ২৫। ঘোশাহরে ৩২২। রত্নপুরে ৮৫৮। রামমাধান চকে ১৬০। লক্ষ্মিপুরে ২৫০। শিউড়িতে ৮২। ঈরামপুরে ৯। সাধমহলে ৩৪। সোলোতে ৮৭০। হাবড়াতে ১৯৫ জন।

“আমারদিগের দেশস্থ লোক দৃষ্টি করুন যে তাহারদিগের

শিক্ষা-বিভাগ হইতে ক্রমে সরকারী অস্ত্র বিভাগেও পাদ্রীদের প্রাধান্য অহুত হইতে লাগিল। রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৫১ সনের ৭ই অক্টোবর ডক্টর উইলসনকে একখানি পত্রে লেখেন—

“Missionary influence is now on the ascendant. Every department from the fountainhead of Government to the lowest course of office is infected with it.”

৩

১৮৩৫ সনের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাহা কার্যকর করিবার পদ্ধতি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের বিশেষ অগ্রকূল হইল। এত দিন কলিকাতার মত বড় বড় শহরেই পাদ্রীদের প্রচারকার্য চলিতেছিল, চতুর্থ দশকে তাহার প্রায়ে ছড়াইয়া পড়িল এবং নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীদেরকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে লাগিয়া গেল। আর এ কার্যে বিশেষ অগ্রণী হইলেন আলেকজান্ডার ডাক। ডাক যখন ১৮৩০ সালে প্রথম কলিকাতায় আসেন তখন রাজা রামমোহন রায় স্কুল প্রতিষ্ঠার তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন বিলাত গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় স্কুলটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে হিন্দুদের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেও ডাক অল্পদিনের মধ্যেই নিজ মৃষ্টি ব্যরণ করেন এবং ডিয়ারেট প্রমুখ অজ্ঞাত পাদ্রীদের সঙ্গে একযোগে নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট খ্রীষ্টমতাদ্বয় প্রচারে তৎপর হন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রধানতঃ ইহারই উপদেশে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক প্রায় পাঁচ বৎসরকাল (১৮৩৫-৯) ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিয়া বহুতা দিয়া বেড়ান। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া *India and India Missions* নামক পুস্তক রচনা করিয়া কি পৌত্তলিক, কি বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের সকল শাখার উপরই তীব্র কটাক্ষ করেন। দেশিতে দেশিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও হইয়া যায়। ডাক ভারতবর্ষে ফিরিয়া পূর্ণোজ্জ্বল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে লাগিয়া যান। বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফত ছেলেদের কোমল মনে খ্রীষ্ট-কথা অহুপ্রবিষ্ট করাইবারও ব্যবস্থা করা হইল।

পাদ্রীদের এরূপ কার্যের কুফল সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ প্রথম দিকে ততটা সচেতন হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদিকে সর্বপ্রথম অগ্রণী হইয়া বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাবধারা বর্জন না করিয়া বরং তাহা গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত ছিল যে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে নিজস্ব ধর্ম ও অহংসাহ এবং অনলক্ষ্য প্রযুক্ত খ্রীষ্টানেরা কি প্রকার প্রবল হইতেছে। অতএব স্বধর্ম রক্ষা এবং কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম নিবারণ জন্য যেরূপ যত্নের আরম্ভ হইয়াছে তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দ্বারা মানস সকল করিতে সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।”

সংস্কৃতির ভিত্তিতে। বিজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আমাদের কাছে গ্রাস করিয়া ফেলিলে বহু সহস্র শতাব্দীপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। দেবেন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা করিয়া তত্ত্বাবোধিনী সভা ও তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অতিসন্ধি কঁাস করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রীরাও শীঘ্রই বুঝিল যে, তাহাদের এক জন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হইয়াছে।*

৪

দেবেন্দ্রনাথের প্রতিরোধ এতদিন আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি উহাদের প্রকাশ্যে বাধা দানে অগ্রসর হইলেন। ১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে নিজ কুটির রাজেন্দ্রলাল সরকার নামক জনৈক কর্মচারীর কিস্কিন্দু চতুর্দশ বৎসরব্যয়ক জাতা এবং ডাকের স্থলের ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার ডাক সাহেবেরই পরামর্শে একাদশ বর্ষিয়া নাবালিকা স্ত্রীকে লইয়া তাঁহার বাটীতে যায় এবং সেখানে কয়েকদিন মাত্র অবস্থান করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। 'হেবিয়াস কর্পাস' স্ত্রী উহাদিগকে কিরাইয়া লইতে চাহিয়া আবেদন করা হইলে সুপ্রিম কোর্ট তাহা নামঞ্জুর করেন। অথচ ইহার প্রায় বার বৎসর পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ান ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি চতুর্দশ বর্ষীয় বালককে পাদ্রীদের কবল হইতে হেবিয়াস কর্পাস অহুসারে উদ্ধার করিয়া পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিচার বিভাগের যখন এইরূপ বিপরীত দেখা দিল তখনই হিন্দু সমাজের টনক নড়িল। দেবেন্দ্রনাথ নিজ পত্রিকায় এই সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লিখিলেন যে, পাদ্রীদের মত হিন্দুদের পক্ষেও অবৈতনিক বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া নিঃসম্বল ছাত্রদের সেখানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া হিন্দু-প্রধানদের এই বিষয়ে ক্রুর উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আয়জীবনী'তে তিনি তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। (পৃ. ১০২-৩, বিষভারতী সংস্করণ)। তিনি তাঁহার কার্যে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ প্রগতিবাদী উভয় দলেরই আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিলেন। বহুদিনের বিবদমান হিন্দু-সভা এবং ব্রজ সভা এক হইয়া গেল। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৪৬ সনের ১লা মার্চ 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'

নামে একটি অবৈতনিক ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে এই স্থল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইবে জানিয়া দানবীর মতিলাল শীল ১৮৪৫ সনের ২রা জুন নিজ ভবনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং এতদ্ব্যতীত নিজ তহবিল হইতে এক লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া রাখিলেন।

এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সময়ে হিন্দুগণ পাদ্রীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির পরিবর্তে মাত্র নিজদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়সমূহেই ছেলেদের পাঠাইয়া খ্রীষ্টানীর শ্রোত রোধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কারণ তখন পাদ্রী-স্কুলে অক্ষরজ্ঞান হইবার পরই ছাত্রদিগকে অজ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতেও বাধ্য করানো হইত। আর এ হেতু তাহাদের মন অল্প বয়সেই খ্রীষ্ট-ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যাইত। হিন্দুগণ এবিষয়ে ক্রমে অধিকতর হুঁশিয়ার হইলেন। ১৮৪৭ সনের ১২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গোরাচাঁদ বসাকের ভবনে এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহারা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, অতঃপর তাঁহারা মিশনরীদের স্কুলে ছেলেদের আর পাঠাইবেন না। এই সভার একটি বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম। বিবরণটি মিশনরীদের প্রদত্ত—

"Hindoo Anti-Christian Meeting . . . The meeting crowded to excess by a curious and motely group of natives of every caste and creed . . . The proceedings began with Rajah Radhakanta Deb's taking the chair. It was resolved that a society be formed, named the Hindu Society, and at the first instance each of the heads of castes, sects, and parties at Calcutta, orthodox as well as heterodox, should, as members of the said Society, sign a certain covenant, binding him to take strenuous measures to prevent any person belonging to his caste, sect, party from educating his son or ward at any of the Missionary Institutions at Calcutta, on pain of encommunication from the said caste, sect or party. Many of such heads present signed the covenant. It was presumed that the example will soon be followed by the inhabitants of the Mofussil. One of the orthodox party present at the meeting said after its dissolution, addressing himself to the boys present, "Babas, be a follower of one God, (i.e., a Vedantist), eat whatever you like, do whatever you like, but be not a Christian."*

সভায় হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, মতের ও দলের যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আন্ততোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, হরকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এখানে হিন্দু সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। সমবেত ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মিশনরী বিদ্যালয়সমূহে কোনমতেই আর ছেলেদের পাঠানো হইবে না। যাহারা এই

*The Christian Observer (July 1840) লেখেন—

"Hinduism and Vedantism Missionary . . . The last and most novel movement on the part of the Hindu is that of the Vedists. They have, we understand, determined to send out Missionaries to preach the doctrines of the Vedas amongst the people. They also design to establish a *patshala* for the vernaculars in which the Vedas shall alone be taught. . . ."

*Hand-Book of Bengal Missions. By the Rev. James Long. 1848. P. 501.

সিদ্ধান্ত অমার্জিত করিয়া এই সব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাইবে তাহারা যে শ্রেণী, মত বা মলের লোক হউক না কেন, তাহা-
দিগকে সমাজচ্যুত করা হইবে। মঞ্চলেও এই আন্দোলন
সুরু করিবার কথা হইল। এই সময় মিশনরীদের দৌরায়ে
হিন্দুসমাজ কতখানি উত্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, উপরিউক্ত
বিবরণের শেষে উক্ত জনৈক রক্ষণশীল হিন্দুর উক্ত হইতে
তাহা বুঝা যাইবে। তিনি সভান্তে উপস্থিত যুবকদের সম্বোধন
করিয়া বলেন যে, তাহারা এক ইংরেজের ভজনা করুক, যাঁহা
ইচ্ছা করুক, যদৃচ্ছা আচরণ করুক তাহাতে কোনই
আপত্তি নাই, কিন্তু তাহারা যেন খ্রীষ্টান না হয়। হিন্দুসমাজের
এই আন্দোলন এবং অবৈতনিক বিজ্ঞানাদি স্থাপন হেতু খ্রীষ্টান
হইবার শ্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথ
লিখিয়াছেন—“সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার শ্রোত ব্যাহত হইল,
একেবারে মিশনরীদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।” (আত্মজীবনী
পৃ. ১০৬)। নব্যশিক্ষিত প্রগতিবাদী যুবকগণ পূর্বে যেমন খ্রীষ্টান
ধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িত, এই সময় হইতে তাহা ক্রমে বন্ধ
হইয়া গেল। অল্পকাল মধ্যে মিশনরীদের হিন্দুধর্ম নিন্দার
অসকরণে তাহারাও প্রকাশ্য স্থানে খ্রীষ্টধর্মের দোষত্রুটি
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। ভূদেব লিখিয়াছেন—

“কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাড়ীরা যেমন খ্রীষ্টধর্মের
প্রচার করিয়াছিলেন, অমনি তাহাদিগের পার্শ্বে নব্য ব্রাহ্মেরা
আপনাদিগের মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন
স্থানে সনাতন হিন্দুধর্মের স্বপক্ষেও দুই একটি বক্তৃতা হইতে
লাগিল। নব্যেরা এই সময়ে আর একটি উপায় করিয়া-
ছিলেন। এতদিন খ্রীষ্টধর্মই এদেশের ধর্মের প্রতি আক্রমণ
করিয়া ইহার দোষ প্রদর্শন করিতেছিল...এই অবধি নব্যেরা
খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাহারা যে সকল
মুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম মানিতেন না, তাহাদিগের
গ্রন্থ হইতে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া
ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি ছেলেরা ইংরাজী
পড়িলেই খ্রীষ্টান হইবে—এ আশঙ্কা ন্যূন হইয়াছে।” (বাংলার
ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৭) ইহার পর, শাসকবর্গের উপর,
বিশেষতঃ সরকারী শিক্ষানীতির উপরও মিশনরীদের প্রভাব
ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

৫

হিন্দুগণ, বিশেষতঃ হিন্দু যুবকগণ যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে
উদ্বুদ্ধ না হয় এ তো হইল তাহারই প্রচেষ্টা। কিন্তু যাহারা
ইতিমধ্যে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে তাহাদের উদ্ধার করিয়া সমাজে
পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থাও তো করা আবশ্যিক। সমাজের চিন্তাশীল
ব্যক্তিগণ এ বিষয়েও শীঘ্রই অবহিত হইলেন। ১৮৫১ সনের
প্রথম দিকে কলিকাতা ভবানীপুরে আবার মিশনরীরা কয়েক-
জন হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলে। এই সময় ঐ অঞ্চলের
নেতৃস্থানীয় লোকদের আগ্রহাতিশয়ে পুনরায় হিন্দু সমাজের

পক্ষে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। ১৮৫১
সনের ২৫শে মে তারিখে চিংপুরস্থ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি
ভবনে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে এই সভার
অধিবেশন হয়। এবারেও হিন্দু-সমাজ ভুক্ত রক্ষণশীল প্রগতি-
বাদী সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। এদিনকার সভায়
প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল—“যাহারা বেচ্ছার ও সভানে
পরধর্ম গ্রহণ ও ইহার আচারাতি পালন করিয়াছে, নিষিদ্ধ
খাদ্য খাইয়াছে তাহারাও যদি পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসিতে
চায় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজ্যমাত্র অর্থের
বিনিময়ে তাহারা তাহা করিতে পারিবে কিনা?” সে
যুগের বহু বিখ্যাত পণ্ডিতও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের
অধিকাংশই এরূপ ব্যবহার সপক্ষে মত প্রদান করিলেন।
কিন্তু এই সঙ্গে দেশের অজ্ঞাত অঞ্চলের পণ্ডিতদেরও মত গ্রহণ
আবশ্যক বিবেচিত হইল। সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রীয় নানা
বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের
বিভিন্ন বিধির উল্লেখ আছে এবং যুগে যুগে তাহার পরিবর্তনও
ঘটিয়াছে। বর্তমান কালে কড়ি মাত্রের বিনিময়েই ‘পতিত’ বা
ধর্মাস্তরিত ব্যক্তিকে স্ব-সমাজে ও স্ব-ধর্মে পুনর্গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।
সভার অন্তিমত এবং সভাপতির উক্তির উল্লেখ করিয়া শ্রীরাম-
পুরের মিশনরীদের পরিচালিত ‘ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া’ এই জুন
তারিখে ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর একটি মস্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ
ঘটনা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। (“Constitute one of
the most important events that has occurred in
India in the present century.”)।

হিন্দুদের এই সভা হইতেই যে ‘পতিতোদ্ধার সভা’র
উৎপত্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।* সভার প্রস্তাব এবং
সভাপতির উক্তি দুটো একটি প্রস্তাবনা রচনা করিয়া বঙ্গের
বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতদের নিকটে প্রেরিত
হইল। প্রস্তাবনা বা ভূমিকায় যে সব প্রধান সমস্তার কথা
উদ্ভাষিত হইল তাহার একটি হইল এই : পাড়ীগণ মুসলমান-
দের খ্রীষ্টান করাইতে বা মুসলমানগণ খ্রীষ্টানদের ইসলাম
ধর্ম গ্রহণ করাইতে বড় একটা আগ্রহ দেখায় না, অথচ উভয়েই
হিন্দুদের ধর্মাস্তর গ্রহণ করাইতে লালসিত হয়, ইহার কারণ
কি? ইহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে,—প্রথমোক্ত
ধর্মাবলম্বিগণের ধর্মাস্তর গ্রহণ করিবার পর পূর্বধর্মে ফিরিয়া
যাইতে কোনও বাধা নাই, পরন্তু হিন্দু সমাজে ইহার বিপরীত
রীতি বলবৎ। সমাজের লোকের যেরূপ মনোভাব তাহাতে
একবার হিন্দুর পক্ষে ধর্মাস্তরিত হইলে পূর্বধর্মে ফিরিয়া

* “ধর্মীয় সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যত্নে
কলিকাতায় পতিতোদ্ধারিণী নারী একটি সভা স্থাপিত হয়”—
“পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা”র তৃতীয়
সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আসা সাধ্যাতীত। তবে হিন্দুশাস্ত্রে মনু রাজবন্ধ্যা যে-সব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা কিসের জন্ত? পরন্তু বর্তমানে যদি সমাজকে রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ধর্ম্মান্তরিত জাতীগণকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনা একান্ত আবশ্যক। হিন্দু সমাজে পূর্বে এরূপ করা হইত। বর্তমান যুগেও রামমুলাল সরকার এরূপ কার্যে প্রতী হইয়া কয়েকজন ‘পতিত’কে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিত্তশালীদের মধ্যে কেহ কেহ খেজাচারী হইলেও পরে বৈদ্যবর্ধ্য বলে হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা যদি কখনও খেজায় বা প্রলোভনে পড়িয়া কিংবা অজ্ঞ যে-কোন কারণে পরধর্ম্ম গ্রহণ করে ও ‘পতিত’ হয় তাহা হইলে তাহাদের আর উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই সমাজে ব্যবহার-সাধ্য স্থাপন জন্তও তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা বিধেয়।

পতিতোদ্ধার সভার আবেদনে কাজ হইল। শ্রেষ্ঠতম সাত জন পতিত মিলিয়া একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন। তাহা উক্ত প্রস্তাবনা সহিত ‘পতিতোদ্ধার সভা’র পক্ষে “পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা” নামে ১৭৭৫ শকে (১৮৫০-৪) মুদ্রিত হয়। অম্বিকা, আগড়পাড়া, আটপুর, আড়িয়াদহ, উলা, উত্তরপাড়া, কলিকাতার আরপুলি, কলুটোলা, সিমলা, শোভাবাজার প্রভৃতি, কামারহাট, কুমারহাট, কুলীন-গ্রাম, কোরগর, গুপ্তপল্লী, গোবরডাঙ্গা, চিঙ্গড়িপোতা, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, পানিহাট, বংশবাটী, ময়মনসিংহ, সুরম্ভা, শান্তিপুর, হরিনাভি প্রভৃতি সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্রসমূহের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই শত জনের মধ্যে ছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইল এই যে, পরধর্ম্ম গ্রহণ এবং অত্যাচারজনিত অপরাধ হেতু পতিত হইলেও পূর্বধর্ম্মে ফিরায়া আসিতে কোন হিন্দুরই শাস্তগত কোন বাধা থাকিবে না। সামান্য মত প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর তাহাদের ‘অব্যবহার্যতা’ ঘোষা খণ্ডিত হইয়া যাইবে।

গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে হিন্দু সমাজের উপর মিশনরীগণ যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, সাধারণের, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ভিতরের ধ্বংস সাধিতেন তাহাদের বিশ্বাস, রাজশক্তি তাহার খুবই সহায় হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম, কিরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রগতিপন্থী এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল নেতৃবর্গ একযোগে কার্য্য করিয়া বিভিন্ন উপায়ে ইহাতে বাধা দান করতঃ কতকাংশে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার পর এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। জগতে বহু বিষয়ে বিপুল পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ধারাও যুগে যুগে বদলাইয়াছে। বর্তমানে শাসনে যে পন্থা অহুস্ত হইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশের শাসনদণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে একটি সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। ইদানীং কতকটা রাজনৈতিক প্রচারের ফলে এবং কতকটা ব্রিটিশের অদৃষ্ট হস্তের সহায়ে বঙ্গীয় সমাজের এক শ্রেণীর উপর নানাভাবে আক্রমণ চলিতে শুরু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণ একটি। সমাজনেতৃসমূহের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে আরম্ভেই বলিয়াছি। পূর্বযুগের মত বর্তমানেও হিন্দুদের সম্মুখ হইতে হইবে। কিন্তু এই সম্মুখোপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে। সমাজের তথাকথিত উচ্চ এবং তথাকথিক নীচ সকলের মধ্যেই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে যাহাতে সমান চেতনার উদ্রেক হয় তাহার উদ্যোগ করা প্রয়োজন। আর বর্তমান সময়ে ইহার প্রথম সোপান হইবে—বংশগত, জন্মগত, বা শ্রেণীগত ভেদবৈষম্য বিদূরণ এবং গীতার ‘গুণধর্ম্ম বিভাগঃ’ নীতি মানিয়া গুণী এবং কর্ম্মীর যথোচিত সমাদর। তাহা হইলে গত শতাব্দীতে যেমন খ্রীষ্টান হইবার প্রোত রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল আজিও অন্যবিধ ‘রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মগত পথ’ অগ্রাহ করিয়া প্রগতির পথে অবাস্থ্যে অগ্রসর হওয়া চলিবে।

প্রিয়া তুমি এই ধরণীর

অনিহারকাস্তি ঘোষ দস্তিদার

অনেক স্বপন নিয়ে ভারাক্রান্ত দিনান্তের শেষে
কত যত্ন পাড়ি-দেওয়া প্রিয়া মোর দেখা দিল এসে।
কত ঘুঘু ডেকে গেল—উড়ে গেল কত বুনো হাঁস,
আকাশের নীল ধূসী বুকে ক’রে রেখেছিলো ঘাস।
‘নবগন্ধা’—তীরে শুনি এলোমেলো বাতাসের সুর,
কত সন্ধ্যা কতবার ক’রে গেছে তাহারে বিদূর।
নয়ম ঘূমের মত ব’রে গেছে কত শেফালিকা,
জলে জলে নিবে গেছে কতবার কত দীপশিখা।

তারারা জেগেছে কত শতাব্দীর কত প্রেম নিয়ে,
তারি মধু-ভালোবাসা আজি কিছু ঘোরে গেল দিয়ে।
নিশুতি রাতের মাঝে ঝিকি ডাকে—কৈপে ওঠে বন,
ঘুম ভুলে কণে কণে তাই আমি হই উন্মন।
জোনাকির আলো-মাখা ঝুঁই ফুলে সুরভি অধীরঃ
তুমি এলে প্রিয়া মোর—প্রিয়া তুমি এই ধরণীর।

মৃৎশিল্পের ক্রমোন্নতি

শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি

মৃৎশিল্প সম্বন্ধে ইংরেজী এবং অজ্ঞাত মুরোপীয় ভাষায় অনেক বই আছে, কবে কোথায় এবং কখন মৃৎশিল্পের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়েও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এসম্বন্ধে পুস্তকাদি নেই বললেই চলে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় খনিজ পদার্থ বা তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মাত্র দু-চারখানা বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঠিক এই বিষয়ে কোন বই না থাকার দরুন, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় মৃৎশিল্প সংক্রান্ত পরিভাষার অভাবে ভারতীয় মৃৎশিল্পের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসে এখনও আলোকপাত হয় নি। এই সব নানা কারণে মৃৎশিল্প বিষয়ে লিখতে গিয়ে সম্যক ভাব-প্রকাশের জন্তে সময় সময় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার করতে হয়েছে।

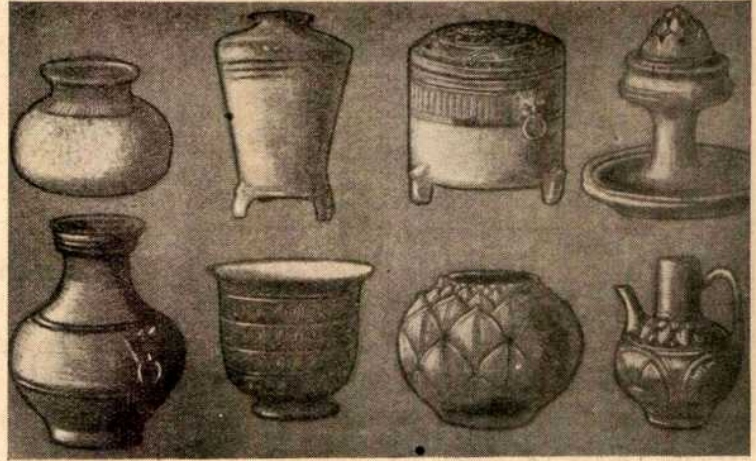
অজ্ঞাত কলা বা বিজ্ঞানের দ্বায় মৃৎ-শিল্পেরও নানা শাখা-প্রশাখা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই শিল্পের যাবতীয় বিভাগ সম্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করেছি।

মৃৎশিল্প বোধ হয়, পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। কখন কোথায় এবং কেমন করে এর প্রথম সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এই শিল্প মাহুষের আদিম মনোরত্তির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত বলে কেমন করে স্তরে স্তরে এর ক্রমোন্নতি হ'ল সেই কথাই বলব।

মাহুষ সব সময়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। প্রস্তরযুগে মাহুষ পাহাড়ের গুহায় বাস করত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বাসস্থানের পরিবর্তন হ'ল এবং মাহুষ গিরিগুহা পরিত্যাগ করে নদীর ধারে গাছের পাতা বা ঘাসে ছাওয়া কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল। প্রস্তর-যুগে যেমন তারা পাথরকে নিজেদের কাজে লাগাত তেমনই এখন তারা যে মাটির বকে বাস করত তাকেই কাজে লাগাল।

তারা দেখলে, ভিক্ষে মাটিকে নিয়ে চেষ্টা করলে যে রকম খুঁশি আকার দেওয়া যায় এবং সহজে সেই আকারের পরিবর্তন হয় না, এটা হ'ল মাটির স্বাভাবিক ধর্ম। ইংরেজীতে একে "Plasticity" বলা হয়, বাংলায় একে "নমনীয়তা" বলা যেতে পারে। আদিম যুগের মাহুষ নিজেদের খেয়ালখুঁশিতে ঐ সব ভিক্ষে মাটিকে নানা আকার দান করত। তারা যখন দেখলে, রৌদ্রের তাপে ঐ সব জিনিস শক্ত হয়ে যাব বটে

তবে আবার জলে ভিক্ষেলে নরমও হয়, এমন কি আকারেরও পরিবর্তন হয়, তখন তারা ভাবলে ঐ সব জিনিসকে আরও গরম করলে কি পরিণতি হয় তা পরখ করে দেখা উচিত। কাজেই তারা কাজে লেগে গেল। ঐ সব মাটির জিনিসকে আগুনে পোড়ালে, ফল হ'ল আশ্চর্য। আগুনে পুড়িয়ে যে জিনিস তারা পেল তা আর আগের মত ঠুনকো নয়, অল্প বা



চীনদেশীয় মৃৎশিল্প

মৃৎ আঘাতে ভাঙে না বা জলে পড়লে নরমও হয় না। এমনি করেই "মৃৎশিল্পের" গোড়াপত্তন হল।

তখন তারা মাটি দিয়ে হাড়ি, কলসী, খেলনা ইত্যাদি নানা রকম জিনিস তৈরি করতে লাগল। এই সব তারা তাদের খাণ্ডদ্রব্য তৈরি করার ছাঁচরূপে এবং খাণ্ডবস্তুর আধার হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। এই সব জিনিসকেই বলা হয় মৃৎপাত্র। এই সব মাটির জিনিস দিয়ে হয়ত তাদের কাজ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু এতেই তারা সন্তুষ্ট হতে পারলে না—দেখলে, সব জিনিস মনের মত হয় নি, হয়ত আকারে তারা সমান নয়, কোনটা পাতলা, কোনটা মোটা আবার কোনটা হয়ত টুটা-ফাটা। এগুলোর উন্নতির জন্ত তারা অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগল। এদের ভিতর যারা বেশী মাথাওয়ালা তারা দেখলে, শুধু হাতের দ্বারা যে জিনিস তৈরি হয় তা সব সময় মজবুত হয় না এবং তাদের যে সামান্য যত্নপাতি আছে (যা হয়ত পাথরের) তাও মৃৎপাত্রাদি গঠনের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। তখন যন্ত্রগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন যন্ত্র-নির্মাণের চেষ্টা চলতে লাগল এবং এরই ফলে পটাবুস ছইলের সৃষ্টি হ'ল, যাকে আমরা বলি "কুমোরের চাক"।



ইংলণ্ডের য়ংশিল্ল (কেল্টিক য়ুগ)

মাটির জিনিস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় য়ংশিল্লের প্রাচীনত্বের কথাই সর্বপ্রায়ে মনে হয়। ভারতে মাটি দিয়ে শুধু যে খেলনা তৈরি হয়েছিল বা ব্যবহারিক জীবনে য়ুক্তিকানির্মিত দ্রব্যাদিকে কাজে লাগানোই মাত্র হয়েছিল তা নয়, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনার সঙ্গেও মাটি ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। মাটি দিয়ে দেব-দেবীর য়ুক্তি নির্মাণ করে আমরা পূজা করে আসছি অরণ্যভীত কাল থেকে। এই প্রতিমা পূজা কতকালের সে বিষয়টি বিতর্কমূলক, কিন্তু এটা যে ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্যতম প্রতীক তাতে সংশয় নেই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা'হলে দেখি, ধাপে ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে। গিরিগুহা পরিত্যাগ করে মানুষ যখন গৃহবাসী হল তখন ধীরে ধীরে তার নজর পড়ল বাসগৃহের উন্নতিবিধানের দিকে—জল ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে মানুষ তখন মাটি থেকে তৈরি করলে ইট, টালি প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে হ'ল তার সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ। তাই মাটির জিনিসগুলি কিসে সূক্ষ্ম এবং নয়নযুগ্মকর হয় সেই বিষয়ে লোকেরা চিন্তা করতে লাগল। কেউ কেউ ভিজা মাটির জিনিসগুলি পোড়াবার আগে তাদের গায়ে জন্ত-জানোয়ার প্রভৃতির ছবি এঁকে কারুকার্যমণ্ডিত করলে।

এই সময় এক শ্রেণীর মানুষ নানা প্রকার জিনিস মিশিয়ে নানারকম রঙের সৃষ্টি করলে এবং সেই সব রং মাটির জিনিসের গায়ে লাগিয়ে হরেক রকম সূন্দর ও বাহারি দ্রব্য তৈরি করতে লাগল। এরই ফলে সৃষ্টি হ'ল সেই সব জিনিসের—যাদের এখন 'টালি' এবং 'টেরাকোটা' বলা হয়। এই জাতীয় জিনিসের যে এককালে খুব কদর ও প্রচার ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের য়াফ্রসমূহ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু এইখানেই এর শেষ হ'ল না। মানুষ তার সহজাত

সৌন্দর্য্যবোধের প্রভাব এড়াতে পারলে না। তখন তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন আরম্ভ হয়েছে। লঘু লাল রঙের মাটির জিনিস বা সেগুলোর উপর রং-করা জিনিস নিয়ে তারা সজ্জ হ'ল না। নানা রকম জিনিস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হ'ল। কোন্ জিনিস পোড়ালে কি রূপান্তর হয় তা তারা পরীক্ষা করে দেখলে এবং নানা রকম জিনিস বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে মিলিয়ে পোড়ালে কি হয় তাও তারা জানতে পারলে। তখন তারা সাদা রঙের জিনিস তৈরি করার জন্ত সচেষ্ট হল, এই পরীক্ষাতেও তারা সফলকাম হ'ল।

সাদামাটির সঙ্গে চূণ-জাতীয় পদার্থ মিলিয়ে ও পুড়িয়ে তারা সাদা রঙের

হরেক রকম জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। তখনকার দিনে তারা এই সব জিনিসের কি নাম দিয়েছিল তা আমরা জানি না, এখন এই সব জিনিসকে আমরা চীনা মাটির পাত্র বলে অভিহিত করি।

কুমোরের চাকের সাহায্যে কেমন করে শুভে শুভে য়ুগ-পাত্রের উন্নতি হ'ল তা আমরা দেখলাম, এখন যে জিনিস-গুলো পাওয়া গেল সেগুলো আগের থেকে বেশী সাদা, সূন্দর ও শক্ত। কিন্তু একটা খুঁত তাতে দেখা গেল। এই সব জিনিসের "সচ্ছিদ্রতা" (porosity) তখনও যায় নি। যখন এ সব পাত্রের ভিতর জল ইত্যাদি তরল পদার্থ রাখা গেল তখন সহজেই তা বোকা গেল, দেখা গেল যে, তরল পদার্থটি আন্তে আন্তে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন পরীক্ষামূলক গবেষণা আরম্ভ হ'ল কিসে এ সচ্ছিদ্রতা বন্ধ করা বা কমানো যায়। দুই উপায়ে চেষ্টা চলতে লাগল। যে সব জিনিস দিয়ে এই সব পাত্র তৈরি হত তার সঙ্গে ফেলস্পার (felspar) জাতীয় জিনিস মেশানো হ'ল যা আগুনের উত্তাপে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ কেউ উত্তাপের পরিমাণ বাড়িয়ে সচ্ছিদ্রতা কমানোর চেষ্টা করতে লাগল। এরই পরিণতি হ'ল "stoneware" বা পাথুরে জিনিস, যা তারা সাদামাটির সঙ্গে কম উত্তাপে দ্রবীভূত হয় এমন পদার্থ মিলিয়ে ও কিছু বেশী উত্তাপে পুড়িয়ে পেতে সক্ষম হ'ল।

এই জিনিসগুলি হ'ল পূর্বেরকার য়ুক্তিকানির্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা শক্ত ও মজবুত। কিন্তু তখনও সেগুলি মসৃণ হয় নি। কি করে তা করা যায় সেই বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা ও গবেষণা করে এমন একটি পদার্থের আবিষ্কার হ'ল যা পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে অল্প উত্তাপে পোড়ালে স্বচ্ছ ও

মুৎশণ আবিষ্কারের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় “গ্লেজিং”। আমরা জানি ‘গ্লেজ’ খুব কম উত্তাপে গলে যায় এবং এর ভিতর লিড অক্সাইড, বোরাক্স, ফেল্‌স্পার, সোডা, প্রভৃতি জিনিস থাকে। এই স্বচ্ছ মুৎশণ আবরণ মুৎপাত্রাদির পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী হয়েছিল। তা ছাড়া নানা রং মিশিয়ে এমন সব বিভিন্ন রকমের গ্লেজের সৃষ্টি হয়েছিল যা আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে মুৎপাত্রাদির টুটা-ফাটা ইত্যাদি সারিয়ে নিতেও বিশেষ ভাবে সহায়ক হত।

চীনা মাটির জিনিসের উপর এ ধরনের স্বচ্ছ আবরণের দ্বারা পোসেলিনের পাত্রাদির সৃষ্টি হল। এই সব জিনিস দেখতে সুন্দর এবং কাঁচের মত পাতলা কিন্তু একেবারে স্বচ্ছ নয়।

এমনই ভাবে ক্রমাগত পরীক্ষা ও গবেষণা করে শিল্পীরা মুৎশিল্পের উন্নতি সাধন করতে লাগল। তাদের অধ্যবসায়ের শেষ নেই। কি উপায়ে এই সব পোসেলিনের পাত্রাদি আরও সুন্দর করা যায় তার চেষ্টা চলতে লাগল। এরই ফলে এনামেলের আবিষ্কার হ’ল, যাকে বাংলায় “কলাই করা” বলা হয়। হরেক রকম রং দিয়ে শিল্পী পোসেলিনের পাত্রাদির উপর নানা কারুকାର্যের সৃষ্টি করলে। ফলে মুৎশিল্পকে আশ্রয় করে তার সৌন্দর্যবোধও ধীরে ধীরে চরিতার্থতা লাভ করতে লাগল।

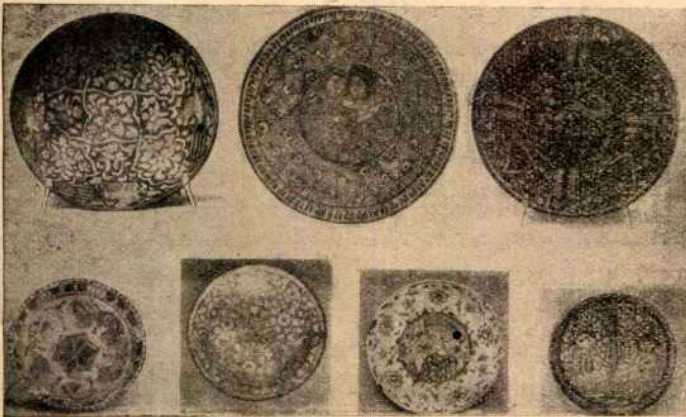


প্রাচীন গ্রীসদেশীয় মুৎশিল্প। (৭ম হইতে ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দ)

জিনিস নানা অংশে বিভক্ত করে একত্রে মিলিয়ে নানা জাতীয় কাঁচের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাকে বিবিধ কাজের উপযোগী করা হয়েছে। এখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাঁচের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, কাঁচকে এখন কাপড়ের ছায় ব্যবহারের চেষ্টাও পুরামাত্রায় চলছে।

কাঁচের সৃষ্টি ও প্রসার পরে হয়েছে। প্রাচীন যুগে কাঁচের আদর ছিল কম, বিশেষ করে ব্যবহারিক জীবনে। আমরা দেখলাম, কাঁচের মতন স্বচ্ছ জিনিসের দরকার হয়েছে গ্লেজিং সৃষ্টির পরে এরই আনুষঙ্গিক হিসেবে। কাঁচ কোথায় ও কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে

অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক কথা লিখেছেন। তার মধ্যে সার ডব্লু. এম. গ্লিন্ডারস্‌ যা লিখেছেন তা আংশিক ভাবে নিয়ে উল্লেখ করছি। গ্লিন্ডারসের মতে কাঁচ প্রথম তৈরি হয় এশিয়াতে, বিশেষ করে সিরিয়া-ইউফ্রেটিস অঞ্চলে। মিশর দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগে তৈরি কাঁচের জিনিস পাওয়া যায় তবে এগুলি এশিয়া থেকে আমদানী করা বলে মনে হয় ভারতবর্ষে মোহেন-জো-দাড়ো আবিষ্কারের ফলে যে সমস্ত যুক্তিনির্মিত দ্রব্য পাওয়া গেছে তার থেকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এদেশে মুৎশিল্পের, বিশেষ করে ‘পটারি’ ও ‘গ্লেজ’র উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।



ইরানীয় মুৎশিল্প

যখন গ্লেজ বা এনামেলের সৃষ্টি হ’ল তখন দেখা গেল যে, এর জন্মে কাঁচের মত স্বচ্ছ আবরণের দরকার। এই স্বচ্ছ ধরনের গবেষণা করে সিলিকা, লাইম, সোডা প্রভৃতি নানা রকম

ভারতবর্ষে কাঁচের আমদানী প্রথম সিংহল দেশে হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাঁচকে মুৎশিল্পের ক্রমোন্নতির শেষ পর্যায়ের ধরা ভুল হবে বলে মনে হয় না।



মেক্সিকোর যুৎশিল্প। (১৫০০-১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে)

যুৎশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে লাগল। যুৎশিল্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শিল্পেরও প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ধাতু-শিল্প। এই সময়ে শিল্পীরা বুঝল যে, মজবুত দ্রব্যাদি তৈরি করতে গেলে বেশী উত্তাপের দরকার। তাই আদিম যুগে শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে কাঠ ছেলে যে অগ্নি উৎপাদন করা হত তা যথেষ্ট বলে তাদের মনে হল না। এল কয়লার যুগ, ক্রমে ক্রমে গ্যাস এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের সূত্র হ'ল বহুল পরিমাণে।

খোলা জায়গায় যে অনেক উত্তাপ নষ্ট হয় এটা বহু প্রাচীন কালেই লোকেরা বুঝতে পেরেছিল। তখন গর্ত খুঁড়ে বা মাটির প্রাচীর নির্মাণ করে তার ভিতরে বিভিন্ন পদার্থ দক্ষ-করণের ব্যবস্থা হ'ল। বেশী উত্তাপও পাওয়া গেল এবং জিনিষও আগের চেয়ে উৎকৃষ্ট হল। কিন্তু এই সমস্ত অগ্নিদগ্ধ দ্রব্যাদিতে নানা রকম দাগ বা ময়লা লেগে থাকতে দেখা গেল। শুধু তাই নয় চারপাশের মাটির দেয়ালেও নানা রকম পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। কোথাও পুড়ে খুব লাল হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও বা আগুনের তাপে গলে যাচ্ছে। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বোঝা গেল যে, যে আধারে বা যে জায়গার ভিতরে জিনিসগুলি পোড়ানো হচ্ছে তার সর্বত্র সমান তাপের সৃষ্টি হয় না এবং পাত্রগুলোও কাকের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। তখন কি ভাবে এই সব আধারের উন্নতি সাধন করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা সূত্র হ'ল। আগুনের উত্তাপে যাতে আধারের কোন ক্ষতি না হয়, অথচ জিনিসগুলি ভাল ভাবে তৈরি হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। তখন শুধু মাটির দেওয়ালের বদলে নানা রকম খনিজ পদার্থ মিলিয়ে

সেগুলোকে দগ্ধ করে এমন এক রকম জিনিসের সৃষ্টি হল যাকে এখন আমরা Refractories ('উচ্চতাপ-সহিষ্ণু') দ্রব্য বলে থাকি।

রিফ্রাক্টরিয়জ বলতে বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন জিনিস বোঝায়। এদের প্রধান গুণ হ'ল, এরা খুব বেশী উত্তাপ সহনক্ষম এবং অল্প জিনিসের সংস্পর্শে সাধারণতঃ এদের কোন পরিবর্তন হয় না। এদের অল্প অনেক গুণও বর্ণিত আছে।

প্রথমে আধার (container) কে একটি পাত্রের রূপ দেওয়া হল। এগুলি দেখতে সাধারণতঃ বাক্স বা বড় জালার ভায়। এদের নাম দেওয়া হল

"Pots" বা "Mettle"। কিন্তু চাহিদা যত বাড়তে লাগল পাত্র বা আধারের আয়তনও তত বাড়তে লাগল। এর ক্রমোন্নতিতে এমন একটি স্তর উপস্থিত হ'ল যখন শুধু একটি বড় পাত্রে কাজ চালানো সম্ভব হয়ে উঠল না। প্রথমতঃ বড় বড় পাত্র তৈরি করা সহজ নয়, দ্বিতীয়তঃ দগ্ধ করবার সময় ঐ সব পাত্র বিনষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

এই অন্তরায় এড়াবার জন্য শিল্পীরা তৈরি করতে লাগল এক ধরনের ইষ্টক যাকে বলে রিফ্রাক্টরী ব্লকস। পরে এই সব ইষ্টক বা বিভিন্ন আকারের জিনিসগুলি একত্রে জুড়ে তৈরি হ'ল ওডেনস বা ফার্নেস যাকে বাংলায় বলে উল্লন বা চুল্লী। এর ভিতরে জিনিসগুলি সুন্দর ভাবে পোড়ানো সম্ভব হ'ল।

ধাতুশিল্পীদের দরকার হ'ল বড় বড় ফার্নেসের যার ভিতরে তারা নানাবিধ খনিজ পদার্থ মিলিয়ে ও দ্রবীভূত করে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু উৎপন্ন করতে পারে। এই সব কাজ ১৫০০/১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কম উত্তাপে হয় না। এইজন্য যুৎশিল্পীদের অনেক গবেষণা করে বিশেষ বিশেষ উপাদানে এমন সব আধার সৃষ্টি করতে হয়েছে যার ভিতর লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু সকল দ্রবীভূত হয়ে জলের মত তরল আকার ধারণ করে অথচ ফার্নেসের কিছু ক্ষতি হয় না। শুধু তাই নয়, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু তৈরি করার সময় যে slag বা মল বেরোয় তার ক্ষয়ের শক্তি খুব বেশী। সে বিষয়েও যুৎশিল্পীদের দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হয়েছে।

ব্যবহারিক দৃষ্টান্তে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুসমূহের কদর বেশী, কেননা তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, যুৎশিল্পীদের সাহায্য ব্যতীত এ সব জিনিসের সৃষ্টি হত না।

অধ্যাত্ম-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আজ নানাদিক থেকেই দেখবার ও জানবার চেষ্টা চলছে। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সবদিকেই আলো পড়ছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার দিকটা এখনো লোকের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর ধর্মমত বা দার্শনিক-তার আলোচনা যদি বা মেলে, ব্যবহার-জগতে সাধনা-পরিচয় ঘুলুঙ। এদেশ ধ্যান-ধারণা, জপতপের দেশ—এখানে সাধারণের কাছে একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পান অনেকটা এই সব প্রক্রিয়ার ঐশ্বর্যে। কোন গুরু নাম শুনেগেই লোকের কোতূহল জাগে আগে তাঁর তপস্তার দিকটাতেই। লোকে দেখে তাঁর বিভূতি, তাঁর শিষ্যসংখ্যা। রবীন্দ্রনাথও আখ্যা পেয়েছেন—“গুরুদেব”। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জপতপ আদৌ কিছু করতেন কিনা, কিংবা কি সব করতেন, তার কথা বড় একটা জানার মধ্যে নেই। অথচ ভারতের একজন গুরু, সেই-তপস্তা-ধারণার কিছু চিহ্ন না নিয়ে কি ক’রে তিন গুরুদেব হয়েছেন, সেই হচ্ছে কোতূহলের বিষয়।

অবশ্য সাধনার কথা গুহ্য কথা। নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং উপযুক্ত ধারাবাহী ছাড়া এ সব বিষয়ে কথা কইবার অধিকারী যে-সে হতে পারে না। কিন্তু এদিকে এখনো তেমন কোনো আলোক-পাতনের সহায়তা সাধারণ পায় নি। না পেয়েছে বরাবর তাঁর কাছ থেকে, না অল্প কারো থেকে। তাই এ প্রশ্ন কেবলি জাগে “গুরুদেব”র গুরুত্ব কোথায়?

তাঁর মৃত্যুর মাসাধিক আগে, মধ্যাহ্নে স্নান সেরে গুরুদেব এসে উদয়নের একতলায় বসেছেন, আহ্বানের প্রতীক্ষায়। সে সময়কার পার্শ্বপরিচর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মশায়ও বসেছেন এক পাশে। তাঁর সঙ্গে কবির স্বধন-তখন অনেক কথাই হত, তা গভীর হাল্কা সব ভাবেরই। কথায় কথায় সেদিন কবি তরল আলোচনা হিসাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—“তুমি আন্তিক না নাস্তিক।” উত্তরে সুধাকান্ত বাবু বললেন, “আমি মশায়, আন্তিক এবং নাস্তিক মিশ্রিত জীব।” কবি বললেন—“সেটা কি রকম?” সুধাকান্ত বাবু বললেন—“আমার চিন্তায়, প্রচলিত হৃত ও ভগবান আমার কাছে উভয়ই সমান। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে, হৃতকে ভয় এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমিও ভগবান কি, না জেনেই সকলের সঙ্গে মিশে সাকার-লিঙ্গাকার ভগবানকে গোঁড়ভাবে নমস্কার জানাতাম এবং ভয় না পেয়েও শ্রদ্ধানে-মশানে হৃতের ছবি কল্পনা করতাম। অথচ এই উভয় বস্তুর সঙ্গেই কোনকালে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি।” ঈশ্বর-প্রসঙ্গে সুধাকান্তবাবু একটু অবিশ্বাস ও পরিহাসের ছলেই এই উক্তি করে ফেলেছিলেন। অমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-স্বৈর পরিহার করে আহত চিত্তের উগ্র প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা সন্দেহ বলতে শুরু করলেন। সুধাকান্ত-

বাবু কবির এই গভীর ও গভীর উজ্জ্বল বিমূঢ় হয়ে গেলেন। প্রায় বর্টাখানেক একটানা শ্রোতে কবি এই বলেছিলেন—“ঈশ্বর আছেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মহাজন ধারা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, প্রকায় তাঁদের কথা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত; তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্যও অনেক বেশী। তাচ্ছিল্য করে তা ওড়াবার জিনিষ নয়। স্থলিত ভাবে নাস্তিকতার গর্ব করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তা অজ্ঞায়ও বটে।” কবি ঈশ্বর-সাধক ছিলেন তাঁর গভীর সত্তা থেকে। এই ঈশ্বরের বোধ অবশ্য কালে কালে নানাভাবেই ক্রমপরিণতি লাভ করেছে তাঁর জীবনে। শেষাবস্থায় এই ঈশ্বর তাঁর “মাহুয়ের ধর্ম” নামক গ্রন্থে এবং কাব্যসমূহে ভক্তিরসের ব্যক্তিব্যক্তির চেয়ে জ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক আনন্দরূপেই যেন বেশি প্রতিভাত। মন্ত্র ছিল তাঁর ঔ। পড়ে সে কথা আছে। আর একটি মন্ত্রও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল, সেটি “শান্তং শিবম্ অদৈতম্।” “যাত্রী” গ্রন্থে লিখেছেন, “যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতি, লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ ক’রে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে শান্তং শিবম্ অদৈতম্ মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে।” একটি মন্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেষ দিকে, সেটি হচ্ছে—“সোহং”। আর এক স্থানে বলেছেন, “আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি” উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।” এই সঙ্গেই আরও বলেছিলেন, “বিশ্ব স্থূল নম্, বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখছি, তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার মৃত্যু নেই।” এই উক্তি থেকেই বুঝা যায়, বিশ্বের সকল বস্তুকে স্বীকার করে তার বস্তুত্বের আশ্রয়ে যে রসসত্তা, তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভিতরে বাহিরে বস্তুতে ও অন্তর্ভুক্তিতে (বারসে) বিশ্বের সমগ্র ভাবের সেই উপলব্ধি দ্বারাই তিনি অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন।

দেখা যায়, একটি মূল প্রেরণা তাঁর আদর্শরূপে চিরদিনই তাঁকে ভিতর থেকে চালিয়েছে। সেই প্রেরণাটি তাঁর উপলব্ধির প্রেষ্ঠ সত্য, ধর্ম-কর্মের মূল সে জিনিষ তাঁর—বিশ্বযোগ। এই যোগ-প্রেরণা তাঁর ভিতরে প্রথম অল্প মেনে শৈশবের উপনয়নের পর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে। তিনি বলেছেন—“এই মন্ত্র চিন্তা করত করত মনে হ’ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। হুঁ ভূবঃ স্বঃ—এই ভুলোক অন্তরীক্ষ, আমি তার সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্বঃ বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।”

ধর্মপ্রেরণার মূল রেখাপাত কবির এইখানে, একেই সাধন করেছেন সারা জীবন। প্রক্রিয়ার কথা পরে আসবে, এখানে মূল নির্ধারণের সঙ্গে আর একটি তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করা যাচ্ছে যে, জীবন-আলো দর্শনের সাহায্যে এসে কবির ধর্মগুরুর কাজ করেছেন, একভাবে বলা যায় তাঁর পিতাই। কারণ তিনিই কবিকে বুঝিয়ে দেন এই গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য। পিতারই সমস্ত তত্ত্বাবধানের শিক্ষা কবিকে নিয়ে যায় শৈশব থেকেই সংস্কৃত-চর্চার পথে—ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে উপনিষদের জ্যোতির্লোকে। কবির নিয়মিত উপাসনার অভ্যাসও এরূপে তাঁর পিতার নিকট থেকেই পাওয়া। শেষদিকে এ কাজটি কবি করতেন লোকের অগোচরে, অতি প্রত্যুষে। লোকে জেগে দেখত তিনি হাত মুখ ধুয়ে দিনকর্মে প্রস্তুত। মধ্য জীবনে যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন, সে সময়ে এই উপাসনার কাজটি বাইরে একটু স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে অন্তরঙ্গ আশ্রমিকদের কাছে। তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, পূর্বপার্শ্বে মন্দিরসংলগ্ন যে ছোট বারান্দাটি আছে; কিছুদিন প্রভাতী আলো-আঁধারে গুরুদেবকে দেখা যেত সেখানে, প্রশান্ত ধ্যাননির্মীলিত নেত্রে সমাসীন। ঐ পর্বেরই তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণধারার সূত্রপাত। তা ছাড়া, সচরাচর তাঁর বাসগৃহ দেহলী ভবনের বিতলস্থিত সঙ্গীত খোলা ছাদটুকুতেই তাঁকে উক্ত অবস্থায় প্রতি উষার আসীন দেখা গেছে। ভোরে উঠে এই উপাসনার অভ্যাসের কথা তাঁর দেশবিশেষের জীবন-প্রাসঙ্গিক অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। সমাধিস্থ হলে যে ভাবতন্ত্রয়তা আসে তার পরিচয় কোনও জপধ্যানের প্রক্রিয়া থেকে কবিজীবনে স্থলভ নয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দৃষ্টি মন তাঁর এক এক ক্ষেত্রে তেমনি অবস্থাই যে প্রাপ্ত হয়েছে, গদ্যে পদ্যে তার উদাহরণ আছে বহু। সে অবস্থাকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দোপলব্ধির পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। জীবনমুষ্টিতে বর্ণিত শৈশবের সেই নারিকেল গাছের পত্রঝালরের ফাঁক দিয়ে দেখা স্বর্ষোদয় থেকে ‘নির্ঝর স্বপ্নভঙ্গ’, ‘প্রভাত-উৎসব’ কবিতা এবং শেষজীবনে সিক্কল পাছাড়ের স্বর্ষ্যাত থেকে ‘পত্রপুট’ কাব্যের প্রথম কবিতার প্রেরণা-দৃষ্টান্ত—এইরূপ দুর্লভ অপার্থিব আনন্দ-সন্তোগেরই অতীতম সাক্ষ্য রহন করে। পদ্মাপারে জমিদারীতে রুটির দোতলায় ঠাণ্ডিয়ে নববর্ষা-দিনের একটি উপলব্ধির কথার সঙ্গে, স্নানের ঘরে বাবার পথে জানলা দিয়ে বাইরের দৃষ্ট দেখার থেকে আর একবার এরূপ ভাবাবেশের অবস্থা ঘটে বলে উল্লিখিত আছে। প্রভাত-সঙ্গীত পর্বের স্বর্ষোদয়ের থেকে যে অভিজ্ঞতা

হয় সেইটাই কবির প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলে তিনি নিজেই বলেছেন, “সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।” ধ্যান-প্রাণায়ামের অঙ্কুরান দেখা যায় নি সত্য, কিন্তু তার ফল তাঁর জীবনে ফলতে দেখা গেছে। চৈতন্যকে স্বায়ত্তে এনে অনেক বার কবি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছেন। জাহাজে চলবার সময় জানলার একটি পাটের চাপ পড়ে আঙ্গুল একবার ধোঁলে যায়, সেই ছঃসহ জালার সময় মনকে পিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে রেখে ক্রমশ করে বেদনা ভুলেছিলেন, চিঠিতে তা লিখে গেছেন। অনেক শোক-ছঃধের মুহুর্তে জ্বরভূতিকে বশ করেছিলেন এই করে। ‘চিঠিপত্র’ জাতীয় বইয়ে তার অনেক সন্ধান মিলবে।

দেখা যেত সহজে এমনিতেই তিনি সোফায় বসে চোখ বুজে আছেন স্থিরভাবে, কোনও বিশেষ বাঁধা সময় করে নয়—যখন-তখনই এবং কোনও বিশেষ আসন বা মুদ্রার আভাসও নেই। ধ্যান-ধারণার চেয়ে এই গভীর মননের প্রক্রিয়াই তাঁতে বেশী প্রকট ছিল।

মানবজীবনের পূর্ব ও পরলোক রয়েছে যবনিকার ওপারে। ইহলোকের মধ্যে যা আছে, সেই পঞ্চভূতের কারবারই তবু যা সাধারণের প্রত্যক্ষ। এই কারবারের তত্ত্ববিচার ও প্রণালী নিরূপণ নিয়েই বিজ্ঞান। দেখা যায়, কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানানুরাগী। তার এই অমুরাগের মূল অমুরসন্ধান করলে দেখা যাবে, সর্বমামুষের যোগপ্রেরণাই তাঁতে নিহিত। কবিজ্ঞানোচিত অমুর-ভবের রাজ্যটি তাঁর অপ্রত্যক্ষের, চিন্তাও তাঁর অনেকখানি অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে। কিন্তু বিষয়কে যথাসম্ভব সকলের বুঝবার স্তরে এনে বলতে গিয়ে যোগ রেখেছেন বিজ্ঞানের। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাষণগুলির অনেক স্থলেই দেখা যাবে সাম্প্রতিক ঘটনা এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বহুল সমাবেশ। তাঁর গানে আছে—

“সবার মাঝারে তোমারে খীকার করিব হে।”

“বিধ সাধে যোগে যেখার বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাধে আমারো।”

মন ছিল তাঁর লক্ষ কোটি প্রাণী অভিমুখী। সকলের সঙ্গে মেলা যায়, এমন একটি সহজ সাধারণ স্বাভাবিক যোগসত্ত্ব নিয়েই তিনি ছিলেন স্বধর্ম পালনে সক্রিয়। জানকেন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিই মামুষের সেই যোগভূমি হওয়ার কথা, যেখানে শিক্ষা উপলক্ষে জাতিবর্ণশ্রেণী নির্বিশেষে সব মামুষ এসে মিলতে পারে একত্রে। পিতা মহর্ষিদেব গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন। কবি কার্যত করলেন তাকেই জ্ঞাননিকেতন, কিন্তু সেটাই তাঁর কাছে তাঁর নিজের সাধনাগীঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ‘আশ্রম’ শব্দের যোগ, বিশেষ করে তাঁর ভারত-পথের ধর্ম-প্রবণতাই স্মৃতি করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ও অগ্রজ* মনীষী বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তা ছাড়া, ঠাকুর-পরিবার একটি শাখা-ধর্মের ধারাবাহী। প্রাচীন সংস্কৃতির পঠন ও অধ্যয়নের সঙ্গে কবির স্বীয় শিক্ষা-জীবনের পরিমণ্ডলগত এই ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের ধর্ম-প্রভাবও পরিণত জীবনে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার রেলায় স্থূল-কলেজের স্থলে এই ‘আশ্রম’ গড়াতে ভিত্তির ভিতরে কিছু কাজ করে থাকবে। লোকসমাজে তাঁর ‘ঋষি’ আখ্যার হেতু এই আশ্রমও যে কিছু না হয়ে আছে এমন নয়। স্মৃতরাং ধর্মকেন্দ্রিক এই ‘আশ্রম’-তত্ত্বটির তাৎপর্য বিশেষভাবে এখানে বুঝে নেওয়া দরকার।

স্থূল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাধারায় প্রত্যক্ষ জগতের বস্তু-জ্ঞানকেই মুখ্য ধরা হয়। খেয়ে-পরে চলার ব্যবহারিক কাজ চালানোর কাজেই সেই শিক্ষার প্রয়োগ, এবং তা সংসারে কার্যকরীও বেশী, এজ্ঞত আদরও তার বেশী। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বাহ্যত ছেনে রাখা হয় মাঝ। এই করে অপ্রত্যক্ষ জীবনাংশ সেখানে গৌণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ মিলিয়ে বুঝ করে সমভাবেই জীবনকে সত্য বলে দেখেছেন। প্রত্যক্ষের বাস্তব জগতেই পরিসমাপ্ত ভাবে জীবনকে ধ্বংসরূপে দেখা নয়। অপ্রত্যক্ষের অসীম অনন্ত সম্ভাবনাময় ছেনে তাকে সমগ্র ভাবে এক বুঝে সত্য উপলব্ধি করা,—এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। গোড়া থেকে তাই ঈশ্বর নামে এক বুঝে সত্য বা বুঝে জীবনকেই করা হয়েছে মূলভিত্তি। ঈশ্বর সম্পর্কীয় যে আচরণ, ব্যবহারিক ভাষায় তাই হ’ল ধর্ম। উপাসনা ইত্যাদি এ প্রকারের ধর্মকৃত্যাদি দ্বারা সেই বুঝে জীবন-ধারণাই অহুত্তব এই ধর্ম জীবনে বহন করা হয়। সেই অহুত্তবে অহুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে নির্দিষ্ট প্রণালীমতে চিন্তায়, কথায়, কাজে প্রতিদিন গড়ে তোলাই ছিল পুরাকালীন আশ্রমের শিক্ষা। বড় জীবনের সাধক রবীন্দ্রনাথ ধর্ম জীবনগুলিকে গড়ে তোলার সাধনায় সেই আশ্রমের প্রণালীতে আশ্রমেরই পত্তন করলেন। তাই ধর্মের সংযোগে জীবনের যাবতীয় শিক্ষালাভ গোড়া থেকেই হ’ল এখানকার উদ্দেশ্য। সে ধর্ম সাধু চিন্তা ও সদাচরণের মধ্যেই প্রধানত অহুত্তিত্ব হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরের নিরাকার সত্তার উদার সাধনাশ্রমী। আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা হু’ বেলা এবং প্রতি বুধবার সকালে মন্দিরে সমবেত উপাসনার ভগবৎ স্মরণ বা অধ্যাত্ম-মননই এর আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। বহিরঙ্গের হাত-মুখ ধোয়ার সমান্তরালে অন্তরঙ্গের জ্ঞানও এই উপাসনা বা মননজীবনের মূল প্রেরণাশক্তির উৎস হিসাবেই এখানে দিনচর্যরূপ অবস্থা-কর্তব্যশৃঙ্খলার অন্তর্গত। বুধবার মন্দিরে উপাসনার পর উপদেশচ্ছলে আচার্য অনেক সময় স্ব-উক্ত ব্যাখ্যান দিয়ে ধর্মপ্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

উপাসনার অবস্থা-কর্তব্য সন্মুখে এই উপলক্ষে কবির অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তার মহার্ঘ

মূল্যদানই নির্দেশ করে। এ বিষয়ে যে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা-পরায়ণ ছিলেন আর একটি কার্য তার পরিচায়ক। এই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই আবার এমন কোন ধর্মীহুষ্ঠান কোনও আশ্রমবাসীকেই তিনি করতে দিতেন না, যা আশ্রমের সর্বধর্ম-সমব্রী জীবন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এই নিয়ে কোন কোনও স্থলে তাঁর কার্যে রুচতারও হয়ত কটাক্ষ আসবে। কিন্তু বিচার-শীল দৃষ্টির কাছে সেই কটাক্ষপাতের বিষয়টিই স্বভাবকে তাঁর আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। কারণ তদ্বারাই প্রতিজ্ঞাত হবে যে, তিনি ব্যক্তিগত আচার-অহুষ্ঠানের ধর্মের চেয়ে জাতিধর্মের গভীমুক্ত মানব-সমাজের বৃহত্তর যোগের সামগ্রিক জীবনকেই বড় বলে জানতেন, তা-ই নিয়েছিল তাঁর প্রথম পুঙ্খার আসন।

পিতৃচরিত্রের আত্মহুতার প্রভাব তাঁকে অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল। উপনিষদের শিক্ষাও তাঁকে ভাব-ব্যাকুলতার স্থলে বীর্ঘবৃত্তাতেই মন স্থির রাখবার প্রেরণা জুগিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে—শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার মন্দিরে গান ও উপাসনা হয়। দেশের অনেক অহুরূপ আরাধনায়, যেমন কীর্তনে ব্যাখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি কতকটা শিথিল হতে পারে, এখানে তা হয় না। যা হয়, তাকে রাশভারি অবস্থাই বরণে বলা চলে। শান্তিনিকেতন বাসকালে সমর্থাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রতি বুধবার মন্দিরে নিয়মিত ভাবে আচার্যের কাজ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, কখন কখন গানও করেছেন, তাতে উপলব্ধির আনন্দ জমেছে, উদ্ভাদনা জাগে নি। লোকের অন্তর্নিহিত বিবেক-বুদ্ধিকেই তিনি সশ্রদ্ধ সম্মান দিয়ে তার বিচারের কাছেই নিজের মননটি যেন প্রাত্যহিক আলাপের ভাষায় স্থাপন করতেন, কোন যোগপ্রক্রিয়ার ঐশ্বর্য্য অবতারণায় আত্মমহিমা বুদ্ধির সুযোগ নিতে চান নি। তাতে যেন তাঁর এক রকমের সঙ্কোচই ছিল। লোকে যেমন করে তাঁকে ভাবত, লোকের সেই ‘গুরু’-ভাবনাই ছিল তাঁর মনের পক্ষে গুরু-পরিপাকের বিষয়। বারবার বলেছেন—“আমি গুরু নই”। কিন্তু তবু তিনি গুরুদেবই রয়ে গেলেন। কোনরূপ ধর্মের ডেধ দ্বারা অস্ত্রের বিবেকবুদ্ধির উপর সঙ্কোচ বিস্তারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন সর্বদাই; এ জ্ঞত কাউকে দীক্ষাদানে তাঁর মন ছিল না। নিজে গুরু হতে চান নি, কিন্তু তা বলে এই গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না তাঁর কোনকালেই। কালে কালে বিশ্বের যেখানেই যারা গুরু বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন, তাঁদের সকলের সাধনা তিনি বুঝে উঠতে পারেন আর নাই পারেন, বিনয়নয়ন নমস্কারে সকলকে তিনি ভক্তি জানিয়েছেন এবং সকলকে তেমনই ভক্তি জানাতে বলেছেন।

কবি কাজ করেছেন আমরণ, সে কাজ সকল মানুষের মুক্তির জ্ঞত সকলকে নিয়ে সকল মানুষের যোগের কাজ। যুরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ধর্মের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ

ছই ধারাকে এক করে মিলিয়ে তিনি ভিতরে বাইরে পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাধনা করেছেন তাঁর “বিশ্বভারতী”তে। একজুই আশ্রমের আবাসিক জীবনে আচরিত ধর্ম—এবং বিজ্ঞান মানে মোটের উপর ক্লাসের বিস্তৃত ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা—ছই দিক দিয়েই বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আছে; এবং তার আশ্রমিক জীবনেও যে এই ছই বিষয়েরই সমান গুরুত্ব আছে, এ কথাও মনে রাখা দরকার। ধর্ম ও নিছক শিক্ষা উভয়কেই কবি এখানে সামঞ্জস্যে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। পাছে এই আশ্রম শুধুই পড়া শেওয়ার-নেওয়ার একটা ক্লাস-রুমের রুটিন বাঁধা খুল-কলেজ মাত্রে পর্যবসিত হয়, এই ভয়ে সর্বদাই ছিলেন তিনি শঙ্কিত। অনেকবার এই শঙ্কা থেকে আশ্রমের কোন কোন কর্মবিভাগ বর্জনেও তিনি উত্তত হয়েছেন। আবার তেমনই ভাবনা ছিল, পাছে এই ধর্মের দেশে ধর্মোন্মাদনার প্রাবল্যে কোন দিন এটা-একটা মঠ-মন্দির মোহান্তেরই জায়গা না হয়ে ওঠে।—মঠমন্দির বা ভগবানের নাম করে কোন একটা উপলক্ষে খুলি পাতলেই আর্থিক বনিয়াদের দিক দিয়ে বিশ্ব-ভারতীর জুড়ি তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতেন, এই সম্ভাব্য সুযোগের কথা অনেকবারই তিনি কৃত্রিম আপশোসের সহিত পরিহাস করে বলতেন। তাতে তিনি টাকা পেতেন কিন্তু মাহুষ পেতেন না। কিন্তু তাঁর সকল মাহুষকেই যে পাওয়া চাই। বিশ্বমৈত্রীই যে তাঁর বড় সাধনা। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মিলিত বিশ্বই যে তাঁর কাছে অখণ্ড সত্তার ভগবান। জানে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধি, কর্মে তাঁর নিবিড় সংযোগ। কোন আচারে বা প্রচারে কার সঙ্গে মিলিত বাধা পেলে সে যে তাঁর সাধনারই বাধা।

সারাজীবনের সকল কাজই ভগবৎ কর্ম, কবি তাঁর জীবনে এই ভাবেই সব কাজকে মর্যাদা দিয়ে দেখেছেন এবং তাই নিয়েই নিশ্চিন্তে নিয়ত সংসারের সকলের মধ্যে থেকে কর্মরত ছিলেন। জপতপের বিশেষ প্রকিয়া সেই মর্যাদাকে হীন করে বিশেষ পুণ্যগৌরবের সঙ্গে স্বভাবভাবে তাঁর জীবনে বা তাঁর আশ্রমে বিশেষ স্থান পায়নি। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এ জীবনে কিছু হ'ল না, শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে সাংসারিকতায় জীবন ব্যর্থ গেল, পরম ধন পাওয়া গেল না—এ সব স্মৃতি নৈরাশ্যের দীনবাণী তাঁর শেষ দিনগুলিকে ক্লান্ত বা নিশ্চিন্ত করে নি। এপারেও তাঁর পাওয়া, ওপারেও। কোথাও হান্ন-আপশোস নেই। “সময় হয়েছে, খেলাধরের এক কোঠা থেকে অল্প কোঠায় চলে চলে যাচ্ছি,”—এই যেন তাঁর শেষের ভাবধানা। হয়তো প্রচলিত মতে তাঁকে সাধক বলতে বাধা ঠেকবে, তাঁর আনুষ্ঠানিক জপতপের অভাব দেখে—কিন্তু, মাহুষ হিসাবে তাঁরই ভাষায় সেই “হু হাত দিয়ে বিধেয়ে ছোঁবার” মত বিশ্বদরদী মাহুষও সচরাচর বোধ হয় এমন কর্মই মিলবে।

সবার বড় সংস্কার শিক্ষা। মাহুষের জীবন গড়ে শিক্ষায়, জ্ঞান থেকে। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই তাঁর মুখ্য সাধনার বিষয় বলে বেছে নিয়েছেন গোড়া থেকেই। আর সেই শিক্ষার আচারে ও প্রচারে জীবনের প্রধান অংশই ব্যয়িত করছেন একনিষ্ঠায়। এক রকম বলতে গেলে, এই বিশ্বের জ্ঞানই নিয়েছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্থান, শিক্ষা ছিল সেই ঈশ্বরের সাধনা আর তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর কাছে সেই ঈশ্বরের নিত্যনৈমিত্তিক পূজামন্দির। শিক্ষা শুধু বসে বসে পঠনপাঠন নয়, তার বিষয় ও প্রণালীবৈচিত্র্যে তা যেমন সুপ্রসার, তেমনি দৈনন্দিন আহার-নিদ্রায় উৎসবে ব্যসনে, ব্যক্তি ও সমাজের সক্রীণ ও প্রসারিত গভীতে মিশিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে অর্ছ চেষ্টায় সে শিক্ষা পরম উপভোগ্য রূপে সত্তার পূর্ণতাবিকালী। সেই শিক্ষার সাধনা তাঁকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের মধ্যে নিয়ে গেছে, সে আনন্দও মুনি-ঋষির মুক্তির আনন্দের চেয়ে তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। প্রত্যক্ষত, বিশেষ করে শিক্ষাই যার সাধনপ্রক্রিয়ার অজুতম বিষয় ছিল, স্বভাবত শিক্ষিতদের মধ্যেই তিনি গুরুদেব হয়ে রয়েছেন। তিনি রসে মগ্ন ছিলেন, ঘর-সংসার, আত্মীয়স্বজন, নাচগান এবং মেয়েদের তাঁর জীবনে ও অন্তর্জনে সঙ্কট স্থান দিয়ে। কবির একটি কথা এ সম্পর্কে স্মরণীয়, এক স্থলে তিনি বলেছেন,—“আনন্দকে স্মরণকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই...আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বঙ্গ ক্রিয়া নয়; রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখন প্রাণ আসে। তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটার, ফল ধরার, সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।” জ্ঞান-কর্মের সঙ্গে কবির সাধনা সমভাবেই শেষ পর্যন্ত উৎসবময়ী রসাত্মক হয়ে ছিল ও আছে।

আর কোথাও নয়, মাহুষেই চরমতত্ত্ব, এই মাহুষের পৃথিবীতেই জানে কর্মে অহুতবে মাহুষের সঙ্গে মিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে, এই বলে লোকান্তরের দেবদেবী স্বর্গ-নরক ছেড়ে পৃথিবী ও মাহুষের মর্যাদা এবং মাহুষের উদার সর্বজনীন মিলনের আবশ্যিকতাকে একান্ত করে ধরে পৃথিবীর মাহুষেই দৃষ্টিবিস্তৃত, এই লক্ষণেই রবীন্দ্রসাধনা বিশ্ব-গুরুদের সাধনা-স্তরে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। আর কোনও ব্যারার সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক, নিজস্ব পথে ভালমন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাঁর লেখায়, তাঁর গানে, নৃত্যে, তাঁর উৎসবে, তাঁর সেবায়, তাঁর শিক্ষায়, ভ্রমণে, তাঁর আশ্রমে, গৃহধর্মে সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি সর্বাঙ্গীণ জীবনযোগের ধারা।

এই দেশে ত ধারাবৈশিষ্ট্যের অন্ত নেই। শব্দসাধক অধোর-

পছন্দী কাপালিক, আউল বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, আবার ব্রজ-জানী, সনাতনী কত কি। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারাপ্রবর্তকদের প্রত্যেকেই যে পূর্ব শিক্ষাবীক্ষা বা গুরুগোরব পেয়েছেন তারই ছবছ ধারা টেনে তাঁরা গুরু হন নি। নিজেরা প্রত্যেকেই এমন কিছু দিয়েছেন যে সাধন-প্রক্রিয়া বা বাণী-বৈশিষ্ট্যে তাঁরা পূর্বাচার্যদের মহিমা ছাড়িয়েও উত্তর হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের মত উত্তরকালে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশিষ্ট সত্তার, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গুরুর পরেও নতুন গুরু বলে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই ধারার গুরুত্ব বরণে নিত্যন্ত সন্কোচে বারবারই বলেছেন—“আমি গুরু নই, আমি কবি। আমি বিচিঞ্জের দূত।” কিন্তু তাঁর কর্মে ও বাণীতে মিলিয়ে যে ব্যবহারিক জীবন তিনি রচনা করে রেখে গেছেন, এই দেশে তা যে একদিন গুরুর বিশিষ্টতায় তাঁকে ঠাঁড় করাতে পারে, সেই সম্ভাবনা তিনিও যে একেবারে না দেখেছিলেন এমন নয়। এই বিষয়ে তাঁর ‘গুরু’র স্বীকারের নিষেধ-বাণীর পৌনঃপুনিক বহুল ব্যবহার এবং তীব্রতাই সেই কথা আরো মনে করিয়ে দেয়। কাব্যের এলাকা ছেড়ে দিয়ে জীবনের এলাকায়ও রবীন্দ্রনাথের ‘গুরু’র স্বীকার করবার নয়। সে গুরুত্ব তাঁর সমন্বয়-ধর্মে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের সমন্বয় করে জীবন পরিচালনা এবং মানুষেরও সর্বশ্রেণীর সংযোগ-স্থাপনে কায়মনোবাক্যের যোগ,—এই আদর্শ রেখে গেছেন তিনি বিরোধের জগতে। চারদিকেই তখন তাঁর মানুষে মানুষে হৃদয়ের চরম। তাঁর কাছেও বাস্তবের অধিকারভেদজনিত হাজার স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে

স্পষ্ট, কিন্তু তাহ’লেও জীবনের গোড়া থেকেই ভেদে এসেছেন তিনি একত্বকেই।

স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম কবি মত প্রকাশ করেছেন “আমার ধর্ম” নামক প্রবন্ধটিতে। তার উপসংহারে শুদ্ধিয়ে নিয়ে যা বলেছেন, তাতে বিচিঞ্জের মধ্যে এক মহান সত্তাকে পূজার কথাই পাওয়া যায়। কবির ধর্মধারণার জন্মবিকাশের আদিমূত্র হিসাবে রচনাটি মূল্যবান। তিনি তাতে বলেছিলেন, —“আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে ত তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের এক দিকে দৈত, আর এক দিকে অদৈত; এক দিকে বিচ্ছেদ, আর এক দিকে মিলন; এক দিকে বন্ধন, আর এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিঞ্জের মধ্যেও এককে পূজা করে।” আজ ধর্মে জাতিতে রাষ্ট্রে মারামারি-কাটাকাটির পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই কেবল প্রশ্রয়প্রাপ্ত, সেটাই একমাত্র সত্য হয়ে উঠে কার্যকরী আর প্রলয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়াল। মানবের একের মধ্যে বিচিঞ্জের সমন্বয়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বাস্তববিশিষ্ট রবীন্দ্র-সাধনাদর্শ তাই আরও বিশেষ করে এ সময় অগ্রদূত ও আচরণের বিষয়। তাতে যোগের নতুন ইতিহাস রচিত হওয়ার বীজ আছে।

বাঙালীর ব্যাকের অগ্রগতি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১৯২৭ সনে যখন বেঙ্গল ভাষাশাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায় তখন বাঙালীর মনে এক দারুণ নৈরাশ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ইহাই ছিল বাঙালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু এবং স্বদেশী যুগের প্রথম (১৯০৮ সনে) প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাহা হউক বাঙালীর ব্যবসায়-প্রতিভা এবং অধ্যবসায় বেঙ্গল ভাষাশাল ব্যাঙ্কের পতনকে পরাজয় বলিয়া স্বীকার করে নাই, পরবর্তী ঘটনা তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে।

১৯৩০ সন হইতে ঋণায়ু্যলোর, বিশেষ করিয়া কৃষিজাত পণ্যের, যে মন্ডা দেখা দেয় তাহাতে বাংলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তৎকালীন প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অল্পসন্ধান কমিটি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক অল্পসন্ধান কমিটির রিপোর্ট হইতে এই দুর্দশার কথা বিশেষভাবে জানা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন তৎকালীন বাংলার ব্যাঙ্কিং বলিতে লোন আপিস বুঝাইত। এই লোন আপিসের কার্য ছিল

বিশেষ করিয়া জমিজমার সম্পর্কে ধার দেওয়া। কৃষিক্ষেত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার জমির দাম পড়িয়া যায়। ঋণাধারী আদায় শক্ত হইয়া পড়ে, ফলে এই সকল ব্যাঙ্কের লগ্নি-করা টাকা এরূপভাবে আটকা পড়ে যে, তাহা ফিরাইয়া পাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। লোন আপিসগুলি অধিকাংশই ছিল মফস্বলে অবস্থিত, সুতরাং উহাদের দূরবাহার দরুন বাংলার জেলাসমূহে যে আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইল তাহা অবর্ণনীয়। এই দুর্দিনের আঘাত হইতে বাংলার সমবায় ব্যাঙ্ক, মহাজন কেহই অব্যাহতি পায় নাই। মনে রাখিতে হইবে, বাংলার এই দুর্দিন বিশেষভাবে বাঙালীকে আঘাত করিলেও ইহা ছিল বিশ্ববাণী মন্ডার এক অংশ মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অব্যবহিত পরে প্রথম যে মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মুদ্রাসঙ্কোচ দেখা গিয়াছিল এই বিশ্ব-মন্ডা উহারই অবশেষাবী ফল। অবশ্য তদানীন্তন রাজনীতিক জগতের কর্ণধারগণ যে আর্থিক পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং

মুদ্রা ও শিল্প প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বিরাট-মন্ডা ও বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় যে উহার ফল নহে এরূপ বলা চলে না।

এখন বিষয়টি আলোচনা করা যাক। এই মন্ডার আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত বাংলার মফস্বলের কতকগুলি ব্যাঙ্ক কলিকাতায় আপিস স্থাপন করে। মফস্বলের কৃষিকেন্দ্র হইতে কলিকাতায় ব্যবসা-কেন্দ্র তখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল এবং এখানে আমানতের টাকাও, বেশী মূল্যে অর্থাৎ বেশী সুদে, সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। তখন কলিকাতার মত বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙালী ব্যাঙ্কের কোন স্থানই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ নিরাশার আবহাওয়ায় বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের নূতন করিয়া জন্মদাত্রী সূত্র হয়। আঙ্গিকার সাফল্যের দিনে অতীতের সে কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ষাট-প্রতিষাট সহিয়াই সকল ব্যবসায়ের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসাও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

বর্তমানে বাঙালী পরিচালিত ছোট-বড় সর্বশ্রেণীর ব্যাঙ্ক-গুলির অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদের সংখ্যা, আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং কর্তৃকেন্দ্রগুলির (শাখা-প্রশাখা) হিসাব সওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে উক্ত ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় তথ্যাদি বৎসর বৎসর প্রকাশিত করিতেছেন। যুদ্ধের দরুন ১৯৪৩ সনের পরবর্তী হিসাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ সন পর্যন্ত যে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা লইয়াই বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের বর্তমান অবস্থার পরিমাপ করা যাক। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলিকে ধরা হয় নাই।

(ক) ১৯৪৩ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৫০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ টাকা মূলধনের মোট ১৪৩টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৬টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এই ২৬টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন প্রায় ৬,১০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ১,৭০,০০০ টাকা এবং আমানত ১,১৭,০০,০০০ টাকা। ইহাদের মোট আপিসের সংখ্যা ১১৫টি। মাত্র চারিটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে।

(খ) ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে ১,০০,০০০ হইতে ৫,০০,০০০

টাকা মূলধনের মোট ১৫২টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৭টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত। এই ২৭টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৫২,৮৮,০০০ টাকা, রিজার্ভ প্রায় ৯,০০,০০০ টাকা এবং আমানত ৩,৮০,০০,০০০ টাকার উর্দে। এই সকল ব্যাঙ্কের মোট কার্যালয়-সংখ্যা ২২৩টি। ইহাদের মধ্যে দশটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে। ১৯৪৩ সনের হিসাবে সাধারণ ব্যাঙ্ক এই শ্রেণীতে পড়িয়াছে; ১৯৪৬ সনে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইয়াছে।

(গ) এখন যে সকল ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে তন্মধ্যে সবগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে অর্থাৎ এগুলি প্রত্যেকেরই আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লক্ষ বা তদুর্দ্ধ কিন্তু এগুলি ১৯৪৩ সন পর্যন্ত তপশীলভুক্ত হয় নাই।

আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ লইয়া যে সকল ব্যাঙ্কের টাকা ৫,০০,০০০ বা তদুর্দ্ধ হইয়াছে, সমস্ত ভারতে তাহাদের সংখ্যা ৩৫টি—তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৪টি, অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম। এই সকল ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৮৮,৫০,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ৯,৫০,০০০ টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৪,২৬,০০,০০০ টাকা। এগুলির মোট ২০২টি আপিস আছে। ছয়টি ব্যাঙ্কের ১০টি বা তদুর্দ্ধ সংখ্যক শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে ২৫ হইতে ৫০টি শাখায়ুক্ত ব্যাঙ্কও রহিয়াছে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'ব্যাঙ্ক অব কমার্স', 'হুগলী ব্যাঙ্ক' এবং 'ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক' পরে তপশীলভুক্ত হইয়াছে।

(ঘ) এখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে। ১৯৪৩ সনে এরূপ ব্যাঙ্কের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৫৮টি, তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২টি, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীমূলধন ২,১০,০০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ৪৮,৫২,০০০ টাকা এবং আমানত ২৪,৬৫,০০,০০০ টাকা ছিল। ইহাদের মোট কার্যালয়-সংখ্যা ছিল ২৫৫টি। ১৯৪৩ সনের হিসাবে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ও নিউ-ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক পৃথক ছিল। বর্তমানে (১৯৪৬) ইহারা একটি ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এই-বারোটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের আটটির ২০টি বা তদুর্দ্ধ সংখ্যক আপিস ছিল।

এইবার (ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) এই চারি শ্রেণীর বাঙালী ব্যাঙ্কসমূহের সম্মিলিত অঙ্কগুলি দেখা যাক :—(১নং তালিকা)

(১নং তালিকা) ভারতের ব্যাঙ্ক বাঙালীর ব্যাঙ্কের		আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত	বাঙালীর ব্যাঙ্ক আপিসের
সংখ্যা	সংখ্যা	(০০০ বাদ দেওয়া হইয়াছে)			সংখ্যা
(ক)	১৪৩	২৬	৬,১০	১,১৭,০০	১১৫
(খ)	১৫২	২৭	৫২,৮৮	৯,০০	২২৩
(গ)	৩৫	১৪	৮৮,৫০	৯,৫০	২০২
(ঘ)	৫৮	১২	২,১০,০০	৪৮,৫২	২৫৫
	৩৮৮	৭৯	৩,৫৭,৪৮	৬৮,৭২	৭৯৫
				৩৩,৮৮,০০	

১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে মোট ৩৮৮টি ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে ৭৯টি ছিল বাংলাদেশে বাঙালীর ব্যাঙ্ক। এই সকল বাঙালীর ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৩,৫৭,৪৮,০০০ টাকা, রিজার্ভ ৬৮,৭২,০০০ টাকা এবং আমানত ৩৩,৮৮,০০,০০০ টাকা ছিল। বাংলার বাঙালীর সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল ৭৯টি। অবশ্য অনেকগুলির শাখা বাংলা দেশের বাহিরেও ছিল।

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বাংলার বাহিরে আসামে বহু এবং বিহারে কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক আছে—তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। আসাম প্রদেশের একটি বিশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ক্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলাকে বাংলাদেশের অংশ বলিলেই হয়। ক্রীহট্ট, গোঁহাটী এবং শিলঙে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত বহু ব্যাঙ্ক রহিয়াছে।

১৯৪৩ সনের হিসাবে বাঙালীর ১২টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কটি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত একত্রীভূত হওয়ার বর্তমান সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১টি। আবার (খ) শ্রেণী হইতে একটি (সাদার্ন ব্যাঙ্ক) এবং (গ) শ্রেণী হইতে আরও তিনটি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব কমার্স, হুগলী ব্যাঙ্ক এবং ত্রিপুরা মার্গার ব্যাঙ্ক) তপশীলভুক্ত হওয়ার বর্তমানে তপশীলভুক্ত বাঙালীর ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৫টি হইয়াছে। বাঙালীর তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ১৯১০ সনে, দিনাজপুর ব্যাঙ্ক ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ১৯১৪ সনে, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯১৮ সনে, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২২ সনে, পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সনে, নাথ ব্যাঙ্ক ১৯২৬ সনে, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২৯ সনে, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সনে, ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সনে এবং ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয়। ১৯৪৩ সনের পরে যে চারটি ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত হয়, সে সব কয়টিই গত দশ বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্ত ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা (ইউ-রোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) বর্তমানে ৭৯টি, ইহাদের মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্ক ১৫টি মাত্র।

১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনে এবং ১৯৪৬ সনের এই কয় মাসে সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং বিশেষ ভাবে আমানত খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার একটি

কারণ অবশ্য আর্থিক সম্ভলতা। তাহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক আইনের আওতা হইতে আয়রক্ষার ক্ষমতা এবং যুদ্ধোত্তরকালের পুনর্গঠনে প্রকৃতই সহায়ক হওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই নিজ নিজ বিনিয়াদ শক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অনুকরণে বাংলাদেশে আমরা বাঙালী ব্যাঙ্কের বড় পাঁচটাকে একসঙ্গে 'বিগ ফাইভ' বলিয়া থাকি। ইহাদের আর্থিক বিনিয়াদের হিসাব নিম্নে ২নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।*

তালিকায় সংখ্যাগুলি মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পাঁচটি প্রধান বাঙালী ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ২,৮৭ লক্ষ, -রিজার্ভ ৯৬ লক্ষ এবং আমানত প্রায় ৫৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ ইহাদের মোট অর্থবল প্রায় ৫৮ কোটি টাকা।

এখন একবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দুই-একটি ব্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ান কথা ধরা যাউক। এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ মিলিয়া পাঁচ কোটির বেশী দাঁড়ায়। ইহার আমানতও ১০০ কোটি ছাড়াইয়াছে। স্তরাত এই একটি ব্যাঙ্কই আমাদের পাঁচটি বড় বাঙালীর ব্যাঙ্ককে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বোম্বাই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। লাহোরের পঞ্জাব জাশনাল ব্যাঙ্ক, এবং মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নামও উল্লেখযোগ্য। অল্পকাল মধ্যে মাদ্রাজারীণ ভারতের নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত ব্যাঙ্ক (দিল্লী), হিন্দুস্থান • কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (কানপুর), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক, হিন্দ ব্যাঙ্কের (কলিকাতা) নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বিভলাদের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও গোয়েন্দাদের হিন্দ ব্যাঙ্কে বাঙালীর সহযোগিতাও রহিয়াছে। মাদ্রাজারীরা দেশীয় রাজ্যে জয়পুর ব্যাঙ্ক এবং বিকানীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাদ্রাজারী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই বড় ব্যাঙ্ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত হয় এবং অল্পকাল কার্য করিবার পরই বিপুল আমানত সংগ্রহ করে এবং লাভ হইতে বহু লক্ষ টাকা তুলিয়া লইয়া রিজার্ভ গঠন করে। অবশ্য মাদ্রাজারী-গণের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা এবং শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ। মহায়ুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে হইতেই মাদ্রাজারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ পরিকল্পনা করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে

* (২নং তালিকা)	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৭৮,০০,০০০	৩০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৭০,৪০,০০০	১৫,৬৫,০০০	১০,৫৩,০০,০০০
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৬০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	১২,৫০,০০,০০০
নাথ ব্যাঙ্ক	৪৮,৭৬,০০০	১৫,০০,০০০	৯,৯১,০০,০০০
ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক	৩০,০০,০০০	১১,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
মোট	২,৮৭,১৬,০০০	৯৬,৬৫,০০০	৫৩,৯৪,০০,০০০

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপিত করিবার ক্ষমতা সচেষ্ট হইয়াছেন এবং বহুলাংশে সফলও হইয়াছেন। অনেক শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইউরোপীয়ের নিকট হইতে মাড়োয়ারীরা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ও পরিচালনা করিতেছেন। আশা করা যায়, অল্প দিন মধ্যেই ব্যবসাক্ষেত্রে জাতীয়-করণ আরও বিপুলভাবে দেখা মাইবে। তবে ইহাও লক্ষ্য করা দরকার, এখনও ব্যাঙ্কের কার্য, বিশেষ ভাবে বিদেশী বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির কার্য, ভারতীয়েরা উল্লেখযোগ্য ভাবে দখল করিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে শীঘ্রই দেশীয় ব্যাঙ্ক-সমূহের প্রতিযোগিতা বাড়িবে ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা বলা হইল তাহাতে বাঙালীর নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই, তবে অস্বাভাবিক ভারতীয়েরা কিভাবে ব্যবসা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। নিজেদের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মাড়োয়ারী, গুজরাটী ও পার্শ্বদেশের এবং ইউরোপীয়গণের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নিজেদের কোণায় দুর্বলতা তাহা জানিতে হইবে ও তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙালীর ব্যাঙ্ক মধ্য-বিত্তের প্রতিষ্ঠান। একজ্ঞ বাঙালীর ব্যাঙ্ক গড়িতে অনেক সময় লাগিয়াছে। আমাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম। অবাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হয়, কারণ তাহারা বেশী মূলধনে কার্য আরম্ভ করে, আর আমাদের ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলতা ও মন্থরগতি সত্ত্বেও আমাদের ব্যাঙ্কের অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। তবে আমাদের কর্মপন্থা ও নিয়ম-কানূনের পরিবর্তন দরকার বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়েও যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনে বাঙালীর ব্যাঙ্ক আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে।

১। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন বৃদ্ধি করা। যুদ্ধের সময় এই বিষয়ে নানা বাধা ছিল এখন তাহা দূর হওয়ায় অনেক ব্যাঙ্কের স্তুবিধা হইবে।

২। শাখার সংখ্যা অবাঞ্ছনীয়ভাবে না বাড়াইয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কর্ম কেন্দ্রীভূত করা ও পরস্পরের মধ্যে অলাভ-জনক প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লওয়া।

৩। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রীভূত করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা।

৪। ব্যাঙ্কের উন্নতি, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে উপযুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত কর্মচারীর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাহাতে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণ উপযুক্ত বেতন ও সুখসুবিধা পান ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। সর্বোপরি যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদে খাটে তাহার ব্যবস্থা করা। ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ যতই ধারক না কেন উহার কার্যকরী মূলধনের বিপুল অংশ গ্রাহকগণের আমানত হইতে আসে। সুতরাং যাহাতে সাধারণের অর্থাৎ আমানতকারীদের অর্থের অপচয় না হয় ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই স্থানেই ব্যাঙ্কের সহিত অস্বাভাবিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের (বীমা ব্যতীত) তফাৎ। অংশীদারের লাভ অপেক্ষা আমানতকারীগণের টাকার নিরাপত্তার দিকে ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বেশী নজর রাখিতে হয়।

৬। দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে যথোচিত সাহায্য করা ব্যাঙ্কের অগ্রতম কার্য। এইরূপ কার্যে উভয়েরই মঙ্গল। কারণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইলে ব্যাঙ্কের টাকা বেশী খাটিবে; অংশীদারের বেশী লাভ হইবে। আবার ঠিক সময় উপযুক্তরূপে সাহায্য পাইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কাজেই উভয়ের সহযোগিতায় পরস্পরের মঙ্গল। ব্যাঙ্কিং সুদ-ধোরের ব্যবসা নহে, ইহা জন-হিতকর ব্যবসায়ের অগ্রতম। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝেই এই ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। আজ বোম্বাই ও পঞ্জাবের ব্যবসায়ের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল প্রদেশের নিজস্ব বড় বড় ব্যাঙ্ক থাকার দরুন উহা সম্ভব হইয়াছে।

৭। বাঙালীর ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্ক-ব্যবসা তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করিতেছে। এখন প্রত্যেক বাঙালীর কর্তব্য হইতেছে, নিজেদের ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করা। এক কালে বাঙালীর বিশ্বাসযোগ্য ভাল ব্যাঙ্ক ছিল না। আজ আর সেকথা বলা চলেন না, বাঙালীর ব্যাঙ্কে বাঙালী টাকা রাখিলে তবেই বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহা হইতে সাহায্য পাইবে এবং বাঙালীর অগ্রগতিরও সহায়তা করা হইবে। মনে রাখিতে হইবে, অবাঙালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অর্থই অবাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করা এবং বাঙালীকে সেই সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা। একথা বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সত্য। আমরা এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতাসমূহ তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি।

৮। আর একটি বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে সকল বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক মিলিয়া নিজেদের, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির হিতকর একটি সাধারণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও গ্রহণ করা। বর্তমানের অহিতকর প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, একথা বাঙালীকে মনে রাখিতে হইবে। ঈর্ষা দ্বারা

কাহারও কোন লাভ হয় না, কেবলমাত্র ঈর্ষাকারীর নিজের ক্ষতি হয়; বাঙালীর তাহাই হইয়াছে। এত কালের ক্ষতি হইতে আজ আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। ছোট বড় সকল ব্যাক্ষের কর্ণধারগণ একত্র হইয়া বাঙালীর ব্যাক্ষের কিসে আরও প্রতিষ্ঠা বাড়ে, ভিত্তি শক্ত হয়, বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কিসে আরও বেশী সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিলে দেখিতে পাইবেন—ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বাঙালীর আবার মেতৃৎ গ্রহণ সম্ভব হইবে।

সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙালীর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক করিতে হইলে জাতি হিসাবে বাঙালীকে আজ নূতন করিয়া গঠনকার্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। এ কার্যে বাঙালী ব্যাক্ষ-পরিচালক ও কর্ণধারগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সর্বশাস্ত্রের রহস্য জানাবার জন্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদের শাখাগুলির উপযোগী ক'রে এই শিক্ষাশাস্ত্র রচনা করেন। ১ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল ছন্দ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতির নিয়ম-কানুনকে স্পষ্ট ক'রে দেখান। বেদপাঠের প্রধান অবলম্বনই ছন্দ ও স্বর; তাই মহর্ষি প্রথমেই “উদাত্তাশ্চান্দ্রদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ তথৈব তৎ” বলে উদাত্তাদি স্বর তিনটির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আসল পরিচয় দেবার আগে স্বর তিনটির বর্ণ (রঙ), দেবতা, জাতি, ঋষি, ছন্দ ও প্রকৃতি জানার আকৃতিই দেখি তাঁর বেশী। যেমন তিনি বলেছেন:

“সুক্রমুচ্চং বিজ্ঞানীরাটীচং লোহিতমেব চ।

শ্যামং তু স্বরিতং বিজ্ঞাদগ্নিরুচ্চত দৈবতম্ ॥

নীচং সোমং বিজ্ঞানীরাং স্বরিতে সবিতা ভবেৎ।

উদাত্তং ব্রাহ্মণং বিদ্যারীচং ক্ষত্রিয়মেব চ ॥

বৈশ্যং তু স্বরিতং বিজ্ঞাদারদ্বাজুদাত্তকম্।

নীচং গৌতমমিত্যাহর্গ্যং তু স্বরিতং বিজ্ঞঃ ॥

বিদ্যাদুদাত্তং গায়ত্রীং নীচং ত্রৈলোক্যমেব চ।

জগতং স্বরিতং বিদ্যাদেবমেব নিয়োগতঃ ॥৪

অর্থাৎ দেখা যায় যে,

স্বর	রং	দেবতা	জাতি	ঋষি	ছন্দ
উদাত্ত	সুক্র	অগ্নি	ব্রাহ্মণ	ভরদ্বাজ	গায়ত্রী
অনুদাত্ত	লোহিত	সোম	ক্ষত্রিয়	গৌতম	ত্রিষ্টুভ
স্বরিত	শ্যাম	সবিতা (স্বর্ষ)	বৈশ্য	গার্গ্য	জগতি

১। “সর্বশাস্ত্র রহস্যং তদ্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতম্।”—শিক্ষা-

সংগ্রহ, পৃ. ৩৫

২। পাঠভেদ—“নীচে সোমমিতি।”

৩। পাঠভেদ—“উদাত্তং তু ভরদ্বাজম্।”

৪। শিক্ষাসংগ্রহ পৃ. ১। এ ছাড়া ৬-৭ শ্লোকে আবার নিজের কথাই উল্লেখ ক'রে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন:

“বর্ণো জাতিশ্চ মাত্রা চ গোত্রং ছন্দশ্চ দৈবতম্।

এতৎ সর্বং সামাখ্যাতং যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ॥”

এছকারদের নিজেদের নামের সম্বন্ধে উল্লেখ করার এ রকম রীতি প্রাচীনকালে ছিল।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিভাগ ও রীতি নারদীশিক্ষা ও অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি শিক্ষারই অনুরূপ। পরবর্তী গ্রন্থকারদের ভেতর এক দণ্ডিল ও নাট্যাশাস্ত্রকার ভরত ছাড়া প্রায় সকলেই ঐ ধারা গ্রহণ করেছেন। মতঙ্গের বৃহদেন্দ্রশীতোত্তর অবশ্য এই সব বুটিনাটি বিভাগের কোন উল্লেখ নাই তবে স্বরনির্ণয়-প্রকরণে গ্রামসম্বন্ধে মতঙ্গ কিন্তু যখন আলোচনা করেছেন তখন ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রামকে “অসাধারণত্বং দেবকুল-সমুৎপন্নত্বেন” বলেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের দেবতাদের কথাও বলেছেন; যেমন,

“দেবকুলসমুৎপন্নঃ ষড় জগান্ধারমধ্যমাঃ।

এতেষাং দেবতাঃ জ্ঞেয়া ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥”৫

মতঙ্গকে দেখা যায়—বৈদিক বা ঔপনিষদিক প্রভাবকে কাটিয়ে উঠে অনেকটা পৌরাণিক আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন আর সেভাবেই তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখ করাকেই প্রয়োজন বোধ করেছেন। তবে আর একদিকে স্বর বা রাগরূপের বেলান দেবতা, বর্ণ (রং) বা ব্রাহ্মণাদি জাতিরও কথা তিনি আবার কিছু বলেন নি। কিন্তু বৃহদেন্দ্রশীতের পর সঙ্গীতমকরন্দে নারদও স্বরের জাতি, বর্ণ, ছন্দ, স্থান, রস, রাশি সবকিছুরই স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন,

“দেববংশাস্ত সগমাঃ পঞ্চম পিতৃবংশজঃ।

রিধৌ ঋষিকুলে জাতৌ নিষাদোহনুরবংশজঃ ॥

ব্রহ্মজাতি সর্মো জ্ঞেয়ো রিধৌ ক্ষত্রিয়জাতিকৌ।

নির্গৌ বৈশ্যাবিতি প্রোক্তৌ পঞ্চমঃ শূদ্রজাতিকঃ ॥

৫। বৃহদেন্দ্রশী, পৃ. ২১

৬। বৃহদেন্দ্রশীকার মতঙ্গ ভরত, বা দণ্ডিলের মতন যাজ্ঞবল্ক্য আবার “জাতিরাগ” বা জাতিগানের কথাও বলেছেন কিন্তু রাগ বা স্বরের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাদি জাতির কোনও উল্লেখ করেন নি।

৭। এই নারদ কিন্তু শিক্ষাকার নারদ নন, ইনি মকরন্দ-কার নারদ।

পদ্মভঃ পিঙ্গরঃ সর্গবর্ণঃ কুন্দপ্রভঃ সিতঃ ।

পীতঃ কবুর্ ইত্যেতে তেষাং বর্ণা নিরূপিতা ॥

জম্বুশাককুশকৌশলান্মীশেতনামহ ।

দ্বীপেষু পুঙ্করে চৈব জাতাঃ ষড়্ জাদয়ঃ সরাঃ ॥

দক্ষোহত্রিঃ কপিলশ্চৈব বশিষ্ঠো ভার্গবস্তথা ॥

গণেশ্বরাদয়ো দেবাঃ ষড়্ জাদীনাম্ তু দেবতাঃ ॥

ক্রমাদনুষ্ঠুংবগায়ত্রী ত্রিষ্টুপ চ বৃহতী তথা ।

কুন্তপুলা জম্বশ্চৈব সিংহ-কথা-ধনুস্তথা ।

ষড়্ জদ্যাদুতবীরো চ ঋষভস্ত চ রৌদ্রকঃ ॥”৮

এর পর শাস্ত্রদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে (৩।৫০-৫১)ঃ—
“পঞ্চমঃ পিতৃবংশোশো বিধায়ুযিকুলোদ্ধবো” প্রকৃতি বলে স্বরের
বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান, ঋষি, দেবতা ও রসের কথা উল্লেখ করে-
ছেন। শাস্ত্রদেবের পর জৈমিন্যার্চ পার্ষদেব তাঁর সঙ্গীত-
সময়সারে “নাদাশ্রয়নজয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ” ৯ এই
মাত্রাই যা নাদের বিচারে উল্লেখ করেছেন; স্বরের দেবতা,
বর্ণ বা জাতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চেষ্টা করেন নি।
অনেক পণ্ডিতের মতে পার্ষদেব শাস্ত্রদেবের পরবর্তী গ্রন্থকার,
কেননা পার্ষদেব শাস্ত্রদেবের পূর্ববর্তী আচার্য হলে অবশ্য
প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে রত্নাকরের বা গ্রন্থকার শাস্ত্রদেবের
কথা কোথাও-না-কোথাও উল্লেখ করতেন। কিন্তু পার্ষদেব
তা করেন নি। কাজেই অনেকের অভিমত, পার্ষদেব শাস্ত্র-
দেবেরও পরবর্তী গ্রন্থকার। অবশ্য আমরাও এই মতের
এখনও পক্ষপাতী; কিন্তু বিচিত্র ও বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ
রত্নাকরের বিষয়-বস্তু এবং বিকাশভঙ্গী দেখলে মনে হয় অনেক
জিনিসই যেন পার্ষদেবের সময়ের পরে বিস্তৃতিলাভ কর-
ছিল, কেননা পার্ষদেব তাঁর সঙ্গীতসময়সারে সঙ্গীতের অনেক
জিনিসেরই আবার আলোচনা করেন নি; তা ছাড়া আলো-
চনার ভঙ্গীও তাঁর বেশ সুসংযত ও ধারাবাহিক নয়। কিন্তু
শাস্ত্রদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে সঙ্গীতের বিষয়-বস্তুর পারিপাট্য
ও নিয়মিত ক্রমিক আলোচনার ভাব বেশ সুপরিস্ফুট। কাজেই
সন্দেহ করা একেবারেই অসঙ্গত নয় যে, রত্নাকর সময়সারেরও
পরেকার গ্রন্থ। অবশ্য এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্মে
আরও তুলনামূলক নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন। ডাঃ রাধবন্
ও প্রক্কেয় কৃষ্ণমাচারিয়ার ছুঁজনেই কিন্তু শাস্ত্রদেবকে বৃদ্ধ ও
প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আমরাও অবশ্য আরও নির্দিষ্ট
প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ মতই এখন নানা কারণে স্বীকার
করব।

৮। সঙ্গীতমকরন্দ ১।২৮-৫১ •

৯। সঙ্গীতসময়সার ১.২

এখন আলোচনার বিষয় যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে উদাত্ত, অহু-
দাত্ত ও বরিত এই তিনটি স্বরের বর্ণ ও দেবতা ইত্যাদি ক’রে
বিভাগ করেছেন তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের
অনুবর্তী। যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা ও বর্ণের (রঙের) যে সমপাংজিক
ভাগ দেখিয়েছেন তা ঠিক ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত বিভাগের
অনুযায়ীই, তবে তফাৎ হ’ল—ছান্দোগ্যে অগ্নির লাল, জলের
সাদা আর পৃথিবীর রূপ কাল বলা হয়েছে, আর যাজ্ঞবল্ক্য-
শিক্ষায় অগ্নির রং সাদা; সোম, চন্দ্র বা জলের রং লাল ও
স্বর্ষের রং কাল বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ “ত্রীণি
রূপাণীত্যেব সত্যম্” (৬।৪।১) ১০ অর্থাৎ লাল, সাদা আর কাল
এই তিনটি রং মাত্রই সত্য অর্থাৎ আদি বলেছে। এদিক দিয়ে
যাজ্ঞবল্ক্যকারও ঠিক একই কথা বলেছেন, তবে দেবতা ও
রঙের সামঞ্জস্যের বেলায় তিনি ঠিক দমান ধারা বজায় রাখতে
পারেন নি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বিকাশ ও পদার্থগত সামঞ্জস্য
দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সামাজিক প্রভাবের
কলে জাতির অনুসারে বর্ণবিভাগের মোহ সম্ভবতঃ এড়াতে
পারেন নি, আর এ জগেই দেবতার গুণ ও প্রকৃতিগত বর্ণের
সামঞ্জস্য দেখাতেও তিনি কার্পণ্য বোধ করেছেন বলেই
আমাদের মনে হয়।

বর্ণ ও দেবতার কথা ছেড়ে দিলে স্বরকে দেবতা, ঋষি ও
বর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করার আবেগ শুধু শিক্ষাকির-
যাজ্ঞবল্ক্যেরই ছিল না, শিক্ষাকার নারদ থেকে আরম্ভ ক’রে
প্রাতিশাখ্যকারেরা পর্যন্তও এই প্রবৃত্তি রেখেছিলেন।
তবে স্বরের জায়গায় কেউ বা দেখিয়েছেন মুছ’নাকে, কেউ বা
বর্ণ আবার কেউ বা ছন্দকে। যেমন নারদীশিক্ষাকার নারদ
ষড়্ জাদি তিন গ্রামের মুছ’নার কথা বলে শেষে আবার
বলেছেন :

“পিতৃণাম্ মুছ’না সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ ।

ঋষীণাম্ মুছ’নাঃ সপ্ত যাক্ষিমা লৌকিকাঃ শ্বতাঃ ॥১১

সাতটি লৌকিক স্বরের বেলায়ও আবার বলেছেন :

ষড়্ জঃ গ্রীণাতি বৈ দেবানুযীন্ গ্রীণাতি চর্যভঃ ।

পিতৃন্ গ্রীণাতি গান্ধারো গন্ধবান্ মধ্যমঃ স্বরঃ ॥

দেবান্ পিতৃন্ যীর্ধশ্চৈব স্বরঃ গ্রীণাতি পঞ্চমঃ ।

যক্ষান্ নিষাদঃ গ্রীণাতি ভূতগ্রামং চ ধৈবতঃ ॥১২

এখানে ঋষি নারদের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তিনটি
প্রধান বংশের মুছ’না-গ্রীণতির কথা উল্লেখ করেছেন, আর স্বরের
বেলায় চারটি বংশের কথাও বলেছেন। তবে এটা ঠিক যে,
মাক্ষামাখি সময়ে বৈদিক সমাজে দেব, ঋষি ও পিতৃ এই তিনটি
কূল বা বংশের বিভাগই মাত্র প্রধান ছিল আর গন্ধর্ব ছিল

১০। অবশ্য ছান্দোগ্যে (১।৬।১) পৃথিবী অগ্নি, অন্তরীক্ষ
বায়ু, ছান্দোলক আদিত্য—এ রকমের ইঙ্গিতও করা হয়েছে।

১১। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ৪০০

১২। ঐ পৃ. ৪০১

পিতৃবংশেরই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সঙ্গীতের আচার্যেরা নারদের এই বিভাগকেই বৈদিক ভাগ মেনে নিয়েছেন।

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক ইত্যাদি সাতটি ছন্দের ('সপ্ত ছন্দাংসি') এবং দেবতা ও অশ্বর এই দুটি মাত্র বিভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন (ক) "দৈবন্যাপি চ সপ্তৈব" ১৩; (খ) "সপ্ত চৈবাহুরাণ্যাপি" ১৪। তবে ১৬।৮-১৬।৯-এ আবার 'ঋষিছন্দাংসি' কথায় ঋষিবংশেরও উল্লেখ আছে দেখা যায়। কাজেই ঋগ্বেদিক থেকে প্রাতিশাখ্যের যুগ পর্যন্ত ঋক্, সাম ও যজু এই তিন বেদের মতন ঋষি, দেবতা ও অশ্বর, অথবা ঋষি, দেবতা ও পিতৃবংশেরই মাত্র বিভাগ ছিল। ঋকপ্রাতিশাখ্যের ১৭।৮-১২-এ পৃথক বারবার, প্রাজ্ঞাপত্য, বায়ুদেবতা, পৌরুষী, ব্রাহ্মী বলে দেবতাদের নাম করা হয়েছে। ১৭।১৪-এ আবার

'শ্বেতং চ সারঙ্গমতঃ পিশঙ্গং কৃষ্ণমেব চ।

নীলং চ লোহিতং চৈব সূবর্ণমিব সপ্তমম্ ॥

অরণ্যং শ্যামগৌরে চ বহু বৈ নকুলং তথা ॥"

এখানে বিচিত্র বর্ণেরই নাম করা হয়েছে দেখা যায়। তারপর স্ক্রয়জুঃপ্রাতিশাখ্যেও বর্ণ নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে (ক) 'বর্ণদেবতাঃ', (খ) 'ঋগ্বেদাঃ কঠাঃ' প্রভৃতি ১৫-১৬-এ সূত্রাং দেখা যায়, দেবতা, ঋষি, অশ্বর ও পিতৃ প্রভৃতি বংশের সঙ্গে এবং শ্বেত ইত্যাদি রঙের সঙ্গে বর্ণ, ছন্দ, স্বর বা মুছনার একতা অথবা সামঞ্জস্য দেখাবার ধারা বৈদিক-যুগ থেকেই সবার ভেতর ছিল; আর পরবর্তী আচার্যেরা পূর্ববর্তীদের রীতিকেই মাত্র অম্লসরণ করেছেন বলা যায়। কিন্তু কেন? অথবা কি জন্যে?—এর কোন কারণ দেখাবার বা ঐতিহাসিক বিকাশের কোন ইঙ্গিত দেবার আবশ্যকতাও তাঁরা মোটেই অনুভব করেন নি। এতে উপকার হয়েছে এই যে, শাখা-প্রশাখার বিস্তার ক'রে আলোচনার বস্তুকে মোটেই তাঁরা ভারাক্রান্ত করেন নি, আর তার জন্যে সঙ্গীতের স্বর, অলঙ্কার ও রাগ-রাগিণীই যৈ মূল বস্তু তারই মাত্র ভাল ক'রে পরিচয় দিতে পেরেছেন, কিন্তু অপকারও হয়েছে এই যে, বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সঙ্গীতের বিকাশ কেমন ক'রে হ'ল তার সুনির্দিষ্ট একটা প্রমাণপঞ্জীকে তাঁরা একেবারে মুছে দিয়েছেন বস্তুতেও অত্যাঙ্গি হয় না।

এর পরই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন :

গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত যজ্ঞাদয়ঃ স্বরাঃ।

ত এ ব বেদে বিজ্ঞান্যস্তয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ ॥" ১৬

গান্ধর্ববেদে অর্থাৎ লৌকিক গীতিশাস্ত্রে যাকে যজ্ঞাদি সাত স্বর বলা হয়েছে তাই বেদে উদাত্তাদি তিন স্বর।

এখানে যাজ্ঞবল্ক্য যজ্ঞাদি স্বরকে গান্ধর্ববেদের অন্তর্গত বলায় লৌকিক বা দেশী সঙ্গীতের স্বরকেই ইঙ্গিত করেছেন বস্তুতে হবে, কিন্তু স্ক্রয়জুঃপ্রাতিশাখ্যের ১।১২৭-এর ('সপ্ত') ভাষ্যে মহর্ষি কাত্যায়ন আবার "সাময় সপ্তস্বরানামুঃ যজ্ঞ ঋগ্বেদ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্" বলেছেন। আমাদের অভিমতে কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেননা "সপ্ত স্বরা যে যমাত্তে" স্বত্র ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের ১।৭ এই স্বত্রের ভাষ্যে উবট স্পষ্টই বলেছেন : "যে তে সপ্তস্বরাঃ যজ্ঞ ঋগ্বেদগান্ধারমধ্যম-পঞ্চমধৈবতানিষাদাঃ স্বরাঃ—ইতি গান্ধর্ববেদে সমান্নাতাঃ।" তা হ'লে যাজ্ঞবল্ক্য-ও ঋকপ্রাতিশাখ্যকারের কথায় এখানে দেখা যায় মিল আছে। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের এই "তত্রা বেদে বিজ্ঞান্যস্তয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ" কথাগুলির সঙ্গে কিন্তু ঋকপ্রাতিশাখ্য ও তার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ছাড়া তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য বা আর কারও সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ ঋকপ্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উবট বলেছেন : "তথা সাময় ক্রুষ্ঠ-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মজ্জাতিস্বরাঃ।" তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ২৩।১২-এর ('সপ্ত') তাই বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ত্রিরস্ভাষ্যে সোমোচ্চাৰ্ঘ এবং বৈদিকান্ডরণব্যাক্যায় গার্গ্য গোপালয়জ্ঞও পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন : "তদেবং সামবেদবর্তিনঃ ক্রুষ্ঠাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ সমঙ্কনিক্রপিতাঃ। তেষু মজ্জাদয়ো * * যথাক্রমস্মাৎ স্বাধ্যায়বর্তিনঃ অম্লদাত্তস্বরিত প্রচয়োদাত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ।" ১৮ এখানে ভাষ্যের এই "যথাক্রম-স্মাৎ * * অম্লদাত্ত" প্রভৃতি শব্দগুলি অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে। কাজেই বুঝতে হবে যে, বৈদিক সামগানের গোড়াকার দিকে মাত্র উদাত্ত, অম্লদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরের প্রচলনই ছিল। তার পর স্বরিত ও প্রচয়, ১৯ স্বরের অভ্যুদয় হয়।

কিন্তু এতেও ঠিক আসল সমস্তার সমাধান হয় না, কেননা ঋকপ্রাতিশাখ্য প্রভৃতিতে ও বিশেষ ক'রে নারদীশিক্ষায় যে ইঙ্গিত লুকানো রয়েছে তা থেকে প্রথমাদি স্বরকেই ঠিক ঠিক বৈদিক বা সামগানের স্বর বলা যেতে পারে। কেননা নারদীতে "আচিকং গাথিকং চৈব" ২০ অথবা (ক) "ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ", (খ) ঋগ্বেদস্ত দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চ বততে; ২১ পুষ্পস্বত্রের ৯ম প্রপাঠকের ১-৮ শ্লোকগুলি আর তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যের ২৩ অধ্যায়ের ১৭-এর "মজ্জাদয়ো দ্বিতীয়াস্তাশ্চত্বারিত্তৈত্তিরীয়াঃ" শব্দগুলি

১৭। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য ১৩।৪৪

১৮। Vide তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য in *Bibliotheca, Sanskrita*, No. 33, (Mysore), edited by K. Rangacharya, pp. 16-17

১৯। অনেকের মতে 'প্রচয়' স্বর স্বরিতেরই অন্তর্ভুক্ত।

২০। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ৩৯৫

২১। ঐ পৃ. ৩৯৭

১৩। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য ১৬।৩

১৪। ঐ ১৬।৪

১৫। স্ক্রয়জুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩১।৩৮

১৬। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ১

থেকে সে কথাই অহুমান করা যায়। তার পর “মল্লাদিমুক্তিহু স্নানেন্দ্ৰ সপ্ত সপ্ত যমাঃ”২২ সূত্রটিতে মল্ল, মধ্য ও তার অথবা উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্থান যে বৈদিক যুগে ও সামগানের সময়েও প্রচলিত ছিল, আর এই তিন স্থানেই যে প্রথম দ্বিতীয়াদি সাতটি স্বরে উচ্চ-নীচ শব্দের তারতম্য প্রচলিত ছিল সে কথাও বেশ বোঝা যায়। কাজেই একথাই ঠিক যে, মল্ল, মধ্য ও তার স্থান থেকেই পরে লৌকিক স্বরের কারণ বা যোনি-স্বরূপ (source or womb) অহুদাত, স্বরিত ও উদাত্ত স্বর তিনটির সৃষ্টি হয়েছিল। আর তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ত্রিরত্ন-ভাষ্যকার সোমচার্যও “যো দ্বিতীয়ঃ স উদাত্তঃ, যো মল্লঃ সোহুদাত্তঃ যো তৃতীয়চতুর্থো তৌ স্বরিতপ্রচয়ভিত্যর্থঃ” কথাগুলিতে সে সমর্থনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৈদিকভরণ-ব্যাখ্যায় গোপালয়জও “তৃতীয়াখ্যঃ প্রচয়চতুর্থীখ্যঃ স্বরিতঃ” কথাগুলিতে ত্রিরত্ন-ভাষ্যের সমর্থন করেছেন। কাজেই একথা ঠিক যে, মল্ল, মধ্য ও তার এই তিন স্থান থেকেই পরে উদাত্ত, অহুদাত্ত ও স্বরিতের উৎপত্তি হয়েছিল, আর উদাত্তাদি তিনটি স্বর থেকে পরে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। ২৩ এক্ষেত্রে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঠিক বলেছেন :

“উচ্চো নিষাদগাঙ্কারো নীচাব্যমভৌবতো।

শোষাত্ত স্বরিতা জ্যেষ্ঠা ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥”২৪

উচ্চ বা উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গাঙ্কার, নীচ বা অহুদাত্ত থেকে ঋষত ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে মানুষের চাহিদার জট্টেই তিন স্বর থেকে ধীরে ধীরে লৌকিক সঙ্গীতের উপযোগী ষড়্জাদি সাত স্বরের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। তবে উপায় বা অবলম্বন ছিল কিন্তু উদাত্তাদি অথবা উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর তিনটিই।

এর পর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিস্তৃতভাবে মাত্রা কাকে বলে ও তার উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

“নিমেষো মাত্রাকালঃ স্মাদ্বিত্যংকালেতি চাপরে।

অক্ষরাভূল্যযোগস্বাভ্যতিঃ স্থাং সোমশর্মনঃ ॥

স্বর্ধরশ্মিপ্রতীকাশাং কণিকা যত্র দৃষ্টতে।

আণবন্ত তু সা মাত্রা মাত্রা তু চতুরাণবা ॥

মানসে চাণবৎ বিভাং কণ্ঠে বিদ্যাদ্বিরাণবম্।

ত্রিরাণবং তু জিহ্বাথে নিঃসৃতং মাত্রিকং বিদুঃ ॥২৫

নিমেষ কালকে কেউ ‘মাত্রা’ বলেন, আবার বিদ্যুৎ-প্রকাশ যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততটুকু সময়কেও কেউ কেউ ‘মাত্রা’ বলেন। নিমেষকাল অর্থে চক্ষুর পাতা পরিবর্তন হ’তে যতটুকু সময় লাগে। অক্ষর বা বর্ণগুলির অসমকাল যে সম্বন্ধ সেই কালকে

২২। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য ২৩।১০

২৩। বৈদিক ও লৌকিক সাত স্বরের উৎপত্তির ইতিকথা সম্বন্ধে বিশদভাবে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

২৪। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ২

২৫। ঐ শ্লোক ৮-১০

‘একমাত্রা’ বলে। তারপর স্বরের রশ্মিতে যে সর্ব অণুর কণা দেখা যায় তাকেই ঠিক মাত্রা বলে; কিন্তু ঐ রকমের স্বর চারটি অণু বা পরমাণু আবার একত্র হলে তবেই মাত্রার মানস-প্রত্যক্ষ বা অনুভব হয়। মানুষের মনে এক মাত্রা থাকে, কণ্ঠে দুই মাত্রা এবং জিহ্বাথ-নিঃসৃত শব্দে তিন মাত্রা থাকে। ২৬

“অবগ্রহে তু যঃ কালস্বর্ধর্মমাত্রা বিধীয়তে।

পদয়োরন্তরে কাল একমাত্রা বিধীয়তে ॥

হ্রস্বমাত্র কালই অর্ধমাত্রা, আর দুটি পদের ব্যবধানে যে কাল থাকে তাকে বলে একমাত্রা।

“একমাত্রো ভবেদুসো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্যেষ্ঠো বায়নং চাধর্মাত্রিকম্ ॥

এখানে যাজ্ঞবল্ক্য হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের পরিচয় দিয়েছেন। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের উদাহরণ দেবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য আবার ঋকপ্রাতিশাখ্যাকারের মতনই বলেছেন :

“চাষস্ত বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোহব্রবীৎ।

ময়ুরস্ত ত্রিমাত্রাং বৈ মাত্রাণামিতি সংস্থিতিঃ ॥২৭

স্বর্গচাতক বা নীলকণ্ঠের শব্দ একমাত্রাবিশিষ্ট, কাকের শব্দ দু’মাত্রা, আর ময়ূরের শব্দ তিন মাত্রাবিশিষ্ট।

এর পর যাজ্ঞবল্ক্য ভাল ও মন্দ স্বর বা শব্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। কম্পিত, ভীত, অজ্ঞানাসিক শব্দকে মন্দ, আর প্রকৃতি যার বিনীত ও কল্যাণী ও দত্ত সুশোভন এমন লোকের শব্দ বা স্বরকে তিনি ভাল বলেছেন। স্বরকে সুশোভন ও মিষ্ট করতে গেলে আমাদের কি প্রণালী অনুসরণ করা উচিত তারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন প্রাতঃকালে উঠে আত্র, পলাশ, বিজ্র, অপামার্গ, শিরীষ, খদির, কদম্ব, করবী, করঞ্জক শাখা দিয়ে দাঁত মাজা উচিত, তাতে গলার স্বর স্বস্ত্র ও মাধুর্য পূর্ণ হয়। “ত্রিকলাং লবণাক্তেন”—লবণযুক্ত ত্রিকলার জলপান করলে ক্ষীণমেদ হওয়ার জন্যে স্বর যে বেশ সুস্পষ্ট হয় তাও

২৬। ‘মানুষের মনে একমাত্রা থাকে’ ইত্যাদির অর্থ হ’ল অণুর প্রত্যক্ষ হয় না, এসবেরই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। এসবের থেকেই বৈশেষিকদর্শনকারের মতে সৃষ্টির আরম্ভ, অথচ “আণবন্ত তু সা মাত্রা” যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি অনুসারে অণুই ঠিক ঠিক মাত্রা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “মাত্রা তু চতুরাণবা”—চারটি অণুর মিশ্রণ হলে তবে মাত্রার প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তারপরেই যাজ্ঞবল্ক্য সেজ্ঞে বলেছেন : “ত্রিরাণবং তু জিহ্বাথে নিঃসৃতং”। কাজেই বুঝতে হবে যে, জিহ্বাথ-নিঃসৃত ত্রিমাত্রায়ুক্ত শব্দ যখন স্বররূপে ব্যক্ত হয় তখন চতুরাণবযুক্ত হয়েই তা প্রকাশ পায় ও প্রত্যক্ষ হয়।

২৭। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে (১৩।৪০) এর সামাজ্য একটু পাঠভেদ আছে, যেমন,

“চাষস্ত বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোহব্রবীৎ।

শিখী ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ ॥”

বলেছেন। * পরে উদাত্ত, অম্বুদাত্ত ও স্বরিত স্বরকে কি প্রণালীতে উচ্চারণ করতে হবে তার পরিচয়ও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিক্ষাতে দিয়েছেন।

মোট কথা; যাজ্ঞবল্ক্য অথবা অপরাপর শিক্ষাগুলির ভেতর সঙ্গীতের পরিচয় যা আমরা পেয়ে থাকি তা বর্তমানের ভুলুয়ার নগণ্যই বলতে হবে। আসলে শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বৈদিক সমাজের রীতি ও ধারাকে অনুসরণ করে; কাজেই একথা ঠিক যে, শিক্ষাগুলির ভেতর যদি আমরা বর্তমান কালে প্রচলিত রাগ-রাগিণী, তাল, অলঙ্কার, তান, বিস্তার ও বাদী সবাদী প্রভৃতির বিচারপূর্ণ মূল্যকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করি তা হলে অবশ্যই

নিরাশ হব। তাই আসল কথা হ'ল সব জিনিসই যেমন বিকাশ ও ক্রমোন্নতির ধারাকে অনুসরণ করেই পরিপূর্ণ লাভ করেছে, সঙ্গীতের বেলাও তাই। কাজেই শিক্ষাগুলির ভেতর সঙ্গীতের অনুসন্ধান করব আমরা বৈশাখিক গুর ও অভিযান্ত্রিক ইতিহাসকে খুঁজে পাবারই প্রবৃত্তি নিয়ে, বর্তমান ধারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে নেবার মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। শিক্ষাগুলিতে সঙ্গীতিক পরিচয় ও বিকাশ আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। তা ছাড়া বেদ, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের রূপ কি রকমের ছিল তার পরিচয়ও আমরা শিক্ষাগুলির আলোচনা থেকে পেয়ে থাকি।

ভুলুয়ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলার ক্ষুদ্রতম জেলা নোয়াখালীর উপর আজ বিশ্বমানবের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। গান্ধীজী প্রমুখ মহাত্মাগণের পাদস্পর্শে ইহা অভিনব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। নোয়াখালীর দেশাধিপতি দেবতা ভগবতী বারাহীদেবীর বিচিত্র লীলা এবং পুনর্জাগরণ এতদ্বারা সূচিত হওয়া অসম্ভব নহে। পলাশী-যুদ্ধের দ্বিশতবার্ষিকী আসন্নপ্রায়—২০০ বৎসর ইংরেজ অধিকারের একটি ফল আমরা বঙ্গদেশে উপলব্ধি করিতেছি যে, কলিকাতা মহানগরী মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বাংলার জীবনীশক্তি জিপুরা নোয়াখালী প্রভৃতি প্রত্যন্ত ভাগে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। বঙ্গজননীর এই কেন্দ্রীভূত বিকট হৃৎস্পন্দন ধুমুসু অবস্থা সূচনা করে কিনা ভাবিবার বিষয় বটে। নোয়াখালীর ঐতিহ্য এবং অতীত গৌরবের কথা শুনিতে বাংলার জনসাধারণ কোন কালেই আগ্রহান্বিত হইয়া নাই। ১৯০৭ সনে বেগমগঞ্জ মধ্য-ইংরেজী স্কুলের হেড মাস্টার প্যারীমোহন সেন ‘নোয়াখালীর ইতিহাস’ নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার কোনও গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের একটি খণ্ডও রক্ষিত আছে কিনা সন্দেহ। নোয়াখালীর ইতিহাস সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সবগুলিই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে সেন-মহাশয়ের গ্রন্থই স্থানীয় গবেষণামূলক এবং অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। আজ হয়ত সহস্রদয় বাঙালী পাঠকের চিত্তে নোয়াখালীর বিষয়ে কৌতুহল জাগিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত উপকরণসমূহের কিয়দংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া তাহা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে প্রয়াস করিব।

নোয়াখালী জেলার বর্তমান নাম ও কেন্দ্রস্থল অতীত গৌরবের সহিত সম্পর্কবহিত ও আধুনিক। ইংরেজ রাজত্বের

পূর্বে “নোয়াখালী” নামক গ্রাম বা নগরের অস্তিত্ব ছিল না—ইহার অভিনবত্ব নাম-মধ্যেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লাভজনক নিমক মহাল স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অনতিদূরবর্তী এই নোয়াখালীতে এক জন বিশিষ্ট ইংরেজ সেন্ট এজেন্ট রূপে অবস্থান করেন। ইহা ১৭৮৭ সনের কিছু পূর্বের ঘটনা, পরের নহে। জিপুরার কালেক্টার জন বুলার (John Buller) সাহেব (২৪।১১।১৭৮৫-১২।১।১৭৯২) J. Gross নামক ব্যক্তির ১৩।১৭৮৭ তারিখে “Noahcollee” হইতে লিখিত যে পত্র পাইয়াছিলেন তাহা হুমিলা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। ইহাই নোয়াখালীর প্রাচীনতম উল্লেখ। ১৮২২ সনে পৃথক জেলা গঠনের স্বত্বপাতকালে ইহার নাম ছিল “জিলা ভুলুয়া”—১৮৬৮ সন হইতে বর্তমান নাম চলিতেছে।

সমুদ্রমধ্যস্থ হাতীয়া-সন্দীপ বাদ দিয়া নোয়াখালীর বর্তমান ভূ-ভাগ প্রায় সমগ্রই প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সত্রাই আকবরের রাজত্বকালের পূর্বেই জুগীদিয়া ও দাদড়া ভুলুয়া হইতে পৃথক হইয়া যায়। টোড়রমল্লের বন্দোবস্তে ইহাদের রাজত্বের পরিমাণ ছিল—ভুলুয়া (১৩৩১৪৮০ দাম) জুগীদিয়া (৫১২০৮০ দাম) ও দাদড়া (৪২১৩৮০ দাম)। পরবর্তী কালে ভুলুয়ার অংশদ্বারা আরও নূতন নূতন পরগণার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য ও সমাজের স্থিতি এখন পর্যন্ত সর্বত্র জাগিয়া আছে। এই রাজ্যের অধিপতি দেবতার নাম—বারাহীদেবী। ভুলুয়ার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণমাণিক্যের সভাকবি “রঘুনাথ কবিতার্কিক” রচিত ‘কৌতুক-রত্নাকর’ নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত প্রহসনের প্রস্তাবনার ভুলুয়া রাজ্যের রাজধানীর এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

যত্ব হি—জামাদিগ্রহবীধীবিচরণপটুভূমিতা ভূমিদেবৈ—

নিভ্যং ভূদেবদেবার্চনরতমহুজা ভারতীরঙ্গশালা ।

বঙ্গালঙ্কারভূতাত্ত্বিমিলনমহাসাদরাশেষলোকা

বারাহী যত্র দেবী স্বয়মবনকরী ভুলুয়া রাজধানী ॥৫

অপিচ—দানৌদৈববলভিমিত্যঃ স্মৃতিতিনামাশংসনীর্য স্থিতেঃ

সর্বলোকাদপি সা সমুজ্জ্বলগুণা বিভ্রাজতে ভুলুয়া ।

যত্নাং শূরকুলায়ুধেঃ সমুদিতাঃ কল্পক্রমা জঙ্গমাঃ

ক্ষৌণীক্কাঃ বিচরন্তি সন্তি বিব্ধাচাৰ্য্য বিজ্ঞেজ্জাঃ শতম্ ॥৬

অর্থাৎ—লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানী ভুলুয়া জামাদিশাস্ত্রের
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদ্বারা ভূষিত ছিল, অধিবাসীরা দেবদ্বিজ
ভক্তিম্যান এবং সকলেই অতিথিসংকারে উৎসুক ছিল।
সরস্বতীর রঙ্গশালা এবং বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপা এই নগরীর
রক্ষাকর্ত্তী স্বয়ং বারাহীদেবী। স্বর্গ হইতেও সমুজ্জ্বল গুণরাশি
এখানে বিরাজমান—দানবর্ষ ও যাগযজ্ঞ দ্বারা ইহা পুণ্যবানের
প্রশংসনীয় আবাসস্থল। শূরবংশীয় রাজারা জঙ্গম কল্পতরু রূপে
এখানে বিচরণ করিতেছেন এবং শত শত বৃহস্পতিতুল্য শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণ এখানে বিদ্যমান।

অপর এক জন প্রাচীন অজ্ঞাতনামা কবি জম্বুভূমির শুভ
করিয়াছেন—তখনও শূররাজবংশের পতন হয় নাই। ত্রিপুরার
এক পত্নীতে একটি পুত্রের পত্রে এই মনোহর শ্লোক আমরা
পাইয়াছিলাম :—

বারাহী যত্র দেবী ত্রিভুবনভবনভ্রাণ-সংহারকর্ত্তী

যত্রান্তে বহ্ননহা ক্ষিতিপকূলমণেঃ শূরবংশস্ত লক্ষ্মীঃ ।

যত্র জামাদিশাস্ত্রেশ্বরমরগুরুনিজাঃ পণ্ডিতাঃ সন্তি সমুঃ

সা ভূয়া বঙ্গভূমেজগতি বিজয়তে ভুলুয়া জম্বুভূমিঃ ॥

অর্থাৎ, ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তী বারাহী দেবী যেখানে
বিরাজমান, বৃণকুলশ্রেষ্ঠ শূরবংশের রাজলক্ষ্মী যেখানে বদ্ধাবস্থায়
আছেন, দেবগুরুতুল্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা যেখানে বাস করেন,
বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপা সেই জম্বুভূমি ভুলুয়া আজ জগতে
বিজয়লাভ করিতেছে। নোয়াখালীর কতিপয় প্রাচীন দানপত্রে
৮বিষ্ণুগ্রীতের পরিবর্তে “বারাহীদেবী গ্রীতে” লিখিত পাওয়া
যায়। (কুমিল্লা কালেক্টরীর ১৯২৪ ও ৫১৭৮ সংখ্যক সনদের
প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য—প্রথমটির তারিখ ১৬/১২/১১৬৪)। ১২৫২
সনে ভুলুয়া জমিদারী নিলাম হইলে ভুলুয়ার শেষ স্থানীয়
জমিদার খিলপাড়া নিবাসী সাধক কবি জগজ্ঞান নারায়ণ
চৌধুরী নিম্নোক্ত গানটি রচনা করেন :—

“কবুলে কি মা, ওগো ঠামা মা তুলোর উপর ডাকাতি ।

বারাহী নামেতে তুলো, মহিমা জাগ্রত ছিল,

সে তুলো নিলাম হ’ল, মা হ’লে বিঘাস-ধাতী ॥

তুলো অধিপতি হারা, করিলি কৌণীন সারা,

বানেবাড়ী কবুলি ছাড়া, নিবালি জলন্ত বাতি ॥

দাস জগজ্ঞান বসে, এই ছিল মা মোর কঁপালে,

পাধারে পড়িয়া ডাকি, ঠাড়াতে মা নাহি ক্ষিতি ॥”

প্রবন্ধ-লেখকের বাল্যগুরু খিলপাড়া নিবাসী সংস্কৃত গ্রন্থকার
স্বকবি ৮আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় (জন্ম ৪৮/১২৬৬, মৃত্যু
৫১১/১৩৪১) নোয়াখালী ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে
মহলাচরণ করিয়াছিলেন :—

সমুদ্রাভূখিতা লক্ষা স্বঃশ্রেয়সকরী শুভা ।

দেশাধিষ্ঠাতৃদেবী যা বারাহীং তাযুপাস্যছে ॥

বারাহীনগর, বারাহীপুর প্রভৃতি গ্রাম এবং বারাহীপ্রসাদ,
বারাহীচরণ, বারাহীদাস প্রভৃতি নাম নোয়াখালীর বাহিরে
কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। নোয়াখালীবাসীর চিত্তে এইরূপ
ওতঃপ্রোত ভাবে অধিষ্ঠিত দেবী-প্রতিমার কথা বাঙালীর
নিকট এর অজ্ঞাত। “বাংলায় জন্মণে” গ্রন্থ সমস্ত প্রসিদ্ধ
ও অপ্রসিদ্ধ তীর্থাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু নোয়াখালীর ক্ষুদ্র
বিবরণ মধ্যে বারাহী দেবীর নাম নাই। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ
মহাশয় দেবীবিগ্রহের যে আধ্যাত্মিক স্মৃতি করিয়াছেন তাহা
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

মিথিলানিবাসী শূরবংশীয় ক্ষত্রিয় “রাজা বিশ্বস্তর” (অথবা
বিশ্বধর) চন্দ্রশেখর তীর্থদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে
নাবিকদিগের দিগ্ভ্রমবশতঃ একটি চরে উপনীত হন।
নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এক দেবী তাঁহাকে বলিতে-
ছেন,—“আমি বারাহী দেবী তোমার অর্গববানের দক্ষিণপাশে
আছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া পূজা কর। তুমি যে
এখন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে দেখিতেছ, ক্রমে ইহা ভূমিখণ্ড রূপে পরিণত
হইবে। ইহাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত
একাধিপত্যে রাজত্ব করিবে এবং অষ্টম পুরুষের রাজত্বকালে
এই রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত হইবে; ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত ইহার
ঋতঃশে রাজত্ব করিলে, তোমার বংশধরগণ রাজ্যহীন হইবে।”
(নোয়াখালীর ইতিহাস পৃ. ১৫) প্রবাদ অনুসারে ৬১০
বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ বারাহীদেবীকে উত্তোলন করিয়া কুজাটকা-
চ্ছর আকাশে দিগ্ভ্রমবশতঃ “পূর্বমুখী” করিয়া স্থাপনকরতঃ
ছাগাদি বলিদানে দেবীর অর্চনা সম্পন্ন হয়। অর্ঘ্যোদয়
হইলে সকলে বলিয়া উঠেন “ভুল ছন্না”—ইহাতেই নব-
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হইল “ভুলুয়া” ॥ বিশ্বস্তরের সন্দেশ
১৪৯টি নৌকা ২০০ সৈন্য এবং পরিজনবর্গ ছিলেন। বর্তমান
সোনাইমুড়ী রেল স্টেশনের পশ্চিমে “বগাদিয়া” নামক গ্রামে
দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উল্লিখিত অজ্ঞাত প্রবাদ
হইতে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা হইল। আমরা মূলতত্ত্ব-
গুলি নিদ্রাশন করিতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে যে কতিপয়
শূরবংশের শাখা বিজয়মান আছে তাঁহারা বাৎস্তগোত্র—এক
সময়ে ইহারা ক্ষত্রিয়চাচারী ছিলেন তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান
আছে। লক্ষ্মণমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র অনন্তমাণিক্যের বংশধারা
অধুনা ত্রিপুরা জেলার কাদুবা পরগণায় জীবনপুর গ্রামে বিজয়মান
আছে। অনন্তমাণিক্যের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রনারায়ণের গলায়
সোনার ত্রিদণ্ডী উপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণজ্ঞানে জনৈক ব্রাহ্মণ

নমস্কার করিয়াছিল। চন্দ্রনারায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত দান করেন এবং তদবধি আর কেহ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই। এই ঘটনাটি একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্যে প্রচারিত হইয়াছিল—“ব্রাহ্মণে প্রণয় কৈল, ত্রিদণ্ডী দান হৈল।” বিশ্বস্তরের গুরু ও পুরোহিতবংশ মিথিলা হইতে আগত বলিয়া চিরকাল প্রসিদ্ধি আছে, যদিও ইঁহারা রাষ্ট্রীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। শুরবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে চির-প্রচলিত মৈথিল প্রবাদটিকে সম্প্রতি উড়াইয়া দেওয়ার অধুত চেষ্টা হইতেছে। শুরবংশের নামমালা যখন প্রথম সংগৃহীত হয়, বিশ্বস্তরের পরিচয়হলে “আদিশুরের নবম পুত্র” এইরূপ লেখা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই আদিশুরের সহিত বহাদ্রবিপতি বিখ্যাত রাজা আদিশুরের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বল্প কৃত্রিমতায় আশ্রয় লইয়া বিশ্বস্তরকে রাঢ়াগত প্রতিপন্ন করিতে আদিশুর হইতে বিশ্বস্তর পর্যন্ত ১৫শ পুরুষের নাম ও তারিখ আবিষ্কার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। (রাজমালা, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, ১১৯-২১ পৃ.) আদিশুরের প্রামাণিকতা বিচারে এইরূপ উৎকৃষ্ট মুদ্রিত নিদর্শন কেহ আলোচনা করেন নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। বস্তুতঃ ভুলুয়ার সামাজিক ইতিহাস যাহারা ঘূণাক্ষরেও অবগত নহেন তাঁহারা এইরূপ কৃত্রিম বস্তুর আবিষ্কার।

রাজা বিশ্বস্তর কর্তৃক ভুলুয়া রাজ্য ও বারাহী বিএছ প্রতিষ্ঠার তারিখটি প্রমাণসিদ্ধ নহে। বিশ্বস্তরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ লক্ষ্মণমাণিক্য সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বিশ্বস্তরের অতীতকাল কিছুতেই ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে যাইবে না। প্রচলিত তারিখটির মধ্যে একটি বিলুপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বঙ্গ প্রচলিত হয়। তৎপূর্বে বাংলার বহুস্থলে অপর একটি দেশীয় অঙ্গ প্রচলিত ছিল—পরবর্তীকালে ইহা “পরগণাতি সন” নামে প্রচারলাভ করে। প্রাচীনকাল হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ভুলুয়া অঞ্চলেও ঐ সন প্রচলিত ছিল। আমরা ভুলুয়ার শত শত প্রাচীন দলিল ও পুথিতে উক্ত সনের উল্লেখ দেখিয়াছি। ইহা “কার্তিকাদি” এবং ১২০১-৩ সন হইতে আরম্ভ। কারণ, বহু দলিলের সঙ্গে বাংলা সনও লিখিত আছে। যথা, কুমিল্লার সনদ রেজিষ্টারের ১৪ সং সনদের তারিখ “১১৬২ বাশালা সন ৫৫৪ পরগণাতি মাহ ১৫ কার্তিক।” এইরূপ ১১৮৬=৫৭৭ ২৫ জ্যৈষ্ঠ (২৪৫ সং

সনদ), ১১৪২=৫৩৪ ১৫ আষাঢ় (১০৮২ সং), ১১৪১=৫৩৮ ১৫ বৈশাখ (৩০৭৪ সং) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কালক্রমে এই পরগণাতি সনই ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে উপর বলিয়া জান্ত মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত একটি বাংলা পুথির লিপিকাল ১৬১১ শকাব্দা ও “পরগণে ভুলুয়া সন ৪৮৭” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। (I.H.Q., XLV. pp. 740-1; দ্রষ্টব্য) ভুলুয়া ভিন্ন ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণায় ও ঢাকা, করিমপুর, ব্রীহট প্রভৃতি অঞ্চলে এই সনের প্রচার প্রমাণিত হইয়াছে।

বিশ্বস্তর কর্তৃক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবাদ লক্ষ্মণমাণিক্য রচিত ‘বিখ্যাতবিজয়’ নাটকের প্রস্তাবনায় ইঙ্গিতে সমাধিত হইয়াছে :

যদোগ্রপ্রথমে কেনচিদহো আকল্পমত্যন্ততৈ-

ব্রহ্ম স্বীয়গুণৈঃ কুলক্ষিতভুজাং পদালয়া মন্দিরে। (১০ শ্লোক)
অর্থাৎ, লক্ষ্মণমাণিক্যের আদিপুরুষ প্রথম পর্যন্ত স্থায়ী গুণবিশিষ্ট কুলরাজগণের রাজ্যলক্ষ্মীকে স্বীয় মন্দিরে অচলভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৭০০ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত নাটকের (প্রথম দুই অঙ্কের) টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ‘কেনচিং’ পদের ব্যাখ্যা “বিবাহরসায়নামধেয়েন রাজ্য” লিখিত আছে। ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলা হইতে আসিয়া বিশ্বস্তর ভুলুয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য। এই দেশান্তর-গমনের কারণ আকস্মিক ভীষণদর্শন না হইয়া সুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ তোঘলক কর্তৃক মিথিলাবিজয়ই অধিক সম্ভাবিত। তাহা হইলে ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে ১৩২৫-৩৫ সনে ভুলুয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করা যায়। সম্ভবতঃ সোনারগাঁও নবাব ফকরুদ্দীন (১৩৩৯-৪৯ সন) কর্তৃক চাটগ্রাম বিজয়ের পূর্বেই বিশ্বস্তর আসিয়াছিলেন। শিহাবুদ্দীন তালীশের বর্ণনানুসারে (J.A.S.B., 1907, p. 421) ফকরুদ্দীন চাটগ্রাম অভিযানকালে চাঁদপুর হইতে চাটগাঁও পর্যন্ত উচ্চ রাজপথ (‘আল’) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নোয়াখালীতে এই প্রাচীন রাজবস্তুর স্মৃতি “ফজলিনের হুদ” নামে এখনও বাঁচিয়া আছে।

১৪শ শতাব্দীতে নোয়াখালীর উত্তরাংশ সমুদ্রের চর ছিল না। সুতরাং বারাহী মূর্তির বঙ্গদেশকাহিনী এবং পূর্বমুখী হইয়া অবস্থানবান্ধা অমূলক বলিয়া মনে হয়। বারাহী দেবী মূর্তিতত্ত্ববিদ্যার দিক্‌দেখি বৌদ্ধ “মারীচী” মূর্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দেবতার হিন্দু দেবতারূপে এই বিচিত্র পরিণতি-মধ্যে এবং প্রাচুর্য ও বিপরীত ছাগবলিদানের মধ্যে মূলতঃ একটি বৌদ্ধ পরিবারের প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রসম্মত আচার প্রচলিতভাবে আছে কিনা গবেষণাযোগ্য। বর্তমানে নিম্নলিখিত ধ্যানে বারাহীর অর্চনা হয় :—

বারাহীং চাষ্টভুজাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকায়।

পাশাঙ্গুশব্দস্বর্গাং নথ্যেত্রীবদনানুজাম্ ॥

১। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে যত কৃত্রিম বংশলতা ও কুলপঞ্জী রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শতাংশও প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি মধ্যে পাওয়া যায় না। যাহারা বর্তমানে কুলপঞ্জী হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা কেহই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মুদ্রিত গ্রন্থমাত্র অবলম্বন করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছেন।

দক্ষকর্ণে মুখং দুর্গা বামকর্ণে বরাহকর্ণ ।

বরাহবাহিনীমাদ্যাং সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

(আনন্দনাথ রায়ঃ বারহুঞা, পৃ. ১৫৫)

দুর্গার বীজমন্ত্র এবং আবরণ দেবতা মহারুদ্র ভৈরব, দুর্গা, বরাহগণ, উমা, মহেশ্বর এবং সর্বাঙ্গ দেবতারূপে। আমরা বারাহী দেবীর দর্শনলাভে সমর্থ হই নাই। ষাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছেন তাঁহার বলেন মূর্তিটির রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত অক্ষুণ্ণ মনোহর মূর্তির সহিত “অবিকল সাদৃশ্য” আছে (শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃ. ১৩৭)। বাদলা দেশে যতগুলি মারীচী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে রাজসাহীর এই মূর্তিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর—উহা বিক্রমপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৩১৯ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘সাহিত্য’ পত্রে উক্ত মূর্তির উৎকৃষ্ট ছবি মুদ্রিত হইয়াছে (Catalogue of Archaeological Relics, V. R. S., p. 6. ও ছবি দ্রষ্টব্য)। ‘সাধনমালা’ গ্রন্থোক্ত ধ্যানের সহিত উক্ত মূর্তির আশ্চর্য মিল রহিয়াছে :—

স্বর্ঘ্যং পীত বর্ণাকারং ধ্যাওয়া তদিনির্গতরশ্মিনিবহৈরাক্রাশে সমাক্ষ্য ভগবতীমগ্রতঃ স্থাপয়েৎ । গৌরীং ত্রিমুখীং ত্রিনেত্রায়ুষ্টি-
ভুজাং রক্তদক্ষিণমুখীং বজ্রাঙ্কুশ শরহুচিধারিদক্ষিণকরাম্ অশোক
পল্লবচাপপুস্ত্রতর্জনীধরবামচতুরকরাং বৈরোচনমুষ্টিটনীং নানা-
ভরণবতীং চৈত্যগর্ভস্থিতাং রক্তাধরকঙ্কাত্তরীয়াং সপ্ত শূকর
রথাক্রাণ্ডাং প্রত্যাঙ্গীঢ়পদাং এংকারজবায়ুমণ্ডলে হংকারজচ্চ-
স্বর্ঘ্যগ্রাহিমহোগ্রাহসমধিষ্ঠিতরথমধ্যাং দেবচতুষ্টয়পরিবৃত্তাং...
বভ্রালীং...বদালীং...বরাঙ্গালীং...বরাহমুখীং...ধ্যাওয়া । (সাধন-
মালা Vol, 1, p. 303) । অনন্তজ পুরোহিত এবং বিধি মূর্তি
দেখিয়া যে ধ্যান ও আবরণ দেবতা কল্পনা করিয়াছেন তাহা
অদ্ভুত। ভুলুয়ার মারীচী ওরফে বারাহীমূর্তি উজ্জল কষ্টিপাথরে
নির্মিত, ইহার উর্দ্ধভাগে কিছু খণ্ডিত এবং ভিন্ন জাতীয় একটি
পৃথক প্রস্তরখণ্ড পাদপীঠরূপে ব্যবহৃত। ভুলুয়ার এই “জাগ্রত”
দেবীর সম্মুখে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে।

শ্রীরাজগণের রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বারাহী
দেবীরও স্থান পরিবর্তন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশ্বস্তরের
রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল নিঃসন্দ্বিধরূপে জানিবার
উপায় নাই। ভুলুয়া পরগণা ছাড়া ভুলুয়া নামে একটি নগরীও
বিদ্যমান ছিল, কবিতার্কিকের শ্লোকে সেখানে রাজধানী থাকার
প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে মোরাখালী শহরের পাঁচ কোশ
উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন ভুলুয়া নগরী একটি নাতিশূন্য গ্রামে
পরিণত হইয়াছে—জমিদারের একটি কাছারিই ইহার একমাত্র
গৌরবচিহ্ন। এই গ্রামের নামমধ্যেই ইহার প্রাচীনতার প্রতীক
চিহ্ন বর্তমান এবং অনুমান হয় বিশ্বস্তরের রাজধানীও এখানেই
প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বস্তরের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ‘গণপতি’
রাজা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ‘শ্রীরামন্দ’। এই খাঁ উপাধি
দ্বারা গোঁড়ের পাঠান রাজগণের নিকট ইহার আত্মগত্য স্মৃতি

হয়। রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীনই তাঁহার পোষক হওয়া
সম্ভব—চাটগাঁ হইতে জালালুদ্দীনের বহু মুদ্রা প্রচারিত হইয়া-
ছিল। শ্রীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘শ্রীরাম খাঁ’। তাঁহার নামানুসারে
অধুনাখ্যাত ‘শ্রীরামপুর’ গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। তৎপুত্র
‘কবিচন্দ্র খাঁ’—ইহার রাজত্বকালে বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণ
ভুলুয়ার সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘রাজবল্লভ রায়’। ইনি হীনবল ছিলেন এবং ইহার
সময়েই ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্য (১৫২৬-৩২) ২ সর্বপ্রথম
ভুলুয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিজেন্দ্রী ত্রিপুরাধি-
পতি ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬) যে সকল দেশ জয় করিয়া-
ছিলেন তন্মধ্যে ভুলুয়ার নাম নাই। দেবমাণিক্য সম্বন্ধে প্রাচীন
হস্তলিখিত রাজমালায় আছে :

শ্রীদেবমাণিক্য রাজা বড় মুন্ডাজন ।

ভুলুয়া জিনিয়া করে সমুদ্রে গমন । (২৩র্থ পত্র)

রাজবল্লভের দুই পুত্র ‘উদয়মাণিক্য’ ও ‘গন্ধর্বমাণিক্য’।
ইহাদের নাম প্রচলিত মুদ্রিত বংশলতায় বাদ পড়িয়াছে।
আমাদের সংগৃহীত দুইটিমাত্র বংশলতায় ইহাদের নাম আছে
—একটিতে ‘গন্ধর্ব’ স্থানে ‘পঙ্গত’ (Pangat), অপরটিতে
‘সঙ্গব্য’ লিখিত আছে। উদয়মাণিক্যের অতি প্রামাণিক
বিবরণ ত্রিপুরার রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহার প্রকৃত
নাম ছিল ‘দুর্জয়নারায়ণ’ এবং তিনি বিখ্যাত ত্রিপুরাধিপতি
বিজয়মাণিক্যের (১৫৩২-৬৫) অধীনস্থ জমিদার ছিলেন। বিজয়-
মাণিক্যের সেনাপতি গোপীপ্রসাদনারায়ণ বলপূর্বক ত্রিপুর-
সিংহাসন অধিকার করিয়া উদয়মাণিক্য নামে (১৫৬৭-৭৩)
রাজত্ব করেন। তৎকালে উক্ত দুর্জয়নারায়ণ হঠাতঃসংকারে
ত্রিপুরার অধীনতা পরিহার করিয়া স্বয়ং ‘উদয়মাণিক্য’ নাম
গ্রহণপূর্বক বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী ত্রিপুরাধি-
পতি অমরমাণিক্য (১৫৭৭-৮৬) তাঁহাকে “মাণিক্য” উপাধি
বর্জন করিতে আদেশ করেন এবং অস্বীকৃত হইলে ১৫০০ শকে
ভুলুয়া আক্রমণ করেন। উদয়মাণিক্য পরাজিত হইয়া বাকলায়
পলায়ন করিলে বিশ্বাসঘাতক কন্দর্প রায় তাঁহাকে বধ করেন।

২। নূতন মুদ্রাদির আবিষ্কার-ফলে ত্রিপুর-রাজগণের
রাজত্বকাল এখন নিঃসন্দ্বিধরূপে নির্ণীত হইয়াছে এবং মুদ্রিত
রাজমালায় কালনির্ণয় প্রায় সর্বত্র ভ্রাম্যক প্রতিপন্ন হইয়াছে।
দেবমাণিক্যের ১৪৪৮ শকের মুদ্রা ঢাকা মিউজিয়মে আছে।
বিজয়মাণিক্যের ১৪৫৪ শকের দুইটি মুদ্রা মালদহে রক্ষিত
আছে—ইহাতে রাণীর নাম নাই। অনন্তমাণিক্যের ১৪৮৭
শকের মুদ্রা এবং উদয়মাণিক্যের ১৪৮৯ শকের মুদ্রা মালদহে
আবিষ্কৃত হইয়া বর্তমানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্ধন
মহাশয়ের নিকট আছে। উদয়-পুত্র জয়মাণিক্যের ১৪৯৫
শকের মুদ্রা ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত ব্রজেনকিশোর দেববর্ধ
মহোদয়ের নিকট আছে। মালদহের মুদ্রা দুইটি ছাড়া সব
মুদ্রাই আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি।

ত্রিপুরা হইতে যে ‘রাজমালা’ বহু ৩ খণ্ডে বিভক্ত আলোচনাদিসহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মূল্যে উজ্জ্বল দুর্গামণি সংশোধিত প্রাচীন রাজমালার আধুনিক সংস্করণ। আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উজ্জ্বলপ্রবরের ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাববশতঃ তাঁহার তথাকথিত সংশোধন প্রায় সর্বত্র ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাজমালার তৃতীয় লহরে (পৃ. ১১-১৩) ভুলুয়া-বিজয়ের বিবরণ এবং ‘মধ্যমণি’তে (পৃ. ১৩৮-৪৮) তাহার বিভূত ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ এবং সর্বথা সংশোধনীয়। আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার ‘ভুলুয়া জয়ধার্য’ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি,—

“দুর্লভনারায়ণ সুর জাতি ভুলুয়া জমীদার।

নৃপমাঞ্চে জিরে সে যে রাজব্যবহার ॥

পুরুষে পুরুষে তারা ত্রিপুরেস্ত মিলে।

রাজবংশ নহে উদয় দেবেত না মিলে ॥

উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ মারি।

এহি হেতু না যাইল অহঙ্কার করি ॥

আপনে ধরিল নাম উদয়মাণিক্য।

অনন্তমাণিক্য তুমি আমি সমকক্ষ ॥

হেন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জলে।

করিতে না পারে কিছু জুঝে গৌড় বলে ॥

কতবর্ষে অমরমাণিক্য রাজা হৈল।

মাণিক্য না ধরিতে তাহাকে লিখিল ॥

না মানিল আজ্ঞা সে যে মন্তুয়া হয়ে।

তুমি রাজা না হইতে মোর নাম হয়ে ॥

তুমি হ না হও রাজা ধরে বড় নয়।

বড়ুয়া হইছ রাজা কেনে অতিশয়ে ॥

বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।

বড় যা আছিল তান আপনেহ তুমি ॥

* * *

উদয়মাণিক্য ভবে বাকলাত গেল।

কন্দর্প রায় জমিদারে তাহারে মারিল ॥”

ভুলুয়া রাজবংশে এই উদয়মাণিক্যই (দুর্লভমাণিক্য এ স্থলে ভ্রান্ত পাঠ) সর্বপ্রথম গৌরবাগত ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করিয়া বংশমর্যাদা বাড়াইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন সন্দেহ নাই, নতুবা পরাক্রান্ত ত্রিপুরাধিপতিদ্বয়ের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। রাজমালার উক্তি অনুসারে ত্রিপুরাধিপতি বিশ্বাসঘাতক উদয়মাণিক্যের সহিত সংঘর্ষকালে ভুলুয়ার উদয়মাণিক্য গৌড়াধিপতির সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়াধিপতি নিঃসন্দেহ সুলেমান কররানি।

উদয়মাণিক্যের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা গজদৈবমাণিক্য ১৫০০ শকে (১৫৭৮-৯ সনে) ভুলুয়ার রাজা হন। বলা বাহুল্য, তিনি অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। ‘অমরমাণিক্য’ খননকালে ভুলুয়া হইতে যে ১০০০ টাঁড়ী প্রেরিত হইয়াছিল তাহা গজদৈবমাণিক্যের রাজত্বকালীন ঘটনা। যদিও রাজমালার সাগর খনন রূপান্ত ভুলুয়া-জয়ের পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি অমরমাণিক্যের ‘ত্রিহট্ট-বিজয়’ মুদ্রার তারিখ ১৫০৩ শককে হইতে প্রমাণ হয় সাগর খনন ভুলুয়া বিজয়ের পরের ঘটনা, পূর্বের নহে। পরবর্তী ত্রিপুরাধিপতি যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫০০-২৩) গজদৈবমাণিক্য বিদ্রোহী হইয়াছিলেন (রাজমালা, ৩য় লহর, পৃ. ৫৮)। রাজমালার প্রেক্ষায় তাঁহার মাণিক্য উপাধি অঙ্গীকার না করিয়া গজদৈবনারায়ণ নাম লিখিয়াছেন। রাজমালা-সম্পাদক মহাশয় গজদৈবমাণিক্যের অস্তিত্ব অবগত না হইয়া নামটি ভুল অনুমান করিয়াছেন (ঐ পৃ. ৩৪৭)। ভুলুয়ার গজদৈবপুর, গজদৈবনগর প্রভৃতি গ্রামের নাম তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তিনি কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন পুর্কোন্নিখিত ‘কৌতুকরত্নাকর’ গ্রন্থসনে তাহার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে।

“জনকন্ত যন্ত —আসীমনোজ্ঞাধিকরম্যমুর্তিঃ

যেতাতপত্রীকৃতচারুকীর্তিঃ।

শূরায়দ্যন্তোনিধিপূর্ণচক্রে।

গজদৈবমাণিক্যমহীমহেজঃ ॥৭

অপি চ, আভ্রমণ্ডলমা সুরেন্দ্রসদনাদা সপ্তপাতালকাং

আসপ্তার্ণবমা ধরাধরকুলাদা পদ্মসদ্বালয়ং।

আবৈকুণ্ঠমজ্জি যন্ত সময়প্রস্থানলীলাবিধৌ

ভেরীভাঙতি-কুন্তীচীংকুন্তি-বহুঈন্দ্রার-

বাক্ষসনৈঃ ॥৮

অপি চ, গজেন্দ্রজীযুতমদাধুর্যুষ্টিশ্রীপতের্ষন্ত

পুংস্ত সন্নিধৌ।

নিতান্তদূরেপি বিপক্ষভুতুকাং প্রতাপবহ্নিঃ

প্রশমং সমাগতঃ ॥৯

অপি চ, ভ্রমতি যুধি করীন্দ্রে যস্য সংরূঢ়পক্ষঃ,

কিত্তিধর ইতি মোহাদগ্রহীদ্রজমাণ্ড।

তদনু দশনবীক্ষাপান্তাদৃগ্ ভ্রমোহয়ং,

সুরসদসি সলজ্জো বজ্রপার্শ্বিভুব ॥১০”

(সারার্থ, লক্ষণমাণিক্যের পিতা রাজা গজদৈবমাণিক্য কামদেব হইতেও সুলতর ও কীর্তিমান ছিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে ভেরী, হস্তী, ঘন ও অশ্বের বিপুল ধনি ত্রিভুবনাদি ব্যাপ্ত করিত। তাঁহার গজসৈন্তের মদবারিবর্ষণে শত্রুরাজাদের প্রতাপানল নির্বাপিত হইত। তাঁহার যুদ্ধহস্তীকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্র পঙ্কধারী পর্বতভ্রমে বজ্র ধারণ করেন এবং দাঁত দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হন।)

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় তাঁহার গজসৈন্ত ছিল এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধকালে পূর্বতপ্রমাণ একটি বিপুলকায় হস্তীতে আরোহণ করিতেন। কবি এখানে তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্ৰহণ বর্ণনা করিয়াছেন—লক্ষণমাণিক্যের ভ্রাতা তাঁহার বিজা

কিন্তু বিধংপ্রিয়তার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। বুঝা যায় তাঁহার জীবন প্রধানতঃ যুদ্ধবিগ্রহেই কাটিয়াছিল। বিগত ১৫০ বৎসর যাবৎ তাঁহার পুত্র লক্ষণমাণিক্যকেই সকলে বার-ভুঞার অগ্রতম বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ হইতেছে যে, গঙ্গবর্মমাণিক্যই বারভুঞার অগ্রতম এবং তিনিই চাঁদ-কেদার রায়, কন্দর্প রায়, ইছা খাঁ প্রভৃতির সমকালীন এবং বীর্যাদিতে সমকক্ষ। ১২০২ সনে তৎপ্রদত্ত একটি তাম্রশাসন কুমিল্লায় আনীত হইয়াছিল। তদ্রূপ কালেইরীতে ইহার একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—কিন্তু পাঠোদ্ধারকার্য্য এক জন কেরাণীদ্বারা সম্পন্ন হওয়ার প্রতি-লিপিটি অত্যন্ত অন্তর। আমরা যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া “তাহু পত্রের সনদের নকলটি” উদ্ধৃত করিলাম (১৯১২ সংখ্যক সন্দ) :—

শ্রীকৃষ্ণচরণশ্রবণম্

শ্রীশ্রীযুগলক্ষ্মণমাণিক্যদেবদ্য শ্রীলক্ষ্মীমন্তরায়স্য

বন্তি। শ্রীকৃষ্ণচরণান্তোজচ্চরীকেন ধীমতা।

শ্রীলাপ্রহিতকোদণ্ডকাটোঃ খণ্ডিতবৈরিণা।

গৌবিন্দচরণদ্বন্দ্বপরায়ণপরায়ণ।

কলাভিরবতীর্ণেন মহাপারিষদস্য চ।

শ্রীশ্রীগঙ্গবর্মমাণিক্য-মহাপতিমহাশ্রয়।

দত্তা বিভিধিক্রান্তিভ্যঃ পিতৃঃ স্বর্গাভিবুদ্ধয়ে।

শ্রীরামচন্দ্রবীরায় শ্রীরামানন্দশ্রবণে।

হৃদয়ানন্দবিপ্রায় বিদুষে ব্রহ্মচারিণে।

কাচীহাটা-নজিরপুরয়োর্মিশ্রনীলাধরস্য,

যাবভুমির্ভবতি রঘুয়াকীর্যবাসিসমেতা।

তস্মিন্ বাটী লবণমহলে বিপ্রচূর্ণাবরস্য,

মিশ্রাযোপকৃত পরিগতেঃ পঞ্চ চৈর্ষাদ্বয়েসাং।

অত্র গৃহপুণ্যগ্রামপঞ্চাদ্ আয়পোষাঃ সমুপেক্ষিতা ইতি।

যথেষ্টং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমেণোপভূজ্যাতাং।

যদা যদা যস্য ভবেদ্ধরিত্রী, তদা তদা তৎফলমেব তস্য।

অতো দ্বি-জ্ঞানাং (চ) মন্য। প্রদত্তা,

বিভিন্নরৈঃ প্ররিপালনীয়া।

অথ চ, স্বদত্তাং পরদত্তাং ব্রহ্মবিজ্ঞং হরেতু যঃ।

যষ্টবর্ষসংক্রান্তি বিষ্ঠায়াং জায়তে কুমিঃ।

ইতি ৭ ৪০৩ তারিখ...

তাম্রশাসনের তারিখ ‘৪০৩’ পূর্বলিখিত পরগণাতি সন বটে। কারণ, দানস্বাক্ষর ব্যক্তিগণের ৪ জন বৃদ্ধপ্রোত্র ‘রামরত্ন’ প্রভৃতি উপভুক্ত জমির যে বিবরণ তৎকালে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ পারস্ত ভাষায় লিখিত দপ্তরে কুমিল্লা কালেইরীতে রক্ষিত আছে। দানপত্রের তারিখ তন্মধ্যে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে “সন ৪০৩ পরগণাতি।” দান-গ্রহীতাদের পুরা নাম রামচন্দ্র পঞ্চানন, রামানন্দ চক্রবর্তী ও হৃদয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য। কুমির পরিমাণ ষোল ৩৬৮ (তিন ঘোণ

চৌদ কাণি) এবং গ্রামসংখ্যা ছয়—কাঞ্চিহাটা, জয়নারায়ণপুর, কৃষ্ণরামপুর, রামচন্দ্রপুর, রঘুদেবপুর ও মহাবংপুর। এই মূল্যবান তাম্রলিপিদ্বারা প্রমাণ হয় ১৬০৫ সনেও গঙ্গবর্মমাণিক্য জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিনি দুর্দান্ত মননরপতি সিকান্দর সাহা (১৫৭১-৯৩) ও সলীম সাহার (১৫৯৩-১৬১২) সমকালীন এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে তিনি ভুল্লুয়াকে অনেকাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নতুবা মঘ-ফিরিদির অত্যাচারলীলার সম্মুখে অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমই হৃদয়বনের দশা প্রাপ্ত হইত।

১৬০৫-১০ মধ্যে গঙ্গবর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত লক্ষণমাণিক্য ভুল্লুয়ার রাজা হন। বঙ্গের নিভৃত প্রান্তে বসিয়া তিনি যে একটি সারস্বত কেন্দ্র গঠন করিয়াছিলেন তাহার বিচিত্র ইতিহাস চতুর্দিকে মঘ-ফিরিদির শাওবলীলার প্রত্যাদেশরূপে বাঙালীর একটি গৌরবময় কীর্ত্তি এবং পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা যোগ্য। লক্ষণমাণিক্য তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ পিতৃব্যপুত্র অমিতবলশালী অনন্তমাণিক্যের সহিত বিগ্রহ করেন এবং ‘অনন্তমাণিক্য মঘ-রাজা সলীম সাহার সাহায্যে লক্ষণমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ‘বহারিভান’ গ্রন্থসারে অনন্তমাণিক্য ১৬১১ সনে ইসলাম খাঁর মোগল-বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া মঘ-রাজ্যে পলায়ন করেন। অতঃপর অনন্ত কিনা তাঁহার কোন বংশধর ভুল্লুয়ার রাজ্যাংশ কোনকালে প্রাপ্ত হন নাই। লক্ষণমাণিক্য বারভুঞার অগ্রাষ্ট্র বংশধরদের ঋণ মোগল শক্তির বশত স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তৎপ্রদত্ত কতিপয় দানপত্রের প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি—একটির তারিখ ‘১০ মাঘ ৪৩৫ সন’ অর্থাৎ ১৬৩৭ খৃঃ, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালীন। এই দানপত্রে ‘পরগণে ভুল্লুয়া তপে চৌদ্দহাজারীর অন্তর্গত স্বকীয় ‘জায়গীরের’ উল্লেখ আছে। ভুল্লুয়ার চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ অনুসারে বিশ্বাসঘাতক বাক্সলার জমীদার রামচন্দ্রের হস্তে লক্ষণমাণিক্যের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা প্রায় ১৬৪০ সনে সংঘটিত হয়। তাহার অব্যবহিত পূর্বে কি পরে ভুল্লুয়া পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শূরবংশীয় ‘কবি-কীর্ত্তিনারায়ণ’ (দত্তপাড়া) ‘শ্রীরায়’ (মাইজদী) এবং সিংহবংশীয় ‘কবিরত্ন-নারায়ণ’ (বিলপাড়া) চৌধুরীজন্মের সহিত নতুন বন্দোবস্ত হয়। মুগল রাজবংশ ‘তরপ গোপালনগর’ নামক জায়গীর মাত্র অধিকার করেন। লক্ষণমাণিক্যের ৪ পুত্র—ধন্যমাণিক্য (নিঃসন্তান, একটি দানপত্রে ধর্মমাণিক্য লিখিত আছে), চন্দ্রমাণিক্য (নিঃসন্তান), বিজয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্য। অমরমাণিক্যের বহু দানপত্র দ্বারা ১৬৯৬-১৭০৫ মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণীত হয়। তৎপূর্বে বিজয়মাণিক্য ও ধন্যমাণিক্য ‘রাজা’ ছিলেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য ও বিজয়মাণিক্যের পুত্র রুদ্ৰমাণিক্যের মৃত্যুর পর ৫১৭ সনের পূর্বে হইতে অন্ততঃ ৫৩৪ সন পর্যন্ত রুদ্ৰমাণিক্যের পত্নী ‘রাণী

শশীমুখী' স্বকীয় গুণরাশিদ্বারা ভুলুয়া সমাজে চিরস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই ৩কালীধামে গমনকালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বারাহী মূর্তিকে রাজধানী ভুলুয়ার সমিহিত 'কল্যাণপুর' রাজগৃহ হইতে সরাইয়া বর্তমান 'আমিশাপাড়া' গ্রামে স্বকীয় পুরোহিত রাধাকান্ত চক্রবর্তীর গৃহে নূতন দীর্ঘিকা ও মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং কিঞ্চিদধিক ২০০ বৎসর যাবৎ বারাহীদেবী বর্তমান মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। ভুলুয়ার তদানীন্তন সকল জমীদার মিলিয়া উক্ত

রাধাকান্ত চক্রবর্তীকে ৩বারাহীদেবীর পূজার্থে ৭ দ্রোণ ভূমি 'চরমটুয়া' গ্রামে দান করিয়াছিলেন—দানপত্রের তারিখ ১৭ বৈশাখ ১১৭০ (২৬০২ সংখ্যক সনদ দ্রষ্টব্য)। তৎপূর্বে খিলপাড়ার চৌধুরীগণ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১১৬৯ সনে 'চরমনসা' নামক স্থানে উক্ত চক্রবর্তীকে ৩ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ভূসম্পত্তি এখন সমুদ্রগর্ভে। রাধাকান্তের বংশের দৌহিত্রবংশ এখন বারাহীদেবীর মন্দিরাদির স্বত্বাধিকারী।

শিক্ষক

শ্রীজগদীশচন্দ্র বোষ

১

সতীশ দত্তের মনটা আজ মোটেই ভাল ছিল না। সকাল বেলা তিনি রসিক সাহার কাছে অপমানিত হইয়াছেন, গত দুই মাস ধরিয়া বিল আসিলে টাকা দিবেন বলিয়া বলিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ টাকা বাকী লইয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলের টাকাও আসে নাই—তাহার ধারণা পরিশোধ করা হয় নাই।

তা ছাড়া আজ পুনরায় রসিকের নিকট কিছু চাল আর তেলের জন্য গিয়া অনেক কষ্ট কণা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। নীরবে রসিক সাহার কথাগুলো হজম করিতে হইয়াছে এবং আরও দুই-এক জন বন্ধু-বান্ধবের নিকট ঘুরিয়া অবশেষে কয়েকটি টাকা হাওলাত করিয়া চাল ও তেলের যোগাড় করিয়া কোনক্রমে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া সতীশ দত্ত ইঙ্কলে আসিয়াছেন। ইঙ্কলে আসিয়াও সেই এক চিন্তা কেমন করিয়া দিন চলিবে, কবে ইঙ্কল বোর্ড টাকা পাঠাইবে কে জানে। আজ ছয় মাস তাঁহার মাছিনা পান না। আজ তিন বছর ধরিয়া ফ্রি-প্রাইমারী এডুকেশন আরম্ভ হইয়াছে—খোদ সরকার বাহাদুর এখন বেতন দিবার কর্তা। কাজেই বিল করিয়া পাঠাইয়া ও দরখাস্তের পর দরখাস্ত করিয়া তিন মাস ছয় মাস পরে কোন এক শুভ লগ্নে হয় তো বেতন পান। কোন কোন সময় বা তদ্বির করিতে সদরে দৌড়াইতে হয়।

আজ ক্লাসে বসিয়া সতীশ মাষ্টার এই সবই ভাবিতেছিলেন—পড়ানোতে মোটেই মন দিতে পারিতেছিলেন না। এমন এক সময় অমল তাহার প্লেটখানি লইয়া সতীশ দত্তের সম্মুখে আসিয়া বলিল—‘অঙ্কটা মিলছে না মাষ্টার মশাই।’ এই কিছুক্ষণ পূর্বে অঙ্কট একবার বুঝাইয়া দিয়াছেন—হঠাৎ সতীশ দত্তের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গেল, ঠাস করিয়া অমলের গালে একটি চড় কসাইয়া দিয়া বলিলেন—‘ভাগ্য দূর হ।’ অমল সেই হইতে বটখানেক বসিয়া বসিয়া প্লেট আড়াল দিয়া একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছিল, চড়টি খুব জোর লাগিয়াছিল নিশ্চয়। অমল ছুটি হইলে বাহির হইয়া যাইবার সময় সতীশ

মাষ্টার দেখিতে পাইলেন, তাহার গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাত্র হিসাবে তো অমল ধারণা নয়—নিশ্চয়ই অঙ্কট বুঝিতে তাহার কোথাও গোলযোগ হইয়াছিল, সেইটুকু একটু লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিয়া দিলেই ত হইত। আর কতই বা ছেলেটির বয়স—এই তো সবে এগার-বার বৎসর হইবে। ইঙ্কল হইতে ফিরিবার পথেও সতীশ দত্ত এই সবই ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন, বাড়ী আসিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া গীরপুরের গঞ্জের উদ্দেশে বাহির হইয়া যাইতে ছিলেন। গীরপুরের গঞ্জের হৃদয় দাসের আড়তে হিসাবপত্র রাখেন সতীশ দত্ত, মাসিক বেতন আট টাকা। সকালবেলা দুটি ছেলেকে পড়াইয়া পান পাঁচ টাকা, আর ইঙ্কলের মাছিনা তাঁহার একুশ টাকা। এই ছয় মাস শুধু মাত্র তের টাকার উপরে নির্ভর করিয়া সংসার চালাইতে হইতেছে। এ দিকে সংসারের পোয় পাঁচটি—নিজে, স্ত্রী, দুইটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। বাড়ীর বাহির হইবার সময় স্ত্রী ডাকিয়া বলিল—‘আজ মায়ার জন্মে একটা প্যাঁক এনো, ভুলে যেয়ো না যেন।’ সতীশ দত্ত আশ্রিতা আশ্রিতা করিয়া কহিলেন—‘আজ তো হবে না, এই ইঙ্কলের বিলটা পেলেই—’

স্ত্রী মাঝপথে তাঁহাকে ধামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—‘রেখে দাও তোমার বিল—আজ তিন মাস ধরে তো কেবল বিলই দেখাচ্ছ। সাত বছরের মেয়ে নেংটা হয়ে থাকলে কেমন দেখায় বল তো—ঋণীটা মারি অমন চাকুরীর মুখে।’ সতীশ দত্ত কথাটি না কহিয়া চূপ করিয়া পথে নামিয়া পড়িলেন। রাগে ছুঁৎ ছুঁৎ চোখ দিয়া তাঁহার জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

২

মেয়েটি বড়, বয়স সাত-আট, ছেলে দুটির একটি বছর পাঁচেকের, অঙ্কটির বয়স বছরদেড়েক হইল আর কি। মেয়েটির সত্যি পরিধানের কিছুই নাই—সেই বছরখানেক আগে একবার একটি প্যাঁক কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেটি যেমন

ছোট হইয়া গিয়াছে তেমনি ছিড়িয়াও গিয়াছে। এক-মাথা চুল, সব সময় জুট পাকাইয়াই আছে, মুখে সব সময় একটা রোগা রোগা করুণ ভাব, বৃকের হাড়গুলি সব গুনিতে পারা যায়। বড় ছেলেটির অর প্রায় লাগিয়াই থাকে, শিউলি পাতার রস আর চিরতা ডিকানো জল মাঝে মাঝে খাওয়ানো হয়—এক প্রেণ কুইনাইনের দাম দুই আনা, স্ততরাং পেটের প্লীহা, যক্ষ্ম বাড়িয়াই চলিয়াছে। ছোটটিকে এই দেড় বৎসর বয়সেই ভাত ধরানো হইয়াছে, কাজেই পেটের অস্থখ তাহার আর মোটেই ভাল হইতেছে না।

মেয়েটি আজ মাস দুই ধরিয়া ভয়ে ভয়ে আবদার ধরিয়াছে তাহার একখানা রঙিন ডুরে শাড়ী চাই। সামনের মাসে মাহিনা পাইলেই দিবে প্রতিশ্রুতি দিতেই মেয়েটি খুশী হইয়া যায়। ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে প্রতিদিন অন্ততঃ দুই-এক বার করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়, ‘আমার লাল জুতো কবে কিনে দেবে বাবা—দাস্তুর মত।’ গত পূজার সময় পাশের বাড়ীর দাস্তুর এক জোড়া লাল জুতা আসিয়াছে, সেই হইতে ছেলেটির এই আবদার চলিতেছে। সতীশ প্রতিদিনই সেই একই জবাব দেন—‘দেব বাবা দেব, পূজার সময় তোমারও লাল জুতো কিনে দেব।’ শুনিয়া ছেলেটি কখনও খুশী হইয়া, কখনও বা মুখভার করিয়া অবশেষে কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। সতীশ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন এবার বিলের টাকা পাইলে নিশ্চয়ই একখানা ডুরে শাড়ী আর এক জোড়া ছোট জুতা কিনিবেনই।

১৯২০ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ২১ সনের অসহ-যোগ আন্দোলনে জেল খাটিয়াছিলেন সতীশ দত্ত। জেল হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন একটি পল্লীগ্রামে শিক্ষা লইয়া মাতিয়া-ছিলেন। সেই যে শিক্ষার প্রতি অহুঁরাগ—সে অহুঁরাগ আর তাঁহার কোন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। সেদিন সন্ধ্যা ছিল সতীশচন্দ্রের—জীবনে বিবাহ করিবেন না, চিরটা কাল দেশ-সেবা করিয়া, শিক্ষাপ্রচার লইয়াই এ জীবন কাটাইয়া দিবেন। তারপর কতদিন গিয়াছে, নানা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া অবশেষে এই স্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রথম যৌবনের সে সন্ধ্যাও টকে নাই—একটু অধিক বয়সে একটি অনাথা বিষবাকে কতাদায় হইতেও উদ্ধার করিয়াছেন। আত্ম দশ-এগার বৎসর ধরিয়া এই উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়টিতে চাকুরী করিতেছিলেন তিনি। সম্প্রতি তিন বৎসর হইল এই জিলায় সরকারী ‘খয়রাতী শিক্ষা’র প্রচলন হইয়াছে। সতীশচন্দ্র এই স্থলেরই এখন হেড মাস্টার।

প্রথম যৌবনের সেই আদর্শ শেষটায় এমনি অবস্থার আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা সতীশচন্দ্র কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মনে তাঁহার শাস্তি নাই—গৃহে স্বস্তি নাই। স্ত্রী আজকাল যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া যায়, কথায়

কথায় বলে—‘স্বাটী মারি অমন চাকুরীর মুখে, জনশ্রীটাও ওর চেয়ে অনেক ভাল—একটা জনের মজুরি রোজ দেড় টাকা।’

মনের নানা অশান্তিতে ক্লাসে বসিয়াও আত্মকাল আর ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না। অর্থকষ্ট সব সময়ই মনকে পীড়িত করিতে থাকে। তা ছাড়া এই কয় বৎসরে প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্র হইয়াছে দ্বিগুণ, এক জন শিক্ষককে একসঙ্গে পাইকারী হিসাবে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্রকে শিক্ষা খুরাত করিতে হয়। ভাল লাগে না সতীশচন্দ্রের।

৩

সতীশচন্দ্রের স্ত্রী বনলতার এক খুড়তুতো ভাই রমেশ বছর দশেক ধরিয়া কলিকাতায় নানা ব্যবসায় করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হইল মিলিটারী কন্ট্রোল লইয়া একেবারে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাহার নানা দিকে নানা কারবার, একা একা সামলাইয়া উঠা দায়। তাই কলিকাতায় যাইয়া তাহার পুরাতন কারবার দেখাশুনা করিবার জন্ম মাস দুই হইতে সতীশচন্দ্রকে লিখিতেছিল। সতীশচন্দ্র এতদিন কানেই তোলেন নাই। অধ্যাপনা ছাড়িয়া শেষকালে বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? না, তাহা কখনও পারিবেন না। কিন্তু বনলতা এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে, মাষ্টারী করা যে একটি কিছু নয়, এখনই যে সতীশচন্দ্রকে রমেশের নিকট চলিয়া যাওয়া উচিত, যখন-তখন একথা বলিতে কল্পর করে না। এই ছয় মাসে সতীশচন্দ্রের অশান্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে, সব সময়েই খিটিমিটি বাধিয়াই আছে। দুই-এক কথা সতীশচন্দ্রও না বলিয়া পারেন না—ফলে বনলতা চৈতাইয়া কাঁদিয়া একাকার করিয়া ফেলে। পৃথিবীতে টাকাটাই যে সব কিছু নয়, শিক্ষকতা যে কত বড় কাজ স্ত্রীকে সতীশচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই বুধা হইয়াছে—বনলতা তাঁহার একথা কোন দিন কানেই তুলে নাই, বরং প্রকারান্তরে অক্ষম অপদার্থ এমনই অনেক কথা শুনাইয়া দিয়াছে।

এমনি সময় হঠাৎ এক দিন রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। দশ বৎসর পূর্বে যে রমেশ বখাটের মত যখন-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত, সে রমেশ আর এ রমেশে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সে চেহারা নাই—এ কয়টা বছরের ভিতরে শরীরের আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে, পেটে বেশ একটু মেদ জমিয়াছে। পায়ের জুতা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য এক নজরেই বুঝিতে পারা যায়। সে আজকাল বেশ মুরব্বিয়ানা চালে কথা বলে। টাকা যার বুদ্ধিও তার—গরীবেরা কিছু নয়—এইটাই যেন প্রমাণ করিতে চায়। দিদি, ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের জন্ম অনেক টাকার জামাকাপড় লইয়া আসিয়াছে সে। স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া রমেশ সতীশচন্দ্রকে বলিল—‘আমি কিন্তু আপনাদের নিতে এসেছি জামাইবাবু, কাল চারটের গাড়ীতে যেতে হবে প্রস্তুত হোন।’

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—‘সে কি রকম।’

—‘কেন, আজ ক’মাস ধরে লিখছি যে।’

—সে হয় না রমেশ।

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন ?

কি সুখে এখানে পড়ে আছেন শুনি ? একটু চেষ্টা করলে মাসে দুই-এক শ’ টাকা রোজগার সে আবার একটা কথা না কি ? ও সব চলবে না—ধরে তালা দিয়ে চলুন।

কিন্তু সতীশচন্দ্র জবাব দিলেন—ইঙ্গুল ছেড়ে আমি যেতে পারব না রমেশ।

—তার মানে—আপনার ছেলেমেয়েদের এমনি করে উপবাসী রেখে মেরে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, শুনি ?

—মেরে ফেলা ?

—না তো কি ? এমনি করে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকে ছেলেরা কখনও মানুষ হবে মনে করেছেন ? চিরটা কাল পাড়াগায়ে পড়ে পড়ে যদি মাষ্টারীই করবেন—তবে বিয়ে করা উচিত হয় নি—ছেলেমেয়েদের বাপ ইওয়াও উচিত হয় নি।

ওদিকে বনলতা ঝগড়া করিয়া কঁদিয়া কাটিয়া জানাইয়া দিল—রমেশের সহিত না যাওয়া হইলে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে।

রমেশের অকাট্য যুক্তি ও জীর কান্নাকাটির নিকট অবশেষে সতীশচন্দ্র হার মানিতে বাধ্য হইলেন। বনলতা প্রবল উৎসাহে জিনিষপত্র বাঁধাইদা করিতে লাগিল। বেলা গোটা দশেকের ভিতরেই যাত্রা করিতে হইবে—তা না হইলে, তিন মাইল দূরের ষ্টেশনে গিয়া বারটার গাড়ী ধরা যাইবে না। আগের দিনেই খান-দুই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখা হইল। পরের দিন সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া সকলে প্রস্তুত হইলেন। রমেশ প্রায় আশ ঘটাই পূর্বে সতীশচন্দ্রের হাতে ট্রেন ভাড়ার টাকা দিয়া বলিল—‘আপনি হেটে যান জামাইবাবু—আপণে গিয়ে টিকেট করে রাখুন।’ প্রত্যহ যেমনই স্নানাহার করিয়া বেলা দশটার সময় ইঙ্গুলে যান—আজও তেমনি করিয়াই বাড়ীর বাহির হইলেন সতীশচন্দ্র। কিন্তু আজ তো আর

ইঙ্গুলে নয়—ইঙ্গুল যে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন তিনি। কথাটি যেন সতীশচন্দ্র নিজেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিভাগয়ের সম্মুখ দিয়াই পথ। কিছুদূর হইতেই ছেলেদের কোলাহল কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল—সতীশচন্দ্রের কত কালের পরিচিত কোলাহল। জীবনের বাইশটি বৎসর এই কোলাহলের ভিতরেই তিনি কাটাইয়াছেন। যতই স্কুলের নিকটে আসিতে লাগিলেন—ততই তাঁহার মন হইতে ষ্টেশনে গিয়া টিকেট কাটিবার কথা—কলিকাতায় ঘাইবার কথা একেবারে উবিয়া যাইতে লাগিল। যন্ত্রচালিতের মত স্কুল ধরে আসিয়া ঢুকিয়া—চতুর্থ শ্রেণিতে গিয়া বসিলেন, অমলকে ডাকিয়া বলিলেন—‘এদিকে আয় তো অমল—বাংলা বই নিয়ে আয়।’

তার পর বই খুলিয়া পড়াইতে লাগিলেন :—

“ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর।

ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর ॥”

সরোবরে অর্থাৎ দীঘিতে, কমলনিকর মানে পদ্মস্কলসমূহ....।

কোথা দিয়া প্রায় ষট্টিখানেক অভিবাহিত হইয়া গিয়াছে সে খেয়াল সতীশচন্দ্রের নাই। ষ্টেশনে গিয়া টিকেট করিতে হইবে—কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে—সেকথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। দুইখানা গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া বনলতা ও ছেলেমেয়ের সহিত রমেশ ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল—হঠাৎ গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া গাড়োয়ানকে বন্ধিল—‘আরে থামা, থামা।’ পরে দিক্‌দিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—‘দেখেছ জামাইবাবুর কাণ্ড—ষ্টেশনে যাওয়ার নাম করে ইঙ্গুলে এসে বসে আছেন।’

সঙ্গে সঙ্গে রমেশ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়ীর ভিতর হইতে বনলতা চেঁচাইয়া উঠিল—‘এই পথের উপরে আমি কি শেষকালে মাথা খুঁড়ে মরব রমেশ।’

রমেশ ধরে ঢুকিয়া বলিল—‘ব্যাপার কি বলুন তো ? মাথা ধরাপ হ’ল নাকি আপনার ?’ পরে সতীশচন্দ্রের হাত টানিয়া ধরিয়া বলিয়া বলিল—‘উঠে আসুন।’ যন্ত্রচালিতের মত সতীশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রমেশ তাঁহাকে হিড় হিড় করিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া আসিল।

গণিত-বিদ্যায় প্রাচীন ভারত

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণিত-বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। পাটি-গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতি-বিদ্যা প্রভৃতি গণিত-শাস্ত্রের অন্তর্গত। লীলাবতীর মতে ‘ব্যস্তং পাটিগণিতম্ অব্যস্তং বীজগণিতম্।’ প্রথমতঃ, শব্দদ্বারা সংখ্যা-বোধ হইত। এখনও সে প্রথা তিরোহিত হয় নাই।

শতকিয়া পাঠের সময় এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চবাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নব গ্রহ, দশ দিক, একাদশ গুরু, দ্বাদশ আদিত্য পঠন-রীতি বিদ্যমান। প্রাচীন কালে এতদবলম্বনে রাশি লিখিত হইত। “নন্দাদ্রীন্দু গুণান্তথা শক নৃপসন্তো কালেবৎসরাঃ।” বিশেষণে বাক্যটির ব্যুৎপত্তি হয় ৩১৭৯ (তিন হাজার এক শত উন-আশী)। নন্দ=৯,

নবনন্দ শব্দ হইতে ৯ রাশির উৎপত্তি। অর্ধি=৭ (সপ্তাদি), ইন্দু=১ (এক চন্দ্র), গুণ=৩ (সত্ত্ব-রজস্তমঃ)। ‘অঙ্কত বামাগতি।’ প্রথম শিক্ষার্থীদের গণিত-শিক্ষাকালে সর্বদক্ষিণ দিক হইতে বামাগতিতে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি গণনা শিক্ষাদান হয়। এই সূত্রাবলম্বনে উপরের রাশিটি প্রাপ্ত। তৎকালে গণিতবিৎ হইতে হইলে সাহিত্যে অধিকারী হইতে হইত। বর্তমানকালেও জ্ঞান্ধন ভট্টাচার্য্যগণ পত্রাদিতে গণিতের ব্যবহার এইভাবে করিয়া থাকেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেও বিবাহ-বাসরে কতাপক্ষীয়-গণ বিবিধ রহস্যপূর্ণ গণিত-প্রশ্ন দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির পরিচয় লইতেন। যেমন,—

তিন ছয়, তিন নয়।

তিন আঠার কত হয় ॥

এরূপ চর্চা এখন অবলুপ্ত।

সঙ্কলন (+), ব্যবকলন (—), গুণন (X) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যার সহিত ব্যাখ্যাত হয়। একাদশ (১০+১), উনবিংশ (২০—১), ত্রিংশ (১০X৩)

কথিত আছে, প্রজাপতি প্রজাকল্যাণার্থ গণিত-বিদ্যার আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট হইতে ঋষিগণ এবং ঋষিগণের নিকট হইতে মেধাবী ছাত্রগণ গণিত শিক্ষা করেন। লোকসমাজে এই প্রকারে গণিত প্রচারিত হয়।

পুজাদি দৈবায়ুষ্ঠানে ঋষিকগণ যে সূদৃশ মণ্ডলাদি প্রস্তুত করেন তাহাতে গভীর জ্যামিতি-জ্ঞানের আবশ্যক। গৃহ-নির্মাণে, জলাশয়-খননে, ভাস্কর্য্যে এবং চারুকলা-বিদ্যাভিতে গণিত-শাস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। যুদ্ধবিদ্যাতেও গণিত বিশেষ ভাবে আদরণীয়। জ্যামিতির জ্ঞানে বহুরূপ নির্মিত হইত এবং গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) অভিজ্ঞতায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের গতি নির্ধারিত হইত। এতদ্ব্যতীত শত্রু-সংহার ঘটত না।

ভারতের আর্ঘ্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, লীলাবতী, ত্রীধরাচার্য্য, শুভঙ্কর দাস প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিসম্বাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি শুধু ভারতে নিবদ্ধ নহে—সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত।

প্রাচীনকালে প্রাচ্য দেশে গণিত শাস্ত্রাবলম্বনে কিরূপ রহস্যময় জটিল অস্ত্রের সমাধান হইত তাহা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি প্রমাণিত করিবে।

প্রথম, চারি জন রত্ন-বিক্রেতার মধ্যে এক জনের আটটি মাণিক্য, এক জনের দশটি ইন্দ্রনীলমণি, এক জনের এক শতটি মুক্তা এবং অষ্ট জনের পাঁচটি বজ্রমণি ছিল। মৈত্রী বশতঃ প্রত্যেকে নিজ নিজ রত্নের এক একটি পরস্পর বিনিময় করিলে সকলেরই তুল্যধন হইল। ইহাদিগের রত্নের পৃথক পৃথক মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে।

সমাধানের নিয়ম—জনসংখ্যা দ্বারা পরিবর্তিত রত্ন-সংখ্যা গুণ করিয়া গুণফল প্রত্যেক ব্যক্তির সমুদয় রত্ন হইতে পৃথক

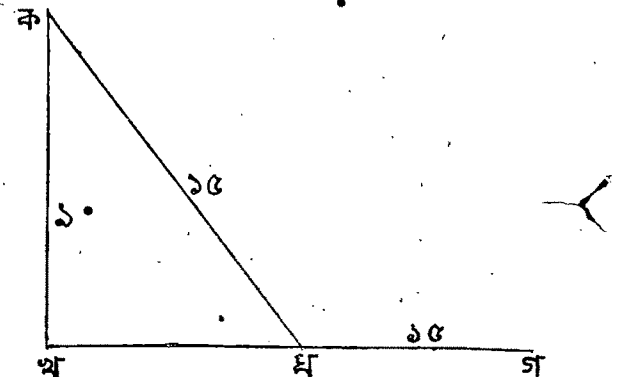
পৃথক বিয়োগের পর ইষ্টরাশিকে বিয়োগফল দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্ণীত হইবে।

এক্ষেত্রে জনসংখ্যা ৪, মাণিক্য ৮, ইন্দ্রনীলমণি ১০, মুক্তা ১০০, বজ্রমণি ৫, পরিবর্তন ১। এক্ষণে নিয়মানুসারে জনসংখ্যা ৪ দ্বারা পরিবর্তিত রত্নসংখ্যা ১ কে গুণ করিয়া গুণ ফল ৪ হইল। এই চার ক্রমান্বয়ে রত্নসংখ্যা হইতে বিয়োগ করিলে, মাণিক্য ৪, ইন্দ্রনীল ৬, মুক্তা ৯৬, বজ্রমণি ১ অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই বিয়োগফলগুলি দ্বারা একটি অভীষ্ট রাশিকে ভাগ করিতে হইতেছে। কিন্তু এরূপ অভীষ্ট রাশি কল্পনা করা উচিত যাহার ভাগশেষ না থাকে। এই হেতু এখানে ৯৬কে অভীষ্ট রাশি কল্পনা করিয়া প্রাপ্ত বিয়োগফল দ্বারা ক্রমান্বয়ে এই ৯৬কে ভাগ করিয়া ২৪, ১৬, ১ এবং ৯৬ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব প্রতি মাণিক্যের মূল্য ২৪, ইন্দ্রনীলের মূল্য ১৬, মুক্তার মূল্য ১ এবং বজ্রের মূল্য ৯৬ নির্ধারিত হইল। এতদনুপাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ধনের সমষ্টি ২৩৩ হইবে।

দ্বিতীয়, নয় হাত উচ্চ একটি স্তম্ভের উপরিভাগে একটি ময়ূর উপবিষ্ট ছিল। ঐ ময়ূর সেই স্তম্ভের সাতাশ হাত দূরে এক সর্পকে দেখিতে পাইয়া উহাকে ধরিতে উজ্জীন হয়। এ দিকে সর্পও ময়ূর-ভয়ে ভীত হইয়া স্তম্ভের নিম্ন গর্ভের অভিমুখে ধাবিত হইল। উভয়ের গতি সমান ছিল। এমতাবস্থায় স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে ময়ূর সর্পকে ধরিতে সক্ষম হয়।

সমাধানের সূত্র—ভূজ ও কর্ণের যোগফল দ্বারা কোটির বর্গকে ভাগ করিয়া সেই ভাগফল ভূজ ও কর্ণের যোগফল হইতে বিয়োগ কর। এই বিয়োগফলের অর্ধেক ভূজের পরিমাণ হইবে। পরন্তু ভূজ ও কর্ণের যোগসংখ্যা হইতে এই ভূজ-পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই কর্ণ।

বলা বাহুল্য, এই সূত্রের উদাহরণ স্বরূপই ময়ূর ও সর্পের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে সর্প ধৃত হইল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মনে করুন—

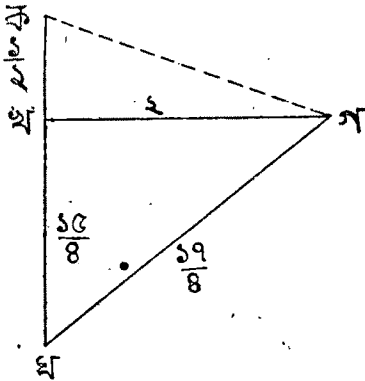


ক খ সেই স্তম্ভ, আর খ গ রেখার গ বিন্দুতে রূপ অবস্থিত করিতেছিল। ক খ স্তম্ভের পরিমাণ ৯ হাত এবং খ স্তম্ভমূল হইতে গ বিন্দুর দূরত্ব ২৭ হাত। এক্ষণে দেখিতে হইবে, খ

বিন্দু হইতে কত দূরে ময়ূরটি সর্পকে ধরিতে পারিবে। মনে করুন, য বিন্দুতে ময়ূর আসিয়া সর্পকে ধরিয়া ফেলিল। তাহা হইলে ক বিন্দু হইতে য বিন্দু পর্যন্ত রেখা টানিলে ক য রেখা য গ রেখার সমান হয়। কেননা, ক বিন্দু হইতে ময়ূর যত দূর আসিবে, গ বিন্দু হইতে সর্পকে ঠিক তত দূরেই আসিতে হইবে; যেহেতু উভয়ের গতি সমান। তবেই দেখা যাই—
—তেছে $কয + যগ = যগ = ২৭$ । এক্ষণে স্বত্রানুসারে $[কয - (কয^2 + যগ) + ২] = যয$ । অর্থাৎ $[২৭ - (২৭^2 + ২৭)] ÷ ২ = [২৭ - ৩] ÷ ২ = ২৪ ÷ ২ = ১২$ অর্থাৎ শুভ হইতে বার হাত দূরে ময়ূর কর্তৃক সর্প ধৃত হইবে।

তৃতীয়,—একটি সরোবরে জল হইতে অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে য়ণালোপরি একটি পদ্ম প্রফুল্লিত ছিল। সহসা ঝটিকাঘাতে পদ্মটি ছই হস্ত দূরে জলমগ্ন হইল। সরোবরে কত জলের উপর য়ণাল জাগিয়া ছিল অর্থাৎ জলের গভীরতা কত ছিল, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। এই অঙ্ক সমাধানে নিম্নরূপ প্রক্রিয়া আবশ্যক।

কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভূজের বর্গকে ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভূজের বর্গকে ভাগ করিয়া, ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল যোগ কর। এই যোগফলের অর্দ্ধেক লইলে কর্ণের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। আর সেই কর্ণের পরিমাণ হইতে কোটি কর্ণের বিয়োগফল বাদ দিলে কোটির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। এস্থলে য জলের উপরি-ভাগ, য ক পদ্ম সংযুক্ত



য়ণাল, য অর্থাৎ জলের উপরি-ভাগে অবস্থিত। য ক য়ণালের পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত। ক য পদ্মসংযুক্ত য়ণাল ঝটিকাঘাতে য হইতে ছই হস্ত দূরে গ বিন্দুতে জলমগ্ন হইল। ঋগ ভূজ। ইহার পরিমাণ ২ হস্ত। এক্ষণে যয কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা স্থির করিতে হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে, ক য = গ য। নিম্নানুসারে কোটির ও কর্ণের বিয়োগ-ফল অর্থাৎ

ই দ্বারা য গ ভূজের বর্গকে অর্থাৎ ৪কে ভাগ দিলে ৮ রাশি পাওয়া গেল। সেই ৮ ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল অর্থাৎ ২ যোগ দিলে ২২ পাওয়া গেল। তাহার অর্দ্ধেক ১১ ই কর্ণের পরিমাণ। কর্ণ ১১ হইতে কর্ণ ও কোটির বিয়োগফল ২ বিয়োগ করিলে ২৫ অবশিষ্ট থাকে। তাহাই কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা।

ভারতে গণিত-শাস্ত্রের চর্চা বর্তমানে এক প্রকার তিরো-হিত। যে যৎসামান্য গণিত অধ্যাপিত হয় তাহা শুধু জীবিকা অর্জনের জন্ত। অনুমান ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানের শ্রোত মন্দীভূত হয়। পাশ্চাত্য দেশ আজ গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় সমগ্র বিশ্বকে বিস্তৃত করিয়াছে। পরোক্ষভাবে এই বিদ্যার জ্ঞ সে ভারতের নিকট ঋণী। আরবীয় মনীষিগণ ভারতবর্ষে আগত হইয়া গণিত শিক্ষা করেন। আরব হইতে পরে স্পেন দেশে এবং সে স্থান হইতে পৃথিবীর অত্রাঙ্ক অঞ্চলে এই মূল্যবান বিদ্যা প্রচারিত হয়।

তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে আধুনিক বাকুড়া জেলায় শুভঙ্কর দাস কবিতাচ্ছন্দে যে সমস্ত গণিত-সমাধান-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন অল্পশীলনের অভাবে তাহাও লুপ্তপ্রায়। তাঁহার কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক প্রথা এবং বঙ্গ ভাষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিখে।

কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিখে।

কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ।

বিশ গণায় হয় কাঠার প্রমাণ।

গণা বাকী থাকে যদি কাঠা নিলে পর।

ষোল দিয়ে পুরে তারে সারা গণা ধর।

পূর্বে কায়স্থগণ পদবীর শেষে অথবা পদবীর পরিবর্তে “দাস” শব্দের ব্যবহার করিতেন। পবিত্র গ্রন্থাদিতে গ্রন্থ-কর্তা উপাখ্যানের শেষে স্বীয় নাম স্বকোশলে সংযোজিত করিয়া বস্তু হইতেন। মহাভারতের অনেক স্থলে কায়স্থ কাশী-রাম লেখনী-মুখে গাহিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

কায়স্থ বংশীয় শুভঙ্করও তাঁহার কোন কোন আখ্যায় শেষ চরণে নিজ নামোচ্চারণে পাদপূরণ করিয়াছেন।

* * *
কড়া প্রতি ছই কাক গণায় অর্দ্ধ তিল।

শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।

বাঁচার দাবী

শ্রীশ্রীশ্রীজ্ঞানাত্ম ভট্টাচার্য্য

বিশ্বে বড় সবার চেয়ে তৃষ্ণা এই,
হুঃখ থেকে মুক্তি এবং স্বাধীন হয়ে বাঁচার দাবী
তার চেয়ে আর এই জগতে শ্রেষ্ঠ কোনই তৃষ্ণা নেই।
বন্দীশালার বন্ধ কারায়
মানবজীবন ছন্দ হারায়;
কোন নিরাশার অন্তবিহীন অন্ধকারে
বাঁচতে যে তাই বারংবারে—
চিত্ত তাহার ক্ষিপ্ত সমান মুক্তি মাগে
সকল বাধা হস্তে তৈলি,
জীবন যে তাই সদাই চাহে মরণ দিয়া
যত্নহীনতার নিত্যরূপ,
শাশ্বত এই প্রাণের দাবী রুদ্ধ করে'
রাখবে সে কোন বর্ষরেরা?
বিশ্ব জুড়ে বাঁচার দাবির যুদ্ধ লাগি
গর্জছে আজ যত্নপণ।
পাশব বলের দস্তপুরে হিরণ্য আজ
দিক না হুঃম হুঃকারিয়া,
অত্যাচারের লৌহচাকা যাক ঘূর্ণিত
সত্যপ্রাণীর বক্ষতল;
যন্ত্রবলের দর্পরাবণ বিশ্বগ্রাসে
দাঁড়াক না আজ ডঙ্কা দিয়া
হুঃম তাহার বহুক না ব্যোম-সিদ্ধজল।
তবুও মানা মানবে না আজ মুক্তিমান
দৃষ্টচেতন প্রহ্লাদের,
সত্যবেশী বর্ষরের জ্ঞানদের।
উজ্জত সেই দীপ্ত ঋতু তুচ্ছ করি'
চিত্তে অরি রুদ্ধ-হরি,
করবে বালক সিংহনাদ,
লক্ষ প্রলয় ঝড়বাত
উঠবে হঠাৎ চমকে হাজার বজ্রপাত,
এক নিমেষে হুলবে সকল অন্ধকারের বন্ধ দ্বার,
নৃসিংহেরি হুঃকার,
সত্যবেশী বর্ষরের শুভ ফেটে
একটি ক্ষণেই অকস্মাৎ,
সত্য-ন্যায়ের রক্ষা লাগি হস্তে নিয়ে আশীর্বাদ,
মর্ত্যেরি এই অত্যাচারের রক্ত-কাদায়,
মুক্ত করি সকল বাধায়

প্রকট হবে রুদ্ধ-হরির বজ্রহাত,
বিশ্বে সকল বিপৎপাত
একটি ক্ষণেই শান্ত হবে
মাতৈঃ রবে,
এই পৃথিবীর রক্তে রাঙা প্রহ্লাদেরা
করবে হেসে মৃত্যু জয়,
সিদ্ধতীরে রক্ষবাজার থাকবে পড়ে ধ্বংসময়
দর্পদিনের সৌধ এ পাপ শতাকীর,
মর্ত্যে শুধুই থাকবে বেঁচে ভক্তবীর।
ডর কি ওরে তোদের তবে শঙ্কা নাই,
তোদের যারা রক্ত শোষণে, বর্ষরের যন্ত্রণায়
আঘাত হানে পাশব বলের,
রচবে ভারাই নিজের লাগি যত্নপণ,
ভক্তবীরের পরীক্ষার এই মুক্তিরণ;
চিরন্তনের বিজয়পথে আত্মদানের
যর্ধরিত যন্ত্রণা,
শাশ্বত এই বাঁচার দাবির যত্নপণ।
হঠাৎ এ কি দেখছি মোদের শীর্ষোপরে
বজ্রবিধাণ রুদ্ধবরে—
মেঘে বাজলো বাগী অকস্মাৎ,
সেখা অয়িলেখায় মলে জলে আশীর্বাদ—
“ওরে, আমার লাগি বইবি বুকে রক্ত যারা,
আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠ ভারাই সর্বহারা,
আম তবে চল করবি কারা হুঃখহীন হুঃখবরণ,
সঙ্গে তোদের সঙ্গী আমি হুঃখ এবং মৃত্যুহরণ।
হুঃসহ কোন দর্পনাশের
রুদ্ধ-হাতের,
বজ্রবাদল ঝড়বাতের সর্বনাশন,
ধ্বংসলীলার প্রলয় নাচন
হুঃকারে,
মুক্তিরঙ্গীন সিংহদ্বারে,
অত্যাচারের রক্তসাগর সত্তরিয়্য,
তাঁধে থিয় তাঁধে থিয়।
প্রলয় আমার মৃত্যুনাচের
সঙ্গে নেচে চলি চল,
বাজবে শিলা লাথ মাদল,
হুঃখহীন শ্রেষ্ঠপথ এই চিরন্তন,
বাঁচার দাবির ভক্তদের এই শ্রেষ্ঠ রণ।

যুদ্ধোত্তর মহাচীন

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বৎসরাধিক কাটিয়া গেল। এই প্রলয়ঙ্কর মারণ-যজ্ঞ মানবের সভ্যবুদ্ধির উদ্বোধন করিয়া জগতে স্বামী শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে কি না নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহের গতি কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল নর-নারীকেই শঙ্কাভুল করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর নবজন্ম হইয়াছে। আগতপ্রায় যুগে পৃথিবী কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রতি বিশ্বের মনীষিবৃন্দ অনবহিত নছেন। যুদ্ধ-পূর্ব যুগে যে সমস্যাগুলি বিদ্যমান ছিল, যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্তে তাহা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমস্যাও দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ ভারতীয় সমস্যাগুলির প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের সমস্যাগুলির প্রতিও আজ আমাদের উদাসীন থাকা চলিবে না।

চীন ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রতিবেশী। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দিক হইতে এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিস্তারিত।

যে মারণ-যজ্ঞের প্রাণঘাতী বিষাক্ত ধূমে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আজও কলুষিত হইয়া রহিয়াছে, মহাচীন তাহার অত্যন্ত প্রধান হোতা। এই সেদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি পঞ্চকের অত্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে অনুন্নত চীনের সংগ্রাম ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী মহাচীনের কণ্ঠলগ্না হইয়াছেন। কিন্তু 'ততঃ কিম্'? এক্যাবদ্ধ, সুশৃঙ্খল চীন যেমন এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তিরক্ষার সহায়ক হইবে, পক্ষান্তরে অন্তর্বিরোধে বিচ্ছিন্ন দুর্বল চীন তেমনি বিশ্ব-শান্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার নিজের জাতীয় অস্তিত্বও নিরাপদ থাকিবে না। অন্তর্বিরোধ তাহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের বিপদ ডাকিয়া আনিবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে চীনে কোন দিনই শান্তি এবং এক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বীর মতের পোষকতায় বর্তমানে যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং যুদ্ধ চলিতেছে তাঁহারা তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ অন্তঃসলিলা ফন্দের মত প্রচ্ছন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব এবং চীনরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রদেশই বিশালায়তন এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যও বড় বেশী।

উপরি-উক্ত মতসমূহের কোনটিই অসত্য নহে। কিন্তু

১৯১১ সালের রপ্তি-বিপ্লব এবং তাহার ফলে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা বিস্মৃত হইলে আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান তথ্যকেই অস্বীকার করা হইবে। ১৯১১ সালে মাঞ্চু-সাম্রাজ্য তাসের ধরের মত ভাঙিয়া পড়িল। যে বিপ্লবীগণ এই পতন ঘটাইলেন, বিপ্লবোত্তর যুগে কোন্ পথে, কি প্রণালীতে রাষ্ট্র-তরঙ্গি পরিচালনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা সূচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। আর পরিকল্পনা থাকিলেও তাহাকে রূপায়িত করিবার কোন উপায় ছিল না। এই কথা মনে রাখিলেই বিপ্লবোত্তর চীনে ইউয়ান-সি-কাইয়ের বৈরাচারী একনায়কত্ব, 'টুচুন' (Tuchun) বা 'ওয়ান-লু' গণের আবির্ভাব এবং দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণটি ধরা যাইবে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১) হইতে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া প্রাস (১৯৩১) পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে মহাচীনে নবজীবনের সুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। জাপ-আক্রমণের ফলে বহুধা বিভক্ত এবং অন্তর্বিরোধে যুতকল্প মহাচীনের দুর্দমনীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে। এই পরিণতি সর্বত্র প্রগতিপন্থীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী যুগের সংস্কারকগণ, যেমন কাঙ-ইউ-ওয়াই, লিয়াঙ-চি চাও, ডাং হু-সি, জেমস ইয়েন প্রভৃতির রচনাবলী এবং সহস্র সহস্র আমেরিকা ও ইউরোপ প্রত্যাগত ছাত্রের প্রচেষ্টা এই পরিণতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের চেষ্টা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলেই চীনে সর্বপ্রথম প্রকৃত জনমত গঠিত হইয়াছে। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নান্‌কিঙ জাতীয় সরকার কর্তৃক অনুন্নত নীতি এবং অল্পশ্রুতি কার্য-কলাপে এই জনমত পরিপূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ প্রতিফলিত হইয়াছে। জাপ-যুদ্ধের ফলে এই জনমত স্পষ্ট এবং দৃঢ়তর হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক চীনকে তুলিতে হইলে ডাং সান-ইয়াট-সেনের "জনগণের তিনটি মূলনীতি" (Three Principles of the people) অথবা "সান-মিন-চুই" এবং চীনা মনের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই 'সান-মিন-চুই' আধুনিক চীনের প্রতিটি সংস্কারমূলক কার্যের মাপকাঠি—অন্ততঃ চীনাদের দৃষ্টিতে। কোন প্রস্তাবিত সংস্কার 'সান-মিন-চুই'র বিরোধী না হইলে তবেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি যে কম্যুনিষ্ট দলের সহিত ক্যুওমিটাং দলের অহি-নকুল সম্পর্ক, সেই কম্যুনিষ্ট দলও প্রথম হইতেই ডাং সান-ইয়াট-সেনের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শাসনভাজ প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

ডাঃ সানের আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদের আর অন্ত নাই। কিন্তু তথাপি একথা মনে করা অযৌক্তিক নহে যে অদূরভবিষ্যতে যখন মহাচীনের সমস্ত রাজনৈতিক দল মতামত প্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থবিধ সমস্যাগুলির সর্বজনগ্রাহ্য একটা সমাধান মিলিতেও বা পারে। ১৯৪৩ সালে গঠিত ‘কমিটি ফর প্রোমোটিং দি রিয়ালাইজেশন অফ কন্সটিটিউশনাল গবর্নমেন্টের’ জাতীয় মহাপরিষদ (National Assembly) গঠনে সহায়তা করিবার এবং পরিষদের চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিধি গ্রহণ করিবার কথা। যে কমিটি পরিষদ নির্বাচন করিবে তাহাতে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুঙমিন্টাং দলভুক্ত সদস্য ব্যতীত এক জন মুসলমান, এক জন তিব্বতীয়, এক জন জ্বীলোক এবং চার জন অপরাপর দলভুক্ত সদস্যও রহিয়াছেন। এই শেষোক্তগুলির কোনটাই সরাসরি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত না হইলেও আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে তাহাদের বৈধতা স্বীকৃত হয় নাই।*

ডাঃ সানের ‘থ্রি প্রিন্সিপলস’র উদ্দেশ্য ছিল চীনের জাতীয় সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সৌকর্য সাধন।

১৯৪২ সালে ইংলণ্ড এবং আমেরিকা চীনে তাহাদের রাষ্ট্র-সীমার বহির্ভূত অঞ্চলের (Extra-territoriality) কর্তৃত্বাধিকার, অর্থাৎ কোন ইংরেজ বা আমেরিকান চীনদেশে কোন অপরাধ করিলে ইংরেজ বা আমেরিকান আদালতে অপরাধীর নিজের দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে জাপানও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ফলে বিশ্বের দরবারে চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল। অর্ধ-উপনিবেশ চীন নামে স্বাধীন হইল সত্য, কিন্তু বহু কঠিন এবং জটিল সমস্যার সমাধান এখনও বাকী রহিয়াছে।

তারপর গণতন্ত্রের কথা। চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণ-তান্ত্রিক আদর্শ জন্মগ্রহণ হইয়াছে বলিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা লজ্জিত হইবে সত্য; কিন্তু তুলিলে চলিবে না যে জাপান-যুদ্ধ কালে চীন শতৈঃ শতৈঃ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রগতি ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই পাদ শতাব্দীর অগ্রগতি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট এবং দ্রুততর। যুদ্ধকালে গঠিত জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ সরকারের কার্যের সমালোচনার অধিকারী। ইহার সহিত পরামর্শ করিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য। প্রাদেশিক পরিষদ এবং নগরাকুলের ও গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও আজ আর

নিজেদের দায়িত্ব অথবা সমালোচনা করিবার শু মতামত প্রকাশ করিবার অধিকারের প্রতি অনবহিত নহে।

১৯৩৬ সালে নানকিং-সরকার রচিত যে রাষ্ট্র-বিধির খসড়া সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে একটি জাতীয় মহা-পরিষদের হস্তে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। পরিষদের ১২০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৬৬৫ জন বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইবেন। ৩৮০ জন থাকিবেন ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অবশিষ্ট ১৫৫ জন তিব্বতীয়, মোঙ্গোলীয়, মাংকু এবং প্রবাসী চীনাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। ৬ বৎসর পর পর এই মহাপরিষদের নুতন নির্বাচন হইবে এবং ৩ বৎসর পরে একবার ইহার অধিবেশন হইবে। দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে ‘লেন্ডিসলেটিভ ইউয়ান’ বা ব্যবস্থা-পরিষদ মহা-পরিষদের স্থান গ্রহণ করিবে। পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার এবং বাজেট মঞ্জুর করিবার অধিকার থাকিবে। সঙ্ঘ-গৃহীত রাষ্ট্র-বিধিতে রাষ্ট্রপতিকে বড় বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই যুদ্ধ-ঘোষণা, যুদ্ধ-বিরতি এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ দিবার ও বিধি-ব্যবস্থা করিবার অধিকারী। জাতীয় বাহিনীর তিনিই সর্বাধিনায়ক। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই হইবেন মহাচীনের একমাত্র মুখপাত্র। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপতি আবশ্যিক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন-পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করিবার অথবা জাতীয় মহা-পরিষদের নিকট পেশ করিবার অধিকার তাহার থাকিবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মচারীগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কর্মচারী নিয়োগে কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নহে। ‘এক্সামিনেশন ইউয়ান’ বা ‘পরীক্ষা পরিষদ’ প্রথমতঃ হির করিবে কাহার রাজকর্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং রাষ্ট্র-পতির মনোনয়ন এই অল্পমোদিত প্রার্থীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এুই যে, রাষ্ট্রপতি যাবতীয় ব্যাপারে জাতীয় মহা-পরিষদের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন। আপত্তি উঠিবে যে মহা পরিষদ তিন বৎসর পর পর আহুত হইবে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে উক্ত পরিষদকে উপেক্ষা করা মোটেই কঠিন হইবে না। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রবিধিতে যে পদ্ধতি-পরিষদসমূহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, প্রায়ই তাহাদের অধিবেশন হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ-গুলির মধ্যস্থতায় তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জনমতের সহিত পরিচিত করিবার সুযোগ পাইবে। এই ভাবে জনমতের সহিত সরকারের সংযোগ রক্ষিত হইবে। সুতরাং জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি গৃহীত চীন-রাষ্ট্রবিধি খুঁটিনাটি ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও আদর্শের দিক হইতে ইহার ভিত্তি গণতান্ত্রিক।

* চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-বিধি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল এই অভিনব রাষ্ট্রবিধি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।—লেখক

কম্যুনিষ্ট-ক্যুঙমিন্টাং বিরোধ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক

আন্তঃরূপীণ রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে চীনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। জাতির অদৃষ্টাংশে যেদিন দুর্ব্যোগের ক্রয় মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, জাতির স্বাধীনতা এমন কি তাহার সত্তা পর্য্যন্ত যেদিন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, সেই চরম দুর্দিনে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের অপূর্ণ আত্মোৎসর্গের কাহিনী অমর হইয়া থাকিবে। চীনের অগ্রতম প্রধান কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল চু-টের কথায়—

“Communist troops had engaged 69 per cent of Japanese troops in China and 95 per cent of puppet troops fighting for Japan.”

অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরাই চীন অভিযানকারী জাপানবাহিনীর শতকরা উনসত্তর ভাগ এবং জাপ তাঁবেদার চীন-সৈন্তের শতকরা পঁচানব্বই ভাগের সহিত লড়াই করিয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক টুমার্ট গেল্ডারের মতে কম্যুনিষ্টরা চীনের তিন লক্ষ বিশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান শত্রুকবল মুক্ত করিয়া জাপ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মোট বিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে নয় কোটি অধিবাসীর মুক্তিসাধন করিয়াছে। অথচ এই যুদ্ধকালেও মধ্যে মধ্যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধ এবং সংঘর্ষের কথা শোনা গিয়াছে। বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এই বিরোধের জন্ত প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত ক্যুওমিটাংকেই দোষী মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে ‘এক কাটি বাজে না।’

১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে উত্তর-চীন হইতে লঙনের ‘টাইমস’ পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছিলেন যে, চুংকিং জাতীয় সরকার কম্যুনিষ্ট অধিকৃত স্থানগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-সমূহ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে ‘দি ওয়ার য়াঙ দি ওয়ার্লিং ক্লাস’ পত্রিকায় মিঃ এ. আন্ডারিন চুংকিং সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা অভিযোগ করেন—

১। প্রতিক্রিয়াপন্থী, যুদ্ধপিপাসু এবং জয় সম্বন্ধে হতাশ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক চুংকিং সরকারের নীতি প্রভাবিত হয়। মিঃ আন্ডারিন এই নেতৃবৃন্দকে যুগোশ্লাভিয়ার মিহাইলোভিচের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

২। আট লক্ষ জাপ তাঁবেদার চীন সৈন্তের শতকরা নব্বই জন পূর্বে সরকারী সৈন্যদলভুক্ত ছিল। এই সমস্ত সৈন্তের অধিনায়কগণ দেশদ্রোহী মীরজাফরের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

৩। চীনের আন্তঃরূপীণ সম্পদসমূহের উন্নতি সাধন বা তাহার যথাযোগ্য ব্যবহারে জনসাধারণ কোন সরকারী সাহায্য পায় না। পক্ষান্তরে সরকার নিরঙ্কুশ ফাটকাবাজির প্রদর্শন দিয়া থাকেন।

৪। চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ এবং পরম আস্থা-ভাজন হো-ইং-চিন প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ ক্যুওমিটাং বাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত এবং দুর্দর্ভ অংশকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া তাহার সাহায্যে স্বদেশপ্রেমিক কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে উত্তর চীনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন।

৫। সম্মিলিত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং সরকার গঠনে বাধা দিয়া ক্যুওমিটাং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ জাতীয় এক্য স্থাপনের পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া জাতীয় সমর-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতেছেন।

যুদ্ধাবসানের পর হইতেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে সর্বনাশা গৃহ-যুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ ক্যুওমিটাং এবং কেহ বা আবার কম্যুনিষ্ট দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রধান শক্তির চুংকিঙে অবস্থিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্বে অভিযোগ শোনা গিয়াছিল যে, তিনি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং সমস্ত সমাধানের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছেন।

অনেকে আশঙ্কা করেন যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধের অবসান না হইলে অদূরভবিষ্যতেই হয়ত মিঃ জিন্না এবং তাঁহার সাধের পাকিস্থানের চৈনিক সংস্করণের কথা শোনা যাইবে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, যে সমস্ত কারণে ভারতীয় পাকিস্থানের উদ্ভট কল্পনা সম্ভবপর হইয়াছে, সে সমস্ত কারণ—প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক একটি রাজনৈতিক দলের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী অপর একটি দলের মতানৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক শেষোক্ত দলকে প্রশ্রয়দান—চীন এবং ভারতবর্ষে সমভাবে বিদ্যমান।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধের অবসান ঘটাইবার দুইটি মাত্র পথ আছে। হয় কম্যুনিষ্টগণকে তাহাদের যাবতীয় সৈন্য-সামন্ত, সমরোপকরণ ক্যুওমিটাং দলের হাতে তুলিয়া দিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে হইবে আর না হয় ত ক্যুওমিটাংদলকে রাজনৈতিক একাধিপত্য পরিত্যাগ এবং জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকার করিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং বিরোধের মূল কারণ কি? সমাজের মেরুদণ্ড ক্রমশঃ সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথমে রাজনৈতিক-হোঁয়াচ হইতে বাঁচাইয়া ক্ষমতা বজায় রাখা ক্যুওমিটাং দলের উদ্দেশ্য। এইজন্মই এই দল আজ পর্য্যন্ত একটুও সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নাই। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টগণ ক্রমশঃ সম্প্রদায়কে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। জনগণের সাহায্যে স্বদেশের শক্তির সংরক্ষণ, সংবর্ধন এবং পরিণামে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভ তাহাদের উদ্দেশ্য।

জাপানযুদ্ধকালে কম্যুনিষ্টগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। ক্যুওমিটাং সরকার এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। জাপ-যুদ্ধের প্রথমাবধি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত চীনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সর্ববিধ সমরোপকরণের একান্তই অপ্রাচুর্য্য ছিল। চীনের মিত্রবর্গ তাহাকে যে পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিতেন তাহার একাংশও করেন নাই। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর যে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর-সত্তার চীনের ছিল তাহারও আয়সঙ্গত অধিকার হইতে কম্যুনিষ্টবাহিনী বঞ্চিত হইয়াছিল।

যত দিন যুদ্ধ চলিতেছিল, কম্যুনিষ্টগণ বার বার ক্যুওমিটাং বাহিনীকর্তৃক কম্যুনিষ্টশাসিত অঞ্চলসমূহের অবরোধ প্রত্যাহার করিবার 'লেও-জি' চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিটাংবাহিনীকে সমান ভাবে দেওয়ার এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়া সর্বদলীয় সরকার গঠন করিবার দাবী জানাইয়া-ছিলেন।

উল্লিখিত দাবিগুলির কোনটাই পূর্ণ করা হয় নাই। স্বীয় নীতির সমর্থনে ক্যুওমিটাং সরকার বলিয়াছেন যে কম্যুনিষ্টগণ অবৈধ ভাবে তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বরাবর শত্রুর সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান করিয়াছেন।

ক্যুওমিটাং দলের কম্যুনিষ্ট-ভীতি কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিটাং ঐক্যের একটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমেই দল মনে করেন যে, কম্যুনিষ্টগণ সুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে, তাহাকে তাঁবে রাখা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের ধারণা যে একবার কম্যুনিষ্ট দলের বৈধতা স্বীকার করিলে কোনক্রমেই আর তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা যাইবে না।

আগত-প্রায় যুগে অস্ত্রাভ্যাস দেশের মত চীনেও প্রগতিপন্থী-দিগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কম্যুনিষ্ট ব্যতীত প্রগতিপন্থী আরও রাজনৈতিক দল চীনে রহিয়াছে। একটিমাত্র রাজ-নৈতিক দলের একনায়কত্বের অবসান আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে ক্যুওমিটাং দলের একাধিপত্য চলিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা অসম্ভব। অস্ত্রাভ্যাস দলের মতামত উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। সর্বপ্রকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তাহার প্রত্যেকটিকেই যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্যাদা দান গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির গোড়ার কথা। জাপ-যুদ্ধের অবশ্যজ্ঞাবহী পরিণতিস্বরূপ চীনের সর্বত্র গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসার লাভ করিয়াছে। তুলনীয়—

"It is the inescapable outcome of the war, and of the widely enlivening effect it has had on the minds of all Chinese even in the lowest strata."—*The Story of China's Revolution* by O. M. Green, p. 115.

জীবনযাত্রা সহজ এবং জীবিকানির্ব্বাহ স্বচ্ছায়াসাম্য না হইলে কোন সংস্কার-প্রচেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না। চীন সরকার এই তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

অস্ত্রাভ্যাস দেশের সঙ্গে তুলনায় চীনের মত একটা সুবিধা আছে। বাবলন চীনের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গৃহনির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করিলে চীন-কৃষক অযথা কালক্ষেপ না করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বাসগৃহ-সমস্তা উপস্থিত হইলে কোণাশ্রয় এবং কি ধরনের গৃহ নির্মিত হইবে আর কাহারাই বা গৃহনির্মাণের অধিকারী হইবে প্রথমতঃ তাহা লইয়া বিভাগীয় কর্তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী তুমুল বাদবিতণ্ডার পর কর্তব্য এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হয়।

আধাত যত গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাল সামলাইয়া উঠিবার ক্ষমতা চীনের অসাধারণ, অমানুষিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হাঙ্কোয় কথা ধরা যাক। 'টাইপিং' বিদ্রোহকালে এই নগর তিন বার অগ্নিদগ্ধ এবং তিন বার পুন-নির্মিত হয়। ১৯১১ সালে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় হাঙ্কো পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৯১৩ সালে হাঙ্কোতে এই বিপর্য্যয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই জাপ-যুদ্ধের ফলে চীনের অপরিণীম ক্ষতি হইলেও যুদ্ধে যোগদান-কারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই চীনই সর্বপ্রথম গা ঝাড়া দিয়া উঠিবে আশা করা হয়ত অধোক্তিক হইবে না।

মহাচীনের বিরাট জনসমষ্টির শতকরা ৮০ জন কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। জীবনধারণের জন্ত ইহারা একান্তভাবেই মাতা বহুস্বাকার করণার মুখোপেক্ষী। কিন্তু কৃষির উপর অনন্তনির্ভর হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বর্তমান যুগে সম্ভব নহে। এইজন্যই চীন-সরকার শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যেই একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে। রাস্তা, রেলপথ এবং জলপথে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, দেশের কয়লা, লৌহ, ম্যানানিজ প্রভৃতি যাবতীয় ধনিজ সম্পদের অপচয় নিবারণ ও যথোচিত সদ্যবহার এবং কলকারখানার সংখ্যা বাড়াইয়া জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপ্ত ষাণ্মাসকালেও—অবশ্য প্রথমতঃ এই যুদ্ধ এবং ভজ্ঞাত সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রয়োজনেই—শিল্প-প্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই। তিব্বত এবং সেচুংয়ের মধ্যবর্তী যে সিকিঙ প্রদেশের নামও পূর্বে প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল সেই সিকিঙই আজ চীনের অস্ত্রতম প্রধান শ্রম-শিল্প কেন্দ্র। উত্তর-চীনেও বহুল পরিমাণে শিল্পের প্রসার হইয়াছে। পশ্চিম চীনে সর্বপ্রকার অনাচার এবং ভূম্যধিকারী-প্রধার কুফল বিশেষভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই অঞ্চলেও যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না। ব্রহ্মদেশের সহিত

আবার চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। চীন এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-চীনের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের কাটতি হইবার পথে কোন অসুবিধাই আর থাকিবে না। ইহার ফলে এক দিকে যেমন দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে অপর দিকে তেমনই আবার রাজনৈতিক ভারসাম্য স্থাপিত হইবার পথও সুসম হইবে।

চীনের সর্বত্র শ্রম-সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) স্থাপিত হওয়ার ফলে চীন কৃষককে এখন বৎসরের কোন সময়েই আর বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। সমবায় আন্দোলন বিদ্যাব্যেগে প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু এখনও বহু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যত শীঘ্র তাহা হয় ততই মঙ্গল। সমবায় আন্দোলন চীনে যতই বিস্তারলাভ করুক না কেন, দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইবার মত শক্তি তাহার কোন দিনই হইতে পারে না। এই জন্যই শিল্পোন্নতি চীনের পক্ষে একান্তভাবেই আবশ্যক। কিন্তু শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জিবাদের কুফলগুলি যাহাতে আত্মপ্রকাশ না করে তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। অত্যাধিক বর্তমানে যে সমস্যাগুলি আছে তাহাদের সমাধান হইলেও নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টির ফলে জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে এবং শিল্পোন্নতির প্রধান উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

দেশে নূতন নূতন পণ্যোৎপাদন প্রয়োজন। পূর্বেকার মত চা, রেশম এবং অত্যন্ত দুই-তিনটি শিল্পের উপর অন্তর্নির্ভর হইয়া থাকিলে চলিবে না। মাটির উপর এবং নীচেকার প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্ভারের সদ্যবহার করিতে হইবে। পণ্যোৎপাদনের শক্তি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিদেগের পারিশ্রমিকের হার বাড়াইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাইতে হইবে।

রপ্তানিকারী দেশগুলি চীনের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিতে পারে। কারণ শ্রমশিল্পে উন্নত চীন

কেবল যে নিজের চাহিদা মিটাইতেই সমর্থ হইবে তাহা নহে, বিদেশের বাজারেও সে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অদূর ভবিষ্যতে নিজের প্রয়োজনীয় সম্ভা ও খেলো কাপড়চোপড় এবং সাধারণ ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেও চীনকে এখনও দীর্ঘ কালের জন্য উৎকৃষ্ট অব্যাদি, কলকজা এবং সুন্দর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রধানতঃ বাহির হইতে যোগানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। চীনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জিনিষের চাহিদাও তাহার বাড়িয়া যাইবে। কাজেই চীনের আর্থিক ত্রিবিধিতে রপ্তানিকারী দেশগুলির আপাততঃ আর্থিক অবনতির কোন আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে চীনের সমৃদ্ধি এখনও বহুদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিবে।

ডাঃ সানের আদর্শকে রূপায়িত করিবার পথে বহু অন্তরায় আছে সত্য; কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ সাল এই আট বৎসর-ব্যাপী দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চীনে বনবন্ধ হইয়াছে। নির্মম শত্রুর নিষ্করণ আঘাত জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া যুদ্ধাঙ্গুরী মহাচীনকে স্ব-শক্তিতে আত্মবান করিয়া তুলিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইংলণ্ডের আক্রমণের ফলে এই ভাবেই স্কটল্যান্ডের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। মেনপোলিয়নের সর্বগ্রাসী রাজ্যলিপ্সার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধের সূচনা এবং বিকাশ ত সেদিনের কথা। আর সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ বাহিরের আঘাতের ফলেই ত অঞ্চল ভারতীয় জাতি-গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল।

জাপ-যুদ্ধের ফলে চীনের গণ-মানসের বিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাব হ্রাস একটু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যুদ্ধের ফলে চীনের দৃষ্টি-ভঙ্গী উদার এবং দৃষ্টি-কোণ প্রসারিত হইয়াছে। চীন নাগরিক আজ নূতনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। সে আজ চিন্তা করে সমগ্র জাতির কথা। জাতি-মানসের এই রূপান্তরই চীনের সাধনার উত্তরসাধক হইবে।

দেওয়ার আলো

• শ্রীহেমলতা ঠাকুর

“দেওয়ার আলো” আলো আলো, নেওয়ার কথা ভুলে যাও, অন্ধকারে যে ধন আছে আলোয় তারে মুক্তি দাও। সত্য যারা ব্যক্ত তারা; গোপন তাদের কিছুই নাই, নির্ভীকতার সাধন তাদের, আসন তাদের সকল ঠাই। খোলা আকাশ তাদের প্রকাশ আপন বুক ধারণ করে, অবাক তাদের অবাধ গতি বিমল ভাতি তিমির হয়ে। আলোর পথে পথিক তারা পথে পথে তাদের বাসা, আশার বাগী বহন করে স্বচ্ছ তাদের মুখের ভাষা,

• মাহুয তারা সকল তারা মানবজাতির তারাই গুরু, ছুটি তাদের আশুন-ঝরা প্রেমের রসে কল্লভর। দিয়ে গেলে, ফেলে গেলে, রেখে গেলে পথে আলো; ছনিঝানার ছয়ার খুলে পথে “দেওয়ার আলো” আলো। ছনিঝা শুধু দেওয়ার খেলা, এই খেলা তো নয়কো সোজা, খেলতে গেলে দেওয়ার ছলে বইতে হবে পথের বোকা।

শিক্ষায় চিত্র-বিজ্ঞা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

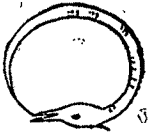
"For, don't you mark, we're made so that we love
First when we see them painted, things we have passed
Perhaps a hundred times, nor cared to see ;
And so they are better painted—better to us,
Which is the same thing. Art was given for that—
God uses us to help each other so,
Lending our minds out."

—BROWNING

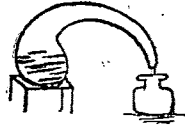
চিত্র-বিজ্ঞাটা আমাদের বর্ণ-বিজ্ঞাস অর্থাৎ লিখতে শিখবার
ঢের আগেই প্রচলিত ছিল। আদিম যুগে মানুষ লিখতে
শেখে নি, কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করবার প্রয়োজন
হয়েছিল। মাটি এবং পরে পাথরের উপর নানা রকম ছবি
এঁকে তখন মনের ভাব প্রকাশ করা হ'ত। এই সব ছবিই
ক্রমে সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে অক্ষরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসভ্য মানুষ যারা তাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই,
তারা লিখতে পারে না—কিন্তু আঁকতে পারে। প্রাগৈতি-
হাসিক যুগের আমাদের পূর্বপুরুষগণও লিখন-বিদ্যা প্রচলিত
হওয়ার ঢের আগে প্রাণীদিগের একটা মোটামুটি ছবি (rude
expression) এঁকে গিয়েছেন।

প্রতীক চিত্র



বকযন্ত্র



অনন্তের প্রতীক

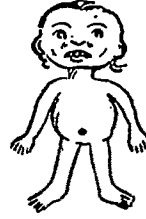


স্বস্তিকা

মানসিক শক্তির বিকাশ হওয়ার প্রথম অবস্থায় কাগজ
পেন্সিল বা খড়িমাটি পেলে শিশু যে সব বস্তুর মধ্যে এবং যে
সব জীব-জন্তুর সঙ্গে বাস করে চিত্রে তা প্রকাশ করবার
চেষ্টা পায়। কারও পরিচালনা ব্যতীত আপনা হতেই শিশু-
মনের এইরূপ বিকাশ লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে শিশু যা
আঁকবে, তা সাধারণের বোধগম্য না হলেও সে কিন্তু তখনই
তার একটা কিছু নাম দেবে।

তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে যা আঁকবে, তার একটা
আকার দেখা দেবে। এই সময়ে সে মানুষ, বিড়াল প্রভৃতি
প্রাণী এবং ঘর-বাড়ী ইত্যাদি যে সব জিনিষের সঙ্গে তার
ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং যে সব জিনিষের সম্বন্ধে তার নির্দিষ্ট
ধারণা আছে, তারই ছবি আঁকবে। তারপর মানসিক শক্তি
বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকবে—ঘরের দরজা-জানালা
এবং আরও নানা টুকিটাকি জিনিষ। মানুষের ছবিতে
তখন দেখা দেবে হাত-পা, কারও মুখে থাকবে গৌফ, কারও
মাথায় পাগড়ী, কারও বা টুপী।

চিত্রাধারা উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আঁকবে গাছ-
পালা, জীবজন্তু, আকাশ, মেঘ, নদীর মধ্যে নৌকা—এই সব।
গুলির সামঞ্জস্যটা হয়ত তার ঠিক হবে না, বর্ণ-বিজ্ঞাসও হয়ত
ঠিক হবে না।



রাফ্‌সে বুড়ী



গুণটানা

শিল্পী :—চিত্রলেখা—বয়স ৪ বৎসর রেখা চক্রবর্তী—বয়স ১০ বৎসর

শিশুকে প্রথম যে চিত্র আঁকতে দিতে হবে, সে চিত্র হবে
তার চিন্তাকে বাইরে প্রকাশ করবার একটা স্মরণ। যে বস্তু
এই সে আঁকবে, সেটা হবে সেই জিনিষ যা তার চিত্তে সব
চেয়ে পরিষ্কারভাবে রেখাপাত করেছে।

এইভাবে ছবি আঁকায় শিশু-মনের স্বজনী-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
এবং একটা কিছু সৃষ্টি করার মধ্যে যে অহুরাগ, সেটা তার
শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই কাজে শিল্পীর মনে একটা
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সমতা বোধ, এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার
করবার নিপুণতা জাগিয়ে তোলে। তার ফলে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর
মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—যা আর কোনও
উপায়ে হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই শিল্পকুশলতা এবং
সৌন্দর্যোপলব্ধি পরিণামে মনে একটা নির্মল আনন্দ এনে
দেয়। মনঃশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রচিত্রের বিকাশ হয় এবং
এই শিল্প-কুশলতাকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা করলে চতু-
পার্শ্বস্থ স্নায়ুর জিনিষের উপর একটা আকর্ষণ এবং অহুরাগ
জন্মে। উত্তর জীবনে রাস্তাবাট এবং গৃহাদি নির্মাণে, গৃহসজ্জায়
এবং সমগ্র চরিত্রে এর সুফল দেখা দেয়।

এই সব কারণে চিত্র-বিজ্ঞা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাত্ত্বক
করবার উপযোগিতা যে অপরিণীম সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই।

কিন্তু কিছুকাল আগেও বিদ্যালয়ে যেভাবে চিত্র-বিজ্ঞা
শিক্ষা দেওয়া হ'ত, সেটাকে অশিক্ষাই বলা যেতে পারে,
কারণ তাতে মনের বিকাশ না হয়ে ক্ষতিই হত বেশী।
শিশুর কাছে যা অর্থহীন, এমন একটা চিত্রের আদর্শ তার
সম্মুখে রেখে তাকে সেটা নকল করবার আদেশ দেওয়া হ'ত।
এইজন্ম ছাত্রের পক্ষে তখন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ক্লাসটা ছিল
নির্ভাল নীরস। প্রকৃত চিত্র-বিজ্ঞা শিক্ষা এতে হয় না; কারণ

যতক্ষণ না মনে একটা অসুস্থসংস্কার ও আনন্দের স্মরণ দেখা দেয় এবং যতক্ষণ না যে চিত্রটা আঁকতে হবে তাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা বলতে আমরা মনের যে অস্থিগত কণা বুঝি, তা ছাত্র কিছুমাত্র লাভ করতে পারে না।



মাছ



বিড়াল

চিত্রলেখা—বয়স আট বৎসর

এইজ্ঞ যে চিত্র আঁকতে হবে, সে বিষয়ে ছাত্রের মনে যাতে উৎসাহ আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের একজন চিত্রাঙ্গী ব্যক্তি বলেছেন—

“The boy encouraged to imitate some natural object will ever after see in that object something unseen and unknown to him before, and he will find the time he formerly did not know what to do with henceforth full of pleasurable sensations.”

—G. F. WATTS

ছবি আঁকতে হলে কি-কি জিনিষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

চক, কাঠকয়লা, পেন্সিল, রবার, কলম, তুলি, জল, রং এবং কাগজ এইগুলি হচ্ছে চিত্র-বিজ্ঞার প্রধান উপকরণ।

মনোভাব প্রকাশের উপায় যেমন ভাষা, চিত্রও তেমনি মনের ভাব প্রকাশ করে; কিন্তু প্রকাশ করবার একটা কিছু ভাব বা বিষয়-বস্তু যদি না থাকে তা হলে চিত্রাঙ্কন সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেইজন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিষ্কার জ্ঞান ও ধারণা পোষণ করা। অর্থাৎ কোনও একটা জিনিষ আঁকবার চেষ্টা করার আগে সেই জিনিষটার স্বরূপ বুদ্ধি দিয়ে যথাযথ ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। সৃষ্টির পিছনে যার মত গভীর চিন্তা থাকবে দেখাটী তার হবে ততখানি যথাযথ। “The eye sees only that which it brings the power to see.”

কোনও একটা ছবি আঁকা যে ধারণা হয় তার কারণ, তার পিছনে চিন্তাটা থাকে ভাসা-ভাসা বা অস্পষ্ট। সাত-তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ এঁকে ফেলার চেয়ে অল্পে প্রবৃত্ত হবার আগে শিশুর পক্ষে ঐ জিনিষের আকৃতি সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করাটী ঢের বেশী দরকারী।

চিত্র সাধারণতঃ ছ-রকম করা হয়ে থাকে। কোনও বস্তু দেখে তদনুসারে আঁকা (object drawing) এবং কোনও একটা আদর্শ দেখার পর সেটা শিল্পীর স্মৃতি থেকে আঁকা (memory drawing)।

কিন্তু পৃথিবীতে ত বস্তুর অভাব নেই। সম্মুখে না থাকলেও আমরা স্মৃতি থেকে তাদের আঁকতে পারি। প্রা

হচ্ছে, পৃথিবীর বস্তুগুলির মধ্যে কোনট সঁরল, কোনট বক্র, কোনট বা গোলাকার ইত্যাদি—এখন এদের মধ্যে আগে কোন শ্রেণীর চিত্র আরম্ভ হবে? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। শিল্পকুশলীরা বলেন, সেটা শিল্পীর মনের গড়নের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ শিল্পী আগে সঁরল রেখা দিয়ে আরম্ভ করে তারপর গোলাকার ও ডিম্বাকার এবং তার পর অজ্ঞাত আকারের ছবি এঁকে থাকে। মনে রাখতে হবে, শিল্পী দৈনন্দিন জীবনে যে সব জিনিষ বেশী দেখে তাদের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং তাদের এঁকেই তার সব চাইতে বেশী আনন্দ। ‘সৃষ্টির আনন্দ’ আনন্দের ভিতর দিয়ে গানের মত ছবিকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

স্মৃতি-চিত্রে সাধারণতঃ কোনও একটা জিনিষ চার-পাঁচ মিনিটের জন্ত দেখতে দিয়ে ওটা সন্নিবেশ ফেলা হয়। এই অল্প সময়ের দৃষ্টিতে ঐ বস্তু শিল্পীর মনে যে রেখাপাত করে সেইটাই তাকে চিত্রে প্রকাশ করতে হয়।



বিড়াল



শূকর

পার্থসারথি—বয়স ছয় বৎসর

পেন্সিলের কাজ শেখবার পর তুলির কাজ; তারপর আলো-ছায়ার সন্নিবেশ। এ ছাড়াও আছে কার-কাজ (Design), অক্ষর-সন্নিবেশ (Lettering), তলের সমতা, বা অসমতা (Textures) এবং বর্ণ-বিভাস (Colouring)। বর্ণ-বিভাস সম্বন্ধে সবিশেষ বলা এখানে সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, হলদের উপর কালো রং সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে এবং সবুজের উপর লাল রং দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে কম।

শিল্পীর মন যখন বস্তুর আকার, বর্ণ ছাড়িয়ে যায় তখন সে হাত দেয় প্রতীকে (symbolic) এবং দৃষ্টান্ত বা স্কেচিং। প্রতীক-চিত্রের পিছনে থাকে একটা গভীর অর্থ। কেউ কেউ মনে করেন আমাদের দেশের প্রতিমাগুলির মধ্যে এই গভীর অর্থ আছে। কালীমূর্তিকে স্থান (space), কাল (time), ও কার্য-কারণ সম্বন্ধের (causality), অতীত মহাশক্তি (eternal power) ধরা হয়। দুর্গা প্রতিমাকে কেউ কেউ বলেন, প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নের প্রতীক এই ত্র্যোদয়ী মূর্তি। স্বস্তিকা চিহ্ন (স্বর্ঘ্যের গতি, পূর্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্তযাত্রা) সৌভাগ্যের প্রতীক। একটা সাপ তার লেজটাকে মুখের মধ্যে দিয়ে বৃত্ত রচনা করেছে, এই ছবিটি হবে অনন্তের (eternity) প্রতীক। বহুধর্মের কাম বা ভালবাসার চিহ্ন, নিজিতে বুঝায়

ছায়বিচার, প্রদীপে জীবন এবং বহু-যন্ত্রে ব্যাঘ্র বিজ্ঞান।
বিভিন্ন দেশে এই রকম বিভিন্ন প্রতীক চলে আসছে।

অঙ্কিত চিত্রের মত বিভিন্ন রংও বিভিন্ন মানসিক অবস্থার
প্রতীক। সাদা রং পবিত্রতার, লাল হিংসার, হলুদ ধর্ম ও
সত্যতার, সবুজ প্রাচুর্যের, আশা ও যৌবনের এবং কালো রং
মৃত্যু, শূন্যতা, দুঃখ বা হতাশার প্রতীক।

কবি যেমন কোনও বিষয়-বস্তুতে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি
সংযোগ করবার অধিকার রাখেন, শিল্পীও তেমনি বস্তুর দাস
নন—বস্তুকে ছাড়িয়েও তার মনের উপলব্ধি কাজ করতে
পারে। এখানে শিল্পী স্বাধীন। দৃষ্টান্ত বা কৈচিড়ের কথাই
আমি বলছি এখানে। টার্নারের একখানি স্বর্ধ্যাস্তের ছবি

দেখে একটি ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, এটা কি স্বর্ধ্যাস্ত? কিন্তু
এমনতর স্বর্ধ্যাস্ত ত দেখি নি কখনও।

টার্নার উত্তর দিয়েছিলেন, দেখেন নি সত্যি, কিন্তু দেখতে
কি চান না?

প্রাকৃতিক দৃষ্টি-চিত্রাঙ্কনের মধ্যে একটা স্বাধীন, আত্মহারা
ভাব আছে, অসীম আনন্দ আছে। হাজারিট এ সম্বন্ধে
বলেছেন—

“One is never tired of painting, because you have
to set down not what you know already, but what you
have just discovered; with every stroke of the brush
a new field of enquiry is laid open; new difficulties
arise, and new triumphs are prepared over them.”

ডাকা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোর ঘেন মনে পড়ে,
যুগে যুগে আমি তোমারে ডেকেছি
ফুট-অফুট করে।
গিরির শিখরে, সাগরের তলে,
ডেকেছি তোমারে নিতি নানা ছলে,
হয়ে কত জীব, কীট ও কীটাপু—
গড়া তব নিজ করে।

২

কত উল্লাসে কখনো ব্যাঘ্র
ভয় ও যাতনা মাঝ,
ডেকেছি তোমারে, তোমারে ডেকেছি,
হে দয়াল রাজরাজ।
কখনো আরাবে, কত কাকলীতে
কত বন্ধারে কত ব্যাহুলিতে,
কত সঙ্গীতে, কখনো মল্ল
জনম জনম ধরে।

৩

জড়িত ও মধু নামের সঙ্গে
আমার লক্ষ রূপ,
আমার যজ্ঞ, আমার সাধনা,
আমার ক্রুদ্ধ-তপ।

মোর আখিলে-ভেজা ওই নাম,
আমার শান্তি, মোর প্রাণারাম,
রসনা বাসনা হৃদি-রসায়ন
ওই নামে মধু ক্ষরে।

৪

ওই নাম মোরে উজ্জান বহিয়া
তোমার চরণে লয়।
নাম-স্বরধুনী আমি যে তোমার
দেয় এই পরিচয়।
তব রূপ রস স্পর্শ ও নাম
মোর ধ্যান জ্ঞান তীর্থ ও নাম,
ওই নাম মোর সকল দৈর্ঘ
সকল শঙ্ক হরে।

৫

ও নাম স্মরণে, ও নাম করণে,
আমি হয়ে যাই পর,
আমার বাঁশীতে সুর দেয় আসি
স্বয়ং বংশীধর।
আমি গলে যাই, আমি ডুবে যাই
আমি নিড়ে যাই, আমি উবে যাই
ক্ষীণ জলকণা মিলাইয়া যাই
অমৃতের সরোবরে।

শিক্ষা ও শরীরচর্চা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র

যে-কোন ধর্মসাধন ও কর্মসাধনের জন্তই সুস্থ সবল শরীরের প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অতি সত্য এই বাণী আমাদের শাস্ত্রে আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সমষ্টিগত বা জাতিগত ভাবে ব্যাপক চেষ্টার দ্বারা সবল দেহে উন্নত মন গড়িয়া তোলার উত্তোগ আমরা করি নাই। কলে বাঙালীকে জাতি হিসাবে দুর্বল, ভীক, সৈন্তবিভাগের অযোগ্য ইত্যাদি অপবাদ হজম করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের নরম মাটি আর আর্দ্র আবহাওয়ার জন্ত বাঙালীরা কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে অপটু। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাই? ইতিহাসে কি বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় নাই? অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা এ অপবাদ খণ্ডন করা যায়, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমষ্টিগত ভাবে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা স্বল্প ও দৈহিক শক্তিতে হীনতর হইয়া পড়িতেছি। যন্ত্রসভ্যতার উন্নতির যুগে আমরা যেন ক্রমেই অল্প আয়ু ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি। ছুই পুরুষ পূর্বেও আমাদের এ অবস্থা ছিল না; দেশে বলিষ্ঠ লোকের এতটা অভাব তখন হয় নাই। ব্যক্তিগত হইলেও একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার দীর্ঘ ঋজুদেহ পিতামহকে তাঁহার আশী বৎসরের বেশী বয়ঃক্রম-কালেও যেরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে দেখিয়াছি তাহা আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করিত। তাঁহার যৌবনকালের একটি ঘটনা এখন অনেকের নিকটই উপকথার মত মনে হইবে, কিন্তু ইহা অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট এবং তাঁহার প্রমুখ্যাই শোন। এক দিন গ্রামের মাইলচারেক দূরবর্তী স্থান হইতে একা ফিরিবার সময় পথে কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় রঙ ও প্রবল শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। লোকালয়হীন মাঠের মধ্যে মাথা বাঁচাইবার কোন আশ্রয় নাই। অগত্যা নিকটের এক বিল হইতে আট হাত লম্বা একখানা ডুবানো নৌকা টানিয়া তোলেন এবং উণ্টা করিয়া মাথায় ধরিয়া তিনি দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়িতে পৌঁছেন। পরদিন সেখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া পূর্ব স্থানে রাখিবার জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ শক্তিমত্তা লোক তখনকার সমাজে বিরল ছিল না।

— আনন্দোচ্ছল স্বাস্থ্য, সাহসবিস্তৃত-বক্ষ, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে উচ্ছল সুঠাম দেহ আত্মকাল খুব বেশী নজরে পড়ে না। অবশ্য ইহার মূলে আছে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিবিধ পুঞ্জীভূত সমস্যা। বাঙালী জাতি যেন নীরবে মৃত্যুর পথ বহিয়া চলিয়াছে। হৃর্তিক্ষ, মহামারী হইয়াছে আমাদের নিত্য সঙ্গী। পুষ্টিভ্রষ্ট খাদ্যের অভাব, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, শহরে উপযুক্ত আলো-বাতাসহীন অঞ্চলে ঘনবসতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর। তদুপরি জীবিকাকর্ষণের সমস্যা কঠিনতর হওয়ার

অনবস্ত্রের সংস্থানের নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেই আমাদের জীবন নিরানন্দপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সুখের দিনের কথা উঠিতেই আমরা অতীতের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি; বর্তমান আমাদের আনন্দহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শিক্ষার জন্ত দেশে বিদ্যায়তন আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মহাশাস্ত্র বিকাশ—দেহের এবং মনের, মস্তিষ্কের এবং মাংসপেশীর, হৃদয়ের এবং বাহ্যবলের উৎকর্ষ সাধন করা, কিন্তু তাহার পরিবর্তে শুধু পুথিগত বিদ্যা অর্জন ও বুদ্ধিরত্তি অনুশীলনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ, সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই ড্রিল শিখাইবার জন্ত শিক্ষক আছেন, অনেক স্থানে খেলাধুলার সরঞ্জামও আছে কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে আন্তরিকতা ও প্রাণস্পন্দনের অভাব। স্কুলে খেলাধুলা করানোর নিয়ম আছে বলিয়াই যেন দায়সারামত এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। আমাদের কাছে শারীর-বিজ্ঞা এখনও সাধারণ বিজ্ঞার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া উঠে নাই।

স্কুল-কলেজে শরীরচর্চা শিখাইবার ভার যে সব শিক্ষকের উপর থাকে তাঁহাদের অনেককে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই বাঁধা-ধরা রুটিন-মাসিক শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে বিভিন্ন রুচির প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁহাদিগকে বলা চলে ‘আনন্দ হত্যাকারী’ (kill joys)। তাঁহাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শারীর-বিজ্ঞার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষকদিগকে আখ্যা দেওয়া যায় ‘পেশীনর্ডনকারী’। অল্পসংখ্যক ছাত্রকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের শরীর গঠন, মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন ও কোন কোন অঙ্গের শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়ানোই তাঁহারা শিক্ষাদান-কুশলতার নিদর্শন মনে করেন। অবশিষ্ট অধিকাংশ ছাত্রই উপেক্ষিত থাকিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর শিক্ষক খেলাধুলার অগাধ স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্ত নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের ট্রেনিং দিতেই ব্যস্ত থাকেন যেন তাহাদের দ্বারা স্কুলের সুনাম অর্জিত হইলেই সকল ছাত্রের শরীরচর্চার সফলতা প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যোন্নতির দিকেই যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, ক্রীড়া-কৌতুকও যে মানসিক শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়া যে ছাত্রদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং পরস্পরের মধ্যে শ্রীতি ও সহযোগিতা জাগাইয়া তোলা যায় ইহা যিনি জানেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তিনিই শারীর-বিজ্ঞার প্রকৃত শিক্ষক। এই শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে ডাঃ এল. পি. জ্যাকস্ লিখিয়াছেন :

Living becomes an art when work and play, labour and leisure, mind and body, education and recreation are governed by a single vision of excellence and a conscious passion for achieving it. A master of the art of living draws no sharp distinction between his work and play, his labour and his leisure, his mind and his body, his education and his recreation.—*Education through Recreation.*

অর্থাৎ, এমন মানুষের জীবনই ছন্দোময় ও সুসমামতি। যিনি কাজ ও ক্রীড়ার মধ্যে কোন গভীরেখা টানিয়া দেন না, যার কাছে শ্রম ও বিশ্রাম, মন ও শরীর, শিক্ষা ও আমোদ সমান আকর্ষণের বস্তু। প্রাণশক্তির জারক রসে তিনি সকল অবস্থা হইতেই আনন্দ আহরণ করিতে সমর্থ।

* * *

ভারতবর্ষ এক নব জীবনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস সার্থকতার দিকে আগাইয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে দেশবাসীকে এখনও বহু অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণের জন্ত যেমন নৈতিক বল, মানসিক দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্যনিবদ্ধ স্থির প্রতিজ্ঞা চাই, তেমনই চাই সাহস, দৈহিক শক্তি, কষ্টসহনশীলতা এবং যে কোন দুঃখকে, এমন কি মৃত্যুকেও হাসিমুখে আলিঙ্গন করিবার মত দৃষ্ট নিষ্ঠাকতা। আশার কথা এই যে, দেশ এ বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। গত অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশে অমরাবতীতে শ্রীযুক্ত শরণচন্দ্র

বহুর সভাপতিত্বে প্রথম নিখিল-ভারত শারীর-বিজ্ঞা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে সিয়া বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি. জি. খের বলেন :

... physical education and intellectual education are complementary to each other and must be integrated in such a way as to form an organic whole. No man can reach perfection without the full development of body, mind and soul.

শারীর-বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিদ্যা উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে উভয়কে একই উদ্দেশ্যে একীভূত করিতে হইবে। দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন মানুষই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় খেলাধুলা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ খের ঘোষণা করেন যে, বোম্বাই-সরকার সে প্রদেশে শিক্ষাধাতে যত টাকা খরচ করিবেন তাহার অর্ধেক শারীর-বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত শরণচন্দ্র বহু বলেন :

It is first of all necessary to create a mass-consciousness among our young men and women, an intense desire to live healthily, to be able to act vigorously and to be able to sustain a considerable amount of physical strain. For this purpose our whole propaganda machinery, both official and non-official, should act conjointly.

অর্থাৎ “আমাদের প্রথম কর্তব্য হইবে আমাদের তরুণ-



দুর্লভ নয় মোটেই -

তরুণদের পেলব কোমলতা ও লাভ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কাম্যবস্তুরূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ‘ক্যাল-কেমিক্যাল’র সম্বন্ধে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিচ্ছে।

ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

★ তুহি না বিউটিফিক
★ রেণুকা টয়লেট পাউডার
★ শাবনী স্নোএবং ক্রীম

তরুণীদের মনে স্বস্থ জীবন যাপনের, ভেজের সঙ্গে কাজ কর-
বার এবং কঠোর দৈহিক শ্রম সহ্য করার ক্ষমতা অর্জনের
তীব্র আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার। এই উদ্দেশ্যে সরকারী এবং
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে প্রচারণা চালাইতে
হইবে।” ‘শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি’ মুছিয়া
ফেলিয়া, যুবসমাজকে তিনি মাহুষের মত বাঁচিতে অমুপ্রাণিত
করেন এবং বলেন যে, অটুট স্বাস্থ্যে বাঁচিয়া থাকার আনন্দে
তাহাদিগকেই জীবনের জয়গান গাহিতে হইবে। তিনি
আস্থান জানাইয়াছেন :

‘It is up to you, the youth of the country, . . . to
demonstrate the bloom of health and the joy of life
and to sing to your countrymen a song of gladness and
hope.

নূতন জীবন গঠনের দিনে যুব-সম্প্রদায় এই উৎসাহের
বাণীতে নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

* * *

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের
উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা
সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।
পরিকল্পনা সমিতি বলিয়াছেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হওয়ার যেমন একটা মান নির্দিষ্ট আছে, সেইরূপ ঐ বয়সের
ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক উৎকর্ষেরও একটা মান (norm)
নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে এবং ঐ মানের নিম্নতম যোগ্যতা
—যেমন শরীরের উচ্চতা, ওজন, ভারোত্তোলন-ক্ষমতা, দৈহিক

কষ্টসহিষ্ণুতা, দ্রুতধাবন-ক্ষমতা, সন্তরণ প্রভৃতি শারীরিক
পটুতা অর্জন না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে
প্রয়োগ করিয়া দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত
ইহা গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে নিখিল-ভারত শারীর-বিজ্ঞা
সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে স্থির
হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে সমষ্টিগত ভাবে মহারাষ্ট্রবাসীগণ
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহাদের সুন্দর দেহগঠন,
নিখুঁত স্বাস্থ্য, অক্লান্ত প্রাণচাকল্য ও সাবলীল গতিভঙ্গী উপ-
ভোগ্য হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের বালিকারাও এই অমূল্য বিশেষ
ভাবে যোগদান করিয়াছিল। স্বাস্থ্যে, শক্তিমত্তায় তাহারাও
প্রায় পুরুষদের সমকক্ষতা দেখাইয়াছে। একজন দর্শক
বলিয়াছেন যে, আগামী দিনে মারাঠা রমণীরাই হইবে ভারত-
রমণীর আদর্শ। ভারতের সকল প্রদেশের বালিকারা যদি
স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে ও বিনয়নয়ন আচরণে মহারাষ্ট্রের বালিকাদের
মত হইতে পারে তবে আমাদের এক নূতন বীর্ষ্যবান সমাজ
গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সফল হইবে নিশ্চিত।

আধুনিককালে বাংলার ছাত্রসমাজ অপূর্ণ শক্তির পরিচয়
দিয়াছে। তাই আশা হইতেছে যে, শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির
যে আন্দোলন দেখা দিতেছে ইহাতে হয়ত তাহারা অল্প কোন
প্রদেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

নেতাজীর অনুসরণে :-

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও
তাহার “শ্রী” মার্ক স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল
বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক
হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার
মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিস্তৃত স্নাত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা
স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ এ্যাচ ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তত্ত্ব ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিন্দ্যবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষাবর্ষ মাস্ত্রজিকরত্ন, এম-আর-এ-এস (লন্ডন); বিশ্বখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনামিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মহোদয় যুগান্তকালীন মহামাঞ্জ ভারতসম্রাট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা-কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে।”

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মহামাঞ্জ ভারতসম্রাট মহোদয়কে ও ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮ X-X-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতিষশিরোমণি মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ইহার নিভুল গণনা, অলৌকিক নিবাত্তির আরও একটি জাম্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের নরপতিবৃন্দ-এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে বৈরাগ্যভাবে চমৎকৃত ও বিম্বিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ত্রিভুজী বহুস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যিনি এই ভয়াবহ যুদ্ধ মোষণার প্রথম দিবসেই মাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্য বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিষ-পরামর্শদাতারূপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় প্রভাবান্বিত হইয়া একমাত্র ইহাকেই “জ্যোতিষশিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাত্ত্বিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিচ্যুত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদছাড়া, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুক্ত ও বিম্বিত।” হার হাইনেস্ মাননীয়া বটমাতা মহারাজী জিপুরা টেট বলেন—“তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মনমোহন মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র মনোমধস্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।” সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মনমোহন রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” .পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মি: বি, কে, রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুন: পুন: বিম্বিত।” বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দৈব রায়কত বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তাত্ত্বিকশক্তি পুন: পুন: প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্বিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।” কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়দাহেব এস, এম, দাস বলেন—“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচর্চা মহাকবি শ্রীহরীদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্তসাধারণ ক্ষমতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বর মাননীয়া শ্রীমুক্তা সরলা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিন্সি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার মি. মাধবম্ নায়ায় কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।” চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মি: কে, রুচপল বলেন—“আপনার তিনটি প্রেমের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে মি: জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শাস্ত্রিময় হইয়াছে—পূজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাক্ষর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।
ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐর্ষ্য, মান, বশ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রীলাভ করেন। (তত্ত্বোক্ত) মূল্য ৭৫০। অতুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্ত্ব ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৫০।, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য।
বঙ্গলাম্বকা কবচ—শত্রুদিগকে বণীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় হফললাভ, আকস্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিব মনিকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্মে নিভিলাভে ব্রহ্মাভ। মূল্য ২০০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৫০। (এই কবচে ঙাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)।
বশীকরণ কবচ ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১৫০, শক্তিশালী ও সত্ত্ব ফলদায়ক বৃহৎ ৩৫০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজি:)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে স্ট্রীট, “বসন্ত নিবাস” (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫
সাক্ষাৎকের সময়—প্রাতে ৮।০টা হইতে ১১।০টা।
প্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা।
 ফোন : কলি: ৫৭৪২। সময়—বেকাল ৫।০টা হইতে ৭।০। লণ্ডন অফিস :—মি: এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন

উপনিষদের ফারসী অনুবাদ

শ্রীশূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

শাহজাহান বাদশাহের পুত্র শাহজাদা দারামশিকোহ বিজ্ঞ-ব্যসনী, জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের আলোচনার জন্তে শাহজাদাকে বহু আয়াস স্বীকার করে অনেক পণ্ডিতের সান্নিধ্য ও সাহায্য লাভ করতে হয়েছিল। তারই ফলে তিনি পণ্ডিতরাজ জগদ্রাধকীর সহিত বিনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর সহায়তায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে উপনিষদের স্থান সর্বোচ্চে। শাহজাদা দারামশিকোহ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করে পাঁচ খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষায় অনুবাদিত করেন।

এই ফারসীতে অনূদিত উপনিষদাবলীর নাম রাখা হয় 'শির'র আকবর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গুণ রহস্য। এই গ্রন্থ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশিত করা হয়েছিল।

তখন ফারসী ভাষায় মুদ্রায়ত্ত ভারতবর্ষে ছিল না; বহু হস্তলিপিকুশল ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ড নকল করে শাহজাদার নিকটে প্রচুর পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

এই হস্তলিখিত পুথিগুলির পাণ্ডুলিপি আজও ভারতবর্ষে—

কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরী, লাহোর, পঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরী এবং লণ্ডনে—ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কথিত আছে যে, দারামশিকোহ একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে বহু কাশ্মীরী বিদ্বান ব্যক্তির সহিত তাঁর আলাপ হয় এবং সেই সূত্রে তিনি উপনিষদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেন। পরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কাশী থেকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের সাহায্যে এই বিবাহিত অনুবাদ-কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়।

যতদূর জানা যায়, অথর্ববেদ বিষয়ক পঁয়ত্রিশ খণ্ড, সাম-বিষয়ক এক খণ্ড, ঋগ্বেদ বিষয়ক তিন খণ্ড ও যজুর্বেদ বিষয়ক এগার খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও বহু হিন্দু শাস্ত্রের ফারসী অনুবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তা এতই দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট যে তার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই অনূদিত উপনিষদ-সংগ্রহের

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন ?

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

“স্থানী আমানতে” জমা রাখুন।

সুদের হার			
৩ মাসের জন্য	... ২½%.	৫ ও ৬ বৎসরের জন্য	... ৫%.
৬ " "	... ৩%.	৭ " "	... ৫½%.
৯ " "	... ৩½%.	৮ " "	... ৫½%.
১ ও ২ বৎসরের	... ৪½%.	৯ " "	... ৫¾%.
৩ ও ৪ " "	... ৪¾%.	১০ " "	... ৬%.

নিরাপত্তা ?

কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও সম্ভ্রান্তিআমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় এবং হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্শ্বে ও মধ্যে আরও বহু জমি খরিদ করিয়াছি। এই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৪১

—নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটি ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোন :—কাল : ১৪৬৪—৬৫

টেলিগ্রাম :—“Aryoplants”

নাম কারসী ভাষায় ছ' রকম—‘শিরুর আকবর’ ও ‘শিরুল অসরার’। কারসী অল্পবাদ থেকেও উপনিষদ ভাষান্তরিত হয়। অঙ্কুটিল ডুপেরন (Anquetil Duperton) ফরাসী ও লাতিন ভাষায়ও উপনিষদের তর্জমা করেন।

মনীষী ম্যাক্সমুলর এই অল্পবাদ সম্বন্ধে বলেছেন—এই উপনিষদ বিচিত্র ও উচ্চভাবপূর্ণ। এর গুচ্ছতত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই গভীর ভঙ্গ-সংবলিত গ্রন্থের তাৎপর্য শুধু শোপেনহাওয়ারের মত মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

শোপেনহাওয়ার শুধু এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই ফাঁসি থাকেন নি, তিনি এর মর্মার্থ এতই স্থলর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ভগবতের প্রায় প্রত্যেক দেশের গুণী-জ্ঞানীদের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

কারসী অল্পবাদ থেকেই ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত ভাষায় উপনিষদের অল্পবাদ-কার্য সম্পন্ন হয়।

মুগ্ধ উপনিষদে রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবান সর্বজীবে ও সর্ব দ্রব্যাদিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বুধা তর্ক ও কালক্ষেপ করেন না। তাঁরা অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গভীর ভাবে উপলব্ধি করে মহানন্দে কাল যাপন করেন এবং ক্রমে

তাঁদের সাধনা জয়যুক্ত হয়ে তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষোত্তমে পরিণত করে।

উল্লিখিত অংশের কারসী রূপান্তর নিম্নলিখিতরূপঃ

“দো পরিন্দ্ খুব অন্দ্ ও হর দো হমেশা হমনশীন হম্ অন্দ্ বয়ক দীগচ্ যার অন্দ্ ও দচ্ এক দরন্ত মীওয়া শন্দ্। একে অল্পা দো মেও আ দচন্তয়া শীরী দানিস্ত জী খুরদ দোয় মে। হেচনশী খুরদ্ ও মীবীনদ। খুরদ অজী দো পরিন্দ্ কি একেমী খুরদ ও দীগরে নমী খুরদ ও মীবীনদ আকি জী-খুরদ জীব আয়া অন্ত ও আকি নমী খুরদ ও মীবীনদ পরম আয়া অন্ত ও খুরদ অব দরন্তবদন ও খুরাদ অজ্ মেও কি শিরি দানিস্ত জী-খুরদ নতীজাঃ আমাল অন্ত, ও আ পরিন্দ্ কি মেও আ দরন্ত মী-খুরদ অবর নাদানী অজ্ হকীকত খুদ ওয়াকিক অজ্ হমী জহত হমেশাঃ দর খিজ্ ও আজাচ্ অন্ত বজোঁকি বচ্ হকীকত আ পরিন্দ্ কি চীজোঁ নমী খুরদ ও তমাশা মীবীন মুতালা শবদ ও হম্ অজ্ খুর্দন বাজ্ মীম।”

এর অর্থ হ'ল এইঃ একই বৃক্ষে ছুটি পাতী গভীর মিত্রতা ও সৌজন্মের সঙ্গে পরস্পরের স্নেহ-হৃৎষের ভাগী হয়ে বাস করে। একটি পাতী ঐ বৃক্ষের ফল খুব মিষ্টি মনে করে আহার করে; অপর পাতীটি সাগ্রহে তাই দেখে।

যে পাতীটি ফল খায় তাকে জীবাত্মা ও যে পাতীটি ফল

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

হেড অফিসঃ ১০২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কালকাতা।

তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ্ সার্টিফিকেট

প্রচার মূল্য মেয়াদ অন্তে

টাকা ৮৯০০ টাকা ১০০

টাকা ৮৬০০ টাকা ১০০০

টাকা ৮৬২৯০ টাকা ১০০০০

সুদঃ

চলতি হিসাব ১/২%

সেভিংস হিসাব ১ ১/২%

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত ৩ ১/২%

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুবিধাযুক্ত প্রথম শ্রেণীর
উন্নততম জাতীয় ব্যাঙ্ক।

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন।

ফোনঃ ক্যাল ৩৪৪৭

পূর্বাচল

(মাসিক পত্রিকা)

ভূতপূর্ব বিখ্যাত ‘মানসী’ ও ‘যমুনা’ পত্রিকার যুক্ত-সম্পাদক কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের সম্পাদনা এবং স্বনামধন্য লেখক সম্প্রদায়ের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইবে। সাহিত্যিক টীকা-টিপ্পনী ও রস-রচনা ইহার অন্ততম নূতন বৈশিষ্ট্য।

আগামী মাঘ মাস হইতে প্রতি মাসের শেষে নিয়মিত-রূপে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০/ ছয় আনা মাত্র।

বার্ষিক (সডাক) মূল্য ৪৯/ সাড়ে চার টাকা।

গ্রাহক হইবার জন্য অবিলম্বে আবেদন করুন। কারণ, নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রাহক লওয়া কাগজের অভাবে এক্ষণে সম্ভব হইবে না।

বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের জন্য সম্ভব হউন।

পূর্বাচল পাবলিশিং হাউস

কার্যালয়ঃ—

৫নং মল্লিক লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা (২৫)

খায় না তাকে পরমায়া বলে কল্পিত হয়েছে। রক্ষকে জীবন রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং তার সুস্বাদু ফলকেই বলা হয়েছে কর্মফল।

যে পাখীটা ফল খায় সে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে এবং নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্যের সহিত তার পরিচয় সংঘটিত হয় নি। শুধু তাই নয় তার এই ফলাহারের বাসনা তাকে ক্রমেই দুঃখ ও দুঃশিস্তায় অভিভূত করে ফেলে। সে তখন তার সহচর অপর পাখীটির প্রতি ক্রুর নয়নে চেয়ে থাকে এবং তার মত নিঃশব্দ ও দুঃখাতিত হতে উৎসুক হয়, ফল খাওয়ার রুচি ক্রমেই তার কমে আসে।

এই অনূদিত অংশ থেকে বোঝা যায় যে ফারসী ভাষায় উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব কি সুন্দর ভাবেই না রূপান্তরিত হয়েছে। উক্ত ভাষায় অনুবাদ হবহ মূলের অল্পরূপ হয়েছে।

এমনিভাবে উপনিষদের অনুবাদে ভিতর দিয়ে ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব সম্মিলন তখন হয়েছিল এবং সেই আদর্শকে সমগ্র দেশবাসী পরম সমাদরে ও গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিল।

পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে, উপনিষদ দেশ-বিদেশের

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বিশ্ববাসীর সংযোগ স্থাপিত করেছে এবং এই মহৎ কার্যের কৃতিত্বের অনেকটা শাহজাদা দারানিশিকোহের প্রাপ্য। কারণ তিনিই ফারসী ভাষায় পঞ্চাশ খণ্ড উপনিষদের প্রথম অনুবাদক।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার জার্মান ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করেন ডুপেরেনের অনুবাদকে ভিত্তি করে; তাঁর দার্শনিক চিন্তাও বহুলাংশে উপনিষদের প্রভাবে প্রভাবিত।

শোপেনহাওয়ার উপনিষদকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উৎস ও মৃত্যুকালীন চরম শান্তিলাভের অবলম্বন বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে উপনিষদের মধ্যে অক্ষয় ও অপার জ্ঞানের ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে—যার আলোচনা এক দিন সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নির্ধারণে সহায়তা করবে।*

*এই প্রবন্ধ লিখতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদজী, পণ্ডিত কানীপ্রসাদ পাণ্ডুরং ও মৌলভী মহেশপ্রসাদ আলিম ফাজিলের রচনাবলী থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত স্তরের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১. ষৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৫০ টাকা

২. ষৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৫০ টাকা

৩. ষৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৫০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বদ ও তহুপরি ঐ টাকা শেষারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকরবার করিয়া থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিজিটিকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "ইনিকব"

ফোন ক্যাম ৩৩৮১

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অল্পখাই হউক বা স্বস্থ অবস্থাতেই হউক, যখন কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহাৰ্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটা দোষ এই যে উহা দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র স্থনির্বাচিত কোনো খাদ্যদ্রব্যই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্বাঙ্গীন উন্নতি দীৰ্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

আনা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অক্ষুণ্ণ ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

আনা-ভিটা স্থনির্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা স্বস্থ কি অস্থস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্ককো এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া আনা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটা আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিশেষে শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে আনা-ভিটা মস্তিষ্ক,

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

আনা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম আনা-ভিটার আর একটি অপূর্ণ সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিশ্বয়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। আনা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর স্বস্থ পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের স্থনির্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ আনা-ভিটাতে অগ্নাগ্র নানা মূল্যবান উপাদান ছাড়াও দুইটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ আনা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে আনা-ভিটা কেবল যে স্বস্থাত্ম ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অগ্নাগ্র খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ণ খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদেব স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। আনা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অগ্নাগ্র মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্কি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় আনা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

আনা-ভিটা কি স্বস্থ কি অস্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। আনা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

পুস্তক-পরিচয়

কথাসিন্ধু—ঈশ্বরানুগী দেবী ও জীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত।
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এখানি গল্প-সংগ্রহ। আধুনিক কালের বিভিন্ন লেখকের লেখা চৌদ্দটি ছোট গল্প আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, সুবোধ বসু, 'বনফুল', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্তা সেনগুপ্ত, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ইহারা এই চতুর্দশটি গল্পের লেখক। রচনার সঙ্গে সম্পাদকদ্বয় লেখকদের জীবনেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশের ইতিহাস এইরূপ :—কালকাতা কেমিক্যাল কোম্পানী শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের রচনার তত্ত্ব পুরস্কার ঘোষণা করেন, এই সংগ্রহপুস্তক তাহারই ফল। গল্পগুলি সুনির্বাচিত। গ্রন্থ সুপাঠ্য, সমৃদ্ধিত, সুসম্পাদিত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দর্শন ও বিপ্লব—শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়। জিজ্ঞাসা—১০০-এ,
রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৫, মূল্য পাঁচ টাকা।

এখানি গ্রন্থকারের ইংরেজী দার্শনিক প্রবন্ধের অনুবাদ-পুস্তক। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীসমরেন রায়। বস্তুবাদ ও বাস্তুব আদর্শবাদ, বিপ্লবের ইতিহাস এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শ এই তিনটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় সাম্যবাদী লেখকগণের মধ্যে মানবেন্দ্র রায় একজন শক্তিশালী লেখক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ লেখক খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁহার সকল লেখাই ইংরেজী ভাষায়। এজন্য মানবেন্দ্র রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা নিছক বাংলা জানা পাঠকের অপরিচিত। বর্তমান অনুবাদগ্রন্থ কতকাংশে এই অভাব দূর করিবার প্রয়াস। লেখকের চিন্তাধারা বাস্তবপন্থী এজন্য ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার সহিত ইহার ঘোর বিরোধ। মানবেন্দ্রনাথ আদর্শের দিক দিয়া পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের কোন মূলগত পার্থক্য একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর ভাগ্য পরিবর্তিত হইবে, কিন্তু ভারতের বর্তমান কংগ্রেসী নীতি এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই এবং ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তিনি নিছক জড়বাদী বা বস্তুবাদীর চোখেই দেখিয়াছেন। ভারতের জাতীয়

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজিঃ অফিস—আখাউড়া

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

প্রধান অফিস—আগরতলা

(ত্রিপুরা স্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০২/১, ক্লাইভ স্ট্রিট, ৫৭নং, ক্লাইভ স্ট্রিট (রাজকোটরা)

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—	...	...	৫০,০০০,০০
বিক্রীত মূলধন—	...	...	২২,৫০০,০০
আদারীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল—	...	...	১৪,৯৫০,০০
আমানত	...	...	৩,৫০,০০০,০০
কার্যকরী তহবিল—	...	...	৪,০০,০০০,০০

টাকার উপর

টাকার উপর

টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুটী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ফেঁচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, বদরপুর, ফুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, গোলাঘাট, তিনহুকিয়া, নর্থলক্ষ্মীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, রাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, হেমদিনীপুর, পুরী, বেনারস।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জীবনে মানবেরনাথের প্রভাব বিশেষ প্রবল না হইলেও তাহার চিন্তার সহিত পরিচয়ের আবশ্যকতা বারবার স্বীকার করেন এরূপ শিক্ষিত পাঠক-মহলে এই পুস্তকের প্রচার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অল্পবাদের ভাষা সরল হইয়াছে।

নারীর অধিকার—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল। শিল্প-সম্পদ প্রকাশনী, ৩, ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৪, মূল্য পনের আনা।

লেখক সাতটি অধ্যায়ে নারীর মর্যাদা, সমাজ-ব্যবস্থায় নারী, পিতৃকুলীয় পরিবার ও নারী, নারী-আন্দোলন, নারীর অধিকার, খসড়া হিন্দু-আইন এবং নারী-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয় ভারতের হিন্দু নারী। ভারতের হিন্দু সমাজে নারী অতি প্রাচীন কাল হইতেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে নারীদের অবদানও কিছু কম নহে। শাস্ত্রাদিতেও নারীকে খুব উচ্চ-স্থানই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতীয় নারীর অবস্থা অতি শোচনীয়। জাতির প্রকৃত উন্নতি এই নারীজাতির সর্বপ্রাণীক উন্নতি ও তাহার সত্যকার অধিকার প্রতিষ্ঠার উপরেই নির্ভর করে। লেখক খসড়া হিন্দু আইনের সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান জগতের অত্যন্ত দেশের নারীর অবস্থার তুলনায় প্রস্তাবিত হিন্দুনারীর অধিকারগুলি খুবই বিপ্লবাত্মক নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভারতের জাতিগঠন কেবলমাত্র আংশিক ভাবে হিন্দু আইন সংশোধন দ্বারা সম্ভব হইবে না। যুক্তি এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে এরূপ আইন প্রণয়ন দরকার বাহা সম্প্রদায় ও ধর্মনির্বিশেষে

প্রয়োগ করা চলিবে। ধর্মকে সর্বসাধারণের অধিকারের এলাকা হইতে সরাইয়া ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত। নারীকে তাহার নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পুরুষ-জাতির তাহারিগকে পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বকিম চাট্জো স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ ও বিশাল নাট্যসাহিত্য। প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ নাট্যকলার নিদর্শন হিসাবে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু নৃত্য-গীত-বাস্তব-বিদ্যাদির মত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যবিদ্যারও বর্ধার স্বরূপ আজ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে এই বিদ্যার সম্যক অনুশীলন অপ্রচলিত—সম্প্রদায়-বিচ্ছেদের ফলে তাই আমরা বহু বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আধুনিক পণ্ডিতসমাজ এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে সেই প্রয়াসের কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের স্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ-বিষয়ক রীতিনীতি সংক্ষিপ্ত ও যথাসম্ভব সরলভাবে এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তবে এ জাতীয় ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক অস্পষ্টতা ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মতানৈক্য অপরিহার্য। যথোচিত প্রমাণ-নির্দেশের অভাবে গ্রন্থকারের কতকগুলি উক্তি জিজ্ঞাস্য পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। বিবাহ ও গৃহপ্রবেশে নাট্যানুষ্ঠানের অপরিহার্যতা, দৃশ্যনাট্যের মধ্যে গীতবাদ্যের বাহ্যিক উদাহরণ ব্যতীত ভাল বুঝা যায় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

উৎকৃষ্টতম উপারে

টাকা খাটাইতে চাহেন?

আমাদের “স্বাস্থ্য আন্দোলন” জমা রাখুন

সুদের হার			
১	বৎসরের জন্য শতকরা ৩।০	৭	বৎসরের জন্য শতকরা ৪।০
২	" " " ৪.০	৮	" " " ৫.০
৩ ও ৪	" " " ৪।০	৯	" " " ৫।০
৫ ও ৬	" " " ৪।০	১০	" " " ৫।০

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেরার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

“শেরার ডিলার্স হাউস”,—কলিকাতা।

বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী

(২)



“সিংহল নামে রেখে গেছে
নিজ শৌর্যের পরিচয়”

ল্যাডকোভাইন
স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি দূর
করে। এই সুবিখ্যাত
টনিকটির প্রতি বিন্দু
শক্তি, পুষ্টি ও উত্তমের
শ্রেষ্ঠ পরিবেশক।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলার বীর সম্রাট
বিজয়সিংহ যাত্র সাত শত অশ্বচর লইয়া অতুত সাহস
ও বিক্রমের সহিত স্বদ্র লঙ্কার দুর্গভালে বাংলার
অমর পতাকা প্রোথিত করিয়া দীর্ঘ নামাঙ্কনসহ
বিজিত দ্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন “সিংহল”।

বাঙালীর সেই শৌর্য বীর্য আজ কাহিনীতে
পর্যবসিত—স্বাস্থ্যহীনতার লজ্জা জাতীয় জীবন
প্রতিপদে ব্যাহত।



ল্যাডকোভাইন

এমদর্শ টনিক ওয়াইন

লিষ্টার এন্টিসেপটিকস্ কলিকাতা

অসময়—শ্রীমুগ্ধটি সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কুমারী করতোয়ার গৃহশিক্ষক সজল তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তরুণ বয়সে যে কল্পনার স্বর্ণ রচনা করিয়াছিল বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ধনীরা দুলালী করতোয়ার বিবাহ হইল উচ্চ-শিক্ষিত অভিজাত বংশীয় উষরের সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে আবর্তনে করতোয়াকে পুনর্বিবাহিতা হইতে হইল সেই সজলের সঙ্গেই। এই পুনর্জন্ম নারীর জীবনে পর পর দুইটি পুরুষের আবির্ভাবে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই লেখিকা এই কাহিনীটির ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কাহিনী বর্ণনে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস নাই, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের বাহ্যল্যও নাই। প্রবহমান নদীর মত গল্পের ধারাটি সাবলীল গতিতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। নিসর্গ-চিত্রণও লেখিকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। জায়গায় জায়গায়, হালকা তুলির টানে আঁকা রেখাচিত্রের মত, তিনি সামান্য দু'চারটি কথায় নৈসর্গিক দৃশ্যের বড় সুলভ ছবি আঁকিয়াছেন।

শয়তানের জাল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকের নাম হইতে মনে হয় যে, ইহা একটি ডিটেক্টিভ কাহিনী। আসলে কিন্তু, ইহা তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার পটভূমিকার রচিত একটি কিশোর-উপন্যাস। বিগত মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে ধনী, মুনোফাখোর, চোরাকারবারী প্রভৃতি 'শয়তানের দলে'র লুণ্ঠ ও শোষণ-প্রবৃত্তির ফলে বাংলাদেশের, বিশেষতঃ মহানগরীর বুকের উপর ধ্বংসের যে তাণ্ডব লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায়, সরস ভঙ্গীতে লেখক তাহারই একটি নিপুণ আলেখ্য আঁকিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক মাধব—একটি চতুর্দিশ বৎসর-বয়স্ক কিশোর। যশস্তরের দুর্দিনে মহানগরীর পথে পথে তাহার চরম দুর্গতির কাহিনী কিশোর পাঠকপাঠিকাদের চিত্তকে বেদনায় ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুকে অশ্রু-মজল করিয়া তুলিবে। বইটির একটি বিশেষ সার্থকতা এই যে, ইহা পাঠে পরিপূর্ণ প্রাচুর্যের মধ্যে বাংলাদেশে এই চরম দুঃসময় কেন আসিয়াছিল কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের মনে দেই প্রশ্ন জাগিবে এবং লেখকের মন্তব্যগুলি তাহাদিগকে দৃষ্টি-নির্ণয়ে সাহায্য করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কৃষক-প্রজা-আন্দোলনের মুখপত্র

সাপ্তাহিক কৃষক

একাদশ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক—সিরাজউদ্দীন আহমদ

বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২০ টাকা মাত্র।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাঠান হয়।

ম্যানেজার—সাপ্তাহিক কৃষক

৫৪, ক্রীক রো, কলিকাতা।

ইহলোক ও পরলোক—শ্রীমতুলবিহারী গুপ্ত। ৬২ এল, তিলভাওপার, বেনারস সিটি হইতে-শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা।

মানবাত্মার ইহলোক হইতে পরলোক যাত্রার বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পূর্ণ এই পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। লেখক স্বয়ং উচ্চশিক্ষিত এবং এই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য ইউরোপ-আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিতেছেন এবং লেখক স্বয়ং এই তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া বাহা জানিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি পরলোকগত আত্মাদের নিকট হইতে প্রেত-চক্রে যে সব গুহ্যকথা জানিয়াছেন—অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার সমস্তই ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রের সহিত মিলিয়া যায়। বর্তমান নাস্তিকতার যুগে মানুষের ধর্মীয়ভূতি জাগাইবার জন্য এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বাহ্যারী জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন।

অন্নদাতা—কৃষ্ণ চন্দর। অবলী সান্তাল কর্তৃক অনুদিত। ইন্টার গ্রামস্কুল পাবলিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উর্ধ্ব সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক কৃষ্ণ চন্দরের এই ক্ষুদ্র

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স

—নিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)



ঠিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
যাত্রকের শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।

ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

উপজাতিসংগ্রহ বাংলার পঞ্চাশের মধ্যভাগের পটভূমিকায় রচিত। পুস্তকখানির অসাধারণত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় বর্তমান। একজন ভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষার লেখক বাংলার সেই দুর্দিনের দুঃখকে কতখানি সহায়ত্বের সহিত দেখিয়া কিরূপ অগ্নিময় ভাষায় তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন, দেখিয়া বিস্মিত আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে। সাহিত্যের এই মহার্ঘ্য অবদানটিকে যিনি বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব এমনি যে একবারও মনে হয় নাই, অনুবাদ পড়িতেছি।

শ্রীজাই প্রকাশিত হইতেছে

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীশান্তা দেবীর

রামানন্দ ও অর্দ্ধ- শতাব্দীর বাংলা

বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্তমান যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনাদর্শের সুনিপুণ বর্ণন ও বিশ্লেষণ।

প্রবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশোভিত, বাংলা-সাহিত্যে অভিনব জীবনচরিত। ইহা একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী এবং সমসাময়িক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি বিবর্তন আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

মায়ের আশীর্বাদ—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৮৪এ, বিডন রো হইতে পি, দাশ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালী-বরের কতাবধু ও জননীর চরিত্র অকনে তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ। পুস্তকখানি যে জনসমাদর লাভ করিয়াছে উহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। ছাপা ও বাঁধাই আধুনিক রুচিসম্মত।

আবির্ভাব—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার বি.-এ।
৮৭১১এ, হাতীবাগন রোড—ইন্টালী, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

যীশুখৃষ্টের বিষয় অবলম্বনে লিখিত ভক্তিরসাস্রিত নাটিকা। প্রথমতঃ ইহা বেতারে অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। রচনাগুণে নাটিকাখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র সু-অঙ্কিত এবং সংলাপগুলিও সরল এবং সুন্দর।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

সর্বমঙ্গলা-বিদ্যাপীঠ—শ্রীতারাপদ রাহা। মডার্ন পাবলিশার্স,
৬, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অনুপম প্রথম জীবনে লগ্নীর প্রসাদলাভের সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ সরস্বতীর সাধনায় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতির স্বপ্ন দেখিয়া, এম-এ পাস করিয়া মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় এক স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করিল, বাহার নাম সর্বমঙ্গলা-বিদ্যাপীঠ। ইহাকে একটি বে-সরকারী আদর্শ উচ্চ ইংরাজী স্কুল বলা যাইতে পারে। এই শিক্ষকজীবনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হইল তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া অনুপম বোদীর প্রতি শেষ চিঠিতে লিখিয়াছে—“অনেক আশা করে এখানে মাষ্টারী করতে এসে-ছিলাম। মনে করেছিলাম, এখানে কত ঋষি, মহর্ষি, আরাগি, উপমহ্যর দেখা মিলবে। সে ভুল আমার কেমন করে ভেঙেছে, সে কথা তুমি জানো।” শিক্ষকদের উপর দেশের আশা-ভরসা স্থল তরণ ছাত্রগণের জীবন ও চরিত্রগঠনের ভার স্তম্ভ রহিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি নিরাকরণ অবজ্ঞা ও অনুকম্পার ভাব কোন স্বাধীন প্রগতিশীল জাতির মধ্যে দেখা যায় না। বিভূতিবাবুর ‘অনুবর্তন’ের ভায় তারাপদবাবুর ‘সর্বমঙ্গলা-

অভ্যন্তরীণ বলের

ব্রাদ-ভিটা

সকল মনোরম
মেডিকেল রিসার্চ লেবোরেটরি
সি-২০, ডাক্তার এমিউ, কলিকাতা

বিভাগীষ্ঠাও এদিকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কনক-বোদি ও অনুপমের মধুর স্নেহপূর্ণ সন্ধন, প্রভাত ও নীরুর বিয়োগান্ত পরিণতি এরূপ হৃদয়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে উপভাসের সার্বকতা এখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানির গোড়ার দিকে আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকগণের কথাবার্তায় একটু মাত্রাধিক উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথম প্রণাম—শ্রীঅপরূপ ভট্টাচার্য। রথীন্দ্র পাবলিশিং হাউস, ৪০ নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

‘প্রথম প্রণাম’ অপূর্ববাবুর প্রথম উপন্যাস,—পড়িয়া আমাদের ভালই লাগিল। কোনও বিশেষ দোষগুণ এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন উপন্যাসটিতে ফুটিয়া উঠে নাই। সাধারণ পাঠকে ইহা আনন্দদান

করিবে, কারণ ইহা মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থিগুলো অথবা কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার তর্কালোচনায় অথবা ভাষাক্রান্ত নহে। গল্পটি স্বপ্নপাঠ্য, ভাবোচ্ছ্বাস বা বর্ণনার আভিশ্যাদা হইতে মুক্ত। চরিত্রাঙ্কনেও বিশেষ ক্রটি ধরা পড়ে না। জমিদার পিতার ধনমদগর্ভিতা ও বালিগঞ্জের এক অতি-আধুনিক কলেজে সহশিক্ষার ফলে উন্ন্যাসগামিনী নারিকা অশোকার বিপরীতে তাহার বিবাহিত স্বামী ডাক্তার প্রণবের উদার-কোমল অথচ অনমনীয় দৃঢ় চরিত্র হৃদয় ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। অন্ত্যস্ত চরিত্রের মধ্যে অশোকার পূর্বপ্লেগরী সমীরকে শেষের দিকে একেবারে লম্পট পর্যায়ভুক্ত করা অসম্ভব মনে হইল। প্রণবের বন্ধুগণী স্বামীবিয়োগ-বিধুরা সরমার চরিত্র-পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে।

গ্রিমের রূপকথা—শ্রীভারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ইংরেজী অনুবাদ-সাহিত্যে গ্রিমভাতৃদ্বয় সংগৃহীত জাদুখানীর উপকথাগুলি সর্বজনবিদিত। ইতিপূর্বে এই রূপকথার ভাণ্ডার হইতে অধিকাংশ গল্প অনেকে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, ভারাপদ বাবু মাত্র বারটি গল্প ইহা হইতে নির্বাচিত করিয়া সরস মনোহর ভঙ্গীতে ছেলেদের জন্য লিখিয়াছেন। প্রচুর চিত্র বইটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া ছেলেদের নিকট গল্পগুলিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে। গল্পের সংখ্যা আরও বাড়ানো সমীচীন ছিল।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পণ্ডিত ৩২মামাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত-এবং

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

(সচিত্র ও যজ্ঞ) শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১৭

অর্গল, কীলক, কবচ, মূলচণ্ডী, শূভাদি এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, পূজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে ‘চণ্ডী’ বিষয়ক বহুল জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ও বর্ণনাত্মক মৌলিকভাবে সমৃদ্ধ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা ৬/১০ ত্রিসংখ্যা ১০

প্রাপ্তিস্থান—সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক—১২০১২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বুদ্ধদেব বসু-র

নতুন বই

কালের পুতুল

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা

= এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সম্মিলিত হয়েছে =

লেখার ইস্কুল। কবির জীবিকা। প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গল্প। ‘কল্লোল’ ও দীনেশরঞ্জন দাশ। জীবনানন্দ দাশ। সময় সেন। স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত। ‘বিষ্ণু দে। স্বভাব মুখোপাধ্যায়। অমিয় চক্রবর্তী। নিশিকান্ত। অন্নদাশঙ্কর রায়। জুজেন তরুণ মৃত কবি। নজরুল ইসলাম। কালের পুতুল।

চার টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থপঞ্জী ও কবিতাভবনের সম্পূর্ণ তালিকা

জ্ঞান পাঁচ আনার ষ্টাম্প পাঠাবেন।

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

কাঁ ক ডা বিছে র র স

রসকার—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শার্দূলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলকায় খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আঁতে ঘা না লাগিলে বক্তব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অন্ত্যায় শূল বেদনার সম্ভাবনা আছে। যাহারা রসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞ্ছনীয়।

‘কাঁকড়া বিছে র র স’ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে।

বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন।

দেশ-বিদেশের কথা

উত্তরপাড়ায় নিখিল-বঙ্গ আনুষ্ঠান-প্রতিযোগিতা

বিগত ১লা জানুয়ারি, ১৬ই পৌষ, বুধবার অপরাহ্নে উত্তরপাড়ার “হরিনারায়ণ স্মৃতি-পাঠাগারে”র ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এক নিখিল-বঙ্গ আনুষ্ঠান-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে এইরূপ প্রতিযোগিতার ইহা দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। ইহার বিভিন্ন বিভাগে শিশু, বালক-বালিকা, মহিলা এবং বয়স্ক প্রতিযোগিতার যোগদান করেন। “হরিতরুণ”র বিরাট প্রাক্কণ দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার বহু সাহিত্যসেবীরও সমাবেশ হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন কথালক্ষী ত্রিতারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। প্রতিযোগিতার বিচারকের কার্য করেন ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। প্রতিযোগিতার বিচারকের কার্য করেন ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। প্রতিযোগিতার বিচারকের কার্য করেন ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার তালিকায় ১১৫ জনের নাম থাকায় ইতিপূর্বে ২৮শে ডিসেম্বর একটি প্রাথমিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে বিচারক ছিলেন ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ত্রিতারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। আনুষ্ঠান, বিশেষতঃ শিশুদিগের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার পর বিচারকদ্বয় আনুষ্ঠান ও পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবার কালে বাস্তববাদ ও রোমান্টিকিজমের ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, “এই পাঠাগার সম্পর্কে উত্তরপাড়ার যথেষ্ট ঐতিহ্য আছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের এক সংগতিগত হৃদয়োগের সম্মুখীন হইতে হইবে। পাঠাগারকেই দীর্ঘকালের সংগতির বাণী বহন করিতে হইবে।” সভাপতির সহযোগে সংগঠক ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এবং সম্পাদক ত্রিতারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টার জট করেন নাই।

শিশুদের পক্ষে মাতৃসুখ্য অতুলনীয়



কিন্তু স্তন্য-দুগ্ধ যখন কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার সুবিধা থাকে না, তখন “ভিটা-মিল্ক” নির্বিঘ্নে বাড়ন্ত শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা নির্দোষ দুগ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। ইহা সেবনে শিশুদের দাঁত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য স্থায়ী হইয়া উঠে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা সুপথ্য। ভিটা-মিল্ক গত সাত বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সন্তান, প্রসূতি-আগার ও হাসপাতালে স্তন্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।



ভিটা-মিল্ক

ন্যাশনাল নিউট্রিয়েন্টস্ লি: ১২, ভৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

কলিকাতায় মুকব্বির ছাত্রদের শিল্প-প্রদর্শনী

বিগত ৪ঠা পৌষ, ১৯৩০ নং আশার সারুলার রোডে মুকব্বির শিক্ষক-সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এবং মকব্বির কয়েকটি মুকব্বির বিভাগের ছাত্রদের একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ১৯৪০ সন হইতে এ ধরনের প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয়। ১৯৪৪ সনে ৭১ নং ভারত প্রামাণিক রোডে মুকব্বিরদের যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় বাংলার তদানীন্তন গবর্নরের পত্নী মিসেস কেসি তাহার উদ্বোধন করেন। বর্তমান বৎসরের প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য লাটপত্নী লেডী বারোজ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মুকব্বির বিভাগ-প্রাক্ষেপে সভা হয় তাহাতে উক্ত বিভাগের শিক্ষক ত্রিযুক্ত এ. সি. সেন এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কয়েকজন মুক ছাত্রকে কথা বলাইয়া তিনি প্রোত্নস্বর্কে চমৎকৃত করেন। পঞ্চানন প্রামাণিক নামে একটি ছাত্র দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। মুকব্বির শিক্ষক সম্মেলনের অবৈতনিক সম্পাদক ত্রিযুক্ত নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদারও সভায় বক্তৃতা করেন।

ডাঃ কে. কে. রায়

যশবী চিকিৎসক কেশবকৃষ্ণ রায় ডাঃ কে. কে. রায় নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জুয়েলার। স্কুল ত্যাগ করিয়া কেশবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করেন। উচ্চশিক্ষার আহ্বান তাঁহাকে কিছু স্থির থাকিতে দিল না। পরিণত-যৌবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি একসঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন করিতে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চা করিতে আরম্ভ করেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একান্ত সাহস এবং সঙ্কল্পে দৃঢ়তা ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করিতে কেশবকৃষ্ণ আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে এম.ডি. ডিগ্রী লাভের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই এক জন প্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রূপে গণ্য হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আভিজাত্য তাঁহাকে সর্বসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপক রূপেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় হোমিওপ্যাথিক কন্ফারেন্সে তিনি বহু বার সভাপতির পদে বৃত্ত হন। বিহার এবং সুদূর অন্ধ্র প্রদেশের চিকিৎসক-সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। হিন্দু মহাসভা কর্তৃক তিনি কলিকাতার উত্তর বিভাগের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ছয় পুত্র, তিন কন্যা, অসংখ্য



কেশবকৃষ্ণ রায়

বহুবাহুব এবং আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, প্রায় ষাট বৎসর বয়সে সহদয়, নিরস্ত্রমান, পরোপকারী, প্রতিভাবান চিকিৎসক ডাক্তার কেশবকৃষ্ণ রায় তাঁহার চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ভ্রম সংশোধন

(“বহু বর্ষান্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা”)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	সুস্থ
৩৭২	২	৩	আইন	অহিলা
ঐ	ঐ	৩৫	সপক্ষে	সমক্ষে
৩৭৩	১	১১	ট্রেডিনিয়াম	ট্রেডিলিয়ান
ঐ	ঐ	২৭	দর্শনবাদ	দর্শনাদি
ঐ	২			
ঐ	০	২০	ডিয়ামেট্র	ডিয়েলট্র
৩৭৪	১	২২	বিভাগের	বিভাগেও
৩৭৬	১	১৪	শত	শত
ঐ	২	২৭	পথ	চাপ

ইহা ছাড়া, ৩৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের পাদটীকা দ্বিতীয় স্তম্ভের ১৩শ পঙ্ক্তিতে “ঐষ্ঠান করিতে লাগিয়া গেল।”—এর পরে বসিবে।



প্রবাসী হোস, কলিকাতা

প্রণতি
শ্রী বৈষ্ণব দাস



পারকোটের পথে গাঙ্গীজী



সিরঞ্জির প্রার্থনা-সভা। গাঙ্গীজী আমতুস সালামের অনশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নায়মাস্তা বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের ৬ই ডিসেম্বরের বিস্তৃতি মানিয়া লওয়ার পর করাচিতে লীগ-কমিটির অধিবেশন বিগত ২৯শে জানুয়ারী হয়। তাহাতে নূতন কিছুই হয় নাই, পুরান চালই আবার চালিবার ব্যবস্থা হয় এবং সেই সঙ্গে নানাপ্রকার অস্থযোগ-অভিযোগ এবং আক্ষালনও হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বের মতই আছে, প্রেভেদ এইমাত্র যে লীগদল গণ-পরিষদ অচল করা ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযান চালানোর চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতি ভিন্ন অল্প কিছু ঘটবার কথা আশা করাই অসম্ভব ছিল। লীগের পুঁজিতে যাহা কিছু আছে তাহার আন্দাজ এদেশ অনেক দিন যাবৎ পাইয়াছে এবং সেই কারণেই অতি বড় আশাবাদী বা অতি ক্ষীণবুদ্ধি লোক ভিন্ন অল্প কেহই অবস্থার উন্নতির আশা করে নাই। এখন দেখিবার বিষয় কংগ্রেস লর্ড ওয়াডেল ও তাহার লীগের কার্যক্রমের সম্মুখে কিভাবে দাঁড়ায়। দাঁড়াইতে কংগ্রেসকে হইবেই কেননা এখন পদত্যাগ বা পরিষদ ত্যাগ প্রায় আত্মঘাতী হওয়ার সমান। প্রশ্ন কেবল মাত্র কংগ্রেসের কত ব্যক্তি কি।

কংগ্রেসের সম্মুখে এখন নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দিতেছে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের খসড়া অনুযায়ী কার্যক্রম সচল করিতে হইলে লীগ ও অসচ্ছ হোটবড় কংগ্রেস-বিরোধী দলের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হওয়া দরকার। এইরূপ “সমঝোতা” জাতীয় বুঝাপড়া সর্বদাই নির্ভর করে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আন্তরিক বিশ্বস্ততা এবং সদিচ্ছার উপর। সেখানে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যকার ব্যবধান সঙ্কচিত হওয়া প্রয়োজন, দুই দলের মধ্যে বিরোধের মূল কারণগুলি দূর হওয়া প্রয়োজন কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে সে সকলের প্রতিকারের এমন একটা পথ নির্দেশ প্রয়োজন যাহাতে ঐ সকল বিরোধের দরুণ আবার অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ডের আগুন প্রজ্জ্বলিত না হইতে পারে। প্রকাণ্ড বিপ্লবের অন্ত্রপাত হইলেই যাহাতে সালিশী বা বিচারের দ্বারা স্থায়-নিষ্পত্তি হইতে পারে, যাহাতে শান্তির মধ্যে ধর্মসদ্বত ভাবে আপোষ হইতে পারে, এইরূপ

ব্যবস্থার উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ চুক্তিবদ্ধ হইলে এই বৈরিভাব দূর হওয়া সম্ভব, অসম্ভব নহে।

লীগের সঙ্গে ঐরূপ চুক্তির সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপর্যন্ত হইতেছে। তাহার মূল কারণ দুইটি এবং সেই দুই কারণ লীগের অস্তিত্বের সহিত জড়িত। লীগের মূল উদ্দেশ্য হিন্দুকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যবাদের পুনর্গঠন। যুগে নানা প্রকার অল্প মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া অতের চক্ষে হুলা দেওয়ার বুঝা চেষ্টা যতই হউক, কার্যতঃ বাংলাদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশে লীগ শাসনের বাস্তব চিত্রে ভুক্তভোগী হিন্দুর মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছে লীগের প্রকৃত স্বরূপ কি। লীগের আধিপত্যের মধ্যে হিন্দুর ধন প্রাণ মন, স্বাধীনতা বা ধর্ম কোন কিছুই থাকিতে পারে না। তিন শত বৎসর পূর্বে যে অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার মুসলমান সাম্রাজ্যবাদ হিন্দুর উপর চালাইয়াছিল, যে অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া হিন্দু—মারাঠা, রাজপুত, শিখ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতি ও জাতিগোষ্ঠী—বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া নিজের হাতে ক্রমে ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গুঁড়া করে, আজ লীগের লুক্কায়িত নেতৃবর্গ সেই লুপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখিতেছে। ইংরেজ এদেশ অধিকার করে হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, হিন্দুর ধরে বিবাদ লাগাইয়া; তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা প্রবল ভাবে করে মারাঠী ও শিখ। অথচ আজ চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ইংরেজ সেই লুপ্তোদ্ধার করিয়া আবার সেই মধ্যযুগের বর্বরতার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। অতএব, এক কথায় লীগের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে হিন্দুর স্বাধীনতার সম্পূর্ণ লোপের উপর এবং ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তনের উপর। সোচ্চার কথায় ইহার অর্থ লীগ-অধিকৃত ভারতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ। লীগের ক্ষুধা লুপ্তনকারী ক্ষুধা, স্তব্ধতা ভারতের কতটা তাহার গ্রাসে গেলে পরে সে ক্ষুধার সিয়ন্তি হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয় কারণ লীগের কংগ্রেসের উপর সন্দেহ। এই সন্দেহের ভিত্তি প্রতিশোধের ভয়ের উপর। লীগের আরম্ভ হয়

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের চেষ্টার অঙ্গস্বরূপে, এবং ইহার গোড়াপত্তন ও পোষণ হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর অহুচর রূপে লীগ জাতীয়তাবাদ দলনে, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর দলনে ও শোষণে যে কাজ আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে প্রতি-শোধের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। এবং বাংলাদেশে লীগ যাহা চল্লিশ বৎসর যাবৎ করিয়াছে, সারা ভারতবর্ষে তাহা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে বিগত পনের বৎসর এবং বিশেষতঃ গত ছয়-সাত বৎসর। এই অপরূপ কীর্তি যাহাদের ইঙ্গিতে, উৎসাহে ও পারিতোষিক দানে এতদিন চলিতেছিল, আজ তাহারা বিদায় লইতে চলিয়াছে, স্তুরাৎ প্রতিফলের ভয় হওয়া স্বাভাবিক নহে, কেননা আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। কাজেই লীগ ছলে বলে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে ইংরেজ বিদায় না লয়; ইংরেজ প্রভু বিদায় লইলে লীগের পাকিস্থান কি করিয়া থাকিতে পারে? কাজেই লীগের অন্তিমের সহিত ভারতে ইংরেজ আধিপত্য দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। একের অভাবে অজ্ঞের উপস্থিতি অসম্ভব এবং ভারত হইতে ইংরেজ বিদায় না লইলে কংগ্রেসের অন্তিম ও স্থায়ী হইতে পারে না। এইরূপ পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে সমঝোতের অবকাশ কোথায়?

এই বিবাদভঞ্জন ও সমস্তাপূরণ সেই দিনই হইবে যে দিন ভারতে মুসলমান সাধারণের মধ্যে বাহারা প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ বুঝেন তাহাদের প্রতিপত্তি বাড়িবে। বিদেশের মুসলমান স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝে সেকথা মিঃ জিন্না অতি স্পষ্টভাষায় শুনিয়া আসিয়াছেন মিশরে। সে কথা আজও তিনি বলিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলেন নাই। মিশরে ও পশ্চিম-এশিয়ায় আরব নেতৃবর্গ বুঝিয়া লইয়াছেন যে ইংরেজের আধিপত্যের ছদ্মনাম যাহাই হউক তাহার মধ্যে স্বাধীনতার নামগন্ধ থাকিতে পারে না, থাকিতে পারে পররাষ্ট্রের স্বযোগ, ঘৃণা ও দুর্নীতির প্রবল স্রোত। উদাহরণস্বরূপে বাংলাদেশের ও সিন্ধু প্রদেশের লীগ রাজত্বের উল্লেখই যথেষ্ট। কিন্তু সে কথা ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে বুঝাইবে কে? এবং মুসলমান জনসাধারণ সে কথা না বুঝিলে সমঝোতের চেষ্টা পণ্ডিতমাত্র একথা কংগ্রেস বুঝিবে কবে?

মুসলমানদের মধ্যে বাহারা প্রকৃত স্বাধীনতাকামী, বাহাদের স্বাধীনতার চিত্রে অন্যের অপকার, পররাষ্ট্রের হানি বা অন্যের উপর দাসত্বরূপে নাই, তাহাদের কথা আজ মুসলমান জনসাধারণের কাছে পৌঁছায় না। তুরস্কের নূতন স্বাধীনতার দিনে কামাল আতাতুর্কী এরূপ নীতির যে প্রচার করিয়াছিলেন তাহারই কোঁরে আজও তুর্কী স্বাধীন হইয়া প্রগতির পথে চলিয়াছে। সে কথা মুসলমান জনসাধারণ জানে না বা জানিতে চাহে না। তাহাকে শুনান হইতেছে মুহম্মদ বিন কাশিমের কাহিনী এবং তাহাও আশেব অদলবদল করিয়া আরব্য উপন্যাসের মুখরোচক কাহিনীর মত করিয়া। ইহার

প্রতিকার কি? সম্পূর্ণ প্রতিকার কংগ্রেসের হাতে নাই সে কথা ঠিক। কিন্তু যে ভাবে এখন সমস্ত ব্যাপারটা চলিতেছে তাহাতে কংগ্রেসের দাষ্টিত্ব ও কতব্য দুইই রহিয়াছে। লীগ সম্পর্কে কংগ্রেস অতীতে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার ইংরেজী নাম “Policy of drift,” বাংলায় তাহাকে শুধু “না চিলা” দেওয়া বলা চলে না, তাহার সঙ্গে “হাল ছেড়ে দেওয়া” বলা উচিত। বাংলায় ইহার বিষময় ফল ফলিয়াছে, সিন্ধু প্রদেশে কি ঘটতেছে তাহাও দ্রষ্টব্য, পঞ্জাব এখনও সম্পূর্ণ ডুবে নাই তাহার কারণ শিখ সম্প্রদায়ের দৃঢ় সচেতন ভাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আবদুল গফফর খান তাহার ব্যক্তিত্বের জোরে পাঠান জাতির সমুখে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শ ধরিয়া রাখায় এখনও কংগ্রেসে প্রাণ রহিয়াছে। তবে কংগ্রেস সচেষ্ট না থাকিলে তাহাও যাইবে, কেননা বিপক্ষ বিদেশীর সহায়তায় কংগ্রেসের বাঁধে ভাঙন ঘরাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, এবং এসবই ঘটনাছে ও ঘটতেছে কংগ্রেসের দৌর্বল্য ও অবহেলার ফলে। এবং যাহার দিকে চাহিয়া কংগ্রেস এই অবহেলা করিয়াছে সেই দলই ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছে যে কংগ্রেস তাহাদের উপর অবিচার করিয়াছে, করিতেছে ও ভবিষ্যতে করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। একেই বলে “মার জয়ে কর্ত্তি চুরি সেই বলে চোর”।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কংগ্রেসের আদর্শ। আদর্শ কখনও পক্ষপাতহীন হওয়া উচিত নহে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। চল্লিশ বৎসরের দমন, দলন, বৈরাচার, লুণ্ঠন ও বিচার-বৈষম্যের ফলে বাঙালী হিন্দু যে আজ হতসর্ধ, আশীন ও পদচ্যুত এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায়হীন হইয়া পথে দাঁড়াইতে বসিয়াছে সে ব্যবস্থা ইংরেজ কোন্ দলের সাহায্যে করিয়াছে? কংগ্রেস সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধরৎ হউক বলিয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে কেন? যে লোক বা-যে দল প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের কুটিল চক্রান্তের সাহায্য লইয়া নিজের লাগসা এবং হিংসা-প্ররক্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত এরূপ নীচ ও ঘৃণ্য কাজ করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদের স্পষ্টভাষায় অভিযুক্ত করিতে বা নিন্দাবাদ করিতে কংগ্রেসের গলায় কাঁটা লাগে কেন? বিগত যুদ্ধের আরম্ভ হইতে বিগত বৎসরের শেষ পর্যন্ত—বিশেষতঃ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের পর হইতে—লীগদলের লোকে ব্রিটিশ অধিকারীবর্গের অহুগ্রহ, অহুকম্পা ও পক্ষপাতিত্বের সাহায্যে সারা ভারতবর্ষে যে অনাচার, বহুশুলে অত্যাচার এবং সমস্ত দেশব্যাপী নীতি বিকারের স্রোত বহাইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট নিন্দাবাদ এবং সোজাভাবে দোষী নির্দেশ করা হয় নাই কেন? এতদিন শুনিয়া আসিতেছি এরূপ অহুযোগ-ঐভিযোগের ফলে “একতা” নষ্ট হইতে পারে, স্তুরাৎ হিন্দুকে সকল কিছু সহ করিয়া যাইতে হইবে। একেই খাতিরে কংগ্রেসের নেতৃ-

বর্গ একরূপ থাক্য বোধ করিয়াছেন আজ প্রায় বিশ বৎসর, ফলে কিন্তু অনৈক্যই দাঁড়াইতেছে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া। অন্ততঃ পক্ষে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাই দেখায়, নেতৃবর্গ দ্বিবা দৃষ্টিতে কি দেখেন আমরা জানি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের এই আদর্শচ্যুতির ফলে ভাসিয়া গিয়াছে অধিকাংশ মুসলমান-প্রধান প্রদেশে, এখন সে সব অঞ্চলে পূর্ণ পাকিস্তান স্থাপনের ব্যবস্থা চলিতেছে যাহাতে সে সকল প্রদেশে কংগ্রেস যাত্রাবরের প্রদর্শনীর বস্তুবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়।

কংগ্রেসকে তাহার কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। যদি কংগ্রেসের আদর্শকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয় তবে মিথ্যার সহিত আদানপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে। নিজের দল, নিজের পক্ষকে কেবল ত্যাগের ও বলিদানের উপদেশ দিয়া অনাচার ও অত্যাচারের পরোক্ষ সমর্থন করিলে যাহা হয় তাহা তো দেখাই গিয়াছে। এখন কংগ্রেসকে হয় তাহার স্বপক্ষ রক্ষার জন্য সংগ্রামকামী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে নয় আসন ছাড়িয়া বসে যাইতে হইবে। হাল ছাড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া চলিবার সময় আর নাই, কেননা স্রাবুবি আসন্নপ্রায়। পঞ্জাবে কংগ্রেস শক্তিশূন্য, বাংলায় নেতৃবর্গের কর্মতৎপরতার অভাবে কংগ্রেস ক্লীবত্ব প্রাপ্ত, সিন্ধুদেশেও প্রায় তথৈবচ, আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ লীগের প্রাসের মধ্যে যায় কি না যায়, এইরূপ তো অবস্থা, ব্যবস্থা আর হইবে কবে?

বাংলাদেশ ও পঞ্জাবের সমতা এক না হইলেও সমতা-পূরণের পথ একই। দুই প্রদেশেই বিভাগ ভিন্ন গতান্তর নাই। যদি অন্য উপায় কিছু থাকে তবে তাহার নির্দেশ অনেক পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল অথচ সরূপ কোন কথাই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি বলেন নাই। এখন এই দুই প্রদেশে কংগ্রেস-বাদী ও জাতীয়তাবাদীদিগের অস্তিত্ব রক্ষার ইচ্ছা যদি কংগ্রেসের থাকে তবে এরূপ বিভাগের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, সহিলে কংগ্রেস ইহাদিগকে লীগের অনলে নিক্ষেপ করুন।

বাঙালী জাতির ক্রৈব্যের লক্ষণ

অজ্ঞান অত্যাচার নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করা, উহার প্রতিবিধানে অগ্রসর না হওয়া এমন কি প্রতিবাদ পর্যন্ত না করা বাঙালীর স্বভাব হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় ম্যাকডোনাল্ড-বার্টোরার-পুষ্ট ভারতশাসন আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই তাহার এই দুর্দশা আরম্ভ হইয়াছে। চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার প্রবর্তনের পর বাঙালী হিন্দু শাসনযন্ত্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতাপূর্ণ পদগুলি হইতে একে একে অপসারিত হইয়াছে। কেরাণীগিরিতে বাঙালী হিন্দু এখনও আছে বটে, কিং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা, বিভিন্ন বিভাগীয় ডিরেক্টর, শিক্ষাবিভাগে স্কুল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহাদের প্রবেশাধিকার এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াই আসিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্দু বৃকের

রক্ত দিয়াছে, সর্বস্ব দান করিয়াছে, তাহারই সাধনার ও ত্যাগ-স্বীকারের ফলে স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন তাহাকেই স্থান গ্রহণ করিতে হইতেছে সকলের পিছনে। প্রমত্তি-বিরোধী, স্বাধীনতা-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নিছক মাথাগুন্ডিত্তিতে সংখ্যাধিক্যের দ্বারে আসিয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দু বৃকের রক্তে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেছে এবং এক শ্রেণীর ভাবেদার হিন্দু সহায়তার উহা জাতীয়তাবাদী বাঙালীর ধ্বংসসাধনে প্রয়োগ করিতেছে। এক মুষ্টি অন্ন, একখণ্ড বস্ত্র, এক কোঁচা তৈল, এক টুকরা কয়লা প্রভৃতি জীবনযাত্রার অপরিহার্য জিনিষগুলির জন্য বাঙালী আজ গবর্নেন্ট অর্থাৎ মুসলিম লীগের উপর একান্ত অসহায়ভাবে নির্ভরশীল। ঘটায় পর ঘটী জলবৃষ্টিতে মৌজে দোকানের সম্মুখে লাইন বাধিয়া দাঁড়াইয়া সে নীরবে মনুষ্যত্বের চরম ও পরম লাঞ্ছনা সহ্য করে। তারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা রেশনের দোকানদারও এই মেঘপালকে বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহা-দিগকে অথবা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে। দণ্ডায়মান প্রতীক্ষমান লোকেরা সবই দেখে সবই বুকে, কিন্তু প্রতিবাদের সাহস পায় না, কারণ এই সব লোকেরই মজির উপর আজ তাহার জীবনমরণ নির্ভরশীল।

এই অসহায় অবস্থা মানুষকে ক্লীবে পরিণত করিতে বাধ্য। মানুষ যখন অজ্ঞান সহ্য করিতে আরম্ভ করে, অজ্ঞান-কারীর নিকট হইতে ঐকটা কোন সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহারই তোষামোদে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটায়। মানুষ নিজেকে যখন একান্ত অসহায় বলিয়া বোধ করে, জাতির উপর যখন সে শ্রদ্ধা হারাইয়া বসে, নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর যখন তার কোন বিশ্বাস থাকে না, তখনই সে কল্পনা করে সবল প্রকৃতির অপর কেহ আসিয়া আমাকে রক্ষা করুক। বাংলার এই মনোভাবই কিছুদিন যাবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিহারী এবং শিখ প্রভৃতি আমাদের বাঁচাইবে ইহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। নোয়াখালীর ঘটনার পর দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকা লিখিয়া ছিলেন যে অতঃপর বাঙালী হিন্দুরা নোয়াখালী জেলার বিহারী বসাইবেন এবং শিখ-গুরুদ্বার স্থাপন করিবেন এবং তারপর দেখিয়া লইবেন কে বাঙালীর গায়ে হাত দেয়। ইহাই আজ-কালকার বাঙালী হিন্দুর বোধ হয় অধিকাংশেরই মনোভাব। ১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতায় ভবানীপুরের একটি ঘটনার ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় ক্রৈব্যের নিদর্শন হিসাবে ঘটনাটির উপর আমরা অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। উহা এইরূপ :—এ দিন অপরাহ্ন প্রায় ছয় ঘটিকার সময় প্রকাশ দিবালোকে রসা রোডের উপর বাসের কণাষ্টর শ্রেণীর এক পাঞ্জাবী ঐকটি বাঙালী তরুণীর আঁচল ধরিয়া টানে। তরুণীটি প্রতিবাদ করিলে সে তাহাকে আরও অপমান করিতে

উদ্যত হয়। ভবানীপুরের এই অঞ্চল জনবহুল, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক জমিয়া যায়। কয়েক মুহূর্তে র মধ্যে প্রায় তিন শত লোক দাঁড়াইয়া পড়ে কিন্তু “বাঙালীর পরিভ্রাতা”-পুস্তকের কবল হইতে তরুণীটিকে রক্ষা করিবার জন্ত কেহ অগ্রসর হয় না। একটি শীর্ণদেহ বাঙালী ভ্রমলোক সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে পাঞ্জাবী গুণ্ডাটার হাতে তিনি ভয়ানকভাবে প্রহৃত হন। তখনও তিন শতাধিক লোকের জনতা সেখানে দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে এক জন সাহস সঞ্চয় করিয়া পুলিশে খবর দেয়। ঘটনাস্থলও থানার অতি নিকটে। পুলিশ আসিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং লোকটাকে গ্রেপ্তার করে।

বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলন

বাঙালীর এই ক্লৈব্যের জন্ত প্রধানতঃ তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা দায়ী ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সর্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করা, প্রতি পদক্ষেপে অপমান ও লাঞ্ছনা মুখ বুজিয়া সহ করা, নিজেকে ক্ষুদ্র এবং অসহায় মনে করা মাহুষকে অধঃপাতের কোন অতলে টানিয়া নামাইতে পারে উপরোক্ত ঘটনাটি তাহারই নিদর্শন। ইহার আশু প্রতিকারের উপায় বাঙালী তরুণ-তরুণীদের মুষ্টিযুদ্ধ, জুজুং প্রভৃতি শারীর বিভ্রাম পারদর্শী করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে। দেহে শক্তি এবং আত্মত্যাগীকে ঘায়েল করিবার কৌশল জানা থাকিলে হয়ত সকলেই একপ নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতে পারিবে না, সক্রিয় প্রতিরোধের জন্ত অগ্রসর হইয়া আসিবে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোষ্টেল-ইনস্পেক্টরের উদ্যোগে প্রত্যেক ছাত্রী-নিবাসের ছাত্রীদের ব্যায়াম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, ছোরা খেলাও সেখানে হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যায়াম-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ছাত্রী-নিবাসে এই বন্দোবস্ত সম্বোধিত এবং উপযোগী হইয়াছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু ছাত্রাবাসগুলিতেও অবিলম্বে মুষ্টিযুদ্ধ ও জুজুং শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কবিতা লেখা ও সিনেমা দেখায় বাঙালী তরুণেরা সকলকে হার মানাইয়াছে, এবার তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বলের পরিচয় দানের দিন আসিয়াছে।

এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় বাঙালী হিন্দুর নিজস্ব স্বতন্ত্র গবর্নেন্ট গঠন। মুসলীম লীগের উপর বাঙালী হিন্দুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা দূর করিতে না পারিলে বাঙালীর ক্রীবৎ ঘৃণিবে না এবং এই নির্ভর-শীলতা দূর করিবার একমাত্র উপায় তাহার নিজস্ব গবর্নেন্ট গঠন। ইহারই জন্ত আমরা বঙ্গ-বিভাগের একান্ত পক্ষপাতী। বাংলার নেতৃবৃন্দ প্রতিকারের আশু এবং স্থায়ী উত্তর পন্থা সম্বন্ধেই সমান উদাসীন। এখনও তাঁহারা ভাবপ্রবাহে গা ভাসাইয়া বাঙালী জাতির ধ্বংস নির্বিকার চিন্তে প্রত্যাঙ্ক

কারিতেছেন। বাংলা কংগ্রেস দল-বিশেষের দ্বারা কবলিত, তাঁহারা দলগত প্রাধান্য রক্ষার জন্তই এত ব্যস্ত যে জাতীয় সমস্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবার সময় তাঁহাদের নাই। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দল সম্পূর্ণ ক্ষীয়মান শক্তি বাড়াইবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবার জন্তই এত ব্যস্ত যে তাঁহাদেরও এ দিকে মন দেওয়ার সম্ভাবনা। কম্যু-নিষ্ট দলেই বোধ হয় সবচেয়ে কর্মভংগের লোক আছে, কিন্তু তাঁহারাও কংগ্রেসের ধ্বংস সাধনের “শুভ” কার্যে লিপ্ত আছেন বলিয়া জাতীয় সমস্তার প্রতি মন দেওয়ার সময় পাইতেছেন না। হিন্দু মহাসভা চেটু গণিতেছেন, কোন্ দিকে চলিলে সুবিধা হইবে তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। এই অবস্থাতেও মুষ্টিমেয় হইলেও কয়েকজন লোক বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলনে ত্রুতী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পার্টনার বেঙ্গল পার্টিশন লীগ নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। ত্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ উহার সম্পাদক। এই সমিতি বাংলার জেলায় জেলায় বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ আরম্ভ করেন। আসানসোল, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহের বার এগোসিয়েশন বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়াছেন। আরও বহু নেতৃস্থানীয় লোকেও তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন। ত্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চৌধুরী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। বেঙ্গল পার্টিশন লীগ পরে মেজর-জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি নাম গ্রহণ করে এবং পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন উহার সহিত মিলিত হয়। বর্তমানে মেজর-জেনারেলের নেতৃত্বে ইহার বিভিন্ন জেলায় কমিটি প্রভৃতি গঠনে অগ্রণী হইয়াছেন। মেদিনীপুর, বাঁকড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলনের সপক্ষে প্রচুর সাড়া মিলিতেছে। মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি স্বয়ং বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া জনমত গঠন করিতেছেন।

হিন্দু বাংলার আয়তন

হিন্দু বাংলার আয়তন কি হইতে পারে তাহা লইয়া নানা-বিধ আলোচনা চলিতেছে। একটি মতানুসারে হিন্দু বাংলা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার পশ্চিমাংশ, খুলনা, চক্ৰিশ পরগণা, কলিকাতা ও বর্ধমান বিভাগ লইয়া গঠিত হইতে পারে। আর এক মতানুসারে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসন এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা লইয়া উহা গঠন করা যাইতে পারে। বাংলার হিন্দুসংখ্যা শতকরা ৪৫, সুতরাং মোট ভূমি পরিমাণের এই অংশ হিন্দুরা দাবি করিতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে বঙ্গ-বিভাগ হইলে এই পরিমাণ ভূমি হিন্দুরা পায়। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা এই যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, বিহারের ভিতর দিয়া সেখানে যাইতে হইবে। তবে সাঁওতাল পরগণা, বলভুম প্রভৃতি বাংলার ফিরিয়া

আসিলে এই অল্পবিধা দূর হইতে পারিবে। এই ভাবে বাংলা ভাগ করিলে পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান সংখ্যা হইবে ৭৪ লক্ষ এবং পূর্ব বঙ্গে হিন্দু হইবে ১০১ লক্ষ। এই মতামতদ্বারা আয়তন, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিভাগ হইবে নিম্নোক্তরূপ :—

আয়তন

বর্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫ বর্গমাইল
প্রেসিডেন্সি "	১৬,৪০২ "
পশ্চিম বঙ্গ	৩০,৫৩৭ "
জলপাইগুড়ি	৩০৫০ "
দার্জিলিং	১১৯২ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বাংলা	৩৪,৭৭৯ "
নূতন পূর্ব বাংলা	৪২,৬৬৩ "

বাংলার মোট আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, উহার শতকরা ৪৫ ভাগ হয় ৩৪,৮৪৯ বর্গমাইল।

এই সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলির আয়তন তুলনা করা যাইতে পারে—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৪,২৬৩ বর্গমাইল
উড়িষ্যা	৩২,১৯৮ "
সিন্ধু	৪৮,১৩৬ "
আসাম	৬৪,৯৫১ "

জনসংখ্যা

বিভাগ	মুসলমান	অ-মুসলমান
বর্ধমান	১৪,২৯,৫০০	৮৮,৫৭,৮৬৯
প্রেসিডেন্সি	৫৭,১১,৩৫৪	৭১,০৫,৫৩৩
পশ্চিম বঙ্গ	৭১,৪০,৮৫৪	১৫৯,৬৭,৪০২
জলপাইগুড়ি	২,৫১,৪৬০	৮,৩৮,০৫৩
দার্জিলিং	৯,১২৫	৩,৬৭,২৪৪

নূতন পশ্চিম ও	
উত্তর বঙ্গ	৭৪,০১,৪৩৯
মোট—	২৪৫,৭০,১৩৮

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং ব্যতীত	
রাজসাহী বিভাগ	৭২,৬৭,৫৩২
ঢাকা	১,১৯,৪৪,১৭২
চট্টগ্রাম	৬৩,৯২,২৯১

নূতন পূর্ব বঙ্গ	২,৫৬,০৩,৯৯৫
মোট—	১,০১,৩২,১২২

নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুসলমান সংখ্যারূপাত ৩০%	
নূতন পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যারূপাত	২৮%

তপশীলী জনসংখ্যা

বর্ধমান বিভাগ	১৮,৩৫,০৩৮
প্রেসিডেন্সি	১৮,৯৪,৮৯৭

নূতন পশ্চিম বঙ্গ	৩৭,২৯,৯৩৫
জলপাইগুড়ি	২৮,৯২২
দার্জিলিং	৩,২৫,৫০৪
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	৪০,৮৪,৩৬১
নূতন পূর্ববঙ্গ	৩২,৯৪,৬০৯
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হাজার-করা ৫৫৩ জন তপশীলী বাস করিবে, পূর্ববঙ্গে থাকিবে ৪৪৭ জন।	

খাদ্যসত্তার

এইরূপে নবগঠিত প্রদেশদ্বয় খাদ্যসম্বন্ধে নিজের উপর কি ভাবে নির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহা ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট হইতে দেখানো যায়। যান উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁহাদের সংগ্রহীত তথ্য এই প্রকার :

বর্ধমান বিভাগ	৮৯,৭৩২,০০০ মণ
প্রেসিডেন্সি "	৮৯,৭৯৩,০০০ "
জলপাইগুড়ি	১৬,০৮৫,০০০ "
দার্জিলিং	৯৬৫,০০০ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	১,৯৬,৫৭৫,০০০ "
নূতন পূর্ববঙ্গ	২,৮৫,৪৫৭,০০০ "
গড়পড়তা বার্ষিক জন প্রতি ভাত খাওয়ার পরিমাণ—	
পশ্চিম বঙ্গ	৮°০২ মণ
পূর্ববঙ্গ	৮°০০ "

• খনিজ দ্রব্য

সমস্ত কয়লার খনি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত।

শিল্প

চটকল, ইম্পাত ও লোহার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। রেলের কারখানার মধ্যে পূর্ববঙ্গে পাহাড়তলীতে একটি আছে, অপরগুলি সব পশ্চিম বঙ্গে। ৩০টি কাপড়ের কলের মধ্যে ২৭টি পশ্চিমবঙ্গে।

রাজস্ব

১। জমিদারস্ব—

জমিদারী প্রথা হয়ত শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। অতরাং এ ক্ষেত্রে জমিদারের রাজস্ব হিসাব না করিয়া প্রজা কর্তৃক জমিদারকে দেয় রাজস্ব হিসাব ধরা হইল। জমিদারী উঠিয়া গেলে গবর্নেন্ট এই টাকা প্রকার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২,৬১,৪৭,০০০ টাকা
বর্ধমান	২,৫৮,৭৯,০০০ "
জলপাইগুড়ি	১১,৭৯,০০০ "
দার্জিলিং	৪,১৬,০০০ "
নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ	৫,৩৬,২১,০০০ "
নূতন পূর্ববঙ্গ	৫,৯৫,৮৩,০০০ "

বর্তমানে জমিদারদের নিকট হইতে বাজনা আদায় হয় :

নূতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে

১,৬৯,৩৩,৫১৫ টাকা

নূতন পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে ১,৫৫,৯৫,০৬১

২। পাটিলুঙ্গ—পাটিলুঙ্গের মোট পরিমাণের শতকরা ৯৫ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে।

৩। আয়কর—আয়করের মোট পরিমাণের শতকরা ৮৫ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে।

৪। কৃষি আয়কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি কোন এলাকায় কত আদায় হয় তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে এই প্রকার করগুলির শতকরা ৮০ ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্গে ও শতকরা ২০ ভাগ পূর্ববঙ্গ হইতে আসে।

৫। আমদানী, রপ্তানী শুল্কের শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় হয় কলিকাতায় এবং শতকরা মাত্র ৭ ভাগ চট্টগ্রামে।

৬। লবণ-করের পরিমাণ ভাগ করিলেও দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে উহার শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় হয় এবং মাত্র ৭ ভাগ আসে পূর্ববঙ্গ হইতে।

পৃথক নির্বাচন ও শান্তিরক্ষা

পৃথক নির্বাচন-প্রথা যে শান্তিরক্ষার কত বড় প্রতিবন্ধক কলিকাতার দাঙ্গার সময় হইতে তাহা বিশেষভাবে ধরা পড়িতেছে। বাংলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মুসলমান-দের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আইন ভঙ্গ ও দাঙ্গা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে শান্তি রক্ষার জন্ত যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন সব সময় সম্ভব হয় না ইহা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মন্ত্রীরা যাহাদের ভোটে নির্বাচিত, যাহারা তাহাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিয়াছে, ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধী দলের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের তাহার অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে ইহাদেরই শরণাপন্ন তাহাদের হইতে হইবে। এই অমুবিধা বাংলাদেশেই অন্ততঃ উগ্রভাবে দেখা দিয়াছে। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তিত থাকিলে এরূপ ঘটত না, জনসাধারণের ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্ত মন্ত্রীমণ্ডলী কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিতেন না এইজন্য যে এই কার্য সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া গণ-স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হইত এবং এই কারণে অধিকাংশ ভোটদায়ের সম্মতি লাভ করিতে পারিত। পৃথক নির্বাচন না থাকিলে ধনপ্রাণ ও নারীর সম্মান রক্ষার ছায় নাগরিক জীবনের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে সাম্প্রদায়িক রেযারেরি কণাও উঠিত না।

কলিকাতার দাঙ্গার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা লইয়া যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পার্ক স্ট্রীট থানায় আনীত সাত জন অভিযুক্ত আসামীকে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী আসিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক শ্রেণীর লোককে এই ভাবে আরও অনেক থানায় অত্যাচার ভাবে মুক্তি বা জামীন দেওয়া হইয়াছে, বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারই করা হয় নাই এরূপ বহুসংখ্যক অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদিগের ছুফাংয়ের কথা জানিয়াও গবর্নমেন্টের পরিচালক মন্ত্রীরা গুণ্ডা-শ্রেণীর লোককে পর্যন্ত শান্তি দানে রুগ্নিত হন এই কারণে যে ভোটের এবং ভোট গ্রহণ কালে সাহায্যের জন্ত তাহারা ইহা-দেহই উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এই বিসদৃশ অবস্থা আরও ভয়াবহ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ৯ই ফেব্রুয়ারীর বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সভায়। এই সভায় অনেক সদস্য প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীকে চাপিয়া ধরেন এই বলিয়া যে, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় মুসলমান-দের উপর পুলিশের অত্যাচার চলিতেছে এবং প্রধান মন্ত্রী তাহা কেন নিবারণ করিতে পারেন নাই। ইহারা দাবি করেন যে, জেলার সমস্ত হিন্দু পুলিশ কর্মচারীকে বদলী করা হউক। হটগোলের মধ্যে অনেক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ সুরাবর্দী যে স্বাবব দেন তাহাতে নির্বাচকমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইবার ভয় স্পষ্ট। তিনি বলেন যে, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা তিন হাজার নহে, ৮৫০ এবং জানান যে নোয়াখালীর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বদলী করা হইয়াছে ও অনেক সাব-ইনস্পেক্টরকে সদপেণ্ড করা হইয়াছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যাহা ঘটয়াছে তাহার তুলনায় ৮৫০ জন গুণ্ডা গ্রেপ্তার অতি সামান্য ব্যাপার। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মিঃ আব্দুল্লা, তাহার পক্ষপাতিত্বের খ্যাতি সুবিদিত। ইনিই যদি ৮৫০ জনকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন তবে নিরপেক্ষ লোকের হাতে কত লোক গ্রেপ্তার হইত তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তথাপি দলের লোকের চাপে বাধ্য হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে ইহার বদলীর আদেশ দিয়া নোয়াখালীতে আর এক জন মুসলমান পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাঠাইতে হইয়াছে। বাংলায় যৌথ নির্বাচক-মণ্ডলী থাকিলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এরূপ কৈফিয়ত কেহ দাবি করিতেও পারিত না। তিনিও ভ্রাম্য বিচার করিতে সাহস পাইতেন না এই ভরসায় যে তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বুদ্ধিমান লোকেরা ইহার জন্য তাহাকেই সমর্থন করিবেন। গুণ্ডা তখন গুণ্ডা বলিয়াই পরিচিত হইত, তাহার সাম্প্রদায়িক ছাপ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পক্ষপাতিত্বের দাবি উঠিতেই পারিত না। কলিকাতার দাঙ্গা হইতে সুরু করিয়া লীগ কাউন্সিলের সভা পর্যন্ত গবর্নমেন্টের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের এবং অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচারের যে স্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে পৃথক নির্বাচন বজায় থাকিতে তাহা দূর হইবার

নহে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যেরা ব্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করিলে তাঁহাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে শাসনক্ষমতা আসিলে উহা এক সম্প্রদায়ের স্বার্থে এবং প্রয়োজন হইলেই অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার অবসর ঘটে। বাংলাদেশে তাহাই ঘটতেছে এবং ইহার ফলে বাঙালী হিন্দু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া এমন একটা অসহায় অবস্থায় আসিয়া টাড়াইয়াছে যাহা তাহাকে জাতীয় ক্রৈব্যের স্তরে আনিয়া ফেলিতেছে।

বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল

বর্গা জমির নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা-সরকার একটি বিল আনিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যান্য বিলের ন্যায় এই বিলটিরও মূলে কোন দূরদৃষ্টি নাই, আছে শুধু একটি আন্তরিক সমস্যা যেন- তেন-প্রকারে এড়াইবার মনোভাব। এই বিলটি সম্বন্ধে বহরমপুর হইতে মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার ‘যুগান্তরে’ পত্র লিখিয়া যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য বলিয়া আমরা মনে করি। সত্তার সাহেব প্রথমেই বলিতেছেন, “বিলের ধারাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা কেবল বর্গাদারদের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছে কিন্তু জমির মালিকগণের স্বার্থ ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আরো লক্ষ্য রাখা হয় নাই। বাজারের যুঁড়ি-মুড়কী, রসগোল্লা, ছানাবড়া প্রভৃতি সমস্তই খাজ, কিন্তু উহা কি একই দরে বিক্রয় হইবে? তাহা যদি না হয় তবে সকল স্থানে এবং সমস্ত জমিরই উৎপন্ন ফসলের বিভাগ একই রূপ হয় কোন্ যুক্তিতে? জমির মূল্য, খাজনা এবং বর্গাদারের পারিশ্রমিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎপন্ন ফসলের বিভাগ বণ্টন হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত নহে?”

বাংলার সব স্থানে মাধ্যমিক জমির পরিমাণ সমান নয়। কোথাও বা লোকের ভুলভাল জমি বেশী, কাজেই সেখানে বড় বড় জোতদার বিদ্যমান। জমির মূল্য কম, খাজনাও খুব কম। আবার কোন কোন স্থানে জমি কম, মূল্য বেশী, খাজনাও বেশী। কোথাও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় আবার কোন স্থানে কঠোর পরিশ্রমে সামান্য ফসল পাওয়া যায়। কোন স্থানে জমির মালিকেরা অবস্থাপন্ন, কোথাও বা মালিকেরা দরিদ্র ও অসহায় বলিয়াই জমি বর্গা দিতে বাধ্য হয়। সত্তার সাহেব পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিতেছেন, “এই অঞ্চলে লোকসংখ্যার অল্পপাতে জমির পরিমাণ খুব কম। বিধবা, অসহায়, অক্ষম এবং যাহাদের যৎসামান্য জমি আছে সাধারণতঃ তাহারা ই জমি বর্গা দিয়া থাকে। আর যাহারা বর্গাদার তাহাদের নিজের কিছু জমি থাকে, কেবলমাত্র বর্গা জমি লইয়া সাধারণতঃ কেহ চাষ-আবাদ করে না। এক জনের হয়ত পনের বিঘা জমি আছে,

উহা চাষ-আবাদের জন্য একখানি হাল ও দুইজন লোক অবশ্যই দরকার। সে আরও পাঁচ-সাত বিঘা জমি বর্গা লইয়া ঐ হালে এবং ঐ দুই জন লোকেই চাষ-আবাদ করিয়া লাভবান হয়। এই অঞ্চলে বর্গাদারগণ জমির শ্রেণী অনুসারে ২, ৩ বা ৪ অংশ পাইয়া থাকে। একই গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর এরূপ উৎকৃষ্ট ও নিরুৎকৃষ্ট জমি আছে যে উৎকৃষ্ট জমি ৬ অংশ বর্গা লইবার জন্য অনেকেরই, এমন কি অনেক অবস্থাপন্ন কৃষকও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু নিরুৎকৃষ্ট জমি ২ অংশ বা তাহার অধিক অংশও কেহ বর্গা লইতে চাহে না। বর্তমানে কোন কোন স্থানে ভাল জমির মূল্য প্রতি বিঘা হাজার টাকারও কিছু বেশী এবং খাজনা ৪৮ টাকা আবার সেই গ্রামেই ধারাপ জমির মূল্য ৬০৭০ টাকা ও খাজনা দশ-বারো আনা মাত্র। অতি অল্প পরিশ্রমে ভাল জমিতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায় এবং জল সেচন ও ফসলরক্ষার বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই উহার মূল্য ও খাজনা অত্যধিক। আর ধারাপ জমিতে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও ভাল শস্য হয় না বলিয়াই উহার মূল্য ও খাজনা কম। পরিশ্রমের তুলনায় ভাল জমি বর্গা লইয়া অর্ধাংশ ফসল পাইয়াও তাহার পরিশ্রমের মূল্য উঠে না বলিয়াই উহা লইতে আপত্তি করে।” বাংলা-সরকার বিলটিতে জমির তারতম্য অনুসারে মালিকের ও বর্গাদারের ভাগের কোন পার্থক্য করেন নাই, উভয় প্রকার জমির উৎপন্ন ফসলের অংশ একই প্রকার ধরিয়া দিয়াছেন।

বর্গাদারের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কেহই আপত্তি করিবে না, কিন্তু মূল্য-স্বরূপ জমির মালিক যে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে এবং উচ্চহারে খাজনা দিয়াছে সে দিকটাও কি বিবেচ্য নহে? এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অক্ষম, অসহায় ও দরিদ্র মালিককে বর্গাদারেরা আর গ্রাহ্য করিবে না। মালিক মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়া হুঁচকি হইবে, বর্গাদার সমস্ত জমিতে দুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া প্রবল হইবে। বড় জোতদারের পক্ষে আইন এড়ানো কঠিন হইবে না, তাহারা বর্গা দেওয়া বন্ধ করিয়া খাসে জমি চাষ করিতে পারিবে। দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের জন্য বীজ, সার, হাল প্রভৃতি দিতে হইলে তাহারা বর্গা দিতে চাহিবে না বরং জন খাটাইয়া নিজে চাষ করিয়া সমস্ত ফসলই নিজে রাখিতে পারিবে। ইহাতে দরিদ্র বর্গাদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অপর পক্ষে বিধবা অথবা দরিদ্র জোতদারেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন হাল, গরু, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ ফসল লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং উহারই মধ্য হইতে বর্তমান চড়া হারে খাজনা দিতে হইবে। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইবে। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে যাহারা কর্মী হিসাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই কারণে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই ইংরেজ

গবর্নেন্টে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিকে ধ্বংস করিবার জন্ত সর্বপ্রকার আয়োজন করিতেছেন। বর্গাদার বিলের মূল উদ্দেশ্যও এই।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কাজ

মাস্তেবের, দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হৃদয়হীন লোক কৃষি বিভাগের দ্বারা জাতীয় কল্যাণকর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে তাহার কি দশা ঘটে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বর্তমান কার্য-কলাপে তাহা বিশদভাবে দেখা যাইতেছে। মেদিনীপুরের যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটটি ঘূর্ণীবাত্যার সময় দুর্গতদের প্রতি অমানুষিক হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কৃষির উন্নতির নামে ইঁহাদের হাত দিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা অপচয় হইয়াছে। কৃষির উন্নতি কতটা হইতেছে তাহা যে কোন গ্রামে সন্ধান লইলেই জানা যাইবে। “ভারত” পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত পত্র হইতে উহার স্লামাঙ্ক একটি দৃষ্টান্ত মিলিবে। পত্রখানি এই :—

আজকাল দেশে কৃষির উন্নতির জন্ত সরকারী ব্যবস্থার কথা খুব চলিতেছে। বাংলাদেশে অস্তুতঃ ময়মনসিংহ জেলায় এই ব্যবস্থা কি রকম চলিতেছে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে কতকটা আন্দাজ করা যাইবে।

এক ভদ্রলোক এক বার তাঁহাদের অঞ্চলে চীনাবাদামের চাষ প্রচলন করিবার জন্ত স্থানীয় সরকারী কৃষি ফার্মে যান ভাল বীজের জন্ত। ফার্মের কর্মকর্তারা দিলেন তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট বীজ। কিন্তু বাজারে ঐ ফসল চলিল না, কারণ সরকারী সর্বোৎকৃষ্ট চীনাবাদাম বাজারের নিকৃষ্টতম বাদামের কাইতেও অধম।

গত দুই বৎসর সরকারী ফার্ম হইতে ধূহারাই কপি ইত্যাদি তরকারির বীজ আনিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন ফুলকপির বীজ হইতে বাঁধাকপির চারা বাহির হইয়াছে, যে চারাতে কার্তিক মাসে ফুলকপি হওয়ার কথা, তাহাতে ফুলকপি হইয়াছে মাঘ মাসে ইত্যাদি শুনা যায়, তরকারির গাছে মরশুমী ফুলও হইয়াছে।

এই জেলার কলমাকান্দা মোহনগঞ্জ অঞ্চলে ভাল সরিষা হয়। কৃষি বিভাগের জনৈক কর্মচারী যান সেই অঞ্চলে প্রচারকার্যে। তিনি সকল কৃষককে জানাইয়া দিলেন যে, সরকারের খোঁজে এক বিশেষ শ্রেণীর সরিষা আছে। উহা বুনিলে ফসলও ভাল হইবে, সরিষার গুণও ভাল পাওয়া যাইবে। সকলে তাঁহাকে ধরিল সেই বীজ আনাইয়া দিতে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেক দিন পরে বুনিবার সময় পার হইয়া গেলে খবর আসিল আরায়গঞ্জ শহরে কোন দোকানে ঐ সরিষা পাওয়া যায়।

কৃষকেরা যেন উহা আনাইয়া লয়। সোয়াই মাইল দূর নারায়ণগঞ্জ শহর হইতে সরিষা আনা ঐ সকল কৃষকের পক্ষে সম্ভবও ছিল না, আনিলেও কোন কাজ হইত না। বুনিবার সময় চলিয়া গিয়াছিল। আনা হইলেও ঐ বীজে সরিষা ফলিত কি গাড়া ফুল ফুটিত সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মশতবার্ষিকী

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মের এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথের নিকট প্রগতিশীল মুক্তিকাম ভারতবর্ষ বহুভাবে ঋণী। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী পালনের আয়োজন ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীও তাহাতে সাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সাধনাশ্রম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজে বিশেষ উপাসনা হয়। সিটি স্কুলে এবং ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে স্মৃতিসভা হয়।

ভারতীয় সমাজ-জীবনে পণ্ডিত শিবনাথের দান অনন্ত-সাধারণ। রাজা রামমোহনের চিন্তা ও ভাবধারা শিবনাথের জীবনে দীপ্ত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ধর্মবীর, চিন্তাবীর, কর্মবীর এবং সাহিত্যবীর এই মহাপ্রাণ দেশনায়কের পরিচয় স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নহে। এদেশে সজ্ঞবদ্ধ ছাত্র-আন্দোলনের প্রকৃত পথপ্রদর্শক তিনি। বিভিন্ন ছাত্র-সভায় ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া তিনি ছাত্রসমাজকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান অতুলনীয়। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির সহিত একত্রে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তাঁহার দেশপ্রেমে দীক্ষা গ্রহণের জন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি গ্রহণ করিতেন এবং জীবন দিয়া উহা পালন করিতেন : “(১) স্বায়ত্ত-শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া মনে করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গবর্নেন্টের আইন-কাহন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য ও নিরাশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গবর্নেন্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না। (২) আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহা অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।”

শিবনাথ ও তাঁহার সহকর্মী আনন্দমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল “অত্যাচারের উপর দাঁড়া, অসাম্যের

উপর সম্রাট রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাম্রাজ্যতন্ত্রের আয়োজন" করা। এই কল্পনা শিবনাথ-সম্পাদিত "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় ১৮০৩ শকাব্দের (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬ই ফাল্গুন প্রথম প্রকাশ পায়। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে ভারত-সরকার যখন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয় জনকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন তখন তাহার প্রতিবাদে কলিকাতায় যে জনদণ্ডার অগ্রদূত হন তাহার সভাপতিত্ব করিবার জন্ত তৎকালীন কোন দেশনেতাকে পাওয়া যায় নাই। শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঐ সভায় নেতৃত্ব করেন।

নারীজাতির প্রতি শিবনাথের অজ্ঞা ও সহানুভূতি অতি প্রগাঢ় ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার জন্ত অশেষ লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ করেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় তাঁহারই কীর্তি। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার দান অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত পুষ্পমালা, নির্ধাসিতের বিলাপ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ; মেঘবট, নয়নতারা, বিধবার ছেলে, যুগান্তর প্রভৃতি উপাদেয় উপন্যাস। তাঁহার রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃতির একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস। তাঁহার রচিত "ধর্মজীবন", "আত্মচরিত" ও প্রবন্ধাবলী বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিবনাথ শতবার্ষিকী কমিটির অগ্রদূত শেষ হইয়াছে, কিন্তু কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শিবনাথের অমূল্য গ্রন্থাবলীর কয়েকটি ভিন্ন অপরাংশ লিখিত হইয়া উঠিয়াছে। কমিটি এইগুলির পুনঃপ্রকাশে ত্রুটি হইলে শিবনাথের স্মৃতিরক্ষায় প্রকৃত সাহায্য করা হইবে।

ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বাংলার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের উৎসাহী গবেষক ও তত্ত্বাবস্থাস্থিৎ লেখক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখক হিসাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। ঢাকা শহরে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি উহার কিউরেটর রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও পর্যটনের ফলে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বহু মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রশাসন প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঢাকা মিউজিয়ামে উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মিউজিয়ামটির উন্নতিসাধনেই তিনি তাঁহার সমস্ত সময় ও শক্তি অতিবাহিত করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *Iconography of Buddhist and Brahmanical Scriptures in the Dacca Museum, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, এবং *Last Bhowal Copper Plate of Lakshman Deb of Bengal*. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বারুইঞা সম্রাজ্ঞী তাহার প্রবন্ধাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণা যোগলশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহের ইতিহাসের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে। ডাঃ ভট্টশালীর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই শিক্ষা ক্রটিপূর্ণ হইলে সমগ্র জাতির মেরুদণ্ড শক্তিহীন হয় এবং দুর্বল হইয়া পড়িয়া উঠে। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ক্রটিহীন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্ত চেষ্টা ও যত্নের অন্ত নাই। কিংবারগাটেন, মর্টেনসন, নাসারি স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আজও সে সব দেশে গবেষণা চলিতেছে এবং নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে। ভারতবর্ষের মনীষিবৃন্দও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাথমিক শিক্ষাদানপদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ওষাধী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং বনিয়াদী স্কুল স্থাপন আরম্ভ হয়। বনিয়াদী স্কুলের কার্য-পদ্ধতি দেখিয়া এখন বিশ্বাস করা সহজ হইতেছে যে এই প্রথাই বোধ হয় আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাঙ্গাঙ্গ উপযোগী। ইহার দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষালাভের সঙ্গে মেধাবৃদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ, স্বাবলম্বন এবং চরিত্রগঠনেরও সুযোগ এবং ক্ষেত্র আছে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে বনিয়াদি শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

বাংলাদেশে কি ঘটতেছে তাহা এবার দেখা দরকার। এখানেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে বনিয়াদি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকারের সাহায্য উহার লাভ করে নাই। বাংলা-সরকার এখন ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি কার্যে পরিণত করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতেছেন যাহার ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলি এক প্রকার সমগ্রভাবে মুসলিম লীগের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িতেছে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে অবস্থা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখানে বহু স্কুলে এখন মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করিতে হইতেছে। ধর্মশিক্ষা প্রাথমিক স্কুলে ১৯৪০ সাল হইতে অবশ্যপাঠ্য বিষয় করা হইয়াছে। উহাতে পরীক্ষা লওয়া হয় এবং বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক রাখা হয় নাই বলিয়া সেখানে মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ছেলেমেয়েরা হিন্দু ধর্ম শেখে। কি শেখে তাহা বুঝা কিছু কঠিন নয়। সমগ্র সময়টা বৃত্তিতে হইলে একটু আত্মপূর্বিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের উদ্দেশ্য ছিল বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দান। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া স্কুল বোর্ড স্থাপন করিয়া উহাদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। দার্জিলিং এবং মেদিনীপুর ভিন্ন অপর সকল জেলাতেই স্কুল বোর্ড গঠিত হইয়াছে। আপাততঃ প্রাথমিক শিক্ষা-কর বসাইয়া উহার দ্বারাই স্কুলগুলির ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা হইতেছে। বিনা বেতনে শিক্ষা-দানেরই চেষ্টা এখন চলিতেছে, শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আয়োজন এখনও হয় নাই। এই আইন শুধু গ্রাম্য এলাকায় প্রযোজ্য এবং সেখানেই উহা প্রয়োগ করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদ রাখা হইয়াছে, কারণ সেখানে উহার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে গেলে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর হিন্দু প্রধান জেলা, উহাও বাদ আছে।

স্কুল বোর্ডের একদল সদস্য নির্বাচিত হন ইউনিয়ন বোর্ডগুলির দ্বারা এবং আর এক দল গবর্নমেন্ট মনোনয়ন করেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির অধিকাংশই লীগের ঝাঁট, সেখান হইতে সদস্য নির্বাচনে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক কারণই প্রবল হয়, নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত লোক সাধারণতঃ চুকিতে পান না। সরকারী মনোনয়নের দ্বারাও এরূপ লোকই বোর্ডে আসিয়া থাকেন। বোর্ডে প্রথম আট বৎসরের জন্ম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন সভাপতি, তার পর হইতে সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্ব কালে প্রকৃত পক্ষে তাহার অনুমোদন সাপক্ষে ভাইস-প্রেসিডেন্ট কার্য পরিচালনা করেন। প্রথমে ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পরে প্রেসিডেন্ট এই দুইটি পদ জেলা বোর্ডের সভাপতিরাই সাধারণতঃ অধিকার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই স্থানীয় মুসলিম লীগেরও সভাপতি। সুতরাং স্কুল বোর্ডগুলিকে স্থানীয় জেলা বোর্ড অথবা মুসলিম লীগের প্রতিচ্ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগে একটা নিয়ম ছিল যে প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিচালনায় পরামর্শ দানের জন্ম একটি করিয়া স্থানীয় এডভাইসরি বোর্ড থাকিবে। ঐগুলি শিক্ষিত লোকদের লইয়া গঠিত হইত। এবার উহাও ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র কর্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছে স্কুল বোর্ডের হাতে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল বোর্ডগুলির সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব কায়ম করিবার জন্ম বাংলা-সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে একটি

কেন্দ্রীয় এডভাইসরি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা

প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের সরকারী নিয়ম এই যে প্রতি দুই বর্গ মাইলে একটি স্কুলের বেশী থাকিবে না। স্কুল বসাইবার সময় মুসলমান পাড়ার মধ্যে অথবা যথাসম্ভব উহা যেসিরা যাহাতে উহা স্থাপিত হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। ইহা লইয়া দুই বিভিন্ন দলে বিরোধও বাধে এবং শেষ পর্যন্ত উহা লইয়া উৎকোচের আদান-প্রদানও হয়। স্কুলসমূহের সাব-ইন্সপেক্টরই সাধারণতঃ স্কুলের স্থান নির্দেশ করেন এবং উহার দ্বারা তাহার উপরি-আয়ও কিছু কিছু হয় বলিয়া শুনা যায়। আজ পর্যন্ত কত জন সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে তাহা শিক্ষামন্ত্রী জানাইলে ভাল হয়। পূর্ববঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত হিন্দু স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থার আর একটি মারাত্মক বিধান এই যে, সরকারী সাহায্য ছাড়া ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও কোন প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইতে পারে না।

শিক্ষক নিয়োগেও এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকট। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে আধা-আধি বখরা। শিক্ষক নির্বাচনে স্থানীয় লীগ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে, কারণ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে লীগের উল্লাসিয়ারের কাজ করে। পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে বহু স্কুলে একটিও হিন্দু শিক্ষক নাই। ত্রিপুরা স্কুল বোর্ডে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করান হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি যে, যে এলাকায় মাইনরিটির অনুপাত শতকরা ২৫ জনের কম সেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায় হইতে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন না।

শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য গুরু ট্রেনিং স্কুল আছে। উহাতে এতদিন হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রবেশাধিকার ছিল। বর্তমানে তাহাও গিয়াছে। গুরু ট্রেনিং স্কুলের পাণ্টা হিসাবে শুধু মুসলমান শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য মোসল্লেম ট্রেনিং স্কুল বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাতে গুরু ট্রেনিং স্কুলে মুসলমানদের ভর্তির ব্যবস্থাও হইয়াছে। মোসল্লেম ট্রেনিং স্কুল শুধু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই স্থাপিত হয় নাই, ছগলী এবং ২৪ পরগণা জেলাসমূহেও উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালে শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসার বলিয়াছিলেন যে গুরু ট্রেনিং স্কুলগুলি যাহাতে শিক্ষাদান ও শিক্ষিত লোকের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য উহা-দিগকে স্থানীয় হাই স্কুলগুলির কাছে বসানো হউক। কিন্তু কার্যতঃ ঐগুলিকে এখন মাদ্রাসার কাছে কাছে বসানো হইতেছে।

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের ব্যবস্থাও চমৎকার। বঙ্গীয়

পাঠ্য পুস্তক কমিটি মনোনীত পাঠ্য পুস্তকসমূহের একটি তালিকা করিয়া দেন। এই তালিকা হইতে আবার নিজেদের অভিরিচি অনুযায়ী উপ-তালিকা প্রণয়নের ক্ষমতা জুল বোর্ডসমূহের আছে। তাঁহারা এই উপ-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় এমন ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন নিজেদের তাঁবেদার শ্রেণীর হিন্দু ভিন্ন আর কোন হিন্দুর পুস্তক পাঠ্য করা না হয়। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় প্রাথমিক স্কুলসমূহে যে সব পুস্তক পাঠ্য হইয়াছে তাহার তালিকা সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে একটিও হিন্দু লেখকের পুস্তক পাঠ্য করা হয় নাই। ইহার অপরিহার্য পরিণাম এই যে, বাঙালী ছেলেদের উচ্চ মিশ্রিত অপূর্ণ খিচুড়ি ভাষা শিক্ষাকাল হইতেই গলাধঃকরণ করিতে হইতেছে। ১৯৪০ সালে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-তালিকা পরিবর্তন করা হইয়াছে। এত দিন এই সব স্কুলে ধর্ম-শিক্ষা অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল না, উহাতে পরীক্ষাও লওয়া হইত না। এই বৎসর হইতে ধর্মশিক্ষা অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হয় এবং উহাতে অশাস্ত্র বিষয়ের ন্যায় পরীক্ষাও লওয়া হয়। মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দীনের আমলে এই কার্য করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিংয়ের অধ্যক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ত্রীযুক্ত অনাধনাথ বসু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই এই ব্যবস্থা করা হয়। মাইনরিটির অনুপাত শতকরা ২৫-এর কম হইলে সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষক স্কুলে থাকিতে পারিবে না এই নিয়ম অনুসারে পূর্ববঙ্গের বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নাই এবং সেই সব স্কুলে মোল্লাশ্রেণীর গোড়া মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ধর্ম শিক্ষার নামে হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা কি বস্তু শিক্ষা করিতেছে তাহা বলিয়া না দিলেও চলে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বড় একটা বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস বা হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রসমূহ পর্যন্ত সমান উদাসীন।

স্কুল পরিদর্শনেও লীগের প্রভাব সাহায্যে অব্যাহত থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জেলা ইনস্পেক্টর এবং তাঁহার অধীনে কয়েকজন করিয়া সাব-ইনস্পেক্টর থাকেন। ২৮ জন জেলা স্কুল ইনস্পেক্টরের মধ্যে ১৭ জন মুসলমান, ১১ জন হিন্দু। একজন মাত্র ছিলেন শিক্ষিত তপশীলী হিন্দু, ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষার জ্ঞা ছুটি লওয়ায় তপশীলী দরদী লীগ গবর্নেন্ট তাঁহার স্থলে একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছে। মুসলমানপ্রধান সমস্ত জেলায় স্কুল ইনস্পেক্টর মুসলমান, হিন্দুপ্রধান জেলা খুলনা, চব্বিশপরগণা, হাওড়া প্রভৃতিতে এবং কলিকাতাতে স্কুল ইনস্পেক্টর মুসলমান। এই পদের কোনটি খালি হইলে পাবলিক সার্ভিস কর্তৃক মনোনীত একটি তালিকা হইতে লোক বাছাই করিবার কথা, কিন্তু তাহা করিতে গেলে

কয়েকজন হিন্দু চুকিয়া পড়িতে পারে বলিয়া লীগ গবর্নেন্ট স্কুলপরিদর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হাই স্কুলের মুসলমান হেডমাষ্টারদের আনিয়া এই সব পদ পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাব-ইনস্পেক্টরদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত আরও বেশী। নোয়াখালী জেলায় ১২ জন সাব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে ১১ জনই মুসলমান, একজন মাত্র হিন্দু।

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে ইহা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ চিত্র মাত্র। বাংলাদেশ জুড়িয়া ১৯৪০ সাল হইতে এই ব্যাপার চলিতেছে, তথাপি নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আন্দোলন করাও আবশ্যক বোধ করেন না ইহাই পরম আশ্চর্য।

পরিকল্পনা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট

গত অক্টোবর মাসে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সব দিকের কথাই বিবেচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, একটি স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতির একটি আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আর্থিক নীতি বস্তুনিষ্ঠ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের স্থান দেখানো হইয়াছে। সর্বশেষে শিল্প-পরিচালনায় সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

স্থায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য-সংখ্যা উর্ধ্বপক্ষে পাঁচ ও ন্যূনপক্ষে তিনের মধ্যে স্থির করা হইয়াছে। এই কমিশনকে সাহায্য করিবার জ্ঞা ন্যূনপক্ষে পঁচিশ হইতে উত্তর তম ব্রিটিশ জনসদস্যের এক পরামর্শদাতা কমিটিও থাকিবে। এই পরামর্শদাতা কমিটিতে বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রতিনিধি থাকিবে ও বস্তির দিক হইতে থাকিবেন কৃষি, শিল্প, শ্রম, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ। বোর্ডের আরও ধারণা যে, কেন্দ্রের এই ধরনের সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা কমিটি প্রত্যেক প্রদেশে ও এমন কি প্রতি জেলাতেও গঠন করা উচিত। তাহা হইলে জেলা কমিটিগুলি কৃষি ও কুটীরশিল্পের উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিকে জাতীয় পরিকল্পনার দৃঢ় বনিয়াদে পরিণত করিতে পারিবে।

জাতীয় পরিকল্পনা-কমিটির কার্য-প্রণালী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় বিধান হইবে ইহার প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কাজ হইবে প্রয়োজনীয় খনিজ ও অশাস্ত্র প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় রাজস্ব বরাদ্দ করা। তৃতীয়তঃ, এই কমিটি শিল্পের মালিকানা সম্পর্কে সরকারী নীতিকে পরিচালনা করিবে। এ ছাড়া পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে মুদ্রা ও আমানত সমেত জাতীয় আর্থিক লেনদেনকে এই কমিটি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

বাস্তব প্রয়োগের ভিত্তিতে ভাবিতে গিয়া রিপোর্টে পরি-

কল্লনার ছই অংশ কৃষি ও শিল্পের পরিকল্পনাকে পৃথকভাবে ও সবিস্তারে দেখান হইয়াছে। খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষিকে ছই দিক হইতেই দেখা হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক—অর্থাৎ জাতীয় জীবনের মানের উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কৃষিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা যায় কৃষির বিপদ দ্বিবিধ মধ্যস্থত—মালিকানা ও কৃষিকার্গের উপাদান। পরিকল্পনায় কৃষিকে এই দুই বিপদের হাত হইতেই রক্ষা করার প্রয়োজন বলা হইয়াছে। কৃষির বিপদ ভূমিস্বত্ব আইনের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা, শিল্পের বিপদ যন্ত্র-সরবরাহের অসুবিধা। শিল্পের বেলায় সর্বপ্রথমেই খনিশিল্পে বিদেশী মালিকানার বিরোধিতা করা হইয়াছে।

শিল্পকে ছই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এক ভাগে আছে লৌহ, কয়লা, তৈল, ইম্পাত ও যানবাহন ইত্যাদি মৌলিক শিল্প। এইগুলিকে সরকারী মালিকানায় রাখিতে হইবে। এ ছাড়াও যে সব শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূলধন সহজে আসে না সেই সব শিল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে। এ ছাড়া সাধারণভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারের উৎসাহ থাকিবে। শিল্পপতিদের সুবিধার জন্ত পরিকল্পনা-কমিশন মাঝে মাঝে জগতের আর্থিক গতিপ্রকৃতির তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন।

এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইতে হইলে বহু পরিমাণে যন্ত্রকুশলী শ্রমিকের প্রয়োজন। বোর্ডের রিপোর্টে এই দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। যান্ত্রিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্ত একটি ক্ষুদ্রতর সাবকমিটি নিয়োগের কথা বলা হইয়াছে। এই সাবকমিটি বেডিন-পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করিয়া এক ব্যাপক পরিকল্পনার বিধান করিবে। এই কাজে সরকারের শ্রম ও শিক্ষা বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজনও উল্লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু এই রিপোর্টের গঠনমূলক সমালোচনা চাহিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বজন-স্বীকৃত। এমন কি কৃষি ও শিল্প সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রয়োগ-নীতিকেও আমরা ভারতীয় সমস্যার বিচারে যথার্থই মনে করি। কিন্তু এই কাজ সম্ভব করিতে হইলে পরিকল্পনা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে যে ধরনের সংগঠন হওয়া প্রয়োজন, জরাজীর্ণবশতঃ আমাদের সরকারের বর্তমানে সেই যোগ্যতা নাই। এই অভাব রিপোর্টেও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট ছবিও তুলিয়া ধরা হয় নাই। এখানে আমরা সোভিয়েট পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সোভিয়েটে প্রত্যেকটি প্রাথমিক পরিকল্পনা কমিটিতে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও এক জন সাংবাদিক, এক জন যন্ত্রকুশলী ও এক জন শ্রমিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অনেকটা এইজন্যই সোভিয়েট পরিকল্পনা এত তাড়াতাড়ি এত বেশী জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশে সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা বিবেচনা করিয়া আমরা জেলা কমিটি-গঠনে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ লাভজনক মনে করি।

দুর্নীতি-দূরীকরণ বিল

উৎকোচ ও দুর্নীতি দূরীকরণ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় একটি বিল পাস করা হইয়াছে। যুদ্ধের স্বযোগে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতি বিশেষভাবে বাড়িয়াছিল। যুদ্ধ আঁজ আর না থাকিলেও দুর্নীতির স্বযোগ-গুলি আরও কিছুকাল থাকিয়া যাইবে। এখনও সরকারী কণ্ট্রোল বিতরণ করা হইতেছে, উদ্ভূত সরকারী সমরোপকরণ বিক্রয়ও চলিতেছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জব্যাদির উপর আরও কিছুদিন কণ্ট্রোল বজায় রাখা আবশ্যক হইবে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহের জন্ত বহু সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সব কার্যের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার স্থান রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তার লাভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিল পাস করা হইয়াছে। বাংলাদেশের শাসনবিভাগের কার্য-কলাপ অনুসন্ধানের পর রোল্যাণ্ড কমিটি এ বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। রোল্যাণ্ড কমিটির রিপোর্টের পর বাংলা-সরকার রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় (জমি-জরীপ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর) দুর্নীতির কারণগুলি ও তাহা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করিতে নিয়োগ করেন। ৯৩ ধারার শাসন-আমলের শেষ দিকে তাঁহাকে এই কার্যের ভার দেওয়া হয় ও পরবর্তী লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে তিনি রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু ঐ রিপোর্ট গোপন রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ঐ রিপোর্টের এক কপি চাহেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাংলার শাসন-যন্ত্র কতখানি দুর্নীতিপরায়ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি নিবারণ আইনে ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৬১ ধারা ও ১৬৫ ধারা দুইটিকে পুলিশগ্রাহ্য অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই ভাবে দুর্নীতি দূরীকরণের পথে একটা বড় বাধা অপসারণ করা হইয়াছে। এই বিলে আরও বলা হইয়াছে যে যদি কোন সরকারী কর্মচারী বা তাহার পক্ষে অপর কোন লোক তাহার আয় বা সম্পত্তির বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক কারণ না দর্শাইতে পারে তবে বিচারক মনে করিতে পারেন যে ইহা অসচ্ছপারে গৃহীত সম্পত্তি এবং ঐ ব্যক্তি ফৌজদারী আইনে দোষী। বিলের এই ধারা বিলাতের ১৯০৬ সালের দুর্নীতি-দূরীকরণ আইনের অনুকরণে রচিত। এই বিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আমলাদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এই বিলের দুইটি ত্রুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রোল্যাণ্ড কমিটি ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধারাকে পরিবর্তন করিতে সুপারিশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কোনও দুর্নীতির মামলার তদন্তের সময় পুলিশের নিকট যে বিবৃতি দেওয়া হইবে তাহা যেন পরে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ ঘটনাস্থলে ধরা পড়িয়া আসামী যে বিবৃতি দিবে তাহা হইতে সত্য ঘটনা

প্রকাশ পাইবে। পরে ভাবিনা-চিন্তিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হয় তাহাতে সত্য গোপন করিবার যথেষ্ট সুযোগ আসামী পাইবে। বিলে এই সুপারিশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় ক্রটি এই যে কোজদারী আইনের ১৬২ ধারা, ১৬৫ ধারা বা ৫ ধারার অধীন পুলিশ হইতে প্রাপ্ত অপরাধ-বিষয়ের কোন মামলায় কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের সম্মতি পূর্বাহ্নে লইতে হইবে। এই ধারা বিলের আসল উদ্দেশ্যকেই মাটি করিয়া দিবে। বিশেষতঃ বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশে যেখানে এই আইনের বেশী প্রয়োজন, সেখানেই ইহার প্রয়োগ হইবে না। নির্দোষ কর্মচারীদিগকে অথবা হায়রানি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত একটি গোপনীয় প্রাথমিক বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটিই যথেষ্ট হইত।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধীয় সমস্তাগুলির সম্যক আলোচনা ও তাহার সুবাহার জন্ত ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলন স্থির করিবে যে ইস্পাত ও লৌহার কারখানাগুলিকে যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইবার জন্ত সংরক্ষণ-স্কুল (Protection) বসাইবার ব্যবস্থা হইবে কি না এবং হইলে উহা কি প্রকার হইবে।

কিন্তু যে কোন প্রকারের শিল্প-ব্যবস্থাই হোক না কেন, তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পূর্বে কতকগুলি কথা বিবেচনা করিবার আছে।

আমরা যখনই কোন প্রতিষ্ঠানের রক্ষা-ব্যবস্থা করি বা তাহার অনুমোদন করি তখন বিশেষ করিয়া সেই শিল্পটি সমগ্র শিল্পজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও তাহার সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করি। সমগ্র শিল্পজগৎ ও অর্থনীতির সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রায়শঃই ভাবিয়া দেখি না যে এই ব্যবস্থা করিলে দেশের শিল্প ও অর্থের দিক দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। বর্তমান ট্যারিফ-বোর্ডও প্রত্যেক শিল্প-বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখিয়া ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে তাহা আশা করা যায় না। কারণ তাহা হইলে এই বোর্ডকে ইস্পাত ও লৌহের কিছা বস্ত্রশিল্প ছাড়াও অজ্ঞাত বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইবে।

কিন্তু কাল কমিটির রিপোর্টে যথোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার কথা অনুমোদন করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে ট্যারিফ-বোর্ডগুলির মধ্যস্থতায় দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ও কল-কারখানার উন্নতিসাধন করা হইবে। বোর্ডগুলি কেবলমাত্র কোন কোন বিশেষ শিল্প-ব্যবস্থার সুবিধা করিয়া দিবে তাহা নহে—দেশের সর্বাঙ্গীণভাবে সাহায্যে শিল্পগত ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে তাহাই করিবে। রক্ষা-ব্যবস্থার জন্ত প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে হইবে যে, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বোক্ত সুবিধা দেওয়া

হইবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি আছে কিনা এবং দেশের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানজাত জিনিষপত্রগুলির বিক্রয় ও প্রসারের জন্ত উপযুক্ত বাজার আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে সেই বিশেষ প্রতিষ্ঠান রক্ষা-ব্যবস্থা পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিতে পারিবার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং তৃতীয়তঃ, একথাও চিন্তা করিয়া দেখিবার যোগ্য যে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশেষে সারা জগতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়গুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা। এখানে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সারা পৃথিবীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির সহিত প্রতিযোগিতার সময় রক্ষা-ব্যবস্থার কথা অবান্তর।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা সম্বন্ধে অবশ্য এই সমস্ত বিষয় আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এই প্রাথমিক স্তরগুলি ইহার অতিক্রম করিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত কারখানাই প্রথম ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষা-ব্যবস্থার জন্ত আবেদন জানাইয়াছিল। এতকাল ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা মূলতঃ রক্ষণনীতির জন্তই। এখন এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান জগতের সমজাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহাই ভাবিবার কথা। দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। *জীব এ কথা সহজেই বলা চলে যে এই ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি-স্বরূপ। যুদ্ধের সময় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যেই যুদ্ধের বহু অপরিহার্য দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। দেশের সামগ্রিক ও বেসামরিক প্রয়োজনের জন্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা জারি করিতে হইয়াছিল।

এই শিল্প কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বাৎসরিক উৎপাদন-পরিমাণের কিছুকালের হিসাবেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ১৯১৬-১৭ সালের ১৩৯,০০০ টন পরিমাণ উৎপাদন বর্ধিত হইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯৭০০০ টন হইয়া উঠিয়াছে। ইস্পাতের উৎপাদন পরিমাণ ১৯১৬-১৭ সালের ৯৮,০০০ টন হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭২৬,০০০ টনে উঠিয়াছে। লৌহপিণ্ডের উৎপাদন উনিশ শতকের প্রথম দিকে ছিল ৩৫০০০ টন, কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই উৎপাদন ১৫৭৬০০০ টনে উঠিয়াছে। এই পরিমাণের একটি বিরাট অংশ সমুদ্র পারে চালান গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে রপ্তানীর পরিমাণ ঢের কমিয়া গিয়াছে। শুধু কমিয়াছে বলিলে ভুল হইবে বরং এই রপ্তানী এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যুদ্ধের জন্ত মাল সরবরাহের অসুবিধা এবং

বাহিরে অজ্ঞাত দেশে মাল তৈয়ারী হওয়ার কারণে ভারতবর্ষের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। কেবল দুই একটি বিশেষ ধরনের জিনিষপত্র ছাড়া রপ্তানীর কথা আর ধতব্যের মধ্যে নহে।

যে প্রকার উন্নতির কথা বলা হইল তাহা খাপছাড়া সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও ঘটয়াছে। ১৯২৭ সালে “ট্যারিফ বোর্ড” যে শুষ্ক অনুমোদন করিয়াছিল তাহাতে অবস্থা-বশেষে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। উহা এই ছিল যে ব্রিটেন ও অজ্ঞাত দেশ হইতে আমদানী লোহার উপর ভিন্ন রূপ শুষ্ক থাকিবে। তা ছাড়া, অটোয়া চুক্তি (Ottwa Agreement 1932) অনুসারে অ-ব্রিটিশ দেশগুলি হইতে আমদানী করা গ্যালভানাইজড টিনের পাতের উপর আরোপিত কর টনপ্রতি ৮০ টাকা ধার্য হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-টিনের সেই সমপরিমাণ ওজনের দ্রব্যের উপর ৫০ টাকা কর ধার্য করা হইয়াছিল এবং ভারতীয় লোহ বা ইস্পাতের দ্বারা প্রস্তুত রূপ টিনের উপর কর ৩০ হিসাবে ধার্য করা হইত। ইহাতে ভারত হইতে কাঁচা মাল রপ্তানী ও ব্রিটেন হইতে তৈরী মাল আমদানীর ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখা দিল। তাহার ফলে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তবে এখন আমরা উন্নতির এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে এখন ভারতবর্ষ আর কোন প্রকারের কলকাঠি নাড়া সহ্য করিবে না। কারণ তাহাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই সময়ে এমন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা উচিত যাহাতে সরকারী পরিদর্শনের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রসর হইতে পারে। দেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অনেক কিছুই এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে লোহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ-শুল্ক তুলিয়া লওয়াই প্রয়োজন। কারণ যে যে অবস্থায় সংরক্ষণের প্রয়োজন ইহারা তাহা অতিক্রম করিয়াছে এবং অগতের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিফ

সম্প্রতি মাস্ত্রাজ প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রকাশ শ্রী নাগরিক জীবনের শান্তি বিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত যে অভিন্যাস জারি করা হইয়াছিল তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, দেশের সাময়িক বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ধারাবাহিক ও পৌনঃপুনিক ধর্মঘটের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে কমিউনিষ্টদের। তাহারা দেশের সরকারী ব্যবস্থাকে অচল করিয়া তুলিবার জন্ত সর্বত্র একই ঘটনা ঘটাইতেছে। সম্প্রতি দ্বিবার্ষিকে শ্রীযুক্ত হংস মেটা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কমিউনিষ্টরা হুঃস্থ দরিদ্র শ্রমিক কৃষক প্রভৃতির দাবি-দাওয়া ও

অসন্তোষগুলিকে ভাড়াইয়া আপনাদের প্রতিষ্ঠার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই মর্মে খবর পাওয়া গিয়াছে দিল্লীর কমিউনিষ্টরা হির করিয়াছে তাহারা পৌনঃপুনিক ভাবে ধর্মঘট চালাইয়া সেই ধর্মঘটের পরিস্থিতি যাহাতে দেশব্যাপী ভাবে একটি সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয় তাহার প্রচেষ্টা করিবে। ইহার দ্বারা যাহাতে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিবে।

বর্তমানে দেশের যেকোন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাকে নানাপ্রকারে সঙ্গীন বলা ছাড়া উপায় নাই। অল্পযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, খাজাভাব ও অজ্ঞাত অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও সর্বোপরি একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভাব দেশের আবহাওয়ায় গুরুভার করিয়া তুলিয়াছে। কমিউনিষ্টরা দেশের বর্তমান অবস্থার এই গুরুত্বের সুযোগে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা এই সুযোগে দেশপ্রেমিক সাজিয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্টার জট করিতেছে না। এইজন্য মাস্ত্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির কংগ্রেস গবর্নেন্টসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন যাহাতে তাহারা এই সময়ে হিংস্র নীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে না পারে, দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইহার চ্যামসঙ্গত ও উপযুক্ত যে সমস্ত কার্য চালাইয়া যাইবে তাহারা তাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।

শ্রমিক কল্যাণে কংগ্রেসের আন্তরিকতার অভাব কোন দিনই ছিল না, বর্তমানে উহা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগও কতক পরিমাণে তাহাদের হাতে আসিয়াছে। শ্রমিকদের এখন বুঝাইতে হইবে যে দেশের কেন্দ্রস্থলের সরকারী শাসন-ভার এখন দেশেরই প্রধান প্রধান নেতাদের হাতে। তাহাদের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পথ মসৃণ করিয়া তোলাই এই নেতৃগণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও তাহারা সেই প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সামর্থ্য রাখেন। শ্রীযুক্ত অশোক মেহতা বলিয়াছেন যে যাহাতে শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্ত দ্রুতভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করা যায় সেই বিধানই আগে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে যে সময় লাগিতেছে, তাহার মধ্যবর্তী সময়ের যে সমস্ত-গুলি শ্রমিক ও অজ্ঞাত হুঃস্থদের পীড়িত করিয়া তুলিতেছে সেই সাময়িক অসন্তোষের কারণগুলিকেই কমিউনিষ্টগণ ভাড়াইয়া অশান্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। প্রায়শঃ এইরূপই ঘটয়া থাকে যে ধর্মঘটদের অভাব-অভিযোগ আমরা শীঘ্র শীঘ্র কানে তুলি না। উদাহরণ-স্বরূপ দিল্লীর শিক্ষক সম্প্রদায়ের ধর্মঘটের কথা বলা যাইতে পারে। এই নীতির আশ্রয় পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সরকার চিরস্থায়ী ভাবে শ্রমিকগণের সকল সুখ-সুবিধা ও

দাবি-দাওয়ার সহিত পরিচিত থাকে। যদি কোন সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যাহাতে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া কোন কিছুর মীমাংসার সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে সেই স্থলে এইরূপ নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে মালিক ও শ্রমিককে একই চক্ষে দেখা হইবে।

এই ব্যবস্থা ছাড়া জম্মুল্যের অস্থবিধার ক্ষয় শ্রমিকগণ যে আত্মবল্ল ইত্যাদি সংগ্রহে অস্থবিধা ভোগ করিবে তাহার প্রতিরোধকল্পে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সাময়িক অস্থবিধার সুযোগে কম্যুনিষ্টরা তাহাদের স্বার্থ পরিপূষ্টির উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে না পারে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে এমন একটি যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক যাহাতে গত যুদ্ধের ছয় বৎসরের ধারাবাহিক অত্যাচারে দুর্বল ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড আবার শক্তি অর্জন করিতে পারে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যখন সকল পরিষদগুলিতে সাংসদগণিক হিসাববিকাশ হইবে তখন যদি জনসাধারণের বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের অভাব-অভিযোগের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় তাহা হইলে এই বিষয়ে সুরাহা হইবার আশা আছে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে দরিদ্র জনসাধারণের উপর হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব কমিয়া যাইবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথ পরিষ্কার হইবে।

দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ সর্বত্র একই প্রকার। সর্বত্রই উহাদের লক্ষ্য এক—লীগের সহিত একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি। সিদ্ধান্তে শ্রমিক-ক্ষেত্র হইতে পূর্বে যিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের সহিত যোগ দেন। গত নির্বাচনে তাহার বিরুদ্ধে লীগ ও কম্যুনিষ্ট উভয়ে মিলিয়া এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া তাহাকে জয়যুক্ত করান এবং ইনি নির্বাচনের পরেই লীগদলের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। বাংলা-দেশেও লীগের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ফেব্রুয়ারী যে হরতালের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে তাহার পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে হরতালের উদ্দেশ্য লীগ গবর্নমেন্টের অবসান ঘটানো নয়, ২১শে জানুয়ারী ভিয়েনাম দিবসে ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ছাত্র বা পথচারীর উপর গুলি বর্ষণ বর্তমান লীগ রাজত্বে প্রায়ই ঘটিতেছে। বর্তমান লীগ গবর্নমেন্ট বজায় রাখিয়া এরূপ প্রতিবাদ করিতে গেলে প্রায়ই উহা করিতে হইবে। কম্যুনিষ্টদের তাহাতেই উৎসাহ কিন্তু রোগের মূল লীগ গবর্নমেন্টের অবসানে অগ্রগী হইতেই তাহাদের আপত্তি।

আন্দোলনের সূত্রপাত সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের কার্য-প্রণালীও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ভিয়েনাম দিবস ঘোষণা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে

বিচার-বিবেচনার সুযোগ মাত্র না দিয়া তাহাদিগকে শোভা-যাত্রা সহকারে পথে বাহির করা হয়। শহরে ১৪৪ ধারা জারী আছে, শোভাযাত্রা করিলে উহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে শোভাযাত্রা বাহির করা উচিত কিনা, বাহির করিলে তাহার পরিণাম কি হইবে, দেশের বর্তমান অবস্থায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ করিতে গেলে কংগ্রেসের সম্মতি আবশ্যক কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার সুযোগ না দিয়াই অতর্কিতে ছাত্রছাত্রীদের পথে বাহির করিয়া তাহাদিগকে পুলিশের গুলি ও গ্যাসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ছুইটি ছাত্রের মৃত্যুও ঘটে। অথচ ইহা ভালভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে পুলিশের গুলি ও গ্যাস চলিবার পূর্ব মুহূর্ত্তে কম্যুনিষ্ট নেতারা সরিয়া পড়িয়াছেন। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া এবং অন্তরাল হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া ‘সিচুয়েশন’ সৃষ্টি করিয়াই ইঁহারা অন্তরালে সরিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের এই ‘ট্যাকটিক্স’ কলিকাতাবাসী জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরাও যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই ফেব্রুয়ারীর হরতালের ব্যর্থতা তাহার প্রমাণ। বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট চালিত যদিও উহার সম্মতিপত্র নিজে কম্যুনিষ্ট নহেন। নামের মোহে তিনি নিজেকে কম্যুনিষ্টদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দিতেছেন এবং ইহা করিতে গিয়া কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইঁহাদের ভায় অস্থবিধাবাদী ও স্বার্থনর্ষক লোকদের সম্মুখে রাখিয়া এই ফেব্রুয়ারির হরতালে কম্যুনিষ্টরা নিজে আড়ালে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামের বিচার আদালত

গ্রাম্য স্বরাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে মুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক “গাঁও ছকুমত বিল” আনা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মর্বাদা বাড়াইবার দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এই বিলের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল পঞ্চায়েতী আদালত। এই আদালত ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারিবে। অপব্যয় ও খন খন আদালত যাতায়াতের অস্থবিধা হইতে দরিদ্র গ্রাম-বাসীদিগকে ইহার চেয়ে বেশী কোনও সাহায্য করা সম্ভব নয়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা করিবার অভ্যাস বেশী। যদি এই কু-অভ্যাস দূর করিতে পারা যায় তবে অর্থ-নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে সফল হইবে। এই দিক দিয়া গ্রাম্য আদালত-গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল।

জেলাগুলি কতকগুলি সার্কেলে ভাগ হইবে এবং কতক-গুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি সার্কেল থাকিবে। প্রত্যেক সার্কেলেই পঞ্চায়েতী আদালত থাকিবে। সার্কেলের প্রত্যেক

ইউনিট পাঁচ জন পক্ষায়েৎ নির্বাচন করিবে। নির্বাচিত পক্ষায়েৎ-গণ কর্তৃক আদালত গঠিত হইবে। গ্রাম্য পক্ষায়েতের মতামত পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। বিলে এমন ভাবে পক্ষায়েৎ গঠনের কথা বলা হইয়াছে যাহাতে উহা উপরোক্ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু অর্থনৈতিক সুবিধাও আছে। প্রত্যেক গ্রামের উপর (পক্ষায়েতের ব্যয়ের জন্ত) আর্থিক চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে।

সরপঞ্চ আদালতের সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনিও নির্বাচিত হইবেন। ফলে সরপঞ্চ প্রত্যেকের বিশ্বাসভাজন হইবেন। ১৯২০ সালের গ্রাম্য-পক্ষায়েৎ আইন অনুসারে সরপঞ্চ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। এবার এই ছইয়ের মধ্যে মন্তব্যবধান সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর নির্বাচন প্রত্যেক পক্ষায়েৎকে কায়মী স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ, বিচারের প্রধান অন্তরায় পক্ষপাতিত্বের হাত হইতে পক্ষায়েৎ মুক্ত থাকিবে।

আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ এই ভাবে বিচারক নির্বাচন করেন। সমালোচকদের মতে এই সব বিচারক অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সমর্থকদিগকে পুণী করিতে চেষ্টা করেন। আরও বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই শুধু ভোটের জোরে অনুপযুক্ত ব্যক্তিই আসন দখল করিয়া থাকে। বহু উপযুক্ত ব্যক্তি পরাজিত হইয়া বাদ পড়িয়া যান। এক কথা স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে মানুষের সুবুদ্ধির উপর আস্থা হারান উচিত নয়। ভাল মন্দের মধ্যে ভারতম্য করিবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই আছে।

বিবদমান পক্ষদ্বয়ের এক জন যে গ্রামের অধিবাসী, বিচারকদের অন্তঃ এক জন সেই গ্রামের এবং অন্যান্য তিন জন ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়া চাই। বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে মামলার কোন পক্ষ বা সরপঞ্চ বা তাহার নিকট আত্মীয় মামলার পক্ষভুক্ত অথবা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সেই মামলার বিচারে পক্ষ বা সরপঞ্চ বসিতে পারিবেন না। এই রকম নিরপেক্ষ পদ্ধতির প্রশংসার জন্ত বেশী কথা বলা দরকার হয় না। পক্ষ বিচারকদিগকে সাহায্য করিবেন। তিনি গ্রামের ও প্রতিবেশীর অভিযাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সর্বদা অবগত থাকিবেন। বিচারকদের অনেকেই ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়ার দ্বারা দলগত বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে। এই ভাবে গণতান্ত্রিক আদালতে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে।

১৯২০ সালের পক্ষায়েৎ আইন হইতে নতুন আইন পৃথক। নতুন পক্ষায়েৎ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, তাহার অধিকার বহু দূর বিস্তৃত। নতুন পক্ষায়েতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মানুষ অধিকতর সচেতন। ক্ষমতা ও কর্তব্যের সঙ্কোচন রূপে কার্যের পক্ষে অন্তরায়। যথার্থ

ক্ষমতা হাতে থাকিলে মানুষ আপনার উপর জন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্থভাবে সম্পাদনের জন্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলারই পক্ষায়েতের ক্ষমতা অধিক।

পক্ষায়েতী আদালতে আইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের অনুপস্থিতি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। কারণ তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকেরা আর কথায় কথায় উকিলের পরামর্শের জন্ত ছুটাছুটি করিবে না। বরং তাহারা প্রতিবেশী বা স্বজাতীয় লোকদিগের সঙ্গে আপোষ করিতেই পছন্দ করিবে। অন্ততঃ ছোট ছোট মোকদ্দমায় তাহা করিবেই। বিলের এই সত্তা অথচ দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা আইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের হাতে পড়িলে মারা যাইত।

কোন মোকদ্দমায় নিজে বা অজ্ঞের দ্বারা উপস্থিত হইবার সুযোগ আছে। কোন মোকদ্দমায় প্রয়োজন হইলে পক্ষায়েৎ সাফ্য গ্রহণ করিতে পারেন। বিবাদী বা আসামীকে উপস্থিত হইয়া সাফ্য দিবার জন্ত সমন দিতে পারেন। এমন কি অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা পর্যন্ত বাহির করিতে পারেন। সামান্য খুঁটনাটি কারণে মোকদ্দমা হইবে না। তাহার জন্ত যথেষ্ট বাস্তব কারণ থাকা চাই।

নিজেকে বড় মনে করা মানুষের স্বভাব এবং অনেক সময় এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পক্ষায়েৎ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করিতে পারে। এই অবস্থা এড়াইবার জন্ত শাস্তি বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা কিছু খর্ব করা হইয়াছে। পক্ষায়েতী আদালত দশ দিনের বেশী জেল ও পকাশ টাকার অতিরিক্ত জরিমানা করিবার অধিকারী হইবে না।

নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গ্রাম্য দলাদলিতে অভ্যস্ত লোকের খেলা-খুশির নিকট বলি দেওয়া হয় নাই। পরন্তু যে সকল জটিল মোকদ্দমা বা বিষয় পক্ষায়েতের বিচারকদিগের দ্বারা মীমাংসা সম্ভব নয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সেই সব মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন। অথবা এই সব জটিল মোকদ্দমা অপর ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকট বিচারের নিমিত্ত হস্তান্তর করিতে পারেন।

পক্ষায়েতী আদালতের রাই হুচাঙ। ইহার বিরুদ্ধে কোন রকম আপীল করা যাইবে না। বিলের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি করা হয় যে আইন-অনভিজ্ঞ বিচারকের হাতে বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কারণ মোকদ্দমার বিচার ঠিক ঠিক মত হইতেছে না বা হইবার সম্ভাবনা নাই মনে করিলে ডিক্রি বা আদেশের এবং হুলতুবী মোকদ্দমার ষাট দিনের ভিত্তর ঐ অঞ্চলের মহকুমা হাকিম বা মুনসেফ নতুন ভাবে নিজ আদালতে মামলার শুনারী আদেশ দিতে পারিবেন।

দুর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ

(পঞ্চম প্রকরণ)

ত্রিযোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি

আমরা দুর্গোৎসবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম অল্প-সন্ধান করিতেছি। পূর্ব পূর্ব প্রকরণে ফল ও যথাজ্ঞান বিবৃত করিয়াছি। যদি দুর্গাপূজায় ও উৎসবে তাহার সমর্থন থাকে, তাহা হইলে অল্পমান বিশ্বাসযোগ্য হইবে, নচেৎ কল্পনা-প্রসূত মনে করিতে হইবে। এই নিমিত্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান অঙ্গ অবলোকন করিতে হইবে।* রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দুর্গার্চন-পদ্ধতিতে বহু ব্যবস্থার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যবস্থা করেন নাই। পূর্বকালের স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে যে পদ্ধতিতে পূজা হইত, বর্তমানও সেই পদ্ধতিতে পূজা হইবে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, এখনও সেই ব্যবস্থা মানিতে হইবে। ইহা যাবতীয় স্মৃতির অভিপ্রায়। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণ সে সে ব্যবস্থার হেতু দেন নাই। যেমন, দুর্গাপূজায় কুমারীপূজন অবশ্য কতব্য। যেহেতু দেবীপুরাণে এই ব্যবস্থা আছে। দেবীপুরাণ কেন এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, তাহা পুরাণে নাই। নিশ্চয় কোন হেতু ছিল। আমরা সেই হেতু অনুসন্ধান করিতেছি। এই নিমিত্ত কয়েকখানি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল জানিতে হইবে। নচেৎ ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। পরবর্তী প্রকরণে সে বিষয়ে যত্ন করা যাইবে।

প্রথমে দুর্গাপূজা-প্রকরণ স্মরণ করিতেছি। পূজার সাতটি কল্প অর্থাৎ সাতটি বিধি আছে। যথা—

১। ভাস্কর্য্যনবমী। সেদিন দেবীর বোধন করিতে হয়। তদবধি আশ্বিনশুক্লনবমী পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা।

২। আশ্বিনশুক্লপ্রতিপদ। প্রতিপদে কেশসংস্কারদ্রব্য দিতে হয়। দ্বিতীয়্য কেশবন্ধনের পট্টবোর, তৃতীয়্য পদ-রঞ্জনের জন্ত অলঙ্কার, ললাটের জন্ত সিদ্ধূর, মুখদর্শনের

* মাস-সংক্রান্তি-গণনা হইতে জানিতেছি নবদ্বীপে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে “ঐষ্ট্যাবিশিষ্টতত্ত্ব” লিখিয়াছিলেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদিত এই স্মৃতি-তত্ত্বের শেষে “ত্রিহুর্গার্চন-পদ্ধতি” সন্নিবিষ্ট আছে। পণ্ডিত ত্রিগুণীচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত “দুর্গাপূজা-তত্ত্ব” বিস্তৃত ভূমিকার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দুই ভাগ প্রমাণতত্ত্ব ও প্রয়োগতত্ত্ব। পণ্ডিত প্রবর ত্রিগুণীচন্দ্র কবিরত্ন বিদ্যা-বারিষি টীকা-টীপ্সনীর সহিত “কালিকা-পূরণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতি” প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বহু বৈদিক মন্ত্র আছে। “আর্ঘ্য-শাস্ত্র-প্রদীপ” প্রণেতা যোগ-ব্রহ্মানন্দ “দুর্গার্চন ও নবরাত্র-তত্ত্ব” লিখিয়াছিলেন। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (প্রকাশক ত্রিহুর্গীকোষ বিদ্যানন্দ, উত্তরপাড়া, হুগলী)।

জন্ত দর্পণ, চতুর্থীতে মধুপর্ক, নেত্রের কঙ্কল, পঞ্চমীতে অগুরুচন্দন প্রভৃতি অঙ্গ-রাগ দ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়।

৩। আশ্বিনশুক্লষষ্ঠী। সন্ধ্যাকালে বিশ্বশাখায় দেবীর বোধন, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৪। উক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্যন্ত ঘটে পূজা। সপ্তমী হইতে তিন দিন মুন্ডায়ী প্রতিমায় পূজা। পূর্বাঙ্কে প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপন।

৫। শুক্ল-অষ্টমী। অষ্টমী নবমী দুই দিন পূজা।

৬। কিম্বা কেবল অষ্টমীতে পূজা এবং সেই দিনই বিসর্জন।

৭। শুক্ল-নবমী। কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জন। কেবল অষ্টমী কিম্বা কেবল নবমীতে ঘটে পূজা করা হয়।

দশমীতে বিসর্জন। সন্ধ্যাকালে ঘট ও প্রতিমা নদী কিম্বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া জল ও কদম লইয়া কোতুকজীড়া। ইহার নাম শবরোৎসব। গৃহে প্রত্যাগমনকালে খঞ্জন পক্ষী (কিম্বা নীল-কণ্ঠ পক্ষী) দৃষ্ট হইলে শুভ। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গুরুজনের আশীর্বাদ, আত্মীয়-স্বজনের কুশল ক্রামনা ও তদনন্তর অন্ন সিদ্ধিপান প্রচলিত আছে।

এক্ষণে পূজা দেখি। ঋগ্বেদের কালে হিম। (শীত) ঋতু ও শরৎ ঋতু হইতে দুই বৎসর গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম। বৎসর এবং তাহার চারি ঋতুর পরে শরৎ ঋতু হইতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা পূর্বে মহিষমর্দিনী প্রকরণে বলা গিয়াছে। প্রত্যেক ঋতু আরম্ভেই যজ্ঞ হইত। হিম-ঋতু ও শরৎ ঋতু আরম্ভেও যজ্ঞ হইত। শরৎকালীন যজ্ঞই রূপান্তরিত হইয়া দুর্গাপূজা হইয়াছে।

যজ্ঞের ও পূজার কর্ণে প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের অভিপ্রায় একই। দেবতার প্রসাদের নিমিত্ত তাহাঁকে প্রীতিকর দ্রব্য সমর্পণের নাম যজ্ঞ। যে দ্রব্যে আমরা প্রীত হই, আমরা মনে করি, সে দ্রব্যে দেবতাও প্রীত হন। দ্ব্যতাহতি যজ্ঞের এক প্রধান অঙ্গ। দুর্গাপূজায় হোম একান্ত কৃতব্য। যজ্ঞবিশেষে দ্ব্যতাহত পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) মাংস ও সোমরস দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অর্পিত হইত। দেবতার স্তব অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রশংসা উচ্চারিত হইত। ধন দাও, প্রচুর অন্ন দাও, বীর পুত্র দাও, শত্রু বিনাশ কর ইত্যাদি স্বাভাবিক মানুষের প্রার্থনা থাকিত। দুর্গা-পূজাতেও তাহাই হয়। চণ্ডীমাহাত্ম্য তাহার স্তব। নৈবেদ্য

ও পশু-বলি দ্বারা তাহাঁকে প্রসন্ন করা হয়। আর দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করা হয়,

“আয়ুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমস্তুতে।

রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।

পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে।”

দুর্গাপূজার মন্ত্রে যজ্ঞ শব্দ বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

“দেবি যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ,” হে দেবি! যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। পশুবলি দিবার সময় বলা হয়,

“যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ তস্মিন্ যজ্ঞে বধোহবধঃ।”

যজ্ঞের নিমিত্তই পশু সৃষ্ট হইয়াছে। সে যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ। দুর্গাপূজা যজ্ঞ না হইলে পশুবলি প্রাণিহিংসায় দাঁড়াইয়া। আরও আশ্চর্যের বিষয়, পশুচ্ছেদের সময় ভক্ত-

দর্শকেরা “মো মো” শব্দ করিতে থাকেন। সংস্কৃত মহস্ শব্দের সংক্ষেপে এই “মো মো” আসিয়াছে। মহস্ শব্দের অর্থ যজ্ঞ।*

হোমের সমুদয় ক্রিয়া বৈদিক। (পণ্ডিত শ্রীশ্রামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত কালিকাপুরাণোক্ত পূজা-পদ্ধতি পত্র।)

যাগ ও হোমের অল্পমাত্র প্রভেদ আছে। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আহুতি দিলে যাগ, বসিয়া দিলে হোম। কিন্তু কর্মে প্রভেদ নাই। দুর্গাপূজা পশুযাগ। ইহাকে সোমযাগ বলিতে পারি। সোমযোগে পশুবলি হইত ও সোমরস প্রদত্ত হইত।

আমার অল্পমানে বেদের সোমবৃক্ষ সিদ্ধিগাছ। সিদ্ধির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাম ভঙ্গা। বাংলায় বলি ভাং। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম বিজয়া।

রঘুনন্দন বিজয়াকালে দেবীকে সিদ্ধি দিবার ব্যবস্থা লিখেন নাই। কিন্তু ইহা বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে।

দুর্গাপূজা বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর, তন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তন্ত্রের উৎপত্তি বহু প্রাচীন। ঋগবেদে ইহার অঙ্কুর আছে। অথর্ববেদে তন্ত্রের প্রসার হইয়াছে। তন্ত্রে রেখা দ্বারা নির্মিত প্রতিকৃতির নাম যন্ত্র।

বর্ণমালার এক এক বর্ণ এক এক দেবতার ছোটক। এই সকল বর্ণের নাম বীজ। প্রাচীনেরা তন্ত্রকে ঋতি মনে করিতেন। তাহারা বলিতেন, ঋতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ইহা দেবী-ভাগবতে ও মহাসংহিতার কুল্লুক ভট্টের টীকায় আছে। দেবীপুরাণ দুর্গাপূজাকে বৈদিক বলিয়াছেন।

দেবীর বোধন।

বোধন নিজ্রা-ভঞ্জন। দেবী নিজ্রিতা থাকেন। তাহাঁকে জাগাইয়া পূজা করিতে হয়। কেন নিজ্রিতা থাকেন? যেহেতু রবির উত্তরাংশ ছয় মাস দেবতার দিবা, দক্ষিণাংশ

ছয় মাস তাহাঁদের রাত্রি। দিবা কর্মের কাল, রাত্রি নিজ্রা-কাল। শরৎ ঋতু দক্ষিণাংশে পড়ে। দেবী তখন নিজ্রিতা থাকেন।

কালিকাপুরাণ বোধনের এই প্রয়োজন লিখিয়াছেন। কিন্তু এমন অসম্ভব ব্যাখ্যা পুরাণে কদাচিৎ আছে। জগন্ময়ী নিজ্রিতা, বাতুলের প্রলাপ। বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়া এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে আরও আছে, রাবণবধার্থে রামচন্দ্রকে অহুগ্রহ করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা দেবীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ আলোচনার সময় দেখা যাইবে পুরাণ-কর্তা জ্যোতিষচর্চা করিতেন। তিনি প্রকৃত তত্ত্ব ঢাকা দিয়াছেন, অসঙ্গতি চিন্তা করেন নাই। পরে পরে দেখাইতেছি।

প্রথম কথা, বাল্মিকী-রামায়ণে দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই। রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র আদিত্যহৃদয়স্তব পাঠ করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় কথা, শরৎ ঋতুতে রামবাবণের যুদ্ধও হয় নাই। শরৎ ঋতু যুদ্ধকালও নয়, হেমন্ত ও বসন্ত যুদ্ধোত্তমের কাল। ইহা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। তৃতীয় কথা, যদি দক্ষিণাংশ কালে দেবতার নিজ্রিতা থাকেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায়, শ্রামাপূজায়, জগদ্ধাত্রী পূজায়, কা্তিক পূজায় বোধন নাই কেন? চতুর্থ কথা, সপ্তম্যাতি অষ্টম্যাতি ও কেবল অষ্টমী ও নবমীতে পূজায় বোধন করিতে হয় না কেন? আশ্বিন শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূজা আরম্ভ, যষ্টির সায়াংকালে বোধন। তবে কি প্রতিপদ হইতে যষ্টি পর্যন্ত ঘটে যে পূজা হয়, তাহা নিষ্ফল? পঞ্চম কথা, নবরাত্রি ব্রতে বোধন নাই কেন? ষষ্ঠ কথা, ঘটে নয়, প্রতিমায় নয়, বিষ্ণু বৃক্ষে, বিষ্ণু শাখায় দেবীর বোধন। কেন বিষ্ণু-বৃক্ষে বোধন? ইহার অর্থ কি?

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, অরুণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। বিষ্ণুকাষ্ঠের অরুণি; এই হেতু দেবী বিষ্ণবাসিনী। দুর্গা অগ্নি-স্বরূপা। অরুণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সেই অগ্নি কুমার। তিনিই কুমারী দুর্গা। কাষ্ঠে যে অগ্নি স্থপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিজ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়।

বৃহদ-ধর্মপুরাণে (পৃ. ২২) এই ব্যাখ্যার আভাস আছে। লিখিত আছে, “রাবণের বধার্থে ব্রহ্মাদিদেবগণ দেবীর স্তব করিলে তিনি বিষ্ণুবৃক্ষে বোধন করিতে বলিলেন। তাহারা ভূতলে আসিয়া এক দুর্গম নির্জন স্থানে একটি বিষ্ণুবৃক্ষ দেখিলেন। তাহার এক পত্রে তপ্তকাঞ্চনবর্ণী স্বরূচিরা অচিরপ্রসূতা এক বালিকা নিজ্রিতা। বালিকা অনাবৃতদ্বা, নিশ্চেষ্টা। দেবগণের স্তবে বালিকা প্রবুদ্ধা হইয়া যুবতীরূপ ধারণ করিলেন।” অতএব দেখিতেছি বিষ্ণুবৃক্ষে কুমারীর

*পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়াই, “জাম কাঠালিয়া পীড়ি-খানি ঘুতে ম ম করে।” কাঠালের পীড়ি ঘুতসিক্ত হইয়া উৎসব-গন্ধ ছড়াইতেছে।

জন্ম হয়। কুমারীকে গুহ্য বিবরণে প্রথমে নিদ্রিতা পরে প্রবুদ্ধা দেখা যায়।

শমী-কাঠই অরণির প্রসিদ্ধ কাঠ, ঋগ্বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজা-যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নি উৎপাদন আবশ্যক। শমীবৃক্ষ ভারতের পশ্চিমাংশে স্থলভ, কিন্তু পূর্বাংশে দুর্লভ। বঙ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত। দেখা যাইতেছে, যে দেশে শমীবৃক্ষ দুর্লভ, সে দেশে বিষ্ণুকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদন প্রচলিত হইয়াছিল। অমরকোষে বিষ্ণুবৃক্ষের এক নাম শাণ্ডিল্য; মেদিনীকোষে এক অগ্নির নাম শাণ্ডিল্য এবং শাণ্ডিল্য এক মূনির নাম। বোধ হয় শাণ্ডিল্য গোত্রের কোন ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকাষ্ঠের অরণি প্রচলিত করিয়াছিলেন।

পূর্বকালে রাক্ষস ও পিশাচেরা যজ্ঞের বিঘ্ন করিত। দুর্গাপূজা দুর্গাযজ্ঞ, বোধনের সময় যজ্ঞ-বিঘ্নকারকদিগকে মন্ত্রিত খেত সর্ষপ বিক্ষেপের দ্বারা অপসারিত করা হয়।

চণ্ডীমণ্ডপে বোধন হয় না। বোধনের নিমিত্ত স্তূপদ্বারা এক পৃথক বস্ত্রগৃহ নির্মিত হয়। (এক বেদীর চারি কোণে শর পুতিয়া কয়েকবার স্তূপ বেটন পূর্বক বস্ত্রগৃহ মনে করা হয়)। সেই বস্ত্রগৃহে যুগ্মফলবিশিষ্ট বিলশাখা স্থাপিত হয়। বেদীতে অলঙ্কৃত, স্তূপ ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিষ্য দেখিলে এই বস্ত্রগৃহ স্তূতিকাগৃহ, যুগ্মফলের একটি মাতার কুক্ষি, অপরটি ভ্রূণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি। নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত স্তূপ। অলঙ্কৃত শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত ঘটস্থদেবীর নিমিত্ত কেশ-সংস্কার দ্রব্য, অঙ্গরাগ দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ত সম্ভাবনা না করিলে এই এ সবেব প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিলশাখা ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বৃষ্টিতে হইতেছে বিলশাখায় দুর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব। বিলফল • দেবীর প্রতিকল্পক। সূর্যোদয়ের পর অগ্নিমন্ত্রন ও যজ্ঞ হইত, রাত্রিকালে হইত না। অতএব সায়ংকালের বোধন অকালবোধন। সায়ংকালে কেন? কারণ রাত্রি সম্ভানপ্রসবের কাল।

এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, দেবীকে ঘটে পূজা করিতেছি। তখন তাহার বোধন হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত কেশ-সংস্কারাদি দ্রব্য কাহাকে প্রদত্ত হয়? কাহার জন্মের নিমিত্ত স্তূতিকাগৃহ নির্মিত হয়? দেবীর হইতে পারে না। আদ্যা বিশ্বারণির জন্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমার বোধ হয়, দুইটি পৃথক ভাবনা মিশ্রিত হইয়াছে। একটি বিলশাখায় অগ্নি-উৎপাদন, অপরটি অস্ত্রের জন্ম কল্পিত হয়। পরবর্তী প্রकरणে সে অস্ত্রের অনুসন্ধান করা যাইবে।

আমি নবপত্রিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমা

বৃষ্টিতে পারি নাই। নবপত্রিকা নবদুর্গা, ইহার দ্বারাও কিছুই বুঝিলাম না। দেবোপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই। ইহা কোন্ পুরাণে প্রথম পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। নবপত্রিকা দুর্গা পূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে। কোন্ দেশে কবে ইহার উৎপত্তি? বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নঘটি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিব। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মাহুঘের স্বভাব যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্ত্র প্রচারিত হয়। নবপত্রের মধ্যে জয়ন্তী একটা। জয়ন্তী কি গাছ? জয়ন্তী নাম সংস্কৃত। অগ্নিমন্ত্রের নাম জয়ন্তী আছে। আমরা বঙ্গদেশে যে গাছকে জয়ন্তী বলি, সে নাম বাঙ্গলা, সে গাছই সংস্কৃত নামের জয়ন্তী, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। রঘুনন্দন ভবিষ্যপুরাণ হইতে নবপত্রিকার নঘটি গাছের নাম দিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের বচন কোন্ দেশের, কোন্ কালের তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য।

দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব

(ষষ্ঠ প্রकरण)

দুর্গাপূজা কবে? পূর্বে দেখিয়াছি, কেবল আশ্বিন শুক্লাষ্টমীতে, কিম্বা কেবল শুক্লনবমীতে পূজা করিতে পারা যায়। হেতু কি? ঘটে পূজা হইলেও পূজা সিদ্ধ হয়।

শরৎ ঋতু আরম্ভে পূজা করিতে হয়। দৈবক্রমে চান্দ্র আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতুর আরম্ভ, কিন্তু পূজা আশ্বিন-মাসীয়া নয়, শারদীয়া। • খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দে কৃষ্ণযজুর্বেদের কালে বসুস্তাদি ছয় ঋতু ও প্রত্যেক ঋতুর দুই সমান ভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। যথা,—মধু ও মাধবঃ বসন্ত, ইষ ও উর্জ শরৎ, ইত্যাদি ঋতু-সম্বন্ধীয় ভাগ। এই সকল ভাগকে আতর্ভ মাস বলা যাইতে পারে। ইষ শরৎ-ঋতুর প্রথম মাস। পূজার সংকল্পে ইষ মাস বলিতে হয়। আশ্বিন মাস অশ্বিনীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত আছে। অতএব সে মাস স্থির ও নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু ইষ মাস স্থির নাই। ঋতু পিছাইতেছে, ইষমাসের আরম্ভও পিছাইতেছে। বর্তমানে ভাদ্রমাসের ৮ই ইষমাসের আরম্ভ হইতেছে।

দেখা গেল, সূর্যের ভোগ দেখিয়া পূজার দিন নিরূপিত হইয়াছে। সৌরমাসে নিরূপিত হইলে বর্ষে বর্ষে সৌর মাসের একই দিবসে পূজা হইত। চান্দ্রমাস ধরিয়া তিথির দ্বারা দিন গণিত হইতেছে। কিন্তু তিথি যথেষ্ট নয়। কেবল তিথি জানিলে, কিম্বা চন্দ্রের নক্ষত্র জানিলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না। তিথি ও চন্দ্রের নক্ষত্র, এই দুই না পাইলে সূর্যের ভোগ জানিতে পারা যায় না।

এই কারণে স্মৃতিকার তিথির সহিত নক্ষত্র দেখিতে বলিয়াছেন। (পরিশিষ্ট পঞ্চ)

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিমবৎসর আরম্ভ হয়। চান্দ্রমাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ ধরা হইতেছে। ইহার আট মাস পরে এবং প্রতি মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া আশ্বিন শুক্ল অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ ধরিতে হইতেছে। এই কারণে সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের পূর্ব-তিথি পৌষ অমাবস্তা। যদি সেদিন মধ্যরাত্রে অমাবস্তা পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আশ্বিন শুক্লাষ্টমীর মধ্যরাত্রে আট তিথি পূর্ণ হয়। মধ্যরাত্রে সন্ধিক্ষণের আরও মাহাত্ম্য।

এই আলোচনা দ্বারা শারদীয়া পূজা প্রচলনের পূর্বসূচী পাইতেছি। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার দিন গণনার নিমিত্ত এক পুস্তিকা ছিল। তাহার নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। ইহা খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তিথি বৃদ্ধি এবং মাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ গৃহীত হইয়াছে। দুর্গাপূজা যজ্ঞক্রিয়াবিশেষ মনে করিলে উক্ত অব্দের পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহার পূর্বে কবে হইত? দৈবক্রমে তাহার প্রমাণ আছে। আমরা জানি আশ্বিন অমাবস্তায় শ্রামাপূজা এবং প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা। পরদিন কাৰ্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে দ্যূতক্রীড়া। এই দিন গুজরাটে বণিকেরা নূতন বৎসর আরম্ভ করে এবং নূতন খাতা খুলে। সে প্রদেশে এই দিন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। হেতু কি? তাহারা যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের কালের শরৎ বৎসর গণনা করে। এই দুই বেদে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই তিথির নাম একাষ্টকা ছিল। “একাষ্টকা সম্বৎসরের প্রথমা রাত্রি।” (রাত্রি দিবস)। সেদিন হইতে আট মাস আট তিথি গণিলে আশ্বিন অমাবস্তা আসে। পরদিন কাৰ্ত্তিক শুক্লপ্রতিপদে শরৎবৎসর আরম্ভ। দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। নূতন বৎসর কেমন যাইবে, তাহা জানিবার ইচ্ছা। এখন কোথাও ভাগ্যপরীক্ষার এই বিধি প্রচলিত আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, সকলেরই ভাগ্য স্বপ্নসম দেখিবার কথা। অমাবস্তার প্রদোষে লক্ষ্মীপূজার বিধিরও সেই অভিপ্রায়। নববর্ষের পূর্বদিন লক্ষ্মীর প্রসাদ ও শ্রামার নিকট অভয় প্রার্থনা করা হয়। আশ্বিন শুক্লনবমীতে যেমন দুর্গাপূজা, আশ্বিন অমাবস্তায় তেমন শ্রামাপূজা। সে রাত্রের দীপালীর সহিত এই পূজার ও নববর্ষোৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। দীপালীর হেতু ভিন্ন। মহালয়ায় যেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান, আশ্বিন অমাবস্তাতেও তেমন পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দীপদান করা হয়।

মাসপ্রতি একদিন বৃদ্ধি স্থূল গণনা। স্থূল গণনায় আশ্বিন শুক্লনবমীতে বর্ষা ঋতুর শেষ হয়। দশমীতে শরৎ ঋতু ও শরৎ বৎসর আরম্ভ হয়। নবমী অন্তে রবির ভোগ ৫ রাশি পূর্ণ হয়। (পরিশিষ্ট পঞ্চ)। ২৪১ শক=৩১২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কালের গণনা চলিয়াছে। অতএব মনে হয়, ঐ শকের পূর্বে নয়দিন দুর্গাপূজা ও নবরাত্রিব্রত প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু এতদ্বারা সপ্তমীতে ও ষষ্ঠীতে কল্লারন্তের হেতু ও নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি পাইতেছি না। বঙ্গদেশে আমরা প্রতিমায় পূজা করি, নবরাত্রব্রত ভুলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ। নবরাত্র নয় রাত্রি, নয় তিথির ব্রত। আশ্বিনশুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথির ব্রত। রাত্রি শব্দে তিথি বুঝায়। দশমী দশ-রাত্রি। ইহার সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোক “দশরা পরব” বলে, ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে। ঘটের সম্মুখে নয় দিন চণ্ডীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের বিসর্জন।

আমাদের কোনও ব্রত বা পূজা বৎসরের যে-সে দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিন জ্যোতিষে বিশেষ দিন। সকল জাতিই এই বিধি অনুসরণ করে। ব্রতপালন ও দেবদেবীর পূজার দ্বারা আমরা সেদিন স্মরণ করি। কোন্ স্মরণীয় দিনের সহিত নবরাত্রব্রত যুক্ত হইয়াছে? কিন্তু কোন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি নির্ণয় অতিশয় কঠিন। এখানে একটা উৎপত্তি উপলব্ধ করিতেছি।

মাহেশ্বরযুগ নামে এক যুগ-গণনা প্রচলিত ছিল। (পরিশিষ্ট পঞ্চ্য)। ২৪৭ সায়ন বৎসর ও ১ মাস এই যুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। ইহা এই যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক শুক্ল সপ্তমীর এক নাম ছিল। কয়েকটি ম্রম মন্ত্রপুরাণে আছে, কয়েকটি পাজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন মিত্র সপ্তমী, রথ সপ্তমী। শুক্ল ষষ্ঠীতে যুগ সমাপ্ত হইত। শুক্ল ষষ্ঠীরও নাম ছিল। কয়েকটি নাম পাজিতে লিখিত হইতেছে। যেমন গুহষষ্ঠী, আরণ্য ষষ্ঠী। ইহা হইতে প্রতিমাসের শুক্ল সপ্তমী রবির এবং শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। যদি কোন যুগ আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হয়, পরবর্তী যুগ কাৰ্ত্তিক শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। এই ক্রমে পূর্বাপর যুগ গণনা চলিতে থাকে। এই কারণে এই যুগ-গণনা কবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমার অনুমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বৎসর হইতে এই গণনার প্রচলন হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দের হেমন্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। পরবৎসর খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া ২৪৭

বৎসর একমাস পরে খ্রি-পূ ১১২৩ অব্দের আশ্বিন শুক্ল
ষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়াছিল। এই ষষ্ঠীর নাম আদিকল্প ষষ্ঠী ছিল।
পরদিন সপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ, ইত্যাদিক্রমে যুগ-
গণনা চলিয়াছিল। প্রথম যুগে আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে
রবির ভোগ ১৫০° অংশ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগে আশ্বিন
শুক্ল ষষ্ঠীতে, তৃতীয় যুগে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে ইত্যাদিক্রমে
সপ্তমযুগে খ্রি-পর ২২১ অব্দে (২১৩ শকে) আশ্বিন শুক্ল
প্রতিপদে রবির ভোগ ১৫০° হইয়াছিল। আমার বোধ
হয়, শুক্ল অষ্টমী ও নবমীর সহিত এই সাতদিন যুক্ত হইয়া
নবরাত্র হইয়াছে। দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ খ্রি-পূ ১১২৩
অব্দে এক বিশেষ যোগ ঘটিয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে
রবির ভোগ ১৫০° অংশ পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে নবযুগ
ও নব শরৎবৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। এমন যোগ দুর্লভ।
যুগচক্র একবার ঘুরিয়া না আসিলে আর ঘটে না। খ্রি-পর
২২১ অব্দে সপ্তমযুগে আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদে রবির ভোগ
১৫০° হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় এই অব্দের
পরে ও অষ্টম যুগের পূর্বে নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে।
ইহার সহিত পূর্বোল্লিখিত খ্রি-পর ৩১২ অব্দের ঐক্য
হইতেছে। এই অনুমানের এক প্রমাণ দিতেছি। কালিকা
পুরাণ লিখিয়াছেন, আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দশভুজা
আবিভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেদিন শরৎ ঋতুর আরম্ভ
হইয়াছিল। কালিকা পূর্ণাঙ্গের মাস পূর্ণিমাস্ত। আমরা
যে অমাস্ত মাস গণি, তদনুসারে ইহার নাম ভাদ্রকৃষ্ণ
চতুর্দশী হয়। ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।
কালিকাপুরাণে উহার পরের তিথি নাই। অতএব মনে
হয় কালিকাপুরাণ অষ্টম খ্রিষ্ট শতাব্দী হইতে একাদশ খ্রিষ্ট
শতাব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

উক্ত যুগগণনায় খ্রি-পূ ১১২৩ অব্দের যুগে আশ্বিন-শুক্ল
ষষ্ঠীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় ইহাকেই আমরা
ষষ্ঠীাদি কল্প বলিতেছি। ষষ্ঠীতে বোধন সঙ্গত হইতেছে।
পরদিন শুক্ল সপ্তমীতে নূতন যুগের সহিত নব বর্ষের রবির
উদয় হইয়াছিল। ষষ্ঠীর রাত্রে এই রবির বোধন হয়।
উদয়ের নাম জন্ম, বেদে প্রসিদ্ধ আছে। সপ্তমী রবির
তিথি। রবির নিকট পশুবলি নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এই
কারণে দুর্গাপ্রতিমা পূজাতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রঘুনন্দন দেবীপুরাণের প্রমাণে ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতেও
কল্পারম্ভ লিখিয়াছেন। দেবীপুরাণের মাস পূর্ণিমাস্ত। তদনু-
সারে আমরা বাহা ভাদ্রকৃষ্ণনবমী বলিতেছি, তাহা আশ্বিন-
কৃষ্ণনবমী। এই আশ্বিনকৃষ্ণনবমী হইতে আশ্বিনশুক্লনবমী
পর্যন্ত ১৬ দিন পূজা হয়।

১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের “প্রবাসী”তে বন্ধুবর বিজয়-
চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন, ছত্রিশগড় অঞ্চলে গ্রামের

কুমারীরা “কুমারী ওষা” (কুমারীর উপবাস) নামক ব্রত
করে। ভাদ্রকৃষ্ণঅষ্টমীতে আরম্ভ ও আশ্বিনশুক্লনবমীতে
শেষ। এই ১৭ দিন তাহারা একবেলা ভোজন করে,
কুমারী দেবীর পূজা করে। পাড়ায় পাড়ায় বাজনা বাজে,
নিয়ন্ত্রণের নারীরা নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। শেষদিন
বেহায়া বর্ষীয়সী নারী অল্লীল গান গাহিয়া থাকে। তিনি
আরও লিখিয়াছিলেন; “কুমারী ওষার কুমারীরা পূর্বে
অনার্য ছিল। এখন আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে।” তাহারা
আর্ঘ হউক, অনার্য হউক ১৭দিন পূজার সমর্থন পাইতেছি।

পূর্ণিমাস্ত আশ্বিন, অমাস্ত ভাদ্রকৃষ্ণনবমীতে পূজার হেতু
বুঝিতে কষ্ট নাই। রবির উত্তরাংশ হইতে হিমবৎসর
আরম্ভ। আমরা অমাস্ত চান্দ্রমাস গণি। তদনুসারে পৌষ
অমাবস্যায় উত্তরাংশ। পরদিন, মাঘ শুক্ল প্রতিপদ হইতে
নূতন বৎসর। কিন্তু পূর্ণিমাস্ত মাস গণিলে পৌষ পূর্ণিমায়
উত্তরাংশ, এবং পরদিন মাঘ কৃষ্ণপ্রতিপদে হিমবৎসর আরম্ভ
হইবে। অবশ্য একই বৎসরের পৌষ পূর্ণিমায় ও পৌষ
অমাবস্যায় উত্তরাংশ হইতে পারে না। একের চারি বৎসর
পরে অপরটি হয়। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ৮ মাস ৮ তিথি
গণিলে ভাদ্রকৃষ্ণ নবমীতে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হয়। সেদিন
দেবীপূজা সমাপ্ত হইবার কথা। (পরিশিষ্ট পশ্চ)। সেদিন
বোধন ও পূজার আরম্ভ হইবার হেতু পাই না, নবরাত্র
ব্রতও পাই না। পূজার এত কল্প কদাপি একদেশে কিম্বা
এককালে আসে নাই। একের সহিত অগ্নের স্বাভাবিক
যোগও নাই। ফলে দুর্গাপূজাপদ্ধতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাপূজার সঙ্কল্পে দেখিতেছি, কেহ অতুল বিভূতি,
কেহ সম্বৎসর স্বথপ্রাপ্তি, কেহ দুর্গাপ্রীতিকামনায় বার্ষিক
শরৎকালীন দুর্গামহাপূজা করেন। রাজা প্রথমটি, প্রজা
দ্বিতীয়টি এবং ভক্ত তৃতীয়টির কামনা করেন। সম্বৎসর
স্বথপ্রাপ্তি, অর্থাৎ দুর্গাপূজা হইতে সম্বৎসর আরম্ভ।
“বৃহদধর্মপুরাণে” আশ্বিনাদি মতাঃ মাসাঃ, আশ্বিন হইতে
বৎসরের মাস গণনা হইয়াছে। বিজয়া দশমী হইতে নূতন
বৎসর আরম্ভ হয়। এই পুরাণ রঘুনন্দনের প্রায় শত
বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছিল।

সকল জাতিই নববর্ষের আরম্ভে উৎসব করিয়া থাকে।
গৃহ মার্জিত ও সাজ্জিত হয়, সকলে নববস্ত্র পরিধান করে,
আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, স্বস্বাচ্ছন্দ্য ভোজন
কর, নূতন বৎসরে স্বথসৌভাগ্য ও বিজয় কামনা করে।
পূজা-প্রাঙ্গণে মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, মণ্ডপের চারি দিকে
বনমালা লগ্নিত হয়, তোরণ নির্মিত হয়, ধ্বজা উত্তোলিত
হয়, নানাবিধ বাদ্য উৎসব ঘোষণা করিতে থাকে। গ্রামে
কাহারও বাড়ীতে দেবীর পূজা হইলে, গ্রামস্থ সকলে মনে
করে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে। যিনি পূজা করেন, তিনি

গ্রামস্থ সকলকে উৎসবে আহ্বান করেন। সকলেই হুট-চিলে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। (কয়েক বৎসর হইতে কালধর্ম এই ভাব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।)

গুজরাট ও কাঠিবাড় প্রদেশে নবরাত্রের সময় নারীরা “গর্বা” নৃত্য করে। এক শতচ্ছিন্ন শ্বেতরঞ্জিত হাঁড়ির ভিতরে প্রজ্জলিত দীপ রাখে এবং তাহাকে বেঠন করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান গায়। এই নৃত্য ও গীতের নাম গর্বা। শব্দটি গর্ভ (জগ) তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঁড়ির শতচ্ছিন্ন পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে যেন সূর্য। নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাত্রের অন্তে নববর্ষের সহিত নবসূর্য উদ্ভিত হইবে, এই আহ্বানে নৃত্যগীত করে। বিবাহাদি উৎসবেও গর্বানৃত্য হয়। বোধ হয় সেখানেও গর্ভসম্ভাবনা কল্পিত হয়।

নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দমক্রীড়া। সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান হইত। ইহা দুর্গোৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। উত্তর-ভারতে হোলি খেলায় এইরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। দোলযাত্রায় আমরা পূর্বকালের হিম বর্ষারস্তুর স্মৃতি পালন করিতেছি। সে দিন মহারাষ্ট্র দেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ অন্ত্যস্ত স্পর্শপূর্বক দেহ অশুচি করেন, অতিপ্রায় একই। নববর্ষ প্রবেশহেতু সেই একই কারণে শবরোৎসবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শবরজাতির বাস ছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজা নবরাত্র করিতেন। তাহাঁর শবরজাতীয় প্রজা ঘট বিসর্জনের পর জলকান্দা লইয়া খেলা করিত। নববর্ষারস্তে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক। এই আচার দুর্গাপূজা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু ক্রীড়া-কৌতুক এক কথা, আর ‘ফেউড়’ আর এক কথা। ছত্রিশ-গড় অঞ্চলে কুমারী ওয়া নামক ব্রতের সমাপ্তি দিনেও নির্লজ্জা নারী অঙ্গীল গান গাহিয়া বেড়ায়। কুম্ভজুর্বেদে আছে, সন্ধ্যাসরব্যাপী সত্রের পর ঋত্বিকেরা হর্ষক্রীড়া করিতেন, আর তাহাঁদের সম্মুখে দাসজাতীয়া বারাদনা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য ও অঙ্গীল গীত করিত। আগার বোধ হয় লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন অঙ্গীল ভাষা শুনিলে দেহ অশুচি হয়, যমরাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন না।

দশরা দিনে দেশীয় রাজ্যে মহাসমারোহে নৌরাজনা হয়। দশমীর পূর্ব হইতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যক্ত ও তৈল মার্জিত হয়। সেদিন অশ্বগজের গাত্র ঘোত ও অলঙ্কৃত হয়। রাজ-পুরোহিত অশ্বগজ ও অস্ত্রের পূজা করেন। অপরাহ্নে রাজা স্ববেশে স্তম্ভজিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অমাত্য, সামন্ত ও উচ্চপদস্থ পাত্রমিত্র স্ব-স্ব মর্ষাদা অল্পসারে অত্যাশ

হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। পদাতিক ও অশ্বারোহী রণবেশে প্রাসাদের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকে। রাজা দেবী প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। দামামা বাজিতে আরম্ভ হয়। পথের জনাকীর্ণ দুই পার্শ্বের মধ্য দিয়া রাজা সদলবলে যাত্রা করেন। কিছু দূরস্থিত মন্দিরে দেবীকে প্রণাম করেন এবং শমীপত্র লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সেদিন যাত্রা করিলে সন্ধ্যাসর বিজয় হয়। এই উৎসবের নাম দশরা।

পূর্বের আলোচনা হইতে মনে হয়, তৃতীয় খ্রিষ্ট শতাব্দের পরে নবরাত্র ও দশরা আসিয়াছে। তৎপূর্বে উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও মহিষ-মর্দিনীর পাষণ প্রতিমা নির্মিত ও পূজিত হইত। মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মহিষমর্দিনী কল্পনার বিস্তার হইয়াছিল। চামুণ্ডা মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মহারাজার কুলদেবী। মৎস্যপুরাণে মহিষমর্দিনী-দশভুজা প্রতিমা লক্ষণ আছে, অস্ত্র পুরাণে নাই। মৎস্যপুরাণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রচিত মনে হয়, পরবর্তী প্রकरणে প্রমাণ দেওয়া যাইবে। সেখান হইতে কামরূপে কালিকাপুরাণে দুর্গাপূজা বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পুরাণ বৃদ্ধের দুর্গাপূজার আদি। এই অল্পমান সত্য হইলে দশম খ্রিষ্ট শতাব্দের পরে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রচারিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের দুর্গাপূজা-বিষয়ক নিবন্ধও-পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, রাজা সুরথ দুর্গার মূর্যমূর্তি পূজা করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজা সার্বণি মনু হইয়াছিলেন। দেবী ভাগবত অস্ত্র রাজারও নাম করিয়াছেন। এইরূপ দেবীর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত কালিকা-পুরাণ লিখিয়াছেন, ত্রোতাযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত রাম-চন্দ্রের হিতার্থে ব্রহ্মা দেবীপূজা করিয়াছিলেন। আরও আছে, রাবণ বসন্তকালে দেবীপূজা করিত। এই সকল উপাখ্যান পুরাণকারের স্বেচ্ছাকল্পিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত সুরথ রাজার উপাখ্যানে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

মনু এক কাল-সংখ্যা। একমনু কাল ২৮৪ বৎসর। (পরিশিষ্ট পত্র)। এই গণনার আদি হইতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মনু ইত্যাদি না বলিয়া এক এক নাম হইয়াছিল। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া যেমন অশ্বিনী ভরণী রুত্রিকা ইত্যাদি নাম আছে, তেমন মনু গণনাতেও আছে। আমরা শুনিয়া আসিতেছি বৈবস্বত মনুর অষ্টা-বিংশতিতম যুগের দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সে কোন বৎসর? আমার মতে খ্রী-পূ ১৪৪১ অব্দ। তখন বৈবস্বত মনুকাল চলিতেছিল। পরে সার্বণি মনু আসিয়াছিলেন। খ্রী-পূ ১২৬৮ অব্দে সার্বণি মনুর আরম্ভ এবং

২৮৪ অব্দে শেষ। পুরাণ মানিলে এই দুই অব্দের মধ্যে সুরথ রাজা ছিলেন। রাজা অবশ্য মন্থ হন নাই। মন্থ নামগুলি সংজ্ঞা যাত্র। বুঝিতে হইবে রাজা সুরথ সাবর্ণি-মন্থকালে ছিলেন।

ইহার সহিত পূর্ববর্ণিত মাহেশ্বর যুগ স্মরণ করিতে হইবে। দেখিয়াছি খ্রি-পূ ১১৯৩ অব্দে মাহেশ্বর যুগ আশ্বিন-শুক্লষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে শরৎ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা সপ্তমীতে দুর্গাপ্রতিমায় পূজা হইবার হেতু মনে হয়। দেখা যাইতেছে দ্বিবিধ গণনাতে খ্রি-পূ দ্বাদশ শতাব্দে আসিতেছে। ইহা আকস্মিকও হইতে পারে।

সুরথ কোল দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিদ্যাপর্বতের পূর্বাঞ্চলে এখনও কোল জাতির বাস আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নাগপুর প্রদেশে পঞ্চম খ্রিষ্ট-শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। বোধ হয় সে দেশে দুর্গার মূম্বয়ী প্রতিমা নির্মিত হইত। অতাপি জবলপুর অঞ্চলে হিন্দী-ভাষীর মধ্যে দেবী-প্রতিমায় পূজা চলিতেছে। এই পুরাণ কিস্কদন্তী আশ্রয় করিয়া সুরথ রাজার উপাখ্যান লিখিয়া থাকিবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে আর এক কল্পে বৈবস্বত মন্থর পুর সাবর্ণি মন্থকালে মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদে বৈবস্বত মন্থর জন্মবৃত্তান্ত আছে। বিবস্বান্ অশ্ববাচি দিনের সূর্য। সেই সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মন্থ। সব কথা দেবলোকের। মহিষাসুর বধও দেবলোকে হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৈবস্বত মন্থ, যম ও সাবর্ণি মন্থর জন্মবৃত্তান্ত উপাখ্যান আকারে লিখিত হইয়াছে। অতএব সেকালের সহিত সুরথ রাজার কালের বিরোধ নাই। পাঠকের কোতুলন নিবারণার্থে উপাখ্যানের অর্থ করা গিয়াছে। যে অর্থই করি, মনে রাখিতে হইবে আখ্যান নয়, উপাখ্যান। খ্রি-পূ দশম শতাব্দে দুর্গার কিস্কদন্তী দেবদেবীর মূম্বয়ী প্রতিমা নির্মাণের অল্প কোন প্রমাণ নাই।

পরিশিষ্ট

১। রাশি নক্ষত্র তিথি

রবি এক বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে। এক তারার হইতে সে-তারায় পুনরাগমন হইতে রবির যতদিন লাগে তাহা বৎসরের পরিমাণ। ইহা ৩৬০° অংশে বিভক্ত। এই বৃত্তকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি। ∴ ১ রাশি = ৩০° অংশ। রবির এক রাশি ভ্রমণ কালের নাম এক মৌর মাস। কিন্তু বৃত্তের আদি নাই, অন্ত নাই। কোন বিন্দু হইতে ১২ ভাগ করা যাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪২১ শকে (৪২১ খ্রিষ্টাব্দে) যে বিন্দুতে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল,

সেই বিন্দু রাশি-ভাগের আরম্ভ। কিন্তু পূর্বকাল হইতে যে পারম্পর্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত এই আদি বিন্দুর বিরোধ ঘটে। এই কারণে ৪২১ শক পরিত্যাগ করিয়া ২৪১ শকের (৩১২ খ্রিষ্টাব্দের) বাসন্ত-বিষুব স্থানে আদি-বিন্দু স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে বৎসর শুণ্যাব্দেরও আরম্ভ।

সে বৎসরকে ৬ ঋতুতে ভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বসন্ত	চৈত্র	৩৩°—৩৬° (বাসন্ত-বিষুব)
	বৈশাখ	০°—৩০°
গ্রীষ্ম	জ্যৈষ্ঠ	৩০°—৬০°
	আষাঢ়	৬০°—৯০° (দক্ষিণায়নাদি)
বর্ষা	শ্রাবণ	৯০°—১২০°
	ভাদ্র	১২০°—১৫০°
শরৎ	আশ্বিন	১৫০°—১৮০° (শারদ-বিষুব)
	কার্তিক	১৮০°—২১০°
হেমন্ত	অগ্রহায়ণ	২১০°—২৪০°
	পৌষ	২৪০°—২৭০° (উত্তরায়ণাদি)
শিশির	মাঘ	২৭০°—৩০০°
	ফাল্গুন	৩০০°—৩৩০°

শিশির ঋতুর বৈদিক নাম হিম। দেখা যাইতেছে সূর্য ১৫০° অংশে আসিলে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হয়।

তারার স্থির আছে। উক্ত বৎসরের পরিমাণও স্থির আছে। তারার তুলনায় বিষুব-বিন্দু মুহূর্তগতিতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে। প্রায় ৭২ বৎসরে ১ অংশ। ২৪১ শকে বাসন্ত-বিষুব বিন্দু যে তারার সমান্তরে ছিল, পরে উভয়ের মধ্যে অন্তর দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান ১৮৬৮ শকে ১৮৬৮—২৪১ = ১৬২৭ বৎসরে সে অন্তর ২২°৬৫ অংশ হইয়াছে। এই অন্তর গমন করিতে রবির প্রায় ২৩ দিন লাগে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ৩০ দিন। এই হেতু ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন বিষুব দিন হইতেছে। ভাদ্র মাসে ৩১ দিন; এই হেতু ৮ই ভাদ্র ইষ মাসের আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু আমরা ২৪১ শকের মাস ও ঋতু বিভাগ মানিয়া চলিয়াছি।

বিষুব বিন্দুর পশ্চিমগতি যত, বলা বাহুল্য, অয়নাদি বিন্দুরও তত। এক অয়নাদি হইতে সেই অয়নাদিতে পুনরাগত হইতে রবির যত দিন লাগে, তাহার নাম, সায়ন-বর্ষ। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগের নাম আতব মাস। সায়নবর্ষের পরিমাণ ৩৬৫°২৪২২ দিন। নাক্ষত্র বা নিরয়ন বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫°২৫৬৪ দিন। নিরয়ন বর্ষ অচল ঠাট, সায়ন বর্ষ সচল ঠাট বলা যাইতে পারে। সায়ন বর্ষের মাস ও ঋতু বিভাগ এইরূপ—

শিশির	তপস্	২৭০°—৩০০°
	তপস্র	৩০০°—৩৩০°
বসন্ত	মধু	৩৩০°—৩৬০° (বাসন্তবিষুব)
	মাঘব	০°—৩০°

গ্রীষ্ম	শুক্ল	৩০°—৬০°
	শুচি	৬০°—৯০° (দক্ষিণায়নাদি)
বর্ষা	নভস্	৯০°—১২০°
	নভস্য	১২০°—১৫০°
শরৎ	ইষ	১৫০°—১৮০° (শারদবিষুব)
	উর্জ	১৮০°—২১০°
হেমন্ত	সহস্	২১০°—২৪০°
	সহস্য	২৪০°—২৭০° (উত্তরায়ণাদি)

রবিপথ-বৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম নক্ষত্র। অতএব এক নক্ষত্র = $৩৬০ \div ২৭ = ১৩^\circ$ অংশ। সেই একই আদি-বিন্দু হইতে নক্ষত্র ভাগ হইয়াছে। প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া অশ্বিনী, ভরগী, কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে। রবি যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহার নাম রবিনক্ষত্র। চন্দ্র যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। পাক্ষিতে প্রতি দিনের যে নক্ষত্রের নাম থাকে তাহা চন্দ্রনক্ষত্র। চন্দ্রস্বর্গাদি গ্রহ রাশিচক্রের বা নক্ষত্রচক্রের যত অংশাদি অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নাম ভোগ। নক্ষত্র শব্দের মূল অর্থ নিকটস্থ কয়েকটি তারা লইয়া কল্পিত আকৃতি। যেমন মৃগাকার মৃগনক্ষত্র।

তিথি এক কাল-মান। রবি ও চন্দ্র পূর্বদিকে গুণমন করিতেছে। রবির গতি মন্দ। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। চন্দ্রের গতি দ্রুত। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। অমাবস্তায় রবি ও চন্দ্রের ভোগ একই থাকে। চন্দ্র রবিকে ছাড়িয়া পূর্বদিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। উভয়ের ১২° অংশ অন্তর হইতে যত দণ্ডাদি লাগে, তাহার নাম তিথি। ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস। ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণিয়া গেলে পূর্ণিমা ১৫ তিথি, অমাবস্তা ৩০ তিথি। ১২° অংশকে নক্ষত্র করিলে,

$$\frac{১২ \times ৩}{৪০} = \frac{৯}{১০} \text{ নক্ষত্র।}$$

তিথির অর্থ হইতে পাইতেছি,

$$\frac{C^\circ - R^\circ}{১২} = \text{তি}$$

এখানে C° চন্দ্রের ভোগাংশ, R° রবির ভোগাংশ, তি তিথির সংখ্যা। রবি ১৫০° অংশে আসিলে শরৎ ঋতুর আরম্ভ ও আশ্বিন শুক্লনবমীর অন্ত। তখন চন্দ্র ভোগাংশ কত?

শুক্লনবমী = $৯ \times ১২ = ১০৮^\circ$ । $R = ১৫০^\circ$ । অতএব $C = ১০৮^\circ + ১৫০^\circ = ২৫৮^\circ$ । ইহাকে নক্ষত্রে আনিষ্টল $২৫৮ \times \frac{১৩}{৩৬০} = ৯২.৩৫$ নক্ষত্র অর্থাৎ ১৯ নক্ষত্র গতে ২০ নক্ষত্রের অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়ার ৩৫ শতাংশ গত। অথবা, নক্ষত্রে গণিলে রবি $১৫০ \times \frac{১৩}{৩৬০} = ১১.২৫$ নক্ষত্র। তিথি শুক্লনবমী = $৯ \times \frac{১৩}{৩৬০} = ৮.১$, অতএব চন্দ্র নক্ষত্র = $৮.১ + ১১.২৫ = ১৯.৩৫$ ।

রঘুনন্দন দ্বত দেবীপুராণ মতে আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র কৃষ্ণনবমীতে নবম্যাতি-কল্প আরম্ভ হয়। সেদিন রবির ভোগ কত? পূর্বদিন ধরি। কৃষ্ণ-অষ্টমী = ২৩ তিথি। চন্দ্র নক্ষত্র, মৃগশিরা = $৫৯ = ৫ \times \frac{১৩}{৩৬০} = ১.৬৬$ অংশ।

$$C^\circ - R^\circ = ১২ \times \text{তি}। \quad ৬৬.৬ - R = ১২ \times ২৩ = ২৭৬^\circ।$$

$$\text{অতএব } R = ২৭৬^\circ - ৬৬.৬^\circ = ২০৯.৪^\circ।$$

$$+ R = ৩৬০^\circ - ২০৯.৪^\circ = ১৫০.৬^\circ।$$

দেখা যাইতেছে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিনে রবি শরৎ ঋতুতে প্রবেশ করে। নবমী শরৎ ঋতুর প্রথম দিন।

২। মাহেশ্বর যুগ

এই যুগ অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে। শতাব্দিক বর্ষ হইল জন বেটলী নামে এক ইংরেজ বঙ্গদেশে দ্বৈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্গণিত চর্চা করিতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণা বিকৃত ও হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার পুস্তকের নাম 'Historical view of Hindoo Astronomy.' (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড আছে।) তাহাতে সংক্ষেপে কয়েকটা যুগের তালিকা আছে। কিন্তু কোন বিবরণ নাই, যুগের উপযোগ নাই, প্রয়োগও নাই। বোধাইয়ের জ্যোতিষ কেতবর মহাশয় সেই তালিকা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রয়োগ বুকাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছে। যুগের পরিমাণ = ২৪৭ সাধারণ বর্ষ ১ মাস। প্রথম যুগ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়া ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীতে পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগ পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ হইয়াছিল। আশ্বিন শুক্লষষ্ঠীর নাম আদিকল্পষষ্ঠী ছিল। বোধ হয় কল্প শব্দের অর্থ যুগ। আদিকল্পষষ্ঠী প্রথম যুগের ষষ্ঠী, সেদিন রবির ভোগ ১৫০° অংশ হইয়াছিল। পরদিন আশ্বিন শুক্লসপ্তমীতে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ কাতিক শুক্লসপ্তমীতে হইয়াছিল ইত্যাদি ক্রমে এক এক যুগ এক এক মাস আগাইয়া আসিয়াছিল। খ্রি-পূ ১৪৪০ (শকপূর্ব ১৫১৭) অব্দে প্রথম যুগ। সে যুগের বৈশাখ শুক্লতৃতীয়া বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। পাক্ষিতে অক্ষয়া তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রাবণ শুক্লপঞ্চমীতে দক্ষিণায়নাদি। সেদিন নাগপঞ্চমী। কাতিক শুক্লাষ্টমীতে শারদ-বিষুব। পাক্ষিতে এই দিনের বিশেষ নাম পাণ্ডয়া যায় না। মাঘ শুক্ল-একাদশীতে উত্তরায়ণাদি। সেদিন ভীষ্ম একাদশী নামে খ্যাত। এই চারি দিনের প্রসিদ্ধি ও একা হেতু আমি মনে করি খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে এই যুগমালিকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অগ্র প্রমাণও আছে। বেটলী এই সকল যুগের কোন নাম দেন নাই। কেতবরও কোন

নাম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সোমসিদ্ধান্তে (মধ্যমাধিকারে) এক গার্গ্য শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার অর্থ অধুনা সপ্তম মন্থর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহেশ্বর ত্রৈলোক্য হইয়াছেন। অর্থাৎ, মহেশ্বর কালবিভাগকর্তা হইয়াছেন। বায়ু পুরাণে (৩২) চতুর্মুখ মহেশ্বর সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের কর্তা হইয়াছেন। চতুর্মুখ মহেশ্বরের প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত ও বায়ু পুরাণের শ্লোক হইতে আমার মনে হয় এই যুগের নাম মাহেশ্বর যুগ ছিল। মাহেশ্বর যুগের কয়েকটি তিথি ধরিয়া আমাদের কয়েকটি পূজার তিথি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মাহেশ্বর যুগ সাহায্যে বিষ্ণু, অয়নাদি ও আর্তব মাস সংক্রান্তি দিনের তিথি বাহির করিতে পারা যায়। ১২ আর্তব মাসে ১২ যুগ পূর্ণ হয়। অতএব $১২ \times ২৪৭ \text{ বর্ষ} = ২৯৬৪$ সায়ন বর্ষে যুগ-চক্র একবার আবর্তন করে খ্রি-পূ ১১২৩ অব্দে = ১২৭০ শকপূর্বে আশ্বিন শুক্ল সপ্তমীতে এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব $২৯৬৪ - ১২৭০ = ১৬৯৪$ শকেও সেইরূপ যুগ আসিয়াছিল। বর্তমান ১৮৬৮ শকে সে যুগ চলিতেছে।

উদাহরণ দ্বারা যুগের উপযোগিতা দেখাইতেছি। উদাহরণ ১। ১৮৬৮ শকে বাসন্ত-বিষুব দিনে কি তিথি হইয়াছিল? শকের পঞ্চম মাসে যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব সে বৎসরের ৭ মাস অবশিষ্ট ছিল। ১৮৬৮ শকের বাসন্ত বিষ্ণু দিন = ১৮৬৭ বৎসর + ১২ মাস। এখন বিয়োগ কর,—

$$\begin{array}{r} ১৮৬৭ + ১২ \\ ১৬৯৪ + ৭ \\ \hline ১৭২ \text{ বৎসর} + ৫ \text{ মাস} \end{array}$$

সায়ন বৎসরে ১১°০৪৮ তিথি

মাসে • ২২ তিথি বৃদ্ধি হয়। অতএব

$$১৭২ \times ১১°০৪৮ = ১৯০০°২৬$$

$$\begin{array}{r} ৫ \times ২২ = ৪৬° \\ \hline \text{যুগারম্ভে গত} \quad ৬ \end{array}$$

$$১৯১০°৮৬$$

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২০°৮৬ তিথি থাকে। অর্থাৎ সেদিন ২১ তিথি কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল। কোন চান্দ্র মাসের? আমরা জানি বাসন্ত বিষ্ণুদিন চৈত্র মাসের ৭ই হইয়াছিল। অতএব সেদিন চান্দ্রচৈত্র হইতে পারে না। পূর্ববর্তী চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণষষ্ঠী হইয়াছিল।

২। ১৮৬৮ শকের উত্তরায়ণাদি দিবসে কি তিথি ছিল? ২৭০° অংশে উত্তরায়ণাদি, ও নবম আর্তব মাস আরম্ভ। অতএব

$$১৮৬৮ + ৯$$

$$১৬৯৪ + ৭$$

$$১৭০ \text{ বর্ষ} ২ \text{ মাস গত}$$

$$১৭৩ \text{ বর্ষে } ১৭৩ \times ১১°০৪৮ = ১৯১১°৩০ \text{ তিথি}$$

$$২ \text{ মাসে } ২ \times ২২ = ৪৪$$

$$\text{যোগ} = ৬°$$

$$১৯১২°১৪$$

৩০ দিয়া ভাগ করিলে অবশেষ ২২°১৪ থাকে। ৭ই পৌষ উত্তরায়ণাদি। সেদিন চান্দ্রপৌষ অমাবস্তা হইতে পারে না। অতএব চান্দ্র অগ্রহায়ণ অমাবস্তা।

অথবা, সে বৎসর বাসন্ত বিষ্ণু দিনে তিথি ২০°৮৬। ২ মাসে ৮°২৮ তিথি বৃদ্ধি। যোগ করিলে ২২°১৪ তিথি হয়। রবির ভোগ জানা আছে। তিথি জানা গেল। পূর্বপ্রদত্ত সমীকরণ দ্বারা নক্ষত্র পাওয়া যাইবে। তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে পরিকল্পিত যুগদ্বারা অতীত প্রায় শুদ্ধফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়।

৩। বৎসর যুগ মন্থ

প্রয়োজনানুসারে বহুবিধ কালমান প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে মাহুযমান ও দেব বা দৈবমান প্রসিদ্ধ। মাহুযের ব্যবহারের নিমিত্ত মাহুযমান ও নৈসর্গিক ঘটনার কাল জ্ঞাপনের নিমিত্ত দৈবমান। আমাদের দিবস, বৎসর, যুগ বা কতিপয় বৎসরের সমষ্টি আছে। দৈবমানেও তেমন দিবস বৎসর ও যুগ আছে। আমাদের ছয় মাসে উত্তরায়ণ। দৈবমানে নাম দৈবদিবা, ছয়মাস দক্ষিণায়ন দৈবরাত্রি। আমাদের এক বৎসর এক দৈবদিবস। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈববৎসর ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের দৈবমানে প্রয়োজন নাই। যাহা লিখিতেছি, তাহা মাহুযমানের বৃত্তিতে হইবে।

১ কল্প যুগ-সহস্র অর্থাৎ ৪০০০ বৎসর। ১ কল্পে ১৪ মন্থ বা মন্বন্তর। অতএব ১ মন্থ-কাল ২৮৫°৭ বৎসর। কিঞ্চিদধিক ৭১ যুগে ১ মন্থ। অতএব ১ যুগ = ৪ বৎসর। এই চারি বৎসরের নাম কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এখানে এই চারি নাম চারি বৎসরের, যুগের নয়। ইহার প্রমাণ দিতেছি। মহাভারতে বনপর্বে পাণ্ডববনিগের বনবাসকালে লোমশ ঋষি বলিতেছেন, “হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি” (১২।১১২)। আর এক স্থানে (১২৫।১৪), সেইরূপ কথা আছে। পাণ্ডবেরা বনবাসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। সেই সময় মধ্যে অন্ততঃ দুইবার ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি হইয়াছিল। আর একস্থানে (১৪৮।৩৭), ভীম ও হনু-মানের তর্ককালে উক্ত হইয়াছে, “অচিরে কলিযুগ প্রবর্তিত হইয়াছে।” অতএব ৪ বর্ষে ১ যুগ জানিতে হইতেছে। এই মন্থ গণনার আদি কোথায়? সেই আদি আমাদের

জাত কোন অঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত না করিলে মনু দ্বারা কাল নির্ণয় হইতে পারে না। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে, খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে মনুগণনার আদি বা কল্পাদি। এই বৎসর রোহিণী তারার সমস্ত্রে বাসন্ত-বিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী, পরদিন শুক্লদশমী আমরা দশহরা নামে পালন করিতেছি। এখন আমরা সপ্তমমনু, বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরের খ্রিষ্টাব্দ পাই-তেছি। যথা। কল্পাদি=খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে গত, ৬ মনু $২৮৪ \times ৬ = ১৭০৪$ বৎসর সপ্তম মনুর ২৭ যুগ $৪ \times ২৭ = ১০৮$, কৃত ত্রেতা দ্বাপর ৩ বর্ষ = ১৮১৫ বর্ষ। খ্রি-পূ ৩২৫৬ - $১৮১৫ =$ খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দ। ইহা কলি বৎসর। অতএব খ্রি-পূ ১৪৪১ অব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর প্রথম মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। অতএব ২০০০ বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রি-পূ ৩২৫৬ - ২০০০ = ১২৫৬ অব্দের পরে অষ্টম মনু সাবণি মনু আরম্ভ হইয়া ২০৮ বৎসর চলিয়াছিল।

ঋগ্বেদের কাল হইতে যাজ্ঞিকের পাঁচ বৎসরে যুগ গণনা করিতেন। এই পাঁচ বৎসরের সম্বৎসর, পরিবৎসর ইত্যাদি পাঁচ নাম ছিল। পুরাণে ও পাজিতে এই পাঁচ বৎসরের নাম আছে।

কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ প্রসিদ্ধ। প্রথমে প্রত্যেক যুগের পরিমাণ সহস্র মানুষ্যবর্ষ ছিল। চারি যুগে চারি সহস্র বৎসর এক কল্প। পরে ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে কলির পরিমাণ ১২০০ মানুষ্য বৎসর হইয়াছিল। দ্বাপর কলির দ্বিগুণ, ত্রেতা ত্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুগুণ। একুনে চারি যুগে দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়াছিল। পাজিতে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিমাণ লিখিত হইতেছে তাহা দৈবযুগের। মানুষ্যকলি ১২০০ মানুষ্যবৎসর, দৈবকলি $১২০০ \times ৩৬০ - ৪৩২০০$ মানুষ্যবৎসর। তদনুসারে মনুস্মৃতি দৈবমানে অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। পাজিতে দৈবমানে লিখিত হয়।

দেহ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমার সর্বদা যেই যে ব্যাকুল বাণী
যত অশ্রুধোত শান্তি লইয়াছে মানি
আপনার পরিণাম সন্দেহ প্রকাশে
বিকশি উঠেছে আজি শোভা আর বাসে
পুষ্প সম পূর্ণ হয়ে; কিছু সার্থকতা
লভেছে ফোটার মাঝে, আর যত কণ
কহিবার বাকী আছে—নৈবেদ্য তোমার
শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার।

তুমি কেনো এই দেহ প্রাণের বিকাশ
তাই এত বাণী ফুটে, গানের আভাষ
হেথা বিশ্বলোক ছানি বাসা বাধিয়াছে
তোমারে শুনাবে বলে; তাই মিশে আছে
দেহের অতীতাকাশে তোমার প্রভাতে
এ জীবনে যা শুভ্রতা নক্ষত্রের সাধে।

নব-যুগ-রবি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

আকাশের কূলে কূলে নিবিড় আধার,
নিশাচর স্বাপদেরা করে কলরব,
দিকে দিকে দানবের বীভৎস তাণ্ডব;
কল্প বক্ষে দেবে, আর রুদ্ধ করে দ্বার
প্রাণপণে ভীরু মনে গীড়িত মানব।
ভাবে—অবসান বুঝি নাহি হবে তার
এ দুখ-রাত্রির, আর এ বিভীষিকার,
জাগিবে না কোন দিন আলোর গৌরব।
তাই চূপে চূপে আসে নক্ষত্র-আলোক,
নিঃশব্দে চূষন করে স্বদীর্ঘ চিকুর
প্রান্ত ধরণীর। জাগে অপূর্ণ পুঙ্ক
বেদনার বীণাটিতে ঝঙ্কারিয়া স্বর
নিখিলের কানে কানে কহে—ওরে কবি,
পূরব গগনে ওঠে নব-যুগ-রবি।



জলপাইগুড়ি : তিস্তানদীর বুকে

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

..

১

ডুমার্সের জঙ্গলে বাঘের ফোটোগ্রাফ তোলা কি ভাবে সম্ভব এই নিয়ে ডুমার্স জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত শিকারপ্রিয় অশোকের সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে কথা হয়। ডুমার্সের জঙ্গল শিকারী মাজেরই কাছে একটি তীর্থস্থানবিশেষ। অনেকেই এখানে বাঘ মেরেছেন কিন্তু জংলী বাঘের ফোটোগ্রাফ নেওয়া সম্পর্কে কোনো বাঙালী শিকারীর কখনও কোনো আগ্রহ হয়েছে বলে জানা নেই। শিকার করা এবং শিকারের ছবি তোলা একই সঙ্গে একা লোকের পক্ষে অবশ্য সব সময় সম্ভব হয় না, অথচ বন্দুক নিয়ে শিকার করা আর ক্যামেরা নিয়ে শিকার ধরা এ দুটো কাজই যে-কোনো অভিজাত শিকারীর পক্ষে সমান লোভনীয়।

অশোকের কাছে শুনলাম ইউরোপীয়ান ছাড়া এ দেশে সে রকম সফল চেষ্টা কেউ করেন নি। (এবারে একটি ফরেস্ট অফিসে গিয়ে আমি কয়েকখানা বাঘের ছবি দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সেগুলো সবই ফ্ল্যাশ আলোতে তোলা এবং প্রত্যেকখানাই অতি সুন্দর।)

এ রকম ছবি তোলা একটা অসম্ভব কিছু নয়, সবই পূর্ব আয়োজন সাপেক্ষ। খরচও বিশেষ কিছু নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্যের। যে-কোনো সুজ্ঞান

ফোটোগ্রাফার এ কাজ অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নিরুৎসাহজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ রকম ছবির চাহিদা এ দেশে সে রকম নেই। কাজেই এ দেশের শিকারী বাঘ মেরে তার উপর একখানা পা তুলে দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে যে জঘন্য ছবি তোলা তাইতেই তিনি ও সে ছবির দর্শকেরা তৃপ্ত।

যুদ্ধের পরে, গত বৎসর অশোক জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাইথন শিকার করেছিল; তার ছবিখানা এবারে আমাকে দেখাল, এবং পুরাতন প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করে বলল, তুমি শিকারের ছবি তুলতে রাজি থাক তো এবারে চল।

কিন্তু শিকারের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে অন্তত একবার পরিচয় না ঘটলে কথা দেওয়া শক্ত। তা ছাড়া ক্যামেরার শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ আলো জ্বালাবার যে পৃথক বন্দোবস্ত থাকা দরকার তা আমার নেই—বাজারে এখন সে রকম ফ্ল্যাশ কিনতেও পাওয়া যায় না, কাজেই ইতস্তত করছিলাম।

শিকারের ফোটোগ্রাফ আমাদের দেশে যে তোলা একান্ত প্রয়োজন সে কথা অশোক গভীর ভাবে চিন্তা করছে। এ জঙ্গে আমার খুব আনন্দই হ'ল। সত্যিই কোনো ফোটোগ্রাফার যদি একান্ত ভাবে শিকারের ছবি নেওয়ার জঙ্গে উঠে-

পড়ে লাগেন তা হলে তাঁর ছবিগুলো বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে পারে। তবে তাঁকে আর সব ভুলে একমাত্র ক্যামেরা নিয়েই থাকতে হবে। আমাদের মতো ছুটির দিনের সৌখিন ফোটোগ্রাফার হলে চলবে না।



গৌরীহাট সংলগ্ন মদনমোহন মন্দির ও পুজারী

আমি বললাম ক্যামেরা নিয়ে বেরলে অবশ্য অনেক কিছুই কাজ হতে পারে। বাথের ছবি না তুললেও অন্তত হরিণের ছবি তোলা যেতে পারে।

অশোক বলল, তার চেয়েও ভাল জিনিস আছে। এবারে হাতী-খেদায় হাতী ধরা দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তুমি যদি যাও তা হলে একটা নতুন জিনিসের ছবি নিতে পারবে।

তবে কি আসাম যেতে হবে?

অশোক বলল, এই বাংলাদেশেই হাতী ধরা হয়। জল-পাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভুটানের পায়ের কাছে যে গভীর জঙ্গল আছে সেইখানে হাতী ধরা হয়। জায়গাটা আসামের খুবই কাছাকাছি এবং নামে বাংলাদেশ হলেও পরিচিত বাংলাদেশের কোনো চিহ্নই সেখানে নেই।

বলা বাহুল্য, এ রকম নিরাপদ প্রভাবে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্বাস্থ্য কিছু খারাপ ছিল, সেজঙ্গে স্বভাবতই দুর্গম স্থানে ভ্রমণ আমার পক্ষে একটু দুঃসাহসিকতার ব্যাপার ছিল, কিন্তু তবু এ সুযোগ ছাড়ায় মন রাজি হ'ল না। তা ছাড়া ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে পড়লাম দক্ষিণ মেরু অভিযানের জঙ্গে ইউরোপ আমেরিকা থেকে তোড়জোড় চলছে।—কল্পনা ক'রে নিজের সাহস বেড়ে গেল।

কিন্তু কথটা বজ্রমহলে প্রচার ক'রে হ'ল মুশকিল।

তারা বলতে লাগল ডুয়ার্সে এমন ভীষণ ম্যালেরিয়া যে

সেখানে কেউ এক বার গেলে অস্থ দেহে ফিরে আসে না। আর সে না কি সবই প্রায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। বিশেষ ক'রে যারা বাইরে থেকে ওখানে নতুন যাচ্ছে তাদের ভয় সব চেয়ে বেশি। তাদের মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

দু-তিন দিন ধরে এই ধরনের সব কথা শুনে শুনে মনে বেশ ভয় জেগে উঠল, এবং সর্বশেষ যার সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বক্তৃতা দিয়ে রক্ত জমিয়ে দিলেন।

ভূষণকে আরও কয়েকবার বক্তৃতা দিতে দেখেছি। দাদার সময়, শহরের লোকের তখন মাথার ঠিক নেই, সেই সময় তাঁর বক্তৃতার অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলাম। পাড়া রক্ষা করা যায় কি ভাবে এই বিষয়ে যারা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন, আসবার সময় বেশ উৎসাহ দেখেছি তাঁদের মনে, কিন্তু ভূষণের কাছে এসে তাঁরা একটু কথা বলবারও সুযোগ পান নি, চুপ ক'রে শুনেছেন তাঁর উচ্ছাসপূর্ণ বক্তৃতা এবং শোনবার পরে তাঁরা আধমরা হয়ে ফিরে গেছেন। অনিবার্য ধ্বংসের বিভীষিকাপূর্ণ চেহারা তাঁদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। অবসন্ন মনে, কম্পিত চরণে, তাঁরা ধরে ফিরে গিয়ে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

২৩ নবেম্বর। সন্ধ্যায় আমার পুরাতন ভ্রমণসঙ্গী সুধাংশু-প্রকাশ এবং আমি রওনা হব, আয়োজন করছি এমন সময় হঠাৎ ভূষণ এসে হাজির।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ডুয়ার্সে।

বলেন কি? উদ্বেগ?

দেহটা ভাল নেই, দিন পনেরো একটু বাইরে কাটা ব।

তাতে আত্মার সদগতি হতে পারে, দেহটার নয়।

কি রকম?

সেটাকে ওখানেই রেখে আসতে হবে, আগেই বলে দিছি।

ভয়ের কারণ আর এমন কি থাকতে পারে, মাহুষ তো সেখানে থাকে?

রেখে দিন মাহুষ। আমি বলছি যাবেন না।

মনে পড়ল গত বারে অশোকের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কিন্তু তবু সে এবারেও যাচ্ছে সেই ডুয়ার্সেই। তাই বললাম, যিনি আমাদের ডাকছেন তিনি মারাত্মক কিছু আশঙ্কা করলে নিজেও যেতেন না। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া যখন কলকাতাতেও হয়, তখন ভয় ক'রে লাভ কি? তিনি অনেক বার ওখানে শিকার করতে গিয়েছেন।

তিনি তো তা হলে বাথের মুখে যাচ্ছেন—মশার মুখে যেতে তাঁর তো ভয় থাকবার কথা নয়। কিন্তু আপনি কেন যাবেন? বিশ্বাস করুন, আমি ডুয়ার্সে থেকে জানি। এখন হাজার টাকা দিলেও দ্বিতীয় বার আর যাব না।

এ কথার পরে আমাদের ভয় যে বেড়ে গেল তা বলা বাহুল্য। তখনই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। বললাম সাবধানের

যখন মার'নেই, তখন আগেই কুইনিন ইন্জেকশন নিয়ে নিলে হয় না ?

ডাক্তার বললেন, দরকার নেই, রোজ একটা ক'রে মেপাক্রিন খেলেই চলবে। ভয় কমে গেল, এবং এই ব্যবস্থামতে চলে কোনো বিপদেই পড়ি নি। (তা ছাড়া আরও একটি কথা আগে থাকতেই বলে রাখি যে জলপাইগুড়ি শহরে দু'চারটে মশার দেখা পেলেও ডুয়ার্সের অরণ্যে যত দিন ছিলাম একটি মশার চেহারাও দেখি নি।)

সন্ধ্যা সাতটায় দার্জিলিং মেল। নবেম্বরের শেষে যাচ্ছি, কাজেই জলপাইগুড়িতে নিশ্চয় প্রবল শীত, এই আশঙ্কা করে আগে থাকতেই প্রায় দার্জিলিং যাবার পোষাক পরে নিয়ে-ছিলাম। জানতাম গাড়িতে ভিড়ের মধ্যে আর মাথপথে গরম জামা পরার সুবিধা হবে না, কারণ আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে যাচ্ছিলাম। গাড়ি ছাড়বার সময় হচ্ছে ৬-৫০, কিন্তু আমরা সাড়ে পাঁচটায় গিয়েও কোনো রকমে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ভিড় বাড়তে লাগল এবং গাড়িও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করেও কেন যে ছাড়তে অকারণ দেরি করতে লাগল জানি না, কিন্তু আমরা মুশকিলে পড়লাম গরম পোষাকে। দার্জিলিং মেলই যে দার্জিলিং নয়, এ কথাটা ভবিষ্যৎ শীতকে অগ্রাহ করেও আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

দার্জিলিং মেল দার্জিলিং নয়, কিন্তু আমরা যে গাড়িখানায় বসেছিলাম তাকে ভারতবর্ষ বলতে কারও আপত্তি হবে না। একেবারে অথও ভারতবর্ষ। মানুষকে ধীরে ভালবাসেন তাঁরা ভারতবর্ষীয় রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করবেন। দেববেন যুযু'রোগী থেকে শুরু করে বিশালদেহ পালায়ান সবাই এসে ভিড় করেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, ওড়িয়া, আসামী, বিহারী, পঞ্জাবী, নেপালী, ভূটিয়া, মাদ্রাজী সবাই আছে। মালপত্র এক এক জায়গায় পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। ভিড়ের চাপে প্রত্যেকে নিশ্বেষিত, কিন্তু সেলিকে কারও জ্রঙ্ক্ষেপ নেই, মনকে পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত রাখবার অভাবনীয় কৌশল এদের জানা আছে। একই কামরায় তিন-চারটি প্রদেশের তিন-চার জন লোক বিভিন্ন সুরে গান ধরেছে—অথচ কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ম্যালেরিয়ার রোগী জন্মে আত'নাদ করছে, মেয়েদের কোলের কোনো কোনো শিশু-সন্তান তারধরে চীংকার করছে, আর একজন রোগী ক্রমাগত কাসতে কাসতে মরবার উপক্রম হচ্ছে, কিন্তু কারও দিকে কারও চেয়ে দেখবার দরকার নেই। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরকাল ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্তে পথের সকল রকম দুর্দশা বেছায় বরণ করে নিয়েছে। রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেও দেখা যাবে সেই একই ভারতীয় জীবন-দর্শনের প্রতিচ্ছবি।

এর জন্তে রেল কোম্পানীকে বক্তবাদ। যারাই টিকিট কিনতে গিয়েছে তাদেরই কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, এবং

যত চেয়েছে তত দিয়েছে। আসনের হিসাব নেই, সুখ-সুবিহার প্রশ্ন নেই, হিসেব চলছে শুধু বুকিং অফিসে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যদি কেউ তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তবে সেই যাত্রীর কোনো অপরাধ নেই। ঐ কামরায় যে তোমাকে উঠতে দিয়েছে, তাকেও সেই উঠতে দিয়েছে। তোমারও যেমন যাওয়া দরকার, তারও তেমনি যাওয়া দরকার। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নাও, এবং যদি মনের অবস্থা অতুল থাকে তা হলে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপটি প্রত্যক্ষ করবার পুরো সুযোগ গ্রহণ কর চতুর্দিকের মানবিক চাপের মধ্যে বসে।

২৪শে নবেম্বর ভোর ছটায় গিয়ে নামলাম জলপাইগুড়িতে। কলকাতা বসে হিমালয়ের কাছাকাছি যে শীতের আশঙ্কা করেছিলাম, এখানে এসে দেখি সে রকম কিছুই নয়। আমরা ষ্টেশন থেকে চা খেয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটের মধ্যে। সাইকেল-রিকশা এখানকার প্রধান বাহন। শহরের পথও বেশ চমৎকার। আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অশোক আমাদের টেনে নিয়ে গেল তেতলার ছাদে। বলল একটা দৃশ্য দেখবে চল। ছাদে উঠেই দেখি নির্মল নীল আকাশের বৃকে স্বর্ণবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘার অনাবৃত অপরূপ রূতি। ইতিপূর্বে দার্জিলিঙের পথে জলপাইগুড়ি থেকেই এ দৃশ্য বার বার দেখেছি, কিন্তু এত ভালভাবে দেখবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু সব সময়েই এ দৃশ্য কেন জানি না সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়। হয়তো আমি যত বার দেখেছি তত বারই একভাবে বহুক্ষণ ধরে দেখতে পারি নি। সে দিনও দেখতে দেখতে নিচের মেঘ ধীরে ধীরে উপরে উঠে সমস্তটা দৃশ্য ঢেকে ফেলল। ভোরে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার আবির্ভাব না দেখলে এর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখা হয় না। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। স্বর্ষ্যোদয়ের কয়েক মুহূর্ত আগে সর্বোচ্চ চূড়াটি প্রথম আলোর স্পর্শে এককুঁখানি দৃশ্য হয়। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য হাতের তুলির স্পর্শে ঐ জায়গাটার প্রথম রং লাগল। তারপর তুলি চলতে লাগল ধীরে ধীরে। অনেকগুলো চূড়ার উপরের লাইনটি আঁকা হয়ে গেল। উপরে নিচে কিছুই নেই—আকাশের গায়ে শুধু পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপী একটি স্বর্ণবর্ণ তরঙ্গায়িত রেখা। তারপর ধীরে ধীরে নিচের দিকেও রঙীন হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তবু এ দৃশ্য একমাত্র আঁকা ছবির সন্ধেই তুলনীয়। এমন জীবন্ত প্রকাশ, এবং পরিচিত সকল বস্তুসীমার এত উর্ধ্বে অবস্থিত এবং এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল যে এ দৃশ্যকে অবাস্তব না ভেবে পারা যায় না।

অবাস্তবকে উড়িয়ে দিয়ে এবারে বাস্তবে আসা যাক। এখানকার খাওয়ার কথাটা দীর্ঘকাল র‍্যাশন এলাকাবাসী কাকরভোগীর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ সরা চাল এখানে সব সময়েই মেলে। এখানকার মাছও বেশ সুখাদ্য। মিষ্টায়ও অতি উপাদেয়। সন্দেশ বা

রসগোল্লায় এমন একটা কোমল মাধুর্য আছে যা কলকাতার শ্রেষ্ঠ মিষ্টানের চেয়েও স্বতন্ত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো মহিমময় দৃষ্টির পাশে বসে ভারতের সঙ্গে হিমালয়ের পাথর চর্চণ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকত, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক বলে আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের নিতান্তই অমুকুল। এখানে এসে হিমালয়কে আর উদরে পূরতে হ'ল না।

প্রত্যুষের প্রথম দৃষ্টি মন ভরে উঠেছিল, দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলপাইগুড়ি জেলা অত্যন্ত ভাল লাগতে লাগল। বিকালে বেড়াতে যাওয়া গেল তিস্তা নদীর দিকে। এখানে এই নদীটি বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। বহু প্রশস্ত নদী, কিন্তু এখন জল শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নদীর মাঝখানে অনেক-গুলো চর জেগে ওঠাতে দৃষ্ট নতুনতর হয়ে উঠেছে, এক নদী বহু চর বুকে নিয়ে বহু নদীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের পায়ের কাছেই নদীর অংশটি খুবই সঙ্গীর্ণ। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সন্ধ্যের প্রকাশ চরের আর এক প্রান্ত থেকে মধুর গান গেয়ে এক রাখাল তিনটি বাছুর নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। তিনটি বাছুর ও রাখালের চলমান মূর্তি শাদা বালির উপর বহু দূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্বর্ষ ডুবে গেছে অলক্ষণ আগে। ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার পর তিনটি বাছুর ও তাদের রাখাল জলে নামল। জল অগভীর। অত্যন্ত স্বচ্ছ। ওরা যখন যুদ্ধ শ্রোত ঠেলে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল তখন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি রাখাল রাখাল-বালক নয়, বাঙালী গৃহস্থ বালিকা। বয়স বছরদশেক হবে। ক্রম পরে হাতে ছোট লাঠি নিয়ে ওপারে বাছুর আনতে গিয়েছিল। তার গানের সুর তখনও ধামে নি। গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না, মনে হ'ল কথা তার কাছে অবাস্তব। আমাদের কাছেও। কিন্তু সেই গোবুলি অন্ধকারে দিগন্তবিস্তৃত বালুচরের উপর লেই ছবি, সেই সুর, মনকে একটি অপক্লপ আনন্দে ভরে তুলল।

সন্ধ্যার ফিরে এসে শোনা গেল আমাদের অরণ্য-পথে যাওয়ার আরও দু-এক দিন দেরি হবে, গাড়ি তেল ইত্যাদির যোগাযোগ ঠিকমত ঘটে উঠছে না। তা ছাড়া যে সব পথে মোজা যাওয়া যায় সে সব পথের সব জায়গায় এখনও বড় গাড়ি চলবে না। বড় গাড়ি মানে ট্রাক। ট্রাক ভিন্ন অন্য কোনো গাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সঙ্গে অনেক মাল-পত্র। শুনে মনটা ধারাপ হয়ে গেল। কিন্তু দমলাম না। যদি জলপাইগুড়িতে দু-এক দিন থাকতেই হয় তা হলে এখানকার পল্লী অঞ্চলের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা যাবে এই ভেবে কিছু উৎসাহ বোধ করলাম।

২৫ নবেম্বর। শহরের প্রান্তে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছি। বেলা নটা। ক্ষেতের পারে বহু দূর দিগন্তে গাছপালার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ধান পাকতে শুরু হয়েছে কিন্তু এখনও

কাটা শুরু হয় নি। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই রকম সুবিশীর্ণ ধানক্ষেত দেখা যায়। এর দিকে চাইলে কল্পনা করা শক্ত যে এ দেশে লোকে ভারতের অভাবে মারা যেতে পারে। অথচ এ দেশে ধানের প্রাচুর্যও যেমন সত্য, হুর্ভিক্ষও তেমনি সত্য। আমরা ভাঙাচোরা উঁচুনিচু পথে এগিয়ে চলেছি। ধানক্ষেতের এপারে চাষী পল্লী। ওদের সবই ছোট ছোট খড়ের ঘর। বাড়ির জমির সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে কলা গাছ। সমস্তটা মিলে বেশ একখানি ছবির মতো মনে হচ্ছে। আমরা যে পথে চলেছি সে পথে বহু যাত্রী চলেছে নদীর দিকে। একটু পরেই তিস্তার ধারে এসে পড়লাম। চার-পাঁচ জন ডাক-হরকরা বড় বড় চিঠির থলে মাথায় নিয়ে হন হন করে চলেছে। তারা নদী পেরিয়ে যাবে রেল-স্টেশনের দিকে।

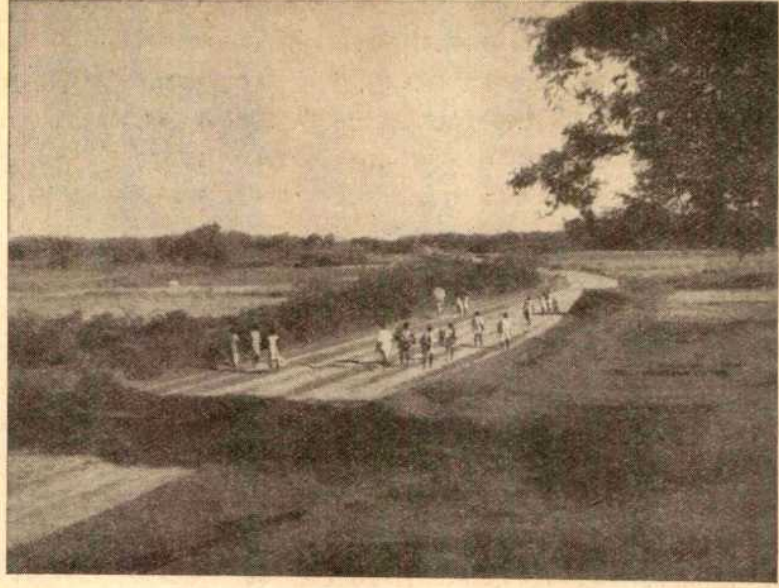
দিনের প্রথর আলোয় তিস্তার রূপ ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল। নদীর অগভীর জল ঠেলে পিঁপড়ের শারের মতো মানুষের সার নদী পারাপার করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে নদীর পাড়, কিন্তু জল বহু দূরে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। এই বিশীর্ণ নদীর বুকে অগভীর জলে এক বৃদ্ধা একটা ছোট ষামা কাঁখে নিয়ে লাঠি হাতে কি যেন বুঁজে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরা ব'লে মনে হ'ল না। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানে ছিলাম, তার খোঁজা তখনও শেষ হয় নি। তাকে দেখে পরশ-পাথর-খোঁজা ক্যাপার ছবিটি মনে জাগছিল। বৃদ্ধিত ছবিখানা দেখলেই সেটা কল্পনা করা যাবে।

তিস্তা নদীর ধারে বেড়ানো এমনি ভাল লাগল যে বিকেলে আমরা আবার এলাম সেখানে। নদীর ধারে এই রকম ষোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় শহরের কাটিকে বেড়াতে দেখলাম না। বেড়ানোর মত এমন মূল্যবান জায়গা, অথচ একেবারে নির্জন, কেবল বারা পার হয়ে যাচ্ছে তারা ভিন্ন আর লোক নেই।

সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখন মুসলিম লীগের বাইরে-থেকে-আসা কয়েকজন লোক নাকি একটি মত বসিয়েছিল, তার আভাস পাওয়া গেল পথে। বহু উৎসাহী যুবকের ছোটোছোটো এবং ব্যস্ততা দেখলাম। পূর্বদিন ওদের একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল শহরে—শহরে উত্তেজনা সৃষ্টির নাকি চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় নেতারা নাকি হিন্দু-মুসলিম প্রীতি নষ্ট করার বিরোধী, তাই বাইরের লোকেরা বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি।

বিদ্যুত্তের আলোতে পথের উপর একটি বিজ্ঞাপন দেখে চমকিত হলাম। পাটকটির বিজ্ঞাপন। স্বভাবতই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু হওয়া গেল না। দেখে মনে হ'ল রুটি প্রস্তুতকারক রুটির ক্রেতাকে স্তম্ভিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি ফরাসী ভাষায় প্রচার করতে চেয়েছেন। তাই বড় বড় বাংলায় কয়েক সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে, “দ্য লোক অ্যান্ড”। দেশী কটিতে এই জাতীয় ফরাসী শব্দ মিশ্রিত হয়ে কি দাঁড়িয়েছে তা ভুলভোগীরাই জানেন।

২৬শে নবেম্বর। আজ দুপুরের একটু পরেই যাওয়া গেল জলপাই-গুড়ির উত্তরে একটি পল্লীগ্রামের হাট দেখতে। হাটটির নাম গৌরীর-হাট, কেউ কেউ রাজারহাটও বলে। মোটর গাড়িতে গিয়ে-ছিলাম। আমরা যখন হাটের কাছে এলাম তখন হাট সবে বসতে শুরু করেছে, তাই তখনই সেখানে না থেমে ঐ পথে আরও আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বসলাম খন্টা-খানেকের জন্তে। আমরা যে পথে এলাম সে হচ্ছে শিলিগুড়ি রোড। শিলিগুড়ি উনত্রিশ মাইল দূরে। উঁচু জায়গাটা থেকে চারদিক বেশ দেখা যাচ্ছিল। এর পিছনেই মাঝারি আকারের একটা দীঘি। চারদিক দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রামে যাবার বহু পথের



গৌরীরহাটের পথে

চিহ্ন। নানা গ্রাম থেকে হাটের পথে বেরিয়ে আসছে নানাজাতীয় জীপুরুষ। হিন্দু মুসলমান সবাই চলেছে। কেউ বা চলেছে গরুর গাড়িতে। এখানকার আদি-বাসিন্দারা রাজবংশী। আমাদের দেশে এরা “বাহে” নামে পরিচিত। এদের মেয়েরা একঝানা গুড়ি জাতীয় বস্ত্র বুকের মাঝামাঝি জায়গায় এঁটে পরে। সে কাপড়ে আর কোনো বাহুল্য নেই, দেহটাকে শুধু ঘিরে রাখে মাত্র। এই অদ্ভুত শাড়ীর নাম হচ্ছে পোতা।

আমরা চারটের পর এলাম হাটে। বেশ বড় হাট। তরিতরকারী, কমলালেবু, কলা, চাল, পান, সুপারি, চুন, ধেলনা এবং কলকাতা থেকে আমদানী নানা রকম সস্তা মনোহারী জিনিস। পোতা শাড়ী এবং গামছা ইত্যাদিও অনেক এসেছে। তা ছাড়া স্থানীয় রাজবংশী মালাকরদের শোলার উপর চিত্র-বিচিত্র আঁকা দেবদেবীর মূর্তি। হাটে সাঁওতাল মেয়েপুরুষও অনেক এসেছে। হিন্দু মুসলমান সবাই আছে। তারা সবাই গ্রামবাসী। স্বাস্থ্য তাদের কারোই বিশেষ ভাল দেখলাম না। অত্যন্ত নিরীহ, চাষুরাস ক’রে কিংবা তরিতরকারী বেচে খায়। জলপাইগুড়িতে বহিরাগত লীগনেতার আগমনে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনো চাকল্য জেগেছে কিনা লক্ষ্য করছিলাম। দেখে মনে হ’ল এরা বহু পুরুষ ধ’রে যেভাবে এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস ক’রে আসছে তার ছাপ প্রত্যেকের মুখে লেগে আছে। এরা খেতে পায় না, দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন, ঠিক এখানকার হিন্দু গ্রাম-বাসীদের মতোই। তাই এদের মধ্যে কোনো আত্মঘাতী প্ররুতি জাগে নি। হিন্দু মুসলমান দুই গরিব প্রতিবেশী—দুজনের স্নেহে

সুখী, দুঃখে দুঃখী, আজ হঠাৎ এরা পরস্পর মারামারি করবে কেন তা এরা জানে না।

হাটের পাশেই একটি মন্দির আছে—মদনমোহন বিগ্রহের মন্দির। বিগ্রহ বহুদিনের, কিন্তু মন্দিরটি অল্পদিন হ’ল জলপাই-গুড়ির রাজার টাকায় তৈরি হয়েছে স্তন্যল্যাম। মন্দিরের সংলগ্ন জমিতে সুপুরি গাছের বাগান। বাগানকে ঘিরে রেখেছে ছুর্ভেদ্য বাঁশবন। এত লম্বা লম্বা বাঁশ এর আগে দেখি নি। এর পাতাগুলো একটু বেশি সরু ব’লে মনে হ’ল। এই বাঁশবনের ছায়ায় ঘেরা সুপুরি গাছগুলোর প্রত্যেকটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে পানের গাছ। সুপুরী গাছ যত উঁচু পানের লতাও ততখানি উঁচু হয়ে উঠেছে। একে বলে গাছ পান। পান গাছ ও সুপুরি গাছের এই অদ্ভুত মিলন বেশ মজার মনে হ’ল।

আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সরোজবাবু ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সকলের পরিচিত। এঁর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আমরা বেশ খাতির পেলাম। পূজারী আমাদের চা খাইয়ে অন্তর্ধান করল।

আমরা বসে থাকতে থাকতে এক ভিখারী রোগী এল ঐ মন্দিরে। সে পূজারীর কাছ থেকে দেবতার রূপা ভিক্ষা করতে এসেছে। জরে কাঁপছিল। ম্যালেরিয়া কিংবা কালাজ্বর হবে। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় ক’রে দেওয়া হ’ল। এইখান থেকে আবার আমরা হাটে এলাম। হাটের ভিতরে ধান চালের আমদানী হচ্ছেছিল অনেক। খুব সরু চাল টাকায় সওয়া পের এবং মোটা লাল আমন চাল আড়াই সের ক’রে বিক্রি হচ্ছিল। আমরা মালাকরদের শোলার উপর আঁকা

হবিগুলোর দিকে আরুঠ হলো। মনসা দেবী, কালী ও পুজারিগীদের ছবি তুলি ও রঙের সাহায্যে আঁকা। কালীর মূর্তিতে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। পুজারিগীদের ছবি সবই এক রকম। কিন্তু অনেকগুলো পর পর আঁকলে অতি চমৎকার একটি প্যাটার্ন হয়। আমরা ইচ্ছে করলে এই প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অভ্যন্তর ব্যবহার করতে পারি। কালী ও পুজারিগীদের মূর্তি এঁকে এরা যে জিনিষ তৈরি করেছে তা ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা যায়—অথবা ল্যাম্পের শেড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ল্যাম্পে লাগিয়ে দেখা গেছে তারি সুন্দর দেখায়। আলোক নিয়ন্ত্রণের সময় যে রকম শেড ব্যবহার করা হ'ত এগুলোও সেই ধরনে তৈরি, কিন্তু সেগুলো মুদ্রিত ছবিতে আর নেই, কারণ ফোটা নেবার জন্তে কেটে টান করে নেওয়া হয়েছিল। মনসা মূর্তি আঁকা ডিজাইনটি দু-ফুট লম্বা। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা যায়।

২৭শে নবেম্বর। রওনা হবার জন্তে দুঃসাহ্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তবু সব ঠিকমতো যোগাযোগ খটছে না। সেজন্তে আজ আর কোথায়ও যাওয়া হ'ল না। সন্ধ্যায় স্থানীয় অনেকে এলেন এবং নানা রকম গল্প শোনা গেল তাঁদের কাছ থেকে। সবই প্রায় শিকারের গল্প। এ অঞ্চলের অরণ্যে বীদের বোরা-কেন্দ্র করতে হয় তাঁদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা বাধ মারা। বাধ মারার চেষ্টা অনেকেই করেন, কিন্তু বাধ পাওয়া নিতান্তই দৈবের উপর নির্ভর করে। অনেকে আবার সামনে পাওয়া সত্ত্বেও মারতে পারেন না। সরোজবাবু বললেন শিকারী দলের সঙ্গে যে দিন তিনি প্রথম হাতীর পিঠে বাধ মারার হাতে ঝড়ি দিতে যান সেদিন তিনি সুর্যোগও পেয়েছিলেন, লক্ষ্যও ঠিক করেছিলেন এবং গুলি করলেও ভোলেন নি, কিন্তু তবু বাধ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে তাঁকেই পাকা শিকারীদের বাক্যগুলির লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করার জানতে পারা গেল, সবই রুটিন মত করে-ছিলেন, কেবল বাধ দেখে দাবড়ে গিয়ে বন্দুকে টোটা পুরতে ভুল হয়েছিল। অত্যন্ত ভয়ে তাঁর তখন জ্ঞান ছিল না, ঘরুচালিতবৎ কি করেছিলেন খেয়াল করতে পারেন নি। দামুদ্রাবু বললেন এক আনাড়ি দল এক চা বাগানে মাচা বেঁধে বাঘের অপেক্ষার বসে আছেন, এমন সময় একজন ভয়ে বা-বা-করে চৈচাতে লাগলেন এবং সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সমবেত ভাবে গুলি চালালেন কালো অর্ধ-দুঃ জন্তুর উপর। অব্যর্থ গুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্তুটি কোন্ সাহেবের একটি পোষা কুকুর। মহা সমস্যা। অতঃপর আত্মরক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করলেন অজ্ঞ একটি কুকুর মেরে—এবং নিহত পোষা কুকুরটিকে সরিয়ে ফেলে।

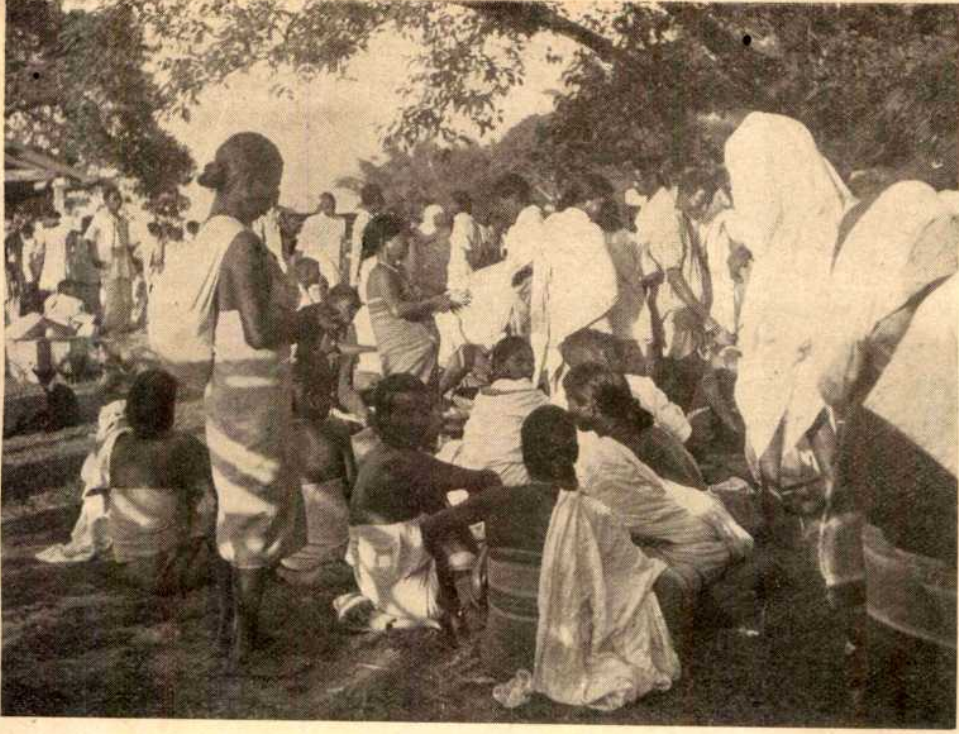
২৮শে নবেম্বর। আজ রওনা হওয়া যাবেই এই রকম বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে হ'ল না। মনটা খুবই

ধারাপ হয়ে গেল। সকালে উঠেই বিছানাপত্র বাঁধা হয়েছিল, এমন অবস্থায় না যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত জলপাই-গুড়ির জনারণ্যকেই আশ্রয় করলাম আজকের দিনের মতো। হুপুরের পরেই আমরা তিন জনে গেলাম এখানকার আর একটি হাটে। নাম নতুনহাট, বেশি দূরে নয়, রিকশতেই যাওয়া সম্ভব হ'ল। হাটটি পৌরীহাটের তুলনায় খুবই ছোট, কিন্তু চেহারা একই। এখানে অতিরিক্ত আমদানী দেশলায় বাঁশের নানা রকম খুড়ি কুলো ইত্যাদি। বহু রকম ডিজাইনের তৈরি। এখানেও মালিকদের শোলার উপর আঁকা দেবদেবীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। আরও কিছু কিনলাম এখান থেকে। বহুকাল ধরে এরা একই ধরনের ছবি এঁকে আসছে, ছবির অর্ধও এরা ভাল করে জানে না, কিন্তু আঁকার হাত এদের পাকা। বংশাধিকৃতভাবে একই ভঙ্গীতে এঁকে এদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আঁকার সময় একটুও ভাবতে হয় না—অত্যন্ত হাত দ্রুত চালিয়ে যেতে পারে। হাটে বসে বসেই কতকগুলো অর্ধ-সমাপ্ত ছবি শেষ করছিল দেবলায়।

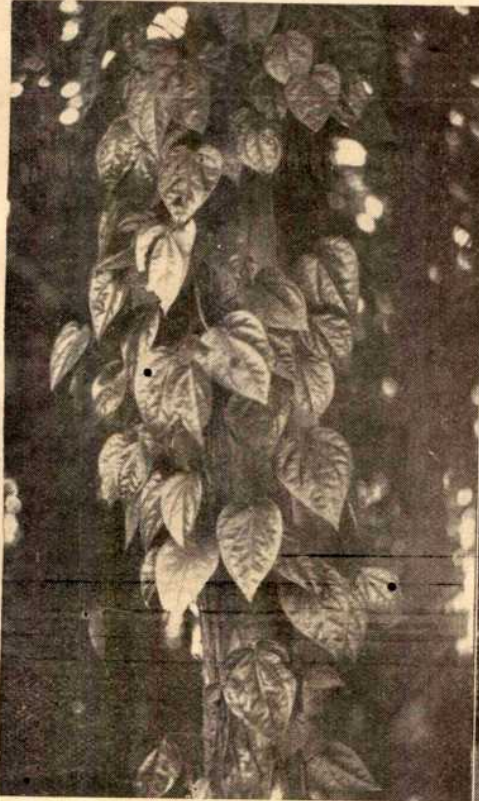
২৯শে নবেম্বর। বিছানা রাজে একটুখানি খুলে তারই উপর শুয়ে মধ্যপথে জরুরি অবস্থায় রাত কাটানোর মতো রাজিটা কাটিয়ে দিলাম। পাঁচটি রাজি এখানে কাটানো গেল, কিন্তু একদিনও মশারি ব্যবহার করতে হয় নি। শোবার সময় 'ইন্সট্রি রিপেল্যান্ট' নামক এক দুর্গন্ধ মার্কিন তেল দুধে ও হাতে মেখে শুভাম। মশা খুব অল্পই ছিল, রাজে দুমস্ত অবস্থায় সেই তেলকে অগ্রাহ করে কোনো মশা আমাদের রক্ত পান করেছে কিনা জানি না। যাই হোক ভোরে উঠে বিছানা ভাল করে বেঁধে নিয়ে চা খেয়েই গিয়ে উঠলাম ট্রাকে। মার্কিন যুক্তকালীন ট্রাক—অতি চমৎকার—কলকজা অতি মজবুত, পথ চলতে কিছুমাত্র ঝাঁকানি লাগে না। আমরা খোলা ট্রাকের উপর ডেক-চেয়ারে এবং প্যাকিং বাগ্জের উপর গদি বিছিয়ে খুব আরামে যেতে লাগলাম। মোটর-যন্ত্রের পাকা শিল্পী স্থলীল পোখার গাড়ি চালিয়ে চললেন। অশোকের এক মাসের রপদ সঙ্গে, তা ছাড়া বন্দুক গুলি ইত্যাদি।

আমাদের পার হতে হবে মণ্ডলঘাট ফেরি। জলপাইগুড়ির সন্মুখে পার হয়ে বার্নেস ঘাটে যাওয়ার পথ তখনও খোলা হয় নি। মণ্ডলঘাট নহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে। অনেকখানি পথ তিস্তানদীর পাড়ের উপর দিয়ে আসতে হ'ল। সে পথ অত্যন্ত ধারাপ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। ট্রাক চালনায় এক মুহূর্তের জ্বলে সবসম্মত নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। পথ সব জায়গাতেই উঁচুনিচু এবং ভাঙা, চলবার সময় মনে হচ্ছিল বাঁয়ের দিকের ঢাকা নদীতে পা বাড়িয়েই আছে।

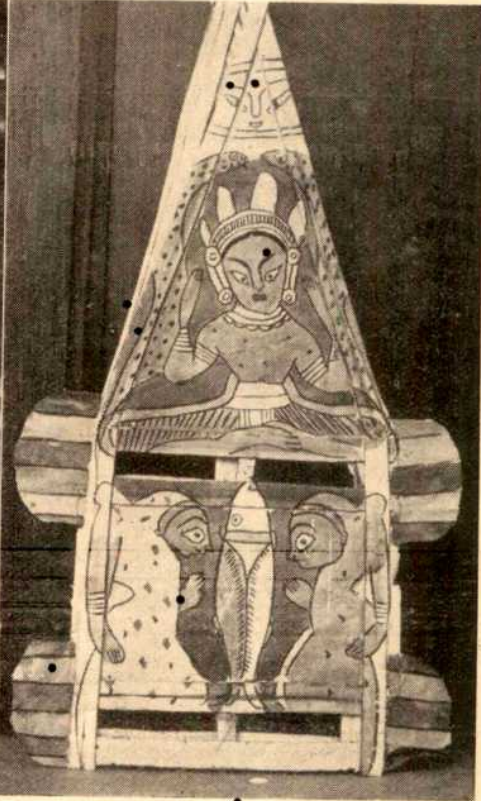
মণ্ডলঘাট পার হতে বেশ খানিকটা দেরি হ'ল। নদীর মাঝখানে প্রকাণ্ড চর। তাতে নদী দুই ভাগ হয়ে দুটো নদীতে পরিণত হয়েছে, কাজেই দুবার পার হতে হ'ল একই



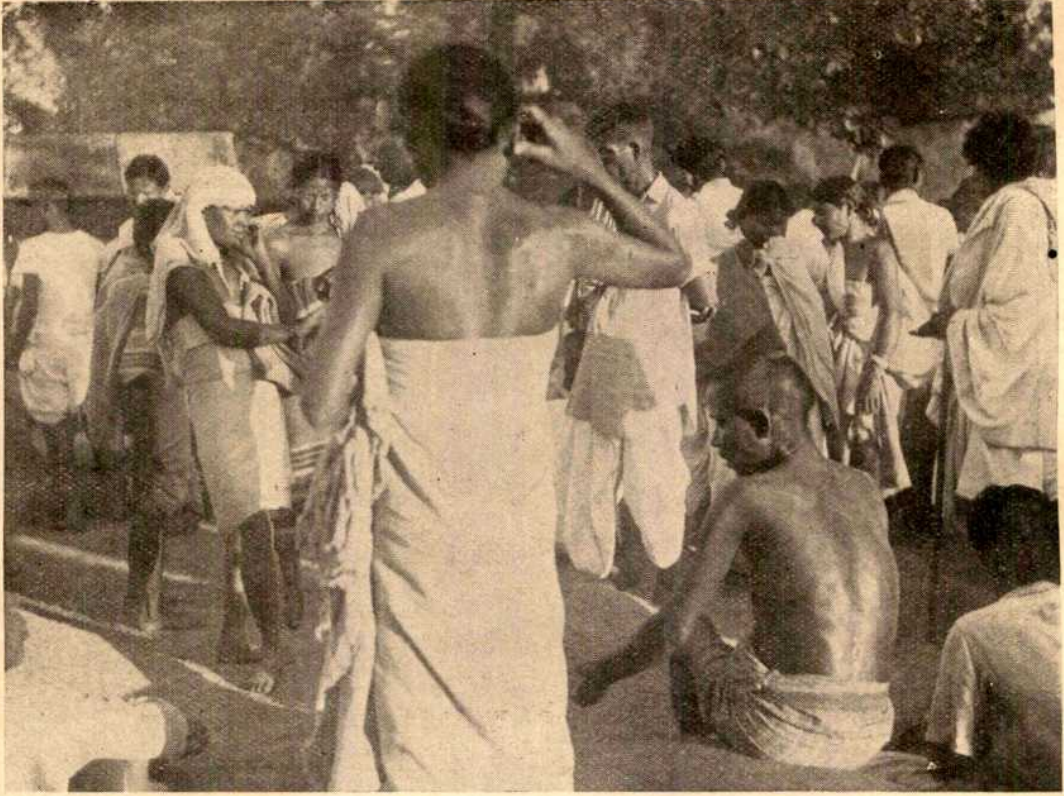
গৌরীরহাট : সাধারণ দৃশ্য



গৌরীরহাটের পাশে গাছপানের বাগান। পানের
লতা সুপারি গাছের সঙ্গে জড়াইয়া উঠিয়াছে



জলপাইগুড়ির প্রাচীন বাসিন্দা মালাকারদের
আঁকা সোলার উপর মনসাদেবীর মূর্তি



গৌরীরহাট : চাল বিক্রি



বাম পার্শে :

মালাকারদের আঁকা কালীমূর্তি ও
পূজারিণী দল, বিভিন্ন ভঙ্গীতে

উপরে :

•মালাকারদের আঁকা কালীমূর্তি

নদী। হু-খানা খেয়ানৌকা একসঙ্গে জোড়া। তার উপর ট্রাক গিয়ে দাঁড়াতে পারে একত্রে চওড়া তক্তা পেতে দেওয়া আছে। আমরা দেড়ঘণ্টা ধরে ছুটি জায়গা পার হয়ে ওপারে এসে উঠলাম ঘন কাশবনের (এলিফ্যান্ট গ্র্যাস) মধ্যে। এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের পথ। এ পথের দৃশ্য খুবই ভাল লাগল, কিন্তু ট্রাক দ্রুত চালিয়ে নেবার মতো ভাল পথ নয়। ময়না ভূমি পর্যন্ত কোন রকমে এসে ভাল পথ পাওয়া গেল। আমরা বেলা একটার সময় দলগাঁওতে পৌঁছলাম। এইখানে কিছুক্ষণ ধেমে বাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সঙ্গেই খাবার ছিল। এখানে কয়েকটা বড় দোকান আছে। পথ চলতি যা-কিছু দরকার প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখান থেকে কালাকাটার পথ আরও বেশি ভাল লাগল। হুধারে অবিচ্ছিন্ন চায়ের বাগান। বাগানে কুলি মেয়ে পুরুষেরা ছুরি চালিয়ে চা গাছ ছাঁটাই করছে—ছুটি হাঁত সমানে চালিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন সবুজের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।

আমরা কখনও কাকনজল্যাকে পিছনে ফেলে চলেছি, কখনও তার দিকেই এগিয়ে চলেছি, কখনও বা হিমালয়ের সমান্তরাল চলেছি। চলতে চলতে কাকনজল্যা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ দিকটায় প্রথম আসছি, তাই গ্রামগুলোর চেহারা পরিচিত লাগলেও সমস্ত মিলে, বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পটভূমিতে সবই অভিনব মনে হচ্ছিল। তা ছাড়া ছোট ছোট নদী যে কত আছে তার সংখ্যা নেই। মনে হচ্ছিল যেন পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই একটি ক'রে সেতু পার হয়ে চলেছি। এ পথে 'জলঢাকা' নদীটাই সবচেয়ে প্রশস্ত। গ্রামে অধিকাংশই দোচালা ছোট ছোট বাড়ির ঘর। হুতিনখানা ঘর মিলিয়ে এক একটা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ। সম্মুখে বা পাশে একটুখানি ভরিতরকারীর বাগান। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের ঘরগুলো টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি এবং জমি থেকে অনেকটা উঁচু। এ অঞ্চলে অনেক বাড়িই এই রকম উঁচু জিতের তৈরি। এদেশের বর্ষা খুব ভীষণ—অবিরাম বৃষ্টিতে সব ভিজে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, তাই ঘরের নিচে কাঁকা রাখতে হয়, অবশ্য যারা পারে তারাই রাখে। ঠিক যেন দোতলা বাড়ি, নিচের তলাটা শুধু শূন্য। ঘরগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

আমরা এগিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এলাম সেখান থেকে একটা পথ উত্তরের দিকে গেছে অপর একটা পথ দক্ষিণের দিকে গেছে। দক্ষিণ দিকের পথটি কুচবিহারের দিকে গেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হলে উত্তরের পথটিই ধরতে হবে। কিন্তু সে পথটি ছিল খুব খারাপ। ভাঙাচোরা, এবং উপরে বেশ বড় বড় পাথরখণ্ড এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। একটু দূর এগিয়ে যাবার পর মথুরা নামক জায়গায় এসে আবার পথ জিজ্ঞাসা করে নেওয়া গেল। একটা চা-বাগানের শেষ

প্রান্ত থেকে বায়ের দিকে ঘুরতেই পথ অনেকটা ভাল মনে হ'ল। আমরা বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে চিলাপাতা ফরেই অফিসের সম্মুখে গিয়ে একটুখানি থামলাম এবং ওখান থেকে আবার পথের খবর জেনে নিয়ে এগিয়ে চললাম।

মিনিট পাঁচেক এগিয়ে যাবার পরই জঙ্গল সুরু হ'ল। জঙ্গল ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর। বাঘ ভালুকের রাজত্ব প্রবেশ করছি। পথের পাশে তখনও দু-একটি লোকের দেখা মিলল। তারপর 'অরণ্য সম্পূর্ণ জনহীন। আমরা যে পথে চলেছি সে পথ নামমাত্র, আসলে তা অরণ্যেরই অংশ। গাড়ি চলতে পারে সহজেই, কিন্তু কোনো পথচারী একা মাত্র সে পথে যায় কি না সন্দেহ। লোকালয়ের চিহ্ন নেই। চারদিক ধমধম করছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের বড়বড় শব্দ সমস্ত অরণ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যত এগিয়ে চলেছি ততই বেশি ঠাণ্ডা। হাত যেন জমে যাচ্ছে। কোনো হিংস্র জন্তু আমাদের কাছে লাফিয়ে পড়লে পালাবার কোনো পথ নেই। প্রকাণ্ড এক একটা শালগাছ, তার সঙ্গে আরও কত রকম গাছ লতা গুল্ম। গাড়ি চলার সুরু পথের হুধারে অজস্র হাফা সবুজ রঙের ফার্ন গাছ। ট্রাকের শব্দে গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাচ্ছে। গাড়ির সামনে দিয়ে একটা ছোট বানর এক পাশ থেকে আর এক পাশে লাফিয়ে গেল। বাইরের কড়া রোদ থেকে ক্রমে অন্ধকার রাজত্ব চলেছি। সব আলো যেন হঠাৎ নিবে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। অশোক জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ ক'রে তার সতর্ক দৃষ্টি চালনা করছে চারদিকে। চাপা গলায় বলছে ক্যামেরা তৈরি রাখ।

কেন?

যে-কোন অবস্থার মধ্যে তৈরি থাকা ভাল। আচমকা সুযোগ আসতে পারে।

বুঝলাম হরিণ কিংবা বাঘ অথবা ভালুক হঠাৎ সামনে এসে যাওয়া বিচিৎর নয়। ক্যামেরা আমার খোলাই ছিল। চলতে চলতে একটা বাক ঘুরতেই মনে হ'ল যেন আঙন জলে উঠেছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। হঠাৎ আমরা ছোট ছোট নদীর সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি। স্বর্ষের আলো তার প্রবল স্রোতকে এমন বলকিত ক'রে তুলেছে যে চোখ ধাঁষিয়ে দেয়। নদীর দুই পাড়ে শত শত কাশুল। আলো-উভাপহীন প্রাচীন অরণ্যের বুকে এ একটুখানি যেন ছুটির আনন্দ হাসি। মনে হ'ল এইখানে একটু থামি, কিন্তু মনে হতে হতেই গাড়ি বহুদূর এগিয়ে চলে গেছে। এর পর থেকে এ নদীর কাঁকা পথের দেখা কিছুক্ষণ পর পরই পেতে লাগলাম। তার পর আবার সব অন্ধকার। পুরো এক ঘণ্টা এই বোমাফকর অরণ্যবক্ষে বাস ক'রে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাশের নিচে। এলাম আর এক অভিনব অরণ্যে। হুধারে শুধু কাশবন।

প্রত্যেকটি গাছ পনেরো-ষোল হাত উঁচু—এবং প্রত্যেকটি গাছ থেকে এক একটা শিখ আকাশের দিকে বেরিয়ে গেছে। যে সব কাশকুল তাতে ছিল তা অল্পদিন হ'ল শুকিয়েছে, তবু বেশ লাগছিল।

এর পর আবার অরণ্য পথ শুরু হ'ল। তবে এ অরণ্য ভয়ঙ্কর নয়, এখানে মানুষের বসতি আছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর একটা নতুন জিনিষ দেখলাম। শালবনের ভিতর আধুনিক ধরণে তৈরি সব বাড়িঘর—কংক্রীটের দেয়াল ও অ্যাসবেস্টসের চাল। প্রথমে দু'একখানা ঘর, ক্রমে যত এগিয়ে চলেছি ততই ঘরের সংখ্যা বাড়ছে। একটা মানুষের

চিহ্ন নেই, শুধু ঘর। তারপর জুড়ল ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দেবি সেখানে ঘরের সংখ্যা আরও বেশি। সব মিলে একটা ছোটখাট শহর। সিনেমাসর, জলকল, সবই আছে, কেবল মানুষ নেই।

শুনলাম যুদ্ধের শেষ দিকে এখানে এইভাবে সেনানিবাস তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সৈন্যেরা এ সব বাড়ি সম্পূর্ণ দখল করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাই কোনো কাজে লাগেনি। এ রকম টাটকা নতুন শহর অথচ সম্পূর্ণ শূন্য—দেখলে মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ক্রমশঃ

নিন্দুক

শ্রীমুখাংকুমার গুপ্ত

হস্তলিপিবিজ্ঞানের শিক্ষক সার্জে ক্যাপিটোনিচ আধিনেয়েভের মেয়ে নাটালিয়ার সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক ইভান পেট্রোভিচ লোশাভিনিখের বিবাহ উপলক্ষে ভোজের উৎসব চলেছে। নাচগান আর হস্তার বসবার ঘর সরগরম হয়ে উঠেছে। ক্লাব থেকে ভাড়া-করে-আনা খানসামার দল কালো ফ্রক কোট ও হলিমলিন সাদা নেকটাই পরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে বাস্তবাবে। অতিথি অভ্যাগত ও চাকর-বাকরদের কোলাহলে কান পাতবার জো নেই। বাইরে থেকে এক দল লোক খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছে কোতূহলী দৃষ্টি নিয়ে—সামাজিক পদমর্যাদা নেই বলে ভিতরে ঢুকতে ভরসা পায় না তারা।

রাত ঠিক বারটার সময় গৃহবাসী আধিনেয়েভ রান্নাঘরে এসে হাজির হলেন—খাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখবার জ্ঞ। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝোঁয়ায় ভর্তি—ঝোঁয়ায় রাজহাঁস ও অজ্ঞাত পশুপক্ষীর মাংসের লোভনীয় গন্ধ। হরেকরকমের খাবার আর পানীয় ছোটো টেবিলের উপর ছড়ানো রয়েছে নিত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে। রাধুনী মার্ক' খাবারের টেবিলের কাছে ষোরাফেরা করছে বাস্তবাবে। অত্যন্ত শুল তার দেহ, মুখের রঙটা খোর লাল।

“ষ্টার্ক্‌নটা কেমন তৈরি করেছে দেখি,” লুজ দৃষ্টিতে রান্নার পাঞ্জুলোর দিকে তাকিয়ে ঠোট চাটতে চট্টতে বললেন আধিনেয়েভ—“কি চমৎকার গন্ধ। ইচ্ছে করছে সমস্ত রান্না-ঘরটাই গিলে কেলি। ষ্টার্ক্‌নটা দেখাও তো একবার।”

মার্ক' একটা বেকির কাছে গিয়ে চব্বিমাখা একখানা খবরের কাগজ তুললে অতি সাবধানে। কাগজটার নীচে প্রকাণ্ড একটা ডিসে মস্ত একটা ষ্টার্ক্‌ন—তার চার পাশে একরাশ জলপাই আর ক্যারট। ষ্টার্ক্‌নটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আধিনেয়েভ। মাছটা তৈরি

হয়েছে খাস। তার মুখমণ্ডল উজ্জল হয়ে উঠল, চোখের তারা বিক্ষারিত হয়ে উঠল আনন্দের আবেশে। নীচু হয়ে অধর ও ওষ্ঠ সংযুক্ত করে তৃপ্তির একটা আওয়াজ করলেন তিনি—চলন্ত গাড়ীর চাকার যেমন আওয়াজ হয় তেমনি। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর আনন্দে ভুড়ি দিলেন—একটা এবং আবার ঠোট দুটো যুক্ত করে আওয়াজ করলেন আগের মত।

“এ্যা। চুয়ু খাওয়ার আওয়াজ শুনি যে। বলি, কাকে চুয়ু খাচ্ছে, মাকুশ্‌কা?” কে একজন বলে উঠল পাশের ঘর থেকে এবং এক মুহূর্ত পরেই জুলমাষ্টার ভ্যানকিনের কদম-হাঁট দেওয়া মাথাটা দেখা গেল দরজার সামনে।

“কাকে চুয়ু খাচ্ছিলে, মার্ক'। এ্যা। সার্জে ক্যাপিটোনিচ যে। বুড়ো বয়সেও মনটা বেশ কাঁচা রেখেছে দেখছি। বলিহারি ভাই।...মেয়েমানুষের কাছে নিরালার দাঁড়িয়ে কি করছিলে বল তো?”

“চুয়ু আমি খাই নি মোটেই,” হতবুদ্ধির মত জবাব দেন আধিনেয়েভ—“চুয়ু খাচ্ছিলাম এ কথা তুমি বললে কি করে? মাছটা খাসা রান্না হয়েছে দেখে আমি শুধু একটা আওয়াজ করেছিলাম মুখে।”

“ও কথা আর কাউকে ব'লো,” ব্যঙ্গের সুরে বললেন ভ্যানকিন এবং কথটা বলেই দরজার অন্তরালে অদ্ভুত হয়ে গেলেন। তার মুখে বিজ্রপের একটা ঝাঁক হাসি খেল গেল।

“ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াবে ভগবানই জানেন।” আধিনেয়েভ বললেন মনে মনে—“লোকটা এবার চতুর্দিকে ঐ কথা রটাবে নিশ্চয়। পাঞ্জি নছার কোথাকার। সারা শহরে ওর জেছে দেখছি মাথা হেঁট হবে আমার।”

ভীতকণ্ঠিতপদে বসবার ঘরে ঢুকে আধিনেয়েভ বার বার তাকাতে গেল ভ্যানকিনের দিকে—ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য

করবার জন্ত। ভ্যান্কিন ঠাঁড়িয়েছিলেন পিয়ানোর কাছে। হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন কিস কিস করে বললেন ইন্স্পেক্টরের জালিকার কানে আর অমনি সেই মেয়েট হেসে উঠল খিল খিল করে।

“আমারই কথা বলাবলি করছে ওরা।” মনে মনে বলেন আধিনেয়েভ, “আমারই কথা নিশ্চয়। লোকটা পাকা শয়তান। মেয়েটা বিশ্বাস করেছে বলেই মনে হচ্ছে, নইলে অমন করে হাসবে কেন? আচ্ছা বিপদেই পড়লাম।...না, চুপ করে থাকলে চলবে না—এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে ওর কথা বিশ্বাস না করে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা আমি বলব—তা হলে ও জব্ব হবে বুঝে—কেউ ওর কথা শুনে চাইবে না—সকলেই বুঝবে ও কত বড় মিথ্যাবাদী।”

আধিনেয়েভ বার কতক মাথা চুলকোন, তারপর আঙুলে এগিয়ে যান পাদেকয়ের দিকে।

“মাসিয়ে পাদেকয়, একটু আগে আমি ছিলাম রান্নাঘরে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম দেখানে,” ফরাসী ভদ্র-লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন আধিনেয়েভ। কথার খেঁই হারিয়ে যায় যেন, একটু ইতস্ততঃ করে আবার বলতে শুরু করেন, “আপনি যে মাছ ভালবাসেন তা আমি বিলক্ষণ জানি। এই এত বড় একটা ষ্টার্কিন রান্না হয়েছে—প্রায় চার হাত—খেতে যা হবে!...হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি। রান্নাঘরে ঐ ষ্টার্কিনটা নিয়ে ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। ধাবার জিনিষপত্র দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে। ষ্টার্কিনটার দিকে তাকিয়ে ভারি খুশি হ’ল মনটা—চমৎকার রান্না হয়েছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আনন্দে একটা আওয়াজ করছে মুখে আর অমনি ঐ বোকা ভ্যান্কিনটা এসে ঢুকল ঘরে আর বললে কিনা...হা হা...বললে কিনা—‘তুমি চুপ থাকছিলে লুকিয়ে।’ বুঝুন ব্যাপারটা। আমি চুপ থাকবো মার্কাকে—ঐ রাঁধুনী মাগিকে? লোকটার বুদ্ধিহীন নেই একেবারে—নিরেট বোকা। মার্কাকে দেখেছেন তো? মোটা কদর্যা চেহারা—বীদরের মত মুখ—আর ভ্যান্কিন বলে কিনা আমি চুপ খেয়েছি ওকে। এমন আহাম্মক আপনি দেখেছেন কোথাও?”

“কার কথা বলছ, আধিনেয়েভ? আহাম্মকটা কে?” এগিরে আসতে আসতে প্রশ্ন করেন টারান্টুলোভ।

“ভ্যান্কিনের কথা বলছিলাম। খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে—”

মার্কা ও ষ্টার্কিন খটখট কাহিনীটির পুনরুক্তি করেন আধিনেয়েভ।

“ভ্যান্কিনের বুদ্ধির বহর দেখে হাসি পায় আমার। কি বড় বেয়াক্তেলে লোক বল তো? আমার কি মনে হয় জান? মার্কাকে চুপ থাকায় চেয়ে কুহুরের মুখে চুপ থাকায় ঢের বেশী তৃপ্তিকর।” কথাটা শেষ করে মুখ ফেরাতেই দেখা হ’ল মাজ্‌দার সঙ্গে।

“ভ্যান্কিনের কথা আলোচনা করছিলাম আমরা। অতুত ঐ লোকটা। রান্নাঘরে চুকে ও আমার ঠাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মার্কার পাশে আর অমনি আজ্ঞাবি গল্প বানাতে শুরু করল আমাদের সম্বন্ধে। বলে কি না আমরা নাকি চুপ খেয়েছি পরস্পরকে!...নেশটা হয়তো একটু বেশী করেছে আজ, তাই আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে। আমি বললাম ওকে—‘আমি বরং হাঁসের মুখে চুপ খেতে রাজী আছি, তবু মার্কাকে চুপ থাকবো না কিছুতেই। তা ছাড়া আমি তো আর অবিবাহিত নই, আমার জী বর্তমান—’। ওর জন্মে হাত্তাপদ হতে হয়েছে আমরা।”

“কে তোমায় হাত্তাপদ করলে হে?” আধিনেয়েভকে জিজ্ঞাসা করেন ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক।

“ভ্যান্কিন। রান্নাঘরে ষ্টার্কিনটার দিকে তাকিয়ে ঠাঁড়িয়ে-ছিলাম আমি—”

সমস্ত কাহিনীটা গড় গড় করে বলে যান আধিনেয়েভ। আধ খটখট মধ্যেই ভ্যান্কিন ও ষ্টার্কিন সংক্রান্ত কাহিনীটা সকলের কানেই গেল পৌঁছে।

“এখন ও বলুক আমার সম্বন্ধে যা খুশী,” মনে মনে বলেন আধিনেয়েভ। “হ্যাঁ, বলুক যত পারে। ও বলতে শুরু করবে আর অমনই ওকে ধামিয়ে দেবে লোকে, ‘বাজে কথা বলো না আমাদের কাছে। ব্যাপারটা সবই আমরা জানি’।”

আধিনেয়েভ মনে মনে এত খুশি হয়ে উঠলেন যে তারপর মদ খাওয়ার পরেও আশ্রিত চার গ্লাস ব্র্যান্ডি দিলেন নিঃশেষ করে। মেয়েকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে, নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর ষ্টার্কিন-সংক্রান্ত ব্যাপারটা মনেই রইল না তাঁর। কিছু হয়, মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর। দুটো লোকের জিত তলোয়ারের মত ধারালু আর তার কর্মতৎপরতাও অসাধারণ। বেচারী আধিনেয়েভের সমস্ত কৌশলই হ’ল ব্যর্থ। এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। সেদিন বুধবার, রাসে পড়ান শেষ করে আধিনেয়েভ যখন টিচার্স রুমে এসে ছাত্র ডিসিরেক্টরের অশিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে এগিয়ে এসে ইসারা করে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন এক পাশে।

“দেখুন সার্জে ক্যাপোনিটোনিচ,” ঢোক গিলে বলতে শুরু করেন প্রধান শিক্ষক, “ক্ষমা করবেন আমরা। ব্যাপারটা অবশ্য স্থল সম্পর্কিত নয়, তবু এ সম্বন্ধে কিছু না বলেও পারছি না। এটা আমার কর্তব্য। দেখুন গুজব রটেছে ঐ জীলোকটির সঙ্গে...অর্থাৎ কিনা আপনার রাঁধুনীর সঙ্গে আপনার নাকি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু বলা সাজে না...ওর সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠতা করতে পারেন, ওকে চুপ খেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন, তবে আমার

অনুরোধ, অহুঃ করে অত প্রকাণ্ড ভাবে করবেন না।
ভুলবেন না যে আপনি স্কলমাষ্টার।”

আখিনেয়েভ নিষ্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—কি
যে বলবেন ভেবে পেলেন না। ছুটির পর বাড়ী চললেন অসহ
জালা নিয়ে—এক ঝাঁক মৌমাছি সর্ব্বাঙ্গে হল ফুটিয়েছে যেন।
পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হতে লাগল সারা শহরের লোক
কোতুহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—যেন সর্ব্বাঙ্গে
আলকাতরা মেখে রাস্তায় বেরিয়েছেন তিনি।

বাড়ীতে পৌঁছেও নিস্তার নেই।

“আজ কিছু খাচ্ছো না যে?” খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলে
জী।—“কি ভাবছ একমনে? প্রণয়-দেবতার কথা বুঝি?
মাহুশকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো আজকাল। ভেবেছ কেউ
কিছু জানতে পারবে না? সব টের পেয়েছি আমি। ভাগ্যিস
পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসেছিল আজ। বুড়ো বয়সে এ
আবার কি বধীপনা।” ঠাসু করে সে একটা চড় বসিয়ে দিলে
আখিনেয়েভের গালে।

খাওয়া শেষ করা হ’ল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন
আখিনেয়েভ, তারপর টলতে টলতে চললেন ভ্যান্কিনের
বাড়ীর দিকে—মাথায় যে টুপি নেই, গায়ে কোট নেই সেদিকে
খেয়াল নেই তাঁর।

“পাজী বদ্‌ম্যেশ।” সজোরে ভ্যান্কিনের কলারটা ধরে
গর্জন করে ওঠেন আখিনেয়েভ—“হুনিয়াস্ক লোকের কাছে

তুমি আমার খাটো করেছ কেন? কেন আমার বদ্‌নাম রটালে
মিছামিছি?”

“বদ্‌নাম? আমি রটিয়েছি? কি বলছ তুমি?” ভ্যান্কিনের
চোখ কপালে ওঠে।

“কে তবে সকলকে বললে যে মার্কাকে চুমু খেয়েছি
আমি? তুমি নও...বল তুমি নও? বেল্লিক...বেয়াদব...বুনে
কোথাকার।”

ভ্যান্কিন হাঁ করে চেয়ে থাকেন আখিনেয়েভের দিকে—
মুখে ফুটে ওঠে একটা অনহায় ব্যাকুলতা। যীশু খ্রীষ্টের মূর্তির
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলেন, “তোমার
সহজে একটুও কথা যদি আমি কারও কাছে বলে থাকি
তা হলে ভগবান যেন শান্তি দেন আমার, চোখের দৃষ্টি যেন
আমি হারাই, আমার মৃত্যু হয় যেন...আমার খর-সংসার যেন
ছারখার হয়ে যায়।”

ভ্যান্কিনের উজ্জ্বল মধ্যো আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে
যে আখিনেয়েভের নিম্না রটায় নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

“তবে কে এ কাজ করেছে? কে সে?” পরিচিত
সকলেরই মুখ পর্যায়ক্রমে ভেসে ওঠে আখিনেয়েভের মনে
আর নিষ্ফল আক্রোশে বন্ধে করাঘাত করে বার বার তিনি
গর্জন করেন, “কে সে?”*

* রুশ লেখক এ্যাটন শেখভ হইতে

তুমি কি ভুলেছ সবে

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

তুমি কি ভুলেছ সবে—ভারতের ভাগ্যবিধাতা গো,
শতাব্দীর তন্ম্রা ভাঙি আজি তুমি জাগো, তুমি জাগো।
হানো তব স্মৃতির বজ্র, হানো হীন স্বার্থ লাগি
শোষণ করিছে যারা; তিলে তিলে দিবারাত্র জালি
অসহায় দুঃস্থকে বিদ্রোহের তীব্র বহি জালি
শ্রমশান করিছে গৃহ, ছড়াইছে কলঙ্কের কালি
লুণ্ঠ করি অতীতের ইতিহাস, গৌরবের গাথা,
যাহারা ভুলেছে তোমা। ভয়ঙ্কর হে ভাগ্যবিধাতা,
নির্মম আঘাত হানি রক্ত তব মৃত্যু-অভিশাপ
তাদের বর্ষণ কর—দূরে থাক সর্ব দুঃখ তাপ।

অভাগিনী পুত্রহীনা অন্নহীনা বস্ত্রহীনা যারা,
শোকতপ্ত বুকে আজও বেঁচে আছে যারা সর্বহারার,
তাদের সাহুনা দাও। তুমি ত ভোল নি মাধবীরে,
অরুণ হস্তে তারে পত্র দাও পুষ্প দাও ফিরে,
শিশিরে জাগাও আশা শুষ্ক রিক্ত মৃত ধরণীর,
তোমার অমৃত লভি চিরপূর্ণ প্রাণ প্রকৃতির।
শুধু কি ভুলিয়া রবে যারা তব প্রেম-ভালবাসা
অন্তরে জাগিয়ে রাখে? চারিদিক দারুণ হতাশা—
কোথা আলো, শান্তি কোথা? সর্ব দুঃখ গ্রাসি করি দূর
তোমার আনন্দ-গানে পৃথী পুনঃ করো ভরপুর।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭০—১৮৯৯

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বল্পবয়সে সন্তানবন লইয়া যাহার জন্ম, অকস্মাৎ কালের নির্মম আঘাতে অকালে তাহার তিরোধান ঘটায় মত শোকাবেদ ঘটনা পৃথিবীতে বিরল; বাংলা সাহিত্য-সংসার হইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরবিদায় এইরূপ একটি শোকাবেদ ব্যাপার। তাহার অল্পস্থায়ী জীবনেই কয়েকটি কবিতা এবং অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’ বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধ-রচনার যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে সেই ধারার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই। আজও পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে এমন কবিভ্রমর গদ্য আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই, বস্তুতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। চুঃখের বিষয়, অকালমৃত্যুর জন্ত বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্পর্শ দিয়া তিনি চিরস্থায়ী ও সর্জনজননীয় আসন দখল করিতে পারেন নাই; যেটুকু তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা এক বিপুল সম্ভাবনার আকস্মিক বিনাশের জন্ত হাহাকার করিতে পারি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

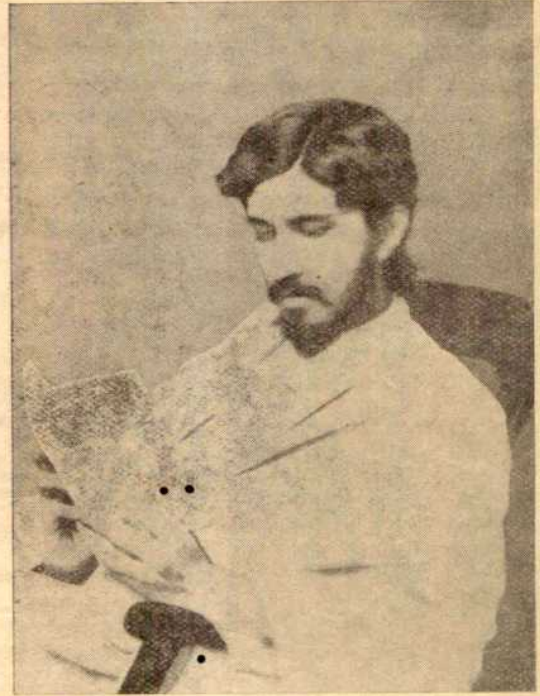
১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর (২১ কাঠিক ১২৭৭) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তাহার পিতা বীরেন্দ্রনাথ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র; মাতা প্রফুল্লময়ী—বাঁশবেড়িয়ার কুলীনপ্রধান হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম বর্ষ বয়সে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* এখানে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া তিনি ছেয়ার স্থলে চলিয়া যান এবং ১৮৮৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাহার বয়স “১৫ বৎসর ৩ মাস” বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে উল্লেখ আছে।

ছাত্রাবস্থা বৎসর বয়সে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ (২২ মাঘ ১৩০২) তারিখে সাহানা দেবীর সহিত বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন।

* বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও আত্মীয় (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) হেমেন্দ্রনাথের পুত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—“অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি [বলেন্দ্রনাথ] সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই বৎসর ৩ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র চার্যর প্রথম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপূর্বে ৩ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রিন্সিপাল ছিলেন।” ১৮৭৭ সনের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে বদলি হন এবং তাহার স্থলে সংস্কৃত কলেজে চার্যর মহাশয় অস্থায়ী ভাবে (officiating) প্রিন্সিপাল হন।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—“তিনি বাণিজ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাহার কল্পনা প্রবল ছিল; একটা কিছু মত্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।...বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই তাহার এই অর্থকরী বিদ্যার দিকে মনের টান



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গিয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়ে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল পরামর্শদাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা কিছু করিতেন তাহা বলেন্দ্রনাথই। যাহা হউক, বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়। এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক কাস্মিক পরিশ্রমই বোধ হয় তাহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহার মনোবলের বড় একটা ট্রাস হয় নাই। তিনি জীবনের শেষ ভাগে আর্ধ্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্ধ্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্ত তাহার মনের একাগ্রতা [ছিল]।”†

† “বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়”—গ্রন্থাবলী, পৃ. ৬।

বলেজনাথ বল্লভ ছিলেন। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে, ২০ আগষ্ট ১৮৯৯ (৩ ভাদ্র ১৩০৬) তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা

বলেজনাথের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী সংক্ষেপে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই স্মৃতিকথায় পুত্র বলেজনাথ সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। স্মৃতিকথায় সাল-তারিখের এক-আধটু গোল থাকি স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কোন সালে এবং কত বৎসর বয়সে বলেজনাথ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহা তিনি ঠিকমত বলিতে পারেন নাই।—

“সেই বছর ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়। দিদির বিবাহের দুই বৎসর পরেই ওই বাড়ীতেই মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স বার বৎসর ছয় মাস মাত্র। আশ্বিনের ষড়্দের বছরেই আমার বিবাহ হয়, ...। চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ...দিন দিন শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকায় আমার গুস্তর কিছু দিনের জ্ঞান তাঁহাকে আলিপুর পাগলাগারদে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ছয় মাস থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেই সময় আমার শরীর নানা চিকিৎসার মধ্যে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগলাগারদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরে বলুর (বলেজনাথের) জন্ম হয়। ...

১২৭৭ সাল ২১শে কার্তিক রবিবার বিকাল ৫টার তার জন্ম হইয়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই, নিশ্চয় অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুস্থ। নানী ছাড়িয়া কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। আমার নানা রকম মনের অশান্তির মধ্যে ওর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, ছুটি পা-ও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুন অনেক দিন পর্যন্ত পা ধসিয়া ধসিয়া চলিত। ...

* ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে এই বড় হয়। ১২৭১ সালের কার্তিক সংখ্যা ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশ :— “মত ২০এ আশ্বিন বুধবার বেলা ১০টা হইতে বেলা ৪। পর্যন্ত যে প্রবল বড় হয়, তাহাতে অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।”
† বীরেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাডেমি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কুছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি নিজেই তাকে অন্ন অন্ন পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিয়া পড়িতে যাইত, কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অল্প ভাইরা ঠাট্টা করিত। এই কথা শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ ডাক্তারের গাড়ী কিছু দিনের জ্ঞান ভাড়া করিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তাহার পর তার জন্য খোঁড়াগাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত। বার বছর বয়সের সময় সে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়। যে বছর বলু বিভাগলয়ে যায় সেই বছরে আমার শান্তদীর মৃত্যু [১১ মার্চ ১৮৭৫] হইয়াছিল। বলুর বিভাগলয়ে যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়া, তিনি খুবই খুশী হইয়াছিলেন। ...

আমাদের এই সব সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া বলু বড় হইতে-ছিল। বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে, সে লেখাপড়া লিখিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবে। লেখাপড়া তার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহেলা করে নাই। যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার ত্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল “আমার বুড়োবুড়ী পায় না মুড়ী” ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক-একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুধবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত। তখন হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অগ্ররূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলুর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স সেই সময় ডাক্তার ফকির-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণা সাহানী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে খুবই খট্টা হইয়াছিল। ...বলুর বিবাহ ১৩০২ সালে ২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ধরে আসিল তখন এত কষ্ট

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্নী—সারদা দেবীর মৃত্যু হয় ২৭ ফাল্গুন ১২৮১। ১৭৯৭ শকের বৈশাখ সংখ্যা ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশ :—“৩০ ফাল্গুন শনিবার। মাতার চতুর্থ শ্রাবক্রিয়াতে ত্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা। তিন রাজি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এলোক হইতে অবস্থত হইয়াছেন।” “ব্রাহ্মসম্মেলন” শরদা দেবীর মৃত্যু হয় (সৌদামিনী দেবী : “পিতৃস্মৃতি”—‘প্রবাসী’, ফাল্গুন ১৩১৮), সুতরাং ইংরেজী-মতে তাঁহার মৃত্যু-তারিখ—১১ মার্চ ১৮৭৫।

ভোগের পর মনে বড় আত্মদা হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর আমাকে একটু বৃষ্টি স্নেহের মুখ দেখাইলেন। সাহানার যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া তের বছর। দেহের রং যদিও ক্ষামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুন্দরী ছিল। স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা বলিত বা ঠাট্টা করিত, সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইত। আমার কথা হয় নাই, সে আমার কন্ঠার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।...

একবার আমাকে বলুক সঙ্গে লইয়া কোন একটা আত্মীয়ের ছুটি কন্ঠার বিবাহ স্থির করিবার জন্ত তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে হঠাৎ শুনিলাম যে, মুসলমান এবং ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে মারিতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা মসজিদ ছিল, সেই মসজিদটি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাঙিয়া ফেলেন। তারই জন্ত ইহাদের আক্রোশ। আগে জানিতাম না, রাস্তার মাঝে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলাম—আমাদের ঘরের গাড়ী ছিল, আমারই এক ডাক্তার নন্দাইয়ের গাড়ীতে সেদিন গিয়াছিলাম। তাহার কোচম্যানকে প্রথমে কার গাড়ী জিজ্ঞাসা করাতে সে অত বিবেচনা না করিয়া বলে যে ‘সাহেবের’। এই কথা বলিবামাত্র অজ্ঞত ধারায় ইট লাঠি সমানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল। গাড়ীর কাঁচ ভাঙিয়া চারি দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি বল্ল মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিঠের উপর অনেক ইট আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন কোচম্যান চীংকার করিয়া বলিতে লাগিল, “এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুর—সাহেবের নয়।” তাহার গাড়ীর নিকটে যখন আসিয়া দেখিল সত্যসত্যই ইহা বাঙ্গালীর গাড়ী তখন নিরস্ত হইল। আমরাও কোন রকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া তিন-চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুজনে পড়িয়াছিলাম। সারা দেহে অসহ্য রকম বেদনা এবং তার দরুন যন্ত্রণায় আমার গর্ভশরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া ওষুধপত্র ব্যবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আরাম পাই। বল্ল কপালের ভিতর একটা ছোট কার্টের টুকরা বিধিয়া অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, তার পর আপনা হইতেই সেটি বাহির হইয়া যায়।

পঞ্চাবে আর্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন স্থাপন হয়* সেই জন্ত তাহার প্রাণের

প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্ত বল্ল আর্যসমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারও তাকে প্রাণের সহিত ভাল-বাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনও বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বল্লকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্ত আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ আর জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। দ্বিতীয় বার যখন সে তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায় [মার্চ ১৩০৫], সেই দিন আমার মেজ ভ্রাতার কন্ঠা ইন্দ্রির কুলশয্যা। সেই জন্ত সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে যথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বাড়ী আসার পর নানা রকম সেবা-যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্র চুকাইবার জন্ত তাহাকে শিলাইদহে জমীদারিতে যাইতে হয়। সাহানা ওখানে আমার ছোট ভ্রাতার কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার পড়াইত। সারা দিনরাত হিসাবপত্র লইয়া বল্ল এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনও বা পাঁচটায় খাইত, এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে। সে যখন শিলাইদহে, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বল্ল আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, “মা, আমার শরীর ভাল নাই।” ইহা শুনি আমার মন তাহার জন্ত আরও অধিক অস্থির হইতে লাগিল। আমি সাহানাকে লিখিলাম যে, তাহাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অব্যবহৃত ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয়ে, ডাক্তার সালজার এই তিন জনে দেখিতে লাগিলেন। তাঁরা আমাকে বলিতেন, যে, ভ্রাতার কোনও কারণ নাই, ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সে ভরসা পাইলাম না। বাড়ীর সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাইতে চাই কি না, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না।

* এই মিলন সাধনের জন্ত বলেজ্ঞনাথ ১৮৯৮ সনের মে ও জুলাই মাসে আর্যসমাজের সহিত ইংরেজীতে যে পত্রবিনিময় করিয়াছিলেন, ১৮২০ শকের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা ‘তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা’র তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত দুইখানি পত্রের অনুবাদ পরবর্তী আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

তাহারাই তখন সাহেব ডাক্তারকে আনাহিয়া দেখান। বলুর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেই দিন রবি (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, “তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা, মা করিয়া ডাকিতেছে।” আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম, তখন তাহার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল, আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বসি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। স্বর্গদেব ধীরে ধীরে তাহার কিরণচ্ছটার পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল।... যেদিন তার মৃত্যু হয় সেই দিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, চাকরদের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “বাড়ীতে সব তালাবন্ধ কেন?” যদিও তখন তিনি উদ্ভাদ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভিতরেও পুঞ্জশোকের দারুণ যন্ত্রণার অনুভব-শক্তি দিয়া-ছিলেন।

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও আনিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া গেল। ঊনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ৩রা ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়।—“আমাদের কথা” :—‘প্রবাসী’, বৈশাখ ১৩৩৭।

রচনাবলী

অল্প বয়স হইতেই বলেজনাথের সাহিত্যাত্মরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋতেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—“[সংস্কৃত কলেজের] ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া সংস্কৃত কাব্যরসের আশ্রয় অল্প অল্প লাভ করিলাম। সে সময়ে তাহার বয়ঃক্রম নবম বর্ষ মাত্র। সেই সময়ে আমাদের সাহিত্য রচনার প্রবৃত্তি উৎসাহিত্বের রক্তিম আভার দ্বারা প্রথম দেখা দিল। আমরা দুজনেই কোন একটা বিষয় লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিতাম। একই বিষয়ে বলেজনাথ লিখিতেন গড়ে আমি লিখিতাম পড়ে।” কিশোর বলেজনাথ যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র, সেই সময়ে তাহার “একরাত্রি” প্রবন্ধটি জ্ঞানদানিনী দেবী-সম্পাদিত ‘বালকে’ (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, ইং ১৮৮৫) “বালকের রচনা” বলিয়া মুদ্রিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ইহাই তাহার প্রথম রচনা। তাহার সাহিত্য-ক্ষমতার প্রতি পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহ-বারি-সিঞ্জন তাহার সাহিত্য-জীবন বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

তরুণ বয়সেই বলেজনাথের জীবনাবসান ঘটে। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

১। চিত্র ও কাব্য (নিবন্ধ)। ৫ ভাদ্র ১৩০১ (২০ আগষ্ট ১৮৯৪)। পৃ. ১১৭।

সূচী :—কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, উত্তরচরিত, যুদ্ধকটিক, জয়দেব, পদ্মপ্রীতি, কাব্যে প্রকৃতি, রবিবর্ণা, হিন্দু দেবদেবীর চিত্র।—এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে ‘সাধনা’য় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরি-বর্ধিত হইয়াছে।

২। মাধবিকা (কাব্য)। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ এপ্রিল ১৮৯৬)। পৃ. ৩২।

৩। শ্রাবণী (কাব্য)। ৪ আষাঢ় ১৩০৪ (১৭ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ২৬।

বলেজনাথের মৃত্যুর আট বৎসর পরে—১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে, রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত “বলেজনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” সহ ‘স্বর্গীয় বলেজনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী’ (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলীতে বলেজনাথের পুস্তক তিনখানি ও নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে কতকগুলি রচনা ইহাতে বাদ পড়িয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে সঙ্কলনকর্তা রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী নিজেই বলিয়াছেন, “রচনার কালামুদ্রক্রে সঙ্কলন করিলেও লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি বুঝিবার সাহায্য ঘটিত; কিন্তু তাহাও ঘটয়া উঠে নাই।” এমন কি পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলি কোন পত্রিকার কোন সংখ্যা হইতে গৃহীত, তাহার নির্দেশও গ্রন্থাবলীতে পাইবার উপায় নাই। স্থানাভাবে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার রচনাবলীর কালামুদ্রক তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কেবল যে-রচনাগুলি গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই, তাহারই উল্লেখ করিতেছি :—

১। কল্পোলিনী (কবিতা)—

‘ভারতী ও বালক’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭

২। বিজ্ঞতা (কবিতা)—

‘সাহিত্য’, আষাঢ় ১২৯৭

৩। কবি ও সেক্টিমেন্ট্যাল—

‘সাহিত্য’, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

৪। প্র্যাকটিক্যাল—

‘সাহিত্য’, ভাদ্র ১২৯৮

৫। লওনে কংগ্রেস—

‘ভারতী ও বালক’, ভাদ্র ১২৯৮

৬। রবিবর্ণা (অসমাপ্ত); লাহোরের বর্ণনা (অসমাপ্ত);

শিবসুন্দর*—‘প্রদীপ’, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬।

* রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“বলেজনাথের রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া

সম্প্রতি ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩) বলেজনাথের তিনটি ছোট কবিতা—“সৌরভ”, “হৃদনার” ও “বিদায়” প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-জবনে রক্ষিত “পারি-বারিক-স্মৃতিলিপি-পুস্তক” অহুসন্ধান করিলেও হয়ত তাঁহার কিছু অপ্রকাশিত রচনা মিলিতে পারে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

সঙ্গীত-রচনাতেও বলেজনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইটি গান ‘ব্রহ্মসঙ্গীত’ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গান দুইটি—

(১)

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়।
জগত শিশুর মত চরণে ঘুরায়ে রয়।
অভিমান অঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি হুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অমৃত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

(২)

নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
সুপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা।
খাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে শুভ্রমান,
অচেতন বিধে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি-নিমেষ,
মিল’ সে জাগ্রত প্রাণে, ভাদ্র এ কুহক-কারা।

বলেজনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

বলেজনাথের যুত্বুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে মনীষী প্রিয়নাথ সেন আলোচনা করেন। এই আলোচনা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘প্রদীপে’ (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬) প্রকাশিত হয়। আমরা উহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“বলেজনাথের যুত্বুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যাহুগী মাঝেই শোক-সমুদ্র হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ণ রচনা-শক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গড়ে—কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার

আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জঁজ যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের অরণ্যার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহাদেশকে ‘প্রদীপ’ সম্পাদকের নিকট গুণযুক্ত করিলাম।”

প্রথম গদ্য-প্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিভা প্রায়ই পূর্বতন আচার্য-দিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা-গঠনে পরিচিত শব্দবিভাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দ-রচনায় পূর্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য্য অহুভব করি। বলেজনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা-প্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা বা ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেজনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে বলেজনাথের গড়ে বা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্তী লেখককে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পূর্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না-কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে বাহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেজনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি কল্পকবি—আজন্ম রচনা-রসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজস্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গড়ে তিনি যেসকল উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে, তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে গড়ের সকল পদ্ধতি তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাঁহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির অন্তর্গত ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পড়ের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর কারণ। গড়ের শক্তি ৩০ উৎকর্ষের সীমা আছে—পড়ের নাই। গড়ে মানব-হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার ‘নাগাল’ পায় না—গভীরতার ‘ঐ’ পায় না—সৌন্দর্য্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস, ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না—জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে—ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়—কমনীয়তায় ও নমনীয়-তায় পদ্য জীবনের সমস্ত অনির্দেশ পরিধি তাহার আলোকময়ী

গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাণী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখক সত্যই বলিয়াছে যে পণ্ডের পক্ষ ও চরণ দুই আছে—কিন্তু গণ্ডের পক্ষ নাই কেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গল্পপাঠে আমরা পরিতুষ্ট হই। পণ্ডপাঠে আনন্দলাভ করিলেও, আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

‘ভারতী’তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গল্পে বলেন্দ্রনাথ একখানি পুস্তক ‘চিত্র ও কাব্য’ এবং পণ্ডে ‘মাধবিকা’ এবং ‘শ্রাবণী’ নামে দুইখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

‘চিত্র ও কাব্য’ সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িণী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা-শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখায় ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাচ নাই—পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চক্চকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তরুণ হৃদয়ের বিস্তারতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য-সমালোচনার তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রৌচ্ছল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তি সকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্যের কনক মন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও দেখিলাম না মিথ্যা বাক্যচাতুরীর জালে চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য সকলের মর্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত-স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্যকলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আয়তানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখন্য স্থান পায় নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনায় আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্ম্মস্থলন দেখাইয়া দিয়াছেন। ‘গীত-গোবিন্দ’ যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্য্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমল-কান্ত শব্দ-বিভাস এবং বিচিত্র স্বাক্ষর যে গানের সর্ব্বথা উপযুক্ত ইহা দেখাইয়া সন্দেহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনা-পটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বার্থাত্মক আত্মবিস্মৃতি তাহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা প্রকৃতির মহান ও বিরাট রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি ‘মেঘমল্ল সমাসে’—নিবিড় শব্দ-যোজনায় তাহাতে সিদ্ধহস্ত।

চিত্র ও কাব্যে আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত কলার (Fine arts) আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিহার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ-পাইয়াছে। আজকাল আবাকুরবিবর্ষা—ক্ষাত্রে প্রভৃতির শিল্পচাতুর্য্যে এই দীন দেশের পূর্ব্ব গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তক এবং অল্প বলেন্দ্রনাথ তাহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদেব নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

‘ভারতী’তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গল্প প্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাব-গৌরবে ও রচনা-সৌন্দর্য্যে তাহারা বাদ্যলা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গল্প সকল কথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাদ্যলা গঞ্জে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণের ছায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ছায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও বৃক্ষবাটিকার ছায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্র-নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ছায় সমুচ্ছল। ‘বসুমতী’র লেখক যে বলিয়াছেন, “বলেন্দ্র সুলেখক”;—সুলেখকই নয়, অমন গল্প লেখা বুদ্ধি আর পড়ি নাই; তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাব-মাধুর্য্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াক্রমের বীজনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ” ইহা নিতান্ত অতুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পণ্ডগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব্ব সম্বোধনী আছে। ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটাই পড়িবে তাহারই ভিতর স্তনিতে পড়িবে এক নূতন কণ্ঠ, নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্রনাথের সমীচীন প্রাধাত্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাহার মৌলিকতা গদ্যে, কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, যুলে কবি। পূর্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটি কথা এক একখানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্পাধিক পরিমাণে তাহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডে একা প্রকৃতি নিজেই তাহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্গীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্য্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মুখ সৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের যুগ্মমিয়ার ধোয়া সহসা ছাড়ে না।

এই ছই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী “দিশে দিশে গীতে গন্ধে” মুগ্ধরিত। বিরহে মিলনে, অন্তরে বাহিরে, শয়নগৃহে, নদীবক্ষে—প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-বন নিবিড় অহুসাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে—সকল বিলাস-কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—“একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি”।

কালিদাসের ‘ঋতুসংহার’র সহিত ‘মাধবিকা’ ও ‘শ্রাবণী’র কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু ‘ঋতুসংহারে’ বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব, একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই ছই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া ‘ঋতুসংহার’ বাহ্যশোভা বর্ণনাই পরিপূর্ণ। এই ছই পুস্তকের কবিতা, পূর্বেই বলিয়াছি, নিত্য অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত। ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটি। প্রথম কবিতাপুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেঙ্গনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্ত যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয়-সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাবগত বশ্য।

সাহিত্যে এমন অহুসাগ এমন অপূর্ণ ক্ষমতার অকাল অবসানে বাদলা ভাষার, বিশেষতঃ অভিনব ও উপচীর্ণমান বাদলা গদ্যের যে সুস্থান, ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।”

রচনার নিদর্শন

বলেঙ্গনাথের অপূর্ণ রচনা-কৌশল দেখাইবার জন্ত আমরা

তাঁহার “কণারক (উড়িয়ার স্বর্য়্যমন্দির)” প্রবন্ধ হইতে অংশ-মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

“কণারকে এখন কিছুই নাই, ধু ধু প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি-মন্দির—শৈবালচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম স্বর্য়্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল ওজ আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবরিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত। তান্ত্রিলিপির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পথ ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল যুগ অর্ণবয়ান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ষষ্ঠাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসন্ত্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশষোষণায় তরুণী সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উজ্জীর্ণমান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিংগধ্বর্ক-সেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত ছুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি স্বর্য়্যদেবের অহুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাহুতি আপন কনক কিরণে সমস্ত জালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়ন।।.....

পন্নিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাহুড় বাসা বাধিয়াছে, হিম শিলাধোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামস্থখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের বিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পণ্ডিতজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্নস্বর্য়্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল-শয্যায় এখানে নিঃশঙ্কে অবসিত হইতেছে—এবং অন্তগামী স্বর্য়্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাতু যুত্মর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশের মত বোধ হয়।”—‘সাদনা’, ভাদ্র ১৩০০।

বলপূর্বক ধর্মাস্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে স্মৃতির বিধান

শ্রীমদাচার্য

নোয়াখালির মর্মান্তিক ব্যাপারের পর আজ হিন্দুসমাজ এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ নোয়াখালির ঘটনা-বলীকে সাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর্যায়ে ফেলা চলে না। সাধারণ দাঙ্গায় যে সব ঘটনা ঘটে, যেমন নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি, সে সব ছাড়াও যে ছুটি ব্যাপারে সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন সে ছুটি হল বলপূর্বক ধর্মাস্তরীকরণ এবং বিবাহ বা ধর্ষণ। বলা বাহুল্য যে, বলপূর্বক ধর্মাস্তরীকরণের কোনই অর্থ বা মূল্য নেই। পৃথিবীর কোনো ধর্মই এটা অনুমোদন করে না। সেজন্য এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ধর্মবিরোধী, এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল মুসলমানই এক বাক্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ধর্ম মনের জিনিষ—বুদ্ধি দিয়ে বুঝে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, স্বৈচ্ছাক্রমে যা গ্রহণ করা হয় তাই কেবল হতে পারে মানুষের প্রকৃত ধর্ম। কিন্তু প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বলপূর্বক নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়ে, অর্থহীন কতকগুলি আচারানুষ্ঠান করতে বাধ্য করিয়ে যে ধর্মগ্রহণ করান হয়, তাকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করাই মুঢ়তা মাত্র। বলপূর্বক বিবাহ বা ধর্ষণের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। ধর্মের মত সত্যিকার মনের ধর্ম। পশুপ্রকৃতির হুরারাদার অত্যাচারে নারীর দৈহিক ও মানসিক পুষ্কিতার কণামাত্র হানি হয় না, এত স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, অতীতে আমাদের এই হিন্দুসমাজই এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকেই অবহেলা করে, বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত নরনারী এবং বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে ত্যাগ করেছে। যুক্তি, তায়, দয়া—সমস্ত কিছুই বিসর্জন দিয়ে তৎকালীন সমাজপতিরা কেন এরূপ অত্যন্ত নিয়মের প্রচলন করেছিলেন, সে আলোচনা আজ আর করে লভ্য নেই। কিন্তু তাঁদের সেই হুঁচকিপ্ৰসূত বিধানের জটাই বেশ শত শত বৎসর পরেও আজ এরূপ পৈশাচিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হতে পায়ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু নরনারীদের ধর্মাস্তরিত করা এবং হিন্দু নারীদের বিবাহ করে বসমাজভুক্ত করা এত সহজ বলেই ত হুঁচকির এ বিষয়ে এত সাহস করতে পারে। যদি তারা জানত যে হিন্দু সমাজ এদের ত্যাগ করবে না, বরং সাদরে স্থান দেবে, তা হলে নিশ্চয় তারা এ সব করাকে পণ্ডশ্রম বলেই গণ্য করে এ থেকে নিবৃত্ত হ'ত।

যা হোক, অতি দুঃখের বিষয় যে, অতীতে হিন্দুসমাজ এই প্রকার নিরপরাধদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করে থাকলেও বর্তমানে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। প্রবাদ আছে যে, প্রতি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের বীজও নিহিত থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতি প্রচণ্ড আঘাতে আজ হিন্দু-সমাজের যুগযুগান্তব্যাপী জড়তা ও মুঢ়তা অনেকাংশে ছিন্নভিন্ন

হয়ে গেছে, এবং ফলে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতির পন্থা আজ সুগম হয়ে এসেছে। নোয়াখালির ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত হিন্দুসমাজে স্পষ্ট বিধান দিয়েছেন যে, বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত হিন্দু নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা হিন্দু নারীরা 'হিন্দুই' আছেন, এবং তাঁদের দৈহিক ও মানসিক পুষ্কিতার কোনই হানি হয়নি বলে তাঁদের কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নেই। এই বিধান যে সর্বতোভাবে ভার্য্যমোদিত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কারের উচ্ছেদ এক দিনে হবার নয়। সেজন্য আজ সমাজ তাঁদের সাদরে আহ্বান করলেও, ধর্মাস্তরিত নরনারী ও অপহৃত নারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের অশুচি মনে করে সমাজের বাইরেই থাকতে চাইছেন। এমন খবরও শোনা গেছে যে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীরা কয়েকজন হিন্দুসমাজে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি দিয়েছেন, যাতে তাঁদের পরিবার তাঁদের অশুচিসংস্পর্শে বিপদগ্রস্ত না হন। এঁদের মানসিক শান্তির জন্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা বিধান দিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে সমাজের দিক থেকে তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন না হলেও, তাঁরা তাঁদের নিজেদের দিক থেকে নিজেদের অশুচি বলে মনে করলে গঙ্গাস্নান বা সহস্রবার নামজপ প্রভৃতি নাম মাত্র প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। যারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত মানসিক শান্তি পাবেন না তাঁদের জন্ত এই বিধানও ফে সমরোপযোগী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অতীতের সমাজ-ব্যবস্থায় বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের সাধারণতঃ সমাজে স্থান না থাকলেও আমাদের পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কয়েকটি স্থানে স্পষ্ট বলা আছে যে বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত ও ধর্ষিতাদের কোন অপরাধ হতে পারে না। কোটনো কোনো স্মৃতিকার এঁদের জন্ত নানারূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করে তাঁদের সমাজে স্থান দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে সংস্কৃতির চর্চা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায়, এবং স্মৃতিশাস্ত্রাদির মুদ্রিত সংস্করণ ছাপা হওয়ায় এ সম্বন্ধে সাধারণের অনেকেই কিছু জানেন না। সেজন্য এরূপ কয়েকটি বচন সংগ্রহ করে বঙ্গভূবাসী সহ এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

মহাভারত

মহাভারতের শান্তিপর্বতের মোক্ষধর্ম পর্বে কয়েকটি সূত্রের মতো আছে। এই শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, নারীরা পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল বলে, নারীদের কোন অপরাধ হতে পারে না, সব অপরাধ কেবল পুরুষেরই। অর্থাৎ, সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষই যখন নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণা-

বেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন, তখন পুরুষের ক্রটি বা অক্ষমতার জন্ত নারীর বিপদ ঘটলে তার জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষই, নারী কেন সেজন্ত সামাজিক দণ্ড ভোগ করবে? এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার নীলকণ্ঠ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বলপূর্বক ধর্মিতা-নারী সম্পূর্ণ নিরপরাধা; এমন কি, ব্যভিচারিণী নারীকেও কোন দণ্ড সমাজ দিতে পারে না, কারণ এ ক্ষেত্রেও পুরুষই প্রথম নারীকে প্রলোভিত করেন বলে, সব দোষ কেবল পুরুষেরই। শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত রূপে :—

মূল সংস্কৃত :—“পানিবন্ধনং স্বয়ং কৃত্বা সহধর্মমুপেত্য চ। যদা যাত্তস্তি পুরুষাঃ জিয়ো নারীস্তি যাচাতাম্ ॥ ভরণাচ্চি জিয়ো ভর্তা। পাত্যাট্টেব জিয়ঃ পতিঃ। গুণসাম্য নিবৃত্তো তু ন ভর্তা। ন পুনঃ পতিঃ ॥ এবং জী নাপরাধোতি নর এবাপরাধ্যতি। ব্যুচরংস মহাদোষং নর এবাপরাধ্যতি ॥ জিয়া হি পরমোভর্তা। দৈবভং পরমং স্মৃতম্। তস্তাশ্চনা তু সদৃশমাত্মানং পরমং দর্দো ॥ নাপরাধোহস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি। সর্বকাৰ্য্যাপরাধ্য-ত্বাপরাধ্যস্তি চান্দনাঃ ॥” (শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ২৬৫ অধ্যায়, শ্লোক ৩৭—৪০)

নীলকণ্ঠকৃত টীকা :—“নহু ব্যভিচারিণী জীহন্তব্যৈবান্যাথা কুল-সঙ্করাপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। এবমণীত্যর্থঃ। ব্যাচরন-চরন মহাদোষং পারদার্মম; যদি প্রার্থয়িতেন ন স্যাতিহি নায়ং দোষঃ প্রসজ্যোভাতঃ প্রথম প্রবৃত্তে গুণেবাস্বয়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নহু জিয়া অপি তদহুমোদনাদপরাধোহন্তোবেত্যশঙ্ক্যাহ জিয়া হীতি। তস্তাশ্চনা পরীরেণ সদৃশমিত্তমালেক্ষ্য আত্মানং শরীরং পরমং শ্রেষ্ঠং দর্দো স্বপতিবেষণাগত্য পরমৈ পতিবুদ্ধ্যা শরীরং প্রযচ্ছন্ত্যা মম মাতুর্ন ব্যভিচারদোষোহস্তি গর্ভাহংপন্তে: কুলসঙ্করা ভাবাচ্চ নৈয়ং বহোভ্যর্থঃ। উপসংহরতি নাপরাধ ইতি। কিঞ্চ সর্বৈষু কার্ষেধপরাধ্যত্বাদহুরোধ্যত্বাদম্বলব্ধেন সর্বথা পুরুষাধীনত্বাং। তথা চ বলাংকারকৃতে ব্যভিচারাদৌ জিয়ো নাপরাধ্যস্তীত্যর্থঃ ॥”

বদ্বাহবাদঃ :—“এক নারীর পানিগ্রহণ করে এবং তাঁকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে যদি পুরুষ পরদারগামী হন, তা হলে তিনি জীর নিকট পুঞ্জীয়ও আর থাকেন না। ভরণপোষণ করেন বলেই তিনি (স্বামী) জীর ‘ভর্তা’, এবং পালন করেন বলেই তিনি জীর ‘পতি’। এই গুণের নিবৃত্তি হলে তিনি ‘ভর্তা’ও থাকেন না, ‘পতি’ও থাকেন না। এরূপে জীর কোনো অপরাধ হয় না, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। মহাদোষ অহুষ্ঠিত হলেও, কেবল পুরুষেরই অপরাধ হয়। ভর্তাই জীর পরম দেবতা—স্মৃতির এই মত। (অহল্যা) পতি জানেই (ইন্দ্রকে) আত্মদান করেছিলেন, (সেজন্ত তার কোন দোষ হয় নি)। নারীর কোন অপরাধ নেই, পুরুষই অপরাধ করেন। সর্বব্যাপারে পুরুষাধীন বলে নারীদের কোন অপরাধ হতে পারে না।”

টীকা :—“ব্যভিচারিণী জী নিশ্চয়ই হত্যার যোগ্য, নতুবা কুলসঙ্করের উৎপত্তি হবে—এই মতের নিরসনের জন্ত বলা হচ্ছে যে, পরদারগমন রূপ মহাদোষে পুরুষেরই অপরাধ হয়, কারণ নারীকে পুরুষ প্রার্থনা করেন বলেই এই মহাদোষ ঘটে। স্মৃতরাং (এই ছন্দার্থে) পুরুষই প্রথম প্রবৃত্ত হয় বলে এই দোষ পুরুষেরই। যদি বলা হয় যে, নারীরও এই কার্যে অহুমোদন আছে বলে তাঁরও অপরাধ হয়—তার উত্তর এই যে, নারী পতিজ্ঞানেই পরপুরুষকে আত্মদান করেন বলে তিনি ব্যভিচারিণী হন না। এইজন্ত উপসংহারে বলা হচ্ছে—যে, নারীর কোন অপরাধ হয় না। বস্তুতঃ, সর্বকার্যে নারী পুরুষের অধীন বলে বলাংকারকৃত ব্যভিচারাদিতে নারীদের কোন অপরাধ হয় না।”

মহাভারতে অপর এক স্থলে বলা আছে :—“ন তু জিয়া ভবেদোষো ন তু সা তেন লিপ্যতে ॥ ভোজনং হস্তরা শুদ্ধং চাতুর্মাসো বিধীয়তে ॥ জিয়ন্তেন প্রপ্ত্যস্তি ইতি ধর্মবিদো বিহুঃ ॥ জিয়াত্মাশঙ্কিতাঃ পাপাঃ নোপগম্যা বিজ্ঞানতা। রজসা তা বিস্তুধ্যন্তে ভয়না ভাজনং যথা ॥” (শান্তিপর্ব, রাজধর্মপর্ব, ৩৫।২৮-৩০)।

অর্থাৎ “নারীর কোনো দোষ হয় না, তিনি দোষে লিপ্ত হন না। (মহাপাতক করলেও) তাঁরা চতুর্মাসব্যাপী পারগব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন—ধর্মবিদগণের এই মত। পণ্ডিতগণ নারীদের মানসিক বা একবার মাত্র কৃত পাপকে গুরুতর বলে মনে করেন না। সেই পাপ রজঃ দ্বারা শুদ্ধ হয়, যেরূপ ভক্ষ্য দ্বারা পাত্র শুদ্ধ হয়।”

অত্রিসংহিতা, অত্রিস্মৃতি, বশিষ্ঠস্মৃতি ও বৌধায়ন স্মৃতি

এই স্মৃতিগুলি অতি প্রাচীন, এবং এদের সবগুলিতেই প্রায় একই শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে নারীরা সর্বদাই পবিত্র, সেজন্ত তাদের কোন অপরাধ হতে পারে না; বলপূর্বক ধর্মিতা নারীদের ত্যাগ অবিধেয়। অত্রিস্মৃতির শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত রূপে। অত্রিসংহিতায় (শ্লোক ১৯৩-১৯৮) এর অনেকগুলি উদ্ধৃত আছে, বশিষ্ঠস্মৃতিতে (শ্লোক ২৮।১-১০) এর সবগুলিই হুবহু পাওয়া যায়; এবং বৌধায়নস্মৃতিতে (২।৬৩-৬৪) এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ আছে।

মূল সংস্কৃত :—“ন জী ছ্যতি জারেন ন বিপ্রো বেদপারগঃ। নাহংপো মূত্রপূরীষেণ নায়ির্দহনকর্মণা ॥ বলাংকারোপভুক্তা য় চৌরহন্তগতাপি বা। স্বয়ং চাপি বিপরা বা যদি বা বিপ্র-বাদিতা ॥ ন ত্যাজ্যাদৃষিতা নারী নাস্তান্ত্যাগো বিধীয়তে। পুষ্পকালয়ুপাসীত্বা ঋতুকালেন শুধ্যতি ॥ জিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতাছ্যস্তি কেনচিৎ। মাসি মাসি রজো হাসাং ছুস্তান্ত-পকর্ষতি ॥ পূর্বং জিয়ঃ স্মরৈতু জ্ঞাঃ সোমগধ্ববহিভিঃ। ভুজ্যন্তে মাহুযৈঃ পশ্চাদ্ভৈতা ছ্যস্তি কহিচিৎ ॥ অসবর্ণেন যো গর্ভঃ

জীবাং যোনা নিষিচ্যতে। অন্তরা তু ভবেনারী যাবচ্ছল্যং ন মুঞ্চতি ॥ নিঃসৃত্যে তু ততঃ শল্যে রজসোহপীহ দর্শনাং। ততঃ সা শুধ্যতে নারী বিমলা কাঞ্চনোপমা ॥ সোমঃ শৌচং দর্দো তাসাং গর্ভবশ্চ শুভাং গিরম্। পাবকঃ সর্বমেধ্যাং তন্মান্নিক্রম্যাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ব্যঞ্জনৈশ্চ জাতৈশ্চ সোমো ভুঞ্জে চ কল্ককাম্। পয়োধরেয়ু গর্ভা রজস্যগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ভক্ষনা শুধ্যতে কাংস্তং তান্নমল্লেন শুধ্যতি। রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি ॥ গৌকরীষেণ রজতং স্তবর্ণং চাপি বারিণা। আকরাঃ শুচয়ঃ সর্বে বর্জয়িত্বা সুরাকরম্ ॥ আসনং শয়নস্থানং জীমুখং কুতপং বুরম। ন দূষয়ন্তি বিদ্বাংসো যজ্ঞৈশ্চ চমসং যথা ॥ মক্ষিকাসন্ততিধারা ভূমিস্তোষং হত্যাশনঃ। মার্জারশ্চৈব দর্বা চ নকুলশ্চ সদা শুচিঃ ॥ বংসঃ প্রস্রবণে মেধ্যাঃ শকুনিঃ ফলপাতনে। শ্রিয়শ্চ রতি-সংযোগে ণা যুগগ্রহণে শুচিঃ ॥ পাতুকে খঞ্জতো মেধ্যে হুতমার্গে জ্যপানহো। বজ্রং কোপীনকে মেধ্যাং জিয়ো মেধ্যাস্ত সর্বতঃ ॥ অজার্ষো মুখতো মেধ্যো গাবো মেধ্যাস্ত পৃষ্ঠতঃ। ব্রাহ্মণাঃ পাদভো মেধ্যাঃ জিয়ো মেধ্যাস্ত সর্বতঃ ॥”

বঙ্গাহ্বাদ :—“উপপতি কর্তৃক জী দোষদুষ্টি হন না, বেদজব্রাহ্মণও (বেদোপদিষ্ট হিংসামূলক কর্ম দ্বারা) দোষদুষ্টি হন না। জল মূত্র পূরীষ দ্বারা এবং অগ্নি (অশুচি দ্রব্যের) দাহকার্য দ্বারা দোষদুষ্টি হয় না। বলপূর্বক উপভুক্ত, অথবা চোরহস্তগতা, অথবা স্বয়ং বিপন্ন, অথবা প্রতারিতা নারী অদূষিতা বলে ত্যাক্ষ্য নয়, তাঁকে ত্যাগ করা উচিত নয়। ঋতুকালে নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করলে তিনি শুদ্ধ হন। নারীরা অতুল পবিত্রতা ভাজন, তাঁরা কিছুতেই দোষদুষ্টি হন না। প্রত্যেক মাসে ঋতু এঁদের দোষ অপহরণ করে। পূর্বে নারীরা সোম, গর্ভ ও অগ্নি—এই দেবতাগণ কর্তৃক উপভুক্ত হয়েছিলেন। পরে মানুষ তাঁদের উপভোগ করে, (সেজ্ঞ) তাঁরা কোনপ্রকারেই দোষদুষ্টি হন না। অসবর্ণ কর্তৃক যে গর্ভ নারীতে নিষিক্ত হয়, সেই গর্ভ যত দিন পর্যন্ত নিঃসৃত না হয় তত দিন নারী অশুদ্ধ থাকেন। কিন্তু গর্ভনিঃসৃত হবার পরে এবং রজোদর্শনের পরে তিনি বিমল কাঞ্চনের ছায়া শুদ্ধ হন। তাঁদের সোম শুচিতা, গর্ভ শুভবাক্য ও অগ্নি সর্বপবিত্রতা দান করেছেন, সে জন্ত নারীরা নিকল্যা। কাংস্ত পাত্র ভক্ষ দ্বারা ও ভাত্রাপাত্র অন্ন দ্বারা শুদ্ধ হয়। নারী রজঃ দ্বারা ও নদী বেগ দ্বারা শুদ্ধ হয়। রৌপ্য গোময় দ্বারা, স্বর্ণ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। সুরাপাত্র ব্যতীত অপর সকল পাত্রই শুচি। বিদ্বান্গণ যেক্রপ যজ্ঞে যজ্ঞপাত্রাদির নিন্দা করেন না, সেক্রপ আসন, শয়নস্থান, জীমুখ, কুশ (বা কয়ল) ও ধূরেরও নিন্দা করেন না। ভ্রমরপুঞ্জ, জলধারা, ভূমি, জল, অগ্নি, মার্জার, যজ্ঞহাতা ও নকুল সর্বদা শুচি। গোবংস ছুঁ ক্ষরণ সময়ে, পক্ষী ফলপাতন সময়ে, নারীরা রতি-সংযোগ সময়ে ও কুরুর যুগ গ্রহণ সময়ে শুচি হয়। খঞ্জের নিকট পাতুকা এবং দুর্গমার্গে পাতুকা শুচি। বজ্রের মধ্যে কোপীন শুচি, কিন্তু নারীরা সর্বত্র শুচি। অজ ও

অশ্বের মুখ পবিত্র, গাভীর পৃষ্ঠ পবিত্র, ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র, কিন্তু নারীদের সর্বত্র পবিত্র।” (অত্রিসংহিতা ৫১১-১৬)।

অত্রিসংহিতায় ধর্মিতা নারীদের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত নূতন দুটি শ্লোক আছে।

মূল সংস্কৃত :—“সকৃদুক্তা তু যা নারী স্নেহৈর্বা পাপকর্মভিঃ। প্রাজাপত্যেন শুদ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু ॥ বলাদ্ধাতা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি। সকৃদুক্তা তু যা নারী প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।” (অত্রিসংহিতা ১১৭-১১৮) ॥

বঙ্গাহ্বাদ :—“যে নারী স্নেহ বা পাপিষ্ঠ কর্তৃক একবার উপভুক্ত হয়েছেন, তিনি প্রাজাপত্য ব্রতাহুষ্ঠান ও ঋতু দ্বারা শুদ্ধ হন। যে নারী বলপূর্বক অপহৃত অথবা স্বয়ং প্রতারিতা হয়ে একবার উপভুক্ত হয়েছেন, তিনি প্রাজাপত্য ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হন।”

অত্রি সংহিতায় বিধর্মী জী সংস্পর্শদুষ্টি পুরুষের জন্তও নিম্ন-লিখিত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

মূল সংস্কৃত :—“জিয়ো স্নেহস্ত সম্পর্কীকৃতিঃ সান্তপনে তথা। তপ্তরুচ্ছ্রং পুনঃকৃত্য শুদ্ধিরেষাভিধীয়তে। সংবর্তেত যথা ভাষ্যং গয়া স্নেহস্য সদতাম্। সচেলং স্নানমাদায় দ্ব্যতস্ত প্রাশনেন চ।...চাণাল-স্নেহ-ঋপচ-কপালব্রতধারিণঃ অকামতঃ জিয়োগত্যা পরাকেন বিশুধ্যতি।” (অত্রিসংহিতা, ১৮০-১৮১, ১৮৩)

বঙ্গাহ্বাদ :—স্নেহ জীর সংস্পর্শে আসিলে সান্তপনব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়। পুনরায় তপ্তরুচ্ছ্র সাধন করলে শুদ্ধি-লাভ হয়। স্নেহোপভুক্তা ভাষ্যর সহিত ব্যবহার করলে সব্রত স্নান ও দ্ব্যত ভোজন দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।...অনিচ্ছা সত্ত্বে চাণাল স্নেহ, ঋপচ ও কপালব্রতধারীদের জীগমন করলে পরাক-ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।”

মহুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ও বিষ্ণুস্মৃতি

মহুস্মৃতি প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিরূপে সমাজে সম্মানার্থ হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিও অতি প্রাচীন। মহুস্মৃতিতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। তাতে বলা হয়েছে যে বলপূর্বকৃত কার্যাদি অর্থশূন্য বলে কর্তার কোন অপরাধ হয় না। শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপে :—

মূল সংস্কৃত :—“বলাদ্ধতং বলাভুক্তং বলাদযজাপি লেখিতম্।* সর্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মহুস্মৃতবীং।” (মহু-স্মৃতি ৮।১৬৮)।

বঙ্গাহ্বাদ :—“বলপূর্বক যা দত্ত হয়, বলপূর্বক যা ভুক্ত হয়, বলপূর্বক যা লিখিত হয়, বলপূর্বক যা কৃত হয় মহু বলেছেন যে, সে সবই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ।”

অন্ত এক স্থানে মহু অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত পাপের মধ্যে প্রভেদ বোঝাবার জন্ত বলেছেন যে, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে অনিচ্ছাকৃত পাপেরই কেবল প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষালন সম্ভব,

ইচ্ছাকৃত পাপের নয়। মনুষ্য মতে, অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্ত কেবল লঘু প্রায়শ্চিত্তেরই প্রয়োজন, যেমন বেদাভ্যাস; কিন্তু ইচ্ছাকৃত পাপের জন্ত অত্যাচ্ছন্ন গুরু প্রায়শ্চিত্তও অত্যাৱশ্যক। শ্লোক দুটি এইরূপ—

মূল সংস্কৃত :—অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিহুবৃধাঃ।
কাম্যকারকৃত্যেহাপ্যাহরেকৈ শ্রুতিনিদর্শনাৎ। অকামতঃ কৃতং
পাপং বেদাভ্যাসেন শুদ্ধ্যতি। কামতস্ত কৃতং মোহাৎ
প্রায়শ্চিত্তৈঃ পুণ্যবৈধৈঃ।” (মহাসংহিতা, ১১৪৫১৪৬)

বঙ্গাহ্ববাদ :—কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে (কেবল) অনিচ্ছাকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। কেহ কেহ শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলেন যে ইচ্ছাকৃত পাপেরও (প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব)। অনিচ্ছাকৃত পাপই বেদাভ্যাসে শুদ্ধ হয়। কিন্তু মোহবশতঃ ইচ্ছাকৃত পাপের ক্ষালন পুণ্য পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সম্ভবপর।”

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লেখ্যপ্রকরণে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বলপূর্বক বা হলপূর্বক যা লিখিত হয় তা অপ্রমাণ। এই নিয়মটি নিঃসন্দেহ অত্যাচ্ছন্ন বিষয়েও সমান প্রযোজ্য।

মূল সংস্কৃত :—“বিনাপি সাক্ষিভিলেপ্যং স্বহস্ত লিখিতস্ত
যৎ। তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে।” যাজ্ঞবল্ক্য-
সংহিতা, ৯১।

বঙ্গাহ্ববাদ :—“সাক্ষী ব্যতীত ও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য (দলিল) প্রমাণ বলে পরিগণ্য কিন্তু যা বলপূর্বক ও হলপূর্বক লিখিত হয়, তা প্রমাণ নয়।”

বিষ্ণু-সংহিতাতেও এই একই কথা আছে।

মূল সংস্কৃত :—তদ্ব্যাপ্যকারিতমপ্রমাণম্। উপধিকৃতাস্ত
সর্ব এব। (বিষ্ণু-সংহিতা ৭৬-৭)

বঙ্গাহ্ববাদ :—“বলপূর্বক সাধিত (লেখ্য) অপ্রমাণ, হলপূর্বক সাধিতও তাই।

বৃহৎ-যমস্মৃতি

বৃহৎ-যমস্মৃতির মতেও বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত ব্যক্তিদের জন্তও প্রায়শ্চিত্ত আছে, এবং সেজন্য সমাজ তাদের ত্যাগ করতে পারে না। শ্লোকটি এইরূপ—

মূল সংস্কৃত :—“বলাদাসীকৃত্য যে চ স্নেহ-চাণাল-দম্মাভিঃ।
অন্তঃ কারিতা কর্ম গবাদি প্রাণিহিংসনম্। প্রায়শ্চিত্তং চ
দাতব্যং তারতম্যেন বা দ্বিভৈঃ।” (বৃহৎ-যমস্মৃতি ৫১৫-৬)

বঙ্গাহ্ববাদ :—“ঈদের স্নেহ, চণাল ও দম্মা বলপূর্বক দাসরূপে পরিণত করেছে এবং ঈরা গবাদি প্রাণিহিংসারূপ অন্তঃ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের জন্ত ঐ সবার তারতম্যানুসারে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য।”

দেবলস্মৃতি

এই স্মৃতি বর্তমানে ছুপ্রাপ্য। সমগ্র স্মৃতিটিতেই বলপূর্বক ধর্মাস্তরিতকরণ ও ধর্মগত বিষয়ে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান

আছে। মূলস্মৃতিটি বা তার সমগ্র বঙ্গাহ্ববাদ এ স্থলে দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে, বাংলা সারাংশ মাত্র প্রদত্ত হচ্ছে।

১। যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক বিধর্মী কর্তৃক নীত হয়ে অপেক্ষা দ্রব্য পান, অত্যাচ্ছন্ন দ্রব্য ভক্ষণ এবং অগম্য স্ত্রী গমন করতে বাধ্য হন, তা হলে ব্রাহ্মণ প্রমুখ চতুর্ভূজ এবং ঈদৃশ অবস্থার কাল ভেদে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে।

(ক) এক বৎসর কাল এই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হলে, ব্রাহ্মণের পক্ষে চাক্ষায়ণ ও পরাক্রতের অনুষ্ঠান আবশ্যক। ক্রুপক্ষের প্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশ, এইরূপে ক্রমশঃ এক এক গ্রাস গ্রাস করে চতুর্দশীতে এক গ্রাস মাত্র ভোজন ও অমাবস্তায় সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। পুনরায় শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এইরূপে ক্রমশঃ এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করতে হবে। এই ত্রয়ের নাম “চাক্ষায়ণ”। সংযতচিত্তে দ্বাদশ দিন উপবাস করার নাম “পরাক” ব্রত। ক্ষত্রিয়কে একটি পরাক ব্রত এবং পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করতে হবে। এক দিন দিবসে একবার মাত্র ভোজন, এক দিন রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন এবং এক দিন উপবাস করার নাম “পাদকৃচ্ছ্র”। বৈশ্যের অর্ধপরাকব্রত সম্পাদন, অর্থাৎ ছয়দিন উপবাস, এবং শূদ্রের পাঁচ দিন উপবাস করা কর্তব্য (শ্লোক ৭-৯)।

বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত কোনো ব্যক্তির দণ্ড ও মেথলা অপহৃত হলে, তিনি সংস্কার প্রমুখ সব কার্যে (যথা—বিবাহ, ব্রাহ্ম প্রভৃতিতে) যথাবিধি অধিকারী থাকবেন। কিন্তু শুদ্ধিলাভে ইচ্ছুক হলে তাঁকে ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, ভূমি ও স্বর্ণ দান করতে হবে। অত্যাচ্ছন্ন তিনি কুটুম্বগণের সঙ্গে পংক্তি ভোজনে অধিকারী হবেন না। (শ্লোক ১২-১৩)।

(খ) যিনি বৎসরাধিক কাল বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত বা অপহৃত হয়ে থাকবেন, তিনি উপরি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের পরে গঙ্গানানের দ্বারা শুদ্ধ হবেন (শ্লোক ১৫)।

(গ) যিনি পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, বা দশ থেকে বিংশতি বৎসর বিধর্মী কর্তৃক বলপূর্বক নীত বা অপহৃত হয়েছেন, তিনি দুটি প্রাজাপত্যব্রত পালন করে শুদ্ধি লাভ করবেন (শ্লোক ৫৩-৫৪)। একটি প্রাজাপত্য ব্রত দ্বাদশ দিন ব্যাপী। এর মধ্যে প্রথম তিন দিন একবার মাত্র প্রভাত্যে, দ্বিতীয় তিন দিন একবার মাত্র সন্ধ্যায়, তৃতীয় তিন দিন ভিঞ্চালরু অন্ত ভোজন, এবং শেষ তিন দিন উপবাস করতে হবে।

২। ঈরা বিধর্মী, চণাল বা দম্মাকর্তৃক বলপূর্বক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হবেন, এবং পবাদি বধ প্রভৃতি অন্তঃ কর্ম, তাদের উচ্ছিষ্ট মার্জন বা ভোজন, উষ্ট্র, শূকর প্রভৃতির মাংস ভোজন, তাদের স্ত্রীসঙ্গ ও সেই স্ত্রীগণের সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে বাধ্য হবেন, তাদের জন্ত নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন (শ্লোক ১৭-১৯)।

(ক) এক মাস এই অবস্থায় থাকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈজ্ঞ প্রাজাপত্য এবং শূদ্র পাদকৃচ্ছ্র ব্রতদ্বারা শুদ্ধিলাভ করবেন। (শ্লোক ১৯-২৭)।

(খ) ছয়মাস বা তিন মাস বিধর্মীর সঙ্গে বসবাস করলে ক্ষত্রিয় পক্ষে যথাক্রমে পরাক ও অর্ধপরাক ব্রত অস্থগ্ঠান করতে হবে (শ্লোক ২৭)।

(গ) একবৎসরকাল বিধর্মীর সঙ্গে বসবাস করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈজ্ঞ চাক্ষায়ণ ও পরাক এবং শূদ্র চাক্ষায়ণ ব্রত ও যবমিশ্রিত জলপান দ্বারা শুদ্ধ হবেন। (শ্লোক ২০, ২৬)।

(ঘ) বৎসরাদিক এই অবস্থায় থাকলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অজ্ঞাত প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন (শ্লোক ২২)।

৩। বিধর্মীর সঙ্গে একত্রে বসবাস, আলাপ ও ভোজন করলে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।

এক থেকে পাঁচ দিন এই সব করলে: গোমূত্র, গোময়, গোক্ষীর, দধি ও ঘৃত যথাক্রমে একটি, দুটি, তিনটি চারটি ও পাঁচটি গ্রহণ করতে হবে। (শ্লোক ৭৫-৭৭) তদুপরেও পঞ্চগব্য গ্রহণের বিধান আছে।

৪। চতুর্বর্ণের যারা স্নেহ বা চৌর কতৃক অপহৃত হয়ে বনে বা বিদেশে নীত হন, এবং ক্ষুধাত হরে বা ভয়বশত: অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তাঁরা স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হলে নিম্নলিখিত করেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণ একটি কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয় অর্ধ কৃচ্ছ্র, বৈজ্ঞ এক পাদ কম, শূদ্র এক পাদ কম কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করবেন (শ্লোক ৪৫-৪৬)।

৫। (ক) নারীরা যদি বিধর্মী কতৃক অপহৃত হয়ে বলপূর্বক ঋষিতা হন তা হলে ব্রাহ্মণী এক পরাক ব্রত এবং ক্ষত্রিয়া, বৈজ্ঞা ও শূদ্রা যথাক্রমে এক এক পাদ কম পরাক ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন (শ্লোক ৩৭)।

(খ) যারা ঋষিতা হন নাই তা অভক্ষ্য ও স্নেহান্ন ভক্ষণ করেন নাই, তাঁরা জিরাত্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হন (শ্লোক ৩৯)।

(গ) চতুর্বর্ণের যে নারী স্নেহান্ন বা অনিচ্ছায় বিধর্মী কতৃক সন্তান সন্তাবিতা হয়েছেন এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করেছেন, তিনি সান্তপন কৃচ্ছ্র ব্রত পালন ও ঘৃত লেপনদ্বারা বিশুদ্ধ হন। (শ্লোক ৪৯)। প্রথম দিনে সম্পূর্ণ উপবাস, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দিনে যথাক্রমে মাত্র গোমূত্র, গোময়, গোক্ষীর, দধি ও ঘৃত ভোজন এবং সপ্তম দিনে কেবল কুশোদক পান—এই হল “কৃচ্ছ্র সান্তপন” ব্রত।

(ঘ) অসবর্ণ কতৃক যে নারী সন্তানসম্ভবা হন, তিনি সন্তান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত অশুদ্ধা থাকেন, কিন্তু তৎপরে তিনি বিমল কাকনের ছায় শুদ্ধা হন (শ্লোক ৫১)।

অনীতিবর্ষ বৃদ্ধ, এবং ঊনষোড়শ বর্ষ বালক, নারী ও রোগীর পক্ষে অর্ধ প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। পঞ্চ থেকে দশ বৎসরের বালকের পক্ষে স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের স্থানে পিতা, বা যিনি লাগন-পালন করেন বা একপ অস্ত্র কেহ প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ

মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে।

যথা—ব্রাহ্ম বা উপযুক্ত পাত্রকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে সুসজ্জিতা কন্যাদান; দৈব বা যজ্ঞের পুরোহিতকে সুসজ্জিতা কন্যাদান; আর্ষ বা বরের নিকট থেকে গোবলীবর্দ গ্রহণ করে কন্যাদান; প্রাজাপত্য বা যে স্থলে স্বয়ং বরই কন্যা প্রার্থনা করেন; গান্ধর্ব বা বর কন্যার প্রেমমূলক ও পরস্পর স্থিরীকৃত বিবাহ; রাক্ষস বা কন্যাপক্ষীয় লোকদের হত্যা ও তাঁহাদের গৃহাদি ধ্বংস করে রোদ্ধমানা অনিচ্ছুকা কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ; পৈশাচ বা নিদ্রিতা, মদ্যপানমত্তা অথবা উন্মত্তা কন্যা-গমন। এর মধ্যে, সকলের মতেই, প্রথম চার প্রকার বিবাহ “ধর্ম্য” বা ধর্মসম্মত ও আইনসম্মত। গান্ধর্ব বিবাহ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। মহাভারতে রাক্ষস ও আসুর বিবাহকে “অধর্ম্য” বা ধর্মসম্মত ও আইনসম্মত নয় বলে নিন্দা করা হয়েছে, এবং একপ তথাকথিত বিবাহ কোনক্রমেই করা উচিত নয় বলে বিধান দেওয়া হয়েছে (“পৈশাচশাস্ত্রনৈশ্চ বন কতর্ব্যো কথঞ্চন”। অমুশাসন পর্ব, ৪৪।৮-৯)। এই একই পর্বে পুনরায় বলা হয়েছে যে, অনিচ্ছুকা কুমারীকে বলপূর্বক বিবাহ করলে অদ্যতমঃ নরকগামী হতে হয় (অমুশাসন পর্ব, ৪৫।২২)। মহাভারতের আদি পর্বে অবশ্য ভীষ্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কন্যাপ-হরণপূর্বক বিবাহ ধর্মসম্মত বলে নির্দেশ দিয়েছেন (আদি পর্ব, সম্ভব পর্ব, ১০২ অধ্যায়)। কিন্তু একপ বিবাহকে সাধারণ রাক্ষস বিবাহ বলা চলে না, কারণ কন্যার আত্মীয়-স্বজনকে আক্রমণ ও হত্যা করা হলেও, এস্থলে কন্যা স্বয়ং অনিচ্ছুকা নন। ভীষ্মও কাশ্মীরাজের তিন কন্যাকে স্বীয় ভ্রাতার জন্য হরণ করেন। কিন্তু প্রথমা কন্যা অর্থা এই বিবাহে অনিচ্ছুকা ছেনে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্তি দেন। সুতরাং হরণও রাক্ষস-বিবাহ নয়, কারণ স্বয়ং সুতদ্বার এ বিবাহে পূর্ণ সম্মতি ছিল। সেজন্য মহাভারত কদাপি অনিচ্ছুকা কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ ধর্মসম্মত এ কথা বলেন নি—অনিচ্ছুক অভি-ভাবকের গৃহ থেকে বিবাহেচ্ছুকা কন্যার সহিত পলায়নই যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দোষাবহ নয়—এই কেবল বিহিত হয়েছে। মনুও যখন বলেছেন যে গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত বলে স্মৃত আছে (৩।২৬), তিনিও কেবল উপরি-উক্ত বিবাহের কথাই বলেছেন, অনিচ্ছুকা কুমারীকে বলপূর্বক বিবাহ করা নয়—কারণ, তার আগের শ্লোকেই স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শেষ দুটি, অর্থাৎ রাক্ষস ও পৈশাচ “অধর্ম্য” এবং আসুর (আইনসম্মত হলেও) ও পৈশাচ বিবাহ কদাপি করা উচিত নয় (৩।২৫)। একপে মনু, ব্রহ্মস্পতি, নারদ প্রমুখ স্মৃতিকারগণ সকলেই একমত যে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অর্থাৎ বলপূর্বক অনিচ্ছুকা কন্যাকে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই “অধর্ম্য”। সুতরাং ছায় ও যুক্তির কথা বাদ দিলেও হিন্দু-শাস্ত্রানুসারেও বলপূর্বক বিবাহ হিন্দুসমাজে ধর্ম, সমাজ, আইন কোনদিক থেকেই সিদ্ধ বলে স্বীকৃত হতে পারে না। সেজন্য বলপূর্বক বিবাহিতা নারীর তথাকথিত বিবাহ যে

সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বর্তমানে পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিশদ কেবল যে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত তাই নয়, শাস্ত্রসম্মতও নিশ্চয়। অবশ্য শাস্ত্রের চেয়েও বড় কথা জ্ঞানধর্ম ও যুক্তি—যা ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত তা শাস্ত্রসম্মত হলেই অবশ্য ভাল, কিন্তু না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা

ছোট বড় সব কথাতেই শাস্ত্রের দোহাই দিতেই অভ্যস্ত এবং শাস্ত্রের অহুমোদন না পেলে আমাদের মনের সন্তুষ্টিও হয় না। সেজন্য বিশেষ করে বর্তমানে এ সব লাহিত নরনারীদের মানসিক তৃপ্তি ও সান্ত্বনার জন্ত আমাদের শাস্ত্রের এই সকল উদার ও উন্নত মতবাদগুলির সমাজে বহুল প্রচার হওয়া কর্তব্য।

নব-সন্ধ্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৬

নারী প্রকৃষ্ট করে পূর্ণ। চম্পা ও টুলুর বিষয়েও তাহাই করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিজে হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতার।—

কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়াছে। টুলু কতপাড়ায় তাহার কাকার বাসা হইতে ফিরিতেছিল। সঙ্গে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের একটা পাস-বুক থাকে ওর সর্বদা। সাধুসঙ্গে পরলোকের পথ অহুসন্ধান করিবার সময়ও ওটা দরকার হইত। বইটা আনিতে গিয়াছিল। কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা এড়াইবার জন্ত সন্ধ্যার অল্প একটু আগে বাহির হইয়াছিল; ঐ সময়টায়ই বিক্রম বেনী, তিনি দোকানেই থাকেন।

যখন সেই তেমাধার কাছটার আসিয়াছে যেখান থেকে বস্তির রাস্তাটা নামিয়া গেছে, টুলুর মনে হইল স্থলে বা তাহার বাসায় হঠাৎ একটা হটগোল উঠিল। তাহার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল,—এতদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত ফিলিসই নাকি সেটা? বেশ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে আওয়াজটা, যেন আট-দশ জন লোকের একটা মিশ্র কলরব। ভাল করিয়া শুনিবার জন্ত টুলু দাঁড়াইয়া পড়িল একটু, ভয়ে বুকের স্পন্দনটা আরও দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে,—ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত খটাইলই কাণ্ডটা।—উপরে উপরে একটা অজ চাল দিয়া, নিজেও সরে-জমিন থেকে সরিয়া পড়িয়া—টুলু বেশ যখন অসতর্ক, নিজের সঙ্কল্প কার্বে পরিণত করিল।...ব্যাপারটা বুঝিবার জন্ত সেকেও কয়েক দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্তটুকু পরিষ্কার হইয়া গেল।...পা চালাইয়া দিল। তিনটি শ্রীলোক রহিয়াছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কোলের শিশু পূর্ণ; কি মতিচ্ছন্ন হইল তাহার যে সবাইকে এই ছবিপাকের মধ্যে টানিয়া আনি।

গোলমালের মধ্যে বনমালীর গলা একটু পিষ্ট—“নেকালো! ...তুয়া বেরোক হারামজাদারা। খুনট করে ফিলবোক।...” উত্তরে যে আওয়াজ হইতেছে সেগুলো অস্পষ্ট,—অনেকগুলো উগ্র কণ্ঠস্বর যেন জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছে। টুলু চড়াই ভাঙিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। চিত্তার যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে।

স্থলের ধানিকটা কাছে আসিয়া পড়িতে গোলমালটা হঠাৎ ধামিয়া গেল। টুলু ছুটাই আসিতেছে, দেখে বনমালী তাহার বাসা হইতে হন হন করিয়া এই দিকে চলিয়া আসিতেছে; শরীরটা গতির বেগেই সামনের দিকে ছুইয়া গিয়াছে, এক-একবার ঠেলিয়া পিছন দিকে ঘুরিয়া শাসাই-তেছে—“তুয়া রোস্ ক্যানে...কেমন না ঘাস দিখবো...মরোদকা বাচ্চা হোস তো তুয়া থাকবি আমি না আসা তক, ই।...”

টুলু কটকের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল, প্রশ্ন করিল—“কি ব্যাপার বনমালী?”

বনমালী আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল—“হইছে ব্যাপার; বনমালীকে জিগ্যেসটি কুবেন না—উর কণাটিতে কান দিবেন না, ব্যাপার হবেক হাই? যান দিবেন।...হ, বাহির হবেন না, দিবি হয় কিনা বাহির।”

নিজের ধোঁকেই ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

চম্পা গেটের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, যুখটা কটিন; একটু ভিতরে ছেলে কোলে করিয়া প্রজ্ঞাদের বউ।

টুলু প্রশ্ন করিল—“ব্যাপারখানা কি?”

চম্পা নির্বিকার কণ্ঠে বলিল—“বিশেষ কিছু নয়,—বস্তির সবাইকে দরদ দেখিয়ে বাসার ভুলেছেন, বাসা বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; নতুন কথা কিছু নয়।”

যুখটা একটু ঘুরাইয়া লইল। প্রজ্ঞাদের বউয়ের দিকে চাহিতে সে কোন উত্তরই দিল না। চম্পাই আবার বলিল—“যান, দেখুন, এর পরেও যদি থাকে সখ।”

অস্তরের একটা যেন তীব্র বিতৃষ্ণার ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে পা বাড়াইল।

ওদিকে সব চূপচাপ। টুলু বিমূঢ় ভাবে অগ্রসর হইল। গিয়া ছয়ার ঠেলিয়া দেখে ভিতর হইতে বন্ধ, এদিকে সুরার উগ্র গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়া গিয়াছে, হাকিল—“কে দোর দিয়েছে?—খোল দোর।”

ভিতর হইতে ছুটি গাঢ় জড়িত কণ্ঠে উত্তর হইল—“কে বটে?...কোন হায়?”

চেনা গলা, টুলু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিল চরণদাস নেশা করিয়া

আসিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি সে এক দিনও মেশা করে নাই। হয়ত মাপিকসই একটু করিয়া খনিতেই তাহার প্রভাবটা মিটাইয়া লইয়া বাসার আসে। হয়তো চম্পা খুব চোখে চোখে রাখিতেছিল, কিম্বা হয়তো চক্ষুজ্ঞার খাতিরে পড়িয়া প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল, আজ আর পারে নাই। টুঙ্গুও একটু ভাবিল, তাহার পর নরম গলাতেই হাঁকিয়া বলিল—“কে, চরণ? দোরটা খোল ত একবার।”

কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করিয়াও আর উত্তর নাই। শেষে যান্ত্রিক ধারের ঘরের জানালা-পথে সাড়া পাওয়া গেল,—ঠিক উত্তর নয়, একটা গভীর গল-খাঁকারি। টুঙ্গু ঘুরিয়া দেখে জানালার গরাদে ধরিয়া অল্প একটা লোক মাথা নিচু করিয়া অল্প অল্প টলিতেছে, খনির কাপড় পরা, সর্বাঙ্গে কয়লার ছোপ। টুঙ্গুর সেকো কয়েক বাক্যসূত্র হইল না, তাহার পর বলিল—“দোরটা খুলে দাও একবার।”

লোকটা মাথাটা একটু তুলিল, চোখ চাড়া দিয়া চাহিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“কি দরকারটি আছে?”

“এটা আমার বাসা।”

আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইল টলিতে টলিতেই; প্রথম লোকটার হাতে একটা টান দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“চল ক্যানে, সর্দার ডাকে।”

টুঙ্গু জানালার দিকে একটু সরিয়া আসিয়াছে, লোকটা তাহার দিকে একটু চাহিয়া প্রশ্ন করিল—“কে, কোন্ হায়?”

টুঙ্গু বলিল—“আমার বাসা এটা, বলছি দোরটা খুলে দাও।”

প্রথম লোকটা ঘাড় নিচু করিয়া শুনিতেছিল, একেবারে ধাক্কা হইয়া উঠিল, দুই হাতে গরাদে চাপিয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলিল—“আমি যা বলছি তার জবাব দেও ক্যানে—কি দরকারটি আছে—না, আমার বাসা—আমার বাসা।...কথাটি বুঝবেক না।”

বনমালী গন গন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে একটা লাঠি, নুতন সাকানো-গোছানোর গোলমালে বোধ হয় সেইটাই খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া গেছে; আসিয়াই সামনের লোকটার হাত গরাদেস্থ চাপিয়া ধরিয়া লাঠিটা উঠাইল। টুঙ্গু ক্ষিপ্ৰগতিতে তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল—“লাঠি রেখে এস বনমালী; দাও, বরং আমার হাতে দাও।”

একরকম জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল। লাঠি হাতে আসায় বনমালী যেন আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাড়িয়া লইলেও একজন যুবার মতই লাফাইতে লাফাইতে ছক্কা করিতে লাগিল—“আমি খুনট করবো—মাষ্টারমশাই আমার জিম্মায় বাসাটি দিয়া গেছেন—উরা সরাব আনলেক—আমি খুনট করব বটে...উরা আমার ঠাকুর ঘরে সরাবটি এনে তুল লেক।...”

ঘরের মধ্যে আরও জন-চারেক আসিয়া দাঁড়াইল, সবাই পিছনে চরণদাস। সেদিনকার মত মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িবার অবস্থা না হইলেও, খুব অপ্রকৃতিস্থ, টুঙ্গু শান্ত ভাবেই ডাকিল—“এই যে চরণদাস, একবার এদিকে এস না।”

বনমালী ওদিকে সমানে ছক্কা ছাড়িয়া যাইতেছে।

চরণদাস টলিতে টলিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। টুঙ্গু বলিল—“দোরটা খোল একটু। আর, একি কাণ্ড চরণ? তুমি নিজে রয়েছে, অথচ এরা করছে কি?”

চরণ স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর উল্ক্ষন দেখিতেছিল, হাতটা উঁচাইয়া টুঙ্গুকে ধামিতে ইসারা করিল, একটু পরে বলিল—“আপনি র’ন ক্যানে, দোর খুলবো; উর তড়পানিটা একটু দিবি—কত তড়পাতে পারে উ।”

দলের সবাইকে বলিল—“তুঁরা চূপ করে দেখ উর তামাশাটি; কথাটি বুজি না।”

মাতালের নানা ভঙ্গী, আগের বারে হৈ-হল্লা খুব করিলেও এবারে কি ভাবিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া টলিতেছিল, চরণদাসের ছক্কা সাধ্যমত বনমালীর দিকে দৃষ্টিটা তুলিয়া রাখিয়া গভীর অভি-নিবেশের সহিত তামাশা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বনমালীকে সরাইতে পারিলে বোধ হয় একটা সুরাহা হয়, কিন্তু তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, টুঙ্গু কয়েকবার বারণ করিলেও নড়িল না; উহারা কিছুমাত্র না বলিয়া তামাশা দেখিতে থাকায় যেন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভাবেই ধানিকটা গেল; চরণ দোর খুলিতে রাজী হয়, কিন্তু তড়পানি দেখা বন্ধ করিয়া নিজের অগ্রসর হয় না, কাঁহাকে দেয় না অগ্রসর হইতে।...টুঙ্গুরও মনে হইল যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে।

এমন সময় প্রহ্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আজ খনি হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, হৈ চৈ শুনিয়া ফটকের মুখে চম্পা আর নিজের জীর নিকট তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া পা চালাইয়া আসিয়া পড়িল এবং টুঙ্গুর ছক্কা অনেক কষ্টে বনমালীকে সরাইয়া স্কুলের দিকে লইয়া গেল।

এদিকটা শান্ত হওয়ার পর চরণ বলিল—“হঁ, খুলবো, আপুনির জেগে খুলবো নাই ক্যানে? র’ন, একটু বুঝি উ এত তড়পায় ক্যানে।”

তড়পানোর রহস্য বুঝিতে বেশ আরও একটু বিলম্ব হইল, তাহার পর চরণদাস টলিতে টলিতে গিয়া ছয়ারটা খুলিয়া দিল। কিন্তু তখন আর তাহার দাঁড়াইবার মত অবস্থা নাই। ছয়ার ঠেলিয়া টুঙ্গু তাহার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। যাই হোক, কোনরকমে মিটল ব্যাপারটা। এক এক করিয়া সবাই চরণদাসের মত জমি লইল।

বনমালীকে রাজী করানো গেল না কোনমতেই। প্রহ্লাদকে

লইয়া টুলু সৰাইকে টানিয়া টানিয়া ওদিক্কাৰ ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া দিল।

নিজের ঘুমাইতে বেশ বিলম্ব হইল। মেহনত হইয়াছে, অপরিণীম ক্লান্তি, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটুকুর গ্লানি ক্লান্ত চক্ষুর নিদ্রাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে লাগিল।

১৭ পরদিন পোষ্ট আপিসে গিয়া কিছু টাকা বাহির করিল। ফিরিল বস্তির মধ্য দিয়াই। লোকে আরও একটু চিনিয়াছে, অনেকে আবার নতুন ছুইট পরিবারের সম্পর্কে জুলে যায়,—অভিবাধন কুড়াইতে, প্রেমের উত্তর দিতে আরও দেয়ি হইয়া গেল। বস্তির ত্রী সেই রকমই,—সেই নোংরা, সেই কল-তলার ভিড়, তবে এবার একটা নতুন ব্যাপার এই যে, টুলু যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল বগড়া আর গালি-গালাজের কণ্ঠ সবার নরম হইয়া আসিতে লাগিল; অনেক স্থানে নরম হইয়া নীরবও হইয়া গেল। এই সন্তমটুকু লাগিল বড় মিষ্ট। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কয়েকজন বয়সগোছের লোকের সঙ্গে একটু আলাপও করিল—নিত্যকার দরকারী কথার কিছু কিছু, আবার অদরকারী কথাও—এই নতুন জগতের সহিত পরিচয়ের আনন্দটুকু সঞ্চিত করিয়া লওয়া। একটু লজ্জায়ও পড়িয়া গেল,—ডিয়ারিগিকে যে আশ্রয় দিয়াছে সে সংবাদটুকু বস্তিতে চারাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিজে বিশেষ কিছু করে নাই বোধ হয়, তবে ঐ যে উপর থেকে নামিয়া টুলু তাহাকে ভুলিয়া লইয়াছে—তাহাদেরই একজনকে—তাহাতে তাহাদের সবার অন্তরই ক্রতজ্ঞতা উঠিয়াছে ভরিয়া। কেহ প্রকাশ করিল বাক্যে, কেহ বাক্যের সমর্থনে একটু হাসি দিল, কেহ মাত্র সন্মিত একটু চাহনি; সঙ্কোচ হয়, কিন্তু আন্তরিকতায় পুষ্ট বলিয়া লাগে বড় চমৎকার।

যেন সেই দ্বিতীয় দিনে বস্তিতে আসার জের ধরিয়াই—টুলু সোজা জুলে না গিয়া ঘুরিয়া বটতলায় আসিয়া বসিল। একটু পরিবর্তন হইয়াছে, দলটা একটু পাতলা, মেয়ে একেবারেই নাই। টুলুর মনে পড়িল দলের গুটিচারেক মেয়ে এবং নিতান্ত যাহারা ছোট এই রকম দু-তিনটি ছেলে বৈকাল হইলে জুলে গিয়াই ছোট্টে আঁজকাল। জুল হইতে বাহির হইয়াই রাস্তার ধারে একটা মহয়া গাছ আছে, বুড়ীর নাতি নাতনীকে ডাকিয়া ওদের আলাদা একটা দল হয় তাহার নিচে।...এখানকার ভাঙন ওখানে একটা স্থগিত স্বরূপাত করিয়াছে।

ঐটুকুকে আশ্রয় করিয়া মনটা জুলে গিয়া পড়িল; বেশ শুছাইয়া ভাবিবার জুই টুলু বেশ ঘন ছায়ায় একটা শিলা-ধোঁয়ের উপর গিয়া বসিল।

হ্যাঁ, এইবার যেন আরম্ভ হইয়াছে একটু কাজ। চম্পা আসিয়াছে আজ বুধি সাত দিন হইল, বুড়ী আসে দিন দুয়েক পরে। একটা পরিবর্তন আসিয়াছে বৈকি—আজ শান্ত বনছায়ায় এই নিরিবিলিতে বসিয়া বোধ হয়, প্রথম বার সমস্ত

ছবিটুকু একটু অসমঞ্জস দ্রব্বে দেখিতে পাইল টুলু : বুড়ী ভাল হইয়া উঠিয়াছে; চম্পা তাহার ঔষধের বাছাইছরি দেখ, হয়তো পড়িয়া গেছে ঠিক ঔষধটা, অন্তত এটা তো ঠিক যে, ঔষধ ইহাদের পেটে বড় একটা পড়ে না বলিয়া লাগে বড় শীঘ্র। ভাল হইয়াছে বুড়ী, শুধু শরীরের দিক দিয়াই নয়, ওর একটা চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে মনেরও,—শুধু ওরই নয়, ছেলেমেয়ে দুটিরও; এই সচ্ছলতায় আর মানুষের মধ্যে মানুষের মত ব্যবহার পাইয়া এই সামান্য ক'টি দিনেই ওদের ওপর থেকে সেই দীনতা, সেই গ্লানি, সেই নিজের মধ্যে গুটাইয়া থাকার ভাব নিঃশেষে মিটিয়া গিয়াছে। তিন জনেই বেশ একটা মুক্ত সহজ মনুষ্যত্বে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বড় আশ্চর্য বোধ হয়—সেই একই মানুষ, পাঁচটি দিনের এদিক-ওদিকে কত তফাৎ। মাত্র একটু মানুষের মত থাকিতে পাইয়াছে বলিয়া।...পরশু-কার কথা মনে পড়িল। সন্ধ্যার সময় টুলু কাঞ্চনতলাটিতে বসিয়াছিল; কি মনে করিয়া বনমালী আসিয়া বসিল। কোন কারণ নাই, শুধু বলিল—মাষ্টারমশাইও সন্ধ্যার সময় বসিতেন এই জায়গাটিতে; যেমন ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল, টুলু বুঝিল জায়গাটিরও মোহ ওকেও আকৃষ্ট করে। গল্পভিহির পুরানো গল্প হইল। খেলার পর ছেলেমেয়ে দুটিও একটু হঠিত ভাবে আসিয়া বসিল, দুটিই টুলুর নিতান্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া মেয়েটি,—বড় স্নিগ্ধ স্বভাব। টুলু বলিতেই তাড়াতাড়ি গিয়া বুড়ীকেও হাত ধরিয়া লইয়া আসিল। এই যে সমাবেশ, এটাকে যেন পূর্ণতা দিবার জুই টুলু কথায় কথায় মাষ্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিল। বনমালী হইয়া উঠিল মুখের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, তাহার একটা ধ্যান-রূপকে যেন সবার মাঝখানটিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। তাহার পর এক সময় আসিল চম্পা। ঠাকুরদাদাকে বলিল—“তু ইখানে? আমি চারিদিক বুঁজে মরছি।” ঠাকুরদাদা বলিল—“তু বোস ক্যানে একটু, সারাদিন চরখি ঘুরছি।” দুটো ভাল কথা শোন বসে।” চম্পা উত্তর করিল—“তুর মতন বসলে যেন আমার চলে।”...তবুও বলিল ধানিকক্ষণ, বেশ বোকা যায় বসিবার জুই একটা ছুতা করিয়া আসা; তাহার পর একবার বাসার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—“এখনও আলো জালিস নাই ঘরে? দিখো কাণ্ডটি।”—বলিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

এই নতুন ব্রূত চম্পাই টুলুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে সবপ্রথম,—সেইজন্তও, আর সবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট বলিয়াও চম্পার প্রত্যেক গতিবিধির উপর টুলুর দৃষ্টি গিয়া পড়ে। বড় পরিজ্ঞ বোধ হয় ওকে, একটা শতদল যেন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে,—মনে হয় চম্পা যেন টুলুর ধারণাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এমন সামঞ্জস্যবোধ টুলু যেন আর কোথাও দেখে নাই। টুলু তার প্রথম শিখার মন বোকে,—ও চায় টুলুর দেবা ক্রিয়তে, কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থার পর

সন্ধ্যার এদিকে এই প্রথম এ বাসায় পা দিল,—যেন সেবার পথ খুঁজিতেছিল—ঘরে আলো জ্বালা না হওয়ায় একটা অছিলা পাইয়া বাঁচিল।

এই চিত্তের পাশেই ফুটিয়া উঠিল কালকের চিত্র। কতদিন লংঘন থাকিয়া যেন নিজের এবং আর সবার ওপর আক্রোশ বেশেই চরণদাস মাষ্টারমশাইয়ের বাসারটা একেবারে ভাটিখানা করিয়া তুলিল। টুলুর মনটা বড় বিষন্ন হইয়া উঠিল—কোন উপায় নাই।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছেলের দল তাহাদের গরু-ছাগল লইয়া বটতলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিল। চিত্তের ওটুকু কালিয়া মুছিয়া ফেলিবার যেন কোন উপায়ই দেখিতেছে না টুলু। অনেকক্ষণ গেল, মনে ক্রমে যেন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িতেছে।—কোন উপায়ই কি নাই? তাহার পর একসময় চিত্তার মধ্যেই হঠাৎ শিলাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

ঐ চম্পারই কথা মনে পড়িয়া গেছে। চম্পাই পারিবে।

তাড়াতাড়ি বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

একবার প্রবেশ করিয়া চম্পা কায়মী ভাবেই ঠাকুরদাদাকে বেদখল করিবার মতলব করিয়াছে। টুলুর বাসায় ঝাঁটপাট দিয়া আলো জালিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, দরজার মুখে দেখা হইল। টুলু উৎসাহের স্বীকৃতি তাড়াতাড়ি হাঁটয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প হাঁপাইতেছে, বলিল—“তোমাকেই খুঁজছিলাম চম্পা—কালকের ব্যাপার সহজে—কাল রাতিরে যে...”

ওর বাপের সম্পর্কে কথাটা বলিতে গলায় যেন আটকাইয়া গেল।

চম্পা পূরণ করিয়া দিল—“নেশা ত্যাগ করে যা-করলে সব?”

তাহার পর বোধ হয় টুলুর বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া একটু হাসিয়াই বলিল—“ওতো আবার করবে—আপনার উপকারের নেশা না ভাঙা পর্যন্ত।”

টুলু বলিল—“না, ও যাবে, আমি উপায় ঠাওরেছি।”

“কি?”

“তুমি।”

“আমি!...বুঝতে পারলাম না।”

টুলু একটু চুপ করিল, তাহার পর যেন গুছাইয়া লইয়া বলিল—“একদিন মাষ্টারমশাই আমায় বলেছিলেন পরে আমিও মিলিয়ে দেখলাম—যতদিন ওকে খনির ঐ কানা গলির মধ্যে কাজ করতে হবে তত দিন নেশা ওকে করতেই হবে চম্পা, ওই ভীষণ মেহনতের শক্তি ওর আর নেই এ বয়সে। এখন দরকার ওকে এখান থেকে সরিয়ে অল্প কাজ দেওয়ানো—একটু হালকা কাজ।”

চম্পাও এবার একটু চুপ করিয়া মাথা নিচু করিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—“আমি কি কাজ দেওয়াবার মালিক?”

কোথায় যেন একটা আঘাত লাগিয়াছে তাহার। টুলুর কিন্তু সেদিকে মোটেই দৃষ্টি গেল না, নিজের স্বীকৃতিই বলিয়া গেল—“তুমি বলে-কয়ে দেওয়াতে পার—ম্যানেজার নেই, তুমি এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজারকে দিয়ে ব্যবস্থা করতে পার।”

“আমার কথা শুনবে কেন?”

সোজা মূখের পানে চাহিয়া রহিল চম্পা।

সেই প্রথম বার চম্পাকে খনির মধ্যে দেখা,—একটা গলির মাঝখানে একটা উন্টানো বেতের চুপড়ির ওপর পা দিয়া চম্পা এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার পরেশের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া লম্বাভাবে গল্প করিতেছে, সেই জ্বোরেই টুলুর মনে উদয় হইয়াছে কথাটা। এতক্ষণ চরণকে ফিরাইবার একটা উপায় আবিষ্কারের আনন্দে ছিল বিভোর, এদিকে গিয়া কিন্তু তাহার কদর্যতায় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সখিৎ ফিরিয়া আসিয়া এমনই অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, চম্পার দৃষ্টি থেকে মুখটা কি করিয়া ফিরাইয়া লইবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না। শেষে চম্পাই কথা কহিল, একটু হাসিয়াই বলিল—“আপনি অমন হয়ে গেলেন কেন? যাব আমি, অবস্থা দেওয়াতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করতে দোষ কি?—যদি মনে করেন একটু হালকা কাজ পেলে বাবার বদ অব্যেসটা যেতে পারে।...সরুন, যান ভেতরে আপনি।”

আরও একটু গা-ঢাকা-গোছের হইলে চম্পা গিয়া পরেশের সঙ্গে দেখা করিল। পরেশ রাজী হইল বেশ সহজেই, বরং বেশ আগ্রহের সহিতই। আজকাল চম্পার ভাবটা একটু অল্প রকম—আসেও কম, থাকেও অল্পক্ষণ, একটু উপকার করিতে পারিয়া যেন বাঁচিল পরেশ। আপাতত দিনকয়েকের জন্ত অল্পত্র কাজ দিবে, ম্যানেজার আসিলে পাকা ব্যবস্থা করিবে।

সকাল বেলা, দশটা প্রায় হইয়াছে। টুলু একটা হোমিওপ্যাথি বই পড়িতেছিল—একটু-আধটু চর্চা করে আজকাল, চম্পা আসিয়া তাহার নিজের পদ্ধতিতে ছুইটি হস্ত পিছনে দিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; টুলু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাস্য নেত্রে চাহিতে বলিল—“রাজী হয়ে গেল। ট্রাকে কয়লা তুলে দেবার কাজ দিয়েছে।”

টুলু বলিল—“সে তো খুব সহজ কাজ।”

“হ্যাঁ, সবচেয়ে সহজ এইটেই; বিশেষ করে বাবার পক্ষে তো বটেই—এত শক্ত কাজের পর।”

“দিলে যে একেবারে এত সহজ?”

কথাটা বলিয়াই টুলুর হাঁস হইল; বেশ খানিকক্ষণই আর কিছু বলিতে পারিল না। চম্পাও চুপ করিয়া রহিল। টুলু বড়ই অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছে, কাল চম্পাকে কথাটা বলা পর্যন্ত ভীষণ অশান্তিতে কাটিতেছে ওর। চম্পাকে কিছু বলিয়া ওটুকু স্থগিত করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, কিন্তু এতক্ষণ

পায় নাই। বোধ হয় ঐ ধরণেরই কিছু বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার সময়ের দিকে খেয়াল হইল, বলিল—“দশটা বাজে, এখনও খনিতে যাও নি যে?”

চম্পা মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“না, গেলাম না; আর যাব না ভাবছি...ঠিকই করেছি আর যাব না।”

টুঙ্গু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—“কেন?”

চম্পা সেই ভাবে হাসিয়া বলিল—“এত বড় উপকার চেয়ে নেবার পর আর মান-সন্ত্রম নিয়ে দাঁড়ান যাবে ওদের সামনে?—জানেনই ত সবাইকে আপনি।”

টুঙ্গুর বিশ্বাসের যেন শেষ নাই, তাহার উপর অহুতাপের স্বরে বলিল—“এ কি হ'ল!—তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে—আমার কথায়?...তোমার কষ্ট হবার কথাই চম্পা, আমি কেমন না বুঝেই তোমায় পরেশবাবুর কাছে চেষ্টা করতে বলি—বলে ফেলেই বলা ঠিক—তার পর সত্যিই তুমি কি

ভীষণ আঘাত পেয়েছ ভেনে ভবুনি যাই আমি ও বাসায়, শুনলাম তুমি বাইরে কোথায় গেছ তার পর থেকে সমস্ত রাত...”

চম্পার হাসিতে এবার একটু অস্ত্র ধরণের আলো ফুটল, বলিল—“আপনার কথায় মনে হচ্ছে ভেবে নিরেছেন—আমি রাগে বা আক্রোশে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম। তা তো নয়—অনেক দিকেই যেমন চোখ খুলে দিয়েছেন, এরিকটাও তেমনই দিলেন খুলে। নিত্যা কি অপমান বাড়তে পারে আমার কাজ তা তো আমারই বোঝা উচিত ছিল। বাকি থাকে পেট চলার কথা,—তা বাবা যদি শোনারায় ত একটা মেয়ের পেট চালিয়ে নিতে আর পারবে না?...তা ভিন্ন কাজ যে ছেড়ে দিয়েই এলাম একেবারে এমনও তো নয়। যাচ্ছি না—বলেন যেতে, যাব।”

মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—“কিন্তু সত্যিই কি আপনি আর বলবেন?”

ক্রমশঃ

আমাদের নেতাজী

শ্রীশিউলী সেনগুপ্তা (মালয়)

১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী বর্গীয় জানকীনাথ বসুর গৃহে একটি ছোট শিশুর আবির্ভাব হয়। ইনিই আমাদের নেতাজী—শ্রদ্ধেয়, দেশপুঞ্জ্য, কর্মীশ্রেষ্ঠ নেতাজী—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বমুখ্য কর্মী—সুভাষচন্দ্র বসু।

বাল্যকাল হতেই সুভাষচন্দ্র খুব তেজস্বী, শক্তিশালী ও সাহসী ছিলেন। অত্যন্ত তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীদের মধ্যে কোন দিন ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলে তিনি মধ্যস্থ হয়ে দুর্বলের পক্ষই অবলম্বন করতেন। তাঁর সে সময়কার সাহসিকতার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কলেজে পড়তেন সে কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ভারতবাসীদের অপমানসূচক কি কথা বলেছিলেন—তিনি সেই সাহেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দুটপ্রতিজ্ঞ হন এবং ছাত্রগণ দলবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম প্রদান করে। সে কারণে কিছু কালের জন্যে তাঁকে কলেজে পড়তে দেওয়া হয় নি। সংগঠনের ক্ষমতা বাল্যকালেই তিনি অর্জন করেন।

ছোটবেলায়ই তাঁর আধ্যাত্মিকতার স্ফূরণ হয়। তিনি মনের মত গুরুত্ব অর্ষণে পাঠ্যাবস্থায় এক দিন সকলের অজান্তে বাড়ী হতে বার হন এবং হিমালয় অঞ্চল ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। তাঁহার বীশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। স্কুল-কলেজেই তার আভাস পাওয়া যায়। ১৯১১ সালে বি-এ পাস করে তিনি আই-সি-এস পরীক্ষার জন্যে বিলাত গমন করেন।

সম্মানের সহিত ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে গবর্ণমেন্ট তাঁকে এক উচ্চপদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিলেতের লোকদের হাবভাব চালচলন দেখে তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল। চল্লিশ কোটি নিপীড়িত ভারতবাসীর অবস্থার সঙ্গে তুলনায় বিলাতের লোকদের জীবনমাত্রার ঐচ্ছ মান তাঁর চোখে নূতন করে ধরা পড়ে। বসন্তঃ, বিদেশে না গেলে, নানা জিনিষ না দেখলে লোকের সম্যক জ্ঞান হয় না। তা ছাড়া একই জিনিষ প্রতি-ন্যস্ত একই স্থানে দেখলে তার পরিবর্তন বা প্রভেদ সহজে চোখে ধরা পড়ে না।

দেশে আসবার পথেই নেতাজী তাঁর ভাবী জীবনের কর্তৃ-পন্থা ঠিক করে এসেছিলেন। দেশসেবার মানসে বোম্বাইয়ে নেমেই তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজী এই উৎসাহী যুবককে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত দেখা করতে নির্দেশ দেন। দেশবন্ধু এই প্রভাদীপ্ত যুবককে সাদরে গ্রহণ করলেন। ইনিই ছিলেন নেতাজীর রাজনৈতিক দীক্ষা-গুরু। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে নেতাজীর দেশপ্রেম দিন দিন পরি-বর্ধিত হতে লাগল। দেশবন্ধুর “করওয়ার্ড” পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন তিনি এবং দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র হলে তিনি হন তাঁর প্রধান সহায়ক। ঐ সময় নানা স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বার ছ' বার নয়, এগার বার তিনি কারাবরণ করেন।

মাঙালে জেলে থাকবার সময় দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি কিছুকাল একেবারে ভিন্নমাত্রা অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তাঁর সিংহভেজ আবার ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হতে লাগল। তিনি বুঝলেন, দেশবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁর জন্তে শোক প্রকাশে বা বিলাপে হবে না—তাঁর আরক্ত কাঁধের সমাপ্তিতেই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিপূজা। কারামুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণ উত্তম কাজ চালাতে লাগলেন—তখন বাংলাদেশে তাঁর অপরিসীম প্রতিপত্তি—ইংরেজ প্রভুদের তা সইবে কেন—পুনরায় তিনি কারাগারে আবদ্ধ হলেন। জেলে থাকতেই তিনি কলিকাতার মেয়র পদে নিযুক্ত হন এবং আবার জেলে গেলে ১৯৩৩ সনে অতুহতা নিবন্ধন মুক্তি পেয়ে তিনি চিকিৎসার জন্তে “ভিয়েনা”য় গমন করেন।

দেশবাসী তাঁর গুণে এবং কর্মে মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৮ সনে তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতিপদে বরণ করে। ১৯৩৯ সনে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের মতের বিরুদ্ধে এবং তাদের দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদেই বহাল রইলেন। গান্ধীজী এই পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে একে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন। পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি বেছারা এই পদ ত্যাগ করেন।

কিন্তু এতে তিনি দমবার পাত্র নন। তাঁর মত উচ্চমণীল দেশপ্রেমিকের পক্ষে বসে থাকা বড়ই কঠিন—তাই তিনি তাঁর মনোমত কয়েকজন সাহসী ও কর্ণঠা যুবককে নিয়ে একটি দল গঠন করে তার নাম দিলেন “ফরওয়ার্ড ব্লক”। তাদের লক্ষ্য সামনের দিকে, রাজনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া। ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, ফলে তাঁকে আবার জেলে যেতে হয় এবং তিনি প্রতিবাদে অনশন-ব্রত গ্রহণ করলে সরকার তাঁকে কারামুক্ত করলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীর চারদিকে কঠোর পাহারার বন্দোবস্ত করে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন স্বভাষচক্র হুনিপুণ ষ্টিশ গুপ্তচর বিভাগের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে আফগানিস্থান হয়ে অপরিসীম কষ্ট সহ করে এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহায্যে জার্মানীতে গমন করেন। সেখানে হের হিটলার তাঁকে সম্মানের সহিত অভিনন্দন জানান। জার্মানীতে ও ইটালীতে স্বভাষচক্র ভারতীয়দের নিয়ে হিন্দু সৈন্ত-দল গঠন করেন।

১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর জাপানীরা সমস্ত জগৎকে শুভিত করে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেদিনই টোকিয়োতে বিপ্লবী রাসবিহারী বহু এবং অজ্ঞাত ভারতীয়েরা মিলে এক সভা আহ্বান করেন—তার মূল উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানের মুক্তিসংগ্রাম চালাবার উপায় নির্ধারণ; তারা এ সুযোগ কিছুতেই অবহেলায় ব্যর্থ হতে দেবেন না।

১৯৪২ ইংরেজের ৯ই এবং ১০ই মার্চ মালয়দেশীয় প্রাদেশিক নেতাদের প্রথম সভা হয়। সেখানে স্থির করা হয় যে,

ক্রীলীজকণ্ঠ আইয়ার (মালয়), স্বামী সত্যানন্দ পুরী, সরদার প্রীতম সিং (জামদেশ) এবং ক্যাপ্টেন আক্রাম খাঁকে (আজাদ হিন্দ ফৌজ) টোকিও কনফারেন্সে পাঠানো হবে, কিন্তু হুঁচকা-বশতঃ গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁরা বিমান-দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন—এঁরাই আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী শহীদ। কিন্তু এই অশুভ ঘটনা সত্ত্বেও অন্যান্য নেতাদের উপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ টোকিও কনফারেন্স শেষ হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো এই সভায় জাপান সরকারের তরফ থেকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি জানান।

এর পর ১৫ই জুন “ব্যাঙ্ক কনফারেন্স”র উদ্বোধন হয়। সেখানে সমস্ত পূর্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ সজ্জের সভাপতিগণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিবর্গ এবং অজ্ঞাত দেশানুরাগী ব্যক্তিগণ মিলিত হন। এই সভায় উপস্থিত হবার জন্তে নেতাজীকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল—কিন্তু তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা অসম্ভব বলে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি এক বার্তা প্রেরণ করেন এবং এই সজ্জের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এই সভাতে ত্রিযুত রাসবিহারী বহুকে আজাদ হিন্দ সজ্জের সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং সজ্জের প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব হয়।

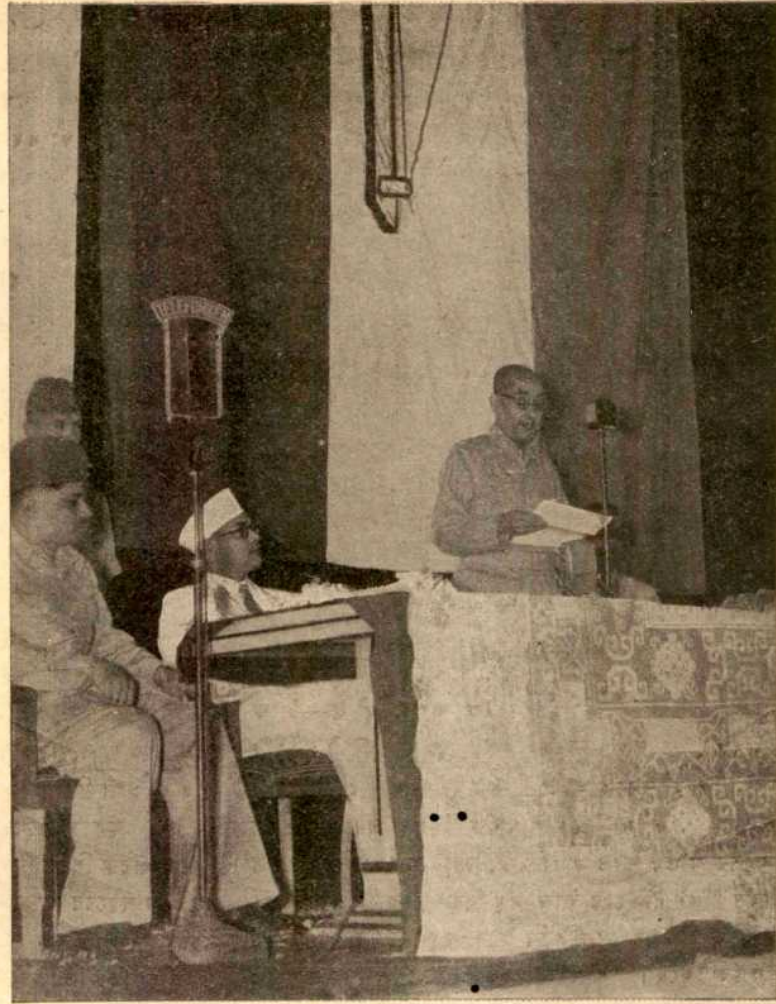
এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন-কার্য ও নতুন লোকদের শিক্ষিত করে ফৌজে ভর্তি করার কাজ পূর্ণোচ্চমে চলছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের সঙ্গে জাপানীদের মতবৈধ হওয়াতে একটু গুণগোলের সৃষ্টি হয়—সে অনেক কথা। কিন্তু তাই বলে কেউই মতানৈক্যবশতঃ চূপ করে বসে ছিল না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় পূর্ব-এশিয়া থেকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ পরিচালনার সম্বন্ধ করে নেতাজী নানা বিপদ মাথায় নিয়ে কতিপয় সহচর সহ প্রায় এক মাসে ডুবো জাহাজে টোকিয়ো কর্তৃক আগমন করেন (১৪ই জুন ১৯৪৩ সন)। এই সংবাদ অচিরেই সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা পরম উৎসাহে তাঁর ভাবী কার্যকলাপের জন্তে উদ্বেগ হয়ে রইল। টোকিয়োতে তিনি জাপানী প্রধান মন্ত্রী ও সামরিক বিভাগের বড়কর্তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে নানা সমস্তার সমাধান পূর্বক ২রা জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং আজাদ হিন্দ সজ্জের উদ্ভব-স্থল ও তৎকালীন প্রধান কেন্দ্র “শোনানে” (সিঙ্গাপুরের জাপানী প্রদত্ত নাম) অবতরণ করেন। সেদিন মালয় দেশের এক স্মরণীয় দিন। তাঁর আগমনবার্তা চতুর্দিকে ঘোষিত হতে লাগল এবং তাঁকে দেখবার জন্তে এবং তাঁর মুখের কথা শুনতে চারদিক থেকে দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হ'ল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে উপস্থিত,

চারদিকে অগণিত জনতার কল-কোলাহল ও উচ্ছ্বাস। নেতাজী উড়ো-জাহাজ হতে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র সমস্ত কোলাহল মুহূর্ত-মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সম্মুখে দণ্ডায়মান মুক্তিকামী হিন্দু ফৌজকে উদ্দেশ্য পূর্বক আবেগভরা কণ্ঠে, সেই নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করে বললেন, “ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীরই অভাব বহুদিন হতে আমরা অনুভব করে এসেছি। হে স্বাধীনতার আদর্শে অহুপ্রাণিত যোদ্ধাগণ! তোমরা এসে আজ তা পূরণ করেছ। এস, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সমবেত ভাবে সম্মুখ রণাঙ্গনে জীবন উৎসর্গ করি।” ফৌজ তাঁর আদেশ গগন কাঁপিয়ে সমর্থন করল।

৪ঠা জুলাই সিদ্ধাপুরের বিখ্যাত “ক্যাথে” সিনেমা-প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার সমাবেশ হ’ল। নেতাজী প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র জনতা সসন্মানে উঠে দাঁড়াল এবং “সুভাষ বসু কী জয়” “রাসবিহারী বসু কী জয়”, “মহাত্মা গান্ধী কী জয়” প্রভৃতি জয়ধ্বনি সকলের উৎসাহ বর্ধন করল। সে সভায় প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসু



রাসবিহারী বসু কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের হস্তে আজাদ হিন্দু সঙ্ঘের সভাপতিত্ব-ভার অর্পণ

সকলকে সম্বোধন করে বললেন, “বঙ্গগণ ও যোদ্ধাগণ, তোমরা হস্ত জিজ্ঞেস করবে আমি চোকিনো হতে তোমাদের জন্মে কি উপহার, কি শুভ সংবাদ এনেছি। হাঁ, আমি তোমাদের জন্মে এই (নেতাজীর দিকে চেয়ে) উপহার এনেছি। যা কিছু উৎকৃষ্ট, যা কিছু মহৎ এবং সাহসিকতার আদর্শ এবং যুব-শক্তির প্রেরণা সবই এঁর মধ্যে বিদ্যমান। আজ আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব এঁকে অর্পণ করলাম, এখন হতে ইনিই তোমাদের প্রেসিডেন্ট, ইনিই তোমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা এবং আমার বিশ্বাস এঁর নেতৃত্বে তোমরা জয়ী হবে।” এই ঘোষণার জনতা মুক্তকণ্ঠে সম্মতি জ্ঞাপন করল। নেতাজী উঠে পরিকার হিন্দুস্থানীতে বললেন—“পত্নী মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই স্বাধীনতার এই পূজারীকে জানতেন—আজ হস্ত অনেকেই এঁকে ভুলে গিয়ে থাকবেন।

জীবন বিপন্ন করেও ইনি যেভাবে দেশসেবা করেছেন, সে শ্রুতি এখনো আমাদের মনে সজীব হয়ে আছে। আমার অনুরোধ ইনি ‘প্রধান পরামর্শদাতা’ হয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে ঠিক পথে চালিত করে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।” তারপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন—“আপনাদের এই সমর্থনকে আমি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করছি; এর সঙ্গে সঙ্ঘের দায়িত্বও গ্রহণ করছি এবং ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাকে অসীম শক্তি দেন যাতে আমি আমার দেশবাসীকে সর্বতোভাবে সুখী করতে পারি। ইতিহাসে এই প্রথম বিদেশ হতে হিন্দুস্থানীরা এইভাবে সুগঠিত হয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেশমাতার স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে। আপনাদের এই সংসাহস, উৎসাহ ও আয়োজন দেখে আমার আশা আরো বলবতী হচ্ছে। আমি আপনাদের অল্প

দিকেও সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনারা যেন শত্রু-শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। আমাদের আগতপ্রায় যুদ্ধ হবে দুইই ভীষণ, দুইই কঠিন, অবর্ণনীয়—ইংরেজ তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে যে-কোন পন্থা বা কৌশল প্রয়োগ করতে ছাড়বে না। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় ও জীবনদানেই আমরা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে পারব। আত্ম-বিসর্জনের জন্তে সকলকে প্রস্তুত হতে হবে—ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ—আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।”

এর পর লেঃ কর্নেল ভোঁসলে সেনা বিভাগের পক্ষ হতে বললেন, “আমাদের নিকট আপনি আজ নূতন আশার বাণী বহন করে এনেছেন, আপনাদের আগমনে সৈন্যদের মধ্যে আজ এক অপূর্ণ জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন আমরা এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে আসছি, আজ আমরা নেতার মত নেতা পেয়েছি যিনি আমাদের উৎসাহিত করে, পথ প্রদর্শন করে আমাদের বহুকালের আকাজিক মুক্তির, স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাবেন। আমরা আপনার আদেশের জন্তে অপেক্ষা করছি—অহুমতি করণ উপযুক্ত সময়ে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।”

পরের দিন, ৫ই জুলাই—মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত নেতাজী উন্নতশিরে দণ্ডায়মান, হুঁধে তাঁর এক অপূর্ণ দীপ্তি—তাকে বিরে সশস্ত্র রক্ষা দাঁড়িয়ে, সন্মুখে আজাদ হিন্দ বাহিনী। তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন—“আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আজ জগদীশ্বর আমাকে হিন্দুস্থানের মুক্তিকামী সৈন্যদলের অন্তিম সমস্ত জগৎকে জানাবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিয়েছেন। এই সৈন্যদের কাজ শুধু হিন্দুস্থানের মুক্তিই নয়—অবিভক্ত জাতীয় সেনাদল গঠন করে স্বাধীনতা অক্ষর রাখাও এর কর্তব্য হবে। তা ছাড়া দরকার হলে যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হবে, এমন কি জাপানীদের বিরুদ্ধেও। আজ প্রত্যেক দেশবাসীর গর্বের বিষয় এই যে, তাদের বাহিনী দেশীয় নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এবং উপযুক্ত যুত্বর্গে সেই নেতার আদেশে তারা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে * * * ১৯৩৯ সনে যখন ফরাসী আর্ম্যানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন প্রত্যেক আর্ম্যান সৈন্যের মুখে রব উঠেছিল ‘চলো প্যারিস’, সেইরূপ জাপানীদের মুখে ধ্বনি উঠেছিল, ‘চলো সিঙ্গাপুর’—তখনই আমাদেরও যুদ্ধরব হবে ‘চলো দিল্লী, চলো দিল্লী’। এই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কে কে বেঁচে থাকবে বলু কঠিন—কিন্তু আমরা জয়ী হবই হব এবং আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তাদের কর্তব্য শেষ হবে না যে পর্যন্ত না তারা দিল্লীর লাল কেল্লাতে বিজয়োৎসব করবে। * * প্রত্যেক সিপাহীর আদর্শ হবে বিধান, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মবলিদান এবং প্রত্যেককে হতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ও অটল। বজ্রগণ, তোমরা আজ যে কাজে ত্রুটি এর চেয়ে মহৎ কাজ, গর্বের কাজ ও সন্মানের কাজ আর নেই। আমি তোমাদের কথা

দিচ্ছি যে, আমি হুঁধে দুঃখে, আলোতে অন্ধকারে এবং জরে পরাজয়ে তোমাদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করব * * *।

৬ই জুলাই—জাপানের প্রধান মন্ত্রী কেনোরেল তোজো নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করেন। আজ নেতাজী ফৌজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেন—আজ তিনি “সুগ্রীম কমান্ডার”—আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। তিনি সে দিবস তাঁর একান্ত মনের কামনা জানাতে গিয়ে বললেন, “আমার পক্ষে এ আজ আনন্দের ও গর্বের বিষয়, দেশের স্বাধীনতাকামী ফৌজের কমান্ডার হওয়ার চেয়ে বড় সন্মান আর নেই, আজ আমার দেশবাসী আমায় সেই সন্মানে বিভূষিত করেছেন যদিও এর গুরুত্ব, দায়িত্ব আমার নিকট অজ্ঞাত নয়। আমি ৩৮ কোটি দেশবাসীর সেবক এবং তাদের ঐক্যের জন্তে নিজেকে সর্বপ্রকারে নিয়োজিত করব। এ ছাড়া আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা আয়ত্ত করার জন্তে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।”

নেতাজী, সভাপতিত্ব গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নানা পরিবর্তন সাধন করেন এবং নূতন নূতন বিভাগ খোলেন, যথা—১। সামরিক প্রচার বিভাগ, ২। সিপাহী বিভাগ, ৩। সামরিক শিক্ষা বিভাগ, ৪। মহিলা বিভাগ, ৫। শিক্ষা ও চর্চা বিভাগ ৬। অর্থ বিভাগ ৭। স্বাস্থ্য বিভাগ ৮। প্রচার, বিভাগ, ৯। সম্পাদকীয় বিভাগ, ১০। সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ, ১১। বিজিত প্রদেশ সংগঠন ও শাসনবিভাগ ইত্যাদি। নিয়ে এ সকল বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ’ল :—

সামরিক শিক্ষা বিভাগ—সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার পূর্বে প্রত্যেক শহরের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বালক-বালিকাদের জুড়েও সে ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্য বিভাগের মত ট্রেনিং ক্যাম্প (সেনানিবাস) খোলা হয় এবং অসংখ্য উৎসাহী ও উদ্যোগী বালক-বালিকা সামরিক শিক্ষা লাভার্থে সেগুলোতে যোগদান করে। এদের মধ্যে বাল-সেনাদলের কয়েকজন সাহসী বালক সামরিক শিক্ষার জন্যে টোকিওতে গমন করে। নেতাজী জানতেন—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এদেরই উপর—তাই এদের ঠিকমত গড়ে তুলতে হবে। এদের মধ্যে গোড়া থেকেই দেশায়বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে—দেশকে, দেশবাসীকে, দেশের সন্মানকে, দেশের স্বাভাব্যতাকে কি করে রক্ষা করতে হয়? শেখাতে হবে এবং সর্বোপরি দেশকে কি করে ভালবাসতে হয় সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে, কারণ যাকে ভালবাসা যায় তার জন্যে মরাও যায়। এই আদর্শে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের হাবভাব, চালচলন, তাদের মুখের সঙ্গীত, “জয় হিন্দ” সন্তোষ, তাদের প্রফুল্ল বদন, তাদের সত্য-পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা দেখে মনে হ’ল যেন এক নব আলোড়ন এসেছে এদের মধ্যে—এরা যেন এক নূতন যুগ সৃষ্টি করেছে।

মহিলা বিভাগ—এই বিভাগের কাজ ছিল পূর্ব-এশিয়ার সকল নারীকে একত্রিত ও সম্বন্ধ করে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অগ্রপ্রাণিত করা এবং তাদের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। এ ছাড়া যুক্তবিদ্যা-শিক্ষার্থিনী এবং সেবাত্রত গ্রহণে ইচ্ছুক মহিলাদের “রাণী বাসী” নামক সাময়িক শিক্ষা বিভাগে ভর্তি করা—যাতে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভাইদের সেবা করতেন এবং দরকারমত অস্ত্র ধরতেও পরাধুনা হন। লেঃ কর্ণেল শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন এর অধিনায়িকা।

এদিকে নেতাজী নানা দেশ ঘুরে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ও ফৌজের তত্ত্বাবধান করে অবস্থানায়ী নির্দেশ প্রদান করেন ও নানা স্থানে বক্তৃতা করে সিদ্ধাপুর ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি “সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকার” স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। হির হ’ল যে, শুধু সাধারণ শাস্তি রক্ষা করাই নয়—সংগ্রাম পরিচালনাদিই হবে এর প্রধান কাজ। এই সরকার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের মুক্তির শেষ যুদ্ধ পরিচালিত করবে। ২১শে অক্টোবর তিনি সাময়িক গবর্ন-মেণ্ট গঠনের এই সম্বন্ধে কার্যে পরিণত করেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময় বৈকালিক অধিবেশন শুরু হয়—হলঘর লোকে লোকারণ্য। নেতাজী “সাময়িক সরকার” স্থাপনের উদ্দেশ্য সকলের নিকট জ্ঞাপন করে বলেন—“আমরা যখন হিন্দুস্থানে প্রবেশ করব তখন এই সরকার অজ্ঞাত স্বাধীন দেশীয় সরকারের মত প্রাজ্ঞ্য বসে শাসনকার্য পরিচালিত করবে। পূর্ব হতেই আমাদের সব কিছুই প্রস্তুত আছে কেবলমাত্র যুদ্ধ আরম্ভেরই বিলম্ব। আমরা শুধু অপেক্ষা করছি কোন্ শুভক্ষেণে আমাদের ফৌজ হিন্দুস্থানের সীমানার ভিতর পৌঁছে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবে এবং আমাদের জাতীয় পতাকা নয়া দিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদের উপর গর্ভভরে উড়বে।” এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হতে তুমুল হর্ষধ্বনিতে হলঘর পরিপূর্ণ হ’ল। যথাক্রমে মন্ত্রীদেব নাম ঘোষণা করা হ’ল। এরপর শুরু হ’ল “আজ্ঞা হুমাং”—সরকার ও নেতার উপর আত্মগত্যসূচক শপথ গ্রহণ।

সে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। নেতাজী প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্র সামনে ধরে দাঁড়ালেন এবং গভীর স্বরে পড়তে লাগলেন, “ভগবানের নামে আমি এই মহান শপথবাক্য গ্রহণ করছি যে, হিন্দুস্থানকে এবং আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীকে মুক্ত করতে আমি, স্ত্রীসহচর্য বসু, আমার শেষ দিন পর্যন্ত এই পবিত্র মুক্তি-যুদ্ধ চালাতে থাকব।” বলতে বলতে নেতাজীর বাকরোধ হয়ে এল এবং তাঁর চোখ হতে কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এল। চারদিক নিস্তব্ধ, সকলের চোখ ছিল ছল—নেতাজী চোখ মুছে পড়তে লাগলেন, “আমি সর্বদা দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব এবং ৩৮ কোটি ভ্রাতাভগ্নীর সুখসুবিধা দেখাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। হিন্দুস্থানের

স্বাধীনতা অর্জনের পরেও তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।”

এর পর একে একে সকলেই নেতাজীর নিকট সম্মুখবাক্য গ্রহণ করলেন।

২২শে অক্টোবর—নেতাজী “রাণী বাসী” রেজিমেন্টের উদ্বোধন করেন এবং হিন্দুস্থানের বীর নারীদের দৃষ্টান্ত সকলের নিকট ব্যক্ত করেন।

২৪শে অক্টোবর—আজ তিনি ৫০,০০০ লোকের সম্মুখে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ২৩শে অক্টোবর ১৩৪৩ সন রাত্রি ১২:০৫ মিনিটের সময় আজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা বিবৃত করেন। জনতা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—চতুর্দিক হতে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী কী কর রবে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

ইতিমধ্যে নেতাজী বেতার যোগে গান্ধীজীর নিকট এই বার্তা প্রেরণ করেন, “আপনি জাতির পিতৃস্বরূপ, হিন্দু-স্বাধীনতার ধর্মযুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা যাত্রা করি * * *।”

এর পর ৬ই নভেম্বর টোকিয়োতে বিখ্যাত “পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনের অধিবেশন” বসে, সেখানে পূর্ব-এশিয়ার সকল দেশের বড় বড় নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। নেতাজী সেখানে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং পরদিন জাপান সম্রাট “তোমো হেইকা”র সহিত আলাপ করেন।

৯ই ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ সরকারের এক বৈঠক বসে। সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঠিক করা হয়—১। হিন্দুস্থানী হবে রাষ্ট্রভাষা, ২। জয়হিন্দ হবে হিন্দুস্থানীদের সম্ভাষণ, ৩। ত্রিবর্ণ পতাকা হবে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা, ৪। “সুধ-সুখ-চন্দন কি বড়খা বরষে ভারত নাম হায় জাগা”—এই গানট হবে জাতীয় সঙ্গীত, ৫। “ব্যান্ড” হবে জাতীয় চিহ্ন, ৬। ‘চলো দিল্লী’ হবে জাকীনাচা (যুদ্ধনিনাদ)।

১৯শে ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন এবং পোর্ট ব্লেয়ারের কয়েদখানা পরিদর্শন করেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের দ্বারা শাসিত হয়। মেজর জেনারেল লোকনাথনকে নেতাজী এর “চিফ কমিশনার” নিযুক্ত করে পাঠান। নেতাজী আন্দামানকে “শহীদ দ্বীপ” ও নিকোবারকে “রাজ দ্বীপ” নামে অভিহিত করেন।

৭ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সন, নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার এবং সাময়িক বিভাগ, “হুপ্রিম কমান্ড”কে ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করেন হিন্দুস্থানের পূর্বদ্বারে আক্রমণাত্মক অভিযানের আদেশের অপেক্ষায়। ‘বাসী রাণী বাহিনী’র নারী-সৈন্যরাও তাঁর আদেশ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ’ল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সন আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান প্রদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর বীর বিক্রমে লাকিয়ে পড়ল।

—“এ দূরে, নদী বন পর্বতমালার শেষে আমাদের পূণ্য ক্ষত্ৰভূমি। দিল্লী আমাদের হাতছান দিয়ে ডাকছে। ওঠ, অস্ত্র ধর, সম্মুখে অগ্রসর হও। হয় আমরা জয়ী হব নয় মৃত্যু বরণ করব এবং আমাদের অস্ত্রিম সময়ে আমরা দিল্লী যাওয়ার পথকে আলিঙ্গন করব—দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী।”—নেতাজীর এই বাণীতে অমুপ্রাণিত হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্ত আত্মদ হিন্দু ফৌজ মৃত্যুবরণ করতে বদ্ধপরিকর হ’ল। সকল ভারতীয়ের মনে আজ নব আশা, নব প্রেরণা, অভিনব উদ্ভেদন।

২১শে মার্চ, ১৯৪৪ সন আত্মদ হিন্দু বাহিনী মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নেতাজী ব্রিগেডের কমান্ডার মেজর-জেনারেল শাহ্ নওয়াজ প্রথম হিন্দুস্থানের মাটির উপর তিনরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ফৌজ প্রবল উৎসাহের সহিত মনিপুর-রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করে তুফল যুদ্ধ চালাল এবং অল্প দিকে আসামে ঢুকে অগ্রসর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে আত্মদ হিন্দু “ব্যাঙ্ক”ও খোলা হ’ল। অতঃপর নেতাজী সামনে গিয়ে সৈন্যদের উৎসাহ বর্ধন করতে লাগলেন, সাধারণ সিপাহীর ছায় সব রকম অনুবিধা স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করলেন।

কিন্তু হঠাৎ ইম্ফল পাহাড়ে ঝড়ঝড়ির সূচনা হ’ল এবং বারি-বর্ষণ ক্রমবর্ধমান হয়ে সংবাদ আদান-প্রদান, খাদ্য সরবরাহ এবং ফৌজের চলাচলের পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হ’ল। এটা জানা কথা যে, কয়েক মাসের জন্তে রাস্তাঘাট জলপ্লাবিত থাকবে, কাজেই “কিরে আসার” আদেশ দেওয়া হ’ল। কিন্তু জলঝড় ও খাদ্যাভাব উপেক্ষা করে ফৌজ সেখানেই থেকে যেতে চাইলে এবং তীব্র প্রতিবাদ করে জানালে “নেতাজী আমাদের আদেশ দিয়েছেন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে—পিছনে ফেরবার ত আদেশ দেন নি, বরঞ্চ তিনি সাবধান করে দিয়েছেন আমরা যেন কিছুতেই পিছু না হটি। এত দিন আমরা ঘাস-পাতা খেয়েই বেঁচে আছি—এখনও আমরা তাতেই চালাতে পারব—আমরা শত্রুকে তাড়া করে সামনের দিকেই পা বাড়াব।” কিন্তু নেতাজীর স্বহস্তলিখিত আদেশ পেয়ে কারুরই প্রতিবাদ টিকল না—অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎক্ষণাত্বে তারা কিরে এল। নেতাজী তাদের সাহস দিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত হতে বললেন। তিনি সমস্ত মাল্য দেশ ঘুরে ঐ বিপুল্যে আলোড়িত জনসাধারণের মনকে আবার জাগিয়ে তুলতে লাগলেন।

২১শে জাঘুয়ারী ১৯৪৫ সনে আত্মদ হিন্দু সন্দের প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসু পরলোকগমন করেন।

ক্রমে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশের জিতর প্রবেশ করতে লাগল। রেভুন দখলের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও নেতাজী তাঁর প্রিয় ফৌজকে ছেড়ে চলে আসেন নি। তিনি একরকম ঠিকই করেছিলেন, “হয় করব, নয় মরব”। ফৌজ রেভুনের আশে-

পাশে যুদ্ধ চালাচ্ছে। মস্ত্রিগণ ও মিলিটারী অফিসারগণ তাঁকে বারংবার ঐ স্থান ত্যাগ করে অল্প স্থান হতে আবার যুদ্ধ চালাবার জন্তে অহরোধ জানাতে লাগলেন। পরিশেষে সকলের সনির্বন্ধ অহরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ‘রাণী বাসী’ বাহিনীর নারী-সৈন্যদের ও কিছু সিপাহী নিয়ে পদব্রজে ৩০০ মাইল পথ তিন সপ্তাহে অতিক্রম করে ১৪ই মে রাজধানী ব্যাঙ্ককে পৌঁছলেন। পথে শত্রুর গোলবর্ষণ চলছিল। সম্মুখে এক নদী পার হওয়ার সময় সকলকে নিরাপদে ওপারে না পাঠিয়ে কিছুতেই তিনি নদী পার হতে রাজী হলেন না। সকলের শেষে তিনি এলেন।

ব্যাঙ্ক পৌঁছে ২১শে মে তিনি যুদ্ধরত সৈনিক ও অফিসারদের একটি বিশেষ আদেশ প্রেরণ করেন, “ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমাকে ব্রহ্মদেশ—যেখানে তোমরা আজো যুদ্ধ চালাচ্ছ এবং যে স্থানের শত স্মৃতি আমার মনে ভেসে আসছে—ছেড়ে আসতে হ’ল। তোমাদের সেই সব বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। বন্ধুগণ, আজ তোমাদিগকে আমার একটিমাত্র আদেশ দেওয়া বাকি আছে—যদি কিছু কালের জন্তে তোমাদিগকে আঁধার এসে ঘিরে ফেলে তা হলে বীরত্বের সহিত, শূণ্ণতার সহিত এবং ইজ্জতের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকার সন্মান রেখে মরো। অনাগত হিন্দু-সন্তান, যারা স্বাধীন হয়ে জন্মাবে, তারা তোমাদের বীরত্বের কাহিনী এবং ত্যাগের আদর্শ জগতের নিকট ঘোষণা করবে। আমি তোমাদের হাতে হিন্দুস্থানের সন্মান এবং আমাদের জাতীয় পতাকা রেখে নিশ্চিন্ত। কারণ তোমাদের শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে—মনে রেখো অধ-কারের পরেই আলো। হিন্দুস্থান অচিরেই স্বাধীন হবে। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।”

ধর্মযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিরক্ষার্থে ৮ই জুলাই, ১৯৪৫ সনে নেতাজী “আত্মদ হিন্দু স্মৃতিস্তম্ভ” নির্মাণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য সিঙ্গাপুর দখল করলে এবং ঐ পথে যাবার সময় মিলিটারী কান্দায় সন্মান দেখালে ইংরেজ তা ধূলিসাৎ করে দেয়।

পূর্বে-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের উপর দিয়ে নানা ঝড়ঝড়া বইবার পরও তাদের অদম্য উৎসাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। এতে অমুপ্রাণিত হয়ে নেতাজী নতুন করে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন—কিন্তু ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সনে জাপানের হঠাৎ আত্মসমর্পণে সবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল এবং সকলের অহরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে নেতাজী টোকিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি আত্মদ হিন্দু ফৌজকে সম্বোধন করে তাঁর শেষ আদেশ রেখে যান, “বন্ধুগণ, আমাদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা বহু অচিন্তনীয় সমস্তার সম্মুখে এসে পড়েছি। তোমরা হয়ত মনে করবে, তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে অকৃতকার্য

হয়েছে এবং অনেক কিছু হারিয়েছে, কিন্তু না, তোমরা বিশেষ কিছুই হারাও নি, তোমরা যা পেয়েছ তা অতুলনীয়। তোমরা অনেকেই তোমাদের শক্তির এবং আত্মোৎসর্গের প্রকৃত প্রমাণ দিয়েছ সকল স্থানে। শৃঙ্খলার সহিত, অন্ধার সহিত প্রকৃত বিপ্লবী সেনার উপযুক্ত সম্মান—যা তোমরা এতদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছ—শত বাধাবিঘ্ন ও হুংকটের ভিতর দিয়ে তা রক্ষা করা এবং সে পথ হতে বিচলিত না হওয়াই এখন তোমাদের কর্তব্য। দিল্লী যাওয়ার পথ অনেক দূর—দিল্লীই আমাদের গন্তব্য স্থান। জগতে কোন শক্তিই নেই যা হিন্দুস্থানকে আর বেঁধে রাখতে পারে—অচিরেই হিন্দুস্থান স্বাধীন হবে। জয় হিন্দ।”

তিনি আর এক বার্তা সমস্ত ভারতীয়ের জন্তে রেখে যান। “ভগ্নী ও ভাইগণ, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা—যুদ্ধের এক অপূর্ণ মহিমামণ্ডিত শেষ অধ্যায়ে তোমাদের স্থান হবে অমর। ধন-দৌলতের অক্ষুরন্ত শ্রোতের দ্বারা এবং আন্তরিক উৎসাহদ্বারা স্বাধীনতা-যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করবার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জীবনে আমি কখনও ভুলতে পারব না। তোমরা দেশের প্রকৃত সম্ভানের কর্তব্য করেছ। তোমাদের চেয়েও আমার হুংকট বেশী এই যে, তোমাদের ত্যাগের ফল যথাস্থরূপ সময়ে ফলে নি, কিন্তু তা বৃথা যাবে না—সমস্ত হিন্দুস্থান তোমাদের ত্যাগে সজীবিত হয়ে উঠবে। এ ক্ষণিকের বিপর্যয়ে নিকরসাহ হয়ো

না, নিজেদের উজোগী করে তোলা—কাজ রয়েছে অনেক। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা সমুখে, জয় হিন্দ।”

নেতাজীর চরিত্রবিশ্লেষণ করা কঠিন। তাঁকে জগতের যে-কোন বড় নেতার সমান সম্মান দেওয়া যায়। তিনি একবার যা মনস্থ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তা কার্যে পরিণত করতে উঠে-পড়ে লাগতেন, এ ছিল তাঁর বিশেষত্ব। শত বাধাবিঘ্ন তাঁকে তাঁর কর্তব্য হতে বিচলিত করতে পারে নি। তাঁর অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা, তাঁর চরিত্রবল, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর উপদেশ, তাঁর স্বভাব, তাঁর দেশপ্রীতি সকলকে মুগ্ধ করেছে। তিনি যখন কাজ করতেন তখন অল্প কোন দিকেই তাঁর জরাজপট থাকত না—না আহা, না নিদ্রা—অনেক সময়ই তিনি মাত্র দু’তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন।

১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সনে বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। কিন্তু কেউই তা আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে নি। আমাদের বিশ্বাস নেতাজী জীবিত আছেন—উপযুক্ত সময়ে তিনি ফিরে আসবেন।

কিন্তু তিনি যদি ফিরে না আসেন—তাঁর কাজ, তাঁর উচ্চ আদর্শ কি তাঁর সঙ্গের শেষ হবে? তা নয়, চোখের জলেই নেতাজীর স্মৃতিপূজা শেষ হবে না তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সুসম্পূর্ণ করলেই দেশবাসী নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মাহুঘের চোখে দেখার ক্ষমতা নির্দিষ্ট গভীরে সীমাবদ্ধ। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর স্বরূপ সাদা চোখে ধরা পড়ে না। এক সেন্টিমিটারের শতাংশ (০.০০৪ ইঞ্চি) পরিমিত ক্ষুদ্র বস্তুর একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাদি হইয়া থাকিলে উহাদের পৃথক অস্তিত্ব আমরা চোখের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না। চিনির দানা একটী একটী করিয়া বাছাই করিতে পারিলেও ময়দার কণিকার স্বাতন্ত্র্য চোখে ধরিতে পারি না। বহুকাল মাহুঘ দৃষ্টির এমনই সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা বিশ্বের বিচার করিয়াছে, চেষ্টা-দেখা গভীর বহির্ভূত বিরাট সত্তার কথা সে ভাবিতেও পারে নাই।

একাদশ শতাব্দীতে কাচের লেন্সের সাহায্যে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তখন মাহুঘের দৃষ্টির পরিধি আরও দশগুণ প্রসারিত হইয়াছিল, ১০০১ সেন্টিমিটার স্থান জুড়িয়া যাহারা অবস্থান করে তেমনি ক্ষুদ্র বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়িয়াছিল।

হল্যান্ডের এন্টনি লিওয়েন হোয়েক (১৬৫০) সর্বপ্রথম

একাধিক লেন্সের সমন্বয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যেই সর্বপ্রথম দৃষ্টির অন্তরালে স্থিত জীবলোকের অস্তিত্ব জানা যায়। তৎপূর্বে জীবাণুর কথা মাহুঘের কল্পনার অতীত ছিল। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রমোন্নতি হইয়াছে এবং মাহুঘের দৃষ্টিশক্তি সহস্র গুণ বর্ধিত হইয়া এক সেন্টিমিটারকে লক্ষ ভাগে ভাগ করিয়াও দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। যদিও একথা বেশ জানা ছিল যে, বস্তুর আকৃতির ক্ষুদ্রত্বের উহাই শেষ সীমা নহে তবুও ইহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল যে, যান্ত্রিক দৃষ্টির গভীর উহার পরে আর সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন?

আলোকরশ্মি সরল রেখায় গমন করে এবং ইহারই ফলে অনচ্ছ পদার্থের ছায়া পড়ে—জ্যামিতিক আলো-বিজ্ঞানের ইহা মূল স্বীকৃত সত্য। অণুবীক্ষণের কার্য-প্রণালী অমুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে উহাতে প্রধানত দুইটি লেন্স থাকে—একখানা লক্ষ্য-বস্তুর খুবই কাছে (অবজেক্ট) অপর খানা



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ

(পার্শ্ব দণ্ডায়মান ছোঁরিকিন, উপবিষ্ট হিলিয়র)

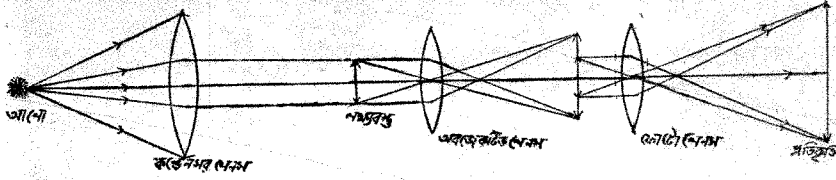
চোখের সামনে (আইপীস)। তৃতীয় আর একখানা লেন্সের (কণেনসর) সাহায্যে কোনো আলোর উৎস হইতে রশ্মি গ্রহণ করিয়া উহা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় অবজেকটভের উপর ফেলানো হয়। কণেনসর ও অবজেকটভ উভয়ের মাঝখানে থাকে দ্রষ্টব্য বস্তু। তাই আলোকরশ্মিকে অবজেকটভে পৌঁছিবাব পূর্বে এই বস্তুকে অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। ইহারই ফলে আপতিত আলোকরশ্মির খানিকটা অংশ দ্রষ্টব্য বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অবজেকটভ লেন্সে যে আলো প্রবেশ করে তাহা অবিশিষ্ট আলো নহে, উহাতে লক্ষ্য-বস্তুর ছায়া থাকিয়া যায়। অবজেকটভ লেন্সে গৃহীত আলোকরশ্মি লেন্স হইতে নির্গত হইয়া আইপীসের সম্মুখদেশে লক্ষ্য-বস্তুর একটি আলোছায়ায় আঁকা প্রতিকৃতি বা সদ্বিগ্ন সৃষ্টি করে—যাহা লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে আকারে অনেকাংশে বৃহত্তর। অতঃপর আইপীসের সাহায্যে এই সদ্বিগ্নকে আরও বৃহদাকারে চোখে দেখিবার ব্যবস্থা কিংবা ফোটো লেন্সের দ্বারা ফোটোগ্রাফেটে ফেলিবার উপায় করা হইয়া থাকে।

এই যন্ত্রের কার্য-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে আলো সরল রেখায় গমন করে বলিয়া অনঙ্গ লক্ষ্যবস্তুর যে ছায়ার উৎপত্তি হয় লেন্সের সাহায্যে ঐ ছায়াকে বৃহদাকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। লেন্স যত শক্তিশালী হইবে ছায়ার আকার তত বড় হইবে। কোন বস্তুকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত হইতে হইলে উহার আকৃতি অন্তত ০.১

সেটিমিটার হওয়া প্রয়োজন। বস্তুর আকৃতি ঐ পরিমাণের কম হইলে উহার ছায়া সৃষ্টি করিয়া তাহার আকৃতি ইচ্ছামত বড় করিয়া লইতে পারি। সুতরাং ছায়ার মধ্যবর্তিতায় অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকে দেখা সম্ভব। ছায়া সৃষ্টি ও উহার বিবর্জনকার্য এই দুই ব্যাপারকে পৃথক করিয়া ভাবিলে সুবিধা হইবে—ছায়া সৃষ্টির জন্য আলোক-রশ্মিকে সরল রেখায় চলিতে হইবে, আবার সেই ছায়াকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত করিতে হইলে উহার বিস্তৃতি অন্তত ০.১ সেটিমিটার করিতে হইবে। আলোর গতি-পথে কোন বস্তুকণিকা পতিত হইলে আলোর শক্তিস্রোতী পদার্থটির আকৃতির অনুসারে ছোট-বড় একটি ছায়ার উৎপত্তি হয়, উহাকে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত আকৃতি প্রদান করিতে পারে লেন্স উহার বিশেষ গুণের প্রভাবে। কিন্তু যদি কোন বস্তুর ছায়া না পড়ে (অর্থাৎ যদি উহা স্বচ্ছ হয়) তবে লেন্সের ক্রিয়া নিষ্ফল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রোগ-জীবাণু দেখিবার পূর্বে জীবাণুর স্বচ্ছতা দূরীকরণার্থ উহাদের গায়ে রং লাগান হয়।

খুবই ক্ষুদ্র অনঙ্গ বস্তুর সম্মুখ দিক হইতে আলো ফেলিয়া তাহার পিছনের ছায়া পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সেখানে বস্তুর আকৃতির অস্পষ্ট অবিবর্তিত ছায়া পড়ে না। একটি সূঁচ বা রেডের ধারালো অংশের ছায়াকে লেন্সের সাহায্যে বড় করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উহা মোটেই মূল জিনিষের প্রতিকৃতি নহে। ছায়া দেখিয়া কায়ার ধারণা করা চলিবে না, যেখানে ছায়া হইবার কথা সেখানে আলো প্রবেশ করিয়া ছায়ার বৈশিষ্ট্য তথা বস্তুর আকৃতির স্বরূপ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। হাতের যে-কোন দুই অঙ্গুলিকে একত্রিত অবস্থায় রাখিলে উহাদের অভ্যন্তরে সামান্য কঁক থাকিয়া যায়। তাহার ভিতর দিয়া তাকাইলে ঐ কঁকের মধ্যে কতকগুলি কালো দাগ দেখা যাইবে। এই ক্ষেত্রে যে স্থানে আলো ঠাকা উচিত সেখানে রহিয়াছে অন্ধকার। এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, আলোকরশ্মি একান্তভাবে সরল রেখায় গমন করে না—খানিকটা বাঁকিয়া যাইতে পারে। খুবই ছোট পদার্থ হইলে আলোকরশ্মি উহাকে ডিঙাইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাই সূঁচ বা তারের ছায়ার ভিতরেও আলোর রেখা থাকে, আবার ক্ষুদ্র রঞ্জপথে আলোকরশ্মি নির্বিবাদে চলাফেরা করিতে পারে না বলিয়াই অঙ্গুলির কঁকে কালো রেখার সৃষ্টি হয়। সূঁচের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রাকৃতি বস্তুতে আলোকরশ্মি মোটেই বাধা পায় না এবং অঙ্গুলির কঁকের চেয়েও রঞ্জপথকে আরও এমন ছোট করা যাইতে পারে আলো যাহার ভিতর দিয়া যাইতেই পারে না।

অণুবীক্ষণের নীচে একান্ত ক্ষুদ্র কণিকা রাখিয়া দিলে উহার আলোকরশ্মির পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না, সুতরাং উহাদের কোন স্পষ্ট ছায়াও পড়ে না। যে সকল অঙ্গুলি বস্তুর আকৃতি এক সেটিমিটারের লক্ষ ভাগের চেয়েও কম,



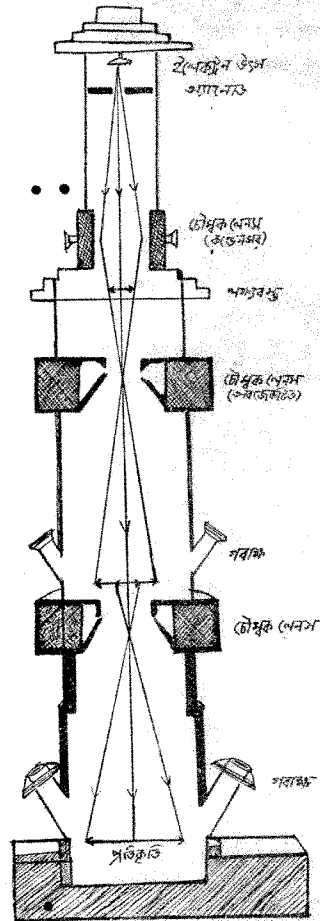
অণুবীক্ষণের কার্যপ্রণালী

উহা আলোকরশ্মির কাছে যত্ন পদার্থের ছায়া প্রতিভাত হয় বলিয়া অণুবীক্ষণে উহাদের স্বরূপ জানা যায় না। অণুবীক্ষণের এই অক্ষমতা লেন্সের ত্রুটিজনিত নহে। ইহার মূলে রহিয়াছে আলোকতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। যে বস্তুর আকৃতি আলোর তরঙ্গের তুলনায় বড়, তরঙ্গ উহাদের ডিফ্রাইয়া যাইতে পারে না এবং আলো এই প্রকার বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়—এইজন্ম আলো সরল রেখায় গমন করে এবং বস্তুর আকারের অল্পরূপ একটি ছায়া সৃষ্টি করে। কিন্তু অল্প বস্তুর আকৃতি আলোকতরঙ্গের সমপর্যায়ের হইলে আলোকরশ্মি বঁাকাপথেও চলে। এই সব ক্ষেত্রে ছায়াসৃষ্টির জ্যামিতিক নিয়মগুলি আর প্রযোজ্য হয় না।

তুইট কণিকা যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেক দূরত্বে অবস্থিত হয় তবে উহাদের স্বতন্ত্র ছায়া পড়ে না, উহারা মিলিতভাবে একটি ছায়া সৃষ্টি করে। সেই অবস্থায় লেন্সের বিবর্জনক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া গেলেও উহাদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। আমরা বিভিন্ন বর্ণের যে আলো দেখি উহাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্য আছে। কোন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যে এক সেন্টিমিটারের লক্ষাংশের চার হইতে আটগুণের (০০০০৪-০০০০৮ সেং মিঃ) বেশী নহে। বেগুনী আলোর তরঙ্গ সবচেয়ে ছোট। ঐ আলোতে কোন বস্তুকে দেখিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা চরমে পৌছায়। কিন্তু তাহাতেও ০০০০২ সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে দেখা যায় না। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই আকারের জিনিষকে চোখে দেখিতে হইলে উহাকে অন্তত পাঁচ শত গুণ বড় করিয়া লইলেই চলে। অণুবীক্ষণের লেন্সের বিবর্জন-ক্ষমতা ইহার চেয়েও তিন গুণ (পনের শত) করা সম্ভব হইয়া থাকিলেও তাহাতে ০০০০২ সেন্টিমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্রতর জিনিষকে দেখা যায় না। মনে করুন তুইট কণিকা ০০০০২ সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে রহিয়াছে। অণুবীক্ষণযন্ত্রে চরম বিবর্জন করিয়াও উহাদের পৃথক উপলব্ধি করা চলিবে না। কারণ আলোর তরঙ্গ উহাদের আভ্যন্তরীণ কঁক দিয়া স্ফুটভাবে নির্গত হইতে পারে না। তুই ছায়ার জিতরেও আলোকরশ্মির ব্যবধান না থাকিলে উহাদের স্বাতন্ত্র্য বুঝা যায় না। যন্ত্রের সাফল্য এখানে আসিয়া আলোর তরঙ্গের বিচিত্র ব্যবহারের কাছে হার মানিয়া গেল। আলোক-তরঙ্গের আকৃতি ছোট করিতে না পারিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা বাড়াইবার উপায় নাই জানিয়াই একদা বলা হইত যে ০০০০২

সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট জিনিষকে আমরা কোনক্রমেই দেখিতে পারিব না। অতঃপর অণুবীক্ষণের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্ম আলোকে বাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

বেগুনী আলোর তরঙ্গের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির। এই রশ্মি আলোর অহুত্ব জাগায় না বটে, কিন্তু তবুও ইহার আলোর সমধর্মী। দর্শনেন্দ্রিয়কে কঁকি দিয়া চলিলেও ইহার ফোটোগ্রাফে ধরা দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কণ্ডেন্সরে দৃশ্য আলো ব্যবহার না করিয়া আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিদ্বারা ছায়া সৃষ্টির কাজ চালাইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বস্তুর অবিকৃত ছায়ার উৎপত্তি সম্ভব, কেননা, এই রশ্মির তরঙ্গের আকৃতি ছোট। আলট্রা-



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের কার্যপ্রণালী

ভায়লেন্ট রশ্মির যে ছায়া পড়িবে উহা চোখে দেখা না গেলেও ফোটো-প্লেটে ধরা পড়িবে। আলট্রা-ভায়লেন্ট অণুবীক্ষণদ্বারা ০০০০১ সেন্টিমিটার পরিমিত বস্তুর স্বতন্ত্র ফোটো তোলা সম্ভব হইয়াছে।



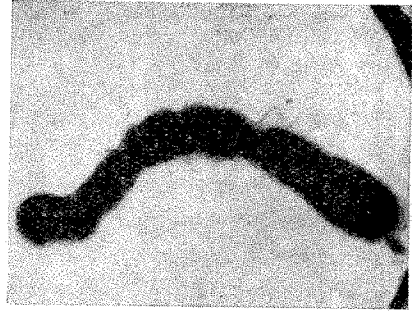
ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে যক্ষা জীবাণু
(সাধারণ অণুবীক্ষণে এই জীবাণুর এত খুঁটিনাটি অংশ
দেখা যায় না)

রঞ্জন-রশ্মি ও গামা-রশ্মির তরঙ্গ আলট্রা-ভায়লেন্ট তরঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। কিন্তু ইহাদের সাহায্যে অণুবীক্ষণের কার্য করা সম্ভব নহে। লেন্সদ্বারা আলোকরশ্মির গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া উহাকে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে কোন বস্তুর ছায়া বা সদবিশ্বকে বৃহত্তর আকার দেওয়া সম্ভব নহে। আলোকরশ্মি সরল রেখায় গমন করে বটে, কিন্তু এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে গমনকালে উহার গতিপথ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়। আলোকরশ্মি বায়ু ছাড়িয়া যখন কাঁচের লেন্সে প্রবেশ করে তখন ঐ রশ্মি বাকিয়া যায়। লেন্সের বক্রপৃষ্ঠ উহাকে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী করিয়া থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে যতগুলি রশ্মিই লেন্সের বিভিন্ন অংশে আপতিত হউক না কেন, লেন্স হইতে বহির্গত হইয়া উহার আবার একই বিন্দুতে মিলিত হয়। লেন্সের এই বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই উহারই মধ্যবর্তিতায় কোন বস্তুর সদবিশ্ব সৃষ্টি করা সম্ভব এবং ইচ্ছামত ঐ সদবিশ্বের আকৃতি বড় বা ছোট করিয়া লওয়া চলে। দৃশ্য আলোক এক বস্তু হইতে অল্প বস্তুর ভিতরে প্রবেশকালে বাকিয়া যায়, কিন্তু রঞ্জন-রশ্মি বা গামা-রশ্মি অল্পরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই জাতীয় রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে এমন ক্ষমতা কোন লেন্সেরই নাই। অণুবীক্ষণের কার্যে ইহাদের ব্যবহার সম্ভব না হইলেও ইহা জানা ছিল যে, রঞ্জন-রশ্মির অল্পরূপ ছোট তরঙ্গ সুবিধায় ব্যবহার করিতে পারিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দৃশ্য আলোকে দেখা অণুবীক্ষণের ক্ষমতার গণী অধিকতর সম্প্রসারিত করা কোন সম্ভব নয় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির জটিলতা পরিহার করিয়া মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, আলোর তরঙ্গের চেয়ে যথেষ্ট ছোট আকারের জিনিসকে পৃথক ভাবে দেখা সম্ভব নহে, কারণ আলোক-তরঙ্গের এই

বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহার আকৃতির তুলনায় ক্ষুদ্রতর অথচ বস্তু রশ্মিকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, আবার কোন রূপে যদি আলোর তরঙ্গের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হয় তবে ঐ পথে আলোকতরঙ্গের পক্ষে যাহা অসম্ভব ইলেকট্রনের তাহা সাধ্যায়ত্ত বটে।

পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তর উপাদান ইলেকট্রন। ইহাই তড়িৎ-শক্তি ক্ষুদ্রতম পদার্থ কণিকা। ইলেকট্রনের চলাচলের ফলেই তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি। কোন কোন ধাতব তারকে উত্তাপ দিলে উহার পরমাণু হইতে স্বতঃই ইলেকট্রন নির্গত হয়। তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণে ইহাকে বেগযুক্ত করা যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, অতি বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন চলিবার সময় আলোর তরঙ্গের দ্বায় ব্যবহার করে। ইহারাতঃ সরল রেখায় গমন করে এবং ইহাদের গতিপথে কোন বস্তু পতিত হইলে ইলেকট্রন তাহাতে আটকাইয়া যায়। ডিরোপলি (১৯২৪) প্রমাণ করেন, বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনের চলার রীতির সঙ্গে আলোর তরঙ্গের মিল আছে। কোন পদার্থের নিকট দিয়া চলিবার সময় আলোর রশ্মি যে নিয়ম মানিয়া চলে ইলেকট্রন-রশ্মিও অল্পরূপ নিয়ম অনুসরণ করে। আলোক-তরঙ্গের চলিবার রীতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে বদলায়—ইলেকট্রন-রশ্মির গুণও উহার বেগের উপর নির্ভর করে।



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ট্রেপটোককাস জীবাণু

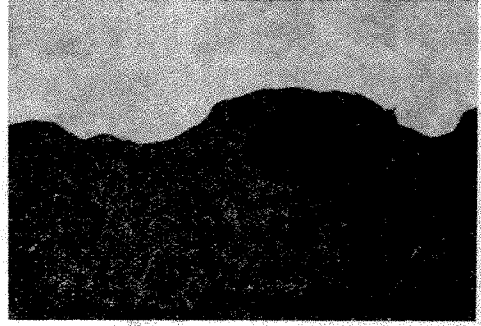
ইলেকট্রন-রশ্মিকে আলোক-রশ্মির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, যে ইলেকট্রন প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল বেগে চলে তাহা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিক দিয়া রঞ্জন-রশ্মির সম-পর্যায়ভুক্ত। কার্যতঃ আমরা বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনকে এমন আলোক-রশ্মিরূপে বিচার করিতে পারি যাহার তরঙ্গ দ্রুত হইতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দৃশ্য আলোকরশ্মি ০০০০২ সেন্টিমিটারের চেয়ে অপরিসর রূপে দিয়া কার্যতঃ নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উহার চেয়ে অনেক কম পরিসর স্থান দিয়া নির্গত হইতে সক্ষম। আলোক-রশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করিলে এমন কণিকার ছায়া পাওয়া যাইতে পারে যাহারা আলোক-রশ্মিতে ছায়া গঠন করে না। ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করিয়া অণুবীক্ষণের কার্য করিলে যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রকটজেন-রশ্মি-অণুবীক্ষণ নির্মাণ কেন সম্ভব হয় নাই সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রকটজেন-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার উপযুক্ত লেন্স নাই। ইলেকট্রন-রশ্মিকে (বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন স্রোত) তড়িৎ বা চুম্বকের প্রভাবে বাঁকানো যায়। বৃশ (১৯২৬) সপ্রমাণ করেন যে, কোন কাঁপা চোঙের আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুতে চৌম্বক প্রদান করিলে উহার অভ্যন্তরে যে আকর্ষণক্ষেত্র স্থাপিত হয় তাহার ফলে প্রবাহমান ইলেকট্রন-রশ্মি বাঁকিয়া যায়। আলোক-রশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়া যাইবার সময় যে প্রকার কেন্দ্রীভূত হয়, উল্লিখিত চৌম্বক-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহমান ইলেকট্রন-রশ্মিও সেই একই নিয়মে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে বিশেষ ভাবে স্থাপিত চৌম্বক-ক্ষেত্রের নাম চৌম্বক লেন্স। ইলেকট্রন-রশ্মি ও চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ।

উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে নির্গত ইলেকট্রন-রশ্মিকে ৫০ হাজার (বা তদপেক্ষা বেশী) ভোল্ট-বিভবযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের আকর্ষণে বেগযুক্ত করা হয়। ইলেকট্রন প্রতি সেকেন্ডে প্রায় লক্ষ মাইল বেগে সরল রেখায় চলিতে থাকে এবং এই রশ্মিকে চৌম্বক লেন্সের (কণ্ডেনসর) প্রভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপরে ফেলানো হয়। আলোক-রশ্মির মতই লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন কণিকার কাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসে ইলেকট্রন-রশ্মি। কিন্তু যে কাঁক দিয়া আলোক-রশ্মি নির্গত হয় না, ইলেকট্রন সেখানে অনায়াসে পথ করিয়া চলিয়া আসে। আবার যে ক্ষুদ্র কণিকা আলোকরশ্মিকে আটকাইতে পারে নাই, ইলেকট্রন সেখানে আটকাইয়া যায় সেইজন্য নির্গত ইলেকট্রন-রশ্মিতে লক্ষ্যবস্তুর স্বচ্ছ ছাপ থাকিয়া যাইবে। অতঃপর এই রশ্মিকে দ্বিতীয় চৌম্বক লেন্সের (অবজেকটিভ) প্রভাবে ফেলিয়া অপর পার্শ্বে কেন্দ্রীভূত করা হইল। এখানে ইলেকট্রন রশ্মি লক্ষ্য-বস্তুর কণিকা-বিচ্ছাসের এক বৃহদাকৃতি প্রতিবিম্ব (ইলেকট্রন-গড়া) গঠন করিল। পুনরায় তৃতীয় চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে এই ইলেকট্রনের চিত্রকে আরও বিবর্তিত করিয়া লইয়া স্ক্রাইনী পর্দার উপরে ফেলানো হইল। ইলেকট্রনের আঘাতে এই পর্দার গায়ে আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠে। লক্ষ্য-বস্তুর যে সকল অংশ দিয়া ইলেকট্রন নির্গত হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে পর্দার অমুরূপ সেই সকল স্থানে আলোক উৎপন্ন হইবে—অজ্ঞাত হইবে অঙ্ককার। ইহাতেই লক্ষ্যবস্তুর একটি ছায়াচিত্র পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা করিলে ইলেকট্রন-রশ্মিকে ফোটোপ্লেটে ফেলিয়া লক্ষ্য-বস্তুর ফোটো ভোলাও সম্ভব।

জার্মানিতে নোল ও রুজকা (১৯৩১) সর্বপ্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেন। তিন বৎসর পরে তাঁহাদের যন্ত্র কার্যোপযোগী হয়। তৎপরে কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হোরিকিন, হিলিয়র, মার্টিন, বার্টন প্রভৃতির চেষ্টায় আরও দুইটি যন্ত্র নির্মিত হইয়াছিল (১৯৩৯)। বিগত মহা-সময়ের সময়ে এই যন্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডকে সাতটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপর ইংলণ্ডেও এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের বিভিন্ন অংশের জন্ম নানা প্রকার সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা দরকার। যন্ত্রের উপরিভাগে থাকে ইলেকট্রন-রশ্মির উৎস—উত্তপ্ত ধাতব তার (ক্যাথোড)। ইহারই অদূরে রহিয়াছে ৫০ হাজার ভোল্টযুক্ত একটি সচ্ছিন্ন ধাতব প্লেট (অ্যানোড)। অ্যানোডের ভোল্টবিভবের উপরেই ইলেকট্রনের গতি নির্ভর করে। ইলেকট্রনের বেগের সঙ্গে রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য তথা অণুবীক্ষণের ক্ষমতার সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিয়াছে।



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচে ফ্লুরের রেড। চিত্রে প্রদর্শিত অংশের বিস্তৃতি ০০০০৩ সেন্টিমিটার। সাধারণ অণুবীক্ষণে এই প্রকার ক্ষুদ্রাংশের এত স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না

অ্যানোডের আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র রক্তপথে বহির্গত হওয়ার পর ইলেকট্রন-রশ্মি কণ্ডেনসর লেন্সের প্রভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া লক্ষ্য-বস্তুর উপরে পড়ে। সাধারণ আলোর অণুবীক্ষণে স্বচ্ছ কাচের প্লেটের উপর লক্ষ্য-বস্তুকে রাখা হয়। ইহাকে বলে মাউন্ট। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে মাউন্ট-নির্বাচন কঠিন সমস্যা। কাচ যে প্রকার আলোক-রশ্মির কাছে স্বচ্ছ, সেইরূপ ইলেকট্রনরশ্মিকে বাধা দিবে না এমন পদার্থই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে মাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কাচ বা এ জাতীয় কোন জিনিস এই কার্যের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব নহে, কারণ কাচের দানায় ইলেকট্রন আটকাইয়া যাইবে ও তাহার ছায়া পড়িবে। ০০০০০১৫ সেন্টিমিটার পুরু কলডিয়নের ফিল্ম প্রায়শঃ এই কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর দিয়া ইলেকট্রন অনায়াসে চলিয়া আসিতে পারে।

চৌম্বক লেন্সের জন্য চোঙের মত তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। প্রবাহের শক্তি লেন্সের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

ইলেকট্রন-রশ্মির চলাচলের জন্য মাইক্রোস্কোপ নলকে প্রায় বায়ুশূন্য করা প্রয়োজন। সেইজন্য যন্ত্রের সঙ্গেই পাম্পের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষার বস্তু বা ফোটোপ্লেটকে যথাযথানে বসাইয়া দিবার জন্য বা বাহির করিয়া আনিবার জন্য 'লকে'র ব্যবস্থা থাকে যাহাতে নলের ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। যন্ত্রের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিবিম্ব চোখে

দেখিবার উদ্দেশ্যে নলের স্থানে স্থানে গবাক্ষের ব্যবস্থা থাকে।
এক একটি মাইক্রোস্কোপের দৈর্ঘ্য সাত-আট ফুট।

এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে কোন কণিকাকে পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখা সম্ভব। ০০০০০০০ সেণ্টিমিটার আকৃতির জিনিসও ইহার সাহায্যে স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষের দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য জিনিস হাজার গুণ বদ্ধিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের দৌলতে মৃতন এক অজ্ঞাত জগৎ মানুষের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে। বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগজীবাণুর সাধারণ সংজ্ঞা ভিন্ন। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে এতাবৎকাল ইহাদের স্বরূপ অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে নাই। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নীচে ইহারা এত দিনে আত্মপ্রকাশ করি-

য়াছে। ইতিপূর্বে ব্যাসিলাস বা ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবাণুর আকৃতিমাত্রই জানা ছিল; এক্ষণে উহাদের দেহের ভিতরকার গঠনপ্রণালী মানুষের কাছে প্রকটিত হইতেছে। অনেক দানাদার পদার্থের গঠন এবং যে সকল যৌগিক পদার্থের অণু আকারে অপেক্ষাকৃত বড় তাহাদের রূপ যান্ত্রিক চক্র পদ্যায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

যে যন্ত্র ছোটকৈ বড় করিয়া দেখায় তাহার নাম এক সময় দেওয়া হইয়াছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু পদার্থের অণুর স্বরূপ চোখের সামনে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কোন ক্ষমতাই তাহার ছিল না। এতদিনে বোধ হয় সার্থকনামা অণুবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে।

চলে গেল তারা

শ্রী অরুণবরণ চক্রবর্তী

চলে গেল তারা জন্মের মত বিদায় নিয়ে

সবার চোখের ওপর দিয়ে।

কেউ ডাকে নাই, কেউ বলে নাই, “কোথায় যাও?”

এমন কি শুধু যুগের কথার সাহুনাতেও বলে নাই কেউ—

“আমরা রয়েছি, কোন ভয় নাই, ছেড়ো না গাঁও,

নিরুদ্ধেশের যাত্রায় তাই ভেসেছে নদীতে হৈলে বউ নিয়ে

কাহারো নাও,

পায়ে হাঁটী-পথে বাকীরা চলেছে মিছিল ক’রে

দূর সহরে,

যেখানে জীবন আগের মত

উদ্যম গতি, উজ্জল স্রোতে চলায় রত।

যেতে যেতে তারা বার বার ক’রে চেয়েছে কিরে,

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় চলেছে বীরে,

বুরি-নামা বুড়ো বটের শেষে

গাঁয়ের সীমানা যেখানে মেসে,

সেখানে এসে

অপলক চোখে জন্মের দেখা দেখেছে চেয়ে,

প্লাবন ছুটেছে দু-চোখ বেয়ে।

তারা শুধু জানে কি গভীর ব্যথা পড়েছে গ’লে

ভিটে-মাটি-ছাড়া সব-হারা ঐ নিরঙ্গদের বিদায়-বেলার

চোখের জলে।

সেদিনের সেই ছুঁদিনে যারা সুদিন পেলে,

শীতের রাতেই ভুবনে যাদের ফাণ্ডন এলো,

হঠাৎ-পাওয়া সে টাকার গরমে আত্মহারা,

কালো বাজারের নকল আলোর মদের নেশায় মত্ত তারা।

রাতের অন্ধকারের তলে

তাদের লোভের লেলিহ-জিহ্বা শাণিত ছুরির মতন বলে।

নকল আলোর মদের নেশায় রতীন চোখ—

পৃথিবী তখন তাদের ভোগের স্বর্গলোক।

তাদেরি চোখের তলায় এদিকে ক্রমশঃ শূন্য হ’ল যে দেশ

তাদেরি লোভের খোরাক জোগাতে—কি তাতে তাদের?

করেছে যে কাজ করেছে বেশ—

তারা ত হয়েছে লক্ষপতি—

হতভাগাদের ভাগ্যের সাথে নিজেদের জড়ালে হ’ত কি কখনো

এ উন্নতি?

নিজেকে হারিয়ে স্বার্থ-জ্ঞান আর আত্ম-স্বার্থে

মানুষ যখন মানুষেরে দিল নির্দয়ে ঠেলা মৃত্যু-মুখে,

বহু পুরুষের বহু স্মৃতি মাথা বসতবাগী,

মায়ের মতন স্নেহাতুরা আর গাঁয়ের মাটি,

এরাই তখন কঁদেছিল আর বার বার করে ডেকেছে পিছু,

দেয় নাই সাড়া, চলে গেছে তারা, শুনেছে তবুও শোনে নি কিছু।

মানুষ যখন মানুষের মাঝে আরেক মানুষে দিল না ঠাই,

তাদের তখন কেহই নাই।

জন্মের মত বিদায় নিয়ে

চলে গেল তাই সবার চোখের ওপর দিয়ে।

নোয়াখালি-শ্রীরামপুরের পূর্বকথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীরামপুর নোয়াখালি জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। কিন্তু তাহার প্রসিদ্ধি জেলার ক্ষুদ্র পরিসর অভিক্রম করিতে এত কাল সমর্থ হয় নাই। কারণ, বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর সারিঘাই স্থানসমূহের প্রসিদ্ধির নিদান হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্ময়কর নব অভিযান এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হওয়ায় অন্যান্য ছই মাস কাল তাহার এবং তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়া শ্রীরামপুর আজ ভারতের এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাত্মাজীৱ তত্ত্ব্য আশ্রয়ভূমির একটি ‘রাজবাড়ী’র পথের ধারে অবস্থিত এবং বর্তমান ‘রাজা’ শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় রাজোচিত বদান্ততার পরিচয় দিয়া উক্ত ভূমির সহ বিস্তৃত ভূখণ্ড দেশমাতৃকার উদ্দেশে দান করিয়াছেন। এই ‘রাজ’-বংশের উল্লেখ বর্তমান শাসনতন্ত্রের দপ্তরে পাওয়া যাইবে না। ইংরেজ অধিকারে ‘রাজা’ উপাধিধারা ভূষিত না হইলেও নোয়াখালি জেলার আপামর জনসাধারণ এই বংশের রাজক্য্যতি অদ্যাপি অটুট রাখিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত আমরা সংক্ষেপে শ্রীরামপুর ও তাহার রাজবংশের অতীত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নোয়াখালির আদিরাজ্য বিখ্যাত রায়ের প্রপৌত্র “রাজা শ্রীরাম ষাঁ”র নামানুসারে গ্রামের নাম শ্রীরামপুর হয়। শ্রীরাম ষাঁর রাজত্বকাল অহুমান ১৪৫০-১৫০০ খ্রিঃ—সুতরাং গ্রামটি প্রায় ৫০০ বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। শ্রীরাম ষাঁর পৌত্র রাজা রাজবল্লভের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ‘রাজা কৃষ্ণরায়’; তিনিই মূল রাজবংশ হইতে পৃথক হইয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন। মূল রাজবংশ নোয়াখালিতে বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি মাত্র রাজ্যভ্রষ্ট শাখা ত্রিপুরা জেলার বিদ্যমান আছে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৪)। সুতরাং নোয়াখালি জেলার শূরবীর্য্যগণের একমাত্র রাজোপাধি উত্তরাধিকারী রূপে শ্রীরামপুরের রাজবংশ ঐতিহাসিক গৌরবে মহিমাম্বিত। রাজা কৃষ্ণ রায় বারভূঞার অগ্রতম রাজা গদ্বর্ধমানিক্যের পিতৃব্য ও সমসাময়িক, সুতরাং প্রায় ১৬০০ সনে বিদ্যমান ছিলেন। কৃষ্ণ রায় ভুল্লয়া পরগণার একাংশ উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাক্রান্ত ভ্রাতৃত্ব উদয়মানিক্য ও গদ্বর্ধমানিক্যের রাজত্বকালে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এইরূপ অহুমান করার কারণ আছে। চৌডরমজের রাজত্ব-বন্দোবস্তে ভুল্লয়ার রাজত্বের পরিমাণ লিখিত আছে ১৩৩১৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩০২৮৭ টাকা। এই সময় হইতেই ভুল্লয়া পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল—তপে চৌহাঁজারী, তপে অষ্টহাজারী ও তপে দশহাজারী। ইহাদের নাম রাজত্বের পরিমাণ হইতে স্ফট হইয়াছে বলিয়া অহুমান করাই সম্ভব—মোট রাজত্ব ৩২,০০০ টাকা স্থূলতঃ

চৌডরমজের রাজত্ব পরিমাণের সহিত অভিন্ন বটে। তপে দশ হাজারীর উল্লেখ প্রাচীন দানপত্রাদিতে অত্যন্ত দুপ্রাপ্য। আমরা একটি মাত্র দেবোত্তরের দানপত্রে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। রাজা কৃষ্ণ রায়ের যুদ্ধপ্রপৌত্র উদয়নারায়ণ ৫৪১ পরগণাতি সনের ৫ আশ্বিন (১৭৪২-৩ সন) নিজ পুত্র ‘প্রাণপ্রীতিম’ কীর্ত্তি-নারায়ণের নামে ‘রাজরাজেশ্বর’ দেবতার জন্ত ২১০ ধোণ দেবত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। দানপত্রে ভূমির অবস্থান নির্দেশস্থলে লিখিত আছে, ‘পরগণে ভুল্লয়া তপে দশ হাজারী জায়গীর সরকার আলী।’ (ত্রিপুরা কালেক্টরীর ৪৯১৯ সংখ্যক সনদ) সুতরাং অহুমান হয় ‘তপে দশ হাজারী’ই রাজা কৃষ্ণ রায়ের সম্পত্তি ছিল এবং কালক্রমে একটি ক্ষুদ্র জায়গীর মাত্র তাঁহাদের দখলে থাকে।

রাজা কৃষ্ণরায়ের সময় হইতেই বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আসিয়া শ্রীরামপুরের রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামটিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণ রায় তদীয় পুরোহিত ‘সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য’কে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে ৩৬/৭১০ ভূমি দান করিয়াছিলেন (ত্রিপুরা কালেক্টরীর ৪৫১৫ সংখ্যক ফার্সী চূষক দ্রষ্টব্য)। উক্ত ভট্টাচার্য্য বাহ্যৎ গোত্র, কাঞ্চিলাল গাঞি—তাঁহার অবন্তন ৯-১০ পুরুষ এখনও বিদ্যমান। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত তদীয় পিতৃব্য-পুত্র অনন্তমাণিক্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য স্বয়ং অমিতবলশালী ছিলেন, কিন্তু অনন্তমাণিক্য তদপেক্ষাও বলীয়ান এবং লক্ষ্মণমাণিক্যের ঈর্ষ্যা ও বৈরভাবের কারণ হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, এক দিন রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজবেশে সজ্জিত হইয়া কৃত্রিম মেহ প্রদর্শনপূর্বক কল্যাণপুর রাজগৃহের এক প্রকোষ্ঠে অনন্তমাণিক্যকে আহ্বারে বসাইয়া তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। আহ্বার করিতে করিতে অনন্তমাণিক্যের মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কার উদ্রেক হয় এবং তিনি হঠাৎ ভোজন আসন হইতে এক প্রচণ্ড লক্ষ্য প্রদান করিয়া একটি ক্ষুদ্র জানালায় ভিতর দিয়া গলিয়া উচ্ছিষ্ট হইয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়াইয়া চৌদ-পনের মাইল দূরবর্তী রাজা কৃষ্ণ রায়ের ভবনে শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ রায়ের পুত্র গৌরীপ্রসাদের কীর্ত্তি কথা জানা যায় না। তৎপুত্র ‘রাজা বারাহীদাস’ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক দুইটি ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি—একটিতে (৩১৫৬ সংখ্যক চূষক দ্রষ্টব্য) দানভাজন ব্যক্তি দেবীদাস এবং ঐপরটিতে (৪৫১৬ সংখ্যক চূষক) কৃষ্ণরাম ও রঘুনাথ চক্রবর্তী। শেষোক্ত দানের তারিখ ১১১৫ সন (১৭০৮-৯ খ্রিঃ) এবং ভূমির পরিমাণ ৫১/৫ গভা। বারাহীদাসের পুত্র কংশনারায়ণ অজ্ঞাত ছিলেন। তৎপুত্র ‘রাজা উদয়নারায়ণ’ই এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বহু দানপত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা দুইটি মাত্র উল্লেখ

করিতেছি, পূর্বে একটি উল্লিখিত হইয়াছে। ২০২৮ সংখ্যক সনদ পত্রে তিনি স্বপুত্র “রাজা রত্ননারায়ণ”কে আড়াই ঘোণ দেবজ ভূমি ১৫ ভাজ, ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রিঃ) দান করেন। ১২০২ সনে উক্ত ভূমির দখলকার ছিলেন রতননারায়ণের পৌত্র (অর্থাৎ নরসিংহের পুত্র) রাজচন্দ্রনারায়ণ। এই রাজচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা রাজবিহারীনারায়ণ অল্পকাল হইল স্বর্গত হইয়াছেন। এই দানপত্রের শীলমোহরে উদয়নারায়ণের নাম ও তারিখ ৫১১ (নকলে ৩১১ লিখিত আছে, ৫১১ হইবে সন্দেহ নাই) লিখিত ছিল। সুতরাং রাজা উদয়নারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৭১২-৪২ সন বলিয়া নির্ণীত হয়। ২০৩০ সংখ্যক সনদদ্বারা উদয়নারায়ণ অপর পুত্র কীর্তিনারায়ণকেও ঐ সনেই ভূমিদান করেন—১২০২ সনে তাহার উত্তরাধিকারী ছিলেন কীর্তিনারায়ণের এক কীর্তিমান পুত্র রাজা রঘুনাথনারায়ণ এবং এক পৌত্র রাজনারায়ণ। কীর্তিনারায়ণের ধারায় বর্তমান রাজা ত্রিনেপেজনারায়ণ রায় মহাশয়।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজা লক্ষ্মণসেনের অনুকরণে ‘পঞ্চরত্ন’ সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন কীর্তিনারায়ণ-নিবাসী মহাকবি রঘুনাথ কবিতার্কিক। এই রাজকবির নাম বঙ্গদেশে চির-স্মরণীয় হওয়া উচিত। ভুলুয়ার পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি আছে যে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য-রচিত গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ বিখ্যাতবিজয় নাটক, বস্তুতঃ কবিতার্কিকেরই রচনা এবং পৃষ্ঠপোষক রাজার নামে প্রচারিত। * আমরা সংক্ষেপে কবিতার্কিক ও তৎকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। রাজা বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার পুরোহিতও মিথিলা হইতে ভুলুয়া আগমন করেন, তাঁহার বংশধরগণ নোয়াখালীর নানা গ্রামে প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্র এবং বংশপরিচয় নির্দেশকালে বলেন ‘সাকুটাল কাঠবাণী’। সাকুটাল রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর ‘সাহাডিয়াল’ হইতে অভিন্ন হইতে পারে, কিম্বা পৃথক একটি মৈথিল বংশও হইতে পারে। এই রাজপুরোহিত বংশের

১। লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের নাম নিম্নলিখিত শ্লোকে বিস্তৃতভাবে কীর্তিত হইয়াছে, ত্রিপুরা জেলায় একটি প্রাচীন পুথি মধ্যে ইহা আমরা পাইয়াছিলাম।

“গোবর্দ্ধনশ শরণঃ কবিরাজানামা,

খ্যাতস্তথা গুণিগণৈর্জয়ন্তেবধীরঃ।

ত্রীমাহুমাতিথেরো জগদেকরত্নং

রত্নানি পঞ্চ নৃপলক্ষ্মণসেনভূমৌ ॥”

২। মিথিলার ভরদ্বাজগোত্র সাকুটাল বংশ ছিল কিম্বা আছে কি না গবেষণা না করিয়া এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয় অসাধ্য। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য বিখ্যাতবিজয় নাটকের প্রস্তাবনার পূর্ব-পুরুষের কীর্তিপ্রসঙ্গে পুরোহিতবংশের আদিপুরুষ ‘সাহাচার্য্য’র উল্লেখ করিয়াছেন (৯ম শ্লোক)—

এক দৌহিত্র শাখায় রাষ্ট্রীয় মূলপাড়ার চট্টোপাধ্যায়বংশীয় কীর্তিবাস পণ্ডিতের অধস্তন বংশধর বাণীনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রথম কীর্তিনারায়ণের আসিয়া বাসস্থাপন করেন এবং রাজ-পৌরোহিত্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্রই রঘুনাথ কবিতার্কিক। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত ‘কৌতুকরত্নাকর’ নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থসন আবিস্কৃত হইয়াছে। লঙ্কনের ইন্ডিয়া অফিস এম্বাগারে একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (এগেলিঙ্গ সাহেবের পুথিবিবরণীর পৃ. ১৬১৮ দ্রষ্টব্য) এবং অপর একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি ত্রিপুরা মহারাজার রাজএম্বাগারে আছে। আমরা শেষোক্ত পুথি পরীক্ষা করিয়াছি। এই গ্রন্থের বিস্তৃত প্রস্তাবনার লক্ষণরাজা ও তৎপিতার উচ্ছল প্রশস্তি রচনার পর কবি আত্মপরিচয় দিতেছেন :

বাণীনাথমহাশয়নঃ স্মৃতিনো বিদ্যাবিবেকক্ষমা-

ধৈর্য্যোদার্য্যগভীরতা-সুজনতা-কারুণ্যবাবাংনিধেঃ।

ভূমীদেবমণেঃ স্তুতস্ত কৃতিনঃ সংকাব্যরত্নাসুধি-

রাশ্তে ত্রীকবিতার্কিকস্ত সরসঃ কশিৎ প্রবন্ধোত্তরঃ ॥ (১৮)

পরবর্তী গদ্যাংশে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যে তিনি লক্ষ্মণ রাজার পুরোহিত ছিলেন (এতদ্বি পুরোহিতা তেন বিরচিতং কৌতুকরত্নাকরং গ্রন্থসনম)। এই গ্রন্থসনের বিষয়বস্তু হইল মান নামক এক মুর্থ রাজার রাজ্যের অপহরণ এবং কুমতিদেব-মন্ত্রী, অশুভচিন্তক দৈবজ্ঞ, আচারকালকূট পুরোহিত, প্রচণ্ড-শেকবর্ষের গুপ্তচর, অজিতেন্দ্রিয় গুরু ও ব্যাধিবর্জক বৈদ্য প্রভৃতির দ্বারা তাহার উদ্ধার চেষ্টা। কবির শেষ মনোহর ভরতবাক্যটি উদ্ধারযোগ্য—

পৃথ্বীং বিস্তারশতাং জনয়তু বিদধদেবরাজঃ স্মৃষ্টিং

ভূদেবৈর্ভজকর্মাধিল-নিহিত-পুরোডাশ-সত্ত্বপিতঃ সন।

ক্ষীরং স্নানিগ্ধগাবো দধতু বহুতরং তদ্বৈরাজ্যসংদৈঃ

যজ্ঞেস্তৃণাঃ প্রজানাং বিদধতু নিখিলানন্দবৃন্দানি দেবাঃ ॥

১৭শ শতাব্দীতে ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রতীরে যাগন্নাথের সমারোহদ্বারা প্রজাবর্গের আনন্দোৎপত্তির এই শুচিসম্পন্ন কামনার সহিত বিংশশতাব্দীর কামনার তুলনা করিলে দেবতার প্রসাদ নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যপ্রতিষ্ঠ মানবতার বর্তমান উদ্ধার বিজ্ঞপ্তি প্রকট পার্থক্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

কীর্তিনারায়ণ হইতে কল্যাণপুর রাজসভার যাতায়াত সহজ-

সাহাচার্য্য-বিশুদ্ধসত্ত্বিসমুদ্ভূতঃ স্বভঙ্গ্যতি-

স্বভূতঃ পরিতোপনীতবিপদাং মল্লৈস্তথা সুরিতিঃ।

যদগোত্রীয়মহীভুজামহরহঃ সধর্ম্মানৈর্ধর্ম্ম-

ভোমৈঃ পূর্ণমজীর্ণমুজ্ঞয়ং ব্রহ্মাণ্ডমুজ্ঞাত্তে ॥

এই সাহাচার্য্য কে আমরা জানিতে পারি নাই। তার্কিক সমাজে সাহাচার্য্যপদে মিথিলার মহাপণ্ডিত উদয়নাচার্য্য কিম্বা উদ্যোতকরাচার্য্যকে বুঝায়। পুরোহিতবংশ ইঁহাদের অজ্ঞতের বংশোদ্ভূত হওয়াবিচিত্র নহে।

সাধ্য নহে। প্রবাদ অনুসারে কবিতার্কিক এবং রাজসভার অগ্রাঙ্ক রত্নের ভবনে হাতী বাঁধা থাকিত এবং তাঁহারা হাতীতে চড়িয়াই প্রত্যহ রাজসভায় যাতায়াত করিতেন।

কবিতার্কিকের উপাধি হইতেই প্রতিপন্ন হয় তিনি একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রতিভা-প্রকাশের শ্রেষ্ঠবিজ্ঞ তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার অশস্তন বংশধারায় বহুকাল পাণ্ডিত্য বিজ্ঞান ছিল এবং এখনও সম্পূর্ণ বিদূষিত হয় নাই। কবিতার্কিকের পুত্র রত্নেশ্বর বিদ্যাবাগীশ—তিনিও পিতার সহিত লক্ষ্মণমাণিক্যের পঞ্চরত্নসভার অন্তর্গত

ছিলেন বলিয়া একটি মত প্রচলিত আছে। মতান্তরে পঞ্চরত্ন সভার রত্নেশ্বর ভিন্নবংশীয় এবং ভিন্নগ্রামবাসী ছিলেন। রত্নেশ্বর বিদ্যাবাগীশের পুত্র রামভদ্র সার্কভৌম। সার্কভৌমের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামগোপাল তর্কবাগীশ ও কনিষ্ঠ রামরমণ জায়ালাকার। জায়ালাকারের চার পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ তর্কভূষণ তৎকালে ভুলুয়ার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে হিরণ্যগর্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকর চক্রবর্তীর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র, গুরুচরণ ও চূর্ণাচরণের, পুত্র-পৌত্রগণ বিদ্যমান আছেন।

ফলতাবাড়ী টী এণ্টেটে

শ্রীমতীমাধব চৌধুরী

অজ্ঞানকভাবে মিনতির চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া সতীন চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত দেহ শক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিখানা শেষ করিয়া পাশের টিপরের উপর ফেলিয়া দিয়া সে সম্মুখের দিকে চাহিল।

দূরে ডিম্বাধোলের পাহাড়। থাকে থাকে চা-গাছের লাইন পাহাড়ের গা বহিয়া খানিকটা উঠিয়াছে। কুয়াশার একখানা ঘন জাল গাছগুলির উপর ভাসিয়া রহিয়াছে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের চূড়া হইতে স্বর্ষের আলো গড়াইয়া পড়িয়া কুয়াশার আবরণীকে ফিকা করিয়া তুলিয়াছে।

সতীনের দৃষ্টি একটু সরিয়া আসিয়া গেট-হাউসের বাম-দিকে একটু দূরে ফলতাবাড়ী চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলার উপর পড়িল। কাঠ, টিন, কাচের দ্বিতল বাড়ী, ছবির মত দেখাইতেছে। দোতলার সার্শাগুলি বুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেটের পরদার উপর, সার্শার উপর আলোর ফালি আসিয়া পড়িয়াছে।

উচ্চ হাসির শব্দে সতীনের শূন্য দৃষ্টি সম্মুখের রাস্তার উপর নামিল। গুট কয়েক ওয়াওঁ মেয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া ফ্যাক্টরীর পথে চলিয়াছে। সকাল বেলাতেও মাধ্যম শুদ্ধিয়াছে লাল ক্যানা ফুলের গুচ্ছ, অহুচ্চ কণ্ঠে কোরাস গান চলিয়াছে। মাঝে মাঝে গানের মধ্যে কলহাস্তের ঢেউ ভাঙিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ তাহাদের চোখ পড়িল সতীনের উপর। ছোট সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তাহাদের হাসির বান ডাকিয়া গেল। হাসিয়া ও গায় পড়িতে পড়িতে তাহারা আগাইয়া গেল।

সতীনের মুখে এতক্ষণে যুহু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মিনতির চিঠিতে একটা অপ্রত্যাশিত খবর আসিয়াছে। তাহার ভগ্নী গুরুফে কমরেড মিনতি সেন একজন ঝাঁকালো কমিউনিষ্ট। কমরেডী ঠাইলে সে লিখিয়াছে পার্টীর ডেলিগেট হিসাবে

কমরেড উষা দত্ত ও কমরেড ভেক্টাপ্লা তাম্বন্দ ইয়ং কমিউনিষ্ট কনকারেন্সে যোগদান করিবার জন্ত কিছুদিন পূর্বে রওয়ানা হইয়াছিল। পথে একটি ছুঁটনার ফলে কমরেড ভেক্টাপ্লার মৃত্যু হইয়াছে, কমরেড উষা দত্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। পার্টীর একজন বিশিষ্ট কর্মীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলেই দুঃখিত, কমরেড উষা দত্ত এই ছুঁটনার মর্মান্বত হইয়া আছে। পার্টীর মিটিঙে সে নীরবে বসিয়া থাকে, কোন কাজে উৎসাহ নাই। চেহারায় ভাইটিমির ঝি-ওয়ান ও বি-টু যুক্ত ষাডের অভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট। এই শব্দ কাটাঁইয়া উঠিয়া যাহাতে সে পূর্বের মত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতে পারে এজন্ম তাহার একটু চেষ্টা দরকার। গত ১২ই মার্চ তারিখের পার্টী মিটিঙে এই রেজোল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইয়াছে। নন-অফিসিয়ালী স্থির হইয়াছে যে পার্টীর জন্ত এই কাজের ভার আমাকে লইতে হইবে। যদি তাহাকে রাজি করিতে পারি—আশা করি পার্টীর নামে পারিব—তাহাকে সঙ্গে লইয়া ২১ তারিখে আমি ফলতাবাড়ী রওনা হইব।

পুনশ্চ কমরেড মিনতি লিখিয়াছে : তাহাদের ফলতাবাড়ী যাইবার প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য বাগানের ওয়ার্কারদের অবস্থা ঠাণ্ডি করা ও তাহাদের মধ্যে কিছু প্রোপাগান্ডা করা। মালিক সাবধান।

সতীন হাসিল। আলিপুর-ডুমাসের ফলতাবাড়ী চা-বাগানের মালিকের কণ্ঠা আসিতেছে বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রোপাগান্ডা করিতে। চমৎকার আইডিয়া! কমরেড মিনতি সেনের উপযুক্ত প্রস্তাব।

পরিবারের সকলের কনিষ্ঠ সন্তান, পিতামাতার আদরের মেয়ে। আদরের আধিক্যে স্বভাব ও ক্ষুদ্র মস্তকটি বেশ বিগড়াইয়াছে। স্কুলে পড়িবার সময় হইতে কমিউনিজম তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। চৌদ্দ বছর বয়সে সে ক্লাস-ওয়ান,

বুর্জোয়া, প্রোলেটারিয়েট প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিত। বাবা ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিতেন। —তারপর ছোটমা, তোমার ক্লাস-ওয়ার কেমন এগুচ্ছে?

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মত সে ক্লাস-ওয়ারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস্ কি বলিয়াছেন মুখস্থ বলিয়া যাইত। কি ব্যাপার! অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার পার্থ্য পুস্তকের শেলফের মধ্যে পাওয়া গেল কমিউনিজম-মেড-ইজি, সাম্যবাদী লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা ছই পয়সা মাত্র। প্রথমে সচিত্র জীবনী কার্ল মার্কস্, কমরেড লেনিন ও কমরেড ষ্ট্যালিনের। তারপর প্রবোন্ধরের আকারে কমিউনিষ্ট মতবাদের পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যা। মিনতি এই ৫৫+১০ অর্থাৎ ৭১ পাতার বইখানি ঝাড়া মুখস্থ করিয়াছিল। যখন তখন তাহার কমিউনিষ্ট বক্তৃতার করকাপাতে বাড়ীর লোকের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িত।

তারপর জুল ছাড়িয়া মিনতি কলেজে পড়িতে গেল। পার্টের সভ্য হইল। পার্টের কাজে সে গাড়ী লইয়া বাহির হইলে আর কাহারও সেদিন গাড়ী পাইবার উপায় থাকিত না। ফিরিতে সন্ধ্যা, কখনও বেশ রাত হইতে লাগিল। বাবা একদিন ডাকিয়া আড়ালে কি উপদেশ দিলেন, সোফারকে ডাকিয়া কড়া আদেশ দিলেন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিতে হইবে।

তারপর হইতে তাহাদের বাড়ীতে কমরেডদের যাতায়াত আরম্ভ হইল।

—শুধু কি ব্যস্ত আছেন?

সতীনের চিন্তাচ্ছন্ন, নিষ্পন্দ ভাব কাটিয়া গেল। সে দেখিল বাগানের নূতন ইলেকট্রিক কন্ট্রাক্টর নির্মল, তাহার হাতে একটি গোলাপের তোড়া।

এই ছোকরা কন্ট্রাক্টরটি তাহার প্রিয়পাত্র। নূতন কন্ট্রাক্ট করিবার সময়ে আগেকার পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরকে ছাড়াইয়া ইহাকে সে কাজ দিয়াছে।

—এস, এস। এত গোলাপ কোথা থেকে যোগাড় করলে হে?

—আমার বাগানের শুর। সেদিন আমাদের কোয়ার্টারের স্নমুখ দিগে যেতে যেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার বাগান দেখছিলেন খবর পেয়েছি। নতুন-লাগানো পাঁচটা গাছে ফুল দিয়েছে,—তিনটে গী-রোজ, দুটো হাইব্রিড গী। কত বড় ফুল দেখেছেন?

নির্মলের হাত হইতে তোড়াটি লইয়া সতীন সপ্রশংসা দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।—এটা কি ব্ল্যাক প্রিন্স? সে জিজ্ঞাসা করিল।

—না শুর, ইতোয়াল ড ফ্রাঁস, কি রং দেখুন। কে বলবে গী-রোজ?

বাহাদুর বারান্দায় চা লইয়া আসিয়াছিল। তাহার হাতে

তোড়াটা দিয়া কন্ট্রাক্টর বাবুর জুজ চা আনিহত বলিল। নির্মল চা খাইয়া বিদায় লইবার সময় সতীন বলিল—আমার ছই একজন গেষ্ট আসছেন পরশু। তাঁরা বাগানের কাজ দেখবেন। যাবার পথে একবার ওভারসিয়ার বাবুকে ডেকে দিও।

মিনতি কলেজে ভর্তি হইবার পর হইতে তাহাদের বাড়ীতে কমিউনিষ্ট বন্ধুদের যাতায়াত আরম্ভ হইল। ঢাকাই জামদানী শাড়ী-পর। কমরেড, বেনারসী ক্রেপের শাড়ী-পর। কমরেড, বরোদার পাড় জর্জেট শাড়ী-পর। কমরেড বাড়ীর গাড়ীতে চড়িয়া আসিতে লাগিল। চটকলের শ্রমিক, কাপড়ের কলের শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক, গ্যাসকোম্পানীর শ্রমিক, বিজলী কোম্পানীর শ্রমিকদের মালিক কর্তৃক নির্মম শোষণের প্রতিকার করিবার সঙ্কল্প তাহাদের সুরমা মাথা চোখে, লিপ্ত-রঞ্জিত ওঠে পরিস্ফুট। জমিদার ও মহাজনের নির্দয় শোষণের বিরুদ্ধে সর্বস্বার্থ চাষীদের সংঘবদ্ধ করিবার অটল প্রতিজ্ঞা তাহাদের ভ্যানিশিং স্নো-মার্জিত মস্তণ ললাটে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই এই কমরেডদিগের সভা বসিত দোতলার দক্ষিণ-দিকের বারান্দায়। নানাপ্রকার স্বরের বক্তৃতা-কাকলীতে বাড়ীখানি মুখরিত হইত। বক্তৃতার যতটুকু কানে আসিত তাহাতে মনে হইত সকলেই সেই কমিউনিজম-মেড-ইজির মুখস্থ বিদ্যার পরিচয় দিতেছে। পার্টের মিটিং শেষ হইলে রিলাক্সেশন। তাহাতেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যাডমিণ্টন, টেবিল-টেনিস, ক্যারম, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, গালগল্প, ভাঙুটাইচ, কেক, চা।

বছরখানেক বাদে কমরেড দলের মধ্যে কয়েকটি চেনা মুখ অদৃশ্য হইল, বোধ হয় পরিণয়-ঘবনিকার অন্তরালে; কয়েকটি নূতন মুখ আবির্ভূত হইল। মিনতি ষাউ-ইয়ারে ভর্তি হইবার পর হইতে আবার তাহার বাড়ী ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল।

সতীন চেয়ার হইতে উঠিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। ডিম্মাখোল পাহাড়ের মাথা উপকাইয়া স্বর্ষের আলো থাকে থাকে সাকানো চা-গাছগুলির উপরের খন কুয়াশাছালের আড়ালে আগাইতে আগাইতে হঠাৎ ফলতাবাড়ী বাগানের গেষ্ট-হাউসের বারান্দায় শত ধারায় বিকীর্ণ হইয়া বরিয়া পড়িল। এ যেন স্বর্ষের আলোর খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ। সতীনের এই জিনিষটা খুব নূতন মনে হইল। ক্ষণভাবে নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ তুলিয়া ডিম্মাখোলের দিকে চাহিল। ডিম্মাখোলের দেহে সবুজ চা-গাছের সাড়ি আলোতে ঝলমল করিতেছে। দিকে দিকে নরম, তাপহীন আলোর সঞ্চরণ। দেহের যেদ-মাংসের আবরণী ভেদ করিয়া এই নরম, তাপহীন আলোর একটু ঝলক সতীনের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মিনতির সঙ্গে একদিন আসিল এক নূতন কমরেড, উমা দত্ত তাহার নাম।

হাঁ, উষাই বটে। শুভবর্ণা, শুভবসনা তবী উষাদেবী—স্বয়ম্বী মূর্তি। যন অন্ধকারের পরিবেশে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা। ওঠের বিন্যাসে ও ক্ষুদ্র চিবুকটির গড়নে একটু বিশেষত্ব ছিল, পশ্চিম-উপকূলের কোঙ্কণী বা মালাবারী ধাঁচ।

প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার চারি পাশে একটা ছায়ার পরি-মণ্ডল। চলনে বলনে ঈষৎ গাভীরের বাধ। উষা আসিল, কোণাও কি সাড়া পড়িয়াছিল তাহার আবির্ভাবে? কিন্তু সে ত কেবল উষা নয়, সে কমরেড উষা দত্ত, কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। তাহার সঙ্গী আবার বুজোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি সতীন সেন নয়, তাহার সঙ্গী কমরেড ভেক্টরাপ্পা, কমরেড তেলাঙ্গর, কমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল—প্যামফ্লেট, পোষ্টার, স্লোগানে যাহারা সর্বস্বার্থের জন্ত স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করিতেছে। সতীনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, ব্যঙ্গের হাসি নয়, অহংকার হাসি নয়, অদ্ভুত হাসি।

কমরেডী জনযুদ্ধ নাটকের কয়েকটা দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে দ্রুত ভাসিয়া উঠিল। সেই স্লোগান—“জাপানকে রুখিতে হবে।” তারপর ধামিয়া—“হাতিয়ার চাই।” এ হাতিয়ারটা কাহার বিরুদ্ধে কাজে লাগিবে? জাপানের?

সতীন পায়চারি ধামাইয়া পথের দিকে চাহিল। বাগানের শ্রমিক মেয়েরা পিঠে বুড়ি বাঁধিয়া ছোট ছোট দলে বাগানের দিকে চলিয়াছে। প্লাকিং সিঁজন আর কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হইবে। অনেকগুলি দল চলিয়াছে। বেশীর ভাগ ছোট-নাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁ মেয়ে, নিকষ কালো, নিটোল স্বাস্থ্য, উজ্জল হাসি। যাহারা পিঠে বুড়ির পাশে পুঁটুলীতে ছেলে বাঁধিয়া বুলাইয়া লইয়া যাইতেছে খোঁপায় তাহারাও ফুল গুজিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই-একটি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীদের মেয়ের দল, ময়লা পীত বর্ণ, তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য, তেমনি উজ্জল হাসি। এরাও ফুলের ভক্ত। গল্পে, হাসিতে, লীলায়িত পদক্ষেপে অল্প পথচারীদের উপেক্ষা করিয়া মেয়েরা বাগানের পথে চলিয়াছে।

দূরে ফলতাবাড়ী বাগানের ম্যানেজার আসিতেছেন দেখা গেল, হাতে কাগজপত্রের বাঁড়িল। সতীন অত্মমনস্ক ভাবে সে দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে বসিল।

প্রৌঢ় বয়স্ক বাঙালী ম্যানেজার, অল্প তাম্বী, যুঁহু ভাষী, পাকা কাজের লোক। নমস্কার করিয়া দুই-চারিটা কথা পর তিনি ডেলি রিটার্ণ ছোট সাহেবের হাতে দিলেন, তাহা দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়া সহি করিয়া দিতে হইবে কলিকাতায় সাহেবের কাছে পাঠাইবার জন্ত। রিটার্ণ দেখিয়া সতীন মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তার পর রিটার্ণ দেখা শেষ হইলে সহি করিয়া ফুরত দিয়া ডাক্তারখানার এক্শর্টেনশন সহজে প্রশ্ন করিল। কতকগুলি যন্ত্রপাতি আনিয়া লেবরেটরীর কাজ আরম্ভ করা হইবে। মাল আসিবার দেরিতে কাজ শুরু করা

যায় নাই। সাহেব কোম্পানীকে একটা তাগিদ দিতে বলিয়া সতীন বলিল—আমার বোন ও তার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে দুই-তিন দিনের মধ্যে। দুইটি আয়ার খোঁজ করবেন, আর ছোট গাড়ীটা আগের দিন জলপাইগুড়ি পাঠাতে হবে। ঠিক সময়ে আমি আপনাকে জানাবো।

ম্যানেজার নমস্কার করিয়া কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সতীন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর বাহাদুর, বাহাদুর বলিয়া ডাকিল। তাহার মাধ্যম হঠাৎ একটা গ্ল্যান আসিয়াছে।

বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা ঠাণ্ডি করিতে দুই কমরেড আসিতেছেন। মালিককে সাবধান করিয়াছেন। মালিকের উচিত এই ইঙ্গিতের মর্ম গ্রহণ করা। তাহাই হউক। টোকনিয়া ও ঝাঝাবাড়ী বাগানের কাজ দেখিয়া তাহার কলিকাতা ফিরিবার কথা। কি পরিমাণ মাল তিনটা বাগান হইতে সংগ্রহ হইতে পারে বুঝিয়া কণ্ট্রোল করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে চাপাচাপি করিয়া মোট উৎপন্ন মালের পরিমাণ কিছু উঠানো দরকার হইতে পারে। কমরেডরা পৌঁছিলেই সে টোকনিয়া রওনা হইবে, সেই দিনই। টোকনিয়া তিন দিন, সেখান হইতে ঝাঝাবাড়ী তিন দিন। তার পর ফলতাবাড়ী ফিরিয়া ডিয়াকোলের ওপারে ঝিকপানির জঙ্গলে এক দিন ঘুরিয়া আসিবে। শিকারীর স্বর্গ ঝিকপানির জঙ্গল, তিব্বতের সীমানায়। তার পর সটান কলিকাতায়। এরা ম্যানেজারের চোখের সামনে প্রোপাগান্ডা করুক কয়েকদিন।

বাহাদুর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে বলিল—ম্যানেজার সাহেবকে বলো কাল দুপুরে সাইকেল-পিয়ন আমার চিঠি নিয়ে টোকনিয়া বাগানে যাবে। তিনি যেন বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

বাহাদুর চলিয়া গেল। সতীনের ঈষৎ উত্তেজিত ভাব এতক্ষণে শান্ত হইয়া আসিল। সিগারেট-কেসটা হাতে লইয়া সে বাংলোর বারান্দার সঙ্গে লাগানো কাঠের সিঁড়ির তিনটা ধাপ নামিয়া সম্মুখের সিমেন্ট-বাঁধানো গোল চাতালে আসিল। পায়ের ও মরশুমী ফুলের টবে সাজানো চাতাল, মাঝখানে খানকয়েক বেতের চেয়ার ও টপয়। চাতালটি মাটি হইতে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া টেনিস-গ্রাউন্ডের পাশ দিয়া বাংলোর দক্ষিণের বাগানের পথে সে অগ্রসর হইল।

কাঁটাতারের ও মেদীগাছের বেড়ায় ঢাকা বেশ, বড় বাগান। প্রবেশ করিতেই ব্যাডমিণ্টন মাঠ। কলোনীর মেয়েরা এখানে খেলেন। তার পর ফুল ও ফলের গাছ। মাঝখানে একটা উচ্চ বেদীর উপর ফলতাবাড়ী বাগানের প্রতিষ্ঠাতা সতীনের পিতামহের উপবিষ্ট মর্মর মূর্তি। আর একটু আগাইয়া গেলে জঙ্গলাকীর্ণ নিম্নভূমি দেখা যায়। বাগানের পাশ হইতে এই দিকটা বাঁড়া নামিয়া গিয়াছে। দূরে

জঙ্গলের কঁকে কঁকে কলা ও বাঁশ গাছের ঝোপের মধ্যে ছোট ছোট খড়ো ঘর দেখা যায়।

বাগানের এই দিকটাতে আসিয়া একটা কাঠের বেঞ্চের উপর বসিয়া সে সিগারেট ধরাইল। নীচের জঙ্গল ও বগীচুলির পশ্চাতে দূরে ডিয়াকোল পাহাড়ের একাংশ দেখা যাইতেছে। যেন একটা প্রকাণ্ড ঈগল পাখী তাহার যোজন-বাগী দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমানা আটকাইয়া পড়িয়া আছে।

ছিন্ন চিত্তার মূহুর্তি আবার জোড়া লাগিতে লাগিল।

কমরেড ডেফটাপ্লা, কমরেড উ পো, কমরেড তেলাঙ্কর, কমরেড উষা দত্ত। কমরেড রবি পালের পিতা সাপ্লাই বিভাগের বড় চাকুরীয়া। তিনি লীগভক্ত, কোয়ালিশনবাদী। ছেলে বাউড়িয়ার চটকলের গোলমালের পর কখনো কমিউনিষ্ট কখনো কংগ্রেস-মাইণ্ডেড কমিউনিষ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। দক্ষিণী, বর্মী ও মারাঠী কমরেড আন্তর্জাতিক একিলিয়েশন বা সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তি।

কমরেড উষা দত্ত কর্মঠতায় অবাঙালী। তাহার ওঠের বিশ্বাস ও চিবুকের গঠন কোকালী বা মালাবারী মেয়ের মত। তাহাকে চিংপাবন, কুলু বা মলয়ালী মেয়ে বলিয়া লোকে ভুল করিতে পারে। মেয়েটির সব সময়ের অমুক্তোজিত ভঙ্গীটিও আশ্চর্য। কথায় উত্তেজনা নাই, ব্যবহারে উত্তেজনা নাই, মনের টেম্পারেচারও বোধ হয় সর্বদা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে।

সতীন সিগারেট ফেলিয়া দিয়া নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। এই বাঙালিনী বেশী সাব-আর্টিক জগতের মেয়েটির পিছনে সে একটা বৎসর ঘুরিয়াছে তাহার কমরেড ভগ্নীর বহুস্তার শিলা-বৃষ্টি মাধায় করিয়া। র্যাক মার্কেটে পেট্রোল কিনিয়া জগদল হইতে বাউড়িয়া, বাউড়িয়া হইতে বাটানগর, বাটানগর হইতে বিদ্যাপুর সারাদিন গাড়ী দৌড় করাইয়াছে কমরেডদের বহন করিয়া।

সেবার ইলেকশনের সময় বজ্রবজ্র হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছু দূর আসিতেই সামনে এক দল লোক দাঁড়াইয়া গাড়ী আটকাইয়া দিল। তার পর “মার” “মার” শব্দে গাড়ীর উপর ইট-পাটকেল বৃষ্টি। একখানা ঢিল কপালে লাগিয়া সতীনের কপাল কাটয়া গেল। মিনতি পুলিশ, পুলিশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কে যেন চিংকার করিয়া বলিল—ভাই সব, এটা কংগ্রেস সেবকদের গাড়ী। আমাদের ভুল হয়েছে। এই দেখ বনেটে জাতীয় পতাকা ছিল, ঢিল লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

একজন লোক পকেট হইতে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালাইয়া দেখিল বাস্তবিক সের্টী জাতীয় পতাকা। ঐ আলোতে দেখা গেল জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়াইয়া কমরেড রবি পাল। কোন্ কঁাকে সে গাড়ী হইতে নামিয়া ভীতু মিশিয়াছিল সতীন জানে না।

গাড়ীতে কংগ্রেস সেবিকারা রয়েছেন। আমি তাঁদের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আনছি। বলো কংগ্রেস জিন্দাবাদ! কমিউনিজম বরবাদ!

জনতা স্লোগান দিল—কংগ্রেস জিন্দাবাদ! কমিউনিজম বরবাদ!

কমরেড রবি পাল আসিয়া সতীনের পাশে বসিল, সে গাড়ী চালাইয়া দিল।

এই ব্যাপারের পর হইতে পার্টি সার্কেলে কমরেড রবি পাল সম্বন্ধে কাণাবুঝা উঠিল সে কংগ্রেস-স্পাই।

এক বছর এই ভাবে পার্টির মেম্বারদের সেবা করিয়াও সতীন কমরেড উষা দত্তের ব্যবহারে এমন কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইল না তাহার উপর নির্ভর করিয়া সে আর এক ধাপ আগাইতে পারে। অবশু পার্টি সার্কেলে ও পরিবারের মধ্যে তাহার এই তপশ্চরণের হেতু অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল এবং ইহা লইয়া কথাবাতাও শুনা যাইত। তাহার নাম হইয়াছিল কমিউনিষ্ট-মাইণ্ডেড অপার বুর্জোয়া। এই অপারভেন্টিকে জ্বাতে তুলিবার ইঙ্গিত কমরেড দলের আর কেহ না হউক কমরেড মিনতি কমরেড উষা দত্তকে অনেক বার দিতে ভুলে নাই কিন্তু তাহার প্রত্যাচারিণীর নিরাসক্ত ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সতীনের অবশেষে ধারণা হইল যে পার্টির খাতায় নাম লিখাইলেও কমরেড ডেফটাপ্লা, কমরেড তেলাঙ্কর প্রভৃতির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতির কমরেড হাজির থাকিতে তাহার কোন প্রসপেক্ট নাই, গল্পের সার্কাস পার্টির গাধার ঘেঁটু ছিল তাহাও নাই। তাহার পার্টির খাতায় নাম লিখাইবার বাস্তবিক কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহারে সে বুর্জোয়া, অপরিবর্তনীয় রূপে বুর্জোয়া, যদিও তাহার ভগ্নী অর্থোডক্স কমিউনিষ্ট বলিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সতীন কমরেড দলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ছাড়িল। সে আত্ম ছয় মাসের কথা। ভাবিয়াছিল কলিকাতা ছাড়িবার আগে কমরেড উষা দত্তের মন বুঝিবার জন্ত একবার শেষ চেষ্টা করিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ উত্তম ত্যাগ করিয়াছিল। রূপের নেশা। সে প্রতিজ্ঞা করিল দুই মাস কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করিয়া সে এ নেশা জয় করিবে। ‘এণ্ড নাই হি ইজ হিঙ্গ ওল্ড শেলফ’। ডেফটাপ্লা মরিয়া গিয়াছে। উরাল পর্বতের পশ্চিমের কমিউনিষ্টদের স্বর্গধামে তাহার আত্মার প্রয়াণ হউক। কমরেড তেলাঙ্কর, কমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল সান্ত্বনা দিবার জন্ত বর্তমান আছেন।

সতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভারিল বারকয়েক ডনবৈঠক দিয়া শরীর ও মন একটু চাঙ্গা করিয়া লইবে। সে নিজের মনে হাসিয়া ফেলিল। ছোট সাহেব ছপূরবেলা ব্যুগানে ডন-বৈঠক করিতেছেন এ দৃশ্য দেখিলে ছোট সাহেবের সলিড প্রেক্ষিজ গুলি লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। সে কয়েক পা আগাইয়া

গিয়া ছুই হাতে কতকগুলি কজমস ফুলের লগা শুছ টানিয়া ছিঁড়িল। সেগুলি বগলে চাপিয়া আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া গেট-হাউসের পথ ধরিল।

মধ্য-এশিয়ার তাসখন্দ অভিযান হইতে প্রত্যগতা কমরেড উষা দত্তের আলিপুর ডুয়াসে অভিযান। কি মতলবখানা তোমাদের ছুই কমরেডের? কলিকাতার ইনডাস্ট্রিয়াল এলাকা, সুন্দরবনের সংগ্রাহণীল লাট ছাড়িয়া ডুয়াসে কমিউনিষ্ট প্রোপাগান্ডা করিবে? এত যুরোপীয় বাগান থাকিতে ফলতাবাড়ী বাগানে কেন? চা ব্যবসারে দেশী লোক যেতুই দাঁত বসাইয়াছে তাহাও অসহ্য? যাইবার সময়ে ম্যানেজারকে ছুই-একটা উপদেশ দিয়া যাইতে হইবে। মালিকের মেয়ের সুযোগ-সুবিধা কমিউনিষ্ট প্রোপাগান্ডার কাছে ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু এরা তাহাই চায়। ব্যানার্জি জমিদারের ছেলে মহালে গিয়া ভূস্বামীর প্রোপ্য নজর পকেট করিবে আবার আড়ালে জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করিবে। মজুমদার-পরিবারের মেয়ে বাপের পরসার কারপোতে কমরেড ছোকরাদের লইয়া লাক খাইবে, গ্রেট ব্রিটেনে নাচিবে আবার বাপের কারখানায় গিয়া মজুমদারের মধ্যে প্রোপাগান্ডা করিবে। ইহাদের কমিউনিজম এই প্রকারের। 'হাউএভার, দে আর ওয়েলকাম হিয়ার'।

পরের দিন জলপাইগুড়ি গাড়ী রওনা করিয়া দিয়া বাহাদুরকে নির্দেশ দিল মল্লিক সাহেবের বাড়ীতে রাত্রি থাকিবে। সকালে শ্রেশন হইতে দ্বিদিগদিদের আনিয়া সেখানে স্নানাহার সারিয়া বারোটার মধ্যে গাড়ী ছাড়িবে যাহাতে চারটার মধ্যে ফলতাবাড়ী পৌছায়। সন্ধ্যাবেলা তাহাকে টোকনিয়া বাগানে যাইতে হইবে।

তার পরের দিন। বেলা যত গড়াইয়া আসিতে লাগিল সতীনের মানসিক চাকল্য তত বাড়িতে লাগিল। ফলতাবাড়ীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে কমরেড উষা দত্তের মত অতিথিকে লইয়া সে সহজ ভাবে চলিতে পারিবে কিনা, নিষ্পৃহ ও দাঁদাণী ও অশোভন আগ্রহের মধ্যে মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা এই চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। একবার ভাবিল তখনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেটা হইবে প্রত্যক্ষ অভ্যস্ত। * তারপর তাহার নিজের ভগ্নী আসিতেছে।

ম্যানেজারকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া, আনিয়া বলিল সে একটু বাহিরে যাইতেছে, সন্ধ্যার আগে কিরিবে, ইহার মধ্যে মিনতিরা আসিয়া পড়িলে তিনি যেন সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। বলিল না যে পথের মধ্যে মিনতিদের ধরিবার উদ্দেশ্যে সে যাইতেছে।

বাগানের বড় গাড়ীখানা আসিয়া গেট-হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইল। কয়েকটা বাস্কেট ও দুইটা বন্দুক উহাতে উঠিল। কণ্ঠাঙ্কুর নির্মলের কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী থামাইয়া ডাকিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া সতীন বাড়ীকাটা পাহাড়ের দিকে গাড়ী চালাইল। বাড়ীকাটা পার হইয়া রাস্তা প্রধান রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে, এক প্রান্ত গিয়াছে তিন্তাঘাটমুখে, অল্প প্রান্ত ঘুরিয়া কিরিয়া আসাম ডুয়াসের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে।

প্রকাণ্ড সিডান-বডির ডঙ্ক গাড়ী, উঁচুনীচু রাস্তায় তুলিয়া তুলিয়া নিঃশব্দে ছুটয়া চলিল। বাড়ীকাটা পাহাড়ের একটা দিক বেশ ঢালু, গড়াইয়া গড়াইয়া নামিয়াছে। রাস্তার বাম দিকে বুনো ফুল ও নানা রকম ছোট গাছের অসংখ্য ঝোপ, একটানা নয়, কঁক কঁক। ধরগোস ও প্যাটিজের আড্ডা।

ঘটাখানেকের মধ্যে গাড়ী আসিয়া এখানে পৌঁছিলে সতীন গাড়ীখানা রাস্তা হইতে ঝোপ-জঙ্গলের দিকে খানিকটা সরাইয়া আনিল। তারপর ছুই বন্দুক লইয়া ছুই জন গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল।

সতীন নির্মলকে বলিল—তোমার হাত কতটা ঠিক হয়েছে পরীক্ষা দিতে হবে আজ। এক ডজন পুরাতন না পারলে রাস্তার তোমাকে ফেলে রেখে যাব।

নির্মল হাসিল।

ছুই জন ছুই দিক হইতে এক একটা ঝোপ পরীক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ধরগোস ও তিতির কোম্পানী কি আজ দূরবর্তী কোন জায়গায় মিটিং করিতে গিয়াছে? অথবা বেতারে আততায়ী-যুগলের আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া ট্রেকে আশ্রয় লইয়াছে? সতর্ক ভাবে আগাইতে আগাইতে ছুই শিকারী বহুদূর চলিয়া গেল। আর খানিকটা আগে পাহাড়ের ঢাল খাড়া নামিয়া নালায় পড়িয়াছে। বৃষ্টির জল নামিবার পথ। ঢালের মাধ্যম একটা ঝোপ হঠাৎ নড়িয়া উঠিল। ছুই শিকারী বন্দুক তুলিবার আগেই এক ছোড়া বন্য মোরগ ঝোপ হইতে বাহির হইয়া নালায় দিকে ছুটিল বিদ্যুতের গতিতে। পিছনের মোরগটি আগে যাইবার জন্য নীচুতে উড়িল। সতীন সেইটিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। পাখার ও পাঁজরায় হররা লাগিয়া সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্যটি উড়িয়া নালায় মধ্যে নামিয়া অদৃশ্য হইল। নির্মলের আর বন্দুক ছুড়িবার অবকাশ হইল না। সে উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—সুত্র, মোটরে কে হর্ন দিচ্ছে।

—তুমি এগিয়ে দেখ ত কি ব্যাপার। আমি এটিকে সংগ্রহ করে আসছি।

নির্মল দ্রুত পদে আগাইয়া গেল। দূরে রাস্তায় একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হর্ন দিতেছে। আর একটু আগাইয়া যাইতে সে বাগানের গাড়ী চিনিতে পারিল। সে বুকিতে পারিল তাহাদের গাড়ীখানা দেখিতে পাইয়া বাহাদুর হর্ন দিয়া তাহাদের ডাকিতেছে। সে সতীনের জন্য দাঁড়াইল।

মোরগটাকে বা হাতে তুলিয়া সিগারেট মুখে সতীন আসিতেছিল। মোরগটি তখনও মরে নাই, সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত করিয়া এক-এক বার ঝাপটাইতেছিল। যেমন বিদ্যুতের মত গতি তেমন শক্ত প্রাণ এই বন্য মোরগের। নির্মলের কাছে আসিয়া সে বলিল—তুমি এগিয়ে যাও, মিনতিরা এসে গেছে মনে হচ্ছে।

নির্মলকে লক্ষ্য পাইয়াছিল। সে যুহু আপত্তি করিয়া বলিল—আমি ত অপরিচিত। আপনিও অস্বন্দ।

—একেবারে রাশিং গার্ল। বলিয়া সতীন হাসিল।—

ভূমি এটাকে ধর দিকি। সাবধান, এখনও আঁচড়াতে চেষ্টা করছে।

নির্মল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পাখীর ছই পা বাঁধিল। তারপর পাখীটাকে নির্ভয়ে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। সতীনের হাত ছই-এক জায়গায় ছড়িয়া গিয়াছিল।

তাহারা ছই জন কাছে আসিতে বাহাদুর ও মিনতি গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি গাড়ীর মধ্যে ছিল যতীন দেখিতে পাইল।

নির্মল বন্দুক ও পাখী মাটিতে রাখিয়া মাথা নোয়াইয়া মিনতিকে নমস্কার করিল। সতীন মিনতির পিঠে এক ধাবড়া মারিয়া বলিল, ওয়েলকম কমরেড মিনতি। তার পর—

সে গাড়ীর মধ্যে দৃষ্ট নিক্ষেপ করিল। নত মুখে উষা বসিয়া আছে। মিনতি চোখের ইসারা করিল। সতীন সিগারেট ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে গাড়ীর কাছে গিয়া এক হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, মোষ্ট ওয়েলকম মিস দত্ত। নেমে আসুন।

উষার মুখে অতি যত্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। সতীন এক পা সরিয়া দাঁড়াইল। উষা গাড়ীর ফুটবোর্ডে এক পা রাখিতেই সে উষার ডান হাতখানি মুঠির মধ্যে ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইল। মুখে বলিল, একস্মিকিউজ মাই বুর্জোয়া ম্যানারস্, কমরেড দত্ত।

নির্মলের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় করিয়া দিয়া সতীন বাহাদুরকে বলিল—তাহার গাড়ী লইয়া বাগানে চলিয়া যাইতে। সে ইহাদের লইয়া একটু পরে যাইতেছে। সাতটায় টোকনিয়া রওনা হইতে হইবে ম্যানেজার সাহেবকে জানাইবে।

বাহাদুর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নির্মল ও সতীন বড় গাড়ী হইতে ঝুড়িগুলি নামাইয়া আনিল। সেগুলির মধ্য হইতে বাহির হইল একটা বড় ধামোলাক্সে চা, ক্রিম-ক্র্যাকারের বাস্ক, বিস্কুটের বাস্ক ভর্তি সন্দেশ, পেয়ালা, পিরিচ, ডিস ইত্যাদি।

সম্মিলিত কমরেড-যুগলের অল্প লাইট রিফ্লেক্সমেণ্টের আয়োজন, সতীন হাসিয়া বলিল—নির্মল ডিসগুলো সাজিয়ে চা ঢালো, আমাকে আগে দেবে, শিকারের পরিশ্রমে বর্মজ-কলেবর হয়েছে কি না? ভূমিতে শায়িত মোরগটার দিকে তর্জনী হেলাইয়া সে মিনতির দিকে মুখ বাকাইয়া এই মন্তব্য করিয়াই হাসিয়া উঠিল।

মিনতি হাসিল, উষা মুখটা একটু ঘুরাইল, হাসিল কি না জানা গেল না। নূতন পরিবেশে সতীনের চরিত্রের এই নূতন রূপের প্রকাশ কি তাহাকে বিস্মিত করিয়াছিল?

বিরত নির্মল চা ঢালিতে গিয়া খানিকটা চা মাটিতে ফেলিয়া দিল।

তোমার ভাগ ঐ গেল নির্মল, আর পাবে না, সতীন বলিয়া উঠিল—এখন হাঁ করে এদের মুখের দিকে চেয়ে থাকো বিস্কুটের ছই একটা টুকরো যদি ফেলে দেন।

মিনতি প্রতিবাদ করিয়া নির্মলকে আশ্বাস দিল। বলিল—আপনি ছাড়ুন, আমরা শুধিয়ে দিচ্ছি।

সে উষাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল—ডিসগুলো সাজা দেখি।

একলাফে বিস্কুটের বাস্ক ছইট লইয়া সতীন সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আপনারা কমরেড-যুগল আমাদের অতিথি। আপনারা দয়া করে পা মেলে আরাম করে বসুন, আমরা সার্ভ করছি।

দ্রুত হাতে একটু ডিস ভরতি করিয়া উষার দিকে ধরিল—‘হিয়ার ইউ আর কমরেড দত্ত’। উষা বিনাবাক্যে ‘ডিসটা’ লইল। না একটু চকিত চাউনী, না একটুখানি মোলায়েম ধ্যাক্স। সতীনের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সে ছইখানি বিস্কুট মিনতির কোলের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিল, ভূমি আর চেয়ো না, অনেক দেওয়া হয়েছে কমরেড মিনতি।

উষার মুখে এবার হাসি দেখা গেল, বেশ স্পষ্ট হাসি সতীন দেখিল। গন্তীর ভাবে সে বলিল, ধ্যাক্স কমরেড দত্ত, আমরা এটা নোট ক’রে রাখবো।

ইহার পর অল্প ডিসগুলি সাজাইয়া সে মিনতি ও নির্মলকে দিল, নিজেও একটা লইল।

প্রায় ষষ্ঠাধানেক পরে সে তাড়াইয়া সকলকে গাড়ীতে উঠাইল। বলিল, আমার মাত্র ষষ্ঠাধানেক সময় হাতে থাকবে। আর দেরি নয়।

গাড়ী ফলতাবাড়ী মুখে ছুটিল।

পঞ্চ মিনতি একবার জিজ্ঞাসা করিল—পৌছে মাত্র এক ষষ্ঠা সময় তোমার হাতে থাকবে বললে, এর মানে কি?

সতীন/বলিল—পরে শুনো।

কমরেডদ্বয়ের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার মনে কি ঈষৎ সংশয়ের উদয় হইতেছিল? উষা বরাবর কম কথা বলে কিন্তু তাহাকে কি কেমন যেন একটু নরম নরম মনে হইতেছে? তুলা অঞ্চল কি দক্ষিণে সরিয়া আসিতেছে অথবা কমরেড ভেক্টাপ্লার শোক? মরুগণে এ সব চিন্তা। কাদাল-পনা সে যথেষ্ট দেখাইয়াছে, আর নয়। সে সোজা হইয়া বসিয়া গাড়ীতে স্পীড বাড়াইয়া দিল।

ফলতাবাড়ী পৌছিয়া পরিচয়ের প্লালা সারিয়া হাত-মুখ ধুইয়া তাহারা বাংলোর সম্মুখে চাতালে আসিয়া বসিল। সম্মুখে ডিয়াকোল পাহাড়ের মাথায় অন্তর্গামী স্তরের রক্তিম আভা থাকে-থাকে-সাজানো চা-গাছগুলির উপর মায়াজাল বিছাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে সূর্যাসার ছোট ছোট কুণ্ডলী পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাগানের কাজ অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে। নবাগতা ছই জন বিস্মিতভাবে এই শুষ্ক স্নানায়মান দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল।

ম্যানেজার বাবু প্রচুর জলযোগের আয়োজন করিয়া ছিলেন। সতীন ছাড়া আর কেহ বিশেষ কিছু খাইল না। সতীন একটি প্লেট উঠাইয়া লইয়া ধরের মধ্যে গেল, ইন্দ্রিতে মিনতিকে অনুসরণ করিতে বলিয়া।

মিনতি আসিলে তাহাকে বলিল—তোমাদের হৃৎকনের জন্ত পাকা বন্দোবস্ত করা হয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না।

রাতের দু'জন আয়া তোমাদের কাছে থাকবে, তা ছাড়া বড়ো বাহাদুর ও আর একজন বিশ্বস্ত লোক পাশের কামরায় থাকবে। ম্যানেজারবাবুকে বললে তিনি তোমাদের ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা করে দেবেন। যেমন ইচ্ছা প্রোপাগান্ডা করে বেড়াও কয়েক দিন। আমি আশ ঘটান মধ্য টোকনিয়া বাগানে রওনা হব, সেখানে কাজ আছে। টোকনিয়া থেকে ঝাঁঝাড়া। কাজ শেষে ফিরতে ছয় দিন লাগবে। তোমার সঙ্গিনীকে বুঝিয়ে বলো। এ বাগানে তুমি তার হোস্টেস, আমার অস্থায়ী স্থিতিতে কিছু এসে যাবে না।

মিনতির মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঠোট কামড়াইয়া চাপা স্বরে বলিল—ইউ আর এ ফুল, নিরেট গাধা।

সতীন হাসিল। বলিল—সম্ভবতঃ তাই। অতের কথা কি আমার নিজেরও সেই রকম সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু তুমি কি করতে বল আমাকে?

—কিছু করতে বলি না তোমাকে। মিনতি রাগিয়া বলিল—এর পর ল্যান্ডনেড়ে পা চেটে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য চার পায়ে ছুটবে আমার পিছু পিছু। বনমোরগ পর্বত যার দোড়, সে আর কত উঁচুতে উঠতে পারে?

সতীন চমকিয়া উঠিল। কি ইঙ্গিত করিতেছে মিনতি? মিনতি ঝাঁঝালো কমরেড, মেয়েও যে সে এ রকম ঝাঁঝালো তাহা ত মনে হয় নাই।

—তোমার অতিথির মঙ্গল কামনা করি, এই বলিয়া সতীন শান্তভাবে প্লেট হইতে একটি সিদ্ধাড়া তুলিয়া মিনতির মুখে গুজিয়া দিল এবং নিজের মুখেও একটা পুরিল।

—কমরেড ভেক্টরাগার কি হয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল একটু অকুট করিয়া।

তাসৎকন্ড অভিযান কেঁচে গেল কেন?

—ভেক্টরাগা গাড়ী থেকে পরে গিয়ে মরেছে। সে গাড়ীতে উষা ছাড়া আর কেহ ছিল না। ইচ্ছা হয় এটা ম্যাক্সিমডেন্ট মনে করতে পার, ইচ্ছা হয় অল্প কিছু মনে করতে পার। এ প্রসঙ্গ এখন থাক, যথাসময়ে সব শুনবে। আপাততঃ যা শুনলে তোমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। খেয়ালীপনা করে কাজ নষ্ট করে না—মিনতি একটু অহুসের স্বরে বলিল। ইউ টক্ লাইক এ সেন্সিবল গার্ল, সতীন গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিল। তারপর দ্বিতীয় সিদ্ধাড়া মিনতির মুখে পুরিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে প্লেট খালি হইয়া গেল।

তাহারা চাতালে ফিরিয়া আসিল।

—টোকনিয়া লোক পাঠানো মিছা হয়রানি হ'ল ম্যানেজার বাবু। সে হাসিয়া বলিল।

ম্যানেজার বাবু একটু হাসিলেন।—মায়েরা এই এলেন, এখনই আপনাদের টোকনিয়া যাওয়া ঠিক হ'ত না, তিনি বলিলেন।—কাল সেখানে খবর দেওয়া যাবে।

কথাবার্তার সঙ্গ্য নাশিয়া আসিল। ডিম্বাখালের পাহাড়

অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার দেহের অস্পষ্ট রেখাটি পর্বত মুছিয়া গিয়াছে।

নির্মলকে ইতিমধ্যে গল্পে পাইয়াছিল, ডিম্বাখালের ওপারে ঝিকপানির জঙ্গলে আর একটু রাত হইলে বড় বড় হাতী, রম্যাল বেঙ্গল টাইগার বাহির হইবে সে বলিতেছিল। পথের উপর বাঘ দাঁড়াইয়া, আগুনের ভাটীর মত দুই চোখ জ্বলিতেছে। হঠাৎ হেড-লাইটের উজ্জ্বল আলো মুখের উপর পড়িতে বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিবে কিছুক্ষণ। তার পর ভীষণ গর্জন করিয়া প্রকাণ্ড লাফে জঙ্গলে ঢুকিবে। কখনও দেখা যাইবে মত্ত শিংওয়ালা সঘর গাছের আড়ালে থাকিয়া লম্বা মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাঁতালো প্রকাণ্ড হাতী হেলিয়া-হুলিয়া চলিয়াছে, পিছনে দশ-বিশটা হাতী, বাচ্চা-গুলোর কি দাপাদাপি। অনর্গল সে বকিয়া যাইতেছিল। দুই কমরেড তনয় হইয়া তাহার গল্প শুনিতোছিল।

টোকনিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহাদুর বড় গাড়ী-খানা আনিয়া বাংলোর সম্মুখে দাঁড় করাইল। সাতটা বাজিয়াছে।

মিনতি জিজ্ঞাসুভাবে সতীনের দিকে চাহিল। তারপর এক বার উষার দিকে আবার সতীনের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল। কি ইঙ্গিত সে করিতেছে সতীন যেন বুঝিতে পারিল।

নির্মল তখন উষার দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—যাবেন মিস্ দত্ত ঝিকপানির জঙ্গলে বেড়াতে? মিনতিকেও সেই প্রশ্ন করিল। বলিল—সাত্বে দশটা, এগারোটার মধ্যে ফিরে আসা যাবে।

ম্যানেজার বাবু আপত্তি তুলিলেন—এ'রা বড় ক্লান্ত আছেন। কি ছেলেমানুষি করছ নির্মল?

নির্মল ধমক খাইয়া দমিয়া গেল, আর কথা বলিল না।

সতীন বলিল—আশ ঘটানোদের মধ্যে জোংগা উঠবে। মিনতি, তোমরা যদি বেড়াতে যেতে চাও ত বল। আমার আপত্তি নাই।

মিনতি বলিল তাহারা এমন কিছু ক্লান্ত হয় নাই, যাইবে। সতীন উষার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ দত্ত কি বলেন?

উষা মুখ তুলিয়া সতীনের দিকে চাহিল, তারপর চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—ভাল। ম্যানেজার বাবু এদের ধরে বেঁধে কিছু খাইয়ে দিন। নির্মল, তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে তৈয়ের হও। আমার রাইফেল আর একটা শটগান, গুলির বাজ, বড় কয়েকটা টর্চ সব গাড়ীতে ঠিকমত জুড়ে দাও। কিছু চা নিতে পার।

নির্মলের ভাঙা উৎসাহ জোড়া লাগিল। সে দুই প্লেট খাবার মিনতি ও উষার কাছে আগাইয়া দিয়া একটা সতীনের হাতে দিল। একটু হতভুতঃ করিয়া একটা প্লেট ম্যানেজার

বাবুর দিকে ঠেলিয়া দিল। তিনি হাসিয়া নির্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া মেয়েরা ঘরে প্রবেশ করিল। উষা ঘরে যাইবার সময়ে সতীন তাহার মুখের একটা পাশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল আলোতে। ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে মনে হইল। তুল্লা অঞ্চলে কি তবে অর্ধোদয় হইয়াছে?

ঝাঁঝালো মেয়ে কমরেড মিনতি। ভিতরে চারি জনের জায়গায় সে বসাইল দুই জনকে, নিজে বসিল বাহাদুরের পাশে ভাল 'ভিউ' পাইবে বলিয়া, তাহার অগ্র পাশে বসাইল শর্ট-গানধারী নির্মলকে।

গাড়ী তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়া পীচ-বাধানো রাস্তা দিয়া ডিম্বাখোল পাছাড়ের দিকে ছুটিল।

নির্মল আর মিনতি আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে মিনতি বাহাদুরকে প্রশ্ন করিতেছে। ভিতরের সীটে আলো জ্বইচ-অফ্ করিয়া পাশে রাইফেল রাখিয়া সিগারেট ধরাইয়া সতীন ভাল করিয়া বসিল। উষাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—মিস দত্ত, দোরের একেবারে ধারে বসবেন না, ইট ইচ্ছা রিস্কিক। যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, এদিকে সরে বসুন।

উষা কতটা সরিয়া বসিল অন্ধকারের মধ্যে বুঝা গেল না।

দুই দিকে চা-বাগান, মাঝের রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। এই অন্ধকারেও দুই-একটি লোক পথে চলিতেছে। কাহারও ঘাড়ে কাঠের বোঝা, কাহারও কাঁধে বাঁশের কষ্টির জাঁটি। তাহারা আলো দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া এক পাশে দাঁড়াইতেছে। এক চা-বাগান শেষ হইয়া আর এক চা-বাগানের এলাকা। ক্রমে বাগান শেষ হইতে দুই পাশে জঙ্গল দেখা দিল, পীচের রাস্তা ছাড়িয়া উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা আসিয়া পড়িল, গাড়ীর গতি মন্দ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ছল্লনি বাড়িল।

হঠাৎ নির্মল চীৎকার করিয়া বলিল—যাত্রা অশুভ স্তর, এ দেখুন। মিনতি দেখিল একটা ছোট জন্তু গাড়ীর আগে তীর বেগে ছুটিতেছে। সতীন বলিল—ধরগোস নাকি? তবে হয়েছে।

এই উষা, দেখ, দেখ—মিনতি চোঁচাইয়া বলিল।

উষা কি ভাবিতেছিল। মিনতির ডাকে চমকিয়া উঠিল, বলিল—কি হয়েছে?

ততক্ষণে ধরগোসটি পাশ কাটাইয়া পাশের জঙ্গলে চুকিয়াছে। মিনতি ক্ষিপ্তসা করিল—যাত্রা অশুভ বললেন কেন নির্মল বাবু? কোন বিপদ হবে?

—না না, নির্মল ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—শিকারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, যাবার সময়ে পথে

ধরগোস বেরুলে সেদিন আর শিকার মিলে না। কথাকী ঠিক কিন্তু।

আরও কিছুক্ষণ চলিয়া গাড়ী উপরে উঠিতে লাগিল। নির্মল বলিল—আমরা ডিম্বাখোলের উপরে উঠছি। নামবার সময়ে সাবধান হবেন।

সতীন ভাবিতেছিল কেন মিনতি রাত্রি এই জঙ্গলে তাহাকে টানিয়া আনিল। এই নির্বাক যাত্রায় বিরক্ত হইয়া সে মিনতিকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইবে কিনা ভাবিতেছিল।

গাড়ী ততক্ষণ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। নামিবার পথের পাশে অগভীর খাদ। খানিকটা যাইতে হঠাৎ খাদের জঙ্গল ভয়ানক নড়িয়া উঠিল, একটা ভারী শব্দ হইল, কেমন একটা বোটকা গন্ধ নাকে ঢুকিল। বাহাদুর হাঁকিল হুঁদিসার।

চকিতে রাইফেল তুলিয়া ধরিয়া সতীন পাশের জঙ্গলের উপর টর্চের আলো ফেলিল। নির্মল তাহার বন্ধুকে গুলি পুরিয়া ব্যারেলের মুখ জঙ্গলের দিকে ফিরাইল। জঙ্গল তখনও নড়িতেছে।

গাড়ী নামিতেছিল। কোন জানোয়ার খাদ হইতে লাকাইয়া জঙ্গলে চুকিয়াছে, এ শব্দ তাহার। সতীন রাইফেল নামাইয়া রাখিল। ভাল করিয়া বসিতে গিয়া মনে হইল উষা সরিয়া তাহার খুব কাছে আসিয়াছে।

ভয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সে বা হাতটি বাড়াইয়া দিতে উষার হাতে লাগিল। মনে হইল উষা আরও কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

খুব ভয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সে আশ্বাস দিয়া যত্ন স্বরে বলিল—কোন ভয় নাই মিস—

হঠাৎ হাত বাড়াইয়া জ্বইচ ঘুরাইয়া মিনতি আলো জ্বালিয়া দিল। খাড়া ফিরাইয়া একটু হাসির সঙ্গে বলিল—ও, কে। আলো নিভিয়া গেল। নির্মল হাঁকিয়া বলিল—ঝিকপানি এসে গেছি।

সতীন নিজ মনে বলিয়া উঠিল—হাঁ এসে গেছি। উষার হাতবানো নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে বলিল—কোন ভয় নাই উষা।

ঝিকপানির ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়া জাঁকিয়া-বাকিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল।

মধ্য-এসিয়ার তাসখন্দ হইতে ডুয়ানের জঙ্গল। সতীন মনে মনে হাসিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া উষার কাছে সরিয়া আরাম করিয়া বসিয়া স্নেহের স্বরে ডাকিল—কমরেড উষা? নির্বাক উষা ধীরে ধীরে সবাক হইতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা। তাহার স্বরে কি প্রিয় মিলনের স্বচ্ছ পুলকভাস? মিনতি আদেশ দিল—বাহাদুর, গাড়ী ঘুমাও।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারকল্পে সবিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। উভয়েই, বিশেষ করিয়া শৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রচারের জন্ত তনু-মন-মণন বিনিয়োগ করেন। সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশেও তিনি তৎপর হন। তিনি স্বয়ং বাংলায় সঙ্গীত-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে যন্ত্রকোষ, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা, সঙ্গীত-শাস্ত্র-প্রবেশিকা, জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ত্রায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ চর্চা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ‘ডক্টর অফ মিউজিক’ উপাধি লাভ করেন।* পাশ্চাত্যের অগ্রাগ্র বহু প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলীও সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অপরিমিত ব্যুৎপত্তির জন্ত তাঁহাকে নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শৌরীন্দ্রমোহন একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলাল। শৌরীন্দ্রমোহনের হিন্দু সঙ্গীত পুনরুদ্ধার চেষ্টা যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে, বর্তমান কালে ইহার ব্যাপক চর্চাই তাহা সপ্রমাণ করে। ২৫ নবেম্বর ১৮৬৯ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা “Hindu Revival of Music” শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারবনে যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের কৃতিত্বের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

“The decay of Hindoo music may be said to have commenced from the death of Akbar and what remained was almost extinguished during the late Sack of Delhi—the Boston of Hindu music. It is the enlightened nobleman Babu Jotindra Mohun and his brother Sourindra who have taken upon themselves the task of reviving Hindu music. Enormously rich, extremely liberal, and fond of music, they have collected around them the remnant of ancient *calowats* and scientific Sanskrit works. They opened a musical class where instructions are given freely, but with such zeal and avidity that the learners believe that they confer an obligation on their teachers by condescending to learn. As regards the scholarship of professors, it is not with *jas* lay people to give an opinion, but we believe theirs is the best school in India.”

এখানে পত্রিকা বলিতেছেন, হিন্দু সঙ্গীত আকবরের মৃত্যুকাল হইতে এবং বিশেষ ভাবে দিল্লী লুণ্ঠনের পর

* এই প্রসঙ্গে ২২ জুলাই ১৮৭৫ দিবসীয় অমৃত বাজার পত্রিকা লেখেন,—

“America has honored Rajah, Sourindra Mohun Tagore with the title of Doctor of Music. . . . The revival of Hindoo music is mainly due to this gentleman.”

হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল, ইদানীং যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহা পুনরুদ্ধারের জন্ত বিশেষ চেষ্টিত আছেন। ঘরওয়ানা কালোয়াত এবং সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রের যাহা কিছু অবশেষ তাঁহাদের যত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা দানের একটি আয়োজন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা এত অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, শিক্ষার্থীরা মনে করে সঙ্গীত পিথিয়া তাঁহারা যেন উত্তোক্তাদেরই কৃতার্থ করিতেছে। এখানকার সঙ্গীতচার্য্যদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম, তবে আমাদের মনে হয় তাঁহারা ভারতের ঘরওয়ানা সঙ্গীত-অনুশীলনকারীদের শীর্ষস্থানে সমাসীন রহিয়াছেন।

পত্রিকা অতঃপর এখানকার প্রধান আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বিখ্যাত ‘সঙ্গীতসার’ গ্রন্থের উল্লেখ করেন। ইহা তখনও প্রকাশিত না হইলেও মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া উক্ত নিবন্ধেই পত্রিকা এইরূপ মন্তব্য করেন—

“We had fortunately a glimpse of it, and we can confidently declare that considering the deep research and the amount of facts collected, this work alone will confer immortality on the professor and his patrons.”

অর্থাৎ, পত্রিকার মতে, এই গ্রন্থখানির মধ্যে যেরূপ গভীর গবেষণার ছাপ স্পষ্ট এবং যেমন বিপুল তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রণেতা ও পৃষ্ঠপোষকদ্বয়কে অমর করিয়া রাখিবে।

‘সঙ্গীতসার’ গ্রন্থ প্রণয়নে শৌরীন্দ্রমোহন যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রমোহন ইহার অনুক্রমণিকায় (পৃ. ১/৩+১/০) তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“আমার আশ্রয়কল্পপাদপ সঙ্গীতাত্ত্বিক বিজ্ঞোত্তম সুবিখ্যাত বিদ্যাহুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণপূর্বক আমি প্রথমে রাগের আলাপ, তাল, লয়, গ্রাম, গমক, মুর্ছনা, ঞ্জতি প্রভৃতির লক্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে উক্ত শ্রীযুক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (আমি তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র বলিয়া অভিমান করি) সেই আয়ুধান শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় মৎপ্রণীত সেই পুস্তকদুট্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদানপূর্বক আমাকে সাধারণের নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে উত্তত হইলেন, হইয়া অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম প্রাচুর্য্য স্বীকার করত নানা সংস্কৃত ইংরাজী ও পারস্ত প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া তন্ত্বে গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহ পূর্বক

আমার ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রভূত রূপে পল্লবিত করিয়াছেন, এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে আমাকে সেই ধনকুবের বদান্তবর মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যও করিয়াছেন, ফলে তাহা হইতেই আমি এই দীর্ঘ কলেবর সঙ্গীতসার গ্রন্থের গ্রন্থ-কর্তা ও প্রকাশকর্তা হইয়াছি।*

‘সঙ্গীতসার’ গ্রন্থ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে প্রকাশিত হয়। হিন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তিমূলক শৌরীন্দ্রমোহনের একটি রচনা এই সময়কার অমৃত বাজার পত্রিকার ফাইলে* সম্প্রতি পাইয়াছি। ইদানীং হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা হয়ত অনেকেরই অবিদিত নাই। তথাপি সে যুগে যিনি হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের জন্ত এতখানি সচেষ্ট ছিলেন, তাহার লেখনী-প্রসূত সঙ্গীতবিষয়ক রচনা স্বতঃই আমাদের কৌতুহল উদ্রেক করিবে। এ কারণ ইহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইল,—

সঙ্গীত

গীত, বাণ্য এবং নৃত্য এই তিনকে একত্র করিলে সঙ্গীত সংজ্ঞা হয়। বিখ্যাত কল্লিনাথ বলেন, সঙ্গীতঃ বিবিধঃ প্রোক্তঃ দৃশ্যঃ শ্রাব্যঞ্চ সুরিভিঃ। অর্থাৎ সঙ্গীত বিবিধ, দৃশ্য, এবং শ্রাব্য। গীত এবং বাদ্য এই উভয়বিধ শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়। নৃত্য ইত্যাদির নাম দৃশ্য সঙ্গীত। সুতরাং নাটকাদির অভিনয়ও দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার আডল্ফ বারনার্ড মার্ক সাহেব তাহার ইউনিভারসাল মিউজিক নামক গ্রন্থেও নৃত্য এবং নাটকাদির অভিনয়কে দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এখানে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রাব্য সঙ্গীতের সমালোচন করাই প্রীধান উদ্দেশ্য।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল, মুসলমান শাসকদের অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিশেষ আদর ও সম্মান ছিল। তখন লোকে ইহাকে দেবধিকৃত এবং অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিত। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ, এই সাতটি স্বরই সঙ্গীতের মূল; এই সাতটি স্বরের প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলে, সঙ্গীত দর্পণকর্তা দামোদর মিশ্র বলেন, স্নিগ্ধচ রঞ্জনকশাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ যে ধ্বনি-বিশেষে রঞ্জন এবং স্নিগ্ধ গুণ আছে তাহারই নাম স্বর, ইংরাজী সঙ্গীত গ্রন্থকারেরা, যাহাকে (মিউজিকল সাউণ্ড) বলিয়া থাকেন। সঙ্গীত রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটি

স্বর চারিবেদ-সম্ভূত, ঋগবেদ হইতে ষড়জ এবং ঋষভ, যজুর্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার এবং পঞ্চম, অথর্ববেদ হইতে কেবলমাত্র নিষাদ। উক্ত সাতটি স্বর আবার এক একটি দেবতা-বিশেষের অধিগত বলিয়া উক্ত আছে। অগ্নির ষড়জ, ব্রহ্মার ঋষভ, সরস্বতীর গান্ধার, মহাদেবের মধ্যম, লক্ষ্মীর পঞ্চম, গণেশের ধৈবত, সূর্য্যের নিষাদ। এই সাতটি স্বরের কেবল আদিবর্ণ মাত্র গ্রহণ করিয়া সা, ঋ, প, ধ, গ, ম, নি, এইরূপ ব্যবহার করা যায়; সঙ্গীত গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত সাতটি স্বরকে কোমল এবং তীব্র ভাবে বিকৃত করা যায়, কল্লিনাথ বলেন, ততঃ সপ্ত স্বরঃ শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশপ্যমী, অর্থাৎ শুদ্ধ স্বর সাতটি, বিকৃত করিলে বারটি হইয়া থাকে ঋ, গ, ধ, নি এই চারিটি স্বর কোমল ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে, মধ্যমকে তীব্র ভাবে বিকৃত করা যায়, সাধারণ্যে যাহা কড়ি মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাতটি স্বর আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা বাদী, সখাদী, অনুবাদী এবং বিবাদী। রত্নাবলী কর্তা বলেন, “স্বামী বহুদনাস্বাদী সরাগঃ প্রতিপাদক বাদিনা সহ সখাদীং সখাদী মন্ত্রী তুল্যকঃ মুখে ওস্তাদবাদানার্দ্র বাদী চ ভূত্যং তথা বিরাগাতুল্যেব ধৈবত বিবাদী বৈরীবদ্ভবেৎ” অর্থাৎ যে স্বর বিশেষের দ্বারা রাগ প্রতিপন্ন হয় এবং যে স্বর বিশেষের রাগ বিশেষের উপর স্বামিত্ব আছে তাহার নাম বাদী, মন্ত্রী এবং যে স্বর ব্যবহার হয় তাহার নাম সখাদী, ভূত্য এবং যে স্বর ব্যবহার হয় সে সকলের নাম অনুবাদী, রাগ ভ্রষ্টকর বৈরিবৎ যে স্বর তাহার নাম বিবাদী। অপরন্তু সঙ্গীত রত্নাকরকর্তা শারঙ্গদেব বলেন, “রাগানৌ স্থাপিতৌ যন্ত সগ্রহ স্বর উচ্যতে। ত্রাসঃ ষড়ন্ত বিজ্ঞেয়ো যন্ত রাগ সমাপকঃ। বহুলত্বঃ প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে।” অর্থাৎ কোন রাগ-বিশেষের আরম্ভে যে স্বর ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহ স্বর, যে স্বরবিশেষে রাগে প্রবেশ হয় তাহার নাম ত্রাস, আর যে কোন স্বর রাগবিশেষের মধ্যে বহুল প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। সঙ্গীত নারায়ণ কর্তা নারায়ণদেব বলেন, “যন্ত সর্বত্র বাহল্যং বাদ্যং সোহপি নৃপোত্তম” এই শ্লোকার্থবোধে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই একার্থবোধক বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। সোমেশ্বর, সুধাকর এবং সঙ্গীত দর্পণ এই তিন গ্রন্থেতেও বাদী এবং অংশ উভয় শব্দ একার্থবোধের আরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর কর্তা বলেন, “যোহয়ং ধ্বনি বিশেষস্ত স্বরবর্ণ বিভূষিত রঞ্জকো জনচিন্তানাং সরাগৌ কথিত কুধেঃ।” সঙ্গীত রত্নাকর-টীকা-সুধাকর কর্তা সিংহ ভূপাল কথিত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা—স্বরবর্ণ বিশিষ্টেন, ধ্বনি ভেদেন বা পুনঃ, রজ্যতে যেন, সচিন্তঃ

* ২০ জানুয়ারি, ১৮৭০ দিবসীয় ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’। পত্রিকার ফাইল অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সরাগ:। অর্থাৎ স্বরবর্ণ বিশিষ্ট যে ধ্বনি যদ্বারা লোকসমূহের চিত্তরঞ্জন করে তাহার নাম রাগ।

সঙ্গীতসার কৰ্ত্তা বলেন, “অথ রাগাঃ সমুচ্যতে লয় ধাবাদি সংশ্রিতা, সম্পূর্ণা ষাড়বাস্তুহা রোড়বা চেতিতে ত্রিধা”, অর্থাৎ ধাতু এবং লয় সংশ্রিত যে রাগ তাহা তিন প্রকারে বিভক্ত যথা সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ওড়ব। সাতটি স্বর বিশিষ্ট যে রাগ তাহার নাম সম্পূর্ণ, ছয়টি স্বর বিশিষ্ট রাগের নাম ষাড়ব এবং পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট রাগকে ওড়ব কহে। শাস্ত্রকারেরা আবার রাগকে তিন জাতিতে বিভাগ করিয়া থাকেন যথা শুদ্ধ, শালঙ্ক এবং সংকীর্ণ, যে সকল রাগের সহিত অল্প রাগের সংশ্রব নাই সেই সকল শুদ্ধ জাতীয়, দুই রাগ মিশ্রিত হইয়া যে রাগ জন্মে তাহার নাম শালঙ্ক, বহু রাগ

মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে সে সকলের নাম সংকীর্ণ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, মহাদেবের সত্ত্বনামক মুখ হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্তক, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ, এই পাঁচ মুখ হইতে পাঁচ এবং পার্শ্বতীর মুখ হইতে নট নারায়ণ, সাকল্যে ছয়টি শুদ্ধ রাগের প্রথম জন্ম হয়। কথিত এই আদি ছয়টি শুদ্ধ রাগকে আশ্রয় করিয়া পরস্পর মিশ্রণে অপরাপর বহুতর শালঙ্ক এবং সংকীর্ণ রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি অন্যায্যি আমাদের সেই প্রাচীন নামেই চলিতেছে, অপরগুলি কালভেদে নানাবিধ যাবনিক নামে পরিবর্তিত হইয়াছে, বাস্তবিক শুদ্ধ রাগের ভাগ অতি অল্প।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ

অনেকের বিশ্বাস যে, ‘হরিক্রন’ কথাটি মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উদ্ভাবিত। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্ত কবি তুলসী দাসজী এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। হরিক্রন কথাটি সেখানেও অল্পমাত্র লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য জীব-মাত্রেরই ভগবানের, মানুষমাত্রেরই হরির জন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি আছে? কিন্তু যাহারা অক্ষম, শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতিতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহারা বিশেষভাবে যে নারায়ণের গণ, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত হরিক্রন শব্দটির ব্যবহার। এই ভাবে আমরা ‘দরিত্রনারায়ণ’ ‘অভিধিনারায়ণ’ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। বাহাদের সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হয়, তাঁহাদের মর্যাদা লাভ করা অভিপ্রেত নয়-বরং তাহার উল্টা। অর্থাৎ আমরা আমাদের অসহায় ভ্রাতৃত্বগীকে ধর্মের উচ্চভূমিতে তুলিয়া গৌরবই দিতে চাই। আজকাল শুনিতে পাই, ‘হরিক্রন’ কথাটির মধ্যে কেহ কেহ অসম্মানের আভাস পাইতেছেন। যদি কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাহা হইলে ভেমন কথা ব্যবহার না করাই ভাল।

কিন্তু হিন্দু সমাজের অভিজ্ঞ যেমন সত্য, জাতিভেদ প্রথাও তেমন সত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই হউক, অথবা কালের অমোঘ প্রভাবেই হউক—অনেক স্থলে জাতিভেদ-প্রথার মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত-সমাজে জাতিভেদের কঙ্কালমাত্র বর্তমান, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুধর্ম জাতিভেদ একেবারে বর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, এই সংস্কার বর্জন করা বাঞ্ছনীয় কিনা এবং যদি সমগ্রভাবে বর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কতটুকু রাখা উচিত

এবং কতটুকু পরিবর্তন করা উচিত, তাহা বলা কঠিন। কালবশে যাহা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে মনে বড় একটা



স্বামী প্রণবানন্দ

বিধা উপস্থিত হয় না, কিন্তু সংস্কারক সাজিয়া কোনও প্রথার বর্থাৎ প্রবর্তন করিতে গেলে বা কোনও চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে গেলে সমাজদেহে দারুণ আঘাত লাগে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সন্ধি না করিয়া ত উপায় নাই। যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করে, তাহারাই বাঁচিয়া থাকে। আমাদের অরণ রাধিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী

মহাসমরের প্রথম পর্যায়ের পর হইতে মানবসমাজে অনেক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা আবশ্যিক-মত পরিকর্তন-পরিবর্তন পূর্বক সমাজকে সমন্বয়যোগ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা নিছক আশ্বর্য্যকার জন্যই করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে ভুল নাই। যুগে যুগে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমাদের হিন্দুসমাজে এক দিন সত্যীদাহ প্রথা ছিল, গঙ্গাসাগরে সম্ভান বলি দেওয়ার রীতি ছিল, সে সকল উঠিয়া গিয়াছে। সম্মতি আইন লইয়া কত আন্দোলনই না হইয়াছিল। হিন্দু-সমাজ তোলপাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সে কথা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যাতি হইবে না। বিলাত-ফেরত আজ সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গিয়াছে, অরক্ষণীয় আর পদবালাই আর নাই। অ-সম জাতির মধ্যে বিবাহও চলিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, সমাজ একটি বিরাট প্রাণবন্ত বস্তু। ইহার প্রাণ-সত্তা পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকে।

জাতিভেদ-প্রথা একমাত্র হিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ ও বিভক্তনিত বৈষম্য যাহাই থাক, জাতিগত কোনও বৈষম্য দেখা যায় না। যেত এবং কৃষ্ণ, উত্তরাগত (Nordic) এবং ইন্দী প্রকৃতি জাতিগত বৈষম্য লইয়া বিধে অনেক মারামারি কাটাকাটি আছে, থাকিবেও। ধর্ম্মমত লইয়াও কম রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ আর কোনও জাতির মধ্যে নাই।

এখন এই জাতিভেদের ভগ্নোন্মুখ লৌহপঙ্ক্তরে গণসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে। সমাজজীবনে একটি আসন্ন বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এত দিন অসুস্থ ছিলেন, তাঁহারা উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই উদগ্র জনজাগরণের মুখে পতিত হইয়াছে হিন্দুর চিরগত সংস্কার। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই জাতিভেদ-প্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহার অনুপযোগিতা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখা যাইতেছে এবং যে ঐক্য ও সংহতি সমাজরক্ষার, আশ্বর্য্যকার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক তাহার মূল শিথিল করিয়া দিতেছে। একথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, আমাদের বাংলাদেশে ‘অস্পৃশ্যতা’ নামক সর্বনাশা ব্যাধি না থাকুক, আমরা সমাজের সকল অংশের প্রতি সমান সুবিচার করিতে পারি নাই। এই যে কোটি কোটি বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ লোক সমাজে বাস করিয়াও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে না, ইহাতে সমগ্র সমাজদেহই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এত দিন যাহারা লাঞ্ছনা, গ্লানি, নির্ধাতন ভোগ করিয়াও নীরবে সহ্য করিতেছিল, তাহারা হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে। অধীনতা কেহই চাহে না। গণচেতনার প্রথম উদ্বোধেই দৃষ্টিপথে অধীনতার শৃঙ্খলের উপর

—যে অধীনতা আত্মপ্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে, যে অধীনতা আত্ম-সম্মানে আঘাত করে। আটলাটিক সন্দেহ যে সার্বভৌম আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি মাত্র, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ মানব জাতির বিচ্ছিন্ন অংশে। আমরা ভারতীয় বলিয়া যে স্বতন্ত্রতার দাবি করি, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ আমাদের খণ্ড খণ্ড সমাজ-স্তরে যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে আমরা উপেক্ষা করি কেমন করিয়া?

এই দিক দিয়া আমাদের করণীয় অনেক কিছু রহিয়াছে। অবশ্য ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ জড়ত্ব পরিহার করিয়া সকলকে বক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। দেবমন্দিরের দ্বার অনেক স্থলে আমরা হিন্দু মাত্রকেই খুলিয়া দিয়াছি। অভিশপ্ত অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছি। একত্র ভোজন সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদারতা দেখা যাইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে যে, জাতি-ভেদের প্রাচীর তুলিয়া হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিলে সে আত্মঘাতী অপচেষ্টা ধ্বংসের সূচনা করিবে মাত্র।

চারি শত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য এই কথা বুঝিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহার ভক্তগণ উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভগবানের দরবারে উচ্চ-নীচ বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা কেবল ভগবৎসুখতার দ্বারাই পরিমিত—অর্থাৎ যে ভগবৎসুখ সে-ই সুখ, সে-ই হীন। ভগবানকে ভজনা করিলে সে যে কোনও জাতিভুক্ত হউক না, সে-ই বড়।

যে-ই ভজে সে-ই বড় অ-ভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।

হিন্দুসমাজ যদি ধর্ম্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জাতি-ভেদকে নুতন দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। ভগবৎসুখতাই একমাত্র পাতিতোর কারণ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী এই দৃষ্টি দিয়াই সমাজকে দেখিয়াছিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীমন্নহাগ্রজু যেমন আপামর সাধারণকে তাঁহার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজীও তাঁহার হিন্দু সংগঠন-যজ্ঞের হোমানলে ভেদনীতিকে ভস্মীভূত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বর্তমান আচার্য্যগণও সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে নানাহানে তাঁহারা যে মহাপ্রাণতার আদর্শ স্থাপন করিতেছেন হিন্দুদের মরণ-বাঁচন সমস্তার তাহাই হইবে প্রকৃত সমাধান। সংস্কার সহজে ছাড়িতে চাহে না, কিন্তু প্রকৃত পথের সম্ভান লাভ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা অসম্ভব নহে।

বর্তমান যুগে অবনত ভারতীয় হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা-পাপকে পরিহারপূর্বক সমাজের পতিত দলিত ঘৃণিত জন-গণকে উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত মিলাইয়া লইবার জন্ত স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং অজ্ঞাত মহাপুরুষ ও নেতৃবর্গ বহুভাবে প্রচারকার্য্য করিয়া গিয়াছেন ও করিতে-

ছেন। তাঁদ্বারা অভিজ্ঞাত ও উচ্চশ্রেণীর জনগণের মনোবৃত্তির পরিবর্তনসাধনে যথেষ্ট সহায়তা ঘটান।

সার্ব্ব চারি শত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টচতুর্থ মহাপ্রভু একটি অভিনব পন্থার মধ্য দিয়া অতি দ্রুত ও স্বাভাবিক ভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা আনয়ন-পূর্বক অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার প্রতিকার করিয়াছিলেন। হরিশ্যামসংকীর্ণনের প্রবল প্রাবল্য ছিল সে যুগে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর সেই অনন্তসাধারণ কর্ণ-ও প্রচার-কৌশল। বর্তমান যুগেও দেখিতেছি—সজ্ঞেনতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী ঠিক এ যুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উদ্ভাবনপূর্বক অতি দ্রুত অথচ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু জনগণের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক সমতা আনয়নপূর্বক অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে লইয়া “হিন্দুমিলন মন্দির গঠন”ই সেই অপরূপ গঠনমূলক অথচ বিপ্লবাত্মক কর্ণপন্থা।

উক্ত মিলন-মন্দিরসমূহের সাপ্তাহিক ও পার্ব্বাহিক অধিবেশনে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর সমবেত হরি-সংকীর্ণন, সন্ধ্যা-উপাসনা, বৈদিক-যজ্ঞ, অঞ্জলি ও আহুতি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ,

অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার কুসল আলোচনা, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ ও আলোচনার দ্বারা হিন্দু ধর্মের বিখ্যাত মতানুসারী জ্ঞান এবং হিন্দু সমাজের উচ্চ আদর্শ হিন্দু জনগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকা-দ্বিতে প্রবন্ধ ও বাণী-প্রচার অবশ্যই ফলপ্রসূ। কিন্তু নিয়মিত ভাবে দিনের পর দিন সেই বাণী ও নির্দেশ আলোচনাপূর্বক শুনাইতে ও বুঝাইতে না পারিলে স্থায়ীভাবে জনগণের মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। সাময়িক প্রচার দ্বারা জন-সমূহকে বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে সমবেত করাইয়া পঙ্ক্তি-ভোজনও যে অনাবশ্যক বা নিষ্ফল তাহা বলি না। কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক মানসিক উদারতা ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আচার্য্য প্রণবানন্দের কর্ণপন্থা অতি সুচিন্তিত, স্থায়ী ও দ্রুত ফলপ্রসূ। তাঁহার সন্ধ্যার সন্ন্যাসী ও প্রচারকবর্গ—উপরিউক্ত প্রচারমূলক ও সংগঠনমূলক—উভয় প্রকারে যে সংস্কৃতি, সমতা, মহা-মিলন ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহা আদর্শস্থানীয় এবং হিন্দু-সমাজের অশেষ কল্যাণপ্রদ।



শ্রীমতী সুপ্রিয়ময়ী সিংহ এম-এ., পিএইচ-ডি,

মহিলা সংবাদ

কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সম্মেলন উৎসবে শ্রীমতী সুপ্রিয়ময়ী সিংহ এম-এ., ডি-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারিণী হইলেন। শ্রীমতী সুপ্রিয়ময়ী দেবানন্দের বিখ্যাত উকিল পরলোকগত শরণ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। এই প্রতিভাশালিনী মহিলা ছাত্রজীবনেও আগাগোড়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও অপচয়ে বর্তমান ধনতন্ত্র

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মিয়া থাকে। নানা দেশের লোকের প্রধান খাদ্যও গম। গ্রীষ্মমণ্ডল ছাড়াইয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইলে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডগুলি নজরে পড়ে সেই সকল দেশেই প্রচুর গমের চাষ হয়। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে আবহাওয়ার পার্থক্য যথেষ্ট এবং এসব অঞ্চলে পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজও পোলাণ্ডা বা পশ্চিমের দরিদ্র কৃষক প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন করিলেও ব্লক মূল্যের অন্যান্য খাদ্যশস্য নিজে আহার করে—গম বেশী মূল্যে বিদেশে চালান হইয়া যায়।

আমেরিকা আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ খাদ্যের জন্য গম উৎপাদন করিত বা পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে উহা আমদানী করিত। যখন আমেরিকার উত্তর আলবার্টা হইতে উত্তর টেক্সাস পর্যন্ত বিস্তৃত তরুহীন বিশাল প্রান্তর (prairies) আবিষ্কৃত হইতে লাগিল তখন পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা আসিয়া দলে দলে চাষাবাস আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিশাল অকর্ষিত জমি সাধারণতঃ উর্বর ছিল। বৃষ্টিপাত অল্পই হইত এবং শীতও খুব প্রচণ্ড ছিল না, এজন্য গমের ফসল ভালই ফলিত। অবশ্য এই জমি পুরাতন মহাদেশের জমি অপেক্ষা উর্বর ছিল না। তবে এই জঙ্গলহীন বিরাট জমিতে কলের সাহায্যে চাষ করার সুবিধা থাকার দ্বন্দ্বন ইউরোপের ছোট ছোট জমিতে চাষে যত বেশী খরচ পড়িত, তত পড়িত না। এই চাষে লোকজনও কম লাগিত। এজন্য অপেক্ষাকৃত কম উর্বর আমেরিকার জমির চাষ ইউরোপীয় গম চাষ অপেক্ষা লাভজনক ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় উৎপন্ন গম ইউরোপের বাট্টি দেশগুলির অভাব মিটাইয়াছে।

প্রথম প্রথম ঔপনিবেশিকেরা অতি সামান্য ভাবেই গমের চাষ আরম্ভ করে। ছোট ছোট জঙ্গল ও গাছ কাটিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া জমি পরিষ্কার করিত এবং কয়েক বৎসর যে-কোন উপায়ে চাষ করিত। জমির উৎপাদন একটু কমিলেই আবার নূতন জমি লইয়া ঐরূপ করিত—নূতন দেশে জমির কোন অভাবই ছিল না। অষ্টাদশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই দেখা গেল নিউ ইংলণ্ডের ষ্টেটগুলিতে জমির উর্বরতা বিশেষ রকম হ্রাস পাইয়াছে। দাকোতাস, নাব্রাস্কা এবং মিনেসোটা ষ্টেটে অল্প দিন পূর্বে পর্যন্ত ঐরূপ অপচয়মূলক চাষ চলিয়াছিল। জমির উর্বরতা কমিলেই কৃষকেরা কানাডার নূতন জমিতে চলিয়া যাইত।

এই বেপরোয়া গম চাষের ইতিহাসের শেষ পর্বে দেখা দেয় বাজারের জন্য গলাকাটা প্রতিযোগিতা। কানাডাই বড় রপ্তানীর দেশ হইয়া দাঁড়ায়। আলবার্টা, সাস্কাটোনিয়া এবং ম্যানিটোবা প্রদেশে যেমন চমৎকার আবহাওয়া তেমনই ছিল চাষের জমির প্রাচুর্য। আর লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। ঐরূপ অবস্থায় এক দিকে যেমন রপ্তানীর জন্য প্রচুর

বাড়তি গম ছিল, অন্য দিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাজার গ্রেট ব্রিটেন সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় (Imperial Preference) ছিল কানাডার একচেটিয়া।

বিষুবরেখার দক্ষিণে আর্জেন্টাইন ও অষ্ট্রেলিয়ায় গত কয়েক বৎসরে উপরোক্ত নানা কারণের জন্যই গমের চাষ খুব বাড়িয়াছে। এই দেশগুলি দক্ষিণ ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া এবং উত্তর ভূভাগে যখন শীতকাল তখন এই সকল দেশের গমের ফসল ফলে এজন্য ইউরোপের বাজারে ইহাদের রপ্তানীর খুবই সুবিধা। কিন্তু এই দুইটির কোনটিতেই কানাডার মত বেশী গম উৎপন্ন হয় না। অষ্ট্রেলিয়ায় অনাবৃষ্টি লাগিয়াই আছে এজন্য ফলন অনিশ্চিত। আর আর্জেন্টাইন চাষের অব্যবস্থার দরুণ যথেষ্ট ফসল পাওয়া যায় না। বড় বড় জমির মালিকেরা অল্প দিনের মেয়াদে জমি পত্তন নেয়। ফলে চাষীরা—যাহারা সাধারণতঃ ইউরোপ হইতে আগত ঔপনিবেশিক, কয়েক বৎসর বেপরোয়া চাষ করিয়াই নূতন জমিতে চলিয়া যায়। জমির মালিকানা স্বত্ব নিজে না পাইলে পৃথিবীর সকল দেশের চাষী এইরূপই করিয়া থাকে এবং এইজন্যই এই সকল জমির উৎপাদনও খুব কম হয়। পরিত্যক্ত জমিতে অনাদৃত ভাবে আলফাল্ফা (alfalfa) পশুখাদ্য ঘাস জন্মে।

ইহা ছাড়া আর্জেন্টাইনে এক-একটা ষ্টেটে শত শত বর্গমাইল জমি। এই পরিমাণ জমির উন্নতিসাধন সহজ নহে। জমির বর্ধিত মূল্যের প্রত্যাশায় মালিকগণ চাষের জন্য পত্তনি দিতে চায় না, সুতরাং বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই সকল পতিত জমি পশু চরাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসরের জন্য পত্তনি দেওয়া হয় এবং জমিতে আলফাল্ফা ঘাস জন্মাইতেও কোন ব্যয় নাই। জমির মালিক কয়েক বৎসর পর জমি ফিরিয়া পায় বলিয়া এইরূপ পত্তনি দিতে তাহাদেরও খুব উৎসাহ। কিন্তু আসলে আর্জেন্টাইনের চাষীরা অর্থের ও সম্ভবত্বতার অভাবে চিরদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কৃষকের শুল্ক নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা নাই, শুল্ক বাহিরে খোলা জায়গায় বস্তাবন্দী করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়, ফলে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন শস্যের অপচয় হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে সারা পৃথিবীতে গমের উৎপাদনের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরেই এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে রপ্তানীকারী দেশসমূহে বৃদ্ধি—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টাইন এবং অষ্ট্রেলিয়ায় খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়, ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ সনের মধ্যে গমের উৎপাদন ৩০০ কোটি বুশেল হইতে বাড়িয়া প্রায় ৪০০ কোটি বুশেলে দাঁড়ায়। প্রত্যেক দেশের কৃষকেরা যত পারিল জমি কিনিল এবং গম চাষ করিল, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে এত গম পৃথিবীর বাজারে কাটিবে কিনা। ১৯২৮ সনের উৎপাদন চরমে পৌছিলেই দাম

পড়িতে শুরু হইল। লিভারপুল বাজারে এক হাজার গম কয়েক বৎসর পূর্বে ১৫ শিলিং দরে বিক্রয় হইত, তখন তাহা ১০ শিলিং নামিয়া আসিল। ১৯৩১ সনে দর আরও কমিয়া চার শিলিং ছয় পেন্সে নামিল। এক্রপ অবস্থায়ও আমেরিকার চাষী পূর্বের দরের এক-চতুর্থাংশ পাইলেও খুশী ছিল। কিন্তু সমগ্রা দাঁড়াইল এই যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন গম কিরূপে বিক্রয় করা যাইবে। চাহিদা একেবারেই ছিল না।

আমেরিকার গবর্ণমেন্ট সরকারী ধরচার গম কিনিয়া মজুত করিতে লাগিল। তুলার বাড়তি উৎপন্নের সঙ্কটেও এই পন্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিছু কালের মধ্যেই দেখা গেল আমদানীকারক দেশসমূহের বৎসরের চাহিদা গমের তিন-চতুর্থাংশই সরকারী গুদামে মজুত হইয়াছে। তখন গবর্ণমেন্ট নিজ ধরচার কাছাজের মাংশল দিয়াও এশিয়ার দেশসমূহে গম চালান করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা গেল আমেরিকার গম-রপ্তানী-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কানাডায় সাধারণ ব্যাপারী ও কাটকা-ব্যবসায়ীগণও গম কিনিয়া মজুত করিতেছিল, কিন্তু গমের দর যখন ক্রমেই পড়িয়া যাইতে লাগিল তখন তাহারাও গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইল। গবর্ণমেন্ট কোন একটা নিকিষ্ট হারের নীচে মূল্য নামিলেই তাহাদের নিকট হইতে গম ক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। ১৯৩৫ সালে দেখা গেল গবর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর বাড়তি গম জমিয়াছে। অবশ্য এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় এবং অপর বৎসর ‘কালো মরিচা’ (Black rust) নামক এক রোগের আক্রমণের ফলে ফসল খুবই কম পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও বাড়তি উৎপাদন সমস্যার সমাধান হইল না।

পৃথিবীর এই বাড়তি গমের মূল কারণ অহুসধান করিতে হইলে একবার পশ্চিম ইউরোপের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। যখন আমেরিকা প্রকৃতি দেশে ফসল বাড়তির পথে তখন ‘আর্থিক স্বাধীনতার’ দোহাই দিয়া জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালী নিজ নিজ দেশে গমের আমদানী কমাইয়া দিল। অবশ্য আমদানী গমের উপর খুব মোটা রকমের আমদানী-শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

যত বার আমেরিকার কৃষকেরা দাম কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে তত বারই ইউরোপে আমদানীর উপর শুল্ক বাড়ানো হইয়াছে। জার্মেনীতে বৃশেল প্রতি ১৬০ ডলার শুল্ক বসানো হইয়াছিল—ইহা আমেরিকার গমের মূল্যের চারিগুণ। ফ্রান্স ও ইটালীতে শুল্কের মাত্রা ছিল যথাক্রমে এক ডলার ও ৮৫ সেন্ট। কিন্তু শুধু ইহাতেই শুল্কবৃদ্ধির ব্যবস্থা শেষ হয় নাই। ইউরোপের এই সকল দেশ হইতে যাহাতে গ্রেট-ব্রিটেনে গম রপ্তানী হয় সেজন্য প্রত্যেক গবর্ণমেন্ট নিজ নিজ দেশের রপ্তানী গমের উপর অর্থসাহায্য (bounty) ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। ইহাতে গ্রেট-ব্রিটেনে আমেরিকার গম রপ্তানী আরও বাধা পাইয়াছে।

জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইটালী এই উপায়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বার্ষিক ১০ কোটি বৃশেল গমের আমদানী হ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে আমেরিকার গম উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুবিধা নষ্ট করা হয় এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পশ্চিম ইউরোপে গম-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও সফল হয় নাই। শেষকালে যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কৃষকগণকে বহু কোটি ডলার খেসারত দিল। তুলা চাষের পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই উপায়ে গম চাষের জমির পরিমাণ ৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর হইতে কমিয়া ৪ কোটি ২ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের গম রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং গমের আমদানী আবশ্যক হয়। আবার এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেই গম চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৫০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। ইহার অর্থই গম-রপ্তানী-বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় প্রবেশ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আরম্ভ হইলে যে নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহার ফলে গম উৎপাদনের পুরাতন অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সেগুলিতে চাষাবাস কমিয়া যায় এবং যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পগুলি প্রসারলাভ করে। ফলে যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই পৃথিবীর খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিয়াছে। বর্তমানে এই সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষতা হইতে বাঁচিবার জন্য সমস্ত জনগণের ঋণাত্মক একত্রীভূত করিয়া যাহাতে বাড়তি দেশসমূহ হইতে ঘাটতি দেশে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা সাময়িক মাত্র হইলে, সঙ্কটকালের অবস্থানে আবার যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেপরোয়া প্রতিযোগিতা দেখা দিবে তখন এক দিকে চাষ বাড়িবে বটে, কিন্তু অন্য দিকে শুল্ক-ব্যবহার সাহায্যে ইউরোপীয় দেশসমূহে অবাধাভাবিকভাবে দাম বাড়াইয়া গমের চাষে উৎসাহ দেওয়া হইবে। ফলে আবার অপচয়ের পথ উন্মুক্ত হইবে। এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বিধান অহুসারে পৃথিবীর সকল দেশের খাদ্য-শস্যের চাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পুঁজীবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য লাভ—বিশ্বমানবের স্বাচ্ছন্দ্য নহে। একজন্মই যত অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে।

ভুট্টা

পৃথিবীর অল্পতম খাদ্য-শস্য ভুট্টা। অবশ্য গরীব দেশগুলিতেই, যথা ভারতবর্ষে—ইহা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সমৃদ্ধ দেশে ইহা পশুখাদ্য, বিশেষতঃ শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত পৃথিবীর দুইটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেন্টিনা, ভুট্টা উৎপাদন ক্ষেত্রেও জনতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমেরিকার প্রধান প্রধান বন্দরসমূহের দক্ষিণে ১০০ মাইল ব্যাপিয়া ও পশ্চিম দিকের ষ্টেটগুলি জুড়িয়া এই বিরাট ভূটা চাষের অঞ্চল। উৎপন্ন ভূটার দশ ভাগের নয় ভাগই প্রধানতঃ শূকরের খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। শিকাগো বন্দরে শূকর-মাংসের বড় বড় কারখানা আছে (Packing-industries)। সেখানে বাস্তবন্দী হইয়া এই মাংস ও ইহা হইতে প্রস্তুত নানা খাদ্যদ্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। আর্জেন্টাইন হইতে কিছু পরিমাণ ভূটা পশ্চিম-ইউরোপে চালান হয়। অবশ্য সে দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পশুমাংস ইউরোপে রপ্তানী হয়। বর্তমান খাদ্যসম্পদে (১৯৪৬) আর্জেন্টাইন সরকার ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী করা চট্টের বিনিময়ে ভূটা সরবরাহ করিতে প্রীত হইয়াছেন।

আমেরিকার ভূটাচাষীর সমান উৎসাহে ভূটা উৎপাদন ও শূকর প্রতিপালন হুই-ই করে এবং এই উভয় জিনিসই তাহার সরবরাহ করে। শূকরের মূল্য বেশী বলিয়া চাষীর ভাগ্য শূকরের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির উপর অধিকতর নির্ভরশীল। অবশ্য আমেরিকাতেই অর্ধেক শূকরের মাংস বিক্রী হয়, কারণ ইয়াকীর্ণ উত্তম শূকর-খাদক। কিন্তু কোন কারণে রপ্তানীতে বাটতি পড়িলে কৃষকের দুর্দশার একশেষ হয়। ১৯৩২ সনে এরূপ এক দুর্দিন উপস্থিত হয়। ঐ বৎসর রপ্তানীর তিন ভাগের দুই ভাগ হ্রাস পায়। ইউরোপের দেশসমূহ শুষ্ক-প্রাচীর ভুলিয়া জাতীয় উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়াতেই এই বিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ভূটা চাষের জমি-গুলিতে চাষ চলিয়াছিল যদিও আর শূকরের খাদ্যের জন্ম ইহার প্রয়োজন ছিল না। বিশ্বের জ্যান্ত শূকর বাড়তি হইল। শেষে ৮০ পাউণ্ডের কম ওজনের সমস্ত শূকর মারিবার ব্যবস্থা হইল এবং খাদ্যের বাজারে চাহিদা না থাকায় উহা হইতে অ-ভক্ষ্য চর্বি ও জমির সারের তেল তৈয়ার করা হইল।

জনবহুল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে নানা দেশ হইতে মাংস আমদানী করিতে হয়। এই আমদানী করা মাল স্বভাবতঃই পশুপালন এলাকার সংলগ্ন শহরের প্যাকিং কেন্দ্রে বড় বড় ধনিগণের একচেটিয়া। আর্জেন্টিনা ঠাণ্ডা এবং জমাট পোমাংস রপ্তানীর জন্য বিখ্যাত। তেড়া ও ছাগ মাংস রপ্তানীর জন্য নিউ জিল্যান্ড প্রসিদ্ধ। এই সকল ব্যবসায়ের আরম্ভে কত না অপব্যয় ও অপচয় হইয়াছে। মাংসের চাহিদা কমিলে কেবল মাত্র চামড়া ও বুকের জন্মই পালিত পশুগুলিকে হত্যা করা হইত। আর্জেন্টিনার বিরাট পশুচারণ ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ পশুকে এই ভাবে হত্যা করিয়া উহাদের মাংস চালান দেওয়া হইয়াছে।

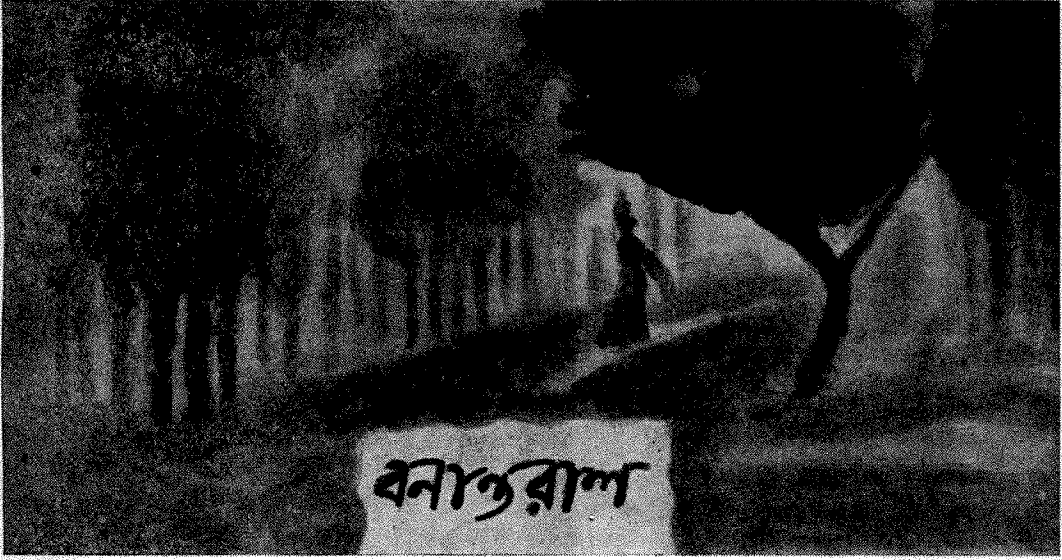
আর্জেন্টিনার অধিকাংশ কারখানার মালিক ইংরেজ বা মার্কিন বনপতিগণ। ১৯০৯ সালে ইহারা মাংস রপ্তানী প্রতি-

ষ্ঠানের শতকরা ৬৯টির মালিক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এই মালিকানা স্বয়ং শতকরা ৮৫তে পৌছিয়াছে।

আর্জেন্টিনার গো-মাংসের কারবারে ইংরেজের মূলধন খাটিতেছে, সুতরাং এই ব্যবসায়ের উন্নতি বিশিষ্ট পুঁজি-পতিদের খুবই কাম্য। অথচ সাম্রাজ্যের অজ্ঞাত অংশের পশুপালকেরাও সাহায্য কামনা করে। কাজে কাজেই 'সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙ্গে' এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আর্জেন্টাইনের গো-মাংসের চালান কতকটা বন্ধাব থাকে এরূপ ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অজ্ঞাত রক্ষণ-শুক প্রবর্তিত হইয়াছে।

নিউ জিল্যান্ডে মেঘ ও ছাগ প্রতিপালন করা হয় পশম রপ্তানীর জন্য। কিন্তু পূর্ব-অস্ট্রেলিয়ায় পশম উৎপাদনের জন্য শুধু মেঘই পালন করা হয়। অবশ্য অল্পকৃত্তিক বাগিক্যে পশমের স্থান তুলার নিয়ে। শীত-প্রধান দেশে ইহার চাহিদা খুব বেশী। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারের মিলের জন্য পশম রপ্তানী হয়। ইউরোপের অজ্ঞাত শিল্প-ক্ষেত্রেও এই পশম চালান হয়। চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিতে বা শুষ্ক-প্রাচীরের আঘাতে পশমের আমদানী-রপ্তানী খুবই উঠানামা করে। ১৯৩২ সনে অস্ট্রেলিয়ায় ৩০ লক্ষ গাঁট পশম উৎপাদন করা হয় ও চাহিদার জোরে তাহা কাটিয়া যায়, কিন্তু পর বৎসর জার্মানী ও ইটালীতে শুষ্ক-প্রাচীর তোলা হইলে অস্ট্রেলিয়ার মেঘপালকগণের দুই লক্ষ গাঁট পশম বাড়তি হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আর্থিক জাতীয়তাবাদ (Economic nationalism) হইতেই পৃথিবীতে অনেক অপচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, একজন্ম আজ এক জাতি অপর জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কারণ যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক সরবরাহের গতি বন্ধ হওয়ায় আমদানী রপ্তানীকারী দেশসমূহ মহা অসুবিধায় পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি একতাবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ভার লইলেই বিশ্ব-সম্পত্তার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে যত দিন এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শাসন ব্যবস্থা ও শোষণনীতি এবং স্বনৈতিক উপায়ে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-প্রণা বহাল থাকিবে তত দিন ইহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আজ বিশ্বসম্পত্তা সমাধানের জন্য বিশ্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বস্বত্বাধার জনগণের হৃৎকেন্দ্র দূর করা, পৃথিবীর সুখ ও সম্পদকে কিরূপে সকলের আয়ত্তে ও ভোগে আনা যায়, ইহাই আর্থিক একমাত্র সমস্যা। সমস্যার পূর্ণ সমাধান হউক আর না হউক, অন্ততঃ সমাধানের জন্য হুনিয়ার প্রগতিশীল জাতিসমূহের আন্তরিক চেষ্টার সকলতার উপরেই ভবিষ্যতের বিশ্বশান্তি ও তাহার মানবের সুখ-স্বাস্থ্য নির্ভর করিবে।



[নাটক]

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পটছায়া

• •

সন্ধ্যাকগ্ন থেকে বহু বহু দূরে। উত্তরে একটা ছোট পাহাড়, দক্ষিণে একটা ছোট পাহাড়, দুই পাহাড়ের মাঝখানে দুই দুই খুবই কম। সেই অপরিহার্য উপত্যকার মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট নদী। তার বাম আর পাশের বিছানো বৃক্ষের উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যায় সরু একটি বহু জলধারা। উত্তর পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম উজ্জালী, দক্ষিণ পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম হুবিয়া। একখানি পথ উজ্জালী থেকে নদীপার হয়ে গেছে হুবিয়াতে, সেই পথ ধরে সকাল-সন্ধ্যায় উজ্জালী আর হুবিয়ার মেয়েরা আসে নদীতে জল নিতে, স্নান করতে; ছপুসবেলা দুই গায়ের ছেলেরা আসে গরুর পালকে জল ঝাওয়াতে আর খেলা করতে।

উজ্জালীর একটি মেয়ে, নাম গুলবী, বয়স ১৬ কি ১৭, পাতলা গড়ন, রং ফর্সা, চোখ দুটি চক্ চক্ করে, হাসলে ঠাঁতগুলো দেখায় ফুটফুটে সাদা। হুবিয়ার একটা ছেলে, নাম তার দেওয়া, বয়স ১৯ কি ২০, রং কৃষ্ণ কালো, লম্বা গড়ন, নাকটি টিকলো।

১ম দৃশ্য

সময় অপরাহ্ন, উত্তর থেকে গুলবী গাঙ্গরি নিয়ে নদীতে আসে, দক্ষিণ থেকে দেওয়া আসে গাইকে জল ঝাওয়াতে।

এ পাড়ে গুলবী গাঙ্গরি রেখে বামুর উপর বসে, ও-পাড়ে দেওয়া একটা পাথরের উপর নিয়ে ঠাঁড়ায়। দুই পাড়ে শাল আর পলাশের জল, সেই জলে নীচে বাস করে ধরপোশ, তিতির আর বনহুরগি, উপরে বাস করে ঘুঘু, টিয়ে, কাঠবেড়াল।

গুলবী—(দেওয়ার দিকে তাকায়, তারপরে মাথা নীচু করে হাসে—গাঙ্গরি মাজতে শুরু করে, গাঙ্গরি গায় কঁাকনের বা লেগে বাজে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ)

দেওয়া—(গুলবীর দিকে তাকিয়ে থাকে—গুনগুনিয়ে গান গায়)

গুলবী—(শেষ হয় গাঙ্গরি মাজা, আঁজলা করে জল তরে গাঙ্গরিতে)

দেওয়া—(হঠাৎ একটু জোরে গান গেয়ে ওঠে—লাঠি চৌকে পাথরের উপর হুঁ হুঁ করে)

• গুলবী—(মাথা তুলে দেওয়ার দিকে চায়—গান শুনে হাসে)

১ম ঘুঘু—(উত্তর পাড়ের শালগাছে বসে ডাকে) ঘু ঘু (অর্থ—আহা বেশ)

২য় ঘুঘু—(দক্ষিণ পাড়ের শাল গাছে বসে ডাকে) ঘু ঘু— ঘু ঘু (অর্থ—আহা বেশ, আহা বেশ)

১ম টিয়ে—(উত্তর পাড় থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়)

২য় টিয়ে—(দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তরে উড়ে যায়)

দেওয়া—(আঙে ডাকে) গুলবী ! (একটি ডাকের মধ্যে যেন অনেক কথা তার বলা হয়ে গেল)

গুলবী—(আঙে জবাব দেয়) কি ? (এই 'কি' বলে সাড়া দেওয়ার মধ্যে যেন অনেক কথা তার শোনা হয়ে গেল)

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—ভারি মিষ্টি)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু ঘু-ঘু (অর্থ—ভারি মিষ্টি, ভারি মিষ্টি)

দেওয়া—(কি কথা বলি বলি করেও বলে না)



গাগরি রেখে বালুর উপর বসে

গুলবী—(গাগরি নিয়ে উঠি উঠি করেও ওঠে না)

দেওয়া—(আবার ডাকে) গুলবী !

গুলবী—(সারা দেয়) কি ?

দেওয়া—সেই কথাটার জবাব দিলি নে ?

গুলবী—(হেসে বলে) কোন কথাটা ?

দেওয়া—রোজই বলি তবু কেন ভুলে যাস ?

গুলবী—রোজই তো জবাব দি তবু কেন ব্লিস্ নে ?

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—বাঃ, বেশ জবাব দিয়েছে উজালীর মেয়ে)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—এইবার উজালীর মেয়ে বাবে হুবিয়ায়)

গুলবী—(ভরা গাগরি নিয়ে উঠে পড়ে)

দেওয়া—(পাখর থেকে নেমে একটু এগিয়ে এসে থেকে যায়)

গুলবী—(চলে যায় গাঁয়ের দিকে, একবার ফিরে তাকায় পিছনে আর হাসে)

দেওয়া—(দাঁড়িয়ে থাকে, সে হাসির মানে বুঝতে চায়)

২য় দৃষ্ট

আর এক দিন, সময় অপরাহ্ন। দৃষ্টপটের একটু পরিবর্তন ঘটেছে, নদীর ছই পাড়ের গাছপালা আজ আরো সবুজ, আরো ঘন। অন্তরাল থেকে বনফুলের গন্ধ ভেসে আসে। উত্তর পাড়ের বনপথে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়—কেউ গুলগুনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে আসে। একটু পরে গাগরি মাধায় নদীতে নামে গুলবী, পরনে তার কুসুমি রঙের শাড়ি, চুলে তার এক গোছা বনফুল। ঘাটে বসে আবার সে গান শুরু করে। এমন সময় উত্তর পাড়ের বনপথে আবার আওয়াজ পাওয়া যায়, জুতোর আওয়াজ, ভারী জুতো, কঁাকরের উপর আওয়াজ হয় মশ মশ। তার খানিক পরে নদীতে নামে পখিক, মাধায় লাল পাগড়ি, গায় ছিটের কুতী, পায় নাগরা জুতো, হাতে হাতবাড়ি। গুলবী চমকে ওঠে, ফিরে চায়, তারপর গাগরিটা কাছে টেনে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে। পখিক এসে বসে একটা বড় পাখরের ওপরে, পাগড়ি খুলে পাশে রাখে, তেল কুচকুচে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আওয়াজ করে—‘আঃ’

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—এটা কে ?)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—এখানে কেন—এখানে কেন ?)

পখিক—এ গাঁয়ের নাম কি গা ?

গুলবী—(ভয়ে ভয়ে) উজালী !

পখিক—আরো অনেক দূর যেতে হবে—অনেক দূর !

গুলবী—(আড় চোখে দেখে পখিককে)

পখিক—(পকেট থেকে একটা চুকচকে সিগারেট-কেস, খঁট করে খুলে তুলে নেয় একটা বিড়ি, সেটা বরায় দাঁতে চেপে ধরে—আঙে আঙে টানে)

গুলবী—(আড়চোখে দেখে—অবাক হয় খুব)

পখিক—তুই বিড়ি বাস ?

গুলবী—(লজ্জিত ভাবে) না।

১ম ঘুঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—কেমন লোক ?)

২য় ঘুঘু—ঘু-ঘু—ঘু-ঘু (অর্থ—লোক ভাল নয়, ভাল নয়)

পখিক—(বসে বসে বিড়ি টানে আর দেখে গুলবীকে)

গুলবী—(গাগরি মাজতে শুরু করে)

পখিক—তোমার দেশে এবার কসল কেমন ?

গুলবী—(এ এমন একটা আপনার জনের মত প্রশ্ন যাতে গুলবীর ভয় অনেকখানি কমে আসে, একটু ঘুরে বসে—বলে) ভাল না।

পথিক—তুই কোন্ জাত গা ?

গুলবী—গোয়াল।

পথিক—(দাঁত বার করে হেসে) আমিও গোয়াল।

গুলবী—(দেখে পথিকের সামনের ছুটো দাঁত রক্তাক্ত করে ওঠে—সোনা দিয়ে বাঁধান)

পথিক—কটা বেজ্ঞেছে ?

গুলবী—(কথার মানে বুঝতে পারে না—অবাক হয়ে পথিকের দিকে চায়)

পথিক—(বাঁ হাতখানা তুলে ঘড়ি দেখে বলে) আড়াইটা।

গুলবী—(অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, বলে) ওটা কি ?

পথিক—হাতঘড়ি—দেখিস্ নি কখনো ?

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—নকল ঘড়ি)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—আসল নয়, নকল ঘড়ি)

পথিক—তা দেখবি কেমন করে, ভোরা জঙ্গলে বাস করিস্। যদি দেখতিস্ কলকাতা।

গুলবী—(ব্যগ্র ভাবে) কলকাতা কি ?

পথিক—(দাঁত বার করে হেসে) খাবার জিনিস নয়, কলকাতা শহর, ভারি শহর—সেখানে যাহুদর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, কেল্লা ময়দান আছে।

গুলবী—(আরও ঘুরে বসে) চিড়িয়াখানা কি ?

পথিক—(অভ্যাসমত দাঁত বার করে) সেখানে বাঘ আছে, ভালুক আছে, বাঁদর আছে।

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—এখানেও বাঘ আছে, ভালুক আছে)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—এখানেও বাঁদর আছে, দাঁত বার করা বাঁদর আছে)

গুলবী—(ভয় কেটে যায়, বলে) আর কি আছে ?

পথিক—বড় বড় দোকান আছে, বিজলীবাতি আছে, রাতকে দিন করে।

গুলবী—(অবাক হয়ে পথিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—তোর দেখতে ইচ্ছে করে কলকাতা ?

গুলবী—(অল্প অল্প হাসে, বলে) হাঁ।

পথিক—আমি নিয়ে যাব কলকাতা—যাবি ?

গুলবী—(মাথা নেড়ে জানায় অসম্মতি)

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—বলে কি ?)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—বাঁদর বলে কি ?)

পথিক—রেলগাড়ীতে চড়িয়ে তোকে নিয়ে যাব।

গুলবী—(কণা কয় না—চূপ করে বসে থাকে)

পথিক—যাবি ? কেউ জানতে পারবে না, চূপ করে তোকে নিয়ে যাব, যাবি ?

গুলবী—(চোখ ফিরিয়ে অল্প দিকে চায়)

পথিক—তোর নাম কি গা ?

গুলবী—আমার নাম গুলবী।

পথিক—কি সুন্দর নাম, কি সুন্দর চেহারা !

গুলবী—(মুখ ফিরিয়ে নেয়, দেখতে পাওয়া যায় না হাসে কি হাসে না)

পথিক—আমি বুধবার এই পথ দিয়ে ফিরব, যদি কলকাতা যেতে চাস্ তা হলে এই সময়ে এইখানে থাকিস—বুধবার।

পথিক তার লাল পাগড়ি বেঁধে উঠে পড়ে, একটা বিড়ি ধরায়, নদীর ওপারে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসে, তার পরে কাকরের ওপর দিয়ে মসৃণ করে চলে যায়। আনমনা গুলবী গাগরি ভরে মাথায় তুলে উঠে দাঁড়ায়, এমন সময় ওপারে দেখা দেয় দেওয়া, কালো কুচকুচে অনারত নিটোল দেহ।

দেওয়া—(ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে)

গুলবী—(চূপ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকে)

দেওয়া—(নদীর মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়)

গুলবী—(পেছন ফিরে যাবার জন্তে পা বাড়ায়)

দেওয়া—(ডাকে) গুলবী, গুলবী।

গুলবী—(ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় কিন্তু হাসে না)

১ম ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—ছোড়াটা বোকো)

২য় ঘুঘু—ঘুঘু—ঘুঘু (অর্থ—ছুঁড়ীটা আরও বোকো)

দেওয়া—গুলবী ও গুলবী—শোন।

গুলবী—কি ?

দেওয়া—কাল আমি হাটে যাব তোর জন্তে শাড়ি কিনতে।

গুলবী—আমি কলকাতার শাড়ি চাই।

দেওয়া—কি বললি ?

গুলবী—কিছু না (যাবার জন্তে আবার পা বাড়ায়)

দেওয়া—একটু দাঁড়া গুলবী।

গুলবী—আজ না—বেলা গেছে। (চলতে থাকে)

১ম ও ২য় টয়ে—(মাথার উপরে উড়ে উড়ে আবার গিয়ে পাছে বসে)

গুলবী—(ধীরে ধীরে চলে যায়)

দেওয়া—(কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায়)

অপরাত্তের ছায়া মনিয়ে আসে, উত্তর পাড়ে নেপথ্যে তিত্তির ডাকে, দক্ষিণ পাড়ে নেপথ্যে ডাকে বনমুরগি।

৩য় দৃশ্য

বুধবার—স্থান ও কালের কোন পরিবর্তন নাই। জলের ধারে ছুট বক দাঁড়িয়ে আছে, একটু দূরে একটা মোষ জলে গা ডুবিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে। গাগরি মাথায় আসে গুলবী, হাটে গিয়ে বসে, বক ছুটো সাদা পাখা মেলে উড়ে যায়, মোষটা নির্বিকার চেয়ে থাকে। খানিক পরে দক্ষিণ পাড় থেকে আসে জুতোর আওয়াজ, শালগাছের আড়াল থেকে নদীতে নামে পথিক—মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে ছিটের কোর্তা, হাতে হাতঘড়ি। নদী পার হয়ে সে এসে বসে

গুলবীর খুব কাছে—দাঁত বার করে হাসে, ঝঙ্কঝঙ্ক করে ওঠে তার সোনা-বাঁধান সামনের ছুটো দাঁত।

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—গুলবী পালা)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু ঘৃণু (অর্থ—পালা পালা—পালা পালা)

পথিক—(সিগারেট কেস থেকে বিড়ি বার করে সেটা ধরিয়ে) গুলবী!

গুলবী—কি?

পথিক—যাবি কলকাতা?

গুলবী—(জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—দর্জার গয়না তোকে মানায় না গুলবী, আমি তোকে চাঁদির গয়না কিনে দেব। যাবি আমার সঙ্গে?

গুলবী—(জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে)

পথিক—আমি সর্দার, আমার অনেক টাকা, আমি তোকে বিয়ে করব—যাবি?

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—গুলবী ভুলিস নে)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—ভুলিস নে, ভুলিস নে)

পথিক—যাবি গুলবী?

গুলবী—(আঙুলি বজা) যাব।

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—ছি ছি)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু ঘৃণু (অর্থ—ছি ছি—ছি ছি)

চট করে উঠে দাঁড়ায় পথিক, দাঁত বার করে আর একবার নিঃশব্দে হাসে, তারপরে উত্তর-রক্ষিণের পুথ ছেড়ে দিয়ে পূর্ব দিকের ঘন শালবনে প্রবেশ করে, পেছনে যায় গুলবী—ঘাটে পড়ে থাকে তার গাগরি।

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—কোণায় যায় গুলবী?)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—গোলায় যায় গুলবী)

খানিক পরে গান পেয়ে গেছে আসে দেওয়া, হাতে তার

একখানা লাল রঙের শাড়ি। পাখরটার ওপর গিয়ে বসে, ঘাটে গাগরি দেখে খুশী হয়, চারদিকে চায়—হাসে। মনের আনন্দে গুনগুনিয়ে গান গায় দেওয়া।

১ম টিয়ে—(শালগাছ থেকে উড়ে পলাশ গাছে গিয়ে বসে)

দেওয়া—(চমকে ওঠে—চারদিকে চায়—মুচকি হাসে)

২য় টিয়ে—(পলাশ গাছ থেকে উড়ে শালগাছে বসে)

দেওয়া—(ফিরে সেই দিকে চায়)

সময় ধীরে ধীরে কেটে যায়।

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—সে নাই)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু ঘৃণু (অর্থ—সে আর আসবে না)

সময় ধীরে ধীরে কেটে যায়—অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে দেওয়া।

দেওয়া—(ডাকে) গুলবী, গুলবী।

১ম ঘৃণু—ঘৃণু (অর্থ—সে শুনতে পায় না)

২য় ঘৃণু—ঘৃণু ঘৃণু (অর্থ—সে শুনতে পায় না—সে অনেক দূর)

এ পারে আসে দেওয়া—ঘুরে ঘুরে খোঁজে, শেষে সে ভয় পায়—চঞ্চল হয়ে ওঠে—টেঁচিয়ে ডাকে কিস্ত সাড়া আসে না। অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসে। লাল শাড়িখানা গাগরির পাশে রেখে দিয়ে ছুটে যায় বনের মধ্যে, ডাকে ‘গুলবী গুলবী’।

সন্ধ্যা নেমে আসে, নামে নিবিড় নিশ্চলতা।

বনমুরগি নিঃশব্দে জল খেতে আসে।

১ম বনমুরগি—(সাবধানে পা ফেলে ফেলে লাল শাড়ি-খানার চার পাশে ঘোরে)

২য় বনমুরগি—(লাক দিয়ে গাগরিটার উপরে ওঠে)

অদূরে মোষটা নির্বিকার চেয়ে বসে থাকে।

(পটক্ষেপ)

বাসন্তী গীতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দিন যায়, বর্ষ যায়, আশাতুর মনে
ভূমি আর আমি রহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়,
এ শীতের অবসান হবে হবে হয়,
বসন্ত আসিবে কবে জাতির জীবনে?
মত্ত হাওয়া হুসি ওঠে কেন ক্ষণে ক্ষণে,
দিকে দিকে শুক পত্র শুধু উড়ে যায়,
গাছগুলি রিক্তশাখা—ককালের প্রায়;
আমাদের মতনই কি তারা দিন ধরে?

এ ককালে কবে হবে প্রাণের সঞ্চার?
সবুজ শোভায় হবে সুন্দর ধরণী,
ফুলে ফুলে ভরে যাবে, কানন-কান্তার,
অপকূপ হবে দেশ উজ্জল-বরণী।
আজি কি পেয়েছ কবি, বার্তা ভূমি তার?
গাও সে বাসন্তী গীতি নব-জাগরণী।

স্মৃতি-কথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ

১২৭৪ সালে কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী যামিনীতে বাধরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রায়ের কাগী রাজবাড়ীতে বাহুকি গোত্রের আমার জন্ম হয়। বাহুকি গোত্রোদ্ভব রাজা শশিভূষণ রায় চৌধুরী আমার জনক এবং রাণী মৃৎকেশী চৌধুরাণী আমার জননী। রায়ের কাগীস্থ রাজবংশে বাহুকি গোত্রের আমার জন্ম হইলেও নানা কারণে আমার পিতা ও মাতা নিত্যান্ত নিঃস্ব ও অশরণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; নিদারুণ কষ্টে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। রায়ের কাগীস্থ মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষার মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত বৃত্তিলাভ সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া, বর্ধমানকাল পিরোজপুরস্থ ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়নান্তে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত বরিশাল জেলা স্কুলে অবতনে অধ্যয়নপূর্বক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন-মানসে আমি কলিকাতায় যাত্রা করি। আমার বাল্যাবধি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষ ঝোঁক। কলিকাতায় গিয়া তত্রস্থ গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অভিলাষে প্রথমেই সেই সুপ্রসিদ্ধ কলেজ মহামণ্ডপে গমনপূর্বক কলেজের মহামাধ্যক্ষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়ের ত্রিচরণ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার আদেশমত আমার পরিচয় দানান্তে প্রাণের বাসনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি আমার পরিচয় ও বাসনা অবগত হইয়া প্রথমে আমি একজন কায়স্থ জামিনা নিত্যান্ত অবজ্ঞাতরে বলিলেন যে, আমি একটি শূদ্রজাতীয় ছাত্র হইয়া কিরূপে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত সংস্কৃত বিদ্যালয়দ্বিধে অধ্যয়নের সুমহতী প্রযুক্তি হৃদয়ে পোষণে লাস্য হইতে পারি। নিত্যান্ত সুপদ-সম্মানানন্ভিজ্ঞ তরুণ শূদ্র বলিয়া তিনি আমার অনধিকার প্রবেশের অপরাধ মার্জনা করিয়া আমার বিদায় প্রদান করিলেন। গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ প্রবেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব মাত্র অধিকার, আর কাহারও নহে।

গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়দ্বিধে হইতে আমাদের বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শোকে ও নৈরাশ্রে আমি যারপরনাই কাতর হইয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে ভগবানের অপার করুণায় ত্রিঅরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামধেয় আমাদের বাসাস্থ আমার চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর একজন ছাত্র আমার মুখে সব শুনিলেন এবং যারপরনাই সহানুভূতি সহকারে আমাকে প্রাতঃস্মরণীয় দয়াপারাবার ত্রিযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারপূর্বক ভাবকথাবলী নিবেদনের উপদেশ প্রদান করিলেন। আমরা তখন বাহুড়-বাগানে কালিদাস সিংহের গলিতে বাস করিতাম, পুজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসস্থান উহার উত্তরে নাতিদূরে বর্তমান।

সেই ভ্রমলোকের সুপদেশে আমি সেই দিনই পরমপুজ্য-

পাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসস্থান দেখিয়া আসিলাম। অতঃপর ক্রমশঃ দুই দিন ঐ বাড়ীতে গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু সাহসভরে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলাম না। অতঃপর তৃতীয় দিনে আমি গিয়া যেমন দাঁড়াইয়া আছি, অমনি আমাকে দেখিয়া মহাপুরুষ সাদরে আহ্বান করিলেন—“ওগো কে তুমি? কাকে বুঝিতেছ? আমার কাছে এস। তোমার ভয় হইয়াছে কি? অত কাঁপিতেছ কেন? আমার কাছে এস, আমি তোমার সহায় হইয়া সব সাহায্য করিব।” মহাপুরুষের সুমধুরবচনে আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে করিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ধরিয়া তুলিয়া সাদরে আমার পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অভয়দানে আমি আমার নাম, বাসস্থান ও বংশের পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে আমার আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন, “বাবা, আমি তোমাদের বর্তমান বাড়ী-রায়ের কাগী বেশ চিনি। রায়ের কাগীস্থ রাজবংশ বাহুকি গোত্র আমার সুবিদিত, তোমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজা শিবনারায়ণ রায় চৌধুরীর আমি যে একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ। তোমায় সংস্কৃত-কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় শূদ্র বলিয়াছেন? তিনি কি জানেন না যে তোমরা কায়স্থ-কুলমণি ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সংস্কৃত কলেজে তিনি তোমায় গ্রহণ না করিয়া আর কাকে নেবেন? অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র কি তোমায় দেখেছেন? তিনিও ত রাজা শিবনারায়ণের একজন বৃত্তিভোগী। তোমাদের গোত্র যে বাক্সালায় সর্বত্র সুবিদিত। কাল পূর্বাক্ষে তুমি আমার নিকটে আসিবে, আমি তোমায় সংস্কৃত কলেজে লইয়া গিয়া সম্মানিত ভক্তি করাইয়া দিব। আচ্ছা বাবা, তোমার প্রপিতামহ রাজা দেবনারায়ণ ও পিতামহ রাজা মহেশনারায়ণ অজ্ঞাপি জীবিত আছেন কি?” আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক বলিলাম—“আজ্ঞে, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই, আমার পিতাও এক্ষণে জীবিত নাই। আমাদের এক্ষণে আর সে রাজসম্মান নাই। আমরা এক্ষণে প্রায় সকলেই অর্থহীন ও সম্মানহীন হইয়া পড়িয়াছি, পূর্বপুরুষদের চতুর্দশ পরগণা সম্পত্তি প্রায় সব পরহস্তগত হইয়াছে, আমাদের জীবিকার জন্ত আমাদের প্রায় সকলেরই বেতনভোগী চাকরীজীবী হইতে হইতেছে। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বিভাগসাগর মহাশয় যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। পরদিন আবার তাঁহার ত্রিচরণ দর্শনে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখিলাম যে, মহাপুরুষ আমার জন্ত প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহার অস্ত্র একখানি গাড়ী আনিতে যাইবার কথা বলিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে,

তাঁহার যাতায়াতে শকটের কখনও কোন প্রয়োজন হয় না, পদব্রজে তিনি অনায়াসে বারানসীধামে গমনে সমর্থ। সুতরাং পদব্রজেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি আবার সংস্কৃত কলেজে গমন করিলাম। কলেজের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই তিনি তারদ্বরে “মহেশ, মহেশ” বলিয়া কলেজের মহাপণ্ডিত অধ্যক্ষ মহাশয়কে ডাকিতে আসিলেন। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ও মহাপুরুষের আস্থানে প্রাসাদের নিম্নতলে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ভায়রভ মহাশয়কে আমার সমুদায় পরিচয় প্রদান-পূর্বক কেন আমাকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অতঃপর কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়কে তিনি স্বীয় কার্যভার বহনের নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া ভৎসনা করিলেন। অবশু পরিশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সবিনয় অহুরোধে তাঁহার ক্রোধ উপশান্ত হইল এবং তৎসঙ্গে আমিও অবতরনে কলেজে প্রবেশের ও অধ্যয়নের অহুজা লাভ করিলাম। সংস্কৃত কলেজ হইতেই ক্রমশঃ আমি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই সময়ই বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবধাম পরিহার করেন। সুতরাং আমিও নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি, তবে অধ্যক্ষ ভায়রভ মহাশয়ের করুণা বলে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত না হইয়া তথায় ক্রমে দুইবৎসর যাবৎ সংস্কৃতে এম. এ. অধ্যয়নের অহুমতি লাভ করি। তৎকালে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন—(১) স্বয়ং অধ্যক্ষ ভায়রভ মহাশয়, (২) পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মণুসুন্দর স্মৃতিরত্ন, (৩) বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ মহাপণ্ডিত গোবিন্দশাস্ত্রী, (৪) পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, (৫) যদুদর্শনে মহাপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং (৬) সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী। অধ্যাপকমণ্ডলীর সকলেরই স্ব স্ব বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় সাহিত্য ও অলঙ্কারের সঙ্গে বৈদিক কাল হইতে লৌকিক কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করিতে হইত, ঐতিহাসিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই জার্মানী হইতে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন একজন মহাপণ্ডিত আসিয়া ছাত্রদের লইয়া প্রায় অর্ধ বৎসর-কাল ইংরেজী ভাষায়—“History of Sanskrit Literature from the Vedic time to the latest age” বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেন। আমাদের বৎসর আসিয়াছিলেন ডাঃ গোল্ডষ্ট্রকার। নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে আমি ডাঃ গোল্ডষ্ট্রকার মহোদয়ের বড় স্নানজরে পড়িয়াছিলাম। জানি না কেন তিনি আমাকে পণ্ডিত বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ডাঃ গোল্ডষ্ট্রকারের নিকটে অনিতাম জাতি

অনেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যাহুরাগী। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষই প্রকৃত বিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী। তিনি বলিতেন ভারতবর্ষে জন্মলাভ মহাপূণ্য কৰ্ম্মের ফল। বড়ই দুর্ভাগ্য যে, ভারতবাসীর মধ্যে এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বিরল। তাঁহার মতে মহাপাপে ভারতবাসী প্রকৃত শিক্ষার অভাবে জগতে পুঞ্জিত না থাকিয়া ছেয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিতেন যে, গণিত, বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, অধ্যাত্মসাধনা, গুণগন পরিদর্শন প্রভৃতি ঐহিক ও পারমাণবিক সর্বজ্ঞানার্জনেই একদিন ভারত বিশ্বপূজ্য ছিল।

আমার দ্বিবৎসর অধ্যয়নান্তে আমি এম. এ. পরীক্ষায় ক্রমে চারিটি প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটিতে প্রতিশতে নব্বই নম্বর পাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি প্রশ্নপত্রে প্রতিশতে ঊনবিংশতি করিয়া পাই। অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভায়রভ মহাশয় আমাকে বলিলেন, “বাবা, তুমি চারিটি প্রশ্ন পত্রের উত্তরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও দুইটি প্রশ্নপত্রের উত্তরে আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়ের নিকট মাত্র ঊনিশ করিয়া পাইয়াছ। তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য।” আমি পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের ত্রীচরণে প্রণাম করিয়া রোদন করিলাম। তিনি আমাকে সাব্বনাচ্ছলে বলিলেন, “আমি তোমাকে বেশ জানি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তোমাদের পূর্ববর্ষের অন্তর্গত মৈমনসিংহের লোক, তিনি তোমার উপর বড়ই রুষ্ট, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার তোমার সাধ্য নাই। এক্ষণে আর কোনও পরীক্ষা না দিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে তুমি অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করিলে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার পূর্ণ সমাদর হইবে। কোন কলেজে বিশিষ্ট অধ্যাপকের আবশ্যক তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানানিলে আমি তোমার সেই পদলাভের জন্ত যত্ন করিব।” আমার প্রতি পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাদৃশ অহুগ্রহের বাক্য শ্রবণে আমি সানন্দে তাঁহার ত্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং তৎপর একটি কৰ্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই সিটি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের একটি পদ খালি জানিয়া গ্রামবাজারে গিয়া পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ভায়রভ মহাশয়ের সকাশে নিবেদন করিলে তিনি পরম-শ্রীতি-সহকারে বলিলেন, “তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কলিকাতায় দেশীকৃত কলেজগুলির মধ্যে সিটি কলেজ সর্বোত্তম, কেননা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু মহাশয় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের একজন রত্নবিশেষ। তাঁহার অধীনে কৰ্ম্মলাভ তোমার ভাবী মহোন্নতিসাধক। আগামী কল্যই আমি তোমাকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইব। কাল সকালে তুমি এখানে আসিবে।” পরদিন আমি অধ্যক্ষ ভায়রভ মহাশয়ের সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে গমন করি। ইহারই কলে সিটি কলেজে

আমার অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তি হয়। সেই দিনই কলেজে গিয়া অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সিটি কলেজে প্রধানতম অধ্যাপকের পদে কর্তব্য প্রবৃত্ত হইলাম। কলেজ হইতে বার্ষিক্যবশতঃ পণ্ডিত বরদাকান্ত বিজ্ঞানবৈদ্যর বিদায় গ্রহণে আমার উক্ত পদ লাভ হয়। আমার সহাধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন ও পণ্ডিত ভূতনাথ বিহারত্ন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের সংস্কৃতজ্ঞানের পরীক্ষা করিতেন। সিটি কলেজে শিক্ষাদান প্রণালীতে পরম প্রীত হইয়া বঙ্গ মহাশয় ক্রমে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক রূপে নিয়োজিত করাইলেন। তিনি আমাকে সার আস্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান এবং তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া আমাকে অনুরূহীত করেন। সার আস্ততোষের দ্বারা ক্রমশঃ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার এম-এ পরীক্ষার অলঙ্কারশাস্ত্রের পরীক্ষক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আমার প্রতি এতাদৃশ প্রীতিলাভ করেন যে, আমি সিটি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি জানিয়া তিনি একদিন আমাদের কলেজে আসিয়া আমার নানা সুখ্যাতিপূর্বক আমাকে রিপণ কলেজে লইয়া গিয়া কর্তব্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। আনন্দমোহন তাহা শুনিয়া বিস্মিত ও ছুঃখিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি মহাপণ্ডিত, আপনার কি আমার কলেজের একজন সুযোগ্য অধ্যাপককে অগ্রহণ লইয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত? আমি এখানে উপেক্ষাব্যুৎসাহে যে বেতন প্রদান করিতেছি, তাহা অবশ্য ইঁহার জায্য বেতন অপেক্ষা কম, তথাপি আমার ও আমার কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ইঁহার বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধনের ইচ্ছা, বিশেষতঃ ইঁহার এখানে আগমন অবশিষ্ট ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। আমরা ইঁহার বেতন পরের মাস হইতে বাড়াইয়া দিব। আপনার ও সুরেন্দ্রবাবুর সম্মাননার জন্ত পণ্ডিত মহাশয় আপনাদের কলেজে প্রতি সপ্তাহে তিন ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।” বঙ্গ মহাশয়ের বচনে কৃষ্ণকমল বাবু বলিলেন, “আপনার বাক্যগুলি সকলই স্মৃতিপূর্ণ। শিক্ষাদানে উপেক্ষা বাবুর এইটুকু সাহায্য পাইলেই আমাদের যথেষ্ট হইবে, কেননা আমি সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষার অলঙ্কারশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস বিষয়ে ইঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এত দূর প্রীত হই যে, প্রথমে আমি উহাকে প্রায় পূর্ণ সংখ্যাই প্রদান করি, শেষে পরীক্ষক-সভার নির্দেশে নব্বয় করাইয়া প্রতি শতে ৯২ করিয়া প্রদান করি। তদবধি উহাকে আমাদের রিপণ কলেজে গ্রহণে মানস করি। আজি আমি দেখিতেছি উপেক্ষা বাবু কর্তৃক আমাদের দুইটি কলেজেই আদর্শ

সংস্কৃত শিক্ষা-প্রদান কার্য চলিবে।” পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এইরূপ স্থির করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। আমারও যুগপৎ দুই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর একদিন সংস্কৃত কলেজের পূর্ব-সম্পাদক ও তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের কলেজে আগমনপূর্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস উপেক্ষা, আমি তোমার প্রতি ভূব্যবহার করিয়াছিলাম। তোমাকে সংস্কৃত পরীক্ষায় নিতান্ত অলীক আচারে অকৃতকার্য করিয়াছিলাম। উহার জন্য এত দিন যারপর নাই আত্মশ্লাঘা ভোগ করিয়া কালযাপন করিয়াছি। আজি আমি ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে তোমার নামে ‘বিজ্ঞানভূষণ শাস্ত্রী’ উপাধি-পত্র বহু আয়াসে লইয়া আসিয়াছি। বৎস, তোমার পুরাতন অধ্যাপকের পূর্বস্মৃতি অপরাধ বিস্মৃত হইয়া এই উপাধিপত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী কর।” আমি পণ্ডিত মহাশয়ের তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বার বার প্রণামপূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে উপাধিপত্রখানি গ্রহণ করিলাম।

কলিকাতা সিটি কলেজে আমার কার্যকালে আমার সহযোগী অধ্যাপক ইতিহাসে ছিলেন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিজ্ঞানে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গণিতে ছিলেন প্রথমে প্রান্তঃস্বরগীষ আনন্দমোহন বঙ্গ, তৎপরে কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, ইংরেজী সাহিত্যে ছিলেন অধ্যাপকব্রত হেরষচন্দ্র মৈত্র, দর্শনশাস্ত্রে ছিলেন অম্বিকাচরণ মিত্র, পশ্চাতঃ ভাঃ হীরলাল হালদার, আরব্য ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন মহম্মদ আব্দুল হাদি, ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক ছিলেন ব্রজমুন্দর রায় চৌধুরী ও রজনীকান্ত গুহ, সংস্কৃতে অত্যন্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিজ্ঞানী।

অবশেষে কলেজের অধ্যক্ষ হেরষচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনের পর বৎসরই বয়সাদিক্যবশতঃ আমিও স্বকর্তৃ হইতে বিরত হইলাম।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউশন

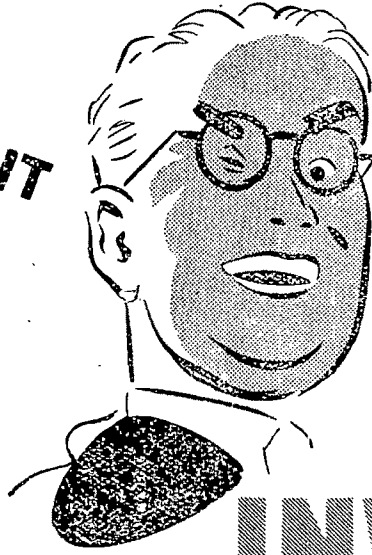
—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সোয়ার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

TAKE IT



FROM ME

INVEST

IN DOUBLE BENEFIT SCHEME!

আমরা আমাদের ডবল
বেনিফিট স্কীমে ৫০০ বা
ততোধিক টাকা স্থায়ী
আমানত হিসাবে গ্রহণ
করিয়া উক্ত টাকা শেয়ার,
সোনা ও জমিতে লগ্নী
করিয়া যথানির্দিষ্ট সুদ
ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের
শতকরা ৫০ ভাগ বোনাস
হিসাবে আমানতকারি-
গণকে দিয়া থাকি।
প্রতি তিন মাস অন্তর
সুদ ও বোনাস বিতরণ
করা হয়।

যথানির্দিষ্ট হারে সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের
শতকরা ৫০ ভাগ আয় করুন।

DEPOSIT ACCEPTED

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা
৩ " " " " " ৬ "
১০ " " " " " ১০ "

আমাদের উইকলি শেয়ার মার্কেট
ব্রিডিউ চাহিয়া পাঠান
(চাহিলে নমুনা-সংখ্যা দেওয়া হয়)

আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত ষ্টক-এক্সচেঞ্জের সকল প্রকার শেয়ার
ও গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি-সমূহ ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করি।

কমার্শিয়াল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড

হেড অফিস : ২৩২৪, রাধাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা। টেলিফোন : ক্যাল. ১২৪৫

ইউ, পি অফিস—উইলসন লজ, মডেল হাউস, লক্ষ্মী।

বাকুড়া অফিস—কেরানীবাজার, বাকুড়া।

• ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মি: কে, ডি, মুখার্জি

বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব

শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়

কমলাকান্ত প্রমুখাৎ বন্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “হায়, কত গণিব ! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, শতাব্দীও কিরিয়া কিরিয়া সাত বার গণি। কই অনেক দিবসে মনের মাহুখে বিধি মিলাইল কই ? যাহা চাই তাহা মিলাইল কই ? অমৃত্যু মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? বিভা কই ? গৌরব কই ? শ্রীহর্ষ কই ? হলায়ুধ কই ? লক্ষ্মণসেন কই ? আর কি মিলিবে না ? হায়, সবাইই ঈপ্সিত মেলে কমলাকান্তের মিলিবে না ?” উত্তর আজও আসে নাই।

বাঙালীর বাংলা বাঙালীর চিরপ্রিয়। তার বাংলাকে খিরায়া সে কবিতা রচিয়াছে, সঙ্গীত গাহিয়াছে, তার অতীতের স্বপ্ন দেখিয়াছে, ভবিষ্যৎ কল্পনার স্বর্ণ তুলিতে আঁকিয়াছে। তার কবি অনন্যসাধারণ স্বপ্ন অমৃত্যুতির দ্বারা অমৃত্যু করিয়াছেন বঙ্গ-জননীর মাতৃমুষ্টি। দেশমাতৃকার প্রতিমা কেশাধর হইতে নখাধর পর্যন্ত ভক্তিমুগ্ধ চক্ষে যুগ যুগ ধরিয়া দেখিয়াও বাঙালী কবি তৃপ্তি অমৃত্যুত্ব করে নাই।

বাঙালী বিদেশীয় সম্ভাটার বাহ্য চাকচিক্যময় ঐশ্বর্যে আত্মবিস্মৃত হয়—কিন্তু স্বর্ণকের জন্ত। তার দেশ “স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্থিতি দিয়ে ধেরা।” ভাবরুদ্ধ স্বরে সে সম্বোধন করে তার দেশমাতৃকাকে,

“তুমি তো মা সেই

তুমি তো মা সেই

চির পরীক্ষণী ধন্যা।”

বাঙালীর সুফলা সুফলা মল্লকশীতলা শস্তাশ্রমলা দেশ যে শুধু কবির কল্পনা ছিল না তার সাক্ষ্য ইংরেজ লেখকদের বহু বর্ণনায় রহিয়াছে। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের ঐতিহাসিক চার্লস হুয়ার্ট ১৮১৩ সালে রচিত তাঁহার বাঙলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “প্রকৃতি বাংলাদেশকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শান্তির উপায় দান করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছে এমন সমস্ত সামগ্রী যাহা যে-কোন দেশের নিকট বাহ্যিক। বাংলার ক্ষমিতে মাহুশ ও পশুর সর্বপ্রকার খাদ্যশস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ এত প্রচুর যে এক বৎসরের ফসল অন্ততঃ দুই বৎসরের প্রয়োজনীয় খাতের সংস্থান করিয়া দেয়। বাংলার প্রয়োজন মিটাইয়া বাংলার শস্ত অন্যান্য অভাবগ্রস্ত স্থানে রপ্তানী হয়। এইজন্য বাংলাদেশই পূর্বাঞ্চলের খাদ্যশস্যের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত হয়, যেমন মিশর পাশ্চাত্য দেশসমূহের খাদ্য ভাণ্ডাররূপে গণ্য হয়। বাংলার ফল-ও-পশু-সম্পদ অপরিমিত। মাহুশের ঐশ্বর্য-সম্ভোগের বাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা এ

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন ?

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

“স্বামী আমানতে” জমা রাখুন।

সুদের হার

৩ মাসের জন্ম	... ২½%	৫ ও ৬ বৎসরের জন্ম	... ৫%.
৬ " "	... ৩%.	৭ " "	... ৫½%.
৯ " "	... ৩½%.	৮ " "	... ৫½%.
১ ও ২ বৎসরের	... ৪½%.	৯ " "	... ৫½%.
৩ ও ৪ " "	... ৪¾%.	১০ " "	... ৬%.

নিরাপত্তা ?

কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও সম্প্রতিআমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় এবং হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্শ্বে ও মধ্যে আরও বহু জমি খরিদ করিয়াছি। এই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৪১

—নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটি ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা

ফোনস :—ক্যাল : ১৪৬৪—৬৫

টেলিগ্রাম :—“Aryoplants”



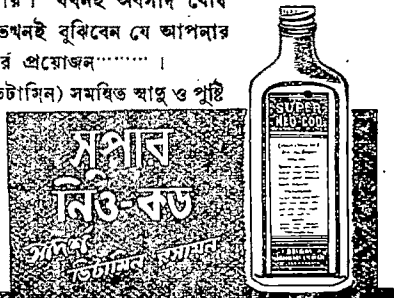
২৩ জীবন অব্যাহত শেষ হয়ে যায় ...

যদি সময়োচিত সাবধানতার তাবের রক্ষা করা না যায়। যখনই অবসাদ বোধ করিবেন বা কর্মশক্তির অভাব বোধ করিবেন.....তখনই বুঝিবেন যে আপনার স্বাস্থ্যে কোথাও টুট ধরিয়েছে.....স্বস্তর প্রতিকারের প্রয়োজন.....। সুপার-নিও-কড পরিমিত মাত্রায় বিবিধ খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) সমৃদ্ধিত স্বাদু ও পুষ্টি কর রসায়ন.....পুষ্টিহীনতা, যক্ষ্মার পূর্বাবস্থা এবং রোগ মুক্তির পর সর্বপ্রকার দৌর্বল্যে আশু কার্যকরী।

কর্মশক্তিই জীবন

ক্ষীয়মান শক্তির পুনরুদ্ধার চাই

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ : কলিকাতা ১৩



দেশবাসী প্রস্তুত করে। বাংলার শিল্পনিপুণ অধিবাসীরা শিল্প-নৈপুণ্যের বহু প্রণালীতেই অভিজ্ঞ। অন্য দেশের অন্য জাতির কোন সাহায্য তারা চায় না, উপরন্তু বাংলারই সৌষ্ঠবযুক্ত সুন্দর পণ্যদ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয়।”

‘ধনধান্যপুষ্পে ভরা’ এই বাংলারই শতাব্দী পূর্বের চিত্রের সঙ্গে আধুনিক অবস্থার তুলনা প্রয়োজন। নীচেকার অল্পক্ষেত্রেরও লেখক অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত ইন্ড-বঙ্গ রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতীক ইংরেজ—“পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘা জমি একটি সাধারণ বাঙালী পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি জমি হইতে আমন ধান্য ব্যতীত আর কিছুই না জন্মে তাহা হইলে অন্যান্য আট একর অর্থাৎ ২৪ বিঘা জমি প্রয়োজন।”

বাংলাদেশের অধিবাসী সংখ্যা ১৯৪১-এর সেন্সাস অনুসারে ৬ কোটি। তাহার শতকরা ৭২ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। উড্‌হেড কমিশন রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে, বাংলাদেশের বিশ লক্ষ পরিবারের মাত্র পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘার অধিক জমি আছে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ পরিবারের গ্রিষ বিঘার বেশী জমির সংস্থান আছে। বাকি পরিবারদের সম্পত্তি—ভরণ-পোষণের জন্ত প্রয়োজনীয় এই নিম্নতম পরিমাণেরও অনেক কম। উড্‌হেড কমিশনের হিসাবে বাংলায়

কৃষিজীবীর সংখ্যা	শতকরা	৭৪
শিল্পজীবীর	”	১৩.৫
চাকুরীজীবীর	”	৩.২
অন্যান্য	”	৯.৩
		১০০

১৮১৩ সালের সহিত ১৯৪৩ সালের তুলনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই ১৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলার আর্থিক অবস্থার দ্রুত ও সুনিশ্চিত অধোগতি হইয়াছে। পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পৎশালী জাতি দারিদ্র্যের ও দুর্দশার চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৯৪৩-এর মনস্তর বাঙালী কৃষিজীবী ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকের চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার অভ্যন্তর নিদর্শন। এই দুর্দশার কথা কোন কোন দেশীয় কর্মচারী বহু পূর্বে হইতেই রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তব্য ও জন-নাশকদের গোচরীভূত করাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও প্রতিকারের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইতে অমরোষ জানাইয়া-ছিলেন। কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে—“চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।” বিদেশী আমলাতন্ত্র উপার্জনের জন্ত এদেশে আসেন। উপার্জন ও স্বকীয় ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ব-স্ব কার্য নির্বাহ করেন। শেষে অর্থ, শ্রম, গৌরব ও পৈতৃক লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে যেটুকু সময় ও শক্তি

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিম্নলিখিত হ্রদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪১০ টাকা

২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫১০ টাকা

৩ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬১০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে হ্রদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

- ১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা হ্রদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক-এণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ধাকে তাহা ভারতের পরাধীনতার পৌষকতায় ও ভারত-বাসীর নিন্দায় অভিবাহিত করেন। ইঙ্গ-বঙ্গ কণ্ঠচ্যারী, বাহারা উচ্চপদস্থ হন ময়ূরপুচ্ছ সংগ্রহে তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনের এত অধিক সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে, পুচ্ছহীন অবস্থায় তাঁহাদের আর কিছু উত্তম দেশের কোন সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করার রুচি বা শক্তি থাকে না। দেশের স্বরাজ্য-সাধকগণ “হু” লইয়াই এত ব্যস্ত যে রাজ্য বা সঙ্গীর্ণ স্বার্থ সজাগ যেখানে নম্র সেখানে তাঁহাদের কোন চেষ্টার বা চিন্তার অপব্যবহার (?) তাঁহারা করিতে চাহেন না। সার জন উড হেডও লিখিয়াছেন, “রাষ্ট্র-পরিচালকদের ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ ছিল না, লাট সাহেবের সঙ্গে মন্ত্রীদের সহযোগিতা ছিল না, জনসাধারণের সঙ্গে সরকারেরও কোন সহায়ত্ব ছিল না—এই সমস্ত কারণে দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোন আয়োজন সম্ভব হয় নাই।” কি দায়িত্বপূর্ণ কর্মী সংযোগ! ফলে লাট মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলসমূহের অধিনায়কবৃন্দ কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, মরিগ বিশ লক্ষাধিক অসহায় নরনারী, বাহারা ট্যাঙ্ক দেখে, লাট মন্ত্রী আমলাতন্ত্র হইতে স্তব্ধ করিয়া তথাকথিত স্বরাজ-সাধকদের ঐশ্বর্যের খোরাক আহার্য যোগায় কিন্তু যাহাদের অভাব-অভিযোগের, হুং-কণ্ঠের, ব্যাধি দারিদ্র্যের কোন উপশম কখনও হয় না।

এই দুর্দশা যে কত ব্যাপক, কত গভীর গত দুর্ভিক্ষে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের আপামর সাধারণের যেখানে এই অবস্থা সেখানে ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবস্থাপক সভার ২৫০ জন সভ্য, মন্ত্রী-মণ্ডল, রাজকণ্ঠচ্যারী—কবি বিজ্ঞেন্দ্রলালের “নন্দলাল” রূপে দেশের না হইলেও স্বগৃহের শোভাবর্ধন করিতেছেন। অবসর মত গরম বক্তৃতাও মাঝে মাঝে যে না দেন এমনও নয়।

বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে আজ বাংলার যথার্থ দেশপ্রেমিক ও অভিজ্ঞ নেতার একান্তই অভাব। আজ দেশ অপেক্ষা দল বড়, দল অপেক্ষা দলের অধিনায়ক বড়। অধিনায়কত্বের জন্ত চরিত্র, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম ও নীতিনিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। বাংলা কংগ্রেসমণ্ডলীর নির্বাচনে সভাপতির গুণাবলীর বিশ্লেষণ নিষিদ্ধ। দেশবিশেষে দুষ্টি-বহির্ভূতা বোরখা পরিহিতা স্ত্রী-নির্বাচনের বিধি আছে স্তনিয়াছি। কিন্তু গুণবিচার-নিষিদ্ধ সভাপতিবরণ বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রাচীন ঋষিরা উপদেশ দিয়াছিলেন, “আত্মানং সত্যং রক্ষণং।” বাংলাদেশে ঋষিবাক্য ব্যর্থ হয় নাই। কংগ্রেস কমিটি, বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি, এমন কি ভারত সভা (Indian Associa-

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজি: অফিস—আখাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা স্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০২১, ক্লাইভ স্ট্রিট, ৭৭নং, ক্লাইভ স্ট্রিট (রাজকোটরা)।

২০১নং হ্যারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন—

...

৫০,০০০,০০

বিক্রীত মূলধন—

...

২২,৫০০,০০

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল—

১৪,৯৫০,০০

টাকার উপর

আমানত

...

...

৩,৫০,০০০,০০

টাকার উপর

কার্যকরী তহবিল—

...

৯,০০,০০০,০০

টাকার উপর

ব্রাঞ্চসমূহ—কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুচি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ফেচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, বদরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মোলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, গোলাঘাট, তিনসুকিয়া, নর্থলক্ষ্মীপুর, ট্যাংলা, গোহাটী, ডিব্রুগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর

tion) হইতে ইউনিয়ন বোর্ড পর্যন্ত নেতারা আত্ম-ব্রতায় ব্যস্ত।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভাবাবেগের সহিত কলিকাতা নগরীতে বলিয়াছিলেন, “স্বরাজ্য আসিবেই; ব্রিটিশ শাসন শেষ হইবেই ইহা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু আজ বিচারের বিষয় এই যে, স্বরাজ্য পাইয়া আমরা কিরূপে তাহার পরিচালনা সাধন করিতে দিকে লইয়া যাইতে পারি। আমাদের মধ্যে কত লোক আছেন যাহারা শুধু দেশসেবাকে আদর্শ করিয়া জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। আজ সর্বত্র প্রয়োজন সেবার আগ্রহ এবং সংযত ও সংহত সেবাকার্য্য।”

হয়ত বাংলার নেতৃবৃন্দ সম্মুখে বলিবেন, “আমিই সেই একমাত্র দেশসেবক।” প্রত্যেকেই হয়ত নিজ নিজ ত্যাগের দীর্ঘ স্বত্ত্ব পেশ করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবেন।

আজ বাংলার দুর্দিন। সে দুর্দিন প্রমাণ করিতেছে তার রাষ্ট্রপদ্ধতি ও রাষ্ট্রপরিহিত—সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার না বর্জন না গ্রহণ সিদ্ধান্ত, দেশবিদ্রোহী শাসনক্ষমতা, কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা; বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, উপ-যুক্ততাহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। কলে দুর্ভিক্ষ—কলিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরায় তাড়ব লীলা। উৎকোচ গ্রহণকারী, অকর্ম্মণ্য ও

অহুপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সমগ্র জাতীয় কেন্দ্র পরিপূর্ণ। এর মীমাংসা কোথায়? কে সে মীমাংসা করিবে? কে পথের সন্ধান বলিবে? এ দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালীর—প্রত্যেক বাঙালী সন্তানের, পুরুষ ও স্ত্রীর। সে সিদ্ধান্ত করিবার ও স্পষ্ট ভাষায় পথের নির্দেশ দিবার দিন আজ আসিয়াছে।

প্রত্যেক বাঙালীকে স্থির করিতে হইবে বাংলার এ পরিস্থিতির মূল কি ও কোথায়? কোন্ নীতির বলে, বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, নীতিহীনের হস্তে দেশের জীবন-মরণের চাবিকাঠি চলিয়া গিয়াছে? বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে, (ক) প্রথমতঃ আত্মসর্ব্বস্ব ত্যাগকথিত নেতৃবৃন্দের হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে কংগ্রেসকে। স্বচ্ছ গণতন্ত্র সহজ ভাবে শৈবালযুক্ত হইয়া দেশকে প্রাবল্য করিবে। (খ) প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক গৃহে স্বদেশের উন্নতিকামী, সংসাহসী দেশপ্রেমিকের উদ্বোধন করিতে হইবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক পরিকল্পনা স্বহস্তে লইতে হইবে। (গ) রাষ্ট্রপদ্ধতি পরি-বর্তনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—(১) বিচ্ছিন্ন বাংলার অংশকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে জনগণের সম্মতিক্রমে।

(২) বাংলায় বোধ-নির্বাচন-পদ্ধতি পুনঃ-প্রবর্তন করিতে হইবে—পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার (adult suffrage)

নেতাজীর অনুসরণে :—

• বাংলার বিখ্যাত স্বত ব্যবসায়ী শ্রী অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাঁহার “শ্রী” মার্কী স্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্প্রয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্বতের ব্যবহার অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল স্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীমুভাষচন্দ্র বসু

আদর্শ রাধিয়া নির্বাচন-লিপি (Electoral Roll) প্রস্তুত করিতে হইবে। তার সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থা-পরিষদের সংখ্যা নির্ণীত হইবে। সম্পূর্ণ পূর্ণবয়স্কের নির্বাচন অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নির্বাচন-লিপির সংখ্যা অনুপাতে এক যৌথ-নির্বাচন-পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচিত হইবে।

(৩) যোগ্যতা অনুপাতে সকল শ্রেণীর সহজগাধ্য পরীক্ষার বা পরীক্ষা ও নির্বাচনের দ্বারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে চাকুরি, ব্যবসায় বা বিভাগসমূহে জ্ঞানগ্রহণ, নির্ধারণ করিতে হইবে। অনগ্রসর কোনও শ্রেণীর শিক্ষার জন্ত বিশেষ বিধি বা বিশেষ ভাবে অর্থ দান নির্ধারিত সময়ের জন্ত নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ততাই একমাত্র মানদণ্ড হইবে। যদি এই সব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে কোনও শ্রেণী বা ধর্ম-বলদ্বী বাধা দেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে। যাহা অস্বাভাবিক জাতির পক্ষে সহ করা সর্বতোভাবে অকল্যাণকর।

(৫) যদি এই যৌথ-নির্বাচন-পদ্ধতি ও উপরিলিখিত বিধির অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ প্রেরণের পথ মনে হয় তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে ও উভয় প্রণালীর মধ্যে দূরদৃষ্টিতে বহুর কল্যাণজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়া কার্যে পরিণত করিবার উপায় আন্তরিকতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে।

বাংলার নেতৃবৃন্দ যদি স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা পরিহার করিয়া দেশের সমস্ত সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন তবে তো সত্যি দেশের স্বর্দিন। কিন্তু যদি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত না হয় তবে দেশের প্রত্যেক সন্তানকেই বাঙালীর জীবনমরণ সমস্তা মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।



টিকানাটা লিখিয়া রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ
ঘাটুকর শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।

ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

জহ্নাহিন্দ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে স্বাধীনতাকামী ভারতের উদ্দেশে—

এস, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেডের নিবেদিত অর্থা

নেতাজীর বাণী

প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির পড়া উচিত। নেতাজীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর প্রথম জার্মানী হইতে আরম্ভ করিয়া রেঙ্গুন হইতে অন্তর্ধান করিবার পূর্ব পর্যন্ত বেতারযোগে যে সকল বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা একত্র সম্মিলিত করিয়া এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

বহু অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও বিবৃতি যাহা কোন পুস্তকে বা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয় নাই, এই গ্রন্থে সেই সকল বক্তৃতাবলী পাইবেন। এইরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক স্বাধীনতার মর্মবাণী এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

চাবিশত পৃষ্ঠায়, দুই খণ্ডে, অ্যাটিক কাগজে সুন্দর নেতাজীর মূর্তিসম্মিলিত বোর্ডে বাঁধাই। মূল্য ৫।০ মাত্র।

প্রকাশক—এস, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড

১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পুস্তক - পাঠ্য

সাহিত্য প্রসঙ্গ—ক্রিয়রঞ্জন সেন। প্রাপ্তিস্থান—সেন রায় এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪২।

লেখক সাহিত্যরসিক, সুসমালোচক এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই হুপড়িত। ওড়িয়া, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। কাজেই সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রস্তাব সহিত গ্রণিধানযোগ্য। বর্তমান পুস্তকে ক্রীতককৌর্জন ও জাগের গান, রাজনারায়ণ বহু, কামিনী রায়, বাংলা-সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সতেরটি প্রবন্ধ আছে। এগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্বৎ ও রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্যভিমানের পরিচয় পুস্তকখানিতে পাই না। তিনি সাহিত্যবিচার করিয়াছেন রস-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। শুধু বাংলা সাহিত্য নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের রস আহরণ করিয়া হৃষ্টভাবে তাহা পরিবেশন করাতেও যে তাঁহার নৈপুণ্য আছে, সে পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা ও উড়িয়ার যোগ এবং কাকি প্রভৃতি প্রবন্ধে। আর একটি জিনিষ পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে, সেটি তাঁহার ভাষার প্রসঙ্গ। এবং অনায়াস সাবলীলতা। এই সমস্ত গুণের সমন্বয় পুস্তকখানি বাংলা মনন-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

দ্রুতের বিষয়, চম্পে কলঙ্কের স্থায় এই তথ্যবহুল সমালোচনামূলক গ্রন্থ-খানির মধ্যেও কতকগুলি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে মারাত্মক মুদ্রাকরপ্রমাদ ও সন-তারিখের কিছু গুণগোল আছে। দুই-চারিটির

উল্লেখ করিতেছি :—(১) পৃ. ৩২ : রাজনারায়ণ বহু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ, ১৮৬৬ পর্যন্ত মেদিনীপুরে কর্মস্থল”। “জন্মগ্রহণ” না হইয়া “কর্মগ্রহণ” এবং “১৮৬৬” না হইয়া “১৮৬৮” হইবে। (২) পৃ. ১৩৯ : “মনোমোহন বহুর ‘সতী’ নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকার তারিখ, ১৭ই মাঘ, ...”। লেখক প্রথম সংস্করণের ‘সতী নাটক’ দেখিলেই ধরিতে পারিতেন যে তারিখটি “১৮ই মাঘ।” (৩) পৃ. ১৫৫ : অধ্যাপক সেন লিখিয়াছেন, “স্মার এক বিষয়ে মনোমোহন বাবুর মত অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; শ্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের তিনি অমু-মোদন করেন নাই; ওজুপ ব্যবস্থায় দেশের দুস্ত্যবস্থা বাড়িবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা।” কিন্তু পরবর্তী কালে মনোমোহনের এই ধারণা যে পরি-বর্তিত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার সম্ভবত কারণ আছে। গোপাললাল শীল-প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারে শ্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই অভিনয় করিতেন। মনোমোহন সেই থিয়েটারের ‘ডাইরেটর’ ছিলেন এবং তাঁহারই সময়ে এই রঙ্গমঞ্চে তাঁহার “রাসলীলা” নাটক অভিনীত হইয়াছিল। (৪) পৃ. ১৬৭ : “বারো বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ইং ১৯২১ সনে কবির [কামিনী রায়ের] ‘গুপ্তন’ প্রকাশিত হয়।” ইহা ঠিক নহে। ‘গুপ্তন’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সনের মে মাসে।

দ্বিতীয় সংস্করণে তথ্যঘটিত এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিলে পুস্তক-খানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুদের পক্ষে মাতৃস্তন্য অতুলনীয়



কিন্তু স্তন্য-দুগ্ধ যখন কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার সুবিধা থাকে না, তখন “ভিটা-মিল্ক” নিষ্মিলে বাড়ন্ত শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা নির্দোষ দুগ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ ও পেটে যন্ত্রণা ইত্যাদি আশঙ্কা থাকে না। ইহা সেবনে শিশুদের দাঁত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য স্থায় হইয়া উঠে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা সুপথ্য। ভিটা-মিল্ক গত সাত বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সন্তান, প্রসূতি-আগার ও হাসপাতালে স্থানান্তর সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।



ভিটা-মিল্ক

ন্যাশনাল নিউফ্রিমেণ্টস্ লিঃ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

বন-জ্যোৎস্না—ত্রিনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পুস্তকালয়—২৯, বাবুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—২৫০।

হুলেখক ত্রিনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্প-সংগ্রহখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মনস্তত্ত্ব আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ও প্রচলিত রীতিনীতিতে যে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে তাহার এক একটি দিকের ইঙ্গিত প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে আছে। মানুষের অপরিণীম লোভ, কদর্য কামনা, জিঘাংসা ও পশুবৃত্তির তলে স্নেহ-ভালবাসার কলুষধারার পরিচয়ও শিল্পীর তুলিকায় ধরা পড়িয়াছে। ‘বন-জ্যোৎস্না’ ও ‘আলু-খলিফার শেষ খুন’ গল্প দুটিকে এই সংগ্রহের সেরা গল্প বলা যায়।

ত্রিরামপদ মুখোপাধ্যায়

ময়মনসিংহের কৃত্তী সন্তান—প্রথম খণ্ড। ত্রিনরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সৌরভ আপিস, ময়মনসিংহ, হইতে ত্রিনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য অমূল্যবিশিষ্ট।

ময়মনসিংহ জিলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ আট জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে রহিয়াছে। বিভালায় পারিতোষিকরূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত গ্রন্থ। তবে ময়মনসিংহের বাহিরে ইহার সমাদর কত হইবে, বলা কঠিন। ভাষা আর একটি সংস্কৃত-বর্জিত হইলে ভাল হইতে মনে হয়। ছাপা ও বাঁধাই ছেলেদের চিত্তাকর্ষক হইবে।

আলোচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যাবান ও বিভুবান উভয়ই রহিয়াছেন। বাঁহারী উত্তরাধিকারহরে বিভূ লাভ করিয়া উচ্চ স্থান জীবন বাপন না করিয়া ভক্তভাবে চলেন, অথবা বাঁহারী রাজা বা রাজপুত্রদের অনুগ্রহে বিদেশী রাজার আমলে বড় চাকরী লাভ করেন, তাঁহার সত্যি কৃত্তী বয়লা ইতিহাসে স্মরণীয় হইবার মত লোক কিনা, সে প্রশ্ন আজ সমাজ-তান্ত্রিক যুগে অনিবার্য। তথাপি ভক্তভাবও একটা মূল্য আছে; এবং

যে ভক্ত, উদার ও অমায়িক ব্যবহার করে নির্ধন কিংবা ধনী হইলেনও তাহার প্রশংসা করা চলে। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মত পণ্ডিতকেও যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, ইহা জানে পরাধীনতার একটি লক্ষণ এবং রাষ্ট্রে পরাধীনতার একটি ফল। ইউরোপের কেহ সংস্কৃত বুঝেন কিনা বিচার করিতে এদেশে আসা উচিত, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, সংস্কৃতের জন্মভূমি ও বিকাশভূমি এই দেশের পাণ্ডিত্যের পরিমাণ করিবার জন্য ইউরোপে বাইতে হয়। তার ফল কিরূপ শোচনীয় হয় তাহার প্রমাণ এই যে, ম্যাক্সমুলারের মত লোকও তর্কালঙ্কারকে ঠিকানা করিয়াছিলেন, ‘আপনি কি আমার বন্ধুশব্দকল্প-ক্রমকার বাধাকান্তের পুত্র?’

(Are you the son of my old friend and correspondent, Radhakanta of Sabdakalpadruma?)

গ্রন্থকার তর্কালঙ্কারের স্মৃতিটির প্রমাণস্বরূপ ম্যাক্সমুলারের এই চিঠি খানা উদ্ধৃত না করিলেও পারিতেন। ইহাতে প্রশংসা খুব বেশী নাই, মরকোয়ানা আছে যথেষ্ট।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলার নারীজাগরণ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০৮, মূল্য—১০ মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নানা মুক্তি-আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় সত্যদাহ প্রথা নিরোধ আন্দোলন শুরু করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় এই নিগ্রম সামাজিক প্রথা বন্ধ করিতে সক্ষম হন। অতঃপর নারীজাগরণে মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু তাহাও নানা বাধা-বিয়ের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হয়। বিভাসাগর



চুল্লভ নয় মোটেই—

তরুণদের পেলব কোমলতা ও লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য সুষমা প্রকৃতির চুল্লভ দান। নিবিড় তরুণীর পরম কাম্য-বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিক যুগে নারীর পক্ষে এ সম্পদ চুল্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ‘ক্যাল-কেমিকো’র সযত্নে প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্যকে প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

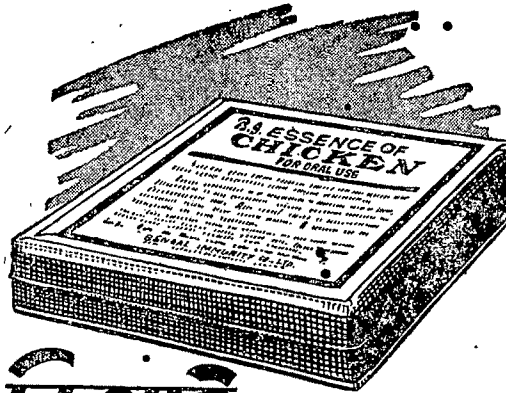
**ক্যালকাটা
কেমিক্যাল**

☆ **তুহিনা** বিউটিফিক
☆ **য়েনুকা** টয়লেট পাউডার
☆ **লাবনী** স্নো এক ক্রীম



যোগ্যে

হতসাহ্য ও কর্মশক্তিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার
করতে হলে লঘুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর বলাধানের
প্রয়োজন। বেসল ইমিউনিটি কোম্পানীর
“এসেন্স অব চিকেন” বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে
প্রস্তুত এবং সহজপাচ্য ও আশুফলপ্রদ।



বি.আই.এস.এস.এব
চিকেন
আদর্শ পুষ্টিবর্ধক

বেসল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা - ১৩

মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং বহু-বিবাহ নিবারণ আন্দোলন নারীর মুক্তি আন্দোলনের দুইটি বিশিষ্ট দিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বঙ্গের নারীজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। গ্রন্থকার বাংলার নারী জাগরণ-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নারী আন্দোলনেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া আন্দোলনের সর্বভারতীয় রূপের আভাস দিয়া বিষয়টি সুপাঠ্য করিয়াছেন। চন্দ্রমুখী বহু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—বাংলার এই কল্যাণের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট (১৮৮২)। তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দ্বার নারীদের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। চন্দ্রমুখী পাস করিলেও সার্টিফিকেট দাবি করিতে পারিবেন না, এই সর্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বাহ্য হউক ক্রমে ক্রমে বাংলার তথা ভারতের নারী-সমাজ নিজেদের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিতেছেন। এখন নারী-আন্দোলন পরিচালনা নারীরা নিজেরাই করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের কোন কোন প্রগতি-মূলক প্রচেষ্টায় আজ নারীরা নেতৃত্ব করিতেছেন। সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীরা আজ তাঁহার সমান অধিকার দাবি করিতেছেন এবং তাহা লাভও করিতেছেন। ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে নারীর আসন আরও উর্দ্ধে হইবে সন্দেহ নাই।

পুস্তকে মুসলমান নারী-আন্দোলনের নেত্রী জালাম (সাতকং মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়) ও সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ না থাকিলে যে ক্রটি হইয়াছে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধন করিলে শ্রেষ্ঠ হইবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত

প্রশ্ন—শ্রীজগদীশ ঘোষ। কাত্যায়নী বুক ষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

শুটি পাঁচ-ছয় মূখ্য চরিত্র লইয়া লেখক এই উপজ্ঞাস্থানি রচনা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এটি ‘প্রবাসী’তে ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল। তিনটি ভিন্নছাড়া যুবকের আদর্শ-নিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পাংশটি গঠিত; মোটামুটি একটা কোতূহল আগাগোড়া বজায় আছে। তবে রচনার দিকটা, বিশেষ করিয়া সংলাপ একটু দুর্বল। এবিষয়েও মাঝে মাঝে শক্তির পরিচয় পাওয়ায় মনে হয় লেখক প্রয়োজনমত বৈধ দিয়া বইখানি লেখেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ পুস্তকে বর্ণিত ভালবাসার বিকাশের কথাটা ধরা যায়—এক জায়গায়, অর্থাৎ পরেশ আর মালতীর মধ্যকার ভালবাসার চিত্রণে যে নিপুণতাটুকু লক্ষ্য করা যায়, অবনী আর লতিকার ব্যাপারে তা ক্ষুধ হইয়াছে।

বইটি ১২৮ পাতায় শেষ হইয়া গেছে,—যেমন গল্পের আয়োজন তাহাতে আরও কিছু জায়গা পাইলে ভাল হইত।

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ও পথে—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড। ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

লেখক একজন নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ধানীগোঁড়া, সাবলসিংপুর, পলাশপাই প্রভৃতি পল্লীগ্রামে প্রচারকাণ্ড করিতে গিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পল্লীর ব্যথা লেখক সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যোগ-শোক-আধিব্যাধি প্রপীড়িত পল্লীর নরনারীর প্রতি তাঁহার অপরি-

উৎকৃষ্টতম উপায়ে টাকা খাটাইতে চাহেন?

আমাদের “স্বাস্থ্য আন্দোলন” জমা রাখুন

সুদের হার			
১	বৎসরের জন্য শতকরা ৩।০	৭	বৎসরের জন্য শতকরা ৪।০
২	" " " ৪.০	৮	" " " ৫.০
৩ ও ৪	" " " ৪।০	৯	" " " ৫।০
৫ ও ৬	" " " ৪।০	১০	" " " ৫।০

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিমিটেড

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”,—কলিকাতা।

সীম দরদ পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে কুটিয়া উঠিয়াছে। কক্ষী হইলেও লেখক আসলে কবি। পল্লীর মানুষগুলিকে তিনি ভালবাসেন, 'গ্রাম ও পথে'র আকর্ষণ তাঁহার নিকট প্রবল এবং তিনি স্বপ্ন দেখিতে জানেন। তাঁহার ভাষায় এমনি একটি বাহু আছে যে পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতে হয় এবং ভাবাবেগে মন আন্দোলিত হয়। তাঁহার নিপুণ কলিকায় পল্লীর ছবি যেন চোখেবু সামনে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠে। শুধু প্রকৃতি বর্ণনায় নহে, চরিত্র-চিত্রণেও লেখকের শিল্পীমনের পরিচয় মেলে। সাগর হাজরা, খাঁ সাহেব, ভাবু মা (বরদামহী) প্রভৃতি চরিত্র পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। লেখকের শিল্প-চাতুর্যের দরুন এই প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে কথাসাহিত্যের আমেজ লাগিয়াছে। আজ সমস্ত দেশ জুড়িয়া গণ-আগরণের বড় বড় বুলি শোনা যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের সহিত যোগস্থাপন না করিলে গণ-আন্দোলন যে বার্থ হইতে বাধ্য, তাহা আজ বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাই আজ পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামকেই তাঁহার শেষ-সাধনার পাদপীঠরূপে বাছিয়া লইয়াছেন। লেখক তাঁহারই ম-শিষ্য এবং কোন পথে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, পল্লীগ্রামের দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা সমস্যা দ্রুত হইয়া প্রকৃত গণ-সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকে কথোপকথনরূপে তিনি সে বিষয়ে সমন্বয়যোগী ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই মূল বিষয়টির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

পৃথিবীর মানুষ নয়—ক্রীশাযুক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট—কলিকাতা মূল্য ১১০ টাকা।

লেখার বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্রতার জন্ম বইখানি শিশু-বৃদ্ধ সকলেরই ভাল লাগিবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা, ছবি ও বাঁধাই সুন্দর।

বইখানি সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

২৬শে জানুয়ারী—শ্রীনরেন সেনগুপ্ত ও শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯ টেশন রোড—ঢাকা হুইতে শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১১০ টাকা।

দেশাত্মবোধক কবিতার পুস্তক। প্রত্যেকটি কবিতাই ভাষা ও ভাবের ঔজ্জ্বল্যে মনোহারী। বর্তমান সময়ে এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশ আমাদের জাতীয় কাগরণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম।

যুগের যাত্রী—শ্রীধরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভারতী ভবন—১১ বক্সি চাট্‌জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২১০ টাকা।

পাঁচটি অংশে বিভক্ত উপন্যাস। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীতে মৌলিকত্ব আছে এবং তাঁহার ভাষাও বেশ সাবলীল।

অমরার অমৃত সাধনা—শ্রীদেবদাস বোষ; শ্রীধর লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখকের রচনার মধ্যে যে আবেগ-প্রবণতা দেখা যায়, তাহা সংযমের সহিত ব্যবহৃত হইলে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে—ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম। দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকখানি সকলের পড়িয়া দেখা উচিত।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

আমাদের বন্ধন

ব্লাড-ভিটা

নিরলোচন ও অমজারিত যে কোন রোগের আশঙ্কা টানিও বন্ধ হোক

অন্তিম মমত্ব বানুর

মেডিকেল রিসার্চ লেবোরেটরি

নিঃসৃত এডালিউ, কলিকাতা

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটি উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অস্থখ্যেই হউক বা স্বস্থ অবস্থাতেই হউক, যখন কোনো কারণে আমাদের জীবনশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটি টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহাৰ্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটি দোষ এই যে উহা দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র স্থনির্বাচিত কোনো খাদ্যদ্রব্যই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

আনা-ভিটা এই সকল কারণেই একটি আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অক্ষরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

আনা-ভিটা স্থনির্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মণ্ডযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা স্বস্থ কি অস্থস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বদ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া আনা-ভিটা রোগান্তে ও বদ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে আনা-ভিটা মস্তিষ্ক,

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

আনা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্ডযুক্ত সয়াসীম আনা-ভিটার আর একটি অপূর্ণ সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। আনা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুগুণীর সৃষ্টি পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের স্থনির্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ আনা-ভিটাতে অগ্ন্যাগ্ন নানা মূল্যবান উপাদান ছাড়াও দুইটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ আনা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মণ্ড ও সয়াসীম থাকাতে আনা-ভিটা কেবল যে স্বস্থাত্ম ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অগ্ন্যাগ্ন খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ণ খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

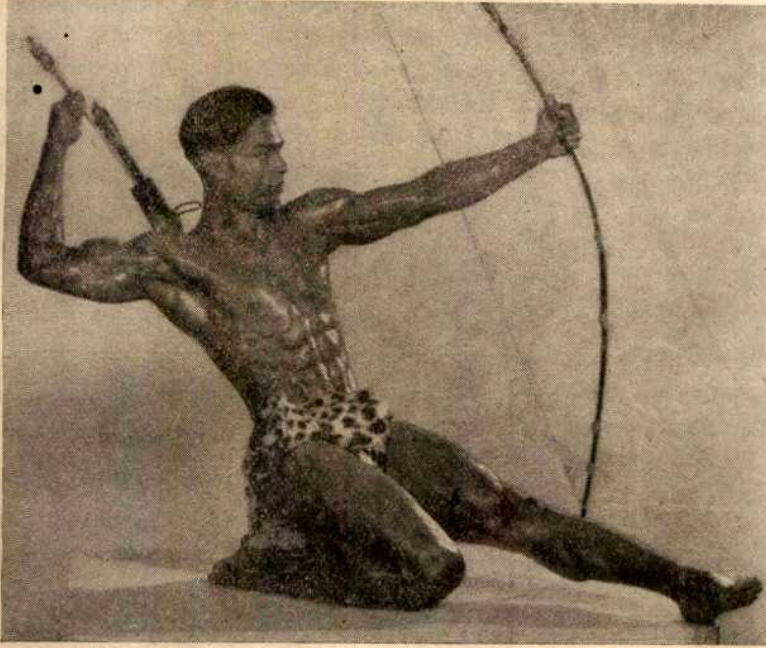
প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদেহের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। আনা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অগ্ন্যাগ্ন মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্কি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিত্যন্ত সহজপাচ্য অবস্থায় আনা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

আনা-ভিটা কি স্বস্থ কি অস্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। আনা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

দেশ-বিদেশের কথা

ব্যায়ামবীর মনতোষ রায়



মনতোষ রায় কর্তৃক “সমুদ্র-শাসন” প্রদর্শন

অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত শরীরচর্চা সম্মেলনে বিফুচরণ ঘোষের প্রধান শিষ্য-ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত মনতোষ রায় পাঁচ হাজারেরও অধিক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ক্রমাগত পাঁচ দিন প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর মেজর-জেনারেল শাহনওয়াজ মনতোষ বাবুর প্রথম স্থান অধিকার করিবার কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে মালাভূষিত করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের আদর্শে উদ্ভূত হইয়া আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ধর্মপ্রচার, তীর্থসংস্কার, সন্ন্যাসী সঙ্ঘ-সংগঠন, হিন্দু-সমাজ-সমস্যা আন্দোলন, শিক্ষাপ্রচার, লোক-সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ধর্মপ্রচারের জন্ত সঙ্ঘ বহু সন্ন্যাসীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বহির্ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। হিন্দু জাতি বাহ্যতে আবার আত্মস্থ হইয়া, বিভেদ ভুলিয়া সজ্জব হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল হিন্দুর মিলনক্ষেত্র রূপে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে হিন্দু মিলন-মন্দির স্থাপন ও হিন্দু রক্ষীদল গঠন করিতেছেন। সঙ্ঘের এই জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টায় হিন্দু যাত্রাবই সহায়তা ও সহযোগিতা করা উচিত। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র-ব্যবহার করিলে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। • স্বামী বেদানন্দ, জেনারেল সেক্রেটারী—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

অধ্যাপক হরিরঞ্জন ঘোষাল

মজঃফরপুর সরকারী জি. বি. বি, কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন ঘোষাল এম-এ, বি-এল, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ “বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৯৩-১৮৩৩)” সম্বন্ধে গবেষণায় রত ছিলেন। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি “ডক্টর অব লিটারেচার” উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষাল এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র।

“এটম চরকা”

(ATOM CHARKA)

আমরা এই চরকা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা মাত্র সাত ইঞ্চি দীর্ঘ এবং প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। অথচ ইহা দ্বারা সাধারণ চরকার ন্যায় স্ততা কাটা যায়। এই চরকা এত ছোট যে যে-কোন স্থানে বসিয়া স্ততাকাটা চলে। ইহার কলকজা খুবই সরল। দীর্ঘকাল ব্যবহারেও অটুট থাকে। ইহা ছাত্রছাত্রী ও ভ্রমণরত কর্মীর খুব উপযোগী হইয়াছে। সম্বন্ধেই পকেটে করিয়া

লওয়া যায়। মূল্য মাত্র ২৫০ টাকা।

প্রাপ্তস্থান : ১। দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দশগ্রাম, মেদিনীপুর। ২। গান্ধীভবন, কৃষ্ণনগর, হৈদ্রাবাদ, মেদিনীপুর। ৩। শিল্পাশ্রম, বি ৭৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

খুলনার জননায়ক নগেন্দ্রনাথ সেন

খুলনার বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এল, গত ২২শে ডিসেম্বর, ৭৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। খুলনা জেলার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং জনহিতকর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি অনাড়ম্বর প্রবীণ কংগ্রেস-সেবী রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ আকৈশোর কংগ্রেসের অমুরাগী ছিলেন। ১৮৮৬ সালে টিভোলি গাউনসে কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন নগেন্দ্রনাথ স্কুলের ছাত্র। সেই কিশো-বয়সেই তিনি ইহার স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ একজন সুযোগ্য সাংবাদিকও ছিলেন। ১৮৯৯ সালে খুলনার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র “খুলনা”র সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় স্তরের শিরোভূষণ (Motto) রূপে তিনি “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র ব্যবহারের প্রথম গৌরব অর্জন করেন। বুঝের যুদ্ধের সময় তাঁহার সম্পাদকতায় মক্কেলে “খুলনা”ই প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। “খুলনা”র সম্পাদক রূপে এবং পিণ্ডল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতিরূপে তিনি খুলনায় জনহিতকর নানা আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে খুলনা বাবে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সালে পুনরায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন।

হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তিনি খুলনা আধিপত্য সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হওয়ার পরে তিনি কংগ্রেসের নির্দেশমত সভাপদ ও ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকন্ধ্যা হইয়া তাঁহার অধ্যাপক আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত খুলনা ও উত্তর বঙ্গে ভ্রমিষ্ণে ও বঙ্গীয় আর্ন্তিক্রাণের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিগত আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় তিনি খুলনা জিলা-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি সপরিবারে আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি বাকুলি গ্রামে আইন অমান্তের জঙ্ঘ অভিধান করিয়া কারাবদ্ধ হন।

ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত

কেটালিপাড়ার (ফারদপুর) ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়



সারদাচরণ দাশগুপ্ত

প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এতদঞ্চলের সুপরিচিত জননেতা ও সমাজসেবক রূপে সকলের শ্রদ্ধা পাত্র ছিলেন।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দ্বারভাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠয়ারি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি দ্বারভাঙ্গা বাঙালী সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং স্থানীয় বাংলা স্কুল, বারোয়ারি সজ্ব প্রভৃতি বাবতীয় অস্থানের ও প্রাতিষ্ঠানের সাত্ত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর প্রকৃতির জঙ্ঘ শশিভূষণ স্থানীয় বিহারী এবং বাঙালী উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ত্রিহস্তের এ-প্রান্তের বাঙালীসমাজ সবিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইল।

শ্রীমতী আমতুস সালাম

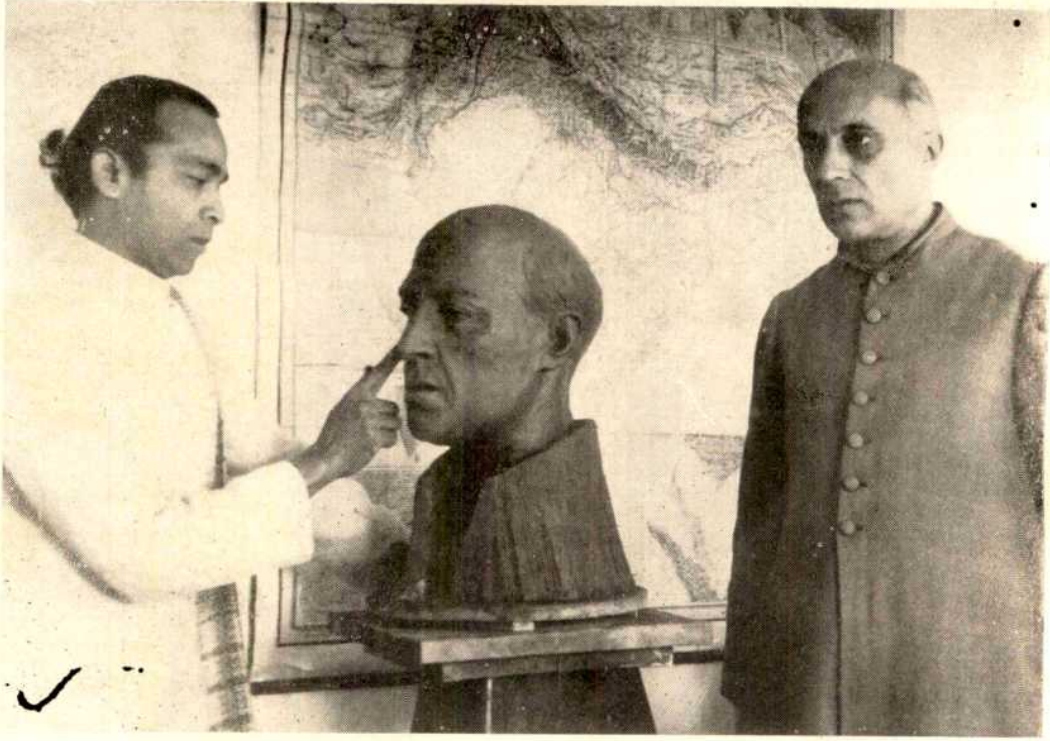


হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমতুস সালাম অনশন-ব্রত অবলম্বন করেন। অনশন ভঙ্গের দুই দিন পরেই তিনি চরকার অত্যা কাটিতেছেন এবং চরকার প্রয়োজনীয়তার কথা সমবেত নারীদিগকে বুঝাইয়া বলিতেছেন।

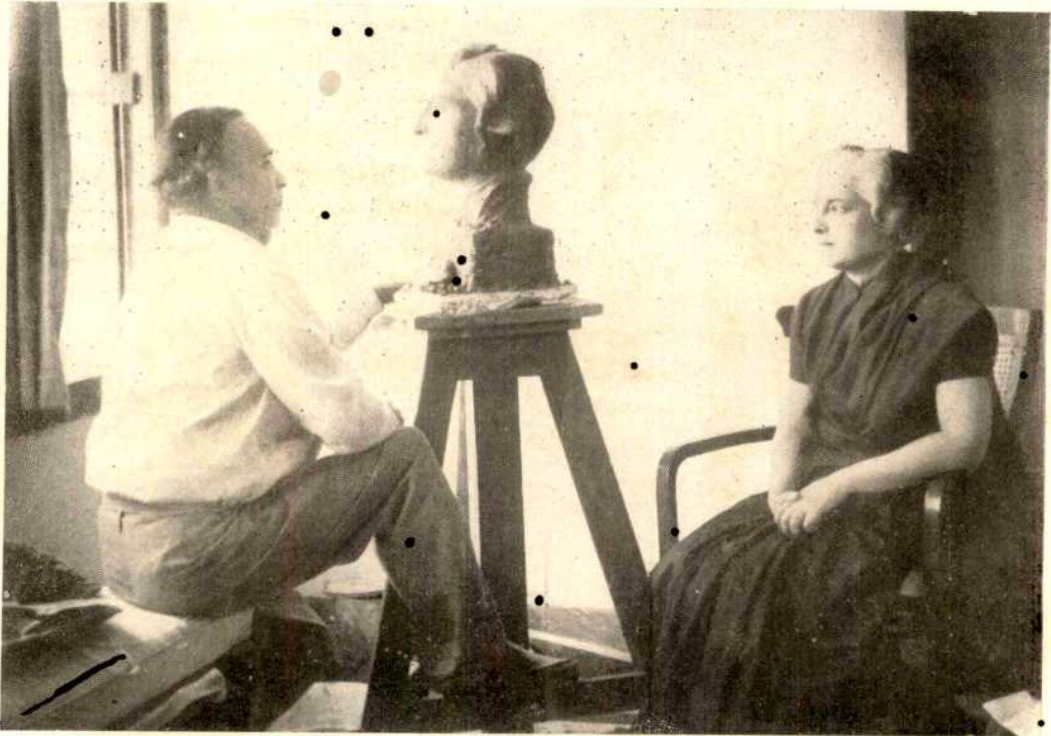


শ্রবাসী শ্রম, কলিকাতা

দেবতার গ্রাস
হ্রীহরব্রজ সেনগুপ্ত



পণ্ডিত জগদ্বাহরলাল নেহরুর প্রস্তরমূর্তি নির্মাণরত শ্রীমুখীর খান্দগীর



শিল্পী মুখীর খান্দগীর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মূর্তি গড়িতেছেন

প্রবাস

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নামমাস্ত্যৈ বলহীনেন লভ্যঃ”

৪৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৫৩

৬৬ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত ত্যাগের তারিখ

পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটেন ভারত শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে সরিয়া যাইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্বন্ধে বলা হয় যে, প্রয়োজনবোধে ব্রিটেন উহা কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের হাতে অথবা প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের হাতে দিতে পারিবে। এই সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের কার্যকালের অবসান ঘোষণা করিয়া বড়লাটপদে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এই ঘোষণার পর হাউস অব লর্ডসে এবং হাউস অব কমন্সে রক্ষণশীল দল বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং শ্রমিক গবর্নমেন্টের কার্যের বিরূপ সমালোচনা করেন। লর্ডস সভায় প্রাক্তন সার স্যামুয়েল হোর, বর্তমানে লর্ড টেম্পলউড, গবর্নমেন্টকে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন, কমন্স সভায় বাক্‌বিভূতি বিকীরণ করেন মিঃ চার্লিস এবং সার জন এডার্সন। ইহাদের কাহারও বক্তৃতায় মাইনরিটি সংরক্ষণের মান্বলী বুলি ছাড়া সার কথা কিছুই ছিল না। ভারত ত্যাগের তারিখ নির্দেশের প্রতিবাদ সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলের নেতা লর্ড স্যামুয়েল শুনাইয়া দেন যে রক্ষণশীল দলের জাতি ও অদূরদর্শিতার জড়ই ব্রিটেন আমেরিকা, আয়ারল্যান্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হারাইয়াছে এবং ইহারা কেহই আজ ব্রিটেনের আন্তরিক মিত্র নহে। শ্রমিক দল যেহেতু ভারত ত্যাগে স্বীকৃত হইয়া ভারতবাসীর বন্ধুত্ব রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিতেছেন। রক্ষণশীল দলের নেতারা পণ্ডিত, নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের সম্বন্ধে কষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিলেই শ্রমিক দলের মিঃ আলেকজান্ডার, সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি তাহাতে বাধা দেন এবং বুঝাইয়া দেন যে, কংগ্রেস-নেতাদের আন্তরিকতা, দূরদর্শিতা এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা গভীর প্রভাবান।

মাইরিটি সংরক্ষণের বুলি বাঁহারা জাগড়াইয়াছেন এবার তাঁহারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের আদিমজাতি এবং অহরত

সম্প্রদায়ের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মাইনরিটি স্বার্থ-সংরক্ষণের ভার ইংরেজ চিরদিন নিজেদের হাতেই রাখিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে মাইনরিটি রক্ষার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপরে পর্ষত্ত্ব অর্পিত হয় নাই, উহা দেওয়া হইয়াছিল গবর্নরের হাতে। ইহার ফলে কোথাও মাইনরিটির উন্নতি হয় নাই। কংগ্রেস প্রদেশে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের ও সমাজসেবকদের চেষ্টায়, গবর্নরের উদ্যোগে নহে।

মাইনরিটি বলিতে রক্ষণশীল ইংরেজ চিরদিন বুঝিয়াছে প্রধানতঃ মুসলমান, এবং তৎপরে তপশীলী হিন্দু ও আদিম জাতি। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের হিন্দু মাইনরিটির দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখে একটি কথাও যোগায় নাই। বাংলায় ও সিন্ধুতে হিন্দুদের উপর যে সম্ভবতঃ অত্যাচার চলিতেছে তাহা নিবারণে মাইনরিটি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত গবর্নরের কোনই হুশিঙ্গা নাই, এই অত্যাচারের নায়ক লীগ গবর্নমেন্টসমূহের অপচেষ্টা বন্ধ করিবার কোন প্ৰয়াস তাঁহারা কখনও দেখান নাই। গবর্নরদের যে রাজকীয় উপদেশপত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সময় তাঁহারা যেন উহাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেন। বাংলা ও সিন্ধুর গবর্নরেরা রাজ্যের এই উপদেশ অমান্য করিতেও ঘিরা করেন নাই। বাংলাদেশে হাইমচরে অহরত শ্রেণীর লোকদের উপর লীগওয়ালারা যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার প্রতিকারে বাংলার গবর্নর কোন কাজই করেন নাই, চার্লিস, এডার্সন, টেম্পলউড প্রভৃতির কণ্ঠেও তাহাদের প্রতি একটু সমবেদনাও ধ্বনিত হয় নাই।

ওয়াভেলের অপসারণকে চার্লিস পদচ্যুতি বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ইহা স্বীকার করাইবার জটিলতার বার মিঃ এটলীকে প্রদত্ত করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যে যে ভাবে বিশ্ব স্থাপ্ত করিয়াছেন এবং লীগকে ডাকিয়া আনিয়া অন্তর্ভুক্ত গবর্নমেন্টের

কাজে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অপ-
সৃতির মূল কারণ ইহা সকলেই অনুমান করিতেছেন।
লর্ড ওয়ার্ডেলের কার্যকলাপ সমালোচনার অতীত নহে।
ব্রিটিশ শ্রমিক দল কর্তৃক ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের
অভিপ্রায় সার্থক করিবার কোন সহায়তা তিনি তো করেনই
নাই, অধিকন্তু নিজে এবং সিঙ্কলাট মূর্খী ও সীমান্তলাট
কার্যার প্রগতিবিরোধী কার্য সমর্থন করিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
উদ্দেশ্য বানচাল করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের
আসামের গবর্নর পদে একজন মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থাও
তিনিই করিয়াছেন। পঞ্জাবের গোলযোগ সৃষ্টি ব্যাপারে
তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী আবেল সাহেবের কীর্তিকলাপও
প্রকাশ পাইয়াছে। রাজনৈতিক দপ্তরের বুনা রক্ষণশীলদের
সাহায্যে দেশীয় রাজ্য এবং কংগ্রেসের মিলন-পথে বাধা সৃষ্টি
করিবারও কম চেষ্টা তিনি করেন নাই। এলেনবির শিষ্যরূপে
তিনি নিজেকে জাহির করিয়া আসিয়াছেন এবং ভারতবাসীও
তাঁহার কথার এতদিন বিশ্বাসই করিয়াছেন। প্রথম তিনি
ধর্ম পড়েন কংগ্রেসকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া অন্তর্ভুক্তি গবর্নমেন্টে
লীগকে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে। তাঁহার এই আচরণের
প্রকাশ্য সিদ্ধি কংগ্রেস-নায়কেরা মীরাট কংগ্রেসে করিতে বাধ্য
হন। বড়লাটের পদচ্যুতি ব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথম।
ওয়ার্ডেলকে অপসারণে শ্রমিক গবর্নমেন্ট যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন
তাহাতে তাঁহাদের উপর দেশবাসীর আস্থা আরও দৃঢ় হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণা
সম্পর্কে কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব
হইতে একত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে
কমিটি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এই ক্ষমতা হস্তান্তর যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে হইতে পারে,
একত্র কার্যতঃ অন্তর্ভুক্তি গবর্নমেন্টকে আগেই ডোমিনিয়ন গবর্নমেন্ট
বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কর্মচারী ও শাসন-
ব্যবস্থা ইহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং বড়লাট ইহার
নিয়মতান্ত্রিক নেতা হইবেন। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সহ
কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভারূপে কার্য করিবেন। অত্র কোন
ব্যবস্থাই সুশৃঙ্খল শাসনকার্যের সহায়ক হইবে না এবং
এই সদ্ধিকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্রুত বিপজ্জনক
বিবেচিত হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মের বিষয়িত
গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যাও মানিয়া
লইয়াছেন তাহা পূর্বেই জানাইয়াছেন। শুই ভিত্তিতেই গণ-
পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইতেছে এবং বিভিন্ন কমিটি গঠিত

হইয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহার
বিভিন্ন অংশের শাসনতন্ত্র যাহাতে রচিত হইতে পারে, একত্র
গণ-পরিষদের কার্য আরও দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন।

কতিপয় দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করিয়াছেন, কমিটি একত্র তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতে-
ছেন। কমিটির বিশ্বাস ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা
ব্যাপারে সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং তাঁহাদের প্রজাগণ যোগদান
করিবেন। এই ঐতিহাসিক কার্যে যোগদান করিবার
জন্য কমিটি গণ-পরিষদে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের
নিকট আবার অনুরোধ জানাইতেছেন।

গণ-পরিষদের কার্য স্বেচ্ছাধীন। ওয়ার্কিং কমিটি বহু বার
জানাইয়াছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার বাধ্যতা-
মূলক কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। এই বাধ্যতামূলক
ব্যবস্থার ভীতি, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে।
এই ভয় দূর হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা সহজ হইবে
এবং সকলের পক্ষে সমান সুবিধাজনক ভাবে সকল সম্ভ-
দায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। সুশৃঙ্খলভাবে
বলা হইয়াছে, গণ-পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন,
যাহারা উহা গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহাদের উপরই উহা
কার্যকরী হইবে। যদি কোন প্রদেশ বা প্রদেশাংশ
ইহা গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়
কোনক্রমেই তাহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে
না। সুতরাং কোন পক্ষেই বাধ্যতামূলক কিছু থাকিবে না,
জনসাধারণই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবেন। এই
ভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মতিসূচক সাধারণতন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত
গ্রহণ সম্ভব।

বর্তমানে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত এবং
ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার ভারতীয়গণেরই উপর।
এজন্য ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত দল, সকল সম্ভদায় এবং সমস্ত
ভারতবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন যে, তাঁহারা
হিংসা ও বলপ্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে
শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হউন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়
আসিয়াছে। কেহই বাধা দিতে পারিবে না অথবা নিষেধ
ধাকিতে পারিবে না। যুগ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত,
শীঘ্রই নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে। নূতন যুগের এই নূতন
উদ্যাকে আমরা যেন সানন্দে অভিনন্দিত করিতে পারি।
হিংসা দ্বেষ অতীতের বস্তু হউক।

ওয়ার্কিং কমিটি পঞ্জাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ
করিয়াছেন :—

পৈশাচিক হিংসা, হত্যাকাণ্ড এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা রাজ-
নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টার ফলে গত সাত মাস ভারতবর্ষে
বহু বীভৎস ও শোকাবহ ঘটনা ঘটয়াছে। এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ

হইয়াছে; উহা ব্যর্থ হইবেই। ইহার ফলে ব্যাপক হিংসা এবং নরহত্যাই দেখা গিয়াছে।

পঞ্জাব প্রদেশে এত দিন উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত ছিল। ছয় সপ্তাহ পূর্বে ঐ স্থানে এক আন্দোলন শুরু হয়। উক্তপক্ষে অধিষ্ঠিত কয়েক ব্যক্তির উহাতে সমর্থন ছিল এবং অনগ্রসর মস্ত্রিমণ্ডলীকে চাপ দিয়া ভাঙিয়া ফেলাই উক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। শাসনতান্ত্রিক কোন উপায়েই উহার ক্ষতি করা সম্ভব হইত না। উহাতে কিছু সফলতা দেখা দেয়। যে দল উক্ত আন্দোলন চালনা করে, তাহাদের সাহায্যেই একটি মস্ত্রিমণ্ডলী গঠন করার চেষ্টা হয়। উহার তীব্র বিরোধিতা করা হয়; ফলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নরহত্যা এবং অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। অমৃতসর এবং মুলতানে বীভৎসতা এবং ধ্বংসের পরিমাণ অত্যধিক।

এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বলপ্রয়োগদ্বারা পঞ্জাবের সমস্তা সমাধান করা যাইবে না; ঐরূপ কোন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতেও পারে না। যতদূর সম্ভব বঙ্গ বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের ভিত্তিতে উক্ত সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। পঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে অ-মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ সমাধানের প্রস্তাব করিতেছে। ইহা দ্বারা পরস্পর বিবাদ, ভয় বা সন্দেহ হ্রাস পাইবে। এই হত্যাকাণ্ড এবং নৃশংসতা বন্ধ করিবার জন্য এবং বর্তমান শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হইয়া উহা সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য কমিটি পঞ্জাবের জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছে। সমস্তার ঐরূপ সমাধান করিতে হইবে যে, উহা কোন ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক হইবে না এবং বিপদের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে।

বঙ্গ বিভাগ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত ঘোষণার মধ্যে কয়েকটি অংশ বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেননা বর্তমানে মিঃ এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার পর, বাংলার ও বাঙালীর ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হইবে বা দাসত্বের আদিম অন্ধকারে আবৃত থাকিবে সে বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছে। “গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাঞ্জে” যদি আজ সারা ভারতবর্ষে কেহ থাকে তবে সে বাঙালী। তাহার আত্মপ্রাণি মোচনের, তাহার সকল জাতিগত ব্যাধি ক্ষালনের যদি কোনও উপায় থাকে তবে

তাহা স্বাধীনতার আলো। এ বিষয়ে আশা করি কাহারও মনে সন্দেহ নাই যে এই সর্বস্বহারা, নেতৃহীন, বুদ্ধি-বিবেচনা ও রাষ্ট্রগঠন-প্রতিভার দৈর্ঘ্যে অভিশপ্ত দেশের চরম দুর্গতি নিবারণের যদি কোনও পথ থাকে তাহা হইলে সে পথ স্বাধীনতার পথ। এই স্বাধীনতার পথ কোন দিকে তাহার একমাত্র নির্দেশ আমরা এত দিনে পাইয়াছি ব্রিটিশ মস্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায়, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির উপরোক্ত প্রস্তাব-গুলিতে। বাংলার ও বাঙালীর যাহারা মাথা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন যাহারা সেই আসনগুলি অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেশের অবস্থার দ্রুত অবনতিতেই এত দিন পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে যে সুযোগ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়াছে সে সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহারা দেশকে কি ভাবে চালনা করেন তাহাই সন্দেহ। যিনি দৃঢ়ভাবে বাধা উপেক্ষা করিয়া দেশকে ঠিক পথে চালাইতে পারিবেন, তাঁহারই নাম বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে, যিনি বুদ্ধির অভাবে বা অজ্ঞতার দ্বারা নির্দেশ দিবেন তাঁহার উদ্দেশ্যে বাঙালীর অভিশাপ চিরদিনই বর্ষিত হইবে।

ভারতে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার দিনক্ষণের শেষ নির্দেশ হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও চরমভাবে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে যে, যে প্রদেশাংশ উক্ত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক কোনক্ষেত্রেই তাহাকে বাধা দেওয়া হইবে না, অতঃপক্ষে যাহারা অনিচ্ছুক তাহাদিগকেও জোরজবরদস্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে টানিয়া আনা হইবে না। বলা বাহুল্য, এই ইচ্ছা বা অনিচ্ছার একমাত্র ইঙ্গিত আসিতে পারে জনমত হইতে এবং কোন অঞ্চল ইচ্ছুক বা কোন অঞ্চল অনিচ্ছুক তাহা নির্ধারিত হইবে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের অধিকাংশের জনমতের উপর। যদি ইচ্ছুক দল সেই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন তবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রে যাইবে, অতঃপক্ষে যাইবে না। বাংলার কোন জাতীয়তাবাদী বাঙালী আছে যে ঐ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে না? কিন্তু হৃৎকের বিষয় বাংলার সকল অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের ওজন সমান নহে, সুতরাং সেই প্রদেশাংশই যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে পারিবে যেখানে বাঙালী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেননা বাঙালী হিন্দুর প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী।

বাংলার বেশ ধানিকটা যদি স্বাধীন হয় তবে বাঙালীর দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ কল্পকটা পরিষ্কার হইবে, বাঙালী জাতির ভবিষ্যতে আশার আলো জ্বলিতে থাকিবে, সকল জাতীয়তাবাদীর একটি আশ্রয়স্থল, একটি দুর্গ থাকিবে যেখানে যে কোনও বাঙালী ঠাড়াইয়া বলিতে পারিবে “আমি স্বাধীন, আমি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক...”

এ কথা যেমন নিছক সত্য তেমনিই ইহাও সত্য যে, যে পথে জাতীয়তাবাদী বাংলা ও বাঙালী আজ দুর্গতির ও ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, সমস্ত বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গেলে সে ধ্বংসের পথে সমস্ত জাতীয়তাবাদী বাংলার—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর—গতি দ্রুততর হইবে। আজ যাহারা বাহির হইতে আসিয়া বাঙালী হিন্দুকে সর্বনাশী ও সর্বপ্রাণী শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কাল সমগ্র বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে চলিয়া গেলে তাঁহাদের আগমনের পথও বিষম-ভাবে সঙ্কীর্ণতর হইবেই। দেশের ভিতরে যাহারা আছেন ও থাকিবেন, যাহাদের মধ্যে এখন কয়েকজন নানারূপ কূটতর্কের অবতারণা করিতেছেন, তাহারা তখন কি করিবেন তাহার পরিচয় নোয়াখালীতেই পাওয়া গিয়াছে। আজ বাংলা-দেশে পূর্ণ পাকিস্তান হয় নাই, এ অবস্থাতেও সেখানে বাঙালীকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এক জন প্রণয় ক্ষীণদেহ অতিবৃদ্ধ অবাঙালী। কাল তাঁহার অবর্ত-মানে লীগের করাল ঐদ হইতে বাঙালী হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে ?

স্বাধীনতা মানুষের ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার। অতঃপর স্বাধীনতা অপহরণ করা যত বড় পাপ, তাহার স্বাধীনতা-লাভের পথে বাধা দেওয়াও তত বড় পাপ। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকল যুক্তিই ভুয়া, সকল তর্কই মিথ্যা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্বাধীনতা লাভের উপায় যাহার, রহিয়াছে তাহাকে বাধা দেওয়ার জন্য যত কূট তর্কের, যত যুক্তির অবতারণাই করা হোক স্বাধীনতাকামী নিকট—মোক্ষকামীর সম্মুখে পাপের প্রলোভনের ন্যায়—সে সকলই অগ্রাহ ও তুচ্ছ। রাম ও ঞাম দু-জনেই স্বাধীনতাকামী, যদি রাম স্বাধীনতা পাইয়া যায়, ছোট ভাই ঞাম তাহার অংশ চাহিতে পারে বা নিজের স্বাধীনতা লাভের জন্য সাহায্য চাহিতে পারে, কিন্তু “আমি স্বাধীন না হইলে তোমাকে স্বাধীন হইতে দিব না” একথা বলা তাহার অধিকার তো নাই-ই, বরঞ্চ একথা ঘূরাইয়া বলিলেও সে রামের শত্রু, এবং রামের সহিত তাহার সম্পর্ক যতই নিকট, এরূপ বাধাদান ততই ঘৃণ্য, ততই নীচ, ততই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখা এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক বাঙালী জাতীয়তাবাদীই বুঝিবেন যে বাংলা আংশিক ভাবেও স্বাধীন হইলে বাঙালীর তবু কিছু আশাশ্রয়সা আছে। ভবিষ্যতে বাঙালীর ছেলে-বুড়োর, স্ত্রী-পুরুষের একটা আশ্রয়-স্থল থাকিবে যেখানে তাহারা নির্বিবাদে শক্তিগঠন করিতে ও নিজের মত নিজের জীবন যাপন করিতে পারিবে। অতঃপর “বাঙালী হিন্দুর চরম দুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্য। যাহারা বলিতেছেন “এখন আংশিক স্বাধীনতা লইও না, পরে আমরা সমস্ত দেশকে লড়িয়া স্বাধীন করিব” সেই সকল বাকসর্বস্ব লোকের কার্যশক্তি ও যুদ্ধদানের ক্ষমতার

পরিচয় তো আজ বিশ বৎসর যাবৎ বাঙালী হাড়ে হাড়ে পাইয়াছে, আজ আর শোকবাক্যে তুলিবার বা মিথ্যা তর্ক-জালে অঙ্ক হইবার সময় নাই। এই সন্ধিক্ষণে ভাবের উচ্ছ্বাসে গা ভাসাইয়া নির্বোধের মত আত্মঘাতী হওয়ায় কোনই ফল ফলিবে না, কেননা এরূপ বলিদান, ন দেবার, ন ধর্ম্য, উহা বলিই নহে, উহা বিকৃতমস্তিষ্কের আত্মহত্যা। বাংলার যে যে অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন তাহাদের এখন সুস্পষ্টভাবে সজবদভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, “আমরা স্বাধীনতা চাই, আমরা এখনই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ-দান করিতে চাই। আমাদের আত্মীয়স্বজন, সন্তান-সন্ততির স্বাধীনতার ব্যবস্থাই আমাদের নিকট সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়, অস্ত সকল কথা পরে আসিবে।”

আনামকে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, আশাম যদি স্বাধীনতা চায় তবে ছনিয়ায় কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। আজ আমরা বাংলার হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসী দিগকে বলিতেছি যে, যদি তাহারা স্বাধীনতা চাহেন তবে ছনিয়ায় কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। মহাত্মাজী যে যুক্তিতে আশামকে বাংলা হইতে পৃথক হইতে বলিয়াছেন সেই যুক্তিই এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীনতার পথে যাহারা কাঁটা দিতে চাহেন তাহাদের এক দল মহাত্মাজীর উক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে পশ্চিম বাংলার পক্ষে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করা মহা পাপ। আমরা বলি মহাত্মাজীর এই উক্তি অবিধাণ্য। আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি আশামকে স্বাধীন থাকিতে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গকে বলিবেন দাঙ্গা বরণ করিতে। সুতরাং এই উক্তি প্রচারের মধ্যে প্রচলিত মিথ্যা আছেই। মহাত্মাজী বলিয়াছেন বাংলাদেশকে হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক বসতি হিসাবে বিভাগ করিলে এদেশে অস্তঃকলহ চিরস্থায়ী হইবে। সে কথা ঠিক, কিন্তু বাংলাকে ধর্ম হিসাবে বিভাগ করার কথা কে তুলিয়াছে ? আমরা তো সে কথা শুনি নাই, বলিও নাই। আমরা চাই বাংলার যতটা অংশ সম্ভব স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করার, সে অংশে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলেই যেমন আছে থাকিবে। সুতরাং বাংলা বিভাগের এরূপ ব্যবস্থার কথা তিনিই মহাত্মাজীকে বলিতে পারেন যিনি নিজের নাক কাটিয়া পরের যাজ্ঞাভঙ্গ করিতে উদ্ভত। সর্বশেষে পুনর্বার বলিব যে, যদি মহাত্মাজী সব ঠিক শুনিয়াই এরূপ মত দিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাহার এ মত অগ্রাহ, কেননা, তাহার বিচারে তুল হইয়া থাকিবে। কারণ, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও দাসত্ব বরণের সপক্ষে কোন যুক্তিই ন্যায় বা ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলিবার অধিকার কোনও মানুষের আছে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

“হিন্দু-মুসলমান পৃথক হইলে দেশের সর্বনাশ,” “ভাই ভাই এক ঠাই ভেদ নাই ভেদ নাই,” ইত্যাদি উপদেশ মহাত্মাজী বহু বার দিয়াছেন, এবং তাহারও বহু পূর্বে বহু দেশপুঙ্খ ব্যক্তি আমাদের সে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা সে উপদেশ

আজ পক্ষীয় বংসর যাবৎ তনিয়াছি, মানিয়াছি এবং মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অল্প পক্ষ সে কথা তনিতেছে না, মানিতে প্রস্তুতও নহে, বরঞ্চ যতই তাহার জ্ঞান এ পক্ষ স্বার্থ ছাড়িয়া দিতেছে ততই তাহার লালসা ও হিংসাত্মকতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কোনও প্রতিকার কাহারও দ্বারা হয় নাই, মহাত্মাজী বহুবার চেষ্টার পর এখন শেষ চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের মুখেই আমরা শুনিতেছি যে সে চেষ্টা সফল হওয়ার কোনও চিহ্ন এখনও দেখা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায় আমাদের উচিত বাস্তব জগতে কিরিয়া আসা এবং মহাজনের উপদেশ স্থানকালপাত্র বিবেচনা করিয়া তবে প্রয়োগ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করা। শীতপন্থী মুসলমান যেদিন বলিবে, সে হিন্দুর ভাই—সেদিন সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে সে কথা বলাইবে কে, কবে ও কি উপায়ে? তাহার বর্তমান মনোবৃত্তি যতদিন থাকিবে ততদিন মহাত্মাজীর উপদেশ যেভাবে প্রচারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী কার্য করিলে সমস্ত বাঙালী হিন্দুর হৃদয়সর্ব্ব ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে আর অল্প উপায় থাকিবে না। অবশ্য বাঙালী হিন্দু সর্বদাস্ত হইয়া আজীবন পশুর মত থাকিবার অল্প কিছু স্থান বাংলায় পাইতে পারে, তবে সে, স্বাধীনতার কথা দূরে থাক, মনুষ্য পর্গায়ে থাকার কথাও ভাবিতে পারিবে না। মহাত্মাজী স্বচক্ষে ঐরূপ অবস্থা নোয়াখালীতে দেখিয়াছেন। সমস্ত বাংলাদেশে হিন্দুর ঐরূপ অবস্থা ইউক ইহা তিনি নিশ্চয়ই চাহেন না। ইহার প্রতিকারের উপায় এখনও তিনি পাইতেছেন না, খুঁজিতেছেন মাত্র। তবে যদি ইহার ঐরূপ মনুষ্য বাস্তব জগতে প্রয়োজ্য নহে এ কথা বলা হয় তাহা হইলে তাহাতে ভুল কোথায়?

পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীনতার আশা ছাড়িয়া দাসত্ববরণ করিলে পূর্ববঙ্গের উপকার হইবে এ কথা প্রমাণ হইলে—সে কথা যতই স্বার্থপরতা ও পরকীয়তাতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হউক—বরঞ্চ তাহাতে কিছু থাকিবে। যখন তাহাও নহে তবে এ ভয়াঙ্কর ভোকব্যাক্য ও কূটতর্ক কিসের জন্ত?

বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে অভিমত

বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। তাহার সম্পূর্ণ বিচার বারান্তরে করার ইচ্ছা আছে। সম্প্রতি যুক্তিগুলি আমরা একত্রে পাঠকবর্গের বিচারের জন্ত উপস্থিত করিতেছি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী 'জয়হিন্দ' পত্রিকা আপিসে ত্রীমুখ অধিল-চক্র দত্তের আহ্বানে একটি সভায় বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। তাহাদের যুক্তি এইরূপ :

(১) হিন্দুদের রক্ষার জন্ত যখন সর্বপ্রথমে চেষ্টা করা উচিত, তখন বঙ্গ ভঙ্গদ্বারা প্রতিকার করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

(২) ইহা পাকিস্তান নীতির পরিণামশূন্য।

(৩) সমগ্র আন্দোলনটি অবসাদ ও আত্মবিশ্বাসের

অভাবে উদ্ভূত পরাজয়মূলক মনোভাবসম্পন্ন। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা উগ্র ভাবে ধারণ করিতে বাধ্য এবং ইহা সমস্তার সমাধানে সাহায্য না করিয়া আরও জটিল সমস্তার সৃষ্টি করিবে।

(৪) ইহা পশ্চাদগামী ও প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলন। সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় জীবনে একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিই আমাদের দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার কার্য সূত্র হইয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গ করা হইলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হইবে এবং দেশের ক্ষতি হইবে।

(৫) বঙ্গ ভঙ্গের দ্বারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক এক্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৬) ইহার দ্বারা তপশীলী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের গুরুতর ক্ষতি হইবে; কারণ পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে তাহার এক বিরূতি অংশ। যদি বঙ্গ ভঙ্গ হয় তবে সম্প্রদায়ী বর্ণহিন্দুরা দরিদ্র তপশীলী ও বর্ণহিন্দুদের তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া আসিবে। সুতরাং যখন জাতিভেদ উচ্ছেদের জন্ত আমরা চেষ্টা করিতেছি তখন সেই সময়ে বর্ণহিন্দু ও তপশীলীদের মধ্যে পুনরায় এক ব্যবধান সৃষ্টি হইবে।

(৭) আদম স্মারীর সংখ্যায় দেখা যায় যে প্রস্তাবিত পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় সমান। এই কারণে হিন্দুদের জন্ত পৃথক আবাসস্থলের নীতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ত্রীমুখ কামিনীকুমার দত্ত বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন :

(৮) এই আন্দোলনের ফলে সুখ এবং দল জাতিগঠন-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। বাংলাদেশে হিন্দুরা সমগ্র জনসংখ্যায় শতকরা ৪৫ ভাগ হইয়াও যথোপযুক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন এবং তাহাদের দাবি কার্যকরী করিয়া তুলিতে অক্ষম—এইরূপ ভাবিয়াই বর্তমান আন্দোলন চালানো হইতেছে।

(৯) হিন্দুদের স্বার্থহানি করিয়া মুসলমানেরাই চিরদিন রাষ্ট্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং হিন্দুদের কোন ইচ্ছাই কার্যকরী হইবে না—এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধারণা করা ভুল। পশ্চিম বঙ্গের যদি এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মত যথেষ্ট শক্তি থাকিবে থাকে তবে কেন তাহারা উহা সম্মিলিত বঙ্গ বা স্বতন্ত্র বঙ্গ গঠনের কার্যে বিনিয়োগ করে না?

(১০) স্বাধীন বঙ্গের নূতন শাসনতন্ত্র এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিতে হইবে যেন হিন্দুরা রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে তাহাদের ইচ্ছা কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতালিপ্সু যে কেহ হিন্দুদের শাস্য দাবি প্রতিপালনে বাধ্য হন। হিন্দুরা যদি নাগরিক অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারাইয়া না থাকে তবে অন্য কোনরূপ সমাধানের কথা ভাবাও যায় না।

(১১) ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে না, উহা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিবে।

(১২) এই দাবির পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা রহিয়াছে।

(১৩) পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে থাকার দরুণ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থ কিছুতেই একরূপ হইতে পারে না; ফলে বর্তমানে তাহাদের মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আছে তাহাও ক্রমশঃ নষ্ট হইবে; জাতি হিসাবে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ভীষণ ভাবে ব্যাহত হইবে; পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ বদ্ধ হইয়া যাইবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মনকষাকষির জন্ম পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্পূর্ণ বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

(১৪) কলিকাতা বন্দর হিসাবে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গ কর্তৃকই সৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অসংখ্য জনপ্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সম্মিলিত সাধনার ফল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর আইনগত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকিলে পূর্ববঙ্গ ঐকরূপ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হইতে পারে না। তা ছাড়া এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে নানারূপ জটিলতা দেখা দিবে।

(১৫) হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রকাণ্ড বড় এবং তুলনায় দরিদ্র অংশের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। মাত্র কয়েক জনের কায়মী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আন্দোলন চালনা করা হইতেছে।

(১৬) পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু রাষ্ট্রগঠনের দাবি পাকিস্তান দাবিকেই সমর্থন করে। উভয় প্রস্তাব জাতীয়তাবিরোধী এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্ষতিকর। এক অঞ্চল হইতে অল্প অঞ্চলে গমন বাস্তবতার দিক হইতে সম্ভবপর নয়। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি দাবি মরীচিকা মাত্র।

ত্রিযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের যুক্তি এইরূপ :

(১৭) বাংলাকে ভাগ করা হইবে কি না এই ভূমি সমস্তা লইয়া জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভেদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

(১৮) বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন দ্বারা জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হইবে এবং মুসলিম লীগের প্রভূদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

(১৯) নোয়াখালীর ধ্বংসকার্য সত্ত্বেও বাংলার বহুভাগ অংশের হিন্দুরা মুসলমান জাতীয়তাবাদের সহিত একত্র শান্তিতে বসবাস করিতে সক্ষম হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোকই ইহা চায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা আজ মুসলিম অত্যাচারে জর্জরিত মনে করিতেছে। নোয়াখালী এই পৈশাচিক ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

উত্তর হিসাবে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সেগুলি নব্বয় অল্পবয়সী দেওয়া গেল।

(১) পশ্চিম বঙ্গের মুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাংলার হিন্দুর প্রধান অংশ রক্ষা পাইবে। ইহাতে অল্প অংশকে সাহায্য করার ক্ষমতাও স্বাধীন অংশের বাড়িবে। রক্ষার অল্প কোনও ব্যবস্থা এ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই; কথায় আরম্ভ ও কথায় শেষ হইয়াছে।

(২) যে সকল অঞ্চল পাকিস্তানে যাইতে ইচ্ছা করে তাহাদের বাধা দেওয়ার বা নিবৃত্ত করার উপায় কিছুই দেখানো হয় নাই, চেষ্টা তো দূরের কথা। বঙ্গ বিভাগে বরঞ্চ ধানিক অংশ পাকিস্তান হইতে বাঁচিয়া যাইবে এবং বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট পথ রহিয়াছে, অল্প দিকে আছে ভুয়া কথা।

(৩) স্বাধীনতালাভের চেষ্টা অবসাদ ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের পরিচায়ক ইহা অতি অভূত যুক্তি। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগের নিজের জীবন ও নিজের সম্ভাবন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার অধিকার আছে এ কথা বোধ হয় দত্ত মহাশয়ের দলস্থ লোকে বিশ্বাস করেন না।

(৪) ইহাও কূটতর্কের ফাঁকির এক দৃষ্টান্ত। “সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় জীবনে একটি ঘটনা মাত্র”। কত বড় ঘটনা এবং তাহার দ্বারা বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি ভাবে বিপর্যাস তাহা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এক পক্ষের মধ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে ইহা ত বাস্তব সত্য। সেই বিদ্বেষ নিবারণের পথ এ পর্যন্ত দেখাইতে কেহই পারেন নাই। “অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে” ইহা সত্য, কিন্তু “ইহার কার্য সূত্র হইয়াছে” ইহা সত্য নহে। বঙ্গ বিভাগ উক্ত রাজনৈতিক পথ।

(৫) ইহা সম্পূর্ণ ভুল। হিন্দু সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বহুদূরে থাক, অস্তিত্বনাশের চেষ্টা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দ্রুতবেগে আরও অগ্রসর হইতেছে ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে এবং সে চেষ্টা করিতেছে যাহারা তাহাদের কবল হইতে কিছু অংশের বাঁচিবার চেষ্টাই বঙ্গ বিভাগে করা হইতেছে। বাঙালী হিন্দু সাধারণ সর্ববাস্তব হইয়া গেল—কয়েকজন হিন্দু চোরাকারবারী বা লীগের ও ব্রিটিশ সরকারের চাটুকার বাদে—বাংলার “অর্থনৈতিক ঐক্য” কাহার ভোগে আসিবে?

(৬) “সম্প্রদায়িক বর্ণহিন্দুগণ” কি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বহুপূর্ব হইতে “দরিদ্র তপশীলী ও বর্ণহিন্দুদের তাহাদের অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া পশ্চিম বঙ্গে দলে দলে চলিয়া আসেন নাই? এ যুক্তি কি করিয়া লোক ‘সমাজে উপস্থিত করা হয় তাহাই আশ্চর্য।

(৭) সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ১,৫৯,৬৩,৪০২। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা যোগ করিলে হয় ১,৭১,৬৮,৬৯৯। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা উক্ত দুই জেলা বাদ দিলে হয়, ১,০১,৩২,১৯২। উক্ত দুই জেলা যোগ করিলে হয় প্রায় ১,১৪,০০,০০০। স্মরণীয় প্রস্তাবিত পশ্চিম বঙ্গে দেওঘরের বহু অধিক বাঙালী হিন্দু

ধাকিবে। এই মিথ্যা যুক্তির শেষ আরও অপরূপ। যদি সমান সমানই হইত তবে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা পাইবে না কেন? স্বাধীনতা কি গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ব না কারবারের হিসসা?

(৮) এই অপরূপ যুক্তির আলোচনাই বৃথা। “সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের প্রচেষ্টা” কোন কল্পনা। রাজ্যের ধুম্মশালে আবৃত আছে, তাহার বাস্তব জগতে কোনও চিহ্নই নাই, অথচ তাহার জন্ত পশ্চিম বঙ্গকে দাসত্ব লিখিতে হইবে। বরঞ্চ প্রস্তাবিত বিভাগে বাঙালী জাতীয়তাবাদীর শতকরা ৬০ ভাগ লীগের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া “সুস্থ ও সবল জাতি গঠন” করিবার সুযোগ পাইবে।

(৯) এই যুক্তিও বাজে তর্কের সামিল। পশ্চিম বঙ্গ পৃথক হইতে চাহিলে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহার স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। অস্ত্র সকল বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমানে ক্ষমতার অভাব। স্বাধীনতা পাইলে সে ক্ষমতা আসিতে পারে।

(১০) উত্তম কথা। কিন্তু পথ ও উপায় কি? এবং ঐ চেষ্টায় সাক্ষ্যের আশা বর্তমানে কতটা? হিন্দুর “নাগরিক অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা” কতটুকু বাকী আছে? সব শেষ হইয়া গেলে এবং যে পথ এখন খোলা আছে তাহাও হারাইয়া ফেলিলে তখন কি হইবে?

(১১) আমরা ভবিষ্যৎ বক্তা নহি। তবে যে ভাবে এই তর্কবাগিণীগণ সমস্ত দেশকে অকূল পাথারে ডাসাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আমরা বলিতে বাধ্য যে বঙ্গবিভাগ না হইলে ঐ প্রবন্ধের উত্তর একমাত্র লীগের কর্তৃপক্ষগণ দিতে পারিবেন। বাঙালী হিন্দুর এখনও কোনও কথা প্রায় গ্রাহ্য হইতেছে না, তখন একেবারেই হইবে না।

(১২) ইহা মিথ্যা কথা এবং যাহারা একথা বলিতেছেন তাঁহাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে অস্ত্রের অনিষ্ট করার জন্ত তাহারা একদম মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করিতেছেন।

(১৩) ইহাও ভয়জনিত তর্ক। বর্তমানে বাস্তব অস্তিত্ব থাকে কিম্বা সন্দেহ, সে স্থলে ভবিষ্যতের কাল্পনিক অবস্থার ভয় বিবেচনার অভাবের লক্ষণ।

(১৪) ঐতিহাসিক তর্ক করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু সহজ কথা এই যে পশ্চিম বঙ্গের লোক কোন পথে যাইবে সে কথা বলিবার অধিকার একমাত্র পশ্চিম বঙ্গবাসীদের আছে।

(১৫) ইহাও মিথ্যা কথা। (১২)নং যুক্তির উত্তর দেবুন।

(১৬) তর্কের খাতিরে বলা যায় যে লীগ দল মরীচিকাকে প্রায় বাস্তবে আনিয়াছে। তবে ইহা সহজ উত্তর যে এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক হিসাবে হইতেছে না, হইতেছে জাতীয়তাবাদ ও যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনের হিসাবে। সুতরাং এই প্রস্তাব পাকিস্তান বিরোধী।

(১৭) ইহা অল্পমাত্রায় ঠিক কিন্তু সেইজন্য কি পশ্চিম বঙ্গ দাসত্ব বরণ করিবে?

(১৮) ইহা সম্পূর্ণ বিবেচনাহীন বাজে যুক্তি।

(১৯) বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া শুধু কল্পনার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে কি হয় এই যুক্তি তাহার এক দৃষ্টান্ত।

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্য

পাবনা হিম্মতপুরে এক সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন, “কিছু লোকের ইচ্ছা যে বাংলা বিভক্ত হওয়া উচিত। দেশের এক শ্রেণীর লোক—ভূতগ্যবশতঃ তাহারা পেলন ভোগী ও বিলাসীর দল—সাধারণ বাঙালীর মনোভাবের কোন ধরনই রাখেন না। তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্তই বাংলাকে ভাগ করিতে চাহেন।” বৃহত্তর বাংলা ও বৃহত্তর ভারত গঠনই নেতাজীর কাম্য ছিল এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে তিনি নিজেও শ্রীহট্ট, সিংভূম, মানভূম ও পুর্ণিমা প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষী জেলাসমূহ বাংলার সহিত যুক্ত করিতে চাহেন। তিনি এই বলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন যে এই মনোরম বঙ্গদেশকে ভাগ করিবার জন্ত যদি কোন চেষ্টা হয় তবে আবার এক শক্তিশালী আন্দোলন সূত্র হইবে এবং সকল শ্রেণীর লোকই এই আন্দোলনে যোগ দিবেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, “আমরা সকলেই বাঙালী। পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীরা সম্মিলিত ভাবেই বসবাস করিবেন। যাহারা একসঙ্গে বসবাস করিতে চাহেন না তাহারা যেন পিঞ্জরাপালে চলিয়া যান। বাংলা কিম্বা ভারত বিভক্ত হউক ইহা আমরা চাই না।”

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মন্তব্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা চলে। কিন্তু আমরা এখন কেবলমাত্র তাঁহাকে কিছু অমরোষ করিয়া ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ শেষ করিব। বসু মহাশয় সম্প্রতি কিছু দিন এক দল অমুচরের কথাই শুনিতেছেন এবং তাহাদেরই পরামর্শে চলিতেছেন। ইহার ফল শেষ পর্যন্ত কি হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। বাংলার ভাগ্য নির্ণয়ের এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অংশবিশেষে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার সুযোগ দেখা দিয়াছে। যাহারা ছলে, বলে বা কৌশলে এ বিষয়ে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা শুধু পশ্চিম বঙ্গের নহে, সমস্ত বাঙালী হিন্দুর শত্রু। এই শত্রুতা বিশেষে অশ্রুপ্রসৃত, কিছু ভয়জনিত এবং কিছু বিবেচনা বুদ্ধির অভাবজনিত। কারণ যাহাই হউক এই সুযোগ হারাইয়া সমস্ত বাঙালী যদি দাসত্বে নিমজ্জিত হয়, তবে ইতিহাস বলিবে যে পরক্রীকাতর, হিংসা বিদ্বেষপরায়ণ, গৌরব বাঙালী জাতি কয়েকজন বিধাসভাতক চক্রান্তকারীর কাঁদে পড়িয়া স্রোনার সুযোগের সময় বাক্যযুদ্ধে কাটাইল। বসু মহাশয়কে অমরোষ এই যে তিনি উপযুক্ত লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া সুবিবেচনার সহিত কার্যক্রম আরম্ভ করুন। যাহারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছে যে এই বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব আসিয়াছে কেবলমাত্র পেলনভোগী

বিলাসীদিগের নিকট হইতে, তাহারা যৈ কত বড় মিথ্যাবাদী তাহা তিনি অল্প অল্পসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। তিনি নেতাজীর নাম করিয়া বৃহত্তর বন্ধের কথা বলিয়াছেন। নেতাজীর সাহস, আত্মবলিদান, কার্যক্ষমতা ও অনাসক্তির সহস্র ভাগের এক ভাগও আছে এইরূপ কে আছে আজ বাংলাদেশে যে ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবে? বৃহত্তর বাংলা একত্র ও স্বাধীন না হইলে সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার আলো প্রবেশ করিতে পারিবে না, এ কথা স্বাধীনতার জলন্ত পাবকের প্রতীক যে নেতাজী, তাঁহার মনে স্থান মাত্র পাইতে পারিত কি? পশ্চিম বঙ্গ স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্ত হইলে নেতাজীর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথই পরিষ্কার হয় কিনা একথা ত্রিযুক্ত শরণ চন্দ্র বসু বিচার করিয়া দেখুন।

বাংলা বিভাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর অভিমত

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাংলার সদস্যগণ সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে বাংলার হিন্দুদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাঁহারা তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলোচনাকালে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরু এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের নুতন বড়লাট আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতা হস্তান্তর কার্য আরম্ভ হইয়া যাইবে। এক্ষণে বাংলার জাতীয়তাবাদীদিগকে স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহারা “সাম্প্রদায়িক সরকারের” অধীনেই থাকিবেন, না অত্যাচার কংগ্রেস প্রদেশের মত শক্তিশালী কেন্দ্রে যোগ দিবেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বলেন, প্রয়োজন হইলে বাংলাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভাগ করা যাইবে এবং ইহাতে কোন কিছুই বাধার সৃষ্টি করিবে না, আমরা এ বিষয়ে পূর্ণ আশ্বাস পাইয়াছি। কংগ্রেস আশা করেন যে, বাংলার দুইটি প্রদেশই কেন্দ্রে যোগ দিবে। তবে লীগ গণ-পরিষদে যোগ না দেওয়ার দরুণ উহা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে তবে পশ্চিম বঙ্গ অবশ্যই কেন্দ্রে যোগ দিবে।

বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের বিবৃতি

কলিকাতা হাইকোর্টের পঞ্চাশ জন ব্যারিষ্টার বঙ্গ-বিভাগের দাবি জানাইয়া এবং উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে :—সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অঞ্চলে একটি প্রদেশ গঠনের জন্ত যে আন্দোলন চলিতেছে, আমরা তাহা সমর্থন করিতেছি। আমরা যে সকল কারণে এই দাবি সমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছি তাহা এই :—(১) আমরা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শে একটি রাষ্ট্রগঠন করিতে চাই। এই রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট) ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের পূর্ণ রক্ষা-ব্যবস্থা থাকিবে এবং প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও পুষ্কার্চনার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে; (২) একটি শক্তিশালী ও জাতীয়তাবাদী বাংলা প্রদেশ গঠিত হইলেই পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরিত

সংখ্যাগরিষ্ঠদের কার্যকরী রক্ষা-ব্যবস্থা হইবে; (৩) অত্যাচার বিষয়ের সহিত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার বিলোপসাধন, একটি জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠন, অধিকন্তু সরকারী চাকুরী এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদের জন্ত আমরা যে চ্যালেঞ্জ দাবি জানাইয়া আসিতেছি, মুসলিম লীগ তাহাতে কর্ণপাত করিতে রাজী নয়; (৪) যে সাম্প্রদায়িক গবর্নমেন্ট আমাদের পক্ষ ও ধ্বংস করিতে চায় আমরা তাহাদিগকে কর দিতে রাজী নই। অধিকন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের কাঠামো ধ্বংস করাই যে সাম্প্রদায়িক আইনের লক্ষ্য আমরা তাহা বন্ধ করিতে চাই; (৫) আমরা বাংলার বর্তমান গবর্নমেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোর বিরোধী; (৬) পাকিস্তানে আমাদের বিশ্বাস নাই; কাজেই কোনও আকারে আমাদের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া হইলে আমরা উহার প্রতিরোধ করিব। আমরা দেখাইয়া সর্বভারতীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে থাকিবার জন্ত সম্মত; (৭) আমরা বাংলার সংস্কৃতি এবং বাংলার মহাপ্রাণ সন্তানদের ত্যাগ ও সেবার দ্বারা যে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা রক্ষা করিতে চাই; (৮) আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে ক্রীতদাসের দাস বাস করিতে চাই না। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার হিসাবে স্বাধীনতার দাবী জানাইতেছি। আমরা এক দাসত্বের বিনিময়ে অল্প দাসত্ব চাই না।

বাংলায় আবার অন্তর্কণ্টের আশঙ্কা

বাংলার নানাস্থানে এখন হইতেই এমন ভাবে চাউলের দর বাড়িতে শুরু হইয়াছে যে লোকের মনে আবার গুরুতর অন্তর্কণ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। নোয়াখালী, করিমপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বাটীতি জেলার স্থানে স্থানে চাউলের অভাব এত তীব্র হইয়াছে যে দরিদ্রদের ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের পক্ষে চাউল সংগ্রহ দুঃসহ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। বাংলার লীগ মন্ত্রীরা এই মূল্য বৃদ্ধির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়া অবস্থার গুরুত্ব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে কিরিয়া জনসাধারণের সেবকগণ যে বিবরণ দিতেছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে চাউলের মূল্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে, না মন্ত্রীদের কাঁকা কথার আস্থা স্থাপন করিবে? সাংবাদিক বৈঠকে সিডিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ এস. এন. রায় বলেন,

বাংলার চাউল বাহাতে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতে না পারে বা উদ্ভূত অঞ্চল হইতে বাটীতি অঞ্চলে চোরাই ভাবে না যাইতে পারে, তাহার জন্ত পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইটি উপায়ে গবর্নমেন্ট মুশকিল হইতে আসান পাইতে পারেন।—একটি হইতেছে সমগ্র বাংলা দেশটাতেই চাউলের বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তন করা এবং মজুতদারদিগকে চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য করা। দ্বিতীয় উপায়টি হইতেছে যেখানে চাউলের টান পড়িবে সেখানেই দ্রুত চাউল পাঠাইয়া দেওয়া এবং বেশী দামে যাহারা বিক্রয় করে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কম দামে বিক্রয় করা। তবেই প্রতিযোগিতা দাম কমাইতে বাধ্য হইবে।

বাংলার লীগ সরকারের অকর্মণ্য ও অপদার্থ কর্মচারী বাহিনী লইয়া প্রথমটা করা অসম্ভব এবং করিলে উহা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে দারুণ নিপীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ বিশেষ নাই। তদপেক্ষা দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা অনেক সহজ এবং ইহাতে হাতে হাতে ক্ষল ফলিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ময়মনসিংহে মাস খানেক আগে চোরাকারবারীদের সমবেত চেষ্টায় চাউলের দর বাড়াইয়া তোলা হইয়াছিল। তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নূরুন্নাহী চৌধুরী তাহাদিগকে শাস্ত্তা করিবার জন্য শেখোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন। কলিকাতা হইতে চাউল আনা হইয়া তিনি নিয়ন্ত্রিত দরে নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বিক্রয় আরম্ভ করিষামাত্র চোরাকারবারীরা ভীত হইয়া সমস্ত চাউল বাজারে ছাড়িতে আরম্ভ করে। এই ধরনের কত ব্যপারায়ণ ও প্রজাদায়ী লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা লীগ সরকারের ইচ্ছা নহে, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে চৌধুরী সাহেবকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আইন ও সাম্প্রদায়িকতা

বাক্সেটে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বেশী বেশী টাকা বরাদ্দ করিয়া এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের মারফত পুরনো ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করিয়া সাম্প্রদায়িক কারণে নূতন ছুইকোঁড়-দেড় দরাজ হাতে লাইসেন্স দিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কাজ চলিতেছে। শাসন বিভাগে, বিচার বিভাগে, রেশন ও সরবরাহ বিভাগে, শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে মুসলমান নিয়োগ অনেক দিন হইতেই এমন ভাবে চলিতেছে যেন বাঙালী হিন্দু কোনক্রমে কোন ক্ষমতাপূর্ণ পদে না থাকিতে পারে। সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল কয়েক হওয়ার পর হইতে এই কার্য চলিতেছে। শুধু সরকারী বিভাগগুলিতে নয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের উপরও লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলের ক্ষমতা প্রবল করিবার জন্ত আয়োজন হইতেছে। প্রকাশ, বাংলা-সরকার কর্পোরেশন আইন পরিবর্তন করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন যাহার ফলে কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পদে কর্মচারী নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বাংলা-সরকারের হাতে চলিয়া আসিবে। বর্তমান আইনে ঐ সব পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা কর্পোরেশনের আছে কিন্তু ঐ নিয়োগ বাংলা-সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। আইন পরিবর্তন করিয়া লীগ গবর্নমেন্ট নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিম্ন পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্থায় একটি কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই আইন পাস হইলে সরকারের উক্ত ক্ষমতা কর্পোরেশন ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপরেও বর্তিবে। কলিকাতায় এবং শহরগুলিতে লীগের জুট মেজরিট নাই বলিয়া

কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ করায়ত্ত করিবার জন্ত এই আয়োজন।

বাংলার লীগের অভিযানে এখন আর চক্ষু লজ্জার দেশমাত্র নাই। বাংলার পরিপূর্ণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় লীগ কোন সময়েই গোপন করে নাই এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলে মুসলমান ভিন্ন অপর সকলের অবস্থা কি হইবে তাহা নোরাখালীতে দেখাইয়াও দেওয়া হইয়াছে। বাংলার সাম্প্রদায়িক অস্থাপত্য সমগ্র প্রদেশের হিসাবে বেশী হইলেও পশ্চিম বঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গের পশ্চিম ভাগে হিন্দুর অস্থাপত্য অনেক বেশী। মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু পূর্ববঙ্গে এবং উত্তর বঙ্গের পূর্বভাগে। পূর্ববঙ্গের জুট মেজরিটের জোরে হিন্দু প্রধান পশ্চিম বঙ্গে কি ভাবে লীগ-প্রভুত্ব কয়েক করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা দরকার। কলিকাতা, পশ্চিম বঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি গ্রাস করিবার চেষ্টা লীগ প্রকাণ্ডেই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ বিভাগ কি ভাবে দখল করা হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। ইহার পর আরও পরিবর্তন ঘটয়াছে। অভিযোগের তদন্তের ভার কলিকাতায় সাত জন ডিভিসনাল ইন্সপেক্টরের উপর দ্রুত আছে, ইহাদের এক এক জনের অধীনে তিনটি বা চারটি করিয়া থানা থাকে। ইহাদের মধ্যে এখন ছয় জন মুসলমান এবং এক জন মাত্র হিন্দু। শেখোক্ত ইন্সপেক্টরের অধীনে আছে মাত্র ২টি থানা, অবশিষ্ট ২৩টি থানা মুসলিম ইন্সপেক্টরের হাতে। জেলা ছুইটির ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারদ্বয় এখনও মুসলমানই রহিয়াছেন। এবং ইহাদেরই উপরে সমস্ত থানা পরিচালনের চরম দায়িত্ব অর্পিত আছে। থানাগুলির অর্ধেকের বেশীতে মুসলমান অফিসার-ইন্-চার্জ মোতায়েন করা হইয়াছে। ইহাদিগকে মুসলমান না বলিয়া পাকিস্থানী সৈনিক বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ দেখা গিয়াছে যে কোন মুসলমান কর্মচারী সাম্প্রদায়িক উদ্বেগে সিন্ধির জন্য বিবেক বিসর্জন দিতে না চাহিলে তাহাদিগকে অবিলম্বে সরাইয়া দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা বিভাগ গ্রাস করিয়া কিস্তাবে হুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে উচ্চ-মিশ্রিত খিচুড়ী বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কেমন করিয়া তাহাদিগকে মোজা-শ্রেণীর শিক্ষকদের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইতেছে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পছন্দ করিবার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায় উচ্চ ইংরেজী বিভাগগুলি দখল করিবার আয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। সমগ্র শাসন-যন্ত্র লীগের কবলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে তিন-চারিটির বেশী বাঙালী হিন্দু নাই। জেলা-বোর্ডগুলিও লীগের কবলে। নূতন একটি আইন করিয়া জেলা-বোর্ড নির্বাচনের বর্তমান যৌথ নির্বাচন ভাঙিয়া সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের

চেষ্টা হইতেছে। এখনই ঐগুলি লীগের এক একটি খাঁটি, সকলের টাকায় কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর বার্থে নলকূপ বসানো, রাশা মেরামত প্রভৃতি তো এখনই চলিয়াছে, এই আইন পাস হইলে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে করের কড়ি গুনিয়া দিয়া পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া ছাড়া হিন্দুর আর কোনই কাজ থাকিবে না। জেলা-বোর্ডের উপর সরকারের প্রাধান্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে উহা বাড়িবে বই কমিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যেখানে নির্বাচনের দ্বারা চেয়ারম্যানের পদে লীগওয়াল বসিবার সম্ভাবনা নাই সেখানে জেলা-বোর্ড নির্বাচন বন্ধ রাখিয়া সরকার কর্তৃক মনোনীত পাকিস্থানী চেয়ারম্যানের হাতে বোর্ডের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত কিছু নূতন নয়। বিচার বিভাগেও এই অবস্থা ক্রমশঃ আসিতেছে। কলিকাতার ছোট আদালতের সব কয়েকজন জজই মুসলমান, এক জন মাত্র তপশীলী হিন্দু। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদেও ইংরেজ ও মুসলমানেরই প্রাধান্য, বাঙালী হিন্দুর স্থান নাই।

শাসন বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগে বাঙালী হিন্দুর বিরোধিতা আরও একটি ব্যাপারে সম্প্রতি প্রকট হইয়াছে। নূতন দুই জন বিভাগীয় কমিশনার কয়েক দিন আগে নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন মাদ্রাজী অপর জন ইংরেজ। দুই জনেরই উপরে কয়েকজন বাঙালী হিন্দু সিলিলিয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাদের দাবি অতিক্রম করিয়া তালিকার নীচের দিক হইতে এই দুই জনকে বসাইবার একমাত্র এই অর্থই হইতে পারে যে মুসলমান যদি না পাওয়া যায় তবে বাঙালী হিন্দু ভিন্ন আর যাহাকে হউক নিযুক্ত করা চলে।

উচ্চপদে মুসলমান নিয়োগে আমাদের আপত্তি ইহা সত্য নহে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া উপযুক্ত মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করিলে আমরা আপত্তি করিতাম না। নিছক সাম্প্রদায়িক কারণে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুবিধার জন্ত অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগের আমরা ষোড়শ বিরোধী। কারণ অযোগ্য লোকের পক্ষে উচ্চপদে বহাল থাকিতে হইলে উপরওয়ালার তোষামোদ ভিন্ন অস্ত্র উপায় নাই, এবং এই সুযোগে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অভিলାষী মন্ত্রীরা ইহাদের দ্বারা বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করাইয়া লইতে অস্বীকার বোধ করেন না। নিরপেক্ষ ও কতব্যপরায়ণ মুসলমান কর্মচারীর উপরেও যে শাসন কার্যের ভার দিয়া মন্ত্রীরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নূরুন্নাহারী চৌধুরীর অপসারণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় মুসলিম কর্মচারী দেওয়া হইতেছে—কারণ উহা তো মুসলমানেরই এলাকা। কোন হিন্দু কর্মচারী এরূপ স্থলে কোন কারণে মোতায়েন হইলে স্থানীয় লীগ হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সরাইবার দাবি উঠে এবং লীগ মন্ত্রীরাও বদলীর আদেশ দিতে ক্ষুণ্ণ বোধ করেন না। হিন্দু প্রধান এলাকাতো লীগ-মার্কী কর্মচারী বাড়ানো

হইতেছে, কারণ সেখানে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। গাছেরও খাইব, তলারও কুড়াইব, কিন্তু গাছে উঠিবার পরিশ্রম তো করিবই না বরং অপরকে দিয়া ফল পাড়াইয়া লইব—লীগের এই নীতি বাংলাদেশের কেন, ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় পাইয়া মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সাপ্লাই অফিসার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দারোগা, এমনকি সরকারী স্কুল-মাস্টারদের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

জাতীয়তাবাদী বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙিবার জন্ত তাহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্রে হইতে বিভাঙিত করা হইতেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিকৃত করিয়া তাহাকে গোড়া হইতেই দেহে ও মনে পঙ্ক করিবারও চেষ্টা হইতেছে। ইহাই পাকিস্থানী অভিযানের মূল সূত্র। ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে যে সতর্কতার সহিত বাংলার শিক্ষা বিভাগ ইংরেজ নিজেদের হুকুমত করিয়া লইয়াছিল, আজ লীগও ঠিক তাহাই করিতেছে। যে কারণে ইংরেজ সেদিন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, স্কুলের স্থান ও সংখ্যা নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে তেমন দৃষ্টি রাখিত, সরকারী অর্থ সাহায্যের প্যাঁচে ও পরিদর্শনের চোটে স্কুলে কোনরূপ স্বদেশপ্রেম প্রচার অসম্ভব করিয়া তুলিত, ঠিক সেই কারণে এবং সেই ভাবে লীগ আজ শিক্ষা-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অবস্থা আর দশ বৎসর চলিতে দিলে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে কোষায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে নেতারাজ্য ও তাহা উপলব্ধি করিবার সময় পান নাই। ইংরেজের আক্রমণের ছের অপেক্ষা লীগের আক্রমণ অনেক বেশী ব্যাপক, উহার ফলও অনেক বেশী সূক্ষ্মপ্রসারী হইতে বাধ্য। কেননা এই আক্রমণের গোড়ায় ইংরেজের কুটবুদ্ধি, জোর, মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সহায়ক বাঙালী হিন্দুর নিদারুণ বুদ্ধির অভাব।

বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাঙালীকে কিভাবে পঙ্ক করিয়া আনা হইতেছে তাহা তো সর্বত্র দৃশ্যমান। কর্তৃপালের বেড়াফালে পড়িয়া প্রতিটি মানুষ চাউল, আটা, তেল, চিনি, কাপড়, কেয়োসিন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য হার হার করিয়া ঘুরিতেছে। মানুষের সকল শক্তি আজ অর্থোপার্জনে এবং প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহে নিঃশেষ হইতেছে। দেশের কাছে মন দিবার সময় খুব কম লোকেরই আছে। তার উপর প্যুরমিট বিতরণের কৌশলের দ্বারা হিন্দু ব্যবসায়ীদের পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য অসম্ভব করিয়া রাখিয়া সকল ব্যবসায়ীকে লীগের মুখোপেক্ষী করিয়া রাখা হইয়াছে। পারমিট বিতরণ চলিতেছে সাম্প্রদায়িক কারণে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। আমরা শুনিতেছি যে নারিকেল তৈলের পারমিট সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিতরণ হইয়াছে এবং মোট তৈলের শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান এবং ৪০ ভাগ হিন্দু ব্যবসায়ীদের দেওয়া

হইতেছে। কোন্ ব্যবসায়ীর চাহিদা কত অথবা কে কি কার্কে উহা ব্যবহার করিবে তাহার কোন সম্ভান না লইয়াই শুধু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তেলের পারমিট বিলি করার আয়োজন হইতেছে। ভারত-সরকার ঈল কন্ট্রোল তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা-সরকার উহা বজায় রাখিয়া উহাকেই লোহার ব্যবসা হইতে বাঙালী বিভাভনের যন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। পুরান ব্যবসায়ীদের পক্ষে লোহা পাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু ভূঁইকৌড় নূতন ব্যবসায়ীদের নিকট সাম্প্রদায়িক কারণে উহা সহজলভ্য। মফঃব্বলের লোকের পক্ষে টেউ-টিন একান্ত প্রয়োজন। উহারও বিলি-ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক কারণে এমন ভাবে কন্ট্রোলের বজ্র-আঁটনির মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে যে এক দলের নিকট উহা অপ্রাপ্য, অপর শ্রেণীর নিকট সহজলভ্য। মফঃব্বলে কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেল প্রভৃতির বিলি-ব্যবস্থাতেও এই একই অবস্থা। লীগের লোকের অল্প-মোদন ভিন্ন কাহারও পক্ষে এ সব দ্রব্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। নূতন ব্যবসা অসম্ভব করিয়া তুলিয়া এবার নজর পড়িয়াছে পুরান ব্যবসার দিকে। নারিকেল তেলের লাইসেন্স দেওয়ার নূতন নিয়মটা ইহারই পরিণতি, শোনা যাইতেছে কাগজের পারমিট সম্বন্ধেও এ একই ব্যবস্থা হইতেছে,

—মুসলমান কাগজ বা পুস্তক ব্যবসায়ীর সংখ্যাভূপাত ব্যবসা ক্ষেত্রে পাঁচই হউক আর দশই হউক তাহারা মোট কাগজের ঠকের শতকরা ৬০ ভাগ পাইবে এবং হিন্দু পাইবে ৪০ ভাগ। বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ২০ ভাগের বেশী মুসলমান নহে, তৎসত্ত্বেও তাহাদের জন্য ৬০ ভাগ কাগজ বরাদ্দ করিবার অর্থ মুসলমানের উন্নতি নয়, কারণ শুধু বেশী করিয়া কতকগুলি কাগজ পাইলেই কেহ রাতারাতি শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, উহার আসল অর্থ হিন্দুকে বঞ্চিত করা। চোর-বাছারে কাগজ কিনিতে হইলেও দালালীর টাকার তাহাতে লীগওয়ালাদের পকেটে আসে তাহার ব্যবস্থা করা। পুরানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সব কর্মচারী কাজ করে তার অর্ধেক মুসলমান লওয়ার দাবি উঠিয়াছে, অপরের অর্ধে ও রক্তে স্প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহীষ ব্যবস্থা-পরিষদের ম্যাকডোনাল্ডী জুট মেজরিটির জোরে জাতীয় করণের নামে লীগায়ত্ত-করণের দাবিও উঠিয়াছে।

মুসলমান হিন্দু হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি—এই ধূসা তুলিয়া যাহারা হিন্দুর সঙ্গে একত্র বাস করিতে চাহে না, যৌথ নির্বাচন আনিয়া লইয়া একসঙ্গে থাকিতে আপত্তি করিয়া নিজের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান দাবি করে, বাংলার মাত্র একসঙ্গে সংখ্যা-গুরু বলিয়া তাহারাই অপর অংশের সংখ্যাগুরু হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা-গুরুত্বের দাবিতে যাহারা সেখানে পাকিস্তানী শাসন, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রণালী চাঙ্গ করিয়াছে, পূর্ব বঙ্গের ঐ মেজরিটির জোরেই তাহারা

কলিকাতা এবং পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের পশ্চিম ভাগের হিন্দু প্রধান এলাকায় পাকিস্তানী শাসন সম্প্রসারণে উদ্যত। ম্যাক-ডোনাল্ডী বাটোয়ারা-প্রস্তুত ব্যবস্থা-পরিষদ এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র। যে কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী, যেখানে করের শতকরা নব্বই ভাগ দেয় হিন্দু, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার কে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে লীগ-পূর্ব বঙ্গের জুট মেজরিটির জোরে। মুসলমান যদি নিজেকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সেই যুক্তিতে যদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশে হিন্দুর দ্বারা শাসিত হওয়ার ধূসা তুলিয়া বাস করিতে না চায়, তবে বাংলার একাংশে মাথা গুনতির জোরে অপর অংশের হিন্দুদের সকল অধিকার হরণ করিয়া হিন্দু-অধ্যুষিত জেলাগুলি পর্যন্ত গ্রাস করিবার চেষ্টা করে কোন যুক্তিতে কিসের জোরে? যুক্তির বাংলাই এখানে নাই, জোর ছিল শুধু পিছনে চার্টারদপ্তরী ব্রিটেনের বেয়নেট এবং সেই ভরসাতেই এতদিন এই পাকিস্তানী অভিযান চলিয়াছে। এক দিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দমননীতি, অপর দিকে পাকিস্তানী আক্রমণে অভিভূত হইয়া বাঙালী যেন আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে। বাঙালীর মুখে আদর্শবাদের যে বুলি আজ শোনা যায় তাহা প্রাণহীন, পুরাতন বুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভাবপ্রবণতার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া এক দল এই পরাজয়ের গ্লানি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, আর এক দল লীগের সহিত মিশিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগের সন্ধানে রত আছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরাজিতের মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে-ছেন এবং যাহারা বঙ্গবিভাগের দ্বারা এক দিকে আত্মরক্ষা এবং অপর দিকে লীগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে পরাজিতের মনোবৃত্তির সম্ভান করিয়া আত্ম-গ্লানি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের ভূমি ভাব-প্রবণতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছে।

বাংলার বাজেট

বাংলার লীগ গবর্নেন্ট এবার যে বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাকে অসামান্যে পাকিস্তানী বাজেট আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষমতা হাতে পাইলে লীগ যে কি ভাবে সাধারণের অর্থ অপচয় করিতে পারে গত কয়েক বৎসরে তাহা দেখা গিয়াছে, সাম্প্রদায়িক কারণে এবং দলগত পোষ্যপ্রতিপালনের জন্ত রাজস্ব ব্যয়ে যে কতদূর বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্ভবপর তাহাও এবার দেখা গেল। যুদ্ধের বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত বাংলার আয়ব্যয়ের অবস্থা তুলনা করিলেই পাকিস্তানী বাজেটের মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকট হইবে।

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯৩৯-৪০	১৪,৩১,৬৬,০০০ টাকা	১৩,৭১,২৪,০০০ টাকা
১৯৪০-৪১	১৩,৫৪,৫০,০০০ "	১৪,৪৫,৩৯,০০০ "
১৯৪১-৪২	১৪,৯৪,২৮,০০০ "	১৫,৫০,৩৮,০০০ "

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপানী যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বাংলাদেশে এ.আর.পি এবং অন্যান্য সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে স্লিট ট্রেক কার্টা, নৌকা সরানো, মাগুপি ভাঙা প্রভৃতির জন্য মোটা মোটা টাকা ব্যয় অথবা অপচয় সুরু হয়। এই বৎসর প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল কাজ করিতে ছিলেন এবং অর্থসচিব ছিলেন ডাঃ খামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আয়ব্যয়ের অবস্থা তাঁহাদের বাজেটে ছিল নিম্নোক্তরূপ :

আয়—	১৬,৪৬,৪২,০০০ টাকা
ব্যয়—	১৬,৭৯,০০,০০০ "

যুদ্ধের এই ডামাডোলের বাজারেও তখন ৩৩ লক্ষ টাকার বেশী বাটতির ভয় ছিল না।

পর বৎসর সার জন হার্বার্টের চক্রান্তে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া যায়। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষও আসিয়া পড়ে। এই বৎসর লীগের হাতে রাজকোষ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পায় দশ কোটি টাকা। আয়ব্যয় হয় এইরূপ :

আয়—	২৩,৭১,৭২,০০০ টাকা
ব্যয়—	২৬,৭৫,১৮,০০০ "
বাটতি—	৩,০৩,৩৬,০০০ "

বাজেটের দোষ ঢাকিবার জন্য এই বৎসরের বাজেটকে "দুর্ভিক্ষের বাজেট" আখ্যা দেওয়া হয় এবং এমন ভাব দেখানো হয় যেন দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যই বেশী টাকা খরচ হইয়াছে এবং স্বাধীনতা পড়িয়াছে। অথচ দুর্ভিক্ষে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভারত-সরকার মিটাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে নিম্নোক্তরূপ :

খরচাতি ব্যয়—	৩,২৯,৬১,০০০ টাকা
টেস্ট-রিলিফ প্রভৃতি—	১,১৬,৬৮,০০০
কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি—	৪৬,৩৩,০০০
মোট—	৪,৯২,৬২,০০০

ইহার মধ্যে তিন কোটি টাকা ভারত-সরকার দিয়াছেন, বাংলা-সরকারকে বহন করিতে হইয়াছে মোট ১,৯২,৬২,০০০ টাকা।

এই বৎসরই চাউলের সরকারী কারবার সুরু হয় এবং এই কার্যে এই বৎসর মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা লুট হয়।

পর বৎসর ১৯৪৪-৪৫ সালও লীগের রাজত্ব। এই বৎসর অক্টোবর মাসে যুদ্ধ শেষ হয়। ব্যয় বৃদ্ধি পায় পূর্ব বৎসরের প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি, দেড় গুণের অনেক বেশী। এই বৎসরে রেশনিং সুরু হয়। বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্তে রসদ

সরবরাহের ভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানদারদের হাতে না দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারী দোকান খোলা হয় এবং উহাদের হাতে রেশন সরবরাহের অধিক ভার দেওয়া হয়। লীগের পোষ্যবৃন্দের চাহুরির সুরাহা করিবার জন্তই বিশেষ ভাবে এই ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। চাউল ও গমের কারবারের নামে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা অতল গহ্বরে অদৃষ্ট হয়। বাংলা-সরকার পঞ্জাব হইতে সম্ভাব্য গম কিনিয়া চট্টগ্রামে রেশন দোকান মারফত বিক্রয় করিতেছেন এই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাওয়ার আটার দাম দুই পয়সা কমে বটে, কিন্তু সরকারের খাতার লোকসান কমে নাই। সম্ভাব্য গম কিনিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়াও এ বৎসর মবলগ ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। চাউলের সরকারী এজেন্টরা একচেটিয়া কারবার এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া গ্রামাঞ্চল হইতে অতি সম্ভাব্য চাউল কিনিয়াছেন, বন্দী ব্যবস্থা-পরিষদে এইরূপ প্রকাজ অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল বৎসরান্তে চাউলের কারবারে সরকারের মোট ৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। নৌকা তৈয়ারির নামে আর একটি বিরাট চুরি ও অপচয়ের পথও খুলিয়া দেওয়া হয়। লোকের দুর্দশার সুযোগে লীগের পোষ্যবৃন্দের চাহুরি দেওয়ার যে ব্যবস্থা এ বৎসর হয় পৃথিবীর কোন অসভ্য দেশেও তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। এই বৎসর দুর্ভিক্ষের নামে দুর্গতদের ১,২০,০৪,০০০ টাকা খরচাতি সাহায্য এবং ১২,৪৩,০০০ টাকা টেস্ট-রিলিফ প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, কিন্তু এই খরচাতি করিবার জন্ত কেরাণী প্রভৃতির বেতন ও আপিস খরচা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হয় ২,০৯,৬৩,০০০ টাকা। এ বৎসর দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ লোক-দেখানো ব্যয় ধরা হয় মোট ৩,৫৩,৬৯,০০০ টাকা এবং এই টাকার ভিতর হইতে ২ কোটি টাকার বেশী বাহির হইয়া যায় পোষ্যদের জন্ত। যুদ্ধের জন্ত খরচ হয় মোট ১,০৬,২৮,০০০ টাকা। আয়ব্যয়ের অবস্থা ছিল নিম্নোক্তরূপ :

আয়—	৩৯,৩৯,১৩,০০০ টাকা
ব্যয়—	৪৪,১২,২৭,০০০ "
বাটতি—	৪,৭৩,১৪,০০০ "

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ৭ কোটি টাকা খরচাৎ পাইয়া লীগ গবর্নমেন্ট বাঁচিয়া যায়।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটে এবং ৯৩ ধারা অনুসারে পর বৎসর শাসনকার্য চলে। এই এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা ঘটিয়া একেবারে ৫ কোটি টাকা উদ্ধৃত দাঁড়াইয়া যায়। অপচয় এবারও যথেষ্টই হইয়াছে কিন্তু লীগের হাতে কর্তৃত্ব থাকিলে যতটা হওয়ার কথা ততটা হয় নাই। আয়ব্যয়ের অবস্থা এ বৎসর এইরূপ :

আয়—	৪৫,৫৬,২৬,০০০ টাকা
ব্যয়—	৪০,৬০,৪৭,০০০ "
উদ্ধৃত—	৪,৯৫,৮৯,০০০ "

লীগ মন্ত্রীরা এ বৎসর গদীতে ছিলেন না। প্রথমেই দেখা যায় চাউল প্রভৃতির কারবারে লোকসান ১৪ কোটি টাকা হইতে সওয়া দুই কোটিতে নামিয়া আসিয়াছে। নৌকা-বিলাসে এবার ব্যয় হইয়াছে ১,৯২,৮৩,০০০ টাকা। পূর্ব বৎসর মন্ত্রীরা দুর্ভিক্ষ সাহায্য দানের জন্ত যে বিরাট কর্মচারী-বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন এ বৎসরও তাহা বহাল রাখা হয় এবং দুর্ভিক্ষ সাহায্যে ৭৫,৯৪,০০০ টাকা ব্যয় করিবার জন্ত কর্মচারী প্রভৃতির বেতন, ভাতা ও আপিস খরচা ইত্যাদিতে ২,১৩,৪৮,০০০ টাকা বাহির হইয়া যায়। এত করিয়াও এবার গত বৎসর অপেক্ষা মোট ব্যয় প্রায় ৪ কোটি টাকা কম হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসর দান করেন ৮ কোটি টাকা।

১৯৪৬ সালে মজ্জিমণ্ডলে লীগের পুনরাবির্ভাব হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে আবার ব্যয় বৃদ্ধিও হয়। যুদ্ধ ধামিয়া গিয়াছে, যুদ্ধের নামে অপব্যয়ের পথ আর নাই কিন্তু 'রক্ত' আবিষ্কারে দুর্জনের অসুবিধা কখনও হয় নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নামে এবার বড় বড় ব্যয় শুরু হইয়াছে এবং সেই ফাঁকে অপচয় ও চুরির রাস্তাও খোলা রাখিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাজেটের অবস্থা এইরূপ :

আয়—৪২,৫০,৫৬,০০০ টাকা

ব্যয়—৫২,২০,৬৯,০০০ "

খাটুতি—৯,৭০,১৩,০০০ "

এই বৎসর হইতে লীগের কার্য একেবারে নিরন্তর হইয়াছে। আপত্তি করিবার কেহ নাই, ভাগ আদায়ের সম্ভাবনাও কম। কাজেই এবার হইতে লোভও হইয়াছে দুর্জয়। আগামী বৎসরের জন্ত যে বাজেট দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে লোভ আরও স্পষ্ট। উহাতে আয় ব্যয় ধরা হইয়াছে এই ভাবে—

আয়—৪৭,৬৭,৮৯,০০০ টাকা

ব্যয়—৫৩,৮৮,০৩,০০০ "

খাটুতি—৬,২০,১৪,০০০ "

এ বৎসর পুনর্বসতি প্রভৃতিতে ব্যয় হইবে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষের নামে মোতায়েন কর্মচারীবাহিনী আছে, বিহারে লোক পাঠাইয়া যাহাদিগকে বাংলায় আনা হইয়াছে তাহাদেরও খরচ আছে। চাউল, গম প্রভৃতির কার-বারে এবারও যথারীতি ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লোকসান ধরা হইয়াছে। তবে এবারকার লোকসান অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। অল্প কোন বৎসরেই সওয়া দুই কোটি বা আড়াই কোটি টাকার কম লোকসান হয় নাই, দুর্ভিক্ষের পর বৎসর উহা ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল। নৌকা-বিলাসে এবারও ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা লোকসান ধরা হইয়াছে। মোট ৪৪৩৫৫ নৌকা গবর্নমেন্টের হাতে আছে। ১৯৪৪ সাল হইতে এইগুলিকে ক্রমাগত পুঁথিয়া রাখিয়া উহা-

দের তদারকী বাবদ প্রতি বৎসর মোটা টাকা ব্যয় হইতেছে। যেচিয়া ফেলিলে ত আর এই আয়টা থাকে না, কারণ নৌকা তদারকী বিভাগটাই উঠিয়া যায়। নৌকা তদারকীর এবং উহার বিক্রয়লব্ধ আয়ের হিসাব এইরূপ :

তদারকীর ব্যয়—

১৯৪৪-৪৫ ৪,০৬,০০০ টাকা

১৯৪৫-৪৬ ৩৫,৬৮,০০০ "

১৯৪৬-৪৭ ৫৫,৭৭,০০০ "

(সংশোধিত বাজেট)

১৯৪৭-৪৮ ৩০,৭৩,০০০ "

মোট ১,২৬,২৪,০০০ টাকা

সরকারী হিসাবে মনে হয় যে ৪৪৩৫৫ নৌকার খরচদারী করিবার জন্ত এই টাকাটা খরচ হইয়াছে। এই কার্যে কাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা বোধ হয় বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

নৌকার বিক্রয়লব্ধ আয়—

১৯৪৫-৪৬ সালে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে বলা হইয়াছিল নৌকা বিক্রয়ে আয় হইবে ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে উহা বদলাইয়া করা হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার। এবারকার বাজেটে বলা হইয়াছে গবর্নমেন্ট আগামী বৎসর ৪২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আদায়ের আশা রাখেন। বৎসরান্তে একটা সংশোধিত বাজেট খাড়া করা, এবারও উহা কমাইয়া লাভ বারো করা হইবে কি না এবং পর বৎসরের বাজেটে আবার একটা মোটা আদায়ের ভরসা দেখাইয়া জাওতা দেওয়ার চেষ্টা হইবে কি না তাহা এখনও বলা যায় না। তবে কৌশলটা স্পষ্ট। এই হিসাবের সারমর্ম এই যে আজ পর্যন্ত নৌকা বিক্রয়ে প্রকৃত পক্ষে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং উহার তদারকীর জন্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে আর কত টাকা আদায় সত্যি হইবে গবর্নমেন্ট তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তদারকী বাবদ যে ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে সেই টাকাটা খরচ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ সালের মূল বাজেটে বিক্রয়লব্ধ আয় ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দেখাইয়া তদারকী ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার কিন্তু সংশোধিত বাজেটে দুইটাই বদলাইয়া আয় কমাইয়া ধরা হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার এবং তদারকী ব্যয় বাড়াইয়া ধরা হইয়াছে ৫৫ লক্ষ ৭৭ হাজার। মূল বাজেট ভুলিয়া যে পরিমাণ সমালোচনা হয় সংশোধিত বাজেটে তাহা হয় না, এই সুযোগটি পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং অপচয়ের ব্যাপারে লীগ কর্তাদের দূরদর্শিতা বা পরিকল্পনা নাই এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। গবর্নমেন্ট নিজেই বলিতেছেন যে

বর্তমানে নৌকার বাজার এত পড়িয়া গিয়াছে যে সরকারী নৌকা তৈরিতে যে টাকা খরচ হইয়াছে তার এক-চতুর্থাংশের বেশী দাম পাওয়ার আশা নাই, তথাপি একসঙ্গে সমস্তগুলি বেচিয়া ফেলিয়া তদারকী ব্যয় কমাইবার কোন চেষ্টা হইতেছে না। কারণ তাহা করিলে নৌকার খবরদারীর নামে যে পাকিস্থানী বাহিনী মোতায়েন রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে বিদায় দিতে হয়।

যে নৌকা বিক্রয় করিয়া এক-চতুর্থাংশ টাকাও দাম পাওয়া যাইবে না বলিয়া গবর্নেন্ট নিজেই স্বীকার করিতেছেন তাহা নির্মাণের জন্য গত বৎসর পর্যন্ত কি উৎসাহের সহিত টাকা খরচ হইয়াছে তাহাও দৃষ্টব্য।

নৌকা তৈরির ব্যয়—

১৯৪৪-৪৫	১০,৪৪,০০০ টাকা
১৯৪৫-৪৬	১,৫৭,১৫,০০০ "
১৯৪৬-৪৭	৮৭,৬১,০০০ "

মোট— ২,৫৫,২০,০০০ টাকা

ইহার মধ্যে প্রথম দুই বৎসরের টাকাটা খরচের পাকা হিসাব, ১৯৪৬-৪৭ এর টাকাটা বরাদ্দ, তবে এটাও যে খরচ হইবে তাহা মনে না করিবার কোন কারণ নাই। লীগ রাজত্ব কায়ম থাকিতে দল ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে না ইহা হইতেই পারে না। ১৯৪৪-৪৬ এই দুই বৎসরে মবলগ ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা যে নৌকা তৈরিতে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া আদায় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। গবর্নেন্ট অবজ্ঞা এখনও চার ভাগের এক ভাগ টাকা তুলিবার আশা ছাড়েন নাই।

অপচয়ের হিসাব শুধু এই একটি নহে, আরও অনেক আছে। লীগের হাতে রাজত্ব ব্যয়ের কর্তৃত্ব থাকিলে কি অবস্থা হয় ইহা তাহার একটি নিদর্শন মাত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা

বাংলাদেশে লীগের হাতে এই ভাবে যে বিপুল টাকা অপচয় হইতেছে তাহার বাটতি পূরণের বেলায় কিন্তু অগ্রসর হন কেন্দ্রীয় সরকার। লীগ কথায় কথায় ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না কিন্তু টাকার বেলায় হাত পাতিবার ব্যগ্রতা তাহার কাহারও অপেক্ষা কম নয়। গত কয়েক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার লীগ গবর্নেন্টকে বাটতি মিটাইবার জন্য ২৩ কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছেন। বাংলার রাজত্ব গত কয়েক বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে। একটু বুঝিয়া খরচ করিলে এবং চুরি ও অপচয় নিবারণ করিলে বাটতি হওয়ার কোন কারণ তো নাই-ই, অধিকন্তু বাংলার বাজেটে প্রতি বৎসর প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকিবারই কথা। কিন্তু লীগের হাতে গবর্নেন্ট পড়িবার পর হইতে তার কোন উপায় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য যে টাকা বাংলা-সরকারকে দিয়াছেন তাহারও অপচয় কি ভাবে হইতেছে তাহাও দেখা দরকার। গত বৎসরের জন্য ভারত-সরকার দিয়াছিলেন সাড়ে দশ কোটি টাকা, বাংলা-সরকার উহা কাজে লাগাইতে পারেন নাই, ইহার মধ্যে সাত কোটি টাকা মাত্র তাঁহারা কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন। আগামী বৎসরের জন্য সাড়ে বার কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ইহারও কতটা শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় তাহা পরে দেখা যাইবে। খরচের নমুনাটা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে ভারত-সরকার-প্রদত্ত এই টাকাটা দেশের উন্নতি সাধনের জন্য পাওয়া গেলেও উহা লীগ মন্ত্রীদেব মডলব সিদ্ধির কাজেও যথেষ্ট পরিমাণে লাগিতেছে। জেলা ও সাবডিভিশনের সরকারী আপিসের বাড়ী তৈরি, সার্কেল অফিসারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাঁহাদের বাড়ী তৈরি, পুলিশের বাড়ী তৈরি ও সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, অথচ এই সব টাকা বাংলা-সরকারের নিজস্ব রাজস্ব হইতেই দেওয়া উচিত ছিল। দেশের উন্নতি বলিতে যাঁহা বুঝা যায় তাহার সহিত এই সব ব্যয়ের সম্পর্ক খুবই কম। ঢাকার আশাশুভা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ইসলামিয়া কলেজের বাড়ী তৈরি ইত্যাদির জন্য ভারত-সরকারের বরাদ্দ হইতে প্রায় ত্রিশ-লক্ষ টাকা উত্তোল হইয়াছে কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্য যে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল তাহা বাতিল করা হইয়াছে। বাংলা-সরকারের নিজের রাজস্বে না কুলাইলে ভারত-সরকারের বরাদ্দ হইতে এই টাকাটা না দেওয়ার কোন কারণ নাই—সাম্প্রদায়িক বিরূপ মনোবৃত্তি ছাড়া।

চট্টগ্রামের অবস্থা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামে গত দুই মাসে সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের মুসলিম লীগের সম্পাদক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেন।

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামের কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সেখানে গত দুই মাস সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি বিপদের সময় গিয়াছে। তিনি এই অভিযোগ করেন যে, চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ কজল কাদের চৌধুরী সংখ্যালব্ধি সম্প্রদায়কে শাসাইয়া-ছিলেন। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সেনকেও তিনি শাসাইয়া-ছেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে, চট্টগ্রামে 'বিহাঙ্গ দিবস' পালনের সময় ব্যবসায়ীদের নিকট মোটা টাকা দাবি করা হইয়াছিল। একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা

বলেন যে, একটি নির্দোষ বালকের হত্যাকারীকে ঘটনার দুই মাস পর গ্রেপ্তার করিয়া ধানায় দেওয়া হয়। মিঃ কাদের চৌধুরী ধানায় গিয়া ঐ লোকটির জামিনের জন্ত চেষ্টা করেন। পুলিশ জামিন দিতে অস্বীকার করিলে মিঃ চৌধুরী রাত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত দেখা করেন এবং আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ সময়ের পর দুই মাস পার হইয়া গিয়াছে অথচ ঐ আমলা সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না।

সাপ্তাহিক মনোভাবে উকানি দিবার জন্ত কিল্লপ প্রচার-কার্য চালানো হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তা বলেন যে ব্যবস্থা-পরিষদের জর্নেলক সদন্ত এক জায়গায় কতকগুলি লোককে বুঝাইতেছিলেন যে গত দাঙ্গায় মিঃ সুরাবর্দী নিজে দশ জন লোককে হত্যা করিয়াছেন। তিনি (ঐ সদস্য) শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাহারাও যদি মিঃ সুরাবর্দীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে তাহা হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাদেরও নিজেদের জীবনে যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তা বলেন যে তিনি সর্বদা রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত তিনি মুসলিম লীগের এক জন প্রধান কর্মীর সহিত সর্বক্ষণ বোরাঙ্কেরা করেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তা ঐ বিষয়ট সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রশ্ন করিলে তিনি এই উত্তর দেন যে লোকটি অতি বদমায়েস, সেজন্য তিনি উহাকে চোখে চোখে রাখিবার জন্ত সর্বদা উহার সঙ্গে থাকেন।

মুসলিম ভাষণাল গার্ডের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তা বলেন যে ঐ দলের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতি রাত্রে রাস্তায় প্যারেড করে কিন্তু হিন্দুরা দলবদ্ধভাবে পথে বাহির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিছুদিন হইল অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বদলী করিয়া তাহার স্থলে একজন মুসলমানকে সেখানে পাঠানো হইয়াছে। অজ্ঞাত হিন্দু অফিসারদের স্থানে মুসলমান বসাইবার চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তা বলেন যে, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর আক্রমণ, সম্পত্তি হরণ ও নরহত্যা চলিয়াছে কিন্তু তাহারা কোন পার্শী আক্রমণ করে নাই। তিনি আরও বলেন যে, দাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনই সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

নোয়াখালী-ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা

নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার বহুস্থান হইতে এখনও সংঘবদ্ধ গুণ্ডামির সংবাদ আসিতেছে। আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই মার্চ চাঁদপুর মহকুমার সীমান্তে নোয়াখালীর কোন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি প্রকাণ্ড দিবালাকে পশ্চিমঘে এক দল গুণ্ডাকর্তৃক

আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে প্রহৃত হন। এই গুণ্ডাদের সর্দার গত হাদামার সময় কুখ্যাতি অর্জন করে এবং সে আহত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে আহত ব্যক্তি কোন প্রকারে নিকটবর্তী স্ব-সম্প্রদায়ের এক জন লোকের বাড়ী পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ছুর্ত্তেরা তাহাকে তাড়া করিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং পলায়িত লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত এক ঘণ্টা যাবৎ চেষ্টা করে কিন্তু তাহাকে বাহির করিতে পারে নাই। বাড়ীর মালিক লোকটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এই অভিযোগে ছুর্ত্তেরা তাহাকেও খুঁজিতে থাকে। তিনি পরিবারের অজ্ঞাত লোকসহ নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকাইয়াপ্রাণ রক্ষা করেন। ছুর্ত্তেরা চলিয়া যাওয়ার পর এছাহার দেওয়ানিবার জন্ত আহত ব্যক্তিকে একটি পুলিশ ক্যাম্পে লইয়া যাওয়া হয় ও পরে তাহাকে রায়পুরা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, ঐ দিনই সন্ধ্যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রায় পাঁচ শত লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সমবেত হয় এবং নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে থাকে।

চাঁদপুরে আসামী ধরিতে গিয়া পুলিশ বাধা পাইতেছে এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদপুরের হানারচর অঞ্চলে এক দল পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে এক দল লোক পুলিশকে বাধা দেয়। পুলিশ বাধাদানকারীদের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হয় এবং ইহাতে একব্যক্তি নিহত হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবলও আহত হইয়াছে। আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, জামীন গ্রাহ্য নহে এইরূপ এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ সশস্ত্র পুলিশ গত হাদামার সংগ্রহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করিলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বাড়ীর লোকজন সহ পুলিশকে বাধা দেয় ৩০ ধারাল অস্ত্র দ্বারা এক জন সশস্ত্র কনেষ্টবলকে জখম করে। ফলে পুলিশ গুলি চালায় এবং ঐ অভিযুক্ত লোকটিই নাকি উহাতে মারা যায়।

এই ঘটনা “আনন্দ বাজার পত্রিকায়” প্রকাশিত হওয়ার পর লীগের অজ্ঞতম মুখপত্র “আজাদ” নিরোক্ত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন, “চাঁদপুরে আবার জনতার উপর পুলিশের গুলি চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তার ফলে এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে বলিয়াও জানা গেল। চাঁদপুরের পুলিশ বাহিনীর আত্মপরাই সীমা নাই বলিয়া মনে হইতেছে। সেই যে নোয়াখালীর ছুর্ঘটনার পর হইতে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় পুলিশী জুলুম আরু হইয়াছে এখনও তার ইতি হইল না। ঐ অঞ্চলটা যেন মগের মুহুরে পরিণত হইয়াছে। পুলিশরাই এখানে জনসাধারণের হত্যাকর্তৃবিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দী কতবার যে এ-পুলিস জুলুম বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু পুলিশ জুলুম এখনও বন্ধ হইল না এবং তার ফলে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির যে এক কাণাকড়িও মূল্য নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভ্যই কি এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই, না তিনি এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার মনে করেন না? কথায় কথায় বিহারের কথা তুলিয়া নোয়াখালীর বীভৎসতাকে লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে এবং এই প্রচার-কার্যে বিমূঢ় হইয়া ভালমাহুষ শ্রেণীর এক দল গোবেচারী লোক লঙ্ঘ্য অধোবদনও হইয়া থাকেন। সভ্য কথা বিবেচনা করিলে এই জিনিষটাই আমাদের মনে হয় যে বিহারের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল কলিকাতায় বিহারী মুসলমান কর্তৃক বিহারী হিন্দুদের হত্যা ও লাহনা। নোয়াখালী ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। নোয়াখালীতে সুপরিকল্পিত ভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, দৈনিক যত্ন অপেক্ষা ধর্মাস্তর ঘটাইয়া আশ্বাস যত্ন ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে নোয়াখালীতে, বিহারে নয়। বিহারের ব্যাপারের পিছনে পরিকল্পনা ছিল না, ছিল চূড়ান্ত provocation-এর পর পৈশাচিক উত্তেজনা। বিহার-পরিষদে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীক্ষয় সিংহ হত্যাকাণ্ডের পূর্ববর্তী এক মাস মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রচারের নামে কি ভাবে উত্তেজনায় ধোরাক জোগাইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন এবং লীগ সদস্যেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নোয়াখালী-দিবস পালনের অমুমতি দেওয়ার পূর্বে বিহার গবর্নেন্ট স্থানীয় লীগ কর্মকর্তাদের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারা আপত্তি না করিতেই ঐ অমুমতি দেওয়া হয়। নোয়াখালীতে মাসাবধিকাল যাবৎ ঐরূপই পাকিস্তানী প্রচার কার্য চলিয়াছিল। স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা উহার সংবাদ গবর্নেন্টকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কোন সাহায্য পান নাই।

হাক্কামা দমনে বিহারের কংগ্রেস গবর্নেন্ট সর্বশক্তি নিযুক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজন মাত্র নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছেন, পণ্ডিত নেত্র সৈন্যে ছুটিয়া গিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধ করিবামাত্র এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণ করা হইবে এই কথা বলায় তীব্র সমালোচনা সহ করিয়াছেন। প্রায় ছয় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সাহায্যদানের ভার লীগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিও কেহ করে নাই, হত্যাকাণ্ডের নায়কদের মাথায় তুলিয়া নাচিবার চেষ্টাও হয় নাই, সর্ববাদপত্রগুলিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় নাই। মুসলমানের প্রার্থনার আজান শুনিয়া কোন হিন্দু উহা বন্ধ করিতে বলে নাই, বরং উত্তেজনা ধামিয়া গেলে নিজেদেরাই ভাঙা মসজিদ মেরামত করিয়া দিয়াছে; দুর্গতদের ঘরবাড়ীও নিজেদেরাই তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাহারা দিয়াছে।

আর নোয়াখালীতে? লীগ গবর্নেন্ট প্রথম হইতেই

পক্ষপাতিকমূলক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। লীগের উচ্চতম নেতারা নোয়াখালী গিয়া যে দুর্বৃত্তেরা ছোঁরা দেখাইয়া প্রাণভয়ে মানুষকে ধর্মাস্তর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি স্ববিত্ত কাজ যাহারা করিয়াছে তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টা তো করেনই নাই, বরং এমন কথা বলিয়াছেন এবং এমন আচরণ করিয়াছেন যাহার ফলে দুর্বৃত্তেরা প্রকারান্তরে উৎসাহই পাইয়াছে। তাহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে কাজ তাহারা করিয়াছে তাহা অজ্ঞার নহে, শুধু এখনও পুরাপুরি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়াই তাহাদিগকে একটু অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, পুলিশে টানাটানি করিতেছে, পাকিস্তানটা ভাল করিয়া কামেম হইলেই আর ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বধ লুণ্ঠনে ও নারীহরণে আপত্তি করিবার কেহ থাকিবে না। নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারী-হরণ ও নারীধর্ষণ প্রভৃতি মানব সমাজের অধঃতম অপরাধের অভিযোগে যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের জামিন ও গ্রেপ্তারকালীন সময়ের জন্য পারিবারিক ভাতা প্রভৃতি লীগ পত্রিকাগুলি দাবি করিতেছে এবং এই নারকীয় কাণ্ডের নায়ক গোলাম সারোয়ারকে মোলানা আখ্যা দিয়া তাহাকে উচ্চমান দানের জন্য লীগের সব কয়টি পত্রিকার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রেপ্তার, জামীনদান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে কোমলতা এত বেশী দেখান হইতেছে যে তার ফলে নোয়াখালী বা ত্রিপুরার স্থায়ী শান্তি কিহতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, পারেও না। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ার স্থানীয় লোকদের মনোভাবে পরিবর্তন আনিতে দেখিয়া লীগনেতারা কি ভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা এখনও সকলেরই মনে আছে। নোয়াখালীর ঘটনার নায়কদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন তো দূরের কথা তাহাদের প্রতি কে বেশী দরদ দেখাইবেন তাহারই প্রতিযোগিতা তাহারা করিয়া চলিয়াছেন। বিহার ও নোয়াখালীর ঘটনার প্রতি কংগ্রেস ও লীগ গবর্নেন্টদের মনোভাব লক্ষ্য না করিলে এই দুইটি স্থানের সমস্যার আসল রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নুহ। শ্রীযুক্ত এ. ভি. ঠকুর ৯ই মার্চ চাঁদপুর হইতে যে বিবৃতি দিয়াছেন, এই দিক হইতে বিবেচনা করিলেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি হইবে। শ্রীযুক্ত ঠকুর বলিতেছেন যে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় এখনও অরাজকতা চলিতেছে। অক্টোবর হাক্কামার পূর্ব পাঁচ মাস কাটয়া যাওয়া সত্ত্বেও উপদ্রব হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে কোন কোন অস্থায়ী ধান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার অর্থ দুর্বৃত্তদের আরও অবাধে ছুড়ম চালাইবার অমুমতি দান। তিনি বলেন যে, পুনর্বাসতি কার্যের জন্য তিনি আর পূর্ববঙ্গে আসিবেন না। শ্রীযুক্ত ঠকুর বোকাই রওনা হইয়া গিয়াছেন।

বৈদিক আৰ্য ও ইরানীয় আৰ্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

(২)

বৈদিক আৰ্য ও ইরানীয় আৰ্য সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে (প্রবাসী কাৰ্তিক, ১৩৫৩) প্রাচীন ইরানীয় ধৰ্মগ্রন্থ ভেন্দিদাদে বর্ণিত ষোলটি আৰ্য-বসতির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আৰ্য-বসতিগুলির অবস্থান হইতে বৈদিক আৰ্য ও ইরানীয় আৰ্য-দিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুপ অন্বেষণ করা চলে বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা হইবে।

ভেন্দিদাদ প্রাচীন ইরানীয়দিগের ধর্ম ও সমাজ এবং আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুশাসন এবং মোটামুটি স্থতি-শাস্ত্রের সহিত তুলনীয়। 'Vendidad' নামটি vi-daevo-datam হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ "যাহা দেবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত", অর্থাৎ যাহাতে দেবদিগের (ইরানীয় ধর্ম-শাস্ত্রের অপদেব) অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বিধান করা হইয়াছে। বাইশটি অধ্যায়ে (fargards) বিভক্ত ভেন্দিদাদ বিভিন্ন সময়ে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের দ্বারা রচিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রাচীনতম অংশ সম্ভবতঃ জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাবে দুই-এক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভেন্দিদাদের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে অহুর মাজদা কতৃক সৃষ্ট ষোলটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে এই ষোলটি অঞ্চল ষোলটি প্রাচীন আৰ্য-বসতি এবং এইগুলি জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রভাবের মধ্যে আসিয়াছিল। এই মত বিচারসহ-কিনা পরে দেখা যাইবে।

ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ের আবেস্তা অংশে দেখা যায় স্পষ্টতম জরাথুষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া অহুর মাজদা বলিতেছেন যে প্রথম যে বাসযোগ্য উত্তম অঞ্চল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম আইরিয়ানা বেজো (Airy-ana vaejo)। আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পাখিবর্ষ। জেন্দ অংশে (আবেস্তার ভাষ্য অংশে) বলা হইয়াছে যে, বাসযোগ্য হইবার পূর্বে সেখানে দশ মাস শীত এবং দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম প্রচলিত ছিল, এবং এই দুই মাসেও এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হইত ("cold as to water, cold as to earth, cold as to plants")। যাহারা উত্তরের আর্টিক বা তুবার অঞ্চলে আৰ্য-জাতির আদিম বাস ছিল এইরূপ মত পোষণ করেন তাহারা ভেন্দিদাদের এই স্মৃতিতে একটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভেন্দিদাদের আবেস্তা ও জেন্দ

অংশ এবং উহার পহ্লবী অনুবাদ হইতে আইরিয়ানা বেজোর অবস্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা করা সম্ভব নহে। সে যাহা হউক, দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম বিশিষ্ট আর্টিক অঞ্চল পর্যন্ত জরাথুষ্ট্রের ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল বা ইরানী ও ভারতীয় আৰ্যগণ এইরূপ কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন এই প্রকার মতবাদের বাস্তব কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক বর্ণনা মিলাইয়া আইরিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং ইরানীয় ধর্ম-শাস্ত্রের সৃষ্টিকালের যে পুরাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সমস্তার সমাধানে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

অহুর মাজদার সৃষ্ট দ্বিতীয় উত্তম অঞ্চল "গৌ" (Gau.) যেখানে স্বর্গধা অবস্থিত। পহ্লবী অনুবাদে গৌকে গাবা (Gava) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মিহির ইয়াটে একবার গৌ-স্বর্গধার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথের (বৈদিক মিত্র) স্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে তাঁহার অনুগ্রহে বিশাল-কায়া নদীসকল আইস-কাতা (Aish-kata), পুরুতা (Pouruta, Parthia), মৌর (Mouru, Merv), হারোয়ু (Haroyu, Hefat), গৌ-স্বর্গধা (Sugdha) এবং কাই-জেরিজেম (Khoraesmia)-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। আইসকাতার অবস্থান অজ্ঞাত। পার্থিয়া বা পার্থব, মার্ত, হিরটি, স্বর্গধা এবং থিবার উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্ম এই সকল অঞ্চলকে প্রভাবিত করিয়াছিল। অহুর মাজদার সৃষ্ট তৃতীয় উত্তম অঞ্চল মৌর বা মার্ত। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, থিবা ও মার্ত উভয় অঞ্চল ইরানের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে। স্বর্গধা, মার্ত, থিবা বর্তমানে রাশিয়ার অধীন। চতুর্থ অঞ্চল বাখধি (Bakdh), অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া বা বালখ। বালখের উচ্চ-ভূমির (berokdha kehrpa) উল্লেখ অনেকবার পাওয়া যায়। পহ্লবী অনুবাদের নাম বুখার। বাখধিকে সৌভাগ্য-শালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অঞ্চল নিশাই (Nisai)। জেন্দের ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিশাই বাখধি ও মৌরুর মধ্যে অবস্থিত। নিশাইয়ের অধিবাসী যে বিধর্মী ও অবিশ্বাসী ছিল আবেস্তায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পহ্লবী অনুবাদক বলিতেছেন যে তাহারা দেবতা ও অপদেবতা উভয়ের অস্তিত্বে সংশয়ী ছিল। ষষ্ঠ অঞ্চল হারোয়ু বা হিরটি, পহ্লবীতে হরিব বা হরাব। অনুবাদকের বর্ণনায় দেখা যায় হিরটিতে বৈশিষ্ট্য মশক ও ভিক্ষুর প্রাচুর্য। সপ্তম অঞ্চল বেকেরেত (Vaekereta)।

পহলবী অম্ববাদকের মতে বেকেরেত কাবুল, কিন্তু এইরূপ অম্বমান করা হয় বেকেরেত সজস্থান বা শকস্থান (Seistan, Gk. Drangiana)। আবেস্তা হইতে জানা যায় বেকেরেতের অধিবাসী যাহুবিজার পক্ষপাতী ছিল। পহলবী অম্ববাদক বলিতেছেন তাহারা যাহুবিজা ও প্রতিমাপূজায় আসক্ত ছিল এবং নিয়মাম্বসারে ক্রিয়াকর্ম করিত না। প্রতিমাপূজার এই উল্লেখ লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টম অঞ্চল বিস্তীর্ণ গো-চারণভূমি-বিশিষ্ট উর্ব (Urva)। উর্ব কাবুল এইরূপ অম্বমান করা হয়। নবম অঞ্চল খেণ্ডত (Khenta, পহলবী Khnan)। খেণ্ডত কান্দাহার এইরূপ অম্বমান করা হইয়াছে। খেণ্ডতের বৈশিষ্ট্য নেকড়ে বাঘের প্রাচুর্য ও ইহার অধিবাসীদিগের পুংমৈথুনে আসক্তি। দশম অঞ্চল হারাকাইতি (Haraqaiti, পহলবী Harakhmond) হারাকাইতি বা হারগোবতী গ্রীকদিগের আরাকেশিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। হারাকাইতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহার অধিবাসীদিগের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে,

"The vile sin which cannot pass the bridge, which is burying the dead; this is heathenish and according to their law."

আবেস্তা অংশে বলা হইয়াছে "the inexpressible deeds of burying the dead." মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করা জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের মতে ঘোরতর পাপ। হারাকাইতিতে এই ধর্মবিগর্হিত প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যাইতেছে এবং জানা যাইতেছে সেখানকার অধিবাসীরা জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মরীতি অনুসরণ করিত না। একাদশ অঞ্চল হেতুমত (Hætumat, পহলবীতে Het-homand)। হেতুমত আধুনিক হিলমণ্ড এবং গ্রীকদিগের এটিমাণ্ডার। ইহাকে গৌরবোজ্জল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পহলবী অম্ববাদক বলিতেছেন বেহ (Veh) নদী এখানে প্রবাহিত। এই পৌরাণিক বেহ নদী বৃন্দাহিসের (Bundahish পার্শী ধর্মগ্রন্থ, রচনাকাল অম্বমান খ্রীঃ পূঃ ৪০০) মতে পূর্ব এলবোরজ্ হইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বাধিক প্রবাহিত হইয়া ইহা সিন্ধুর মধ্য দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। সিন্ধুদেশে ইহার নাম মেহরা (Mehra)। সম্ভবতঃ ইহা মেসকিদ নদী। হেতুমতের অধিবাসীদিগের যাহুবিজার প্রতি আসক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বাদশ অঞ্চল রাঘা (*Ragha বা Rai)। রাঘা তেহেরানের নিকটবর্তী রায় নগর। রাঘার অধিবাসীদিগকে সংশয়বাদী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অঞ্চল চখ্র (Chakra, পহলবী Chakhar)। আবেস্তায় চখ্রকে বলশালী ও ত্রায়পরাধণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আবেস্তার মতে সেখানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। চখ্রের অধিবাসীরা জোরোস্ত্রিয়ান ধর্ম গ্রহণ করে নাই বুঝা যায়। চতুর্দশ অঞ্চল বরেন (Varena)। বরেনকে চতুষ্কোণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। চতুষ্কোণের অর্থ করা হইয়াছে চারটি রাস্তা বা ফটক-বিশিষ্ট। পহলবী অম্ববাদক বলেন বরেন কিরমান, কেহ কেহ বলেন গিলান। ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে ইহা অনার্য জাতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত ("non-Aryan plagues of the country")। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। পঞ্চদশ অঞ্চল সপ্ত সিন্ধুর দেশ (Hapta Hindu)। আবেস্তায় পূর্ব সিন্ধু হইতে পশ্চিম সিন্ধুর (Ushastara Hendva avi daoshastarem Hendum) উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব সিন্ধুর পরে পশ্চিম সিন্ধুর উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পহলবী অম্ববাদকের মতে সপ্তসিন্ধুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে সাত জন প্রধান রাজার সংখ্যা হইতে। আবেস্তায় সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ থাকিলেও মাত্র পূর্ব ও পশ্চিম সিন্ধুর নাম করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রকৃত সংখ্যা সাত বিধা দুই একরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে অম্ববাদক একথা উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে কাহারও কাহারও মতে সাতটি অঞ্চলে প্রবাহিত নদী হইতে সপ্তসিন্ধুর সংখ্যা পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত গ্রীষ্ম ও জ্বর। মিহির ইয়াটে পূর্ব ও পশ্চিম হিন্দু (Hindvo) বা সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অহরা মাজদার সৃষ্ট ষোড়শ অঞ্চলের বর্ণনা অস্পষ্ট। দেশের নাম নাই। বলা হইয়াছে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাকারে পরিবেষ্টিত না হইয়া সমুদ্র-উপকূলে বাস করে। অর্থাৎ ইহা উপকূল-অঞ্চল। পহলবী অম্ববাদে এই অঞ্চলের নাম আরাক্শিহান (Arangistan) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আরাক্শিহানের অর্থ আরাক্শ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। আরাক্শ নদী বৃন্দাহিসের বর্ণনায় এলবোরজ্ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমে প্রবাহিত। সুতরাং যে উপকূলের কথা বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ কাশ্মিরের সাগরের উপকূল নহে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে অতিরিক্ত শীত ও তুষারপাত। পহলবী অম্ববাদক বলিতেছেন প্রাকারবেষ্টিত না হইয়া বাস করিবার কারণ যাহাতে শত্রুর আগমনে তাহার দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে পারে। এই অঞ্চলে প্রকৃত বহুত্বসম্পন্ন কোন রাজা নাই কেহ কেহ এইরূপ বলেন, অম্ববাদক ইহা জানাইয়াছেন।

ইহার পর জৈম অংশে এইগুলি ছাড়া যাহাদের নাম করা হয় নাই এক্ষণ আরও অনেক উপত্যকা ও সমতল অঞ্চল আছে একথা বলা হইয়াছে। পহলবী অম্ববাদক

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফার্সের (Fars বা Farsistan) নাম করিয়াছেন।

ভেন্দিদাদে উল্লিখিত ষোলটি অঞ্চলের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে ষোলটির মধ্যে এগারটি অঞ্চল অবিসম্বাদীরূপে পূর্ব ইরাণ, আকগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে। এই এগারটির নাম, গৌ-স্বগধা, মার্ভ, বালখ, নিশাই, হিরাট, বেকেরেত বা শকস্থান, উর্ব বা কাবুল, খেঙত বা কান্দাহার, হারাকাইতি, হেতুমত বা হিলমণ্ড ও সপ্তসিন্ধু, বাকী পাঁচটির মধ্যে চখু বা চাখারের অবস্থান পরিষ্কার নহে; উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে পহ্লবী অম্ববাদকের ব্যাখ্যার ফলে অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়; এবং আইরিয়ানা বেজোর বর্ণনা হইতে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না। বাকী দুইটির মধ্যে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণের মধ্যে। একটি মতানুসারে ইম্পাহান, রায়, হামাদান, নিহাবন্দ ও আদর বা আজারবাইজান প্রাচীন পহ্লব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই সকল অঞ্চল লইয়া প্রাচীন মিডিয়া গঠিত ছিল। অবশিষ্ট থাকে বরেন। বলা হইয়াছে যে বরেন কাহারও মতে গিলান কাহারও মতে কিরমাণ। কিরমাণ ইরাণের দক্ষিণ-পূর্বে, গিলান উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে। বরেনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ইহা অনার্য দেশের নিকটবর্তী বা বাহির হইতে তাহাদের ইরাণ-আক্রমণের পথে। গিলানে আৰ্য-বসতি থাকিলে পূর্বে মাজানদারেন ও পশ্চিমে আজারবাইজানও প্রাচীনকালে আৰ্য-বসতির অন্তর্ভুক্ত ছিল মনে করা যায়। মাজানদারেনের পূর্বে প্রাচীন হিরকানিয়া অনার্যদেশের অন্তর্ভুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে দাহী (Dahae) সিথিয়ান (Scythian) বলিয়া পরিচিত অনার্য জাতিদিগের অঞ্চল। কাস্পিয়ানের পশ্চিমে আজারবাইজান বা প্রাচীন আত্রোপাতেন ককেশাসের সংলগ্ন। ককেশাশ ও পূর্ব-রুশিয়া প্রাচীন মিডিয়ান ও হাকামনি সাম্রাজ্যের আমলে সিথিয়ান বলিয়া পরিচিত গোষ্ঠীসমূহের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। দেখা যায় সাসানীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইহাদের বিরুদ্ধে ককেশাসের দ্বার রক্ষা করিবার জন্য রোম সাম্রাজ্য সাসানীয় সম্রাটগণকে কর দিত। মিডিয়ান সাম্রাজ্যের আমলে অনার্য জাতিদিগের আক্রমণ কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল হইতে ঘটয়াছিল। আরসিকিডান আমলে এই আক্রমণ প্রধানতঃ ইরাণের পূর্বদিকে কিরমানের সন্নিহিত অঞ্চল হইতে ঘটে। বরেন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে উহা পেতাওনা বা ফ্রেহুনের জন্মস্থান। ফ্রেহুদন অহি দাহকের (Azhi Dahak) বিনাশকারী বলিয়া

ইরাণীয় পুরাণে প্রসিদ্ধ। ফ্রেহুদন, যিম, কবযুস প্রভৃতি ইরাণীয় পুরাণের বিখ্যাত বীর এবং দেবতারূপে পরিচিত। ইহার পরে দেখা যাইবে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের অভ্যুদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় মিডিয়ান। মিডিয়ান মাজি গোষ্ঠী জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসে পুরোহিত সম্প্রদায়রূপে বিখ্যাত। এই সকল কথা মনে রাখিলে বরেনকে কিরমান অপেক্ষা গিলান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পহ্লবী অম্ববাদে কিরমানের উল্লেখের ভিত্তি যে কোন প্রাচীন প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। হান-বংশের আমলের প্রাচীন চীনা ক্রনিকলে উল্লিখিত Great Wan ভেন্দিদাদের বরেন হইতে অভিন্ন কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। হান আমলের প্রসিদ্ধ রাজদূত চ্যাং কিয়নের বর্ণনা হইতে Great Wan-এর অবস্থান ফরগণার সন্নিহিত মিলিয়া যায় এইরূপ বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এ আলোচনা বাহুল্য, কারণ বরেন ছাড়া আরও কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থান অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত ষে ষোলটি অঞ্চলকে প্রাচীন আৰ্যবসতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে এগারোটি পূর্বদিকে। এই এগারোটির মধ্যে গৌ-স্বগধা, মৌরু, নিশাই ও বাখদিবাদে বাকী সাতটি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে আবৃত্তিত (মোর্ঘসাম্রাজ্য) এবং বাকী চারটিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সীমানার মধ্যে ফেলা যায়। আরব-আক্রমণের সময় পর্যন্ত স্বগ্ধায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল।

“Even for a long time after the invasion of Islam Buddhist idols are said to have been sold in the bazars of Bokhara”. Buddhism flourished in Scythiana until Arab conquest in the 8th century” (Aurel Stein).

উপকূলবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে সন্দেহের কথা বলা হইয়াছে। পহ্লবী অম্ববাদে আরাঙ্গিস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সন্দেহ এই কথা বলা যায় যে উহা মাক্রাণ উপকূল হওয়া অসম্ভব নহে। আরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে একটি পৌরাণিক নদীর নাম। আরাঙ্গিস্থানের সম্পর্কে অম্ববাদে Arum কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং উহার অর্থ করা হইয়াছে রোমের-পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য। ইহাতে প্রাচীন ইরাণীয় ও রোমক-সাম্রাজ্যের সীমানা যুক্তেতিস নদীর কথা আসিয়া পড়ে। ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যায় এই অঞ্চল বরাবর সেমিটিক জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। তারপর বরেনকে কিরমাণ বা ফরগণা বলিয়া স্বীকার করিলে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণে একমাত্র আৰ্যবসতি দাঁড়ায়।

প্রাচীন আৰ্যজাতির উপনিবেশ বলিয়া ব্যাখ্যাত

ভেন্দিদাদে অহরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম (perfect) অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে আৰ্যবসতিগুলি স্বর্গধা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ভারতবর্ষের মধ্য পর্যন্ত প্রসারিত। স্বর্গধার পশ্চিমে মার্ত ও খোরাসানের দক্ষিণে কিরমান পর্যন্ত এই বসতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অক্সাস, হিররুদ ও সিন্ধুর অববাহিকা লইয়া একটি compact ভৌগোলিক অঞ্চল পাওয়া যাইতেছে যাহার মধ্যে অধিকাংশ আৰ্যবসতিগুলি অবস্থিত। দূরবর্তী রাধা এই সীমানার বাহিরে। এই সিদ্ধান্ত প্রচলিত আৰ্যবাদের, অর্থাৎ আৰ্যজাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের সমর্থন করে না। তারপর অহরা মাজদার সৃষ্ট এই সকল উত্তম অঞ্চলের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবস্থা অংশে যাহা বলা হইয়াছে ও পহলবী অহ্রবাদে যাহা বিশদ করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কি উত্তম অঞ্চল কি জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আহুগত্য, কোন হিসাবে তাহাদের অনেকগুলির প্রশংসা করা চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আইরিয়ানা বেজো সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্মবিশিষ্ট আইরিয়ানা বেজো অহরা মাজদা মনুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পৃথিবীর স্বর্গ। একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী আৰ্যজাতির উপনিবেশ-বিস্তার সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে আৰ্যজাতি উত্তর অঞ্চল হইতে ইরাণে পৌছিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়; এক দল পশ্চিম মুখে ও অন্য দল পূর্ব দিকে প্রস্থান করে। এই উত্তর অঞ্চল তাহার মতে আইরিয়ানা বেজো।

"From Airyana Vaejo, a sub-artic region to the north of Sogdiana, with ten months of winter (which explains the origin of the cult of Fire) and two of summer."

অর্থাৎ গো-স্বর্গধার উত্তরে এই সাব-আর্টিক অঞ্চল হইতে আৰ্য জাতি ইরাণে প্রবেশ করে। স্বর্গধার উত্তরের অঞ্চল গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণের নিকট সিথিয়া বলিয়া পরিচিত (Scythia intra Imaum ও Scythia extra Imaum) এবং ইতিহাসের আশ্রয় হইতে উহা মোঙ্গল-তুর্কী যাযাবর গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া প্রসিদ্ধ। মেয়ারের (Meyer) মতে আৰ্যজাতি খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পর্যন্ত কাস্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করে, তারপর দক্ষিণে ভারতবর্ষের দিকে চলিতে আরম্ভ করে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সকল মতের পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় ধারণা যে আৰ্যজাতির আদি বাসভূমি ককেশাশ বা পূর্ব-রুশিয়া এবং এই বাসভূমি

হইতে আৰ্যজাতি দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলিতে চলিতে ইরাণ ও ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। যে ব্যাপার খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৪০০ বৎসরের পরে লিখিত ভেন্দিদাদের লেখকের নিকট স্থপরিচিত ছিল বিনা দ্বিধায় এইরূপ অনুমান করা আবশ্যক। তাহা না হইলে আইরিয়ানা বেজো যে স্বর্গধার উত্তরে আলতাই পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রকার মতবাদের কোন ভিত্তি দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য, আইরিয়ানা বেজোর মাত্র শীতের বর্ণনা উপরের মতবাদের ভিত্তি। ভেন্দিদাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে সৃষ্টিকল্পের আরম্ভে অহরা মাজদা, মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রথম রাজা যিম ও দেবগণের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। অহরা মাজদা বলিলেন, পৃথিবীতে শীতের প্রকোপ হইবে ও ভয়ানক তুষারপাত হইবে। শীতের পূর্বে পৃথিবীতে বহু পশুখাদ্য ভূণ জন্মিত। তারপর জলে পৃথিবী প্রাবিত হইল ও তুষার গলিয়া নালার সৃষ্টি হইল। জলাশয় খনন করিয়া এই জল নিকাশ করিয়া যিম মনুষ্য-বসতি স্থাপন করিলেন। শীতের প্রাবল্য সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইতেছে তাহা পৃথিবীব্যাপী শীত এবং মনুষ্যসৃষ্টির পূর্বের ব্যাপার। আইরিয়ানা বেজোতে দশ মাস শীতের প্রভাব এবং গ্রীষ্মকালেও অতিশয় শীতের প্রকোপ ছিল। অহরা মাজদা ইহাকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু শীতের বর্ণনা হইতে আইরিয়ানা বেজোকে কাস্পিয়ান ও আরল সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিবার হেতু নাই।

জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে Dr. Haug বলিতেছেন যে জরাথুষ্ট্রকে বিশেষভাবে আইরিয়ানা বেজোতে বিখ্যাত বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ

"Famous in the Aryan home, whence the Iranians and Indians emigrated in times immemorial".

Dr. Haug বলেন, জরাথুষ্ট্রের শিষ্যগণ তাহাকে এই রূপ বিশেষণে ভূষিত করিতেন না যদি তাহাদের এ বিশ্বাস না থাকিত যে জরাথুষ্ট্র অতি প্রাচীনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাবকালের প্রাচীনত্ব নিরূপণে এই ধরণের যুক্তির মূল্য যাহাই হউক দেখা যায় যে অহরা মাজদা ও রাজা যিমকেও আইরিয়ানা বেজোতে বিখ্যাত বলা হইয়াছে। উপরে দেখা গিয়াছে যে আৰ্যবসতিগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইয়াছে পৃথিবীর স্বর্গ, এখানে অর্থ করা হইয়াছে আৰ্যদিগের বাসভূমি। ভেন্দিদাদের পহলবী অহ্রবাদে Airyana Vaejocকে Airan vej রূপে দেখা যায়। স্ততরাং প্রাচীন Airyan-এর পহলবী রূপান্তর Airan. Airan হইতে Erañ, Irun ও আধুনিক রূপ Iran আসিয়াছে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ যে

আইরিয়ানা বেজোকে স্বর্গধার উত্তরের সাব-আর্টিক অঞ্চল এবং গ্রী: পূ: ২০০০ বৎসরের Aryan home বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে উহা Airan বা Iran vej, অর্থাৎ ইরানের স্বর্গ বা ইরানের পবিত্র ভূমি। ভেন্দিদাদের আর্যবসতিগুলির তালিকার প্রথম অঞ্চল আইরিয়ানা বেজোর প্রকৃত অর্থ পবিত্র Iranian home এইরূপে অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তালিকার প্রথম উল্লিখিত অঞ্চল ইরানের স্বর্গ হউক বা আর্যবাসভূমি হউক ইহা একটি পৃথক অঞ্চল নহে, তালিকার পরবর্তী অঞ্চলগুলি এই আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত—ইহাই সহজ ও সরল অর্থ। পণ্ডিতগণ ইহাকে পৃথক একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া স্বর্গধার উত্তরে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন।

এখন এই অঞ্চলগুলির অগ্ৰাণ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে।

আইরিয়ানা বেজোতে শীতাদিক্য, গৌ-স্বর্গধার গো-মড়ক, যৌকতে যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠরাজ, বাকধিতে কীট ও বিঘাত্ত গাছপালা, নিসাইতে অবিশ্বাস (unbelief), হারোমুতে শিলাবৃষ্টি ও দারিদ্র্য, বেকেরেতে ভূতপ্রোতে বিশ্বাস, উর্বে যুদ্ধবিগ্রহের দরণ ধ্বংস, খেঙ্তায় অস্বাভাবিক ইঞ্জিয়াশক্তি, হারাকাইতিতে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, হেতুমতে যাত্নবিজ্ঞায় আসক্তি, রাঘায় সংশয়বাদিতার প্রাধাণ্য, চখে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, বরেনে অনার্য জাতির আক্রমণ, সপ্তসিন্ধুতে জ্বর ও উপকূল অঞ্চলে তুষার পাত—অহরা মাজদার কতৃক সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির এই সকল ক্রটির উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে উত্তম অঞ্চলগুলির এই সকল ক্রটির জন্ম Angro-mainyush দায়ী, শত্রুতা করিয়া সে উত্তম অঞ্চলগুলিকে এই ভাবে কলঙ্কিত করিয়াছে। দেখা যাইতেছে এই ক্রটিগুলির কতক নৈসর্গিক, কতক নৈতিক। অগ্ৰাণ্য অঞ্চলের কথা বাদ দিয়া নিগাহি, হারাকাইতি, রাঘা ও চখে ক্রটির বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হারাকাইতি ও চখে মৃতদেহ কবর দিবার ও দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মমতে এই দুইটি গুরুতর অপরাধ, বিধর্মীর প্রথা। অহরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন থাকিবার সরল অর্থ জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মমত এই দুই অঞ্চলে গৃহীত হয় নাই। নিগাহিতে এই ধর্মমত সম্ভবতঃ প্রবল ছিল না। রাঘায় সংশয়বাদিতার (over scepticism) উল্লেখ আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, একটি মতানুসারে জরাথুষ্ট্রের জন্মভূমি বলিয়া রাঘার প্রসিদ্ধি আছে। তাহা ছাড়া রাঘা প্রকৃত প্রস্তাবে জরাথুষ্ট্র উপাধিধারী জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের দ্বারা শাসিত হইত।

কয়েকটি অঞ্চলের মারাত্মক ক্রটির উল্লেখ হইতে

মোটামুটি এই কথা জ্ঞানিতে পারা যাইতেছে যে এই সকল অঞ্চলের সম্ভবতঃ তিনটিতে জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মমত গৃহীত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই অঞ্চলগুলি পূর্ব-ইরানের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। জোরোস্ত্রিয়ান মত এই অঞ্চলগুলিতে গৃহীত না হইয়া থাকিলে অহরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির তালিকায় এইগুলির স্থান পাইবার কারণ কি? ইরানীয় বা আর্যজাতির উপনিবেশ হিসাবে ভেন্দিদাদের লেখক এইগুলির নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মমত এই সকল অঞ্চলে গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। অহরা মাজদার জবানীতে এই অঞ্চল তাঁহার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির মধ্যে, এইরূপ প্রচারণার পশ্চাতে অহরা মাজদাকে ইরানীয় আর্যজাতির জাতীয় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত মনে হয় না।

আর্যজাতির আদি বাসভূমি এবং এই বাসভূমি হইতে কতকগুলি গোষ্ঠীর নীপার নদীর গতি অনুসরণ করিয়া উক্রাইনের মধ্য দিয়া পোলাণ্ডাবাল্টিক অঞ্চল, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, মধ্য ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কতকগুলি গোষ্ঠীর পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ইরান ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে করা হইয়াছে। আইরিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলৌচনীয় এই orthodox আর্যবাদের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। এখন সংক্ষেপে দেখা প্রয়োজন অহরা মাজদার সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল তাহা এই প্রচলিত আর্যবাদের সমর্থন করে কিনা এবং এই সকল তথ্য হইতে ইরানীয় ও বৈদিক আর্যগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি ধারণ করা সম্ভব।

আইরিয়ানা বেজোকে স্বর্গধার উত্তরে অবস্থিত সাব-আর্টিক Aryan home বলিয়া দাবি করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক দাঁড়ায় যদি আগে হইতে প্রচলিত আর্যবাদ স্বীকার করিয়া না লওয়া হয়। কাম্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের পূর্বাঞ্চলের কথা উঠে আর্যজাতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইরান ও ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এই মত গ্রহণ করা হইলে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিতে উত্তরের এই পথ ছাড়া আরও পথ ছিল। ককেশাস হইতে আজারবাইজান, মিডিয়া, সূসা, ফার্স, খোরাসান হইয়া বালথ বা কিরমান হইয়া বেলুচীস্থান অথবা আজারবাইজান, বুর্দীস্থান, মেশোপটেমিয়া হইয়া ইরান, এই সকল পথ ছিল। যাহারা মেশোপটেমিয়ার পথে আর্যজাতি ইরানে ও ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলেন মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস তাঁহাদের কিছুটা সমর্থন করে এ কথা অস্বীকার করা চলে

না। কাস্পিয়ান ও আরলের পূর্ব-উত্তরের পথে আৰ্যজাতি ইরাণে আসিয়াছিল যাহারা বলেন তাঁহাদের মতের সমর্থনে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন প্রমাণ নাই, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রমাণের কথা বলা বাহুল্য। উপরে দেখা গিয়াছে যে আইরিয়ানা বেজো বাস্তবিক ইরাণ, অথবা পূর্ব-ইরাণ। স্বর্ণাঙ্ক ও মার্ভের উত্তরে ইরাণের সীমানা বিস্তৃত ছিল ইরাণের প্রাচীন ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না।

যোলটি অঞ্চলের মধ্যে আইরিয়ানা বেজো বাদে পনেরটি অঞ্চলের মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পড়ে এবং এই এগারোটি অঞ্চল একটি compact ভৌগোলিক অঞ্চল ইহা দেখা গিয়াছে। এই তথ্য বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। যোলটি অঞ্চলের অধিবাসী যে জাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত সেই জাতির, সংখ্যার-দিক দিয়া এবং কৃষ্টির দিক দিয়াও বটে, প্রধান কেন্দ্র এই ভৌগোলিক অঞ্চল। এই জাতিকে যদি আৰ্যজাতি বলা হয় তাহা হইলে মধ্য-এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে আৰ্য-জাতি পূর্ব-ইরাণে আসিয়াছিল যাহারা বলেন তাঁহাদের মত মূল্যহীন হইয়া যায়। অর্থাৎ আৰ্যজাতি যে পশ্চিম দিক হইতে (ককেশাস বা উত্তর-পশ্চিম খিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া) আসিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়। ভেন্দিদাদের এই তালিকার কিছুমাত্র প্রামাণিকতা আছে স্বীকার করিলে রাধা বাদে পশ্চিম-ইরাণের অষ্টাশ্রু অঞ্চলগুলির অনুল্লেখ নিশ্চয় তাৎপর্যহীন ব্যাপার নহে। জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের পীঠস্থান মিডিয়ায় নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। ভেন্দিদাদের রচনাকাল যদি খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর হয় তাহা হইলে মিডিয়ায় নাম এবং হাকামণি সাম্রাজ্যের উৎপত্তিস্থান ফার্সের নাম উল্লেখ না করিবার হেতু কি? এই অনুল্লেখ যদি কোন প্রকার অভিসন্ধিমূলক না হয় তাহা হইলে বলিতে হয় লেখক আৰ্য বা ইরাণী আদি বসতি সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসরণ করিয়াছেন। এই কিম্বদন্তীর মর্ম এই যে আৰ্যজাতি পশ্চিম হইতে আসে নাই, পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Eratosthenes, Strabo এবং আরও অনেকের মতে আবেস্তার আইরিয়ানা পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান প্রভৃতি অঞ্চল। হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিয়সের একটি লেখনের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। আজ্ঞাপরিচয় দিয়া তিনি বলিতেছেন যে তিনি "Aryan, son of an Aryan, Persian, son of a Persian." পারশীক হইয়াও যে তাঁহাকে কুলগৌরব জানাইবার জন্ত বলিতে হইয়াছে যে তিনি আৰ্য ও আর্ষের পুত্র ইহার প্রাঞ্জল অর্থ পারশু গোড়ায় আৰ্য

দেশ ছিল না। ভেন্দিদাদের তালিকা এই কথা সমর্থন করে।

ইহার পর মিডিয়া ও পারশ্বের প্রাচীন ইতিহাস ও জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে এই বিষয় সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনার স্থান নাই। উপরের আলোচনা হইতে ইরাণী আৰ্য ও ভারতীয় আর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ভেন্দিদাদের তালিকায় যোলটি অঞ্চলের প্রথমটি যদি আৰ্য দেশ (আইরিয়ানা) অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অকসাস ও সিন্ধুর অববাহিকা ও পশ্চিমে হরিরুদের অববাহিকা এই দেশের মধ্যে পড়ে ইহা বলা হইয়াছে। এই দেশের পশ্চিমে কিরমান ও শকস্থানের মরুভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত পড়ে। অহরা মাজদা এই দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্বতরাং এই দেশের অধিবাসীরা এক জাতিভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের প্রতি বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন তালিকায় সেই সকল অঞ্চল স্থান পাইয়াছে তখন তাহারা যে একজাতিভুক্ত ছিল এই ধারণা সমর্থিত হয়। এই জাতিকে যখন সপ্তসিন্ধু বা বর্তমান কালের পঞ্চসিন্ধু বা পঞ্জাব পর্যন্ত অবস্থিত দেখা যাইতেছে তখন জাতি (race) হিসাবে ইরাণী আৰ্য ও ভারতীয় আর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল কিনা বিচার করা অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করিলে এই আৰ্য দেশের বর্তমান কালের অধিবাসিগণের এক বৃহৎ অংশকে অল্পবিস্তর তারতম্য সত্ত্বেও একটি প্রধান টাইপের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

উপরের আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত কড়া সম্ভব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

আবেস্তার আইরিয়ানার অর্থ আৰ্য দেশ হইলে দেখা যায় যে এই আৰ্য দেশ হিমালয় হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত mountain axis ও মালভূমির পূর্ব-অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্ব-ইরাণ, বর্তমান আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত-বর্ষ লইয়া এই দেশ গঠিত। এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যাহারা বাস করিত তাহারা এক জাতীয় ও এক ভাষাভাষী ছিল অনুমান করা যায়। তাহাদের নাম আৰ্য হইতে তাহাদের দেশের নাম আইরিয়ানা হইয়াছে। এই আইরিয়ানা পরবর্তীকালে ইরাণে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই জাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে তাহাদের প্রাচীন বাস-

ভূমিতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন বিচারসহ যুক্তি বা প্রমাণ কেহ উপস্থিত করেন নাই। স্বতরাং ককেশাশ বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া বা থিরগিজ অঞ্চল হইতে মধ্য-এশিয়া বা মেশোপটেমিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া ইরাণে তাহার উপনিবিষ্ট হয় এবং ইরাণে উপনিবিষ্ট দলগুলির মধ্যে কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ করে এই মতবাদ ভিত্তিশূন্য। ইরাণে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিবাদের ফলে ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং জরাথুষ্ট্রের ধর্মাবলম্বন এই বিচ্ছেদের প্রমাণ,—অর্থাৎ জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত প্রচার ও ভারতীয় আর্যদিগের ইরাণ পরিত্যাগ এই দুইটি সমসাময়িক ঘটনা, এই মত গ্রহণ করা যায় না। জরাথুষ্ট্রের ধর্মমত বাথখি হইতে প্রচারিত হইলেও আবিস্তায় বর্ণিত এই আর্য দেশে স্থায়ী হইতে

পারে নাই। নিশাই, চখু ও হারাকাইতি সম্বন্ধে আবিস্তায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয়। তার পর গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ, Fravardin Yasht-এ বৌদ্ধ চক্রের (turning wheel) উল্লেখ ও প্রাচীন গাথা অংশে ও পরবর্তী ধর্মসাহিত্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিমাপূজার প্রতি আক্রমণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে জরাথুষ্ট্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। জরাথুষ্ট্রের পূর্বে বৈদিক ধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত ছিল, গাথার সোমস্তুতি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত অভ্যুদয় হইয়াছিল হুদূর মিডিয়ায়।

জোরোস্ত্রিয়ান ধর্মের এই পশ্চিমমুখী গতি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের উপর কিরূপ আলোকপাত করে দেখা প্রয়োজন।

দয়াময় নাম কে রেখেছে ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দয়াময় নাম তোমারে দিয়েছে

বড় বড় চাটুকারে,

এত নির্দম কঠিন কঠোর

হইতে কি কেহ পারে ?

হে নাট্যকার, তোমার কি সখ ?

বিরোগান্তই সকল নাটক,

হে মহাশিল্পী, সৃষ্টি তোমার

নেহাত লয়ের ধারে।

• তোমার বাণীর সব শেষ হুস

সেই এক পুরবী তো,

যাহা স্মৃষ্টি তাহার শেষেই

রেখেছ প্রচুর তিতো।

হাসিয়া স্বর্ণলক্ষা পোড়াও,

হৃদয়ের ট্রয় নিমেষে ওড়াও,

সকল আলোক নিক্রাণ লভি

মিশে এক অন্ধারে।

• মাহুষে দিয়াছ কতটুকু হাসি,

কতটুকু দেছ বল ?

তাহার শুষ্ক চক্ষে বরষাও

একটী মেঘের জল।

এমন মাখা কি আছে উন্নত ?

চরণে তোমার হয় নাই নত।

• হাঁটু গাভা থেকে রেছাই দিয়াছ

বল দেখি ভূমি কারে ?

তোমার হুবনে দেখছি কেবল

ব্যাঘাতুর চারি দিক,

• নুরেনবার্গে কাসির মতন

অতি মর্দঙ্গপুক।

শুধু লাঞ্ছনা হত্যা দস্ত

কাল শেষ, যার আন্ধি আরম্ভ

প্রসন্ন রূপ দেখিতে পাইনে

আখি নত জলজ্বারে।

• আনন্দময় আনন্দ তব

বুঝিতে পারিনে কি সে ?

ভূমি স্খাময় সৃষ্টি তোমার

ভরা কেন এত বিষে ?

পদে পদে পাই নত ছব তবু

মোরার ঘষ সাপের-কপোত হে প্রভু

তিজ্ঞ হলেও বাঁচিতে পারিনে

পরিহরি পারাবারে।



(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী

সেলেস্ত—করাসী রূপসী, মুখখানা পুড়ে গেছে।

আনা—রূপ নত'কী, একখানা পা ক্লান্তি গেছে।

এভা—জার্মান বালিকা, বাপ মা ভাইবোন সব মারা গেছে।

অপূর্ব—বাঙালী শিল্পী; অন্ধ হয়ে গেছে।

পল—পোলিশ শিয়োনোবাদক, ডান হাতের আঙুল উড়ে গেছে।

জন—অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়, বুকের রোগে ভুগছে।

অদূরে একখানা বাড়ী, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে এসেছে বাগানে। বাগানে ছোট বড় ফুল-ফলের গাছ, একটা গাছের নীচে একখানা বেঞ্চ ও কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা। সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে আসে অপূর্ব আর সেলেস্ত, অপূর্বকে হাত ধরে নিয়ে আসে সেলেস্ত।

অপূর্ব—তুমি কি বললে সেলেস্ত, আকাশ আজ খুব নীল ?

সেলেস্ত—খুব নীল আর গাছের পাতা বড় সবুজ।

অপূর্ব—আমি যে দেখতে পাচ্ছি না, তবু আকাশ আজ খুব নীল, গাছের পাতা বড় সবুজ।

(অপূর্বকে বৈকে বসিয়ে দিয়ে সেলেস্ত পাশে বসে)

সেলেস্ত—একটা সাদা কারনেশানের উপরে একটা হলুদ প্রকাশিত'সেছে—কি চমৎকার !

অপূর্ব—সত্যিই চমৎকার। নীল, সবুজ, সাদা, হলুদ—চমৎকার। তুমি কি কোন দিন ছবি এঁকেছ সেলেস্ত ?

সেলেস্ত—না, ছবি আঁকি নি।

অপূর্ব—আমি আর ছবি আঁকব না, আমি আর রং দেখতে পাব না; আমার জগতে আজ একটা মাত্র রং—গভীর কালো।

সেলেস্ত—হয়তো একদিন তুমি আবার দেখতে পাবে।

অপূর্ব—না, দেখতে পাব না—চোখ আমার এ জন্মের মত গেছে। পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরের সমুদ্র-উপকূলে।

সেলেস্ত—বম্ ?

অপূর্ব—বম্। আর রং দেখব না, আর রূপ দেখব না সেলেস্ত। (অপূর্বের হাতের উপর হাত রেখে) কি অপূর্ব ?

অপূর্ব—তুমি সুন্দরী।

সেলেস্ত—না।

অপূর্ব—তুমি সুন্দরী, আমি সেটা বুঝতে পারি আমি সেটা অনুভব করতে পারি।

সেলেস্ত—তুমি তো জান আমার ইতিহাস, রূপ আমার ছিল কিন্তু এখন আর নাই। রূপ পুড়ে গেছে।

অপূর্ব—(সেলেস্তের হাতের উপর হাত দিয়ে) কিন্তু আমার অনুভব কেমন করে মিথ্যা হবে ? আমার যেন মনে হয় তুমি সুন্দরী, তুমি তরী তরুণী, গোলাপের মত তোমার গায়ের রং, সরু ছোট ডুকর নীচে ছোট নীল চোখ—কোতুকে জ্বরা।

সেলেস্ত—(একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—একটু হাসে)

অপূর্ব—আমার চোখ থাকলে আমি তোমার ছবি আঁকতাম।

সেলেস্ত—চোখ থাকলে ?
চোখ থাকলে তুমি আমার ছবি
আঁকতে না।

অপূর্ব—আঁকতাম, নিশ্চয়
আঁকতাম।

(সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে
লাঠি ভর দিয়ে জন, পাশে পাশে
আসে পল, ডান হাতখানা তার
দস্তানা দিয়ে ঢাকা।)

জন—আজ কোন্ তারিখ
পল ?

পল—১৩ই নবেম্বর।

জন—নবেম্বরের মাঝামাঝি।
ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে
অষ্ট্রেলিয়ায়।

পল—হ্যাঁ, অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট
খেলা চলছে।

জন—কি অপূর্ব খেলা এই

ক্রিকেট! উন্মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ মাঠের বৃক
সারাদিন ছুটোছুটি; কখনও খর্টার পর খর্টা বল করে
চলেছি, ক্লান্তি নেই। কখনো ব্যাট করছি... (দাঁড়িয়ে লাঠি-
খানা ব্যাটের মত ধরে বল মারবার ভঙ্গী করে, তারপরে
হঠাৎ কাশতে শুরু করে)

পল—(জনের পিঠে হাত দিয়ে) আজ বড় কাশছ জন।

জন—এই বুকটাতে আর কিছু নেই পল।

(ছ'জনে এগিয়ে আসে)

অপূর্ব—কারা আসছে ?

সেলেস্ত—পল আর জন।

(পল আর জন এসে চেয়ারে বসে)

সেলেস্ত—আজ কেমন আছ, জন ? আজ দিনটা ভারি
চমৎকার, কত রোদ !

জন—চমৎকার দিন, কত রোদ, ক্রিকেট খেলার আদর্শ
দিন। জানো সেলেস্ত, আমি এক দিন একা ছয়টা উইকেট
নিরেছিলাম আর করেছিলাম একটা সেঞ্চুরি, ক্লান্তি কাকে বলে
জানতাম না—পেশীগুলো ছিল ইস্পাতের, কিন্তু আজ ?

সেলেস্ত—তুমি ভাল হয়ে যাবে জন।

জন—(গ্লানভাবে হাসে তারপরে খুঁ খুঁ করে কাশে)

অপূর্ব—সেলেস্ত বলে এক দিন আমার চোখও ভাল হয়ে
যাবে।

পল—আচ্ছা বল তো সেলেস্ত আমার হাতের কাটা
আঙুলগুলো আবার গজাবে কিনা ?

(সবাই হাসে)

পল—(দস্তানা খুলে ফেলে আঙুলহীন হাতখানা উঁচু
করে) হে স্বর্গগত বিটোফেন, দেখুন আপনার দেশবাসীরা



আমার দামী আঙুলগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে,
নাইন্থ সিমফনী আর এ হাতে বাজবে না।

(সবাই হাসে)

(হাতে আবার দস্তানা পরতে পরতে) মাঝে মাঝে স্বপ্ন
দেখি আঙুলগুলো আমার ঠিকই আছে, টিপে নেড়ে চেড়ে
দেখি, ভারি আনন্দ হয়—ছুটে গিয়ে পিয়োনোর সামনে বসি,
একটার পর একটা শুরু বাজাই।

• (সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

জন—আমিও স্বপ্ন দেখি, ক্রিকেট খেলছি।

অপূর্ব—আমিও দেখি, (হেসে) অঙ্কেও স্বপ্ন দেখে।

• (সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

সেলেস্ত—১৯৩৮ সালে প্যারিতে আমি পলের পিয়োনো
বাজনা শুনি। এখনও মনে পড়ে পিয়োনোর চাবিগুলোর
উপরে ওর লম্বা আঙুলগুলোর নাচ।

পল—(হাঁটুর উপর হাতখানা রেখে) সে আঙুলগুলো
আজ কোথায় ? শুরু হয়ে শূন্যে উড়ে গেছে।

(সবাই করুণভাবে হাসে)

জন—১৯৩৮ সালে ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সিডনিতে আমি
ক্রিকেট খেলছি, বোলার-হিসেবে আমার নাম হ'ল
সেবরই।

অপূর্ব—১৯৩৮ সালে আমি দক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছি; কি
অপূর্ব দেশ, কি সুন্দর দৃশ্য, ছবির পর ছবি, এঁকে চলেছি।
তারপরে যাই অজ্ঞতা—সে রেখা, সে রং আর দেহতে পাব
না।

সেলেস্ত—১৯৩৮ সাল, মনে পড়ে, অনেক কথা মনে পড়ে
—থাক; চল অপূর্ব, তুমি যে একটু ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলে ?

অপূর্ব—(উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, চল (হাত বাড়িয়ে দেয়, সেলেস্ত হাত ধরে, হু'কনে আস্তে আস্তে চলে যায়)

পল—তুমি ওর কটো গ্রাফ দেখেছ ?

জন—কার ?

পল—সেলেস্তের।

জন—দেখেছি, ওর টেবিলের উপর সেখানে সব সময়েই থাকে।

পল—কি রূপই ছিল ওর। যে মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাহুষের আশ মিটত না, সেই মুখখানার দিকে আজ তাকাতে ভয় হয়। আগুনের শিখা ওর মুখ থেকে সবটুকু রূপ লেহন করে নিয়েছে।

জন—লক্ষ্য করছে ও আমাদের কাছে বেনীক্ষণ বসে না ?

পল—হ্যাঁ, কেন তা জানো ?

জন—জানি।

পল—ও অপূর্বকে সঙ্গী বেছে নিয়েছে।

জন—ঠিকই করেছে, অপূর্ব দেখতে পায় না। যদি ওর মত আমার মুখটা পুড়ে যেত তা হলে কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমার এই পেনীগুলো যদি সবল থাকত তা হলে আমি ক্রিকেট খেলতে পারতাম, কিন্তু এই রোগটা (বুকে হাত দিয়ে), এই রোগটা—(কাশতে শুরু করে)

পল—ও রকম কথা আমারও মনে হয়; সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েও যদি আমার আঙুল ক'টা আজ বজায় থাকত।

(দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে এভা, হাতে তার এক পোছা ফুল)

পল—বাঃ কি সুন্দর ফুল, এত ফুল কোথায় পেলে এভা ?

এভা—অনেক দূরে একটা বাগান আছে, কত ফুল সেখানে। এই ক'টা আজ নিয়ে এলাম।

পল—বেশ করেছে, ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখ।

এভা—(কাছে এসে) আমি যে আপনার জন্যেই নিয়ে এলাম।

পল—আমার জন্যে ?

এভা—হ্যাঁ, আপনার জেডে (ফুলের পোছা এগিয়ে দিয়ে) মিন্।

জন—এভা তোমার অত্যন্ত পক্ষপাতী, ও কেবল তোমাকেই ভালবাসে।

পল—তাই নাকি এভা, এ তো ভারি অন্যায়।

এভা—(লজিত হয়ে পড়ে)

পল—(এতদূর কাছে টেনে) বড় ভাল মেয়ে, লক্ষী মেয়ে, আমাকে তুমি ভালবাস এভা ?

এভা—(ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়)

পল—(হেসে) কেন বল তো, আমি বুড়ো বলে বুঝি ?

এভা—না, আপনি, আপনি আমার বাবার মত দেখতে।

(পল এভার মাথার হাত বুলায়) •

পল—লক্ষী মেয়ে, ফুল পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি; যাও আমার ঘরে টেবিলের উপর রেখে এস।

(এভা চলে যায়)

পল—বাপ, মা, ভাই বোন সবাইকে একই মুহুর্তে হারিয়েছে, আহা বেচারী।

জন—(কাশতে থাকে)

পল—(আঙুলখীন হাতখানা হাঁটুর উপর রাখে)

(সিঁড়িতে ঝট ঝট আওয়াজ হয়, পল আর জন সেই দিকে তাকায়, কাঠের ঠেকা নিয়ে এঁকে বঁেকে আসে আনা, এক বার দাঁড়ায়)

জন—আজও ঠেকা নিয়ে চলতে আনা অভ্যস্ত হয় নি।

পল—কোন দিনই অভ্যস্ত হবে না। একটা শখচিলের ডানা কেটে যদি কাঠের ডানা বেঁধে দেওয়া যায় তা হলে যেমন হয় এ যে তার চেয়েও করণ। আনার একখানা পা কাঠের।

জন—তুমি ওর নাচ দেখেছ ?

পল—দেখেছি, এক বার নয়, অনেক বার—মক্কোতে। ওর হঠাম পা হু'খানার লঘুগতি আর অপূর্ব ভঙ্গিমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আজ তার একখানা পা—(ধেমো যায়)

জন—বেই।

(আনা এসে উপস্থিত হয়, পল উঠে তার কাঠের ঠেকা হু'খানা নেয়, একখানা চেয়ারে তাকে সম্বলিয়ে বসিয়ে দেয়)

আনা—(চেয়ারে বসে লম্বা গাউনে কাঠের পা ঢাকতে চেষ্টা করে) ধন্যবাদ পল, কি চমৎকার দিন, ঘরে বসে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম, অধচ আমার চলা তো যেমন-তেমন চলা নয়, যেন—যেন—একটা উপমা দাও পল।

পল—(যেন শুনতে পায় না, অনেক দূরে কি যেন দেখে)

জন—চমৎকার দিন, সত্যিই চমৎকার দিন, ভেতরে থাকতে পারি নে, বাইরে ছুটে আসি—আলো-বলমল মাঠের দিকে চেয়ে থাকি—হঠাৎ যেন দেখতে পাই সেই মাঠের এখানে ওখানে মাহুষ ঘুরছে কিয়ছে, ছুটছে—তারি ক্রিকেট খেলছে। আর চেয়ে থাকতে পারি নে, ভেতরে কিরে যাই। চমৎকার দিন ?

(পল উস্‌বুস করে—জন আর আনাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে হঠাৎ উঠে একটা প্রজাপতির পেছনে ছোট্টে, তারপরে এসে বসে)

আনা—ভারি সুন্দর, ভারি চমৎকার।

পল—কি ?

আনা—আমি তোমার গতিশীল পা হু'খানা দেখছিলাম, ভারি সুন্দর।

পল—আমার পা সুন্দর—বলো কি আনা। এমন কদাকার
জারী পা ছুটকে তুমি সুন্দর বললে কেমন করে ?

আনা—(হাসে)

জন—যেমন এক ছোড়া উটের পা-ও কাঠের ঠেকার
চেয়ে সুন্দর।

পল—(চোখের ইশারায় জনকে তিরস্কার করে)

আনা—এ আমার কি হয়েছে বল তো পল, নজর আমার
সব সময় সবার পায়ের দিকে !

পল—অত্যন্ত ছোট নজর।

(সবাই হাসে)

আনা—আবার কি মনে হয় জানো, মনে হয় সবাই
আমার একটা পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

পল—অন্তত আমি এক সময়ে তাকিয়ে থাকতাম, অবিভি
তখন ছোটো পা-ই তোমার ছিল।

আনা—মনে পড়ে আমার নাচ ? কেমন ছিল আমার
পা ছুঁখানা ?

পল—মনে পড়ে, পরিষ্কার মনে পড়ে।

আনা—আমি অনেক সময় স্বপ্ন দেখি আমি নাচছি,
আমার পা ফিরে পেয়েছি।

পল—প্রিন্স হার্মিসের মত ?

(সবাই হাসে)

জন—তুমি স্বপ্ন দেখ ঘুমিয়ে, আমি স্বপ্ন দেখি জেগেই।

(এভা আবার ছুটে আসে)

পল—এভা চলবে তো ছুটে !

আনা—কি সুন্দর গর হাত-পাগুলো, সবল আর নিটোল।
এ বয়সে আমি নাচতে শুরু করি।

পল—আঙুলগুলোও বেশ লম্বা।

জন—(উঠে দাঁড়ায়) আমি যাচ্ছি পল।

আনা—শরীরটা কি ভাল নেই ?

জন—(হাসবার চেষ্টা করে, তারপরে কাশে)

পল—(উঠে) চল, আমিও যাচ্ছি।

(দু'জনে চলে যায়)

এভা—(আনার কাছে এসে দাঁড়ায়)

আনা—(এভার হুলগুলো নাড়ে)

এভা—তুমি খুব বড় নত কী, না আনা ?

আনা—কে বলেছে তোমাকে ?

এভা—ওরা বলেছে।

আনা—এক সময়ে ছিলাম।

এভা—তোমার নাচ দেখতে ইচ্ছে করে।

আনা—আমার নাচ আর দেখতে পাবে না।

এভা—আমি ছবিতে দেখেছি তুমি একখানা পায়ের উপর
ভর দিয়ে আর একখানা পা উঁচুতে তুলে দাঁড়িয়ে আছ, হাঁটু
পর্যন্ত সাদা লেসের গাউন তোমার—কি সুন্দর যে দেখতে !

আনা—খুব সুন্দর ?

এভা—খুব সুন্দর। আমার ইচ্ছে করে ঐ পোশাকে
তোমাকে নাচতে দেখি। ঐ রকম ভাবে একটু দাঁড়াও না
আনা ?



অপনা—একটা পায়ের উপর ? আজ একটা পা-ই যে
সম্বলণ

এভা—কি সুন্দর তোমার ঐ একটি পা, এক বার দাঁড়াও
আনা।

আনা—(এভার মুখের দিকে চায়, আন্তে আন্তে চেয়ারের
হাতল ধরে উঠে দাঁড়ায়, চারদিকে চেয়ে দেখে, তার পরে
একটি পায়ের উপর ভর দিয়ে কাঠের পা উঁচু করে দাঁড়ায়—
সেটা ছিল তার নাচের একটা অপূর্ণ ভঙ্গী)

এভা—কি সুন্দর, কি সুন্দর ! (হাততালি দেয়)

আনা—(চেয়ারে বসে পড়ে) না-না, হাততালি দিও না
এভা।

এভা—(ধেমের গিয়ে) কেন ?

আনা—ভালো লাগে না, কি যেন মনে পড়ে।

(কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

এভা—(কাছে এসে) আমি নাচ শিখবো—নত কী হব।

আনা—(যুথের দিকে কেমন একভাবে তাকায়) নাচতে শিখো না ।

এভা—কেন শিখবো না ?

আনা—যদি, যদি আর একটা যুত বাধে ।

(ছ'জনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

এভা—কিন্তু নাচতে বড় ভাল লাগে ।

আনা—আমারও ভাল লাগতো, কিন্তু হঠাৎ যদি এক দিন এমন হয় যে আর নাচতে পারবে না—বৈচে থাকবে, হাসবে, কথা কইবে কিন্তু নাচতে পারবে না—তা হলে ?

(এভা বোকে না, চেয়ে থাকে)

আনা—(নিজের মনেই বলে যায়) নাচ যার আনে অর্থ, আনে যশ, আনে উত্তেজনা, আনন্দ—জীবন মানেই যার নাচ, যদি হঠাৎ এক দিন সে আর নাচতে না পারে তা হলে ?

(একটু থেমে)

এ যে ছোটো মাহুষ চলে গেল, এক জন আর শিয়োনো বাজাবে না, আর এক জন ক্রিকেট খেলবে না, এ যে ছোটো মাহুষ গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মত ফিরছে, এক জন আর কারো মুখ দেখবে না, আর এক জন কাউকে মুখ দেখাবে না—ওরা কি মাহুষ ? ওরা মাহুষ নয়, ওরা হুত, ওদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, অতীত নিয়ে বেঁচে আছে ।

(কিছুক্ষণ ছ'জনেই চুপ করে থাকে)

আনা—(উঠে দাঁড়ায়) চলো এভা, লাঠি ছ'টো দাও তো লক্ষ্মীটি । (এভা লাঠি ছ'টো এগিয়ে দেয়, এঁকে-বেঁকে আনা চলে, এভা চলে তার পাশে পাশে—একটু পরে আসে অপূর্ব আর সেলেন্ড)

অপূর্ব—ওরা বুঝি চলে গেছে ?

সেলেন্ড—চলে গেছে । (চেয়ার টেনে নিয়ে) বসো ।

(অপূর্ব বসে, সেলেন্ডও বসে)

অপূর্ব—সেলেন্ড !

সেলেন্ড—কি ?

অপূর্ব—কোন শিল্পী কি তোমার ছবি এঁকেছে ?

সেলেন্ড—এঁকেছে, অনেক এঁকেছে ; এক সময়ে কত শিল্পী যে আসতো তার ঠিকানা নেই । কিন্তু আজ ?

অপূর্ব—(চুপ করে থাকে)

সেলেন্ড—কিন্তু আজ কেমন আসে না ?

অপূর্ব—(চুপ করে থাকে)

সেলেন্ড—বলো শিল্পী, আজ কেমন আসে না ? আমার রূপ আর নেই বলে ? তোমরা যে রূপের এত উপাসনা কর, যে রূপ ছবিতে ফোটাতে এত সাধনা কর সে কি এত পল্কা, এত কাঁচা যে, একটু আঁচে একেবারে গলে যায় ? সে কি চেয়ার টেবিলের বার্নিশের মত একটুতেই চটে যায়—তার কি স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই ?

(ছ'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে)

সেলেন্ড—রূপ কি ?

অপূর্ব—রূপ কি ? বলতে পারছি নে । এক সময়ে হয়তো বলতে পারতাম । এক সময়ে বারুণা ছিল রূপ কি, কিন্তু এখন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, একটা অন্তহীন অন্ধকারে রং-রেখা, ভাব-ভঙ্গিমা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

সেলেন্ড—(চুপ করে থাকে)

অপূর্ব—বল তো সেলেন্ড, আজও কি মাথার উপরে আকাশ আছে, সেখানে মেঘ ভেসে আসে ভেসে যায়, আজও কি পাহাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে—না—সমতল হয়ে গেছে ? বল তো সেলেন্ড আজও দিনরাত্রি হয়, গাছের ডালে কচি পাতা গজায় ?

সেলেন্ড—(চুপ করে থাকে)

অপূর্ব—বলো সেলেন্ড, আজ সব কুলের কি একটা রং ? পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে ?

সেলেন্ড—পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে, রূপের পুঞ্জ আছে ?

অপূর্ব—বলো, আছে ?

সেলেন্ড—জানি না ।

(ছ'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পরে পট পড়ে)

শ্রেষ্ঠ দান

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমার সে কল্পলোক আপনারে লয়ে
কত ফুল ফুটায়েরে, প্রান্ত উৎসরে
উঠেছে অমৃত বিন্দু, সুখ শতদল
ফুটেছে আলোক গুহে, লীলা অচঞ্চল
কোতুকে রয়েছে জাগি, বসন্ত বাতাস
হুঁয়ে গেছে মঞ্জীমালা, শুভ্র বনকানু
জানায়েরে হাসি, নদী গেরে গেছে গান ;
তুমি শুধু দেখ তব সর্ব শ্রেষ্ঠ দান ।

যেথা দাঁড়ায়েরে তুমি আমার জীবন
পারিবে না সেথা যেতে, অনন্ত রূপন
তবু ত ভেদেছ তুমি অহুঁলী পরশে—
তাই তাহা তোমা' দিহু, তুমি ব্যথারসে
তাহারে ডোবালে, মোর হৃথের সন্ধান
বেদনার ফুটে র'ল—তব শ্রেষ্ঠ দান ।

‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ ও স্বাধীনতা আন্দোলন

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

১

রাজা রামমোহন রায় ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে সুসংস্কৃত ও শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্ত সমযোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের সনন্দে যেদ্বারা ভারতীয় শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ক্রমশঃ সমগ্র ইংরেজ-সমাজের উপর গিয়া বর্তে তাহা তখন হয়ত তিনি আঁচ করিতে পারেন নাই। এই দ্বারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৮ সনে রাণী ভিক্টোরিয়া-কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের ফলে পরিণতি লাভ করিল। তখন একটি বিশেষ ইংরেজ কোম্পানীর পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মারফত ইংরেজ জাতিই আমাদের ভাগ্যানিয়ন্তা হইল। ইংরেজ-রাজ বিজ্ঞানের পূর্ণ সহায়তা লইয়া তার ও রেলপথ দ্বারা ভারতের দূর দূরান্তের দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পথও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং ইংরেজদের পক্ষে এ দেশ নিতান্তই প্রবাস বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্বে ভারতবর্ষে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবস্থানহেতু ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ঘটিবার যে কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা ছিল তাহাও আর রহিল না। কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের শাসন-কাঠামোতে যে সব খুঁত ছিল, ব্রিটিশরাজ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর তাহা সংশোধিত হইয়া ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিল। ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সর্ব বিভাগই শাসন-সৌকর্য্যে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গেল, আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর কর বসাইয়া ভারতীয় জনগণকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীদের টাকায় শাসনকার্য্য চলিবে, অথচ ইহাতে তাহাদের কোন হাত থাকিবে না। এক দিকে ভারতীয় মনীষিগণ এবং অন্য দিকে ‘হিন্দু পেটিয়ট’, ‘সোমপ্রকাশ’ প্রভৃতি প্রগতিশীল সংবাদপত্র এই অগ্রায় ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে সুরু করেন। কেহ কেহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভে তৎপর হইয়া আন্দোলন পরিচালনে অগ্রসর হন। কিন্তু ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ই সর্বপ্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে জেতু-বিজিতের সম্বন্ধ, কাজেই একের লাভে অন্যের ক্ষতি, এবং স্বাধীনতা লাভ না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। পত্রিকা ইহার উপায়ও নির্ণয় করিতে ক্রটি করেন নাই।

অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি

১, যশোহরের অন্তর্গত অমৃত বাজার (পূর্ব নাম পলুয়া-মাগুরা) হইতে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যার অনুষ্ঠান-পত্রে আলোচ্য বিষয়াদি প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন,

আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে বার্ষিক মহাশ্মা ইংরেজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী যবন অধিকার হইতে দ্বীপ হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—ঈহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের জায় অতি ক্রেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদেরকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন না, তাহাদিগের স্বীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে গুণশাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

সদাশয় ইংরেজ কর্মচারীদের ‘স্বীতি নীতি উদ্দেশ্য’ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্রিকার নীতি সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। পত্রিকা জনৈক সরকারী ইংরেজ কর্মচারীর দুর্কার্য্যের কথা প্রকাশ করায় একটি মানহানির মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িলেন। ইহার পর সম্পাদক ৯ জুলাই ১৮৬৮ সংখ্যায় যাত্রা লেখেন তাহাতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য অধিকতর পরিষ্কৃত হয়। তিনি লেখেন,

বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা আর কাপড় দিয়া আগুন ধাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার জন্মে কোমল করিয়া লিখি না। কল আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাহাদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটোগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটোগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটোগ্রাফ তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ অজ্ঞের মতের ভাভ কাড়িয়া ধাইতেছে; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে; অজ্ঞ অগম্য করিতেছে; এক জনের ভাষা দ্বন্দ্ব অজ্ঞকে দেওয়া হইতেছে; বিচারক বিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি?

কোন প্রধান কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাহাকে বন্ধবাদ। কিন্তু জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্তব্য কে? আমরা অধিক কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতা মদমদ হই। প্রতিবিশ্বাসের স্থান হিন্দুদিগের মন নয়। আমরা প্রহার ধাইয়া যদি প্রহারকের নিকট

হুট মিষ্ট কথা শুনি তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরেজ অপেক্ষা এ দেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় জায়গরতা আমাদের কাছে সর্বোপেক্ষা প্রিয়। মনে একটু মুখে অল্প প্রকার ধাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা মনের কথা ধাঁহারা বুলিয়া বলেন, তাঁহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্য কথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার একটি 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল। ৭ই মে, ১৮৬৮ তারিখ হইতে ইহা প্রদত্ত হয়। পর বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় ইহা ব্লকে উৎকীর্ণ ছিল। ইহার পর শিরোভূষণটি আর মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু এই শিরোভূষণ হইতেও পত্রিকার উদ্দেশ্য ও স্বাধীনচিত্ততা পরিস্ফুট হইতেছে—

"অধীনতা* কালকূটে মরি হায়২

করেছে কি আর্ধ্যস্থিতে চেনা নাহি যায়।"

সমসাময়িক সংবাদপত্রে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা উল্লিখিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রাচীনপন্থী ও কতকটা সরকার-ঘোষা সংবাদপত্র, কাজেই পত্রিকার মতামত অধিকাংশ সময়ই সমর্থন করিতে পারিতেন না। তথাপি উপরোক্ত গুণ-নিচয়ের প্রশংসা করিয়া লেখেন,—

"অমৃত বাজার অল্পদিন হইল বঙ্গদেশের বুদ্ধভূমিতে জীড়া করিতেছে, চন্দ্রিকার নিকট বাল্যজীড়া ব্যতীত আর কি বোধ হইবেক? বাহা হউক তাহার বিষয় দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অমৃত বাজারের 'বাক্যগুলি তেজীয়া, বাক্যগুলিগের নিকট অমৃত তুল্যই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু পবর্গমেন্টের নিকট সর্বদা বিষদৃষ্টি ব্যতীত অহুত হয় না। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের জাগ্রত কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না। এমন কি কর্তব্যের অহুরোধে অনেক ক্রেশ সহ্য করিতেছেন।... (১৮ জাহুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' উদ্ধৃত)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থক বাহন এই অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিরিকুমার সে যুগে ভারতবাসীদের, এমন কি ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাণেও কিরূপ স্বদেশভক্তির উদ্রেক করিয়াছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি অমৃত বাজার পত্রিকা প্রকাশের অল্পকাল পরেই, ১৮৬৮ সনের জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া যশোহরে গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে শিরিকুমারের সংশ্রবে আসিয়া পড়েন। তিনি লিখিয়াছেন,

শিরিকুমার তখন মাতৃভূমির হৃৎকের কথা কহিতে কহিতে কাদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত হইতেন।... যশোহরে

* ৭ই মে সংখ্যায় 'অধীনতা' হলে 'পর্যবীন' মুদ্রিত হয়।

লিখিত আমার বড় কবিতা ও 'পলাশীর যুদ্ধ' স্বাধীনতার জন্ত যে নিঃশাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিরিকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক। (আমার জীবন, ২য় ভাগ)

ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্মকথা জানিতে ও বুঝিতে হইলে অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম যুগের রচনাবলী বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। ইহার প্রথম দুই বৎসরের ফাইল এতদিন না পাওয়ায় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। সম্প্রতি এই ফাইলগুলি* পড়িবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ইহা হইতে অবগতব্য কতকগুলি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। সামাজিক জীবনের নানা সমস্যার কথা ছাড়াও শাসনে অনাচার, বিচারে পক্ষপাতিত্ব, খেত-কৃষকের জাতিবৈরিতা, জেতু-বিজিত সম্পর্ক, আপোষে ইংরেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা, এশিয়াবাসীদের জ্ঞান এশিয়া, জাতীয় প্রকাশন এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় পরিব্যক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেন্ট এটলী পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজেরা চলিয়া যাইবে, অর্থাৎ এ দেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে। ঠিক আশী বৎসর পূর্বে ১৮৬৮ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে পত্রিকা বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিষয় আলোচনাকালে উক্ত সমিতিতে উত্থাপিত ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং এই মন্তব্য করেন যে, ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা লাভ না করিলে ভারতবর্ষের পূর্ণ উন্নতি অসম্ভব।

ইংলিশ পবর্গমেন্ট ও ভারতবর্ষ

১৮৫৯ সালে যশোহরে ষোড়শোড় হয় ও তখন শতাবধি নীল কুঠিমালা ৭৮ দিন পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করে; পর বৎসর সেই সময়ে আর কয়েকটি কুঠিমালা আমোদ-প্রমোদে ইচ্ছা ছিল? '৫৭ সালে যে তজ্রপ বিদ্রোহানল প্রজলিত হইল তাহা কি কেহ স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? লং সাহেব যখন নীল কুঠিমালাদের ক্ষেত্র কারারুদ্ধ হন তখন বলিয়াছিলেন যে আমি

* ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় 'পুস্তকালয়' শীর্ষক নিবন্ধে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির উল্লেখ আছে। ইহার তুমিকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুঁচুড়া গ্রন্থাগারটির কথাও বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-সংকলনটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পথে ছিল। সম্প্রতি বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ডের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ইহার নষ্টোদ্ধার হইয়াছে এবং তদ্ব্যবধি অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম দুই বৎসরের ফাইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফাইলগুলি উক্ত ফণ্ডের সভাপতি শ্রীযুক্তকদেব মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীমোহনচন্দ্র ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কার্যক্রম হইয়াছিল ইহাতে নীলকরেরা জিতিল না প্রকার/ জিতিল? আমরাও বলি যে ড্যালহাউসি যখন অযোগ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জিতিয়াছিলেন? কজাখুয়ারী হইতে হিমালয় পর্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ অধিবাসিগণের সম্মুখে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভারতবর্ষীয় অর্থ লইয়া তুর্কীর মুলতানের ভোজ দিলেন কি আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্যয় করিলেন ইহাতে কি ইংলিশ গবর্ণমেন্ট জিতিলেন? যদি মহম্মদের মন দেখা যাইত তবে ইংরেজেরা দেখিতে পাইতেন যে, এই অপমান ও গ্লানি মুশিকিত বাঙালী মাজের হৃদয়ে অনবরত জাগরক। ইহা কি ইংরেজেরা বুঝেন না যে বিদেশী কর্তৃক শত বর্ষের অশ্রুগ্রহ ও ভয়তাই এইরূপ একটি অত্যাচারে ধৌত হইয়া যায়? আয়ারলণ্ড ও ইংলণ্ডে কত নৈকট্য সত্ত্বে, মধ্যে কেবল একটি ক্ষুদ্র সাগর বই নয়। উভয় দেশের লোকেরা এক জাতি ও তাহাদের আচার, ব্যবহার, নীতি, পদ্ধতি, ভাষা, মানসিক ভাব সমুদায় প্রায় এক প্রকার। আইরিশ রাজ্য ইংরেজদের ভায় পালিয়ামেন্টে প্রতিনিধি পাঠাইতেছেন, সুতরাং নিজের দেশ নিজে শাসন করিতেছেন, তবুও তাঁহারা ইংরেজদের বাধ্য হইলেন না। আমরা আইরিশদের ভায় এক্ষণে স্বাধীনতা প্রার্থনা করি না। ইংরেজেরা আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমরা এক্ষণে তাহাদিগকে ছাড়িতে পারি না। আমরা এক্ষণে আর কিছুই প্রার্থী নই, রাজপুরুষেরা পালিয়ামেন্টে আমাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে দিউন ইহাই আমাদের মানস। আমাদের দেশীয়দের মধ্যে পালিয়ামেন্টে বসিবার উপযুক্ত পাত্র নাই এরূপ আপত্তি যিনি করেন, তিনি হর নিকোঁধ নয় অজ্ঞ নয় মিথ্যাবাদী।

পরিশেষে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে যত দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিবেন তত দিন সহস্র মূল হাপন কি সিবিল পরীক্ষার দায়োন্স্যাটন অথবা অজ্ঞ কোন অশ্রুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা ভারত সন্তানগণের প্রকৃতরূপে বাধ্য করিতে সক্ষম হইতেন না—ততদিন বহুতর সৈন্ত রাবার ব্যয় ও বস্ত্রাট সহ করিতে হইবে এবং ততদিন অনবরত স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবে, সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রকৃত লাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। (১২ মার্চ, ১৮৬৮)

বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবসে কলিকাতার টাউন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করিবার জন্ত একটি সভা অধিবেশিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর অনন্বেল মিষ্টার সিটন-কার সভাপতি হইয়া কার্য সমাপনাতে একটি মনোহর ও প্রাজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন।...মুসলমান জাতাদিগের অমূল্য অবস্থা সর্বদা কয়েকটি নূতন কথা বলিয়া তাহাদিগকে আপনাদের পূর্বপুরুষদের ভায় উন্নত হইতে প্রার্থনা করিলেন। [তিনি বলেন], প্রতি বৎসর পরীক্ষার তালিকার প্রতি দৃষ্টি-

পাত কর, মহম্মদীয়দিগের নাম অতি বিরল দৃষ্টি করিবে, ভারতবর্ষের কোন মঙ্গলকর কার্য দৃষ্টি কর, অত্যন্ত সংখ্যক মুসলমানদিগকে অগ্রসর পাওয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান এক দেশবাসী, উভয়ে এক জলবায়ু সেবন করে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে এত প্রভেদ থাকে হৃৎকের বিষয় সন্দেহ নাই। সিটন-কার মহাশয় যে এই নূতন নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় আহলাদিত হইলাম। তাহারা জাতি গর্ব ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ও দেশীয় রীতি নীতি কোন প্রকারে পরিবর্তিত করিতে চাহেন না, তাহারা তাহাদিগের পাদীগণিত-গণনা দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না; এবং তাহারা যাহাকে উন্নতি বলেন তাহা কেবল বিকারী রোগের ক্ষণিক সুস্থতা মাত্র। বীর্ঘ্য চাই, জ্ঞান চাই, সাহস চাই, এবং প্রকৃত প্রীতি চাই, তাহা হইলেই ভারতের স্বাধীনতা দূর হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই জাতৃত্বাবে পরিপূর্ণ হইয়া এক মনে ও এক হৃদয়ে স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবে। এক অংশ উন্নত হইলে হইবে না, মূল অবশি অগ্রভাগ পর্যন্ত উন্নত হওয়া চাই। স্বীয় করণ যেন মুসলমান জাতাগণ হিন্দুদিগের সহিত উন্নত হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। (১২ মার্চ ১৮৬৮)

বেথুন সোসাইটী

বিগত ১১ই মার্চ সন্ধ্যার পর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে উপরিউক্ত সভা অধিবেশিত হয়। সভ্যরা উপস্থিত হইলেন, শ্রোতাবর্গে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সম্পাদক কর্তৃক পূর্ব অধিবেশন দিবসের কার্য বিবরণ পঠিত হইল, তৎপরে সভাপতি অনন্বেল জস্টিস ফিল্ডের মহোদয়ের প্রার্থনামুসারে মেং উইনি, মিষ্ট, স্পষ্ট ও অমৃত্যুক্ষেত্রে স্বরচিত, হৃদয় গ্রাহক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শারীরিক শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, এই বিষয়ে বক্তা মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের মধ্যে অধিকাংশই যৎপরোনাস্তি পরিভূত হইলেন। বঙ্গনিবাসীদিগের পক্ষে বক্তৃতাটি অমূল্যময় ঔষধস্বরূপ; সুবিচক্ষণ বক্তা যে সকল কথা বলিলেন তাহা আমাদের নিকট যেন নিফল হইয়া না যায়; এবং যতদিন আমাদের শারীরিক উন্নতি না হয় ততদিন যেন আপনাদিগকে প্রকৃতরূপে উন্নত জ্ঞান না করি।

বক্তৃতাটি যে প্রকার মনোহর, তৎসম্বন্ধীয় বাদামুবাদও সেই পরিমাণে, বা ঐতিহাসিক, কৌতুকবহু হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সুবিখ্যাত খ্রীযুত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাজোখান করিয়া ঐকিতক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে দুইটি

* ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৫৯ সনে বি-এ পাস করেন। প্রথম কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়া পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তারাপ্রসাদ জুদের সুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বারাসতের অধিবাসী।

উল্লিখিত হইবার যোগ্য, কিন্তু চুঃখের বিষয় এই যে তিনি মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে এদেশে বিদ্যাহীনতার বিদেশীয় ভাব গিয়া স্বাভাবিক ভাব হয় নাই, কৃত্তবিশ্বাসদিগের মধ্যে সত্যনির্ণয় সূচ্য সম্যকরূপে বলবতী হয় নাই। বিদ্যার উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তি-চয়ের পূর্ণ উন্নতি, ইহা প্রকৃতরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ভাষা শিক্ষা যে সেই মহৎ উদ্দেশ্যের একটি উপায় মাত্র এই জ্ঞান প্রায় কাহারও মনে অস্থায়ী হয় নাই। তারাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় মতট এই, “যত দিন পর্যন্ত ইংরেজেরা প্রাতঃভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন না করিবেন তত দিন আমাদের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে না ও আমাদের স্বাধীনতাও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।”* বোধ হয় তিনি ইহা অস্বীকার করেন না যে ইংলণ্ডের অধীনে ভারতবর্ষ সত্যতার সোপানে দিন দিন আধরোহণ করিতেছেন এবং অন্তেষ প্রকারে উপকৃত হইতেছেন। বস্তুর যতাপি এই অভ্য-প্রায় হয় যে যদিও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের হস্ত ধারণ করিয়া এত দিন উন্নতি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন তথাপি ভারতভূমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইতে না দিলে তাহার উন্নতির পারসমাধি হইবে না; তবে এ মতটি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে।

এই মত খণ্ডন করিতে ঐযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা উল্লেখ না করিয়া বিচক্ষণ যৎ উইনি যাহা বলিলেন তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। স্বমত অখণ্ডনীয় এই মত বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে “কোন জাতি পরাজিত না হইয়া উন্নত হইতে পারে নাই।” ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিতে পারি না। ইংলণ্ড নর্দানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার পর উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল জাতির এইরূপে ঐবৃত্তি হয় নাই। রোম ঐসকল পরাজিত করিয়া বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে। এক জাতির সাহায্যে অল্প জাতির উন্নত হইয়াছে এরূপ তুরি তুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু পরাজিত হওয়া যে উন্নত হইবার একমাত্র উপায় ইহা স্বীকার করিতে পারিলাম না। অতএব উইনি সাহেবের এ যুক্তিটি নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক তাহার অল্পরোধে স্বীকার করা গেল যে পরাজয়ই উন্নতির মূল। কিন্তু ইহা হইলেই যে তারাপ্রসাদ বাবুর মত বঞ্চিত হইল ইহা বলিতে পারি না। পরাজিত জাতি অনেক সাহায্য লইয়া উন্নতির পথে গমন করিতে শিক্ষা করে বটে কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর আর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অধীনতা হইতে উন্নতি আরম্ভ হইতে পারে বটে কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। অদূরদর্শী লোকদিগের নিকট বোধ হইতে পারে যে অধীনতার অবস্থাতে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু দূরদর্শী উইনি সাহেব

* এই প্রসঙ্গে বর্তমান কালের ‘Quit India’ বা ‘ভারত ছাড়িয়া যাও’ আন্দোলনের কথা স্মরণীয়।

যে এ কথা বলিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। (২৬ মার্চ ১৯৬৮)

জাতি-ঐক্যতা

হিন্দু জাতির পরাধীনতার কারণ বাহারা সাহস ও বীর্ষের অভাব বলেন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়গণকে চেনেন না। তাঁহাদের বীর্ষের, সাহসের, বুদ্ধির কি রাজকৌশলতার অভাব নাই, তাঁহাদের এক মহৎ অভাব—ঐক্যতা এবং ইহাই তাঁহাদের সকল সর্বনাশের মূল। যদি জাতি-ঐক্যতা থাকিত, তবে ভারত-ভূমি স্বাভাবিক যেমন পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত সম্ভ্রানগণের যেমন বীর্ষ, যেমন সাহস, তাহাতে কখনই কোন ভিন্ন জাতি এ দেশে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু এই অঐক্যতার জন্য এতদেশীয়গণের কোন দোষ নাই। যে দেশ কস্মিন্ কালে সম্পূর্ণরূপে একছত্রাধীন হয় নাই, যে দেশে ভিন্নত্ব জাতির অবস্থিতি, যে দেশে ভিন্নত্ব ভাষা ও ভিন্নত্ব বর্ণ প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে ঐক্যতা থাকা কঠিন; কল কঠিন বই অসম্ভব নয়।

ভারতবর্ষীয়গণ হৃদয়শূন্য নন; পূর্বে ঐক্যতা হওয়ার যে সমুদয় প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও এখন অনেক গিয়াছে; এখন সকলেরই এক দশা, আবার পরাধীনতাকে সকলকে ঐক্যতা কৃত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার শিক্ষা উত্তমরূপে দিয়াছে, অতএব এখন যত্ন করিলে আমাদের এই সর্ব্বদেশে অভাবটি দূরীভূত হওয়া সম্ভব। যদি কোন দেশহিতৈষী, ব্রাহ্মগণের ভাষা, ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রাতৃত্বাব উদ্ভীপনের জন্ত ভ্রমণ করেন তবে বোধ হয় তিনি অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারেন।

কিন্তু এইরূপে প্রীতিযাজন দ্বারা সকলের পরস্পরের ভাল-বাসা জন্মাইতে পারে মাত্র এবং ভালবাসা আর ঐক্যতা ঠিক এক নয়। ভালবাসা ঐক্যতার ঘটক মাত্র। জাতি-ঐক্যতার সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেশ্য আবশ্যক করে যেখানে সকলের স্বার্থ সমানরূপে সম্মিলিত হয়। এবং আমাদের মধ্যে এমন কি আছে যেখানে গিয়া সকলে মিশিতে পারে? কেহ বলেন ইংরেজ প্রীতি দ্রুগা বিষয়ে সকলে এক মত হইতে পারেন—এমন কি ইহাতে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিতে ঐক্য হইবে; কিন্তু এটি কি কর্তব্য? কোন জাতিকে দ্রুগা করা নীচত্বের কার্য, ...এতদেশীয়গণের সম্মিলিত হইবার এক মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং যেখানে বোধ করি সকলের স্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারতভূমিকে দাসত্ব মুখল হইতে উন্মোচন করা। ইহাতে শুদ্ধ হিন্দুরা কেন, মুসলিমরা সকল মহৎ জাতিই সম্মিলিত হইতে পারেন। হিন্দু জাতির ভাষা মহৎ একটি জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে কাহার না আন্তরিক আনন্দ হইবে? ইংরেজগণ আমাদেরকে এই রত্ন উপভোগের জন্ত এত যত্ন পাইতেছেন। এ দেশে থেকের, স্বদেশে অবস্থিতি করিয়া, ক্রমে আমাদেরকে সত্যতার সোপানে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা যদি দেখেন যে আমরা

বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যত্নশীল হইতেছি তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দে নৃত্য করিবেন। কল কি উদ্যোগে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে?

এদেশে প্রতিনিধি সভা সংস্থাপনের কথা হইতেছে। উদ্যোগটি মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুদয় ভারতবর্ষীয়গণ ইহার মর্ম সুন্দরী রূপে অবগত হন তবে সকলে এক তানে “জয় জয় ভারতবর্ষেই জয়” বলিয়া উঠিতে পারেন। (৭ মে ১৮৬৮)

ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে মর্টগমারী সাহেবের মত

ব্রিটিশ শাসনের উপর এ দেশের লোক কেন বিরক্ত, মর্টগমারী সাহেব তাহার এই২ হেতু দর্শান। (১) ইংরেজেরা বিদেশী (২) বিচার প্রণালীর জটিলতা (৩) আইনের অস্বৈর্য্যতা (৪) বাকী খাজনার নিমিত্ত জমিদারী বিক্রয় (৫) ব্যক্তিচারিদিকগকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি (এটা কোন কাহের কথা নয়) প্রভৃতি (৬) সাক্ষীদের কষ্ট (৭) ক্ষোভের বাজাপ্ত করা (৮) পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করা, মহৎ বংশীয়দিগকে মর্যাদাজনক পদ না দেওয়া, কি স্বদেশোদ্ধৃত হুবা ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মর্টগমারী সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল গুটিকয়েক প্রধান কারণ ছাড়াইয়া দিয়াছেন। অনেক জাতি বৈরিতার কারণ শুধু এইগুলিকে বলিয়া থাকেন। বিচারপতিদের পক্ষপাতিত্ব, এদেশবাসী ইংরেজদিগের অর্থাৎ নীল-কুঠিয়ার প্রভৃতির অত্যাচার, তত্ত্বাবধ প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অন্ন মারা, ও ইংরেজদিগের অহঙ্কার ও এদেশীয়দের প্রতি ঘৃণা। আর একটি কারণ আছে। এদেশে নুতন ইংরেজের আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে, ইংরেজদিগের এদেশ হইতে প্রস্থান।

মর্টগমারী সাহেব বলেন যে, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীদের প্রকার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ দেবান কর্তব্য। প্রজাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা, অধিবাসীদের মত লইয়া আইন প্রণয়ন করা, দেশ শাসনের ভার কতক কতক এদেশীয়দের উপর দেওয়া উচিত ইত্যাদি। মর্টগমারী সাহেব যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ দিই। গবর্ণমেন্ট যদি সুবোধ হন তবে সমস্ত সমস্ত মর্টগমারী সাহেবের উপদেশানুসারে কার্য করিতে থাকুন। তাঁহারা যদি বেজ্ঞপূর্বক এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়েন, তবে তাঁহাদের জিত থাকিবে, আর যদি বাধ্য হইয়াকরেন, তবে সম্পূর্ণরূপে ঠকিবেন। (১৪ মে ১৮৬৮)

ইন্ডিয়ান ডেলিনিউজ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

ডেলিনিউজ সম্পাদক বলেন যে, ইংরেজেরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমাদের অবস্থা আরো মন্দ হইবে। সম্পাদক রাজবংশীয়, সুতরাং তাঁহার এ কথার আমরা চূপ করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এদেশের কোন কোন কৃতবিদ্যেরও

এইরূপ মত। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকয়েক কথা বলিতে বাসনা হইতেছে।

ইংরেজেরা আমাদের হঠাৎ ত্যাগ করিয়া গেলে যে আমরা আত্মরং দেখিব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অফিকেন-সেবীরা যদি উহার সেবন অভ্যাস ত্যাগ করিতে যায় তবে ঐ রূপ প্রথমে আত্মরং দেখিয়া থাকে। সতীহ্রষ্ট জীর একমাত্র সম্বল উপপত্তি, তাই বলে কি তাহার চিরকাল ব্যক্তিচার করিতে হইবে? পীড়া হইলেই ঔষধ সেবন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ঘোড়া হইতে পড়িয়া অস্থির করিলে হাড় ঘোড়া লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। যখন ভারতবর্ষেরা একবার স্বাধীনতা ধন হারায়াছেন, যখন তাঁহাদের একবার জাতি গিয়াছে, তখন প্রায়শ্চিত্ত রূপ কষ্ট আজি হটুক, কালি হটুক, একদিন করিতেই হইবে।

“অদ্যাপি ভারতবর্ষেরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হয় নাই” ইংরেজ মাজের মুখে এই কথা শুনি, ও একবার উত্তর দিবার যোগ নাই। কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার প্রমাণের ভার ডেলিনিউজ সম্পাদকের উপর। তিনি কি ইহার উত্তর দিতে পারেন? সিন্, কোসিন্, টানজেন্ট দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এদেশীয়দের উপর একটি দেশের ভার দিয়া দেব, তাহারা না পারে, তখন আমরা চূপ করিয়া থাকিব। আর যত দিন এরূপ প্রমাণ না দিয়া কোন ব্যক্তি বলিবেন, তিনি হয় বুঝিয়া বলেন না, নয় হুঁই।

“ভারতবর্ষেরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে।” ইহা কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিবিবার পুষ্টক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয়। স্বাধীনতা শিবিবার পুষ্টক স্বাধীনতা। আমরা না শত শত ইংরেজী পুষ্টকে পড়িয়াছি যে, অনেক দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্বলের যত দোষ অর্থাৎ মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, ভীকৃত্য, নীচতা প্রবেশ করিয়াছে? আমরা না পড়িয়াছি যে, রোমানেরা যখন ইংলণ্ড প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে ও চারি শত বর্ষ পরে যখন রোমানেরা ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, তখন ব্রিটিশ জাতি এরূপ হীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেক গুণ নিকৃষ্ট পিক্ট জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? তাহারা ত রোমানদের কর্তৃক হসন্ত হইয়াছিল? মুসলমানদের ও ইংরেজদের অধিকার অগ্রে আমরা কাহার দ্বারে? খোসামোদ করিয়া বেড়াইতাম, “ওপো তোমরা অগ্রহ করিয়া আইস, আমাদের দেশগুলি শাসন করিও, আমরা নিকৃষ্টকে লাকল চষিব?”

স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক, এইজন্য দাসেরা মাঝে২ জুটয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭-৫৮ সালের যোঁর সময় হয়, আর এই নিমিত্ত আমরা বিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকি। ১৮৫৭-৫৮ সালে যে২ যুদ্ধে

যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে কি কেহ আর ঐক শত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে? ইংরেজেরা কি এইরূপে আমাদেরকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিরস্ত্র করিয়াছেন, এ বুঝি আর একটি উপায়? এটি নিশ্চিত যে, পরাধীন অবস্থার আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে। (২৮মে ১৮৬৮)

জাবা দ্বীপ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া

আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পার্ঠে একটি নূতন বিষয় পাঠ করিলাম। ওলোন্দাজেরা জাবা দ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার সহ শাসন করিতেছে শুনিয়া ইউরোপের ও আমেরিকার সমুদায় সভ্য জাতি তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়াছেন। ডেকার নামক এক ব্যক্তি ১৭ বৎসর পর্যন্ত জাবা দ্বীপে বাস করিয়া সেখানকার অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হন কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া পরে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য অফল টম্‌স্‌ কেবিনের ছায়, উহাতে ওলোন্দাজেরা জাবা দ্বীপ অধিবাসিগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাই একটি গল্প-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের লিখিত অত্যাচার শুনিয়া পৃথিবীর তাবলোকের রোমাঞ্চ হইয়াছে।

নীলকরেরা যেরূপ কোন কোন জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিত, কি করিতেছে, ওলোন্দাজ গবর্নমেন্টও সেরূপ দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের সাহায্য পাইয়া অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। এইরূপ যে হইতেছে তাহা ডেকার সাহেবের পুস্তক প্রচার না হইলেও আমরা জানিতে পারিতাম। ওলোন্দাজেরা যদি ভারতবর্ষ শাসন করেন তবে জাবা দ্বীপ রাধায় তাঁহাদের কিছুমাত্র লাভ থাকিবে না বরং পদে পদে ক্ষতি। তবে জাবা রাধায় তাঁহাদের লাভ কি? অতএব যেখানে এইরূপ দুই দেশে অনৈসর্গিক সম্বন্ধ উপস্থিত হয় সেখানে নিশ্চিতই অত্যাচার হইবে—সে দেশের ক্রিয়াক্ষমতা হইবে না। যাহারা পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা না দিয়া অথচ তথাকার অত্যাচার নিবারণ করিতে যান, তাহারা মিত্র নয় বরং শত্রু। তাহারা দুই একটি উপসর্গ নিবারণ করিয়া গিঁড়া যাপ্য করিয়া রাখেন, সুতরাং দেশের পরিবর্তন হইতে দেন না। জগদীশ্বরের সুকোশলাশুসারে বিষ বিষহর প্রায় এক স্থানেই পাওয়া যায়। অত্যাচার অত্যাচারীর মহোৎসব। নীলকরেরা একটু কম করিয়া অত্যাচার করিলে আরো অনেক বৎসর নিকটকে অত্যাচার করিতে পারিত। ইংরেজেরা যদি একটু বাহ ওঁদার্য্য ও দয়া না দেখাইতেন, তবে এতদিন এদেশ রাধিতে পারিতেন না পারিতেন, সন্দেহ স্থল। ইহা বুঝিয়াও যে অনেকে অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করেন তাহার মানে এই যে, অনেকে হুইনিয়ানকে ঘৃণা করিয়াও অনেক সময় উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডেকার সাহেবের পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে আমি যে এরূপ পুস্তকপঠে এ সমুদায় অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিতেছি ইহাতে যিনি রাগ করেন তাহার বিবেচনা করা উচিত যে, ইংরেজেরা যদি ভারতবর্ষে কিরূপ শাসিত হইতেছে তাহার প্রতি পূর্বে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে সিপাহী যুদ্ধের সময় এত কোটি টাকা অপব্যয় ও এত মহত্বা যুগ্ম নষ্ট হইত না। এই কয়েকটি কথা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় পুত হয় নাই। তিনি বলেন অত্যাচার নয় বরং সোহাগে সিপাহী যুদ্ধের উৎপত্তি করে। ফ্রেণ্ড যে এরূপ দুই একটি কথা বলেন, ইহাতে ভারতবর্ষের তাবলোকের তাহার নিকট বাধিত হওয়া উচিত, কারণ ইহাতে তাহাদের মনে পরাধীনতার নিমিত্ত ক্ষোভের উদ্রেক করিয়া দেয়। ওলোন্দাজেরা জাবা দেশের জমিদারের সাহায্য লইয়া অত্যাচার করিতেছে বলিয়া ফ্রেণ্ড বলেন, এদেশস্থ অধিবাসীদিগকে রাজ্য শাসনের কি আশিয়াটিকদিগকে আশিয়াটিকদিগের উপর ভার দেওয়া উচিত নয়। ফ্রেণ্ডের এ হিসাবে, ওলোন্দাজ গবর্নমেন্টের জাবা দ্বীপের উপর অত্যাচার দেখিয়া, আমরাও বলিতে পারি যে, ইউরোপীয়দিগকে আশিয়াটিকদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে দেওয়া উচিত নয়। (১৯ জুন ১৮৬৮)

বজাতি পক্ষপাতিতা

আমরা জাতিতে বাল্যলী, শাস্ত্রে শুনিয়াছি “রাজারা পুত্র নির্বিশেষে প্রজা পালন করিবেন। তাহাদের সকলের প্রতি সম দয়া থাকিবে।” কিন্তু আজ কালি ইংরেজ গবর্নমেন্টের আচরণে তেমন রীতি দেখিতে পাই না। ইহাতে হয়ত আমরা নিতান্ত অসন্তুষ্ট; নতুবা ইংরেজেরা এতদূর সভ্য যে, আমরা তাহাদিগের সভ্য ব্যবহার বুঝিতে পারি না। যদি তাহাও না হয়, তবে ইংলিশ গবর্নমেন্ট বোকা বা পক্ষপাতী।

আমরা “সিবিল সার্ভিসের দ্বার উদ্বাটন কর” বলিয়া চীৎকার করিতে গলা ভাঙিলাম। বড় রাজপদ লাভের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইলাম। সকল গেল ধূমের মত উড়িয়া। যাউক, মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেই যে আমরা শিথিল, ইংরেজেরা জেত; আমরা অসভ্য, কৃষ্ণকায়, ইংরেজেরা সুসভ্য খেতকাণ্ডি; আমরা সপত্নীপুত্র, ইংরেজেরা পেটের সন্তান। কাজেই অধিকারের ভারতম্য থাকিবে। কিন্তু বিচারের বেলাও এইরূপ জাতিভেদ করা হয়, এটি বড় অসহ। ইংরেজরাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছেন, আবার তাহারা কলুর বলদের মত উহা ঢাকিয়া রাধিতে চান। কোন কোন ইংরেজ মহাত্মা সাধারণ্যে বক্তৃতা করেন যে, “আমরা বাল্যলীদিগকে সভ্য করিয়াছি, তাহাদিগকে আলোতে এনেছি” তবে আমরা তুল্য বিচার কেন না পাই? তবে কেন অন্ধকারে পচিয়া মরি? তবে কেনই বা আমাদেরকে দেখাইয়া ইংরেজেরা সর উঠাইয়া ধান? ইহাও বরং সহ্য করিতে পারা যায়, যদি উপযুক্ত ইংরেজেরা কেবল তাহা গৌরব লাভ করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ, ঘোষণাবশ, অস্থির-

প্রকৃতি, ঐশ্বর্য ও মঙ্গল পর্যাণ্ড পেটুলনের বলে বড় কাক, বড় অধিকার পান; এবং কঠিন অপরাধের দণ্ডরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। আর ধৃতি চাদরের দোষে বাঙ্গালী রাজার বার্ষিক, পারদর্শী, শাস্তচরিত্র, অক্রোধী হউন—না উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, না অল্প একটু দোষ করিলেও সারিয়া যাইতে পারেন। এই কি রাজার সুবিচার? না এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপক্ষ-পাতিতার লক্ষণ।

যশোহরে কেবিরণ সাহেব বিনাদোষে একজন সম্রাট রাজকর্পচারীকে মরণান্ত প্রহার করিলেন; গবর্ণমেন্ট লিখিলেন যে পর্যাণ্ড তিনি শাস্ত প্রকৃতির পরিচয় না দিতে পারেন, তাবৎ উন্নতির পথ রোধ হইল। বৎসর না ফিরিতে ফিরিতেই তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল। তারপর, চেম্বার্স সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ভদ্র ও মাজ বংশোদ্ভব সর্ব-ইনস্পেক্টরকে প্রহার করিয়া ৫০ টাকা জরিমানা পর্যাণ্ড দিলেন। কিন্তু সে অপরাধ বাসি মা হইতেই তাহার পদোন্নতি হইল। এই সে দিন আইবিস একটি জবজ্বল মোকদ্দমাতে ঠেকিলেন। গবর্ণমেন্ট নিতান্ত দয়াপূরবশ হইয়া তাঁহার পাপের দণ্ডরূপ তাড়াতাড়ি ফুল ইনস্পেক্টর দিয়া সুবিচার প্রদর্শন করিলেন। নাম করিলে, অনেক করা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক শাস্তি-রক্ষককে জানি, বাহারা অশান্তির ভূমি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও উন্নতি লাভ করিতেছেন। আবার অপর দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে, পদে অবিচার। কলিকাতার স্মল কজ কোর্টের জজ কান্দীপ্রসাদ মিত্র ফুড্র একটি কারণে পেনসিন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র কি একটু দোষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই একেবারে ডিসমিস হইলেন। অনেক দূর যাইবার প্রয়োজন কি? এই যশোহরে একটি কৃতবিদ্য কেরাণি কোন কথায় নাকি অব্যাহতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে পদচ্যুত তো হইলেনই, আজিও কর্ম পাইতেছেন না। ২৭১৮ বৎসরের পুরাতন তিন জন আমলা প্রপিতামহের আমলে নাকি উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কত গল্পগোলা গেল। আমরা পুত্রবাহুক্রমে জানিয়া আসিয়াছি, যে পদের যে উপযুক্ত, রাজা তাহাকে তাই দেন; যে ব্যক্তি দোষী তার দণ্ড হয়; বার্ষিক ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের পুরস্কার হয়। কিন্তু ইংরেজেরা আমাদের দূতন-রাজনীতি শিখাইতেছেন। ইংরেজেরা আমাদের এত আলোতে আনিয়াছেন যে, এখন দেখিতে চক্ষু খলসিয়া গেল। (৩০শে জুলাই ১৮৬৮)

[বাত-প্রতিবাত]

আবাত প্রতিবাতের সমান। অজ্ঞকে চপেটাবাত করিলে হাতে বেদনা লাগে। এই নৈসর্গিক নিয়ম। পরমেশ্বর মনুষ্যকে এইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সকলেই পরস্পর স্বাধীন। বলবান দুর্বলের প্রতি আক্রমণ করিলে, দুর্বল বলবান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সাধ্য মনুষ্যের নাই। প্রজা যে রূপ রাজার অধীন,

রাজাও সেই রূপ প্রজার ভৃত্য বই নয়। কাজেই পূর্বে যাহা বলিয়াছি, মনুষ্যকে পরমেশ্বর পরস্পর স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

নীলকরেরা প্রজার উপর অত্যাচার করিত, এই নিয়মামু-সারে পরিণামে তাহাদের খাট হইতে হয়। গবর্ণমেন্ট প্রজার উপর অত্যাচার করিলে প্রজারও সর্বনাশ, গবর্ণমেন্টেরও সর্বনাশ। উদরে ও অগ্রাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিবাদ যে রূপ; গবর্ণমেন্ট ও প্রজাতেও বিবাদ সেই রূপ, কেহ কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কোমন্ড স্থানে আপাতত কিছু লাভ দেখা যাইতে পারে, যেরূপ এক্ষণে ইংলিস গবর্ণমেন্ট স্বচ্ছন্দে প্রজাদিগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য্য করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন, কিন্তু এ যুগের পূর্বে অর ত্যাগের, স্বভেদের পূর্বে শান্তির ভায়।

যে গবর্ণমেন্টের বহুদশিতা এত কম যে, বাধ্য না হইলে আর কোন কথা শুনেন না, সে গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইলে যে শুধু সেই কথাটি শুনিয়া অব্যাহতি পান এরূপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্বকার তাচ্ছিল্যের দণ্ড স্বরূপ আর কিছু দিতে হয়। ইংলিস গবর্ণমেন্টে ও প্রজায় যে রূপ অসম্মান, আর এ অসম্মান যে রূপ ফ্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে গবর্ণমেন্টের ঐক্যি তাহার কোন নিরাকরণের উপায় না করিলে শেষে অসুখাপ করিবেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি আবাত প্রতিবাতের সমান। গবর্ণমেন্ট এরূপ কিছু আমোদেবু ক্ষতি করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতি না হয়। তাহার দেশ সমেত লোকে বলেন যে, ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্তই তাহার ভারত-শাসন করিতেছেন। তাহার আমাদিগকে শাস্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বলেন, বলিয়া বিপদীত করেন। আমরাও মনে যাহা ভাবি না ভাবি মুখে বলিয়া থাকি ইংরেজেরা আমাদের পরমোপকারী। ইংরেজেরা যে কাজ করেন তাহাতে এইটা দেখান হয় যে, প্রজাদের মঙ্গল তাহাদের মুখা উদ্দেশ্য, আমরাও যখন যে বিষয় বলি কি লিখি, “দয়াবান গবর্ণমেন্ট” “প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট” না বলিয়া আর কোন ছত্র আরম্ভ করি না।

ইংরেজেরা অগ্নান বদনে বলেন যে ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদিগকে দেশ শাসন করিতে দেন না, আমরা সেই পিঠ পিঠ বলি ইংরেজ গবর্ণমেন্ট চিরকাল বজায় থাকুক। আমরা তাহার যেরূপ গোপনে গোপনে বলিয়া পরামর্শ করেন যে কিসে নিকটকে ভারতবর্ষকে দোহন করা যায়, আমরাও তেমনি খাটে, মাঠে, নগরে, বাজারে, যেখানে পারি আপনারা আপনারা সুখ দুঃখের কথা বলি। তাহার যেরূপ আমাদের স্বার্থশূন্য, হিতাকাজী বলিয়া পরিচয় দিয়া অথচ ভারতবর্ষের চারি পার্শ্বের প্রাচীর দিবারাত্র চৌকি দিতেছেন, আমরা তেমনি ইংরেজ রাজা চিরকাল বজায় থাকুক বলিয়া আপনারা আপনারা গণনা করিতে বসি। এই আমাদের আপাতত প্রতিশোধ। (২০ আগষ্ট ১৮৬৮)

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

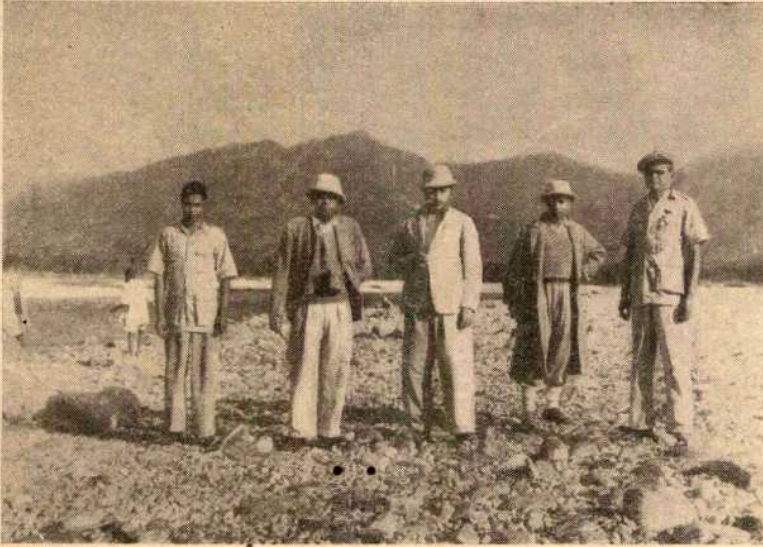
২

আমরা সন্ধ্যার একটুখানি আগে এসে পৌছলাম নীলপাড়া সৌদামিনী টা এটেটের বাংলোয়। এইখানে আসবার একটা আকর্ষণ, এখানে একটু দূরেই গণ্ডারের রাজত্ব। কিন্তু সকালে গণ্ডার দেখতে যাওয়া হবে এই প্রস্তাবে যতখানি

ঘর, প্রত্যেক ঘরে দুখানি ক'রে ঝাট পাতা। বারাণ্ডাটাও অতি চমৎকার। সব সময় সেখানে বসে হিমালয়ের শোভা দেখা যায়। পাহাড়ের সঙ্গে সব সময়েই প্রায় মেথ লেগে আছে। পাহাড়ের গাট নীল রং ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে সন্ধ্যাবেলা। শুধু এক-একটা জায়গা তখনও উজ্জ্বল সাদা

দেখাচ্ছে। পাহাড়ের সেই সেই অংশ প্রবল রুষ্টিতে ধ্বসে গিয়ে শাদা মাটি পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এখানে সমস্ত দিনের পর রাতে ঝাওয়া হ'ল উৎকৃষ্ট সুগন্ধ চালের ভাত ও মাংসের ঝোল। দুম হ'ল গভীর।

৩০ নবেম্বর। সকালে হিমালয়ের এক অপূর্ব রূপ এ এক পরমার্শর্ঘ্য দৃশ্য। সমস্ত পর্বতশ্রেণী উজ্জ্বল বেগুনি রঙে টকটকে হয়ে উঠেছে। ঘষা বেগুনি কাঁচের পর্বতমালার অভ্যন্তরে যেন হাজার হাজার আলো জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙে লালের আভাই বেশি। রং ভিজ়ে মনে হচ্ছে। যেন আকাশের বুকের উপর শিল্পী এইমাত্র তুলির টানে



খুলঝোরা যাইবার পথে রায়ডাক নদীর বুকে

আশাবিত্ত হয়ে উঠলাম, নিরুৎসাহও বোধ করলাম ততখানি। এখান থেকে জঙ্গল পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, যেতে হবে হাতীর পিঠে চড়ে। কিন্তু গেলেই যে গণ্ডার দেখা যাবে তার কানো স্থিরতা নেই, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু যেতে হবেই, যদি দৈবাৎ একটা বা একটা দলস্থল ক্যামেরায় ধরা পড়ে তা হলে ক্যামেরা ধ্বংস হবে।

এসেছি চা-বাগানের বাংলোয়, অতএব আসার পর থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তিন বার চা ঝাওয়া হ'ল। বাগানের ম্যানেজার বিখাস মশাই আমাদের সুখসুবিধা বিধানের জেজ্ঞে অতি তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাংলোর বাড়িটি ছবির মত। মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটি বা ধামের উপরে টিনের চাল এবং চালের নিচে আগা-গোড়া কাঠের অন্তরণ। উঁচু দোতলা বাড়ি, প্রকাণ্ড কাঠের সিঁড়ি। 'দামী আসবাবপত্রের ঘরগুলো সাজানো। জানালা-গুলো সব কাঁচের। সব ঘরেই বিদ্যুতের আলো। দোতলাতেই স্নানের ঘর, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো। স্নানের ঘরের মেঝে সিমেন্টের। হুই প্রান্তে দুখানি শোবার

এই পর্বত শ্রেণী আকলেন, রঙ তখনও কাঁচাই আছে—রঙের মধ্যে এক অবর্ণনীয় আর্দ্র উজ্জ্বলতা। এ রকম দৃশ্য কখনো দেখি নি—কখনো হতে পারে এরকম কল্পনাও করা যায় নি। এই অভাবনীয় দৃশ্য আমাদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। এবং এ রং মিলিয়ে যেতে না যেতে আর এক উত্তেজনা। বাইরে চেয়ে দেখি আমাদের জেজ্ঞে হাতী এসে গেছে।

প্রকাণ্ড উঁচু হাতী। পোষা হাতীদের প্রত্যেকেরই একট ক'রে নাম থাকে। এটির নাম হচ্ছে ধরমপিয়াড়ী। "ধুই" শ্রেণীর। ওদের শ্রেণী পরিচয় হচ্ছে এই—

ধুই—প্রোচা হস্তিনী। কুনকী—স্ত্রী হাতীর সাধারণ নাম। শারীন—তরুণী হস্তিনী। মাকনা—পুরুষ হাতী, কিন্তু দাঁতহীন। দাতাল—দাঁতযুক্ত পুরুষ হাতী 'টাকার'। গণেশ—এক দাঁতের পুরুষ হাতী। এই হাতী দৌড়াগা-পুচক।

ধরমপিয়াড়ীকে দেখে বেশ একটা সন্ত্রম জাগে। প্রকাণ্ড

উঁচু হাতী, চোখ ছুটেতে একটা সহায়ত্বপূর্ণ অতি সহৃদয় ভাব। বুদ্ধিতে উজ্জল। সে এমন ভাবে আমাদের দিকে চাইতে লাগল যেন এখন তাকে যা যা করতে হবে সবই সে জানে।

আমি ক্যামেরা তৈরি ক'রে নিতে ঘরে এলাম, তার জন্তে ছচার মিনিট দেরি হচ্ছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখি আমাদের মোটর বিশারদ সুশীল পোড়ার ঘরের মধ্যে ছুটে এসে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছেন।

ঘরে এসে গোপনে হাসবার কি কারণ ঘটল, জিজ্ঞাসা করলাম।

সুশীল বাবু কোনো রকমে বললেন, বাইরে হাসলে বেয়াদপি হ'ত—কিন্তু আপনি গিয়ে দেখুন কি ব্যাপার!

গিয়ে দেখি অশোক আগেই হাতীর পিঠে বসেছে। হাতীর ঘাড়ের উপর মাহত অশোকের বন্দুক হাতে বসে আছে। হাতীটি হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে নীচু হয়ে সুধাংশুকে পিঠে নেবার চেষ্টা করছে। সুধাংশু তার পিঠের দড়ি ধরে বুলে ছুখানা পা হাতীর পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে পাহাড়ে ওঠার মতো হুঃসাহসিক কাজে রত। তার ছুখানা পা ক্রমাগত ফস্কে যাচ্ছে এবং তার ফলে সেও থেমে উঠেছে, হাতীও থুঁব লজ্জা পাচ্ছে।

মিনিট তিনেক এই ভাবে সংগ্রামের পর সুধাংশুকে পিঠে পেয়ে হাতী মন্ত বড় একটা দায় থেকে উদ্ধার পেল। আমি এ দৃশ্য দেখে হাসতে প্রারম্ভ হলাম না, কেননা এইবার আমার পালা। কিন্তু তার আগে ওদের একখানা ছবি তুলে নিলাম। তার পর আমি এগিয়ে যেতেই মাহতের ইঙ্গিতে ধরমপিয়াদী আমার দিকে কোতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে পিঠটা নামিয়ে আমার জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। ওজনে হাকা হলেও পা ফস্কানোর বেলায় আমার অবস্থাও যে একই রকমের হাত্তকর হয়ে উঠেছিল সে কথা আমি প্রতি পদপাতেই বুঝতে পারছিলাম। এ ভাবে হাতীতে ওঠা জীবনে এই প্রথম, এবং যেমন সেদিন মনে হয়েছিল, আজও তেমনি মনে হচ্ছে, এই শেষ। আর যাই হোক, জীবনে হাতীতে ওঠার আর প্রয়োজন হবে না।

হাতী আমাদের নিয়ে গজগমনে এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু সেই উঁচু হাতীর অরক্ষিত পিঠের অল্প পরিসর জায়গায় তিন



রায়ডাক নদীর একটি দৃশ্য। দূরে হিমালয় শ্রেণী

জনের (মাহত সমেত চার জন) ঠেলাঠেলি ক'রে দড়ি ধরে বসে থাকি আমার পক্ষে খুবই অরক্ষিত মনে হচ্ছিল। তত্পরি নীতের পোষাকে সবাই আরও মোটা হয়েছি, উপরন্তু আমার এবং সুধাংশুর গজায় একটি ক'রে ক্যামেরা। আমরা সামান্য কিছু দূর যাবার পরই বুঝতে পারলাম এ অবস্থায় ক্যামেরা ব্যবহার করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ দুই হাতে হাতীর পিঠের দড়ি শক্ত করে ধরে থাকতে হবে আশ্রয়কার জন্তে, এবং ক্যামেরাটি গলায় লকেটের মত বুলবে—এতে আমি সন্তুষ্ট কোনমতেই আরাম বোধ করব না, তাই অবিলম্বে স্থির করলাম আমি যাব না। কিন্তু সবার সম্মুখে তখনি নামলে সবাই হৈ হৈ ক'রে ছুটে এসে নানা রকম প্রস্তাব করতে থাকবে, তাই একটু দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে সব বললাম এবং তাদের অসু-মতি নিয়ে নেমে পড়লাম এবং ফিরে এসেই বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে জুটে চায়ের কারখানা-ঘরে প্রবেশ ক'রে সব দেখতে লাগলাম।

পূর্ব দিশ তাঁকে সব বলা ছিল। তিনি সঙ্গে থেকে থেকে সব দেখতে লাগলেন। প্রথমে গেলাম বাগান থেকে চা পাতা তুলে এনে আগে যেখানে শুকোতে দেওয়া হয় সেই ঘরে। তারের জালের তাক একটির পর একটি সাক্তানো, তার উপর কাঁচা সবুজ পাতা লাইন ক'রে ক'রে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চা একটুখানি শুকিয়ে নরম হয়ে এলে কলের সাহায্যে পাতাগুলোকে জড়ানো হয়। সেই কলটির নাম টুইসটিং মেশিন বা পাক-দেওয়া যন্ত্র। দেখতে প্রায় পাক্ষ্মন্ত্রের মতোই।



ধরমপিয়ানী

উপরের একটা তলা থেকে একটা ছোট ছেলে বসে মুঠো মুঠো পাতা চওড়া নলের মধ্যে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কলের মধ্যে এসে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেন গমভাঙা বাঁতা। চা-পাতা পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসছে।

এর পরের প্রক্রিয়া হচ্ছে এগুলোকে ঐ ঘরের রৌদ্রহীন মেঝেয় ছড়িয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় থাকতে থাকতে আপনা থেকেই সবুজ পাতা শুকোতে থাকে ও হাওয়ার অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে কালো রং ধরে। তার পর আরও ভাল ক'রে শুকোনোর জন্যে গরম ঘরে রাখতে হয়। এর পর বাছাইয়ের কাজ। এই সময় গোটা চা ও শুঁড়ো চা পৃথক হয়।

এখান থেকে বেরিয়ে ওখানকার এক কর্মচারীর সঙ্গে গেলাম চায়ের বাগানে। এঁদেরই বাগান। পাঁচ-সাত শ' একর পরিমিত জায়গা জুড়ে সবুজের সমুদ্র। চা গাছকে ছায়ার রাখবার জন্যে বাগানের ভিতর এক রকম বড় বড় গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে শেড ট্রী বলে। বাংলা নাম কেউ কেউ বলে কড়ুই। এই গাছগুলো ভারি সুন্দর। দশ-বারো হাত বা বেশি দূরে দূরে এক একটি গাছ—ছবির মতো দেখাচ্ছে। বাগানের সমস্ত চা-গাছ ছোট্ট বুক সমান উঁচু করা হয়েছে। এইভাবে ছোট্ট দিলে অনেক নতুন ডাল গজায় এবং তা থেকে চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। প্রত্যেক ডাল থেকে যে সব নতুন পাতা গজায় তার মাথা-গুলো ছিঁড়ে নিতে হয়। মাথার দিকে থাকে ছুটি কচি পাতা এবং তার মুখোকার অঙ্কুর—এই হচ্ছে চা। সবশেষ প্রান্তের ঐ শীষটুকু ছাড়া অন্য কোনো পাতায় চা হবে না।

বাগানে লাইন বেঁধে কুলিরা আসছে। পুরুষ মেয়ে—নানা জাতীয়। সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে।

প্রত্যেকের পিঠে একটি ক'রে বুড়ি, কপালের সঙ্গে কিতে দিয়ে বাঁধা। তারা এসেই চা তোলার কাজে লাগল। তারা এ কাজে এমনই পাকা যে দেখে মনে হয় তাদের আঙুলগুলো চলছে বিদ্যুৎগতিতে। দু হাত এদের সমান চলে। অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু মুখে লাবণ্যের অভাব। মেয়ে-কুলিদের কেউ কেউ তার শিশুসন্তানদের পিঠের ধলৈয় পুরে চা তুলছে। শিশুরা নির্জীব অবস্থায় নীরবে কুলছে, সেই ধলৈয়। ওরা বাগানের মধ্যে চুকে পড়বার আগে ছ-একটা ছবি নিলাম এবং পাতা তোলার সময়েও নিলাম। এই সময়ে, অন্তত এদের মুখে হাসি ফুটেছিল।

চায়ের ফুলগুলো দেখতে বেশ। শাদা ফুল, মাঝখানে হলদে রংগুয়ালা সরু সরু শেঁয়া। এখানে অনেকে চায়ের ফুল ভেজে খায়—আমরা যেমন কুমড়োফুল বা বকফুল ভেজে খাই।

চায়ের গাছ সাধারণতঃ পনের-ষোল হাত লম্বা। খুব দৃঢ় এবং তেজী গাছ। চায়ের গাছে বেশ মজবুত লাঠি হয়। কিন্তু গাছ এত বড় থাকলে তা থেকে চা সংগ্রহ করা যায় না, তাই কেটে-ছেঁটে বুক সমান উঁচু করে দিলে নতুন অনেক ডালও গজায়, সুতরাং চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। চা গাছের বলিষ্ঠ বৃদ্ধি দেখে কচুরিপানার বৃদ্ধির কথা মনে পড়ে।

এই বাগানে চা তোলা দেখা শেষ হ'লে আমরা ফিরে এসে বিপরীত দিকের আর একটি বাগানে গেলাম। এইখানে বড় বড় চা গাছের বনে কেবল ছাঁটাই কাজ শুরু হয়েছে। বৃদ্ধের দরুন মজুর কমে যাওয়াতে ডুমাস অঞ্চলের অনেক বাগানে অনেক দিন কোনো কাজ হতে পারে নি—কাজেই সে সব বাগান অরণ্যে পরিণত হয়েছে। বড় বড় ঝারালো ছুরি দিয়ে কুলিরা চায়ের গাছ কাটছে। তাদের অনেকেরই গা খালি। হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। এদের খাব্যের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এদের উপার্জন মাসে কুড়ি থেকে সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা। যে যত পরিশ্রম করতে পারে তার উপরে উপার্জনের কম বেশি নির্ভর করে। বাগানের তরফ থেকে ওদের র্যাশন সত্তায় দেওয়া হয়, কেনা দামের চেয়ে কম দামে। কিন্তু চা-বাগানে অনেকের লাবণ্যহীন রোগা চেহারা দেখে বাইরে থেকে অসুস্থ মান করা কঠিন যে এরা সব বিষয়ে ন্যূনতম সুখ-সুবিধা ভোগ করে। করা সম্ভবও নয়। দেশী চা-বাগানে তবু নাকি এরা ইউরোপীয়দের বাগানের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পায়। ইউরোপীয়দের কুলিপ্রীতি তো সর্বজনবিদিত। তাদের পিলে বড় হওয়াও যেমন ছিল অপরাধ এবং তা ইউরোপীয় বুটকে যে অকারণ আকর্ষণ করত সেও ছিল তেমনি অপরাধ। কিছু দিন পূর্বে এ অঞ্চলের ইউরোপীয় বাগানে কুলিদের বিদ্রোহের ফলে হয় তো অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে।

আমরা ফিরে এলাম প্রায় এগারটায়। এখানে শীত এখনও



হাতী গড়ের বেড়া আক্রমণ করিতে আসিলে উপর হইতে
এইভাবে বর্ষার বোঁচা মারিয়া হটাঁইয়া দেওয়া হয়

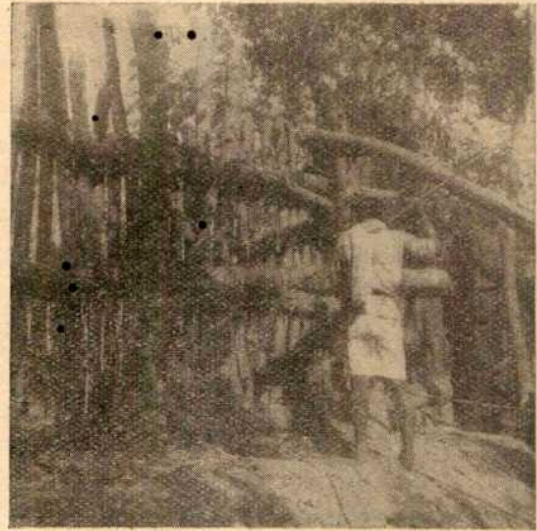
খুব বেশী নয়, রাজে বাইরে গেলে শীত বোকা যায়, কিংবা
দিনে গাঙিতে ছুটে চললে। খুব মনোরম আবহাওয়া এবং
দৃশ্য। তাই বসে বসে উপভোগ করছি আর বস্ত্র ডাক্তার
অনাদি মিজের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা
করছি—বেলা একটা বেজে গেছে—এমন সময় দূরে ধরম-
পিয়রীর বৃত্তি দেখা গেল।

অশোক অধাংশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। গভীর দেখা যায়
নি। এ সময় দেখার নাকি অসুবিধাও আছে। যে পথে
তাদের চলাফেরা সেখানে কাশবনের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে এখন।
তার উচ্চতা হাতীকে ছাড়িয়ে যায়। তা ছাড়া একটা বড়
বিপদের হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে। জঙ্গলের ভিতর একটা
চোরা গর্ত ছিল, হাতী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।
আরোহীরাও যে তার পিঠ থেকে পড়ে যায় নি এটা সৌভাগ্য
বলতে হবে। এ রকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে, কারণ হাতী
চলা-ফেরায় অত্যন্ত সতর্ক। গর্তের অস্তিত্ব জানতে পারলে
এ রকম হ'ত না।

১ ডিসেম্বর। আজ সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম
রাজাভাতখাওয়ার পথে। কিন্তু তার আগে কতকটা উণ্টা
পথে এগিয়ে দলসিংপাড়া ষ্টেশনটি দেখে আবার ঘুরে চললাম
প্রায় রেলপথের পাশ দিয়ে। পথে কালচিনি নামক একটি
বড় জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথের দৃশ্য আগ-
গোড়াই খুব চমৎকার। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় এসে
পৌঁছলাম রাজাভাতখাওয়া। এখানকার অ্যাসিষ্ট্যান্ট করেষ্ট
অফিসার শ্রীমুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় অশোকের পরিচিত। গাড়ি

ধামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি সুখবর দিলেন,
বললেন, বেদায় হাতী ভাঙানো অল্প হয়েছে শুনেছেন, তবে
ধরা পড়েছে কিনা এখনও খবর পান নি। সুতরাং আমাদের
জইন্তীতে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল হবে। আমরা তখনই
উঠলাম সেখান থেকে।

এইবার পথ ক্রমশই উঁচু মনে হচ্ছে, অরণ্যও ক্রমশ গভীর
হয়ে আসছে। দাঙিলিং যাবার পথে ট্রেন শুকনা ষ্টেশন
ছাড়লে অরণ্য এবং উঁচু পথের যে অভিজ্ঞতা হয়, এখানেও
ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছিল। বোরা-কেরা পথে আমরা
ক্রমেই একটু একটু করে উঁচুতে উঠছি। একটা জায়গা এমন
উঁচু যে ট্রাক সেখানে উঠতে খুব বেগ পেয়েছিল। এইবার
আমরা আসল হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করছি এই রকম
মনে হ'তে লাগল। এখানকার শাল, সেগুন, শিশুগাছগুলো
খুব বড় বড়। অরণ্য কোথায়ও ঝোপে অন্ধকার, কোথায়ও
ঝোপশূভ পরিষ্কার। রাজাভাতখাওয়া থেকে জইন্তী পর্যন্ত যে
রেলপথ আছে মোটর পথও প্রায় তার পাশাপাশি। কখনও
রেলপথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি কখনও অত্যন্ত কাছে এসে
পড়ছি। সকাল থেকে আমরা জু' জায়গায় মাত্র চা খেয়েছি,
সুতরাং আরও একবার গাড়ি ধামিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার
দরকার বোধ করলাম। জনহীন অরণ্য-পথে একটি জায়গায়



হাতী গড়ের বেড়া আক্রমণ করিতে আসিলে নীচে হইতে
এইভাবে বর্ষার বোঁচা মারিয়া হটাঁইয়া দেওয়া হয়

দেখা গেল খুব বিস্ময়জনকভাবে কাঠ কাটার কাজ চলছে—সেই-
খানেই যেমত গেলাম। সঙ্গে কিছু রুট জেলি ছিল, কাঁচা
ডিমও ছিল। কিন্তু ডিম খাবার উপায় ছিল না। স্থলীলবাসু
গাড়ির ইঞ্জিনের গরম বাষ্পে একটি ডিম সিদ্ধ করে খেলেন,
কিন্তু এইভাবে একটি একটি করে ডিম সিদ্ধ করতে গেলে সন্ধ্যা



হাতীখেদার গড়ের বাহিরের দৃশ্য। পাশে একটি মঞ্চ দেখা
যাইতেছে। উহাতে দর্শকেরা দাঁড়ায়, হাতীর
প্রহরীরাও দাঁড়ায়

হয়ে যাবে আশঙ্কায় আমরা আর অপেক্ষা করা পছন্দ করলাম
না। সোজা গিয়ে উঠলাম জইন্তী ডাকবাংলোয়।

জইন্তীর দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর। বাংলোর নিচেই জইন্তী
নদী—নদীর পারেই হিমালয়। নদীতে এখন জল বেশি নেই,
তার সাদা হুড়ি-বিছানো বুক ধপ্ ধপ্ করছে, বাংলোর
দিকের পাড়ের নিচে সজীব ঘন নীল নদী তীব্র বেগে পশ্চিম
থেকে পূব দিকে বয়ে চলেছে। তার স্রোতের শব্দ বহু দূর
থেকেও শোনা যায়। পাহাড়ের চূড়াগুলোর মাথার সঙ্গে মেথ
পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে সংলগ্ন হয়ে আছে। রৌদ্র-ছায়ার খেলা
চলছে শালবন-আবৃত সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর উপর। প্রবল বর্ষায়
ধসে-পড়া জায়গাগুলো ছাড়া সমস্ত পর্বতশ্রেণী অরণ্যে ঢাকা।
চূড়ার উপরেও বড় বড় গাছের সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যাচ্ছে।
কিন্তু গাছগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও দূর থেকে সবই ছোট ছোট
গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দেখায় সবই সবুজ বলে
ভ্রম হয়, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে অরণ্যের
বিচিত্র বর্ণে অবাক হয়ে যেতে হয়। লাল, নীল, হলুদ সব
রংই আছে বিভিন্ন ঝোপগুলোতে। পূবদিকে অনেকগুলো
চূড়া একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে—সেগুলোর রং গভীর নীল,
সেখানে মেথগুলো একেবারে পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই সমস্ত দিনের পর পরম উপাদেয়
বিচুড়ি খেয়ে সুখের জায়গায় আসার আনন্দ আরও বেড়ে গেল।
আমরা আড্ডা জমিয়ে বসতে না বসতেই স্থানীয় রেলওয়ে
এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর অব ওয়ার্কস্‌ ত্রীমুক্ত শীতলাকান্ত শীল
খবর পেয়ে আমাদের কাছে এলেন। ইনি অশোকের পূর্ব
পরিচিত। খেদার হাতী ধরা পড়েছে কিনা ইনিও ঠিক জানেন

না। খেদার অবস্থান কোথায় তা আমরা বীরেনবাবুর কাছ
থেকে জেনে এসেছিলাম। কাজেই হাতী ধরা পড়ুক বা না
পড়ুক আমাদের সেইখানে গিয়েই ক্যাম্প করতে হবে এটা
প্রায় ঠিকই ছিল। কারণ হাতী ধরা পড়া একটা দৈব ঘটনা-
মাত্র, দেখতে হলে খেদার কাছাকাছি জায়গায় থাকাই ভাল।
যে খেদার আমরা এখন যাচ্ছি সে হচ্ছে এখন থেকে একুশ
মাইল দূরে আসাম-ভূটান সীমান্তের খুব কাছে। মাঝখানে
রায়ডাক নামক একটি প্রশস্ত নদী পার হতে হবে। এ পথটি
বরাবর হাতীপোতা হয়ে পূবদিকে গেছে, নদী পার হয়েও পূব-
দিকে যেতে হবে প্রায় কুমারগ্রাম বা নিউল্যাং পর্যন্ত, সেখান
থেকে যেতে হবে সোজা উত্তরে গভীর অরণ্যের দিকে। সেই
জায়গার নাম হচ্ছে খুরল খোরা।

কিন্তু আমরা যেখানেই ক্যাম্প করি, হাতী খেদার হাতীর
কাছে বা অল্প বাধের কাছে, তিনি সব জায়গাতেই ধর
তৈরিতে সাহায্য করায় প্রস্তুত। যখন যে ভাবে যে সাহায্য
দরকার তাঁকে বললেই তিনি লোকজন, মজুর ইত্যাদি দিতে
পারবেন।

অশোক বলল এখন এইখানে চূপচাপ বসে থাকি ভাল
লাগছে না, একবার শিকারের সন্ধানে গেলে হয় না? শীল
মহাশয় তৎক্ষণাৎ বললেন, সে তো খুব ভাল কথা, আমি এখনি
সব ব্যবস্থা করছি।

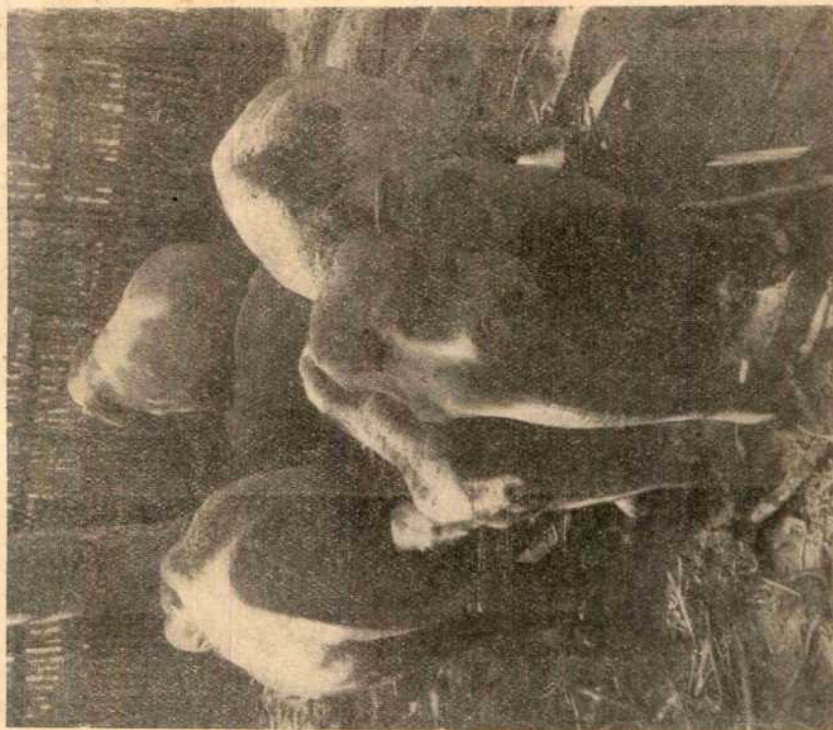


হাতীখেদায় হাতীদের গড়ে আটক করিবার আগে এইরূপ
লতাপাতায় ঢাকা দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া তাড়াইয়া আনা হয়
আমি তো ভেবেই পেলাম না কি ব্যবস্থা তিনি করতে
পারেন এত রাজে। তিনি বললেন যাবেন তো বলুন।

অশোক মহা উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয় যাব, এবং
তখনই টর্চ লাইটগুলো ঠিক করতে লেগে গেল। সুনলাম
শীল মহাশয় ঝিলিতে ক'রে ডিমার জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবেন।



চা-বাগানের একটু ফুলী রমণী



বেগার পড়ে জ্বাংক উদ্ভাস জ্বলী হাতীর দল



বামদিকে—উপর হইতে নীচে : (১) ছোট ছেলেকে বলের খুলাইয়া চ'-বাগানে কুলী রমণী চা-গাছ হইতে চা সংগ্রহ করিতেছে
 (২) কুলী রমণী পিঠে ঝাঁক। বাঁধিয়া চায়ের ডগা সংগ্রহ করিতেছে।

ডানদিকে—উপর হইতে নীচে : (১) এই স্ত্রী সাহায্যে চ'-গাছ ছাঁটাই করা হয়। (২) বহু দূর হইতে মেয়েরা হাতীখেদায়
 হাতীর গলায় কঁাস পরানোর দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে।

অশোককে। সুধাংশুও যাবে বলে, প্রস্তুত হতে লাগল। আমার কল্পনায় দিনের আলোয় দেখা সেই অন্ধকার অরণ্য অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় দশটা। কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করে বলতে হ'ল না, ওরা এক রকম ধরেই নিয়েছিল আমি যাব না, তাই অশোক আমার সম্মান স্বাক্ষর জ্ঞে আগে থাকতেই বলল, তুমি আর এই ঠাঁয় আমাদের সঙ্গে যেনো না।

ওরা দশটার সময় বেরিয়ে গেল বাংলা থেকে। ওদের সঙ্গে স্থলীল বাবুও গেলেন। আমি একা বসে বসে ডায়ারি লিখতে লাগলাম। এমন সময় একটি লোক এসে (বীরেনবাবুর কাছ থেকে আসা) এক জরুরি খবর বিলি করে গেল। চিঠিখানা অশোকের নামে, ইংরেজীতে লেখা। তিনি খবর দিয়েছেন পাঁচটি হাতী ধরা পড়েছে, অতএব আগামী কাল অতি প্রত্যুষে খুলল ঝোরার রওনা হওয়া চাই। পথের নির্দেশও নতুন করে দেওয়া আছে। রায়ডাক নদী পর্যন্ত ট্রাক পার হবার বন্দোবস্ত নেই, সুতরাং সেটি এপারে রেখে থেথা পার হয়ে যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে, অথবা ভিক্ষে ক'রে, অথবা চুরি ক'রে ওপার থেকে কোনো গাড়ী সংগ্রহ করতে হবে।

চিঠির শেষে লেখা আছে Mr. Goswami is really lucky—he has got this opportunity immediately on his arrival.

বীরেনবাবু জানতেন আমার উদ্বেগ হচ্ছে ফোটাটা নেওয়া। কিন্তু খেদা সত্ত্বে আমার কোনো ধারণা না থাকতে তখনও আমার মনে একটা সন্দেহের ভাব থেকে গেল।

আমাদের ভ্রমণে একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল এই যে, স্থলীলবাবু সঙ্গে একটি রেডিও সেট এনেছিলেন, কাজেই অরণ্য পথে দিন কাটলেও দৈনন্দিন শেষ খবর রোজই স্তনতে পেতাম। এতক্ষণ নানা উত্তেজনায় সন্ধ্যায় অথবা রাত দশটার খবর শোনা হয় নি—সে কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল। তখন অবশিষ্ট ছিল মাত্র বি বি সি খবর, তাই একা একা বসে স্তনতে লাগলাম। নানা প্রোগ্রামে রাত এগারোটটা পর্যন্ত বেশ কেটে গেল, কিন্তু তারপর? শিকারীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অনিদিষ্টকাল বসে কাটানো যায় না। তারা যাবার সময়েই বলে গিয়েছিল ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই বিছানায় আশ্রয় নেবার আগে ডায়ারিটা আরও কিছু এগিয়ে রাখলাম।

শিকারীরা ফিরে এল রাত প্রায় ছ'টোর ১ ঘুম ভেঙে গেল। স্তনলাম কিছু মেলে নি। খুবই স্বাভাবিক, কারণ শিকার কখন মিলবে তা কেউ আগে বলতে পারে না। এই অনিদিষ্টতাই যে শিকারের একটি প্রধান আকর্ষণ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

ডুর্ভাগ্যে অনেককেই হিংস্র জন্তুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হয়, তবে এ অঞ্চলের বাঘ মানুষকে নাকি আক্রমণ করে না। তবু এদের সংখ্যাধিক্যে এ অঞ্চলে শিকারীদের

আনাগোনা বেশি। বাঘের সংখ্যা নাকি খুব বেড়ে গেছে এখন। শীল মহাশয় বললেন, একদিন রেল-লাইনের উপর হুঁটো রয়্যাল বেঙ্গল স্তয়ে ছিল, রেলগাড়ির ইঞ্জিন তাদের সম্মুখে থেমে ছইসল বাজাতে লাগল, কিন্তু ওরা তা স্তেও নড়ল না। তারপর এক সাহসী ড্রাইভার কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের রেল-লাইনের উপরকার অনধিকার অবস্থানের বিষয়ে চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হ'ল। আর এক দিন কয়েকজন লোকের সামনেই বাঘ একটা গরুকে ধরে নিয়ে গেছে।

এ দিককার জঙ্গলে হাতী, বাঘ, ভালুক, বাইসন, হরিণ, শূয়ার এবং সাপ আছে। তা ছাড়া ময়ূর এবং মুরগীও আছে। আসবার সময় বস্ত্র মুরগী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি। জঙ্গলের মধ্যে এখানকার লোকেরা বাঘের চেয়েও হাতীকে বেশি ভয় করে। কারণ মাহুঘের শব্দ পেয়ে বাঘ সর্বদাই প্রায় গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাতীর শব্দ পেলে মাহুঘ পালাবার পথ খুঁজে পায় না, বিশেষ করে যুগলপা পাগলা হাতী যদি হয়। পাগলা হাতীর সম্মুখে পড়লে কারো আর বাঁচবার আশা থাকে না।

২ ডিসেম্বর। ভোরে উঠে চা খেয়েই আমরা খুলল ঝোরার দিকে রওনা হলাম ট্রাকে করে। হিমালয়শ্রেণীর সমান্তরালভাবে পূর্বদিকে ষোল মাইল যাবার পর রায়ডাক নদী। হিমালয়ের সঙ্গে এত বড় নদী এদিকে এই প্রথম দেখলাম। নদীর মাঝখানে চর, হুঁদিকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এক দিকে পায়ে হেঁটে পার হবার মত সেতু, তারপর চর পার হয়ে থেথা নৌকো। নদীর চরে হুড়ির অবর্ণনীয় শোভা। বোদের আলোয় স্তনস্ত চরে যেন সাদা আগুন জলে উঠেছে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা উঠলাম থেথা নৌকোয়। ট্রাক এ পারে রেখে যেতে হ'ল। নদী পার হয়ে ওপারে গৌঁছে দেখা গেল আমাদের পিছনে একখানা মোটর গাড়ি এ পারে আসছে। ছোট গাড়ির পক্ষে নৌকোর পার হয়ে আসার কোনো অসুবিধা ছিল না। গাড়ির মালিককে অশোক দূর থেকেই চিনতে পারল। সে দাঁড়িয়ে গেল নদীর পাড়ে, আমাদের বলল এগিয়ে যেতে। শীল মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর ছিল গাড়ির ক্রীনার লালু। আমরা চার জন হেঁটে যেতে লাগলাম নিউল্যান্ডের প্রশস্ত পথে। পথের হুঁধারে চায়ের বাগান। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই গাড়িখানা এসে পড়ল, অশোকও এসেছে সেই গাড়িতে। সে বলল আপত্ত আর একজন যেতে পারে সে গাড়িতে, খুলল ঝোরার গিয়ে গাড়ি আবার ফিরে আসবে, তখন আর সবাই যাবে। সুধাংশুকেই আগে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমরা কাছেই একটা বাংলোয় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

গাড়ি ফিরে এল ঘটাধানেকের মধ্যে। গাড়ির মালিকও এসেছেন। তিনি স্তধু গাড়ির মালিক নন, হাতীখোদার মালিকও তিনি। মালিক অর্থাৎ ইজারাদার। নাম, রায়

সাহেব অন্নদানাথ রায়। নীলপাড়া স্মার্টচুমারির গেম ওয়ার্ডেন ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। ইনি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় শিকারী। পঁচিশটি রয়্যাল বেঙ্গল ইনি নিজের গুলি ক'রে মেরেছেন এবং অন্তত পাঁচ-শ শিকার পার্টির নেতৃত্ব করেছেন। পাকা শিকারী হিসাবে ইউরোপীয়ান শিকারীর কাছে বিশেষ মাননীয়। বাঘের মতোই তেজী লোক এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ইনি তাঁর গাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন খুল্লন কোয়ারায়। ঐখান থেকে খুল্লন কোরা পাঁচ মাইল। গভীর অরণ্য-পথ। পথ সব জায়গাতেই কাঁচা এবং খাড়া-উঁচু এবং নিচু। গাড়ির পথ সে নয়।

আমরা খেদার ধারে গিয়ে নামলাম। চার দিকে জঙ্গল, পায়ের নিচে বালি আর ভাঙা পাথর। দু-এক পা এসিয়ে যেতেই অন্নদা বাবু সেই বালির উপর বাঘের সদ্যজাকা পদ-চিহ্নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা তো দেখে অবাক। এক একটা ষাবার দাগ ছোটখাটো একটা হাতীর পাথের দাগের মতো। রাঙে বড় বাঘ এ পথে গেছে, পায়ের চিহ্ন তখনও টাটকা আছে। আমাদের চোখে এ চিহ্ন ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু শিকারীদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ।

হাতীর দলকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে তাড়াতে যে ফাঁদের পথে নিয়ে আসা হয় সে পথের ছ'ধার জঙ্গল থেকে কাটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হাতী পাছে এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে, তাই সেই বেড়াকে ডালপালা এবং পাতা দিয়ে এমন ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে ওটা যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ। এই পথে হাতীর দল এসে যেখানটার আটকা পড়ে তথেকে বলে গড়। এই গড় এবং গড়ে আসবার পথ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে নাম হচ্ছে খেদা। আমরা কানুন পাতা দিয়ে 'কাম্বুজাঙ্গ'-করা এই দীর্ঘ পথের পাশ দিয়ে দিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। পথের পাশে দু-একটা গাছে অনেক উপরের দিকে মাঠা বাঁধা রয়েছে দেখলাম। হাতী আসবার সময় ঐখানে পাহারা বসে-ছিল। বহুদূর থেকে তাড়া খেয়ে হাতীর দল ফাঁদে ঢুকতে বাধ্য হয়। চার দিকে বহু লোক হুন্না করে, বোমার আওয়াজ করে এবং হাতীরা ভয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? এমন ভাবে তাড়ানো হয় (beat করা বলে) যাতে খেদাপথে না এসে আর তাদের উপায় থাকে না। এই পথের শেষে গড়। গড়ের মধ্যে ঢোকান সঙ্গ সঙ্গ গোট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এই গেটের কাছে যে সব লোক থাকে তাদের সম্পূর্ণ আয়োগোপন ক'রে থাকতে হয়।

আমরা গড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখি চার দিকে বেশ একটা চাক্ষু্য জেগে উঠেছে। তখনই অনেক লোক এসেছে দেখতে।

পথে অন্নদা বাবুর সঙ্গে দর্শকদের এই ভিড় সম্পর্কেই আলাপ হয়েছিল। তিনি বলছিলেন এত লোক আসে যে

তাদের জায়গা করা শক্ত হয় এবং তাতে কাজেরও অনেক সময় অনুবিধা হয়। কিন্তু বৎসরান্তে বুনো হাতী ধরার দৃশ্য এ অঞ্চলের লোকদের জীবনে হয় তো একমাত্র উত্তেজনা এবং আমন্দ। তাই দূর দূরান্তর থেকে কাজ ফেলেও বহু স্ত্রী-পুরুষ খেদার এসে ভিড় করে। আমরা যখন গেলাম তখন বেলা এগারোটা। সে সময় লোকের ভীড় বেশি হয় নি—হয়েছিল ঘণ্টা দুই পর থেকে।

গড়ে আবদ্ধ হাতীদের দেখবার জেগে মোটামুটি ভাল বন্দো-বস্তাই করা হয়েছে দেখলাম। গেটের দুই পাশে দুটি মাচা ও বিপরীত দিকে আর একটি মাচা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক-একটা মাচায় বার-তের জন লোক কষ্ট করে দাঁড়াতে পারে। আমরা গেটের ডান ধারের মাচায় গিয়ে উঠলাম। সরু সরু গাছ কেটে মাচায় ওঠার জেগে মৈ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের সিঁড়িও আছে। আমরা মাচায় উঠে দেখলাম বাঁ দিকের মাচায় অশোক ও সুরাংগ দাঁড়িয়ে। গড়ের ব্যাপ পঁচিশ-ত্রিশ হাত। চার দিক সরু সরু গাছ কেটে তাই দিয়ে গোল ক'রে ঘেরা। গাছের বাকলের আঁশ সব জায়গাতেই বাঁধার কাজে দড়ির মতো ক'রে ব্যবহার করা হয়েছে। মাচার বাঁধনগুলো টেনে দেখলাম, তা পাটের চেয়ে ঢের বেশি শক্ত।

মাচায় উঠে দেখলাম পাঁচটি বন্দী হাতীর মূর্তি। ওদের মধ্যে তিনটি বড় ও দুটি ছোট। বাচ্চা ছোট হাতী ছোটোর একটি দাঁতওয়ালা। বড় হাতীদের একটিকে বুদ্ধা বলে মনে হ'ল। গড়ের মধ্যে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্দী অবস্থার ওদের মোটেই ভাল লাগছে না। এক এক সময় মরিয়া হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে বেড়ার উপর—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে যাবে ব'লে। কিন্তু তখুনি বাইরের পাহারাদারের শড়কির খোঁচা খেয়ে ফিরে আসছে। এই ব্যবস্থা না থাকলে ওদের পক্ষে সেই কয়েদখানা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয় বলেই মনে হ'ল এবং এ রকম সম্ভাবনা আছে বলেই চার দিকে এবং উপরে মাচার উপর সতর্ক প্রহরী খাড়া আছে। শেষ পর্যন্ত বন্দুকের ব্যবহারও হতে পারে ব'লে সে ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে।

আমি যে মাচার উপর দাঁড়িয়ে ওদের ছবি নিচ্ছিলাম সেই মাচা গড়ের গেট এবং বেড়ার সঙ্গে সংলগ্ন। হাতীর আক্রমণে তা বার বার কঁপে উঠছিল। একবার একটা হাতী শুড়-তুলে হাঁ করে ছুটে এসে আমার পায়ের নীচেই মারল—খুব জোর এক শব্দ। সে শব্দায় একেবারে গড়ের দ্বিতরেই আমি পড়ে যেতাম, কারণ আমার দুখানা হাতই ছিল ক্যামেরায় আবদ্ধ। সুনীল বাবু আমাকে ধরে ফেললেন। চেয়ে দেখি আমার পাশে গেটের উপর থেকে একটি ছেলে শড়কির খোঁচা মেরে হাতীকে হটিয়ে দিল। তখন সে গিয়ে চুপচাপ অগ্নি হাতীদের সঙ্গে অত্যন্ত শাস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বেশিকণের জেগে নয়। কিছুক্ষণ পরেই ঐ হাতীটি নিজেদের

দলের বাচ্চা দাঁতওয়ালা হাতীটির উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওরা দল বেঁধে গড়ের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পিঠে ওদের রোদ লাগছিল, ওরা জ্বলে থাকে, এতক্ষণ ধরে বোধ হয় কখনও রোদে থাকে নি, তাই ওদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোশলটিও বেশ অদ্ভুত লাগল।

মাঝে মাঝে সমুখের একখানা পা দিয়ে মাটি হুঁড়ে হুঁড়ে ক'রে সেই মাটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোটোখাকেও পিঠের সেই মাটির প্রলেপ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে এক দল সাহেব মেম এসে উঠল বাঁয়ের দিকের মাচায়। ওদের হুঁজ্বনের হাতে ক্যামেরা।

বড় হাতীটি অতঃপর পাঁচ-সাত মিনিট পর পরই আক্রমণ চালাতে লাগল। এরা জ্বলে যখন থেকে তাড়া পাচ্ছে তখন থেকে অবস্থ ভাল ক'রে বেতে পারে নি। যে পথে এসে এরা গড়ের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হয় সেই পথে কলাগাছ কেটে কেটে পর পর ফেলে রাখা হয়, যাতে অন্ততঃ সেই পথে আসার একটা লোভ জাগে। গড়ে আটকা পড়বার পর থেকে আর

বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না, কারণ এদের গলায় ফাঁস পরানোর কাজটি এমনই কষ্টসাধ্য যে তার আগে এরা অনেকখানি দুর্বল হয়ে না পড়লে চলে না। বজ্র হাতী, বন্দী হয়ে একেবারে ঘাবড়ে গেছে। এরা রাগে ক্ষোভে খিদের অস্থির হয়ে এক এক সময় মেঘের মতো গজ্জন করছে, কখনও বা কান্নার মতো শব্দ করছে।

সুনলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফাঁস পরানোর কাজ শুরু হবে। আমি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে গড়ের চার পাশের অবস্থা ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম। বাইরের নানা গ্রাম থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে ঘুরে কয়েকটা বাইরের ছবি নিলাম। রাঙে গড়ের পাশে আগুন জালানো হয়েছিল ছুঁতিন জায়গায়। মোটা মোটা কাঠের আগুন, তখনও নেবে নি, তারই পাশে তিন ফুট দাড়ে তিন ফুট উঁচু চালা বাঁধা। তার মধ্যে বসে লোকেরা গড় পাহারা দিয়েছে সমস্ত রাত ধরে। আগুন জালানোর উদ্দেশ্য শীতের জ্বতেও বটে, রাঙে ঐ রকম অরক্ষিত জায়গায় বাঘ বা অজ্ঞ হিংস্র জন্তকে ঘুরে রাখবার জ্বতেও বটে। (ক্রমশঃ)

গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য . .

বিধ্বংসের অসীম মায়ার আশ্রয় উদয়ন

সুন্দর করে জীবের বিবর্তন।

মহা আকাশের গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ

আনে অমৃতের নব নব সন্ধান।

অনন্ত ধরা জ্ঞান-যজ্ঞের সুনায় চেতনা গান,

জনমে জনমে প্রাণ-পুরুষের বিচিত্র কোতুক

চলে চিরদিন; ইতিহাস তার দিয়ে যায় বিবরণ।

• ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্যকায়ার জড়িত হুঃখ-সুখ •

পশুর ভিতরে জন্ম লভিছে নর,

সাধনা তাহার দেবজনমের রচিছে উৎসমুখ

সুদূরপিম্বাসী মানব নিরন্তর।

মাহুষের সাথে মিশিছে মাহুষ হৃদয়ের বিনিময়ে

প্রেমের তীর্থে আলোকের দীপ লয়ে,

হাজার হাজার বছর তবুও পরিচয়-সংশয়ে

• অপূর্ণতার অপ্সিছে ব্যাধার মালা।

আরম্ভ্য মন ক্ষণে ক্ষণে পায় মরুর দহনজালা।

সে মিলনে নব মানসলোকের এষণার অভিসার,

ভাবের আবেগে ভাষার প্রবাহ দিকে দিকে যায় বয়ে;

জীবন-স্বপ্ন বিষয়ভরা ক্ষণিক রশ্মি তার

আস-যাওয়া পথে রচিছে ইজ্জতাল;

• কখনো হাসিতে কখনো বিষাদে মন দোলে অনিবার,

• তাহারি চিত্র আঁকিছে চক্রবাল।

• স্বার্থ যেথায় সঙ্কটময় সঙ্কীর্ণতা সনে

আনে সংঘাত বীর্ঘের প্রলোভনে;

মাহুষেরে সেথা পশুর অধম দেখা যায় আচরণে,

হীন অপরাধ রক্ত নিনাদ করে।

টাদের চিতায় ধুমকেতুদের কুমীর-অশ্রু বরে।

অগ্রগতির পটভূমিকায় উজ্জ্বল মত আশা

উদ্বিগ্নে নামে হিংসা রাতের যত্ন আবেষ্টনে।

কখন কি ভাবে নিয়তিচক্রে ঘুরিছে ভাগ্যপাশ

নৈতিক পাপে আনন্দ উপভোগে,

সেই কথা বিধি-বন্ধননীতি বিরচিত ভালবাসা •

স্বরে চঞ্চল নিখিল-চিত্তলোকে।

• শ্রীমতী কোকোতে

শ্রীজীবনময় রায়

পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা রোগা লম্বা লোক উঠোনটার এক কোণে দাঁড়িয়ে জমাগত একটা কুকুরকে ডাকছে—কল্লনার। খুব আদর ক'রে মোলায়েম স্বরে ডাকছে “আয়, আয়রে কোকোতে, আয়, আয় রে সুন্দরী আমার, আয়।” আর জন্তুজানোয়ার ডাকতে হ'লে, যেমন ক'রে লোকে উরুত চাপড়ায়, তেমনি চাপড় মারছে উরুতে।

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলুম, “ও লোকটা কি?” ডাক্তার বললে, ও, ও এমন কিছু শৌনবার মত ব্যাপার নয়। ও একজন কোচোয়ান, নাম জ্যাকোয়া। নিজের কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে যেয়ে পাগল হয়ে গেছে।”

আমি ধ'রে পড়লুম, “গল্পটা বলুন আমার। দেখুন, অতি সাদাসিধে সামান্য ব্যাপারও অনেক সময় ভাবি করণ হয়—আমাদের মনে গিয়ে লাগে।”

এই হ'ল লোকটার বিপত্তির কাহিনী—ওর এক সহিস বহুর কাছ থেকে গল্পটা ডাক্তারের শোন।

পারির শহরতলীতে এক ধনী ভদ্রলোক থাকতেন সপরিবারে। সীন নদীর ধারে একটা বড় বাগানের মধ্যে ছিল তাঁর প্রাসাদ। তাঁদের কোচোয়ান ছিল ঐ জ্যাকোয়া। পাড়ারগেয়ে মাষম; একটু বোকালোকা, ভায়াবী, সাদাসিধে ধরণের; তাই ওকে ঠিকানো ছিল ভাবি সোজা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ী ফিরছে, একটা কুকুর ওর পেছা নিলে। প্রথমটা ও খেয়ালই করে নি, তার পর কুকুরটাকে একেবারে নাছোড়বান্দা দেখে ও ফিরে দাঁড়াল। কুকুরটা পাড়ার কুকুর কি না, একবার দেখে নিলে। না, কশিন্ কালোও ওকে দেখে নি, একটা ভীষণ হাড়গিলে ঝেয়ে-কুকুর। ভাবটা ভাবি কাতর আর হ্যাংলা গোছ; পায়ের মধ্যে ল্যাজটি গুটিয়ে পেছন পেছন টুকটুক ক'রে চলেছে—চলতে শুরু করলে কি ধামলে ওর কান দুটো চ্যাটালো হয়ে ওর মাথায় এসে পড়ছে।

“হাঃ, হাঃ। বেরো, দূর হ। হিস, হিস।” বলে ও সেই ককালটাকে খেদিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কুকুরটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তার পর বদে অপেক্ষা করতে লাগল। কোচোয়ান যেই আবার চলতে শুরু করলে, সেও ওর পেছা নিলে।

কোচোয়ান এবার যেন পাখর কুড়োচ্ছে এমনি একটা জঙ্গী করলে। জানোয়ারটা আরো একটু বেশী পেছিয়ে গেল দৌড়ে, কিন্তু যেই লোকটা পিছন-ফিরল অমনি আবার এসে হাজির।

তার পর কোচোয়ান জ্যাকোয়ার ভাবি মায়া হ'ল, অবোলা

জন্তুটার উপর। ডাকলে তাকে। ভয়ে ভয়ে কুকুরটা এসে হাজির হ'ল। লোকটা তখন কুকুরটার দশা দেখে আদর ক'রে ওর পাঁজরের জিলজিলে হাড়গুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, বললে, “আয়; আমার কাছে আয়।” তক্ষুণি সে ল্যাজ নাড়তে লাগল—বুঝল যে ওকে পুষি নেওয়া হ'ল, আর তাই বুঝে এবার সে তার নতুন মনিবের আগে আগেই দৌড়ে চলল।

লোকটা ওর জন্তে আস্তাবলের খড়ের উপর শোবার জায়গা ক'রে দিলে আর খানিকটে রুটি আনতে গেল রান্নাঘরে। পেট ঠেসে খেয়েদেয়ে কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন কোচোয়ানের মনিবরা সব কথা শুনে, আর আপত্তি করলে না কুকুরটাকে থাকতে দিতে।

কুকুরটা ভাল জাতের কুকুর—ভাবি ভাওটা, বিদ্যাসী, চালাক আর ঠাণ্ড।

মোট কথা জ্যাকোয়া কোকোতেকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাগত। বলত “ওটা মানুষের মত, শুধু কথা বলতে পারে না।”

খুব চমৎকার একটা লাল চামড়ার কলার তৈরি করিয়ে তার উপর তামার ফলকে বোদাই ক'রে লিখে দিলে “শ্রীমতী কোকোতে। মালিক—কোচোয়ান জ্যাকোয়া।”

বছরে চারবার ক'রে, পালে পালে যত রকম জাতের কুকুর কল্লনা করা যায়, সব রকমের বাচ্চা দিত কুকুরটা। ওরই মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে, শ্রীমতীর জন্তে রেখে—বাকীগুলোকে, জ্যাকোয়া নদীতে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসত। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই রাঁধুনী, মালী, চাকর, সবাই এসে নালিশ শুরু করলে। বলে, যে চুলোর নীচে, কল্লনার বাজে, মাঝ বরফের তোরঙ্গে পর্যন্ত—দেখো—কুকুর। আর যা পাকে তাই চুরি করবে।

শেষে নালিশে নালিশে হস্তরান হয়ে মালিক হকুম দিলেন—কোকোতেকে তাড়িয়ে দিতে। হতাশ হয়ে লোকটা ওটাকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। কেউ নিতে চায় না।

তখন ওকে একেবারে দূর করে দেবে ঠিক করে, একটা রাখালের হাতে দিয়ে, জয়েন ভিল-লে-পঁতের কাছে, প্যারিস একেবারে বাইরে ওকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বললে।

সেই দিনই কোকোতে ফিরে এল।

নাঃ। কিছু একটা করতেই হয়। একটা ট্রেন কণ্ডাক্টরকে পাঁচ ফাঁ দিয়ে ওটাকে হাভারে ছেড়ে দিয়ে আসতে দিলে।

তিন দিন পরে আবার ওটা ফিরে এল আস্তাবলে—বেশ রোগা, পায়ে খা আর খুব হস্তরান হয়ে।

তখন মালিকের ওর উপর আবার একটু দয়া হ'ল, ওকে ওকে থাকতে দিলেন। কিন্তু ঠিক আগের মতই, ওর টানে, অল্প সব কুকুর আবার আসতে লাগল।

একদিন বড় একটা ভোজ চলছে; আর ওদেয়েই মধ্যে একটা, রাঁধুণীর নাকের ডগার থেকে একেবারে, পূর দিয়ে ঠালা একটা আন্ত 'টার্কি'রূপে ক'রে তুলে নিয়ে দে ছুট—তাকে বাধা দিতেও শ্রীমতীর ভরসা হুজোল না।

এবার, মনিব একেবারে ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে ক্র্যাঙ্কোয়াকে বললেন—“কিন্তু হে, কাল সকালের মধ্যেই ঐ জানোয়ারটাকে যদি জুলে না ফেলে দিয়ে এসো,” তা হলে তোমায় চাকরী থেকে বরখাস্ত করব। বুঝেছ ?

লোকটা একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। চাকরীই ছাড়বে ঠিক ক'রে ফেললে; আর বাস্তব জগতে লেগে গেল। তার পর ভেবে চিন্তে দেখলে যে যতক্ষণ ঐ জানোয়ারটা ওর কাছে থাকবে ততক্ষণ ওকে কেউ আর চাকরি দেবে না। নিজের এমন ভাল চাকরীটা! ভাবলে, এত মাইনে, এমন খাওয়া দাওয়া এখানে চিন্তা ক'রে দেখলে যে একটা কুকুর এ সবের তুলনায় কিছুই না। শেষে ভেবে ঠিক করলে, যে ভোর হলে কোকোতেকে ফেলেই দিয়ে আসবে।

ভাল ঘুম হ'ল না রাতে। ভোরে উঠে একটা শক্ত দড়ি নিয়ে কুকুরটাকে বাঁধতে চলল। শ্রীমতী ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা বাঁড়া দিয়ে দেহটাকে টান ক'রে নিলে, তার পর প্রভুকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল।

এর পর ওর মনটা ভেঙে পড়ল—আর ওকে আদর করে, কান টেনে, চুমু খেয়ে, পেয়ারের নাম ধ'রে ধ'রে ডেকে একসা করতে লাগল।

এমন সময় কাছেই একটা ঘড়িতে বাজল ছ'টা। আর ত তার দোমনা করার সময় নেই। দোর বুলে ডাক দিলে, “আয়।” বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে কেনে খুশী হ'য়ে সে ল্যাক্স নাড়তে লাগল।

ওরা নদীর ধারে এল, আর একটা জায়গা বেছে নিলে যেখানকার জলটা গভীর ব'লে মনে হ'ল ওর। তার পর চামড়ার কলারটার উপর দড়িটা জড়িয়ে বেঁধে গেরো দিলে আর দড়ির অষ্ট মুখটায় বেঁধে দিলে একটা ভারি পাথর। যেন মাহুশের কণ্ঠ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনি ভাবে ওকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল। বুকের কাছে চেপে ধ'রে দোল দিতে দিতে আদর করতে লাগল—“কোকোতে, আমার আদরের ঘনরে; ওরে মিঠু জুদে কোকোতে,” আর শ্রীমতী আত্মসম্মানে খুশীতে গলে গিয়ে ওর ওর করে শব্দ করতে লাগল।

দশ বার ওটাকে জলে ছুড়ে ফেলে দিতে গেল, দশ বারই বুকেটা ভেঙে যেতে চাইল তার।

কিন্তু শেষে হঠাৎ এক বার মনটা বেঁধে নিয়ে সে শ্রীমতীকে যতটা পারে নিজের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। প্রথমটা, ওকে চান করবার সময় যেমন করত তেমনি ক'রে, সীতল্লাতে চেঁচী করলে; কিন্তু ওর মাথাটাকে পাথরের ভারে সীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, আর বেচারী যেন ঠিক

মাহুশের মত, পাগলের দৃষ্টি হেনে, চাইলে ওর প্রভুর মুখের দিকে, ডুববার সময় মাহুশে যেমন ক'রে তাকায়; সেই রকম করেই জলের মধ্যে প্রাণপণে হাঁপাই ছুড়তে লাগল। একটু পরেই মাথার দিকটা গেল ডুবে, আর তার পেছনের পা হুঁপানা উন্মত্ত ভাবে জলের বাইরে দাপাদাপি করতে লাগল। তার পর তাও ডুবে গেল।

তার পর, পাঁচ মিনিট ধরে জলের উপর বুদবুদের বুড়বুড়ি কাটিতে লাগল—নদীর জল যেন কুটছে টগবগ ক'রে। ক্র্যাঙ্কোয়ার চোখমুখ বসে গেছে—চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে যে কোকোতে কাদায় পড়ে ছটকট করছে—আর চাষীদের যেমন সাধা অবুধ মন হয়—ও ক্রমাগতই নিজে নিজে বলছে—আহা, বেচারী অবোলা জন্তু, ও কি ভাবছে—আমাকে ? এঁা ?

পাগল পাগল মত হয়ে গেল; এক মাস সে শয়্যাগত হয়ে রইল—আর ঐ কুকুরটাকে স্বপ্ন দেখত। সে এসে ওর হাত চাটছে বুঝতে পারত; ডাকছে শুনে পেত। ডাকার ডাকার দরকার হয়েছিল। শেষে ও সেরে উঠলে, ওর মনিব ক্রয়ের কাছে বীসম্মার এর জমিদারীতে, জুনের শেষ দিকে ওকে নিয়ে গেল।

সেখানেও সে ঐ সীন নদীর ধারেই। নদীতে স্নান স্নান করলে। ভোরে রোজ সে সহস্রের সঙ্গে নদীতে যায় আর হুঁজনে সীতার দিয়ে নদী পার হয়।

এক দিন এমনি ক'রে সীতার খেলছে হুঁজনে, এমন সময় ক্র্যাঙ্কোয়া টেঁচিয়ে ন'লে উঠল, দেখে দেখে, ওটা কি আসছে, ঐটের একটা চপ তোমায় আজ খাওয়াব। একটা মড়া ফুলে ভেসে আসছে—ঠ্যাংগুলো আকাশে তোলা।

ঠাটা করতে করতেই ক্র্যাঙ্কোয়া ওটার কাছে সীতায় দিয়ে গেল : উঃ! মোটেই টাটকা নয়। কি শিকারই জুটলো, খুড়ো। নিত্যন্ত ক্ষীণ ও নয়।” জন্তুটার চার দিকে ঘুরে একটু দূরে দূরে ও সীতার দিচ্ছে—পচে উঠেছে ওটা—হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। এই বার এত কাছে এল যে ছুঁতে পারে। তার পর কলারটার দিকে একবৃষ্টি চেয়ে হঠাৎ হাতখানা বাড়িয়ে গলাটা ধরল, মড়াটা ঘুরিয়ে নিজের কাছে টেনে আনলে আর সেই রং-জলা চামড়াটার উপর তখনো সীটা, সবুজ হয়ে যাওয়া তাহার কলকটার উপরের লেখাটা পড়তে লাগল “শ্রীমতী কোকোতে। মালিক—কোচোয়ান ক্র্যাঙ্কোয়া।”

মরা কুকুরটা মনিবকে খুঁজে খুঁজে এক শ' মাইলের উপর এসে মনিবকে পেয়েছে।

বিকট একটা চীৎকার ক'রে উঠে সে ডাকার দিকে সীতল্লাতে লাগল আর চীৎকার করতে থাকল। আর ডাক ডাক মাদ্রাই, পাগলের মত ছুটে পালিয়ে গেল—গ্রামের মধ্যে দিয়ে—সম্পূর্ণ বিবজ্ঞা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

* মোপাসাঁর বিখ্যাত হাট গল্প “মাদামোয়াজল কোকোতে”র অনুবাদ

সত্যেন্দ্রনাথের 'সন্ধিক্ষণ'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই (৭) ফেব্রুয়ারি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
ও ২৫ জুন ১৯২২ তারিখে ৪১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।
এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি
রাখিয়া গিয়াছেন।

শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরেই
তাঁহার কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। বার বৎসর বয়সে
(ইং ১৮৯৩) লিখিত তাঁহার কোন কোন রচনা 'বেণু ও
বীণা'র স্থান লাভ করিয়াছে। এফ. এ. পড়িবার সময়,
১৯০০ সনে, তাঁহার প্রথম পুস্তক 'দ্বিতা' মুদ্রিত হয়;
ইহা পরবর্তী কালে তাঁহার 'হোমশিখা'র অন্তর্ভুক্ত
হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁহার দ্বিতীয়
পুস্তক 'সন্ধিক্ষণ'। ইহা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তিকা-
খানি বর্তমানে দুপ্রাপ্য, অনেকে ইহার অস্তিত্বের কথাও
অবগত নহেন। ডক্টর স্কুমার সেন ইহা দেখিয়াছেন
বটে, কিন্তু পুস্তিকায় প্রকাশকাল না থাকায় "১৯০০?"
সনে মুদ্রিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।* বলা বাহুল্য,
এই অনুমান ঠিক নহে। 'সন্ধিক্ষণ' পাঠ করিলে কাহারও
বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ইহা ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ-
আন্দোলন উপলক্ষে লিখিত। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত
মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা অনুসারেও ইহার প্রকাশকাল—১৮
সেপ্টেম্বর ১৯০৫। আমরা 'সন্ধিক্ষণ' পুনর্মুদ্রিত করিলাম।
যদি কখন সত্যেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়,
এই দুপ্রাপ্য পুস্তিকাখানিও তাহাতে সন্নিবিষ্ট করা
সহজসাধ্য হইবে।—

এত দিনে। এত দিনে বুঝেছে বাঙ্গালি

দেহে তার আজো আছে প্রাণ।

জগতের পূজ্য ধারা তাঁহাদের মাঝে

আশা হয় পাব মোরা স্থান।

যে খুসী টিটকারী দিক

অন্তরে বুঝেছে ঠিক—

এ কেবল নহেক হুজুগ;

সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গ, এল নবযুগ।

পথে ঘাটে দেখ চেয়ে অন্তরে বাহিরে

দেশহিতে বিলাস বর্জন,

বিরাত সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া

লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।

যেথা যে বাঙ্গালি আছে,

প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,

শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালি,

মনে হয় আর মোরা রব না কাঙ্গালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের

সবে তুলে লয়েছে মাধার;

এবার পরীক্ষা হ'বে প্রতিজ্ঞার বল,

ভগবান হউন সহায়।

তুলেছিহু মহুয়হু

বিলাস ব্যসনে মত্ত,

তুলেছিহু পৌরুষের স্বাদ,—

আজি পুন জাগে সেই সিংহের আক্লাদ।

এ বড় সফট কাল—পণের রক্ষণ,—

আমাদের ভ্রম পদে পদে,

সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্বরক্ষণ,

নাহি ভুবি কলঙ্কের হ্রদে।

শ্রি স্বদেশের দুখ—

মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ—

নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—

“বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।”

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশ

আমাদের সাজিবে সুন্দর,

‘খাটা দেহে খাটো ধৃতি’—লজ্জা কিবা তার?

শ্রমের সৌন্দর্য্য মহত্তর।

শক্তিমান দেহমন,

ভীষ্মের মতন পণ,

তার চেয়ে কি আছে শোভন?

জুড়ার পরাগ মন; কি ছার নয়ন?

ভগবান! হীনবলে তুমিই দিয়েছ

এ অপূর্ণ নূতন জীবন।

লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছে;

শক্তি দাও রাখিব সে পণ।

নব শোভা, বঙ্গভূমে,

তোমার নিদেশে মেমে,

সর্বপ্রাণ করেছে সজীব;

হে বরদ! শুভঙ্কর! হে সুন্দর! শিব

ভূমি দাও বুঝাইয়া নিদ্রুকে, কুটিলে,—
 'বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব,
 কার' চেয়ে ভুচ্ছ নম্র বাঙ্গালির দাবী
 বুঝা সে করে না কলরব;
 মঙ্গল বিধান যত,
 স্বদেশের সেবা ব্রত,
 আজ সে মাধায় লবৈ তুলে;
 মৃঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে।'

'উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
 মহুয়াত্ব-মহত্ত্বের পথ,—
 চিরঘন্টা সে পথে কটক দিতে পারে,—
 এমন জন্মে না দাসত্বত;
 চুক্তির বেতন পাও,—
 সর্বমত কাজ দাও;
 যে প্রভু অধিক করে আশ
 ব'ল' তারে—কর্মচারী নহে ক্রান্তদাস।'

অর্থের সম্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর
 মহুয়াত্ব—দেশহিত ব্রত;
 স্বার্থ সাধে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
 স্বদেশেরি পায়ে হও নত।
 এ কথা না তুলে রও—
 'ভূমি শুধু ভূমি নও—
 দেশের মাঝারে একজন;
 দেশের—দেশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমন' পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
 স্তম্ভিতারে সাহেবের মুখে
 নিজের বুদ্ধির কথা; স্বদেশে বিদেশে
 "পণ পণ্ড" বলে ক্ষীত বুক;
 নিজ মুখে মাখি কালি,
 লভে শূণ্য করতালি,—
 কালি দিয়া দেশের গৌরবে।
 হা বঙ্গ! দিগ্বেছ শুভ ইহাদের' সবে।

শুনি' পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
 সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে।
 কি লজ্জা! এতই ভয় চাকুরির তরে?—
 কি লজ্জাবে দাস্ত বৃত্তি করে?
 বাণিজ্যে বসেন রমা,
 কৃষি প্রায় তারি সমা,
 ছই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
 তবু দ্বিধা-কৃত-মন? জঘন্ট আচার।

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান না কি হায়—
 জান না কি আত্মদ্রোহী ভূমি;
 পুত্র পৌত্র অশ্রাব্যে মরিবে; এখনো
 প্রসারিয়া লও কর্মভূমি।
 কারে কর পরিহাস?
 নিজ জীর লজ্জাবাস—
 তাও নহে আয়ত্ত-অধীন।
 সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীন হীন।

আজি যারা অনাগত—অবিষ্য যাদের
 কি মান তাদের কাছে পাবে?
 কোন্ স্বয় কোন্ বিত্ত (স্বয়ত্তি ব্যতীত);
 তাহাদের তরে রেখে যাবে?
 কোন্ কর্ম, কোন্ নীতি,
 কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
 তাহাদের হবে মূলধন?
 স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জন,
 চমৎকার! দৃষ্ট চমৎকার!
 বিলাস-বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
 অগ্রগামী আজি সবাচার।
 ব'ল' রাজপুতানারে,—
 বেগী বিদজ্জিতে পারে
 বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
 প্রয়োজন হ'লে; সাক্ষী আজিকার পণ।

শিক্ষক শিখান আজ বালকে যুবকে
 হইবীর দেশের সেবক;
 যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
 উর্দ্ধ শিখা উৎসাহ পাবক।
 মহাপ্রাণ, সমুদার,
 কত শ্রাণ্য জমীদার
 লয়েছেন দেশহিত ব্রত;
 মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য ভূমি দরিদ্র বাঙ্গালি,—
 বিসর্জন দিয়েছ সংশয়,
 যেন মল্লবলে ভূমি মুক্তপ্রাণ এবে,
 মুক্তহস্ত কথায় কথায়।
 পরম্পরে এ প্রত্যয়—
 যজ্ঞ আসিবার নয়;
 এ রত্ন দেছেন ভগবান।
 অন্তরে সঞ্চিত করি রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কুল প্লাবি আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার।
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন।
বাদ্য়ালি পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।

কণা কণা স্বর্ণ ছিল যুগ্মিকার মাঝে,
ধূলি পায় ধূলি মাঝে হারা;
আজি কোন অনির্দিষ্ট ভুগভের তাপে
গলে মিলে হ'ল স্বর্ণ ধারা।
হার গড়ি সে কাঞ্চে,
এস সবে, সম্মতনে—
পরাইব দেশের গলায়;
জননী! জনমভূমি! সাজাব তোমায়।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র পরিবার?
অন্তরে প্রবল বায়ু উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখ গো, উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকের কাছে।

পবিত্র কর্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ।
রাজ্যপণে পাশা খেলি, পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ।
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীত্র লও কার্যভার।

এ দিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুকে অন্তরে সে কথা;—
আশা ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়,
শত দিকে পাবে শত ব্যথা;—
শত্রু মিত্র দিবে গালি,
লেপিবের চরিত্রে কালি,—
পক্ষে ফেলি দলিবে ছ'পায়ে;
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছিয়ে।

জাতিত্ব গৌরব যাবে অন্ধুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধ-ফোটা কুল;
ভগবান! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু! মোরা হয়েছি ব্যাকুল।
দুর্বলের বল তুমি।
দীনের শরণভূমি।
আশ্রয় লইছ তব পায়,
লজ্জা নিবারণ সখা! হও হে সহায়।

কে আছে হে ধনবান আন' স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশ আন' শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন নিপুণতা, উচ্ছোগী উচ্চম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে লজ্জা নাই,
জানবীর স্পিনোজাই,—
করিতেন কাচের সংস্কার।
মল্লদণ্ডী তুষ্টি ঋষি আদি-স্বত্রধার।

সুবেশ রাখা-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া হির স্বাধুর মন্তন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মভেদে করি ভর—
কর্মে হও অগ্রসর।
মূর্খে শুধু বলে এ 'ছড়গ';
বঙ্গ-ইতিহাসে আজি এস বর্ণ-সুগ।

মাটি ও সংগঠন

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

পল্লী-সংগঠন, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি অনেক কথা নানা দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু কার্যতঃ পল্লীর কতটুকু উন্নতি আমরা হৃদয়তে পাই? ভারতের পল্লীগুলির দুর্দশা ক্রমেই চরমে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ বছরের আগেকার কথা থাক—বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বেও পল্লীর যে অবস্থা ছিল আজ তা নাই। আগে যে ক্ষমিতে বিধা প্রতি পনর-বিশ মণ ধান হ'ত এখন সেখানে দুই-তিন মণের বেশী ফলে না, যে সব ক্ষেতে তরিতরকারি অল্প উৎপন্ন হ'ত এখন তার এক-তৃতীয়াংশও হয় কিনা সন্দেহ। ফলবান বৃক্ষে আর আগের মত ফল ধরে না। গরুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং পরিচর্য্যার অবহেলায় গ্রামে দুধও মেলে না। নদী, বিল, পুকুরের আগেকার মত জোঁলুস নাই—জল থেকে মাছ যেন উঠাও হয়ে গিয়েছে।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এখনও যদি দেশের লোক মাটির দিকে সত্যিকারের চোখ মেলে না চায় তা হলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের ক্ষেতে ফসল হয় না অথচ জম্যসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ছ ছ করে। মাটির উর্বরতা কমে যাচ্ছে অথচ অপ্রচুর ঋতুশস্যের ভাগীদার হিসাবে জম্মাচ্ছে অগণিত মানব, ফলে মনুষ্যের বিভীষিকা আমাদের ক্রমাগত লেগেই আছে।

আমাদের কিন্তু এমন অবস্থা হবার কথা নয় যে না ধেতে পেয়ে মরতে হবে। জনসংখ্যা যতই বাড়ুক এখনও আমাদের আহাৰ্য্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে দৃষ্টি থাকলে এ সমস্যার সুস্থ সমাধান হতে পারে আমাদের সেইটাই অভাব।

এ অবস্থা থেকে পরিজ্ঞান পেতে হলে 'সংগঠন'র দিকে সকলের দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমাদের সমস্ত সংগঠন-পরিকল্পনার সুক্ক কুরতে হবে মাটির অর্থাৎ কৃষি-পদ্ধতির সংস্কার থেকে। এই সংগঠন-প্রচেষ্টা পরাধীন জাতির গবর্ণ-মেণ্ট দ্বারা কদাচ হবে না। যে দরদী মন উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে পারে আমলাত্মিক গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী-দের সেই দরদেরই অভাব। লক্ষ্য করেছি, গবর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছে কর্মচারীদের মাইনে জোগাতে, কিন্তু যেজন্ম অসংখ্য কর্ম-চারীকে পোষণ করা হয়েছে জনসাধারণের অর্থে, সেই কাজটি অর্থাৎ পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারটিই এক ভিলও অগ্ৰসর হয় নি—বরং দিন দিন অবস্থা ধারাপ হতে চলেছে। পল্লীর লোক অনাহারে মরে, রোগজর্জরিত হয়ে বিনা ওষুধে মরে—পল্লী-উন্নয়ন এই ভাবে চলছে আমাদের দেশে।

যে শুধু থাকলে প্রকৃত 'পাবলিক সার্ভিস' (জনসাধারণের সেবক) হওয়া যায়, কোনও কাজেই নিয়োগ-পর্কের আগে

সেই গুণের যাচাই করা হয় না। সুতরাং এদের দিয়ে কাজের চেয়ে অকাজ হয় বেশী। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে যুক্তোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য কি ভাবে সাধারণের অর্থ খরচ করার ব্যবস্থা হয়েছে—সেই অত্যুত পরি-কল্পনা কিছু দিন আগে গবর্ণমেণ্ট তরফের বক্তৃতা থেকে জানতে পেরে আমরা একেবারে নিশ্চিত এবং কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি।

সুতরাং সরকারী পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে দেশবাসীর কোনও লাভ নাই। যা-কিছু করবার এদেশের দরদী লোক-দেরই করতে হবে। কিন্তু হুঃখের বিষয় চল্লিশ কোটি ভারত-বাসীর মধ্যে সত্যিকারের দরদ দিয়ে কাজ করবার লোকের নিদারুণ অভাব আছে বলেই মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্যের পরিকল্পনা ভারতবর্ষ ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ এখনও পেল না। রাজনীতির কচকচি নিয়েই বেশীর ভাগ কর্মীরা ব্যস্ত—কারণ তাতে টাইকা উত্তেজনা আছে। কিন্তু সংগঠন ব্যাপার নিয়ে দেশের কাজে নামতে হলে যে ধৈর্য্য, যে মহাপ্রাণতা, যে দরদ, যে অধ্যবসায়ের দরকার—তা আমাদের ক'জনের আছে? অথচ এই দুর্দিনে এমনি লোকের দরকার আমাদের শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ।

একটি মাত্র দরদী লোকও যে দেশের কি আশ্চর্য্য উন্নতি করতে পারে—তাঁই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দৃষ্টান্ত অবশ্য বিদেশের—কিন্তু সেই দেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার হৃদয় মিল আছে।

প্রায় বছর দুই আগে ওয়াশিংটন শহরে পৃথিবীর নানা দেশের পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হন। তাঁদের ঠিক্কা ছিল কি ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র হুঃখ, অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে উপায় ঠিক করা। ডি. স্পেন্সার হ্যাচ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন—কি করে তিনি একক যেকোনো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কাজ করে সে দেশের কৃষি-ব্যবহার উন্নতি সাধন করেছেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ত্রী যুক্তি করে তাদের পরবর্ত্তা থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলের পথ নির্দেশ করেছেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে একজন প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার তৈরি বক্তৃতা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল হ্যাচের বক্তৃতা শুনে। এবার আমার স্থির ধারণা হ'ল যে হ্যাচ যে ভাবে কাজ করেছেন—অজ্ঞ পল্লীবাসীর মঙ্গল কামনা করলে আমাদের তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। তাঁর কর্মক্ষেত্রের মত কেন্দ্রই আমাদের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান—যেখানে হাতে-কলমে লোকে কাজ শিখছে এবং মাটির উন্নতির জন্য যেখানে নেতা তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে।

স্পেনসার হ্যাচ একজন নামজাদা উদ্ভয়ন-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। তিনি কৃষ্টি বহুরের ওপর দরিদ্র পল্লীবাসীদের উন্নতির জন্ত কাজ করেছেন, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং তাতে কৃতকার্য হয়েছেন। বছর পাঁচেক আগে তিনি কিছু টাকা ধার করে মেক্সিকো শহরের পক্ষাট মাইল দূরে পাহাড়ের পাশে এক উপত্যকাকৃত্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করলেন। এই উপত্যকা থেকে পাহাড়ী রাস্তা চলে গিয়েছে এগারোটি আদিম লোকদের অধ্যুষিত পল্লীর দিকে—যেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা বার হাজার এবং যারা সভ্যতার আলো পায়নি। এমনি স্থানে হ্যাচ অসম্ভব অল্প খরচায় উন্নত ধরণের শস্ত ও ফল উৎপাদন এবং পশু পালনের ব্যবস্থা করেছেন, যা দেখে কাজ শুরু করলে সমগ্র মেক্সিকোর উপকার হতে পারে। প্রত্যেকটি ঘর—হাঁস মুরগীর ছোট চালা থেকে সপরিবারে বাসের উপযোগী গৃহ পর্যন্ত—এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে কিভাবে সহজপ্রাণী উপকরণ ব্যবহার করে ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করা যায় এবং দরিদ্রতম ব্যক্তিও সে উপকরণগুলি এক রকম নিখরচায় সংগ্রহ করে সুন্দর গৃহ নির্মাণ করতে পারে।

ক্ষুদ্র আদর্শ কার্য তৈরি করে হ্যাচ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন যে তাঁর রেড ইন্ডিয়ান প্রতিবাসীরা তাঁর কাজ দেখে আকৃষ্ট হয় কিনা। তিনি মুখে তাদের কিছুই বললেন না। সমস্ত দেখে শুনে তারা ইজ্ঞাসু হয়ে তাঁর কাছে আসে কিনা তা তিনি দেখতে চাইলেন। তাঁর কাজ দেখে কি ওদের বিস্ময় উদ্বেক হচ্ছে? এ সবকিছু তিনি কিন্তু তাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। ওরা কি চায় তার শস্তের মত ফলন? তাঁর প্রতিবেশীরাও কি তাঁরই মত শাকসব্জি, ফল ভালবাসে? তারা কি চায় তাঁর মুরগীর মত মুরগী যা তিন চার গুণ বেশী ডিম দেয়? এমন শূকর যারা একই পরিমাণ খাদ্য খেয়েও চর্ষিতে ভরপুর হয়ে ওঠে? ছাগল যা তাদের শিশুদের অপরিখ্যাত দুধ জোগাবে? সুন্দর আলোকোজ্জ্বল গৃহ বাস করার জন্ত? পরিশ্রুত জলের অবিরাম প্রবাহ?

হ্যাচ আমাদের বলেছেন, মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানদের ব্যঙ্গচিত্রে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি যে তারা চোখ-পর্যাপ্ত-টাকা-টুপি পরা মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে ঝিমুচ্ছে—সেটা কিন্তু তাদের সত্যকারের চিত্র নয়। তারা সত্যই চোখ বুঁজে নেই—তাদের টুপির কিনারায় দুইটি ছোট গর্ত আছে তার মধ্য দিয়ে তারা তোমাকে নিরীক্ষণ করছে। তারা যখন হির নিশ্চিত জানবে যে তুমি তাদের সত্যই ভাল করতে চাও এবং তোমার কার্যটা তাদের শোষণ করার আর একটি ষড়যন্ত্র নয়—তখনই তারা তোমার অহুসরণ করার চেষ্টা করবে। হ্যাচ বলেন—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কৃষকরাই রক্ষণশীল। তারা এমন জিনিসেই আগ্রহ দেখাবে যা তাদের আয়ত্তের মধ্যে।

এক শ' মাইল দূরবর্তী পল্লী থেকেও ইন্ডিয়ানরা দেখতে আসে, কিভাবে ক্ষেতে অপরিখ্যাত শস্ত ফলছে এখানে, কিভাবে ঘরের পর ঘর তৈরি হচ্ছে, কেমন করে হাঁস মুরগীর উন্নতি হচ্ছে। তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে—তারপর ধীরে ধীরে ভাবতে থাকে এখানকার কথা বাড়ী ফিরে গিয়ে। প্রথমে অল্পসংখ্যক ইন্ডিয়ান আসে তাঁর কাছে কিছু বীজ নিতে, কিছু উপদেশ শোনবার জন্ত। তারপর তারা ফিরে গিয়ে যখন হ্যাচের 'ঘাট'তে তাদের নিজের ক্ষেতেও ফলন হয়—তখন দলে দলে সেই গ্রাম থেকে লোক আসতে থাকে পাহাড় ডিকিয়ে, আঁকা-বাঁকা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে।

হ্যাচ আরও বলেন, এদের মত লোককে শিক্ষা দিয়ে কৃত-কার্যতা লাভ করতে হলে সব কথা একবারে প্রকাশ করতে নেই, প্রথমে ততটুকুই এদের দেওয়া উচিত যতটা তারা আয়ত্ত করতে পারবে। হ্যাচ চান কানবার কৌতুহল তাদের মধ্যে জাগুক, এ নিয়ে তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন কিছু নাই। তারপর যা তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে তার ভাষ্য মূল্য দিতে সক্ষম হোক। এমনি করেই স্থায়ী সহযোগিতা গড়ে ওঠে। এখানকার ইন্ডিয়ানদের রীতিমত আত্মসন্মান জ্ঞান আছে। তারা বিনামূল্যে চায় না কিছুই। হ্যাচ মনে করেন—এই সব ইন্ডিয়ানের উপর ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেওয়ার বোঝা চাপিয়েই এদের আরও দরিদ্র করে রেখেছে। এই রকম করণা প্রদর্শন অত্যন্ত ভুল পন্থা এবং এতে মানুষকে আরও পছ করে ফেলে।

হ্যাচ বিনা পরসায় দেন না কিছুই। তেল মাথতে হলে কড়ি ফেলতে হবে এই তাঁর নীতি। তবে সে কড়ি যে আগেই ফেলতে হবে তার কোনও মানে নেই। যদি কোনও ইন্ডিয়ান আসে তাঁর কাছে সেই সেরা শস্তের বীজের জন্ত যাতে দশগুণ বেশী শস্ত ফলে, অথবা কয়েকটা ডিম নিতে যা থেকে আশ্চর্য রকমের বড় বড় মুরগী জন্মায় তখন হ্যাচ প্রয়োজন হলে তার নামে হিসাব খোলেন তাঁর খাতায়। সর্ব্ব থাকে এই—প্রথমে সেই বীজ থেকে যে শস্ত জন্মাবে এবং ডিম থেকে মুরগী হবার পর সেই মুরগীর যে ডিম হবে প্রথমে—তা থেকে ধার নেওয়া শস্ত ও ডিমের মূল্য শোধ দিতে হবে। হ্যাচ মনে করেন এই ভাবে সাহায্য করাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় হয়তো কাজ মন্দ গতিতে চলবে। হয়তো বা এ ব্যবস্থা কঠোর বলেও মনে হতে পারে—কিন্তু এইটাই কৃতকার্যতা লাভের স্থায়ী ব্যবস্থা।

অনুর্বর মাটি দারিদ্র্য সৃষ্টি করে—এটা চলতি কথা। আবার দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি—এই তিনটি অভিন্ন সমস্যা। শুধু মেক্সিকো নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্বন্ধে এই কথা খাটে। হ্যাচ বলেন, এই তিনটি সমস্যার মূল থেকে সমাধান করতে হবে এবং তিনি মূল থেকেই আরম্ভ করেছেন—অর্থাৎ মাটি থেকে

যে মাটি শতাব্দীর পর শতাব্দীর অপব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উদ্ভিদ ও গোবর সার মিশ্রিত করে তিনি এক ঝণ পোড়ো মরা মাটি তৈরি করে নিলেন চাষের উপযোগী করে। এই ধরণের সার দ্রুততম কৃষকও অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে। • তাঁর ক্ষেতে খাট-শস্যের গাছ হ'ল আকারে সাধারণ গাছের দ্বিগুণ আর শস্যের ফলন হ'ল আশেপাশে তাঁর প্রতিবেশীদের ফলনের চারগুণ বেশী। তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে পোকার উপদ্রব থেকে গাছ রক্ষা পায়। তাঁর প্রতিটি ঝণ জমিতে শাকসব্জি, ফলমূল প্রভৃতি এমন ভাবে জন্মাতে লাগল মাসের পর মাস যা দেখে লোকের তাক লেগে গেল।

তিন বছরের চেষ্টায় হ্যাচ্ সেই জীর্ণ উপত্যাকাত্মিকে ছোটখাট একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে ফেললেন। মাটির যৌবনপ্রাপ্তি হ'ল আবার—ফসল ফলতে লাগল অজস্র। চলতি ফসলের চাষ ছাড়াও নতুন নতুন ফসলের চাষও তিনি করতে লাগলেন। তিনি এক রকম সন্ন্যাসীদের চাষ করলেন যা থেকে সারা বৎসর উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ খাট পাওয়া যাবে। মেক্সিকোবাসীকে তিনি দেখিয়েছেন, কি করে কুড়ি বর্গ ফুট জমিতে সন্ন্যাসীদের চাষ করে একটি পরিবারে খাট-সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মাংসের জন্ত বেপরোয়া হত্যার দরুন যেসকল এ দেশ থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। হ্যাচ্ আবার এই দেশে মেষ আমদানি করলেন এবং হাতের তাঁতে পশম বোনার পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করলেন। এদেশের লোক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরনো প্রথায় মোঁচাক থেকে মধু সংগ্রহ করত। হ্যাচ্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মোঁমাছি পালন ও মধুচক্র নির্মাণ-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন। এখন ইন্ডিয়ানরা আধুনিক মধুচক্র থেকে যে পরিমাণ মধু আহরণ করে যে অর্থ পায়, আগে চল্লিশটি বস্ত্র মোঁচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেও সে অর্থ তারা পেত না। পেন্সিল্ট ও পশুপালন বিষয়ে হ্যাচ্ বিশেষ কৃতকার্য হয়েছেন। তাঁর কার্খের বাছাই-করা ভাল ষাঁড়, মেঘ, মৌরগ পালা করে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উৎকৃষ্ট জেঞ্জীর পশু ও মুরগী প্রজননের সহায়তার জন্ত।

গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন হ্যাচের বৈশিষ্ট্য এবং এই ব্যাপারটি মেক্সিকোবাসী ইন্ডিয়ানদের অত্যন্ত কুতূহলী করে তুলেছে। মাত্র দেড়শত টাকায় একটি ছোট পরিবারের আদর্শ গৃহনির্মাণের প্ল্যান তিনি করেছেন। এই বাড়ীতে পরিষ্কৃত

জলের চৌবাচ্চা, সেনিটারি পায়খানা, রান্নাঘর থেকে ধূম নির্গমনের ব্যবস্থা, কংক্রিটের-মেঝে, এমন কি শাওয়া-স্নানের (shower bath) ব্যবস্থাও আছে।

হ্যাচের আদর্শ গৃহনির্মাণকার্য শেষ হওয়ার কিছু আগেই নিকটের কোনও এক গ্রামের মোরগ তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী নিজের গৃহের অনেক পরিবর্তন সাধন করে—এমন কি তার মুরগীর ঘরটিও হ্যাচের মুরগীর ঘরের মত তৈরি করে। এই ব্যাপারের পর গ্রামের কুমারী মেয়েরা ঘোষণা করে যে তারা এমন যুবকদেরই বিবাহ করবে যারা এমনি সুন্দর গৃহনির্মাণ করতে সক্ষম হবে।

হ্যাচের কার্খ স্থায়ী প্রদর্শনী বোলা আছে—যেখানে ইন্ডিয়ানরা কৃষিকাজ পণ্যের উৎকর্ষ নিজেরা চোখে দেখে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তা ছাড়া, বই এবং ছবির লাইব্রেরিও আছে তাঁর কার্খে।

হ্যাচের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে—আত্মনির্ভরতা এবং পর-বশ্যতা থেকে উদ্ধার লাভ। জীবনে বারংবার ব্যাধি ও দুর্ঘটনার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে। তিনি বাঁচবেন না এবং বাঁচলেও সারা জীবন পছন্দ হয়ে থাকবেন এই আশঙ্কা অনেকে অনেক বার করেছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এবং মনের বলে প্রত্যেক বারই তিনি আরোগ্যলাভ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আত্মপ্রত্যয় কি আসাযা সাধন করতে পারে।

হ্যাচের আদর্শ কার্খ দেখবার জন্ত দলে দলে লোক আসছে নানা দেশ থেকে। পৃথিবীর প্রত্যেক অহম্মত পল্লীর কৃষকেরা হ্যাচের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। উন্নতি করতে হলে হাতে-কলমে কাজ করতে হবে—হ্যাচ্ এই শিক্ষাই দিচ্ছেন সবাইকে।

• আমাদের দেশে—যেখানে মনুষ্যের বিভিন্নতা ভয় দেখাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্ব—সেখানে হ্যাচের আদর্শ প্রত্যেক পল্লীতে গ্রহণ না করলে আর উপায় নাই। পল্লী-সংগঠন, গ্রাম-উন্নয়ন যুগের কথা নয়। গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে কতকগুলো মোটা মাইনের কর্মচারী পোষণ করে এবং শহরে বসে বক্তৃতা দিয়ে পল্লী-সংগঠন চলে না। এর জন্ত চাই দরদী কৃষক-বন্ধু—যাদের দরদ শুধু ছলনার নামাঙ্কর নয়—যারা উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে গ্রামে গিয়ে বসবেন, নিজের হাতে মাটি-মায়ের সেবা করবেন এবং তাঁদের আদর্শে অজ্ঞ পল্লীবাসীদের উদ্বোধিত করে পল্লীর প্রকৃত উন্নয়ন করবেন।

জ্বালাশ-পথের অশ্বারোহী

শ্রীনিলিনীকুমার ভদ্র

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্ন। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার একটা রাস্তার পাশে ছোট একটি বন-ঝোপের ভেতরে শুয়ে ছিল এক তরুণ সৈনিক। সে শুয়েছিল সমস্ত দেহ প্রসারিত করে উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে, পা ছুটোর ভার রেখেছিল সে আঙুলগুলোর ওপরে আর বাম বাহটিকে উপাধান করে সে তার উপর জন্তু করেছিল তার মস্তক, তার প্রসারিত দক্ষিণ বাহু আলগোছে তার বন্ধুকে ধরে রেখেছিল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কতকটা স্নায়ুশক্তি বিচ্যাস এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার কোমরবন্ধের পেছন দিকে ঝুলানো কার্ভুজের বাস্কেটের ছন্দময় দোলনই শুধু স্মৃতি করছিল যে সে বেঁচে আছে, নৈলে যে স্থানে যে অবস্থায় সে পড়ে ছিল তাতে তাকে যত বলে মনে করার সম্ভাবনা ছিল ঘোলা আনা। যেখানে সে গভীর নিদ্রায় অচেতন সেখানে সে প্রেরিত হয়েছিল সামরিক বিভাগের বিশেষ কোনো কর্তব্য সম্পাদন করবার জন্তে, কিন্তু নিদ্রামগ্ন হওয়ার তার কর্তব্য কর্ত্তে ত্রুটি হচ্ছিল। যদি সে ধরা পড়ত তা হলে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব, কেননা সেই হ'ত তার অপরাধের জায্য এবং আইনসম্মত শাস্তি।

সৈনিকটি যে বন-ঝোপের মধ্যে শায়িত ছিল সেটি একটি ছুরিগম্য চড়াইয়ের একটেরে অবস্থিত। চড়াইটি প্রথমে ঝাড়া দক্ষিণ দিকে ওঠে গিয়েছে, তারপর পশ্চিম দিকে বেঁকে আন্দাজ এক শ' গজ গিরিগাজ বেঠন করে বরাবর পর্বতশিখরান্নিম্নে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে রাস্তাটি আবার দক্ষিণদিকে ঘুরে সর্পিলা গতিতে নিম্নান্নিম্নে অবতরণ করে বনের ভেতরে গিয়ে আশ্রয়গোপন করেছে। রাস্তাটির এই দ্বিতীয় বাকের মুখে, পশ্চাতের অনন্ত পর্বতমালা থেকে উত্তর দিকে উদ্গত একটি গিরিশৃঙ্গ যেন মৌনভাবে নীচেকার গভীর উপত্যকাভূমির জ্বালাশ-শোভা অবলোকন করেছে। এই পর্বতশৃঙ্গ এত উত্তুঙ্গ যে, যদি এর ভূগর্ভস্থ থেকে একটি প্রস্তরখণ্ড নিষ্কিপ্ত হয় তা হলে সেটি পড়বে গিয়ে সোজা হাজার ফুট নীচে পাইন বনের শীর্ষদেশে। সৈনিকটি যেখানে শুয়েছিল সে জ্বালাশ-পথেরই বিপরীত দিকে। জেগে থাকলে এই পার্কভূমির সৌন্দর্য্যে সে একেবারে অভিভূত হয়ে যেত। শুধু বনপথের ধানিকট্টা এবং পাহাড়ের উদ্গত শৃঙ্গই নয়, পর্বতসাহস্রদেশের সমগ্র দৃশ্যটাই এক সঙ্গে তরে নজরে পড়ত এবং এই অপূর্ণসুন্দর দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই সে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হ'ত।

এই বিস্তীর্ণ পার্কভূমির প্রায় সমস্তটাই জঙ্গলাকীর্ণ, কেবল উত্তর দিকে উপত্যকার এক প্রান্তে শম্পাবৃন্ত একটি অনতিবৃহৎ জামল প্রান্তর। এই জামলক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে প্রবহমান ক্ষুদ্র নদীটির রক্তস্রোত জলধারা উপত্যকার প্রান্ত-

সীমা থেকে অস্পষ্ট দৃশ্যমান হয় না। সেখান থেকে এই খোলা জ্বালাশ-পথের সাধারণ একটি গৃহস্থারের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণ অপেক্ষা আরও বড় দেখায় না, আসলে কিন্তু কয়েক একর জমি জুড়ে এর প্রসার। সম্মুখিত অরণ্য অপেক্ষা এর জ্বালাশ-শোভা অধিকতর নয়নানন্দকর। এরই এক প্রান্ত থেকে পাহাড়ের মালা ক্রমোচ্চভাবে ওঠে অঙ্গ ভেদ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই পর্বতশ্রেণীর গা বেয়েই রাস্তাটি যেন বহু আয়াসে গিরিচূড়ায় গিয়ে আরোহণ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উপত্যকাটি থেকে বহির্গমনের যেন কোনো রাস্তা নেই এবং যে রাস্তাটি উপত্যকার বাইরে অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইটেই যে কি ভাবে দুর্গম বনানী অতিক্রম করে পাহাড়ের কোলে গিয়ে পৌঁছল তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

এমন অরণ্যপর্বতসঙ্কুল ছুরিগম্য দেশ বিরল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মাত্র শ্রম পথ্য এই নিভৃত পার্কভূমিতে-ভূমিকে ও যুদ্ধভূমিতে পরিণত করে ছাড়লে। এই দুর্গম পর্বত-মালার পাদমূলস্থ অরণ্যে আশ্রয়গোপন করে অবস্থান করছিল ফেডারেল পদাতিক বাহিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট। এই পার্কভূমি প্রদেশ থেকে নিষ্কাশিত হওয়া এতই কঠিন যে, যদি মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য বহির্গমন-পথ আগলে বসে থাকে তা হলে বিরাট সৈন্যবাহিনীকেও শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে তাদের নিকট আশ্রয়সম্পর্ক করতে বাধ্য হতে হবে।

পূর্বোক্ত সৈন্যবাহিনী পূর্বদিকের সারা দিনরাত 'মার্চ' করে এখন এই নিভৃত স্থানে এসে বিশ্রাম করছিল। রাত্রে আবার সুর হবে তাদের পথ চলা, বীরে বীরে তারা পৌঁছাবে গিয়ে সেই জ্বালাশ-পথের বনঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে কর্তব্যকর্ম-অবহেলাকারী সেই সৈনিক-প্রহরী। তারপর গিরিগাজের অঙ্গ ঢালু পথ বেয়ে ক্রমাবতরণ করে তারা মধ্য-রাত্রি নীপাদ একটি শত্রু শিবিরে গিয়ে আচমকা হানা দেবে। অতর্কিত আক্রমণে তাদের হতবুদ্ধি করে দেওয়াই এই অভিযাত্রী বাহিনীর অভিপ্রায়, কেননা প্রতিপক্ষ এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, তরুরাজির আড়ালে অদৃশ্য পথটি তাদের ছাউনির পেছন দিকে, স্তূতরাং এর অস্তিত্বই আক্রমণকারীদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আক্রমণকারীরা চলছিল বিশেষ সতর্কণে, কেননা ব্যর্থকাম হলে তাদের অবস্থা হবে চূড়ান্ত ভাবে শোচনীয়; আর একথাও সত্যি যে, তাদের গতিবিধির কথা বিরুদ্ধ পক্ষ যদি দৈবক্রমে অথবা সতর্ক প্রহরার দরুন ঘূর্ণাক্ষরেও টের পায় তা হলে তাদের সফলকাম হওয়ার কোনোই আশা নেই।

এখন বনঝোপে নিশ্চিত তরুণ সৈনিকটির পরিচয় দেওয়া

যাক। সে হচ্ছে ভার্জিনিয়ার অধিবাসী, নাম তার কার্টার ডিউস। সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে। প্রচুর বিত্ত এবং সুরূচি এ দুটির সমন্বয়ে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্শ্বত্যা প্রদেশে যতটুকু শিক্ষা-সংস্কৃতি লাভ এবং আয়েসপূর্ণ, উন্নত ধরনের জীবনমাত্রা সম্ভবপর তারই অধিকারী সে হয়ে উঠেছিল। এখন যেখানে সে শুয়ে আছে সে জায়গা থেকে তার বাড়ী মাইল কয়েকের ব্যবধান মাত্র। বাড়ীতে একদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় সে শান্তগভীর সুরে তার পিতাকে বললে—“বাবা, একটুনে এক মিনিয়ন রেজিমেণ্ট এপে উপস্থিত হয়েছে, আমি যাচ্ছি তাতে যোগদান করতে।”

পিতা দৃষ্টান্তীতে মন্তক উত্তোলন করে নির্ঝকভাবে ক্ষণকাল পুঞ্জের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তার পর জবাব দিলেন—“যাও কার্টার, আর মনে রেখো আমার একটি কথা, যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা মনে হবে সর্ব প্রথমে তাই পালন করবে। ভার্জিনিয়ার নিকট তুমি বিদ্যাসভাতক, কিন্তু তোমাকে ছাড়াও তার চলবে। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা উভয়েই যদি বেঁচে থাকি তা হলে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারব। ডাক্তার তো তোমাকে জানিয়েছে যে, তোমার মায়ের অবস্থা সঙ্কটজনক। মাত্র কয়েক সপ্তাহের বেশী তাকে আর আমরা ধরে রাখতে পারব না। কাজেই এই সময়টি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এখন এ নিয়ে তাকে বিব্রত না করাই সমীচীন।”

অবশেষে এল বিদায়ের মুহূর্ত। কার্টার ডিউস পরম শ্রদ্ধাভরে পিতাকে বিদায় অভিবাदन জানালে। পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাহ্যতঃ শান্তভাবে অবলম্বন করে তিনি দৃষ্টান্তীতে সৌজন্তসহকারে তাকে প্রত্যভিবাदन করলেন। তারপর কার্টার তার শৈশবের সুখনীড় পরিত্যাগ করে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

কার্যক্ষেত্রে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শীঘ্রই সে সহকর্মী এবং অফিসারদের মন জিতে নিলে। এই সমস্ত গুণ এবং পার্শ্বত্যা প্রদেশ সহজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দরুনই তাকে এই সূত্র পাছাভিত্তিক অফিসের বিপৎসঙ্কুল বাটীতে প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একান্ত দৃঢ় সঙ্কল্প সত্ত্বেও কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তার ত্রুটি হ'ল। গভীর ক্লান্তি তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শীঘ্রই সে নিরাশ্রিত হয়ে পড়ল। অবশেষে যখন দেখা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কর্তব্য কর্মে অবহেলাজনিত তার অপরাধ ফলন করবার সুযোগ করে দিলে শয়তান না দেবদূত, কে বলবে?

অবসন্ন অপরাহ্নের সুগভীর নিস্তরঙ্গতার মধ্যে নিঃশব্দ চরণে, নীরবে স্তম্ভের কোনো অদৃষ্ট মোহন অঙ্গুলির স্পর্শ বুলিয়ে তার চৈতন্যের চক্কে উদ্দীলিত করলে; তার আশ্রয় কানে কানে এমন সব রহস্যময় ঘুম ভাঙানিয়া কথা যুদ্ধ গুঞ্জরণে বলতে

লাগল যা কখনও কোনো মনুষ্য-কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি, মানুষের স্মৃতিতে যা কোনো কালে এখিত হয়ে থাকে নি। শান্তভাবে বাহ-উপাধান থেকে মন্তকোত্তোলন করে সে বন-ঝোপের অবকাশ-পথ দিয়ে সূর্যের পানে তাকালে, আর সহজ সংস্কার বশতঃই ডান হাতে বন্দুকের বাঁটটি শক্ত করে ধরলে।

সুন্দর দৃষ্ট দর্শনে শিল্পীর যে আনন্দময় অমুভূতি হয় প্রথম সেই ধরনের অমুভূতিতে তার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। সে দেখলে আকাশের পটভূমিকার অত্যন্ত গিরিশিখর-সংলগ্ন একটি শিলাপট যেন এক বিরাট পাদ-পীঠ রচনা করে রেখেছে আর তারই উপর চিত্ত অভিভূতকারী দৃষ্টান্তীতে সমাসীন এক অধারোহী প্রস্তরমূর্তি। অশ্বের উপর উপবিষ্ট সোয়ারটির দেহ ঋজুদীর্ঘ এবং সৈনিকোচিত বীরত্বব্যঞ্জক, কিন্তু তার আননে মর্ম্মরপ্রস্তরে খোদিত গ্রীক দেবতাদের মুখের স্নিগ্ধ প্রশান্তি। তার ধূসর পরিচ্ছদের সঙ্গে আকাশের পটভূমিকার বর্ণের অপূর্ব সৌসামঞ্জস্য। অধারোহীর হাতুনির্ম্মিত রণসজ্জা এবং অশ্বটির শান্তব অঙ্গাবরণে আকাশের ছায়া পড়ে স্নিগ্ধ-মেহুর আভা ধারণ করেছে। একটা বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র বন্দুক বোড়ার জিনের উদগতাংশের পাশে ঝুলছে। অধারোহীটি ডান হাত দিয়ে বন্দুকের বাঁট ধরে রেখেছে, দৃঢ়-বল্লী বাম হস্তটি অদৃষ্টপ্রায়। আকাশের পটে বোড়ার মুখের আদরাকে দেখাচ্ছে যেন পাথর কুঁড়ে তৈরি অশ্বের আননের পার্শ্ব-দৃষ্টির মত। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল ছুরবগাছ খন্ডের দিকে। অধারোহী আনন বাঁদিকে ঈষৎ ফেরানো। তার কপালের পার্শ্বদেশ এবং ঋজুরাজিই কেবলমাত্র নিপুণ তুলিকায় আঁকা রেখা-চিত্রের মত দৃষ্টমান হচ্ছিল। তার দৃষ্টি ছিল নিরাশ্রিমুখে, উপত্যকার গভীরতম তলদেশে নিবদ্ধ। আকাশের কোণে অবস্থিত অধারোহীর বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তিটি যেন মনে বিরাটত্বের আভাস এনে দিচ্ছিল।

ক্ষণকালের জন্তে ডিউসের মনে এ ধরনের একটা অমুভূত অজানা অমুভূতি হ'ল যেন দীর্ঘ নিজাববাসনে একেবারে যুদ্ধ-বিরতির পর ক্ষেপে ওঠে সে ঐ উত্তুল গিরিচূড়ায় স্থাপিত এমন একটি মহান ভাস্কর্য-শিল্প-কর্ম্মের নিদর্শনের পানে তাকিয়ে আছে, যা নির্ম্মিত হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বীরত্ব-কাহিনীকে অরণীয় করে রাখবার জন্তে—আর সে যেন সেই মহিমা-মণ্ডিত অতীতের কলঙ্কহরূপ। কিন্তু হঠাৎ মূর্তিটির মধ্যে ঈষৎ স্তম্ভ-সকালনের আভাস পরিলক্ষিত হওয়ায় আচমকা তার আচ্ছন্ন ভাব টুটে গেল। অশ্বটি তার পাগুলো স্থিরভাবে রেখেই গিরিগাত্রের প্রান্ত থেকে দেহটাকে পশ্চাৎভাগে একটু সরিয়ে নিলে, সওয়ারটি কিন্তু পূর্ববৎ অনড় অবস্থায়ই বসে রইল। ব্যাপারটির নিগূঢ় তাৎপর্য সত্ত্বেও ডিউস এবার সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে উঠল এবং বন-ঝোপের ভেতর দিয়ে বন্দুকটিকে সঙ্গপণে টেনে এনে বাঁটটাকে নিজের গালের কাছে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলে, তারপর গিরিশিখরের পানে

তাকিয়ে অঝোরোহীর বক্ষ তাক করে গুলি ছুঁড়তে উত্তত হ'ল। সব ঠিকঠাক। এখন শুধু টিগারটি স্পর্শ করলেই কাটার ড্রিউসের মতলব হাসিল হয়। কিন্তু হঠাৎ সেই মুহূর্তে অঝোরোহীটি মন্তক ঘুরিয়ে বন-কোপে লুক্কায়িত তার আততায়ীর দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে। ড্রিউসের মনে হ'ল সেই তীক্ষ্ণ জলন্ত দৃষ্টি তার মুখমণ্ডলের উপর, তার চোখের উপর নিবদ্ধ—যে দৃষ্টি যেন একেবারে তার মর্মস্থল পর্যন্ত ভেদ করে দেখছে। কাটার ড্রিউসের ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল।... আততায়ীকে নিপাত করতে গিয়ে এ দোমনা ভাব কেন? বিশেষতঃ যে এমন একটি গোপন তথ্য জেনে নিয়েছে যা তার নিজের এবং তার সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার প্রবল অন্তরায়। সেই শত্রু কি অবিলম্বে হস্তব্য নয় প্রতিপক্ষের মন্ত্রণালয়ের রহস্য অবগত হওয়ার দরুন যে একা একটি সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাও দুর্বল।

কাটার ড্রিউসের মুখমণ্ডল যুতের আননের মত বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধর ধর করে কাঁপতে লাগল, তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল, তার মনে হ'ল তার স্তম্ভের প্রস্তর-মুষ্টি ছুটি যেন কতকগুলো কৃষ্ণবর্ণ শরীরী জীবে রূপান্তরিত হয়ে অগ্নিপূর্ণ আকাশে একবার উঠছে আর একবার পড়ছে—আর অস্থিরভাবে বুতাকারে ঘুরছে। হাতিয়ার থেকে ড্রিউসের হাত আলগা হয়ে গেল, তার মাথা ধীরে ধীরে হেলে পড়তে লাগল। শেষে, যে পর্ণশয্যার উপর সে হেলান দিয়ে বসেছিল তারই উপর হস্ত হ'ল তার মুখমণ্ডল। হৃদয়বেগের আতিশয্যে এই সাহসী এবং কষ্ট-সাহসু সৈনিকটির সন্ধি প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হ'ল।

কিন্তু তার এ আচ্ছন্নতা বৈশীকণ স্থায়ী হ'ল না। ক্ষণকাল পরেই পর্ণশয্যা থেকে মুখ তোলে সে সোজা হয়ে বসল, তার হাত ছুটি বন্ধুকের ওপর যথাস্থানে জড়িত হল, তার তর্জনীটি যেন আপনা থেকেই টিগার স্পর্শ করতে উদ্যত হ'ল। তার হৃদয় মন এবং চক্ষু ছুটির উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল; তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিচারশক্তি সব কিছুই আবার ফিরে এল। সৈনিকটি এবার তার কর্তব্য স্থির করে নিলে—আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত মুহূর্তমাত্র অবসর না দিয়েই জঙ্গলের আড়াল থেকে অঝোরোহীটিকে অতর্কিতে গুলি করে মারতে হবে। আর মুহূর্তমাত্র কালহরণও মারাত্মক, এত ক্ষিপ্রে হস্তে অব্যর্থ সন্ধান এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে হবে যেন তার অন্তিম প্রার্থনা অলুচ্চারিতই থেকে যায়।

কিন্তু না এর উল্টা দিকও তো আছে...লোকটিকে হত্যা না করলে কি চলে নু। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশার আলো তার মনে কিলিক দিয়ে যায়। এমনও তো হতে পারে যে, লোকটি শত্রুপক্ষের গতিবিধি তাদের অবস্থান-স্থল ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি। এটাও তো অসম্ভব নয় যে, তেমন কোনো মতলবও তার নেই—এই

পার্বত্য-প্রদেশের মহিমামণ্ডিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর্ষণেই শুধু এখানে এসে সে মুগ্ধ বিশ্বাসে চতুর্দিশের রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের পানে তাকিয়ে আছে। যদি তাকে রেহাই দেওয়া যায়, তা হলে হয় তো খানিক বাদে কোনও দিকে দৃকপাত না করে অঝোরোহণপূর্বক যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানেই চলে মাবে। বস্তুতঃ চলে যাওয়ার সময় তার গাব-ভঙ্গী থেকেই, সে আক্রমণোদ্যত শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি ক্রান্তিতে পেরেছে কিনা তা বুঝা যাবে। হঠাৎ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জলযান-আরোহী যেমন করে কাচের মত স্বচ্ছ নীলাবুরাশির ভিতর দিয়ে তাকায়, তেমনি করে ড্রিউসও মাথা ঘুরিয়ে এনে দৃষ্টিকে একাধারে, বায়ুস্তর ভেদ করে বহুনিম্ন উপত্যকাকূর্মির পানে তাকালে। নজরে পড়ল, সবুজ শম্পারূত প্রান্তরের ওপর অশ্ব ও মানুষের একটি চলন্ত রেখা যেন ক্রমশঃ স্তম্ভের পানে সম্মতসারিত হচ্ছে। সে বুঝতে পারলে যে, কোনো অদূরদর্শী সৈন্যদল গোলা জায়গার ঘোড়াগুলোকে স্নান করিয়ে আনবার জন্যে তার অধীনস্থ সৈন্যদের হুকুম দিয়েছে—গিরিচড়া থেকে সে দৃষ্ট যে স্তম্ভরূপে নজরে পড়তে পারে সে বিষয়ে সে আদৌ সচেতন নয়।

উপত্যকা হতে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ড্রিউস আবার বন্ধুক বাগিয়ে ধরে আকাশের পটভূমিকায় দৃশ্যমান অশ্ব এবং অঝোরোহীটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, এবার কিন্তু অশ্বটি হ'ল তার লক্ষ্যবস্তু। তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, তার পিতার বিদায়-কালীন কথাগুলো যেন প্রত্যাদেশের মত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলঃ “যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা মনে হবে সর্বপ্রথমে তাই পালন করবে।” এই কথাগুলো আবৃত্তি করতে করতে তার মনের হৈর্য ফিরে এল, তার দাঁত-গুলো দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হ'ল। তার স্নায়ু-মণ্ডলী হ'ল নিম্নিত শিশুর স্নায়ুর মত স্নিগ্ধ প্রশান্ত—তার দেহ হ'ল স্থির সর্বচাঞ্চল্যমুক্ত, কোনো মাংসপেশীতে ইষৎ কম্পনও অহুত্ব হ'ল না। তার স্বাসবায়ু ধীরে এবং নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হতে লাগল, অবশেষে লক্ষ্য স্থির করবার সময় তা হয়ে উঠল দীর্ঘনিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যবুদ্ধিরই জয় হ'ল, আত্মা যেন কানে কানে দেহকে বলে গেল—“শান্ত হও।”—সে গুলি ছুঁড়লে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফেডারেল ফোর্সের একজন দুঃসাহসী সৈনিক-কর্ণচারী এই পাহাড় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবার উদ্দেশ্যে, উপত্যকার নিভৃত স্থানে অবস্থিত নৈসর্গ-শিবির পরিত্যাগ করে খেয়ালবশতঃ লক্ষ্যহীনভাবে চলতে চলতে গিরিপাদমূলের নিকটবর্তী একটি নাতি-উচ্চ, অল্পপরিসর খোলা জায়গার নিম্নপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন। পাহাড়ের গহন-গভীরে আরো এগিয়ে গেলে কোনও কান্দা হবে কিনা তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। তাঁর সামনে দিকি মাইল দূরে—কিন্তু

দৃষ্টান্ত: এক রশ্মিমাঝ ব্যবধানে, পাইনবনের নীৰ্ঘদেশ থেকে বিশাল পাহাড়টি অভ্যন্তর করে উঠেছে। ছিন্নিরাষ্ট্র গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল, আকাশের গায়ে কুটিল রেখার মত দৃষ্টমান শৈলশিখরপ্রান্তের পানে সে মুগ্ধবিশ্বয়ে তাকালে। ডানদিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত পাহাড়ের একপার্শ্ব যেন নীল আকাশের পটে আঁকা, তার পেছনে কয়েক সারি সুনীল পাহাড়, গিরিপার্শ্ব তরুশ্রেণী যেন আকাশের কোলে বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বনানীমণ্ডিত গিরিশীর্ষের অত্রংগিহ মহিমা সৈনিক-কর্মচারীটির হৃদয়কে নির্বাক বিশ্বয়ে গুপ্তিত করে দিলে। আচমকা নড়রে পড়ল তার চমকপ্রদ অভিনব এক দৃষ্ট—একজন অশ্বারোহী যেন আকাশপথে অঞ্চালনা করে নীচেকার উপত্যকাভূমিতে অবতরণ করছে।

দৃঢ়পিন্ড জিনের উপর অশ্বারোহীটি সাময়িক কায়দায় ঝুঁকভাবে বসে আছে। গভীর গহ্বরে পতনের হাত থেকে বাহনটিকে রক্ষা করবার জেতেই যেন সে বজ্রযুগ্মিতে বন্না ধরে রেখেছে। তার শিরশ্রাণহীন অনায়ত মস্তকের দীর্ঘ কেশরাঙ্কি উর্দ্ধাভিমুখী হয়ে যেন পালকগুচ্ছের মত আন্দোলিত হচ্ছে, অশ্বের উৎক্ষিপ্ত কেশরজালে ঢাকা পড়েছে তার দক্ষিণ হস্ত—অশ্বটি গতির এমন সমতা রক্ষা করে অবতরণ করছে যে, যেন হচ্ছে যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপ নীচেকার স্থিতিকার উপরে সমতাগে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। অশ্বটির গতিভঙ্গী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ডভাবে নীচে লাফিয়ে পড়ছে, কিন্তু হঠাৎ সৈনিক-কর্মচারীটির মনে হ'ল যেন সে প্রতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সবগুলো পা স্তম্ভের পানে প্রসারিত করে দিয়েছে অর্থাৎ সে যেন এবার সংঘতভাবে ধীরে ধীরে নিম্নাবতরণ করে গিরিপার্শ্ব কোনো আশ্রয়-স্থলের উপর দেহভার হস্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ তার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র—বায়ুস্তর ভেদ করে অতলস্পর্শ গহ্বরে পতন তার অনিবার্য।

আকাশপথে এই অস্বাভাবিক মুহূর্তি দেখে সৈনিক-কর্মচারীটির অন্তর ভীতিমিশ্র বিশ্বয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাবাবগের গভীরতায় তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে ক্ষণকাল শুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—তার পা ছুটো যেন অবশ হয়ে এল, অবশেষে তিনি মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। ঠিক তদুৎপত্তেই বনান্তরালে হৃদয়ুড় করে একটি অস্রী জিনিষ পতনের শব্দ তার কানে এসে পৌঁছলো—সেই শব্দ অপ্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল, তারপর বনতলে আবার সেই অস্রুভীর নিশ্চলতা।

কর্মচারীটি কম্পিতচরণে উঠে দাঁড়ালেন। নিমেষমধ্যে তার আত্মভাব কেটে গেল। গা ঝাড়া দিয়ে ত্বরিতপদে ছুটতে ছুটতে তিনি গিরিপাদমূলস্থ সে স্থান থেকে আশ মাইল দূরবর্তী এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে,

কাছেপিঠে কোথাও ভূপতিত অশ্ব এবং অশ্বারোহীটিকে দেখতে পাবেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। আকাশপথে উড্ডীয়মান অশ্বারোহীর মুক্তি-দর্শনের মুহূর্তে, এই অভিনব দৃষ্টের বাহ্যিক সহজ সৌন্দর্য্য, এর স্তম্ভাম ভঙ্গী এবং এই দুঃসাহসিক কর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য তার কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাই এটা তার খেয়ালই হ'ল না যে, এই উড্ডীন অশ্বারোহীর অবতরণ-পথ হচ্ছে বরাবর গিরিপাদমূলস্থিৎ এবং যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি তার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান লাভ করতে পারতেন।...আন্দাজ আশ ঘটটিটাক পরে তিনি ছাউনিতে ফিরে এলেন।

এই কর্মচারীটি ছিলেন এক জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয়, এমন সত্য যে বলতে নেই তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তাই যে অবিদ্যাস্ত ব্যাপার তিনি দেখে এসেছেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বললেন না। কিন্তু সৈন্যধ্যক্ষ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অরণ্য-পর্বতে বিচরণের ফলে তিনি তাদের অভিযানের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, এমন কোনো ভাষা অবগত হতে পেরেছেন কিনা তখন তিনি জবাব দিলেন, “হাঁ মহাশয়, দক্ষিণদিক থেকে সরাসরি এ উপত্যকার অবতরণের কোনো পথ নেই।”

সৈন্যধ্যক্ষ তার চেয়েও উত্তমরূপে একথা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি একটুখানি মুচিস্তি হাসলেন মাত্র।

এদিকে গুলি নিক্ষেপ করে প্রাইভেট কার্টার ডিউস আবার তার বন্দুকে গুলি ভরলে, তারপর হাত-ঘড়িটি পুনরায় কজিতে বেঁধে নিলে। মিনিট দশেকও অতিক্রান্ত হয় নি এমন সময় সত্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে জনৈক ফেডারেল সার্জেন্ট তার কাছে এসে হাজির হ'ল। ডিউস মুখও ফেরালে না, কিম্বা তার পান্ন তাকালেও না, স্থির নিশ্চল ভাবে বসে রইল। সে তাকে চিনতে পেরেছে কিনা এটা পর্য্যন্ত তার ভাবভঙ্গীতে পরিষ্কৃত হ'ল না।

“তুমি গুলি ছুঁড়েছিলে?” সার্জেন্ট চুপি চুপি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে।

“হাঁ”

“কিসের ওপর”

“একটা ঘোড়ার ওপর। সেটা দাঁড়িয়েছিল অনতিদূরবর্তী এ পাহাড়ের উপর। কিন্তু এখন তাকে তুমি আর দেখতে পাচ্ছ না, গুলি বেয়ে সে পড়ে গেছে পাহাড়ের নীচেকার এ অতল গহ্বরে।”

ডিউসের মুখ ছাইয়ের মত সাদা, কিন্তু এ ছাড়া আবেগের আর কোনো চিহ্ন তার আননে পরিলক্ষিত হ'ল না। কথাগুলো বলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভূমিস্তার অবলম্বন করলে। সার্জেন্ট তার এই ভাবান্তরের হেতু বুঝতে পারলে না,

ব্যাপারটা যেন তার কাছে বড় হৈয়ালিপুর্ণ বলে মনে হতে লাগল।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সে বললে—“শোনো ড্রিউস ব্যাপারটাকে রহস্যময়, জটিল করে তোলায় কোনো ফায়দা নেই। আমার ছকুম, সব কথা তোমায় খোলসা করে বলতে হবে। ঘোড়ার ওপরে কি কেউ ছিল?”

“হাঁ”

“কে”

“আমার বাবা”

সার্জেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন—“হা ইয়র।” এই ছুটো কথা মাত্র তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল।*

* Ambrose Bierce-এর “A Horseman in the Sky” গল্প অবলম্বনে।

অপভ্রংশ-সাহিত্যে মুসলমানের দান

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করেছি। এ দান স্বল্প পরিমাণ হলেও উচ্চাঙ্গের। এটাও সম্পূর্ণ ঠিক যে মুসলমান রাজত্বসময়ে ভাষাকর, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, অকবরীয় কালিদাস, বংশীধর মিশ্র, সর্ববিজ্ঞানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি বহু বড় বড় কবি ও আলঙ্কারিক, জগদগুরু নারায়ণ ভট্ট প্রমুখ স্মার্ত, জ্যোতিষ রায়, কেশব শর্মা ও নীলকণ্ঠ প্রমুখ জ্যোতির্বিদ, কল্যাণমল্ল প্রমুখ কামশাস্ত্রবিদ সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিতেরা ভারতীয় নবাব বাদশাহদের রাজসভা সমলঙ্কৃত করেছিলেন। অল্প দিকে নসীর মাযুদ, ককীর হাবিব, সৈয়দ মর্ন্তজা, ফাতন, চাঁদ কাকী, আলিরাঙ্গা, আকবর শাহা, কবীর, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখলাল প্রভৃতি চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের মুসলমান কবির। যেমন বঙ্গ-সাহিত্যে অনবদ্য প্রভূত দান করে গেছেন, তেমনি ছুটি ধী, পরাগল ধী প্রভৃতি শাসকরুম্বের উৎসাহেও বাংলা-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পদ্মাবত-প্রণেতা মালিক মহম্মদ জায়সী, আমির খুসরো প্রভৃতি অতি উচ্চাঙ্গের কবির। ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহের প্রভূত ইষ্ট সাধন করে গেছেন। ফলতঃ, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা এবং হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা—ভারতের যে-কোনও ভাষা মুসলমানদের বিশিষ্ট দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল একজন মুসলমান অপভ্রংশ কবির বিষয়ে আলোচনা করব। ইনি হচ্ছেন সন্দেশরাসক-প্রণেতা কবি আব্দুল রহমান।

মেঘদূত কালিদাসের অনবদ্য সৃষ্টি এবং বহুদিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। মেঘদূত ভারতীয় সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সৃষ্টি মানসে পরবর্তী কবিদের হৃদয় যাদুশভাবে আকৃষ্ট করেছে, কালিদাসের অল্প কোনও গ্রন্থ তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মেঘদূতের অহুত্বগণ, বাক্যাবলম্বনে বা ভাবাবলম্বনে ন্যূনাধিক দু-হাজার গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে এবং শুণ্ড ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীরা নন, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সর্ব-ধর্মাবলম্বীরাই এ দূত-সাহিত্যাবলম্বনে কাব্য, দর্শন ও ধর্মগ্রন্থ

প্রণয়ন করেছেন। যক্ষ পরমায়্যা, যক্ষিণী জীবায়্যা এবং মেঘ ভক্তি, শ্রদ্ধা, মন প্রভৃতি দূত রূপে পরের যুগে স্থান পরিগ্রহ করেছে। বঙ্গদেশে আমরা মেঘদূতের আদর্শাবলম্বনে যে পবন-দূত, মনোদূত, ভ্রমরদূত, উল্লবদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতির সৃষ্টি করেছি, সেগুলি বাঙালীদের সংস্কৃত সাহিত্যে স্থায়ী দান—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আব্দুল রহমানের সন্দেশ-রাসকও এ দূত-সাহিত্যের অন্তর্গত—মেঘদূতের বংশপরম্পরা-জাত, তবে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।

আব্দুল রহমান জাতিতে তাঁতি, কিন্তু সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যে সুনিপুণ। সন্দেশরাসক গ্রন্থের ছয় নম্বর কবিতায় তিনি বলেছেন—

অবহট চন্দ্র-সকল-পহিয়মি পেসাইয়ংমি ভাসাএ।

লক্ষণহুংদাহরণে স্কইওং ভূমিয়ং জেহিং।

[অপভ্রংশ-সংস্কৃত-প্রাকৃত-পৈশাচিক-ভাষাভিঃ।

লক্ষণ-ছন্দ আভরণাভ্যাং স্ককবিত্বং ভূমিতং যৈঃ।

তেভ্যঃ নম ইত্যর্থঃ]

ফলতঃ, সন্দেশরাসক গ্রন্থের সর্বত্র সংস্কৃত-প্রাকৃত বিষয়ক পাণ্ডিত্যের বিস্তার প্রমাণ বিজ্ঞমান। কবি তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন—এ গ্রন্থ অল্পবয়স্কদের রতি গৃহ, বিরহিণীদের মকর-ধ্বজ, রসিকদের রস-সঞ্জীবনকর, প্রেমনির্ধাস ও শ্রুতিসুখ-সুখ-প্রবাহ-স্বরূপ। কবির প্রত্যেকটি কথা অতি ঠিক—স্বকীর গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি কিছুই অত্যুক্তি করেন নি।

বিজয়নগর থেকে কোনও বিরহিণী তাঁর কাছে-প্রবাসী প্রিয়ের কাছে কোনও পণিকের মুখে তাঁর হৃৎসহ অবস্থার বিষয়ে বাতী প্রেরণ করছেন। এ গ্রন্থে ভারতীয় ষড় ঋতু—গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি অতি নিখুঁত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রিয় প্রয়াণ করেন, বৎসরান্তেও তিনি ফিরে আসেন নি। ঋতুর পর ঋতু এসে অঞ্জলি-সঙ্কেতে বা প্রকট ভাষায় কত আবেদন-নিবেদন জানিয়ে গেল, হৃৎসহের হৃৎশব্দ প্রজ্জ্বলিত করে সমস্ত দেহ-মন দগ্ধ করে দিয়ে গেল—নিষ্ঠুর পাহা কিছুতেই ফিরে এল না। বিরহিণী ২১১ নং কবিতায়

বসন্তোপজ্জ্বলিত হুঃখ বর্ণন প্রসঙ্গে সত্যি বলেছেন—অশোক বৃক্ষ
সুমন্ত শোকের আধার ; অঞ্চ লোকে তাকে বলে অ-শোক ;
ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে—

জম্বু নাম অলিঙ্গিত কহই লোউ ।

ন হু হরই ঋগ্জু অসৌউ সৌউ ।

[যম্বু নাম লোকঃ অশোক ইতি কথয়তি, তদলীকম্—

যতোহশোকঃ ক্ষণাধর্মপি মম শোকং ন হরতি] ।

কবি গ্রন্থের অন্তে স্মৃষ্টি ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর হৃদয়ের
আশা—

সংবাদ-বাহককে প্রেরণ করার পরে দূর থেকে আগমনশীল
প্রিয়কে দেখতে পেয়ে প্রিয়া যেমন আনন্দ-তরঙ্গে হাবুডুব
খেতে খেতে পাগলপারা মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন, তাঁর
গ্রন্থখানা পাঠ করেও তেমনি যেন পাঠকবর্গ উল্লসিত হয়ে
উঠেন। অনাদি অনন্ত পরম পুরুষের জন্ম হউক ।

তৎ পড়ুংজিবি চলিয় দীহুছি

অই তুরিয় ইখং তরিয় দিসি দক্ষিণ তিগি

আসন্ন পহাবরিউ দিট্টু নাহুতিগি আস দরসিও, ঝণ্ডি হরসিয় ।

জ্জেম অচিতিউ কজ্জু তম্মু সিদ্ধু ঋগ্জি মহংতু,

তেম পঢ়ং ত মুগং তম্মহ জ্জম্ভট অগাই অগং তু ॥ ২২৩ ॥

এ গ্রন্থ মূলতানের প্রভূত সমৃদ্ধি সময়ে বিরচিত হয় এবং
ইহাও অত্যন্ত সম্ভব যে যখন পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষার সমাদর
ছিল, সেই সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল। মূলতান
মাহমুদ ঘোরীর আক্রমণে মূলতান বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং তার
কিছু পূর্বে এ গ্রন্থের রচনা সম্ভবপর। এ সময়ে অপভ্রংশ

ভাষার সমাদর ছিল। সুতরাং মনে হয়—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ গ্রন্থ বিরচিত হয়।

বিরহাঙ্ক ও স্বয়ং অপরূপ রাসঅ বা রাসার (সংস্কৃত
রাসক) ব্যাখ্যানে বলেছেন যে এ জাতীয় গ্রন্থে বিশিষ্ট কতিপয়
অপভ্রংশ ছন্দ অবলম্বনীয় এবং এ প্রকার গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র
হওয়া কর্তব্য। ফলতঃ, আকারের দিক থেকে একে সংস্কৃত
খণ্ড কাবোর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

দরাক খাঁ, আবদুল রহমান, মুদ্রাকর শাহ, শায়েস্তা খাঁ,
দারাস্তকো প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক-
দের বিষয়ে ভাবতে গেলে আমার স্বতঃই এ কথাই মনে
হয়—এঁরা কি কখনও ভেবেছিলেন যে বিধর্মীর ভাষা বলে
সংস্কৃত ও প্রাকৃত এঁদের উপেক্ষণীয়; অথবা এর বিরুদ্ধ
প্রক্রিয়াই তাঁদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল? কবীর, দাছ প্রভৃতির
যখন ভারতের মধ্য যুগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে
চরম সত্য বিষয়ে সন্ধান দেওয়ার জন্য দীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন
কি তাঁরা হিন্দু-মুসলমান বিষয়ক ভেদবুদ্ধিতে প্ররোচিত হয়ে-
ছিলেন? কত অগণিত হিন্দু আরবী, পার্সী গ্রন্থাদি প্রণয়ন
করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। কোন্ বিচারবুদ্ধি বলে
আজ হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী এ অমূল্য ভারতীয় শিক্ষা
ভুলতে বসেছে? জাতীয় অভ্যুদয় যদি ভারতীয়দের কাম্য
হয়, এ সনাতন শিক্ষা কায়মনোবাক্যে আপনার বলে গ্রহণ
করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। এতেই জাতির চরম ক্ষেম
অন্তর্নিহিত রয়েছে।

প্রবাসী:

শ্রীঅচলাপ্রসাদ দাঁসগুপ্ত

হেথা এই শৈলশিখরে দেবদারু বনছায়া-তলে
নিঃসঙ্গ বিলাসলীলা; আদিগন্ত সিদ্ধু খন নীল
বহু নিম্নে প্রসারিত, উদ্ধাকাশে নির্ঝাঁক মিছিল
রৌপ্য-মেঘ-শিশুদের, গ্রামধানি সাহুড়ামাঝলে
রৌদ্রকরে ঘুম যায়—বহুদূরে কোন্ শব্দ-ক্ষেত্রে
ধূসর মেঘেরা চরে। তজ্জালস উত্তপ্ত বাতাসে,
প্রান্তর পারায়ে কোন্ রাবালের বংশীধ্বনি আসে—
পরিপূর্ণ মধ্যদিবা দিবাসখে উঠিয়াছে মেতে ।

হোথাই উটজ ঘিরে শুছে শুছে পার্শ্বত্যা কুসুম
গালিচার মত পাতা। পশ্চাত্তের ফলের বাগানে
পুষ্পিত কমলাবীধি—একটু গবাক্ষে কোনোখানে
রক্তাভ আঁহুর দোলে। কার পুষ্ট কপোলে কুসুম,
ঘনশ্রীম অরণ্যানী মর্ম্মরিত কার তাজ-কেশে,
চক্ষের সমুদ্রনীলে উঠিয়াছে ঝড় সর্ব্ববনেশে ॥

দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল

(সপ্তম প্রকরণ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

দুর্গোৎসবের প্রমাণ কি? কে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন? যিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণ। যে পদ্ধতিতে দুর্গোৎসব হইতেছে, কে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন? যিনি করিয়াছেন, তিনি প্রমাণ (authority)। একজনে করেন নাই, বহুজনে করিয়াছেন, বহুজন প্রমাণ। যে পুরাণে লিখিত আছে, সে পুরাণ প্রমাণ। কোন্ পুরাণ মাগ্ধ, কোন্ পুরাণ নয়, তাহা স্থতির ব্যবস্থাপকের বিচার্য। প্রসিদ্ধি এই, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি পুরাণের বীজ দিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য-পরম্পরা অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিতে পারে না। উপ-পুরাণ ব্যাস-সম্প্রদায়ের বহির্ভূত অস্ত্রের রচিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রধান। যে পুরাণই হউক, তাহার রচনার দেশ ও কাল না জানিলে দুর্গোৎসবের ইতিহাস সঙ্কলনের সাহায্য হয় না।

আমি এইখানে কয়েকটি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলা বাহুল্য, এই কর্ম অতিশয় কঠিন। যদি বা পুরাণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পারা যায়, পুরাণ-রচনার কাল অনুমান দুঃসাধ্য। কারণ পুরাণ পুরাবৃত্ত, ইহাতে স্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, প্রাক্কালের বৃত্তান্ত থাকে। আর এক বিষয় আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে নূতন নূতন বিষয় যোজিত হয়। শ্লোক, অধ্যায়, মন্দভাষ্য যোগ হেতু পুরাতনের সহিত নূতন মিশ্রিত হইয়া যায়।

পুরাণকর্তাকে কবি বলা যাউক। তিনি পুরাবৃত্ত রচনা করিলেও কদাপি স্বদেশ ভুলিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, কবি কোন্ দেব বা দেবীর, কোন্ তীর্থের মাহাত্ম্য সविশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্ কোন্ বৃক্ষ তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়াছে। সকল বৃক্ষ সকল দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সে সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের না কবির স্থতি। পুরাণ পুরাবৃত্ত বটে, কিন্তু কবি স্বসময়ের ও স্বদেশের আচার-ব্যবহার বর্ণন করিতে পারেন না।

কাল-অনুমানের নিমিত্ত এরূপ সাহায্য অত্যন্ত পাওয়া যায়। অমুক দেশে অমুক শতাব্দে এই অচ্যুত ছিল, কিম্বা পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই পুরাণ জ্ঞানকাল অমুক গ্রন্থের কিম্বা পুঙ্খবহ

পূর্বে কিংবা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে তাহার কাল-অনুমানের প্রজ্ঞা জন্মে। ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণসকল কালানুসারে সাজাইতে পারা যাইত। মরাঠী ভাষায় শ্রী ত্রাশ্বক-গুরুনাথ কালে “পুরাণ নিরীক্ষণ” লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও কয়েকখানি উপপুরাণের রচনার কাল অনুমান করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রাহ্য মনে হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ ও নন্দিকেশ্বর পুরাণ দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাইলাম না। দেবী ভাগবত বহু জনের আদৃত, বৃহদ্রথপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাঢ়ে প্রণীত। এই দুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্তা করা যাইবে।

১। মৎস্যপুরাণ

মৎস্যপুরাণ মহাপুরাণ। মহাভারতে (বনপর্বে) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের নাম আছে। মহাভারতের বর্তমান আকার খ্রি-পূ দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরে কোথাও কিছু প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা নগণ্য। অতএব মৎস্যপুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু মৎস্যপুরাণের বর্তমান আকার কোনও এক সময়ে আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ বিষয় কবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

মৎস্যপুরাণ মহাভারত হইতে অনেক উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে নূতন রূপ প্রদত্ত হইয়াছে। দুই-একটা উদাহরণ দিতেছি। মহাভারতে ভারকাসুর-বধের নিমিত্ত কাতিকেশ্বরের জন্মবৃত্তান্ত ঘেরূপ আছে, মৎস্যপুরাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চৈত্র মাসের অমাবস্যা পার্বতীর কৃষ্ণ ভেদ করিয়া কুমার যজ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভারতের মতে কাতিক অমাবস্যা শব্দে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে কাতিকেশ্বর ঋগ্বৈতীয় পুত্র। মহাভারতে পার্বতী উমার নামও নাই। মৎস্যপুরাণ কুমারসম্ভব নামে কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস তাহা অনুসরণ করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মৎস্যপুরাণের বক্তা, বৈবস্বত মনু শ্রোতা। অতএব মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ হইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা শৈব পুরাণ। ইহাতে বিষ্ণুর পাঁচ দিব্য অবতার বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর প্রাধান্য ও আরাধনা নাই। প্রতিমা-লক্ষণে উমা-মহেশ্বরের প্রতিমা

বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর হয় নাই। শুক্র সপ্তমীতে
• বহুবিধ ব্রত করিতে বলা হইয়াছে। এই সকল ব্রতে
দিবাকরের আরাধনা প্রথিত হইয়াছে। এই সকল ব্রত
ও বহুবিধ দানের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের
পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞমানের অর্থ দোহন করিতে মংস্ত-
পুরাণে* এই সকল বিষয় সম্বিষ্ট করিয়াছেন এইরূপ
পুরাণের দেশ ও কাল অনুমান হুঃসাধ্য।

তথাপি মনে হয় মংস্তপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত
হইয়াছিল। মংস্তপুরাণে লিখিত শ্রাদ্ধকল্প প্রাচীন।
• লিখিত আছে, শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ও কোকন ব্রাহ্মণ বর্জন
করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্কন, বোম্বাই নগর হইতে
দক্ষিণে গোম্বা পর্যন্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ। ইহার
দক্ষিণে কেরল দেশ; বর্তমান নাম মালাবার। কেরল
দেশের পশ্চিমে দ্রাবিড়। শ্রাদ্ধে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোঙ্কন
ব্রাহ্মণ বর্জনীয় হইয়াছে। অতএব মনে হয় মংস্তপুরাণ
কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্বুদ্রি
ব্রাহ্মণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নম্বুদ্রি
ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিম্বদন্তী এই, তাহাঁদের পূর্বপুরুষ বহুকাল
পূর্বে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয়া বাস করিয়া-
ছিলেন। তাহাঁদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকত্ব
প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই।
তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশূর হইতে পশ্চিম-
সমুদ্র ও কন্ঠাকুমারিকা পর্যন্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে
পারে। কেরলে গ্রামে গ্রামে কালীপূজা হইতেছে। নূতন
হইতে পারে না। দ্রাবিড় পণ্ডিতেরা মনে করেন তাহাঁদের
দেশ শিবপূজার আদিস্থান।

মংস্তপুরাণে দুই তিন স্থানে আছে, উমা বিশ্বের অরুণি
(জনকজননী)। তিনি নীলোৎপলবর্ণা ছিলেন। তপস্বী
করিয়া তিনি গৌরীত্ব লাভ করেন। কালিকাপুরাণ এই
উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাঁর কৃষ্ণবর্ণ ত্রু হইতে
কৌশিকীমূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। কৌশিকী কালীমূর্তি।
লিখিত আছে, এই কৌশিকী মূর্তি বিদ্যাচলে প্রসিদ্ধ। বোধ
হয় এই কৌশিকী দেবী বিদ্যাচলে বহু পুরাতন এবং ইনিই
• বিদ্যাবাসিনী। (বিদ্যাচল ই. আই. রেল ষ্টেশন। সেখানে
এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বস্ত্রাবৃত থাকে,
কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভূজা ভদ্রকালী, যিনি
যশোদার কন্ঠা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিদ্যাচল-
বাসিনী লিখিয়াছেন (২১।৩৮)। মংস্তপুরাণে দেউলের
গোপুর (বহির্দ্বার) আছে। গোপুর দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ।
একস্থানে দেউলে দেবদামীর উল্লেখ আছে, ইহাও দক্ষিণ-
ভারতের। এক স্থানে অগ্ন্যগ্ন ফলের সহিত তাল, নারিকেল,
ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও

আছে, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব দিকে শমী নাই; শমী পশ্চিম
দিকে আছে। এই সব কারণে মনে হয় মংস্তপুরাণ
কেরল দেশে রচিত হইয়াছিল। এই দেশ উত্তর-ভারত
হইতে বহু দূরে অবস্থিত। উত্তর-ভারতের প্রচলিত
উপাখ্যান, বহুদূরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত
হইয়াছিল। কালান্তরও বিশ্ব হইয়া থাকিবে।

মংস্তপুরাণে নানা ঋষিবংশ ও রাজবংশ বর্ণিত
হইয়াছে। সে সকল বংশের বর্ণনাদ্বারা মংস্তপুরাণের
প্রাচীনতাই প্রমাণিত হইতেছে। নারদপুরাণে অষ্টাদশ
পুরাণের সূচী আছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই।
শ্রীযুত কালে মনে করেন, বর্তমান নারদপুরাণের পুরাণ-
সূচী ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে
বর্তমান মংস্তপুরাণের কয়েকটি বিষয় ও ভবিষ্যৎ রাজ
বংশের বর্ণনা আছে। অতএব মংস্তপুরাণ পঞ্চম খ্রিষ্ট
শতাব্দে বর্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল। মংস্তপুরাণে
প্রতিমা-লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ
খ্রিষ্ট শতাব্দীর মনে হইতেছে।

২। মার্কণ্ডেয়পুরাণ

আমরা যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত।
• নারদপুরাণসূচী অনুসারে মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় সহস্র শ্লোক
ছিল। বর্তমান কঙ্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩০০ শ্লোক
আছে। অবশিষ্ট ২৭০০ শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সে
সব শ্লোকে কি ছিল তাহা নারদসূচী হইতে জানিতে পারা
যায়। বর্তমান পুরাণের নরিগন্ত চরিতের পর রামচন্দ্রের
কথা, কৃষ্ণবংশ, সোমবংশ, পুরুবংশ, নহষ, যযাতি, যদুবংশ,
শ্রীকৃষ্ণবংশচরিত, মথুরাচরিত, দ্বারকাচরিত, সর্বাভ্যাস
কথা ছিল। মনে হয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া পুরাণের
বৈষ্ণব অংশ ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ
অধ্যায়ে কবির বিষ্ণুপ্রীতি ও বাহুদেব-ভক্তি প্রকটিত
আছে, কৃষ্ণের মাথুর মূর্তির উল্লেখও আছে। ইহা
বৈষ্ণবপুরাণ-কি শাক্তপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না।
স্বর্ঘেরও এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ মৌর্য কিনা
তাহাও তর্কের বিষয় হইতে পারে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অনেক উপাখ্যান আছে। সে সব
উপাখ্যান অগ্র পুরাণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর
ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মন্ত্রের উৎপত্তি,—বিশেষতঃ
অষ্টম মন্ত্র সাবর্ণি মন্ত্রের উৎপত্তি অগ্র পুরাণে নাই। সাবর্ণি
মন্ত্র সম্পর্কে চণ্ডীমাহাত্ম্য আদিয়াছে। নারদসূচীতে উল্লেখ
আছে। বোধ হয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ মংস্তপুরাণ হইতে শুষ্ক-
নিশ্চয়, মধুকৈটভ ও মহিষাসুর লইয়াছেন। মহাভারত
হইতে বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম রৈবতক বনে

নানাবৃক্ষ দেখিলেন (৬.১২-১৭)। যথা, আম্র, আম্রাতক, (আমড়া), ভব্য (চালতা), নারিকেল, তিন্দুক (গাব)। “আবিষকান্ স্তথা জীরান্ দাড়িমান্ বোজপুরকান্।” ইত্যাদি মহাভারত বনপর্ব (যক্ষযুদ্ধপর্ব) হইতে গৃহীত।*

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-রচনার দেশ-নির্ণয় সহজ। ইহা বিদ্যা পর্বতে নর্মদা নদীর নিকটে (৪২:২)। সে দেশ অতিশয় গ্রীষ্ম। সে দেশে করন্ত-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প কর্দম মিশ্রিত করিয়া নির্মিত) কুন্তমধ্যস্থ শীতল সমীরণ স্নখ-সেবা হইত (১৩.৫)। (বোধ হয় বালিয়া মাটির কলসীতে জল রাখিয়া তাহার উপরিস্থ বায়ু বায়ুপ্রেরক যন্ত্রদ্বারা ধনাঢ্য ও স্নখী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। আমি কটকে এক মোহস্তের ছুই হাত ব্যাসের তাম্র-নির্মিত বায়ু-প্রেরক দেখিয়াছি। বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন ঘুরায়।) তালবৃন্ত, অনিলস্থান, চন্দন, উশীর (বেনামূল, খসখস) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত (১৪:১৮)। ষটিযন্ত্র দ্বারা কুপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (১১:১৬)। ধাতু, ঘব, গোধূম, মুদগ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর চাষ হইত (১৫:১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, ছুকুল, কাপাস, বিশেষতঃ কোশেয় ও পত্রোর্ণ পাওয়া যাইত।

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট। ‘মধ্যপ্রদেশ’ এই নামে দেশ বুঝিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদেশ বলিব। এই প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে। বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র একপ্রকার আচার-ব্যবহার, একপ্রকার সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা। নাগপুর প্রদেশে এই তিন বিষয়ে ঐক্য নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মরাঠা, দুই ভাষা। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। ব্রাহ্মণ ও কুম্মী নিরামিষাশী, অগ্র সকলই আমিষাশী। পূজা বলিতে এক গণেশ-পূজা আছে, অগ্র পূজা নাই। পরব আছে। নবরাত্রে পূজা নাই, ইহা এক পরব। নবরাত্র কৃষকদের পরব। তাহার নবরাত্রের পরের দিন গোধূম বপন করে। শারদীয়া পূজার সময় পনের দিন “রামলীলা” নামক যাত্রাগান হয়। অথচ কয়েক বৎসর হইতে কোথাও কোথাও কালীপূজা হইতেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়

এক বিজ্ঞ বহুতীর্থদর্শী আমায় বলিয়াছেন, তিনি গংগা-পূজার মহাষ্টমীতে জবলপুর নগর হইতে টোঙ্গায় আরোহী হইয়া তের মাইল দূরে শ্বেত পাড়া দেখিতে যাইতে-ছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-পাঁচখানি মুন্সায়ী সিংহবাহিনী দশভুজার পূজা দেখিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে এককালে কোথাও কোথাও শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক পূজা ছিল। জবলপুরে ষোড়শ যোগিনীর মন্দির আছে। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ভৈরবীর পূজা হয়। জবলপুর নগর হইতে নর্মদা ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

জবলপুরের দিকে গোধূমের চাষ হয়, কুপ হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। কেহ কেহ ষটিযন্ত্রদ্বারা জল তোলে। অগ্র উপায়ও আছে। কবি কামরূপ গিয়াছিলেন। সেখানে “সিদ্ধক্ষেত্রে” ভাস্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন (১০৯৩৩)। বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬.৮)। ‘ময়নামতীর গানের’ ও ‘গোরক্ষবিজয়ের’ বিজয়নগর। কদলীরাজ্য আসামে। তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে? তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০:২২) আভিচারিক ক্রিয়া (১১৭) ও তান্ত্রিক যোগের (৩৩) উল্লেখ করিয়াছেন।

নাগপুরে প্রথর গ্রীষ্ম। ভারতের আর কোথাও তত গ্রীষ্ম হয় না। বিশেষতঃ জলের অভাবে লোকের আরও কষ্ট হয়। নদীকূলে বালিয়া মাটিতে অল্প তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তালবৃন্ত অল্প আসে। বাঁশের সরু টাঁচের পাখা অধিক প্রচলিত। স্নখী ও ধনী লোকে খসখসের পর্দা জলসিক্ত করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইয়া দেয়। বোধ হয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকূলের অনেক বর্ণনা আছে। নাগেরা মানুষ, সর্প নহে। সেই নাম হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে। পুরাণের কালে অতসীর চাষ হইত, অংগ দ্বারা ক্ষৌম ও ছুকুল নির্মিত হইত। এই দুই যন্ত্র চারি শত বৎসর অজ্ঞাত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর প্রদেশে ক্ষুন্নার নির্মিত অতসীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। নাগপুর প্রদেশে কোশেয় (তসর) উৎপন্ন হয়, কিন্তু পত্রোর্ণ (সাদা তসর) হয় কিনা, সন্দেহ। গঙ্গা ও বিদ্যাপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোট-নাগপুরে—ধেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি।*

* মহাভারতে এই সকল বৃক্ষ গন্ধমাদন পর্বতে ছিল, মার্কণ্ডেয়পুরাণের কবি বৈবস্বতক বনে আনিয়াছেন। গন্ধমাদন পর্বত, বর্তমান নাম করকোরম। এই সকল বৃক্ষ সেখানে অসম্ভব। মহাভারতের পাঠে ‘স্তথা জীরান্’ স্থানে অঞ্জীরান্ আছে, বিদ্যুৎসমাজে তর্ক উঠিয়াছে। অঞ্জীর নাম ফার্সী, অর্থ সিরিয়া দেশের মধুর বড় ডুয়ুর। মহাভারতে ঐ নাম থাকে অতীব বিস্ময়কর।—মার্কণ্ডেয়পুরাণের পাঠে জীর, এই জীর, বহু ফল-তরু; জীরক (জীরা) নামক শাক নহে। জীর, কেমন তরু তাহা অজ্ঞাত।

* নাগপুর প্রদেশের রাইপুরের কার্ধ্যাঙ্ক ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব ত্রিবিধনাথ ভট্টাচার্যের নিকট হইতে নাগপুর প্রদেশের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। এইরূপ ত্রিবিধের কার্ধ্যাঙ্ক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণের নিকট হইতে কামরূপের অনেক বিবরণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়ারকে নানা স্থান ঘুরিতে হয়, চোখ কান খুলিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ডিপ্লীষ্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব ত্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুরাণে অগ্নিশক্তি বস্ত্রের উল্লেখ আছে (৮৫।৫২), যেষ বস্ত্র অগ্নিহারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগ্নিহারা দগ্ধ হয় না? অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী নাম Asbestos. মিশর দেশের পুরোহিতেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অগ্নির অস্পৃশ্য বস্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল (৭১)। ফলজ্যোতিষ (৭২), মেঘাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বালকৃষ্ণচরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খ্রিষ্ট শতাব্দী মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল মনে হয়।

৩। দেবীপুরাণ

দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইহাতে দেবীর পূজাবিধি ও মহাশক্তি বর্ণিত হইয়াছে, অল্প কথা প্রায় নাই। পুরাণের প্রথম কয়েক পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, এক রাজগুরু রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত এই পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তিনি গুরুপূজাবিধিও দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন রাজার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তিনি নানাছন্দে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন স্মার্তচার্য্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। যেমন “ইষে মাস্তমিতে পক্ষে” ইত্যাদি ইষ মাসে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনবমীতে বিব্রশাখায় দেবীর বোধন। বর্তমান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবীপুরাণে সে সব শ্লোক নাই। এক স্থানে (৮৯) আছে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্ল নবমী পর্যন্ত সর্বমঙ্গলার পূজা করিবে। এখানে বোধন কিম্বা পাত্রী-প্রবেশের উল্লেখ নাই। আশ্বিন শুক্লঅষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা (২১), আশ্বিন শুক্লপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত পূজা (২২) বিহিত হইয়াছে। ইহার সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে।

পুরাণের দেশ নর্মদা ও বিষ্ণুপর্বতের নিকটবর্তী। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ শৈব ছিলেন (১০০)। নিকটে জৈনেরা থাকিত। কবি তাহাদিগকে পাণ্ডু বলিয়াছেন (১৩।১০)। উষ্ট্র এক যান ছিল। ষটিমুখ দ্বারা কূপ হইতে জল উত্তোলিত হইত (৩৩।৭)। শমী কাষ্ঠের অরণি হইত। বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি শ্লেচ্ছ

কৈলাশ দর্শনে গিয়াছিলেন। হিমাবৃত মানস সরোবরে স্নান ও রক্তভোজ্য কৈলাস গিরি পরিক্রম করিয়াছিলেন। তাহার মুখে না তুলিলে মুক্তবান্ পর্বতের সে পারে রুদ্রের আলয় আমার মানস নেত্রে স্পষ্ট হইত না।

জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দেবী পূজা করিত। তাহাদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, তাহারা গুপ্তাবীজের আভরণ পরিধান করিত। দ্রোণ, বিশ্ব, আত্ম, জাতি, নাগ ও চম্পকপুষ্পে পূজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর প্রচলিত ছিল না (২১.৫০)। এই সকল লক্ষণ হইতে মনে হয় এই দেশ বিষ্ণুপর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধ হয় উজ্জয়িনী এই পুরাণের দেশ (৩২)।

এই পুরাণ রচনার কাল অনুমানের কয়েকটি ক্ষণস্থূত পাওয়া যায়, এই পুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তী। কারণ, ইহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত ‘সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে’ ইত্যাদি নামের নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের তেজে পরিবৃত হইয়া জালামালা সদৃশী (১৪২)। তিনি মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় তেজে জলন্তী। কালরাত্রি মহামায়া দীপ্তকাঞ্চন-সপ্রভাতা (১২৭)। এই পুরাণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণের কারণ বিচারে বরাহমিহিরের অনুলকরণ আছে। পুরাণের নানা স্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্তু যোগের উল্লেখ নাই। (অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দে যোগ গণনা আসিয়াছে।) পুরাণকালে হুণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ অবতারের নাম, যথা—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি (৬), অর্থাৎ তৎকালে দশ অবতার গণনা বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোধ হয় দেবীপুরাণ সপ্তম খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এই পুরাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুত্র কংসসেনকে নিহত করিয়াছিলেন (১০২)। গজাননের উৎপত্তি নুতন। বিষ্ণু স্বীয় পাণ্ডিত্য মন্বন্তর করিয়া গজাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১১২)। গণেশ মূর্তির বাম হস্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমুত্র ও অভয়দান অথবা দণ্ড ও মৎস্য (৫০।৩৯)। মূর্তির দক্ষিণ ভাগে রতি নাম্নী সুরূপা যুবতী মূর্তি। মহালক্ষ্মী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মৃগ ও খট্টাঙ্গ (৫০।৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্রা (২১) কোন পুরাণে নাই। একটা উৎসব করিতে হইবে, এই ভাবিয়া রথযাত্রা (৩১) আসিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচিত্র কথা আছে।

কবি মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কবি মন্ত্রতন্ত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা করিয়াছেন। (গারুড়ী মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদি

*শরৎকালে আমের মুকুল কোথায় দেখা যায়? রঘুনন্দন-দ্বত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আত্মকল দিতে বলা হইয়াছে। ইহা কি দো-ফলা আম?

জাতি অষ্টবিদ্যা দেবীর বামাচারে পূজা করে। হৃৎদেশে, বরেন্দ্রে, রাঢ়দেশে ভোড়দেশে, কামাখ্যায়, উজ্জয়িনীতে, ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিদ্যাদেবীর অধিষ্ঠান আছে। (৩৯, ১৪৫-১৪৬)। “গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিস্তার করিতে পারে না।” এই পুরাণে সেই গুরু বহু ধন রত্ন ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিণী দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছেন। পুরাণে নবরাত্রের উল্লেখ নাই। প্রতিমায়, পটে কিম্বা শূল খড়্গ বা পাছুকায় পূজা বিহিত হইয়াছে। বোধ হয় পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবর্তিত ছিল না। আশ্বিন কৃষ্ণনবমী হইতে শুক্লনবমী পর্যন্ত পূজায় নবরাত্র আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি পীঠ স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওড়্রদেশ (ওড়িয়া), জ্মীরাজ্য (কেরল), কামরূপ, উড্ড্রয়ান (আসাম) ও বরেন্দ্র নাম আছে (৪২৮, ৯)।

৪। কালিকাপুরাণ

কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপ-পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাস-প্রোক্ত নহে। ঋষির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব বা ঋষির নাম করা হইয়া থাকে। এইরূপে মার্কণ্ডেয় মুনি কালিকাপুরাণের বক্তা হইয়াছেন। রাজার আশ্রয় বাতীত উপপুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্ত্র, পুণ্যবিধি প্রভৃতির বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কালিকাপুরাণ কামরূপে কোন রাজার অভিমতে রচিত হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কবি গ্রহ-বিগ্ন ছিলেন। গ্রহবিপ্ৰেরা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে আচার্য নামে খ্যাত। কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন। দৈবযুগ ও মানুষ্য যুগ, যুগ গণনার দুই ক্রম আছে। দুই যুগের পরিমাণে বহু অন্তর। কালিকাপুরাণে যেখানে কোন ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানেই কবি মানুষ্য যুগের উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ্যযুগ মানুষ্যের ব্যবহার-যোগ্য। কবি সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। কবে দক্ষের কতগুলি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি লিখিয়াছেন, মানুষ্য ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২।১৩)। কবে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসন্ত কালে যুগশিরা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে অর্ধরাত্রি পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর চৈত্রমাস প্রবেশের দিন। তিনি চৈত্র বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন। কবে শিব-পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বৈশাখ মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে, যেদিন সূর্য ভরণী-নক্ষত্রে প্রবেশ করেন (৪৪।৪৬)।*

কামরূপের নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ব্রহ্মা কামরূপে থাকিয়া নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩৮।১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। মহাভারতে ও রামায়ণে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দিক-নির্ণয় আছে। সে দেশ শাকদ্বীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্তরে বোধ হয় বর্তমান চিত্রল নামক স্থানে ছিল। কবি স্বয়ং জ্যোতিষী না হইলে, শাকদ্বীপী না হইলে প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামের এই কাল্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়াসী হইতেন না। মহাভারতে ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। কামরূপের এক বিখ্যাত রাজবংশ তাম্রশাসনে ভগদত্ত-বংশ নামে কীতিত হইয়াছে। বোধ হয় এই রাজবংশের পূর্ব পুরুষ আর্ষেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্তের পিতার নাম নরক। নরক দুইটি, একটি স্বর্গীয়, অপরটি ভৌম। স্বর্গীয় নরক বলির হ্রায় এক দৈত্য, ষোড়শলোকের অর্থশাস্ত্রে আছে। দেবী পুরাণে নরক যমের অন্তর্ভুক্ত। ভৌম নরক ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিজ, অর্থাৎ যে অস্থল দেশ হইতে আসে নাই। কবি দুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম নরকের পিতা বরাহরূপী বিষ্ণু এবং মাতা পৃথিবী বলিয়াছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ত্ব বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পরে দিতেছি।

কালিকাপুরাণকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগে পুরাণ, দ্বিতীয় ভাগে কামরূপের মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি। রঘুনন্দন দুইখানা কালিকাপুরাণ পাইয়াছিলেন। তিনি একখানিকে ‘হুস্তাপ’ বলিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রমাণ পূজা-বিধির। বোধ হয় পুরাণের প্রথম ভাগে পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিবর্তন আকাজক্ষিত হইতে পারিত। একটা উপহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল পঞ্চমী ত্রীপঞ্চমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবের পূজা করিবে (৫১।২৫)। অগ্র দুই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পূজা করিবে (৮৫।১০, ৮৮।২৫)। দুইটিই পূজাবিধির ভাগে আছে।

উপাখ্যান ভাগের সহিত পূজাবিধি ভাগের একা নাহি।

মহাবিশুব সংক্রান্তির পরদিন ও চৈত্র নক্ষত্র আর্দ্রার পরদিন, বর্তমান পাক্ষির ১৩ই বৈশাখ। আশ্বিনের বিষয় বাকুড়ায় বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরে মহাজনেরা সেদিন নৃতন খাতা খুলেন। সেদিন তাহাদের ‘হালখাতা’। এক উপাখ্যানে আছে, সেদিন ধর্মপূজা-প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। তাহার ডোমশিষ্যরা ১৩ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে করে।

প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা যুথীর নাম (১০।৪২), দ্বিতীয় ভাগে লবঙ্গলতা না হইয়া যুথী নাম আছে (৬৯।৫২)।

কবি প্রথম ভাগে মৎস্যপুরাণ হইতে হর-পার্বতীর বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর মৎস্রাবতার, দশভুজাদেবীর রূপ ইত্যাদি, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে দেবীর স্বরূপ বর্ণনা, “সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে” ইত্যাদি শ্লোক, দেবীপুরাণ হইতে “জয়ন্তী মঙ্গলা কালী” ইত্যাদি মন্ত্র ও পূর্ণিমাস্ত আশ্বিন মাস গণনা ও আশ্বিন কৃষ্ণনবমীতে দেবীর পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন। অভএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত হইয়াছিল। কত পরে তাহা বলা কঠিন। পূর্ব প্রকরণে লিখিয়াছি, কালিকাপুরাণের ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর আবির্ভাব হইতে মনে হয় ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাহেশ্বর যুগের পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই অল্পমান অভ্যাস্ত নয়। কারণ দেবী পুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর পূজা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালিকাপুরাণে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকাপুরাণ অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দের বলিতে হইতেছে। কত বৎসর ইহাতে নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন।

দ্বিতীয় ভাগে (৮৮.৭০) বিষ্ণুধর্মোত্তরের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অষ্টম খ্রিষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। স্থলতঃ বলা যাইতে পারে বর্তমান কালিকাপুরাণ অষ্টম হইতে একাদশ খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল। সপ্তম হইতে দশম খ্রিষ্টশতাব্দ পর্যন্ত আসামে শালভঙ্গ বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজার নিমিত্ত রাজনীতি, দুর্গ নিৰ্মাণ, পুষ্য স্নানাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ক্রীর্ধর্ষদেব (৭৩০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। বোধ হয় কবি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতের জ্ঞাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পূজাবিধি এই পুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র দুর্লভ হইতেছিল, শাণ ৫ ভঙ্গার অংশ দ্বারা নির্মিত) বস্ত্র স্থলভ ছিল (৬৮।১২)।

৫। দেবীভাগবত

বঙ্গদেশে দেবী ভাগবতের তাদৃশ প্রচার নাই। দক্ষিণ-ভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা এক প্রামাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবী ভাগবতেরও টীকা লিখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুভাগবত বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত নামে খ্যাত। বহুকাল হইতে একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে, বিষ্ণুভাগবত ও দেবী ভাগবত, এই দুই ভাগবতের মধ্যে কোনটা পুরাণ, কোন্টাই উপপুরাণ।

বৈষ্ণবদিগের মতে বিষ্ণু ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ। শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত। কোন কোন পুরাণও দেবী ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীযুত কালে তাহার “পুরাণ নিরীক্ষণে” দুই ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে সে সব আলোচনা নিশ্চয়োজ্ঞান। দুই তিন প্রকারে উক্ত তর্কের নিরাশ করা যাইতে পারে। (১) কোন্ ভাগবতে পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্ পুরাণে নাই? (২) কোন্ ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্ ভাগবতে হয় না? (৩) কোন্ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই তিন তর্ক-সংকীর্ণ আলোচনা করিয়া আমার বোধ হইয়াছে বৈষ্ণব-ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত উপপুরাণ।

বিষ্ণুভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত। দেবী ভাগবতও স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই দ্বাদশ স্কন্ধ। কবির মতে দেবী ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপপুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, কালিকাপুরাণ, নন্দিপু্রাণের নাম আছে (১।৩।১৫)। অর্থাৎ কবি তাহার পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়াছেন। এই শ্লোক পরে যোজিত মনে করিবার হেতু নাই।

কবি নানাবিধ ছন্দে তাহার পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্তু ভাষায় গাঢ়তা নাই। তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং সে সকল পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে মহিষাসুর বধ (৫ম স্কন্ধ), ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জ্বলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান (৯ম স্কন্ধ), বিষ্ণুভাগবত হইতে ব্রহ্মাসুর বধ, বোধ হয় দেবী পুরাণ হইতে সারস্বত বীজ (৩.১১) গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যাদি, মহাভারত হইতে রামায়ণ-সংগ্রহ আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের অল্পকল্পে রামায়ণ কতক দেবী পূজা লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞকর্মে পশু-বধ অহিংসা। ইহাও দেবীপুরাণ ও কালিকা-পুরাণের অল্পকরণ। বৃত্তের সহিত ইন্দ্রের “যুদ্ধং বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে” (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে বিষ্ণুভাগবতের পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ বৃত্তের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষ্ণুভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল (৯।৩৬)। ইহাও তাহার অর্বাচীনত্বের প্রমাণ, শ্রীযুত কালে লিখিয়াছেন, বিষ্ণু-পুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়াছেন। তিনি একাদশ খ্রিষ্টশতাব্দে ছিলেন। এই সকল কারণে মনে হয় দশম খ্রিষ্টশতাব্দে এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

কাশী কিম্বা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী ভাগবত রচনার দেশ। কাশীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই

পুরাণে নতন। বিষুভাগবত দক্ষিণ-ভীরতে, দেবী ভাগবত উত্তর ভারতে প্রণীত হইয়াছিল। কবি নবরাত্র ব্রতবিধি আল্পপূর্বিক লিখিয়াছেন (৩,২৬)। বসন্ত ও শরৎ দুই ঋতু যমদংষ্ট্র। চৈত্র ও আশ্বিন দুই মাসেই দেবী পূজা কর্তব্য। “পুরাণং পঞ্চলক্ষণং” কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণায়িত করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত্ত সংকলন করিয়াছেন। এই একখানি পুরাণ পাঠ করিলে বহু পুরাণ পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিয়া রচিত হইয়াছে।

৬। বৃহদ্রমপুরাণ

বৃহদ্রমপুরাণ একখানি উপপুরাণ। ইহা রাঢ়ে গঙ্গার নিকটস্থ ছগলী জেলায় রঘুনন্দনের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখের “ভারতবর্ষে” “পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস” ইতি নামে এক প্রবন্ধে “বৃহদ্রমপুরাণ” হইতে ইতিহাস সংকলন করিয়াছিলাম। আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীমন্ত সদাগরের ও কালীদহে কমলে কামিনী আবির্ভাবের পুরাণ পাঠ করি। সে পুরাণ এক এক স্লোকে বৃহদ্রমপুরাণে আছে। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এই পুরাণ হইতে দক্ষযজ্ঞ নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন।

পুরাণখানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। পূর্বখণ্ডে তৎকাল প্রচলিত দেবদেবীর পূজার ও ব্রত আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্দনে অধিক আছে। কোন কোন পূজার প্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রঘুনন্দন মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুরাণের কবি সেদিন শিবা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কালিকাপুরাণের এক স্থানে শিবের, অন্য স্থানে লক্ষ্মীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বৃহদ্রমপুরাণে এই দুই দেবীর সহিত সরস্বতী আসিয়াছেন। সরস্বতীর প্রতিমাতে প্রভেদ ছিল। এই পুরাণে সরস্বতী শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা। তাহার মস্তকে চন্দ্রকলা, হস্তে স্মৃতি বিজ্ঞা মুদ্রা অক্ষমালা (পৃ: ১৫, পৃ: ২৫।২৬) চৈত্রশুক্ল পঞ্চমী আর এক ত্রীপঞ্চমী (পৃ: ১৬)। সেদিন লক্ষ্মী পূজা।

কবি কালিকাপুরাণ মতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ কিছু মানিয়া কিছু ছাড়িয়া রামরবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া

দিয়াছেন, কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে স্ত্রীবেবের সহিত রামের মিত্রতা হয়, এবং কাটিকী পূর্ণিমায় স্ত্রীবেব ভল্লক ও বানর-গণ আনাইয়া এক মাসের সময় দিয়া সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন (পৃ: ১২)। (বাল্মীকী রামায়ণে আছে চারি মাস বর্ষার পরে যখন আকাশ সলিল নির্মল হইয়াছিল, অর্থাৎ শরৎকালে স্ত্রীবেব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কাটিক, এই চারি মাস বর্ষা ধরিয়াছেন। অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষমাসে রামরবণের যুদ্ধ হইয়াছিল।) সেই কবিই লিখিয়াছেন, রাম ভাদ্র পূর্ণিমার পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমাস্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন (পৃ: ২১।২২)। সেদিন হইতে রাবণ ও বানরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবীর অলুগ্রহ লাভার্থ আর্দ্রা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিশ্বব্রহ্মে বোধন করিলেন। আশ্বিন শুক্ল নবমীর অপরাহ্নে রাবণ ধরাতলে পতিত হইল।

কবি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস বিশ্বশাখায় পূজা করিবে। সপ্তমীতে সে শাখা গৃহে আনিয়া দিবসত্রয় পূজা করিবে। পনের (ষোল) দিন পূজা করিতে না পারিলে অষ্টমী, নবমী কিম্বা নবমীতে পূজা করিবে। কবি এক রাজার সভা-পণ্ডিত কিম্বা গুরু ছিলেন। সে রাজ্যে নিশ্চয় উক্ত বিধি অলুগারে দুর্গার অর্চনা হইত। আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী সায়াংকালে বোধন হইত না, পত্নী প্রবেশ হইত না, বোধ হয় দুর্গার প্রতিমাও নির্মিত হইত না।

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির কালে রাঢ়ে হিন্দুরাজ্য ছিল, পরিখা খনন দ্বারা দুর্গ নির্মিত হইল। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল, অলুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎকালে যবনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। কেহ কেহ যবন সংসর্গ করিত, যবন ভাষায় কথা কহিত। এই সব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুরাণখানি চতুর্দশ খ্রিষ্টশতাব্দে রচিত হইয়াছিল।*

* এই প্রকরণ সমাপ্তি কালে বঙ্গবাসী প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঐযোজ্ঞচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরাণশাস্ত্র-দান-কীর্তি স্মরণ করিতেছি।

নব-সন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৭

কয়েক দিন পরের কথা। বোধ হয় অতিরিক্ত তদারকের ষোঁকেই চম্পার সন্দেহ হইয়াছে যে ঠাণ্ডা লাগিয়া হীরকের অতিরিক্ত রকমের কিছু একটা হইয়াছে। যে কোন মুহুর্তেই বিপদ ঘটতে পারে। বুড়ী টোটকা-টুটকিতে খুব ছরত, তাহারই ফর্দ অমুখ্যায়ী বনমালী বেনের দোকান হইতে গাদাধানেক শেকড়, শুকনো পাতা আর গাছের ছাল কিনিয়া আনিয়াছে। সেগুলি বাঁধা ছিল একটা আন্ত খবরের কাগজে, হাতে হাতে সেটা কি করিয়া টুলুর বারান্দায় আসিয়া পড়ে।

টুলুর নজরে পড়িতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে ও জিনিষটা দুর্লভই। বহুদিন পরে চলমান জগতের সঙ্গে একটা যোগাযোগ অনুভব করিতে করিতে টুলু অসমভাবে এক ধার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, একটা কারাগার আসিয়া তাহার দৃষ্টি যেন আটকাইয়া গেল : কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলিদের একটা বড় রকম বর্মঘট হইয়া গেছে—কিছু খুনজখম হইয়াছে এবং আশঙ্কা আছে যে ব্যাপারটা শীঘ্রই বরিয়। আর রাগিগল্প অঞ্চলের স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। উপরে তারিখটা দেখিয়া টুলু বুঝিল কাগজটা টাটকা। টুলুর জ-মুগল অঙ্গে অঙ্গে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সংবাদশব্দে এ বিষয়ে আর কিছুই নাই, তবু এই স্বত্রটুকু বরিয়। তাহার মাষ্টারমশাইয়ের কথা যেন বড় বেশী করিয়া মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। মাষ্টারমশাইয়ের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার কোন সম্বন্ধ থাকি। সম্ভব কি? ভাবিয়া দেখিলে অসম্ভব নয়, তবু এত বড় একটা ব্যাপক কাণ্ড যে তিনি কি করিয়া ঘটাইতে পারেন যেন মাঝায় আসে না। শুধু তাহাই নয়, একটা বেদনাও অনুভব করে টুলু—মাষ্টার-মশাই এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন যাহার পরিণামে খুনজখমও আসিয়া পড়ে। সেই নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, যুগে না হয় আবেগের মাধ্যম আসিয়াই পড়িত এখনকার রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু উগ্র মন্তব্য, তাই বলিয়া হাতে-কলমে এমন একটা কাণ্ড ঘটাইয়া বসিবেন যাহার পরিণাম নরহত্যা। টুলু নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে, যেন মাষ্টারমশাইয়ের হইয়া ওকালতি করিতেছে, কৈ একটু-আধটু উগ্র মন্তব্য মাঝে মাঝে করিলেও এমন তো কিছু বলেন নাই বা করেন নাই যাহাতে তাঁহাকে এ ধরনের মানুষ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। খনির অভিজ্ঞতার সেই প্রথম দিনের কথা—টুলুই বয়ঃ ধ্বংসের কথা তুলিয়াছিল, প্রমাণ করিয়াছিল—“ওগুনো বুদ্ধিরে দেওয়া যায় না মাষ্টারমশাই?” উত্তরে মাষ্টার-মশাই বলিয়াছিলেন—“যদি সম্ভব হ’তই তবু উচিত হ’ত না টুলু।...সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘোরাতে যাওয়া

অস্বাভাবিক, আর সেই জন্তে বোধ হয় পাপও।” আরও মনে পড়ে টুলুর; বলিয়াছিলেন—“এবার দুঃখ দিয়ে তোমের মন্দিরে দেবতা-প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে—আনন্দ-দেবতার।”...না, ভাঙনের মজ মাষ্টারমশাইয়ের যুগের মজ নিশ্চয় নয়। তাহার পর চিঠিতে টুলুকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন সে সবই তো মাত্র শাস্ত, নিকপত্রব সেবার উপদেশ। তাহাতে সংস্কারের কথা যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ অল্প ধরনের সংস্কার। এই লোক ক্ষেপাইয়া অযথা কাজ অচল করিয়া তোলা নয়—এটা পুরাপুরি জানিয়াও যে যাহাদের ক্ষেপাইয়া তুলিলাম, শেষ পর্যন্ত পরিণামটা তাহাদেরই পক্ষে হইয়া পড়িবে সবচেয়ে মারাত্মক।...টুলুর স্বভাব-কোমল মনে বেদনা জাগে—যখন যাহা বলিয়াছেন সে সব হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের মনের কাছে সঞ্চার করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায়—না, মাষ্টার মশাই ও-ধরনের মানুষ নয়; খুনজখম?—মাষ্টারমশাই আছেন তাহার মধ্যে?—না, অসম্ভব...

সমস্ত দিন তর্ক চলিল, বাছা বাছা প্রমাণ দিয়া মনটাকে শান্তও করিল টুলু। তাহার পর খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার একটু পরে যখন বাসায় ফিরিল, দেখে বারান্দায় একটা লোক বসিয়া আছে। টুলুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে প্রশ্ন করিল—“আপনার নাম টুলু বাবু?”

টুলু উত্তর করিল—“হ্যাঁ।”

“ভালো নামটা...?”

“নিতাইপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।”

লোকটি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন মিলাইতে-ছিল, বলিল—“আপনার একটা চিঠি আছে।” পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। টুলু প্রশ্ন করিল—“কার চিঠি?”

উত্তর হইল—“ধরের ভিতর গিয়ে পড়ে দেখুন, আমি শুতক্ষণ বসছি এখানে।”

কেমন যেন একটু ধাপছাড়া কাণ্ড। যুগের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া টুলু ভিতরে চলিয়া গেল। খামটা বড়, ছিঁড়িয়া দেখিল চিঠিটাও বড় চিঠির কাগজের পাঁচপান্না পাতা জুড়িয়া লেখা; প্রথমেই শেষের পাতাটা উন্টাইয়া দেখিল লেখক মাষ্টারমশাই। আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল—

স্নেহান্বিত,

আমার আচরণে আমি নিজেই অস্বস্তি বোধ করছি, কিন্তু কোন উপায় ছিল না, একবার মুখ্যমি করে আমার অতিরিক্ত সাবধান হয়ে পড়তে হয়েছে; আমার প্রথম চিঠির কথা বলছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। সেটা যে কোথায় পৌঁছাচ্ছে এবং কি

অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে, আমি কতক কতক টের পেয়ে বাকিটা আন্দাজ করে এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি, অবশ্য তোমার ক্ষমতা। ওর পরে আর ডাকের হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া চলত না কোন চিঠিকে, অথচ এমন একজন নির্ভরযোগ্য লোক পাচ্ছিলাম না যাকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়ে এতদূর পাঠানো যায়। আরও ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয় লোক ছিল, তবে বাড়তি লোক ছিল না, যে কয়জন ছিল তাদের এ তজ্জাটি থেকে নড়বার উপায় ছিল না একটা দিন।

অথচ তোমার বলবার কত কথা।—পেট ফুলছিল আমার। শিক্ষা, সংস্কার বা তোমার মনের স্বাভাবিক প্রবণতা—যে জেতেই হোক তুমি একটা রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমায় সেই রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসেছি। তোমায় ধর্মাস্ত্রিত করেছি বললেও ভুল হয় না। কি জেতে এমন করা সেটা তোমায় ভালো করে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। তোমায় মাঝে মাঝে যে সব কথা বলেছি, যে সব তর্কবিতর্ক হয়েছে আমার সঙ্গে, আমার পূর্বকার চিঠিতেও যে কথা লিখেছি সে সব থেকে তোমার একটা ধারণা দাঁড়িয়েছেই আমি কি প্রত্যাশা করি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সে ধারণাটা অসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ এই মনে করে তুমি বসে থাকতে পার যে তুমি নিরীহ, নিরুপদ্রব সেবাস্বার্থে পাকা হয়ে উঠলেই আমার মনের অভিল্যাস পূর্ণ হবে; আমি সন্তুষ্ট হব। এই রকম একটা অসম্পূর্ণ ধারণা থাকার কারণ এই যে আমার সহজেই তোমার ধারণাটা অসম্পূর্ণ, সেইজন্মে আমার পরিচয়টা একটু পূর্ণতর করিয়ে দিয়ে আরম্ভ করি।

“পূর্ণতর” কথাটা আমি জেনে শুনেই ব্যবহার করলাম, কারণ আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা আজও দিতে পারব না, একটু রেখে-ঢেকে দিতে হবে; কিম্বা হয়তো দেওয়া নাও দরকার মনে করতে পারি, তবে তার জন্মে কিছু এসে যাবে না।

তুলা, আমি আমার নিজের চেহারাটা আর প্রকৃতিটা মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেখছি। শুষ্ক, শীর্ণ, বড় বড় চুলের ছায়ায় মুখটাতে একটা শান্তভাব; গায়ের রংটা গৌর, কিন্তু তাতে উজ্জলতার উগ্রতা নেই—এই হ’ল আমার চেহারা। প্রকৃতির দিক দিয়ে আমি হালপ্রবণ, কড়া কিছু বলতে গেলে সেটাকে রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে হালকা করে ফেলি অনেক সময়। এক একবার লোকের কাছে কিম্বা নিজের মনের কাছে ইঠাৎ জলে উঠে কিছু একটা করে বসি—যেমন এই রকমই একবার জলে ওঠবার ঝোঁকে তোমায় ধর্মাস্ত্রিত করেছিলাম; কিন্তু মোটের উপর বাহিরে বাহিরে আমি শান্ত। এমন লোক যে নিরীহ সেবার বেশী কিছু প্রত্যাশা করতে পারে সহসা এমন খেয়াল আসতেই পারে না মনে। কিন্তু আজ তোমায় বলি, আমি অন্তরের দাহভেদেই শুষ্ক, আর যে আগুন আমার দহন করে বাইরে তার প্রকাশ এ

রকম ক্ষণিক আর আকস্মিক হলেও ভিতরে সেটা অনিবার্যই রয়েছে। কিন্তু যেন ভুল বুঝো না, এ আগুন আমার তৈরী নয়, পরম্পর প্রাণের প্রাণ; অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা নিয়েই আমি একে জ্বীয়ে রেখেছি আমার অন্তরে। এই আগুনের দীক্ষা আমার সেই যুগে যে যুগটাকে নাম দেওয়া হয়েছে বাংলার অগ্নিযুগ। যেমন গালভরা নাম সে অল্পপাতে কাজ হয়ে ওঠেনি। তার অনেক কারণ, আর সে ছুৎখের গান গাইবার এটা অবসরও নয়, তবে এটা খাঁটি সত্য যে বাংলার যুব-চৈতন্য সেদিন অত্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্প নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল এক হিসেবে সজীব—বদ্ধভঙ্গ রোধ করা; কিন্তু বদ্ধপনিকর হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যাপক, সে দেখলে মূল অত্যাচার, অর্থাৎ পরাধীনতার মধ্যে। বাঙালী ভারতের আর সবাইকে ডাক দিলে, আগুন পড়ল ছড়িয়ে।

এ ইতিহাসের এই পর্যন্ত থাক তুলা। তুমি এরসের রসিক না হলেও কতক কতক জান। এর পরের যা ইতিহাস তা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। স্বাধীনতার সাধনা চলল, কিন্তু যে ধর্মকে আমরা বরাবর গুরু করতাম, তাই চুকে সাধনার ধারা দিলে বদলে। আমাদের ছিল গীতার ধর্ম—অত্যাচারীকে করতে হবে হনন; তার জায়গায় যা এসে উপস্থিত হ’ল তা সেই একই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে থাকলেও একেবারে উল্টো প্রকৃতির—হনন বা হিংসার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এই “অভিনীতলমলয়ানিল”র দেশে তারই হ’ল জয়, আমাদের আসর ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হ’ল। স্বাধীকার করব না, মনের আকোশেই আমি ভক্ত কবির রচনা থেকে এই উদ্ধৃতিটুকু করলাম, তুমি রাগ করো না কিন্তু; আমি তো অহিংসার বিশ্বাসী নয়; আমরা যে আগুন জেলেছিলাম সে তো বুদ্ধবুদ্ধি হয়ে গেল ঐ দিক দিয়ে, মনের ছুৎখে এটুকু আকোশ বা রাগ না প্রকাশ করলে আমি যে আমার ধর্মের কাছে পতিত হই।

যাক, এটুকু অবাস্তব। আমাদের অনেকেই গেল ধ্বংস হয়ে। অনেকের বুকের আগুন গেল চন্দনশীতল হয়ে, অনেকে আবার নিজের বুকের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। কিছু রইল বেঁচে, তার মধ্যে আছি আমি। আমিও দগ্ধ, তবে নিঃশেষ হই নি, বুকের আগুন ছড়িয়ে বেড়াবার নেশা নিয়ে আছি বেঁচে।

কিন্তু লক্ষ্য গেছে বদলে। বদলে যাওয়া কথাটাও ঠিক নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত; যুগের সে এক তো আছেই। এক একবার যখন ভাবি, মনে হয় এই ঠিক হয়েছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধেই আগুন জালানো, কিন্তু অত্যাচার তো ঐ বিদেশীর অত্যাচারের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি তুলা। ওটা আমাদের ছুৎখের মূল, জাতিহিসেবে একটা অসদৃশ্য পরিণতির অন্তরায় এটা সর্বাঙ্গকরণে স্বীকার করি, কিন্তু অত্যাচার তো

এখানেই শেষ হয়ে গেল না ? স্বার্থের আকারে, লালসার আকারে, সে তো জীবনকে প্রতিনিয়তই নিষ্পিষ্ট করে চলেছে—হোঁষায়, হোঁষায়, সর্বত্রই। অত্যাচারের তো স্বাধীনতা পরাধীনতা নেই। সমাজে অত্যাচার—নীচে থেকে যারা তোমার জীবনকে সুন্দর, সহনীয় করে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের পশুর চেয়েও নীচু করে রাখছ; স্বার্থে অত্যাচার, উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রবল অত্যাচার—বেশী দূর না গিয়ে গঞ্জভিহির কতর্পাড়া আর বস্তির ভারতম্যটা মিলিয়ে দেখো, হীরকের জন্মের দৃষ্টটা মনে করো, গর্ভের বোঝার ওপর কয়লার বোঝার চাপে ওর মাকে পুত্রমুখ দেখবার আগেই চোখ বুজতে হ'ল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যাচার—সেখানে সাংঘ্যের নামে যে কত বড় বৈষম্য মাথা উঁচু করে চলেছে তার হিসেব হয় না। এ সব শুধু আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, স্বাধীন পরাধীন সব দেশেরই। মানুষের ছুটে বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়—অত্যাচারী প্রবঞ্চক, আর অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত। এখানে আবার তুমি আমার ভুল বুঝতে পার, মনে করতে পার যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জায়গা না পেয়ে আমরা বাজে কাজের বড়াই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। মোটেই নয়। আমরা জানি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরাই, ও রত্ন কেউ হাতে তুলে দেয় না—ভিক্ষায় নৈবচ নৈব চ। সব চেয়ে বড় অত্যাচার এক দিন আমরাই সব চেয়ে বড় আশ্রয় জেলে দগ্ধ করব, ইতিমধ্যে আমাদের ছত্যাশনে ছোট ছোট আহতি চলতে থাকবে। অগ্নিহোত্রে ছোট ছোট ইন্ধন দিয়ে প্রতি দিনের আশ্রয় রাখে জালিয়ে—তার পর একদিন বিশেষ ইন্ধনে করে বড় যন্ত্রের অগ্নিহোত্রে।

তোমাদের মাষ্টারমশাইয়ের একটা পূর্ণতর পরিচয় পেলে টুঙ্গ। এবার তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা যে কি তার বোধ হয় কতকটা আশ্রয় পেয়েছ। ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট করি।

আমি এই রকম একটা আহতির আয়োজন করেছি সম্প্রতি; বনি অঞ্চলে আমি অশান্তির আশ্রয় জাললাম। নানা কারণেই ভেবেছিলাম একেবারে বাড়াবাড়ি না করে ধীরে অগ্নিহোত্রে—সেবার মধ্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, যেমন তোমার দিয়েছিলাম নির্দেশ, কিন্তু হীরকের জন্মের দৃষ্টটা আমার বুকের আশ্রয় দাউ দাউ করে জালিয়ে দিয়ে আমার ঘরছাড়া করে নিয়ে এল এখানে। আমি এখন ঝুরিয়া-অঞ্চলের একটা জায়গায়। দিনচারেক আগে ছিলাম কাতরাসগড়ের দিকে, সেখানে কয়েকটা বনিতেই জালিয়ে দিয়েছি বিদ্রোহের আশ্রয়। কিছু লোককে পুড়তে হ'ল, তা পুড়ুক, না হয় আরও কিছু পুড়বে, তারা কিন্তু আর সবাইয়ের জন্মে মানুষের অধিকার অর্জন করে দিয়ে যাবে। এখানে এসেছি, হুঁপাচ দিনের মধ্যেই জলবে আশ্রয়, তার পর অল্প প্রান্তে, তার পর আবার অল্প—বাংলা-বিহারের বিরাট বনি-চক্রে আমি

আশ্রয়ের মালা জালবড় বড় দামী মালা টুঙ্গ, অগ্নিমূলের অগ্নি-মালা বলতে পার। ক্ষমা করতে পারি যদি কথা পাই যে মানুষকে ওরা মানুষের মর্দাদা দেবে—ওদের এলাকায় হীরকের মায়ের মত যুতু, চরণদাসের মত ধ্বংস, আর চম্পার মত অধোগতি আর সম্ভব হবে না। কি করে করছি কাজ ? বছরদিন থেকেই আমি আছি এ কাজে—অবশ্য ভুল কাজের সঙ্গে সঙ্গে—অনেক জায়গায়ই তোমার মত ঝাঁটদার বসিয়ে রেখেছি, অনেক দিন থেকে, যখন কাজ আরম্ভ করা দরকার বুঝলাম তখন আর বিশেষ বিলম্ব হ'ল না।

এবার তোমার কথায় আসা যাক। কোন এক সময় তর্ক-সূত্রে তুমি আমার জিজ্ঞেস করেছিলে আমি শক্তিপুঞ্জীয় বিদ্বানী কিনা। তখন অল্প রকম উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তোমায় বলি আমার মত শক্তিসাধক আছে কে ? আমার খঞ্জের তুচ্ছ বলিতে পিপাসা মেটে না তার চাই নয়-বলি। আজ আমি বনি নিয়ে পড়েছি, কিন্তু এর আগে অনেক জায়গাতেই আসন পেতেছি আমার। অনেক বলি পায়ে দিয়েছি মায়ের—বাছা বাছা। তোমাকেও সেই রকম একটা বলি করে তোয়ের করব, তার পরে করব উৎসর্গ, এই আমার অভিশ্রব। তোমাদের মত বলি দিলেই তো আমার সিদ্ধি হবে বিরাট, অমোঘ।

তোমায় তিনটি কাজ দিয়েছি—সেবা আর শিক্ষা অঙ্গের, তার কতদূর কি হয়েছে আমি অল্প অল্প খোঁজ পাই টুঙ্গ, কেমন করে সে রহস্য এখন ভাঙবে না। অবসর পেলেই তোমার ওখানকার চিত্রটা মনে মনে একে নিয়ে যুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, কিসে অপরাধ ছবি। এর আগে তোমায় লিখেছি তোমায় আমি ধর্মাস্ত্রিত করেছি, কিন্তু কৈ, তুমি তো সেই সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীই আছ, শুধু এক নতুন রূপের সন্ন্যাস। তুমি গৃহহীন হয়েও গৃহী—নির্বিকার চিত্রে চম্পাকে দিয়েছ পাশে ঠাঁই, সন্তানহীন হয়েও তুমি যেন জনকের প্রতীকমূর্তি হয়েই হীরককে নিয়েছ নিজের বুকে তুলে। তোমার সর্বাঙ্গ-করণে পিতা-জননী-পুত্র, অথচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। দেহাতীত শুদ্ধ সহজের সূত্রে বাঁধা তোমরা তিন জনে। এমন অপরূপ জিনিষ আমি কল্পনায় আনতে পারতাম না—নিজের দরকারে কে যেন ঘটয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিষের ব্যাপক পূর্ণতর রূপের কথা ভাবতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই একেবারে।

কিন্তু স্বয়ংতো সেরূপ কোটিবারই অবসর পাবে না, সেই কথাই বলছি :

আমার আর আর শিষ্যের সঙ্গে তোমার মনের প্রভেদ আছে বলেই এ জিনিষটি তোমার জীবনে সম্ভব হয়েছে। তুমি আরও শিশুকে বুকের কাছে টেনে নাও, আরও নারীর জীবনকে কলুষযুক্ত করো, চরণদাসের মত আরও যারা আছে তাদের এক এক করে তুলে ধরো। এই তোমার ব্রত হোক, কেননা এই তোমার জীবনের সত্য।

তবু যে এর মধ্যে একটা “কিন্তু” আছে—তোমার জীবনের পত্যের পাশে পাশে যে আছে ওদের জীবনের সত্য। ওরা তোমায় দেবে না সুশৃঙ্খলার কাজ করতে। তাই সর্বক্ষণই তোমায় ছেনে রাখতে হবে যে যা কিছুই করতে যাও, যত শান্ত ভাবেই করতে যাও, পরিণাম সংঘর্ষই। ভালো ভাবে লোককে ভালো হতে দেওয়া ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাই যদি কাজ করে যাও তো সংঘর্ষ এক দিন আসবেই, প্রস্তুত তোমার অষ্টপ্রহরই থাকতে হবে। অনেক সময় আবার দেখবে যে সংঘর্ষটা যদি প্রয়োজন বৃক্ তুমিই আরম্ভ করতে পার তো সেইটাই শ্রেয়ঃ। সংঘর্ষটা হবে ওদের সঙ্গে কিন্তু কাদের নিয়ে সেটা নিশ্চয় বৃক্তে পারছ। খনির লোকদের সঙ্গে মনপ্রাণ দিয়ে মেশো ধীরে ধীরে। দেখবে কি ওদের প্রাণ, কত মেশবার যুগি ওরা, কত অল্পে সাড়া দেয়। ওদের কাণে মম্ব্যাত্তের মন্ত্র দাও, নিজের অধিকার সম্বন্ধে ওদের সচেতন করে তোলো, দেখবে যখন সংঘর্ষ হবে তখন, যারা ওদের মাছুষ বলে মানলে না, এক কথাতাই তাদের বিরুদ্ধে মাথা ঝাড়া করে উঠবে। কিন্তু এই সংঘর্ষে তোমার আত্মিক বা নৈতিক বিজয় অনিশ্চিত হলেও যে দৈহিক ক্ষেত্রেও তুমি জয়ী হতে পারবে এমন তো বলা যায় না। কাতরাসগড় অঞ্চলে আমার একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে হারামাম একদিন, বলি তুলে দিলাম আর কি, তোমাকেও তো ঐ পরিণামের জন্তে তোয়ের থাকতে হবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখি, কান্কে আগে যেতে হবে কে জানে, হয় তো আমিই আর বলবার সময় পাব না। আমার টেবিলে অনেকগুলি মোটা মোটা ইংরেজী বই আছে, বহু নব নব ‘ইজমের’ অর্থাৎ মতবাদের বই। আমার সব পড়া, তুমিও হয় তো পড়েছ কিছু কিছু, তাই থেকে মনে একটা ধারণা জন্মে যেতে পারে আমিও কোন একটা মতবাদের দাস। না, মোটেই নয়, এখানে আমি একেবারে মুক্ত রৈখি নিজেই, আর তুমিও চিরদিন রেখো। দেখলাম মতবাদে জড়িয়ে থাকলে তার মধ্যকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে হয়। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা কারণে আমি খনি-গত অজ্ঞানের সামনে এসে পড়েছি বলে, কোন ‘ইজমের’ দাসত্ব করছি না। এর আগে অজ্ঞত করেছি কাজ, আজ এখানে আবার কোথায় সুযোগ পাব অজ্ঞানের কোন অভিনব রূপের সামনা-সামনি হতে কে জানে? শুধন ধ্বংস করবার জন্তে শক্তি-সাঁধনা করব নব ভাবে। এই আমার ব্রত।

এই শক্তি-সাধনার মধ্যে দিয়ে, শক্তিমত্তার জন্তই, ভ্রান্তি অজ্ঞান তো আমার নিজের মধ্যেও এসে বাসা বাঁধতে পারে, তখন হ্রিমমত্তার মত নিজেই বলি দেবার শক্তি যেন অবশেষে আসে একটু।

তুমি আমার প্রত্যাশার কথা জানলে এবার। কি তোমার

উত্তর—ইদ্রিতে অল্প কথায় এই লোক মারফত জানিও। যদি সাধ্যাভীত মনে করে তোমায় রেহাই দোব।

আমি আরো কিছু দিন থাকব অল্পপস্থিত। আশীর্বাদ নিও।

ইতি—মাষ্টারমশাই

২৮

নিভান্ত অবস্থিকর একটা পত্র—পড়িয়া বুঝা যায় না অহুত্বিটা ভয়, বিষয়, আনন্দ বা নিরাশার। হাতে করিয়া টুল অনেকক্ষণ শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা চিঠি পড়ার পক্ষে এত বিলম্ব হইয়া গেল যে লোকটি উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, এবং তাহাতেও টুল মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না পারায় প্রস্থ করিল—“হয়ে গেছে পড়া চিঠিটা?”

টুল ফিরিয়া চাহিল, উত্তর করিল—“হ্যাঁ, হয়ে গেছে।”

“কি বলব তাঁকে? লিখে দেবেন কিছু?”

টুল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল—“বলো যেমন লিখেছেন সেই রকমই হবে।”

চিঠিটাতে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল; পড়িতেছে না কিছু, ভাবিতেছে। একটু পরে যখন চোখ তুলিয়া তাকাইল, দেখে লোকটি নাই। ডাক দিতেও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন টুলর ভাল করিয়া সন্ধি ফিরিয়া আসিল।

লোকটি চলিয়া গেল নাকি? আহা নাকি করিয়াই? আর সামনে রাত্রি। এতক্ষণে আর একটা কথা মনে পড়িল, বেশভূষার লোকটি হুজি-কারকুন বলিতে যাহা বুঝায় অনেকটা সেই রকম, বারান্দার পাতলা অন্ধকারে মনেও হইয়াছিল সেই রকম টুলর; এখন কিন্তু হঠাৎ মনে হইল, দরজায় আসিয়া সে যখন দাঁড়াইল, ঘরের আলোর টুল যেন তাহার মুখে ভ্রমশ্রেণীর কমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছিল। বড় অজ্ঞানত্ব ছিল, তখন ভাবিয়া দেখে নাই এতটা। এখন মিলাইয়া মনে হইতেছে—হ্যাঁ, ঠিকই তো তাই।

আর ভদ্রই হোক, কুলি-কারকুনই হোক, এইভাবে অনাহারে গেল। মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তখনই বাহিরে গিয়া খানিকটা ডাকাডাকি করিল; একবার গল্পের দিকে একবার বালিয়াড়ির পথে খানিকটা আগাইয়াও গেল, কোনরকম সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই লইয়া মনের খুঁখুতানিটা কিন্তু অল্প সময়েই কাটয়া গেল। একটু মনস্থির করিয়া ভাবিতেই বৃক্তে পারিল—নিশ্চয় মাষ্টারমশাইয়ের এই রকমই নির্দেশ ছিল—তা না হইলে এমন বেখাপ্পা কাজ কেন করিবে লোকটি? চিঠিটা পাঠাইতে মাষ্টারমশাই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, একটা ফালতো লোক বাসায় থাকিয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটা নিশ্চয় চান না তিনি। অহুরোধ করিলেও নিশ্চয় থাকিত না; চতুর লোক, সুযোগ বুঝিয়া অহুরোধ

করিবার অবসরই দিল না। টুলু আর এদিকটায় মন দিল না,
 • শুধু মাষ্টারমশাইয়ের পার্শ্বচরদের চারি দিকেও কতটা রহস্য,
 • সেটা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তাটা আবার তাঁহাকে শিখাই
 আশ্রয় করিল। মাষ্টারমশাই তাহা হইলে একজন বিপ্লবী।
 টুলুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তবে শোনা আছে বাংলার অরিয়গের
 কথা—আলিপুর বোমার মামলা, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর;
 ক্ষুদ্রাঘের ফাঁসি, গীতা হাতে করিয়া নাকি ফাঁসিকাঠে ওদের
 সবাই উঠিত; কে একজন, নাম মনে পড়িতেছে না—ফাঁসির
 হুকুম থেকে ফাঁসিকাঠে ওঠার কটা দিনের মধ্যে নাকি ওজন
 বাড়িয়া গিয়াছিল। টুলু যখন স্থলের নিচের ক্লাসে তখন এ যুগ
 অন্তিমিত তখনও কিন্তু গানের ক্ষেত্র রহিয়াছে আকাশে-বাতালে,
 —মেঠো সুরের হুটো লাইন এখনও কাণে লাগিয়া আছে টুলুর
 —“একবার বিদায় দাও মা, ফিরে আসি, ভাই কানাইয়ের
 দীপ চালান মা, ক্ষুদ্রাঘের ফাঁসি।”, যতীন দাসও এ পছন্দই
 ছিল না? চৌষটি দিনের দিন জেলে অনশনব্রতে প্রাণ দিয়া
 অজ্ঞানের বিক্ষিপ্তে নিফল আক্রোশ মিটাইয়া গেল।

যত নাম মনে আছে সবার একটা বিরাট মিছিল টুলুর
 চোখের সামনে দিয়া ধীরে ধীরে অনন্তের পানে মিলাইয়া
 গেল। গৌরবে কতবার বুক গেছে ভরিয়া, আজও যায়।

কিন্তু তবুও অস্বস্তি বোধ হইতেছে মাষ্টারমশাইয়ের এই
 নুতন রূপের সামনাসামনি আসিয়া। যাহাদের লইয়া এক দিন
 বাঙালী হইয়া জন্মানোয় আসিত গৌরব—আজও আসে—
 তাহাদের একজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া মনটা
 যাইতেছে যেন সঙ্কুচিত হইয়া, ভয়ে নয় অশ্রদ্ধাতে ত নম্রই,
 তবে কিসে?

এর উত্তর টুলু খুঁজিয়া পাইল না তবে এটা বুঝিল যে
 যাহাদের বৃকে এত জালা তাহাদের সহিত সমান তাগে পা
 ফেলিয়া চলায় মন তাহার সায় দিতেছে না। আগে কতবারই
 যেমন মাষ্টারমশাইকে পরিহার করিতে চাহিয়াছে—শ্রদ্ধা-
 সত্ত্বেও, আজও সেই রকম একটা দিন আসিয়াছে—স্বাভাবিক, এই
 চিঠি পাওয়ার পর শ্রদ্ধা যখন আরও কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া
 উঠিয়াছে—মাষ্টারমশাইয়ের নির্দেশের অমর্যাদা করিয়া তাঁহাকে
 ছাড়িয়া যাওয়া যখন নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতই
 অসম্ভব।

মনে তো পড়ে না এত বড় অশান্তিতে টুলু আর কখনও
 পড়িয়াছে কিনা। সমস্ত রাতটা এই ভাবেই কতকটা অনিদ্রার
 মধ্যেই গেল কাটয়া।

সকাল থেকে আবার কাজের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটা
 অনেকটা মিলাইয়া আসিল। আজকাল কিছু কিছু কাজ
 থাকে হাতে; নিত্যন্ত দুরকারী যে কাজই এমন নয়, তবে এটা
 ওটা সেটা দিয়া একটা রুটিন গড়িয়া লইয়াছে; সময়টা কাটে
 এক রকম করিয়া, সকালে বুড়ীর ঘরে গিয়া ছেলে আর
 মেয়েটিকে তোলে, বুড়ী যদি উঠিয়া পড়ে একটু-আধটু গল্প হয়,

বুড়ীর জীবনের যদি সে রকম কিছু আসিয়া পড়িল তো
 অনেকখানি; তাহার পর দুটিকে সঙ্গে করিয়া যায়
 বনমালীর বাসায়। বেশ বড় একটা জটলা হয়, এদিকে
 এরা তিন জন, ওদিকে বনমালী, চম্পা, প্রহ্লাদের বো।
 জটলাটা হয় হীরক আর প্রহ্লাদের শিশুটিকে কেন্দ্র করিয়া
 —দুটোই ধীরে ধীরে চান্দা হইয়া উঠিতেছে—বিশেষ
 করিয়া প্রহ্লাদের শিশুটি আরও যত্নে আরও হঠপুঠ হই-
 য়াছে, বেশী লোকের সাহচর্যে আরও বেশ চনমনে, ঘাটিয়া-
 ঘুটিয়া লুকিয়া দোলাইয়া বেশ সাড়া পাওয়া যায়। এ বাসার
 আসল টান অবশ্য হীরক। কয়দিনেরই বা? কিন্তু অপূর্ব-
 সূন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আর একে লইয়াই তো জীবনের
 এদিকে পা বাড়ানো টুলুর, তার এমন দেবশিশুর মত হইয়াও
 ওর জীবনের ঐ সুগভীর ট্রাজেডি সব মিলাইয়া একটা অদ্ভুত
 মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ছেলেরা। এই মায়ার জড়
 এখনও ওকে লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিতে সঙ্কোচ হয় টুলুর,
 স্নেহটা প্রকাশ করিতে এক ধরনের লজ্জা করে। চম্পা
 অনুযোগ করে—“আপনি আমার ছেলেকে একটু কম আদর
 করেন—বেশই একটু, তা মিতিনের সায়নেই বলছি, যদি মনে
 করে হিংসে করছি ওর ছেলের তো নাচার। সত্যি-কথাটা
 বলতে ছাড়ব নাকি?” যেটুকু করিতে চায় টুলু সেটুকুতেও
 বাধা পড়ে, একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলে—“আদর বোঝবার
 মতন হোক একটু, এখন তো কাদার ডেলা একটা তোমার
 ছেলে।”...মুক্ত বৈবাহারের মধ্যে প্রহ্লাদের বো আজকাল
 আর কথায় এড়ে না, হাসিয়া বলে—“ততদিন তো ওর মা
 হিংসায় ফেটে মরে যাবেক গো।” কথাটা শুনিয়া একদিন
 বনমালী মুখটা তার করিয়া বলিল—“তুর ছাওয়াল। তুর
 ছাওয়াল কেমন করে হ’ল আমার বুঝায় দে ক্যানে, উর
 •মা বিয়ালো, তার ছাওয়ালট হোলোক নাই; ছোটবাবু
 উর ছাওয়াল হোলোক নাই; পেদাদর বো মাই মিছে, উটির
 লিলেন, ছাওয়াল হোলোক নাই,—তুর ছাওয়াল। কোন্
 আইনের কোন্ ধারায় আমার বুঝায় দে ক্যানে।”

বেশ হাসি পড়িয়া গেল, তাহারই মধ্যে গান্ধীর্ষ রক্ষা
 করিবার চেষ্টা করিয়া চম্পা বলিল—“তা তুই যা না বুড়া
 জলদি করে উর মাকে সগুণে থেকে পাঠায় দেগে; আমি
 দিন্নী দিব তার ছাওয়ালটিকে।”

বনমালী রাগিয়াই গেল, হাত নাড়িয়া বলিল—তা সিটি
 নাই, তু ছোটবাবুকে দিন্নী দে ক্যানে, উনি লিলেন, ওর
 ছাওয়াল। দিখখো না, পরের ছাওয়াল নিয়া চোখ রাঙায়
 গো। তুর ছাওয়াল তো বিদ্যা হলে তু নিয়া যাস তুর স্বত্তর-
 বাড়িতে; ই, আমি দিখবো।...

ছেলে লইয়া নাতনী ঠাকুরদাদার বাকবিতণ্ডা একরকম
 নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকাল বেলায় এই
 সময়টুকু লঘু রহস্যের মধ্যে দিয়া কাটে এই ভাবে।

এর পরে বেশ একটু শক্ত কাজ হাতে লইয়াছে। মাঠার মশাইয়ের বাসার সঙ্গে দেয়াল দিয়া ঘেরা বেশ ধানিকটা জমি, সেটা শাকসব্জির বাগান করিবে। বনমালীকে লইয়া যেমনতে লাগিয়া যায়, কোদাল চালানো, টেলাভাঙা, আল-বাঁধা, ভাগাভাগি করিয়া সবই করে; ছেলে আর মেয়েটি সাহায্য করে। বর্ষা আসিতেছে, তাহার আগেই তৈয়ার করিয়া কেলিবে বাগানটা, রৌদ্র যতক্ষণ না নিতান্ত কড়া হইয়া ওঠে ততক্ষণ লাগিয়াই থাকে, মাঝে একটা ছোটখাটো বৃষ্টি হইয়া গেছে, জমিটা নরম থাকিতে থাকিতে যতটা অগ্রসর হওয়া যায়।

ক্রান্তিটুকু অপনোদিত হইয়া গেলে স্নান করিয়া খরে ঢোকে। আঙ্গকাল হোমিওপ্যাথির দিকে একটু ঝোক গেছে; বুড়ীর আরোগ্যের ব্যাপারটা চম্পা এক গুণকে সাত গুণ করিয়া বসিতে রটাইয়াছে, ছ'চার জন করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়টা বই দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের ঔষধ বলি করে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর নাতনী হীরককে আনিয়া হাজির করে।

টুকু কখনও এ করমাসটা করে নাই, এতে ছুটি শিশুর মধ্যে সে পক্ষপাতিত্বের ভাবটুকু ফোটে তাহাতে তাহাকে সজ্জিতই করে একটু; কিন্তু তবুও ব্যাপারটুকু নিয়মিত ভাবেই হইয়া আসিতেছে। টুলুর মনে হয় চম্পা যেন ওং পাতিয়া থাকে, ঘরটা খালি হইতে দেখি, হীরককে দেয় পাঠাইয়া। বুড়ীর নাতনীকে বারণ করে না, তবে চম্পাকে ঐকদিন এই সময় একলা পাইয়া বলিল। চম্পা একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়াই হাসিয়া উত্তর করিল—“বেশ যাহোক। আমার আপনি এতই বেয়াকলে ভাবেন? সত্যি আমি এতই হিংস্র নাকি?—মিতিন দেয় পাঠিয়ে; আমি বরণ বারণই করেছি ক'দিন—উনি এখন একটু বই-টাই নিয়ে থাকেন, কাজ নেই পাঠিয়ে।”

বুড়ীর কাছে কি একটা কাজে যাইতেছিল, চলিয়া গেল। ফিরিবার সময় আর একবার আসিল—“না হয় যাব নিয়ে হীরককে?” বলিয়া খুব অল্প একটু হাসির সহিত টুলুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

পরীক্ষার স্বস্তায় টুলু মনে মনে একটু হাসিল, ঠোটেও তাহার একটু আভাস আসিয়া পড়িল, কিংবা অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিল—“বা—ক, কি আর ক্ষতি করছে?”

“না হয় বারণ করে দোব মিতিনকেই?”

এবার টুলু হাসিয়াই ফেলিল, কথায় কিন্তু পরাভবটা স্বীকার করিল না, বলিল—“তোমারও যেন হঠাৎ জিদ বেড়ে গেল চম্পা, প্রহ্লাদের বৌয়ের কষ্ট হবে না মনে?—পাঠিয়ে দেয় বেচারি...”

—স্বীকার করিতে চায় না; চম্পা, যে সব চেয়ে বেশী জানে কথাটা, তাহার কাছেও নয়, তবে সত্যই হীরক যেন

মায়ার নতুন নতুন তত্ত্ব বুনিয়া চলিয়াছে তাহার চারি দিকে। বেশ মোটা মোটা ফুলতোলা গোটা দুই কাঁধার উপর শোয়াইয়া দেয় মেয়েটি, নিজে প্রায় থাকে না, ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করিতে চলিয়া যায়। টুলু পড়েই এই সময়টা—হোমিও-প্যাথিই হোক বা অথ কোন বই-ই হোক, মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া চায় হীরকের পানে, হাত পা নাড়িয়া, হাতের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া নিজের খেলালে একটা একটানা শব্দ করিয়া যাইতেছে—এক একবার হঠাৎ উৎসাহের জোয়ার নামে, ছাত-পা ছোঁড়ায় অতিরিক্ত ক্ষিপ্ততা আসিয়া যায়, একটানা শব্দটা টুকরা টুকরা হইয়া কাকলিতে ভাঙিয়া পড়ে। এক এক সময় চাহিতে গিয়া টুলু আর দৃষ্টি সরাইতে পারে না—কত নিশ্চিন্ত, অথচ কত অসহায় ও। এত অসহায়তার মধ্যে এত নিশ্চিন্ততা বড় বিস্ময়কর, বড়ই করুণ মনে হয় টুলুর—আজ ওকে লইয়া কাড়াকাড়ি, কিন্তু কে জানে যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল আবার তেমনি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে কি না। তিনটি আশ্রয়ের মধ্যে একটি প্রহ্লাদের বৌ, বাকি চম্পা আর টুলু। কি স্থিরতা চম্পার জীবনে? টুলুর জীবনে তো আরও অনিশ্চয়—কোণাকার একটা কুটা, স্রোতের মুখে কোণায় আসিয়া লাগিয়াছে, আবার ভাসিয়া যাইতে কতক্ষণ?...সে আবার একটা কুটার সহায়।

আবার কখনও কখনও মনটা সংকল্পে হইয়া ওঠে দৃঢ়। না, যত যা-ই হোক, হীরককে ছাড়িবে না ও; যেমন বুকে করিয়া তুলিয়া লইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বুকে জড়াইয়া রাখিবে, আর সব ভ্রত থাক, ঐ একটা ভ্রত সার করিয়া জীবনটা দিবে কাটাইয়া।...আবেগের মাধুর টুলু উঠিয়া শিয়া শিশুর উপর দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়ায়—মনে হয় ঐ নিশ্চিন্ততার অন্তরালে রহিয়াছে একটা বিশ্বাস—অবুঝ, কিন্তু অটল বিশ্বাস। টুলুর হাতটা কখন যেন আপনা হইতেই গিরা ওর ললাট স্পর্শ করে, আশীর্বাদের মত একটা প্রতিজ্ঞা নামিয়া সঞ্চারিত হয় ললাটে—না, তুই নিশ্চিন্তই থাক, এ বিশ্বাস আমি দোব না ভাঙতে...

আহারাদি করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়ে, দেশের চেয়ে এখানকার গরমটা ঢের বেশী, আলগুটা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। উঠিয়া ছেলে আর মেয়েটিকে লইয়া পড়াইতে বসে। এই সময়টা কাটে বেশ ভাল। শুধু বসিয়া পড়া মুখস্থ করানো নয়, অবশ্য তাহাও একটু করাইতে হয় কেননা দুইটাই একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন, তবে বেশীর ভাগ গল্প বলা; গল্পের মধ্যে দিয়া ছুপরিচয়, দেশ-বিদেশের মানুষের পরিচয়, ইতিহাস, বিশেষ করিয়া নিজের দেশের ইতিহাস, পুরাণ—যতটুকু নিজের জানা আছে। যেটুকু বলে সেটুকু ওদের কাছ থেকে আবার শুনিয়া লয়। বড় চমৎকার লাগে, ছুটি ক্ষুটনোমুখ মনের পরিধি কেমন ধীরে ধীরে যাইতেছে বাড়িয়া।—সেই রকম একটা দুইট করিয়া যেন পাণ্ডিখোলা। ফুলের মতই যেন মনের একটা সৌরভও পড়িতেছে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া। এই সময়টা টুলুর সব চেয়ে অল্প কাটে; শুধু একটা অভাব বোধ করিয়া কষ্ট হয় যে মোটে ছ'জন এরা,

—ফুল দুটির নীচে আরও গোটাঁকতক্ কুটিলে বড় ভাল
হইত। পড়ার দিক দিয়া ছটকেই সেই “অ-আ” হইতে আরম্ভ
করিতে হইয়াছে। তবে এদিকে টুপু একটু বৈচিত্র্য আনিবে
—একটি ক্লাসকে ছইটিতে ভাঙিয়া ফেলিবার জন্ত ছেলেটিকে
ছট দেওয়ার পরও মেয়েটিকে বসাইয়া রাখে। রাঙেও
তাহাকে একটু খাটায়, ফলে এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম
ভাগটা শেষ করিয়া সে প্রায় দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে আসিয়া
পড়িল বলিয়া। বলে—তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল তাই,
নহিলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক বই পড়া—মুখ দেখাইবার
জো থাকিত ?

ভদ্র জীবনের উপর একটু এই শিক্ষার স্পর্শে বেশ একটু
মর্দাদাজান হইয়াছে।

টুপু কিন্তু এ জানটা একটু সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার
চেষ্টা করে। বিকালবেলা ওদের একেবারেই দেয়
ছাড়িয়া।

আগেকার সঙ্গী-সঙ্গিনীরা আসে, সেই রকম ছোর খেলা

জমে, তবে ভিক্ষে-ভিক্ষে জাতীয় নয়। এরা ছটতে পরিচ্ছন্ন,
গুরা প্রায় সেইরূপই, এদের দেখিয়া যদি সামান্য একটু ইতর-
বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু পাছে পরিচ্ছন্নতার জন্ত এক্ষেত্রেও
মর্দাদাজান ওঠে জাগিয়া সেজন্ত টুপু প্রায় সর্বক্ষণ থাকে কাছে
কাছে, যদি বাহিরে যায়, চম্পাকে বলিয়া যায়—“একটু লক্ষ্য
রেখো, কাপড় একটু ফরসা বলে ওদের মনে ময়লার না ছোপ
ধরে।”

সন্ধ্যার সময় সকলে কাকনতলাটিতে জড়ো হয়।

এই এখন সমস্ত দিনের কটন, খুব বেশী কিছু না হোক
তবুও খানিকটা কাজ আছে। সেই প্রথম সপ্তাহের বন্দী-
জীবনের জড়তা গিয়া উত্তমের খানিকটা পথ তো অস্তুত
পরিষ্কার হইয়াছে। সর্বোপরি আছে একটা আশা, নূতন যে
জীবনকে অবলম্বন করিল তাহার একটা ভবিষ্যতের স্পষ্টতর
ছবি।

মনে বেশ একটু তৃপ্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, মাষ্টার-মশাইয়ের
চিঠি এই তৃপ্তিকুকে যেন গ্রাস করিতে বসিল। ক্রমশঃ

স্বপ্ন ও জাগরণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভুলিনি বন্ধু, ভুলিনি তোমায়, ভুলিনি আজো,
আমার উত্তল সমুদ্র-বুক উথলি রাজো
আনন্দ-সম, বেদনার সম, স্বপ্ন-সম,
আমার আশা ও আমার হুঁশা, নিরাশা মম।

সবার বেদনা—আমার বেদনা ; সবার বাড়া
আমার ছুঃখ তাই ত এমন সৃষ্টি-ছাড়া।
স্বদয়-অন্তলে বিরাজিত চির চাঁদের ছবি,
আকাশের গান তাই আমি গাই ধরার কবি।

আছে সংসারে কর্ণ-মুখের চপল দিন।
নাই কি শাস্ত্র মধুর রাজি স্বপ্ন-জীন ?
আসে পুণিমা, প্রাণিয়া পৃথিবী জ্যোৎস্না কোটে,
জীবনের এই অশ্রু-সাগরে তুফান ওঠে।

সবার সঙ্গে যেথা আমি এক—দিবস সেথা,
প্রতি মুহূর্ত্ত কাল কোলাহলে পূর্ণ যে তা !
বিজনে গোপনে রক্ত-রক্তনী জীবনে আসে,
আকাশ ধরার দূরত্ব ঘোচে, চন্দ্র হাসে।

জনতা-বিহীন নিভৃত নিশীথে—যেখানে একা,
হে আমার চাঁদ, তোমায় আমার সেখানে দেখা।
সূর্য্য-ভূগুণ ধরণী শীতল শিশির মাচে,
তুমি আছ আর আমি আছি, আর কি-ই বা আছে ?

জাতির জীবনে, জোয়ার এনেছে বাঁধন-ভাঙা,
উর্গ-উত্তল ধৈ ধৈ জল, নাইকো ভাঙা।
এ কি স্পন্দন, এ কি অহুভূতি, কি বিষয় !
উচ্ছল স্রোতে ভেসে গেছে দূর সর্ব ভয়।

সকলের সাথে মাটির স্পর্শ দেবার লজ্জি,
উদিত দেখি সে নূতন আকাশে নূতন রবি।
স্ববার মাঝারে আপনারে ভুলি আয়হারা,
পীমার তন্ত্রে কি স্নর জাগায় নূতন সাড়া।

জীবন ভরিয়া দিন-রাত্রির চলেছে খেলা,
কখনো সেবার পূর্ণিমা, কভু প্রভাত-বেলা।
সত্য যদি এ পৃথিবীর নব-স্বর্ঘ্যোদয়,
আমার রাতের চাঁদের স্বপ্ন মিথ্যা নয়।

নব-জাগরণে জেগে ওঠে দেখা নূতন প্রাণ,
সবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে গাই যে গান।
বহুত স্নরে নূতন যুগের সম্ভাবনা,
অহুভব করি নব-জীবনের উন্মাদনা।

আকাশ আকুল, মায়া-মঞ্জুল চৈত্র-নিশা,
জীবন-ভাসানো জ্যোৎস্না-প্রাবনে হারাই দিশা।
স্বদি-সমুদ্র উথলে তোমার স্নদর ছবি,
হে আমার চাঁদ, আমি যে তখন তোমার কবি।

বাঙ্গলার মঘদৌরাস্ত্রের বিবরণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৬৬৬ খ্রীষ্টীয় সনে বাঙ্গলার বিখ্যাত নবাব সায়েস্তা খাঁ চাটগ্রাম* জয় করিয়া মঘ-ফিরিঙ্গির চরম শাস্তি বিধান করেন এবং বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী দারুণ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রচেষ্টা ক্রীষকনাথ সরকার মহাশয় পারভ-ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস হইতে চাটগাঁ বিজয় ও চাটগাঁ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিবরণ প্রকাশ করেন। (J.A.S.B. 1907, pp. 405-25)। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসের এই তমসচ্ছন্ন যুগের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও লিখিত হয় নাই। কারণ, মঘদৌরাস্ত্রের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ঝটিকা নিয় বঙ্গের প্রায় ঘরে ঘরে যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল রাজ-দরবারে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত পৌঁছবার অবসর পায় নাই এবং অধিকাংশ স্থলে প্রজার বিলোল ক্রন্দনধ্বনি আকাশে সাময়িক তরঙ্গ তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, কচিং তাহার স্মৃতি তৎকালীন সমাজ-হৃদয়ে জাগরক থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত অজ্ঞাতপূর্ব কতিপয় ছিন্নপত্রের বিবরণ প্রকাশ করার পূর্বে মঘদৌরাস্ত্রের উৎপত্তির বিচিত্র ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

পাঠান রাজত্ব কালে চাটগ্রামের আধিপত্য লইয়া চতুঃ-শক্তি সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—পাঠান, আরাকান, ত্রিপুর ও ফিরিঙ্গি। সেনারগাঁর সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩২-৪৯ খ্রিঃ) সর্বপ্রথম চাটগ্রাম জয় করেন।* তাহার সময়ে অনেক ধর্মমন্দিরাদি চাটগ্রামে নির্মিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ধ্বংসাবশেষ সায়েস্তা খাঁর সময় বিদ্যমান ছিল। (J.A.S.B. 1907, p. 421)। তবীন হইতে চাটগ্রাম

বাঙ্গলার পাঠান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কালে চাটগ্রামে একটি টঙ্কশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দলুজমর্দনদেব, মহেশ-দেব ও জালালুদ্দীনের চাটগ্রামী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে (Bhattasali : *Independent Sultans of Bengal*, pp. 119, 123-5)—ইহাদের তারিখ ১৪১৭-২০ সন মধ্যে। দশ বৎসর পরে পলায়িত আরাকানরাজ “মেড্ ছৌ-মুন” গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে চল্লিশ বৎসর থাকিয়া তাহার সাহায্যে রাজ্যোদ্ধার করেন—ইহা জালালুদ্দীনের রাজত্বকালীন ঘটনা। আরাকানের ইতিহাসে পাওয়া যায় ৭৬৮ মধী সনে (১৪০৬ খ্রিঃ) ঐ রাজা তৎকালীন “চাটগ্রামের উজীরে”র সাহায্যে গৌড়সুলতানের আশ্রয় লাভ করেন। আরাকান-চাটগ্রাম-সম্বাদের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। চাটগ্রামের ইতিহাসের এই তমসচ্ছন্ন যুগের একমাত্র আলোকদাতা হইল আরাকানী ভাষায় লিখিত আরাকানের ইতিহাস গ্রন্থ এবং শতাধিক বর্ষ পূর্বে ১৮৪৪ সনে ফেরার (Phayre) সাহেব তাহা হইতে যে অতি সংক্ষিপ্ত সারসংলন করিয়াছিলেন তদতিরিক্ত কোন কথাই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। পনের বৎসর পূর্বে রেজুনে প্রকাশিত আরাকানের বিস্তৃত ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪১৫) পাঠানযুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত পাওয়া যায়। হন্দ-মালালকার রচিত ১২৯৩ বর্ষাব্দে প্রকাশিত “রথইন্ড্ রাজওয়ান্ড্ খ্খ-ক্যাম্” অর্থাৎ আরাকানের নূতন ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি এবং তন্মধ্যে বহু নূতন কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে।† আরাকান রাজ-গণ পরে ক্রমশঃ চাটগ্রামে অধিকার বিস্তার করিলেও রাজা-উজীরের এই সামান্য সংঘর্ষে প্রজাসাধারণের শান্তিভঙ্গ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। গৌড়সুলতানের প্রতিজ্ঞা চাটগ্রামের

* অনেকই অবগত নহেন “চট্টগ্রাম” শব্দটি আধুনিক এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে তাহার প্রয়োগ ছিল না। চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক রূপই ‘চাটগ্রাম’ এবং সর্বত্র তাহারই প্রয়োগ পাওয়া যায়। দলুজমর্দনদেবের ১৩৩৯ শকাব্দের মুদ্রায় স্পষ্ট “চাটগ্রামাং” উৎকীর্ণ আছে (ডঃ ভট্টাচার্যীর *Independent Sultans of Bengal*, p. 119 ও pl. VIII দ্রষ্টব্য)। ত্রিপুরাশিপতি ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দের “চাটগ্রাম-জয়ি” মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঠান যুগের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কোষকার “অভিধানতন্ত্র” রচয়িতা জটায়ব ফণী নদীর নিকটে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করেন—তন্মধ্যেও চাট-গ্রাম রূপেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ এই সকল উৎকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অসংখ্য বাঙ্গলা ও ফার্সি (“চাটগাম”) গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পরে, তজ্জগৎ “চট্টল” শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া “চট্টগ্রাম” কল্পিত হইয়াছে এবং দেশমাতৃকার উদ্বোধনে কবির লেখনীতে “চট্টলা” রূপেও পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্পদে সমৃদ্ধ চাটগ্রাম রূপটি বর্জনীয় নহে।

† সুলতান প্রেরিত বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নাম “উলু খেড্” (পৃ. ৭) সম্ভবতঃ উলু খাঁর অমুবাদ। মঘনরপতি মেড্-খারির প্রথম মুসলমানী উপাধি “অলিখা” (পৃ. ২০, অলি শা নহে)। ইহাদের তিনটি কব্রিয়া নাম থাকিত, মধী, পালি ও ফার্সি। ফার্সি নামগুলি এইঃ—বসৌপুয়া=কলিমা সা (পৃ. ৩১), মেড্, দৌল্যা (১৪৮১-৯১)=মো খু সা (পৃ. ৩৫), মেড্-এ (১৪৯১-৩)=মহামো (দু) সা (পৃ. ৩৬), মেড্ রনুও (১৪৯৩-৪)=নোরি সা (পৃ. ৩৬), ছলেড্ গথু (১৪৯৪-১৫০১)=সক্-মোক্ দৌল সা (পৃ. ৩৭), মেড্, রাজা (১৫০৯-১৩)=ইলি সা (পৃ. ৩৮), মেড্ সোউ (১৫১৫)=জল সা, খজাত (১৫১৫-২১)=ইলি সা (পৃ. ৪১)। মেড্-বেড্ (১৫৩১-৫৩)=শ্রীপৃষ্ঠা-চন্দ্র-মহা-বর্ষ-রাজা=ভোক্ পোক্ (পৃ. ৪৪)। সিকান্দর শাহ প্রভৃতি পরবর্তী নামত্রয় প্রাচী আছে। ডঃ হক্কত আরাকান-রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য পৃ. ৬ ও J.R.A.S.B. 1945, p. 34 দ্রষ্টব্য।

উজীরগণ জবাবে আরাকানের সহিত আদান-প্রদান চালাইয়া
• আয়রফা করিয়াছে সন্দেহ নাই। ১৬শ শতাব্দী আরম্ভ
• হওয়ার পূর্বেই চাটিগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালার মঘনরপতি
“রাজা জয়চন্দ” সভাপতিত্ব ভবানীনাথ দ্বারা “লক্ষণ-দ্বিধিকর”
রচনা করাইয়াছিলেন।* রাঢ়ীয় সম্রাট প্রোড্রিয় বংশীয়
“দিগ্বী” বিপ্র জটায়র এই সময়েই ফেইনদীর নিকটে চাটি-
গ্রামের অন্তর্গত ‘দেবগড়’ গ্রামে “অভিধানতন্ত্র” নামক উৎকৃষ্ট
কোষ রচনা করিয়াছিলেন।

১৫১৩ সনে বিখ্যাত ত্রিপুরনরপতি ধর্মমাণিক্য (১৪৯০-
১৬) প্রথম চাটিগ্রাম জয় করেন। হুসেন শাহার সহিত ধর্ম-
মাণিক্যের যুদ্ধবার্ষিক বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে মুদ্রিত
হইয়াছে (মূলের পৃ. ২২-২৮)। ধর্মমাণিক্যের ১৪৩৫
শকাব্দের “চাটিগ্রাম-জয়” মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার এই বিবরণের
প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার
পাঠ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় রাজমালার এই অংশের রচয়িতা
ধর্মমাণিক্যের মুদ্রা দেখিতে পাইয়াছিলেন :—

ঐধর্মমাণিক্য রাজা চাটিগ্রাম চলে

চৌদস পাঁচত্তিস সকে নিছ বাহুবলে ॥

‘চাটিগ্রামবিজয়’ বলি মোহর মারিল।

গৌড়েশ্বরের সন্ত সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥ (২১ পত্র)

ধর্মমাণিক্যের বিরুদ্ধে অতঃপর দুইটি অভিধান প্রেরণ
করিয়া হুসেন শাহ বিফল হইয়াছিলেন—প্রথমটির নেতা
ছিলেন “গোরাই মল্লিক”, সঙ্গে ছিল “বহুতর তরিরর গোমতি
কারণ”।† ১৪৩৬ শকে ধর্মমাণিক্য কর্তৃক চাটিগ্রাম পুনর্বিজিত

* বাহুলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে রাজা জয়চন্দ ও
ভবানীনাথের বিবরণ ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া আছে—পৃথক প্রবন্ধে
তাহার সংশোধন আবশ্যক। জটায়রের পরিচয় শ্লোক এই :—
ভাগীরথীঃ জলময়ীঃ জগতাম্বীঃ, মন্দোদরীরূপভা পিতরো চ
নন্দা। দিগ্বীঃবিপ্রকুলজঃ স জটায়োনা-বাচাধ্য এতদকরোদ-
ভিধানতন্ত্রম্। ঐন্দ্রেশ্বরঃ-গিরিপ্রভবান্তি চাটি-গ্রামে ফণীতি
তটিনী নিকটেবনোয়ে। উপপত্তিভূমিরপি দেবকড়াভিধানো,
গ্রামোন্তি যন্ত পিতৃভূমিরতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ জটায়রের বংশ ও “অতি-
প্রসিদ্ধ” অম্মস্থান বহুকাল নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার
এই বাহুলীর সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভরত মল্লিকের
মাঘ টাকার আবহা জটায়রের বচন উদ্ধৃত পাইয়াছি।

† গোরাই মল্লিক নিঃসন্দেহ তৎকালীন মুসলমান চাটি-
গ্রামপতির আখ্যায় “Gromalle”-এর সহিত অভিন্ন। (Cam-
pos : Portugese in Bengal, p. 28) তাহার প্রকৃত নাম
পর্তুগীজ ও বাহুলা বিকৃতি হইতে উদ্ধার করা ঋটিন, সম্ভবতঃ
কমল্লা। তাহার নামে একটি গড় ছিল এবং কাঙ্গারু এই
“কমল্লাব গড়” হইতেই Komulla ও বর্তমান কুমিল্লা নগরীর
নামকরণ হইয়াছে। ইহা কেবল কল্পনা নহে, ১৮৭৫ সনে মুদ্রিত
ভগবত্বেশ্বরবিশারদ রচিত “ত্রিপুরা সংবাদঃ” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে
(পৃ. ৫-৬) “কমিল্লানামপুর বিবরণ”-পরিচ্ছেদে অতি কৌতু-
জনক প্রবাদ সিদ্ধান্ত হইয়াছে—“আসীং পুত্রকল্পিতুরানিবাসী,
কমিল্লানাম যবনো মহীয়ান।” ইত্যাদি।

হয়। এই সময়ে আরাকানরাজ হীনবল ছিলেন, নতুবা ধর্ম-
মাণিক্যের সেনাপতি কি করিয়া—

রাধু আদি ছয় সীক মারিয়া গেল।

রসাতল নিকটে জাইয়া পুত্ররিণ দিল ॥

রসাতল মারিতে গিয়াছিল সেনাপতি।

সেই হতে রসাতলমর্দন নাম ক্ষ্যাতি ॥ (ঐ)

পরে হুসেন শাহার সেনাপতি হৈতন ঝাঁ “সরালি”র পথে
আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। চাটিগ্রামের উপর ত্রিপুরার
আধিপত্য “দ্বিধিকরী” অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল (১৫৭৭-
৮৬) পর্যন্ত অটুট ছিল। অমরমাণিক্যের ১৫০২ শকের
“দ্বিধিকর” মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ১৫১৭ সন
হইতে পর্তুগীজগণও ক্রমশঃ চাটিগ্রামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।
১৫৮৬ সনে দুর্দান্ত মঘনরপতি সিকান্দর সাহ অমরমাণিক্যকে
পরাজিত করিয়া রাজধানী উন্নয়নপুর অধিকার করেন এবং
অমরমাণিক্য আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় রসাতলমূলের
তথ্যপূর্ণ বিবরণ রাজমালা তৃতীয় লহরে (মূল ২৭-৪৯) মুদ্রিত
হইয়াছে, তন্মধ্যে সত্যগোপনের কিছুমাত্র চেষ্টা করা হয় নাই,
যদিও উজীর দুর্গামণি প্রাচীন রাজমালা সংশোধন করিতে
গিয়া নানাবিধ ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন। আরাকানের
পূর্বোক্ত ইতিহাসেও ‘মড-পরাক্ষয়ের’ কথকিং অতিরঞ্জিত
বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৯০-২), তন্মধ্যে অনেক নূতন
কথা পাওয়া যায়। অমরমাণিক্যের সৈন্য মধ্যে সর্বপ্রথম
ফিরিঙ্গির উল্লেখ পৃষ্ট হয়—

ফেরেদি সকল চলে নৌকাতে ভরিয়া (প্রাচীন রাজমালা
৪০ পত্র)। এই যুদ্ধকালেই মঘ-ফিরিঙ্গির মিলনের সূত্রপাত
হইয়াছিল, তাহারও আভাস রাজমালার পাওয়া যায় :—

ত্রিপুরের সন্ত দেবী মগে ভঙ্গ দিল।

ফেরেদির সঙ্গে মগে প্রীতি আরম্ভিল ॥ (ঐ)

এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য অপূর্ণ ক্ষাত্র তেজ দেখাইয়া পরা-
জয়ের শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত তদীয় শরণাগত মঘবিদ্রোহী আদম
সাকৈ পুনঃ পুনঃ অমরোদেব সত্ত্ব ও মধ্যরাজ্য হস্তে সমর্পণ করেন
নাই। অমরমাণিক্যের এই কীর্তি চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত
থাকিবে। এই পরাজয় রাজ্যের কিরণ মর্দ্যবাতী হইয়াছিল
তাহার খেদোক্তিতে তাহা ব্যক্ত হয় :—

সর্বকালে ত্রিপুরে নি মগধ জ্মিল।

• অমরমাণিক্যকালে ত্রিপুরে হারিল ॥ (ঐ ৪৭ পত্র)

এই ঘটনার পর মঘ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে বাধা দেওয়ার
একটি প্রবল শক্তি তিরোহিত হইল, কিন্তু তখনও ইশা ঝাঁ,
কেন্দার রায়, গধর্বমাণিক্য প্রভৃতি বারভুক্তার মহারথীগণ
জীবিত থাকিয়া অত্যাচার স্বষ্টির অন্তরায় হইয়াছিলেন সন্দেহ
নাই। এই শেষ অন্তরায়ও মানসিংহ ও ইসলাম খাঁর বিজয়
অভিযানে নিখুঁত হইলে মঘরাজা সলীম সা, হুসেন সা
প্রভৃতির একান্ত তাবে দুর্দমনীয় হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ

ইব্রাহিম ঐ কতে জন্ম নবাবের আরাকানী অভিযান ব্যর্থ হইলে (বহারিভান, পৃ. ৬৩২-৩) দীর্ঘ ৪০ বৎসর (১৬২৫-৬৬) ধরিয়া মধ্য-ফিরিঙ্গির অত্যাচারলীলা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল। আরাকানের পূর্বোক্ত ইতিহাসে মথুরাজা সলীম সার ১১ রাণীর পরিচয় দেওয়া আছে (পৃ. ১৬৪)। তন্মধ্যে চাটিগ্রামপতির কছা ও 'মুন্ড-মেণ্ড' অর্থাৎ ত্রিপুররাজের কছা ছাড়া একটি বিশ্ময়কর নাম আছে "ত্রিপুরের রত্না রায়ের ভগিনী সুনন্দী" (খিরিপুত্চা রত্নারে নম ধুন্দরে)। সলীম সা ত্রিপুরের কেদার রায়ের সমকালীন ছিলেন এবং আকবরনামায় লিখিত আছে (৩।১২৩৫ পৃ.) ত্রিপুরপতি ও মথুরাজা একযোগে সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। মথুরাজার সহিত কেদার রায়ের প্রীতিমিলন যে সামাজিক বন্ধনে নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আরাকান-ইতিহাসের উক্তি সত্য হইলে, তাহার এক আশ্চর্য্যকর নিদর্শন আবিস্কৃত হইল। সলীম সার চতুর্থমণীর পরাক্রম এতদ্বারা বিশেষভাবে সূচিত হয়।

বাদশার বহু সন্তান পরিবার মথুর হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এই স্বল্পে তৎকালে রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজে একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নাম মথদোষ। কুলপঞ্জীতে এই মথদোষের বিবরণ মধ্যে ঘটকগণ অজ্ঞাতসারে বহু করণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অল্প কোন গ্রন্থাদিতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিবরণ এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ছয়টি বৃহদাকার হস্তলিখিত কুলগ্রন্থ হইতে ইহা সংগৃহীত হইল।* বর্তমান যুগের সামাজিক প্রতিষ্ঠাবর্ণনে ইহাদের কোন সাফাৎ সম্পর্ক নাই এবং তজ্জন্ম মুদ্রিত কুলগ্রন্থে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার বহু কুলগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ। ২১০২ সংখ্যক পুথির পত্র সংখ্যা ৬১৮ অর্থাৎ ১২৩৬ পৃষ্ঠা এবং বৃহদাকার।* মুদ্রিত করিলে প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ হয়। ইহা মাধা-ডাক্তার কুলাচাধ্যায় রামহরি জায়াসঙ্করের গৃহে ১২১০-১ সনে লিখিত। (সংক্ষেপে "মাধা" নামে উদ্ধৃত) ৭৮৭ সং. পুথির পত্র সংখ্যা ৩৬৯, লিপিকাল ১৭২০ শক ('পরিষৎ' নামে উদ্ধৃত)। ১৮১৫ সং. পুথির পত্রসংখ্যা ৪৬৪ ('চেতলা' নামে উদ্ধৃত, চেতলার এক ঘটক পরিবারের পুথি)। এক শত বৎসর পূর্বে হুগলী জজ কোর্টে একটি পুথি এক মোকদ্দমায় দাখিল হইয়াছিল—পত্র সংখ্যা ৪৫৬। বর্তমানে ইহা শ্রীরামপুরের ত্রিযুত কণীক্ষ চক্রবর্তীর নিকট রক্ষিত আছে ('হুগলি' নামে উদ্ধৃত)। আমাদের নিকট ৫৫৮ পত্রের একটি পুথি আছে—যশোহর জয়ন্তীপুর ঘটক সম্প্রদায়ের পুথি ('জয়ন্তী' নামে উদ্ধৃত)। বর্তমান জিলার কামাল গ্রামের ঘটক সম্প্রদায়ের একটি পুথি রোণ্ডা নিবাসী ত্রিযুত চন্দ্র-ভূষণ শর্মা মণ্ডল মহাশয়ের কৃপায় পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম—ইহা 'কামাল' নামে উদ্ধৃত। প্রত্যেক পুথিতেই কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়, যাহা অপর পুথিতে অপ্রাপ্য।

১। 'বন্দ্যধর্মী' অর্থাৎ বানার্জি বংশধরের একটি প্রসিদ্ধ শাখা "সাগরদিয়া" নামে পরিচিত। এই শাখার "জহু" প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। তাহার এক পৌত্র (বলভদ্রের পুত্র) ত্রিপতির নাম পর্যাণ্ড ধুবানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশাবলী পৃ. ১৩৬)। অর্থাৎ ত্রিপতি ১৫০০ সনে জীবিত ছিলেন। তাহার এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়: "ততো বিষ্ণুপ্রিয়ানামী কছা মথেন নীতা সর্কনাশাকানি:" (সাফা ৯৩।১, হুগলী ৮৩।১)

এই ঘটনা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬০০-৫০ সনে) পড়ে। রামচন্দ্রের বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। "রামচন্দ্রে গুড়িবিবাহ বিভালকারস্য কছা" এই উক্তি দেখিয়া অহুমান হয় নদীয়া কি যশোহর অঞ্চলে তাহার বাড়ী ছিল কারণ নদীয়া-যশোহরই গুড়গ্রামী শ্রোত্রিয়বংশের প্রধান সমাজ ছিল।

২। উক্ত রামচন্দ্রের এক ভ্রাতার নাম রাধব। তাহারও "গুড়িবিবাহ ভবানীদাস চক্রবর্তী: কন্যা" স্মরণ্য তিনিও একই অঞ্চলের লোক। তাহার ৮ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ চাঁদ, তিনি সম্বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন—"চাঁদস্য পিতৃভক্তকালে হুং যাদবেল্ল রায়স্য কছাবিবাহ অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ মথে নীতা" (সাফা ৯৩।২, হুগলী ৮০।২)। তাহার বাকী চারি ভ্রাতাকেও মথে লইয়া যায়—"চাঁদ বিনোদ রাধারাম যহ মধু মথে নীতা:" (এ, এ)। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের তিন ভগ্নীকেও মথে লইয়াছিল, অর্থাৎ এক বাড়ী হইতে ৫ ভাই ও ৩ ভগ্নী মথের কবলে পতিত হয়।

"ততঃ স্বরূপা-মণিরূপা-কপূরমঞ্জরী এতাঃ কছাঃ মথেন নীতা সর্কনাশাকানি:" (এ, এ) তৎকালীন সম্রাট কুলীন পরিবারে মেয়েদের কিরূপ সুরচিসম্পন্ন নাম রাখা হইত তাহারও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া নামটি মাত্র প্রচলিত দেখা যায়।

৩। সাগরদিয়াবংশেই ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন "রঘুরাম চক্রবর্তী" ঐ সময়ের লোক। তাহার বংশধরগণ বঙ্গদেশের নানা স্থানে এখনও সসম্মানে বাস করিতেছেন। তাহার কুলবিবরণে একটি মাত্র পুথিতে পাওয়া যায়,

"ততঃ পশ্চাৎ কছা মথেন নীতা ইতি কেচিৎ" (কামাল বন্দ্য প্রকরণ ৪৫।২)। ইহা অল্প কোন পুথিতে নাই বলিয়া মনে হয় অমূলক প্রবাদ মাত্র।

৪। সাগরদিয়াবংশে বড়দহমেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন ভগীরথপুত্র শ্রীমন্ত (মহাবংশাবলী পৃ. ১৩৩)। শ্রীমন্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—"কৃষ্ণচরণস্য ফিরাদি অপবাদঃ বিক্রমপুর কাঁটালতলি গ্রামে।" (জয়ন্তী ৩৭৪।১) কৃষ্ণচরণের বংশ এখনও নানা স্থানে সসম্মানে বিद्यমান আছে। নূতান্তরে ঐ অপবাদ কৃষ্ণচরণের ভাই রামদেবের সম্বন্ধে ছিল, "রামদেবস্ত ফারাদিতে নীতা মথসংপর্কঃ" (কামাল, বন্দ্য প্র, ৪১।২)। রামদেব নিঃসন্তান ছিলেন। একটি গ্রন্থে

কৃষ্ণচরণ-শায়ী একটি সমসাময়িক কারিকার অংশ উদ্ধৃত
হইয়াছে :—

“কৃষ্ণচরণ বন্দ্যবর, পাইয়া কিরিসির ডর, কাঁঠালতলা করি
পরিত্যাগ।” (চেতলা; ৬৫১২)

৫। চট্টবংশের একশাখা “ধনো” চট্টনামে পরিচিত। এই
বংশে শ্রীনাথের পুত্র গোবিন্দ খাঁড় হইতে বঙ্গভীষ্মলের একটি
ভাগ “গোবিন্দ খাঁড়ী” নাম লাভ করে। তাঁহার এক পৌত্র
দোকড়ি সম্বন্ধে লিখিত আছে—“দোকড়ি মঘেন নীতঃ”
(পরিষদ ৩১১১), “দোকড়িকন্তু ততো মঘে প্রবেশঃ” (জয়ন্তী
৩১৩১)। দোকড়ির বংশ বিদ্যমান নাই।

৬। উক্ত গোবিন্দ খাঁড়ের ভ্রাতা গঙ্গাদাসের এক প্রপৌত্র
শ্রীকৃষ্ণ “মঘে গতঃ” (পরিষদ ৩০৯১), অথবা “মঘাভ্রাতঃ”
(জয়ন্তী, ৩১২১)। একটি পুথিতে কিছু বিবরণ আছে—
“শ্রীকৃষ্ণে মঘেন নীতঃ, পুনশ্চ গৃহমাগতঃ চিরদিনাং পরং,
তৎপুত্রো মহাদেবো ব্যবহারককার। ততঃ(ঃ) শ্রীকৃষ্ণে যত,
অভ্যায়ীকার্যপ্রাধিকারং কৃত্য মহাদেবো জাতিহীন” (কামাল,
চট্টপ্রকরণ, ৭১১-২)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল পরে মঘের কবল
হইতে কিরিয়া আসিলে তাঁহার পুত্র মহাদেব তাঁহাকে গ্রহণ
করিয়া এবং যত্ন পর প্রাধিকার করিয়া “জাতিহীন” হইয়া-
ছিলেন। মহাদেবের বংশ বহুকাল বিদ্যমান ছিল। প্রথম
উক্তিযে জাতিহীনতার প্রসঙ্গ নাই।

৭। অবসখী চট্টবংশীয় রবিকরপ্রকরণে গোবিন্দের পুত্র
রমেশ (অথবা রামশরণ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—“ততঃ পত্নী
মঘে গতা” (হুগলী, ৩৪৩১২), “রমেশ চক্রবর্তিনঃ পত্নী মঘেন
নীতঃ” (জয়ন্তী, ২৫১১১)। একটি গ্রন্থে লিখিত আছে, এই
পত্নী কিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌতুক-
জনক বৃত্তান্ত আমরা বিনা অসুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি—“রাম-
শরণস্ত্রী হরিহরন্ত কন্তা মঘেন নীতা পিঙ্গলী বন্দরে
বিবাহিতা। সা কন্তা পুনরপি শান্তিপুরে আগতা রামশরণ
বৃহৎ। তেন রামশরণেন গর্ভঃ কৃতঃ, সা পুনরপি মাঠ্যারিতে
স্থিতা জনাপবাদ ইত্যচাৰ্য্যং” (কামাল, অবসখী প্রকরণ,
১৬১২)। বুঝা যায় মঘের দৌরাত্ম্য মাঠ্যারি ও শান্তিপুর্ পর্যন্ত
প্রমার লাভ করিয়াছিল। পিঙ্গলী বন্দর মেদিনীপুরে সমুদ্র-
তীরে অবস্থিত ছিল। মঘেরা বন্দ-বন্দিনীদিগকে এখানে
বিক্রয় করিত (“a place where captives were sold”—
Bengal : Past & Present XIII. p. 39)।

৮। মুঘলবংশে কামদেব পণ্ডিতের দ্বারায় শৌরীকান্তের
পুত্র পরমানন্দের “মঘজবনদোষঃ” (জয়ন্তী ১৫৬১২), “পরমানন্দো
মঘেন নীতঃ” (কামাল, মুঘলবংশ, ১৫১২)।

৯। উক্ত কামদেব পণ্ডিতের সন্তান বিশ্বনাথের পুত্র
গণেশের সম্বন্ধে লিখিত আছে—“পশ্চাৎ কন্তা মঘে নীতা
সর্বনাশঃ।” (সাক্ষা ৫১৩১২, হুগলী ২৮৯১২)

১০। গাজুলীবংশে রামনাথের পুত্র রামেশ্বরের সম্বন্ধে
লিখিত আছে—“ততোহদন্তা কন্তা মঘেন নীতা, সর্ব-
নাশান্নানিঃ।” (হুগলী, ৪৩৭১২)

১১। কাজীবংশে নীলকণ্ঠের পুত্র গোপীকান্তের “কন্তা
হারমাদেন নীতা” (পরিষদ ৩৬৩১১)।

১২। কাজীবংশেই দামোদরের এক বৃদ্ধপ্রপৌত্র রমাপতির
“গুড়িবিবাহঃ, ততোহদন্তা কন্তা মঘেন নীতা অত্র সর্বনাশঃ।”
(ঐ, ৩৬৪১১)।

১৩। আমাদের নিকট ঘটককেশরীর একটি কুলপঞ্জী
আছে, পত্রগুলি গলিতপ্রায়। ধনো-চট্টবংশের বিবরণে রাজীব
চক্রবর্তীর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীর কৌতুকজনক বিবরণ আছে—
“ইমং মঘেন নীতা গতাং, পশ্চাৎ যুদ্ধাং দন্তা আদিত্যমূল বৈদ্যেন
নীতঃ মঘাবাসে ষড়দিনং ব্যাপ্য স্থিতং” (৫১২ পত্র)। অর্থাৎ
মঘেরা তাঁহাকে নিয়া ছয়দিন রাখিয়াছিল, এক বৈদ্য যুদ্ধা
দিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লন।

১৪। ধনো-চট্টবংশীয় রাধাপুত্র নারায়ণ নপাভীবন্দ্যবংশীয়
রামচন্দ্রের পুত্র রঘুনন্দনের সহিত কুল সম্বন্ধ করিয়া “মঘদোষ”
প্রাপ্ত হন। কারণ, “বৎ রামচন্দ্রে মঘে নীতা পলাইতবান,
জাতিধ্বংসো ন ভবতি, স্পর্শদোষে ছদ্রো ভবতি।” (সাক্ষা
২৯৬১২)

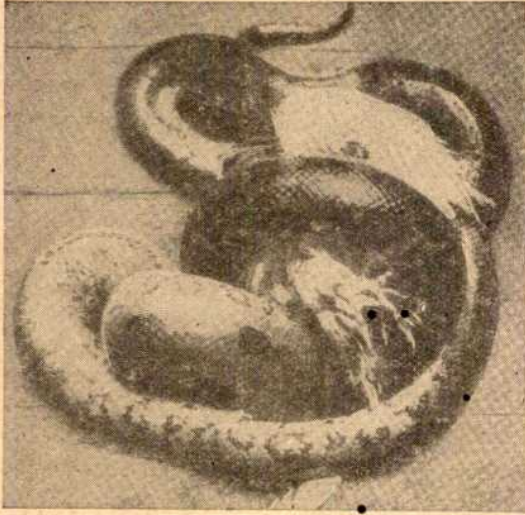
কুলগ্রন্থে এই জাতীয় বহু মঘদোষের উল্লেখ হুঁকিয়া বাহির
করা যায়। রাস্তার কুলগ্রন্থের প্রতিপাদ্য কেবল কুলীনদের
কুলকথা, বংশজ ও শ্রোত্রিয়ের বিবরণ এই সকল গ্রন্থে নাই।
অর্থাৎ বঙ্গের বিশাল রাস্তার ব্রাহ্মণ সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের
বিবরণ মধ্যেই উদ্ধৃত কথা পাওয়া যাইতেছে। সমগ্র বাঙ্গালীর
মধ্যে সহস্রগুণ অত্যাচার যে সাধিত হইয়াছিল সহজেই অনুমান
করা যায়। এই ভীষণ অত্যাচারের সময়েও নিয়বদ্ধ হইতে
জনসংস্কারণ বাড়ীঘর ছাড়িয়া বহুসংখ্যায় অস্ত্রচলিয়া গিয়াছিল
এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্গীর হাঙ্গামার সময়েও প্রায়
কেহই চিরকালের জন্য পশ্চিম বঙ্গ ত্যাগ করিয়া যান নাই,
কেবল সাময়িকভাবে অনেকে পলাইয়া গিয়াছিল।

মঘদোষের উদ্ধৃত বিবরণসমূহে তৎকালীন সামাজিক প্রতি-
ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্বনাশ ও জাতিনাশ শব্দের
উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন ভ্রান্ত ধারণা না করেন। এই দুইটি
শব্দ অতি সীমাত্ম কারণেই আদর্শবাদী কুলচার্য্যগণ প্রায় প্রতি
পৃষ্ঠায় প্রয়োগ করিয়াছেন। বংশজের কন্তাগ্রহণ কিম্বা
শ্রোত্রিয়ের কন্তা দান করিয়া বহুতর কুলীনের এইরূপ সর্বনাশ
হইয়াছে। উদ্ধৃত শেষ ঘটনায় “জাতিধ্বংসো ন ভবতি” উক্তি
প্রতিবাদযোগ্য। কুলচার্য্যগণ আদর্শবাদী হইলেও উচিত স্থলে
উদারতা দেখাইতে পরাধীন হন নাই। ইহাই সমাজের
সজীবতার লক্ষণ।

প্রকৃতি কি সত্যই নিষ্ঠুর?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই বিচিত্র জীব-জগতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধটা অতিমাত্রায় পরিষ্কৃত। আশেপাশে যে দিকে চোখ ফিরাই, সর্বত্রই কেবল হানাহানি, রক্তাক্তির ব্যাপার নজরে পড়ে। বিড়াল হাঁহকে তাড়া করে; সাপ ব্যাঙকে উদরস্থ করে; হিংস্র পশুরা নিরীহ প্রাণী হত্যা করিয়া উদর পূরণ করে। নিয়ন্তরের কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা—ছলে, বলে, কৌশলে একে অঙ্কে হত্যা করিয়া জীবিকাজনের ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। ইহার মধ্যে দয়া-মায়ার স্থান নাই। একের



সাপের কবলে পড়িয়া মুরগীর অবস্থা। এক চাপুই মুরগীর হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া যায়

দেহ উদারসং করিয়া অতের পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—প্রকৃতির এই অলম্ব্য বিধান। আয়রকার প্রয়োজনে অপরের রস-রক্ত আহরণ এবং প্রবলের কবল হইতে দুর্বলের বাঁচিবার উপায় অবলম্বন—ইহাই হইতেছে জীবন-সংগ্রামের একটা বৃহত্তর দিক। এই দিক দিয়া অভিব্যক্তির ধারায় জীব-জগতে বহু বৈচিত্র্য এবং যোগ্যতমের উদ্ভবন সম্ভব হইয়াছে।

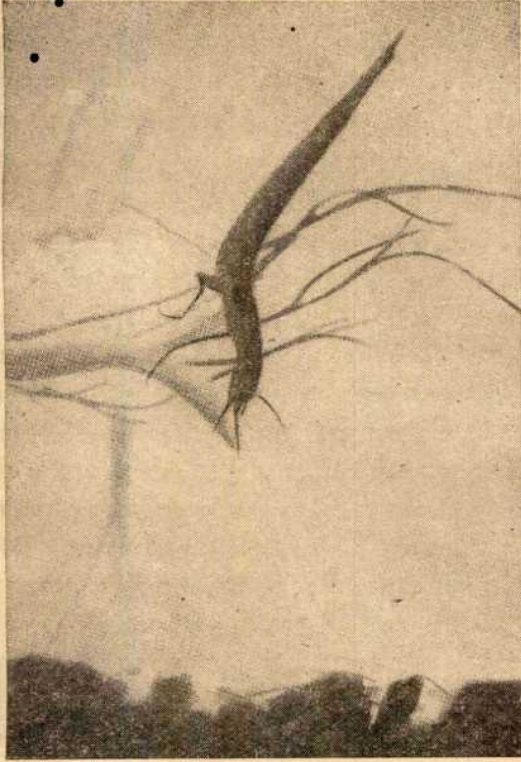
জীব-জগতের অভিব্যক্তি বা যোগ্যতমের উদ্ভবন এবং অজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিধান সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব না থাকিলেও যে কারণেই হউক হুঃখ-কষ্ট, জালা-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মধ্যে সহানুভূতিমূলক একটা বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। এই সহানুভূতির দিক হইতে প্রকৃতির রাজ্যের হানাহানি, কাটাকাটির ব্যাপারগুলি আমাদের কাছে গুরুতর

নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। মানুষও বুদ্ধি করিয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এখন কথা হইতেছে—মানুষ বুদ্ধি-কৌশলে যে সকল নিষ্ঠুরতার অবতারণা করিয়া থাকে প্রকৃতির রাজ্যে এই হানাহানির মধ্যে সেরূপ কোন নিষ্ঠুরতার ব্যাপার ঘটে কি না।

বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে—প্রকৃতির রাজ্যে হানাহানি, কাটাকাটির মধ্যেও মনুষ্য-পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার সমতুল্য কোন গুরুতর নিষ্ঠুরতার স্থান নাই। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ মার্টিনার ব্যাটেন লিখিয়াছেন—তিনি একজন বিশিষ্ট শিকারীকে জানিতেন। দৈবক্রমে একবার এই শিকারী এক বাধিনীর কবলে পড়েন। বাধিনী তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে বাচ্চাদের নিকটে লইয়া যায়। বিড়ালের বাচ্চারে যেমন হাঁহ লইয়া খেলা করে বাধিনীর বাচ্চাগুলিও সেইরূপ শিকারীকে লইয়া খটখটানেকের বেশী সময় ধরিয়া খেলা করিতে থাকে। যত বারই শিকারী হামাগুড়ি দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে ততবারই বাধিনী তাহাকে বাচ্চাদের কাছে টানিয়া লইয়া আনে। এইরূপ ব্যাপার চলিবার সময় শিকারীর দলবল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। গুরু পাইয়া বাধিনী শিকারীকে তুলিয়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু চতুর্দিকে লোকজনের হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে বেগতিক দেখিয়া শিকারীকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। শিকারী প্রায় অক্ষত দেহেই দে যাত্রা বাঁচিয়া যায়। শিকারী তাহার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলিয়াছেন—বাধিনীর কবলে পড়িয়া আমার যে মানসিক অবস্থা ঘটয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি বিষয় পরিষ্কার মনে আছে। বাধিনীর শিকট হইতে হামাগুড়ি দিয়া পলাইয়া আসিবার জন্ত আমার মানসিক শক্তি যেন ক্রমশঃই অত্যাশ হইয়া উঠিতেছিল। মনে তখন আমার ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। ডর-ভয়ের বোধশক্তিই যেন মন হইতে লোপ পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দিনের আলো, চতুর্দিকের গাছপালা এবং নিজের গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থা সহস্বে কিছুমাত্র বিভ্রম ঘটে নাই। দৈহিক বা মানসিক কোন যন্ত্রণাও অনুভব করি নাই। দাঁত তোলাইবার জন্ত ডেউক্টের চোমারে বসিয়া অনাগত বিপদের আশঙ্কায় যতটা মানসিক উদ্বেগ বা যন্ত্রণা অনুভব করা সম্ভব তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

রোগাক্রমণে অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রণার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াও কোনক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এরূপ অনেকের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, এরূপ সঙ্কটজনক

অবস্থায় পৌছবার পূর্বে মানসিক অবস্থার এমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যেখানে ভয় এবং যন্ত্রণাবোধ সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ চরমক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মেই মন এমন একটা সম্বোধিত অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে ছুঃখ-কষ্ট, জালা-



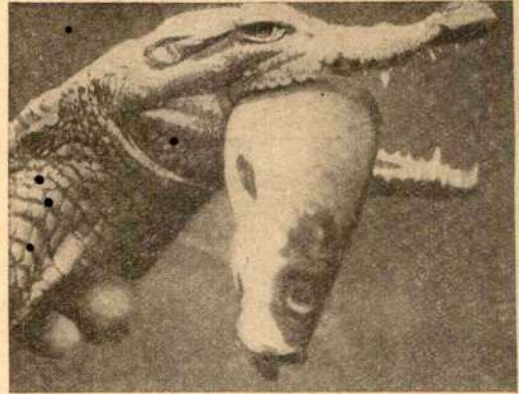
কালো রঙের জল-পোকার বাচ্চা, ছোট একটা বাণমাছকে দাঁত ফুটাইয়া অসাড় করিয়া রক্ত চুষিয়া খাইতেছে

যন্ত্রণা বোধের প্রশ্নই উঠে না। বোধশক্তি মনের। জালা-যন্ত্রণার অহুত্ব জাগে মনে, মন নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলে যন্ত্রণা অহুত্ব করিবে কে? মহুত্বের প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মন অতি-মাত্রায় সচেতন এবং তাহার প্রসারতাও অসম্ভব রকমের বেশী। একটা ইঁদুরের মন মানুষের মনের তুলনায় অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র। কাজেই একথা সহজেই অস্বীকার করা যাইতে পারে—বাবের কবলে পড়িয়া মানুষকে যদি যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হইয়া থাকে তবে বিড়ালের কবলে পড়িয়া ইঁদুরের অতি-সামান্য যন্ত্রণা ভোগ করিবারই কথা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে—উদরসাৎ করিবার পূর্বে শিকারীর দস্ত, নখরাধাতে শিকার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠে কি না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—এরূপ অবস্থায় যন্ত্রণা অহুত্ব হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। গুরুতর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার স্নায়বিক অসাড়তা সর্ব-শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিকারীর সশুধীন হইবামাত্র

আঘাত করিবার পূর্বেই কোন কোন ক্ষেত্রে আবার শিকার ভয়ে সম্পূর্ণ অসাড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হওয়া বা ক্ষণপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ঘটনাও বিরল নহে। স্নায়বিক আঘাত, রক্তমোক্ষণ বা মানসিক হুস্টিজা প্রভৃতি যে কোন কারণে সংজ্ঞাহীনতা বা অসাড়ত্ব ঘটুক না কেন ইহা যে প্রাকৃতিক করুণার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জীব-জগতে যেদিন হইতে পরস্পরের প্রতি এই শত্রুতার উন্মেষ ঘটয়াছে সেই দিন হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে সংজ্ঞাহীনতা বা অসাড়ত্ব উৎপাদনে ছুঃখ, কষ্ট, যাতনা বোধ তিরোহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসের বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র মন হইতে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায় এবং শরীরের যন্ত্রণাবোধ থাকে না অথচ আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে খাড়া উদরসাৎ করিবার প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। সে সকল ক্ষেত্রে বিষপ্রয়োগে স্নায়বিক অবসাদ ঘটাইয়া বোধশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নিম্ন-স্তরের প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়।

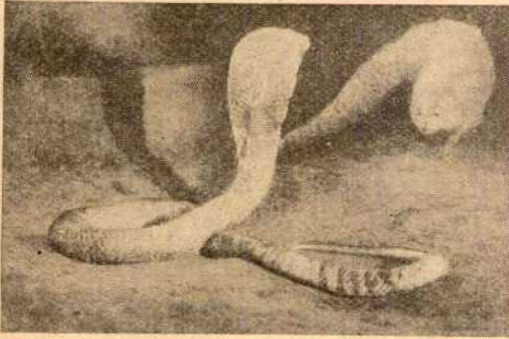
আমাদের দেশে পুতুর, খাল, বিল প্রভৃতি অগভীর জলাশয়ে গুবড়ে পোকার মত বড় বড় একরকমের কালো রঙের জল-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহাদের বাচ্চা-গুলিকে বড় রকমের মশার বাচ্চার মত মনে হয়। দিন দশ-



কুমীরমাছ শিকার করিয়াছে। শুদূচ চোয়ালের এক আঘাতেই মাছের সর্বশরীরে অসাড়তা ছড়াইয়া পড়ে, তখন আর যন্ত্রণাবোধ থাকে না

মনের মধ্যেই বাচ্চাগুলি প্রায় তিন ইঞ্চির বেশী লম্বা হইয়া যায়। শরীরের মধ্যমাংশ বেশ মোটা কিন্তু মাথা ও লেজের দিকটা খুবই সরু। মাথাটা চেপ্টা এবং মুখের দুই দিকে দুইটি বাকানো সাঁড়াশীর ফলা। ইহার মনোরম ভঙ্গীতে হেলিয়া-হুলিয়া জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। লেজটাকে

উপরের দিকে প্রসারিত করিয়া জলনির্মিত খাদপাতার মধ্যে শিকারের আশায় নিশ্চন্দ্র ভাবে অবস্থান করে। মাছ বা অঙ্ক কোন প্রাণী নিকটে আসিলেই অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া সাঁড়াশীর সাহায্যে চাপিয়া ধরে। আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত শিকার প্রাণপণে চেষ্টা করে বটে; কিন্তু তাহা কেবল এক-আধ মিনিটের জন্ত। দেখিতে দেখিতেই সে যেন ঝিমাইয়া পড়ে এবং নড়াচড়া করিবার ইচ্ছাই যেন লোপ পায়। কিন্তু প্রাণপ্রাণ-প্রক্রিয়া সমানভাবেই চলিতে থাকে। মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় দেখা যায় শিকারীর সাঁড়াশী ছুইট সাপের বিষ-দাঁতের মত ফাঁপা, এবং তাহাদের গোড়ায় বিষের গ্রন্থি রহিয়াছে। সাঁড়াশী দিয়া চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভ



সাপ ও বেজীর লড়াই। সুবিধা পাইলেই ত্রেজী এমন ভাবে সাপের ষাড় কামড়াইয়া ধরে যে সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বেশীক্ষণ তাহাকে যতনা ভোগ করিতে হয় না।

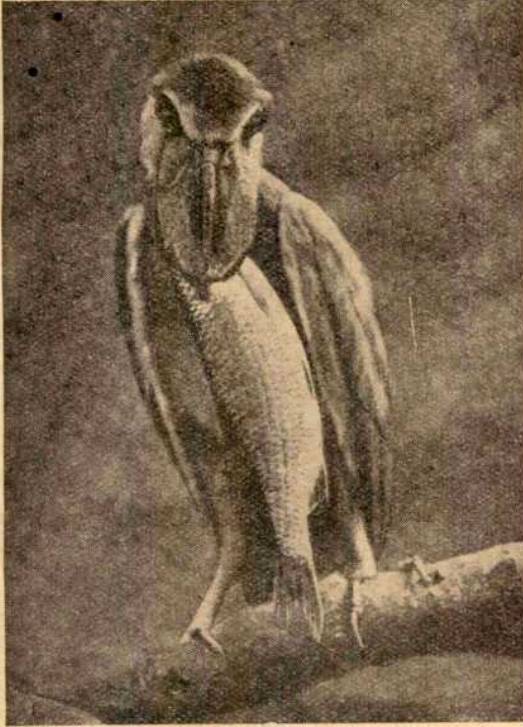
ছিন্নপথে বিষ আসিয়া শিকারের সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহার বোধ-শক্তি রহিত করিয়া ফেলে। এই পোকাগুলি শিকারের রসরক্ত চুষিয়া খায় এবং ইহাতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া থাকে। প্রথম আঘাতের ফলে মৃত্যু ঘটিলে রক্ত জমাট ধাঁধিয়া যাইবার সম্ভাবনা; তখন রক্ত চুষিবার সুবিধা হয় না। কাজেই প্রাকৃতিক বিধানই যেন শিকারকে জীবিতাবস্থায় আঁড় করিয়া তাহার জালা-ময়ূর উপশমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলিকাতার আশপাশে খাল, বিল, নালা-ডোবায় মেছো-মাকড়সার অভাব নাই। ইহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলের উপর বিচরণ করে; পোকামাকড় শিকার করে এবং সুবিধা পাইলেই মাছ ধরিয়া খায়। কাচের চৌবাচ্চায় মাকড়সা গুলিকে পুষিয়া তাহাদের মৎস্য-শিকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মাছ ধরিবার আশায় ইহারা বর্টার পর বর্টা এক স্থানে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাছ দেখিতে পাইলেই বিহ্বল-গতিতে তাহার উপর পড়িয়া ঝাড়ের কাছে সাঁড়াশীর মত দাঁত ছুইটাকে বিধাইয়া দেয় এবং প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট চাপিয়া বসিয়া থাকে। ছুই-চার সেকেন্ড লাফালাফি করিয়াই শিকার নির্জীব হইয়া পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ দম লইবার পর শিকারকে

চিবাইয়া মণ্ডের ডেলার মত তৈয়ারী করে এবং ধীরে ধীরে রস চুষিয়া খায়। একেএক বিষ-প্রয়োগেই শিকারকে অসাড় করিয়া রাখা হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে একবার একটি সুবর্ণরেখা-মাছের উপর শিকারী মাকড়সা ঝাপাইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক, ঝাড়ের কাছে না ধরিয়া মাছটার শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে সাঁড়াশী বিধাইয়া দেয়। মাছটা ছিল মাকড়সাটার অপেক্ষা বড়; কাজেই ছুই-চার সেকেন্ডেই মাকড়সার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলাম সেই মাছটার লেজের দিকটা যেন ক্রমশঃই সাদা এবং অস্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। প্রায় মিনিট পনের পরে মাছটাকে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম শরীরের একপাশে বেশ ক্ষত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বেশী গভীর নহে। ক্ষতের পর লেজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ সাদা হইয়া গিয়াছে এবং সে অংশটা সুস্থ অংশের মত কোমল বা নমনীয় নহে। এই অংশে ইলেকট্রো-থার্মেল ষ্ট্রিম্যুলাস প্রয়োগে তেমন কোন সাদা পাওয়া গেল না অথচ এই উপায়ে সুস্থ অংশে প্রবল উত্তেজনা লক্ষিত হয়। আংশিক ভাবে মাকড়সার বিষ সঞ্চালনের ফলেই যে মাছটার অঙ্গাংশ অবশ হইয়া গিয়াছিল এ কথা সহজেই বুঝা যায়।

ছোট ছোট গাছপালা-পরিপূর্ণ যে কোন বাগানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—কালো রঙের ছোট ছোট পিপড়ের মত ডানাওয়ালা এক জাতীয় পোকা, হয় উড়িয়া বেড়াইতেছে, নয় লতাপাতার উপর ব্যস্তভাবে কি যেন খোঁজা-খুঁজি করিতেছে। ইহারা এক জাতীয় কুমোরে পোকা। এই পোকাগুলি কালো রঙের শুয়াপোকার শরীরের ভিতরে ডিম পাড়ে। ইহাদের শরীরের পশ্চাভাগে খুব স্বল্প স্বচের মত একটি ফাঁপা নল আছে। এই নলটিকে শুয়াপোকার শরীরে প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া যায়। ইহাদের দেখিতে পাইলেই শুয়াপোকা প্রাণপণে ছুটিয়া কোথাও আয়গোপন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কুমোরে পোকার মুখোমুখি পড়িয়া গেলেই সে যেন ভয়ে কেমন এক রকম হতভম্ব হইয়া যায় এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কুমোরে পোকা তখন তার শরীরে হুল প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ বাদেই শুয়াপোকাটা আবার স্বাভাবিক ভাবে চলা-ফেরা করিতে থাকে। দশ-পনের দিন পরে দেখা যায়—হঠাৎ আবার শুয়াপোকাটা স্বাভাবিক ব্যস্ততার সহিত এক দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর তাহার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কোন নিরালো জায়গায় আসিয়া শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে চামড়া ভেদ করিয়া স্থতার মত স্বল্প স্বল্প কতকগুলি পোকা বাহির হইয়া আসে। পোকাগুলি বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থতার মধ্যে এখানে সেখানে সাদা গুটি তৈয়ারী করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই শুয়াপোকাটার সর্বশরীর সাদা গুটিতে

ভর্তি হইয়া যায়। গুটি নির্মাণ শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই শুয়াপোকার জীবনের অবসান ঘটে। এই ব্যাপারটার মধ্যেও সুস্পষ্ট ভাবে কোন অবসাদক পদার্থের ক্রিয়া লক্ষিত হয়।



বোটবিল পাখীর মাছ ধরিবার কৌশলই এমন যে,
এক চাপেই মাছের যন্ত্রণার অবসান ঘটে

সামনের পা হইতে পিছনের পা পর্যন্ত প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা ধূসর রঙের এক রকম কাঁকড়া-মাকড়সা দেখা যায়। ইহার জাল বোনে না। ডিম পাড়িবার সময় গাছের পাতা, মুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। মৌমাছির মত এক জাতীয় কুমোরে পোকা ইহাদের পরম শত্রু। শত্রুর আগমন টের পাইলেই মাকড়সাটি ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু কুমোরে পোকার নজর কিছুতেই এড়াইতে পারে না। কুমোরে পোকা যখন শিকার বাগে পাইয়া তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে, মাকড়সাটি ভয়ে কাঠ হইয়া তখন নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। এই সময়ে কুমোরে পোকা তাহার খাড়ের কাছে হল ফুটাইয়া বিষ ঢালিয়া দেয় এবং পরক্ষণেই পিঠের উপর একটিমাত্র ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া মাকড়সার পিঠের উপর এঁটুলির মত লাগিয়া তাহার রস চুষিয়া বাইতে থাকে। প্রায় তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাটি একটি বড় মুড়ির আকার ধারণ করে। মাকড়সাটি

তখনও এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করে বটে, কিন্তু কিরূপ যেন একটা সন্দোহিত অবস্থা—ভয়-ভর, জালা-যন্ত্রণা বোধের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাচ্চাটি আরও বড় হইয়া মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাকড়সাটার সর্বশরীর বেমালাম উদরস্থ করিয়া ফেলে। একটা জীবন্ত প্রাণিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধীরে ধীরে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া নিঃশেষিত করা ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানই এমন যে, ইহাকে জীবন্ত অথচ অবশ করিয়া রাখিবার জন্ত যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার ফলেই যাতনা বোধও তিরোহিত হইয়া যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি—মাছয়ের মনের প্রসারতা এতই বেশী যে, অজ্ঞ কোন জীবজন্তুর সঙ্গে তাহার কোন তুলনাই চলিতে পারে না। মাছ যেমন একের অবস্থা দেখিয়া অজ্ঞের অবস্থা যথাযথ অনুমান করিয়া লইতে পারে মহাযাতার প্রাণীদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা যেমন অজ্ঞের যত্ন দেখিয়া নিজের যত্ন সন্দেহে সচেতন হই, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য অনুভবন করিতে পারি, নিয়ন্ত্রণী প্রাণীরা সেরূপ কিছুই পারে না। রক্ত দেখিলে বা রক্তের গন্ধ পাইলে তাহারা যত্ন বা ঐ রকমের কোন গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। আবার দৃষ্টিপথ হইতে রক্তাক্ত দৃশ্য অপহৃত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ভাব কাটিয়া যায়। কিন্তু যত্নভয় ছাড়াও আর একটি ব্যাপার আছে, সেটি হইতেছে যাতনা-বোধ। কিন্তু তাহাদের যাতনা-বোধও যত্নভয়ের চেয়ে বেশী কিছু গুরুতর



পাখীর ঠোঁটে ধরা পড়িয়া ইঁদুরট অসাড় হইয়া পড়িয়াছে

ব্যাপার নহে। আমাদের কোন অজপ্রত্যয় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে কত গুরুতর আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে—পূর্বে হইতেই তাহা অনুমান করিয়া যাতনাম, অশান্তিতে ভ্রিয়মাণ হইয়া পড়ি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের প্রাণীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

এত অমুমান শক্তি নাই বলিয়াই তাহাদের যাতনার পরিমাণও কম হইয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন বা কণ্ঠিতাদ শিয়াল, কুকুর, কাক, চিল প্রভৃতি প্রাণীকে আঘাতজনিত ক্ষত বিলুপ্ত হইতে না হইতেই স্বাভাবিক ভাবেই পরস্পর ঝগড়াঝাটি বা খেলাধুলায়



ইএট পানী হাঁহর ধরিয়াছে। ঠোঁটের প্রথম আঘাতের পরই শিকারের শরীর অবশ হইয়া পড়ে

যোগদান করিতে দেখা যায়। মোটের উপর ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত যাতনার কারণ বিদ্যমান থাকে তাহার বেশী সময় তাহাদের যত্নবোধ থাকে না; কিন্তু মাহুষের ক্ষেত্রে যাতনার কারণ দূরীভূত হইলেও মানসিক হুন্টিতায় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

• •

তা ছাড়া, নিম্নস্তরের প্রাণীদের যাতনা-বোধ যে খুবই স্বল্পকাল স্থায়ী কতকগুলি ব্যাপার হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আঘাত লাগিলে টিকটিকির লেজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে রক্তপাত ঘটে। কিন্তু এরূপ গুরুতর আহত অবস্থায়ও টিকটিকির গতিবিধি দেখিয়া কোন উৎকর্ষ যাতনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইলে মাকড়সার শরীর হইতে একাধিক পা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনার অব্যবহিত পরে অবস্থাপ্রাপ্তে তেমন কোন যাতনা-বোধের লক্ষণ দেখা যায় না। মাছ, ব্যাঙ, হাঁহর প্রভৃতি প্রাণীদের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে সামান্য কিছুক্ষণের জন্ত যত্নবোধ করে বটে; কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করে। কড়িং বা অজ কোন কীট-পতঙ্গের লেজ বা অঙ্গ যে কোন অঙ্গবিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে কত অল্প সময়ের জন্ত যত্নবোধ অহুত্ব করে সে বিষয়ে অনেকেরই

অভিজ্ঞতা আছে। পিপীলিকার শরীরের অর্দ্ধাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও পরমুহুর্তেই তাহারা যেভাবে প্রয়োজনীয় কার্যে আত্মনিয়োগ করে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। মনে হয় যাতনা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য একটু অহুত্ব জাগে; কিন্তু পরক্ষণেই সেই অহুত্ব লোপ পায়। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছি মাছির বেলায়। আকস্মিক আঘাতে মাছির মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার যেন কিছুই হয় নাই। মাছির একটা স্বভাব—বসিয়া থাকিলেই সে পা দিয়া ডানা, মুখ এবং অন্তঃস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রসারণে লাগিয়া যায়। মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি সে বসিয়া বসিয়া প্রসারণ করিতেছে। চোখ নাই, মুখ নাই, সর্কোপরি মাথা নাই—মস্তক না থাকিলে তাহাকে চালাইবে কে? কাজেই সে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক হাঁটয়া বেড়াইতেছে। সময় সময় চিং বা কাত হইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু আবার উঠিয়া বসে এবং প্রসারণে লাগিয়া যায়। এ অবস্থায় ঘণ্টা দুইয়েরও বেশী সময় ছিল। ষাওয়াবার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আর বেশী সময় বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। কফা জাতীয় একটা বিচ্ছিন্ন মস্তক পিপড়ে গলনাঙ্গীর মধ্যে তরল খাদ্য প্রবেশ করাইয়া জ্যানেন্ট উনিশ দিন পর্যন্ত জীবিত রাখিয়াছিলেন। মিস্ ফিলডে পেনসিলভেনিকাস্ জাতীয় একটা পিপড়ের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া উক্ত উপায়ে খাদ্যপ্রয়োগে ৪১ দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত উন্নত-স্তরের শিকারী প্রাণীদের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে—ঠোঁট বা নখরাখাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিকারের শরীরে এক রকমের অদাড়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের যাতনা বোধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন বা পেশীসমূহের ক্রিয়া সমান ভাবেই চলিতে পারে। এইজন্যই আমরা পানীর ঠোঁট, সাপের প্যাচ, সাঁড়াশীর মত ধারালো ঠাঁড়া বা কুমীরের চোয়ালে আবদ্ধ প্রাণীকে উদরস্থ হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রবল বেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখি। তা ছাড়া, শিকারী প্রাণীরা শিকার ধরে উদরপূর্ণি করিবার জন্ত, শিকারের যত্নগা উপভোগ করিবার জন্ত নহে। কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা শিকারকে উদরস্থ করিবারই চেষ্টা করে। যত্নবোধ যদিও বা কিছু থাকে এই কারণেই তাহা স্বল্পকাল স্থায়ী হইতে বাধ্য। মোটের উপর, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারগুলি আপাতঃ প্রতীয়মান নির্ভরতা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিতে নির্ভরতার স্থান খুবই কম।

প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা : কেনিয়া ও টাঙ্গানায়িকা

অধ্যাপক শ্রীসুখান্তবিমল মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের বর্তমান যুগকে যেত-প্রাধাত্যের যুগ আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। জগতের রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেতাদ্ৰ প্রভাব এবং কর্তৃত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনধিক শতাব্দীকালের মধ্যে গীত জাপান রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বলদপিত যেত জাতি-সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রের প্রতি-কূল আবর্তন আজ তাহাকে যে অবস্থিত এবং অপ্রত্যাশিত হৃদশার গভীর গহ্বরে টানিয়া নামাইয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া কবে যে আবার সে পূর্বে অবস্থা লাভ করিবে ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নহে। কোন দিনই করিবে কিনা কে জানে।

বিশ্বপ্রাসী যেতপ্রাধাত্য অত্যাচার, শোষণ এবং উৎপীড়নের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত মানব আত্মার অভিযোগ দিনের পর দিন মুখর হইয়া উঠিতেছে। মানব-মৈত্রী, জাতি-প্রেম প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী কথামূল্যের আবরণের অভ্যন্তরে এতদিন পর্যন্ত যে নিখরম শোষণ চলিতেছিল, আজ তাহার মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে। যেতজাতি নির্মিত সম্পদসৌধের নিয়ে পুঞ্জীভূত অশ্বতকালগণের দুঃখ দুর্দশা এবং ভাষাভাষীত অবমাননার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আজই হউক, কালই হউক, বিধাতার রুদ্ররোষ গণ-বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেত সভ্যতার শাসনশাখা রচনা করিবে। তাহার পর আবার নূতন করিয়া চির-অপরাজিত মাহুষের জন্মযাত্রা শুরু হইবে। বিশ্ব-সভ্যতার ধারা নূতন ধাতে প্রবাহিত হইবে।

একদা ভারতবর্ষ ছিল বিশ্ব-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছুরিত জ্ঞান এবং সভ্যতার রশ্মি বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল। সে যুগে প্রবাসী ভারতসন্তানের মর্যাদার আসন ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

আজিও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু ভারতীয় রহিয়াছেন। সংখ্যায় ইঁহারা প্রায় ৪০ লক্ষ। কিন্তু আজ সর্বত্রই ইঁহারা অবহেলা এবং অবমাননার পাত্র। ইঁহারা মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলেই ভারতীয় বিদ্যে এবং নিপীড়ন চরমে উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্যে ত সর্বজনবিদিত। কিন্তু পূর্ব-আফ্রিকাও কম যায় না। পৃথিবীর অচ্যুত অংশেও প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা সুখের বা গৌরবের নহে। ভারতমাতার শৃঙ্খল খোঁচনের পূর্বে ইঁহাদের ভাষা অধিকার স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা সূর্য-পর্যন্ত। পণ্ডিত নেহরু যথার্থই বলিয়াছেন যে প্রবাসী ভারতসন্তানের অবস্থা কি প্রকার হইবে তাহা নির্ভর করে স্বদেশে ভারতীয়ের অবস্থার উপর ("The status of an Indian abroad must ultimately depend upon his status at home" অথবা "The question of Indians abroad is intimately connected with the independence of India and when independence is

achieved the status of Indians everywhere will inevitably improve.") স্বাধীনতালাভের পরে ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিতে হইবে প্রবাসী ভারতীয় সমাজের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং তাঁহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ তাঁহার মধ্যে অন্যতম।

ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার প্রদেশগুলির মধ্যে টাঙ্গানায়িকা অন্যতম। নামে ব্রিটিশ ম্যাজেটের অধীন হইলেও ইঁহাকে ব্রিটিশ রক্ষণাধীন পূর্ব-আফ্রিকায় অপর দুইটি প্রদেশ কেনিয়া এবং উগাণ্ডার সমপর্যায়ভুক্ত করা অসমীচীন হইবে না। এই তিনটি প্রদেশের স্তম্ভ এবং ডাক ও তার বিভাগ সম্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকার সমস্ত ডাক টিকিটের উপর একটি সিংহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত এবং তাঁহার চতুর্দিকে কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানায়িকা এই কথার কয়টি মুদ্রিত থাকে। ইঁহাদের সকলের মুদ্রার উপরই ইংলণ্ডের প্রতীকটি উৎকীর্ণ। সামগ্রিক প্রয়োজন ব্যতীত অর্থনীতিক কারণেও উপরি-উক্ত প্রদেশ তিনটির মুক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্ত ইঁহাদের মুক্ত শাসন-ব্যবস্থা অপরিহার্য। কেনিয়া, টাঙ্গানায়িকা এবং উগাণ্ডার মোট আয়তন (১৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার), ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক। কাঁচামালের যোগানদার এবং বাড়তি মূলধন নিয়োগের কেন্দ্র হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ইঁহাদের অসাধারণ গুরুত্ব রহিয়াছে।

কেনিয়া এবং টাঙ্গানায়িকার মোট ৮,৪৩৪,১১১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৬৫,৭৯০ জন ভারতীয় এবং আনুমানিক ২৮,২১১ জন ইউরোপীয়।*

পূর্ব-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও মোটামুটি ভাবে বলিষ্ঠ গেল ১৮৯৫ সালের পর হইতেই ভারতীয়গণ পূর্ব-আফ্রিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ঈষ্ট আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া, উগাণ্ডা রেলপথ-নির্মাণের জন্য ভারত সরকারের নিকট ভারতীয় শ্রমিক আমদানির প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশাগত শ্রমিকের পরিপ্রমেষে উক্ত রেলপথ-নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের নিকট পূর্ব-আফ্রিকার গুণের কথা বলিতে যাইয়া ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র ভারতবিদ্বেষীও প্রশংসার পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। My African Journey গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,

* ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী। ১৯৪১ সালে নূতন করিয়া আদমশুমারির কথা থাকিলেও যুদ্ধের জন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই।

"It was the Sikh soldier who bore an honourable part in the conquest and pacification of these East African territories. It is the Indian trader, who penetrating and maintaining him in all sorts of places to which no whiteman would go or in which no whiteman could earn a living, has more than anyone else developed the early beginnings of trade and opened up the first slender means of communication. It was by Indian labour that one vital railway on which everything else depends was constructed."

অর্থাৎ পূর্ব-আফ্রিকা বিজয় এবং তথায় শান্তি সংস্থাপনে শিখ সৈনিক একটি গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে সমস্ত অঞ্চলে-স্বোত্মগণের গমন বা জীবিকাকর্জন অসম্ভব ছিল ভারতীয় বণিকগণ সে সমস্ত জায়গায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া চলাচল ব্যবস্থা সূচনা করিয়াছেন। এ অঞ্চলের প্রধান এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি ভারতীয় শ্রমিকের পরিশ্রমে নির্মিত হইয়াছে।

কেবল পূর্ব-আফ্রিকাই নহে, ফিজি, মরিশাস, দক্ষিণ-আফ্রিকা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ ভারতীয় শ্রমিকের প্রাণপাত পরিশ্রম এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দুর্জয় সাহস।

১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে টাঙ্গানায়িকাই ইংরেজদের হস্তগত হয়। তৎপূর্বে ইহা জার্মানীর অধিকৃত ছিল। যুদ্ধাবসানে ইহাকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। জার্মান শাসনাধীন টাঙ্গানায়িকাতে প্রবাসী ভারতীয়-গণকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইংরেজ শাসনে ইহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা, পূর্বোপেক্ষা অব-নতিই ঘটয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ইংরেজ, জার্মান, ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুসারে টাঙ্গানায়িকায় মোট ৫১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩,৪২২ এবং ন্যূনাধিক ৯০০০। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই প্রদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ ভারতীয়-দিগের হাতে ছিল। কিন্তু ভারতীয়দিগকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পছন্দ করিয়া কালে সেই দেশ হইতে বিভাঙিত করা টাঙ্গানায়িকা সরকার কর্তৃক অস্বস্ত ভারতীয় নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৩২ সাল হইতে আজ পর্যন্ত আইনের বলে বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দিগকে কোণঠালা করিয়া ফেলিবার চেষ্টার আর বিরাম নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে তাহা-দিগের ব্যবসায়ের পূর্বতন স্থান পরিভাগ করিয়া নতুন নতুন জায়গায় ঘাইতে বাধ্য করা হইতেছে। সরকারের মতে এই নতুন ক্ষেত্রগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। টাঙ্গানায়িকায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তদ্রূপ ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের উক্ত প্রদেশের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছিল। কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে এই অধিকার বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের ছায়া টাঙ্গানায়িকাতেও ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং দোকানদারগণই সর্বপ্রথম কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারী এবং শ্রমশিল্প পণ্য ক্রয়কারী স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত

সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। নিজের প্রয়োজনেই তাহা-দিগকে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বেও টাঙ্গানায়িকার সর্বত্রই ভারতীয় মালিকের ভারতীয় চালক পরিচালিত মোটর এবং অল্পবিধ যান দেখা যাইত। আয়তনে টাঙ্গানায়িকা একেবারে নগণ্য নহে। ইহার মোট আয়তন ৩৪০,০০০ বর্গ মাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডে রেলপথ আছে মাত্র ১৪০০ মাইল। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে একেবারেই অপরিপাক তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় পরিচালিত মোটর-যানই ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে সক্রিয় এবং সচল রাখিয়া-ছিল। ১৯৩১ সালে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রথম ভারতীয় মালিকের যানবাহনের উপর লাইসেন্স কর দাখ্য করেন। ২ বৎসর পর ১৯৩৩ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে রেলপথের সমান্তরাল কোন রাজপথে ভারতীয় মালিকের মোটর চালানো নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অপ্রধান রাজপথ-গুলিতে তাহার অধিকার এখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় মোটর-মালিকের অধিকার আরও সঙ্কুচিত হইল। ৩ বৎসর ঘাইতে না ঘাইতে ১৯৪০ সালে অপর একটি আইন প্রণয়ন করা হইল। এই আইনে ব্যবস্থা হইল যে টাঙ্গানায়িকার দক্ষিণাংশের মালভূমিতে (Southern Highland of Tanganyika) যে সমস্ত মোটর চলাচল করিবে কোন ভারতীয় তাহাদের মালিক বা চালক হইতে পারিবে না। টাঙ্গানায়িকার কৃষি-সমৃদ্ধ এই অংশে প্রচুর চা, কফি, গম-এবং ধান উৎপন্ন হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই আইন একটি পূর্ব-পরিকল্পিত, সূচিস্থিত কার্য পদ্ধতির অংশ মাত্র।

টাঙ্গানায়িকার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ৫০০০-এরও অধিক ভারতীয় বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান ব্যবস্থায় ইহাদের পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। কেবল তাহাই নহে। সমপদস্থ ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা ইহা-দিগকে ক্ষম্য বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। কাগজে কলমে প্রবাসী ভারতীয়গণ অস্বাভাবিক ব্রিটিশ প্রজার সমান অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নহে। আইন-পরিষদ (Legislative Council) এবং বিভিন্ন উপদেষ্টা সমিতিতে (Advisory Committees) ভারতীয় প্রতিনিধি রহিয়াছেন সত্য কিন্তু আইন-পরিষদের ১৩ জন সরকারী এবং ১০ জন বেসরকারী মোট ২৩ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ ভারতীয়ের ৩ জন এবং ন্যূনাধিক ৯,০০০ ইউরোপীয়ের ২০ জন প্রতিনিধি আছেন।

তারপর কেনিয়া ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি (Crown Colony)। এই প্রদেশটিতে ১৯৩১ সালের আদমশুমারির হিসাবে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৪২,৩৬৮। ইহার মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩,৩৩৪,১৯১, তন্মধ্যে ভারতীয় ব্যতীত ১৯,২১১ জন ইউরোপীয় আছে। টাঙ্গানায়িকার ছায়া

কেনিয়ার অর্থনীতিক জীবনেও এক সময়ে ভারতীয়গণের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের বার্ষিক প্রয়োজনে কেনিয়া হইতে আজ ভারতীয় বিতাড়ন অত্যাশঙ্কক হইয়াছে। ঠিক একই কারণে টাঙ্গানিকাতে ভারতীয় দলন আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৯০ সালে কেনিয়াতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫ বৎসর পর ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল ইষ্ট আফ্রিকা কোম্পানীর নিকট হইতে ইংরেজ সরকার ইহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত কেনিয়া ব্রিটিশ রক্ষানামীন (Protectorate) অঞ্চলরূপে শাসিত হইত। ঐ বৎসর ইহা ক্রাউন কলোনিতে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে টুই-এক জন করিয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিক কেনিয়াতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালের পর হইতে সরকারী উৎসাহ এবং অনুমোদনের ফলে ইংরেজ ঔপনিবেশিকের সংখ্যা পূর্বাগ্রেসে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্বে হইতেই কিছু ভারতবাসী কেনিয়াতে ঘর বাঁধিয়াছিলেন। প্রায় প্রথম হইতেই খেতাব এবং কৃষিক ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রেযারেমি আত্মপ্রকাশ করিল।

কেনিয়ার মোট আয়তন প্রায় ২২০,০০০ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরাংশ অধুর্ভর। কিন্তু নাইরোবি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চল অতিশয় উর্বর। সমগ্র কেনিয়ার প্রায় ১৮৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুটের কম উচ্চ বলিয়া নীতপ্রধান দেশাগত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের বাসোপযোগী নহে। এতদ্ব্যতীত অঞ্চলকে Highlands অর্থাৎ উচ্চ বা মালভূমি বলা হয়। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও একান্ত মনোরম। এইখানে যথেষ্ট শিকার মিলে এবং প্রচুর পরিমাণে কফি, গম, চা ও ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের তদানীন্তন উপনিবেশ সচিব লর্ড এলগিন কেনিয়ার মালভূমিতে এশিয়াবাসীদিগের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া সমীচীন নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

“Grants of land in the upland areas should not as a matter of administrative convenience be made to Asiatics.”

ইহার দুই বৎসর পূর্বে যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মালভূমিতে কেবলমাত্র খেতাদগণকেই জমি বন্দোবস্ত দিতে আরম্ভ করেন, তখনও লর্ড এলগিন তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে কেনিয়ার আইন পরিষদে একজন বে-সরকারী সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হইলেও পরে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ১৯১৩ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সামাজিক সুবিধার ওজুহাতে ভারতীয়গণকে ইউরোপীয়গণ হইতে সর্বপ্রকারে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার সুপারিশ করা হয়। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্ভ্রষ্ট হইতে পারেন নাই।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের একটি ফল এই যে ইহার ফলে বিশ্বের সর্বত্র এক অভিনব গণ-চেতনার সঞ্চার হয়। কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণও নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং অধিকার সম্বন্ধে পূর্বাগ্রেসে সচেতন হইয়া উঠিলেন। এদিকে স্বার্থবান ক্ষমতা-ভোগীর দলও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-রক্ষায় পূর্বাগ্রেসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কাজেই কেনিয়ার ভারতীয় সমাজ গুরুতর আকার ধারণ করিল। ১৯১৯ সালে কেনিয়ার গবর্নর একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে কেনিয়াতে ভারতীয় স্বার্থ একেবারে উপেক্ষিত না হইলেও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কেনিয়াতে ইউরোপীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেনিয়া শাসনে এই নীতিই অমুসৃত হইবে।

“The principle has been accepted that this country is primarily for European development, and that, whereas the interests of the Indians will not be lost sight of, in all respects the interests of the Europeans must predominate.”

১৯২০ সালে লর্ড মিলনার প্রস্তাব করিলেন যে কেনিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলসমূহে বিশেষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় সদস্য নিরীচন করা হইবে, যে সমস্ত আইনের বলে কেনিয়াতে বৈদেশিকগণের আগমন নিয়ন্ত্রিত হইবে (Immigration Laws) তাহাতে ভারতীয়গণ সম্বন্ধে কোন অস্বাভাবিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না, কেনিয়ার মালভূমি কেবলমাত্র খেতাদগণের জম্ম সংরক্ষিত রাখা হইবে সত্য, কিন্তু অল্প উৎকৃষ্ট চাষের জমি ভারতীয়গণের জম্ম সংরক্ষিত থাকিবে এবং ভারতীয় ও খেতাদগণের জম্ম স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং সম্ভব হইলে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার নীতি অমুসৃত হইবে।

এই প্রস্তাব কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করিল। ১৯২০ সালের ২২শে আগষ্ট নাইরোবিতে আহৃত ভারতীয়গণের একটি বিরাট সম্মিলনে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল। খুব সম্ভবতঃ ইহারই ফলে ভারত সরকারের চৈতন্যোদয় হইল। ভারত সরকার বলিলেন যে ব্রিটিশ ভারতীয়গণকে সাম্রাজ্যের অধীন কোন দেশেই ইংলণ্ডের অঙ্গ কোন প্রজা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

“There is no justification in a Crown Colony or Protectorate for assigning to British Indians a status in anyway inferior to that of any other class of His Majesty's subjects.”

১৯২১ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সেও প্রবাসী ভারতীয় সমস্তার আলোচনা হয়। কনফারেন্স মত প্রকাশ করিল যে ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন যে সমস্ত জায়গায় ভারতবাসী ঘর বাঁধিয়াছে, সাম্রাজ্যের স্বার্থেই সে সমস্ত জায়গায় তাহাদিগকে নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

"That in the interests of the solidarity of the British Commonwealth it is desirable that the rights of such Indians—lawfully domiciled in some other parts of the Empire—to citizenship should be recognized."

ইহাতে সমস্তার সমাধান ত হইলই না, বরং সমস্তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়া এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। কেনিয়াবাসী স্বৈরাচার বিদ্রোহের হুমকি দিলেন। অনন্তোপায় হইয়া ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভা কেনিয়া সমস্তার একটা সমাধান করিবার চেষ্টা করিলেন।

"The British Cabinet gave this device because the white people threatened rebellion."—*Srinivas Sastri*.

এই সমাধানে স্বেচ্ছা মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কেনিয়া স্বৈরাচার (Kenya White Paper) নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়—

১। কেনিয়া ব্যবস্থা পরিষদে ১১ জন ইউরোপীয় এবং ৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

২। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন হইবে অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ ইউরোপীয় ভোটে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ভারতীয় ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৩। ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিবার ক্ষমতা ভোটাধিকার লাভের পক্ষে একটি বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। কেনিয়ার মালভূমি ইউরোপীয়গণের জন্ত এবং নিম্নভূমিতে অবস্থিত উৎকৃষ্ট চাষের জমি ভারতীয়গণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

১৯২০ সালে কেনিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে প্রবাসী ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করা হইবে না।

"They, i.e., the Indians, were in error in supposing that the Government has any intention of drawing any distinction between Europeans and Indians so far as rights of mining, settling and acquiring lands are concerned."

১৯২০ সালের স্বৈরাচার এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

স্বৈরাচারে বলা হইল যে স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থ রক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি সাধনই কেনিয়াতে অগ্রসৃত শাসন-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

"In the administration of Kenya, His Majesty's Government regard themselves as exercising a trust on behalf of the African population, and they are unable to delegate or share this trust—the object of which may be defined as the protection and the advancement of the native races."

এই সাড়ম্বরে ঘোষিত নীতি কেনিয়া শাসনে কতটা অগ্রসৃত হইতেছে বিগত ১৯শে ডিসেম্বর মস্কো বেতার কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তাহা কীস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বক্তা মিখাইল মিখালভ (Mikhail Mikhallov) বলেন

যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার করা হয় কেনিয়াতে স্থানীয় অধিবাসিগণের উপর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। নিজেদের জমি হইতে বিভাজিত হইয়া ইহার নাম মাত্র মজুরির বিনিময়ে ইউরোপীয়গণের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার শূন্যকরা মাত্র ৫ জন। ১৯৪৫ সালে উপনিবেশ সরকার ৪,০০০,০০০, স্থানীয় অধিবাসীর শিক্ষার জন্য মাত্র ৫০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন।

"The British press, which certainly is not likely to paint the picture blacker than it is, reports that the position of the African population in Kenya is deteriorating from year to year. Driven from their land, native Kenyans have to sell their labour to European residents for next to nothing. Ninety-five per cent of the native population are illiterate. That is hardly surprising when you consider that the sum allowed last year for the education of 4,000,000 Kenyans was just £500."

মন্তব্য নিম্নরোজন।

কেনিয়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল। একাধিক কমিশন নিযুক্ত এবং একাধিক স্বৈরাচার প্রকাশিত হইল। ১৯৩২ সালে নিযুক্ত কার্টার কমিশন (Carter Commission) ১৯৩৪ সালে সুপারিশ করিলেন যে কেনিয়ার মালভূমি স্বৈরাচারগণের জন্ত সংরক্ষিত রাখা হউক। ১৯৩৯ সালে এই সুপারিশ অমূল্যায়ী ব্যবস্থা করা হইল।

কেনিয়া-প্রবাসী স্বৈরাচার ১৯২০ সালের ছায় এবং বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে প্রবাসী ভারতীয়গণকে তাঁহাদের সমান মর্যাদা দিলে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিবেন না। কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়া ঐ দুই দেশে ভারতীয়গণকে স্বৈরাচারগণের সমান অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে কেনিয়া এবং টাঙ্গানিকার্টে স্থানীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে সরকার নিযুক্ত একটি বোর্ডের অনুমোদিত যানবাহন ব্যবহারকেই মাত্র একচেটিয়া অধিকার দেওয়া চলিবে। ইহার ফলে সরকারের মর্জি মাস্টিক মোটর এবং নৌকার মালিকগণকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইতে পারে। নৌকা এবং মোটর ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়গণের হাতে। সুতরাং উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব-আফ্রিকায় ইংরেজ শাসনাধীন কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা এবং জাম্বিয়ার ভারতীয় বিদ্রোহ চরমে উঠিয়াছে। এই চারিটি প্রদেশেই সরকার বৈদেশিকগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ

করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব ব্যবস্থা পরিষদে আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। সার মহারাজ সিং, মিঃ কে. সারওয়ার হোসেন এবং মিঃ সি. এস. বা. দ্বারা গঠিত ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মতে প্রস্তাবিত আইন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জাঞ্জিবার ব্যতীত অষ্ট তিনটি প্রদেশেই বহু জন-বিরল অঞ্চল রহিয়াছে। কাজেই তথায় এখনও বহু আগন্তকের স্থান সম্বলান হইতে পারে। প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে বলা হইয়াছে যে কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা বৈদেশিকগণের পূর্ব-আফ্রিকা প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত না করিলে ভবিষ্যতে বৈদেশিক-গণ দক্ষিণ-আফ্রিকা ছাইয়া ফেলিবে। অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু এই যুক্তির পোষকতা করে না।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে অধিক সংখ্যক বৈদেশিক আমদানির ফলে পূর্ব-আফ্রিকায় বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু একথা মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। একথাও ভুলিলে চলিবে না যে বহিরাগতদের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলেই পূর্ব আফ্রিকার অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

কেনিয়ার মালভূমিতে ইউরোপীয় ব্যতীত অজ্ঞাত জাতির চাষ এবং বাসের অধিকার স্বীকৃত হইলে বহু সহস্র প্রবাসী ভারতীয়ের কর্মসংস্থান হইতে পারে। বর্তমানে এই অঞ্চলের অতি সামান্য অংশ মাত্র চাষ করা হয়। কেনিয়াতে বর্তমানে ২০০০ ইটালি দেশীয় যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে। ইহার নীচই অন্তরীণ যুদ্ধে হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। তাহার ফলেও কিছু স্থানীয় অধিবাসী এবং বহিরাগতের কর্মজাতের পথ প্রশস্ত হইবে। কেনিয়া, উগাণ্ডা, জাম্বিয়া এবং টাঙ্গানয়িকা প্রত্যেক প্রদেশেই যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য ধন এবং জন-বলের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা অমুহুরী কাঙ্ক্ষ করিতে হইলে সহস্র সহস্র কর্ম্মীর-সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং বেকার সমস্যার ওজুহাতে বৈদেশিকগণের পূর্ব-আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকায়, বিশেষ করিয়া কেনিয়া এবং উগাণ্ডায়, রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে তথাকার অধিবাসীসমূহ বহিরাগত মাত্রকেই সম্বোধনের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসিগণের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতও যে না আছে এমন নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ভাবে বলিতে গেলে ভারতীয় এবং আফ্রিকাবাসীর মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা বিরোধ নাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উভয় সম্প্রদায়ের যে সমস্ত অক্ষমতা (disabilities) রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ইহার সমবেত আন্দোলন করিয়াছে।

পূর্ব আফ্রিকায়, আর কেবল পূর্ব-আফ্রিকায় কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র আজ ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে যে অভিযান

আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ আজ স্বৈরাচার বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে নতুন অর্থনৈতিক বিধান প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুগে নতুন নতুন অঞ্চল কবলিত করিয়া সাম্রাজ্যের অঙ্গ ঘোটা করা সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই যুগে কাঁচা মাল উৎপাদকারী এবং শ্রমশিল্প পণ্য জরুরী দেশসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষার জন্ত হুঃসাহসী ব্যবসায়িকগণের সহায়তা একান্ত ভাবেই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বল্পতুঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই যুগে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার প্রধান সহায় হইয়াছে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকের চাহিদার একটা বড় অংশ ভারতবর্ষ মিটাইয়াছে। যখন পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ শ্রমিক পাওয়া যাইতেছিল না, তখন ভারতীয় শ্রমিকগণই বিভিন্ন উপনিবেশের কৃষিক্ষেত্রে এবং কারখানা সমূহকে চাপু রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র হাজার হাজার ভারতীয় বণিক এবং ক্ষুদ্র দোকানদার দেখা যায়। ইহার স্থানীয় কাঁচামাল জরুরী করিয়া বিভিন্ন শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সাম্রাজ্যের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল এবং সক্রিয় রাখেন। ইহারাই আবার স্থানীয় অধিবাসীদিগকে শ্রমশিল্প পণ্য সরবরাহ করেন। নতুন নতুন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার যুগে এই সংগঠনই ছিল সুকৌশল।

"Extensive agriculture and middlemen's profits could be permitted while imperialist capital could yet derive increasing profits out of newer areas."—*Indians in Foreign Lands* by Dr. Ram Manohar Lohia.

ব্রিটিশ পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নতুন করিয়া প্রমাণ করিবার মত জ্ঞান আজ আর দেখা যাইতেছে না। তাই বীথ প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহের পরিপূর্ণ শোষণ আজ ইংলণ্ডের অমুহুর্ত নীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই কবলিত অঞ্চলসমূহের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদার-গণের উৎসাদন, ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদিগকে বিভবীনের পর্যায়া-ভুক্ত করিবার এবং স্থানীয় শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব বেকী খাটাইবার প্রয়োজনীয়তা অমুহুর্ত হইতেছে। ব্রিটিশ উপ-নিবেশিক সাম্রাজ্যের সর্বত্র আজ এই অভিনব নীতি অমুহুর্ত হইতেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক নববিধান জাতীয় (Racial) এবং অর্থনৈতিক (Economic) দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথমতঃ এই নীতির ফলে ব্রিটিশ উপ-নিবেশের প্রবাসী ভারতীয়গণই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার শেষ উপায় হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ আজ এই অভিনব নীতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবাসী ভারতীয় সমাজকে এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের

স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মরক্ষার জন্ত সম্মিলিত চেষ্টা করিতে হইবে। মূলতঃ অর্থনীতিক এই নববিধানের সহিত উপ-নিবেশবাসী ব্যবসায়ী জাতির ভাগ্য জড়িত। ইহাদের সকলের সম্মিলিত চাপ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাধারার বাহক দলগুলি এবং ভারতবর্ষ ও প্রবাসী ভারতীয় সমাজ এবং উপনিবেশবাসী নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্ম-

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিতে পারে। ১৯৩৭ সালের জাতিসংঘের লব্ধ ধর্মঘট ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত সফলতা লাভ করিত না। নেহরু সরকার কর্তৃক সত্ত-সমাপ্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N. O.) অধিবেশনে ত্রিমুখী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কার্যকলাপ ও তাহার ফলাফল ত সর্বজনবিদিত।

নোয়াখালি

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

নোয়াখালি। তুমি আজি পুণ্যতীর্থস্থান
হিংসাক্রম করিবার দিয়াছ সন্ধান,
জালিয়াছ পথে আলো যে পথ অগম্য
পরিত সমান যাহা দূর-অতিক্রম্য।

ভীমকায় টলি যায় বিশ্বাসের বলে
অহিংসায় হিংসা লয় অপূর্ণ কৌশলে,
কঠিন তপস্বী এ যে কঠিন সাধনা
উন্নত ভূফান বুকে শান্ত উপাসনা।

হুঃসহ হুঃস্বের পথে আনো সমাচার
মুহুর্তে মুহুর্তে যাহে করো হুঃস পার,
মৃত্যুর ছায়ার খুলি দেখাও যে স্বর্ণ
বিশ্বে তুলি ধরো আত্ম-বিশ্বাসের অর্থ।

নিরন্তরের অজ্র তার আত্মার আলোক-
ধৌত করে ধরাতল দৃষ্টি অপলক,
অলক্ষ্য মোক্ষের দ্বার হয় উল্কাটন
মহাতীর্থ নোয়াখালি যোহর বিশ্বজন।

সঞ্জীবনী

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

ঘুমায়ো না, ঘুমায়ো না অঙ্গরা উর্ধ্বশী,
অনেক অনেক আলো আকাশে এখনো,
বাতাসের স্তরে স্তরে উঠিছে উছসি
হাজার আশার গান—কান পেতে শোনে।

অনেক অনেক আলো আকাশে এখনো,
জাগিছে হাজার চাঁদ রূপের নেশায়,
স্বপন-সাগর হতে পরীরা আভাসে
বিবর্ণ জীবন-পটে সবুজ যেশায়।

মানুষ মরিছে জানি প্রহরে প্রহরে,
ঝরে ঝরে পড়ে যত কামনা-মুকুল,

প্রলয়-তরঙ্গ ওঠে জীবন-সাগরে,—
জলচর পাখী যত হতেছে ব্যাকুল।

কোথা যাবে প্রাণতরী—পায় না নিশানা,
কোথায় স্বপনে দেখা সাগর-সুন্দরী,
কি নামে ডাকিব তারে—কি তার ঠিকানা?—
জানি না; সমুখে জাগে কঠিন শব্দরী।

সাগরের বক্ষ হতে উঠি' মৃত্যু-চেউ
হৃদয় দান্তিক বেগে ছুঁয়েছে আকাশ,
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে, কোথা নাহি কেউ—
এ হৃদ্যোগে যে আনিবে বাঁচার আশাস।

মানি, মানি, যে উর্ধ্বশী, মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে
তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান,
তবু ত' উঠিছে চাঁদ দূরের গগনে,
ভোরের আলোর জাগে স্বপনের গান;

এখনো অনেক আশা রয়েছে জীবনে,
হৃদয়ের মণিকোঠা হয়নি ত' ছাই,
বঁাকা হোক—তবু আজো রাতের স্বপনে
সুহৃদের পথরেখা নয়নে মেশাই;

হেথা হোথা পাহতর জাগে সীহারায়,—
নব নব আশা জাগে পথিক-অন্তরে,
নিঃসঙ্গ নিশীথে আজো কি যেন মায়ার
মরুর সীমান্তে বসি' পাণিনা কুহরে।

আজিও পৃথিবী সব হয়নি শ্মশান,
আজিও যায়নি নিভে দিশারী প্রদীপ,
এখনো তোমার যত অন্তরের গান
হুলার ধরারে নিত্য করে যে সজীব।

ঘুমায়ো না, ঘুমায়ো না অঙ্গরা উর্ধ্বশী,
নিভায়ো না হেম-দীপ শীলা-বাসরের,
পারিজাত-মালা বাঁধা ছ'হাতে পরশি'
নিশেষে ঘূচাও আজ ক্লীবত পাথের।

ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস বা পাঠ্যভালিকা

এস. এম. ছদ্মকদ্দিন

বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস নিয়ে নানা রকম বাগ-বিতণ্ডা চলছে। অনেকের মতে সিলেবাস অত্যন্ত গুরুভার হয়েছে। কথটা আংশিক সত্য। আমাদের দেশে সিলেবাস করা হয় বেশ জাঁদরেল ধরণের, কিন্তু কাজ হয় খুব সামান্য; যাকে বলে—‘বজ্র আটুনি ককা গেরো’। অথচ অস্বাস্থ্যবোধে এর থেকে কম সিলেবাসেই অনেক অধিক শিক্ষা করে ছাত্রেরা বেরিয়ে আসে। সিলেবাসই আসল কথা নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে ছাত্রেরা নোট-বই ছাড়া এক পা-ও এগুতে চায় না। মুখস্থ—মুখস্থ—মুখস্থ—না বুঝে সুঝে মুখস্থ ছাড়া আর কোন কিছু তারা জানে না। ফলে ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাস আসলে যতটা কঠিন, তার চেয়ে দেখার বহুগুণে বেশী। ‘Gramm- ing’ (মুখস্থ-বিদ্যা) ও তাত্ত্বিক মত আওড়ানো এই দু’টো জিনিষ কতকটা প্রতিরোধ করতে পারলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা হবে প্রকৃত শিক্ষা। এর জন্য এক সঙ্গে তিন দিক থেকে সংস্কারকার্য চালাতে হবে; যথা—

(ক) সিলেবাসের সংস্কার-সাধন;

(খ) পাঠ-দান ও পাঠ-গ্রহণের গতানুগতিক ব্যবহার পরিবর্তন;

(গ) পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

মাতৃভাষা—ম্যাট্রিকুলেশনের বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী বাংলা ভাষার জন্য দুটি প্রস্তপত্র ও এদের প্রত্যেকটির জন্য ১০০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। প্রথম প্রস্তপত্রে গল্পের জন্য ৬০ এবং পছের জন্য ৪০ নম্বর নির্ধারিত আছে। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সংকলনের উদ্দেশ্য হল বড় বড় সাহিত্যিকদের রচনা-সম্ভার থেকে চয়ন করে কেবল মালা-গাঁধাই নয়, বরং এর সৌরভে ও সৌন্দর্যে ছাত্রমনকে আদর্শ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করা। মালাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যসিদ্ধির পন্থা মাত্র। বড় বড় সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্যমূলক দু-একটি লেখা পাঠে ছাত্রমনে তাঁদের গ্রন্থ পাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। কিন্তু বর্তমানে এই উদ্দেশ্য শতকরা ৯৯টি ছাত্রের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে। ছাত্রেরা সংকলনগুলি বড় একটা পড়ে না, পড়ে শুধু নোট, তত্ত্ব নোট, পরীক্ষা পাসের হুজুমি দাওয়াই—যার মধ্যে বড়ির চেয়ে ফাঁকিই বেশী—ফলে ছাত্রেরাও ফাঁকে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রস্তপত্রে ব্যাকরণে ২৫ নম্বর, অনুবাদে ২৫, রচনায় ২৫ এবং কৃত পঠনের পুস্তক থেকে ২৫ নম্বর—মোট ১০০ নম্বর থাকে। গদ্য ও পদ্য সংকলন-পাঠের বেলায় যা ঘটে কৃত পঠনের বেলায় তার চেয়ে হয় অনেক বেশী। রচনা

গোছের একটি প্রস্ত আসবে, আসল-বইয়ের মূল গল্পের চেহারা না দেখে নোট থেকে মুখস্থ করাই ‘মহাজনন্ত পন্থা’ বলে পৌনে ষোল আনা ছেলেই মনে করে। ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব রচনা পাঠ করলে তাহাদের ভাষা-শিক্ষার আসল রূপ চোখে পড়ে। শতকরা ৯৫টি ছেলের প্রকাশভঙ্গী (style) দূরে থাক, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা নাই বললেই চলে। রচনা ছাড়া মুখস্থ-বিভার মধ্যেও এটা বেশ নজরে পড়ে। হঠাৎ যদি কোথাও খেঁই হারিয়ে গেল, তবেই মুশকিল; ভাব জট পাকিয়ে যায়, হয়ে পড়ে ‘হু’টি পাকা তেল সরিষার বেল’ জাতীয়, ভাষার ছরবছা হয় তার চেয়েও করুণ।

ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সূচুরূপে ভাবগ্রহণ ও ভাব-প্রকাশ হয়, তা হলে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিলেবাস গঠন করলে কতকটা উপকার হতে পারে। মুখস্থ-বিদ্যা ফলানোর মধ্যে বিশেষ কোন বাহ্যিক নেই। ছেলেমেয়েরা অতের ভাব গ্রহণ করে নিজের কথায় সূচুরূপে প্রকাশ করতে পারে কিনা, তারা বুঝে-সুঝে পড়তে পারে কিনা, দশ জনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভাব শুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে কিনা—এইগুলির উপর নির্ভর করে তাদের ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা ও সফলতা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলা ভাষার সিলেবাস নিম্ন-লিখিতরূপে সংস্কার করা যেতে পারে:—

প্রথম প্রস্তপত্র (লিখিত)—	গদ্য (সংকলন)—	৩০ নম্বর
	পদ্য	৩০ ”
	ব্যাকরণ	২০ ”
		৮০ ”
	হোম ওয়ার্ক—	২০ ”
	মোট—	১০০ ”
দ্বিতীয় প্রস্তপত্র—	রচনা (২টি)—	৪০ নম্বর
	অনুবাদ—	১৫ ”
	পত্র ও মর্ম-লিখন—	১৫ ”
		৭০ ”
	হোম-ওয়ার্ক—	৩০ ”

	মোট—	১০০ ”
তৃতীয় প্রস্তপত্র, প্রস্তোত্তর—	২০ নম্বর	নির্বাচিত পুস্তক হতে
(মৌখিক) সরব পঠন—	১৫ ”	
উপস্থিত বস্তুতা—	১৫ ”	

মোট— ৫০ নম্বর
প্রথম ও দ্বিতীয় ‘পেপার’ (প্রস্তপত্র) লিখিত। এর মধ্যে প্রথম পেপারে ‘প্যারোটিডের’ (তাত্ত্বিক পাণ্ডুর মত আওড়ানো)

অবকাশ যথেষ্ট থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ-পদ্ধতির পরিবর্তন না হবে এবং বাজারে হুজুমি 'নোটের' প্রচলন বন্ধ না করা যাবে। দ্বিতীয় পেপারে ছাত্রদের মৌলিকত্বের উপর জোর দিতে হবে। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় পেপারে 'প্যারোটডে'র অবকাশ অতি অল্প। তৃতীয় পেপারেও তথৈবচ। তা লিখিত না হয়ে মৌখিক হওয়ায় ছাত্রদের পঠন, কথন, ভাবগ্রহণ ও ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতার বিচার করা যেমন সহজ তেমনি অনেকখানি সঠিকও হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছাত্রেরা লেখার বেলায় কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্ষ হলেও ছোটো কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে একেবারে হকচকিয়ে যায়। অথচ লেখার চেয়ে বলার প্রয়োজন সামাজিক জীবনে অনেক বেশী।

এ ছাড়া সিলেবাসের মৌখিক অংশের আরও কয়েকটি দিক আছে। ক্রম পঠনের বইগুলি ছেলেরা একেবারে পড়ে না, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সিলেবাসে মৌখিক প্রশ্নোত্তর ও সরব পঠনের স্থান থাকায় ছাত্রেরা তা না পড়েই পারে না; কারণ নোট-বুক এখানে অচল। পুস্তক থেকে ছোট ছোট প্রশ্নের নিভুল উত্তর দেবার জন্য এবং সুন্দর পঠনের জন্য মর্ম-গ্রহণের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ছাত্রকে আসল পাঠ্যপুস্তক পুনঃ পুনঃ পড়তেই হবে। মুখস্থের বালাই নেই, বারবার ভাল ভাবে পাঠ করলে পুস্তকের বিষয়বস্তু আপনা হতেই ছাত্রমনে বহুস্থল হবে।

উচ্চাদের যে-কোন সাহিত্য ভাবরাজ্যের জিনিষ। এ ছাড়া সাহিত্যিক হলেন শ্রুতি, জ্ঞান ও ভাবুক। তাঁর প্রতিভা, ও ব্যক্তিগত ছাত্রমনে শ্রুতি ও জ্ঞান না এনে পারে না। কথায় বলে, ধারে ও ভারে কাটে। নামী সাহিত্যিকের ধারও আছে ভারও আছে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ এইখানেই। সংবাদপত্রের লেখা যতই সুচিন্তিত ও সুন্দর হোক না কেন, যদি নামী লেখনী থেকে না বেরিয়ে থাকে তাহলে তার প্রভাব ছাত্রমনে ততটা দামী হয় না। এইজন্যই নামকরা সাহিত্যিকের লেখা ভাব-সম্প্রসারণে যতটা সাহায্য করে, অল্প কোন কিছুই ততটা করে না।

কবিতা-পাঠের মতই সাহিত্যপাঠেও যথেষ্ট সতর্কতা চাই, অল্পাধার উদ্বেগ ব্যর্থ হবে। আমরা সাহিত্যকে যে ভাবে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করি তাতে তার উদ্বেগ বহুল পরিমাণে ব্যর্থ না হয়ে পারে না। ব্যাকরণের কচকচি ও সমালোচনা কপচানি দ্বারা আর যা-ই হোক সাহিত্যের মুখ্য উদ্বেগ—শ্রেষ্ঠ মনীষার ভাব-সম্পদের অলঙ্কার স্পর্শে নিজের মনোরাজ্যের তামাকে সোনা করা—নিষ্ফল হতে বাধ্য। অল্পোপচার সফল হতে পারে, কিন্তু রোগী টেকে না। ছাত্র-মনে সাহিত্যের এই অদৃশ্য প্রভাব বাড়তে হলে ছাত্রকে এক বার, দু' বার, দশ বার, বিশ বার সাহিত্য পড়তে হবে। যতই পড়বে সাহিত্যের রূপ, রস, গন্ধ ততই পরিষ্কৃত হতে

থাকবে, যতই দিন যাবে সাহিত্যের প্রভাব হবে ছাত্রজীবনে সুদূরপ্রসারী ও কার্যকরী। সিলেবাসে সরব পঠনের ব্যবস্থা রাখলে এ বিষয়ে সুরক্ষা পাওয়া যাবে।

ছাত্রের মৌলিক রচনাও এর ফলে সমৃদ্ধ না হয়ে পাবে না। লিখনভঙ্গীকে বলা চলে হীরক-হার অথবা পুষ্পমালা। হার ও মাল্যের সৌন্দর্য নির্ভর করে প্রথমতঃ বিভিন্ন ধরণের জুহর অথবা পুষ্প-প্রাচুর্যের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ এদের সংমিশ্রণ ও সংযোজন উপর। লিখনভঙ্গী তেমনি নির্ভর করে শব্দসম্ভারের প্রাচুর্য, বাক্যপদ্ধতি ভাষারীতি প্রভৃতির জ্ঞান ও এগুলির সুস্থ প্রয়োগের উপর। ছাত্র যত পড়বে তার বাক্য-পদ্ধতি ও ভাষা-রীতি এবং সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গী উন্নত না হয়েই পারে না। দু-দশ জন সেরা সাহিত্যিকের লিখনভঙ্গী ওতঃপ্রোতভাবে মনের উপর ক্রিয়া করতে থাকে; এবং শেষে সর্বসম্মুখে গঠিত হয় তার নিজস্ব ঠাইল। বর্তমানে ছাত্রদের নিজস্ব রচনার দারিদ্র্য এই ভাবে ঘুচানো যেতে পারে।

বর্তমান পদ্ধতিতে হোম-ওয়ার্ককে (গৃহে লিখন-পঠন) অবহেলা করা হচ্ছে। হোম-ওয়ার্কের জন্য পরীক্ষায় নম্বর নির্দিষ্ট না থাকায়, এর প্রতি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই বড় একটা চাড়া দেখা যায় না—একে তো শিক্ষকের সমস্যাভাব তাতে ছাত্রের আগ্রহের অভাব,—শিক্ষককে 'ফাঁকি' দেবার সুযোগ কখনো সে পরিত্যাগ করে না। তার উপর বিভিন্ন বিষয়ের হোম-ওয়ার্কের কার্যক্রম বড় একটা দেখা যায় না। ফলে, কোন দিন বা ছাত্রের খাড়ে পাঁচ-ছয় বিষয়ের হোম-ওয়ার্ক পড়ল, অল্প দিন একেবারেই হয়ত ফাঁক গেল।

এর প্রতিকার করতে হলে সিলেবাসে অল্পাধার বিষয়ের মত হোম-ওয়ার্কেরও ঠাই করতে হবে এবং শিক্ষককে তা দেখবার সময় ও সুযোগ দিতে হবে। সুস্থভাবে হোম-ওয়ার্ক পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা চাই; শিক্ষক ও ছাত্র কারও উপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। হোম ওয়ার্ক অতিমাত্রায় কঠিন বা সহজ না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেকটি হোম-ওয়ার্কের জন্য ছাত্রকে ক্লাসেই কতকটা প্রস্তুত করাতে হবে, অবশ্য মৌলিক রচনার কথা স্বতন্ত্র। এই ভাবে এগোতে পারলে ছাত্রের চাড়া না এসে পারে না।

হোম-ওয়ার্ক সুস্থভাবে পরিচালিত করতে পারলে কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। এই কারণেই মাতৃভাষায় এর জন্য ৫০ নম্বর রাখা হয়েছে। মাতৃভাষায় ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী করতে হলে মৌলিক রচনা ও হোম-ওয়ার্কের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। প্রথম পেপার অপেক্ষা দ্বিতীয় পেপারে হোম-ওয়ার্কের নম্বর এইজন্যই রাখা হয়েছে দেড় গুণ বেশী।

বাজারের চলতি নোট-বইয়ের প্রচলন বন্ধ করতে হবে, এ কথা বহু বার বলা হয়েছে। ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হলে এ কাজ সহজ হবে। হু-ভাবে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে—শিক্ষকের নিকট হতে নোট গ্রহণ করে এবং নিজেরাই নোট তৈরি করে।

শিক্ষককে নোট দিতে হলে তাঁর পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। বর্তমানে যে পাঠ-নীচা (lesson notes) রাখার ব্যবস্থা আছে তা একেবারে অকেজো। লোক দেখানো পাঠ-নীচায় আর যা-ই হোক সত্যিকারের কোন কাজ হয় না—কি শিক্ষকের কি ছাত্রের। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভালভাবে কাজের উপযোগী পাঠ-নীচা রাখা হয় না কেন? এর জবাবের জন্য বেশী দূর যেতে হয় না। সপ্তাহে ৩৯ পিরিয়ড (পাঠ-ঘণ্টা) কাজের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষককে কমবেশী ২৯ পিরিয়ড ক্লাস নিতে হয়। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে তিনি দেড় পিরিয়ড অবসর পান; ৪০ মিনিটে এক পিরিয়ড হলে তা হয় মাত্র এক ঘণ্টা। অল্পপস্থিত শিক্ষকের জের টানার পর অবসরের যা ছিটা-কোঁটা বাকী থাকে তার মধ্যে তাঁকে ক্লাসের হিসাবপত্র, হোম-ওয়ার্ক খাতা-পরীক্ষা প্রভৃতি সেরে নিতে হয়। কাজেই স্কুলে প্রস্তুতির সময় ও সুযোগ কোথায়? বাড়ীতে অবসর সময়ে যদি কেউ ইচ্ছাও করেন, তবু পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এর জন্য বেশ ভাল রকমের পুস্তক-সংগ্রহ প্রয়োজন—সেখানে থাকবে নানা রকমের দামী রেফারেন্স বই। কিন্তু এতদৈর্ঘ্যের গরীব শিক্ষকের ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহের কল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র।

ভাল ভাবে সমস্ত কাজ চালাতে হলে শিক্ষককে স্কুলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাববার ও প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ দিতে হবে। অবসর সময়ে শিক্ষক স্কুলের লাইব্রেরি মছন করে ছাত্রদের জন্য নোট প্রস্তুত করবেন। এ ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। এতে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিসর বহুগুণে বাড়বে; ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হবে।

মোট কথা ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণে ও তার প্রয়োজন অস্বাভাবিক মানসিক ধোঁরাক যোগানোয় এ ধরনের নোট দেওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী। কিন্তু নোট দান ও নোট গ্রহণকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষককে দৈনিক কম পক্ষে তিন পিরিয়ড অর্থাৎ পুরা দুটি ঘণ্টা অবসর দিতে হবে। এর উপর কোনক্রমেই হাত দেওয়া চলবে না। প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক-সংখ্যা দেড় গুণ না হোক, কম পক্ষে সওয়া গুণ বাড়াতে পারলে এই ভাবে কাজ করা সম্ভবপর হবে। কেরাণীর সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষককে হিসাব-নিকাশের হাত থেকে রেহাই দিলেও কিছু কাজ হতে পারে। এ ছাড়া, প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা রাখতে হবে পচিশের কাছাকাছি। অল্প যে-কোন ভাবে কাজ করতে গেলে সমস্তার সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

ছাত্রেরা নোট গ্রহণে সমর্থ হলে তাদের নোট তৈরির পালা আরম্ভ হবে। শিক্ষক সব বিষয়ে নোট দেবেন না; তিনি কখনো নোট দেবেন, কখনো শুধু পুস্তকের উল্লেখ করবেন। ছাত্রগণ অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে বসে উল্লিখিত পুস্তক থেকে বিষয়টি টুকে নেবে। এর জন্য দুটি জিনিষের

প্রয়োজন—স্কুলের লাইব্রেরি এবং তা ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা। প্রত্যেক দিন ছাত্রদের কমপক্ষে এক ঘণ্টা 'লাইব্রেরি পিরিয়ড' রাখতে হবে। ক্লাস-লাইব্রেরিতে ক্লাস-টিচারের তত্ত্বাবধানে এই কাজ চালানো যেতে পারে, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স বই ও অষ্টাঙ্গ পুস্তক দেওয়া সম্ভবপর হয়। তা না হলে একজন অভিজ্ঞ এম্প্লয়ীকে রেখেও এ কাজ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পদতাই প্রকৃষ্ট। লাইব্রেরি ঘরে বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী পুথি-পত্র পৃথক পৃথক সাজানো থাকবে এবং এ ছাড়া সর্বপ্রকারের রেফারেন্স-বই সকলের অধিগম্য অবস্থার রাখতে হবে।

পাঠ্য পুস্তকের গল্প প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ছাত্রগণ যাতে পনর-বিশ বার সরবে পাঠ করে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ বিষয়ে তাদের বিশেষরূপে উৎসাহিত করতে হবে। দ্রুত পঠনের পুস্তকগুলি বহুবার পাঠ করায় যে সফল হবে, সংকলনের গদ্য ও পদ্যংশ পুনঃ পুনঃ পাঠেও ঠিক সেই একই ফল দিবে। এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখা কতব্য। গল্প ও পদ্যংশ সংখ্যায় অধিক হলে কাজও হবে ভাল। ভাল, আর ফলও বিশেষ পাওয়া যাবে না। এইজন্য নাম-কা-ওয়াণ্ডে গালভরা সিলেবাস না করে ছাত্রের সামর্থ্যের প্রতি-লক্ষ্য রেখে তা তৈরি করতে হবে।

অষ্টাঙ্গ জিনিষের সঙ্গে, মৌলিক রচনার প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে। ছাত্রকে শুধু মৌলিক রচনার মৌলিক উৎসাহ দিলেই কাজ হবে না; তাকে মাঝে মাঝে পথও দেখাতে হবে। লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনা করবেন যেন মৌলিক রচনার প্রতি তার আগ্রহ দিন দিন বাড়ে এবং তার মাল-মশলারও অভাব না হয়। সহায়ত্বপূর্ণ সমালোচনারও বিশেষ প্রয়োজন।

সকল ছেলের মৌলিক রচনা সমান ভাবে উত্থার না। এ বিষয়ে পারদর্শী ছাত্রছাত্রীদ্বয়কে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দানের প্রয়োজন। উৎসাহ ও সুযোগ পেলে তারা অনেক কিছুই লিখতে পারবে, কিন্তু সব কিছু শিক্ষকের পক্ষে দেখা সম্ভবপর হবে না, সংশোধন করা ত দূরের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে রচনা সংশোধন করা না করার বিশেষ কিছু আসে যায় না, আসল কথা হল প্রেরণা যোগানো। বড়ার জলে কিছু কাদামাটি থাকবেই, পরিষ্কৃত করতে গেলেই বড়ার জলে বাঁধ পড়বে এবং তা হবে বিলান জল। আরো বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত করতে হলে তাকে পুরতে হবে ছিপি-আটা বোতলে। পরিষ্কৃত এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হল পুলি ফেলানো, যার ফলে ক্ষেতে ফলবে সোনার ফসল। প্রেরণার উৎসাহ যদি ধুলে রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে স্বর্ণাধারার মত তা নিছক গতিপথ বেছে নেবেই এবং পরবর্তী কালে নদীর মত সুপের জল বিতরণ করবে।

ইংরেজী :—গত শতাধিক বৎসর ধরে ইংরেজীর মারফত শিক্ষাদানের কলে শিক্ষার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। এই ভুল অনেক আগেই ধরা পড়েছে এবং ছ-এক জায়গায় সংশোধন-কার্যও ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নিজাম রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে উর্দুর মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও চলছে, কিন্তু বাংলা-দেশ এ বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে বাংলা ভাষার মারফতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কাগজে-কলমে করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা চালু করার সুব্যবস্থা এখনো হয় নাই। অনেক পাঠ্য পুস্তক ইংরেজী ও বাংলার সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায় এক উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রেরা ক্লাসে শেখে আধা বাংলা আধা ইংরেজীর মারফত, কিন্তু পরীক্ষার হলে প্রায় আসে পুরোপুরি ইংরেজীতে। প্রায়ই বোঝে না তার উত্তর দিবে কি? জানা জিনিষও তাল-গোল পাকিয়ে গোলকর্ধার সৃষ্টি করে।

ম্যাট্রিকুলেশনে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তা এখনো ইংরেজী। মজা মন্দ নয়। যে ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষার মারফতে শিক্ষালাভ করছে, তারা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে হার্ডবু থেতে থাকে—না বক্তৃতা বোঝে, না কিছু শোনে। কাজেই কি মাতৃভাষা, কি বিদেশী ভাষা কোনটাই এরা আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে কলেজ দেয় স্কুলের শিক্ষার দোষ, স্কুল চাপায়, হয় প্রাথমিক শিক্ষার নয় কলেজের শিক্ষার খাড়ে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দোষত্রুটি যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছই-নৌকানু পা-দেবার নীতিই যে মুখ্যতঃ এর জন্ম দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এদেশে শিক্ষার বিদেশী ভাষার প্রকৃত স্থান যত নীচ নির্ধারিত হয় ততই মঙ্গল। বিদেশী ভাষাকে কোনক্রমেই মাতৃভাষার সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়। এতে মাতৃভাষা প্রচারের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। অথচ আমাদের দেশে বিদেশী বিমাতৃভাষাকে মাতৃভাষার অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। হাতে হাতে এর ফলও ফলছে। “ইংরেজী ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চারিদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইহুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।” (১) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কতখানি সত্য তা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না।

মাতৃভাষাকে সুবহেলা করার ভাব ও ভাষা ছই-ই হচ্ছে পজু। মাতৃভাষায় যারা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন না তারা বিদেশী ভাষার মারফত তা করবে কিরূপে? গাছের

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালায় মতই এটা হাফজর। অ-বরণ্যকে বরণ করবার ক্ষমতা অনিচ্ছায় অনাহারে এই যে ব্যর্থ সাধনা, এর স্বরূপ উপলব্ধি দেশবাসীর কবে হবে, কবেই বা এই অবস্থিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে? “বাংলা যার ভাষা সেই আমার ভূমিত মাতৃভূমির হয়ে” রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও “বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্যভেদী শিশুর-চুড়া বেঁটন করে পুঞ্জ পুঞ্জ থামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্তে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালী চিত্তের শুক নদীর রিক্ত পথে বান ভাকিয়ে বয়ে যাক, ছই কুল জাঙক পূর্ণ চেতনায়, বাটে বাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।”*

মাতৃভাষার সঙ্গে যে-কোন একটি বিদেশী ভাষা পার্শ্বে মনের ও জ্ঞানের প্রসার বাড়ে, এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলে তা মাতৃভাষার সমকক্ষ কোনক্রমেই নয়। মাতৃভাষা চক্ষু, বিদেশী ভাষা চশমা; একটি হস্ত ও পদ, অপরটি লাঠি। চশমা অন্ধকে চক্ষুদান করতে পারে না, লাঠি হস্তপদহীনের কোনো কাজে আসে না। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাব ও ভাষার উপর যতখানি দখল ও মৌলিক স্বাধীনতা, বিদেশী ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য ততখানি নয়। এর উদ্দেশ্য তিন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সাধারণ রূপে ভাবের আদান-প্রদান—স্বল্প-ভাবে পঠন, লিখন, ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশ। বিদেশী ভাষার স্থান তাই গৌণ।

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বর্তমান ইংরেজী সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন দরকার। তা নিম্নলিখিত রূপে গঠন করা যেতে পারে :—

প্রথম পেপার (লিখিত)	গত পত্র	(সংকলন)—৩০	নম্বর
	ব্যাকরণ	২০	১৫
	মর্মলিখন	১০	১০
	চিঠি	১০	১০
		৮৫	৮৫
		হোম-ওয়ার্ক	১৫
		মোট	১০০
দ্বিতীয় পেপার (ই) (লিখিত)	রচনা	২০	২০
	অনুবাদ	১৫	১৫
		৩৫	৩৫
		হোম-ওয়ার্ক	১৫
		মোট	৫০
			১৫০

তৃতীয় পেপার—প্রমোক্তর ২০ নম্বর	নির্বাচিত পুস্তক
(মৌখিক) সরব পঠন ১৫ "	হইতে
বক্তৃতা ১৫ "	ছবি অথবা পরিচিত বস্তু
মোট ৫০ নম্বর	ও বিষয় সম্পর্কে

মাতৃভাষা ও বিদেশী ভাষা পঠন ও পাঠদানে তফাৎ উদ্দেশ্যের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যবহারিকত্ব ও মৌলিকত্ব উভয়ই, বিদেশী ভাষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যবহারিকত্ব। সাধারণ ভাবে সাধারণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং সাধারণ রকমের পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করে মর্ম-গ্রহণ করতে পারলেই যথেষ্ট। এই উদ্দেশ্য অমুযায়ী মাতৃভাষার পাঠদান ও পাঠগ্রহণ পদ্ধতি সামান্য রদবদল করে ব্যবহার করা চলে। বস্তুতঃ, নোট-দান, নোট-গ্রহণ ও নোট-প্রস্তুত-প্রণালী স্থান-কালপাত্র ভেদে ও উদ্দেশ্য অমুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন করে ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ে পাঠদানে ও গ্রহণে প্রযোজ্য।

অঙ্ক-গণিত ও জ্যামিতি এ দুটির আবশ্যিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু এর মধ্যেও কতকটা নির্বাচন ও সংকোচন প্রয়োজন। ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত অঙ্ক এবং জ্যামিতিক উপপাত্ত ও সম্পাত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় তারই উপর ভিত্তি করে অঙ্কের সিলেবাসের সংস্কারসাধন করতে হবে। গণিতে খুব বেশী সংকোচন হয়ত সম্ভবপর হবে না, কিন্তু জ্যামিতিতে অনেকখানি ছাঁটাই ও বাছাই করতে পারলে ভাল। ব্যবহারিক দিক থেকে বীজগণিতের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তা একেবারেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। যদি একান্তই বাদ দেওয়া না চলে, তবে অঙ্ক-শাস্ত্রের একটি শাখা হিসাবে তার মূল নীতি ও বেছে বেছে গুটি-কয়েক ফরমুলা শেখানো যেতে পারে। ছাত্রের স্বল্প থেকে অনাবশ্যক চাপ যতটা কমানো যায় ততই সুফল দেবে। এই হিসাবে অঙ্কের সিলেবাস নিম্নোক্তরূপ হতে পারে—

(ক)	গণিত	৫০ নম্বর
(বীজগণিত বাদ দিলে)	জ্যামিতি	৩০ "
		৮০ "
	হোম-ওয়ার্ক	২০ "
	মোট	১০০ নম্বর
(খ)	গণিত	৪০ নম্বর
(বীজগণিত রাখলে)	জ্যামিতি	৩০ "
	বীজগণিত	১৫ "
		৮৫ "
	হোম-ওয়ার্ক	১৫ "
	মোট	১০০ নম্বর

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি :—বর্তমানে ভারতের ও ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের শাসন-পদ্ধতি বিভাগীয়পাঠ্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে লওয়া চলে। ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়, একটি না জানলে অপরটি ভাল ভাবে জানা যায় না। এই জন্য ইতিহাসের সিলেবাস নিম্নোক্তরূপ হওয়া উচিত—

ভারতের ইতিহাস	... ৫০ নম্বর
ভারতের শাসন-পদ্ধতি	... ৩০ "
চলতি ঘটনা	... ১০ " (মৌখিক)
	৯০ "
হোম-ওয়ার্ক	... ১০ "

মোট ... ১০০ নম্বর

অনেকের মতে বিদেশী যে-কোন একটি ইতিহাস পাঠ না করলে নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে না। এ কথা অতি সত্য। কিন্তু যারা নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেই অজ্ঞ, তারা অজ্ঞ দেশের ইতিহাসকে মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করবে কিরূপে? এইজন্য ইংলণ্ড, রোম অথবা গ্রীসের ইতিহাসের চেয়ে ভারতের শাসন-পদ্ধতি শিক্ষাদান বহুগুণে শ্রেয়ঃ। নাগরিকের পক্ষে দেশের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এ ছাড়া ভারতের ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি ভাল ভাবে পাঠ ও এ বিষয়ে পাঠদান করতে গেলে ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে না এসে পারে না।

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সাধন করতে না পারলে এগুলোর শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ। বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গীমিশ্রণে নিত্য নূতন ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি রচিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় ঘটাতে না পারলে ইতিহাস-পাঠ হয় নিতান্ত নীরস বস্তু।

ভূগোল ও বিজ্ঞান :—ভূগোল ও বিজ্ঞানের জন্য দুটি বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রয়োজন নেই, যদিও এই বৈজ্ঞানিক যুগে এগুলোর যত বিশদ আলোচনা হয় ততই ভাল। ছাত্রদের সময় ও সামর্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্রের মঙ্গলামঙ্গলই হ'ল আসল কথা। এখন প্রশ্ন, এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় এক প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে রাখা যায় কিরূপে? এতে পাঠদানই বা কতখানি সাক্ষ্যমণ্ডিত হবে? এর উত্তর এই যে 'সেকেন্ডারি শাখার মত গরুড়ান-গিরা কাটা' ছাড়া এ সমস্তা সমাধানের আর কোন উপায় নেই, প্যাচ খুলতে যাওয়াই তোকামি। বর্তমান ক্ষমতে সফল নাগরিক জীবন যাপনের জন্য কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না, অথচ পুরোপুরি শেখাও সম্ভবপর নয়; এ ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় কি? সিলেবাস নিম্নোক্ত রূপ হতে পারে—

ভূগোল—	৪০	নম্বর
বিজ্ঞান—	৪০	"
সাধারণ জ্ঞান—	১০	" (মৌখিক)
	৯০	"
হোম-ওয়ার্ক—	১০	"
	—	"
মোট—	১০০	নম্বর

এই ব্যবস্থার ভূগোল প্রায় পূর্ববৎই রইল। শুধু যে-বিজ্ঞানকে একটি পুরো প্রশংসা করে বাধ্যতামূলক করার কথা হচ্ছে, তাকে বিশেষরূপে ছাঁটাই করতে হবে। ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি নয়, বিজ্ঞানের মূলনীতি ও নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির সাধারণ ভাবে আলোচনা, যাতে এই সাধারণ জ্ঞানের অভাবে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের পদে পদে বিভ্রান্ত হতে না হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রাখলে সিলেবাস রচনা কতকটা সহজ হবে।

ধর্ম-ভাষা :—সংস্কৃত ও আরবী হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সভ্যতার আদি ভাষা হিসাবে এখনও বিশেষরূপে সমাদৃত। কোরাণ ও বেদ বুঝতে হলে সকলের এ দুটির চর্চা অত্যাবশ্যক। ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এই ভাষা দুটি শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি দেখে মনে হয় এগুলোর চর্চা ধর্ম-ভাষা হিসাবে সিলেবাসে স্থান পায়নি। একমাত্র ধর্মের বাহন হিসাবে বিবেচনা করলে আরবীর পরিবর্তে ফার্সী অথবা উর্দু ব্যবস্থা রাখা উচিত নয়। অনেকে বলবেন, ধর্মের মূল ভাষা না হলেও উর্দু ও ফার্সীর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার এত বিকাশ সাধিত হয়েছে যে, এগুলোকেও অংশত ধর্মভাষা বলা চলে। এর উত্তরে বলা যায়, আরবীর পরিবর্তে অন্য কোন ভাষার মারফত যদি ধর্ম-শিক্ষা করতে আপত্তি না থাকে, তবে বাংলার মারফতে শিক্ষা করলেই বা আপত্তি কি? হু'চার-আরগায় ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কাজও শুরু হয়েছে। মাতৃভাষায় পুরোপুরি ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান অজ্ঞতা অনেকখানি কমে আসত। মসজিদে ধোতবা পাঠ ও নমাজ বর্তমানে শতকরা ৯৯ জন বাঙালী মুসলমানের কাছেই ছর্বোধ্য। প্রার্থনার বিষয়বস্তুই যদি অজ্ঞাত রইল, তবে চরিত্রের উপর তা প্রভাব বিস্তার করবে কিরূপে? অথচ মাতৃভাষায় ধর্মশিক্ষা ও প্রার্থনা প্রচলিত হলে তা সহজেই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হবে।

মোট-কথা, শুধু ভাষা শিক্ষা হিসাবে আরবী ও সংস্কৃতের স্থান সিলেবাসে না রাখাই উচিত। এতে অথবা ছাত্রমনকে পীড়িত করা হয়। কারণ, একে তৃতীয় ভাষা, তাতে সপ্তম শ্রেণী থেকে যে ভাবে তার চর্চা হয় তাতে তার বৎসরে

ছাত্রদের এক রকম কিছুই শেখানো যায় না। তার বৎসর পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর চর্চা করবার সুযোগ আর না হওয়ায়, সংস্কৃত ও আরবী ফারসির যে চর্চা হয়েছে তাই ছাত্রেরা বেশ মালুম ভুলে যায়। একে শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায়? এরূপ ক্ষেত্রে হয় একে বাদ দিতে হয়, নয় উর্দু হিন্দী আরবী ফারসী ও সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পরিবর্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সত্যিকার ধর্মভাষা হিসাবে সংস্কৃত ও আরবীর চর্চা হলে, এই দুই ভাষার পরিবর্তে অল্প কোন ভাষা দেওয়া চলবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। ধর্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এই ভাষা-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে এর সিলেবাসের সংস্কার প্রয়োজন। তা নিম্নলিখিত রূপে করা যেতে পারে,—

ধর্মগ্রন্থ সংকলন (মূল ভাষায়)—	৪০	নম্বর	} লিখিত
মূল ভাষায় ব্যাকরণ	—২০	"	
হোম-ওয়ার্ক	—১০	"	
	১০		

বাংলা ভাষায় স্বধর্মের সার ও	} মৌখিক ও
অল্প ধর্মের উদার আলোচনা	
৩০	ব্যবহারিক

মোট ১০০ নম্বর

কলেমা-কালাম, রোজা নমাজ স্মৃতিভাবে সমাপন করবার জন্য কোরাণ শরীফের বৈশিষ্ট্যমূলক গুটিকয়েক ছোট ছোট ছুরা ও আয়াত দ্বারাই সংকলন রচিত হবে। তা সংখ্যায় অল্প হবে যেন এগুলির মর্ম ছাত্রেরা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে। আর একখানি গ্রন্থ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও সৌন্দর্য এবং অল্প ধর্মের তুলনামূলক উদার আলোচনা বাংলার মারফত ছাত্রদের সামনে ধরতে হবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্তও ঠিক অল্পরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

এই ব্যবস্থার কলে ছাত্রগণ হবে নিজ নিজ ধর্মে আস্থাভান ও পরধর্মসহিষ্ণু। স্বধর্মে অজ্ঞতা ও পরধর্মে অসহিষ্ণুতাই হ'ল বর্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ। স্বধর্মের আসল পরিচয়ের সহিত পরধর্মের সহানুভূতিপূর্ণ উদার আলোচনা মিলিত হলে এ বিরোধের অবসান হতে পারে। সর্বজাতীয় ছাত্রদের জন্য সার্বজনীন নীরব প্রার্থনা এবং যদি পারা যায়, বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আভয়রহীন প্রার্থনার ব্যবস্থা করলে বিশেষ সফল হবে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত স্কুলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম এর চেয়ে খুব বেশী প্রচলন সম্ভবপর হবে না। এটা গৃহের কাজ। মোট কথা, ধর্ম-ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাষা-শিক্ষা বা ধর্মাত্মতা বৃদ্ধি নয়, ধর্ম-প্রাণতা ও উদারতা; মানসিক উৎকর্ষ নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। ধর্ম-ভাষায় প্রকৃত হোম-ওয়ার্ক হবে স্কুলের শিক্ষাকে কুসংস্কারমুক্ত ধর্মকর্মে রূপায়ণ। প্রকৃত প্রভাবে, 'সুগৃহই হ'ল স্বধর্মনিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র।



**নারীজীবনের
চব্বিশ সার্থকতা**

মাতৃত্বের বিকাশ

নবজাতকের জননীকে নিঃশেষে কী মূল্যই না দেওয়া হতে হয়! তাঁর
জীবনীশক্তি হয় নিশ্চয়, স্বাস্থ্য যায় ভেঙ্গে।

যথাসময়ে তাঁর প্রতিকার না হ'লে মাতার স্বাস্থ্যহীনতা সম্বন্ধেও প্রতিফলিত হয়।

অথচ এ সকল উপসর্গের হাত থেকে পরিভ্রাণ পেয়ে স্বাস্থ্যক্সল জীবন তাঁরা
অন্যায়সেই ফিরে পেতে পারেন—যদি নিয়মিত “ডাইনোমর্ট” সেবন করেন।



ডাইনোমর্ট

**স্বতঃস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে
আদর্শ রসায়ন**

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ • কলিকাতা-১৩ GRASP/V/B1.

বাধ্যতামূলক প্রশ্নপত্র—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ :—

ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য পাঠ্য বিষয় দিন দিন বাড়ছেই এবং ছাত্রদের উপর অথবা ভার চাপানো হচ্ছে, এ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কথ্যটি ফেলবার মত নয়। এইজন্য বর্তমান সিলেবাসের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবিত সিলেবাসের তুলনা করা প্রয়োজন।

বর্তমান কোর্স

বাংলা ভাষা (লিখিত) —	২০০ নম্বর
ইংরেজী " —	২৫০ "
অঙ্ক " —	১০০ "
ইতিহাস " —	১০০ "
ভূগোল " —	৫০ "
ক্লাসিক " —	১০০ "

মোট—

৮০০ নম্বর

প্রস্তাবিত কোর্স

লিখিত	মৌখিক	হোম-ওয়ার্ক	মোট নম্বর
বাংলা ভাষা—	১৫০	৫০	২০০
ইংরেজী—	১২০	৫০	২০০
অঙ্ক—	৮০	—	১০০
ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতি }	৮০	১০	১০০
ভূগোল ও বিজ্ঞান—	৮০	১০	১০০
দ্বিতীয় ভাষা—	৬০	৩০	১০০
	৫৭০	১৫০	১৩০
			৮৫০

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত কোর্সকে খুবই গুরুভার বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ততখানি মনে হবে না। কারণ হোম-ওয়ার্কের জন্ম ১৩০ নম্বর নির্দিষ্ট থাকায়, হোম-ওয়ার্কের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে এবং শিক্ষা দান ও গ্রহণ সুস্থভাবে পরিচালিত হবে। তা ছাড়া জীল ভাবে কাজ করলে শতের কাছাকাছি নম্বর সহজেই মিলতে পারে। বর্তমানেও হোম-ওয়ার্ক হয়, তখনও হবে; খাটুনি সমান, অধচ পাসের পথ হবে পূর্বাপেক্ষা অনেকখানি প্রশস্ত। মৌখিকের জন্য ১৫০ নম্বর নির্দিষ্ট আছে। লিখিত অপেক্ষা মৌখিক বিষয়ে খাটুনি অধিক কম, অধচ নম্বর পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য কতকটা উপস্থিত-বুদ্ধি চাই।

নম্বরের তারতম্য ছাড়া আর এক দিক থেকে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক। সেটা হ'ল ম্যাট্রিকুলেশন কোর্সে পাঠ্য বিষয়ের প্রাচুর্য। বর্তমানে চলতি ঘটনা ও সাধারণ জ্ঞান ম্যাট্রিকুলেশনের কোর্স-বহির্ভূত। কোর্সের মধ্যে এদের টেনে আনা হয়েছে। শাসন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান এখন ঐহিক বিষয়,

এদের করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। এতে মনে হবে ছাত্রের মাধ্যম কি গুরুতর ভার চাপানো হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে সিলেবাস রচনার উপর কোর্সের গুরুত্ব বা লঘুত্ব যতটা নির্ভর করে, বিষয়ের প্রাচুর্যের উপর ততটা নয়।

সাধারণ ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন যাপন প্রণালী সুন্দর করতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই প্রত্যেক বিষয়ের সিলেবাস রচনার বেধে বাকীটা কেটে ছেঁটে বাদ দিতে হবে, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকেই যদি লক্ষ্য ধরা হয়, তা হলে সিলেবাস লঘু করা সহজ হবে। অনেকে আপত্তি করবেন, এতে জ্ঞান হবে ভাসাভাসা। কিন্তু আমার মনে হয়, সুস্থভাবে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ চললে এই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা যতখানি শিক্ষালাভ করবে ও বর্তমান জগতের সঙ্গে ভাল বেধে চলতে পারবে, বর্তমান সিলেবাসে তা সম্ভবপর নয়।

ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, উর্দু ও হিন্দীকে (যদি ইংরেজীর পরিবর্তে উর্দু ও হিন্দীর ব্যবহার না হয়) ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যাট্রিকের পর যারা আর্টস পড়বে, তারা নেবে ইতিহাস, যারা বিজ্ঞান পড়বে তারা হয় অঙ্ক নয় বিজ্ঞান এবং যারা কমার্স পড়বে তারা নেবে ভূগোল। উর্দু, হিন্দী ও ক্লাসিক যে কেউ নিতে পারবে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন—সিলেবাস পুনর্গঠন ও পাঠদান-পদ্ধতির অদল-বদল করতে পারলে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন কতকটা আপনা হতেই হবে। প্রস্তাবিত সিলেবাসকে কার্যকরী করতে হলে দুই রকমের পরীক্ষার প্রয়োজন হবে—আভ্যন্তর ও বাহ্য (internal & external)। হোম-ওয়ার্ক বিষয়ে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দই হবেন আভ্যন্তর পরীক্ষক। শিক্ষকের সততা, সত্যাহ্বার ও নিরপেক্ষতার উপর আভ্যন্তর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করবে। শিক্ষক সততা ও রিবেকের দ্বারা চালিত না হলে বিভিন্ন স্থলে হোম-ওয়ার্কের নম্বর দানে প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। প্রবাদ আছে, কোন শিক্ষক নাকি ধুশী হয়ে পরীক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১১০ নম্বর দিয়েছিলেন। তাঁর ছিল নিঃস্বার্থ ছাত্র-প্রতিভা-প্রীতি। কিন্তু এক্ষেত্রে হবে তার উল্টো—স্বার্থাঙ্গ ছাত্র-প্রীতি।

এর প্রতিকারের জন্ম প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধিবাহিনী চার পাঁচ জন প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়ে এক একটি জেলা আভ্যন্তর পরীক্ষক সমিতি গঠন করতে হবে। এই সমিতির কাজ হবে জেলার সমস্ত স্কুলের হোম-ওয়ার্কের নম্বর তদারক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা এখনকার মত বাহ্য পরীক্ষক দ্বারাই চলতে থাকবে।

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটি উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অল্পখেই হউক বা স্বস্থ ভাবস্থাতেই হউক, যখন কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটি টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহাৰ্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহাৰ্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটি দোষ এই যে উহা দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র স্থিতিশীল কোনো খাদ্যদ্বারা ই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্বাঙ্গীন উন্নতি দীৰ্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

আনা-ভিটা এই সকল কারণেই একটি আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

আনা-ভিটা স্থিতিশীল ও মূল্যবান উপাদানসমূহের স্বল্প সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্স, মণ্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা স্বস্থ কি অস্থস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ।

ভিটামিন “বি” কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া আনা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিশ্লবস্ত শরীরের ক্ষত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে আনা-ভিটা মস্তিষ্ক,

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

আনা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্টযুক্ত সয়াসীম আনা-ভিটার আর একটি অপূর্ণ সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। আনা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুগুণীর সৃষ্টি পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের স্থিতিশীল অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২.৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ আনা-ভিটাতে অগ্ন্যন্ত নানা মূল্যবান উপাদান ছাড়াও দুইটি ভিটামিনের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ আনা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে আনা-ভিটা কেবল যে স্বস্থাত্ম ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অগ্ন্যন্ত খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ণ খাদ্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত আনা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। আনা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অগ্ন্যন্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা ক্রত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্কি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় আনা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

আনা-ভিটা কি স্বস্থ কি অস্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। আনা-ভিটার মধুর গন্ধ ও স্মিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে।

বিজ্ঞাপন

পুস্তক - পাঠ্য

(১) জপজী—অথবা নানক-গীতা।

(২) জাপজী—অথবা গুরুগোবিন্দ সিংহের অমর-বাণী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ১০ আট আনা ও ১২ এক টাকা।

দুইখানি সমপর্যায়ের বই, সুতরাং এক সঙ্গেই সমালোচনা করা চলে। দুইখানিতেই শিখদের ধর্মগ্রন্থের কতক অংশের মূল বঙ্গানুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে দেওয়া বাংলা টীকা ও ব্যাখ্যা এবং অন্ত্যস্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সমার্থক বাক্য বই দুইখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইখানি বইয়েই গ্রন্থকারের দীর্ঘ 'মুখবন্ধ' রহিয়াছে। তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং বিপুল অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব আলোচনা মুখবন্ধে তিনি করিয়াছেন তাহাতে অনেক জানিবার এবং ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। বেদ, আবেত্তা, মহাভারত, ভাগবত, হাফেজ ইত্যাদি হইতে সমার্থক অথবা সমান-ভাব-বাস্তবক বাক্য এত উদ্ধৃত হইয়াছে যে, এই পাণ্ডিত্যের গুরুভার সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহন করা কঠিন হইলেও পণ্ডিত-পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিবে; অধ্যয়নে একটু আয়াস প্রয়োজন হইলেও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থকারের ভাষা জ্ঞানীর ভাষা। কিন্তু দুই একটি নূতন শব্দ এবং নূতন অর্থে পুরাতন শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি এই ভাষার কিছু হানি করিয়াছেন, মনে হয়। যথা,—বাংলা 'এবং' 'অথবা' 'আর' এই সংযোগার্থক অব্যয়ের

পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন 'কিঞ্চ', যথা—জপজী ৩য় পৃষ্ঠা, চৈতন্ত্য কিঞ্চ পরমহংস, ঐ ৩৬ পৃষ্ঠা, বুদ্ধ 'কিঞ্চ' জিন; ইত্যাদি। এই অর্থে 'কিঞ্চ' শব্দ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। দর্শন সম্বন্ধে প্রযুক্ত ইংরেজী orthodox শব্দের বাংলায় 'কুলীন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে (জাপজী—পৃ. ১)। কেন? 'আস্তিক' কথাটির কি অপরিণাম? 'কুলীন' শব্দের যে আরও একাধিক অর্থ রহিয়াছে। Epistemology শব্দের অনুবাদ তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া প্রমাণ-জ্ঞান বরং সঙ্গত, তত্ত্বজ্ঞানের ইংরেজী ontology হওয়া ভাল। Prophet (জাপজী পৃ. ৪) অর্থ 'অবতার' নয়। 'নবী' বা 'পয়গম্বর' ইহার অনুবাদ। শুদ্ধ বাংলায় 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ' শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবতারের ইংরেজী incarnation—মনে রাখা উচিত যে, ইসলাম অবতার মানে না, কিন্তু নবী মানে।

গ্রন্থকারের দুই একটি মন্তব্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। জাপজী ৪০ পৃষ্ঠায় চতুর্থীতে বেগুন খাওয়ার কথা উদ্ভূত। চতুর্থীতে নিষিদ্ধ ভক্ষ্য মূল্য, বেগুন নয়; বেগুন নিষিদ্ধ ত্রয়োদশীতে। লৌকিক হিন্দুধর্মের এই সব বিধিসে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকিতে পারে কিন্তু উল্লেখ করিলে জানিয়া লইতে দোষ কি?

জাপজী ১৬ পৃষ্ঠায় পাই—'mind and matter', সংস্কৃত দর্শনে বলা হয় 'প্রকৃতি ও পুরুষ'। এখানে অনুবাদে প্রথমতঃ ক্রম-ভঙ্গ হইয়াছে; বলা উচিত ছিল, 'পুরুষ ও প্রকৃতি।' দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত দর্শন অর্থ কি? ভারতের সব দর্শনই ত—জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সমেত—সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে।

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন?

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

“স্থানীয় আমানতে” জমা রাখুন।

সুদের হার			
৩ মাসের জন্ম	... ২½%	৫ ও ৬ বৎসরের জন্ম	... ৫%.
৬ " "	... ৩%.	" "	... ৫½%.
৯ " "	... ৩½%.	" "	... ৫¾%.
১ ও ২ বৎসরের	... ৪½%.	" "	... ৫%.
৩ ও ৪ " "	... ৪¾%.	১০ " "	... ৬%.

নিরাপত্তা?

কালী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে মূল্যবান জমি ছাড়াও সম্প্রতি আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় এবং হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্শ্বে ও মধ্যে আরও বহু জমি থরিদ করিয়াছি। এই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৪১

—নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটি ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

হেড অফিস : ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফোন :—কাল : ১৪৬৪—৬৫

টেলিগ্রাম :—“Aryoplants”

ত সুখ্যা ছাড়া আর কোন দর্শনই মানে নাই। 'জড়' আর ঠিক এক জিনিস নয়।

শ্রী ১৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ইসলামের সঙ্গে পার্শ্বদেব ধর্মের যে দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছেন তাহা কোন প্রকারে দেখাইতে পারিলেও সম্পর্ক তিনি বাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। নবী পরম্পরা মুশা ইহাতে আরম্ভ করিয়া মুহম্মদ পর্যন্ত আসিয়াছে, পার্শ্বদেব কোন বোণ নাই। ঐ গ্রন্থেরই ৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি ন—'গৌতমবুদ্ধ প্রচার করেন কর্মযোগ, আর বদ্ধমান জিন যেন জ্ঞানযোগ'। কোন অর্বে ঠিক বুঝিলাম না। সম্রাটের মতই সমান। জ্ঞানের কথা, দার্শনিক আলোচনা, বৌদ্ধদের ধর্ম, আর, পূজা পার্শ্ব ইত্যাদি বৌদ্ধদের অপেক্ষা ঐক্যবাদের কান্টা জ্ঞান আর কোনটা কর্ম?

র উদাহরণ বাড়াইতে চাই না। গ্রন্থকারের এরূপ আরও সম্ভব। আমরা গ্রন্থযোগ্য মনে করিতে পারি নাই।

র অধায়ন অধ্যবসায় এবং পরিভ্রম প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু মনে হয় তাহার সিদ্ধান্তগুলি একটু দ্রুত-গঠিত, অনেক সময়। একটা জিনিস তাহার দীর্ঘ আলোচনায় আমরা পাই না। শিখ-জাতি গঠন করিয়াছিল কি প্রকারে? শিখদের বর্তমান লক্ষের মত হইবে। পূর্বে নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। এই লোক মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তে সে শক্তির উৎস কোথায়? নামককে চৈতন্যের সঙ্গে তুলনা গ্রন্থকার বলিতেছেন—“চৈতন্যকে আমরা বলিতে পারি নির্বাক নামককে বলিতে পারি সবাক চৈতন্য” (রূপজী ৩৬ পৃ.)। এ ভিত্তিতে বাংলার মুদঙ্গ আর পঞ্জাবের কৃপাণের প্রভেদ ব্যাখ্যাত হয় শিখদের ধর্মকে শুধু ধর্ম হিসাবে দেখিয়া ইহাতে ভক্তিরসের

আধার উপভোগ করা এবং জরথুষ্ট্র, রামচন্দ্র এবং চৈতন্যের ধর্মের সঙ্গে উহার এক্য আবিষ্কার করা ইতিহাসিক গবেষণা হইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের ঘটনার ব্যাখ্যা তাহাতে হয় না। বীর শিখজাতির উদ্ভব তাহাতে বুঝা যায় না।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলা ১৩৫০—শ্রীইন্দু স্তম্ভ। বুক কোম্পানী, কলকাতা। চিত্র-পুস্তক। মূল্য দশ টাকা।

শক্তিমান তরুণ শিল্পী ইন্দু স্তম্ভ নন্দলাল বসুর ছাত্র। ইতিমধ্যে সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের সংশ্রবে আসিয়া তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানেও ছবি আঁকিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই চিত্র-পুস্তক সাতখানি ছবির সমষ্টি। প্রথমখানি সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমির পল্লীগ্রাম। দ্বিতীয়খানিতে মুক্তিফরিদ পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া শস্যহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তৃতীয়খানিতে নগরের পথে শীর্ণদেহ তাহাদেরই কন্ডজন খাণ্ডের আশ্রয় করণ আর্জনাৎ করিয়া ফিরিতেছে। চতুর্থখানিতে নগরীর গ্যাসালোকিত অন্ধকারে ডাষ্টবিনের পাশে তিনটি বড়ো প্রাণী। পঞ্চম ছবিতে দেবি স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া যুত্মর মধ্যে শ্রীর দীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হইল। ষষ্ঠখানিতে নির্জন নিশীথে ক্ষুধাতাড়িত পরিবারের অবশিষ্ট একটি মাত্র বালক নগর হইতে দূরে ধু-ধু মাঠের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। সপ্তম চিত্রে সমাপ্তি—একটি গাছের তলায় কয়টি ককাল; উল্লসিত তৃণ এবং অরুণাভাস সমাপ্তির মধ্যেও

নেতাজীর অনুসরণে :—

বাংলার বিখ্যাত স্নাত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও তাহার “শ্রী” মার্কা স্নাতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিম্নয়োজন। আজকাল বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ‘শ্রী’ স্নাতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল স্নাতের যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্নাত যে ব্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা স্নাত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয়।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

স্বচনার ইঙ্গিত করিতেছে। প্রচ্ছদপটে বাংলার সবুজ মানচিত্র; ভূগভূমিতে দুটি মড়ার মাথা এবং সবেমাত্র গজাইয়া উঠিতেছে একটি গাছ। বাংলার যে মধ্যাত্তিক ব্যাধি রঙে ও রেখায় চিত্রকর ফুটাইয়াছেন, এই চিত্রমালা প্রত্যেক দরদীর মনে সেই বেদনা জাগাইয়া তুলিবে।

রহস্যময়ী—শ্রীভার্যাপদ রাহা। সেন ব্রাদার্স এও কোং। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

এখানি ছোট গল্পের বই। আটটি গল্পে গুস্তকথানি সম্পূর্ণ। গল্পগুলি গতানুগতিক নয়, প্রেমের কাহিনীও নয়। সচরাচর সাংসারিক জীবনযাত্রার মধ্যেও কখনও কখনও এমন মুহূর্ত আসে এবং এমন ঘটনা ঘটে যাহাকে প্রাত্যহিক এবং সাধারণ বলা চলে না। এই গল্পাষ্টকে বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে জীবনের সেই অ-সাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ গল্পটির নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। এ কাহিনী যে রহস্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে শুধু মরণই তাহার আবরণ উন্মোচন করিতে পারিয়াছে। যুতু-রটনার মধ্য দিয়া “সাহিত্যিক” স্বভাঙ্গন হইয়াছেন। আর একটি গল্পে একটি ছয়-সাত বৎসরের ছোট মেয়ের দেওয়া ছেঁড়া কাগজের টিকেট তাপসের আত্মহত্যার ইচ্ছাকে শিথিল করিয়া দিল। একটি যোগক্লিষ্ট কচি মুখের আকর্ষণ দারুণ শুচিবাসুগ্রস্ত মহীতোষের

মানসিক ব্যাধির আয়োগ্যের কারণ হইয়াছে। এক সমস্ত “উর্কশী” গল্পের পাঠকের নিকট সমাবান করিতেছে। গল্পগুলি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। শ্রীভা রাহা ছোট গল্প লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। “রহস্য” তাহার ব্যাতি অক্ষর রাখিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ

প্রান্তিক—শ্রীভার্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দি পাবলিশিং হাউস, ২২১ কণ্ঠয়ালাশি ষ্ট্রিট, কলিকাতা। তিন টাকা।

‘প্রান্তিক’ উপন্যাসের প্রারম্ভে ‘শ্রীমান ভার্যাপদ’ ‘অবাস্তব মারকতে কিছু অভিযোগ আনিয়াছেন। নিতান্ত দৈববশ সাহি এই নামের দুই জন লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে এইরূপ অবশ্যভাবী। অবশ্য বাপারটি ব্যক্তিগত লাভক্ষতির সীমানার মহাকালের দরবারে নিরপেক্ষ বিচারের আশাসে আবৃত্ত হওয়াটী কতিন বলিয়াই দুই পক্ষ ইহাতে প্রচুর অশান্তি ভোগ করেন ক্ষেত্রে কেহ কাহাকেও অথবা আক্রমণ না করিয়া (অর্থাৎ উপর অশান্তি না বাড়াইয়া) যথাসম্ভব রক্ষা-নিশ্চিন্তি করিয়া লই দিক দিয়া শোভন হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ স্বত্ব প্রমাণের বিরল নয়।

একটু সাবধানী পাঠক ‘ধাত্রী দেবতার’ লেখকের সঙ্গে প্রান্তিক লেখকের পার্থক্য অনানুসারে বুঝিতে পারিবেন। তবুও গল্পপ্রিয় পাঠকে ‘শ্রীমান ভার্যাপদ’ের লেখা নিতান্ত সময়কটানো বা নিম্ন

দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯২৯
(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

পৃষ্ঠপোষক—এইচ, এইচ, মহারাজা মানিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই., ত্রিপুরা।

রেজিঃ অফিস—আধাউড়া

প্রধান অফিস—আগরতলা

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে)

(ত্রিপুরা স্টেট)

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১০২১, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, ৭৭নং, ক্লাইভ ষ্ট্রিট (রাজকাটার)

২০১নং হারিসন রোড, ১০৯নং শোভাধাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

অনুদানিত মূলধন—

৫০,০০০,০০

বিক্রীত মূলধন—

২২,৫০০,০০

আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল—

১৪,৯৫০,০০

টাকার উপর

আমানত

৩,৫০,০০০,০০

টাকার উপর

কার্যকরী তহবিল—

৪,০০,০০০,০০

টাকার উপর

প্রাঞ্চসমূহ—কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুটী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ফেঁচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদ বদরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মোলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগ গোলাঘাট, তিনহুকিয়া, নরলক্ষ্মীপুর, টাংলা, গোহাটা, ডিব্রুগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য করা হয়।

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বাছিয়া লওয়া কটনই ঠেকিবে। পুরাতন বিষয়-বস্তুকে চলিয়া লইবার দক্ষতা লেখকের আছে। গল্প বলার ভঙ্গী তরল এবং সবচেয়ে প্রশংসার বিষয় অত্যন্ত তরল বিষয়কেও তিনি পঙ্কিল করিয়া তুলেন নাই।

গণাবলী সম্বন্ধে পাঠক বলিতে পারেন আত্মবিশ্বস্ত নায়ককে স্তম্ভ নিলিগু করিয়া গড়িয়াছেন। ভালবাসার স্পর্শ তার বৃত্তিকে ঘাড়ে—তবু সে সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়। নায়িকাও আত্ম-সচেতন বৃত্তিসম্পন্ন। ভালবাসার অনুভূতিতে তার চিত্ত আলোড়িত, যাকে লাভ করিয়া সব দিক দিয়া যে সার্থক হইতে পারিত—মনর তীব্র আকাজ্জবশতঃ সেই গৃহ সে ছাড়িয়া গেল। এই যে ঘরে তেলিয়া দিবার আরোজন—বাহিরের সামান্য মাত্র বাধার চূড়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বাস্তবকে অবহেলা করিয়া এই ব্যবধানের কি আরোজনই বা ছিল—এ প্রশ্নও পাঠক রিতে পারেন।

স্বাভাবিক উদ্দেশ্য কি গৃহকে অস্বীকার করা? তেমন বৃহত্তর স্মারিকার সম্মুখে ধরা হয় নাই।

প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক হইয়াছে এবং গল্প পড়ার কোঁতুল হয় রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সিনেমা-মূলভ ভাষার দ্বারা কয়েক সন্ধিপ্ত করার চেষ্টাকে যুগ্ম প্রয়োগ বলা যায় না।

চিত্র হৃদয়—ঐশ্রীতিভা বহু। কবিতা ভবন, ২০২, রাস-হনিট, কলিকাতা। নাম—দুই টাকা।

গ্রন্থের মধ্যে গুণীজনোচিত, খণ্ড কাব্য, বিচিত্র হৃদয় ও অন্তহীন গল্প আছে। 'এই চারটি গল্পের মধ্যে একটি হুরই আমি হইতে গেয়েছি।' লেখিকার এই স্বীকারোক্তি পাঠক সানন্দ চিত্তে প্রবেশ। মানবমনের বিচিত্র লীলা, প্রধানতম বৃত্তি ভালবাসাকে

আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রকাশিত। সংবেদনশীল মন ও নিপুণ প্রকাশ-ভঙ্গির দ্বারা লেখিকা এই হুরের ইলজাল বুনিয়াদেছেন। মূলতঃ হুর এক হইলেও অপূর্ণ ব্যঙ্গনায় ও বিচিত্র রসমাধুর্য্যে প্রতিটি গল্প অভিব্যক্ত। কেবলমাত্র প্রথম গল্পটির পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু অনুযোগ করা যায়। এ সম্বন্ধে লেখিকা সচেতন হইলেও বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসে অলৌকিক এক পারিপার্শ্বিকের সাহায্য লইয়াছেন। গল্পটির অন্তর্নিহিত রস এতদূর কিছু ফিকা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মণিকাকুন (প্রথম খণ্ড)—শ্রীধাণ্ডকুমার গুপ্ত। পাল প্রকাশনা নিকেতন, ২০৩২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বিদেশী-সাহিত্যের অনুবাদে ও শিশুসাহিত্য-রচনার গ্রন্থকার খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পূজা-বার্ষিকীর সম্পাদনা কিশোর-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা তাঁহার সংগৃহীত, প্রখ্যাত ও উদীয়মান বহু সাহিত্যিকের নানা রসদস্তাবে পূর্ণ অজস্র কথা ও কাহিনীর একত্র সমাবেশ উপহার পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। যুগোপযোগী বহু কবিতা ও সচিত্র গল্প ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ একখানি বই ছেলেদের উপহার দিলে অর্থব্যয় সার্থক হইবে। একটি ক্রটির কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক।

নিয়মিত স্বদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে :—

১ বৎসরের ক্ষমতা শতকরা বার্ষিক ৪৮০ টাকা

২ বৎসরের ক্ষমতা শতকরা বার্ষিক ৫৮০ টাকা

৩ বৎসরের ক্ষমতা শতকরা বার্ষিক ৬৮০ টাকা

সাধারণতঃ ৫০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিড প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ করিলে উপরোক্ত হারে স্বদ ও তদুপরি ঐ টাকা শেষারে ষাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত লাভের শতকরা ৫০ টাকা পাওয়া যায়।

১৯৪০ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা স্বদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেষার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমরা কাজকারবার করিয়া থাকি। অল্পগ্রহপূর্বক আবেদন করুন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস সিঙ্ক্রিকেট

লিমিটেড

৫১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম "হনিকব"

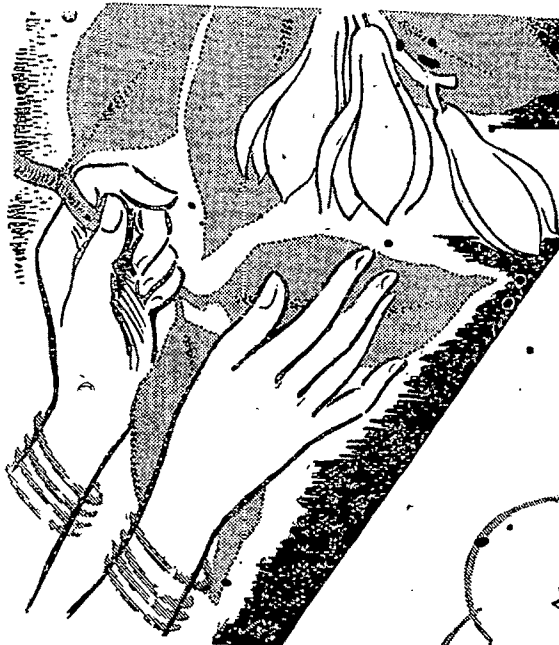
ফোন ক্যাল ৩৩০১

গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনা—(গান্ধীজীর ভূমিকা-সম্বলিত) শ্রীমদ্রায়গ অগ্রবাল। অম্ববাদক—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। পূর্বশাঃ লিঃ পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিহু। মূল্য—দুই টাকা।

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের আগমনের পর হইতে ভারতের রাজ-নৈতিক বঙ্গমঞ্চে ক্ষত পটপরিবর্তন হইতেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ অবশ্যস্বাবী হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে অনেকেই মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন আসন্ন বলিয়া আশার সঞ্চার হইতেছে। স্বাধীনতা সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই আমরা অর্জন করিব। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করিলেই শুধু হয় না, অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থাই হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য এবং সেইজন্যই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে—বর্তমানে স্বাধীন ভারতের গঠন-তন্ত্র প্রণয়নের, ব্যাপক চেষ্টাও চলিতেছে। অধ্যক্ষ শ্রীমদ্রায়গ অগ্রবাল তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে যে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহা একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রধানতঃ গান্ধীজীর চিন্তা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই এই পরিকল্পনাটি রচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি লইয়া গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যে নূতন তথ্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন তৎসমুদয়ও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা শুধু গান্ধীজীর মতামতের প্রতিধ্বনিই নয়, লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারাও ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। গান্ধীজী ভূমিকায়

বলিয়াছেন “কাঠামোটি বাস্তবিক অধ্যক্ষ অগ্রবালই দাঁড় করিয়াছেন, তবে ইহাতে এমন কিছু লেখা হয় নাই যাঁহা আদর্শের সহিত ঝাপছাড়া বলিয়া আমার মনে হইয়াছে।” অগ্রবালের ইংরেজী পুস্তকখানি বাংলায় অম্ববাদ করিয়া নারায়ণ চৌধুরী বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করি পুস্তকখানির প্রকাশ বিশেষ সমরোপযোগী হইয়াছে। রাষ্ট্রবিধির ব্যর্থতা, আত্ম-সম্প্রদায় রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যাত্ৰিক ও নাগরিক সভ্যতা মানব-জাতিকে ধ্বংসের কে গহ্বরে টানিয়া লইয়া বাইতেছে, পর পর অম্লভিত দুই তাহা দিবালোকের গায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিধিই যে এই ধ্বংসলীলার জর্জর মুখ্যতঃ দায়ী তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তাই মহাত্মা গান্ধী আজ পাশ্চাত্য অম্বকরণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং অম্ববায়ী অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কবিরহিত স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত হইলে আবার ‘রামরাজ্য’ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন ভারতের গ্রামে গড়িয়া উঠিবে রাষ্ট্রের স্মৃতি বনিয়াদ। কুটির-শিল্পের দয়ের নিকট বঙ্গদানবের উদ্ধৃত শির অবনত হইবে।

পুস্তকখানি রাজনৈতিক গঠনমূলক কণ্ঠে অম্ববায়ী, পাঠকমাত্রের অবশ্যপাঠ্য। অম্ববাদের ছত্রে ছত্রে ভাষ্য লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। এরূপ দুর্লভ এমন স্বচ্ছন্দ অম্ববাদ কম কৃতিত্বের কথা নহে।



ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

দুর্লভ নম্র মোটে

তলুদেহের পেলব কোমলতা ও লুবধামণ্ডিত স্তম্ভা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃতিকৈবজ্ঞানিক যুগে পক্ষে এ সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে কেমিকো'র সমস্ত প্রস্তুত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্য্য প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

☆ তুহিনা বিউটিফাই
☆ স্বেনুকা টয়লেট পাউডার
☆ লাবনী স্নো এবং ক্রীম

দীর্ঘ লেখা—প্রকাশক শ্রীশরণ দাস। মডার্ন পাবলিশিং কোম্পানীর কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই পুস্তকটি একখানি সম্বলন-গ্রন্থ। ইহাতে রূপকথা, গল্প, অল্পবান-সাহিত্য, নাটক, রাজনীতি ও অর্থ-নীতি, দর্শন, এবং সাহিত্য ইত্যাদি সকল প্রকারের লেখা আছে। যে সমস্ত খ্যাতিমান লেখকের রচনা ইহাতে সংগ্রহ করা হয়েছে তাই তাইরাশ্রয় বস্তুপাঠ্যের ‘আরগ্যক’ উপরিস্থিত গোষ্ঠীর ‘বেগুনি সম্রাট’ নামক গল্প দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সম্বলন-গ্রন্থ সম্পাদকের আসল কৃতিত্ব লেখকদের রচনা-নির্বাচনে। শান্তি রায় প্রমুখ কয়েকজন লেখকের রচনার মধ্যে আমরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় পাই। এই পুস্তকে কিশোর-পাঠকদের জন্য শুধু যে আনন্দ-স্বরূপ আয়োজন করা হয়েছে তাহা নয়, ইহার সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা-তাহাদের মনে গভীর ভাবনারও উদ্রেক করিবে এবং এর-মানে আদর্শবাদের সঞ্চার করিয়া তাহাদের দৃষ্টিকে স্বদেশ-পালের দিকে সম্ভারিত করিবে। গোপাল হালদারের ‘ভারত’ নামক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি পড়িয়া কিশোর পাঠক-ইংরেজ-শোষিত ভারতবর্ষের আসল চেহারা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি একদিকে যেমন বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ। অল্প দিকে তেমনি রূপসজ্জায়ও অনবদ্য। এর বহিঃস্থ পরিচ্ছিন্নতা, মুদ্রণ-পারিপাট্য ইত্যাদির দিক দিয়া পাবলিশার্স অল্পকাল মধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন,

‘শতাব্দীর লেখা’ তাহাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং পুস্তক-খানিও, বিশেষভাবে প্রবন্ধ-গৌরবে—বাংলা-কিশোর-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীললিনীকুমার ভদ্র

কুড়ায়ে এনেছি—বারা ফুল—শ্রীবাবীন দাশগুপ্ত।
শ্রীধর্ষ পাবলিশিং হাউস, ৭৭, হারিসন রোড, কলিকাতা।

ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট সবই সুন্দর। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান, অবজ্ঞাত অবহেলিত দরিদ্র মানব-সমাজের প্রতি লেখকের মন সহানুভূতিসম্পন্ন। ক্রিয়াপদের বানানে অভিনব দেখাইতে গিয়া যে পন্থা লেখক অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে উৎসাহ দেওয়া যায় না। দুই চারিটি, যথা—চোলতে, কোরে, হোয়েছে,

সদ্বিপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে

এমকো প্রডাক্টস লিমিটেড-এর

বাসাস্টোন

(স্বর্ঘ ও রাসায়নযুক্ত বাসক সিরাপ)

আদর্শ মহোপকারী টনিক

সর্দি, কাশি, হাঁপানী ও নিউমোনিয়ার পর শরীরকে
স্বস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে ইহা অদ্বিতীয়।

৮ আউন্স শিশি ৩/- ৪ আউন্স শিশি ১৬/-

ষ্টকিষ্ট—রাইমার এণ্ড কোং, কলিকাতা

শিশুদের পক্ষে যাতুস্তন্য অতুলনীয়



কিন্তু স্তন্য-দুগ্ধ যখন কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার সুবিধা থাকে না, তখন “ভিটা-মিল্ক” নির্বিঘ্নে বাড়ন্ত শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা নির্দোষ দুগ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। ইহা সেবনে শিশুদের দাঁত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য স্ঠাম হইয়া উঠে। দুর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা সুপথ্য। ভিটা-মিল্ক গত সাত বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সন্তান, প্রসূতি-আগার ও হাসপাতালে স্নানামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।



ভিটা-মিল্ক

ম্যাক্সিমাল নিউট্রিয়েন্টস্ লি: ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

বোলছেন। বানান ভুলও আছে যথা—নির্ভিক, ভুল, ভীর, বৃহদ ইত্যাদি।
এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও, এই সাম্প্রদায়িক সমস্তার দিন জাহার 'ভিখারী' নামক
গল্পটি অন্তর স্পর্শ করে।

শ্রীতারাপদ রাহা

শেওলা—শ্রীশ্রীল জ্ঞান। প্রকাশক—শ্রীঅমল বসু, ৩০২,
বোম্বাইর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখক করেকট গল্পে বর্তমান বাংলার দুঃখ-হৃদশার এমন চমৎকার
চিত্র অঙ্কন করিয়াছে যা শুধু মনকে দোলা দেয় না—হৃদয়ে স্থায়ী আসন
পাইবার দাবি রাখে। সব গল্পই সমান হৃদয় না হইতে পারে কিন্তু
সমগ্রভাবে এই গল্প-সংগ্রহ সত্যই উপভোগ্য। পল্লীবাংলার গণ-জীবনের



ঠিকানাটা লিখিয়া
রাখুন

Mr. P. C. SORCAR
Post Box 7878
Calcutta.

ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম
যাহুকর শ্রীযুক্ত পি. সি.
সরকারকে engage
করিতে হইলে এখানেই
পত্র দিবেন।
ট্রেডমার্ক 'SORCAR'
বানান লিখিতে ভুল
করিবেন না।

বিজ্ঞপ্তি

বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মি
লিমিটেডের অংশসমূহের মূল্য তালিকা চা
ইংরাজী ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ বা
পূর্বে পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ মত বন্ধ
হইবে।

প্ল্যাটারস্ সিণ্ডিকেট লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্

এসভেনর হাউস

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস,
কলিকাতা

উৎকৃষ্টতম উপায়ে

টাকা খাটাইতে চাহেন?

আমাদের “স্বাস্থ্য আনন্দ” জমা রাখুন

সুদের হার

১	বৎসরের জন্ম শতকরা ৩।০	৭	বৎসরের জন্ম শতকরা ৪।০
২	” ” ৪.০	৮	” ” ৫.০
৩ ও ৪	” ” ৪।০	৯	” ” ৫।০
৫ ও ৬	” ” ৪।০	১০	” ” ৫।০

ইহা নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”,—কলিকাতা।

কবির নিবিড় পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়কে তিনি রঙে-রঙে রঞ্জিত ও রসায়িত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীফাজলী মুখোপাধ্যায়

ফুলের স্বপ্ন—শামসুদ্দীন। চরনিকা পাবলিশিং হাউস, দায় এক টাকা।

এনে মহান স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ কবিকে প্রেরণা রচনা সহজ, সুকুমার। প্রথম কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, মোহনলাল প্রভৃতির পবিত্র স্মৃতি এবং পরবর্তীতে মহৎ আদর্শ রূপ নিয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তু জগদ্বন্ধু—ব্রজচাঁদী শ্রীমৎ পরমলবধু দাস, কলিকাতা। মামকান্ত মিত্র লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১১০ + মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সঙ্কীর্ণ-ন-ধর্মের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উদ্বোধনকারী আবাল্য ব্রজচাঁদী প্রভু জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ-ঢাহাপাড়াই এক এসিদ্ধ ভক্ত ও ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর এবং বাকলা গ্রামে বধাক্রমে শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত করিয়া পরিণত

বয়সে নামধর্ম ও প্রেমধর্ম বিতরণে তিনি বঙ্গবাসীর হৃদয় বেতাবে জয় করিয়াছিলেন সেই সব অপূর্ণ লীলাকথা আলোচ্য গ্রন্থে ভক্ত ব্রজচাঁদী কর্তৃক সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ নয়নারী এই গ্রন্থ পাঠে প্রভু জগদ্বন্ধুর পুণ্যময় জীবন-কথা জানিয়া নিশ্চিত উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউশন

—লিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সক্যুসার

আই, সি, এস (রিটার্ড)

দেশ-বিদেশের কথা

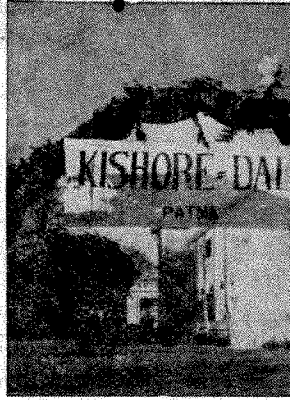
নিখিল-ভারত কিশোর-সম্মেলন

পাটনার কিশোর-দলের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সম্মেলিত এক নিখিল-ভারত কিশোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এ ধরনের অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

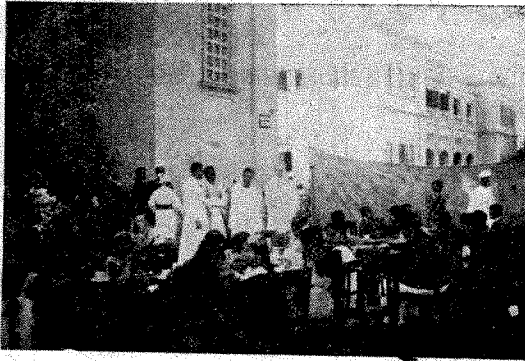
তিন দিন যাবৎ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রথম দিন পতিত আসন গ্রহণ করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস-জলর সার চন্দ্রশেখরপ্রসাদ সিংহ। তাঁহার অভিভাষণে সরকারকে এই অভিনব আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক্য প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিশোর-দলের সভাপতি শ্রীমত মণিচন্দ্র সমাদারের অভিভাষণের পর,

সংগঠক শ্রীরঞ্জিত সিংহ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীমন্তা সুরমা সেন। সন্ধ্যার পর “ক্যাম্প-ফায়ার” হয়। দ্বিতীয় দিন “শিশু-দ্বিবস” পালন করা হয়। শিশু-বাসর, “দেশ-বিদেশের-ছেলেমেয়ে” নামক সচিত্র প্রদর্শনী (যা ইতিপূর্বে এদেশে আর কোথাও হয় নাই), নৃত্য-গীত-অভিনয় এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর সেদিনকার আসর শেষ হয়। তৃতীয় দিন কিশোর-সংগঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যার ক্লিকোর্ড আগ্রওয়াল; প্রথমে অধ্যাপক শিবকুমার মিত্র “কিশোর ও

সংস্কৃতি" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে "কিশোর-আলোচনা" সম্পর্কে আলোচনা হয়। অধিবেশনটি শেষ সাক্ষাৎমণ্ডিত ইয়াছে এবং দেশবাসী সর্বক্ষেত্র কিশোর কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।



কিশোর সম্মেলনের প্রবেশ দ্বার



কিশোরদের পাঠ



মণ্টেক্সের স্থলের ছাত্রী

ছেন। ডাক্তার গুপ্ত ১৮৯৬ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠ নগরে এক সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধা-হিসাবে কৈশোরে খ্যাতিলাভ করিয়া ১৯১৮ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ইনি ডাক্তারী পাশ করেন। মহাযুদ্ধে সাড়ে তিন বৎসর আই. এম. এস. রূপে ক্যান্সার পদবী লাভ করেন। পরে ইনি উক্ত ক্যান্সার লগুনে চর্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষা লাভের



ডাক্তার অমর গুপ্ত

করেন। সেখানে ১৯২৩ সালে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ অধিকার করিয়া চেষ্টারকিল্ড পদক লাভ করেন। তিনি মেডিকেল কলেজ, ক্যামব্রিজ কলেজ ইত্যাদিতে চিকিৎসা শিক্ষা দিতেন এবং যাবতীয় চর্মরোগের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি স্বতন্ত্র পূর্বে বৎসরাধিককাল হনাদোয়া দারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু সে সময়েই সচিবতার সহিত কথাবাক্য বলিতে পারেন।

এর নিবিড় পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়কে তিনি
ডে-রসে রঞ্জিত ও রসায়িত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

হলের স্বপ্ন—শামসুদ্দীন। চরনিকা পাবলিশিং হাউস,
। দাম এক টাকা।

নে মহান স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ কবিকে প্রেরণা
রচনা সহজ, অক্ষমার। প্রথম কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ,
চন্দ্রশেখর, মোহনলাল প্রভৃতির পবিত্র স্মৃতি এবং পরবর্তী
পটে মহৎ আদর্শ রূপ নিয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তু জগদ্বন্ধু—রাজচাঁদী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস, কলিকাতা।
রমকান্ত মিত্র লেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১১০ +
মূল্য এক টাকা মাত্র।

হরিনাম সঙ্গীত-ন-ধর্মের অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ উদ্বোধনকারী আবাল্য
রাজচাঁদী প্রভু জগদ্বন্ধু মুর্শিদাবাদ-ঢাকাপাড়া এক প্রসিদ্ধ ভক্ত ও
ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর এবং
পদ্মা গ্রামে যথাক্রমে শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত করিয়া পরিণত

বয়সে নামধর্ম ও প্রেমজ্ঞান বিতরণে তিনি বঙ্গবাসীর হৃদয় বেতাবে জয়
করিয়াছিলেন সেই সব অপূর্ব লীলাকথা আলোচ্য গ্রন্থে ভক্ত ব্রহ্মচারীজী
কর্তৃক হৃনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ নরনারী এই গ্রন্থ পাঠে
প্রভু জগদ্বন্ধুর পুণ্যময় জীবন-কথা জানিয়া নিশ্চিত উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সটিটিউশন

—নিমিটেড—

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

চেয়ারম্যান—সি, সি, দত্ত এক্সক্যুসিভ
আই, সি, এস (রিটার্ড)

দেশ-বিদেশের কথা

নিখিল-ভারত কিশোর-সম্মেলন

পাটনার কিশোর-দলের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে
ত এক নিখিল-ভারত কিশোর সম্মেলন অহুষ্ঠিত হইয়া
ছে। ভারতবর্ষে এ ধরনের অহুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

তিন দিন যাবৎ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রথম দিন
পতির আসন গ্রহণ করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-
জলের সার চন্দ্রশেখরপ্রসাদ সিংহ। তাঁহার অভিভাষণে
সরকারকে এই অভিনব আন্দোলনের প্রতি আহ্বান
নাশ করিবার জন্য অগ্রবোধ করেন। কিশোর-দলের
পতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্বারের অভিভাষণের পর,

সংগঠক শ্রীরঞ্জিত সিংহ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে
শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্তা হুম্মা
সেন। সন্ধ্যার পর “ক্যাম্প-ফায়ার” হয়। দ্বিতীয় দিন
“শিশু-দ্বিবস” পালন করা হয়। শিশু-বাসর, “দেশ-
বিদেশের-ছেলেমেয়ে” নামক সচিত্র প্রদর্শনী (যা
ইতিপূর্বে এদেশে আর কোথাও হয় নাই), নৃত্য-গীত-
অভিনয় এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর সেদিনকার আসর শেষ
হয়। তৃতীয় দিন কিশোর-সংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব
করেন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ক্লিফোর্ড
আগরওয়াল; প্রথমে অধ্যাপক শিবকুমার মিত্র “কিশোর ও

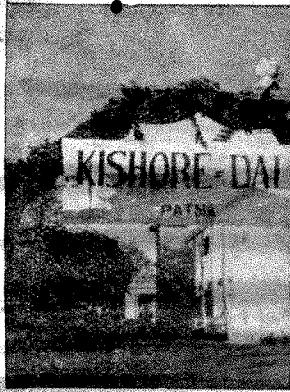
ডাকারেরা বলেন

ব্রাদ-ভিটা

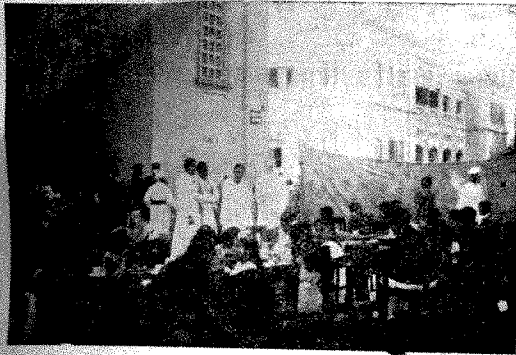
সর্বলভ্য ও অমূল্য যে কোন ব্রাদ-ভিটা টিকিট ও ব্রাদ-ভিটা

সর্বজনীন মন্ডল
মোটরকারি
সি১০, কলিকাতা

সংস্কৃতি" এই বিষয়ে
বক্তৃতা প্রদান করেন।
তৎপরে "কিশোর-
আন্দোলন" সম্পর্কে
আলোচনা হয়। অধি-
বেশনটি শেষ সাফল্য-
মণ্ডিত হয়েছে এবং
দেশবাসীর সম্মুখে
কিশোর কল্যাণমূলক
প্রচেষ্টার নতুন আদর্শ
স্থাপন করিয়াছে।



কিশোর সম্মেলনের প্রবেশ দ্বার



কিশোরদের পাঠ



মণ্টেক্সের স্থলের ছাত্রীদল

ডাক্তার অমর গুপ্ত

বিগত রবিবার ১২ই মার্চ শেষরাতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ
চর্মরোগ চিকিৎসক ডাক্তার অমর গুপ্ত পরলোকগমন করিয়া-

ছেন। ডাক্তার গুপ্ত ১৮৯৬ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠে
নগরে এক সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধা-
হিসাবে কৈশোরে খ্যাতিলাভ করিয়া ১৯১৮ সালে কলিকাতা
মেডিকেল কলেজ হইতে ইনি ডাক্তারী পাশ করেন।
মহাযুদ্ধে সাড়ে তিন বৎসর আই. এম. এস. রূপে কাজ
করাপট্টেন পদবী লাভ করেন। পরে ইনি উক্ত কাজ
লগ্নে চর্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষা লাভের সু-



ডাক্তার অমর গুপ্ত

করেন। সেখানে ১৯২৩ সালে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ
অধিকার করিয়া চেষ্টারফিল্ড পদক লাভ করেন। তিনি এ
মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ ইত্যাদিতে চর্ম
চিকিৎসা শিক্ষা দিতেন এবং যাবতীয় চর্মরোগের চিকিৎসা
বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে বৎসরাধিককাল হারারোগ্য ব্যা-
দাক্রম কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু সে সময়েও তিনি অ-
সহিষ্ণুতার সহিত রোগী ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সহ-
কথাবার্তা বলিতেন। এই অমায়িক সজ্জনের মৃত্যুতে কলি-
কাতার একজন নিপুণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশিষ্ট না-
হারািল এবং ডাক্তার আত্মীয়বন্ধন ও বিদ্বত বন্ধু
অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ভ্রম সংশোধন

৫৮৯ পৃষ্ঠার 'প্রবাসী' কবিতার লেখকের নাম 'শ্রী-
প্রসাদ দাসগুপ্ত'র স্থলে 'শ্রীঅর্জুনপ্রসাদ দাসগুপ্ত' হইবে